যুবক : হে প্রিয়তমা, আমি তোমায় কোট দিয়েছিলাম
বাড়ি গিয়ে বাবা-মাকে বলবো
যখন সেতু পার হচ্ছিলাম
সে কোট হাওয়ায় গেছে উড়ে।

ভূতপূর্ব 'চম্পা' ও বর্তমান ভিয়েৎনামের সঙ্গে শ্রীতারণ আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন সার্থকভাবে। তাঁর এই বইটি সকলেরই ভালো লাগবে। (৫০২।৫৮)

অনুবাদ সাহিত্য

শ্রীমতী আর্ভের—তরু দত্ত। অনুবাদক : পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত। মূল্য—চার টাকা।

তরু দত্তের মন নিজেকে বিদেশী ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করলেও তা ঠিক মধুসূদন দত্তের ইংরেজি ভাষায় প্রথম পর্বের সাহিত্যচর্চার মতো অসম্পূর্ণ নয়। 'অসম্পূর্ণ' কথাটিকে শক্তিগত স্বল্পতার বিচারদণ্ড করে এখানে ব্যবহার করা হয়নি, প্রবণতার স্বাভাবিক সংস্থিতির দিকে চোখ রেখেই বলা হয়েছে। তরু দত্ত রূপকথার মতো বিদেশকে ভালবেসেছিলেন, মধুসূদন দত্তও। তবু মধুসূদনের সেই ভালবাসা শক্তি-পরীক্ষার বা পৌরুষচর্চার দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণীয়; তরু দত্তের ভালবাসায় নারীত্বের গোপনতা ও সৌগন্ধ্য পরিপূর্ণরূপে ধরা পড়েছিল। শ্রীমতী আর্ভের সেই ভালবাসারই ফল। মূল ফরাসী উপন্যাস থেকে অনুবাদ-কালে পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে-দক্ষতা দেখিয়েছেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূমিকাটি সুন্দর। এই গ্রন্থের বহুল সমাদর একান্ত কাম্য। (৩৬০/৫৮)

ওয়াল্‌ডেন—হেনরি ডেভিড থোরো। অনুবাদক : কিরণকুমার রায়। প্রকাশক—গ্রন্থম্‌, ২২।১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলি-৬। দাম—১.৫০।

বিগত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের অন্যতম থোরো। তাঁর 'ওয়ালডেন' ইংরিজী জানা শিক্ষিত লোকমাত্রেরই শ্রদ্ধেয়। স্বেচ্ছায় বনবাসী হয়েছিলেন থোরো। সেই নির্জনবাসরের ফসল এই গ্রন্থ; মানব-জীবনের চূড়ান্ত সত্য নিয়ে আলোচনা, মহৎ চিন্তার প্রকাশ।

অনুবাদক কিরণকুমার রায়ের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। তাঁর ভাষা ঝরঝরে। অনুবাদের মধ্যে ইংরিজী কোথাও এসে খোঁচা দেয় না। পাদ-টীকাগুলি জুড়ে দেওয়াতে পাঠকের সুবিধা হয়েছে খুব। অনুবাদককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(৫৮৫।৫৮)

তোমাদের চারিদিকে। ইলিন ও সেগাল। রুশ থেকে অনুবাদ করেছেন তরুণা বসু। প্রকাশক : ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী, ৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মূল্য এক টাকা বারো নয়া পয়সা।

শিশুদের চারিদিকের যন্ত্রবিশ্ব শিশুদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। সেই বিস্ময়ের কাহিনী এই পুস্তিকায় বিবৃত। অনুবাদিকার ভাষা-মাধুর্য প্রশংসনীয়; বইয়ের ছবিগুলিও ছোটোদের আকর্ষণ করবে। বইটির সমাদর স্বাভাবিক। (৬৭৯/৫৭)

বিবিধ

গোবরডাঙা হিন্দু কলেজ পত্রিকা (১৩৬৫) —সম্পাদক : শ্রীঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

অন্য দশটা কলেজ পত্রিকার মত আলোচ্য পত্রিকাখানিতেও ছাত্রছাত্রীগণের রচনার সহিত অধ্যাপকগণের রচনাও স্থান পাইয়াছে। তা ছাড়া পত্রিকাখানির শেষাংশে একটি ইংরাজী বিভাগও রহিয়াছে। এই ইংরাজী বিভাগে আছে প্রবন্ধ, কবিতা আর জীবনী। ছাত্রদের লেখাই বেশী। বাংগলা বিভাগে আছে এগারোটি কবিতা, চৌদ্দটি প্রবন্ধ এবং গল্প ও রম্য রচনা এগারোটি। গল্প ও কবিতায় প্রথম প্রচেষ্টার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট, তা হইলেও সম্ভাবনাময়। 'পথের রক্ত' পাঠককে অভিভূত করিবে নিশ্চয়। কয়েকটি প্রবন্ধ অতি সংক্ষিপ্ত—ফলে আকর্ষণীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই, কয়েকটি লেখা চিন্তার খোরাক জোগাইবে। রচনা ছাড়াও ছাত্রদের অংকিত কয়েকটি ছবিও আলোচ্য সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রিকাটির ছাপা ও প্রচ্ছদপট অতি সুন্দর।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে :—

কেরী সাহেবের মুন্সী—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।
আধুনিক যৌন বিজ্ঞান—ডাঃ হ্যানা স্টোন ও ডাঃ আব্রাহাম স্টোন। অনুবাদক—সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়।
মৌন মুখর—শ্রীজিতু গুপ্ত।
মন-ময়ূরীর নাচ—কন্দর্পকান্তি মুখোপাধ্যায়।
আগুনের বাঁশী—সেখ আবদুল ওহাব।
দীপক—শ্রীতারকেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।
সোভিয়েত রাজ্যে অনুপস্থিত ও প্রয়োজনাতিরিক্ত শ্রমিক, সোভিয়েত রাজ্যে শ্রমিক—এনাতোলে শাব।
আর্ভিলে বাগদাদ—শিশিরপ্রসাদ সর্বাধিকারী।
জলতরংগ—বনফুল।
নক্ষত্রের রাত—মতি নন্দী।
ভাস্বতী—শ্রীসুধাংশুরঞ্জন ঘোষ।
দুরি বৌদি—অবধূত।
শুভায় ভবতু—অবধূত।
সকাল সন্ধ্যার নাটক—সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
সবিতা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য।
অপরূপা—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।
দু কুনকে ধান—ওকেযী শিবশংকর পিল্লাই অনুবাদ—মলিনা রায়।
মাটির মানুষ—কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী অনুবাদ—সুশ্বলতা রাও।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

চন্দ্রশেখর

শিল্পীর জীবনাবসান

গত ৫ই মার্চ প্রখ্যাত চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর ৫৪ বৎসর বয়সে তাঁর দক্ষিণ কলকাতা বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর বৃদ্ধা জননী, স্ত্রী ও একমাত্র ছোট ভাইকে রেখে গেছেন। শ্রীভট্টাচার্য নিঃসন্তান ছিলেন।

১৯২৫ সালে ম্যাডান থিয়েটারের নির্বাক চিত্র "সতীলক্ষ্মী"তে শ্রীভট্টাচার্য প্রথম অবতরণ করেন। বাংলা ছবির সেই নির্বাক যুগ থেকে আরম্ভ করে এ-কালেও সবাক যুগে শিল্পী হিসাবে তিনি সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করে গিয়েছেন। ধীরাজ ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে বাংলা ছবির দুই বিচিত্র যুগের একটি সেতু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। বাংলা চিত্রের অনতিদীর্ঘ ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গিয়েছিলেন তিনি। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে বাংলা রজতপটে এসেছে নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোড়ন, শুরু হয়েছে নবদিগদর্শনের বিপ্লব। প্রতিভাধর শিল্পী বাংলা ছবির এই নব-উন্মেষের স্রোতের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য না হারিয়ে অপরূপভাবে মিশিয়ে দিয়েছিলেন নিজেকে। তাই মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন আগেও তিনি চিত্রনির্মাতাদের কাছে ছিলেন অপরিহার্য। অসুস্থ অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বে নিজের বাড়িতেই "অপরাধ" নামক একটি নির্মীয়মান ছবির একটি দৃশ্যে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল তাঁকে।

ধীরাজ ভট্টাচার্য

নতুন যুগের দাবীর কাছে কখনও শিল্পী হিসাবে তিনি কুণ্ঠা প্রকাশ করেননি। বাঁশী হাতে বৃন্দাবনের কিশোর কৃষ্ণ সেজেছিলেন তিনি, পরবর্তীকালে তাঁকে দেখা গেছে প্রণয়ী নায়কের ভূমিকায়। এ-কালের চাহিদা মেটাতে তিনি অবতীর্ণ হলেন বিশিষ্ট 'টাইপ' চরিত্রাভিনয়ে।

পূর্ববর্তী যুগের চিত্ররসিকেরা আজও ভুলতে পারেন নি তাঁর অনবদ্য অভিনয় "সোনার সংসার", "অভয়ের বিয়ে", "অভিনয়", "দ্বন্দ্ব", "আহুতি", "সমাধান", "বিদেশিনী", "কতদূরে", "ব্যবধান", "এপার-ওপার", "মিলন", "নীলাঙ্গুরীয়", "কলঙ্কিনী", "বাংলার মেয়ে", "সহধর্মিণী", "পথ হারার কাহিনী", "মানে না মানা", "শহর থেকে দূরে" প্রভৃতি ছবিগুলিতে। তেমনি একালের দর্শকের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে তাঁর অপূর্ব কৃতিত্ব "ডাকিনীর চর", "হানাবাড়ী", "মরণের পরে", "কঙ্কাল", "নিয়তি", "চীনের পুতুল", "কালোছায়া" প্রভৃতি ছবিগুলিতে।

বাংলা সবাক চিত্রের গত রজত-জয়ন্তী উৎসবে যখন তাঁকে সম্মানিত করা হয় তখন সম্মান-প্রাপ্যকদের নাম ঘোষণাকালে বাংলা ছবির আরেকজন 'ভিলেন'—চরিত্রাভিনেতা বিকাশ রায় বলেছিলেন, "He is a better villain than anyone of us"। কুচক্রীর অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহে যেমন এই প্রখ্যাত নট দর্শকদের উষ্মা ও ক্রোধ জাগাতে সমর্থ হয়েছেন, তেমনি তিনি দর্শকের মন করুণ ব্যথার সুরে ভরে দিয়েছেন "ময়লা কাগজ" ও "আদর্শ হিন্দু হোটেল"য়ে তাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয়ে। মাত্র ৩৫ বৎসর কালের মধ্যে তিনি প্রায় দু'শোর কাছাকাছি ছবিতে অভিনয় করেছেন। যে কোন শিল্পী-জীবনের পক্ষে এটা অম্লান গৌরব।

শুধু চলচ্চিত্রপটেই নয়, মঞ্চেও সমান সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। কালিকা নাট্যমঞ্চের সঙ্গে তিনি প্রথম থেকেই জড়িত ছিলেন। সৌখিন নাট্যসম্প্রদায় "শিল্পশ্রী"র বিভিন্ন নাটকে তিনি অভিনয় করেন। মঞ্চে "আদর্শ হিন্দু হোটেলে" তাঁর হাজারী ঠাকুরের চরিত্রে অভিনয় আজও নাট্যামোদীদের আলোচনার বস্তু।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্য যশ অর্জন করেছিলেন। যখন "দেশ" পত্রিকায় তাঁর "যখন নায়ক ছিলাম" ও "যখন পুলিশ ছিলাম" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখন পাঠকমহলে আলোড়নের সৃষ্টি হয়। এর আগে "সাজানো বাগান" বইয়ের মাধ্যমে তিনি পাঠকবর্গের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে ধীরাজ ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন যাঁরা তাঁদের বন্ধু-বিয়োগ-ব্যথার গভীরতা বাইরে থেকে অনুমান করা

সূচীপত্র

সম্ভব নয়। অন্তরের অনেকখানি দিয়ে তিনি বন্ধুদের আপন করে কাছে টেনেছেন। উদার প্রাণের প্রাচুর্যে তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়।

অমায়িক ও অকপট প্রকৃতির এই লোকটির মধ্যে ছিল অপরিমেয় রসবোধ। যে কোন বৈঠকে অনাবিল হাসির বন্যা বইয়ে দিতে পারতেন তিনি একা। সদালাপী এই বন্ধুবৎসল শিল্পীর বাকচাতুর্য পরিচিত মহলে তাঁকে খুবই আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। সরলতায় মেশা এই বাকচাতুর্যে ব্যথা পায়নি কেউ কোনদিন।

নিষ্ঠা ও দরদ ছিল তাঁর স্বভাবের বিশেষ গুণ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে এই বিরল চরিত্র-সম্পদের জন্য তিনি জয়ী হয়েছিলেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগে জীবনপথের এই ক্লান্তপথিক চেয়েছিলেন আত্মিক শান্তি। মৃত্যুর পূর্বে মধুপুরে থাকাকালীন তিনি মোহনানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

ধীরাজ ভট্টাচার্যের মৃত্যুতে বাংলা চলচ্চিত্রশিল্প তার একজন নিরলসসেবীকে হারাল। বাংলা ছবির ক্ষেত্রে তাঁর পরলোক-গমনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হল সহজে তা পূর্ণ হবে না। ধীরাজ আজ মরদেহে নেই; কিন্তু বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তাঁর স্থান অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁর লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি।

চিত্রালোচনা

ছবিতে ছবিতে ছয়লাপ বলবো না—তবে পাঁচখানি নতুন ছবি গুনে গুনে নিতে পারবেন এ সপ্তাহে। বাংলায় দুখানি—প্রভাত প্রোডাকশন্সের তৃতীয় নিবেদন "বিচারক" ও রূপ-জ্যোতির ভক্তিমূলক ছবি "ঠাকুর হরিদাস"। হিন্দী ছবি তিনটির নাম—পুষ্পা পিকচার্সের "দুলহন", সিপ্পী ফিল্মসের "ব্ল্যাক ক্যাট" ও ইউনিটি ফিল্মসের "সাচ্চে কা বোলবালা"।

প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত ও পরিচালিত "বিচারক" ছবির রাজ্যে বাংলার অগ্রগতির বাহক হয়ে এসেছে। ছবিখানি সম্বন্ধে আমাদের বিস্তারিত অভিমত এই সংখ্যাতেই প্রকাশিত হ'ল।

যবন হরিদাসের ভক্তজীবনের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে "ঠাকুর হরিদাস" চিত্রে। নির্মলকুমার নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, অন্যান্য ভূমিকায় নেমেছেন সুমিত্রা দেবী, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, তপতী ঘোষ, শোভা সেন ও নবাগত মলয়-কুমার। গোবিন্দ রায়ের পরিচালনায় তোলা এই ছবিতে সুরযোজনা করেছেন অনিল বাগচী।

প্রভাত প্রোডাকসন্সের "বিচারক" ছবির দুটি মুখ্য নারীচরিত্রে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও দীপ্তি রায়।

হিন্দী ছবির জগতে ঘরোয়া কাহিনী পরিবেশন করে যিনি সুখ্যাত হয়েছেন, "দুলহন" সেই বি এম ব্যাসের নবতম অবদান। নিরুপা রায়, রাজকুমার, নন্দা, জীবন, জাগীরদার, ভগবান ও আগাকে নিয়ে এর প্রধান ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। রবি এতে সুরসৃষ্টি করেছেন।

"ব্ল্যাক ক্যাট" রহস্য-রোমাঞ্চে ভরা একটি ক্রাইম ড্রামা। এন এ আনসারী এর পরিচালক। মুখ্য ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন বলরাজ সাহনী, মীনু মমতাজ, জনি ওয়াকার প্রমুখ জনপ্রিয় শিল্পিবৃন্দ। পরিচালক স্বয়ং একটি বিশিষ্ট চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। এন দত্ত সংগীত পরিচালনা করেছেন।

যে ধরনের হাসি-তামাশা নাচ-গান ও চিত্তোত্তেজক ঘটনার সমাবেশ থাকলে হিন্দী ছবির দর্শকরা খুশী হন, তারই প্রচুর আয়োজন করেছেন পরিচালক ভগবান তাঁর নতুন ছবি "সাচ্চে কা বোলবালা"-তে। তাঁর সঙ্গে চিত্রাবতরণ করেছেন কুমকুম, চন্দ্রশেখর, রাধিকা ও কাক্কু। নিসার এর সুরকার।

বিবেকের বিচারশালায়

মানুষের তৈরী বিচারালয়ের বিচারককেও একদিন নতমস্তকে এসে দাঁড়াতে হয় আপন বিবেকের সওয়ালের সামনে। দণ্ডদাতার জীবনেও বুঝি অতর্কিতে এমন মুহূর্ত আসে যখন সে নিজের দণ্ডবিধানের জন্য অধীর হয়ে ওঠে। আত্মবিচারের ন্যায়

সূচীপত্র

দেবার নির্মম ক্ষণটি কি করে এক বিচারকের জীবনে একদিন অপরিহার্য্য হয়ে দেখা দেয়, তাই নিয়ে গড়ে উঠেছে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় রচিত "বিচারক" গল্পের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা। প্রভাত প্রোডাকসন্সের "বিচারক" জটিল মনোবিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত এই অপরূপ কাহিনীর এক অনিন্দ্যসুন্দর চিত্ররূপ।

ছবির আখ্যানভাগের শুরু আদালতে এক দায়রা মামলার শুনানীকালে বিচারকের আসনে আসীন প্রবীণ গম্ভীর জ্ঞানেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন তাঁর জজিয়তি ভগবান-গিরির চাইতেও কঠিন। তিনি জানেন তাঁর রায় নির্ভুল। তাঁর আদালতে বিচিত্রধরণের মামলা আসে একটার পর একটা। এমনি

এক মামলার আসামী নগেন—সে তার ছোট ভাইকে খুন করেছে। ওদের মাঝখানে ছিল গ্রামের স্বৈরিনী প্রকৃতির তরুণী বিধবা চাঁপা। সরকারী উকিল প্রমাণ করেন, আসামী এই নারীর আকর্ষণে অন্ধ ও উন্মত্ত হয়ে স্নেহ-মমতা-কর্তব্য ভুলে নদীর বুকে ডুবন্ত ভাইকে গলা টিপে মেরেছে। স্তব্ধ বিচারকের মন বুঝি কেঁপে ওঠে। আসামী নগেন যেন এক বিরাট জিজ্ঞাসার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়ায় তাঁর সামনে। তাঁর প্রথমা স্ত্রী সুমতির মৃত্যুর জন্য কি তিনিও এমনিভাবে দায়ী নন?

চাকরীর প্রথম জীবনে সুমতিকে নিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ এসেছিলেন জেলার সদর শহরে থার্ড মুন্সেফ হয়ে। জেলার জজসাহেব ছিলেন সুমতিরই মামা। ব্রাহ্ম হয়ে যৌবনে বাড়ী ছেড়ে চলে আসেন তিনি। সুমতি মামার কথা ভুলেই গিয়েছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের চাকরীর সূত্র ধরে দুই পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে। জজসাহেবের আধুনিকা শিক্ষিতা মেয়ে সুরমা সরল প্রকৃতির ভগিনপতিকে পেয়ে আনন্দে মশগুল। তাদের অন্তরঙ্গতা ভালো চোখে দেখে না ঈর্ষাতুরা সুমতি। একদিন স্পষ্টই জানিয়ে দেয় সে বোন সুরমাকে যে রাহুর মতোই সুরমা যেন তার জীবনকে গ্রাস করতে চলেছে। বোঝাপড়া সে করতে চায় জ্ঞানেন্দ্রনাথের সঙ্গেও।

সুমতির অন্তরে গভীর জ্বালা; একদিন সুরমা সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্নে সে জর্জরিত করে তোলে জ্ঞানেন্দ্রনাথকে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সুরমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথা স্বীকার করেন। কিন্তু একথাও বলেন যে স্বামী হিসাবে তিনি সুমতির প্রতি অবিচার করেন নি। সুমতি ক্রোধে আত্মহারা হয়ে সুরমা ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের একত্রে তোলা ফটো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জ্বলন্ত ফায়ার প্লেসের মধ্যে ফেলে দেয়। তবে মধ্যে তাদের চিঠিগুলোও।

সেই আগুন লাগে ঘরে। দেখতে দেখতে সমস্ত বাড়ীতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকুণ্ড থেকে সুমতিকে প্রায় বাঁচিয়ে এনেছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। কিন্তু শেষ সময় নিজের বাঁচার কথা ভেবে সুমতির হাতটা ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি।

জ্ঞানেন্দ্রনাথের জীবনে এর পর সহধর্মিনী হয়ে আসে সুরমা। জ্ঞানেন্দ্রনাথের ক্ষত-বিক্ষত জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চায় সুরমা। কিন্তু হঠাৎ সেদিন আসামী নগেনের বিচার করতে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিজেরই বিচারক হয়ে পড়লেন। বাঁচতে চেয়েছিল সুমতি—পরম বিশ্বাসে সে হাত বাড়িয়ে ধরেছিল জ্ঞানেন্দ্রনাথকে। সে হাত ছাড়িয়ে নেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ। তিনি কি তাহলে খুনী নন? সুরমার প্রতি আকর্ষণের জন্যই হয়তো আত্মবিসর্জন করতে পারেননি ধর্মপত্নীর জন্য। ধর্মের

বিচারে অপরাধী জ্ঞানেন্দ্রনাথ। সুরমা তাঁকে প্রেরণা দেয় ভগবানের কাছে নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিজেকে শুদ্ধ করে তুলতে।

পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁর মননশীল পরিচালনায় কাহিনীর নিগূঢ় নাট্যমর্মটিকে আবেগনিবিড় করে চলচ্চিত্র-পটে উপস্থাপিত করেছেন। বক্তব্যকে স্পষ্ট করবার জন্য অনেক জায়গায় তিনি সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনার আশ্রয় নিয়েছেন। কোন কোন দৃশ্যের নাট্যরসকে সহজগ্রাহ্য করতে গিয়ে তিনি ইঙ্গিতেরও অবতারণা করেছেন যথেষ্ট। পরিমিত ও সুকল্পিত এই ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিত ছবিতে বিশেষ নাট্য-মুহূর্ত গড়ে তোলার ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে। ছবির শেষের দিকে সুমতির ছবির ওপরে সুরমার ছায়া ফেলে দুই নারীর আগমনের মধ্য দিয়ে তিনি জ্ঞানেন্দ্র-নাথের জীবনের স্বন্দ্বটিকে অতি চমৎকার-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাথরুমের জানালার কাচে, আগুনের ছটা দেখে জ্ঞানেন্দ্রনাথের 'আগুন আগুন' বলে চীৎকার করে ওঠার দৃশ্যটিও ছবিতে নাট্য-আবেশ সৃষ্টি করে। জ্ঞানেন্দ্রনাথের মনে বিভিন্ন ঘটনা ও কথার প্রতিক্রিয়ার সূত্র ধরে ফ্ল্যাশব্যাকে দর্শকদের জ্ঞানেন্দ্রনাথের অতীত জীবনে নিয়ে যাওয়ার মধ্যেও পরিচালকের অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ফ্ল্যাশব্যাকের উপস্থাপন নাট্যসূত্র ব্যাহত হয়নি। চিত্রনাট্য রচনায়ও পরি-চালক এমন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন যে সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের উপর গড়া এই কাহিনীর গতি ও পরিণতি সর্বক্ষণ দর্শকদের নিবিষ্ট করে রাখে। ছবির বিভিন্ন দৃশ্যের উপস্থাপনে পরিচালকের শিল্পীমনের পরিচয় যেমনি পাওয়া যায়, তেমনি মেলে তাঁর সূক্ষ্মরসবোধ ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রমাণ।

তবে অনেক সময় খুব চড়া সুরে ছবির নাটকটিকে বাঁধতে চেয়েছেন পরিচালক। ফলে অনেক সময় দর্শকমনে একটি নাট্য-স্পন্দনের রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি এসে সজোরে আঘাত করে। মানুষের ভুল-ভ্রান্তি-পদস্খলন নিয়ে তৈরী এই নাটকে হয়তো দর্শকের মনে সুখের রেশ আনতে পারে এমন ঘটনার অবকাশ কম। তবে নাটকের সুরটিকে একটু চড়িয়ে দিলে দর্শকমনে তথাকথিত একটু নাট্যস্বস্তি আসতে পারত।

আসামী নগেনের পাপাচারের কাহিনী শুনে বিচারকের মনের প্রতিক্রিয়া ও নিজেকে অপরাধী ভাবার মধ্যে কাহিনীর মূল নাট্যরস নিহিত। ছবির শেষ দৃশ্যে সুরমার জ্ঞানেন্দ্রনাথকে তার অপরাধের কথা বলা ও তাকে গ্লানি থেকে বাঁচার উপদেশ দেওয়ার মধ্যে সুরমা চরিত্রটির প্রতি দর্শকের সহানুভূতি টানবার প্রচেষ্টা রয়েছে। মূল কাহিনীর অনুসরণে ছবিতে জ্ঞানেন্দ্রনাথকেই নিজের বিচারক ও আত্মগ্লানি থেকে বাঁচার পথ নিজেকেই খুঁজে বের করতে দেখানো হলে ছবির নাটকীয় আবেদন হয়তো আরও হৃদয়গ্রাহী হত! কারণ বিচারকের জীবনের যে অপরাধ দর্শকের বিবেকবোধকে পীড়িত করে তার সংগে সুরমা'ও জড়িত।

সর্বাঙ্গীন-ভাবে দেখতে গেলে ছবিখানি কৃতী পরিচালকের একটি অভিনন্দনযোগ্য চিত্রসৃষ্টি এবং নিঃসন্দেহে বাংলা চিত্র-শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। জটিল মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকায় লেখা তারাশংকরের এই কাহিনীর এমন মহৎ চিত্ররূপের জন্য পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় চিত্ররসিকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করবেন।

ছবির মুখ্যচরিত্র রূপায়ণে উত্তমকুমার যে বলিষ্ঠ অভিনয়ের প্রমাণ দিয়েছেন তা তাঁর শিল্পীজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব

DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 20th December, 1958

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৮ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৫ই পৌষ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

ভূদানপত্রে মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেলের একটি প্রবন্ধের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। রাসেল প্রবন্ধটির নাম দিয়াছেন "এক সাধারণ মানুষের আবেদন।" অর্থাৎ বিশিষ্ট ব্যক্তি বা মনীষী হিসাবে নয় একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে মানুষের কাছে আবেদন জানাইয়া এক গুরুত্বের সমস্যা উপস্থাপিত করিয়াছেন। মানব সভ্যতার ধ্বংসের আশংকার চেয়ে আর কী গুরুতর হওয়া সম্ভব? রাসেলের আবেদনের বিষয়টি নূতন নয়, আগেও তিনি অনেকবার বলিয়াছেন, অপরাপর মনীষিগণও বলিয়াছেন, তৎসত্ত্বেও পুনরুক্তি আবশ্যক। কিন্তু বাঁহারা কুণ্ডে প্রবেশোচ্ছু পতঙ্গ শুভাকাঙ্ক্ষীর নিষেধ বাক্য শুনিবে কি? রাসেলের বক্তব্যের কিয়দংশ আমরা উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

তিনি বলিতেছেন—

"এখানে আমি যা কিছু বলতে যাচ্ছি তা কোন ইংরেজ বা ইউরোপীয় কিংবা কোন পশ্চিমী গণতন্ত্রের সদস্যরূপে নয়, পরন্তু একজন মানুষ হিসেবে মানবজাতির এক সজীব অঙ্গরূপে—যে মানবজাতির অস্তিত্বই আজকের দিনে আশঙ্কাজনক হয়ে উঠেছে। আজ সংঘর্ষে সবাই মেতেছে। দৃষ্টান্ত অনেক। তার মধ্য থেকেই আমি কয়েকটির উল্লেখ করবো। নিজের অভিজ্ঞতার দাবীতে স্যর জন শ্লেসর আকাশ যুদ্ধ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু বলবার অধিকারী। তিনি বলেছেন, "আজকের দিনে এই বিশ্ব যুদ্ধের অর্থ হল সার্বজনীন আত্মঘাত।" তিনি আরও বলেছেন, কোন একটি বিশেষ অস্ত্র বর্জন করার মধ্যে অতীতেও কিছু লাভ হয়নি, ভবিষ্যতেও কিছু হবার নয়। আমাদের আজ যার মূল উচ্ছেদ করতে হবে তা হলো যুদ্ধ।

এক সাধারণ মানুষের আবেদন

সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ শারীরবিদ লর্ড এড্রিয়ান সম্প্রতি এবিষয়ে পরিপূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি একথা অস্বীকার করতে পারি না যে, বার বার পরমাণু বিস্ফোরণের দ্বারা যে তেজস্ক্রিয়তা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে—যা কেউ সহ্য করতে পারবে না, এবং এর হাত থেকে রেহাই পেয়ে পারবে না বাঁচতে। এ ধরনের অনেক উদাহরণ আমি উপস্থাপিত করতে পারি।।"

উদ্ধৃত অংশ হইতে দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয় পাওয়া যাইতেছে। প্রথম, কোনও বিশেষ ধরনের অস্ত্র নিষিদ্ধ হইলেই বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা নিবারিত হইবে না। দ্বিতীয়, নামত না হইলেও কার্যত আণবিক যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

প্রথমটার কথা আগে পাড়িয়া লই। আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ হইলে সমস্যার সমাধান হইবে কি? আণবিক অস্ত্র ছাড়াই মানুষ সভ্যতার উষা হইতে লড়াই করিয়া আসিতেছে। দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে। কাজেই আণবিক অস্ত্র সংবরণ করিলেও যুদ্ধ বন্ধ হইবার কারণ নাই। তারপরে একবার গতানুগতিক অস্ত্রে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে আসন্ন পরাজয়ের সম্মুখে আণবিক অস্ত্র ব্যবহারের লোভ পরিত্যাগ করিবে এমন নিষ্কাম যোদ্ধার কল্পনা আমাদের মাথায় আসে না। অতএব যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিলে ঘুরিয়া-ফিরিয়া আণবিক অস্ত্র ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী।

কিন্তু ইতিমধ্যেই আণবিক যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছে ইহার অর্থ কী? রাশিয়া ও মার্কিন পরীক্ষার্থ নিরন্তর আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাইয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এমন দূষিত করিয়া তুলিয়াছে যে, সেই তেজস্ক্রিয়তার অশুভ ফল জীবদেহে ও উদ্ভিদে অনুভূত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা যুদ্ধকালীন হাতে মারা নয় বটে, কিন্তু ধীর মন্থর-গতিতে মারা নিশ্চয়ই।

এ হেন স্থলে রাসেল প্রমুখ মনীষীগণের উপদেশ এই যে, যুদ্ধ সমূলে বন্ধ করিতে হইবে। তাহা না করিয়া কোনও অজুহাতে একটুকু রন্ধ্র রাখিলে সেই পথে সর্বনাশের বন্যার প্রবেশ অনিবার্য। যাঁহারা বলেন যে যুদ্ধ হোক, কিন্তু আণবিক যুদ্ধ নয়, তাঁহারা—"A pound of flesh without a drop of blood"—জাতীয় পরামর্শ দেন। মিলনান্ত নাটকে উহা চলে, কিন্তু সর্বজনীন প্রাণের ব্যাপারে উহা একেবারেই নিরর্থক। আমরা রাসেলের মতের সমীচীনতা সর্বাংশে স্বীকার করি। মানবসভ্যতা যদি টিকিয়া থাকিতে চায়, তবে যুদ্ধ সমূলে বন্ধ করিতে হইবে—সর্বজনীন প্রাণের জন্য অন্য কোন পন্থা নাই। আণবিক অস্ত্র বন্ধ করিয়াছি অতএব আশঙ্কা নাই, এই মনোভাব চিত্তাশয়ের রচনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

অবশ্য শান্তি সকলেই চায় (অন্ততঃ মুখের কথা শুনিলে তাই মনে হয়) কিন্তু এই প্রার্থনার ভিত্তি বড় ঠুনকো। রাজনৈতিক সন্ধিপত্র, কূটনৈতিক চাতুরী ও "সাংস্কৃতিক" সখ্য বিনিময়ের ভিত্তিতে যে শান্তির প্রতিষ্ঠা, সে শান্তি "শান্তি উৎসব" উপলক্ষে উড্ডীয়মান কপোতের মতই চঞ্চল ও বিলীয়মান। ও-পথে স্থায়ী শান্তি আসিবে না। শান্তির ভিত্তি নৈতিক হওয়া আবশ্য[illegible]বার সঙ্গে আধ্যাত্মিক শব্দটিও [illegible] স্মরণ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু য[illegible] করিতে বাধ্য করিয়া সে ইচ্ছা [illegible] হইলাম।

বলা যায় নিঃসংশয়ে। জটিল চরিত্রাভিনয়েও এই জনপ্রিয় নায়ক যে সমান প্রতিভাধর তার প্রমাণ নিঃসংশয়ভাবে পাওয়া গেল ছবিখানিতে। চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্ব, গ্লানি-ময় অতীতের প্রতিক্রিয়ায় ক্ষণে ক্ষণে মনের 'গুমোট' ভাব ও মর্মবেদনা শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দক্ষতায় মরমী করে তুলেছেন তিনি। সুরমা-বেশিনী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় তাঁর শিল্পীজীবনের আরেকটি অনিন্দ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এই ছবিতে। ছবির শেষের দিকে চরিত্রটির শান্ত অভিব্যক্তি তিনি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন। ঈর্ষাতুর, সংশয়গ্রস্তা সুমতির চরিত্রটি দীপ্তি রায়ের অভিনয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। পার্শ্ব-চরিত্রগুলির প্রশংসা পাবার মতো অভিনয় করেছেন সরকারী উকিলের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, সুরমার বাবার চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল ও চাঁপার ভূমিকায় নবাগতা বাণী হাজরা। অন্যান্য চরিত্রে অতনু ঘোষ, প্রফুল্ল দে ও মনোরমা দেবীর নামও উল্লেখযোগ্য।

প্রখ্যাত শিল্পী তিমিরবরণ এই ছবির আবহসংগীতের জন্য ভূয়সী প্রশংসা পাবেন। তাঁর রচিত সুরঝংকারে ছবির কয়েকটি দৃশ্য পরম নাট্যরসে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

পরিচালক ছবিতে দুটি রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করেছেন। "যখন মল্লিকাবনে প্রথম ধরেছে কলি" গানটি ছবিতে অপূর্ব প্রয়োগের ফলে দর্শকদের অভিভূত করে। গানটি উপলক্ষ্য করে পরিচালক দর্শকদের নিয়ে গেছেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও সুরমার অতীত জীবনে। ছবিতে গানের এমন অর্থপূর্ণ প্রয়োগ সচরাচর দেখা যায় না। উৎপলা সেন ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠদানে দুটি রবীন্দ্র সংগীতই সুগীত।

আলোকচিত্রে অজয় মিত্র অনবদ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন ছবিতে। ক্যামেরার এমন সূক্ষ্ম কাজ ও পরিবেশানুগ দৃষ্টি-কোণ খুব বেশী ছবিতে দেখা যায় না।

সংগীতানুলেখনে সত্যেন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনায় হরিদাস মহলানবীশ ও শিল্প-নির্দেশে সুনীতি মিত্রের কাজ প্রশংসনীয়। শব্দগ্রহণ আশানুরূপ হয়নি। কলা-কৌশলের অন্যান্য বিভাগের কাজ উঁচুদরের। সামগ্রিক অংগশোভা ছবির এক বিশেষ সম্পদ।

সারা বছরব্যাপী নাট্য-সমারোহ

৫ম বার্ষিক নাট্যোৎসবের পরিবর্তে এ বছর থেকে থিয়েটার সেণ্টার সারা বছর-ব্যাপী নাট্যসমারোহের ব্যবস্থা করেছেন। আগামী মাস থেকে এই নাট্যসমারোহ শুরু হবে এবং প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম শুক্রবার থেকে থিয়েটার সেণ্টারের নিজস্ব রংগমঞ্চে এক একটি নতুন পূর্ণাংগ নাটকের অভিনয় চলবে বেশ কয়েকদিন ধরে, যাতে সংঘের সভ্যেরা নিজেদের সুবিধামত দেখতে পারেন। জনসাধারণের দেখার সুবিধার জন্য কিছু সংখ্যক টিকিটের ব্যবস্থাও থাকবে।

থিয়েটার সেণ্টারের কর্তৃপক্ষরা মনে করেন, সারা বছর ধরে অভিনয় না চালালে নাট্য আন্দোলনকে আরও জোরালো করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক বছর নাট্যোৎসব করে তাঁরা দেখেছেন যে, সত্যিকারের উঁচুমানের নাটক পাওয়া খুবই শক্ত। তাই তাঁরা স্থির করেছেন এই সারা বছরব্যাপী নাট্য-সমারোহে অন্তত দশটি নতুন নাটক দর্শক ও সমালোচকদের সামনে উপস্থিত করা হবে। এই থেকেই চয়ন করে দুই বা তিন বছর অন্তর এক একটি নাট্যোৎসবের তাঁরা আয়োজন করবেন, যা হবে সত্যিকারের নাট্যোৎসব ঃ যেখানে উঁচু মানের নাটক, শক্তিশালী দল এবং প্রকৃত শিল্পীদের তাঁরা তুলে ধরতে পারবেন পাদপ্রদীপের সামনে।

থিয়েটার সেণ্টার নানাভাবেই নবনাট্য আন্দোলনকে পুষ্ট করার চেষ্টা করছেন, সারা বছরব্যাপী নাট্যসমারোহ তাঁদের আর এক নতুন প্রচেষ্টা। আশা করি নাট্যামোদী-দের সহানুভূতি তাঁরা আগের মতই পাবেন।

এই শিল্পযুগে যে নব্য-দর্শনের উপরে আমরা, আধুনিক নাগরিকেরা, নির্ভর করে করে থাকি, তার নামকরণ করা যেতে পারে 'পরিসাংখ্য-দর্শন।' পরিসংখ্যানের প্রসাদে আমরা অনেক কিছুই জেনেছি। তার মধ্যে একটি হল পশ্চিমবঙ্গে বেকারের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি। শুধু এঁদের মধ্যে নারীর অনুপাত কত সে-বিষয়ে এতকাল সবিশেষ অবহিত ছিলুম না। অধুনা ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসের ডিরেক্টর কর্তৃক প্রকাশিত এক পুস্তকের প্রসাদে তারও একটা প্রামাণ্য হিসাব পাওয়া গিয়েছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জগুলিতে বর্তমানে ৭৪০০০ কর্মপ্রার্থী মহিলার নাম রেজেস্ট্রীকৃত। গত পাঁচ বছরের মধ্যে যে-কোন সময়ের তুলনায় এই সংখ্যা তিন গুণ। এবং কর্মপ্রার্থিনী মাত্রেই এক্সচেঞ্জে তালিকায় নাম রেজেস্ট্রী করেননি, একথাও বিচার্য। যথাসময়ে নাম রিনিউ করেননি বলে অনেক নাম বাতিল হয়েও গিয়েছে। অতএব হরের সঙ্গে গড় কাটাকুটি না করে অনায়াসেই যোগ দেওয়া চলে এবং যোগফল কোন্ না লক্ষের কাছাকাছি হবে।

ব্যাপারটা যদি পরিহাসের হত, তবে বলতাম, ভারত ললনাদের জাগরণের নির্ভুল লক্ষণ যখন দেখা গিয়েছে, ভারতের জাগরণের তখন আর বিলম্ব নেই। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ পরিহাস্য নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কয়েকটি গুরুতর পরিবর্তনের ফল। একথা স্পষ্ট যে, গৃহিণী বা ঘরণী ইত্যাদি শব্দগুলির ধাত্বর্থ ক্রমেই লোপ পেয়ে আসছে। সদর আর অন্দরের মধ্যেকার প্রাচীরটা এখন আর পূর্ববৎ প্রথম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এত কাল যাঁদের দেবী বলে উপরে, কিংবা সামান্যা বলে রন্ধনকক্ষে রেখেছি, তাঁরা দলে দলে পার্শ্বে এসে দাঁড়াতে চান কেন, সেটা বুঝতে হলে বর্তমান অর্থনীতির ফ্রেমে-আঁটা সমাজের আলেখ্যটির দিকে দৃষ্টিপাত প্রয়োজন। এই ঝোঁক একজন বা দু'জনের হলে একে খেয়াল, ব্যক্তিগত রুচি, শখ ইত্যাদি বলে ব্যতিক্রমের কোঠায় ফেলা যেত। কিন্তু কাল যা ছিল ব্যতিক্রম, আজ তাই নিয়ম হয়ে উঠছে।

নারী সমাজের যে অংশ আজ কর্মপ্রার্থী, তাঁরা কারা? কোন শ্রেণীর? স্বরও আমরা জানিঃ মূলত মধ্যবিত্ত বিং। পাঠাভ্যাস কালেই একটি মধ্য- চাকরির লক্ষ্য করে, পাশ-করা ভাইয়ের প্রয়োজনে বাবার সামান্য আয় দিয়ে পাওয়া ভার। পাশ করার পর তাকেও চাকরি খুঁজতে হবে, এ-সঙ্কল্প সে তখনই করে। সপ্তপদী গমনের সুযোগ যার ঘটে, পতিগৃহে যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তারও যে দুর্ভাবনা ঘুচে গেল এমন নয়। অভাব সেখানেও পিছে-পিছে তাড়না করে আসে। এক জনের আয়ে দু'জনের চলে না। কেন না, মন্ত্রবলে দুইটি হৃদয়ই মাত্র এক হয়েছে, দুইটি জঠর নয়। এবং অবশেষে একদিন দেখা যায়, দুইটি হৃদয়ও হয়ত নয়। সেকালের কুললক্ষ্মীরা সব দায় স্বামীর উপর সমর্পণ করে নীরবে অশ্রুপাত করতেন, একালের যাঁরা, তাঁরা তা করেন না। নিষ্ঠুর-বিমুখ পৃথিবীটাকে নিজেদের চোখ দিয়েও যাচাই করতে চান। সম্ভবত এঁরাই সার্থকতর অর্থে সহধর্মিণী।

এইটুকু স্বীকার করে নিলে বাকিটা হৃদয়ংগম করাও কঠিন হবে না। শুধু সংসারের প্রয়োজনে নয়, মেয়েদের চাকরি চাই পূর্ণ মর্যাদা অর্জনের জন্যেও। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ঘটেছে। কারও বোঝামাত্র হয়ে আপন অস্তিত্বকে টেনে টেনে আজকের খাতা থেকে কালকের পাতায় জমা করে দিতে রাজি নয়। তাদের দাবি সমানাধিকারের, তারা আর ফেভর চায় না, ফেয়ার ফিল্ড চায়। চাকরির আশায় প্রসারিত হাতগুলি ঠেলে দিলে সে-হাত হয়ত অচিরে মুষ্টিবদ্ধ এমন কি উর্ধ্বোত্থিতও হবে।

কিন্তু প্রকৃত সমস্যা সেখানেই নয়। যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পুরুষদের জন্যেই যথোপযুক্ত কাজের সংস্থান নেই, সেখানে মেয়েরা প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বাড়বে, বাড়ছে। নারী-পুরুষের সহাবস্থিতি নিতান্ত শান্তিপূর্ণ থাকছে না। পরিকল্পনানুযায়ী ক্ষেত্র ভাগ করে অবশ্য এসমস্যার আংশিক সমাধান সম্ভব। কেননা, কর্মের বহিরাঙ্গনেও মেয়েদের একটা গণ্ডি মেনে চলতে হয় পুরুষদের মত সব পথই তাঁদের কাছে খোলা নয়। অনেক কাজ তাঁদের ক্ষমতারও বহির্ভূত। আবার যে ক্ষেত্রে মেয়েদের সহজ কৃতিত্ব, সেখানেও কিছু আসন জুড়ে আছে এখনও পুরুষেরাই। একটি দুটি চাকরি নয়, সব কয়টি কেরানীর পদ মেয়েরাই অলঙ্কৃত করে আছেন, আজকের দিনে এরকম একটি অফিস কল্পনা করা কঠিন নয়। নার্সিং-এর মত, স্কুলের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী অবধি সব কয়টি শিক্ষকের আসনই মহিলাদের জন্য রক্ষিত হতে বাধা কী। অবশ্য সমগ্র সমস্যার সুরাহা তাতে হবে না। সেজন্য নতুনভাবে ভাবনার প্রয়োজন হবে। ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসের অধিকর্তা যে পরামর্শ দিয়েছেন, এ প্রসঙ্গে তাও বিবেচনাযোগ্য। কায়ক্লেশের প্রয়োজন কম, এমন কিছু কিছু কারখানা, যথা বিস্কুট, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি, মেয়েদের জন্যই খোলা যেতে পারে। এই 'প্রমীলা রাজ্যের' পরিকল্পনাকে নিতান্ত অভিনবই বা বলি কী করে, বিশেষ করে যে-দেশে ট্রামে-বাসে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের নজীর আছে?

* * *

'কলিকাতা কর্পোরেশন' নামটির সঙ্গে নানা স্মৃতি বিজড়িত। সুখের এবং দুঃখের। প্রথমটির চেয়ে স্বীকার করতে বাধা নেই, দ্বিতীয়টির ভার বেশী। সেই কর্পোরেশনের নবকৃত নাম 'পৌরসভা'। অবশ্য পুরবাসীর আস্থা সে কতখানি অর্জন করতে পেরেছে, সে-বিষয়ে সংশয় আছে। কলকাতার জল সরবরাহ এবং জল নিকাশ ব্যবস্থার উন্নতিবিধান একটি জরুরী সমস্যা। কিন্তু জরুরী কাজের সূচনা যা দেখছি তাতে ভরসা বিশেষ পাচ্ছি না। পৌরসভার অধিবেশন অবশ্য ঘটা করেই আরম্ভ হয়, কিন্তু বাক্যের ঝড় আর তর্কের ধূলিই ওঠে, ঘড়ির কাঁটা নির্বিবাদে এগিয়ে যায়, এবং ছুটির ঘণ্টা পড়তে না পড়তেই পরবর্তী অধিবেশনের তারিখ পড়ে। দেওয়ানী আদালতে মামলার যা হাল হয়! মতভেদটা করণীয় কর্ম নিয়ে নয়। উপায় নিয়ে। সংস্কার ব্যবস্থার ভার কে নেবেন—চীফ এঞ্জিনীয়র, না নূতন একটি বোর্ড? কাউন্সিলররা এই ব্যাপারটির কোন ফয়সালা করতে পারছেন না। টালবাহানা করছেন কর্পোরেশন, অথচ দোষ দিচ্ছেন রাজ্য সরকারকে। করদাতাদের স্বার্থ বলেও যে একটি বস্তু আছে সেকথা এঁরা একেবারে বিস্মৃত হয়েছেন। সেজন্য পৌরসভার বিশেষ সংকোচবোধ আছে বলে মনে হয় না, কেননা করও ত তাঁরা নিয়মিত আদায় করেন না। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বিবরণীতে দেখছি চৌদ্দ বৎসরের উপর আদায় হয়নি এমন বিলও আছে এবং তার ঢের আগেই প্রচলিত আইনমতে গোটা পাওনাটাই তামাদি হয়ে যাবার কথা।

খেলার মাঠে

একলব্য

আগেই বলেছি খেলাধুলার ক্ষেত্রে যেন দেল-দোল-দুর্গোৎসবের আয়োজন লেগে গেছে। জাতীয় ফুটবল, জাতীয় হকি এবং জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা চলছে এক সঙ্গে। ভারতের খেলাধুলার ইতিহাসে এর আগে একই সঙ্গে জাতীয় খেলাধুলার তিনটি বড় অনুষ্ঠান হয়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের ভারত সফরের জন্য ক্রিকেটের খেলা পেছিয়ে গেছে। ফুটবলের শেষ পর্যায়ের খেলা পিছিয়ে যাবার কারণ জাতীয় ফুটবলে লীগ খেলার নবপ্রবর্তন। হকি অবশ্য বর্তমানের মরসুমী খেলা।

স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, ইংরেজ শাসকরাই আমাদের দেশে খেলাধুলার প্রবর্তন করে গেছেন। তাই আমাদের খেলাধুলার কাঠামো ইংলণ্ডের খেলাধুলার অনুরূপ। কিন্তু খেলার মরসুম ভাগের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ক খুবই কম। এক্ষেত্রে দুই দেশের অবস্থা 'তোমার হ'লো শুরু, আমার হ'ল সারা'র মত। ইংলণ্ডের ফুটবল খেলা শেষ হলে আরম্ভ হয় আমাদের দেশে ফুটবল খেলা, আমাদের ক্রিকেট মরসুমের শেষে আরম্ভ হয় ওদের ক্রিকেট মরসুম। আমাদের বর্ষাপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে অবশ্য ক্রিকেট খেলা সম্ভব নয়, কিন্তু আমাদের দেশের ক্রীড়া পরিচালকরা এখন ভাবতে আরম্ভ করেছেন—গ্রীষ্ম-বর্ষার পরিবর্তে শীতকালে ফুটবল মরসুমের প্রবর্তন করা সম্ভব কিনা। এতে খেলার স্থায়িত্বকাল বাড়ানো যায়, শ্রমশীল খেলায় বাড়ে খেলোয়াড়দের পরিশ্রম করবার ক্ষমতা। ভারতে ফুটবল অবশ্য এখন একরকম সারা বছরের খেলায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু মাঠের অভাবে এবং সুযোগ সুবিধার অভাবে সারা বছর ফুটবল খেলা অনুশীলনের কোন সুযোগ নেই। এ ব্যবস্থা উন্নত নৈপুণ্য আয়ত্তের পরিপন্থী। বাংলা দল আজ জাতীয় ফুটবলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। কিন্তু মাঠের অভাবে খেলোয়াড়রা প্রায় ৩।৫ মাস ধরে ফুটবলের অনুশীলন করতে পারেননি। ক্রিকেট এবং হকি খেলা ফুটবল খেলোয়াড়দের অনুশীলনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। শুধু ফুটবল খেলার জন্য যদি পৃথক মাঠের ব্যবস্থা থাকতো, কিংবা কয়েকটি ক্লাবের কাজকর্ম সীমাবদ্ধ থাকতো শুধু ফুটবলের মধ্যে তবে সারা বছর ধরেই ফুটবলের অনুশীলন জীইয়ে রাখতে পারতেন। ক্রীড়া মরসুমের জগাখিচুড়ী আর ক্লাবগুলোর সবরকমের খেলায় অংশ গ্রহণ খেলোয়াড়দের উন্নত নৈপুণ্য আয়ত্তের পক্ষে এক অন্তরায় কিনা সেটা ভেবে দেখা দরকার। ইংলণ্ডে যে ক্লাব ক্রিকেট খেলে সে ক্লাব ফুটবল খেলে না, যারা ফুটবল খেলে তারা মাতামাতি করে না ক্রিকেট নিয়ে। ফলে যে ক্লাব যে খেলার জন্য গঠিত হয় সেই খেলায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জনাই তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়—অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং সাধনার মধ্য দিয়ে খেলোয়াড়রাও নৈপুণ্য আয়ত্ত করে। কিন্তু আমরা এক ক্লাবের মধ্য দিয়ে সবকিছু করতে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলি। ফলে আমাদের খেলোয়াড়দের অবস্থা হয়—'জ্যাক অব অল ট্রেড মাস্টার অব নান'-এর মত। নিজ পরিবেশের মধ্যে মাস্টার অব অল ট্রেড হওয়া অবশ্য অসম্ভব নয়। মোহনবাগান ক্লাব হয়েছেও। একই বছরে ফুটবল, হকি ও ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে মোহনবাগান খেলাধুলায় শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড় বেশী সৃষ্টি করতে পেরেছে কি? আজ মোহনবাগান বা অন্য কয়েকটি ক্লাব যদি শুধু ফুটবল নিয়ে মেতে থাকতো তবে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ভারতের মান হয়তো অনেক উঁচু হত। এইভাবে হকি এবং ক্রিকেটের জন্য পৃথক পৃথক ক্লাবের ব্যবস্থা থাকলে হকি এবং ক্রিকেটের মানও উঁচু হত সন্দেহ নেই।

স্বীকার করি, ইংলণ্ডের ডেনিস কম্পটনের মত একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে একাধিক খেলায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের ঘটনা বিরল হলেও অসম্ভব নয়। দৃষ্টান্তের জন্য বেশীদূরে যেতে চাই না। সাম্প্রতিককালের দু'জন বাঙ্গালী খেলোয়াড়—নির্মল চ্যাটার্জি ও পঙ্কজ রায়ের নাম উল্লেখ করছি। ক্রিকেট এবং ফুটবলে দু'জনেরই প্রতিভা ছিল। পঙ্কজ ফুটবল ছেড়ে দিয়ে ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, আর নির্মল কিছুই না ছাড়ার ফলে কিছুতেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। যাই হক, আমার বক্তব্য—কোন খেলোয়াড়ের মধ্যে কোন খেলার প্রতিভার সাক্ষাৎ পেলে তাকে সেই খেলায় নিপুণ ও পারদর্শী করে গড়ে তোলার দায়িত্ব ক্লাবের। এইভাবে ফুটবল ক্লাব যদি গুণী খেলোয়াড় সংগ্রহ করে সারা মরসুম ধরে তাদের রেওয়াজের ব্যবস্থা করে, হকি ক্লাব সংগ্রহ করে হকি খেলোয়াড়দের, ক্রিকেট ক্লাব ক্রিকেটারদের তবে সর্ববিষয়ে ভারতের ক্রীড়ামান উন্নত হতে বাধ্য। এর জন্য ক্লাবে ক্লাবে সারা বছর ধরেই প্রস্তুতির আয়োজন থাকা দরকার। ফুটবল, হকি ও ক্রিকেটের জগাখিচুড়ির মধ্যে এ ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

• • •

ভারতের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা—সন্তোষ ট্রফির খেলা শেষ না হতেই এ সম্পর্কে আলোচনা যখন পাঠকদের হাতে পৌঁছবে তখন জাতীয় ফুটবলের খেলা শেষ হয়ে গেছে।

১৯৪১ সালে জাতীয় বা আন্তঃ রাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হবার পর থেকে এতদিন নক আউট প্রথায় খেলা পরিচালিত হয়ে এসেছে। এবারই সর্বপ্রথম লীগ ও নক আউট প্রথায় খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে প্রথমে লীগ প্রথায় খেলা অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রতি অঞ্চলের বিজয়ী ও রানার্স দল মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইনালে খেলার অধিকার পাবার জন্য আবার দুটি গ্রুপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে লীগ প্রথায়। এই লীগের

মাদ্রাজে জাতীয় ফুটবলের উদ্বোধন দিনে মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রীবিক্রম মেধী মাদ্রাজের খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করছেন

গত সপ্তাহে ঘানার রাজধানী আক্রায় যে অল-আফ্রিকান পিওপল্‌স্‌ কনফারেন্স হল তাতে ঘানার প্রধানমন্ত্রী নক্রুমা তাঁর উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে "আমাদের জীবদ্দশয়াই" সারা আফ্রিকা স্বাধীন হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হবে এরূপ আশা ঐ কনফারেন্সের দৃশ্যের মধ্যেই নিহিত ছিল বলে মনে হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন পঁচিশটি দেশ অথবা শাসনিক অঞ্চল (টেরিটরী) থেকে পঞ্চাশটি রাজনৈতিক এবং শ্রমিক সংস্থার দুশো প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তাছাড়া সৌভ্রাত্রাত্মক (ফ্রেটার্নাল) প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন সংখ্যায় দুশো। সারা আফ্রিকায় স্বাধীনতা আন্দোলন কিরূপ শক্তি সংগ্রহ করে চলেছে আক্রা সম্মেলন থেকে তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। কেনিয়ার অধিবাসী মিঃ টম ম্বোয়া কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করেন। তিনি শ্রোতৃবর্গকে স্মরণ করিয়ে দেন—"বাহাত্তর বছর পূর্বে বার্লিনে ইউরোপীয় শক্তিরা নিজেদের মধ্যে আফ্রিকাকে কী রকম ভাগাভাগি করে লুট করবে তাই স্থির করেছিল। আজ আমরা তাদের বলছি 'আফ্রিকা থেকে ভাগো'।"

আফ্রিকানদের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন উপায় প্রাধান্য পাবে সেই প্রশ্ন নিয়ে একটা তর্ক চলছে। অনেকে কেবলমাত্র অহিংস উপায়েই সংগ্রাম করার পক্ষপাতী; কেউ কেউ অহিংসার উপর জোর দিতে চান না। যখন যেমন সুবিধা তেমন উপায় অবলম্বনের পক্ষপাতী। মিঃ নক্রুমা অহিংস উপায়ের পক্ষপাতী এবং তিনি কনফারেন্সে এই ঘোষণা করেন যে অহিংস উপায়ে যেখানেই সংগ্রাম হবে সেখানেই ঘানা সমর্থন করবে এবং যথাসাধ্য সাহায্য দেবে। উত্তর আফ্রিকার আরব অধ্যুষিত অথবা আরব-প্রভাবান্বিত অঞ্চলসমূহ ছাড়া অন্য সর্বত্র অহিংস উপায়ের সমর্থকই বেশী বলেই মনে হয়। উত্তর আফ্রিকার বিগত ইতিহাস এবং বর্তমান পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এই পার্থক্যের কারণ অনেকটা বুঝা যায়। আজ আলজেরিয়ায় যে-অবস্থা তাতে যুদ্ধরত জাতীয়তাবাদী আলজেরিয়ানদের হিংসা ছেড়ে অহিংসার পথ ধরতে বলা নিরর্থক হবে এবং [illegible]র বর্তমান সশস্ত্র লড়াইয়ের নিন্দাও অহিংস উপায়ের সমর্থকগণ করতে পারে না। কিন্তু যেখানে সংগ্রামের উপায় বেছে নেওয়ার সুযোগ আছে সেখানে অহিংস উপায়ের উপরই জোর দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

এটা ভরসার কথা যে আফ্রিকানদের মধ্যে গান্ধী পন্থার প্রতি ঝোঁক ক্রমশ বাড়ছে। ঘানার সমর্থন তার পক্ষে আরো অনুকূল হবে। সারা আফ্রিকায় বিদেশীর প্রভুত্ব দূর করার সংগ্রাম যদি কেবল সহিংস উপায়ের দ্বারা করা সম্ভব হয় তবে আফ্রিকার ভবিষ্যত সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। কারণ একদিকে নিরস্ত্র জাতিদের পক্ষে ব্যাপক সহিংস সংগ্রামের প্রচেষ্টা দুঃসাধ্য, আর যদি নানা অবস্থার যোগাযোগে তা সম্ভবও হয় তাহলেও তার ফল কতদূর মঙ্গলকর হবে সে বিষয় গভীর সন্দেহের কারণ আছে। দেখা যাচ্ছে অস্ত্রবলের উপর ঝোঁক যেখানে বেশী সেখানে নবলব্ধ স্বাধীনতাই হোক অথবা,

জাতীয় ফুটবলে 'বি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও সেমি ফাইন্যালের পরাজিত হায়দরাবাদ দল

খেলা এবং সেমি-ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলার আসর বসে মাদ্রাজে। কিছুদিন আগেই মাদ্রাজ ফুটবল এসোসিয়েশন তাদের রজতজয়ন্তী উৎসব পালন করেছে। তার পরেই সেখানে জাতীয় ফুটবলের শেষ পর্যায়ের জাঁকজমকপূর্ণ খেলা। এই খেলাকে কেন্দ্র করে ফুটবল খেলায় অগ্রগণ্য ভারতের ৮টি রাজ্যের খেলোয়াড়রা মাদ্রাজে সমবেত হয়েছিলেন। ফলে প্রায় তিন সপ্তাহের জন্য মাদ্রাজ হয়ে উঠেছিল ভারতীয় ফুটবলের নামকরা সব খেলোয়াড়দের আবাসস্থল। ফেব্রুয়ারীর বিশ তারিখে মাদ্রাজের রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী এখানে জাতীয় ফুটবলের উদ্বোধন করেন।

দুটি গ্রুপে বিভক্ত ৮টি রাজ্য দলের লীগ ও নক আউট মিলিয়ে মাদ্রাজে ১৫টি খেলা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। লীগে ১২টি, সেমি-ফাইন্যালে ২টি আর ফাইন্যালে একটি। কিন্তু সেমি-ফাইন্যালে বাঙলা ও বোম্বাইয়ের খেলাটি দুইদিন অমীমাংসিত থাকায় ইতিমধ্যে দুটি খেলা বেড়ে গেছে। যাই হক, যেহেতু ফুটবল ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা এবং জাতীয় ফুটবলের খেলার বিবরণ জানবার জন্য সবাই আগ্রহী তাই অতি সংক্ষিপ্তভাবে সব খেলারই ধারাবাহিক কিছু কিছু আলোচনা করছি।

প্রথম খেলা

মাদ্রাজ (৪) — দিল্লী (০)
(টমাস ২, অরুমুগম ও জানকীরাম)

জাতীয় ফুটবলের উদ্যোক্তা রাজ্যের টীমকেই উদ্বোধন দিনের খেলায় ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। এটি ছিল বি গ্রুপের খেলা। মাদ্রাজ সহজেই দিল্লী দলকে ৪—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে তাদের অগণিত সমর্থকদের প্রশংসাভাজন হয়। দিল্লী অবশ্য ৪—০ গোলে পরাজিত হবার মত খেলেনি। পুরোভাগের খেলোয়াড়দের গোল করবার ব্যর্থতাই তাদের শোচনীয় পরাজয়ের প্রধান কারণ। সুজাত ও সরবজিতের একটি করে শট পোস্টে লেগে ফিরে আসাতেও তাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মাদ্রাজের পক্ষে প্রথমার্ধে গোল করেন টমাস পর পর দুটি ও অরুমুগম একটি, দ্বিতীয়ার্ধে চতুর্থ গোল করেন জানকীরাম।

দ্বিতীয় খেলা

বোম্বাই (৬) — বিহার (০)
(ডি'সুজা—৪ ও চার্লস)

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ফুটবলের উন্নত কলাকৌশল দেখিয়ে বোম্বাই দল এ গ্রুপের প্রথম খেলায় বিহারকে ৬—০ গোলে পরাজিত করে। সারা খেলার মধ্যে বিহারের খেলোয়াড়দের বোম্বাই দলের পিছন পিছন ছুটতে দেখা গেছে। বোম্বাইয়ের সেণ্টার ফরোয়ার্ড নেভিল ডি'সুজা ৬টি গোলের মধ্যে একাই ৪টি গোল করেন, বাকী দুইটি গোল করেন লেফ্‌ট ইন চার্লস।

তৃতীয় খেলা

সার্ভিসেস (২) — মহীশূর (০)
(এথিরাজ ও লাহিড়ী)

এ গ্রুপের তৃতীয় খেলায় সার্ভিসেস ও মহীশূর দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস থাকলেও বেশীর ভাগ তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গড়া মহীশূরের খেলার বাঁধুনী ছিল কাঁচা। অভিজ্ঞতা এবং শুটিং ক্ষমতাই সার্ভিসেস দলকে এ খেলায় বিজয়ীর সম্মান এনে দেয়। সার্ভিসেসের পক্ষে গোল করেন সেণ্টার ফরোয়ার্ড এথিরাজ ও রাইট ইন লাহিড়ী।

চতুর্থ খেলা

বাঙলা (৩) — দিল্লী (১)
(দামোদরন—২ ও সি গোস্বামী) (আসলাম)

বি গ্রুপের দ্বিতীয় খেলায় দিল্লীকে ৩—১ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয় পাঁচজন অলিম্পিক খেলোয়াড় সমন্বয়ে গড়া শক্তিশালী বাঙলা দলের কাছে। কিন্তু বাঙলার খেলা আশানুরূপ হয়নি। খেলা আরম্ভের পর ২ মিনিটের মধ্যে সেণ্টার ফরোয়ার্ড দামোদরন একটি গোল করে বাঙলাকে এগিয়ে রাখলেও প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে দিল্লীর আসলাম গোলটি শোধ করে দেন। এর পর দিল্লী বেশ দৃঢ়তার সংগে খেলতে থাকে। শেষ ১০ মিনিটে আরও দুটি গোল করে বাঙলা খেলায় বিজয়ী হয়। চুনী গোস্বামী ও দামোদরন গোল করেন।

পঞ্চম খেলা

সার্ভিসেস (১) — বিহার (১)
(লাহিড়ী) (রমজান)

বোম্বাইয়ের কাছে যে বিহার দলকে ৬—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল সেই বিহারের সংগে সার্ভিস দলের লীগ খেলাটি ১—১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়াকে অপ্রত্যাশিত ফলাফল বলে মনে করা যেতে পারে। সার্ভিসেস দলের খেলোয়াড়রা এইদিন মোটেই ভাল খেলতে পারেননি। সব কিছুতেই যেন তাঁদের ভুল হয়ে যাচ্ছিল। খেলা আরম্ভের পর ১০ মিনিটের সময় লাহিড়ী সার্ভিসেসের পক্ষে প্রথম গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ১০ মিনিটের সময় রমজান গোলটি শোধ করে দেন।

ষষ্ঠ খেলা

হায়দরাবাদ (৪) — দিল্লী (১)
(কানন—২, ইউসুফ—২) (প্রকাশ)

পর পর দুটি খেলায় পরাজয় স্বীকারের পর দিল্লীকে লীগের শেষ খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয় শক্তিশালী হায়দরাবাদের সংগে। জাতীয় ফুটবলে গত দু' বছরের বিজয়ী হায়দরাবাদ, ভারতের ফুটবল ক্ষেত্রে যাদের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য তারা অতি সহজেই ৪—১ গোলে বিজয়ী হয়। ফলে দিল্লীকে তিনটি খেলাতেই হার স্বীকার করে বিদায় নিতে হয়। প্রথমদিকে দিল্লী অবশ্য যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে খেলা আরম্ভ করেছিল। কিন্তু হায়দরাবাদের খেলোয়াড়রা খেলায় আধিপত্য বিস্তার করবার পর তাদের আর মাঠে খুঁজে পাওয়া যায় না। হায়দরাবাদের পক্ষে সেণ্টার ফরোয়ার্ড কানন ও লেফ্‌ট আউট ইউসুফ দুটি করে গোল করেন। দিল্লীর পক্ষে একটি গোল শোধ করেন প্রকাশ।

সপ্তম খেলা

বিহার (১) — মহীশূর (০)
(এস ঘোষ)

বোম্বাইয়ের কাছে পরাজয় এবং সার্ভিসেস দলের সংগে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করে বিহার দল তাদের তৃতীয় খেলায় মহীশূরকে ১—০ গোলে পরাজিত করে। খেলাটিকে মামুলী ধরনের বলা যেতে পারে। তুলনামূলক বিচারে বিহারের খেলায় কিছুটা নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। খেলাটি গোলশূন্যভাবেই শেষ হবার উপক্রম হয়েছিল। শেষ মিনিটে বিহারের লেফ্‌ট আউট এস ঘোষ বিজয়সূচক গোল করেন।

নবরক্ত বিপ্লবই হোক কোনটাই বিশেষ সোয়াস্তিতে আছে বলা যায় না। তাছাড়া, অহিংস সংগ্রামের পথে না গেলে আফ্রিকায় স্বাধীনতা আন্দোলনকে বর্ণ-যুদ্ধে রূপান্তরিত হওয়া থেকে বাঁচানো দুঃসাধ্য হবে। অনেকে হয়ত বলবেন তার জন্য বিদেশীদেরই বেশি দুশ্চিন্তা হওয়া উচিত। কিন্তু আসলে আফ্রিকা যাদের আদিমাতৃভূমি তাদেরই বেশী গরজ কিসে আফ্রিকার ভবিষ্যত সমাজজীবন সুস্থ ও নি[illegible]প হয়ে গড়ে উঠতে পারবে।

* * *

কেনিয়ার আসল অবস্থা এবং কিকিয়ুদের বিরুদ্ধে চালিত বৃটিশ দমননীতির নৃশংসতা ঢাকবার জন্য 'মাউ মাউ'-এর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কাহিনী রং চং দিয়ে ব্যাপক ফলাও করে বহুদিন ধরে প্রচার করা হয়েছিল। কেনিয়ায় পরস্পর-পৃষ্ট বৃটিশ ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক স্বৈরাচার এবং অর্থনৈতিক জুলুমের কোনো প্রতিকারের পথ না পেয়েই কিকিয়ুদের প্রতিবাদ "মাউ মাউ"-এর সন্ত্রাসবাদের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তাও নিশ্চয়ই অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। বৃটিশ গভর্নমেন্ট "মাউ মাউ" দমনের নামে সারা কিকিয়ু জাতির কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করলেন। তাদের সম্বন্ধে যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন তা পশু শিকারের পদ্ধতি সঙ্গে তুলনীয়। কিকিয়ুদের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা মিঃ জেমো কেনিয়াট্টার বিরুদ্ধে "মাউ মাউ"এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হল। জেমো কেনিয়াট্টার মতো লোকের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সত্যতায় অনেকেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। কিন্তু মিঃ কেনিয়াট্টাকে নাইরোবিতে নিয়ে গিয়ে "বিচার" করে তাঁকে দোষী "প্রমাণিত" করে তাঁর প্রতি সাত বছর কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। এই মোকদ্দমায় সরকার পক্ষের প্রধান সাক্ষী,—প্রকৃতপক্ষে যার সাক্ষ্যের উপর কোর্ট মিঃ কেনিয়াট্টাকে দোষী সাব্যস্ত করে—সেই রসন মাচারিয়া নামক ব্যক্তি এখন অ্যাফিডেভিট করে বলেছে যে সে সাক্ষ্য দিতে গিয়া যা বলেছে সব মিথ্যা, কর্তৃপক্ষ তাকে টাকা দিয়ে ঐসব মিথ্যা বলিয়েছে। মাচারিয়া বলছে যে আরো সাক্ষীকেও ঐরকম ঘুষ দেওয়া হয়েছে।

বিলাতে কর্তারা এর কী জবাব দেবেন? অন্তত একটা তদন্ত না করে উপায় নেই। কিন্তু ততদিন মিঃ কেনিয়াট্টা কি জেলেই পচবেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের যদি সুবুদ্ধির অবশেষ থাকে তবে মাচারিয়ার স্বীকৃতিতে তাঁদের মনে মনে খুশি হওয়া উচিত কারণ এর দ্বারা কেনিয়ার সমস্যা সমাধানের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কিকিয়ু বিদ্রোহের পর কেনিয়াতে যে শাসন সংস্কার প্রবর্তন করা হয়েছিল সেটা নিষ্ফল হয়েছে, "নেটিবরা" ওতে আদৌ সন্তুষ্ট হয়নি। যে নরমপন্থী নেতাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ভরসা ছিল তারা পর্যন্ত বেঁকে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদেরই যিনি দল-পতি তিনিই মাচারিয়ার অ্যাফিডেভিট লণ্ডনে পেশ করেছেন। ওদিকে আবার কেনিয়াতে আর একটা নূতন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কার্যকলাপ শুরু হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই অবস্থায় মিঃ জেমো কেনিয়াট্টাকে শুধু মুক্তি দেওয়া নয় তাঁকে কেনিয়ার শ্রেষ্ঠ নেতা বলে স্বীকার করে নেওয়াই হবে সমস্যা-সমাধানের দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

১৪।১২।৫৮

"যত নষ্টের মূল"

অষ্টম খেলা

বাঙলা (৪) মাদ্রাজ (০)
(দামোদরন—২, পি কে
ব্যানার্জি ও সি গোস্বামী)

প্রথম খেলায় দিল্লীকে ৩—১ গোলে পরাজিত করবার পর দ্বিতীয় খেলায় মাদ্রাজকে ৪—০ গোলে পরাজিত করতে বাঙলা দলকে মোটেই বেগ পেতে হয়নি। মাদ্রাজ ও বাঙলার এই খেলা দেখবার জন্য মাঠে অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়—সমস্ত দর্শক গ্যালারী কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু মাদ্রাজের খেলোয়াড়রা ক্রীড়াধারায় তাঁদের অগণিত সমর্থকদের নিরাশ করেন। বাঙলার খেলা হয় দর্শক চোখের তৃপ্তিদায়ক। প্রথমার্ধের মাঝামাঝি সময়ে এবং ২০ মিনিটে দামোদরন পর পর দুটি গোল করবার পর বিরতির ২ মিনিট আগে পি কে ব্যানার্জির বাঁ পায়ের বিদ্যুৎগতি শটে তৃতীয় গোল হয়। বিরতির পর নারায়ণের শট বারে লেগে ফিরে আসে। খেলা শেষ হবার মুখে বাঙলার চতুর্থ গোল করেন চুনী গোস্বামী।

নবম খেলা

বোম্বাই (২) মহীশূর (১)
(চার্লস ও এন ডি'সুজা) (জন)

আগের দুটি খেলায় সার্ভিসেস ও বিহার দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করলেও মহীশূর দল শক্তিশালী বোম্বাইয়ের সংগে তাদের তৃতীয় খেলায় বিশ্রাম সময় পর্যন্ত ১—০ গোলে এগিয়ে থাকে। এমন কি, খেলায় মহীশূরের জয়লাভেরও সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু বিরতির পর বোম্বাইয়ের লেফট ইন চার্লস ৩০ গজ দূরের তীব্র শটে গোলটি শোধ করে দেবার পর অলিম্পিক সেণ্টার ফরোয়ার্ড ডি'সুজা আর একটি গোল করে বোম্বাইকে জয়যুক্ত করেন। প্রথমার্ধের সূচনায় মহীশূরের পক্ষে গোল করেন জন। দিল্লীর মত কোন পয়েণ্ট না পেয়ে মহীশূর দলকে জাতীয় ফুটবল থেকে বিদায় নিতে হয়।

দশম খেলা

হায়দরাবাদ (১) মাদ্রাজ (০)
(কানন)

মাদ্রাজ দল আগের খেলাটিতে বাঙলার কাছে শোচনীয়ভাবে ৪—০ গোলে পরাজয় স্বীকার করায় হায়দরাবাদের সংগে তাদের শেষ খেলার আকর্ষণ কমে যায়। মাঠেও তেমন দর্শক সমাগম হয় না। তাছাড়া, মাদ্রাজের কয়েকজন নিয়মিত খেলোয়াড় এ খেলার সময় অসুস্থ ছিলেন। তবু পরম শক্তিশালী হায়দরাবাদ দল মাদ্রাজের বিরুদ্ধে একটির বেশী গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের ১৭ মিনিটে সেণ্টার ফরোয়ার্ড কানন বিজয়সূচক গোলটি করেন। মাত্র ২ পয়েণ্ট পেয়ে মাদ্রাজ জাতীয় ফুটবলের খেলা থেকে বিদায় নেয়।

জাতীয় ফুটবলের 'এ' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ও সেমি ফাইন্যালের পরাজিত বোম্বাই দল

একাদশ খেলা

বোম্বাই (০) সার্ভিসেস (০)

বোম্বাই ও সার্ভিস দল পরস্পর মিলিত হবার আগে দুটি করে খেলায় বোম্বাই ৪ পয়েণ্ট ও সার্ভিসেস দল ৩ পয়েণ্ট সংগ্রহ করে। সুতরাং এ খেলাটি ছিল এ গ্রুপের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলা। খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হওয়ায় ৫ পয়েণ্ট পেয়ে বোম্বাই লাভ করে এ গ্রুপের চ্যাম্পিয়নশিপ। সার্ভিস রানার্স হয় ৪ পয়েণ্ট পেয়ে। দুটি দলই সেমিফাইনালে খেলায় অধিকার পায়।

দ্বাদশ খেলা

হায়দরাবাদ (১) বাঙলা (০)
(কানন)

বোম্বাই ও সার্ভিস দলের খেলার মত হায়দরাবাদ ও বাঙলা দলের খেলাটিও ছিল 'বি' গ্রুপের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলা। আগের দুটি খেলায় কেউই কোন পয়েণ্ট হারায়নি। ফুটবলে দুটি রাজ্যদলের নাম-ডাক সর্বজনবিদিত। হায়দরাবাদ গত দু'বছরের বিজয়ী। বাঙলা সন্তোষ ট্রফি ঘরে তুলেছে ৮ বার। সুতরাং খেলা দেখবার জন্য মাঠে যে জনসমাগম হয় মাদ্রাজের ফুটবল খেলার ইতিহাসে তাকে অভূতপূর্ব বলা যেতে পারে। দুই দলকেই তিন ব্যাক প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায় এবং দুই দলের ২২ জন খেলোয়াড়ই তাদের শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলা ভারতে খুব কমই দেখা গেছে। উৎসাহ উদ্দীপনায় মাঠ সব সময়ই সরগরম থাকে। এক মুহূর্তের জন্যও খেলার আকর্ষণ ক্ষুন্ন হয় না, আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ চলতে থাকে পর্যায়ক্রমে যদিও আক্রমণের সংখ্যা বাঙলারই কিছু বেশী ছিল। খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হবে এই ধারণা যখন সকলের বদ্ধমূল হয়েছে এবং খেলার বাকী আছে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড, তখন হায়দরাবাদের খ্যাতনামা সেণ্টার ফরোয়ার্ড কানন আকাশভেদী এক প্রচণ্ড আনন্দরোলের মধ্যে একটি গোলে হায়দরাবাদকে জয়যুক্ত করেন। তিনটি খেলার পুরো পয়েণ্ট পেয়ে হায়দরাবাদ লাভ করে বি গ্রুপের চ্যাম্পিয়নশিপ। রানার্স বাঙলা দলও সেমি ফাইন্যালে খেলার অধিকার পায়। নীচে দুটি গ্রুপের লীগ টেবল দেওয়া হল। সেমি ফাইনাল ও ফাইনাল খেলার বিবরণ পরের সংখ্যায় আলোচনা করবো।

পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় পাকিস্তান ৪১ রানে বিজয়ী হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে 'রাবার' পেয়েছে। এ আলোচনাও পরের সংখ্যার জন্য তোলা রইল।

'এ' গ্রুপ

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বি	পঃ
বোম্বাই	৩	২	১	০	৮	১	৫
সার্ভিসেস	৩	১	২	০	৩	১	৪
বিহার	৩	১	১	১	২	৭	৩
মহীশূর	৩	০	০	৩	১	৫	০

'বি' গ্রুপ

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বি	পঃ
হায়দরাবাদ	৩	৩	০	০	৬	১	৬
বাঙলা	৩	২	০	১	৭	২	৪
মাদ্রাজ	৩	১	০	২	৪	৫	২
দিল্লী	৩	০	০	৩	২	১১	০

ভুল সংশোধন

'দেশের' ১৮ সংখ্যায় সরকারী টেস্ট খেলায় ভারতের পক্ষে এবং বিপক্ষে এ পর্যন্ত যারা সেঞ্চুরী ও ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ছাপার গোলমালের জন্য বিবরণে একটু ভুল থেকে গেছে। ১৯৪৬ সালে ভারতের ইংলণ্ড সফরে ওভাল মাঠের তৃতীয় টেস্ট খেলায় বিজয় মার্চেণ্টের ১২৮ রান ছাড়া লর্ডস মাঠে প্রথম টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের জো হার্ডস্টাফ ২০৫ রান করেও নট আউট ছিলেন।

পুণ্যদর্শন পোপ

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

ভগবান যিশুর পার্থিব জীবনাবসানের অব্যবহিত পরক্ষণেই তাঁর শিষ্যবর্গ প্রভুর প্রেম ও শান্তির অমর বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়েন পশ্চিম এশিয়া ও দক্ষিণ ইউরোপের প্রায় সকল স্থানে। রোমক সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম নগরীতে এই উদ্দেশ্যে আনুমানিক ৩৬ খৃষ্টাব্দে আগমন করেন সন্ত পীতর ও তার কিছু পরে

নূতন পোপ

সন্ত পল। যাঁদের প্রচারের ফলে সম্রাট ক্লডিয়াসের রাজত্বকালেই (৪১—৫৪ খৃষ্টাব্দে) খৃষ্টধর্ম রোমে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়। খৃষ্টধর্মের একেশ্বরবাদ ও খৃষ্টীয় ধর্মযাজকদের সরল অনাড়ম্বর জীবন ও ধর্মনিষ্ঠা সেদিন রোমের সকল ধর্মাত্মা ব্যক্তির মনে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং তাঁরা সকলেই বহু দেবতায় বিশ্বাসী সম্রাট-কেন্দ্রিক রোমের সনাতন ধর্মের সারবত্তায় সন্দেহী হয়ে ওঠেন। ফলে তাঁদের অকুণ্ঠ রাজানুগত্যেও শৈথিল্য প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে।

ঠিক সেই অবস্থায় রোমের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন সম্রাট নীরো। সেই নির্বোধ নিষ্ঠুর নৃপতিটি নিজেকে ভগবানের প্রতিনিধি বলেই জানতেন। তাই সিংহাসনে বসেই তিনি তাঁর সীমাহীন রাজশক্তিতে সন্দেহপ্রকাশকারী খৃষ্টধর্মীদের সেরা শত্রু বলে ধরে নিলেন, আর সমগ্র রোমক সাম্রাজ্য থেকে তাঁদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

সে সুযোগ পেতে তাঁর খুব বেশি দেরী হল না। নিজের নিষ্ঠুর খেয়াল চরিতার্থ করতে একদিন তিনি সমগ্র রোম নগরীতে দিলেন আগুন জ্বালিয়ে। পুরনো নোংরা রোমকে পুড়িয়ে ফেলে তারই ভস্মস্তূপের ওপর গড়ে তুলবেন আর এক সুরম্য প্রাসাদ নগরী, এই ছিল তাঁর মনের বাসনা। কিন্তু সব হারানো মানুষের দল যখন দলে দলে ছুটে আসতে লাগল তাঁর প্রাসাদের দিকে, খাদ্য ও আশ্রয়ের দাবি জানিয়ে, তখনই টনক নড়ল তাঁর। তিনি বুঝলেন, শুধু মুখের সান্ত্বনা দিয়ে সেই উন্মত্ত জনতাকে তিনি শান্ত করতে পারবেন না। তাই আত্মরক্ষার তাগিদে ও সেই সঙ্গে মনের নিষ্ঠুর ইচ্ছা চরিতার্থ করবার জন্যে সেই খলবুদ্ধি নৃপতি জনতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে অগ্নিকাণ্ডের জন্যে প্রকাশ্যে দায়ী করলেন, নগরীর এক প্রান্তে বসবাসকারী দীনাতিদীন খৃষ্টধর্মীদের। আর সব হারিয়ে হতবুদ্ধি রোমবাসীরাও সেদিন তাঁর কথা বিশ্বাস

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২রা মার্চ—ভারত সরকার অবিলম্বে ধান ও চাউলের ফাটকা এবং ধান ও চাউলের ক্রয় অথবা বিক্রয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট মাল সরবরাহে হস্তান্তরের অযোগ্য চুক্তি নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেল সারা পশ্চিমবঙ্গে এক সার্কুলার প্রেরণ করিয়া রাজ্যের পুলিস অফিসারগণকে ধান চাউলের সরকারী নিয়ন্ত্রিত মূল্য চালু করিবার প্রশ্নটিকে সর্বাপেক্ষা অগ্রাধিকার দিবার নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৩রা মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী পক্ষের জনৈক সদস্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম উপমন্ত্রী শ্রীমতী মায়া ব্যানার্জি এবং অন্যতম বিশিষ্ট কংগ্রেস সদস্য শ্রীহংসধ্বজ ধারার বিরুদ্ধে ২৪ পরগণা জেলা স্কুল বোর্ডের বহু টাকা অপচয় ও আত্মসাতের ঘটনার সহিত লিপ্ত থাকার অভিযোগ উত্থাপন করিলে কংগ্রেস দলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় পুলিস বাজেটের আলোচনাকালে বিরোধীপক্ষ হইতে বিভিন্ন সদস্য কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অক্ষমতা, দুষ্কৃতিপরায়ণতা, কর্তব্যে শৈথিল্য ও জনগণের আন্দোলন দমনে অত্যাচারের বিবিধ অভিযোগ উত্থাপন করিলে সভাকক্ষে থমথমে ভাবের সৃষ্টি হয়।

৪ঠা মার্চ—খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী এ পি জৈন আজ লোকসভায় শ্রী এন বি মাইতির এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে বলেন যে, ভারত সরকার খাদ্য-শস্য সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাহিদা পূরনে সম্মত হইয়াছেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সাধারণ শাসন-খাতে ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনাকালে বিরোধীপক্ষ হইতে দুর্নীতিপরায়ণ কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর প্রকাশ্য বিচার দাবিতে এবং জনৈক মহিলা আই এ এস অফিসার সম্পর্কে একটি মন্তব্যে সভাকক্ষে তুমুল উত্তেজনা দেখা দেয়।

৫ই মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহক কমিটির এক সভায় অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, দেশ বিভাগের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শাসনাধীন বেরুবাড়ী ইউনিয়ন পাকিস্তানকে দিবার প্রস্তাব অযৌক্তিক এবং সংবিধান বিরোধী।

৬ই মার্চ—কলিকাতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দায়িত্ব গ্রহণ অথবা ঐ উদ্দেশ্যে কলিকাতা কর্পোরেশনকে উপযুক্ত অর্থ সাহায্যদানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে রাজ্য সরকার এক্ষণে একটি প্রস্তাব পরীক্ষা করিয়া দেখিতে-ছেন বলিয়া প্রকাশ।

যক্ষ্মারোগাক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার এবং আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ধুবুলিয়ায় প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে শহর নির্মাণের কাজ সমাপ্তপ্রায় হইয়াছে। ঐ স্থানে যক্ষ্মা রোগীদের জন্য এক হাজার শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল ছাড়া হাসপাতালের সকল কর্মচারীর জন্য বাসগৃহও থাকিবে।

৭ই মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ দিল্লীতে বলেন, এদেশে বিপ্লব ঘটুক, লক্ষ লক্ষ বিপ্লব—তাহাই বরং আমি কাম্য মনে করিব। কিন্তু লক্ষ লক্ষ কৃষকের এই অনশনক্লিষ্ট জীবন আমি মানিয়া লইব না। কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাবের সমালোচনা প্রসঙ্গে—সমবায় কৃষি পদ্ধতির ফলে কম্যুনিজমের আবির্ভাব ঘটিবে বলিয়া যাহারা ধুয়া তুলিতেছেন তাহাদের উদ্দেশ্যে শ্রীনেহরু উপরোক্ত কথাটি বলেন।

অদ্য আলিপুরদুয়ারে বানারহাটে বঙ্গীয় প্রাদেশিক চিকিৎসা সম্মেলনের ১৮শ অধি-বেশনে সভাপতির ভাষণ ডাঃ পি বি ত্রিবেদী চিকিৎসা ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসার যে অবনতি ঘটিয়াছে এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা এবং সাহায্যের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য না করিয়া পারা যায় না।

৮ই মার্চ—শিয়ালদহের অনতিদূরে বেলিয়া-ঘাটা রেলওয়ে ওভার-ব্রিজের উপর হইতে একটি দ্রুত-ধাবমান জীপ গাড়ি অদ্য সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ সেতু সংলগ্ন লোহার রেলিং চুরমার করিয়া প্রায় ৫০ ফুট নীচে পড়িয়া যায় এবং এই শোচনীয় দুর্ঘটনার সহিত জড়িত জীপের অন্যতম আরোহী শ্রীসুনীল পাল (৩০) ও সেতুর নীচে মায়ের কোলে উপবিষ্ট তিন মাসের একটি শিশু গুরুতর আহত হইয়া প্রাণ হারায়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভি আই পি অফিসারদের জন্য একরকম ব্যবস্থা আর পথচলতি সাধারণ লোকদের জন্য অন্যরকম ব্যবস্থা! বাঁকুড়া স্টেশনে ভি আই পি'দের জন্য নির্মিত প্ল্যাট-ফরম লক্ষ্য করিয়া ঐ জেলার সাধারণ লোকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২রা মার্চ—শীর্ষ বৈঠকের প্রাক্কালে পররাষ্ট্র-মন্ত্রী সম্মেলনের পাশ্চাত্য প্রস্তাবে রাশিয়া রাজী হইয়াছে। এই সম্পর্কে আজ পাশ্চাত্য শক্তি ত্রয়ের নিকট নূতন একটি নোট প্রেরণ করা হইয়াছে।

৩রা মার্চ—রুশিয়ার সুপ্রীম সোভিয়েটের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শ্রীআন্দ্রে আন্দ্রেয়েভিচ আন্দ্রেয়েভের নেতৃত্বে সোভিয়েট শুভেচ্ছা প্রতি-নিধিদল অদ্য অপরাহ্নে আসানসোল হইতে বিমানযোগে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

ভারত পাকিস্তান সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে সম্প্রতি করাচীতে উভয় রাষ্ট্রের সেক্রেটারীদের মধ্যে যে বৈঠক হইয়াছে, সেই সম্পর্কে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন এক বিবৃতিতে বলেন যে, প্রতিনিধি দলের মধ্যে এই ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় মীমাংসা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই।

৪ঠা মার্চ—গতকল্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সহিত প্রথম বিনিময়-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। এতদনুযায়ী ৩ কোটি ১৫ লক্ষ ডলার মূল্যের উদ্বৃত্ত মার্কিন খাদ্যশস্য, ম্যাঙ্গানিজ, ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি কয়েকটি সামরিক গুরুত্ব-পূর্ণ বস্তুর বিনিময়ে ভারতকে সরবরাহ করা হইবে।

সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীখ্রুশ্চেভ অদ্য লিপজিগে এক বক্তৃতায় বলেন, পশ্চিম জার্মানী যদি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হয়, তবে সোভিয়েট ইউনিয়ন পূর্ব জার্মানীর সহিতই স্বতন্ত্রভাবে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিবে।

৫ই মার্চ—আজ আঙ্কারায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্কের সহিত এক দ্বিশক্তি প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছে। এই চুক্তির শর্তানুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র "আক্রমণের" হাত হইতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যসমেত যে কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

সোনার পাতে মোড়া মার্কিন রকেট পাইওনিয়ার ৪ চন্দ্রকে অতিক্রম করিয়া সূর্যের চতুর্দিকস্থ কক্ষপথ প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিতে মহাকাশে ধাইয়া চলিতেছে। যতদিন পর্যন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন রকেটটিও মহাশূন্যে টিকিয়া থাকিবে বলিয়া আশা করা যায়।

৬ই মার্চ—সাম্প্রতিক মস্কো সফর সম্পর্কে আলোচনার জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলান আগামী ১৭ই মার্চ বিমানযোগে অটোয়া ও ওয়াশিংটন অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

৭ই মার্চ—পাক মার্কিন দ্বিশক্তি সামরিক চুক্তি সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী ভাষ্য করা হইতেছে। মার্কিন মহল হইতে ভারতের সংশয় দূর করার চেষ্টা করিয়া বলা হয় যে, ভারত আক্রমণ চালাইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সাহায্য করিবে, এমন কোন ব্যবস্থা চুক্তিতে বিহিত হয় নাই। এদিকে পাকিস্তানী মহল হইতে বলা হইতেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের নিকট চুক্তির যেরূপ ব্যাখ্যাই করুক না কেন, যে কোন মহলের আক্রমণের বিরুদ্ধে এই চুক্তি প্রয়োগ করা চলিবে।

৮ই মার্চ—মেরীল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক মহাকাশ বিশেষজ্ঞ ডাঃ ফ্রেড সিঙ্গার গতকল্য এক ভোজসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া উপগ্রহে করিয়া দুইজন লোককে মহাশূন্যে মানুষ প্রেরণ করিতে পারেন। তিনি আরও বলেন, যে দুইজন মানুষকে রাশিয়া মহাশূন্যে প্রেরণ করিবেন তাঁহারা ইংরাজীতে কথা বলিতে, ভূপৃষ্ঠে হইতে প্রেরিত সংকেত ধরিতে, প্রচারকার্য করিতে, প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দাবানলের কথা জানাইতে পারিবেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার　　সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা ষাণ্মাসিক ১১ ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

করে উন্মত্ত আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। ফলে অগ্নিদগ্ধ রোম নগরী আর একবার তপ্ত হল খৃষ্টধর্মীদের উষর রক্ত-স্রোতে।

আহত, নিহত ও মুমূর্ষু খৃষ্টধর্মীদের দলে দলে বন্দী করে নিয়ে আসা হ'ল সম্রাটের সম্মুখে। এম্ফি থিয়েটারে ছেড়ে দেওয়া হল তাদের সিংহের খাদ্যরূপে, আর জিঘাংসা-নিষ্ঠুর শত সহস্র রোমবাসী এসে হাজির হ'ল সেখানে, সেই হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করার পৈশাচিক আনন্দে। ভয়ংকর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অসহায় বন্দীর দল যখন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই সময় এম্ফি থিয়েটারের পুরোভাগে রোমক জনতার নিষ্ঠুর উন্মত্ত কোলাহলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন সন্ত পীতর। উদাত্তকণ্ঠে সেই অসমসাহসী সন্ন্যাসী আহ্বান জানালেন, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষগুলির কাছে—হাসিমুখে মৃত্যুবরণ কর। এ জীবনদান ব্যর্থ হবে না,—এই ত্রাসের রাজত্বের অবসান ঘটাতে স্বয়ং ভগবান নেমে আসবেন রোমের সিংহাসনে......। তাঁর কথা তিনি শেষ করতে পারেন নি। তার পূর্বেই নিষ্ঠুর নীরোর নির্মম নিষ্পেষণে সে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়। তারপর নগরীর উপকণ্ঠে টাইবার নদীর তীরে ভ্যাটিকান পর্বতের চূড়ায় নিয়ে গিয়ে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ঐতিহাসিকের অনুমান এ ঘটনা ঘটে খৃষ্টীয় ৬৭ অব্দে।

বীর সন্ন্যাসীর অকৃপণ জীবনদানে ভ্যাটিকান হয়ে উঠল খৃষ্টজগতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ এবং সন্ত পীতর হলেন সে জগতের প্রথম ধর্মগুরু। তারপর প্রায় দুটি সহস্রাব্দ অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু সেই ধর্মগুরুর ধারা প্রায় কখনোই বিচ্ছিন্ন হয়নি। সদ্যনির্বাচিত পোপ ত্রয়োবিংশ জন হলেন সেই মহান ধর্মগুরু পীতরেরই উত্তরসূরি। একমাত্র জাপানের রাজপদ ছাড়া এত দীর্ঘায়ু সম্মানিত পদ পৃথিবীতে আর একটিও নেই এবং বর্তমানে যে অবস্থা ও পরিবেশ স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি, তাতে নির্ভয়ে একথা বলা যেতে পারে যে, যতদিন খৃষ্টধর্ম থাকবে পৃথিবীতে, ততদিন পোপতন্ত্রেরও অবসান হবে না।

এই দু'হাজার বছরে পোপতন্ত্রকে যে কতবার কত সাংঘাতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা বলে শেষ করা যায় না। এক একবার প্রায় সম্পূর্ণ অবলুপ্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে তাকে, কিন্তু তবুও ভগবানের আশীর্বাদে শেষ পর্যন্ত সে ফাঁড়া তার কেটে গেছে। পঞ্চম শতাব্দীতে [illegible] হুন ও জার্মান জাতিদের আক্রমণ, [illegible] শতাব্দীতে তুর্কী মুসলমানদের আঘাত, [illegible]দশ শতাব্দীতে ইংলন্ডেশ্বর অষ্টম হেনরীর অপমান ও উপেক্ষা, অষ্টাদশ [illegible]তাব্দীতে মদমত্ত নেপোলিয়নের নির্যাতন ও ঐ শতাব্দীরই শেষের দিকে ইতালীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবিরাম আক্রমণে প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে তাকে। কিন্তু তবুও তাঁরা হার মানেন নি। বলিষ্ঠ চিত্তে বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন এবং মুখাত সাহস ও সত্যনিষ্ঠার জোরেই শেষ পর্যন্ত এসব বিপদ অতিক্রমণে সমর্থ হয়েছেন।

রেনেসাঁসের পূর্বে পর্যন্ত ইউরোপে পোপের প্রভাব ছিল সীমাহীন। ১৬ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্য সেদিন তাঁর করতলগত ছিল। কিন্তু শুধু সেই কারণেই তাঁর ক্ষমতা সেদিন অপ্রতিহত ছিল না। ধর্মভীরু ইউরোপের সকল মানুষের কাছে সেদিন তাঁর বাণী ছিল বাইবেলের নির্দেশের চেয়েও অধিক পালনীয়। সকল সামন্ত ও নৃপতি ছিলেন তাঁর আজ্ঞাবহ। তাঁকে শীর্ষে স্থাপন করে সমগ্র ইউরোপকে একটি সংঘবদ্ধ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার চিন্তাও সেদিন অনেক চিন্তানায়ক করেছিলেন। কিন্তু ঐ সময় নিজের প্রয়োজনে ও অনুগত যাজকবর্গের বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করার তাগিদে এমন কতকগুলি কাজে প্রবৃত্ত হলেন তিনি যা ধর্মভাবাকুলদের মনে প্রশ্ন না জাগিয়ে পারল না। তিনি যাজকদের শান্তিপত্র (Indulgence) বিক্রয়ের অনুমতি দিলেন। প্রচার করলেন যে, সেই শান্তিপত্র কিনলে সকল পাপীর সব পাপ স্খালন হয়ে যাবে। কৃত পাপের জন্যে অনুশোচনাও করতে হবে না কাউকে দণ্ডও ভোগ করতে হবে না কিছু। দুষ্কৃতির থেকে এত সহজে নিষ্কৃতিলাভের উপায় উদ্ভাবিত হওয়াতে ইউরোপের লোকদের সেদিন কোন রকম পাপে প্রবৃত্ত হতেই আর আপত্তি রইল না। ফলে অপরাধে ভরে গেল সারা ইউরোপ, আর সেইসঙ্গে গাদা গাদা শান্তিপত্র বিক্রি হতে লাগল রোমের রাস্তায় রাস্তায়।

এই অসম্ভব ধর্মবিরোধী ও খৃষ্টবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্যে প্রতিবাদ জানালেন জার্মানীর উইটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক মার্টিন লুথার। প্রকাশ্যে তিনি শান্তিপত্র পুড়িয়ে দিলেন, তার মূলে বাইবেলের ৯৫টি সূত্র উদ্ধৃত করে দেখিয়ে দিলেন যে শান্তিপত্র বিক্রয়ের অনুকূল নির্দেশ বাইবেলের কোথাও নেই। মহামান্য পোপ লুথারকে প্রতিবাদ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু লুথার তাতে কর্ণপাত করলেন না। তখন পোপ তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করলেন, কিন্তু তাতেও লুথার হার মানলেন না। পরন্তু তিনি জার্মানীর সম্রাট পঞ্চম চার্লসকে আহ্বান জানালেন তাঁর ধর্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। কিন্তু জার্মান সম্রাটের সেদিন পোপের বিরুদ্ধাচরণ করার সাহস ছিল না। অথচ প্রজাদের মনে লুথার যে কি বিপুল পরিমাণে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছেন তাও তিনি বুঝেছিলেন। তাই উভয়দিক রক্ষা করার জন্যে জার্মান সম্রাট লুথারকে ওয়ার্মস্ শহরে আহ্বান জানালেন তাঁর ধর্মমত ব্যাখ্যা করতে। স্যাকসনী প্রদেশের এক সামান্য কৃষক সন্তান সম্রাটের সম্মুখে কথা বলতে সাহস করবে না এই বোধহয় ভেবেছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর সব ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে লুথার এসে দাঁড়ালেন ওয়ার্মস্ শহরের প্রকাশ্য সভায় এবং দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করলেন নিজের ধর্মমত। সঙ্গে সঙ্গে জার্মানীর প্রত্যেকটি রাজ্যে লুথারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এবং দলে দলে জার্মানবাসী লুথারের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে লাগলেন। ফলে অচিরেই পোপের বিশাল ধর্মরাজ্য দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে লুথারের ধর্মমত জন্ম নিল বলে তাঁর ধর্মের নাম হ'ল প্রোটেস্টাণ্ট, আর পোপের অনুগামীরা পরিচিত হলেন রোমান ক্যাথলিক নামে। প্রোটেস্টাণ্টরা খৃষ্টধর্মী হলেও পুণ্যদর্শন পোপের সঙ্গে তাদের আর কোনও সম্পর্ক রইল না। নিজ ধর্মাবলম্বীদের কাছে পোপ এই পেলেন প্রথম আঘাত।

দ্বিতীয় প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়ল তাঁর এতদিনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাবের ওপর, ইংলণ্ডরাজ অষ্টম হেনরীর কাছ থেকে। অষ্টম হেনরী প্রথম অবস্থায় পোপেরই অনুগত ছিলেন, এবং মার্টিন লুথারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ কালে তিনি পোপকেই সমর্থন করেছিলেন। সে কারণে পোপ খুশি হয়ে তাঁকে ডিফেণ্ডার অফ ফেথ উপাধিতে ভূষিত করেন। কিন্তু একটি ব্যক্তিগত বিষয়কে কেন্দ্র করে কিছু দিনের মধ্যেই তাঁদের মধ্যে সংঘাত দেখা দিল। এনি বলিনকে বিবাহের উদ্দেশে তিনি পোপের কাছে আবেদন জানালেন তাঁর প্রথমা মহিষী ক্যাথরিনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের। কিন্তু পোপ সে বিবাহ বিচ্ছেদে অনুমতি দিতে সাহসী হলেন না। কারণ ক্যাথারিন ছিলেন জার্মান সম্রাট পঞ্চম চার্লসের মাসী, আর পঞ্চম চার্লস ছিলেন ইউরোপে মার্টিন লুথারের অভিযানের বিরুদ্ধে তাঁর সবচেয়ে বড় সহায়। পাছে মাসীর অপমানে বোনপো তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এই আশংকায় পোপ অষ্টম হেনরীকে বললেন, রাজ-বিবাহ অবিচ্ছেদ্য, সুতরাং ক্যাথারিনকে বর্জনের অনুমতি তিনি দিতে পারেন না। কিন্তু অষ্টম হেনরী তখন এনি বলিনের প্রেমে উন্মাদ। তাই পোপকে থোড়াই কেয়ার করে তিনি

ক্যাথারিনকে ত্যাগ করলেন এবং বিরাট-খরচ করে' বিয়ে করলেন তাঁর নতুন প্রণয়িনীকে। শুধু তাই নয়, এক আইন জারি করে তিনি ইংলণ্ডের রাজাকেই ইংলণ্ডের চার্চের প্রধান বলে' ঘোষণা করলেন এবং ক্যাথলিকদের সব মঠ লুঠ করে' সেই সঞ্চিত ঐশ্বর্য দিয়ে এক বিরাট শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গড়ে তুললেন, সুতরাং ইংলণ্ডের সংগেও পোপের সম্পর্কের অবসান ঘটল।

এরপর পোপ আরও আঘাত খেলেন ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের হাতে। ইতালীর জয় করার পর নেপোলিয়ন দাবি করলেন ফ্রান্সের চার্চের মত ইতালীর চার্চকেও তিনি স্বনিয়ন্ত্রণে আনবেন। সপ্তম পোপ সে প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে নেপোলিয়ন সেই মুহূর্তেই তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন এবং পোপের সমগ্র রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করে নিলেন। এই জবরদখলের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে পোপ বন্দী হলেন এবং রোম হল ফরাসী সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী। ফলে সাময়িকভাবে ইউরোপ থেকে পোপতন্ত্র নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিন্তু এ অবস্থাও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারল না। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ভিয়েনা কংগ্রেসে সমবেত ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসকবর্গ ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে আবার পোপকে তাঁর হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দিলেন এবং পোপও তাঁর পূর্ব সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হলেন।

কিন্তু সে প্রচেষ্টায় এবার বাধা পেতে হ'ল তাঁকে আর এক নতুন জাগ্রত শক্তির কাছে, সে হ'ল ইতালীর জাতীয়তাবোধ। নেপোলিয়নের ইতালী বিজয় ইতিহাসের একটি চলতি ঘটনামাত্র ছিল না। ফরাসী বিপ্লবের এই বলিষ্ঠ শিশু ইতালীর অভ্যন্তরস্থ কৃত্রিম বিভাগগুলি লুপ্ত ক'রে সমগ্র ইতালীর অধিবাসীকে এমনই এক জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত করে গিয়েছিলেন যে তাঁর পরাজয়ের পর ভিয়েনা কংগ্রেসের নেতৃবর্গের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়নি। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইতালীকে আবার আগের মত প্রায় কুড়িটি ভাগে বিভক্ত করে ভিয়েনা কংগ্রেসের নেতৃবর্গ পুনঃস্থাপিত করেছিলেন তাদের প্রাক্তন শাসকবর্গকে। কিন্তু ইতালীর নবজাগ্রত গণশক্তি কিছুতেই আর তাঁদের সেই পুরাতন অবস্থায় ফিরে যেতে চাইলেন না। ফলে ম্যাৎসিনি, কাভুর, গ্যারিবলডী প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেল ইতালীর ঐক্য ও মুক্তি আন্দোলন এবং বিভিন্ন বহিঃশক্তির শত বাধা সত্ত্বেও [illegible] আন্দোলন হয়ে উঠল দুর্জয় ও দুর্নিবার। আর এর ফলে আর একবার নতুন করে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন মহামান্য পোপ। বহুকষ্টে ভিয়েনা কংগ্রেসের দয়ায় তিনি ফিরে পেয়েছেন তাঁর হৃত সাম্রাজ্য ও সম্মান। জাতীয়তাবাদীদের আঘাতে আবার তা বিপন্ন হোক, এ তিনি চাইলেন না। তাই সবদিক বিবেচনা করে' পোপ ভিয়েনা কংগ্রেসকেই তাঁর শেষ আশ্রয় বলে ধরে নিলেন এবং অস্ট্রিয়া ও ফ্রান্সের অস্ত্রশক্তির ভরসায় তিনি প্রকাশ্যে জাতীয়বাদী শক্তির বিরোধিতা শুরু করলেন। ইতিহাসের অগ্রগতি যে দুর্নিবার তা আর একবার বুঝতে ভুল হল মাহামান্য পোপের।

সংখ্যাতীত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে পিয়েডমণ্টের রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের নেতৃত্বে ইতালীর ঐক্য ও মুক্তি সংগ্রাম সফল হল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে একমাত্র পোপরাজ্য রোম ছাড়া ইতালীর আর সকল অঞ্চলই ঐক্যবদ্ধ হল। রোম তখন ফরাসী সৈন্যদের প্রহরাধীন ছিল। পাছে রোম দখল করতে গিয়ে ফরাসী সৈন্যদের সংগে যুদ্ধ বাধে এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের সঙ্গে একটা অবাঞ্ছিত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হয় তাই জন্য ইতালীর মুক্তিযোদ্ধারা রোম দখলের ব্যাপারে এতটা সংযত হয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন, সমগ্র ইতালী যখন ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে, তখন রোম একদিন তার অন্তর্ভুক্ত হবেই। আর তাঁদের সে আশা পূরন হতে বেশি সময়ও নিল না। ঐ বছরেই প্রুশিয়ার আক্রমণে ফ্রান্স এমনই পর্যুদস্ত হয়ে পড়ল যে ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন বাধ্য হলেন রোম-অবরোধকারী ফরাসী সৈন্যবাহিনীকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। আর সেই সুযোগে ইতালীর মুক্তিযোদ্ধারাও রোম দখল করে নিলেন। ফলে রাজ্যহারা সম্মানহারা পোপের জীবনে আবার নেমে এল দারুণ বিপর্যয়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইতালীর পার্লামেণ্টে পোপের অধিকার ও পদমর্যাদার প্রতি স্বীকৃতি জানিয়ে একটি আইন গৃহীত হ'ল। তাতে পোপকে তাঁর হৃতরাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল না বটে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত ও ধর্মগত সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেওয়া হল। তাঁকে আগের মতই বিভিন্ন রাজ্যে ব্যক্তিগত প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার দেওয়া হ'ল এবং তাঁর ভ্যাটিকান-স্থিত প্রাসাদে অবস্থান করে তিনি স্বাধীনভাবে ধর্ম পরিচালনা করতে পারবেন এ প্রতিশ্রুতি তাঁকে দেওয়া হ'ল। এ ছাড়াও

তাঁকে একটি মাসিক ভাতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হ'ল। কিন্তু ক্রুদ্ধ অপমানাহত পোপ সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করলেন না। শুধু তাই নয়, নবগঠিত ইতালী সরকারকেই তিনি অস্বীকার করলেন এবং তাঁর ভ্যাটিকানস্থিত প্রাসাদের অভ্যন্তরে অবস্থান করে তিনি সমগ্র ক্যাথলিক জগতের কাছে ঘোষণা করলেন, ইতালীর স্বৈরাচারী শাসকবর্গের জঘন্য লুণ্ঠন কার্যের প্রতিবাদে তিনি স্বেচ্ছাবন্দিত্ব গ্রহণ করলেন। যতদিন না ইতালীর শাসকবর্গ তাঁর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে' নেবে, ততদিন পর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর প্রাসাদে বন্দী হয়ে থাকবেন।

তারপর অর্ধশতাব্দী ধরে' চলল এই অচল অবস্থা। একজন পোপের মৃত্যু হলে তাঁর পরবর্তী পোপ অগ্রবর্তীর মতই নিজেকে বন্দী বলে' ঘোষণা করতে লাগলেন এবং ইতালীর নবগঠিত জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র ক্যাথলিক জগতকে প্ররোচিত করতে লাগলেন। এবং ইতালী সরকারের অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মত বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রেরণ করতে লাগলেন ব্যক্তিগত দূত, এবং তার বিনিময়ে সেই সকল রাষ্ট্রের কূটপক্ষও তাঁর সঙ্গে স্থাপন করতে লাগলেন "কূটনৈতিক সম্পর্ক"। ১৮৭১ থেকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থা এই একই রকম অচল ও অস্বাভাবিক থেকে গেল। মহামান্য পোপের এই ঔদ্ধত্য ও অবমাননা ইতালীর জাতীয় সরকার আদবেই সমর্থন করেননি, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু তবুও তাঁরা তাঁর কাজে বাধা দেননি এই কারণে যে তার ফলে তাঁদের সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিতভাবে ইউরোপ তথা বিশ্বের ক্যাথলিক সমাজের কাছে অপ্রিয় হয়ে পড়তে হ'ত, আর এই অপ্রিয় হওয়ার ফল যে কি মারাত্মক তা তাঁরা নেপোলিয়নের পরিণতি থেকে শিক্ষালাভ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ ঘটে গেল এবং তার ফলে ইতালীর জাতীয় জীবনে নেমে এল নানা বিপর্যয়। আর সেই বিপর্যয়ের মধ্যে আবির্ভাব ঘটল ফ্যাসিস্ট নেতা সিনর মুসোলিনির। ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েই তিনি ইউরোপের ক্যাথলিক সমাজের মনোরঞ্জনের জন্যে চাইলেন ইতালী সরকারের সঙ্গে পোপের অর্ধশতাব্দীকাল বিরোধের নিষ্পত্তি করে' নিতে এবং পোপকে যতখানি সম্ভব তাঁর পুরাতন মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। এই উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন পোপ একাদশ পায়াসের সঙ্গে আলোচনা শুরু করলেন এবং সেই আলোচনার ফলস্বরূপ ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উভয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত হ'ল ল্যাটেরান চুক্তি। পোপ-ইতালী বিরোধের নিষ্পত্তি হ'ল এবং পরের দিন ভাটিকান প্রাসাদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে পুণ্যদর্শন পোপ একাদশ পায়াস প্রশান্তচিত্তে আশীর্বাদ জানালেন সমবেত লক্ষাধিক হর্ষোৎফুল্ল নরনারীকে।

ল্যাটেরান চুক্তির ফলে রোম নগরীর উপকণ্ঠে টাইবার নদীর তীরে একশত নয় একর ভূমি নিয়ে গঠিত হ'ল একটি নতুন রাষ্ট্র, নাম তার ভ্যাটিকান সিটি। পুণ্যদর্শন পোপ হলেন তার রাষ্ট্রপ্রধান এবং তার নাগরিকের সংখ্যা হ'ল ৭২৮ জন! স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, সুতরাং অন্যান্য রাষ্ট্রের মত তারও গড়ে উঠল স্বতন্ত্র আইনসভা, বিচার ব্যবস্থা শাসনযন্ত্র; এমন কি স্বতন্ত্র মুদ্রা, ডাকটিকিট, রেলওয়ে, জেলখানা, সৈন্যবাহিনীও! সৈন্যবাহিনী আবার তিনভাগে বিভক্ত হ'ল। একজন লেফটেনাণ্ট জেনারেলের অধীনে ৬৪ জন রোমান নাগরিক নিয়ে গঠিত হ'ল 'গার্ডিয়া নোবাইল', একজন কর্নেলের অধীনে ১২০ জন সুইস নাগরিক নিয়ে গঠিত হ'ল 'সুইস গার্ডস', আর আরও ৫৩ জন নিয়ে গঠিত হ'ল গার্ডিয়া প্যালাটিনা', যাদের কাজ হ'ল বিশেষ অবস্থায় ভ্যাটিকান সৈন্যবাহিনীকে সাহায্য করা। এ ছাড়াও ৭০ জন লোককে নিয়ে গঠিত হ'ল রাষ্ট্রের শান্তিরক্ষক পুলিস বাহিনী। ল্যাটেরান চুক্তি অনুসারে ভ্যাটিকান সিটির মুদ্রা ইতালীতেও চলতি মুদ্রারূপে স্বীকৃতি লাভ করল। এছাড়াও ডাক, তার, রেলপথ, বিমানপথ প্রভৃতির মাধ্যমে ইতালীর সঙ্গে তার স্থায়ী সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে পোপ এবার একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রধানরূপে দূত বিনিময় করলেন। ভারতের সঙ্গেও বর্তমানে ভ্যাটিকান রাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ইতালীস্থ রাষ্ট্রদূতই বর্তমানে ভ্যাটিকানের রাষ্ট্রদূতরূপে নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

ভ্যাটিকান রাষ্ট্রের প্রধান আকর্ষণ হ'ল ভ্যাটিকান প্রাসাদ। এত বড় প্রাসাদ বর্তমানে পৃথিবীতে আর একটিও নেই। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম নিকোলাস এর গঠন কার্য শুরু করেন এবং প্রায় চার শ' বছর বাদে পোপ নবম পায়াসের কার্যকালে সে কাজের পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রায় ৪৯ বিঘা জমির ওপর গঠিত এই প্রাসাদটির ঘর, প্রার্থনা সভা ও হলের সংখ্যা হ'ল ১৪০০! আর সেই প্রাসাদের দেওয়ালে ছবি এঁকেছেন বত্তিচেল্লি, পেরুজিনো, মাইকেল এঞ্জেলো প্রমুখ পনের জন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। এই প্রাসাদেই রক্ষিত আছে মাইকেল এঞ্জেলোর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'লাস্ট সাপার'। এছাড়াও এই প্রাসাদের আর্ট গ্যালারিতে সংরক্ষিত আছে র‍্যাফেল, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, পেরুজিনো, মুরিলো প্রমুখ শিল্পীবৃন্দের অবিনশ্বর ও অনবদ্য শিল্প সৃষ্টি। এই প্রাসাদের গ্রন্থাগারের বিশালতাও বিশেষ উল্লেখ্য। এ গ্রন্থাগারে মুদ্রিত গ্রন্থ আছে পঞ্চাশ লক্ষ, আর অমূল্য পাণ্ডুলিপি আছে পঞ্চাশ হাজার। এই পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ভার্জিলের কাব্যগ্রন্থ, সিসারোর চতুর্থ শতাব্দীর 'ডি রিপাবলিকা', আর এনি বোলিনকে লেখা অষ্টম হেনরীর উচ্ছ্বাসে ভরা প্রেম পত্রাবলী। এই পত্রগুলি কি সূত্রে পোপের হাতে এসে পৌঁছেছে তা' জানি না, কিন্তু কেন যে মহামান্য পোপ এগুলিকে সযত্নে রক্ষা করে' রেখেছেন তা বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রায় চার শ' বছর আগে ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেনরীকে তাঁর মহিষী ক্যাথারিনকে ত্যাগ করার অনুমতি না দিয়ে পোপ যে কোন অন্যায় কাজ করেননি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বোধ হয় এই পত্রাবলী।

৩
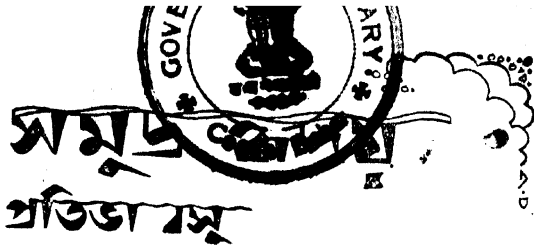
'সুলতান সাহেব।'

সুলতানের চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল।

'শোনো, সুলেখা,' ফরাসী সিল্কের ঢোলা লম্বা পোশাকে কম্পন তুলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, 'এই তিন বছর তোমাকে দেখবার পর থেকে সত্যিই আমি একটা শয়তানের পার্ট করেছি যা নই বা ছিলাম না তাই হয়েছি, হিন্দু বিদ্বেষে প্রতি-মুহূর্তে জ্বলে পুড়ে মরেছি আমি। আমার সব ক্ষমতা আমি ঢেলে দিয়েছি একটা দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টায়, যতো খারাপ লেগেছে, ততো উদ্দাম হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছি, কিন্তু টিকতে পারিনি শেষ পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত আমার বিবেক আমার শত্রুতা করেছে। তোমরা নিজে থেকেই যতোটা মন্দ, যতোটা কুৎসিত, আর যতো নিষ্ঠুর, আমি চেষ্টা করেও তা হতে পারিনি। মানুষকে আমি মানুষ হিসেবেই ভালোবেসেছি, জাত হিসেবে নয়। মানুষ হিসেবেই শ্রদ্ধা করেছি, তার নাম গোত্র জিজ্ঞাসা করিনি। মুসলমানদের বিরোধ-করতে প্ররোচনা দিয়েছি বটে, পরমুহূর্তেই আবার হিন্দুদের রক্ষা করেছি বুক দিয়ে। পাশাপাশি দুটো মানুষ কাজ করেছে আমার ভিতরে যাদের কোনোদিকে কোনো মিল নেই। এই মারামারির আগেও তোমাকে চুরি করবার চেষ্টা করেছিলাম আমি। পারিনি। নবাব বংশের ছেলে, আমার রক্তে কাম প্রবল, জেদ প্রবল, ভালোবাসা প্রবল। চেয়ে পারো না এ আমি জানি না, ইচ্ছে যেখানে প্রতিহত হয় সমুদ্র সেখানে উত্তাল হয়ে ওঠে আমার বুকে। মনে মনে শেষে এই ভেবেছিলাম, তোমাকে যদি কখনো হাতের মুঠোয় পাই তোমাদের সব হিঁদুয়ানী আমি চেটেপুটে খেয়ে শেষ করে দেবো। অপমানে, অসম্মানে, অত্যাচারে ক্ষত বিক্ষত করে রাস্তায় ছেড়ে দেব তোমাকে। একটা উল্টো প্রতিক্রিয়ায় আমি পাগলের মতো সব অন্যায় চিন্তা করেছি। ভালোবেসে আমি ব্যর্থতা বহন করবার শিক্ষা নিয়ে বড়ো হইনি। দুঃখ মহান, দুঃখ পবিত্র, এ ধর্ম আমার নয়। দুঃখ আমার শত্রু এই আমি জানি, জানি বলেই এই লড়াই।' আর সিল্কের মহিমায় তিনি হেঁটে গেলেন দরজার কাছে। পা মুড়ে, মুখ নিচু করে ছবির মতো বসে রইলো সুলেখা। কোনো কথাই তার কানে গেলো না।

ধীরে ধীরে আবার ফিরে এলেন সুলতান সাহেব, কাছে এসে দাঁড়ালেন, প্রায় রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'তুমি কি সত্যিই চলে যেতে চাও?'

সুলেখা ছটফট করে উঠলো, 'চাই না!'

'তাইতো! কেনই বা চাইবে না।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'কিন্তু কোথায় যাবে?'

'মার কাছে।'

'তোমার মা কোথায় আমি তো তা জানি না।'

'আপনিই তো তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'তা দিয়েছি। বাইরের খবর তুমি জানো না, একটা নরক। এ শহর থেকে যাতে পালাতে পারেন, অতি কষ্টে সেটুকু ব্যবস্থাই করতে পেরেছি শুধু। হিন্দু-স্থানের প্লেনে চড়িয়ে দিয়ে এসেছি, আর আমি কিছু জানি নে।

'তা হলে আমাকেও সে ব্যবস্থা করে দিন।'

'তোমাকে!'

'আপনার পায়ে পড়ি—'

'কিন্তু তারপর।'

'তারপরের দায়িত্ব তো আপনার নয়।'

সুলতান মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়ে দিলেন বাতাসে, একটু হেসে বললেন, 'তোমার বিবেচনায় না হতে পারে, আমার তো একটা কর্তব্য আছে। উদ্বেগটাকেই বা অস্বীকার করি কী করে। না, না, তুমি যেয়ো না, তোমাকে এ ভাবে আমি ছেড়ে দেবো না, দিতে পারি না।'

'তাই বলুন।' সুলেখার বিনীত ভঙ্গি কঠিন হলো, একটা ক্রূর হাসিতে ভরে গেল মুখ।

'সুলেখা!' সুলতানের গলা কোমলতায় ভেজা।
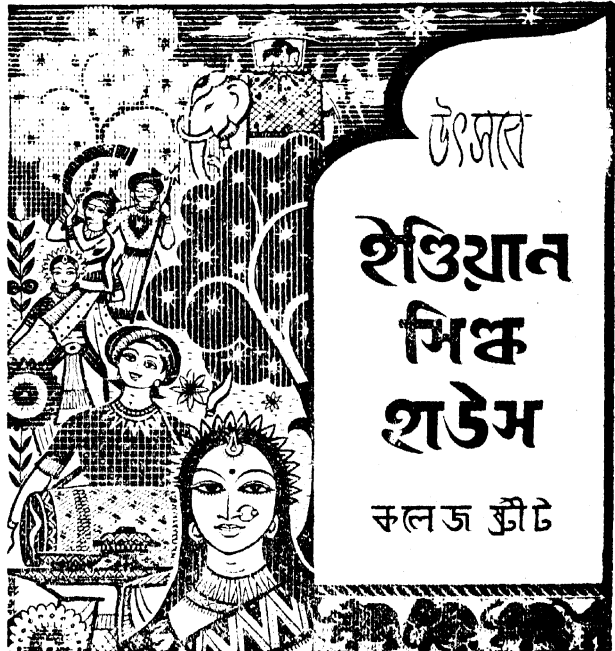
'বলুন।'

'একটা কথা শুনবে—'

'কান যখন বধির নয়, শুনতেই হবে।

'এদিকে তাকাও।'

'না।'

'একবার তাকাও।'

'না।'

'একবার তাকিয়ে তুমি দেখো—'

'আপনার দেবদুর্লভ সুন্দর মুখ তো আমি অনেকবার দেখেছি সুলতান সাহেব।'

সুলতান সরে এসে আবার সোফায় বসলেন, স্মিতহাস্যে বললেন, 'আর একবারও না হয় দেখো।'

'সুন্দর মুখই যে সুন্দর হৃদয়ের প্রতিবিম্ব নয়, সে কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়ে কী লাভ আপনার?' দুর্বলতা কাটিয়ে আবার ঋজু শরীরে কঠিন মুখ নিয়ে উঠে দাঁড়াল সুলেখা। আবার তার চোখে পুরোনো দিনের প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে লাগলো থর থর করে।

কয়েকটা মুহূর্ত নিথর। নিঃঝুম। নবাব বাড়ির দেয়ালঘেরা বিশাল বাড়ির বিশাল মাঠের এক কোণে একটি গোল হল ঘর যেন যাদুমন্ত্রে শিলীভূত হয়ে রইলো। বাইরের জমাট অন্ধকার ভিতরেও জমে উঠতে লাগলো। সুলতান সাহেব জানালা দিয়ে আকাশভরা তারার দিকে তাকালেন। তারপর সুলেখার হিংস্র চোখে চোখ রেখে হাসলেন 'কী ইচ্ছে করছে জানি। কিন্তু সুলেখা, তোমার কাছে কি আমি কিছুই আশা করতে পারি না?'

'কিসের আশা?'

'বিশেষ কিছুই না, শুধু একটুখানি সৌজন্য, তাও কি এতোদিনে পাবার যোগ্যতা অর্জন করিনি আমি?'

এমন একটা মজার কথা কে কবে শুনেছে? হাসি পেলো সুলেখার। যে লোকটার পেশাই হচ্ছে মেয়ে চুরি করা আর মানুষ খুন করা, তার মুখে সৌজন্যের বুলি। সুলেখা গুম্ হয়ে চুপ করে রইলো, একটু আগে নিজের দুর্বলতার কথা ভেবে ধিক্কার দিলো নিজেকে। এর কথায়ও বিশ্বাস করেছিলো সে!

'কথা বলছো না!' সুলতানের নরম গলা প্রায় কান্নার মতো সজল—'আমাকে কি তুমি এখনো ক্ষমা করতে পারো নি?'

বাতুল! শ্যামল মুখ রক্তিম করে সুলেখা বাইরের দরজার দিকে তাকালো। ভারি পর্দায় আচ্ছন্ন। না, কোনোদিন আর সে-পর্দা সরবে না তার জীবনে। আর সূর্য উঠবে না অন্ধকার ভেদ করে। কেবল আশার ছলনা। মিথ্যাবাদী! নিষ্ঠুর! কপট! হীন! লম্পট! বাজে কথা বলে মন ভেজাতে এসেছে আমাকে। আমি যেন ওকে চিনি না, জানি না। দাঁতে দাঁত ঘষে উদ্যত কোনো কঠিন কথাকে পিষ্ট করে বললো, 'দাসীর সঙ্গে কি রহস্য করছেন নবাবজাদা? দাসী কি আপনার রহস্যের যোগ্য?'

'সুলেখা।'

'মহল তো আপনার একটাই নয়, ক্রীত-দাসীর সংখ্যাও অদ্বিতীয় নয়—'

'সুলেখা, তুমি তো একজন মেয়ে—'

'সে বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে?'

'তোমার কি মনে হয় না, এই যে দিনের পর দিন, আমি কেবল অপেক্ষাই করছি, এটাই আমাকে বিশ্বাস করবার মতো যথেষ্ট প্রমাণ। লোকে যা-ই বলুক, সত্যিই আমি অসৎচরিত্র নই, কিন্তু আমারো তো রক্ত-মাংসের শরীর আছে একটা। প্রত্যেক দিন এই নিঃঝুম রাত্রির নিরালা নিভৃতে একান্ত কাছে বসে এক মুহূর্তের জন্যও যে তোমাকে আমি স্পর্শ করি না সেটা—'

'চুপ করুন। চুপ করুন।' অসহ্য বোধে কানে আঙুল দিল সুলেখা। তারপর দৌড়ে চলে এলো এদিকে, এই দেয়ালের জানালায়। একেবারে শক্ত হয়ে পিছন ফিরে ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো তেজী ঘোড়ার মতো। ইচ্ছে করলো জানালার লোহাগুলো উপড়ে ফেলে দেয় দৈবশক্তিতে। হায় রে! মনের সঙ্গে শরীর যদি একটুও সহযোগিতা করতো।

চুপ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময়ে উঠলেন সুলতান সাহেব, দুটি হাত পিছনে রেখে একটু ভাবলেন, ব্যাকুল পদক্ষেপে ছুটে এলেন এদিকের দেয়ালে, কিন্তু না, ইচ্ছাকে সংযত করলেন তিনি, অর্ধেক এসেই থামলেন, একটু হাঁপালেন তারপর আবার ফিরলেন। ধীরে ধীরে হেঁটে এলেন দরজার কাছে, ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলেন পর্দার ওপিঠে। দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লো সুলেখা, ফুলে ফুলে কান্না আসতে লাগলো তার। কতো-দিন পরে আজ সে তার মায়ের কথা শুনেছে, ভাইয়েদের কথা শুনেছে, দুঃখের পাষাণ গলে গেছে। আজ আর ধৈর্য বাঁধ মানে না।

এরপরে পর পর তিন দিন সুলতান সাহেব সুলেখার মহলে এলেন না। তাতে অবিশ্যি ইতর বিশেষ হলো না কিছু। সুলেখার দিন তেমনিই কাটতে লাগলো। তেমনিই বিস্বাদ। তেমনিই বিরস। তেমনিই রাতের পর দিন আর দিনের পর রাত। একই তারে বাঁধা। সকালের লাল সূর্য কমলা রং রোদ হয়ে ধীরে ধীরে দুপুরের আকাশ বিলীন হয়, দুপুরের খাঁ খাঁ আকাশ গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যার ধূসরে মিশে যায়। রাত্রির নিঃসঙ্গতা তেমনি ঘন, তেমনি গাঢ়। তবু থেকে থেকে সুলেখার বুকের ভিতরে একটা আশার বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। বারে বারে মনে হয় এই বুঝি দেখা দিলো আলো, বুঝি বা এজন্যেই ব্যস্ত আছেন সুলতান সাহেব। হঠাৎ এসে খবর দেবেন সব ব্যবস্থা ঠিক।

ঘর মুছতে মুছতে ছোটো বাঁদী বললো, বড়ো মহলে নাকি ভীষণ বিপদ। সাহের বানু বাঁকা ঠোঁটে হাসলো, 'কর্তার কি অখন পরাণের ডর আছে! রাংতার চশমা চোখে দিছে যে। গোটা দুনিয়াটাই অখন তেনার কাছে বিলকুল রঙিন। পর্শু রাইত তিনটার সময় কী কাণ্ড! আমিত দেইখা শুইনা ভয়ে মরি। প্রথমে কি বুঝছি নাকি? শয়নে দেখি শাড়ে শাড়ে মাথা। বাইরের থন সব আনাইছে যে দাঙা করণের লেইগা, সেইগুলির কি আর নবাব সুবার জ্ঞান আছে? আইয়া কয় যে বাড়ির মইদ্দে কাফের লুকাইয়া থুইছ, আমরা দেখছি। শহরে গুজব রটছে হুজুরে নাকি বোরখা পরাইয়া নিজে মটর চালাইয়া কোন এক হিন্দু পরিবারকে হাওড়াই জাহাজে তুইলা দিয়া আইছে নিরাপদে—'

চকিত হলো সুলেখা, 'কী! কী, গুজব রটেছে?'

কানের কাছে মুখ আনলো সাহের বানু, 'গুজবটা বৈন উড়াইয়া দেওনের কথা না। এই সাহেবজানের বুদ্ধি বড়ো ধার, চক্ষু মেকুরের মতো অন্ধকারে জ্বলে। লুকাইলে কী অইব, দুই চক্ষের কিরা আমি যদি সাচা কথা না কইয়া থাকি। কতো বড়ো ঠেকি ঠেকি দুইটা জাওয়ানরে কর্তা মাইয়া লোক সাজাইয়া কেমন বোরখা পরাইয়া দিলেন। যেন দুইটা তক্তা। হাইসা আর বাঁচি না। নিজের চক্ষে দেখলাম ঘুলঘুলি দিয়া চুপি মাইরা।'

'আর—আর কী দেখলে সাহের বানু—'

'সব কি বৈন কওন যায়? শেষে জবেদার কানে উঠুক, তখন মরি আর কি। গোপন খবর ছড়াইতাছি কইলা অমনে গিয়া কান ফুসকুরি দিবো না। আর আমাগো নবাব সাহেবও তো সেই পদেরই কান পাতলা। শোনন মাত্র আস্তা মাটিতে পুইতা ফালাইবো।'

নাস্তা নিয়ে গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকলো জবেদা, সংগে সংগে প্রায় কেঁপে উঠে থেমে গেল সাহের বানু, ঢোক গিলে গলার স্বর বদলে বললো 'এই তো কইতে কইতেই জবেদা দিদি আমাগো নাস্তা লইয়া আইছে। খাও বৈন খাও, মুখখান একেবারে শুকাইয়া গেছে।' তাড়াতাড়ি উঠে এটা ওটা নাড়তে লাগলো সে। জবেদা ছুটি দিল তাকে। তারপর নাস্তা রেখে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। খাবার বাসনগুলো ঠেলে দিল সুলেখা—আমি খাবো না।'

'কেন?'

'আমার খিদে নেই।'

'খিদে তো তোমার বাছা কোনো দিনই থাকে না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও—' জবেদার মুখ আজ গম্ভীর, বিষণ্ণ, চিন্তিত। চোখের ভারি পাতা দুটি যেন আরো ভারি হয়েছে, টলটলে চোখ আরো সজল। একটু তাকিয়ে দেখলো সুলেখা, জবেদা নতমুখে রুপোর পট থেকে চা ঢেলে দিল।

'শোনো', চায়ের পেয়ালাটা সুলেখার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললো, 'ক'দিন সাহেবের শরীর ভালো ছিলো না, তা ছাড়া নানারকম বিপদ আপদেও উদ্‌ভ্রান্ত ছিলেন, তাই আসতে পারেননি। নিজের মহল থেকে এ ক'দিন এক পা-ও নড়েননি। আজ এখুনি, আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে উনি একবার তোমার সংগে দেখা করতে চান, তোমার কোনো অসুবিধে হবে কিনা জিজ্ঞেস করেছেন।'

তিন দিন পরে মাত্র এই খবর! রাগে সুলেখা টান হয়ে বসলো, 'বাধিত হলাম। কিন্তু আমার সুবিধে অসুবিধের জন্য তোমাদের নবাব সাহেবের আবার এতো ভক্তি হলো কবে থেকে?'

জবেদা কঠিন চোখে তাকালো, 'বেইমানি কোরো না। তিনি তোমার কোনোই ক্ষতি করেননি।'

'ক্ষতি! ক্ষতি বললে কতোখানি বোঝো? কতোটা ধারণায় আসে?'

'দ্যাখো, ঐ মানুষটাকে এই দুখানা হাতেই নেড়ে চেড়ে আমি বড়ো করেছি, আর কিছু না হোক, এটুকু অন্তত জানি, দিনে রাত্রে অহরহ তুমি যার জীবন নাশের চিন্তা করছো, সে একান্ত মনে তোমার ভালোটুকুই চেয়ে এসেছে। আর এটাও জানি, কারো কোনো মন্দ চিন্তা করবার মতো ছোট দিল দিয়ে খোদা তাকে দুনিয়ায় পাঠাননি।' চাঁপার কুঁড়ির মতো আঙুলে দটি সে কপালে ছোঁয়ালো—'নসিব, বজিব—সব, নসিবের খেলা। নইলে এই দুর্মতি তার কেন হবে। কেন সে এমন করে আপন সর্বনাশ আপনি ডেকে আনবে। কিসের অভাব ছিলো তার। কোন দিকে সে অযোগ্য। কী তার করতল-গত ছিলো না এ সংসারে।'

জবেদা স্নেহময়ী। জবেদা ধীর স্থির শান্ত। এ তিন মাসে সুলেখা তাকে অশান্ত হতে দেখেনি, উত্তেজিত হতে দেখেনি, কোনো কারণে এতোটুকু উঁচুতে উঠতে শোনেনি তার গলা। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিয়ম করে করে আরো চারজন পরিচারিকা থাকে বটে তার জন্য, কিন্তু জবেদা তার দিন রাতের। জবেদা সঙ্গী হয়ে থাকে, মা হয়ে থাকে, বন্ধু হয়ে থাকে। গল্প করে, সেলাই করে, ঘর গুছিয়ে দেয়। মন শান্ত করবার চেষ্টা করে নানা কথা বলে। চুল আঁচড়ে দেয়, তেল মাখিয়ে দেয়, স্নানে নিয়ে যায় গোসলখানায়। বললে গেলে শিশুর মতো তাকে আগলে রাখে জবেদা। হয়তো বা ভালোও বাসে। আজকের এই উক্তি তাই অবাক করলো সুলেখাকে। মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো সে।

জবেদাও চুপ করলো। তার সুর্মা আঁকা বড়ো বড়ো চোখের দৃষ্টি অপলক হলো সুলেখার মুখের উপর। এই বিশাল সবুজ মহলের মাননীয়া অতিথিটির দিকে তাকিয়ে মনে পড়লো সাহেব ইঞ্জিনিয়র আনিয়ে সুলতানের আব্বাজান নবাব আকতার আমেদ যেদিন এ বাড়ির নক্সা আঁকালেন। উন্মনা ছেলেকে ঘরমুখো করবেন তিনি। সাদি দেবেন ধুমধাড়াক্কা করে। পাঁচ মাইল জোড়া মিছিল বেরোবে। ঘোড়ার মিছিল, গাড়ির মিছিল, পদাতিকের মিছিল। সারা শহর সাজিয়ে দেবেন আলোক মালায়। কাঙালী ভোজন হবে এক মাস ধরে, এক মাস ধরে চলবে সেই উৎসব। এই নতুন মহলে উঠবে এসে নতুন মানুষ।

নবাব বাড়িতে বহুদিন তেমন কোন জলসের উৎসব ঘটেনি, এবার তা পরি-পূর্ণ মাত্রায় উশুল করতে হবে। আমির-ওমরাওর ঘরের সব গোলাপ-সুন্দরীদের সেরা সুন্দরীটিকে আনবেন ঘরে। অনেক বছর বিলেতে কাটিয়েছেন সুলতান, বিদেশিনীদের হার মানাতে পারে এমন রং না আনলে চলবে কেন। দেশে বিদেশে খোঁজ খোঁজ রব উঠলো। শেষে ঘরের কোণে উত্তর বাংলার নবাবের ঘরে পাওয়া গেল উপযুক্ত পাত্রী। রূপগুণে সমতুল্যা। নামেও জাহানারা কাজেও জাহানারা। সুলতানের পাশে দাঁড়াবার যোগ্য বেগম। এ বাড়ির বেগমরা কেই-বা সুন্দরী নয়। সুলতানের মাকে অবিশ্যি জবেদা দেখেনি, কিন্তু শুনেছে, তিনি অলোকসামান্যা রূপসী ছিলেন। সুলতানের নানি তো এই সেদিন মারা গেলেন, কী তার রং ছিলো, তাকালে ঝলসে যায় চোখ। সুলতানের জন্যও যে তাই আসবে তা আর এমন বিচিত্র কী? কিন্তু একটু বিচিত্র হলো সকলকে হার মানাবার মতো রূপ নিয়ে হঠাৎ একদিন সশরীরে এসে হাজির হলো এই মেয়ে। উত্তর বাংলার নবাব সপরিবারে বেড়াতে এসেছিলেন এ শহরে, পূর্ববাংলার নবাবের নবাবোচিত আতিথেয়তার ত্রুটি হলো না, সেই সঙ্গে ছেলের বৌও পছন্দ হয়ে গেল। কে না পছন্দ করবে এই মেয়েকে? এতো রূপ কে কবে দেখেছে? আলোর মতো মানুষ। এলিয়ে বসেছিলো বাগানে, মাথায় স্বচ্ছ ওড়নার আবরণ, তার তলায় মুখখানা যেন একটুকরো চাঁদ। জাফরান রংয়ের ঢোলা পাজামার উপরে চুমকিদার জামা, নিচের দিকে জরির চটি পরা ছোট্ট দুখানা খোলা পা। পাশে পাথরের বাসনে আপেল, নাসপাতি, নরাঙ্গি। সুলতানের আব্বাজান দেখে এসে এই বর্ণনা দিয়েছিলেন জবেদার কাছে। বলেছিলেন, 'ছেলে এবার আর না বলতে পারবে না।'

তখনই জবেদা বলেছিলো, 'বিয়ে করে ছেলে তার সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে মধুবাসর কোথায় যাপন করবে, সব কর্তাদেরই তো আলাদা মহল আছে, ওর জন্যেও হোক। নতুন মানুষ এসে নতুন বাড়িতে উঠুক।'

আমেদ সাহেব একটু হেসেছিলেন, জবেদার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে নরম গলায় বলেছিলেন, 'আমি জানি সুলতানের আম্মা বেঁচে থাকলে ও ছেলের জন্য ঠিক এই আবদারই তুলতেন।'

এ কথায় বড়ো সরম লেগেছিলো জবেদার। একথা বলবার সময় সুলতানের বাবার গলায় আবেগ ছিলো, স্নেহ ছিলো, মমতা ছিলো। আর ছিলো এই অযোগ্য হতভাগিনী জবেদাকে একটা মর্যাদা দেবার বিশেষ ভঙ্গি। মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলো জবেদা। একটু পরে আমেদ সাহেব আবার বললেন, 'জবেদা, ছেলেকে তুমিই মানুষ করেছ, তোমারই সকলের চেয়ে বড়ো অধি-কার। তোমার সাধ আহ্লাদ আমি সবই মিটাতে চেষ্টা করবো। যা তুমি চাও, যে রকম তোমার শখ, সব তেমন করেই হবে।' আর তারপরেই নবাব বাড়ির বিশাল মাঠের এই ঝাউ আর ইয়ুকেলিপটাসের লম্বা লম্বা ছায়াঘেরা কোণটিতে গড়ে উঠলো এই মর্মর প্রাসাদ। সুলতানের বাসর ঘর।

কিন্তু হলো না। কিছুই হলো না। রাজী হয়েও বিগড়ে গেল ছেলে। মাঝ-খান থেকে অকারণে রঙিন কাচ দেয়া এই দামী মহলটি তৈরী করার খাতে বৃষ্টির মতো ঝরে গেল হাজার হাজার টাকা। নবাবেরা ব্যয় সংকোচ করতে জানেন না, বিলাসিতায় কার্পণ্য করা তাঁদের বংশের ধারা নয়। দরাজ হাতে খরচ করেছিলেন আকতার আমেদ। নানা দেশ থেকে নানা রকম জিনিস সংগ্রহ করেছিলেন মহলটিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তুলতে। কাঠের কাজ করবার জন্য সব চীনে মিস্ত্রিরা এসেছিলো, মারবেল এসেছিলো ইটালি থেকে, আয়না এসেছিলো বেলজিয়ম থেকে; ঢাকাই ওস্তাগররা কত মাথা খাটিয়ে তৈরী করে-ছিলো এর ছাতার মতো ছাদ আর তলায় আধহেলা সমান সব কলসী পিলার বসিয়ে এর উঁচু ভিত। বাগান সাজাতে জাপানী বিশারদ পর্যন্ত আনানো হয়েছিলো। বাড়ি তো নয় একখানা আঁকা ছবি। আর তার ভেতরে আসবাব-পত্রেরই বা কী বাহার।

ঐ পর্যন্তই। দিনের পর দিন শুধু সেজেগুজে নিঃসঙ্গ শূন্য কক্ষ হয়েই দাঁড়িয়ে রইলো সবুজ মহল। দাঁড়ে আর পাখি বসলো না। কারো স্পর্শে ধন্য হলো না তার মারবেল পাথরের মসৃণ মেঝে। কারো সুমিষ্ট হাস্যধ্বনিতে মুখর হলো না

ফ্রেসকো আঁকা রঙিন দেয়াল। অতি যত্নে তৈরী স্নানশালার পরীমুখী ফোয়ারা থেকে এতোদিন বৃথাই গোলাপগন্ধ জল উৎক্ষিপ্ত হলো। তার মর্মরখচিত শিলাসনে বসে কেউ তার ননীর মতো পা দুখানি ছড়িয়ে দিলো না উদাস আলস্যে, স্নানের আগে আঙুর গুচ্ছের মতো চুল খুলে দিয়ে কেউ আপন মনে, আপন সুখে গজল গেয়ে উঠলো না।

সুলতান বললেন, 'ঘর চাবিবন্ধ করে রাখো।' জবেদা বলেছিলো, 'তুমি নিজে থাকো না এখানে।'

সুলতান হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'থাকবার মতো সংগী কই।'

'সে তো তোমার ইচ্ছার অধীন বাপজান।'

'ইচ্ছা! আমার ইচ্ছার কি ততো শক্তি? তুমি ভেবো না, উপযুক্ত মানুষ এলে নিজেই আমি তালা খুলে দেবো।'

এই কি তার উপযুক্ত মানুষ? এরই জন্য শেষে তালা খুললো সে? আর শেষে এঁরি জন্যে আজ প্রত্যেক মুহূর্তে তার জীবন সংশয়?

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো জবেদা। টেবিল থেকে খাবার বাসনগুলো সরিয়ে রাখলো, টুকটাক গুছিয়ে দিল একটু, টান বিছানাটা আরো একটু টান করলো। সুলতান আসবেন, তারই জন্য সামান্য প্রস্তুতি। সুলেখার বাসি চুলে চিরুনি বুলোতে বুলোতে বললো, 'তোমার বাবাকে আমি দেখেছি।' হঠাৎ বললো কথাটা, মনে পড়ে গেল হঠাৎ।

'আমার বাবাকে?' সাগ্রহে ঘুরে বসলো সুলেখা।

'খুব কম এসেছেন। তোমার দাদুর কোনো চিঠি কি খবর, এই ধরনের কোনো কাজেই হয়তো একবার কি দু বার এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে মনে আছে আমার। বুড়ো নবাব আদর করে নিজের অন্দরে নিয়ে এসেছিলেন, বুড়ি নানি তাঁকে বাপজান বলে সম্বোধন করেছিলেন, আর আমি ফল সাজিয়ে দিয়েছিলাম।'

'তারপর।'

'সুলতানকে বোধহয় ভালোবাসতেন খুব। এসেই তাঁর খোঁজ করলেন, কাছে ডেকে বসালেন, আদর করলেন—'

'তাঁর চেহারা মনে আছে তোমার?'

'স্পষ্ট। এই তো সেদিনের কথা। তারপর হঠাৎ একদিন খবর পেলাম মারা গেছেন। নানির কোলে মুখ গুঁজে কেঁদেছিলো সুলতান। আলিসাহেবও মারা গেছেন তার আগে, হয়তো সে দুঃখটাই মনে পড়ে গিয়েছিলো। সুলতানের আব্বাজান তৎক্ষণাৎ দুশো টাকার ভেট পাঠিয়ে দিলেন, তোমাদের বাড়ি, পরের দিন নিজে গিয়ে নগদ টাকাও দিয়ে এলেন তোমার জ্যাঠামশায়ের কাছে।'

'টাকা!'

'তোমার জানবার কথা নয়, তুমি তখন ছোটো। তোমার মা নিশ্চয়ই জানেন। তার জন্যেই দিয়েছিলেন। আমেদ সাহেব সেদিন সুলতানকেও সংগে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, গেলো না সে। আমি জানতাম সে যাবে না। আমি জানতাম তার বালক বয়সের এমন কোনো দুঃস্বপ্ন আছে তোমাদের হিন্দু বাড়ি সম্বন্ধে—ভবিষ্যত জীবনে যে স্মৃতি তাকে অনেক যন্ত্রণার পাথারে নিয়ে গেছে। তাকে তোমরা অপমান করেছিলে। তার সেই বেদনা ভরা মুখ আমি কোনো দিন ভুলবো না।'

'অপমান।'

'মনে করে দেখো তো, এমন কী ঘটনা ঘটেছিলো যার জন্য বাড়ি ফিরে এসে সে অমন পাগলের মতো লুটিয়ে পড়ে কেঁদেছিলো। আমি গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কাঁদো কেন বাপ?' কিচ্ছু বললো না, মুখ তুললো না, খেলো না সেদিন। রাত্তিরে তখনো তার ঘরে, তার পাশের খাটে শুতাম আমি। নইলে সে ঘুমুতে পারতো না, ভয় পেতো। অনেক রাত্তিরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, 'আমি কি কুত্তা, আমি ঘরে গেলেই সব নোংরা হয়ে যাবে, সব ফেলে দিতে হবে?' আর কেউ না বুঝুক মায়ের কলিজা দিয়ে আমি তার দুঃখ বুঝেছিলাম। ঘটনাটাও আন্দাজ করতে পেরেছিলাম।'

সুলেখা চোখ নামালো, হয়তো ঝাপসা ছবিটা মনে পড়লো তার।

'তা হলে ভেবে দেখো তো, সেই দশ বছরের বালকের মনে যে যন্ত্রণার আগুন তোমরা জ্বালিয়েছিলে, তার ফল তুমি কতোটুকু ভোগ করছো? সেই বাড়ির মেয়ে, তুমি, আশ্চর্য! তোমার জন্যই আবার পাগল হলো সে। সাদি করলো না, সংসার পাতলো না, সকলের মনে দাগা দিয়ে কী ভাবে সে নষ্ট করলো জীবনটা। তার বাপ কতো দুঃখ নিয়ে মারা গেলেন, সকলের মনের সব আশা আনন্দ ভেঙে দিল সে। আর এই বাড়ি—থাক সে সব।'

একটু থামলো জবেদা। 'ও'র বাপকে নিশ্চয়ই দেখেছ, সেবার কী না করলেন তিনি দাংগা থামাবার জন্য। ইংরেজরা তলায় তলায় বিষ ঢালে আর আমেদসাহেব রুখে রুখে সভা ডাকেন। বুড়ো নবাবও ছিলেন তখন, পীস কমিটি করলেন তিনি। সবই তো দেখেছি, সবই তো জানি। আর আজকের নবাব, কাজি সুলতান আমেদ—'

পর্দা সরিয়ে মোমতাজ ঘরে এলো অসময়ে, ব্যস্ত গলায় বললো, 'নবাব আসছেন, তুমি বাইরে এসো জবেদাদিদি।'

সুলেখা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো, সংযত হয়ে জবেদা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।
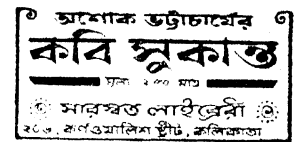
(ক্রমশ)

শ্রীকৌটিল্য

আমাদের দেশের বেকার সমস্যা দূর করবার জন্য যে সব জল্পনাকল্পনা হচ্ছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলের অব-নিযুক্ত লোকদের শহরাঞ্চলের শিল্পে সরিয়ে আনা। আমাদের শিল্প এখনো খুব সংকীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ। কাজেই এত বিপুল-সংখ্যক বেকার বা আধা-বেকারকে আত্মসাৎ করবার উপযুক্ত নূতন শিল্পের সৃষ্টি এবং বর্তমানের চালু শিল্পগুলির প্রসার আমাদের সমূহ সমস্যা। অনেক বিখ্যাত দেশী-বিদেশী অর্থনীতিবিদ্ গ্রামাঞ্চলের অতিরিক্ত (redundant) জনতার একটা অর্থপূর্ণ পরিমাপের চেষ্টা করছেন; কারণ এই পরিমাপ অনুযায়ী নতুন কাজ সৃষ্টি করতে হবে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরো কতকগুলো কথা এসে পড়ে, যেগুলো ভারতবর্ষের মতো দেশে সর্বদাই মনে রেখে চলতে হবে। প্রথমত, খাদ্যের ব্যাপারটা। নতুন কাজে এই অতিরিক্ত জনতা নিয়ে আসবার পরে তাদের খাদ্য সরবরাহ কোথা থেকে হবে? অর্থনীতিবিদ্ নার্ক্সে বলছেন যে, এরা আগে গ্রামে যে খাবার খাচ্ছিল তাই যদি আমরা কোনোরকমে গ্রাম থেকে সংগ্রহ করে এনে আবার এদেরই হাতে তুলে দিতে পারি তবে সমস্যার সমাধান হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত লোকদের গ্রাম থেকে সরিয়ে নেবার পরে অবশিষ্ট গ্রাম্য জনতার মাথাপিছু খাদ্য বাড়তে দেওয়া চলে না। এটা একটা সমাধান প্রস্তাব বটে। তবে এই প্রস্তাব কাজে লাগাতে হলে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া খানিকটা বিপর্যস্ত হতে পারে।

যাই হোক, খাদ্য সমস্যা যদিও বা মিটে যায়, অন্য সমস্যা থাকবে। যেমন, গ্রামের লোকদের খাওয়ার ধরণ (consumption pattern) শহরের লোকদের সঙ্গে এক নয়। এই দুই ধরনের সংঘাতের ফলাফল সদ্য-গ্রাম-ছেড়ে-আসা শ্রমিকদের পক্ষে খুব প্রীতিকর নাও হতে পারে। এই ব্যাপারটা প্রয়োজনীয়; কারণ প্রথম অবস্থায় নতুন কাজের পরিবেশের অনুকূলতা কিংবা প্রতিকূলতার উপর নতুন শ্রমিকদের কর্মক্ষমতা ও কাজের ইচ্ছে নির্ভর করবে। এই খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের আর দশটা ধরন বা pattern এর কথাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। যথা নতুন কাজের জায়গায় হয়তো পাকা বাড়ি তৈরী করে শ্রমিকদের বাস-সংস্থান করা হলো। কিন্তু গ্রামে তারা বসবাসের ব্যাপারে যে অভ্যাস পালন করত, পাকা বাড়িতে অথবা তার স্বল্পপরিসর স্থানে সে অভ্যাস চালু না রাখতে পেরে তাদের অসন্তুষ্টি এবং অসুবিধে হবে সন্দেহ নেই। বর্তমান লেখক আসামের চা-বাগান অঞ্চলে শ্রমিকদের মধ্যে এই সমস্যা সম্প্রতি লক্ষ্য করেছেন। তারা তাদের শতভগ্ন পুরনো বাড়ি ত্যাগ করে নতুন তৈরী পাকা-বাড়িতে যেতে নারাজ। এই patternগুলোর সঙ্গে শ্রমিকের কাজের স্পৃহার (incentive) যে কী নিবিড় সম্পর্ক তা শ্রম-মনঃস্তত্ত্ব সম্পর্কে বর্তমানকালের গবেষণা এবং অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায়।

খাওয়া পরার ব্যাপারে আরেক কথাঃ গ্রামের লোকেরা শহরে এসে এবং শিল্পাঞ্চলে কাঁচা পয়সা উপার্জ্জন করে ক্রমশ কিছু কিছু শহুরে হালচালের প্রবণতা দেখাতে পারে। এর জন্য শহরাঞ্চলের শিল্পজাত নানারকম দ্রব্যের জন্য বাড়তি চাহিদা দেখা যাবে, যে চাহিদা মেটাবার জন্য উৎপাদনের দিকেও নজর দিতে হবে। অথচ এটা মোটামুটি মনে হয় যে আমাদের দেশের আগামী পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনাতেও ভোগ্য-বস্তুর (consumption goods) সরবরাহ কমের দিকে রাখবারই চেষ্টা হবে। যদি এই রকম অনুমান সত্যি হয়, তবে গ্রাম থেকে শহরাঞ্চলে শ্রমিক চালান দিয়ে খানিকটা মুদ্রাস্ফীতির (inflation) সুযোগ করে দেওয়া হবে।

আরেকটা সমস্যা সম্বন্ধেও মনোযোগ দেওয়া হয়নি। গ্রাম থেকে শ্রম-শক্তি চালান দিলে খুব সম্ভবত যুবক সম্প্রদায় তার সর্বপ্রধান অংশ হবে। অর্থাৎ গ্রামের অবশিষ্ট শ্রম-শক্তিতে গুণগত দিক থেকে এই মুহূর্তেই অবনতি ঘটবে। ফলে কৃষিজ এবং সংশ্লিষ্ট পেশাগুলিতে উৎপাদন-ক্ষমতাও কমে যাবে। তাছাড়াও গ্রামাঞ্চলের অব-নিয়োগের ' সমস্যাটা অনেকাংশেই সাময়িক (seasonal) রোপণ, বপন কিংবা ধান কাটার সময়গুলিতে ব্যস্ততা বেড়ে গিয়ে নিয়োগের পরিমাণ তখনকার মতো অনেক বাড়িয়ে ফেলে। অর্থাৎ, যে তথাকথিত 'অতিরিক্ত' গাম্য জনতাকে আমরা কৃষি থেকে শিল্প ইত্যাদির ক্ষেত্রে চালান দিতে চেয়েছি তাদের সাময়িক প্রয়োজন অস্বীকৃত হতে পারে না। ফলে আমাদের প্রস্তাবিত পন্থা অবলম্বনের পরে কৃষি অর্থনীতিতে সাময়িক শ্রম-ঘাটতির আশংকা থাকতে পারে। এইজন্য আমাদের নতুন করে চিন্তা করবার সময় এসেছে যে, কৃষি অর্থনীতি থেকে সরিয়ে নিলেও হয়তো এই অতিরিক্ত শ্রমিকদের জীবনকে গ্রাম্য কাঠামো থেকে বিযুক্ত করে ফেলা যুক্তিসঙ্গত হবে না। শিল্পায়নের গতি প্রকৃতি অনেক রকমের হতে পারে। গ্রামাঞ্চলের শ্রমিকদের নানারকম টানা হ্যাঁচড়া করে যে শিল্পায়ন মোটামুটি আমাদের পরিকল্পিত উৎপাদন হার বজায় রাখতে পারবে তাই আমাদের প্রথম কাম্য। গ্রামীণ শিল্পের উন্নতিকরণ ও প্রসারের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে এবং শহরের শিল্পায়নের এবং চাহিদার সঙ্গে এর যেন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকে সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে শ্রমের অবনিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির অবনিয়োগের সমস্যাও আছে। অনেক কুটির-শিল্প বছরের কিছু সময় অচল হয়ে পড়ে। কৃষির ব্যস্ত সময়ের সঙ্গে কুটিরশিল্পের মন্দা সময়ের যোগাযোগ করাতে পারলে একটা ভালো সমাধানের হদিশ পাওয়া যেতে পারে। শ্রমশক্তির ওপর টানাপোড়েনের বৃহৎ ইতিহাসের দুঃখময় অধ্যায় আমাদের অজ্ঞাত নয়; সম্প্রতিকালে চীনদেশ একই সমস্যা অনেক সন্তোষজনকভাবে সমাধান করছে বলে খবর পাচ্ছি। চীনের পন্থা ভারতবর্ষের পক্ষে অনেকাংশেই অনুকরণ-যোগ্য হতে পারে।

জগদীশচন্দ্রের শতবার্ষিকী

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

এ **কচল্লিশ** বছর পূর্বে ১৯১২ সালের ৩০ নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্র যে পুণ্য দিনটিতে 'ভারতের গৌরব ও জগতের কল্যাণ কামনায়' তাঁর সাধনপীঠ বসু-বিজ্ঞান মন্দির 'দেবচরণে নিবেদন' করেন, সেদিনের সেই শুভ অনুষ্ঠানে যোগদানের সৌভাগ্য আজকের আমাদের অনেকেরই হয়তো হয় নি। কিন্তু গত ৩০ নভেম্বর আচার্যদেবের জন্মশতবার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন-সভায় উপস্থিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ রচিত 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে' মধুর সংগীতটি যখন শুনেছিলুম তখন মনে হলো ৪১ বছর পূর্বের সেই শুভ অনুষ্ঠানের মাঝেই যেন উপস্থিত হয়েছি। মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হলো, আচার্যদেব শুভ্র গরদের ধুতি ও চাদরে বিভূষিত হয়ে শান্ত সমাহিত প্রতিভাদীপ্ত অপরূপ মূর্তিতে বেদীর উপর এসে দাঁড়ালেন। বাণীকণ্ঠ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে সুললিত সুরে ঝংকৃত হলো 'নরোত্তম পুরুষ সত্তম তপস্বীরাজের জয়গাথা।

সত্য শিব ও সুন্দরের পূজারী জগদীশচন্দ্রের সেদিনের যজ্ঞায়োজনে উৎসবমণ্ডপ আজকের মতোই বোধ করি অনুপম শিল্পশোভায় সজ্জিত হয়েছিল। আজ দেখছি উৎসবমঞ্চের নিম্নে সু-অংকিত বেদীর উপর প্রজ্জ্বলিত হয়েছে জন্মশতবার্ষিকীর প্রতীকস্বরূপে একশতটি দীপবর্তিকা। মঞ্চের পশ্চাদ্দেশে শোভা পাচ্ছে জগদীশচন্দ্রের জীবনাদর্শের প্রতীক বজ্র। মঞ্চের উপর স্থাপিত হয়েছে সুশোভিত মঙ্গলকলস। মঞ্চগাত্রে অংকিত হয়েছে নয়নাভিরাম আলপনা। বিজ্ঞানমন্দিরের প্রবেশদ্বারে, দ্বারদেশের তোরণেও অপরূপ আলপনা।

এই সুসজ্জিত মণ্ডপে ৩০ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসব উপলক্ষে বহু মনীষী আচার্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, বিশিষ্ট বক্তাগণ জগদীশচন্দ্রের প্রতিভাদীপ্ত জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তার মাঝে একটি সুর অনুরণিত হয়েছে বার-বার। সেই সুরটি হচ্ছে সত্যসাধক জগদীশচন্দ্রের পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী অধ্যাত্মবোধের অপূর্ব সমন্বয়-সাধনের মর্মবাণী।

৩০ নভেম্বর শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধনদিনে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনকালে ভারতের গৌরবময় উত্তরাধিকারের উল্লেখ করে বললেন, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ই প্রাচীন

ভারতের জীবনাদর্শ। এই আদর্শ সম্পর্কে আচার্য বসু সচেতন ছিলেন এবং এই আদর্শের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠাই তাঁর সাধনা পরিচালিত করেছে। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ই আচার্য বসুর সাধনার বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানের পথে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। কল্পনায় তাঁর মানসনেত্রে যা প্রতিফলিত হয়েছে তাকেই তিনি পরীক্ষিত সত্যে রূপান্তরিত করেছেন। ভারতের চিন্তাশীলতার উত্তরাধিকার তিনি লাভ করেছিলেন আর সেই ঐতিহ্যকেই তিনি প্রমূর্ত করেছেন তাঁর সাধনায়।

বিশ্বের বর্তমান সংকটময় পরিস্থিতির পটভূমিকা বিশ্লেষণ করে শ্রী নেহরু তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে বললেন, বিজ্ঞানীরা আজ রাষ্ট্ররথচক্রে আবদ্ধ এবং রাষ্ট্রনীতিবিদগণের দ্বারা পরিচালিত। আজ তাই জগদীশচন্দ্রের কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সেতু বন্ধনের যে বাণী তিনি প্রচার করেছিলেন, বিশ্বকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার মন্ত্র তারই মধ্যে নিহিত আছে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের অভ্যর্থনা অভিভাষণে এবং অনুষ্ঠান-সভাপতি রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডুর ভাষণেও জগদীশচন্দ্রের এই ঐক্যসাধনের মর্মবাণী উচ্চারিত হয়।

বিশ্বের বিজ্ঞানভাণ্ডারে জগদীশচন্দ্রের অমূল্য অবদানের কথা উল্লেখ করে কয়েকটি বিদেশী বিজ্ঞানসংস্থার প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। এ ছাড়া, অস্ট্রেলিয়ার একাডেমী অব সায়েন্স, বেলজিয়ামের রয়েল একাডেমী অব সায়েন্স, কানাডার ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিল, চীনের একাডেমিয়া সিনিকা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানী, আয়ারল্যাণ্ড, ইতালী, জাপান, পোল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান সংস্থাসমূহ এবং ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস ও বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রভৃতির পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করে বাণী প্রেরণ করা হয়। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকেও উপাচার্য অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশেষ প্রতিনিধি মারফত একটি সুদৃশ্য আধারে শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেছিলেন। জানি না কি কারণে এই সুন্দর বাণীটি সভায় পঠিত হয় নি, এমন কি বিশ্বভারতীর নাম পর্যন্ত উল্লিখিত হয় নি (যদিও বিশ্বভারতীর বিশেষ প্রতিনিধি এই সভায় স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন)।

উদ্বোধন দিনের অপরাহ্নে উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আচার্য জগদীশচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান করলেন। আচার্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি যে কয়টি কথা বলেছিলেন তা সকল শ্রোতার হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি বললেন, জগদীশচন্দ্র ছিলেন ভারতীয় সাধনার ভাবমূর্তি। প্রাচীন ভারতীয় ঋষিগণের ন্যায় তিনি বিশ্ববৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করেছিলেন। ঋষিদের কয়েকটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি আচার্য বসুর গবেষণার দ্বারা বৈজ্ঞানিক
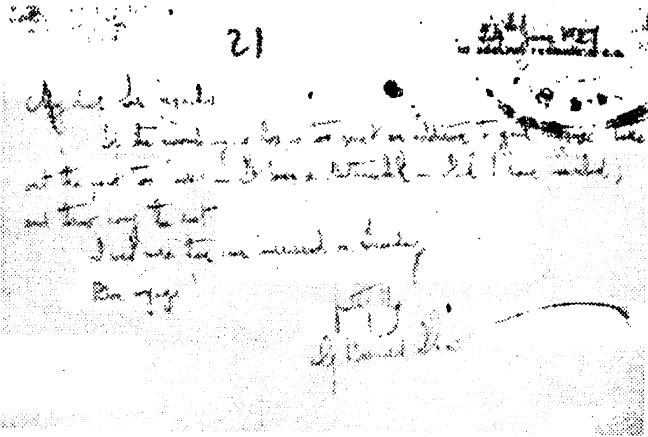
আচার্য জগদীশচন্দ্রকে লিখিত বার্ণার্ড শ'-এর চিঠি

সত্যরূপে প্রমাণিত হয়েছে।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রধান ও প্রকৃত পরিচয় তিনি বিজ্ঞানী। কিন্তু শুধু বিজ্ঞানীরূপে তাঁকে আখ্যাত করলে তাঁর মহত্তর জীবনের পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাঁর বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ, তাঁর শিল্পমানস, বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর অতুলনীয় বন্ধুত্ব, তাঁর ভারত-পরিক্রমার কথাও বলা প্রয়োজন। তাঁর জীবনের এই মহৎ দিকগুলি জনসাধারণের কাছে তুলে ধরবার উদ্দেশ্যে সপ্তাহব্যাপী উৎসবে কয়েকটি বিশেষ বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল।

উৎসবের দ্বিতীয় দিন থেকে এই বক্তৃতামালার সূচনা হয়। প্রথম বক্তৃতা দেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা: অক্ষয় দত্ত থেকে জগদীশচন্দ্র বসু।'

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করে অধ্যাপক বসু বললেন, পাশ্চাত্যের প্রভাবে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়। বাংলা ভাষায় প্রথম যে বিজ্ঞানের বই পাওয়া যায় তা কেরী মার্শম্যান প্রমুখ ইংরাজ মিশনারীদের লেখা। এই সময়ে পাশ্চাত্যের উপলব্ধ জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বাংলায় তর্জমা করে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় সুপরিকল্পিতভাবে কিছুই করা সম্ভব হয় নি। ১৮০০ সালের পর থেকে দেখা যায় যে, বিজ্ঞানচর্চা দানা বেঁধেছে। যে সব বিদ্যা অর্জন করে বিদেশীরা এতটা ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে সে সকল বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্যে তখন জনসাধারণের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগল। দেশের মধ্যে যাতে বিজ্ঞানের কথা ছড়িয়ে পড়ে তার জন্যে কৃতবিদ্য দেশ-প্রেমিকরা বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় লিখতে লাগলেন। কিন্তু তখন বাংলা গদ্যভঙ্গী অনেকটা আড়ষ্ট ও সংস্কৃত ঘেঁষা ছিল বলে সংস্কৃত অনভিজ্ঞ লোকেদের পক্ষে এইসব বিষয় বোধগম্য হওয়া দুরূহ ছিল। অক্ষয় দত্ত সর্বপ্রথম ঝরঝরে বাংলায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখতে শুরু করেন। অক্ষয় দত্তর পর রাজেন্দ্রলাল মিত্র বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনায় অগ্রসর হন। জগদীশচন্দ্র যখন বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতে শুরু করেন তখন দেখা গেল যে, তিনি যে একজন প্রতিভাধর বিজ্ঞানী তা নন, তিনি বাংলাও সুন্দর লিখতে পারেন। তাঁর রচনা পড়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তাঁকে বিজ্ঞানসরস্বতী উপাধি দেওয়া যেতে পারে। বিজ্ঞানচর্চার বাহনরূপে বাংলা ভাষার কতদূর ক্ষমতা আছে তা রামেন্দ্রসুন্দরের রচনা পড়লেই বুঝতে পারা যায়।
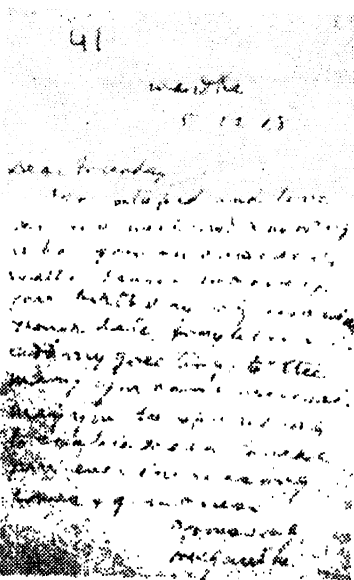
বক্তৃতাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক বসু একটি অতি মূল্যবান কথা বলেছিলেন। সে কথাটি এখানে উদ্ধৃত করছি—বাংলা ভাষার যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়ের যাঁরা দিগ্গজ তাঁরাই বাংলাভাষার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। তাঁরা ইংরেজীকে ভারতীয় ভাষার অন্তর্ভুক্ত করে একটা কায়েমী বন্দোবস্ত করবার পক্ষপাতী। কিন্তু এদেশের জনসাধারণের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা দিতে হলে কত শত বছর লাগবে তা বলা মুশকিল। ইংরেজরা ২০০ বছর এদেশে বাস করেও ইংরাজী শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ১০ জনের বেশি বাড়াতে পারে নি। কাজেই জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের কথা প্রচার করতে হলে তা বাংলাভাষাতেই করতে হবে। যেদিন বাঙালী বিজ্ঞানী তাঁর মৌলিক আবিষ্কারের কথা প্রকাশের জন্য বিদেশী ভাষার শরণাপন্ন না হয়ে বাংলাভাষায় প্রকাশ করবেন সেদিন বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা সার্থক হবে। আচার্য জগদীশচন্দ্র সে পথ আমাদের দেখিয়ে গেছেন।

এইদিনের দ্বিতীয় বক্তৃতায় উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক পরিজা আচার্য জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব সম্পর্কিত মৌলিক আবিষ্কারের বিষয় আলোচনা করেন।

তৃতীয়দিনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ বেতার বিজ্ঞানী ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র হ্রস্ব বেতারতরঙ্গ উৎপাদনে জগদীশচন্দ্রের মৌলিক গবেষণা সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, জগদীশচন্দ্র ১৮৯৪-১৯০০ সালের মধ্যে মাত্র ৬ বৎসরকাল এই বিষয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যে হ্রস্ব বেতার তরঙ্গ উৎপাদনে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতি বর্তমানে বেতার-বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রে অনুসৃত হচ্ছে।

যে যন্ত্রের সাহায্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং একমুখীকরণ ধর্ম প্রমাণিত করেন সেই মূল যন্ত্র সভায় প্রদর্শিত হয়। ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে যে যন্ত্রের সাহায্যে তিনি দূরত্ব ব্যবধান বেতারবার্তা প্রেরণ করেন সেই মূল যন্ত্রের কার্য কৌশল সভায় দেখানো হয়। এই যন্ত্র উৎপন্ন বেতার-তরঙ্গ যখন দূরে অবস্থিত একটি বাতি জ্বালালো, একটি ঘণ্টা বাজালো এবং বন্দুক ছুঁড়লো, তা দেখে ও শুনে সমবেত

আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মদিনে মহাত্মাজীর শুভেচ্ছা লিপি

সকলে বেতারবার্তা প্রেরণে জগদীশচন্দ্রের মৌলিক অবদানের কথা স্মরণ করে বিমুগ্ধ হন।

চতুর্থ দিনে দুটি মনোজ্ঞ আলোচনা হয়। প্রথম আলোচনা করেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী 'জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনা' সম্বন্ধে। বিশী মশায় স্বয়ং উপস্থিত হতে না পারায় তাঁর লিখিত প্রসঙ্গটি সভায় পাঠ করা হয়।

জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনা আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রী বিশী বলেন, "মাতৃভাষায় প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র যথেষ্ট বাংলা রচনা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। 'অব্যক্ত' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধসমষ্টিই তাঁহার লিখিত একমাত্র বাংলা গ্রন্থ। এই গ্রন্থের 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। এই অত্যাশ্চর্য রচনাটি বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের একটি পরম সম্পদ। কবি-হৃদয়ের ইহা একটি অনবদ্য সৃষ্টি। 'অব্যক্ত' গ্রন্থের 'পলাতক তুফান' নামে রচনাটি একটি মজলিসী মনের সৃষ্টি। রচনাটিতে যে সার্থক হাস্যরস আছে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যে বিচিত্র ব্যাখ্যা আছে, সর্বোপরি যে সাহিত্যিক গুণ আছে তাহা যে কোন প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের ঈর্ষার স্থল। সর্বশেষে তাঁহার আধ্যাত্মিক রচনার উল্লেখ করিতে হয়। 'যুক্ত কর', 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে', 'নিবেদন', 'হাজির' প্রভৃতি রচনা আধ্যাত্মিক রশ্মিতে উজ্জ্বল।"

প্রবন্ধের উপসংহারে শ্রী বিশী যে কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে সকলেই একমত হবেন—"জগদীশচন্দ্র মাতৃভাষার মন্দির-প্রাঙ্গণে অনেকগুলি সম্ভাবনার দীপ জ্বালিয়াছিলেন। বিধিনির্দিষ্ট প্রেরণা তাঁহাকে অন্যপথে চালিত না করিলে এই সম্ভাবনার দীপগুলি উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল হইয়া বাংলা সাহিত্যাকাশে একটি অক্ষয় সপ্তর্ষিমণ্ডল রচনা করিতে পারিত—সেই শক্তি, সেই কবিমন, সেই সরস প্রসাদগুণ তাঁহার যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।"

এইদিনের দ্বিতীয় বক্তৃতায় অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু 'জগদীশচন্দ্রের ভারত পরিক্রমা' সম্বন্ধে একটি হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন। দেশভ্রমণে জগদীশচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গী সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে অধ্যাপক বসু বলেন, জগদীশচন্দ্র তীর্থক্ষেত্রে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যে বা শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখার জন্যে দেশভ্রমণ করেন নি। ভারতের ইতিহাসে যেখানে যেখানে মানবীয়তা প্রকাশ পেয়েছে সেই স্থানগুলি তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। তাই তিনি বৌদ্ধমন্দির, বৌদ্ধ বিহার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দর্শন করেছিলেন। এমন কি, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দুতীর্থগুলিও তিনি বাদ দেন নি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, এইসকল কুসংস্কারের মধ্যে কিছু সত্য ছাইচাপা আছে। সেই সত্যের সন্ধান তিনি
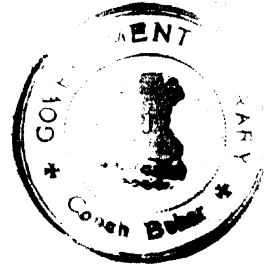
করেছিলেন। আলোচনার সময় অধ্যাপক বসু দেশভ্রমণকালে জগদীশচন্দ্রের গৃহীত কয়েকটি আলোকচিত্র প্রদর্শন করেন। এই ফটোগুলি দেখে উপলব্ধি করা যায়, জগদীশচন্দ্র একজন দক্ষ চিত্রশিল্পীও ছিলেন।

পঞ্চম দিনে প্রথমে ডাঃ বি ডি নাগ চৌধুরী 'জীব ও জড়ের চেতনা' সম্পর্কে জগদীশচন্দ্রের অনন্যসাধারণ আবিষ্কারের বিষয় আলোচনা করেন। তারপর শ্রীপুলিন-বিহারী সেন 'জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলীর মাধ্যমে শ্রী সেন এই দুই মহামনীষীর প্রগাঢ় বন্ধুত্বের একটি অপরূপ চিত্র শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জগদীশচন্দ্র এই বন্ধুত্বকে দেবতার করুণা বলে মনে করেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ একে সৌভাগ্য বলে মেনেছিলেন। কিন্তু এই 'দেবতার করুণা' এবং 'সৌভাগ্য' কেবল তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সমগ্র জাতির নিকট দেবতার করুণা ও সৌভাগ্যের কারণ হয়েছিল। তাঁদের এই নিবিড় অন্তরঙ্গতা ও সাহচর্যের ফলেই সমগ্র দেশ ও জাতি তাঁদের মধ্য দিয়ে বিশ্বের দরবারে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

উৎসবের ষষ্ঠ দিবসে বক্তৃতামালার শেষ পর্যায়ে অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী 'জগদীশচন্দ্র' সম্বন্ধে এবং শ্রীসৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'জগদীশচন্দ্র ও বাংলার নবজাগরণ' সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁর বক্তৃতায় একটি সুন্দর কথা বলেন, 'বৈদিক ঋষির মন্ত্রে আমরা আদিত্যবর্ণ মানুষের যে উল্লেখ পাই সেরকম মানুষ পৃথিবীতে কখন কখন জন্মগ্রহণ করেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র ছিলেন এরকম একজন আদিত্যবর্ণ মানুষ। তাঁর সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি এক বেদনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং সে বেদনা ছিল দেশমাতৃকার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের বেদনা।'

সৌমেন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাবগ্রাহী ভাষায় রামমোহনের আবির্ভাবের ফলে বাংলাদেশে সাহিত্য শিল্প শিক্ষা বিজ্ঞান সর্বক্ষেত্রে যে নব যুগের সূচনা হয় তার এক মনোরম চিত্র উদ্ঘাটিত করে বলেন, 'জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী হলেও দেশ ও জাতি থেকে কখনও দূরে সরে থাকেন নি। বৈজ্ঞানিক সত্যানুসন্ধানে নিমগ্ন থেকেও তিনি জাতির শিক্ষা, শিল্পোদ্ধার ও অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে ভেবেছেন। 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সংগীত হতে পারে কিনা এ বিষয়ে ১৯৩৭ সালে যখন দেশে তুমুল বিতর্ক চলছিল তখন সুভাষচন্দ্র এ সম্পর্কে আচার্য জগদীশচন্দ্রের অভিমত প্রার্থনা করেন। তার উত্তরে জগদীশচন্দ্র লিখেছিলেন—'যাঁহার কল্যাণে আমরা পরিপুষ্ট ও বর্ধিত হইয়া আসিতেছি সেই জন্মভূমি ও জননীর মধ্যে সন্তান কি ভেদ কল্পনা করিতে পারে? জননী জন্মভূমির নামের ধ্বনি হৃদয় হইতেই স্বতই উৎসারিত হইয়াছে এবং উহা আপনাআপনি সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ, ঐ ধ্বনি ভারতের অন্তর্নিহিত প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে।'

বক্তৃতাশেষে জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শ মিলনের কথা উল্লেখ করে সৌমেন্দ্রনাথ যে কথা বলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশকে ধন্য করবার জন্যে বিধাতা এই দুজন আশ্চর্য মানুষকে মিলিয়েছিলেন। তাঁরা দুজনেই অসীম শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন, বিশেষ দ্রষ্টা, বিশুদ্ধ দ্রষ্টা। তাঁরা বাস্তবতা বিবর্জিত স্বাদেশিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা দেশের গৌরব প্রতিষ্ঠা ও মানুষ গঠনের সাধনা করেছিলেন।'

জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ বক্তৃতামালা যেমন একটি আকর্ষণ ছিল, সেরূপ আর একটি প্রধান আকর্ষণ ছিল শতবার্ষিকী প্রদর্শনী। ২৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীটি দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি অংশ ছিল আচার্যদেবের বাসভবনে এবং দ্বিতীয় অংশটি ছিল নবনির্মিত প্রদর্শনী হলে। বাসভবনের অংশে জগদীশচন্দ্রের প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপত্র, অভিনন্দন পত্র, জগদীশচন্দ্রকে লিখিত দেশবিদেশের মনীষীদের চিঠিপত্র, তাঁর পুরাতাত্ত্বিক ও শিল্প সংগ্রহ, তাঁর গবেষণাপত্রের পাণ্ডুলিপি, তাঁর গৃহীত আলোকচিত্র ইত্যাদি রক্ষিত হয়েছিল। নবনির্মিত প্রদর্শনী হলের এক পাশে ছিল জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত অভিনব যন্ত্রগুলি এবং অপর পাশে ছিল বসুবিজ্ঞান মন্দিরের বর্তমান কর্মধারার পরিচিতি। জগদীশচন্দ্রের উদ্ভাবিত যন্ত্রগুলির কার্যপ্রণালী দেখবার জন্যে দর্শকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। প্রতিদিন এই প্রদর্শনী দেখবার আকাঙ্ক্ষায় যে বিপুল জনসমাগম হত তা থেকে এটুকু উপলব্ধি করা গিয়েছিল, জনমানসে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে কৌতূহল আছে কতখানি এবং দেশবাসীর অন্তরে তাঁর স্থান কোথায়। সপ্তাহব্যাপী উৎসবের পরে আরও তিনদিন অর্থাৎ ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই প্রদর্শনী উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। শেষের দুদিন বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়ের জন্যে প্রদর্শনী খোলা ছিল। এই দুদিন দ্বিপ্রহর থেকে সন্ধ্যা অবধি অবিরাম ছাত্রছাত্রীর স্রোত প্রদর্শনী দর্শনাভিলাষে প্রবাহিত হয়েছিল। প্রদর্শনী ছাড়া ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন বক্তৃতাশেষে ফিল্ম ডিভিশন কর্তৃক গৃহীত আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনী ও কর্মধারার তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। ভারতীয় সাধনার পটভূমিকায় জগদীশচন্দ্রের সারা জীবনের কর্মকৃতির পরিচয় এই চিত্রে রূপায়িত হয়। এই জীবনীচিত্র দেখবার জন্যেও বিপুল দর্শক সমাগম হত এবং সেকারণে প্রতিদিন দুবার করে চিত্রটি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।

জন্মশতবার্ষিক উৎসবে আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের এবং তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবন ও মহৎ সাধনা অনুধাবনের সুযোগ পেয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমরা যেমন ধন্য তেমনি সমগ্র দেশ এবং জাতিও ধন্য।

কাজে কর্মে দুর্বৃত্ত, বদমায়েস, অথচ তার ওপর শত শত লোকের শ্রদ্ধার অন্ত নেই। ১৯৪১ সনে যখন পৌর প্রতিষ্ঠানের এক কণ্ট্রাক্ট ব্যাপারে জুয়াচুরি করায় দু-লক্ষাধিক টাকা জরিমানা করা হয়, তখন কাতারে কাতারে বুড়োবুড়ি, যুবকযুবতী, আট আনা, এক টাকা, দু টাকা করে সঙ্গে নিয়ে লাল রঙের একটা বাড়ির সামনে এসে বলেছিল : "এই নাও জিম, এই দিয়ে জরিমানা দাও।"

একটা পাষণ্ড কিন্তু তবুও ১৯৪৬ সনে যখন ডাক জালিয়াতির দায়ে পড়ে সাজা হয়, তখন ওয়াশিংটন থেকে মামলার পর ফিরে আসার সময় হাজার হাজার বোস্টন-বাসী ওকে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য সাউথ স্টেশনে সমবেত হয়।

ওর অপরাধের ইয়ত্তা ছিল না, কিন্তু গত নভেম্বরে যখন তার মৃত্যু হয়, তখন হাজার হাজার বোস্টনবাসী কেঁদেছে, হাজার হাজার লোক নীরবে সারি দিয়ে তার মৃত-দেহ প্রদক্ষিণ করে শেষ সম্মান জ্ঞাপন করে।

দুর্বৃত্ত, পাষণ্ড কিন্তু তবুও নেতা। এই হল জেমস মাইকেল কার্লের পরিচয়, যে দুবার জেল খেটেছে চারবার কংগ্রেসের সদস্য হয়েছে, চারবার বোস্টনের (যুক্তরাষ্ট্র) মেয়র হয়েছে এবং একবার হয়েছে মাসাচু-সেটসের রাজ্যপাল। ওর মত লোক আর বোধহয় দেখা যাবে না, কারণ যে আমেরি-কায় ওরকম লোকের আবির্ভাব ঘটা সম্ভব হয়েছিল সে-আমেরিকা আর নেই।

জেমস মাইকেল কার্লের প্রতিপত্তি হয় যে সময়ে তখন ইওরোপের লোকে আমেরিকার রাস্তায় রাস্তায় সোনা উড়ছে বলে মনে করতো এবং সেই জেনে দলে দলে এসে উপস্থিত হতো।

আইরীশরা এসেছিল হাজারে হাজারে। এবং এসে ওরা দেখে যা ভেবেছিল তার অনেকখানিই সত্যি।

বোস্টনে এসে ওরা কুলির মজুরিতে কাজ করে। দিনে প্রায় পৌনে পাঁচ টাকা একজন শ্রমিকের পক্ষে মন্দ নয়। তারপর কঠিন সময় আসতেই বোর্ড পড়লো : 'আইরীশদের আর আবেদন চাই না।"

এই হল জেমস মাইকেল কার্লের অভ্যুত্থানের সুযোগ। কাজের খোঁজে এলে জেমস কাউকেই প্রত্যাখ্যান করতো না। সব সময়েই ওর কাছে হয় কোন কাজ আছে, আর না হয়ত লোকটিকে সাময়িকভাবে কিছু দিয়ে সাহায্য করাও চাই।

বোস্টনের পাণ্ডারা চেঁচাতে লাগলো যে জেমস শহরটাকে দেউলে করে দেবে। কিন্তু যতই ওরা জেমস কার্লের বিরুদ্ধে চেঁচাতে লাগল ওর পক্ষে ভোটের সংখ্যা ততই বাড়তে লাগলো।

কার্লে আইরীশ 'রবিনহুড' নামে অভি-হিত হতো—বড়লোকদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদের দিয়ে দেওয়া।

অলডারম্যানের পদের জন্য দাঁড়িয়ে কার্লে এক দরিদ্র তরুণের হয়ে পরীক্ষা দিয়ে কারা-বরণ করে, কারণ ছেলেটির পরীক্ষায় অবতরণের বড় ভয় ছিল।

জেল থেকে কার্লে বলে পাঠায় : "ওটা দোষের মোটেই নয়। ছেলেটা চমৎকার পত্র-বাহকের কাজ করতে পারবে। আমি ওকে কাজ পাইয়ে দেবার চেষ্টা করা ছাড়া আর এমন কি করেছি।" বোস্টনের আইরীশ অধিবাসীরা ওর কথায় সায় দিয়ে ওকে নির্বাচিত করলে।

ওর বন্ধুবান্ধবরা বলতো "কার্লে কখনো নিজের জন্যে এক কড়িও খরচ করে না, তবে ওদের কথার অর্থ হল টাকা যত দ্রুত আমদানি হতো কার্লে খরচও করতো তত তাড়াতাড়ি। ওর বিশ্বাস ছিল যে, টাকা খরচ করবারই জন্যেই। ১৯৩২ সনে ডেমক্র্যাটিক দলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়নকালে কার্লে প্যাট্রিকের প্রতি-

নিধি সেজে রুজভেল্টের পক্ষে ভোট দিয়ে দেয়।

সময়ের সংগে পরিস্থিতি বদলে যেতে থাকে। আইরীশরা ক্রমে স্থিতি লাভ করে। কার্লোকে আর তেমন প্রয়োজনও নেই। কিন্তু তবুও ১৯৪৭ সনে যখন কার্লো জেল থেকে ছাড়া পায়, তখন বোস্টনবাসীরা বিপুল-ভাবে ওকে সম্বর্ধনা জানায়।

১৯৫৬ সনে কার্লোর জীবনধারাকে কেন্দ্র করে এডউইন ওকোনর নামক এক লেখক একখানি উপন্যাস লেখে। ঐ উপন্যাসের চরিত্র ফ্রাংক স্কেফিংটনের মৃত্যুকালীন দৃশ্য যেখানে তার এক পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী বলে যে, লোকটার বাঁচবার ইচ্ছে থাকলে অন্যভাবে জীবন কাটাতো, শুনে স্কেফিংটন চেঁচিয়ে বলে ওঠে "ভারি বয়ে গেছে"—এ অংশটা কার্লো উপভোগ করতো।
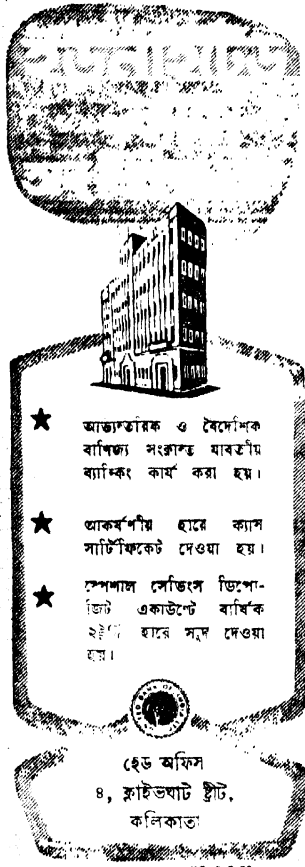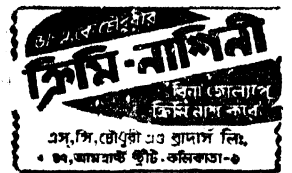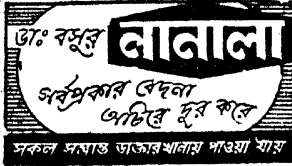
প্রায় লৌহযুগের সমসাময়িক, সম্ভবত খৃষ্টের জন্মের পূর্বে—আফ্রিকার নাইজিরিয়ার লোক সংস্কৃতির নিদর্শন পোড়ামাটির তৈরী মুখোশ

* * *

আফ্রিকার মোম্বাসা থেকে উগান্ডা পর্যন্ত রেল লাইন বসাবার জন্যে সোভো নামক এক স্থানে একটি সেতু নির্মাণ করার সময় প্রতিদিন রাত্রে দুটো নরখাদক সিংহ এসে শ্রমিকদের আস্তানায় হামলা আরম্ভ করে দেয়। আর প্রতিবারই একজন-না-একজনকে কাঁধে করে নিয়ে জংগলে পালিয়ে যায়।

অগত্যা পাহারা বসানো হল এবং ফাঁদও পাতা হল সিংহ দুটোকে ধরবার জন্যে। কিন্তু সিংহ দুটো সব সতর্কতা কাটিয়ে আবার এসে হাজির। জংগল থেকে আস্তানার কাছে পেঁছিতে পেঁছিতে ওদের গর্জনও বাড়তে থাকে। তারপর নিস্তব্ধ। শ্রমিকরা বুঝতে পারলে সিংহ দুটো তাঁবুর ভেতরে ওদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছে। ভীত, সন্ত্রস্তভাবে ওরা অপেক্ষা করতে থাকে। হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনে ওরা দুরুদুরু বুকে বুঝতে পারলে সেদিনের মত শিকার সিংহ দুটো জুটিয়ে নিয়েছে।

পরদিন সকালে নাম ডাকার সময় আগের রাতের হতভাগ্যের নামটা জানা গেল। ততদিনে প্রায় শতজন লোককে নরখাদক দুটো কবলিত করেছে। বাকি লোকগুলির মনের জোর ভাঙতে আরম্ভ করেছে।

সেতু নির্মাণ কার্য অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। কাজেই শ্রমিকদের সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হল এবং ওখানে রয়ে গেল কেবল একদল শ্বেতকায় ব্যক্তি সিংহ দুটোকে শিকার করার উদ্দেশ্যে। ফলে সিংহ দুটোকে হত্যা করা সম্ভব হল এবং আবার কাজ আরম্ভ হয়ে গেল।

সেতুটি খোলা হবার পরও সেই রেললাইনের ধার থেকে সিংহের যথেষ্ট উপদ্রবের খবর আসতে লাগল। একবার খবর গেলঃ "ট্-ডাউন গাড়ীর ড্রাইভারকে নির্দেশ দিন যেন স্টেশন-চত্বরে সাবধানে প্রবেশ করে। সিগনাল লক করা। কেউ বাইরে বের হতে পারছি না; সবাই অফিসে। অফিসের দরজায় সিংহ বসে আছে।"

পরে সেইদিন সেই একই স্টেশন মাস্টার তার পাঠালেঃ "বিশেষ জরুরী। পয়েণ্টসম্যান দুটি সিংহ দ্বারা বন্দী। কোনক্রমে জলের ট্যাংকের ধারে টেলিগ্রাফ পোলে চড়ে রয়েছে। এক্ষুনি সাহায্যের প্রয়োজন।"

আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশ্বাস যে মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা বুনো জন্তুর দেহে প্রবেশ করে। সর্দারদের আত্মা প্রবেশ করে সিংহের দেহে। মৃতব্যক্তিকে রুষ্ট করা হবে এই আশংকায় ঐ সব নরখাদকদের তাই হত্যা করার চেষ্টা হয় না।

* * *

পূর্ব আফ্রিকা থেকে ইংলণ্ড যাবার সময় নিজের প্রাইভেট বিমানে আটলান্টিক পার হবার সময় রোলাণ্ড বাকসটন আতংকের সংগে লক্ষ্য করলে ইঞ্জিনের তেল ফুরিয়ে গেছে।

বাকসটনের মনে একটু আশা জাগলো অনেক নীচে সমুদ্রে একখানা জাহাজ দেখে। তাড়াতাড়ি একখণ্ড কাগজ লিখে পায়ের জুতোয় পুরে বিমানখানিকে নিচে নামিয়ে জাহাজের দিকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলে। সৌভাগ্যবশত জুতোটা ঠিক জাহাজের ডেকেই পড়ল। তারই একটু পরে বিমানখানি সমুদ্রে পড়ে নিমজ্জিত হয়ে গেল। কিন্তু জাহাজের লোকদের চেষ্টায় বাকসটন রক্ষা পেয়ে গেল, সামান্য আহত অবস্থায়।

সন্তোষকুমার ঘোষ

[৮]
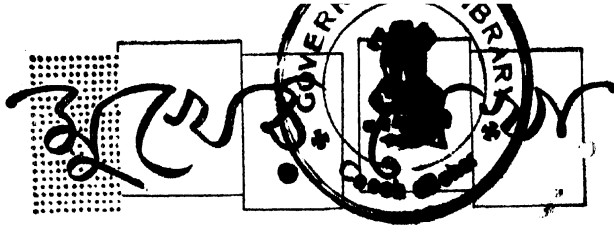
সৌরেশের নিজের 'দিনান্তলিপির' মতই তাঁর বাবার ডায়েরি-রাখার অভ্যাসের মধ্যে কোন নিয়ম বা শৃংখলা ছিল না। কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টিয়েই তিনি টের পেয়েছিলেন, বাবা নেহাতই অবসরমত ডায়েরি লিখতেন। হয়ত পর পর কয়েক-দিনের তুচ্ছ খুঁটিনাটি ঘটনার উল্লেখ আছে, আবার হয়ত কখনও কখনও গোটা মাস, এমন কি বছরও বাদ গিয়েছে।

তবে কি অনুল্লিখিত বছর কিংবা মাস কটিতে সৌরেশের বাবা বাঁচেননি? আমরা যাকে বাঁচা বলি, জীবন যাপন করা, তা কি করেননি?

করেছেন। কিন্তু সেকথা লিখে রাখার যোগ্য বিবেচনা করেননি। করলেও সম্ভবত লেখার অবকাশ পাননি। কেননা, সৌরেশের বাবা বেশীদিন এক জায়গায় সুস্থির হয়ে থাকতে পারতেন না, অনেকটা ভবঘুরে প্রকৃতির ছিলেন। তাই ডায়েরিতে তাঁর জীবনের অনেক কথাই উহ্য আছে।

কিন্তু সৌরেশের সৌভাগ্য, তাঁর মৃত্যুর রহস্যটা ডায়েরির পৃষ্ঠাতে পাওয়া গিয়ে-ছিল। সৌভাগ্য, না দুর্ভাগ্য? জীবনের সব সত্য জানতে পারা কি সুখের? দু-একটি বোধহয় না-জানা থাকাই বাঞ্ছনীয়। অজ্ঞানতা নিরাপদ, অজ্ঞানতা নিষ্কণ্টক, অজ্ঞানতা স্থির এবং প্রশান্ত।

ওই ডায়েরিটা সৌরেশ কেন পড়তে গিয়ে-ছিলেন। পুরনো আলমারিটা সাফ করতে গিয়ে আরও ত কত উঁইধরা কাগজপত্র বেরিয়ে পড়েছিল। পুরনো ফটো, কয়েকটা অকেজো চাবি, সোডার বোতল ভাঙবার সেকেলে একটা যন্ত্র পর্যন্ত।

সেদিন আলমারিটা খুলতেই অতীত কালটা যেন হাঁ করে সৌরেশের মুখোমুখি দাঁড়াল। এতকাল সে বন্দী ছিল, হঠাৎ তাকে মুক্তি দিল কে, কেন দিল, সে নিজেই যেন ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছে।

অবাক হয়েছিলেন সৌরেশও। বিহ্বল এবং কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। একটা তীব্র হাওয়ার ঝাপটা যেন তাঁর মুখে লাগছিল। সে ঝাপটা গন্ধের। কটু এবং তীব্র। তখনকার পৃথিবীর, যে পৃথিবীর নমুনা এতদিন এই আলমারীতে রাখা ছিল, গন্ধ কি এইরকম ছিল? নাকি যা পুরনো যা অতীত তার গন্ধ এমনি টকটক আর ঝাঁঝাল হয়ে যায়? আলমারিটার সামনে দাঁড়িয়ে সৌরেশ সে-কালের গন্ধের একটা আন্দাজ পেলেন। কাল নিরবয়ব তবু তার গন্ধ আছে আর গন্ধ যদি থাকে বর্ণ থাকবে বৈ কি! বিবর্ণতাই তার বর্ণ। মাঝে মাঝে তাকে হাল্কা হলদে বলে ভুল হতে পারে। সৌরেশ হাত বাড়িয়ে তাকে স্পর্শ করলেন। পুরনো খবরের কাগজের নীচে দুটো আর-শুলা মরে পড়েছিল, অন্য খাদ্য না পেয়ে বন্দী ক্ষুধিত অতীত ওদের মেরে ফেলেছিল কি না কে জানে। সৌরেশ আঙুলের টোকা দিয়ে আরশুলা দুটোকে মাটিতে ফেলে দিলেন। পোকায় কাটা কাগজগুলো টেনে টেনে নামালেন নীচে, তার ভিতরে ডায়েরিটা পাওয়া গেল। সেই সঙ্গে আরও অনেক বই, মলাট আছে বা নেই, একটাকে আর একটা থেকে আলাদা করে চেনা যায় না। যদি কোন রহস্যপুরীতে সৌরেশকে নিয়ে গিয়ে কেউ বলত, এখানে যা দেখছ সবই তোমার, শুধু ওই দক্ষিণ দিকের জানালাটা কোনদিন যেন খুলতে যেও না, তা হলে দুঃখ পাবে, বিপদ ঘটবে, তবে সহজাত ঔৎসুক্যই হয়ত তাঁকে নিবারিত জানালাটার দিকে ঠেলে দিত। সেই কৌতূহলই সেদিন তাকে দিয়ে ডায়েরিটার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পড়িয়ে নিল। পড়ল তাঁর ঔৎসুক্যই, চোখ দুটো আর আঙুল কটি নিমিত্ত মাত্র।

হয়ত না পড়লেই ছিল ভাল।

ডায়েরি পড়েই সৌরেশ জানতে পেরে-ছিলেন, বুলু ঠিক টাইফয়েড রোগেই মারা যায় নি। তার অসুখ না সারলেও জ্বর ছেড়ে গিয়েছিল।

ডায়েরি পড়ে যা মনে হয়, সৌরেশের বাবা ভাষার দিক থেকে কিঞ্চিৎ প্রাচীনপন্থী ছিলেন।

তিনি লিখেছিলেনঃ

"বহুদিন পরে খাতাটা খুলিয়া বসিয়াছি। এতদিন সময় পাই নাই। সত্য কথা বলিতে কি, খাতাটার কথা মনেও পড়ে নাই। ইহার পূর্বেকার লেখার তারিখ দেখিতেছি,

'১০ই অক্টোবর, বুধবার'। অর্থাৎ একমাসের মত খাতার সহিত আমার সম্পর্কও ছিল না। যতদূর মনে পড়ে, এই বিচ্ছেদটাই দীর্ঘতম।

"বিচ্ছেদ শব্দটা ইচ্ছা করিয়াই লিখিয়াছি। কেন না, আমি এই বাঁধান খাতাটাকে রাশি-কৃত নিষ্প্রাণ কাগজের গ্রন্থন মনে করি না। এই খাতাটা অত্যন্তই সজীব। আমার বন্ধু! এমন একটা বয়স আসে, যখন প্রকৃত বন্ধু কেহ থাকে না। স্ত্রীও মনের কাছ হইতে অনেকটাই দূরে সরিয়া যায়। আমাকে কেহ বোঝে না, বন্ধুরা সংসারী, আপন আপন সমস্যার গণ্ডি-বেষ্টিত, স্বতন্ত্র। এই খাতাটার কাছেই আমার মনের কথা বলিতে পারি। ঠিক আলাপ বলিব না, কারণ কথা বলিয়া যাই বটে, কিন্তু কোনদিন জবাব পাই না, পাইব এমন প্রত্যাশাও অবশ্য আমার নাই। আমার কথা ও যে ধৈর্য ধরিয়া শোনে, কখনও চঞ্চল হয় না, শুনিয়াই যায়, আমি সেজনাই কৃতজ্ঞ। শুধু শোনেই না, সব কথা ধরিয়াও রাখে। কিছুই হারায় না, বিশ্বস্ততাও উহারি একটি গুণ বটে।

"তবুও খাতাটিকে গত একমাস একদিনও খুলিয়া বসি নাই। আজ প্রথম সময় মিলিল এবং সঙ্গে [illegible] ইহাকে খোঁজ করিলাম, খাতা[illegible] না। খাতাটা যেখানে থাকে সেখানে ছিল না। বাক্স প্যাটরার পিছনে কখন পড়িয়া গিয়াছিল কেহ লক্ষ্য করে নাই। অন্যকে দোষ দিব কেন, আমিই তো করি নাই। অনেক কাগজপত্রের তলায় ধূলিমলিন অনাদৃত শয্যায় প্রায় শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, তবু অভিযোগ করে নাই। করিবেই বা কি করিয়া? আমারই পরম সুহৃদটি যে একেবারেই মূক।

"আজ তাহাকে মনে পড়িল কেন এবারে বলি।

"আজ বুলুর জ্বর ছাড়িয়াছে। সকালে তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, একে-বারে হিম। এই একমাসে তাহার জ্বর কোনোদিন বাড়িয়াছে, কোনোদিন কিছুটা নামিয়াছে, কিন্তু এত নীচে বুঝি কখনই নামে নাই। জ্বরকাঠি দিলাম, সেও আমার করস্পর্শের অভিজ্ঞতারই সমর্থন করিল। আমার স্ত্রীকে ডাকিলাম, সেও বুলুর কপালে হাত দিল; তার মুখে হাসি ফুটিল। সেই হাসি আমাদের উভয়েরই মনের স্বস্তির প্রতিচ্ছবি। এই ত্রিশ-বত্রিশ দিন শরীর এবং মনের উপর দিয়া ধকল তো কম যায় নাই! আমরা দুইজনে পালা করিয়া রাত জাগিয়াছি, অবশ্য শারীরিক কষ্ট যতটুকু তাহার বেশীটা আমার স্ত্রীকেই সহিতে হইয়াছে। দুর্ভাবনার বোঝা বুকে লইয়া আমি ডেক চেয়ারে শুইয়া ঝিমাইয়াছি। মাঝে মাঝে দাগে দাগে মিলাইয়া ঔষধ ঢালিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া থাকিব; আমার সাহায্য মাত্র এইটুকু। ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটির দায় অবশ্য আমার ঘাড়েই ছিল।

"আজ বুলুর জ্বর ছাড়িল। এতদিন এইখানে বাঁধা পড়িয়াছিলাম। এইবার আমার ছুটি। ঘর ছাড়িয়া এখন বাহির হইয়া পড়িতে বাধা নাই।"

এর পরের দিনের ডায়েরীতে ছিলঃ

"বুলুর জ্বর সত্যই ছাড়িয়াছে। কিন্তু মেয়েটা এখনো বড় দুর্বল, বড় পাণ্ডুর। সামান্য পথ্য দিয়াছি, ডাক্তার যতটুকু দিতে বলিয়াছেন মাত্র ততটুকু। তাহাতে বোধ-করি উহার আশা মেটে না, কাছে যখন যাই তখন কেমন শূন্য করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। কথা বলে নাই, গত কয়েকদিন একবারও না। ভয় হয় এই রোগে মেয়েটার বাকশক্তি লোপ পাইয়া গেল না তো! কপালে কয়েকবার হাত দিয়াছি তেমনি ঠাণ্ডা, যেন বড় বেশী ঠাণ্ডা। নিয়মিত ক্ষীণ শ্বাসস্পন্দ ছাড়া উহার দেহে প্রাণের আর কোন লক্ষণ নাই। মেয়েটা জীবন ফিরিয়া পাইয়াছে, অন্ততঃ আশা করিতেছি পাইয়াছে। কিন্তু মাত্র শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়াটুকুই কি জীবন?"

তৃতীয় দিনের ডায়েরীঃ

"বুলু আজ সন্ধ্যায় ভয় পাইয়াছিল। আমি কাছে ছিলাম না, উহার মাও বোধ হয় ছিল রান্নাঘরে, তখন সন্ধ্যা, বুলু হঠাৎ আর্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। কোনো স্পষ্ট কথা নয়, তীব্র বিকৃত স্বর মাত্র। হয়ত জানালাটা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গিয়া থাকিবে, কিংবা পেয়ারা গাছটার পাতার আড়ালে পাখীগুলি বাসা খুঁজিয়া পায় নাই, বুলু তাই চকিত হইয়া উঠিয়া-ছিল। সে ভয় পাইল; ভয়টাই প্রবল, কম্পিত শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি করিল বলিয়াই

তাহার স্বর শুনিতে পাইলাম। তাড়াতাড়ি আমরা দুইজনেই ছুটিয়া আসিয়াছিলাম। বুকে হাত দিয়া দেখি, শ্বাস অতি দ্রুত, অস্বাভাবিক। বয়সের তুলনায় মেয়েটা বরাবরই রীতিমত সাহসী ছিল। অলৌকিক বা অশরীরী কোনো কিছু কল্পনা করিয়া ভয় পায় নাই। এখন পায় কেন? কেন এত সামান্য কারণে এমন চকিত, বিচলিত হইয়া উঠে? রোগটাই সম্ভবত ইহার জন্য দায়ী। বুলুকে সে রুগ্ন করিয়াছে, দুর্বল করিয়াছে, ভীরুও করিয়াছে।"

এর পরে কয়েকদিন কিছু লেখা হয়নি। সৌরেশ দেখেছেন কয়েকটা সাদা পাতা, সম্ভবত অসাবধানতার বশে ছেড়ে যাওয়া। তারই পরে তার বাবা সেই ভয়ংকর স্বীকারোক্তিটি লিখে রেখেছিলেন। আত্ম ধিক্কারে জর্জরিত গ্লানি-কলংকিত একটি মনের ছাপ ছিল দ্রুত লিখিত অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদে। পংক্তিগুলো অসমান, অক্ষরগুলো বাঁকা। বোঝা যায় কী অস্থিরতা এই কয়েকটি পৃষ্ঠা লেখার সময় সৌরেশের বাবাকে পেয়ে বসেছিল। নিজেও তো নিনার্তরূপিণি লেখেন সৌরেশ। এই অস্থিরতার স্বাদ তিনিও জানেন। সৌরেশ পড়ে গিয়েছিলেন :

"ওঘরে ছোট টুকুটা টাঁ টাঁ করিয়া চীৎকার করিতেছে। কেহ তাহাকে ধরিতেছে না। ধরিবে কি? যাহার ধরিবার কথা, টুলুর মা, সে কোথায়, কোন কোণে মাটিতে আঁচল পাতিয়া লুণ্ঠিত হইয়া শুইয়া আছে আমি জানি না। সেও হয়ত কাঁদিতেছে, আমি শুনিতেছি না। সে জোরে কাঁদে না। সব কোলাহল থামিয়া গেলে চাপা গলার গোঙানি কানে আসে, তবে কচিৎ। গলা খুলিয়া কাঁদিতে যে শুদ্ধচিত্ত প্রয়োজন তাহা টুলুর মার নাই। পাপবোধ সাঁড়াশীর মত তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরে।

"কাঁদিতেছি আমিও। এ কান্না নিঃশব্দে। অনেক রোগে মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হয় বলিয়া শুনিয়াছি, সেই রক্তপাত অদৃশ্য: কাহারও চোখে পড়ে না। আমার কান্না তেমনই অশ্রুত, অশ্রু নাই, আর্তনাদও নাই।

"জানালার ধারে বসিয়া আছি, এক একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, তক্তপোশটার নীচে খানিকটা শরণার্থী ফেরারী অন্ধকার, মূক এবং আড়ষ্ট—শিকারী দিন তাহার নাগাল পায় নাই। তক্তপোশের উপরে বিছানা খালি, কয়েকদিন ধরিয়াই খালি। ওঘরে যে শুইত সে নাই।

"সে নাই, বুলু নাই। শোকে অভিভূত হইয়াছি একথা লিখিলে অত্যন্ত মামুলি, ফাঁকা শোনাইবে। ঐই কথা বাহিরের লোককে বলিতে পারি, কিন্তু এই খাতায় লিখিতে পারি না। কেননা এইখানে কোনো গোপনতা রাখিব না। এই ত আমার প্রতিজ্ঞা?

"যে ছিল সে নাই। এমন অনেকেই ত থাকে না। জাতের মৃত্যু ধ্রুব। কিন্তু যে গেল সে অকালে গেল বলিয়াই কি এতটা আঘাত পাইয়াছি? না কি সে একান্তই আমার, আমাদের আপনার ধন বলিয়াই?

"শুধু এইটুকু লিখিয়াই যদি পার পাইতাম, কারণ যদি কেবল ইহাই হইত, তবে বাঁচিতাম। কেননা, মৃত্যু শোকেও শান্তি আছে। কিন্তু গ্লানির কালিমা নাই।

"গ্লানি কেন, তাহাই লিখিব। অকপটে লিখিব। না লিখিলে আমার উপায় নাই। যে আত্ম সন্দেহ এই কয়দিন আমার মনের ভিতরে ধূম-জ্বালা হইয়া রুদ্ধ হইয়া আছে, তাহাকে এই পথে মুক্তি দিব। এই কাজটা আমার নিশ্বাস ফেলার মত।"

এতখানি লিখেও সৌরেশের বাবা হয়ত ইতস্তত করেছিলেন। কেননা খাতার পাতা আরো অনেকখানি আবার সাদা পড়েছিল। লেখাটাও একটানা নয়, খানিকটা লিখে কেটেছেন, ফের লিখেছেন; আবার হয়ত খানিক কাটাকুটি। বোঝাই যায়, সংকল্পের সঙ্গে তাঁর রুচির বিরোধ হয়েছিল। একান্ত সঙ্গী খাতাটাকেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, অথবা তাকেও লজ্জা পাচ্ছিলেন।

এই লজ্জা বস্তুটা, সৌরেশ, ভেবে

দেখেছেন, অত্যন্ত বিচিত্র। অনেকটা ভয়ের মত। কাছাকাছি কেউ নেই জেনেও আমরা অশরীরী সত্তাকে কল্পনায় সৃষ্টি করি, সৃষ্ট বস্তুকে নিজেরাই ভয় পাই। লজ্জাও তেমনি। নির্মক্ষিক নির্জন স্নান কক্ষেও অনেকে নিরাবরণ হতে পারেন না, কেবলই ভাবেন, অদৃশ্য কোন চোখ যেন লক্ষ্য করছে। নিভৃতে বসে একান্ত নিজের জন্যেই লেখা খাতাটায়ও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খুলে ধরাও তাই বাবার কাছে সহজ হয়নি। লিখেছেন, কেটেছেন, লিখেছেন। সবে হাঁটতে শেখা শিশুরা যেমন ওঠে, টলতে টলতে এক পা দু পা চলে, পড়ে, আবার ওঠে, খানিক এগোয়।

সৌরেশের বাবা লিখেছিলেন :

"মানুষ বিচারশীল পশু, না এমনই কি একটা কথা অধ্যাপকদের মুখে শুনিয়াছিলাম। তখন কথাটাকে তলাইয়া বুঝি নাই। মানুষের কতখানি বিচারশীল আর কতখানি পশু, তাহা লইয়া ভাবনার বয়স তখন নহে। পরে দেখিয়াছি, পরিমাণ বা অনুপাতের কোন স্থিরতাও নাই, চন্দ্রকলার মত, নদীর জলের মত তাহাদের হ্রাস বৃদ্ধি আছে। আমাদের সত্তা নির্মল নীল অপার আকাশের মত। কখনও বিচার বোধের রশ্মিতে সমুজ্জ্বল, কখনও পাশব বৃত্তির কালো মেঘে আচ্ছন্ন, অসংযমের ধূলিকণায় মলিন।

"সেদিন আমার বুঝি তাই হইয়াছিল। আমার যে অংশটা পশু, সে প্রথমে চঞ্চল, পরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। বুলুর পরিচর্যায় দীর্ঘকাল আমরা স্বতন্ত্র থাকিয়াছি, দাম্পত্য সম্পর্কটা আচরণে কখনও স্বীকৃত হয় নাই।

"শরীর অবসন্ন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে কতখানি ক্ষুধার্ত হইয়া উঠিয়াছিল সেটা অনুভব করিলাম সেদিন মধ্যরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গিয়া। ঘামে শরীর ভিজিয়া গিয়াছে, কিন্তু ঘুম ভাঙিল কেন। কান পাতিয়া থাকিলাম, কোথাও কোন শব্দ ত নাই। বাসি ফুলের মত ঈষৎ হরিদ্রাভ জ্যোৎস্না বিছানার এক পাশে পড়িয়া আছে। আমার পাশে বুলু নিদ্রামগ্ন। হাত বাড়াইয়া দেখিলাম কপালটা হিম, বুকে হাত দিলাম, শ্বাস পড়ে কি পড়ে না। হয়ত শরীর খারাপ বলিয়া, হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল বলিয়াও হইতে পারে, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইল। একটু দূরেই স্বতন্ত্র শয্যায় আমার স্ত্রী, পাশে নবজাত শিশু। চাপা গলায় তাহাকে ডাকিলাম। তাহার ঘুম ভাঙিল না। তখন তাহাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতে হইল। ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, কি? আমি অঙ্গুলি নির্দেশে বুলুকে দেখাইলাম। ইঙ্গিতটা সে বুঝিল, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া বুলুকে দেখিল, আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—কই, কিছু না তো! এতদিনের অসুখ তাই কিছু বেশী দুর্বল। বলিয়াই সে বুঝি আপন শয্যায় ফিরিয়া যাইবে, আমি তখন তাহার হাত ধরিলাম। মুখে কথা ছিল না, চোখে কী ছিল আমি জানি না, কেননা চোখ তো নিজেকে দেখিতে পায় না, তবু সে বুঝিল। বলিল—এখন নয়। গাঢ় তপ্ত কণ্ঠে বলিলাম—নয় কেন? এখনই। সে শুনিল না, হাত ছাড়াইয়া বাহিরে আসিল, তাহার পিছে পিছে আমিও বাহিরে আসিলাম। ভিতরের বারান্দা একেবারে অন্ধকার, সেখানে জোনাকির আলোটুকুও নাই।

* * *

"এই আমার ইতিহাস। আমার স্খলনের, আমার প্রবৃত্তির।

"বুলু ঘুম ভাঙিয়াছিল কিনা জানি না। ক্ষীণ গলায় সে হয়তো আমাদের ডাকিয়াও থাকিবে, আমরা শুনিতে পাই নাই। চুপে চুপে ঘরে ঢুকিয়া বুলুর ক্ষীণ দেহটা স্থির দেখিলাম, সে কি আমাদেরই পাপের শাস্তি? নিদ্রার ঘোরে এমন অনায়াস শান্ত মৃত্যুর আর কোন দৃষ্টান্ত আমার অভিজ্ঞতায় ছিল না। কম্পিত হাতে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়াছি, বুলুর চোখে কিংবা শুষ্ক অধর কোণে অভিযোগও কি মরিয়া পড়িয়াছিল? মধুপাত্রের কিনারে যেমন মক্ষিকা থাকে? জানি না। আমার স্ত্রী সেই মুহূর্ত হইতে পাথর হইয়া গিয়াছিল।

"জানিতাম না, আমার শাস্তির লজ্জার সেই সীমা নয়; শেষ নয়। তখন অনেকটাই বাকি ছিল। আরও পরে, বেশ কয়েক মাস পরে, আমার স্ত্রীর শরীরে যখন একটি ক্ষণিক বিচ্যুতির লক্ষণকে ভুল করিবার উপায় রহিল না, তাহার পরে করণীয় সম্পর্কে সংকল্প স্থির করিতে আমার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। মৃত্যু বাসনার অঙ্কুরটুকু ত ছিলই, সে এক নিমেষে যেন ডালপালা মেলিয়া আমাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। আমার পথ ত আমি জানি, কিন্তু আমার স্ত্রীর? আবার এক রাত্রিতে, যখন চরাচর সুপ্ত, তাহাকে ডাকিলাম। এবারও আমার কণ্ঠ কম্পিত, সে শুনিল, কী বুঝিল সেই জানে। শুধু বলিল, বেশ।

"খানিকটা মৃত্যুচূর্ণ একটা শিশিতে সংগ্রহ করিয়াও আনিয়াছি, এখন শুধু সময় স্থির করিলেই হয়। সেই লগ্নেরও দেরি নাই। দেরি হইতে আমিই দিব না, কি জানি যদি জীবন স্পৃহা মৃত্যু বাসনাকে আবার পরাস্ত করে? মৃত্যু বাসনারও মৃত্যু ঘটা ত অসম্ভব নয়!"

সৌরেশের বাবার ডায়েরীতে আর কিছু লেখা ছিল না। এর পরের সব কয়টা পৃষ্ঠাই একেবারে সাদা। (ক্রমশ)

রায়

ফ্রানৎস কাফকা

ভরা বসন্ত। রবিবারের সকাল। ছোকরা ব্যবসাদার জর্জ বেন্ডেমান দোতলায় নিজের ঘরে বসে আছে। নদীর ধারে একটানা ছোট ছোট জীর্ণ একসার বাড়ি। রঙ আর উচ্চতায় যেটুকু পার্থক্য, নাহলে একটা থেকে আর একটা বাড়ির বৈশিষ্ট্য যেন নজরে পড়ে না। এক প্রবাসী বন্ধুকে চিঠি লেখা শেষ হল জর্জের এই মাত্র। চিঠিখানা সে ভরে রাখলে খামে, ধীরে-ধীরে অন্যমনস্কভাবে। তারপর লেখার টেবিলের ওপর কনুইয়ের ভর দিয়ে তাকিয়ে থাকে জানালার বাইরে, নদী আর ব্রিজের দিকে, নদীর ওপারে কাঁচ সবুজে ছাওয়া পাহাড়গুলোর দিকে।

তার বন্ধুর কথাই সে ভাবছে। কয়েক বছর আগের কথা। দেশে কোনো ভবিষ্যৎ নেই দেখে মনের ক্ষোভে পালিয়ে গেল তার বন্ধু, রুশ দেশে। এখন সে ব্যবসা করে সেন্ট পিটার্সবার্গে। প্রথম দিকে তার ব্যবসা চলছিল ভালো। কিন্তু অনেকদিন থেকেই তার ব্যবসার অবস্থা ভালো যাচ্ছে না। ইদানীং আর সে বড় একটা আসে না। কিন্তু মাঝে-মাঝে যখন আসে, তার মুখে ওই একই অভিযোগ। বিদেশ-বিভুঁইয়ে প্রাণপাত করেও লাভ হচ্ছে না কিছুই। দাড়ি রেখেছে। তাতে ওকে যতই অন্যরকম দেখাক, জর্জের আশৈশব পরিচিত মুখখানি ঢাকা পড়ে না। তার গায়ের রঙটা হয়ে যাচ্ছে হলদে, যেন কোনো গুপ্ত-ব্যাধির নিদর্শন। নিজেই সে বলে, দেশের যারা ওখানে আছে, তাদের সঙ্গে ওর কোনো যোগাযোগ নেই। কোনো রুশ পরিবারের সঙ্গে ও আদৌ মেলামেশা করে না। কাজেই জর্জ হতাশ হয়ে ধরে নিয়েছে, আজীবন তার বিয়ে-থা না করেই কাটবে।

কী লেখা যায় এরকম লোককে, যে স্পষ্টই বে-কায়দায় পড়েছে, যার জন্যে দুঃখিত হওয়া যায়, কিন্তু যাকে সাহায্য করা যায় না? ওকে দেশে ফিরে আসতে বলা উচিত কি—আবার ঠাঁই-নাড়া হওয়া, আবার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ ঝালিয়ে নেওয়া,—অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো অসুবিধেই নেই—এক কথায় মোটামুটি, বন্ধুদের সহৃদয়তার ওপর নির্ভর করা। কিন্তু একথা বলার সামিলই হল তাকে বলা তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে, সব ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে দেশে ফিরতে হবে, লোকে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখবে অনুতপ্ত সন্তান ঘরে ফিরেছে, তার বন্ধুরাই তার ব্যাপার বুঝেছে ভালো, কারণ ও একটি বয়স্ক শিশুমাত্র। যত মোলায়েম-ভাবেই এসব কথা বলা হবে, ততই তাকে বিঁধবে। তার কৃতী বন্ধুরা, যারা দেশ ছেড়ে কোথাও যায়নি, তাকে বাতলে দেবে, কী তাকে করতে হবে। তাছাড়া, এটা কি নিশ্চিত যে, তাকে এইরকম কিছু বলে এত কষ্ট দিয়ে কিছু ফল হবে? হয়তো, এর ফলে তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা আদৌ সম্ভব হবে না আর। সে তো নিজেই বলে, দেশের ব্যবসা-জগতের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই তার। আর তারপর, বন্ধুদের এইরকম উপদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে হয়তো চিরদিন বিদেশে থেকে যাবে বিদেশী হয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে বিচ্ছেদ হবে আগের চেয়েও গভীর। কিন্তু বন্ধুদের পরামর্শে দেশে ফিরে, ঈর্ষায় না হোক, অবস্থাবিপাকে, এখানে যদি খাপ খাওয়াতে না পারে? কিংবা বন্ধুদের সঙ্গেই যদি না বনে বা তাদের সাহায্য ছাড়া আদৌ চালাতে না পারে এবং খুবই অপদস্থ হয়? এমন অবস্থায় সে বন্ধুদের হারাবে, নিজের দেশ বলতেও তার আর কিছু থাকবে না। তার চেয়ে এখন সে যেমন আছে, এইরকম বিদেশে থাকাই কি ভালো নয়? সব দিক বিচার করে দেখে কেউ কি জোর করে বলতে পারে, দেশে ফিরে এলেই সে জীবনে সাফল্যলাভ করবে?

এইরকম নানা কারণে, তার সঙ্গে চিঠি-পত্রে যোগাযোগ রাখতে চাইলেও তাকে কোনো প্রকৃত খবর দেওয়া যায় না, যা অকপটে কোনো নামমাত্র পরিচিতকেও দেওয়া যায়। গতবার সে যখন দেশে এসেছিল......তারপর তিন বছরেরও বেশি কেটে গিয়েছে। কারণ হিসেবে সে এক বাজে অজুহাত দিয়েছে। রুশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থা অনিশ্চিত, একজন ছোট ব্যবসাদারের পক্ষে সামান্য কিছুদিনের জন্যেও সেখান থেকে আসা সম্ভব নয়, যদিও হাজার হাজার রুশ বিদেশে নির্বিবাদে ঘুরে আসছে। কিন্তু বিগত এই তিনটি বছরে জর্জের নিজের জীবনেও পরিবর্তন হয়েছে অনেক। মা মারা গেছেন দু' বছর আগে। তারপর থেকে সংসার বলতে সে আর তার বাবা। মা'র মৃত্যু-সংবাদ সে বন্ধুকে দিয়েছিল বটে, কিন্তু সহানুভূতি জানিয়ে যে-উত্তর পেয়েছিল, তার ভাষা এতই নীরস যে, মানতে হয়, সুদূর বিদেশে বসে এইরকম শোকের গভীরতা উপলব্ধি করা যায় না। অবশ্য সেই সময় থেকেই জর্জ ব্যবসায়

অন্যান্য সব বিষয়ে লেগে গেছে আরও বেশি দৃঢ়তার সঙ্গে।

হয়তো মা'র জীবদ্দশায় ব্যবসার প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বাবা বজায় রাখতেন নিজের জিদ্, আর সেইজন্যে তার নিজের কর্মক্ষেত্র বাড়ানোর সুযোগ ছিল না। হয়তো মা মারা যাবার পর থেকে বাবার জিদ্ কমেছে অনেকখানি, যদিও তিনি ব্যবসার জন্যে খাটেন এখনো। কিংবা হয়তো আসল কারণ, তাদের কপাল খুলেছে হঠাৎ, আর বাস্তবিক তা' সম্ভবও বটে। কিন্তু, যে কোনো কারণেই হোক, এই দু'বছরে তাদের ব্যবসার উন্নতি হয়েছে অপ্রত্যাশিতভাবে, কর্মচারীর সংখ্যাও করতে হয়েছে দ্বিগুণ, বিক্রীপাটা বেড়েছে পাঁচগুণ। সন্দেহ নেই আরও উন্নতি হবে অদূর ভবিষ্যতে।

কিন্তু, তাদের এই উন্নতির বিন্দু-বিসর্গ জানে না জর্জের বন্ধু। প্রথমদিকে, আর সম্ভবত শেষবার সেই শোক-প্রকাশের চিঠিতে, দেশ ছেড়ে রুশদেশে চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছিল সে জর্জকে। জর্জের
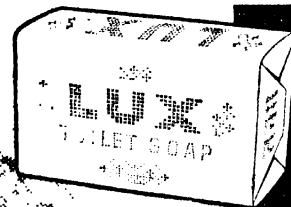
ব্যবসায় সেদেশে সাফল্যলাভের সম্ভাবনার ওপর অনেক লিখেছিল সে। সম্ভাব্য আয়ের যে অঙ্কগুলো দিয়েছিল, জর্জের বর্তমান ব্যবসার সঙ্গে তুলনায় সেগুলো অকিঞ্চিৎকর মনে হবে। তবুও জর্জ বন্ধুকে নিজের সাফল্যের সংবাদ দেয়নি। এখন যদি সেই খবর বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হয়, নিশ্চয় তা অদ্ভুত মনে হবে।

অতএব জর্জ বন্ধুকে শুধু অপ্রয়োজনীয় টুকিটাকি খবর দিত, যা' রবিবারের শান্ত সকালে অলসভাবে চারিদিকের হাল-চাল ভাবতে-ভাবতে মনে জাগে, এলোমেলোভাবে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য, এই দীর্ঘদিনের প্রবাস-জীবনে নিজের শহরের যে ছবিটি গড়ে তুলেছে তার বন্ধু তৃপ্তিভরে, মনে-মনে,—তাতে যেন সে আঘাত না দেয় কোনোমতে। আসলে ঘটেছেও তাই। তিনবার দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তিনখানি চিঠিতে জর্জ তার বন্ধুকে জানিয়ে এসেছে, এক হেঁজী-পেঁজী লোকের সঙ্গে ওই একই রকমের একটি সাধারণ মেয়ের বাক্‌দানের খবর। তার বন্ধু তার উদ্দেশ্যের বিপরীত-ভাবেই এই উল্লেখ্য ঘটনায় উৎসাহ দেখাতে শুরু করার পর থামতে হয়েছে।

এই যে এক মাস আগে সম্পন্ন ঘরের মেয়ে ফ্রলিন ফ্রিডা ব্র্যান্ডেনফিল্ডের সঙ্গে জর্জের বাক্‌দান হয়ে গেছে,—এ খবর বন্ধুকে জানানোর চেয়ে সে পছন্দ ক'রে বন্ধুকে টুকিটাকি গুজব লেখা। প্রণয়িনীর সঙ্গে অনেক আলোচনা করেছে বন্ধুকে নিয়ে। চিঠি-পত্রের আদান-প্রদানের মারফত তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক। সেকথা বলেছে সে ফ্রিডাকে।

'তোমার বন্ধু তাহলে আমাদের বিয়েতে আসছেন না!' বলেছে ফ্রিডা। 'জান, তোমার বন্ধুদের সকলের সঙ্গে আলাপ করার অধিকার আছে আমার।'

'দেখ, আমি তাকে বিব্রত করতে চাই না।' উত্তর দিয়েছে জর্জ। 'আমাকে ভুল বুঝো না যেন, হয়তো সে আসবে, অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। কিন্তু সে হয়তো ভাববে তাকে জোর ক'রে টেনে আনা হ'ল। তাতে মনে কষ্টই পাবে, আমাকে হিংসে করতেও পারে। তার মনে নিশ্চয়ই অতৃপ্তি জাগবে, আর যখন মনের অতৃপ্তি ঘোচাতে পারবে না, তাকে আবার ফিরে যেতে হবে এ-ক-লা। একলা—তার মানে কী বোঝ?'

'তা বটে। কিন্তু আমাদের বিয়ের খবর তিনি কি অন্য কোথাও থেকে জানতে পারেন না?'

'একেবারে বন্ধ করার উপায় নেই বটে, তবু জানতে পারবে না মনে হয়। যেভাবে তার দিন কাটে সেখানে!'

'দেখ জর্জ, তোমার বন্ধুরা যখন সবাই এই ধরনের, তখন বাক্‌দানে রাজি হওয়া উচিত হয়নি তোমার।'

'তার জন্যে তো আমরা দুজনেই দোষী। কিন্তু, এখন আমি আর এই অবস্থাটা বদলাতে চাইনে।'

তবুও জর্জের চুম্বনের মধ্যেই দ্রুত নিঃশ্বাস নিতে-নিতে বললে ফ্রিডা, 'যাই হোক, তবু আমি কেমন যেন ভেঙে পড়েছি মনে হচ্ছে।' জর্জ ভাবছিল, বন্ধুকে খবর দিলেও বিভ্রাটে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই তার। মনে-মনে বলল: 'এই ধরনের লোক আমি, এইভাবেই বন্ধুত্ব রাখতে হবে আমার সঙ্গে। পছন্দসই বন্ধু হবার জন্যে নিজেকে আমি অন্য ছাঁচে ঢেলে গড়তে পারি না।'

আর, বাস্তবিকই জর্জ তার বন্ধুকে তার বাক্‌দানের কথা জানাল এই চিঠিতে, রবিবার সকালে যেটা লিখল তার ভাষাটা এইরকম: 'সেরা খবরটা দিচ্ছি সবশেষে। অবস্থাপন্ন ঘরের ফ্রলিন ফ্রিডা ব্র্যান্ডেন-ফিল্ড নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার বাক্‌দান হয়েছে। তোমার পক্ষে ওকে চেনা সম্ভব নয়, কারণ ওরা এখানে এসেছে তুমি এখান থেকে চলে যাবার অনেক পরে। বারান্তরে মেয়েটির সম্বন্ধে আরও কিছু জানানোর সুযোগ আসবে। কিন্তু আজ শুধু এই কথাটি বলব যে, আমি খুব খুশী। তোমার-আমার সম্পর্কের মধ্যে এবার একটিমাত্র পরিবর্তন আসবে। এখন থেকে আমি তোমার সাধারণ একটি বন্ধুমাত্র নই, আমি তোমার সুখী বন্ধু। আমার প্রণয়িনীও তোমাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছে। তোমাকে চিঠিও দেবে শিগ্‌গীর। ও হবে তোমার অকৃত্রিম বান্ধবী। তোমার মতো চিরকুমারেরর কাছে এর গুরুত্ব কম নয়। আমি জানি, নানা কারণে তুমি আমাদের সঙ্গে এসে দেখা করতে পার না। কিন্তু আমার বিয়ে কি সব প্রতিবন্ধক

অতিক্রম করার মতো উপযুক্ত সুযোগ নয়? যাই হোক, তবুও অন্য কারুর কথা না ভেবে নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে যা ভালো মনে হয় ক'রো।'

এই চিঠিখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ জর্জ বসেছিল লেখার টেবিলের ধারে, জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে। একজন স্বল্প-পরিচিত লোক রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে অভিনন্দন জানিয়ে গেল। অন্য-মনস্কভাবে হেসে সে কোনোমতে তাকে প্রত্যভিবাদন জানাল।

অবশেষে সে চিঠিখানা পকেটে রাখল। নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে ছোট একটি 'লবি' পার হয়ে পেঁছিল তার বাবার ঘরে। এই ঘরে সে অনেককাল আসেনি। অবশ্য আসার দরকারও হয় না। কারণ, কাজের জায়গায় তার বাবার সঙ্গে দেখা হয় প্রতিদিন। একই খাবারের দোকানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে দুপুরের খাওয়া সারে। অবশ্য সন্ধ্যাবেলা যে যার খুশি মতো জায়গায় যায়। ওই সময়টায় যদি বা জর্জ বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে না গেলো, বা হালে যা হয়েছে, তার বাক্‌দত্তার সঙ্গে দেখা করতে না গেছে, পিতা-পুত্রে একই বসবার ঘরে যে যার খবরের কাগজ নিয়ে দুজনে এক সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটায়।

অবাক হ'ল জর্জ যে, এমন রৌদ্রালোকিত সকালেও তার বাবার ঘরটা কী অন্ধকার! ঐ সরু উঠানের গায়ে বড় পাঁচিলটা তাহলে এই আন্দাজ আড়াল করেছে ঘরখানা! ঘরের এক কোণে তার মায়ের নানা স্মৃতিচিহ্ন ঝোলানো রয়েছে। সেখানে জানালার ধারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন তার বাবা। দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতার জন্যে কাগজটা একটু কাত্ করে ধরেছেন। টেবিলের ওপর পড়ে আছে প্রাতরাশের অবশেষ। দেখে মনে হয় বিশেষ কিছুই খাননি।

'এই যে জর্জ!' তাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন তার বাবা। চলার সময় তাঁর ভারী ড্রেসিং গাউন দুফাঁক হয়ে গেল, তার প্রান্ত ঝলমল করতে থাকল তাঁর দেহ ঘিরে। 'এখনো আমার বাবাকে একটি দৈত্য বলা চলে', বললে জর্জ স্বগত।

'অসহ্য অন্ধকার এখানে!' সে বললে মুখ ফুটে।

'হ্যাঁ, এখানে যথেষ্ট অন্ধকার', উত্তর দিলেন তার বাবা।

'আপনি জানালাটাও বন্ধ করে দিয়েছেন?'

'এইরকমই আমার ভালো লাগে।'

'মানে, বাইরে তো বেশ গরম!' আগেকার কথার রেশ টেনে বলে জর্জ। তারপর বসে পড়ে।

তার বাবা প্রাতরাশের পাত্রগুলো সরিয়ে রাখলেন একটা সিন্দুকের ওপর।

'আমি আপনাকে যা বলতে এসেছি—', শূন্যদৃষ্টিতে তার বাবার নড়াচড়ার দিকে

তাকিয়ে বলে যায় জর্জ, 'আমার বাক্‌দানের খবরটা সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে পাঠাচ্ছি।' পকেট থেকে চিঠিখানা একটু বার করে আবার সে ঢুকিয়ে রাখে।

'সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে?' জানতে চাইলেন তার বাবা।

'সেখানে আমার এক বন্ধু আছে।' বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার চেষ্টা করে জর্জ। বাবার সময় একেবারে আলাদা মানুষ তার বাবা, ভাবছিল সে। বাহুবন্ধ, কীরকম যেন শক্ত হয়ে বসে আছেন এখন।

'ও হ্যাঁ। তোমার বন্ধুর কাছে।' কথাগুলোর ওপর অদ্ভুত জোর দিয়ে বললেন তার বাবা।

'মানে, বাবা, কথাটা হচ্ছে, প্রথমে আমি তাকে আমার বাক্‌দানের খবর জানাতে চাইনি। অনেকটা তার মুখ চেয়েই। আপনি তো নিজেই জানেন, ভারি আড়ম্বরে লোক ও। ভাবলুম, আমার বাক্‌দানের কথা অন্য কেউ হয়তো তাকে বলতে পারে, অবশ্য তার মতো নিঃসঙ্গ লোকের ক্ষেত্রে সেরকম সম্ভাবনা খুব কম,—আর অন্য কেউ যদি বলে তাহলে তো আমি তা ঠেকিয়ে রাখতে পারব না—কিন্তু তবুও আমি নিজে তাকে খবরটা দিতে চাইনি।'

'আর এখন তুমি তোমার মত পরিবর্তন করেছ?' প্রশ্ন করলেন বাবা। বিরাট খবরের কাগজখানা রাখলেন জানালার তাকের ওপর, তার ওপর রাখলেন তাঁর চশমা। তারপর হাত দিয়ে ঢাকলেন চশমাটা।

'হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভাবছিলুম আমি। ভাবলুম, যদি সে আমার সত্যিকার বন্ধু হয় তাহলে সুপাত্রীর সঙ্গে আমার বাক্‌দানের খবর শুনে সেও নিশ্চয় খুশী হবে। তাই তাকে খবরটা দিতে আর দেরি করা আমার পক্ষে উচিত হবে না। কিন্তু চিঠিটা ডাকে দেবার আগে আপনাকে তো একবার জানানো দরকার।'

'জর্জ!' নির্দন্ত মুখখানা ছুঁচোলো ক'রে বললেন তার বাবা, 'মন দিয়ে শোন আমার কথা! তুমি আমার কাছে এসেছ এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে। এটা খুবই প্রশংসার। কিন্তু এর কোনো মূল্য থাকবে না, বরং তার চেয়েও খারাপ হবে যদি তুমি আদ্যোপান্ত খুলে না বল। এখন যা বলা উচিত নয়, এমন কথা খুঁচিয়ে তুলতে চাই না। তোমার মা মারা যাবার পর থেকে এমন কতকগুলো ঘটনা ঘটছে, যা ঠিক হচ্ছে না। সেসব কথা উত্থাপন করার সময় আসবে, হয়তো খুব শিগ্‌গীর। ব্যবসায় এমন কতকগুলো জিনিস করা হচ্ছে, যা আমি জানি না। এগুলো যে আমাকে লুকিয়ে করা হচ্ছে, তা' নয়—আমি বলব না যে আমার কাছে গোপন করা হচ্ছে—এসব বোঝার মতো শক্তি আর আমার নেই, আমার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে। সবদিকে নজর রাখার ক্ষমতা নেই আর। প্রথমত, আমার এরকম হচ্ছে অনেকটা বয়সের ধর্মে। দ্বিতীয়ত, তোমার মায়ের মৃত্যুতে তোমার চেয়ে আমি শোক পেয়েছি বেশি। কিন্তু, এখন যখন এই চিঠিটা আমাদের আলোচ্য,—জর্জ, আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, আমাকে ঠকিয়ো না। এটা সামান্য ব্যাপার একটা, উল্লেখ করার মতো নয়। তবু, ঠকিয়ো না আমাকে। বল তো, সত্যিই সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে তোমার কোনো বন্ধু আছে কি?'

বিহ্বল হয়ে উঠে দাঁড়াল জর্জ। 'ছেড়ে দিন আমার বন্ধুদের কথা। এক হাজারটা বন্ধুও আমার কাছে বাপের চেয়ে বড় নয়। আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? আপনি নিজের ঠিকমতো যত্ন নিচ্ছেন না। কিন্তু, বুড়ো বয়সে শরীরের যত্ন করা তো কর্তব্য। আপনি ভালো করেই জানেন যে, আপনাকে বাদ দিয়ে আমি ব্যবসা চালাতে পারি না। কিন্তু, ব্যবসা দেখতে গিয়ে আপনার স্বাস্থ্য যদি মাটি হয় তাহলে বরং কাল থেকেই আমি ব্যবসা উঠিয়ে দেব বরাবরের মতো। কিন্তু তা' করলে তো চলবে না! আপনার
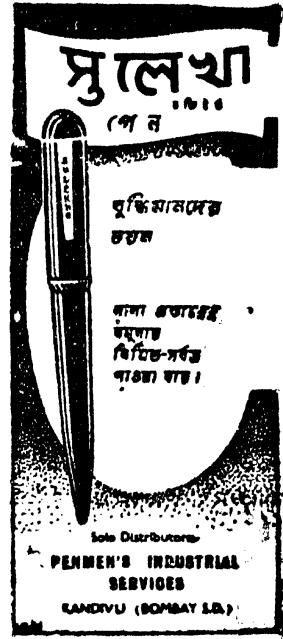
জীবনযাত্রার পারিবর্তন করতে হবে, আমূল পরিবর্তন। এই অন্ধকার ঘরে বসে আছেন আপনি। অথচ বসবার ঘরে যথেষ্ট আলো। শরীর বাঁচানোর জন্যে ভালো ক'রে খাচ্ছেন না আপনি। না বাবা, এরকম চলবে না আর। আমি ডাক্তারকে ডেকে পাঠাচ্ছি, আর তিনি যেমনটি বলবেন, সেইরকমভাবে চলতে হবে আপনাকে। আপনার এই ঘরটা ছাড়তে হবে। সামনের ঘরে থাকবেন আপনি; এখন থেকে আমি থাকব এই ঘরে। অবশ্য, এ ঘর ছাড়তে কষ্ট হবে না আপনার, এঘরের সব জিনিস ওঘরেই রাখা হবে। যাক্, সেসব ব্যবস্থা হবে পরে। এখন অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে আমি বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছি আপনাকে,—এখন বিশ্রামের দরকার আপনার। নিন্, আমি আপনার পোশাক বদলে দিচ্ছি; দেখুন না, আমি কেমন করতে পারি এসব। অবিশ্যি আপনি যদি এখনই সামনের ঘরে যান তাহলে এখনকার মতো আমার বিছানায় শুতে পারেন। সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে।'
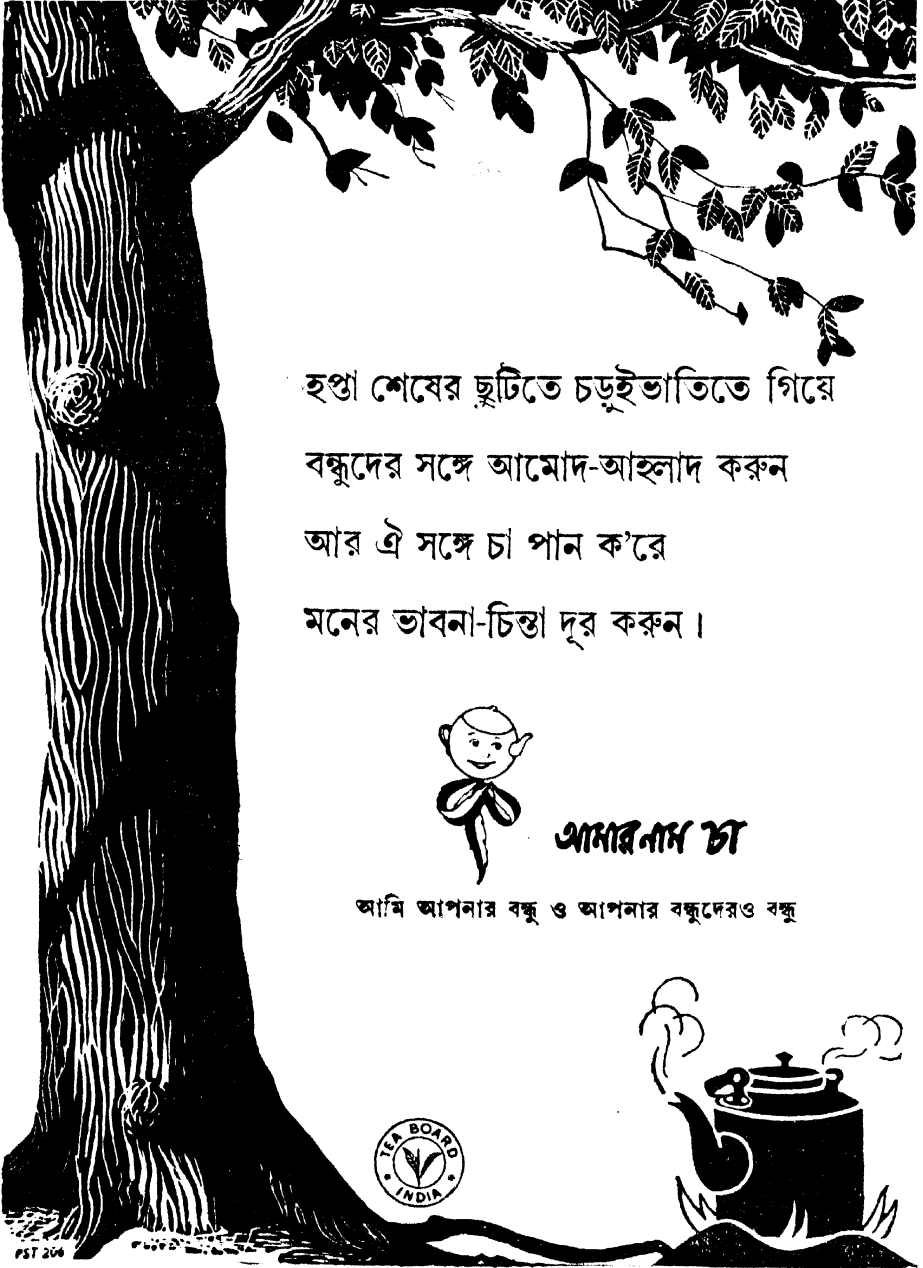
বাপের গা ঘেঁষে দাঁড়ায় জর্জ। তার বাবার এলোমেলো পাকা চুলে ভরা মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে তখন বুকের ওপর।

'জর্জ!' নিচু গলায় ডাকলেন তার বাবা নিষ্পন্দভাবে।

তৎক্ষণাৎ বাপের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে জর্জ। তাকায় বৃদ্ধের ক্লান্ত মুখের দিকে। অস্বাভাবিক রকমের বড় চোখের স্থির তারা দুটো কটকট্ ক'রে তাকাচ্ছে তার দিকে, চোখের কোণ দিয়ে।

'সেণ্ট্ পিটার্সবার্গে তোমার এক বন্ধু আছে! লোকের পেছনে লাগা তোমার বরাবরের অভ্যেস। এমন কি, আমাকেও তুমি বাদ দাও না। ঐ অত দূরে দেশে তোমার বন্ধু আছে! এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'একটু মনে করার চেষ্টা করুন, বাবা', বলে জর্জ। চেয়ার থেকে বাবাকে তুলে ধরে তাঁর গায়ে গলিয়ে দেয় ড্রেসিং গাউন। দুর্বলভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন তার বাবা। বলে চলে জর্জ, 'এই তো, প্রায় তিন বছর হতে চলল, আমার বন্ধু এসেছিল এখানে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। আমি জানি, আপনি তাকে পছন্দ করেন না। অন্তত বার দুয়েক আপনার সঙ্গে তাকে দেখা করতে দিইনি, যদিও আমার ঘরে আমার কাছে সে বসেছিল। আপনার তাকে দেখতে না পারার কারণ বুঝি আমি। আমার বন্ধুটি একটু অদ্ভুত ধরনের। কিন্তু, পরে তো আপনার সঙ্গে তার বেশ বনত। খুব ভালো লেগেছিল যখন দেখলুম যে আপনি তার কথা শুনেছেন, তার কথায় সায় দিচ্ছেন, নানা কথা জানতে চাইছেন তার কাছে। পুরনো দিনের কথা ভেবে দেখলে এসব নিশ্চয়ই মনে পড়বে আপনার। রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে কত অবিশ্বাস্য গল্প বলত সে আমাদের। ধরুন না সেই গল্পটা। একবার ব্যবসার কাজে কিয়েভে গিয়েছিল সে। সেখানে জড়িয়ে পড়ল এক দাঙ্গায়। একটা বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে এক পাদ্রী। হাতের চেটো কেটে রক্ত দিয়ে এঁকেছে এক ক্রুশ-চিহ্ন চওড়া ক'রে। সেই হাত উত্তেজিত জনতার দিকে তুলে মিনতি জানাচ্ছে। এই গল্পটা আপনি নিজেই দু-একবার বলেছেন অন্যলোকের কাছে।'

ইতিমধ্যে সযত্নে তার বাবাকে জর্জ বসিয়েছে, সাবধানে খুলে নিয়েছে পশমী ইজের, যা' তিনি পরেছিলেন কাপড়ের অন্তর্বাস ও মোজার ওপর। ময়লা অন্তর্বাস দেখে জর্জ মনে-মনে তিরস্কার করে নিজেকে এতদিন বাপের দিকে নজর দেয়নি বলে। সময়মতো তার বাবা অন্তর্বাস বদলাবেন, এটা দেখা নিশ্চয়ই তার কর্তব্য। ভবিষ্যতে তার বাবার সম্পর্কে কী ব্যবস্থা হবে, এটা সে তার ভাবী বধূর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করেনি এতদিন। তারা দুজনে অনেকটা ধরেই নিয়েছিল, তিনি একা এই পুরনো বাড়িতে বাস করবেন। কিন্তু এখন সে চট্ ক'রে পাকা-পাকি সিদ্ধান্ত ক'রে ফেললে যে, ভবিষ্যতে যে নতুন বাসা সে করবে, সেখানেই থাকবেন তার বাবা। এখন ভালো করে ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে যে ভবিষ্যতে তাঁর বাবাকে যে যত্ন-আদরে মুড়ে রাখবে সে ভেবেছে, দেরি করলে হয়তো সে সুযোগ আর আসবে না!

বাবাকে কোলে ক'রে নিয়ে গেল বিছানায়। হঠাৎ ভয় পেল সে। বৃদ্ধকে কোলে নিয়ে বিছানার দিকে যাচ্ছে যখন, তখন তিনি বুকের ওপর ঘড়ির চেন্ নিয়ে খেলা করছেন। বিছানার ওপর শুইয়ে দিতে দেরি হ'ল এক মুহূর্ত,—ঘড়ির চেন্ নিয়ে এত ব্যস্ত তার বাবা।

কিন্তু বিছানায় শুইয়ে দিতেই সব যেন ঠিক হয়ে গেল। তার বাবা ঢেকে নিলেন নিজেকে। কাঁধের ওপর একটু বেশি করেই টেনে নেন কম্বলটা। তারপর তাকান জর্জের দিকে। চাহনিটা খুব বিরূপ নয়।

'এবার আমার বন্ধুকে মনে পড়ছে তো?' শুধালো জর্জ। তাঁকে উৎসাহ দিয়ে মাথা নোয়ায় সে।

'দেখ তো, সবদিক ঠিক ঢাকা পড়েছে কিনা!' বলেন তার বাবা, যেন তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, তাঁর পা দুটোয় কম্বল ঠিকমতো চাপা পড়েছে কিনা।

'দেখছেন তো, বিছানায় শুয়ে কেমন আরাম লাগছে এর মধ্যেই!' কম্বলটা আরও চেপে-চুপে গুটিয়ে দিতে-দিতে বলে জর্জ।

'সবদিক বেশ ভালোভাবে ঢাকা পড়েছে কি?' আবার জিগ্যেস করেন তার বাবা। উত্তরটার জন্যে যেন তিনি অদ্ভুতভাবে ব্যগ্র।

'ব্যস্ত হবেন না, চারিদিক ঢাকা পড়েছে ভালো ক'রে—'

'না!!' চিৎকার ক'রে ওঠেন তার বাবা, জর্জের কথার মাঝে। ছুঁড়ে ফেলে দেন কম্বলখানা,—এত জোরে যে, মুহূর্তের মধ্যে উড়ে পড়ল সেখানা চতুর্দিকে। খাড়া দাঁড়িয়ে ওঠেন বিছানার ওপর। শুধু নিজেকে খাড়া রাখার জন্যে আলতো ক'রে একখানা হাত রাখলেন ছাদে।

'তুমি আমাকে ঢাকা দিয়ে রাখতে চাও, জানি হে ছোকরা, জানি। কিন্তু এখুনি আমাকে ঢাকা দিয়ে রাখা যাবে না! শরীরে আমার যতক্ষণ শেষ বিন্দু শক্তি আছে, ততক্ষণ এ তোমার কর্ম নয়, তোমাকে বরং ঘায়েল করার পক্ষে যথেষ্ট। তোমার বন্ধুকে আমি বিলক্ষণ চিনি। সে যদি আমার ছেলে হ'ত, তাহলে আমার মনের মতো ছেলে হ'ত সে। আর, সেইজন্যেই এই ক'বছর ধরে তার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি করে আসছ তুমি। এছাড়া, আর কী উদ্দেশ্য আছে তোমার?

মনে কর বুঝি যে তার জন্যে কষ্ট হয় না আমার? সেইজন্যেই তো আপিস ঘরে আটকে রাখ নিজেকে,—বড় কর্তা এখন ব্যস্ত, তাঁকে এখন বিরক্ত করা চলবে না—বুঝি না নাকি এসব রুশিয়ায় ঐরকম ঝুড়ি-ঝুড়ি মিথ্যে চিঠি লেখার ফিকির শুধু? আর এখন, যখন দেখছ যে, বেশ কাত করেছে তাকে, এমন মাটিতে মিশিয়েছ যে, তার বুকের ওপর তুমি চেপে বসলেও তার নড়ার সাধ্য নেই, তখন তুমি, পুত্ররত্ন আমার, ঠিক করলে যে, এবার বিয়ে করবে!'

বাপের এই মন-গড়া অভিযোগ শুনে হাঁ হয়ে গেল জর্জ। অভূতপূর্ব কল্পনায় ভেসে ওঠে তার সেণ্ট পিটার্সবার্গের বন্ধু, হঠাৎ জানা গেল, তার বাবা চেনেন ভালোভাবে। কল্পনায় দেখতে পায়, তার বন্ধু হারিয়ে গেছে রুশ দেশের বিশাল আয়তনে। দেখতে পায়, তার বন্ধু শূন্য, লুণ্ঠিত গুদামের দরজায় আছে দাঁড়িয়ে। শো-কেসের ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে, ভাঙগাচোরা জিনিসপত্রের অপচয়ের মাঝে, ভেঙেগ-পড় গ্যাসের দেওয়ালগিরির পাশে দাঁড়িয়ে আছে তার বন্ধু,—শুধু দাঁড়িয়ে আছে! কেন তাকে চলে যেতে হ'ল দূরে,—এত দূরে!

'কিন্তু, আমার কথা শুনে নাও!' চেঁচিয়ে ওঠেন তার বাবা। প্রায় হতবুদ্ধির মতো ছুটে যায় জর্জ বিছানার দিকে সবকিছু গুছিয়ে নেবার জন্যে, কিন্তু থেমে যায় মাঝপথে।

'যেহেতু সেই মেয়েটা ঘাগরা তুলে দেখিয়েছে', বলে চলেন তার বাবা বাঁশির সুরে, 'যেহেতু সে ঘাগরা তুলে দেখিয়েছে এমনি ক'রে, নোংরা মাগী!' মেয়েটিকে ব্যঙগ ক'রে তার বাবা শার্টটা এত উঁচুতে গুটিয়ে নেন যে, তাঁর জানুর ওপরকার যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন বেরিয়ে পড়ে; 'যেহেতু, এমনি ক'রে, এমনি ক'রে সে ঘাগরা তুলেছিল, তুমি তার সঙেগ জুটেছ। আর, সেই তাকে নিয়ে নির্বিবাদে ফুর্তি করবার উদ্দেশ্যে অপমান করেছ মায়ের স্মৃতির, বিশ্বাসঘাতকতা করেছ বন্ধুর সঙেগ, আর বাপকে এনে আটকে রেখেছ বিছানায়, যাতে নড়তে না পারে। কিন্তু, তোমার বাপ নড়তে পারে। দেখবে, পারে কিনা?'

কোনো অবলম্বন ছাড়াই উঠে দাঁড়িয়ে পা ছুঁড়তে থাকেন তিনি। অন্তর্দৃষ্টির আলোকে তিনি উজ্জ্বল। জর্জ ছিটকে পড়ে এক কোণে,—তার বাবার কাছ থেকে যত দূরে যাওয়া সম্ভব। অনেকদিন আগে সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে অপরের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি গতিবিধি সে লক্ষ্য করবে মন দিয়ে, যাতে সে কোনো পরোক্ষ আক্রমণে হকচকিয়ে না যায়,—তা' সে আক্রমণ পেছন থেকেই আসুক, বা মাথার ওপর থেকে। এই মুহূর্তে তার মনে পড়ে যায় সেই দীর্ঘ-বিস্মৃত প্রতিজ্ঞা। যে লোক এক টুকরো ছোট সুতো ছুঁচে পরাচ্ছে, তার মতোই সে ভুলে যায় তার প্রতিজ্ঞা।

'কিন্তু, যাই হোক, তোমার বন্ধুকে ঠকাতে পারনি তুমি!' চিৎকার ক'রে বলেন তার বাবা। কথাগুলোর ওপর জোর দেবার জন্যে হাওয়ায় বিঁধিয়ে দেন তর্জনী। 'এইখানে, আমি তার প্রতিনিধিত্ব করছি।'

'ভাঁড় কোথাকার!' খোঁচাটা বেরিয়ে গেল জর্জের মুখ দিয়ে এবং সঙগে-সঙেগই খেয়াল হ'ল কতটা ক্ষতি সে ক'রে ফেলেছে। তার চোখগুলো নাচতে লাগল মাথার মধ্যে, জিভটা কামড়ে ধরে সে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। যন্ত্রণায় তার হাঁটু দুটো ভেঙেগ পড়ে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, [illegible] তো, প্রহসনের অভিনয়, করছি আমি প্রহসন! বলেছ বেশ! হতভাগা বৃদ্ধ বিপত্নীকের কপালে এছাড়া আর কী সান্ত্বনা আছে? বল, বল, আর যখন উত্তর দেবে, মনে রাখবে তুমি আমার জীবিত সন্তান। বল, আমার আর কী আছে। এই পেছনের ঘরে পড়ে রয়েছি, সহ্য করছি অবাধ্য চাকর-বাকরের অবজ্ঞা, আর হাড়ে-মজ্জায় গেছি বুড়িয়ে! আর আমার পুত্র, বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দুনিয়ায়, সেইসব কারবার ফলাও করছেন, যার ভিত আমিই ওর জন্যে তৈরী করে রেখেছি, আর বিজয়গর্বে ফেটে পড়ছেন; আর বাপের কাছ থেকে চলে যাচ্ছেন সম্ভ্রান্ত ব্যবসাদারের মতো, কিছুই হয়নি, এইরকম মুখের ভাব নিয়ে। তুমি কি মনে কর, তোমাকে ভালবাসতুম না আমি, আমার রক্ত বইছে না তোমার শরীরে?'

এইবার উনি ঝুঁকে পড়বেন সামনে, ভাবলে জর্জ। যদি উল্টে পড়ে যান, আঘাত লাগে! চিন্তাটা সাপের মতো হিস্‌হিস্‌ ক'রে ওঠে তার মনে।

তার বাবা সামনে ঝুঁকে পড়লেন কিন্তু পড়লেন না। তিনি ভেবেছিলেন, জর্জ এগিয়ে আসবে। কিন্তু জর্জ এগিয়ে না আসাতে আবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

'যেখানে আছ, সেখানেই থাক। তোমাকে দরকার নেই আমার। ভাবছ, এখানে আসবার মতো ক্ষমতা তোমার আছে, কেবল ইচ্ছে করেই পিছিয়ে আছ। এত নিশ্চিন্ত হওয়া ভালো নয়। এখনও তোমার চেয়ে আমার গায়ে ঢের বেশী জোর। একলা হলে হয়তো ভেঙেগ পড়তুম আমি। কিন্তু তোমার মা এত শক্তি যুগিয়েছেন আমাকে যে, তোমার বন্ধুর সঙেগ চমৎকার যোগাযোগ করেছি আমি,

আর তোমার সব খদ্দের, এই আমার পকেটে।'

'ওর শার্টের পকেট আছে দেখছি!' মনে-মনে বলে জর্জ। ভাবলে, এই একটি মন্তব্য প্রকাশ পাবে সারা দুনিয়ার মধ্যে কী অসম্ভব লোক তার বাবা। এক মুহূর্তের জন্যে ভাবলে কথাটা। একটি মুহূর্ত মাত্র। আজ সে সবকিছুই ভুলে যাচ্ছে।

'বউকে জড়িয়ে ধরে আমার সুমুখে আসার চেষ্টা ক'রে দেখো একবার! তোমার পাশ থেকে বিদেয় করব তাকে, দেখবে মজা তখন।'

অবিশ্বাসের হাসি হাসে জর্জ। যেদিকে দাঁড়িয়েছিল জর্জ, সেইদিকে মাথাটা নইয়ে জানান তার বাবা যে তাঁর কথায় আর কাজে তফাৎ নেই।

'খুব হাসির খোরাক জুগিয়েছ আজ তুমি! আমাকে জিগ্যেস করতে এসেছ যে বন্ধুকে তোমার বাকদানের খবর দেবে কিনা। সে ইতিমধ্যেই সব কিছু জানে। বুঝেছ বোকা ছেলে, সব কিছু জানে সে! আমি তার কাছে বরাবর চিঠি লিখে আসছি, কারণ লেখার সরঞ্জাম তো আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে ভুলে গেছ তুমি। তুমি নিজে যা জান, তার চেয়ে শতগুণ ভালো সে জানে সব খবরই। তোমার যেসব চিঠি যায়, সেগুলো সে খোলেই না, বাঁ হাতে নিয়ে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দেয়। আর আমার চিঠিগুলো সে ডান হাতে তুলে নেয় পড়ার জন্যে।'

উৎসাহের ঝোঁকে মাথার উপর হাত তুলে দোলাতে থাকেন তিনি। 'সব খবর সে জানে হাজারগুণে ভালো', চেঁচিয়ে ওঠেন তিনি।

'দশ হাজার গুণ!' বাপকে পরিহাস করার উদ্দেশ্যে বলে জর্জ, কিন্তু তার মুখের মধ্যেই কথাগুলোয় লাগে মারাত্মক ব্যগ্রতার সুর।

'বছরের পর বছর ধরে আমি অপেক্ষা করছি, কবে তুমি এইরকম একটা প্রশ্ন নিয়ে আসবে! এছাড়া আর কোন ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাই নাকি? তুমি কি মনে কর খবরের কাগজ পড়ি আমি? এই দেখ!' এই বলে জর্জের দিকে তিনি ছুঁড়ে দেন একখানা খবরের কাগজ, যা তিনি কোনো-রকমে বিছানায় রেখেছিলেন নিজের কাছে। পুরনো একখানা খবরের কাগজ, জর্জের সম্পূর্ণ অপরিচিত।

'সাবালক হতে কত দেরিই না হলো তোমার! তোমার মাকে মরতে হল, তিনি এই সুখের দিন দেখে যেতে পারলেন না। তোমার বন্ধু মরতে বসেছে রুশ দেশে। তিন বছর আগেও হলদে দেখাচ্ছিল তাকে, কবরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই হত। আর আমার কথা; আমার হাল তো দেখতেই পাচ্ছ। তা দেখার জন্যে তোমার কপালেও তো দুটো চোখ আছে!'

'ও, তাহলে আমার জন্যে ওত্ পেতে বসেছিলেন আপনি?' চেঁচিয়ে ওঠে জর্জ।

তার বাবা বলেন কাতরকণ্ঠে, কোনো কিছু না ভেবেঃ 'মনে হয় এই কথাটাই তুমি বলতে চাইছিলে অনেক আগে। কিন্তু এখন আর কিছু যায় আসে না।' তারপর গলা চড়িয়ে বললেনঃ 'এতক্ষণে বুঝলে যে দুনিয়ায় তুমি ছাড়াও আর কি কি ছিল: এই একটু আগেও তুমি জানতে শুধু নিজের কথাটুকু! নির্দোষ শিশু, হাঁ, বাস্তবিকই তুমি ছিলে তাই। কিন্তু তার চেয়েও সত্যি যে তুমি ছিলে পৈশাচিক মানবসন্তান! অতএব জেনে নাওঃ আমি তোমাকে ডুবে মরতে আজ্ঞা করছি।'

জর্জের মনে হল কে যেন তাকে জোর করে তাড়িয়ে দিলে ঘর থেকে। পালাতে থাকে সে। তার কানে তখনও ভেসে আসে বিছানার উপর তার বাবার পড়ে যাওয়ার মড়মড় শব্দ। সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে গেল জর্জ। মনে হল, সিঁড়ি নেই যেন, ঢালু জমি নেমে গেছে নিচে। ঠিকা-ঝি আসছিল সকালে ঘর পরিষ্কার করতে। ধাক্কা লাগল তার সঙ্গে। 'যিশু!' চেঁচিয়ে উঠে অ্যাপ্রন দিয়ে মুখ ঢাকে ঝি। ততক্ষণে চলে গেছে জর্জ। সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে, পার হয়ে গেছে রাস্তা, ছুটছে জলের দিকে। ইতিমধ্যেই শক্ত মুঠোয় সে রেলিং-গুলো ধরেছে, উপোসী লোক যেমন করে চেপে ধরে খাবার। তারপর রেলিং ধরে পাক খেয়ে গেল অপরদিকে পাকা খেলোয়াড়ের মতো। যৌবনে সে ছিল নাম-জাদা খেলোয়াড়, তার বাপ-মায়ের গর্ব। মুঠো আলগা হয়ে আসছে তবু ধরে আছে সে, কিন্তু রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে যখন দেখল একটা বাস আসছে, যার আওয়াজে তার ছিটকে পড়ার শব্দ চাপা পড়ে যাবে, তখন মৃদুকণ্ঠে বললে সে, 'বাবা, মা,—তবু চিরকাল আমি তোমাদেরই ভালবেসেছি।'

হাতের মুঠো খুলে দিল জর্জ।

ঠিক সেই মুহূর্তে ব্রিজের উপর দিয়ে বয়ে যায় যানবাহনের অফুরন্ত স্রোত।

অনুবাদঃ সুনীলকান্তি মুখোপাধ্যায়

৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৪—(রংপুর জেল), বরিশাল জেল হইতে চলিয়া আসার দিন বিদায়-সভায় করিম যে কথাগুলি বলিল এবং বেলায়েতের করিম ও সুধীরের প্রতি যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা দেখিয়াছি, যে যোগাযোগ দেখিয়াছি, তাহাতে পরশুর পত্রখানা (বেলায়েতের) revealing।

...বেলায়েতের যে বেদনাদায়ক অনুভূতি তার কোনও প্রতিকার করিতে পারিতেছি না। আমার উপরে, হবিবুল্লা প্রভৃতির উপরও শ্রদ্ধা ছিল। আজ ভীরু অবিশ্বাস ওকে আক্রমণ করিয়াছে। তথাকথিত বন্ধু ও দলীয় লোকদের কতগুলি বিষয়ের পরিচয়ও পাইল এবং তাহার পরীক্ষা হইল। যদি সকলেরই এই অনুভূতি হয়, তাহা হইলে তো ভয়ানক। ইহাদের জেলের অভিজ্ঞতাটা বাহিরে বেশ কাজের হইবে। করিম, প্রাণকুমারবাবু প্রভৃতি কেন এই সবের সলিউশন দিতে পারিতেছেন না? ......আমার চলিয়া আসা ভাল হইয়াছে। ওরা নিজেরা ঠেকিয়া শিখুক।......

কাল (৮ই) হইতে নিমপাতার রস খাওয়া শুরু করিলাম।

১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—কাল সকালে ডাঃ মাখন ঘোষ মুক্ত হইলেন। পরশু রাজসাহী হইতে গাইবাধার মোতিয়ার রহমান আসিল। গাইবাধার একজন ছাত্র-নেতা গ্রেপ্তার হইয়া আসিল।

১৩ পাউণ্ড ওজন কমিয়া যাওয়ার জন্য মেডিকেল অফিসার আজ চার ছটাক দুধ ও একটা ডিম মঞ্জুর করিলেন।

২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৪, (রংপুর জেল)—আজ সকালে জেলর সাহেব জানাইলেন আই জি'র "decision to segregate me"......

আজ হবিবর রহমান (এম এল এ) সাহেব রাজসাহী গেলেন। আজ দিল্লী হইতে Fellowship of Truth-এর কনফারেন্সের পত্র পাইলাম। মিটিং হইয়া গিয়াছে।

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৪, (রংপুর জেল) সুনীলবাবু আজ ইনটারভিউ নিলেন। D. I. O. I supervise করিলেন। প্রথমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইনটারভিউ নামঞ্জুর করিয়াছিলেন। কেরাণীর কাছে শুনিয়াছিলেন যে, আত্মীয় ছাড়া ইনটারভিউ হয় না। নিয়মটা বলিলাম। আত্মীয় ছাড়া দেওয়া হইবে না এমন কোনও কথা নাই।

দমদমের কবিরাজের নিকট হইতে এবং স্থানীয় কবিরাজদের কাছ হইতে কতগুলি instruction লওয়ার জন্য বলিলাম। এবার আমার চিঠি ও প্রাণকুমার সেনের তার সহ representation দেওয়াতে মঞ্জুর হইল।

সিগ্রিগেশন ইত্যাদি সম্বন্ধে জেলর সাহেব বলিয়াছিলেন—"I leave it to you"। আজ বেড়াইবার সময় দেখা হয় নাই। মনে হইল ইচ্ছা করিয়াই দেখা করেন নাই। (পরের ঘটনা হইতে এটা এক রকম Confirmed হয়) C. H. W. বলিল পরে জেলর সাহেব আমাকে খুঁজিয়াছিলেন।

ফিরিয়া আসিয়া আমি জেলর সাহেবকে পত্র দিলাম—Thought over the matter. "It requires to be discussed and decided"। এর পর C. H. W. আসিয়া অনেক কথা বলিল। আমি সিগ্রিগেশন-এর পুরা ইতিহাসটা তাহাকে বলিলাম। তাহার পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া একটা কথা বলিতে লাগিলেন—বেড়াইতে যাইবার সময় আমি যেন তাহাকে খবর দিই, একজন ওয়ার্ডার আমাকে বেড়াইতে লইয়া যাইবে। বৈকালে খবর দিলাম। C. H. W. আসিয়া লইয়া গেল, কিন্তু পিছন হইতে এরা বলিল, আমি যেন এই রাস্তাতে যাই। আমি বলিলাম, "এ-সব জেলর সাহেবের সঙ্গে আলাপ হবে—আর এ রাস্তায় কেন যাওয়া হবে? সদর রাস্তাতেই যাওয়া......" ইত্যাদি।

C. H. W.-র বৈকালের প্রস্তাব এবং আচরণ হইতে মনে হইল জেলর সাহেবের উপদেশ মতই এই সব করিতেছে।......

জেলর সাহেবের পক্ষে এ খুব অন্যায়।" "I leave it to you" প্রস্তাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ inconsistent—খুব dishonorable। কি develop করে কে জানে?

২৬শে সেপ্টেম্বর (রংপুর জেল)—পরদিন (২৩শে) সকালে একজন ওয়ার্ডার আসিল বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য। গেলাম না। জেলর সাহেব আসিলেন—তাঁহার সহিত একান্তে আলাপ হইল। বলিলাম, মনটা বিরক্ত হইয়াছে এই দুই-দিনের ইতিহাসে। "I leave it to you" বলিয়া আবার C. H. W.-র মারফত এইভাবে ডিসিশন চালানোর চেষ্টা, ইহা অন্যায়। অনেক আলোচনা হইল। স্থির হইল সাবেক জায়গায় বেড়ানো এবং সদর রাস্তায়ও যাওয়া হইবে। তাই চালাইতেছি।

২রা অক্টোবর ১৯৫৪, (রংপুর জেল)—যখন যেখানে থাকা, সেখানকার মত কাজ সবটা যদি নিষ্ঠা ও কর্মযোগের নীতি অনুসারে করা যায়, সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে করা যায়, চেষ্টা হইলে এই টেকনিকটা আয়ত্ত হয়। তখন এটা স্বভাবে পরিণত হয়, সহজে ছোটবড় সব কাজের সব সমস্যায় স্বাভাবিকভাবে বিনা আয়াসে এই টেকনিক অনুসরণ করা সম্ভব। কাজের এ কথা ভাবিয়াছি—পারা গেল না। Try, try, try again; Better something than nothing—
এবারে না হয় পরের বারে (!).....

৫ই অক্টোবর ১৯৫৪, (রংপুর জেল)—গত শনিবার জেলার সাহেবের কাছে চিঠি দিই। চিঠির বিষয় ছিল, দুর্গা পূজা উপলক্ষে তিন নম্বর ওয়ার্ডের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য, টি বি ওয়ার্ড হইতে আমার উত্তরের বারান্দায় জল পড়া সম্বন্ধে। কোনও জবাব পাওয়া গেল না। রবিবারে কড়া চিঠি দিলাম ঐ দুই বিষয় সম্বন্ধেই। জল পড়াতে আমার (স্বাস্থ্যের দিক হইতে) যে grave and great risk এবং তার দায়িত্ব সম্বন্ধে এবং দুর্গাপূজা সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা না করার জন্য অনুযোগ করিয়া। উভয় ব্যাপারেই দিতে না পারিলে সুপারিন্টেন্ডেন্ট এর কাছে যাওয়া উচিত, অথবা সুপারের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা উচিত। চিঠিতে ছিল—I am tired of mismanagement of our officers here" আর "You are not exercising your responsibility etc"। অফিসে ডাকাইলেন। অনেক কথা হইল।.....অফিস ম্যানেজমেন্ট ডিসিপ্লিন, সাপ্লাই ইত্যাদি কর্তৃত্ব বিষয়ে মারাত্মক ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বলিলাম। জল পড়া সম্বন্ধে

তিনি কি স্টেপ নিয়াছেন বলিলেন। 'পূজো সম্বন্ধে বলিলেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রাজী নন, তবে সোমবার তিনি আলাপের ব্যবস্থা করিবেন।

সোমবার সুপার আসিলেন। এই প্রথম তাঁহার সহিত কোনও বিষয় নিয়া আলোচনা হইল।......

জেলর সাহেব পরে অফিসে ডাকাইলেন। বলিলেন, সপ্তমী ও দশমীতে আমরা 'পূজো উপলক্ষে মিলিব। ধীরেনকে ডাকানো হইল—details স্থির হইল।

আজ সকালে বিকালে চা এবং দুপুরে একত্র খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। দুপুরে খাওয়ার আয়োজনে দেরি হওয়ায় হাস-পাতালে আমার ঘরে আনাইয়া খাই।

প্রথম দিন যখন জেলর সাহেবকে চিঠি দিই তখন ভাবিতেছিলাম:—আমার কাজ আমি করিয়া যাই, তিনি না করিলে না করিবেন; ইহার মধ্যে রাগদ্বেষের কোনও স্থান নাই। কিন্তু কাজে দেখিলাম সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। ভয়ানক ক্রোধ ও অপমান হইল,...তখন তখন প্রকাশ হইলে explosive হইত.....immediate occasion হইল না, সুতরাং কণ্ট্রোল করিতে সুবিধা হইল। মনেও স্থির করিয়াছিলাম শান্তিতে নিষ্পত্তি চাই। একদিন বিলম্ব হওয়ায় মন শান্ত হইল। নিষ্পত্তিটাও শান্তিপূর্ণ হইল, অন্তত রাগারাগি হইল না। কিন্তু বলবার, আত্মপ্রত্যয়ে থাকিলে, bold aggresive ও হয় নাই। জেলর সাহেবের সঙ্গে আলোচনা সাধারণ স্ট্যাণ্ডার্ডের হইয়াছে ....সুপারের সঙ্গে আলোচনা তার চেয়ে উচ্চস্তরের হইয়াছে। অহিংসার স্ট্যাণ্ডার্ডের দিক হইতে আরও ভাল হওয়া উচিত ছিল।

বিসর্জনের দিনও সকলের দেখা সাক্ষাৎ করার কথা আছে।

৭ই অক্টোবর ১৯৫৪, (রংপুর জেল)—আজ সকালে উপনিষদের ঈশাবাস্য পাঠের পর হইতে কত চিন্তা মনে আসিতেছিল। বার বার মনে হইতেছিল—যেমন হইয়াছে মাঝে মাঝে পূর্বেও—ঈশাবাস্যের যে আদর্শ, গীতার যে আদর্শ, তদনুযায়ী জীবন যাপন—বিশেষ করিয়া কর্মীর পক্ষে—কি সুন্দর, মহান্, বিরাট, সার্থক। বিবেকানন্দের কতগুলি নাম করা সোহহং গানের পদও মনে আসিল। অনেক দিন পর্যন্ত যে গান্ধীবাদের কথা ভাবি, উপনিষদের আদর্শে সেটা সুন্দরভাবে পালিত হইতে পারে।......পরে পড়িলাম গীতার একাদশ অধ্যায়। অথচ মনে দুইটা বিরোধী চিন্তাও চলিতেছিল—(১) স্বধর্ম-পরধর্মের; (২) স্থানীয় কতকগুলি irritating affairs, জেলর প্রভৃতির সঙ্গে।

বেড়াইতে যাইবার সময় ব্যবস্থা-বন্দোবস্তের ত্রুটিতে খুব বিরক্ত বোধ করিলাম। ক্রুদ্ধভাবে সেটা প্রকাশও করিলাম। মনে যাহা স্থির করি কার্যত করিয়া ওঠা কত শক্ত। ভাবি জেলে বসিয়া অভ্যাস করিব, কিন্তু পদে পদে পদস্খলন। ষোল আনা ফেল নয়। এই চিন্তাধারা দ্বারা খুব উপকৃত হইতেছি। যখনই এই চিন্তানুযায়ী কোনও সমাধান বা কর্মপদ্ধতি প্রবর্তিত করিতে পারিতেছি তখনই হাতে হাতে ফল পাইতেছি। ষোল আনা হয় না—ষোল আনা প্র্যাকটিস করিতে পারিতেছি না। যতদূর পারিতেছি তার চেয়ে বেশী ফল পাইতেছি।

সহ অবস্থানের জন্য, সমবায়ের জন্য, সংঘর্ষ (রাষ্ট্রিক ও সাবরাষ্ট্রিক) দূর করিবার অতি-বাস্তব প্রয়োজনে দরকার ভ্রাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত এক বিশ্বজনীন মানব সমাজ। সংঘর্ষের ফল বিষময় হইবে, আত্মঘাতী হইবে। উহা প্রগতির পথের কাঁটা।

সুতরাং এক জাগ্রত ধর্মের সূত্রে গাঁথা বিশ্বজনীন এক ভ্রাতৃসমাজ প্রতিষ্ঠার আইডিয়া আছে, অথবা এক বিশ্ব এক সমাজ, ইণ্টারন্যাশনাল গভর্নমেণ্ট ইত্যাদির কথা যে ভাবে, তাহার সদাসর্বদা আদর্শটা চোখের সামনে রাখা উচিত এবং সমস্ত ক্ষেত্রে রাজনীতিক, সামাজিক, অর্থনীতিক—সকল কাজ তদনুসারে করা উচিত।

৯ই অক্টোবর ১৯৫৪, (রংপুর জেল)—কাল সকালে সেল-এ একজন কয়েদী মারা গেল। এই লোকটিকে পূর্বদিন সকাল ১১।১২টার সময় সেল-এ আনিতে আমি দেখিয়াছি। জোর করিয়া (forcibly) আনিতেছিল—C. H. W. অন্য একজন হেড ওয়ার্ড, দু'একজন ওয়ার্ডার এবং দু' একজন কয়েদী ছিল। সেল-এর দরজায় লোকটা সেল-এ না ঢোকার জন্য দরজা ধরিয়া বাধা দিতে লাগিল, কিন্তু সুপিরিয়র ফোর্স-এর কাছে পরাস্ত হইয়া গেল। কাল সকালে যখন

অজ্ঞানের মতো হইয়া পড়িল, সি এইচ ডব্লিউ ও আরও অনেকে আসিল, ডাক্তার সাহেবকে খবর দিল, ইনজেকশন দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ পরে লোকটা মারা গেল। এস এ এস-এর সঙ্গে তৎক্ষণাৎ দেখা করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, লোকটি কী ধরনের পেশেণ্ট ছিল। পাগল হিসাবে কি সেল-এ রাখা হইয়াছিল? এস এ এস বলিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত তাঁহাকে কেহ রিপোর্ট দেয় নাই। জেলরসাহেব, ডেপুটি জেলরসাহেব প্রভৃতি মৃত্যুর পরে সেল-এ দেখিতে আসিয়া তাঁহার অনুরোধে সেল হইতে ফেরার পথে তাঁহার ওখানে যান। আমি পূর্বদিন যা দেখিয়াছিলাম বলিলাম। পূর্বদিন তাহার উপর যে পীড়ন করা হইয়াছে, তাহার কথাই বলিলাম। সুতরাং পীড়নের ফলেই মৃত্যু কি না এটা তাঁহার দেখা দরকার। কাল বৈকালে কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে খবর পাইলাম যে, দুইজন লোক পূর্বদিন সন্ধ্যায় সেল বন্ধ করিবার সময় উহাকে খুব, মারিয়াছে।

আজ সকালে জেলর সাহেবকে এইজন্য স্লিপ দিলাম। ডেপুটি জেলর আসিলে তাঁহাকে সব বলিলাম। ইহাও বলিলাম যে, কেসটা বোধ হয় পুলিসে দেওয়া দরকার, পোস্ট-মরটেম করাও প্রয়োজন। গোটা বারোর সময় জেলর সাহেব আসিলেন। তাঁহাকেও সব বলিলাম।

১০ই অক্টোবর ১৯৫৪, (রংপুর জেল)—সেদিন সেল-এ একটা মরিল। আমরা যে সংবাদ পাইয়াছি, তাহা যদি সত্য হয় (আমার মনে কোনও সংশয় নাই সে বিষয়ে) তাহা হইলে ইহার ভিতর দিয়া জাতির বর্তমান অবস্থার অনেকটা দিক বোঝা যাইতেছে। যাহারা মারিল, যে ওয়ার্ডারের সামনে জিনিসটা হইল, যাহারা দেখিয়াও সাক্ষী দিতে সাহসী হইতেছে না; অফিসারদের কর্তব্যে অবহেলা, মিথ্যা রিপোর্ট; অফিসার ও কয়েদীদের মধ্যে যাহারা স্বার্থের খাতিরে, ভয়ে বা সুবিধা-লাভের আশায় অফিসের ন্যায়-অন্যায় সব কাজেই সমর্থন করে ইহাদের সকলের আচরণ হইতে বোঝা যায় জাতির অবস্থা।

কয়েদীদের যদি সেই সৎসাহস থাকিত, তাহা হইলে তাহারা তাহাদের ডাএট, ডিভিশন, কাজকর্ম, চিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে যে ব্যবস্থা আছে, তাহার পরিবর্তন করিয়া অনেক উন্নতি করিতে পারিত। যে দুর্ঘটনাটা ঘটিয়া গেল, এমন আরও অনেক ঘটিবে, যদি এই দুর্বলতা তাহাদের থাকে। শুধু জেলের ভিতরে নয়; বাহিরেও তাহাদের এই দুর্বলতা। ইহারা এখনও দুর্বল, তাই ভিতরে বাহিরে অনেক অন্যায় তাহাদের মাথা পাতিয়া সহ্য করিতে হয় এবং যে পর্যন্ত

মন হইতে দুর্বলতা দূর না হইবে, ততদিন সহ্য করিতে হইবে।

এমন একটা কোনও স্টেপ দেওয়া যায় না, যাহাতে এই ধরনের জিনিস চিরতরে বন্ধ হয়। ধাপে ধাপে, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। এই বিষয়ে শেষ স্টেজে (যদি ব্যাপারটা প্রমাণিত হইয়া যথাবিহিত সরকারী প্রতিকার না হয় তাহা হইলে) আমার হয়তো একটা বিবৃতি দিতে হইবে—তাহাতে জিনিসটা সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করিয়া নিজের ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, কনস্ট্রাকটিভলী।

২০শে অক্টোবর, ১৯৫৪, (রংপুর জেল)—দুই তিনদিন ধরিয়া জেলর সাহেবের সহিত সেল-এর মৃত্যু ঘটনা লইয়া তিক্ততার সৃষ্টি হইতেছে। কাল তিনি বলিলেন, "আমি আর আপনার সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিতে চাই না। আমি জেনারেল ওপেন এনকোয়ারী করিতে পারি না, আপনাকেও কয়েদীদের মধ্যে গিয়া এনকোয়ারী করিতে দিতে পারি না। আমি গোপন এনকোয়ারীতে স্যাটিসফায়েড, কোনও ভায়োলেন্স হয় নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

অন্যান্য কথার মধ্যে আমি বলিলাম, "শুধু ন্যায় বিচার করাই যথেষ্ট নয়, ন্যায় বিচার যে হইয়াছে, সকলেরই সেটা বোঝা দরকার। কিন্তু কয়েদীদের মধ্যে অনেকের বদ্ধমূলে ধারণা যে, শারীরিক উৎপীড়ন হইয়াছে। গোপনে ভয়প্রদর্শন চলিতেছে। যাহারা ব্যাপারটা দেখিয়াছে, তাহারাও কিছু বলিতে সাহস পাইতেছে না। পুরা তদন্ত যদি না হয়, তাহা হইলে সত্য বাহির হইবে না। সেক্ষেত্রে আমার হয়তো সাম কোর্স অব সাফারিং লইতে হইতে পারে।" জেলরসাহেব বলিলেন, "তাহা হইলে এটা জেল পরিচালনায় অনধিকার হস্তক্ষেপ হিসাবে আমরা গ্রহণ করিব এবং তদনুযায়ী কার্য করিব।"

আমি বলিলাম, "আপনারা যাহা ভাল বোঝেন, আপনাদের যাহা কর্তব্য, আপনারা করিবেন। আমার কর্তব্য আমি বুঝিব।" এক সময়ে জেলরসাহেব বলিলেন, "আপনি সুপারিন্টেন্ডেণ্টকে সব বলিতে পারেন।"

আমার কথা এই যে, (১) লোকে যেন বুঝিতে পারে যে, ন্যায়বিচার হইয়াছে; (২) কাপুরুষতা, ভীরুতা, দুর্বলতা যাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়া আছে, তাহাদের উৎপীড়ন করিয়া, ভয় দেখাইয়া, আরও কাপুরুষ করিয়া তোলা দেশের ক্ষতি, জাতির ক্ষতি; (৩) আমি দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি কামনা করি না—আমি চাই তাহাদের মনের পরিবর্তন, অফিসাররা তাঁহাদের কর্তব্য করুন, যাহা তাঁহারা করেন নাই।

এর পর সি এইচ ডব্লু আসিল। দুঃখ করিয়া বহু কথা বলিল। বলিল, "আপনি বলিয়াছেন আমি মারিয়াছি।" খুব করুণভাবে তাহার অতীতের লম্বা ইতিহাস দিল...বলিলাম, আমার উদ্দেশ্য শাস্তি নয়, মনোভাব পরিবর্তন এবং অফিসাররা যথাযথ তাঁহাদের কর্তব্য করেন—কয়েদীদের মধ্য হইতে ত্রাসের ভাবটা দূর হয়। সে আশ্বাস দিয়া অনেক খুঁটিনাটি উল্লেখ করিয়া বলিল যে, অফিসারদের আচরণের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে।

কাল মেডিকেল অফিসার আসিলেন। বুক ইত্যাদি পরীক্ষা করিলেন। অনেক আলাপ হইল। তাহার পর আমি বলিলাম কতগুলি বিষয় লইয়া আলাপ করিবার আছে সময় লাগিবে। কিন্তু কাল খুব দেরিতে তিনি আসায় এবং আমারও খাবার সময় হওয়ায় অন্য একদিনের কথা বলিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আলাপটা অফিসে হইতে পারে কিনা। আমি বলিলাম আপত্তি নাই।

সত্য ও অহিংসার পথ, সর্বোদয়ের পথ কি? "অপেন নয় সুপথারামে।" সুপথ কি? সর্বোদয়ের পথ কি?

সে পথ কী, যাহাতে আমার যাহা লক্ষ্য তাহা লাভ হয়?

যাহাতে কয়েদীদেরও কল্যাণ হয়, অফিসাররাও আপন হয়—তাঁহাদের যদি কোনও ত্রুটি থাকে তা এমনভাবে শোধরাইবার চেষ্টা করিতে হইবে যে, তাহারা তাহাতে আনন্দিত হইবে। তাহারা দেখিবে আমি তাহাদের শত্রু নই—মিত্র। তাহাদের কিছু ত্রুটি ছিল, অফিসারদের কার্যের সংশোধন হওয়া দরকার ছিল—অসন্তোষের সৃষ্টি না করিয়া, কাহারও কোন ক্ষতি না করিয়া,

বন্ধুভাবে দোষের সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত।

কাল সকালে যখন বেড়াইতে যাই জেলরসাহেবের সহিত দেখা হইল। কোনও কথা হইল না, সেরেফ নমস্কার আদানপ্রদান। লক্ষ্য করিলাম, পূর্বদিনের উত্তাপ পুরোপুরিই বিদ্যমান। এতদিন পর্যন্ত প্রায় প্রত্যহ দেখা হইয়া আসিতেছে এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত নানা আলাপ হয়। এই প্রথম এইভাবে সাক্ষাৎ ও বিদায় গ্রহণ হইল।

কাল বেলা আন্দাজ বারটার সময় হঠাৎ দেখিলাম সাধারণ পোষাকে জেলরসাহেব ফাইল-এ উপস্থিত। পরে কেস-টেবিলে বসিয়া অনেক কয়েদী—ইউ টি, কনভিক্ট, এস পি (নন্-পলিটিক্যাল)—ডাকিয়া সাক্ষ্য লইলেন সেল-এর মৃত্যু-ঘটনা সম্বন্ধে। সি এইচ ডবলিউ এবং অন্যান্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে মারের নাকি ভাল সাক্ষ্য হইয়াছে। পুরাপুরি এবং পক্ষপাতশূন্যে হইয়াছে বলিয়া খবর পাইলাম না। যদি হইত, আরও অনেক কিছু সত্য ঘটনা বাহির হইত মনে হয়। অনিচ্ছায় নেওয়া—নিতে হইল (যে কোনও কারণেই হউক) বলিয়া নেওয়া।

আজ কয়েকজনের কাছে শুনিলাম হেড ওয়ার্ডার এবং অন্য ওয়ার্ডাররা খুব সংযত হইয়াছে। বুঝিয়া-সুঝিয়া কয়েদীদের সহিত ব্যবহার করিতেছে, মারধর করে নাই। একজন হেড ওয়ার্ডার নাকি বলিয়াছে যে, সি এইচ ডবলিউ'র চাকরি যাইবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সাক্ষ্য নেওয়াতে এবং প্রমাণ হওয়াতে আমি যে অবস্থা উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখিয়াছিলাম—যাহার জন্য হয়তো আমাকে একটা কোর্স অব সাফারিং নিতে হইবে এবং জেলরসাহেব যাহাতে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা তাহা হইলে শাসনকার্যে অনধিকার হস্তক্ষেপ হিসাবে জিনিসটা গ্রহণ করিবেন—তাহা দূর হইল। নূতন একটা অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন। কয়েদীদের মধ্যে বেশ একটা নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। এখন বহু লোক সাক্ষ্য দিবার জন্য যাচিয়া আসিতেছে। প্রথমের জড়তা ও ভীরুতা কাটিয়া গিয়াছে। তিন নম্বরের বন্ধুদের (যাহারা ব্যাপারটা দেখিয়াছিল এবং প্রথমে খুব উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিল) আচরণ খুব নিরাশ করিয়াছে।

একেবারে হোপলেস সিচুয়েশন ছিল—দারুণ ভীতি—তথাপি কি করিয়া এইরূপে অঘটন ঘটিল? কোনও সহকারী নাই, সাহায্য করিবার কেহ নাই। অন্যের উপর নির্ভর করার রুগ্নিক, শোচনীয় স্বভাব আমার। এতৎসত্ত্বেও কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল? অবস্থায় পড়িলে বাঁচার তাগিদে, অন্তর্নিহিত শক্তি জাগিয়া উঠে, বৃত্তিসমূহ প্রয়োজনমত বিকশিত হয়, তাই কি? প্রথম প্রথম আমার যে স্বভাব ছিল তাহার যে পরিবর্তন করিয়াছি, তাহাতেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। এই পরিবর্তনটা না করিলে ইহা মোটেই সম্ভব হইত না। এই দিকে আরও উন্নতি করিতে হইবে এবং ভাবিতে হইবে।

আজ সকালে জেলরসাহেব পূর্বের চেয়েও বেশী আগ্রহ, দরদ ও আত্মীয়তার সংগে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার সাংসারিক বিপদআপদ, অসুখবিসুখ ইত্যাদি সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক আলাপ করিলেন। কাল এবং পরশুর ব্যবহারের সংগে কি ব্যবধান—কি পরিবর্তন! কালকের সাক্ষ্যের ফল বোধ হয়। আমার কথা যে কতখানি সত্য, তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহার ভ্রান্ত ধারণার এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া যে ব্যবহার, তাহারই প্রতিক্রিয়া। অন্য সব আলাপের পর বলিলেন যে, তিনি ডি আই ও নং ১-কে আমার মেডিকেল গাছগাছড়াগুলির কথা বলিয়াছেন। (ক্রমশ)
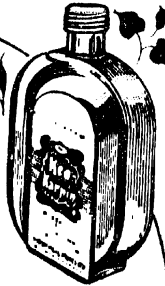
বাঘা যতীন প্রসঙ্গে

ডাঃ সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

"দেশ" পত্রিকার ২০ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় বাঘা যতীন্দ্রনাথের শেষ কয়েক ঘণ্টা প্রকাশিত হইবার পর আমি বহু পরিচিত ও অপরিচিত ভদ্রমহোদয়ের পত্র পাইয়াছি। যতীন্দ্রনাথের মর্যাদা হানিকর আমি যে কিছু লিখিয়াছি তাহার ইঙ্গিত পর্যন্ত কেহ দেন নাই।

১।১১ তারিখে দেশ পত্রিকায় অ্যাডভোকেট উপেন্দ্রনাথ ঘোষের যে সমালোচনা বাহির হইয়াছে, তাহা পড়িয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। বিস্মিত হইয়াছি এই জন্য যে, সেই বীর পুরুষের শেষ কয়েক ঘণ্টায় তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার অতুলনীয় চরিত্রে যে বিভিন্ন ভাবের সমন্বয় ও অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখিয়াছিলাম তাহারই প্রকৃত ও সত্য বিবরণ প্রকাশ করিয়া আমি বীর পূজা করিয়াছিলাম। সমালোচক তাহা উপলব্ধি না করিয়া কতকগুলি অবান্তর বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আমার বীর পূজাকে মলিন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

সত্যবাক যতীন্দ্রনাথ হাসপাতালে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তাহাই ছিল আমার বিবরণের উপাদান। সমালোচক সেগুলির উপর বিশেষ আস্থা না দেখাইয়া ট্রাইব্যুনাল এ বালেশ্বর কেস কিভাবে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল, সেখানে কোন কোন সাক্ষী কি বলিয়াছিল তাহারই উল্লেখ করিয়া আমি যাহা বলি নাই তাহাই আমার লেখার মধ্যে অনুপ্রবেশ করাইয়া, আমার অনেক কথা সুবিধামত উহ্য রাখিয়া আমার লিখনের একটি বিকৃত রূপ দিয়াছেন। আমি যতীন্দ্রনাথের মর্যাদা ক্ষুন্ন করিয়াছি কি না এই সংশয় উপস্থিত করিয়া আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি তাহা নিরসনের জন্য যেন উচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করি।

সেই ব্যবস্থা করিবার জন্য আমি তাঁহার বক্তব্যকে ধারাবাহিকভাবে সাজাইয়া লইতেছি যাহাতে পাঠকদের বুঝিবার ও আমার উত্তর দিবার সুবিধা হয়।

সমালোচকের নিজের যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনও ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল না। হাসপাতালে তিনি কি অবস্থায় আসিয়াছিলেন ও সেখানে তাঁহার কিরূপ চিকিৎসা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কোনও ব্যক্তিগত জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও, পরের মুখের বিবরণ শুনিয়া ও তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া আমার মূল প্রবন্ধের যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার উত্তর প্রথমে দিব।

মনোরঞ্জন ও নীরেনের পক্ষ সমর্থনকারী ব্যবহারজীবী হিসাবে বালেশ্বরে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তৎসম্বন্ধে তাহার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের নিকট হইতে, আগত সাক্ষীদের মুখ হইতে মনোরঞ্জন ও নীরেনের নিকট হইতে বাচনিক প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিবার সুযোগে যাহা তিনি বলিয়াছেন তাহার উত্তর দ্বিতীয় স্তরে দিব।

প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, যাঁহার নিকট হইতে আমি বিবরণ শুনিয়াছিলাম, তিনি একজন সাধারণ মনুষ্য ছিলেন না। দৈহিক বল ও মানসিক বল তাঁহার ছিল অসীম। তিনি ছিলেন একজন বীর, মাতৃভূমি উদ্ধারের জন্য নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া "জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য" করিয়া জীবনের জয়গান গাহিয়া গিয়াছেন। তিনি কোন্ পার্থিব লোভে বা মোহে অপ্রকৃত কথা বলিয়া যাইবেন? শেষ পর্যন্ত তাঁহার ধী-শক্তি ছিল প্রবল, প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্যদের প্রতি সজাগ স্নেহ দৃষ্টি ছিল অপ্রতিহত, সর্বদায়িত্ব নিজ স্কন্ধে লইয়া শেষ পর্যন্ত তাহাদের নিরপরাধ বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশায় মাতৃভূমির উদ্ধার সাধন হইল না বলিয়া চোখের জল ফেলিয়া গিয়াছেন, আর মাতৃভূমি উদ্ধার হইবে এই ভবিষ্যৎ বাণী সদম্ভে করিয়া গিয়াছেন। এমন বীর পুরুষের অনৃত ভাষণ করিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি ৪৩ বৎসর পরে অপ্রকৃত বিবরণ কোন মোহে দিব? আমার কামনা ছিল, শেষ সময়ে হাসপাতালে কি ঘটিয়াছিল, তিনি কি বলিয়াছিলেন যাহা আজ পর্যন্ত জনসাধারণের কাছে অজ্ঞাত রহিয়াছে, তাহারই বিবরণ সকলকে জানাইয়া মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের পূজা করিব! ইহার মধ্যে আমার ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থই থাকিতে পারে না।

যতদূর জানা আছে মনোরঞ্জন ও নীরেন তাহাদের পক্ষ সমর্থন করে নাই। তাঁহাদের জন্য ব্যবহারজীবী ছিলেন—কিন্তু defence সাক্ষী কেহই ছিল না বলিয়াই জানা আছে। সাক্ষী যাহা ছিল সবই প্রোসিকিউশনের সাক্ষী এই সাক্ষীদের ও তাহাদের সাক্ষ্যের কথা পরে আসিবে। এখন মূল প্রবন্ধের সমালোচনার উত্তরে আসা যাউক। হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা, যতীন্দ্রনাথের অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে সমালোচক যাহা বলিয়াছেন তাহাকে তাঁহার পর্বত-সমান ভুল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! তিনি বলিয়াছেন "তখন হাসপাতালে মাত্র একজন ডাক্তার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন গাঙ্গুলি। তিনি নিশ্চয় যতীন মুখার্জি ও যতীশ পালকে লইয়া বিশেষভাবে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহাদের সহিত যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা ডাক্তার বা আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নিশ্চয় হয় নাই।"

ইহার উত্তরে আমি বলিব ইহা সম্পূর্ণ ভুল! তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ও উপদেশ দিবার জন্য ছিলেন খান বাহাদুর দাওদার রহমান। আর ছিলেন লেডি ডাক্তার মিসেস শুভমণি অধিকারী, কমপাউণ্ডার গোকুল রায় ও চিন্তামণিবাবু। চারিজন প্রৌঢ় অভিজ্ঞা নার্স শ্রীমতী এলিজাবেথ শ্রীমতী শংকরী শ্রীমতী নীলমণি ও শ্রীমতী কিরণ। ওয়ার্ড কুলি—বিশু পানু ও প্রসাদ এবং দুইজন মেথর।

ইহারা সকলেই প্রাণপণে খাটিয়াছিলেন, তাহা কিলবি সাহেব পর্যন্ত স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন।

খান বাহাদুর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সংবাদ পাইয়া হাসপাতালে আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন প্রবীণ, বিজ্ঞ ও ধীর চিকিৎসক।

সার্জারিতেও তাঁহার সুনাম ছিল। শুধু চিকিৎসা ব্যাপারে না সর্ববিষয়ে আমাদের সুপরিচালিত করিয়াছিলেন। আজ আবার কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের স্মরণ করিতেছি।

খাঁ বাহাদুরের দৈব দুর্ঘটনায় ৩০।৯।১৫ আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় তিনি ট্রাইব্যুনাল-এ সাক্ষ্য দিতে পারেন নাই। তাঁহার রিপোর্টস খান-বাহাদুরদের রিপোর্টস জজ সাহেবের অনুমতি অনুসারে কোর্টে আমি পড়িয়াছিলাম।

যতীশের অবস্থা সাংঘাতিক ছিল না, তবে Gun shot wound ছিল। গুলি দেহ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। রক্ত-মোক্ষণ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। স্যালাইন ইনজেকশন ও অন্যান্য চিকিৎসায় তিনি সুস্থির হইয়াছিলেন। একজন অভিজ্ঞ নার্সের জিম্মায় তাঁহাকে মিলিটারী গার্ড-এর হেফাজতে একক ঘরে রাখা হইয়াছিল।

যতীন্দ্রনাথের আঘাত সাংঘাতিক ছিল। রক্তমোক্ষণও হইয়াছিল, কিন্তু এত প্রচুর হয় নাই যাহাতে তাঁহার অপারেশন না করা চলে। তেমন রক্ত হীনতা হইলে সিভিল সার্জন কখনও অস্ত্রোপচার করিতেন না। হাসপাতালে যখন তিনি আসেন, তখন তিনি গুলির ক্ষত যন্ত্রণায় ও শক-এ কষ্ট পাইতেছিলেন। Reversed peristalsis-এর জন্য তাঁহার বমি হইতেছিল তাহার কারণও shock। Dripsaline ও অন্যান্য ইনজেকশন চলিতেছিল। তিনি তাহার মধ্যেই একটু সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। রক্ত বন্ধ হইয়া যাওয়ায় ও অবস্থা উহারই মধ্যে একটু ভাল হওয়ায় অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল। কথা তিনি বরাবরই কহিতে পারিতেছিলেন, তবে অনর্গল নয়, কখনও ধীরে ধীরে কখনও বা একটু দ্রুত; কখনও থামিয়া থামিয়া। নিদ্রার চেষ্টা মাঝে মাঝে হইতেছিল। কখনও বা একটু ঘুমাইয়া পড়িতেছিল—১০।১৫ মিনিটের জন্য। Per rectum Peptonised milk, Brandy. ইত্যাদি চলিতেছিল। শেষের দিকে আর রক্তপাত ছিল না। যত কথা তিনি বলিয়াছিলেন তাহা এমন কিছু বেশী নয় সর্বসাকুল্যে হয়ত আধ ঘণ্টাও লাগে না। যাহারা আশঙ্কা করিয়াছেন এত দীর্ঘ বিবরণ ও উপযাচক হইয়া কথা বলিবার শক্তি তাঁহার ছিল, না তাহারা আশ্বস্ত হউন, তাঁহারা পরের মুখের কথা শুনিয়া ভুল বুঝিয়াছেন। সমালোচক যদি স্বয়ং এই সময়ে উপস্থিত থাকিতেন যতীন্দ্রনাথের পার্শ্বে তাহা হইলে নিজেই স্বীকার করিতেন যে ইহা সম্ভব ছিল!

প্রথম দেখা হইতেই আমাকে দাদা বলিয়াছিলেন যদিও সর্ববিষয়ে আমি তাঁহার ছোট ছিলাম। চিকিৎসা ব্যাপারে আমি তাঁহার সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে আসিতেছিলাম সেইজন্য মনের দুঃখ ও কষ্ট আমার কাছে বলিয়া তিনি স্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। আমি কার্যব্যপদেশে সরিয়া গেলেও আমাকে মাঝে মাঝে সংবাদ দিয়া আনাইয়া লইতেছিলেন। ইহাই স্বাভাবিক ও এমনই হয়। যাঁহার আজীবনের সাধনা ও তপস্যা এমনই করিয়া ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, মাতৃভূমি উদ্ধারের প্রয়াস এমনই করিয়া বিফল হইয়া যায়, ধূলিসাৎ হইয়া যায়, সেই হতাশার ক্ষোভে ও মর্মান্তিক দুঃখে তখন এমন করিয়া শোক প্রকাশ করা কিছুতেই অসম্ভব নয়!

সমালোচক হয়ত বলিতে চাহিয়াছেন যে, যতীন্দ্রনাথ কিছুই বলেন নাই বা অল্প কিছু বলিয়াছিলেন আমি এত সব কথা বানাইয়া বলিয়াছি। আমি তাঁহাকে ও জনসাধারণকে বলিতে চাই যে ইহা সত্য নহে! যতীন্দ্রনাথ সব কথাই বলিয়াছিলেন ও বলিতে পারিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ সম্মুখেই রহিয়াছে—একটু অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। আমি যখন অকুস্থলে যাই নাই, তাঁহাদের অভিযানের সাথী ছিলাম না তখন এত খুঁটিনাটি কথা এত খুঁটিনাটি ঘটনা কেমন করিয়া বলিতে পারিতেছি যদি তিনি আমাকে না বলিতেন? আর যখন দেখা যাইতেছে যে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সবই সত্য!

কাজ আমাদের ভাগ হইয়া গিয়াছিল, কেহই এমন অতিরিক্ত কার্যভারে ব্যস্ত ছিলাম না যে ঘটনা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না, কিন্তু এই পোলিটিক্যাল কেসে যখন গোয়েন্দা ও পুলিস অফিসারের ঘর ভর্তি ছিল তখন কে এমন আছে যে তাহাদের সম্মুখে খাতা কলম লইয়া এই সব লিখিতে বসিবে? যতীন্দ্রনাথের দেহ অপসারণের পর যখন সি আই ডিদের ভিড় কমিয়া গিয়াছিল, তখন ঢের সময় ছিল।
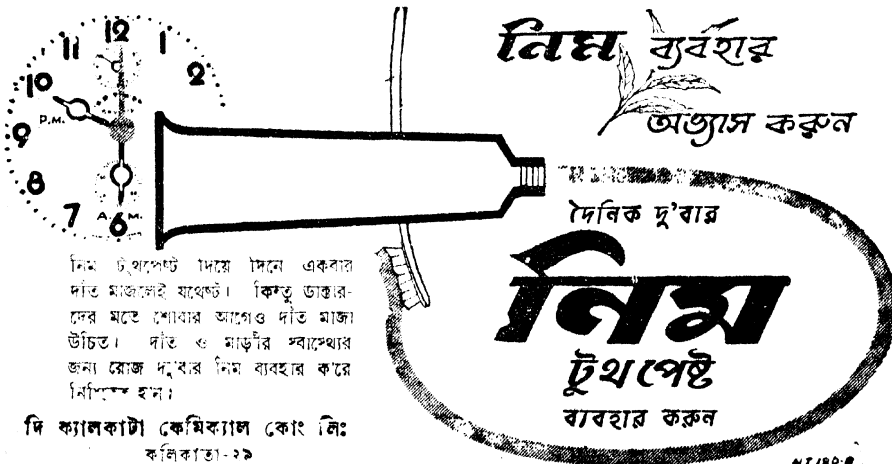
মৃত্যুকালীন জবানবন্দী সম্বন্ধে

এই স্থানে লেখা হইয়াছে, "এই সময়ের মধ্যে উনি (যতীন্দ্রনাথ) যে এই মকর্দমায় কোনও dying declaration দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ পায় নাই"।

সমালোচক একজন প্রবীণ ব্যবহারজীবী হইয়া এমন কথা লিখিতে পারিলেন ইহাই বড় আশ্চর্যের বিষয়। তিনি নিজে খুব ভাল করিয়া জানেন, যে, এই declaration লওয়া হইয়াছিল। তবু প্রকৃত কথা পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি কি জানেন না যে কোনও মরণোন্মুখ পুলিস কেস হাসপাতালে আসিলে, পুলিসের নির্দেশ মত সেই কেসের মৃত্যুকালীন জবানবন্দী একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়া রেকর্ড করাইয়া লইতে হয়? ইহা ইন-চার্জ ডাক্তারের অবশ্য করণীয় কর্তব্যকর্ম এবং ইহা না করিলে কর্তব্যকর্মে অবহেলা হয় ও ডাক্তারকে গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হয়, চাকরী পর্যন্তও যাইতে পারে!

এস ডি ও-কে অবিলম্বে সংবাদ দিতে হয়, তিনি নিজে আসেন বা একজন ডেপুটিকে পাঠাইয়া দেন জবানবন্দী লইবার জন্য! আহতকে শপথ করিয়া জবানবন্দী দিতে হয়। বলিতে হয় যে, মৃত্যু আসন্ন জানিয়া একজন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সে সত্য কথা বলিতেছে শপথ করিয়া। যদি ইহা তাহার বিপক্ষেও যায়, তাহা জানিয়াই বলিতেছে যে ইহা সত্য! তাহার পর জবানবন্দীকারী সেই কাগজে নিজের স্বাক্ষর বা অশক্ত হইলে আঙুলের ছাপ দিয়া দেয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ইহার উপর নিজ স্বাক্ষর দিয়া তদন্তকারী অফিসারের কাছে পাঠাইয়া দেন। যদি আহত ব্যক্তি জবানবন্দী দিতে অস্বীকার করে বা অজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা হইলে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার রিপোর্ট সেইরূপই লিখিয়া দেন।

এই যে procedure তাহা কি সমালোচক জানেন না বুঝিতে হইবে? তিনি জানেন ও নিশ্চয় জানেন। রেকর্ডে কিলবি সাহেবের হাতে লেখা ও যতীন্দ্রনাথের আঙুলের ছাপ দেওয়া এ declaration নিশ্চয় তিনি দেখিয়াছেন।

যে কেসে অস্ত্রোপচার করা দরকার বোঝা যায় তাহার ত' অস্ত্রোপচারের পূর্বেই ইহা লইয়া লইতে হয়—কেননা অস্ত্রোপচারের পর যদি সম্পূর্ণ জ্ঞান না হয়!

কিলবি সাহেব ইহা সব জানিতেন, একজন ডেপুটি আসিতে বিলম্ব হইতে পারে তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জবানবন্দী লইয়াছিলেন তাহা আমার মূল প্রবন্ধে আছে। এই declaration না লওয়া থাকিলে জজ সাহেব পুলিস ডিপার্টমেণ্ট ও মেডিকাল ডিপার্টমেণ্টকে সহজে অব্যাহতি দিতেন না! তাহা যখন হয় নাই, তখন ইহা যে লওয়া হইয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই জবানবন্দীতে কিলবি সাহেবের স্বাক্ষর ও যতীন্দ্রনাথের অঙ্গুলির ছাপ আছে। তাহা রেকর্ডের সঙ্গে নিশ্চয় নথিভুক্ত হইয়া আছে।

এই declaration যে লওয়া হইয়াছিল তাহার প্রমাণ সমালোচক নিজেই দিয়াছেন যখন তিনি লিখিয়াছেন, "তবে এ কথা সত্য যে যতীন কিলি (?) সাহেবকে বলিয়াছেন বালেশ্বরে যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য তিনি (যতীন) দায়ী, বালক দুটি নহে। বৃটিশ বিচারপতি তাহাকে ধরিয়া লইয়াছিলেন যতীনের চালাকি?"

এখন আমার প্রশ্ন এই যে কিলবি সাহেব ইহা যতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে কখন শুনিয়াছিলেন? নিশ্চয় অকুস্থানে নয় যখন যতীন্দ্রনাথ চেতন-অচৈতন্যের মধ্যে ছিলেন—আর তখন তাঁহারা পরস্পরে অপরিচিত ছিলেন। নিশ্চয় পথে আসিতে আসিতে নয় যখন একজন ছিলেন মোটরে ও আর জন ছিলেন বাহকের স্কন্ধে খাটিয়ায়! এই কথা যতীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন আমাদেরই সম্মুখে হাসপাতালে যখন তিনি জবানবন্দী দিতেছিলেন! ইহা অতি সত্য কথা! সমালোচক কেমন করিয়া যে পরস্পর-বিরোধী কথা বলিয়াছেন তাহাই আশ্চর্যের বিষয়!

যতীন্দ্রনাথের জবানবন্দী যাহা আমি উদ্ধৃত করিয়াছি আমার মূল প্রবন্ধে, তাহাতেই এই দায়িত্ব লইবার কথা আছে। অনুগ্রহ করিয়া পাঠক মিলাইয়া লইবেন। বুঝিতে পারিবেন যে কেমন করিয়া এই বিবৃতি লওয়ার ব্যাপারটিকে পাশ কাটাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই বিবৃতির অপর অংশ যেখানে বৃটিশ ন্যায়পরায়ণতার কথা ও মনোরঞ্জন-নীরেনের ছাড়িয়া দিবার কথা আছে—তাহা যদি কিলবি সাহেব সাক্ষ্য (যদিও কিলবি সাহেবের সাক্ষ্য শুনিবার আমার সৌভাগ্য হয় নাই। সমালোচক যাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেছি) না বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। সব কথাই যে সাক্ষ্য বলিতে হইবে এমন, নহে। তাহা ছাড়া কিলবি সাহেব না নিজের পক্ষ হইতে না বৃটিশ সরকারের তরফ হইতে যখন কোনও প্রতিশ্রুতি দেয় নাই তখন কেন এ কথার উল্লেখ করিবেন? সিভিলিয়ান হইয়া তিনি একথা বলা সমীচীন মনে করে নাই। এইবার আসে সোরো যাওয়ার কথা!

ইহা সমালোচক বলিয়াছেন আদৌ ঠিক নয়। তাঁহার সাক্ষীরা কি বলিয়াছিল, না বলিয়াছিল তাহা আমার বিবেচনার বিষয় নয়—তাহারা সব রকম কথাই বলিতে পারে—আমার বিবেচ্য তাহাই, যাহা যতীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন।

হউক না সোরো ২৭ মাইল দূরে, হউক না বিপথে। কিন্তু সেটি ত একটি রেলওয়ে স্টেশন! সেখানে ত রেল গাড়ি যায় আসে তাহা কটকই যাউক কি কলিকাতায় যাউক সেই গাড়িই পলায়নের সুবিধা করিয়া দিতে পারিবে? দূরে অবস্থিত বলিয়া হয়ত সেখানে পাহারার ব্যবস্থা হয় নাই। তাই তাঁহারা সোরো যাওয়া স্থির করিয়াছিলেন। সোরোয় গিয়াছিলেন। আশ্রম ত্যাগ করিবার সময় তাঁহারা বোঝা হাল্কা করিয়াছিলেন, তাহা আগেই বলা হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের সহিত নিশ্চয় কোনও খাদ্যদ্রব্য ছিল না। তবে ইহারা এ কয়দিন খাইয়াছিলেন কি? তিনি যে বলিয়াছিলেন 'পাটপাতা ও আলের জল' তাহা সত্যই বলিয়াছিলেন।

৬ তারিখ হইতে ৯ তারিখ সকাল পর্যন্ত তাঁহারা আত্মগোপন করিয়া ছিলেন—তাঁহারা যে কোথায় আত্মগোপন করিয়া ছিলেন, তাহা পুলিসের দল বাহির করিতে পারে নাই, পারিলে সমালোচক তাহা নিশ্চয় জানাইতেন। তাহার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা, না প্রকৃত বিবরণ দানকারী কেহই বলিতে পারে নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত সমালোচক এই কয়দিন তাঁহারা কোথায় ছিলেন তাহার প্রামাণিক তথ্য দিতে পারিতেছেন না, ততক্ষণ তাঁহারা সোরো গিয়াছিলেন বলিয়া মানিয়া লইব। কোন স্বার্থে যতীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলিবেন তাহাও বিবেচ্য!

খেয়াঘাটের কথা

যতীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই, ইহা আমার মূল প্রবন্ধে নাই। তবু এই বিষয়ে এইখানে আলোচনা করিব এই জন্য যে, সাক্ষীরা এইখানে যাহা বলিয়াছে, তাহা কত অবান্তর ও কত পরস্পরবিরোধী! ইহা বিশ্বাসযোগ্য কিনা পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

সমালোচনায় বলা হইয়াছে, কিলবি সাহেব পরে আসিয়া বালেশ্বর স্টেশন ও খেয়াঘাটে সতর্ক পাহারার ব্যবস্থা ও অজানা পাঁচজন লোক দেখিলে তাহাদের আটকাইবার ও বালেশ্বরে খবর দিবার কড়া হুকুম জারি করিয়া যান। চৌকিদার ও অন্যান্য লোকদের তাহা জানান হইল পাঠকগণ জানেন। কিন্তু এই স্থানে কেমন করিয়া, একক্ষণে ও সমবেতভাবে এই হুকুম অমান্য করা হইল তাহা পাঠকগণকে অনুরোধ করিতেছি দেখিবার জন্য।

১ম দৃষ্টান্ত—খেয়াঘাট ও বালেশ্বর স্টেশনে সতর্ক পাহারার সংবাদ কে বা কাহারা যতীন্দ্রনাথদের দিল যে তাঁহারা খেয়াঘাট এড়াইয়া নদীর ধারে চলিয়া গেলেন? সমালোচক এইটুকু মাত্র বলিয়া নীরব হইয়া গেলেন? এই যে কে বা কাহারা, তাহারা নিরুদ্দিষ্ট রহিয়া গেল? ইহাদের বিরুদ্ধে কোনও স্টেপ লওয়া হইল কিনা? তাহাদের পাওয়া গেল কিনা—এ সব সংবাদ দিবার কোনও প্রয়োজন নাই। পাঠক এই পর্যন্ত জানিয়াই সন্তুষ্ট থাকুন—কেননা ইহা যে প্রত্যক্ষদর্শীর কথা।

২য়। নদীর ধার দিয়া চলিতে চলিতে বিপ্লবীরা সকলকে নদী পার করিয়া দিতে বলিলেন—কিন্তু কেহই রাজী হইল না। কিন্তু তাহারা তাহাদের আটকাইবার ও বালেশ্বরে সংবাদ দিবার কোনও চেষ্টা করিল কিনা তাহা প্রকাশ নাই।

৩য়। এক বালক মাঝি রাজী হইয়া গেল! ও জিনিসপত্র ছোট ডিঙিতে উঠাইল। এই বালকের ঘাড়ে কটা মাথা ছিল জানিলে বুঝিতে পারা যাইত সে কোথা হইতে শক্তি সঞ্চয় করিল ও হুকুম অমান্য করিল?

৪র্থ। নদীর ধারে সকলে এই দৃশ্য দেখিতে রহিল। কিন্তু কেহই কিছুই করিল না। বাধা পর্যন্ত দিল না।

৫ম। ডিঙিতে জিনিসপত্র অর্থাৎ 'অগ্নিবাণ' তুলিয়া দিয়া যতীন্দ্রনাথেরা নিরস্ত্র হইলেন, তখন কেহ তাহাদের ধরিবার চেষ্টা করিল না। তাঁহারা সাঁতরাইতে (?) লাগিলেন।

৬ষ্ঠ। কেহ অন্য নৌকা বাহিয়া এই বালক মাঝিকে ধরিবার চেষ্টা করিল না। সে নিশ্চয় পিস্তল ছুড়িতে জানিত না তাহাকে ধরা খুবেই সহজ ছিল। অস্ত্রশস্ত্র সমেত।

৭ম। ওপারে গিয়া বালক মাঝি সব জিনিসপত্র সেফ ডেলিভারি দিয়া দিল। এপারে না ওপারে কেহ তাদের বাধা দিল না!

৮ম। বিপ্লবীরা এইবার জংগলের দিকে চলিলেন—ওপারেও কেহ বাধা দিল না!

৯ম। এইরূপে বিপ্লবীরা এত বাধাবিপত্তি নিরাপদে পার হইয়া আসিলেন—। এইবার জংগলে ঢুকিতে পারিলে কতকটা নিরাপদ আশ্রয় পাওয়া যায়,—কিন্তু এইবার গ্রহ বিরূপ হইয়া গেল। জংগলের মধ্যে পথ না থাকায় যে জংগল চিরদিনই পলাতকদের আশ্রয় স্থল, সেই জংগলে পথ (?) না থাকায় তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন—তখন

১০। একজন লোক (অনির্দিষ্ট রহিয়া গেল) আসিয়া (পরিত্রাতারূপে আসিয়া) দুবদা বাঁধের পথ দেখাইয়া দিল ও যতীন্দ্রনাথরা সেই দিকে দৌড়াইতে লাগিলেন।

দিবালোকে পাঁচজন অচেনা, অদ্ভুত বেশধারী লোক পৃষ্ঠে বোঝা লইয়া নদীর ধারে ধারে ছুটিল, বালক মাঝিকে পাকড়াইল ও তাহার পর নিরাপদে নদী পার হইয়া গেল। এই অদ্ভুত অবাস্তব চিত্র আপনারা বিশ্বাস করিতে পারেন কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখুন। কিল্‌বি সাহেবের এত কড়া হুকুম এইভাবে পালিত হইল! মনে হয়, তখন হইতেই বৃটিশের ভিত আলগা হইয়া গিয়াছিল! বিশেষত এই নদীর দুই পারে!

রাউণ্ড অফ ফায়ারের কথা!

ইহা আমার মূল প্রবন্ধে আছে। সমালোচক বলিয়াছেন দুই রাউণ্ড ফায়ারের কথা! প্রথম রাউণ্ডে একটি লোক আহত হইয়াছিল, কিন্তু সেই সংগে বলিয়া দিয়াছেন যে, বিপ্লবীরা আহতের কথা জানিত না। যতীন্দ্রনাথ কয় রাউণ্ড ফায়ার হইয়াছিল তাহা বলেন নাই, বলিয়াছিলেন—গুলী ছোড়াতে অযথা একটা খুনোখুনি হইয়া গেল সেই জন্য মন খারাপ হইয়া গেল। অতএব দেখা যাইতেছে যতীন্দ্রনাথ একটি খুনোখুনির কথাই জানিতেন, আর সমালোচক মহাশয়ই তাহাই বলিয়াছেন অতএব কোন অসংগতি নাই। যতীন্দ্রনাথ গুলী বর্ষণকারীর নাম বলেন নাই! ইচ্ছা করিয়াই বলেন নাই, দলের কাহাকেও তিনি ইহার মধ্যে জড়াইতে চাহেন নাই। আর এই খুনোখুনিকে যে মৃত্যু বলেন নাই, তাহা হয়ত তিনি মৃত্যু বলিয়া জানিতেন না। রাজু হয়ত তাঁহারা অন্তর্হিত হওয়ার পর মরিয়া থাকিবে। সমালোচক কোথাও ইনস্ট্যানটেনিয়াস ডেথ্ বলেন নাই। বরং বলিয়াছেন, "মনোরঞ্জন ভয় দেখাইবার জন্য গুলী ছুড়িয়াছিল, মারিবার জন্য নহে"।

যুদ্ধ স্থানের কথা

কোনও অসংগতি নাই। একজন বলিয়াছেন, 'ছায়া শীতল টিলা'—আর একজন বলিয়াছেন, উইঢিপি! যতীন্দ্রনাথ 'চৌহদ্দি' দেন নাই।—সমালোচকের সাক্ষীরা দিয়াছে! তাহাতে মূল প্রবন্ধের কিছু যায় আসে না।

তথাকথিত খণ্ড যুদ্ধের কথা

যাহারা শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহারা কি করিয়া জানিবে যে কিল্‌বি ও রাদারফোর্ড সাহেব ত 'সাঁড়াশী' ব্যূহ রচনা করিয়া তাঁহাদের ঘিরিয়া ফেলিয়াছে? বন্দুকের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া দেখেন তাঁহারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন। ইহার পর সম্মুখ সমর শুরু হইল। এতক্ষণ পর্যন্ত দুইপক্ষের বিবৃতি মিলিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহার পর যখন সেই আলো আবছায়ার মাঝে রাদারফোর্ড হামাগুড়ি দিয়া আসিয়া চিত্তপ্রিয়কে পার্শ্বদেশ হইতে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিল—সম্মুখ সমর লইয়া যে জন ব্যস্ত সে তাহা কেমন করিয়া জানিবে? যতীন্দ্রনাথ যদি ওকথা জানিতেন, তাহা হইলে কখনও আমার নিকট বলিতেন না, 'উঁহারা বীরের জাত'। অন্যায় সমরে চিত্তপ্রিয় মরিয়াছে বলিয়া হয়ত দুঃখ প্রকাশ করিতেন। ইহার পরে তিনি ধারাবাহিকভাবে যে ক্যাজুয়ালিটির বর্ণনা দিয়া গিয়াছেন, সেখানে ত কোনও প্রতিবাদই হয় নাই! এইখানে আর একবার প্রমাণ হইয়া গেল যে যতীন্দ্রনাথের এত ডিটেলস-এ কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল!

প্রসংগতঃ এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। এই কেসে দুই দিন আমাকে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল, তাহা বোধহয় অ্যাডভোকেট মহাশয়ের মনে আছে। যদি না স্মরণ থাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। দ্বিতীয় দিন আজ কোর্ট উইটনেস জজ সাহেব আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেইদিন বহুক্ষণ ধরিয়া গান শট ইনজুরিস সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন। তখন ইহার অন্তর্নিহিত মর্ম সব বুঝিতে পারি নাই—আজ বুঝিতেছি দুইজন সাক্ষীর সত্য কথা বলিবার সাহসের পরখ তিনি করিয়াছিলেন।

এইবার সেই সব প্রশ্নের উত্তর দিব যাহা নীরেন দের পক্ষ সমর্থনকারী Counsel হিসাবে করা হইয়াছে। অর্থাৎ সাক্ষীদের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া যেসব কথা বলা হইয়াছে।

(১) দোকান সার্চ। আমার মূল প্রবন্ধে নাই ঃ যতীন্দ্রনাথ বলেন নাই। ইহা সম্পূর্ণ অবান্তর কথা! শহরবাসীরা যাহারা হাসপাতালে আসিয়াছিল তাহারা ৯ই তারিখে পুলিস দোকান ঘিরিয়াছে বলিয়াছিল, সার্চ বলে নাই!

(২) কিল্‌বি ও রাদারফোর্ডের অভিযানের কথা যতীন্দ্রনাথ বলেন নাই—আমার প্রবন্ধে নাই। ইহাও অবান্তর। ইহার মধ্য হইতে যে তথ্য প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে তাহা কিন্তু প্রণিধানযোগ্য!

৬ই তারিখ সাহেবরা কপ্তিপদায় ইহাদের সন্ধান পান নাই। পরে ৭ তারিখ ময়ূরভঞ্জ হইতে সব সংবাদ সংগ্রহ করিয়া যখন আনিলেন তখন "কিন্তু যতীন ও তাহার চারিজন সহকর্মী সাহেবদের আগমন সংবাদ পাইয়া * * পূর্বেই জংগলের মধ্য দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন" তখন এই স্থানে এই দুইটি কথা—পূর্বেই ও জংগলের কথা বিচার করা যাউক। "পূর্বেই" মানে কবে, কোন তারিখে ও "জংগলে" মানে কোন্ জংগলে। এই জংগল আশ্রমের কোন দিকে অবস্থিত, এই জংগল আশ্রমের কোন দিকে প্রসারিত ও তাহার মধ্য দিয়া যাইলে কোন দিকে যাওয়া যায়? তারিখ ও জংগলের ব্যাপার সমালোচক অস্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। হয় তাহার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরা বা প্রকৃত বিবরণ দানকারী সাক্ষীরা সাহায্য করিতে পারে নাই বা তিনি ইহা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। এই তারিখ ও জংগলের নির্দেশ ঠিকমত পাইলে বিপ্লবীরা কবে ও কোন দিকে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন যেমন তাহা জানিবার সাধারণের কিছু সুবিধা হইত। এই সুবিধা তিনি না দিয়া সমস্ত ব্যাপারই অস্পষ্ট রাখিয়া দিলেন।

জনসাধারণের সুবিধার জন্য আমি এইখানে যতীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই তুলিয়া ধরি—"তিন রাত্রি ও চারদিন আমরা কি কষ্টই পেয়েছি * * জংগলের মধ্য দিয়ে রাতের ঘোর অন্ধকারে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আমরা যে কি করে পথ চলেছি, তার ধারণা তোমরা কিছুই করতে পারবে না। * * * এই রকম করে পথ চলতে চলতে আমরা সোরো স্টেশনে পৌঁছিলাম।"

এইখানে বিচার করা যাউক। ৬ই তারিখে সন্ধ্যায় সাহেবরা তাহাদের সন্ধান পান নাই। অর্থাৎ ৬ই তারিখে তাহারা আত্মগোপন করিয়াছেন। (এইখানে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের গুপ্তচর ব্যবস্থা কত সুষ্ঠু ছিল। পাঁচ তারিখে সার্চ হইয়াছে। ৬ তারিখেই সংবাদ পৌঁছাইয়া গিয়াছে।) এর পর তাঁহাদের ৯ তারিখের সকালের আগে কেহ দেখে নাই। তাহা হইলে যতীন্দ্রনাথের ভাষণ "তিন রাত্রি ও চারিদিন অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়া যাইতেছে। তখন তাঁহারা যে বলিয়াছিলেন তাঁহারা এই সময়ে জংগলে জংগলে সোরো গিয়াছিলেন তাহাও সত্য বলিতেই হইবে। কি হেতু তাঁহারা সোরো যাওয়ার কথা বানাইয়া বলিবেন? তাহাতে ইহাদের কোন স্বার্থ সাধিত হইত!

সোরো যাওয়ার কথা আগে একবার

বলিয়াছি, আবার বলিলাম শুধু এই প্রমাণ করিবার জন্য যে সত্যই তাহারা গিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রনাথের বালেশ্বর দিয়া কলিকাতায় যাইবার অভিপ্রায়

বিপ্লবীরা সাধারণ শ্রেণীর লোক ছিলেন না। সাধারণের চেয়ে দৃঢ়চেতা, বুদ্ধিমান ও কূটকৌশলী ছিলেন। যে প্রাণ দেশের জন্য সমর্পিত তাহার কোনও মায়া করিতেন না। দৈহিক কোন সুখের তাহারা প্রত্যাশী ছিলেন না। অকুতোভয়ে কাজ করিয়া যাইতেন। বুকের রক্ত দিয়া লিখিয়া তাহারা দলের আনুগত্য স্বীকার করিতেন। কোনও প্রলোভনে দলের গুপ্ত কথা বা তথ্য প্রকাশ করিতেন না —করিলে অমোঘ দণ্ড ছিল—প্রাণদণ্ড! তাঁহারা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত displined দলপতির নির্দেশ, বিনা প্রতিবাদে মানিয়া চলিতেন। তাহাদের চরিত্র কিছু পর্যালোচনা করা থাকিলে অনেক বিষয় বুঝিবার সুবিধা হইবে।

কলিকাতার যাওয়া কথা আমার প্রবন্ধে নাই ইহা অবান্তর। কিন্তু ইহা প্রণিধানযোগ্য!

কোথায় ও কাহার কাছে কলিকাতায় যাওয়া কথা প্রকাশ করা হইল? যখন [illegible] [illegible] [illegible] নাই! [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিবেন, [illegible] [illegible] [illegible]!

এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহারা এই কথা প্রকাশ করিতে গেল কোন মোহে? কোন [illegible]? তাহারা নিজেদের পক্ষ সমর্থন করে নাই, মৃত্যু [illegible] অবধারিত, তাহারা তাহা জানে, তবে তাহারা কেন দলের কথা প্রকাশ করিল? কেন বুকের রক্ত দিয়া লেখা প্রতিজ্ঞার অবমাননা করিল? একবার [illegible] বিপ্লবীদের [illegible] [illegible] হইয়া থাকিতে পারে, ঠিক তাই বলিয়া তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিবে? আমাদের তাহাদের দেখিবার সুবিধা [illegible] হইয়াছে। তাহারা সে ধাতুর লোকই ছিল না। তাহারা এত নীচ ছিল না! তাহারা বীর ছিল। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ইহা তাহারা বলিয়াছিল, তবে বুঝিতে হইবে তাহারা বিপক্ষকে ভুল পথে চালিত করিবার জন্যই ইহা বলিয়াছিল!

আর এক দিক দিয়া বিচার করা যাউক! দলের নেতা যখন জানিয়াছেন যে, বালেশ্বরে রেড হইয়াছে পুলিশ আসিয়াছে টেগার্ট আসিয়াছে, মিলিটারী আসিয়াছে তখন দক্ষ নেতা যতীন্দ্রনাথ যাইবেন বালেশ্বরে ট্রেন ধরিতে? বা অন্য কথায় টেগার্টের কাছে ধরা দিতে? মৃত্যুর পূর্বে তিনি টেগার্টের সঙ্গে রসিকতা করিয়াছিলেন কিন্তু এই সময় কি রসিকতার সময়? সমস্ত দলের দায়িত্ব যখন তাহার উপর!

ইহাও সুবিদিত যে বিপ্লবীরা কখনও সোজা পথে চলিতেন না। ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী বোমা ফেলিয়াছিল মজঃফরপুরে, কিন্তু ধরা পড়িয়াছিল কোথায়? নিশ্চয় মজঃফরপুর stationএ নয়! তারপর সুভাষচন্দ্রও সোজা পথে ভারতবর্ষ ছাড়েন নাই!

কলিকাতায় যাওয়ার কথা ত' আরও অসম্ভব ও অবান্তর! পুলিস তাহাকে ধরিবার জন্য কলিকাতায় ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। সেখানে তাঁহার মাথার দাম পঞ্চ সহস্র মুদ্রা! সেইখানে যাইবেন যতীন্দ্রনাথ? নিতান্ত বালক ছাড়া ইহা কেহই বিশ্বাস করিবে না।

প্রাণ ভিক্ষার কথা ও মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কা

এই স্থানে দুই পক্ষের লেখা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা হইলে পাঠক বুঝিবেন যে, আমি যাহা বলি নাই বা যতীন্দ্রনাথ যাহা বলেন নাই তাহাই আমার লেখার মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়া আমার লেখার প্রয়োজনীয় অংশ অনুল্লেখিত রাখিয়া আমার উপর কতটা অবিচার করা হইয়াছে। সমালোচক লিখিয়াছেন, "সেই ব্যক্তি যদি বৃটিশ রাজের উপর ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া তাহাদের ন্যায় বিচারের দোহাই দিয়াও কাকুতি মিনতি করিয়া তাহাদের নিকট সহকর্মীদের প্রাণ ভিক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বাঘা যতীনের উপর আমার তথা জনসাধারণের যে ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল তাহার পরিবর্তন করিতে হইবে ও যতীনবাবুর মর্যাদা [illegible] ক্ষুণ্ণ হইয়া যাইবে।"

যতীন্দ্রনাথের উক্তিঃ—

They are mere boys, and they are all innocent I have a great faith in the British Raj and I know you will do justice. Please see that they are aquitted.

আমার উক্তিঃ—কিন্তু যখন বিপ্লবীদের ছেড়ে দেবার কথা উঠল, তখন সমস্ত কথার [illegible] এমন একটা কাকুতি ও ব্যাকুলতা ভেসে উঠল যেন কোনও আবেদন প্রার্থীর আবেদন শুনেছি"

যতীন্দ্রনাথের উক্তিঃ—* * * "সাহেব ওরা যদি সত্যকারের বিপ্লবী হ'ত তাহলে কি এ সুযোগ ছেড়ে দিত? আকাশে গুলি না ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত তোমার লোকেদের বুকের উপর, নিশানা ভুল হ'ত না।"

পাঠক এইবার দেখিয়া লউন যতীন্দ্রনাথের উক্তির মধ্যে কোথায় প্রাণ ভিক্ষা আছে? Please see that they are aquitted—ইহা তর্জমা করিলে কি প্রাণ ভিক্ষা হয়! "নিশানা ভুল হত না"। যে বীর বলিতে পারেন তিনি এই উক্তিতে দীনতা নিশ্চয় দেখান নাই!

কিলবি সাহেবকে সমপর্যায়ের লোক মনে করিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়া যে বীর অপরের জন্য প্রতিশ্রুতি চায়—সে নিশ্চয় দীনতা প্রকাশ করে না। প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাইবে না ইহার আভাষ মাত্র পাইয়া যে বীর মুখ ফিরাইয়া লয় ও আর বাক্যালাপ করেন না, ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে তিনি "দোহাই" পাড়িতেছিলেন?

প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্যদের ছাড়িয়া দিবার কথা বলায় তাঁহার মনের উদারতা ও মহানুভবতা যে কত প্রকাশ পাইয়াছে তাহা সমালোচক যদি বুঝিয়াও না বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, তিনি ইচ্ছা করিয়াই যথার্থ অর্থ বুঝিতে চাহেন না! আমার উক্তির মধ্যে কোথায় আছে প্রাণ ভিক্ষার কথা! আছে "ছেড়ে দেবার কথা"। ইহার মানে নিশ্চয় প্রাণ ভিক্ষা নয়! আছে "যেন একটা কাকুতি ও ব্যাকুলতা ভেসে উঠল"? ইহার মধ্যে কোথায় আছে—"কাকুতি-মিনতি? মিনতি মানে বুঝায় বিনীত প্রার্থনা, কিন্তু ব্যাকুলতা মানে কি বোঝায়? উৎকণ্ঠা! সকলেই বুঝিতে পারেন যে, দুই বাক্যের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য কত বেশী!

আমি সমস্ত প্রবন্ধে যতীন্দ্রনাথের পূজা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কেহ যদি ইহা ভুল বুঝিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে তাহার কোনও প্রতিকার নাই।

রাজু মহান্তি সম্বন্ধে আমি বিস্মৃত হই নাই। প্রবীণ এডভোকেট মহাশয় আবার একটা ভুল করিয়াছেন। পুলিস-কেস মরিয়া গেলে যায় মর্গে পুলিস হাসপাতালে সেখানে পুলিস ডাক্তারের সহায়তায় সিভিল সার্জন শব ব্যবচ্ছেদ করেন। সে আর হাসপাতালে আসে না! রাজু মরিয়া মর্গে গিয়াছিল—অতএব আমার জানিবার কোনও সুযোগ হয় নাই। আমার কিছুমাত্র বিস্মৃতি হয় নাই।

পুলিস সুপার মিঃ খুদাবক্সও রণাঙ্গনে গিয়াছিলেন ও যতীন্দ্রনাথদের লইয়া হাসপাতালে আসিয়াছিলেন তাহা দেখিয়াছিলাম। তিনি কি Pincer movement এ ছিলেন না?

আমার কাছে কিলবি সাহেবের চিঠি আছে তাহাতে দেখিতেছি নাম R. KILBY উচ্চারণও জানিতাম কিলবি, কিন্তু আজ দেখিতেছি তাহা কিলি! কে জানে ইহা আমারই উচ্চারণের ভুল কি না!

Advocate মহাশয়কে আমার শ্রদ্ধা জানাইতেছি। তাঁহাকে আমার স্মরণ আছে—আর সেই সঙ্গে স্মরণ আছে আরও অনেককে। ললিতবাবু, রজনীবাবু, দেবেন্দ্রবাবু, মুকুন্দবাবু, যোগেশ্বর, গিরিবাবুকে মহাদেববাবু, দৈত্যারীবাবু, আর কত নাম করিব। তিনি যে আমাকে যতীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার সুযোগ দিয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি!

চক্রদত্ত

যারা খেলে আনন্দ পান তাদের কথা আলাদা, কারণ তারা খেলতে গিয়ে বেশ কিছুটা পরিশ্রম করেন। কিন্তু যারা খেলা দেখে আনন্দ লাভ করতে চান এবং এই আনন্দলাভের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা আরামও লাভ করতে চান তাঁদের অনেকেই রোদে বসে খেলা দেখতে নারাজ। শোনা যাচ্ছে ১৯৬০ সাল থেকে পিটসবার্গ সিভিক এরিনায় যে নতুন স্টেডিয়াম দেখা যাবে তাতে বসে ইচ্ছে করলে আকাশের নীচে বসার আনন্দ অথবা ছাদের নীচে বসার আরাম পাওয়া যেতে পারে। এর মাথার ছাদটি ইচ্ছেমত সরান নড়ান যাবে। এক জায়গায় বসে দেখতে দেখতে রোদ চলে গেলে ছাদ সরিয়ে দেওয়া যাবে কিংবা বৃষ্টির সময় ছাদের নীচে বসলেও বৃষ্টি থামলেই ছাদ সরিয়ে দেওয়া যাবে। ছাদটি ৪১৫ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট স্টেনলেস স্টীলের তৈরী হবে। এতে ৮টি বড় বড় প্যানেল থাকবে। তার মধ্যে দু'টি স্থায়ী ও ৬টি সরান নড়ানর উপযোগী হবে।
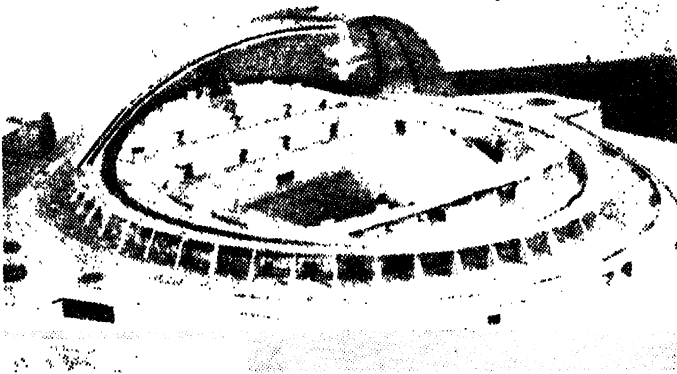
ছাদওয়ালা স্টেডিয়াম

*

শীতস্তম্ভ (hibernation) আমরা কয়েক ধরনের প্রাণীর মধ্যে দেখতে পাই। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে কিছু, দুই জাতের পাখি এবং কিছু-সংখ্যক মাছের মধ্যে শীতস্তম্ভ দেখা যায়। শীতস্তম্ভ বলতে আমরা সাধারণত শীত-কালের লম্বা ঘুম বুঝি। শীতের শুরু থেকে আরম্ভ করে গরমকাল পর্যন্ত সময় হচ্ছে শীতস্তম্ভের সময়। এই সময় প্রাণীদের শরীরের উত্তাপ হিমাঙ্কের (freezing point) মাত্র কয়েক ডিগ্রী উপরে থাকে। শরীরের তাপমাত্রা এত নেমে এলেও হৃদযন্ত্রের কাজ সমানভাবেই চলতে থাকে। রক্ত ধমনী এবং শিরার ভিতর দিয়ে সাধারণভাবেই প্রবাহিত হয়। মানুষ এই অবস্থায় পড়লে তাদের হৃদযন্ত্রের কাজ বন্ধ হয়ে যেত। শীতস্তম্ভ অবস্থায় থাকা-কালীন প্রাণীরা কোনপ্রকার খাদ্য গ্রহণ করে না। কিন্তু এর জন্য এরা কোন অসুবিধা বোধ করে না। এদের শরীরে যে অতিরিক্ত চর্বি জমা থাকে তার থেকেই এদের শরীরের পুষ্টি সাধন হয়। হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ লেম্যান প্রাণীদের শীতস্তম্ভ নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনি গবেষণার জন্য কয়েকটি স্তন্যপায়ী প্রাণী বেছে নিয়েছেন— যেমন 'হ্যামস্টার' সজারু, একজাতের ইঁদুর, 'মারমোট' ইউরোপ এবং সুমেরুর কাঠ-বেড়াল, কয়েক জাতের বাদুড় এবং দু জাতের পাখি। ডাঃ লেম্যান দেখলেন যে, বছরের যে কোন সময় যদি তাপমাত্রা ৪১ ডিগ্রী ফারেনহাইট-এ আনা যায় তাহলেই 'হ্যামস্টার' শীতস্তম্ভ অবস্থায় পৌঁছবে। সেই সময় তার হৃদযন্ত্রের গতি কমে গিয়ে মিনিটে ৮।৯ বার হয়। রক্তের চাপ তখন খুব বেশী নেমে যায় এবং বিপাক (metabolism) সাধারণ অবস্থার থেকে শতকরা ৩ কিম্বা ১ ভাগ পর্যন্ত নেমে যায়। অবশ্য সেই সময় হ্যামস্টার জ্ঞানহীন অবস্থায় (unconscious) থাকে। এর পর তাপ-মাত্রাকে যদি হিমাঙ্কের নিচে নামিয়ে আনা হয় তাহলে বিপাক ৩ থেকে ৪ গুণ বেড়ে যায়, ফলে প্রাণীর শরীরের তাপ ৩৭·৪° ডিগ্রী ফারেনহাইট হয়। এত কম তাপ-মাত্রায় কিন্তু প্রাণীর স্নায়ু কাজ করতে থাকে। যদি এই অবস্থায় প্রাণীটিকে আঙুলে কিম্বা লাঠি দিয়ে খোঁচা দেওয়া যায় তাহলে সে জেগে ওঠে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে জেগে উঠতে এর প্রায় তিন ঘণ্টা লাগে। এরও প্রায় এক ঘণ্টা বাদে হ্যামস্টার মিনিটে ৩৫ বার করে শ্বাস নেয় এবং তখন শরীরের উত্তাপ ৫০ ডিগ্রী হয়। দু ঘণ্টার মধ্যে সে মিনিটে ১০০ বার করে শ্বাস নেয়—নাড়ীর গতি তখন মিনিটে ৫৫০ হয় এবং শরীরের তাপ হয় ৮৬° ডিগ্রী। এই অবস্থায় সে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু তখন তার সমস্ত পেশীগুলি কার্যক্ষম হয় না। এরও দু থেকে তিন ঘণ্টা বাদে তার শরীরে স্বাভাবিক তাপ, ৯৮° ডিগ্রী হয়। এবং সে তখন তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। ডাঃ লেম্যান হ্যাম-স্টারের মস্তিষ্কের অংশ কেটে পরীক্ষা করে দেখে বলেছেন যে, ৬৮° ডিগ্রী ফারেন-হাইটে পৌঁছোমাত্র মস্তিষ্ক আর কাজ করে না, যদিও সংবেদ (সেন্সরী) স্নায়ু এর থেকে অনেক নিচের তাপমাত্রায় কাজ করে। এর থেকে বোঝা যায়, কেন তাপমাত্রা নামার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীর পেশীসমূহ কাজ করে না আবার তাপমাত্রা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পেশীগুলি কাজ করে। এছাড়া শীত-স্তম্ভের সময় আরও একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করা যায় সেটা হচ্ছে শরীরের জমা শক্ত চর্বি কিছুটা তরল অবস্থায় এসে শরীরের পুষ্টি সাধন করে। এই বিশেষ প্রক্রিয়া ছাড়া এইসব প্রাণী শীতস্তম্ভের সময় বাঁচতেই পারে না। আর শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ চর্বি জমা করবার জন্য এরা শীতের আগে থেকে খুব বেশী পরিমাণে খেতে থাকে এবং খুব মোটা হয়ে যায়।

শিল্পের আলো

রমেন্দ্র দেশমুখ্য

আমার মূলের সঙ্গে জড়ানো
চিন্তার একগোছা শিকড়কে
সৃষ্টির নদীজলে ভাসিয়ে
নিঃশব্দে কূলে বসলেই
স্রোতের আঙুলের আকুল আঘাতে
যখন হৃদয়ে আবেগ জাগে।

কল্পনার গাছপালার নির্জনে
কেবল শব্দ-যোজনার জন্য
এই উপত্যকায় শান্ত কূজনের
পাখির মতো উড়ন্ত শব্দগুলির
পিছনে সুরমুগ্ধ
যখন গভীর স্নেহে ছুটতে থাকি।

তখন অনুভব করি
প্রকৃতির সমস্ত বেগের,
নিত্য-নতুন প্রাণ-বিকিরণের
পিছনে পিছনে আকুল আবেগ
তার শিল্পকে পূর্ণতার দিকে
ক্রমাগত নিয়ে চলেছে।

আবেগ না হলে বকুল গাছ
বসন্তে কোমল ফুল ফোটাত না,
তরুণী ঘরছাড়া বুনো নদীর
সাগরে মোহনা রচনা হত না।
আবেগ না এলে কবির
শিল্পের আলোই ফুটত না।

সূর্যমুখী

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

সকালের সূর্য তাকে দ্যাখে, সেই ফাঁকে তার মুখ
দেখে মনে হয়েছিল, আকাশেই আছে কোনো নদী—
যার সোনা গলা স্রোত, অথবা উচ্ছ্বাস নেমে আসে।
বনের শাসন মানে স্বাধীন হরিণ কণ্টক,
বিশেষত সেই বন মত্ত থাকে ছায়াবৃত্তে যদি;
মৃগনাভি-গন্ধ যদি সে সময় ছড়ায় বাতাসে!

অচিরেই দেখা হলো, হৃদয়েই লেখা হলো নাম,
সে কাহিনী। তবু বলি কেন সেই খেই হারালাম।

অনন্য মুক্তির পন্থা। এমনি খোলা থাকবে তার দ্বার;
অথচ আসবো না আমি; সেও আর আমাকে ডাকবে না।
ফুলদানিতে ফুল শুকোবে, ধুলো জমবে জানালার পর্দায়,,
টেগোরে, র‍্যাফেলে; ক্লান্ত দিন ঝরবে; হাওয়ার চিৎকার
বাড়বে; দিগন্তের বর্ণলিপি চোখে ছবিও আঁকবে না;
তথাপি ফিরবো না জানি, সেও জানে ফেরানো অন্যায়।

হাওয়াটা মুখর হতে চাইলো; নুড়টা দেয়ালে বিব্রত;
পরিতৃপ্ত আলসেশিয়ান বাইরে ছুটলো; ক্ষুব্ধ, প্রতিহত

তরঙ্গের মত সেও চেয়ে রইলো, যেন অগন্তুক।
কিছু বলতে গিয়ে থামলো, নখ দেখলো, বেণী ঝুললো ফের;
গেটের রেলিঙে এসে ঝুঁকে রইলো—অনড় পাথর।
কপালের চুল উড়ছে, বিবর্ণ পাণ্ডুর তার মুখ,
চোখে মাকড়সার জাল; চিত্রার্পিত। তীক্ষ্ণ মুহূর্তের
আলোতে দেখলাম তার বুকটা যেন মৌসুমী সাগর।

তোতা কি নীরব হয়? মধ্যাকাশে উল্কা থেমে থাকে!
বিশ্বাস হয় না বলে বিকেলের সূর্য দ্যাখে তাকে।

সুরভি

মানিক মুখোপাধ্যায়

গহিন অন্ধকারের আমি
পরিখা বেয়ে বেয়ে
জানি না আজো এসেছি কদ্দুর,
গভীরতর অনুভূতির
প্রশ্ন ফেরে মনে
কবে যে দেবে পরশ রোদ্দুর!
জীবনে যতো বসন্তের
আর্ত হাহাকার
ব্যর্থ সে কি? চেতনা বলেঃ নয়,
প্রতীক্ষার বৃন্তে ফোটা
আশার রাঙা ফুলে
নেবে সে নেবে সৌরভের জয়॥

'শতকিয়া বৃহৎ উপন্যাস, এবং আধুনিককালের অন্তজ শ্রেণীর জীবন আলেখ্য হিসেবে অন্যতম সার্থক উপন্যাসও। ৪৭৫।৫৮

সাহিত্যালোচনা

সাহিত্যরুচি—সরোজ আচার্য। ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ২০৬, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। তিন টাকা।

গত ছ বছরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর মধ্য থেকে ষোলটি রচনাকে এই গ্রন্থে নির্বাচিত করা হয়েছে। অধিকাংশই সাহিত্য-সাহিত্যিকের মতবাদের সমালোচনা বা সমালোচনার সমালোচনা। প্রবন্ধগুলি আলোচনায় বা আয়তনে 'গুরুত্ব' প্রাপ্ত হয়নি, বরং স্বল্পপরিসরে সুভঙ্গিম পর্যালোচনায় রমনীয় হয়ে উঠেছে, প্রবন্ধের গণ্ডি অতিক্রম করে রচনা রসস্তরে উন্নীত হয়েছে। শ্রীযুক্ত সরোজ আচার্য নিজের পাণ্ডিত্যকে গোপন করে একজন রসজ্ঞ আস্বাদকের ভূমিকা গ্রহণ করে দ্রুতলয়ে বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সাহিত্য বিচারের যে দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থে রেখেছেন তা হৃদয়গ্রাহী এবং সমূহ প্রশংসনীয়। প্রায় রম্যরচনার ঢঙে লেখা এই অনুন্নাসিক রচনাগুলি সাহিত্য জগতের অত্যন্ত ঘরোয়া বিষয়গুলি নিয়ে স্বচ্ছ ও সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। রাজনীতি ও বিশেষ দলগত মনোভাবের স্পর্শ বাঁচিয়ে সাহিত্য পাঠকের রুচিকে জাগ্রত করবার এই প্রচেষ্টা ফলবতী হবে আশা করি। সরোজবাবুর শুধু রচনা-ভঙ্গিই নয় ভাষাটিও চিত্তাকর্ষক, পাঠককে সহজে কাছে টেনে নেয়।

গ্রন্থের শেষে একটি নির্ঘণ্ট থাকলে ভালো হত। তাছাড়া অধুনাতম বিদেশী লেখকদের নাম বা কোন কোন পরিচিত মত-মন্তব্য উল্লেখমাত্র ক'রে লেখক যেখানে প্রসঙ্গানুগমন ক'রে এগিয়ে গেছেন সেখানে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির কোন উপায় নেই; স্থানান্তরেও অন্তত যদি আলোচ্য উল্লেখের টীকা থাকতো তাহলে বাহুল্য তো হতই না, বরং সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য হত। দু একটি ছাপার ভুল নজরে পড়লো; বিশেষ করে দুটি প্রবন্ধে একাধিকবার 'ত্রিশ দশক' কথাটি ছাপা হয়েছে, ওটি নিশ্চয়ই তৃতীয় দশক হবে। ৪৯০।৫৮

অভিজ্ঞতার কাহিনী

খড়ির লিখন—সুকন্যা। প্রকাশক—নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২২, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১। দাম—২.৫০।

ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের রূপে প্রকাশ করার একটা রীতি অনেককাল ধরেই চলছে এবং মাত্র কয়েক বৎসরের ব্যবধানে বাংলা সাহিত্যেও কয়েকটি ভালো গ্রন্থ আমরা পেয়েছি। খড়ির লিখন সেই সার্থক রচনাবলীতে যুক্ত হওয়ার মতো একটি উপযুক্ত গ্রন্থ। সুকন্যা তাঁর শিক্ষয়িত্রী জীবনের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে হাসিকান্নায় মেশানো কয়েকটি ঘটনাকে এখানে প্রকাশ করেছেন। যে আশ্চর্য দক্ষতা থাকলে সকল কৌশলকে গোপন করে সহজ সাবলীলতা লেখায় আনা যায়, সেই দক্ষতা লেখিকার আছে বলেই খড়ির লিখন রিপোর্টাজে পরিণত না হয়ে সত্যিকার সাহিত্য হয়ে উঠেছে। মানুষ চেনার ক্ষমতা লেখিকার কি অসাধারণ, মণিকাদি, বাসীদিদি, সুরমাদি, সুলেখাদি রমলাদি কিংবা কাজলাদির কথা তিনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সমবেদনায় লেখিকার হৃদয় ভরপুর, তাই নারী-জীবনের অনেক অন্যায় অপরাধকে তিনি সাধারণের চোখ দিয়ে দেখতে পারেননি এবং প্রত্যেকের মনের ভেতরে প্রবেশ করার অবাধ অধিকার তিনি তাই অনায়াসেই পেয়েছেন।

তারই মধ্যে ছোটখাটো হাসিরস ঘটনা পাঠকের মনকে তরল হাসিতে ভরে তুলছে। এমন করুণ অথচ মধুর গ্রন্থ হাতে এলে পাঠকদের দুঃখ থাকবার কথা নয়। এ গ্রন্থ কেন উপন্যাস হয়ে এলো না, তার জন্য আফসোস করবার কথা পাঠকের একবারো মনে হবে না। ৪২২।৫৮

কিশোর-সাহিত্য

প্রাণী ও প্রকৃতি—বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। এক টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

বাঙ্গ কবিতা—রম্যরচনায় প্রখ্যাত বিমলাপ্রসাদ ছোটদের জন্যে প্রাণী, প্রকৃতিতত্ত্বের এই ছোট্ট বইখানির মধ্যে আর একটি ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কবিমন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গির যুগল মিলন হয়েছে, শুধু তাই নয়, ছোটদের কাছে কি করে জ্ঞানের কথাকে গল্প কথায় জমিয়ে দেওয়া যায় তার পরিচয়ও পাতিটি পৃষ্ঠায় রয়েছে। এক নিঃশ্বাসে বইটি পড়ে ফেলবার পরে বইটির আয়তন সম্বন্ধে অভিযোগ মনে আসে। বইটির মুদ্রণ ও চিত্র সংগঠনে প্রকাশক আরো মনোযোগী হলে ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে এর আকর্ষণ বেড়ে

যেতো। এক কথায়, বইটির জন্য লেখক এবং প্রকাশক আমাদের কাছে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ৪৮৭।৫৮

অনুবাদ

কাব্যে ধর্মপদ—অনুবাদকঃ শ্রীশশাঙ্কমোহন বড়ুয়া। প্রকাশক—শ্রীরবীন্দ্রবিজয় শ্রমণ, ১, বুদ্ধিস্ট টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৸৹ আনা।

ধর্মপদ বৌদ্ধ সাহিত্য ও ধর্মের ব্যাখ্যাই শুধু নয়, তার মধ্যে মানুষের জীবনচর্চার মূল সূত্রটিকে নানাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অনুবাদক সহজ সরল কাব্যে সেই বর্ণনাকেই বাংলা ভাষায় ধরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। বিষয়বস্তু সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার নেই, লেখকের কবিতাগুলো ভালো এবং কবিতা হিসেবেও এ রচনা পাঠকের কাছে ভালো লাগবে। ৩৫০।৫৮

প্রবন্ধ

বার্নার্ড শ'—শ্রীসত্যনারায়ণ চৌধুরী। প্রাপ্তিস্থান—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ১·৫০।

বিংশ শতাব্দীর লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক চরিত্র বোধ হয় জর্জ বার্নার্ড শ'। তাঁর সম্বন্ধে কত যে কাহিনী প্রচলিত আছে তার সীমা নেই। কিন্তু এই প্রখ্যাত লেখকটি সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় বিশেষ কিছু আলোচনা হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। অথচ অনুশীলনকারীদের বিশ্ব সাহিত্যের ওপর তাঁর প্রভাব কিছু কম নয়। বর্তমান সমালোচক কয়েকটি দিক দিয়ে বার্নার্ড শ'কে আলোচনা করেছেন। পাঠকদের সঙ্গে তাঁর মতামত সব জায়গায় হয়তো মিলবে না, তথাপি বলা যায়, তিনি স্বচ্ছভাবেই তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করতে পেরেছেন। ২১৬।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

পুঁথি পরিচিতি—আহমদ শরীফ।
সাময়িকী—অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়।
জোনাকি—ফয়েজ আহ্‌মদ।
রাঙামাটি—শ্রীভোলানাথ মোহান্ত।
কেলেঙ্কারী—বিরূপাক্ষ।
আমার ভালুক শিকার—শিবরাম চক্রবর্তী।
শতাব্দীর শিশু-সাহিত্য ১৮১৮—১৯১৮—খগেন্দ্রনাথ মিত্র।
সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা—ডাঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য।
বিজ্ঞান ঋষি জগদীশচন্দ্র—শুভেন্দু ঘোষ।
অপরাজিত (নাটক)—রমেন লাহিড়ী।

দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

দিন ছয়ের জন্য দিল্লী গিয়েছিলাম প্রথম তিনদিন কেটেছে কাজে, বাকি তিন রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রের সন্ধানে। এর আগে যতবার গেছি সে শুধু নির্দিষ্ট কর্তব্যের নির্দেশে, চাহিনি রহিতে বসে ফুরাইলে কাজ। ধারণা ছিল, সরকারী চাকুরেদের এই ঊষর মরুতে অবসরবিনোদন অপ্রশস্ত। লাটিনসের গড়া এই নয়াদিল্লীতে আর যাই থাক প্রাণ নেই। এখানে লোকে আসবে ক্ষমতার মরীচিকার টানে বা অন্যতর অনুল্লেখ্য সুযোগের সন্ধানে। এ নগরীর নিজস্ব কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, যতটুকু আছে তা একান্তই আরোপিত, বাইরে থেকে প্রক্ষিপ্ত। যুক্তি ছিল, কী করেই বা থাকবে? এ তো কারো আপন ভূমি নয়। এখানে কেরালা থেকে কেউ আসে জীবিকার প্রেরণায়, তার মন পড়ে থাকে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত মন্দিরে বা প্রান্তরে। বাঙগালী বাবু দিল্লীতে যান ওই একই কারণে, তাঁরও মন পড়ে থাকে বাংলার কোমল ভূখণ্ডের কোনো এক কোণে। দিল্লীর নিজের হৃদয় নেই, সে পায়ওনি কারো হৃদয়।

আজ আর আমি এত নিশ্চিত নই। আজ সন্দেহ করি, দিল্লী আর মাদ্রাজী বা বাঙগালীর সাময়িক নির্বাসনের স্থান নেই। তার নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠছে। সব বাঙগালী আর বাঙগালী থাকছে না। প্রথমত, বাঙলার টান কমেছে, দ্বিতীয়ত, দিল্লীর টান বেড়েছে। এমন বললেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে বহু দিল্লীবাসী পূর্বতন প্রাদেশিকতা পরিহার করে ভারতীয় হতে শুরু করেছেন। শুরু মাত্র।

*

তাই প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আজো স্পষ্ট। আজো স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়নি। পাঞ্জাবীদের জীবনধারার প্রভাব সর্বত্র দৃষ্ট। বাঙগালীর কালীবাড়িতে আজো ভিড়, দুর্গাপূজার সংখ্যাও নগণ্য নয়। দাক্ষিণাত্যের বন্ধুরা এখনও প্রধানত দাক্ষিণাত্যেরই সঙ্গে। এতে দোষেরও কিছু নেই বোধহয়। ভালো বাঙগালী হওয়ার সঙ্গে ভালো ভারতীয় হবার বিরোধ অবশ্যম্ভাবী নয়। দেশপ্রেম অতি উগ্র হলে তবেই সে বিশ্বপ্রেমের অরি। আমার বক্তব্য এই যে, প্রাথমিক আনুগত্যগুলির যে পরিমিতি ব্যতীত বৃহত্তর আনুগত্যের আয়ত্তীকরণ অসম্ভব তার লক্ষণ এখন লক্ষণীয়। আমি আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম এক দাক্ষিণী দম্পতির; একবারও মনে হয়নি, জলে পড়েছি। আশা করি আমার সুহৃদেরও মনে হয়নি, ডাকাত পড়েছে।

পরে দেখলাম, আমার বন্ধুর গৃহ সকল প্রদেশের সন্তানের জন্যই অবারিতদ্বার। আবিষ্কার করে আশ্বস্ত হলাম, এটা আর ব্যতিক্রম নয়। প্রাদেশিকতা সম্পূর্ণভাবে লোপ পায়নি। জাতিভেদ এখনো নিশ্চয়ই আছে। নানা রঙের বাঙগালী, ওড়িয়া, আসামী, গুজরাটী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি সব একদিন একটা ধূসর অভিন্ন ভারতীয়তায় পর্যবসিত হবে, এ বোধহয় বাঞ্ছনীয়ও নয়। তবু এও সত্য যে আমি সেই পরিমাণেই সর্বভারতীয় যে পরিমাণে আমি পুরোপুরি বাঙগালী নই, সেই পরিমাণেই আমি বিশ্বের নাগরিক যে পরিমাণে আমি শুধু ভারতীয় নই। আমি তো মাঝে মাঝে বাড়িয়ে বলি, নেহরু একমাত্র ভারতীয় কেননা তিনি ভারতীয়ই নন। দেখেছি, কেউ কেউ আমার উক্তির দ্বিতীয়

অংশ সানন্দে গ্রহণ করে প্রথমাংশ প্রত্যাখ্যান করেন।

*

আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার অপেক্ষাকৃত কম প্রীতিপ্রদ। এর নাম দেব : দি আন-ইমপর্ট্যান্স অব বীয়িং এ বেঙগলী। নয়াদিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত হয়েছে এই সেদিন। সেদিনও কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে বাঙগালীর স্থান ছিল সর্বাগ্রে। ভারতীয় রাজনীতিতে বাঙগালীর কণ্ঠ ছিল সশ্রদ্ধশ্রুত। আর আজ?

'বাঙগালী কোথায়?'—এই প্রশ্নের পূর্বনির্ধারিত উত্তর যে-সরোল বিলাপ ও আর্তনাদ ও অশ্রু বিসর্জন সম্প্রতি সংবাদপত্রবিশেষের প্রচার বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে তাতে যোগ দিতে আমি একান্তই অপারগ। প্রশ্নটির প্রকাশ্য উত্থাপনেই ব্যক্ত আছে বাঙগালীর ব্যর্থতার লজ্জাকর স্বীকৃতি। লজ্জা বহুগুণ বাড়ে যখন আপন অবরোহণের জন্য সকল দায়িত্ব স্তূপীকৃত করি অপরের মাৎসর্যের দরজায়, যখন একবারও স্মরণ করিনে যে আমার নিজের সামান্যতাও অতিসামান্য না হতে পারে। আমার গরব আমার আশা নিয়েও কবুল না করে পারব না, জীবনের একাধিক ক্ষেত্রে বাঙগালীর শ্রেয়তা আজ আর আদৌ স্বতঃসিদ্ধ নেই। সর্বপ্রকার প্রতিযোগিতায় তার শোচনীয় পরাজয়ের একমাত্র ব্যাখ্যা অন্যান্য প্রদেশের নির্দয়তা নয়। স্বভাবতই আমার বিচরণ সাধারণত সংবাদপত্রজগতে। সেখানে দক্ষ বাঙগালী ঠিক অগণ্য নয়, সেখানে মাদ্রাজী ও পাঞ্জাবীদের প্রতিপত্তি অন্তত নয়াদিল্লীতে আদৌ অনর্জিত নয়। সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব বড়ো ক্ষয়িষ্ণু সম্পত্তি, আলস্যে তার অপচয়। আর আমার বিশ্রামের সময় হয়তো আর সবাই শ্রম করেছে ক্লান্তিহীন। দিল্লীর সাংস্কৃতিক জীবন আজ নির্জীব নয় এবং সে জীবনে বাঙগালীর ভূমিকা অপ্রধান।

*

রাজনীতিক ক্ষমতার ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করে নয়াদিল্লী তার গুরুত্ব লাভ করেছে, দুষ্মন্তের দেয়া শকুন্তলার আংটি একদিন মাছের পেটে গেলে নয়াদিল্লীর পরিচয়ও আর কেউ জানবে না—এ সব উক্তিতে আমার প্রতিপাদ্যের পরিপূর্ণ খণ্ডন আছে বলে মনে করিনে। সমৃদ্ধির উৎস সন্ধান গোলমেলে কাজ : অন্য কিছু খুঁড়তে গেলেও বেরুবে হয়তো সাপ। আজকের অভিজাতের অতীত অনুধাবন করলে অত্যন্ত অনভিজাত কীর্তির প্রকাশন একেবারে অসম্ভব নয়। নগরের আভিজাত্যও পুরোপুরি ভিন্নরূপ না হতে পারে—যদিও এ প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো, দিল্লীর বয়স অনেক। কলকাতা শিশু।

আর ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সংস্কৃতির শত্রুতা সত্যি কিন্তু খুব বেশি নয়। বরং বলা যায় প্রথম দুয়ের অবনতি ঘটলে তৃতীয়ের সমারোহ শীঘ্রই ঘনিয়ে আসে, অন্তত তৃতীয়ের বিশ্বপ্রতিপত্তি। ফরাসী দৃষ্টান্ত কারোই অজানা নেই, যেমন অজানা নেই কেন এত শত বিদেশী আজ রুশভাষা শিখতে উৎসাহী। ইংরেজ একদিন পৃথিবীর প্রতি কোণে তার রাজত্ব বিস্তার না করলে তার ভাষার এমন প্রসার সম্ভব হত না নিশ্চয়ই এবং মার্কিন ভাষা মোটামুটি অনুরূপ না হলে হয়তো বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্যাস্তের সঙ্গে ছায়া পড়ত ইংরেজী ভাষার উপরও—যেমন আজ পড়ছে ফরাসী ভাষার উপর। হিন্দীভাষীদের ঔদ্ধত্যও কি অংশত ভারতীয় রাজনীতির উপর উত্তর-ভারতী প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল নয়? দিল্লীতে কেবলই মনে হচ্ছিল : বাঙগালীর বর্তমান অভিমান কিছুটা অযৌক্তিক, কিছুটা অশোভন—এবং একেবারেই অনর্থক।

স্মরণীয় সৃষ্টি

পৌরাণিক ছবি এদেশে নিয়মিতভাবেই তোলা হয়। সাধারণ দর্শকের ভক্তিপ্রবণতার সুযোগ নিয়ে কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে কার্যোদ্ধার করার দিকেই বেশীর ভাগ প্রযোজকের ঝোঁক। এই নিয়মের উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম দেখা গেল এমকেজি প্রোডাকসন্সের "কংস"-তে।

একটি অতিপরিচিত কাহিনীকে রুচিসঙ্গত পৌরাণিক আবেষ্টনের মধ্যে একান্ত নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে এই ছবিতে রূপ দেওয়া হয়েছে। নির্মাতারা তার জন্যে উপযুক্ত অর্থব্যয় করতে যেমন কার্পণ্য করেননি, তেমনি উপযুক্ত শিল্প-প্রেরণার অভাব ঘটেনি তাঁদের কাছে। ফলে একটি উচ্চশ্রেণীর সর্বরস-সমন্বিত ছবি হয়েছে "কংস"—যা দেখে ভক্তেরা তো তুষ্ট হবেনই অন্য শ্রেণীর দর্শকরাও কম খুশি হবেন না।

জনমানসে কংসের যে রূপ প্রতিফলিত তা' অত্যাচারী এক দুর্দ্ধর্ষ দানবের। এই ছবিতে চরিত্রটির একটি যুক্তি-গ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবে পুরাণসম্মত। কংস মথুরার রাজা উগ্রসেনের পুত্ররূপে পরিচিত হলেও তার জন্ম হয় দৈত্য দ্রুমিলের ঔরসে। উগ্রসেনের ছদ্মবেশে মায়াবী দানব রাণী পদ্মাবতীকে ছলনা করার ফলে কংসের জন্ম।

যেদিন কংস তার লজ্জাকর জন্ম বৃত্তান্ত জানতে পারে, সেদিন তার মন নিদারুণ বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। অত্যাচারের মধ্য দিয়ে

চন্দ্রশেখর

সে তার শোধ তুলতে চায় জগৎ-সংসারের কাছ থেকে। বৃদ্ধ উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করে পিতার জীবদ্দশাতেই সে মথুরার সিংহাসন অধিকার করে বসে। রাণী পদ্মাবতী স্বামীর অনুগামিনী হন স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে।

কংসের স্বৈরাচারে মথুরাবাসীদের মনে বিপ্লবের বহ্নি যখন ধূমায়িত, তখন অহিংসার বাণীতে তাদের শান্ত করতে এগিয়ে এলেন বসুদেব। বিক্ষুব্ধ জনতার ওপর তাঁর অসীম প্রভাব দেখে মহামাত্য অক্রুরের পরামর্শে কংস ভগিনী দেবকীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিয়ে জনক্রোধ প্রশমিত করবার এক রাজনৈতিক চাল চাললো। কিন্তু তার সকল কৌশল ব্যর্থ করে দৈববাণী হলো যে দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কংসকে নিধন করবে। প্রাণভয়ে দেবকীর স্নেহশীল অগ্রজ দেখা দিল তার হন্তারকরূপে। দেবকীর প্রত্যেকটি সন্তানকে জন্মের সঙ্গে সঙ্গে কংসের হাতে তুলে দেবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসুদেব কোনরকমে নবপরিণীতা পত্নীর প্রাণ রক্ষা করলেন। তবে কংসের আদেশে কারাবরণ করতে হল দেবকী ও বসুদেবকে।

তার পরের ইতিহাস সুবিদিত। একে একে ছ'টি নবজাত সন্তানের মৃত্যুর পর কারাবাসী স্বামী-স্ত্রীর সপ্তম সন্তান দেবকীর গর্ভ থেকে সঞ্চারিত হলো বসুদেবের প্রথমা স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে। এই সন্তানই কৃষ্ণের অগ্রজ বলরাম। যেদিন কৃষ্ণ জন্ম নিলেন দেবকীর ক্রোড়ে, সেদিন দৈবাদেশে বসুদেব তাকে গোপরাজ নন্দের ঘরণী যশোমতীর সদ্যজাতা কন্যার সঙ্গে বদল করে সেই কন্যাকে নিয়ে এলেন কংস কারাগারে। এই কন্যাকে আছড়ে মারতে

রূপজ্যোতির "ঠাকুর হরিদাস" চিত্রে শ্রীমান বিভুকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে

"রাজধানী থেকে" কে আসছেন? উৎপল দত্ত, না কালী বন্দ্যোপাধ্যায়? ছবিটির মধ্যে এর উত্তর রয়েছে।

গিয়ে কংস শুনলো তার চরম মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞা ঃ তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।

গোকুলের ঘরে ঘরে নবজাত শিশুর সন্ধান সুরু হলো। কৃষ্ণ বলরামকে নিয়ে নন্দ সদলে আশ্রয় নিলেন অরণ্যের মধ্যে। বৃন্দাবনের পত্তন হলো সেখানে।

কৃষ্ণ বলরাম যখন বড় হয়ে উঠেছেন, তখন কংস জানতে পারলো তাদের আসল পরিচয়। তার আগেই এই দুই গোপ বালক কংস প্রেরিত একাধিক দৈত্য-দানবকে সংহার করেছে। কংস নতুন কৌশলের আশ্রয় নিলো এবার। মথুরায় এক বিরাট ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করে কৃষ্ণ-বলরামকে আমন্ত্রণ পাঠালো চতুর কংস। তারপর কৃষ্ণকে মারতে গিয়ে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে সে নিজেই হলো হত। মৃত্যুর আগে কংস বলে গেল যে শত্রুরূপেই সে এতদিন বিষ্ণুর ভজনা করে এসেছে, বিদ্বেষের আবরণে সে অঞ্জলিই দিয়েছে তাঁর পায়ে।

• • •

প্রফুল্ল রায় রচিত কাহিনীকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করেছেন সুনীলকুমার বসু-মল্লিক এবং এমকেজি ইউনিটের পরিচালনায় তা হৃদয়গ্রাহী রূপ নিয়েছে ছবির পর্দায়। এঁদের দুপক্ষকেই প্রশংসা করতে হয় এঁরা যেভাবে পৌরাণিক কাহিনীর নাটকীয় উপাদানকে আধুনিক রুচিগ্রাহ্য করে ছবির পর্দায় হাজির করেছেন সেইজন্যে। এর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার কিছু কিছু অংশ সন্নিবেশিত হওয়ায় মধুর রসেরও অভাব ঘটেনি এছবিতে।

কংসের ভূমিকায় কমল মিত্রের অভিনয় তাঁর নটজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বল্লে অত্যুক্তি করা হবে না। চলনে-বলনে, আচারে-ব্যবহারে, অন্তর্দ্বন্দ্বের সুনিপুণ প্রকাশে পুরাণের চরিত্র রক্ত-মাংসের রূপ নিয়েছে অভিনেতার রূপদক্ষতায়। নবাগত বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে চমৎকার মানিয়েছে কৃষ্ণের ভূমিকায়। সুগঠিত দেহ ও মধুর বাচন-ভঙ্গী তাঁর অভিনয়ের সাফল্যকে অনেক-দূর এগিয়ে দিয়েছে। অক্রূরবেশী অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালো লাগে তাঁর আত্ম-সমাহিত অভিব্যক্তির জন্যে।

দীপ্তি রায় কংস-বনিতা অস্তি ও প্রাপ্তি এই দুই যমজ ভগিনীর দ্বৈত ভূমিকায় নেমেছেন। একজন প্রাণবন্যায় উচ্ছল, অপরজন শান্ত মাধুর্যের প্রতিমূর্তি। চরিত্র দুটির বৈপরীত্য নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন দীপ্তি রায়। জহর গাঙ্গুলী ও মলিনা দেবী উগ্রসেন ও পদ্মাবতীর ভূমিকায় চরিত্রোচিত অভিনয় করেছেন। নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও ভারতী দেবী সম্বন্ধেও ঐ এক কথাই বলা যায়। এঁরা সেজেছেন যথাক্রমে দেবকী ও বসুদেব। গোপরাজ নন্দের ভূমিকায় গুরুদাস কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন তাঁর আধা-পাগলা অভিব্যক্তির জন্যে। যশোমতী চরিত্রের

সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি "অপুর সংসার"-এর নায়ক ও নায়িকা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় (অপু) ও শর্মিলা ঠাকুর (অপর্ণা)।

তবু খানিকটা মর্যাদা রেখেছেন পদ্মা দেবী।

এ ছবিতে পার্শ্ব চরিত্রের সংখ্যা অনেক। তাদের অধিকাংশই সুঅভিনীত।

দৃশ্যপটের জাঁকজমকে "কংস" বাংলা পৌরাণিক ছবির ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। মথুরার রাজপথ, বাজার, কংসের রাজপ্রাসাদ, মল্লক্ষেত্র প্রভৃতি শিল্প-নির্দেশকের পরিচ্ছন্ন শিল্পবুদ্ধির পরিচায়ক। ক্যামেরার কাজও এককথায় সুন্দর। এর একাধিক 'ট্রিক শট' বাহবা-পাবার উপযুক্ত। আঙ্গিকের অন্যান্য বিভাগেও যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় রয়েছে।

"কংসে"র সুরকার অনিল বাগচী অকুণ্ঠ প্রশংসা পাবেন এ ছবিতে তিনি সুরের যে সমারোহ দেখিয়েছেন সেইজন্য। প্রত্যেকটি গান সংগীত এবং অধিকাংশ সুরই মার্গাশ্রয়ী।

সব দিক দিয়েই "কংস" বাংলা ছবির জগতে একটি স্মরণীয় সৃষ্টি।

চিত্রালোচনা

এ হপ্তায় চারখানি নতুন ছবির মুক্তি। কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই—এই তিনটি প্রধান কেন্দ্রের চিত্রশিল্পের প্রতীক এগুলি।

কলকাতায় তোলা বাংলা ছবি 'রাজধানী থেকে' গোগোলের বিশ্ববিখ্যাত ব্যঙ্গনাট্য 'ইনস্পেক্টর জেনারেলে'র ভাবানুবাদ। মৃণাল সেন এর চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং ছবির পর্দায় তাকে রূপান্তরিত করেছেন নবীন পরিচালক নির্মল মিত্র। উৎপল দত্ত, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু দে, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনেকগুলি নামকরা রঙ্গাভিনেতার সমাবেশ হয়েছে এর ভূমিকালিপিতে। নচিকেতা ঘোষ সংগীত পরিচালনা করেছেন।

জাঁকজমকে ভরা মাদ্রাজী ছবি 'সুবর্ণ-সুন্দরী' হিন্দী চিত্রপ্রিয়দের চিত্তবিনোদন করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে। দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় জুটি—অঞ্জলি দেবী ও নাগেশ্বর রাও—এর নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে বোম্বাইয়ের বহু বিখ্যাত তারকা এই ছবিতে নেমেছেন। তাঁদের মধ্যে শ্যামা, কুমকুম, বিপিন গুপ্ত, রণধীর, আগা, সাপ্রু, ধুমল, মুকরি, নিরঞ্জন শর্মা, রাধাকিষণ, ডেজি ইরানী

প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। আদি নারায়ণ রাউ ছবিখানির প্রযোজক ও সংগীত পরিচালক। পরিচালনা করেছেন ভি রাঘবৈয়া।

পাদ্মিনী, রাগিণী, শিবাজী গণেশ—দাক্ষিণের ছবির জগতে এ'রা এক একজন দিকপাল। এ'দের একত্র সমাবেশ ঘটেছে মাদ্রাজে-তোলা আর একখানি হিন্দী ছবিতে। তার নাম 'শিতমগড়'। নাচ-গান হাসি-হুল্লোড় বীর ও মধুর নানা রসের সমন্বয়ে গঠিত এই ছবির অন্যান্য ভূমিকায় আছেন, কনাম্বা, নাম্বিয়ার, তংগভেলু ও হেলেন। টি প্রকাশ রাওয়ের পরিচালনায় গৃহীত এই ছবিতে সুরযোজনা করেছেন জি রামনাথন।

এ হপ্তার চতুর্থ চিত্র 'পঞ্চায়েৎ' বোম্বাইয়ের অবদান। 'ভাবী'-খ্যাতা লাণ্ডারী বাঈ এর নায়িকা। তাঁর বিপরীতে অন্যান্য মুখ্য চরিত্রে চিত্রাবতরণ করেছেন শ্যামা, রাজকুমার ও জবীন। কুলদীপ সেগল প্রযোজিত এই ছবির পরিচালনা ও সুরসৃষ্টির কৃতিত্ব যথাক্রমে লেখরাজ ভকরী ও ইকবাল কুরেশীর প্রাপ্য।

'রাজধানী থেকে'র নির্মাতা ছায়াচিত্রম্। 'সুবর্ণসুন্দরী' ও 'শিতমগড়' তুলেছেন যথাক্রমে অঞ্জলি পিকচার্স ও ভেনাস পিকচার্স—দুটিই মাদ্রাজের প্রতিষ্ঠান। **'পঞ্চায়েৎ'** বোম্বাইয়ের হসনীরিস্তানের নিবেদন।

* * *

একটি চিত্রগৃহে একাদিক্রমে পঞ্চাশ সপ্তাহ ধরে প্রদর্শিত হবার গৌরব অর্জন করলো এ ভি এম প্রোডাকসন্সের 'ভাবী' এ হপ্তায়। ছবিটি যেখানেই প্রদর্শিত হয়েছে সেখানেই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কলকাতায় ছবিখানির সাফল্য কিন্তু আর সব জায়গার তুলনায় অনেক বেশী। এই বছরের গোড়ার দিকে রক্সি সিনেমায় 'ভাবী' মুক্তি পায়। বছর শেষ হতে চললো, এখনও কিন্তু ছবিখানির জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। স্মরণযোগ্য ঘটনা এটি। আগামী হপ্তায় এর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হবে যথোচিত আড়ম্বরের সঙ্গে। 'ভাবী'র যাঁরা নির্মাতা ও কলাকার তাঁরা সকলেই আসছেন এই উৎসবে যোগ দিতে।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রতিটি ছবিতে নতুন নতুন শিল্পীর সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় ঘটিয়েছেন। প্রোডাকসন সিণ্ডিকেটের নবতম চিত্রার্ঘ 'নৌকাবিলাসে'ও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈচিত্র্যের মধুরতম নিদর্শন এই নৌকাবিলাস—যার মধ্যে রয়েছিল রাধাকৃষ্ণের শত বছরের বিরহের অবসান। এই যুগল ভূমিকায় দর্শকরা দেখতে পাবেন দুটি সম্পূর্ণ নতুন মুখ—শ্রীরাধার ভূমিকায় অনুরাধা গুহ এবং শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় মিহির মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য প্রধান চরিত্রে আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (বৃন্দা), অনুপকুমার (সুবল), নিভাননী (জটিলা), পূর্ণিমা (কুটিলা), পদ্মাদেবী (বড়িমাই) প্রভৃতি। পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সুর এবং গেভাকলারে গৃহীত নৌকাবিলাস ও যুগলমিলনের দৃশ্যগুলি এই ছবির অতিরিক্ত আকর্ষণ। ছবিটি বর্তমানে মুক্তির প্রতীক্ষা করছে।

* * *

কার্তিক চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায়

নালন্দা ফিল্মসের বৌদ্ধযুগীয় চিত্র "আম্রপালী"র একটি দৃশ্যে সুপ্রিয়া চৌধুরী ও দীপক মুখোপাধ্যায়।

চিত্রাঞ্জলি পিকচার্সের 'অন্ধ জঙ্গল'-এর চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে। এর অধিকাংশ বহির্দৃশ্য নেওয়া হয়েছে সুন্দর বন ও বাদা অঞ্চলে। মনোজ বসুর এই বহুপঠিত গল্পের চিত্ররূপে প্রকৃতির দুই দুলাল-দুলালীর ভূমিকায় অসীমকুমার ও মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দর্শকদের নতুন করে ভাল লাগবে। সন্ধ্যা রায়কেও একটি বিশিষ্ট চরিত্রে দেখা যাবে। বর্তমানে ছবিখানির সম্পাদনা চলছে। রবীন চট্টোপাধ্যায় এর সুরকার।

নাট্যাভিনয়

চার দিনব্যাপী নাট্যোৎসবে শিশিরকুমার ভাদুড়ি

গত সপ্তাহে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত নবা বাঙলা নাট্য পরিষদের চারদিনব্যাপী নাট্যোৎসব এখানকার রঙ্গজগতের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নাট্য আন্দোলনের উন্নতিকল্পে গঠিত এই নূতন সংস্থা নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়িকে উৎসবের নাটক তিনটিতে উপস্থিত করে রসিকজনের সাধুবাদ পেয়েছেন। 'মাইকেল মধুসূদন,' 'ষোড়শী' ও 'বিজয়া' এই তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়; উৎসবের প্রথম ও শেষ দিন (১১ই ও ১৪ই ডিসেম্বর) 'মাইকেল মধুসূদন' এবং বাকী দুদিন যথাক্রমে 'ষোড়শী' ও 'বিজয়া' অভিনীত হয়।

সাধারণ রঙ্গালয় থেকে অবসর গ্রহণের

পর নাট্যাচার্য মাঝে মাঝে পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু শ্রীরঙ্গম ছাড়ার পর একাদিক্রমে চার রাত ধরে তাঁর অভিনয় এই প্রথম। শিশিরবাবুর বয়স এখন প্রায় সত্তর, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, সাধারণ স্বাস্থ্যও যথেষ্ট ভালো নয়। এ-অবস্থায় তাঁর চার রাত অভিনয়ের কথা বুঝি ভাবাই যায় না। উদ্যোক্তারা অসম সাহসের কাজ করতে যাচ্ছেন, উৎসবের আগে এ-কথা সম্ভবত অনেকেই মনে করেছেন। সুখের বিষয়, পরিষদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে। সার্থক হয়েছে নাট্যাচার্যের অভিনয়ে এবং সহস্র দর্শকের গুণগ্রাহিতায়।

শহরের নাট্যরসিকরা অনেক দিন পরে শিশিরবাবুর অভিনয় দেখার এই সুযোগ হারাননি। যাঁরা নাট্যাচার্যের অভিনয় আগে দেখেছেন, তাঁরা সাগ্রহে এসেছেন, সে-সুযোগ ইতিপূর্বে যাঁদের হয়নি তাঁরাও ছোট-বড়, বাঙালী-অবাঙালী সকলে মিলে চারদিনই প্রেক্ষাগৃহটি ভরিয়ে রেখেছেন। তার পর ঘরে ফিরেছেন ভরা মন নিয়ে। মঞ্চ-ব্যবস্থা এবং প্রেক্ষাগৃহের শতেক ত্রুটি সত্ত্বেও এ-জিনিস সম্ভব হয়েছে।

“বিজয়া” নাটকে রাসবিহারীর রূপসজ্জায় শিশিরকুমার ভাদুড়ি।

শিশিরকুমার ভাদুড়িকে দেখা গেল তিনটি বিভিন্ন চরিত্রে। প্রথম নাটকে তিনি মধু-কবির রূপসজ্জায়—যিনি বাঙলার সাহিত্যক্ষেত্রে একদা নূতন যুগ এনেছেন, আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন, সৃজন প্রতিভাকে নানা দিকে বিকীর্ণ করে দিয়েও শেষ পর্যন্ত যিনি কর্তব্য সমাপন না করার মনোযন্ত্রণায় দগ্ধ হয়েছেন। যে প্রতিভাধর কোন ব্যাপারেই হিসাব করে চলতে শেখেননি, অনিয়মের চূড়ান্ত প্রায়শ্চিত্ত যাঁকে প্রায় সারা জীবন ধরে, বিশেষ করে শেষ জীবনে করতে হয়েছে, নাট্যাচার্য তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক, তাঁর বেদনা, তাঁর শিল্পজনোচিত মহত্ত্বের চিত্র দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন। এক কথায়, এক প্রতিভাধরকে আমরা দেখেছি আর এক বেদনাহত প্রতিভাধরের চরিত্রে। এ-ভূমিকায় শিশিরবাবু তাঁর অননুকরণীয় কণ্ঠে শেকসপীয়র, মিল্টন, কালিদাস এবং মাইকেলের কাব্যাংশ আবৃত্তি করবার অবকাশ পেয়েছেন। দর্শকরা তাতে যে আনন্দ পেয়েছেন, সে-কথা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয় নাটক শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী'তে তিনি হয়েছেন জীবানন্দ। একদা বাহিরের শক্তিতে বলী, উচ্ছৃঙ্খল জীবানন্দ কিভাবে তার পূর্বপরিণীতা অলকাকে (ষোড়শী) জোর করে দাবি করতে গিয়ে জীবনের নূতনতর অর্থ খুঁজে পেল তা-ই নিয়ে এই নাটক। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে অসাধারণ এই চরিত্রটি নাট্যাচার্যের অপূর্ব অভিনয়ে মূর্ত হয়েছে। নাটকের মহৎ, মানবীয় আবেদন তিনি সহজেই দর্শকের মর্মে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। জীবানন্দের বেদনা ও আত্মোপলব্ধির ভাগ নিয়ে দর্শক মহৎ আনন্দের স্বাদ পেয়েছেন।

তৃতীয় নাটক শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া'তে শিশিরবাবু কুটিল রাসবিহারীর ভূমিকায় রূপ দিয়ে দর্শকদের বুঝতে দিয়েছেন, সৎ-অসৎ সব রকম চরিত্র বিশ্লেষণে তাঁর ক্ষমতা আজও অসাধারণ।

নাট্যাচার্যের সঙ্গে প্রথম দুটি নাটকে 'মাইকেল মধুসূদন' ও 'ষোড়শী'তে অভিনয় করেছেন রেবা দেবী। আঁরিয়েত ও ষোড়শী দুটি চরিত্রেই তাঁর অভিনয় প্রশংসনীয়।

টাইম ফিল্মসের প্রথম নিবেদন “চাওয়া পাওয়া”-তে ছবি বিশ্বাস ও উত্তমকুমারকে যথাক্রমে সংবাদপত্রের মালিক ও রিপোর্টারের ভূমিকায় দেখা যাবে।

গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত দল আই পি টি এ প্রান্তিক শাখার প্রতিনিধির হাতে গিরিশচন্দ্রের মূর্তি অংকিত শীল্ড তুলে দিচ্ছেন বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি অহীন্দ্র চৌধুরী

গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল

গত শনিবার (১৩ই ডিসেম্বর) বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার (১৯৫৮) ফলাফল ঘোষণা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।

প্রথমে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীরাসবিহারী সরকার প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়ে বলেন যে, এই প্রতিযোগিতায় দেখা গেল যে শৌখীন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি বিদ্যমান। এই শক্তি নাট্যজগতের শীর্ণ স্রোতধারাকে বেগবতী করে নূতন খাতে বইয়ে দিতে পারে।

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী পেশাদার মঞ্চ কর্তৃক নাট্য উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ ও নাট্য প্রতিযোগিতাকে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে অভূতপূর্ব ও অভিনব বলে অভিনন্দিত করেন।

প্রতিযোগিতার ফলাফল নীচে দেওয়া হলোঃ—

প্রথম স্থানাধিকারী সংস্থা—গিরিশ পুরস্কার—গণনাট্য সংঘ (প্রান্তিক শাখা)—নাটক : 'সংক্রান্তি'।

দ্বিতীয় স্থানাধিকারী সংস্থা—রসরাজ অমৃতলাল পুরস্কার—অভ্যুদয়—নাটক : 'বারো ঘণ্টা'।

শ্রেষ্ঠ টিমওয়ার্ক—তিনকড়ি চক্রবর্তী পুরস্কার—গণনাট্য সংঘ (প্রান্তিক শাখা)।

শ্রেষ্ঠ নাট্যকার—মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার—শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায়।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক—অপরেশচন্দ্র পুরস্কার—শ্রীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

শ্রেষ্ঠ আলোকশিল্পী—ধর্মদাস পুরস্কার—শ্রীতাপস সেন (ইনি অন্যতম বিচারক থাকায় পুরস্কার পাবেন না)।

শ্রেষ্ঠ রূপসজ্জাকর—বামনদাস পুরস্কার—শক্তি সেন।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা—দুর্গাদাস পুরস্কার—জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়।

শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা—অর্ধেন্দু মুস্তফি পুরস্কার—তমাল লাহিড়ী।

শ্রেষ্ঠ টাইপ চরিত্রাভিনেতা—অমর দত্ত পুরস্কার—সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী—তারাসুন্দরী পুরস্কার—রেবা রায়চৌধুরী।

শ্রেষ্ঠা সহ-অভিনেত্রী — প্রভাদেবী পুরস্কার —কল্পনা রায়।

শ্রেষ্ঠা টাইপ চরিত্রাভিনেত্রী—বিনোদিনী পুরস্কার—নন্দিতা দেবী।

শ্রেষ্ঠা গায়িকা—নরীসুন্দরী পুরস্কার—প্রতিমা দাশগুপ্তা।

শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক, শ্রেষ্ঠ নৃত্য পরিচালক, শ্রেষ্ঠ নর্তক, শ্রেষ্ঠা নর্তকী ও শ্রেষ্ঠ গায়ক হিসেবে কাউকেই পুরস্কার দেওয়া হয়নি এই সব বিভাগে যথোচিত উচ্চ মানের পরিচয় না পাওয়ায়।

এই প্রতিযোগিতায় ১৩২টি শৌখীন নাট্য সংস্থা নাটক পাঠান। তাদের মধ্য থেকে ৩৫টি দলকে অভিনয় করবার জন্যে বেছে নেওয়া হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে প্রতি শনিবার এদের অভিনয় চলে। শীর্ষস্থানীয় চারটি দলকে সবশেষে পুনরভিনয়ের সুযোগ দেওয়া হয় চূড়ান্ত বিচারের জন্যে। উপরের ফলাফল তারপর ঘোষিত হয়।

পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলন

আগামী ৩রা থেকে ৬ই জানুয়ারী নবমিলনের পরিচালনায় পূর্ব কলিকাতা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলনের প্রথম দিনটি বঙ্গ সংস্কৃতি দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হবে। বঙ্গ সংস্কৃতির বহুবিচিত্র আঙ্গিককে রূপায়িত করবেন দেবব্রত বিশ্বাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে, নির্মল চৌধুরী ও সম্প্রদায়, কবিয়াল শেখ গোমানী ও লম্বোদর চক্রবর্তী প্রমুখ শিল্পীরা রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদের গান, কীর্তন, লোকসংগীত ও কবিগানের মাধ্যমে। এ ছাড়া মার্গ সংগীতের আসরে অংশ গ্রহণের আমন্ত্রণ এ পর্যন্ত যে সমস্ত শিল্পী গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে বিনায়ক রাও পটুবর্ধন, তারাপদ চক্রবর্তী, ভীমসেন যোশী, সুনন্দা পট্টনায়ক, শিবশংকর মুখোপাধ্যায়, কেরামতুল্লা খাঁ, রাজীবলোচন দে প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চারদিনব্যাপী এই সম্মেলনের মূল সভাপতি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

দক্ষিণী

নিজস্ব শিক্ষিতগোষ্ঠী নিয়ে 'দক্ষিণী' আগামী ২৮শে ডিসেম্বর সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে তাঁদের বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। এই অনুষ্ঠানের প্রথমার্ধে 'ভরত-নাট্যম', 'কথাকলি'ও 'মণিপুরী' পদ্ধতির বিভিন্ন নৃত্যকলা এবং দ্বিতীয়ার্ধে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের প্রথম অংশ পরিবেশিত হবে। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য পরিবেশনের প্রচেষ্টা দক্ষিণী'র এই প্রথম। নৃত্যাংশ পরিচালনা করবেন মাধবী রায় ও মঞ্জুলিকা দাশ।

একলব্য

ইংলিশ চ্যানেলের দুর্জ্ঞেয় রহস্য

ভারতীয় উপমহাদেশের দুইজন সাঁতারু, পাকিস্থানের ব্রজেন দাশ ও ভারতের মিহির সেন ভয়াবহ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করবার পর চ্যানেল পার হবার পক্ষে কোন্ পথটা সোজা এই নিয়ে এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। দুইজন সাঁতারু চ্যানেল পার হয়েছেন দুই পথে। ব্রজেন দাশ ফ্রান্সের 'কেপ গ্রিজ-নেজ' থেকে সাঁতার আরম্ভ করে অপর পারে ইংলণ্ডের ডোভারে পৌঁছেছেন, আর মিহির সেন ফ্রান্সের উপকূলে পৌঁছেছেন ইংলণ্ডের ডোভার থেকে সাঁতার আরম্ভ করে। অবশ্য ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কাটা বেশী কষ্টসাধ্য এ কথা কেউই বলেনি। বিতর্কটা আরম্ভ হয়েছে তখন যখন মিহির সেন নিজেই বলতে আরম্ভ করেছেন ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ডে সাঁতার কেটে পার হবার চেয়ে ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সাঁতার কাটা বেশী কষ্টসাধ্য।

বিতর্কের ব্যাপারে পরে ঘুরে আসছি। তার আগে বলি—ভয়াবহ ও বিপদসংকুল ইংলিশ চ্যানেলের হিমশীতল জলে সাঁতার কেটে চ্যানেল পার হবার প্রচেষ্টাকে সবাই দুর্জয়ের অভিযান বলেই মনে করে। যাদের অজানাকে জানবার আগ্রহ আছে, দুর্জয়কে জয় করার বাসনা আছে, আছে অ্যাড্‌ভেঞ্চারের উন্মাদ নেশা, তাদের পক্ষেই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের প্রচেষ্টা সম্ভব। যদিও আজ পর্যন্ত বিশ্বের শত শত সাঁতারু ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের প্রচেষ্টা করেছেন, সাফল্যও অর্জন করেছেন বহুসংখ্যক সাঁতারু, কেউ কেউ দুই পথে ৪ বার করেও চ্যানেল জয় করেছেন, এমন কি, কয়েকজন তরুণী সমেত ১৭ বছরের ক্যানাডিয়ান তরুণী সাঁতারপটিয়সী মেরিলিন বেলের পক্ষেও চ্যানেল জয় করা সম্ভব হয়েছে—তবু বলি, বহুজনের সাফল্য সত্ত্বেও ইংলিশ চ্যানেলে অভিযান দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, আর দুস্তর পারাবারের অভিযানেরই নামান্তর। তাই 'ঘরকুনো' দু' বাঙালী দুর্জয় ইংলিশ চ্যানেল জয়ের কৃতিত্ব অর্জন ক'রে সমগ্র বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসীর কাছে জাতীয় বীরের সম্মান লাভ করেছেন। এর মধ্যে কোন্ পথ অপেক্ষাকৃত সোজা আর কোন্ পথ বাঁকা সেটা বড় কথা নয়। কে ক'দিন আগে আর কে ক'দিন পরে চ্যানেল জয় করেছেন সে প্রশ্নও অবান্তর।

এখন কথা হচ্ছে, কারো কৃতিত্বকে খাটো করবার জন্য যেমন এক শ্রেণীর লোকের অভাব নেই, তেমন কারো কৃতিত্বের বড়াইকে জাহির করে তাতে রঙ ফলানোর চেষ্টা করারও লোকের অভাব নেই। আবার কৃতিত্ব অর্জন না করেও কৃতিত্বের দাবী করার ঘটনাও বিরল নয়। চ্যানেল সাঁতারের ইতিহাসে এমন ঘটনাও আছে যে, চ্যানেল জয় করেননি অথচ চ্যানেল জয়ের কৃতিত্ব দাবী করেছেন। আবার কেউ রেকর্ড করে তার স্বীকৃতি পাননি এমন ঘটনাও দেখা গেছে। যেমন 'ওয়ার্লড অ্যালমানাকে'র বিবরণ অনুযায়ী ইটালীর সাঁতারু গিয়ান্নি গাম্বি ১৯৪৮ সালে ইংলণ্ড থেকে সাঁতার কেটে ফ্রান্সে পৌঁছেছেন সবচেয়ে কম (১২ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট) সময়ে। কিন্তু চ্যানেল সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন গাম্বির রেকর্ড স্বীকার করেননি।

মিহির সেনের কৃতিত্ব সম্পর্কে আমাদের কাছে কয়েকখানা চিঠি এসেছে। ইংলণ্ড থেকে অপেক্ষাকৃত কঠিন পথে যাত্রা শুরু করে এশিয়ার প্রথম সাঁতারু হিসাবে চ্যানেল অতিক্রম করায় কেউ তার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাকে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সাঁতারুর মর্যাদা দিয়েছেন। সোজা পথে পাঁচবার ব্যর্থতার পর তথাকথিত কঠিন পথে চ্যানেল জয় করে সেই কৃতিত্ব ফলাও করায় কেউ বা শ্রী সেনকে উপহাস করতে কসুর করেননি। ফলে কোন্ পথ সহজ আর কোন্ পথ দুরূহ তাই নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্ক যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন সে সম্বন্ধে আলোচনারও প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে, এ সম্বন্ধে আমার উপরও একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে। ইংলিশ চ্যানেল পার হবার পক্ষে কোন্ পথ সহজ আর কোন্ পথ কঠিন সেই সম্পর্কে পত্রপ্রেরকদের সন্দেহ সন্নিহান হয় 'দেশের' পরবর্তী সংখ্যায় (৬ই ডিসেম্বর ৫৮, ৬ সংখ্যা) আমরা শ্রী সেনের কাছে ইংলিশ চ্যানেলের টেকনিক্যাল তথ্য জানতে চেয়েছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম, কোন্ পথে কতটুকু সুবিধা অসুবিধা আছে তারই তথ্য। শ্রী সেনকে অশেষ ধন্যবাদ, তিনি স্বয়ং আমাদের অফিসে এসে এ সম্বন্ধে আলোচনা করে গেছেন। দুর্জ্ঞেয় ইংলিশ চ্যানেল সম্পর্কে তার কিছু কিছু পুঁথিপত্রও আমাদের দেখার সুযোগ ঘটেছে। বিতর্কের মধ্যে যাবার ভয়ে নিজে কোন বিবৃতি দেননি।

শ্রী সেনের সঙ্গে আলাপ করে এবং চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশনের সরকারী পুস্তিকা দেখে যদিও আমাদের বিশ্বাস জন্মেছে ডোভার থেকে সাঁতার কেটে ফ্রান্সে পৌঁছনই বেশী কষ্টসাধ্য তবুও বিভিন্ন

ইংলিশ চ্যানেল পার হবার পথের নিশানা। উপরের চিত্রে ইংলণ্ড-ফ্রান্স পথে চ্যানেল অতিক্রমকারী প্রথম সাঁতারু ক্যাপ্টেন ওয়েব, দ্বিতীয় সাঁতারু টমাস বার্জেস, তৃতীয় সাঁতারু হেনরী সুলিভান ও ফ্রান্স-ইংলণ্ড পথে চ্যানেল বিজয়ী সাঁতারু এডওয়ার্ড টেমের পথের নিশানা দেখানো হয়েছে

পুস্তিকায় কিছুটা পরস্পর-বিরোধী তথ্যে মনের কোণে একটা ধোঁকা থেকে গেছে। কেন ধোঁকা আছে সেই কথাই বলছি।

চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশনের সরকারী পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ আছে—চ্যানেল বিজয়ী তৃতীয় সাঁতারু আমেরিকার সন্তরণবীর হেনরী সুলিভ্যান ১৯২৩ সালের আগস্ট মাসে ডোভারের সেক্সপীয়ার ক্লিফ্ বীচ থেকে সাঁতার আরম্ভ করেন এবং ২৬ ঘণ্টা ৫০ মিনিট সাঁতার কাটবার পর অপর পারে ক্যালে (ফ্রান্স) উপকূলের মাটি স্পর্শ করেন। এর ৭ দিন পরে ফ্রান্সের কেপ গ্রিজ নেজ থেকে সাঁতার আরম্ভ করেন ইটালীর এনরিকো টিরাবস্কি। ইংলণ্ডের সেক্সপীয়ার ক্লিফ্ বীচে পৌঁছাতে এর সময় লাগে ১৬ ঘণ্টা ২৩ মিনিট।

বলা বাহুল্য, এনরিকো টিরাবস্কির আগে আরও বহু সাঁতারু ফ্রান্স থেকে সাঁতার কেটে ইংলণ্ডে পৌঁছুনর চেষ্টা করলেও সফলকাম হননি। স্বল্প সময়ে চ্যানেল অতিক্রমে টিরাবস্কির সাফল্যের সূত্র থেকে প্রথম ধরে নেওয়া হয়েছে ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড পর্যন্ত সাঁতার কাটাই সহজসাধ্য। তারপর আরও সূত্র পাওয়া গেছে। তাই চ্যানেল সুইমিংয়ের হ্যাণ্ডবুকে লেখা আছে

"The Italian (Enrico Tiraboschi) vindicated the theory, held by many swimmers, that the "easy course" was from France to England. The same year Charles Toth, an American, re-inforced the theory by swimming from France to England in 16 hours 54 minutes."

[Hand Book of the Channel Swimming Association Page-16]

অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে আমেরিকান সাঁতারু চার্লস টথও ফ্রান্স থেকে সাঁতার আরম্ভ করে ইংলণ্ডে পৌঁছুনর ফলে সকলের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়—ইংলণ্ড-ফ্রান্স অপেক্ষা ফ্রান্স-ইংলণ্ড পথই সাঁতারের পক্ষে সহজতর।

ইংলণ্ডের 'ডোভার এক্সপ্রেস' কর্তৃক প্রকাশিত 'অ্যাক্রস দি স্ট্রেটস' নামক পুস্তিকা যাতে চ্যানেল সুইমিং এবং সাঁতারুদের সাফল্য অসাফল্যের খতিয়ান বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে তাতেও পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে—

...."That the swimmer who started from France had a better chance than one who began his swim from the English side. If he judges correctly his start from Cap Gris Nez, the swimmer can take advantage of the flood tide, which can carry him practically across the channel in one tide. In the opposite direction very little assistance can be obtained from the tides."

[Across The Straits; Page-3]

অর্থাৎ ফ্রান্স থেকে যাঁরা সাঁতার আরম্ভ

অস্ট্রেলিয়ার নতুন ব্যাটসম্যান নর্ম্যান ও'নীল

করেন তাদেরই সাফল্যের সম্ভাবনা বেশী। কারণ এরা 'ফ্লাড-টাইডের' অর্থাৎ জোয়ার স্রোতের সুযোগ পান এবং একই স্রোত এদের অপর পারে পৌঁছে দিতে পারে। কিন্তু অপরদিক অর্থাৎ ইংলণ্ড থেকে যাত্রা শুরু করলে স্রোতের খুবই কম সাহায্য পাওয়া যায়।

এখন 'ফ্লাড' ও 'এব' টাইড অর্থাৎ দুই রকমের স্রোত সম্বন্ধে সরকারী পুস্তিকায় দেখছি—

"In the straits of Dover, between Cap Gris Nez and the English coast, the main stream flows approximately from south-west to north-east, and is called the "flood". When it flows in the opposite direction, north-east to south-west, the stream is known as the "ebb".

"The flood tide runs in quiet weather for about five hours, and the ebb for approximately seven-and-a-half hours."

[Hand Book of Channel Swimming Association; Page 40]

এর অর্থ ফ্লাড টাইড অর্থাৎ জোয়ারের স্রোত বয় পাঁচ ঘণ্টা ধরে আর ভাটার স্রোত থাকে সাড়ে সাত ঘণ্টা। তাহলে ফ্রান্স থেকে যারা যাত্রা করেন তারা স্রোতের সুযোগ পান পাঁচ ঘণ্টা আর ইংলণ্ড থেকে যারা সাঁতার আরম্ভ করেন তারা স্রোতের সুযোগ পান সাড়ে সাত ঘণ্টা। অথচ বলা হচ্ছে ফ্রান্স থেকে যারা সাঁতার আরম্ভ করেন একই স্রোত তাদের অপর পারে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু কি ভাবে? ফ্রান্স থেকেই তো ইংলিশ চ্যানেল পার হবার সময়ের রেকর্ড আছে ১০ ঘণ্টা ৫০ মিনিট!

ব্রিসবেন মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় নীল হার্ভে লোডারের বলে এল-বি-ডব্লিউ আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে যাচ্ছেন রেডিয়ো ফটো

ব্যাপারটা-একটু গোলমেলে নয় কি? ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী ভারতের একমাত্র সাঁতারু এবং চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশনে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি শ্রীমিহির সেন বিষয়টি পরিষ্কার করে দিলে সুখী হব।

অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দল ৮ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে ক্রিকেট খেলায় তাদের হৃত সম্মানের কিছুটা পুনরুদ্ধার করেছে। অবশ্য যুদ্ধোত্তর ক্রিকেট খেলায় ব্রিসবেন মাঠে ইংলণ্ড কোনবারই অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করতে পারেনি। উপর্যুপরি তিনবারের 'রাবার' বিজয়ী ইংলণ্ডকে বিগত অস্ট্রেলিয়া সফরেও ব্রিসবেন মাঠের প্রথম টেস্ট খেলায় শোচনীয়ভাবে ইনিংসে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। তবুও দুই দলের বর্তমান শক্তি অনুযায়ী ইংলণ্ডের এমন পরাজয় কেউ আশা করেনি। প্রথম টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের পরাজয়ের ফলে অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলার আকর্ষণ আরও বেড়ে গেছে। অস্ট্রেলিয়াবাসীর মনেও 'অ্যাসেস' পুনরুদ্ধারের আশা জেগেছে।

উইকেটে শিকড়-আটা-খেলোয়াড় ট্রেভর বেলী

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলাকে ক্রিকেট মাঠে বাঘ-সিংহের লড়াই বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। সুদীর্ঘ কাল ধরে এই দুটি দেশ ক্রিকেট মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছে। এদের খেলাকে কেন্দ্র করে কত ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে, কত কাব্য, কত উপকথা রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিশ্বের ক্রীড়ামোদী মাত্রেরই এ খেলা দেখবার, এ খেলার ফলাফল জানবার আগ্রহ অপরিসীম। তাই সারা ক্রিকেট বিশ্বই আগ্রহ ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে বাকী চারটি টেস্ট খেলার দিকে। দেখি কি হয়! কে হারে, কে জেতে!

ব্রিসবেন মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলাকে লো-স্কোরিং ম্যাচ বলে অভিহিত করা যেতে পারে। কোন দলই আশানুরূপ রান সংগ্রহ করতে পারেনি। ফলে ছয় দিনব্যাপী খেলার উপর যবনিকা পড়েছে পঞ্চম দিনের খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের পঞ্চাশ মিনিট আগে। ১৮৭৬ সাল থেকে দুই দেশের মধ্যে টেস্ট খেলা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সুদীর্ঘকালের মধ্যে রানের এমন দৈন্য দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। গড় হিসাব করলে এবার কোন দিনই ১৩০ রানের বেশী সংগৃহীত হয়নি।

ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাটিং করবার সুযোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু এলান ডেভিডসন, আয়ান মেকিফ ও রিচি বেনোর প্রশংসনীয় বোলিংয়ের ফলে ইংলণ্ডের বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানরা প্রথম ইনিংসে ১৩৪ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেন না। অস্ট্রেলিয়া দল কোন উইকেট না হারিয়ে ৮ রান করলে প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের মধ্যে একমাত্র বর্ষীয়ান চৌকস খেলোয়াড় ট্রেভর বেলী এবং অধিনায়ক পিটার মের খেলায় কিছুটা দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। আর কেউই আস্থার সঙ্গে খেলতে পারেন না।

ইংলণ্ডের ১৩৪ রানের প্রত্যুত্তরে দ্বিতীয় দিন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং খুব আশাপ্রদ না হলেও ইংলণ্ডের খ্যাতনামা বোলাররা অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করে আক্রমণ করতে পারেননি। অবশ্য ট্রেভর বেলী প্রশংসনীয়ভাবেই বোলিং করেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া সংগ্রহ করে ৬ উইকেটে ১৫৬ রান। এর মধ্যে ওপেনিং ব্যাটসম্যান ম্যাকডোনাল্ডের ৪২ এবং নতুন ব্যাডম্যান নামে অভিহিত নর্ম্যান ও'নীলের ৩৪ রানের বিষয় উল্লেখযোগ্য।

একদিন বিরতির পর তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হলে প্রধানত লোডারের মারাত্মক বোলিংয়ের ফলে আর ৩০ রান যোগ হয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস ১৮৬ রানে শেষ হয়ে যায়। প্রথম ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়া অগ্রগামী হয় ৫২ রানে। তৃতীয় দিনের

শেষে ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ২ উইকেট হারিয়ে ৯২ রান সংগ্রহ করে। আবার সেই ট্রেভর বেলী। এখানে বলা যেতে পারে ৩৪ রানের মধ্যে ইংলণ্ডের ওপেনিং দুই ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যাবার পর অধিনায়ক পিটার মে ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন করে উইকেটে শিকড় আটা ব্যাটসম্যান ট্রেভর বেলীকে প্রথম দিকে ব্যাটিং করতে পাঠান। বিপর্যয় এড়াবার জন্য পিটার মে'র এই প্রচেষ্টা এবং আত্মরক্ষামূলক মনোভাবের অনেক সমালোচনা হয়েছে। কেউ প্রশংসা করেছেন, কেউ আবিষ্কার করেছেন তার আত্মবিশ্বাসের দৈন্য। যাই হোক ট্রেভর বেলী অসীম ধৈর্যের সঙ্গে ব্যাটিং করায় ইংলণ্ডের আর কোন উইকেট পড়ে না। বেলী ৩৩ রান করে নট আউট থাকেন।

পরের দিন ডিসেম্বরের ৯ তারিখ অ্যাংলো অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। স্মরণীয় অন্য কোন কারণে নয়। স্মরণীয় মন্থর ব্যাটিংয়ের জন্য। দীর্ঘ ৫ ঘণ্টার খেলায় ইংলণ্ড দল মাত্র ১০২ রান সংগ্রহ করে মোট ১৯৮ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে। জয়লাভের জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন থাকে ১৪৭ রানের। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে শিকড় আটা ব্যাটসম্যান ট্রেভর বেলীর দীর্ঘ ৮ ঘণ্টা ৩১ মিনিটে ৬৮ রান সংগ্রহের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

ব্রিসবেন মাঠের উইকেটের চরিত্র বিচিত্র। এর মধ্যে কি রহস্য লুকোনো থাকে ব্যাটসম্যানরা তার হদিস পান না। সাধারণত প্রথম দিকে এখানে ফাস্ট বোলাররা সাফল্য অর্জন করেন। স্পিন বোলারের উইকেট লাভের সুযোগ আসে শেষ দিকে। অবশ্য স্পোর্টিং উইকেটের এইটাই চরিত্র। ইংলণ্ডের দুই কীর্তিমান স্পিন বোলার টনি লক ও জিম লেকারের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে পঞ্চম দিনের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১৪৭ রান করতে পারবে কিনা এই প্রশ্নই সবার মুখে মুখে ঘুরতে আরম্ভ করে।

দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনায় অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ের কিছুটা বিপর্যয়ের চিহ্নও ফুটে ওঠে। ৫৮ রানের মধ্যে পড়ে যায় দুটি উইকেট। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার 'নতুন ব্র্যাডম্যান' একুশ বছর বয়স্ক খেলোয়াড় নর্ম্যান ও'নীল ব্যাটিং করতে এসে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। নিপুণ হাতে উইকেটের চতুর্দিকে বল মেরে ও'নীল রান সংগ্রহ করতে থাকেন। রান যত বাড়তে আরম্ভ করে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের মন থেকেও তত অপসারিত হতে থাকে জয়ের আশা। অপর দিকে অস্ট্রেলিয়ার সামনে রঙীন আশার হাতছানি। ও'নীল ও জিম বার্ক নির্ভয়ে ব্যাটিং করে চলেছেন। খেলা শেষ হতে যখন ৫০ মিনিট বাকী তখন বার্ক টনি লকের বলে খেলার 'উইনিং স্ট্রোক' করবার সঙ্গে সঙ্গে বিপুল জনতা ছুটে এসে ও'নীলকে অভিনন্দন জানাল। অস্ট্রেলিয়ার 'নতুন ব্র্যাডম্যান' ও'নীল, তার টেস্ট খেলার প্রথম আবির্ভাবে দেশের সম্মান বাড়িয়ে দেন, পুনরুদ্ধার করেছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ঐতিহ্য। এই খেলায় ১১৩ মিনিটে ও'নীলের নট আউট থেকে ৭১ রান লাভ ও তার খেলার ধরন দেশবিদেশের ক্রিকেট পণ্ডিতদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করেছে।

প্রথম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ডঃ—

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—১৩৪ (ট্রেভর বেলী ২৭, পিটার মে ২৬, টম গ্রেভনি ১৯; মেকিফ ৩৩ রানে ৩ উইকেট, ডেভিডসন ৩৬ রানে ৩ উইকেট, বিনোড ৪৬ রানে ৩ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস ১৮৬ (ম্যাকডোনাল্ড ৪২, নর্ম্যান ও'নীল ৩৪, ডেভিডসন ২৫, জিম বার্ক ২০; লোডার ৫৬ রানে ৪ উইকেট, বেলী ৩৫ রানে ৩ উইকেট, লেকার ১৫ রানে ২ উইকেট)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—১৯৮ (ট্রেভর বেলী ৬৮, টম গ্রেভনি ৩৬, কলিন কাউড্রে ২৮, এ মিল্টন ১৭; বিনোড ৬৬ রানে ৪ উইকেট, ডেভিডসন ৩০ রানে ২ উইকেট, মেকিফ ৩০ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—(২ উইকেট) ১৪৭ (নর্ম্যান ও'নীল নট আউট ৭১, জিম বার্ক নট আউট ২৮, নীল হার্ভে ২৩)

ইংলণ্ডের পক্ষে খেলেছিলেনঃ—রিচার্ডসন, মিল্টন, গ্রেভনি, মে (অধিনায়ক), কাউড্রে, বেলী, ইভান্স, লক, লেকার, স্ট্যাথাম ও লোডার।

অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলেছিলেন—ম্যাকডোনাল্ড, বার্ক, হার্ভে, ও'নীল, বার্জ, ম্যাকে, বিনোড (অধিনায়ক), ডেভিডসন, গ্রাউট, মেকিফ ও ক্লাইন।

দেশী সংবাদ

৮ই ডিসেম্বর—আজ লোকসভায় পররাষ্ট্র ব্যাপার বিষয়ক বিতর্কের উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন যে, পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় ভারত-পাকিস্তান সমস্যাবলীর সমাধান আরও কিছুটা দুষ্কর হইয়া পড়িয়াছে।

নিখিল ভারত বীমা কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রী বি এস বসু আজ বলেন যে, ভারত সরকার জীবনবীমা কর্পোরেশনের কর্মচারীদিগকে দুই মাসের বেতন বোনাস হিসাবে দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৯ই ডিসেম্বর—পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত সাত ঘণ্টাব্যাপী বিতর্কের জবাব দিতে উঠিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ লোকসভায় ভারত-পাক সমস্যার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁহার আশংকা যতদিন এই দুই দেশের মধ্যে বিরোধ চলিবে ততদিন সীমান্ত সংঘর্ষ থামিবে না।

আজ সকালে মুচিপাড়া থানার অন্তর্গত হরগঞ্জ রোডে মঙ্গলা দাসী নামে ষাট বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা বাসে চাপা পড়িয়া ঘটনাস্থলেই মারা গেলে এক উত্তেজিত জনতা ঐ বাসটিতে অগ্নি সংযোগ করে এবং বাসের ড্রাইভার ও জনৈক পুলিস অফিসার জনতার হাতে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হন।

১০ই ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, পূর্বদিকে ভারত-পাকিস্থান সীমান্তের ঘটনাসমূহ যথার্থই পাকিস্তান কর্তৃক ক্ষুদ্র আকারে আক্রমণ।

পশ্চিমবঙ্গের বড় বড় কলেজসমূহের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধিকল্পে যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হইবে, সেই সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ-মঞ্জুরী কমিশন তাহার নিজ অংশ দিয়া দিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১১ই ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি এই রাজ্যে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন, বাঙালীদের উদ্যোগহীনতার জন্য সেগুলির অধিকাংশই অবাঙালীদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাঙালীরা এইরূপ পশ্চাৎপদ হওয়ায় তাঁহাদের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে।

শ্বেত হস্তী অনেক দেখা যায়, কিন্তু শ্বেত সিংহ দেখা যায় না। দিন কয়েক পূর্বে উত্তর প্রদেশের জঙ্গল হইতে নাকি দুইটি শ্বেত সিংহ বাহির হইয়াছে। শিকারীরা এই দুই পশুরাজকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

[illegible] ডিসেম্বর—এখানে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মজুতবৃদ্ধি রোধ করিবার উদ্দেশ্যে দেশের সর্বত্র কেন্দ্রের পরিচালনার জন্য পণ্যদ্রব্যের দোকান খুলিবার জন্য ডাঃ সীতা পরমানন্দ (কংগ্রেস) আজ রাজ্যসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। প্রস্তাবটি বিপুলভাবে সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও গভর্নমেণ্ট উহা গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই।

১৩ই ডিসেম্বর—ভারতের তিনশতাধিক প্রাক্তন বিপ্লবী অদ্য রাজধানীতে দুই দিনব্যাপী এক সম্মেলনে মিলিত হন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তাঁহারা দীর্ঘদিন কারাদণ্ড ভোগ করেন অথবা খুব অল্পের জন্য ফাঁসিকাঠ হইতে রক্ষা পান। বিপ্লবীদের এইরূপ সম্মেলন এই প্রথম অনুষ্ঠিত হইতেছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অদ্যকার অধিবেশনে ভূমিসংস্কার সম্পর্কে এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাস মধ্যে ভূমিসংস্কার সম্পর্কে সর্বপ্রকার আইনকানুন প্রণয়ন শেষ করিতে হইবে।

১৪ই ডিসেম্বর—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক প্রস্তাবে আমদানি নিয়ন্ত্রণে কড়াকড়ি, জীবনবীমার সম্প্রসারণ, বেসরকারী ক্ষেত্রে মুনাফা নিয়ন্ত্রণ, সম্পাদিত কার্য ও উৎপাদন অনুযায়ী বেতন ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং অত্যাবশ্যক নহে এমন গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনায় কাটছাঁটের উল্লেখ করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৮ই ডিসেম্বর—রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ইন্দোনেশিয়ায় ১২ দিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় পরিদর্শনের জন্য আজ জাকার্তায় আগমন করিয়াছেন।

অদ্য কোয়েটায় এক বিশেষ সামরিক আদালতের বিচারে বালুচ গান্ধী খাঁ আবদুস সামাদ খাঁ আচাকজী রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে ১৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

৯ই ডিসেম্বর—খ্যাতনামা বৃটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী জোডরেল ব্যাঙ্কের অতিকায় রেডিও-টেলিস্কোপের ডিরেক্টর প্রফেসর লোভেল এক বেতার ভাষণে বলেন, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি সন্ধানে যে সকল বিজ্ঞানী আজ নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহাদের গবেষণার শেষ সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন।

১০ই ডিসেম্বর—সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন ক্ষেত্রেই তাহারা সম্পত্তি বিক্রয় করিতে পারিবে না। কেবল মুসলমানদের বেলায় দশ বিঘা পরিমাণ জমি সরকারী আদেশ লইয়া বিক্রয় করা যাইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দক্ষিণ কোরিয়া ও ভিয়েৎনামকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যরূপে গ্রহণের চেষ্টায় বাধা দিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন অদ্য নিরাপত্তা পরিষদে দুইবার ভিটো প্রয়োগ করে।

১১ই ডিসেম্বর—পাকিস্তান সরকার অদ্য ওয়াশিংটনে খালের জল বিরোধ সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় নিযুক্ত প্রতিনিধি দলের নিকট হইতে এক জরুরী বার্তা পাইয়াছেন। সিন্ধু অববাহিকার জল বণ্টন সম্পর্কে বিশ্বব্যাংকের উদ্যোগে ওয়াশিংটনে আলোচনা চলিতেছে।

পাকিস্তান সরকার মিঃ আলফ্রেড জে রাইস নামক মার্কিন সামরিক দলের জনৈক ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁহার স্ত্রীকে সাত দিনের মধ্যে পাকিস্তান হইতে বহিষ্কৃত করার আদেশ দিয়াছেন।

১২ই ডিসেম্বর—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, পূর্ব জার্মানী আক্রান্ত হইলে সোভিয়েট রাশিয়া সার্বভৌম পূর্ব জার্মানীর সীমান্ত রক্ষা করিবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী এম সি চাগলা নিউ ইয়র্কে বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত যে সব ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট তিনি পাকিস্তানের সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে ভারতের আশংকার কথা বলিয়াছেন। একমাত্র পাকিস্তানই ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বের অন্তরায়।

১৩ই ডিসেম্বর—গতকল্য লাহোরে এক নাগরিক সম্বর্ধনার উত্তরে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ তাঁহার পূর্বেকার অভিমতের পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন যে, কাশ্মীর এবং খালের জলের সমস্যা পাকিস্তানের পক্ষে জীবনমরণ সমস্যা। এই দুইটি সমস্যা সমগ্র মানবজাতি এবং আন্তর্জাতিক নীতিবোধের প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। পাকিস্তানবাসিগণ সাহসের সহিত এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিতে কোন সময়েই পশ্চাৎপদ হইবে না।

ফরাসী শাসন হইতে সদ্যমুক্ত গিনি গত রাত্রিতে রাষ্ট্রপুঞ্জের ৮২তম সদস্যরূপে গৃহীত হয়।

১৪ই ডিসেম্বর—সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের তীব্র বিদ্বেষ এইবার দানা বাঁধিতে শুরু করিয়াছে। স্থানে স্থানে উহা প্রচণ্ড বিক্ষোভের আকারে ফাটিয়া পড়িতেছে। বেপরোয়া জনতার সহিংস প্রতিবাদের মুখে কয়েকজন সৈনিক নাকি নিহতও হইয়াছে। নিহতদের মধ্যে একজন পদমর্যাদায় মেজর।

আলজিরিয়ার প্রশ্ন সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনার অনুরোধ জানাইয়া যে খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। অদ্য রাত্রিতে সাধারণ পরিষদে তাহা মাত্র এক ভোটের জন্য অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার — সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক [illegible] টাকা ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

[illegible] বার্ষিক ২২ টাকা ষাণ্মাসিক ১১ ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, [illegible] সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফিনিক্স পরিকল্পিত বস্ত্রে
সর্বদাই নিজেকে অসাধারণ
করে তুলুন
রুইয়া বস্ত্র
Ruia fabrics
ডিজাইন ও বুনুনির নিছক চমৎকারিত্বে
ফিনিক্স প্রিন্ট, ভয়েল ও লেনোর মত
সুক্ষ্ম কাজ আর নেই। সারাদিন ধরে
তাজা ও ঝকঝকে বলে মনে হবে।
দি ফিনিক্স মিলস্ লিমিটেড,
লোয়ার প্যারেল, বম্বে-১৩

REG. NO. C. 2109

দেশ
বর্ষ] শনিবার, ১১ পৌষ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ DESH 27th December, 1958 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ৯
গ্লিসারিন
স্বচ্ছ স্নেহস্পর্শময়
অনিন্দনীয় প্রসাধন
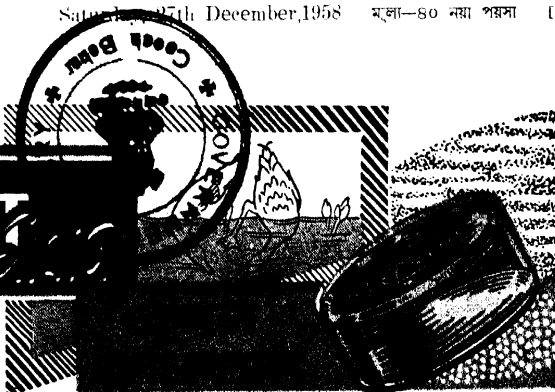
এই জীবাণুনাশকই
ডাক্তার ও নার্স'রা
ব্যবহার
করেন
ANTISEPTIC
DETTOL
NON POISONOUS GERMICIDAL
AEL
অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড
(ইংল্যাণ্ড-এ সংগঠিত)

সুলেখা
পেন
বুদ্ধিমানদের
চয়ন
নানা প্রকারের
অনুপাত
নির্দিষ্ট-সর্বত্র
পাওয়া যায়।
Sole Distributors
PENMEN'S INDUSTRIAL
SERVICES
KANDIVLI (BOMBAY S.D.)

Glucovita
GLUCOSE-D
অতিরিক্ত শক্তির জন্য
গ্লুকোভিটা
কর্ণ প্রোডাক্টস কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
ভারতের এজেন্ট: প্যারী এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড
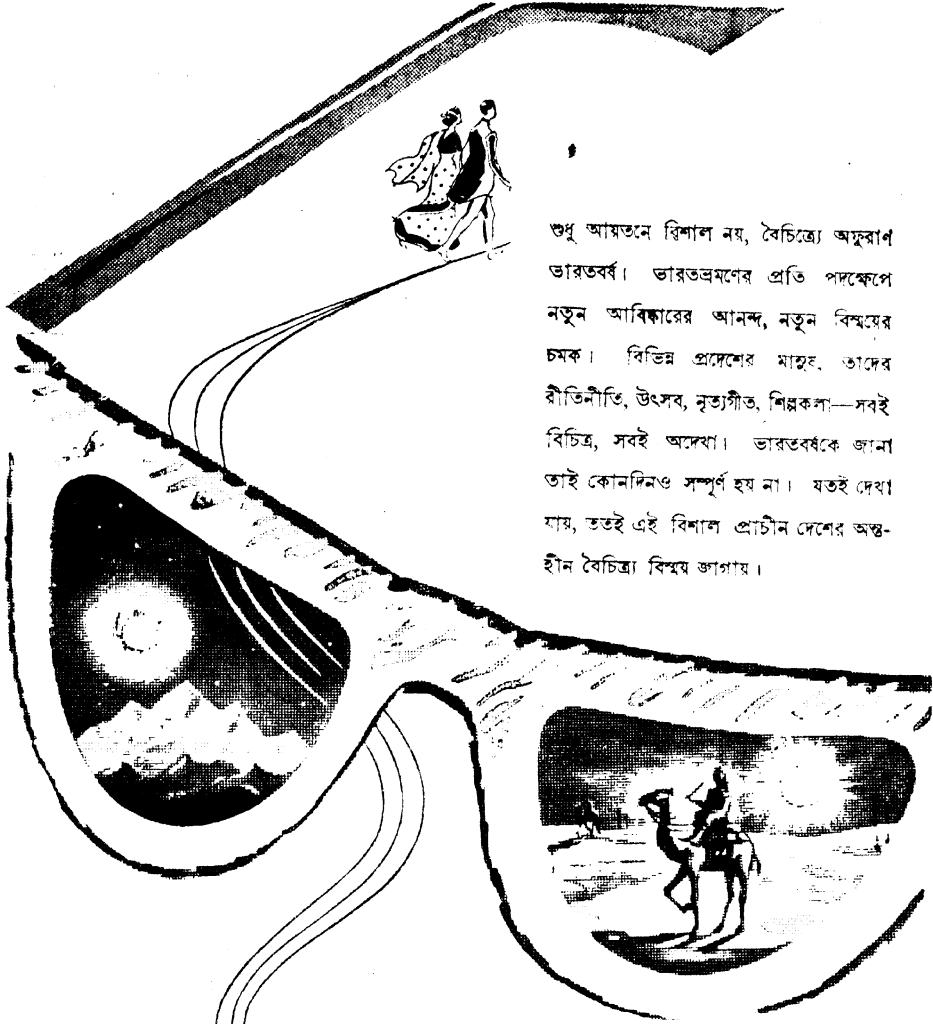
শুধু আয়তনে বিশাল নয়, বৈচিত্র্যে অফুরাণ ভারতবর্ষ। ভারতভ্রমণের প্রতি পদক্ষেপে নতুন আবিষ্কারের আনন্দ, নতুন বিস্ময়ের চমক। বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ, তাদের রীতিনীতি, উৎসব, নৃত্যগীত, শিল্পকলা—সবই বিচিত্র, সবই অদেখা। ভারতবর্ষকে জানা তাই কোনদিনও সম্পূর্ণ হয় না। যতই দেখা যায়, ততই এই বিশাল প্রাচীন দেশের অন্তহীন বৈচিত্র্য বিস্ময় জাগায়।
আর হিমালয়ের পদপ্রান্ত থেকে, কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত যেখানেই যান, আপনার ভ্রমণের আনন্দকে পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করবে উইল্‌স-এর গোল্ড ফ্লেক সিগারেটের অতুলনীয় স্বাদগন্ধ।
যেখানেই যান সেখানেই
গোল্ড ফ্লেক পাবেন
আর গোল্ডফ্লেকের চেয়ে
ভালো সিগারেট কোথায় পাবেন

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আইডিয়া বনাম অস্ত্র	...	৫৮৫
প্রসঙ্গত	... ...	৫৮৬
বৈদেশিকী	... ...	৫৮৭
জব্বলপুর	শ্রীকুসুমবিহারী চৌধুরী ...	৫৮৯
মুখের রেখা	শ্রীসন্তোষকুমার ঘোষ ...	৫৯৩
গহন (কবিতা)	শ্রীউমা দেবী ...	৫৯৬
অবশেষে (কবিতা)	শ্রীসতীন্দ্রনাথ মৈত্র ...	৫৯৬

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 27th December, 1958

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ৯ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১১ পৌষ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

আইডিয়া বনাম অস্ত্র

প্রধানমন্ত্রী একটি টেলিভিশন ফিল্ম বক্তৃতায় অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। নানাকারণে তাঁহার প্রদত্ত উত্তরগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আমরা এখানে নেহরুজীর একটিমাত্র মন্তব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। তাঁহার বক্তব্য এই যে, সৈন্যদলের সাহায্যে ভাব বা আইডিয়াকে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, আইডিয়ার বিরুদ্ধে আইডিয়াকে স্থাপন করিতে হয়। আইডিয়া দ্বারা অন্য আইডিয়াকে প্রতিরোধ করিতে হয়। তাঁহার মতে, এইরূপ দ্বৈরথ হইতেছে বাস্তবসম্মত। এখন তাঁহার বক্তব্যকে সাধারণভাবে বিচার করিতে চাই, দেখিতে চাই বিষয়টি ইতিহাসের দ্বারা সমর্থিত কিনা কিম্বা কতদূর সমর্থিত।

সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে নেহরুজীর অনুমান সত্য, আইডিয়া বা ভাবকে ভাবের সম্মুখীন হইতে হয় আর তাহাদের দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত একতরের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। আবার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে সৈন্যদল স্থাপিত হইলে একতরের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। ইতিহাসে এমন হাজার নজীর মিলিবে। কিন্তু এইরূপ সঙ্কীর্ণক্ষেত্রের বাহিরে আসিয়া বৃহৎ ইতিহাসের মল্লভূমিতে পদার্পণ করিলে দেখা যাইবে যে এ নিয়ম বুঝি খাটে না। কারণ ইতিহাসে এমন ন্যায্য দ্বৈরথ কখনো কদাচিৎ ঘটে। বরঞ্চ এমন প্রমাণ অগণিত মিলিবে যেখানে একপক্ষে আইডিয়া অন্যপক্ষে সৈন্যদল, কিম্বা সৈন্যদলের বিরুদ্ধে আইডিয়ার ছদ্মবেশী সৈন্যদল। দুইক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত সৈন্যদলেরই জয় ঘটিয়াছে।

ফরাসী বিপ্লবের মূলে ছিল কয়েকটি আইডিয়ার সমষ্টি। কিন্তু এই আইডিয়ার জোরে রাজার সিংহাসন টলিয়াছিল মনে করিলে নিতান্ত ভুল হইবে। বিপ্লবীপক্ষ ও রাজতন্ত্রের মধ্যে যে পক্ষ সঠিক গুলী ছুঁড়িতে পারিয়াছিল জয় হইয়াছিল তাহারই। যুবক নেপোলিয়ানের আবির্ভাব সেদিনের বিপ্লবকে ধরাশায়ী করিয়া দিয়াছিল। অবশ্য পরে স্বয়ং নেপোলিয়ান বিপ্লবের অনেক আইডিয়াকে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে-ও তো তরবারির সাহায্যে। কিন্তু যখন আবার অপর পক্ষের তরবারির শক্তি প্রবলতর হইয়া উঠিল তখন নেপোলিয়ান ও বিপ্লবীমতবাদকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

বিপ্লববাদের পুরোধা ভলতেয়ারও জয়ের প্রকৃত রহস্য অবগত ছিলেন—ভলতেয়ার বলিতেন যাদুমন্ত্রে ভেড়া মারা যায় সত্য কিন্তু সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ সেঁকো বিষ থাকা আবশ্যক।

আমাদের বক্তব্য এই যে যাহাকে আমরা আইডিয়ার জয় বলিয়া ঘোষণা করিতেছি তাহা আসলে সেঁকো বিষের জয়, সঙ্গে যাদুমন্ত্র থাকা উত্তম।

আজ যে মার্ক্সীয় সমাজ পৃথিবীর নানাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে কেবল আইডিয়ার গৌরবে এমন মনে করিলে বিষম ভুল হইবে। বলশেভিক পার্টি রুশীয় সামরিক শক্তিকে হস্তগত না করা অবধি মার্ক্সীয় সমাজ নিতান্তই ভাবের অন্তরীক্ষচারী ছিল। রুশীয় সামরিক শক্তি তাহাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এখন বিশলক্ষ সঙ্গীনের দ্বারা তাহা সুরক্ষিত। নাৎসীবাদ ও ফাসিস্টবাদ কি আইডিয়ার দ্বৈরথে পরাজিত হইয়াছে? চীনা কম্যুনিস্ট শক্তি কি শুধু যাদুমন্ত্রে চিয়াং কাইশেককে পরাজিত করিয়াছে?

কাজেই নেহরুর উক্তির যাথার্থ্য বুঝিতে আমরা অক্ষম। আজকার পৃথিবীতে যতগুলি রাষ্ট্রতত্ত্ব বা Ideology আছে কোনটাই নিছক আইডিয়ার স্তরে নাই, প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে সেঁকো বিষ আছে। পৃথিবী যেদিন স্বর্গ হইবে সেদিন হয়তো সব সমস্যার সমাধান আইডিয়ার স্তরে ঘটিবে, ভাবের সঙ্গে ভাবের দ্বৈরথে বাদবিসম্বাদের মীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু বর্তমান বাস্তব পৃথিবীতে এমন ঘটিতেছে না। ঘটিবার আশাও নাই। আইডিয়ার শিখণ্ডী খাড়া করিয়া পিছনে আণবিক অস্ত্র শানাইতে যখন সবাই উদ্যত, তখন "ভাবধারা দিয়াই ভাবধারার সঙ্গে সংগ্রাম করিতে হয়" মতবাদ অত্যন্ত বিপজ্জনক। "সৈন্যদলের সাহায্যে ভাবধারার সঙ্গে সংগ্রামের ধারণা পুরাতন হইয়া গিয়াছে"—ইহাও স্বীকার্য নয়। কারণ ইতিহাসের বড় বড় নজীর উদ্ধার করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে আইডিয়াকে শিখণ্ডীরূপে ব্যবহার করিয়া সর্বত্র সৈন্যদলের সঙ্গে সৈন্যদলের লড়াই চলিয়াছে আর ইতিহাসের বৃহৎ ক্ষেত্রে আইডিয়ার সঙ্গে আইডিয়ার দ্বন্দ্বে কখনো কোন সমস্যার মীমাংসা হয় নাই। পৃথিবীর প্রকৃতি যখন এইরকম ইতিহাসের গতি যখন এইরকম—তখন কেবল আইডিয়ার অমোঘতার উপরে ভরসা করিয়া বসিয়া থাকা নিতান্ত অন্যায় হইবে। *

গীতির মোহ আছে। মুগ্ধ মন প্রভেদ জানে না গতি আর প্রগতিতে। আমরা ভুলেও কখনো বলিনে, দেশটা চলেছে। (চলা প্রকৃতির নিয়ম, "জগৎ" কথাটার মধ্যেই আছে গম্ ধাতু)। বলি, দেশটা এগিয়ে চলেছে। আর অমনি আমাদের বাক্য আর শুধু তথ্যের নিবেদন রইল না, হয়ে গেল মতে-মোড়া আরও কিছু। তার উপর আছে বাইরে থেকে প্রশংসার নিরবচ্ছিন্ন বৃষ্টি। ইন্ডিয়া অন দি মার্চ। এশিয়ায় উদারতা ও গণতন্ত্রের লেগেছে মড়ক, কিন্তু ভারত ভরসা। হালের কাছে জহর আছে করবে তরী পার।

মুশকিল এই যে, মুমূর্ষু বৎসরের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রির স্বভাবতই বিষণ্ণ হিসাবের নিরিখেও ভারতের নানাবিধ সাফল্য একেবারে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করার কারণ নেই। অপচয় আর অক্ষমতার অভিযোগে সত্যের পরিমাণ যতখানিই হোক, এ তো মিথ্যা নয় যে, গত এগারো বছরেই ভারতে নানা কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং ব্যাপক শিল্পায়নের ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে। গণতান্ত্রিক শাসনের কাঠামো রয়েছে লোকসভা আর বিধান সভাগুলিতে। ভারতের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক উন্নয়ন পুরোপুরি অলীক নয়। প্রতিবেশী দেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে পরিমিত আত্মতৃপ্তির প্রভূত সমর্থন মেলে।

১৯৫৯ বাধা আনবে, নৈরাশ্য আনবে, তবু যেদিকে দেশ চলেছে, তার গতি হ্রাস হলেও দিক্‌পরিবর্তন হবে না।

*

সংশয় জাগল সামান্য একটি সংবাদ পড়ে। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর নাকি প্রস্তাব করেছেন, সহশিক্ষা বাতিল হোক। কয়েকজন ছাত্রের আচরণই তাঁর এ সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী, ছাত্রীদের নিরাপত্তার নিশ্চয়ীকরণের দ্বিতীয় পন্থা নেই। ছাত্রসমাজে শৃঙ্খলার সমাধি হয়েছে, এমন বিলাপ নতুন নয়। এই প্রসঙ্গে বর্তমান অভিপ্রায় অনুরূপ আর্তনাদ করা নয়। আরেকটু অতীতে স্মৃতিমন্থন করা।

কলকাতায় যেদিন প্রথম মেয়েদের জন্য ইস্কুলের দরজা খোলা হয়েছিল, সেদিন সংস্কারকদের চিত্তে নিশ্চয়ই সন্দেহের বাষ্পমাত্র ছিল না যে যে-ধারার প্রবর্তন তাঁরা করলেন, তার জোয়ার সারা দেশে

প্রসঙ্গত

ব্যাপ্ত হবে, সমাজে নারী প্রতিষ্ঠা পাবে, ভারত আধুনিক হবে। যুগধর্ম আচারের ঊর্ধ্বে স্থান পাবে। সংস্কারমুক্ত ভারত-জাতি বহু শতাব্দীর অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে আন্দোলনের শুরু, তার আয়ুর দীর্ঘতা সম্বন্ধে সন্দেহের সেদিন কারণ ছিল না। সেটা ছিল বলিষ্ঠ আশাবাদের যুগ, সমাজ গঠনের যুগ, অপ্রতিহত প্রগতিতে অবিচল আস্থার যুগ।

শতাব্দীর সায়াহ্নের সঙ্গে এলো শীত, রাজনীতিক আন্দোলনের উত্তুরে হাওয়া। গৌরবের বিষয়, দেশ তাতে সাড়া দিল একপ্রাণ হয়ে। জীবনের আর সব কিছু স্থগিত রইল, সর্বশক্তি নিয়োজিত হোলো স্বাধীনতা অর্জনে। স্বভাবতই অন্যান্য বহু জিনিস উপেক্ষিত হোলো। তার মধ্যে গুটিকয় জরুরী জিনিস ছিল।

*

রাজনীতির সর্বগ্রাসিতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সাবধানবাণী উচ্চারণ করে-ছিলেন একাধিকবার, অপ্রিয়ভাষণ থেকেও বিরত থাকেননি। মহাত্মা গান্ধীরও প্রথম ধ্যান ছিল রাজনীতিক সংগ্রাম, কিন্তু তাঁর রাজনীতির বৃহৎ অংশ ছিল সমাজ গঠন। তবু গণ-আবেগের বন্যার গতি-নির্দেশ তাঁর সাধ্যাতীত ছিল। ফলে গান্ধীজীর অভিপ্রায়ে প্রথম অংশ ত্রিশ বছরেই ফলল কেমন করে, কিন্তু অবহেলিত রইল আর-সব। বিপদ এই যে, সমাজ সাধারণত স্থাণু থাকে না। অগ্রগতি স্তব্ধ হলে পশ্চাদ্‌গতি প্রায় অবশ্যম্ভাবী।

লখনউর খবরটি বিষাদের কারণ হয়েছে এইজন্য যে, এটি গভীরতর কোনো ব্যাধির বাইরের উপসর্গ মাত্র হতে পারে। রাজস্থানের কোনো পল্লী থেকে আকস্মিক সতীদাহের সংবাদ এলে বা দক্ষিণ ভারতে অস্পৃশ্যতার নূতনতর প্রকাশ হলে তাই নিয়ে তারস্বরে চিৎকারের প্রয়োজন নেই, কিন্তু এ জিজ্ঞাসা আর অবান্তর থাকে না যে, আমাদের দেশের চরিত্র-নীতির সংরক্ষণশীলতার অনেকখানি এখনো আমাদের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক আধুনিকতার ঠিক একটু নীচেই লুকিয়ে আছে কিনা। আধুনিকদের অতি-নিশ্চিন্ততায় উল্লিখিত প্রবণতা প্রশ্রয় পেতে পারে।

*

নবীন ও প্রাচীনের দ্বন্দ্বে ইন্ধন জোগাবার উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গের উত্থাপন নয়। উদ্দেশ্য এই সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যে গত শতকের নবীন-পন্থীরা হয়তো শত্রুর সাময়িক পশ্চাদপসরণকেই নিজেদের চূড়ান্ত জয় বলে ভুল করেছিলেন। নইলে বাঙলার বহুঘোষিত নবজাগরণ এত শীঘ্র পুনঃ সুপ্ত হোলো কী করে? উদারতার দখিন মলয় মিলিয়ে গেল মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে? লক্ষ্য করতে হবে, লখনউতে যদি সহশিক্ষার অবসান ঘটে, তবে তা এর বিরুদ্ধ মতের দ্বারা এর প্রত্যাখ্যানের জন্য হবে না। মতের দ্বন্দ্ব সুস্থ সমাজের লক্ষণ, দুয়ের বিরোধ কারো পক্ষেই লজ্জার কারণ নয়। লখনউতে মতের উল্লেখ মাত্র ঘটেনি। ঘটেছে ব্যাপক স্খলন এবং কর্তৃপক্ষ নিরুপায় হয়ে লৌহ-যবনিকা নামিয়ে দিতে চাইছেন ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে। আধুনিকতার প্রত্যক্ষ বর্জন নয়, প্রাচীনতার পুনর্বরণ নয়, শুধু প্রগতির শোচনীয় পরাজয়!

সহশিক্ষা সামান্য অংশ আধুনিকতার। শঙ্কার কারণ অনাধুনিক মনের সর্বাত্মক পরাজয়ের অনতিদূর সম্ভাবনা। কিছু-দিন আগে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলান একটি বক্তৃতায় বলেছেন: Tradition does not mean that the living are dead but that the dead are living.

ভারতে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক আধুনিকতার অন্তরালে যে সংরক্ষণ-শীলতা আত্মগোপন করে প্রতিদিন আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজছে, তার কারণ খুঁজতে হবে দুদিকে। এক, প্রাচীনের শক্তি কোথায়? দুই নবীনের গলদ কোথায়? লখনউতে দ্বিতীয়ের ত্রুটি অতি প্রকট। প্রথম প্রশ্নের উত্তর সন্ধান ভারতীয় সমাজতত্ত্ববিদের প্রথম জিজ্ঞাসা হবার কথা। প্রাচীনরা জানতেন গৈরিক-ধারণ ভক্তির অতিক্রম নিদর্শন নয়। নবীনদের কি জানা আছে যে শার্টিছয় তৈজস কারখানার নামাবলী পরিধান করলেই আধুনিক হওয়া হয় না?

বৈদেশিকী

কৃত্রিম উপগ্রহ হিসাবে "অ্যাটলাস"এর বৈজ্ঞানিক মহিমার চেয়ে আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র হিসাবে তার ভয়াবহ উপযোগিতার কথাই সকলের মনে পড়িয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টারই যখন ত্রুটি নেই তখন তার মধ্যে টেপ-রেকর্ডারে-ধরা প্রেসিডেণ্ট আইজেন হাওয়ারের একটি কৃস্‌মাস বাণী "অ্যাটলাস" থেকে পৃথিবীর রেডিও শ্রোতাদের নিকট বিতরণটা বেখাপ্পা এবং অনেকটা উপহাসের মতো লাগে। ছ হাজার মাইলের চেয়েও বেশী পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের সাফল্যের সংবাদ মার্কিন কর্তারা কয়েক দিন পূর্বেই প্রকাশ করেছেন। তার অর্থ এই যে, উত্তর আমেরিকার অভ্যন্তরে অবস্থিত ঘাটি থেকে উৎক্ষিপ্ত অস্ত্র এখন সোভিয়েট রাশিয়ার ভিতরে লক্ষ্যে পেঁছিতে পারবে। রাশিয়া থেকে আমেরিকাকে আঘাত করার উপযোগী আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করার সংবাদ রাশিয়া অনেক আগেই প্রকাশ করেছে। এই ব্যাপারে এখন রাশিয়া ও আমেরিকা পরস্পরের সমকক্ষ হল বলা যায়। যদিও আমেরিকার চেয়েও রাশিয়া দূরতর পাল্লার—আট হাজার মাইলেরও বেশী পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করার কৌশল আয়ত্ত করতে প্রায় সক্ষম হয়েছে বলে সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া রাশিয়া নিউক্লিয়ার শক্তির দ্বারা চালিত এমন বোমারু বিমান নির্মাণ করতে এখন পারে যেগুলো দিনের পর দিন হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উড়ন্ত অবস্থায় তৈরী থাকতে পারে এবং আঘাত করার আদেশ পেলেই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হতে পারবে। কিন্তু বিষের মারাত্মক মাত্রার উপর কম-বেশিতে যেমন বিশেষ আসে যায় না তেমনি রাশিয়া এবং আমেরিকার অস্ত্রশক্তি এখন যে অবস্থায় পেঁছিছে সে অবস্থায় তাদের নিজেদের এবং জগতের সম্বন্ধে মারাত্মক হবার পক্ষে কার অস্ত্র দু এক হাজার মাইল কম বা বেশি যেতে পারে তাতে কিছু আসে যায় না।

এখন দুই "পালের গোদার" একটা কথার যাচাই হয়ে যাবে। আমেরিকা বিদেশে যেসব সামরিক ঘাটি তৈরী করেছে সেগুলো নাকি "আত্মরক্ষার" জন্য কম্যুনিস্ট ব্লকের চার-দিক দিয়ে ঘাটি পাতা, যাতে কম্যুনিস্ট আক্রমণের উপক্রম হলে এইসব ঘাটি থেকে বোমারু বিমান ছুটতে পারে। কম্যুনিস্ট আক্রমণ থেকে আমেরিকার আত্মরক্ষার অজুহাতেই (যে-কোনো দেশকে সামরিক সাহায্য দিতে হলেই আমেরিকার আইন অনুযায়ী বলতে হবে সেটা কম্যুনিজম-এর আক্রমণ থেকে আমেরিকাকে রক্ষার জন্য।) বিভিন্ন দেশকে সামরিক চুক্তিতে বাঁধা হয়েছে এবং সামরিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। সোভিয়েটও তার চারদিকে তাঁবেদার রাজ্যের একটি যে ঘের সৃষ্টি করে তাদের একটি সামরিক শৃঙ্খলে বেঁধেছে তারও ঐ একই ধরনের অজুহাত। কিন্তু আজ যদি সোভিয়েট নিজের রাজ্যের ভিতর থেকেই আমেরিকার ভিতর নিউক্লিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারে এবং আমেরিকাও যদি নিজের রাজ্যের ভিতর থেকেই সোভিয়েট দেশের উপর অনুরূপ আক্রমণ চালাবার শক্তি ধারণ করে তবে আমেরিকা বা সোভিয়েটের স্ব স্ব রাজ্যের বাইরে সামরিক ঘাটি বা সামরিক চুক্তির শৃঙ্খলাবধ তাঁবেদার রাষ্ট্রগোষ্ঠী সৃষ্টি করার কোনো সংগত কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে নিজেদের মারণ অস্ত্রের শক্তি যতই বাড়ুক এবং তাই নিয়ে যতই গর্ব করা হোক কোনো ব্লকেরই

সামরিক জাল সংকুচিত করার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

আসলে "আত্মরক্ষার" যুক্তির মধ্যে দুটো বড়ো ফাঁকি আছে। মারণাস্ত্রের শক্তি বৃদ্ধিতে এক পক্ষ অপরের ভীতি বাড়াচ্ছে বটে; কিন্তু তাতে নিজের স্বস্তি বাড়ছে না বা নিরাপত্তার ভাব বাড়ছে না। এক পক্ষ কোনো বিষয়ে একটু এগিয়ে গেছে দেখলে তখন ভয় বাড়ে এবং তার নাগাল পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা হয়, ধরতে পারলে সাময়িক একটা উল্লাসের ভাব হয়; কিন্তু কে-কাকে ডিঙিয়ে যাবে তার চেষ্টা অবিরামই চলতে থাকে। সুতরাং নিরাপত্তা মরীচিকার মতো ক্রমাগত দূরেই সরতে থাকে, কখনও নাগালের মধ্যে আসে না।

দ্বিতীয় ফাঁকি হচ্ছে এই যে, বিদেশে সামরিক ঘাটি স্থাপন করা বা অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রকে নিজের সামরিক আওতার মধ্যে রাখার লক্ষ্য কেবলমাত্র সামরিক আত্মরক্ষা নয়। অনেক ক্ষেত্রে সামরিক প্রয়োজনের দোহাই দেওয়া হয় বটে; কিন্তু তার পিছনে রাজনৈতিক প্রভাব বা অর্থনৈতিক স্বার্থের বিস্তারের প্রচেষ্টাই প্রধান হয়ে উঠতে দেখা যায়। সেইজন্য হাইড্রোজেন বোমা এবং আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত হয়েও আমেরিকা এবং রাশিয়া বিদেশে সামরিক ঘাটির শ্রেণী বা তাঁবেদার রাষ্ট্রের ঘেরের মধ্যে থাকতে চায়। কাজে কাজেই আজ যদি কেউ আশা করে যে যখন দুপক্ষই হাইড্রোজেন বোমা এবং আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী হয়েছে তখন অতিকায় শক্তিদ্বয়ের বিদেশে সামরিক ঘাটি স্থাপন এবং তাঁবেদার রাষ্ট্রের জোটের প্রয়োজন থাকবে না, সুতরাং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলির উপর থেকে চাপ অনেকটা নেমে যাবে তাহলে সেটা ভুল আশা করা হবে। যেরূপ দেখা যাচ্ছে তাতে স্বদেশে নিউক্লিয়ার অস্ত্রের ঘাটি স্থাপন ও বিদেশের ঘাটিগুলিতে নিউক্লিয়ার অস্ত্র মজুত করার দিকেই ঝোঁক হবে।

* * *

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ মালয় ও ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণ শেষ করে ১৯ তারিখে স্বদেশে ফিরেছেন। ঘানার প্রধানমন্ত্রী মিঃ নক্রুমা ভারত ভ্রমণে এসেছেন। জেনারেল দ্য গল ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

২২।১২।৫৮

জব্বলপুর

কুসুমবিহারী চৌধুরী
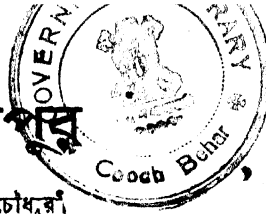
নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এই বৎসরের অধিবেশন ২৮শে ডিসেম্বর জব্বলপুর শহরে অনুষ্ঠিত হইতেছে। জব্বলপুর মধ্য প্রদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শহর। ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্বিন্যাসের পূর্বে জব্বলপুর ছিল মধ্য প্রদেশের দ্বিতীয় শহর। রাজধানী নাগপুরের পরেই ছিল এর স্থান। ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিটি—এই শহরের গুরুত্বের বিষয় বিবেচনা করিয়া, ইহাকে নবগঠিত মধ্যপ্রদেশের রাজধানী করারও সুপারিশ করেন। এই শহর মহাকোশল বিভাগের প্রধান অঞ্চল এবং হিন্দী ভাষাভাষীদের অঞ্চলে পড়ে। রাজ-ধানীর গৌরব থেকে বঞ্চিত হইলেও মধ্য প্রদেশের হাইকোর্ট জব্বলপুরে স্থাপন করিয়া জব্বলপুরের গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করা হয় নাই।

জব্বলপুর কলিকাতা হইতে প্রায় ৭৩০ মাইল দূরে। চারিদিকে দূরে দূরে সবুজ দিগন্ত বিস্তৃত পাহাড় শ্রেণী আর মাঝ-খানে বিস্তৃত উপত্যকা। এই উপত্যকার মাঝে গড়ে উঠেছে এই জব্বলপুর বা জবলপুর শহর। জবল অর্থ পাহাড় এবং পুর অর্থ পূর্ণ বা ভরা। এই জেলা প্রায় পাহাড়ে পূর্ণ, সেজন্য এর নাম হইয়াছে জবলপুর। এই জেলার প্রধান পর্বতমালা দুইটি হইতেছে—বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতমালা।

কিংবদন্তি আছে যে অতি প্রাচীনকালে এখানে জাবালি নামে এক মুনি বাস করিতেন। সেজন্য তাঁর নাম অনুসারে এই জেলার নাম ছিল জাবালিপুর। এই জাবালিপুর হইতে পরবর্তীকালে এই জেলার নাম জব্বলপুর বা জবলপুর হইয়াছে।

জব্বলপুর শহরের প্রান্ত দিয়া বহিয়া চলিয়াছে কুলু কুলু নাদিনী পুণ্যসলিলা হিন্দুদিগের অতি পবিত্র নদী—নর্মদা। বিভিন্ন পুণ্যতীর্থতে পুণ্যলোভাতুর স্নানার্থী নরনারীর ভিড় জমে—এখান-কার নর্মদার লমেটা ঘাট, গোয়ারী ঘাট, তিলওয়ারা ঘাট ও ভেড় ঘাটে।

নর্মদার একটি জলপ্রপাত—এই শহরেরই প্রান্তে ভেড়াঘাটে। ভেড়াঘাটের নর্মদার এই জলপ্রপাতটি "দুগ্ধধারা" নামে খ্যাত। বর্ষার পরে যখন নর্মদার স্রোতধারা ক্ষীণ হইয়া উঠে, তখন এই জলপ্রপাতের নৈসর্গিক শোভা অপূর্ব হইয়া উঠে। এই জলপ্রপাতের জল বহিয়া চলিয়াছে, নিম্নে অগণিত মার্বেল পাথরের সারির মধ্য দিয়া। জব্বলপুরের একটি প্রধান আকর্ষণ —এই "মার্বেল রক" বা মার্বেল পাথরের পাহাড়। বহুদূরবর্তী স্থান হইতে সৌন্দর্যপিপাসু পর্যটকের দল আসেন জব্বলপুরে—"মার্বেল রক" দেখিয়া নয়নমন সার্থক করিতে। দুকূলে উত্তুঙ্গ মার্বেল পাহাড়ের সারির মধ্যে পাষাণের কারা ভাঙিয়া বহিয়া চলিয়াছে নর্মদা। বর্ষার পরে এক স্রোতা চঞ্চলা নর্মদার দুর্দাম গতি স্তিমিত হইয়া উত্তুঙ্গ মার্বেল পাথরের ক্রোড়ে যেন বিশ্রাম নেয়, নর্মদা যেন এখানে

ধ্যান নিমীলিত-নেত্রে শান্ত শিবের আরাধনায় রত। মার্বেল রক দেখিতে হইলে নৌকাবিহার একান্ত অপরিহার্য হইয়া পড়ে। সরকারী পূর্ত বিভাগের পরিচালনায় এখানে একটি রেস্ট হাউস এবং নৌকা-বিহারের সুবন্দোবস্ত করা আছে।

ভেড়াঘাটে নর্মদা তীরে পর্বত শৃঙ্গে "হরগৌরী ও চৌষট্টি যোগিনীর" মন্দির প্রাচীন ভাস্কর্যের অন্যতম একটি সুন্দর নিদর্শন, কথিত আছে যে এই মন্দিরটি রাজা শালিবাহনের আমলের এবং ঔরঙ্গ-জেবের অভিযানের সময়ে মন্দিরটি কলুষিত হয়। এখনও মন্দিরের চৌষট্টি যোগিনীর বিভিন্ন মূর্তির গায়ে হিন্দু-বিদ্বেষীর আক্রমণের ক্রূর আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান। কোন মূর্তির স্তন দ্বিখণ্ডিত, আবার কোন কোন মূর্তির মস্তক হস্ত-পদাদিও বিধ্বস্ত। বর্তমানে মন্দিরটি সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রক্ষণাধীনে।

মদনমহল পাহাড়ের উপর "রাণী দুর্গাবতীর দুর্গ" জব্বলপুরের আর একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। নর্মদা নদীর দক্ষিণ তীরে এই দুর্গটি অবস্থিত। নদী এখন অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, দুর্গের প্রধান গৃহটি নির্মিত হইয়াছে এক খণ্ড বিরাট পাথরের উপর, কথিত আছে যে এই দুর্গ থেকে গুপ্তপথে নর্মদা স্নানে যাই-বার জন্য রাণী দুর্গাবতীর একটি সুড়ঙ্গ পথ ছিল। এই সুড়ঙ্গপথটি দীর্ঘকাল অব্যবহৃত থাকার জন্য এখন অবরুদ্ধ হইয়া গিয়েছে। সম্রাট আকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ একবার এই দুর্গ আক্রমণ করিলে রাণী দুর্গাবতী বিপুল বিক্রমে প্রথমবার মোগলদের হটাইয়া দেন, পরে অবশ্য স্বীয় সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় এই সমরেই তিনি দেহত্যাগ করেন। এই সমরেই বীরের মত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁর পুত্রও নিহত হন। রাণী দুর্গাবতীর দুর্গের অনতিদূরে মুসলমান বিজয়ীর জয়ধ্বজার প্রতীক মসজিদটি আজিও সগর্বে দাঁড়াইয়া আছে। রাণী দুর্গাবতীর দুর্গশীর্ষে দাঁড়াইয়া চারিদিকে, দূরে বিন্ধ্যগিরির পাহাড় শ্রেণীর মাঝখানের দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ উপত্যকার মনোরম দৃশ্য দেখিতে সত্যই অপূর্ব ! যেন এক-টানা নিরবচ্ছিন্ন শ্যামল আস্তরণে ধরিত্রী আচ্ছাদিত। আকাশ যেন হাতের কাছে আগাইয়া আসিয়াছে। মন যেন ধরিত্রীর মালিন্যের অনেক ঊর্ধ্বে বিচরণ করে!

রাণী দুর্গাবতীর দুর্গে যাইবার বন্ধুর পথে পর্বতগাত্রের নানাস্থানের বিভিন্ন রকমের বিশালকায় পাথরগুলিও পথিকের মনে বিস্ময় সঞ্চার করে। পথিপার্শ্বে এখানের ব্যালান্স রকটি (Balance rock) দেখিয়া পথিক ক্ষণেকের তরে থমকিয়া দাঁড়ায়। একটি বিপুলকায় পাথর আশ্চর্যরকমভাবে যুগ যুগ ধরিয়া টাল সামলাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, অন্য একটি বিশালবপু পাথরের প্রান্তদেশে পড় পড় অবস্থায়—অথচ পড়িতেছে না। এই শহরেরই পাশে রাণী দুর্গাবতীর একটি সুবৃহৎ দীঘি "রাণী তাল" নামে পরিচিত। তারই পাশে "চেরী তাল" নামে আর একটি বৃহৎ দীঘি রাণী দুর্গাবতীর বিশ্বস্তা দাসীর কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

এখানকার "হনুমান তাল" আর একটি প্রকাণ্ড দীঘি। তার চারিধারের জৈন মন্দির ও বাড়ীগুলি জৈন শিল্পকলার নিদর্শন। হনুমান তালে রাজা গোকুল দাশের বাড়ীও জব্বলপুরের অন্যতম গৌরব। রাজা গোকুল দাশের বংশধর বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শেঠ গোবিন্দ দাশ ভারতে সুপরিচিত।

জব্বলপুরের প্রাচীন পরিক্রমা শেষ করিয়া, এবার বর্তমান জব্বলপুরে আসা যাক্। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে বিগত কয়েক বৎসরে জব্বলপুরের অসাধারণ উন্নতি হইয়াছে সর্বক্ষেত্রে, শুধু উন্নতি হয় নাই নগরের জল সরবরাহ ব্যবস্থার। জব্বল-পুরের উন্নতির মূলে বাঙালীদের দান বড় কম নয়। দুইজন বিশিষ্ট বাঙালী বহু বৎসরকাল জব্বলপুর মিউনিসি-প্যালিটির কর্ণধার ও সহকারী কর্ণধার থাকিয়া জব্বলপুরের উন্নতি সাধন করিয়া-ছেন। বাঙালীরা শিক্ষা এবং চিকিৎসার মাধ্যমে জব্বলপুরবাসীর প্রভূত সেবা করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন।

জব্বলপুরে নবাগতদের প্রথমে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে—জব্বলপুর রেলওয়ে স্টেশনটি। এই সুবৃহৎ সুন্দর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে স্টেশন ভবন ও প্ল্যাটফরমটি স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারতের উন্নয়ন-মূলক কর্মপন্থারই প্রতীক—প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম অবদান।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জব্বলপুরের চেহারা অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। আজ জব্বলপুরের সর্বত্র গঠনমূলক কাজের প্রাণ-স্পন্দন ধ্বনিত হইতেছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে জব্বলপুর অনেক আগাইয়া গিয়াছে। মধ্য প্রদেশের মধ্যে জব্বলপুর আজ শিক্ষার পীঠস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয়, কারিগরী বিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়।

এখানকার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সুবৃহৎ ভবনগুলি রবার্টসন লেকের তীরে চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলেকা জুড়িয়া অবস্থিত। এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের যিনি কর্ণধার, তিনিও একজন বাঙালী—অধ্যক্ষ শ্রী এস পি

চক্রবর্তী। জব্বলপুরে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তাও অধ্যক্ষ শ্রীচক্রবর্তী মহাশয়।

জব্বলপুরের প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—মহাকোশল মহাবিদ্যালয় (প্রাক্তন রবার্টসন কলেজ)। রবার্টসন লেকের তীর থেকে এই কলেজটি বর্তমানে সীতা পাহাড়ের পাদদেশে নবনির্মিত সুরম্য বিরাট অট্টালিকায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই কলেজ)। রবার্টসন লেকের তীর হইতে বাঙালী—অধ্যক্ষ শ্রীউমাদাশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, কৃষি মহাবিদ্যালয়, কলা নিকেতন, মানকুমারী বাঈ হোম, সায়েন্স প্রভৃতি কলেজের নবনির্মিত প্রাসাদোপম বিরাট ভবনগুলি শিক্ষাক্ষেত্রে জব্বলপুরের অগ্রগতি সূচনা করিতেছে। মদনমহলে নির্মাণরত মেডিকেল কলেজ ভবন ও হাসপাতাল জব্বলপুরের উন্নতির অন্যতম নিদর্শন।

জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার এখনও নিজস্ব কোন ভবন নাই। এখন অস্থায়ীভাবে গোলবাজারে "শহীদ স্মারক" ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ চলিতেছে। "শহীদ স্মারকের" সুরম্য ভবন ও চতুষ্পার্শ্বস্থ ফুলের বাগান জব্বলপুরকে বিশেষরূপে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।

জব্বলপুর স্টেশন হইতে শহরে আসিতে প্রবেশ দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে—সুউচ্চ ঘণ্টাঘর, (Tower clock) অতিথিদের যেন সাদর অভ্যর্থনা জানায়। এই ঘণ্টাঘরটি প্রথম মহাযুদ্ধে উৎসর্গীকৃত সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ নির্মিত হইয়াছিল।

জব্বলপুর শহরের নাম ত্রিপুরী কংগ্রেসের জন্যও বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই ত্রিপুরী কংগ্রেসে বাঙলার বীর সন্তান সুভাষচন্দ্রের জয়লাভ সেদিন সারা ভারতে ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই শহরের অন্তঃস্থলে নির্মিত নেতাজীর পুণ্যস্মৃতি জড়িত "ত্রিপুরী কংগ্রেস স্মারক তোরণ" জব্বলপুরের আর একটি বিশিষ্ট কীর্তি।

জব্বলপুর শহরের জল সরবরাহ করা হয় —জব্বলপুর ওয়াটার ওয়ার্কস এবং পেরিয়ার ট্যাঙ্ক হইতে। শহর হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে সীতাপাহাড় শেষে জব্বলপুর ওয়াটার ওয়ার্কস, জব্বলপুর ওয়াটার ওয়ার্কসের বিরাট জলাধারের তিনদিকে পাহাড়ঘেরা অঞ্চল, শুধু একদিকে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এখানকার আরণ্যক প্রকৃতি বড়ই মনোরম। শীতের মরসুমে ছুটির দিনে এখানে শুরু হয় বন ভোজনের পালা। জব্বলপুরের প্রায় ১০ মাইল দূরে খামারিয়া অঞ্চল পার হইয়া "পেরিয়ার ট্যাঙ্ক" ও অনুরূপ একটি বিরাট জলাশয়। ইহার তিনদিকে পাহাড়ঘেরা অঞ্চল, শুধু একদিকে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রাকৃতিক বন্য-পরিবেশও অনুপম।

মিলিটারী ও ফ্যাক্টরী হাসপাতাল ছাড়াও জব্বলপুরে দুইটি সুবৃহৎ Civil Hospital আছে। একটি Lady Elgin Hospital, অন্যটি Victoria Hospital। ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের অধ্যক্ষও একজন বাঙালী—সিভিল সার্জন ডাঃ নিয়োগী।

জব্বলপুর একটি সার্বজনীন শহর। এই শহরের বাসিন্দাদের অধিকাংশই বহিরাগত। উত্তর প্রদেশীয়, মারাঠী, পাঞ্জাবী, দক্ষিণ ভারতীয় এবং বাঙালীরাই এখানকার অভিজাত সম্প্রদায়। দেশ বিভাগের পর যথেষ্ট সংখ্যক পাঞ্জাবী ও সিন্ধী শরণার্থীর পুনর্বসতি এই শহরে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্যবসায় বাণিজ্যের মাধ্যমে বহু সংখ্যক পূর্ববঙ্গীয় শরণার্থীর পুনর্বাসনও এখানে অসম্ভব নয়। বহু-বাঙালী এখানে স্থায়ীভাবেও বাস করিতেছেন। এখানকার স্থায়ী ও অস্থায়ী বাঙালী বাসিন্দার সংখ্যা অনুমান ২০।২৫ হাজার।

"সিদ্ধবালা বসু লাইব্রেরী এসোসিয়েশন" (বা City Bengali Club) স্থানীয় বাঙালীদের প্রধান প্রতিষ্ঠান। বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং কৃষ্টি প্রবাসে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য—এর প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২৫ সালে। এই প্রতিষ্ঠানের

বিস্তীর্ণ জমি সংগ্রহ করিয়া দেন রায় বাহাদুর প্রভাতচন্দ্র বসু। তাঁহার স্বর্গতা স্ত্রী সিদ্ধিবালার স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি ইহার তিনখানা ঘরও তৈয়ারি করাইয়া দেন। ইনি বৃটিশ আমলে মধ্যপ্রদেশ সরকারের একজন মন্ত্রী এবং দীর্ঘকাল যাবত জব্বলপুর মিউনিসিপ্যালিটির "চেয়ারম্যান" ছিলেন। লাইব্রেরী স্থাপিত হইলেও পূজার ঘর, বাংলা শেখার জন্য স্কুলের, বঙ্গীয় তরুণ সমিতির খেলাধুলোর জন্য আস্তানারও অভাব অনুভূত হইতে থাকে। এবারও আগাইয়া আসিলেন দুইজন মহানুভব বাঙালী। ১৯৩১ সালে তৈয়ারি হইল মোহনচন্দ্র মেমোরিয়াল হল আর মোক্ষদা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের তিনটি ঘর। জব্বলপুরে বাঙালীর সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে নাট্যরসিক বাঙালীর প্রয়োজন হইয়া পড়িল একটি স্থায়ী নাট্যমঞ্চেরও। শ্রীযুত তুলসী-বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকের সফল প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠিল—"তুলসী নাট্যমঞ্চ। দুর্গাপূজা বাঙালী কৃষ্টির অন্যতম মহান ঐতিহ্য, ইহার জন্যও চাই—একটি স্থায়ী মণ্ডপ। এবারও অগ্রণী হইলেন একজন এবং তার পরিপূরক হিসাবে আরও অনেকে— ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠা হইল "তরঙ্গিণী পূজা মণ্ডপের"। তারপর নারীদের জন্য তৈয়ারি হইল "কিরণশশী" কলা ভবন। শ্রীযুত অম্বিকাচরণ দে মহাশয় তাঁর স্বর্গতা স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষার্থ এই ভবনের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করেন। City Bengali Club—স্থানীয় বাঙালী জনসাধারণের মিলনতীর্থ। এখানে উদ্‌যাপিত হয় দুর্গা পূজা, লক্ষ্মী পূজা ও শ্যামা পূজা। ছাত্রীদের সরস্বতী পূজাও বাদ যায় না। পূজার কয়দিন এখানে সমারোহ লাগিয়া থাকে নাট্যাভিনয়ের। বাংলার নববর্ষ, রবীন্দ্র জন্মতিথি ও সুভাষ জয়ন্তী পালন করেন স্থানীয় বাঙালীরা এখানে সমবেত হইয়া। বাঙলার কৃতি সন্তানেরা আসিলে, তাঁহাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হয়— সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে সম্বর্ধনা জানানো হয়। অবাঙালী কৃতি পুরুষেরাও বাদ যান না। অধুনা জব্বলপুরে বাঙালীর সংখ্যা সমধিক বাড়িয়া যাওয়ার ফলে এই প্রতিষ্ঠানের গৃহগুলির সম্প্রসারণও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ইহার সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য বর্তমান সেক্রেটারীর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জব্বলপুরে যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালী থাকা সত্ত্বেও এখানে বাঙালী ছেলেমেয়েদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল না। "মোক্ষদা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের" প্রতিষ্ঠার পর বাঙালী বালকবালিকার মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিবার পথ সুগম হইয়াছে। বৎসর ২।৩ আগে পর্যন্ত ৮ম মান অবধি বাংলা ভাষারই মাধ্যমে এখানে শিক্ষা দেওয়া হইত। এখন প্রাইমারী পর্যন্তই শুধু বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। স্থানীয় বাঙালীদের অনুৎসাহ এবং সহযোগিতার অভাবে স্কুলের কর্ণধার ৫ম মানের (বা প্রাইমারীর) পর হিন্দীকে শিক্ষার বহনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে অবাঙালী ছাত্রীদেরও ভর্তি করিয়া স্কুলের আয় বাড়াইবার সুযোগ হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার পরিণাম এই হইল যে—মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য-তালিকা হইতে "বাঙলা ভাষা"য় শিক্ষার স্বীকৃতি মধ্য প্রদেশ সরকারের শিক্ষা বিভাগ প্রত্যাহার করিলেন। আমাদের ছেলেমেয়েদের হিন্দি শিখানো উচিত, কিন্তু তাই বলিয়া মাতৃভাষা "বাঙলাকে" বাতিল করিয়া দেওয়া কি উচিত? নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনকে আগামী অধিবেশনে জব্বলপুরে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিবার একটা কার্যকরী পন্থার নির্দেশ দিতে অনুরোধ জানাইতেছি। আশা করি স্থানীয় বাঙালী সমাজও "বাংলাভাষা শিক্ষার সমস্যা" সম্বন্ধে আর নিষ্ক্রিয় থাকিবেন না।

জব্বলপুরের আবহাওয়া মন্দ নয়। বাতাসে আর্দ্রতা কম। সাধারণত গরমের সময় তীব্র গরম এবং শীতের সময় এখানে খুব শীত থাকে। ডিসেম্বর এবং জানুয়ারীতে এখানে খুব শীত থাকে। এ বৎসর বৃষ্টিপাতের অনুপাত বেশী হওয়ার জন্য, এবার শীতের মাত্রাধিক্য হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।
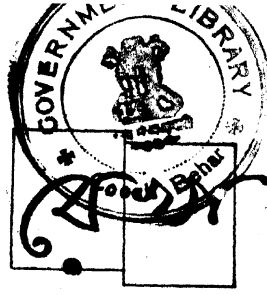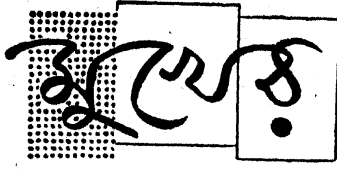
মৃদু স্বরে সৌরেশ বললেন, "টুলু, আমি এবার যাই।" বলেই হয়ত ভয় হল, টুলু রাজী হবে না, যেতে দেবে না। তাই তাড়াতাড়ি কারণস্বরূপ জুড়ে দিলেন, "আমাকে আবার অনেক দূরে যেতে হবে কিনা?"

টুলু এতক্ষণ যেন সৌরেশের একখানা হাত ধরে রেখেছিল। সৌরেশ যেই অনুরোধ করলেন, অমনি সে তাড়াতাড়ি তাঁকে ছেড়ে দিল। ক্ষোভ না, ব্যথা না, অভিমানও না। অত্যন্ত শান্ত গলায় বলল, "বেশ যাও। তুমি অনেক দূরে যাবে, আমি জানি।"

আর সঙ্গে সঙ্গে সৌরেশ টুলুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করলেন। ইচ্ছে করলে টুলু তাঁকে বাধা দিতেও পারত। জোর করে চেপে রাখতে পারত তার হাতের মুঠি। বলতে পারত, "বস, বসই না আর একটু। কত দিন পরে তোমাকে দেখলাম।"

তখন? তখন কি সৌরেশ ছিনিয়ে নিতে পারতেন নিজেকে? অনেক—অনেক বছর আগে এক দিন যেভাবে নিজেকে টুলুর কাছ থেকে কেড়ে এনেছিলেন? পারতেন না। হয়ত বারবার একই কথা বলতে হত,—"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমাকে অনেক দূরে যেতে হবে।"

অনেক দূরে। কিন্তু কত দূরে। কত দিন, রাত্রি, মাস, বছরের পর বছর পার হয়ে আজ এখানে এসে পৌঁচেছেন। কিন্তু সেদিন যে যাত্রা করেছিলেম, তখন কি জানতেন এখানে এসেই পৌঁছবেন? সৌরেশ ঠিক জানেন না। হয়ত অন্য কোথাও যাবার কথা ছিল, রাস্তা ভুল হয়ে এসেছেন এখানে, রাস্তা যে ভুল হয়েছে, তাও খেয়াল করেননি। আর এখানেই যে যাত্রা শেষ তাই বা কে বলতে পারে। ক্লান্তিতে সৌরেশ হাই তুললেন, ক্লান্তিতেই ফের চোখ বুজলেন। কে জানে, হয়ত যতটা এসেছেন, ততটাই, কিংবা তারও বেশী পথ এখনও বাকী থাকতে পারে।

আজ কিন্তু টুলু তাঁর সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করেছে। সুকুমার ভীরু ছেলেটি ভীরুর মতই তাঁর পথ ছেড়ে দিয়েছে, দরজা জুড়ে দাঁড়ায়নি। হত যদি টুলু হিংস্র প্রকৃতির, সে এত সহজে তাঁকে রেহাই দিত না। বলত, "তোমাকে আমি চিনি। সেদিন তুমিই না আমাকে গলা টিপে একেবারে নিস্তেজ অবসন্ন করে পালিয়ে গিয়েছিলে? তুমি—তুমি খুনী। আজ এত দিন পরে তোমাকে বাগে পেয়েছি, সহজে ছাড়ছি না।"

আমি, আমি খুনী? শ্রান্ত সৌরেশ চোখ বুজে কথাটাকে চিন্তা করলেন। তিনিই সত্যি টুলুকে গলা টিপে শেষ করে দিয়ে সেদিন পালিয়ে এসেছিলেন? তা ত নয়! টুলুর হত্যাকারী যদি কেউ থাকে, সে ত সময়।

ভাঙা ভাঙা গলায় সৌরেশ বলতে চাইলেন, "টুলু, তা নয়। তোমার হত্যাকারী ত সময়। আগে তুমি ছিলে, পরে আমি এলুম। কড়া চোখে সময় সেদিন আমাদের দুজনকেই যাচাই করেছিল। অবশেষে বেছে নিয়েছিল আমাকেই। তার হাত ধরেই তো আমি এখানে এলাম।"

সৌরেশ টুলুর মুখে যেন ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠতে দেখলেন। —"খুব যে সময়-

সোহাগী হয়েছ। সময় তোমাকে নিয়েই বরাবর থাকবে, তাই বুঝি ভেবেছ? বয়সে তুমি বড়, কিন্তু তোমার অভিজ্ঞতা কম। সোরেশ, আমাকে একদিন সময় যা করেছিল, তোমাকেও তাই করবে। টুঁটি টিপে ফেলে পালাবে। কালার পীরিতির মত কালের পীরিতিকেও বিশ্বাস কর না। সে অস্থির প্রণয়ী, অবিশ্বাসী, অল্পেই ক্লান্ত। বুড়ি- ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছোটা ছাড়া আর কোন খেলা সে জানে না।"

সৌরেশ সম্মোহিতের মত শুনছিলেন। ছোট্ট টুলু, যার চোখের মণি ক্ষোভে-দুঃখে সবুজ টিপের মত হয়েছে, সে একটু থামল,—দম নিয়ে আবার বলল; "আমাকে তোমরা মারবে বলে চক্রান্ত করেছিলে। তবু দেখ, আমি মরিনি। যদি মরতাম, তবে কি তুমি এত দিন পরেও ফিরে এসে আমাকে খুঁজে পেতে?"

সৌরেশের বাকরোধ হয়েছিল; সৌরেশ অন্তত কিছুক্ষণের জন্যেও হতবুদ্ধি হয়েছিলেন, নইলে তখনই বলতে পারতেন, টুলুকে যে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তার নাম সৌরেশ নয়, সৌর। সেও গলা টিপে টুলুকে মারতে চায়নি, তিলে তিলে শেষ করতে চেয়েছিল।

সেই সৌর কি এখনও কোথাও আছে?

আছে। ওই ত, কৃষ্ণদাস মল্লিক লেনের চৌদ্দ নম্বর বাড়ির দোতলায় তক্তপোশে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে যে ছেলেটি অঘোরে ঘুমচ্ছে, তার নামই ত সৌর। ভাল শোনায় বলে বন্ধু মহলে নিজের নামটা সে ছেঁটে এই ভাবে ছোট করে নিয়েছে। ভাল দেখায় বলে সরু কাঁচি দিয়ে গোঁফের সরু রেখা আরও সরু করেছে।

চেনা গলি, জানা বাড়ি, সেখানে যেতে সৌরেশের অতএব কোন অসুবিধে হল না।

সন্তর্পণে দরজা ঠেললেন সৌরেশ, বাঁ হাতের দিকে কাঠের সিঁড়িটা সংগে সংগেই চোখে পড়ল। আর সামনেই স্যাঁত-সেঁতে উঠোনটার কোণে ছিঁচকাঁদুনে কলটায় সারা রাত ধরে টপটপ জল ঝরছে। অচেনা লোক হলে ওই এ্যাঁটোকাঁটা ছাইয়ে ছাওয়া উঠোনটাতেই পা পিছলে পড়ে যেত, কিংবা নর্দমার ঝাঁঝরিটা যে অনেককাল থেকেই নেই সেটা জানা না থাকার দরুণ পা মচকেও যেত, কিন্তু সৌরেশ অভিজ্ঞ লোক পা টিপে টিপে অনায়াসে উঠোনটা পার হয়ে গেলেন।

আর সেই গন্ধটাকেই চিনলেন। বাসী, পচা-পচা টকটক।

এই গন্ধটা কলকাতার। পুরনো কলকাতার। তখন কলকাতার গায়ে এই গন্ধটা ছিল। শহরে যাদের জন্ম, নিরবচ্ছিন্ন বাস, তারা টের পেত না, কিন্তু এখানকার মাটিতে পা দিতে না দিতে এই গন্ধটা মফস্বলের লোকের নাকে লাগত। গন্ধটা বিশেষ করে ছিল গলিতে, ভাড়াটে বাড়ির উঠোনে আর বাথরুমে, দিনের পর দিন কারা যেন কড়া অ্যাসিড ঢেলে একে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করেছিল কিন্তু সফল হয়নি। আবার এই গন্ধ ছিল সদর রাস্তাতেও। এত উগ্র-ভাবে নয় অবশ্য, সেখানে গন্ধটা পেট্রলের পোড়া-পোড়া গন্ধ মেশান।

আসলে একই গন্ধ, তবু যেন ঋতুতে ঋতুতে একটু আলাদা রকমেরও মনে হত। বর্ষাকালে পুরনো ইটে দিনের পর দিন জলের ছোপ ধরত, ভিজে ভিজে গন্ধ ছড়াত। গরমে আস্তর-খসা চুনে হাওয়া ভারি হয়ে থাকত, আর চৈত্রের সন্ধ্যায় ছাদে দাঁড়ালে মাঝে মাঝে বেহিসাবী দক্ষিণে হাওয়া চেনা-চেনা কোন ফুলের গন্ধ জমা দিয়ে আরও উত্তরে ছুটে যেত।

সবই নবাগত কিশোরের কাছে সেদিন বিচিত্র লেগেছিল।

সেই বিস্মৃত বৈচিত্র্যের স্বাদ সৌরেশ আজও যেন একটু ফিরে পেলেন। কাঠের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে লম্বা বারান্দা পার হয়ে কোণের ঘরের দরজাটা সন্তর্পণে ঠেললেন, আলো নেবান, তবু মৃদু একটু জ্যোৎস্নার আভাস আছে, সৌরকে তাই সংগে সংগেই দেখতে পেলেন।

ছড়ান খাতাপত্রের মাঝখানে একটি ছেলে ঘুমিয়ে আছে। সৌর। টুলুর হত্যাকারী। এই অসহায় কুণ্ঠিত কিশোর কাউকে হত্যা করেছে, অন্তত করতে চেয়েছে, এ কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু সত্যিই চেয়েছিল।

সদ্য ম্যাট্রিক পাশ-করা মফস্বলের ছেলেটি শহরে এসে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। গন্ধ? না, না, শুধু সেজন্যে নয়। এর ভিড়, এর কোলাহল, অবিরাম জনস্রোত আর যানস্রোত আর ব্যস্ততা, নিরাকাশ রুদ্ধশ্বাস এই শহরটার কোন কিছুর সংগেই যেন নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছিল না। গাড়ি দেখলেই প্রথম দিকে ছুটে উঠত ফুটপথে, গলা বাড়িয়ে ট্যাক্সি-ওয়ালা কতদিন তাকে ধমক দিয়েছে, ঢংঢং করে ট্রামের চালক তাকে সাবধান করে দিয়েছে। বাসের রুটের রহস্য বুঝতেই তার কেটে গিয়েছে কয়েক দিন। গোড়ার দিকে অবাক হয়ে ভাবত একই নম্বর লেখা বাস এত তাড়াতাড়ি ফিরে ফিরে আসছে কী করে। ভাবত, বাস বুঝি ঐ একটাই। পরে জানল, বড় করে লেখা সংখ্যাটা রুট নম্বর ছাতখোলা দোতলা বাস তখন কলকাতার রাস্তায় দেখতে পাওয়া যেত। কত দিন লোভ হয়েছে বাঁকান সিঁড়ি বেয়ে সেও উপরে বসে, কিন্তু সাহস পায়নি। যদি টলে পড়ে। তার চেয়েও ভয়ের কথা, যদি নামিয়ে দেয়?

বাস চলে যেত, সে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। মাঝে মাঝে গন্ধ শংকিত হাওয়ার। এই গন্ধটা বোধহয় পেট্রলের। ভাল লাগত।
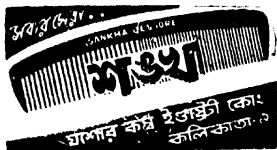
মোড়ে লাল নীল আগুন-হরফে একটা বিজ্ঞাপন জ্বলত, নিবত। সেদিকেও সে চেয়ে থাকত। এই কলকাতা একেবারে নতুন, তার চেনা কোন কিছুর মতই নয়।

কলকাতাকে সে ভয় করল। ভয় করল বলেই ভালবাসল। প্রতিজ্ঞা করল, একে আপন করে নিতে হবে। আপন করে নিতে হলে নিজেকে এর উপযুক্ত করেও তুলতে হবে।

কিন্তু রাস্তা পার হওয়া শিখতেই যার সপ্তাহ খানেক কেটেছিল, শহরটাকে আপন করে নেওয়া তার পক্ষে সহজ ছিল না।

খাতাপত্রের ভারে বিব্রত ছেলেটি কেবলই ভাবত সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে, বলছে, 'গেঁয়ো, গেঁয়ো ভূত কোথাকার।'

কেউ যে দেখেন না, কেউ হাসে না, এই ব্যস্ত শহরটায় কারুর যে অন্য লোকের দিকে তাকাবার ফুরসত নেই, এই কথাটা বুঝতে নতুন অতিথিটির বেশ কিছুদিন লেগেছিল।

ক্লাশে গিয়ে জড়সড় ভংগিতে বসত, সবার পিছে। উপায় থাকলে হয়ত সবার নিচে, অর্থাৎ মাটিতে বসে পড়ত। অধ্যাপকদের ইংরাজী বক্তৃতা শুনত, বুঝত না এক বর্ণ, সেজন্য ধিক্কার দিত নিজেকে, চোরের মত চাইত অন্য ছেলেদের মুখের দিকে, জানতে চাইত তারাও বুঝতে পারছে কি না। যারা, তারই আশে পাশে সপ্রতিভ মুখে বসে থাকত, মনে মনে হিংসা করত তাদের। আশ্চর্য, এরা সবাই হাসি হাসি মুখে বসে আছে, ঘাড় নাড়ছে সমঝদারের মত, আর সে একাই কি সকলের চেয়ে জড়, অবোধ, হতবুদ্ধি? মাঝে মাঝে তার কান্না পেত।

একদিন অধ্যাপক কী একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, প্রথমে সে বুঝতেই পারল না যে, লক্ষ্য সেই। অধ্যাপক যখন ঈষৎ উত্তেজিত গলায় বার তিনেক বললেন, "ইউ, ইউ, ইউ"—তখন তার সম্বিত ফিরে এল। পাশের ছেলেটি পেন্সিল দিয়ে তার কাঁধে খোঁচা দিচ্ছিল। উঠে দাঁড়াল সে, পা টলছিল, মাথা ঘুরছিল। অধ্যাপক প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করলেন, তবু সে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়েই রইল। যেন মানেই বোঝেনি। অধ্যাপক অপ্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, "নেকস্ট"—পাশের ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে চটপট জবাব দিয়ে দিল। তার মুখ চোখ তখন লাল হয়ে উঠেছে। উত্তর শুনে বুঝতে পেরেছিল, সেও জানত। মাথা নীচু করে সেদিন সে সারাক্ষণ ক্লাশে বসেছিল, আর ভাবছিল কেন এমন হয়। কেন সময় মত জানা কথারও জবাব তার মুখে জোগায় না?

সেদিন, সেই লজ্জা বিড়ম্বিত মুহূর্তে বিব্রত কিশোরটি অকস্মাৎ আবিষ্কার করেছিল; তার কেউ শত্রু আছে, যে তাকে পদে পদে অপদস্থ করে, স্বচ্ছন্দ হতে, স্বাভাবিক হতে দেয় না। আড়ষ্ট কুণ্ঠিত করে রাখে।

সেই শত্রু কে, ছেলেটি তাকেও চিনতে পেরেছিল। সে টুলু, তারই গ্রাম্য অতীত। টুলুকে হত্যা করতে হবে, যত শীঘ্র পারে,—এ সংকল্প সে তখনই গ্রহণ করেছিল। জেনেছিল, টুলু না মরলে সে বাঁচবে না। (ক্রমশ)

জনৈক বিশ্বনেতার প্রতি

রণজিৎ গুপ্ত

আমাদের শহরতলীর ফ্ল্যাটে আসুন
একবার। এই গলিতে আপনার গাড়ি
(ছোট রাস্তা, পরিষ্কার দুদিকেই বাড়ি)
ঢুকবে। সিঁড়ির মাথায় দরজা, কাশুন,
বা টোকা দিন। দরজা খুললে বসুন
বসার ঘরে। দেয়ালে মণিকার আঁকা
ছবি, কোণে বুদ্ধমূর্তি, কালিতে বাঁকা
আখরে মেজেতে—সমীরণ ও প্রসূন।

মণিকা, ছেলেরা, বুদ্ধমূর্তি, আমি
এই ফ্ল্যাট, এই গলি, ধীর অগ্রগামী
সাধারণ মানুষের সভ্যতাধারার
এই শান্ত ছবি—একে বিনাশ করার
কে আপনাকে ক্ষমতা দিল—অকারণে—
অকস্মাৎ—গামা-রে ও বিবিধ মারণে?

৬০

অবশেষে

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

অবশেষে আর কিছুই যে থাকবে না
শূন্য নদীর তীরে সে অন্যমনা
দেখবে প্রাচীন নদীজলে ভাঙে ঢেউ
তারপর শেষ আলোও যে যাবে ডুবে
বিষণ্ণ তারা উঠবেই নিশ্চুপে
তবুও যে তাকে ঘরে ডাকবে না কেউ।

ক্রমে ঘনতর হবে তার কালো ছায়া
রাত্রি গড়াবে, তবু উঠবে না, মায়া,
তাকে মনে হবে গভীর অন্ধকার,
তার পদতলে প্রাচীন নদীর জল
কান পেতে রবে, তবু তার চঞ্চল
ঢেউও শুনবে না হৃদয়ের হাহাকার

গহন

উমা দেবী

ও-পথ গহন ঘন অন্ধকার থেকে
নিজেকে গোপন করে রেখে
উঠেছে হৃদয় বেয়ে।
একটি আলোক জ্বলে ভীরু সবচেয়ে
ভাঙা ভাঙা আশার মতন—
ও-পথে আশ্চর্য আগমন
হবে কার?
—সময়ের নীরব পাথার!

হৃদয়ের ফেরারী জিজ্ঞাসা—
তার কি হবে না ফিরে আসা
অনুরাগ অনুতাপে এ-জীবন বিভ্রান্ত যখন
সুপ্তির তমিস্রা-ভাঙা নিশীথের ক্লান্ত জাগরণ!
কোনো স্মৃতি কোনো সুখ আসবে কি ভেসে
এই অলস হাওয়ায়?
আবার কি স্বচ্ছ হবে এ-মনের ঘোলা জল
সব কান্না থিতিয়ে যাওয়ায়?

এ-মনের প্রশ্ন নেই—এ-রাতেরও প্রশ্ন নেই—
অক্লান্ত স্মৃতির মত বয়ে-যাওয়া শীতল হাওয়ায়
—এ-রাত ঘুমাতে শুধু চায়!
এ-রাত তারার বীজ ছড়ায় ছিটায় এক অকারণ শোকে
তিমির-কণিকা হ'য়ে যারা নিভে যায় শুধু পাথর-দু-চোখে।

জানি তো সম্মুখে ঐ গহন নিরালা এক অন্ধকার থেকে
আজো ফিরে আসেনি অনেকে!
সব উড়ে-যাওয়া এই নিশীথের দুরন্ত হাওয়ায়—
ক্লান্ত ও কাতর এই সময়ও ঘুমিয়ে যেতে চায়!

নিখিল ভারত তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন

কালসেন

তানসেন সংগীত সম্মেলন এবার নটি অধিবেশনে সংগীত প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। সিংহী হাউসে, সুপ্রশস্ত মণ্ডপে সুব্যবস্থার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু অসুবিধা হয়েছে এইখানে যে, নটি অধিবেশনের প্রত্যেকটিতে যোগদান করে সবগুলি অনুষ্ঠান শোনার সময় এবং সুযোগ করে ওঠা আজকালকার পরিস্থিতিতে কঠিন ব্যাপার। সহৃদয় শ্রোতারা অনুষ্ঠানসূচী দেখে তাদের মনের মত অনুষ্ঠানগুলি শুনে থাকেন, কিন্তু সম্মেলনের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা যাঁদের করতে হয় তাঁদের সবগুলি অনুষ্ঠান শোনাই উচিত। ভাগ্যদোষে সুযোগ পেয়েও তার সদ্ব্যবহার করতে পারিনি, এই কারণে কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীর অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা সম্ভব হল না, এজন্য মার্জনা ভিক্ষা করছি। অবশ্য আলি আকবর খাঁ বা বিলায়েৎ খাঁর মত স্বনামধন্য শিল্পীর অনুষ্ঠানের দু-একটা আলোচনা বাদ পড়লে কিছু এসে যায় না, তথাপি আলোচনা করতে পারলে লেখক নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করতেন।

আলোচনা সম্পর্কে কোন রীতি অনুসরণ করা হবে সেটি একটি সমস্যা। অনেকে প্রতিটি রাগ, তার বাদী, সম্বাদী, বিস্তার প্রভৃতি টেকনিক্যাল ব্যাপার নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করতে উৎসাহ বোধ করেন এবং এদিক দিয়েই শিল্পীদের যাচাই করে নিতে চেষ্টা করেন। আমার মনে হয়, এত বড় ব্যাপারে এই রীতি অনুসরণ করা নিরর্থক। আসলে আমাদের কর্তব্য হবে মূল্যায়ন অর্থাৎ অনুষ্ঠানগুলির সর্বোপরি ফল কি হল সেটি নির্ণয় করা। যাঁরা এত বড় আসরে অংশ গ্রহণ করছেন, তাঁদের প্রয়োগশিল্প সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান আছে, এটা জানা কথা কিন্তু পরিবেশিত শিল্প কতখানি রসোত্তীর্ণ হল, কোন অজ্ঞাবণ্য শ্রোতাদের অনুভূতি গোচর হল, এইগুলিই মুখ্যতঃ আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়া উচিত। কোনো শিল্পী যদি কোনো রাগে বেদনিষিদ্ধ পর্দা লাগিয়ে একটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চান, তাহলে মারমার কাটকাট করবার কিছু নেই। শিল্পী সেটি জেনেশুনেই করেছেন, শ্রোতাও যদি সেই প্রয়াসের সার্থকতা বুঝতে পারেন, তাহলেই হল। মিশ্রণ আমাদের শাস্ত্রসম্মত, তবে রসহানি যদি ঘটে, তবে শিল্পীই দায়ী। এই রসের বিচারই হচ্ছে আসল বিচার।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে সর্বাগ্রে একটি বড় অভাবের কথা বলতে হয়, সেটি হচ্ছে রূপায়নের অসম্পূর্ণতা। এমন একটি অনুষ্ঠানও এই সম্মেলনে শোনা গেল না যেখানে একটি রাগের বিকাশ ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে অঙ্কুরিত, পল্লবিত এবং বর্ধিত হয়ে মঞ্জরিত সুরের বনস্পতিতে পরিণত হয়েছে। সবত্রই যেন কতকগুলি কৌশল দেখাবার প্রচেষ্টা। আগে কলার পূর্ণতা সাধিত হোক তবে তো কৌশল। কিন্তু আজকালকার শিল্পীদের কাছে কলার বিকাশের চেয়ে কৌশল প্রদর্শনই শ্রেয়, কেননা এতে হাততালি মেলে। কিন্তু কাদের কাছ থেকে এই হাততালি আসে এবং তার সার্থকতা কি, সেটা শিল্পীরা ভেবে দেখেছেন কি? এই কলকাতায় অনেক সম্মেলন দেখলাম, কিন্তু রাগের বিকাশকে চমৎকার করে তুলতে পারেন এমন কম শিল্পীই চোখে পড়ল, কেবল আমীর খাঁ, ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়, স্বর্গীয় পালুসকর এবং তারাপদ চক্রবর্তীর কথাই মনে পড়ে। অথচ প্রতিটি শিল্পীই সময় কিছু কম নেননি, এই সময়টা অনেকে এক জিনিসের পুনরাবৃত্তি করেছেন অথবা কতকগুলি নিজস্ব ভঙ্গি দেখাতে গিয়েছেন, যেগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে খাপছাড়া হয়ে দাঁড়ায়নি এমন নয়। এর মধ্যে একটি বিশেষ ব্যতিক্রম শ্রীমতী সারদাবাই ধুলেকর। এঁর গান আগে শুনিনি, কিন্তু এঁর ইমন শুনে মনে হয়েছে এঁর প্রচুর সম্ভাবনা বর্তমান। শান্ত সমাহিতভাবে নিয়মিত নির্দিষ্ট ক্রম অনুসারে গান গাইবার চেষ্টা করেছেন প্রতিটি পর্দায় যথাযথভাবে সুর লেগেছে। তাঁর আয়াসহীন কণ্ঠের স্বাভাবিক সঞ্চরণ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

রূপায়নের অসম্পূর্ণতা গায়কদের চেয়েও বাদকদের অনুষ্ঠানেই অধিকতর লক্ষ্যগোচর হল। বিশেষ করে তবলিয়াদের আচরণ আজকাল একটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। সুবোধ্য এবং প্রচলিত ঠেকার পরিচয় দুর্লভ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে হয়। বাদক সুরের কাজ আরম্ভ করলে তবলিয়ার ঠেকা দিয়ে যাওয়াই নিয়ম, কিন্তু সে নিয়ম আদৌ মেনে চলা হয় না, তবলিয়াও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের পথ ধরলেন। একসময় ধাঁই করে আওয়াজ পড়ল, আপনি বুঝলেন শম সমে এসে পৌঁছল, কিন্তু লয়ের সূক্ষ্ম কাজ ধরা আপনার পক্ষে সম্ভবই হল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার যেখানে সেখানে দুর্দান্ত চাঁটি মেরে 'জবাব' দেওয়া

হয়, কিন্তু এ জবাব না দিলেই বোধ হয় খাঁটি জবাবটি পাওয়া যায়। তবলিয়ারা অভিযোগ করেন যে, এ না হলে তাঁদের সুযোগ মেলে কোথায়? কিন্তু যেটুকু সুযোগ মেলে, তারই সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য যে সুযোগ নেই, তাকে দখল করবার চেষ্টা করলে দুর্যোগই দেখা দিয়ে থাকে। মোট কথা, যাই করা হোক না কেন শ্রোতাকে স্পষ্ট বুঝতে দেওয়া উচিত কিভাবে সংগত চলেছে, নইলে তবলার মূল উদ্দেশ্যই বিফল হয়। এই প্রসংগে তবলার লহরার কথা ওঠে। এই ব্যাপারেও এই মত দৃঢ়ভাবেই জানাব যে, তবলা লহরার অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করা উচিত। এক একজন ঘণ্টা-খানেক বা তারও ওপর যদি কেবলমাত্র তবলা বাজাতে থাকেন, তবে সেটি বিশেষ কর্ণপীড়াদায়ক হয়ে ওঠে। প্রথমত তবলা এমন একটি বাদ্য, যার সাংগীতিক আবেদন খুব বেশি নয়। খোলের একটা সুরেলা আওয়াজ আছে, পাখোয়াজেরও একটি বিশেষ পরিবেশের পক্ষে উপযোগী আবেদন আছে. কিন্তু তবলার গঠনটাই এমনি যে, তাতে কেবলমাত্র ঠেকা দেবার কাজই চলতে পারে। তথাপি কিছুটা বোলের বিস্তৃতি-সাধন যে তবলায় চলে না তা নয়, কিন্তু তার বেশি আয়াস না করাই ভাল। অপর-দিকে তবলার সংগে যে সারেংগি বাজে, তাতে একঘেয়ে এক লয়ে একই সুরের পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে। এটিও অতিশয় ক্লান্তিকর। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় অনায়াসেই তবলায় তাঁর একক অনুষ্ঠান সংক্ষিপ্ত করতে পারতেন। তাছাড়া হস্তপাট ছাড়া মুখপাট বা মুখে বোলের আবৃত্তি তিনি করেননি, এই কারণে তাঁর অনুষ্ঠানে বৈচিত্র্য দেখা যায়নি। এইদিক থেকে কানাই দত্ত মহাশয়ের অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানটি ভাল লাগে। আল্লা রাখা এবং শান্তা প্রসাদের সংগত শুনলাম। উপযুক্ত শ্রোতারাই হাততালি দিয়ে তাঁদের সম্বর্ধিত করেছেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাদনকৌশল যদি দেখাতে হয়, তবে তার বৈষম্যের ব্যাপারগুলিও বুঝিয়ে বলা উচিত এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ে বাদনভংগিও সেই সংগে বাজিয়ে দেখান উচিত। নতুবা কেবলমাত্র কতকগুলি আওয়াজের বৈচিত্র্য ছাড়া আর কিছুই বোধগম্য হয় না এবং স্বাভাবিক ভাবেই কিছুক্ষণ পর অনুষ্ঠান এক ঘেয়ে হয়ে পড়ে।

কেবলমাত্র চর্মবাদের অনুষ্ঠান যে সরস করা যায় না তা নয়। প্রাচীন ভারতে একাধিক চর্মবাদ্যের সম্মেলনে বিভিন্ন শব্দ সৃষ্টি করে নানাভাবে বৈচিত্র্যসাধন করা হত, কিন্তু আজকাল সেই ধরণের প্রয়াস দেখা যায় না। এই রকম একটা নূতনত্ব সৃষ্টি করা কি আজকালকার শিল্পীদের পক্ষে অসম্ভব?

তানসেন সংগীত সম্মেলন এবারে বেহালায় সত্যদেব পাওয়ারকে পরিচিত করাবার ব্যবস্থা করেছেন। এ'র পুরিয়া কল্যাণ মোটামুটি মন্দ নয়, তবে তাঁর গুণপনার সম্যক পরিচয় দিতে পেরেছেন বলে মনে হল না। আরো কয়েকটি অনুষ্ঠান না শুনলে এ'র সম্ভাবনার বিষয়ে কিছু বলা যায় না। এছাড়া কণ্ঠে আবিদ হোসেন খাঁ এবং তবলায় নিজামুদ্দিন খাঁকেও এই সম্মেলনে স্বীয় প্রতিষ্ঠা স্থাপন করবার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অগ্রগামীদের মধ্যে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাগেশ্রীর আলাপ অতি সুন্দর লাগল। এই তরুণ শিল্পী তাঁর সেদিনকার অনুষ্ঠানে যেন সুরলোকের দ্বার উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্মুখে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বর্তমান, তা যেন তিনি ম্লান হবার অবকাশ না দেন। যতীন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ঝিঁঝিটের আলাপে ততখানি চমৎকারিত্ব প্রদর্শন না করলেও গৎ বেশ ভালই বাজাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ দ্রুত লয়ে একটা একঘেয়ে ঝনঝনানি তাঁকে পেয়ে বসল এবং শেষ পর্যন্ত সুসন্ত হাততালিতে তিনি অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি করলেন। শ্যাম গাংগুলী মহাশয়ের মত প্রবীণ শিল্পীও যতক্ষণ না এই হাততালি পেলেন, ততক্ষণ বাজনা ছাড়লেন না। এটা বুঝতে পারি না যে, বহুক্ষণ ধরে তাঁরা যে মধুময় আবেশ সৃষ্টি করেন, তাকে একটা দুঃস্বপ্নে পরিণত করতে তাঁরা দ্বিধাবোধ করেন না কেন? জলদ বলে বাজনার একটা অংশ আছে, কিন্তু সেটা কি এই? বাজনার অসম্ভব দ্রুত গতি, তবলিয়ার তীব্র চপেটাঘাত এবং বিবিধ অংগভংগি, সবশুদ্ধ নিয়ে একটা নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এক ধরণের শ্রোতা আছেন, যাঁরা এই পরিবেশে উল্লসিত হয়ে হাততালিটা সামলাতে পারেন না। অনভিজ্ঞতার ফলে এইটাকেই তাঁরা একটা আদর্শ সাংগীতিক পরিস্থিতি বলে মনে করেন। শিল্পীরা যদি এর বিরুদ্ধে নিজেরা না প্রতিবাদ করেন বা বিরক্তি প্রকাশ না করেন, তাহলে বুঝতে হবে অনভিজ্ঞের উল্লাসই তাঁদের কাম্য। তাহলে আমাদের আর কিছু বলবার নেই।

বড়ে গোলাম আলি খাঁ সাহেব তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। রাগেশ্বরীর খেয়ালে তিনি শুদ্ধ গান্ধারের বৈশিষ্ট্য চমৎকার দেখিয়ে ছেন। আর এক অনুষ্ঠানে তাঁর গাওকী রাগের মর্ম কিন্তু বোঝা গেল না। কিন্তু তার গানে বিস্তারের আশানুরূপ মাধুর্য পাওয়া গেল না, ছোট ছোট টুকরো টুকরো কাজই তিনি বেশি দেখিয়েছেন। সর্গমের অতি বাহুল্যও কিঞ্চিৎ রসহানি ঘটিয়েছে। বস্তুত কেবলমাত্র কতকগুলি স্বরের আবৃত্তি না করে যদি তিনি স্বরগুলিকে রসাল করে প্রক্ষেপ করতেন, তাহলে এই সর্গম অনেক মধুর লাগত।

এই একটি অনুষ্ঠান রেডিওতে প্রচার করা হয়েছে। এইরকম পরিবেশে এবং পরি-স্থিতিতে রেডিওর প্রচার না হলেই মণ্ডপস্থ শ্রোতাদের সুবিধা হত। আজকাল শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের গানের প্রচার তো রেডিওতে প্রায়ই হচ্ছে, তথাপি এসব ক্ষেত্রে বেতারিক প্রচারের কোনো আবশ্যকতা ছিল বলে মনে হয় না। অনর্থক চলতি আসরকে এক ঘণ্টা বন্ধ রাখা হল। সবচেয়ে বিরক্তি-কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বেতারের কর্মী এবং কর্মিণীরা দফায় দফায় আসবেন, তাঁদের যন্ত্রগুলি বসাবেন, এ'কে পিছনে হটাবেন, ও'কে পাশে সরাবেন, হাত নেড়ে ইসারা করে এক একবার এক একরকম নির্দেশ দেবেন—আর যাঁরা গান শুনতে এসেছেন, তাঁদের এই মণ্ডলীলা নিরতিশয় ধৈর্য সহকারে দেখে যেতে হবে। খাঁ সাহেব যেভাবে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিলেন, তাতে সময়ের এই অপব্যয় তিনিও পছন্দ করছেন বলে মনে হচ্ছিল না। এইসব ব্যাপারেও অনেক সময় শিল্পীদের উৎসাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁরা আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেন।

ভীমসেন যোশীর কল্যাণ রাগে খেয়াল আমাদের সুন্দর লেগেছে। তবে তানকর্তবে কোন বৈচিত্র্য দেখা গেল না। তাঁর দাদরা অতি মধুর লাগল এবং তাতে একটা বৈশিষ্ট্যেরও পরিচয় পাওয়া গেল।

রবিশংকর 'অভোগী'র আলাপে মুন্সি-য়ানার পরিচয় দিয়েছেন। বরাবরই বাগেশ্রী থেকে এ রাগের পার্থক্যটি বজায় ছিল। এইসব রাগ বড় একটা কেউ গান না বা বাজান না। তার কারণ এর স্বরূপ বজায় রেখে খুব বেশিক্ষণ বাজাতে গেলেই অপর রাগের ছায়াপাত ঘটে। দক্ষতা প্রকাশের

পক্ষে এই ধরণের রাগ মন্দ নয়, তবে স্বমহিমায় ভাস্বর আরও যেসব পরিচিত গম্ভীরতর রাগ আছে, তাদের আবেদন মহত্তর এবিষয়ে সন্দেহ নেই। আলাপ উপলক্ষে দোলন এবং কম্পনের কাজগুলি খুব সাধারণভাবে ব্যবহার না করলে উক্ত ক্রিয়াগুলির বৈশিষ্ট্য আরো ভালভাবে উপভোগ করা যেত।

শ্যাম এবং তিলককামোদের মিশ্রণে যে সুরটি তিনি তাতে প্রয়োগ করলেন, সেটি ভারি মিষ্টি লাগল। গৎটিতে তিনি অসাধারণ লয় জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। বস্তুত তাঁর যে দুটি অনুষ্ঠান শুনেছি, সে দুটিতেই আলাপের চেয়ে গৎই অধিকতর মনোজ্ঞ হয়েছে। তবলা সংগত আর একটু সংযত হলে রসগ্রহণে আরো সুবিধা হত।

এই সম্মেলনে অপর যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তবলা এবং মৃদঙ্গে ছিলেন প্রতাপনারায়ণ মিশ্র, গোলাম নিজামুদ্দিন খাঁ, নানকু মহারাজ, একবাল হোসেন, ছানু গাঙ্গুলী, বিশ্বনাথ বসু, অসিত মুখোপাধ্যায়। সারেঙ্গিতে ছিলেন গোপাল মিশ্র, রামনাথ মিশ্র। কণ্ঠ সংগীতে ছিলেন—দবীর খাঁ, সন্তোষ ঘোষাল, মণিরাম এবং জয়রাজ, মানোয়ার খাঁ, আশীষকুমার, মোহনতারা আজিনকিয়া, এ কানন, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কথক নৃত্যে অংশ গ্রহণ করেছেন রোসনকুমারী, যমুনা নাগ, ইরা কপকাট, সুমিতা ভট্টাচার্য।

সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির। তিনি একথা জোর দিয়ে বলেছেন যে, সংগীতের ব্যাপারে কোন সরকারী নিয়ন্ত্রণ তিনি সমর্থন করেন না। জীবনের কতকগুলি ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে, কিন্তু সংগীতের ক্ষেত্রে সে প্রশ্ন আদৌ ওঠে না। আমরা তাঁর উক্তি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। সভাপতি ছিলেন শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন যে, শিল্পীদের চাহিদা বেড়েছে বলে আজকাল অনেক সময় তাঁরা অধিক অর্থ দাবী করে বসেন। দাবীর মাত্রা যদি সামর্থ্যকে ছাপিয়ে যায়, তাহলে এইরকম অনুষ্ঠান করা কঠিন হয়ে পড়বে। খুবই সত্যি কথা, তবে ন্যায়সংগত দাবীটুকু পূরণ করা উচিত। তার ওপরে যদি উদ্যোক্তারা সমবেতভাবে না ওঠেন, তাহলে অন্যায় দাবীও ক্রমেই কমে আসবে।

সর্বশেষে একটি কথা। অনুষ্ঠানের ঘোষণায় সবাইকার নামের আগে একটি করে 'প্রফেসার' যোগ করবার স্বপক্ষে কোনো সংগত যুক্তি আছে বলে মনে হয় না। পণ্ডিত আখ্যাটিও একটু বিবেচনা করে প্রয়োগ করলে ভাল হয়, গুরুত্ব আরোপ করবার এই রীতি বিশেষ সমর্থনযোগ্য নহে।

গোল্ডেন গেট কোয়ার্টেট

আমেরিকান দূতাবাসের আমন্ত্রণে গত ৯ই ডিসেম্বর আমেরিকার সুবিখ্যাত গোল্ডেন গেট কোয়ার্টেট দলের গীতানুষ্ঠান শুনে আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। এ'রা নিগ্রো স্পিরিচুয়াল গেয়ে শুনিয়েছেন। ইতিপূর্বে ম্যারিয়ান আন্ডারসনের কণ্ঠে যে নিগ্রো স্পিরিচুয়াল শুনেছিলাম, তার প্রকৃতি ভিন্ন রকমের। এই অনুষ্ঠানে লঘুতর পরিবেশের মধ্যে নিগ্রো স্পিরিচুয়ালের আর একটি প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া গেল। অতিশয় সুকণ্ঠ চার জন কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানের কণ্ঠে গানগুলি এত বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং মাধুর্যমণ্ডিত হয়েছিল যে, শ্রোতারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বারবার তাদের গান গাইতে অনুরোধ করেন। নির্ধারিত অনুষ্ঠানের পরেও আরও কয়েকটি গান গেয়ে তাঁদের শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তিসাধন করতে হয়।
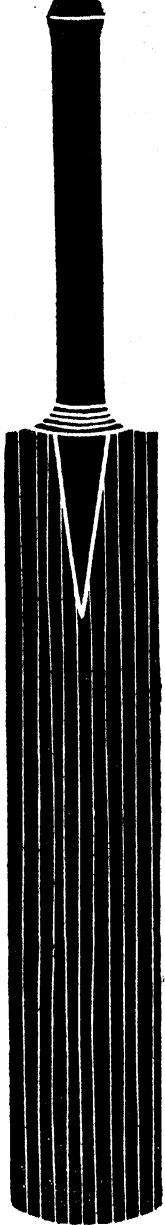
(৪)
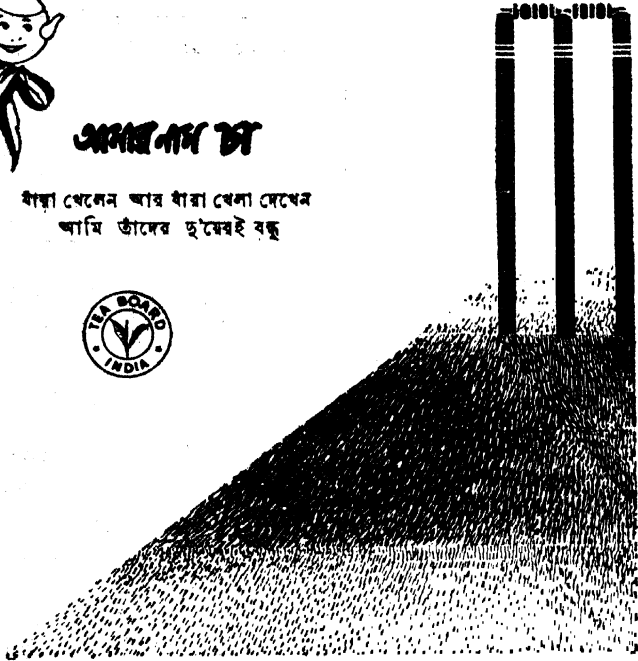
স্বভাবোচিত বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকলেন সুলতান সাহেব। দিনের আলোয় এই ঘরে এই প্রথম সুলেখাকে দেখছেন তিনি। একটু সময় চুপ করে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে বললেন, 'বিরক্ত করলাম।'

'না—'

'আশা করি ভালো আছ।'

সুলেখা মাথা নাড়লো।

'আশা করি এ কদিন কথঞ্চিৎ শান্তিতেও ছিলে।'

সুলেখা জবাব দিলো না।

'বসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।'

'তোমার সঙ্গে একটা জরুরী কথা বলতে এলাম।'

'বলুন।'

'দাঁড়িয়েই থাকবে?'

'ঠিক আছি।'

'দাঁড়িয়ে থাকার একটা বিশেষ অর্থ আছে জানো তো?'

'না।'

'ওটা অতিথিকে তাড়াতাড়ি বিদায় দেবার একটা ভঙ্গি।'

'আপনি তো অতিথি নন।'

'তাছাড়া আর কী?'

'এ বাড়ির আপনিই প্রভু।'

'বাড়ি তো তোমার।'

'আমার।'

'তোমার আগে এই নতুন মহলে আর কেউ বাস করেনি, আমিও না। তোমার পরেও নিশ্চয়ই কেউ করবে না।'

'আপনার বিনয় আপনারই যোগ্য।'

'সুলেখা।'

'বলুন।'

'তুমি কি সব সময়েই রেগে থাকো আমার উপর?'

'না, রাগ কেন?'

'আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা, এরপরই তোমার সব দুঃখের অবসান হবে।' সুলেখা চকিতে তাকালো একবার।

'শিরদাঁড়ার অস্তিত্বে আর ভাঙা ধনুকের লজ্জা বয়ে লাভ নেই। আমি সব খবরই সংগ্রহ করে এনেছি।'

'কিসের খবর?'

'তুমি কি সত্যিই সুখী হও, যদি আজই তোমাকে তোমার মার কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি?'

'আজ!' সুলেখার দুই চোখে তারা ফুটে উঠলো।

সোফার উপর নড়ে চড়ে বসলেন সুলতান সাহেব, বাইরের দিকে তাকিয়ে নিজের মধ্যেই নিজে নিমগ্ন হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। এক ফালি রোদ্দ এসে আলস্যে এলিয়েছে তার মাথায় মুখে, জানালাটা টেনে দেবার জন্য হাত বাড়ালেন, কিন্তু হাত পেঁছোলো না। সুলেখা এগিয়ে এসে ভেজিয়ে দিল জানালাটা

'অনেক ধন্যবাদ।' হাসলেন সুলতান, 'কলকাতায় লোক পাঠিয়েছিলাম তোমার মায়ের খোঁজ আনবার জন্য।'

'পাঠিয়েছিলেন? খোঁজ পাওয়া গেছে?'

'গেছে?'

'ও'রা ভালোভাবেই পেঁচেছেন। তোমার কোনো আত্মীয়, কী যেন নাম—'পকেটে হাত দিয়ে এক টুকরো কাগজ বার করলেন, 'দ্যাখো তো চেনো নাকি। এখানেই আছেন ও'রা।'

থরো থরো আঙুলে কাগজটা হাতে নিয়ে চোখ বুলোলো সুলেখা, 'হ্যাঁ, চিনি, খুব চিনি। আমার দাদামশাই, আমার মায়ের কাকা—'

একটু চুপচাপ।

'তা হলে যাবে?'

'দয়া করে—'

বাঁ হাতের সঞ্চালনে সুলতান সাহেব থামিয়ে দিলেন সুলেখাকে, 'ও শব্দটা আর উচ্চারণ কোরো না। কথাটা হচ্ছে এই যে, তোমাকে পাঠানো ঠিক এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বড়ো মুশকিলের কথা হয়েছে। একাও পাঠাতে সাহস হয় না অথচ—'

'আমার কোনো ভয় নেই, আমি একা চলে যেতে পারবো।'

'আমি যেতে দিতে পারবো না সুলেখা।'

'তাই বলুন।' সুলেখা ভার হলো।

'রাগ কোরো না, এটা রাগের সময় নয়। এখন আমার যাওয়াটা—' দীর্ঘশ্বাস চাপলেন

সুলতান সাহেব, 'ঠিক আছে, আমি নিজেই নিয়ে যাবো। আজ রাত্তিরেই রওয়ানা হবো।'

'আজ। আজ রাত্তিরে।' সুলেখার চোখ দুটো এতো বড়ো বড়ো হয়ে উঠলো।

'হ্যাঁ, আজই তোমার সব দুঃখের অবসান হোক।'

'সুলতান সাহেব, কী বলে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো।'

'আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র আমার সবুজ মহল আলো করে থাকো তুমি।'

সুলতান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন, 'অনেক কষ্ট পেলে, যতো রাগই থাক হয়তো কোনো একদিন ক্ষমা করতে পারবে। অসময়ে আর বিরক্ত করবো না তোমাকে, সন্ধ্যাবেলা প্রস্তুত থেকো, যে কোনো সময়ে আমি ডেকে নেবো।'

সুলেখাও উঠে দাঁড়ালো, মৃদুহাস্যে বললো 'বসুন না।'

তার হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে অভিভূত হলেন সুলতান সাহেব। আজ মেজাজ বদলে গেছে সুলেখার, সুলতানের উস্কো খুস্কো উদ্‌ভ্রান্ত চেহারার দিকে তাকিয়ে বরং মমতাই বোধ করছে মনে মনে। আলাপ করলো একটু, 'শুনলাম কী সব গোলমাল হচ্ছিলো সেদিন, আশা করি মিটে গেছে?'

'মিটবে। হয়তো আজ রাত্তিরেই মিটবে।'

'আমি গেলে আপনার সব বিপদ কেটে যাবে।'

'আমার বিপদ কাটুক এটা তুমি কখন থেকে চাইছো সুলেখা?'

'আমি আপনার অমঙ্গল চাই না।'

'এতো বড়ো মিথ্যেটা এতো অনায়াসে উচ্চারণ করলে?'

'মিথ্যে নয়। যেদিন মিথ্যে ছিলো সেদিন উচ্চারণ করিনি। আজ আমি কৃতজ্ঞ।'

'ও, কৃতজ্ঞতা। ভালো।' সুলতান সাহেবের চোখের কোলটা হাসির আভায় টোল খেলো। আস্তে আস্তে মস্ত হল ঘর পার হয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন, সাদা পরিপুষ্ট আঙুল কটি গভীর নীল পর্দার উপর আলতোভাবে ছুঁইয়ে ফিরে তাকালেন ঘরের মাঝখানে। দৃষ্টি দিয়ে যেন সস্নেহে লেহন করলেন সুলেখার মাথা, মুখ, সরল চোখের বড়ো বড়ো পল্লব। তারপর বেরিয়ে গেলেন।

আজ সুলেখা স্নান করলো ভালো করে, ভালো করে খেলো, খেয়ে প্রসন্নচিত্তে গড়িয়ে নিলো বিছানায়। যখন উঠলো, বোধ হয় চারটে। জানালা দিয়ে বেলাটা অনুভব করবার জন্য তাকালো একবার, চোখ ফিরালো না। বাগানভরা নানা রংয়ের ফুল, নানা রংয়ের প্রজাপতি। যতদূর দৃষ্টি চলে শুধু রং, রং আর রং। কী আশ্চর্য! এই বাগান এতোদিন দেখেনি সুলেখা। ঘোরানো গোল বারান্দার কোণে কোণে পাতাবাহারের ঝাড়। এমন পাতাবাহারই কি কোনদিন দেখেছে সে! খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো এক বিঘত উঁচু পারস্য গালিচার নরমে। গালিচাটাও আজ লক্ষ্য করে দেখলো সে। ধীরে ধীরে ঘরের সমস্ত কিছুর দিকেই নজর পড়লো তার। চিরদিন শুনে এসেছে, নওয়াবগঞ্জের নবাব বাড়ি একটা দেখবার মতো ব্যাপার। কতো বিদেশী ভ্রমণকারী আসে এখানে, কতো প্রশংসা করে, কাগজে ছবি বেরোয়। কিন্তু নওয়াবগঞ্জবাসীরা কোনদিন কোন কৌতূহলবোধ করে না। এতো কাছের বলেই করে না বোধ হয়। না কি করে। কে জানে। এ বাড়িতে ঢুকতে গেলে তার অনুমতিপত্র চাই, পরিচয়পত্র চাই, ঠিক জনসাধারণের অধিগম্য নয় বলেই হয়তো উৎসাহ নেই কারো। দাদু বেঁচে থাকতে, ছেলেবেলায় ঠাকুমাকে বলতে শুনেছে 'একদিন নবাববাড়ি দেখাবে না।' দাদু বলেছেন, 'দেখাবো, দেখাবো; ব্যস্ত কি। আমিও পালিয়ে যাচ্ছি না, নবাববাড়িও পালিয়ে যাচ্ছে না।'

ঠাকুমা বলেছেন, 'এতো সেই সাতকাল থেকেই শুনছি।'

'আমরা কি টুরিস্ট? আমরা এই শহরেরই মানুষ। অত আদেখলেপনায় আমাদের দরকার কী।'

সেই কথাটাই কায়েমী হয়ে থেকেছে বছরের পর বছর। যেহেতু আমরা বাইরে থেকে আসিনি, যেহেতু আমরা এক শহরে বাস করি বলে যখন খুশি তখন যেতে পারি, সেজন্যেই আর দেখা হয়ে ওঠেনি। ঠাকুমাও দেখেননি, জ্যাঠাইমাও দেখেননি, মা-ও দেখেননি, সে নিজেও দেখেনি।

নবাববাড়ির এই কারুকার্যখচিত নতুন হলঘরের গল্পও অনেক শুনেছে সুলেখা। হেঁটে ঘরটার এ-মাথা থেকে ও মাথায় গেল, এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে অপর প্রান্তে তাকিয়ে আয়তনটা অনুমান করবার চেষ্টা করলো, ফ্রেসকো আঁকা দেয়ালটা দেখলো। হজরত মহম্মদের কোন উপদেশমূলক গল্পের ইশারা। দেখলো বুকসমান উঁচু খাট, খাটের তিন ধাপ সাজে লাক্ষার প্রলেপিত উঁচু সিঁড়ি, একরাশ বেলফুলের মতো বিছানা। এইমাত্র ঐ বিছানা থেকে উঠে এসেছে সে। তারই বিছানা, তারই জন্য এই আয়োজন। নবাববাড়ি, নবাবী তো থাকবেই। তাই বলে এই? এতো? তার উপরে আছে এদের ভদ্রতা, সভ্যতা, আচার, ব্যবহার আর—আর—এইখানে এসে ভাবনাটা থামলো সুলেখার। সভ্যতা কথাটাই বলতে চাইছিলো সে। কিন্তু সেটা কি সত্যি? আজ বিদায়ের দিনে মনটা নরম আছে বলেই কি এতো বেশী করে ভাবছে সে?
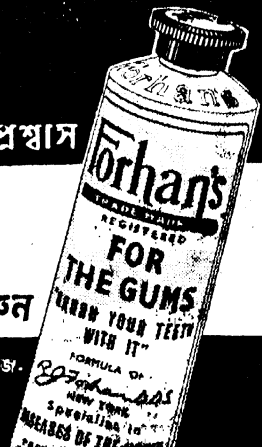
কিন্তু কাল থেকে বা তার আগের দিন থেকে বা তারও আগের দিন থেকে, আজকের দিনে তফাতটা হচ্ছে কোথায়? এই তো ঠিক তেমনি করেই বিকেল নামলো মাঠে, গা ধুয়ে এসে মস্ত হলের মাঝখানটিতে ঘাস রং পুরু গালিচার উপর লাল টুকটুকে মখমল মোড়া গোল আর নিচু আসনটিতে ঠিক তেমনি করেই বসলো সুলেখা, চুল বাঁধার সরঞ্জাম নিয়ে এসেছে জবেদা, সুগন্ধ তেল আনতেও ভোলেনি। সেই তেল রোজের মতোই আস্তে আস্তে বুলিয়ে দিচ্ছে চুলে, সোনা বাঁধানো চিরুনির মসৃণ হাড়ের দাঁত দিয়ে আঁচড়ে দিচ্ছে মাথা। মূল্যবান শাড়ি-জামা বুকে নিয়ে রুপোর কারুকার্য করা ট্রে-টি চুপচাপ শুয়ে আছে বিছানার উপর।

হয়তো এক্ষুনি জ্বলে উঠবে মোমের আলো, জবেদা বলবে, 'একটু হাসো, চুপ করে বসো, এখুনি সুলতান আসবেন।' বলবে, 'এ তো সুলতানের নেকনজর নয়, এর নাম প্রণয়। প্রেমই জীবন, প্রেমই প্রাণ, প্রেমই সত্য। প্রেম মানুষকে ধুয়ে মুছে পবিত্র করে দেয়। যার হৃদয়ে সেই প্রেম জাগে, সে-ও ধন্য। যার জন্য জাগে সে-ও ধন্য। প্রেমের জাত নেই, ধর্ম নেই, বিবেক নেই। প্রেম অন্ধ। তুমি পেয়েছ নাও, মন খারাপ করে থেকো না।

বইয়ের মতো এ কথাগুলো সুলেখার মুখস্ত। তিন মাসে তিন তিরিশে অন্তত নব্বুইবার শুনেছে। সহসা সারা অন্তর সংশয়ে আচ্ছন্ন হয়ে উঠলো তার। বেলা চারটার ভালো-লাগা বেলা পাঁচটার প্রান্তে এসে সভয়ে থমকে দাঁড়ালো। কে জানে সুলতান সাহেবের অগণিত কূট চক্রান্তের মধ্যে এটিও আর একটি কিনা। জবেদাকে চমকে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে, পা দিয়ে ঠেলে দিল প্রসাধনের সরঞ্জাম। অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকালো জবেদা, তাকিয়েই রইলো। তারপর আবার ধীরে ধীরে গুছিয়ে নিল সব। হাত বাড়িয়ে বললো 'এসো।'

'না।'

'কেন?'

'ভালো লাগে না।'

'সাজতে ভালো লাগে না?'

'না'

'আমার ভালো লাগে তোমাকে সাজাতে।'

'তোমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক!'

'নেই।'

'কখনোই না।'

'তবে থাক।' জবেদাও উঠে দাঁড়ালো, রেখে দিল জিনিসপত্র। শাড়িটা হাতে নিয়ে বললো, 'নতুন শাড়ি, সুলতান পাঠিয়ে দিয়েছেন, বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন আজ এটা পরবার জন্য।'

তীব্র দৃষ্টিতে বহুমূল্য ঢাকাই শাড়িখানার দিকে তাকালো সুলেখা। টুক টুক করছে রং, সারা গায়ে রুপোলী জরির ঘেঁষাঘেঁষি তারা-বুটি, লতাপাড়ের ছোটো ফুলগুলো সাচ্চা সোনায় যেন জ্বলছে। তাকালে চোখ ফেরানো যায় না।

নিস্তাপ গলায় জবেদা আবার বললো, 'বাড়িতে তাঁতী বসিয়ে নিজে হাতে এঁকে সুলতান সাহেব হাজার কাটিমে তৈরি করিয়েছেন এই শাড়ি, এ শাড়ি এখন আর বোনা হয় না, এসব তাঁতীদের বংশ লোপ পেয়েছে, অনেক চেষ্টায় এদের সংগ্রহ করেছেন উনি। তুমি দয়া করে পরলে সুখী হবেন।'

'দুঃখিত।' সুলেখা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো, 'তোমাদের সুলতান সাহেবকে সুখী করার জন্য আপাতত আমি খুব ব্যস্ত নই।' জবেদা দাঁত দিয়ে তার গোলাপী ঠোঁট কামড়ে লাল করে ফেললো, রুদ্ধস্বরে বললো 'নিষ্ঠুর।'

পাঁচটার বেলা আস্তে আস্তে পাঁচটা পনেরোতে এসে থামলো, তারপর পাঁচটা তিরিশ, তারপর চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট। বাজলো ছটা, কিন্তু ছটার পরে আর কেন কাটা সরে না। ছটার পরে ছ'টা পাঁচ মিনিট হতেও কেন এমন পুরো একটা দিন কেটে যায়। তারপর দশ, তারপর পনেরো। মানে সোয়া ছ'টা। মানে একটা মাস। আর সোয়া ছ' থেকে সাড়ে ছ'তে পৌঁছুতে একটা বছর। কিন্তু বছরেও কুলোলো না, শেষে যেন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যুগ-যুগান্তর পার হয়ে যেতে লাগলো সুলেখার জীবনের উপর দিয়ে। কী দীর্ঘ আর কী যন্ত্রণাদায়ক সময়। যে সন্ধ্যা এই তিন মাস ধরে প্রত্যেকদিন সুলেখার দরজায় একটা দৈত্যের মতো দিনকে ডিঙিয়ে পঙ্খীরাজ ঘোড়ায় চড়ে হুড়মুড়িয়ে এসে হাজির হয়েছে, সেই সন্ধ্যা আজ আসতেই ভুলে গেল? জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গ্রীষ্মের লম্বা বেলাকে অভিসম্পাত দিল সুলেখা। শেষে এক সময়ে সত্যিই সন্ধে হলো, সন্ধ্যার নিথরতায় ঝিম ঝিম করতে

লাগলো সবুজ মহলের সারা অন্তঃকরণ। সুলেখার বুকটাও ধক্ ধক্ করতে লাগলো প্রতীক্ষায়। সুলতান সাহেব ডাকতে এলেন ঠিক আটটা বাজতে পাঁচ মিনিটে।

'প্রস্তুত।'

'যাবো?' ঝিমিয়ে যেতে যেতে টগবগিয়ে উঠলো সুলেখা।

এক পা ঘরের ভেতরে, এক পা বাইরে। দরজার পর্দাটা শরীরের আধেক ঢেকে রেখেছে সুলতান সাহেবের। অনেক রোগা দেখাচ্ছে তাঁকে, দুরন্ত বিলিতি পোশাকে চেনা যাচ্ছে না বাঙালী বলে। আজ মোম নয়, ইলেকট্রিকের উজ্জ্বল আলোয় ঝক ঝক করছে সব। সুলেখা তার বহু প্রত্যাশিত সময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রায় কাঁপতে লাগলো।

'এতোদিনে শান্তি, না?' একটু হাসলেন সুলতান সাহেব।

'দেরি আছে যেতে?'

'তোমার কী ইচ্ছে?'

'আমার?' মাথা নিচু করলো সুলেখা, তখুনি চোখ তুলে বললো, 'প্লেনে যাবো?'

'যাবো। সত্যি যাবো।'

'ক'টায় ছাড়ে?'

'সারাদিন, ঘণ্টায় ঘণ্টায়—'

'তবে আর রাত করা কেন?'

'তাইতো।' সুলতান সাহেব হাতের স্টেট এক্সপ্রেসের টিন থেকে সিগ্রেট বার করলেন একটি, কিন্তু ধরালেন না। ডান হাতের দু' আঙুলে ধরে বাঁ হাতের বুড়ো নখে ঠুকতে লাগলেন, 'তাহলে প্রস্তুত হয়ে নাও।'

'আমি প্রস্তুত হয়েই আছি।'

'প্রস্তুত? কোথায়?' সুলেখার আপাদ-মস্তক তাকালেন তিনি, 'এভাবেই যাবে নাকি?'

'বেশ তো আছি।'

একটু চুপচাপ।

'বিকেলে একটা ঢাকাই শাড়ি পাঠিয়েছিলাম।'

'দেখেছি।'

'ভেবেছিলাম আজ অন্তত একটা প্রার্থনা তুমি পূরণ করবে।'

'প্রার্থনা বলছেন কেন, আদেশ বলুন।'

'সুতোগুলো তুলো থেকে তৈরী, আর সেই সুতো থেকেই জামা-কাপড়ের জন্ম, বুনেছে তাঁতীরা, ওর মধ্যে আমি কই? যাকগে, সে শাড়িটা না হয় না-ই পরলে, কিন্তু একটু ভদ্রভাবে রাস্তায় চলাফেরা করাই কি ভালো নয়?'

'আমাকে তো বোরখাই পরতে হবে।'

'না-ও হতে পারে, আমি যে পর্দা প্রথার বিরোধী সেটা অনেকেই জানে।' ইতস্তত করলো সুলেখা।

'তা ছাড়া সুলতানের বিবি সেজে নবাব-গঞ্জের নবাববাড়ি থেকে বেরুচ্ছো, যথোপযুক্ত বেশভূষা না হলে সন্দেহ করতে পারে।'

'বিবি।'

'উপায় নেই, ঘণ্টাখানেকের জন্য মিসেস সুলতান আমেদের পার্টটাই তোমাকে নিতে হবে।'

'সেকথা আমি জানতাম না।'

'জানলে কী করতে? যেতে না?'

সুলেখা চুপ করে রইলো।

সুলতান সাহেব পর্দা ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভেতরে এলেন, গাঢ় গলায় বললেন, 'লজ্জা আমারো আছে সুলেখা, ধিক্কারও আছে। আত্মসম্মানের সঙ্গে সম্প্রতি যতোই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকি না কেন, তারও কিছু অবশিষ্ট আছে। কিন্তু এ অভিনয় তোমারি জন্য, শহর থেকে তোমাকে সরাবার এ ছাড়া আর কোন কৌশল আমার জানা নেই।'

'শহরের সবাই জানে আপনি অবিবাহিত।'

'শহরের লোকেদের জন্য আমার ভয় নয়, এবারকার দফায় এই শহরের লোক উৎসাহী নয়! বাইরের গুণ্ডা এসেছে সব। তারা কাউকেই রেয়াৎ করে না। আমি বরং অপেক্ষা করছি, দয়া করে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে নাও, শাড়িটা বদলাও, কিছু গয়নাও প'রে নিও।'

ঘাড় বেঁকালো সুলেখা, 'না।' বিবি কথাটা আবার উত্তপ্ত করেছে তাকে।

'বেশ। যা তোমার খুশি।'

সুলতান ক্লান্ত। বিষণ্ণ। কিছু নিয়েই আর জোর করবার মতো তাঁর শক্তি নেই, উৎসাহ নেই। বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি।

কালো কুচকুচে বিশাল রোলস রয়েস দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। মাথার উপর সীমিতহীন আকাশের বিস্তার। চুলের মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে গাড়ির দরজায় হেলান দিলেন। একটু সময় লাগলো সুলেখার আসতে। কী ভেবে শেষ পর্যন্ত শাড়িটা বদলেছে সে, সামান্য প্রসাধনের প্রলেপও পরেছে মুখে, চুলের লম্বা বেণীতে সিল্কের ফিতের ফাঁস। সুলতান সাহেব মুখ ফিরিয়ে তাকালেন, লাল টুকটুকে ঢাকাই শাড়ির জরির চুমকি বুটি শুধু চোখকেই ঝলসে দিলো না, বুকের মধ্যেও তার বিদ্যুৎ ব'য়ে গেল।

জবেদার কাছে বিদায় নিল সুলেখা, চোখে চোখে তাকিয়ে হৃদয়ে মেঘ ঘনিয়ে এলো। কোমল গলায় বললো, 'তাহলে যাই?'

চোখ নামিয়ে নিয়ে জবেদা বললো, 'আল্লা, আল্লা।'

'অনেক অন্যায় ব্যবহার করেছি, নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা কোরো।'

জবেদা চোখে আঁচল চাপা দিল।

(ক্রমশ)

ট্রামে-বাসে

কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রের সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে চুয়াত্তর হাজার বেকার মেয়ে কর্মপ্রার্থী আছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"আগেকার দিনে মেয়েরা কখনও বেকার বসে থাকতেন না; কাজ না থাকলে অন্তত খৈ ভাজার সুযোগ ছিল। কিন্তু কথায় খৈ ছাড়া আর এখন আর খৈ ভাজা সম্ভব নয়। সুতরাং বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য বলতে হয় বে-কর" !!

* * *

ইলেনোর রুজভেল্ট রাশ্যা ভ্রমণ করিতে গেলে মঃ খুশ্চেভ তাঁহাকে বিশ্ব সংগ্রামের একটি সংহার চিত্র দেখাইয়াছেন। চিত্রটি এই:—প্রথম দিনের বিশ্বযুদ্ধে বৃটেন ও পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ ধ্বংস হইবে, দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে ধ্বংস হইবে মার্কিন। আমেরিকার পাল্টা আক্রমণে রাশ্যার প্রচণ্ড ক্ষতি হইবার পর চীন মাত্র টিকিয়া থাকিবে। শ্যামলাল বলিল—"আমাদের দশাটা চিত্রে দেখানো হয়নি। রাশ্যা হয়ত খবর পেয়েছেন—মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি"।

* * *

মঙ্গোলিয়া হইতে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুকে তিনটি ঘোড়া উপহার দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে একটি

অশ্বের ছাবও দেখিলাম। "খিদিরপুরের মাঠে ঘোড়াটি আগামী কুইন্‌স কাপে ছুটবে কি না এবং ছুটলে তার বাজী মারার কোনও চান্স হবে কি না সে খবর না পেলে শুধু শুধু ছবি দেখে আর কী হবে"—বলেন জনৈক ঘোড়দৌড় রসিক সহযাত্রী।

* * *

বিমান চালনার ব্যাপারে সরকারের নাকি প্রায় দুই কোটি টাকার উপর লোকসান হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"হাওয়াই জাহাজের ...রবারে টাকা হাওয়া হবে এ আর এমন কী বিচিত্র ব্যাপার" !!

* * *

কানপুরে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার মাঠে দর্শকরা গেট ভাঙিয়া ফেলায় এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। পুলিসের

সঙ্গে সংঘর্ষে ৭০ জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল।—"প্রমাণ হয়ে গেল মাঠে বা গেটে আমরা "সোবার"-এর সামিল নই"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

সম্প্রতি সংবাদপত্রে কলিকাতার মালিশ-ওয়ালাদের কাহিনী পাঠ করিলাম। "—অবশ্য রাজনৈতিক মালিশওয়ালাদের এই কাহিনীর মধ্যে ধরা হয়নি, হয়ত কথা সংখ্যার প্রাচুর্যের জন্যই এই কাহিনীতে তাঁদের স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রী এম, সি চাগলা বলিয়াছেন যে, ভারতই এশিয়ার গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকার একমাত্র বাহক।—"কিন্তু একমাত্র শিবরাত্রির সলতের ওপর ভরসাই বা কতখানি রাখা যায়"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * *

ডঃ সি ডি দেশমুখ কলিকাতার ফুট-পাথের বাসিন্দাদের সমস্যা নিয়া আলোচনা করিয়াছেন।—"বাসিন্দাদের মধ্যে ধর্মের এবং অধর্মের ষাঁড়দের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ব'লে সংবাদ পাইনি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

ডঃ দেশমুখ ছাত্র সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা হ্রাস করার জন্য সাধু সমাজের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"মাস্টার মশাইরা এ ব্যাপারে ফেল হয়েছেন, এমন কি কম্পার্টমেন্টেলের চান্সও বুঝি আর নেই" !!

* * *

খেলা প্রসঙ্গে সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—আলেকজেণ্ডার অধিনায়কোচিত ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।—"আমরা হেরে গেলেও পুরুর ন্যায় বলব—রাজার প্রতি রাজার আচরণ"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

মহাশূন্যে এবারে নাকি একটি Squirrel monkey প্রেরণ করা হইয়াছে।—'অতঃপর হয়ত কাঠবিড়ালী যাবে সেতুবন্ধনের কাজে আর পেছনে পেছনে যাবে বাঁদর, সুতরাং লংকাকাণ্ড হতে দেরি নেই" বলে শ্যামলাল।

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ, উত্তর প্রদেশের সরকারী জংগল হইতে দুইটি শ্বেত সিংহকে বাহির হইয়া আসিতে দেখা গিয়াছে। শ্যামলাল বলিল—'সরকারী জংগলে শ্বেত সিংহের বিরুদ্ধে "কুইট

জংগল" আন্দোলন শুরু করা হয়েছে কি না তা ঠিক বোঝা গেল না" !!

* * *

জনৈক ইংরেজ শল্য চিকিৎসক দীর্ঘদিন গবেষণার পর মোনালিসার হাসির অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার মতে ইহা নাকি সদ্য প্রসূতার হাসি। বিশু খুড়ো তাঁর দন্তবিরল মুখ ব্যাদন করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"দা ভিঞ্চির ভাগ্য ভালো, শল্য চিকিৎসার গুণে এতদিনে তাঁর শিল্প সৃষ্টি সার্থক হলো। এতদিন অর্থ না বোঝার দরুণ মোনালিসার হাসি মাঠেই মারা যাচ্ছিল। অতঃপর কোন দন্ত চিকিৎসক কী আবিষ্কার করেন দেখা যাক" !!

চক্রদত্ত

একাডেমিশিয়ান বরাবেসভ-এর মত যে চাঁদ পৃথিবীর কাছে থাকার দরুণ মানুষ প্রথম গ্রহ, চাঁদেই পদার্পণ করবে। পৃথিবী থেকে চাঁদে পোঁছতে তার মতে প্রায় ৫৩ ঘণ্টার মত সময় লাগবে। বরাবেসভ বলেন যে, মহাশূন্যে ভ্রমণকারী যানের চাঁদে গিয়ে নামতে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে, তা পৃথিবীর থেকে অনেক তফাৎ। তিনি বলেন যে, এখন বৈজ্ঞানিকদের প্রথম কাজ হবে, একটি সূক্ষ্ম চাঁদের এট্‌লাস তৈরী করা। আর এটি প্রথম মহাশূন্যে ভ্রমণকারী ব্যবহার করবে। তিনি বলেছেন যে, চাঁদের পাহাড়গুলো সবই প্রায় এক রকম দেখতে। যদি আগে থেকে এর সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা থাকে, তাহলে চাঁদ থেকে তথ্য সংগ্রহের অনেক সুবিধা হবে। চাঁদের আবহাওয়া এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের বাস করবার উপযোগী বলেই মনে হয়। বরাবেসভ বলেন যে, চাঁদে খুব উন্নত ধরনের জীবন্তবস্তু নেই। খুব সম্ভবত নিম্ন ধরনের জীবন্তবস্তু আছে—যারা দেখতে খুব ছোট ছোট। তবে এ সম্বন্ধেও তিনি যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। চাঁদে যে সমস্ত লোকেরা রকেট থেকে নামবে তাদের এক বিশেষ ধরনের পোশাক পরতে হবে। এই পোশাক না পরলে চাঁদের আবহাওয়ার নিম্ন চাপ তারা সহ্য করতে পারবে না।—অক্সিজেন মুখোশ তাদের সব সময় ব্যবহার করতে হবে। শরীর গরম রাখবার জন্য পোশাকের ভেতর থার্মো রেগুলেটার লাগান থাকবে। চাঁদের আবহাওয়া পাতলা হওয়ার দরুণ যাতে একজন আর একজন এর কথা শুনতে পায় তার জন্য পোশাকের মাথার ওপর একটা ছোট রেডিও সেট লাগান আছে। এতে কথা বলা এবং শব্দ ধরবার ব্যবস্থা আছে। চাঁদ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকালে, পৃথিবীকে একটা উজ্জ্বল নীল বলের মত দেখাবে, তবে প্রায় ১৪ গুণ বড় দেখাবে। বারাবাসভ বলেন যে, যে সব ভ্রমণকারী চাঁদে পোঁছবেন, তাঁরা শুধু চোখেই দেখতে পাবেন যে, পৃথিবীটা অক্ষের ওপর ঘুরছে। তার বিশ্বাস যে, যেহেতু কোনও সময়েই চাঁদে মেঘ পাওয়া যাবে না সূর্যচালিত ব্যাটারিই সব সময় কাজ করবে। ঐ ব্যাটারি থেকেই বৈদ্যুতিক আলো সংগৃহীত হতে পারবে। বারাবাসভের মতে চাঁদই এমন একটি মধ্যবর্তী স্টেশন হবে যেখান থেকে প্রয়োজন হলে মানুষ অন্যান্য গ্রহে যেতে পারবে।—চাঁদের কোনও রকম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি না থাকায় এখান থেকে মহাশূন্যে উড়ে যাওয়া সহজ হবে।

চাঁদে অভিযান

*

আজকের দিনে প্রত্যেক দেশই তার তৈল সম্পদ বাড়াবার চেষ্টা করছে। এই সম্পদ ছাড়া দেশের বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বাণিজ্যর উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। এর জন্য অনেক দেশ ডাঙ্গা ছেড়ে জলেও নেমেছে। যেমন জাপান তার চারধারের সমুদ্র থেকে তেল খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে। জাপানের প্রথম সমুদ্র উপকূল থেকে তেল তোলবার চেষ্টা হয় উত্তর-পশ্চিম হনসুতে। জাপান এর জন্য টেক্সাস থেকে বিশেষ ধরনের তেল তোলবার যন্ত্রপাতি যাকে 'বহনোপ-যোগী দ্বীপ' বলা হয় তা আনিয়েছে। এই 'দ্বীপ' সমুদ্রের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে খুব সহজেই নিয়ে যাওয়া যায়। এই বহনোপযোগী দ্বীপ একটি তেকোণা ৪,০০০ টনের প্ল্যাটফর্ম এবং এর ১২০ ফুট উঁচু, গম্বুজ। এটা স্বচ্ছন্দে সমুদ্রের উঁচু উঁচু ঢেউ এবং ঝড় সহ্য করতে পারে। এর থেকে ৬০০০ ফিট পর্যন্ত কুয়া খোঁড়া যায়। এখানে ৪৬জন লোকলস্কর বাস করতে পারে এবং হেলিকপ্টার নামবার ব্যবস্থাও আছে। জাপানের ভূতত্ত্ববিদ্‌দের মতে জাপানের আশেপাশে সমুদ্রের তলায় ২৫ মাইল্স পর্যন্ত স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে তেল আছে।

*

লক্ষ্ণৌর 'সুগার কেন রিসার্চ ল্যাব-রেটরী' আখের ক্ষতিকারক শুঁয়োপোকা ধ্বংস করবার জন্য পরভোজী (parasite) পোকা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছেন। ক্ষতিকারক শুঁয়োপোকা ভারতবর্ষের আখের প্রায় শতকরা ২০ ভাগ নষ্ট করে। এই পোকাকে এতদিন পর্যন্ত কোন রকম পোকা মারবার ওষুধ দিয়ে ধ্বংস করা যায়নি। কিছুদিন আগে 'শেলওয়া' নামক এক পরভোজী শূকের খোঁজ পাওয়া গেছে। এদের উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে পাওয়া যায়। এই নূতন পরভোজীকে ক্ষতিকারক শুঁয়োপোকাওয়ালা আখের ক্ষেতে ব্যবহার করে দেখা গেল যে শতকরা ৭০ ভাগ শুঁয়োপোকা কমে গেছে।
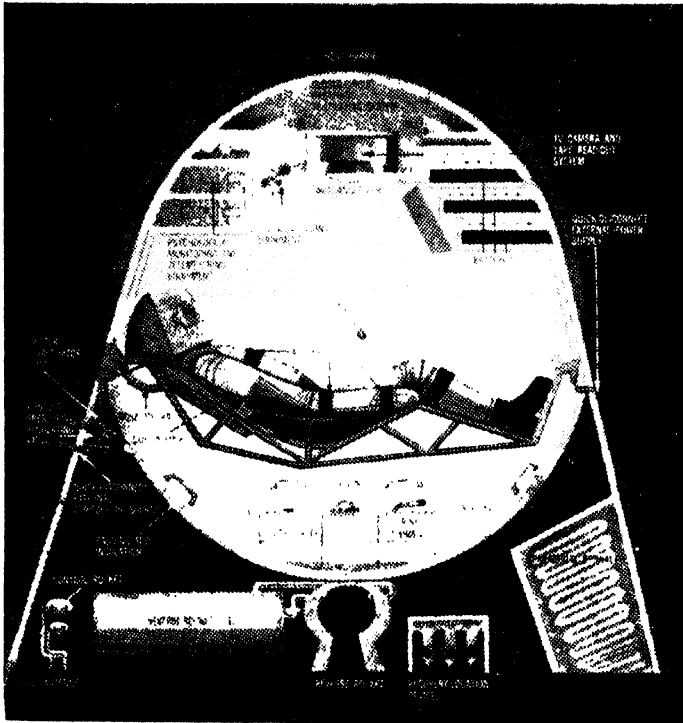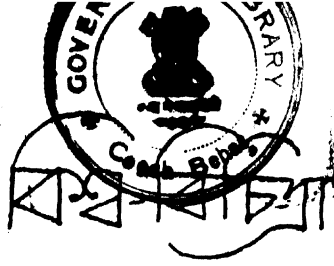
পৃথিবীতে অনেক ঘটনা ঘটে বৈজ্ঞানিকরাও যার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পান না। বিলেতের এক দৈনিক পত্রের সম্পাদক ফ্রেজার রবিনসন একবার একটা মিশরীয় মমির আধার বিষয়ে শোনেন যে, এর জন্যে নাকি আটটি লোকের মৃত্যু ঘটেছে। ফ্রেজার সত্যি ব্যাপার জানতে তদন্তের উদ্যোগী হলেন। এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ তিনি সবে শেষ করেছেন, হঠাৎ কোন কিছু নেই, সাংঘাতিক অসুখে পড়ে গেলেন। যথেষ্ট অল্প বয়সেই তার মৃত্যু ঘটে।

ঘটনাটা কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় কিনা সিদ্ধান্ত করার আগে মমি-আধারটির ইতিবৃত্ত একটু বলা দরকার। কাহিনীটির শুরু হয় ১৮৬৯ সনে মিসরের মরুভূমিতে। পাঁচজন ইংরেজকে দেখে এক আরবি মমি-আধারটি নিয়ে আসে ওদের কাছে বিক্রী করতে। আরবি জানায় তার প্রভু মুস্তাফা আগা ওটি বিক্রী করে দিতে চান।

ইংরেজ কজন প্রথমে একটু সতর্ক হয়, তারা বিক্রী করার কারণ জানতে চাইলে। তার উত্তরটা অর্থপূর্ণ ছিল। আরবি লোকটি জানায় যে ওটির জন্যে কেবল দুর্ভাগ্যই এসেছে।

এই বৃত্তান্ত শুনে ইংরেজরা হেসে ফেললে; ওরা ধরে নিলে দুর্ভাগ্য আনার কথা নেটিভদের কুসংস্কার। পরে কিন্তু আরবির উক্তি ওরা মর্মে মর্মে বুঝেছিল।

বাক্সটা ওরা কেনার অব্যবহিত পর থেকে নানা কাণ্ড ঘটতে আরম্ভ হল। বাক্সটি নিয়ে তাঁবুতে পৌঁছবার পর ওদের মধ্যে একজনের শিকার করতে যাবার অভিপ্রায় হল। ভৃত্যকে বললে বন্দুকটা নিয়ে আসতে। বন্দুক ওর হাতে পড়তেই হঠাৎ গুলী ছুটে গেল, যেন নিজের থেকেই। গুলীটা সেই ইংরেজটির হাত এমন বিদীর্ণ করে দিলে যে, হাতটা কেটে ফেলতে হল।

ধারাবাহিক কটি দুর্ভাগ্যের এই হল শুরু। সেই দলের একজন কমাস পর দারিদ্র্যের জ্বালায় সর্বস্বান্ত হয়ে যায়। তৃতীয় একজনেরও অনুরূপ ভাগ্য ঘটে। ব্যবসায় সে এমন সর্বস্বান্ত হয়ে যায় যে, সেই আঘাতে সে মারা যায়। চতুর্থ ব্যক্তির মৃত্যু হয় এক দুর্ঘটনায়।

ওদের মধ্যে একজন মাত্র নিস্তার পায়। সে লোকটি মমির বাক্সটা ইংলণ্ডে নিয়ে এসে তার বোনকে দেখায়। বোন সেটি দেখেই মোহিত হয়ে যায় এবং নেবার জন্যে আবদার ধরে।

প্রথমে লোকটি বোনের আবদারে কান দেয়নি, কিন্তু বোন দাদার একটা বাজে কুসংস্কার বলে বিপদের কথা উড়িয়ে দেয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকটি শেষ পর্যন্ত

রাজি হল যদিও বাক্সটা বিপদশূন্যে বলে সে তার বিশ্বাস পাল্টাতে পারলে না। পরে এর জন্যে তাকে নিদারুণ অনুশোচনা করতে হয়।

বোনের বাড়িতে মমির বাক্সটা পৌঁছে দেবার পর থেকেই পর পর নানা অঘটন ঘটতে আরম্ভ করে। শারীরিক দারুণ আঘাত, ভয়াবহ আর্থিক ক্ষতি—এই ধরনের এবং আরো সব অঘটন সেই মহিলা এবং তার পরিবারের লোকের মন ভেঙে দেয়। শেষ পর্যন্ত মহিলা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, মমির বাক্সটায় একটা অপদেবতা আছে নিশ্চয়ই। ওটাকে বিদেয় করাই ঠিক হল, তাতে যদি আবার ভাগ্য ফেরে।

বিদেয় করার আগে মহিলা ওর একটা ফটোগ্রাফ তুলে রাখলে তার দুর্ভাগ্যের স্মৃতি রেখে দিতে। আশ্চর্য তার ফল দেখা গেল এবং তা এমনি যে ফটোগ্রাফার ছবি দেখে হতভম্ব।

বাক্সটার ডালার ওপরে একটি স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি আঁকা ছিল। গোলাকার, ছোট, ভয়াবহ একটা মুখ যেন আধুনিক জগতের দিকে বিদ্রূপ ও রোষের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কিন্তু ফটোটাতে উঠেছে দেখা গেল এক সুন্দর যুবতীর ছবি; অবয়বগুলো অনেকটা জীবন্ত মানুষের প্রতিকৃতির মতো।

সম্পূর্ণ বিমূঢ় হয়ে ফটোগ্রাফার ছবিখানি নিয়ে বাক্সের মালিকের কাছে উপস্থিত হল। মহিলা খুঁটিয়ে ছবিখানি দেখলে এবং তারপর ফটোগ্রাফারের দিকে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করলে। স্পষ্টই বোঝা গেল মহিলা ধরে নিয়েছে ওটা ফটোগ্রাফারের কারসাজি। ফটোগ্রাফার সে কথা অস্বীকার করে জানালে যে, সে নিজে ছাড়া আর কোন ব্যক্তি বাক্সটা বা তার ক্যামেরা ছোঁয়নি।

মহিলা বুঝলে লোকটা সত্যিই বড় ভাবনায় পড়েছে এবং নিঃসন্দেহে সে সত্যি কথাই বলছে। মমির বাক্সটা ইতিপূর্বে যে সব অঘটনের কারণ হয়েছে ফটোটাও তারই একটা জের। এর পর কি ঘটে মহিলার সেইটেই হল ভাবনা।

উত্তর আসতে বেশী দেরীও করতে হল না। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ফটোগ্রাফারটির অপঘাতে মৃত্যু ঘটল। এর পর মহিলা বাক্সটির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য কৃতসংকল্প হল। বাক্সটি সে বৃটিশ মিউজিয়মে দান করতে চাইলে। দান গৃহীত হল এবং যথাসময়ে একজন বাহক এল নিয়ে যেতে।

বাক্সটি নিয়ে লোকটি নিরাপদেই পেঁছল কিন্তু এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই তার মৃত্যু হল। যে লোকটি বাক্সটা সরাতে সাহায্য করেছিল, তার একটা হাত ভেঙে গেল। এবং মিসরীয় স্মারক কামরায় বাক্সটি রেখে দেবার পর মিউজিয়মের দুজন পরিচারকের অভাবনীয়ভাবে মৃত্যু ঘটল। তারপর থেকে এ পর্যন্ত আর কোন অঘটন ঘটেনি।

বাক্সটায় কার মমি ছিল কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না। কিন্তু ডালার ওপরে কতকগুলো চিত্র দেখে মিসরতত্ত্ববিদেরা কতকগুলো তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছেন।

কতকগুলি ছবি হচ্ছে মূল্যবান পাথর ও প্রতিকৃতির। তাছাড়া আছে প্রাচীন থীব দেবদেবীর প্রতিকৃতি এবং প্রাচীন দেবতা ওসিরিস ও এনুবিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতীক।

এইসব থেকে এটা নির্ধারিত হয়েছে যে, বাক্সটায় এক রাজকন্যার অথবা উচ্চ বংশীয়া মহিলার মমি রক্ষিত ছিল যিনি বেঁচে ছিলেন সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্বে।

কোন ঘাতকের হাতে তার মৃত্যু হয় কি না, কিংবা সে অত্যন্ত নির্দয়া শাসক ছিল কিনা —এ সব প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া যায় না; কিন্তু বিদ্বেষের রোষ তার মধ্যে ছিল, যেটা তার মৃত্যুর পরও চলতে থাকে।

মুস্তাফা আগা, অর্থাৎ প্রথমে যে ব্যক্তিটি বাক্সটির হাত থেকে নিস্তার পেতে চেয়েছিল, সে নিশ্চয়ই সব কিছু জানতো এবং যে বস্তুটি তার দুর্ভাগ্যই শুধু এনেছে সেটিকে আর তাই কাছে রাখতে চায়নি।

প্রশ্ন হচ্ছে, বহু প্রাচীনকালে মৃত রাজকুমারীর মমিটি কি বাক্সটি যখন মুস্তাফার কাছে ছিল তার মধ্যেই ছিল? যদি তাই হয় তাহলে সেটার কি হল? আর সেই মমিরও কি বিদ্বেষ আরোপের ক্ষমতা ছিল? এ সব প্রশ্নের কোন জবাব দেওয়া সম্ভব নয়—সে রহস্যের হয়ত কোনদিনই সমাধান হবে না।

*

যুক্তরাষ্ট্রের ওহিওতে পুলিস জন প্সাইম্যান নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এই অপরাধে যে সে দরজায় দরজায় ঘুরে লোককে তার পিঠ চুলকে দেবার জন্যে বলে বেড়াচ্ছিল।

*

টোকিওতে স্কুল শিক্ষকরা অনশন ধর্মঘট করায় অভিভাবকদের একটি গোষ্ঠি খোলা জায়গায় খাদ্য রান্না করে ক্ষুধার্ত শিক্ষকদের জানায় তারা যদি ক্লাসে ফিরে যেতে সম্মত হয় তাহলে যেন খাবার নিয়ে খায়।

ফ্রান্সের নির্বাচনের ফলাফল

৬

২২শে অক্টোবর ১৯৫৪, (রংপুর জেল) —কাল সন্ধ্যায় লক্‌আপ-এর সময় হঠাৎ খবর আসিল যে, আমার এখানে প্রত্যহ পাহারা বদলি হইবে। কাল হইল, আজও হইল। অথচ মুখে কেহ কিছু বলিল না। ইহাদের মনোভাব ক্রমশই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

সর্বোদয়ের আদর্শ কী? কোন কোন পক্ষ এখানে? সকলের উদয়। সকল বলিতে কে বা কাহারা? (১) কয়েদীরা; (২) ওয়ার্ডাররা; (৩) অফিসাররা; (৪) নিরাপত্তা বন্দীরা। এদের সকলের কল্যাণ কিসে হয়? "Sin and not the Sinner" প্রিন্সিপলটা এক্ষেত্রে কি করিয়া খাটানো যায়, অন্যায়কারীর হৃদয় জয় করা যায় কি করিয়া?

২৪শে অক্টোবর ১৯৫৪, (রংপুর জেল) —কাল জেলর সাহেবকে দৈনিক পাহারা বদলি সম্বন্ধে লিখিলাম। তিন চারদিন পূর্বে কয়েদীদের যে আলু শাক দেয় তাহাতে কয়েদীরা বলে আমাশয় হয়। জেলর সাহেবকে তাহা বলিলাম। তিনি বলিলেন যে, কয়েদীরা উহা পছন্দ করে। অথচ তার পরদিন হইতেই উহা বন্ধ হইল। তৎপরিবর্তে পালং শাক দেওয়া শুরু হল। কিন্তু ডাক্তার সাহেবকে যে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। যত দূর জানি তিনি কোনও স্টেপ নেন নাই।

• • •

২৫শে অক্টোবর ১৯৫৪, (রংপুর জেল) —আজ সকালে বেড়াইবার সময় জেলর সাহেবের সহিত দেখা হইল। কাল বৈকালে আসগর আলী সাহেব আসিয়াছিলেন। অন্যান্য কথার মধ্যে আমার পথ্য এবং অন্যান্য অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে খোঁজ লইলেন। আজ সকালে বেলা দশটার সময় আবার আসিয়াছিলেন। জেলর সাহেব তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। আজ সকালের জেলর সাহেবকে পথ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতেই আসিয়াছিলেন। (আজ ও কাল দুই দিন ঘি ভাতে ভাত খাইব; পরশু হইতে আমার প্রয়োজনানুযায়ী আমার পৃথক রান্না হইবে।) জেলর সাহেব বলিয়াছেন যে, ডাএট স্কেলে ঘির উল্লেখ নাই। আমি বলিলাম যে, যে-সব জিনিস বাদ দিতেছি তাহার পরিবর্তে খরচ না বাড়াইয়া ঘি দিবেন। আসগর আলী সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া গেলেন। কিন্তু খবর পাইলাম জেলর সাহেব ধীরেনকে (পাচক) বলিয়াছেন যে, ঘি বাদে ভাতে ভাত দিতে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিলেন। আমার কামরায় বসিয়া দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত ব্যক্তিগত আলোচনা হইল। প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল কারা পরিচালন পদ্ধতি এবং সেই মুচির মৃত্যু সম্বন্ধে। ইতিমধ্যে আমার খাবার তৈয়ারি হইয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঘি দেওয়া হইয়াছে কিনা। ফালতু বলিল, দেওয়া হয় নাই। আমি বলিলাম, তবে তো আমার খাওয়া হবে না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিজ্ঞাসা করায় আমি তাঁহাকে সব বলিলাম। Security Prisoners Rules দেখাইয়া বলিলাম যে, তাঁহার ক্ষমতা আছে খরচের নির্দিষ্ট হার বজায় রাখিয়া খাদ্যবস্তুর পরিবর্তন করার। তিনি জেলর সাহেবকে ডাকাইলেন। কথা হইল। জেলর সাহেব বলিলেন যে, ঘি দিবার হুকুম নাই। Within cost-এও দেওয়ার ক্ষমতা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর নাই, আই-জি-কে লিখিতে হইবে। এই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়, পূর্বে আমাকেই বলিলে হইত। আমি যদি Convinced হইতাম তাহা হইলে আমি জিদ করিতাম না, নিজের টাকাতেই কিনিতাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলর সাহেবকে বলিলেন, "পটোল ইত্যাদি যখন আপনি কিনিয়া দেন তখন ঘি দিতে পারিবেন না কেন?" জেলর সাহেব কথায় কথায় বলিলেন যে, ধীরেন তাঁহাকে বলিয়াছে যে, আমি নাকি তেলেভাজা খাইতে খুব ভালবাসি। অথচ

অবার তেলে আপত্তি করি। আমি বলিলাম It's a despicable lie.

জেলর—You call me a liar?

আমি—You have not the capacity to understand simple English.

জেলর—Why do you shout? Is it a threat to me?

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজেকে খুব অসহায় বোধ করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, এ-সব ভাল নয়। জেলর সাহেবকে বলিলেন, "আমার সামনে আপনার এভাবে কথা বলা ঠিক নয়।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি ঘি-এর ব্যবস্থা করিবেন। আমি বলিলাম "আপনি যখন ঘি-এর ব্যবস্থা করিলেন এবং খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন তখন আমি খাইব।"

পরে তাঁহারা হাসপাতালের অফিসে গিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমি সেখানে গিয়া আমার ব্যবহারের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলাম। বলিলাম, I am sorry for getting so heated over it.

সুপার—"বিশেষ করিয়া আপনার এই বয়সে উত্তেজিত হওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ।"

আমি—শুধু স্বাস্থ্যের পক্ষে নয়, আপনাদের পক্ষেও। একটু পরেই হেড ওয়ার্ডার ঘি দিয়া গেল।

ঘটনাটা জেলময় রাষ্ট্র হইয়া গেল। বৈকালে বেড়াইয়া ফিরিবার সময় অন্তেই প্রথম সি এইচ ডব্লিউ একজন ওয়ার্ডার পাঠাইল এসকর্ট করার জন্য লক-আপ-এর সময় হঠাৎ দেখিলাম দুইজন হিন্দু চৌকাওয়ালা পাহারায় আসিল, দুইজন মুসলমান পাহারা আসিল, আর আসিল বখ্তার।

প্রথমে কালকের ব্যাচ আসিয়াছিল। হঠাৎ খবর আসিল নূতন ব্যাচ আসিবে, কালকের ব্যাচ ছয় নম্বরে যাইবে। কিন্তু বখ্তার রহিয়া গেল। সি-এইচ-ডব্লিউ লক্-আপ্-এর সময় আসিয়া বলিল, "এখনও পাহারা আসিল না কেন?"

আমি বলিলাম, "বাছিয়া যে পাঠাইতে হইবে" বখ্তারকে বলিলাম "তোমাকে বুঝি রাখিল এইজন্য যে, তুমি এদের দালাল—স্পাইয়িংএর জন্য তোমাকে রাখা।"

সে লজ্জা পাইল এবং অস্বীকার করিল, বলিল তাহারও ছয় নম্বরে যাইবার কথা হইয়াছিল কিন্তু তাহার সহিত ঝগড়া থাকার জন্য সে যায় নাই, কাল যাইবে। বখ্তার অল্প সময়ের জন্য বাহিরে গেলে নূতন ওয়ার্ডারদের সঙ্গে আলাপ করিলাম। দেখিলাম তাহারাও ভাল।...

আজ একজন লোক খবর দিল যে, কাল জেলর সাহেব এবং আজ বৈকালের জমাদার আলোচনা করিতেছিল যে, ব্যাপারটা প্রকাশ

হইল কি করিয়া। বেশ খোঁজাখুঁজি চলিতেছে...জনকয়েকের movement restricted হইয়াছে।

এই যে স্পাইগুলি সরাইল এবং কতকগুলি ভাল লোক (নূতন ওয়ার্ডার) দিল, এবং বখ্‌তার বলিল যে, তাহারও বদলির অর্ডার হইয়াছিল, এতে মনটা হালকা হইল। কাল-পরশুর straintটা গেল। এদের খাওয়াইলাম।

আজ শুনিলাম দুইজন ওয়ার্ডারের জরিমানা হইয়াছে—একজন দল বদলের জন্য, অন্যজন হাসপাতালের পারিচারককে দিয়া দরখাস্ত লেখানোর জন্য।

২৭শে অক্টোবর ১৯৫৪, (রংপুর জেল)—দৈনিক ওয়ার্ডার বদলি হইতেছে, কিন্তু বখ্‌তার থাকিয়াই যাইতেছে।

কাল বেড়াইয়া আসিয়া শুনিলাম যে, জেলর সাহেব প্রকাশ্যে অর্ডার দিয়া গিয়াছেন, কোনও ওয়ার্ডার বা কয়েদী আমার সহিত কথা বলিতে পারিবে না, বলিলে রিপোর্ট করিতে হইবে। হাসপাতালের রান্নাঘরের লোকদের ওয়ার্নিং দেওয়া হইয়াছে যে, আমার কোনও জিনিস এই রান্নাঘরে পাক বা গরম হইতে পারিবে না, সেখান হইতে কয়লা, কাঠ ইত্যাদি আনা যাইবে না। যদি তাহারা দেয় তবে তাহাদের বিরুদ্ধে কেস হইবে। এই নির্দেশ আজ হইতে enforced হইবে। ওয়ার্ডারদের ইনচার্জ বলিল, "আপনি কোনও কয়েদীর সহিত কথা বলিবেন না এবং বারান্দার এই পর্যন্ত (একটা সীমা দেখাইল) আসিবেন।"

কাল পিছনের বারান্দার উপর টি বি ওয়ার্ডের বারান্দা হইতে প্রচুর জল পড়িল। জেলরকে রিপোর্ট করা হইল, no action। জেলর সাহেবকে চরকা মেরামত, স্টেটসম্যান (সংবাদপত্র) ইত্যাদি সম্বন্ধে লেখা হইল, no action। সি এইচ ডাব্লিউ আসিয়া বলিল যে, জেলর সাহেব বলিয়া দিয়াছেন বেড়াইবার সময় আধঘণ্টা। আমি বলিলাম, "জেলর সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইবে।" সি এইচ ডাব্লিউ অনেকক্ষণ বসিয়া অনেক কথা বলিল। পরে আসগর আলী সাহেব আসিলেন। একজোড়া কাপড় দিলেন আর বলিলেন যে, সাহেব বলিয়াছে কালকের মধ্যে তাহাকে আমার সব জিনিস দিতে হইবে। (আজ বোধহয় বাসনকোসন সব আসিয়াছে; শিল নোড়াও।)

কাল সকালে বেড়াইবার সঙ্গী হইবার জন্য রিজার্ভ হইতে একজন ওয়ার্ডার আসিল। বেড়াইবার সময় জেলরসাহেবের ভাবভঙ্গী খুব বিশ্রী দেখা গেল।

আজ সকালে রিজার্ভ হইতে আর একজন ওয়ার্ডার আসিল। তাহার সহিত বেড়াইতে যাইতে হইবে। হাসপাতালের গেটের বাহির হইতে সে বলিল যে, পিছন দিয়া যাইতে হইবে। তাহা শুনিয়া আমি বলিলাম, বেড়াইতে যাইব না। পরে আবার আসিয়া অনুরোধ করিল পিছনের দরজা দিয়া যাইবার জন্য। গেলাম না। পনর কুড়ি মিনিট পরে আমার কামরায় আসিয়া পুনরায় আমাকে বেড়াইতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল—সদর দরজা দিয়া। আমি বলিলাম, "একবার যখন ফিরিয়া আসিয়াছি, তখন আজ আর যাইব না।" সে দুঃখিত হইল, বলিল, তাহার কোনও দোষ নাই। আমি তাহার বুকে পিঠে হাত দিয়া বলিলাম, "আমি সব বুঝিতেছি, আপনার কোনও দোষ নাই। আপনাদের উপর আমার কোন রাগ বা বিরক্তি নাই। কিন্তু আমি গুণ্ডামি সহ্য করিব না।" কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ওয়ার্ডারদের ইনচার্জ এবং বাঙ্গালী...... জমাদার সব দেখিতেছিল ও শুনিতেছিল। কিছু পরে ইনচার্জকে জিজ্ঞাসা করিলাম

এ-কথা কি সত্য যে, হাসপাতালের রান্না-ঘর হইতে কোনও সাহায্য পাওয়া যাইবে না। সে বলিল, কথাটা ঠিক নয় (অথচ ফালতু বলিল, সে-ই কাল ওইরূপ হুকুম দিয়াছিল)। কিছু পরে সি এইচ ডব্লিউ আসিল, বলিল, ওয়ার্ডার ভুল করিয়াছে, আপনি সদর দিয়াই বেড়াইতে যাইবেন। হাসপাতালের রান্নাঘর সম্বন্ধেও বলিল যে, পূর্বের মতই চলিবে। মেট্ বলিয়াছিল, তাহাকে আমার কামরায় আসিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম সি এইচ ডব্লিউ-কে বলিতে যে, আমি এই নির্দেশে খুব বিরক্ত হইয়াছি। বলামাত্র সি এইচ ডব্লিউ তাহাকে বলিল, "বাবু ডাকিলে তুমি ভিতরে যাইতে পার।" মেট্ বলিল, "কাল সব কড়া ছিল, আজ আবার সব ঢিল!"

বৈকালে বেড়াইবার জন্য সকালের সেই ওয়ার্ডার আসিল। আমি বেড়াইতে গেলাম না। আজ সকালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আর একটা নোট দিলাম (কালও দিয়াছিলাম)। Situation worsening। জেলর সাহেবকেও রিমাইণ্ডার দিলাম। সি এইচ ডব্লিউ বলিল, "আপনার সব বাসনকোসন, শিল, নোড়া ইত্যাদি আসিয়াছে।" আমি বলিলাম, "আজ একজন ওয়ার্ডার ইউ টি (আণ্ডার ট্রায়াল)-দের মারিয়াছে। সি এইচ ডব্লিউ টি বি ওয়ার্ড হইতে জল পড়া সম্বন্ধে খুব ইন্টারেস্ট নিল। লক-আপ এর পরে ডেপুটি জেলর সাহেবও আসিয়া টি বি ওয়ার্ড-এর জল কোথায় পড়ে ইত্যাদি দেখিয়া গেলেন।

জেলর সাহেব আসিলেন না। কালও দেখা করেন নাই। আজ সকালেও না, বিকালেও না। আমিও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর কাছে জেলর সাহেবের সম্বন্ধে লিখিতেছি। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আজ আসিয়াছিলেন। এঁদের মধ্যে কি কথাবার্তা হইল কে জানে! তবে হঠাৎ এই পরিবর্তন হইল কেন? সুপারিনটেণ্ডেণ্ট-এর কোনও হাত আছে কি ইহার মধ্যে?

২৮শে অক্টোবর ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—আজও সকালে ও বৈকালে রিজার্ভ হইতে ওয়ার্ডার আসিল বেড়াইতে লইয়া যাইবার জন্য। গেলাম না। মিষ্টি কথায় বিদায় দিলাম।

সুপারইন্টেন্ডেন্টকে আজও চিঠি দিলাম। আজ পৃথক্ রান্না হইল। কিন্তু চুলা defective, জ্বালানী কম, তেল ইত্যাদির পরিবর্তে অন্য কিছু দেওয়া হয় নাই। আসগর আলী সাহেবের মারফত জেলর সাহেব জানাইলেন যে, সুপারইন্টেন্ডেন্ট যদি কিছু করিতে পারেন করিবেন। C. H. W. জানাইল যে, সুপারইন্টেন্ডেন্ট না বলিলে সে আর স্নানের জলের ব্যবস্থা করিবে না। ঔষধ-

পত্রের জন্য রিকুইজিশন করিতে হইবে। আসগর আলী সাহেবকে বলিলাম, "তাহা হইলে অবিলম্বে আপনি সুপারইনটেন্‌ডেন্ট-এর সহিত যোগাযোগ করুন। সুতরাং আজও দুই বেলা সিদ্ধ (ভাতে ভাত) চলিল।

২৯শে অক্টোবর ১৯৫৪, (রংপুর জেল) —বেড়াইতে গেলাম না। আজ চুলা সম্পূর্ণ হইল। ঘি দেখা গেল—মেডিক্যাল অফিসার চার দিনের জন্য মঞ্জুর করিয়াছেন। কাঠ, সবজি, ঘি, গুড় ইত্যাদির অবস্থা দেখিয়া নিজের টাকা হইতে কিনিবার জন্য রিকুইজিশন দিলাম। সাপ্লাই করা হইল না। আসগর আলী সাহেব জানাইলেন ঘি ও গুড় দেওয়া হইবে; কাঠ প্রভৃতি সম্বন্ধে সুপারইনটেন্ডেন্ট স্থির করিবেন। সুপারইনটেন্‌ডেন্টকে আজ চতুর্থ নোট দিলাম। চুলা জ্বলে না, কাঠের স্বল্পতা, no substitute article of diet, ঔষধ গ্রহণ করিতেছি না, এই সব জানাইলাম।

বৈকালে ডেপুটি জেলর সাহেব আসিলেন—চরকা মেরামত ও সবজি বাবদ কোন নিয়ম অনুসারে টাকা পাওয়া যায় তাহা জানিতে। আসগর আলী সাহেব আসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন substitute article (of diet) কি নিতে চাই, ঔষধ কি চাই ইত্যাদি।

৩০শে অক্টোবর ১৯৫৪, (রংপুর জেল)— আজ সকালে সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্টকে কড়া নোট দিলাম। খুব লম্বা, সাতটা পয়েন্ট সমেত। বৈকালে ডেপুটি জেলর সাহেব আসিয়া বলিলেন যে, সুপারইনটেন্‌ডেন্ট খুব দৌড়াতে আসিয়াছিলেন, প্রথমেই আমার সবগুলি নোট পড়িয়াছেন, গরম জলের ব্যবস্থা তিনি (সুপার) করিয়াছেন। তুলার পাঁজ ডেপুটি সাহেবই লইয়া আসিলেন। সকালে C. H. W. চরকা লইয়া যাইবে এবং বৈকালে মেরামত করিয়া ফিরাইয়া আনিবে।

৩১শে অক্টোবর ১৯৫৪, (রংপুর জেল)—আজ সকালে ঘি ইত্যাদি পাওয়া গেল। গরম জলও আসিল।

১লা নবেম্বর ১৯৫৪, (রংপুর জেল)— এই যে সামান্য সামান্য প্রশ্ন লইয়া ছোট-খাট সংগ্রাম—জীবনের সংগ্রামের সঙ্গে ইহাদের কি কোনও অসংগতি আছে? এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধগুলি কি সেই বড় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার পথে বাধা সৃষ্টি করে? কি করিয়া এই ছোট ছোট লড়াই-গুলি বড় লড়াইটার জন্য প্রস্তুত হইতে সাহায্য করিতে পারে? কেমন করিয়া? কি উপায়ে?

আজ সুপারইনটেন্‌ডেন্টের সঙ্গে প্রায় দুই ঘণ্টা আলাপ হইল। তিক্ততার সম্ভাবনায় জেলর সাহেবকে প্রথমেই সরানো হইল। মুচীর মৃত্যুর পর এবং সুপারইনটেন্‌ডেন্টের সঙ্গে সেদিন আলাপের পর হইতে জেলর সাহেব যত নূতন নূতন উপদ্রব সৃষ্টি করিয়াছেন সেই সব এবং ডাএট সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম।

ডাএট সম্বন্ধে কথাবার্তার পর উত্থাপন করিলাম নিমপাতার কথা, স্নানের গরম জলের কথা, সপ্তাহে দুই খানা চিঠি, কবিরাজী ঔষধপত্র, তুলার পাঁজ, দৈনিক ভ্রমণ, বাজার হইতে সবজি আনা, খবরের কাগজ ও চরকার কথা। বলিলাম অনুরোধ সত্ত্বেও এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুপারইন্‌টেন্‌ডেন্টকে কেন জানানো হয় নাই।

জানাইলাম রসুই ঘরের পাচক প্রভৃতি ও হাসপাতালের পরিচারকদের উপর অপমানকর হুকুমের কথা, বারান্দায় গতি-বিধি সীমাবদ্ধ করা এবং কয়েদী ও ওয়ার্ডারদের সহিত কথা বলিতে নিষেধ করার কথা। হেড ওয়ার্ডার ও অন্য ওয়ার্ডাররা সদাসর্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিবে, হেড ওয়ার্ডার আমার ধোপা প্রভৃতির সঙ্গে থাকিবে, রাত্রের পাহারা মোতায়েন ইত্যাদি নূতন হুকুমের বিষয়ও বলিলাম।

এই সব পাহারা এবং ওয়ার্ডার ও কয়েদীদের বারবার ওয়ার্নিং ইত্যাদির উদ্দেশ্য, তাহাদের ভয় দেখাইয়া সন্ত্রস্ত করা এবং সেই সেল-এর মৃত্যুটা সম্বন্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব করিয়া তোলা—ইহাও বলিলাম। হিস্টোরি টিকেট-এ লেখা হইয়াছেঃ—সুপারিন্‌টেনডেন্টের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রয়োজন হইলে অফিস তাহা করিবে। পুরাতন ব্যবস্থার এদিক-ওদিক করা চলিবে না, সুপারিনটেনডেন্টের অনুমতি ব্যতিরেকে। বাগানের (বাজার হইতে নয়) সবজি চলিবে।

সুপারিনটেনডেন্ট কি করিতেছেন এই সব সম্বন্ধে? অফিসের মঙ্গলের জন্য, তাঁহার নিজের, গভর্নমেণ্টের, নিরাপত্তা বন্দী এবং অন্যান্য বন্দীদের মঙ্গলের জন্য?

সেল-এ মৃত্যু, বিচারাধীন কয়েদীদের ওয়ার্ডার কর্তৃক প্রহার, কনকনে শীতের সকালবেলা দুরন্ত হাওয়া ও বৃষ্টির মধ্যে কয়েদীদের আহার গ্রহণ, কয়েদীদের খাদ্য সম্পর্কে আলুশাক ইত্যাদির প্রতি প্রীতি......

অফিস ও অফিসারদের বিরুদ্ধে কি করিয়া কয়েদীরা চার্জ প্রমাণ করিতে পারে? অফিসের একজোটের বিরুদ্ধে একজন পার্ট-টাইম সুপারিনটেনডেন্ট কি করিয়া সত্য আবিষ্কার করিতে পারে? কনভিক্ট, আণ্ডারট্রায়ালস এবং অন্যান্য সকলে কোবড্, কাজল্ড এ্যাণ্ড টেরোরাইজড — ওয়ার্ডারদের শাস্তি— বাঙালী-অবাঙালী ঝগড়া।

(ক্রমশ)

ক্রিকেটের রাজকুমার

শ্রীখেলোয়াড়

১৮৭৯ সালের এক গভীর রাত্রি। নবনগরের মহারাজা জামসাহেব বিভাজী প্রাসাদ কক্ষে পদচারনা করে বেড়াচ্ছেন। চোখে মুখে গভীর উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার ছাপ। মাঝে মাঝে উন্মুক্ত দরজার দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চাইছেন। চারিদিকে সতর্ক প্রহরী। এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলেন রাজার রাজনৈতিক উপদেষ্টা কর্নেল বার্টন। বার্টন ঘরে ঢুকতেই মহারাজা তাকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বললেন, "বার্টন, তুমি এখনই নিয়ে যাও। মোটেই নিরাপদ নয় এ স্থান। যে কোন মুহূর্তে বিপদ হতে পারে।" বার্টন কিছু বলার চেষ্টা করতেই মহারাজা বাধা দিয়ে বললেন, "না-না, তুমি বুঝছো না বার্টন। আমি আর এক মুহূর্তেও অপেক্ষা করতে পারি না। আমার দ্বিতীয় দত্তকপুত্র কি ভাবে প্রাণ হারিয়েছে, তোমার অজানা নেই। প্রথম উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ব্যাপারে খাবারে বিষ মিশিয়ে আমাকে মেরে ফেলার প্রচেষ্টার কথাও তোমার জানা আছে, সেই কারণেই আমি আর অপেক্ষা করতে পারি না। তোমার জিম্মায় ওকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।" কথা শেষ করে মহারাজা ইঙ্গিত করতেই পাশের ঘর থেকে ৭ বছরের সৌম্যকান্তি এক বালককে নিয়ে এল ভৃত্য। মহারাজা বালকটিকে বুকে চেপে আদর করে কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "এই আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত দত্তকপুত্র রণজিৎ। আমার সবকিছুর উত্তরাধিকারী হবে এই শিশু। বার্টন যে করে হোক তুমি একে নিরাপদে রেখো।"

নবনগরের রাজা জাম বিভাজী

জাম বিভাজীর ১৪টি বিবাহিত স্ত্রী ছিল। এই ১৪টি স্ত্রীর সাহচর্যে সন্তুষ্ট না হয়ে বহু সংখ্যক উপপত্নীও তিনি রেখেছিলেন অন্দর মহলে। কিন্তু বিবাহিত ১৪টি স্ত্রী এবং বহু সংখ্যক উপপত্নীর সঙ্গে দীর্ঘদিন বসবাস করেও কোন সন্তান সন্ততি না হওয়ায় বিভাজী দত্তকপুত্র নিতে মনস্থ করেন। প্রবীণ বয়সেও বিভাজীর সুন্দরী নারীর প্রতি এমন মোহ ছিলো যে, নগর পরিক্রমা বা প্রমোদ ভ্রমণের জন্য রাজপথে বের হয়ে কোন সুন্দরীকে দেখলেই তাকে ভোগ করার স্পৃহা তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠতো। অনেক বাধা বিপত্তিও হাসিমুখে বিভাজী অতিক্রম করতেন তাঁর এই ভোগলালসা চরিতার্থ করার জন্য। নারী তাঁর কাছে ছিল ভোগের সামগ্রী। জাতি, কুল বা মান নিয়ে তিনি বড় মাথা ঘামাতেন না। সুগঠিত দেহ ও রূপের জলুস তাঁর কাছে যোগ্য অযোগ্য বিচারের একমাত্র মাপকাঠি।

একদিন রাজপথের ধারে কর্মরতা অবস্থায় এক সিন্ধি শ্রমিক রমণী বিভাজীর দৃষ্টি পথে পড়ে। কামান্ধ রাজা মুসলমান জেনেও সেই রমণীকে উপপত্নী মহলে আসার জন্য আহ্বান জানান। এই শ্রমিক রমণীর নাম ধানবাই। ধানবাই অশিক্ষিতা এবং নীচবংশোদ্ভূতা হলেও অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। ধানবাই যখন বুঝলেন যে রাজার মনে তিনি নেশা ধরাতে পেরেছেন তখন তিনি দুটি শর্ত আরোপ করে ফেলেন উপপত্নী মহলে ঢোকবার আগে। প্রথম শর্তে তিনি দাবী করলেন যে তাঁর আরও তিনটি উপযুক্ত ভগিনী রাজার উপপত্নীর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। দ্বিতীয় শর্ত হলো আইনবহির্ভূত হলেও ধানবাইকে বিবাহ করে রানীর মর্যাদা দিতে হবে। বৃদ্ধ বিভাজীর লালসাপূর্ণ চোখে ধানবাই-এর যৌবন-উচ্ছল দেহবল্লরী তখন এমন মোহের সৃষ্টি করেছে যে সেই প্রস্তাবেই রাজী হলেন তিনি।

বছর পার হতে না হতেই ধানবাই রাজাকে এক পুত্র সন্তান উপহার দিলেন। বৃদ্ধ রাজার আনন্দ ধরে না। পিতা হবার দীর্ঘদিনের আকাঙ্ক্ষিত বাসনা পূর্ণ হওয়ায় আনন্দে উন্মাদপ্রায় হয়ে উঠলেন বিভাজী। হিতাকাঙ্ক্ষী ও বিশ্বস্ত প্রবীণ কর্মচারীরা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন, ধানবাই রাজার সঙ্গে বসবাস করার আগেই গর্ভবতী ছিলেন। কিন্তু সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না মহারাজা। হিন্দু মুসলমান বিবাহ আইনসিদ্ধ নয়। পুত্রটি বিভাজীর ঔরসজাত নয়। নবনগরের সিংহাসনে কোন ভিন্ন জাতির বা কোন উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের বসবার অধিকার নেই এসব আইনঘটিত এবং যুক্তিপূর্ণ উপদেশও তিনি গ্রাহ্য করলেন না। নবকুমারের নাম দেওয়া হলো কালুভা। কালুভাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন বিভাজী। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর সকল স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। কালুভার আত্মীয়-স্বজনেরা

রণজির পিতা জাওয়ান সিংজী

বিষ প্রয়োগে বিভাজীকে হত্যা করবার এক চক্রান্ত করলেন। এই চক্রান্তের কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরেই বিভাজী কালুভাকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। এইভাবে ধানবাই ও তাঁর তিন ভগিনীর নবনগরের সিংহাসন দখল করার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো।

এবারে খাঁটি রাজপুত বংশ থেকে উত্তরাধিকারী নির্বাচন করবেন স্থির করলেন বিভাজী। বোম্বাই সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমতি চেয়ে পাঠানো হলো। অনুমতি পাওয়ার পর বিভাজী গেলেন ঝালাম সিংজীর কাছে। এই ঝালাম সিংজীই হলেন রণজির ঠাকুর্দা। ঝালাম সিংজীর প্রথম পুত্র জিওয়ান সিংজী রণজির পিতা। রাজপুতদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ও গোড়া জারেজী সম্প্রদায়ভুক্ত এ'রা। নবনগরের রাজকীয় সৈন্যবাহিনীতে ঝালাম সিংজী ছিলেন শক্তির উৎসস্থল। এ ছাড়া বিভাজীর সংগে একটি আত্মীয়-তার সম্পর্কও ছিল ঝালাম সিংজীর। রাজ্যের সকল কর্মচারীর মধ্যে তিনিই ছিলেন বিভাজীর সবচেয়ে বড় সুহৃদ। তাই বিভাজীর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে ঝালাম সিংজী তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র উমেধ সিংজীকে দত্তকপুত্র হিসাবে বিভাজীকে দান করলেন। কিন্তু বিভাজী উমেধকে দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করার এক বছরের মধ্যেই উমেধকে একদিন মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলো।

বিভাজী আবার গেলেন ঝালাম সিংজীর কাছে প্রার্থী হয়ে। প্রিয় পুত্রকে হারিয়েও মহারাজার অনুরোধে এবারেও সাড়া না দিয়ে পারলেন না তিনি। কিন্তু তাঁর তখন আর কোন পুত্র ছিল না। ফলে নাতিদের মধ্যে থেকে কাউকে দেবেন বলে স্থির করলেন। রণজির বড় ভাই বংশের প্রথম সন্তান হওয়ায় সামাজিক ক্রিয়া-কলাপের জন্য তাকে রেখে দেওয়া হলো। রণজি মনোনীত হলেন দত্তকপুত্র হিসাবে। ৭ বছরের বালক রণজিকে নিয়ে এলেন বিভাজী। ১৮৭২ সালে নবনগর থেকে ৪০ মাইল দক্ষিণে সারোদার গ্রামে রণজির জন্ম হয়েছিলো।

এবারে প্রথম থেকেই খুব সতর্ক হয়ে গেলেন বিভাজী। দু একজন বিশ্বস্ত পাত্র মিত্র ছাড়া কাউকে কিছু বললেন না তিনি। একদিন সকালে চারিদিকে ঢাকা দেওয়া অবস্থায় রাজকীয় গাড়িটি রাজপ্রাসাদের ফটক পার হয়ে গেলো। কোথায় সেই গাড়ি চলেছে কেউ তা বলতে পারলো না। গাড়িটি এসে দাঁড়ালো রাজধানীর বাইরে দ্বারকাপুরী মন্দিরে। মন্দিরের চারিদিকে অসংখ্য প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। বিভাজী রণজির হাত ধরে সেই ঢুকলেন মন্দিরে।

রাজকুমার কলেজে শিক্ষকের সংগে ছাত্র রণজি

এইভাবে অত্যন্ত গোপনে দত্তকগ্রহণ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো।

বাইরের শত্রু থেকে, পত্নী ও উপ-পত্নীদের জিঘাংসা থেকে বালককে কি করে রক্ষা করা যায়, সেই চিন্তাই সব থেকে উদ্বিগ্ন করে তুললো বিভাজীকে। অনেক চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত কর্নেল বার্টনের হাতে রণজির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে রাজকোটে পাঠিয়ে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন বিভাজী। যখন রণজি নিজ গ্রাম সারোদরে যেতেন তখন তাঁকে চোখে চোখে রাখার ভার থাকতো ঝালাম সিংজীর উপর। রাজকোটে এক বিশেষ বাংলোতে বার্টনের সতর্ক পাহারার মধ্যে রণজির থাকবার ব্যবস্থা হলো। ১৪ জন বিশ্বস্ত ভৃত্য রণজির সুখ-সুবিধা দেখার জন্য সব সময় কাছে কাছে থাকতো।

১৮৮০ সালে রাজকোটে রাজকুমার কলেজে এসে ভর্তি হলেন রণজি। বন্ধুবান্ধবদের সংগে হৈ-হল্লা করে কৈশোরের স্বপ্নময় দিনগুলি কোথা দিয়ে যে কেটে যেতে লাগলো সে হিসাব ছিলো না তাঁর কাছে। কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কেম্ব্রিজের ক্রিকেট 'ব্লু' চেস্টার ম্যাকনাটেন। দক্ষ ক্রিকেট খেলোয়াড় ছাড়াও দরদী ক্রিকেট শিক্ষক হিসাবেও ম্যাকনা-টেনের ছিল যথেষ্ট সুনাম, খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে বিশেষ করে ক্রিকেট খেলার মাধ্যমে ছাত্রদের অনেক সুশিক্ষা দেওয়া সম্ভব এটা বিশেষ করেই বিশ্বাস করতেন ম্যাকনাটেন। তাই ব্যাটবল প্রভৃতি যোগাড় করে ছাত্রদের নিয়ে প্রায়ই ক্রিকেট খেলায় মেতে উঠতেন তিনি। রণজির ক্রিকেটের হাতেখড়ি হয় এই ম্যাকনাটেনের কাছে। র‍্যাকেট খেলারও প্রথম পাঠ তিনি এই অধ্যক্ষের কাছেই গ্রহণ করেন।

ম্যাকনাটেন রণজির ক্রিকেট খেলার স্বতঃস্ফূর্ত কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। রণজির চোখের তীব্র দৃষ্টি, সাবলীল ভংগিমা এবং বিভিন্ন ধরনের বলকে

সহজাত উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করে দর্শনীয় মার—ইত্যাদি দক্ষতা দেখে ম্যাকনাটেন বিস্মিত হন। ক্রিকেট খেলায় রণজির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা রঙীন কল্পনা তাঁর মনে এসে বাসা বাঁধতে থাকে।

রনজি খেলাধুলো সব থেকে ভালো-বাসতেন বটে তবে খেলাধুলোর মাঝেই সমস্ত সময় অতিবাহিত করতেন না। পড়াশুনোতেও তাঁর সুনাম কিছু কম ছিল না। ছাত্র এবং শিক্ষক সকলেরই প্রিয় ছিলেন রণজি। ম্যাকনাটেন রাজকুমার কলেজ থেকে অবসর নিয়ে যখন দেশে চলে যান তখন রনজি সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন—

"A better or manlier boy has never resided within the college. I speak of him because he has taken so marked a lead in the college that he will be specially remembered."

রাজকুমার কলেজে প্রথম তিন বছর খুব আনন্দের মাঝেই কেটে যায় রণজির কিন্তু তিন বছর পর দুর্বল ও চঞ্চলমতি বিভাজীর মনের গতি আবার পরিবর্তিত হয়। কুটিলা ধানবাই এবং তার নীচমনা কুচক্রী তিন ভগিনী তখনও বিভাজীর অন্তঃপুরে অবস্থান করছেন, রণজিকে উত্তরাধিকারীর অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য রাজাকে ক্রমাগত তারা কুমন্ত্রণা দিয়ে চলেছেন। ১৮৮২ সালে ধানবাই-এর এক ভগিনী জানবাই একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছেন বলে অন্তঃপুর থেকে ঘোষণা করা হয়। যশোবন্ত সিংজী নাম রাখা হয় বালকটির।

এক বিরাট ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নবনগর রাজ্য ও তার বৃদ্ধ দুর্বল রাজাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলছে এটা রাজ্যের বিশ্বস্ত কর্মচারীদের বুঝতে কষ্ট হয় না। তাই ষড়যন্ত্রের জাল থেকে তাদের রাজ্য ও রাজাকে মুক্ত করতে তারা এগিয়ে আসেন। প্রাসাদের বাইরে থেকে ঐ নবজাতকে আমদানী করে বিভাজীর ঔরসজাত বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে এর প্রমাণ পর্যন্ত দিতে চান তাঁরা। তা ছাড়া তাঁরা মহারাজাকে আরও বলেন—আপনার ১৪টি বিবাহিত স্ত্রী ও অসংখ্য উপপত্নী এই দীর্ঘকাল কোন সন্তান আপনাকে উপহার দিতে পারলো না অথচ ঐ দুই মুসলমান রমণী এত অল্প সময়ের মধ্যে দুটি পুত্র প্রসব করলো এটা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু বিভাজী এ সব যুক্তিপূর্ণ কথায় কর্ণপাত করেন না। দুষ্টমনা চার ভগিনীর মায়াজালে বৃদ্ধ বিভাজী তখন এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে সেই জাল ছিন্ন করে বাইরে আসতে তিনি সক্ষম হলেন না।

বোম্বাই সরকারের কাছে বিভাজী দত্তকপুত্রের অধিকার থেকে রণজিকে সরিয়ে দিয়ে জানবাই-এর পুত্রকে সেই শূন্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করার নতুন আবেদন পেশ করলেন। বোম্বাই সরকার এই অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবীকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দিতে দেরী করলেন না। ধানবাই ভগিনীদের জাম-নগরের সিংহাসন দখল করার দ্বিতীয় চক্রান্ত এইভাবে ব্যর্থ হলো বটে তবে তারা নিরুৎসাহ হলেন না। নতুন পথে কার্যোদ্ধার করার আর এক ফন্দি আঁটলেন চার বোন। বিভাজীর সঙ্গে বড়লাট লর্ড রিপনের তখন খুব মধুর সম্পর্ক ছিল। এ কথা জানতেন ধানবাই ভগিনীরা। তাই মহারাজাকে দিয়ে নতুন আবেদন পেশ করালেন বড়লাটের কাছে। আবেদনে বিশেষ করে বিভাজীকে দিয়ে লেখানো হলো বড়লাট সহানুভূতির সঙ্গে আবেদনটি বিচার না করলে তার জীবনের আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। এই আবেদনে কাজ হলো। লর্ড রিপন বৃদ্ধ বিভাজীকে রক্ষা করার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে ন্যায়

অন্যায় বিচার না করেই আবেদনটি মঞ্জুর করে দিলেন। রাজপুত বংশের এবং জামনগরের দীর্ঘদিনের প্রচলিত আইনকে অবহেলা করে বড়লাটের আদেশে জানবাই স্বীকৃত হলেন রানী হিসাবে। যশোবন্তজী পেলেন একমাত্র ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীর অধিকার।

রাজকুমার কলেজে অধ্যয়নরত রণজি এ সব ষড়যন্ত্রের বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলেন না। ক্রিকেট ব্যাট ও বলের অপূর্ব স্বাদ পেয়েছেন তিনি তখন, আর পেয়েছেন এক দেবতুল্য অধ্যক্ষ ও অসংখ্য সদাহাস্যমুখ কিশোর বন্ধুবান্ধব। খেলাধুলো জগতের স্বর্গদ্বার তার চোখের সামনে তখন ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে। সেই উন্মুক্ত পথে তিনি তখন দেখছেন—পরস্পর প্রীতি ও প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হাত ধরাধরি করে এগিয়ে চলেছে সবাই। বৃহৎ স্বার্থের জন্য নিজস্ব স্বার্থকে নিঃশেষে বিসর্জন দিয়ে শেষ শক্তিটুকু উজাড় করে ঢেলে দিচ্ছে সকলে।

বিভাজীর অন্তরের কোন এক গোপন প্রকোষ্ঠে তখনও রণজির জন্যে কিছুটা দুর্বলতা অবশিষ্ট ছিল। পরপারের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে আর বেশী দিন থাকতে পারবেন না একথাও তখন বুঝতে শুরু করেছেন বিভাজী। তাঁর অবর্তমানে পাছে রণজির জীবন বিপদাপন্ন হয় এই ভয়ে এবং তার প্রিয় দত্তকপুত্র যাতে উচ্চশিক্ষার আলোকে নিজের মুখোজ্জ্বল করতে পারে এই আশায় রণজিকে কেম্ব্রিজে পাঠিয়ে দেন বিভাজী। বিলেতে যাত্রার আগে বিভাজীর শেষ সাক্ষাৎ হয় রণজির সঙ্গে। দীর্ঘ ১৩ বছর পর রণজি যখন নবনগরে ফিরে আসেন তার বহু আগেই বিভাজী পৃথিবীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে চিরশান্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছেন।

১৮৮৯ সালে লণ্ডনে এসে রণজি তাঁর প্রিয় ও পরিচিত অধ্যক্ষ চেস্টার ম্যাকনাটেনের তত্ত্বাবধানে বসবাস শুরু করেন। রাজ্যের উত্তরাধিকারীর অধিকার হারিয়েছেন বলে মনে এতটুকু ক্ষোভ বা দুঃখ নেই রণজির। যে কোন অবস্থাকে সাহসভরে এবং সহজভাবে গ্রহণ করার শিক্ষা তিনি পেয়েছেন ম্যাকনাটেনের কাছেই। যাই হোক, রণজির সুপ্ত ক্রিকেট প্রতিভাকে জাগ্রত করার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলেন ম্যাকনাটেন। বিভিন্ন কুশলী ক্রিকেট খেলোয়াড়দের খেলা দেখলে রণজির খেলা উন্নত হবে এই আশায় তিনি নিজে রণজিকে সঙ্গে নিয়ে খেলা দেখতে যেতেন। রণজির প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলা দেখার সুযোগ হয় ওভ্যাল মাঠে। এখানে সারে ও অস্ট্রেলিয়ার খেলা হচ্ছিল। এই খেলায় মধ্যাহ্নভোজের বিরতির সময় ম্যাকনাটেন তখনকার দিনের দিকপাল ক্রিকেট খেলোয়াড় পার্সি ম্যাকডোনেল, সি টি বি, এবং জি এইচ এস ট্রটে প্রভৃতির সঙ্গে রণজির আলাপ করিয়ে দেন। এ ছাড়া মাঠে উপস্থিত অন্যান্য কুশলী প্রবীণ ও নবীন খেলোয়াড়দের কাছেও তাঁর ছাত্রের বিরাট ক্রিকেট ভবিষ্যতের কথা পঞ্চমুখে প্রচার করতে দ্বিধা করেন না। কিন্তু ভারতীয় স্কুলের এই হেডমাস্টারের কথায় সেদিন তেমন কেউ কান দেয় না। অবশ্য পরবর্তী জীবনে রণজি ম্যাকডোনেল, ট্রটে প্রমুখ খেলোয়াড়দের কাছ থেকে ক্রিকেটের অনেক শিক্ষা লাভ করেছিলেন এ কথা না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে।

ক্রিকেটের চেয়ে টেনিস খেলার উপর রণজির এই সময়ে বেশী উৎসাহ দেখা যায়। অল্প সময়ে টেনিস খেলায় তিনি এমন হাত পাকিয়ে ফেলেন যে অনেক নামকরা খেলোয়াড়কে যখন তখন তাঁর হাতে নাজেহাল হতে দেখা যায়। এমনকি কোন এক টেনিস প্রতিযোগিতায় আরনেস্ট রেনশ'র মত বিখ্যাত খেলোয়াড়কে হারিয়ে দিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। টেনিস জগতে রণজিকে নিয়ে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। টেনিস ছাড়া অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল, রাগবি ফুটবল, র‍্যাকেট ও বিলিয়ার্ড খেলাতেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি কেম্ব্রিজের খেলাধুলোর কর্তৃপক্ষ এই অভিমত পর্যন্ত প্রকাশ করতে বাধ্য হন যে রণজি যদি কিছুদিন অনুশীলন করেন তাহলে কেম্ব্রিজ দলে ক্রিকেট, ফুটবল, র‍্যাকেট, টেনিস এবং বিলিয়ার্ড খেলাতে স্থান পেতে পারেন। অবশ্য টেনিস বা অন্যান্য খেলাধুলোর উপর তাঁর এই আকর্ষণ বেশীদিন ছিল না। নিজের মন থেকে তাঁকে কে যেন ডেকে বলে, "রণজি তুমি যদি টেনিস বা অন্যান্য খেলাধুলোর উপর একসঙ্গে অত বেশী ঝুঁকে পড়ো, তাহলে কোন খেলাতেই সুনাম অর্জন করতে পারবে না। যে কোন একটি খেলাকে বেছে নাও এবং সেই পথে একনিষ্ঠ সাধনায় এগিয়ে চলো।" ক্রিকেট খেলাকেই রণজি বেছে নেবেন বলে স্থির করেন। ক্রিকেট খেলা শুধু উত্তেজনা ও উন্মাদনাপূর্ণ নয়, বীরত্বব্যঞ্জকও বটে বলে মনে হয় তাঁর কাছে।

চেস্টার ম্যাকনাটেনের সঙ্গে লণ্ডনে ছয় মাস বসবাস করার পর রণজি কেম্ব্রিজে চলে আসেন। রেভারেণ্ড বরিশ তাঁর অভিভাবক নিযুক্ত হন। বরিশ'র সংসারেই রণজির থাকা'র ব্যবস্থা হয়। ট্রাম্পিংটন রোডে সেণ্ট ফেথ স্কুলে রণজির ক্রিকেট খেলা শেখার ব্যবস্থা করে দেন বরিশ। এই স্কুলের হেডমাস্টার আর এস গুডচাইল্ড রণজির ক্রিকেট-প্রতিভা দেখে বিস্মিত হয়ে যান। তিনি মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন—"এই বালক নিঃসন্দেহে একদিন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে।" খেলাধুলো ও আমোদ-আহ্লাদের মধ্যেই রণজি বেশী সময় অতিবাহিত করেন বলে বরিশ প্রায়ই তাঁকে বকুনি দিয়ে বলতেন, "পড়াশুনা তোমার হবে না বাপু।" রণজি হাসিমুখে উত্তর দিতেন "তাহলে বাজী ধরুন আমার সঙ্গে।" ১৮৯২ সালে বরিশ এবং অন্য আরও অনেককে বিস্মিত করে রণজি নিজের কথার সত্যতা প্রমাণিত করেছিলেন।

১৮৯০ সালে রণজি প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলায় অবতীর্ণ হন। প্রথম বছরে ক্যাসাণ্ড্রা ক্লাব ও ফিট্জ উইলিয়াম হল দলের হয়ে খেলে অধিকাংশ খেলাতেই শতরানের সীমা অতিক্রম করে যান তিনি। অতি দ্রুত রান তোলার পক্ষপাতী ছিলেন রণজি। স্বকীয় বিশেষ ভঙ্গিমায় এবং অপরূপ মারের সাহায্যে তিনি দ্রুত রান তোলার পথকে বেছে নিয়েছিলেন। হয়তো রণজির ঐসব মার ক্রিকেট খেলার আইনসম্মত ছিলো না। কিন্তু ঐসব পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে তিনি মোটেই মাথা ঘামাতেন না। নিজে অনেক সময় বলতেন, কোন কোন সংবাদপত্র এই সময় থেকেই রণজির ক্রিকেট-প্রতিভা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেও ইংলণ্ডের অধিকাংশ পুঁথিগত ক্রিকেটের সমর্থকেরা রণজির খেলাকে তেমন সুনজরে দেখতেন না।

(ক্রমশ)

গোলমাল বাধল বিবাহ বাসরে। হরিমোহনবাবু অর্থাৎ পাত্রের পিতা উঠে দাঁড়ালেন—"পাই পয়সা পর্য্যন্ত মিটিয়ে না দিলে বিবাহ বন্ধ হয়ে যাবে।" বিবাহ বাসরে একটা বাজ পড়লেও লোকে এত স্তম্ভিত হয়ে যেতোনা। সুলেখা চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত উঠে বসল—তার ঘোমটা গেল খসে। সানাইয়ে

পুরিয়া ধানেশ্রীর সুর একটা মীড়ের মুখে এসে হঠাৎ বেসুরো আওয়াজ করে বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিকে একটা বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল—"সেকি?" খোকন ছুটে গেল বাসরে, বাবুর খোঁজে। কিন্তু বাবু কোথায়? আর একজনকেও পাওয়া যাচ্ছিলনা। তিনি হচ্ছেন বাচস্পতি মশায়। হরিমোহনবাবুর গুরুদেব। তাঁর কথা হরিমোহনবাবুর পরিবারে সবাই মেনে চলে বেদবাক্যের মত। হরিমোহনবাবু চারিদিক খুঁজে হতাশ হয়ে ফিরে এলেন। একজন বলল এ বাড়ীর ছেলে বাবু আর সুলেখার এক বান্ধবীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে গল্প করতে দেখেছে। বাচস্পতি মশায়কে না পাওয়া গেলে তো বিপদ—তাঁর মতামত না নিয়ে হরিমোনবাবু কখনও কিছু করেননা। চরিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়ে গেল। খোঁজ পাওয়া গেল প্রায় আধঘণ্টা পরে। খোকন হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল বাবু আর বাচস্পতি মশায় দুজনকেই সে দেখেছে। "আপনারা সব আমার পেছনে আসুন—"

দলবল নিয়ে হরিমোহনবাবু চললেন তার পেছনে।

জেরুজেলাম!

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ডামাসকাস গেটে পেঁছুতেই বন্ধুরা ট্যাক্সি থেকে জেরুজেলাম জেরুজেলাম বলতে বলতে হুড়মুড় করে লাফিয়ে পড়লো। ক্রীসমাসের আগের দিন। ছ মাস আগে এখানে দেখেছিলাম মক্কা-ফেরত হাজীদের ভিড়। তারা এসেছিল হারেম—এল-শরিফে। সেবারেও দেখেছিলাম কাতারে কাতারে ভিড়। এবারেও ট্যাক্সি থেকে নেবেই দেখি জনসমুদ্র। তখন জনতার মধ্যে মুহুর্মুহু ধ্বনি আল্লাহ-আকবর, এবার জেরুজেলাম! জেরুজেলাম! এ-যেন সেই ক্রুসেডারদের চিৎকার ঃ চলো জেরুজেলাম— Enter you the road to Holy Sepulchre, convert it from the wicked race, and subject it."

ভিড়ের মধ্যে দম নিয়ে দাঁড়াতেই দেখি আমাদের বাক্স-প্যাটরা উধাও! মিশরের যুদ্ধে বোমার স্পিলন্টারে আমার ক্যামেরাটা আগেই জখম হয়েছিল এবারে টানা হ্যাঁচড়াতে ওর শাটারটা একেবারে বুঝিবা ভেঙ্গে গেল। ওয়াই-এম-সিএতে পৌঁছে দেখি আমাদের জিনিসপত্র ম্যানেজারের হেপাজতে রেখে প্যালেসটাইনী পোর্টার আবার উধাও হয়ে যাচ্ছে। মজুরির কথা তুলতেই হবে বলে দে-ছুট। কারু এতটুকু বুঝিবা আজ সময় নেই। চারিদিকে নানা জাতের লোক। সাদায় কালোয় সব যেন লেপেমুছে গেছে। কেউ এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে তো কেউ এসেছে নরওয়ে থেকে। কোনও দেশই বাকি দেখছি না। হনলুলু থেকে দুটি মেয়ে আমাদের সামনের ঘরটায় জেঁকে বসেছে। সাউথ আফ্রিকানের দলটা বেশ ভারি। কিন্তু তারাও এশিয়ানদের মতন কালা আদমিদের সঙ্গে হেসে খেলে বেশ মিশছে। জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, গ্রীসের লোকই সবচেয়ে বেশী এসেছে বলে মনে হয়। কে কার খোঁজ রাখে। সবাই ছুটেছে বেথলেহামে, কেউবা চলেছে যীশুর সমাধি-মন্দিরে।

যিশুর সমাধি মন্দির

কত বছর প্ল্যান করে তবে আসা এই হোলি জেরুজেলামে। এ-যেন আমাদের কুম্ভের ভিড়। কানা খোঁড়া নুলো বুড়ো বুড়ি যুবক যুবতীতে চারিদিক একাকার। বুড়োদের চেয়ে ছোটদের উৎসাহ বেশী। চারিদিকে মেলা বসে গেছে। একজন গ্রীক বুড়ো সাপের নাচ দেখিয়ে বেশ দু'পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে। কেউ দড়ির উপরে মেয়েদের নাচ দেখাচ্ছে, কেউবা রোপট্রিক দেখাবো বলে এই তালে জড়িবুটি বিক্রি করে নিচ্ছে।

ওয়াই-এম-সি এ-র পাশেই ম্যাণ্ডেলবাম গেট। গেট ঠিক নয়। যেন যুদ্ধের ফ্রন্ট। কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা একটা পথ। এ-ধারে জর্ডান মুল্লুক। আরব লিজিয়ন। ওধারে ইজরাইল। স্টেনগান। গজ পঁচিশেক দূরে পথের ওধারে বড় বড় করে ইংরেজীতে লেখা ঃ ওয়েলকাম টু ইজরাইল। চারিদিকে ভাঙ্গা বাড়ি। কারও সামনেটা মস্তবড় একটা হাঁ, আবার কারওবা ছাদটাই নেই। খানকতক বাড়ির শুধু ফ্রেমটাই দাঁড়িয়ে আছে। মেশিনগানের গুলীর দাগগুলো যেন হাঁ করে গিলতে আসছে। 'গেটের' উপরে লোহার একটা শিকল। পাসপোর্ট দেখিয়ে ওধারে যাওয়া যায়, কিন্তু তাহলে এপারে আর ফিরে আসা যাবে না। কখনও না। যতক্ষণ না পাসপোর্টে ইজরাইলে গিয়েছি সে-ছাপের চিহ্ন দূর হয়।

একটা শহরের বুক চিরে দুটো স্বাধীন রাষ্ট্রের এলাকা। ওদিকে নতুন জেরুজেলাম; ইজরাইলের রাজধানী। এদিকে আদিকালের পুরনো জেরুজেলাম যেখানে জন্মেছিলেন যিশু, যেখানে মুসলমানদের তীর্থস্থান হারেম-এল-শরিফ, ইহুদীদের ওয়েলিং ওয়াল। এ সেই জেরুজেলাম যেখানে রোমানরা ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতায় যিশুকে ক্রসে চাপিয়ে পেরেক ঠুকে হত্যা করেছিল। এ সেই জেরুজেলাম যেখানে হ'ল বাইবেল ল্যাণ্ড, যেখানে হ'ল ইহুদীদের পীঠস্থান। বেচারাদের দুঃখ, এতো আরবী-দের ওরা মারলো, স্বাধীন একটা রাষ্ট্রের সৃষ্টি করলো আরবীদের বুকের উপর, কিন্তু তবু ওয়েলিং ওয়াল হল না ওদের
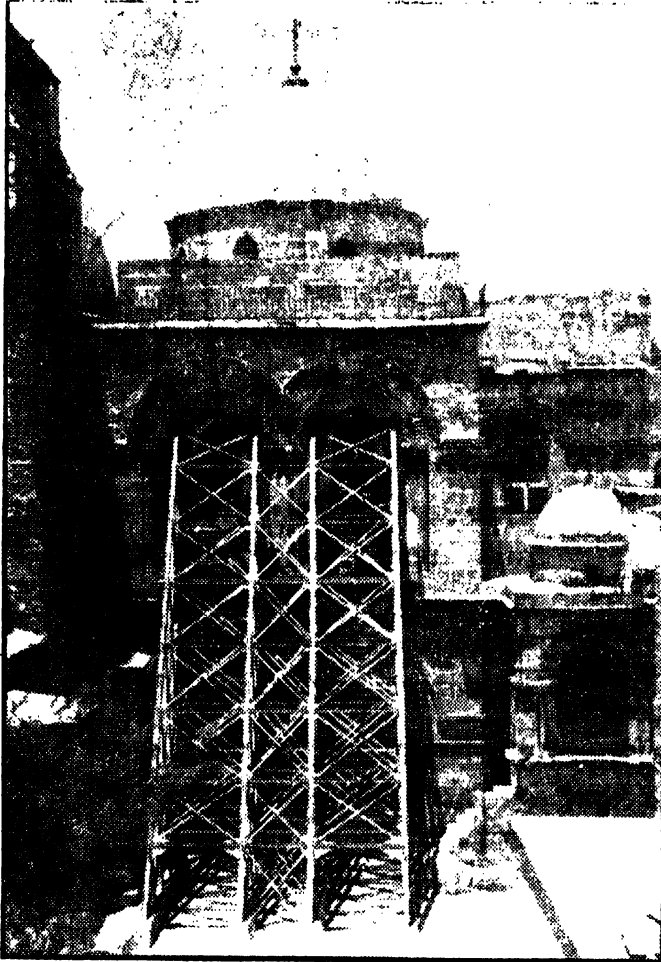
বেথলেহেমের পথে 'মাউণ্ট অব অলিভ'

হস্তগত। এ যেন বিনা রামেই রামায়ণ, হেমলেট উইথআউট দি প্রিন্স অব ডেন-মার্ক!

চা খেয়েই আমি পুরোনো বন্ধুদের খোঁজে বেরুলাম। এদের অনেকের সঙ্গেই আমার দেখা হয়েছিল কায়রোতে, ডামাসকাসে, বেরুথে। অনেকেই ওদের মধ্যে হয়েছে নিজ দেশ থেকে নির্বাসিত। কিন্তু তবু মিয়াসরকে পেলাম তাঁর বইয়ের দোকানে। বিনা নোটিশে হাজির হতেই হৈ হুল্লোড় করে আমার দুটো গালে সশব্দে চুমু খেয়ে বললে—আমি ভেবেছিলুম তোমাকে আর এ মগের মুল্লুকে দেখতে পাব না। ভালোই করেছ এই ভিড়ের মধ্যে তীর্থ দর্শনে এসে। তা-তোমার বাক্স-প্যাটরা কোথায়?

ওয়াই-এম-সি এর নাম শুনেই ইয়া আল্লা ইয়া আল্লা বলে চিৎকার করে উঠলো। বললো—তুমি দেখছি আজও মানুষ হওনি। দোকানের অ্যাসিস্ট্যান্টকে কি একটা বলেই ছিটকে বেরিয়ে পড়তে পড়তে বললে—চলো, তোমার মালপত্র নিয়ে আসি।

খুব খুশি হতাম বন্ধু মিয়াসারের বাড়িতে থাকতে পারলে। কিন্তু সঙ্গে দু-দুটো মার্কিন ও একটি জার্মান সাংবাদিক বন্ধু। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না। বুঝিয়ে বলতেই বন্ধু রাগ করল না। বরং বললো—ভালই হল। বাড়িতে এখন চাকরের সঙ্গে আমি একা। বিবিজান নেই। কে এখন আর তোমার মেহেমানদারি করবে!

বিবিজান নেই? কেন তিনি বুঝি তোমাকে তালাক দিয়েছেন?—জিজ্ঞাসা করলাম ঠাট্টা করে। ভাবলেম বৌ বুঝি আম্মানে গিয়েছে আব্বাজানের বাড়ি। বৌ স্কুলের ইন্সপেক্টর। বদলিও তো হতে পারে!

হ্যাঁ, মিয়াসার বললে, বিবিজানের বদলিই হয়েছে। রাজা হুসেন তাকে তাড়িয়েছে দেশ থেকে। অপরাধঃ দেশদ্রোহ, রাজদ্রোহ।

অবাক হই। আমার আগেকার দেখা জেরুজেলামের অনেক কিছুই আজ নেই। যা আছে তবু তাই ক্রীসমাসের মেলায়
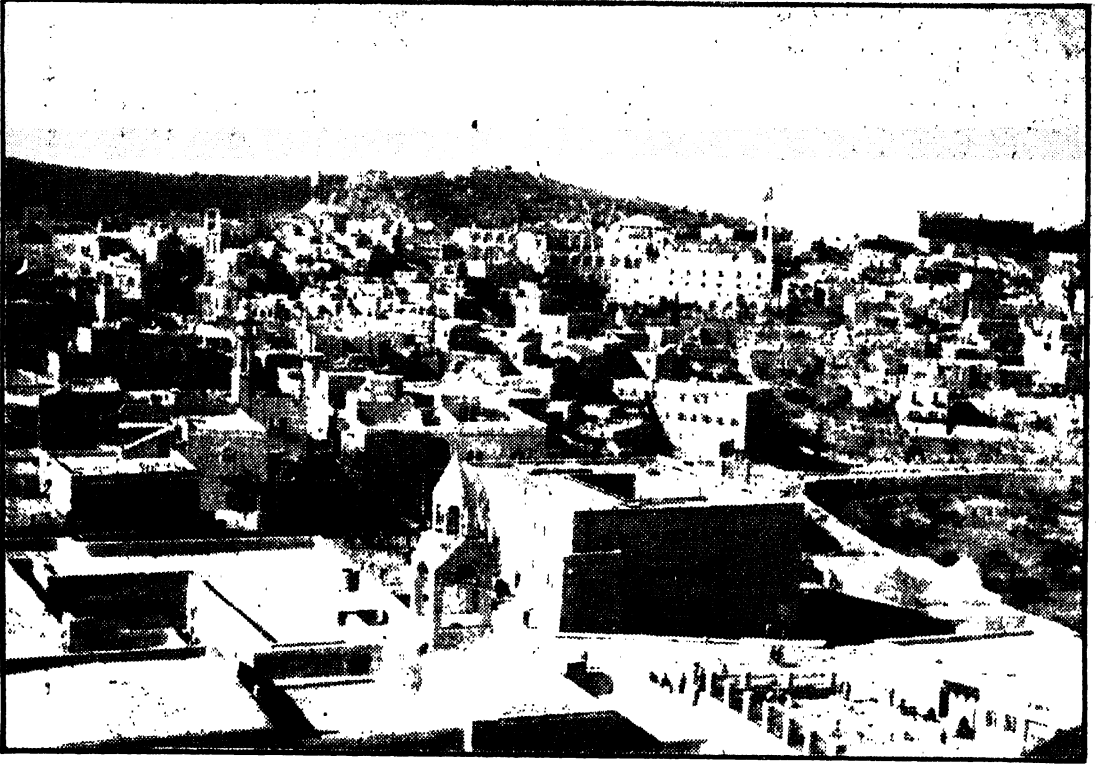
বেথলেহেম শহর

দেখে নিতে হবে। আগে এসেছি কাজে। এবারে এসেছি ট্যুরিস্ট হয়ে। আগে এসেছি সংবাদ সংগ্রহ করতে। এবারে এসেছি পাপ ক্ষয় করতে। মিশরে দেখেছি রক্তের গঙ্গা। মৃত্যুর করাল মূর্তি। এবারে দেখব শান্তির দূত যিশুর জন্মস্থান। মৃত্যু ছড়ালো যিশুর চেলারা। তারাই একদিন হত্যা করেছিল ভগবানের দূতকে। আজ তাই ওরা কাতারে কাতারে আসছে "পাপক্ষয় করতে"। সত্যি?

মিয়াসারকে নিয়ে ওয়াই-এম-সি এ'তে আসি। বিদেশী বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। মিয়াসারের মুখে হাসি লেগেই আছে। হাসতে হাসতে মার্কিন সাংবাদিকদের বললে—এখান থেকে বুঝি যাবে ইজরাইলে?

আমেরিকানদের মতন এমন মন খুলে কেউ বুঝি আর হাসতে পারে না। অট্টহাসিতে বন্ধুদ্বয় ফেটে পড়লো। বললো—আমরা যাবো ইজরাইলে, আর আমাদের ডালেস সাহেব খিড়কি দরজা দিয়ে তোমাদের রাজাকে পাঠাবে বোমারু, পাঠাবে ট্যাঙ্ক, পাঠাবে সিক্সথ্ ফ্লিটের লোক।

না। এটা রাজনৈতিক প্রবন্ধ নয়। আমি এখন সাংবাদিকতা করতে আসিনি। কথার মোড় ফিরাই। কিন্তু তবু এরই মধ্যে রথ দেখা কলা বেচা চলে। সাংবাদিক বুঝিবা কয়লা—স্বভাব যায় না মলে!

মিয়াসারকে নিয়ে আমরা চারজন যিশুর সমাধিতে চলি। নগর প্রাচীরের বাইরে ওয়াই-এম-সি-এ। ডামাসকাস গেটের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে স্মৃতির পাতা আপনা থেকেই উল্টে চলে। কত সকাল সন্ধ্যা এই পথের দুধারের কাফেতে বসে আড্ডা দিয়েছি। গড়গড়ার লম্বা নল মুখে নিয়ে কত অজানা যাত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। কত অপরিচিত এখানে হয়েছে পরিচিত, কত লোক হয়েছে আপন। অবাক শহর জেরুজেলাম, কিন্তু ডামাসকাস গেটের কাফেতে বসে আড্ডা দিতে দিতে আমি নিজেই হয়ে যেতাম আরবী। কত পুরনো শহর এই জেরুজেলাম। কত যুদ্ধের ক্ষত আজও এর বুকে। পোপের আদেশে, ধর্মের নামে, কত খৃশ্চান রাজার হয়েছে এখানে অভিযান, কত নরনারীর হয়েছে এখানে অকাল মৃত্যু। কিন্তু তবু যিশুর সমাধি মন্দিরে আজও হয়নি শান্তি।

খৃশ্চানদের নিজেদের ভেদাভেদ জেরুজেলামে এলে যেমন দেখা যায়, এমন বুঝি বা আর কোথাও দেখা যায় না। ছুত অছুত আমাদেরই নেই। বিলেত দেশটা সত্যিই মাটির। যিশুর সমাধির চাবি কাঠিটি, অবাক হই আমি, নেই ওদের হাতে। যুগ যুগ ধরে ওদের আপসের পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও ভেদ চাবিকাঠিটিকে রেখেছে দূরে—ঐ আরবদেরই হাতে।

ভেঙে পড়ছে যিশুর সমাধি মন্দির। বাঁশ, লোহা, কাঠ, জাল দিয়ে কোনও রকমে দাঁড় করানো এই বিশাল মাহাত্ম্যপূর্ণ গির্জা। কিন্তু তবু নেইকো কোনও একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের খৃশ্চানের অধিকার এর মেরামত করার। ক্যাথলিকরা বলে মেরামত করব আমরা। অর্থোডক্সরা বলে আমরা। কপ্টিকরা বলে আমরা। প্রোটেস্টান্টরা বলে আমরা। সিরিয়ান চার্চ বলে আমরা। সবাই বলে আমরা। তাই পৃথিবীর, সবার মাহাত্ম্যপূর্ণ গির্জাটি আজও ধ্বংসের মুখে।

পান্ডা ভিখারীদের ফাঁকি দিয়ে গির্জার ভিতরে ঢুকে পড়ি। ঢুকে পড়ি মোমবাতি হাতে পবিত্র ক্রুশের অন্ধকার ঘরে। রক্তের দাগ আজ নেই ক্রসে, কিন্তু তবু মনে হয় রক্তের নদী বুঝিবা বয়ে চলেছে এরই বুকে। চারিদিকে ক্যামেরার ক্লীক্ ক্লীক্। ফ্ল্যাসের চকমকি। হাজার হাজার মোমবাতি— কিন্তু কোথাও নেই এতটুকু শব্দ। কেউ

এখানে চিৎকার করে বলেছে না—বাবা যিশু, লটারীর টাকা পাইয়ে দাও, মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দাও, নেহাত তা-যদি না পারো বাতের ব্যারামটা সারিয়ে দাও। কিন্তু এরাও নিঃশব্দে ফেলে চোখের জল, মনে মনে হয়তো বা বলে—আমি পাপী, আমি পাপী, আমায় দাও মুক্তি, নয়ত দাও শাস্তি।

ভিড়ের শেষ নেই। কিন্তু কোথাও এতটুকু চিৎকার নেই। গলাবাজি নেই। হৈ হুল্লোড় নেই। লাইন করে কিউ দিয়ে আমরা গির্জার প্রতিটি ঘর ঘুরে ঘুরে দেখি। কোথাও সিকি আট আনি ফেলতে হয়; কোথাও বা এক টাকার নীচে মুক্তি নেই। বিশ্বনাথের মন্দিরেও পয়সার খেলা। যিশুর মন্দিরেও। আমরা 'অসভ্য'। এরা 'সভ্য'। আমরা 'পুতুল' পুজো করি। এরা ক্রস পুজো করে। মা মেরীর ছবি পুজো করে কুমারী মেরীকে সেমিজের ভাঁজে রাখে। আমরা যজ্ঞ করি। এরা মোমবাতি জ্বালায়। পাদরীর সামনে দাঁড়িয়ে কনফেশান করে, কৃত পাপের স্বীকারোক্তি পেশ করে। বলে—শান্তি দাও, থামাও মনের ঝনঝনানি!

ক্রীসমাস ঈভের সময় হয়ে এল। আমরা এখন জেরুজেলাম থেকে সাত মাইল দূরে বেতলেহেমে। ছোট্ট শহর বেতলেহেম। ঝকঝকে পরিষ্কার শহর। পৃথিবীর সর্ব-পুরাতন গির্জা এখানে—চার্চ অব নেটিভিটি। আজকের রাতের উৎসব ভুলবার নয়। একদিন অনেকদিন আগে, কুমারী মা মেরী এখানে জন্ম দিয়েছিলেন একটি শিশুর যাঁর নাম জীসাস ক্রাইস্ট!

রক্তের নদী বইল এখানে। ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন মাউণ্ট অব অলিভস—ওইখানে ইহুদী জুডাস, কিন্তু, না থাক সে কথা আজ। বিশ্বাসঘাতকতা আজ কোথায় বা না!

ঐ ক্রস আজও জীবন্ত। আজও ও শান্তির প্রতীক। কিন্তু তবে কেন নেই ক্রসের দেশে আজ শান্তি? বলুন, বুদ্ধের দেশে আজ কেন অশান্তি? গান্ধীর দেশে মড়ক?

বন্ধুরা কে যেন কোনদিকে হারিয়ে গেছে। হঠাৎ কে যেন পিছন থেকে আমার ওভারকোটের আস্তিন টেনে ধরল। টুপির উপর থেকে ঝরে ঝুরিয়ে তুষার পড়ছে। নাকের ডগার উপর কে যেন বরফ ঘষে চলেছে। ঠাণ্ডা বাতাস। তুষার বৃষ্টি। বরফের ঢেউ। তবু এ-রাতেও জনতার নেই শেষ! আস্তিনে আবার পড়ে টান!

ভূত দেখলেও বোধ হয় এত অবাক হতাম না, কিন্তু তবু যাকে দেখলাম সে আমারই পাশে দাঁড়িয়ে। যাঁকে একদিন দেখেছি রাজপ্রাসাদে, ক্লাবে, দরবারে, যাঁকে দেখেছি এ ডি সি পরিবেষ্টিত, আবার

হঠাৎ যিনি নিজে থেকেই গেলেন হারিয়ে, তাঁকে আজকের ছদ্মবেশে দেখে অবাক হলাম। অবাক হলাম ও বললাম—সলাম আলেকুম। বললাম, আদাব। বললাম বেআদবী মাফ কিজিয়ে. কিন্তু চলুন ঐ মাটির নীচের বীয়ারের আড্ডায়।

ভোর হতে চলেছে। কিন্তু বরফ পড়া থামেনি। আজ যিশুর জন্মদিন। বীয়ারের আড্ডা থেকে বেরুতেই কে যেন আমার অনাবৃত মুখের উপর তুষারের চাবুক চালিয়ে দিল। কালো ওভারকোটের হুডটা শাড়ির আঁচলের মতন মাথায় চেপে ধরে ঐ হারিয়ে-যাওয়া মানুষটি কুয়াশার মধ্যে আবার গেল হারিয়ে। রাঙ্গা সূর্যের উদয় আজ বুঝি আর হবে না। কিন্তু তবু ভিড়ের এখানে নেই শেষ। সামনে জন-সমুদ্র। আরও দূরে ডেড-সী। মৃত সমুদ্র। মাঝখানে জেরীকো, পৃথিবীর সর্বপুরাতন শহর। বরফ পড়ছে। আরও বরফ। শীত করছে। আরো শীত। তবু এরই মধ্যে চিৎকার ঃ জেরুজেলাম! জেরুজেলাম!

দুর্যোধন

আনন্দকিশোর মুন্সী

দুর্যোধন মুখোটি আগে ছিল ডেপুটি, এখন হয়েছে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। কাজেই সরকারী মহলে ওর নাম এখন ডি এম।

কিন্তু এই নামটা অনেক আগেই দুর্যোধন পেয়েছিল ওর শালা-শালীদের কাছ থেকে। শ্বশুরবাড়ির সবাই ওকে চিরদিন ডি এম বলেই ডাকে। এমন কি ওর শাশুড়ি পর্যন্ত দুর্যোধন মুখোটির চেয়ে সংক্ষিপ্ত এই ডি এম নামটাই পছন্দ করেন বেশি।

পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শালারা অবশ্য মাঝে মাঝে আজকাল ওকে ডাকে ডবল ডি এম। কিন্তু বাড়ির আর কেউ তা বলে না।

ওর সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়, তখন সবে যুদ্ধ শেষ হয়েছে এবং ছোট হাকিম থেকে বড় হাকিম হয়ে দুর্যোধন কলকাতায় বদলী হয়ে রাসবিহারী অ্যাভিনিউএ বাসা করেছে।

দুর্যোধনের বড় শালা আমার অনেকদিনের বন্ধু। সে থাকত মফঃস্বলে। সেবার কি একটা কাজে কলকাতায় এসে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আটকে গেল। সেই সূত্রে আমি গেলাম দুর্যোধনের বাড়িতে।

দুর্যোধনের স্ত্রী বিনুকেও সেই প্রথম আমি দেখলাম। যেমন ধবধবে গায়ের রঙ, তেমনি সুন্দর ওর নাক, মুখ, চোখ। সবচেয়ে সুন্দর ওর ঠোঁট দুটি। রঙ না মেখেও যে কোন বাঙালী মেয়ের ঠোঁট এবং গাল এমন সুন্দর রাঙা হয় আগে কখনও তা দেখিনি। ছেলেবেলায় ওর শরীর যেমন ছিল তুলতুলে গায়ের রঙও ছিল ঠিক তেমনি টুকটুকে। তাই ওর দাদু নাকি আদর করে ওকে ডাকতেন 'সন্দেশ' বলে।

বিনুর ইচ্ছে ছিল বি-এ পাশ করে বি-টি পড়বে। কিন্তু তা হল না। বি-টি ক্লাসে ভর্তি হবার ঠিক আগেই বিনুর বাবা এই দুর্যোধন ডেপুটির সঙ্গে ওর বিয়ে দিলেন। বিনুর বয়েস তখন মাত্র একুশ আর দুর্যোধনের চল্লিশ।

এ সবই আমি শুনেছি অনেক আগে; কিন্তু বিনুকে কখনও দেখি নি। আজই প্রথম ওকে দেখলাম ওর দাদার অসুখের চিকিৎসা করতে এসে।

অথচ প্রথম পরিচয়ের কোন সংকোচ বিনুর ব্যবহারে পেলাম না। এমনভাবে বিনু কথা বলল, যেন আমি ওর বহুকালের চেনা। আমি ওর দাদার বন্ধু, কাজেই আমিও ওর দাদা হয়ে গেলাম।

রাস্তা থেকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার বাঁদিকে বিনুদের ফ্ল্যাটে কড়া নাড়তে বিনু নিজেই এসে দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল, আপনিই তো কালুদা? দাদাকে দেখতে এসেছেন? আসুন এই দিকে।

ও যেমন অনায়াসে আমাকে চিনে ফেলল, আমিও তেমনি বুঝলাম এই সেই বিনু, ছেলেবেলায় যার আদরের নাম ছিল সন্দেশ।

ডাইনের বারান্দা দিয়ে বিনু পূর্বদিকের কোণের ঘরটায় আমায় নিয়ে এল। ওর দাদার বিছানার পাশে একটা চেয়ার আমার জন্য এগিয়ে দিয়ে নিজে দাঁড়িয়ে রইল।

রোগী পরীক্ষার পর মুচকি হেসে জিজ্ঞেসা করল, কেমন দেখলেন দাদাকে? বিশেষ কিছু ছোঁয়াচে নয় ত? আমার কর্তা তো ভয়ের চোটে এ ঘরেই আর আসেন না।

বেশ সপ্রতিভ এই মেয়েটি। খুব ভাল লাগল আমার ওর এই স্বাভাবিক কৌতূহল আর সহজ সরল ব্যবহার দেখে।

বললাম, সামান্য একটু ইনফ্লুয়েঞ্জা, জ্বরও বেশী নয়, কাজেই ভয় পাবার কি আছে?

দেখলাম, এই কথায় ভাই-বোনের চোখে চোখে কি যেন এক গোপন কথা হয়ে গেল ইশারায়।

দরজার দিকে কটাক্ষ হেনে হেসে বিনু বলল, ঐ দেখুন আমার কর্তা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায়।

ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, আপিসের পোশাক পরে এক ভদ্রলোক দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, ডানহাতের রুমাল দিয়ে নাক-মুখ চাপা। চোখে কালো শেলের চশমা। তারই ভেতর দিয়ে চোখ দুটি যেন জ্বল জ্বল করছে অজানা এক কৌতুকে। ছোঁয়াচে দেখে যে ভয় পেয়েছে, তা কিন্তু মনে হল না।

উঠে দাঁড়িয়ে হাতযোড় করে নমস্কার করলাম।

দুর্যোধন বলল, গুড মর্নিং ডাক্তার। কেমন দেখলেন রুগীকে?

নাকে-মুখে রুমাল চেপেই দুর্যোধন একথা জিজ্ঞেস করল।

তাই দেখে আশ্চর্য হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, রুগী তো দেখছি ভালই। কিন্তু আপনি কেন রুমাল চাপা দিয়েছেন নাকে-মুখে?

তবু দুর্যোধন মুখের রুমাল সরালো না। হেসে বলল, আপনারাই তো বলেন এসব রোগ নাক-মুখ দিয়ে ঢোকে। আটকাতে হলে এমনি করেই রুমাল চাপা দিতে হয়।

বললাম, কিন্তু রুগী রইল ঘরে আপনি রইলেন বাইরে, তবু নাকে রুমাল দিতে হবে? তাছাড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা হল ভাইরাস-ঘটিত রোগ। জীবাণুর চেয়েও এরা এত বেশী ছোট্ট যে, ফিলটারের মধ্য দিয়েও অনায়াসে গলে যায়; সামান্য ঐ রুমালে তা আটকাবে কি?

তেমনি হেসে দুর্যোধন বলল, অত শত জানিনে মশাই। নাকে রুমাল না দিলে মন খুঁত খুঁত করে তাই রুমাল দিই। আপনাদের মত মনে এক মুখে আর আমার কাছে পাবেন না।

নাকে-মুখে রুমালের মধ্য দিয়ে ওর এই কথা শুনে সবাই আমরা হেসে উঠলাম।

বিনু বলল, বেশ বাপু যত ইচ্ছে মুখে রুমাল দাও, কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু রাস্তায় যখন ধুলো উড়বে, তখনও যেন একথাটা মনে থাকে।

দুর্যোধন বলল, দেখলেন ডাক্তার আমার

ঐ রোগ। ছোঁয়াচে রোগ দেখলেই আমি নাকে-মুখে রুমাল দিই, কিন্তু রাস্তায় কখনও দিই না।

বিনু অমনি বলে উঠল, হ্যাঁ। তাই বারো মাসে হাঁচি-সর্দি তোমার যায় না।

দুর্যোধনের চোখ দুটি আবার চিক চিক করে উঠল কৌতুকে। হেসে বলল, মাসিমা যারা নেয় তাদের হাঁচি-সর্দি বারো মাসই লেগে থাকে। কি বলেন ডাক্তার? আচ্ছা আমি চলি, আপনি বসুন।

এই বলে দুর্যোধন আপিসে বেরিয়ে গেল। আমিও হাতটা ধোওয়ার জন্যে বারান্দায় এলাম। বিনুকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় ধোবো?

বিনু তাড়াতাড়ি ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে সাবানের বাক্সটা তুলে তোয়ালে হাতে এগিয়ে এল। বারান্দায় এসে সাবানটা আমার হাতে দিয়ে পাশের বাথরুমটা দেখিয়ে দিল।

বাথরুমে ঢুকতেই ডানদিকে একটা বেসিন। তার ওপর জলের কল। বেসিনের ওপর সাবান রাখবার জায়গায় সরু সরু লাইফবয় সাবানের কুচি। মনে হল যেন ছুরি দিয়ে কেটে লম্বায় এবং প্রস্থে আধ ইঞ্চি প্রমাণ সরু সরু এই সাবানের টুকরো করে রাখা হয়েছে। মেঝের ওপরেও এমনি সব ভেজা টুকরো আটকে রয়েছে দেখলাম।

কৌতূহলী হয়ে এই সব সাবানের টুকরো-গুলির দিকে আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হেসে বিনু বলল, আপনি যা দেখছেন সবই আমার কর্তার কীর্তি। প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য রোজ যতবার ওঁকে হাত ধুতে হয় ততবারই ওঁর আলাদা একটি সাবান চাই। এ জন্য এক সাবান দ্বিতীয়বার উনি ছোঁন না। নোংরা হাতে সাবান ধরলে সেই নোংরা নাকি সাবানে লেগে যায় এবং জলে ধুলেও তা নাকি যায় না। তাই আস্ত একটি নতুন সাবান ওঁর জন্য কুচো করে কেটে রাখতে হয়। অথচ দেখুন ঐ সরু পাতলা সাবান হাত ধোবার সময় ফসকে গলে মেঝেতে পড়ে আটকে থাকে, ঘর নোংরা হয়, পিছল হয়।

ভারি অদ্ভুত মনে হল। অনেক বাড়িতে দেখেছি এজন্য আলাদা সাবান থাকে। কিন্তু এমনটি কখনও দেখিনি।

বিনু বলল, দেখুন কাকুদা কি রকম লোক নিয়ে ঘর করি। ছেলেমেয়ের যখনি কারু অসুখ বিসুখ হয় সব আমাকে সামলাতে হয় একা। ওঁর ঘর আলাদা। ও ঘরে যেতে হলে এই কাপড় জামা সব বদলে তবে যেতে হবে।

শুনে সত্যি অবাক হয়ে গেলাম। দুর্যোধন যদিও মুখে রুমাল চাপা দিয়েছিল তবু ওর চোখ দুটি ছিল কৌতুকে উজ্জ্বল। তাই বিনুর এই কথায় আমি বেশ একটু ধাঁধায় পড়ে গেলাম। কি বিনু বলতে চায় ঠিক বুঝলাম না।

অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত বিনুর দিকে তাকিয়ে একটু ইতস্তত করে বললাম, তাহলে তোমার কর্তা একটু বাতিকগ্রস্ত, কি বল?

একগাল হেসে বিনু বলল, বাতিক বলে বাতিক! সাংঘাতিক বাতিক। শুধু অসুখের বাতিক হলেও না হয় একটা কথা ছিল। কিন্তু ওঁর বাতিকের আর শেষ নেই। পাগল হয়ে গেলুম একরকম।

হাতে সাবান মাখতে মাখতে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, কি রকম?

তেমনি হেসে বিনু বলল, সেবার আমরা একটা মফস্বল শহরে ছিলাম। উনি তখন এস ডি ও। একদিন পুলিস সাহেবের স্ত্রী আর আমি সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরছি ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে। হঠাৎ কলেজের এক ছোকরা সাইকেল করে আমাদের গাড়ির
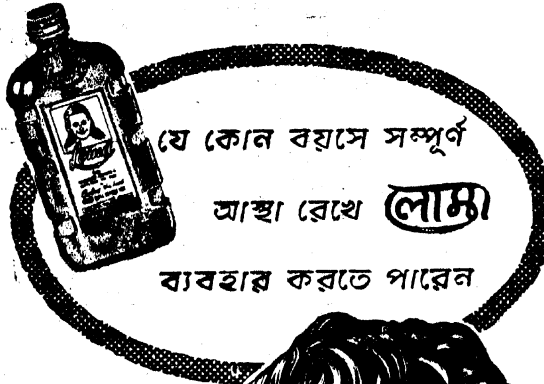
পাশ দিয়ে এগিয়ে, গিয়ে আবার ফিরে এল শিস দিতে দিতে। ছেলেটার নাম সবাই ওখানে জানে। আমরাও চিনতাম। শহরের বড় এক উকিলের বখা ছেলে। চারবার বি.এ ফেল করেছে। মেয়ে স্কুলের গাড়ি দেখলেই ও সাইকেলে করে এমনি করে পাশ দিয়ে যায় আর শিস দেয়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত তার বেশী আর ও এগোয় না। কিন্তু সেদিন আমাদের গাড়ির কাছে এসে ও অমনি করে শিস দিল দেখে, সত্যি আমরা অবাক হয়ে গেলাম।

বাড়ি গিয়ে এই কথাটা মজা করে গল্প করতেই কর্তা ক্ষেপে উঠলেন। রিভলবার বার করে ছুটলেন সেই উকিলের বাড়ি, ছোঁড়াটাকে গুলি করবেন বলে। দেখুন দেখি কি কান্ড! ছোট শহর একদিনেই এ খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল। লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। উনি কিন্তু নির্বিকার। বললেন, ছোঁড়াটাকে হাতের কাছে পেলে সত্যি তিনি গুলি চালাতেন ওর পা লক্ষ্য করে। এখন বুঝুন কি লোক নিয়ে ঘর করতে হয় আমাকে।

বিনুর এই কথায় ওর মুখে চোখে আপসোসের লেশ মাত্র আভাষ কিন্তু দেখলাম না। এই বাতিকগ্রস্ত স্বামীটিকে নিয়ে ও যে কিছু অসুখী হয়ে আছে তাও কিন্তু মনে হল না। বরং মনে হল, স্বামী-গর্বে ও যেন বেশ একটু ডগমগ।

হাত ধুয়ে আবার বিনুর দাদার ঘরে ফিরে এলাম। মামুলী ইনফ্লুয়েঞ্জা মিকশ্চার লিখে বললাম এই সংগে কোডোপাইরিন খেতে।

বিনু হঠাৎ বলল, আর একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিন এক বোতল রেক্টিফাইড স্পিরিটের জন্য।

তখন যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে কিন্তু ওষুধের কন্ট্রোল কিছু যায় নি। ইনজেকশনের জন্য এ জিনিস আমরাও সহজে পাই না। তাই রেক্টিফায়েড স্পিরিটের বদলে মেথিলেটেড স্পিরিট দিয়েই বেশীর ভাগ কাজ সারতে হয়। অথচ বিনু চাইছে এই জিনিস, তাও আবার পুরো একটি বোতল।

অবাক হয়ে গেলাম।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, এত স্পিরিট দিয়ে তুমি করবে কি?

ওর দাদার দিকে তাকিয়ে আবার বিনু হাসল। অর্থপূর্ণ সেই মুচকি হাসি। ওর দাদাও দেখলাম হাসছে বেশ একটু মিট মিট করে।

বিনু বলল, এ ও দরকার আমার কর্তার জন্যে।

ভেবে পেলাম না কেন দুর্যোধনের এত স্পিরিটের দরকার। শুনেছি সস্তা হয় বলে অনেকে নাকি এই স্পিরিট আজকাল জলে মিশিয়ে খায়। দুর্যোধন হাকিম মানুষ, তা কখনও করবে না। তাহলে?

সংশয়াকুল মুখে বিনুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাকে অমনি করে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিনু বলল, আমার কর্তা নস্যি নেন কি না, তাই ও'র এত স্পিরিট লাগে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, নস্যি তো লোকে নেয় নাকে, তাতে স্পিরিট লাগে কি করে?

হেসে বিনু বলল, আর কারু লাগে না, কিন্তু আমার কর্তার লাগে। নস্যি নেবার আগে উনি আঙুলের ডগায় একটু স্পিরিট ঢেলে নেন। তাইতে বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর ডগা জীবাণুশূন্য হয়। তারপর ঐ দু আঙুলের ডগা দিয়ে এক টিপ নস্যি তুলে তিনি নাকে দেন। পরে আবার স্পিরিট দিয়ে ঐ দু আঙুল মুছে ফেলেন।

যতবার নস্যি নেবেন, ততবারই তাঁকে এমনি করেই নিতে হবে। হাত ভাল করে সাবান দিয়ে না ধুয়ে কখনও তিনি কিছু খান না। এমনকি, ওষুধের বড়ি পর্যন্ত না। নাকে, মুখেও আঙুল দেন না কখনও। সব সময় হাত ধোওয়া সম্ভব হয় না বলেই পকেটে তাঁর একশিশি রেক্টিফায়েড স্পিরিট চাই সর্বদা। নিজের ডিবের নস্যি ছাড়া অপরের নস্যিও কখনও তিনি নেন না।

নাক-মুখে রুমাল-চাপা দুর্যোধনের কৌতুকোজ্জ্বল চোখ দুটি দেখে মনে হয়েছিল অসুখ-বিসুখের ভয়টা আসলে বোধহয় ওর একটা মুখোশ। কিন্তু বিনুর কথায় মনে হল, মুখোশ ওর সেই চোখ দুটি।

তিন দিনের মধ্যেই বিনুর দাদা সেরে উঠল। আমারও ও-বাড়ি যাবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। এই উপলক্ষে যে-কদিন আমি গিয়েছি দুর্যোধনের সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমার।

দুর্যোধনের এক বন্ধু ছিল ওর বাড়ির গৃহচিকিৎসক। কাজেই ওর বাড়ির অসুখ-বিসুখে কখনও আমার ডাক পড়েনি। বিনু অবশ্য আমাকে ডাকত ওর ছেলেমেয়ের জন্মদিনে অথবা যখন ওর ভাই-বোনরা কেউ এসে ওর ওখানে উঠত। সেই উপলক্ষে আমি গিয়েছি অনেকবার। দুর্যোধনের সঙ্গে দেখাও হয়েছে কয়েকদিন।

বছর খানেক পরে একদিন খবর পেলাম বিনুর ছোট বোন এসেছে, আমাকে বলেছে দেখা করতে।

সন্ধ্যেবেলা গিয়ে দেখি বিনু খাটের ওপর শুয়ে আছে। হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আর দুর্যোধন খাটের পাশে বসে বিনুর মাথায় হাত বোলাচ্ছে।

অবাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ আজ এ কি হল বিনুর?

শুনলাম বিনুর আঙুল-হাড়া হয়েছিল। আজই সকালে অপারেশন হয়েছে। শহরের নামকরা অভিজ্ঞ এক সার্জন অপারেশন করেছেন ক্লোরোফর্ম করে।

অপারেশন টেবিলে ক্লোরোফর্ম শুঁকে অজ্ঞান হবার আগে পর্যন্ত বিনু নাকি এমন চিৎকার করেছে যে, আশপাশের সব ফ্ল্যাটের লোক এ-বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল।

যাই হোক, অপারেশন ভালই হয়েছে। সার্জন বলেছেন, নিজে এসে তিনি এই ব্যাণ্ডেজটা খুলবেন একদিন পরে। কিন্তু বিকেল থেকেই বিনুর আঙুলে নাকি সাংঘাতিক ব্যথা।

আমাকে দেখেই বিনু বলে উঠল, এই যে কালুদা। দেখুন আমি মরে যাচ্ছি। হাতে অসম্ভব ব্যথা।

এই বলে হাতখানা এগিয়ে দিল আমার দিকে।

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা বিনুর হাতখানা তুলে

নিলাম। মণিবন্ধের ওপরে আঙুল দিয়ে নাড়ী দেখলাম। তারপর যে আঙুলে অপারেশন হয়েছে, তার ওপর আস্তে আস্তে চাপ দিলাম।

দুর্যোধন বিনুর শিয়রে বসে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, এখন হঠাৎ উঠে এসে আমার হাত থেকে বিনুর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ঐ হাতখানা নিজের কোলে তুলে নিল। বিনুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, কোথায় ব্যথা বল ত?

বিনু একথার উত্তর দিল উঃ বলে চেঁচিয়ে।

দুর্যোধন তখন আমাকেই হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি দেখছিলেন আপনি টিপে টিপে?

দেখলাম ও বেশ গম্ভীর।

দুর্যোধনের ঐ গোমড়ামুখের দিকে তাকিয়ে আমারও হঠাৎ মনে পড়ে গেল বিনুর প্রথম দিনের সেই কথা। কিছুদিন আগে মফস্বলে কলেজের একটি ছোকরা শিস দিয়েছিল বলে এই দুর্যোধন রিভলবার নিয়ে তেড়ে গিয়েছিল গুলি করতে। অথচ আমি বিনুর হাত ধরেছি; এমন কি টিপেছি পর্যন্ত। অতএব আমার ভাগ্যে কি আছে?

বেশ একটু ঘাবড়ে গেলাম। খুবই অপ্রস্তুত এবং অপরাধী বোধ হল নিজেকে।

তাড়াতাড়ি বললাম, টিপে দেখছিলাম ভেতরে কোন পুঁজ আছে কি না। আমার মনে হয় আছে এবং এক্ষুনি এই ব্যাণ্ডেজ খুলে ওটা বার করা দরকার।

বিনুর হাতখানা নিজের হাতে রেখে আদর করে ঐ ব্যাণ্ডেজের ওপর হাত বুলিয়ে দুর্যোধন তেমনি গম্ভীর হয়েই বলল, কিন্তু সার্জন বলেছেন ব্যথা হলেও এ ব্যাণ্ডেজ আজ আর খোলা যাবে না। ব্যথা হলে বলেছেন কোডোপাইরিন খেতে।

বিনু অমনি বলে উঠল, অনেক খেয়েছি ঐ কোডোপাইরিন। কিচ্ছু হয় না। আমাকে তাহলে তোমরা মরফিয়া দিয়ে অজ্ঞান করে রাখ। এ আর আমি সইতে পারব না।

এই বলে বিনু গোঙাতে শুরু করল যন্ত্রণায়। ছটফট করতে লাগল বিছানায় এপাশ ওপাশ ফিরে।

দেখে আমিও উঠে দাঁড়ালাম। গম্ভীর হয়ে দুর্যোধনকে বললাম, দেখছেন তো কি সাংঘাতিক ব্যথা। সার্জনকে খবর দিন এক্ষুণি। তিনি এসে একবার দেখে যান রোগীর এই অবস্থা। আমার মনে হয় ব্যাণ্ডেজটা এখনি একবার খোলা দরকার। নইলে পরে কিন্তু আবার ঐ আঙুল কাটতে হবে।

বলা বাহুল্য দুর্যোধন আমার কথা শোনে নি। মোটেই কোন মূল্য দেয় নি আমার এই পরামর্শের। আমিও আর কথা না বাড়িয়ে উঠে এসেছিলাম সেদিন।

পরে শুনেছি, সত্যি বিনুর ঐ আঙুল আবার কাটা হয়েছিল পুঁজ বার করবার জন্য। কে না জানে আঙুলহাড়ায় এরকমই হয়। একবার অপারেশনে সব পুঁজ বেরোয় না। তিন চারবার পর্যন্ত কাটতে হয় অনেকের। ভাগ্যিস দুর্যোধন ভাল সার্জন দেখিয়েছিল তাই মাত্র দুবার অপারেশনেই সেরে উঠেছে বিনু।

তারপর ২।৩ বছর কেটে গেছে। বিনুদের বাড়ি যাবার আর সুযোগ হয় নি আমার। ওদেরও যেমন প্রয়োজন কিছু হয় নি, আমারও তেমনি আগ্রহ হয় নি যেতে।

একদিন সকালে বিনুর চাকর ছোট্ট একটা চিঠি নিয়ে আমার কাছে এল।

দেখলাম বিনু লিখেছে, ওর ছেলের ১০৫° জ্বর। গায়ে গুটি বেরিয়েছে খুব। যত শীগগির সম্ভব আমি যেন একবার ওকে দেখে যাই।

দুর্যোধনের গৃহচিকিৎসক আমি নই, তবু কেন যে বিনু আজ হঠাৎ আমায় ডেকে পাঠাল বুঝলাম না।

আমি যখন গেলাম তখন বেলা প্রায় এগারোটা। দুর্যোধন অনেক আগেই চলে গেছে আদালতে।

বিনু বলল, দেখুন ছেলের আমার ১০৫° জ্বর, সারা গায়ে গুটি বেরিয়েছে। কাল থেকে ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষা শুরু। কর্তা বলেছেন দিতেই হবে পরীক্ষা। হলই বা এটা জল বসন্ত, তবু বলুন দেখি তা কি কখনও সম্ভব?

বললাম, এত জ্বরে পরীক্ষা কেউ কখনও দেয়? না কি দিতে পারে? আর এই জ্বরে গায়ে এরকম গুটি নিয়ে পরীক্ষকরাই বা ওকে হলে ঢুকতে দেবেন কেন?

বিনু বলল, সে ব্যবস্থা সব আমার কর্তা করে এসেছেন। পরশু সকালে দেখলাম ছেলেটার মুখে দুটি একটি গুটি বেরিয়েছে। সামান্য জ্বর হয়েছে। তাই শুনেই উনি নিজে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে তদ্বির করে ওর পরীক্ষার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করে এসেছেন এই দুদিনের মধ্যেই। এমন কি এসব রোগে যে পেন্সিল দিয়ে খাতায় লিখতে হয় তা পর্যন্ত কিনে এনেছেন এক ডজন।

এই বলে বিনু সদ্য-কেনা এক বাক্স নতুন পেন্সিল দেখালো। পরীক্ষার খাতায় এই পেন্সিলে লেখা জীবানুধ্বংসী গ্যাসেও নষ্ট হবে না কখনও।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, তা না হয় হল কিন্তু এত জ্বরে ছেলেটা উঠবে কি করে আর লিখবেই বা কি?

বিনু বলল কর্তা বলেছেন ওকে উঠতে হবে না। বিছানায় শুয়ে শুয়েই নাকি লেখা যাবে। উনি হস্পিটালে বেডের ব্যবস্থা করে এসেছেন। আমি কিছুতেই রাজী হই না দেখে অবশেষে ওঁর সেই বন্ধু ডাক্তারকে পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন, আমাকে বোঝাতে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি বললেন সেই ডাক্তার?

অবজ্ঞা ভরে বিনু বলল, কি আর বলবে? বলল, এটা তো জল বসন্ত, ছেলে যদি পরীক্ষা দিতে চায় তাহলে দিক না! লোকটা ছেলেটার নাড়ী দেখল না, বুকে স্টেথোস্কোপ বসালো না, ভয়ে ওর গায়ে হাত দিল না পর্যন্ত। আর সেই ডাক্তারের কথা আমি শুনব? তাই আপনাকে খবর দিয়েছি। দেখুন দেখি একটু ভাল করে ওকে পরীক্ষা করে।

দেখলাম সাংঘাতিক গুটি বেরিয়েছে ছেলেটার সারা গায়ে মুখে মাথায় হাতে পায়ে। সারা মুখটা যেন ফুলে উঠেছে। সত্যি বিকৃত হয়ে গেছে মুখটা। জ্বর ১০৪°। নাড়ীর গতি ভালই এবং বুকে কোন দোষ নেই। ভরসার কথা শুধু এই যে, এটা সত্যি জল বসন্ত, আসল বসন্ত নয়।

বিনুর দাদার অসুখে প্রথমদিন যে ঘরে আমি এসেছিলাম দেখলাম সেই পূব দিকের কোণের ঘরেই ছেলেটির থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। দরজা জানলায় পুরু পর্দা। খাটের ওপর মশারির ভেতরে রুগী। সমস্ত ঘরে লাইজলের উগ্র গন্ধ। এত বেশী উগ্র এই গন্ধ যে বাড়িতে ঢুকলেই তার ঝাঁঝ নাকে এসে লাগে।

বিনুকে ভরসা দিয়ে বললাম, ছেলেটার গায় অনেক বেশী গুটি বেরিয়েছে এবং এখনও বেরুচ্ছে তাই জ্বরও এত বাড়ছে। কিন্তু ভয়ের কিছুই তো দেখছি না। তবে কাল ওর পরীক্ষা দেওয়া চলবে না কিছুতেই। আমার মনে হয় গুটি আরও বেরুবে। কাজেই-এ অবস্থায় ওকে নড়ানো অন্যায় হবে খুবই।

বিনু জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ও খাবে কি?

বললাম, এখন ওকে জল খেতে দাও খুব। চিনির জল, মিশ্রির জল, ডাবের জল, বার্লির জল এইসব দাও। মাথাটা ঠান্ডা জলে ধুয়ে গাটা গরম জলে খুব সাবধানে স্পঞ্জ করবে। জ্বরটা কমলে সাবান দিয়ে স্নান করাবে রোজ, আর যা খেতে চায় তাই খেতে দেবে।

বিনু বলল, এটা জল বসন্ত ঠিক তো? নাকি আসল বসন্তের সঙ্গে মেশানো?

বললাম, সময়মত টিকা নিলে বসন্ত কখনও হয় না। এটা চিকেন পকস্। জল

বসন্তও একবার হলে আর কখনও হয় না সাধারণতঃ। ওর কি ছেলেবেলায় জল বসন্ত হয় নি কখনও?

বিনু বলল, ছেলেবেলায় আমার জল বসন্ত হয়েছে, কর্তারও হয়েছে শুনেছি। কিন্তু আমার ছেলে বা মেয়ের কারু এতদিন হয় নি।

বললাম, তাহলে এবার তোমার মেয়ের হয়ত হতে পারে। কোথায় সে?

বিনু বলল, ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি ওর মামাবাড়ি। ওখানে গিয়ে আবার হবে না তো?

বললাম, তা হয়ত হতে পারে। হয় যদি তো হবে, সে কথা এখন ভেবে আর কি হবে? আপাতত এই ছেলেটার পরীক্ষা দেওয়া তো বন্ধ কর তারপর অন্য কথা।

বিনু বলল, পরীক্ষা দেওয়া আমি বন্ধ করে দিয়েছি আগেই। খুব একচোট হয়ে গেছে আজ কর্তার সংগে এই নিয়ে। তাইতো আপনাকে ডেকেছি। আপনি কিন্তু রোজ একবার করে আসবেন।

সেই সময় রোজ ওদের বাড়ি গিয়েছি পর পর কয়েকদিন। দিন তিনেকের মধ্যেই জ্বরটা ছেড়ে গেল, গুটি ওঠাও বন্ধ হল। ভাত খাবার ব্যবস্থা দিলাম।

বললাম, যা খেতে চায় তাই ওকে খেতে দিও। কিন্তু বিনু তা দিল না। মাছ মাংস ডিম সব বন্ধ করে শুধু নিরামিষ খাইয়ে রাখল।

আমি যখন ওদের বাড়ি যেতাম দুর্যোধন তখন থাকত আদালতে। কাজেই ওর সংগে আমার দেখা হত না কোনদিন। শুনতাম আপিসে যাবার আগে ছেলের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রোজ একবার দেখে যেত নাকে মুখে রুমাল চেপে। তারপর আর এদিকে আসত না।

একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরতে আমার অনেক দেরি হল। মরণাপন্ন এক রোগী নিয়ে এমন আটকে গেলাম যে, বাড়ি ফিরতে রাত বারোটা বেজে গেল। একটু ভয় পেয়ে বাড়ি ফিরে দেখি আমার ঘরে আলো।

ঘরে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দেখলাম আমার ছেলে দুটি ঘুমিয়ে পড়েছে, চাকরও ঘুমুচ্ছে, কিন্তু আমার চেয়ারে বসে দুর্যোধন আমারই প্যাডে কি যেন লিখছে।

আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে দুর্যোধন চমকে তাকালো। কাগজটা ছিঁড়ে উঠে দাঁড়াল লজ্জিত মুখে।

বলল, আপনার জন্যই ডাক্তার বসে আছি সেই নটা থেকে। এত রাতেও যখন ফিরলেন না তখন এই চিঠিটা লিখে রেখে যাব ভাবছিলাম।

উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন কি হয়েছে? ছেলের আবার কি হল? জ্বর তো ছেড়েছে আজ প্রায় সাতদিন হল।

দুর্যোধন যেন আরও বেশী লজ্জিত হল। বলল, ছেলে ভালই আছে। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। কিন্তু আমি এসেছি আমার নিজের জন্য।

আরও বেশী আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি ওর গৃহচিকিৎসক নই। ওর চিকিৎসা কোনওদিন আমি করি নি। এবারও যে আমি ওদের বাড়ি গিয়েছি তাও শুধু বিনুর জেদের জন্য, দুর্যোধনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সেই দুর্যোধন আজ রাত নটা থেকে এই গভীর রাত্রি পর্যন্ত বসে আছে আমার অপেক্ষায় নিজের অসুখ সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে। তাজ্জব বনে গেলাম।

ব্যাগটা টেবিলের ওপর রেখে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলাম, সে কি? আপনার আবার কি হল?

দুর্যোধন ওর ডান হাতের তর্জনীটা আলোর কাছে এগিয়ে নিয়ে এসে বলল, দেখুন তো কি হয়েছে এখানে?

আঙুলটা উল্টে-পাল্টে ভাল করে দেখে কোথাও কোন দোষ পেলাম না।

বললাম, কৈ কিছু তো দেখছি না। কি হয়েছে?

দুর্যোধন আঙুলের গোড়ায় আলপিনের ডগার মত্ত ছোট একটা ফুসকুড়ি দেখিয়ে বলল, এটা তাহলে কি?

বিস্মিত হয়ে বললাম, ওটা তো সামান্য একটা ফুসকুড়ি। এই দেখাতে রাত বারোটা পর্যন্ত বসে আছেন এখানে?

দুর্যোধন আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ফস করে আমার ডান হাতখানা নিজের দুহাত দিয়ে চেপে ধরে আবেগ ভরে বলে উঠল, এটা তাহলে চিকেন পকস্ নয়?

কবিতা

সোনার হরিণ—শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়। কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ২বি, বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা-৩। দেড় টাকা।

'সম্প্রতিকালের মধ্যে তরুণতর কবিদের যে ক'খানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে 'সোনার হরিণ' তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জীবনের জন্য বেদনা এবং জীবনের প্রতি বিশ্বাস এক সংগে বিচ্ছুরিত হয়েছে এই গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে। ভংগি-প্রকরণের দিক থেকে যে শুধু কবিতাগুলি আধুনিক হয়ে উঠেছে তাই নয়, আধুনিক জীবন সমস্যা সংস্পর্শিত মননের ছোঁয়াও লেগেছে বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও প্রকাশনে। চিত্রকল্প এবং শব্দের ব্যবহারে শরৎবাবু কৃতার্থ; অনায়াস প্রযত্নে এমন বহু আশ্চর্য পংক্তি তাঁর হাত দিয়ে বেরিয়েছে যাদের ধারাবাহিক সমন্বিতি শ্রেষ্ঠ-কবিতার লক্ষণ। প্রথম রচনায় যে সমস্ত ত্রুটি এবং দুর্বলতা থাকে স্বাভাবিক, 'সোনার হরিণ'-এ তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয় একথা সত্য হলেও আমরা স্বীকার করবো যে এই মাত্র চব্বিশটি কবিতার প্রথম কাব্য-গ্রন্থেই তিনি সমকালীনদের মধ্যে বিশেষরূপে চিহ্নিত হবেন। এই প্রতিশ্রুতিবান কবির কাছে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক প্রত্যাশা থাকলো। (২২৫।৫৭)

মিস্টিমন—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক। সাহিত্যতীর্থ, ৬৭, পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দুই টাকা।

'মিস্টিমনে'র কবি বাংলা কাব্যক্ষেত্রে নবাগত হলেও সুখের বিষয় গ্রন্থকার হবার সৌভাগ্য তিনি অর্জন করেছেন। তার আলোচ্য গ্রন্থের কবিতাগুলি পাঠকের মনে কোন প্রকার রেখা-পাত করে না; প্রথম বয়সের উচ্ছ্বাস এবং অনবধানী শব্দ প্রয়োগ এর জন্যে দায়ী। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে রমেন্দ্রনাথ মল্লিক আমাদের আশান্বিত করবেন এই আশা রইল। (৬০৬।৫৭)

আকাশ মাটি—শান্তি লাহিড়ী। প্রকাশিকা : নির্মলকুমারী চতুর্বেদী, পি-৫৯৫, লেক রোড এক্সটেনশন, কলিকাতা। দেড় টাকা।

শান্তি লাহিড়ী কবি হিসাবে শুধু যে নবাগত তাই নন, অনুমান হয় বয়সেও তিনি অতি তরুণ এবং এইটিই তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। সুস্থ এবং সবল মনোভংগিতে, সুরেলা প্রকাশে 'আকাশ মাটি'র কবিতাগুলি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছন্দের বিবিধ বিন্যাসে কবির বিশেষ আগ্রহ পরিলক্ষিত হল, এটি বিশেষ আশার কথা। অত্যন্ত হাল্কা সুরের দু' তিনটি কবিতা এই গ্রন্থে অনধিকার প্রবেশ করেছে ব'লে মনে হল। বাকি কবিতাগুলির মধ্যে একটি হার্দ্য প্রসাদগুণ ছড়িয়ে রয়েছে যা, অনায়াসে পাঠকের মনকে প্রসন্ন করে তোলে। ভাব ও ভাবনার প্রগাঢ়তা, যাকে আমরা প্রৌঢ়ত্ব বলি, কোন কোন কবিতার বক্তব্যে তা প্রস্ফুট হয়েছে। নবজাতক, আত্মহত্যা, কবিতার জন্ম, সমুদ্র, আলপনা সেন, জন্মদিন প্রভৃতি কবিতাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা এই তরুণ কবির উজ্জ্বল ভবিষ্যতে বিশ্বাসী। (৫০৭।৫৭)

নিঃসংগ শপথ—শ্রীমতী দত্ত। প্রকাশক : পি, আর, কুণ্ডু এণ্ড কোং, ১৯৪, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। পাঁচসিকে।

কবিতাগুলির অধিকাংশই গদ্য কবিতার ঢঙে লেখা, যদিও যে যে গুণ থাকলে গদ্য কবিতা হয়ে ওঠে তার অভাব চিহ্নই রচনা-শৈলীতে নজরে পড়ে। ভাবে ভাষায় শব্দ-প্রয়োগে একটি অনতিস্পষ্ট শৈথিল্য প্রায় সর্বত্র ছায়াপাত করেছে। কবির কাছে আমরা আরো নিষ্ঠা এবং প্রযত্ন ভবিষ্যতে আশা করবো। কারণ কখনো কখনো কচিৎ কোন ছত্রে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়ে ফেলেছেন তা লক্ষ্য করলে হতাশ হবার খুব কারণ নেই। (২৮৯।৫৬)

নক্ষত্রের আলোয়—বিনয় মজুমদার গ্রন্থ-জগৎ, ৬, বংকিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। এক টাকা।

মাত্র চোদ্দটি কবিতার মধ্য দিয়ে কোন কবির

সঙ্গে প্রথম পরিচয় অনেক ভুল বোঝার অপেক্ষা রাখে। তবু একথা বলতে পারি, নির্বাচনের গুণে 'নক্ষত্রের আলোয়' বর্তমান কবির চেহারা স্পষ্ট হয়েছে। এই রোমান্টিক কবির হৃদয় আর্তির সহজ সুমিত প্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করে। জীবনের ভগ্নাবশেষের মধ্যে যে করুণ রাগিণী বাজে তা সবসময়ে নিরাশার নয়।

'চাঁদ নেই, জ্যোৎস্নার অমলিন জ্বালা নেই,
তবু কী এক বিপন্ন আলো লেগে আছে এ-
মাঠের আঁধারের মুখে।'

এই বিপন্ন আলোর ভাষাই তিনি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর কবিতার মধ্যে।

(৫৩৮।৫৮)

আলো আঁধার—অময়কুমার নন্দী। প্রকাশিকা : ইলা নন্দী, নগতা, দমদম ক্যাণ্ট। ১.৭৫ নঃ পঃ।

উদ্ভট, হাসাকর কতকগুলি কবিতা 'আলো আঁধার' কাব্যগ্রন্থটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, অবশ্য হাস্যরস সৃষ্টির দিকে কবির নজর ছিল না একথা বলাই বাহুল্য। 'ভূমিকম্প' নাম দিয়ে একটি 'ভূমিকা নয়' গৌরচন্দ্রিকা রয়েছে প্রথমে। সেটি পড়লেই কবির প্রতিভা মালুম হবে। আমরা শুধু এই কথাই বলতে পারি যে, এই জাতীয় কাব্যোন্মাদনা ভীতিকর।

(৬১৪।৫৮)

বকুলে পলাশে—সংকলক : দিশারী লেখক চক্র। দিশারী প্রকাশনী, ৫২ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম তিন টাকা।

এই কবিতা সংকলন গ্রন্থের প্রকাশক ভূমিকায় লিখেছেন : 'সন্দেহ নেই বাংলা সাহিত্যে একক কবিতার বই প্রচুর আছে। কিন্তু তাদের আবেদন কতটুকু? কার জন্যে? যার জন্যে হোক একথা বলা চলে যে সাধারণের জন্যে নয়।......সুতরাং বলতে পারি কবিতা এবং পাঠক দুই তৈরী করা আমাদের উদ্দেশ্য।' এই জাতীয় হাসাকর উক্তিতেই তিনি ক্ষান্ত হননি, আলোচ্য গ্রন্থে তা কাজেও প্রমাণিত করেছেন।

৫৪৮।৫৮

স্মৃতিকথা

দাদাঠাকুর—নলিনীকান্ত সরকার। রাইটার্স সিণ্ডিকেট, ৮৭ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনায় এমন একটি পলিতকেশ বৃদ্ধের পূর্বভূমিকা আমরা দেখেছি, তিনি শুধু যে একলা তাই নয়, তিনি হাজার কাজের দাদাঠাকুর। আলোচ্য জীবনস্মৃতি গ্রন্থের যিনি কেন্দ্রব্যক্তি তিনি যেন আংশিকভাবে রবীন্দ্রনাটের দাদাঠাকুরেরই জীবস্মৃতি। আসল নাম শরৎচন্দ্র পণ্ডিত, সবাই ডাকেন দাদাঠাকুর বলে। এমন একটি শুভবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতি বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ সচরাচর নজরে পড়ে না; রহস্য ভাষণের তির্যকতায় এবং ক্ষিপ্রতায় এঁর জুড়ি মেলা ভার। বাংলা দেশ চিরকালই পরিহাসদক্ষ দেশ, কিন্তু তার রসিকতা সর্বদা উচ্চস্তরের হয়ে ওঠে না, ভাঁড়ামির পর্যায়ে নেমে আসে। বর্তমানগ্রন্থে দাদাঠাকুরের বালক বয়স থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বিস্তৃত জীবনের স্মৃতিকণিকা সুনিপুণভাবে সঞ্চিত করেছেন নলিনীকান্ত সরকার। স্মৃতিকণিকাগুলি জীবনের নানা রসোজ্জ্বল মুহূর্ত থেকে বাছা হয়েছে এবং এই চয়নকাজটি একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেই করা হয়েছে—তা হচ্ছে হাস্যপরিহাসের দিক থেকে। দাদাঠাকুর হাস্য-পরিহাস যদি নিছক পরিহাস হত, তাহলে অনেকক্ষেত্রেই তা ভাঁড়ামির কোঠায় নেমে আসতো সন্দেহ নেই, কিন্তু রহস্য সৃষ্টিই তাঁর বাক্য ও ব্যবহারের শেষকথা হয়ে দাঁড়ায়নি। মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, জাতীয় মূঢ়তার জন্য গভীর অনুবেদনা, ন্যায়নিষ্ঠা, স্বাবলম্বনচারিতা, সাহস ও ধৈর্য এগুলির মূলে উৎস ছিল। বস্তুত লেখক ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন, 'দাদা-ঠাকুর একটি চরিত্র এবং আমার মনে হয় বাংলা দেশের একমাত্র চরিত্র।' আচারে আচরণে, অসনেবসনে নবীন ও প্রবীণ বাংলার প্রতিভূ হয়ে এই সদাচারী, স্বজাত্যাভিমানী ব্রাহ্মণ অদ্যাবধি জীবিত আছেন এটি আমাদের পক্ষে আনন্দের বিষয়। এই প্রায় নিশ্চরিত্র যুগে এমন একটি মূল্যবান জীবন ও চরিত্র যিনি শুধুমাত্র হাসির রেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন সেই হাস্যরসিক নলিনীকান্তবাবুকেও আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। শ্রীযুক্ত কালী-কিংকর ঘোষদস্তিদার অঙ্কিত চিত্রগুলি গ্রন্থ-খানির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। গ্রন্থটির বহিরঙ্গ-সজ্জা আর একটু রুচিসম্পন্ন হলে খুশি হওয়া যেত।

৪২০।৫৮

নাটক

অপরাজিত—রমেন লাহিড়ী। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯। এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাব্য-গল্প-উপন্যাসের

ইদানীং যে সমৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যায়, সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যদি তা দেখতে পাওয়া যেত, তাহলে যে খুবই সুখের কথা হত তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের সাহিত্যের যে সমস্ত অংশ এখনও অনেক পিছিয়ে আছে, নাটক তার অন্যতম। তবে সুখের কথা এই যে, নতুন কালের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অনেকেই এখন নাটক রচনায় হাত দিচ্ছেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানিও একটি নাটক। সামাজিক নাটক। ঘটনার সংস্থাপনে, কাহিনীর বিন্যাসে এবং সংলাপ রচনায় লেখক যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা সামান্য নয়। অনুশীলন অব্যাহত থাকলে বাঙালী পাঠকদের হাতে তিনি যে ভাল কিছু নাটক তুলে দিতে পারবেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। (৬১৩।৫৮)

বিবিধ

কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রা। আর্মস্ট্রং স্পেরি। অনুবাদক ঃ সুনীলকুমার নাগ। গ্রন্থম, ২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬। এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারকে পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। নাবিক কলম্বাসের জীবন ছিল অত্যন্তই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। কিন্তু অত্যন্তই সাহসী পুরুষ বলে সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতে তিনি কখনও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েননি। এ বইয়ে সেই সাহসী নাবিকের জীবন-কথা খুব সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অনুবাদ প্রাঞ্জল। পড়তে পড়তে কোথাও হোঁচট খেতে হয় না। (৫৮৪।৫৮)

হিন্দী বাক্‌ভংগী (প্রিয় পর্যায়)। অশোককুমার ভট্টাচার্য। এস সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিমিটেড, ১।সি কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ১২।

নতুন যাঁরা হিন্দী শিখছেন, এ-বইখানি এঁদের খুবই কাজে লাগবে বলে আমাদের মনে হয়। হিন্দী বাক্‌রীতির ধরন সম্পর্কে প্রচুর দৃষ্টান্ত ও উদাহরণের সাহায্যে এ-বইয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে, তা খুবই মনোগ্রাহী। বইখানির প্রচার হলে সুখের বিষয় হবে। (১২০।৫৮)

Thoreau, Tolstoy and Gandhiji—Pyarelal. Publishers—Benson's, Calcutta. Price 75 Np.

থোরোই প্রথম সত্যাগ্রহের ভূমিকা রচনা করেন গান্ধীজীর মনে, পরে তিনি সেই আদর্শকে প্রত্যক্ষরূপে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যান। আর গান্ধীজীর আদর্শের প্রতি অকৃত্রিম সমর্থন ছিলো সাহিত্যিক টলস্টয়ের। সুতরাং এ তিনজনের মধ্যে যে আত্মিক মিল ছিলো, তা লক্ষ্যণীয় বিষয়। গান্ধীজীর বহুকালের সহকর্মী পিয়ারীলাল এই দিক থেকে তাঁর চিন্তাকে ছোট্ট গ্রন্থে গ্রথিত করেছেন। পাঠকেরা এই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন সন্দেহ নেই। ২৭৩।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছেঃ—

আলো আঁধার—অমরকুমার নন্দী।
জাতক—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা—অনাদিনাথ পাল।
দিল্লীর ডাকে—বিক্রমাদিত্য।
দ্বিতীয় সন্ধি—দুর্গাদাস সরকার।
দূরতমা—উষাদেবী সরস্বতী।
গীতা (বাংলা পদ্যে)—শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীকৌটিল্য

তৃতীয় পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার তোড়জোড় এর মধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। শুনতে পাচ্ছি এবার আরো সাহসী পরিকল্পনা নেওয়া হবে। পরিকল্পনায় কোন্ দিকে এবার ঝোঁক পড়বে বলা কঠিন; তবে প্রথম পরিকল্পনায় যেমন কৃষি এবং দ্বিতীয়তে যেমন শিল্পের উপর অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব পড়েছিল, আগামী পরিকল্পনায় সম্ভবত একটা সার্বিক ভারসাম্যমূলক বৃদ্ধির (balanced growth) কথা মনে রাখা হবে। প্রধানমন্ত্রী একথাই সেদিন কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের বৈঠকে বলেছেন। কোনো কোনো মহলের আশা ছিল দুটো বিরাট পরিকল্পনার প্রচণ্ড প্রচেষ্টার পর এবার একটু ক্লান্তি বিনোদনের প্রয়াস থাকবে; কিন্তু প্রধানমন্ত্রী, আমাদের সৌভাগ্যত এই হুঁশিয়ারী দিয়েছেন যে, বিরাট তৃতীয় পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবার পরিশ্রমের তুলনায় পরিকল্পনা সম্বন্ধে সাময়িক নিস্পৃহতা এই মুহূর্তে দেশের পক্ষে অনেক বেশি দুশ্চিন্তার বিষয় হবে।

এখন, এই সাহসী পরিকল্পনার মেরুদণ্ডস্বরূপ শিল্পকে নিশ্চয়ই দ্রুত উন্নত করতে হবে। এটা আশাপ্রদ কথা যে দুটো পরিকল্পনার আংশিক সাফল্য এবং অনেক বিফলতা থেকে অন্তত তত্ত্বগতভাবেও আমাদের সরকার এই প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেয়েছেন যে, ভূমি-সমস্যার উপযুক্ত সমাধান না হলে গোড়ায় গলদ থেকেই যাবে। তবে ভূমি সমস্যার অনেক দিকের কোন্ কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণ করা হবে সেটা স্পষ্ট নয় এবং সেই সিদ্ধান্তের উপরেই সমাধানের সাফল্য নির্ভর করবে। অন্য কথায়, আমাদের দেশের শিল্পের এবং কৃষির যোগসূত্রটি আবিষ্কার করতে পারা এবং সেই ভিত্তির উপরে তৃতীয় পরিকল্পনা পর্যায়ে এদেশের শিল্পায়নের গতি-প্রকৃতিকে নির্ধারিত করাই হচ্ছে আসল কাজ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ক্ষেত্র থেকে কী হারে ভবিষ্যৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা বাস্তবিক সৃষ্টি করা হয়েছে সেটাও আমাদের তথ্যমূলক স্তরে জানতে হবে। ভারি শিল্পের ভূমিকা সম্বন্ধে অধ্যাপক মহলানবীশের রুশ-প্রভাবিত নীতি কতটা সার্থক হয়েছে এ সম্বন্ধেও ভালোভাবে জানা যায় নি। এই সব কিছু খবরের উপর এই ব্যাপারটা নির্ভর করবে যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় ভারি শিল্পকে হাল্কা অথবা ভোগ্যবস্তু (consumption goods) শিল্পের চেয়ে প্রাধান্য দেওয়া হবে কি না। আগামী পাঁচ-ছ বছরে ভোগ্যবস্তুর সম্ভাব্য উৎপাদন ও যোগানও এই সূত্রে খানিকটা আঁচ করা যাবে। এই ব্যাপারটা প্রয়োজনীয়; কারণ ভোগ্যবস্তুর ভবিষ্যৎ যোগানের সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতি সমস্যার সংযোগ আছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরুতে অনেক অর্থনীতিবিদেরই ভয় ছিল যে, ভোগ্যবস্তুর অপেক্ষাকৃত সংকোচন এবং পরিকল্পনাকালীন দ্রুত মুদ্রা-প্রচলন মোটের উপর প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবে। এই ভীতি অনেকাংশে অমূলক প্রমাণিত হলেও তৃতীয় পরিকল্পনায় সত্যি দেখা দিতে পারে।

এ সব দিক ছাড়াও, সাম্প্রতিক আলোচনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় ব্যয়সংস্থানের ব্যাপারটি। আয় কোথা থেকে হবে? গত দুই পরিকল্পনার মতো এবারেও যে বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করা হবে না এমন নিশ্চয়তা নেই। তবে মনে হয় দেশের ভিতরেই সংস্থানের দিকে অপেক্ষাকৃত জোর দেওয়া হবে। দেশের ভিতরের সম্পদ থেকে আয়-সংস্থানের উপর এতটা জোর এবারেই দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত, বিশ্ব-রাজনীতিক পরিস্থিতির সম্ভাব্য পরিবর্তনের আশঙ্কা করেই এই ব্যাপারে এত বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। যাই হোক, আভ্যন্তরিক আয় সৃষ্টির উপায় সম্বন্ধে যে সব সাম্প্রতিক আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির নাগপুরে বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রধানত, মুনাফার ঊর্ধ্বসীমা স্থির করে তার বাড়তি অংশটুকু ছেঁকে নেবার প্রস্তাব হয়েছে। প্রসঙ্গত, কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুসারে পারিশ্রমিক নির্ধারণ এবং উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবও নেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট সঞ্চয়ের পরিমাণ আরো বাড়ানোর সম্ভাবনার কথাও চিন্তা করা হয়েছে। অন্যতম উল্লেখযোগ্য চিন্তা-পরিবর্তন দেখা দিয়েছে কর ধার্য করার ব্যাপারে। কার্যকরী সমিতি মনে করেন নতুন কর বসানো, কিংবা পুরোনো কোনো কর আর বাড়ানোর কোনো যৌক্তিকতা নেই, তাতে জনসাধারণের দুর্দশা বাড়বে। এই পথে চিন্তা সর্বসাধারণের তরফ থেকে প্রশংসিত হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু কর ফাঁকির বিপুল পরিমাণ সম্বন্ধে অধ্যাপক কালডর গতবার যে বক্তব্য জানিয়েছিলেন এবং সে পথে আয় বৃদ্ধির কোনো ব্যবস্থা সরকার আজ পর্যন্তও যে করতে পারলেন না, এ বিষয়ে কার্যকরী সমিতিও চুপ থেকে গেছেন। অবশ্য বেসরকারী শিল্পে কর ফাঁকির দিক দিয়ে রাজস্বে যে ক্ষতি হচ্ছে, কার্যকরী সমিতি প্রস্তাবিত মুনাফা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তার খানিকটা হয়তো উদ্ধার হতে পারে। অবশ্য বেসরকারী উৎপাদন ক্ষেত্রের নিশ্চিত প্রতিবাদকে সরকার কতটা উপেক্ষা করে চলতে পারবেন সেটা বোঝা কঠিন, কারণ এখন পর্যন্ত সরকারী শিল্প ক্ষেত্রের পরিসীমা যথেষ্ট সংকীর্ণ থেকেছে এবং জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য বেসরকারী শিল্পের উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করতে হচ্ছে। কার্যকরী সমিতির অন্যান্য প্রস্তাবের মধ্যে একটি হচ্ছে সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করা এবং আরো ক্ষমতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে তাকে পরিচালনা করে এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় (state trading) যন্ত্র চালনা করে প্রচুর আয়ের উপায় সৃষ্টি করা। এ থেকে মনে হয় আগামী পরিকল্পনায় সরকারী উৎপাদন ক্ষেত্রের প্রতি আরো বেশি নজর দেওয়া হবে। যদি সত্যি তাই হয় তবে ভারতবর্ষের অর্থনীতিক তথা রাজনীতিক জীবনে যথেষ্ট আলোড়নের সম্ভাবনা থাকবে।

কার্যকরী সমিতির অন্যান্য প্রস্তাব, যথা, অপ্রয়োজনীয় জিনিসের আমদানীর পথ বন্ধ করা; এবং বর্তমানে উৎপাদিত হচ্ছে এরকম অ-ফলপ্রসূ বস্তুর শিল্পে খরচ কমিয়ে বা বন্ধ করে ফেলা—নীতিগত দিক দিয়ে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য, যদিও অবশ্য আমদানী সংকোচন নীতির সাম্প্রতিক কতকগুলি কুফলের প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে তাঁরা আলোচনা তোলেন নি। দেশের মধ্যে বর্তমানে উৎপাদিত কোন্ কোন্ শিল্পদ্রব্য অ-ফলপ্রসূ সে সম্বন্ধেও তাঁরা নীরব থেকেছেন। এ-সব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা অবিলম্বে হওয়া দরকার।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

দক্ষিণের দান

দাক্ষিণ ভারতের চিত্র-প্রযোজকরা হিন্দী ছবির ক্ষেত্রে নিজেদের অধিকার বিস্তার করবার যে সহজ পথ বেছে নিয়েছেন, তার লক্ষ্য এক এবং অভ্রান্ত—সবচেয়ে বেশী-সংখ্যক লোককে আনন্দ দেওয়া। সর্ব-ভারতীয় জনসাধারণের রসবোধের একটি ন্যূনতম মান ধরে নিয়ে এইসব প্রযোজক সাধারণত ছবি তৈরি করেন। তাই মোটা ধরনের রঙ্গব্যঙ্গ, নাচ-গান ও অন্যান্য প্রমোদ-উপকরণের প্রচুর সমাবেশ থাকে তাঁদের ছবিতে।

এই জাতীয় ছবির একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ অঞ্জলি পিকচার্সের "সুবর্ণ সুন্দরী"। ছবিটি তৈরি করতে যে প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছে তা দেখলেই বোঝা যায়। জমকালো সেট, চোখ-ধাঁধানো সাজসজ্জা, জনপ্রিয় শিল্পী সমাবেশ—কিছুরই অভাব নেই এ ছবিতে। অভাব যা কিছু তা কাহিনীর যৌক্তিকতার এবং নাটকীয় মাত্রাজ্ঞানের। তাই সাধারণ দর্শকের বাহবা পেলেও, এ জাতের ছবি রসবেত্তার মন ভরাতে পারে না।

আরব্য উপন্যাসের সঙ্গে পৌরাণিক গল্প মেশালে তার রূপ যা দাঁড়ায়, "সুবর্ণ সুন্দরী"র কাহিনী আকারে প্রকারে সেই ধাঁচের। এক রাজপুত্রকে কেন্দ্র করে যা-কিছু ঘটনা। স্থান-কাল-পাত্রের কোন নির্দেশ ইচ্ছে করেই যেন দেওয়া হয় নি, যাতে পোষাক-পরিচ্ছদের অসঙ্গতি সম্বন্ধে কেউ দোষ ধরতে না পারেন। প্রাচীনকালের পটভূমিকায় মধ্যযুগীয় সাজসজ্জার অকুণ্ঠ সমাবেশ করা হয়েছে এর মধ্যে।

কোন এক দেশের রাজপুত্র তার গুরু-কন্যার প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করায়, আশাহতা গুরুকন্যা তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনলো যে, সে তার শ্লীলতাহানি করেছে। রাজপুত্রের নাম জয়ন্ত। রাজদরবারে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করবার কোন চেষ্টা না করে সে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল। পথে যেসব আজব ব্যাপার ঘটলো, তাই হলো গল্পের প্রধান উপাদান।

প্রথমেই এক শাপভ্রষ্ট দেবতার উপকার করে জয়ন্ত পেলো আরব্য উপন্যাসে বর্ণিত ম্যাজিক কার্পেটের অনুরূপ এক কুশাসন—যার ওপর বসলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যাওয়া চলে, একটি কমণ্ডলু—যার মধ্য থেকে হুকুম করলেই ইচ্ছামত খাদ্য ও পানীয় পাওয়া যায়, এবং একটি কাষ্ঠদণ্ড—যার দ্বারায় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা চলে। তিনজন জুয়াচোর জিনিস

তিনটি জয়ন্তর কাছ থেকে চুরি করলো এবং সারা ছবিটি জুড়ে প্রচুর হাসির উপাদান জোগালো এগুলিকে নিজেদের কাজে ও অকাজে লাগিয়ে। জিনিস তিনটি শেষকালে অবশ্য আসল মালিকের কাছেই ফিরে এলো।

আসল গল্প কিন্তু এদের নিয়ে নয়। ঘটনাচক্রে জয়ন্ত ইন্দ্রসভার এক নর্তকীর প্রেমে পড়ে গেলো। গোপনে তাদের বিয়ে হলো। ব্যাপারটা দেবরাজের গোচরে আসতে বিলম্ব ঘটলো না। তিনি শাপ দিলেন, নর্তকীর স্পর্শমাত্রে জয়ন্ত পাথর হয়ে যাবে। সুতরাং তাদের ছাড়াছাড়ি হলো। যে ছেলেটি এলো নর্তকীর কোলে, দৈব-দুর্বিপাকে তাকেও হারাতে হলো।

এদিকে জয়ন্ত আর এক রাজ্যে গিয়ে পড়েছে। দেবতার অভিশাপ থেকে সে-ও রক্ষা পায় নি। দিনে সে হয়ে যায় নারী, রাত্রে হয় পুরুষ। এ থেকে অনেক রকমের হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতে লাগলো।

ষোল হাজার ফুট ছবির প্রায় শেষের দিকে স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন। শঙ্কর-পার্বতীর প্রসাদে ছেলেটিকেও তারা ফিরে পেলো। কিন্তু পেলে হবে কি, ছেলেটিরও তো কিছু করবার থাকা চাই। সুতরাং স্ত্রীর অতর্কিত স্পর্শে জয়ন্ত ধীরে ধীরে যখন পাথরে পরিণত হতে লাগলো, তখন বালকপুত্রের বীরত্ব দেখাবার সময় এলো। স্বর্গের যে সোনার ফুল ছোঁয়ালে সব অভিশাপ কেটে যাবে, উড়ন্ত কুশাসনের সাহায্যে তাই নিয়ে এলো সে ইন্দ্রপুরীর প্রহরীদের বোকা বানিয়ে।

গল্পটি এখানেই শেষ নয়—আরো আছে। স্ত্রী-পুত্র সমভিব্যাহারে জয়ন্ত তার নিজের রাজ্যে ফিরে গেলো। বৃদ্ধ রাজা আগেই জানতে পেরেছিলেন, গুরুকন্যার ব্যাপারে জয়ন্ত সম্পূর্ণ নির্দোষ। সুতরাং আনন্দময় মিলনের মধ্যে কাহিনীর পরিসমাপ্তি। বলতে ভুলেছি, সুবর্ণসুন্দরী নায়িকার নাম এবং কাহিনীর নামকরণ তাই থেকে।

• • •

ছবিটিকে গাঁথা হয়েছে ছাড়া-ছাড়া ঘটনার সূত্রে। অর্থাৎ যে ব্যাপারটা ঘটছে, তার সঙ্গে আগের বা পরের ঘটনার বিশেষ কোন যোগ নেই। দর্শকদের আনন্দ দেওয়াই যেখানে মূল উদ্দেশ্য, সেখানে সংগতি-অসংগতির প্রশ্ন নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়? দর্শকেরা আনন্দ পেলেই হলো। ছবিটি যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁদের সম্ভবত এই মনোভাব।

নাম-ভূমিকায় অঞ্জলি দেবী বিভিন্ন রসের প্রকাশে নিজের দক্ষতা প্রকাশ করেছেন। হাস্যে-লাস্যে, নাচে-গানে, করুণ রসের অভিব্যক্তিতে তাঁর নিপুণতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। জয়ন্তবেশী নাগেশ্বর রাও 'স্টান্ট পিকচারে'র নায়কের মত লম্ফ-ঝম্প, অসিচালনা প্রভৃতি ব্যাপারে যতখানি সুপটু, গভীর রসের প্রকাশে ঠিক ততখানি নন। তিনি যখন স্ত্রীলোকে রূপান্তরিত হয়েছেন, তখন তাঁর জায়গায় শ্যামার দেখা পাওয়া গেছে। বলা বাহুল্য, দর্শকের চোখ ও মন তাতে অধিকতর তৃপ্তি পেয়েছে। নায়ক-নায়িকার শিশুপুত্রের ভূমিকায় ডেজি ইরাণী তার স্বভাবসুলভ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে।

আগা, রাধাকিষণ ও মুকরি তিন জুয়াচোরের ভূমিকায় দর্শকদের হাসবার প্রচুর সুযোগ দিয়েছেন। অন্যান্য ভূমিকায়

কুমকুম, বিপিন গুপ্ত, ধুমল, রণধীর, সাপ্রু, সরোজা দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য।

এ ছবির অনেক জায়গায় 'ট্রিক-শটে'র অবতারণা করা হয়েছে এবং চমৎকার হয়েছে সেগুলি। যে কোন বিদেশী ছবির কলা-কৌশলের সঙ্গে তুলনীয় "সুবর্ণ-সুন্দরী"র ক্যামেরার কারচুপি। আঙ্গিকের অন্যান্য বিভাগেও কলাকুশলীদের কাজ সন্তোষ-জনক বলা চলে। নাচ-গানে বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে। গানগুলি সুগীত।

"সুবর্ণসুন্দরী"র প্রযোজক আদিনারায়ণ রাউ-ই এর সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। কাহিনী লিখেছেন দুজনে—আদিত্য ও সদাশিব ব্রহ্মম্। ভি রাঘভৈয়া পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন। শিল্প-নির্দেশনার কৃতিত্ব বালী-র।

অনাবিল রঙ্গব্যঙ্গ

রুশ লেখক নিকোলাই গোগোল যে-দেশের ছবি এঁকেছিলেন তাঁর "ইন্সপেক্টর জেনারেল" গ্রন্থে, তা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষ নয়। কিন্তু এমনি তাঁর প্রতিভা যে, তাঁর গল্পে সর্বকালের সকল দেশের ছায়া পড়েছে। ছায়াচিত্রমের প্রথম নিবেদন "রাজধানী থেকে" দেখে তা নতুন করে হৃদয়ঙ্গম করা গেল। এটি গোগোলেরই মূল কাহিনী অনুসরণ করে বাঙলায় তোলা হয়েছে।

মৃণাল সেন রচিত যে চিত্রনাট্যের ওপর ছবিটির ভিত্তি, তা মূলে কাহিনীকে প্রায় অবিকৃত রেখেছে বলা চলে। শুধু আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় যেটা বিসদৃশ—যেমন, মা ও মেয়ের একসঙ্গে একই লোকের প্রেমে পড়া—সেইটুকু বর্জন করা হয়েছে। ছবির রস তাতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি।

রাষ্ট্র ও সমাজের ভার যাঁদের হাতে, তাঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত হলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়, তারই একটি কৌতুকোজ্জল ছবি এটি। এক অনামী শহরের দুর্নীতি-পরায়ণ শাসকবর্গ খবর পেলেন যে, তাঁদের গলদ ধরবার জন্যে রাজধানী থেকে একজন বিশিষ্ট পর্যবেক্ষক আসছেন। শুধু আসছেন না, হয়তো বা এসেই গেছেন।

জেলা-শাসকের ভাবনা সবচেয়ে বেশী। তিনি চর নিযুক্ত করলেন রাজধানী থেকে আগত সেই গুপ্ত পর্যবেক্ষককে খুঁজে বার করবার জন্যে। একজন ভবঘুরে শিল্পী রাজধানী থেকে এসে একটি হোটেলে উঠে-ছিলো। তার নাম কেষ্টধন। সব পয়সা তার ফুরিয়ে গেছে, হোটেলের পাওনা শোধ করতে না পারায় ম্যানেজারের লাঞ্ছনা নিত্য সহ্য করতে হচ্ছে তাকে। লোকটির কিন্তু অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং চোখে-মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। জেলা-শাসকের চরেরা তাকেই রাজধানীর সেই বিশিষ্ট পর্যবেক্ষক

বলে ভুল করে বসলো। তার কপর্দকহীনতা তার আসল পরিচয় গোপন রাখবার একটা চাল হিসেবে ধরে নিলো।

জেলা-শাসক কেষ্টধনকে সাদরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়ির সবচেয়ে ভালো ঘরে তার থাকবার ব্যবস্থা হলো। নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে সম্মানিত অতিথির পরিচর্যায় নিযুক্ত করলেন জবরদস্ত জেলা-শাসক।

কেষ্টধন প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেছলো। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যখন সে বুঝতে পারলো, তখন তার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে আরম্ভ করলো। জেলাশাসক শহরের চাঁইদের ডেকে আনলেন এই সম্মানিত ব্যক্তিটির সঙ্গে "ইণ্টারভিউ" করতে। ঘুষের টাকায় কেষ্টধনের পকেট ভারী হয়ে উঠলো। যারা ঘুষ গুঁজে দিলো তার হাতে, তারা নিজেদের ধন্য মনে করতে লাগলো এই সম্মানিত ব্যক্তিটিকে হাত করতে পেরেছে ভেবে।

কেষ্টধন ধরা পড়বার আগে সরে পড়তে পারলে বাঁচে। কিন্তু গোল বাধলো জেলা শাসকের মেয়েকে নিয়ে। সে ইতিমধ্যে কেষ্টধনকে তার হৃদয় অর্পণ করে বসেছে। কেষ্টধনকে অথবা তার কল্পিত পদ-মর্যাদাকে? কে জানে!

যাই হোক, কেষ্টধন হপ্তাখানেকের জন্যে অন্যত্র যাবার অছিলায় সকলকে বোকা বানিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করলো। প্রায় একই সঙ্গে খবর এলো—রাজধানী থেকে একজন অফিসার আসছেন শহরের হালচাল পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে। যারা কেষ্টধনকে নিয়ে মাতামাতি করেছিল, এর পর তাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ছবিটির আগাগোড়া প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গে ভরা। কিন্তু ব্যঙ্গ কোথাও ব্যক্তিগত বিদ্বেষের রূপ নেয় নি বলে, "রাজধানী থেকে"র প্রদর্শনকালে বিমল কৌতুকের প্রস্রবন বয়ে চলে সারা প্রেক্ষাগৃহে। পরিচালক নির্মল মিত্রের এটিই প্রথম ছবি হলেও, তিনি পাকা হাতের পরিচয় দিয়েছেন এর পরিচ্ছন্ন রূপায়ণে।

কেষ্টধনের ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায় সহজেই আসর জমিয়ে ফেলেন তাঁর সাবলীল অভিনয়ের গুণে। জেলা শাসকের বেশে উৎপল দত্ত হাসির খোরাক জোগান সবচেয়ে বেশী বিপরীতমুখী ভাবসংঘাতের অভিব্যক্তিতে। তাঁর স্ত্রী সেজেছেন মঞ্জু দে। তাঁর অভিনয় যথাযথ। মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায় নেমেছেন এঁদের আদরিণী কন্যার ভূমিকায়। "না, ও যাবে না" এই কথার পুনরাবৃত্তি করে তিনি যেভাবে হাসির হুল্লোড় সৃষ্টি করেন প্রেক্ষাগৃহে, তা তাঁর অভিনয়-নৈপুণ্যেরই পরিচায়ক।

অমর মল্লিক, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, জীবেন বসু, হরিধন মুখোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানি—এঁরা সকলেই এক একটি টাইপ চরিত্রের অভিনয়ে নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

এ ছবিতে কলাকুশলীদের কাজও মোটের ওপর ভালো। নচিকেতা ঘোষ বিষয়বস্তুর উপযোগী সুর সৃষ্টি করে ছবিটির আকর্ষণ

বাড়িয়েছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এর গান দুখানি সংগীত হয়েছে।

চিত্রালোচনা

দুখানি নতুন ছবি এ হপ্তায় মুক্তি পাচ্ছে -দুখানিই হিন্দীতে তোলা।

পারিজাত পিকচার্সের "ফির্ সুব্হা হোগী" ডস্টয়েভস্কির বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস "ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট" অবলম্বনে তোলা হয়েছে। ঘটনাচক্রে একজন সচ্চরিত্র যুবক কেমন করে মানুষ খুন করে বসলো এবং যদিও সে ধরা পড়লো না, তবুও বিবেকের দংশন সহ্য করতে না পেরে অবশেষে কিভাবে সে ধরা দিলো—তাই নিয়ে ছবির গল্প। রাজ কাপুর, মালা সিংহ, রেহমান, মুবারক, জগদীশ শেঠী, লীলা চিটনিশ প্রভৃতি এর বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন। রমেশ সায়গল ছবিখানির প্রযোজক ও পরিচালক। খায়াম সুর দিয়েছেন এর গানে ও আবহ সংগীতে।

ইউনিক পিকচার্সের "ভোলা শিকার" এ হপ্তার দ্বিতীয় ছবি। ক্রাইম ড্রামা বলতে যা বোঝায় এ ছবিটি তাই। এর ভূমিকালিপিতে আছেন কামরান, নাজির, হবিব ও নীলোফার। পরিচালনা ও সুরসৃষ্টির দায়িত্ব যথাক্রমে অক্ষু ও আই দত্তর।

* * *

অগ্রদূত চিত্রের বহু প্রতীক্ষিত "লালু ভুলু" ইংরেজী নববর্ষের প্রথম দিনেই দর্শকদের সামনে হাজির হবে মানবীয় আবেদনের পশরা নিয়ে। যে আত্মবিশ্বাস ভাগ্যহত দুই কিশোরকে জীবনযুদ্ধে জয়ের প্রেরণা দিয়েছিল, এ ছবিতে তারই এক অনুপম আলেখ্য পাওয়া যাবে। বাণভট্ট রচিত মূল কাহিনীকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করেছেন কবি শৈলেন রায়। অগ্রদূত পরিচালক গোষ্ঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই 'লালু ভুলু'তে অভিনয় করেছেন শোভা সেন, কাজল চট্টোপাধ্যায়, কমলা মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, শিশির বটব্যাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। নামভূমিকা দুটিতে দেখা যাবে সুখেন ও নবাগত পরেশকে।

ছোটদের নিয়ে তোলা আর একটি ছবি কে জি প্রোডাকসন্সের "দেড়শো খোকার কাণ্ড"। শুটিং পর্বের শেষে এটিও আশু মুক্তির প্রতীক্ষা করছে। শিশু সাহিত্যের যশস্বী লেখক হেমেন্দ্রকুমার রায়ের একটি বিখ্যাত উপন্যাসকে ছবিতে রূপান্তরিত করেছেন তরুণ পরিচালক কমল গাঙ্গুলী, চিত্র সম্পাদক হিসেবে যাঁর খ্যাতি সুবিদিত। নানা রকমের বহু ছেলে-মেয়েকে অভিনয়ের

প্রোডাকশন সিণ্ডিকেটের গীতিমুখর ভক্তি চিত্র "নৌকা বিলাসে"র নায়ক নবাগত মিহির মুখোপাধ্যায়।

ক্ষেত্রে একত্রিত করে ছবিটি সার্থকনামা হয়ে উঠেছে। ভারতীয় আর কোন ছবিতে এর আগে শিশু প্রতিভার এমনিধারা বিরাট সমাবেশ ঘটেছে কিনা সন্দেহ। বড়দের ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, বিকাশ রায়, কমল মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, অনুপকুমার, পদ্মা দেবী, সুরুচি সেনগুপ্তা, তরুণকুমার প্রভৃতি।

•   •   •

জানুয়ারীর গোড়াতেই আরো দু'খানি নতুন বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে।

বরুণ পিকচার্সের "জন্মান্তর"-এর মুক্তি দোসরা জানুয়ারী নির্ধারিত হয়েছে। জন্মান্তরবাদকে কেন্দ্র করে এর কাহিনী। অরুন্ধতী, নির্মলকুমার, অসিতবরণ, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী, তপতী ঘোষ, রেণুকা রায় প্রভৃতি জনপ্রিয় তারকাদের নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। পরিচালক হিসেবে অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করছেন। সংগীত পরিচালনায় সরোজ কুশারী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন বলে প্রকাশ।

প্রোডাকশন সিণ্ডিকেটের গীতিমুখর ও গেভাকলার-রঞ্জিত "নৌকা বিলাস"-এর মুক্তিও আসন্ন। প্রযোজক-পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় এই ছবিতে যেসব নূতনত্বের সমাবেশ করেছেন, তার পরিচয় গত সপ্তাহে দেওয়া হয়েছে। গান এই ছবির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ এবং সেগুলি গেয়েছেন বিখ্যাত সংগীত-শিল্পীরা। রাধাকৃষ্ণের ভূমিকায় অনুরাধা গুহ ও মিহির মুখোপাধ্যায়ের চিত্রাবতরণও দর্শকদের কম খুশী করবে না।

•   •   •   •

প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায় "অপুর সংসার"-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ করে এনেছেন। ফেব্রুয়ারীতে ছবিটি মুক্তি পাবার কথা। ইতিমধ্যেই ১৯৫৯ সালের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি পাঠাবার নিমন্ত্রণ এসে গেছে উৎসব কমিটির তরফ থেকে। সত্যজিতের বিশ্বজয়ের এ আর এক নিদর্শন।

এ ছবিতে অপু ও তার স্ত্রী অপর্ণার ভূমিকায় অভিনয় করছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর—চিত্রপ্রিয়দের কাছে এ খবর নতুন শোনাবে না। কারণ সত্যজিৎ রায় কর্তৃক আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই দুটি নতুন শিল্পী তারকার আসন লাভ করেছেন দর্শকদের মনে। অন্য একাধিক নতুন শিল্পীর সঙ্গেও পরিচয় ঘটবে "অপুর সংসার"-এর ভূমিকালিপিতে। অপুর শিশুপুত্র কাজলের ভূমিকায় দেখা যাবে আলোক চক্রবর্তীকে—বয়স তার ছয়। অপুর বন্ধু প্রণবের চরিত্রে অভিনয় করছেন স্বপন মুখোপাধ্যায়। অপর্ণার মা-বাবা সেজেছেন শেফালিকা (পুতুল) ও ধীরেশ মজুমদার।

রবিশঙ্করের ওপর সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে—"পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত"তে যেমনটি করা হয়েছিল।

• • •

গত ২১শে ডিসেম্বর ইস্ট ইন্ডিয়া স্টুডিওতে সিনেক্রাফ্টের প্রথম চিত্র "ছোট-স্বর্গ"-এর মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়। এর কাহিনী লিখেছেন কেশব চৌধুরী। অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এর পরিচালনা ও চিত্রনাট্য রচনার ভার নিয়েছেন।

প্রভাত প্রোডাকশন্সের "বিচারক"-এর একটি আবেগময় মুহূর্তে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার।

নাট্যাভিনয়

পেশাদারী মঞ্চে

অনেকদিন বন্ধ থাকবার পর গত ২৪শে ডিসেম্বর মিনার্ভা থিয়েটার পুনরায় দ্বারোদ্ঘাটন করেছে জলধর চট্টোপাধ্যায়ের নতুন নাটক "ডাঃ শুভংকর" নিয়ে। সীতা দেবী ও অসিতবরণ নাটকখানির প্রধান দুটি ভূমিকায় অভিনয় করছেন। শৌখীন মঞ্চের অনেকগুলি নামকরা শিল্পীকে একত্রিত করা হয়েছে এর ভূমিকালিপিতে। তাঁদের মধ্যে ঠাকুরদাস মিত্র, বিশু চট্টোপাধ্যায়, তুষার বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার স্বয়ং নাটকটি পরিচালনা করছেন।

স্টার থিয়েটারে "শ্যামলী"র পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। এই মূক-বধির মেয়েটি যাঁর প্রতিভার স্পর্শে সকলের হৃদয় অধিকার করে বসেছিল, সেই সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ও আবার ফিরে এসেছেন স্টারে তাঁর পুরাতন ভূমিকাটি অভিনয় করতে। উত্তমকুমারের বদলে আশীষকুমার এবারে নায়কের ভূমিকায় নামছেন। গত ২৫শে ডিসেম্বর থেকে "শ্যামলী"র পুনরভিনয় শুরু হয়েছে।

একাদিক্রমে চারশো রাত্রি অভিনীত হয়েও বিশ্বরূপায় "ক্ষুধা"র আকর্ষণ কিছুমাত্র কমে নি। জানুয়ারীর গোড়াতেই যাতে বিশ্বরূপা শিশুনাট্য শাখার উদ্বোধন করা যায় সেজন্যে জোর আয়োজন চলেছে। মৌমাছি-রচিত মায়া-নাটিকা "মায়া-ময়ূরে"র মহলা পূর্ণোদ্যমে চলছে। নাট্যকার স্বয়ং এর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেছেন।

রঙমহলে "মায়া-মৃগে"র জনপ্রিয়তাও অব্যাহত রয়েছে। এর ধারাবাহিক অভিনয় দেড়শো রাত্রির কাছাকাছি পৌঁছেছে।

গিরিশ নাট্যোৎসবের উদ্বোধন

গত শনিবার বিশ্বরূপা থিয়েটারে বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত প্রথম গিরিশ নাট্যোৎসবের শুভ উদ্বোধন হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অহীন্দ্র চৌধুরী।

সকলকে স্বাগত জানিয়ে উৎসবের যুগ্ম-সম্পাদক রাসবিহারী সরকার এই বলে আশা প্রকাশ করেন যে, এই নাট্যোৎসব বাংলার নাট্য ইতিহাসে যেন একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে।

অহীন্দ্রবাবু তাঁর ভাষণে বলেন, বিশ্বের দরবারে আমরা নাচে-গানে ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের খবর পৌঁছে দিতে পেরেছি, নাটকের ক্ষেত্রে তার যেন অন্যথা না হয়। এবিষয়ে দেশের প্রগতিশীল নাট্যগোষ্ঠীগুলির একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে।

সভাপতির ভাষণে তারাশংকরবাবু অহীন্দ্রবাবুর বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন করেন। বর্তমান নাট্যোৎসবের সাফল্য কামনা করে তিনি বলেন, যাঁর নামে এই উৎসবের নামকরণ হয়েছে, তাঁর নাটকাবলীই এই উৎসবে অভিনীত হবে বলে তিনি আশা করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের মত প্রতিভাধর নাট্যকার এদেশে আর দ্বিতীয় জন্মান নি এবং বাঙালী জীবনের বাস্তবানুগ চিত্র তাঁর চেয়ে ভাল করে আর কেউ আজ পর্যন্ত আঁকতে পারেন নি বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

যে কুড়িটি নাট্যসংস্থা সাড়ে চারমাসব্যাপী এই সাপ্তাহিক উৎসবে যোগ দিতে সম্মতি জানিয়েছেন, তাদের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে গিরিশচন্দ্রের তৈলচিত্রের সামনে পুষ্পস্তবক স্থাপন করে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। উৎসবে যোগদানকারী একমাত্র ইউরোপীয় সংস্থা ড্রামাটিক ক্লাব অফ ক্যালকাটার তরফ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, তাঁরা "ফোর্থ ওয়াল" নামক নাটকটি এই উৎসবে মঞ্চস্থ করবেন।

অনুষ্ঠানের শেষে উৎসবের প্রথম নাটক "ক্ষুধা" বিশ্বরূপা থিয়েটার কর্তৃক সাফল্যের সংগে অভিনীত হয়।

একলব্য
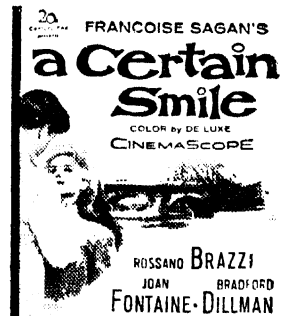
দ্বিতীয় টেস্টে ভারতের পরাজয়

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারতের প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর কানপুরের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে ভারতকে ২০৩ রানে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। দুই দেশের ১২টি টেস্ট খেলার মধ্যে ভারতের এটি তৃতীয় পরাজয়। বাকী ৯টি খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। ভারতের পক্ষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাজিত করবার আশাও এখন পর্যন্ত অপূর্ণ রয়ে গেছে।

কানপুরের খেলার ধারা অনুযায়ী ভারতের অবশ্য জয়লাভের কোনই আশা ছিল না। তবে সম্যকভাবে নিজেদের অবস্থা বিবেচনা করে দৃঢ়তার সঙ্গে খেললে পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার যথেষ্টই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ভারতের ব্যাটসম্যানেরা উপযুক্ত দৃঢ়তা ও মনোবলের পরিচয় দিতে পারেননি। পারেননি অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের মনকে প্রস্তুত করতে। তাই অপরিণামদর্শিতার ফল স্বরূপ ভারতকে পরাজয় মাথা পেতে নিতে হয়েছে। খেলোয়াড়দের অপরিণামদর্শিতার কথা কেন বলছি সেটি খেলার ধারাবাহিক আলোচনা থেকেই বোঝা যাবে।

দ্বিতীয় টেস্ট খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে কানপুরের গ্রীন পার্কে। মাঠের নাম গ্রীন পার্ক হলেও মাঠের উইকেট কিন্তু মোটেই গ্রীন ছিল না। খেলা হয়েছে গ্রীন পার্কের ম্যাটিং উইকেটে। এখানে বলা প্রয়োজন ম্যাটিং উইকেট ক্রিকেট খেলার উন্নত ছলাকলা প্রদর্শনের পক্ষে সুউপযুক্ত নয়। মধুর অভাব অনেক সময় যেমন গুড় দিয়ে মেটাতে হয় তেমন টার্ফ উইকেটের পরিবর্তে অনেক সময় টেস্ট খেলারও আয়োজন করতে হয় ম্যাটিং উইকেটে। একমাত্র পকিস্থান ছাড়া বিশ্বের কোথায়ও ম্যাটিং উইকেটে টেস্ট খেলার ব্যবস্থা নেই। কানপুরে টার্ফ উইকেট ছিল না, এমন নয়। কিন্তু ইতিপূর্বে কয়েকটি বিদেশী দলের ভারত সফরের সময় যখন কানপুরের দাবী অস্বীকার করে টেস্ট খেলার অনুষ্ঠান ক্ষেত্র স্থানান্তরিক করা হয় লক্ষ্মৌতে তখন থেকে কানপুরের টার্ফ উইকেট নষ্ট হতে থাকে। দীর্ঘদিনের অব্যবহারের ফলে সে উইকেট একেবারেই নষ্ট হয়ে গেছে। অল্প সময়ের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার জন্য আর টার্ফ উইকেট করা সম্ভব হয়নি।

যাইহক বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্ট খেলাতেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক জেরি আলেকজাণ্ডার টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাটিং করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কানপুরেও আলেকজাণ্ডার টসে জয়ী হয়ে ম্যাটিং উইকেটে প্রথম ব্যাটিং করবার সিদ্ধান্ত করেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংসের সূচনা হয় ভারতের পক্ষে খুবই আশাপ্রদ। কীর্তিমান স্পিন বোলার সুভাষ গুপ্তের মারাত্মক বোলিংয়ের

গারফিল্ড সোবার্স

ফলে মাত্র ৮৮ রানের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৬টি উইকেট পড়ে যায়। হোল্ট, হান্ট, সোবার্স, কানহাই, স্মিথ প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যাটসম্যানেরা কেউই বেশীক্ষণ ব্যাট ধরে টিকে থাকতে পারেন না। কিন্তু সপ্তম উইকেটে অধিনায়ক আলেকজাণ্ডার ও সলোমানের সঙ্গে দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করে খেলার মোড় ঘুরিয়ে দেন। সাহসের সঙ্গে বিপদের সম্মুখীন হওয়াই বিপদ এড়াবার প্রধান উপায়। আলেকজাণ্ডার যখন দেখলেন সুভাষ গুপ্তের লেগ ব্রেক ও গুগলী বল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছে তখন তিনি সেই বলকেই মারতে আরম্ভ করলেন কব্জির সবটুকু জোর দিয়ে। সলোমানও অধিনায়কের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। ফলে অতি দ্রুত রাণ উঠতে আরম্ভ করলো; গুপ্তের বলের সংহার শক্তিও কমে এল। সপ্তম উইকেটে আলেকজাণ্ডার ও সলোমানের সহায়তায় যোগ হল ঠিক ১০০ রান। আলেকজাণ্ডার দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ৭০ রান করলেন। টেস্ট খেলায় জীবনে তিনি এত বেশী রান আর কোন খেলায় করতে পারেননি। সুভাষ গুপ্তে, যিনি মাত্র ২৭ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ৬টি উইকেট নিয়েছিলেন, ১০২ রানে তিনি ৯টি উইকেট দখল করে ভারতের টেস্ট খেলার ইতিহাসে বোলিংয়ের এক নতুন রেকর্ড করবার পর ২২২ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হল। প্রত্যুত্তরে ভারতের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান পি রায় ও নরী কণ্ট্রাক্টর ২৪ রান সংগ্রহ করলে শেষ হল প্রথম দিনের খেলা।

দ্বিতীয় দিন ভারতের দুই নট আউট খেলোয়াড় নতুন উৎসাহ এবং নতুন মন নিয়ে ব্যাটিং করতে শুরু করলেন। রাত্রির বিশ্রামের ফলে তাদের আগের দিনের ক্লান্তি কেটে গেছে। সুতরাং আগের দিন যে ২৪ রান সংগ্রহ করেছিলেন, সেটিকে ইনিংসের 'ফাউ' রান হিসাবেও ধরা যেতে পারে। কিন্তু হলে কি হবে। এই 'ফাউ' রান নিয়ে দ্বিতীয় দিনের শেষে ভারতের ৫ উইকেটে ২০৯ রান সংগ্রহ কোন মতেই ব্যাটসম্যানদের পক্ষে প্রশংসার কথা নয়। ভারতের খেলার সূচনা হয়েছিল বেশ আশাপ্রদ এবং সম্ভাবনা-বহুল। ৯৩ রানের মাথায় পড়েছিল প্রথম উইকেট এবং এক সময় ২ উইকেটে সংগৃহীত হয়েছিল ১৮১ রান। কিন্তু এর পর উইলি হলের প্রশংসনীয় বোলিংয়ের ফলে অল্প রানের ব্যবধানে আরও তিনটি উইকেট পড়ে যায়। আগের দিনের ২৪ রান বাদ দিলে দ্বিতীয় দিনের সাড়ে পাঁচঘণ্টার খেলায় ভারত সংগ্রহ করে মাত্র ১৮৫ রান। অত্যন্ত মন্থর ব্যাটিং সন্দেহ নেই। তবুও ভারতীয় সমর্থকদের আশা ছিল প্রথম ইনিংসে ভারত বেশ সন্তোষজনক রান সংগ্রহ করতে পারবে।

কিন্তু তৃতীয় দিনের খেলার ইতিহাস সত্যিই করুণ। পাঁচ উইকেটে ভারতীয় দল ২০৯ রান সংগ্রহ করলেও তৃতীয় দিনের সূচনার আর বাকী পাঁচটি উইকেটে তারা ১৩ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেননি। ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ইনিংসে যে রান করেছিল ঠিক সেই ২২২ রানে ভারতের প্রথম ইনিংসও শেষ হয়ে যায়।

মহা অনিশ্চয়তাই ক্রিকেট খেলার বিশেষত্ব এবং অনিশ্চয়তাই ক্রিকেট খেলার অন্যতম আকর্ষণ। কিন্তু এই অনিশ্চয়তা ভারতের

বেলায় এমন প্রকটভাবে প্রকাশ পাবে এ কথা কোনভাবেই আন্দাজ করা যায়নি। উইকেট ভিজে থাকলে বা উইকেটে ক্ষত থাকলে কিম্বা প্রতিপক্ষের বোলিংয়ে সংহার শক্তির সম্যক পরিচয় পাওয়া গেলে এই ব্যাটিং বিপর্যয়ের কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু গিলক্রিস্ট—অ্যাটকিনসন—রামাধীন বিহীন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট টীমের বোলিং খুব উচ্চ পর্যায়ের ছিল না, ব্যাটিং উইকেটের মধ্যেও ছিল না এমন কিছু কুহক লুকানো। তাই ভারতের শেষ দিনের ব্যাটসম্যানদের এই নিদারুণ ব্যাটিং বিপর্যয়ের কোন কৈফিয়ৎ নেই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুই বোলার উইলি হল ও জাসউইক টেলরের বল ফাস্ট বোলিংয়ের পর্যায় পড়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু এদের বল গিলক্রিস্ট বা অ্যাটকিনসনের বলের মত ফাস্ট নয়। তাই হল ও টেলরের বল যদি ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা ঠিকভাবে খেলতে না পারেন তবে প্রকৃত ফাস্ট বোলারের সম্মুখীন হবেন কি ভাবে? যাই হক, তৃতীয় দিন ভারতের প্রথম ইনিংস ২২২ রানে শেষ হয়ে যাবার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। কোন রান করবার আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান আউট হয়ে যান। সূচনার এই বিপর্যয়ে আবার ভারতীয় সমর্থকরা উল্লসিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু সে উল্লাস সাময়িক মাত্র। তৃতীয় উইকেটে রোহন কানহাই ও গারফিল্ড সোবার্স খেলতে নেমেই হাত খুলে বল মারতে আরম্ভ করেন। নিপুণ হাতে মেরে খেলে কানহাই যখন ৪১ রানের মাথায় আউট হয়ে যান তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩ উইকেটে ওঠে ৭৩ রান। ৮৩ রানের সময় আবার চতুর্থ উইকেট পড়ে যায়। কিন্তু পঞ্চম উইকেটে শুধু সোবার্স ও বুচারের সহযোগিতায় যোগ হয় ১১৪ রান। ৫ উইকেটে ২৬১ রান উঠলে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়। বিশ্বের কীর্তিমান খেলোয়াড় গারফিল্ড সোবার্স, যিনি প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪২ রান করেছিলেন তিনি ব্যাটিংয়ের উন্নত ক্রীড়াশৈলী দেখিয়ে ১৩৬ রান করেও নট আউট থাকেন। তৃতীয় দিন ভারতের বোলিং নিম্নস্তরের হয়েছে একথা বলা যায় না। তবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানরা বেশীর ভাগ সময় বোলারদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে ব্যাটিং করেছেন। কিছু কিছু ফিল্ডিংয়ের ত্রুটিবিচ্যুতিও আগন্তুক দলের রান সংগ্রহের সহায়ক হয়েছে।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের খেলা আরম্ভ হলে সোবার্স ও সলোমান বেপরোয়া পিটিয়ে রান তুলতে থাকেন। স্পষ্টই বোঝা যায় দ্রুত রান তুলে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের লক্ষ্য। সোবার্স দু'শো রান লাভের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। সলোমানও অর্ধশত রানের মুখে পৌঁছান। যখন দু'শো রান পুরতে সোবার্সের দুই রান বাকী, আর অর্ধশত রান পুরতে সালামনের বাকী ১ রান তখন একটি শর্ট রান নিতে গিয়ে সোবার্স রান আউট হয়ে যান। মাঠের পঁচিশ হাজার দর্শকের সংবেদনশীল মন সোবার্সের জন্য

সুভাষ গুপ্তে

ব্যথিত হয়ে ওঠে। মাত্র দুই রানের জন্য তিনি দ্বিশত রান করতে পারলেন না, রান আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে গেলেন। সোবার্স আউট হবার পর খেলতে এলেন অধিনায়ক আলেকজাণ্ডার, যার প্রথম ইনিংসের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের কথা কেউই ভুলতে পারেনি। এবারও আলেকজাণ্ডার মারমুখী। সমানে ব্যাট চালিয়ে রান করছেন তিনি। সলোমানের ব্যাট থেকেও রান আসছে দ্রুতগতিতে। ৮৬ রান করে সলোমানও যখন রান আউট হলেন তখন স্কোর বোর্ডে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৭ উইকেটে ৪৪৩ রান। এই রানেই আলেকজাণ্ডার ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন। চা-পানের বিরতির সময় উপস্থিত হতে তখনও অনেক বাকী।

প্রথম ইনিংসের রানে কারও ক্ষয়ক্ষতি নেই। এখন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় জয়পরাজয়ের প্রশ্ন। কিন্তু দেড়দিন সময়ের মধ্যে জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ৪৪৪ রান করা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী পরাজয় এড়াবার জন্য ভারতের ব্যাটসম্যানরা দেড়দিন উইকেটে টিকে থেকে আত্মরক্ষা করবেন একথা বুঝতে কারোই বাকী রইলো না। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতের খেলার সূচনাও হল ভাল। কোন উইকেট না হারিয়ে চতুর্থ দিনের শেষে ভারত সংগ্রহ করলো ৭৬ রান। এখানে বলা যেতে পারে দ্বিতীয় টেস্ট খেলার চতুর্থ দিনটি ছিল বোলারদের পক্ষে বড়ই দুর্দিন। এই-দিন কোন দলের কোন বোলার একটিও উইকেট দখল করতে পারেননি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যে দুইজন খেলোয়াড় আউট হয়েছিলেন। তাতে বোলারের কোন কৃতিত্ব ছিল না। দুইজনই হয়েছিলেন রান আউট।

চতুর্থ দিনের খেলায় বোলারদের এই ব্যর্থতা পরাজয় এড়াবার প্রশ্নে ভারতীয় সমর্থকদের আরও আশান্বিত করে তোলে। যখন ভারতের সবকটি উইকেট অটুট রয়েছে তখন পরাজয় এড়ানো তাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হবে না, এই ধারনাই সকলের মনে দানা বাঁধে। কিন্তু নিজের দোষে নিজে ডুবলে তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না। বিচারশক্তির অভাব এবং অপরিণামদর্শিতার জন্য দলের যে দুইজন ব্যাটসম্যান প্রধান ভরসা সেই দুইজনই রান আউট হয়ে যান। পি রায় রান আউট হন ৪৫ রানের মাথায় আর মঞ্জরেকার রান আউট হন নিজের ৩১ রানের সময়। অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করাই যখন ভারতীয় দলের মূল লক্ষ্য ছিল তখন রান করার প্রশ্ন অবান্তর। অথচ সেই রান করতে যেয়ে দলের দুজন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যানের এইভাবে আউট হয়ে যাওয়া অমার্জনীয় অপরাধ বলেই বিবেচিত হবে। ভারতীয় দলের শেষদিকের ব্যাটসম্যানদের উপর বেশী আস্থা রাখা অবিবেচনার কাজ একথা বিবেচনা করে প্রথম দিকের ব্যাটসম্যানদের আরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। প্রথমদিকের খেলোয়াড়দের আউট করবার পর ভারতের শেষদিকের খেলোয়াড়দের আউট করতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলারদের বেশী বেগ পেতে হয়নি। ফলে ২৪০ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায়। খেলাটির উপর যবনিকা পড়ে শেষ দিন চা-পানের সময়ের ১৫ মিনিট পরে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ২০৩ রানে খেলায় বিজয়ী হয়।

দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কীর্তিমান ব্যাটসম্যান গারফিল্ড সোবার্স ও অধিনায়ক আলেকজাণ্ডারের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে। সমভাবে ভারতের খ্যাতনামা বোলার সুভাষ গুপ্তের ৯টি উইকেট লাভের বিস্ময় অপূর্ব বোলিং কৃতিত্বের পরিচায়ক। যদিও টেস্ট খেলায় একজন বোলারের পক্ষে ১০টি উইকেট লাভের একটি নজির আছে তবুও একার পক্ষে ৯টি উইকেট লাভ টেস্ট খেলায় এক দুর্লভ সম্মান। ইতিপূর্বে ভারতের কোন খেলোয়াড় টেস্ট ম্যাচে ৯টি উইকেট লাভ করতে পারেননি। সেইদিক দিয়ে সুভাষ গুপ্তে ভারতীয় টেস্ট খেলার ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

নীচের দ্বিতীয় টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত স্কোরবোর্ড দেওয়া হলঃ—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—২২২ (ফ্রাঞ্জ আলেকজাণ্ডার ৭০, জো সলোমান ৪৫, জন হোল্ট ৩১, কনরাড হাণ্ট ২৯, কোলী স্মিথ ২০; সুভাষ গুপ্তে ১০২ রানে ৯ উইকেট)

ভারত—প্রথম ইনিংস—২২২ (পলি উম্রিগর ৫৭, পি রায় ৪৬, নরী কন্ট্রাক্টর ৪১, ভি মঞ্জরেকার ৩০; উইলি হল ৫০ রানে ৬ উইকেট, টেলর ৩৮ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—(৭ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড) ৪৪৩ (গারফিল্ড সোবার্স ১৯৮, জো সলোমান ৮৬, বেসিল বুচার ৬০, ফ্রাঞ্জ আলেকজাণ্ডার নট আউট ৪৫, রোহান কানহাই ৪১; রামচাঁদ ১১৪ রানে ২ উইকেট)।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস ২৪০ (নরী কন্ট্রাক্টর ৫০, পি রায় ৪৫, পলি উম্রিগর ৩৪, ভি মঞ্জরেকার ৩১, এন এস তামানে ২০; উইলি হল ৭৬ রানে ৫ উইকেট, জাসউইক টেলর ৬৮ রানে ৩ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে খেলেছেন—জন হোল্ট, কনরাড হাণ্ট, গারফিল্ড সোবার্স, রোহান কানহাই, কোলী স্মিথ, বেসিল বুচার জো সলোমন, ফ্রাঞ্জ আলেকজাণ্ডার (অধিনায়ক), ল্যান্স গিবস, উইলি হল ও জে টেলর।

ভারতের পক্ষে খেলেছেন—পি রায়, নরী কন্ট্রাক্টর, পলি উম্রিগর, ভি মঞ্জরেকার, সি বোড়ে, জি রামচাঁদ, এম হারদিকার, এন এস তামানে, বি রঞ্জনে, গোলাম আমেদ (অধিনায়ক) ও এস গুপ্তে।

* * *

ভারতের কীর্তিমান বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় উইলসন জোনস গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব বিলিয়ার্ড প্রতিযোগিতার খেলায় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে বিশ্বশ্রেষ্ঠ বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। দেশ বিদেশের সব কৃতী ও গুণী খেলোয়াড়দের পরাজিত করে কোন প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এক দুর্লভ সম্মান। উইলসন জোনসের এই দুর্লভ সম্মানে ভারতবাসী মাত্রেরই গর্ব করবার কারণ আছে।

এক হকি এবং পোলো খেলা ছাড়া বিশ্বের ক্রীড়া-মানচিত্রে ভারতের প্রাধান্যের আর বিশেষ কোন চিহ্ন নেই। এ দু'টিই দলগত প্রতিযোগিতা। একক প্রতিযোগিতায় বিশ্ব ক্রীড়াক্ষেত্রে কোনো ভারতীয় প্রতিনিধির প্রতিভার স্বাক্ষর খুবই পরিমিত। সুদীর্ঘ ৩৭ বছর আগে সানফ্রান্সিস্কো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বের পেশাদারী কুস্তি প্রতিযোগিতার লাইট হেভিওয়েট বিভাগে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিলেন ভারতের মল্লবীর যতীন্দ্রচরণ গুহ, যিনি সকলের কাছে গোবরবাবু নামে পরিচিত। তারপর দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতের কোনো পুরুষ বা নারী খেলাধুলার কোন বিষয়েই বিশ্ব প্রাধান্য অর্জন করতে পারেননি। আজ উইলসন জোনস বিলিয়ার্ডে বিশ্বজয়ী হয়ে সকলের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।

শুধু বিলিয়ার্ডই নয়। বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়নশিপের পর একই অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে বেসরকারীভাবে বিশ্ব স্নুকার চ্যাম্পিয়নশিপের যে আয়োজন হয়েছিল তাদের বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন ভারতের খেলোয়াড় চন্দ্র হিরজী।

যদিও বিলিয়ার্ড ও স্নুকার খেলা সাধারণের কাছে জনপ্রিয় নয়। দেশের ক্রীড়ানুরাগীদের বৃহৎ অংশই এ খেলার রূপ গুণের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত। তবুও রূপ গুণ ও দক্ষতার বিচারে বিলিয়ার্ড ও স্নুকার উচ্চ শ্রেণীর এক বৈশিষ্টাপূর্ণ খেলা। এ খেলায় যেমন অধ্যবসায় এবং দক্ষতার প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন চিন্তাশক্তি স্থৈর্য ও অপরিমিত মনঃসংযোগের। ভারতের দুইজন প্রতিযোগী যখন এ খেলায় বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান অর্জন করেছেন তখন আশা করি এ খেলা শুধু প্রাসাদোপম অট্টালিকার চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ভারতীয় প্রতিনিধিদের কৃতিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষরে এ খেলা ধীরে ধীরে ছোট ছোট ক্লাব ঘরেও প্রবেশ করবে।
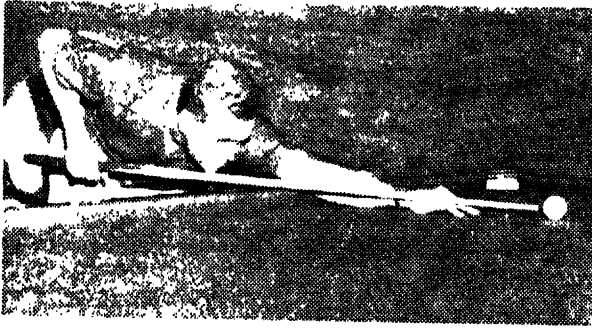
বিলিয়ার্ড ক্রীড়ারত বিশ্বজয়ী খেলোয়াড় উইলসন জোনস

বে-সরকারী বিশ্ব স্নুকার চ্যাম্পিয়ান চন্দ্র হিরজী

* * *

গৌহাটির নবনির্মিত ইনডোর স্টেডিয়ামে এবার জাতীয় ও আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। এর আগে আসাম রাজ্য ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশন কোনবার জাতীয় ব্যাডমিণ্টন পরিচালনার সুযোগ পায়নি। তাই জাতীয় প্রতিযোগিতা উপলক্ষে ভারতের সব খ্যাতনামা ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়ের সমাবেশে আসামের প্রাণকেন্দ্র গৌহাটিতে উৎসাহ উদ্দীপনারও যথেষ্ট সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু কি আন্তঃ রাজ্য প্রতিযোগিতা, কি জাতীয় ব্যাডমিণ্টন কোন বিভাগের খেলাতেই তেমন উন্নত কলানৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

আন্তঃ রাজ্য অর্থাৎ দলগত ভিত্তিতে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে বোম্বাই

রাজ্য ফাইন্যালে উত্তর প্রদেশকে ৩—১ খেলায় পরাজিত করে। আন্তঃ রাজ্য প্রতিযোগিতার প্রথম দিকের খেলাগুলিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাষ ছিল না। আশা করা গিয়েছিল উত্তর প্রদেশ ও বোম্বাইয়ের ফাইন্যাল খেলা হবে খুবই প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক। বিশেষ করে দুই রাজ্যের দুই কীর্তিমান খেলোয়াড় নন্দু নাটেকার ও ত্রিলোকনাথ শেঠ যখন পরস্পরের সম্মুখীন হবেন তখন এদের খেলার উন্নত ছলাকলা ইনডোর স্টেডিয়ামের বিপুল দর্শকের মন আনন্দে ভরে তুলবে। কিন্তু হায়, অজ্ঞাত কারণে ত্রিলোক শেঠ আন্তঃ রাজ্য ফাইন্যালে নাটেকারের সম্মুখীন হলেন না। দর্শকরাও ভাল খেলা দেখার আশায় নিরাশ হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন। বোম্বাইয়ের আর ত্রিবেদী ও উত্তর প্রদেশের পি কে মজুমদারের প্রথম সিংগলসের খেলাটি ছাড়া আর সব খেলাই স্ট্রেট গেমে মীমাংসিত হল। অনুষ্ঠিত চারটি খেলার মধ্যে উত্তর প্রদেশ জিতলো মাত্র একটি খেলায়। ভারতের এক নম্বর মহিলা খেলোয়াড় মিস মীনা শাহ বোম্বাইয়ের মিসেস সুশীলা কাপাদিয়াকে পরাজিত করলেন। এখানে বলা যেতে পারে আন্তঃ রাজ্য ফাইন্যালে মিস শাহ মিসেস কাপাদিয়াকে পরাজিত করলেও জাতীয় প্রতিযোগিতার সেমি-ফাইন্যালে মিসেস কাপাদিয়ার কাছে মিস মীনা শাহকে পরাজয় স্বীকার করতে হয় এবং মিসেস কাপাদিয়া শেষ পর্যন্ত মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন গত বছরের বিজয়িনী মিসেস প্রেম পরাশরকে পরাজিত করে।

জাতীয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছেন বোম্বাইয়ের কুশলী খেলোয়াড় নন্দু নাটেকার। আন্তঃ রাজ্য প্রতিযোগিতায় ইনি ত্রিলোক শেঠের সঙ্গে খেলবার সুযোগ পাননি। কিন্তু জাতীয় ব্যাডমিণ্টনের ফাইন্যালে গতবারের বিজয়ী ত্রিলোক শেঠকেই নাটেকার পরাজিত করেছেন অতি সহজে। ত্রিলোক শেঠের খেলা দেখে মনে হচ্ছিল তিনি আর আগের সেই শেঠ নেই—অতীত দিনের ছায়ায় পরিণত হয়েছেন। অপরদিকে পড়াশুনোর জন্য কয়েক বছর নন্দু নাটেকার প্রতি-যোগিতামূলক খেলা থেকে দূরে সরে থাকলেও তাঁর নৈপুণ্য এতটুকু কমেনি। নিপুণ হাতে খেলে তিনি আবার ভারত শ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়ের সম্মান অর্জন করেছেন।

জাতীয় ব্যাডমিণ্টনের কয়েকটি খেলায় এবার অপ্রত্যাশিত ফলাফল প্রত্যক্ষ করা গেছে। উদাহরণ স্বরূপ বাঙলার এক নম্বর খেলোয়াড় রঞ্জিত ব্যানার্জির কাছে ভারতের দুই নম্বর খেলোয়াড় অমৃত দেওয়ানের পরাজয় এবং বাঙলার উঠতি খেলোয়াড় দীপু ঘোষের কাছে ভারতের
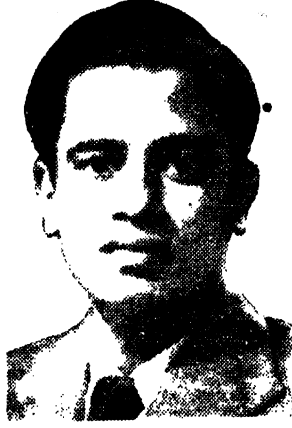
জাতীয় ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ন নন্দু নাটেকার

৬ নম্বর খেলোয়াড় পি এস চাওলার পরাজয়ের কথা বলা যেতে পারে। ভারতীয় ব্যাডমিণ্টন ক্রমপর্যায়ে বাঙলার প্রণব বসুর স্থান চতুর্থ। দিল্লীর খেলোয়াড় জগদীশ লালও প্রণব বসুকে পরাজিত করতে কোন বেগ পাননি। এই সব অপ্রত্যাশিত ফলাফল এবং কয়েকটি খেলায় বিশেষ করে ভারতের কয়েকজন উঠতি খেলোয়াড়ের খেলায় নৈপুণ্যের আভাষ পাওয়া গেলেও জাতীয় ও আন্তঃ রাজ্য ব্যাডমিণ্টনের খেলা এবার ভাল জমেনি।

নীচে ফাইন্যালে খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল:—

সিংগলস ফাইন্যাল—নন্দু নাটেকার (বোম্বাই) ১৫-৬ ও ১৫-১ পয়েণ্টে টি এন শেঠকে (উত্তর প্রদেশ) পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইন্যাল—নন্দু নাটেকার ও এম কে ভূপারদিকার ১৫-৮ ও ১৫-৯ পয়েণ্টে অমৃত দেওয়ান ও পি এস চাওলাকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইন্যাল—মিসেস সুশীলা কাপাদিয়া (বোম্বাই) ১২-১১ ও ১২-১১ পয়েণ্টে মিসেস প্রেম পরাশরকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

বালকদের সিংগলস ফাইন্যাল—সুরেশ গোয়েল (উত্তর প্রদেশ) ১০-১৫, ১৫-৩ ও ১৫-৯ পয়েণ্টে দীনেশ খান্নাকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেন।

দেশী সংবাদ

১৫ই ডিসেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিবসে নেহরু-নূন চুক্তির সর্তাদি অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি এলাকা পাকিস্তানকে ছাড়িয়া দিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলি সম্মিলিতভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

১৬ই ডিসেম্বর—উৎপাদক, পাইকারী ব্যবসায়ী ও খুচরা ব্যবসায়ীরা ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ধান্য ও চাউলের সর্বোচ্চ যে মূল্য গ্রহণ করিবেন তাঁহার পরিমাণ ধার্য করিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য সম্পর্কিত আইন অনুযায়ী মূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় খাদ্য ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন—১৯৫৯ সালের ৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে জবর দখল কলোনী-গুলির বৈধকরণ সম্পন্ন হইতে পারিবে বলিয়া রাজ্য সরকার আশা করেন।

১৭ই ডিসেম্বর—আজ রাত্রে শিলং-এ সরকারীভাবে সংবাদ আসিয়াছে যে, পাকিস্তানী সৈন্যরা আজ বেলা ২টা ২৫ মিনিট হইতে ভারতীয় এলাকা খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের অন্তর্গত শিলং মহকুমার ভোলাবটায় আবার নূতন করিয়া গুলীবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে।

দুর্গাপুর কয়লাচুল্লীর প্রথম ব্যাটারিতে অগ্নিসংযোগ করা হইয়াছে। ব্যাটারিটি সম্পূর্ণ ভাতিতে ১০ সপ্তাহ সময় লাগিবে। চুল্লীটি সম্পূর্ণ তাতিয়া গেলে নানা ধরনের মিশ্রিত কাঁচা কয়লা উহাতে দগ্ধ করিয়া বিভিন্ন প্রকার "কোক" বা পোড়া কয়লা, গ্যাস এবং কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্যের মৌল উপাদানসমূহ পাওয়া যাইবে।

১৮ই ডিসেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বহু প্রতীক্ষিত মুনাফাবাজী নিরোধ বিলটি উত্থাপিত হইলে বিরোধী দলের পক্ষ হইতে রাজ্য সরকারের খাদ্যনীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া উহাকে 'মারাত্মক খাদ্যনীতি'-রূপে অভিহিত করা হয় এবং মাছ, মসলা, ডাল চিনি প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যগুলি উক্ত বিলের আওতায় আনিবার জন্য দাবী জানান হয়।

আজ রাণাঘাটের সরকারী মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, গতকাল পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর একদল সৈন্যের নেতৃত্বে ও সশস্ত্র প্রহরায় ৪০ জন পাকিস্তানী খেজুরের রস সংগ্রহ করিবার জন্য সীমান্তবর্তী ভারতীয় গ্রাম সোনাগঞ্জে অনধিকার প্রবেশ করে।

১৯শে ডিসেম্বর—১৯৫৮ সালের অডিট রিপোর্টে রাউড়কেল্লায় ইস্পাত কারখানার ডিরেক্টরদের ব্যবহারের জন্য ৭ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা ব্যয়ে "প্রাসাদোপম" একটি ভবন নির্মাণের সমালোচনা করা হইয়াছে। নির্মিত ভবনটিতে ১২টি শয়নকক্ষ, প্রতি কক্ষ সংলগ্ন স্নানাগার ও ড্রেসিং রুম, একটি মন্ত্রণা কক্ষ, বিশ্রাম কক্ষ, খাবার ঘর, রান্নাঘর ও ভাঁড়ার, বৈঠকখানা, ভিতের নিচেকার ঘর ও শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র আছে।

অদ্য বিকালের দিকে পরিষ্কার আকাশে সাদা ধূম্রাঙ্কিত রেখা লক্ষ্য করিয়া সমগ্র কলিকাতায় নাগরিকদের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। ধূম্রাঙ্কিত পুচ্ছ আসলে জেট বিমানের। রাষ্ট্রপতির উপস্থিতির প্রাক্কালে ঐ বিমানগুলি নগরীর উপর দিয়া উড়িয়া যায়।

২০শে ডিসেম্বর—মালয় এবং ইন্দোনেশিয়া পরিভ্রমণের পর রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অদ্য অপরাহ্নে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৫০ এবং ১৯৫২ সালে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বিধি লঙ্ঘন করার অভিযোগে গতকাল বোম্বাইয়ের এসপ্ল্যানেড কোর্টের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী জি রেগে কলিকাতার এস্ বি ট্রেডিং ও উহার দুইজন ডিরেক্টর শ্রীহরিদাস মুন্দ্রা এবং তুলসীদাস মুন্দ্রাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া সাকুল্যে মোট ৪৫০০০ টাকা জরিমানা করিয়াছেন।

২১শে ডিসেম্বর—আজ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ ও গার্ডেনের বিধিনিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে পুলিস ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করে। গার্ডেনের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য হাওড়া পুলিসের পক্ষ হইতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই ডিসেম্বর—ওয়াকিবহাল মহলের নিকট হইতে জানা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহের আশঙ্কা করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানস্থ কর্তৃপক্ষ মার্কিন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত কিছু সংখ্যক সৈন্য গত মাসে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করিয়াছেন।

বন-এর খবরে প্রকাশ, ফাদার আইকিঞ্জার নামক জনৈক জার্মান পাদ্রি পশ্চিম চীনের পার্বত্য অঞ্চলে জনৈক "তুষার মানব" বা "উলঙ্গ লামার" সাক্ষাৎ পাইয়াছেন। আইকিঞ্জার উক্ত লামার ফটো তুলিয়া লইয়াছেন।

১৬ই ডিসেম্বর—বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, মাও সে তুং এ বৎসর চীনা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রধানের পদ ত্যাগ করিতে চলিয়াছেন। তাঁহার বর্তমান কার্যকাল শেষ হইলে তিনি চেয়ারম্যান পদে পুনরায় নির্বাচন প্রার্থী হইবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

মার্কিন রাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র অদ্য রাত্রিতে বলেন, পশ্চিম এশিয়া দপ্তরের সহকারী রাষ্ট্রসচিব শ্রীউইলিয়াম রৌনট্রি অদ্য বাগদাদ উপনীত হইলে তাঁহার গাড়ি লক্ষ্য করিয়া পচা ডিম, আবর্জনা ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হয়।

১৭ই ডিসেম্বর—আগামী বৎসর শরৎকালে মহিলাদের আন্তর্জাতিক হিমালয় অভিযাত্রী দলের ১২ জন মহিলাকে চো-উ পর্বতশৃঙ্গে (২৬৮৬৭ ফুট) আরোহণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর আতলান্তিক চুক্তি সংস্থাভুক্ত ১৫টি রাষ্ট্র এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে যে, সমগ্রভাবে জার্মানী সম্পর্কে রাশিয়ার সহিত বুঝাপড়া হইলে তবেই বার্লিন সমস্যার সমাধান হইতে পারে। তৎপূর্বে নহে।

১৮ই ডিসেম্বর—সংযুক্ত আরব সাধারণ-তন্ত্রের 'আল গেইস' নামক সাময়িক পত্রের গত সংখ্যায় লিখিত হইয়াছে, পাকিস্তান কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে ভারতের উপর চাপ দিতে সমর্থ হওয়ার উদ্দেশ্যে ভারতের সহিত খালের জল সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করিতে অসম্মত হইতেছে।

আধা সরকারী সংবাদপত্র "আল-সা-আবে" প্রকাশ, সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের আণবিক আক্রমণরোধে সক্ষম অস্ত্র সজ্জিত সেনাদল রহিয়াছে।

১৯শে ডিসেম্বর—মস্কো বেতারের ঘোষণায় বলা হয় যে, রাশিয়ার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন গতকল্য সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। "তাস"-এর খবরে প্রকাশ, সোভিয়েট রাশিয়ার কৃষি উন্নয়নের ব্যাপারে বুলগানিন, ম্যালেনকভ, মলোটভ, শেপিলভ এবং কাগানোভিচের কার্যকলাপ সম্পর্কে শ্রী খুশ্চেভ যে সব অভিযোগ করিয়াছেন, মার্শাল বুলগানিন তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন।

২০শে ডিসেম্বর—যন্ত্রবিদ্যা সংক্রান্ত সাময়িক পত্র "মিসাইলস ও রকেট"এ প্রকাশ, "সোভিয়েট ইউনিয়ন আণবিক শক্তি চালিত এমন একটি রকেট ইঞ্জিন আকাশে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছে যাহার ভর হইতেছে ৫০ হাজার পাউণ্ড।

২১শে ডিসেম্বর—নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র তীব্র অসন্তোষের ভাব ধূমাইত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একদা 'সোনার পাকিস্তানের' স্বপ্নে বিভোর হইয়াছিল, সামরিক শাসন পাকিস্তানকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাওয়ায় তাহারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।
মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
LIFEBUOY
SOAP
MADE IN INDIA FROM PURE VEGETABLE OILS ONLY
HINDUSTAN LEVER LIMITED
LIFEBUOY SOAP
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

REG. NO. C. 2109

দেশ

২৬ বর্ষ] শনিবার, ১৮ পৌষ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 3rd January, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১০

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয় লেখক

DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 3rd January, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১০ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৮ পৌষ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

বিশ্বভারতীর কর্মসমিতি ২৩শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত বিশেষ অধিবেশনে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরীকে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যরূপে নির্বাচিত করেন এবং রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ তাঁহার নির্বাচন অনুমোদন করেন, পাঠকগণ এ সংবাদ অবগত আছেন। শ্রী চৌধুরী মহাশয় বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে অপেক্ষাকৃত নবাগন্তুক, যদিচ তিনি এক বৎসরকাল বিশ্বভারতীর কোষাধ্যক্ষরূপে কাজ করিয়াছেন। তিনি শুধু নবাগন্তুক নন বিশ্বভারতীর ভাবী উপাচার্য বলিয়া যাঁহাদের নাম শোনা গিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যেও তিনি ছিলেন না।

বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিয়োগ লইয়া যে অশোভন বাদবিসম্বাদ দলাদলি শুরু হইয়া গিয়াছিল আশা করি এবারে তাহার উপর যবনিকাপাত ঘটিবে। নূতন উপাচার্যকে আমরা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি যদিচ তাঁহার পথ কুসুমাস্তীর্ণ হইবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিতেছি না।

কিছুকাল হইল বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা দেশের শিরঃপীড়ার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। দেশবাসীর এই উদ্বেগের কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাহাদের গভীর ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। অনেকের চোখেই রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী অভিন্ন। আমরাও ইতিমধ্যে একাধিকবার বিশ্বভারতীর প্রতিকূল সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। বলা বাহুল্য তাহা আমাদের পক্ষে সুখকর হয় নাই।

বিশ্বভারতী

আমরা যতদূর বুঝি বিশ্বভারতীর বর্তমান উদ্বেগজনক অবস্থার মূলে আছে প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের বিরাট ব্যক্তিত্বের তিরোধান। ইহার ফলে যে শূন্যতা সৃষ্টি হইয়াছে সেখানে নানাদিক হইতে প্রবল বায়ুস্রোত প্রবেশ করিয়া আলোড়ন বাধাইয়া দিয়াছে। ইহা প্রায় নৈসর্গিক নিয়ম। এখন এই শূন্যতা ব্যক্তিত্বের দ্বার পূর্ণ করা সম্ভব নয়, কিন্তু কতকটা সাম্য আনা সম্ভব সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার দ্বারা। সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার জন্যে বিশ্বভারতী প্রসিদ্ধ নয়। আরও একটি কারণ আছে এই উদ্বেগজনক অবস্থার মূলে। সেটি হইতেছে বিশ্বভারতীর বিশ্ববিদ্যালয়ীভবন। সৃষ্টিকাল হইতে বিশ্বভারতী ছিল "সৃষ্টিছাড়া," কবির স্বপ্নে ইহার দেহ গঠিত। এমন প্রতিষ্ঠানকে সরকারী নিয়মতন্ত্রের হাজার শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত করিতে গেলে ইহার মৌলিক প্রকৃতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আচার্য নেহরু সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন যে, খুব সম্ভব বিশ্বভারতীকে আনুষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা শুভকর হয় নাই। আমাদেরও ধারণা সেইরূপ। কিন্তু এখন আর সে আলোচনা নিরর্থক। কিন্তু এ সমস্তের কথঞ্চিৎ প্রতিকার হইতে পারিত উত্তম ব্যবস্থাপনার সাহায্যে। নানা কারণে তাহা হইয়া ওঠে নাই। অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছিল যে স্বয়ং আচার্যকে পদভার বিসর্জন করিতে হইয়াছিল, পুনরায় আশা করি এবারে এই দুঃখজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়া নূতন অধ্যায়ের সূচনা ঘটিবে।

আচার্য নেহরু বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিয়াছেন, বলিয়াছেন যে বিশ্বভারতী যেন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গতানুগতিক না হইয়া পড়ে। এই সূত্রে আর একটা বিষয় আমরা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করাইয়া দিতে ইচ্ছা করি। আমরা অবগত হইলাম যে, কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বভারতীর তিনশত ছাত্রের জন্য বার্ষিক পনেরো লক্ষ টাকা দিয়া থাকেন—ইহা ছাড়া এককালীন সাহায্য। প্রত্যেক ছাত্র পিছু কত পড়ে সামান্য একটু হিসাব করিলেই পাওয়া যাইবে। ছাত্র পিছু এত বিপুল ব্যয় আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় কিনা সন্দেহ। আমাদের দেশ দরিদ্র এ দেশের শিক্ষকগণ স্বল্প বেতনভোগী। ছাত্রগণ সর্বদা অর্থকষ্টে পড়াশোনা করিতে বাধ্য হয়—এ সমস্ত জানিয়া শুনিয়া কেন্দ্রীয় সরকার বিশ্বভারতীর প্রতি মুক্তহস্ত। এখন এই অর্থের যদি যথার্থতম সদ্ব্যবহার না হয় তবে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ শুধু সরকারের কাছে নয় দেশবাসীর কাছেও দায়ী হইবেন। আমাদের বিশ্বাস বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য ও আদর্শরক্ষায় যদি কর্তৃপক্ষ সজাগ ও সচেষ্ট না হন তবে কেবল অর্থের পূর্ণতম সদ্ব্যবহার করাই হইবে না, প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের কাছে তাঁহাদের যে অপরিশোধ্য ঋণ আছে তাহারও কিছু পরিশোধ করা হইবে।

আমাদের এই রৌদ্রদাহে গলদঘর্ম দেশে ছুটির সঙ্গে কাজকে বেঁধে জীবনের জুড়িগাড়ি হাঁকান শক্ত। কল্পনায় এ-দুই প্রায়ই মেলে না। একে অপরের বিপরীত অর্থবাচক শব্দ। দীর্ঘ দগ্ধ দিনে আমরা যে বস্তুটিকে কামনা করি তার নাম আরাম। আমাদের নীল গগনে ছুটির বাঁশি বাজে, মেঘের কোলে রোদ হাসলে সমস্বরে বলে উঠি "আজ আমাদের ছুটি।" আবার নীল নবঘন আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই না থকলেও অপরকে ঘরের বাহিরে যেতে মানা করি। ছুটির প্রতীক্ষায় সুখ, স্মরণে রোমাঞ্চ, ভোগে আনন্দ। শনিবারের বিকালে রবিবারের জন্য ব্যাকুল হই, আবার সোমবার সকালে বিগত রবিবারটির জন্য শোচনা করি। ছড়ার ছেলেটির সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলি না বটে, তবু সোম, মঙ্গল, বুধ এরা যে সব তাড়াতাড়ি আসে, আর রবিবার যে বড়ই দেরী করে ফেলে, এ-বিষয়ে আমরা তার সঙ্গে মোটামুটি একমত। নববর্ষের দেয়ালপঞ্জী হাতে পেয়ে প্রথমেই তাকাই লাল তঙ্কগুলির দিকে তাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় আনন্দের প্রতিশ্রুতি পড়ি, উৎসবে, প্রমোদে বা ভ্রমণে—কোন্ দিনটিকে কোন যজ্ঞে আহুতি দেব, তার একটা খসড়া তখনই মনে মনে তৈরি হয়ে যায়। বছরের শেষে সালতামামি করতে বসে হযত দেখি, হিসাবে গরমিল ঢের রয়ে গিয়েছে, জমার ঘরে অনেক ফাঁক। অর্থাভাবে অনেক প্রোগ্রাম বাতিল করতে হয়েছে। হোক—তবু শুধু হিসাবেই বা আনন্দ কম কি। এ-হিসাব আমাদের এক রকম মৌল অধিকার। স্কুল-কলেজে হিসাব, হিসাব অফিস আদালতে। কর্মস্থল থেকে অবসর গ্রহণের কালেও আমরা ছুটির হিসাব কড়ায় গণ্ডায় খতিয়ে দেখি, আদায় করে নিই, যদি পাওনা থাকে। ইহলোকে যদি কিছু বাকী থেকে যায়, তবে বৈতরণী পারে গিয়ে বকেয়া উশুল করে নিই কিনা কে জানে!

কিন্তু এ কি বাণী শুনি আজ নেহরুর মুখে? কিছুকাল পূর্বে আমেদাবাদের এক জনসভায় তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, অন্যান্য সব কিছুর মত ছুটিরও অত্যন্তটা গর্হিত। তাঁর যুক্তি দুটি। এক, অধিকাংশ দেশের চেয়ে ভারতে আমরা বেশী ছুটি চাই, পাই। কঠোর শ্রমসাধ্য কর্তব্য সম্মুখে রেখে কোন জাতির বেশী ছুটি ভোগ করা অসংগত। এই অপ্রিয় কথাটি অন্য কেউ উচ্চারণ করলে আমরা এক কথায় তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে পারতুম। বলা যেত দেশ-কাল-আবহাওয়া ভেদে ছুটির পরিমাণে তারতম্য ঘটা স্বাভাবিক। আর, শ্রমের কালকে দীর্ঘতর করার জন্য যদি ছুটি কমানর প্রয়োজন থাকে, তবে শ্রমক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও বিশেষত এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ছুটির সংখ্যাবৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। কিন্তু কথাটা তুলেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, যাঁর কথাকে সহজে নস্যাৎ করা যায় না। অতএব বিষয়টি নিরীক্ষাযোগ্য। আমাদের ছুটি প্রকৃতই কি বেশী? স্কুল থেকে আদালত পর্যন্ত অবস্থাটা একবার বিচার করা যাক। অবসরের যে রীতি প্রচলিত, তার কাঠামোটা ইংরেজ আমলের। পরিবর্তন যা হয়েছে তা সামান্যই। এ দেশের গরম ইংরাজের সহ্য হত না। বিদায়তনগুলিতে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশের মূলে সেই প্রখর আতপাসহিষ্ণুতা কাজ করে থাকবে। কিন্তু এই দেশেতেই যাদের জন্ম সেই ছাত্রছাত্রীদের গ্রীষ্মবোধ তাদৃশ উৎকট হওয়া সম্ভব নয়, বিশেষত বৎসরের শেষে পাঠ্যতালিকার একটা বড় অংশ যখন অপঠিত থেকে যায়। গরমের ছুটির বহরটা একটু ছাঁটলে, ছোট করলে, ছেলেমেয়েদের জ্ঞানের পরিসর সম্ভবত খানিকটা বাড়ে। অফিসে কিংবা কারখানায় অবশ্য গরম বিলক্ষণ থাকলেও গরমের ছুটি নেই। কিন্তু সুদ দিয়ে আসল পূরণের ব্যবস্থা আছে। বার মাসে আমাদের তের পার্বণ নয়, অন্তত তেত্রিশটি, এবং পুরো, আধা আর সিকি ছুটির হিসাব মিলিয়ে যা দাঁড়ায় আমরা অম্লানবদনে উপরি বলে তা গ্রহণ করি। বৃহৎ পূজা বা উৎসবের ছুটির বরাদ্দে হাত না দিয়ে ছোটখাটো পালা-পার্বণগুলোকে অনায়াসেই আর একটু ছোট করতে পারি। আদালতের ছুটির নিয়ম আরও বিচিত্র। বড় আদালত, অর্থাৎ হাইকোর্টের ছুটি অত্যন্ত বেশি, এ-কথা লিখে আশা করি আদালত-অবমাননার দায়ে পড়ব না। সেকালে সম্ভবত বিদেশী বিচারকেরা শারদ অবকাশে 'ফার্লো' নিয়ে দেশে যেতেন। সাহেব ধর্মাবতারেরা বিদায় নিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সুবিধার জন্য চালু রীতিটা নেয়নি। এবারে নিক। খানিকটা ছুটি লোকসান করে হয়ত দেখব দেশের উন্নতির ঘরে লাভের অঙ্ক বেড়েছে। জল ঈষৎ না মেশালে দুধ সুপেয় হয় না সত্য, কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত জলমিশ্রণের ফলে দুধ আর দুধ থাকে না, তার রঙও টেঁকে না এ-কথাও সত্য। তার চেয়ে কাজের মাত্রা যদি বাড়িয়ে দিই, তবে অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব ছুটির স্বাদ!

• • •

কাজের কথায় পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তাবিত তিনটি সুতোকল প্রতিষ্ঠার কথা মনে পড়ল। এক একটি সুতোকল বসাতে মোট খরচ হবে ৯০ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে ৩০ লক্ষ টাকা। ৩০ লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আমদানীর সুযোগও সরকারই করে দেবেন। বাকি রইল ৩০ লক্ষ টাকা। সুতোকলের জন্যে বাঙালীদের দিক থেকে দরখাস্ত পড়েছিল মোট তিনটি। তার মধ্যে দুটি বাতিল হয়ে গেছে। তৃতীয়টির অবস্থা অজ্ঞাত। দুটি বাতিল হয়েছে, তার কারণ শর্ত পূরণে অক্ষমতা, ৩০ লক্ষ টাকা জোগাড় করার সাধ্য উদ্যোক্তাদের নেই। এককভাবে না হোক যৌথভাবে টাকার ব্যবস্থা করা বাঙালী ধনীদের পক্ষে সম্ভব নয়, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। তার চেয়ে বরং এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছান সহজ যে, ব্যবসায়ে মন নেই বাঙালীর, বাঙালী ধনী ঝুঁকি নিতে আজ নারাজ। বিষয়টা আরেকটু তলিয়ে দেখা দরকার। শুধু বৃহৎ শিল্প নয়, ছোটখাট শিল্পের ক্ষেত্রেও বাঙালী ব্যবসায়ীর অমনোযোগ অধুনা প্রকট। এই অনিচ্ছা শোচনীয়। আচার্য রায়ের উপদেশ বাঙালী ব্যবসায়ীরা বড় তাড়াতাড়ি বিস্মৃত হয়েছেন।

বৈদেশিকী

মস্কোতে সুপ্রীম সোভিয়েটের সভায় সোভিয়েট স্বরাস্ট্র মন্ত্রী বলেছেন যে, বার্লিনের প্রশ্ন যদি সোভিয়েট সরকারের প্রস্তাবিত ধারায় মীমাংসিত না হয়, তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সারাজেভোর অনুরূপ পরিস্থিতি বার্লিনে উদ্ভূত হতে পারে অর্থাৎ সারাজেভোতে অস্ট্রিয়ান যুবরাজের হত্যা সংঘটনের পরেই যেমন প্রথম মহাযুদ্ধ লেগে যায়, তেমনি বার্লিনেও এমন কিছু একটা ঘটতে পারে যার ফলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগে যেতে পারে। এরূপ উক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য যে পশ্চিম শক্তি-বর্গের উপর চাপ দেওয়া সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একথাও ঠিক যে, বড়ো বড়ো যুদ্ধ কী কারণে কখন লাগে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতাদের উক্তি এবং মতামতের উপর অতিমাত্রায় বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। পরবর্তী ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে বারবার দেখা গেছে যে, প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধেরই কারণ সম্পর্কে সমসাময়িক কর্তাদের উক্তি মিথ্যা, অতিরঞ্জন এবং ভুল বোঝার দ্বারা দূষিত। কার দোষ বেশি বা কম অনেক ক্ষেত্রে সে প্রশ্নের শেষ মীমাংসা বহু বৎসর ধরে আলোচনার পরেও মেলে না মতানৈক্য থেকে যায়। আর একটা জিনিস দেখা গেছে যে, যাদের কর্ণধার বলে মনে করা হয় তাদেরও কোনো বিশেষ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রিত করার শক্তি, এমন কি তাদের স্বকৃত কর্মের ফল এবং গতি নির্ধারণের ক্ষমতাও কত কম। সারাজেভোর হত্যাকাণ্ড কোনো প্রত্যাশিত ঘটনা ছিল না, ঐ ঘটনা না ঘটলে প্রথম মহাযুদ্ধ লাগত না একথা বলা যায় না। অবশ্য তথাকথিত সামান্য একটা ঘটনার অদল বদলেও ইতিহাসের ধারার পরিবর্তন হতে পারে, এরূপ মনে করাও অসংগত না হতে পারে। তৃতীয় মহাযুদ্ধের দিকে পৃথিবীকে ঠেলে নিয়ে যাবার মতো অনেক ব্যাপার ঘটছে, অনেক চিন্তা ও কর্মধারার গতি সেই দিকে। আবার তার উল্টো অনেক শক্তিরও ক্রিয়া চলছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে হলে সেটা ঠিক কীভাবে কোথায় শুরু হবে তা কোনো রাজনৈতিক নেতার জানা আছে বা সে সম্বন্ধে সঠিক ভবিষ্যত বাণী করার শক্তি কারো আছে এরূপ বিশ্বাস করার কোনো হেতু নেই। আর কর্তাদের মধ্যে যদি সে কথা কারো জানাও থাকে (অর্থাৎ যদি কোনো পক্ষ যুদ্ধ লাগাবার জন্য দিন ক্ষণ স্থির করে প্রস্তুত হয়ে থাকে) তাহলেও তা নিশ্চয়ই আগে-ভাগে প্রচারিত হবে না। সুতরাং ১৯১৪ সালের সারাজেভোর স্মৃতির সঙ্গে বার্লিনের বর্তমান প্রশ্নকে জড়িয়ে দেখলে ঐতিহাসিক সত্য দৃষ্টির পরিচয় দেওয়া হবে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। নিউক্লিয়ার অস্ত্রের মহাযুদ্ধ যদি লাগে তবে রূপ এবং ফলাফল শুধু নয় তার লাগার ধরনটাও ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ থেকে যথেষ্ট রকম আলাদা হবে বলেই মনে করা

উচিত। কিন্তু তাই বলে বার্লিন সমস্যা থেকে কোনো সাক্ষাৎ সংঘাতের সম্ভাবনা আদৌ নেই অথবা সুদূরপরাহত এরূপ মনে করাও উচিত হবে না। সোভিয়েট মনস্থ করেছে যে, বার্লিন থেকে সোভিয়েট সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হবে, সোভিয়েটের সেখানে যে সামরিক কর্তৃত্ব ছিল তা পূর্ব জার্মান গভর্নমেণ্টের হাতে সমর্পণ করা হবে। সোভিয়েট সরকার চান যে, পশ্চিমা শক্তিরাও অনুরূপভাবে বার্লিন ছেড়ে যাক এবং বার্লিনকে "ফ্রি সিটি" বলে ঘোষণা করা হোক। আমেরিকা, বৃটেন ও ফ্রান্স বলেছে যে, তারা বার্লিন থেকে সৈন্য সরাবে না কারণ তাহলে পশ্চিম বার্লিনকে অরক্ষিত অবস্থায় কম্যুনিস্ট পূর্ব জার্মান গভর্নমেণ্টের এলাকার ভিতরে ছেড়ে দিয়ে আসা হবে—দ্বিধা বিভক্ত জার্মানীর একীকরণের পূর্বে অর্থাৎ বার্লিনকে সারা রাজধানীরূপে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত না দেখে তারা বার্লিন থেকে সরবে না। রাশিয়া বার্লিনের সমস্যাকে জার্মানীর একীকরণের সমস্যা থেকে পৃথক করে মীমাংসা করতে চায়। পশ্চিমা শক্তিরা জার্মানীর একীকরণের প্রশ্নকে অমীমাংসিত রেখে বার্লিন সম্বন্ধে কিছু করতে নারাজ। জার্মানীর একীকরণের প্রশ্ন সম্পর্কে দুই পক্ষের মুখ দুই-দিকে। পশ্চিমা শক্তিরা চাচ্ছে সারা জার্মানীতে স্বাধীন নির্বাচন, রাশিয়া চায় পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর গভর্নমেণ্টের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে এক ধরনের মিলন যাতে কম্যুনিস্ট অংশের সত্তা ও প্রভাব পুরোপুরি বিলুপ্ত হবে না। তাতে পশ্চিমা শক্তিরা রাজী নয়। তাদের চেয়েও গররাজী হচ্ছেন পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার এ্যাডেনয়ের। তিনি চান না যে পশ্চিমা শক্তিরা পূর্ব জার্মানীর গভর্নমেণ্টকে কোনো প্রকার স্বীকৃতি দেয়।

কিন্তু বিভিন্ন পক্ষ উপরে উপরে যে-ভাব দেখাচ্ছে ভিতরের অবস্থার সঙ্গে তার অনেকাংশে মিল নেই। ভিতরে নানারকম প্যাঁচ আছে। পশ্চিমা শক্তিরা জার্মানীর একীকরণের প্রশ্ন সর্বাগ্রে রাখছে বটে, কিন্তু সেটা মুখেই বেশি। আসলে তারা জার্মানীর একীকরণের জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নয়, বরঞ্চ জার্মানীকে বিভক্ত রাখতেই অনেকে মনে মনে চায়। রাশিয়ারও জার্মানীকে এক করার চেয়ে পূর্ব জার্মানীতে কম্যুনিস্ট প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহই বেশি। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা রুশ নীতির ঘোষিত কাম্য বটে, কিন্তু পূর্ব জার্মান গভর্নমেণ্টকেও এ বিষয়ে কতখানি স্বাধীনতা দিতে সোভিয়েট সরকার প্রস্তুত আছেন সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের আছে। আবার পশ্চিম জার্মান গভর্নমেণ্টের দিক থেকে পূর্ব জার্মান গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলোচনা করার অনিচ্ছাও সেটাই নির্জলা নয়। এ্যাডেনয়ের অবশ্য এ বিষয়ে খুব কট্টর ভাব, কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর সাধারণ ভাব তা নয়। সোশ্যাল ডেমোক্রাট-দের মধ্যে তো বটেই, এ্যাডেনয়ের নিজের পার্টির মধ্যে, এমন কি তাঁর মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যেও অন্য রকম ভাবের অস্তিত্ব রয়েছে। শুধু তাই নয়। তলে তলে দুই জার্মানীর মধ্যে অনেক রকম যোগাযোগ আছে। সুতরাং দুই জার্মান গভর্নমেণ্টের মধ্যে স্বাধীন আলোচনার সুযোগ হলে তার ফল যে রাশিয়ার পক্ষে অবিমিশ্র সুখকর হবে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই। এই কারণে কেউ কেউ সন্দেহ করে যে, রাশিয়া যে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে সরাসরি আলোচনার এতো পক্ষপাতী সেটা হয়ত তার ষোল আনা আন্তরিক মনোভাব নয়, রাশিয়া এ্যাডেনয়ের ও তাঁর সমর্থক পশ্চিমা শক্তিদের বিরুদ্ধতার সুযোগ নিচ্ছে।

কিন্তু সে যাই হোক, রাশিয়া বার্লিন সম্পর্কে পশ্চিমা শক্তিদের বেশ প্যাঁচে ফেলেছে, কারণ রাশিয়া যদি তার প্রস্তাব মতো কাজ করে তবে যে শুধু পশ্চিমা শক্তিরা পূর্ব জার্মানীকে স্বীকার করা না করা নিয়েই একটা মুস্কিলে পড়বে তা নয়, তার চেয়েও একটা বড়ো আশংকার কথা কেউ কেউ ভাবছে। বার্লিনে বর্তমান সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা যদি পূর্ব জার্মান গভর্নমেণ্টের হস্তে অর্পিত হয়, এবং পূর্ব জার্মান গভর্নমেণ্ট যদি পশ্চিম বার্লিনের সম্পর্কে বর্তমান ব্যবস্থা এবং পশ্চিম জার্মানী এবং পশ্চিমা শক্তিদের পক্ষে বার্লিনে যাতায়াতের বর্তমান সুখ-সুবিধায় হস্তক্ষেপ না করে সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষের উত্তরাধিকারী হিসাবে মাত্র কাজ করতে চায় তাহলে তাকে অস্বীকার করে চলা কঠিন হবে এবং অস্বীকার করে চলতে গেলে যে বিরোধ বাধার সম্ভাবনা তার দায়িত্ব পশ্চিমা শক্তিদের উপর আসবে। এর চেয়েও আর একটা গুরুতর আশংকা কেউ কেউ করছে। সোভিয়েট যদি তার কথা মতো বার্লিন এবং পূর্ব জার্মানীর অন্যান্য অংশ থেকে সৈন্যসামন্ত সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তারপরে যদি পূর্ব জার্মানীতে কোথাও কম্যুনিস্ট-বিরোধী কোনোরূপ বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তাহলে যে অবস্থার উদ্ভব হবে তার আকর্ষণ থেকে কি বার্লিনস্থ ন্যাটো সৈন্য-সামন্ত মুক্ত থাকতে পারবে এবং যদি না পারে তবে কি সোভিয়েটের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে না? এদিক থেকে দেখলে সারাজেভোর উপমার একটা অর্থ হয়।

২৯।১২।৫৮

আর্থিক সমীক্ষা

শ্রীকৌটিল্য

দেখতে পাচ্ছি, তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এক-দিকে পরিকল্পনার আয়তন আর অন্যদিকে ব্যয় সংস্থানের প্রশ্ন। গত সংখ্যায় এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেছিলাম। তারপরেই সংবাদ পেলাম, লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত অর্থনীতি সম্মেলনেও এই বিষয়েই প্রচুর আলোচনা হয়ে গেছে। বিখ্যাত অর্থ-নীতিবিদ্‌রা একমত হয়েছেন যে, পরি-কল্পনার আয়তন সংক্ষিপ্ত করা হবে না। এমন কি বিদেশী অর্থসাহায্য গ্রহণের ভীতিপ্রদ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও। ডাঃ কে এন রাজ হিসেব দিয়েছেন যে, এই সাহায্য গ্রহণের পরিমাণ ১৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়াবে, যদিও মার্কিন আলোচনা-প্রতিনিধি ডাঃ স্পেন্সরের ধারণা যে এর চেয়েও বেশি সাহায্যের প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। সরকারী মহল থেকে যদিও এই সম্মেলনে পরি-কল্পনার আয়তন সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করা হয়নি, তথাপি শ্রীআঞ্জারিয়ার বক্তব্য থেকে এটা বোঝা গেছে যে প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার চেয়ে এবার বৃহত্তর পরিকল্পনার চিন্তা করা হচ্ছে।

এখন কথা হচ্ছে যে, পরিকল্পনার অবশ্যই একটা নিজস্ব যুক্তি আছে; সে যুক্তি তার আয়তন সম্বন্ধেও। এই যুক্তিকে অস্বীকার করতে হলে অর্থনীতিক দাবিকে লঙ্ঘন করে রাজনীতিক কিংবা অন্য দাবিকে আগে স্থান দিতে হয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে সব দাবি অগ্রগণ্য হতে পারবে না। ভারতবর্ষের অর্থনীতিক সমস্যার প্রকার এবং পরিমাণের পরি-প্রেক্ষিতে তত্ত্বগতভাবে তার প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় পরিকল্পনারও একটা বিশুদ্ধ অর্থনীতিক প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে প্রয়োজনের দাবিকে শেষ পর্যন্ত আমরা কতখানি স্বীকার করে থাকতে পারব সেটা ভাবা দরকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারি শিল্পের প্রসারের দাবি শেষ পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ রাখতে পারিনি। পরিকল্পনাকে মোটের উপর ছেঁটেও ফেলতে হয়েছিল। এদিকে একথাও ঠিক যে বর্তমান মুহূর্তে ভারতবর্ষের জনমত বিদেশী সাহায্য গ্রহণের বিশেষ পক্ষপাতী নয়। এই জনমতের প্রতিধ্বনি সম্প্রতি শ্রী নেহরুর কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের মধ্যেও শোনা যায়নি এমন নয়, এবং দ্বিধাজড়িত কণ্ঠেই তিনি বলেছেন যে, দরকার মতো বিদেশী সাহায্য না নিয়ে যদি উপায় না থাকে তবে তা তিনি নেবেন। এই দ্বিধা এবং অনীহাই তাঁকে আবার পরিচালিত করেছে দেশবাসীর কাছে আভ্যন্তরীণ রসদ (internal resources) বৃদ্ধির জন্য আবেদন জানাতে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ রসদ কোন খাতে বাড়তে পারে, অথবা নতুন কোনো খাতের সন্ধান পাওয়া সম্ভব কিনা এ সব সম্পর্কে আপাতত সকলেই চুপ। চুপ না থেকে উপায় নেই, কারণ তথাকথিত গণতান্ত্রিক ছকের পরিবর্তন না হলে বড়ো বড়ো আয় বৃদ্ধির পথগুলি চিরকালের জন্যই বন্ধ থেকে যাবে।

গণতান্ত্রিক পরিবেশে বৃদ্ধি যতদূর চলছে তাতে মনে হচ্ছে আমদানী সঙ্কোচন ও রপ্তানী বৃদ্ধি ছাড়া শেষ পর্যন্ত আর কোনো দাওয়াই বাতলানো সম্ভব হবে না। একথা না হয় মেনে নিলাম যে, একমাত্র ওষুধ ছাড়া অন্য সব আমদানীর উপর নির্মমভাবে কাঁচি চালানো দরকার। কিন্তু

ভারতবর্ষে যে কোনো pattern-এর শিল্পায়নই কল্পনা করা হোক না কেন, খুব বেশি আমদানী কমিয়ে তাকে সার্থক করা প্রায় অসম্ভব। সম্মেলনে রেয়ন এবং প্ল্যাস্টিক শিল্পের উল্লেখ করা হয়েছে (এদের আমদানীকৃত উপকরণ প্রায় ৫০%), কিন্তু এ রকম দু-চারটি শিল্পের অস্তিত্ব কিংবা বিলুপ্তি এদেশের শিল্পায়নের গতি-প্রকৃতিকে খুব সামান্যই প্রভাবিত করবে, এবং মোটের উপর আমদানী-সংকোচনের পন্থা দেশের চাহিদা বজায় রেখেও কতটুকু আর্থিক সংগতি ঘটাতে পারবে তাতে সন্দেহ করি। অর্থাৎ বলার কথা হল যে, আমদানী-সংকোচন নীতি বর্তমান অবস্থায় এক যুক্তিতে সংগত মনে হলেও অন্য যুক্তিতে শেষ পর্যন্ত টিঁকবে না।

অপর দিকে রপ্তানী বৃদ্ধির পন্থা কী? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং সুদূর-পূর্ব অঞ্চলে আমাদের যে সব জিনিসের বাজার ছিল অথবা আছে, আগামী পাঁচ বছরে চীনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তার কি অবস্থা হবে বলা কঠিন। ম্যাঙ্গানিজ এবং পাটের বাজার দখল করতে পারলেও তা আর কতটুকুই বা? আফ্রিকাতে এবং এশিয়ার নানা অঞ্চলে যন্ত্রপাতির কিছুটা রপ্তানী হয়তো সম্ভব হতে পারে। যাই হোক, বিদেশে আমাদের শিল্পদ্রব্য রপ্তানীর পথ যদি খুব বেশি খুলে না যায়, তবে রপ্তানী-পন্থাও খুব সাহায্যদায়ক হবে না।

অথচ পরিকল্পনাকেও খাটো করা চলবে না। এই প্রসঙ্গে আমরা একটা কথাই বুঝি। যদি অবশেষে আমাদের বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করতেই হয় তবে তার জন্য ন্যূনতম প্রস্তুতিও আমাদের রাখতে হবে। এটা খুবই সোজা কথা যে খাদ্য সমস্যার সমাধানের উপরেই এই প্রস্তুতির সামর্থ্য নির্ভর করবে। আমাদের খাদ্য পরিস্থিতির উপর সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান আমাদের উপর কতটা জোর খাটাতে পারবে তা নির্ভর করবে। খাদ্য ছাড়াও আমাদের মৌলিক সমস্যা আরো অনেক থাকবে, কিন্তু খাদ্যের সমস্যা, আমাদের দুর্ভাগ্যত, অর্থনীতিক পরিধি পেরিয়ে রাজনীতিক পরিধিতে গিয়ে স্থান পেয়েছে। ভারতবর্ষ যদি জাপানের মতো ইতিমধ্যেই শিল্পে (এবং বিশেষত রপ্তানী-শিল্পে) যথেষ্ট শক্তিশালী হতে পারত তবে তার খাদ্যের দুরবস্থার সুযোগ কেউ ততটা নিতে পারত না, যেমন নিতে পারছে না জাপানের কাছ থেকে, যদিও জাপানের খাদ্য পরিস্থিতি তার সবচেয়ে বড়ো দুশ্চিন্তার কারণ। সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে হয় ছোট পরিকল্পনা করা, অথবা খাদ্য পরিস্থিতির উন্নতি ক'রে বড়ো পরিকল্পনাকে গ্রহণ করা বিকল্প উপায়।

দণ্ডকারণ্য

দেশ সম্পাদক সমীপেষু,

১৩ই ডিসেম্বর "দেশে" "প্রসঙ্গত" নামক প্রবন্ধে দণ্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে প্রকাশিত মতের সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ একমত। উদ্বাস্তু-সমস্যার সমস্ত দিক তলিয়ে ভাবলে বাঙ্গালীদের বাংলার বাহিরে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। আজ যখন কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ ও অন্যান্য সুবিধা দেবার জন্য স্বীকৃত তখন এ সুযোগ হারাতে দেওয়া কি ভাল হবে! দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকার পর দেখেছি সিন্ধী ও পাঞ্জাবীদের একটি বৃহদংশ কিভাবে বোম্বাই দেশে নিজেদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান করল। আমাদের মতে, বাংলার প্রতিবেশী রাষ্ট্রে অর্থাৎ বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে পুনর্বাসন সমস্যা সমাধানের অসুবিধা আছে। প্রথমত উক্ত তিনটি রাষ্ট্রই উপার্জন ক্ষমতার দিক থেকে বোম্বাই বা অন্যান্য প্রদেশ থেকে অনেক অনুন্নত। দ্বিতীয়ত উক্ত রাষ্ট্রে নবাগত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী পুনর্বাসনকে খুব ভালো চোখে দেখবেন না। এর জন্য দায়ী উক্ত রাষ্ট্রের সীমাবদ্ধ নিয়োগ সম্ভাবনা ও প্রাচীন দিনের তিক্ত স্মৃতি। কিন্তু এই সব নিয়ে আক্ষেপ করার দিন আজ নয়। বাস্তববাদীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমাদের উদ্বাস্তু সমস্যা বিচার করার দিন এসেছে।

আমাদের মনে হয় সিন্ধী ও পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুরা বোম্বাইএর মতন একটি ঐশ্বর্যশালী রাজ্যে এসেছিলেন বলে তাঁদের পুনর্বাসন সমস্যা অধিকতর সহজ হয়েছে। সুতরাং দণ্ডকারণ্যের প্রচুর সম্পদ ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনুকূলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছে বলে মনে হয়। সিন্ধী ও পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচনা করে তাদের মধ্যে নিজেকে নতুন পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় মনোভাব দেখেছি। কিন্তু আমাদের পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা হতাশা, নৈরাশ্য নতুন রাজ্য সম্পর্কে অতিশয় ভীতি ও খানিকটা কুঁড়েমি মনের পরিচয় পাওয়া যায়। হয়তো দারুণ দুঃখে কষ্টে মানুষের মন ভেঙ্গে যায়। আবার অনেক সময়ে দেখেছি দুঃখের আগুনে তা জ্বলেও উঠে।

আজ বাঙ্গালী উদ্বাস্তু বন্ধুরা যদি এই সুযোগ গ্রহণ না করেন তাহলে অন্যান্য প্রদেশে থেকে দাবী উঠবে তাদের লোকেদের যেন উক্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। এই ধরনের একটা মনোভাব অংকুরে গড়ে উঠছে, কিন্তু আজো এরা প্রকাশ্যভাবে তাদের দাবী ওঠাননি। সুতরাং উদ্বাস্তু হিতৈষীরা হুঁশিয়ার।

বাঙলা দেশের বাইরে গেলেই বাংলার বিরাট সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবো এই ভয় অমূলক। এ-সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীরা সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ যদি তেমনি বাঙ্গালীরা আবার সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েন, তাহলে আমাদের মনে হয় বাংলার নবজীবনের আর এক অধ্যায় শুরু হবে। কারণ উদ্বাস্তু-সমস্যা বাঙলা দেশের অর্থনীতিক কাঠামোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যা সমাধান হলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য সমস্যার সমাধানের পথ খুলে যাবে।

পুনর্বাসন সমস্যার একটি বড়ো দিক হোলো human approach। যাদের ঘর ভেঙ্গে গেছে, শিকড় উপড়ে গেছে, তাদের আবার নতুন পরিবেশে খাপ খাওয়াতে হলে, শুধু নতুন পরিবেশে আনতে হলে জমি, বাড়ি, খাদ্য, বস্ত্র, ছাড়াও আর বড়ো কথা তাদের কাছে right approach. এই সমস্যা দণ্ডকারণ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দপ্তর কতখানি পারবেন তা ভেবে দেখা দরকার। বিহার, উড়িষ্যায় পুনর্বাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতার মূল কারণ এবং তার থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই—এটাও এখন-ই ভেবে দেখার দরকার। প্রতিমা মজুমদার। বোম্বাই-৯।

বিম্ববতী নয়, তবু

বিষ্ণু দে

বিম্ববতী নয়, তবু প্রথম উন্মেষ
প্রথম মমতা জাগে এরই তো মায়ায়,
স্বচক্ষে নিজেকে দেখে দেয়ালে ছায়ায়
আয়নায় জলে-দেখে সুবেশ বিবেশ।
এই বুঝি মানবিক আদিম ক্ষমতা
আপন শরীরী স্বপ্নে আত্মস্থ মমতা?

তাই ভালোবেসেছিল দেহের মন্দির,
প্রকৃতি যেমন বাসে প্রাকৃত-সত্তাকে,
নিজেই অবাক হয় নিজেরই গম্ভীর
স্বরূপে স্বপ্নের ঘোরে, খুশি বা লজ্জায় ;
অথচ অভ্যাসনীতি মজ্জায় মজ্জায় ঃ
কোথায় বাঁধবে ভাবে হৃদয়বত্তাকে।

আর আজ? আজও সেই প্রথম মমতা
মরে নি নিশ্চয়, আর অধিকন্তু জানে
অন্যেরও লেগেছে ভালো, দ্বিতীয় আদরে
দেখায় ছোঁয়ায় দিন রাত্রি মনে প্রাণে
এ দেহ মাহাত্ম্যে স্থিত, আজ একা ঘরে
সে আদি মমতা ধরে ত্রিগুণ ক্ষমতা॥

আকস্মিক

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

টেবিলে শুকনো ফুল মন শুকনো তার চেয়ে বেশি ;
আদিম রক্তের গন্ধ আছে নাকি ঘরের দেয়ালে—
রহুলগ্ন এই থাকা, সব থাকে আপন খেয়ালে,
পুরোনো রক্তের গানে অকুণ্ঠ কঠিন মাংসপেশী।

মেলায় যাবো না আর ; সার্কাসে বা ম্যাজিক-আসরে
সমস্ত শুকিয়ে যায় ঃ আর সে কি বিবর্ণ কৌতুক
বোঝানো যায় না বলে—অন্তহীন প্রতীক্ষার ঘরে
ভেসে উঠবে আকস্মিক ফেলে-আসা নিজের শ্রীমুখ॥

প্রজাপতি

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কতো প্রজাপতি দেখ মৌসুমী ফুলেরা
একাকার হয়ে গেল শুধু রঙ ফেরুন্ত রঙে ;
যেন এ পৃথিবী সত্য যতক্ষণ ইন্দ্রধনু ঘেরা
তরঙ্গিত স্বপনে স্বপনে।

দুর্বোধ যন্ত্রণা, আমি আকাশের থেকে
বিপুল রহস্যে চোখ নামালাম। যেন কারও প্রতি
অভিমান আরও শুদ্ধ কান্নায় বারেকে
উজ্জ্বল, কী শুভ্র আমি হয়েছি যে ঃ
প্রজাপতি, কতো প্রজাপতি!

চিত্রশিল্পী উইলিয়ম ব্লেক

শিবনারায়ণ রায়

The Enquiry in England is not whether a Man has Talents and Genius, But whether he is Passive and Polite and a Virtuous Ass and obedient to Noblemen's Opinions in Art and Science. If he is, he is a Good Man. If Not, he must be starved......

Poetry and Prose of William Blake, Ed. Geoffray Keknes, পৃঃ ৭৭৯

....I am under the direction of Messengers from Heaven. Daily and Nightly; but the nature of such things is not, as some suppose, without trouble or care. Temptations are on the right hand and left; behind, the sea of time and space roars and follows swiftly; he who keeps not right onward is lost, and if our footsteps still in clay, how can we do otherwise than fear and trouble ?....

টমাস বাট্স্-কে লেখা ব্লেকের চিঠি, ১৮০২।
ঐ, পৃঃ ৮৫৫॥

—এক—

জীবদ্দশায় ব্লেকের প্রতিভা তাঁর দেশবাসীর কাছ থেকে কোনো স্বীকৃতি পায়নি। এবং যদিও ইংরেজি কবিতার ইতিহাসে রোমান্টিক যুগের প্রবর্তক হিসেবে পরবর্তী কালে তিনি কিছুটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন, তবু তাঁর গ্রন্থাবলীর একটা বড় অংশ আজও সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য। অন্যদিকে বিলেতি চিত্রশিল্পের ইতিহাসে কিছুদিন আগে পর্যন্তও তিনি ছিলেন অপাংক্তেয়ঃ ওয়ালটার আর্মস্ট্রং তাঁর "আর্ট ইন গ্রেট-ব্রিটেন অ্যাণ্ড আয়ারল্যাণ্ড" কেতাবে কিম্বা উইলিয়ম অর্পেন তাঁর "আউটলাইন অব্ আর্ট" গ্রন্থে ব্লেকের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেননি। অথচ সম্ভবত শেক্সপীয়র, মিল্টন, ব্রাউনিং এবং ইয়েটসকে বাদ দিলে ব্লেকের সংগে তুলনীয় কবি প্রতিভা ইংরেজি সাহিত্যেও দুর্লভ; এবং পশ্চিমের সেরা ছবি-আঁকিয়েদের তালিকায় যে তিন জন ইংরেজ হয়ত যায়গা দাবী করতে পারেন, তাঁরা হচ্ছেন হোগার্থ, ব্লেক এবং টার্নার।

ব্রিটিশ মিউজিয়মে ব্লেকের দ্বিশত জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী দেখে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, এমন একটা অসামান্য প্রতিভা নিজের দেশে কেন স্বীকৃতি পেল না। সংগে ছিলেন শ্রীমতী প্যাট্রিসিয়া লিভিস। ইনি নিজেও ছবি আঁকিয়ে। বললেন, কারণ ব্লেক রফা করতে শেখেননি, এবং যেজন রফা করতে গররাজি, ইংরেজ তাকে চিরদিনই সন্দেহের চোখে দেখে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর এক গরিব ঘরে ব্লেকের জন্ম। ছেলেবয়েস থেকেই বাস্তব জগতের চাইতে কল্পনার জগৎ তাঁর কাছে বেশী সত্যি বলে ঠেকত। গল্প আছে চার বছর বয়েসে ঘরের জানলায় ঈশ্বরের মুখ প্রত্যক্ষ করে শিশু ব্লেক ভয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। গাছের ডাল থেকে দেবদূতেরা নাকি তার সংগে গল্প করত, মাঠে তার সংগী হত আদ্যিকালের এজেকিএল, আইসায়া। শেষদিন পর্যন্ত শরীরী স্ত্রী-পুরুষদের চাইতে দেবদূত, প্রেত, প্রফেট এবং স্বকপোলকল্পিত চরিত্ররাই ছিল ব্লেকের কাছে অনেক বেশী প্রত্যক্ষ। গরীব বাপের সাধ ছিল ছেলেকে আঁকার ইস্কুলে পাঠান, কিন্তু সাধ্যে কুলোয়নি। তখনকার ইংল্যাণ্ডে গরিবঘরের ছেলেমেয়ের সাধারণ লেখাপড়ারও বিশেষ সুযোগ ছিল না। চোদ্দ বছর বয়েসে ব্লেক এক এনগ্রেভারের অ্যাপ্রেণ্টিস নিযুক্ত হন। সাত বছর কাটে শিক্ষানবিশীতে, তারপর নিজেই এনগ্রেভিং এবং ছাপাখানার দোকান খুলে বসেন। একাজ থেকেই এই কবি-শিল্পীকে সারা

উইলিয়ম ব্লেক অংকিত 'দি এনসেণ্ট অফ ডেজ'

জীবন জীবিকা উপার্জন করতে হয়েছে। আর কীসে উপার্জন! এনগ্রেভিং করে, অন্যের বই চিত্রণ অলংকরণ করে, ছাব ছেপে বই বাঁধিয়ে বছরের পর বছর ব্লেকের গড়-পড়তা সাপ্তাহিক আয় দশ শিলিং-এর উপরে ওঠেনি। বিলেতে সেটা যন্ত্রশিল্পের যুগ: প্রগতির দাম উসুল হচ্ছিল কারি-গরদের উপর দিয়ে। ছবি-আঁকিয়ে হিসেবে ব্লেকের পক্ষে স্বীকৃতি পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না: ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর ছবির যে প্রদর্শনী করেন, তার খরচা পর্যন্ত তুলতে পারেননি। অথচ যন্ত্র-শিল্পের প্রসারের চাপে কারুশিল্পীদের তখন মুমূর্ষু অবস্থা। ফলে সারা জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুঝে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগস্ট ব্লেক যখন মারা গেলেন, তখন এই অমর শিল্পীর দেহ আর তিনজন নিঃসম্বল ভিখিরীর শবের সঙ্গে একত্রে কবর দেওয়া হল। কবরের পাথরে নাম লেখার পয়সা না জোটায় তাঁর সমাধিক্ষেত্র আজও নাকি অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

কিন্তু সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যে বঞ্চিত হলেও ব্লেক অসুখী ছিলেন না। পঁচিশ বছর বয়েসে তিনি এক মালীর নিরক্ষর মেয়ে ক্যাথরিন সোফিয়া বুচারকে বিয়ে করেন। তাঁকে তিনি নিজে লেখাপড়া শেখান। পরে ক্যাথারিন স্বামীর পাণ্ডুলিপি কপি

ব্লেক অংকিত 'ডেথ্ অন্ দি পেল্ হর্স'

করতেন, তাঁর ছবিতে রং লাগাতে শিখে-ছিলেন, ব্লেকের প্রতিকৃতিও তিনি এঁকে-ছিলেন, এমনকি স্বামীর রহস্যময় কল্পলোকে বিচরণ করার সামর্থ্যও নাকি তাঁর জন্মেছিল। স্বামীকে তিনি সন্তান উপহার দিতে পারেননি। কিন্তু ইয়েটসের ভাষায় "সে অভাব তিনি ভরে দিয়েছিলেন সীমাহীন প্রেমে, ত্রুটিহীন বন্ধুত্বে"। কখনো কখনো ঘুম থেকে উঠে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতেন পনেরো বিশ ক্রোশ পথ; পথে যা জোটে খেয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরতেন রাতে তারার আলোয় পথ দেখে; মাঝরাতে স্বামীর খেয়াল মাফিক বিছানা ছেড়ে উঠে হাত ধরাধরি করে দুজনে বসে থাকতেন ভোরের আলোর প্রতীক্ষায়। কখনো-বা আদম ইভ হয়ে দুজনে গিয়ে বসতেন বাড়ির পিছনের বাগানে; তাঁদের নিষ্পাপ নগ্নতাকে সর্পবেশী শয়তান জ্ঞান-বৃক্ষের আপেল ফল খাওয়ার জন্যে প্রলুব্ধ করত।

ধৈর্যশীলা সহৃদয়া সহধর্মিণীর প্রশ্রয়ে অর্ধোন্মাদ শিল্পী দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন সাধনায় গড়ে তুলেছিলেন তাঁর কল্পনার জগৎ। গল্পে আছে, ব্রহ্মার উপরে অভিমান করে বিশ্বা-মিত্র আলাদা এক নক্ষত্রলোক সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু পর্যাপ্ত যোগবল না থাকায় সে জগৎ শেষ পর্যন্ত টেঁকেনি। ব্লেকও তাঁর সমাজ পরিবেশের প্রতি বীত-শ্রদ্ধ হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বকপোল-কল্পিত রূপের জগতে; রেখা, রং এবং ব্যঞ্জিত বাক্যের ঊর্ণায় বোনা সে-জগৎ সময়ের স্পর্শে ম্লান না হয়ে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে। তার কারণ, সামাজিক বিধি-নিষেধের চাপে বিশীর্ণ, প্রথাবদ্ধ, হিসেবী বুদ্ধির পরামর্শে সংকুচিত মানবীয় অস্তিত্বকে ব্লেক দুর্জয় সাহসে মুক্তি দিতে পেরেছিলেন আদিম এবং নিত্য, প্রাতিস্বিক

অথচ সর্বজনীন, প্রবৃত্তি-পরিচালিত স্বপ্নের নির্দিগন্ত আকাশে। প্রথম মহা-যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে স্যুররেয়ালিস্ত আন্দোলন গড়ে উঠবার প্রায় সোয়াশো বছর আগে বেনের দেশ বিলেতের রাজধানীতে বসে এই অবজ্ঞাত শিল্পী ঐ আন্দোলনের মূল প্রত্যয়টিকে শিল্পরূপে যেভাবে সার্থকায়িত করেছিলেন, তাঁর অতিপ্রাকৃত-তন্ত্রী উত্তরসাধকদের মধ্যে অতি অল্প ব্যক্তিই সে সার্থকতার কাছাকাছি পৌঁছতে পেরেছেন।

ব্লেকের মুক্তিস্পৃহায় কোন খাদ ছিল না। কিছু ফাঁক ছিল তাঁর মননে, তাঁর শিল্প-কর্মে, তাঁর উপাদান সংগ্রহে। শিল্পী হিসেবে তাঁর ত্রুটি স্পষ্ট। পূর্বসূরীদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে অল্প কথার মধ্যে অনেকখানি অর্থ সঞ্চারিত করার বৈদগ্ধ্য তাঁর রচনায় দুর্লভ। লিরিক কবি হিসেবে তিনি অসামান্য, কিন্তু তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে লিরিকের অংশ আর কতটুকু? প্রফেসি, দীর্ঘকাব্য, নাটক, সব মিলিয়ে তাঁর লেখার পরিমাণ নেহাৎ কম নয়: কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সংযমের অভাবে বাগ্মিতা বাগ্মিতায় পর্যবসিত হয়েছে। ফলে ভবিষ্যৎদ্রষ্টার মুখোসের আড়ালে কবি ব্লেকের মুখ অনেক সময় আর নজরে আসে না। তাছাড়া যেসব প্রতীকের মারফৎ তিনি তাঁর ভাবনা-অভিজ্ঞতা-আবেগরাজিকে রূপ দিয়েছেন, তারা তাঁর কল্পনায় প্রত্যক্ষ হলেও অধিকাংশ পাঠকের কাছে তাদের অর্থ পণ্ডিতদের বিস্তর টীকা ভাষ্য সত্ত্বেও আজো অনেকটা অনধিগম্য। তাঁর ব্যবহৃত বেশীর ভাগ প্রতীকই পূর্বসূরী মিস্টিকদের কাছ থেকে পাওয়া। কিন্তু তাঁর কল্পনায় তারা যে অর্থের ধারক এবং বাহক, তা প্রায়শই আনাতিক্রম্যভাবে ব্যক্তিগত। এমন কি সন্দেহ করা যায় যে, এতই প্রতীকের অর্থ রচনা থেকে রচনায় পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে ব্লেক-ভক্ত এ ই হাউসম্যানকে বলতে হয়েছে ব্লেকের কবিতার অর্থভেদ নিষ্প্রয়োজন; শুধু কান পেতে তাঁর দিব্য সুর শোনাই রসিক পাঠকের পক্ষে যথেষ্ট।

অন্যধারে ছবি আঁকতে গিয়ে ব্লেক বহি-র্জগত থেকে উপাদান আহরণের পন্থাকে সযত্নে বর্জন করেছিলেন। প্রকৃতি, তাঁর মতে, শয়তানের সৃষ্টি ঃ 'প্রাকৃতিক রূপের অনুসন্ধান আমার কল্পনাকে দুর্বল, নিষ্ক্রিয় করে দেয়।' তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমকালীন ইংরেজ ছবি আঁকিয়েদের রীতিকে তিনি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করতেন। (বিশেষ করে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত রয়্যাল অ্যাকাডেমির সভা-পতি যোশুয়া রেনল্ড্‌সকে)। অথচ অন্য দেশের অথবা কালের সেরা আঁকিয়েদের কাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল সামান্য। যেটুকু বা পরিচয় ছিল, তাও প্রায় ক্ষেত্রে

মূলের সঙ্গে নয়, কপির সঙ্গে। এই স্বল্প-জ্ঞানের উপর নির্ভর করে তিনি টিশিয়ানকে গাল পেড়েছেন 'ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র অনুকারক' বলে। উক্ত মহাশিল্পীর পুরুষেরা নাকি 'চামড়ার তৈরী' আর 'মেয়েরা খড়ি মাটির'। পূর্বসূরীদের মধ্যে এক মিকেলাঞ্জেলোকে তিনি গুরু হিসেবে স্বীকার করতেন, কিন্তু এনগ্রেভিং-এর কাজে ব্লেকের যতই দক্ষতা থাক, মিকেলাঞ্জেলোর মত তীক্ষ্ণবলিষ্ঠ রেখায় প্রাণময় ত্রিবেধ রূপসৃষ্টির রহস্য তিনি ভেদ করতে পারেননি। তাঁর অঙ্কনশৈলী এবং উদ্ভাবনী শক্তির মধ্যে তাই অনেক সময়েই মস্ত ফারাক রয়ে গেছে।

এসব অভিযোগ সঙ্গত; তা সত্ত্বেও ব্লেক যে মহৎ কবি এবং অসামান্য চিত্রকর এবিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ ব্লেককে বলেছিলেন পাগল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, "এই মানুষটির পাগলামি স্কট কিংবা বায়রণের বিচক্ষণতার চাইতে আমাদের মনকে অনেক গভীরভাবে আলোড়িত করে।" ব্লেক যে অতিপ্রাকৃতলোককে বিশ্বাস করতেন, মানবীয় কল্পনার বাইরে তার কোন অস্তিত্ব আছে, একথা ভাবার স্বপক্ষে যুক্তি দেখি না। কিন্তু ব্লেক সেই জাতের দুর্লভ মানুষ, যাঁদের কাছে কল্পনার জগৎ প্রাকৃতিক জগতের চাইতে অনেক বেশী প্রত্যক্ষতা অর্জন করেছিল। এবং কাবালা, বোএম কিংবা সুইডেনবর্গের গূহ্যতত্ত্ব থেকে প্রতীকের উপাদান সংগ্রহ করলেও ব্লেকের কল্পনার মূল উৎস ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ অনুভূতিবোধ, ঐকান্তিক আবেগ এবং অসজ্জ প্রবৃত্তি। ফলে তাঁর প্রতীকের অর্থ-ভেদ আমরা করতে পারি বা না পারি, তাদের আড়ালে এই উৎসের প্রবল অস্তিত্ব প্রাত্যহিক অভ্যাসের জড়তাকে ভেদ করে আমাদের চৈতন্যের মূলে ধাক্কা মারে।

—দুই—

ব্লেক কল্পনাকে দুই জাতে ভাগ করেছিলেন। গ্রিসিয়ান আর গথিক। তাঁর মতে গ্রিসিয়ান মন গাণিতিক রূপের সাধক ঃ যুক্তিধর্মী স্মৃতির মধ্যে এ রূপ নিত্যতা লাভ করে। অন্যধারে জৈব রূপ বা শাশ্বত অস্তিত্বের সাধনা গথিকের বৈশিষ্ট্য। এ বিভাগ কতখানি সঙ্গত, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ আছে; কিন্তু ব্লেক গথিককেই তাঁর আদর্শ বলে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য গথিক শিল্পরীতির সঙ্গে ব্যাপক পরিচয়ের সুযোগ তাঁর ঘটেনি; এবিষয়ে যেটুকু তাঁর জ্ঞান তা প্রধানত ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি এবং অন্য কয়েকটি প্রাচীন বিলেতি গির্জা থেকেই আহৃত। গথিক বলতে তিনি বুঝেছিলেন, সেই শিল্পরীতি যা প্রকৃতির অনুকরণ ছেড়ে ধ্যানের দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ রূপ সৃষ্টি করে, যা তলপৃষ্ঠ পটের ছবিতে বেধের ইঙ্গিত আনার প্রয়াস' না পেয়ে রেখার দৃঢ় বন্ধনের মধ্যে প্রাণের প্রোজ্জ্বলতা এবং গতি সঞ্চারে উদ্যোগী, যা রংএর সঙ্গে রং মেশানো আলো-আঁধারির আকর্ষণ এড়িয়ে বিশুদ্ধ বর্ণের সমাবেশে ব্যঞ্জনাসৃজনে সক্ষম। ব্লেকের সেরা ছবিগুলো এই রীতিতেই আঁকা। বৃটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত শিল্পসম্ভারের মধ্যে অ্যাসিরিয়া এবং ব্যাবিলনের আইকন-গ্রাফির সঙ্গেই ব্লেকের শিল্পরীতির সবচাইতে বেশী মিল চোখে পড়ে। এদের মত ব্লেকের ছবিতেও বিশ্বপ্রকৃতি মানব-রূপকে আশ্রয় করেই শিল্পীর কল্পনায় প্রতিফলিত হয়েছে। অঙ্গসংস্থান বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অতিসামান্য; মডেল সামনে রেখে আঁকতে তিনি শেখেননি; তাঁর অধিকাংশ ছবিই হল কোন না কোন কাহিনীকে রং-এ এবং রেখায় প্রত্যক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্যে আঁকা। ফলে শিল্পী হিসেবে ব্লেকের ত্রুটি বিস্তর। কিন্তু সব ত্রুটি ছাপিয়ে যেখানে তিনি অসামান্য, সে হল তাঁর রেখার ছন্দময়তায়, তাঁর বর্ণ-বিন্যাসের দীপ্তিতে, এবং সবচাইতে যা বড়, তাঁর কল্পনার ক্লান্তিহীন প্রাবল্যে। ছবির মধ্য দিয়ে যে জগৎ তিনি সৃষ্টি করেছেন, তার প্রাণৈশ্বর্যে অভিভূত না হয়ে উপায় নেই। বাহ্যরূপের অনুকরণ নয়, মননের স্পষ্টতা নয়, প্রাণশক্তির উৎক্ষেপ তাঁর সেরা ছবি এবং সেরা লিরিকের উৎস। এই উৎক্ষেপ তাঁর আঁকা গাছ, পাহাড়, সমুদ্র, দেবতা, নারী, প্রতিটি আকৃতিতে ছন্দের

সঞ্চার করেছে। উল্লাস এবং আতঙ্ক, করুণা এবং জিঘাংসা, প্রেম এবং ঘৃণা—আদিম অসংস্কৃত প্রাবল্যে স্ফুরিত হয়েছে তাঁর ছবির জগতে। মিকেলাঞ্জেলোর প্রজ্ঞা এবং কলানৈপুণ্য তাঁর ছিল না, কিন্তু কল্পনার এই নৈসর্গিক গতিশীলতায় তিনি তাঁরি আত্মীয়। অন্তত "বুক অব জব"এর জন্যে করা তাঁর এনগ্রেভিং এবং "ডিভাইন কমেডির" জন্যে আঁকা তাঁর রঙিন ছবিগুলো দেখলে এ আত্মীয়তা বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

বিলেতি চিত্রশিল্পের ইতিহাসে ব্লেক একক পুরুষ। প্রাচীন কেল্টিক এবং মধ্যযুগীয় অ্যাংলো-স্যাক্সন শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর কিছুটা মিল আছে; কিন্তু ব্লেকের তীব্রতা, গতি বা প্যাশনের সন্ধান পূর্বোক্তদের ক্ষেত্রে দুর্লভ। রেনেসাঁসের পর থেকে বিলেতি চিত্রকলা নিজের স্বকীয়তা হারাতে শুরু করে; হলবেইন, রুবেনস, ভানডাইক প্রমুখ বিদেশী শিল্পীদের প্রতিপত্তির চাপে দেশী চিত্রকরেরা ক্রমেই নিজেদের আত্মপ্রত্যয় হারিয়ে ফেলে। তাদের শিল্পচর্চা অন্যদের অনুকরণে পর্যবসিত হয়। এ অবস্থা থেকে বিলেতি চিত্রশিল্পকে উদ্ধার করলেন হোগার্থ। হোগার্থও ব্লেকের মত প্রকৃতি থেকে অনুকরণের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ব্লেক এই বিরোধকে নিয়ে গেলেন তার ন্যায়সঙ্গত পরিণতিতেঃ সিম্বলিস্ট চিত্রকলার তিনিই জনক। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রতীকবাদীর প্রতীক একান্তভাবেই ব্যক্তিগত; প্রাকৃতিক জগতের বিচিত্র রূপের মত সে প্রতীক যদি তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ না হয়ে ওঠে, তাহলে রেখা রঙের মধ্যে তার যে প্রকাশ, তাতে প্রাণসঞ্চার ঘটে না। ব্লেকের কল্পনায় প্রতীক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের প্রত্যক্ষতা অর্জন করেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ ইংরেজি ঐতিহ্যে তিনি ব্যতিক্রমমাত্র। বৃটিশ মিউজিয়মে এবং পরে ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়মে ব্লেক এবং তাঁর সমকালীন ও উত্তরসাধক শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনী দেখে ব্লেকের অনন্যতা বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ রইল না। ফ্যুসেলির রেখাঙ্কনের হাত ব্লেকের চাইতে পাকা, কিন্তু ব্লেকের প্রোজ্জ্বল, স্বতঃসিদ্ধ কল্পনায় তিনি একেবারেই বঞ্চিত। এই কল্পনার কিছুটা আভাস মেলে স্যামুয়েল পামারের ছবিতে; সম্প্রতি কালে পামারের অনুকরণে জন ন্যাশ এবং গ্র্যাহাম সাদারল্যান্ড ইংরেজি চিত্রশিল্পে ব্লেকের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া ও অ্যালবার্ট মিউজিয়মে ব্লেকের ছবির পাশেই এঁদের ছবির প্রদর্শনী দেখে এ চেষ্টার সার্থকতা বিষয়ে আমি অন্তত খুব উৎসাহিত বোধ করিনি। অন্য ক্ষেত্র থেকে একটা উদাহরণ দিলে আমার নিরুৎসাহের কারণটা হয়ত একটু স্পষ্টতর হবে। তফাৎ যেন মেঘনাদ বধ কাব্যের সঙ্গে বৃত্তসংহার কাব্যের, অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্গে রচনার।

শিল্পী হিসেবে ব্লেকের যদি উত্তরসাধক খুঁজতেই হয়, তবে বিলেতের চাইতে কন্টিনেন্টেই সে সন্ধান সার্থক হবার সম্ভাবনা বেশী। বিশুদ্ধ এবং মিশ্রণবিমুখ বর্ণ প্রয়োগের দিক থেকে ব্লেককে হয়ত ফোভিস্তদের পূর্বসূরী বলা চলে। বেধহীন তলপৃষ্ঠতায় রেখাধৃত রূপসৃষ্টিতে তিনি মাতিসের আত্মীয়। কিন্তু তাঁর সবচাইতে বেশী মিল সম্ভবত আধুনিক এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রকরদের সঙ্গে। জৈবরূপের অনুকরণ না হয়েও জীবন্ত, নিসর্গের প্রতিফলনে পরাঙ্মুখ হয়েও নৈসর্গিক, রহস্যময় অবচেতনের গুহা থেকে উৎসারিত হয়েও সূর্যকরোজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ রেখার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েও গতিশীল—ব্লেকের ছবি প্রাচীন অ্যাসিরিয়ান-ব্যাবিলিয়ান শিল্প কল্পনা এবং নব্য এক্সপ্রেশনিস্টদের রীতির মধ্যে সেতু বন্ধ রচনা করেছে।

—তিন—

ব্লেক লিখেছিলেন, "আমার কাজ সৃষ্টি করা। আমি অন্যের সৃষ্ট জগতের দাস হতে চাই না, নিজের আত্মসম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করতে চাই। প্রাণ এবং প্রেরণা যাতে শুকিয়ে না যায় সেই উদ্দেশ্যেই ত' আমার এই দিনরাত পরিশ্রম।" অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "প্রকৃতি যেসব রূপ সৃষ্টি করে, মনের সৃজিত রূপ তার চাইতে অনেক বেশী বলিষ্ঠ, পরিচ্ছন্ন, গতিশীল।" একথার মধ্যে সত্য যেটুকু আছে, বিপদের সম্ভাবনা বোধ হয় তার চাইতে কম নেই। মন ত শূন্য থেকে সৃষ্টি করে না, প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেই মনকে কাজ করতে হয়। প্রকৃতির প্রতি যে-কল্পনা উদাসীন, একধারে পুষ্টির অভাবে তা যেমন শীর্ণ হয়ে আসে, অন্যধারে তার কল্পিত রূপে অসংলগ্নতা দেখা দেবার আশঙ্কা খুব বেশী। স্বতঃসিদ্ধতার অহঙ্কারে সে কল্পনা হয়ত লক্ষ্য করে না যে, তার সৃজিত রূপ সংখ্যায় স্বল্প এবং বৈচিত্র্যে দরিদ্র; প্রকৃতি থেকে উপাদান আহরণের অভাবে সে কল্পজগতে রূপের পুনরাবৃত্তি এড়ানো কঠিন। অপরপক্ষে প্রকৃতির সম্বন্ধধৃত জগৎকে উপেক্ষা করার ফলে সেই কল্পিত রূপের গঠনে সৌষম্য এবং অর্থ-গ্রাহ্যতা প্রায়শই দুর্লভ হয়ে ওঠে। এসব কারণেই অধিকাংশ সিম্বলিস্ট শিল্পপ্রচেষ্টা হয় কিছুটা এগিয়ে থমকে গেছে, আর নয়ত পাগলামির গোলকধাঁধায় পথ হারিয়েছে। অর্থাৎ প্রকৃতিবোধ হল এরিয়াডনের সেই সুতো গ্রীক পুরাকাহিনী-কথিত মিনটোরকে জয় করার পর শিল্পী থিসিয়ুস যা অবলম্বন করে অন্ধকার গুহা থেকে আবার বেরিয়ে আসতে পারে।

ব্লেক বহিঃপ্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে অন্তঃপ্রকৃতিকেই শিল্পের একমাত্র উৎস এবং উপজীব্য ঠাওরেছিলেন। আমার বিশ্বাস, শিল্পী হিসেবে তার জন্যে তাঁর কম ক্ষতি হয়নি। তাসত্ত্বেও যে তাঁর কিছু কবিতা এবং অনেক ছবি সিম্বলিস্টদের বিভ্রান্তি এড়িয়ে সৎ শিল্পের সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছে, তার কারণ অন্তঃপ্রকৃতির উৎঘাটন ব্যাপারে তাঁর মনে কিছুমাত্র দ্বিধাসংকোচ ছিল না। এই নির্ভীক সততা হয়ত তাঁকে পাগলামির দিকে টেনে নিয়ে গেছে, কিন্তু কখনোই নির্বীর্য অভ্যাসাশ্রয়িতার সঙ্গে রফা করতে দেয়নি। ফলে তাঁর শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে আমার মত সংশয়ী ব্যক্তির পক্ষেও ব্লেকের সৃষ্টির সান্নিধ্যে এসে গভীরভাবে বিচলিত না হওয়া অসম্ভব।

পথে বেরিয়ে প্যাট্রিসিয়া বললেন, "ব্লেকের গুরুও ছিল না, শিষ্যও নেই। ব্যতিক্রমদের ওসব বালাই থাকে না। সুস্থ লোক পাগলের কাছ থেকেও টেকনিক হয়ত শিখতে পারে, কিন্তু ভিসন (vision)-এর অংশভাগ সে কি করে হবে?"

সন্তোষকুমার ঘোষ
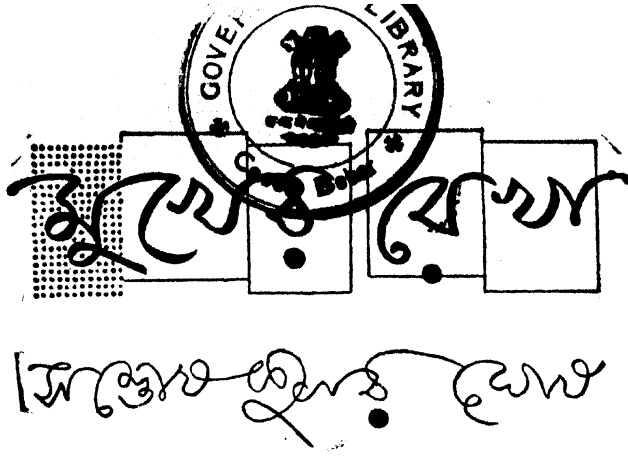
(১০)

চোখ তুলেই সৌর চোখ নামিয়ে নিয়েছিল।

এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক মুখোমুখি। জানালার নীচের পাল্লাটা অন্য দিনের মত আজও বন্ধ। হয়ত হাঁটু ভেঙে বসে আছে, কিংবা ওখানে একটা নীচু জলচৌকিও থাকতে পারে; অথবা বেতের একটা মোড়া।

কী করছে? বই পড়ছে? মনে ত হয় না। শুধু চেয়েই আছে। কাঁধের ওপরে ওর শরীরের সেটুকু, মাত্র সেটুকুই সৌরর পড়ার টেবিল থেকে দৃশ্য। অর্থাৎ বেগনি শাড়িটার আঁচলের সামান্য আভাস, অর্ধ-চন্দ্রাকারে কাটা ব্লাউজের গলার বোতামটা, থুতনি—সেটা একটা সোনার শিকে ঠেকান, নাক, বড় বড় দুটি চোখ (এই চোখকে কী বলে?—আয়ত? কথাটা সৌর তখনই সবে শিখেছিল। আর রাশি রাশি চুল।

চেয়ে আছে। এই যে সৌর এখন বইয়ের পাতায় মুখ রেখে ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার-কাহিনী পড়ছে, এখনও চেয়ে আছে। সৌর যদি এই বই সরিয়ে রেখে লজিকটা টেনে নেয়, গুন গুন করে পড়ে 'বারবারা সেলারেণ্ট- ডেরিয়াই -ফেরিও', তখনও থাকবে। কিন্তু যেই সৌর বইয়ের পাত মুড়ে ওপর দিকে চাইবে, কিংবা চাইবে তার দিকে, তখন আর থাকবে না, সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নেবে। সৌর বোঝে না, কেন। চোখ মেলে যার চেয়ে থাকতে আপত্তি নেই, চোখাচোখিতে তার সঙ্কোচ কেন। যে নির্লজ্জ, সে সেই সঙ্গেই কেন এত ভীরু। আবার এই ভীরুতাটুকু আছে বলেই হয়ত নির্লজ্জ দৃষ্টিটুকুকে এত সুন্দর লাগে অথবা নির্লজ্জ চাহনির জন্যই ভীরুতাকে।

আবার চোখ তুলল সৌর, আবার নামাল। সরিয়ে রাখল ইংরাজী পাঠ্য বই। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার-বিবরণীতে কোন রস নেই। থাকলেও, এই দৃষ্টি বিনিময়ের মুহূর্তটির সঙ্গে ঠিক মেলে না। সৌর অতএব বাংলা বইটা টেনে নিল। পাতার পর পাতা উলটিয়ে চলে গেল কাব্যাংশে। একটা কবিতা পড়তে শুরু করল।

"অয়ি, ভুবনমনোমোহিনী
অয়ি, নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী—"

পড়তে গিয়ে টের পেল তার গলা কাঁপছে। আজকাল এরকম প্রায়ই কাঁপে, যখনই আবেগ আসে, বুকের ভিতরটা অস্থির হয়, তখনই কথা বলতে গেলে গলা কাঁপে সৌর টের পেয়েছে। কাঁপে চোখের পাতাও। কেবলই পলক পড়ে। সৌর চেয়ে দেখল, তার হাতের আঙুলও কাঁপছে। কেন? অস্থিরতায়? ভয়ে? সুখে?

বেঁচে থাকার যে-সুখের কথা একদিন মোহিতদা আর মিলিদির আচরণ থেকে জানতে পেরেছিল, এ কি তাই? একটি মেয়ে তার দিকে চেয়ে আছে, মাত্র এই অনুভূতিতেই এত সুখ?

সৌর আবার জোরে জোরে পড়ে গেল, "অয়ি ভুবনমনোমোহিনী—"

কে জানে, এই বিশ ফুট উঠোনটুকু আড় হয়ে তার কম্পিত কণ্ঠ ও-পাশের জানালায় পৌঁছচ্ছে কিনা। এই কবিতাটাই বেছে নেবার কোন অর্থ হয় না, সৌর জানে। এর মানে সে যতটা বুঝেছে, এটা কোন কিশোরীকে শোনাবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু অন্য কবিতাই বা এখন পাচ্ছে কোথায়। আর কিছুই মুখস্থ নেই যে, যা আছে, তা আবার পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব দেশবন্দনায়ই একটি কিশোরীর স্তুতি হক।

বোকামি, বোকামি! কয়েক বছর পরে সৌর বুঝেছিল, সেদিন সে যা করেছে তা নিছক বোকামি ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু সেই ষোল-সতের বছর বয়সে বোকামিকে বোকামি বলে চেনা যায় না।

দশ বছর বয়সের অনেক কথা অনেক কাজই যেমন ছেলেমানুষী, ষোল-সতেরো বছর বয়সের বেশীর ভাগ কাজই তেমনি বোকামি। কিন্তু এই ছেলেমানুষী আর বোকামি ধরা পড়ে শুধু পরবর্তীকালের পরিণত চোখে।

একটা কাক বিশ্রী গলায় ডাকতে শুরু
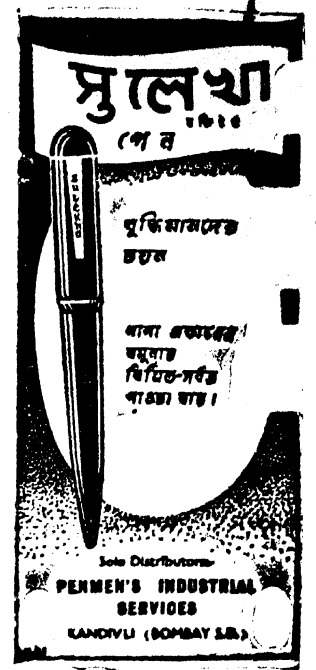
করে সৌরকে জানিয়ে দিল যে, কলেজে যাবার বেলা হয়েছে। আবার সে মুখ তুলে জানালা দিয়ে চাইল। তখনো সে দাঁড়িয়ে। হাতে একটা তেলের শিশি, সম্ভবত এখন স্নান-ঘরে ঢুকবে। কতকটা যান্ত্রিকভাবে নিজের চুল মুঠো করে ধরল সৌর, রুক্ষ লম্বা লম্বা জট পাকানো। আর তখনই মনে পড়ল, ইস্ কতদিন এই চুলে কাঁচি পড়েনি। (কোলকাতার সেলুনের অভিজ্ঞতা ইতিমধ্যেই একবার দু'বার হয়েছিল। সেখানে উমেদারের মত ঘণ্টাখানেক বসে থাকতে হয়, অনেকক্ষণ ধরে খুশি থাকতে হয় ছেঁড়া একটি খবরের কাগজের টুকরো নিয়ে,—তার ভুল বাঙলা, মুড় অদরকারী খবর আর ভাঙা টাইপ পিঁপড়ের মত মগজটাকে কুরে কুরে খেয়ে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার সৃষ্টি করে, তখনও ডাক পড়ে না। হাতে হাতে কাঁচি সমানে চলে, সেই ঐকতানে বিন্দুমাত্র স্বরসংগতি নেই। যখন ডাক পড়ে তখন খরিদ্দারেরা একের পর এক চেয়ারে গিয়ে বসে, টলতে টলতে, তাদের স্নায়ু যেন অসাড়, যেন বলির পশু হাঁড়িকাঠে মাথা দিচ্ছে; কিংবা ফাঁসির আসামী বধ্যমঞ্চে আরোহণ করছে। বধ্যমঞ্চ কথাটা সৌরর বিশেষ করে মনে হয়েছে এই কারণে যে, সে নিজে নিরস্ত্র, শানিত যন্ত্রাদি যা কিছু সব সেলুনওয়ালার হাতে। তাই বলে তাদের হিংস্র মনে করলে ভুল হবে। এরাই আবার কুসুমাদপি মৃদু হতে জানে। যেই সৌর চেয়ারে গিয়ে বসল অমনই একজন তার মাথাটা যেন টেনে নিল একবারে বুকের ভিতরে। তারপর কতক্ষণ ধরে যে সেই মাথাটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা দিক থেকে দেখল, হিসাব নেই। কাঁচি অবশ্য সমানেই চলে, কখনো চুল ছোঁয়, কখনো ছোঁয় না। সব শেষে গন্ধ তেল ঢেলে, স্নো ঘষে ঈষৎ আদরের ভঙ্গীতে দাঁড় করিয়ে দেয়। নীরব ইশারায় বলে এবার তোমার ছুটি। কিন্তু এই দীর্ঘ প্রক্রিয়াটাই সৌরর ভালো লাগে না। সে লাজুক, স্বভাব-অসহিষ্ণু।)

কিন্তু ভালো লাগুক আর না লাগুক এবার তাকে সেলুনে যেতেই হবে। আবার যায় বা কি করে। ও যে এখনো ওপাশের জানালায় দাঁড়িয়ে। যেমন করে ঠাকুর ঘরে পিসীমা মাথা নুইয়ে দিয়ে প্রার্থনা করেন, তেমন সুরেই সৌর মনে মনে বলতে থাকল,—"তুমি ওখানে কেন দাঁড়াও, কী দেখ? আমাকে? আমাকে দেখার কী আছে। দেখতে ত লোকে যাকে বলে ভালো, আমি তা নই, আমার চোখ দুটি বিলোল নয়, নাক তাদৃশ উন্নত নয়, দেহ নয় সুগঠন, রঙ ত গৌর নয়ই। তা ছাড়া সবচেয়ে যেটা লজ্জার কথা—আমার চেহারায়, পোশাকে, চাউনিতে গ্রাম্যতার ছাপ আছে আমি জানি। তুমি কি তাই দেখ, মজা পাও? তাই যদি হয় তবে তুমি আর দাঁড়িয়ো না, আমার দিকে চেয়ো না, আর চাইলে মুখ ফিরিয়ো না। তুমি জানো না, তুমি চাইলে আমি অস্বস্তি বোধ করি, মুখ ফেরালে কী যন্ত্রণা পাই। আর যদি শুধু মজা পাওয়াই তোমার মনে থাকে, তবে তুমি যাও। বিনামূল্যে বিলোবার মত মজা আমার নেই।"

এই স্বগতোক্তিটুকু করে সৌর শান্ত হয়েছিল, তার চিত্তের চাঞ্চল্য কমে এসেছিল। এইবারে মাথায় তেল ঘষে স্নান-ঘরে গিয়ে ঢুকতে তার বাধা নেই।

স্নান নামমাত্র, খাওয়া মানে অন্নস্পর্শ। ঠিক পনের মিনিট পরে গায়ে শার্ট গলিয়ে সৌর খাতাপত্র নিয়ে যখন কলেজে যাবার জন্যে তৈরি হল, তখনও চোখ দুটো একবার ও-বাড়ির জানালার দিকে গিয়েছিল। না, নেই। অপলক একটি দৃষ্টি ওখান থেকে সরে গিয়েছে। সরে গিয়েছে কিন্তু সঙ্গ ছাড়েনি। কার যেন পরানের সঙ্গে নীল শাড়ি চলত, সৌরর পিছু পিছু অহরহ আছে কালো অতল দুটি চোখের চাহনি।

এ-দায়, এই জ্বালা মফস্বলের সেই শহরে ছিল না।

কলেজ দূর নয়, হাঁটা পথেও মোটে মিনিট কুড়ি।

এই কয় সপ্তাহে পথটা সৌরর পুরোপুরি চেনা হয়ে গিয়েছে। যাবার পথে একটি দোকানে দাঁড়িয়ে সে পান খায়, সেই দোকানের আয়নাতেই মুখ দেখে। পার্কের কোণের চীনাবাদামওয়ালার সঙ্গেও তার রীতিমত ভাব। দু'পয়সায় সে রোজই দু'চারটে ফাউ পায়। আর দুপুরে দুই পিরিয়ডের ফাঁকে সরবতের দোকানে দাঁড়িয়ে সে বানানার ফোঁটা মেশানো ঘোলের সরবত খাবেই। রোজকার হাত-খরচ দু'-আনার এই হিসাব।

এইসব ছোট ছোট শখ, সামান্য শহুরে বিলাস সৌরর চরিত্রে জমছে। তবু ত এখনও সে আর কজন সহপাঠীর মত দড়ির আগুনে সিগারেট ধরিয়ে গুরুজন-দের লুকিয়ে খেতে শেখেনি। লোভ হয়নি যে, তা নয়, আসলে সাহসে কুলোয়নি।

টুলুর ভীরুতার কিছুটা সৌর শহরেও সঙ্গে করে এনেছে। নইলে সে ত কবেই অন্য সকলের সঙ্গে ম্যাটিনীতে নামকরা সেই বিলিতি ছবিটা দেখে আসতে পারত। রঙীন প্রাচীর-চিত্রে ছবিটির একটি দৃশ্যের নমুনা সে দেখেছে, মুগ্ধ হয়েছে। মূক ছবি বাচাল হয়েছে সৌর জানে, কিন্তু আজও একটিও দেখবার সুযোগ ঘটেনি।

তবু, সন্দেহ নেই, সৌর বদলে যাচ্ছিল। অথবা বদলে নিচ্ছিল নিজেকে। এই শহরটার উপযুক্ত হবার সাধনায় সজ্ঞানে নিজেকে সমর্পণ করেছিল এবং অপরের দিকে চেয়ে চেয়ে, অপরের সঙ্গে তুলনা করে নিজের সাফল্যের বিচার করছিল।

কিন্তু যে পরিবর্তনটা ঘটছিল অলক্ষ্যে; ওই চাহনি আবিষ্কারের ক্ষণ থেকে সেটাই যেন স্পষ্ট হয়ে উঠল। আগে আয়নার সামনে দাঁড়ালে যে ছবিটা ভেসে উঠত, এখনও সেটাই ভাসে, কিন্তু ঠিক যেন সেটা নয়। কিংবা সেটাই, শুধু যে দেখছে তার চোখ দুটি আলাদা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ যাকে দেখছে, সে সৌর, কিন্তু যে দেখছে সে অন্য একজন। সেই একজন কে, তাও সৌর জানে। যে মুহূর্তে সে আয়নার সামনে দাঁড়ায়, সেই মুহূর্তেই তার চোখ দুটি তার খাতা থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়; কিংবা সৌর জানালার ওপাশের ওই মেয়েটির দেখা পায়। তার চোখ দিয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। হাতের উলটো পিঠটা গালে ঘষে আর ভাবে ক্ষুণ্ণ মনে। ভাবে এখনও তার চিবুক আর কপোল এত মসৃণ, এত মেয়েলী কেন। ঠোঁটের উপরের দিকটা অনেক দিনই নীলাভ হয়ে উঠেছে, কিন্তু ক্ষুর লাগাবার উপযুক্ত হয়নি। তা ছাড়া ক্ষুর ছোঁয়াতে সৌরর শুধু লজ্জা নয়, ভয়ও করে।

একবার কামাতে গিয়ে সৌর রক্তারক্তি কাণ্ড করে ফেলেছিল। দেখতেও কেমন বেখাপ্পা লাগছিল, আয়নার দিকে চাইতে কেমন অস্বস্তি বোধ হয়েছিল। নিজেকে ঈষৎ অপরিচিত ঠেকছিল।

তার চেয়ে এই ভাল, ঠোঁটের উপরে এই নীলাভ রেখাটুকু মন্দ কী। যে চোখ দুটি পাশের বাড়ির মেয়েটির কাছ থেকে ধার করে এনেছে, সেই চোখ দুটি তাকে অভয় দিয়ে বলল, "বেশ ত, এই বা মন্দ কী।"

এই পরিবর্তনের কতটা মনের, কতটা শরীরের? সৌর কোন দিন ভেবে কুল পায়নি। মনে যা আছে, তা ত মনেই আছে। কিন্তু শরীরের লক্ষণগুলিকে সহজেই চেনা যায়। তারা এক নজরেই ধরা পড়ে। যেমন কিছুদিন থেকে সৌর লক্ষ্য করছে তার গলা কেমন যেন ভাঙা-ভাঙা, বেসুরো, কর্কশ। একেবারে গোড়ায় অস্বস্তি হয়ে-ছিল, গুরুজনদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সৌর অকারণেই লজ্জা পেত, এখন পায় না। শুধু গলা কেন, গালও কেমন ভাঙা-ভাঙা, শ্রী আর সুষমাটুকু সৌর কবে কী করে খুইয়ে বসল সে নিজেও জানে না। গোটা কপালটা ঘামাচির মত বড় বড় ফুস্কুড়িতে ছেয়ে গেছে, এর নাম ব্রণ। সৌর মাঝে

মাঝে খ‍ুটে খ‍ুটে দেখে। যেগ‍ুলো শ‍ুকনো তার ভেতরে আছে সাদা মতন শাঁস, সেটা বেরিয়ে গেলে একটা কালচে চিহ্নমাত্র পড়ে থাকে। বিশ্রী বিশ্রী গোটা ম‍ুখটাই তার নিজের চোখে কেমন হতর‍ুপ লাগে। এই লাগাটা কে জানে হয়ত সংস্কার মাত্র। স‍ুকুমার কিশোর-আবরণ সরিয়ে দিয়ে যে পর‍ুষ ম‍ুখখানা উঁকি দিচ্ছে, তার আকর্ষণও হয়ত কম নয়। নইলে ওই মেয়েটি চেয়ে চেয়ে দেখবে কেন?

আরো একরকমের অভিজ্ঞতা সৌরর সম্প্রতি হয়েছে, সে জানে না তার তাৎপর্য কী। রাত্রিবেলা আলো নিবিয়ে দিয়ে যেই বিছানায় শ‍ুয়ে পড়ল অমনি যেন তখনি জানালার বাইরে, উপরের আকাশে ফ‍ুটে উঠল অজস্র তারা। তার মধ্যে দ‍ুটি তারা ওই মেয়েটির চোখ। যেন এত রাত্রে অন্ধকারে জানালায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখা যাবে না বলে মেয়েটি উঠে গেছে একেবারে আকাশে, সেখান থেকে নির্নিমেষ চোখে সৌরকে দেখছে।

সৌর স্বপ্নেও তাকে পায়। স্বপ্নে সে আকাশের নয়, ওপাশের জানালারও নয়, একেবারে কাছের। সৌর হাত বাড়িয়ে দেয়, তাকে টেনে আনে, কাছে, আরও কাছে, আর ঠিক তখনই ঘ‍ুম ভেঙে যায়। উপাধান সিক্ত, স্পন্দমান শরীর রোমাঞ্চিত যন্ত্রণায় যেন কঠিন। সেই অব্যক্ত অস্থিরতাই সৌরর সেই বয়সে একমাত্র অস‍ুখ আর সেই অস‍ুখটাই স‍ুখ।

ঘ‍ুম ভেঙে নিঃসঙ্গ শয্যায় শ‍ুয়ে শ‍ুয়ে কতদিন সৌর মনে মনে বলেছে, "তুমি আর ওভাবে চেয়ো না, আমাকে টেনো না। তোমার নির্বাক চোখ দ‍ুটিকে আমার বড় ভয়। তোমাকে জানতে চাই আরো কাছে থেকে, আরো স্পষ্ট করে। কিন্তু তা হবার নয়। আমার ভীর‍ুতাই আমার বৈরী, কুমারী-লজ্জা তোমার। মাঝপথে আমার ভীর‍ুতা আর তোমার লজ্জারই শ‍ুধ‍ু মিলন হতে পারে। হয়ে থাকে; কিন্তু আমাদের কখনো নয়। আমি তোমাকে জানি না। এমন কি তোমার নামও না। কোনোদিন কাউকে শ‍ুনিনি তোমার নাম ধরে ডাকতে। আমি কিন্তু মনে মনে তোমাকে একটা নাম দিয়েছি : স‍ুলক্ষণা। এ নামটা আমার নয়, কোন উপন্যাসে পড়া এক নায়িকার। সেই নামটাই আমি তোমাকে দিলুম। কিন্তু তুমি আমাকে দিলে কী? শ‍ুধ‍ু চাহনি? ও আমি চাইনে, চাইনে।

"এবার আমার কথা বলি। আমার নাম সৌর। আসলে সৌরেশ, ভালো শোনাবে বলে সেটাকে ছেঁটে আমি ছোট করে নিয়েছি। অন্তত নাম থেকে গ্রাম্য গন্ধটা একেবারে ম‍ুছে ফেলতে চেয়েছি। নইলে গ্রামে আমার ডাকনাম ছিল টুল‍ু। ওটা বড় হালকা, ও নামে এখানে, কলকাতায় পিসিমার এই দেওরের বাড়িতে, আমাকে কেউ ডাকে না। কোন্ নামটা তোমার পছন্দ হবে তাও জানি না। আমি তাই তিনটে নামই তোমাকে জানিয়ে রাখল‍ুম। যেটা খ‍ুশি তুমি বেছে নিও। সেই নামে আমাকে চিঠি লিখো।

"অবশ্য চিঠি তুমি কোনোদিন লিখবে না জানি। আমার কিন্তু সাধ হয় তোমাকে চিঠি লিখি। অনেক দিন সাদা কাগজে অনেক ম‍ুসাবিদা করেছিও, শেষ করিনি, আর তোমাকে যে পাঠাইনি তা ত তুমিও জানো। পাঠাবার উপায়ই বা কৈ? যা হয় একটা পথ তুমিই বলে দাও না! ধরো আমি যদি একটা গল্পের বইয়ের পাতার ফাঁকে চিঠিটা রেখে দিই, তারপর একটা কাপড়ে জড়িয়ে সেটা ছ‍ুঁড়ে দিই তোমার জানালায় তুমি কি পাবে? আবার চিঠিটাকে ঘ‍ুড়ির সঙ্গে বেঁধে দিয়েও পাঠানো যেতে পারে। বিকেলে তুমি যখন ছাদে ওঠ, ঘ‍ুড়িটা স‍ুতো ছিঁড়ে পড়বে তোমার পায়ের কাছে, তুমি আমার চিঠিটা কুড়িয়ে নিও। কিন্তু আমি যে ছাই ভালো করে ঘ‍ুড়ি ওড়াতেও শিখিনি।"

একদিন সৌরর ঘরে দরজা জানালা সব বন্ধ ছিল, একটা চড়‍ুই পাখি পথ না পেয়ে উড়ে উড়ে বার বার ফিরে আসছিল তার টেবিলে, শেষে অস্থির হয়ে সৌরর হাতটাই ঠ‍ুকরে দিয়েছিল। নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ ভাবনাগ‍ুলোও তেমনি সেদিন পথ না পেয়ে বার বার সৌররই ব‍ুকের ভিতরে ডানা ঝটপট করেছে। একটি চাহনির বিন্দ‍ুকে কেন্দ্র করে অজস্র পাতার ঘ‍ূর্ণি উড়েছে।

এই নির‍ুপায় অস্থিরতাই সৌরর জীবনে প্রথম প্রেমের, আরো ঠিক করে বলতে গেলে প্রথম প্রেমে পড়ার, অন‍ুভূতি।

(ক্রমশ)

ম নে ম নে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

কিছুই বুঝি বা বুঝিনি অথবা বুঝেছি—
তবু তারে শুধু খুঁজেছি, খুঁজেছি, খুঁজেছি।
এবং খুঁজছি এখনো,
খুঁজবো—আরো ত' খুঁজবো;
যে সুতোর খেই মেলেনি, মেলে না—
তারে মেলাতেই যুঝবো,
—এতদিন যদি যুঝেছি।

যে যাই বলুক, কোনো ক্ষোভ নেই চিত্তে—
আকাশের রঙ পাল্‌টাতে কালো
মেঘের চেষ্টা মিথ্যে।

হয়ত' ভাসিনি হাল্‌কা হাওয়ায় আলতো—
উজানেই তরী বেয়ে গেছি অতলান্ত।
এবং ভিড়িনি গঞ্জে,
চাইনিও কোনো মুজরো;
কিসে কত লাভ খতিয়ে দেখিনি—
পাইকিরি না কি খুচরো,
-পাহারায় মহাকাল ত!

জানি, শুধু আছে—আছেই কোথাও সুপ্ত—
হাজার খুশীর একটি ঝিনুকে
সাগরের সেরা মুক্তো।

আ ত্ম গ ত

অরবিন্দ গুহ

তুমি আর আপন বুদ্ধিতে এত বিশ্বাস রেখো না।
এবার যে বঞ্চনার সঙ্গে তুমি পরিচিত হ'লে!
এতকালে বুঝেছো তো যা তোমার আনন্দবেদনা
তা আসলে সত্য নয়। একে-একে সব গ্রন্থি খোলে
নিষ্করুণ সহৃদয় ভবিষ্যৎ। সবই দেখা হবে
মুখশ্রীর রেখারঙে, ফলে-পুষ্পে, পল্লবে-পল্লবে।

কিন্তু এখনো যে শুনি হৃদয়ে নদীর কলধ্বনি,
তুমি কি এখনো এই বঞ্চনায় বিশ্বাস করো না?
শূন্য করো স্রোতস্বতী, আকাশের অশান্ত অশনি
প্রাণে আনো। প্রাণে রাখো নিষ্কলঙ্ক নিঃসঙ্গ কামনা।
বঞ্চিত হয়েছো ব'লে বঞ্চনা ক'রো না। দেখা হবে।
তখন তোমার ঋণ শোধ ক'রো বজ্রের বৈভবে।

এখনো বিশ্বাস করো সে নিশ্চিত তোমার প্রেমিকা?
সে এসে দাঁড়ায় পাশে, মেশায় সে মধুরশ্যামলে
স্নিগ্ধোজ্জ্বল, উত্তোলিত করে অকস্মাৎ যবনিকা,
দেখায় সে মুহূর্তের চূড়ায়-চূড়ায় জ্বলে, জ্বলে
সংখ্যাহীন কম্পমান স্পর্শাতীত অগ্নিবিন্দু? তুমি
তাহলে বিশ্বাস করো এই বঞ্চনাও ভালোবাসা?
তোমার সত্তার কাছে তবে মরুভূমি বনভূমি
একাকার? তবে তপ্ত অগ্নিস্রোতে তোমার পিপাসা
তৃপ্ত হবে? না, তোমার তৃষ্ণাই সুতৃপ্তি স্বেচ্ছাধীন?

সব সত্য, সব সত্য, তুমি ভ্রান্তিহীন, ভ্রান্তিহীন।

বি স্মৃ ত শ র্ত

দুর্গাদাস সরকার

চমকাই আচমকা দেখে। দোতলার জানলায় দুপুরে
আমাকে দেখেই দ্রুত সরে গেল। একান্ত গোপন
কী কথা ভাবছিল একা চিন্তার চাদরে মুখ মুড়ে।
আমিই দেখার আগে সে দেখেছে আমাকে কখন!
নিতান্ত নিস্তব্ধ পথে আমি স্তব্ধ তখনো একাকী
দাঁড়িয়ে, এবং যতো মিল খুঁজি—ততোই না মিলে
গভীর সে-মুখ-চোখ। জীবনের সমস্ত সংজ্ঞা কি
ঢাকা পড়ে ধীরে ধীরে হৃদয়ের দুর্ভেদ্য পাঁচিলে।

ও-মুখে প্রশান্তি ছিল। হাসির ছটায় দীপ্ত গাল।
কটি বেঁধে আঙিনা নিকোতো হাতে। আর নিতো পাঠ
আমার নিকটে। দীন আমি তার ছিলাম সম্রাট।
তারপর কৈশোর প্রান্তে ভেদ করে' মনের পাতাল
যৌবনের বন্যা এলো। চুনি পান্না হীরে জহরতে
অন্য হাত ধরে ধীরে ডুবে গেল আরেক জগতে।

(৫)

হেডলাইট জ্বলে উঠলো গাড়ির। দুজনে এসে বসলো ভেতরে। জুবেদা, সাহির বানু, মেমতাজ, ছোটোবাঁদী, সব্বাইকে বুকে নিয়ে ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলো সবাই সহজে। ড্রাইভার স্টার্ট দিলো। সুলতান সাহেব জানালার কাচ তুলে সবুজ সাটিনের ঝালর দেওয়া পরদা টেনে অন্ধকার করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা দুর দুর করে উঠলো সুলেখার। ভয় একটুকু হয়ে মিশে রইলো এক কোণে। কে জানে এ আবার কোন নতুন ফাঁদে পা দিল সে।

গাড়ি চোখের পলকে নবাব বাড়ির এলাকা ছাড়ালো। মাঠের মধ্যে মধ্যে সুরকির লাল রাস্তা। বটতলা দিয়ে ডিফেন্স টাউনের পাশে পাশে পোড়া ইঁটের স্তূপ ডাইনে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের লম্বা টানা পীচের রাস্তায় এসে পড়লো দু মিনিটে।

'সুলেখা!'

'বলুন।'

'ভয় হয়ে বোসো না।'

'ভালোই তো বসেছি।' একটু যেন কাঁপলো গলাটা।

'ভয় করছে?'

'না, না তো।'

'গরম লাগছে?'

'না।'

'কাচটা নামিয়ে দেব?'

'না, না—'

থম থম করছে রাস্তাটা। আটটার রাত্তিরে রাত দুটোর নিঃসঙ্গতা। ডাকবাংলো ছাড়িয়ে খানিক দূর আসতেই অধো অন্ধকারে একদল লোক হেঁকে উঠলো, 'কে যায়?'

সভয়ে সুলতান ড্রাইভারকে বললেন, 'নবাব বাড়ির ফ্লাগ দিয়েছ?'

'আজ্ঞে দিয়েছি।'

'তোমার ব্রোকেড টুপি পরেছ?'

'আজ্ঞে পরেছি।'

'ভুল না করে।'

'আজ্ঞে না, নবাব বাড়ির সব সাজ লাগানো হয়েছে।'

'হুঁশিয়ার'।

'আজ্ঞে, ভাববেন না।'

গাড়ির গতি আরো দ্রুত করলো ড্রাইভার।

দুই পাশে কৃষ্ণচূড়ার সারি ভুতুড়ে ছায়া ফেলেছে রাস্তায়। মাঝে মাঝে কালভার্ট। এরোড্রোম এখান থেকে কুড়ি মাইলের রাস্তা। দুই চোখ বন্ধ করে হাত মুঠো করলো সুলেখা।

সাবধান হয়ে, সচেতন হয়ে কাচের ফাঁকে দু পাশের রাস্তায় চোখ রেখে বসে আছেন সুলতান সাহেব। তাঁর গাড়ি, তাঁর ড্রাইভারের পোশাক, তাঁর নিজের বহুমূল্য স্যুট বুট টাই, চেহারা সবই তাঁর উপযুক্ত। সন্দেহ করবার অবকাশ নেই। সুলেখার পাঁচশো টাকা মূল্যের সাচ্চা সোনা রূপোর তারে পাড় বোনা ঢাকাই শাড়িটিও এই শহরে একমাত্র মিসেস সুলতানই ব্যবহার করতে পারেন। কাজেই গোলমাল হলো না কোনো। মাত্র দুবার দু দল লোক গাড়িটা থামিয়ে উঁকি ঝুঁকি করেই ছেড়ে দিলো। নবাব সাহেব তাঁর বেগমকে নিয়ে যেখানে খুশি যাবেন, তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা কী? তবু বলা যায় না, ঐ গাড়িতেই হয়তো কতো কাফের চালান হচ্ছে, তাই চোখ বুলিয়ে দেওয়া। নিরাপদেই এরোড্রোমে পৌঁছুলো তারা।

হাঁফ ছেড়ে সুলেখা বললো, 'এবার আমি একাই যেতে পারবো।'

সুলতান গাড়িটা বিদায় দিয়ে এসে বললেন, 'তা তো পারবেই, তবু যাই সঙ্গে।'

'কী লাভ?'

'কী জানি কী লাভ।'

'মিছি মিছি কষ্ট।'

'কষ্ট কী?'

'যদি কলকাতায়ও মারামারি আরম্ভ হয়ে থাকে?'

'তাতো হচ্ছেই।'

'তবে?'

'কী তবে?'

'এরকম অবস্থায় যাওয়া কি উচিত?'

'মন্দ কী। তোমার প্রত্যেক মুহূর্তের একাগ্র ইচ্ছেটা অনায়াসে সফল হতে পারবে।'

সুলেখা মাথা নিচু করলো।

'তাছাড়া—' একটু হাসলেন সুলতান সাহেব 'ইচ্ছে করলে তুমি নিজেও খুন করতে পারো।' সুলেখার চোখের ঘনপক্ষ্ম এক মুহূর্তের জন্য কাঁপলো একটু।

দিনে রাত্রে এখানে এই এরোড্রোমে নাগার কদিন মুহুর্মুহু প্লেন আসা যাওয়া

করছে, পাকিস্থানের হিন্দুরা হিন্দুস্থানে যাচ্ছে। এয়ারপোর্টে গিস গিস করছে লোক। চারদিকের সাজানো ফুলবাগান পায়ের চাপে পিষ্ট। কেউ বুক চাপড়াচ্ছে, কেউ পড়ে আছে মাটিতে, কেউ উদ্ভ্রান্ত। কারো মা নেই, কারো সন্তান নেই, কারো স্ত্রী নেই, কারো স্বামী নেই। কেউ কেউ সব ফেলে শুধু নিজেকে নিয়ে কোনোরকমে আছড়ে এসে পড়েছে এখানে, কিন্তু টিকিটের দাম দিতে পারছে না বলে ঠেলে দিচ্ছে তাকে, দুই পা জড়িয়ে কপাল কুটছে সে। সবাই, যে যেভাবে পারে ছুটে এসেছে প্রাণ বাঁচাতে। শহর থেকে কুড়ি মাইল রাস্তা ডিঙিয়ে ক'জন আর আসতে পেরেছে বোঁচকা পুটুলি গুছিয়ে। যাদের পয়সা আছে, প্রাণ বাঁচাবার উপায়টা তবু অনেকটা সহজ হয়েছে তাদের পক্ষে, যাদের তা নেই তাদেরই মুশকিল। পুরুষেরা অনেকে বুকের বোতাম, হাতের আংটি জমা দিচ্ছে টিকিটের দাম বাবদ, মেয়েরা হাত খালি করে, গলা খালি করে হার চুড়ি খুলে দিয়ে উঠে বসছে প্লেনে। কোনো রকমে যেতে পারলেই হয়। তারপর সেখানে গিয়ে কী হবে, সেটা পরের কথা।

এইমাত্র একটা প্লেন ছেড়ে গেল। ছোট্টো এয়ারপোর্ট। হলে না বসে অনেকেই অপেক্ষা করছে বাইরে। উপায়ও নেই তা ছাড়া। সেখানে স্থানাভাব। সুলেখাকে নিয়ে সুলতান সাহেবও বাইরেই দাঁড়িয়ে রইলেন। কতো লোক আসছে যাচ্ছে, কে কার দিকে তাকাচ্ছে, তবু ভয় ভয় করতে লাগলো, কাউকে একটু আধটু চেনা মনে হলেই সরে দাঁড়াতে লাগলো দুজনে। ধরা পড়লে আর উপায় নেই। যদিও এখানে যথেষ্ট পাহারাদার আছে, কী হিন্দু, কী মুসলমান কারোরই কারোকে কোনো ক্ষতি করবার উপায় নেই, তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারা যাচ্ছে না।

'দু একটা কথা বলো সুলেখা।' ফিস-ফিস করলেন সুলতান সাহেব।

'কী বলবো।' সুলেখার গলা শুকিয়ে কাঠ।

'একসঙ্গে দুজনে এসেছি, এতোবড়ো একটা সম্পর্ক—', মৃদু হাসলেন তিনি। হলো বা মিথ্যা লোকে তো তা জানে না। অমন অপরিচিতের মতো, শত্রুর মতো দুদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে তারা কী ভাববে?' সে তো ঠিক কথাই। কিন্তু তবু কথা আসছে কই সুলেখার।

'তোমার মাকে নিয়ে যেদিন এসেছিলাম, এর চেয়ে বেশী ভিড় ছিলো, কিন্তু এসেই প্লেন পেয়েছিলেন ও'রা।'

'আপনি নিজে নিয়ে এসেছিলেন?'

'তাতেই কি লোকের বিশ্বাস আছে, কেমন জানাজানি হয়ে গেল।'

'মা কী বললেন?'

'বলবার মতো মনের অবস্থা ছিলো না।'

'আপনাকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিলেন, অন্তত আমার ভাইয়েরা—'

'বোধ হয়।'

'তারা কিছু বললো না।'

'বললো।'

'কী বললো।'

'বললো আপনার কোনো ভয় নেইতো?'

'আপনি কি বললেন।'

'কী বলবো, ভয়তো আমার প্রতি পদ-ক্ষেপে। আমি এখন হিন্দুস্থান পাকিস্থান দুই দেশেরই শত্রু।'

'কেন?'

'মুসলমানরা আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে জানে, হিন্দুরা জানে—ঐ যে তুমি কী বলো না, নরক টরক তাই।'

আরক্ত হয়ে সুলেখা বললো, 'কিন্তু সত্যিই তো আপনি তা নন।'

'নই?' আধো-আলো আধো-ছায়ায় চোখে চোখে তাকালেন সুলতান সাহেব। 'কী করে জানলে?'

সুলেখা অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে রইলো। জবাব দিলো না।

নটা বেজে চল্লিশ মিনিটে সুলেখাদের নিয়ে প্লেন আকাশে উড়লো। কতোটুকু বা রাস্তা। পলক না ফেলতেই শেষ। একটা মুহূর্তে কেটে গেল একটা ঘণ্টা। অন্তত সুলতান সাহেবের তাই মনে হলো। সুলেখার দিকে তাকালেন তিনি, মুখ ফিরিয়ে বসে আছে, গালের পাশটা দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে মস্ত খোঁপার তলাকার মসৃণ ঘাড়। লাল টুকটুকে শাড়িতে নতুন মানুষ বলে মনে হয়। মাটিতে নামবার জন্য পাক খেলো প্লেনটা। সুলতান সাহেব ঘড়ি দেখলেন। সুলেখা জিজ্ঞেস করলো, 'ক'টা?'

'তোমার নিশ্চয়ই সময় কাটছে না।'

'এসেই তো পড়লাম।'

'আমি জানি, অপ্রিয় সঙ্গের মতো দুঃসহ আর কিছু নেই; তিন মাস ধরে তোমাকে সে যন্ত্রণা দিয়েও সাধ পূরণ হয়নি আমার। কিন্তু বিশ্বাস করো, অন্য কোনো উপায় থাকলে আমি আসতাম না।

'এসব বলছেন কেন?'

'এখনই দশটা বেজে সাঁইত্রিশ, নামতে নামতে আরো পঁচিশ মিনিট, এই রাত করে দমদম পৌঁছে, একা একা কেমন করে যাবে সেজন্যেই সঙ্গে এলাম। তোমাকে পৌঁছে দিয়েই আমি চলে যাবো।' সুলেখা চুপ।

'সুলেখা।'

'বলুন।'

'সমস্ত জীবনেও বোধ হয় আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে না না?'

'ক্ষমার কথা উঠছে কিসে?'

'তোমার জীবনের কতোগুলো সুন্দর দিন আমি নষ্ট করে দিলাম।'

'ভালো ছাড়া কখনো তো আপনি আমার মন্দ করেননি।'

আশ্চর্য। সুলেখার গলা যেন ভেজা লাগলো সুলতানের কানে।

'একটা মিথ্যা ক্ষোভে, মিথ্যা আক্রোশে ভারি ভুল রাস্তায় হাঁটলাম এ ক'বছর। কেবল ক্লান্তিই বাড়লো। আর কি পেলাম? জোর করে কেড়ে কি কেউ নিতে পারে কিছু?'

'হয়তো পারে।'

'মিথ্যা। মিথ্যা। সে পাওয়া একান্ত মিথ্যা। পাবার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, সমর্পণ করতে হয়, নিরহংকার হতে হয়। মহাত্মাজী ঠিকই বলেছেন, প্রতিহিংসা জিনিসটা আগুনের মতো। কেবলি পোড়ায়, কেবলি ছড়ায়। অন্যের ঘর জ্বালাতে নিজের ঘরও পুড়ে যায় সেই আগুনে। আমাকে ক্ষমা করো তুমি।'

এয়ার হস্টেস এসে সামনে দাঁড়ালো।

প্লেন নামছে, বেল্ট বাঁধার অনুরোধ জানালো সে।

উন্মত্ত শোকার্ত জনতার সঙ্গে আর একটি ঢেউ হয়ে সুলেখাকে নিয়ে সুলতানও নামলেন মাটিতে। সকলের সঙ্গে ঠেলা-ঠেলি ধাক্কাধাক্কি করে ঢেউয়ের মতোই গড়িয়ে গড়িয়ে কখন সামনের বারান্দায় এসে থামলেন। সুলেখা চারদিকে তাকালো। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ, এক ফালি বড়ো কুমড়োর মতো বাঁকা চাঁদ হেলে রয়েছে দক্ষিণে, ফুর ফুর করে হাওয়া ছেড়েছে, বিশাল মাঠের সাজানো গাছের মাথায় পাতার শিরশিরানি। সবাই সুলেখার অপরিচিত। ছ বছর বয়স থেকে তার বারো বছর বয়সের কলকাতার ক্ষণিক জীবনে এরো-প্লেনে চড়বারও যেমন সুযোগ হয়নি, এই দমদমের এরোড্রমে আসবারও অবকাশ হয়নি। কলকাতারই বা কতোটুকু জানে সে। ভবানীপুরের এক অখ্যাত গলির এক অখ্যাত দোতালা ফ্লাটের বাসিন্দা ছিলো। বাড়িটিতে একটি ছোট্ট বারান্দা ছিলো রাস্তার দিকে। সে বারান্দাটা ভালো লাগতো সুলেখার, সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু পাশে যতটুকু দৃষ্টি চলে, ততোটুকু কলকাতাই দেখতে পেয়েছে সে। মা বাগান করেছিলেন সেখানে। কোণে ইট ঘিরিয়ে মাটি ফেলে মাধবী লতার ঝোপ হয়েছিলো, থোকা থোকা লাল ফুল ফুটতো সন্ধ্যাবেলা। টবের গাছে বেল ফুল, চন্দ্রমল্লিকা আর জিনিয়া। বাবা বলতেন, বোটানিকেল গার্ডেন। মাকে ক্ষেপাতেন। বিকেল বেলা সেই বোটানিকেল গার্ডেনেই ছোট্ট চায়ের আসর বসতো। একটি এলানো চেয়ারে বাবা, মোড়ার উপরে মা, সামনে টিপয়। আর তারা তিন ভাইবোন মা বাবাকে ঘিরে শাড়ির জমিতে উজ্জ্বল পাড়ের মতো সীমারেখা হয়ে শোভা বাড়াতো। এটাও বাবার উপমা। মা সুন্দর পেয়ালায় চা ঢেলে দিতেন, চায়ের সঙ্গে নিত্যি নতুন খাবার। নিত্যি নতুন সারপ্রাইজ।

বাবা কৃত্রিম ক্ষোভে বলতেন, 'আবার তুমি এই গরমের মধ্যে রান্নাঘরে বসে বসে এসব করেছ?'

মা তাঁর স্বভাবসুলভ লাজুক ভঙ্গিতে চোখ চায়ের বাসনে নিবদ্ধ রেখে ঈষৎ আরক্ত হয়ে বলতেন, 'আহা!'

ঐ আহা শব্দটি বোধ হয় বাবার কানে মধুবর্ষণ করতো, উদ্ভাষিত মুখে মার সযত্ন-পরিবেশিত স্বাদু এবং সুখাদ্যের প্রতি সদ্ব্যবহার করতে করতে কী এক রকম করে যে তাকাতেন, সে দৃষ্টি এখনো মনে আছে সুলেখার। তারপর তারিফ করার পালা।

ছ' বছর ঐ একটি বাড়িতেই ছিলো। বাড়ির কাছে একটি স্কুল ছিলো, ঐ স্কুলেই পড়েছে। ছুটির দিনে মাঝে মাঝে মা বাবার সঙ্গে বেড়ানো। তা-ও বেশীর ভাগ বালি-গঞ্জের এই দাদামশায়ের বাড়ি। মায়ের কাকা। এই মুহূর্তে মা তাঁর দুই ছেলে নিয়ে যে বাড়িতে বাস করছেন। হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন। ভাবছেন তার কথা। বারে বারে ব্যাকুল হৃদয়ে জানালায় এসে [illegible]চ্ছেন। কিন্তু তিনি কি কল্পনা করতে পারছেন, আজই—আর একটু বাদেই তা[illegible] সব উৎকণ্ঠার অবসান হবে, আর একটু বাদেই মার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুলেখা [illegible]র সব জ্বালা জুড়িয়ে দেবে। আর তার [illegible]জের

করছে,

দ...ই সুদীর্ঘ তিন মাসের আক্রোশ-ভরা, ...মাভেজা অপমানিত অসম্মানিত দিনগুলোর বেদনা? তা-ও কি ধুয়ে যাবে না সেই সংগে। আজ তার কতো আনন্দের দিন, ...তো সাধের দিন। এই দিনটির কথা ভাবতে পর্যন্ত এক সময়ে বুকের শিরা উপশিরা তার ছিঁড়ে গিয়েছে।

শিরা উপশিরা না ছিঁড়ুক, সহসা কেন জানি বুকটা তার ব্যথা করে উঠলো। সুলতান সাহেবের দিকে মুখ তুলে তাকালো সে।

'কী ভাবছো?' সুলতান সাহেব তার ছ' ফুট দু ইঞ্চি লম্বা শরীরে দাঁড়িয়ে আছেন টান হয়ে, ঠোঁটের ফাঁকে সিগরেটের আলো। গম্ভীর বিষণ্ণ চোখে এক ফোঁটা হাসি।

অসম্ভব ভিড়। দলে দলে লোক আসছে যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে থাকছে, ঘুরছে, আলাপ করছে, কাঁদছে, হাসছে, ঘাম, দুর্গন্ধ, থুতু শিশুর নোংরা—উৎকর্ণ হয়ে সুলেখা বললো, 'আপনি শুনতে পাচ্ছেন?'

'কী!'

'এরা দাঙ্গার কথা বলছে।'

'হ্যাঁ।'

'কাল বস্তি জ্বালিয়েছে? সত্যি!'

'পর্শু চন্দননগর নিশ্চিহ্ন করেছে, তার আগে মমিনপুরের শোধ নিয়েছে চার গুণ হত্যা করে। পাকিস্থানের প্রতিশোধ হিন্দুস্থানে এবার খুব সমারোহের সংগেই সম্পন্ন হচ্ছে।'

'তবে?'

'কী তবে?'

'আপনি।'

'আমার নামতো ওদের তালিকায় সবচেয়ে প্রথমে।'

'আসবার আগে জানতেন না এসব?'

'জানতাম না।' চোখের কোণে কৌতুক জমলো সুলতান সাহেবের, 'এ-ও জানি, এই মুহূর্তে আমি নামক যে মানুষটা বিলিতি পোশাকের আড়ালে জাত লুকিয়ে আকাশ বাতাস দেখছে, পাশের মানুষটির সান্নিধ্য সুখে সব ভুলে সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে সিগেরেট মুখে দিয়ে, একটা সামান্য পলকপাতের অবকাশও আর তার না হ'তে পারে।'

'সুলতান সাহেব।'

'বলো।'

'ফিরে যান।'

'যাবোই তো।'

'এখুনি, এই ফিরতি প্লেনেই চলে যান আপনি।'

'তা কখনো হয়?'

'হয়। একশো বার হয়।'

'হয় না।'

ভিড় ছাড়িয়ে একটু নিরালায় এসে দাঁড়ালেন।

'আমার ভয় করছে।'

'কিসের ভয়?'

'শেষে কি একটা সর্বনাশ হবে।'

সুলতান সাহেব হাসলেন। হাতের সিগেরেট পায়ে পিষে বললেন, 'খুব ভালো লাগছে তোমার, না? আর একটু পরেই মায়ের সঙ্গে দেখা হবে। তোমার ভালো-লাগার কথা ভেবে আমারও ভালো লাগছে।'

'আপনি তো জানেন মানুষের আক্রোশ জন্তুর চেয়েও ভয়ানক। কেমন দলে দলে সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কে কতো খুন করেছে কী ভীষণ ফলাও ক'রে তালিকা দিচ্ছে তার। এরা কি মানুষ আছে এখন?'

'তা নেই বটে।'

'হিন্দু মুসলমান দু'য়ের মধ্যেই এমন কেউ কেউ আছে, যারা এসবই চায়, এসবই ভালোবাসে। তারা যদি—'

'তুমিও তো তাই চাও সুলেখা।'

সুলেখা চুপ হলো।

'চলো, একটা গাড়ির চেষ্টা দেখা যাক।'

সুলতান সাহেব পা বাড়ালেন। সুলেখা নড়লো না।

'মিছিমিছি রাত বাড়িয়ে লাভ নেই।'

'আপনাকে আমি প্লেনে তুলে দিয়ে যাবো।'

'পাগলামি কোরো না। এই অন্ধকারে একা একা কোথায় আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে যাবো বলতো?'

হঠাৎ জল দেখা দিল সুলেখার চোখে, আবছা আবছা জোৎস্নায় চকচকে চোখ তুলে তাকালো সে, 'কেবল আমাকে কষ্ট দেওয়া, যন্ত্রণা দেওয়া।'

'তার মেয়াদ আর খুব বেশী তো নেই সুলেখা।'

'আপনি আমাকে আর কতো ঋণী করবেন সুলতান সাহেব। আমি কী দিয়ে শোধ করবো?'

'শুধু ঋণ।'

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একদল লোক তাকাতে তাকাতে চলে গেল। সুলেখা অস্থির হয়ে উঠলো, 'যান শীগ্গির যান। কী রকম চোখ ওদের। আপনাকে অনেকেই চেনে, কতো কাগজে ছবি বেরিয়েছে তার ঠিক নেই। লোকের মনে কতো ভুল ধারণা আছে।'

'আর তোমার?'

সুলেখা সুলতানের হাত চেপে ধরলো, 'আর একটুও দেরি না, আপনি যান।'

নিজের উষ্ণ হাতের মুঠোয় হঠাৎ সুলেখার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ভীত কম্পিত হাতের স্পর্শ বিচলিত করলো সুলতানকে। চুপ করে থেকে বললেন, 'এজন্যেই কি এতদূর সংগে করে নিয়ে এসেছি।'

'এসেছেন, ভালো করেছেন, কিন্তু আর এক পা-ও শহরের দিকে নয়।'

'চলো।'

'আপনাকে তুলে না দিয়ে আমি কিছুতেই যাবো না।'

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যদি এই করো তা হলে স্বভাবতই ওদের সন্দেহ হবে।'

'আমার ভয় করছে।'

'বাইরে গেলেই ভয় থাকবে না।'

'কেন এমন বারেবারে তাকাচ্ছে ওরা? কী চায়?'

'আমাকেই বোধ হয়।' দু পা এগিয়ে সুলতান হাসলেন।

'আজ না হয় রাতটা এখানেই থাকি।' হাঁটতে গিয়ে পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে সুলেখার।

'ক্ষেপেছ?'

একটা ট্যাক্সি দেখে দৌড়ে গিয়ে তাকে থামালেন সুলতান সাহেব, দরজা খুলে সুলেখাকে ভিতরে তুলে দিয়ে বললেন, 'নাও, এবার শান্ত হয়ে বোসো তো।'

যা হোক গাড়িতে উঠে অনেকটা যেন আরাম পেলো সুলেখা।

(ক্রমশ)

২৬শে ডিসেম্বর থেকে **আর্টিস্ট্রী** হাউস-এ রেবা **এবং** সোমনাথের চিত্রকলা প্রদর্শনী **চলছে।** সোমনাথের **কয়েকটি** উডকাট এবং **এচিং** ছাড়া আর **সব ছবিই** এ-প্রদর্শনীর তৈলচিত্র। **ছবি আছে** সব মিলিয়ে পঁয়তাল্লিশটি। কলকাতার শিল্প-রসিক সমাজের কাছে **এই শিল্পী** দম্পতি অপরিচিত নন। **প্রতি বছর** না হলেও এ'দের চিত্র **প্রদর্শনী বেশ** কয়েকবার **আমাদের** দেখবার সুযোগ **হয়েছে।** দেশের **শীর্ষস্থানীয় শিল্পী** বলে এ'দের **প্রচার** করার মত দুঃসাহস আমার অবশ্যই **নেই;** তবে একথা বলতেও দ্বিধা করিনে যে, **এ'দের মত শক্তিশালী** শিল্পী খুব কমই **দেখা যায়।** কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত **বছর রেবার একটি ছবি ললিতকলা অ্যাকাডেমীর পুরস্কার** পাওয়ায় দিল্লীতে **বেশ** গোল-**মালের সৃষ্টি হয়েছে।**

কয়েকজন দিল্লীর **তথাকথিত প্রখ্যাত** শিল্পী **তাঁদের** যেসব শিল্পকর্ম **ললিতকলা** অ্যাকাডেমীর বিচারকগণ বাতিল করে-ছিলেন, সেই সব শিল্পকর্মের **একটি স্বতন্ত্র প্রদর্শনীর** ব্যবস্থা করেছিলেন, **যাতে জনসাধারণ** ঐসব বিচারকদের বিচার-**বুদ্ধির** বিচার করেন। এ'দের সবচেয়ে বড় **ক্ষোভ,** কুলকারনির মত প্রখ্যাত শিল্পী যে **ছবি** ছ মাস ধরে রচনা করেছেন, সে ছবিও **স্থান** পেল না, আর অখ্যাত রেবা দাশ-গুপ্তের 'বার্ডকেজ' (যা রচনা করতে **নিশ্চয়ই ছ মাস সময় লাগে নি) পুরস্কার পেয়ে গেল!**

কোনও একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক **পত্রিকা** কুলকারনির রচনাটি ছেপে তার তলায় লিখেছেন, ছবিটি রচনা করতে ছয় মাস সময় লেগেছে—অর্থাৎ এহেন ছবিকে বাতিল করে বিচারকমণ্ডলী অত্যন্ত অন্যায় **করেছেন।** তবে কি বুঝবো, **ঐ** পত্রিকার **মতে যে ছবি রচনা করতে যত** বেশী সময় **লাগবে,** সে **ছবি** তত রসোত্তীর্ণ? **প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা মনে পড়ল**—কিছুদিন আগে **একজন ভারতীয়** সাংবাদিকের পিকাসোর **স্টুডিও মধ্যে প্রবেশ করবার এবং** তাঁর **সংগে** আলাপ **করবার** সুযোগ **হয়েছিল। সাংবাদিকটি লক্ষ্য করলেন,** পিকাসো **একটি কাগজে** আঁকিবুকি কাটছেন। মিনিট **পাঁচেক পর** পিকাসো সে **কাগজটি** সরিয়ে **আরেকটি কাগজ** টেনে নিলেন। সাংবাদিক **কৌতুক করে জিগ্যেস করলেন,** আপনি **পাঁচ মিনিটের মধ্যেই** তো একটি **ছবি** শেষ করলেন; কিন্তু ছবিটি বেচবেন খুব **কম** করে পাঁচ হাজার ডলারে নিশ্চয়? পিকাসো হেসে জবাব দিলেন, "পাঁচ কেন, পঁচিশ হাজার ডলারেও বেচতে পারি। কিন্তু মনে **রাখবেন, পাঁচ মিনিটে ছবি আঁকতে হয় কি করে,** সেটা শিখতে **আমার পঞ্চাশ বছরেরও** অনেক **বেশী সময় লেগেছে।** সুতরাং রসোত্তীর্ণ ছবি পাঁচ মিনিটেও **রচনা করা যায় আবার সয়রার** মত পাঁচ **বছরেও** রচনা **করা যায়। সময়** বিচার **করে ছবির রস** বিচার **করা** চলে না। **কুলকারনির** ছ মাসে রচিত ঐ ছবিটি পিকাসোর 'গুয়েরনিকা' রচনার পুনরাবৃত্তি। গুয়ের-নিকা রচনা করতেও পিকাশোর **সময়** লেগে-ছিল অনেক। পিকাশো যে **যশ** লাভ করে-ছিলেন **এই ছবিটি** এ'কে **কুলকারনি** যদি মনে করে **থাকেন** তিনিও সে **যশ** লাভ করবেন তাঁর **রচনাটি** থেকে তা **হলে** বলব সত্যিই তিনি **ভুল** করেছেন। আর্টের দরবারে অসলেরই কদর আছে, নকলের **কদর** নেই। কুলকারনির মত গুজরাল, ভগত, দাভে, গায়তোণ্ডে প্রভৃতি শিল্পীদেরও রচনায় বিদেশী চিত্রকরদের ব্যক্তিগত আর্টের পুনরা-**বৃত্তি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।** এ'রা এসব রচনা রসোত্তীর্ণ বলে **হাজার ঢাক** পেটালেও **প্রকৃত** রসিকদের চোখে **ফাঁকি ধরা** পড়বেই। ওস্তাদ শিল্পী কোন পথে গিয়ে **পরম মণিটির সন্ধান** পেয়েছেন **নকল নবিশ** তার হদিস পায় না। সে **শুধুই ঘোরে অন্ধের মত।** এ'দের মধ্যে **হয়ত অনেকেরই যথার্থ শক্তি** অছে **কিন্তু দিল্লীর কয়েকটি** কাগজে **এই নকলকরা** আর্টের বাহবা দিয়ে দিয়ে এ'দের মাথা একেবারেই বিগড়ে দেওয়া **হয়েছে** ফলে **নতুন** শিল্প **উদ্ভাবনা** এ'দের দ্বারা সম্ভব **হচ্ছে না।** ব্যক্তিগত কান্ত-**বোধের ওপর সুন্দর অসুন্দরের** বিচার নির্ভর **করে** সুতরাং রেবা দাশগুপ্তের 'বার্ডকেজ' **হয়ত** অনেকের ভাল নাও লেগে থাকতে পারে কিন্তু আমাকে না দিয়ে ওকে কেন **প্রাইজ** দেওয়া হল বলে হাত পা ছুড়তে লাগবো—এ কেমন ধারা মনোবৃত্তি! ললিত-কলা অ্যাকাডেমীর পুরষ্কারগুলি নিশ্চয় **দিল্লীর** তথাকথিত প্রখ্যাত শিল্পীদের ব্যক্তি-গত সম্পত্তি নয়।

যাই হোক রেবা ও সোমনাথের চিত্র-প্রদর্শনী অন্যান্য বারের মত এবারেও আমাদের বেশ আনন্দ **দিয়েছে। রেবার ঝোঁক** সব সময়ই বর্ণিকার **ওপর এবং** সোমনাথের ঝোঁক **ফর্মাল** ভ্যালুর **ওপর।** অন্যান্য বারের তুলনায় এবার যেন **দুজনেই** এ'দের **ইন্দ্রিয়লব্ধ** তথ্যগুলিকে **কিছুটা আবস্ট্রাক্ট** আদর্শের অনুযায়ী করে গড়ে **তুলেছেন।** ব্যক্তিগতভাবে আমার কয়েকটি **রচনা** ভাল লাগেনি; তবে প্রত্যেকটি **রচনাই** গভীর চিন্তা এবং নিষ্ঠা প্রসূত। **টেকনিকের** দিকে অত্যন্ত বেশী মাত্রায় নজর রাখার **ফলে** আমার মনে হয় **ছবিগুলির** ভাব **কিছুটা** ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সোমনাথবাবুর উড-কাট এবং এচিংগুলি অনবদ্য।

রেবাদেবীর 'ওয়াশিং নাইট,' 'মেডিসিন শপ' 'স্টেণ্ড গ্লাস', 'রাইণ্ড গার্ল', স্টেয়ার-কেশ' এবং 'ক্রস সেকশন' বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ছবিগুলির বর্ণরচনা লক্ষণীয়। সোমনাথবাবুর 'কলোনী,' 'ব্যালকনী,' 'উই-মেন' এবং 'টিউন' বিশেষভাবেউল্লেখযোগ্য। প্রদর্শনীটি আগামী ৪ঠা জানুয়ারী অবাধ খোলা আছে। কোনও **প্রবেশমূল্য** নেই।

—চিত্রগ্রীব

করছে।

ট্রামে-বাসে

শ্রী মহাবীর ত্যাগী পরিবার নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রচারে সরকারকে উদ্যোগী হইবার জন্য একটি প্রস্তাব আনিয়াছেন এবং ইহা সমর্থন করিয়াছেন শ্রী নেহরু। বিশু খুড়ো বলিলেন—"অতি উত্তম প্রস্তাব, সমর্থনও করেছেন পুরুষোত্তম। কিন্তু ফলের ভরসা হয় না, তার কারণ মহা বীর, ত্যাগী ও পুরুষোত্তম দেশে বিরল"!!

* * *

রিক্সাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, দিন-মজুরদের থাকিবার সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ড একশত শয়নাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রথম দুইটি শয়নাগার স্থাপন করা হইবে মাদুরায়। "মাদুরের জন্য মাথা ঘামাতে হবে না বলেই কি ব্যবস্থাটা প্রথম মাদুরায় করা হয়েছে?" —প্রশ্ন করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

সরকারী চারু ও কারু শিল্প মহা-বিদ্যালয়ের বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনীতে জনৈক দরদী শিল্পী মাছের
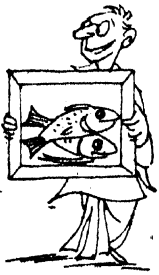
চিত্র প্রেরণ করিয়াছেন। —"জনসাধারণের আনন্দ বিধানের জন্য সরকারী মৎস্য বিভাগ ছবিটি ক্রয় করে রাখলে ভালো হয়"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পৌষ মাসটি কাহার কেমন যাইবে"—একটি প্রবন্ধের শিরোনামা। —"কিন্তু গণনা নিষ্প্রয়োজন, যাঁদের বারো মাসই পৌষ মাস, তাঁদের পিঠে-পুলিতে পৌষ কাটবে, আর যাঁদের সর্বনাশ, তাঁদের পেট পুরবে না অথচ পিঠে সইতেই হবে"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

কাশ্মীরে এক শ্রেণীর পাখী আছে, তারা বিড়ালের মত মিউ মিউ করিয়া ডাকে। শ্যামলাল বলিল—"সে-শ্রেণীর পাখী উড়ে এসে কাশ্মীরে জুড়ে বসে ভেজা বেড়ালের মতো অবস্থান করছে, এ মিউ-মিউ ডাক হয়ত তাদেরই।"!!

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম, সুরাবর্দি সাহেবকে জেনারেল আয়ুব খাঁ পাকিস্তানের সংবিধান রচনার জন্য আহ্বান
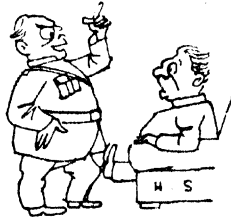
করিয়াছেন। —"সুরাবর্দি সাহেব বহুরূপী এবং যেহেতু তিনি বেশ "হাসান", সেহেতু সংবিধানটিও বোধ হয় তাঁর হাতে ভালোই হবে"—মন্তব্য বিশু খুড়োর।

* * *

সেন্ট্রাল কলেজের শতবার্ষিক উৎসবে সভাপতির ভাষণদান প্রসঙ্গে প্রাক্তন ছাত্র শ্রীরাজগোপালাচারী মন্তব্য করিয়াছেন "ছাত্রজীবনে আমি অলস প্রকৃতির ছিলাম। আপনারা সভাপতির পদে একটি খারাপ ছাত্রকে মনোনীত করিয়াছেন"। আমাদের শ্যামলাল কবিতায় মন্তব্য করিল—"খোকা বলেই ভালোবাসি, ভালো ব'লেই নয়"।

* * *

আমেরিকা রকেটে করিয়া মহাশূন্যে মানুষ প্রেরণের উদ্যোগ করিতেছে। "বায়ুভূত নিরাশ্রয় আকাশস্থ নিরালম্ব না করে এ'রা মানুষকে নিষ্কৃতি দেবে না" মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এবার বড়দিনে আকাশ হইতে শান্তির বাণী প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের অন্য

এক সহযাত্রী বলিলেন—"শান্তি শিকেয় উঠেছে অনেক আগেই, এবারে একবারে হাওয়া"!!

* * *

আমেরিকার গ্রেট সল্ট লেকের জলে এত লবণ আছে যে, তাহা দিয়া নাকি সারা পৃথিবীর লোককে এক হাজার বছর পর্যন্ত খাওয়ানো চলে। —"তাই হয়ত ডালেসের 'এড'-ভালে এত নুনে টান"—মন্তব্য করেন বিশু খুড়ো।

* * *

সুষ্ঠুরূপে নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের জন্য এখন হইতে ভোটদাতাদিগকে টিকা দিয়া চিহ্নিত করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"উত্তম ব্যবস্থা। কিন্তু এই সঙ্গে নির্বাচনপ্রার্থীদের একটা কোন-রকম টিকার ব্যবস্থা হলে আরো ভালো হতো"!!

* * *

২৮শে ডিসেম্বর কলিকাতায় গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন করা হইয়াছে। —"সেদিন বারটা ছিল শনি। আমরা দেখেছি, বই-র কী কাটতি; বিক্রেতা ফাইন্যাল বুক্‌" বলে চেঁচিয়ে শহর মাথায় করেছে—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

আমাদেরই কাগজ আনন্দবাজারে 'বই চুরি' প্রবন্ধ পাঠ করিলাম। কোন এক বই-এর মালিক অজ্ঞাতনামা বই-চোরকে লক্ষ্য করিয়া নাকি বলিয়াছেন—বহু যত্নে আর পরিশ্রমে লেখা-বই যদি কেউ চুরি করে, তবে তার মা শূকরী আর বাবা গর্দভ। —"কিন্তু বই চুরির চেয়ে বই-র বিষয়বস্তু চুরি করে যারা নিজের নামে চালায়, তাদের অপরাধ আরো গুরুতর। অথচ সাদাসিধে বাংলায় তাদের 'চোর' পর্যন্ত বলতে সমীহ করা হয়েছে; পোশাকি ভাষায় বলা হয়েছে কম্পিলক—সাহিত্যিকরা সত্যিই ভদ্র"—বলেন বিশু খুড়ো।

বিদেশী অতিথি এন-ক্রুমা

কমল সরকার

ভারত সরকারের আমন্ত্রণে আফ্রিকার অন্যতম স্বাধীন রাষ্ট্র ঘানার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ কোমে এনক্রুমা পক্ষকালব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে গত ২২শে ডিসেম্বর ভারতে এসে পৌঁছেছেন। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে পঞ্চাশ লক্ষ বিভিন্ন আফ্রিকীয় উপজাতি অধ্যুষিত এই ক্ষুদ্র ঘানা আয়তনে কাশ্মীরের চেয়ে কিছুটা বড় (নয় হাজার দুইশত বর্গমাইল)। অধিবাসীদের অধিকাংশই খৃীষ্টীয় ধর্মাবলম্বী। স্বল্প সংখ্যক মুসলমান অধিবাসীও আছেন। প্রায় ষোল হাজার বিদেশী অধিবাসীদের মধ্যে শ'চারেক ভারতীয়ও আছেন। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য কোকো, কফি এবং চাল। খনিজ দ্রব্যের মধ্যে বক্সাইট এবং ম্যাঙ্গানিজ প্রধান।

১৮৪৪ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ একশো তেরো বছর বৃটিশ উপনিবেশ হিসেবে থাকার পর ঘানা ১৯৫৭ সালের ৬ই মার্চ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে। আধুনিক ঘানা পূর্বের স্বর্ণ উপকূল বা বৃটিশ গোল্ডকোস্টের নামান্তর মাত্র। স্বাধীন ঘানার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ এনক্রুমা স্বদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় নেতা হিসেবে সুপরিচিত। রাজনীতি ছাড়াও দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, আইন ও ধর্মশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত। শিক্ষাব্রতী হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থের গ্রন্থকার হিসেবেও তাঁর খ্যাতি বিপুল। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে, ১৯৫১ সালের সাধারণ নির্বাচনে ডাঃ এনক্রুমা কনভেনসান পিপলস পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচিত হন এবং ১৯৫২ সাল থেকে ইংরেজ অধিকৃত স্বর্ণ উপকূলের প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্ব বহন করছেন। বৃটেন কর্তৃক স্বর্ণ উপকূলের স্বাধীনতা স্বীকৃত হবার পরেও ডাঃ এনক্রুমা স্বপদে অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তৎকালীন স্বর্ণ উপকূলের পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত এক্রিম জেলার ছোট্ট একটি গ্রামে এক স্বর্ণকারের গৃহে ডাঃ এনক্রুমার জন্ম হয়। মিশনারীদের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর আচিমোটায় প্রিন্স অব ওয়েলস কলেজে শিক্ষানবিশী শিক্ষায় শিক্ষিত হন। শিক্ষা সমাপ্তির কিছুকাল পরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯৩৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র রওনা হন। ১৯৩৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়ার লিংকন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থশাস্ত্র এবং সমাজতত্ত্বে স্নাতক উপাধি লাভ করেন। পেনসিলভেনিয়ায় থাকাকালীন তিনি লিংকন থিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের সংগে যুক্ত ছিলেন। এইখানে তিনি ধর্মতত্ত্বে স্নাতক উপাধি লাভ করেন। এ ছাড়াও লিংকন ফ্যাকাল্টির দর্শন এবং গ্রীক ও নিগ্রো ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবেও কিছুকাল জড়িত ছিলেন। ১৯৫১ সালে স্বর্ণ উপকূলের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণের সময়ে লিংকন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। লিংকন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাব্রতী হিসেবে স্নাতকোত্তর উপাধিও লাভ করেন।

ছাত্রাবস্থায় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তিনি নানাপ্রকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন ছুটির সময়ে বন্দরে এবং জাহাজে ষ্টুয়ার্ডের চাকুরী গ্রহণের ফলে সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছে। এমন কি পেনসিলভেনিয়া এবং নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন নিগ্রো চার্চেও তিনি নিয়মিত ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচার করেছেন।

ডাঃ এনক্রুমা ছাত্রাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে এবং যুক্তরাজ্যে প্রত্যক্ষভাবে নিগ্রো ছাত্র আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। আফ্রিকীয় ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকার ষ্টুডেণ্টস এসোসিয়েশন অব ইউ এস এবং কানাডার প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি থাকাকালীন সমিতির মুখপত্র সম্পাদনার দায়িত্ব তিনিই বহন করেছেন। বিদেশে থাকা সত্ত্বেও ছাত্র
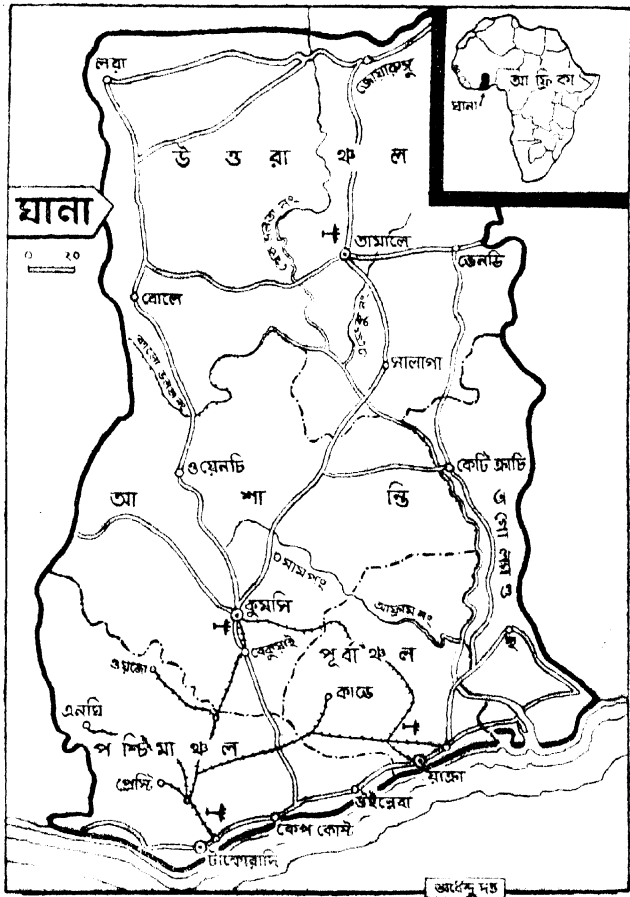
র সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে ক্রমশ তিনি প...ম আফ্রিকার রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন।

১৯৪৫ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্তরাজ্যে অর্থনীতি অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকসে যোগদান করেন। অর্থনীতি ছাড়াও আইনেও তিনি বিশেষ উৎসাহী। গ্রেস ইন আইন অধ্যয়নের জন্যেও যোগদান করেন এবং এই সময়েই তিনি রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। যুক্তরাজ্যে ওয়েস্ট আফ্রিকান ন্যাশনাল সেক্রেটারিয়েটের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পশ্চিম আফ্রিকীয় ছাত্র সংহতির সম্পাদক হিসেবে দলীয় মুখপত্রের সম্পাদনা করেন। সর্বোপরি প্যান আফ্রিকান কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে ডাঃ এনক্রুমার ভূমিকা স্মরণীয়। প্যান আফ্রিকান কংগ্রেসের যুগ্ম সম্পাদক থাকাকালীন "নিউ আফ্রিকা" সাময়িক পত্রের সম্পাদনা তাঁর স্বদেশপ্রীতির ধারণা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে।

ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা সম্পাদনার ফলে সংগঠক হিসেবে তাঁর খ্যাতি স্বদেশেও প্রসারিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর স্বর্ণ উপকূলের জনসাধারণ তখন সেলফ-গভর্নমেন্টের দাবী তুলেছে। ডাঃ এনক্রুমার জাতীয়তাবোধ, স্বদেশ-প্রীতি এবং সর্বোপরি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধাচারণ ডাঃ জে বি দানকোয়ার সংগঠিত স্বর্ণ উপকূলের ইউনাইটেড কনভেনশনের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণে উদাত্ত আহ্বান জানায়, এবং ১৯৪৭ সালে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। স্বাধীনতার দাবীতে দেশের সর্বত্র জনমত

ডাঃ এনক্রুমা

গঠনের উদ্দেশ্যে সভা-সমিতিতে নিজের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করার ফলে তাঁর নেতৃত্বের প্রতি দেশের জনসাধারণ ক্রমশ শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে কনভেনশন দলে মতবিরোধের ফলে ডাঃ এনক্রুমা স্বতন্ত্র একটি দল গঠন করেন এবং ঐ দল কনভেনসান পিপলস পার্টি হিসেবে পরিচিত। নতুন দলের সমর্থনে দেশের প্রগতিশীল জনসাধারণ ও ছাত্র-সমাজ তাদের পূর্ণ সমর্থন জানায়।

দীর্ঘদিন প্রতিবাদ ও আলোচনার পর ইংরেজ অধিকৃত উপনিবেশে নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৫১ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনে কনভেনসান পিপলস পার্টি আটত্রিশটি আসনের মধ্যে চৌত্রিশটি আসনই দখল করে। নির্বাচনের সময় দলের নেতা ডাঃ এনক্রুমা এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী ধর্মঘট প্রভৃতি তথাকথিত দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারারুদ্ধ। কিন্তু নির্বাচনে তাঁর দলের জনপ্রিয়তা উপলব্ধি করে বৃটিশ সরকার তাঁকে মুক্তি দেন। মুক্তিলাভের পর দলীয় নেতা হিসেবে তিনি সরকারী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের বছর খানেক পরে গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয় এবং তিনি প্রধান মন্ত্রী ঘোষিত হন। স্বর্ণ উপকূলের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবার পর ১৯৫৪ সালে পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই নির্বাচনেও তাঁর দলের প্রাধান্য বজায় থাকে। দ্বিতীয়বারের নির্বাচনের ফলে ঘানার অধিবাসীদের গঠনতান্ত্রিক সুবিধা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ এই নির্বাচনে পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধির আসন একশো চারটি নির্ধারিত হয়। ১৯৫৪ সালের দুই বছর পর ১৯৫৬ সালেও পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং তৃতীয়বারও কনভেনসান পিপলস পার্টির প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকে।

ঘানার জাতীয় পরিষদে (National Assembly) সর্বমোট একশো চারজন প্রতিনিধির আসন নির্ধারিত আছে। প্রতিনিধিদের মধ্যে সাতজন পৌরসভার প্রতিনিধি এবং বাকী সাতানব্বইজন প্রতিনিধি প্রতিটি "নির্বাচন জেলার" প্রতিনিধিত্ব করেন। বলা বাহুল্য প্রত্যেক প্রতিনিধিই প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

প্রধান মন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব গ্রহণের পরে দেশোন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে তিনি যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য থেকে বিদেশী কারিগর, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও বৈজ্ঞানিকদের স্বদেশে নিয়োগের জন্য পরিভ্রমণ করেন। দেশোন্নয়নের বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্যে বক্সাইট শিল্পের উন্নতি এবং জলসেচের জন্য ভল্টা নদীর পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এ ছাড়াও টেমার শহর নির্মাণ ও স্থায়ী বন্দর নির্মাণও অন্যতম বৃহৎ পরিকল্পনা। জীবন ধারণের সাধারণ মান উন্নয়ন এবং শিল্প ও কৃষির উন্নতির জন্য ঘানার স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে তাঁর সরকার একটি পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথম পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা স্বাধীনতা প্রাপ্তির কিছুদিন পর সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চম বার্ষিক পরিকল্পনা বর্তমানে বিবেচনাধীন।

ডাঃ এনক্রুমা আফ্রিকার অনগ্রসর দেশগুলির সহযোগিতার প্রতি বিশেষ আগ্রহশীল। ১৯৫৭ সালে স্বর্ণ উপকূলের প্রধান মন্ত্রী হিসেবে তিনি সম্মিলিত আফ্রিকার ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি ঘানার রাজধানী আক্রায় ইন্টার আফ্রিকান মিউচুয়াল এসিস্টান্স অরগানিজেসানের সম্মেলনে এগারটি দেশকে নিমন্ত্রিত করেন। আফ্রিকীয় জনসাধারণের স্বার্থে এ বছর আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলির এক সম্মেলন উদ্বোধন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার এবং কানাডার প্রধান মন্ত্রী ডিফেনবেকারের নিমন্ত্রণে তিনি যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা পরিভ্রমন করেছেন।

ডাঃ এনক্রুমা ১৯৫৭ সালে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশরীয় ছাত্রী মিস ফাতিমা হেলেন রিৎজকে বিবাহ করেন।

ডাঃ এনক্রুমার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে এডুকেসান এ্যান্ড ন্যাশনালিজম ইন ওয়েস্ট আফ্রিকা, টুয়ার্ডস কলোনিয়াল ফ্রিডম হোয়াট আই মিন বাই পসিটিভ অ্যাকসান এবং ঘানা : দি অটোবায়োগ্রাফি অব কোমে এনক্রুমা বিখ্যাত।

জেল ডায়েরি
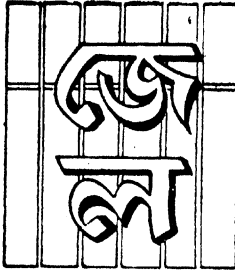
সতীন্দ্রনাথ সেন

॥ ৭ ॥

২রা নবেম্বর ১৯৫৪, (রংপুর জেল)—সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মনে হইল স্যাটিসফায়েড।

"Jailor has been vindictive, not intelligent, etc. committed grave errors of judgment."

আমার মনটা কিভাবে কাজ করে? কাল যখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত আলোচনা করি, কিংবা অন্য কোনও responsible official-এর সহিত যখন আলাপ হয়, তখন আলোচনার একটা enthusiasm, idealistic presentation, atmosphere ইত্যাদিতে মনটা এক স্তরে, একভাবে থাকে—idealism-এর উৎসাহ, আনন্দ ইত্যাদি। অন্য সময়ে যখন এই atmosphereটা কাটিয়া যায় এবং সময়ের ব্যবধান বাড়িয়া যায় তখন এই আনন্দ ইত্যাদি থাকে না। বিশেষ করিয়া যদি নূতন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, situation ইত্যাদি উপস্থিত হয়। এমন অবস্থায় মনের ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। কোনও সময় বিরক্তি, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি, কখনও বা defeatism, depression, doubt আসিয়া আক্রমণ করে; একটা mild আশংকা ইত্যাদিও সময় সময় আসে। এই যে সাময়িক নির্জীব হতোৎসাহের ভাব, idealistic life-এর ইহা সম্পূর্ণ বিরোধী। অবশ্য এটা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। এর মধ্যে বোধহয় আরও কতগুলি জিনিস প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। আমার প্রকৃতিগত পরবশতা এবং তারও পিছনে হয়তো প্রচ্ছন্ন একটা আত্ম অবিশ্বাস, একটা ভয়ও হয়ত আছে। ইহা কতটা organic, constitutional, এর কোনও reasonable basis আমার জীবনে নাই। সব রকম অবস্থার সম্মুখীন হওয়ার শক্তি, আত্মবিশ্বাস আমার আছে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। অথচ একটা অস্পষ্ট ভীরুতার ভাব আছে, একটা সংশয়ের আবছা ছায়া। আমার জীবনে দুইটারই খেলা দেখিয়াছি, দুইটাই আছে। এই self confidence, আত্মবিশ্বাসের উপাদান কি? কোনও বিষয়ে কোন্ পর্যন্ত এই আত্মবিশ্বাস? ন্যাশনাল ইণ্টারন্যাশনাল প্রশ্নে কি এর কোনও প্রয়োগ আছে? কিংবা গান্ধীজীর যে কথা—সত্য ও অহিংসায় প্রতিষ্ঠিত একজনই একটা দেশের মুক্তি আনিতে পারে? আমার এই যে আত্মবিশ্বাস এতে এই বিশ্বাসও বোঝায়। যেমন পাকিস্তানে আমার যে stand—অর্থাৎ পাকিস্তানের fullest development, পাকিস্তানে perfect communal amity, secular democracy, and best relations between Pakistan and Hindusthan—এটা সফল করিবই, করিতে পারিবই, আমি একাই করিতে পারি (অর্থাৎ আমাকে কেন্দ্র করিয়াই হইতে পারে) এই বিশ্বাস কি আছে? অথবা ইণ্টারন্যাশনাল ক্ষেত্রে আমার যে আদর্শ (of one world ইত্যাদি), তাহাতে কি এইসব বিশ্বাসের উপাদান আছে? ইণ্টারন্যাশনাল বাদ দিলাম। ন্যাশনাল অর্থাৎ পাকিস্তান সম্বন্ধে আদর্শ, তাহা অনেক সময় আমি

জোর দিয়া বলি, ইহার সাফল্যে বিশ্বাস করি।

আমি অনেক সময় বলি, আদর্শের জয় প্রথমে হয় আমার মনে, তাহার পর বাইরে। ইহার অর্থ কি? দেখি causeটা right কিনা, necessary sacrifice-এর জন্য প্রস্তুত কিনা, reason আছে কিনা। এই-ই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

গান্ধীজী কি অর্থে ইহা বলিতেন? আত্মবিশ্বাস? উদ্দেশ্যসাধন করিতে পারে এইরূপ মনোবল ও বিশ্বাস আছে কিনা। অর্গ্যানিজেশন, resources in men, money and other things, এ-সব করারও ক্ষমতা আছে কিনা। যে ত্যাগ ও দুঃখবরণের প্রয়োজন তা করিবার ক্ষমতা আছে কি না। ইহাই ত আত্মবিশ্বাস।

পাকিস্তানে আমার যে আদর্শ সেটা স্থাপন করিতে যে মনোবল, সংকল্প, অধ্যবসায়, সাহস, ত্যাগ ইত্যাদির দরকার সত্য ও অহিংসায় অবিচল নিষ্ঠা দরকার, অর্গ্যানিজেশন ইত্যাদি দরকার, তাহার ক্ষমতা আছে কি? পাকিস্তান মুসলমান-প্রধান দেশ। ইহাদের ভালবাসা বোঝা চেনা, ইহাদের ধর্ম সংস্কৃতি ইতিহাস প্রকৃতি সবলতা দুর্বলতা খুব ভাল করিয়া হৃদয় দিয়া বুদ্ধি দিয়া বোঝা দরকার।

৩রা নবেম্বর ১৯৫৪, (রংপুর জেল)—কাল জেলর সাহেব হাসপাতালের এক রোগীকে অতি ভোরে শীতের মধ্যে........ জেল ওয়ার্ড-এ........এবং আদেশ দিলেন ইহারা দুইজনে—নম্বরে থাকিতে পারিবে না। মেট্-কে অর্ডার দিলেন যে, সে আমার কামরায় আসিতে পারিবে না। C. H. W. বলিল যে, জেলর সাহেব বলিয়াছেন সাধারণ কয়েদীদের লক্-আপ-এর সহিত আমার লক্-আপ হইবে।

সেই কাশের রোগীকে বৈকালে জমাদার আবার আমার কামরায় দিল। রাত্রি একটার সময় সে, জালাল এবং আর একজন নূতন ওয়ার্ডার খুব উপদ্রব করিল। চিৎকার করিয়া গোনা, বেদম জ্বর ও কাশির ভান করিয়া খকখক করিয়া কাশা, গোঁ গোঁ শব্দ করা ইত্যাদি। রাত্রি একটা হইতে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত একটানা সজাগ......। চারটার সময় উঠিয়া আমি আমার কাজকর্ম করি। ভোরে খুব দুর্বল বোধ করিতেছিলাম। এত দুর্বল শীঘ্র বোধ করি নাই। রাত্রের উপদ্রবের কথা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে লিখিলাম। যখন ওয়ার্ডার এবং হেড ওয়ার্ডার ইনচার্জকে রাত্রে আমার অসুবিধার কথা বলিতেছিলাম, তখন একজন নূতন ওয়ার্ডার বলিল যে, জেলর সাহেব জোরে জোরে গুনিতে বলিয়াছেন।

বৈকালে ডেপুটি জেলর আসিলেন। তিনি বলিলেন, "সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমার নোটটা পড়িয়াছেন, কাল যাহা হয়

করা হইবে।' আমি বলিলাম, "আপনাদের ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেওয়া উচিত ছিল।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খবর দিয়াছেন যে, ব্যস্ত থাকায় আসিতে পারেন নাই। (১) নিম-পাতার পরিবর্তে অন্য সাবস্টিটিউট দিবেন; (২) ঔষধ পাওয়া যাইবে; (৩) গরম জল পাওয়া যাইবে; (৪) চরকা মেরামত করিবে; (৫) তুলার পাঁজ দেওয়া হইল; (৬) সপ্তাহে দুইখানা চিঠি দেওয়া হইবে; (৭) বেড়ানোর সময় সদর রাস্তা দিয়া নেওয়া হইবে না; (৮) আমার ডাএট কি জিজ্ঞাসা করিবেন—রান্নার ব্যবস্থা করিবেন—জ্বালানী যাহা লাগে তাঁহারা দিবেন। জানাইলেন কাল সকালে আসিবেন, অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা হইবে।

৪ঠা নভেম্বর ১৯৫৪, সকাল প্রায় ৬টা (রংপুর জেল)—কাল রাত্রে নয়টা হইতে এগারোটা পর্যন্ত তিনজন ওয়ার্ডার মিনিমাম মিস্‌চিফ করিল। লাউড কাউণ্টিং অ্যাণ্ড কাফিং। পাঁচ নম্বরেও একজন কি দুইজন।

পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে যে, কর্তৃপক্ষ অথবা তাহাদের সমর্থকদের প্ররোচনায় এই সব গণ্ডগোল হইতেছে আমাকে জ্বালাতন করিবার উদ্দেশ্যে। রাত্রের ওয়ার্ডারদের বিশেষ দোষ দিই না। তাহারা অন্যের হাতের পুতুল—কর্তৃপক্ষ বা তাহাদের সমর্থকদের দুঃখ হয় ইহাদের জন্য। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আমি কয়েদীদের কয়েকটি পয়েণ্ট (মারধোর ইত্যাদি) টেক আপ করিয়াছি—অথচ ইহাদেরই কতক কতক... ইহাদের দুর্বলতা এবং স্বার্থপরতা (Temptation of office), I pity these poor prisoners these weak elements of society.

ইহাদেরও ক্ষতি, সমাজেরও, দেশেরও।

জেলের পরিচালকবৃন্দ এবং জেলর সাহেব যে-পরিমাণে বুঝিতেছে যে তাহারা ভুল করিয়াছে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রভৃতির কাছে এক্‌সপোজড হইতেছে, সেই পরিমাণে তাহারা ক্ষিপ্ত হইতেছে। যে পরিমাণে পরাজয় বোধ করিতেছে, সেই পরিমাণে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইতেছে। এখানে সত্য-অসত্য ন্যায়-অন্যায় প্রশ্ন নাই, হারজিতের প্রশ্ন। জিতিলে আনন্দ, হারিলে দুঃখ, অপমান। ইহারা সাধারণ মানুষ, আমিও তাই। সুতরাং অফিস ও জেলর সাহেবের মনের অবস্থা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। আমারও মনের অবস্থা, আমার আদর্শ সত্য অহিংসা সর্বোদয় স্থিতপ্রাজ্ঞত্বে প্রতিষ্ঠিত নয়। এ-সব আমার স্বাভাবিক নয়। বাহিরে প্রকাশ নাই বটে কিন্তু ভিতরে দুঃখ, অপমান, হিংসা, ঘৃণা, বিরক্তি, ক্রোধ ইত্যাদি সবই আছে। কিন্তু এখানকার অফিসার এবং তাহাদের এজেণ্টদের এই সব ব্যবহার [illegible]

আনা যায়, এইলিং ব্রাদার-এর ভাব আনা যায়? সিন অ্যাণ্ড নট সিনার্স এই ভাব আনা যায়? এদের নিজেদের ক্ষতি হইতেছে। অন্যায়ের পথে, অসত্যের পথে গিয়া ইহারা ধর্মে ইমানে পতিত হইতেছে, হীনতা দেখা দিতেছে। অন্যায়ের পথে চলিতে চলিতে সেই পথে পাকা হইতেছে, এমবোলডেণ্ড হইতেছে। সুতরাং এই অন্যায় পথে চলিতে চলিতে বিপদে পড়িয়া নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। একজন মানুষ বিপথগামী হইতেছে, আমার দেশবাসী অসৎ হওয়ায় আমার দেশের ক্ষতি হইতেছে। এই দিক দিয়া দেখিলেও এদের প্রতি কর্তব্য আছে। অন্ধ, মূর্খ, মূঢ় দেশবাসী। ইহাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ না হইলে, সুস্থ না হইলে, স্বাভাবিক না হইলে, সুন্দর না হইলে, দেশ বড় হইবে না, সংসুন্দর হইবে না।

ইহাদের কল্যাণ চাই। ইহারা আমার অকল্যাণ চায় ভুল করিয়া, তাহাতে ইহাদেরই লোকসান। গান্ধীজীকে, ক্রাইস্টকে তাহাদের স্বদেশবাসী হত্যা করিল। এই ট্রেজেডি জীবনে আছে, ইহাকে বোল্ডলি ফেস করিতে হইবে। গান্ধীজীর উপর কতবার অ্যাটেম্পট্ হইল, তবু তাহাদের কল্যাণের জন্য সতত তাঁহার চেষ্টার বিরাম ছিল না। তাই তো তিনি গান্ধী। আর যাহারা দেশসেবা, দেশবাসীর সেবা, মানুষের সেবা ছাড়িল, প্রতিহিংসার পথ ধরিল, জগৎ তাহাদের ভুলিয়া গেল কিন্তু গান্ধীজী ও ক্রাইস্ট প্রভৃতি অমর হইয়া রহিলেন। সুতরাং মানুষের পথ এই, ইহাতেই দেশের এবং বিশ্বের কল্যাণ।

সর্বোদয়ের আদর্শ যাহার মনেপ্রাণে রহিয়াছে, টেক্‌নিক তাহার কাছে সহজেই আসে। সর্বোদয়—সকলের উদয়। আপনপর, সৎ অসৎ, ছোট বড়, স্বদেশবাসী ভিন্ন দেশবাসী বিশ্ববাসী সকলের কল্যাণ। সকলকে ভাল না বাসিলে হয় না। সাধারণ ভালবাসা নয়। সাধারণ ভালবাসা অল্পেতে ব্যর্থ হয়, শুকাইয়া যায়, অল্প আঘাতে উবিয়া যায়। সর্বোদয়ীর, অহিংসাশ্রয়ীর চাই গভীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা। এমন ভালবাসা, যে চরম শত্রুতা করিবে, চরম হিংস্র যে, তাহাকেও ভালবাসিতে পারিবে। তাহাদের ক্ষমা করিতে পারিবে। * *

৪ঠা নভেম্বর ১৯৫৪, রাত্রি প্রায় আটটা (রংপুর জেল)—আজ সকালে ডেপুটি জেলর সাহেব আসিয়া বলিলেন, "নিয়মমাফিক রান্না করুন, যা কাঠ লাগে আমরা দিব; আর কত লাগে তাও দেখা যাক!" দুই বেলা রান্না করিয়া দেখা গেল: চার সের লাগিল। বোধহয় চার সের করিয়া দিলে কোনও রকম অসুবিধা হয় না।

ডাএট বদলাবদলির প্রশ্ন এবং পি সি (আইডেণ্টিটি কার্ড) হইতে সব্জি ইত্যাদি কেনা যায় কিনা, তাহা আই জি-র কাছে জানানো হইল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে জানানো হইল যে, কাল রাত্রেও সেই তিনজন ওয়ার্ডার চিৎকার করিয়া গুনতি করিয়াছে এবং ইচ্ছা করিয়া জোরে জোরে কাশিয়াছে। এই বারে তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের আরও কয়েকজন, তবে রাত্রি একটা হইতে তিনটা পর্যন্ত না করিয়া অনুষ্ঠানটি করা হয় রাত্রি নয়টা হইতে এগারোটা পর্যন্ত। সন্ধ্যাবেলা ডেপুটি জেলর যখন দেখিলেন সেই তিনজন নাইট-ওয়ার্ডারকে আবার আজও দেওয়া হইয়াছে, তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি তখনই গিয়া সি এইচ ডব্লিউকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন। (লক্-আপ-এর সময় দেখিলাম হাসপাতালের অপর প্রান্তে ইহারা তিনজনে সি এইচ ডব্লিউ-র সহিত পরামর্শ করিতেছে।) তিনি আরও বলিলেন যে, জেলর সাহেব আজ নাইট ওয়ার্ডারদের সহিত দেখা করিয়া তাহাদের 'সিরিয়াস ওয়ার্নিং' দিয়াছেন যে, যদি অপরাধীকে এভাবে জ্বালাতন করা হয়, তাহা হইলে তিনি ড্রাস্টিক স্টেপ নিবেন। গুনতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ওয়ার্ডাররা কামরার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে আস্তে সংখ্যাটা দিতে হইবে। দেখা যাউক আজ রাত্রে ইহারা কি করে। (ক্রমশ)

ক্রিকেটের রাজকুমার

শ্রীখেলোয়াড়

ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে পার্কার 'পিচ' তখন এক বিশেষ আকর্ষণের স্থান ছিল। অনেকগুলি ক্রিকেট খেলা একই সময়ে চলতো বিরাট এই পার্কার পিচে পাশাপাশি। প্রথম বছরেই রণজি পার্কার পিচে এমন কতকগুলি ইতিহাস সৃষ্টি করেন, যা আজও ইংলণ্ডের ক্রিকেট-রসিক জনসাধারণের কাছে কিংবদন্তীর মত হয়ে রয়েছে। একটি ঘটনার কথা বলি, "একদিন রণজি কোন একটি দলের হয়ে খেলতে নেমে মধ্যাহ্নভোজের আগেই ১৩২ রান করে আউট হয়ে যান। তখনও তাঁর দলের অনেক খেলোয়াড়ের ব্যাট করতে বাকী। তাই পাশের একটি খেলা দেখতে যান তিনি। সেখানে গিয়ে জানতে পারেন, যে দল ব্যাট করছে তাদের একজন খেলোয়াড় কম আছে। সেই দলের হয়ে ব্যাট করে রণজি অতি দ্রুত শতরান সম্পূর্ণ করে আবার নিজের খেলায় ফিরে এসে দেখেন তখনও তাঁর দল ব্যাট করছে। তখন রণজি আর একটি খেলা দেখতে যান। সেখানেও কোন এক দলের হয়ে ব্যাট করে তিনি সংগ্রহ করেন ১২০ রান।" এইভাবে একই দিনে তিনটি বিভিন্ন খেলায় শতরান করে রণজি সেদিন যে বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন, সেকথা ক্রিকেট-রসিকরা কোনদিন ভুলতে পারবে না। রণজি নিজেও বুড়ো বয়স পর্যন্ত এই খেলাটির কথা বন্ধুবান্ধবের কাছে গল্প করে শোনাতেন। ঝড়ের গতিতে রান তোলাই ছিল রণজির খেলার বৈশিষ্ট্য। সেই কারণে পার্কার পিচে যখনই যে খেলায় তিনি নামতেন, সেই খেলাতেই দর্শকের ভিড় হতো সবচেয়ে বেশী।

আরও উন্নত ক্রিকেট শিক্ষায় রণজিকে পারদর্শী করে তোলার জন্য গুডচাইল্ড পার্কার 'পিচ' থেকে রণজিকে ফেনার 'পিচে' নিয়ে আসেন। এইখানেই ডানহাওয়ার্ড, সার্প, রিচার্ডসন, লকউড ও ওয়াটসের মত তখনকার শ্রেষ্ঠ পেশাদার বোলারদের বিরুদ্ধে রণজির নিয়মিত অনুশীলন করার সুযোগ ঘটে। 'ফেনার পিচে' উন্নত শিক্ষায় তাঁর খেলা ক্রমশই দোষমুক্ত হতে থাকে। পুরানো অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করতে না পারলেও অনেক ভুল-ত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ হয় তাঁর। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, রণজি খেলার সময়ে উইকেটের সামনে থেকে ডান পা'টা সরিয়ে উইকেটকে বিপক্ষ বোলারদের কাছে মুক্ত করে দিতেন। ডানহাওয়ার্ড রণজির এই ডান পা তোলার অভ্যাস ত্যাগ করিয়ে রক্ষণমূলক খেলার কৌশল শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রণজি এই রক্ষণমূলক খেলাকে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না। হাওয়ার্ড শেষে আর কোন উপায় না দেখে রণজির ডান পা'কে উইকেটের সামনে অনড় রেখে বল মারতে বলেন।

ডানহাওয়ার্ডের এই শিক্ষার ফলে রণজির হাত থেকে এমন এক 'স্ট্রোক' আবিষ্কৃত হয়, যাকে ক্রিকেট ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী স্ট্রোক বা মার হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মারটির নাম 'লেগ গ্লান্স'। ডান পা উইকেটের সামনে অবিচল রেখে নিজের দেহটাকে সুবিধামত বেঁকিয়ে কব্জির অপূর্ব কৌশলে এমনভাবে রণজি বলটিকে মারতেন যে, চোখের নিমেষে বল লেগের দিকে বাউণ্ডারীর সীমানা অতিক্রম করে চলে যেতো। কারো সাধ্য ছিল না সেই বিদ্যুৎবেগে ধাবিত বলের গতি রুদ্ধ করে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকা ডেলি টেলিগ্রাফ রণজির লেগ গ্লান্স মারের তীব্রতা সম্বন্ধে বলেছেন—

"....it goes to leg and boundary like a shell from a 7-pounder, immense, audacious, unstoppable."

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বোলাররা বহুপ্রকারে চেষ্টা করেও রণজির 'লেগ গ্লান্স' মারের সাহায্যে রান তোলার গতিকে কখনও রুদ্ধ করতে পারেন নি। অনেক বোলার রণজির বেপরোয়া রান তোলায় বিব্রত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে আনাড়ী খেলোয়াড়ের অপবাদও দিয়েছেন। কিন্তু রণজি জানতেন বোলারদের ব্যথা কোথায়? এই 'লেগ গ্লান্স' মারই রণজিকে ক্রিকেট ইতিহাসে স্বর্ণ-সিংহাসন লাভে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে। সমসাময়িক বা পরবর্তীকালের বহু কুশলী ব্যাটসম্যান রণজির 'লেগ গ্লান্স' মার অনুকরণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যে দক্ষতার সাহায্যে ও যেমন সাবলীল ভঙ্গিমায় রণজি 'লেগ গ্লান্স' করতে পারতেন তা অন্য কোন
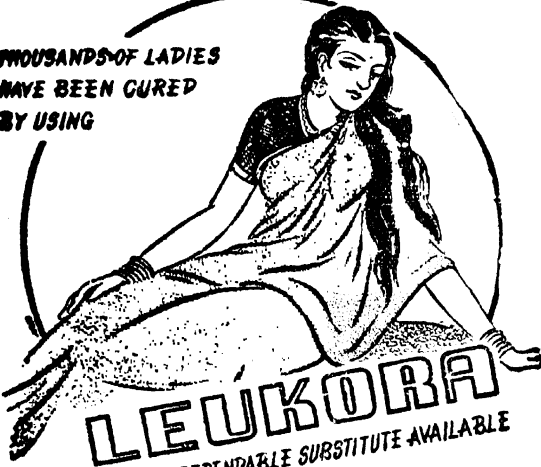
ব্যাটসম্যানের পক্ষে কোনদিন সম্ভব হয়নি। তাই সমসাময়িক সমালোচকেরা বলতেন—"a patent stroke of Ranji's own invention."

কেম্ব্রিজের ক্রিকেট অধিনায়ক এফ এস জ্যাকসনের সংগে রণজির আলাপ হয়। একদিন জ্যাকসন 'পার্কার পিচে'র পাশ দিয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন, দেখেন খেলা হচ্ছে অনেকগুলি অথচ একটি খেলাতেই দর্শকের ভিড় সবচেয়ে বেশী। কি ব্যাপার দেখার জন্যে ভিড় ঠেলে উঁকি মেরে জ্যাকসন দেখতে পান এক ভারতীয় খেলোয়াড় ব্যাট করছেন। প্রায় প্রত্যেকটি বলেই বাউন্ডারী করছেন সেই ব্যাটসম্যান। আর দর্শকেরা উচ্ছ্বসিত আবেগে চীৎকার করছে, হাততালি দিয়ে ব্যাটসম্যানকে উৎসাহিত করছে। লেগের দিকের বলগুলি হাঁটু গেড়ে বসে এত তীব্রভাবে 'পুস' করছেন তিনি যে, অনেক সময় বলের গতিপথ অনুমান করাও সম্ভব হচ্ছে না। জ্যাকসন বনেদী ইংরেজ। ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাঁর স্বভাবতই একটা ঘৃণার ভাব ছিল। তাই জনসাধারণের আনন্দের সংগে নিজেকে যুক্ত করলেন না তিনি। তাছাড়া ভারতীয় খেলোয়াড়ের মারের টেকনিক পুঁথিগত না হওয়ায় জ্যাকসন তেমন সুনজরে দেখলেন না রণজির খেলা।

যাই হোক, অধিকাংশ খেলাতেই বিপুল-সংখ্যক রান করতে থাকায় এবং ক্রিকেট সমালোচক নিউটন ডিগবির অপ্রাণ চেষ্টায় রণজিকে 'ট্রিনিটি কলেজ একাদশের' মধ্যে রাখতে বাধ্য হলেন জ্যাকসন। ভারতীয় হিসাবে ইংলন্ডের কলেজীয় ক্রিকেটে রণজিই প্রথম স্থান লাভ করলেন। প্রথম প্রথম দলের সাদা চামড়ার খেলোয়াড়েরা রণজিকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করতেন। তাই অনেক সময় একা একা চুপচাপ নিঃসঙ্গ অবস্থায় প্যাভেলিয়নে তাঁকে বসে থাকতে দেখা যেতো। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যেই কলেজের সাদা চামড়ার খেলোয়াড়েরা বুঝতে পারেন যে, দলীয় সম্মানের জন্য এবং নিশ্চিত পরাজয়ের লাঞ্ছনা থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য যে কোন খেলোয়াড়ের চেয়ে ঐ কৃষ্ণবর্ণ খেলোয়াড়ের প্রয়োজন অনেক বেশী।

কলেজ ক্রিকেটে রণজি প্রথম বছরেই ব্যাটিং অ্যাভারেজে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় একাদশে তাঁর স্থান পাওয়া উচিত বলে কিছু কিছু সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভীক ক্রীড়া-সাংবাদিক মতামত প্রকাশ করেন। কিন্তু ইংলন্ডের অধিকাংশ গোঁড়া ক্রিকেট সমর্থক বলাবলি করতে থাকেন—ইংলন্ডের ক্রিকেটের অন্তিম সময় আর বেশী দূরে নয় বলেই একজন কালাআদমীকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট দল গঠিত হতে চলেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয় দলের অধিনায়ক জ্যাকসনও ঐ একই কারণে রণজিকে দলে নেওয়ার বিরোধিতা করেন। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ছিল না ক্রিকেটের এমন এক অবিস্মরণীয় প্রতিভা সুযোগের অভাবে অংকুরেই বিনাশ হয়ে যায়। লর্ড হকের অধিনায়কতায় এই সময় ইংলন্ড দল ভারত সফরে আসে। স্ট্যানলী জ্যাকসনও এই দলের অন্যতম খেলোয়াড় হিসাবে ভারত সফরে আসেন। সফর থেকে দেশে ফিরে যাবার পর জ্যাকসনের মনোভাবের পরিবর্তন হয়। ভারতবাসী যে ক্রিকেটে একেবারে আনাড়ী নয়, ক্রিকেট খেলার আদব-কায়দা, নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে ভারতীয়দের যে জ্ঞান আছে, একথা বিশেষ করেই ভারত সফর থেকে বুঝে যান জ্যাকসন। জ্যাকসনের মনো-ভাবের পরিবর্তনের ফলেই রণজির বিশ্ববিদ্যালয় একাদশে স্থান পাওয়া সম্ভব হয়। পরবর্তীকালে জ্যাকসন এই ঘটনার কথা উল্লেখ করলে লজ্জিত হয়ে বলতেন—'সে সময়ে আমি যদি ভারত সফরে না যেতাম এবং আমার মনোভাবের পরিবর্তন না হতো, তাহলে বিশ্বের সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের কথা কেউ হয়তো কোনদিন জানতেও পেতো না।"

ক্রিকেটের স্বতঃস্ফূর্ত-প্রতিভাবলে রণজিকে আখ্যা দেওয়া হলেও তিনি দৃঢ়-ভাবে অস্বীকার করতেন এই ক[...]। তিনি বলতেন "নিয়মিত ও উপযুক্ত শি[...]য় কঠোর অনুশীলন করেই আমি ক্রিকে[...] খেলা শিখেছি। সুযোগ পেলেই [...]শিক্ষক, সমালোচক এবং অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের [...] আলোচনা করেছি কি করে খেলাকে উ[...] করা যায়। এইভাবেই ধীরে ধীরে আমা[...] খেলা উন্নত হয়েছে। ভুল ত্রুটি ক্রমশই শোধরাতে পেরেছি। অবশ্য আমার চোখের দৃষ্টি ছিল খুব প্রখর। তা ছাড়া কোন্ বলকে কখন কিভাবে খেলতে হবে সে কথা অন্তর থেকে কে যেন আমায় বলে দিতো।"

বরিশ'র সংসারে রণজি ছিলেন ঘরের ছেলের মত। বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা রণজিকে কাছে পেলে স্বর্গ হাতে পেতো। এক একদিন বরিশ'র স্ত্রী ছেলেমেয়েদের সাড়াশব্দ না পেয়ে ভাবতেন হয়তো তাদের ভারতীয় অতিথিকে তার ছেলেমেয়েরা বিরক্ত

করছে। উৎকণ্ঠিত হয়ে তিনি গিয়ে হয়তো দেখতে পেতেন রণজি তাঁর স্বাভাবিক মিষ্ট সুরে বাইবেল পড়ে শোনাচ্ছেন আর মন্ত্র-মুগ্ধের মত ছেলেমেয়েরা চুপ করে বসে তাই শুনছে। ধর্মের উপর ছেলেবেলা থেকেই রণজির প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। কেম্ব্রিজে পড়ার সময়ে তিনি প্রার্থনার জন্য যে ভাষণটি লিখেছিলেন সেটি ইংলণ্ডের রাজার অনুরোধে বহু স্কুলের প্রার্থনা সভায় নিয়মিত পড়া হতো। ব্যাকিংহ্যাম প্রাসাদের স্টাডিরুমে আজও সে ভাষণটি সযত্নে রাখা আছে। ভাষণটি ছিল—

"Make me to observe and keep the rules of the game. Help me not to cry for the moon. Help me neither to offer nor to welcome cheap praise. Give me always to be a good comrade. Help me to win, if I may win, but—and this, Powers, especially—if I may not win, make me a good loser."

ক্যামেরার ছবি তোলার উপর এই সময় রণজির বিশেষ ঝোঁক চাপে। বাড়িতে বক্স রুম স্টুডিও নামে একটা স্টুডিও করে যখন তখন তিনি বন্ধুবান্ধবের ছবি তুলে বেড়াতেন।

১৮৯২ সালে বরিশ' এবং অন্য সকলকে তাক লাগিয়ে ট্রিনিটি কলেজ থেকে পাশ করেন রণজি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর নিজের জন্য একটা বাসা বাঁধবার তাঁর সাধ হয়। ধনী পাড়ায় সিডনি স্ট্রীটে দুটি সংসারের উপযোগী একটি ফ্লাট তিনি ভাড়া নেন। বহু মূল্যবান ফার্নিচার, কার্পেট, টেবেলক্লথ, পর্দা প্রভৃতি দিয়ে ফ্লাটটিকে মনোমত করে সাজিয়ে তোলেন তিনি। 'পাপসী' নামে দুধের মত সাদা বিরাটকায় এক কাকাতুয়া হল রণজির সব সময়ের সংগী। পাপসী রণজির মৃত্যু সময় পর্যন্তও তাঁর পাশে ছিল। রণজির জীবনের সর্বাপেক্ষা মধুর দিনগুলি কেটেছে এই ফ্লাট বাড়িতে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বন্ধুবান্ধবের কাছে এই ফ্লাটবাড়ির স্বপ্নময় দিনগুলির কথা তিনি গল্প করে শুনিয়েছেন।

স্টেট থেকে বছরে ৮০০ পাউণ্ড করে হাত খরচ পেতেন রণজি। কিন্তু এই টাকাতে তাঁর কিছুই হতো না। অত্যন্ত শৌখিন ছিলেন তিনি। দামী পোশাক ছাড়া কোন সাধারণ পোশাক কখনও কেউ তাঁকে ব্যবহার করতে দেখেনি। এছাড়া বন্ধুবান্ধবের অর্থের প্রয়োজনে তাঁর দ্বার ছিল সদা অবারিত। প্রার্থীকে কোনদিন কোন অবস্থাতেই বিমুখ করেন নি রণজি। এই সুযোগে অনেকে যে তাঁকে ঠকায়নি, এমন নয়। তবুও এই সাহায্য করার সুযোগ তাঁকে এক বিশেষ আনন্দ দিতো। ঘড়ি, আংটি, আইভরির সুদৃশ্য খেলনা ও আরও অনেক মূল্যবান উপহার বন্ধুবান্ধব ও খেলোয়াড়দের মাঝে যে কত তিনি বিলিয়েছেন তার কোন হিসাব নেই। কেম্ব্রিজের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মোটর গাড়ি কেনেন। এইভাবে দুহাতে অর্থব্যয় করায় রণজিকে অবশ্য অনেক দেনায় জড়িয়ে পড়তে হয়। কিন্তু তবুও খরচার অংক কমানোর কোন চেষ্টাই তিনি করেন না' বন্ধুবান্ধবদের সংগে হৈ-হল্লা, শিকার, ছবি তোলা, পোকার খেলা ও গানবাজনা করেই তিনি বোধহয় দেশের কথা এবং তাঁকে গদিচ্যুত করার হীন ষড়যন্ত্রের কথা ভুলে থাকতে চাইতেন।

১৮৯৩ সালে ইংলণ্ডের আপামর জনসাধারণের কাছে রণজির ক্রিকেট প্রতিভা প্রথম স্বীকৃত হয়। 'রণজিৎ সিংজী' এতবড় নামটি সব সময় বলতে অসুবিধা হয়। তাই ক্রিকেট উৎসাহীরা তাঁর নতুন নামকরণ করেন 'রণজি' নামে। এই নামকরণের ব্যাপারে কয়েকটা মজার ঘটনা ঘটে। লণ্ডনে স্টার নামে একটি পত্রিকার কোন এক কম্পোজিটার রোজ রোজ এবং বারে বারে রণজিৎ সিংজী নামটি কম্পোজ করতে করতে বিরক্ত হয়ে কাগজের সম্পাদকের কাছে একদিন গিয়ে কাতর অনুনয় করে বলেন, "স্যার, এতবড় নাম রোজ রোজ এবং বারে বারে কম্পোজ করতে করতে আমি হয়রান হয়ে পড়েছি। আপনি অনুগ্রহ করে এই ভারতীয় খেলোয়াড়ের এমন একটা সহজ নামকরণ করে দিন যাতে আমার কাজের একটু সুবিধা হয়।" পাঞ্চ পত্রিকা রণজির নামকরণ করে "রান-গেট-সিংজী" নামে। ক্রিকেট স্পেকটেটার পত্রিকা রণজির খেলায় এত বেশী মুগ্ধ হয় যে, "Ramsgate Jimmy" বলে রণজিকে অভিহিত করে। ফলে ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে রণজি আলোচনার বস্তু হয়ে ওঠেন।

বিভিন্ন কাউণ্টি দলে রণজিকে নেবার জন্য টানাটানি হতে থাকে। জেন্টলম্যান এবং প্লেয়ারদের খেলায় এবং সাউথ অফ ইংলণ্ড বনাম কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ডের সম্মিলিত দলের খেলায় তাঁর অপূর্ব কলাকৌশল প্রদর্শনের পর স্ট্যানলী জ্যাকসন নিজে রণজির সবচেয়ে বড় সমর্থক হয়ে ওঠেন। পরস্পরের মধ্যে চিরদিনের জন্য এক প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়।

কলেজ ক্রিকেটে রণজিকে আউট করা ক্রমেই এক সমস্যা হয়ে ওঠে। কেম্ব্রিজ অধিনায়ক স্ট্যানলী জ্যাকসন মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে রণজিকে বলতেন, "বন্ধু, তুমি যদি আউট না হও তাহলে— I should bowl at your left elbow and place as many men as possible to leg."

রণজী হাসিমুখে উত্তর দিতেন, "হ্যাঁ, তুমি ঐভাবে হয়তো আমাকে আউট করতে পারবে কিন্তু সেটা কি ক্রিকেটের শালীনতা বিরুদ্ধ কাজ হবে না?" ইংলণ্ডের ব্যাটিং অ্যাভারেজে বিংশতি স্থান এবং কলেজ ক্রিকেটে তৃতীয় স্থান অধিকার করায় ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ও বনেদী ক্রীড়াসংস্থা 'হক ক্লাবে' রণজিকে গ্রহণ করা হয়। রণজিই প্রথম ভারতীয়, যিনি ইংলণ্ডের হক ক্লাবের সভ্য হবার গৌরব অর্জন করেন।

মধুসূদন খ্রীষ্টান হলেন কেন?

আমিতাভ গুপ্ত

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজের "সিনিয়র বিভাগে" দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। এ সময় হঠাৎ একদিন তিনি কলেজ থেকে উধাও হলেন। কোথায় যে তিনি গেলেন কেউ-ই কিছু জানতেন না—এমন কি, তাঁর মা বাবা বা অন্তরঙ্গ সুহৃদরাও নয়। স্বভাবতই তাঁদের উদ্বেগের সীমা রইল না এবং চারিদিকে চলল তল্লাসী। কিন্তু দিন দুতিনের মধ্যেই খবর এল যে, মধুসূদন খৃষ্টি-ধর্ম গ্রহণ করেছেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারীর এক শীত-প্রভাতে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে। তখন তাঁর বয়স সবে উনিশ বছর।

মধুসূদন দত্ত যে ঠিক কি কারণে খৃষ্টান হয়েছিলেন সে বিষয়ে নানা লোকে নানা কথা বলে থাকেন। তাঁর খ্যাতনামা জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন: "তাঁহার পারিবারিক জীবনের অন্যান্য অনেক কার্য্যের ন্যায় তাঁহার খৃষ্টি-ধর্ম গ্রহণ প্রগাঢ় রহস্যপূর্ণ। কি জন্য যে তিনি খৃষ্টি-ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অন্যের পক্ষে তাহা অভ্রান্তরূপে নির্দেশ করা সম্ভব নয়।" সুতরাং কিছুটা অনুমান এবং কিছুটা সমকালীন ঘটনা পরম্পরার ওপর নির্ভর করেই এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করা চলতে পারে।

কেউ কেউ বলেন যে, মধুসূদন খৃষ্টান-পরিচালিত কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন, এবং খৃষ্টান পাদ্রী ও ধর্মযাজকেরা তাঁদের পড়াতেন। সুতরাং খৃষ্টি-ধর্ম গ্রহণে তাঁরাই হয়ত মধুকে প্রভাবান্বিত করেছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সেকালে হিন্দু-কলেজীয় শিক্ষা খৃষ্টি-ধর্ম প্রচারের অনুকূলে ছিল না একেবারেই। বরঞ্চ প্রতিকূলই ছিল বলতে পারা যায়। শিক্ষা-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সদাসর্বদা সজাগ ছিলেন যে, এদেশীয় ছাত্রদের ধর্ম-অনুভূতিতে যেন কোন আঘাত না লাগে। যে দুজন শিক্ষক তৎকালীন ছাত্র-সমাজের নেতা ও আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন—আমি ডিরোজিও সাহেব ও ডেভিড হেয়ারের কথা বলছি—তাঁরা উভয়েই খৃষ্টি-ধর্মে বিশ্বাসী হওয়া তো দূরে থাক—নাস্তিক ছিলেন। তাঁরা এবং তাঁদের অনুগত ছাত্ররা খৃষ্টি-ধর্ম, বস্তুত যে কোন ধর্মের প্রতিকূল মন্তব্যই বেশী উপভোগ করতেন। হিউম, টমাস পেন, থিওডোর পার্কার প্রভৃতি বিখ্যাত যুক্তিবাদী মনীষীরা তাঁদের যে সব বক্তৃতায় যুক্তিতত্ত্ববাদের অবতারণা করে ধর্মের বা ঈশ্বরের অসারত্ব প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন, ছাত্ররা তা অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে পাঠ করতেন। সাধারণভাবে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা দেখানোই তখনকার দিনের যুবসমাজের প্রায় রীতিই ছিল বলতে পারা যায়। স্বনামখ্যাত ব্রাহ্ম প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন:

ওল্ড মিশন চার্চ-এর প্রথম যুগের একটি ছবি। এই গির্জাতেই মধুসূদন খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন

"For one man who came to embrace Christianity or joined Brahmo Samaj, ten expressed their whole defiance of all religions."

অর্থাৎ যদি একজন খৃষ্টি-ধর্ম বা ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ করতেন, তাহলে দশজন সকল ধর্মের প্রতি শ্লেষোক্তি বর্ষণ করতেন। এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য বিদেশী শিক্ষাব্রতীরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সত্যি কথা, কিন্তু এদেশীয়রা ইংরাজী-শিক্ষাকে তখনও পর্যন্ত সুনজরে দেখতে পারেন নি। অনেকেই ভাবতেন যে, ইংরাজী শিখলে জাত-ধর্ম দুই-ই যাবে। সুতরাং এ অবস্থায় ছাত্রদের মধ্যে প্রকাশ্যে খৃষ্টি-ধর্ম প্রচার করলে অথবা তাঁদের মধ্যে কেউ খৃষ্টি-ধর্ম গ্রহণ করলে ইংরাজী-শিক্ষা-প্রচার আন্দোলন গুরুতররূপে ব্যাহত হবে এবং এ পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি হবে এ আশঙ্কা শিক্ষাব্রতীদের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল। তাঁরা যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গেই এ বিষয়ে অগ্রসর হতেন। সুতরাং হিন্দু কলেজের আবহাওয়া বা শিক্ষা যে মধুসূদনের ধর্মমত পরিবর্তন করানোর ব্যাপারে সহায়তা করেনি তা প্রায় সুনিশ্চিত। এ সম্বন্ধে মধুসূদনের এক সহপাঠী বলছেন: "কলেজের অধিকাংশ ছাত্র হিন্দুর আচার-ব্যবহারে অনাস্থা প্রকাশ করি[...] সত্য, কিন্তু ঐ কলেজের কোন ছাত্র খৃষ্টি-ধর্ম অবলম্বন করিবে—এ আশঙ্কা অনেকের ছিল না। তাহার কারণ দুইটি—প্রথম কারণ, অনেকে গিবন পড়িতেন, হিউম, [...]উন ও ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব সময়ের আর[...] গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ লইয়া বাদানুবাদ করিতেন এবং মৃত ডিরোজিও সাহেবের চরিত্র অনুসরণ করিতেন। দ্বিতীয় কারণ মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব। কে কোথায় যাইতেছে, কি করিতেছে ইত্যাদি বিষয়ে তাহার এক বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমন কি, ছাত্রদিগের পিতা মাতা যাহা না জানিতেন, হেয়ার সাহেব তাহা জানিতে পারিতেন।" এ প্রসঙ্গে একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনীও তিনি বিবৃত করেছেন। কলকাতায় তখন এসে আস্তানা গেড়েছেন সেণ্ডিস্ নামে

। তিনি একদিন ঘোষণা করলেন ...র যে ছেলে বাইবেল পাঠ করতে উৎসুক ...বন, তাঁকে তিনি ঐ গ্রন্থ এক খণ্ড উপহা...র দেবেন। এ খবর পেয়ে হিন্দু কলেজের ...-সাতজন ছাত্র সেণ্ডিস্ সাহেবের কাছে ...স হাজির। তিনি তো বিশেষ সমাদরে, সঙ্গে তাঁদের বসিয়ে খৃষ্টি-ধর্মের মহি... গাইতে লাগলেন। পরে প্রত্যেককে এ...টি করে বাইবেল উপহার দিলেন। ...ন্দর বাঁধাই আর উত্তম কাগজে ছাপা এই বাইবেল। ছেলেরা তো খুব খুশী, যদিও তাঁরা ঠিক করলেন যে, বাইবেল-উপহার-প্রাপ্তির ঘটনা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। বিশেষ করে, হেয়ার সাহেবের কাছে তো নয়ই। কিন্তু আগেই বলেছি যে, ছাত্রদের অধ্যয়ন-বিষয়ক বা ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারই হেয়ার সাহেবের সতর্ক দৃষ্টি এড়াত না। সুতরাং ছাত্রদের বাইবেল-প্রাপ্তির সংবাদটিও তিনি যথাসময়ে জানতে পারলেন এবং একদিন তাঁদের সকলকে ডেকে পাঠিয়ে বাইবেলগুলি হস্তগত করলেন। এমন কি, এ ঘটনায় তিনি এতদূর বিরক্ত হয়েছিলেন যে, তিনি প্রত্যেকটি ছেলেকে বারকয়েক বেত্রাঘাত করে ভবিষ্যতে তারা যাতে এ ধরনের ঘটনায় লিপ্ত না হয়, তা বলে সাবধান করে দিলেন। বেত্রাহত এই ছেলেদের মধ্যে একজন এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ—"আমরা সেই অবধি বাইবেল পড়া দূরে থাকুক, কোন গির্জার নিকট দিয়াও চলিতাম না।"

মধুসূদনের সঙ্গে যাঁরা বাল্যকাল থেকেই বিশেষ অন্তরঙ্গরূপে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই একমত যে, মধুর কস্মিনকালেও খৃষ্টি-ধর্মে বিন্দুমাত্র অনুরাগ ছিল বলে তাঁরা জানতেন না,—শোনেনও নি। সুতরাং তাঁদের বন্ধুর ধর্মান্তর-গ্রহণের সংবাদে তাঁরা অতীব বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁরা সকলে বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, ধর্ম-বিশ্বাস দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কখনও খৃষ্টি-ধর্ম গ্রহণ করেন নি।

তবে এ বিষয়ে বিভিন্ন যে সব জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, এখন সে প্রসঙ্গেই আসছি।

মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নরত ছিলেন, তখন তাঁর বাবা ও মা নিকটবর্তী অঞ্চলের এক সংগতি-সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত জমিদারের সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহের আয়োজন করলেন। কিন্তু পাত্র অর্থাৎ মধু বেঁকে বসলেন যে, তিনি এ বিয়ে করবেন না। কিন্তু পিতা রাজনারায়ণ ও মাতা জাহ্নবী তাঁর আপত্তিতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন না। তাঁরা ভাবলেন যে, পাত্রী রূপলাবণ্যময়ী ও সম্বংশজাতা, সুতরাং মধু এ বিয়ে ঠিকই করবেন, যদিও গোড়াতে তিনি মৌখিক আপত্তি জানাচ্ছেন। তাই তাঁরা বেশ নিশ্চিন্ত মনেই বিবাহের আনুষঙ্গিক আয়োজন সমাপ্ত করতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু পরে যখন পাকা-দেখা হয়ে গেল, তখন মধুসূদন তাঁর মাকে জানালেন যে, তিনি কিছুতেই তাঁদের মনোনীতা পাত্রীকে বিয়ে করবেন না। মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী খ্যাতিসম্পন্না মহিলা-কবি মানকুমারী বসু এ বিষয়ে বলতে গিয়ে লিখেছেনঃ—"......পরে যখন বিবাহের পাকা-দেখা ঠিক হইয়া গেল, তখন মধুসূদন মাতাকে বলিলেন, 'মা, এ কাজ কেন করিলে, আমি তো বিবাহ করিব না।' মাতা পুত্রের কথায় দুঃখিত হইয়া ভাবী বৈবাহিকের ধনমান ও তদীয় কন্যার রূপ-গুণের অনেক সুখ্যাতি করিলেন। মধুসূদন সকল কথা নীরবে শুনিয়া অবশেষে বলিলেন, '...তুমি যতই বল, বাঙ্গালীর মেয়ে রূপে গুণে কখনই ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশও হতে পারে না।' পুত্রের কথা শুনিয়া মাতা চমকিয়া উঠিলেন। যাহাতে শীঘ্র পুত্রের বিবাহ হইয়া যায়, সেই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।"

মধুসূদন তাঁর খুড়তুতো ভাইকে এ বিয়েতে তাঁর বিরাগের কথা জ্ঞাপন করে লিখেছিলেনঃ "বাবা এক কালো পাহাড়ের সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না।"

এছাড়া, প্রিয় বন্ধু গৌর বসাককে লেখা একটি চিঠি থেকে এ বিয়ের প্রতি মধুর বিরাগের তীব্রতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছিলেনঃ—

Kidderpore
27th November, 1842
Midnight

My dear Gour,

It is the hour for writing love-letters, since all around now is love-inspiring. But alas! the heart that 'Melancholy marks for her own' imparts its own morbid hues to all around it, and how can I, the most wretched being, on whom you refulgent lamp of night now shiness, write love letters or gay letters? You don't know the weight of my afflictions (Oh! I really wish that somebody would hang me!) At the expiration of three months from hence I am to be married;—dreadful thought! It harrows up my blood, and makes my hair stand like quills on the fretful porcupine! My bethrothed is he daughter of a rich zemindar; poor girl! what a deal of misery is in store for her in the ever inexplorable womb of Futurity!"

জাহ্নবী দেবীর কানে এসেছিল যে,

কলকাতায় দু-একজন হিন্দু যুবক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। তার ওপর মধু বললেন যে, বাঙ্গালীর মেয়েরা রূপে-গুণে ইউরোপীয় ললনাদের কাছে দাঁড়াতে পারে না। স্বভাবতই তিনি হয়ে উঠলেন অত্যন্ত উদ্বেগাকুল ও অস্থির। রাজনারায়ণ দত্ত শক্ত মানুষ। তিনি বললেন যে, মধুসূদনকে তাঁর মনোনীত পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে তিনি দেবেনই এবং তিনি দিন-ক্ষণও স্থির করে ফেললেন। সগর্বে সবাইকে বললেন যে, তাঁর ছেলের বিয়েতে তিনি এমনই সমারোহ করবেন যে, সকলের তাক লেগে যাবে। কিন্তু ভাগ্যবিধাতা বোধ হয় অলক্ষ্যে তাঁকে বিদ্রূপ করছিলেন। মধুসূদন তাঁর বিবাহের নির্ধারিত তারিখের কুড়ি-বাইশ দিন আগেই খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করলেন।

সুতরাং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আয়োজিত বিবাহ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই মধুসূদন খৃষ্টান হয়েছিলেন, এ অনুমান পূর্ববর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খুব অযৌক্তিক বলে মনে হয় না। "মধু-স্মৃতি" রচয়িতা নগেন সোম মশাই বলছেনঃ "এই অপ্রীতিকর বিবাহের দায় এড়াইবার নিমিত্ত মধু খৃষ্টান হন।"

ইংলণ্ড যাবার উৎকট আকাঙ্ক্ষাও মধুসূদনের খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণের আরেকটি কারণ হতে পারে। বন্ধুদের কাছে সব সময়ই তিনি বলতেন যে, বিলেতে তিনি যাবেনই। ইউরোপ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা মধুসূদনের কত তীব্র ছিল তা ফুটে উঠেছিল গৌর বসাককে লেখা তাঁর একাধিক পত্রের ছত্রে ছত্রে। এরকম একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেনঃ

"—You know my desire for leaving this country, is too firmly rooted to be removed. The Sun may forget to rise, but I cannot remove it from my heart. Depend upon it—in the course of a year or two more—I must either be in England or cease "to be" at all; one of these must be done!"

একথাও শোনা যায় যে, মধুসূদন একটি সুন্দরী, বিদুষী ও পাশ্চাত্য-আদব-কায়দা-দুরস্ত খৃষ্টান যুবতীর প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা দেবকী। মধুসূদন হয়ত অনুমান করেছিলেন যে, খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত হলে এই মেয়েটির সঙ্গে বিবাহিত হতে কোন বাধা থাকবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিলেত যাবার সুবিধেও হবে অনেক। সেকালে সমুদ্র-পাড়ি দেওয়াকে প্রায় সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ বা ভ্রষ্টাচার বলেই গণ্য করা হোত। যিনি সামাজিক অনুশাসন লঙ্ঘন করে সমুদ্র-পাড়ি দিতেন, তাঁকে সমাজ-চ্যুত করাই ছিল তখনকার দিনের বিধি। আর যিনি একবার সমাজচ্যুত বলে গণ্য হতেন, কঠোর প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া তাঁর সমাজে পুনঃ প্রবেশ অসাধ্য ছিল।

সুতরাং মধুর দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল যে, খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করলে শুধু যে তাঁর মনোমত খৃষ্টান পাত্রীটিকে বিয়ে করার পথ সুগম হবে তা নয়, ইংলণ্ড যাবার সকল বাধাও অপসৃত হয়ে যাবে সেই সঙ্গে। এছাড়া, কোন এক খৃষ্টান প্রচারকও নাকি তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, খৃষ্ট-ধর্ম অবলম্বন করলে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণ বিশেষ সহজসাধ্য হবে। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনকেও মধু মনের কথা খুলে ব্যক্ত করেছিলেন, এবং রেভারেণ্ড বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছিল তার যে বিবরণী প্রকাশ করেছিলেন, সেটির বঙ্গানুবাদ দাঁড়ায় এইরকমঃ—"আমি সে সময় কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ারে Christ Church-এ যাজকরূপে অবস্থান করছিলাম। মধুসূদন দত্ত একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে মনে হোল যে, তিনি খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে প্রায় মনস্থির করেই ফেলেছেন। দিনকয়েক পরেই কিন্তু আমার ধারণা হোল যে, তাঁর বিলেত যাবার ইচ্ছে তাঁর খৃষ্টান হবার অভিলাষের চেয়ে কিছু কম নয়,—বরঞ্চ এ দুটি প্রশ্ন তিনি যেন একই পর্যায়ে বিচার করছেন। আমি অবশ্য এ দুটিকে স্বতন্ত্রভাবেই দেখেছিলাম। সুতরাং আমি তাঁকে ধর্মান্তর গ্রহণে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকলেও, দ্বিতীয় বিষয়টিতে অর্থাৎ ইংলণ্ড গমনের ব্যাপারে কোন সাহায্য করবার অক্ষমতা প্রকাশ করলাম। [illegible]ত্র কথা শুনে মধুসূদন বেশ নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন বলে মনে হোল এবং তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসা কমিয়ে দিলেন। একদিন কথায় কথায় আমার উচ্চপদস্থ এক সহকর্মীকে বললাম যে, হিন্দু কলেজের একটি ছাত্র খৃষ্টান হতে চাইছে, আবার সেই সঙ্গেই বিলেতেও যেতে চাইছে। আমার বন্ধু একথা শুনে বেশ আগ্রহান্বিত হলেন এবং মধুসূদনের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করবার অভিপ্রায় জানালেন। আমি তদনুসারে একটি চিঠি দিয়ে মধুসূদনকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। তিনি মধুকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং তাঁকে প্রচুর উৎসাহ দিলেন—এমন কি, তাঁকে বাঙলা দেশের ডেপুটি গভর্নর 'বার্ড' সাহেবের সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দিলেন।"

যাই হোক, স্বধর্ম ত্যাগ করতে মধুসূদন কৃতসংকল্প হলেন এবং কলকাতার অন্যতম প্রধান যাজক আর্চডিকন ডেয়ালট্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করলেন। ডেয়ালট্রী সাহেবের মনে বিশ্বাস জন্মাল যে, মধুসূদন অন্তর থেকেই খৃষ্ট-ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন, এবং ধর্মান্তর গ্রহণ তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় এবং আন্তরিকতার সঙ্গে করছেন।

এমন সময় হঠাৎ একদিন মধুসূদন

কলেজ থেকে বাড়ি ফিরলেন না। কেউই—এমন কি তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরাও জানেন না কোথায় তিনি গেছেন। দিগম্বর মিত্র জানালেন যে, মধুসূদন কলেজ থেকে তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে তাঁর ভাই মাধব মিত্র ও মধু সেই যে বেরিয়ে গেলেন, আর তাঁরা বাড়ি ফেরেন নি। সবাই মিলে অনুসন্ধান শুরু করলেন। কিন্তু রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করে দিলেন যে, মধুসূদন খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে পাদ্রীদের সঙ্গে অবস্থান করছেন। খৃষ্টান হতে ইচ্ছুক যুবকেরা পাছে আত্মীয়-বন্ধুদের অনুরোধে বা চাপে পড়ে শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসে, সেই আশঙ্কায় খৃষ্টান যাজকেরা প্রায়ই তাঁদের নিজেদের বাড়িতে নিয়ে খুব আদর-যত্নের সঙ্গে রাখতেন। কিন্তু মধুসূদনের বেলায় তাঁরা আরও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। মধুসূদনের বাবা রাজনারায়ণ দত্ত কলকাতার একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন—সুতরাং তাঁর সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের ভয়ে পাদ্রী-সাহেবেরা মধুকে একেবারে কেল্লার ভেতর এক দুর্ভেদ্য স্থানে নিয়ে রেখে দিলেন। অবশ্য এ সত্ত্বেও জনরব উঠেছিল যে, মধুসূদনকে সে স্থান থেকে বলপূর্বক উদ্ধার করবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়ে রাজনারায়ণ দেশের জমিদারী থেকে লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা এনে জড়ো করেছিলেন।

মধুসূদন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের মধ্যে আছেন শুনে তাঁর বন্ধুদ্বয় গৌরদাস বসাক ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সেখানে গেলেন। কেল্লার ভেতরে ডাঃ কার্বাইনের বাড়িতে মধু অবস্থান করছিলেন। গৌরদাস ও ভূদেব দুর্গের নীচের তলায় অপেক্ষা করতে লাগলেন। এমন সময় ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং সোজা উপরে উঠে গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বিরস বদনে ফিরে এসে বললেন যে, পাদ্রীরা মধুসূদনের সঙ্গে তাঁকে দেখা করবার অনুমতি দেননি। ঐ কথা শুনে মধুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার দুরাশা মনে করে গৌরদাস ও ভূদেব প্রস্থানোদ্যত হলেন, কিন্তু এ সময় হঠাৎ একজন যাজক এসে বললেন যে, কয়েকদিন পরে মধুসূদনের সঙ্গে তাঁদের দেখা হতে পারে, তবে সেদিন নয়। দিনদুয়েক পরে গৌরদাস একাই ফোর্ট উইলিয়মে গেলেন। একটি সুসজ্জিত কামরায় মধুসূদন বসেছিলেন। তিনি সাদরে গৌরদাসকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং তাঁর ধর্মান্তর প্রসঙ্গে কোন কথা উত্থাপিত হবার আগেই খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণ উপলক্ষে তিনি যে ইংরাজী সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন, সুললিত ছন্দে সেটি
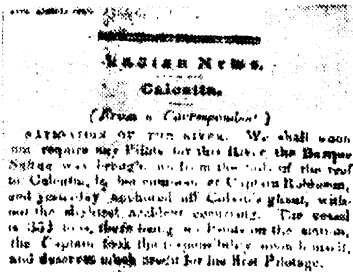
১৮৪৩ খৃঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারী 'বেঙ্গল হরকরা" পত্রিকায় মাইকেল মধুসূদনের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদের আলোক-প্রতিলিপি

আবৃত্তি করতে লাগলেন। এমন সময় ডাঃ কার্বাইন এসে তাঁদের আলোচনায় ছেদ ঘটালেন। গৌরদাস গভীর হতাশা ও আক্ষেপের সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করলেন। এর পরে আরও কয়েকজন আত্মীয় বা বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি মধুসূদনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, এবং তাঁদের একজন এ বিষয়ে যা লিখে গেছেন তা থেকে জানা যাচ্ছে যে, মধু "কয়েকজন পাদ্রী ও সৈনিক সাহেবের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া" কেল্লার মধ্যস্থিত গির্জাঘরে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

এদিকে জাহ্নবী দেবী যখন শুনলেন যে, তাঁর একমাত্র ছেলে খৃষ্টান হতে চলেছেন, তখন তিনি এ নিদারুণ আঘাতের আকস্মিকতায় মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে পাবার পরও তিনি শোকে দুহামানা হয়ে রইলেন। তাঁর করুণ বিলাপ হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করল। মধুসূদনের এক আত্মীয় লিখছেনঃ "সেই নিদারুণ সংবাদ তাঁহার পিতামাতার নিকট বজ্রাঘাত তুল্য হইল। একমাত্র সন্তানের এই অবস্থা শুনিয়া পিতা ও মাতা শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন।"

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী মধুসূদন দত্তের জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও স্মরণীয় দিন। ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে প্রায় বন্দী অবস্থায় দিন কয়েক থাকবার পর এই তারিখে বাঙলার ভবিষ্যৎ মহাকবি মধুসূদন দত্ত খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত হলেন। সেদিন কলকাতা শহরময় হুলস্থূল। রাজনারায়ণ দত্তের নাম সে সময় কে না জানত,—সুতরাং তাঁর একমাত্র পুত্র খৃষ্টান হতে যাচ্ছে, একথা প্রবাদবাক্যের মত মুখে মুখে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিশেষত মধুসূদনের খৃষ্ট-ধর্ম গ্রহণের ব্যাপারে পাদ্রীরা যে রকম সমারোহ দেখিয়েছিলেন, তাতে এ খবর সেকালে বাঙলা দেশের প্রায় সব সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ দৈনিক "বেঙ্গল হরকরা" ১১ই ফেব্রুয়ারী এ খবর প্রচার করলেন। প্রায় একশো পনের বছর আগে প্রকাশিত "বেঙ্গল হরকরা"র এই সংবাদটির একটি আলোক-প্রতিলিপি এই সঙ্গে দেওয়া হোল। এতে লেখা হয়েছিলঃ

"The Conversion and Baptism of a Hindoo Youth"

A student of the Hindoo College (2nd Class, Senior Department) named Modhoosoodun Dutt had for some time past determined to renounce the religion of his fathers and to embrace Christianity. It is very singular that before he had actually made up his mind to take this step, he had received no clerical instruction, whatever, having been in the habit of reading books and tracts by himself. A few weeks ago he presented himself before a clergyman in Calcutta as a Catechumen, and stated his willingness to embrace the religion, which reason, conscience, experience, all conspired to tell him, was the true one. He was shortly after introduced to the Archdeacon, who was highly satisfied with the proofs he exhibited in himself of a sound faith and a well-grounded conviction. His relations

Baptisms [illegible]

ওল্ড মিশন গির্জার ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের রেজিস্টারে মাইকেল মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের বিষয় যা লেখা হয়েছিল তার প্রতিলিপি

having been men of wealth and respectability, he was subject to a great deal of annoyance and trouble. He withstood their opposition with great firmness and continued unshaken in his determinations. A thousand rupees in Government Security was sent to him with a request that he should immediately take his passage to England and get baptised there, that no obloquy might be cast upon his Family by his embracing Christianity on the spot. He refused to accept of the gift upon such conditions and was baptised in the Old Church last Thursday, by the Venerable Arch deacon Dealtry. He had been accustomed to write poetry in the Hindoo College, and several of his productions were printed in the Literary Gazette and other periodicals. He composed a hymn on the occasion of his baptism, of which the following is a copy :—

HYMN

By M. S. Dutt, A Hindu Youth.
(Composed by him to be sung at his Baptism)

I

Long sunk in Superstition's night,
By Sin and Satern driven,—
I saw not,—cared not for the light,
That leads the Blind to Heaven.

II

I sat in darkness,—Reason's eye
Was shut,—was closed in me;
I hasten'd to Eternity
Over Error's dreadful Sea !

III

But now, at length, they Grace, O Lord !
Bids all around me shine :
I drink thy Sweet, thy, precious word,
I kneel before thy shrine !

IV

I've broke Affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake;—
All, all I love benefits the skies,
Lord ! I for The forsake !

9th February, 1943.

উপরোক্ত সংবাদে প্রকাশিত নানা তথ্যের মধ্যে এও দেখতে পাচ্ছি যে, খ্রীষ্টীয় যাজককুল মধুসূদনকে এক হাজার টাকা দিয়ে বিলেতে পাঠিয়ে সেখানে দীক্ষিত করবার পরিকল্পনাও করেছিলেন, কিন্তু সে ব্যবস্থা মধুর মনঃপূত না হওয়ার দরুণ তা কার্যকরী হয়নি।

মধুসূদনের দীক্ষার দিন অর্থাৎ ৯ই ফেব্রুয়ারী উৎসবের সময় পাছে কোন বিশৃঙ্খলা বা শান্তিভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় গির্জার কর্তৃপক্ষ "ওল্ড মিশন চার্চের" সামনে প্রহরা বসালেন। কলকাতার বহু বিশিষ্ট ইউরোপীয় নাগরিক এ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের গাড়িগুলি এসে গির্জার সামনের রাস্তা ভরে তুলল। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি প্রমুখ অন্যান্য পাদ্রীরাও এসে উপস্থিত হলেন। এই ধর্মান্তর গ্রহণ উৎসবে নির্বাচিত সাক্ষীর (chosen witness) ভূমিকা গ্রহণ করলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন। কেল্লা থেকে সাহেবরা মধুকে সঙ্গে নিয়ে গির্জায় উপস্থিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে গির্জার ফটক ও সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মধুসূদন তাঁর খ্রীষ্ট-ধর্ম গ্রহণ উপলক্ষে যে ধর্মসংগীতটি রচনা করেছিলেন—(পূর্বোক্ত "বেঙ্গল হরকরা"র সংবাদটির সঙ্গে এই সংগীতটিও প্রকাশিত হয়েছিল)—গির্জার বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সকলে সমবেতভাবে সেটি গাইলেন। তারপর "Church of England"এর অনুগামী ধর্ম-প্রতিষ্ঠান "Old Mission Church"এর প্রধান ধর্মাচার্য আর্চডিকন ডেয়ালট্রী যথারীতি আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে জর্ডন নদীর পবিত্র জল মধুসূদনের মস্তকে সেচন করে "মাইকেল" নাম দিয়ে তাঁকে খ্রীষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত করলেন। মধুসূদন এখন থেকে হলেন "মাইকেল মধুসূদন"।

"ওল্ড মিশন" গির্জার ব্যাপটিসম্ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রি-কেতাবে মধুসূদনের ধর্মান্তরকরণ সম্পর্কে ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৩ খৃঃ যা লেখা হয়েছিল, তার একটি আলোক-প্রতিলিপি এই সঙ্গে দেওয়া হোল। "ওল্ড মিশন" গির্জার বর্তমান প্রধান যাজক রেভারেন্ড হাওলাটের সৌজন্যে চার্চের প্রাচীন নথীপত্র ঘেঁটে এটিকে আমি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এতে লেখা:—
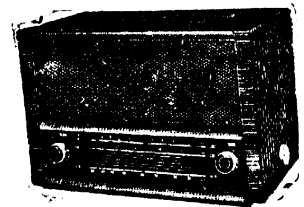
Baptisms' Solemnized at the Old or Mission Church Fort William Calcutta 1848

When Baptised	Child's Christian Name	Sex	Parents Name	Abode	Profession	By whom the ceremony was performed
February 9, 1843	Modoosoodun	Son of	Rajnarayan Dutt	Calcutta	Student of the Hindoo College	T. Dealtry, Archdean

দীক্ষানুষ্ঠান সমাপ্তির পর মাইকেল আর্চডিকনের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গেলেন। সেখানে গৌরদাস বসাক ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা নবরূপে মধুকে দেখে কিছুক্ষণ পর বিষণ্ণচিত্তে সে স্থান ত্যাগ করলেন। এদিকে তাঁর গৃহে "জননী জাহ্নবী সেইদিন হইতে উন্মাদিনীর ন্যায় জীবন্মৃতা হইয়া রহিলেন" ("মধুস্মৃতি")।

দু' দিন পরে মধু গৌর বসাককে লিখলেন:—

"O Gour! Doodeen Char Deenataye At!!!

Now, if you are really desirous to see me, come here, Old Church, Mission Row. You will say, you have no conveyance; well, hire a Palkee, do I will pay. I will. I have plenty of money. If you say, you have no paper for writing to Mr. Kerr for giving you permission to come away, here is a bit. I conjure you by the ties of friendship to come and see me here, (O.C.)

Come brightest Gour Dass, on a hired Palkee
And see thy anxious friend
M.S.D.".

খৃষ্টান হবার পরেও পুরনো বন্ধুদের জন্য বন্ধুবৎসল মধুসূদনের ব্যাকুলতার পরিচয় এ চিঠি।

মাইকেল অতঃপর প্রায় সমাজ-চ্যুত হয়ে বাস করতে লাগলেন। তাঁর মা জাহ্নবী দেবী শোকে-দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেও তিনি যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ছেলেকে আবার গ্রহণ করতে উৎসুক ছিলেন। রাজনারায়ণ দত্তও নানা স্থান থেকে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সংগ্রহ করে প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণ-ভোজন ইত্যাদি শাস্ত্রীয় আচরণ সম্পর্কে বিধান নিলেন। কিন্তু মধুসূদন কিছুতেই প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী হলেন না। তিনি তাঁর মা-বাবাকে স্পষ্ট বললেন যে, খৃষ্টধর্ম পরিত্যাগ করা তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। রাজনারায়ণ ও অন্যান্য আত্মীয়রা কিছুতেই তাঁকে সঙ্কল্পচ্যুত করাতে পারলেন না, এবং এ ব্যর্থতায় তাঁরা এতদূর মর্মাহত ও উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁরা আইনের আশ্রয় নিয়ে আদালতে নালিশ করবেন স্থির করেছিলেন; অবশ্য শেষ অবধি এ নিয়ে তাঁরা আর বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেননি। অবশ্য মধুসূদনের পরবর্তী জীবনে আমরা দেখতে পাই যে, রাজনারায়ণ দত্ত বিধর্মী ছেলেকে পরিত্যাগ করেন নি যদিও স্বগৃহে বসবাস করবার অধিকার তাঁর ছিল না। তিনি পুত্রের উচ্চশিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় বহন করেছিলেন, এবং সম্পত্তির কণামাত্র থেকেও তাঁকে বঞ্চিত করেন নি, যদিও সেকালে তুল্য পরিস্থিতিতে পুত্রকে সর্বপ্রকারে ত্যাজ্য করাই ছিল রীতি।

এই হল বাঙলার অমর-কবি মধুসূদনের ধর্মান্তর গ্রহণের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। মধু স্বধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়েছিলেন সত্যি। আহারে বিহারে, চলনে বলনে অনেক সময়ই তিনি বিদেশীর অনুকরণ করেছিলেন, একথাও সত্যি। কিন্তু অন্তরের অন্তঃস্তলে তিনি ছিলেন খাঁটি স্বদেশী, পুরোমাত্রায় জাতীয়তাবাদী। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একটি সার্থক উক্তি মধু-স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য:—"দেখিতে পাই—তাঁহার (মধুসূদনের) কবিতার সমস্তই প্রায় দেশীয় উপাদানে রচিত, তাহাতে বিদেশীয় মসলা নাই। তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্ত্য জগতের ভাল-মন্দ সমস্তই দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃ পিতামহের প্রাচ্যের প্রতিমার স্থানে কদাচ পাশ্চাত্ত্য প্রতিমা বসান নাই, জাতীয়তা বিসর্জন দেন নাই। পশ্চিম গগনের সুচারু সান্ধ্যরাগের আভায় তিনি তদীয় কবিতা-রানীর ললাট মার্জনা করিয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রাচীর অরুণ রাগে।"

কৈ মাছের প্রাণ

সোমনাথ ভট্টাচার্য

ভরা কার্তিকে গাছের পাতা একটু নড়ল কি না-নড়ল তাতেই ধড়াস্ করে ওঠে চাষার প্রাণ।

সেই ভরা কার্তিকেই মাঝরাতে এ-বছর উঠল অযথা বাতাস। আকাশজুড়ে লাল-আভা ঝোড়ো মেঘের শনশন গতি। সাপের জিভের মত বিদ্যুতের ঝিকিমিকি। বাতাস উঠল, এলোমেলো—দিক নেই, বিদিক নেই, সে বাতাসের। নেশা করা মানুষের মত বে-সামাল, বে-তাল।

সেরাতে কুটমবাড়ির তক্তাপোশে খাতির করে পেতে দেওয়া চাদর তোশকের বিছানায় শুয়েও দুটি চোখে নিদ্রা ছিল না রাসুর। আটচালার মাথাটা বলদের পায়ে পোয়াল-মাড়ার মতন করে মাড়িয়ে বেড়িয়েছে বাতাস। আর রাসুর বুকের ভেতরটা শ্মশানকালীর পুজোয় বলির অন্তিম ঢাকের মত বেজেছে গুড়গুড় করে রাতভোর।

ভয়ে নয়। সময়টা খারাপ। কালটা শেষ কার্তিক। মাঠের ভরাগর্ভ। সবুজে-সোনায় মাঠের এখন ভর-ভরন্ত রূপ। দিনে দিনে ভারী হচ্ছে মাথা—নুয়ে পড়ছে সবুজ ডাঁটো শিষ। ক্রমশ বর্ণ বদল হচ্ছে—বর্ণান্তর হচ্ছে। দিনে দিনে গাঢ় হচ্ছে বুকের দুধ। একটি পরিপূর্ণ শক্ত লাল্‌চে দানা বাঁধবার আর বেশী দেরী নেই। মাথায় এখন শিশিরের ভারটুকুও বুঝি আর সহ্য হয় না। লাঙ্গলের হালধরা মানুষের বুকে বুকে এ-সময় বড় ভয়, বড় শঙ্কা উড়ে যাওয়া পাখ্ পাখালীর পাখার বাতাসে ধানের মাথা হেলেদুলে উঠলে শিরশির করে ওঠে চোখের দৃষ্টি। খাঁজ পড়ে চোখের কোণের চামড়ায়। রুক্ষ শীতে খড়ি-ওঠা তামাটে মুখ অসংখ্য আঁকিবুঁকিতে জটিল হয়ে ওঠে।

কিন্তু বিরিন্দিচর গ্রামখানায় সে রাতে যতখানি হামলা করে গেছিল বাতাস, চার ক্রোশ পুবে বুড়ো তরফের বিলেন জমি-গুলোর ওপর ততখানি করেনি। রেহাই দিয়ে পশ্চিম চেপে চলে গেছিল চৈত্রের ক্ষ্যাপা একগুঁয়ে ঘূর্ণি বাতাসের মতন দখিনমুখো।

তারপর কার্তিক গিয়ে অগ্রহায়ণ বা ওদের কথায় অগ্রাণ। অগ্রাণের মাঝামাঝি শীতের বাতাস ভারী। ভারী ধরিত্রীর কোল। ধরিত্রী এখন ধর-ধরন্তা। ক্রোশটাক লম্বা-চওড়া বিলমাঠে এখন একটি ধানের শিষ খাড়া নেই। একটি আলও দৃশ্যত নেই। এখন চাষা মাঠে এসে নিজের জমি খুঁজতে দিশে হারায়। পাঁজা করে ধানের গোছা উল্টে-সরিয়ে আলের নিশানা খোঁজে। অগ্রাণের নিস্তেজ দুপুরেও যেন জ্বলে যায় সারা মাঠ। চোখ রাখলে ধাঁধা লাগে। নিতাইয়ের মা'র হাতে ক্ষার-কাচা ইটিণ্ডের চাদরখানার মতন হয়েছে বেবাক মাঠের বর্ণ। পাশের পাই-এ কাজ করছে বড় ছেলে নিতাই। কাটা ধান বাঁধা হচ্ছে। ভোররাত। নিতাইয়ের ও-পাশে কাজ করছে রাসুর আরও ছ' ছেলে, তিন ভাই-পো। পাই ধরে কেউ বা এক পা এগিয়ে কেউ বা এক পা পেছনে। ওরই মধ্যে কথা হচ্ছে টুক্‌টাক্। একটু আধটু হাসি ঠাট্টা। দু-এক কলি দেহতত্ত্ব। কিন্তু হাত চলছে সমানে। হাতের কথা আঁটিটা মাটিতে ফেলে কোমরে দু-হাত দিয়ে রাসু শরীরটা টান-টান করে উঠে দাঁড়াল। ছেলে-ভাইপোদের কাজ দেখল খানিকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে। তারপর নিতাইকে বলল, ও নেতাই তামুক সাজবে নাকি এট্টু।

হাতের কাজ সরিয়ে নিতাই যাচ্ছিল আলের দিকে। ঐখানে রয়েছে হুঁকো-তামাক, জ্বলন্ত এলো হাঁড়ি। তামাক সাজার সরঞ্জাম। রাসু গায়ের চাদরটা খুলে নিতাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, 'এটাও নে' যাও দিনি। শরীলে রাকা যায় না—।'

কদিন ধরে আকাশে যেন হিম নেই। শীত নেই। মধ্যে মধ্যে এই অগ্রাণে দখিনার বেগ আসছে। বটেই, ধানের কাজে গরম বেশী, পরিশ্রম বেশী। তবু মনে হয় দেশ-গাঁয়ের আবহাওয়ার আদল চেহারাটাই কেমন বেবাক বদলে যাচ্ছে। মাথার ওপর আকাশ-খানাই যেন দিনে দিনে কেমন ভার হয়ে যাচ্ছে। মায়ের মত রেখেছে মাটি। তাকে যা দেবে তার সহস্র গুণ করে ফেরৎ দেবে। কিন্তু তাকেও তাকাতে হয় আর একজনার মুখের দিকে। সে-জনা দিলে তবে তো সে দেবে। যে দাতা তার দিকে তাকাতে হলে তাকাতে হয় ঊর্ধ্বমুখে। সে-জনা ঐ আকাশখানা। যার দিকে তাকাতে হলে ঊর্ধ্বমুখে না তাকিয়ে উপায় নেই। সেই আকাশখানাই যেন কেমন রুষ্ট হয়ে পড়েছে সমস্ত চাষাকুলের ওপর।

শেষ টান দিয়ে হুঁকোটা নিতাইয়ের

হাতে ফেরৎ দিল রাসু। তারপর একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে কাজ করতে লাগল। পেছনে আওয়াজ হচ্ছে বুড়ুক বুড়ুক।

এখান থেকে সারা বিলমাঠটা দেখা যায় পরিষ্কার। গত দু'বছর ফসলের দুর্বচ্ছর গেছে, কোনরকমে চাষীর ছ' মাসের খোরাক উঠেছে কি ওঠেনি। আউশ আতপ দিয়েছে। আমন তো মাথা হেঁট করেনি। ওরই মধ্যে এ-বছর অবস্থা একটু ভাল। আউশ গেছে ভালই। আমনেরও মন নরম। বুকে যেন একটু বল পেয়েছে চাষীরা।

আস্তে আস্তে গুটিয়ে আনছে মাঠ-জুড়ে-শুকতে-দেয়া ক্ষারকাচা ছিটের চাদরখানা। তার ওপর কাছিমের পিঠের মতন ভেসে বেড়ায় মানুষ-জনের কালো কালো পিঠ। হাঁক ডাক। মাঠে মাঠে এখন শশব্যস্ত মানুষ। চার আনি পরিমাণ ধান কাটা সারা হয়েছে। ওখান ওখান থেকে তামাকের ধোঁয়া দেখা যায়। এলো হাঁড়ি থেকে সারা দিনমান তুষ পোড়ান ধোঁয়া ওড়ে। শুক্লপক্ষের রাতে কাজ চলে অনেক রাত পর্যন্ত।

রাসুও গুটিয়ে আনছে আস্তে আস্তে। বিঘে আঠারো জমির মধ্যে কাটা হয়েছে বিঘে দশ। বিঘে তিন জমির ধান গিয়ে উঠেছে খামারে। পাঁচ পো জমির ধান গাদা করা রয়েছে মাঠে। বাকী সমস্ত রয়েছে ছড়ানো সারা মাঠময়। সবাই কাজে লাগলে কাজ এগিয়ে যেত অনেকখানি। কিন্তু বাড়ির তিন জোয়ানকে রেখে আসতে হয়েছে ডাঙগা মাঠে। সেখানে রয়েছে শীতের মরসুমী ফসল। তার তদ্বির তদারকি রয়েছে। হাটে হাটে পাইকারকে মাল যোগান দিতে হবে। বছরকার কাঁচা পয়সা। কিন্তু কাঁচা পয়সা আর মিথ্যে কথা ও দুই-ই সমান। কোনটাই আখেরে টাঁকে না। সংসারের নিশটা প্রাণীর অস্থি-মজ্জা মায় প্রাণটুকু পর্যন্ত পুতুপুতু করছে এই ক-বিঘে জমির কানাচে। এটুকুতেই নির্ভর।

পুব আকাশে এখনও সূর্যের দেখা নেই। সবে লাল ছোপ ধরেছে আকাশে। ফিকে অস্পষ্ট কুয়াশায় ঢাকা চারিদিক। শুকো কুয়াশা। মাটিতে শিশির নেই। যে ক-বিন্দু পড়েছিল আলো না-ফুটতেই শুকিয়ে এসেছে।

এ-জমিখানা শেষ হল। সকালের দিকে কাজ এগিয়েছে ভালই। রাত তিনটের উড়ো-জাহাজখানা লাল-সবুজ আলো জ্বালিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সবাইকে ডেকে ডেকে কাজে নামিয়েছিল রাসু। তারপর কাউকে আর বসতে দেয়নি। দেয়নি বলেই উঠে গেল কাজটা। ছোট ছেলে কেষ্ট হাত-পা এলিয়ে বসে পড়েছে আলের ওপর। শরীরটা দুর্বল ছেলেটার—পেটের ব্যামোয় ভুগছে ক' বছর। দেখে রাসুর কষ্ট হল। ধানটা উঠে গেলে ছেলেটাকে একবার গঞ্জের বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। উপায় নেই—এ ক'দিন আর ওসব জ্ঞান করলে চলবে না। প্রাণপাত করেও ফসলটা তুলতে হবে ঘরে।

এখন সকলকে ছুটি দিতে হবে খানিক। হাত-পাগুলো একটু জিরিয়ে খেলিয়ে নেবে। হাতের বুড়ো আঙগুলগুলো সকলের এখন ফুলে রাঙগালু। ধানের পাতায় খুরের ধার। তাতেই ফালা ফালা হয়ে গেছে দুই হাত। বুড়ো আঙগুলের নোক হয়েছে কাগজের মত পাতলা। হাতের কাটা রোজ শুকোয় আর রোজে তার ওপর নতুন করে পোঁচ পড়ে। মালুম হয় গরম ভাত-তরকারি মাখার সময়। তখন মনে হয় হাত নিয়ে কোথায় যাই। হেঁসোর পোঁচে কেটে ফেলতে ইচ্ছে হয়। পায়ের হাঁটু পর্যন্ত এখন একগাছি লোম নেই। ধানের ধারে জন্মাতে পারেনি। গোবরঘাটা মেয়ে মানুষের পায়ের মত নি-লোম পা। তাতেই শীতের টানে ফাট ধরেছে। চড় চড় করে। ফেটে ফেটে রক্ত বেরোয়। এখন সকলে হাতে-পায়ে তেল দিয়ে চামড়া নরম করে নেবে খানিক। মাঠে-ময়দানে যাওয়া, মুখহাত ধোয়া আছে। দুটি খেয়ে একটু নেশা করে আবার হুমড়ি খেয়ে পড়বে। মাথা তুলবে পায়ের তলায় ছায়া পড়লে। ঘণ্টাখানেক জিরেন দিয়ে আবার রাত পর্যন্ত।

এখন বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

নিতাইয়ের বৌ কলকেতে ফুঁ দিতে দিতে হুঁকোর মাথায় বসিয়ে দিয়ে গেল রাসুর হাতে।

ছেলেরা খেতে বসেছে রান্নাঘরের দাওয়ায়। ডাঙগা মাঠ থেকে এসেছে এক ছেলে। বাকী দুজন গেছে শুক্কুরের হাটে পাইকারকে মাল যোগান দিতে দু মাইল দূরে গঞ্জে। ভিজে শাড়ি সপ্ সপ্ করতে করতে কেষ্টর বৌ আর ভাইঝি পদ্ম চান করে ফিরল কলসী কাঁখে। জ্যাঠার চোখে চোখ পড়তে চোখ নামিয়ে নিল পদ্ম। লজ্জা—বয়সের লজ্জা। তার ওপর বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে পদ্মর—তারই লজ্জা। ধানটা উঠে গেলে আর দেরী করা চলবে না। ঢেঁকিঘর থেকে ধুপ্ ধাপ্ পাড় পড়ার আওয়াজ আসছে। বৌদের টুকরো টুকরো কথা-হাসি। ছোট ছেলেরা খামারে স্তূপ করে রাখা ধানের ওপর হুটোপাটি করছে। সবে-বিয়ানো এঁড়ে বাছুরটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সারা খামারময়।

গোগাড়ির শব্দ এল মাঠ থেকে। বলদ খেদাবার বুলি। দু-খানা গাড়ি আসছে মাঠ ভেঙে। সামনের গাড়িটা রাসু দূরে থেকে দেখেই চিনল।

পাইকারকে হাটে মাল তুলে দিয়ে ফিরছে দুই ছেলে। বাড়ির কাছে এসে দৌড়চ্ছে বলদ। পেছনে ধুলোর ঝড়। রাসুর হঠাৎ যেন খেয়াল হল। এতখানি বেলা গড়াল নাকি?

পেছন ফিরে রাসু পুব আকাশটার দিকে তাকাল।

এতক্ষণ নজরে পড়েনি। বিলের ওপারে দেউলে মুকুন্দপুরের গাছপালাগুলোর মাথার অনেকখানি ওপরে দপ্ দপ্ করে জ্বলছে সূর্য। কুয়াশা সরে গেছে। গাছ-পালাগুলোর পেছন থেকে ওপর পর্যন্ত আকাশের গায়ে লেপটে থাকা একখানা ফিকে কালো মেঘের আড়ালে ছিল সূর্য। ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছে। শীতের ছোট-বেলার মধ্যে আকাশখানা পাড়ি দিতে হবে বলে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আকাশে। কিন্তু খানিকটা ওপরে রাহুর মত হাঁ করে রয়েছে আর একখানা মেঘ। সেখানাও বেশী উঁচুতে নয়!

রাসু হেঁসোটা তুলে নিল। ছেলেরা খাওয়া-দাওয়া সেরে হাতমুখ ধুচ্ছে। তাদের উদ্দেশ করে বলল, "তোমরা তালে এই-সো—। দেরি কোরো না কিন্তুক—আমি এগোলাম।"

রাসু ক্ষেতের আলের ওপর এসে দাঁড়াল। তাকাল আর একবার পুব আকাশটার দিকে। সূর্য এখনও ওপরের মেঘখানার আড়ালে পড়েনি। ধোঁয়াটে মেঘখানা তেমনি নিশ্চল
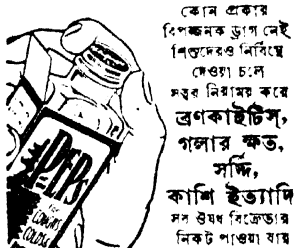
হয়ে লেপটে রয়েছে আকাশের গায়ে। নীচের খানাও তেমনি। মাঝখানে সূর্য। খর হয়েছে তেজ।

মনটা কেমন একটু রাসুর খচ্ করে উঠল। অগ্রাণের আকাশে মেঘখানা যেন বে-এক্তিয়ার এসে পড়েছে। ক'দিন ধরে আকাশের গতিকও যেন কেমন কেমন।

শীত ঋতু—এখন আকাশের রাজা—উত্তর। আকাশখানা তারই অধিকারে। দিক্ জুড়ে এখন তারই আধিপত্য। যে ঋতুতে যা নিয়ম। বর্ষায় পশ্চিম। বসন্তে দক্ষিণ। তেমনি শীতে উত্তর। এখন শাসন-শোষণ, আকাশখানা মায় পৃথিবীর জীবকুল পালনের ভার তারই হাতে। কনকনে উত্তুরে হিম নিয়ে আসবে উত্তুরে বাতাস। দিক অন্ধকার করে কুয়াশা ঝরবে। শুকো বাতাস শন্-শনিয়ে বেড়াবে আকাশময়। তারই যেন কেমন আভাস আকাশটায় ক'দিন ধরে। শীত নেই। কুয়াশা নেই। মাঝে মাঝে আসছে দখিনার বেগ। আকাশখানায় যেন অসময়ে ভাটা পড়েছে উত্তরের আধিপত্যের।

পাশের দু-দাগ জমির ওপাশের জমিখানায় কাজ করছে বৃন্দাবন দুর্লভ। সঙ্গে দুটি জনমজুর। রাসুর দু-একটা কথা বলতে ইচ্ছে হল। কিন্তু কাজের সময়। সকলেই এখন কাজে ব্যস্ত। রাসু ডাকল না। হেঁসোখানা নিয়ে মাঠে নামল।

রাসু আগেই ধানা কাটা ধরেছিল। সারবন্দি ন-জোয়ান এসে নামল মাঠে।

অগ্রাণে পুবে মেঘে ভয় নেই তত টা। ভয় যদি ঐ মেঘ গিয়ে দাঁড়ায় দক্ষিণে। অবশ্য যে মেঘখানা করেছে সেখানা ভারী নয় বিশেষ।

কাজ করছে ন' জোয়ান। কথাবার্তা নেই। নিঃশব্দ মাঠ, শুধু ধানের গোছায় পোঁচ পড়ার খ্যাস্‌রে খ্যাস্‌রে শব্দ। মাথা দেখা যায় না। সেটি ধানের বনে অদৃশ্য। নিকষ কালো কালো পিঠে পিছলে যাচ্ছে রোদ। ঘামের সঙ্গে নুন ফুটে উঠেছে। হাত চলছে দুটো। পেশীগুলো কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা পিঠময়। সবাই এগুচ্ছে প্রায় সমানে। একটু পিছিয়ে পড়েছে কেষ্ট।

ও-মাঠ থেকে বৃন্দাবন এল। বসল আলের ওপর তামাকের সরঞ্জামের কাছে। তামাক সাজতে সাজতে বলল, "এট্টু তামাক খেতে এলাম গো রাসু।" তারপর একটু থেমে বলল, "কিন্তুক এ-সময় একি বালাই বল দি'নি।"

একটু পরচর্চার দিকে ঝোঁক লোকটার। গাঁয়ের সমস্ত খবর বাতাসের আগে যায় ওরই কানে। একটু গল্প শোনা যাবে। গল্পের লোভে হেসে রাসু বলল, কি হল গো আবার—।

কলকেতে আগুন দিতে দিতে বৃন্দাবন বলল, আকাশখানার কত্তা বলচি। ধ্বক্ করে উঠল রাসুর বুক। চকিতে তাকাল পুব দিকে। ফোঁটায় ফোঁটায় ঘাম জমা কপালটা হাজার ভাঁজে কুঁচকে উঠল। পুবের নিরীহ মেঘখানা কখন সরতে সরতে হামাগুড়ি দিয়ে এসে পেঁৗছেচে দক্ষিণে। দুটো মেঘ এক হয়ে চেহারাটা বড় করে ফেলেছে অনেকখানি। মিইয়ে এসেছে সূর্যের তেজ।

—ন্যাও তামাক খাও 'সে। বৃন্দাবন ডাকল। হেঁসোটা মাটিতে রেখে দক্ষিণ আকাশটার দিকে তাকাতে তাকাতে রাসু আলে এসে উঠল। হুঁকোটা নিয়ে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল।

বৃন্দাবন চলে গেল। হুঁকোতে টান দিতে ভুলে গেল রাসু, তাকিয়ে রইল দক্ষিণ দিকে। সময়টা অগ্রাণ। মেঘটা দক্ষিণে। মেঘ নয়—বুকের ওপর যেন একখানা চাঁপ ধরানো পাথর।

'যদি বর্ষে অগ্রাণে রাজা যান মাগনে।' হঠাৎ বারটাও রাসুর মনে পড়ল। মঙ্গলবার—। 'শনির সাত মঙ্গলের তিন'—ডাক-পুরুষের হিসেব। মাথার মধ্যে একরাশ জট পাকানো পোকা কিলবিল করে নড়েচড়ে উঠল। দপ্‌দপ্ করে উঠল রগ দুটো। মঙ্গলের তিন'এর দরকার নেই। মাঠখানার যা-ব্যবস্থা চব্বিশ ঘণ্টার একটা অঝোর বর্ষণই যথেষ্ট। আষাঢ়ের অনাবৃষ্টি, শ্রাবণ-কার্তিকের অতিবৃষ্টি, ঝড়-বাদলের ফাঁড়া কাটিয়ে যদিষা উঠল ফসল—এখন বুঝি ভরা-ডুবির ভয়। চাষার মনে শঙ্কা-সংশয়ের টানা-পোড়ন। প্রাণটার মধ্যে তপ্ত তেলে দেওয়া কৈ-মাছের মরণ যন্ত্রণার ছট্‌ফটানি!

এখন মাঠখানা আর মাঠ নেই—প্রাণ; যাবৎ চাষার প্রাণ। কিন্তু মাঠখানার সে প্রাণ চাষার প্রাণের মত অত ঠুনকো নয়। কৈ-মাছের প্রাণের মত নয়। যেতে যেতেও যায় না—শুধু মরণ-যন্ত্রণায় আছাড়ি পাছাড়ি খায়। সে সূক্ষ্ম প্রাণে অঝোর ধারার ধকল সইবে না।

মেঘটার দিকে নিতাইয়েরও লক্ষ্য পড়েছে। মেঘটার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে আলের ওপর দাঁড়ানো রাসুর দিকে একবার তাকিয়ে আবার মন দিল কাজে। হেঁসোটা তুলে নিয়ে মাঠে নামল রাসু। ধানের গোড়ায় পোঁচ দিয়ে বলল, "আকাশখানা দেকলে নাকি নেতাই—।"

—হুঁ, মেঘখানা ভাল ঠ্যাকচে না।

নিতাইয়ের মনও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে। মন কু গাইছে। রাসুর বুকটা দুর দুর করে উঠল। এতখানি ভয় আসত না। কিন্তু ক'দিন ধরে আকাশখানাও নিজের ব্যবহারে অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। টালমাটাল হয়ে উঠেছে উত্তরের সিংহাসন। দরজার কাছে ওত পেতে বসে আছে দখিনা।

ন'-জোয়ান হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধান কাটছে। প্রথম কাজের তোড়টা এখন একটু ঝিমিয়ে এসেছে। কথাবার্তা হচ্ছে। হাসি-ঠাট্টা হচ্ছে। নিতাই শুধু নিশ্চুপ। মনে মনে যেন একটু বিরক্ত হয়ে উঠল রাসু। হাঁক দিল, টেনে চল সব। বাকী ঢের কাজ।

মেঘের ভেতর থেকে সূর্য বেরিয়ে এসেছে। ঝলমলিয়ে উঠেছে আবার সারা মাঠ। মাঠের চাষারা কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। অন্য অন্য দিন দেউলে মুকুন্দপুরের শিবমন্দিরের চুড়োটা নজরে আসে—আজ এলো না। এলোহাঁড়ির তুষ পোড়ানো ধোঁয়া ওপরে উঠছে [illegible]। একটু উঠে ক্ষেতের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। ওপরের বাতাস ভারী।

—টিঁহি'......টি......হি'......।

মাথার ওপর টেনে টেনে ডেকে উঠল একটা শঙ্খচিল। ধানের মাঠে ইঁদুরের মেলা। তাই ধরার জন্য ঘুরছে চিলটা। কিন্তু দূর আকাশে একটাও পাখী নেই। লক্ষণগুলো রাসুর চোখে যেন বিঁধতে লাগল।

ইঁদুর মারার জন্যে এসেছে সেই সাঁওতাল মেয়ে পুরুষটাও। মেয়েটার পিঠে বাঁধা একটা ছোট ছেলে। মাথার ওপর গোবর নেকানো একটা ধামায় আধ-ধামা ধান। পুরুষটার কাঁধে কোদাল। হাতে দড়িতে ঝোলানো কতকগুলো জ্যান্ত, আধমরা ইঁদুর। আগে আগে চলছে লাল রং-এর একটা কুকুর। ক'দিন ধরেই আসছে ওরা। যে মাঠের ধান কাটা বাঁধা সারা হয় সেই মাঠে গিয়ে কুকুরটা ইঁদুরের গর্ত খোঁজে। পুরুষটা কোদাল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে ধরে ইঁদুরটাকে। মেয়েটা গর্ত থেকে ইঁদুরের নিয়ে যাওয়া ধানক'টা বার করে ধামায় ভরে।

রাসুর একটা জমিতে নেমে ইঁদুরের সন্ধান পেয়েছে কুকুরটা। পুরুষটা মাটি খুঁড়ছে। কুকুরটা কুই কুই আওয়াজ করতে করতে ছট্‌ফট্ করছে গর্তটার দিকে তাকিয়ে। ল্যাজ নাড়ছে। রাসুর বুকটা হঠাৎ হিংসেয় করকর করে উঠল। বেশ আছে ওরা। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। সংসারের বিশটা প্রাণীর কথা ভাবতে হয় না। বুকটার মধ্যে কৈমাছের মরণ যন্ত্রণা নেই। হাঁক ছাড়ল রাসু, আরে ক'চ্চিস্ কি? মাঠটাকে চষে ফ্যালাবি নাকি তোরা?

উত্তর দিল সাঁওতাল মেয়েটা। ঝকমক করে উঠল সাদা দাঁত। হেসে বলল, গোড়ো সে'দরা করছি গ' মশায়।

ধমকে উঠল রাসু, আর শিকারে কাজ নেই। উঠে পড় ক্ষেত থেকে।

কোদাল কাঁধে উঠে দাঁড়াল পুরুষটা। তোমার ক্ষেতটা মশাই খেইয়ে লিতাম নাই।

মেয়েটাও উঠে পুরুষটার সঙ্গে হন্ হন্ করে জমির বাইরে গিয়ে দাঁড়াল নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করতে করতে। কুকুরটা তখনও গর্তটার মধ্যে নাক ঢুকিয়ে কুঁই-কুঁই করছিল। পুরুষটা শিস দিয়ে ডেকে অন্য জমির দিকে চলে গেল। কুকুরটা ছুটতে ছুটতে পিছু নিল।

আর একবার মাথার ওপর টেনে টেনে ডেকে উঠল চিলটা। এবার ডাকটা অন্য রকম—আরও তীক্ষ্ণ। তারপর ডানাদুটো মেলে বিদ্যুতের মত পাশে হেলে চলে গেল পশ্চিমে। কুটোনাটা উড়িয়ে পূব থেকে হু হু করে ছুটে এল বাতাস।

চোখের আলো নিভে এল। রাসুর মুখ অন্ধকার হয়ে এল। এতক্ষণ মাঠে মাঠে জোড়ায় জোড়ায় চাষার শঙ্কিত দৃষ্টির সামনে যেন সাজতে পারছিল না আকাশ। এবার চোখের লজ্জাটুকু ভেঙেগেছে। সহায় হয়েছে পূব বাতাস। আকাশের দিক-বিদিক থেকে হু হু করে তাড়িয়ে নিয়ে আসছে পাঁজা করা মেঘ। এনে জড়ো করছে দক্ষিণে। দক্ষিণের অলস হয়ে শুয়ে থাকা মেঘখানা উঠে দাঁড়িয়েছে গা-ঝাড়া দিয়ে। ছুটে আসা মেঘেদের দু' হাত দিয়ে টেনে টেনে নিচ্ছে বুকে। বড় হচ্ছে শরীর। নিমেষে নিমেষে বদলাচ্ছে কলেবর। পলে পলে ঢেকে ফেলছে আকাশ।

ন' জোয়ান চোখভরা সংশয় নিয়ে তাকিয়ে আছে রাসুর মুখের দিকে। চোখগুলো কথা বলছে—কি হবে এবার। এবার—। রাসু এবার কার দিকে চায়! একটুখানিক ভরসা নিয়ে তাকাল উত্তরে। কিন্তু উত্তর দিকটাও যেন ভাবলেশহীন নিতাইয়ের মুখ। কিছুরই রেখাপাত নেই সেখানে। নিজেকে হঠাৎ ভারী দিশেহারার মত মনে হল রাসুর। চোখের সামনে দেখল বৃন্দাবনের জন দুটো ছুটছে ডাঙগার দিকে। পেছন পেছন তাদের ফেরাবার জন্যে বৃন্দাবন। ডাঙ্গায় জনদুটোর দু-এক বিঘে ভাগচাষ আছে। সেটুকু বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। ফেরাতে না পেরে বৃন্দাবন মাথায় হাত দিয়ে বসেছে আলের ওপর। অমনি করে রাসুর বসে পড়তে ইচ্ছে হল।

মাঠে জটলা করছে চাষারা। সকলের দৃষ্টি বনোশুয়োরের পালের মত ছুটছে মেঘখানার দিকে। বহু দূর থেকে যেন নিতাইয়ের গলা ভেসে এল, "কাটা বাদ দে! যত দূর পারা যায় ধান কাটা গুইচে ফেলা যাক্। মেয়েরা খামারের ধান ক'টা দেকুক।" সেই মত কাজ হবে কি?

পাথরের মত ভারী মাথাটা কোন রকমে তুলে রাসু মাথা নাড়ল।

মাঠে নেমেছে এগারো জোয়ান। ডাঙগা মাঠ থেকে চলে এসেছে তিন জন। হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এগারোটা বুক। রাসু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। সবটাই কেমন অর্থহীন মনে হচ্ছে। বেকার খাটা মনে হচ্ছে।

মাথার ওপর আকাশটা ঘোর হচ্ছে। পরতে পরতে সাজছে আকাশ। মেঘের মধ্যে কোথায় একটা সাদাপেট শঙ্খচিলের মত হারিয়ে গেছে সূর্য।

আলের ওপর উঠে দাঁড়াল রাসু। এগারো জোয়ানের বাহ্যজ্ঞান নেই। কেমন একটা ঝিমুনির মধ্যে রাসুর মনে হচ্ছে—কি দরকার! কিছুই যখন থাকবে না। বাড়ির দিকে পা বাড়াল রাসু। তাকাল উত্তরে। আকাশজোড়া কালো কুকুরের মতন মেঘের ভয়ে উত্তরের একটুখানি সাদা আকাশ ভয়ে জড়সড় হয়ে কোণঠাসা হয়ে বসে আছে তাড়া-খাওয়া বেড়ালের মতন। ক্রমশ এগিয়ে আসছে কুকুরটা। আরও কুঁকড়ে যাচ্ছে সাদা আকাশটুকু।

বাড়ির বৌরা, নিতাইয়ের মা খামারের ধান সাজাচ্ছে। কোন রকমে ঢেকে ঢুকে রাখছে। রাসুকে দেখে বৌরা মাথায় কাপড় টেনে দিল। বেশবাস ঠিক করল।

রাসু দাঁড়াল না, সোজা ঘরে এসে বসল তক্তাপোশের ওপর। কিন্তু টিকতে পারল না বেশীক্ষণ। ঘরটায় আরও অন্ধকার—আরও বুকচাপা। নিশ্বাস নেবার বাতাসটুকুরও অভাব। ঘর থেকে বেরিয়ে হন্ হন্ করে খামার পেরিয়ে আবার মাঠে নামল। এসে দাঁড়াল জমির সীমানায়।

চাপা গুড়গুড় আওয়াজ শুরু হয়েছে মেঘের ভেতরে ভেতরে। আকাশখানা মৌভরা মৌচাকের মত নেমে এসেছে মাথার ওপর। যেটুকু শক্তি বুকে করে এসেছিল রাসু সেটুকু যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গেল। কোনও রকমে অনিচ্ছুক শরীরটা মাঠে কাজের মধ্যে নামিয়ে দিল। মাথা তুলে তাকিয়ে দেখল নিতাই।

শীতের ছোট বেলা গড়িয়ে পড়েছে বিকেলের দিকে। আকাশটা সাজছে আর সাজাচ্ছে।

—ঠাকুর মশাই আসচেন। নিতাইয়ের গলা ভেসে এল।

রাসুর বুকের ভেতরটা চমকে উঠল। কানে এল সাইকেলের টিং টিং। অসহায় চোখ দিশেহারার মত পড়ল গো-গাড়ির পাটের দিকে। সাইকেলের ওপর থেকে ধরণী মুখুজ্জের টলমাটাল বিশাল কালো শরীর নামল। সাইকেলটা পাশের একটা খেজুর গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে পূব দিকের বিঘে তিন আ-কাটা জমির ওপর একবার দৃষ্টি বুলিয়ে ধরণী মুখুজ্জে এসে দাঁড়াল জমির ওপর। ফোলা মুখখানা কঠিন। আকাশের মেঘ বাদে দূরে আছি ও-মুখের।

ঐ তিন বিঘে জমি ধরণী মুখুজ্জের। ভাগচাষী রাসু। ধরণী মুখুজ্জের এমন অনেক জমি ছড়ানো আছে এ-মাঠে ও-মাঠে। তেজারতি বন্ধকী কারবার গঞ্জে। চক্রবৃদ্ধির কল্যাণে ধরণী মুখুজ্জের জমির পরিমাণ নামে বে-নামে হুহু করে বেড়ে চলেছে। চাষার জমির মত ধরণী মুখুজ্জের চাষার মেহনতির ওপর ভারী লোভ। নিজের লাংগল গরু, কিষাণ নেই। বলে, বাউনকে লাংগলের নাম মুখে আনতে নেই; ওতে পাপ হয়। তার চেয়ে জমি দিয়ে চাষার বুকের রক্ত আর ঘামঝরা ফসলের আধাভাগের ভাতে সোয়াদ বেশী পায় ধরণী মুখুজ্জে।

ঠিক এই সময়টিতে ধরণী মুখুজ্জেকে আসতে দেখে প্রথমটা থিতিয়ে গেছিল রাসু। কিন্তু সে ভাবটা গিয়ে রাসুর বুকের ভেতরটা একটা মরিয়া চাষাড়ে গোঁ এসে চেপে ধরল। ধরণী মুখুজ্জে এসে দাঁড়িয়েছে। সেদিকে না তাকিয়ে রাসু হাতে কাজ করে যেতে লাগল। ধরণী মুখুজ্জে চড়া গলায় ডাকল, "এই রাসু, এদিকে আয়।"

চাষাড়ে গোটা উদ্ধত হয়ে উঠল,—"দেকতেছেন তো কাজে রয়েছি এট্টা। বল্লেন না—। শুনতেছি তো—।"

ধরণী মুখুজ্জে প্রথমটা বাক্যহারা হয়ে গেল। তারপর ফেটে পড়ল, সে তো দেখছিরে হারামজাদা—ধানটা কাটা হবে কবে এ্যা? ভাগ দিবি কি—পচা পোয়াল কটা।

রাসু কোমর সোজা করে দাঁড়াল। গলা চড়াল, "শুধু শুধু গাল দিতেচেন কানে। আপনার জমিতো সাধ করে ফেলে থুইনি। পাঁচ বছরই তো সব নীচে বলে আপনার জমি কাটা পড়ে সব শেষে। নতুন তো কিছু লয়। আকাশখানা কি শুটিশ দিয়ে এনে হয়েচে।"

—বড় যে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শিখেছিস। জমি কা' বিঘে নেবার সময় ক' দিন পায়ে পায়ে কুকুরের মত ঘুরেছিলি মনে আছে সে কথা—।

ততক্ষণে রাসু আতসবাজীর মতন ফুরিয়ে এসেছে। এবার নিস্তেজ হবার মুখ। এখন রাগ হচ্ছে নিজের চাষাড়ে গোঁয়ারতুমির ওপর। এই ঔদ্ধত্য যদি মাপ না করে ধরণী মুখুজ্জে। জমির ভাগচাষ যদি হাত বদল হয়। আঠার বিঘে থেকে কেটে যাবে তিন বিঘে। টান পড়বে বিশটা প্রাণীর মুখের অন্নে। ধরণী মুখুজ্জে বুঝেছে ফুরিয়ে গেল রাসু। গালাগাল দিতে দিতে সাইকেলে উঠল। যাবার সময় শাসিয়ে গেল ভাগের পনর মণ ধান কেমন করে আদায় করতে হয় তা তার জানা আছে। তা জানে রাসু। গঞ্জের হাটে যেতেই হবে—সে হাটে নিজের আওতায় পেলে পায়ের জুতো তুলতেও ধরণী মুখুজ্জের হাত কাঁপবে না।

ধরণী মুখুজ্জে চলে গেছে। চাষারা দেখছে তাকিয়ে তাকিয়ে। ফিস্‌ফাস্ করছে নিজেদের মধ্যে। চোখ তুলে তাকাল রাসু। দুটি চোখ জবাফুলের মত লাল। রক্ত ফেটে পড়বে বুঝি। একটা রা' কাড়েনি এতক্ষণ এগারো জোয়ান। নিতাইয়ের সেই মড়ার মত মুখ। যেন যা ঘটেছে সবটাই ঘটবে—এ তার জানা। এর জন্যে ভেবে লাভ নেই। নেমকহারাম সব—এদের জন্যে খেটে মরে রাসু। হঠাৎ জবাফুলের মত লাল

চোখে রাসুর আগুন ছুটল। আলের ওপর বসে পড়ে হাঁপাচ্ছে কেষ্ট। এলিয়ে পড়েছে। রাসু ছুটে এল। "এই তোমার বেশ্রাম করার সময় হল। তোমার বাপকে একজন জুতো মেরে অপমান করে গেল আর এই সময় তোমার প্রয়োজন হল বেশ্রামের।"

হঠাৎ কেষ্টর গালে একটা চড় বসাল রাসু। হতভম্ব সকলে। স্তম্ভিত। কেষ্ট স্তব্ধ হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। শুধু একটা ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মত গলার শির ফুলিয়ে রাসু চেঁচিয়ে চলেছে। হারামজাদা—। নেমকহারামের গুষ্টি—।

আবারও হাত তুলতে যাচ্ছিল রাসু। নিতাই ছুটে এসে আড়াল করে দাঁড়াল। আস্তে আস্তে বলল, পাগল হলে না কি?

নিতাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই আকাশখানা যেন গুড়গুড় করে ধমকে উঠল রাসুকে। তীরের মতন হিম বৃষ্টি নেমে এল। মুহূর্তে রাসু চুপসে গেল। মনে হল দুলছে মাটি। সরে যাচ্ছে।

পাঁচ-ছটা ছাগল আলে আলে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছিল। গায়ে জল লাগতে ছুটল ডাঙার দিকে। পেছন পেছন চীৎকার করতে করতে বাচ্চাগুলো। নিস্তব্ধ হয়ে গেছে মাঠ। মাটিতে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার চুঁই চুঁই শব্দটুকুও বুঝি শোনা যায়। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি ঝরছে। হিম ঝরছে—কাঁপন ধরিয়ে দেয় হাড়ে হাড়ে।

মিনিট দশ পিটপিটিয়ে বৃষ্টি দিয়ে থমকে গেল আকাশ। দুটো হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে পড়েছিল রাসু। শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলো সজাগ করে অনুভব করতে চেষ্টা করল, থেমেছে বৃষ্টি। ভয়ে! কেউ আসছে কি? ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা তুলে [illegible] দিকে তাকাল। ক্লান্তিতে [illegible] এল দৃষ্টি। আরও কালো হচ্ছে আকা[illegible], আরও ভারী হচ্ছে। নেমে আসছে একটা কালো পাথরের মত বুকের ওপর।

বাতাসহীন বুকচাপা অন্ধকার নেমে এসেছে।

খরা চৈতে হাঁটুজল ডোবায় মোষের পাঁক ঘোঁটার মত অন্ধকার ঘুলিয়ে উঠেছে সারা বিলমাঠে। দু-হাত দূরের মানুষ নজরে পড়ে না। আকাশখানা ঝুলে রয়েছে মাথার ওপর। ঝুলিয়ে রেখেছে সমস্ত চাষার গলায় মরণ ফাঁস বেঁধে। মুখগুলো সব মরা। প্রাণগুলোয় কাটা কৈ-মাছের আছাড়-পাছাড়।

তবু বিলমাঠের এখানে ওখানে জ্বলছে ক'টা আলো। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে ক'টা হ্যারিকেন। রাসু বাঁশঝাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল বিলমাঠটার দিকে। সেখান থেকে চোখ সরিয়ে তাকাল খামারের দিকে। অন্য অন্য দিন বাড়ির জোয়ানরা যায় সংকীর্তনের আখড়ায়। পড়শীর বাড়ি। হাটে-গঞ্জে ছোটরা বায়না ধরে। ঘুমচোখে কাঁদাকাটা করে। বৌ-মেয়েরা ধমকায়। হাসি-ঠাট্টা করে—ঝগড়া করে উঁচু গলায়। নিতাইয়ের মা'র এতক্ষণে রান্নাবান্না শেষ হয়।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। নিতাইয়ের ছোট ছেলেটা শুধু পেটের যন্ত্রণায় কাঁদছে। জ্বলছে একটা হারিকেন। তাও কমিয়ে একপাশে রাখা। ছেলেরা বসেছে খামারের একদিকে গোল হয়ে মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে। খেজুর গাছের গোড়ায় একটা জায়গা ফাঁকা। ঐটি রাসুর জন্যে। যদিও রাসু একবারও গিয়ে বসতে পারেনি। সকালের ঘটনাটার পর ছেলেদের সংগে যেন কেমন একটা ফাঁক তৈরী হয়ে গেছে। রাসুর মনে হল নিতাইই ঠিক করে— পৃথিবীর কিছুতেই কিছু ভেবে লাভ নেই। ওতে শুধু পোড়ার যাতনাই দেয়।

আগুন আর আগুন ঘিরে ক'টা মূর্তি চুম্বকের মতন রাসুকে টানছে। পায়ে পায়ে রাসু এগিয়ে এল। বসল খেজুর গাছের তলায়। কি একটা কথা হচ্ছিল—থমকে গেল। রাসু তাকাল আগুনের দিকে। ছেলেদের চোখের দিকে তাকাতে লজ্জা করছে কেমন।

বাঁশঝাড়ের মধ্যে শেয়াল ডেকে উঠল একটা। সারা দিক-বিদিক জুড়ে সাড়া পড়ে গেল। জোনাক জ্বলছে বাঁশঝাড়ে। বারোটা মানুষের ছায়া নাচছে খামার, ধানের গাদায়, বাঁশঝাড়ে। অন্ধকার নিরেট। বারোটা মানুষের বসবার জায়গাটুকু বাদ দিয়ে যেন ধসে গেছে চারিদিকের সারা পৃথিবীটা।

চমকে উঠল রাসু। খোলা ঘাড়ের ওপর কে যেন বরফের মত হিম নিশ্বাস ফেলে গেল। কাঁপন ধরে গেল হাড়ে। আগুনটা হঠাৎ হু হু করে উঠল। মুখ বুজে থাকা এগারো জোয়ান নড়েচড়ে বসে গায়ের কাঁথা র‍্যাপার টেনে নিল। কিন্তু বন্ধ হল না হিম নিশ্বাস। লাগতেই লাগল—বইতেই লাগল। খেজুর গাছের ঝুলে-পড়া একটা শুকনো পাতা খসুর খসুর করে লাগছে গাছের গায়ে। আওয়াজ হচ্ছে খসুর খসুর, খসুর—খসুর। কি যেন খবর দিচ্ছে। খসর খসর কেউ আসছে। হু হু করে উঠছে আগুন। রাসুর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। থেমে আসছে বুকের দুলুনি। রাসু বিস্ফারিত চোখে তাকাল এগারো জোয়ানের মুখের দিকে। পলকহীন এগারো জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে রাসুর মুখের দিকে। ভয়ে! শরীরটা নিশ্চল। আস্তে আস্তে ঘাড়টা পেছন দিকে ফেরাল রাসু। কোণঠাসা সাদা বেড়ালের মতন উত্তর আকাশটুকু কখন উঠে দাঁড়িয়েছে। গা-গলা, লোম ফুলিয়ে অতিকায় হয়ে উঠছে। আকাশ জুড়ে থাবা গেড়ে বসা মিশ-কালো বর্ণের কুকুরটা ভয়ে পেছু হটছে। পেছু হটছে যেদিক থেকে এসেছিল—সেদিকে। পালাচ্ছে দক্ষিণের মেঘ। আকাশখানা অধিকার করতে হিম হওয়া সংগে করে এসেছে উত্তর।

সরসর—। খেজুর গাছের গা দিয়ে ঝরে পড়ল শুকনো পাতাটা। রাত্রে আকাশখানা নামবে। ঝরবে চারিদিক সাদা করে কুয়াশা হয়ে। হরিৎখন্দের সবুজ ডগা লক্ লক্ করে উঠবে। কপির পাতার রং আরও গাঢ় নীল হবে।

রাসু উঠে দাঁড়াল। এগারো জোয়ান উঠে দাঁড়িয়েছে। কাঁথা, র‍্যাপার জড়িয়ে হঠাৎ ভারী তৎপর হয়ে উঠেছে।

কাঁপা কাঁপা গলায় প্রথম কথা বলল নিতাই, "বাতাস উঠল উত্তরে—আগুন সামাল দাও গা—"

কনকনে হিম হাওয়া বুক ভরে নিল রাসু। তারপর কাঁথাখানা দিয়ে মাথা কান ঢেকে থুড়থুড়ে বুড়োর মত কুঁজো হয়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে দাওয়ায় গিয়ে উঠল।

চক্রদত্ত

ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে গিয়ে অনেক সময় টাকা কতটা আছে জেনে নিয়ে অনেককে চেক কাটতে হয়। অথবা টাকা জমা দেবার পর মোট টাকার অংকটা জেনে নেওয়াও দরকার। এই কাজটা যত শীঘ্র সম্ভব এবং কাকে জানা-জানি না করে করা যায়, সে সম্বন্ধে একটু লক্ষ্য রাখা দরকার। যেখান থেকে এই খবর সংগ্রহ করা দরকার, সেই টেবিলে সম্প্রতি একটি ব্যাংক একটি যন্ত্রের ব্যবস্থা করেছেন। টাকার অংক যোগ-বিয়োগের পর দু-এক মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্রের মাথার ওপর সংখ্যাটি ফুটে উঠবে।

বিনা কথায় টাকার অংক জেনে নেবার যন্ত্র

যে ভদ্রলোকের যেটি একাউণ্ট তিনি নিজে যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে কোন রকম প্রশ্ন না করে নিঃশব্দে খবর সংগ্রহ করে নিতে পারবেন।

*

আমাদের পূর্বপুরুষ এক কোষ প্রাণীই আজ মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। এক কোষ প্রাণীরাই মানুষদের রোগাক্রান্ত করে বেশী। এরাই মানুষদের পোষক (host) হিসাবে ব্যবহার করে। মানুষ ছাড়া কুকুর, ঘোড়া, গরু এবং অন্যান্য গৃহপালিত জীবরাও এদের পোষক। আজকের দিনে কম করলেও জীবদের আশি রকম রোগ মানুষকে আক্রমণ করতে পারে। এই সমস্ত রোগেদের 'জুনোসেস' বলা হয়। এদের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে—'রাবিজ', 'অরনিথোসিস', 'ব্রুসেলওসিস' এবং 'রকি মাউন্টেন ফিভার'। জুনোসিসের মধ্যে তিনটি সাধারণ চারিত্রিক গুণ দেখতে পাওয়া যায়। এরা কদাচিৎ এক মানুষের দেহ থেকে আর এক মানুষের দেহে যেতে পারে। এরা মানুষ বা জীবজন্তু—যার দেহই আশ্রয় করুক না কেন, আকৃতিতে একই রকম হয়। এবং যে সমস্ত লোকে বেশী জীবজন্তু অথবা জান্তব পদার্থের সংস্পর্শে আসে, তাদের দেহে এরা বেশী করে আশ্রয় করে। এই সব রোগের মধ্যে 'রাবিজ' রোগটাই সচরাচর হয়। রাবিজ রোগের ভাইরাস জন্তুদের লালার মধ্যে থাকে। মানুষের শরীরে যখন কোনও রকম ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তখন লালা থেকেই ভাইরাস মানুষের দেহে আসে। সম্প্রতি চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন, রাবিজ রোগটির অপর একটি উৎপত্তি স্থল বাদুড়। বাদুড়ের কামড় থেকে রাবিজ রোগ হয়। মানুষের বিশিষ্ট বন্ধু কুকুরও রাবিজ রোগের আর একটি সূত্র। অরনিথোসিস অথবা 'প্যারট ফিভার' জীবজন্তু থেকে মানুষের দেহে যে রোগ আসে, তার মধ্যে একটি অতি সাধারণ রোগ। অবশ্য আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত কাকাতুয়া বা টিয়াপাখী ইত্যাদি পাখী পুষছি, ততক্ষণ পর্যন্ত এদের থেকে রোগাক্রান্ত হওয়ার কোনও ভয় নেই। সম্প্রতি আরও দেখা গেছে, হাঁস এবং পায়রা থেকেও 'প্যারট ফিভার' হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মুরগীর ছানাকেও এই রোগের বাহক ভাবা হয়। সমগ্র জুনোসিসএর মধ্যে ব্রুসেলওসিস রোগটিই বিশেষ পরিচিত। যেসব লোক পশু-পাখী ও জান্তব পদার্থ নিয়ে কাজ করেন, ব্রুসেলওসিস রোগের প্রকোপ তাদের মধ্যেই দেখা যায়। তিন জাতীয় ব্রুসেলআ দেখতে পাওয়া যায় আর এই সব ব্যাকটীরিয়াগুলি গরু, ছাগল ও শুকরের মধ্যেই পাওয়া যায়। রোগ সংক্রামিত পশুর সংস্পর্শে আসার দরুণই এই রোগ হয়।

*

খুব বেশী ধূমপান করলে ক্যানসার হয় বলে অনেকের ধারণা। সম্প্রতি স্যার ওয়াল্টার ফারগুসেন্ বলেছেন যে, ধূমপানের জন্যই যে ক্যানসার হয়—এটা ঠিক কথা নয়। তিনি ঠাট্টার ছলে এমন কথাও বলেছেন যে, কোনদিন এরা বলবে যে মায়ের দুধ খাওয়ার জন্যে ক্যানসার হচ্ছে। অবশ্য এটার প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, কোন কোন জাতের ইঁদুরের দুধে ক্যানসার রোগ হতে দেখা গেছে। স্যার ফারগুসেন ক্যানসারের কারণ জানবার জন্য অনেক বুকের রোগ নির্ণয়-কারী অভিজ্ঞ ডাক্তারদের মতামত নিয়েছেন। এই সব অভিজ্ঞ ডাক্তারদের অনেকেই নিজেরা খুব বেশী ধূমপান করে থাকেন। কিন্তু এই সব ডাক্তাররাও কোন মতামত প্রকাশ করতে পারেন নি। তাদের মধ্যে অনেকেই বলেছেন যে, সিগারেট এবং মদ খাওয়া সমান ক্ষতিকারক। কিন্তু এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা ক্যানসার কেন হয় তার সঠিক কারণ খুঁজে বার করতে পারেন নি।

বিজ্ঞাপন বিজ্ঞান

কানাইলাল বসু

"—বিজ্ঞাপন দেবো কেন?—না—না। শুধু শুধু বিজ্ঞাপন দিয়ে আর পয়সা নষ্ট করবার দরকার নেই—", সাবেকী আমলের ব্যবসায়ী বড়কর্তা বল্লেন সবে কারবারে বেরুচ্ছে হাল আমলের শিক্ষিত তার ছেলে ছোটকর্তাকে। এটা নিছক একটি সেকেলে ব্যবসায়ী বড়কর্তার কথা নয় বরং আজকের এই আধুনিক যুগেও আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দেওয়াকে পয়সার অপব্যয় বলে মনে করেন। নিতান্ত দায়ে না পড়লে বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা ভুলেও চিন্তা করেন না। কারণ তাঁরা বিজ্ঞাপন বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নন। কিন্তু তবুও এদেশে গত দশ বিশ বছরের তুলনায় আজ ব্যবসায় জগতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার রেওয়াজ অনেক বেড়েছে। কিন্তু রেওয়াজটা শুধু শুধু বাড়ে নি— বেড়েছে তার পেছনে ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে বলে। কাজেই, বিজ্ঞাপন কেন দেবো?— দিলে কি উপকার পাবো?—বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারে কি কি বিষয়ে নজর রাখতে হবে? —সেই বিষয়েই সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করবো।

ব্যবসায় যখন মন্দা আসে—বাজারে কেনা বেচার মাত্রা যায় কমে—লাভের অঙ্ক আর মোটা থাকে না—তখন ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপন দিয়ে আর খরচ বাড়াতে চায় না। বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা তখন—বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত। সুতরাং এই দুর্দিনে ওটা বাড়িয়ে আর লাভ কি? এক কথায় ব্যবসায়ীর এই মনোভাব একান্ত ভুল। শুধু তাই নয় তার ব্যবসায়ের পক্ষেও মারাত্মক। এই মনোভাব তার ব্যবসায়ের খারাপ অবস্থাকে আরও খারাপ করে তুলবে। অর্থনীতিবিদদের মতে ব্যবসায় যখন মন্দা ভাব আসে তখন বিজ্ঞাপনে খরচের মাত্রা কমানো দূরে থাক বাড়ানো উচিত। কারণ যে ব্যবস্থা মন্দা ব্যবসায়ে সাড়া জাগাবে—তাকে চাঙ্গা করে তুলবে—সে ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে বরণীয় ও করণীয়ও বটে। আর বিজ্ঞাপন মারফৎ প্রচার সে ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম। ১৯২৯-৩২ সালে যখন বৃটেনে ব্যবসায়ে গুরুতর মন্দা দেখা দিলো তখন বিজ্ঞাপন মারফৎ জিনিসের প্রচারের মাত্রা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছিল—এত বেশী বেড়েছিল, যে, এ যাবৎ তা এক রকম রেকর্ড হ'য়ে রয়েছে।

ভারতের মত দেশে, যেখানে ক্রমশ অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে, সেখানে বিভিন্ন শিল্পোন্নতির জন্য, তৈরী মালের বিক্রী বাড়াবার জন্য, শিক্ষার জন্য, লোকের মধ্যে নতুন নতুন চিন্তা ধারার প্রেরণা যোগাবার জন্য, লোকের আচার ব্যবহার, স্বভাব বদলাবার জন্য, নতুন নতুন জিনিস উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞাপনের যে একান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞাপনের যাঁরা বিরোধিতা করেন তাঁদের অধিকাংশই হয় ভাবপ্রবণ, নয়তো বদ্ধমূল ভুল ধারণার বশবর্তী, নয়তো বিজ্ঞাপন বিজ্ঞান সম্বন্ধে সঠিক খোঁজখবর জানেন না বা রাখেন না। ভারতে আজ শিল্পোন্নতির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে—যার ফলে দেশে এখন ভোগ্য পণ্যের যেমন সাইকেল, পাখা, ফাউন্টেন পেন, ব্লেড ইত্যাদি আরও অনেক জিনিসের উৎপাদন বেড়ে গিয়েছে। অথচ এই সব জিনিস আগে বিদেশ থেকে আমদানী হতো, তাও পর্যাপ্ত পরিমাণে নয়। কাজেই এই সব জিনিসের জন্য নতুন নতুন ক্রেতা চাই। চাহিদা না বাড়লে ক্রেতা বাড়বে না। তাই চাহিদা বাড়াতে হলে চাই প্রচার—আর তার প্রকৃষ্ট উপায় বিজ্ঞাপন—নয় কি?

একদল লোক আছেন, যাঁরা বিজ্ঞাপনের বিরোধিতা করেন এই কারণ দেখিয়ে যে বিজ্ঞাপনের খরচটা ক্রেতার ঘাড়েই চাপানো হয়—যেটা তাঁদের মতে অনুচিত। বিজ্ঞাপনের খরচ যে শেষ পর্যন্ত ক্রেতার ঘাড়ে চাপানো হয় সেটা ঠিক, তবে তারও ন্যায্য কারণ আছে। জিনিস বিক্রির মধ্যে দুটো ভাগ আছে—প্রথম জিনিস তৈরী—দ্বিতীয় তা বিক্রী। জিনিস তৈরী করতে গেলে নানান রকম খরচ আছে—যেমন কাঁচা মালের দাম, তৈরীর খরচ ইত্যাদি। জিনিস তৈরী হলো। এবার এলো বিক্রির পালা। কিন্তু বিক্রি করতে গেলেও একটা খরচ আছে—সেটাকে ঐ বিজ্ঞাপনের খরচ বলা যেতে পারে। সুতরাং বিজ্ঞাপনের খরচটাকে একটা আলাদা ও বাড়তি বলে ধরলে ভুল হবে—কারণ জিনিসটা বিক্রির জন্যই খরচ। কাজেই জিনিসের যা দাম ধার্য হবে বিজ্ঞাপনের খরচটাও তার মধ্যে থাকবে। জিনিসটা যে তৈরী হয়েছে, জিনিসটার যে অস্তিত্ব আছে বিজ্ঞাপন সেই কথাই ক্রেতাদের প্রচারের মাধ্যমে জানিয়ে দিলো—কারণ ক্রেতা যদি জানতেই না পারে মালের অস্তিত্ব তো সেটা তার পক্ষে কেনার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এটা হলো একটা দিক। অন্য একটা দিকও আছে। ক্রেতা একটা জিনিস কিনতে চায়, কিন্তু সে জিনিসটা বাজারে আছে কি না সেটা তার জানা নেই। বিজ্ঞাপন তাকে সেটা জানিয়ে দিলো। এই যে বিজ্ঞাপন ক্রেতার স্বার্থ সিদ্ধি করলো তাকে তার অজানাটা জানিয়ে দিয়ে—তার বিনিময়ে ক্রেতাকে কিছু মূল্য দিতে হবে—সে মূল্য আর কিছুই নয়—বিজ্ঞাপনের খরচ।

অনেকের ধারণা বিক্রি বেশী হলে তবে উৎপাদন বেশী হবে, আর উৎপাদন বেশী হলে তবে উৎপাদনের খরচ কমবে—কমলে বিক্রির দামও কম হবে। কিন্তু জিনিসটা ঠিক তা নয়। উৎপাদনের খরচের মধ্যে যদি বিজ্ঞাপনের খরচ ধরা থাকে তবেই ব্যাপক উৎপাদন অপেক্ষাকৃত সহজ হবে—হলে উৎপাদনের খরচও কম হবে—যার মানেই হলো বিক্রির দাম কম হওয়া—অর্থাৎ বেশী বিক্রি। আর ব্যবসায়ী তাই-ই চায়।
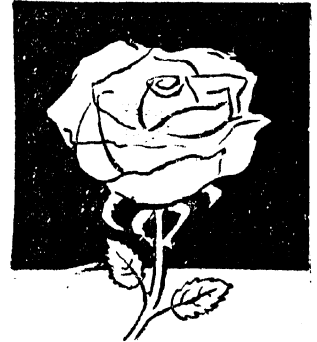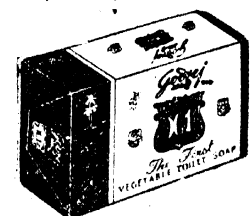
ব্যবসায় বিজ্ঞাপনের যে সঠিক গুরুত্ব কি, ঐতিহাসিক মেকলে তা বলেছেন। তিনি বলেছেন কলকব্জার ক্ষেত্রে বাষ্পের যে ভূমিকা, ব্যবসায়ে বিজ্ঞাপনেরও সেই ভূমিকা। অনেক লোককে একই সঙ্গে জানাতে হলে বিজ্ঞাপনের মত কার্যকরী জিনিস আর হতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে কাজের আগে, ধরুন মাল

তৈরীর সুরুতে, কজন তার জন্য আগাম বিজ্ঞাপনের কথা চিন্তা করেন? মাল তৈরী হলো। যখন ব্যবসায়ী দেখলেন যে, বিজ্ঞাপন না দিলে আর মাল বিক্রী হচ্ছে না—তখন নেহাৎ বাধ্য হয়েই যা তা করে কিছু বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। শেষ সময়ের ব্যাপার কাজেই তাতে কতটা সুফল হবে বলা শক্ত। যদি না হয় তো ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপনের ওপর আরও চটে গেলেন। কিন্তু তা না করে যদি জিনিস তৈরীর শুরু থেকে একটি সুপরিকল্পনা মাফিক বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো তাহলে সেই মালটার জন্য একটা চাহিদা, বাজারে মালটা আসবার আগেই তৈরী হয়ে থাকতো। ফলে সাধারণের চাইতে বিক্রী আরও বেশী হতো—অন্ততঃ হবার সম্ভাবনা থাকতো।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতকেও এখনও শিল্পোন্নত দেশ বলা যায় না। এদেশে জিনিস বিক্রী করতে হলে বিজ্ঞাপনের সাহায্য যদিও অপরিহার্য তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সাহায্য ইচ্ছাকৃত অবহেলিত। ভারত দেশটা বিরাট—এখানে বিভিন্ন ক্রেতার বিভিন্ন রুচি—এক রুচির ক্রেতা এখানে, অন্য রুচির ক্রেতা হাজার মাইল দূরে। এছাড়া ক্রেতাদের কেনবার সামর্থ্যও এদেশে অতি সীমাবদ্ধ। কাজেই এদের কাছে লোক পাঠিয়ে মাল বিক্রী করা খরচ সাপেক্ষ, সময় সাপেক্ষ। কাজেই যে মাল তৈরী করালো এ রাস্তায় তার পড়তা পোষাবে না। তাই এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় বিজ্ঞাপনের সাহায্য নেওয়া। কিন্তু এলোমেলোভাবে নয় বরং সুপরিকল্পিতভাবে। বিজ্ঞাপন দেওয়ার মাধ্যম আছে অনেক, যেমন—খবরের কাগজ, ডাক, হোর্ডিং, সিনেমা, রেডিও ইত্যাদি। এর মধ্যে কম খরচে একসঙ্গে অনেক লোককে খবরের কাগজে একই জিনিসের অস্তিত্বের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেবে—তাতে জিনিসটার সুনাম বাড়বে—জিনিসটার কথা লোকের মনেও থাকবে, ফলে ব্যবসায়ী উপকৃত হবে। কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী—ভারতের এই চারটি প্রধান শহরে প্রথম শ্রেণীর কাগজের প্রথম পাতায় একটি বিশ ইঞ্চি বিজ্ঞাপন দিলেন। প্রথম পাতার বিজ্ঞাপন সুতরাং পাঠকের চোখে পড়বেই। পড়লোও প্রায় দু লাখ পাঠকের চোখে—খরচ হলো প্রায় ৩২০০ টাকা। অর্থাৎ মাথা পিছু গড়ে মাত্র ১·৬ নয়া পয়সা খরচে সারা দেশময় ক্রেতার কাছে বিজ্ঞাপনটি আপনার মালের বিবরণ পৌঁছে দিল। অন্য যে কোন মাধ্যমের বিজ্ঞাপন এ কাজ পারে বলে মনে হয় না।

বিক্রী আর বিজ্ঞাপন—দুটো বিষয় অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। বিক্রীর জন্য বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনের জন্যই বিক্রী। এদেশে নানা ভাষা—বিক্রীর জিনিসটা যখন একই তখন জিনিসটার বিবরণ কিন্তু সব ভাষায় অবিকল এক হওয়া দরকার। আজও ভারতে ব্যবসা জগতে ইংরিজী ভাষা। প্রধান। মাল সম্বন্ধে মূল বক্তব্য হয়তো ইংরাজিতে তৈরী হলো, কিন্তু তার প্রচার হবে হয়তো একাধিক ভাষায়, একাধিক এলাকায়। কাজেই তর্জমা অবিকল মূল বক্তব্যের অনুরূপ হওয়া একান্ত দরকার—না হলে বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্যই হবে ব্যর্থ। এমতাবস্থায় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা ও অভিজ্ঞ অনুবাদকের সাহায্যে বিজ্ঞাপনের বিবরণ রচনা একান্তই বাঞ্ছনীয়। এই ব্যবস্থায় মূল বক্তব্যের বিকৃতি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

অনেক ব্যবসায়ী মাল বিক্রী হচ্ছে না দেখে এজেন্টদের বা ক্যানভাসারদের ধারে মাল দেয়। এতে টাকা মার যাবার সম্ভাবনা আছে—তবু ব্যবসায়ী দেয়। কিন্তু ব্যবসায়ী টাকা মার যাওয়ার ঝুঁকি নিজে নেয় না বরং ক্রেতারই ঘাড়ে চাপায়। কি ভাবে? বিশেষ কিছুই না—ন্যায্য দামের চেয়ে বিক্রীর দামটা কিছু বাড়িয়ে দেয়—আর টাকা মার যাওয়ার ঝুঁকিটা এই বাড়তি দামের ভেতর দিয়ে পুষিয়ে নেয়। খেসারত দিতে হয় ক্রেতা বেচারাকেই। বিজ্ঞাপন কিন্তু ক্রেতাকে এই ঝুঁকি ঘাড়ে নেওয়া থেকে রেহাই দিতে পারে। বিজ্ঞাপন মারফৎ প্রচার মালের চাহিদা তৈরী করলো—আর সেই চাহিদা মজুতদারকে বাধ্য করলে সেই মাল মজুত করতে। এখানে মূল ব্যবসায়ী যদি মাল সরবরাহের বিভিন্ন শর্ত সম্বন্ধে কড়াকড়িও করে তাতেও মজুতদারের আপত্তি করলে চলবে না—কারণ মাল না পেলে মজুতদারকে খদ্দের হারাতে হবে। কাজেই ক্রেতাও অবৈধ বাড়তি দামের খেসারতের হাত থেকে রেহাই পাবে।

বিজ্ঞাপনের একটা শিক্ষণীয় মূল্য আছে—বিশেষত দেশ যখন অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে চলে। আমাদের দেশে গত ২।৩ বছরে বিজ্ঞাপনের শিক্ষনীয় দিকটা বেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। দেশে আজ এমন অনেক শিল্পের উন্নতি হচ্ছে, যার চাহিদা রাতারাতি বাড়বে না—বা বাড়ছে না বা বাড়লেও তা মেটাবার উপায় নেই। কারণ যে চাহিদা আছে তা মেটাতেই শিল্পগুলোর ক্ষমতায় কুলোচ্ছে না। যেমন ধরুন লোহা ও ইস্পাত শিল্প। দেশে লোহা বা ইস্পাতের বর্তমানে যে চাহিদা আছে এই শিল্পের উপস্থিত ক্ষমতা নেই তা মেটাবার। এই অবস্থায় ইস্পাত শিল্পের পক্ষে বিজ্ঞাপন দিয়ে কি লাভ? এ প্রশ্ন

স্বাভাবিক। কিন্তু লাভ আছে। ইস্পাত শিল্পের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে জানাবার দরকার যে তারা কি কাজ করছে? কেন করছে? বিশেষত তারা যা করছে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাদের তা করতে দেওয়া উচিত কেন? জনসাধারণেরও এগুলো জানা দরকার—জানলে দেশের শিল্পের ক্ষমতা সম্বন্ধে তাদের প্রত্যয় বাড়বে—বাড়বে জ্ঞান। দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত বড় বড় শিল্পোগুলোর পক্ষে জনসাধারণের সমর্থন ও বিশ্বাস অর্জনের জন্য এটা দরকার। আর তার একমাত্র পথ বিজ্ঞাপনের সাহায্যে প্রচার।

বিভিন্ন জিনিসের বিক্রী বাড়াতে হলে যখন বিজ্ঞাপন দরকার—শুধু দরকার নয় এক রকম অপরিহার্য, তখন বিজ্ঞাপন বাবদ খরচটাকে ব্যবসায় সম্প্রসারণের বা উন্নতির খরচ বলে ধরা উচিত—অন্তত অর্থনীতিবিদরা সেই কথাই বলেন। এই সম্প্রসারণ খরচ মানেই শিল্পের উত্তোরত্তোর উন্নতি। সামাজিক দিক দিয়ে বিচার করলে এই খরচের পরিবর্তে বাড়ে জাতীয় আয়।

বিজ্ঞাপন বিরোধীরা বলেন, বিজ্ঞাপন জিনিসটা নীতি বিরোধী, কারণ বিজ্ঞাপন ক্রেতার বা মানুষের কতকগুলো স্বাভাবিক ধর্মের অবৈধ সুযোগ নিয়ে প্রথমেই তাকে প্রলুব্ধ ক'রে তার খরচের মাত্রা দেয় বাড়িয়ে। বিজ্ঞাপনের চটকে অকৃষ্ট হয়ে ক্রেতা হয়তো ক্ষমতার অতিরিক্ত হলেও কোন জিনিস কিনে ফেলে—যেটা ধীরে সুস্থে বিচার বিবেচনা করে কিনতে হলে সে হয়তো কিনতোই না। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা খুব বিরল। তবুও বিজ্ঞাপনের সার্থকতা কিছুটা এতে প্রমাণিত হয়।

প্রতারকরা অনেক সময় বিজ্ঞাপনের সাহায্য নেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনের ফলটা নিছাৎই ক্ষণস্থায়ী। কারণ যে কোন মুহূর্তে প্রতারকের ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে। কিন্তু ব্যবসায়ের সত্যি উন্নতির খাতিরে যারা বিজ্ঞাপনের প্রচারের আশ্রয় নেয়, কিংবা যারা বিজ্ঞাপনের সঠিক গুরুত্ব জানে, তারা কিন্তু এলোমেলো ভাবে না গিয়ে, মাত্রাতিরিক্ত বা বিসদৃশ কিছু না করে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রয়োজনানুযায়ী বিজ্ঞাপনের সাহায্য নেয়, যার একটা স্থায়ী মূল্য আছে।

বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে আরও একটা বিষয় বিশেষ মনে রাখা দরকার যে ক্রেতার রুচি পরিবর্তনশীল—তাই চাহিদাও। কাজেই ব্যবসায়ীকেও বিজ্ঞাপনের বক্তব্য সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে—তার জন্য দরকার ক্রেতা সম্পর্কে সদাসর্বদা সজাগ-দৃষ্টি, বিজ্ঞাপনে নতুন ধারা, নতুন চিন্তার অভিব্যক্তি।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, বিজ্ঞাপনের খরচটা বাজে খরচ নয় (যেটা এখনও অধিকাংশ লোকের ধারণা) বরং এটা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা অবশ্য করনীয়। বিজ্ঞাপনের খরচ যে প্রতিদান দেয় আধুনিক জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকারবার অন্ততে সেই কথাই ক্রমশ প্রমাণ করছে।

সোভিয়েৎ প্রস্তাব অনুযায়ী বার্লিন সমস্যার সমাধান যদি না হয়, তা হলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে সারাজেভোর অবস্থার পুনরাবৃত্তি হবে —গুনীকো

সমুদ্রের কন্যা

অশোক মুখোপাধ্যায়

শাস্ত্রে সমুদ্রমন্থনের কথা আছে। তার সত্যতা হয়তো তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা এক সমুদ্রমন্থনের কথা জানি, যা আমাদের বিস্ময়বোধকে কম উদ্দীপ্ত করে না। হল্যাণ্ড বা 'হলো ল্যাণ্ড' সমুদ্র সমতার নিচে—একথা সকলেরই জানা আছে। তবু সে 'জী-বার্গ' অর্থাৎ 'সি-ওয়ালে'র পাহারায় বন্যাকে দূরে ঠেলেছে অনেককাল আগে। তাই সৃষ্ট হয়েছে সেই বহুশ্রুত প্রবাদবাক্য : God created the sea and we created the land তবু একথা অনস্বীকার্য, সমগ্র হল্যাণ্ড কোনদিনই সমুদ্রের অংশ ছিল না, ছিল মহাদেশই। কিন্তু তার উত্তরপূর্ব অংশ সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নয়। কারণ ঐ অঞ্চলটি ছিল সমুদ্রের গর্ভে। নেদারল্যাণ্ডের মানুষ আধুনিক ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যার সহায়তায় তাকে উদ্ধার করেছে জলের নীচ থেকে। তারপর পরিণত করেছে সবুজ শস্যক্ষেত্রে। জলমুক্ত ভূমি হল্যাণ্ডে 'পোল্ডার' নামে অভিহিত। পোল্ডারগুলো এখন জনবসতিতে পরিণত। সেখানে আজ বিরাজ করছে দিগন্তজোড়া গমক্ষেতের শোভা।

সমুদ্রের যে অংশ এইভাবে স্থলে পরিণত হয়েছে, তার নাম 'জাইডার-জী' (zuider zee) অর্থাৎ দক্ষিণ সমুদ্র। অতীতে এখনে বড় বড় পাল তোলা জাহাজ দেশ-বিদেশের বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে যাওয়া-আসা করত। জাইডার-জী ছিল অনেকটা খাঁড়ির মত। মূল মহাদেশের অভ্যন্তরে সমুদ্র ধীরে ধীরে অনুপ্রবেশ করে এই inland sea'র জন্ম দিয়েছিল।

সমাপ্ত অবস্থায় জাইডার-জী বাঁধ। বাঁধের বাঁ পাশে সমুদ্র, ডান পাশে ইসেল হ্রদ

বলা বাহুল্য, নিছক বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপনের জন্য অথবা সমগ্র পৃথিবীকে চমকে দেবার জন হল্যাণ্ডবাসীরা জাইডার-জীকে মহাদেশে পরিণত করেনি। যথেষ্ট কারণ রয়েছে বলেই এই দুঃসাহসী পরিকল্পনার পেছনে অজস্র অর্থব্যয়কে স্বীকার করে নিয়েছে তারা।

জাইডার-জী পরিকল্পনার বিরাটত্ব উপলব্ধি করার মত। হেগ থেকে প্রকাশিত 'ড্রেজ ড্রেন রিক্লেম' গ্রন্থ থেকে আমরা এ বিষয়ে কিছু তথ্য পেতে পারি। গ্রন্থটি লিখেছেন ডক্টর জোহান ভ্যান ভিন (Dr Johan Van Veen)। তিনি হল্যাণ্ডের জলসেচ পরিকল্পনাগুলোর সংগে সরকারীভাবে জড়িত। সুতরাং তাঁর পরিবেশিত তথ্যের ওপর নির্ভর করতে বাধা নেই।

ফার্দিনান্দ ডি লেসেপ্স কৃত মূল পরিকল্পনায় সুয়েজখালের নির্মাণব্যয় ধার্য হয়েছিল প্রায় এক কোটি পাউণ্ড। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাইন-উন্নয়ন পরিকল্পনায় খরচ হয়েছে এক কোটি চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড। পানামা খালে ব্যয় হয়েছে সাড়ে পাঁচ কোটি পাউণ্ড। আর জাইডার-জী পরিকল্পনার আনুমানিক খরচের পরিমাণ এদের মিলিত ব্যয় অপেক্ষাও অনেক বেশি—প্রায় কুড়ি কোটি পাউণ্ড।

জাইডার-জী পরিকল্পনার ইতিহাসও কম চিত্তাকর্ষক নয়। ১৮৪০ সাল থেকে এটি মোটামুটি রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করে। কিন্তু সরকার তখন এর প্রতি ঔদাসীন্য ছাড়া কিছুই প্রদর্শন করেননি। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে কয়েকজন দূরদর্শী ব্যক্তির উদ্যমে 'জাইডার-জী অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। নিজ পেশায় ব্যর্থ ডক্টর সি লেলি নামক জনৈক অখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে এই সমিতির সম্পাদকের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। তখন পর্যন্ত জাইডার-জী পরিকল্পনা ছিল ডক্টর ভিনের ভাষায় "a castle in the air।" কিন্তু লেলি এবং তাঁর পিতা এ বিষয়ে এত উৎসাহী ছিলেন যে, সাংসারিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও লেলি নিজেকে এই অনিশ্চয়তার সংগে জড়িত করতে দ্বিধা করেননি।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জাইডার-জী অ্যাসোসিয়েশন জনসাধারণের কাছ থেকে মোট ২৭ হাজার পাউণ্ড চাঁদা সংগ্রহ করে। প্রারম্ভিক কাজ শুরু করার জন্য আরও ন্যূনতম তিন হাজার পাউণ্ড এর প্রয়োজন ছিল। সেই অর্থের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো হল। কিন্তু

তা ফলপ্রসূ হল না। সুতরাং সমস্ত উদ্যম অংকুরেই বিনষ্ট হতে বসল। অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী পদত্যাগ করে সরে পড়লেন। তখন এগিয়ে এলেন লেলি। তিনি স্বয়ং সমস্ত দায়িত্বভার নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। তারপর এমন দক্ষতার সঙ্গে তাঁর পরিকল্পনার কাঠামোকে কাগজে-কলমে রূপ দিলেন যে, তা দেখে নেদারল্যাণ্ডসের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী Tak Van Poortuliet মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ফলত মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে লেলির ভাগ্যে নেদারল্যান্ডের ওয়াটার-স্ট্যাট বিভাগের মন্ত্রিত্ব লাভ ঘটল। মন্ত্রিত্ব লাভের পর তিনি নানাভাবে সরকারের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করে চললেন। অবশেষে অনেক ভাবনা-চিন্তার পর ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে নেদারল্যাণ্ডস্ স্টেট অ্যাসেম্বলি কর্তৃক পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হল। কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে অনুমোদন লাভ করলেও ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের আগে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ১৯২৫ থেকে ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এর সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে।

জাইডার-জী উদ্ধারের পথে সমস্যা ছিল একাধিক। প্রথমতঃ বিপুল অর্থের প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত যে বাঁধের দ্বারা একে মূল সমুদ্র থেকে পৃথক করে নেওয়া হবে—তার আতঙ্কজনক উচ্চতা ও দৈর্ঘ্য। শতাধিক ফুট উঁচু এবং ২০ মাইল দীর্ঘ একটি বাঁধ তৈরী করতে কি পরিমাণ উপকরণের প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়। আর সাধারণ মাল-মসলা দিয়েও সমুদ্র বন্ধন সম্ভব নয়। চাই অত্যন্ত মজবুত উপকরণ। এ ছাড়া কোনরকম একটি প্রাচীর তুললেই চলবে না, অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং সুপ্রশস্ত বাঁধন গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয় সমস্যা ছিল বাঁধ নির্মাণোত্তর কার্য। জাইডার-জীকে মূল সমুদ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার পর পাম্পের সাহায্যে তার জল সরিয়ে ফেলতে হবে। কিন্তু এটা একবারে সম্ভব নয়। অসংখ্য ক্ষুদ্রতর বাঁধের সাহায্যে তাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ধাপে ধাপে করতে হবে এই কাজ। এ সকল বাদ দিলেও রয়েছে বাঁধগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ, জলমুক্ত অঞ্চলে অত্যন্ত দক্ষ সেচ-ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং তাদের সাফল্যের সঙ্গে কর্ষণযোগ্য করে তোলা।

ডক্টর লেলির সুদক্ষ পরিচালনায় পরিকল্পনাটি সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে চলল। সমুদ্রের তলায়। সৌভাগ্যবশত প্রচুর জলবাহিত উপল—"বোল্‌ডার ক্লে" পাওয়া যায়। নির্মাণকার্যে এদের ব্যবহার করা হয়েছে সার্থকভাবে।

আগেই অনুমান করা গিয়েছিল জাইডার-জী বাঁধ তৈরীর পর সমুদ্রের, জোয়ারকালীন জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। কতটা বৃদ্ধি পাবে সূক্ষ্ম গণনা পদ্ধতির সাহায্যে তা নিরূপণ করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী হল্যাণ্ডের অন্যান্য বাঁধগুলোকেও আগে থেকেই খানিকটা উঁচু করে নেওয়া হয়। তারপর শুরু হল মূল জাইডার-জী বাঁধ নির্মাণ। দু' প্রান্ত থেকে কাজ শুরু করে মাঝখানে এসে পৌঁছুতে সময় লাগে দীর্ঘ সাত বছর। সারা হল্যাণ্ড জুড়ে সেদিন আনন্দের অবধি ছিল না।

সমাপ্ত অবস্থায় এই বাঁধের উচ্চতা

সমুদ্র (বাঁ দিকে) এবং ইসেল হ্রদ (ডান দিকে) এর মধ্যে সরু সুতোর মতন দেখাচ্ছে জাইডার-জী বাঁধ

দাঁড়িয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকেও ২০ ফুটের ওপরে। সবচাইতে চওড়া অংশের বেধ ৬০০ ফুটের বেশি, আর সমুদ্র সমতায় তা প্রায় ৩০০ ফুটের মত।

বাঁধের ওপর একটি কংক্রিটের রাস্তা, একটি সাইকেল চলার পথ এবং দুই লাইন বিশিষ্ট একটি রেলপথ বসেছে। এ সব তথ্য থেকে এর বিপুলতা কিছুটা নিশ্চয় আন্দাজ করা যায়।

বাঁধের তলাকার মাটি ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষয়ে গিয়ে বাঁধ ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। এজন্য হল্যাণ্ডে বহুদিন থেকে প্রচলিত একটি কৌশলকে কাজে লাগানো হয়েছে। উইলো গাছের বড় বড় ভেলা তৈরী করে সেগুলোর ওপর পাথর চাপিয়ে বাঁধ-সংলগ্ন সমুদ্রে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ফলে নরম মাটি সমুদ্রজলের ক্ষয়ক্রিয়াকে বহুলাংশে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়ে ওঠে।

বাঁধ সমাপ্তির পর শুরু হয় জমি উদ্ধারের কাজ। বাঁধের একপাশে রইল সমুদ্র, অন্যপাশে তৈরী হল এক বিশাল কৃত্রিম হ্রদ। এই হ্রদকে শতশত মাইল দীর্ঘ সেকেণ্ডারী ডাইক দ্বারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে চারটি থেকে সমস্ত জল নিষ্কাশিত করা হবে পাম্পের সাহায্যে। তিনটির জল নিষ্কাশন ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে এবং সেখানে কৃষিকার্যও শুরু হয়ে গেছে।

উত্তর হল্যাণ্ডে পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম ১০০ একর জমি উদ্ধার করা হয়েছিল ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। একে সুদৃঢ় প্রাচীর দিয়ে সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে কতগুলো বিষয়ের ওপর বিশদভাবে গবেষণা চালানো হয়। বিষয়গুলো হল :

(১) উদ্ধারপ্রাপ্ত জমির কর্ষণ

(২) জলসেচ ব্যবস্থা

(৩) উর্বরতা বৃদ্ধির উপায়

(৪) সঠিক শস্য নির্বাচন

জাইডার-জী পরিকল্পনা পুরোপুরি সমাপ্ত হলে মোট ৫ লক্ষ ৪৬ হাজার একর চাষযোগ্য ভূমি পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

শস্যক্ষেত্র ছাড়া এই পরিকল্পনার অন্যতম অবদান একটি প্রকাণ্ড মিষ্টি জলের হ্রদ। হ্রদটির আয়তন আড়াইলক্ষ একরের মত। নানা কারণে হল্যাণ্ডের মৃত্তিকায় লবণের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এটা শস্যের পক্ষে অনিষ্টজনক। ইসেল হ্রদ নামক এই নতুন হ্রদটির মিষ্টি জল উপরোক্ত সমস্যা অনেকটা দূর করতে পারবে। রাইনের অন্যতম শাখা ইসেল নদীকে হ্রদটির মধ্যে এনে মেশানো হয়েছে বলে এই নামকরণ। ইসেলের জলপ্রবাহ একে লবণাক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে। বাড়তি জল ত্রিশটি স্লুইস্ গেটের মধ্য দিয়ে চালিত হবে দেশের বিভিন্ন অংশে।

জাইডার-জী বাঁধ নির্মাণপূর্বকালে উত্তর হল্যাণ্ড এবং ফ্রিজল্যাণ্ডের মধ্যে উন্মুক্ত ছিল ১৮৬ মাইল দীর্ঘ উপকূল-রেখা। এর ওপর সমুদ্রতরঙ্গের ক্ষয়ক্রিয়া চলত। কিন্তু বাঁধ তৈরীর ফলে এই দৈর্ঘ্য ১৮৬ মাইল থেকে কমে মাত্র ২০ মাইলে এসে নেমেছে। বলা বাহুল্য এতে জোয়ার ভাটা জনিত ক্ষয়ক্রিয়ার প্রতিরোধ অনেক সহজসাধ্য হয়েছে। এ সকল বাদ দিলেও আর একটি লাভ হয়েছে যা উপেক্ষণীয় নয়। তা হল উত্তর হল্যাণ্ড এবং ফ্রিজল্যাণ্ডের দূরত্বের হ্রাস। যানবাহন চলাচলের পথ নির্দিষ্ট হয়েছে নবনির্মিত বাঁধের ওপর দিয়েই। ফলে যোগাযোগের জন্য এখন আগেকার মাত্র এক দশমাংশ পথ অতিক্রম করলেই চলে।

যে সকল দেশে জনসমস্যার জন্য স্থান এবং খাদ্যের অভাব অত্যন্ত নিদারুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে হল্যাণ্ডের আদর্শ অনুসরণ করে নতুন জমি উদ্ধার করতে পারলে সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে। কলকাতার উপকণ্ঠের লবণহ্রদ-গুলোর উন্নয়নের কথা মাঝে মাঝে শোনা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তদন্তের জন্য হল্যাণ্ডের ইঞ্জিনীয়ারদের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। তবে ফলপ্রাপ্তি কতদিনে ঘটবে, সে সম্বন্ধে আমরা এখনও প্রায় অন্ধকারেই পড়ে আছি।

প্রবন্ধ

রাজনীতি—রাধানাথ সিংহ। পরিবেশক—মহাজাতি প্রকাশক, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের রাজনীতি, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে ছাব্বিশটি সুচিন্তিত প্রবন্ধের সমষ্টি। প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং গ্রন্থকারের প্রকাশভঙ্গি গ্রন্থখানিকে সুসমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। 'রাজনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে লেখকের স্বাধীন চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'শিক্ষা ব্যবস্থা', 'শিক্ষার অপচয়' ও 'শিক্ষা সংস্কার'—এই কয়টি প্রবন্ধে লেখক একদিকে যেমন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি বিচ্যুতি প্রভৃতির নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, অন্যদিকে লেখকের গভীর চিন্তাপ্রসূত নূতন পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের আবেদন জানাইয়াছেন।

বর্তমানে বাংলা সাহিত্যে গল্প, উপন্যাস এবং কবিতা যে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, প্রবন্ধ সাহিত্যের মান তেটা উচ্চস্তরের নহে বলিয়া পাঠক সাধারণের যে ধারণা রহিয়াছে, তাহা আংশিক সত্য—একথা বলা চলে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও প্রবন্ধ-সাহিত্য সম্পর্কে এক শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে যে ঔৎসুক্য ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। বর্তমান গ্রন্থ রচনার পটভূমি নির্বাচনে লেখক যে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির এবং দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য গ্রন্থের মত পরিমিত মূল্যে এরূপ প্রবন্ধ সাহিত্যের বহুল প্রচার সমাজ কল্যাণের পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৫২২।৫৭

শব্দার্থতত্ত্ব—রবীন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তশাস্ত্রী। প্রবর্তক পাবলিশার্স, কলিকাতা-১২। দাম—৫়।

শব্দ শ্রবণেই অর্থবোধ হয়। আর সেই অর্থ নির্ণয়ের ব্যাপারে প্রাচীন ভারতে যেরূপ গভীর গবেষণা হয়েছিল অন্য কোন ভাষায় বোধ করি সেরূপ হয়নি। প্রাচীন আচার্যদের মতে, শব্দের অর্থবোধের অনুকূলে যে ব্যাপার রয়েছে তা হচ্ছে বৃত্তি, আর এই বৃত্তি চারটি—অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য। আলংকারিক আচার্যদের কেউ কেউ এই চারটি বৃত্তিকেই স্বীকার করে নিয়েছেন, কেউ কেউ বা এদের এক বা একাধিককে স্বীকার করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে এই মতামতগুলো সম্পর্কেই বিশদ ও সুচিন্তিত আলোচনা রয়েছে। বইখানি অলংকার শাস্ত্রের ছাত্রদের যথেষ্ট প্রয়োজনে লাগবে।

৪৬৮।৫৮

উপন্যাস

ধূমায়িত পৃথিবী—অশ্বিনী কুমার। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম আড়াই টাকা।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক সাহিত্য ক্ষেত্রে নিতান্ত অপরিচিত নহেন। আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশিষ্ট চরিত্রে সূর্যকুমার, বীরু, টগর ও যুগলের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ আদর্শ চরিত্র বীরুর সাময়িক পদস্খলন, দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে পড়িয়া অসহায় উদ্বাস্তু বীরুর কাকা সূর্যকুমারের মতিচ্ছন্ন এবং অবশেষে বিনা চিকিৎসায় তার মৃত্যুর চিত্র অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে টগর ও যুগলের চরিত্র মাধুর্য বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। পরিশেষে দূর সম্পর্কিত ভ্রাতুষ্পুত্রী যুগলের সঙ্গে বীরুর বিবাহ-বন্ধন নিতান্ত অশোভন প্রতীয়মান না হইলেও আপন খুল্লতাত পত্নী বিধবা টগরের প্রতি বীরুর এবং বীরুর প্রতি টগরের চিত্ত-দৌর্বল্য কিছুটা বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। সাবলীল ভাষা এবং লিপিচাতুর্যের মাধ্যমে গ্রন্থখানি মোটের উপর সুখপাঠ্য হইয়াছে। প্রচ্ছদপট, মুদ্রণ ও বাঁধাই মনোরম।

৮০।৫৪

নাটক

একাংক সপ্তক—দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা-৯। তিন টাকা।

ইংরাজীতে one-act plays-এর অভাব নেই। কিন্তু বাংলা ভাষায় একাংকিকার অভাব রয়েছে যথেষ্ট। কারণ, একাংকিকার স্বল্প পরিসরে নাটকের বিষয়বস্তু ও সংঘাত ফুটিয়ে তোলা সহজ কাজ নয়। আলোচ্য গ্রন্থখানি সেই অভাব পূরণে কিছুটা সহায়ক হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

বইখানিতে সাতটি একাংক নাটক স্থান পেয়েছে। এবং তার প্রত্যেকটিই সুলিখিত। মরমী শিল্পীর চোখে দেখা জীবনের প্রতিফলন রয়েছে নাটকগুলোতে আর সেই কারণেই নাটকগুলোর পাত্রপাত্রীরাও হয়েছে জীবন্ত। শুধু তাই নয়, নাটকগুলোতে স্বল্প আয়াসে যে পরিবেশ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, চরিত্রগুলোর সাথে তা ভারসাম্য বজায় রেখেছে। নাট্যকারের কৃতিত্ব সেদিক থেকেও কম নয়। ৫২৮।৫৮

কবিতা

পত্ররাগ—চিত্ত ভট্টাচার্য। একক প্রকাশনী, ১৪৬।১, কালিঘাট রোড, কলিকাতা-২৬। দেড় টাকা।

মুখবন্ধে লেখক বলেছেন, "আধুনিক কবিতার নামে যে ত্রাস কবিতা পাঠকদের মনে অধুনা বাসা বেঁধেছে এবং একজন মনোযোগী কবিতা পাঠক হিসাবে আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগের আংশিক সত্যকে সমর্থন করি বলেই অযথা কথার কসরত দেখাতে অপারগ। হৃদয়বান পাঠকদের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে তাদের নিজস্ব বুদ্ধি ও বোধের সীমানার অনর্থক দৈন্যের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়ে বিড়ম্বিত করতে ইচ্ছুক নই।" আধুনিক কবিতা সম্পর্কে এই বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য না হলেও কবি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। যে কয়টি কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তাতে সহজ কথা সহজ ও মিষ্টি সুরেই বলা হয়েছে। দুর্জ্ঞেয় ভাব-কল্পনায় তারা বিড়ম্বিত হয়নি বা অযথা শব্দ কণ্টকিতও হয়নি। কবিতাগুলো পড়ে ভালোই লাগে। পূর্ণেন্দু পত্রীর আঁকা প্রচ্ছদপটটি সুন্দর। ৫০৯।৫৬

অনেক মন একটি আকাশ—বিভাস দত্ত। নিরীক্ষা, ৫৬।১এ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা-১২। এক টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

এক বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের সুর শুনতে পেলাম 'অনেক মন একটি আকাশে'র কবিতাগুলো পড়ে। আর সেই প্রত্যয় আঙ্গিকসর্বস্ব নয় বলেই মনকে নাড়া দেয় সহজেই। সেখানেই কবির কবিত্ব। তাঁর অনুভূতিতে যেমন কোন দ্বিধা জড়তা নেই তেমনি তার প্রকাশও দ্বিধাহীন অকম্পিত। মোট ত্রিরিশটি কবিতার সবগুলোই সমান স্তরে না উঠলেও সামগ্রিকভাবে বইখানি পাঠকমনকে তৃপ্ত করবে। ৫৮০।৫৭

মঞ্জরী—রঞ্জিতা কুণ্ডু। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। দুই টাকা।

আলোচ্য বইখানি কবির প্রথম প্রকাশিত বই। প্রায় পঞ্চাশটি বিভিন্ন ধরনের কবিতার এই সংকলনটি পড়তে বসে যে কথাটা প্রথমেই মনে হয় তা হল রঞ্জিতা দেবী কবিতাই লিখেছেন, অন্তঃসারহীন বাহ্যিক চাকচিক্যসর্বস্ব কতকগুলো রচনা সৃষ্টি করেননি। শুধু আঙ্গিকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না রেখে তিনি কবিতার প্রাণ সন্ধান করতে প্রয়াস পেয়েছেন। আর সেই প্রয়াসে যে নৈপুণ্যের পরিচয় তিনি দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। কবিতা-গুলোতে ভাবের আড়ষ্টতা বা অস্পষ্টতা যেমন কোথাও নেই, তেমনি ভাষা বা আঙ্গিকের দুর্বলতাও তাদের দুষ্ট করেনি। ৫৮০।৫৭

দুই ঋতু—আতাউর রহমান। প্রকাশক—আবদুল হাফিজ, টাউন প্রেস, বগুড়া, পূর্ব পাকিস্থান। দেড় টাকা।

দেশকালের সীমা পেরিয়ে ভাষা ও সাহিত্য তার পথ কেটে নেয়। রাজনীতির বেড়া তার পথ রোধ করতে পারে না। সে কথাটারই প্রমাণ আর একবার পেলাম আলোচ্য কাব্য গ্রন্থখানি পড়ে। যে সময়ে পূর্ব পাকিস্থানে বাংলা ভাষাকে উর্দু প্রভৃতি ভাষা থেকে এলোমেলো শব্দ সঞ্চয় করে কণ্টকিত করে তোলার সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা চলেছে, সে সময় এই জাতীয় একখানা বই মনে আশার সঞ্চার করে। লেখকের ভাষায় বুনন দুর্বলতা নেই কোনোখানে। যে বলিষ্ঠ আশাবাদে তিনি আস্থাবান তার প্রকাশেও তাঁর লেখনী দ্বিধাহীন অকম্পিত। পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক কাব্য সৃষ্টিতে বইখানি নিঃসন্দেহে একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ২০২।৫৮

শিকার কাহিনী

শিকারের আদিকথা—অদিতিমোহন রায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স লিঃ, কলিকাতা-১২। পাঁচ টাকা।

বাংলা ভাষায় শিকার কাহিনী অপর্যাপ্ত না

হলেও কম নেই। কিন্তু শিকার ও শিকার করার পদ্ধতি সম্বন্ধে এই জাতীয় বই বোধহয় এই প্রথম। লেখক নিজে প্রখ্যাত শিকারী। আর তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। লেখকের সব চাইতে বড় কৃতিত্ব হল, অনুমানের ওপর নির্ভর করে যেমন তিনি কোনো কথা লেখেননি, তেমনি আবার বাস্তব অভিজ্ঞতাকেও কোথাও কল্পনার রংয়ে বাড়িয়ে তোলেননি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে লেখা বইখানি তরুণ শিকার শিক্ষার্থী এবং শিকার সম্বন্ধে জানতে উৎসুক পাঠকদের সকলেরই ভালো লাগবে। ৫৩২।৫৮

বিবিধ

সহজ রাষ্ট্রভাষা বোধ—শ্রীক্ষিরোদকুমার দত্ত এম-এ। প্রকাশক—এ বসু, ২।১, পাটোয়ার বাগান লেন, কলিকাতা ৯ মূল্য ১·৬২ নঃ পঃ।

বর্তমান পুস্তকখানি হিন্দী ভাষা শিক্ষার্থী-দের উপযোগী একখানি হিন্দী ব্যাকরণ। বাংলা, ইংরেজী এবং হিন্দীর সংমিশ্রণে রচিত বলিয়া ইহা বেশ সহজবোধ্য হইয়াছে। বাংলা ভাষায় সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন যে কোন লোক অতি অল্পায়াসে এই ব্যাকরণের সাহায্যে অত্যল্প-কালের মধ্যে হিন্দী ভাষার প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যায়। প্রথম শিক্ষার্থীর অবশ্য জ্ঞাতব্য সব কিছুই ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। কাজেই নূতন শিক্ষার্থীর পক্ষে আলোচ্য ব্যাকরণখানি অপরিহার্য। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন নূতন ভাষা শিক্ষা করা অসম্ভব। অতএব হিন্দী ভাষা শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই ধরনের সহজ এবং সরলভাবে রচিত ব্যাকরণের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য।

৪৭১।৫৮

ব্লাড প্রেসার ও করোনারী থ্রম্বোসিস—ডাঃ নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। প্রকাশিকা শ্রীমতী বীণা দাশগুপ্ত, ১৫৭, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য এক টাকা।

ব্লাডপ্রেসার বর্তমানে জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত ব্যাধি। করোনারী থ্রম্বোসিস ততটা পরিচিত না হইলেও ইহাতে মৃত্যুর হার যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই উভয়বিধ রোগ সম্বন্ধে শিক্ষিত জনসাধারণের দুশ্চিন্তার অবধি নাই। অতএব এই রোগ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান থাকিলে অনেক দুর্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অসম্ভব নয়। আলোচ্য পুস্তিকাখানিতে উপরোক্ত রোগ সম্বন্ধে লেখক যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অনেক ক্ষেত্রে বাংলা পরিভাষার অপ্রাচুর্যের অজুহাতে লেখক ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিষয়-বস্তুকে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাজেই একমাত্র ইংরেজী শিক্ষিত লোকের পক্ষেই পুস্তিকাখানির আলোচ্য বিষয় বোধগম্য হইবে। ইহা সত্ত্বেও এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার ও প্রসার বাঞ্ছনীয়। ৩৭২।৫৮

আড়বার—আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজদাস প্রণীত। শ্রীবলরাম ধর্ম সোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৸০ টাকা।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্বে আড়বার বৈষ্ণবাচার্যগণের সাধনার ভাব ধারায় দাক্ষিণাত্য পরিপ্লাবিত হয়। আড়বার বলিতে প্রেমোন্মাদ মহাভক্তদিগকে বুঝায়। আড়বার বৈষ্ণবগণের ভগবৎপ্রেম প্রভাবিত জীবনের বৈভব এবং বৈচিত্র্য উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল বলা যায়। মহাপ্রভুর প্রেমের লীলার মাধুর্য এবং বীর্য উদ্দীপিত বাংলা দেশের সংস্কৃতিও সাক্ষাৎ সম্পর্কে আড়বার-গণের ভাবোন্মত্ত জীবনের উদ্দীপ্তির সংযোগ-সূত্র খুঁজিয়া কিংবা বুঝিয়া পাইবার সুযোগ লাভ করে নাই। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমৎ যতীন্দ্র রামানুজদাস আড়বারগণের ভাব সম্পদের অনবদ্য অবদানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া সেই অভাব পূর্ণ করিতে অগ্রণী হইয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে দ্বাদশ জন আড়বারের উদ্গীত গাথা বা সূক্তিসমূহের সংস্কৃত ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অনুবাদও আংশিক এবং গ্রন্থকারের উক্তি অনুসারে আড়বারগণের দিব্যচরিতের কোন কোন প্রধান অংশের দিক্‌দর্শন স্বরূপেই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। কিন্তু আংশিক হইলেও ইহা অপূর্ব এবং মধুর। সুতরাং ভাবানুভূতির প্রদীপ্তির পক্ষে প্রচুর। গ্রন্থকার আড়বারগণের সাধনার ভাব বৈচিত্র্য এবং রসমাধুর্য বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার এই বিশ্লেষণ রীতিতে তাঁহার প্রগাঢ় রসানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব রসসাধনার আলংকারিক বৈচিত্র্য নায়িকাভাবে আশ্লিষ্ট আড়বারগণের অনুভূতির রীতির বিশ্লেষণ তিনি সুস্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে আড়বার-গণের সাধনার সামগ্রিক রূপটি তাঁহার লেখায় পাওয়া যায়। গ্রন্থকার শুধু পণ্ডিত নহেন, তিনি অনুভূতিসম্পন্ন সাধক, এজন্য তাঁহার পক্ষে ইহা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার অবদান বাংলা সাহিত্যকে স্থায়ীভাবে সমৃদ্ধ করিবে। অধ্যাত্ম রসপিপাসু সমাজ এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন এবং পরম প্রীতি লাভ করিবেন।

৬২১।৫৮

মানব উজ্জীবন—আচার্য শ্রীযতীন্দ্র রামানুজ-দাস প্রণীত। শ্রীবলরাম ধর্ম সোপান, খড়দহ, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৸০ আনা।

গ্রন্থকার শাস্ত্রজ্ঞ এবং সাধক পুরুষ, সর্বোপরি তিনি ভক্ত। আলোচ্য পুস্তকখানি মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথে কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির পথে অগ্রসর হইবার ক্রমপারম্পর্য তিনি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং তত্ত্বানুপ্রবেশশীল তীক্ষ্ণ মনীষার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বিচার এবং বিশ্লেষণ রীতি কোথায়ও পারিভাষিক জটিলতায় আড়ষ্ট হয় নাই। বিশেষ কোন মতবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নাই। একদেশদর্শিতার ঊর্ধ্বে থাকিয়া নিরপেক্ষভাবে অধিকার ভেদে শাস্ত্র এবং মহাজনগণের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন সাধন-প্রকরণের নির্দেশ করিয়াছেন। অথচ তাঁহার এই আলোচনায় মানব জীবনের মূলীভূত সত্যের অনুভূতিতে কোনরকম এলোমেলো ভাবের সৃষ্টি হয় না—প্রত্যুত এই আলোচনা একটি স্থির লক্ষ্যে আমাদের মনকে অভিনিবিষ্ট করে। আমরা জীবনের মূলে উদার আশ্রয় অনুভব করি। গ্রন্থকারের প্রগাঢ় মনস্বিতার আলোকে পুস্তক-খানির আলোচনা আদ্যন্ত উদ্দীপিত হইয়াছে। সাধক এবং চিন্তাশীল সমাজের প্রত্যেকে এমন আলোচনা পাঠে উপকৃত হইবেন এবং আনন্দ-লাভ করিবেন। ৬২৫।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্ত-গত হইয়াছে:—

ওপারের কথা (২য় প্রবাহ)—শ্রীশ্রীনৃপেন্দ্রনাথ।

সৈনিকের প্রাণবীণা (২য় পর্ব)—চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীমদ্দক্ষিণা-কালিকাদেবীর যৌগিক তত্ত্বে সাম্যবাদ বা রহস্যবাদ — শ্রীগোলকপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা ছবির খতিয়ান

ঐতিহাসিকের চোখ নিয়ে ১৯৫৮ সালে বাংলা ছবির গতি ও প্রকৃতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, খুব বড় রকমের শিল্প সৃষ্টি করতে না পারলেও বাংলা ছবি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। নতুন ধরনের বিষয়বস্তু, মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী, পরিচ্ছন্ন

বাংলা ছবির সবচেয়ে জনপ্রিয়া নায়িকা সুচিত্রা সেন।

শিল্পরুচি—এ সবেরই অল্পবিস্তর সমাবেশ দেখা গেছে গত বারো মাসে মুক্তিপ্রাপ্ত বাংলা ছবিগুলিতে।

সংখ্যার দিক দিয়ে ১৯৫৮ সালে বাংলা ছবি মুক্তি পেয়েছে অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশ কিছু কম। গড়ে ৪৯ খানি বাংলা ছবি প্রতি বছরে মুক্তি পায়, ১৯৫৭ সালে ৫১ খানি মুক্তি পেয়েছিল। গত বছরে তার সংখ্যা দাঁড়ায়—৪১, অর্থাৎ আগের বছরের চেয়ে দশখানি কম। কাঁচা ফিল্ম নিয়ন্ত্রণের ফলে ছবির ব্যবসায় যে খানিকটা সংকুচিত হয়েছে সে বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নেই, তেমনি ছবির সংখ্যা হ্রাসের সেইটাই একমাত্র কারণ নয়। বাংলা ছবি যেসব সিনেমায় দেখানো হয় তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট। ছবি বেশীদিন ধরে চললে, ঠিক সেই অনুপাতে নতুন ছবির মুক্তি পিছিয়ে যায়। গত বছরে কোন কোন ছবি তিন-চার মাস ধরে একই চিত্রগৃহে প্রদর্শিত হয়েছে। যে ছবি জনপ্রিয়তা লাভ করে, কোন একটি সিনেমায় তার গড়পড়তা আয়ুষ্কাল দু'মাস ধরা যেতে পারে। তার বেশী চললেই মুক্তির সংখ্যা হ্রাস পাবেই।

গত বছরে যে ছবিটি সব চেয়ে বেশী দিন ধরে একই সিনেমায় দেখানো হয়েছিল তার নাম "লুকোচুরি"—বোম্বাইতে-তোলা বাংলা ছবি। কলকাতার বিভিন্ন সিনেমায়

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

সম্মিলিতভাবে ৪২ সপ্তাহ প্রদর্শিত হলেও, এককভাবে ১৫ সপ্তাহ ধরে ছবিখানি একটি চিত্রগৃহে চলে।

১৯৫৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত অন্যান্য ছবির নাম তাদের সম্মিলিত প্রদর্শনীর দৈর্ঘ্যানুক্রমে এইখানে দেওয়া হলো :

"যমালয়ে জীবন্ত মানুষ" (৩৪ সপ্তাহ), "ডাক হরকরা" (৩১ সপ্তাহ), "রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত" এবং "বন্ধু" (৩০ সপ্তাহ করে), "শিকার" (২৮ সপ্তাহ), "মানময়ী গার্লস স্কুল" ও "লৌহ কপাট" (২৭ সপ্তাহ করে), "ইন্দ্রাণী" (২৬ সপ্তাহ), "শ্রীশ্রীমা" ও "ডাক্তারবাবু" (২৪ সপ্তাহ করে), "কাল্লামাটি" (২৩ সপ্তাহ), "জলসাঘর" (২২ সপ্তাহ), "নাগিনী কন্যার কাহিনী" (২১ সপ্তাহ), "পরশ পাথর" (২০ সপ্তাহ), "সাধক বামাক্ষ্যাপা" (১৯ সপ্তাহ), "সূর্য তোরণ" ও "যৌতুক" (১৮ সপ্তাহ করে এবং এখনও চলছে), "পুরীর মন্দির" (১৭ সপ্তাহ), "ধূমকেতু", "নূপুর" ও "বাঘা যতীন" (১৬ সপ্তাহ করে), "ভানু পেলো লটারী" (১৫ সপ্তাহ), "অযান্ত্রিক" ও "সোনার কাঠি" (১৪ সপ্তাহ করে), "বৃন্দাবন লীলা" (১৩ সপ্তাহ), "ডেলি প্যাসেঞ্জার" "মর্মবাণী"—এখনও চলছে—"যোগাযোগ" ও "স্বর্গ-মর্ত্য" (১২ সপ্তাহ করে), "ও আমার দেশের মাটি", "কংস"—এখনও চলছে—"মেঘমল্লার" ও "শ্রীশ্রীতারকেশ্বর" (১১ সপ্তাহ করে), "তানসেন" (১০ সপ্তাহ), "জোনাকীর আলো" (৯ সপ্তাহ), "প্রিয়া", "রাজধানী থেকে"—এখনও চলছে—এবং "লীলা কঙ্ক" (৮ সপ্তাহ করে), "মা শীতলা" (৬ সপ্তাহ) এবং "মেজো জামাই" (৩ সপ্তাহ)।

উল্লিখিত ছবিগুলির কাহিনী বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রেই নামকরা সাহিত্যিকদের রচনা। অন্যান্য প্রদেশের ছবির তুলনায় বাংলা ছবির

কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫৮ সালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন

বৈশিষ্ট্যের অন্যতম কারণ নিঃসন্দেহে এইটি। গত বছর তারাশংকরের কাহিনী অবলম্বন করে তিনখানি ছবি ("ডাক হরকরা", "নাগিনী কন্যার কাহিনী" ও "জলসাঘর") তোলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, পরশুরাম, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় কাহিনীকারদের প্রত্যেকের

সব চেয়ে বেশী সংখ্যক ছবিতে অভিনয় করেও ছবি বিশ্বাস তাঁর অনন্যসাধারণ নাট্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন সত্যজিৎ রায়ের "জলসাঘর"-এর নায়করূপে,

বছরের একমাত্র গেভাকলার ছবি "শিকার"-এর নায়ক উত্তমকুমার। সবশুদ্ধ আটখানি ছবিতে গত বছরে ইনি অভিনয় করেছেন

একটি করে গল্প ১৯৫৮ সালে ছবিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

পুরোপুরি হাসির ছবি তোলার রেওয়াজ সম্প্রতি চালু হয়েছে। গত বছরে তোলা ছবিগুলির মধ্যে ৮ খানি এই পর্যায়ে পড়ে। পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক ছবিও ৭ খানি প্রদর্শিত হয়েছে। জীবনী চিত্রের সংখ্যা তিন। বাদ বাকী অন্য ছবিগুলি সামাজিক কাহিনীর শ্রেণীভুক্ত। ১৯৫৭ সালের মত গত বছরেও একখানি পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি ("শিকার") গেভাকলারে তোলা হয়।

১৯৫৮ সালে চারজন পরিচালক প্রত্যেকে দু'খানি করে ছবি উপহার দিয়েছেন। তাঁদের নাম—সত্যজিৎ রায় ("পরশ পাথর" ও "জলসাঘর"), তপন সিংহ ("লৌহ কপাট" ও "কালামাটি"), নীরেন লাহিড়ী ("তানসেন" ও "ইন্দ্রাণী") এবং সলিল সেন ("প্রিয়া" ও "নাগিনী কন্যার কাহিনী")।

গত বছরে এগারোজন নতুন পরিচালক আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে পাঞ্চজন্য ("বৃন্দাবন লীলা") ও পথিকৃৎ ("ও আমার দেশের মাটি") নামে দুটি পরিচালক গোষ্ঠী নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন। বাকী ন'জনের নাম—অসীম পাল ("স্বর্গ-মর্ত্য"), ঋত্বিক ঘটক ("অযান্ত্রিক"), কমল মজুমদার ("লুকোচুরি"), গৌরাঙ্গ বসু ("ধূমকেতু"), জীবন গাঙ্গুলী ("যৌতুক"), দিলীপ নাগ ("নূপুর"), নারায়ণ ঘোষ ("সাধক বামাক্ষ্যাপা"), নির্মল মিত্র ("রাজধানী থেকে") এবং বিশু দাশগুপ্ত ("ডাক্তারবাবু")।

প্রাচীন এবং খ্যাতনামা পরিচালকদের মধ্যে দেবকী বসু ("সোনার কাঠি"), নীতীন বসু ("যোগাযোগ"), কালীপ্রসাদ ঘোষ ("শ্রীশ্রীমা"), সুশীল মজুমদার ("মর্মবাণী") এবং হেমচন্দ্র চন্দ্রের ("মানময়ী গার্লস স্কুল") নাম উল্লেখযোগ্য। অগ্রদূত, অগ্রগামী, অসিত সেন, চিত্ত বসু—এ'রাও একখানি করে ছবি উপহার দিয়েছেন গত বছরে।

১৯৫৮ সালের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা নামকরা সংগীত শিল্পীদের ছবির সুর-যোজনায় অধিকতর সংখ্যায় আত্মনিয়োগ। পণ্ডিত রবিশংকর, ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ, ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খাঁ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গত বছরে সব চেয়ে বেশী সংখ্যক ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছেন রাজেন সরকার ও নচিকেতা ঘোষ। তারপরই হেমন্তকুমার, রবিশংকর ও অনিল বাগচীর নাম করতে হয়। গায়ক হিসেবে যাঁদের প্রসিদ্ধি, তাঁদের মধ্যে শ্যামল মিত্র, রথীন

আর্ট এন্ড কালচারের আগামী ছবি "অগ্নি-সম্ভবা"র একটি দৃশ্যে মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছবি বিশ্বাস। ১৯৫৮ সালেই মঞ্জুলার প্রথম প্রবেশ চিত্রজগতে

ঘোষ, পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অপরেশ লাহিড়ী ও ভূপেন হাজারিকা বাংলা ছবিতে সুর-যোজনা করে তার মর্যাদা বাড়িয়েছেন।

শিল্পীদের মধ্যে উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে রয়েছেন। যে তিনখানি ছবিতে শ্রীমতী সেন গত বছরে অভিনয় করেছেন, তার প্রত্যেকটিতে উত্তমকুমার তাঁর সহ-অভিনেতা। এছাড়া উত্তমকুমার আরো পাঁচখানি ছবিতে নায়ক সেজেছেন—অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সুমিত্রা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও মালা সিংহের বিপরীতে। অভিনেত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ছবিতে 'তারকা'-রূপে বিরাজ করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অভিনেতাদের মধ্যে উত্তমকুমার ও অসিতবরণ। শেষোক্ত দু'জন প্রত্যেকে আটখানি করে ছবিতে নায়ক বা উপ-নায়ক সেজেছেন। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের ছবির সংখ্যা ছয়। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় সাতখানি ছবিতে অংশ নিয়েছেন, তার মধ্যে চারটির তিনিই নায়ক।

পার্শ্ব চরিত্র অভিনেতাদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস আর সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন পনেরোখানি ছবিতে অভিনয় করে। চন্দ্রাবতী, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতির কৃতিত্বও এই প্রসঙ্গে অনস্বীকার্য। উদীয়মান নায়কদের মধ্যে অসীমকুমার ও আশীষকুমার তিন-চারখানি ছবিতে নিজেদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

গত বছরে অনেকগুলি নতুন শিল্পী বাংলা ছবির পর্দায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রথমেই নাম করতে হয় কিশোরকুমারের। হিন্দী ছবির জগতে তিনি সুপরিচিত হলেও বাংলায় তাঁর প্রথম আবির্ভাব "লুকোচুরি"তে। মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বাসবী নন্দী, শ্বেতা রায় ও সুপ্রিয়া চৌধুরী নায়িকার মর্যাদা নিয়েই ১৯৫৮ সালে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অন্যান্য নতুন শিল্পীদের মধ্যে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, তাপসী রায়, শীলা পাল, অজিত গাঙ্গুলী, শিপ্রা সাহা প্রভৃতি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পরিচয় বহন করে চিত্র জগতে প্রবেশ করেছেন। এ'রা সকলেই বাংলা ছবির রাজ্যে ১৯৫৮ সালের উপঢৌকন

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা বহন করে দেখা দিয়েছেন সন্ধ্যা রায়

বলিষ্ঠ চিত্রসৃষ্টি

নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাস্তবানুগ ছবি তৈরি করবার যে মহত্তর প্রয়াস সাম্প্রতিক কালে শুরু হয়েছে, সেই ঐতিহ্যের বলিষ্ঠ বাহক হয়ে এসেছে অগ্রদূত-গোষ্ঠীর নবতম সৃষ্টি "লালু ভুলু"। নায়ক-নায়িকা-সর্বস্ব বিকৃত-রুচি কাহিনীর মায়া কাটিয়ে এই দক্ষ কলাকুশলীর দল যে সুস্থ জীবনবাদের ভিত্তিতে ছবি তুলতে ব্রতী হয়েছেন, রুচিসম্পন্ন চিত্ররসিকদের কাছে সেটা নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। অগ্রদূত পরিচালিত "বাবলা"র মতই "লালু ভুলু"ও অভিনবত্বে সমুজ্জ্বল, মানবীয় আবেদনে-ভরা, একটি স্মরণীয় চিত্রসৃষ্টি হিসেবে সমাদৃত হবে।

লালু আর ভুলু—একজন পঙ্গু, অন্যজন অন্ধ। অন্ধ আর পঙ্গু তারা ছিল না। আর দশজনের মতই সুস্থদেহে ও মনে আশা-উদ্দীপনা নিয়ে তারা বাল্যের সীমা অতিক্রম করে কৈশোরে পদার্পণ করেছিল। কৈশোরে পদার্পণ করতে না করতেই তারা হল পিতৃমাতৃহীন, অনাথ। ভুলুর জীবন গেল চিরতমসায় আচ্ছন্ন হয়ে, সে হয়ে পড়ল অন্ধ। অন্যদিকে স্বামীর মৃত্যুর পর শোকে ও অভাবের তাড়নায় দিনে দিনে অসুস্থা হয়ে পড়েন লালুর মা। বন্ধ হয়ে গেল লালুর পড়াশুনা। স্বামীর কর্মস্থল থেকে অর্থ সাহায্য পাবার আশাটুকুও যখন রইলো না, মায়ের জীবন-প্রদীপের তেলও গেল ফুরিয়ে। দৌড়ে ডাক্তার ডাকতে যাবার সময় কাঠের পুরোনো সিঁড়ি ভেঙ্গে এক নিদারুণ দুর্ঘটনায় লালু হল পঙ্গু। মাকেও সে হারাল চিরতরে।

পঙ্গু লালু কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। আর ঘুরে বেড়ায় মহানগরীর আলোকোজ্জ্বল পথে অন্ধকার ও হাতের যষ্টিকে সম্বল করে অন্ধ ভুলু। ভুলু খবর পেয়েছে এই শহরেরই কোন হাসপাতালে পূর্ববঙ্গের দাঙ্গায় হারিয়ে যাওয়া তার দিদি নার্সের কাজ করে। সে খুঁজে বেড়ায় তার দিদিকে। লালু আর ভুলু—দুই ভাগ্যাহতের সাক্ষাত ঘটে পথে। পরম সখ্যতার বন্ধনে ওরা আবদ্ধ হয়। লালু বাঁশী বাজিয়ে পয়সা রোজগার করে; তার অন্তরে জেগে ওঠে বড় হবার সংকল্প। ভুলু সুন্দর গান করে, সে দুর্নিবার সংকল্প গ্রহণ করে গান গেয়ে পয়সা রোজগার করে লালুকে পড়াবার। আরম্ভ হয় কঠিন বেদনার পথে তাদের দুশ্চর সংগ্রাম।

ভুলুর রোজগারে ওরা একদিন রাস্তা থেকে উঠে আসে এক বস্তীতে। সেখানে তারা পায় এক স্নেহময়ী মাসীমার সন্ধান। আর পায় কলকাতার বুকে এক রাজপুত্তুরের দেখা। ক্ষয়রোগে শয্যাশায়ী ধনীর দুলাল লালুর বাঁশী শুনে ছুটে চলে আসত জানালায়। সে রাজপুত্তুরও একদিন হারিয়ে গেল। রাজপুত্তুরের দিদি চাইল মৃত ভাইয়ের এই দুই বন্ধুকে তার বাড়িতে নিয়ে আসতে। লালু-ভুলু বস্তী ছেড়ে গেল না সেখানে। কিন্তু সেই বাড়িতেই ভুলু পেল তার দিদির সাক্ষাৎ। ভুলু একদিন পথে তার দিদির গলার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল, আরও শুনতে পেয়েছিল তাকে ভিখিরি বলে সম্বোধন করতে। অভিমানী ভুলু তার দিদিকে ভুল বুঝল, গেল না লালুকে ছেড়ে দিদির সঙ্গে।

এদিকে লালুর ছাত্রজীবনের কৃতিত্ব দেখে এবং বস্তীর অসুস্থ আবহাওয়ার

বৈজয়ন্তীমালাকে কলকাতার দর্শকরা সম্প্রতি সংগীত সম্মেলনে নাচতে দেখেছেন। তাঁকেই আবার অভিনয় করতে দেখা যাবে শিবাজী প্রোডাকসন্সের মুক্তি প্রতীক্ষিত "অমর দীপ" ছবিতে

নতুন বছরে নতুন প্রতিভার পসরা নিয়ে আসছেন শর্মিলা ঠাকুর। সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসারে"র ইনিই নায়িকা

খাজুরাহ মাতঙ্গিনী মন্দিরের সামনে "যাত্রী" ছবির ইউনিট ছবি তুলছেন। ক্যামেরার পিছনে পরিচালক সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদার ও প্রযোজক নিরঞ্জন সেনকে দেখা যাচ্ছে
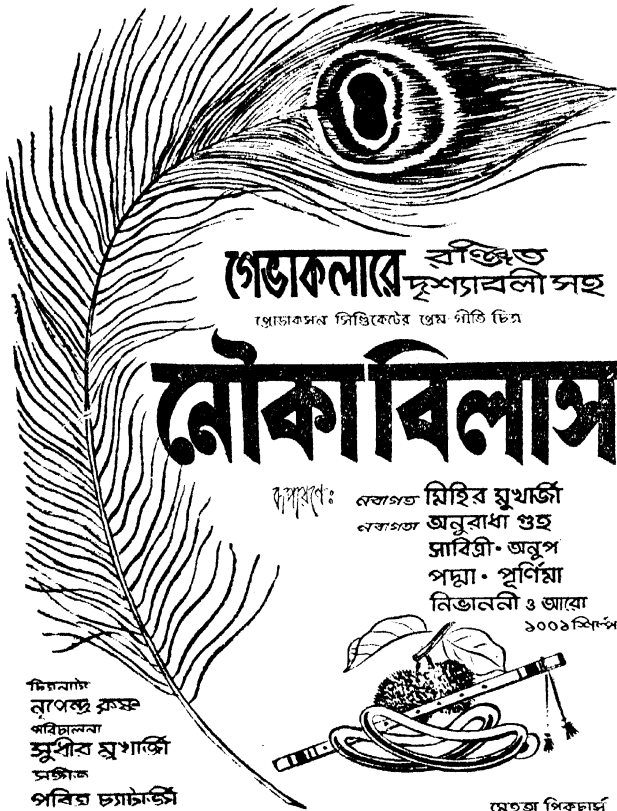
কথা ভেবে তাকে জোর করে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন স্কুলের পণ্ডিত মশাই। লালুর বিরহে ভুলু আর তাদের মাসীমার দিন কাটে না। দিনে দিনে ভুলু অসুস্থ হয়ে পড়ে। এমনি সময় সে খবর পেল লালুর পণ্ডিত মশাই মারা গেছেন—ফি-এর অভাবে লালুর স্কুল ফাইন্যাল দেওয়া বন্ধ। অসুস্থ ভুলু পথে বেরোয় গান গেয়ে রোজগার করে ফি-এর টাকা যোগাতে। স্কুলের সেক্রেটারীর কাছে সে গোপনে টাকা দিয়ে আসে, অনুরোধ করে তার কথা যেন লালু জানতে না পারে। স্কুল ফাইন্যালে লালু প্রথম হয়, দেশে তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। স্কুলের সেক্রেটারী লালুকে বলেন ভুলুর কথা। লালু ছুটে যায় হাসপাতালে, দুই হাতে জড়িয়ে ধরে রোগশয্যায় শায়িত ভুলুকে। আরেকজন কেঁদে কেঁদে ফিরে যায় হাসপাতালের দুয়ার থেকে, সে ভুলুর দিদি। ডাক্তারবাবুর কাছে সে কথা শুনে ভুলু লুটিয়ে পড়ে দিদির কোলে।

* * *

দুস্থ অথচ প্রাণের প্রাচুর্যে ভরপুর দুটি কিশোরের কঠোর জীবন সংগ্রামের এমন অন্তরস্পর্শী ছবি এদেশে খুব কমই তৈরি হয়েছে। ছবির কাহিনীকে দুর্বার নাট্যবেগে মণ্ডিত করে দেওয়ার কৃতিত্বও অর্জন করেছেন অগ্রদূত দল। আর ট্র্যাজিক জীবনের মর্মস্পর্শী ঘটনার গতিপথে আপাত-ব্যর্থ জীবনের জন্যে পরম আশ্বাসের বাণীকেও ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁরা কাহিনীর বিন্যাসে।

ভাবানুগ পরিকল্পনায় ছবির কয়েকটি দৃশ্য অনবদ্য। হাতে জ্বলন্ত লণ্ঠন নিয়ে বস্তীর অন্ধকার ঘরে ভুলুর প্রবেশ করার দৃশ্যটি মৌলিক কল্পনাশক্তির পরিচায়ক। জ্বলন্ত লণ্ঠন যেন ভুলুর অন্তরের আলোরই ব্যঞ্জনা। ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতের ব্যবহার রয়েছে আরও কয়েকটি দৃশ্যে চমৎকারভাবে। ঘরে লণ্ঠনটির দিকে মুখ ঘুরিয়ে ভুলুর গানের ফাঁকে ফাঁকে পঙ্গু লালুর অন্তরের প্রাণৈশ্বর্যের ব্যঞ্জনা হিসাবে কতগুলি সুস্থ সবল লোকের ক্রীড়া-প্রদর্শনীর দৃশ্যের অবতারণা করা হয়। এই প্রতীকী দৃশ্যগুলি ব্যঞ্জনার সূক্ষ্ম আবেগে অনুপম। আবেগ-মাধুর্য তীব্র করার জন্যে গানের সংখ্যা বেশী হলেও সেগুলি চিত্রনাট্যের সাবলীল গতিপথে ছন্দপতন ঘটায় না।

ছবিখানিকে রসমণ্ডিত করে তোলার সহায়ক হয়েছেন অভিনয় শিল্পীবৃন্দ। সব ক'টি চরিত্রই উচ্চাঙ্গ অভিনয়ে দীপ্ত। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ভুলুর চরিত্রে পরেশের অভিনয়ের কথা। একটি সুস্থ জীবনের আশা ও কাতরতা নিবিড় বন্ধু প্রেম ও আবেগ অসহায়তা উনি এমন কৃতিত্বের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, তাঁর মধ্যে

অগ্রদূত চিত্রের "লালু ভুলু"র একটি আশাদীপ্ত দৃশ্যে (ডানদিক থেকে) সুখেন, পরেশ, উমা, শোভা সেন ও গোকুল

ক্ষমতাসম্পন্ন এক কৃতী শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়। সুখেনও তাঁর শিল্পী-জীবনের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন বিড়ম্বিত অথচ সংকল্পে অটল পঙ্গু লালুর চরিত্রে। ছবির তিনটি প্রধান পার্শ্বচরিত্রে প্রাণস্পর্শী অভিনয়ে সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন শোভা সেন, গঙ্গাপদ বসু ও শিশির বটব্যাল। রাজপুত্রের দিদির চরিত্রে কমলা মুখার্জির অভিনয় সংযত; ভুলুর দিদির ভূমিকায় কাজল চট্টোপাধ্যায়কেও মন্দ লাগবে না। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সমর কুমার, সুভাষ ব্যানার্জি, উমা চক্রবর্তী, গোকুল পাল ও দিলীপ ঘোষের নাম।

ছবির সংগীত পরিচালনায় রবীন চ্যাটার্জির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। "আমারে দাও গো বলে, সেই রসিকের কোন ঠিকানা" গানখানি সুরারোপে ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠদানে অপূর্ব। অন্যান্য গানগুলিও সুগীত ও সুরসমৃদ্ধ। শৈলেন রায় রচিত গানগুলি ভাব ও ভাষায় হৃদয়স্পর্শী। পরিমল দাশগুপ্তের মাউথ অর্গ্যান বাজনা সুখশ্রাব্য। ছবির চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, শব্দধারণ ও শিল্পনির্দেশ উঁচু দরের। কলাকৌশলের অন্যান্য দিকও নিন্দনীয় নয়।

"লালু ভুলু"র কাহিনীকার বাণভট্ট বা নীহাররঞ্জন গুপ্ত। চিত্রনাট্য রচনার কৃতিত্ব শৈলেন রায়ের। বিভূতি লাহা ও বিজয় ঘোষ যুগ্মভাবে এর চিত্রগ্রহণ করেছেন। যতীন দত্ত, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন রায়চৌধুরী যথাক্রমে এর শব্দধারক, সম্পাদক ও শিল্প নির্দেশক। ছবিখানি অগ্রদূত-গোষ্ঠীর প্রযোজনায় ও পরিচালনায় গৃহীত হয়েছে।

চিত্রালোচনা

দুখানি বাংলা ও দুখানি হিন্দী—এই চারখানি নতুন ছবি নিয়ে ইংরেজী নববর্ষের যাত্রারম্ভ।

বছরের প্রথম দিনটিতেই নতুন আশার বাণী শুনিয়েছে অগ্রদূত চিত্রের বাংলা ছবি "লালু ভুলু"। ছবিটির সমালোচনা এই সংখ্যাতেই দেওয়া হল। এ হপ্তার দ্বিতীয় বাংলা ছবি বরুণ পিকচার্সের "জন্মান্তর"। এর কাহিনীর মধ্যেও নূতনত্বের ইঙ্গিত আছে। পরিচালকও নতুন—অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়। চিত্রনাট্য রচনার কৃতিত্বও তাঁর। সরোজ কুশারীর সুরবৈচিত্র্য এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ। প্রধান ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, জহর গাঙ্গুলী,
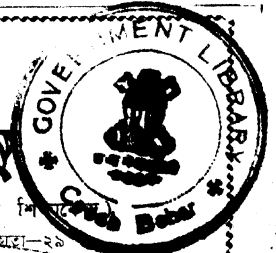
গত রবিবার নিউ এম্পায়ার মঞ্চে দক্ষিণী র নৃত্য-বিভাগের ছাত্রীরা তাঁদের নৃত্য-নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। অত্যন্ত উপ ভোগ্য হয়েছিল এই নৃত্যানুষ্ঠান।

ফটো ঃ দেশ

তপতী ঘোষ, রেণুকা রায়, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি।

হিন্দী ছবি দু'খানির নাম "খোটা পয়সা" ও "মায়া বাজার"। "খোটা পয়সা" মানে মেকি মুদ্রা। এখানি হাসির ছবি, তুলেছেন সাদিক প্রোডাকসন্স। এম সাদিক একাধারে এর গল্প লেখক, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ও প্রযোজক। সুর-যোজনা করেছেন মদনমোহন। ভূমিকালিপিতে আছেন জনি ওয়াকার, শ্যামা, জীবন, ধুমল, এস এন ব্যানার্জি, আনসারী প্রভৃতি।

মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত ঘটোৎকচের কাহিনী নিয়ে বসন্ত পিকচার্সের "মায়া বাজার" তোলা হয়েছে। পৌরাণিক ছবির উপযোগী দৃশ্য সমারোহ তো এতে আছেই, উপরন্তু আছে ক্যামেরার নানাবিধ কারচুপি। 'ট্রিক শটে'র অপ্রতিদ্বন্দ্বী কলাকুশলী বাবুভাই মিস্ত্রি স্বয়ং ছবিটি পরিচালনা করেছেন। অনিতা গুহ, রাজকুমার, মহীপাল, বি এম ব্যাস, উলহাস, বসন্তরাও পাহেলওয়ান, প্রভৃতিকে নিয়ে এর প্রধান ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। ছবিটিতে সুরযোজনা করেছেন চিত্রগুপ্ত।

কৃষ্ণকথা শোনাতে গেলে সুবল সখার কথা না বলে উপায় নেই। প্রোডাকসন সিন্ডিকেটের "নৌকা বিলাসে" এই চরিত্রটিকে রূপায়িত করেছেন কুশলী নট অনুপকুমার। তাঁর অভিনয়ের গুণে কৃষ্ণের সুখ দুঃখ, আনন্দ-বিরহের সুন্দর প্রতিফলন দেখা যাবে এই চরিত্রে। বৃন্দের ভূমিকা নিয়েছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিনয়েও নতুন এক নাটকীয় ধারার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। কৃষ্ণ রাধার ভূমিকায় দেখা যাবে মিহির মুখোপাধ্যায় ও অনুরাধা গুহকে। নারদ সেজেছেন চন্দন রায়। এঁরা সবাই ছবির জগতে নতুন। ছবিতে নতুন মুখের সমাবেশ করতে প্রযোজক-পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়ের জুড়ি মেলা ভার। "নৌকা বিলাস" অচিরেই মুক্তিলাভ করবে। কয়েকটি দৃশ্য গেভাকলারে গৃহীত হওয়ায় ছবিটির আকর্ষণ বেড়েছে।

•   •   •

ওম্ চিত্রমের প্রথম নিবেদন "নিমাই"-এর শুভ মহরৎ অনুষ্ঠান গত ২৬শে ডিসেম্বর স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটির চিত্রাগারে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। ছবিটির নিয়মিত শুটিংও ঐদিন থেকে চলছে। নাম-ভূমিকায় বিশ্বজিৎ ও লক্ষ্মীর ভূমিকায় অনুরাধাকে দেখা যাবে। শচীমাতা সাজছেন মলিনা দেবী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, জহর গাঙ্গুলী, গুরুদাস, ভারতী দেবী, রেণুকা রায়, পদ্মা দেবী প্রভৃতি। পিনাকভূষণ ও পংকজ মল্লিক যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

•   •   •

গত রবিবার মিত্রা প্রোডাকসন্সের "কত অজানারে" ছবির মহরৎ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়। কলকাতা হাইকোর্টের এক ইউরোপীয় ব্যারিস্টারের বাঙালী কর্মচারী বিচারালয়ের চত্বরে কত বিচিত্র নাটক উদ্ঘাটিত হতে দেখেছে, তারই প্রতিচ্ছবি "কত অজানারে"। মহরৎ অনুষ্ঠানে স্পীকার শ্রীশংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিচারপতি শ্রী জে পি মিত্র উপস্থিত ছিলেন। ঋত্বিক ঘটক এর পরিচালনা ভার নিয়েছেন।

•   •   •

"রাজধানী থেকে"র নির্মাতা ছায়াচিত্রমের দ্বিতীয় ছবি "কাঞ্চন মূল্য"। বিদ্যাসাগর মশায়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় যে সমাজচিত্র এঁকেছেন তাই হবে এ ছবির বিষয়বস্তু। মানব রায়ের প্রযোজনায় ও নির্মল দের পরিচালনা ছবিটি গৃহীত হবে।

•   •   •

ছায়াচিত্র পরিষদ নামক একটি নতুন প্রতিষ্ঠান বিধায়কের কাহিনী অবলম্বনে তুলবেন তাঁদের প্রথম ছবি "রাজা সাজা"। বিকাশ রায় ছবিটি পরিচালনা করবেন। প্রধানাংশে থাকবেন উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ সংবাদ

গত ২৬শে ডিসেম্বর এ ভি এম প্রোডাকসন্সের "ভাবী"র সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব মহাসমারোহে রক্সি সিনেমাতে অনুষ্ঠিত হয়। রক্সিতে একাদিক্রমে ৫০ সপ্তাহ ধরে প্রদর্শিত হয়ে জনপ্রিয়তার একটি স্মরণীয় উদাহরণ হয়ে রইল এই হিন্দী ছবিখানি। এর আগে এমন ঘটনা যে ঘটেনি তা' নয়—তবে খুব কম। উৎসব অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু। এই অনুষ্ঠানে ছবির নায়ক বলরাজ সাহানি, যুগ্ম-পরিচালক কৃষ্ণান ও পাঞ্জু, চিত্রনাট্যকার রাজেন্দ্রকৃষ্ণ, সঙ্গীত পরিচালক চিত্রগুপ্ত এবং মূল গল্প-লেখিকা প্রভাবতী দেবী সরস্বতী উপস্থিত ছিলেন। "ভাবী"র প্রযোজক এ ভি মায়াপ্পন এঁদের প্রত্যেককে একটি করে সোনার থালা উপহার দেন। এছাড়া রাজ্যপালের বন্যা ভাণ্ডারে সাহায্যার্থে একটি রূপোর থালায় পঞ্চাশটি গিনি রাজ্যপালের হাতে তুলে দেন তিনি। রক্সির প্রত্যেক কর্মীকেও এক মাসের বোনাস দেওয়া হয়। রাজ্যপাল শ্রী মায়াপ্পনের এই বদান্যতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

একলব্য

ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট খেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ক্রিকেট প্রিয় দর্শক সমাজের উৎসাহ উদ্দীপনার অন্ত নেই। মাঠে ৩২ হাজার দর্শকের বসবার ব্যবস্থা করা হলেও খেলা দেখার আশায় হতাশ দর্শকের নেই কোন হিসাব নিকাশ। সত্যি পাঁচদিনব্যাপী এই টেস্ট খেলা দেখবার জন্য সর্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে এবার যে আগ্রহের সঞ্চার হয়েছে কলকাতার ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব।

৩১শে ডিসেম্বর থেকে খেলাটি আরম্ভ হয়েছে। কোনো অঘটন না ঘটলে জানুয়ারীর পাঁচ তারিখে খেলার উপর যবনিকা পড়বার কথা। ৩১শে ডিসেম্বর ছিল বর্ষবিদায়ের শেষ দিন। অফিস আদালত সব ছুটি। নতুন বছরের প্রথম দিনও স্কুল কলেজ অফিস আদালত বন্ধ ছিল। সুতরাং এ দু'দিন খেলা দেখার পক্ষে ছাত্র সম্প্রদায় ও অফিস কর্মীদের অসুবিধা হয়নি। ২রা জানুয়ারী শুক্রবার খেলার বিরতির দিন। তৃতীয় দিনের খেলা পড়েছে শনিবারে। এদিন খেলা দেখার পক্ষে একটু অসুবিধা আছে বৈ কি! কেউ অফিস কামাই করছেন, কেউ অফিসে নাম সই করেই মাঠে হাজির হচ্ছেন। রবিবার খোস মেজাজে চতুর্থ দিনের খেলা দেখবার পক্ষে কারোই অসুবিধা নেই। কিন্তু মুশকিল বেধেছে পঞ্চম ও শেষদিনের খেলা দেখা নিয়ে। যদি সোমবার পর্যন্ত খেলা টেকে এবং ফলাফল সম্পর্কে শেষ দিনের খেলার পরিস্থিতি হয় আরও আকর্ষণীয় তবে কলকাতার খেলা-পাগল দর্শকরা সে খেলা দেখবেন না এমন তো হতে পারে না। সুতরাং এইদিনের জন্য এবং আংশিক শনি-বারের জন্য সমস্ত অফিসেই 'ক্যাজুয়েল লীভের' গাদা গাদা দরখাস্ত জমা পড়বে। কর্মীদের কারো হবে ইনফ্লুয়েঞ্জা, কারো সর্দি, কারো পেট ব্যথা, মাথা ধরা, কারো জ্বর, কারো বা পেটের অসুখ। ক্রিকেট দর্শকদের সহধর্মিণীরা এ সময় সুস্থ থাকবেন এও আশা করা যায় না। কারো লীভ এপ্লিকে-শনে থাকবে অনুপস্থিতির ব্যক্তিগত কারণ। কোন অফিসের অসুস্থ কর্মীর সঙ্গে অফিসের ছুটি মঞ্জুরের প্রভুর যদি ক্রিকেট মাঠে দেখা শোনাও হয়ে যায়, তবে খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে
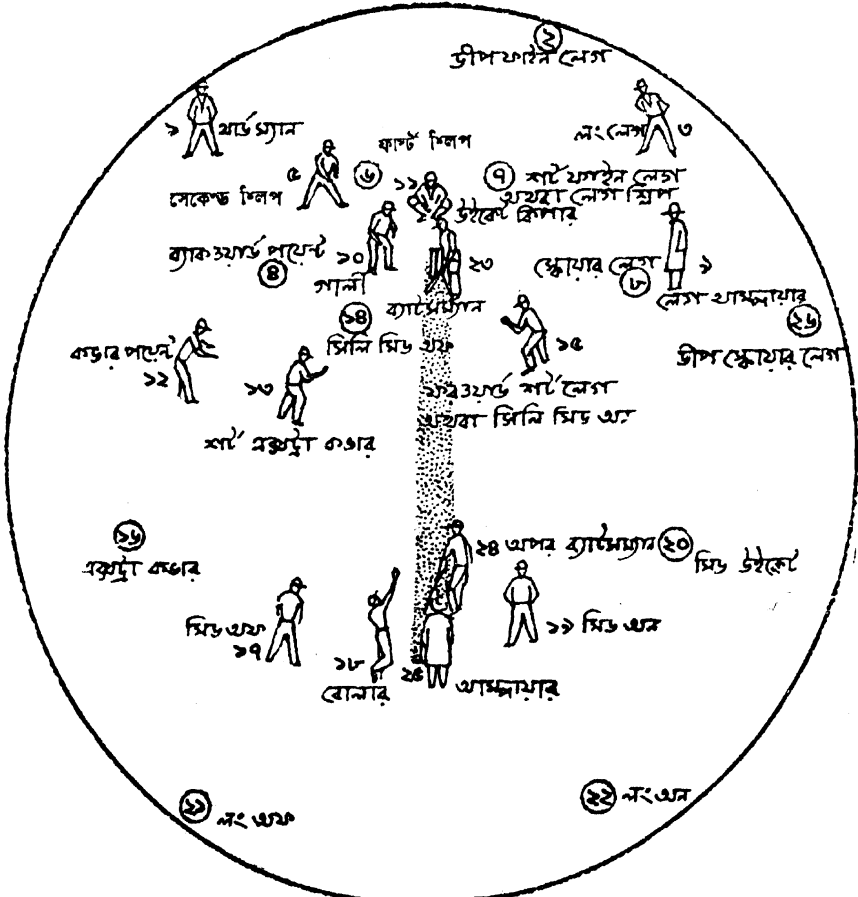
ক্রিকেট মাঠের বিভিন্ন স্থান; উপ রের চিত্রে মিডিয়াম ফাস্ট বোলারের উপযোগী ফিল্ড সাজানো আছে
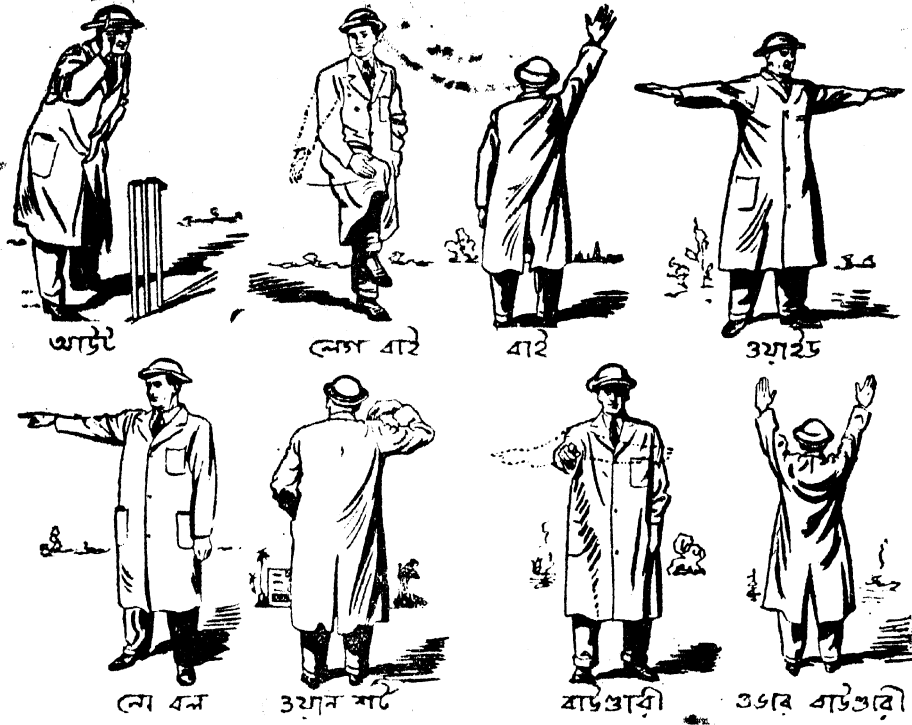
ক্রিকেট খেলায় আম্পায়ারের বিভিন্ন নির্দেশের সংকেত

অফিস প্রভুরা কর্মীদের ছুটি মঞ্জুর করবেন এই আবেদন করে এ সপ্তাহের লেখা শেষ করছি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইতিপূর্বে দেশের বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। এ সপ্তাহে প্রকাশ করা হচ্ছে তৃতীয় টেস্ট টিমের বোলার ও ব্যাটসম্যানদের খেলোয়াড় জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

গোলাম আমেদ (হায়দরাবাদ)—ভারতের টেস্ট অধিনায়ক গোলাম আমেদ কীর্তিমান অফব্রেক বোলার। দক্ষিণ আফ্রিকার টৈফিল্ড এবং ইংলণ্ডের জিম লেকারের সমগোত্রীয় বোলার হিসাবে আমেদকে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে আমেদের বর্থতা এর বোলিং খ্যাতির পরিচায়ক নয়। কানপুরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৪০ ওভার বল করেও গোলাম আমেদ একটি উইকেটও পাননি। তবে উইকেট না পেলেও গোলাম আমেদ ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। তাই ভারতের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।

১৯৩৯-৪০ সালে নিজ রাজ্য হায়দরাবাদের পক্ষে রণজি প্রতিযোগিতায় প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েই গোলাম আমেদ মাদ্রাজের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৯৫ রানে ৫টি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৬২ রানে ৪টি উইকেট দখল করেন। এর পর বোলার হিসাবে এর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৫-৪৬ সালে ইনি

গোলাম আমেদ (অধিনায়ক)

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেটে মুসলিম দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান। প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পান ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম ভারত সফরের সময়। দেশে ও বিদেশে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ইংলণ্ড, পাকিস্থান, নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে গোলাম আজ পর্যন্ত ২১টি সরকারী টেস্ট খেলেছেন এবং নিউজিল্যাণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে একটি করে টেস্টে অধিনায়কত্বও করেছেন। এ ছাড়া চারিটি বে-সরকারী টেস্ট খেলারও সুযোগ ঘটেছে। টেস্টে এর উইকেটের সংখ্যা ৬৭; বে-সরকারী টেস্টে ২৬। ১৯৪৭-৪৮ সালে রণজি প্রতিযোগিতার খেলায় মাদ্রাজের বিরুদ্ধে ৫৩ রানে ৯টি উইকেট এবং ১৯৫৬ সালে টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪৯ রানে ৭টি উইকেট লাভ গোলাম আমেদের বোলিং-এর উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমেদের বর্তমান বয়স ৩৬। ইনি হায়দরাবাদে সরকারী কর্মী।

পি রায় (বাঙলা)—পংকজ রায় জন্মগত ক্রীড়া-প্রতিভা নিয়ে ১৯২৮ সালের মে মাসের শেষ দিনে ভাগ্যকুলের ধনাঢ্য রায়
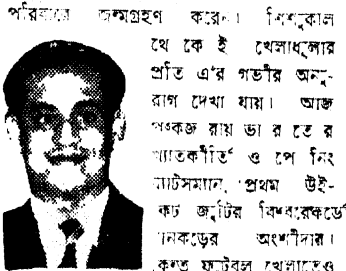
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল

থেকেই খেলাধূলোর প্রতি এ'র গভীর অনুরাগ দেখা যায়। আজ পঙকজ রায় ভারতের খ্যাতকীর্তি ওপেনিং ব্যাটসম্যান, 'প্রথম উইকেট জুটির বিশ্বরেকর্ডে' মানকড়ের অংশীদার। কিন্তু ফুটবল খেলাতেও একদিন পঙকজের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। ক্রিকেটের কঠোর অনুশীলনের জন্য ফুটবলের সঙেগ ইনি সম্পর্কচ্ছেদ করতে বাধ্য হন। ক্রিকেট খেলায় প্রতিষ্ঠা অর্জনের পর চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়ায় এক সময় পঙকজের গৌরবোজ্জ্বল ক্রিকেট জীবনের উপরও ছেদ পড়বার আশঙকা দেখা দিয়েছিল। এর পর পি রায় চশমা পরে খেলতে আরম্ভ করেন এবং প্রতিভা ফিরে পান।

১৯৪৬-৪৭ সালে নিজ রাজ্যের পক্ষে রণজি প্রতিযোগিতায় প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েই পি রায় উত্তর প্রদেশের বিরুদ্ধে (১১২ নট আউট) সেঞ্চুরী করেন। এর পরের বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলায় একে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায়। দেশে ও বিদেশে ইংলণ্ড, পাকিস্থান, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সঙেগ এ পর্যন্ত পি রায় ২৬টি সরকারী টেস্ট খেলে মোট ১৮৪১ রান করেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে এবারকার দুটি খেলায় পি রায়ই করেছেন সবচেয়ে বেশী ১১৯ রান (১৮ : ১০ এবং ৪৬ : ৪৫)।

কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে চারটি বেসরকারী টেস্টেও পি রায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। প্রথম শ্রেণীর খেলায় ইনি সেঞ্চুরী করেছেন ২০ বার, এর মধ্যে টেস্ট সেঞ্চুরীর সংখ্যা পাঁচ। টেস্টে সবচেয়ে বেশী রান (১৭৩) করেছেন নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ১৯৫৫-৫৬ সালে। গতবার পি রায় নর্দার্ন লীগে ব্ল্যাকপুলের পক্ষে খেলেছেন। পি রায়ের হাতে সব রকমের মার আছে। ব্যাটিং করবার এর নিপুণ ভঙিগমা সত্যিই দর্শকচোখের তৃপ্তিদায়ক।
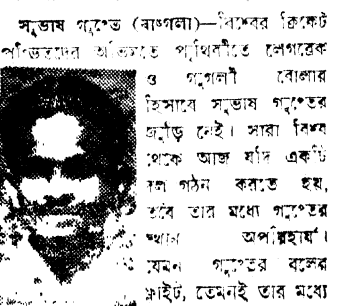
সুভাষ গুপ্তে (বাঙলা)—বিশ্বের ক্রিকেট পণ্ডিতদের অভিমতে পৃথিবীতে লেগব্রেক ও গুগলী বোলার

হিসাবে সুভাষ গুপ্তের জুড়ি নেই। সারা বিশ্ব থেকে আজ যদি একটি দল গঠন করতে হয়, তবে তার মধ্যে গুপ্তের স্থান অপরিহার্য। যেমন গুপ্তের বলের ফ্লাইট, তেমনই তার মধ্যে সংহার-শক্তি লুকানো। সুভাষ গুপ্তে আজ পর্যন্ত ২৩টি সরকারী এবং ৫টি বেসরকারী টেস্ট খেলেছেন। শুধু সরকারী টেস্টে উইকেট পেয়েছেন ১১১টি। এক মানকড় ছাড়া ভারতের দ্বিতীয় কোন বোলার আজ পর্যন্ত টেস্টে শত উইকেট লাভ করতে পারেন নি। কানপুরে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১০২ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৯টি উইকেট এবং বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সভাপতির দলের হয়ে ৭৮ রানে পাকিস্থান সার্ভিস দলের সব কটি (১০টি) উইকেট দখল গুপ্তের ক্রিকেট জীবনের স্মরণীয় অধ্যায়। কানপুরে ৯টি উইকেট দখল করে ভারতের টেস্ট খেলার ইতিহাসেও গুপ্তে এক নতুন ঘটনার সৃষ্টি করেছেন। গুপ্তে বোম্বাইয়ের অধিবাসী হলেও এখন বাঙলায় খেলছেন, ইংলণ্ডের ক্রিকেট মরসুমে খেলছেন ল্যাঙকাশায়ার লীগে রিসটন দলের পক্ষে। বয়স ২৯।

ভি মঞ্জরেকার (উত্তর প্রদেশ)—ভি এল মঞ্জরেকার ব্যাকরণসম্মত ক্রিকেটের অনুরাগী ছাত্র। হাতের মারের নৈপুণ্যও দর্শক-

চোখের আনন্দদায়ক। উইকেটের চারদিকে বল মেরে খেলতে অভ্যস্ত। ইংলণ্ড, পাকিস্থান, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সরকারী টেস্ট খেলায় মঞ্জরেকার এ পর্যন্ত ২৮ বার ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে মোট ১৪৮৫ রান করেছেন। এর মধ্যে সেঞ্চুরীর সংখ্যা চার। এ ছাড়া প্রথম শ্রেণীর খেলায় মঞ্জরেকারের পাঁচ হাজার রান পুরে গেছে।
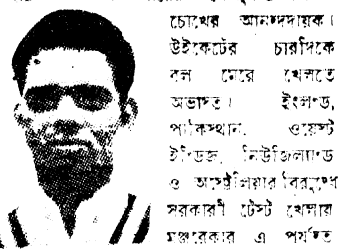
১৯৪৯-৫০ সালে যে বছর ভারতীয় স্কুল ক্রিকেটে মঞ্জরেকার বোম্বাইয়ের অধিনায়কত্ব করেন, সেই বছরই বোম্বাইয়ের পক্ষে রণজি প্রতিযোগিতায় খেলবার সুযোগ পান। তিন বছর বোম্বাইয়ের পক্ষে খেলে ১৯৫৩-৫৪ সালে বাঙলায় আসেন। পরের বছর আবার বোম্বাই যান এবং এক বছর অন্ধ্র রাজ্যের পক্ষে খেলে ১৯৫৬-৫৭ সাল থেকে উত্তর প্রদেশে খেলছেন। মঞ্জরেকার এখন পেশাদার খেলোয়াড় হিসাবে গণ্য। সেণ্ট্রাল ল্যাঙকাশায়ার লীগে ক্যাসলটন মুরের সঙেগ যুক্ত আছেন। টেস্ট খেলায় এ'র সর্বাধিক রান ১৭৭ তৃতীয় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। মঞ্জরেকারের বয়স ২৭। পুরো নাম বিজয় লক্ষ্মণ মঞ্জরেকার।

নরী কন্ট্রাক্টর (গুজরাট)—জীবনের প্রথম প্রতিনিধিমূলক খেলায় দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব খুব বেশী ক্রিকেট

খেলোয়াড় অর্জন করতে পারেন নি। কিন্তু ভারতের ন্যাটা ওপেনিং ব্যাটসম্যান নরী কণ্ট্রাক্টর ১৯৫২-৫৩ সালে নিজ রাজ্য গুজরাটের পক্ষে রণজি প্রতিযোগিতার খেলায় প্রথম অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে বরোদার বিরুদ্ধে দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরী করেন (১৫২ ও ১০২ নঃ আঃ)। নরী কণ্ট্রাক্টর এ পর্যন্ত নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে চারটি, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি এবং এ বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে সুবিধা করতে না পারলেও দ্বিতীয় টেস্টের দুই ইনিংসে এ'র ৯১ রান প্রশংসার দাবী রাখে। গত বছর রণজি ট্রফির খেলায় কণ্ট্রাক্টরের চারটি রাজ্যের বিরুদ্ধে চারটি সেঞ্চুরী করার বিষয় উল্লেখযোগ্য। আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটে তিনবার অধিনায়কত্ব করবার গৌরব সমেত কণ্ট্রাক্টার ৪ বার বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং বোম্বাই ৪ বারই লাভ করেছে রাইটন বেরিয়া ট্রফি। কণ্ট্রাক্টরের সবে পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে। ইনি ওয়েস্টার্ন রেলের কর্মী।

রামনাথ কেনী (বোম্বাই)—রামনাথ কেনী ভারতের কৃতী ব্যাটসম্যানদের অন্যতম। এর হাতে চমৎকার মার আছে। ডিফেন্সও ভাল। সাধারণত অনসাইডের মারেই কেনী বেশী দক্ষ, এক্সট্রা কভার ড্রাইভও দর্শক চোখের আনন্দদায়ক। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে কেনী রণজি ট্রফির খেলায় নিয়মিত বোম্বাইয়ের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন।
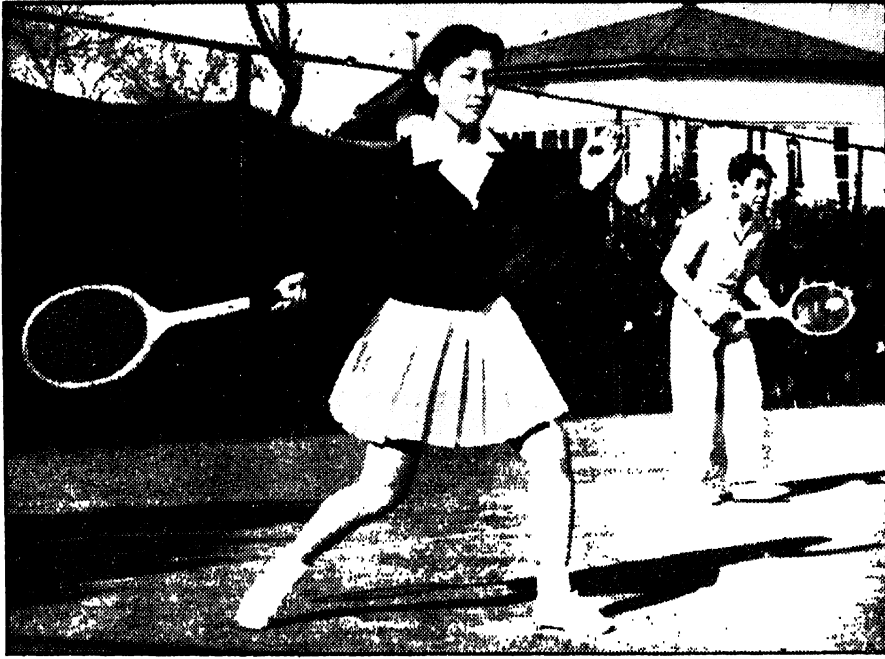
টোকিও লন টেনিস ক্লাবে টেনিস ক্রীড়ারত জাপানের রাজপুত্র আকিহিতো ও তার ভাবী পত্নী কুমারী মিসিকো সোডা। মিস সোডা ফোরহ্যান্ড ড্রাইভ করে একটি বল মারছেন ও তাঁর সংগী আকিহিতো বলের আশায় বেস লাইনে দাঁড়িয়ে আছে

সিলভার জুবিলী ওভারসীজ দলের বিরুদ্ধে দুটি বেসরকারী টেস্ট খেলাতে অংশ গ্রহণ করেছেন, তবে সরকারী টেস্টে কেনীকে এইবার সর্বপ্রথম খেলতে দেখা যাবে। সিলভার জুবিলী দলের বিরুদ্ধে প্রধান মন্ত্রীর দলের হয়ে এর নট আউট থেকে ৯২ রান উল্লেখযোগ্য। রণজি ট্রফির খেলায় কেনী বহুবার সেঞ্চুরী করেছেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ ও মাদ্রাজের বিরুদ্ধে পর পর তিনটি খেলায় কেনীর ১৩৯, ১৩২ ও ২১৮ রান লাভ যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। গত ২৬শে ডিসেম্বর পুণায় মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিপুণ হাতে মেরে খেলে কেনী ১৯২ রান করায় তৃতীয় টেস্টে কেনীর সাফল্য সম্পর্কে অনেকের মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। রমনাথ কেনী বোম্বাইয়ের মাহীন্দ্র এন্ড মাহীন্দ্র লিমিটেডের কর্মী। বয়স ২৮ বছর।

ডি জি ফাদকার (বাঙলা)—ভারতের চৌখস টেস্ট খেলোয়াড় ফাদকারের ক্রিকেট খ্যাতির কথা কারোরই অবিদিত নয়। এমন এক সময় ছিল, যখন ফাদকার ছিলেন ভারতীয় টেস্ট টীমের অপরিহার্য খেলোয়াড়। শুধু খেলোয়াড় হিসাবে নয়, ক্রিকেটের লেখক হিসাবেও ফাদকারের সুনাম আছে। ইংলণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, পাকিস্থান ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দেশে ও বিদেশে এ পর্যন্ত ফাদকার ২৮টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন, আর বেসরকারী টেস্ট খেলেছেন ১৩টি। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ফাদকারের প্রায় পাঁচ হাজার রান পুরে গেছে, উইকেট পেয়েছেন ৩৯১টি। এর মধ্যে শুধু সরকারী টেস্ট উইকেটের সংখ্যা ৬২। সরকারী টেস্টে ফাদকার ক্যাচও ধরেছেন ২১ বার।

ডি জি ফাদকার বোম্বাইয়ের অধিবাসী হলেও ১৯৪২-৪৩ সালে মহারাষ্ট্রের পক্ষে প্রথম রণজি প্রতিযোগিতার খেলায় অংশ গ্রহণ করেন। পরে বহুদিন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ও বোম্বাইয়ের পক্ষে খেলে এখন বাঙলায় বাস করছেন। ইনি ল্যাংকাশায়ার লীগে রকডেল ক্লাবের একজন পেশাদার খেলোয়াড়।

ভারতীয় ক্রিকেট ক্ষেত্রে ফাস্ট বোলার হিসাবেই ফাদকার প্রথম প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। অস্ট্রেলিয়া সফরে পর পর তিনটি খেলায় অর্ধশত রান করায় ব্যাটিংয়ে এ'র প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পরে নিপুণ চৌখস খেলোয়াড়ে পরিণত হন। বলের গতিবেগ এখন অবশ্য যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। ফাদকারের বয়স ৩৩ বছর। পুরো নাম দত্তাত্রয় গজানন ফাদকার।

এন এস তামানে (বোম্বাই)—১৯৫১-৫২ সালে এম সি সি দলের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ এন এস তামানের বড় খেলায় প্রথম আবির্ভাব। তারপর ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকে তামানে নিয়মিতভাবে রণজি প্রতিযোগিতার খেলায় বোম্বাইয়ের এবং টেস্ট খেলায় ভারতের উইকেট রক্ষা করে আসছেন। ইনি এখন ভারতের শ্রেষ্ঠ উইকেটকীপার হিসাবে পরিচিত। কিন্তু ব্যাটিংয়ে সুনাম নেই। বোম্বাইয়ে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে নট আউট থেকে ৯ রান করেছেন, দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করেন নি। কাণপুরে দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে এ'র রানের অঙ্ক শূন্যে। দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য ২০ রান করেন। এ বছরের

দুটি টেস্ট নিয়ে এ পর্যন্ত তামানে ১৪টি সরকারী টেস্ট খেলেছেন। এর মধ্যে ক্যাচ লুফে ২৫ জন ব্যাটসম্যানকে এবং স্ট্যাম্পড করে ১৪ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করেছেন। উইকেটকিপার হিসাবে আজ পর্যন্ত আর কোন ভারতীয় খেলোয়াড় এত খেলোয়াড়কে আউট করতে পারেন নি। তামানের বর্তমান বয়স ২৭। পুরো নাম নরেন্দ্র তামানে। তামানে বোম্বাইয়ে টাটা আয়রন ও স্টীল কোম্পানীর কর্মী।

পলি উমরিগর (বোম্বাই)—পলি উমরিগর ভারতের প্রিয়দর্শন ও জনপ্রিয় চৌখশ ক্রিকেট খেলোয়াড়। নিপুণ ব্যাটসম্যান হিসাবেই উমরিগরের খ্যাতি বেশী, তবে আউট-সুইং এবং অফ ব্রেক বোলার হিসাবেও সুনাম কম নয়-আবার ফিল্ডিংয়েও সমান খ্যাতি আছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে পেন্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পার্শী দলের পক্ষে এঁর বড় খেলায় প্রথম আত্মপ্রকাশ।

ভারতের বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এবং রণজি প্রতিযোগিতায় বোম্বাই ও গুজরাটের পক্ষে খেলে ক্রিকেট ক্ষেত্রে উমরিগর প্রশংসা অর্জন করেন। ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ পান ১৯৪৮-৪৯ সালে এই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে। এবারের দুটি টেস্ট খেলা নিয়ে উমরিগর এ পর্যন্ত ৩৫টি সরকারী ও ১৫টি বে-সরকারী টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং ৪টি সরকারী ও ২টি বেসরকারী টেস্টে ভারতের অধিনায়কত্ব করেছেন। সরকারী টেস্টে তিনটি সেঞ্চুরী ও একটি ডাবল সেঞ্চুরী সমেত এঁর রানের সংখ্যা ২১১৩। ১৯৫২-৫৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে পাঁচটি টেস্ট খেলায় উমরিগরের মোট ৫৬০ রান এবং হায়দরাবাদে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২২৩ রান লাভ বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত উমরিগর ল্যাংকাশায়ার ও সেণ্ট্রাল ল্যাংকাশায়ার লীগে প্রোফেশনাল খেলোয়াড় ছিলেন। উমরিগরের বর্তমান বয়স ৩২ বছর। বোম্বাইয়ের অ্যাসোসিয়েটেড সিমেণ্ট কোম্পানীর কর্মী।

সুরেন্দ্রনাথ (সার্ভিসেস)—সার্ভিস দলের মিডিয়াম ফাস্ট ও ইনসুইং বোলার সুরেন্দ্রনাথের তেমন নামডাক না থাকলেও ফাস্ট বোলারের নিদারুণ অভাবের কথা চিন্তা করেই নির্বাচকমণ্ডলী সুরেন্দ্রনাথকে তৃতীয় টেস্ট টীমে দলভুক্ত করেছেন। ১৯৫২-৫৩ সালে নিখিল ভারত স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় দিল্লী স্কুলের পক্ষে এবং ১৯৫৪-৫৫ সালে ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমীর পক্ষে খেলে অবশ্য সুরেন্দ্রনাথ বোলিংয়ে কিছু নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। ১৯৫৫-৫৬ সালে রণজি প্রতিযোগিতায় সার্ভিস দলের হয়ে মাত্র ২৩ রানে পূর্ব পাঞ্জাব দলের ৩টি উইকেট দখলের কথাও বলা যেতে পারে। সার্ভিস দলের সংগে ভারতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের উদ্বোধনী খেলাতেও সুরেন্দ্রনাথ ৮৩ রানে লাভ করেছেন ৩টি উইকেট। সুরেন্দ্রনাথের বয়স মাত্র একুশ। দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়। মীরাটের অধিবাসী। সামরিক বিভাগের লেফ্‌টেন্যাণ্ট।

সি জি বোরদে (বরোদা)—সি জি বোরদেকে চৌখশ খেলোয়াড় হিসাবে অভিহিত করা হলেও লেগব্রেক এবং গুগলী বোলার হিসাবেই এর খ্যাতি বেশী। কিন্তু বোরদে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় একটিও উইকেট পাননি। দুটি টেস্ট এর বোলিংয়ের হিসাব হয়েছে ৪৫—৮—১০৪—০ উইকেট।

১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে পুণায় বোরদের জন্ম হয়। ১৯৫২-৫৩ সালে যখন বোরদে স্কুলের ছাত্র, তখন রণজি প্রতিযোগিতার খেলায় মহারাষ্ট্রের পক্ষে বোম্বাইয়ের বিরুদ্ধে খেলার সুযোগ পান। প্রতিনিধিমূলক খেলায় প্রথম আবির্ভাবেই প্রথম ইনিংসে ৫৫ রান করেন, দ্বিতীয় ইনিংসে নট আউট থেকে করেন ৬১ রান। পরের বছর গুজরাটের বিরুদ্ধে ১৩৪ রান বোরদের এই পর্যন্ত ক্রিকেট খেলার সর্বোচ্চ রান। ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে বোরদে বরোদার পক্ষে খেলছেন। এখন ইনি সেণ্ট্রাল ল্যাংকাশায়ার লীগে ওয়েস্টার্ন ক্লাবের প্রোফেশন্যাল খেলোয়াড়। ১৯৫৪-৫৫ সালে বোরদে ভারতীয় দলের সংগে পাকিস্থান সফর করেছেন। বোরদের বয়স ২৫ বছর। পুরো নাম চন্দ্রকান্ত গোলাবরাও বোরদে। ডাক নাম চাঁদু বোরদে।

দেশী সংবাদ

২২শে ডিসেম্বর—অদ্য রাজ্য বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাবাজী নিরোধ বিল আলোচনা-কালে খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জানান যে, গতকল্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে ধান-চাউলের নিম্নতম দর বাঁধিয়া দিবার অনুমতি পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-যে, ধান চাউলের নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া বিরোধী পক্ষের অন্যতম প্রধান দাবী ছিল।

আগামীকল্য ভোর ৬টা হইতে আসামের কাছাড় এবং পূর্ব পাকিস্তানের শ্রীহট্ট জেলার মধ্যবর্তী সীমানার সর্বত্র গুলীবর্ষণ বন্ধ হইবে। কাছাড় ও শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনারদ্বয়ের মধ্যে এই গুলীবর্ষণ বিরতি সম্পর্কে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

২৩শে ডিসেম্বর—আজ সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম সমিতির এক জরুরী সভার পর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বিশ্বভারতীর অর্থসচিব শ্রীক্ষিতীশ-চন্দ্র চৌধুরী রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে অন্তর্বর্তিকালের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

আজ সন্ধ্যায় সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, আসাম-পূর্বপাকিস্তান সীমান্তবর্তী ডোলা-বেটায় আগামীকাল ভোর ছয়টা হইতে গুলী-বর্ষণ বিরতিচুক্তি বলবৎ হইবে।

২৪শে ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমানে কোষাধ্যক্ষ শ্রীবিজয়সিং নাহার অদ্য কলিকাতা কর্পোরে-শনের বিশেষ সভায় ভোটাধিক্যে কর্পোরেশনের অল্ডারম্যান নির্বাচিত হন।

৮ই পৌষের প্রভাতে শান্তিনিকেতনের স্নিগ্ধছায়া আম্রকুঞ্জে বিশ্বভারতীর সমাবর্তন ভাষণে আচার্য শ্রীজওহরলাল নেহরু আশা প্রকাশ করেন, গুরুদেবের স্মৃতিপূত এই বিশ্ব-বিদ্যালয় 'অভয় মন্ত্র' শিক্ষা দানের সাধনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে।

২৫শে ডিসেম্বর—আজ নয়াদিল্লীতে এক সম্বর্ধনা সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘানার প্রধানমন্ত্রী ডাঃ কোয়ামে নকরুমা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলির মুক্তি আন্দোলনে ঘানা অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করিবে। তিনি বলেন যে, ছয়টি ঔপনিবেশিক শক্তি আফ্রিকার শাসক।

কলিকাতা ও শহরতলী অঞ্চলে এবং মফস্বলের অনেক স্থানে গৃহস্থের অতি প্রয়োজনীয় কেরোসিন তৈল সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে কোন দোকানেই এক ফোঁটাও কেরোসিন পাওয়া যাইতেছে না। আবার কোন কোন এলাকায় যদিও বা অনেক চেষ্টায় কিছু কেরোসিন মিলিতেছে, তাহার চড়া দাম হাঁকা হইতেছে।

২৬শে জানুয়ারী—অদ্য রাজ্য বিধানসভায় কলিকাতা মহানগরীর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর একটি প্রতিমূর্তি স্থাপন করিবার নিমিত্ত রাজ্য

সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া সর্বসম্মতিক্রমে একটি বেসরকারী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অদ্য রাজ্য সরকারের অধীনে সরকারী কর্ম-চারীদের জন্য চাকুরি সংক্রান্ত নূতন আচরণ বিধি রচনা করিবার উদ্দেশ্যে রাজ্য বিধান-সভা ও বিধান পরিষদের প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন সম্পর্কিত এক বেসরকারী প্রস্তাব সরকার পক্ষ কর্তৃক আলোচনা করিতে দিবার অস্বীকৃতির প্রতিবাদে বিধানসভায় বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ সভাকক্ষ ত্যাগ করেন।

২৭শে ডিসেম্বর—পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী ১৯৫৯-৬০ সনে পরিকল্পনা রূপায়ণে মোট ৩৭ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে পরিকল্পনা কমিশন ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিগণ আলাপ আলোচনার পর উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

২৮শে ডিসেম্বর—আজ জব্বলপুরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৩৪শ অধিবে-শনের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার ভাষণে জীবনের বাস্তব দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, বাঙ্গালীরা যেন তাঁহা-দের বিগত গৌরব ও ঐতিহ্য লইয়াই মশগুল না থাকে।

অদ্য প্রাতঃকালে ১১ ঘটিকার কয়েক মিনিট পরে দিল্লী, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন অংশে ভূকম্পন অনুভূত হয়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের কম্পন অনুভূত হয়। আম্বালা দিল্লী ও সিমলায় সামান্য কম্পন এবং উত্তর প্রদেশের আলমোড়া ও দেরাদুনে প্রচণ্ড কম্পন অনুভূত হয় বলিয়া প্রকাশ।

বিদেশী সংবাদ

২২শে ডিসেম্বর—সোভিয়েট অর্থমন্ত্রী শ্রী জেভেরেভ অদ্য সুপ্রীম সোভিয়েটে ঘোষণা করেন যে, ১৯৫৯ সালের বাজেটে প্রতিরক্ষা ব্যয় সামান্য হ্রাস করা হইতেছে। জাতীয় আয়ের এক বৃহৎ অংশ বরাদ্দ করা হইয়াছে বিজ্ঞান ও শিক্ষা খাতে।

পৃথিবী প্রদক্ষিণে রত উপগ্রহ 'অ্যাটলাস'কে লক্ষ্য করিয়া গতকল্য জর্জিয়ার ফোর্ট স্টুয়ার্ট বেতার ঘাটি হইতে যুগপৎ সাতটি টেলিপ্রিণ্টার বার্তা প্রেরণ করা হয় এবং উপগ্রহটি নিখুঁত-ভাবে তাহার প্রত্যেকটির পুনরাবৃত্তি করে।

২৩শে ডিসেম্বর—কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডাঃ তারকনাথ দাস হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া গতকল্য পরলোক-গমন করেন। ৫৭ বৎসর পূর্বে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করেন এবং তথাকার নাগরিক হন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৪ বৎসর হইয়াছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় চলচ্চিত্র বোর্ড 'পথের পাঁচালী'কে ১৯৫৮ সালের শ্রেষ্ঠতম বিদেশী চিত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

২৪শে ডিসেম্বর—অদ্য পুনরায় ফ্লোরিডা হইতে মার্কিন বিমান বাহিনীর একটি উন্নততর আন্তর্মহাদেশীয় 'অ্যাটলাস' রকেট মহাশূন্যে প্রেরণ করা হয়। এই রকেট আটলাণ্টিক মহা-সাগরের উপর দিয়া সাফল্যজনকভাবে চারি হাজার মাইল চলিয়া যায়।

২৫শে ডিসেম্বর—আজ সুপ্রীম সোভিয়েটের অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীআন্দ্রে গ্রোমিকো বার্লিন প্রসঙ্গে বলেন যে, সোভিয়েট প্রস্তাব অনুযায়ী এই সমস্যার সমাধান যদি না হয়, তবে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে সারাজেভোর যে অবস্থা হইয়াছিল, বার্লিনের অবস্থাও হইবে ঠিক তেমনি।

আজ ক্রেমলিনে সুপ্রীম সোভিয়েটের অধি-বেশনে সোভিয়েট দণ্ডবিধি আইনের নূতন একটি ধারা অনুমোদিত হয়। এই ধারায় সোভিয়েট আদালতের আওতার বাহিরে গোপন বিচারের অনুষ্ঠান রহিত করা হইয়াছে এবং 'জনগণের শত্রু' শীর্ষক অভিযোগটি বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

২৬শে ডিসেম্বর—ভারতীয় জাহাজ 'জল-মণি'র মাস্টারকে গতকাল করাচীতে সামরিক আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহার অপরাধ—জাহাজের মাস্তুলে পাকিস্তানী পতাকা উড্ডীন করিতে তিনি অস্বীকার করেন।

যুগোস্লাভ পার্লামেণ্ট আজ নির্দিষ্ট আকারের বড় সমস্ত ব্যক্তিগত বাসভবন রাষ্ট্রী-করণের নির্দেশ দিয়াছেন। বাড়ি নির্মাণোপ-যোগী ব্যক্তিগত জমি এবং দোকান ও অফিসের জন্য ভাড়া দেওয়া ব্যক্তিগত বাড়িগুলিও রাষ্ট্রী-করণ করা হইবে। সরকার ক্ষতিপূরণ হিসাবে পঞ্চাশ বৎসরের কিস্তিতে বর্তমান ভাড়ার দশ ভাগ পর্যন্ত দিবেন।

২৭শে ডিসেম্বর—বেলুনযোগে আতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রমের চেষ্টায় বিজয়ী হইয়া চারিজন ইংরাজ আরোহী পূর্ব ভেনেজুয়েলার অরণ্য অঞ্চলে নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

ওয়াশিংটনের কোন কোন বিজ্ঞানীর ধারণা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিথিয়াম বোমা তৈয়ার করিয়াছে এবং উহার সহায়তায় হাইড্রোজেন বিস্ফোরণের ব্যয় হ্রাস করিয়াছে।

২৮শে ডিসেম্বর—পাক প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ অদ্য চট্টগ্রামে এক জনসভায় বলেন, সীমান্ত বিরোধ যদি না থামে এবং সীমা ছাড়াইয়া যায়, তাহা হইলে কিভাবে তাহার উত্তর দিতে হইবে পাকিস্তান তাহা জানে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REG. NO. C. 2109

ব্যাপার দেখে চোখ ছানাবড়া
দোকানে গিয়ে বুড়ী-মা তো হতভম্ব! আর দোকানদারের তো কথাই নেই — দোকান হাতড়ে দেখে মালই নেই—তাকগুলো ফাঁকা! মাল না থাকলে যেমন, তেমনি আবার তাক-বোঝাই মালপত্তর মজুত দেখলেও খদ্দেরদের চোখ ছানাবড়া হ'য়ে ওঠে!
এধরণের সব অসুবিধের হাত থেকে রেহাই পাওয়া খুবই সহজ—বিমানে মালপত্তর চালান দিন! কারণ বিমানে মাল পাঠালে—
দরকারী মালপত্তরের যোগান ঠিকমত পাওয়া যায়
টানা-হ্যাঁচড়া ও গুদাম খরচা কম পড়ে
মূলধন খাটতে থাকে—আটকে থাকেনা
মালপত্তরের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা কমে যায়
যখন যেখানে দরকার পৌঁছে যায়
ঠিক বিশ্বাস হচ্ছেনা বুঝি? তবে জেনে রাখুন, এয়ার-ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল-এর বিমান প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ২৬টি বড় বড় শহরে হপ্তায় অনেকবার যাতায়াত করে—সেখান থেকে অন্যান্য জায়গায় যোগাযোগের সহজ ব্যবস্থা আছে!
মাল নেই
এয়ার-ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল
ষ্টীফেন হাউস, ৪, ডালহৌসী স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা
ফোন: ২৩-৩৩১৪, ২৩-৩৩১৫ ও ২৩-৩৩১৬
AII 6842(R)

দেশ

২৬ বর্ষ] শনিবার, ২৫ পৌষ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 10th January, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১১

যখন দেখি মানুষের লোভ, ভণ্ডামি উত্তুঙ্গ হ'য়ে হিমালয়কেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে, অন্তঃসারহীন পাষণ্ডেরা শুধু জুয়াচুরির বলে সমাজের বুকে হীন লালসাভরা স্বার্থের রথ দুর্দাম বেগে চালিয়ে দিয়েছে, নারীর সম্মান, নারীর মাতৃত্ব তাদের অর্থের নিকট তুচ্ছ হয়ে গিয়েছে, দুর্বল সবলের পেষণে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে, তখন আমি আর স্থির থাকতে পারি না, আমি উন্মাদ হয়ে যাই, আমি নির্ভীক মত দুর্বার হয়ে অত্যাচারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি—যতক্ষণ ক্ষীণ শ্বাসটুকুও বইতে থাকে, ততক্ষণ সবল পেষণে চেপে থাকি। হাঃ হাঃ হাঃ—

আমি মোহন, আমি দস্যু, আমি দস্যু মোহন!

(১) মোহন (২) কারাগারে মোহন (৩) মোহন ও রমা (৪) রমার বিয়ে (৫) আবার মোহন (৬) রমা-হারা মোহন (৭) নাগরিক মোহন (৮) মোহনের অপূর্ব অভিযান (৯) মোহনের অজ্ঞাতবাস (১০) বাবসায়ী মোহন (১১) নারী-রক্ষী মোহন (১২) বহু-রূপী মোহন (১৩) মুখোশ মোহন (১৪) মোহনের দুর্ভাগ্য (১৫) মোহন ও জল্লাদ (১৬) দস্যু মোহন (১৭) মোহন ও স্বপন (১৮) মোহনের সঙ্গে স্বপন (১৯) স্বপনের সীমান্ত সংঘর্ষ (২০) গোয়েন্দার মুখে মোহন (২১) নেতা মোহন (২২) মোহনের প্রথম অভিযান (২৩) মোহন ও পথনারায়ণী (২৪) ফাঁসির মঞ্চে মোহন (২৫) রমার দাবি (২৬) মোহন ও দুষ্ট শাসক (২৭) মোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী (২৮) বার্লিনে মোহন (২৯) স্বপন ও দস্যু (৩০) বন্দী মোহন (৩১) মোহন ও হুরী (৩২) বেপরোয়া মোহন (৩৩) জার্মান বন্দরের মোহন (৩৪) ছদ্মবেশী মোহন (৩৫) স্বপনের গুপ্ত অভিযান (৩৬) রাজেশ্বরের স্বপন (৩৭) মোহনের অভিনয় (৩৮) নিশাথে মোহন (৩৯) মোহন-চম্পা সংঘর্ষ (৪০) মোহনের অনুরাগ (৪১) প্রিয় মোহন (৪২) সর্বজ্ঞ মোহন (৪৩) মোহনের তিন শত্রু (৪৪) যৌবনের দেশে মোহন (৪৫) আফ্রিকার মোহন (৪৬) মোহনের প্রতিদান (৪৭) স্বপনের প্রত্যাবর্তন (৪৮) নব-রূপে মোহন (৪৯) মোহনের নূতন অভিযান (৫০) রাজা মোহন প্রভৃতি ২০৪খানি বই বার হয়েছে। সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন, কিম্বা ২৯-১১-৫৮ তারিখের 'দেশ' দেখুন।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের নবতম

শেষ পর্য্যন্ত ৩৲

স্ত্রী-ভাগ্যে ২৲ কাঁচা ও পাকা ৩৲

সবগুলিই নূতন ধরণের কৌতুক উপন্যাস।

এ লেডিজ ম্যান ৩৲

মোপাসাঁর বিখ্যাত উপন্যাসের ভাবানুবাদ।

পরলোকের বিচিত্র কাহিনী

পরলোকের গল্প

পরলোক সম্বন্ধে রোমাঞ্চকর সব সত্য কাহিনী! এক বিচিত্র জগতের সন্ধান পাবেন এই দুখানি গ্রন্থে। পরলোকের আত্মিকদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের কোন উপায় আছে কি? প্লানচেট, টেবল্ টার্ণিং, মিডিয়াম, ক্লারিভয়েন্স, অটো রাইটিং, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, সত্য কাহিনী—সব কিছুই প্রখ্যাত কথাশিল্পী সৌরীন্দ্রবাবু, মনোরম গল্পের মাধ্যমে মনোজ্ঞ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। মূল্য প্রত্যেকটি ২৷৷০

রবীন্দ্র স্মৃতি

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ও সাহিত্য-সাধনার উপরে নূতন আলোক সম্পাত করেছেন সৌরীন্দ্রবাবু এই স্মৃতি কাহিনীতে। বহু অপরিজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাবেন এই গ্রন্থে। দেশ, যুগান্তর, আনন্দবাজার, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত। মূল্য ৩৷৷০

শ্রীবিশ্বনাথ বিশী, বি এস সি প্রণীত

শরৎচন্দ্রের জীবন উপন্যাস

শরৎচন্দ্রের জীবন ছড়িয়ে রয়েছে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র-গুলির মধ্যে। শরৎচন্দ্রের লিখিত বন্ধু তাদেরই নূতন করে প্রাণসঞ্চার করেছেন এই গ্রন্থে। কোন্ চরিত্র কিভাবে শরৎচন্দ্রের জীবনে এসে দেখা দিয়েছিল, তা জানতে পারবেন এই গ্রন্থ পাঠ করলেই। মূল্য ৪৲

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন ২৲

শ্রীকান্ত, অভয়া, কমলা, অচলা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রগুলির মূল কোথায়? সব্যসাচী এবং জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন—রাজবন্দী, বিপ্লবী ব্যক্তি কি তাঁহার জীবনের মূলাধার? সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন এই গ্রন্থে।

সুভাষ-স্মৃতি ২৲

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কয়েকখানি মাসিক রহস্যোপন্যাস। প্রত্যেকটি ২৷০

চীনের নব-নায়ক

ভুলের হীরার ভুল

মুঙ্গেরে দাওয়াই

অদৃশ্য-সংগ্রাম

শ্রীবিমলপ্রতিভা দেবীর উপন্যাস

নতুন দিনের আলো

ব্রিটিশ আমলের বাজেয়াপ্ত আদেশ জাতীয় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রত্যাহৃত।

একদিন নিপীড়িত সর্বহারারা 'নতুন দিনের আলো' দেখতে পেয়ে রুখে দাঁড়াল অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে। সে-সংগ্রামের ইতিহাস লিখেছেন আজীবন বিদ্রোহী...... ভূতপূর্ব রাজবন্দী বিমলপ্রতিভা। উপন্যাস হলেও এ-কাহিনীগুলি রক্ত ও অশ্রুর স্বাক্ষরে লেখিকার সঙ্কেত খচিত। মূল্য ৩৲

পূর্ণশশী দেবীর উপন্যাস

স্রোতের মুখে ২৲

চিত্ত ও বিত্ত ২৲ মরু-নির্ঝর ১৷৷০

মানের মালা নাই ৩৲

যশস্বী নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের

মরণ-মহল (রহস্যোপন্যাস) ২৲

বাঙলার মেয়ে—আশালতা ২৲

সাধারণ পাঠকেরা অন্যূন দশ টাকার বই ভি, পি-তে নিলে ডাক-ব্যয় লাগবে না।

শিশির পাবলিশিং হাউস——২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

(সি ৩৯৪১)

সূচীপত্র

বিষয় লেখক পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : শ্রীরথী দে

বর্ষাকাল বিরহের ঋতু এবং বসন্ত-মিলনের, আমাদের কাব্যপাঠের শিক্ষা এই। বর্ষপঞ্জীতে আরও একটি ঋতু সম্মিলনের, অর্থাৎ সম্যকরূপে মিলনের জন্য চিহ্নিত, তার নাম শীত। দেখতে সে জড়সড়, বুড়ো-বুড়ো, পলিত-পত্র, নিদ্রাতি-নেত্র। কিন্তু সকলকে ছুটো-ছুটি করিয়ে মারতে তার জুড়ি নেই। একাসনে বসে ত্বগাস্থিমাংস লয় করে দেব এমন সংকল্প কখনও সে করে না। এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে অনেক লোককে একত্র করে পুরাতন বৎসরকে (ইং) সে বিদায় দেয়, নতুনের বসবার পিঁড়ি পাতে।

এই বর্ষসন্ধিকালটার কেন্দ্রমাণ যে-দিনটি সে আকারে হ্রস্ব, তবু কোন অজ্ঞাত কারণে, হয়ত তার মহিমার কথা স্মরণ করে, আমরা তাকেই বলি বড়দিন। বড় দিনের ঈষৎ আগে বা পরে এ-বছর যতগুলি সম্মিলন হয়েছে তার সবগুলির আলোচনা আমরা করব না, এমন কি সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়াও সম্ভব নয়। কতগুলি, যথা জাতীয় রেকর্ড কমিশন, অর্থনীতিবিদ সম্মেলন, বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন সহজবোধ্য হেতুতেই প্রসঙ্গত-পৃষ্ঠার এক্তিয়ার বহির্ভূত। এবং সহজ-বোধ্য কারণেই দুটিকে বেছে নিতে চাই। একটি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন অপরটি নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন। প্রথমটির অধিবেশন হয় জব্বলপুরে, দ্বিতীয়টি কয়েক দিন পরেই ভুবনেশ্বরে। পথমটি একটি প্রাচীন সংস্থা, দ্বিতীয়টির প্রতি সরকারী স্নেহ-দৃষ্টি স্পষ্ট।

বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পূর্বে একদা "প্রবাসী", এই উপসর্গটি ছিল। অধুনা উপসর্গটি ঘুচিয়ে সে আপন নামের আদ্যে 'নিখিল' কথাটি লিখে নিয়েছে, কিন্তু কর্মসূচীতে সাহিত্যকে সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত করতে পারেনি, কোন কোন মহল থেকে এই অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগটা পুরানো। অনেকেই, বিশেষ করে বিশুদ্ধ সাহিত্যানুরাগীরা, সম্মিলনটিকে মিলন-মজলিসের সামিল বলে গণ্য করে থাকেন। তাঁরা প্রতিনিধি-দের পরিচয়-পত্র দেখতে চান, ভ্রুকুটি-কুটিল চক্ষে প্রশ্ন করেন, যোগদানকারী-দের মধ্যে সাহিত্যিক ক'জন—এমন কি, সাহিত্য-পাঠক? অনেকের লক্ষ্যই কি স্বল্পমূল্যে দেশভ্রমণের সুবিধাটুকু ছিল না? এই অভিযোগ উড়িষ্যায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনটিকেও স্পর্শ করবে। কেন না, সেখানেও লেখকের সংখ্যা সামান্যই, কেউ কেউ আছেন, অনেকেই নেই। প্রধানমন্ত্রী বা উপরাষ্ট্রপতি অবশ্য স্বাধিকার বলেই সাহিত্য-সম্মেলনে প্রবেশ করতে পারেন, কিন্তু তাঁদের পদাধিকার-বলটাকে সন্দিগ্ধ চোখ বড় করে দেখে। সাহিত্য-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সেখানে ভাষা-আন্দোলন উঁকি দিতে চেয়েছে। এ-সব লক্ষণ যে বিশুদ্ধ সাহিত্য-চর্চার অনুকূলে নয়, এ অভিযোগ অংশত স্বীকার্যও।

কিন্তু অংশত-ই। অভিযোক্তারা সম্মেলনগুলির সার্থকতার দিকটা দেখতে পাচ্ছেন না। সেটা এর সামাজিক দিক। ৩৪ বছর ধরে বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনকে উপলক্ষ করে প্রবাসী বাঙ্গালীরা সংবৎসরে একবার সমবেত হয়েছেন, সম্মেলনের মাধ্যমেই অন্য প্রদেশবাসীদের জানিয়ে-ছেন, বাঙালী আছে, তার সংস্কৃতি আছে, সাহিত্য আছে। বাঙলা দেশে বসেও আমরা তাঁদের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শুনেছি, জেনেছি বহির্বঙ্গে এখনও বাঙালীরা আছেন। তাতে সাহিত্য হয়ত এগয়নি, কিন্তু বাঙালী এগিয়েছে। তার সংস্কৃতি-দৃষ্টির দিগন্ত প্রসারিত-তর হয়েছে। সম্মিলন না থাকলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না, যদি কলহ বা উদাসীনতার ফলে সম্মিলনের অধিবেশন বন্ধ হয়, তখন সিদ্ধ হবে না। বহির্বঙ্গে বাঙালী সমাজের অস্তিত্বের সামগ্রিক গুরুত্ব লঘুতর হবে।

লেখক সম্মেলন সম্পর্কে উপরোক্ত যুক্তির সবটা প্রযোজ্য নয়। তার বয়সও অল্প। সৃষ্টির ক্ষেত্রে সভাসমিতির মূল্য আদৌ নেই, তাই বা বলি কী করে। ভাবের আদান-প্রদান চিন্তাশক্তিকে সমৃদ্ধতর করে, কারুকীর্তিতে অপরের কৃতিত্বের সংবাদ-সংগ্রহ রূপস্রষ্টাদের উৎসাহ দেয়।

×

উভয় সম্মিলনের সভাপতিদ্বয়ের ভাষণের মধ্যে বক্তব্যের একটি প্রচ্ছন্ন মিল লক্ষণীয়। একটির পুরোহিত ছিলেন রাজনীতিবিদ, অপরটি প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। উভয়েই বলেছেন, সাহিত্যস্রষ্টাদের আজ বস্তুনিষ্ঠ হতে হবে। নেহরু বলেন, সাহিত্যে ছাপ থাকবে যন্ত্র-বিজ্ঞানের। আচার্য বসুও চান, কল্পনার অমর্ত্য-লোক নয়, সাহিত্যের বিচরণভূমি হক বস্তুজগৎ। সাহিত্যের বিষয়বস্তুর বিষয়ে এই সদুযুক্তি কতখানি গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে, আমাদের সংশয় আছে। সাহিত্য-স্রষ্টারা স্বভাবতই ফরমাস-অসহিষ্ণু। পর-রুচির যোগান দেওয়াই তাঁদের একমাত্র ঈপ্সিতলক্ষ্য নয়। জীবিকার জন্য চালের প্রয়োজন কতখানি তাঁরা সে-বিষয়ে সচেতন হয়েও কচি ধানের সৌন্দর্যটুকুকে বাদ দিতে চাইবেন না এবং তার সবুজ শিষের আন্দোলন-টুকুকে অবশ্যই লেখায় বা রেখায় ধরে রাখতে চাইবেন। কোন তিরস্কার বা ফতোয়াতেই তাঁরা কর্ণপাত করবেন না, তিরস্কর্তা যদি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হন, তবুও। বিক্রেতারা যেখানে অভিমানী এবং একমাত্র আপন অন্তরের নির্দেশেই চালিত, সেই সাহিত্য-মেলা বড় বিচিত্র "সেলর্স মার্কেট"!
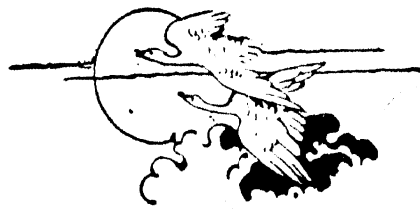
পনেরো মাস পূর্বে সোভিয়েট থেকে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুৎনিক মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়। তারপর ক্রমশ বৃহত্তর আরো কয়েকটি স্পুৎনিক আকাশে উঠেছে। আমেরিকাও কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টির গৌরব অর্জন করেছে; কিন্তু মার্কিন উপগ্রহগুলি আয়তনে রাশিয়ান উপগ্রহগুলির সমকক্ষ হতে পারেনি। অল্প কিছুদিন পূর্বে আমেরিকা একটা রকেট ছুঁড়েছিল যেটা চন্দ্রলোকে পৌঁছবে বলে হৈ হৈ রব উঠেছিল; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা চন্দ্রলোকে পৌঁছতে পারেনি। নূতন বছরে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ আবার আমেরিকার উপর এক হাত নিয়েছেন এক রকেট ছুঁড়ে যেটা চাঁদের পাশ কাটিয়ে (চাঁদ থেকে ৪৬৬০ মাইলের ব্যবধানে) সূর্যের চতুর্দিকে গ্রহের মতো ঘুরতে শুরু করেছে। এই কৃত্রিম গ্রহে সন্নিবিষ্ট যন্ত্র থেকে রেডিও সংকেত আসছে যার দ্বারা মহাকাশ সম্বন্ধে নূতন তথ্য লাভ করা যাবে। এই রকেট চাঁদকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছিল অথবা সূর্যের গ্রহরূপেই চালিত করাই এর সৃষ্টিকর্তাদের উদ্দেশ্য ছিল সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না; কিন্তু সে যাই হোক সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকগণ যে শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তার পরিমাণ আন্দাজ করাও দুঃসাধ্য। তবে কিছুকাল থেকে এই ধরনের কৃতিত্বের সম্ভাবনার কথা এতো আলোচিত হয়েছে যে এর জন্য তেমন বিস্ময়বোধের সৃষ্টি হয়নি। এই রকমটা যে হবে এটা যেন জানাই ছিল, কাদের হাত দিয়ে আগে হবে সেইটাই ছিল প্রশ্ন। সোভিয়েট যা করতে পেরেছে, আমেরিকাও (এখন পর্যন্ত একটু পিছনে থাকলেও) যে তা করতে পারবে এবিষয়ে কারও সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন হচ্ছে তারপর কী? মানুষের এই বৈজ্ঞানিক কীর্তির সঙ্গে তার হাতে মারণাস্ত্রের শক্তি বৃদ্ধির কথাটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং তার আলোচনাও অবিরাম চলেছে। এখন অবস্থাটা অনেকটা এইরকম হয়ে উঠেছে যে বিপদের কথাটা ভুলে না থাকলে বেঁচে থাকার পরিকল্পনাটাই যেন অযৌক্তিক হয়ে ওঠে। একথা ঠিক যে কোনো প্রাকৃতিক শক্তিকে করায়ত্ত করলেই তার সৎ ও অসৎ ব্যবহার করা যায়। কিন্তু শক্তির চর্চা এমন স্তরেও নীত হতে পারে নাকি যেখানে সে মানুষের কর্তৃত্বের আওতার বাইরে চলে যাবে? অথবা এমনও তো হতে পারে যে মানুষ বা মানুষের বুদ্ধি কোনো প্রাকৃতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যন্ত্ররূপে মাত্র ব্যবহৃত হচ্ছে?

* * *

প্রেসিডেন্ট নাসের অসোয়ান বাঁধের জন্য সোভিয়েটের কাছ থেকে সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ডের লম্বা-মেয়াদী ঋণ পাবার ব্যবস্থা করেছেন। অবশ্য এই টাকায় বাঁধের প্রাথমিক কাজ খানিকটা হবে, পুরো পরিকল্পনার জন্য ৪৫ কোটি পাউণ্ডের প্রয়োজন। অসোয়ান বাঁধের জন্য সাহায্য দেবার

প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করার সময়ে মার্কিন সরকার যে মনোভাব দেখিয়েছিলেন সে-রকম ভাব যদি সোভিয়েট সরকার দেখাতেন তাহলে তাঁরাও ইউনাইটেড আরব রিপাবলিককে ইই সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড ঋণ দেবার চুক্তিতে স্বাক্ষর করতেন না। কারণ প্রেসিডেণ্ট নাসেরের প্রতি সোভিয়েটের বিরক্ত হবার যথেষ্ট কারণ ইতিমধ্যে ঘটেছে। কম্যুনিস্ট ব্লক থেকে অস্ত্র ক্রয় করার জন্য নাসেরের উপর রাগ করে অসোয়ান বাঁধ সংক্রান্ত সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি আমেরিকা প্রত্যাহার করে। সোভিয়েট সরকার যদি মিঃ ডালেসের মতো (অর্থাৎ সেই সময়ের মিঃ ডালেসের মতো, আজকের দিনের মিঃ ডালেস হয়ত ঠেকে শিখে কিছুটা অন্যরকম হয়েছেন) রগচটা হতেন তাহলে তাঁরাও প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করতেন কারণ প্রেসিডেণ্ট নাসেরের নীতির কম্যুনিস্ট বিরোধী রূপ ইতিমধ্যে একটু বেশিরকম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমী শক্তিদের দিকে বেশ একটু ঝুঁকে-পড়া ভাবও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাসের গভর্নমেণ্ট মিশরে বরাবরই কম্যুনিস্টদের চেপে রাখার নীতি অনুসরণ করেছেন। তা সত্ত্বেও আরব জাতীয়তাবাদ নাসেরের নেতৃত্বে যখন পশ্চিমী-বিরোধী খাতে প্রবাহিত হয়েছে তখন সোভিয়েট সরকার নাসেরের আভ্যন্তর নীতির কম্যুনিস্ট বিরোধিতা উপেক্ষা করে পশ্চিমী শক্তিদের বিরুদ্ধে নাসেরকে সমর্থন করেছেন। স্থানীয় কম্যুনিস্টরা সোভিয়েট নীতিকে সমর্থন করেছে বটে; কিন্তু তাদের নাসেরের প্রতি কোনো আনুগত্য নেই এবং পশ্চিমী শক্তি-দের বিরুদ্ধে আরবদের সংঘবদ্ধ করার জন্য নাসেরের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও নাসেরের আভ্যন্তর নীতির সম্প্রসারণ কম্যুনিস্টদের কাম্য নয়। সেইজন্য মিশরের সঙ্গে সিরিয়ার সংযুক্তি সিরিয়ার কম্যুনিস্ট-দের মনঃপূত হয়নি। নাসের গভর্নমেণ্টও সিরিয়ার কম্যুনিস্টদের দমন করার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। ইরাকের কাসেম গভর্নমেণ্ট ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের সঙ্গে যুক্ত হবার বিরোধী। এই বিরুদ্ধতার পিছনে কম্যুনিস্টরাই প্রধান, এরূপ একটা প্রচার চলছে। প্রেসিডেণ্ট নাসের ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের আয়তন আপাততঃ আর বাড়াবার বোধহয় পক্ষপাতী নন। সুতরাং ইরাক যদি ইউনাইটেড রিপাবলিকে যোগ দিতে না চায় তবে তার জন্য প্রেসিডেণ্ট নাসেরের মনে মনে দুঃখিত হবার কারণ নেই; কিন্তু ইরাকের গভর্নমেণ্ট কম্যুনিস্ট-দের দ্বারা প্রভাবান্বিত এই বলে নাসের গভর্নমেণ্ট বাগদাদের প্রতি দোষারোপ করছেন। মোটের উপর নাসের গভর্নমেণ্ট বর্তমানে কম্যুনিস্ট বিরোধিতার মুখপাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সেই কারণেই হোক অথবা নিজেদের পূর্ব কর্মের কুফল দেখেই হোক আমেরিকা ও বৃটেন নাসেরের প্রতি প্রসন্নভাব দেখাতে শুরু করেছে। আমেরিকার কাছ থেকে আসোয়ান বাঁধের জন্য আবার সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি আসছে বলে মনে হয়। সুয়েজের ব্যাপার নিয়েও মিশর এবং বৃটেনের মধ্যে যেসব অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়েছে সেগুলিরও আশু নিষ্পত্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

৪।১।৫৯

রান-আউট

শচীন কর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলার বিস্তৃত বিবরণের জন্য এ প্রবন্ধ নয়, সে বিবরণ পাঠক ইতো-মধ্যেই সংবাদপত্রের মারফতে পেয়ে গেছেন। খেলা-শেষে যে-আলোচনায় পথঘাট, কাফে-রেস্তোরাঁ মুখর হয়ে ওঠে, যে-প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নিজের মনে মনেই, সে সম্বন্ধেই দু' একটি কথা বলছি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল টসে জিতে প্রথম দিনে অর্থাৎ ৩১শে ডিসেম্বর তিনটি মাত্র উইকেট খুইয়ে ৩৫৯ রান করেন। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১লা জানুয়ারী আগের দিনের অসমাপ্ত খেলার জের টেনে আর দুটি এবং সবশুদ্ধ পাঁচ উইকেটে ৬১৪ রান ক'রে চা-পানের বিরতির সময় ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এই রানের মধ্যে একটি ডবল আর দুটি সিঙ্গল সেঞ্চুরি হয়।

ভারত প্রথম দিন খেলতে নেমে দু' উইকেটে ২৯ রান করেন। আউট হলেন পি রায় আর নরী কণ্ট্রাক্টর, ভারতের ওপেনিং জুটি, ভারতের ভরসা। দ্বিতীয় দিনে মাত্র ১২৪ রান ক'রে ভারতীয় দল আউট হয়ে যায়। পরে সেই দিনেই ফলো অন্ করে খেলতে নেমে পাঁচ-পাঁচটি উইকেট খুইয়ে তাঁরা রান তোলেন মাত্র ৬৯. এই পাঁচজনের মধ্যে রয়েছেন চৌকস খেলোয়াড় পি রায়, নরী কণ্ট্রাক্টর, উমরিগড় প্রভৃতি।

পাঁচ উইকেটে ৬১৪ রান আর প্রায় দু' ইনিংস-এ খেলার সময় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস-এ খেলার সময় ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস তখনও শেষ হয়নি। ১৫ উইকেটে রান তোলেন মাত্র ১৯৩। ৬১৪-র পর মাত্র ১৯৩, পাঁচ উইকেটের পর ১৫ উইকেট, —ব্যাপারটা প্রায় অবিশ্বাস্য। তাই পরাজয়ের মুখে ভারতের অসহায় অবস্থা দেখেও বিদ্রূপ টিটকারির অন্ত থাকে না, সমা-লোচনা কঠোর হয়ে ওঠে সবার মুখে মুখে। কেউ বলেন—"টিকিটের টাকা ফেরৎ দিক, কেউ বলেন "এই শেষ মশাই, এসব এলে-বেলে খেলা দেখার জন্যে আর গাঁটের পয়সা গচ্চা দিচ্ছিনে।" উচ্চ মূল্য দিয়ে যাঁরা স্টল ভাড়া নিয়েছিলেন তাঁরা কী বলেন শুনিনি বটে কিন্তু এ কথা ভাবতে বেগ পেতে হয় না যে, তাঁরা নিজের কপালে করাঘাত করার পর ভারতের খেলোয়াড়দের কপালে আগুন লাগার কামনা ছাড়া আর কিছু করেন নি। কোন খেলোয়াড় একটু-খানি জল খেতে চেয়েছে ব'লে তা নিয়েও কোন কোন দর্শক তাঁকে ধিক্কার দিয়েছেন। হারতির মুখে জল খেতে চাওয়াও অপরাধ!

এ সমস্তই হলো রাগের কথা। দুঃখটা বুঝি, রাগের কারণ বুঝিনে। কিন্তু সে কথা থাক। ভাবছি খেলা শেষ হয়ে যাবে, রাগও হয়ত পড়ে যাবে। কিন্তু যে-কথাটা একটা চিরন্তন জিজ্ঞাসা হয়ে থাকবে তা বুঝি শেষ হবে না, শেষ হওয়া উচিত নয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল পাঁচ উইকেটে ৬১৪ রান করেছেন আর ভারতই বা পনরো উইকেটে কেন মাত্র ১৯৩ রান করলেন, রাগারাগি করবার আগে তা একবার তলিয়ে বুঝতে হবে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে সোবার্স প্রমুখ কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড় আছেন। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে বিশ্বখ্যাতি ডার্বির মতো রাতারাতি টিকিট কিনে অর্জন করা যায় না, তার জন্য চাই অক্লান্ত শ্রম, কঠোর সাধনা, দৃঢ় সংকল্প। শ্রমে, সাধনায় সংকল্পে তাঁরা যে সফলকাম হয়েছেন তা তাঁদের খেলাতেই সুস্পষ্ট হয়েছে। এখানে বিশ্ববিখ্যাত রণজির কথাটার উল্লেখ হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রণজির

অপূর্ব ক্রীড়াকৌশল সম্বন্ধে নাকি অনেকেই বলতেন যে, এ দক্ষতা ঈশ্বর-দত্ত। কিন্তু রণজি এই অভিমতের প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তাঁর খেলা উন্নত হয়েছে নিয়মিত ও উপযুক্ত শিক্ষায়, অনুশীলনে, সমালোচক ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের সংগে ভুল ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল রণজি বর্ণিত পন্থা অনুসরণ করেন কি না জানিনে। কিন্তু ব্যাটিং-এর যে অপূর্ব কৌশল তাঁরা দেখিয়েছেন, তা নিশ্চয়ই তাঁরা বিনা সাধনায় একদিনে আয়ত্ত করেন নি। ব্যাটচালনায় কী নয়নাভিরাম ভংগী, কব্জির কী অপূর্ব কারিগরি। পায়ের কাজ না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। স্বর্গত 'ক্রিকেট গবর্নর' ম্যাকার্টনি বলতেন—পায়ের কাজ ভালো না হলে ক্রিকেট খেলা হয় না।

যে-সাবলীল ভংগীতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল শর্ট রান তুলেছেন তা যে বহুদিনের অনুশীলন ও জুটিদের পরস্পরের মধ্যে বোঝাবুঝির ফল তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। কোন মারে নিশ্চিত বাউণ্ডারী হবে জেনেও তাঁদের কখনো নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখিনি। বাউণ্ডারী হয়ত শেষ পর্যন্ত হলো না, কিন্তু তাঁরা শুধু অলস দৌড়ের সাহায্যে চার নম্বর করেছেন। কতবার এই রকম তিনের মারে চার রান উঠেছে।

এ ছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্যাটসম্যানদের সংযম ও ধৈর্য। বলের সেই ধার আর নেই, পর পর দু'বার সহজেই হয়ত কেউ বাউণ্ডারী করেছেন কিন্তু তিন বারের বার দেখা গেল তিনি অকস্মাৎ শান্ত হয়ে গেছেন। একশত রান করার পরও কানহাই যে-কায়দায় ব্যাট চালিয়েছেন তা দেখে অনেকবার তাঁকে ওপেনিং ব্যাট বলে মনে হয়েছে। কিন্তু কানহাই কখনো চঞ্চল হননি, একশতের পর দুই শতের চেষ্টা করেছেন, দুই শতের পর তিনশতের দিকে দৃষ্টি। অপূর্ব সংযম আর ধৈর্য।

ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় পেয়েছি সোবার্সের ব্যাটিংএ। গুপ্তের গুগলী ভালো ক'রে দেখে নেবার জন্য সোবার্স যে-ভাবে শান্ত হয়ে কয়েকটি ওভার কাটিয়েছেন তা দেখে মনেই হয়নি তাঁর হাতে আছে এত জোর, তাঁর আছে উইকেটের চারিদিকে নানা বিচিত্র মারের কৌশল। আর শুধু কানহাই-সোবার্সই নয়, অন্যান্য ব্যাটসম্যানও অনুরূপ সংযম ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন। পাঁচশতের ওপর রান উঠেছে, প্রতিপক্ষের আক্রমণ সুস্পষ্টভাবে পর্যুদস্ত, কিন্তু তবু তাঁরা চঞ্চল হন নি, প্রতিটি বল ওয়াচ করেছেন, প্রতিটি বোলারকে যতটুকু সম্মান দেওয়া দরকার তা দিয়েছেন।

এই গেল ব্যাটিং-এর দিক। ফিল্ডিং-এও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সমান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বোলার স্টার্ট নেবার সংগে সংগে সবার একাগ্র দৃষ্টি ঐ ব্যাটের দিকে। একেবারে অর্জুনের লক্ষ্য বললেও ভুল হয় না, পাখী নয়, পাখীর চক্ষুই লক্ষ্যবস্তু। এই একাগ্রতা চলেছে ওভারের পর ওভার। ওপরে ওঠা বল তাঁরা অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রগতিতে লুফেছেন। সরাসরি মাটির ওপর দিয়ে চালানো বল ছোঁ মেরে তুলেছেন জল থেকে মাছরাঙার মাছ তোলার মতো। বল তুলে আর এক মুহূর্ত হাতে রাখেন নি, সংগে সংগে ছুঁড়েছেন লক্ষ্যের দিকে। কোন্ দিকে বল ছুঁড়লে ব্যাটসম্যান সহজেই আউট হবেন সে সম্বন্ধে মনে কোন দ্বিধা নেই। একটি মাত্র নম্বর যেখানে হয় না, সে বলের ওপরও মরি বাঁচি জ্ঞান শূন্য হয়ে তাঁদের ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছি।

দোষ ত্রুটি তাঁদের কোন কিছু নেই একথা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়। কিন্তু যে-চেষ্টায় সমস্ত দোষ-ত্রুটির ওপরে ওঠা যায়, সে চেষ্টা দেখেছি তাঁদের প্রতিটি খেলোয়াড়ের মধ্যে, ব্যাটিংএ, ফিল্ডিং-এ। সুতরাং পাঁচ উইকেটে ৬১৪ রান নেহাৎ ফ্লুক একথা বলতে পারব না।

এবার ভারতীয় দলের কথায় আসা যাক। তাঁদের খেলতে নামতে হয়েছে হল্-গিলক্রিস্টের মতো ফাস্ট বোলারের বিরুদ্ধে। রামজী-নিশার-সুটেরা আর নেই। ফাদকার আজ শ্লথগতি। বাইরের টিমের সংগে কখনোসখনো খেলতে নেবে ফাস্ট বলের সংগে তাঁদের মোকাবিলা হয় বটে, কিন্তু নিয়মিত অনুশীলনের অভাবে ফাস্ট বলের গতিভংগী আজ তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। যে-অনুশীলনে ফাস্ট বলের বিরুদ্ধে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে দাঁড়ান যায়, সেই অনুশীলনের সুবিধে আজ ভারতীয় দলের নেই। ঘোড়দৌড়ের ভাষায় বলা যায় তাঁরা ৯-৭ হ্যাণ্ডিক্যাপ নিয়ে মাঠে নেমেছেন। হলের বাম্পারের মুখে খানিকটা ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তবু বেদরদী দর্শক বলেছেন—'ব্যাটারা কাঁপছে।'

ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের শোচনীয় ব্যর্থতা আমি সমর্থন করছি একথা যেন পাঠক মনে না করেন। শুধু ফাস্ট বলের জন্যই তাঁরা ব্যর্থ হলে আমি তাঁদের সমর্থন করতাম। কিন্তু এই অবিশ্বাস্য শোচনীয় ব্যর্থতা শুধু বিপক্ষের ফাস্ট বলের জন্যই হয়নি। ফাস্ট বল দায়ী এক পার্সেন্ট, আর বাকী নব্বই পার্সেন্ট দায়ী তাঁরা নিজেরাই, স্বখাত সলিলেই তাঁরা ডুবেছেন। সেই কথাটাই বলছি।

দ্বিতীয় দিন চা-পানের পর ভারতের দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান—পি রায় ও নরী কণ্ট্রাক্টর ইনিংসের সূচনা করতে আসেন। ঠিক এক ঘণ্টা খেলার পর তাঁদের রাণ সংখ্যা হয় মাত্র ১৯। এই শম্বুকগতি রানের সমালোচনা কেউ করেছেন ব'লে শুনিনি। প্রায় পাঁচ দিন ফিল্ডিং করে তাঁরা পরিশ্রান্ত। এই অবস্থায় দ্রুত রান তোলা সম্ভব নয় এবং কেউ তা চায়নি। সবাই চেয়েছে সেদিনের বাকী সময়টা টুকটাক ক'রে টিঁকে থেকে পরের দিন তাঁরা পূর্ণ বিশ্রাম নেবেন এবং তারপরে নতুন উদ্যম নিয়ে খেলবেন তিন তারিখের খেলায়।

কিন্তু তা হলো না। এক ঘণ্টার পর গিলক্রিস্টের জায়গায় রামাধীন বল করতে এলে কণ্ট্রাক্টর অকস্মাৎ অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠলেন এবং চতুর্থ বলে এল বি ডবলিউ হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে গেলেন। রান না করে শুধু টিকে থাকবার ইচ্ছে থাকলে রামাধীনের বলে কণ্ট্রাক্টর তিন ঘণ্টাও খেলতে পারেন। আমরা এই টিকে থাকাই চেয়েছিলাম। তিনি আমাদের নিরাশ করলেন। সোবার্স অসাধারণ সংযম ও ধৈর্যের সঙ্গে গুপ্তের বল ওয়াচ করছিলেন। কিন্তু নরী কণ্ট্রাক্টর তা করেননি। কানপুরে গুপ্তে ন'টি উইকেট নিতে পারেন, কিন্তু রামাধীনও

নেহাৎ রামাশ্যামা ন'ন। সুতরাং তাঁর বলে অকারণ অসংযম স্বখাত সলিল ছাড়া আর কী।

তারপর পি রায়। গিলক্রিস্টের ফাস্ট বল। ব্যাটসম্যানের বাঁ দিকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে ফিল্ড সাজানো হয়েছে। শুধু দুর্ভেদ্য প্রাচীর নয় তাঁরা, তাঁদের প্রসারিত পাঞ্জা বুঝি এক একটি মৃত্যুবিবর! সেই ব্যূহ ভেদ ক'রে রায়ের বল মারবার ঝোঁক গিলক্রিস্টের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি ক্রমান্বয়ে মায়াজাল বিস্তার করে যেতে লাগলেন। সংবাদদাতা রায়ের এই খেলার ভঙ্গী সম্বন্ধে লিখেছেন,—

"It was disappointing to see sounder Roy show a tendency to move aside to the fourth stump, leaving his leg stump almost unguarded and in fact he fell to such a habit producing a most awkward shot".—

আমরা সংবাদদাতার সঙ্গে একমত। এই ধরনের অভ্যাস রায়ের নূতন নয়। কিন্তু তাহলেও রায় একজন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। ওয়েস্ট ইন্ডিজের নিখুঁত ফিল্ডিংএর কথা তাঁর অজ্ঞাত নয়। ভারতীয় দল তাঁর ওপর কতটা নির্ভর করেন তা-ও তিনি জানেন। বোর্ডের চোখে আঙুল দেওয়া ৬১৪ সংখ্যাটার দিকে তাকিয়ে জয়ের কথাটা না ভাবলেও, দায়িত্বের কথাটা তাঁর ভাবা উচিত ছিল। সে-বল ছেড়ে দিলে কোন ক্ষতি হতো না সেই বলে ব্যাট চালিয়ে দিয়ে পি রায় আউট হয়ে গেলেন। আমাদের খেলোয়াড়দের ধৈর্য ও সংযমের অভাবের এটি হলো দ্বিতীয় উদাহরণ। মাত্র ২৯ রানে, আবার তার মধ্যে ১১ অতিরিক্ত, ভারতের দুটি সেরা ব্যাটসম্যানের পতনে সাধারণ দর্শক হয়ত কপালের কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরেছেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে এ কপাল নয়, স্বখাত সলিল।

তিন তারিখে খেলতে নামলেন কেনি ও ঘোরপাড়ে। ঘোরপাড়ে গোড়ার দিকে খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলতে থাকেন। কেনিও কোন রকম অসংযত মার মারতে যাননি। তাঁর হাতের দু' একটি নয়নাভিরাম মার দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়। তাঁদের সতর্ক ক্রীড়া-কৌশলে রান সংখ্যা ধীরে ধীরে পঞ্চাশের কোঠায় ওঠে। কিন্তু যে ধৈর্য ও সংযমের অভাবের কথা বলেছি তার সংক্রমণ বুঝি ঘোরপাড়েও এড়াতে পারলেন না, অকস্মাৎ বাইরে বেরিয়ে-যাওয়া একটি বলে অকারণে খোঁচা মারতে গিয়ে ঘোরপাড়ে আউট হয়ে গেলেন। একে সংক্রমণ ছাড়া কী আর বলব, অনুরূপ বলে খোঁচা মারার চেষ্টাতে কেনিরও পতন হলো।

উমরিগারের সঙ্গে মঞ্জরেকার খেলতে নাবলেন। মঞ্জরেকার প্রথম বলটি থামালেন। কিন্তু একটি Yorkerএ দ্বিতীয় বলেই আউট হয়ে গেলেন। ক্রিকেটের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন Yorkerকে আগে বলা হতো tice, মানে ব্যাটের একবারে গোড়ায় বল ফেলে ব্যাটসম্যানকে প্রলুব্ধ করা। খেলার ইতিহাসে মঞ্জরেকারের অভিজ্ঞতার দিকে চোখ না রাখলেও, শেষের দিনে তাঁর দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং অনেকেই নিজের চোখে দেখেছেন। খেলায় নেমে বলের গতিতে ভালো করে চোখ বসতে না-বসতে মঞ্জরেকারের মতো ব্যাটের পক্ষে এই প্রলোভন শোভন তো নয়ই, বরং আত্মঘাতী। এরপর কাদকার স্লিপে ক্যাচ তুলে আউট হলেন, তামানেও আউট হলেন অনুরূপ বলেই।

সুরেন্দ্রনাথ উমরিগারের সঙ্গে যোগ দিলেন। তখন ভারতের একে একে নিভিছে দেউটি অবস্থা। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথের আগমনে কেউ উৎফুল্ল হলেন না, তাঁরা বরং ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল কথাটাই বুঝি ভাবলেন! কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ প্রমাণ করলেন যে অপরিসীম ধৈর্য আর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে খেলতে নামলে সময়ে সময়ে অসংযত ভীষ্ম-দ্রোণকেও লজ্জা দেওয়া যায়! প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপটার মুখে সুরেন্দ্রনাথ ৯০ মিনিট

পর্যন্ত খেলেছেন, এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। আমরা নিশ্চয়ই বলব—সাবাস সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর টিকে থাকবার সংকল্পের জন্যই উমরিগার কিছুটা রান তোলার সুযোগ পেয়েছিলেন, নতুবা ভারতীয় দল শতাধিক রান তুলতে পারতেন কি না সন্দেহ। কিন্তু আবার সেই দুর্ঘটনা ঘটল। যে-মারে রান হয় না, সেই মারে একটি ওভার থ্রোর সুযোগ নিয়ে শুধু একটি রান তোলার জন্য উমরিগারের মতো খ্যাত খেলোয়াড় ভুল করলেন, তাঁরই কল-এ সাড়া দিতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ রান আউট হয়ে গেলেন। তাঁর এই আউট হয়ে যাওয়া মর্মান্তিক। কিন্তু তবু আবার বলব—সাবাস সুরেন্দ্রনাথ।

তারপর উল্লেখযোগ্য আর কিছু ঘটেনি। গোলামের একটি বাউন্ডারী এবং তারপরের বলেই আবার বাউন্ডারীর চেষ্টায় আউট হয়ে যাওয়ার মধ্যে নতুনত্ব নেই। কিন্তু সেটি ছোটখাটো গল্পের বাউন্ডারী দর্শনীয়। সমস্ত খেলার মধ্যে একটি মাত্র ওভার বাউন্ডারীর কৃতিত্ব অর্জনের সুযোগ পেতে পেতে-পেতেও পেলেন না। তবুও তাঁর মারের তারিফ সবাই করেছেন আর হয়ত ভেবেছেন গল্পের বাউন্ডারী, ও কি নক্ষত্র পর ব্যাটের প্রহার!

দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হলো। ভারত বরাবরই দ্বিতীয় ইনিংসে ভাল খেলেন এই রকম একটা ধারণা সবারই আছে। সেই ধারণার প্যারা শালির ওপরে দর্শকরা একটু নড়ে চড়ে বসলেন। কিন্তু এবার তার হলো ব্যতিক্রম। ২৫ মিনিট খেলার পর হলের বাঁ-দিকে বেরিয়ে যাওয়া একটি বলে খোঁচা মারতে গিয়ে পি রায় ক্যাচ আউট হলেন। অনেকে বলাবলি করছেন আম্পায়ারের রায়কে আউট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নাকি ঠিক হয়নি, এই নিয়ে আম্পায়ারকে বেশ খানিকক্ষণ ব্যারাকিংও করেছেন দর্শকদের একটি অংশ। আমরা এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিছু না বলে শুধু বলব যে, বাইরে বেরিয়ে যাওয়া বলে খোঁচা দিতে যাবার চেষ্টার সিদ্ধান্তও রায়ের পক্ষে ঠিক হয়নি। উমরিগার এলেন। তিনি অনুরূপে ডান দিকে বেরিয়ে যাওয়া একটি বলে খোঁচা দিতে গিয়ে আউট হয়ে গেলেন। তারপর গেলেন কনট্রাক্টর। দ্বিতীয় ইনিংসে-এ ভারত ভাল খেলে ব'লে যাঁদের বিশ্বাস তাঁরা বোর্ডের দিকে তাকিয়ে যখন দেখলেন যে, ভারত তিন উইকেটে মাত্র দশ রান তুলেছে তখন নিজের চোখকেই বুঝি [illegible] বিশ্বাস করতে পারলেন না!

খেলার বিস্তৃত বিবরণ দেব না ইচ্ছা থাকলেও লিখতে লিখতে খানিকটা বিবরণ প্রায় বিস্তৃত আকারেই এসে গেল। ভারতীয় টিমের শোচনীয় ব্যাটিং বিপর্যয় হয়ত অনেক দিন দর্শকদের মনে থাকবে। কিন্তু এই ব্যর্থতার ইতিহাস যদি খেলোয়াড়দের মনে থাকে তাহলে তাঁরা উপকৃত হবেন বলেই মনে করি। অকারণ অসংযমে প্রায় সবাই আউট হলেন। তা নইলে মারের কৌশল অনেকেরই জানা, ফাস্ট হলেও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বল এমন কিছু আহামরির পর্যায়ে পড়ে না, তবু তাঁরা আউট হলেন শুধু নিজেদের অকারণ চঞ্চলতায়। এই কথাটাই মনে রাখতে সবিনয় নিবেদন জানাবো।

ভারতীয় টিমের ফিল্ডিং-এর ত্রুটি-বিচ্যুতির বিস্তৃত বিবরণের কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। গুটি কয়েক ক্যাচ তাঁরা মিস্ করেছেন। কিন্তু সেইটেই বড় কথা নয়। বড় কথা হলো ফিল্ডিং এ আমাদের স্বভাবসুলভ শ্রমবিমুখতা। সহজে ছুটতে আমরা নারাজ। ছুটতে গিয়ে হঠাৎ যদি মনে হয় বাউন্ডারী নির্ঘাত হয়ে যাচ্ছেই তখন ছুটোছুটিকে আমরা শ্রমের অপচয় বলেই মনে করি। দুজনের মাঝখান দিয়ে বল ছুটে গেলে আমরা ভাগের মায়ের ছেলেদের নীতিই অবলম্বন করি! মাঠ থেকে ছুটন্ত বল ক্ষিপ্রগতিতে তুলে নেওয়ার অভ্যেস আমাদের সড়গড় হয়নি। কিন্তু তার চেয়েও মারাত্মক হলো অবিলম্বে বল ছুঁড়ে না দেওয়া অভ্যেস। বল ধরে সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে না দেওয়ায় কত যে শর্ট রাণ হয়েছে তার গোনাগুণতি নেই। যে-অনুশীলনে ফিল্ডিং-এ হাত পাকে সেই অনুশীলন কোথাও হয় কি না জানিনে। খেলার আগে মিনিট দুই এর তার হাতে [illegible] দিয়ে লোফালুফিই অনুশীলন নয়।

পর পর দু দিনেই ব্যাটিংএর আত্মঘাতী নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আমাদের ফিল্ডিংএর দুর্বলতা। এই সঙ্গে যেখানে ফাস্ট বোলারের শোচনীয় অভাব সেখানে পনের উইকেটে ১৯৩ রান এবং প্রতিপক্ষের পাঁচ উইকেটে ৬১৪ রান শুধু কপালের দোষেই হয়নি।

ক্রিকেট সমালোচকরা টিমে দু একজন ফাস্ট বোলারের প্রয়োজনের কথা বারবার বলেছেন। ক্রিকেট পরিচালনার ভার যাঁদের হাতে ন্যস্ত তাঁরাও যে ফাস্ট বোলারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন একথা ভাববার কারণ নেই। কিন্তু তাঁরা ফাস্ট বোলার নেই বলে তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাচ্ছেন। নেই তা জানি। ভারতের টিমে নেই। কিন্তু সারাভারতে ফাস্ট বোলার গড়েপিটে তোলা যায় এমন কোন সম্ভাবনা কোন একটি ছেলেতেও নেই একথা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু সেই ছেলেটিকে পাট হাতী ছেড়ে দিয়ে আবিষ্কার করা যাবে না। যে সাধনা যে শ্রম স্বীকার করে কেমন একটি ফাস্ট বোলার আবিষ্কার করা যায় সেই সাধনা ও সেই শ্রম পরিচালকবর্গের নেই, একথা রূঢ় হলেও সত্য। খেলোয়াড় আবিষ্কারের দিকে ঝোঁক না দিয়ে ক্রিকেট পরিচালনা আজ সত্যিই প্রায় প্রহসনে দাঁড়িয়েছে। ফলে কৃতিত্বের দৌড় প্রতিযোগিতায় আমরা রান আউট হয়ে গেলাম।

খেলোয়াড় তাঁর দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন বা যাচ্ছেন বলেই পরিচালকবর্গ তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। খেলাটি যখন কোন ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় এবং এর সঙ্গে ভারতের সম্মান জড়ো আছে, তখন খেলোয়াড় নির্বাচনে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোন প্রশ্নই উঠে না। খেলায় রাজনীতির প্রশ্রয় কেউ সমর্থন করবেন না। তাই অভিযোগ শুনি রাজনীতিই নাকি নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের একমাত্র মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে! সত্য মিথ্যে সঠিক জানিনে, কিন্তু নাম না করেও একথা বলা যায় বর্তমান টিমে কারো কারো নির্বাচন এবং টিম থেকে কারো কারো অপসরণকে যুক্তি দিয়ে মেনে নেওয়া সত্যিই শক্ত। যে পরিচালনা প্রসঙ্গ পার্লামেণ্টে পর্যন্ত বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়েছে তা নেহাৎই অকারণে হয়েছে বলে মনে করতে পারছিনে।

ইডেন গার্ডেনে টেস্টের ছায়া ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ক্রিজের দিকে খেলাশেষের ইঙ্গিত নিয়ে। মনে হলো সেই ছায়া বুঝি দুঃখ রজনীর ইঙ্গিত নিয়ে ভারতের ক্রিকেট খেলার ওপরও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে!

(১১)

তার ক্ষীণ, অপস্ট স্বগত-প্রণয়ের কথা জানত মোটে আর একজন, ক্লাসেরই একটি ছেলে, তার নাম দেওয়া যাক বিজন।

এই একটি ছেলের সঙ্গেই সৌর কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিল। তার কারণ এই নয় যে, সব ছেলের ভিতর থেকে বিজনকেই তার বেছে নিতে ইচ্ছা হয়েছিল। বিজনকে সে যে বিশেষভাবে পছন্দ করেছিল তাও নয়। বিজনই তার কাছে এগিয়ে এসেছিল।

সৌর ক্লাশের যে-বেঞ্চে বসত, সেটা একেবারে পিছনে, সব শেষের সারি, তার পরেই দরজা। তারই পাশে বসত বিজন। প্রথম আলাপ অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে হয়নি। সৌর দেখেছিল একটি ছেলে রোজই ক্লাশ শুরু হবার মিনিট কয়েক পরে চুপে চুপে তার পাশে এসে বসে। নাম-ডাকা শেষ হলেই কিছুক্ষণ উসখুস করে, তারপর মাথা নীচু করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। যতক্ষণ বসে থাকে, ততক্ষণও লেকচারে তার কান থাকে না, পেন্সিল কাটে, খাতায় ছবি আঁকে, অথবা বাজে নবেল-টবেল জাতীয় কিছু পড়ে।

সৌরর সঙ্গে তার কিছুমাত্র মিল নেই না চেহারায়, না আচরণে, না প্রকৃতিতে।

সে-ই একদিন যেচে আলাপ করল।

"পরের ক্লাশটা কার?"

সৌর রুটিন দেখে বলল, "সি এম এর। চার নম্বর রুম।"

"একটা উপকার করবেন? আমার হয়ে প্রক্সি দিয়ে দেবেন?"

প্রক্সি কথাটার মানে সৌর অবশ্য জেনে ফেলেছিল : নাম-ডাকের সময় গরহাজির কোন ছাত্রের হয়ে সাড়া দেওয়া। এই প্রথাটার প্রচলন অবাধ, তবে এতকাল সৌর ছিল শুধুই দর্শক বা শ্রোতা, কেননা অন্য কারুর সঙ্গেই তার তেমন মাখামাখি ছিল না। এই প্রথম একজন তাকে অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করল।

"আমার নাম বিজন—বিজন পালিত' রোল নাম্বার থার্টি-এইট। মনে থাকবে?'

বলেই ছেলেটি একবার ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

সৌর অবাক হয়েছিল। সে যে এ-কাজে রাজী নয়, এ-সবের অভিজ্ঞতা তার নেই, এটুকু বলবার অবসরও পেল না।

পরের পিরিয়ডে সি এম এ-র ক্লাশে। অর্থনীতির প্রবীণ অধ্যাপক ক্লাশে এলেন। চোখে মোটা চশমা, বগলে মোটা মোটা বই। সৌর সেই থেকে কেবলই মনে মনে বলেছে, "কক্ষণও ওর হয়ে প্রক্সি দেব না আমি" অথচ অনিচ্ছা সত্ত্বেও বারবার জপ করেছে "থার্টি-এইট, থার্টি-এইট।" তার নিজের নম্বর কুড়ি।

সেই নম্বরে সে যথাসময়ে সাড়া দিল কিন্তু তার বুক-ধুকধুকানি কমল না। এখনও তার আসল পরীক্ষা বাকী। অধ্যাপক ডেকে চলেছেন, বাইশ, তেইশ... সাতাশ...ত্রিশ—বড় ঘড়িতে টকটক শব্দ করে যেন সেকেন্ডের কাঁটা সরে যাচ্ছে। সৌর শুনতে পেল, 'বত্রিশ—তেত্রিশ'—আর দেরী নেই, আটত্রিশ এসে পড়ল বলে। শেষ ইস্টিশনে পৌঁছবার কিছু আগে থেকেই যাত্রীরা যেমন অতি-ব্যস্ত হয়ে

বিছানাপত্র বেঁধে নেয়, সৌরও পাংশু, উত্তেজিত, তেমনই নিজেকে তৈরি করতে থাকল। "আটত্রিশ"—এই রোল-নম্বর ডাকা হলে সে সাড়া দেবে কি দেবে না, এই প্রশ্নটাই তখন আর বড় নয়, সৌর ততক্ষণে জেনে ফেলেছে সাড়া সে দেবেই। তাকে দিতে হবে। আধ-চেনা যে ছেলেটি কোন দিন ক্লাশে বসে না, পড়া শোনে না, তার কণ্ঠ-স্বরে কী একটা জাদু আছে, আর ব্যক্তিত্বে প্রচ্ছন্ন একটা শক্তি, সৌর ঠিক ধরতে পারছিল না, কিন্তু প্রতিরোধ করবার ক্ষমতাটুকু খুইয়ে বসেছিল।

অধ্যাপক ডাকলেন "থার্টি এইট", সৌরর মনে হল, হুড়মুড় করে যে-গাড়িখানা এসে পড়ল, সে থামবে না, কিন্তু দৌড়ে তারই পা-দানিতে তাকে উঠতে হবে, গত্যন্তর নেই। যেই প্রতীক্ষিত নম্বরটি তার কানে এল, অমনিই সৌর বলে উঠল—বরং নিজেকে বলতে শুনল—"ইয়েসার্"। নিজের গলা নিজের কানেই কেমন যেন ক্ষীণ, চেরা-চেরা, অদ্ভুত শোনাল।

সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতগতি একটা গাড়ি যেন সহসা ব্রেক কষে থেমে গেল। অধ্যাপক, সৌর টের পেল, তীক্ষ্নদৃষ্টিতে যেন এই-দিকেই চেয়ে আছেন। সার্চ-লাইটের মত সন্ধানী চোখ কাকে যেন খুঁজছে। আর সেই চোখ থামল ঠিক সৌররই মুখের ওপর এসে। সৌর গম্ভীর গলা শুনতে পেল, "তুমি সাড়া দিয়েছ?"

সৌর ঘাড় কাত করে স্বীকার করল।

"উঠে দাঁড়িয়ে উত্তর দাও।"

দাঁড়িয়ে উঠে সৌর কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "ইয়েস-সার"।

"তোমার নম্বর থার্টি এইট?"

"হ্যাঁ স্যার।" সৌরকে আবার মিথ্যে কথা বলতে হল, কেননা আর ফেরবার পথ ছিল না।

"কিন্তু তোমার নম্বর ত কুড়ি কিম্বা বাইশ, তাই না?"

সৌর অধ্যাপককে খাতায় দ্রুত চোখ বুলিয়ে যেতে দেখল।

—"ইয়েস, হিয়ার য়ু আর—। তোমার নাম সৌরেশ?"

"ইয়েস সার।"

"আবার বিজনও? বাট য়ু কান্ট বী বোথ অ্যাট দ্য সেম টাইম?"

সৌর আবার বলল, "ইয়েস সার", তার শব্দকোষে অন্তত তখন মাত্র ওই দুটি শব্দই অবশিষ্ট ছিল।

"তাছাড়া, বিজনকে আমি চিনি। বিজন তো তুমি হতে পারবে না।" অধ্যাপকের কণ্ঠ গম্ভীর, মুখে বিদ্রূপের হাসি।

"বিজন হতে হলে তোমাকে আরও লম্বা চওড়া হতে হবে, বুঝলে? কব্জি মোটা হবে, মাস্‌ল দোলান। আর গলাতেও জোর আনতে হবে। এরকম চিঁ-চিঁ গলায় কি বিজন হওয়া যায়? সে কলেজ টীমের খেলোয়াড়, জান না?"

সৌর বসে পড়েছিল। কান দুটি লাল, মুখের ভিতরটা তিতো। সে ভাবছিল, আর কী, এর পরে কী, অপমানের আর কত বাকী। এর পরে কি শাস্তিও আছে? খাতা থেকে তার নাম কি কেটে দেওয়া হবে? সি এম কি তাকে বের করে দেবেন ক্লাশ থেকে?

কিন্তু সি এম সে-সব কিছুই করলেন না, একটু পরেই নাম-ডাকার খাতাটা মুড়ে বই খুলে পড়াতে শুরু করলেন।

ক্লাশের পর সকলের পিছে সে মাথা নীচু করে করিডর দিয়ে চলছিল, হঠাৎ তার পিঠে হাত পড়ল। ফিরে চেয়ে দেখল, বিজন। বিজন বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা আছে।

আর তখনই সৌর, দুর্বল, ভীতু সৌর, ভয় পেল। সে ত এক নিমেষেই বুঝে নিয়েছে কী কথা আছে তার সঙ্গে বিজনের। এই সবল ক্লাশ-পালান সহপাঠীর কাছে সে প্রচণ্ড একটা ধমক খাবে। অধ্যাপক সহজে রেহাই দিয়েছেন, এ দেবে না। সামান্য একটা কাজের ভার নিয়েছিল সৌরকে, সৌর সেটা হাসিল করতে পারেনি, নিজেকে ত বটেই, বিজনকে সুদ্ধ অপদস্থ করেছে, এই অপরাধের কি ক্ষমা আছে? একবার আড়-চোখে চেয়ে দেখল সৌর—কী আছে বিজনের চোখে, রোষ না বিদ্রূপ, ঠিক ঠাহর করতে পারল না। যদি বিজন রুষ্টই হয়ে থাকে, সে কী করবে, চেপে ধরবে কি সৌরর হাতের কব্জি, একটু-একটু করে মুচড়ে দেবে আর জ্বলতে থাকবে তার চোখ দুটো? সৌরর ভয় করছিল। অথবা বিজন ওর গালে আলগোছে একটা চড় মেরে ধাক্কা দিয়ে হেসে উঠতে পারে, বলতে পারে, "অপদার্থ, মেনিমুখো কোথাকার।"

বিজন ওকে সিঁড়ির কোণে নিয়ে এসেছিল। একখানা হাত আলগোছে তখনও ওর পিঠে রাখা ছিল। শুনল, সৌর অবাক হয়ে শুনল, বিজন খুব নীচু গলায় ওকে বলছে, "ভাই, আমাকে মাপ কর।"

"মাপ করব? আমি?" সৌর সিঁড়ির ধাপগুলোকে নীরবে বলতে থাকল, "কেন, আমাকে ও মাপ করতে বলছে কেন? দোষ করেছি আমি, আবার মাপও আমিই করব? বিজন ঠিক কি বলতে চাইছে, আমি বুঝতে পারছি না", সৌর অনুনয়ের সুরে ধাপ-গুলোকে বলল, "তোমরা একটু বুঝিয়ে দাও।"

বিজন বলছিল, "আমার জন্যেই আজ সি এম-এর কাছে তোমাকে অপদস্থ হতে হল। ভাই তুমি মনে কিছু ক'র না।"

সৌর, অভিভূত সৌর, তখনও কাঁপছিল—এবার বিস্ময়ে। ছাত্রদলের নেতৃস্থানীয় একটি ছেলে বন্ধুর মত তার পিঠে হাত রেখেছে, সহৃদয় কণ্ঠে কথা বলছে, তার কয়মাস শহরবাসের ইতিহাসে এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম।

বিজন বলছিল, "তুমি আমার যে উপকার করেছ, তা ভুলব না।"

ক্ষীণ গলায় সৌর বলতে চেষ্টা করল, "উপকার করলুম কোথায়, করতে ত পারিনি।"

তেমনই সস্নেহে বিজন বলল, "করতে চেয়েছ ত। চাওয়া আর পারা একই কথা।"

বলতে বলতে বিজন ওর মুখে একটা সিগারেট গুঁজে দিল। ওরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিল। বাইরে, আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বিজন বলল, "আজ থেকে আমরা বন্ধু।"

অভ্যাস নেই, সিগারেট টান দিতে গিয়ে সৌর খুক্‌খুক্‌ করে কাশছিল, ওর দুটো চোখ লাল হয়ে উঠেছিল, তবু সিগারেট ফেলে দেয়নি। ভালও লাগছিল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়, পোড়া তামাকের বিচিত্র স্বাদে, ওর ভিতরে আত্মপ্রত্যয়ের একটি ছবি জাগছিল, "আমি আর এরকম থাকব না, এই আনাড়ি-পনা আর না", সৌর বলছিল মনে মনে।—"আমি অন্যরকম হব, সকলের মত হব, স্বাভাবিক হব।"

বিজনের মধ্যেই সৌর তার প্রথম নাগরিক বন্ধু পেল।

এই বিজনকেই সৌর একদিন সব খুলে বলেছিল।

একটা ম্যাটিনী শো-এর পর দুজনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিল ময়দানে। ছোট একটা ফুলগাছের পাশে পা ছড়িয়ে বসেছিল। চিনেবাদাম ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খোসাগুলো দূরে ছুঁড়ে ফেলছিল।

সৌর বিজনকে সেই মেয়েটির কথা বলল। যে রোজ জানালায় এসে দাঁড়ায়। কালো দুটি চোখ তুলে তাকে নির্নিমেষে দেখে।

বিজন বলল, "শুধু দেখে? আর কিছু না?"

"আর কী?"

"কথা বলেনি?"

সৌর অবাক হয়ে বলল, "দূর!"

"চোখের কোনরকম ইশারাও না?"

"না।"

একটু যেন বিরক্ত হল বিজন, সৌরর হাত থেকে আধ-খাওয়া একটা সিগারেট

কেড়ে নিয়ে বলল, "সে না করুক, তুই ত করতে পারতিস!"

"কী করে করব।"

"এমনি করে।" বিজন ওকে চোখের ইশারার কায়দাটা শিখিয়ে দিল।—"একটা চোখের কোণা একটিবার কুঁচকেই বড়, বিস্ফারিত করে ফেলবি, যেন বন্দুকের ট্রিগার টিপলি, ব্যস, দেখবি, গুলি ঠিক গিয়ে বিঁধেছে।"

সৌরর তাতেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। অবিশ্বাসটা ব্যবস্থাপত্র সম্পর্কে নয়, ভয় ছিল তার প্রয়োগ-নৈপুণ্য নিয়ে। এই সেদিনও যে সামান্য একটা প্রক্সি দিতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলেছিল, এইসব গুলি ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপারটা হাসিল করা তার পক্ষে সহজ হবে না, বুঝতে পেরেছিল।

ওর সংশয়টা মনে মনে আন্দাজ করে নিয়ে বিজন বলল, "চোখের ইশারা দু'দিন যদি কাজে না আসে, তবে তৃতীয় দিনে একবার মুচকি হাসবি। দেখবি, এই হাসিটা অব্যর্থ। হাসিটা ও ফিরিয়ে দেবেই।"

"আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়?" সুবোধ ছাত্রের মত অনুসন্ধিৎসু গলায় সৌর শুধাল।

বিজন হেসে ফেলল ওর রকম দেখে।—"তাতেও অবশ্য ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই, মেয়েরা অনেক সময় মনের ভাব গোপন করে। সকলের কাছ থেকে লুকোয়। নিজেদের কাছ থেকেও। জানিস ত, ওদের বুক ফাটে ত মুখ ফাটে না?"

বোকার মত সৌর বলল, "তবে বুঝব কেমন করে?"

প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ ভঙ্গীতে বিজন মাথা নাড়ল।—"তবু বোঝা যায়। ওদেরও আলাদা একটা ভাষা আছে। প্রমাণ আছে, লক্ষণ আছে। এই যে বলছিস, তোর দিকে রোজ চেয়ে থাকে, এটাই ত একটা প্রমাণ।"

"প্রমাণ?"

বিজন নিশ্চিত গলায় বলল, "প্রমাণ।"

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বিজন বিজ্ঞের মত মাথা নাড়তে থাকল। মুখে শেষ বেলার রোদ এসে পড়ছিল, সেদিকে পিঠ দিয়ে বসল। যে-ভাবে ক্যারম খেলে, সেই-ভাবে আঙুল দিয়ে ঘাসের শিষ থেকে চিনে-বাদামের খোসাগুলো সরিয়ে দিতে থাকল। তার বিকেলটা যখন আরও চুপ, আরও ময়লা হয়ে এসেছে, তখন ধীরে ধীরে বিজন বলল, "অবশ্য আরও প্রমাণ আছে। ওর যদি ছোট কোন বোন বা বোনঝি বা ভাই থাকে, তাকে কোলে নিয়ে বারবার চুমু খাবে, তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে। আজ পর্যন্ত খায়নি?"

গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। বোকা-বোকা গলায় সৌর বলল, "সে-রকম কোন বোন-টোন ওর আছে কিনা জানি না যে।"

এবার যেন একটু রেগে উঠল বিজন। পা দিয়ে পোড়া সিগারেটটা থেঁতলে দিয়ে বলল, "কিছুই যখন জানিস না, কোন খবরই যখন নিসনি, তখন আমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছিস কেন। প্রেম করবার শখ ষোল-আনা, অথচ সাহস এক ফোঁটা নেই? ছিঃ।"

এই 'ছি'-শব্দটা গরম সীসের মত সৌরর কানে গিয়ে বিঁধল। ফুলগাছের একটা পল্লবকে সাক্ষী মেনে বলতে থাকল, 'বাস্তবিকই অপদার্থ, একেবারে অপদার্থ আমি।' বিজনের দিকে সে চাইতে পারছিল না। প্রক্সি দিতে অক্ষমতাকে বিজন একবার ক্ষমা করেছে, কিন্তু তার এই অমার্জনীয় ভীরুতার কোন ক্ষমা নেই।

রুষ্ট বিজন, সৌর সম্পর্কে হতাশ বিজন, বলেই চলছিল, "প্রমাণের কথা বলছিস? এমনি আরও হাজার প্রমাণের কথা আমি বলতে পারি। একবার ওর দিকে চেয়ে একটুখানি হেসে দেখ, সেই হাসি ও ফিরিয়ে দিক, দেখবি ভাব-বিনিময়ের আরও কত পথ খোলা হয়ে গেছে। গরজ ত ওদেরও। তোকে দেখে বারবার যদি গায়ের আঁচল টানে, সরায় আর ঢাকে,—তা-থেকেও মানে বুঝে নিতে পারিস।"

সৌরর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। একটা ঘাসের গোড়া চিবিয়ে চিবিয়ে সে রস-সংগ্রহ করছিল। অনেক পরে, যখন সন্ধ্যার ছায়া এসে ওর মুখখানা প্রায় আড়াল করে ফেলল, তখন সৌর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, "তুই হলে কী করতিস।"

"আমি?" বিজন হেসে উঠল হা-হা করে। "আমি হলে তোকে যা-যা শিখিয়ে দিয়েছি, তার সবগুলোই করতুম। তাতেও কাজ না হলে কোনদিন যে-কোন একটা সুযোগে, আড়াল মত পেলেই ওর হাত চেপে ধরতুম। ছোঁয়া পেলে ওরা নরম হবেই।"

"আমি তা চাই না," জোরে জোরে মাথা নেড়ে সৌর হঠাৎ বলে উঠল, "কোন ছোঁয়া-টোঁয়া আমি চাই না। আমি ওকে ভালবাসি মনে মনে। মন পেলেই ঢের পেয়েছি ধরে নেব।"

বিজন খুকখুক করে একবার কাশল। সৌরর কানে খুব বিশ্রী লাগল। শুনল, বিজন বলছে, "ওসব মন-টন সব বাজে জিনিস। ফাঁকা, সব হাওয়া। শুধু হাওয়া খেয়ে পেট ভরে না। শুধু মন পেয়ে মন ভরে না। ওসব হাওয়া-বাজী রাখ সৌর। তোকে মানুষ হতে হবে। জোর দেখাতে হবে। গটগট করে একদিন ওদের বাড়ি চলে যাবি—যে-কোন ছুতোয়, যত তাড়া-তাড়ি পারিস। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে কথা বলবি। পা টলবে না, গলা কাঁপবে না। পারবি না?"

সেই আধ-অন্ধকারে বিজন ওর দিকে চেয়ে রইল। অনেক পরে, অনেক ঘাসের শিস ছিঁড়ে ছিঁড়ে, সৌর শেষে সম্মোহিতের মত বলল, "পারব।"

আর তখনই বিজন ওর হাতে একটা সিগারেট দিয়ে ধরিয়ে দিল। দেশলাইয়ের আলোয় সৌরর মুখটা একবার দেখে নিয়ে ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "সাবাস! এই ত চাই। সাহস না থাকলে আবার পুরুষ?"

একটি ছন্নছাড়া পরিবেশে, ময়দানে বসে, কুহেলী-মলিন সন্ধ্যায়, সৌর পৌরুষের বিচিত্রা, ইতিপূর্বে-অজ্ঞাত সংজ্ঞা শিখল।

(ক্রমশ)

মর্ৎসি একটি নতুন খাতা কিনেছে। পাছে কোনো রকমে দুমড়ে যায়, সেই ভয়ে সেটিকে হাতে করে নিয়ে চলেছে। খাতাটি পাকা লেবুর মত হলদে রঙের। মর্ৎসির নিজের হাত দুখানি হলিহক ফুলের মত লাল, আর ঠাণ্ডায় নাকের আগাটিও হয়ে উঠেছে ডগডগে লাল।

ইস্কুলে গিয়ে যখন ও পৌঁছল, তখন বেলা প্রায় দুটো। খাতা কিনতে নিশ্চয়ই একটু দেরি হয়ে গেছে, এই ভেবে ও তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল।

বইপত্র রাখার ওর বড় কাপড়ের থলেটি হাঁটুর পাশে ঝুলছে। ও খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছে, আর নতুন জুতোয় মশ্ মশ্ শব্দ হচ্ছে। খাড়া পাহাড়ের উতরাই বেয়ে স্কুলে আসার যে একটি সোজা পথ আছে, সেটি ধরেই যাচ্ছে মর্ৎসি। পা দু'খানি শূন্যে ছুঁড়তে ছুঁড়তে বরফের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যখন ও নামল, তখন ওর সমস্ত মন পড়ে রয়েছে সেই খাতাটির মধ্যেই।

মর্ৎসি যখন ক্লাসে ঢুকল, তখন সেখানে একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। পড়া আরম্ভ হবার আগে এরকম শব্দ প্রায়ই হয়ে থাকে। ছোটরা তখন বড়দের মত যে কোনও বিষয় নিয়ে, কখনও গম্ভীরভাবে, কখনও বা হাল্কাভাবে আলোচনা করে। ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকেই তখন নিজেদের পাশে-বসা বন্ধুদের সঙ্গে গল্পসল্প করতে পারে। তবে চেঁচামেচিটা করা বারণ। যদি কেউ কখনও চেঁচায়, সঙ্গে সঙ্গে তার নাম ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা হয়ে যায়।

মর্ৎসির বসার জায়গা দ্বিতীয় সারিতে। ইয়ন্চি কোসো বসে ওরই পাশে। ইয়ন্চির বয়সও মোটে সাত বছর। ওর গায়ের রঙ বাদামী। অনবরত সামনের, পিছনের, ডানদিকের কি বাঁ-দিকের ছেলের সঙ্গে ও কথা বলেই চলেছে। চুপ করে বসে থাকতে হলেই, হয় ও পা দোলাবে, নয়তো যারা ওর দিকে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে মুখ করে এমনভাবে কাশতে থাকবে, ঠিক যেন একটি কুকুরছানা মাছি দেখে কাশছে।

এই দুটি ছেলে ভাবে ভঙ্গিতে একে অন্যের চেয়ে একেবারে আলাদা। তাতেই বোধ হয় এদের পরস্পরের প্রতি এত টান। আর সেজন্যেই এরা সর্বদা পাশাপাশি বসতে চায়।

ছোট্ট মর্ৎসি কিন্তু ধীর, স্থির, গম্ভীর ধরনের ছেলে। ও যখন চুপ করে বসে থাকে, তখন ওকে দেখলেই লোকে মনে করবে বুঝি পাদ্রীসাহেবের মতই একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি। ও অথচ জানে না কিছুই, কেবল ওর চোখেমুখে একটি বুদ্ধির আভা খেলে যায়।

মর্ৎসি ওর নিজের জায়গায় এসে বসল। ভেড়ার চামড়ার টুপিটা পাশেই বেঞ্চের ওপর রেখে দিল। কালির দোয়াতটা দড়ি থেকে খুলে নিয়ে নিজের ডেস্কের ওপর ঠিক খাতাখানার ওপরেই রাখল। তারপরে বই-খাতার থলি হাতড়ে একখানা স্লেট, কাঠের হাতল-লাগানো একটি পেন্সিল-কাটা ছুরি, একটি বই, একটি আপেল আর অন্যান্য সব জিনিসপত্তর বের করল। সব-শেষে আবার থলির মধ্যে হাতের কনুই পর্যন্ত ঢুকিয়ে খানিকক্ষণ কলমদানিটা খুঁজল।

ও যখন জিনিসপত্র বের করতে ব্যস্ত, তখন ওর বন্ধুদের মধ্যে তিনজন সেই খাতাখানি ভালো করে দেখবে বলে টানা-টানি করছে। মলাটে হাঙ্গেরীয় বীর

মিক্লোশ ঝিনিার ছবি-আঁকা এরকম খাতা স্কুলের ছাত্রদের হাতে প্রায়ই দেখা যায়। তবু ওরা যেভাবে সেখানা দেখতে লাগল, মনে হয় এরকম সুন্দর জিনিস ওরা জীবনে কখনও চোখে দেখেনি। গভীর শ্রদ্ধাভরে ওরা সেই ছবি দেখছিল। মলাটের পিছন দিকে আবার নামতা লেখা রয়েছে। দেখে ওরা একেবারে অবাক হয়ে যাচ্ছিল। তারপরে ছেলেরা সেই খাতার পাতা গুনে দেখতে লাগল। অবশ্য ওরা ভালো করেই জানে, তাতে ছ'টি পাতার চেয়ে একটিও কম বা বেশি নেই।

মৎসি এরই মধ্যে তিনবার খাতাখানা টেনে নিতে চেষ্টা করেছে। শেষ পর্যন্ত নিজের বড় আপেলটা নিয়ে তার ওপর চাপা দিল। ও জানে, আপেলে হাত দিতে কেউ সাহস পাবে না। কারণ তাতে ঝগড়া বাধার সম্ভাবনা আছে।

যেন আপেলটির গায়ে লেখা আছে, 'আমায় ছুঁয়ো না।'

মৎসি এবার দাঁত দিয়ে দোয়াতের ছিপি খুলতে চেষ্টা করল।

ইয়নুচি এতক্ষণ ধরে ওর পেছনের বেঞ্চিতে-বসা একটি মেয়ের সঙ্গে পেন্সিল বদল করা নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। শর্ত ঠিক হয়ে যেতেই ইয়নুচি ওর স্বাভাবিক ধরনে হঠাৎ ঘুরে বসতে গেছে। মৎসিও ঠিক সেই মুহূর্তেই দোয়াতের ছিপিটা খুলেছে। ধাক্কা লেগে দোয়াতের সব কালি ছিটকে পড়ল।

মৎসির মুখ দিয়ে একটা কথা বেরোল না। বড় বড় চোখ মেলে সে একদৃষ্টে তার খাতা, আপেল আর থলের দিকে চেয়ে রইল। দোয়াতের সবটা কালিই এগুলির ওপর গড়িয়ে পড়েছে।

খাতার ওপর কালো রঙের একটি বলতো হ্রদ বয়ে গেছে আর আপেলের ওপর কালো মুক্তোর সারি দেখা যাচ্ছে। হাঙ্গেরীয় চারটি নদী দুনে (দানিয়ুব), তিসজ, দ্রাভ সাভ—এরা থলে থেকে শুরু করে মেজে পর্যন্ত বয়ে চলেছে।

মুহূর্তের জন্য মৎসির চোখ মুখ রাগে জ্বলে উঠল। এমন জোরে ইয়নুচিকে সে একটা চড় মারল যে, সে বেচারা বেঞ্চি থেকে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি ক্লাসে এসে ঢুকেছি।

ছেলেরা দাঁড়িয়ে উঠে যীশুর নাম স্মরণ করে আমাকে সম্ভাষণ করল। কিন্তু তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠল বন্ধুকে জব্দ করার আশায় একটি চাপা উল্লাস আর অশেষ কৌতূহল। পিছনের সারির একটি মেয়ে হাসি চাপবার জন্য হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

গালে চড় দেওয়াটা সকলেই দেখেছে। আর এও দেখেছে যে, আমার দুই চোখের দৃষ্টি ছেলে দুটির ওপরই নিবদ্ধ।

মৎসির মুখ শুকিয়ে গেছে। সমস্ত ক্লাস চাপা উত্তেজনায় আমি কি বলি শোনার অপেক্ষায় রয়েছে।

—চড় মারা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। মানুষের মুখ বড় পবিত্র, তাতে আঘাত করা ঘোরতর পাপ। যাও, স্পঞ্জ নিয়ে এসো—কথা ক'টি আমি ধীর, প্রশান্ত স্বরে উচ্চারণ করলাম।

শান্দোর ইশ্টেনেশ আমার টেবিলের কাছে বসেছিল। আর স্পঞ্জটাও ওর হাতের কাছে থাকায় ওকেই বললাম—কালিটা মুছে নাও।

গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে শান্দোর প্রথমে খাতাখানা, তারপর ডেস্ক আর থলেটা মুছে নিল। আপেলটাও স্পঞ্জ দিয়ে একবার মুছল। তারপর ইয়নুচির কপালে কালির দাগ দেখে সেখানেও একবার স্পঞ্জটা বুলিয়ে নিল। তাতে কিন্তু কালিটা আরও ধেবড়ে গিয়ে কপালময় ছড়িয়ে পড়ল। এতেও কারো মুখে হাসি দেখা গেল না।

আমি বললাম—এই ছেলে দুটি ক্লাসের পরে এখানে থাকবে। এদের কীর্তি নিয়ে আলোচনা করার সময় এখন নেই। তোমরা আমার কথা বুঝেছ তো—মৎসি নজ আর ইয়নুচি কোসো?

দু'জনেই বিমর্ষভাবে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

সারা বিকেল দু'জনে একটি কথা বলল না। হাত দু'খানি জড়ো করে একমনে পড়া শুনে গেল। মৎসি এর মধ্যে একবার মোটে নড়ে বসেছে। আপেলটা মোছার পরেই সেটা ওর ব্যাগে ভরে ফেলেছিল। এক দুই গোনার সময় সেটা বের করে একবার ভালো করে দেখে নিল। তারপর সেটা একবার চেটে নিয়েই যথাস্থানে রেখে দিল।

বিকেল চারটেয় ছেলেমেয়েরা যে যার বাড়ি ফিরল। স্কুলে রইল কেবল সেই আসামী দুটি, আর রইল দুটি মেয়ে—ক্লাস ঝাঁট দেবে বলে। এরা সবাই পালা করে ক্লাসের পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখে।

ছেলেমেয়েরা সুশৃঙ্খলভাবে স্কুল থেকে বেরোয় কি না দেখার জন্য আমি ওদের সঙ্গে দুয়োর পর্যন্ত গেলাম। সেখানে শ্রীমতী মিক্লোশকে দেখে ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললাম। ও বনের মধ্য থেকে এক বস্তা ভরে শুকনো পাতা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সেগুলি ওর কি কাজে লাগবে জানতে চাইলাম।

উত্তরে সে বললে যে, আস্তাবলের জন্য ওগুলো তার দরকার।

ওদের খড় নেই বলে প্রতি সপ্তাহে ঘোড়ার আস্তাবলের মেজেতে বিছিয়ে দেবার জন্য ওকে পাতা নিয়ে যেতে হয়।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, তোমাদের বিছানার খড় বছরে ক'বার বদলাও?'

তাতে সে উত্তর দিলে—একবার, কেবল ফসল কাটার সময়।

আমায় ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আরেকটি মেয়ে আমার সামনে এল। সে হল শ্রীমতী হর্মিন, একটি চাষী যুবকের স্ত্রী। মেয়েটির কাঁচমুখে বড় বড় দুটি কালো চোখ। সে নিজের ছেলেটিকে আমার স্কুলে ভর্তি করাতে চায়। বাচ্চাটির সবে পাঁচ পূর্ণ হয়েছে। তবু মেয়েটির ম্লান করুণ মুখখানি দেখে আমি ওকে নিতে রাজী হলাম।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম, 'আচ্ছা, ও সর্বদা এত বিমর্ষ হয়ে থাকে কেন?' ওর স্বামী লোক বেশ ভাল, দুজনের মনের মিলও আছে যথেষ্ট। ওদের তো গরীবও বলা যায় না।

তখন হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, এক সময় কানাঘুষোয় শুনেছিলাম, বিয়ের আগে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর ভাব ছিল, তাকে এখনও ভুলতে পারেনি। পাশের গ্রাম থেকে মেয়েটি এখানে এসেছে। সে গ্রাম হাঁটা-রাস্তায় এখান থেকে তিন ঘণ্টার পথ। ও এখানকার মেয়ে নয় কিনা, তাতেই বোধ হয় এসব কথা লোকে ওর নামে রটিয়েছে।

ওর সঙ্গে কয়েকটি কথা বলেই আমি নিজের ঘরে ফিরে এলাম। ঘরে ঢুকে পাইপ জ্বালাতেই ক্লাসে-বন্ধ আমার সেই ছাত্র দুটির কথা মনে পড়ল।

ক্লাসে ঢুকে দেখি, ঘর যেন ধুলোয় ধুলোময় হয়ে গেছে। ছেলে দুটি খোলা মাথায় এই ধুলোর মধ্যে খোলা দরজা জানালার ধারে বসে আছে। ঠিক যেভাবে আমি তাদের দেখে গেছি সেভাবে, সেই জায়গাতেই তারা তখনও বসে। বুকের ওপর হাত দুখানি জড়ো করে চুপ করে বসেছে—চিন্তা ও উদ্বেগের রেখা ওদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে।

—আমার ঘরে এসো।

বলতেই ওরা ধীরে ধীরে এসে আমার ঘরে ঢুকল। দুজনেরই কাঁধ থেকে বইয়ের ব্যাগ হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে। মর্তসির ব্যাগের ভিতর থেকে আপেলটি উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে। আমি চেয়ারে বসে পড়লাম।

আমার সামনে দাঁড়াতে বলতেই ওরা এসে দাঁড়াল। মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন দুটি ফাঁসির আসামী।

—মর্তসি নজ, তুমিই আগে বল।

খাতা কেনা থেকে শুরু করে ইয়নুচির ধাক্কা দিয়ে দোয়াত ফেলে দেওয়া পর্যন্ত সমস্তই সে রুদ্ধকণ্ঠে বলে গেল। বলতে বলতে হঠাৎ সে থেমে গেল।

—বলে যাও, এখনও তোমার সব কথা বলা শেষ হয়নি।

—হ্যাঁ, তারপর.........তারপর আমি ওকে একটা চড় দিয়েছিলাম।

—ইয়নুচি কোসো, এবার তোমার বলার পালা।

ইয়নুচি অনেকটা স্থির হয়ে ছিল। কেবল মাঝে মাঝে ওর নাক আর ভুরু দুটি কুঁচকে যাচ্ছিল। খুব সম্ভবত এই ব্যাপারটা ও মনে মনে বহুবার বিচার করে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে যে, ও সম্পূর্ণ নির্দোষ।

খুব সহজ সরলভাবে সে বলে উঠল—মর্তসি তখন কি করছিল, তা কি আমি দেখতে পেয়েছি? ও তো আমার পিছনে ছিল। তাই এ-পাশ ফিরতে হঠাৎ ধাক্কা লেগে গিয়েছিল।

—ওর হাতে কালির দোয়াত ছিল জানলে কি তুমি ধাক্কা লাগাতে?

—কিছুতেই না।

—তবে, মর্তসি নজ, তুমি কি ইয়নুচিকে দোষী মনে কর?

—না।

—তা হলে ওর মুখে আঘাত দেওয়া কি তোমার উচিত হয়েছে?

মর্তসি আর উত্তর দিতে পারছিল না। অতিকষ্টে চোখের জল রোধ করার চেষ্টা করছিল। তখন ওর গলা দিয়েও আর স্বর বেরোচ্ছে না।

—কেমন, না তো?

—না—বলতে বলতে সে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল।

—তুমি কি দোষ করেছ তা বুঝতে পারছ? মানুষের মুখে তার আত্মার প্রতিরূপ। মুখে যে আঘাত করে, সে আত্মায়ও আঘাত দেয়। আর আমাদের মধ্যে যা কিছু স্বর্গীয়, অবিনশ্বর—তা এই আত্মাতেই আছে।

ওর চোখের জলের ধারা বয়ে চলেছে। হয়তো আমার কথাগুলি ও আর শুনতে পাচ্ছে না। কিন্তু মানুষের হৃদয় যখন স্পর্শ করা যায়, তখন গলার স্বরও অর্থময় হয়ে ওঠে।

—তুমি কি তোমার কাজের জন্য দুঃখিত হয়েছ?

—হ্যাঁ।

—বেশ, তাই যদি হও, তবে যেখানে তুমি ব্যথা দিয়েছ, সেখানে একটি চুমু খাও।

ইয়নুচি ওর ডান গাল মর্তসির দিকে এগিয়ে দিল। মর্তসিও খুব আদর করে তাতে একটি চুমু খেল।

এবার ওরা দুজনে উৎসুক চোখে আগের চেয়ে অনেকটা শান্ত হয়ে দাঁড়াল।

আমি ইয়নুচির দিকে ফিরে তাকালাম। জিজ্ঞেস করলাম—তুমি কি এখনও মর্তসির ওপর রেগে রয়েছ?

নরম গলায় উত্তর এল—মোটেই না।

—ওর দোয়াতে কিন্তু আর একটুও কালি নেই। তোমার কালি থেকে ওকেও লিখতে দেবে তো?

—নিশ্চয়ই দেব, খুব খুশি হয়েই দেব।

—এবার তবে তোমরা যেতে পার।

ওরা যখন বাড়ি যাচ্ছে, তখন আমি জানলা দিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বরফে ঢাকা পথে ওরা পাশাপাশি চলেছে। ছোট পাহাড়টার কাছে মোড় ঘুরে মর্তসি হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল। ইয়নুচি চুপটি করে একদৃষ্টে মর্তসির দিকে তাকিয়ে আছে।

মর্তসি ব্যাগের তলা থেকে আপেলটি আর পেন্সিল-কাটা ছুরিখানা বের করল। আপেলটি দুভাগ করে কেটে অর্ধেকটা ইয়নুচির হাতে দিল।

অনুবাদ—মলিনা রায়

[গেজা গার্দোনী (১৮৬৩-১৯২৩) হাঙ্গেরীয় প্রসিদ্ধ লেখকদের অন্যতম।]

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত
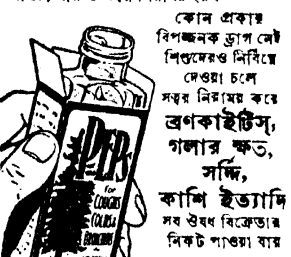
যন্ত্রপাতি চালু রাখার জন্য মাঝে মাঝে তৈলাক্ত করা দরকার হয়ে পড়ে এবং নানা-রকম তেল বা চর্বিজাতীয় পদার্থ দ্বারাই একাজ সমাধা করা হয়। এখন গ্যাস ও হাওয়ার সাহায্যে যন্ত্রপাতি তৈলাক্ত করা হচ্ছে। পুরনো পদ্ধতি অনুসারে কোন রকম পাতলা তৈলাক্ত পদার্থের মধ্যে যন্ত্রপাতিগুলো কিংবা যন্ত্রের অংশগুলি রেখে দিয়ে তৈলাক্ত করা হতো। এখন সে জায়গায় গ্যাস বা হাওয়ার পাতলা আস্তরণের মধ্যে যন্ত্রপাতি রেখে যন্ত্রগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। এই কাজের জন্য নিওন ও হিলিয়ন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। কোনও ইঞ্জিনের বেয়ারিং এইরকম পরিষ্কার করার দরকার হলে হাওয়া কিংবা গ্যাস খুব উচ্চ চাপ দিয়ে এর মধ্যে প্রবেশ করান হয়। এইভাবে পরিষ্কার বা তৈলাক্ত করা পুরনো পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশী কার্যকরী হয়।

*

অনিদ্রা রোগের অনেকরকম ওষুধের নাম এ পর্যন্ত আমরা শুনেছি, কেউ কেউ হয়তো ব্যবহার করেও দেখেছেন। এ রোগের প্রতি-ষেধক হিসাবে কোনও রকম যন্ত্র ব্যবহারের কথা নতুন শোনায়। এই যন্ত্র দিয়ে বৃষ্টি পড়ার শব্দ মানুষের স্নায়ু স্নিগ্ধ রাখে, ফলে এর মধ্যে একটা ঘুমপাড়ানি ক্ষমতা থাকে। এই যন্ত্রটির নাম দেওয়া হয়েছে "স্লিপাট্রোন"। স্লিপাট্রোনের আবিষ্কারক বলেন যে, অনিদ্রারোগগ্রস্থ রোগীর পক্ষে যন্ত্রটি খুবই উপকারী সন্দেহ নেই। এছাড়াও যাদের নিঝুম রাত্রে কারখানায় কাজ করে দিনের কলকোলাহলের মধ্যে নিদ্রার সাধনা করতে হয় তাদের পক্ষেও এটি বিশেষ উপকারী বন্ধু বিশেষ। আবার যাদের ঘরে শিশু কলকাকলি বেশী অর্থাৎ যাদের শিশুদের কলকলানির মধ্যেই ঘুমের চেষ্টা করতে হয় তারাও "স্লিপাট্রোনের" সাহায্য নিতে পারেন। স্লিপাট্রোনের ওজন মাত্র চার পাউন্ড আর বেশ হাল্কা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অনায়াসেই বহন করা যায়। চারটি ব্যাটারীর সাহায্যে যন্ত্রটি কাজ করে।

*

ম্যানিলার তৈরী দড়ি এ পর্যন্ত জাহাজ বাঁধা ইত্যাদি ভারী কাজে সর্বত্রই ব্যবহার হতো, কিন্তু আজকাল এর বদলে নাইলন ডাক্রন এবং পলিথাইলিনের তৈরী দড়িই বেশী ব্যবহার হয়। আশা করা যায় যে, আর পাঁচ বছরের মধ্যে এই নতুন রকম দড়ি সম্পূর্ণভাবে ম্যানিলা-দড়ির স্থান দখল করতে পারবে। নতুন দড়ি ম্যানিলা দড়ির চেয়েও মজবুত কিন্তু হাল্কা, অথচ খুব বোঝাসহ ঝাকুনির ধক সহ্য করার ক্ষমতাও বেশী। জলে ভিজলে পচে যাওয়ার ভয় নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ২½ ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট একটি নাইলনের দড়ি ১৯,৪৫০ পাউন্ড ওজন বহন করতে পারে। ঠিক এই মাপের একটি ম্যানিলা দড়ি মাত্র ৭৭০০ পাউন্ড ওজন বহন করে। নাইলনের দড়ি ম্যানিলা দড়ির চেয়ে চার গুণ বেশী স্থায়ী হবে। জলে ভিজলেও পচার ভয় না থাকায় এবং ওজনে ভারী না হওয়ায় জাহাজের নাবিকদের পক্ষে এই দড়ি ব্যবহার করাই বেশী সুবিধাজনক মনে হবে।

*

রাতের অন্ধকারে ঘড়ি দেখার জন্য রেডিয়াম ডায়ালের চলন আজকাল আর নেই। একটি ঘড়ির কোম্পানি অন্ধকারে হাতঘড়ি দেখার একটি নতুন উপায় বার করেছেন। এই ঘড়িতে একটি ছোট্ট ব্যাটারি লাগান থাকে আর এর সঙ্গে থাকে বোতাম যেটিতে চাপ দিলেই আলো জ্বলে উঠে ডায়ালটি আলোকিত করে। এই ছোট ব্যাটারিটি ছয় মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত কাজ দেয় তারপর ঐ ব্যাটারিটা আবার চার্জ করে নিতে হয়।

*

মানুষের জীবন মরণের হিসাব নিকাশ সঠিকভাবে কিছু করা যায় না, তবে মোটামুটি যেটুকু জানা গেছে তা হচ্ছে, আজকাল সারা পৃথিবীর মানুষের আয়ুষ্কাল বেড়ে গেছে। বর্তমান বছরে "পিউরটো রিকো"তে মানুষের আয়ুষ্কাল বাইশ বছর বেড়ে গেছে। ১৯৩৯-৪১ সালে এখানের লোকেরা গড়পড়তা ৪৬ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকতো আর ১৯৫৫ সালে ঐ লোকেরাই গড়ে ৬৮ বছরেরও বেশী দিন বাঁচছে। মেক্সিকো, ব্রেজিল এবং থাইল্যান্ডের লোকেদের প্রতি বছরে এক বছর করে আয়ু বেড়ে গেছে। ভারতবর্ষের লোকেদের সেই তুলনায় বছরে ½ বছর করে আয়ু বাড়ছে। ভারতবর্ষে যেখানে গড়ে ৩২·১ বছর করে মানুষে বাঁচে নেদারল্যান্ডে সে জায়গায় ৭৫·৫ বছর করে মানুষে বেঁচে থাকতে পারে। অর্থাৎ নেদারল্যান্ডের অধিবাসীরা সবচেয়ে বেশীদিন বাঁচে, আর ভারতবর্ষীয়েরা সবচেয়ে কমদিন বাঁচে। এছাড়া সুইডেনের লোকেরা গড়পড়তা ৭২ বছর আর নরওয়েতে ৭২ বছর করে বাঁচে। এর সঙ্গে সঙ্গেই ইস্রাইল, ইংলন্ড, নিউজিল্যান্ড এবং আমেরিকার নাম করতে হয়। এইসব স্থানের অধিবাসীরাও গড়ে ৭০ বছর করে বাঁচে। ১৯৫৫ সালের হিসাবে দেখা যায় যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে গড়পড়তা ৬৪ বছর করে লোকে বাঁচে।

*

জামবেজী নদীতে বাঁধ দেওয়া ১৯৬০ সালের মধ্যে শেষ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই বাঁধ দেওয়ার ফলে মধ্য আফ্রিকার খুব বেশী উন্নতি হবে। এই বাঁধ দেওয়ার জন্য ১৯০ মাইল লম্বা এবং ৪০ মাইল চওড়া একটি বৃহৎ হ্রদের সৃষ্টি হবে। আর এই হ্রদই পৃথিবীর মধ্যে মানুষের তৈরী সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদ।

*
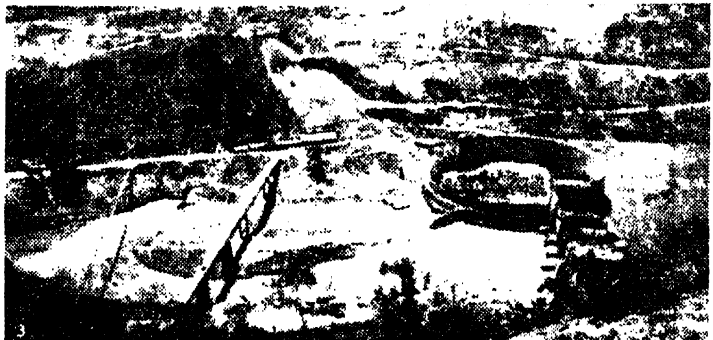
জামবেজী নদীতে বাঁধের কাজ

বিবাহ জয়ন্তী পালনের অদ্ভুদ একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস থেকে। ডয়েল ওয়েস্ট নামে এক ভদ্রলোক তাদের বিবাহের পঁচিশতম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে দৈনিক পত্রিকার এক পূর্ণপৃষ্ঠা নিয়ে তাতে নিজের হাতের লেখা ব্লক করে ছাপিয়ে লেখেনঃ "আমাদের বিবাহের রজতজয়ন্তীতে প্রিয়তমা ডরিসের উদ্দেশে —আমার ভালবাসা নিবিড়তর হল। ডয়েল।"

দু বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রেই মায়ামি রাজ্যের ফ্লোরিডা শহরের হ্যারি হবসন তাদের বিবাহের রজতজয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষ্যে স্ত্রীকে দীর্ঘ অক্ষরে অভিনন্দন জানাতে মনস্থ করেন। একান্ন বৎসরের মিঃ হবসন এ বিষয়ে স্ত্রীকে আগে কিছু না জানিয়ে প্রাতঃভোজনের পর গাড়িতে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করলেন।

খানিকদূরে যাবার পর একটা রাস্তার মোড়ে বিরাট একটা হোর্ডিং দেখে গাড়ির গতি শ্লথ করে অপেক্ষা করতে থাকেন। ধূসরকেশ তেতাল্লিশ বছরের স্ত্রী হেলেন মর্মাহত হয়ে চেয়ে দেখলেন—পঁচিশ ফিট চওড়া আর বার ফিট উঁচু হোর্ডিংয়ে তার স্বামীর প্রমাণ মাপের চেহারার ফটোগ্রাফ আনত হয়ে রয়েছে দু ফিট দীর্ঘ অক্ষরগুলির ওপর যাতে লেখা ঃ আমার সংগে পঁচিশ বছর কাটাবার জন্যে সেই চমৎকার স্ত্রীর উদ্দেশে। তোমার ধন্যবাদ।"

*

বাঘের তুলনায় ছাগলের কি বা শক্তি, কিন্তু ছাগলও যে বাঘ মারতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত শোনা যায় ব্রহ্মদেশে জাপানীদের দ্বারা আক্রান্ত হবার আগে মেমিওতে। রামছাগল, নাম তার ডাকা।

মন্দিরের সেবায়েতের বাড়ির লাগোয়া একটা ছাউনীতে ডাকা থাকত এবং লোকে এসে খাবার এবং ফুল দিয়ে ওকে সম্মান জানাত।

গোড়া থেকেই কিন্তু ডাকা এখানে অমন প্রিয় ছিল না। বছর কতক পূর্বে ও গ্রামে এসে উপস্থিত হয়; সব সময়ে শিং উঁচিয়ে তেড়েই আছে। ধান ক্ষেতে গিয়ে শস্য খেয়ে সাবাড় করে বেড়ায়, এমন কি লোকের কুঁড়েতে গিয়ে খাবারদাবারও খেয়ে নেয়। আর খেলাচ্ছলে লোকদের শিং উঁচিয়ে তাড়া করে।
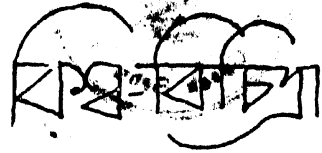
এমন একটা উৎপাতকে মেরে না ফেলে লোকে সহ্য করত কেন, তার কারণ ছিল। মন্দিরের সেবায়েতের ওপর কারুর কথা চলে না, তাঁর মতে ডাকা কোন স্বর্গত বীরপুরুষের জন্মান্তরিত জীবন।

একদা ডাকার চেয়েও বিপজ্জনক এক জানোয়ারের উপদ্রবে গ্রাম সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল—একটা নরখাদক বাঘ। প্রায়ই দিন সকালে লোকে দেখতে লাগল গবাদির এবং কখনো কখনো ছোট ছেলেমেয়েদেরও অস্থি মাঠে ছড়িয়ে আছে। প্রতিকার করতে না পেরে গ্রামের লোকে ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের গোচরে নিয়ে এল এবং যথাসময়ে দুজন ইওরোপীয় শিকারী এবং সহকারীদের নিয়ে একটি সর্কার দল স্যাঙগু গ্রামে উপস্থিত হল। ইওরোপীয় দুজন ছিলেন ক্যাপ্টেন রয় পাওয়েল ব্রাউন যার বিশ বছরের শিকার অভিজ্ঞতা ছিল, এবং ক্লাইভ ইওম্যানস নামক এক শিক্ষক যিনি রেংগুনে এসেছিলেন ছুটি কাটাতে।

কথা উঠল বাঘটাকে ফাঁদে ফেলা যায় কি করে। জ্যান্ত টোপের দরকার এবং সেকথা উঠতেই ডাকার কথা কারুর কারুর মনে এল। ছাগলটাকে যদি দড়ি দিয়ে গাছে বেঁধে রাখা হয় এবং বাঘটি তার প্রতি আকৃষ্ট হয় তাহলে ছাগলটিকে হত্যা করতে আসবেই এবং সেই সুযোগে শিকারীরা তাকে মারতে পারবে।

এইভাবে মারলে এক ঢিলে দুটো পাখি মারা হয়ে যাবে। আর গ্রামের লোকের ওপরও ছাগলটাকে মারার দোষ অর্শাবে না কারণ ওটাকে মারার দায় পড়বে বাঘের ওপর।

ডাকাকে ধরবার জন্য সেবায়েতের অনুমতি যোগাড় করা হল। কিন্তু অনুমতি পাওয়াই যথেষ্ট নয়, ওকে ধরতে সাহস এবং চাতুর্যেরও দরকার। গ্রামের প্রায় সবাইকে জড় করা হল একাজে। ঠিক হল ডাকাকে চতুর্দিক দিয়ে ঘিরে ওকে কোণঠাসা করা যাতে ফাঁস পরাতে দক্ষ একজন কেউ ওকে বেঁধে ফেলতে পারে। ডাকা কিন্তু বড় চটপটে এবং হিংস্র এবং বেশীর ভাগ গ্রামবাসীই ওর কাছে ঘেঁষতে ভয় পেল। ওর আকস্মিক তাড়াতে বেরলই ব্যূহ ভেঙে যেতে লাগল। সেবায়েত লোকটি যে ওকে আদো বোঝাজ করে তাকেও সে গুঁতিয়ে একটা কুয়োয় ফেলে দিলে।

যাই হোক ঘণ্টা কতক পরে ডাকা ধরা পড়ল। টেনে হিঁচড়ে কোনক্রমে ওকে একটা নালার ধারে নিয়ে যাওয়া হল—শুকনো নালা, প্রস্থে সামান্য কিন্তু পনের ফিট গভীর—চাষীদের ক্ষেত আর গভীর জংগলের মাঝের সীমান্ত। নালার কাছেই ছিল একটা আম গাছ, ডাকার গলার দড়িটা তাতে বাঁধা হল। কাছাকাছি আর একটা গাছে একটা মাচা বেঁধে পাওয়েল ব্রাউন ও ইওম্যান্স বন্দুক নিয়ে বসলেন।

অনেকক্ষণ ধরে ছাগলটা মর্মান্তিক চীৎকার করে গেল। তারপরই নালার অপর পারের দীর্ঘ ঘন ঘাসের বন থেকে আরো ভয়াবহ গর্জন আসতে লাগল—বাঘের গর্জন। হঠাৎ ডোরাকাটা জানোয়ারটা এক লাফে ছাগলের দিকে নালার কিনারে এসে দাঁড়াল। ছাগলটার দিকে চেয়ে আবার একটা লাফ।

শিকারীরা বাঘটাকে দেখলে, দুজনেই বন্দুকের ঘোড়ার ওপর হাত রাখলে। কিন্তু গুলী ছুটল মাত্র একটি, কারণ পাওয়েল ব্রাউনের বন্দুকের ঘোড়াটা আটকে গেল আর ইওম্যান্সের গুলীটা লক্ষ্যভেদে অক্ষম হল। ওদের ওপর বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বন্দুকে আবার গুলী ভরার সময় পাওয়া যাবে কিনা ভাবনা হল।

কিন্তু তার আর দরকার হল না। ভীষণ চীৎকার তুলে ডাকা তার দড়িতে দড়দড় না টান পড়া পর্যন্ত শিং উঁচিয়ে এক ছুট দিলে, সোজা বাঘটাকে লক্ষ্য করে। সেই এক গুঁতোয় বাঘটা তার পা ঠিক রাখতে পারলে না, পিছনে হটে গিয়ে নালার মধ্যে পড়ে গেল একেবারে পনের ফিট গভীরে। পড়বার পর সব স্থির, চুপচাপ।

কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবার পর শিকারী দুজন সাবধানে নালায় নামলেন দেহটা পরীক্ষা করে দেখতে। দেখা গেল বাঘের ঘাড় ভেঙে গিয়েছে।

ডাকার কোন আঘাতই লাগেনি। খবরটা সংগে সংগে চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। সেবায়েতের অধিনায়কত্বে গ্রামবাসীর বিরাট একটা দল এসে জমায়েত হল। সেবায়েত জানালেন ছাগলটা এক বীরপুরুষের অবতার। এবং ওকে তিনি পালন করার ভার নিলেন।

সময়ের সংগে ডাকা পোষ মানল। একটা বিপদ শুরু হল বেশী মাত্রায় আস্কারা পাবার দরুন। গ্রামবাসীর দেওয়া প্রচুর খাদ্য খেয়ে খেয়ে সেজায় মোটা হয়ে উঠল; ওর সংসারের জন্য বরাদ্দ হল দশটি ছাগী। ওর সন্তানসন্ততিরা হল পবিত্র এবং বহু মাইল জুড়ে ওদের আধিপত্য বিস্তৃত হল। কারণ ঠিক বলা যায় না, কিন্ত ডাকা যতদিন জীবিত ছিল ততদিন সিয়েঙগু গ্রামে বাঘের উপদ্রব আর ঘটেনি।

সমুদ্র হৃদয়

প্রতিভা বসু
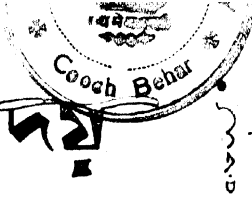
(৬)

অনেকটা নিরাপদ লাগলো।

'গাড়ির মধ্যে কোনো ভয় নেই, না?'

'ভয় কী?'

'কাচগুলো তুলে দিন।'

'থাক না, গরম লাগবে তোমার।'

'না না, তুলে দিন।'

তুলে দিলেন।

'আপনার গাড়িতে পর্দা ছিলো, তা-ই ভালো ছিলো। গাড়িটাও সুন্দর।'

'যদি ফিরে যেতে পারি, পাঠিয়ে দেবো গাড়িটা।'

'কেন?'

'তুমি ব্যবহার করবে।'

'অতো বড়ো গাড়ি! আমি ব্যবহার করবো?'

'দোষ কী।'

'তা কখনো হয়?'

'হয় না, না?'

'আপনি আমার সব কথায় দুঃখ পান কেন বলুন তো'

'আমার স্বভাব।'

'আমি কিন্তু তা চাই না।'

'চাও না?'

'না।'

'আমার ভাগ্য।'

এর পরে হঠাৎ দু'জনেই চুপ হয়ে গেল. জানালার দু' পাশে তাকিয়ে রইলো মুখ ফিরিয়ে। দমদমের লম্বা লম্বা রাস্তা বেয়ে চলতে লাগলো গাড়ি। এক মোড় থেকে আর এক মোড়, এক রাস্তা থেকে আর এক রাস্তা। এ পাড়া আর সে পাড়া। এখানকার সব পাড়াই সমান। মফস্বলের মেয়ে সুলেখার কাছে সব রাস্তাই এক রাস্তা, সব রাস্তাই আলাদা। দু' চোখ মেলে দেখছে সে। শহর ঝিমিয়ে আছে, নিঃসঙ্গ আলোগুলো একা একা দাঁড়িয়ে জ্বলছে অবান্তর হয়ে। পথিক কই? কাকে পথ দেখাবে? সমস্তটা আবহাওয়ার মধ্যে যেন কী একটা আতঙ্ক লেখা হয়ে আছে দিকে দিকে। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে এটাই অনুভব করলো সুলেখা। যতোটুকু স্মৃতি আছে, আলোকিত কলকাতার জনবহুল মুখর রাস্তাগুলোর সঙ্গে আজকের রাস্তাগুলোর যেন মিল পেলো না কোনো। তবু এসপ্ল্যানেডে এসে একটু প্রাণের আভাস পাওয়া গেল, বিজ্ঞাপনের আলোগুলো তেমনই জ্বলছে নিবছে, লোকজনও চলছে কিছু কিছু, এ পাড়ার সিনেমাগুলোও সচল।

'বালিগঞ্জ এখান থেকে আরো অনেক দূর, না?' মুখ না ফিরিয়েই কথা বললো সুলেখা।

'তাতো একটু দূরেই।' একটার পর একটা সিগারেট খাচ্ছেন সুলতান সাহেব। টানছেন কম, ধরাচ্ছেন বেশী, ফেলে দিচ্ছেন আধখানার উপরে।

'বালিগঞ্জও খুব নির্জন, না?'

'এখনো কি তোমার ভয় কাটেনি?'

'না, কিসের ভয়?'

'সময় বড়ো দীর্ঘ লাগছে?'

'না।'

'মায়ের কথা ভাবছো?'

'না।'

'তবে কী?'

'অনেক রাত হয়েছে।'

'খুব আর কি।'

'আজ আর ফিরে যাওয়া হবে না।'

'কার'

'আপনার।'

'একেবারে বেহেস্তে যাবার ব্যবস্থা করবে বুঝি?' আস্তে হাসলেন সুলতান সাহেব। মুখ ঘুরিয়ে সুলতানের চোখের উপর চোখ রাখলো সুলেখা, সুলতান গড়ের মাঠের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন।

অনেকক্ষণ আবার চুপচাপ। আবার দুজনে দু'দিকে তাকিয়ে দেখছে।

গড়ের মাঠের অন্ধকার হারিয়ে গেল, সেন্টপলস্ ক্যাথিড্রেলের চূড়ো ছাড়ালো, এলগিন রোড, জগুবাজার সব পেরিয়ে তীর বেগে দক্ষিণে ছুটে চললো গাড়ি। সুলতান সাহেব তেমনি নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে আছেন বাইরে।

সুলেখা উশখুশ করলো, অপেক্ষা করলো, তারপর আস্তে ডাকলো, 'সুলতান সাহেব।'

'উঁ।'

'কী দেখছেন?'

'দেখছি না।'

'কথা বলছেন না।'

'কী আর বলবার আছে।'

'কিছু নেই?'

মুখ ফেরালেন, 'শোনো সুলেখা, আমি বেছি কি—'

'বলুন—'

'তোমরা হয়তো আর ফিরে যাবে না ওখানে, আমি গিয়ে তোমাদের বাড়িটা যাতে বিক্রি হয় তার চেষ্টা করবো।'

'সুলতান সাহেব—'

'কিন্তু তার আগে নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হবে তোমাদের। যেভাবে সব ছেড়ে চলে এসেছো—' কোটের পকেটে হাত ঢোকালেন, 'আমি অনুরোধ করছি' হাসলেন, 'তার চেয়ে ভেবে নাও না যে, আজ তোমার কাছে একটা ভিক্ষাই চাইছি আমি'—ছোটো একটি মখমল বটুয়ার স্পর্শ লাগলো সুলেখার হাতে—'দয়া ক'রে এটা রাখো, কিছুদিন তো চলুক। বাড়ি বিক্রি হলে সুদে আসলে সব শোধ ক'রে দিও।'

নিস্তব্ধ সুলেখার মুখের দিকে আবছা অন্ধকারে তিনি তাকালেন, 'রাগ করলে?'

সুলেখা চুপ।

'রাগ করো না, এই তো আমার শেষ আবদার।'

সুলেখা চুপ।

'প্রতিজ্ঞা করছি সমস্ত জীবনে আর আমি তোমাকে বিরক্ত করবো না। আর কোনোদিন দেখা করবার চেষ্টা করবো না।'

'বাড়িটা তো আমরা বিক্রি করবো না।' সুলেখার গলা গম্ভীর।

'ও।'

'সুতরাং ঋণ শোধ করাও সম্ভব হবে না।'

'ও।'

বটুয়াটি হাতের মুঠোয় তুলে নিল সুলেখা, 'তা বলে ফিরিয়ে নিতেও দেবো না। আপনার আবদার থাকতে পারে, ভিক্ষা থাকতে পারে, আর আমার বুঝি কোনো অধিকার থাকতে পারে না?'

সুলতান সাহেব হাসলেন, 'সবই তোমার রানীর মতো। এমন সুন্দর ক'রে কে নিতে পারতো আর। তোমার এই দয়া আমি ভুলবো না। কিন্তু বাড়িটা বিক্রি করবে না কেন? ফেলে রেখে লাভ কী? মিছি মিছি বে-দখল হয়ে যাবে।'

'ফেলে রাখবো কে বললো।'

'ভাড়া দেবে?'

'না।'

'তবে?'

'নিজেরাই থাকবো।'

'নিজেরা?'

'দাঙ্গা তো থেমেই গেছে, চলে যাবো আবার।'

'যাবে।'

'কেন যাবো না।'

'ওখানে। পাকিস্তানে।'

'নিজের দেশ কি কেউ ছাড়ে? ছাড়তে পারে?'

সুলেখার চোখের উপর চোখ রাখলেন সুলতান।

'আর যে দেশে এই মানুষ আছে।' সুলেখার গলা গাঢ় হয়ে এলো।

সুলতান তেমনি চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন।

সুলেখা মৃদু হাসলো। একটু লঘু করলো আবহাওয়াটা, 'দরকারী কথা শুনুন, আমার দাদামশায়, মানে মায়ের কাকা অতিশয় সদাশয় সজ্জন মানুষ। তাঁর স্ত্রীও সে রকমই। তাঁর বাড়িতে দু' চারদিন যা হয় ঘুরে ফিরে স্বাধীনভাবে থেকে তারপর আপনার সঙ্গেই আমরা ফিরে যাবো ওখানে।'

'আমার সঙ্গে।'

'তবে আর কার সঙ্গে।'

'পরিহাসপটুতো মস্ত গুণ সুলেখা। স্বীকার করছি তোমার সে গুণ আছে।'

'পরিহাস ব'লে মনে হচ্ছে?'

'তা ছাড়া আর কী ব্যাখ্যা আছে একথার।'

'আশা করি প্রমাণটাই বড়ো ব্যাখ্যা হবে।'

গাড়ি রসা রোড ছাড়িয়ে মোড় ফিরে রাসবিহারী এভিনিউতে পড়লো।

'শুনুন।'

'বলো।'

'আজ কিন্তু আপনার ফেরা হবে না।' গলাটা ভারি শোনালো।

সুলতানের গলাও একটু ভার মনে হলো বৈকি, 'আর কেন, হয়তো কোনোদিনই আর হবে না।'

'আমি ঠাট্টা করছি না।'

'আমিই কি ঠাট্টা ভাবছি?'

'এরকম বললে কারো ভালো লাগে?'

'না লাগার কারণ নেই। শত্রু নিধন কে না ভালোবাসে? আমি নিজেও এবার বিশ্রাম চাই, বিরাম চাই, অবসান চাই।'

'নিজের ইচ্ছের উপর তো অনেকদিনই আসক্ত রইলেন, অন্যের ইচ্ছেরও যে কিছু মূল্য আছে সেটা ভাবলে দোষ কী?'

'অন্যের ইচ্ছেটাই এখন নিজের ইচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। আমার তো কোনো নিজস্ব ইচ্ছে নেই।'

'তাই কি?'

'আমার কথা তুমি কোনোদিনই বুঝবে না সুলেখা। ও সব থাক।' সুলতান রাস্তায় মুখ বার করলেন। নম্বর লক্ষ্য করতে লাগলেন বাড়ি বাড়ির দরজায়। একটু পরেই পাওয়া গেল বাড়ি, গাড়িটা ঘ্যাচ্ ক'রে থেমে গেল।

একতলা ছোট্ট বাড়ি। একটু বারান্দা আছে রাস্তার উপরে। ঘরের জানালাগুলো বন্ধ, ফাঁকে ফাঁকে আলোর রেখা। বোঝা গেল, অধিবাসীরা এখনো জেগে আছে। গাড়ির দরজাটা খুলে দিলেন সুলতান সাহেব। আশ্চর্য! উদ্দাম আনন্দে হুড়-মুড়িয়ে নেমে গেলো না সুলেখা। চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আপনি!'

'আমি আর নামবো না, তুমি দরজায় নক্ করো, ও'রা খুলে দিলেই আমি নিশ্চিন্তমনে যেতে পারবো।'

'গাড়ি ছেড়ে দিন, নামুন।'

'বুঝতে পারছো না, গাড়িটা ছেড়ে দিলে এতো রাতে আবার পাওয়া কঠিন হবে। আমি ওকে আসা যাওয়ার চুক্তি ক'রেই নিয়ে এসেছি।' ঘড়ি দেখছেন সুলতান সাহেব, 'খুব তাড়াতাড়ি ছোটালে নেকস্‌ট্‌ প্লেনটা পেয়ে যাবো।'

'আজ আপনার যাওয়া হবে না।'

'তা কখনো হয়?'

'আমি আপনাকে আজ কিছুতেই ফিরে যেতে দেবো না।'

'পাগল।'

'যা খুশি বলতে পারেন।'

'আমার না ফিরলেই নয় সুলেখা।'

'আপনি এখন আমার অতিথি, আমার অধীন, এতোদিন কি আমার ইচ্ছেমতো আমি আসতে পেরেছি আপনার ওখান থেকে?'

'তোমার কি ধারণা, আমার ইচ্ছায় তুমি এসেছ?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার কাছ থেকে তুমি চলে যাবে, সে ইচ্ছে কি আমার মৃত্যুতেও সম্ভব?'

'তবে নিয়ে এলেন কেন?'

'তোমার সুখের জন্য।'

'আমার সুখটাই সব?'

'সব।'

'তা হ'লে এটাই বা নয় কেন?'

'কী?'

'চলে গেলে আমি যদি কষ্ট পাই—' থেমে গেল সুলেখা। মুহূর্তকাল সুলতান সাহেবও চুপ ক'রে রইলেন, মৃদু হেসে বললেন, 'এ কষ্ট তোমার আমার জন্যে নয় সুলেখা, এটা একজন মানুষের প্রাণের জন্য আর একজন মানুষের একটা স্বাভাবিক মমতা। তুমি নিশ্চয়ই বুঝেছ, বিপদ আমাকে চারদিক থেকে বেড়াজালের মতো ঘিরে ধরেছে, তার জন্য তোমার এই সতর্কতা নেহাত নৈর্ব্যক্তিক। আমি না হ'য়ে যে কেউ হলেও মন তোমার এরকমই ব্যাকুল হতো।'

একথার কোনো জবাব দিলো না সুলেখা, মুখ ফিরিয়ে বসে রইলো চুপ ক'রে।

সুলতান বললেন, 'নামো।'

'না।'

'কী মুশকিল।' একটু থেমে 'তুমি কি সত্যিই আমার জন্য উদ্বিগ্ন হচ্ছো?'

'সাক্ষী সাবুদ যখন নেই, তখন আর—'

সস্নেহে হাসলেন সুলতান সাহেব, 'একেবারে মিছিমিছি। এই ট্যাক্সির মধ্যে কে আমাকে দেখছে? আর দেখলেও কে চিনছে হিন্দু না মুসলমান? তা ছাড়া, রাস্তায় রাস্তায় কী রকম পুলিসের গাড়ি পাহারা দিচ্ছে তাতো আসতে আসতে নিজের চোখেই দেখে এলে।'

'যুক্তি তর্ক থাক না—'

আস্তে দরজা খুলে গেল একতলার। ঢোলা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরা একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। ট্যাক্সি দেখে অনুসন্ধিৎসু হয়ে নামলেন দু' সিঁড়ি।

গাড়ির ভেতরে অবুঝ হয়ে উঠলো সুলেখা, 'আর আমি বেশী বলতে পারছি না, আজ না, আজ যাওয়া হবে না আপনার, আজ আমি যেতে দেবো না, কিছুতেই না—'

অগত্যা নামলেন সুলতান সাহেব। তাঁর সুদীর্ঘ সুন্দর চেহারার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকালেন ভদ্রলোক। গম্ভীর গলায় বললেন, 'কাকে চান?'

দ্রুতপায়ে এগিয়ে এলো সুলেখা, রুদ্ধ-স্বরে বললো, 'আমি। আমি দাদামশায়।'

নিয়মের চারগুণ ভাড়া নিয়ে পবন বেগে গাড়ি ছোটালো হিন্দু শিখ ড্রাইভার। একটু দূরে এসেই থামলো। হাঁপাতে হাঁপাতে উর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি থেকে নেমে একটা আলোর থামের উপর ছোট একটি পেতলের ডান্ডা দিয়ে নিয়মিত ছন্দপাতে কয়েকটি আঘাত করলো। খুব জোরেও না, খুব আস্তেও না। কিন্তু সেই শব্দের অনুরণন ছড়িয়ে গেল অনেক দূরে। দূরে থেকে দূরান্তরে। সাংকেতিক শব্দ।

অপেক্ষা করতে হ'লো না, কয়েক মিনিটের মধ্যেই এ গলি ও গলি থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো কতগুলি লোক, এ বাড়ি ও বাড়ির বারান্দায় ঝুঁকে পড়লো কতগুলো মুখ। ড্রাইভার ফিসফিস করলো, 'মুসলমান, মুসলমান।'

'কোথায় কোথায়?' রক্তলোলুপ বাঘের মতো হিংস্র হয়ে উঠলো লোকগুলোর চোখ মুখ।

'হিন্দু বাড়িতে ঢুকেছে। জলদি চলো।'

যে ক'জন ধরে তার দ্বিগুণ লোক ঠেসে ভরে নিল গাড়িতে। একটু আগে যেখানে সুলেখা আর সুলতানকে নামিয়ে দিয়েছিলো, গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার সেইখানে এসে থামলো। ঝপাঝপ নেমে পড়লো সব, তারপর ধাক্কা দিলো দরজায়। ভেতর থেকে মোটা গলার প্রশ্ন এলো, 'কে!'

'খুলুন।'

দরজাটা কিন্তু খুললো না, একটা জানলো খুলে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালেন সুলেখার দাদামশায়। জানালা দিয়ে লোকগুলো ঘরের ভেতরে তাকালো, উজ্জ্বল আলোর তলায় তার চেয়েও উদ্ভাসিত কয়েকখানা মুখ। সুলেখা, তার মা, তার ভাইয়েরা, আর একখানা আনন্দিত মুখ বাইরের জনতার দিকে তাকিয়ে যেন ঈষৎ নিষ্প্রভ হলো। সুলতান সাহেব চমকে উঠলেন। সুলেখার দাদামশায়ের পাশে তাঁর স্ত্রী এসে দাঁড়ালেন, তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, 'কী চান আপনারা?'

সুলেখার মা বললেন, 'কে কাকিমা?'

চকিতে ঘরের ভেতরকার কয়েকজোড়া চোখই জানালার ওপিঠে পিছলে গেল। একটা লোক একটা পা রাস্তায় রেখে আরেকটা পা উঁচু বারান্দায় তুলে দিয়ে ইতর ভঙ্গিতে বললে, 'যা চাই তা মশাই আপনাদের ঘরের মধ্যে।'

দাদামশায় ভুরু কুঁচকোলেন, 'আপনারা বলছেন কী?'

'সেটা কি আপনার মগজে ঢুকছে না?'

'অভদ্রের মতো কথা বলবেন না।'

'আপনিই বা ভদ্রলোকের মতো কথা শুনেছেন কই?'

'আপনাদের সঙ্গে আবার কথা কী? গুণ্ডামি করাই যাদের একমাত্র পেশা।'

'দেখুন, এসব বলবেন না, ভালো হবে না।'

'ভয় দেখাচ্ছেন? আপনারা কি ভাবেন যে, আপনাদের মতো কতগুলো অমানুষের চোখ রাঙানিকে আমি এতোটুকু ভ্রূক্ষেপ করি?'

'করেন কি করেন না এখুনি দেখতে পাবেন।'

'বিরক্ত করবেন না বলছি।'

'দরজা খুলুন, তারপর অন্য কথা।'

'বাড়ি আমার, আপনাদের হুকুমে খুলবো না।'

'আমাদের হুকুমেই খুলতে হবে দাদা, কেন মিছিমিছি—'

'এতো রাতে হল্লা করলে আমি পুলিস ডাকবো।'

'ডাকুন না, দেখুন না আপনার কোন মামাশ্বশুরের ভাগ্নে এসে হটায় আমাদের।'

'হটায় কি হটায় না এখুনি দেখাচ্ছি আমি।' হন্তদন্ত হয়ে যেন কী না কী করবেন এইভাবে ঠাস ক'রে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিলেন, পিছন ফিরে চাপা গলায় বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে।'

সেকথা কি আর বুঝতে বাকী আছে কারো?

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

কেল্লার মাঠের ধারে

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

অদূরে গঙ্গার বুকে জাহাজের আলো আর
উঁচু উঁচু মাস্তুলের সার!
আবার আশ্বিন এলো সে কার আসার?
হঠাৎ জাহাজী ভোঁ-এ আচমকা ধ'রে যায় স্তব্ধতায় চিড়
কয়েক পলক মাত্র—ধীরে ধীরে জুড়ে যায় ফের:
আমরা তেমনি ব'সে; আমি আর গাছ আর সন্ধ্যাঘন ছায়া সুনিবিড়!
সব ঘিরে ওঠে এক আলোড়িত কুণ্ডলী প্রশ্নের—
আবার আশ্বিন এলো সে কার আসার?
ট্র্যাফিক-গর্জন-ক্ষান্ত এ-মাঠের তীরে
ও হাওয়া, হিন্দোল হাওয়া, নির্জনতা ঘিরে
দোল খেয়ে যাও আরবার।

কেল্লার মাঠের ধারে এই তো সে গাছ
উন্মোচিত করেছিলো কবেকার রাতের আঁধার
একটি দুঃসহ দেহে যৌবনের যত্নে কারুকাজ!
দূরে গিয়েছিলো গ্লানি যা কিছু বাধার!
ও হাওয়া, হারানো হাওয়া, সেই সন্ধ্যা এনেছো কি ফিরে
রজনীগন্ধার-বেণী-দীপ্তি-পাওয়া কুন্তলের অসহ্য তিমিরে?

কেল্লার মাঠের ধারে এই সেই গাছ
যেখানে এখনো রাত্রি প'রে আসে পুরনো সে-সাজ
সে নৈশ-মদিরা-ক্ষিপ্ত বুকে রক্ত কর্ণিকার নাচ
চলে আজো: অনুভূতিদের পাখি অন্ধকার নীড়ে
ডানা ঝেড়ে ফেলে দ্যায় ঝরা-শিহরণগুলি ছায়াদের ভিড়ে!
ছায়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে আড়িপাতে দূরে গড়খাই!
আকাশ-বিছানো কথা তারাদের চোখে চোখে—
শোনো, এই ডাক দিয়ে যাই।

স্মৃতির অতল থেকে একটি ডালিয়া-মুখ ভেসে ওঠে কার?
নরম নরম স্বর অস্ফুট ভাষার—
চলতি গোছের পণ, ছল-ভরা গুঞ্জন যাওয়ার আসার
শপথ-শিথিল কিছু ভালোও বাসার!
আজকে এ-ছায়া দিয়ে সে-মুখের ছায়াটুকু প্রাণপণে মুছি;
কিংবা একেবারে মোছা যায় না তা বুঝি!
স্মৃতি বলে—এখানেই পেলে যে প্রথম—
দেহের অঞ্জলি ভ'রে ঈষদুষ্ণ সোনা-সোনা ত্বকের রেশম।
রাত, মাঠ, যতো সব অন্ধকার অণু
চিৎকৃত জিজ্ঞাসা তোলে—
এ-আঁধারে ফিরে চাও আবার সে-তনু?
প্রাণ কিন্তু বোঝে বেশ সেটা অসম্ভব:
সেদিনের ছিলো যা উৎসব
আজকে ত শব।

হারানো প্রতীক

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

অন্তত নির্বোধ নই, ব্যাধ কিংবা বিপন্ন হরিণ।
মুহূর্তের চিত্রপটে মেঘ শুধু রৌদ্রের শিকারী;
নায়কের মতো রুগ্ন, নায়িকার মতো নগ্ন দিন,
এখনো অশ্বত্থ, কৃষ্ণচূড়ার আড়ালে ছায়া তারই।
মনে হচ্ছে এইভাবে মৃত ভালোবাসার উজানে
ফুটবে এই স্বদেশের অশোক, পলাশ, কৃষ্ণকলি।
পাথরের বুক চিরে প্রকৃত পল্লব কারো গানে
যদি জাগে, সেইদিন জানবো আমি কার রক্তে জ্বলি।
দ্বিধায় পীড়িত নই, দুঃখে নই পিঙ্গল প্রেমিক।
চতুর্দিকে জেগে আছে আমার ইন্দ্রিয়ঃ আমি জানি
আর কতো দূরে গেলে মিলবে সেই হারানো প্রতীক,
অথবা জীবন হবে দ্রষ্টব্যের তালিকাসন্ধানী।
স্বপ্নের সাহসে কৃচ্ছ্রসাধনায়, হায়, ওরে নারী
আমাকে ভেবো না তুমি, মুগ্ধ ভালোবাসার ভিখারি।

মনে মনে

মানস রায়চৌধুরী

এই জলে স্নান সারো। স্মৃতির সৌরভে আমোদিত
তোমার হারানো মণি ফিরে পাবে স্নান সারা হলে,
যে তোমাকে ভুলে গেছে ভিনদেশী সংসারের কাজে
তার ছায়া মিশে আছে এই স্নিগ্ধ নির্ঝরের জলে।

কাকে লজ্জা করো তুমি? বৃক্ষরাজি? শক্তিহীন অক্ষম প্রহরী।
অসঙ্কোচে মুক্ত করো হিরন্ময় বুকের বসন।
নামো নগ্ন অকপট ক্রীড়াপর মীনের মতন
—এই জলে একদিন তার ছায়া ছিলো।

অস্পষ্ট হাসির শব্দ। চমকে উঠলে, পাখি কিম্বা হাওয়া
চটুল যুবার মত বক্ষপথে করে আসা যাওয়া
রোমকূপে স্বাদ নাও, ঢেউগুলি প্রেমিকের [illegible] প্রতীক
—সেদিন ঝর্ণার বুকে নেমেছিলো বিদেশী পথিক।

চিত্র প্রদর্শনী

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম-এ অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর রজত-জয়ন্তী কলা প্রদর্শনী চলছে। অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৩ সালে।

এ-প্রদর্শনীতে ছবি আছে সব সমেত ৩৫১টি এবং ভাস্কর্য ও মডেলিং মিলিয়ে আছে ২৩টি নিদর্শন। ছবির মধ্যে ৪৩টি ছবি প্রবীণ শিল্পীদের রচনা।

এবারের প্রদর্শনীতে মডার্নিস্টিক রচনার আবির্ভাব অন্যান্য বারের তুলনায় একটু যেন বেশী মনে হল। একটা লক্ষ্য করার বিষয়—ঐ সব মডার্ন ছবির বেশীর ভাগই বাংলার বাইরের শিল্পীদের রচনা। তাহলে কি বুঝতে হবে, বাংলা দেশে আধুনিক আর্টের চর্চা অন্য প্রদেশের তুলনায় কম হচ্ছে। আমাদের কিন্তু তা মনে হয় না। এ-প্রদর্শনীতে না দেখতে পেলেও আমরা কলকাতায় অনুষ্ঠিত অনেক চিত্র-প্রদর্শনীতেই লক্ষ্য করেছি, যথার্থ উঁচু দরের মডার্ন ছবি। বর্ণ, দেহনিরপেক্ষ কল্পনা, আধুনিক রচনা কৌশল ইত্যাদি নিয়ে এখানকার শিল্পীরাও কম মাথা ঘামাচ্ছেন না। মনে হয়, অন্য প্রদেশের শিল্পীদের রচনা অপেক্ষা এঁদের রচনা বাছাই করতে যাঁরা বাছাই করেন তাঁরা একটু বেশী 'কঠোরতা' অবলম্বন করে থাকেন বলেই এ-প্রদর্শনীতে এঁদের রচনা স্থান পায় না।

এবারের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন (বিচারকদের মতে) শান্তি দাভের 'কাশ্মীর'। ছবিটি মডার্নিস্টিক সে কথা বলাই বাহুল্য। দেখতেও ভাল লাগে। কিন্তু মনে হয়, কোনও বিদেশী শিল্পী এদেশে বসে ছবিটি রচনা করেছেন। দাভের প্রত্যেকটি রচনাই তাই। বর্ণিকা, রচনাভঙ্গী, আকৃতির বিকৃতিকরণ, এসবেরই মধ্যে থেকে যেন কোনও এক মার্কিন শিল্পীর আর্টের আভাস পাওয়া যায়। নতুন শিল্প উদ্ভাবন করতে হলে নানা দেশের প্রথা-প্রকরণ দেশবিদেশ থেকে আদায় করতেই হবে; কিন্তু ঐ সব প্রথা-প্রকরণ প্রয়োগের সময় বিচার ও বিবেচনা না করলে সে আর্ট শুধুমাত্র বিদেশী আর্টের পুনরাবৃত্তিই হয়ে থাকে। মডার্ন আর্টে শিল্পী অতিরঞ্জন বা অনুরঞ্জনের সাহায্যে আপন ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন প্রকাশ করে থাকেন। তাঁর ছবিকে আমরা রসোত্তীর্ণ শিল্প বলে মেনে নিতে রাজী আছি, কিন্তু তাঁর দেখাদেখি যদি অন্য আরেকজন অনুরূপে অতিরঞ্জন বা অনুরঞ্জন করেন, তা হলে তাঁকেও কি শিল্পের আসরে অধিষ্ঠিত রাখা চলে? সেকালের শিল্পীরা বাঁধা ফরমুলা মেনে ছবি আঁকতেন, কাজেই একের সঙ্গে অন্যের মিল হলে তা দোষের হত না; কিন্তু এখনকার আর্টে সেটি হবার জো নেই; এখন শিল্পীর স্বকীয়তার

অজন্তার অনুকরণে — গণেশ হালোই

ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড দেয়ার কাইন্ড —হাটালকর
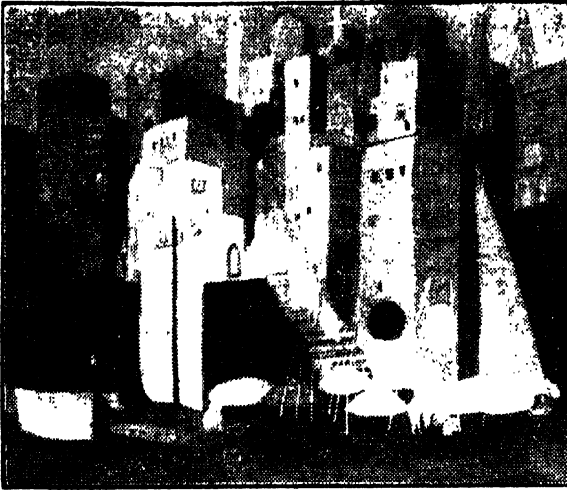
বারাণসী —অরুণ দাস

ওপরেই ছবির রস বিচার করেন রসিক দর্শক। সত্যিকার শক্তিশালী শিল্পী প্রথা-প্রকরণ ধার করলেও তা তাঁর ব্যক্তিত্বের রসে পরিপূর্ণ হয়ে বিশিষ্ট রূপে ধারণ করে। এ-প্রদর্শনীর বেশীর ভাগ মডার্ন ছবিতেই সেই স্বকীয়তার একান্ত অভাব। প্রদর্শনী দেখতে দেখতে চোখে পড়ে পিকাশো, মাতীজ, ব্রাক, শাগাল, বেন শান প্রভৃতি শিল্পীর আর্টের পুনরবৃত্তি। কিন্তু অপটু শিল্পীর হাতে পড়ায় ওসব শিল্পীদের আর্টের প্রসাদগুণ পৌঁছায়নি এসব শিল্প-রচনাতে। জলরঙের ছবির বিভাগের অবস্থা আরও শোচনীয়। ছবিগুলির মধ্যে প্রকৃত পরিণত কাজ একটিও চোখে পড়ল না। সবই যেন শিক্ষানবিশদের রচনা। ক্লাস রুম এক্সারসাইজ। এমন সব ছবি বাছাই হল কোন্ গুণে ঠিক ধরতে পারা গেল না। প্রাচ্য চিত্র বিভাগের কয়েকটি রচনা সত্যই রসোত্তীর্ণ, যেমন প্রদ্যুম্ন তানার 'ওয়ান স্টোরীড হোয়াইট হাট', 'লোটাস পন্ড' এবং 'গোপী', আলমেনকারের 'দি ড্রামার 'উওম্যান উইথ ফিস' এবং 'হিমাচল ডান্সারস' সুধাংশু বসু-রায়ের ওয়াইল্ড ডাক অন স্কীন' কল্লারঞ্জন ঠাকুরের 'বার্থ অব লক্ষ্মী' প্রভৃতি। নন্দলাল বসুকে আমরা প্রবীণ শিল্পী বলেই জানি; কিন্তু অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর কর্তৃপক্ষ তাঁর রচনাগুলি নবীন শিল্পীদের রচনার সঙ্গে কেন প্রদর্শন করলেন, বুঝতে পারলাম না। প্রবীণ শিল্পীদের রচনার মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথ, সুনয়নী দেবী, জে পি গাঙ্গুলি, যামিনী রায়, অতুল বসু, দেবী-প্রসাদ রায়চৌধুরী, সারদা উকিল, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ললিতমোহন সেন, বিনোদবিহারী, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কে সি রায়, অবনী সেন, গোবর্ধন আশ, রামগোপাল বিজয় বারজিয়া, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, ভবানীচরণ লাহা, ভিওয়ান্ডিওয়ালা, অর্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যো-পাধ্যায়, রসময় ভট্টাচর্য, হেমেন মজুমদার, পূর্ণ চক্রবর্তী এবং বিমল মজুমদারের রচনা।

এগুলির মধ্যে কিছু ছবি বাতিল করা হলেই ভাল হত বলে মনে হয়। এ থেকে এইটেই প্রমাণ হয়, প্রবীণদের মধ্যে অনেকেই এখনকার মানের তুলনায় অনেক নিকৃষ্ট রচনা করেও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন সে সময়ে। এ বিভাগের উল্লেখযোগ্য রচনা রবীন্দ্রনাথের 'দি মীস্টিক', সুনয়নী দেবীর 'গোপাল', সারদা উকিলের 'এ পেন্টিং', বিনোদবিহারী মুখোপধ্যায়ের 'ল্যান্ডসস্কেপ' চৈতন্যদেব চট্টোপ্যাধ্যায়ের 'অর্ধনারীশ্বর' এবং হেমেন মজুমদারের 'বু শাড়ি', 'হিস্ট্রী অব হার ওন' এবং 'টয়লেটিং'।

এবারে মডেলিং এবং ভাস্কর্যের নিদর্শন-গুলির মধ্যে অনেকগুলিই বেশ রসোপেত। 'এনার্জি' মূর্তিটিকে প্রথম পুরস্কার দেওয়া হলেও ব্যক্তিগতভাবে রাঘব কানেরিয়ার 'কিড' মূর্তিটিই আমার বেশী রসোপেত বলে মনে হয়েছে। শঙ্খ চৌধুরীর 'স্ট্যান্ডিং ফিগার', রবীন রায়ের 'লাইফ লাইনস অব প্রোগ্রেস—ইন্ডাস্ট্রিজ' এবং ফণিভূষণের 'রেস্ট অন শাল উড'—এই ক'টি নিদর্শনও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মডার্ন আর্ট, জলরঙের ছবি এবং গ্রাফিক আর্টের উল্লেখযোগ্য রচনা হাটালকারের 'ফ্লাওয়ার্স এন্ড দেয়ার কাইন্ড' রাফাই-এর 'রাজস্থান ল্যান্ডস্কেপ' দুটি, জ্যোতিষ ভট্টাচার্যের 'কিউপিডিটি' শৈলজ মুখো-পাধ্যায়ের 'লাভার্স', রথীন মৈত্রের 'টিউন', চিত্তেলের 'লাইফ অব এ ট্রী', মোহন সামন্তের 'মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রাল', রামকিঙ্করের 'ফেস্টিভ ইভ', মুস্তাফা সোনওয়ারের 'লীজার', সুবোধচন্দ্র বোসের 'ল্যান্ডসস্কেপ', পিথাওয়িয়ার 'রয়্যাল ল্যান্ডস্কেপ' বিনোদ্রে প্যাটেলের 'উপভান বিনোদ', নীরদ মজুমদারের 'বেহুলা' সিরিজের ছবি দুটি, কনট্রাকটরের 'বাই দি রিভার সাইড', রতন পারিস্মার 'আট দি ব্রীজ' এবং কৃষ্ণরাওর 'এ স্ট্রীট সীন'।

প্রদর্শনীটি খোলা থাকে সকাল দশটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত, প্রতিদিন। প্রবেশ মূল্য আট আনা।

চিত্রগ্রীব

শার্ঙ্গদেব

জয়দেব স্মরণে

এই পৌষ সংক্রান্তিতে বহু ভক্ত বীরভূমের জয়দেব-কেন্দুলীতে সমাগত হবেন কবি জয়দেবের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ বহন করে। অজয়ের দুই তীর স্নানার্থীর দলে ভরে যাবে। সারারাত ধরে চলবে উৎসব—বাঁশি বাজবে, বাউলেরা নাচবে, গাইবে—দিন-কতকের জন্য মুখর হয়ে উঠবে নির্জন গ্রাম। জয়দেবকে এইভাবে ভক্ত সম্প্রদায় মনে রেখেছেন সাধক বলে। কবি হিসাবে সাহিত্যে তিনি আজও আদৃত। কিন্তু সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে জয়দেবের যে বিরাট পরিচয় ছিল, তা আজ মুছে গেছে। আজ কেন, বহু শতাব্দী পূর্বেই সে পরিচয় বিলুপ্ত হয়েছে। গীতগোবিন্দ গ্রন্থে গীতগুলির ওপরে জয়দেব প্রদত্ত রাগ ও তালের উল্লেখ আছে, কিন্তু মূল সুরের ধরন কিরকম ছিল, তার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। বাংলা দেশে কেন, ভারতের কোথাও বোধ করি ধারাবাহিক-ভাবে জয়দেবের মূল গায়ন-রীতির পরিচয় পাওয়া যাবে না। এমন কি জয়দেবের গীতগোবিন্দ গীতিনাট্যটি নতুনভাবে অভিনীত হবার কোন সংবাদই বাংলা দেশের ইতিহাস থেকে পাওয়া যায় না। ইচ্ছা করলে গায়নসম্প্রদায় মূল রীতির কিছুটা যে বজায় রাখতে পারতেন না এমন নয়, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক সেটা হয়নি। তবে গীতগোবিন্দের গানগুলি বিক্ষিপ্তভাবে শিল্পীর নিজস্ব সুরে গাওয়া হয়েছে। গত শতাব্দীতে যখন যাত্রা থিয়েটারের মরশুম পড়ল, তখন কেউ কেউ এই সব সুর কিছু কিছু সংগ্রহ করেছিলেন অথবা নিজেরা নতুন করে সুর দিয়ে গীতগোবিন্দের গান-গুলিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক করে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন।

ইতিহাসের দিক দিয়ে আলোচনা করলে জয়দেবের গীতগোবিন্দকে রাগসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না, এটি প্রবন্ধের পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। রাগ অবলম্বন করে গান রচনা করলেই সেটি রাগসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত হয় না। সে যুগে রাগসঙ্গীতের কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল, তার একটা বিশেষ রূপ ছিল তার মধ্যে না পড়লে কোন গীতকেই রাগসঙ্গীত বলে গ্রাহ্য করা হত না। জয়দেব নিজেও তাঁর রচনা যে রাগসঙ্গীত, এমন কথা বলেননি তিনি গানগুলিকে 'প্রবন্ধ' বলেই স্বীকার করেছেন। এই প্রবন্ধটিও শুদ্ধজাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে পড়ে না। তারও কলা-কৌশল কম ছিল না এবং জয়দেবের সময়ই শুদ্ধ প্রবন্ধের বিবিধ রূপ উপযুক্ত গণ্ডীর [illegible] হয় আসছিল। জয়দেব দ্বাদশ শতাব্দীতে যে প্রবন্ধ রচনা করে-ছিলেন, তা হচ্ছে ছায়ালগ বা সালগ-সূড় শ্রেণীর প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের অন্তর্গত সাতটি গীতের নাম—ধ্রুব, মণ্ঠ, প্রতিমণ্ঠ, নিঃসারুক, অড্ড, রাস এবং একতালী। জয়দেব এই সব গানের রীতি অবলম্বন করেই গীতগোবিন্দের প্রবন্ধগুলি রচনা করেন। ধ্রুব পর্যায়ের সালগ-সূড় প্রবন্ধ থেকে সাক্ষাৎভাবে আমাদের বর্তমান ধ্রুবপদ সংগঠিত হয়েছে। পরবর্তীকালে গীতগোবিন্দের গানগুলি এই ধ্রুবপদের অন্তর্ভুক্ত হয়। বাংলায় এই পর্যায়ের গানকে বলা হত "ক্ষুদ্র গীত"। তিনশ বছর আগে গীতগোবিন্দের গানগুলি যে ক্ষুদ্রগীতের অন্তর্গত ছিল এমন কেতাবি প্রমাণ আছে।

জয়দেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই তাঁর গীতিকলার রূপটি লুপ্ত হতে থাকে। এ বিষয়ে বিশেষ কেউ উৎসাহীও ছিলেন না, কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন বিরাট সঙ্গীতশিল্পাভিজ্ঞ পণ্ডিত জয়দেবের গীতগোবিন্দকে প্রায় সে যুগের রীতিতেই নতুনভাবে রূপ দিতে অগ্রসর হলেন। ইনি ইতিহাসবিশ্রুত যোদ্ধাগ্রগণ্য মেবারের মহারানা কুম্ভ। কোথায় বাংলা, উড়িষ্যা আর কোথায় সেকালের মেবার—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, মধ্য-যুগে মেবারই জয়দেবের প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। কুম্ভ যে শুধু গীত-গোবিন্দের নতুন গীতরূপ দিয়েছিলেন, তাই নয়, উক্ত কাব্যের রসিকপ্রিয়া নামক যে টীকা রচনা করেছিলেন, সেটিও বোধ করি অপরাপর টীকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ১৪৩৩ সালে কুম্ভ মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পঁয়ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করেন। এই পঁয়ত্রিশ বৎসর যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহে কেটেছে, তা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন, কিন্তু এ-খবর খুব কম লোকেই জানেন যে, তিনি একজন কুশল বীণাবাদক ছিলেন এবং তাঁকে অভিনবভরতাচার্য বলে সম্মানিত করা হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তিনি এই গীতিনাট্যের পরি-কল্পনা করেন। জয়দেব যে সালগ-সূড়ের ধারা অবলম্বন করেছিলেন, তিনিও সেই রীতিই অবলম্বন করেন, তবে তার মধ্যে তৎকালীন রূপক নামক অভিনব গায়ন-কলার পরিচয়ও তিনি দিয়ে গেছেন। জয়দেবের গ্রন্থে কেবলমাত্র প্রবন্ধগুলিতেই রাগ-তাল যোজনা করা হয়েছে, অর্থাৎ সেগুলিই গান করা হত। কুম্ভ কিন্তু অপরাপর শ্লোকগুলিতেও সুরযোজনা করেছেন। গীতগোবিন্দের শেষ সর্গের চার-পাঁচটি শ্লোক তো তিনি রীতিমত সঙ্গীতে পরিবর্তিত করেছেন। পদ্যাংশগুলিও মহারানার কাছে এত মিষ্টি লেগেছে যে, সেগুলিকে গীতিবিধি অনুসারে সুরে রূপায়িত না করে তিনি থাকতে পারেন নি। এই উপলক্ষে তিনি বলছেন—'কলিতাপি পদ্য রচনা ন ধাতুযোগাদৃতে বিভাতি শুভা।

ইতি কুম্ভকর্নন্‌পতির্গায়তি তাং গীত-গোবিন্দে।' লালিত্যসম্পন্ন পদ্য স্বতই গীতধর্মী তাকে ধাতু বা কলি হিসাবে ভাগ করে গানের পর্যায়ে রূপায়িত না করলে যেন মন ভরে না।

কুম্ভ জয়দেব প্রদত্ত সুর এবং তাল বজায় রাখেন নি, কিন্তু তিনি যেসব রাগ এবং তাল প্রয়োগ করেছেন, সেগুলিও জয়দেবের সময় বর্তমান ছিল। অর্থাৎ জয়দেবের সময়কার ষড়ঙ্গ প্রবন্ধের রীতিনীতি নিয়েই তিনি এই নতুন গীত-প্রবন্ধ রচনা করে-ছিলেন। আমাদের কীর্তনও গোড়াতে এই ষড়ঙ্গ প্রবন্ধের নিয়মে রচিত হয়। কুম্ভের রচনায় রাগ এবং তালের বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়। 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী'—এই গানটিতে তিনি পর পর আঠারোটি রাগ যোজনা করেছেন। এই প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন—'চতুর চতুর্ভুজ-রাগরাজিচন্দ্রোদ্যাত। আর একটি গান 'বিরচিত চাটুবচন' এতে তেরটি রাগ প্রয়োগ করেছেন; প্রবন্ধের নাম দিয়েছেন—শ্রীহরিতালরাজিজলধরবিলম্বিত। শুধু তালফেরতাই নয়, এর সঙ্গে নানারকম বাজনার বৈচিত্র্যও সৃষ্টি করেছেন। একটি তালে এক-এক ধরনের বাজনা বাজাবার ব্যবস্থা ছিল। যেমন, নিঃসারুক তালে বাজত পটহ, ঢক্কা, মর্দল, ত্রিবলী, একতালী তালে বাজত ঢক্কলী, ত্রিবলী, দুন্দুভি ঘট। এগুলি বাজাবারও বিশেষ কায়দা ছিল—প্রত্যেকটি যন্ত্রের আওয়াজের তারতম্য হিসাবে যন্ত্রগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে, যাতে সমবেত ধ্বনির মধ্যে একটি বিচিত্র সংগীত সৃষ্টি হয়। এর সঙ্গে শঙ্খ বাজত আর বাজত নানারকমের বাঁশি, যেমন—কহলী, তুন্ডাকিনী, শৃঙ্গ প্রভৃতি। গানে মাঝে মাঝে আলাপের অবকাশ থাকত। প্রায় সব গানেই সর্গম, বাদ্যের বোল প্রভৃতি নানাভাবে উচ্চারিত হত। 'রাধবদন বিলোকন বিকশিত বিবিধবিকারবিভঙ্গম্'—এই গানটিতে ক্রমান্বয়ে সতেরোটি রাগ এবং ছটি তাল যোজিত হয়েছে। এর নাম দেওয়া হয়েছে — সানন্দগোবিন্দরাগশ্রেণী কুসুমাভরণ। জয়দেব যেসব রাগ প্রয়োগ করেছিলেন, সেগুলি হচ্ছে মালব, গুর্জরী, বসন্ত, রামকিরি, কর্নাট, দেশাখ্য দেশবরাড়ি গোন্ডকিরি, ভৈরবী, বিভাস। কুম্ভকর্ণ প্রযুক্ত রাগগুলি হচ্ছে—মধ্যমাদি, ললিত বসন্ত, গুর্জরী, ধানসী, ভৈরব, গোন্ডকৃতি দেশাখ্য, মালবশ্রী, কেদার, মালবগৌরক স্থানগৌড, শ্রী, মহ্লার, বরাটিকা, মেঘ ভদ্রাবৎ ধোরনী নন্দ নট দেবশাল। জয়দেব প্রযুক্ত তালগুলি হচ্ছে—রূপক, নিঃসারুক, যতি, একতালী, অষ্টতালী। কুম্ভ প্রবর্তিত তাল—আদি ঝম্পা বর্ণযতি প্রতিমণ্ঠ নিঃসারুক অড্ড মণ্ঠ (দ্রুত চতুর্মাত্রিক নবমাত্রিক) রূপক প্রতি, ত্রিপুটক, দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চ জয়মঙ্গল বিজয়ানন্দ এবং জয়শ্রী। এই সবগুলিই শাস্ত্রানুমোদিত তাল।

মহারানা কুম্ভ যে গীতকলার পরিচয় রেখে গেছেন, তা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রবহমান প্রবন্ধ সংগীতের একটি চমৎকার নমুনা। এমন উদাহরণ আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। অনেকে ঠাট্টা করেন, সেকালকার শাস্ত্রীয় সংগীত নিছক কেতাবি ব্যাপার এবং কৃত্রিম—তাঁদের কুম্ভপ্রযোজিত গীতগোবিন্দের আটাশটি প্রবন্ধের পরিচয় গ্রহণ করতে বলি। এগুলি একেবারে প্র্যাকটিক্যাল ব্যাপার—রানা কুম্ভ অভিনয়-যোগেই এগুলি প্রদর্শন করেছিলেন। অভিজ্ঞ শিল্পী ইচ্ছা করলে এযুগেও এই প্রবন্ধগুলির রূপায়ণ সম্ভব করতে পারেন। এখানে প্রতিটি গান বিশ্লেষণ করে দেখাবার সুযোগ নেই নতুবা দেখানো যেত, শাস্ত্রীয় সংগীতকলা কেমন সুনিয়মে প্রত্যক্ষভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কুম্ভকর্ণ এই গীতরূপ পরিকল্পনা করে বলছেন—'যদি কৌতূকিনো গানে সংগীতে চাতুরী যদি। রসিকাঃ কুম্ভকর্ণস্য শৃন্বন্তু বাধসওমাঃ॥' জয়দেব তাঁর মনোহর পদাবলী সম্বন্ধে বলেছিলেন—'যদি হরি স্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্ মধুর কোমলকান্ত পদাবলীং শৃণুতদা জয়দেব সরস্বতীং।' জয়দেব মধুর কোমল-কান্ত পদাবলীর কথা পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন আর কুম্ভ সংগীতকলায় তাঁর চাতুর্যের প্রতি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। এটা নেহাৎ কেতাবি বা থিওরেটিক্যাল ব্যাপার নয়।

এই প্রসঙ্গে এমন কথা যেন কেউ মনে না করেন যে, জয়দেবের প্রতি একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে কুম্ভ তাঁর সংগীত পরিকল্পনা করেছিলেন। জয়দেব এবং তদীয় গীতগোবিন্দ সম্বন্ধে কুম্ভকর্ণের অপরিমিত শ্রদ্ধা ছিল নতুবা উক্ত গ্রন্থের এমন সুন্দর টীকা প্রণয়নে তিনি অগ্রণী হতেন না। গীতগোবিন্দের গীত পরিচয় হারিয়ে যাওয়ায় তিনি মনোবেদনা অনুভব করেছিলেন এবং এই কারণেই এই গীতি-কাব্যে আবার সুর-তাল আরোপ করে নতুনভাবে সংগীত রচনা করলেন। ভারতীয় সংগীতেরই এটি বিশেষত্ব যে, মূলে সুর হারিয়ে গেলেও শিল্পীরা নিরস্ত হন না, আবার তাতে সুরযোজনা করে তাকে নতুনভাবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির গানে সুর আরোপ করেছেন—এটা তিনি দোষনীয় মনে করেন নি। যাতে গীতগোবিন্দের গান পরিপূর্ণ মর্যাদায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে এই কারণে কুম্ভ যথেষ্ট ভেবেচিন্তে সেকালের শ্রেষ্ঠ গীতিরীতিগুলি প্রয়োগ করে নবতর প্রবন্ধ প্রণয়ন করলেন তিনি স্পষ্টই তাঁর টীকায় স্বীকার করেছেন যে, জয়দেবের গীতকে তিনি নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী রূপায়িত করেছেন। নিজেকে তিনি 'কুটিকার' বলেছেন। যিনি অপরের প্রযুক্ত সংগীতকে নিজের আদর্শে পরিবর্তিত করেন, তাঁকেই বলা হয় 'কুটিকার'। কুম্ভ এর চেয়ে বড় দাবী উপস্থিত করেন নি। কুম্ভের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাব এই কারণে যে, যে সংগীত উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তার পূর্ব গৌরব থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল, তাকে তিনি পূর্ব গৌরবের আসনে স্থাপন করবারই প্রয়াসী হয়েছিলেন।

কিন্তু হায়, এই প্রয়াসও অল্পকালের জন্যই স্থায়ী হয়েছিল। সেই সংগীতও শিল্পীপরম্পরা আমাদের কাছে পৌঁছোলো না। তবু একটা মহৎ চেষ্টাও যে হয়েছিল, তার পরিচয় আমরা পাচ্ছি, কিন্তু সে তো সুদূর পশ্চিম ভারতে—যে বাংলা আর উড়িষ্যা জয়দেবকে আপনার বলে এত আড়ম্বর সহকারে ঘোষণা করেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জয়দেবের সংগীত রক্ষার কোন দায়িত্বই সেখানে স্বীকার করা হয়নি। এমন একটি বা একাধিক প্রচেষ্টা কি এসব দেশে হতে পারত না?
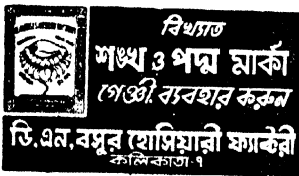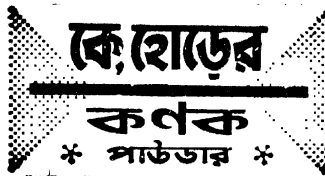
ভাবছিলাম, যতীনের দিদি ক্রিশ্চান, হিন্দু সন্ন্যাসীর কাছে সে গেল কিসের জন্যে?

নজরুলও বলতে পারলো না।

যতীন আর আমি পড়ি একই ক্লাসে, কিন্তু আমাদের সেক্‌শন্ আলাদা। ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা অনেক। এক ঘরে কুলোয় না। তাই সেক্‌শন্ 'এ'র ছাত্রেরা বসে দোতলায়, 'বি'র ছাত্রেরা নীচে। যতীন বসে 'বি' সেকশনে। ছুটির আগে দেখা হল না।

ছুটির পর একদিন দেখি, যতীন গেটের পাশে দাঁড়িয়ে।

কাছে যেতেই বললে, তোকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আজকাল তোর নতুন বন্ধু জুটেছে! তোর সঙ্গে দেখাই হয় না।

কথাটা সত্যি। নতুন বন্ধু মানে নজরুল।

বললাম, কি কথা বলতে ভুলে গেছিস তাই বল্ না।

যতীন বললে, দিদি একদিন তোকে যেতে বলেছিল।

বাড়ি যেতে হলে দুজনেরই এক রাস্তা।

চলতে চলতে বললাম, দিদি আমাকে চিনলে কেমন করে যতীন? আমি তোর দিদিকে সেদিন প্রথম দেখলাম।

যতীন বললে, তুই দেখিসনি হয়ত দিদি দেখেছে।

তা হবে। আগে প্রায় রোজই যেতাম যতীনের বাড়ি। জিজ্ঞাসা করলাম দিদি কি জন্যে গিয়েছিল রে ওখানে—ওই সন্ন্যাসীর কাছে?

জানি না। বলে' সে কথাটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল প্রথমে, তারপর পথ চলতে চলতে হঠাৎ তার কি মনে হলো কে জানে, বললে, বলতে পারি দিদি যদি কোনোদিন না জানতে পারে!

যতীনের গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। বলেছিলাম জানতে পারবে না তুই বল্। যতীন তখন চুপি চুপি বলেছিল, দিদির সংসারে সুখ নেই। দিদি তার শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে আসতে চায়।

—তা সন্ন্যাসী কি করবে?

যতীন বলেছিল, নগেন ময়রার কাছে আমি শুনেছিলাম, চক্‌মকির মাঠে এক সাধু এসেছে নাকি কত রকমের সব অসাধ্য সাধন করছে। সেই কথা দিদিকে বলেছিলাম। দিদি প্রথমে বিশ্বাস করেনি। তখন আমি নিজে গিয়ে একদিন ডেকে এনেছিলাম সন্ন্যাসীর সঙ্গে একজন লোক আছে—তাকে। সে এসে বলেছিল, সাধুবাবার জন্যে কিছু গাঁজা আর পাঁচটি টাকা নিয়ে যাবেন মা, বাবার কাছ থেকে আমি কিছু মন্ত্র-দেওয়া ভস্ম চেয়ে নিয়ে আপনাকে দিয়ে দেবো, সেই ভস্ম আপনি আপনার স্বামীর খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন, তারপর দেখবেন মজা। আপনাদের ছাড়াছাড়ি যদি না হয় তো আমাকে পাঁচ জুতো মারবেন। তাই এক টাকার গাঁজা আর পাঁচটি টাকা নিয়ে দিদি গিয়েছিল সেদিন।

শুনলাম মন্ত্র-দেওয়া ভস্ম নাকি দিদি সেদিন নিয়ে এসেছে!

রাস্তার ধারেই একতলা বাড়ি যতীনদের। কতদিন গেছি সেখানে। জানতাম যতীনের এক দিদি আছে, আর একটি বোন আছে যতীনের চেয়ে ছোট, কিন্তু কোনোদিন তাদের আমি চোখে দেখিনি। সেদিন দিদিকে প্রথম দেখলাম চক্‌মকির মাঠে সেই গাছের তলায়।

দোরের কড়া নাড়তেই চাকর এসে দোর খুলে দিলে। ছোট ছোট কয়েকটা মুরগীর বাচ্চা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমাদের দেখেই ছুটে পালালো।

সুমুখের ঘরখানিই যতীনের ঘর। পুরনো ভাড়াটে বাড়ি। কিন্তু এমনি পরিপাটি করে' সাজানো, পুরোনো বলে মনেই হয় না। দরজায় জানলায় পর্দা খাটানো, টেবিল, চেয়ার, খাট, আলমারি—সব-কিছু একেবারে নতুনের মত।

ঘরে ঢুকেই বললাম, ডাক্ দিদিকে!

যতীন আমার কথাটার জবাব দিলে না। বইখাতা নামিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। ভাবলাম দিদিকে ডাকতে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকারে লণ্ঠনের আলোতে যে-দিদিকে দেখেছি অপরূপ সুন্দরী, আজ সেই দিদিকে দেখবো দিনের আলোয়। সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি দোরের দিকে তাকিয়ে।

খানিক পরে দেখি, ইয়াসিন ঘরে ঢুকলো চা নিয়ে। চা আর একটা গরম আলুর চপ।

জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কোথায় ইয়াসিন?

ইয়াসিন বললে, দিদিমণি তো এখানে নেই বাবু।

সেকি? তবে যে যতীন বললে—

কি বললে যতীন? বলতে বলতে যতীন ঘরে ঢুকলো।

বললাম, দিদি এখানে নেই?

যতীন বললে, না। চারদিন আগে চলে গেছে প্রসাদপুরে।

—তবে যে বললি, দিদি আমাকে ডেকেছে!

—যাবার আগে ডেকেছিল। বললাম তো তোকে বলতে ভুলে গেছি।

বললাম, কই, আগে তো সেকথা বললি না?

যতীন বললে, বললে কি করতিস? আসতিস না?

—আসবো না কেন? কিন্তু মনটা সত্যিই খুব খারাপ হয়ে গেল।

যতীন বললে, আসছে রবিবার আমি যাব দিদির কাছে। তুই যেতে পারিস আমার সঙ্গে।

সোম মঙ্গল দুদিন কিসের যেন ছুটি ছিল। বললাম, যাব।

যতীন বললে, সকালে আসিস আমাদের বাড়িতে। সাতটায় ট্রেন।

সেই কথাই রইলো। রবিবার সকালে যতীনের সঙ্গে আমি প্রসাদপুর যাব।

সঙ্গে যদি নিয়ে যেতে পারি নজরুলকে তাহলে বেশ মজা হয়। বললাম গিয়ে

নজরুলকে। বললাম, তোমাকে যেতেই হবে।

নজরুল রাজি হয় না কিছুতেই। নানারকমের ওজর-আপত্তি। কখনও অ্যালজেবরাটা দেখিয়ে বলে, এই দ্যাখো, এই এতগুলো অঙ্ক কষতে হবে। কখনও বলে, ইংরেজীতে তিনটে 'এসে' লিখতে হবে ছুটীতে। 'হোম্ টাস্ক্' এই এ-তো! করবে না কিছুই। বুঝলাম, সব বাজে কথা। যাবার ইচ্ছা নেই।

বাধ্য হয়ে আমাকে একাই যেতে হলো। ভাগিস একা গিয়েছিলাম! সেখানে গিয়ে বুঝলাম সেকথা।

জংসন স্টেশন থেকে মাত্র মাইলখানেক পথ।

আজকার মোটর বাস, সাইকেল-রিক্শা, কতরকমের কত যান-বাহন, যেখানে যাবেন পৌঁছে দেবে, পকেটে পয়সা থাকলেই হলো। কিন্তু তখনকার দিনে স্টেশনটাও এত বড় ছিল না, এত গাড়ি ঘোড়াও ছিল না, লোকজন সব পায়ে হেঁটেই যাওয়া আসা করতো।

ট্রেন থেকে নেমে গল্প করতে করতে যতীন আর আমি কখন যে প্রসাদপুরে এসে গেছি বুঝতেই পারিনি।

দূরে গ্রাম দেখা যাচ্ছে। লোকালয় থেকে দূরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে চমৎকার একটি বাংলো-বাড়ি—কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। চারিদিকে বড় বড় আম আর অর্জুনের গাছ।

জায়গাটা যেমন নির্জন, তেমনি মনোরম। হাওয়া এসে লাগছে গাছের ডালে। কত রকমের কত পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে।

কাঁকর-পাথরের ডাঙ্গায়-ভরা এই কয়লাকুঠির দেশ। এখানে ফুল খুব কমই পাওয়া যায়। কিন্তু সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার এই যে—বাড়িটার সামনে গেটের কাছাকাছি যেতেই ফুলের সমারোহ দেখে থমকে থামতে হ'লো। দেখলাম, সুমুখের অনেকখানা জায়গা জুড়ে বাগান, আর সেই বাগান আলো করে ফুটে আছে বড় বড় গাঁদা আর ডালিয়া।

—কিরে, তোরা ওখানে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আয়!

মুখ ফিরিয়ে দেখি, দিদি এসে দাঁড়িয়েছে। এলো চুল পিঠের ওপর ফাঁস দিয়ে বাঁধা। পরনের শাড়িটা আটসাঁট করে কোমরে জড়ানো।

সেদিন চকমকির গঙ্গার সেই বড় বট-গাছের তলায় সন্ন্যাসীর আস্তানায় যাকে দেখেছিলাম, এ যেন সে-মেয়ে নয়।

বললাম, ফুল দেখছি।

দিদি বললে, পরে দেখবি। আয়!

কাছে যেতেই বললে, সারাদিন একা-একা কি আর করবো, একটা মালি রেখে ওই-সব করেছি।

মনে হলো দিদি যেন কাজ করতে করতে উঠে এসেছে।

ঠিক তাই।

বললে, তোদের জন্যে রান্না করছিলাম।

বললাম, আমরা আসবো জানলেন কেমন করে?

—যতীন চিঠি লিখেছিল। নজরুলকে আনতে পারলে না?

বললাম, এলো না।

দিদি বললে, জানি—আসবে না।

বাড়িতে অনেকগুলো ঘর। প্রতিটি ঘর এমনভাবে সাজানো, দেখলে মনে হয় মস্ত বড়লোকের বাড়ি। যে-ঘরে আমাদের নিয়ে গিয়ে বসালে সে-ঘরে ধুলোমাখা জুতো পায়ে দিয়ে বসতে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকছিল।

দিদি আমার কাছে এগিয়ে এলো। বললে, তুমি এসেছ, আমার এত আনন্দ হচ্ছে! বোসো, তোমাদের আগে চা খাওয়াই।

দিদি বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। যতীন বললে, রান্না করছিলে কেন? যোসেফ নেই? দিদি বললে, আছে। যোসেফ আছে, কালীচরণ আছে, আমি তাদের দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। আজ তো আবার তিনি আসবেন।

যতীন জিজ্ঞাসা করলে, কখন?

—তার কি কোনও ঠিক-ঠিকানা আছে? দুখু যখন ছিল, ঠিক সময়ে টেনে আনতো। বলেই দিদি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যতীনকে জিজ্ঞাসা করলাম, কার কথা হচ্ছে?

যতীন বললে, জামাইবাবুর কথা।

যাক, তাহলে দেখা হবে সেই মানুষটির সঙ্গে!

বাড়িতে ঢুকে অবধি কানে আসছিল পিয়ানোর আওয়াজ। মনে হচ্ছিল, কাছা-কাছে কোনও ঘরে বসে কে যেন টুং টুং করে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। মুখ হাত ধুতে গিয়ে একটা ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি, পিয়ানোর সামনে পিছন ফিরে বসে আছে একটি মেয়ে। মুখ না দেখা গেলেও বুঝতে দেরি হলো না মেয়েটি ইংরেজ।

একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখছি, যতীন আমাকে সেখানে দাঁড়াতে দিলে না। তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে চলে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম, কে এ মেয়েটি?

বললে, পরে বলবো।

খাবার জন্য ওদের আলাদা ঘর। ঘরের মাঝখানে মার্বেল পাথরের টেবিল, চারি-দিকে চেয়ার। ওইখানেই ওরা খায়। কিন্তু শুধু আমার জন্যে কিনা জানি না, সেদিন দেখলাম, মেঝের ওপর আসন বিছিয়ে দিদি আমাদের বসে বসে খাওয়ালে। সে আদর, সে যত্ন ভোলবার নয়।

আমারও ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, একটুখানি স্নেহ ভালবাসার ছোঁয়া পেয়ে ভাবপ্রবণ মন আমার গলে জল হয়ে গেল। যতীনের দিদি মনে হলো যেন আমারও দিদি।

দিদিও বললে, একটা ভাই ছিল, আজ মনে হচ্ছে যেন দুটো হলো।

সেকথা দিদি তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রেখেছিল। যতীনের মত আমিও তার ভাই হয়ে গিয়েছিলাম। আজ এর ইহজগতে তাদের কোথাও খুঁজে পাব না। যতীনও নেই, দিদিও নেই। কিন্তু এই দুটি মানুষের অবিচ্ছিন্ন সংস্পর্শে আমি যে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছিলাম, আজও আমার কাছে তা অম্লান হয়ে আছে।

নজরুলের খবর নিতে গিয়ে আমি এই দিদিকে পেলাম। শুধু দিদির কথা নিয়েই বিরাট এক উপন্যাস লেখা চলে। অসামান্য রূপ আর গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল এই নারী। কি বিচিত্র অদ্ভুত তার জীবনের কাহিনী। পরে বলবো সেকথা।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর দিদির ঘরে গিয়ে বসলাম। যতীন শুয়ে পড়লো দিদির খাটের ওপর। আমি বসে বসে একখানা বই পড়ছিলাম। দিদি খেয়ে এসে বললে, আজ আর তোমাদের যেতে দিচ্ছি না। তুমিও শুয়ে পড়।

বললাম, দিনে আমি ঘুমোই না।

যতীনের নাক ডেকে উঠলো। দিদি বললে, ওমা, যতীন ঘুমিয়ে পড়লো! ঘুমোক।

বলেই দিদি চলে যাচ্ছিল। কিন্তু যে-কথা জানবার জন্যে আমি এখানে এসেছি সেকথা

জিজ্ঞাসা করবো কখন? এই তার উপযুক্ত সুযোগ ভেবে ডাকলাম, দিদি!

দোরের কাছে ফিরে দাঁড়ালো দিদি।—কি রে!

বললাম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো আপনাকে?

—আপনি আপনি করিসনে বাপু, নে কি বলবি বল!

হাসতে হাসতে দিদি তার খাটের ওপর চেপে বসলো।

জিজ্ঞাসা করলাম, নজরুল—মানে তোমাদের দুখু, কি করতো এখানে?

দিদি সেকথার জবাব না দিয়ে আমাকেই পাল্টা জিজ্ঞাসা করে বসলো, ও আজকাল ইস্কুলে পড়ছে না?

বললাম, হাঁ, খুব ভাল ছেলে। ডবল প্রমোশন পেয়ে দুটো ক্লাস ডিঙিয়ে একবারে সেকেন্ড ক্লাসে চলে এসেছে। আমাদের সঙ্গে।

—ও তো শিয়াড়শোলে, আর তোরা—রাণীগঞ্জে।

—তোর সঙ্গে খুব ভাব হয়েছে বুঝি?

বললাম হাঁ। ওদের বোর্ডিং আমাদের বাগানের পাশেই। কি সুন্দর কবিতা লেখে দিদি, তুমি যখন যাবে রাণীগঞ্জে, তখন দেখাবো।

দিদি বললে, গানও গাইতে পারে।

বললাম, হাঁ, নিজেই লেখে, নিজেই গায়।

দিদি বললে, গান প্রথমে সে গাইতে চাইতো না। গাইতে বললেই লজ্জায় মাথা হেঁট করে বসে থাকতো। বলতো, আমার গলা ভাল নয়। তারপর লজ্জা যখন ভেঙে গেল, তখন আবার থামতে চাইতো না।

কিন্তু যে কথাটি আমি জানতে চাই, সেটা যে দিদি বলতে চাইছে না কিছুতেই। যতবার জিজ্ঞাসা করি, ততবারই অন্য কথা বলে চাপা দেয়।

জানবার এইটেই উপযুক্ত সময়। যতীন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, দিদির হাতে কোনও কাজ নেই, জামাইবাবু এলে হয়ত কথাই বলতে পারবো না, তাই আবার আমি দিদিকে বললাম, বলনা দিদি, নজরুল কেমন করে এখানে এসেছিল আর চলেই-বা গেল কেন?

দিদি বললে, ও কি ওই কাজ করবার জন্যে জন্মেছে? আর আমরাই-বা ওকে রাখবো কেন?

তারপর অনেক কষ্টে দিদির কাছ থেকে আমি যেটুকু জেনেছিলাম তা এইঃ

দিদির স্বামী ব্র্যাঞ্চ লাইনের গার্ড সাহেব, গাড়ি নিয়ে ডিউটিতে বেরিয়েছেন। শীতকালের রাত্রি। গাড়ি দাঁড়ালো গিয়ে একটা স্টেশনে। কয়লাকুঠির দেশ। কয়লা-ভর্তি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে সাইডিং-লাইনের ওপর। সেগুলো টেনে এনে জুড়তে হবে গাড়ির সঙ্গে। তারপর গাড়ি ছাড়বে। অনেকক্ষণ বসে থাকতে হবে চুপচাপ।

লাইনের ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা আম-কাঁঠালের বাগান। সেই বাগানের একটা গাছের নিচে চট বিছিয়ে কতকগুলো লোক গানের আসর জমিয়েছে। হার-মোনিয়াম বাজছে, ঢোল বাজছে। ঝুমুরের সুরে কবি গান হচ্ছে। মন্দ লাগছে না শুনতে। গার্ড সাহেব তাঁর কামরা থেকে নেমে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সেই-দিকে।

গোটাকতক লণ্ঠন জ্বলছে টিম টিম করে, আর দুদিকে দুটো কাঁচা কয়লার গাদায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

একটা অর্জুন গাছে হেলান দিয়ে গার্ড সাহেব দাঁড়িয়ে গান শুনছেন। শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলেন। দেখলেন, দলের মাঝখানে বসে জোয়ান যে-ছেলেটি ঢোলক বাজিয়ে গান গাইছে, তারই কৃতিত্ব যেন সবচেয়ে বেশি। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, গায়ে একটা হাত-কাটা জামা, পরনে খাটো ধুতি। হাসি যেন মুখে তার লেগেই আছে।

দুটো গান শেষ হলো। ছেলেটি উঠে দাঁড়ালো। বললে, চললাম।

সবাই তাকে ধরে বসলো, আর-একটু

থাকো। ছেলেটি থাকলো না। পেরিয়ে যাচ্ছিল গার্ড সাহেবের পাশ দিয়ে। গার্ড সাহেব তার হাতটা চেপে ধরলেন। ছেলেটি হকচকিয়ে থমকে থামলো। মাথার চুলগুলো একটু দুলিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো শুধু। সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বড় বড় ঢলঢলে চোখ, চওড়া বুকের ছাতি! দেখে মনে হলো ছেলেটি রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সাহেব-ভীতি থাকা তখনকার দিনে স্বাভাবিক। যদিও গার্ড সাহেবের গায়ের রং দেখলে সাহেব-সাহেব মনে হয় না।

সাহেব বললেন, তুমি এ-দলের নও তাহ'লে?

—না।

—কি নাম তোমার?

—দুখু মিঞা, ভাল নাম—নজরুল ইসলাম।

—মুসলমান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সাহেব তার বুকে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন, বাঃ!

বাসুদেব হারমোনিয়াম বাজাচ্ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখেছে ব্যাপারটা। দুখুকে সাহেবে ধরেছে। মানুষকে বাঘে ধরলেও মানুষ বোধ হয় এত বিচলিত হয় না। ধড়মড় করে আসর ছেড়ে ছুটে এলো বুড়ো বাসুদেব। সাহেবের কাছে এসে হাতজোড় করে বললে, দল আমার হুজুর, ও শুধু গান লেখে, পালা লেখে, আর সুর দিয়ে দেয়। যা বলতে হয় আমাকে বলুন। আমরা তো রেলের বাউণ্ডারী ছেড়ে দূরে বসেছি হুজুর।

বাসুদেব ভেবেছিল বুঝি কোনও বে-আইনী কাজ তারা করে ফেলেছে, যার জন্যে সাহেব ধরেছে দুখু মিঞাকে।

সাহেবের বেশ মজা লাগলো। বললেন, তা গাঁ ছেড়ে এসে এখানে আসর বসালে কেন?

বাসুদেব বললে, গাঁয়ের ছোঁড়াগুলো ভারি গোলমাল করে হুজুর। আর এ-জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। তবে সত্যি কথাটা বলি হুজুর আপনার কাছে, শুনুন। মদনের দোকান-ঘরের পাশে যে টিনের চালা-ঘরটা আছে, ওইখানে আমরা আসর বসাচ্ছিলাম। বেশ চলছিল। মদন মাঝে-মাঝে বলছিল বটে—তোমরা অন্য কোথাও দ্যাখো ভাই, আমার বৌ-বেটি ঘরের কাজ-কর্ম ছেড়ে তোমাদের গান শুনতে বসে যায়, রাত্তিরে ভাল করে রান্না পর্যন্ত করে না। কথাটা আমি গ্রাহ্যই করিনি। কিন্তু পরশু হলো কি, মদনের বড় মেয়েটা দু-খিলি পান আমাদের এই দুখু মিঞার হাতে গুঁজে দিয়ে বলে কিনা, এসো দুখু, মোড়ল-পুকুরের ঘাটে বসে আমাকে তোমার সেই গানটা শিখিয়ে দেবে এসো! ব্যাপারটা মদন দেখে ফেললে। বাস্ তাই না দেখে মেয়েটাকে মদন হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে লাগালে বেধড়ক মার। এর পর আর আমরা সেখানে যেতে পারি? কই, আপনিই বলুন হুজুর। অথচ দু' দুটো বায়না, মহড়া না দিলেই নয়। তাই নিরিবিলি এইখানে এসে বসেছি হুজুর। আপনি একটু হুকুম দিয়ে দিন। আজকের দিনটা, আর কালকের দিনটা। ব্যস্ তারপর আমরা জায়গা দেখে নেবো।

রেল লাইন ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে বাগানে বসে গান গাইছে তারা। হুকুমের দরকার হয় না। তবু গার্ড সাহেব বললেন, আচ্ছা যাও, হুকুম দিলাম। কিন্তু তুমি এসো আমার সঙ্গে।

এই-না বলে নজরুলকে নিয়ে গার্ড সাহেব তাঁর ট্রেনের কামরায় এসে উঠলেন। বললেন, এই যে তুমি ওদের কাজ করে দাও এর জন্যে ওরা তোমাকে কি দেয়?

নজরুলের মুখে আবার সেই হাসি।—দেবে আবার কি? শখের দল তো!

তোমার বাড়ির অবস্থা বুঝি খুব ভালো?

মাথা হেঁট করে ঘাড় নেড়ে নজরুল বললে, না।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কাজকর্ম কিছু করবে?

নজরুল বললে, পেলে তো করি। দিন-না একটা!

সাহেব বললেন, আমার সঙ্গে থাকতে হবে।

—থাকবো।

—গান শোনাতে হবে।

—শোনাব।

বাস্। সেইদিনই কাজ পেয়ে গেল নজরুল। রাত্রে বাড়ি পর্যন্ত গেল না। বাসুদেবকে বলে দিলে, মাকে বলে দিও, আমি একটা কাজ পেয়েছি।

চমৎকার কাজ। রেল-স্টেশন থেকে প্রসাদপুরের বাংলো মাত্র মাইল দেড়েক পথ। এই দেড় মাইল কাঁচা রাস্তার উপর দিয়ে গার্ড সাহেবকে নিয়ে গিয়ে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া। এই হলো প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ—টিফিন-ক্যারিয়ারে খাবার ভর্তি করে প্রসাদপুর থেকে নিয়ে আসা। তৃতীয় কাজ একদিন অন্তর ট্রেনে চড়ে আসানসোল যাওয়া আর সেখান থেকে বিলিতি মদ কিনে আনা।

আর একটি কাজ তার ছিল। গার্ড সাহেবকে গান শোনানো। সে কাজ করবার সময় অবশ্য তার ছিল প্রচুর, কিন্তু গার্ড সাহেবের অবসর ছিল না শোনবার।

তবু এক-একদিন নেশার ঝোঁকে সাহেব বলতেন, শোনাও দেখি তোমার একখানা গান!

গান তো সে গাইতেই চায়, কিন্তু বাজাবার যন্ত্র কোথায়?

যন্ত্র আছে প্রসাদপুরের বাংলোয়। হারমোনিয়াম আছে, পিয়ানো আছে।

সাহেব বলেছিলেন, তাহলে কি প্রসাদপুরে গিয়ে তোমার গান শুনতে হবে নাকি?

গাইতে যখন বলেছেন, তখন গাইতেই হবে।

বুক বাজিয়ে টেবিল বাজিয়ে নজরুল শোনাতো তার গান। কিন্তু নাঃ, এরকম করে গান গেয়েও সুখ নেই, শুনেও সুখ নেই।

সাহেব কিন্তু তাইতেই খুশী!

নজরুলকে তখন তিনি সত্যিই ভালবেসে ফেলেছেন। বলতেন, ভাল করে বাজনা বাজিয়ে মেম-সাহেবকে একদিন শুনিয়ো তোমার গান। সেইদিন আমিও শুনবো।

একদিন কেন, মেম-সাহেব অনেক দিন শুনেছে তার গান। কিন্তু প্রসাদপুরের বাংলোয় প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সাহেবকে পাওয়া গেল না কোনদিন, কাজেই বাজনা বাজিয়ে নজরুলের গান তাঁর শোনাও হল না।

রেলের ফিরিঙ্গী কর্মচারীদের জন্যে কয়েকটি বাংলো ছিল জংসন স্টেশনে। তাদেরই একটিতে থাকতো এক আধবুড়ো সাহেব আর তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। এই-খানেই ছিল গার্ড সাহেবের আড্ডা। রেলের ডিউটি শেষ হবামাত্র সাহেব একরকম

ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হতেন এই বাংলোর ফটকে। ডাকতেন, পল।

ডাকবামাত্র ভেতর থেকে শোনা যেতো, কাম ইন!

বাংলোর ভেতর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতো হয় পল, নয় তার স্ত্রী নোরা।

নোরা আলু ভেজে ডিম ভেজে কোনদিন বা মাংস রান্না করে টেবিল সাজিয়ে বসে থাকতো। গার্ড সাহেব গিয়ে বসতেন তাদের সংগে। তারপর তাঁর চামড়ার সুটকেশটি খুলে বের করতেন বিলেতী মদের বোতল। শুরু হতো তাদের মদ্যপান।

নোরা দু এক পেগ খেয়েই উঠে পড়তো। পল অবশ্য তার চেয়ে একটু বেশি খেতো, কিন্তু আমাদের গার্ড সাহেবের খাওয়া আর শেষ হতে চাইতো না। একাই বসে বসে পেগের পর পেগ চালিয়ে যেতেন।

এখন যদি-বা একটু সংযত হয়েছেন, আগেকার দিনে কারও নিষেধ বারণ তিনি শুনতেন না। যতক্ষণ না বেহুঁশ হয়ে টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন, ততক্ষণ সমানে চলতো তাঁর মদ্যপান। পল ও নোরা এক-একদিন ভারি বিপদে পড়তো। দু' জনে ধরাধরি করে অতি কষ্টে তাঁর সেই বিরাট দেহটিকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিত। সকালে ঘুম ভাঙতেই দিব্যি ভাল মানুষটির মত মুখ হাত ধুয়ে এক কাপ চায়ের জন্যে টেবিলের ধারে চুপটি করে বসে থাকতেন।

নোরা নিজের হাতে চা তৈরি করে এনে এক একদিন জিজ্ঞেসা করতো, আচ্ছা বলতে পারো মিস্টার গোস্, এই রকম করে মদ খেয়ে তুমি কি আনন্দ পাও?

গার্ড সাহেব বলতেন, ওসব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না নোরা, বলতে পারবো না।

নোরা অবশ্য কিছু কিছু জানতো। পলের কাছ থেকে শুনেছে।

গার্ড সাহেবের চার পুরুষ ধরে ক্রিশ্চান। তবু তাদের বংশের কেউ কোনদিন একটা ইংরেজ মেয়ে বিয়ে করে ঘরে আনেনি। খাস ইংরেজ না হোক অন্তত পক্ষে ফর্সা একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেয়েও যদি আসতো তো গায়ের চামড়াটা তাদের এত কালো হতো না। তাই তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—বিয়ে যদি করতে হয় তো মেম বিয়ে করবেন। তাঁর পিতামহের ছিল বিরাট কাঠের কারবার। মৃত্যুর পর তাঁর সেই কারবার সমেত প্রচুর ধনসম্পত্তি রেখে যান তাঁর ছেলের জন্যে। গার্ড সাহেবের বাবা ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। কারবার তিনি চালাতে পারলেন না। নগদ টাকা নিয়ে বেচে দিলেন এক চীনা ভদ্রলোককে। বাপের মৃত্যুর পর গার্ড সাহেবের হাতে এলো অনেক টাকা। তখন তিনি যুবক। দামী দামী সুট পরেন, রেল কোম্পানীর ইউরোপীয়ান কোয়ার্টারের আশে-পাশে ঘুরে বেড়ান, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বখাটে ছেলেমেয়েগুলোর সংগে আড্ডা মারেন, আর নিজের গায়ের কালো রংটার জন্যে আফসোস করেন। দুটো জিনিস তখন তাঁর খুব ভালভাবে রপ্ত হয়ে গেছে। ভুল ইংরেজীতে ফড় ফড় কথা বলে যাওয়া, আর প্রত্যহ নিয়মিতভাবে একটু একটু করে মদ খাওয়া। তাঁদের আদি বাড়ি ছিল সাহেবগঞ্জে। সেইখানেই এক ইউরোপীয়ান রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার দয়া করে তাঁকে রেলের চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। কৃতজ্ঞতার সে ঋণ অবশ্য তিনি পরিশোধ করবার চেষ্টা যে করেননি তা নয়। সেই ইঞ্জিনীয়ারের যুবতী কন্যাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে তুলেছিলেন আসানসোলে পলের বাসায়। পল তখন সেখানে সামান্য এক ফিটার মিস্ত্রির কাজ করতো। নিতান্ত নিরীহ বেচারা পল তার এই বন্ধুর মতলব বুঝতে পেরে সাবধান করে দিয়েছিল মেয়েটিকে। সেই রাত্রেই মেয়েটি আমাদের সাহেবের গালে একটি চড় মেরে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গিয়েছিল তার বাবার কাছে। সেই লজ্জায় তিনি জলের দামে বিক্রি করে দিয়েছিলেন সাহেবগঞ্জের বাড়িঘরদোর, যা কিছু সব। সাহেবগঞ্জের সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে তিনি বদলি হয়ে এলেন আসানসোলে। সেখান থেকে এই কোল্ ডিস্ট্রিক্ট অন্ডালের এই ব্রাঞ্চ লাইনের গার্ড। ভেবেছিলাম এইখানে একটি বাড়ি তৈরি করে এবার ভাল মানুষের মত বাস করবেন তৈরি করলেন প্রসাদপুরের এই বাংলো। গৃহ হলো কিন্তু গৃহিণী কোথায়? প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন গার্ড সাহেব। চেষ্টার ফল ফললো অচিরেই। ফিরিঙ্গী বন্ধু আর বান্ধবী জুটলো অনেকগুলি। জলের মত টাকা খরচ হতে লাগলো আর সেই টাকার লোভে গৃহিণী একজন এলেন সাদা চামড়া অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। কিন্তু বেশিদিন তিনি রইলেন না, তিন চার মাস পরেই শুরু হলো তাঁদের ঝগড়াঝাটি। ছ' মাসের ভেতরেই সব খতম।

এইখানেই শেষ নয়। তার পরেও এসেছিল, আরও দুটো মেয়ে। পল তাদের দেখেই বলেছিল, এরা পালাবে।

একটা পালিয়েছিল এক মাস পরে। আর একজন ছিল তিন মাস।

পল তখনই বলেছিল, তুমি একটি বাঙ্গালী মেয়েকে বিয়ে কর গোস্। বাঙ্গালী মেয়েরা অনেক ভাল।

সাহেব বলেছিলেন, তোমার নোরা তো বাঙ্গালী নয় পল।

বাঙ্গালী না হলেও নোরার জন্যে পল যা করেছে, আর কেউ তা করতো বলে মনে হয় না। পল যখন নোরাকে বিয়ে করে, নোরার সঙ্গে তখন তার প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে। মেয়েটির বয়স তখন ন বছর। মেয়েটি দেখতে সুন্দরী, কিন্তু বিকলাঙ্গ। বসে যখন থাকে, তখন কিছু বুঝতে পারা যায় না। উঠে দাঁড়ালেই দেখা যায়—কোমরটি বাঁকা, পা-দুটি ঠিক জায়গায় পড়ে না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে। নোরা ভেবেছিল এই মেয়েটি যতদিন তার সঙ্গে থাকবে, ততদিন কেউ তাকে বিয়ে করবে না। কেনই বা করবে? একে পরের মেয়ে, তার ওপর বিকলাঙ্গ। তাই নোরা তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে মেয়েটিকে অতিকষ্টে মানুষ করছিল। বিয়ের আগে নোরা তাই পলকে বলেছিল, 'বিয়ে তুমি আমাকে করছো বটে, কিন্তু আমার এই খোঁড়া মেয়েটাকে কতদিন তুমি সহ্য করবে জানি না।'

পল কিন্তু তাকে সত্যই সহ্য করেছে। ন বছরের লোলা আজ সতেরো বছরের যুবতী।

পলের ধারণা, নোরা সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করছে। নইলে তার সংসারে এত কষ্ট সহ্য করে নোরা হয়ত এতদিন থাকতো না।

যদিও সে অনেক দিন আগেকার কথা, তবু পলের উপদেশ গার্ড সাহেবের বোধ হয় মনে ধরেছিল। কিন্তু তাদের বাঙ্গালী কৃশ্চান সমাজটাকে তিনি চেনেন। সুন্দর ছেলে যদি বা পাওয়া যায়, সুন্দরী মেয়ে সেখানে দুর্লভ। কাজেই দু এক জায়গায় চেষ্টা করে গার্ড সাহেব সে-আশা পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে সংবাদ পেয়ে গেলেন একটি পরমা সুন্দরী মেয়ের এবং কেমন করে কে জানে—হয়ত বা তাঁর বাইরের চাকচিক্য আর টাকার জোরেই তাকে তিনি বিয়ে করে ঘরে নিয়ে এলেন।

প্রসাদপুরের বাংলোর চেহারা গেল ফিরে।

কাউকে না জানিয়েই তিনি বিয়ে করেছিলেন।

পল আর নোরা বৌ দেখতে চাইলে। লোলা জেদ ধরে বসলো সেও দেখবে।

কিন্তু লোলার পক্ষে প্রসাদপুর পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া অসম্ভব। সাহেব একখানা টাক্সি নিয়ে এলেন আসানসোল থেকে। সবাই গিয়ে বৌ দেখে এলো। নতুন করে আবার একটা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন সাহেব।

তা উৎসব করবার মত বৌ তিনি এনেছেন বাড়িতে, তাতে আর সন্দেহ রইল না কারও।

পল বলেছিল, এবার তুমি মদ্যপানের অভ্যাসটি একেবারে ছেড়ে দাও মিস্টার গোস্।

গোস্ সেদিন বলেছিলেন ছেড়ে দেবেন। ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তাঁর রইলো কোথায়? পলের বাড়িতে প্রতিদিন নিয়মিত বসতে লাগলো তাঁর মদ্যপানের আসর।

গার্ড সাহেবকে চটাতে ভয় হয়। অথচ মদ্যপানের কথা বললেই সাহেব চটে যান।

সাহেব বলেন, ওই তো একটা ছেলে আমার সঙ্গে যায় রোজ, আমি মাতাল হই কিনা ওকে জিজ্ঞাসা কর। দুখু! দুখু!

অন্য সময় না হোক অন্ততঃ এই সময়টায় দুখু মিঞাকে কাছাকাছি কোথাও থাকতে হয়। সাহেবের চামড়ার ব্যাগটি হাতে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে প্রসাদপুরের বাংলোয়।

ছোট বাংলো। কাছাকাছি থাকতে হলে বাংলোয় ওঠবার সিঁড়ির একটা ধাপে বসে থাকতে হয়।

তাই সে থাকতো। কিন্তু কয়েকদিন হলো বাইরে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। পাশেই লোলার ঘর। লোলা সেদিন নিজেই তাকে ডেকে বলেছে, বাইরে কেন বসে আছো দুখু, ভেতরে এসে বোসো।

সেদিন থেকে নজরুল লোলার ঘরে গিয়ে বসে। লোলার সঙ্গে গল্প করে।

চমৎকার বাংলা বলে লোলা।

সাহেবের ডাক শুনেই নজরুল ছুটে বেরিয়ে গেল লোলার ঘর থেকে। জিজ্ঞাসা করলে, কি বলছেন?

সাহেব কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, পল তাঁকে থামিয়ে দিলে। বললে, না, কিছু বলেননি। তুমি যাও।

নজরুল ফিরে আসছিল, সাহেব বললেন, না, যেয়ো না তুমি।

মনিবের কথা, অমান্য করা চলে না। নজরুলকে থামতে হলো।

সাহেবের চোখে তখন রং ধরেছে। বললেন, তুমি তো রোজ আমার সঙ্গে থাকো। বল তো, আমি মাতাল হই?

নজরুল বললে, আজ্ঞে না।

সাহেব বললেন, পল, শোনো। নাও, ঢালো। বলেই তিনি তাঁর হাতের গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরলেন।

আর বেশিক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। নজরুল বললে, শেষ হলে ডাকবেন। আমি এইখানেই আছি।

এই বলে সে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসে ঢুকলো লোলার ঘরে।

লোলা বললে, মিছে কথা বললে যে?

নজরুল বললে, না, মিছে কথা আমি বলি না।

লোলা হাসতে লাগলো। —'সাহেব মাতাল হয় না, এই কথা তুমি বললে?

নজরুল বললে, শুনবে তবে?

—বল।

নজরুল বললে, এখান থেকে প্রসাদপুরে যেতে কত সময় লাগা উচিত, বলতে পারো?

লোলা বললে, আমি কি কোনোদিন গেছি যে, জানবো? তাছাড়া আমি খোঁড়া মানুষ, তোমাদের যদি এক ঘণ্টা লাগে তো আমার লাগবে পাঁচ ঘণ্টা।

নজরুল বললে, আধ ঘণ্টার পথ, আমাদের লাগে দু ঘণ্টা। সাহেব টলতে টলতে চলে, বারে বারে হোঁচট খায়, দড়াম করে আছাড় খেয়ে পড়ে রাস্তার ওপর, হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলেই কিন্তু চেঁচিয়ে ওঠে, বলে, খবরদার বলছি গায়ে হাত দিও না, আমি মাতাল হইনি।

কথাটা শুনে লোলা হো হো করে হেসে ওঠে। নজরুল বলে, হাসছো কেন? বল, আমি মিছে কথা বলেছি?

হাসতে হাসতে লোলা ঘাড় নেড়ে বলে, না।

নজরুল বলে, এমনি রোজ। দেয়াল ধরে ধরে বাড়ি ঢুকে সোজা একেবারে বিছানায়।

হাসি থামিয়ে লোলা জিজ্ঞাসা করে, ওয়াইফ কিছু বলে না?

কথাটার জবাব দিতে পারে না নজরুল।
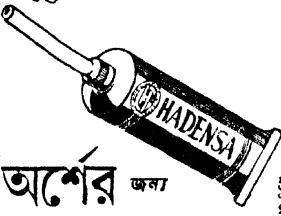
মাথা হেঁট করে খানিক চুপ করে থেকে বলে, জানি না।

পলের কোয়ার্টারের পেছন দিকে কিচেন গার্ডেন করবার মত খানিকটা জায়গা ছিল কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা। নোরার ইচ্ছে ছিল সেখানে দুটো আনাজপাতির গাছ লাগাবার। কিন্তু সংসারের সবদিক একা দেখতে গিয়ে সময় পায় না বেচারা। মনের সাধ মনেই থেকে যায়।

লোলা তার মায়ের সেই অতৃপ্ত বাসনা পূর্ণ করেছে। পাশের কোয়ার্টারের মালির কাছ থেকে গোটা চার-পাঁচ দোপাটি আর গাঁদা গাছ চেয়ে নিয়ে পুঁতেছিল সেই বাগানে। আর পুঁতেছিল একটি লাউ-এর বীজ।

সেই দোপটি আর গাঁদার গাছে ফুল ফুটেছে। আর কাঁটা তারের বেড়া বেয়ে লাউ-এর লতা উঠেছে।

লোলার আনন্দের আর সীমা নেই। দেখা যায় প্রতিদিন ভোরে উঠে সে তার ক্যানভাসের চেয়ারটি টানতে টানতে বাগানের ধারে নিয়ে এসে চুপটি করে বসে থাকে।

একদিন সে নোরাকে ডেকে বললে, না মা, কাল থেকে আর আমি এখানে বসবো না।

লোলা বললে, আজ ক'দিন থেকেই এক-জন সায়েব এসে আমাকে নানারকম কথা জিজ্ঞাসা করছে। বলছে, সব পাপের সংসারে তুমি কি সুখে আছ লোলা? আমার সঙ্গে চলে এসো। আমি তোমাকে [illegible] করবো।

নোরা বললে, আমাকে ডেকে দিলিনি কেন?

লোলা বললে, আমিতো তার সুমুখে উঠে দাঁড়াতে পারি না মা।

—চেঁচিয়ে ডাকলেই তো পারতিস।

লোলা বললে, দুবার ডেকেছিলাম, তুমি শুনতে পাওনি।

বলেই সে ঘন-ঘন তাকাতে লাগলো তার মুখের দিকে। নোরা জিজ্ঞাসা করলে, কিছু বলনি?

লোলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, প্রথমে ভেবেছিলাম--ভাল কথা বলছে বলুক। তাই প্রথম দু দিন তোমাকে ডাকিনি। তার পর ধীরে ধীরে আমার কেমন যেন মনে হতে লাগলো। মনে হলো, লোকটার সব মিছে কথা। লোকটা অভিনয় করছে। বললাম, আমার মাকে বল। তখন সে কি বললে জানো? বললে, না, তোমাকে আমার সঙ্গে পালাতে হবে। যদি না যাও, আমার লোক জোর করে তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে। তখন ভয় পেয়ে যেই ডাকলাম তোমাকে, লোকটা তক্ষুনি পালিয়ে গেল।

নোরা বললে, এবার এলে ডেকে দিস।

লোলা বললে, আমি আর বাইরে বেরুবোই না।

দিনকতক পরে, একদিন দুপুর বেলা পল তখন কাজে বেরিয়ে গেছে, নোরা আর লোলা—দুটো মেয়ে মাত্র বাড়িতে, এমন সময় এক বুড়ো সাহেব, হাতে লাঠি, চোখে চশমা, হঠাৎ এসে দাঁড়ালো নোরার কাছে।

লোকটাকে দেখে নোরা চমকে উঠেছিল প্রথমে।

—হ্যালো নোরা, হাউ ডু উ ডু!

গলার আওয়াজ শুনে চিনতে দেরি হলো না।

প্রথম যৌবনে ভালবেসে যাকে বিয়ে করেছিল, তার সেই প্রথম পক্ষের স্বামী বেট্‌স্‌। লোলার বাবা।

নোরা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে।—বললে, এত বুড়ো হয়ে গেছ তুমি?

বেট্‌স্‌ বললে, বয়েসও ত কম হলো না।

গায়ের জামাটা ছেঁড়া, প্যাণ্টের হাঁটুর নীচে অনেকখানা সেলাই করা। নোরা জিজ্ঞাসা করলে, এরকম দুর্দশা তোমার হলো কেমন করে? তোমার এত টাকা—

বেট্‌স্‌ বললে, আজ আর তার একটিও নেই।

গলার আওয়াজটা ধরে এলো।

নোরার কেমন যেন দয়া হলো লোকটির উপর। জিজ্ঞাসা করলে, কি খাবে বল।

নোরারও খুব স্বচ্ছল সংসার নয়। তবু তার মনে হলো বেট্‌স্‌কে যদি অন্তত একটা ডিমের ওমলেট আর এক পেয়ালা চাও সে খাওয়াতে পারে, মনে যেন একটু তৃপ্তি পাবে।

বেট্‌স্‌ কিন্তু কিছুতেই খেতে চাইলে না। বললে, নো। থ্যাংকস্‌। খেতে আমি আসিনি। আমি যে-জন্যে এসেছি শোনো। লোলাকে আমি নিয়ে যাব।

এতদিন পরে এ আবার কিরকম কথা!

অনুনয় বিনয় নয়, কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা বলিষ্ঠ দাবীর আভাস পাওয়া গেল। বললে, তাকে নিতেই আমি এসেছি।

হঠাৎ যেন সুর কেটে গেল নোরার মনের। লোকটির সাজসজ্জা, লোকটির চেহারার সঙ্গে কথার যেন কোনও মিল নেই। এর চেয়ে বিনীত ভাবে যদি সে তার নিজের কন্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইতো, নোরা বিপদে পড়তো, সহজে জবাব দিতে পারতো না।

নোরাও কেমন যেন একটু কঠিন হয়ে উঠলো। বললে, খোঁড়া মেয়েটাকে এতদিন পরে হঠাৎ তোমার কেন মনে পড়লো বলতে পারো?

—সে কৈফিয়ত আমি দিতে পারবো না। তুমি তাকে দেবে কিনা তাই বল।

বেট্‌স্ তার মোটা লাঠিটা মেঝের ওপর বারকতক ঠুকলে খুব জোরে জোরে।

নোরা বললে, যদি বলি দেবো না।

—পারবে আটকে রাখতে?

নোরা বললে, দুপুর বেলা তুমি কি মদ খেয়েছো বেট্‌স্?

বেট্‌স্ বললে, হ্যাঁ, খেয়েছি।

নোরা বললে, মাতালের কথা আমি বিশ্বাস করি না। তুমি যেতে পারো।

—লোলাকে না নিয়ে আমি যাব না।

—নিয়ে যাবে কি জোর করে?

বেট্‌স্ বললে, হ্যাঁ। দরকার হলে আমি তাও পারি।

—বুঝেছি। যে-লোকটা লোলাকে বিয়ে করবে বলেছিল, সে তাহলে তোমারই লোক।

—হ্যাঁ, আমারই লোক। লোলাকে সে বিয়ে করতে চায়।

—লোলাকে সে ভাল করে দ্যাখেনি নিশ্চয়ই।

—দেখেছে।

—সে-দেখা নয়। লোলাকে শুধু বসে থাকতে দেখলে মনে হয় খুব সুন্দরী মেয়ে। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে দেখলে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয়।

বেট্‌স্ বললে, তবু সে তাকেই বিয়ে করবে।

নোরা বললে, তারপর? যখন তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে? তখন কি হবে?

বেট্‌স্ বললে, ছাড়াছাড়ি হবে কেন?

নোরা বললে, আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল কেন? আমিতো কদাকার কুৎসিত ছিলাম না, লোলার মত খোঁড়া ছিলাম না।

বেট্‌স্ সেকথার জবাব দিতে পারল না। বললে, তোমার সঙ্গে তর্ক আমি করতে চাই না। লোলাকে তুমি এমনিতে ছাড়বে না এই কথাই আমি জেনে গেলাম। দেখি তুমি কেমন করে ওকে রাখতে পারো।

এই কথা বলে বেট্‌স্ উঠে দাঁড়ালো। তারপর কটমট করে নোরার দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নোরার মাথাটা তখন ঘুরছে। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না। লোকটি কোন-দিকে যায় দেখবার জন্যে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। কিন্তু যাকে দেখবার জন্যে সে বেরিয়ে এলো, তাকে দেখতে গিয়ে নজরে পড়লো, লোলা তার ঘরের চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার জন্মদাতা পিতার দিকে।

হতভাগী সবই শুনেছে তাহলে।

নোরার চোখ থেকে টস টস করে দু ফোঁটা জল পড়লো তার জামার ওপর। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল।

বিকলাঙ্গ ওই খোঁড়া মেয়েটাকে নিয়ে সারাদিন সে একাই থাকে তাদের এই কোয়ার্টারে। দুপুরে আশ-পাশের কোয়া-র্টারগুলোও ফাঁকা হয়ে যায়। বেট্‌স্ যদি সত্যিসত্যিই জোর করে নিয়ে যেতে চায় লোলাকে?

পলকে বলে কোনও লাভ নেই। বেচারা কষ্ট পাবে শুধু শুধু।

তার একমাত্র ভরসা গার্ড-সাহেব।

পুলিসে খবর দিলে কেমন হয়? নোরা ভাবলে, আসুক মিস্টার ঘোষ, তাকে জিজ্ঞাসা করবে কি তার করা উচিত।

গার্ড-সাহেবের আসার আশায় বসে রইলো নোরা।

মোটা একটা শালকাঠের টুকরো পড়ে-ছিল বাগানের কাছে। নোরা সেইটে হাতে নিয়ে লোলার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। লোলা হাসতে হাসতে বললে, একি? তুমি আমাকে মারবে নাকি মা?

এত দুঃখেও নোরার মুখে ম্লান একটু হাসি দেখা গেল। বললে, নে, এইটে রাখ হাতের কাছে।

ঘরের জানলাটা সে খুলে দিলে। দিয়ে বললে, ঘরে খিল বন্ধ করে বসে থাক্ লোলা। তোর বাবাকে আর আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

বলতে বলতে আবার তার চোখ দুটো সজল হয়ে এলো।

লোলা তার মাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলে। বললে, তুমি ভেবো না মা, তোমার কাছ থেকে কেউ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গলাটা তার ধরে এলো। কিছুই সে বলতে পারলে না। হরিণের মত জলে-ভরা দুটি চোখ তার মায়ের দিকে তুলে ধরে শুধু ডাকলে, মা!

ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজলো, আর দেখা গেল আপনমনে গান গাইতে গাইতে নজরুল আসছে। আজকাল রোজই সে ঠিক এই সময়েই আসে প্রসাদপুর বাংলো থেকে। সাহেবের ডিউটির সঙ্গে সঙ্গে তারও ডিউটির সময় বদলে যায়।

নজরুলকে দেখে নোরা খানিকটা আশ্বস্ত হলো। তবু একজন জোয়ান ব্যাটাছেলে এলো বাড়িতে!

এইবার পল আসবে। তারপর আসবে গার্ড-সাহেবের গাড়ি।

লোলার ঘরের দোরটা বন্ধ দেখে নজরুল ফিরে আসছিল, নোরা ডাকলে, লোলা, দরজা খোল্।

উনোন ধরে গেছে। নোরা গিয়ে ঢুকলো রান্নাঘরে। খাবার তৈরি করতে হবে। এক্ষুনি এসে পড়বে সবাই।

ঠিক সময়ে পল এলো। তার সামনে খাবার ধরে দিয়ে নোরা বসলো তার সামনে। বেট্‌সের কথা একটি একটি করে সবই সে তাকে বললে।

পল বললে, ভেবো না। লোলাকে ও পারবে না নিয়ে যেতে। আইন তোমার দিকে। দরকার হলে আদালতে যাব।

নোরা ম্লান একটু হাসলে। বললে, দেখে যা মনে হলো আইন-আদালতের ধার-পাশ দিয়েও সে যাবে না।

পল বললে, বুঝতে পেরেছি। ভদ্রলোকের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছে। এখন সে লোলাকে বিক্রি করে কিছু রোজগার করতে চায়।

কথাটা শুনে শিউরে উঠলো নোরা। আবার তার চোখে জল এলো। বললে, দুপুরে সবাই কাজে চলে যায়, চারিদিক খাঁ খাঁ করে, বাড়িতে থাকি তো আমরা দুই মা আর মেয়ে। দুটো জোয়ান গুণ্ডা নিয়ে যদি এসে দাঁড়ায় তো কি করতে পারি আমরা?

পল একটু ভেবে বললে, কালই আমি পুলিসে একটা ডায়েরী করে রাখবো।

কথাটার নিষ্পত্তি হবার আগেই গার্ড-সাহেব এলেন।

তিনিও শুনলেন সব কথা।

শুনে তাঁর বড় বড় চোখ দুটো লাল হয়ে উঠলো। টেবিলের ওপর সজোরে এক কিল মেরে চেঁচিয়ে উঠলেন, দুখু!

নজরুল এসে দাঁড়ালো : বলুন!

—তুমি একটি কাজ করতে পারবে?

—সব কাজই তো করছি।
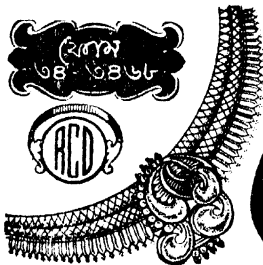
সাহেব বললেন, তাহলে কোমর বাঁধো। লোলাকে নিয়ে তুমি চলে যাও আমার প্রসাদপুরের বাংলোয়। মেম-সাহেবকে বোলো, দক্ষিণদিকের ঘরখানা ওকে ছেড়ে দিতে—যে-ঘরে পিয়ানো আছে। তারপর দেখি লোলাকে কে নিয়ে যেতে পারে!

নজরুল বললে, লোলা কি পারবে অতখানি পথ হেঁটে যেতে?

নোরা বললে, পারবে। তবে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবে না। দেরি হবে।

সাহেব বললেন, তা হোক। আমি রইলাম এইখানে। লোলাকে রেখে তুমি ফিরে এসো। লোলার জিনিসপত্র পরে নিয়ে যাবে।

সাহেবের যে-কথা সেই কাজ! নোরাও ভাবলে সেই ভালো। লোলাকে কিছুদিনের জন্যে সরিয়ে দিলে সব ঝঞ্ঝাট চুকে যায়।

কিন্তু যাবার সময় নোরা কি ভাবলে কে জানে। বললে, আমিও যাচ্ছি লোলার সংগে। ওকে ওখানে রেখেই আমি আবার ফিরে আসছি।

এই বলে লোলার জামা-জুতো একটা সুটকেসে ভরে নিয়ে নোরাও বেরিয়ে পড়লো তাদের সংগে।

পরের দিন দুপুরে বেট্‌স্ আবার এলো।

জামা ইস্ত্রি করছিল নোরা। লোলাকে রেখে এসেছে প্রসাদপুরে। বাড়িটা তার একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। চোখের জল কিছুতেই মানা মানছে না।

ঠিক এমনি সময় বেট্‌স্ এসে দাঁড়ালো তার কাছে। বললে, কি ঠিক করেছ বল। কাঁদছো কেন?

নোরা বললে, কেন কাঁদছি শুনবে? লোলা কাল রাত্রে পালিয়েছে।

কথাটা শুনেই দপ্ করে জ্বলে উঠলো বেট্‌স্। বললে, পালিয়েছে না তুমিই সরিয়ে দিয়েছ?

—কোথায় সরাবো? আমার সরাবার কোনও জায়গা আছে?

এই বলে নোরা কাঁদতে লাগলো।

কি জানি কেন বেট্‌সের বিশ্বাস হয়ে গেল কথাটা। বললে, পালাবেই তো! এতদিন পালায়নি এই যথেষ্ট। বয়েসটাও তো তার কম হয়নি!

নোরা বললে, না। পালালো তোমার জন্যে। তুমি যদি কাল চীৎকার করে ওই সব কথা না বলতে তাহলে হয়ত এমন করে আমাকে ছেড়ে চলে যেতো না।

বেট্‌স্ জিজ্ঞাসা করলে, কার সংগে পালিয়েছে জানো?

নোরা হঠাৎ বলে ফেললে, একজন মুসলমান বয়ের সংগে।

কথাটা বলেই তার মনে হলো— বলা তার উচিত হলো না।

বেট্‌স্ জিজ্ঞাসা করলে, কি নাম তার, কোথায় বাড়ি?

নোরা বললে, তা আমি কেমন করে জানবো?

—কার বয় তা তো জানো!

নোরা ভয়ে-ভয়ে বলে ফেললে, ব্রাঞ্চ লাইনের একজন গার্ড-সাহেবের বয়। তার নাম ঠিকানা জানবার জন্যে পাঠিয়েছি পলকে।

বেট্‌স্ বললে, আমি দেখছি।

এই বলে সে উঠে দাঁড়ালো।

নোরা তখন ভয়ে থর্ থর্ করে কাঁপছে। এ কি করলে সে? এতখানি তাকে না বললেই হতো!

গার্ড-সাহেবের হদিস পেয়ে যদি সে প্রসাদপুরে চলে যায়?

বেট্‌স্ চলে গেল। নোরা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কোনও কাজেই তার মন বসলো না।

গার্ড-সাহেব আসতেই নোরা তাকে বললে সব কথা। বললে, একটা মিথ্যা কথা বলতে গিয়ে আমার মাথার ভেতরটা কেমন যেন গোলমাল হয়ে গেল! আমি যা তা বলে ফেললাম।

সাহেব বললেন, বলেছ—বেশ করেছ। কি করবে ও? আমার ওখান থেকে লোলাকে বের করবার সাধ্য ওর নেই।

নোরা বললে, কিন্তু গার্ড-সাহেবের মুসলমান বয় কথাটা বলা আমার অন্যায় হয়েছে।

কথাটা সাহেব হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন কিছু অন্যায় হয়নি। আমার সংগে বেট্‌সের দেখা হলে বলতাম—তুমি পুলিশ নিয়ে এসে হাংগামা করতে পারো, এরা গরীব মানুষ, সহায়সম্বল কিছু নেই, তাই আমি লোলাকে নিয়ে গিয়ে রেখেছি আমার বাড়িতে। তোমার ক্ষমতা থাকে তো একবার চেষ্টা করে দেখতে পারো।

এই কথা বলবার পরেও, সাহেবের কি মনে হলো কে জানে, পরের দিন সকালে চায়ের পেয়ালাটি হাতে নিয়েই ডাকলেন, নুখদু!

নজরুল এসে দাঁড়াতেই বললেন, দিনকতকের জন্যে তুমি গা-ঢাকা দিতে পারো?

—পারি।

সাহেব বললেন, তাহলে আজই তুমি খেয়েদেয়ে চলে যাও।

এই বলে পঞ্চাশটি টাকা তিনি তার হাতে গুঁজে দিলেন।

টাকাগুলো হাতে নিয়ে নজরুল বললে, এত কেন?

সাহেব বললেন, এত নয়। পঁচিশ টাকা হিসেবে তোমার দু মাসের মাইনে।

নজরুলের চাকরি এইখানেই খতম্।

সেই যে সে গা-ঢাকা দিয়েছিল, জীবনে আর কোনোদিনই সে প্রসাদপুরের বাংলোয় ফিরে যায়নি।

ট্রামে-বাসে

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারতের তৃতীয় টেস্ট খেলায় প্রথমে ফিল্ডিং এবং পরে প্রথম ইনিংসের গোড়ার দিকে ভারতীয়

দলের শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ স্বরূপে অনেক অনেকরকম মন্তব্য করিলেন। এসব মন্তব্য রাগে করা হয় না বলিয়াই কেহ তাহা জানিবার সুযোগ পায় না, পাইলে বেরি-সুরিটা পর্যন্ত লজ্জায় অধোবদন হইতেন। আমরা শুধু আমাদের শ্যামলালের একটি মন্তব্যই উদ্ধৃত করিলাম—"এ বিপর্যয় হতেই হবে, এ যে নির্বাসিত শ্রীরামচন্দ্রের শাপমর্দনার ফল"—শ্যামলাল পরে বুঝাইয়া বলিল, শ্রীরামচন্দ্র মানে রামচাঁদ!!

* * *

খেলা প্রসঙ্গে বিশুখুড়ো অন্য কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন—"খেলা দেখে মনে হলো, ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের

চেয়ে আমাদের আগে প্রয়োজন ব্যাটস্‌ম্যান কনট্রোল বোর্ডের অর্থাৎ চৌকস ও ফাস্ট বোলার আবিষ্কারের। এ না করে ইন্দ্-গিলক্রিস্ট ঝড়ের মুখে কাগজের নৌকো ছেড়ে দিয়ে মজা দেখার মধ্যে কোন মজা নেই।"

* * *

হলের একটি মারাত্মক (টীকাকার ডি, জি-র মতে ইহা নাকি বে-আইনীও বটে) বাম্পার হইতে মাথা বাঁচাইবার জন্য পংকজ রায় যখন "ডাক্" করিয়া বাঁচিয়া গেলেন তখন গ্যালারি হইতে জনৈক দর্শক চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ভাই হলধর, ও কাজটি তুমি কোরো না, ক্রিকেট খেলায়
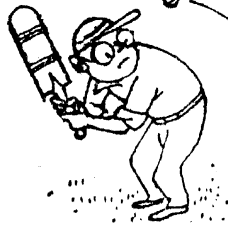
বাংলাদেশের ঐ একটিমাত্র মাথাই আছে, ওটিকে আর ভেঙো না ভাই।"

* * *

এবার ইডেন গার্ডেনে একটি নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে, সমাগত দর্শকদের জন্য খোলা হইয়াছে একটি মদের দোকান। বিশুখুড়ো বলিলেন—"উদ্যোক্তারা খৈয়ামের নীতি গ্রহণ করেছেন,—কিছু চপ্ কাটলেট, দু পাত্র মদ আর "তিনি" যদি সঙ্গে থাকেন তাহলে খেলা, ফুঃ"!!

* * *

কলিকাতা ঘোড়দৌড়ের মাঠে প্রথম ডার্বি জিতিয়াছে "ওয়াইজম্যান" নামক একটি ঘোড়া। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"কিন্তু 'ফুল' নামক অনেক পান্টার তা ধরতে পারেন নি।"

* * *

বড়দিনে উচ্ছৃংখল আচরণের জন্য আটজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আমাদের অন্য সহযাত্রী বলিলেন—"এতে কি আর দিন বড় হয়? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঐদিনে দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে চার শতাধিক নরনারী, একে বলে বড়দিন"!!

* * *

বিলাতের শ্রীমতী হান্না টেলর নামক প্রাচীনতম মহিলাকে বড়দিনে প্রণাম জানাইয়াছে ১৩টি ছেলেমেয়ে, ২৭টি ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়ে, ৩০টি ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়ে, ২ জন ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়ে, ২ জন ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়ের ছেলেমেয়ে......কিন্তু হিসেব গুলিয়ে গুলিয়ে যাচ্ছে, ছেলেমির বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে" বলে শ্যামলাল।

* * *

নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে শ্রীনেহরু ভাষা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—বাইসাইকেলের মতো শব্দ বিদেশী হইলেও উহা বর্জন করিয়া নূতন শব্দ গ্রহণের চেষ্টা অদ্ভুত। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু ভাষা সম্বন্ধে যাঁদের জ্ঞান নিতান্তই ভাসা ভাসা তাঁরা নেকটাইকে টেনে হিঁচড়ে লেংগটি পর্যন্ত করে ছাড়লেন।"

* * *

নিখিল ভারত বংগ সাহিত্য সম্মেলনে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন—বাংগালীরা যেন তাঁহাদের বিগত দিনের গৌরব ও অতীত ঐতিহ্য লইয়াই মশগুল না থাকেন। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"তা বললে হবে কেন, অতীত দিনের স্মৃতি কেউ ভোলে না, কেউ ভোলে।"

* * *

কেন্দ্রীয় শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী শা' ব্যবসায়ে উচ্চ আদর্শ বজায় রাখার আবেদন জানাইয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"শুধু আদর্শ কেন, সবদিকে—উঁচুর দিকেই তো তাঁদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে উচ্চ মুনাফা দিয়েই মহড়ার কাজ চলছে"!!

* * *

শ্রী নেহরু সম্প্রতি কোন এক সভায় দুই মিনিট মাত্র বক্তৃতা দিয়াছেন।—"এটা কি নয় আপনি [illegible] ধর্ম জীবনের শিখায় নীতি? [illegible] বক্তৃতা [illegible] নীতি গ্রহণ করেন তা [illegible] নিশ্চয়ই কাজের কাজ হয়"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

পি-ই-এন সম্মেলনে শ্রীনেহরু বলিয়াছেন—কবি, প্রবন্ধকার এবং ঔপন্যাসিকদের সভায় আমি উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু আসলে এটা অছিলা মাত্র। আমি আসিয়াছি জনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"সত্য সব সময়ে বলতে নেই, 'পণ্ডিত' হয়েও কি তিনি জানেন না যে অপ্রিয় সত্য সদাই বর্জনীয়"!!

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম, কলিকাতা বাস্ সার্ভিসের দায়িত্ব একটি স্বয়ংশাসিত কর্পোরেশনের হস্তে প্রদান করিবার জন্য ভারত সরকার পশ্চিমবংগ সরকারকে নির্দেশ দিয়াছেন। শ্যামলাল বলিল—"সম্পূর্ণ নূতন রুট, কতজনের রুটি উঠবে কে জানে"!!

* * *

অন্য এক সংবাদ—নদীয়া সীমান্তে ব্যাপক পাক্ সৈন্য সমাবেশ।—এদিকে যখন নদে ভেসে যায়, তখন শান্তিপুরে ডুবু ডুবু হবে আর বাধা কি, সত্যি শান্তি না ডাবিলে আর শান্তি নেই"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

১৮৯৪ সালের বসন্তকালে বিভাজীর মৃত্যু সংবাদে রণজি খানিকটা মুষড়ে পড়েন। তাঁর সকল দাবীকে উপেক্ষা করে জেসাজীকে (যশোবন্ত সিংজী) জামনগরের গদিতে বসানোর খবরও তাঁর কানে আসে। অবশ্য বিভাজীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁর উপর কোন অবিচার শুরু হবে এটা তিনি আশা করেছিলেন না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বিলাত খরচের অংক এমনভাবে কমিয়ে দেওয়া হয় যে, রণজি কেম্ব্রিজ ছেড়ে ব্রাইটনে চলে যেতে বাধ্য হন। সিডনী স্ট্রিটের পরিপাটি করে গোছানো ফ্লাটটি ছাড়ার চিন্তাই সবচেয়ে ব্যথিত করে তোলে তাঁকে। তাই কেম্ব্রিজ ছাড়লেও ফ্লাটটি তিনি হাতছাড়া করেন না।

কেম্ব্রিজ থেকে ব্রাইটনে এসে এম সি সি দলের হয়ে নিয়মিত খেলতে থাকেন রণজি। এইখানে বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় সমালোচক সি বি ফ্রাই এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। প্রথম আলাপেই উভয়ে উভয়কে চিরদিনের বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন। ফ্রাই ছাড়া এম সি সি দলের খেলোয়াড় হিসাবে ইংলণ্ডের ক্রিকেট জনক ডব্লিউ জি গ্রেসের সঙ্গেও রণজির আলাপের সুযোগ ঘটে। এই দুই মহান ক্রিকেট খেলোয়াড়ের এক সঙ্গে প্রথম ক্রিকেট মাঠে নামার ঘটনা ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। কেম্ব্রিজ একাদশের বিরুদ্ধে এম সি সি দলের হয়ে এঁরা এক সঙ্গে ব্যাট করতে নামেন। একজন প্রবীণ হলেও চিরনবীন, আর একজন নবীন হলেও প্রবীণের ন্যায় অভিজ্ঞ ও দক্ষ। মাঠের বিপুল দর্শক রুদ্ধনিঃশ্বাসে সেই খেলা দেখে মাঝে মাঝে পরস্পর প্রশ্ন করে 'কার খেলা ভাল?' কিন্তু সে প্রশ্নের সমাধান হয় না। প্রথম ঘণ্টায় ১০০ রান ওঠে। দ্বিতীয় ঘণ্টায় রান সংখ্যা ২০০ অতিক্রম করে যায়। দলের ৫৯৫ রানের মধ্যে রণজি, গ্রেস ও গ্রেসের ছেলের রানের সমষ্টি হয় ৩৪৪। ভারতীয় খেলোয়াড়ের সাহচর্যে গ্রেস সেদিন লর্ডস মাঠে নিজের ব্যক্তিগত রানের রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় গ্রেসের নামের সঙ্গে রণজির নামও যুক্ত হয়।

সাউথ আফ্রিকা দল এই বছর ইংলণ্ড সফরে আসে। ইংলণ্ড ও সাউথ আফ্রিকার খেলায় ব্যাটিং এভারেজে রণজির নাম থাকে সবার উপরে।

১৮৯৫ সালে সম্পূর্ণ সুস্থদেহ এবং মুক্ত মন নিয়ে রণজি ইংলণ্ডের ক্রিকেট আসরে অবতীর্ণ হন। নতুন নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হতে থাকে তাঁর দৈনন্দিন খেলায়।

ক্রিকেটের রাজকুমার

শ্রীখেলোয়াড়

ইংলণ্ডের সমস্ত সংবাদপত্র মিলিতকণ্ঠে ঘোষণা করে
"The finest batsman that cricket had even known."
সাসেক্স দলের হয়ে প্রথম কাউণ্টি খেলার সুযোগ হয় রণজির। কাউণ্টি খেলার সময় অনেকবার অসুস্থ হয়ে পড়া সত্ত্বেও তাঁর মোট ৫৮ ইনিংসে রানের সমষ্টি হয় ১,৭৬৬। কাউণ্টির খেলাগুলিতে রণজির ঝড়ের গতিতে রান তোলা দেখে ক্রিকেট সমালোচকেরা লেখেন "the ball flows from his bat like water rushes down the hill."

কাউণ্টি খেলা ছাড়াও ল্যাংকাশায়ার লীগেও এ বছর রণজি যোগদান করেন। ল্যাংকাশায়ার লীগে এ সময় মোল্ড ও ব্রিগস নামে দুজন বোলার ব্যাটসম্যানদের ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের মারাত্মক বলে কিছু কিছু ব্যাটসম্যান আহত হয়ে চিরদিনের জন্য খেলা থেকে অবসর নিতে পর্যন্ত বাধ্য হন। ব্রিগস থেকে মোল্ডের বল ছিল আরও ভয়াবহ। কিন্তু রণজি মোল্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দিন খেলতে নেমেই অবলীলাক্রমে একটার পর একটা লেগ গ্লান্স করে বাউণ্ডারীতে বল পাঠাতে আরম্ভ করলেন। মোল্ড উত্তেজিত হয়ে যত বেশী জোরে বল করেন, রণজির ব্যাটের যাদুস্পর্শে সেই বল ততোধিক জোরে বাউণ্ডারীর সীমানা অতিক্রম করে যেতে থাকে। লাংকাশায়ারের দর্শকদের কাছে **রণজি এক অলৌকিক খেলোয়াড়ের মর্যাদা পান। রণজি যে মাঠে খেলতে নামেন সেই** মাঠের দর্শক আসন একটিও খালি থাকে না। আবার রণজি আউট হবার সঙ্গে সঙ্গেই মাঠ দর্শকবিরল হয়ে উঠে।

১৮৯৬ সাল রণজির কাছে বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রত্যেকটি খেলায় এই বছর তিনি অপূর্ব ক্রীড়া চাতুর্যের পরিচয় দেন। অস্ট্রেলিয়া দল এ বছর ইংলণ্ড সফরে আসে। ইংলণ্ড দলে রণজির স্থান নিয়ে কারো মনে কোন সংশয় থাকে না। কিন্তু এম সি সির সভাপতি লর্ড হ্যারিস জনমত এবং নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্যদের যুক্তি উপেক্ষা করে ভারতীয় খেলোয়াড়কে টেস্ট খেলার মর্যাদা দিতে অস্বীকৃত হন। তিনি রণজিকে "Birds of passage" বলে উল্লেখ করেন। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের নামের তালিকা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে অসন্তোষ দেখা যায়। রণজিকে টেস্ট দলে গ্রহণ করার দাবী সারা ইংলণ্ডের আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে তোলে। এই গণ-দাবীর কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হন লর্ড হ্যারিস। দ্বিতীয় টেস্টে রণজিকে দলে নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় টেস্ট খেলার আহ্বান আসতেই খেলাধূলার আদর্শ পূজারী রণজি সেই আহ্বানে সাড়া দেন বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হয়ে। অপমানের প্রত্যুত্তর অপমানের সাহায্যে না দিয়ে নিজের যোগ্যতার মধ্য দিয়েই উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেবার সংকল্প করেন তিনি। টেস্ট খেলার আহ্বানে সম্মতি জানিয়ে রণজি জানান "খেলাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে আমি জানতে চাই আমি ইংলণ্ডের পক্ষ সমর্থন করলে অস্ট্রেলিয়া দলের তরফ থেকে কোন আপত্তি উঠবে কি না?" অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ট্রট্‌কে রনজির পত্র দেখানো হলে ট্রট্‌ হাসিমুখে জবাব দেন "রনজির মত কুশলী খেলোয়াড়ের নয়নাভিরাম খেলা দেখার সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হতে চাহি না। তাঁর সঙ্গে টেস্ট খেলার সুযোগ পেলে আমার দলের খেলোয়াড়েরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করবে। আমিও গৌরবান্বিত হবো।"

এক দুর্জয় ও দুর্বার সংকল্প নিয়ে রণজি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের হয়ে প্রথম টেস্ট খেলতে নামেন। তাঁর হাসিমুখ দেখে কারো সেদিন বোঝবার উপায় ছিল না যে, অন্তরে রয়েছে তাঁর অপমানের তীব্র জ্বালা। ইংলণ্ডের বনেদী ক্লাব এম সি সি'র ক্রিকেট নির্বাচকমণ্ডলী খেলোয়াড় নির্বাচন করতে বসে যাতে দেহের রঙ আর বিচার না করেন। খেলার **মাঠে ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞা যাতে**

চিরদিনের জন্য দূর হয় সেই শিক্ষা দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন তিনি।

প্রথম ইনিংসে সাবলীল ভঙ্গিমায় **৬২** রান করে আউট হয়ে যান **রণজি**। অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসে বিরাট রান সংগ্রহ করেন। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুতেই ডব্লিউ জি গ্রেস, স্টোডার্ট প্রমুখ কয়েকজন ধুরন্ধর ব্যাটসম্যান অল্প রানেই প্যাভেলিয়ানে ফিরে যান। ফলে ইংলণ্ডের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়। মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর ঘরের নিস্তব্ধতার মত সমস্ত মাঠে এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে। উপস্থিত দর্শক এবং ইংলণ্ডের অধিকাংশ খেলোয়াড় পরাজয়কে নিশ্চিত বলে মেনে নিলেও ক্রিকেটের রাজকুমার রণজি পরাজয়কে স্বীকার করে নিতে রাজি হন না। সাবলীল ভঙ্গিমায় রান করে যান তিনি। সহখেলোয়াড়দের যাতে বিপক্ষ বোলারের সম্মুখীন না হতে হয় সেজন্য উপযুক্ত সময়ে রান করে রণজি উভয়দিকের আক্রমণের সম্মুখীন হতে থাকেন। এদিকে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ট্রট্ জয় পরাজয়ের মীমাংসা করে নিতে উৎকণ্ঠিত। কখনও জোন্সকে দিয়ে তীব্র জোরে, গিফিনকে দিয়ে ফ্লাইটেড বল দিয়ে আবার কখনও বা নিজে লোফ্‌ফা বল দিয়ে প্রলুব্ধ করেন রণজিকে। কিন্তু ট্রটের সকল ছলাকলা ব্যর্থ হয়ে যায়। পশ্চিম গগনে সূর্য ঢলে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে খেলা শেষ হবার সাংকেতিক ঘণ্টাধ্বনি বেজে ওঠে। কিন্তু তখনও উইকেটে দাঁড়িয়ে সেই মহা ক্রিকেট খেলোয়াড় রণজি। চোখেমুখে প্রতিশোধের আনন্দ। কাঁধে তাঁর ১৫৪ রানের ঝুলি। এই ভারতীয় খেলোয়াড়ই সেদিন রক্ষা করেন ইংলণ্ডকে নিশ্চিত পরাজয়ের লাঞ্ছনা থেকে। বুঝিয়ে দেন

পাতিয়ালা রাজ্যের এডিকংরূপে রণজি

তিনি খেলাধুলায় বিস্তৃত চন্দ্রাতপের নীচে জাতি, কুল, মান নিয়ে যোগ্য অযোগ্য বিচার করা যায় না। খেলোয়াড়ের যোগ্যতা দিয়েই যোগ্যতার বিচার করতে হয়।

পরের দিন সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে রণজির অবিশ্বাস্য সাফল্যের কথা প্রচারিত হয়। সি বি ফ্রাই লেখেন "he moved as if he had no bones." ডেলি নিউজে লেখা হয় "There is little display in his methods—an Oriental calm with an Occidental swiftness, the stillness of the panther with the suddenness of its spring........If the supreme art is to achieve the maximum result with the minimum expenditure of effort, then Ranji is in a class by hmself."

এই স্মরণীয় খেলার পর রণজি সাসেক্স দলের হয়ে লর্ড ডিলা ওয়ারীর আমন্ত্রণে বাক্সহীলে খেলতে যান। অসমতল মাঠ। তাই খেলার আগে দুই দলের মধ্যে ঠিক হয় কোনো দলই ফাস্ট বোলার দিয়ে বল করাবে না। কিন্তু খেলা শুরু হতেই সাসেক্স দলের বিরুদ্ধে বিখ্যাত ফাস্ট বোলার লকউড বল করতে আরম্ভ করেন। ফলে সাসেক্স দলের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই আহত হওয়ার ভয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে আউট হয়ে যান। কিন্তু রণজি ঐ অসমতল মাঠে সেদিন পুরা একঘণ্টা লক্‌উডের তীব্র আক্রমণকে উপেক্ষা করে ঝড়ের গতিতে রান তুলে যান। রণজির এই খেলার কথা আজও গল্পের মত হয়ে রয়েছে। এরপর লর্ডস মাঠে জেণ্টলম্যান ও প্লেয়ারদের খেলায় মাত্র ১২টি বলে ৪৭ রান সংগ্রহ করার ঘটনা আর এক অবিস্মরণীয় কাহিনীর সৃষ্টি করে।

১৮৯৬ সালে রণজির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি গ্রেসের দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত রানের রেকর্ডকে ভঙ্গ করা। এই বছর গড়ে ৫৭·৪৪ রান এবং মোট ২,৭৮০ রান করে তিনি শুধু ইংলণ্ডের ব্যাটিং এভারেজে প্রথম স্থানের অধিকারী হন না। মোট রান সংখ্যায় গ্রেসের প্রতিষ্ঠিত রানের রেকর্ডকেও ম্লান করে দেন। গ্রেসকে এই সংবাদ জানানো হলে গ্রেস বলেন "Ranji fully deserved to beat a record that had been standing for so long."

এই নতুন কীর্তি অর্জন করার পর রণজিকে সম্বর্ধনা করার জন্য গীল্ড হলে এক বিরাট ভোজসভার আয়োজন করা হয়। কিন্তু এত আনন্দের মাঝেও রণজিকে মাঝে মাঝে বিষণ্ণ দেখা যায়। একদিন রণজির উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ইংলণ্ডের দ্বারে দ্বারে যিনি প্রচার করেছিলেন এবং সেদিন যাঁর কথা কেউ কর্ণপাতও করেনি সেই প্রথম ক্রিকেট শিক্ষাগুরু, চার্লস ম্যাকনটেনের কথাই বার বার মনে এসে তাঁকে উন্মনা করে দেয়। ম্যাকনটেন ঠিক তার ছয় মাস আগেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। যাই হোক পরের দিন সংবাদপত্রে এই ভোজসভার বিবরণীতে লেখা হয় "Last night, the hearts of England and India came closer together than they had ever come before."

রণজির প্রিয় মার ছিল 'লেগ গ্লাইড।' নিখুঁতভাবে এবং উপযুক্ত সময়ে বল না মারতে পারলে এই স্ট্রোকে আউট হবার সম্ভাবনা খুব বেশী। তাই রণজির সমর্থকেরা রণজিকে বলতেন "আপনি যখন তখন ঐরকম লেগ গ্লাইড করেন কেন? কোন একটা বল ঠিকমত মারতে না পারলে তার ফল কি দাঁড়াবে তা কি আপনি ভেবে দেখেন না?" উত্তরে রণজি বলতেন "আমি যে কোন বলে যখনই পরাজিত হই তখনই মনে করি আউট হয়ে গিয়েছি। কিন্তু আমার নিজের উপর একটা বিশ্বাস আছে—বিশ্বাস আছে চোখের প্রখর দৃষ্টির উপর এবং শরীরের প্রত্যেকটি মাংসপেশীর উপর। বলের গতিপথ সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি এত সজাগ যে সেই দৃষ্টিশক্তি মুহূর্তে আমার মগজের বুদ্ধিকে সজাগ করে তোলে। বুদ্ধি হতে উদ্বুদ্ধ বিচারশক্তি আমার মাংসপেশীর মধ্যে নিমেষে সঞ্চারিত হয়ে

উপযুক্ত ও সময়োচিত মারের শক্তি ও সাহস জোগায়।" রণজির দ্বিতীয় প্রিয় মার ছিল 'লেট কাট'। এ ছাড়া রণজির আরও একটি বিশেষ প্রিয় মার ছিল, যে মারটির কোন বিশেষ নামকরণ করতে পারেননি। এই বিশেষ মারটি বর্ণনা করতে গিয়ে রণজির ক্রিকেট জীবনী রচয়িতা জ্যাকসন বলেছেন—"বোলার বল করছেন—বলটি সোজাসুজি অথবা একটু অফে তীব্রভাবে উইকেটের দিকে ছুটে আসছে। এ জাতীয় বলে রণজি উইকেটে অবিচল থেকে শুধুমাত্র হাতের কব্জির অপূর্ব দক্ষতায় নিমেষে ব্যাটখানাকে এমনভাবে চালনা করতেন যে, অগণিত দর্শক তাকিয়ে শুধু দেখতো, বলটি অনসাইডের বাউণ্ডারীর দিকে তীব্রভাবে ছুটে যাচ্ছে। বিস্ময়ে হতবাক বোলারের মুখ থেকে বের হয়ে আসতো একটিমাত্র কথা—'চমৎকার, রণজির পক্ষেই এ সম্ভব।'"

ইংলণ্ডের জনসাধারণের কাছে রণজি এ সময়ে এত বেশী প্রিয় হয়ে ওঠেন যে, ইচ্ছা করলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্মানলাভ করা তাঁর পক্ষে কঠিন ছিল না। পার্লামেণ্টের সদস্য যে কোন সময়েই হতে পারতেন তিনি।

১৮৯৭ সালে রণজির বিখ্যাত ক্রিকেট বই 'দি জুবিলী বুক অফ ক্রিকেট' প্রকাশিত হয়। হাসপাতালে শয্যাশায়ী থাকা অবস্থায় এই বইখানির অধিকাংশ ভাগ তিনি রচনা করেন। ক্রিকেট রসিকদের কাছে রণজির এই বইখানি চিরদিন এক অমূল্য সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হবে।

ব্যাট হাতে থাকা অবস্থায় কোন বল ব্যাটসম্যানকে আঘাত করলে রণজি সেই ব্যাটসম্যানকে খুব ভালো চোখে দেখতেন না। তিনি বলতেন—"আমার হাতে যদি ব্যাট থাকে তবে বোলার যেভাবেই খুশী বল করুক না কেন তাতে কি আসে যায়।" একবার লর্ডস মাঠে কোন একটি খেলায় শতরান সম্পূর্ণ করার পর প্যাভেলিয়নে ফিরে গেলে খেলোয়াড় ও সমর্থকেরা তাঁকে অভিনন্দিত করতে ছুটে আসেন। রণজি ম্লানমুখে তাদের বলেন "আপনাদের এ অভিনন্দনের যোগ্য আমি নই। শতরান করলেও আজকের খেলা আমার যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে।" এই কথা বলে তিনি তাঁর দুধের মত সাদা প্যাডের উপর তিনটি বলের ছাপের দাগ দেখান। বোলারের যে কোন একটি বল নিজের প্যাডে বা দেহের কোন অংশে আঘাত করা ছিল তাঁর কাছে এক পরম লজ্জার বিষয়।

তখনকার দিনে পেশাদার ও শৌখীন খেলোয়াড়দের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান ছিল। খেলার মাঠ তো দূরের কথা পোশাক পরিবর্তনের জন্যেও শৌখীন ও পেশাদার খেলোয়াড়দের ভিন্ন ভিন্ন ঘর নির্দিষ্ট

শিকারসহ শিকারী রণজি

থাকতো। খেলোয়াড়দের মধ্যে জাতি বিচার এবং এই নিয়ে পরস্পর মন কষাকষি রণজিকে বড় ব্যথিত করতো। তাই রণজি পেশাদার ও শৌখীন খেলোয়াড়দের মধ্যে ব্যবধান দূর করার জন্য প্রথম আন্দোলন শুরু করেন। রণজি বলতেন—"খেলার মাঠে জাত বিচার করা মানেই খেলার আদর্শকে ছোট করা। খেলার পূজারী আমরা সকলেই। নিষ্ঠার সঙ্গে খেলাই সকলের উদ্দেশ্য। সেখানে কে পেশাদার কে শৌখীন তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি? যে ভালো তাকে ভালো না বলা কি নীচতার লক্ষণ নয়?" রণজির এই আন্দোলন সম্বন্ধে ডেলি নিউজ পত্রিকা লিখেছিলেন—

"It was Ranji who first set himself to break down the barriers between the professional and the amateur."

রণজিকে অনেকে শুধুমাত্র ধুরন্ধর ব্যাটসম্যান হিসাবেই জানেন। কিন্তু ফিল্ডিং-এও তাঁর মত দক্ষ খেলোয়াড় সমসাময়িককালে যে খুব কমই ছিল একথা হয়তো অনেকেই জানেন না। তাঁর বল ধরা, এক উইকেট থেকে অন্য উইকেটে দৌড়ানো এবং যে কোন রকমের বলের গতিকে রুদ্ধ করার ক্ষমতা ছিল অভূতপূর্ব। সমসাময়িক ক্রিকেট সমালোচকেরা রণজির ফিল্ডিং সম্বন্ধে লিখেছেন—

"There was no man more energetic between wicket and man in. There is nobody more skilful than Ranji at fielding the ball a yard above his head or an inch above the ground."

রণজির খেলাতেও যেমন বিশেষত্ব ছিল তেমনি খেলার পোশাক আশাকেও ছিল সূক্ষ্মরুচির অভিব্যক্তি। দামী সিল্কের ফুল সার্ট পরতেন তিনি। হাতের ও গলার প্রত্যেকটি বোতাম লাগানো থাকতো। একটু বাতাস হলে শার্ট চারিদিক থেকে ফুলে উঠতো নৌকার পালের মত। পাল তোলা নৌকা যেমন সহজ ও সাবলীলভাবে এগিয়ে যায় তেমনি পালতোলা শার্ট পরে সাবলীল ভঙ্গিমায় একের পর এক রান করে যেতেন তিনি। রণজির এই শার্ট সম্বন্ধে বহু সমালোচক কবিত্ব করে নানা কথা বলেছেন। কেউ কেউ বলেছেন—

"It rippled in the breeze, and seemed to carry into infinity the smooth follow-through."

ফিলাডেলফিয়া থেকে এক ক্রিকেট দল এই সময় ইংলণ্ড সফরে আসে। বার্টকিং নামে এই দলে একজন দুর্ধর্ষ ফাস্ট বোলার ছিলেন। রণজি সাসেক্স দলের হয়ে কিংএর বিরুদ্ধে খেলতে নেমে প্রথম বলেই আউট হয়ে যান। ক্রিকেট খেলায় প্রথম বলে আউট হওয়া রণজির এই প্রথম। কিন্তু আদর্শ খেলোয়াড় রণজি আউট হবার পর কিংকে জড়িয়ে ধরেন। পরস্পরের মধ্যে

বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়। ১৮৯৭ সালে মোট ১,৯৪০ রান করে ইংলণ্ডের ব্যাটিং এভারেজে পঞ্চম স্থানের অধিকারী হন রণজি। ফলে অস্ট্রেলিয়া সফরকামী ইংলণ্ড দলে রণজির স্থান নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না।

অস্ট্রেলিয়ার পথে জাহাজে উঠেই রণজি তাঁর পুরানো ব্যাধি হাঁপানীতে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এদিককার জাহাজের খুঁটি-নাটি আইনকানুন সম্বন্ধে তাঁর তেমন জ্ঞান ছিল না। একদিন রাত্রে গান-বাজনার জন্য নির্দিষ্ট কামরাটি খালি দেখে নিশ্চিন্তে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন তিনি। লোহিতসাগরে জাহাজ চলার সময়ে গান-বাজনার ঘরটি রাত্রে মহিলারা শোবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করেন, এটা তিনি জানতেন না। সকালে ঘুম ভাঙতে কম্বল থেকে মুখ বার করতেই রণজির চক্ষুস্থির। আশেপাশে চারিদিকে মহিলারা সব ঘুমুচ্ছেন। বেশভূষাও সকলের সংযত নয়। সুট করে তাড়াতাড়ি আবার কম্বলের ভেতর মাথাটা ঢুকিয়ে নিয়ে মড়ার মত কাঠ হয়ে পড়ে থেকে ভগবানকে ডাকতে থাকেন রণজি। জানাজানি হলে লজ্জার আর সীমা থাকবে না। বেলা হলে একে একে মহিলারা সব ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর চোরের মত নিজের ঘরে পালিয়ে এসে রণজি তবে নিশ্চিন্ত হন।

অস্ট্রেলিয়ায় পেঁৗছে রণজি এক অভূত-পূর্ব সম্বর্ধনা লাভ করেন। ছোট বড় সকল সংবাদপত্রে তাঁর জন্যে বিশেষ প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এমন কি অস্ট্রেলিয়া সরকার রণজির জন্য প্রচলিত আইনেরও পরিবর্তন করেন। তখনকার দিনে কোন বিদেশী অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তাকে একটা কর দিতে হতো। কিন্তু সরকারের এক বিশেষ অধিবেশনে সদস্যেরা মিলিত হয়ে রণজির জন্য প্রচলিত আইনের পরিবর্তন করেন। রণজিকে কোন ট্যাক্স দিতে হয় না। রাস্তা-ঘাটে যেখানেই রণজি যান, সেখানেই ভীড় জমে যায়। অস্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত সংবাদপত্র 'রিভিউ অফ রিভিউজ' কাগজে ক্রিকেট সমালোচনার জন্য রণজিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

এডিলেড মাঠে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম খেলায় ঝড়ের গতিতে ১৮৯ রান করে রণজি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু রিভিউ অফ রিভিউজ কাগজে প্রথম প্রবন্ধে তিনি অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার জোন্স বল করার সময়ে 'থ্রো' করেন, এই অভিযোগ করতে কসুর করেন না। ফলে অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণ, ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র রণজির এই অভিযোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ তোলেন। জোন্সের তীব্র ফাস্ট বলে ভীত হয়ে রণজি ঐরূপ কাপুরুষোচিত উক্তি করেছেন, একথা বলতেও অনেকে কুণ্ঠিত হন না। রণজি এ সময়ে হাঁপানীতে শয্যাশায়ী ছিলেন। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সব কথাই তাঁর কানে আসে। কিন্তু রণজি ভীত হয়ে আর খেলায় যোগদান করছেন না, সংবাদপত্রে এই অপপ্রচার যখন করা হয় তখন তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না। নির্বাচকমণ্ডলী এবং দলের সকল খেলোয়াড়দের আপত্তি এবং অনুরোধ অগ্রাহ্য করে দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্য অসুস্থ শরীরেই মাঠে এসে উপস্থিত হন।

ভারতীয় রাজপুত কোন ভয়ে ভীত হয় না। বিশেষ করে রণজিৎসিংজী ক্রিকেট মাঠে কোন বোলারকেই পরোয়া করে না, একথা অস্ট্রেলিয়ার জনসাধারণের কাছে প্রমাণ করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। জোন্সের প্রত্যেকটি বল অবলীলাক্রমে খেলে রান করতে থাকেন তিনি। উত্তেজিত হয়ে জোন্স তীব্র থেকে যত তীব্রবেগে বল করেন, রণজির রান ওঠার গতিও তত দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়। দর্শকরা ভারতীয় ব্যাটস-ম্যানের ব্যাটিং প্রতিভা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ড দলের খেলোয়াড় হিসাবে রণজি সেদিন ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড করেন। কিন্তু ১৭৫ রান করে প্যাভেলিয়ানে ফিরে এসেই জ্ঞান হারিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়েন রণজি। স্ট্রেচারে করে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ, সাংবাদিক এবং সাধারণ ক্রিকেট উৎসাহীরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন। রণজি-বন্দনায় মুখর হয়ে ওঠে অস্ট্রেলিয়ার আকাশ-বাতাস। ব্যাট, বল, বার এমন কি দেশলাইএর নামের সঙ্গে রণজির নামকে যুক্ত করে জনসাধারণ তাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানায়।

তৃতীয় টেস্ট-ম্যাচ খেলার আগে রণজি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। খেলার দিন সকালে তাঁর গলায় ছোট একটা অপারেশন করা হয়। শারীরিক অসুস্থতাকে উপেক্ষা করে রণজি খেলতে নামেন। দুর্বল শরীরে প্রথম দিনে ৪০ রান করলেও কোন বোলারই তাঁকে আউট করতে পারেন না। দ্বিতীয় দিন তাঁর রান সংখ্যা হয় ১৮৬। অসুস্থ অবস্থায় রণজির এই অবিস্মরণীয় খেলা সারা ক্রিকেট বিশ্বে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। ক্রিকেট জগতের এক মহামানব হিসাবে তাঁকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। অস্ট্রেলিয়া সফরে রণজি ব্যাটিং অ্যাভারেজে প্রথম স্থানের অধিকারী হন। ২০ ইনিংসে তাঁর মোট রান সংখ্যা হয় ১,১৫৭, যার গড় হিসাব হলো ৬০·৮৯।

দীর্ঘদিন দেশছাড়া হয়ে থাকায় ভারতের জন্য রণজির মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে তাঁর বৃদ্ধা মাতার জন্য মন বড়ই উতলা হয়। অবশ্য তাঁর ভারতে আগমনের সংবাদ জামনগর রাজপ্রাসাদের পক্ষে খুব সুখকর হবে না, একথা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাই ভারতে অবস্থানকালে তিনি কখনো জামনগরে যাবেন না বলে মন ঠিক করে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

দীর্ঘদিন পরে ভারতগৌরব রণজিকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে ভারতের জনসাধারণ ও বহু দেশীয় নৃপতি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। চারিদিক থেকে আহ্বান আসে তাঁর কাছে তাদের রাজ্যে কিছুদিন অবস্থান করার জন্য। পাতিয়ালার বৃদ্ধ মহারাজা রণজিকে ঘরের ছেলের মত কাছে ডেকে নেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পরপার থেকে বৃদ্ধ রাজার ডাক আসে। পাতিয়ালার নতুন মহারাজা রণজিকে পিতার অপেক্ষা অধিক স্নেহে কাছে টেনে নেন। সৈন্য বিভাগের উচ্চপদ এ ডি সি হিসাবে তাঁকে মনোনীত করা হয়। ভারতে ১১ মাস অবস্থান করার পর ইংলণ্ডের ক্রিকেট মাঠের ডাকে আবার রণজি জাহাজে আরোহণ করেন। আবার বিদেশ যাত্রা। (ক্রমশ)

ঠিক এই সময়টা। এই এগারটা বাজলেই সুবর্ণার ফুরসত। আর ফুরসৎই নয় শুধু, একটা ইচ্ছে যেন ওকে অদ্ভুত নেশায় মাতিয়ে তোলে। চটের আড়াল করা কুয়োতলায় দাঁড়িয়ে গায়ে জল ঢালতে ঢালতে উঁকি দেয়। কি রোদ।

পেয়ারা ডালের পাতাগুলোর দিকে তাকায়। নাঃ, ওইতো ওর ঘরের সামনে রোয়াকটায় আবরণহীন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে রোদ্দুরটা। জল ঢালতে গিয়ে গা শির শির করছিল ওর। কিন্তু রোয়াকের ধারে রোদ্দুরের তেজ আন্দাজ করে জল ছিটিয়ে দেয় গায়ে। তারপর সব জলটাই ঢালে। আর যেন দাঁড়াতে পারে না। কোন রকমে ভিজে কাপড়টা নিঙড়ে নিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢোকে। কাপড় ছাড়ে, কাপড় পরে আলগোছাভাবেই। তারপর ভিজে গামছাটায় চুলের জল ঝাড়ে। শব্দ করে করে।

ওর মনে তখনও অমনি একটা আনন্দ ছিল। দুপুরের রোদটুকুতে পা মেলে শুতে পারবে। ঘুমোতে পারবে একটু। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমোবার জো নেই ওর।

কাশির ঘড় ঘড় শব্দ শুনতে হয় ওকে। হয়ত 'বৌমা' বলে খুব মৃদু স্বরে ডাকবে ওর পাশের ঘরের মানুষটা। ওর বুড়ো শ্বশুর। দু বছর ধরে, ওর বিয়ে হবার পর থেকে ভাল করে হলেও কুমারী জীবনেও ওদের বাড়িতে দেখেছে ও'কে। বাইরের ঘরে বসে ও'র এবং বাবার মধ্যে অল্প অল্প হাসি আর উচ্ছ্বাসের শব্দ শুনেছে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে। ওদের চাপা কণ্ঠস্বরের মৃদু আলাপে কান পাততে গিয়ে একটু লজ্জা আর গোপন আনন্দকে জায়গা করে দিতে হয়েছে। কিন্তু যখন একটু সাহস করে ঘরে ঢুকেছে তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে চায়ের কাপ দুটো হাতে নিয়ে।

ওই বুড়ো মানুষটা অল্প হেসে ওর দিকে তাকিয়ে একটু সাহস জুগিয়েছেন।

"বোসো মা, বোসো। লজ্জা কি!"

"প্রণাম কর সুবর্ণা। ইনি তোমাদের ইস্কুলে আগে মাস্টার মশাই ছিলেন। চিনতে পারবে না"—সুবর্ণার বাবা সংক্ষেপে পরিচয় দিয়েছেন। তারপর প্রণাম করেছিল সুবর্ণা। সেদিন ওর বেশ লাগছিল। ওদের চায়ের কাপের ওপর চোখ রেখেই চুপ করে বসে রইল সুবর্ণা। ওর বাবা আরও বললেন—"আমার খুব পুরোনো বন্ধু। একই সংগে মাস্টারী করেছি। তারপর এই ত বার বছর হল অন্য জায়গায় ও মাস্টারী নিয়ে চলে গেছে।"

একবার বন্ধুর দিকেও তাকালেন ওর বাবা, "চলে গেছে ত একবারে যেন ভুলেও গেছে"।

"না হে না, অত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারিনি তাই ত আবার এলুম, এবার যাতে আর ছাড়াছাড়ি না হয়।"

সুবর্ণার পিঠের ওপর একটা হাত রেখে বলছিলেন উনি। এরপর আরও দু'দিন এসেছেন। নিজেই সুবর্ণাকে তাগিদ দিয়ে চা চেয়ে খেয়েছেন। বাবার সংগে গল্প করেছেন। কৌতূহলও ততই বেড়ে গেছে সুবর্ণার। বাবার চোখে একটা যেন প্রশ্ন দেখতে পেয়েছে ও। দুরন্ত মনটা একটু স্বস্তি পেতে চেয়েছে।

সেই মুহূর্তটুকু এল তারপর। রাত্রে মা'র কাছে শুয়ে নিজেকে কেন জানি খুব দুর্বল মনে হতে লাগল সেদিন। কিন্তু ভাবল—নাঃ ওকে শক্ত হতেই হবে। মা'র ছোঁয়া থেকে একটু সরে এল ও। ওর বুকের ওপর মা'র হাতটা মনে হচ্ছিল একটা কঠিন প্রশ্নের পাথর। নিঃশ্বাসটা যেন ক্রমশ ঘন হয়ে উঠতে লাগল সুবর্ণার।

খুব নিচু স্বরে প্রশ্ন শুনতে পেল ও,—"কেমন ছেলে তোর পছন্দ বল না। লজ্জা কি।"

এইটুকু একটা ছোট্ট হালকা প্রশ্নের জবাব দিতে ও যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। সেই নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে পাশাপাশি শুয়ে মা'র প্রশ্নের জবাব দিতে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে ওর চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন ওর মা। জবাবের জন্য তাগিদ দিতে লাগলেন থেমে থেমে।

"বল সুবর্ণা! তোর অমত ছাড়া আমি কাজই করব না। তুই তো আমার একটিই......"

যেন আর নিস্তব্ধতার মধ্যে আশ্রয় নিতে পারছিল না সুবর্ণা। তাই মা'র বুকের

কাছে মুখ নিয়ে খুব অস্ফুট সুরে বলল, "ভাল......"

"বড়লোক ?......"

মাকে বাধা দিয়ে আবার বলল সেই রকম চাপা কণ্ঠস্বরে—"বড়লোক না, আমাদের মতো।"

মা আরও কাছে টেনে নিলেন ওকে। তারপর আশ্বস্ত করলেন—"আমি জানি তুই ঠিক এই রকম বলবি।"

আর কোন জবাব দিল না সুবর্ণা। তারপর দিন মনে হল কাল রাতে কে যেন এসেছিলো ওর মনের কথা জানতে।

বিকেল বেলাই আবার এলো এই বুড়ো মানুষটা। এবার আর সুবর্ণা দাঁড়াতে পারলো না ও'র সামনে। পাশের ঘরে বোনার কাঠিটা নিয়ে বসে রইল, একটু আনমনা হয়ে থাকবার জন্যে। কিন্তু না, চুপ করে বসে থাকতে পারল না। আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল ওর বাবা আর মা'র মৃদু আলাপ। আরও লক্ষ্য করল একখানা ছবির মত কি যেন বাঁধানো।

মা রান্নাঘরে চলে যাবার পর, বাক্স থেকে লুকিয়ে বার করল ছবিখানা। মিলিয়ে মিলিয়ে দেখতে লাগল ওর মনের ওপর আঁকা ছবিখানার সংগে।

অনেক তফাৎ। এ যেন শুধু আঁচড় নয়, অবিকল একটা জীবন্ত মানুষ। কি যেন বলতে চাইছে। কি যেন একটা শুনতে। চুপি চুপি নয়। একটু সুর মিলিয়ে। অনুভব করতে চাইছে ওকে। ও যেমন চাইছে জীবন্ত মানুষটাকে। হ্যাঁ, সেই জীবন্ত মানুষটা।

ওর কাছে খবর এল। মা সাজিয়ে দিলেন, পরিপাটি করে, চুল বেঁধে। সুন্দর একখানা কচি কলাপাতা রং এর শাড়িও মার বাক্স থেকে বার করে পরতে হল সুবর্ণাকে। না না, এ সেই মেয়ে দেখতে আসার মত নয়। ওই বুড়ো লোকটার আবদারের মতো। তিন পেয়ালা চা নিয়ে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল ও। কিন্তু একটু দাঁড়াতেও হল। তারপর বুড়ো মানুষটা নিজে থেকেই চায়ের কাপটা এগিয়ে নিলেন। কিন্তু ওর হাতে রইল একটা। আর সেটা ওকেই একটু সংকুচিত হয়ে এগিয়ে দিতে হল আর-একজন অল্পবয়সী মানুষের এক জোড়া ভীরু চোখের চাহনি বাঁচাতে।

তারপর বসতে হল ওদের সামনা-সামনি। এমনি মৃদু প্রশংসা আর বুড়ো-মানুষটির হালকা প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল খুব থেমে থেমে। সেদিনই জানত প্রশ্নগুলো বুড়ো মানুষটার ভাঁপিদে নয়। ওই ভীরু একজোড়া নীরব চাহনির। আর সুবর্ণার মৃদু প্রশংসা ওকেই আবিষ্কারের চিহ্ন রেখে দেওয়ার জন্যে। যখন সকলেই চুপ করে বসে থেকেছে তখন এক মুহূর্তে, এক পলকে মিলিয়ে নিয়েছে সুবর্ণা। ওর মনের ওপর আঁকা ছবির সাথে। কিন্তু কই, মেলেনি ত' তেমন নিখুঁত হয়ে মেলেনি ওর চেহারার সাথে। ভেবেছিল, চোখ দুটো খুব অচঞ্চল। কিন্তু তা' ত নয়। একটু কোমল আর ঠোঁট দুটো অত পুরু নয়। আঁচড় কাটা কাটা। খুব পাতলা। এই দুটো বুড়ো মানুষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সুবর্ণাই শুধু চুরি করে দেখেনি। আরও একজোড়া ভ্রূ কুঁচকে মেপে লক্ষ্য করেছে ও।

কি জানি, হয়ত বা সেও কিছু মেলাতে চেয়েছে ওর সংগে। একটু কৌতূহল জেগেছে সুবর্ণার।

ফুলশয্যার রাত্রেই ওর কাছে নিজেকে হালকা না করেই খুব জড়ানো জড়ানো স্বরে প্রশ্ন করেছে ও।

"সেদিন তুমি আমাকে দেখছিলে?"

"কেন? তোমার কি মনে হল?"

"কিচ্ছু না, কিন্তু......"

"তুমি?"—ছোট্ট একটা প্রশ্ন করেছে চিন্ময়। জবাব পেয়েছে তেমনি আড়ষ্ট স্বরেই।

'না।'

'তবে তুমি দেখলে কি করে?'

যেন খুব লজ্জা পেল সুবর্ণা। তারপর,

অনেকক্ষণ পর আবার বলল ও।—"আচ্ছা, আমাকে তুমি ভাবতে ?"

"ভাবব কেন ?"

"না, এমনি, মানে আমার মতো কাউকে মনে হতো না ?"

প্রশ্নের তাগিদ শুনে একটু হাসল চিন্ময়।

"খুব মনে হতো, মনে হতো কি রকম জান......?"

"কি রকম !" উদ্বেগ যেন বাড়তে লাগল সুবর্ণার।

"মনে হতো অল্প কালো আর লাজুক একটা মেয়ের কথা।"

"আর, আর কি রকম ?"

"থাক্ এখন অত কি আমি মনে করে ছবি এঁকে রেখে দিয়েছি। আমি ত আর্টিস্ট নই। অত আমার মনে থাকে না।"

অনেকক্ষণ চুপ করেই থাকে ওরা। সুবর্ণা তখনও একটু সংকোচ আর লজ্জায় নিজেকে ছাড়তে দেয়নি। খুব আলতো করে চিন্ময় একটা হাত বাড়িয়ে দিল সুবর্ণার দিকে।

কিন্তু সুবর্ণা হ্যাঁ, তখনও আড়ষ্টতা কাটেনি ওর। শুধু অনুভব করল ওর ছোঁয়া। ছোঁয়া লেগেছে ওর হাতের সঙ্গে চিন্ময়ের। একটু পর আর চঞ্চলতা টের পেল না চিন্ময়ের। বালিশ থেকে মাথাটা তুলে তাকাল ও স্বামীর দিকে। যেন খুব ক্লান্ত মানুষটা। খুব অল্পসময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। রাত একটু বেশীই হয়েছে। কিন্তু এই ত ওদের প্রথম রাত। শুধু কি দুটো কথাতেই ক্লান্ত হয়ে গেল মানুষটা। আগ্রহ কি নেই ওর! আশ্চর্য। একটু আশ্চর্য হল সুবর্ণা। ঘুম এল না ওর। মনে হচ্ছিল আজ যেন সারারাতই ঘুম আসবে না। কিন্তু যেন নাই তার কোনো। ও ভেবেছিল ঠিক এমনি। ...এই প্রথম রাতটির কোলে অবশ হয়ে নুইয়ে পড়বে না। অজস্র প্রশ্ন আর মনের অনুভূতির ইশারায় সাড়া দেবে ওরা। হ্যাঁ সুবর্ণাই। কত রাত ধরে কল্পনা করেছে। ছবি এঁকেছে। ছক কেটেছে ওর স্বচ্ছন্দ মনের ওপর।

আজ তাই এক মুহূর্তে চিন্ময়ের ওই এক জোড়া ভীরু চাহনি ওকে চঞ্চল করে তুলেছে। উদগ্রীব করে তুলেছে ওকে। কেমন যেন আনন্দ লাগছে ওর পাশে ঘুমন্ত মানুষটার দিকে বার বার তাকিয়ে থাকতে। আশ্চর্য আরও কত তাড়াতাড়ি ও একজনের সঙ্গিনী হয়ে উঠল। অন্য একজন ওর সঙ্গ হয়ে উঠল। অথচ যদি মনে করতে চায় ওর অতীতকে, যখন এমনি একটা যৌবন-মন আশ্রয় চাইছে ওর কাছে, মিনতি জানাচ্ছে! তখন কত বয়স?

নিখুঁতভাবে হিসেব করল সুবর্ণা। ওর চাই্‌দু কার বয়ে-যাওয়া অতীতকে। ভুল নেই একটুও। স্মৃতির অতলে সাড়া দিল কিশোরী সুবর্ণা। ও তখন একটু একটু করে পরিণত বয়সের আশঙ্কায় ঝুঁকে পড়ছে। যেন ঝোড়ো হাওয়ার মত বয়স বাড়ল সুবর্ণার। তখন ফ্রক ছেড়ে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে রাখতে শিখছে ওর পরিণত বয়সের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের উদ্দিপনাকে। চোখের পাতা দুটো তখন আপনি মুড়ে আসতো দোপাটি ফুলের মত। নিটোল গোড়ালির ওপর ভর করে চলে যেতে গিয়ে একটা নিলাজ-লজ্জা একটু জায়গা করে নিয়েছে ওর সারাদেহের যৌবনতায়।

সেদিন কত জোড়া চোখই না তাকিয়ে থাকত ওর দিকে। ওর শান্ত পদক্ষেপ লক্ষ করত তারা। কিন্তু কেউ প্রলুব্ধ করতে পারেনি। হয়ত সাহসের পুঁজি তাদের কম। কিন্তু এই একটা মানুষের ভীরু আর নম্র দৃষ্টির সামনে ওর স্থির দৃষ্টিও একটু পিছলে গেল। আর প্রলুব্ধ করল ওকে। ওর দেহ, মন, আশা, আকাঙ্ক্ষাকে।

সেই রাত্তিরটার কোলে একটা ছোট্ট ঘরের এক কোণায় ঘুমন্ত স্বামীর পাশে শুয়ে কত কথাই ভেবেছে সুবর্ণা তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে। পরের দিন ভোর না হতেই ঘুমটা ভেঙে গেছে, ওর চিন্ময়ের দুজনেরই। পাশের ঘরের বুড়ো শ্বশুরের খক্‌খক্ কাশির শব্দে। তখনো ঘুমের রেশ কাটেনি ওর। ভাবল, বোধ হয় অনেক বেলা হয়ে গেছে। বেলা অবধি ত ঘুমিয়ে থাকে না ও। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসতে যাচ্ছিল সুবর্ণা। কাঁধে একটা হাত রাখল চিন্ময়। বাধা দিল ওকে। "এখনও ভোর হয়নি। কোথায় যাবে এই ঠাণ্ডায়! শুয়ে পড়।"

কোন জবাব দিল না সুবর্ণা। বোবার

মত তাকাল ওর দিকে। "বাবার ওটা বরাবরের অভ্যেস। চারটে বাজলেই ঘুম ভেঙেগ যায়। তার ওপর হাঁপানির জন্যো আর", আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিল থেমে গেল কাশির সংগে একটা ঘড় ঘড় শব্দ শুনে। একটু যেন ভয় পেল সুবর্ণা ফ্যাকাসে দৃষ্টিতে তাকাল স্বামীর দিকে, "ডাক্তার দেখাও না 'বাবাকে'।

"কোন চিকিৎসা বাকি নেই, এলোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথী, কবিরাজী মাদুলী সব করেছেন—" একটু থেমে আক্ষেপের সুরে বলল চিন্ময়, "এই অসুখটার জন্যে বাবার স্বাস্থ্যটাও ক্রমশ ভেঙেগ পড়ছে। এক সংগে একঘণ্টা কাজ করতে পারেন না, কিন্তু......"

"এই শরীর নিয়ে ইস্কুলে যাচ্ছেন......"

"আমি বারণ করেছিলুম। কিন্তু বললেন, এই ত্রিশ বছর একটানা কাজ করার পর বসে গেলে আরও দুর্বল হয়ে পড়বেন। আর, তাছাড়া......"

"তা ছাড়া আবার কি, না না, তুমি বল বাবাকে এই বয়সে আর কাজ করতে হবে না। তার ওপর ছেলে পড়ানো বক্ বক্ করে বকা।"

"আচ্ছা দেখি আর একবার বলে দেখব।" একটু থেমে আবার কি ভাবল চিন্ময়। তারপর সুবর্ণার দিকে তাকাল। "তার চেয়ে বরং তুমিই বল একবার। তুমি বুঝিয়ে বললে হয়ত শুনবেন।"

"আমি বলব—" একটু যেন ইতস্তত করছিল সুবর্ণা।

তারপর একদিন ইস্কুলে যাবার আগে যখন বুড়ো মানুষটা ওর কাছেই ছাতাটা চাইল তখন ও ভেবেছিল, কিন্তু হল না বরং বুড়ো মানুষটাই বলল, "সাবধানে থেকো মা। প্রথম প্রথম এই দুপুর বেলাটা একলা থাকা, একটু ভয় ভয় করবে।"

ওঁর পায়ের জুতো জোড়ার ওপর চোখ রেখেই বলল সুবর্ণা খুব আস্তে আস্তে, "আপনার ত সাড়ে তিনটেয় ছুটি হয়ে যাবে...।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি খুব তাড়াতাড়িই চলে আসব। আর তোমার ত বই পড়ার অভ্যেস আছে। চিনুর বাক্সে অত বই রয়েছে ত—" ব্যস্ত হয়ে আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন থেমে গেলেন। দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন—"আসি মা..."

"আচ্ছা' খুব আলতো সুরে একটা সম্মতি জানাল সুবর্ণা।

এরপর যখন দরজাটা বন্ধ করে ভেতরে চলে আসতো খুব একা একা লাগতো। মা'র কাছে থাকতে ত এত নিঃসঙ্গ ছিল না। বাবা ইস্কুলে যাবার আগেই ও ইস্কুল থেকে ফিরে আসত। কাপড় বদলে বাবার খাওয়াটুকু তদারক করতো। গরম ভাতের থালায় পাখার বাতাস দিয়ে সাহায্য করত মা'কে। তাড়াতাড়ি দুটো পান সেজে এগিয়ে দিত বাবার দিকে। তারপর রান্নাঘরে ঢুকে মা'র সঙ্গে আটার রুটি সেঁকতে বসত উনুনের সামনে। অবশ্য তাতেও মা বাধা দিয়েছেন। উনুনের আঁচের সামনে বসে যখন ওর মুখখানা লাল হয়ে উঠত, মা বলত, "শ্বশুর বাড়ি গিয়ে যা করিস করিস্ লোকে তোর গুণ গাইবে। কিন্তু এখানে আমার কথা না শুনলে বলবে মা মেয়েটাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মুখখানা আগুনে তাতে পুড়িয়ে দিয়েছে।"

নিঃশব্দে গোপন হাসি হেসে চুপ করে থাকত সুবর্ণা। কোন জবাব দিত না মা'র কথায়। এমনি করে বাকী সময়টুকুও মা'ই বেশ সংগী হয়ে উঠেছিলো ওর। ইস্কুল ছাড়বার পরও তাই।

দুপুরবেলাটা জানালার ধারে একখানা মাদুর বিছিয়ে ভিজে চুলগুলো মেলে দিয়ে শুয়ে পড়ত সুবর্ণা। হাতে থাকত উপন্যাস কিংবা সোনার কাঠিটা, বিকেল গড়িয়ে এলেই গা ধোয়া, চুল বাঁধা শেষ করতে সন্ধ্যে নেমে আসত। তখনও হয়ত রান্নাঘরে মা'র কাছে গিয়ে বসেছে কিংবা বাবার বাইরের ঘরে গিয়ে বসত।

তখন হয়ত ওর বাবা পরীক্ষার খাতা দেখছেন, কিংবা সাদা কাগজের ওপর কালির আঁচড় টেনে টেনে নতুন পাঠ্য বই রচনা করছেন এক মনে। সুবর্ণা তখন খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে গিয়ে বাবার পাশে বসত। লক্ষ্য করত বাবার নীরবতা। কিন্তু ধৈর্য ওর কতটুকু? বরাবরই একটু চঞ্চলমতী মেয়ে ও। স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেনি কোনদিন। সত্যিই আজ ভাবতে একটু অবাক হয়ে অনেক খুঁজে খুঁজে বার করল চিন্ময়ের সঞ্চয় করা গল্প-উপন্যাসের বই। কিন্তু তাতেই বা কদিন চলে।

একদিন সবাই নিঃশেষ হল।

চিন্ময় বলল, "আরও ত বই রয়েছে। পড় না কত পড়বে। বিয়েতে যে অত বই পেলে সে সব ত রয়েছে।"

"সেই বই ত কবে শেষ হয়ে গেছে, তোমার পুরোন ইতিহাস ভূগোল বইও শেষ করে ফেলেছি।"

এবার আর কোন জবাব দিল না চিন্ময়। শুধু একটু হাসল। ও লক্ষ্য করছিল সুবর্ণার দিকে তাকিয়ে, ও যেন বেশ অন্তর্মুখ-প্রবণ হয়ে উঠেছে। তারপর ভাবল শুধু সুবর্ণা কেন চিন্ময়ের নিজেরও কেমন যেন একটু ছটফটে ভাব এসেছে। একঘণ্টা স্থির হয়ে অফিসের কাজ করতে পারে না। ভাবনাটা যেন অকারণেই সুবর্ণার মুখখানা মনে করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় ছুটির দিনের দুপুরটার কথা। খুব মিষ্টি গল্প ভরিয়ে তুলছে সুবর্ণা। কখনো বা একটু আবদার করছে কিছু একটার। কিংবা অল্পবয়সী মেয়ের মত বায়না শুনতে হচ্ছে চিন্ময়কে। ভাবল ও, সত্যিই সুবর্ণা একটু কষ্ট পায়। এই দুপুর বেলাটা একা একা থাকা। লেজারের পাতার ওপর কলমটা অনেকক্ষণ থেমে গেছে ওর। ভাবছে তখন, একদিন হঠাৎ ছুটি নিয়ে দুপুর বেলা যদি গিয়ে পড়ে ও! হ্যাঁ, সত্যিই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে পারবে। কি করে সুবর্ণা এই দুপুরটায়! হয়ত বা জানতেও পারবে ওর অন্তর্মুখ-প্রবণ মনটার কথা।

ভেবেছিল ঠিক আসবে একদিন, এমনি দুপুর বেলায়। কেউ থাকবে না। শুধু ও একাএকাই লক্ষ্য করবে আরেকজনকে। যে ওর চেয়ে আরও একা। এই সময়টুকুর সান্নিধ্যে। কিন্তু তা আর হল না, ঠিক তেমন আর হল না। বড় সাহেবকে ধরে করে দুপুরে ছুটিরও বন্দোবস্ত করেছিল, কিন্তু সেইটুকুই।

সেদিন বাড়ি ফিরে বাবার ঘরটার দিকে তাকিয়ে একটা থম্‌থমে ভাব আর মাথার কাছে সুবর্ণাকে দেখে এক মুহূর্তে সব সরে গেল মন থেকে। এসে দাঁড়াল একটার

পর একটা প্রশ্ন। আর থম্‌থমে গলায় বলতে লাগল সুবর্ণা।

"মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন......"

তারপর ব্যস্ততা বাড়ল চিন্ময়ের। আর চিন্ময়ের দিকে তাকিয়ে সুবর্ণাও কেমন যেন একটু শোকাতুর হয়ে পড়ল। ওর সামনে চায়ের কাপটা রেখে পাশে বসল ও।

"তুমি ততক্ষণ চা'টা খেয়ে নাও। সারাদিন খেটে খুটে এলে, একটু জিরিয়ে নাও। আর ভয়ের কিছু নাই!"

"তা হোক, সবটা শুনি আগে তারপর....."

"ইস্কুলে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ কাশিটা বাড়ে তাইতেই মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তার এসে ইনজেকসন দেবার পর জ্ঞান ফিরেছে! তারপর থেকে আর উঠে বসতে পারেননি। মাথায় বুকে হাত বুলিয়ে দিতে একটু ঘুমিয়েছেন।"

সব শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ করেই বসে রইল চিন্ময়। তারপর ওরা দুজনেই এসে বসল ওর বাবার বিছানার ধারে। একটু পর যখন সুবর্ণা রান্নাঘরের দিকে চলে গেল চিন্ময় একদৃষ্টে সেই বুড়ো মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইল। ওর মনে হল একটা অবশ দেহ যেন একটু বিশ্রাম অনুভব করছে। চোখ ফিরিয়ে তাকাল চার পাশে।

সেদিন আবার চেতনা ফিরে এল মানুষটার। আর চিন্ময়-সুবর্ণা দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। লক্ষ্য করল কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন ভাব! খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, ডাক্তারখানা থেকে আনা ওষুধটুকুও খাওয়াল সুবর্ণা। উনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। সেই রাতটা জেগেই কাটাতে হল সুবর্ণা আর চিন্ময়কে।

"তুমি শুয়ে পড় সুবর্ণা। সারাদিনই তোমার খুব খাটাখাটনি গেছে।" একবার চিন্ময় বলল।

"তুমি একলা জেগে থাকবে। না, না আমার ঘুম পায় নি। বরং তুমি একটু ঘুমোও আমি ডাকব যদি দরকার হয়।"

শেষ পর্যন্ত এমনি করে কেউই ঘুমোতে পারেনি ওরা। একটা ভয় আর ভাবনা নিয়ে পাশাপাশি কাটিয়েছে। স্থির দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ্য করেছে নিঃসাড়ে ঘুমন্ত মানুষটার দিকে। হয়ত আবার কয়েকটি মুহূর্তের জন্যে, তেমনি আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে খুঁজবে ওদের। এমনি একটা গভীর আশা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুখোমুখি বসে আছে ওরা।

চিন্ময় আরও গভীরভাবে ভাবছে বাবার শক্ত সবল দেহটার কথা। উদ্বেগ-উচ্ছ্বাস প্রবণ মানুষটার কথা। যার ভাবনা চিন্তা সব কিছু ঘিরে ছিল চিন্ময়। হাঁ, এই নিঃসাড়ে ঘুমন্ত মানুষটাই ওকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, এই বিশাল পৃথিবীর অসংখ্য উত্থান-পতনের সঙ্গে। মা কবে মারা গেছেন তা প্রায় মনেই পড়ে না চিন্ময়ের। ও জানে শুধু বাবাকেই। এত দিন শুধু ও একাই ছিল বাবার কাছে। চিন্ময় বি এ পাশ করার পর চাকরী করার সময় লক্ষ্য করেছে বাবার নীরবতা। কি যেন নতুন ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকতেন।

তারপর আজ বাবার চোখে একা ও দুজন হয়ে উঠল। চিন্ময় আর সুবর্ণা। ওদের ঘিরেই কি যেন একটা গভীর চিন্তা মাতিয়ে তুলেছিল মানুষটাকে। ঠিক সেই চিন্তার ঢেউ ভাঙতে গিয়েই আজ পরিশ্রমের ক্লান্তিতে নুইয়ে পড়লেন।

আর এই অবশ দেহটার পরিণতি লক্ষ্য করতে গিয়ে, চিন্ময় আর সুবর্ণা দুজনেই গুণতে লাগল প্রতিটি মুহূর্ত। যে মানুষটা সর্বদা উৎসাহের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিয়েছেন, সেই বুড়ো মানুষটার ভাব-ভঙ্গি, ভাষা-স্বর, দেহ সব যেন আরও বৃদ্ধ হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ল। চিন্ময় আর সুবর্ণার সারা দিনরাত্রের একটাই ভাবনা ওদের আচ্ছন্ন করে রাখল। কিন্তু নাঃ, ডাক্তারের ওষুধে কিছুই হল না। শুধু রাশি রাশি টাকাই খরচ হল মানুষটাকে উৎসাহ জোগাবার তাগিদে। ডাক্তারই বললে, বুড়ো মানুষটার অঙ্গের বাঁ দিকটা চিরদিনের মতই অবশ হয়ে গেছে। অসাড় হয়ে গেছে একটা অচেতন পদার্থের মত।

কিন্তু সেই বুড়ো মানুষটাই ওদের ভাংগা ভাংগা স্বরে, থেমে থেমে সান্ত্বনা জানাতে লাগলেন, যেন ওরাই হারিয়েছে ওদের চেতনা।

"চেষ্টা করবার ত......্রুটি......ছিল না" আরও ঝুঁকে পড়ল চিন্ময় আর সুবর্ণা দুজনেই। "আমার দিন... ত শেষ হয়ে... এল শুধু কষ্ট ....কষ্ট। এ রকমভাবে... বেঁচে থাকা। তোমাদেরও.... কষ্ট..... কষ্ট।" আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। জোর করেই যেন থামাতে হল।

বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে মৃদুস্বরে বলল সুবর্ণা, "আমাদের কিচ্ছু কষ্ট হবে না। আপনি আবার ভাল হয়ে উঠবেন।"

একবার ওর মুখের দিকে তাকালেন। একটু হাসলেন, যখন বিষাদের ছায়াটা সমস্ত মুখখানা আচ্ছন্ন করে ফেলে। অস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করল চিন্ময় আর সুবর্ণা দুজনেই।

তারপর থেকে সুবর্ণার রোজকার নীরবতা গেল বিচ্ছিন্ন হয়ে। ওরা দুজনেই যেন পড়ে গেল একটা বাঁধা নিয়মের মধ্যে। এখন সত্যি সত্যিই রাত থাকতেই ঘুমটা ভেঙে যায়। পাশের ঘরের বুড়ো মানুষটার কাশির শব্দে। একটু পরেই উঠতে হয় বিছানা ছেড়ে। উঠতে হয় স্বামীর বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে আলগা করে নিয়ে। কাপড় কাচা সেরে উনুনে আগুন দেয়। সকলের আগে ঐ বুড়ো মানুষটার জন্যে একটু গরম দুধ একটু চায়ের সাথে দুখানা বিস্কুট। নিজে বসে খাইয়ে দেয় সুবর্ণা। আর মানুষটা অল্প অল্প করে তৃষ্ণা মেটায়। একটু স্বস্তি পায়। শুধু ঐ বুড়ো মানুষটা কেন সুবর্ণাও। গলার ঘড় ঘড় শব্দটা তখন একটু কম শব্দ করে। সুবর্ণার মনে হয় হয়ত বা একটু আনন্দ দিতে পারল। কিংবা স্বাদ পেল একটু আনন্দের। কিন্তু চিন্ময়। ও তখনো শীতের সকালে রোদ্দুর ওঠার অপেক্ষায় লেপ ঢাকা দিয়ে শুয়ে থাকে। ও জানে এখনই চা খেয়ে

বাজারের থলি নিয়ে বেরোতে হবে। খুব মনে করে করে খুঁটিনাটি জিনিস কিনতে হবে।

একটু অপলক দৃষ্টিতে সুবর্ণার মুখের ওপর তাকিয়ে লক্ষ্য করে চিন্ময়, যখন সুবর্ণা অবিকল একটা নিপুণা গৃহিনীর মত এক হাতে বাজারের থলিটা এগিয়ে দেয়। আর খুব ব্যস্ত মেয়ের মত ওকে ওর দায়িত্বটুকু বুঝিয়ে দেয় হাত নেড়ে ভঙ্গি করে করে।

মাঝে মাঝে ভাবে চিন্ময়। সত্যিই বাবার অসুখের পর এই দুটো বছরের মধ্যে কত তাড়াতাড়ি নিজেকে শক্ত সবল করে তুলল সুবর্ণা। আর দুটো মানুষ—একজন পঙ্গু অসহায় শিশুর মত ওর যত্নের ছোঁয়া পেয়ে সমস্ত দায়িত্ব ভুলে দিন গুণতে লাগল। আর-একজন চিন্ময়। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই খুব দায়িত্বশীল মানুষ হয়ে উঠল। কিন্তু সুবর্ণা! একটা সন্দেহ জাগে ওর, সত্যিই কি ওর কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা নেই কিংবা...। এমন অনেক দিন হয়েছে, রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছে চিন্ময়ের। মনে হল ওর কাছেই যেন কিছু প্রত্যাশা করছে সুবর্ণা। চিন্ময় তখন ওকে একটু কাছে টেনে নিল।

ওর চুলগুলোয় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে খুব চাপা একটা স্বর শুনতে পেল চিন্ময়।

"ঘুম আসছে না আমার।"

কোন জবাব দিল না চিন্ময়। অনেকক্ষণ পর ও খুব মিহি সুরে ডাকল। "সুবর্ণা!"

"কি!"—তেমনি অস্পষ্ট স্বরেই জবাব শুনতে পেল চিন্ময়। তারপর ও থেমে থেমে বলতে লাগল—। "তোমার খুব কষ্ট হয় সুবর্ণা......"

কোন জবাব দিল না ও।

"খুব একা একা লাগে তোমার আমি জানি," একটু থেমে আবার বলল চিন্ময়, "কিন্তু কি করব। আমিও......"

ওকে বাধা দিয়ে সুবর্ণা বলল, "আমার জন্যে ভেব না। আমি সব ঠিক করে নেব।"

অনেকক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। চিন্ময় বলল, "এই দু বছরে বাবা অসুখে ভুগে কি রকম যেন হয়ে এলেন। কোন কিছুই সাড় পান না।"

"যখন কেউ থাকে না, কি যেন নিজের মনেই বকে যান," ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে বলতে লাগল সুবর্ণা, "আমার কি মনে হয় জান!"

"কি মনে হয়?" ছোট্ট একটা প্রশ্ন করল চিন্ময়। ঠিক জবাব দেবার মুহূর্তেই হঠাৎ পাশের ঘর থেকে কাশিটা যেন শব্দ করে করে বাধা দিতে লাগল সুবর্ণাকে।

তারপর গলার ঘড় ঘড় শব্দটা যখন একটু একটু করে পাতলা হয়ে এল, কথা বলল চিন্ময়। খুব ভারী ভারী শোনাল ওর গলার স্বরটা।

"এই দু বছরে একভাবে একখানা ঘরের মধ্যে পড়ে থেকে থেকে যেন অদ্ভুত হয়ে এলেন!"

"সত্যিই সব সময় মনে হয় কি যেন ভাবছেন"। সুবর্ণাও বলল, "আমার বড় ভয় ভয় করে, তারপর তুমি ত থাক না। মনে হয় সবটা বুঝি......" হঠাৎ সুবর্ণার গলার স্বরটা আরও গাঢ় হয়ে নিভে গেল। চিন্ময়কে আঁকড়িয়ে ধরল। একটা অজানা আতঙ্কে। তারপর ভয় আর ভাবনায় নিস্তব্ধ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল!

আবার ঘুম ভাঙল ঠিক পাঁচটায়। সেই বুড়ো মানুষটার কাশির ঘড় ঘড় শব্দে। উনুনে আঁচ ধরিয়ে পাখার বাতাস দিতে দিতে মনটা আচমকা যেন একটা আনন্দে ভরে উঠতে লাগল। কালকের রাতে চিন্ময়ের আকর্ষণে নিজের দেহটা কল্পনা করে।

এই দু বছরে যেন এই প্রথম পরিপূর্ণভাবে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পেরেছে ও, চিন্ময়ের মধ্যে। সারাক্ষণ মনে লেগে রইল একটা মৃদু আবেগ আর সমস্ত দেহটা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। যখনই ওর দিকে একটা স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে তাকাল চিন্ময়। আগের মত স্বামীর দিকে তাকাতেও পারল না ও। যেন একটা আঁচড় ঠিক ওর দৃষ্টির সামনেই। অফিস যাবার আগে যখন চিন্ময় কাছাকাছি দাঁড়াল আর খুব কাছে টেনে নিল ওকে, তখনও চোখ তুলে তাকাতে পারল না ও।

সেদিন সারাদিনই কেমন যেন এলোমেলো হয়ে রইল সব কাজ। রান্নার কাজ সেরে বুড়ো শ্বশুরকে খাওয়াতেও প্রায় ভুলেই যাচ্ছিল।

বুড়ো মানুষটা খুব মৃদুস্বরে থেমে থেমে ডাকতে লাগলেন। "কটা......বাজল... বৌমা?" আবার একটু থামলেন। কোন সাড়া না পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন "আমার......খিদে পেয়েছে।"

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সুবর্ণা। অল্প অল্প স্বর কানে আসতেই চমক ভেঙে গেল ওর। আর খুব লজ্জা পেল। তারপর খাবারের থালাটা নিয়ে শ্বশুরের পাশে গিয়ে বসল। বুড়ো মানুষটা ফ্যাকাসে দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। খুব কাঁপতে কাঁপতে অনেকক্ষণ পর হাতখানা ওর চুলগুলো স্পর্শ করল। সেইভাবেই থেমে থেমে ব্যগ্র হয়ে সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করলেন,—"তোমার কি শরীর খারাপ বৌমা?"

"না, না, শরীর খারাপ হয়নি। কাজ করতে করতে দেরী হয়ে গেল"—একটু লজ্জিত হয়েই জবাব দিল সুবর্ণা।

খাইয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করল ও—"আপনার খুব কষ্ট হচ্ছিল বাবা?"

"না, না, আমার কিছু......না"।

হঠাৎ গলার ঘড় ঘড় শব্দটা একটু বাড়তে লাগল। সুবর্ণা ওঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে একটু যেন সামলিয়ে নিলেন। তারপর আবার তেমনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে লাগলেন—"তোমাকে...... দেখলে বৌমা বড় কষ্ট হয়!"

"আপনি খেয়ে নিন বাবা"। অল্প বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল সুবর্ণা।

"কিন্তু...কি...করব মা, তুমি..." আর যেন নিঃশ্বাস ফেলার জোর পেলেন না তাই থামতে হল। খাওয়ানো শেষ করে অনেকক্ষণ বসে রইল সুবর্ণা। তারপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে বলল। "আমি চান করে এসে আপনার মালিশ করে দেব। আপনি ততক্ষণ চুপ করে শুয়ে থাকুন। কথা বলবেন না।"

হাতের কাজ শেষ করে ও বালতি গামছা নিয়ে কুয়াতলায় দাঁড়ায়। শীতের সময় একটু বেলাতেই চান করে ও। ঠিক রোদ্দুরটা যখন মাথার ওপর দাঁড়ায়। আজ যেন আরও একটু বেশী বেলা হল। ভাবছে তখনও। গামছাটা পাড়ে রেখে কুয়োর জলের ওপর নিজের অতি অস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি দেখে ভাবছে সুবর্ণা।

ওর দেহে একটু পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। এমনি একটা নেশায় ডুবে গেল যেন সুবর্ণা। নিজেকে নিজের চোখ দিয়ে দেখা। দেহটা যেন ক্রমশ আরও মসৃণ হয়ে উঠছে ওর।......ঠিক তখন হঠাৎ ঐ বুড়ো মানুষটার ডাক শুনলে মনটা একটু বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। স্নানের পর চুল আঁচড়িয়ে মালিশের তেল ছুঁতে অস্বস্তি লাগে সুবর্ণার। শুধু তাই নয়। এই সুন্দর ভিজে ভিজে রোদ্দুরের দুপুরটায় শ্বশুরের তেল মালিশ করা, টুকিটাকি

ফাইফরমাস খাটতে সত্যিই যেন আর সয় না সুবর্ণার। জানালা দিয়ে যখন ভাঙগা কাচের মত রোদ্দুরটা এসে পড়ে, তখন বুড়ো মানুষটাও খোলস ওঠা পিঠটা পেতে দিয়ে যেন স্বস্তি পায়। যেন স্বাদ পায় এই মিষ্টি দুপুরের সান্নিধ্যটুকুর। কিন্তু বঞ্চিত হয় সুবর্ণা। সেদিন সুবর্ণা সত্যিই ব্যথিত হয়েছিল। যেন একটা হতাশা লক্ষ্য করল বুড়ো মানুষটার চোখের দিকে তাকিয়ে। নিজের ঘরে এসে জানালার ধারে মাদুরটা বিছিয়ে শুয়ে পড়ল ও। কিন্তু মন! তখন ভাবছে বুড়ো লোকটার ব্যথিত দৃষ্টি। আস্তে আস্তে মালিশও বন্ধ হয়ে গেল। আর তারপর থেকে সুবর্ণা নিজের মনকে স্থির দিল। জোর করে যেন ভাবতে শিখল ও। ঐ বুড়ো মানুষটার কথা। একটু আলাদা করে। মনকে বোঝাল।

নিস্তব্ধ রাত্রির মত মানুষটা একদিন সত্যিই আরও নিস্তব্ধ হয়ে যাবে। সেদিন! সেদিন কি করবে সুবর্ণা! কাতর দৃষ্টিতে মানুষটা যখন ওর দিকে তাকাবে। কিন্তু সুবর্ণা! সুবর্ণা পারবে না। সেদিন কাতর দৃষ্টির সামনে আজকের সুবর্ণা কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না। হ্যাঁ, এই কাতর দিকে তাকিয়ে থাকবে অনেক যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে ওর সামনে সেই জীবন্ত রূপকে কিছুতেই রুখতে পারবে না ও।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ভেবেছে সুবর্ণা। ওর জীবন্ত রূপের কথা। দেখেছে সেই চোখের অন্তরালে। সাদা চোখের ওপর ভেসে উঠেছে ওর দেহটার আবছা প্রতিচ্ছবি। শুধু সুবর্ণা কেন? চিন্ময়ও। ও যখন সুবর্ণার চোখের ওপর চোখ রেখে তাকায় মনে হয় কি যেন ভাবছে, কি যেন একটা কামনা করছে ওর কাছে। একটা কিছুর আকাঙ্ক্ষায় উদগ্রীব হয়ে উঠছে।

আজকাল অফিস ছুটির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফিরে আসে চিন্ময়। আরও অবাক লাগে সুবর্ণার, যখন ও নিজে থেকেই খুঁটিনাটি কাজে সাহায্য করে ওকে। সন্ধ্যেবেলা সুবর্ণার বদলে চিন্ময় নিজেই ওর বাবার কাছে বসে। বই পড়ে শোনায়। বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তখন ওই বৃদ্ধ পঙ্গু মানুষটাও বুঝতে পারে, সুবর্ণার অলস দৃষ্টির সামনে কি আছে। ইশারায় বোঝায় ওকে। হ্যাঁ, চিন্ময়কে আজ সত্যি সত্যিই দায়িত্বের বোঝা বহন করতে হবে খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে। যেমন তিনি করেছিলেন, তাঁর সন্তানের জন্যে। তারপর দু গালের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে বুড়ো মানুষটার। লক্ষ্য করে সুবর্ণা-চিন্ময় দুজনেই।

তারপর সুবর্ণাকে লক্ষ্য করে একটু ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরে বলেছে চিন্ময়। "বাবা বোধ হয় আর বাঁচবেন না সুবর্ণা।"

'কেন?' খুব বড় বড় চোখ মেলে তাকাল সুবর্ণা।

"তা জানি না। কিন্তু মনে হল......"

আরও একটু সরে এল সুবর্ণা। তারপর ওর চুলগুলোয় হাত বুলোতে বুলোতে বলল, "তুমি মিথ্যে ভয় করছ। না, না, ওসব ভেব না। আমাকে দেখে ত বেশ খুশী হলেন মনে হল।"

"কিন্তু তোমাকে ত এবার তোমার মার কাছে চলে যেতে হবে। তাই ভাবছি তখন......" খুব জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগল চিন্ময়। সুবর্ণাকেও যেন একটু চিন্তিত মনে হল।

"আমি চলে গেলে... বাবাকে কে দেখবে?" ব্যস্ত হয়ে প্রশ্ন করল সুবর্ণা। যেন এই প্রশ্নটা আগে কোনদিন ভাবেনি ও।

"বাবাকে খাওয়ানো, রোদ্দুর এলে বালিশ কাঁথা শুকোতে দেওয়া, বই পড়ে শোনানো। এ সব কে করবে?"

"আমিও তো তাই ভাবছি। অথচ তোমাকে ত পাঠিয়ে দিতেই হবে।"

এবার আর কোন জবাব দিল না সুবর্ণা। চুপ করেই রইল। শুধু সেদিন না, রোজই ভাবতে লাগলো। কিন্তু কোনও হদিশ পেল না। একটু একটু করে সব হারিয়ে ফেলেছে সুবর্ণা। দুপুরে যখন রোজ শ্বশুরের বালিশ কাঁথা রোদ্দুরে দিয়ে, ও নিজে মাদুর বিছিয়ে জানালার ধারে পা মেলে শোয়, তখন যেন সব কেড়ে নিয়ে যায় ঐ পেয়ারা ডালের ওপর বসা প্রজাপতিটা। ওর কঠিন প্রশ্নগুলো তখন আপনি নিজে থেকে মন থেকে।

প্রজাপতিটার ডানার রংটার সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে ভাবতে থাকে একটা জীবন্ত রং-এর সঙ্গে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ে ও। আজকাল কি নিঃসাড়ে ঘুমোতে পারে সুবর্ণা। আর চিন্ময় ওর আড়ালে অনেক রাত্রির পর্যন্ত জেগে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওকে আরও কাছে টেনে নেয় চিন্ময়। আর শুনতে পায় ঘুমের ঘোরে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বকছে।

আজকাল আশ্চর্য লাগে সুবর্ণার নিঃসাড়ে ঘুম দেখে। এমনি রোজই লক্ষ্য করে চিন্ময়।

হঠাৎ একদিন ঘুমটা ভেঙে গেল ওর। লক্ষ্য করল ঘুমন্ত সুবর্ণা ওকে আঁকড়িয়ে ধরে রয়েছে। আর পাশের ঘরে বুড়ো বাবার কাশির শব্দে ক্রমশ যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে সমস্ত ঘরখানা।

নিস্তব্ধ অন্ধকারে সুবর্ণার আকর্ষণ আর বাবার ঊর্ধ্বশ্বাসে কাশির ঘড় ঘড় শব্দে ভয়ে শিউরে উঠল ও। সুবর্ণাকে ডাকতে গিয়ে গলার স্বর বেরুল না। ঠিক তেমনিভাবে শুয়ে থাকল। তারপর অনেকক্ষণ পর হঠাৎ কাশির শব্দটা এক মুহূর্তে থেমে গেল। গলার ঘড় ঘড় শব্দটাও। অদ্ভুত নিস্তব্ধতায় ভরে গেল ঘরখানা। চোখ মেলে বাইরে তাকাতে, চোখে পড়ল শুধু জোনাকির আলো আর কানে এল কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ। খুব ভয়ার্ত কণ্ঠে সুবর্ণাকে ডাকতে লাগলো ও।

"সুবর্ণা......সুবর্ণা......সুবর্ণা......!"

"কি?" একটু চমকে উঠেছিল সুবর্ণা চিন্ময়ের ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে।

"বাবা", গলার স্বর সরল না চিন্ময়ের।

"কি হয়েছে......?" ভাঙগা ভাঙগা গলায় প্রশ্ন করল সুবর্ণা।

"হঠাৎ কাশতে কাশতে......আর তো কোন সাড়া পাচ্ছি না।"

উঠে বসল সুবর্ণা। "আলোটা জ্বাল তো, হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন।"

আর কোন জবাব দিল না চিন্ময়। আলো জ্বেলে সুবর্ণার পাশাপাশি দাঁড়াল ও। সমস্ত শরীরটা যেন তখনও কাঁপছিল।

আশা আর হতাশা জড়ানো দৃষ্টিতে খুব আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আলো জ্বালাতেই একমুহূর্তে নিস্তব্ধ-নিথর হয়ে গেল ওরা দুজনেই।

বুড়ো মানুষটার দেহটা তখন চৌকির এক পাশে আর শিরাগুলো ফুলে ফুলে নীল হয়ে উঠেছে। অসহ্য বেদনায় মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

চিন্ময় আর সুবর্ণা বাকশূন্য হয়ে দুজনে দুজনের দিকে তাকাল। তারপর ঠিক তেমনি নিস্তব্ধতার মধ্যেই বুড়ো মানুষটার মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিল সুবর্ণা।

মনে হল, এই বুড়ো মানুষটার মৃত্যু যেন সুবর্ণাকে ইশারা করছে। আরও সজাগ করে তুলতে চাইছে ওর মধ্যে আশ্রিত একটা জীবন্ত সম্পদকে।

॥ ৮ ॥

৬ই নভেম্বর ১৯৫৪ (রংপুর জেল)— আজও সুপারিনটেনডেনটকে কতগুলি পয়েণ্ট দিলাম—হাসপাতালে যেসব কারণে প্রধানত গোলমাল হয় সেই সম্বন্ধে। (যেমন loud counting, "squad attention," violent stroking of the grated door and windows, periodical searches, terrible shoutings at change of duty !)

কয়েদীদের প্রহার করা সম্বন্ধেও বলিলাম। Cell-এ যে কয়েদীটি মারা গিয়াছে, তাহার বিষয়ও উল্লেখ করিলাম। বলিলাম, এই বিষয়ে এনকোয়েরি করিতে বিলম্ব হইলে এনকোয়েরির উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইতে পারে।.........

বৈকালে জেলর সাহেবের সংগে দেখা হইলে নমস্কার অভিবাদনাদি হইল। আলাপ হইল—অনেক দিন পরে।.........

জেলর সাহেব বলিলেন, তাঁর বাসায় trouble লাগিয়াই আছে—স্ত্রীর খুব অসুখ চলিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কেমন চলিতেছে। ফুয়েল ইত্যাদির কথা হইল। বলিলেন, "প্রয়োজন হইলে আরও দিতে পারি। আপনাদের relationship humanitarian ইত্যাদি.....আমরা mean নই!" (অর্থাৎ কয়েদীদের উক্তি 'জেলর সাহেব চিৎকার করিতে বলায় চিৎকার করিয়া জমা দিই'—তারই disclaimer।) অনেক কথা হইল। জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার অন্য কোনও কথা আছে কি না। বলিলাম, "সবই ত লিখিয়াছি।" আমার চাই medicinal শাকপাতা। বলিলেন সেজন্য সুপারিনটেনডেনট-এর সংগে আলাপ করা যাবে।.........সবজি ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা হইল।

কয়েক দিন হইতে ভাবিতেছিলাম সর্বোদয়ে জেলর সাহেবের সংগে relation কি হওয়া উচিত। সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে অফিশিয়াল সম্পর্ক যা-ই হউক, সামাজিকতা রক্ষা করা উচিত। হঠাৎ সেটা হইয়া গেল। জেলর সাহেব চলিয়া গেলে মনে হইতে লাগিল যে, সুপারিনটেনডেনট-এর কাছে লিখিতে-বলিতে যে-লাইনটা, যে-সম্পর্কটা তৈরী হইয়াছে সেটা নষ্ট না হয়। সুপার-এর কাছে গিয়া চক্ষু-লজ্জা ইত্যাদি উপস্থিত হইবে না তো? Social relations পুরাপুরি রক্ষা করিয়া official লাইনটা বজায় রাখা সম্ভব, না দুটোতে একাকার হইয়া official-টাও অসম্ভব হইবে? কয়েদীদের মারধর করা, Cell-এর মৃত্যুটা, আমার ন্যায্য দাবীগুলোর উপর অন্যায়, vindictive হস্তক্ষেপ—ইহার কি settlement হইবে? সন্তোষ-জনকভাবে যদি হয় ভাল।

১৩ই নভেম্বর ১৯৫৪ (রংপুর জেল)— আজ অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারী (হোম)-এর কাছে সাত পৃষ্ঠার এক রিপ্রেজেণ্টেশন দিলাম—২৫শে অক্টোবর সুপার-এর সংগে আলাপের পরে জেলর সাহেব যে-সব 'স্টেপ' লইয়াছেন সেই সম্বন্ধে। সুপারকে একটা নোট দিলাম—অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথা বলিয়া যে "যদি কোনও মিস স্টেটমেণ্ট থাকে পয়েণ্ট আউট করিতে, যদি কনভিনসড হই রিভাইজ করিব।"

W. Coat-এর মাপ নিল।

সুপার-এর সংগে শেষ যেদিন কথা হয়, সেদিন বৈকালে Warder এবং Watcher-দের মধ্যে বেশ আনন্দ দেখা গেল। পরদিন হইতে আমার যে-সব পাওনা সে-সব দিকে এদের খুব তৎপরতা দেখা গেল। Additional Cup, বাঁশের case, additional কলসী (রান্নার) with wire case, দুইটা নূতন মগ, পায়খানার মগ (খুব ভাল, বড়, নূতন তৈরী), additional blanket for window, etc। খুব উৎসাহের সংগে এই সব যোগাড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এই কয়দিন পর্যন্ত Head Warder প্রত্যহ সকালে আসিয়া একাধিকবার খোঁজ করিতেছে তার কিছু করণীয় আছে কি না। সুপার এবং ডেপুটি জেলারের মধ্যে আলাপের পর ডেপুটি জেলর কাল বৈকালের পূর্বে আর আসেন নাই। সংবাদপত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে খুব উৎসাহ দেখিতেছি।

আজ "সংবাদে" দেখিলাম গবর্নর-জেনারেলের reception লইয়া United Front-এর মধ্যে meeting-এ হাতাহাতি হইয়া গিয়াছে। দুইটি কমিটি হইয়াছে—একটা ফজলুল হককে প্রেসিডেণ্ট করিয়া, আর একটা আতাউর রহমানকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া। কাল গবর্নর-জেনারেল ঢাকা আসিতেছেন। জোর গুজব যে, sec. 92A Withdrawn হইবে, Parliamentary Government restored হইবে। (ইসকান্দার মির্জা করাচীতে বলিয়াছেন Sec. 92A Withdraw করা হইবে না।)

আজ সংবাদে কলসকাঠির একটা রিপোর্টে দেখিলাম যে, হাসেম তালুকদারের সভাপতিত্বে কলসকাঠি এইচ ই স্কুলে পল্লী উন্নয়নের একটা সভা হইয়াছে। তাতে রঞ্জনবাবু (সম্পাদক) ও বিনোদ বক্তৃতা দিয়াছে। সামনের বারে যাতে ভালভাবে উন্নয়নের কাজ হয়, সেদিকে জোর দিবার জন্য সকলের মধ্যে একটা উৎসাহ জন্মিয়াছে।

১৫ই নভেম্বর ১৯৫৪ (রংপুর জেল)— সুপার-এর সংগে কথা হইল। তাঁর কথায় বুঝিলাম increased (quantity of) vegetables দেবার জন্য তিনি নির্দেশ

দিয়াছেন। যখন শুনিলেন পাই নাই, তখন বলিলেন, "আচ্ছা, অফিসে গিয়া দেখি।" কাল C. H. W. যে পালং শাক দেবার কথা বলিয়াছিল এ বোধ হয় তাই। জেলর সাহেব হয়তো সুপারের নির্দেশ বিকৃত করিয়া তাহার ওইরূপ চেহারা করিয়াছে। সুপার বলিলেন, Trunk Call-এ I. G-কে Contact করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই—was not available—বোধ হয় Burma। তবে Express Letter দিয়াছেন। Dr. B. K. Maitra-কে Contact করিবেন—medical test ইত্যাদির জন্য।

আজ G. G. ঢাকা আসিবেন। Reception লইয়া United Front-এ Division হইয়াছে। দুই দলের প্রেসিডেণ্ট যথাক্রমে M. Huq এবং A. Rahaman। সুরাবর্দী ও ভাসানি সাহেব তো আসিতেছেন না। আতাউর রহমান কি নির্দেশ লইয়া আসিয়াছেন কে জানে। সুরাবর্দীর Statement-এ দেখা যায় Europe-এ খুব propaganda হইয়াছে যে, পাকিস্তানে democracy ভাঙিয়া পড়িয়াছে। পরিণাম কি হবে কে জানে। United Front-এর leading men সব তো বেশ released হইতেছে।

১৮ই নভেম্বর ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—G. G. এবং ইসকান্দার মির্জা তো ঢাকা আসিলেন। ইসকান্দার মির্জার দুইটা প্রেস ইণ্টারভিউ পড়িলাম—একটা ঢাকায় আর একটা বোধ হয় লাহোরে—খুব straightforward, determined, decided, brutally frank—Section 92A সম্বন্ধে, opposition সম্বন্ধে, limited democracy, M. Bhasani সম্বন্ধে, W. Pakistan Unit, Unitary form of Government ইত্যাদি সম্বন্ধে। (এই সবের কোনওটা সম্পর্কে G. G. কোনও আভাস দেন নাই, অথচ ইসকান্দার মির্জা outspokenly বলিতেছেন।) আবার হিন্দুস্থানের সঙ্গে best relation, পাকিস্তান-হিন্দুস্থান-আফগানিস্তানের মধ্যে best relation-ই best defence ইত্যাদি (Bengal-এ আসিয়া ভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানের সঙ্গে best relation সম্বন্ধে বেশ statement করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, I am one of those, who believe in best relations between Pakistan and India, etc.) কাল G. G-র ঢাকা আসার পথে লক্ষ্ণৌয় পণ্ডিত নেহরুকে একটি message পাঠাইবার মধ্যে পণ্ডিতজীর প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন এবং দুইটা State-এর মধ্যে সব problem Ultimately peacefully solved হবে এই জোর বিশ্বাস প্রকাশ করিলেন।

দেশে একটা যেন crisis ঘনাইয়া আসিতেছে—Democracy is in danger মনে হয়। Fascist, Communist, military, Nationalist Dictatorship-এর দিক হইতে। Democracy-ও in danger, আমার যে line, non-violence ও Truth-ও in danger।

অথচ এ-line আমি ছাড়িতে পারি না—ব্যক্তির জন্য, জাতির জন্য, জগতের জন্য এই অহিংসার আদর্শ, সর্বোদয়ের আদর্শ একান্ত প্রয়োজন।
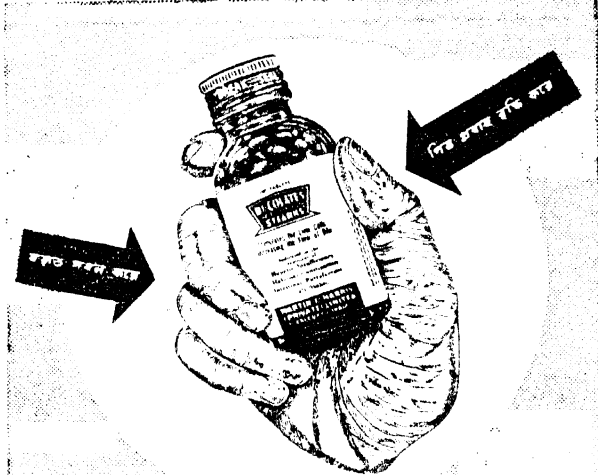
পরিপূর্ণ সকল বিশ্বপ্রেম ভিন্ন সর্বোদয় অসম্ভব। সত্য ও অহিংসার পক্ষে—সর্বোদয়ের পক্ষে এই বিশ্বপ্রেম অপরিহার্য। এই বিশ্বপ্রেম ব্যতীত সর্বোদয়, অহিংসা অসম্ভব। কেমন করিয়া বিশ্বপ্রেম হয়? ভগবানে—সত্যে—প্রেম হইতে?

এই যে জেলে আমি কতগুলো বিষয় লইয়া officer-দের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদি চালাইতেছি, এর ভিতরে J. S. এবং তার সমর্থনে যারা কুৎসিত কাজ করিতেছে, তাদের কি ভালবাসিতে পারিতেছি—J. S-কে কি ভালবাসিতে পারিতেছি? যদি প্রতিপক্ষকে ভালবাসা না যায় তাহা হইলে তো অহিংসা হইল না, সর্বোদয় হইল না।

২২শে নভেম্বর ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—কাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর কাছে representation দিলাম—in continuation—(১) Khata, (২) arranging for Sun's rays in Hospital, (৩) Fish। D. J.-র সঙ্গে কথা হইল। Head Warder, Warder এবং Convict-রা সবাই অস্বীকার করিয়াছে—সেদিনকার রাতের গোলমাল এরা অপরের প্রেরণায় করিয়াছে বলিয়া যে বলিয়াছিল—বলে নাই বলিতেছে। কী ভীষণ মিথ্যাবাদী এরা।

কোনও জেলে আমি এ-পর্যন্ত officer এবং Warder-দের একযোগে এইভাবে grossly মিথ্যাচরণ করিতে দেখি নাই।

Head Warder এদের পাক্কা agent। লোকটা খুব violent, মুখও খুব খারাপ। এইরূপ সাংঘাতিক মিথ্যায় সময়ে মন খুব খারাপ হয়—unbalanced হই। কিছুই প্রমাণ হয় না। Officer-রাও Seriously enquiry করে না। সত্য জানিতে, বুঝিতে চায় না। সত্য বোঝে; স্বীকার করার moral Courage নাই। তবে violence বন্ধ হইয়াছে। কয়েদীদের খাবার খুব ভাল হইতেছে—কম্বল ইত্যাদিও পাইতেছে। এরা যে violence করিয়াছে তা প্রমাণ হয় নাই, কিন্তু যে enquiry হইল তাহাতে এরা ভীত হইয়াছে এবং violence বন্ধ হইয়াছে। এটা আমার পক্ষে খুব তৃপ্তির। কিন্তু এই নির্লজ্জ মিথ্যা—Officer-দেরও এতে যোগ দেওয়া—এতে এত ঘৃণা, রাগ হয় সময় সময় unbalancedও হই। কাল সেই ৪টি কয়েদীর দুজনার সঙ্গে দেখা—যে সবচেয়ে offensive ছিল, দেখামাত্র লম্বা সালাম।

J. S.-এর সঙ্গে কাল দেখা। সুবিধা অসুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক enquiry করিল। অসুবিধা কিছু থাকিলে তাহাকে জানাইতে বলিল। Superintendent, as M.O., সব কিছু solve করিতে পারে এটা আমাকে বলিতে বলিল। আমি বলিলাম, আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতার অভাবে ইনি proceed করিতে পারিতেছেন না। আজ পেটটা ভাল না থাকায় mental balance-ও ঠিক ছিল না।

২৩শে নভেম্বর ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—শরীর ভাল না থাকায়ও বটে এবং অন্যান্য কারণে কাল balance disturbed ছিল। আজ সকালে সহজ 'জবাব' পাইলাম।

দেখিলাম অপরকে ভাল করিতে গেলেও নিজেকে ভাল করা, আরও ভাল হওয়া, একটা বড় পথ। সপ্রেম আচরণ দ্বারা—অসত্যকে সত্য দ্বারা, নিজের প্রেমপূর্ণ সত্য আচরণ দ্বারা—ভাল করা একটা বড় পথ। Self-conquest leads to conquest of outside world। বীরের রক্তে জমি উর্বরা হয়—এর মধ্যেও এই সত্য নিহিত আছে।

কয়েদীদের suffering দেখি অসংখ্য, Officer-দেরও দেখি, Warder-দেরও দেখি। অনেকদিন ইহা চলিবে—যে-পর্যন্ত এদের মধ্যে বোধ না আসিবে, সোজা হইয়া দাঁড়াইতে না পারিবে, নিজেদের ব্যথার কথা, বেদনার কথা সবলে একক বা দলবদ্ধ ভাবে বলিতে না পারিবে এবং বলিতে গেলে যে দুঃখ-কষ্ট আসিবে তা বরণ করিতে না পারিবে—সে-পর্যন্ত solution নাই। যখন পারিবে তখন আলোর প্রকাশে অন্ধকার যেমন দূর হয়, তেমনি সব ব্যথা দূর হবে।

রাগ-দ্বেষ নয়। আরও ভাল হওয়া—এই-ই মন্দের জবাব, প্রতিকার। এই অবস্থা, এই নীচতা, অসত্যাচরণ, এই violence ইত্যাদি—এর সামনে একটি উজ্জ্বল নিখুঁত দৃষ্টান্ত স্থাপন করো, সত্য শিব সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করো নিজের জীবনে।

(ক্রমশ)

ব্যক্তিমানসের প্রতিফলন

ছোটদের গল্প

আমার ভালুক শিকার—শিবরাম চক্রবর্তী। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ২.৫০ নয়া পয়সা।

ছোটদের জন্যে লেখা বারোটি বিভিন্ন ধরনের হাসির গল্পের এই সংকলন গ্রন্থটি শিকার কাহিনী হিসেবে প্রথমতো ইঙ্গিত দিলেও আসলে কতকগুলি সরস [illegible] কাহিনী। আর শিবরামবাবুর সমস্ত গল্পেই যা হয়ে থাকে, গল্পের চেয়ে গল্পের বাচনভঙ্গিমা ও চিত্রধর্ম প্রধান হয়ে ওঠে, প্রতিটি শব্দের বিচিত্র রহস্যে টানটান করে বাঁধা থাকে কাহিনীর জটিল কৌতুক সংগতি; আলোচ্য গল্পগুলিতেও তার ব্যতিক্রম নেই। [illegible], একটি অদ্ভুত পরিবেশ এবং চরিত্র সৃজনে লেখকের কৃতিত্ব তার, ভাষা প্রয়োগেও তিনি একটি অননুকরণীয় স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক। বয়সের দিক থেকে তিনি ছোটদের প্রিয় লেখক, [illegible] কৌতুকের ক্ষেত্রে। কিন্তু [illegible] শিবরামবাবুর এই লেখাগুলি থেকে রস পাবেন সকলেই। [illegible] মাঝে মাঝে তিনি যেমন আমাদের বিস্মিত করে দেন, [illegible] কৌশলে [illegible] পরিণতি [illegible] হয়ে দাঁড়ায়।

আমার ভালুক শিকার, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible] কাহিনী, [illegible] গল্পগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গল্পগুলি শ্রীযুক্ত শৈল চক্রবর্তী কর্তৃক সুচিত্রিত।

৬।১।৫৮

কবিতা

অনামী—শ্রীদিলীপকুমার রায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩-১-১ কর্ণ-ওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

অনামী—এই নামটি দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রায় পঁচিশ বছর আগে যখন এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এটি দ্বিতীয় সংস্করণ,—পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত। এই পঁচিশ বৎসর কেটে গেছে অপরাপর নানাবিধ রচনায়। দিলীপকুমার বলছেন—"জীবনের সায়াহ্নে মনে হল—অনামীর দ্বিতীয় সংস্করণে আমার শ্রেষ্ঠ কবিতার একটি চয়নিকা প্রকাশ করে রেখে যাই তাঁদের জন্য যাঁরা ভাগবতী কবিতায় রস পান।" বলা বাহুল্য এ বই সবাইকার জন্য নয়। দিলীপকুমার ভক্তির অর্ঘ বহন করে এসেছেন ভক্তদেরই জন্য—তবু মন্দিরের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত—রসিক, সাধক সকলেই এই গ্রন্থ পাঠে পরিতৃপ্ত হবেন, শান্তিরসে তাঁদের অন্তর স্নিগ্ধ হয়ে যাবে।

গ্রন্থটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত—মণিমঞ্জুষা, কবিতা-কুঞ্জ, গীতগুঞ্জন, মীরাভজন, পরিশিষ্ট—পত্রাবলী। মণিমঞ্জুষায় ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, এমার্সন, ইয়েট্‌স্ প্রভৃতি নানা কবির কবিতা থেকে অনুবাদ সংকলিত হয়েছে। কবিতাকুঞ্জে দিলীপকুমার তাঁর নির্বাচিত কবিতার গ্রন্থন করেছেন। গীতগুঞ্জনে রয়েছে তাঁর নানান গান। পরিশিষ্টে রয়েছে বহু মূল্যবান পত্র যেগুলি লিখেছেন—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মোহিতলাল, সুভাষচন্দ্র, গোপীনাথ

কবিরাজ, নলিনীকান্ত গুপ্ত, ক্ষিতীশচন্দ্র সেন, কালীপদ গুহরায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জর্জ রাসেল, লোয়েস ডিকিন্সন, সমরসেট মম, জয়েস চ্যাডউইক, সঞ্জীব রাও, শাহেদ, দুরইস্বামী, কৃষ্ণপ্রেম, পল ডিউকস্ ও শ্রীঅরবিন্দ।

বাংলা সাহিত্যে দিলীপকুমার একটি বিশিষ্ট পথ বেছে নিয়েছেন। বুদ্ধি এবং চিন্তার জগতে যে সব প্রশ্ন তিনি তুলেছেন বা আলোচনার সূত্রপাত করেছেন তার দায়িত্ব তিনি একাই বহন করেছেন। তারই অনন্যসাধারণতায় এই গ্রন্থটি সমুজ্জ্বল। বর্তমানে তিনি যে লোকে প্রবেশ করেছেন বুদ্ধি এবং চিন্তা দিয়ে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর কবিতা এবং গানে সেই অলৌকিক অনুভূতির চমকপ্রদ স্পর্শে বার বার অন্তরমন পুলকিত হয়ে ওঠে। ৫৪৯।৫৮

অনুবাদ

মেঘদূত—অনুবাদক: শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক বি এল। প্রকাশক তারাপদ রায়, ২২।১সি, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬। ২·২৫ নঃ পঃ।

কালিদাসের মেঘদূতের অনুবাদ বাংলা ভাষায় অনেকগুলি বেরিয়েছে আজ পর্যন্ত, গদ্য এবং পদ্য উভয়বিধই। অল্পকাল পূর্বের আধুনিক অনুবাদক হিসাবে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর নাম স্বভাবতই মনে আসে। কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ ভৌমিক শুধু যে বর্তমান সর্বশেষ অনুবাদক তাই নয়, তিনিই প্রথম ছড়ার ছন্দে মেঘদূতের আদ্যন্ত অনুবাদ করলেন। ধ্বনিপ্রবাহ, ছন্দ কাব্যের বাঙ্ময় চরিত্রমূর্তি, বিষয় এবং ভাবের লঘুগুরুত্ব অনুসারেই কবি তাঁর উপকরণ শব্দ এবং ছন্দ নির্মাণ এবং প্রয়োগ করে থাকেন। সুতরাং ছন্দের রূপান্তরে, অসমগোত্রীয় শব্দের প্রয়োগে কাব্যের চরিত্র নষ্ট হবার আশঙ্কা অমূলক নয়। মন্দাক্রান্তা ছন্দের বিচিত্র ধ্বনি-উল্লাস, উদাত্ত-প্লুত স্বরের পতন অভ্যুদয় মেঘদূতকে যে সংগীতবহতা দিয়েছে, কোনপ্রকার বাংলা ছন্দই যে তার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে না তা সত্য, কিন্তু তা বলে ছড়ার ছন্দ ব্যবহার মেঘদূতের বাঙ্গীকরণ ছাড়া আর কি। অর্থ প্রবাহের যাথার্থ্য রক্ষা করতে অবশ্য বিশেষভাবেই সক্ষম হয়েছেন লেখক। ছাপা নিতান্ত অরুচিকর। ৫৯২।৫৮

কবি জীবনী

মহাকবি রঙ্গলাল—শিবলাল বন্দোপাধ্যায়। প্রকাশক: শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২নং রামকমল স্ট্রীট, কলিকাতা-২৩। পাঁচ টাকা।

সাহিত্যের বিচারে রঙ্গলাল অন্ততঃ মহাকবি নন, কাব্যকৃতিত্বের কথা ছেড়ে দিলেও আঙ্গিকের দিক থেকে বিচার করলেও দেখা যায় তিনি কোন মহাকাব্য রচনা করেননি। যে পদ্মিনী উপাখ্যানের জন্য তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ, সেটি আসলে একটি আখ্যায়িকা কাব্য মাত্র। গ্রন্থের নামকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা একথা বললাম। এবার গ্রন্থের বিষয়বস্তু লক্ষ্য করা যাক। প্রথম ছটি পরিচ্ছেদে অর্থাৎ প্রথম তিরাশি পৃষ্ঠা কবির জীবনী অংশ। তারপর কিছু রচনা নিদর্শন ছাপা হয়েছে। এবং আমাদের মনে হয় রঙ্গলাল সম্বন্ধে এগ্রন্থে এই পর্যন্তই। অতঃপর প্রায় একশ দশ পৃষ্ঠা জুড়ে খিদিরপুরের বিবিধ বিবরণ। খিদিরপুরের ভূগোল এবং ইতিহাস একত্রে। পথঘাটের বিবরণ, দ্রষ্টব্য বিষয়, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পরিচয়, আঞ্চলিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সবই আছে। অধৈর্য পাঠক বলতে পারেন, 'মহাকবি রঙ্গলাল' গ্রন্থে খিদিরপুরের অনধিকার প্রবেশ কেন এবং তার একাধিপত্য ঘটবার কারণই বা কি। এর জবাবে তাঁকে জানাতে হবে যে খিদিরপুর তো নিছক একটি নগরতলী মাত্র নয়, এ যে কবির মাতৃভূমিসূত্রে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং কবিকে বুঝতে হলে, জানতে হলে খিদিরপুরকে সম্যকরূপে বুঝতে হবে বৈকি! এছাড়া আছে রঙ্গলালকৃত সংগীতের শিবলাল-বাবু প্রণীত স্বরলিপি এবং শিবলালবাবুর ফোটো। ৫৮৯।৫৮

কবি সুকান্ত—অশোক ভট্টাচার্য। সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দাম ২·৫০ নয়া পয়সা।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা, ভেবে দেখলে অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, তাঁর ক্ষণজীবী জীবনের সঙ্গেই একান্তভাবে জড়িত, স্বতন্ত্র করে কিছু নয়। কোন কবিরই রচনা তাঁর জীবনের সঙ্গে অসম্বন্ধ কোন মানসিক ঘটনা মাত্র নয়, জীবনচৈতন্যের অনাত্ম বিচ্ছুরণ বিশেষ। কিন্তু সুকান্তের ক্ষেত্রে জীবন ও কাব্যের সম্পর্ক ছিল অনিবার্যভাবে নিবিড় এবং তীব্র। ছেলেবেলা থেকে অকালমৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত জীবনপরিধি স্পর্শ করে তাঁর এই আলেখ্য রচনা করেছেন অশোক ভট্টাচার্য। এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সুকান্তের জীবন একদিক থেকে অসম্পূর্ণ জীবন, সমগ্র চরিত্রের উপাদান জীবনের প্রথম পর্যায়কালের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। তবু সেই অসম্পূর্ণ জীবনের ঘটনা-তথ্যগুলিকেই গুছিয়ে বৃত্তাকারে ধরে দিতে চেষ্টা করেছেন আলোচ্য গ্রন্থের লেখক। কিন্তু পুরোপুরি সক্ষম হননি। অতি অল্প পরিসরের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে সুকান্তকে হারিয়ে ফেলেছেন বিলক্ষণ নচেৎ, গোটা চরিত্রটা উঠে দাঁড়াতে পারেনি জীবন্ত হয়ে। এবং কবি সুকান্ত রাজনৈতিক কর্মী সুকান্তের কাছে যেন কিছু পরিমাণে খর্বিতই হয়েছেন। কবির বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি ছবি এই গ্রন্থটিকে মূল্যবান করে তুলেছে। ৫৪৮।৫৮

'ডাকিনীর চর' সম্পর্কে

'ডাকিনীর চর' বইটি সম্পর্কে পাঠক সাধারণকে একটা কথা জানান প্রয়োজন মনে করি। আমার একটি ছবির চিত্রনাট্য থেকে অন্য একজন লেখক বইটির উপন্যাসরূপ দিয়েছেন। প্রকাশক বইটির কোথাও সে কথা উল্লেখ না করায় বাধ্য হয়ে আমায় এ বিজ্ঞপ্তি দিতে হল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

গল্পের মত গল্প—শ্রীঅশোককুমার ভঞ্জচৌধুরী।

The Mother of the golden all
Chinmoy.

কথিকাসহ সারদা রামকৃষ্ণ লীলাগীতি—স্বামী চণ্ডিকানন্দ।

॥ রঞ্জন ॥

ই এম ফর্স্টারের আশী বৎসর পূর্ণ হোলো গত পহেলা জানুয়ারি। এই মৃদুভাষী লেখকটির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অতিনিবিড়। তিনি এদেশে এসেছিলেন অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে এবং তাঁর সব চেয়ে বিখ্যাত উপন্যাসের নাম "এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া"। তার পরেও তিনি ভারতে এসেছেন এবং কয়েকটি ভারত সম্পর্কিত প্রবন্ধ ছাড়া আরো আছে "দি হিল অব দেবী।" তারও বিষয়বস্তু ভারত ও ভারতীয়, অবশ্যই বৃটিশ ভারত। এ অঞ্চলে তাঁর খ্যাতি পুরোপুরি সাহিত্যিক নয়। অতিরঞ্জন উপেক্ষা করে অনেকে বলেন, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান এগিয়ে আনার জন্য যে যে বস্তু দায়ী তার মধ্যে ফর্স্টারের উপন্যাসের স্থান উর্ধে হওয়া উচিত। বলা হয়, এই বই পড়েই তরুণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদে আস্থা হারায় আর সাম্রাজ্যবাদীর সেই অবসাদই [illegible] অবসানের [illegible] ফর্স্টারের ভারতীয় খ্যাতি [illegible] রাজনৈতিক, যেমন কিপলিঙের ভারতীয় [illegible] সাহিত্য-বিচ্ছিন্ন [illegible] রাজনৈতিক।

গত জন্মদিনে ফর্স্টার ভারত থেকে যে স্বীকৃতি পেয়েছেন তার রাজনৈতিক ধার তাঁকে খুশী করেছে কিনা জানিনে। [illegible] আমরা [illegible] মাই-ক্রোস্কোপের তলায় বিশ্লেষণ করি, প্রশংসা [illegible] ফর্স্টার [illegible] নন। তিনি হয়তো তাঁর জন্মদিনে [illegible] দেখেননি [illegible] বন্ধুর [illegible] তাঁর [illegible] জীবন দর্শনের সঙ্গে [illegible] অধিকতর সুসঙ্গত।

*

আসলে ফর্স্টার [illegible] তাই [illegible] নন যাঁদের আমি নাম দিয়েছি পেশাদার ভারত-প্রেমিক। নামকরণ নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু অধুনা প্রকাশিত নেহরুর পুরোনো পত্রগুচ্ছে এডওয়ার্ড টমসনের লেখা একটি চিঠি যাঁরা পড়েছেন তাঁদের কাছে এই গোষ্ঠীর বিশদ বিবরণ অনাবশ্যক। ফর্স্টারের দৃষ্টি স্নেহান্ধ নয়, তিনি আমাদের আধ্যাত্মিকতায় অবিশ্বাসী, আমাদের যাবতীয় জাতীয় ত্রুটি তাঁর চোখ এড়ায়নি কখনোই, তিনি জাতীয়তাবাদের উগ্রতার বিরোধী, তিনি তাঁর নিজের দেশকে ভালোবাসেন যদিও বৃটিশ চরিত্রের অনেক দিক তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য।
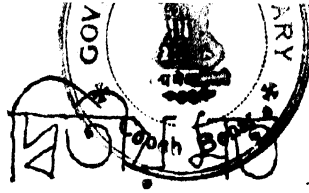
বস্তুত দেশ বা জাতি নামক অ্যাবস্ট্রাকশন-গুলিই তিনি অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখতে অভ্যস্ত। তিনি মানবপ্রেমিক বলেই ভারত প্রেমিক, এমন কি মানবতা প্রেমিকও নন তিনি। মানবতা, সে যে গালভরা বড়ো কথা। তাঁর হৃদয়ে অপরিসীম ভালোবাসার দাবি তিনি করেন না। সবাইকে ভালো-বাসব, এত ভালোবাসা কোথায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ে? আমি ভালোবাসতে পারি শুধু আমার জনকয় বন্ধুকে। আমি অল্প লইয়া থাকি, আমার ভীরু বাসনার অঞ্জলিতে যতটুকু পাই রয় উচ্ছলিতে।

এমন লোকের পক্ষে রাজনৈতিক কারণে জনপ্রিয়তা লাভ একান্তই আকস্মিক ও

অপ্রত্যাশিত, বোধ হয় প্রাপকের অনভি-প্রেতও। তবু এ জনপ্রিয়তা অতি সত্য এবং ফর্স্টারের আদরে ও কিপলিঙের অনাদরের মধ্যে ব্যক্ত আছে আমাদের দ্বিবিধ দুর্বলতা। এক, আত্মপ্রশংসাপ্রাপ্তিতে বিচারশক্তির বিসর্জন। দুই, রাজনৈতিক অভিরুচির পায়ে সাহিত্যরুচির আত্মসমর্পণ।

*

স্বদেশে ফর্স্টারের পরিচিতির ভিত্তি অপেক্ষাকৃত কম অসমীচীন, যদিও সে খ্যাতিও পুরোপুরি সাহিত্যিক নয়। তাঁর অনুদ্ধত ব্যক্তিত্ব তাঁর জন্য অর্জন করেছে অসংখ্য অনুরাগী। একা বাস করেন নির্জন কেম্ব্রিজে, লেখার কিছু না থাকলেও অভ্যাসবশে লিখে চলেন না, সাহিত্যের বাজারের প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই কারো সঙ্গে, বিরোধের তিনি বিরোধী।

এমন লোক অবশ্যই সতীর্থদের সস্নেহ শ্রদ্ধা অর্জন করবেন। এঁরা ফর্স্টারের সৃষ্ট-সাহিত্যের অনুরাগী বলেও হ'তে পারেন, না হলেও ক্ষতি নেই, ব্যক্তি হিসাবে ফর্স্টারকে তাঁরা শ্রদ্ধা করবেনই। কঠোরতম বিচারেও ফর্স্টার স্নিগ্ধ ও গুণী লেখক হিসাবে স্বীকৃতি পাবেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর বর্তমান প্রতিষ্ঠার অসাহিত্যিক অংশ অবৃহৎ নয়।

আরো একটা কারণ আছে। ফর্স্টার প্রথম ভারতে এসেছিলেন ১৯১২ সালে, দ্বিতীয়-বার ১৯২১ সালে এবং "এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া" প্রকাশিত হয় বোধ হয় ১৯২৪ সালে। ইংলাণ্ডে ও য়ুরোপে সেটা আশা-ভঙ্গের ক্ষণ: কেউ হেরেছে আর কেউ জিতে দেখেছে জয়ের পরিপূর্ণ অন্তঃসারশূন্যতা। জাতীয়তাবাদ তখন ধিকৃত এবং ফর্স্টার যখন ভারতশাসনরত অহঙ্কৃত বৃটনদের তিরস্কার করলেন তখন তা শুধু স্বাধীনতা-কামী ভারতীয়দেরই মুখরোচক হোলো না, অনেক ইংরেজও আত্মসমালোচনা সুস্বাদু জ্ঞান করলেন। তার উপর ফর্স্টার শুধু "ওয়েস্ট ল্যাণ্ড" দিলেন না দিলেন, বন্ধুত্বের বিকল্প আকর্ষণ। সবার উপরে বন্ধু সত্য, তাহার উপরে নাই।।

ভারতের ফর্স্টারপ্রেমিকদের পক্ষে ফর্স্টারের জীবনদর্শনের পরিপূর্ণ গ্রহণ ঠিক নিরাপদ নয়। বস্তুত আমার মতে ফর্স্টারের প্রথম গুণ তাঁর অপরিসীম সাহসিকতা এবং আপন প্রীতির প্রতিরক্ষায় পরিপূর্ণ আত্মনিয়োগ। দৃষ্টান্ত:

"I hate the idea of causes, and if I had to choose between betraying my country and betraying my friend, I hope I should have the guts to betray my country."

আমাদের ক'জনের সাহস আছে প্রকাশ্যে এমন প্রার্থনা করবার? কাজ করা দূরে থাক? বর্তমান দেশপ্রেমের বন্যায় এমন উক্তি দেশদ্রোহিতা বলে মনে হবে না কি?

দ্বিতীয় বলা উক্তির। ফর্স্টার:

"I do not believe in Belief. But this is an age of faith. .Faith, to my mind, is a stiffening process, a sort of mental starch, which ought to be supplied as sparingly as possible. I dislike the stuff."

আমরা ক'জন বলব এমন কথা, আর বললে কলসীর কানা আসবে কোন অঞ্চল থেকে?

না, আজকের ভারত ফর্স্টারের ভালো-বাসার ভারত নয়।

চন্দ্রশেখর

সাহিত্যের দরবারে চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের সম্পর্ক গভীর: কালির অক্ষরে যে রস অনুভূতির নিবিড়তায় উপস্থিত, চলচ্চিত্রের রজতপটে তাই রূপে-রঙে মুখর ও মধুর হয়ে ওঠে। তাই চলচ্চিত্রের সঙ্গে সাহিত্যের মিতালী যতটা নিবিড় হওয়া স্বাভাবিক, ততটা অন্য কিছুরই সঙ্গে নয়। কিন্তু সাহিত্যের রাজদরবারে চলচ্চিত্র এতদিন প্রবেশাধিকার পায়নি। তার জন্যে দায়ী সাহিত্য বা চলচ্চিত্র নয়। অভাব ছিল সত্যসন্ধানী মনের। চলচ্চিত্রের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় এবার ব্রতী হয়েছিলেন "কাবুলিওয়ালা" ও অন্যান্য বিশিষ্ট ছবির প্রযোজক শ্রীঅসিত চৌধুরী। এবারকার নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের জব্বলপুর অধিবেশনে চারুকলা বিভাগে চলচ্চিত্র যে আপন মর্যাদায় এই প্রথমবার স্থান পেয়েছে তার পেছনে রয়েছে শ্রীঅসিত চৌধুরীর চেষ্টা ও বদান্যতা। জব্বলপুরে এবারকার বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে চলচ্চিত্র শাখার সভাপতির আসন অলংকৃত করেন স্বনামধন্য অভিনেতা শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এবং শাখার উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত চিত্র-পরিচালক ও প্রযোজক শ্রীদেবকীকুমার বসু।

শ্রীঅসিত চৌধুরী, শ্রীসুবোধ মিত্র, শ্রীসাগরময় ঘোষ, শ্রীহরিধন বন্দ্যোপাধ্যায় (সানুবাবু) ও চলচ্চিত্রের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং কলকাতার কতিপয় বিশিষ্ট সাংবাদিক বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে চলচ্চিত্র শাখার উদ্বোধন উপলক্ষে যোগদান করেছিলেন।

জব্বলপুরে উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীদেবকীকুমার বসু একটি মনোজ্ঞ ভাষণে বলেন, "আনন্দ পরিবেশন ছাড়াও চলচ্চিত্রের আর একটা দিক আছে। সেটা জীবনেরই মত বড় এবং ভবিষ্যতের মতই সুদূরপ্রসারী, সেখানে শুধু প্রেয়ই নয়, সেখানে প্রেয় মিশে আছে শ্রেয়র সঙ্গে। আমি মনে করি, এখানে ভাষা সাহিত্যকেও সম্ভ্রমের সঙ্গে এগিয়ে এসে চলচ্চিত্রকে আহ্বান ও আলিঙ্গন করা উচিত। সাহিত্য মানে যদি জীবনের সঙ্গে সংযোগ, সত্যের সঙ্গে ও আনন্দের সঙ্গে সংযোগের কথা হয়, তাহলে প্রাচীন সাহিত্যের আজ প্রথমেই অভিনন্দন জানান উচিত এই নবীন চলচ্চিত্রকে যে নতুন ভাবে, জ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের নবতম সম্পদে শক্তিমান হয়ে, নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করে নতুন সংযোগ ঘটিয়েছে মানুষের জীবনের সঙ্গে সর্বদিকে। চলচ্চিত্রের সেবার কথা বলছি মানুষের জ্ঞানের ক্ষেত্রে, মানুষের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। এমন শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বস্তু আজ আর নেই যা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শুধু রূপায়িত, প্রকাশিত হচ্ছে না, তা সম্প্রসারিতও হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক একে নিয়েছেন, ঐতিহাসিক একে নিয়েছেন। শিক্ষাবিদ একে নিয়েছেন মানুষের জ্ঞানের জন্যে। চিকিৎসক একে নিয়েছেন মানুষের নিরাময়ের জন্যে। শিল্পেই এর উৎকর্ষ আছে, কিন্তু তাছাড়া, অভিনয়ের সঙ্গে সংগীত সাহিত্য এর গভীর সংযোগ আছে, এই শিল্পের জ্ঞানী ও গুণী একে গ্রহণ করেছেন সর্বান্তঃকরণে। ভবিষ্যতের কথা ভাবলে, আমাদের এই পৃথিবীর যারা ভবিষ্যৎ মানুষ, সেই শিশুদের শিক্ষার জন্য আজ দেশে দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা চলচ্চিত্র আজ যে রূপে প্রতিষ্ঠার রূপে নিয়েছে তাতে শিক্ষাবিদেরাই চলচ্চিত্রকে দ্বিতীয় বিদ্যালয়ের মত স্থান দিয়েছেন। যাঁরা বলেছেন, তারা সেখানে ফিরে এসেছে, চলচ্চিত্র সেখানে দৃঢ় হয়ে বসেছে শিশুর মনে। এর শিক্ষার জন্য কাগজ কলম বা কোন উপকরণের জন্য বাড়তি কলম কালি কোন প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া, আমাদের পৃথিবীর ঐ যে কোটি কোটি নরনারী, বালক, বৃদ্ধ, যারা সাহিত্যের ও কবির বড়াই পড়তেও জানে না, যারা লেখার একটাও বোঝে না, তারাই যে অর্ধেক পৃথিবী। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে এই অর্ধেক পৃথিবী যদি অর্ধশিক্ষিতও হয় তা হলে চলচ্চিত্র ধন্য হবে, আমরা ধন্য হব। এই-ই চলচ্চিত্রের নতুন সাহিত্য।"

শ্রীবসু আরও বলেন, "আজকের চলচ্চিত্র এবং দু-হাজার বছরের সাহিত্য, এই দুইকেই অতিক্রম করে আমাদের ফিরে যাওয়া উচিত মানুষেরই কথায়। একদা বহুর মধ্যে নিজেকে বিস্তারের প্রেরণায় মানুষের সঙ্গে

নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের জব্বলপুর অধিবেশনে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়ছেন অহীন্দ্র চৌধুরী। তাঁর দুই পাশে দেবকীকুমার বসু ও নবগোপাল দাশকে দেখা যাচ্ছে

মানুষের যে সংযোগ ঘটেছিল সেই বহুধা প্রবাহিত রসধারার এক ধারা এই সাহিত্য। আজ এই দিকে আরও বেশী, ঢের বেশী বহুর মধ্যে নিজেকে বিলাবার প্রেরণায় মানুষের সঙ্গে মানুষের নিত্য সংযোগ যার মাধ্যমে ঘটছে সেই চলচ্চিত্র নামে সাহিত্য না হলেও মর্মে সাহিত্য। না জেনে দুহাজার বছরের আগে জন্মলগ্নে মানুষের সৌন্দর্য-বোধের, মানুষের রসলোকের উত্তরাধিকারী শুধু সাহিত্য নয় শুধু, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলা নয়, একা কেউ নয়, উত্তরাধিকারী এরা সবাই—বিংশ শতাব্দীর চলচ্চিত্রও এবং আগামী যুগে যারা যারা আসবে নতুন রূপে, নতুন ভাবে, তারাও।"

সাহিত্যের নন্দন কাননে চলচ্চিত্রের এই প্রথম ঐতিহাসিক স্বীকৃতির পেছনে শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর অবদানের কথা উল্লেখ করে শ্রীদেবকীকুমার বসু বলেন, "সাহিত্যের রাজসভায় চলচ্চিত্র আজ প্রবেশাধিকার পেয়েছে। তাই আজ এখানে আমাদের স্থান হল সেই চলচ্চিত্র অধিকারে আর শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর দুঃসাহসিক অধিকারে যিনি সাহিত্য-সভার লৌহ যবনিকা ভেদ করে এই সৎসাহসের পরিচয় দিলেন যে, সাহিত্যের যিনি দেবী তিনি শুধু বাগদেবীই নন, তিনি বীণাপাণিও। এবং সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলার যিনি মাতৃস্বরূপা তিনি চলচ্চিত্রের বিমাতা নন।"

চিত্রালোচনা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানে এই সপ্তাহে প্রোডাকশন সিন্ডিকেটের সংগীতমুখর বাংলা ছবি 'নৌকা বিলাস' সুরের পাল তুলে চিত্ররসিকদের হৃদয়-যমুনার কূলে এসে ভিড়েছে। কানু ছাড়া গীত নেই—এটা প্রবাদ বাক্য। তারই প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে এই ছবিতে, কারণ কানুই এতে নাটের গুরু—তাঁকে ঘিরেই এর যা-কিছু ঘটনা, মান-অভিমান বিরহ-মিলনের অভিব্যঞ্জনা। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্যের ওপর প্রযোজক-পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় যে সৌধ গড়েছেন, তার সর্বত্র রসিকজন সুন্দরের মধুময় উপস্থিতি অনুভব করতে পারবেন। এর বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা রূপদান করেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, মিতনলী, পূর্ণিমা, পদ্মা দেবী, চন্দন রায় এবং রাধাকৃষ্ণের ভূমিকায় নবাবিষ্কৃত তারকাদ্বয়—অনুরাধা গুহ ও মিহির মুখোপাধ্যায়। সুরসৃষ্টির কৃতিত্ব পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের।

প্রোডাকসান সিণ্ডিকেটের "নৌকা বিলাসে" শ্রীরাধার ভূমিকায় নবাগতা অনুরাধা গুহ প্রথম চিত্রাবতরণেই দর্শকদের চিত্ত জয় করে নেবেন

এ হপ্তায় দুখানি নতুন হিন্দী ছবিও মুক্তি পেয়েছে। একটি অমিয় চক্রের 'ডিটেকটিভ', অপরটি চৌধারী ব্রাদার্সের 'সোহনী মহিওয়াল'।

অপরাধীর মনস্তাপের নাটকীয় কাহিনীকে ভিত্তি করে 'ডিটেকটিভের' গল্পাংশ। প্রমোদের উপকরণও প্রচুর আছে এর মধ্যে। প্রদীপকুমার ও মালা সিংহ এর নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এঁদের সহ-শিল্পীদের মধ্যে কে এন সিং, বিমলাকুমারী, সুলোচনা, ডেজি ইরানী, ধুমল ও জনি ওয়াকারের নাম উল্লেখযোগ্য। শক্তি সামন্ত ছবিটি পরিচালনা করেছেন এবং সুর যোজনার দায়িত্ব বহন করেছেন মুকুল রায়।

পাঞ্জাবের একটি সুপরিচিত প্রেমের উপাখ্যান অবলম্বনে 'সোহনী মহিওয়ালের' কাহিনী রচিত। নিম্মি ও ভারতভূষণকে এর প্রধান দুটি চরিত্রে দেখা যাবে। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন কুমার, অচলা সচদেব, শীলা কাশ্মিরী, মুকরি, চাঁদ বার্ক, বিক্রম কাপুর, ওমপ্রকাশ প্রভৃতি। রাজা নওয়াদি ও নৌসাদ যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

•   •   •   •

হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়কে সবাই সুগায়ক ও কৃতী সংগীত পরিচালক হিসেবে জানেন। তিনি এবার ছবির প্রযোজকরূপে দর্শকদের অভিবাদন করবেন। তাঁর প্রথম ছবি 'নীল আকাশের নীচে' সর্বসাধারণে প্রদর্শিত হবার ছাড়পত্র পেয়েছে সেন্সর বোর্ডের কাছ থেকে। খুব সম্ভব ছবিখানি জানুয়ারী মাসের মধ্যেই মুক্তিলাভ করবে। গতানুগতিকতাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে একটি অভিনব, বলিষ্ঠ কাহিনীর রূপ দেওয়া হয়েছে হেমন্ত বেলা প্রোডাকশন্সের পতাকা তলে নির্মিত এই ছবিতে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় এর মুখ্য চরিত্র এক চীনা ফেরিওয়ালাকে জীবন্ত করে তুলেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। তাঁর বিপরীতে এই ছবিতে অভিনয় করেছেন মঞ্জু দে, বিকাশ রায়, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মৃতি বিশ্বাস, সুরুচি সেনগুপ্তা প্রভৃতি। মহাদেবী বর্মা রচিত হিন্দী গল্প 'চীনি ফিরিওয়ালা' অবলম্বনে ছবিখানি পরিচালনা করেছেন মৃণাল সেন। বলা বাহুল্য, সুর সৃষ্টি করেছেন হেমন্ত-কুমার স্বয়ং।

•   •   •

আর একটি নতুন ধরনের ছবি 'অদৃশ্য ইঙ্গিত'। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে বি এ পি প্রোডাকশন্সের এই প্রথম প্রচেষ্টা সমাপ্তির পথে দ্রুত এগুচ্ছে। পরিচালক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি জামসেদপুরের ইস্পাত নগরী পরিভ্রমণ করে ফিরেছেন, কারণ ছবির কাহিনী এমনিধারা এক বিরাট ইস্পাতনগরীর পটভূমিকায় রূপায়িত। এর কাহিনীকার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র নিজে একজন প্রখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার। ছবির আঙ্গিকে তাই অনেক নতুন জিনিসের সমাবেশ দেখা যাবে। এর বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী, আশীষ-কুমার, ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

*   *   *

ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রঙ্গাভিনয় বাংলা ছবির একটি প্রচণ্ড আকর্ষণ। এবারে তাঁর পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যাকেও অভিনয় করতে দেখা যাবে—অবশ্য এক শিশু-অভিনেত্রীর ভূমিকায়। যে ছবিতে এই অঘটন ঘটেছে, তার নাম 'নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে'। মেট্রোপলিটান পিকচার্সের তরফে বি এন খেমকার প্রযোজনায় ছবির শুটিং এগুচ্ছে ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম স্টুডিওতে। নির্মল দে ছবিটি পরিচালনা করছেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই ছবিতে আরো দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায় নামছেন ছবি বিশ্বাস ও বাসবী নন্দী।

•   •   •

বাংলার চিত্র জগৎ গানে গানে প্লাবিত করবার সংকল্প নিয়ে আসছে প্রোগ্রেসিভ এণ্টারপ্রাইজার্সের ভক্তিমূলক চিত্রার্ঘ্য
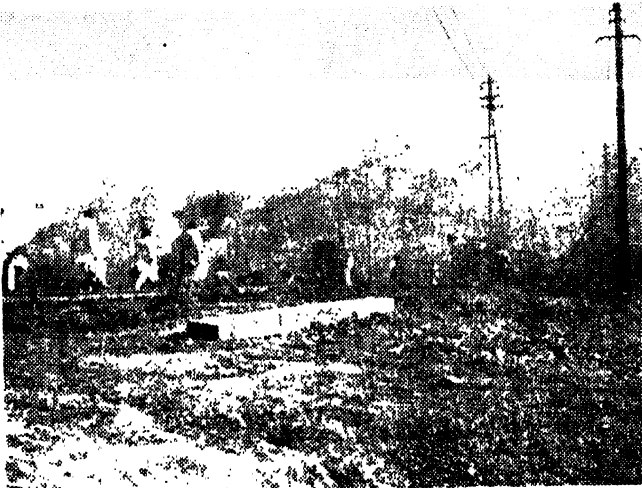
কলকাতা শহরের ওপর একটি ডকুমেণ্টারি ছবি ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে তোলা হচ্ছে। পরিচালনা করছেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত। শহরের একটি অতি-পরিচিত অংশেরই দৃশ্য এটি

'নদের নিমাই'। ছবিটি বর্তমানে শ্রীবিমল রায়ের (যিনি ছোট বিমল রায় নামে পরিচিত) পরিচালনাধীনে গঠন পথে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এর চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন, সুর যোজনা করছেন কীর্তন-কলানিধি রথীন্দ্রনাথ ঘোষ। এই ছবিতে সবসুদ্ধ বত্রিশখানি গান থাকবে এবং সেগুলি গাইবেন হেমন্তকুমার, ধনঞ্জয়, শ্যামল মিত্র, সতীনাথ, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পান্নালাল, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন গুপ্ত, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, মীরা চট্টোপাধ্যায়, মান্না দে,, গীতা দত্ত প্রমুখ প্রখ্যাত গায়ক গায়িকাবৃন্দ। ইতিমধ্যে সাতখানি গানের রেকর্ডিং সম্পূর্ণ হয়েছে।

* * * *

'আবার ভোর হবে' এই নামে ইস্টার্ন টকিজ স্টুডিওতে একটি ছবি তোলা হচ্ছে। তুলছেন নবগঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠান মা চিত্রম। একটি নতুন ধরনের কাহিনীকে চিত্রনাট্যে রূপ দিয়েছেন পরেশ মজুমদার, পরিচালনাও তিনিই করছেন। মাঃ শম্ভু, সমরকুমার, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, ছবি বিশ্বাস, প্রশান্তকুমার, জহর রায়, শোভা সেন, সুপ্রিয়া চৌধুরী, বাণী গাঙ্গুলী, দীপ্তি রায় প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। সংগীত পরিচালনায় আছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

শিল্পীর প্রেম

পুনর্জন্ম নিয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসুদের যেমন গবেষণার শেষ নেই, তেমনি কল্পনার বিরাম নেই রজতপটের কাহিনীকারদের। জন্মান্তরবাদের ভিত্তিতে এজাতীয় কাহিনীর পটভূমিকা সহজেই বিস্তৃত হয়ে পড়ে জন্ম থেকে জন্মান্তরে, এক দুজ্ঞেয় রহস্যের জালে নায়ক-নায়িকাদের জড়িয়ে নিয়ে নাট্যরস পরিবেশনের চেষ্টা করেন কাহিনীকার। 'জন্মান্তর' জীবন ও মৃত্যুর দ্বন্দ্বে গড়া এমনি একখানি ছবি।

কাহিনীর নায়ক শিল্পী আশীষ একদিন ছবি আঁকলো গঙ্গার তীরে আনমনা হয়ে বসে-থাকা একটি মেয়ের। মেয়েটির নাম কবি। চিত্র প্রদর্শনীতে সে ছবি পুরস্কৃত হল এবং ছবিখানি কাগজেও ছাপা হল। কবি ঠিকানা সংগ্রহ করে যায় আশীষের কাছে বিনা অনুমতিতে তার ছবি আঁকবার জন্যে তিরস্কার করতে। শিল্পীর নিঃসহায় জীবনযাত্রা ও চরিত্র মাধুর্য ধীরে ধীরে কবিকে তার দিকে আকৃষ্ট করে। মধুর প্রণয়ের সম্পর্কে ওরা ক্রমশ বাঁধা পড়ে। কিন্তু তাদের মিলনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় জাতের বিচার। কবির বাবা-মা এক মাত্র মেয়েকে তাঁদের চাইতে নীচু জাতের পাত্রের হাতে তুলে দিতে রাজি হন না। তাঁরা জোর করে অন্যত্র কবির বিয়ে দেবার আয়োজন করেন। কবি বাবা-মায়ের দুর্লঙ্ঘ্য

শিশু রংমহলের সদ্যসমাপ্ত বার্ষিক উৎসবে সাউথ সাবার্বান ব্রাঞ্চ স্কুলের "ছন্দের স্বপ্ন" সকলকার প্রশংসা পায়। এটি তারই একটি দৃশ্য

শচীনশংকর ও তাঁর নৃত্যসম্প্রদায় বর্তমানে নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে নাচের আসর বসিয়েছেন সম্প্রদায়ের নতুন অবদান "সাঁঝ সবেরা" নিয়ে। এই ব্যালের একটি স্নিগ্ধ গ্রাম্য দৃশ্য ওপরের ছবিতে ফুটে উঠেছে

শাসন এড়াতে না পেরে বিয়ের দিনেই আত্মহত্যা করে বিষ খেয়ে।

তারপর কেটে যায় কুড়িটি বছর। আশীষ বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন। বিশ্বস্ত ভৃত্য নিধু তাকে পরম স্নেহে শিশুকাল থেকে পালন করে এসেছে। নিধুদাই আশীষের একমাত্র আত্মীয়। কবির মৃত্যুর পর আশীষ আর কলকাতায় থাকতে পারে না। নানা দেশ ঘুরে অবশেষে সে বাসা বাঁধলো রাঁচীতে নিধুদাকে নিয়ে। তার মানসীকে সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। নিজের আঁকা তারই ছবি দিয়ে আশীষ তার ঘর সাজালো—যাতে চোখ মেললেই কবির প্রতিচ্ছবি দৃষ্টিগোচর হয়।

আশীষের বাসার পাশেই থাকে মিনতি তার বিধবা মা ও দাদুর সঙ্গে।

মিনতির বন্ধু ডলির ভাই একদিন এসে বলে, সে মিনুদির ছবি দেখে এসেছে পাশের বাড়ীতে। প্রথমে অবিশ্বাস করলেও মিনতি সেখানে গিয়ে যা দেখল, তাতে তার বিস্ময়ের সীমা রইলো না। মিনতিকে দেখে পরম বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে নিধুদাও। তারই কবি দিদিমণি আবার ফিরে এল কি করে?

আশীষের সঙ্গে দেখা হয় মিনতির। সেও অবাক হয়ে যায়। তার মনে হয়, কবিই যেন মিনতি নাম নিয়ে এসেছে তার কাছে। মিনতির কৌতূহল মেটাতে সে বলে তার আঁকা ছবিগুলির ইতিহাস। আশীষ স্পষ্ট অনুভব করে, কবি আর মিনতি একই ব্যক্তি। নিধুদাও বিশ্বাস করে সেকথা। দুজনের দুর্বোধ্য এই মিল দেখে মিনতির মা ও দাদু কিছুই ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। মিনতির মনে জাগে জন্মান্তরবাদ নিয়ে **অনেক জিজ্ঞাসা। তার মন কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারে না যে, সেই ছিল আগের জন্মে কবি।**

এদিকে শক্ত অসুখে পড়ে আশীষ। ডাক্তার জবাব দিয়ে যায়। মিনতি কিছুতেই আসবে না আশীষের কাছে। রোগশয্যা থেকে কোনরকমে উঠে এসে একটি গানের রেকর্ড বাজায় আশীষ। কবি গাইত সে গান। সে গানের সুর ভেসে আসে মিনতির কাছে। যেন অনেক চেনা গান, সে স্থির থাকতে পারে না। ছুটে আসে সে আশীষের কাছে। আশীষ তখন মৃত্যুর কোলে মাথা রেখেছে।

* * *

আর দশটা রোমাণ্টিক গল্পের মতোই নায়ক-নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নিয়ে রচিত এ কাহিনী। জন্মান্তর এবং দুই জন্মে নায়িকার চেহারা ও ভাবভঙ্গীর অবিকল সাদৃশ্যের অতিপ্রাকৃত উপাদানটুকু দর্শকের অনুভূতিতে সাড়া এনে দেবার মতো বিশেষ নাট্য আবেদনে মণ্ডিত হয়ে ওঠেনি। অতীতের হারিয়ে যাওয়া প্রিয়তমার পুনর্জন্ম নিয়ে নায়কের যে অনুভূতি তা দর্শকমনকে দোলা দেয় না, নায়িকার উভয় জীবনের পরিবেশের তেমন বিশেষ কোন তারতম্য নেই বলে। নির্দেশক কাহিনীর দুই ভিন্নমুখী ধারার সঙ্গে সঙ্গে যথাযথ পট পরিবর্তনেরও চেষ্টা নেই। তার ফলে নায়কের দু'টি জীবন কবি ও মিনতির মাঝখানে জন্ম ও মৃত্যুর যে রহস্যময় ব্যবধান রয়ে গিয়েছে, তা দর্শকদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে না বলে ছবিটি শুধু এক রোমাণ্টিক গল্পের রসটুকুই দেবে, তার বেশী কিছু পাওয়া যায় না।

তবে কোথাও অভিনব হলেই হবে যে, তরুণ পরিচালক অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম চিত্রপরিচালনায় একাধিক পরিচ্ছন্ন ও সুনিয়ন্ত্রিত ছবি উপহার দেবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আবহসঙ্গীত পরিচালকের সঙ্গে সহযোগ প্রশংসনীয়। দেবের দিয়ে একখানি গানের সুর ও দৃশ্যগ্রাহী প্রয়োগের ফলে কাহিনীর দুর্বলতা অনেকাংশে ঢেকে যায়। একটি শব্দ গান দিয়ে ছবির নাটকীয় উৎকর্ষের এই কল্পনার ভূয়সী প্রশংসা করতে হয়। ছবির চিত্রনাট্য মাঝে মাঝে একটু শিথিল হয়ে পড়লেও ছবিখানি অপ্রয়োজনীয় ঘটনা ও চরিত্রে ভারাক্রান্ত নয়।

অভিনয়ে সর্বাগ্রে প্রশংসা পাবেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। স্নেহশীল পুরাতন ভৃত্যের চরিত্রটিকে তিনি এমন স্বাভাবিক এবং মরমী করে তুলেছেন যে, এই ছবির অভিনয় তাঁর শিল্পীজীবনের অন্যতম কৃতিত্ব হয়েই থাকবে। মিনতিকে প্রথম দেখার পর তাঁর বিস্ময় ও তখনকার ভাব-ভঙ্গী অননুকরণীয়।

"চলাচলে"র পর নির্মলকুমার ও অরুন্ধতী শিল্পীজোড়কে দর্শকদের আবার

নতুন করে ভাল লাগবে এই ছবিতে। প্রভূত দরদ ও নিষ্ঠা দিয়ে নায়কের চরিত্রের বেদনাতুর মুহূর্তগুলিকে নির্মলকুমার প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর বাচনভঙ্গীও প্রশংসনীয়। প্রেমিকার চরিত্রে অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় সাবলীল। মিনতির ভূমিকায় জন্মান্তর নিয়ে তাঁর সংশয় এবং শেষের দিকে আশীষের জন্যে উতলা হয়ে পড়ার অভিব্যক্তি তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়কের বন্ধুর চরিত্রে অসিতবরণ অভিনয়ের যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয়-কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন কবির বাবা-মায়ের ভূমিকায় জহর গাঙ্গুলী ও রেণুকা রায় এবং মিনতির দাদুর চরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল। পার্শ্ব-চরিত্রে অপর্ণা দেবী, তপতী ঘোষ, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মাঃ বাবুয়া ও নৃপতি চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

ছবির বিশেষ সম্পদ এর সঙ্গীতাংশ। সংগীত পরিচালক সরোজ কুশারী আবহসংগীত ও গানের সুরারোপে অনবদ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গৌরীপ্রসন্নের লেখা "[illegible] কাকে বলে ভালবাসি" গানখানি সুরে মূর্ছনায় অপূর্ব এবং সুশ্রাব্য। ছবির শব্দানুলেখন চমৎকার এবং অন্যান্য কলাকৌশলের মধ্যে চিত্রগ্রহণ ও শিল্পনির্দেশ বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

"জন্মান্তরের" কাহিনী ও সংলাপ লিখেছেন [illegible], চিত্রগ্রহণ করেছেন [illegible] ও [illegible] চ্যাটার্জি এবং শব্দগ্রহণ ও শব্দানুলেখন করেছেন [illegible]। সম্পাদনা ও শিল্পনির্দেশের দায়িত্ব [illegible] পালন করেছেন [illegible]।

টাইম ফিল্মসের "চাওয়া-পাওয়া"তে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে যাঁদের দেখলে সবাই খুশী হন সেই উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনকে

বিবিধ সংবাদ

গত শনিবার সাতষট্টি বছর বয়সে প্রখ্যাত প্রযোজক পি এন রায়ের জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার ফিল্মশিল্প একজন অনলস কর্মী ও পথপ্রদর্শক হারালো। দেশে-বিদেশে ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে খ্যাতিলাভ করবার পর শ্রীরায় ভারতীয় চলচ্চিত্রের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রথমে যোগ দেন স্বর্গত হিমাংশু রায়ের সঙ্গে। "সিরাজ" ও "লাইট অফ এশিয়া" নির্বাক ছবির যুগে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় বহন করছে। ত্রিংশ শতকের মাঝামাঝি শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সরকারের আহ্বানে তিনি নিউ থিয়েটার্সের প্রধান কর্মসচিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর আমলেই নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর প্রসার ও ছবির সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের মূলে শ্রীরায়ের দান অনস্বীকার্য। নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর শ্রী রায় ফিল্ম সার্ভিসের নামে চলচ্চিত্রের একটি ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে ছবির প্রযোজনায় প্রবৃত্ত হন। শরৎচন্দ্রের "পরিণীতা" তাঁর নিজস্ব প্রযোজনায় তোলা প্রথম ছবি, এবং রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ" প্রযোজক হিসাবে তাঁর শেষ অবদান। শ্রীরায় দারপরিগ্রহ করেন নি।

* * *

বঙ্গীয় নাট্য সংসদ প্রতি এক পক্ষ অন্তর নাটকের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একটি করে আলোচনা সভার আয়োজন করবেন বলে স্থির করেছেন।

এদের প্রথম পাক্ষিক আলোচনা সভার অধিবেশন হয় গত ২৮শে ডিসেম্বর। অধ্যাপক ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য সাম্প্রতিক পেশাদারী ও অপেশাদারী নাটক নিয়ে আলোচনা করেন। "ক্ষুধা", "মায়ামৃগ" ও গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারী নাটক "সংক্রান্তি" এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বঙ্গীয় নাট্য সংসদ স্থির করেছেন যে, কোন নাট্যকার তাঁর প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত নাটক সংসদের কাছে পাঠালে যথাসময়ে তা সংসদের আলোচনা সভায় আলোচিত হবে। বঙ্গীয় নাট্য সংসদের ঠিকানা—৩০২, আপার সার্কুলার রোড।

* * *

যাদুরত্নাকর এ সি সরকার সম্প্রতি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ গ্রেট বৃটেন ও আয়ার্ল্যান্ডের সদস্য (Fellow) নির্বাচিত হয়েছেন। ভারতীয় যাদুকরদের মধ্যে শ্রীসরকারই সর্বপ্রথম এই সম্মান লাভ করলেন। প্রাচীন ভারতের যাদুবিদ্যা

সম্পর্কীয় গবেষণার জন্যে শ্রীসরকার এই সম্মান পেয়েছেন।

* * *

কলিকাতা ফিল্ম সোসাইটির উদ্যোগে গত ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০শে ডিসেম্বর টালিগঞ্জে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে চারখানি জার্মান ছবি দেখান হয়। ছবিগুলির নাম—"দি মার্ডারার্স আর এমং আস", "আণ্ডার ডগ", "লিসি" ও "বার্লিনার ব্যালাড"। জার্মান ফিল্ম শিল্পের অগ্রগতির স্বাক্ষর বহন করে ছবিগুলি। আরো দু'খানি জার্মান ফিল্ম—"ডিউপড্ টিল ডুম্স্‌ডে" ও "ম্যারেজ ইন দি শ্যাডোজ"—৩রা ও ৪ঠা জানুয়ারী ঐ একই জায়গায় প্রদর্শিত হয়।

* * *

মধ্য কলিকাতা মিউজিক একাডেমির সাহায্যার্থে আগামী ১১ই জানুয়ারী লোটাস সিনেমায় একটি আনন্দ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সংগীত ও চিত্র-জগতের বিশিষ্ট শিল্পীরা এতে অংশ গ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠান সুরু হবে সকাল সাড়ে আটটায়।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন

বেলেঘাটা "উদয়ন" পরিচালিত ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন শুঁড়া ইস্ট রোড ও সি আই টি রোডের সংযোগস্থলে এক সুদৃশ্য মণ্ডপে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো। গত ২রা থেকে ৫ই জানুয়ারী।

চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে গিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেন, ভারতীয় সংগীতের সঠিক ব্যাখ্যার আজ বিশেষ প্রয়োজন। বিভিন্ন সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণরত শিল্পীরা সেই চেষ্টা করবেন, এই বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীদ্বিজেন মুখোপাধ্যায় অধিবেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, প্রথমবর্ষে উদয়ন শিশু স্বাস্থ্য সদনের প্রসারকল্পে ভারতীয় রেড ক্রশকে ৫০০০, দেওয়া হয়েছে; এবারের উদ্দেশ্য দুটিঃ শিশু স্বাস্থ্য সদনের সম্প্রসারণ ও একটি সংগীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

প্রথম সন্ধ্যায় (২রা জানুয়ারী) লোক-গীতি পরিবেশন করেন ভূপেন চক্রবর্তী ও মামুদ হোসেন। ভূপেন চক্রবর্তীর ভাটিয়ালী, জারি ও ধানকাটার গান উচ্চাঙ্গের না হলেও উপভোগ্য হয়েছিল। সন্তোষ সেনগুপ্তের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের "শ্যামা" নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠান স্মরণীয় সার্থকতায় সমুজ্জ্বল। সুরের বৈচিত্র্যে নৃত্যের তালে তালে শ্যামার রূপ রস অনবদ্য, শ্যামার ব্যথা বেদনা আবেগময়। রাধারাণীর সুরেলা কণ্ঠে সব শেষের কীর্তন এক ভাব-মধুর আবেশ সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় দিনের (৩রা জানুয়ারী) বিচিত্রানুষ্ঠানে আধুনিক গান, হাস্য-কৌতুক, নৃত্য ও অর্কেষ্ট্রা পরিবেশিত হয়। জাঁকালো অর্কেষ্ট্রা সহযোগে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া চারখানি গান দর্শকবৃন্দের মন কেড়ে নেয়, তবে তাঁর রাগপ্রধান "বাঁধো ঝুলনা" আশানুরূপ হয়নি। ইলা চক্রবর্তীর তিন খানি গানই সুরের বিস্তারে রসোত্তীর্ণ। সতীনাথ মুখোপাধ্যায় গানের সুরের আসন পেতে নিয়েছিলেন সবার মনে। আর উল্লেখ করতে হয় পান্নালাল ভট্টাচার্যের শ্যামা সংগীত। শীতল বন্দ্যো-পাধ্যায় যদিও "বাঁশ" দিয়ে হাসান, তবুও জহর রায়ের "টাংগাওয়ালা"র কাছে সে কৌতুক যেন ম্লান। মণিপুরী নৃত্যে কাজল দাশগুপ্তার "রাধার অভিসার" এবং হিমাংশু বিশ্বাসের পরিচালনায় অর্কেষ্ট্রা উপভোগ্য হয়েছিল।

৪ঠা জানুয়ারীর সারারাত্রি অনুষ্ঠানের আরম্ভ হয় উদয়শংকর-অমলাশংকর ও সম্প্রদায়ের নৃত্যাভিনয় দিয়ে। "শ্রম ও যন্ত্র" যেমন বিস্ময় আছে, তেমনি আছে বৈভব। "পাঞ্জাবী ভাংরা" ও "তিলোত্তমা" উল্লেখ-যোগ্য, কিন্তু "তাণ্ডব নৃত্য" না ছিল প্রলয়ের ভয়ালরূপ, না ছিল আনন্দের উল্লাস। উচ্চাংগ সংগীতের আসরে বড়ে গোলাম আলি খান মেজাজ দিয়ে গেয়ে যান খেয়াল, ঠুংরী আর "আয়ে ন বালম" ও "হরি ওম্"। রবিশংকরের সেতারের সুর ও ঝঙ্কার ভোরের বাতাসে কথা হয়ে ভেসে যায়। এবং ভীমসেন যোশীর ঠুংরী ও "গংগা-যমুনা কী তীর" এক রসসমৃদ্ধ সৃষ্টি।

শেষ সন্ধ্যায় (৫ই জানুয়ারী) শরৎচন্দ্রের "চন্দ্রনাথ" নাট্যরূপে মঞ্চস্থ হয়। জহর গাংগুলী ও সরযূবালার অভিনয়-সাফল্যে অনুষ্ঠান সার্থক হয়।

ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্স

শুক্রবার, ৯ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সের অধিবেশন শুরু। ৯ই ও ১০ই তারিখে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলবে। ১১ই অর্থাৎ শেষদিন অনুষ্ঠানের মেয়াদ সারারাত্রি।

এই তিনদিনব্যাপী উৎসবে অংশ গ্রহণ করবেন—বড়ে গোলাম আলী, নাজাকাত ও সালামাত, ভীমসেন যোশী, সুনন্দা পট্টনায়ক, রবিশংকর, আলী আকবর, ভি জি যোগ, আল্লারাখা, শান্তাপ্রসাদ, যশরাজ, প্রতিমা বসু, যতীন ভট্টাচার্য ও নটরাজ গোপীকৃষ্ণ।

বিদেশী জয়মাল্য

"পথের পাঁচালী"র আন্তর্জাতিক সম্মানের যেন শেষ নেই। শুধু আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রেই সত্যজিৎ রায়ের এই বিশ্বনন্দিত ছবিটি এত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্মানিত হয়েছে যার তুলনা ইদানীংকালে বিরল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল বোর্ড অফ রিভিউ কর্তৃক "পথের পাঁচালী" ১৯৫৮ সালের শ্রেষ্ঠ বৈদেশিক চিত্র হিসাবে মনোনীত হয়েছে এ খবর আগেই বেরিয়েছে।

আমেরিকার মোশান পিকচার এসো-সিয়েশনের বিদ্যালয় চলচ্চিত্র কমিটি "পথের পাঁচালী"কে সকল বয়সের ছেলে-মেয়েদের দর্শনীয় চলচ্চিত্র হিসাবে অনুমোদন করেছেন।

সতেরোটি আমেরিকান পত্রিকা ঐ ছবির দুর্গা চরিত্রের অভিনেত্রী উমা দাশগুপ্তাকে "বৎসরের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা কিশোরী অভিনেত্রী" এই আখ্যায় ভূষিত করেছেন।

মার্কিন যুক্তরাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন ফিল্ম সোসাইটি ও ঐ জাতীয় অন্যান্য গোষ্ঠীর কাছে "পথের পাঁচালী"র বিরাট চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। নিউ ইয়র্কের ফিফ্‌থ্ এভেনিউ সিনেমাতে ছবিটি ধারাবাহিকভাবে প্রদর্শিত হবার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরের সংগ্রহশালার কর্তৃপক্ষরা "পথের পাঁচালী"র বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন।

বিখ্যাত মার্কিন সাপ্তাহিক "টাইম" ১৯৫৮ সালের শ্রেষ্ঠ ছবি এই আখ্যায় "পথের পাঁচালী"কে অভিনন্দিত করেছেন।

নিউ ইয়র্কের ফিল্ম ক্রিটিকদের ভোটে ১৯৫৮ সালের বৈদেশিক ছবিগুলির মধ্যে প্রথম হয়েছে একখানি ফরাসী ছবি এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে "পথের পাঁচালী"।

একলব্য

ভারতীয় ক্রিকেটের দৈন্য দশা

কলকাতার তৃতীয় টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে ভারতকে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছে। বোম্বাইতে দুই দেশের প্রথম টেস্ট খেলায় জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি। খেলাটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জের ভারত সফরকারী দল জয়লাভ করেছে ২০৩ রানে। ফলে পর পর দুটি টেস্টে বিজয়ী হওয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' লাভের পথ সুপ্রশস্ত হয়ে আছে। কোনো অঘটন না ঘটলে দুই দেশের পূর্বের দুই ক্রিকেট-যুদ্ধের রাবার বিজয়ী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তৃতীয়বারও রাবার লাভ নিশ্চিত। অঘটন ঘটার অবশ্য কোনো সম্ভাবনাই নেই। কারণ ভারত শুধু পরাজিতই হয়নি। তার মনোবলও ভেঙে গেছে, প্রকটভাবে প্রকাশ হয়ে পড়েছে ভারতের নিদারুণ ক্রিকেট-দৈন্য।

শুধু টেস্ট খেলার পরাজয়ই ভারতীয় ক্রিকেটের দৈন্যদশার একমাত্র চিত্র নয়।

কানপুর ও কলকাতার টেস্টের মাঝের দুটি খেলাতেও বিশ্ববিদ্যালয় একাদশ ও বিহার রাজ্যপালের একাদশকে অতি সহজে পরাজিত করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল উপর্যুপরি চারটি খেলায় বিজয়ী হয়েছে। এতে একদিকে যেমন বেশীর ভাগ উঠতি খেলোয়াড় নিয়ে গড়া আগন্তুক দলের বোলার ও ব্যাটসম্যানদের প্রতিভাদীপ্ত খেলোয়াড় জীবনের উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছে; অন্যদিকে তেমন ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সাধারণের মনে জেগে উঠেছে গভীর নিরাশা।

সাতাই তৃতীয় টেস্টের সূচনা থেকে পরাজিতের মনোভাব নিয়ে খেলে ভারতীয় দল যেভাবে শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করেছে তা দেখলে ক্রিকেট অনুরাগী মাত্রের মনকেই পীড়া দেয়। পরাজয় ভারত বহুবারই স্বীকার করেছে। আরও অল্প রানেও ভারতের ইনিংস শেষ হয়েছে। ইনিংস পরাজয়ও ভারতের ক্ষেত্রে কোনো নতুন ঘটনা নয়। তবু এবারকার খেলায় যে ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে টেস্ট খেলার ইতিহাসে ইতিপূর্বে ভারতীয় দল এমন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে কি না সন্দেহ। কি ব্যাটিং, কি বোলিং, কি ফিল্ডিং—খেলার সর্ববিষয়ে ভারতের খেলোয়াড়রা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

সংক্ষিপ্তভাবে খেলাটির ধারাবাহিক আলোচনা করলে দুই দলের সাফল্য ও ব্যর্থতার ছবি আরও ভালভাবে ফুটে উঠবে। খেলাটি আরম্ভ হয় ইংরাজী ১৯৫৮ সালের বর্ষ-বিদায়ের শেষ দিনে, আর পাঁচ দিন-ব্যাপী টেস্ট খেলার উপর যবনিকা পড়ে নতুন বছরের চতুর্থ দিনের মধ্যাহ্ন সময়ে। একদিন বিরতির জন খেলারও ছিল এটি চতুর্থ দিন। বলা বাহুল্য, দুই ইনিংসে ভারতের শোচনীয় ব্যাটিং বিপর্যয়ের জন্যই নির্দিষ্ট দিনের দেড় দিন আগে খেলাটি শেষ হয়ে যায়।

ভারতের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারতের টেস্ট খেলার বেলায় ভাগ্যদেবী ভারতীয় অধিনায়কের প্রতি এত অপ্রসন্ন কেন জানি না। ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ভারত সফরের সময় অধিনায়ক অমরনাথ পাঁচটি টেস্টেই 'টসে' পরাজিত হয়েছিলেন। এবারকার তিনটি টেস্টেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক আলেকজাণ্ডার 'টসে' বিজয়ী হয়ে প্রথম ব্যাটিং করবার সুযোগ পেয়েছেন। সুতরাং ভারতের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় অধিনায়কের টসে জয়লাভের আশা এখনো অপূর্ণ আছে। আর খেলায় জয়লাভের আশা কবে পূর্ণ হবে তা ভাগ্যদেবীই জানেন।

যাই হক, ব্যাটসম্যানের সহায়ক ইডেন উদ্যান উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়রা উন্নত ব্যাটিং নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে প্রথম দিনই সংগ্রহ করেন ৩ উইকেটে ৩৫৯ রাণ। ৩৩০ মিনিটে টেস্ট খেলায় ৩৫৯ রাণ সংগ্রহ নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ ক্রীড়াপদ্ধতি এবং কব্জির জোর ও হাতের সূক্ষ্ম কারিগরির পরিচায়ক। অবশ্য স্বীকার করতেই হবে ভারতীয় বোলারদের

ইডেন উদ্যানের টেস্ট খেলায় রেকর্ড-রানের ইলেক্‌ট্রিক স্কোর বোর্ড

রয় গিলক্রিস্টের বলে ফাদকারের মিডলস্টাম্প মাটি হইতে উৎপাটিত হয়ে দূরে ছিটকে পড়ছে

মাঝারি ধরনের চেয়েও নীচু মানের বোলিং এবং নিকৃষ্ট ধরনের ফিল্ডিং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান তোলার গতিকে দ্রুত থেকে দ্রুততর করে তোলে। তবুও আধুনিক কালের টেস্টে ক্রিকেটে এভাবে রান তোলার দৃষ্টান্ত বিরল। প্রথম দিনের খেলাতেই রোহান কানহাইয়ের দ্বিশত রান পূর্ণ হয়ে যায়। নয়নাভিরাম ব্যাটিং ভংগী আগাগোড়া বজায় রেখে কানহাই ২০৩ রান এবং বেসিল বুচার ৮৭ রান করে নট আউট থাকেন।

টেস্ট খেলায় ইডেন উদ্যানে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন

রোহান কানহাই (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—৫৮—৫৯)	... ২৫৬
এভার্টন উইকস (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—৪৮—৪৯)	১৬২ ও ১০১
আর এস হুইটিংটন (অস্ট্রেলিয়া সার্ভিসেস—৪৫)	... ১৫৫
জন রিড (নিউজিল্যাণ্ড—৫৫—৫৬)	... ১২০
আইকিন (কমনওয়েলথ—৫০—৫১)	... ১১১
ক্লাইড ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—৪৮—৪৯)	... ১০৮
গারফিল্ড সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—৫৮—৫৯)	... ১০৬ নট আউট
ব্রুস ডুল্যাণ্ড (কমনওয়েলথ—৫০—৫১)	... ১০৬
বেসিল বুচার (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—৫৮—৫৯)	... ১০৩
জে পেটিফোর্ড (অস্ট্রেলিয়া সার্ভিসেস—৪৫)	... ১০১
(ভারতের—)	
বিজয় হাজারে (কমনওয়েলথের বিরুদ্ধে—৪৯—৫০)	... ১৭৫ নট আউট
বিজয় মার্চেণ্ট (অস্ট্রেলিয়া সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে—৪৫)	... ১৫৫ নট আউট
বিজয় হাজারে (কমনওয়েলথের বিরুদ্ধে—৫০—৫১)	... ১৩৪
এল অমরনাথ (লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে—৩৭—৩৮)	... ১২৩
ডি ডি ফাদকার (ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে—৫১—৫২)	... ১১৫
পলি উম্রিগর (রজতজয়ন্তী দলের বিরুদ্ধে—৫৩—৫৪)	... ১১২ নট আউট
জি এস রামচাঁদ (রজতজয়ন্তী দলের বিরুদ্ধে—৫৩—৫৪)	... ১১১
দীপক সোধন (পাকিস্থানের বিরুদ্ধে—৫২)	... ১১০
জি এস রামচাঁদ (নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে—৫৫—৫৬)	... ১০৬ নট আউট
মুস্তাক আলি (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে—৪৮—৪৯)	... ১০৬
মুস্তাক আলি (লর্ড টেনিসনের দলের বিরুদ্ধে ৩৭—৩৮)	... ১০১
পি রায় (নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে—৫৫—৫৬)	... ১০০

এখানে বলা যেতে পারে ইডেন উদ্যানে টেস্ট খেলার ইতিহাসে দেশের বা বিদেশের কোন ব্যাটসম্যানের দুই শত রান লাভের গৌরব এই সর্বপ্রথম। শুধু ইডেন উদ্যানে কেন? ভারতের মাটিতেই টেস্ট খেলায় এক নিউজিল্যাণ্ডের কীর্তিমান খেলোয়াড় বার্ট সাটক্লিফ ছাড়া আর কেউ দ্বিশত রান করতে পারেননি। ১৯৫৫-৫৬ সালে দিল্লীতে তৃতীয় টেস্ট খেলায় বার্ট সাটক্লিফ নট আউট থাকার কৃতিত্ব সমেত ২৩০ রান করেছিলেন। অবশ্য বিদেশেও ভারতের বিরুদ্ধে বেশী খেলোয়াড় দ্বিশত রান করতে পারেন নি। ইংলণ্ডের ওয়্যালী হ্যামণ্ড ও জো হার্ডস্টাফ, অস্ট্রেলিয়ার ডন ব্র্যাডম্যান এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফ্রাংক ওরেল ও এভার্টন উইকস—এই পাঁচজন খেলোয়াড় ইতিপূর্বে নিজ নিজ দেশে ভারতের বিরুদ্ধে ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন। বলা বাহুল্য, ক্রিকেট ক্ষেত্রে এরা সবাই—এক একজন দিক্‌পাল। একটি কথা না বললে প্রথম দিনের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ভারতের অধিনায়ক গোলাম আমেদ এক ওভার বোলিং করবার পর দ্বিতীয় ওভারে একটি বল করেই হাণ্টের স্ট্রেট ড্রাইভ আটকাতে গিয়ে আঙগুলে আঘাত পান। তার আর খেলবার

থাকে না। পলি উমরিগরের উপর অধিনায়কের দায়িত্ব চাপিয়ে তিনি মধ্যাহ্ন ভোজের আগেই মাঠ ত্যাগ করেন। ভারতের ফিল্ডসম্যানরা এইদিন চারটি ক্যাচ ছাড়া বাদেও হাতের মধ্য দিয়ে বল গলিয়ে কত যে রান বাড়িয়েছেন তার হিসাব রাখা সম্ভব হয়নি।

দ্বিতীয় দিন গোলাম আমেদ অধিনায়কের দায়িত্ব নিয়েই মাঠে নামলেন। বলও করলেন; কিন্তু রান ওঠার গতি একটুও মন্থর হল না। চা পানের সময় পর্যন্ত ৫ উইকেটে ৬১৪ রান করে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক আলেকজাণ্ডার। হার্ট স্যাটক্লিফের রান অতিক্রম করে এবং এ পর্যন্ত ভারতের বিরুদ্ধে যাঁরা দ্বিশত রান করেছেন তাঁদের সবার ব্যক্তিগত রান পেরিয়ে ব্রিটিশ গায়নার সুনিপুণ খেলোয়াড় রোহান কানহাই করলেন ২৫৬ রান। গারফিল্ড সোবার্স এবং বেসিল বুচারও সেঞ্চুরী করতে বাকী রাখলেন না। বিশ্বনন্দিত ব্যাটসম্যান গারফিল্ড সোবার্স, টেস্ট খেলার সর্বোচ্চ রানে তিনি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী এবং তিনি বোম্বাই ও কানপুরে প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে সেঞ্চুরী করে এসেছেন। তিনি উপর্যুপরি তিনটি টেস্টেই সেঞ্চুরী করলেন। বেসিল বুচারও করলেন জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী।

চা পানের বিরতির সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ৬১৪ রানে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করায় চা পানের পর ভারত প্রথম ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় দিনের খেলা যখন শেষ হল তখন ভারতীয় দলের রান উঠেছে ২৯। কিন্তু এই ২৯ রানের মধ্যেই ভারত দুটি উইকেট হারিয়ে বসে গেলেন। দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান কন্ট্রাক্টর ও পঙ্কজ রায় পরপর—গাড়ি-চাপা পড়ার মত আউট হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় দিন ভারতীয় দলের বোলিং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান তোলার গতিকে সাময়িকভাবে শিথিল করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু কোন খেলার বোলিংয়ের মধ্যেই আত্মপ্রত্যয়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও ছিল না। ফিল্ডিংও ছিল একই ধরনের—নীচু স্তরের। মাত্র ২৯ রানের মধ্যেই ভারতের দুইজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় দ্বিতীয় দিনের শেষে আউট হওয়ায় ভারতীয় দল যেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের করুণার পাত্র হয়ে উঠলো। খেলার আকর্ষণও কমে গেল বহু পরিমাণে। ভারতের শোচনীয় পরাজয় মানসচক্ষে দেখে দর্শকরা বাড়ি ফিরলো।

এখানে বলা প্রয়োজন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৬১৪ রান ইডেন উদ্যানের টেস্ট খেলার ইতিহাসে সর্বোচ্চ ইনিংস। সরকারী কিংবা বে-সরকারী টেস্ট খেলায় আজ পর্যন্ত কোন দলই ইডেন উদ্যানে পাঁচশ রান তুলতে পারেনি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মাত্র ৫ উইকেটে ৬১৪ রান করে এক নতুন ঘটনার সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় দিন গারফিল্ড সোবার্সের সাবলীল ব্যাটিং ভঙ্গিমা এবং সূক্ষ্ম টাইমিংসমন্বিত কব্জির কারিগরি দর্শকদের অত্যন্ত আনন্দ দিয়েছে। ৩৫ হাজার দর্শক চোখ জুড়িয়েছেন সোবার্সের নিপুণ হাতের স্ট্রোক দেখে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপুল রানের বিরুদ্ধে ভারতের জয়লাভের কোন প্রশ্নই ছিল না। বড় প্রশ্ন ছিল পরাজয়ের। আর তার পরের প্রশ্ন পরাজয় এড়াবার। তিনদিন উইকেটে টিঁকে থেকে পরাজয় এড়ানোর কথা নজির দিয়ে বিচারের আওতায় আনা গেলেও প্রথম দুইদিন ভারতীয় দলের খেলা দেখে সে প্রশ্ন সকলের কাছে আকাশ কুসুম কল্পনা বলেই মনে হয়েছে। এর আগে ৬০০-র বেশী রান হয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে

টেস্ট খেলায় ইডেন উদ্যানে সর্বোচ্চ ইনিংস ও খেলার ফলাফল

(সরকারী টেস্ট)

সাল	দল	রান	ফলাফল
১৯৩৩-৩৪	ইংলণ্ড	৪০৩	অমীমাংসিত
১৯৪৮-৪৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৩৬৬	অমীমাংসিত
১৯৫১-৫২	ইংলণ্ড	৩৪২	অমীমাংসিত
১৯৫২	পাকিস্থান	২৫৭	অমীমাংসিত
১৯৫৫-৫৬	নিউজিল্যাণ্ড	৩৩৬	অমীমাংসিত
১৯৫৬	অস্ট্রেলিয়া	১৭৭	অস্ট্রেলিয়া ৯৪ রানে বিজয়ী
১৯৫৮-৫৯	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	৬১৪(৫ উইঃ ডিক্লেয়ার্ড)	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংস ও ৩৩৬ রানে বিজয়ী

(বে-সরকারী টেস্ট)

সাল	দল	রান	ফলাফল
১৯৩৫-৩৬	রাইডারের অস্ট্রেলিয়া দল	৯৯	অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে বিজয়ী
১৯৩৭-৩৮	লর্ড টেনিসনের দল	২৫৭	ভারত ৯৩ রানে বিজয়ী
১৯৪৫	অস্ট্রেলিয়া সার্ভিস দল	৪৭২	অমীমাংসিত
১৯৪৯-৫০	প্রথম কমনওয়েলথ দল	১৯০	ভারত ৭ উইকেটে বিজয়ী
১৯৫০-৫১	দ্বিতীয় কমনওয়েলথ	৪৫৭	অমীমাংসিত
১৯৫৩-৫৪	সিলভার জুবিলী দল	২৪৫	সিলভার জুবিলী দল ৬ উইকেটে বিজয়ী

তিনবার। প্রথম ১৯৪৭-৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার এডিলেড মাঠে অস্ট্রেলিয়া করে ৬৭৪ রান। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ৬০০-র বেশী রান করে এই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ১৯৪৮-৪৯ সালে তাদের প্রথম ভারত সফরের সময়। দিল্লীর প্রথম টেস্টে ওঠে ৬ উইকেটে ৬২৯ রান। অস্ট্রেলিয়ার এডিলেড মাঠে ভারত পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি না পেলেও দিল্লী ও বোম্বাইতে ভারতের ব্যাটসম্যানেরা অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে জয়লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে দেয়। ভারতীয় খেলোয়াড়দের এইসব পুরানো কাহিনী মানসপটের অতীত সাক্ষী। কিন্তু ভারতের নিতান্ত আশাবাদী সমর্থকও ভাবতে পারেন না বর্তমান অবস্থায় ভারতীয় দল পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে। কারণ সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। হাজারে, মুস্তাক, রুসি মোদির মত দক্ষ খেলোয়াড় আজ কোথায়? কোথায় অমরনাথের মত বিজ্ঞ অধিনায়ক? মানকড়ের সঙ্গে ক্রিকেট বোর্ডের মান ওজনের পালা চলছে। ফাদকারেরও কি সেদিন আছে, না আছে বিপদের কাণ্ডারী দৃঢ়চেতা অধিকারীর মত খেলোয়াড়? তাই ভারতের পরাজয় সম্পর্কে কারো মনের কোণে এতটুকু সন্দেহ রইল না। এখন কখন কোন্ সময়ে খেলার ওপর যবনিকা পড়বে সেইটাই প্রশ্ন।

ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় সবচেয়ে বেশী রান (২৫৬) করার কৃতিত্বের অধিকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রোহান কানহাই, যাঁর পূর্বপুরুষ একদিন এই ভারতের অধিবাসী ছিলেন

পরের দিন খেলার বিরতি। একদিন বিরতির পর তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুই ফাস্ট বোলার রয় গিলক্রিস্ট ও ওয়েসলী হলের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ভারতের খেলোয়াড়রা শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে প্রথম ইনিংস শেষ করলেন মাত্র ১২৪ রানে। 'ফলো অনের' পর এইদিন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেও ৬৯ রানের মধ্যে ভারতের পাঁচটি উইকেট পড়ে গেল। পরের দিন মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির ২০ মিনিট পূর্বেই দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল। খেলার উপরও যবনিকা পড়লো।

ভারত পরাজয় স্বীকার করলো এক ইনিংস ও ৩৩৬ রানে।

প্রথম ইনিংসের সূচনা থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি পর্যন্ত ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা কোন সময়ই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলিং ভীতি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। শুধু প্রথম ইনিংসে উমরিগর এবং দ্বিতীয় ইনিংসে মঞ্জরেকার দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে কিছু রান সংগ্রহ করেছেন মাত্র। দুই ইনিংসে ৬ জন খেলোয়াড় কোন রান না করেই আউট হয়েছেন, আর ৮ জন খেলোয়াড়ের রান সংখ্যা দুই অঙ্কে পৌঁছুতে পারেনি। উইকেট ভিজে থাকলে বা উইকেট ভেঙ্গে গেলে এই নিদারুণ ব্যাটিং বিপর্যয়ের কৈফিয়ৎ খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু ব্যাটসম্যানের সহায়ক চমৎকার উইকেটে এইভাবে অসহায়ের মত আউট হবার কোন কৈফিয়ৎ নেই। এ অবস্থা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্ষেত্রে ভারতের দেউলিয়া হবার পূর্বে লক্ষণ। তৃতীয় টেস্ট খেলা দেখার পর বার বার এই কথাই মনে আসছে—কিসের জন্য ভারতের ক্রিকেট খেলায় এত হৈ হুল্লোড়। কেন টেস্ট খেলাকে কেন্দ্র করে এই অভূতপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনা? কেন এত জনসমাগম?

একটি কথা না লিখলে তৃতীয় টেস্টের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। খেলার সর্ববিষয়ে বিস্তৃত প্রাধান্য বিস্তার করা সত্ত্বেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় ভুলচুক হয়নি এমন নয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফিল্ডসম্যানরাও ক্যাচ ছেড়েছেন। তবে এরা যখন ক্যাচ ছেড়েছেন তখন খেলার জয়লাভ সম্পর্কে এ'দের ছিল প্রত্যয়প্রসন্ন মনোভাব। প্রকৃত প্রয়োজনের সময় এ'রা একটিও ক্যাচ ছাড়েন নি। সোবার্সের দুটি এবং অধিনায়ক আলেকজাণ্ডারের একটি দুরূহ ক্যাচ ধরার ভঙ্গি মনে রাখবার মত।

ইডেন উদ্যানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বেশী রান করার রেকর্ড আর রোহান কানহাইয়ের ভারতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী রান করার কৃতিত্ব ছাড়াও সংখ্যাতত্ত্বের দিক দিয়ে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সরকারী টেস্ট খেলায় ব্যাট ও বলের বহু ঐতিহাসিক লড়াইয়ের সংগ্রাম ক্ষেত্র ইডেন উদ্যানে সরকারী টেস্ট খেলায় এ পর্যন্ত ৬ জনের বেশী খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। এই ৬ জনের মধ্যে পাঁচজনই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আলো-বাতাস-গাছ-পালা-রোদ-বৃষ্টিতে ভরা ছোট্ট ছোট্ট দ্বীপের অধিবাসী। ষষ্ঠ খেলোয়াড় নিউজিল্যাণ্ডের জন রিড।

তৃতীয় টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড:—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংস:—(৫ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড)—৬১৪ (রোহান কানহাই ২৫৬, গারফিল্ড সোবার্স নট আউট ১০৬, বেসিল বুচার ১০৩, জো সলোমান নট আউট ৬৯, কোলী স্মিথ ৩৪; সুরেন্দ্রনাথ ১৫৮ রানে ২ উইকেট)

ভারত প্রথম ইনিংস:—১২৪ (পলি উমরিগর ৪৪; রয় গিলক্রিস্ট ১৮ রানে ৩ উইকেট, ওয়েসলী হল ৩১ রানে ৩ উইকেট, সোনী রামাধীন ২৭ রানে ২ উইকেট)

ভারত দ্বিতীয় ইনিংস:—১৫৪ (ভি এল মঞ্জরেকার ৫৮, ডি জি ফাদকার ৩৫; রয় গিলক্রিস্ট ৫৫ রানে ৬টি ও ওয়েসলী হল ৫৫ রানে ৩টি উইকেট)

উভয় দলে খেলেছেন:—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ:—হোল্ট, হান্ট, কানহাই, সোবার্স, স্মিথ, বুচার, সলোমান, আলেকজাণ্ডার (অধিনায়ক ও উইকেট রক্ষক), রামাধীন, গিলক্রিস্ট ও হল; দ্বাদশ খেলোয়াড়—গিবস।

ভারত:—পি রায়, নরী কন্ট্রাক্টর, পলি উমরিগর, ভি মঞ্জরেকার, আর বি কেনী, জে এম ঘোরপাড়ে, ডি জি ফাদকার, এন এস তামানে (উইকেট রক্ষক), গোলাম আমেদ, সুভাষ গুপ্তে ও সুরেন্দ্রনাথ; দ্বাদশ খেলোয়াড়—সি জি বোড়ে।

দেশী সংবাদ

২৯শে ডিসেম্বর—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ মুনাফাবাজী নিরোধ বিলের শেষ পর্যায়ের বিতর্ককালে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এরূপ আশ্বাস দেন যে, ঐ বিলে খাদ্যশস্যের যে দর বাঁধিয়া দেওয়া হইতেছে, আগামী আমন ফসল না উঠা পর্যন্ত তাহা বহাল থাকিবে।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ অর্থ লইয়া কিভাবে ছিনিমিনি খেলা হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৫৫-৫৭ সালের অডিট রিপোর্টে প্রকাশ পায়।

৩০শে ডিসেম্বর—ভারতের একটুকরা জমিও পাকিস্তানকে দিবার ক্ষমতা সংবিধানে সংসদ, রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী কাহাকেও দেওয়া হয় নাই। অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে সমস্বরে এই মত ব্যক্ত করা হয়।

৩১শে ডিসেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য রাত্রিতে তাঁহার নববর্ষের বাণীতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের জন্য দেশবাসিগণকে সম্পূর্ণরূপে গভর্নমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বৃহৎ শক্তিবর্গকে পরীক্ষামূলক আণবিক বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করিবার জন্যও অনুরোধ করেন।

১৯৫৯ সালের পশ্চিমবঙ্গ ধান-চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ (যাহা ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।) সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে বলবৎ হইবে। এই আদেশের বিধান বলে বিভিন্ন অঞ্চলে ধান চাউলের উৎপাদক, পাইকার ও খুচরা ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ধরনের ধান ও চাউল সম্পর্কে যে সর্বোচ্চ মূল্য চাহিতে পারিবেন, তাহা নির্ধারিত করা হইয়াছে।

১লা জানুয়ারী—অদ্য পুলিস উত্তর কলিকাতায় শোভাবাজার স্ট্রীট অঞ্চলে কয়েকটি গুদামে হানা দিয়া কাঁকর মিশ্রিত বলিয়া অভিহিত একশত বস্তা চাউল ও এক হাজার বস্তা পরিষ্কার চাউল এবং পাঁচ বস্তা কাঁকর আটক করে। চাউলে কাঁকর মিশ্রিত করিবার এবং উহা মজুত করিবার উদ্দেশ্যে গুদামটিকে ব্যবহার করা হইতেছিল বলিয়া পুলিস সন্দেহ করিতেছে। এই সম্পর্কে শ্রীশ্যামসুন্দর আগরওয়ালা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

২রা জানুয়ারী—সরকারী ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে এক্ষণে নির্দিষ্ট মূল্যে রেশন কার্ডে মাথাপিছু এক সের করিয়া চাউল দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী সোমবার হইতে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মাথাপিছু ১ সের ৮ ছটাক করিয়া সরবরাহ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

অতি সাধারণ একটি ঘটনার সূত্র ধরিয়া হাওড়া পুলিস আজ আন্তঃরাজ্য জাল নোট তৈয়ারী অথবা প্রচলনে লিপ্ত সন্দেহে বেলগাছিয়া (হাওড়া) বেলঘরিয়া ও সোদপুরে (২৪ পরগনা) প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ৪ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৩রা জানুয়ারী—গতকল্য নয়াদিল্লীতে সাংবাদিকদের নিকট শ্রীনগরের জনৈক কাশ্মীরী মুসলমান কুখ্যাত লাহোর ফোর্টসহ পাকিস্থানের বিভিন্ন জেলে দশ বৎসরব্যাপী তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচারের লোমহর্ষণ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সরকারী দপ্তর ভবনে সাংবাদিকগণের সহিত এক সাক্ষাৎকালে চাউল ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, সরকার নির্দিষ্ট মূল্যে যে কেহ মজুত চাউল বিক্রয়ে আপত্তি করিবেন, তাঁহার বিরুদ্ধেই কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে।

৪ঠা জানুয়ারী—পাকিস্তানী সেনাদের নৃশংস অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া গত ১লা জানুয়ারী রংপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার একটি হিন্দু পরিবার প্রাণের দায়ে ঘরবাড়ির মায়া ত্যাগ করিয়া পূর্ব পাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। দীর্ঘকাল পরে এই প্রথম আবার বাস্তুহারা আগমনের খবর সরকারীসূত্রে পাওয়া গেল।

জীবন বীমা কর্পোরেশন কুড়ি হাজার কর্মীকে ১৯৫৭ সালের জন্য বিনাব্যয়ে জীবন বীমার পরিবর্তে এক মাসের বোনাস দানের প্রস্তাব করিয়াছেন। কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রী পি এ গোপালকৃষ্ণন কর্পোরেশনের পরিচালকমণ্ডলীর এই সিদ্ধান্ত কর্মচারী সমিতির প্রতিনিধিদের জানান।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে ডিসেম্বর—আগামী বৃহস্পতিবার নববর্ষ দিবসে পশ্চিম ইওরোপের ছয়টি দেশ এবং ষোল কোটি লোক একটি অখণ্ড অর্থনৈতিক ইউনিটের অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিয়াছে। এই পরিকল্পনার দ্বারা উহারা ১৯৭৪ সালের মধ্যে আর্থিক শক্তি সামর্থ্যের বিচারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিবার আশা রাখে।

৩০শে ডিসেম্বর—আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিকেরা প্রাচীন উপন্যাসের রাজা মিডাসের—যাঁহার স্পর্শে সকল কিছু স্বর্ণে রূপান্তরিত হইত—প্রাসাদ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। মিডাস নামে বাস্তবিকই একজন রাজা যীশুখৃষ্টের জন্মের ৭১৫ বৎসর পূর্বে তুরস্কের ফ্রাইজিয়া অঞ্চলে শাসন পরিচালনা করিতেন।

ফোর্ড ফাউণ্ডেশন অদ্য প্রায় ৩৫ লক্ষ ডলার সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। এই অর্থের বৃহদংশই ট্রেনিং ও গবেষণা এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য ইওরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন গভর্নমেণ্ট বা বেসরকারী সংস্থাসমূহকে দেওয়া হইবে।

৩১শে ডিসেম্বর—কিউবার বাতিস্তা সরকারের পতন আসন্ন বলিয়া বিদ্রোহী সামরিক মহল হইতে প্রচারিত হওয়ায় শত শত সরকারী সেনা দল ত্যাগ করিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রেসিডেণ্ট বাতিস্তার দুই পুত্র, ছয়জন নারী এবং দুই জন পুরুষ সঙ্গে লইয়া নিউ ইয়র্ক উপনীত হইয়াছেন।

বৃটেন অদ্য রাশিয়াকে জানাইয়া দিয়াছে যে, পশ্চিম বার্লিনকে একটি 'স্বাধীন নগরীতে' পরিণত করার জন্য সোভিয়েট সরকার যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা 'গ্রহণের অযোগ্য।'

১লা জানুয়ারী—সোভিয়েট সরকারী সংবাদপত্র 'ইজভেস্তিয়া' অদ্য এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছে যে, ১৯৬৬ সালের মধ্যে রাশিয়া একটি 'মহাজাগতিক গবেষণাগার' স্থাপন করিবে এবং উহাতে টেলিভিসন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি থাকিবে। গবেষণাগারটি ২০ হাজার মাইলেরও ঊর্ধ্বে থাকিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবে।

কিউবার শাসক জেনারেল ফালজেনসিও বাতিস্তা আজ বিমানযোগে যুদ্ধবিধ্বস্ত দ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়াছেন। তিনি ঘোষণা করেন, দেশে আর যাহাতে রক্তপাত না হয় সেজন্য তিনি প্রেসিডেণ্টের পদ ত্যাগ করিতেছেন।

২রা জানুয়ারী—নববর্ষে এক অভিযানে মিশর ও সিরিয়ায় দুই শতাধিক কম্যুনিস্টকে অকস্মাৎ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইহার ফলে মিশর ও সিরিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া পর্যবেক্ষকবৃন্দ বলেন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের নিকট এক শুভেচ্ছাবাণী প্রসঙ্গে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলেন যে, বার্লিন পরিস্থিতির শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সোভিয়েট নেতৃবর্গের পক্ষে চেষ্টা করা বিশেষ প্রয়োজন।

৩রা জানুয়ারী—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইতেছেন, জনৈক সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ার এমন একটি মোটর ইঞ্জিন নির্মাণ করিয়াছেন, যাহার ওজন হইতেছে আড়াই সেরের কাছাকাছি। ইঞ্জিনটি একখানা স্কুটার সাইকেলকে ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে চালাইয়া নিতে পারে।

গত ১১ই অক্টোবর তারিখে আমেরিকা চন্দ্রলোকের দিকে প্রথম রকেট প্রেরণ করে। কিন্তু উহা নির্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় উহাকে ৭৯,২১১২ মাইল ঊর্ধ্বের আকাশ হইতে পৃথিবীতে ফিরাইয়া আনা হয়।

৪ঠা জানুয়ারী—সোভিয়েট সংবাদ পরিবেশন সংস্থা 'তাস' অদ্য প্রাতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সোভিয়েট রকেট অদ্য চন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া সূর্য অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। আগামী বুধ অথবা বৃহস্পতিবার উহা এক কক্ষপথে সূর্য প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিয়া মনুষ্য নির্মিত প্রথম গ্রহে পরিণত হইবে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REG. NO. C. 2109

দেশ

১ বর্ষ] শনিবার, ৩ মাঘ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 17th January, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১২

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

LICHENSA
একজিমা
ও অন্যান্য চর্মরোগে
লিচেনসা
ব্যবহার করুন
DCZ 11

পেপস্ দ্বারা
ব্রণকাইটিস্
সত্বর ভাল হয়
বিশ্ববিখ্যাত
গলার ও
বুকের বড়ি
গলায় ক্ষত, ব্রণকাইটিস্, কাশি ও সর্দ্দি,
গলার ও বুকের পেপস্ বড়ি সেবনে সত্বর
সেরে যায়। পেপস্ মুখে রেখে দিন—
বুঝতে পারবেন আরোগ্যকারী ভাপ কাজ
করছে—জীবাণু ধ্বংস ও ব্যথায় আরাম
করার জন্য।

পেপস্
গলার ও
বুকের বড়ি
যে কোন ঔষধ
বিক্রেতার নিকট
পাওয়া যায়।

ওটিন
নূতন সৌন্দর্য্য নিয়ে
শয্যাত্যাগ করুন!
আপনি যখন নিদ্রামগ্ন, ওটিন ক্রীম ও প্রকৃতির ওপর
আপনার পরিচর্য্যার ভার দিন। ওটিন ক্রীম মেখে শুতে
যান, এবং পরদিন কোমল, মসৃণ ও যৌবনোচিত সৌন্দর্য্য
নিয়ে শয্যাত্যাগ করুন; তারপর ওটিন স্নো মেখে
স্বচ্ছন্দে বিশ্বের সম্মুখীন হোন।

ক্রীম ত্বক
পরিষ্কারের জন্য রাত্রে
ব্যবহার্য্য।
OATINE
Oatine Cream
ক্রীম

GOVERNMENT LIBRARY

স্মরণীয়

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র
LIBRARY
Cooch Behar

রাজস্থানের প্রাচীন বীরত্বের স্মৃতি ও বর্ণাঢ্য ইতিহাস যুগে যুগে
কবি, শিল্পী ও সঙ্গীতরচয়িতার প্রেরণা যুগিয়েছে। রাজস্থানের সূক্ষ্ম
চিত্রকলায়, রাগমালা চিত্রাবলীতে বিভিন্ন রাগরাগিণীর অপরূপ
রূপচিত্রণে, ঘুমর লোকনৃত্যের উদ্দামতায় এই ঐতিহ্যই প্রতিফলিত হ'য়েছে।
এই বিচিত্র দেশের প্রাচীন শিল্পের ধারা আরো প্রকাশ পায়
রাজস্থানের তাঁতের কাজে, সূক্ষ্ম সূচীশিল্পে, মাটির বাসন ও
পেতলের কাজের বর্ণসমারোহ ও দক্ষ কারিগরীতে।

ভারতবর্ষের যেখানেই যান, রাজস্থানের বর্ণোজ্জ্বল জীবনযাত্রা
থেকে আধুনিক বোম্বাই শহরের ঊর্ধশ্বাস
কর্মব্যস্ততার মধ্যে আপনার
আনন্দ সর্বত্রই বাড়িয়ে
তুলবে উইল্‌স-এর গোল্ড
ফ্লেক সিগারেটের
অতুলনীয় স্বাদগন্ধ।

গোল্ড ফ্লেকের চেয়ে
ভালো সিগারেট কোথায় পাবেন

দি ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃক প্রচারিত

GF/448
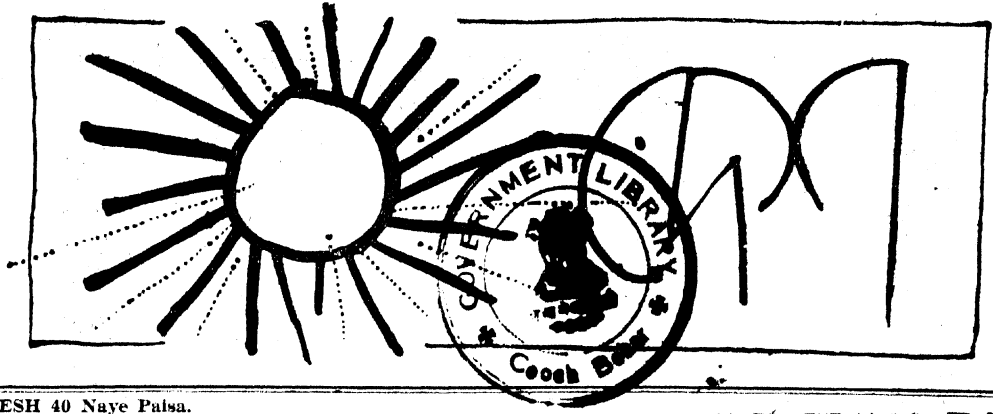
DESH 40 Naye Paisa.
Saturday 17th January 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১২ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩রা মাঘ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র

নাগপুর অভয়ঙ্করনগরে ৬৪তম কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতি শ্রীযুক্ত ডেবর যে দীর্ঘ ও সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন, দেশের মধ্যে তাহার আলোচনা হইতেছে। অভিভাষণটি দীর্ঘ ও নানা প্রসঙ্গ উত্থাপনে জটিল এবং কংগ্রেস সভাপতির ভূয়োদর্শনে গম্ভীর। সামান্য একটি প্রবন্ধে তাহার সম্যক আলোচনা সম্ভবে না। সে চেষ্টাও আমরা করিব না। আজ একটি মূলগত বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা কর্তব্য সমাপন করিব। সভাপতি মহাশয় দেশের সামগ্রিক শ্রীবৃদ্ধি ও সম্পদ বর্ধনের জন্য দলনির্বিশেষে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গ ও বক্তব্যের তলে ইহা তাঁহার একটি মূলগত আবেদন। তাঁহার আবেদন হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জনগণের সহযোগিতা আশানুরূপ পাওয়া যাইতেছে না। পাওয়া গেলে বিষয়টির উপরে এত জোর দিবার আবশ্যক ছিল না। জনগণের সহযোগিতার অন্তরায় সম্বন্ধেও শ্রীযুক্ত ডেবর সচেতন। তিনি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, কিরূপে তাহা অপসারিত করা সম্ভব, তাহাও বলিয়াছেন। "কংগ্রেস যদি কল্যাণ সাধন করিতে চায়, তবে তাহাকে ব্যক্তিগত ও উপ-দলগত রাজনীতির সংকীর্ণ ও গভীর কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে এবং ইহার সামর্থ্য ও জীবনী শক্তির বিকাশ সাধন করিতে হইবে।"

কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সহযোগিতা অভাবের প্রধান দায়িত্ব তিনি কংগ্রেসের উপর ন্যস্ত করিয়াছেন। প্রধান দায়িত্ব যে কংগ্রেসের তাহা ভুল নয়। কিন্তু তিনি যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা ছাড়া কংগ্রেসের দায়িত্বের অন্য কারণও থাকিতে পারে। আমাদের বিবেচনায় খুব সম্ভব ইহাই প্রকৃত কারণ।

কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারত-রাষ্ট্র যে পথ বাছিয়া লইয়াছে, তাহার ছাঁচ কতকটা গণতান্ত্রিক, কতকটা সমাজতান্ত্রিক; কিংবা বলা যাইতে পারে, গণতন্ত্রের কাঠামোতে সমাজতন্ত্রের নীতি ও পরিকল্পনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। এজাতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের নাম দেওয়া যাইতে পারে—গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র। এ একটি সম্পূর্ণ নূতন অপরীক্ষিত ও বহুলাংশে অচিহ্নিত পথ। অদ্যকার পৃথিবীতে গণতন্ত্র আছে, গণতান্ত্রিক রাজতন্ত্র আছে, গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্র আছে, সমাজতন্ত্র আছে; সমাজতান্ত্রিক একনায়কত্ব আছে, কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রের অনুরূপ গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আছে বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে আমরা সকলে সচেতন কিনা জানি না।

সমাজতন্ত্র মানে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত জীবন। কিন্তু ভারত-রাষ্ট্রের সংবিধানানুযায়ী রাষ্ট্রই একমাত্র সত্তা নয়—ব্যক্তিও সমান প্রবল। বস্তুত এ রাষ্ট্রের মূলে আছে রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সমান অংশীদারিত্ব। এখন, এহেন রাষ্ট্রে দলনির্বিশেষে জনগণের সহযোগিতার স্বরূপ কেমন হইবে? এদেশে কোনও ব্যক্তি 'পরিকল্পনায়' সহযোগিতা না করিলে পক্ষে কারণে বা অযথা 'পরিকল্পনার' নিন্দা করিলে আইন অনুসারে তাহাকে দণ্ড দেওয়া চলিবে না—কারণ এইরূপ সমালোচনার অধিকার সংবিধানসম্মত। এখন, ব্যক্তির স্থলে যদি সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে ধরি, তবে ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। আইন লঙ্ঘন না করিয়া সরকারের পতন ঘটাইবার অধিকার তাহাদের আছে। বাস্তবসম্মত কারণে বা অন্যথা সরকারের উদ্দেশ্য ও নীতির উপরে জনগণের আস্থা বিগলিত করিয়া দিবার অধিকার তাহাদের আছে, সরকারের চেয়ে তাহারাই যে প্রকৃত কল্যাণকামী, একথা প্রচার করিবার অধিকার তাহাদের আছে। কাজেই এখানে জনগণের সহযোগিতা কামনা করিতে হইলে আশাকে খাটো করিতে হইবে। ইংলণ্ডে বা মার্কিনে কোন রাজনৈতিক দলপতি (যুদ্ধাদি রাষ্ট্র সংকটের সময় ছাড়া) ঐরূপ আশা পোষণ করেন না বা ব্যক্ত করেন না। চীন ও রুশের মত দেশেও রাষ্ট্রনায়ক ঐরূপ আশা পোষণ করেন না। কারণ সেখানে রাষ্ট্র তথা পার্টি কর্তৃক সর্বজীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে সহযোগিতা দান জনগণের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না—উহা বাধ্যতামূলক। এখন, এখানেই ঘটিয়াছে ভারত-রাষ্ট্রের সংকট। তাহার একদিকে ইংলণ্ড ও মার্কিন, অপরদিকে রুশ ও চীন—মাঝখানের সংকীর্ণ অপরীক্ষিত পথে তাহার গতি। কিন্তু জনগণের সহযোগিতা কামনার বেলায় আমাদের মনে অগোচরে রুশ ও চীনের দৃষ্টান্ত উদিত হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে যে তাহা সম্ভব নয়, তাহা বুঝিয়াও আমরা বুঝি না। তখন মন মুহ্যমান হইয়া পড়ে—ইহাকেই বলিয়াছি সংকট।

ভারতের মত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে আশা-আকাঙ্ক্ষার, জনগণের সহযোগিতায় রাষ্ট্র ও ব্যক্তির সম্পর্কের নূতন নিরিখ বা মান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অকারণে উল্লসিত বা ম্রিয়মান হইলে চলিবে না। বর্তমান সংবিধানে ও পরিস্থিতিতে যে এতটা কাজ করা সম্ভব হইয়াছে বিচার করিলে দেখা যাইবে, ইহাই প্রকাণ্ড বিস্ময়। আমরা ভারত-রাষ্ট্রের পথ বদল করিতে বলিতেছি না, বলিতেছি যে অকারণে উল্লসিত বা মুহ্যমান হওয়া উচিত হইবে না।

প্রসঙ্গত

গতবার প্রসঙ্গত শীত ঋতুর উল্লেখ করেছিলাম। তখন ভাবিনি উল্লেখমাত্র সে অন্তর্ধান করবে। এবারকার শীতকালকে বিশেষ করে কলকাতায় তার যে নমুনা দেখেছি, আবু হোসেন বলা যায়। তার সুলতানির আয়ু নিতান্ত কয়েক দিনের। দিনকতক সে দাপট দেখাল, আমরা জড়োসড়ো হলাম, কেউ কেউ, এখন স্বীকার করতে বাধা নেই, গা-ঢাকাও দিয়েছিলাম। এখন ভাবছি, এইমাত্র, আর কিছু নয়? ভেঙে গেছে ভয়। মধুবনের গন্ধ মিলিয়ে যেতে না যেতে আবার গরম আচ্ছাদনাদি তোরংজাত করতে না হলে বাঁচি।

* * *

এই শীতেই নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশন সাঙ্গ হল। বর্ষীয়ান নেতারা বারবার পুরনো দিনের কথা স্মরণ করেছেন। সেই নাগপুর, সেই কংগ্রেস, তবু সব যেন ঠিক যথাপূর্ব নয়, ঠিক মিলছে না, একটুখানি ফাঁক থেকেই যাচ্ছে। ১৯২০ সাল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পর। তখন নেতৃবৃন্দের সংকল্প ছিল অসহযোগ। অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারত ছাড়'র দীর্ঘ-দুর্গম পথ-পরিক্রমার পর স্বাধীনতা। লক্ষ্য লব্ধ সে শুধু আপাত-বিচারে। একটি শিখরে উঠে নেতৃবৃন্দ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে উপলব্ধি করেছেন যে, যা লব্ধ, তা নিতান্তই সামান্য, অনারব্ধই বেশী। দূরতর দিগন্ত তাদের সম্মুখে প্রসারিত, আজও স্বাধীনতাকে সর্বার্থে সাধক করে তোলার কাজ এখনও বাকী। এবারকার অধিবেশনে সভাপতির মঞ্চ থেকেও তাই সতর্কবাণীই উচ্চারিত হয়েছে। শ্রী ঢেবরের অভিভাষণে আত্ম-তৃপ্তির চেয়ে কিংকর্তব্যের প্রশ্নই বড়।

* * *

তারও আগের প্রশ্ন হল, কর্তব্য কার? কংগ্রেসের? জাতির? না সরকারের? একদা সংগ্রামের কালে, প্রথম দুটি প্রায় সমর্থক ছিল। পরে তৃতীয়টির সংযোগ, সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের সমগ্র জাতির প্রতিনিধিত্ব করবার দাবীকে বহুলাংশে খণ্ডিত করেছে। সে এখন দেশের অন্যতম দল। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে প্রধানতম রাজনৈতিক দল। এবং যেহেতু শাসনযন্ত্র কংগ্রেসেরই করায়ত্ত, অতএব কংগ্রেসের নীতি সিদ্ধান্ত ইত্যাদি সরকারী স্বীকৃতির আভিজাত্য পেয়ে থাকে। কংগ্রেসের সাংবৎসরিক অধিবেশনগুলির গুরুত্ব—যা সমগ্র দেশের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত—অধুনা এইখানে।

অন্য দেশে যে রাজনৈতিক দলের হাতে শাসনরশ্মি, সেই দলের সভায় উদার আত্মপ্রশস্তিই শ্রুত হয়। সাফল্যকে সেখানে বড় করে দেখান হয়, বিফলতা চাপা থাকে। কংগ্রেসের দায়িত্ব দ্বিবিধ। তাকে আত্মসমালোচনাও করতে হবে, যাতে দল হিসাবে তার সত্তা সম্পর্কে সাধারণের আস্থা ক্ষুণ্ণ না হয়। এদেশে কোন বিরোধী দলই যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। ফলে গণতন্ত্রের প্রহরীর ভূমিকাও কংগ্রেসের।

* * *

এখন প্রশ্ন, এই দায়িত্ব পালন করতে কি কংগ্রেস পারছে? বা কতখানি পেরেছে? দলের অভ্যন্তরীণ সংহতি-সাধনের সঙ্গে নির্ভীক, নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার সামঞ্জস্য-বিধান সহজ কাজ নয়। প্রথমটিতে শৈথিল্য ঘটলে দল বিলোপের আশঙ্কা, আবার দ্বিতীয়টি তিরোহিত হলে দলে প্রাণস্পন্দ থাকবে না, জাতির ভবিষ্যতের পক্ষে কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়।

আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও বিরোধের ছাপ আছে কংগ্রেসেরই আত্মকৃত কয়েকটি ব্যবস্থায়, দলের নানা স্তরে, কোন কোন অঞ্চলে সময়-সঞ্চিত অসন্তোষে। সৌরাষ্ট্রের ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের সমস্যা এখনও অমীমাংসিত; উত্তর প্রদেশে দলাদলি। সম্মুখে সমর যেখানে নেই, সেখানেও অন্তরালের ধূম বহ্নির প্রমাণ।

দ্বন্দ্ব সর্বত্র আবার আদর্শ বা নীতিগত নয়। দ্বন্দ্ব যেখানে নীতিগত, তার পরিচয় আমরা পূর্বেও পেয়েছি। এই কংগ্রেস থেকেই ফরোয়ার্ড ব্লক, প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ইত্যাদির উদ্ভব। পূর্ণ বিচ্ছেদ এতটা আশঙ্কাজনক নয়, যতটা অভ্যন্তরীণ বিরোধ-কণ্টক। আধুনিক-কালের বিরোধ অনেকাংশেই কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও স্পষ্টভাবে, ক্ষমতা লাভের বিরোধ। হয়ত এই আত্মনাশা বিরোধের ফলেই কংগ্রেসের কর্মসূচীতে প্রতিশ্রুতি যত থাকে, ফলে তার পরিচয় তত মেলে না। নেতৃবৃন্দ গৃহকলহের কারণ নির্মূল করুন, কংগ্রেসের বাহিরের শক্তির অভাব নেই, অন্তরের শক্তি, মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠারও অনেকখানিই সে ফিরে পাবে।

* * *

ইণ্ডিয়ান রোড কংগ্রেসের দৌলতে সম্প্রতি একটা তথ্য আমরা জেনেছি। ট্রেনের তুলনায় অন্যান্য যানবাহনের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। হিসাবে দেখা যায়, যাত্রীর সংখ্যা দু দিকেই সমান সমান। ট্রেনে যত লোক যাতায়াত করে বাস ট্রাম ট্যাক্সিতে তার চেয়ে কম লোক যাওয়া-আসা করে না। এ হিসাব লোক যাতায়াতের। মাল পরিবহণের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না, কিন্তু তার পরিমাণও যে নিতান্ত কম নয়, সেটা গোরুর গাড়ির কথা ভাবলেই বোঝা যায়। এদেশে একমাত্র গোরুর গাড়ির সংখ্যাই সাড়ে নয় লক্ষ। গোরুর গাড়ির সংখ্যা যে ক্রমশ বাড়তে থাকবে সেটাও অনুমান করা কঠিন নয়। কারণ ট্রেনের মাশুল বেশি এবং হঠাৎ গাড়ির সংখ্যা-বৃদ্ধি হয়ে ভাড়া কমে যাবে এমন আশাবাদী হবার সমস্ত কোন কারণ দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া ট্রেনের গতিপথ নির্দিষ্ট, তার রেল-লাইনে চলার উপায় নেই, কিন্তু গোরুর গাড়ির পক্ষে লাইনটা সমস্যা নয়, তার গতি প্রায় অবাধ, যদি রাস্তা ভাল থাকে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছে সাধারণ রাস্তাঘাটের এখনও দুয়োরানীর দশা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরি-কল্পনায় রাস্তার জন্যে বরাদ্দ ১৭ কোটি টাকা, কিন্ত রেলের বেলায় তার পরিমাণ ৯০ কোটি। ইণ্ডিয়ান রোড কংগ্রেস এই অসম অর্থ-ব্যবস্থার দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

সোভিয়েট নেতা মিঃ মিকোয়ানের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের ধরণটা একটু কৌতূহলোদ্দীপক। মিঃ মিকোয়ান মার্কিন সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে আমেরিকায় যাননি। তিনি ছুটিতে বেড়াতে গেছেন, মার্কিন সরকারের সঙ্গে তাঁর কোনো কাজই নেই, আমেরিকায় তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের অতিথি—এইটে হচ্ছে এই ব্যাপারের বহিরাবরণ এবং কতকাংশে আক্ষরিকভাবে সত্যও বটে। একথা ঠিকই যে মিঃ মিকোয়ান আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন সরকারের আমন্ত্রিত অতিথি নন। কিন্তু মিঃ মিকোয়ানের মতো উচ্চস্তরের কোনো সরকারী নেতার পক্ষে অন্য কোনো দেশে "বেড়াতে" যাওয়াই সম্ভব নয় যদি না সেই দেশের সরকারের আগ্রহ না হোক অন্তত সম্মতি থাকে। মিঃ খ্রুশেচভ মিঃ মিকোয়ানকে একটি "কূটনৈতিক ক্ষেপণাস্ত্র" স্বরূপে আমেরিকায় প্রেরণ করেছেন, এ রকম কল্পনা করার কোনো হেতু নেই। মার্কিন সরকার যদি না চাইতেন যে, মিঃ মিকোয়ান আমেরিকায় আসেন তাহলে তাঁর আসা হোত না, কূটনৈতিক ভদ্রতা রক্ষা করেও তা করা যেতো। আর কিছু না হোক নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রশ্ন নিয়ে টালবাহানা করে অনেককাল কাটিয়ে দেওয়া যায়। মিঃ মিকোয়ান সোভিয়েট রাষ্ট্রদূতের অতিথি হলেও আমেরিকায় তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা তো মার্কিন সরকারকেই করতে হচ্ছে এবং মিঃ মিকোয়ানের মতো লোকের জন্য যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে তা নিশ্চয়ই খুব সামান্য রকমের নয়। বোধ হয় "ছুটির বেড়ানোর" প্রশস্ত গণ্ডী এবং ঢিলে ঢালা ভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার খাটুনি আরো বেশি। যাই হোক মিঃ মিকোয়ানের বর্তমান মার্কিন ভ্রমণের মার্কিন সরকারের অনাগ্রহ কল্পনা করার পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। বরঞ্চ মিকোয়ানের এ ধরনে আসার এই উদ্দেশ্য হতে পারে যে, সোভিয়েট ও মার্কিন সরকার উভয়েই পা টিপে টিপে এগিয়ে দেখতে চাচ্ছেন যে কেবল সোভিয়েট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি শীর্ষ সম্মেলন হতে পারে কি না। সোভিয়েট সরকার অনেক আগেই এবং একাধিকবার কেবল মার্কিন সরকারের সঙ্গে জাগতিক সমস্যাসমূহের আলোচনা করার প্রস্তাব করেছেন। কিন্তু আমেরিকা তাতে আগ্রহ দেখায়নি। আমেরিকা এবং তার মিত্রদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য সোভিয়েট সর্বদাই চেষ্টা করছে, এটা পশ্চিমা কূট-নীতির একটা সব সময়ের আতঙ্ক। কিন্তু রাশিয়াও যে ঘটনা এবং নিউক্লিয়ার অস্ত্রের অগ্রগতিতে, বিশেষ করে ইয়ুরোপে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত শক্তিদের মধ্যে নিউক্লিয়ার অস্ত্র বিতরণে আতঙ্কিত হয়ে একটা আপোষ মীমাংসার জন্য সত্যই লালায়িত হতে পারে এ সম্ভাবনাটা পশ্চিমা শক্তিগোষ্ঠী মানতে চায় না। তার মধ্যে আবার যদি বা কেউ তা মানে তবে তার চেষ্টা হয় সোভিয়েটের ভয় ও উদ্বেগের সুযোগ নেওয়ার দিকে। সুতরাং পরস্পরের ভয় দূর করার দিকে না গিয়ে পরস্পরের ভয় বৃদ্ধি করার দিকে উভয় পক্ষ চলছে।

অবশ্য বর্তমান অবস্থায় যদি রাশিয়া ও আমেরিকা একত্রিত হয়ে নিউক্লিয়ার অস্ত্র সম্পর্কে কোনো চুক্তি করে তবে আপাতত তার বিরুদ্ধতা করার শক্তি কারো নেই। তাতে সাময়িকভাবে পৃথিবীতে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের ভয় দূর হল বলে

অনেকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে। সোভিয়েট এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে "নিউক্লিয়ার বিদ্রোহ" করার ক্ষমতা আপাতত কারো নেই। কিন্তু সোভিয়েট ও আমেরিকা নিউক্লিয়ার চুক্তি করেও যদি এখনকার মতোই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির ভূমিকা আশ্রয় করে থাকে তাহলে তাদের স্ব স্ব গোষ্ঠীর অন্তর্গত রাষ্ট্রসমূহের মতামতের ধার না ধরে উপায় নেই। আর যদি সোভিয়েট এবং আমেরিকা নিজেদের মধ্যে পৃথিবীকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ভাগ করে নিতে চায়। ইচ্ছা থাকলেও সেটা তাদের সাধ্যের মধ্যে নেই, যদি থাকতো তবে সে সম্ভাবনাও মানুষের পক্ষে নিউক্লিয়ার যুদ্ধের সম্ভাবনার চেয়ে বিশেষ কম ভয়াবহ হোত না। যাই হোক, মিঃ মিকোয়ান যেভাবেই বা যে উদ্দেশ্যেই আমেরিকায় গিয়ে থাকুন, সরকারী বেসরকারী সব মহলের সঙ্গেই তাঁর পরিচয় হচ্ছে এবং তার যে-সব বিবরণ কাগজে পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে মনে হয় যে কোনো রকম একটা রুশ-মার্কিন মিটমাট মস্কো চায়, অন্ততপক্ষে আমেরিকায় এই ধারণা সৃষ্টি করতে মস্কো চায়।

* * *

আমেরিকায় মিঃ মিকোয়ানের ভ্রমণের ধরণটা যেমন একটু কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি পূর্ব জার্মানীর (জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক) প্রধান মন্ত্রী হার গ্রোটেওহল্-এর ভারত দর্শনের রকমটাতেও একটু অভিনবত্ব আছে। হার গ্রোটেওহল্ ভারতে ভারত সরকারের অতিথিরূপেই এসেছেন। কিন্তু অতিথি বিদেশী প্রধান মন্ত্রী সম্পর্কে যে-সব আনুষ্ঠানিক রীতি পালন করা হয় পূর্ব জার্মানীর প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্কে সেগুলি পালিত হবে না, কারণ পশ্চিম জার্মানী যেমন রাষ্ট্র হিসাবে ভারত কর্তৃক স্বীকৃত এবং উভয়ের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান, পূর্ব জার্মানীর সম্পর্কে তা নয়, পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি এবং অদূর ভবিষ্যতে যে হবে তারও কোনো সম্ভাবনা নেই। তাহলেও হার গ্রোটেওহল্ এবং তাঁর সঙ্গী দলের প্রতি আসল "খাতির" নিশ্চয়ই কম হবার কথা নয়। হার গ্রোটেওহল্ এখান থেকে হ্যানয় (উত্তর ভিয়েৎনামের রাজধানী) এবং তারপরে পিকিংএ যাবেন। বলা বাহুল্য পূর্ব জার্মানী রাষ্ট্র হিসাবে উত্তর ভিয়েৎনাম এবং চীন কর্তৃক স্বীকৃত। ইতিমধ্যে যুগোশ্লাভ প্রেসিডেণ্ট টিটো ভারতে দিনকয়েক ঘুরে যাচ্ছেন।

* * *

কুমিনটাং চীনের বিধান অনুযায়ী পর পর দুবারের বেশি অর্থাৎ এক সংগে বারো বছরের বেশি কেউ প্রেসিডেণ্ট থাকতে পারবে না। সেই নিয়ম অনুযায়ী চিয়াং কাইশেক ঘোষণা করেছেন যে, তিনি ১৯৬০এ অবসর গ্রহণ করবেন এবং আর প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য দাঁড়াবেন না। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও কম্যুনিস্ট চীন নাকি চিয়াং কাইশেকের অবসর গ্রহণের সংকল্পের সংবাদে মোটেই খুশী নয়। চিয়াং কাইশেক এবং চীনের কম্যুনিস্টরা এক বিষয়ে এক, কেউই চীনের তরফে নূতন পরাতন কোনো দাবী ছাড়তে রাজী নন। কুমিনটাং-এর প্রতি যত বিদ্বেষই থাক, কুমিনটাংএর প্রচারিত মানচিত্রের প্রতি কিন্তু কম্যুনিস্ট চীনের যথেষ্ট ভালবাসা দেখা যায়। অন্য পক্ষে কম্যুনিস্টদের হাত থেকে চীনকে উদ্ধার করার সংকল্প চিয়াং কাইশেকের যত দৃঢ়ই থাকে, কম্যুনিস্ট চীন কর্তৃক তিব্বতের স্বাধীনতা হরণের অভিযোগ ইউনোর নিকট উপস্থিত করার চেষ্টা যখন হয় তখন চিয়াং কাইশেকের প্রতিনিধিই সবচেয়ে আপত্তি করেছিলেন এই বলে যে, তিব্বত চিরকালই চীনের অধীন, সুতরাং এ নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। তেমনি চিয়াং কাইশেক কম্যুনিস্টদের হাত থেকে চীন উদ্ধার করতে চাইলেও তাইওয়ান (ফরমোজা) যে চীনের অংশ এ বিষয়ে তিনি অটল। অবশ্য তাইওয়ান চীনের অংশ বলে স্বীকৃত না হলে ইউনোতে চীনের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষুদ্রতম ছুতাও চিয়াং কাইশেক গভর্নমেণ্টের থাকত না। কিন্তু তাহলেও চিয়াং-এর অবসর গ্রহণ পিকিং সরকারের চিন্তার কারণ হতে পারে। পিকিং সরকার কর্তৃক "মুক্ত" না হওয়া পর্যন্ত তাইওয়ান এমন লোকের অধীনে থাকা চাই যিনি তাইওয়ানকে চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবী করবেন। চিয়াং কাইশেকের পরে যাঁর হাতে ক্ষমতা আসবে তিনি তা নাও করতে পারেন, এই আশংকা পিকিংএর হয়েছে। আমেরিকায় অনেকেই এখন মনে করে যে চিয়াং কাইশেককে চীনের প্রতিনিধি হিসাবে খাড়া করে রাখার চেষ্টার আর কোনই অর্থ হয় না। চীনের কম্যুনিস্ট সরকারকে স্বীকার করার পথ এখন পরিষ্কার করতে হবে। কিন্তু তাইয়ানকে কম্যুনিস্ট চীনের হাতে ছেড়ে দিতেও আমেরিকা নারাজ। আমেরিকার পক্ষে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টার একটাই পথ আছে সেটা হচ্ছে তাইওয়ানকে চীন থেকে আলাদা একটা রাষ্ট্রের মতো স্টেটাস দেওয়া। তা চিয়াং কাইশেকের কর্তৃত্ব থাকা পর্যন্ত সম্ভব নয় কারণ চিয়াং কাইশেক তাইওয়ানকে চীন থেকে পৃথক করে দেখতে কখনও রাজী হবেন না। সেই জন্য তাইওয়ানে চিয়াং কাইশেকের কর্তৃত্বের অবসান কম্যুনিস্ট চীনের পক্ষে সুখকর নয়। এই সঙ্গে তাইওয়ানকে ইউনোর ট্রাস্টিশিপের অন্তর্গত করার একটা কথা উঠেছে। তাতে কম্যুনিস্ট চীন আরো উদ্বিগ্ন হয়েছে কারণ পিকিং সরকারের আশংকা এই যে, এটা তাইওয়ানকে চীন থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করার দিকে একটা পদক্ষেপ হবে। সুতরাং চিয়াং থাকতে থাকতে তাইওয়ান সম্পর্কে একটা ফয়সালা পিকিং সরকার করার চেষ্টা করবেন। বর্তমানে পিকিং থেকে প্রচারিত সংবাদের ধুয়া হচ্ছে এই যে, মার্কিন সরকারই চিয়াংকে সরাবার চেষ্টা করছেন। চিয়াং কাইশেক কম্যুনিস্ট প্রচারের দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হবেন বলে মনে হয় না, কিন্তু যদি তাঁর এই ধারণা হয় যে, তাইওয়ানকে চীন থেকে বিচ্ছিন্ন করার দিকেই মার্কিন সরকার এগুচ্ছেন তাহলে চিয়াং কী করবেন বলা যায় না, চীনের অংশ হিসাবে তাইওয়ানকে রাখার আর কোনো উপায় না থাকলে চিয়াং তাইওয়ানকে কম্যুনিস্ট পিকিংএর হাতেও ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হতে পারেন। ১১-৭-৫৯।

শ্রীকৌটিল্য

পরিকল্পনার ব্যয়সংস্থানের চিন্তা সম্প্রতি খুব প্রাধান্য লাভ করছে। বিশেষত বাইরের দেশ থেকে সাহায্য ভিক্ষা না করাটাই যখন বাঞ্ছনীয় তখন এই চিন্তায় পরিমাণগত দিক ছাড়াও একটা গুণগত রূপান্তর আসছে। দেশের ভিতরেই কতটা সংস্থানের সৃষ্টি করা সম্ভব সেটা নতুন করে সবাই ভাবছেন। আজকের আলোচনায় স্বল্পসঞ্চয় (small savings) পন্থা সম্বন্ধে দু-চার কথা বলব।

চীন ছাড়া অন্য কোনো দেশে অর্থনীতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে স্বল্পসঞ্চয় আন্দোলন হয়েছে কিনা জানি না, তবে আমাদের দেশে প্রথম পরিকল্পনার আমল থেকেই এদিকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। এখন, কথা হচ্ছে যে, আমাদের দেশের পরিকল্পনাগুলির মোট ব্যয়ের তুলনায় স্বল্পপরিমাণ সঞ্চয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল পন্থা। তবে এই উপায়ে কিছু আয় যখন হবেই তখন একে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করাও যথাযথ নয়—সরকার সম্ভবত এই ধরনের মনোভাব আড়ালে রেখে তথাচ জনসাধারণকে স্বল্পসঞ্চয় সম্বন্ধে উৎসাহ দিয়ে আসছেন।

এদেশে স্বল্পসঞ্চয়ের সম্ভাবনা যেটুকু আছে তার কারণ এদেশের বিপুলসংখ্যক জনসাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত অথবা প্রায় দরিদ্র। এঁরা কোনকালেই যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করতে পারেন না, অথচ কিছুটা আর্থিক লাভের প্রলোভন রাখতে পারলে উল্লেখযোগ্য স্বল্পসঞ্চয় না হবার কারণ নেই। এই পন্থায় পাঁচ কিংবা দশ বছরে বিভিন্ন আয়-গোষ্ঠীর কাছ থেকে কতটা সঞ্চয় সরকারের হাতে আসতে পারে সেটা আমাদের পরিকল্পনায় হিসেব করে দেখবার সময় এসেছে। যদি আমরা ধরে নিই যে, অদূরভবিষ্যতে আমাদের দেশের জনসাধারণের ভোগের (consumption) পরিমাণ এবং প্রকৃতি বিশেষ পরিবর্তিত হবে না এবং মূল্যসূচকও স্থির থাকবে তাহলে দেশের আয়-বিতরণ (income distribution) না পাল্টে আমরা সংখ্যাতাত্ত্বিক স্তরে জানতে পারি বিভিন্ন আয়গোষ্ঠীর কাছ থেকে এবং মোটের উপর আমাদের বছরে কত টাকা স্বল্পসঞ্চয়ের আকারে পুঁজি প্রস্তুত (capital formation) হবে। এই হিসেবের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আরো হিসেব করতে হবে যে, আয়-বণ্টনের বিশেষ বিশেষ তারতম্যের সঙ্গে স্বল্পসঞ্চয়ের পরিমাণ ও প্রকৃতিও কিভাবে বদলে যাবে। এই খবরগুলো জানতে পারলে পরিকল্পনার পর্যায়ে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আয়-বণ্টন পরিবর্তিত করে জাতীয় সঞ্চয় বাড়াতে পারব। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের বর্তমান আয়-বণ্টন অত্যন্ত অসম; অর্থাৎ অল্পসংখ্যক লোকের হাতে বৃহৎ পরিমাণ এবং বিপুল জনসাধারণের ভাগে যৎসামান্য জাতীয় অর্থ আসে। অথচ, স্বল্পসঞ্চয়ের চরিত্রই হলো যে, তা স্বল্পবিত্তদের স্বাভাবিক আয় থেকে আসে। সুতরাং, পরিকল্পনার আমলে স্বল্পসঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াতে হলে আমাদের দেশে আয়-বণ্টনের ক্ষেপণের (dispersion) মাত্রা কমাতে হবে। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে স্বল্পসঞ্চয় বাড়াবার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী cumulative time deposit ব্যবস্থা বাতলেছেন। এই ব্যবস্থা উপযোগী সন্দেহ নাই; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মধ্যবিত্তের আয় অদূরভবিষ্যতে না বাড়াতে পারলে শুধুমাত্র উপরোক্ত ব্যবস্থায় খুব উৎসাহ-

জনক ফল পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। আরেক কথাঃ অনেকেই স্বল্পসঞ্চয় এবং বৃহৎ পরিমাণ সঞ্চয়কে বিকল্প বিষয় বলে মনে করেন। অর্থাৎ, বৃহৎ সঞ্চয় কিছুটা বাড়লে সেই অনুপাতে স্বল্পসঞ্চয়ের মূল্য যেন কমে যাবে। এটা অযৌক্তিক চিন্তা। কারণ বৃহৎ সঞ্চয়ের কমা-বাড়ার উপর স্বল্পসঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে না, নির্ভর করে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রের আয় ও জীবনযাত্রার ব্যয় মাত্রার উপর। দেশে কিছু-সংখ্যক স্বল্পবিত্ত লোক থাকলেই কিছু স্বল্পসঞ্চয় স্বাভাবিকভাবেই হতে থাকবে।
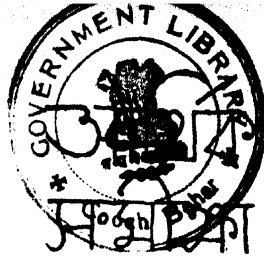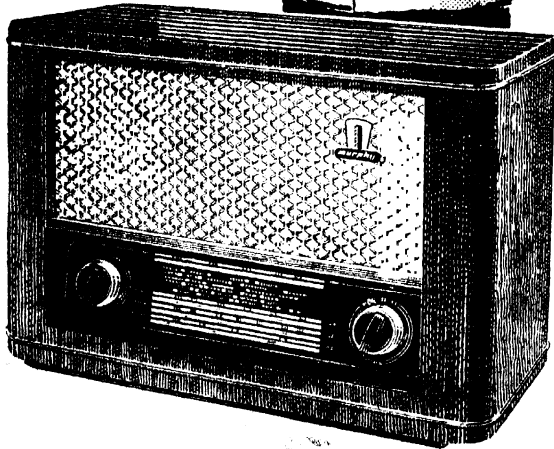
এই গেল একদিককার কথা। আরো দু-একটি বিষয় চিন্তার যোগ্য। স্বল্পসঞ্চয় আন্দোলনের সার্থকতার উদ্দেশ্যে মনস্তাত্ত্বিক প্রশ্নটি মনে রাখতে হবে। কোনো উন্নতিশীল দেশের জনসাধারণ সর্বদাই তাদের নিজের নিজের জীবনে সেই উন্নতির প্রসাদ কতখানি পেল সেটা বিশেষ-ভাবে বিবেচনা করে দেশের উন্নতির জন্য আপন সাহায্য এগিয়ে দেয়। আমাদের দেশে এতাবৎ স্বল্পসঞ্চয়কে সমগ্র রাষ্ট্রের তরফ থেকে দেখা হয়েছে বলে কোনো ব্যক্তিবিশেষ এর অবদান তার নিজের জীবনে খুঁজে পাচ্ছে না। এইজন্য আমাদের দেশের চীনের কাছ থেকে শিক্ষা নেবার প্রসঙ্গতো আছে। চীনের উন্নতির পিছনে জনসাধারণের আবেগপূর্ণ সহযোগিতার কারণ হচ্ছে চীনের আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। আঞ্চলিক উন্নয়নে প্রাসঙ্গিক অঞ্চলের লোকবল ও অন্যান্য উপকরণ নিয়োজিত হয় এবং সেই অঞ্চলের জনসাধারণের চোখের সামনের তাদের সহকারিতার ফল প্রসাদ হয়ে আসে। সহযোগিতা এবং তার নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট প্রসাদ উপভোগের ব্যবস্থার মধ্যে জনসাধারণের ও জাতীয় পরিকল্পনার পারস্পরিক আঙ্গিক সম্বন্ধটি নিহিত। ভারতবর্ষেও যদি এইরকম আঞ্চলিক ভিত্তিতে আত্ম-সংস্থানিক (self financing) পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং সেই পদ্ধতির মধ্যে স্বল্পসঞ্চয়কে যদি একটি বিশিষ্ট মূল্য দেওয়া যায় তবে স্বল্প-সঞ্চয়ের পরিমাণ, প্রকৃতি ও উপকারিতাও আরো কাম্য স্তরে উন্নীত হতে পারবে।

উপসংহারে বলব যে, আমাদের স্বল্প-সঞ্চয় আন্দোলনে সঞ্চয় বিষয়টিকে শুধুমাত্র টাকা-পয়সার আকারেই দেখা হচ্ছে। কিন্তু টাকা-পয়সা আমাদের সর্বশেষ প্রয়োজনে আসে না, আসল প্রয়োজন উৎপাদক সামগ্রীর। সুতরাং, যেসব অঞ্চলে (যথা, দরিদ্র গ্রামাঞ্চলে) এই আন্দোলনে টাকা-পয়সার সঞ্চলের দিক দিয়ে বিশেষ সাড়া পাবার সম্ভাবনা নেই সেখানেও আমরা বাস্তবিক উপকরণের (real resources) একটা আশাপ্রদ সঞ্চয় বা পুঁজি সৃষ্টি করতে পারি। দরিদ্র জনসাধারণকে কিছুটা আর্থিক লাভের প্রলোভন দিলে তারা খাদ্য-শস্য, বাঁশ, কাঠ, সারদ্রব্য, সেচনোপযোগী জল ইত্যাদি নিজেদের ব্যবহারের উদ্বৃত্ত হিসেবে রেখে স্বল্পসঞ্চয় বাড়াতে পারে। সরকার এইসব বাস্তবিক উপকরণের স্বল্প-সঞ্চয় যথারীতি সংগ্রহ করে নিয়ে আঞ্চলিক উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারবেন।

আলোচনা

দণ্ডকারণ্য ও উদ্বাস্তু সমস্যা

সবিনয় নিবেদন,—দণ্ডকারণ্যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে প্রকাশিত মত এবং ৩রা জানুয়ারী "দেশে" প্রকাশিত প্রতিমা মজুমদারের মতের সঙ্গে আমরাও সম্পূর্ণরূপে একমত।

গত দশ বৎসর ধরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যাপারে যে সমস্ত ভুল, ত্রুটি এবং অবিচার করে এসেছেন বর্তমানে শুধুমাত্র তর্কগুলি যুক্তি দিয়ে যদি আমরা তার সমালোচনাই করে চলি তবে কেবলমাত্র পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বাঙ্গালীমাত্রেরই নয় সমগ্র বাঙ্গালী জাতিরই ভবিষ্যৎ দুরবস্থার চরমসীমায় উঠে ধসে পড়বে। অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে সর্ববিষয়ে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে। কারণ সরকারী হিসেব মেনে নিলে এখনও ৩৬ লক্ষাধিক ব্যক্তির অর্থাৎ আন্দাজ ৭ লক্ষ পরিবারের পুনর্বাসন প্রয়োজন। এত অধিক সংখ্যক পরিবারের পুনর্বাসন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় অসম্ভব। কারণ পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যেও বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং এই ৩৬ লক্ষ উদ্বাস্তুর সবাই যদি জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের জমির উপর নির্ভর করে থাকলে খুবই ভুল করা হবে। কারণ এই ৩৬ লক্ষের মধ্যে আন্দাজ ১০ লক্ষ কৃষিজীবী অথবা গ্রাম্য ব্যবসায়ে বা শিল্পে অভ্যস্ত। এদের জন্য প্রয়োজন প্রচুর চাষের জমি।

অপরদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে খুবই আগ্রহসহকারে বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য দণ্ডকারণ্যের বনাঞ্চলে আবাদ করার পরিকল্পনা তৈরী করেছেন। এবং শুধু পরিকল্পনাই নয় সম্প্রতি কাজও শুরু হয়ে গেছে। এই উপনিবেশের রাস্তাঘাট, রেল লাইন, স্কুল পাঠশালা ইত্যাদির প্রাথমিক ব্যয়ভার ভারত সরকার গ্রহণ করবেন এবং যতদিন না বসতিস্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হবে ততদিন উদ্বাস্তুদের পরিশ্রমের অনুপাতে বেতন দেবেন। এই অঞ্চলটি উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্র প্রদেশের কিছু কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। ৮০ হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত এই দণ্ডকারণ্যের বনাঞ্চলে বৃক্ষ সম্পদ ও খনিজ সম্পদ প্রচুর।

বাংলা দেশের বাইরে ৮০ হাজার বর্গমাইলব্যাপী আরেকটি যদি বাংলা ভাষী অঞ্চল গড়ে ওঠে তবে কি সেটি ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে খুবই শুভ হবে না?

রাজনৈতিক দলাদলির কথা ভুলে গিয়ে ঠিক যদি বাস্তববাদীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করা যায়—তাহলে এখন আমাদের এ প্রশ্ন করা উচিত হবে না যে, দশ বৎসর পরে ভারত সরকারের এ পরিকল্পনা কেন? আসল প্রশ্ন হবে—ভারত সরকারের পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপ দেওয়া যাবে কতখানি। এবং এবিষয়ে শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী নয়—পশ্চিমবঙ্গের জীবিকাবিহীন বাঙ্গালীদেরও বসতি স্থাপনের সুযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আরও একটি বিষয় হল বাংলা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানেই বাংলার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়। প্রবাসী বাঙ্গালী মাত্রেই বাংলার সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন বাঙ্গালী নন। ডাক্তারী, ওকালতি এবং চাকুরির বৃত্তি নিয়ে সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যদি জব্বলপুরে, নাগপুরে, দিল্লী এবং উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে দ্বিধা না করে থাকেন— এবং তাঁদের সংস্কৃতি যদি অক্ষুন্নই থেকে থাকে তবে এ বিষয়েও দ্বিধা করার কোনও সুযুক্তি থাকতে পারে না। অবশেষে আরও একটি বিষয়ে চিন্তা করবার আছে। আজ যদি দণ্ডকারণ্য বসতির ব্যাপার বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা প্রত্যাখ্যান করেন তবে ভারতের অন্য প্রদেশের জীবিকাবিহীন ব্যক্তিরা অতীব আগ্রহের সঙ্গে এ সুযোগ গ্রহণ করবেন, এবিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই। বাংলার বাইরে অবাঙ্গালীদের মধ্যে আজ এ প্রশ্ন ক্রমেই দানা বেঁধে উঠছে—দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনা শুধুমাত্র বাঙ্গালীদের জন্য কেন? আমার বাঙ্গালী উদ্বাস্তু বন্ধুরা এবিষয়েও চিন্তা করে দেখবেন আশা করি। ইতি—গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী, নূতন দিল্লী।

বাংলার নাটক

শম্ভু মিত্রের লেখা 'বাংলা নাট্যধারার পথ নিরূপণ' পড়লুম। আমাদের দেশের এবং এদেশের নাট্যধারা লক্ষ্য করে নাট্যশিল্পের ছাত্র হিসেবে তাঁর মন্তব্যগুলো খুবই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে।

আমাদের একটা জাতিগত দোষ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অপ্রিয় হলেও সত্যি। তা হচ্ছে অনুকরণপ্রিয়তা। যাঁরা বলছেন যে আমাদের মঞ্চ সেই ভরতের যুগে ফিরে যাক, আর যাঁরা বলছেন যে মঞ্চ পুরোপুরি পাশ্চাত্যধর্মী হয়ে উঠুক, তাঁরা আসলে একই কথা বলছেন, অনুকরণ করো। আমাদের মঞ্চ কি হবে তা স্থির করবার আগে ঐ প্রবৃত্তিটাকে দূর করতে হবে। তাঁদেরকে বলতে হবে যে, দেশ, কাল, পাত্র ভুলে গিয়ে শুধু কার্বন কপি করলেই মঞ্চের রূপ নির্ণয় করা যায় না। এটা সবাই স্বীকার করবেন যে, বৌদ্ধযুগীয় স্তূপগুলো সত্যিই শিল্পসম্মত, কিন্তু আজ সেখানে বাস করতে নিশ্চয়ই কেউ উৎসাহ বোধ করবেন না। এদিকে পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমাদের গরম দেশের বাড়িগুলিতে Central Heating-এর ব্যবস্থা যদি করি তাহলে দশাটা কি দাঁড়াবে সহজেই বোধগম্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নাট্যধারাকেও আমাদের জীবনধারার সাথে তাল রেখে চলতে হবে। আমরা যেমন আজ আমাদের জীবনে প্রাচীন ভারতীয় রীতি সম্পূর্ণ মেনে চলি না, তেমনি পুরোপুরি সাহেবও হয়ে উঠিনি। এ দুয়ের মাঝামাঝি কোন এক যায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। কাজেই আমাদের মঞ্চেও এ দুয়ের সমন্বয় ঘটালেই বোধ হয় প্রয়োজন এবং তার জন্যে সবার আগে দরকার সত্যিকারের শিল্পবোধ এবং মৌলিক চিন্তা।

যাঁরা থিয়েটারকে সিনেমা করে তুলতে চাইছেন তাঁরা নিশ্চয়ই এ দুয়ের মূল পার্থক্যটুকু উপেক্ষা করছেন। সিনেমায় ইচ্ছা করলেই Locationএ গিয়ে সত্যিকারের দৃশ্যের ছবি তুলে আনা যায়, কিন্তু থিয়েটারে তা সম্ভব নয়, সেখানে নিতে হয় কৃত্রিমতার আশ্রয়। তাই যত জাঁকজমক সহকারেই মঞ্চসজ্জা করা হোক না কেন দর্শকের মনে সব সময়ই জেগে থাকে যে ওটা বানানো। তাছাড়া, মঞ্চসজ্জাই সবকথা এবং শেষ কথা নয়। মঞ্চের মূল কথা হচ্ছে নাটককে ফুটিয়ে তোলা। —এবং তাকে ফুটিয়ে

তুলতে গেলে যতটুকু দৃশ্যপট, জিনিসপত্র (Props) ও আলো না হলে নয় ঠিক ততটুকু ব্যবহার করা। Edwin G. White তাঁর 'Acting And Play Production' বইতে লিখেছেন—

"The essence of drama is illusion. ....The only essential for dramatic presentation are an acting space, an auditorum and actors....Audiences are quite willing to join in a game of 'Let's pretend,' but they will not accept as reality that which is obviously fake."

তবুও যাঁরা মঞ্চে তিন ফুট জল না উঠলে খুশী নন, তাঁদেরকে বলতে চাই যে, বলশই থিয়েটার, কিম্বা ব্রডওয়ের থিয়েটার আমি দেখিনি, কিন্তু লণ্ডনের থিয়েটার দেখেছি এবং দেখছি। তা থেকে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, কলকাতায় পেশাদার মঞ্চগুলোতে (কলকাতার কোন শৌখীন দলের অভিনয় আমি দেখিনি, তবে বহুরূপীর প্রায় সব নাটকের দৃশ্যপটের ছবি দেখেছি এবং 'রক্তকরবীর' মঞ্চসজ্জা আমার কাছে অত্যন্ত উচ্চস্তরের শিল্পনৈপুণ্য বলে মনে হয়েছে) যে ধরনের দৃশ্যসজ্জা ও আলোকসম্পাত করা হয় তা মোটেই ফেলনা নয়। অবশ্য এটা খুবই সত্যি যে ইলেকট্রনিক বোর্ড থাকলে এবং আলোকে যদি একশো ভাগে ভাগ করে lader দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রক্ষেপণ করা যায় তাহলে অত্যন্ত সুবিধা হয়। কিন্তু এ হচ্ছে টেকনিক্যাল সুবিধা অসুবিধার কথা। এর সাথে নাটকের কিম্বা দর্শকের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক সামান্যই। অর্থাৎ আলো যে পদ্ধতিতেই ফেলা হোক না কেন তা যদি প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে তা হলেই যথেষ্ট। প্রেক্ষাগৃহের কথা যদি বলেন, তাহলে কলকাতার নবনির্মিত প্রেক্ষাগৃহগুলির বিশেষ করে স্টারের মত আধুনিক শিল্প রুচিসম্পন্ন আরামপ্রদ প্রেক্ষাগৃহ লণ্ডনে (রয়েল ফেস্টিভ্যাল হল বাদে) কমই আছে বললে বিলেতপ্রেমিকেরা নিশ্চয়ই আমাকে তেড়ে আসবেন না। এরপর অভিনেতার কথা। আমাদের দেশে শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র মত অভিনেতা বেশী নেই যেমন সত্যি, তেমনি সত্যি যে এদেশেও লরেন্স অলিভিয়ার, গিলগুড, রালফ রিচার্ডসন কিম্বা মাইকেল রেডগ্রেভও খুব বেশী নেই। আমাদের দেশে শিশির ভাদুড়ীদের পরে এক শ্রেণীর শক্তিমান অভিনেতা আছেন, এদেশে সেই শ্রেণীর অভিনেতারা ততখানি উজ্জ্বল নন এবং তরুণদের মধ্যে আহামরি গোছের অভিনয় নৈপুণ্য দেখিনি (comedian ও গায়ক অভিনেতাদের কথা ছেড়ে বলছি, কারণ আমাদের দেশে সত্যিকারের কমেডিয়ান কজনইবা আছেন, আর গায়ক অভিনেতা তো নেইই)। তবুও অনেকে বলবেন যে, তাহলে লণ্ডনে এক একটি নাটক পাঁচ সাত বছর ধরে চলছে। 'মাই ফেয়ার লেডী'র জন্য এখুনি ১৯৬০ সালের টিকিট বিক্রী হচ্ছে আর আমাদের মোটে চারটে পেশাদার মঞ্চ তাও সব সময় ভাল করে চলে না কেন? এর জবাব দিতে পারেন শুধু আমাদের নাট্যকার ও দর্শকেরা।

এবার আসছে নাটকের কথা। নাটক কি ধরনের হবে তা নিয়ে কোন বিতর্কে না গিয়ে এবং নাট্যকারকে কোন গণ্ডি টেনে না দিয়েও বলা যায় যে, নাটক হবে মানুষের কথা, জীবনের কথা। তার রূপ স্বভাবতই বস্তুতান্ত্রিক ও মহৎ হবে। এবং সেই মানুষ ও তার জীবনের কথা বলতে গিয়ে যদি পেছন ফিরে তাকাতে হয় তাকাব, যদি গলা বাড়িয়ে সামনেটা দেখতে হয় দেখব, কিম্বা যদি বিদেশী নাটকের অভিনয় করতে হয় করব—একে যদি কেউ চালিয়াত লোকের ইনটেলেকচুয়াল চুলকানি বলে বলুক। বাংলা ভাষা কিরকম হবে তা বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "প্রয়োজন হইলে অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি।" নাটক ও মঞ্চ সম্বন্ধে ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

প্রসঙ্গত, একই শারদীয়া সংখ্যায় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে লিখেছেন, "বিদেশী ভাল নাটক নিতে হবে বলে তার ভাষাও গ্রহণ করতে হবে এ মনোবৃত্তিটা দুর্বোধ্য।" অন্য নাটকের কথা জানি না। কিন্তু আমাদের দেশে স্কুল, কলেজে আজও শেক্সপীয়ার পড়ানো হয়। তাঁর নাটক শুধু ঘটনা ও এ্যাকশানের জন্য নয়, সংলাপের জন্যও বিখ্যাত। এবং যেহেতু নাটকের সার্থকতা অভিনয়ে সেইহেতু শেক্সপীয়ারের নিজের দেওয়া ভাষায় যদি তাঁর নাটকের অভিনয় করা হয় তাতে বাংলা নাট্য প্রগতির হয়ত কোন সাহায্য হবে না, কিন্তু সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির রসোপলব্ধিতে—বিশেষ করে স্কুল কলেজের ছাত্রদের সহায়তা করা হবে। উচ্চাঙ্গের সংস্কৃত নাটক অভিনয়েও এই একই যুক্তি।

সবশেষে, কোন ভারতীয়ত্বের মোহ না রেখেই বলছি যে, যাত্রার ঐতিহ্য আজও আমরা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলিনি। এর থিয়েটারের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে ওঠার কারণ হচ্ছে যে লজ্জায় কিম্বা অবহেলায় সত্যিকারের শিক্ষিত এবং শিল্প-রুচিসম্পন্ন লোকেরা এদিকে নজর দেন না। অথচ দর্শকের উপর যাত্রার প্রভাব আজও কম নয়। কাজেই যদি জ্ঞানী গুণী লোকেরা যাত্রার জন্য উপযুক্ত 'পালা' লিখে তাকে তুলে ধরবার জন্য এগিয়ে আসেন তাহলে আমাদের প্রমোদ-ক্ষেত্রে একটি খাঁটি নিজস্ব বাহন হাতছাড়া হয় না। ইতি—কুমারকুমার ভট্টাচার্য, লণ্ডন।

'চিত্রশিল্পী উইলিয়ম ব্লেক'

সবিনয় নিবেদন,—৩রা জানুয়ারীর দেশ পত্রিকায় "চিত্রশিল্পী উইলিয়ম ব্লেক" প্রবন্ধে শ্রীশিবনারায়ণ রায় লিখছেন: "উইলিয়ম অর্পেন তাঁর 'আউটলাইন অব আর্ট' গ্রন্থে ব্লেকের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেননি।" প্রকৃতপক্ষে আউটলাইন অব আর্টের ১৯৫৫ সালের সংস্করণের ৮০০ পৃষ্ঠায় ব্লেকের শিল্পকলা এবং তাঁর রচনারীতি যেসব শিল্পীদের প্রভাবান্বিত করেছে তাঁদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। ইতি—ভবদীয় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা-২৫।

'পুণ্যদর্শন পোপ'

মহাশয়—২০-১২-৫৮ তারিখের দেশ পত্রিকার ৫২০ পৃষ্ঠার শেষ প্যারার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

উক্ত প্যারাতে শ্রীযোগনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভ্যাটিকান প্রাসাদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—"এই প্রাসাদেই রক্ষিত আছে মাইকেল এঞ্জেলোর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'লাস্ট সাপার'।" 'লাস্ট সাপার' চিত্র মাইকেল এঞ্জেলোর আঁকা নয়—উহা লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা।

(vide Life of Leonardo Da Vinci, page no 358—One hundred great Lives published by Home Library club.)

ইতি—রথীন দত্ত, কলিকাতা।

[১২]

লতা বউদি কিন্তু বিজনের ব্যবস্থা-পত্রে সায় দিলেন না।

"নতুন ঠাকুরপো, তুমি কক্ষণো ওসব করতে যেও না। সব কাজ সকলের সাজে না।"

মোটে ত কয়েক ঘণ্টার আলাপ, এরই মধ্যে লতা বউদি কী-করে টের পেয়ে গিয়েছেন যে, সব কাজ সৌরকে দিয়ে হয় না।

সৌর মাথা নীচু করে চায়ের বাটিতে ছোট ছোট ঢেউ তুলছিল, বিশেষ কথা বলছিল না। বলার মত তখন আর কিছু ছিলও না, মাঝে মাঝে আড় চোখে একবার বিজনকে একবার লতা বউদিকে দেখছিল।

বিজন কখন যেন এরই মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছিল, ঘাড়ের নীচে দুটো হাত ভাঁজ করে রেখে বালিশের প্রয়োজন মিটিয়েছিল, দৃষ্টি শূন্যে অর্থাৎ কড়িকাঠে, ঠোঁটে চেপে-ধরা সিগারেট জ্বলছিল। আরামে এবং আলস্যে বিজন চোখ বন্ধ করেছিল, পাশে রাখা পেয়ালায় চা জুড়িয়ে যাচ্ছিল, বিজনের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। সিগারেটের ধোঁয়ার রঙ গাঢ়, লতা বউদির ঈষৎ রুক্ষ চুলের যে-গুচ্ছ কপালের ওপর এসে পড়েছিল অনেকটা সেইরকম দেখতে। চায়ের পেয়ালার ধোঁয়া প্রায় অদৃশ্য, ঘরের কোণের মাকড়শার জালের মত মিহি। ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত দিনের আলো এসে না পড়লে তাকে ঠাহর করাই যেত না।

একবার সেই ফাঁক দিয়ে চতুর একটু হাওয়াও এল, খানিকটা সিগারেটের ছাই পড়ল বিজনের গলার খাঁজে। কেননা, বিজন চিত হয়ে সিগারেট শুধু টেনেই চলেছিল, ছাই ফেলছিল না, বোধ হয় ভাবছিল, থাকুক না, আয়েস করে টানা শেষ হলে এক সঙ্গে সবটাই ছুঁড়ে ফেলব। অথবা বিজন চোখ বুজে অন্য সুখের কথা ভাবছিল, সিগারেটটার অস্তিত্ব একরকম ভুলেই গিয়েছিল।

কিন্তু যেই ছাই ঝরে পড়ল, অমনই চমকে উঠল বিজন, বলে উঠল, 'উঃ!' সদ্য-পোড়া সিগারেটের টাট্‌কা ছাই, তখনও কিছু গরম ছিল। বিজন কাতরোক্তি করল, কিন্তু চোখ তার যেমন বোজা ছিল তেমন বোজাই রইল, ঘাড়ের নিচে রাখা হাত দুটির একটিও বেরিয়ে এল না।

নিজের ঠাণ্ডা পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতেই সৌর দেখতে পেল, লতা বউদি একটা টোকা দিয়ে ছাইয়ের গুঁড়ো সরিয়ে দিলেন। দিলেন, কিন্তু সবটা সরাতে পারলেন না, বিজনের গলার খাঁজে ঘাম জমেছিল, তার সঙ্গে খানিকটা মিশে গিয়ে বিশ্রী গোটা দুই কালো দাগ পড়ল।

বিজন দেখতে পাচ্ছিল না, কিন্তু সৌর পাচ্ছিল। বারবার তার চোখ মাছির মত উড়ে উড়ে ওই কাল দাগ দুটোর ওপরই বসছিল। দেখছিল, লতা বউদি তর্জনী দিয়ে ঘষে ঘষে দাগটা তুলে দিতে চাইছেন। বিজনের চোখ বন্ধ, সে দেখছিল না, বোধ হয় টের পাচ্ছিল। দাগটা অবশ্য আঙুলের ঘষাতেও মুছে যেতে চাইছিল না। বরং আরও ছড়িয়ে পড়ছিল।

জাপানের হিকারি শহরের শ্রমিক নোবোরু কাওয়ামুরো একদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পথে এক জায়গায় কলহাস্যমুখরিত একদল মেয়ের সমাবেশ দেখে থমকে দাঁড়াল। কৌতূহলবশে কাছে গিয়ে দেখলে মেয়েরা এক রোগা দাড়িওয়ালা গণৎকারের কাছে তাদের হাত দেখাচ্ছে। কাওয়ামুরারও ইচ্ছে হল নিজের হাতটা একবার দেখায়। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকবার পর তার পালা আসতে ও পাঁচসিকে দিয়ে দিলে।

কাওয়ামুরার জানবার বিষয় ছিল কেন ও জন্ম থেকেই ভাগ্যবিড়ম্বিত হয়ে আসছে। ও বললেঃ "আমি যখন শিশু, আমার বাপ-মা মারা যায়; আমার কোন আত্মীয় স্বজন জীবিত নেই। একটাও মেয়ে পেলাম না যে আমাকে বিয়ে করতে চায়। কি যে আমার অপরাধ জানি না, কিন্তু কেবলই দুর্ভাগ্য আমার জীবনে।" আরো দুঃখের কাহিনী শোনালেঃ যখনই কোন চাকরি জুটেছে, হয় ওকে ছাড়িয়ে দিয়েছে, নয়তো সেই কোম্পানীই দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে। ফিরিওয়ালা হল কিন্তু ওর কাছ থেকে কেউ কিছু কেনে না। ঠাণ্ডা পড়লে সর্দি ধরবে সবায়ের আগে কাওয়ামুরার; ঝড়, প্লাবন বা অগ্নিকাণ্ড ঘটলে সবচেয়ে আগে তারই সামান্য যা কিছু সব বিধ্বস্ত হয়ে যায়। দুঃখ করে বললেঃ "যত কিছু দুর্ভাগ্য শুধু আমারই কেন?"

সব শুনে গণৎকার কাওয়ামুরার হাতটি দেখে গম্ভীরভাবে বললেঃ "সত্যিই তুমি অভিশপ্ত। তবে আমি বলতে পারি কি করে তোমার দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটবে। তোমার বাড়ি পেরিয়ে ছোট মাঠটায় যাও। সেখানে একটা অবহেলিত কবর দেখতে পাবে; বহু আগেকার এক সামুরাইয়ের কবর ওটা। তার আত্মা ক্রুদ্ধ হয়ে রয়েছে এবং নিকটতম আত্মীয়ের ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে, আর সে আত্মীয় তুমি। তোমার প্রয়োজন ওকে শান্ত করা।"

ঘাবড়ে গিয়ে কাওয়ামুরা জানালে, ও তাহলে ও-বাড়ি থেকে অন্যত্র চলে যাবে।

"তা হয় না, তা হয় না", গণৎকার বাধা দিয়ে বললে। "ওই সামুরাইয়ের আত্মা যখন তার কবরের প্রতি অবজ্ঞার জন্যে তোমাকে জড়িয়েছে এখন তুমি পৃথিবীর যেখানেই যাও ও তোমার পিছু নেবে।" গণৎকার বললে, কাওয়ামুরা যেন কবরের ওপরের ময়লা জঞ্জাল পরিষ্কার করে এবং "তারপর ধূপধুনো জ্বালিয়ে প্রার্থনা করে তাতেই সামুরাই তুষ্ট হবে।"

কাওয়ামুরা ছুটল শহরতলিতে তার পাতার ছাউনি লোকভর্তি ভাড়াটে বাসায়। বাসায় পৌঁছে তার সহ-ভাড়াটিয়াদের জানালে গণৎকারের কথা। সত্যিই, ওরাও তো
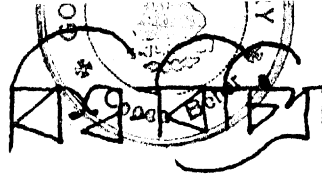
দেখেছে ফাঁকা মাঠটায় একটা পুরনো কবর, এত গভীরে পোঁতা যে, মাটির ওপর শুধু মাথাটাই দেখতে পাওয়া যায়। কারুর জানা

আফ্রিকার সুদানে মিশরীয় ফারোয়াদের মহত্তম মন্দিরে প্রাপ্ত বানরাকৃতি একটি ফুলদান। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে তৃতীয় এমেনোফিস কর্তৃক নির্মিত মন্দিরটি ১৮৪০ সনে প্রথম আবিষ্কৃত হবার পর ১৯৫৭ সনের শেষে পুনরায় খনন হতে এরূপ বহু শিল্প-নিদর্শন পাওয়া যায়

ছিল না কার সমাধি, কিন্তু ওখানেই রয়েছে বরাবর।

ভোর হতেই জীর্ণ বসন পরে এবং ঝাঁকড়া চুল রুমালে বেঁধে কাওয়ামুরা একটা কোদাল জোগাড় করে মাঠে ছুটল। রাস্তার লোক কেউ ঠাট্টা করতে লাগল ওর কাণ্ড দেখে, কেউ আবার উৎসাহও দিলে। সারা সকাল ধরে কাওয়ামুরা মাটি খুঁড়ে গেল। যা ভেবেছিল তার চেয়েও অনেক বেশী কাজ। দুপুরের মধ্যে ছ' ফিট খোঁড়া হতে সমাধি-স্তম্ভের একটা ধাপ পাওয়া গেল—এক ফিট পুরু, চার ফিট চওড়া গুরুভার পাথর। অত খাটুনির পর বিশ্রাম নেবার জন্য কাওয়ামুরা সেই ছ' ফিট গর্ত থেকে ওপরে উঠতে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বিরাট সমাধিস্তম্ভটা কাৎ হয়ে ভাগ্যহীন কাওয়ামুরার ঘাড়ে পড়ল। গণৎকারের কথাই একরকম ফলে গেল; কাওয়ামুরার দুর্ভাগ্যের অবসান ঘটল। ওর মৃত্যু হল।

*

সম্প্রতি জর্জিয়ার বেনিং কেল্লায় সৈন্য-দলে পঁচিশটি ছাগল ভর্তি করে নেওয়া হয়েছে। ছাগলগুলির কাজ হচ্ছে মাঠের ঘাস ছাঁটাই করা যার জন্যে আগে ছ' জন সৈন্যকে দিনভোর খাটতে হত।

*

যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগান রাজ্যের হাফটন শহরের আইরিস এন জনসন বিবৃতি দেয় যে, সে তার স্বামীকে হত্যা করেছে "দুজনে মদ্যপান করতে করতে একটা খেলার সময়। খেলাটি ছিল ও বাগানে ছুটবে আর আমি ওকে ·২২ শক্তির রাইফেল নিয়ে তাড়া করব।"

*

বিজ্ঞান যতো এগিয়ে যায় জুয়াচোরদের কৌশলও ঠিক সেই মতো 'আধুনিক' হতে থাকে। রাশিয়া প্রথম স্পুটনিক ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই দুজন ফরাসী জুয়াচোর এই ব্যাপারটাকে কাজে খাটাতে লাগল।

সরকারি অফিসার বলে পরিচয় দিয়ে ওরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে চাষীদের জানালে যে, আণবিক যুদ্ধ যে কোন মুহূর্তে লেগে যেতে পারে। প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি ঘটবে এবং দুর্ভাগ্যবশত তাদের ওপর ভার দেওয়া হয়েছে যতো হাঁস আছে সেগুলি সংগ্রহ করে নেবার।

হাঁস নিয়ে কি হবে জানতে চাওয়ায় ওরা দুজনে উত্তর দেয় যে, আপৎকালীন সেবা-ব্রতীদের শীগ্গিরই হাজার হাজার জখম লোককে দেখতে হবে এবং তাদের শোয়াবার লেপ তৈরী করার জন্য পালকের দরকার।

কারণটা সম্ভব মনে হওয়ায় এবং পরে উপযুক্ত দাম পাবার প্রতিশ্রুতি লাভ করায় বহু চাষী তাদের হাঁসগুলি ওদের দুজনের কাছে সমর্পণ করলে। জুয়াচোর দুজন একটা ভ্যানে সেগুলি তুললে। কিন্তু চাষী-দের মধ্যে একজনের মনে সন্দেহ দেখা দিল। সে সরে গিয়ে মেয়রকে ফোন করলে। ও জানতে চাইলে কি অধিকার আছে ঐ লোক দুজনের তার হাঁস নিয়ে যাবার। এটা সে বোঝে যে, আণবিক যুদ্ধের সময় লেপের জন্য পালকের দরকার হবে, কিন্তু দেহটা সে রাখতে পারবে না কেন? "পাগল নাকি?" মেয়র চেঁচিয়ে উঠলেন এবং অপারেটরকে ডেকে বলে দিলেন, "লোকটাকে পুলিশের হাতে দাও!"

গ্রহান্তরে যাওয়ার প্রচেষ্টা ব্যাপারটাকেও জালিয়াতরা তাদের ব্যবসার ফাঁদ হিসেবে কাজে লাগাবার চেষ্টা যে করছে তার একটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল।

নিউ ইয়র্কের এক বিধবা মহিলা একদিন এক রেস্তোরাঁয় বসে থাকার সময় এক অপরিচিত ব্যক্তি এসে তার সংগে আলাপ করে। লোকটি জানায় যে, চব্বিশ ঘণ্টা আগে সে মংগল গ্রহ থেকে ফিরেছে এবং সেখানকার শাসকদের অতিথি হয়েছিল সে। সাধারণত কেউ একথা বিশ্বাস করবে না, কিন্তু বিধবা মহিলা পলা চোখ বের করে আগন্তুকের কাহিনী শুনে যেতে লাগল।

লোকটা বলে চলল, "ওখানকার বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা এমন সব গুপ্ত তথ্য বের করেছে যা পৃথিবীর লোক স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। ওদের একটা অদ্ভুত আবিষ্কার হচ্ছে একটা মডুলেটার যা সরাসরি হাওয়া থেকে শক্তি টেনে নেয়। আণবিক ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র বা রাশিয়া যা করেছে এই মডুলেটার দ্বারা তার চেয়ে অনেক সস্তায় শক্তি উৎপাদন সম্ভব হবে।"

লোকটা বলেই চলল তার সেই বিরাট শক্তি উৎপাদক সম্পর্কে। পলা তার কথা-গুলি দিব্যি গিলে যাচ্ছে দেখে লোকটি তার জালিয়াতির থলি থেকে তুরুপের টেক্কাটি বের করলে।

বললে, "মংগল গ্রহের কর্তৃপক্ষ আমাকে বিশ্বাস করে। আমাকে ওরা সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছে—যাবতীয় নক্সাও দিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে প্রথম 'মডুলেটার' তৈরী করার জন্যে। কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে। কাজটায় আমাকেই টাকা ঢালতে হবে। অথচ, বুঝতেই পারছেন বহু অর্থের প্রয়োজন। জানি না, তবে আপনিও হয়ত কিছুটা সাহায্য করতে পারেন।"

পলা অভিভূতা হয়ে পড়েছিল। ও বললে, "দেখুন, আমার পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার (প্রায় এক লক্ষ সাড়ে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা) আছে। তবে 'মডুলেটার'টা অমন অদ্ভুত জিনিস, আমি আমার সব অর্থই ওতে নিয়োগ করব।"

সেই কথামত পলা এরপর একদিন লোকটির হাতে তার যাবতীয় অর্থ প্রদান করলে। পলা তার দু' একজন বান্ধবীকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করলে এবং তাদের একজন উনিশ হাজার এবং আর একজন আট হাজার ডলার দিলে।

জালিয়াৎটির আর এক চালে পলা আরো খুশী হল। লোকটি পলাকে বললে, সে মংগল গ্রহে তার অবস্থান সম্পর্কে একখানি বই লিখছে। পলা যদি পাণ্ডুলিপিটা টাইপ করে দেয়; বইখানি বের হলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে এবং তার বিক্রয়লব্ধ অর্থও তারা কাজে লাগাতে পারবে।

তারপর হঠাৎ জালিয়াৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। সপ্তাহ কয়েক পরে লোকটির এক সহচরের কাছ থেকে পলা খবর পেলে যে, সে আবার মংগল গ্রহে গিয়েছে এবং ওখানে এক দুর্ঘটনায় পড়ায় কয়েক মাস আটক থাকবে। লোকটির জন্য উদ্বিগ্না পলা—তখনও তার অর্থের জন্য চিন্তা হয়নি—যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে একখানি চিঠি পাঠালে। ওর চিঠিখানি পৌঁছল গোয়েন্দা বিভাগে। শেষে গোয়েন্দারা মংগল গ্রহের সেই যাত্রীটির সন্ধান পেলে। মংগল গ্রহেও যায়নি বা গ্রহান্তরে যাবার যন্ত্রেরও প্রয়োজন হল না। লোকটি টেক্সাসে এক স্থানে রয়েছে ঐ 'মডুলেটার' তৈরীর ধাপ্পা দিয়ে বেশ অর্থ বাগিয়ে।

*

প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি নিয়ে মারা গেলে সে ব্যক্তির আত্মা নরখাদক সিংহের মধ্যে আবাস করে নেয় এই অন্ধ বিশ্বাস আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলের অশিক্ষিত কুসংস্কারগ্রস্ত অধিবাসীদের নরখাদক সিংহ হত্যায় বিরত করে রেখে দেয়।

এই বিশ্বাসের ফলে চিয়েংগি চার্লি নামে এক নরখাদক সিংহ বহু ভয়াবহ হত্যা সংঘটনে সক্ষম হয়। উত্তর রোডেশিয়ার চিয়েংগি জেলার এক শক্তিশালী সর্দার তার মৃত্যুশয্যায় ঘোষণা করে যায় যে, মৃত্যুর পর সে সিংহ জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসবে এবং তারপর সে তার শত্রুদের একে একে নিপাত করবে।

অদ্ভুত ঘটনাচক্রে এক নরখাদক সিংহকে সর্দারের মৃত্যুর অব্যবহিত পরই সেই অঞ্চলে ঘুরতে দেখা গেল এবং এমনিই যোগাযোগ যে সেই সিংহের কবলে প্রথম প্রাণ হারালে মৃত সর্দারের শত্রুস্থানীয় দু ব্যক্তি। কোন যুক্তি দ্বারাই অধিবাসীদের বোঝানো অসম্ভব হয়ে উঠল যে ও দুজনের মৃত্যুর সংগে সর্দারের মৃত্যুকালীন ঘোষণার কোন সম্পর্ক নেই। ওরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করলে সর্দার তার কথা রাখতে আবার ফিরে এসেছে।

মাস কতক ধরে চিয়েংগি জেলার সর্বত্র আতংক ছেয়ে রইল। ঐ কদাস নরখাদকটা গ্রামের পর গ্রামে প্রবেশ করে বহুলোকের জীবন নাশ করলে। কিন্তু লোকে সংস্কারে এমন আচ্ছন্ন হয়ে রইল যে জানোয়ারটাকে মারবার এমন কি তাকে বাধা দেওয়াতেও বিরত রইল। প্রথম প্রথম জানোয়ারটার আক্রমণ ঘটতো রাত্রে, কিন্তু কিছুদিন পর ওর এমন সাহস বাড়ল যে দিনের স্পষ্ট আলোতেও কুটীরে ঢুকে লোক মারতে ভয় পেত না।

শেষে সেই নরখাদকটা সংগে আরো দুটো তার মতো জানোয়ার জুটিয়ে তাদেরও যখন মানুষ মারার সহজ বিদ্যেটা শেখাতে আরম্ভ করলে তখন আর লোকে থাকতে পারলে না। বোঝা গেল, এতদিন অবাধে ইচ্ছেমত শিকার পেয়ে পেয়ে জানোয়ারটার বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে। যে গ্রামে জানোয়ারটার প্রায়ই আবির্ভাব ঘটতো তারই পথের মুখে ফাঁস-বন্দুক খাটিয়ে ওটিকে হত্যা করা হয়। ওর সংগের শিক্ষানবীশ দুজনের তারপর আর কোন পাত্তা পাওয়া যায়নি।

৭

'তবে? তবে কী হবে?' সুলেখার মা কেঁপে উঠলেন। দরজায় ধাক্কা শোনা অবধি প্রাণ তাঁর ধুকপুক করছিলো। কাল বিকেলে, এই তো এখানে, এই রাস্তাতেই তো কী কান্ড। জজবাবুর বাড়ির এতোদিনের পুরোনো খানসামাটা, অল্প বয়স থেকে এ পাড়ায় দাদা-চাচা হ'তে হ'তে যে লোকটা বুড়ো হলো, এমন কেউ ছিলো না যে, তাকে না চেনে, না জানে, না ভালোবাসে, কীভাবে তাকে টেনে নিয়ে এলো। বাতে বৃদ্ধ জজ-বাবু নেমে এলেন কাঁপতে কাঁপতে, তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, জামাই, বউ—ঈশ্‌। রক্তে টৈক-টুকে হয়ে গেল পীচের রাস্তাটা, মরণান্ত আর্তনাদটা ভাসতে লাগলো বাতাসে, জজবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন, বাড়ি-সুদ্ধ সব—ভাবতে ভাবতে শিহরিত হয়ে উঠলেন তিনি।

সুলেখা অস্থিরবেগে উঠে দাঁড়ালো। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিতে নিতে চাপা আর দ্রুত গলায় দাদামশায় বললেন, 'যা যা, ওকে নিয়ে ভিতরের ঘরে চলে যা। তারপর আমি দেখছি। সুষমা, তুইও যা।' স্ত্রীর দিকে তাকালেন—ওদের নিয়ে যাও। একে-বারে শোবার ঘরে।

'না না, আমি যাবো না, যেতে পারবো না, কাকা, তুমি যে করে পারো ঠেকাও, আমি দাঁড়িয়ে থাকি এখানে।'

সুলতান সাহেব সুলেখার নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা মায়ের মুখের দিকে তাকালেন। তাকিয়েই রইলেন। মনে পড়লো এই মাকে দেখাবার জন্যই একদিন বালিকা সুলেখা তাকে হাতে ধ'রে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। এই মাকে উপলক্ষ্য করেই একদিন তার হৃদয়ে সমস্ত হিন্দু জাতটার উপর আগুন জ্বলে উঠেছিলো, আর আজ এই মায়ের কাছেই ঘুরেফিরে সে চিরদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে এসেছে। তার চোখের তলায় ঘুমিয়ে পড়তে এসেছে। খোদার কী মর্জি।

দরজায় বড়ো বড়ো আঘাত পড়লো। এক হ্যাঁচকা টানে তাকে নিয়ে ভিতরের ঘরে দৌড়ে এলো সুলেখা। দাদামশায় মুহূর্ত-কাল স্তব্ধ থেকে আবার জানালাটা খুলে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'কেন ধাক্কাধাক্কি করছেন আপনারা?' কপালের শিরা মোটা হয়ে ফুলে উঠেছে, পিঠের গেঞ্জিটা জব জব করছে, পাঞ্জাবির হাতটা গুটোতে গুটোতে বললেন, 'আমি তো বলেছি, আপনাদের আমি কিছুতেই ভিতরে ঢুকতে দেবো না।'

'কেন দেবেন না, দিতেই হবে।'

'বাড়ি কি আমার না আপনাদের?'

'যারই হোক, এ বাড়িতে যখন মুসলমান লুকিয়েছে, তখন আমরা ঢুকবোই, শালার বাচ্চাকে দেখে নেবো একবার।'

'বাজে কথা বলবেন না। আপনাদের মতো কতোগুলো লোফারকে কোনো কারণেই আমি দরজা খুলে ভিতরে আসতে দেবো না। আমি মনে করি তাতে বাড়ির মহিলাদের অসুবিধে হবে।'

'ও, মোচলমান পুরুষ নিয়ে শোবার ঘরে লুকিয়ে থাকলে বুঝি তাদের কোনো অসুবিধে হয় না?'

'খবর্দার। দাঁত ভেঙে দেবো কোনো কুৎসিত কথা উচ্চারণ করলে।'

'ঘরে আমরা ঢুকবোই।'

'জুলুম পেয়েছেন?'

'জোর বলুন, জুলুম বলুন ঢুকতে আমাদের দিতেই হবে। আমরা জানি আপনি ঘরের মধ্যে মুসলমান লুকিয়ে রেখেছেন।'

'কী বলছেন আপনারা?' আকাশ থেকে পড়লেন তিনি—'এখানে কোথা থেকে মুসলমান আসবে? মানুষ খুন করে করে আপনারা কি উন্মাদ হয়ে গেছেন?'

'মাথা আমাদের খুবই ঠাণ্ডা আছে, দরজাটা খুলুন, দেখিয়ে দি আছে কি নেই।'

'আমি বলছি নেই।'

'আছে, আছে,—'

'অসম্ভব।'

'সেই অসম্ভবটাই আপনি সম্ভব করেছেন।'

গলা নরম করলেন দাদামশায়, 'দেখুন, আজ দশ বছর আমি এ পাড়ায়, এই একই বাড়িতে আছি। হয়তো আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে চেনেনও, আপনারাই বলুন আমি কেন ঘরের মধ্যে একজন মুসলমান লুকিয়ে রেখে অনর্থক মিথ্যে কথা বলবো।'

'কেন বলবেন তার আমরা কী জানি। হিন্দুদের রক্ত কি রক্ত? নাকি তাদের কোনো মেরুদণ্ড আছে?'

'থাকলেই কি মানুষ খুন করতে হবে?'

'মানুষ কাকে বলছেন? মুসলমানরা মানুষ? মানুষ হলে এরকম করে?'

'তারা অমানুষ হয়ে যা করছে, আপনারা মানুষ হয়ে তা করছেন কেন?'

'বক্তৃতা রাখুন। প্রতিশোধ আমরা নেবোই।'

'কার উপর নেবেন? আসল দোষীকে পাবেন কোথায়?'

'তর্ক করতে আসিনি, এই শালার জাত আমরা নির্বংশ করবো।'

'আমার একটা কথা শুনুন—'

'দরজা খুলুন।'

'আমি বলছি শুনুন—'

'দরজা খুলবেন কিনা বলুন।'

'না, খুলবো না, যান।'

'খুলতেই হবে।'

'না।'

'দরজা ভেঙে ফেলবো।'

'ভাঙুন, দেখা যাক আপনাদের কতো শক্তি।'

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দশ জোড়া পায়ের লাথিতে থর থর করে কেঁপে উঠলো দরজা। অগত্যা খুলতেই হলো। কপাটের দুই পাটে দুই হাত রেখে বললেন, 'এ খবর আপনাদের কে দিয়েছে?'

'যে-ই দিক আমরা জানতে পেরেছি।'

'ভুল জেনেছেন।'

'বেশ তো, সেই ভুলটা আপনি ভেঙে দিন না।'

'কেমন করে?'

'ঘরে ঢুকতে দিয়ে, দেখতে দিয়ে।'

'যদি আপনাদের অনুমান অসত্য বলে প্রমাণিত হয়।'

'সেটা পরের কথা—।'

'না, সেটাই আগের কথা। আপনারা জানেন, রাত বারোটায় একটা উড়ো খবর নিয়ে এসে কোনো ভদ্র গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে হামলা করা আইনবিরুদ্ধ।'

'রেখে দিন আপনার আইন।'

'কেন রেখে দেবো? এ অপরাধ খুব সোজা নয়।'

'সহজ হোক কঠিন হোক আমরা দেখবোই।'

'না।'

'হ্যাঁ।'

'না।'

'হ্যাঁ।'

'কক্ষনো আমি তোমাদের ঢুকতে দেবো না।'

'দিতেই হবে।'

'না।'

'হ্যাঁ।'

'আমি বলছি না?'

'আমরা বলছি হ্যাঁ।'

'এতোগুলো লোক আমরা বাড়িতে আছি, চেহারা দেখেই তোমরা বুঝে নেবে, কে হিন্দু আর কে মুসলমান? এতো ওস্তাদ তোমরা?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমরা এতোই ওস্তাদ।'

দাদামশায় দিশাহারা চোখে চারদিকে তাকালেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পুলিসের গাড়ি টহল দেয়, এখন কি একটা এসে পড়তে পারে না? ফোন করতে পারলে কাজ হতো। নিজের ফোন নেই, আশেপাশেও কারো নেই। মারামারির হিড়িকে শহরটা সন্ধ্যে থেকেই মরে থাকে, এখন তো মধ্য-রাত। কোনো দোকানে-টোকানে খোঁজ করলে হয়তো মিলতো। কোথায় দোকান! কতো লোকের বাড়িতে পিস্তল থাকে, তাঁর তা-ও নেই। কী দিয়ে ঠেকাবেন এঁদের? এই উত্তেজিত লোকগুলোকে কী দিয়ে ঠান্ডা করবেন? এই নেকড়েগুলো তবে সত্যিই কি টেনে নিয়ে যাবে মানুষটাকে? নবাবগঞ্জের নবাব কাজি সুলতান আমেদকে? কাজি আকতার আমেদের ছেলেকে? ঋষি-তুল্য আমির আলি সাহেবের নাতিকে তার বাড়ি থেকে! কী রকম যে লাগলো, কী যে তিনি করবেন বা করতে পারেন কিছুই ভেবে পেলেন না।

একটু পিছনে সুলেখার মা দাঁড়িয়ে আছেন নিস্পন্দ ছবির মতো। চোখে তাঁর পলক নেই, দেহে সাড় নেই। হয়তো ঈশ্বরকে ডাকছেন। হয়তো সন্তানতুল্য মানুষটির জন্য, কিম্বা সন্তানের চেয়েও এই মুহূর্তে যাকে বেশী মনে হচ্ছে তাঁর জন্য নিজের প্রাণ পণ করছেন বিধাতার পায়ে। আর তার পিছনে দাদামশায়ের স্ত্রী।

* * *

'সুলেখা', ভিতরের ঘরে বসে সুলতান অস্পষ্ট হাসলেন।

সুলেখা অস্থির হায়নার মতো এদিক থেকে ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছে ঘরের খাঁচায়। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে, গাল দুটো লাল, চোখের দৃষ্টি বড়ো বড়ো। কাছে এসে দাঁড়ালো।

'সত্যি সত্যি তাহলে আর আমাকে ফিরে যেতে দিলে না, কী বলো?' সুলেখা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো, রক্ত জমে গেল।

'শান্ত হয়ে বোসো, এইমাত্র এসে একটু ঠান্ডাও হতে পারলে না।' সুলেখার নিঃশ্বাস ক্রমেই দ্রুত হচ্ছে।

'হাজার ভালোবেসেও তোমাকে সুখ দেবো, শান্তি দেবো এমন ভাগ্য আমার নয়। যতোদিন ওখানে ছিলে শুধুই কষ্ট পেয়েছ, আজ আমার কলিজা উপড়ে আমি আমার কাছ থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন করে এনেও সেই কষ্টই দিচ্ছি। আমার অস্তিত্বটাই তোমার পক্ষে অমঙ্গলের।'

সুলেখা তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে।

'কী দেখছো?'

'আপনাকে।'

'আমাকে!' হাসলেন, 'হঠাৎ!'

'যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মূল্যবান তা তো মানুষ হঠাৎই দেখতে পায়।'

'সুন্দর! মূল্যবান!'

'কিন্তু এখন আমি কী করি বলুন তো?'

'বিচলিত হচ্ছো কেন? ব্যাপারটা তো ভালোই।' সুলতানের মখমল গভীর গলা আরো গভীর হলো, 'মৃত্যুকে আর কে কবে ঠেকাতে পেরেছে। কোনো না কোনো রন্ধ্র দিয়ে সে তো আসবেই একদিন। আমি জানতাম দরজাগুলো খুলে গেছে, শুধু কোন্ দরজা দিয়ে ঢুকবে সেটুকু জানতেই বাকি ছিলো।'

'সুলতান সাহেব, এসব—এসব আপনি কী বলছেন? শত হলেও আমি তো একটা মানুষই, আমি তো পাথর নই—' সুলেখা একেবারে ভেঙে পড়লো সুলতান সাহেবের পায়ের কাছে।

ততক্ষণে দাদামশায়কে ঠেলে জোর করে জনাকয়েক লোক ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে—

'কোথায়? কোথায় রেখেছেন। দিন, বার করে দিন।'

দাদামশায় তাঁর পঞ্চাশ বছরের আধপাকা আধকাঁচা চুলেভরা মাথাটা ঝেঁকে বয়সের তুলনায় বলিষ্ঠ শরীরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, বজ্রের মতো গলায় বললেন, 'আর এক পা এগোবে না।'

কোথা থেকে কয়লা-ভাঙা হাতুড়ি আর বঁটি নিয়ে ছুটে এলো বাবু ছোটু, 'শেষ করে ফেলবো একেবারে শেষ করে ফেলবো।'

'কোথায়? কোথায় রেখেছেন, বলুন?' তারা কতোটুকু পরোয়া করে এইসব ছেলে-মানুষী হুমকিকে।

ভগ্নকণ্ঠে দাদামশায় বললেন, 'হাজারবার বলছি এখানে কেউ নেই। তবু তোমরা বিশ্বাস করবে না?'

সুলেখার মা কেঁদে উঠলেন, 'তোমরা বলছো কি বাবা? কেন অমন করছো? তোমরা তো মানুষ, তোমাদের তো একটা হৃদয়-মন বলে পদার্থ আছে। এসব কী?'

'রেখে দিন হৃদয় মন। ঐ দোহাই অনেককাল শুনেছি, অনেকদিন মেনেছি, আর নয়।'

'আপনি সরুন।' একটা অল্পবয়সী ছেলে ঠেলে সরিয়ে দিল সুলেখার মাকে।

'দিন, বার করে দিন।'

'কী বার করে দেবো?'

'বেশী চালাকি করবেন না।'

'চালাকির কী দেখছেন?

'কী দেখছি সবই বুঝতে পারবেন। হিন্দু হয়ে অন্দরে মোছলমান লুকিয়ে রাখেন, আবার লম্বা লম্বা কথা।'

'তোমরা কি জোর করে ঘরে ঢুকবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'[illegible]নো না।'

'শক্তি থাকে ঠেকান না।'

'ঠেকাবোই তো।'

'এই বিশে, যা তো, ঢুকে পড়তো ভেতরে, টেনে আনতো সেই মোছলমানের বাচ্চাকে, একবার দেখে নি।'

দু'হাত বিস্ফারিত করে ভিতরে দরজায় পিঠ রেখে সমস্ত শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন দাদামশায়। কিন্তু কে কার কথা শোনে। লোকগুলো চাঁচামেচি করে, জিনিসপত্র উল্টি[illegible] লাথি মেরে ভেঙেচুরে মুহূর্তে একেবারে তছনছ করে দিলো সাজানো ঘরখানা। বাবু-ছোট্টু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আঘাত করলো একটা লোককে, এক চড় খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল। ক্ষিপ্ত কুকুরের মতো রক্তক্ষুধিত মানুষ নামক কয়েকটি জীব এর পরে সুলেখার দাদামশায়কে আক্রমণ করলো। একটা ধস্তাধস্তির শব্দ আর মাঝে মাঝে দুজন স্ত্রীলোকের আতঙ্কিত আর্তনাদ ছাড়া কয়েকটা মিনিট আর কিছু শোনা গেলো না।

বড়ো বড়ো নিঃশ্বাস টানতে টানতে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন সুলতান। তৎক্ষণাৎ তাকে টেনে বিছানার উপর বসিয়ে দিল সুলেখা।

'আমি একবার যাবো ও ঘরে।'

'না।'

'কী আশ্চর্য!'

'না।'

'তুমি শুনতে পাচ্ছো না, কী রকম গোলমাল হচ্ছে।'

'না।'

তবু আবার উঠে দাঁড়ালেন, 'সে হয় না। কিছুতেই না। আমাকে যেতেই হবে।'

'না, না, না।' ঝড়ের বেগে নিজেই বেরিয়ে গেল সুলেখা চৌকাঠ পার হয়ে, বারান্দা পার হয়ে, তীক্ষ্ণ তলোয়ারের মতো এ ঘরে এসে দাঁড়ালো, 'কী, কী, চাই তোমাদের! ঘরের মধ্যে কী চাইছ তোমরা? কুকুরের দল, শুয়রের পাল। বদমায়েশ, ইতর, গুন্ডা, ভদ্রলোকের বাড়িতে তোমরা কিসের জন্য বিনা অনুমতিতে ঢুকে এরকম হল্লা লাগিয়েছ?'

গলা চিরে অদ্ভুত চীৎকার বেরুলো তার, দুই চোখে আগুন ফিনকি দিয়ে উঠলো, নাসারন্ধ্র একবার ফুলতে লাগলো, একবার নিবতে লাগলো। রুক্ষ চুলে, লুটিয়ে পড়া খোলা বেণীতে লালটুকটুকে দামী শাড়ির বিস্রস্ত আঁচলে, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারায় ভীষণ দেখালো তাকে। একাই অতগুলো লোকের মধ্যে রুষে ফুঁসে সহস্র নাগিনীর ফণা বিস্তার ক'রে থমকে দিল সকলকে। গুন্ডার দল তাকিয়ে থেকে একটু যেন হটলো। সুলেখা গরুর পালের মতো তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল বাইরের দরজার কাছে, 'লোফার, স্কাউন্ড্রেল, ভেড়ার ঝাড় সব, শেয়াল কুত্তার অধম, বীরত্ব ক'রে মুসলমান খুঁজতে এসেছো ভদ্রলোকের বাড়িতে। ছোটোলোক।'

দরজার ধারে গিয়ে একটা লোক তেরিয়া হয়ে দাঁড়ালো, 'যা তা বলবেন না।'

'আবার কথা।' শাবকরক্ষী বাঘিনীর মতো গর্জন উঠলো গলায়, 'জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেবো।' রাস্তায় আঙুল দেখালো, 'বেরোও, বেরোও বলছি, ঐ যে ঐখানে, ঐখানে গিয়ে যত খুশী ঘেউ ঘেউ করো।'

'যদি না যাই কী করতে পারেন?' সকলের পিছন থেকে এগিয়ে এলো বাবরি চুল, ডোরাকাটা শার্ট গায়ে একটি ছেলে। মুখের বিড়িতে শেষ টান দিয়ে একেবারে সুলেখার মুখোমুখি দাঁড়ালো আস্তিন গুটিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে উন্মত্ত বেগে তার গালে ঠাস্ ক'রে একটা চড় কষিয়ে দিল সুলেখা, দাড়িভরা বসা গালে পরিষ্কার ফুটে উঠলো তার দাগ। ঠেলে এক ধাক্কায় তাকে চৌকাঠ থেকে বারান্দায় ফেলে দিল। কিন্তু মাত্রই তো একজন নয়, তৎক্ষণাৎ আর একজন রক্তচক্ষু এগিয়ে বুক ঠুকে দাঁড়ালো। এরপর লাথিতে ঘুষিতে, আঁচড়ে কামড়ে সুলেখা কাকে যে ক্ষতবিক্ষত করলো আর করলো না, হিসেব রইলো না কোনো। ঘরের মধ্যে হাতের কাছে যা পেলো, যতোটা পারলো একটার পর একটা ছুঁড়ে মারতে লাগলো। তারপর হঠাৎ হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো মেঝেতে, বুকের উপর দুই হাত জোড়া করে কেঁদে উঠলো অসহায়ের মতো, 'আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আপনারা। আমার মাথার ঠিক নেই, আমার মনের ঠিক নেই। আমি জানি না এতক্ষণ আমি কী বলতে কী বলেছি, কী করতে কী করেছি। আপনারা তো মানুষ। আপনাদেরও তো মায়া আছে, মমতা আছে, স্নেহ-ভালোবাসার জন আছে বাড়িতে। হয়তো আপনারা কারো বাবা, কারো ভাই, কারো স্বামী। শুধু একটু দরদ দিয়ে চেয়ে দেখুন আমার দিকে, আমার চেহারা দেখুন, আমার কাপড়-জামা দেখুন, শুধু এই দামী শাড়িটি আমি কোনরকমে নিয়ে আসতে পেরেছি, আর কিছু আনতে পারিনি, কত কষ্টে, কত দুঃখে সব ছেড়ে এইমাত্র এসে পৌঁছেছি এখানে, আর তারপরেও আপনারা এরকম অন্যায় সন্দেহ, এই রাত ক'রে বাড়ি বয়ে এরকম যন্ত্রণা দিতে এসেছেন। আপনাদের

হাতে ধরছি, পায়ে ধরছি—'চোখের জলে কথার খেই হারিয়ে গেল। আর তার সেই মর্মান্তিক ব্যাকুল কান্নার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে থেমে গেল কলরব। বরং লোক-গুলো লজ্জা পেয়ে, সংকুচিত হয়ে সরে এলো রাস্তার দিকে।

সুলতান সাহেব তাঁর সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ কন্দর্প কান্তি দেহসুষমা নিয়ে এবার ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন ভিতরের ঘর থেকে। চুপচাপ সুলেখার সামনে এসে দাঁড়ালেন। খোলা দরজা দিয়ে তাকালেন রাস্তায়, তাকালেন যুদ্ধক্লান্ত বিধ্বস্ত ঘরের দিকে, ঘরের মধ্যে চুপচাপ ছবির মত দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি বিপর্যস্ত মানুষের দিকে। তিনি কাজি সুলতান আমেদ, নবাববাড়ির শেষ প্রদীপ, একটি জেলার সর্বময় প্রভু, তিনি কি পারেন এই সময়ে শোবার ঘরে লুকিয়ে থেকে আত্মগোপন করতে? সুলেখাকে সদরে পাঠিয়ে অন্দরে বসে প্রাণ বাঁচাতে? তাঁর পৌরুষ তাঁকে ধিক্কার দেবে না? বিবেককে তিনি কী দিয়ে প্রবোধ মানাবেন?

সুলেখা মুখ ঢেকে বসে আছে দু'হাতে। আঙুলের ফাঁকে অজস্র ধারে গড়িয়ে পড়ছে তার চোখের জল। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে শরীরটা। পিঠটা বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে ধনুকের মত। একটা কবিতা মনে পড়লো। ভেনাসের জন্ম। সমুদ্র থেকে জন্ম নিচ্ছে ভেনাস। মৃণালের বোঁটার মত নমনীয় কমনীয় শরীর নিয়ে উঠে আসছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। সমুদ্র সেদিন ভীষণ ছিল, তার উত্তাল চীৎকারের শেষে, ভাটার টানে যখন সে শান্ত হয়ে এলো, ম্লান দিনের উন্মেষে, স্তব্ধ হলো উতরোল, তখন ঠিক সুলেখার কান্নার মত ক'রেই প্রথমে কয়েকটি রেখা কেঁপে কেঁপে উঠেছিল, সেই কন্যাও এইরকমই শুভ্র স্নিগ্ধ আর সিক্ত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে উন্মোচিত হ'ল। সুলেখার অতল গহন কুমারী হৃদয়ের মতই উন্মোচিত হ'ল তার দেহলতা।

এই মুহূর্তে সুলেখার দিকে তাকিয়ে সেই ছবিটাই তাঁর মনে পড়লো বারে বারে। এই একই ছবি তিনি তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলেন। লোভ। জীবনের উপর লোভ। বাঁচবার জন্য লোভ। এই চোখের জলে ভেসে যাওয়া মেয়েটিকে ভালোবাসার লোভ। সুলেখার ঘন চুলে ভরা নিচু করা কালো মাথাটির আনত ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে, সরু শাদা কুমারী সিঁথির দিকে তাকিয়ে, প্রাণের উপর ভীষণ মমতা হ'ল তাঁর। পা আটকে গেল, গলা বন্ধ হয়ে এল। আশ্চর্য! এই মেয়েই কি একদিন লাথি মেরেছিল তাঁর মুখে। এই মেয়েই কি একদিন প্রত্যেক মুহূর্তে আজকের এই মুহূর্তটিরই স্বপ্ন দেখছিল নবাববাড়ির আসানমঞ্জীলের নতুন হলঘরে বসে? রাত্রিবেলার পাঁচশো মোমের নরম আলোয় এই মেয়েকেই কি তিনি তিন মাস ধ'রে প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেছেন?

'সুলেখা'।

হাহাকার ক'রে উঠলো সুলতানের গলা। চকিতে মুখ তুললো সুলেখা, তারপরেই এক ঝাপটায় উঠে দাঁড়ালো, 'তুমি! তুমি কেন উঠে এসেছ? তুমি অসুস্থ, তুমি রুগ্ন, তুমি যাও, ঘরে যাও।' দুই হাতের সমস্ত শক্তিতে ঠেলে দিল তাঁকে ভিতরের দিকে।

'ইনি কে?' প্রশ্নটি তীরের মত ছুটে এল রাস্তা থেকে। দাদামশায় মুক্তকর হলেন, 'আমার—আমার আত্মীয়।'

'আমি কাজি সুলতান আমেদ।'

গির্জার ঘণ্টার মত সুলতানের গম্ভীর গলা পরিচয় ঘোষণা করলো নিজের। মন থেকে সমস্ত মোহ তিনি ঝেড়ে ফেললেন আজ। এই পবিত্র দিনে, জীবনের পরম শুভ মুহূর্তে, যে মুহূর্তে সুলেখা তাঁকে ভালোবেসেছে সে মুহূর্তে কেমন ক'রে তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারেন? অসম্ভব। অসম্ভব মনে হ'লো তাঁর কাছে।

'এ কী! এ কী করলে তুমি?'

'শান্ত হও।' সুলেখার মাথায় হাত রাখলেন সুলতান সাহেব। 'আমি মুসল-মান।' পরিষ্কার নিষ্কম্প গলায় আবার তিনি উচ্চারণ করলেন। চীৎকার ক'রে উঠল সুলেখা, 'না, না, না। মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা। ইনি আমার স্বামী। আমার স্বামী।' দু'টি ব্যাকুল হাতের গাঢ় আলিঙ্গনে সে জড়িয়ে ধরলো সুলতানকে।

গোধূলি বেলার রঙিন আলোর মত নরম একটি সুন্দর হাসি ছড়িয়ে পড়ল সুলতান সাহেবের মুখে। এটুকুই বাকী ছিল। জানতেন না, পেয়ে জানলেন। বুকটা ভরে গেল। এইতো, এইতো তিনি চেয়েছিলেন, এই তো পেলেন। খোদা তাঁকে চাওয়ার অনেক, অনেক বেশীই তো দিয়ে দিলেন আজ। শূন্য মুঠি উপচে গেল।... তবে? তবে কেন আর বেঁচে থাকা। এই অসীম ক্লান্তি নিয়ে, অখ্যাতির বোঝা বয়ে কিসের আশায় তবে বসে থাকা? মনটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

'আপনারা—আপনারা আমাকে যা খুশী তা-ই করুন। যদিও আমি নিরস্ত্র নই, কিন্তু অস্ত্র আমি আর স্পর্শ করবো না।' পকেট থেকে ছোট্ট রিভলবারটি বার ক'রে আবেগবশত ঝোঁকের মাথায় কোথায় তিনি অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

'সুলতান।'

'কাজি সুলতান আমেদ।'

'আমেদ সাহেব।'

'এই, এই সেই শয়তান।'

'মারো শালাকে—'

'মেরে ফেলো, কেটে ফেলো, জলদি, এখুনি পুলিসের গাড়ি এসে যাবে—'

গলা থেকে গলায় চাপা চাপা আওয়াজ শিলাবর্ষণের মত টুপটুপ ছড়িয়ে পড়তে লাগলো শব্দগুলি।

একটা পলক। চমকে উঠলেন সুলতান সাহেব। মৃত্যুর সীমানায় এসে জীবনের আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে সম্বিত ফিরে এলো তাঁর। 'বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও', সভয়ে আর্তনাদ ক'রে উঠলেন ডুবে যেতে যেতে। সুলেখার দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে দিলেন, 'সুলেখা, তুমি—তুমি—'

চকিত হরিণের ক্ষিপ্রগতিতে কোথা থেকে লাফিয়ে উঠে এলো শিখ ড্রাইভার—কোমরের কৃপাণ বিদ্যুতের মত ঝলক দিল একবার—তারপর সব নিস্তব্ধ।

দেখতে না দেখতে কে যে কোথা দিয়ে অক্টোপাসের দাঁড়ার মত কিলবিলে সহস্র বাহু হয়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেল অতবড়ো মানুষটাকে বোঝাই গেল না। চলন্ত ট্যাক্সীর জানালা দিয়ে একটি ক্ষীণ আর্তস্বর ভেসে গেল বাতাসে। আটাশ বছরের সুস্থ সবল খানিকটা টাটকা রক্ত ছিটিয়ে রইলো বারান্দার শানে, সাদা চুনকাম করা দেয়ালে, আর সুলেখার মাথার কালো চুলে। দাদামশায় পাঁজা কোলে ক'রে অচৈতন্য নাতনীকে বারান্দা থেকে ঘরে তুলে এনে দরজায় ছিটকিনি বন্ধ ক'রে দিলেন।

সমাপ্ত

উৎসব-মুখর লণ্ডন

হিরন্ময় ভট্টাচার্য

আমাদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। কথাটা বলেই ভাবছি পরিচয়টা ঠিক হল কি। রঙ চড়ানর কথা নয়, এ যে নিতান্ত ছাঁটকাট করে বলা। দুধ ফেলে [illegible]রের সরটুকু নেওয়া। মাত্র তেরো সংখ্যাতত্ত্বে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। শ্রীকৃষ্ণ যতই বলুন না কেন—মামেকং স্মরণং ব্রজ, তেত্রিশ কোটি দেবতা একথা মানতেই হবে এবং তাদের ওই গণ্ডি দিয়ে বাঁধা অসম্ভব, শিবেরও অসাধ্য।

ইংরেজের ভগবান বলতে একমেবাদ্বিতীয়ম যীশু। তার উৎসব সারা বছরে জবরদস্তি করলে 'হুইট মনডে'কেও ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে ফেলা যায়। তবে হুইটের সংগে লোকের সম্পর্ক কেবল এক দিন ছুটি উপভোগের। অধিকাংশ লোক জানেই না এর তাৎপর্য। ভাবে বোধ হয় বসন্তোৎসবের অংগ। শীত পেরিয়ে গ্রীষ্মের হাওয়া বইতে থাকে, তাই আনন্দের ঘটা। ইস্টারের জলুস নেই। ছুটি দুদিন এই যা। না হলে শীতলা পুজো বা চড়ক বলতে পারতাম।

খৃসমাস একেবারে দুর্গোৎসব। তিন মাস ধরে চলে আয়োজন। পথে মুখচেনা লোকের দেখা হলে মুখবন্ধে আবহাওয়ার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হবার প্রয়োজন হয় না। বলা যায়, খৃসমাসের আর কত দেরী? কোথায় যাচ্ছ ছুটিতে। কেনাকাটা হল? ঘর সাজান শুরু করেছ?...আলাপের প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট।

আমাদের বিসর্জনে বিষাদের ছায়া পাওয়া যায়, কিন্তু বিষাদের উৎসব—কেমন যেন পরস্পরবিরোধী শোনায়। গুড ফ্রাইডে কিন্তু বিষাদের অনুষ্ঠান। এই দিন যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাণী নিয়ে এসেছিলেন যীশু। দেশের ও দশের মঙ্গল তাঁর কামনা। নিখুঁত মানুষের সংগে খাপ খাবে কেন সাধারণ মানুষের। তাঁর বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি হল। বিচারক দোষ খুঁজে পেলেন না। তবু তাঁকে আত্মাহুতি দিতে হল। ভক্তরা কেঁদে আকুল। কি করবে। তারা যে সংখ্যায় অল্প—অসহায়। তবু ভয়ডর অবহেলা করে খুলে নিয়ে আসে যীশুর মৃতদেহ। সহস্র ধারায় চোখের জল ফেলে। শেষে সমাধি দেয় পুরুষোত্তমকে। গুড ফ্রাইডের মূলে এই ব্যথাতুর কাহিনী। তাই সেদিন লোকে শোকসভা করে। আলোচনা করে যীশুর আত্মোৎসর্গের কথা। যীশু দেখলেন, আত্ম-দান করেও সফল হল না, তাঁর সাধনা। তাই কবর থেকে উঠে এলেন ইস্টার মানডে। এবার লোকে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করল। লুটিয়ে পড়ল পায়ে। জানাল, মানুষকে শুভ বুদ্ধি দাও, সংকাজে প্রেরণা দাও। যীশু ধর্মপ্রচারে মন দিলেন। লোকের মনে জাগল দয়া-মায়া-সহানুভূতি। তবু অনেকে তাঁর মহিমা স্বীকার করেনি। ক্রমে সেই অবিশ্বাসীদের ভুল ভাঙল। তারাও ভক্ত হল যীশুর। সেই উপলক্ষ্যে পালন করা হয় হুইট মানডে।

সবাই জানেন বেথলহেমে যীশুর জন্ম। মেষপালকের আস্তাবলে লোকে তাঁর দর্শন পায়। সেই শুভ লগ্ন স্মরণ করে এই উৎসব। পুজোর আগে যেমন কলকাতায় লাল শালুর ওপর লেখা বিজ্ঞাপন ঝোলে, 'এবার পুজোর বিরাট আয়োজন' ইত্যাদি, এখানেও তাই। ব্যবসায়ী মহলে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। যে যার পণ্যসম্ভার সাজিয়ে দেয়। বিশেষজ্ঞ ডাকে কিভাবে সাজালে বেশী আকর্ষণীয় হবে। জরি দিয়ে, রঙ-বেরঙের কাগজ দিয়ে, পাতাবাহার দিয়ে, খেলনা সাজিয়ে, আলো ঝকমকিয়ে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেবার ব্যবস্থা। কোথাও রাখে 'ফাদার ক্রিসমাস' নামান্তরে স্যান্টাক্লস। বুড়ো দাদুর মত

বৈঠকখানায় সাজানো খৃসমাস গাছ। নীচে উপহারের প্যাকেট

বাইরের ঘরে সাজানো খ্রিসমাস কার্ড

এক গাল দাড়ি। তুষার ধবল চুল। পরনে লাল আলখেল্লা। এক হাতে ঘণ্টা, অন্য হাতে...বলছি পরে। সাণ্টাক্লসকে এ-উৎসবের নায়কের পর্যায়ে ফেলা যায়। কোন কোন দোকানে ঝোলায় বড় বড় ঘণ্টা. হোলি গাছের ডাল সাজাবার একটা বড় উপকরণ। পাতাগুলোর অনেকগুলো ছুঁচলো মুখ। লাল লাল ছোট ছোট ফল, অনেকটা বৈঁচির মত দেখতে। আর আছে খ্রিসমাস গাছ, চিরহরিদ যার গাছ। তার ডালে ডালে রঙীন বিজলী বাতি।

উৎসব তিন দিনের। খ্রিসমাস ইভ, খ্রিসমাস এবং বক্সিং ডে। বক্সিং মানে ঘুষি বিনিময় নয়। বাক্স নিয়ে পয়সা সংগ্রহ থেকে কথাটার উৎপত্তি। অনেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের ওই দিনে বাক্সয় পয়সা ভরে উপহার দিত। এখন প্রথা নেই, নামটা আছে। খ্রিসমাস ইভে অফিস খোলা থাকে। আসলে নামকাওয়াস্তে খোলা। কাজ হয় না। চলে হৈ-হুল্লোড়। পার্টি হয় অফিসের খাবার ঘরে। বারোটা না বাজতেই সবাই জড়ো হয়। খোদ কর্তা এবং খুদে কেরানীর বাদবিচার নেই। চলে পান আহার আর নাচগান। পরস্পর 'মেরী খ্রিসমাস' সম্ভাষণ জানিয়ে বিদায় নেয়।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা গেলাম পিকাডিলীর আলোকসজ্জা দেখতে। বিজ্ঞাপনের আলোয় জায়গাটা ঝলমল করে বারো মাস। পৃথিবী জোড়া নাম। এসময় যেন পদ্মের ওপর রঙ চড়ায়। পিকাডিলী থেকে অক্সফোর্ড সার্কাস এই সমস্ত রিজেণ্ট স্ট্রীট আলোক-মালা দিয়ে সাজায়। প্রতি বছর ভিন্নরূপ। এবার হরতনের মাথার মত করে আলোর সারি টাঙান। অর্ধবৃত্ত যেখানে মিলেছে, সেখানে একটা করে লণ্ঠন ঝোলান। চার পাঁচ হাত উঁচু। ঠিক গেলাসের মত দেখতে। মাথায় মন্দিরের চূড়োর মত ঢাকনি। গায়ে মুকুটের মাথার মত সাজান। চারিদিকে চাঁদোয়া ঝোলান। ভিতরে আলো জ্বালা। সাদা, হলদে, লাল এবং সবুজ। দুপাশের দোকানও খুব সাজায়। প্রায় প্রতি দোকানে ছবি না হয় মূর্তি থাকে ফাদার খ্রিসমাসের। কেউ দেখায় বরফে ঢাকা পরিবেশ। বরফ পড়াটাকে এদেশের কেউ ভালো চোখে দেখে না। তবে খ্রিসমাসের সময় বরফ পড়া নাকি খুব পয়মন্ত। এর নাম হোয়াইট খ্রিসমাস।

এবার চললাম অক্সফোর্ড স্ট্রীটে। সবার সেরা সাজায় সেলফ্রিজ। লণ্ডনের সবচেয়ে বড় ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর—দুনিয়ার হেন জিনিস নেই যা এখানে পাওয়া যায় না। এর সব বিভাগ ঘুরতে হলে পায়ে বাত ধরে যাবে। সিং দরজার মাথায় দুপাশে বিরাট দুই মূর্তি—একটা ফাদার খ্রিস-মাস অন্যটা আঙ্কল হলি—ভিক্টোরিয়ান যুগের পোশাক পরা মোটাসোটা হাসিখুশি লোকটা। দুজনেই মাথা ঘোরাচ্ছে, হাত নাড়ছে। বৃত্তাকারে নানান পুতুল ঘুরছে। জিরাফ, হাতী, কুকুর, বনমানুষ, ঘোড়ার পিঠে ছেলে, নড়ি ইত্যাদি। প্রতি জানলার মাথায় এক একটা প্রকাণ্ড জোকারের মুখ তাদের চোখদুটো জ্বলছে আর নিবছে। বিরাট সাইনবোর্ডের একপাশে লেখা Meet Father Christmas & uncle Holly on the first floor। মাঝে লেখা come to Hopy's circus, অন্য-পাশে Toyland third floor। এসময় খেলনা বিক্রি হয় প্রচুর। তাই বিচিত্র খেলনায় দোকান ভরিয়ে দেয়। সেলফ্রিজের বাইরে এক শো-কেস-এও দেখলাম খালি খেলনা সাজান। এক বিরাট হাতী শুঁড় নাড়ছে আর কান দোলাচ্ছে। সাপুড়ে দুলে দুলে বাঁশি বাজাচ্ছে, ফণা উঁচিয়ে সাপ নাচছে তালে তালে। জিরাফ গলা উঁচু করে এপাশ ওপাশ করছে। দুটো বনমানুষ দোল খাচ্ছে। হাতীর শুঁড়ে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে আর মেয়ে ঘুরে সার্কাস দেখাচ্ছে।

সেখানে আলাপ হল এক ইংরাজ পরিবারের সঙ্গে। দুজনেই প্রৌঢ়, তিনটি ছেলেমেয়ে। তারা গ্রাম থেকে এসেছে। প্রতি বছর খ্রিসমাস ইভে লণ্ডনে বেড়াতে আসে। এখান থেকে যাবে ট্রাফালগার স্কোয়ারে। ক্যারল গাওয়া হবে সাড়ে ছটায়। [illegible] স্কুল থেকে ছেলেরা আসে অংশ গ্রহণ করতে। ক্যারল ছাপান কাগজ বিলি করা হয় সেখানে। ধর্মযাজক প্রথমে গানের ব্যাখ্যা করে দেন। তারপর স্কুলের ছেলেরা হাল ধরে। সবাই সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে থাকে। কয়েক হাজার লোক জড়ো হয়। যেন সবাই এক পরিবারের লোক।

ট্রাফালগার স্কোয়ার। দূরে থেকে দেখা যায় মনুমেণ্ট, নেলসনের স্মৃতিস্তম্ভ। তবে মীনার বেড় দিয়ে যে বিরাট বৃটিশ সিংহ তা অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। দুপাশে ফোয়ারা। আলো দিয়ে সাজান। মাঝে আলোকসজ্জিত খ্রিসমাস গাছ। পাঁচ সাত তলা উঁচু হবে। এটা নরওয়ে সরকারের দান। প্রতি বছরই নরওয়ের শুভেচ্ছা বহন করে আনে। ১৯৪৮ সাল থেকে এই ব্যবস্থা, এটা একতরফা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন। গত মহা-যুদ্ধে ইংরেজ নরওয়েকে যে সাহায্য করে, এ তারই প্রতিদান। এবছরকার গাছটির বয়স ৩৮ বছর, ওজন দেড় টন। খ্রিসমাসের এক সপ্তাহ আগে নরওয়ের রাষ্ট্রদূত আলোকমালা জেলে এর উদ্বোধন করেন। সকল ধর্মসঙ্গীতের ভাষা বোধ হয় এক। এর আবেদন অভিন্ন। ধর্মে প্রীতির আতিশয্য আমার নেই, তবু সংস্কৃত স্তোত্র বা সামগান অর্থোদ্ধারে সক্ষম না হলেও ভালো লাগে। গ্রন্থ সাহেবের সঙ্গীত বিন্দু-মাত্র বুঝিনি, তবু তার আবেদন মনকে করেছে স্পর্শ। তেমনি ভাল লাগল আজ সন্ধ্যার ক্যারল গান। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হলাম। ওরা চলল সেণ্টপলসএ উপাসনায় অংশ গ্রহণ করতে। ঘরে ফিরে মাঝরাতে ফিরবে ঘরে।

খ্রিসমাস গাছ উৎসবের প্রধান অঙ্গ। আমাদের দেশে ঘটেও পুজো হয়। এদেশে খ্রিসমাস গাছবিহীন খ্রিসমাস কেউ কল্পনা করতে পারে না। গাছের আকার অনুযায়ী দাম। ২ টাকা থেকে ১০০ টাকা। বৈঠক-খানায় সাজিয়ে রাখে। তাতে জেলে দেয় নানান রঙের বিজলী বাতি। ছাপোষা মানুষ কাঁচের বল ঝুলিয়ে দেয়। এসময় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকের কাছ

থেকে উপহার আসে। কিন্তু এলেই মোড়ক খোলা চলবে না। খৃস্‌মাস গাছের নীচে জড়ো করবে। উৎসবের দিন বাড়ির কর্তা যার নামে যা এসেছে দিয়ে দেবে।

এবার ফাদার খৃস্‌মাস বা স্যাণ্টাক্লসের পরিচয় দেওয়া যাক। প্রবাদ এই বুড়ো ভদ্রলোক উত্তর মেরুতে বরফ ঢাকা কোন গুহায় বাস করেন। এসময় স্লেজ গাড়িতে চড়ে বসেন। টানতে থাকে বল্‌গা হরিণ। বাতাস উঠুক, তুফান ছুটুক বা বরফ পড়ুক। তাঁর আসার সময়ের নড়চড় হবে না। থলি ভর্তি খেলনা নিয়ে খৃস্‌মাসের আগের দিন মাঝরাতে হাজির। চিমনির ভেতর দিয়ে ঘরে ঢোকেন। ছোট ছোট ছেলেরা খাটের গায়ে মোজা টানিয়ে রাখে। ভোরে উঠে দেখে কোন ফাঁকে স্যাণ্টাক্লস এসে উপহার ভরে দিয়ে গেছে। ছোটদের বিশ্বাস সত্যি স্যাণ্টাক্লস চিমনির ভেতর দিয়ে আসে এবং উপহার দিয়ে যায়। বড় হলে জ্ঞানোদয় হয়। তাই বলে মোজা টানাতে ভোলে না। স্যাণ্টাক্লস সেণ্ট নিকলাসের অপভ্রংশ। ইংরাজ বলে এই বিকৃতির জন্যে দায়ী আমেরিকানরা। যাই হোক তাঁর জন্ম ৩৪২ খৃস্টাব্দে। তিনি লিসিয়ার বিশপ ছিলেন, লিশিয়া এখনকার তুরস্ক। তাঁর বিশেষ গুণ ছোট ছেলেদের খুব ভালোবাসতেন। তিনি যেখানে যেতেন, ছোট ছেলেরা জড়ো হত। অনেক সময় ছেলেরা দরজার কাছে জুতো খুলে এসে বসত। তিনি তাতে নানান খেলনা ভরে দিতেন। ছোট ছেলেরা এখনও স্যাণ্টাক্লসকে চিঠি লেখে। ডাক ও তার বিভাগ প্রতি বছর কয়েক লক্ষ চিঠি প্লেনে করে ফেলে আসে উত্তর মেরুতে। একদা পাঁচ বছরের ছেলে আঁকাবাঁকা অক্ষরে যা লিখেছিল, তার অর্থ। ফাদার ক্রিসমাস, তুমি খুব ভালো। মা আমায় ভালোবাসে। তুমি আমার ভলবাসা নিয়ো, আর মাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিয়ো। মার টাকার দরকার।

খৃস্‌মাসে উপহার দেবার ঘটা পড়ে যায় সত্যি। তবে বন্যা হয় খৃস্‌মাস কার্ডের। বিজয়ার সম্ভাষণ জানাতে চিঠি লিখতে হয়। এরা লেখার দায়িত্ব ব্যবসায়ীর হাতে ছেড়ে দিয়েছে। তারা নানান রকমের কার্ড ছাপায়, কোনটায় থাকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা কোনটায় বা শ্রদ্ধা। কোনো কার্ডে এক ছত্র কবিতা। কেবল সই করে ছেড়ে দিলেই খালাস। একটা মজার ঘটনা বলি। এক বন্ধুর হঠাৎ খেয়াল হল, কাউকেও খৃস্‌মাস কার্ড পাঠান হয়নি। এদিকে আর বেশী সময় নেই। তাড়াতাড়ি দোকান থেকে সুন্দর ডিজাইনের এক প্যাকেট কার্ড কিনে আনেন, ঝটপট সই করে পাঠিয়ে দেন। অনেক দিন পরে পুরোনো চিঠিপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা অবশিষ্ট কার্ড দেখতে পান। পড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসেন। তাতে লেখা,

বিছানায় বসে ছোটরা মোজা থেকে বের করে 'ফাদার খৃস্‌মাসের' দেওয়া উপহার

এই পত্র দিয়ে কেবল জানাতে চাই খৃস্‌মাসের উপহার কয়েক দিনের মধ্যে তোমাদের হাতে পৌঁছবে।

এই কার্ডগুলো লোকে কুলুঙ্গিতে গুঁজে রাখে না, বাক্সয় চাবি বন্ধ করে না। বাইরের ঘরে সাজিয়ে রাখে। এবছর বেডফর্ডের ডিউকের সমস্যা দেখা দেয়। এত কার্ড এসেছে জায়গায় কুলে দিতে পারছেন না। শেষে তাঁর স্ত্রী আলমারী ভর্তি বই-এর ভেতর ভেতর গুঁজে দেন। তার ছবি ছাপা হয় কাগজে কাগজে।

এ সময় পোস্ট অফিসের কাজ বেড়ে যায় প্রচুর। নিয়মিত কর্মচারীরা এঁটে উঠতে পারে না। তাই কয়েক সপ্তাহের জন্যে বহু অতিরিক্ত লোক নেয়। গেলেই চাকরি। সাধারণত ছাত্রছাত্রীরা এই কাজ নেয়। অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্র এই ফাঁকে কিছু উপায় করে নেয়। কেউ চিঠি সর্ট করে, কেউ শুধু ছাপ মারে, কেউবা বিলি করে। এসময় কোন ভারতীয় মেয়েকে চিঠির বোঝা কাঁধে ফেলে বাড়ি বাড়ি ঘুরছে দেখলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

পুজোর বকশিশ এখানেও আছে। যে ছেলেটা ভোর না হতে খবরের কাগজ বাড়ি পৌঁছে দেয়, সেও দুধওয়ালা জমাদার প্রভৃতির সঙ্গে বাক্স নিয়ে হাজির হয় পার্বণী নিতে। কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে আসে। দরজায় টোকা দেয়। আলো জ্বালাতেই ক্যারল গাইতে শুরু করে। অনেক সময় চার

পাঁচটা গান শুনে তবে পয়সা দেয়। সাধারণত যে ধর্মসঙ্গীত গাওয়া হয়, তা hymns, কেবল এই সময়ের জন্যে carol গান—এগুলো যীশুর জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে লেখা।

দু একটা ক্যারল শুনতে হয়ত অনেকের আগ্রহ হবে। সুর দেবার সাধ্য নেই। শব্দ শুনে সান্ত্বনা লাভ করতে হবে।

ONce in royal David's city
Stood a lowly cattle shed,
Where a Mother laid her baby
In a manger for his bed;
Mary was that Mother mild,
Jesus Christ her little Child.

He came down to earth from heaven
Who is God and Lord of all,
And his shelter was a stable,
And his cradle was a still;
With the poor and mean and lowly,
Lived on earth our Saviour holy.

And he is our childhood's pattern;
Day by day like us he grew;
He was little, weak, and helpless;
Tears and smiles like us he knew;
And he feeleth for our sadness,
And he shareth in our gladness.

And our eyes at last shall see him
Through his own redeeming love,
For that Child so dear and gentle
Is our Lord in heaven above;
And he leads his children on
To the place where he is gone.

Not in that poor lowly stable,
With the oxen standing by,
We shall see him; but in heaven,
Set at God's right hand on high;
When like stars his children crowned
All in white shall wait around.

আরও একটা গান আমার ভালো লাগে। প্রেমের গান। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে বাংলা কবিতাটি—দেবতার মন্দিরে অনেকে পুজো দিলো, ভক্তি জানাল প্রণাম করল, কিন্তু কেউ করল না প্রেম দান। এ সেই প্রেমের গান।

সারা বছর না হলেও অধিকাংশ ইংরেজ অন্তত সেদিনটা চার্চে যায়। উপাসনায় যোগ দেয়। চার্চগুলো আলো দিয়ে সাজায়। হয়ত পুতুল দিয়ে যীশুর জন্ম বৃত্তান্ত দেখায়। খড় বিছানো গোয়াল ঘর। দু একটা ভেড়া চরে বেড়াচ্ছে। দড়ির খাটে সদ্যোজাত শিশু। পাশে মাতা মেরী। চার্চের অন্যদিকে সাজান নানান বই ও খেলনা। এইসব খেলনা যাবে গরীব ছেলে-মেয়েদের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে। রেলওয়ে স্টেশনে খৃসমাস গাছ লাগান থাকে। স্বেচ্ছাসেবকরা পয়সা সংগ্রহ করে অন্ধ বা আতুরদের জন্যে। রোটারী ক্লাব গাড়িতে আলো জ্বালা খৃসমাস গাছ নিয়ে পথে বেরোয় সাহায্য সংগ্রহে। এইসব বাক্স খোলা হয় খৃসমাসের পরের দিন এবং সেই দিনই নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাঠান হয়। বক্সিং ডে বলার এও অন্যতম কারণ।

এবার খৃসমাস দিনের অভিজ্ঞতার কথা বলি। সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ ছিল ইংরাজ পরিবারে। আজকের দিনে সেজেগুজে যেতে হয়। ছেলেদের সাজা মানে কালো রঙের স্যুট আর চকচকে কালো জুতো পরলেই হল।

কলিং বেল টিপতেই ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাবার জন্যে। পিছনে ভেঁপু বাজাচ্ছে ছোট ছেলেটা। সদ্য উপহার পেয়েছে বাঁশিটা। ঘরদোর তক তক চক চক করছে। সবাই সেজেছে। মেয়েরা যেন এক একটা ডানাকাটা পরী। আমাদের মাথায় এক একটা কাগজের টুপি পরিয়ে দিল। টেবল থেকে ক্র্যাকার নিয়ে এল। দেখতে অনেকটা বেঁটে রুটি বেলা বেলুনের মত। দুজনে দুপাশে ধরে টানে। দুম করে পটকা ফাটার মত আওয়াজ হয়। একজনের হাতে খাপটা থাকে আর একজন পায় পুরস্কার হয়ত ছোট্ট খেলনা। কোনটার মধ্যে লম্বা কাগজের ফিতে। তাতে আটকে দিয়ে এ ওকে টানতে থাকে। এ ওর গায়ে ছুঁড়ে মারে, ও তার গায়ে। হাসি উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে দেয় বাড়ি। জানলার কাছে খৃসমাস গাছ। পরদা একটু খোলা। যাতে বাইরের লোক গাছটা দেখতে পায়। ঘরের মাথায় কাগজের শিকলি টাঙান। কোথাও কাগজের ফুলের তোড়া। গাছের ফুলের সঙ্গে এমনভাবে মেলান, সন্দেহ হয় সত্যি কাগজের কিনা? শিকলির গায়ে প্যাঁচান রুপালী ও সোনালী রঙতা ঝোলান। হাওয়া লাগলেই দুলতে থাকে। আলো প্রতিফলিত হয়ে চকমক করে ওঠে। চারটে কাগজের ঝাড় টাঙান। মধ্যে বাতি জ্বালা। ছবি আঁকা রঙীন বেলুন গোছা গোছা করে বাঁধা। দুপাশে দুটো হলি পাতার তোড়া। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখছি ঘরটা এমন সময় বাড়ির বড় মেয়ে বলল—দেখছেন ওই কোণে কি ঝুলছে। বয়েস বেশী নয়, তবু মহিলা বলা যেতে পারে, ছেলের মা যখন। স্বামী জার্মানীতে। আসার কথা ছিল। কিন্তু ছুটি পায়নি। তাই মার কাছে এসেছে খৃসমাস কাটাতে. আবার প্রশ্ন—জানেন ওটা কি?

ডালটার লম্বা লম্বা পাতা অনেকটা করবী পাতার মত। ফলগুলো দেখতে হলি গাছের ফলের মত, তবে বড় সাদা।

—তাত দেখছি, কিন্তু—

—খুব সাবধান। মেজ বোন টাঙিয়েছে। গাছের নাম 'মিসলটো'। ওখানে গেলে রক্ষে নেই। যে কেউ ধরে চুমু খেয়ে নিতে পারে।

বললাম—সাবধান মেয়েরা হবে। আমি ত স্বেচ্ছায় অসাবধান হয়ে পড়ব।

—ভুলে যাবেন না সঙ্গে পাহারাদার আছে।

ওর মেজবোন ডোরিন গ্রামার [illegible] পড়া। একটু নাক উঁচু। সাধারণ ইংরেজ মেয়ের তুলনায় রাশভারী। [illegible] যে রূপে আমি জানি, খাপ খাচ্ছে [illegible] না 'মিসলটো'র সঙ্গে।

ডোরিন বলে ও [illegible]—কোন উদ্দেশ্য নিয়ে টাঙাইনি। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে এনেছি। সব [illegible] চেয়ে আশ্চর্যের কথা কি জানেন, এর সঙ্গে খৃষ্টধর্মের অনুষ্ঠানের কোন যোগাযোগ নেই। প্রাচীন ইংলণ্ডে ড্রুইড [illegible] আমলে এই প্রথা ছিল। ড্রুইড-[illegible] অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলতে কারও বাধে না। কিন্তু সুবিধে বুঝে এ অনুষ্ঠান বাঁচিয়ে রেখেছে।

আরও দেখুন খৃসমাস গাছ লাগানর রীতি ইংরেজের নিজস্ব নয়। এ অনুষ্ঠান [illegible] জার্মানীর। জানেন ত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স এলবার্ট জার্মানীর লোক। তিনি এর পত্তন করেন। আজ [illegible] ভাবাই যায় না কিছুদিন আগে ইংরেজরা খৃসমাস গাছ বলে কিছু ঘরে সাজাত না।

এ বছর আমার সবচেয়ে কি ভালো লেগেছে জানেন, রানীর বিশেষ খৃসমাস উপহার। উইন্ডসর-এর আটশ বৃদ্ধ-লোককে এক হন্দর করে কয়লা উপহার দিয়েছেন। কয়েক সপ্তাহ অন্তত আগুনের জন্যে কষ্টভোগ করতে হবে না।

আরও একটা ঘটনা বোধ হয় জানেন না, স্কটল্যান্ডের লোকেরা খৃসমাস উৎসব করে না। তাদের উৎসব নববর্ষে। আমরা কয়েক বছর ছিলাম ওখানে।

রাত বারোটা বাজতেই ওদের মধ্যে যে সবচেয়ে কালো সে বাইরে থেকে বাড়ি ঢোকে। হাতে একটুকরো কয়লা, এক পিস রুটি আর একটা পেনি। আগুন খাবার এবং পয়সা এ তিন থাকলে আর কিসের অভাব। অমনি শুরু হয় উৎসব। সেদিন আলোকসজ্জা দেখতে দেখতে পথ হারালেও ভয়ের কিছু নেই। অবারিত দ্বার। চেনা-অচেনার বালাই নেই। যে কোন বাড়িতে ঢুকে খাওদাও আনন্দ কর।

এ যেন নীরস খৃসমাস হয়ে যাচ্ছে—একাডেমিক আলোচনার আসর। উদ্ধার করলেন বাড়ির কর্তা এসে। বলেন—হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো—কতক্ষণ এসেছ...বল, কি দেব, শেরী না শ্যাম্পেন?

বলি—অরেঞ্জ জুস বা লেমনেড খেলে চলে না?

—ওত রোগীর পথ্য। তুমি দেখি বছরটাকে মাটি করতে চাও।

এবার খাবার টেবলে চলে আসি। মাঝে খৃসমাস কেক। আমাদের দেশে প্রাচীনারা সূচীশিল্পে বিখ্যাত ছিলেন। বর্তমানে [illegible] কেক শিল্পে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখায়। কেকের [illegible] চিনির চাদর। তার ওপর লাল পোশাকের ফাদার খৃসমাস। দুচারটে সবুজ হলি পাতা ছড়ান। মাঝে বড় [illegible] লাল হরফে লেখা মেরী খৃসমাস। আর [illegible] আছে বড় 'টার্কি'র রোস্ট। টার্কি না হলেও এর ছোট সংস্করণ মুর্গি এ উৎসবে চাই-ই। মুখ বদলাতে হলে হ্যাম এবং স্যসেজ আছে। একটা খাবারের নাম 'মিন্সড মীট পাই' এর মধ্যে কিন্তু মাংসের নামগন্ধ নেই। মিষ্টি খাবার। ছোট পাউরুটির মত ভিতরে কিসমিস ও নানা ফলের কুচি। বাদাম এ সময়ে চাই-ই। আর দেয় খৃসমাস পুডিং। সোমরস সিঞ্চিত না করলে এ পুডিং সিদ্ধ হয় না। এর মধ্যে থাকে lucky chum—ছপেনি বা শিলিং সেটা যে পায়—বুঝতে হবে তার ভাগ্য ভালো। নানান ফল সাজান থাকে, ছোট ছোট কেক। কিছু ক্র্যাকারও সাজান থাকে টেবলের ওপর। খেতে বসে দুমদাম পটকা ফোটায়। খাওয়া দাওয়ার পর গ্রামোফোন চালিয়ে দেয়। জাজ বাজতে থাকে। দেখি কোন সময় বুড়োবুড়িও উঠে নাচতে শুরু করেছে। সন্ধ্যার সময় বিদায় নিয়ে চলে এলাম। সারাদিনের হৈহুল্লোড়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ওদের এখনও অফুরন্ত উদ্যম। হয়ত আরও কয়েকজন বন্ধু আসবে। চলবে পানাহারের দ্বিতীয় অধ্যায় আর নৃত্যোৎসব। জানতে পারবে না, কোন ফাঁকে রাত পেরিয়ে যাবে। সম্বিৎ ফিরলে হয়ত দেখবে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

চায়ের দোকানে

হরপ্রসাদ মিত্র

পথের পাশে সে ছোট্টো দোকান,
মারবেল-টপ টেবিল জুড়ে—
আমরা ছিলুম, —আরো একজন
চায়ের দোকানে মির্জাপুরে!

'সূর্যও তার উৎস জানে না'—
লোকটা বললে শান্ত হেসে
'কেউ গাছ হই, কেউ বা পাথর
সূর্য-বংশে আমরা এসে!'

'কেউ বাড়ি ফিরি সকাল সকাল,
কারো দেরি হয় আসতে-যেতে—
কেউ বার-বার আসবে দেখুন
নিরালা চায়েরই ফূর্তি পেতে!'

চা খেতে খেতেই ছোট্টো দোকানে
লেগেছিল সে-যে কী চুলোচুলি—
মালিকে-চাকরে খিস্তি খেউড়,
উলুড়ি ধুলুড়ি কী ধুলোধুলি!'

"সূর্যও তার উৎস চেনে না,
সূর্য-বংশে আমরা এসে
কেউ বা মালিক, কেউ বা চাকর!'
—লোকটা বললে শান্ত হেসে।

বাড়ি ফিরে দেখি ভাঙেনি দেয়াল!
দেয়াল কি ভাঙে?—স্বচ্ছ হয়।
—যেখানে দাঁড়ালে হৃদয় খোলাটা
হয়তো কিছুটা সাধ্য হয়!
হয়তো, হয়তো,
যদিও সেও তো
লটারি-ভাগ্য
বিরল! —তাই
সেই লোকটার দোকানে আমরা
মাঝে মাঝে শুধু চা খেতে যাই!

সমাপ্তির জন্যে

অরবিন্দ গুহ

প্রেমিকের চোখে নয়, আমি দেখছি নিরাসক্তভাবে
আপাদমস্তক। তুমি কোনো প্রেমিকের যোগ্য হ'তে
পারবে না যেহেতু তুমি দু-বাহুর আশ্লেষ জ্বালাবে
নানা পুরুষের রক্ত, অন্ধকারে, উল্লাসে, আঘাতে।

আমার এ-বাক্য ব্যর্থ হবে, হ'তে পারে? বর্তমানে
সুনিপুণ অভিনয়ে তুমি একাধিক পিপাসিত
যুবাপুরুষের দেহ টেনে আনো কফির দোকানে,
তোমার কটাক্ষে তারা একসঙ্গে উত্তেজিত, প্রীত।

তোমাকে স্বৈরিণী বলবো? কিন্তু স্বৈরিণীরা ভালোবাসা
জানে না এমন নয়; বাধ্য হ'য়ে তারা অস্বভাবী।
তোমার শরীরে সত্য একমাত্র কদর্য পিপাসা,
শিশ্নোদরপরায়ণ যুবকেরা মেটায় সে-দাবি।

সংসারের চোখে তুমি সুন্দরী। হাঁ, তুমিও সুন্দরী!
তুমি ভালোবাসা খেলা, খেলো একটু ভালোবাসা নিয়ে;
আমি নিরাসক্তভাবে তোমাকে নিঃশব্দে লক্ষ্য করি—
কামার্ত বায়ুর সত্তা তৃপ্ত করো রাজপথে দাঁড়িয়ে।

কারো-কারো চোখে তুমি একটি নববসন্তপ্রেরিতা
ভ্রমরী। তা হোক। তুমি প্রাণহীন প্রসাধনহীন
কবে একা শুয়ে থাকবে শান্তঘরে, বলো, কলঙ্কিতা।
সুন্দরী হ'লেও তুমি, আশা করি, মৃত্যুর অধীন।

আমি সেই সমাপ্তিকে অর্ঘ্য দেবো টগরে-বকুলে,
দেবো স্তব্ধ তৃপ্ত রাত্রে দেবো স্নিগ্ধ প্রশস্ত প্রভাতে।
নিষ্প্রাণ শরীরী শূন্যে ঢেকে রাখবো শান্ত সাদা ফুলে
প্রেমিকের হাতে নয়, শুদ্ধসত্ত্ব শোকার্তের হাতে।

পাখি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

বৃষ্টি নেই, হাওয়া নেই, আপাতত পৃথিবী নীরব।
জানালায় শঙ্খমালা সমুদ্রের গ্রীবা,
দেয়ালে বিরস, নীল গলিত গন্ধের স্রোত, শব
ছুঁয়ে আছো চন্দ্রমল্লী, পৃথিবীর অমর বিধবা।

আর কেউ পাশে নেই; বৃষ্টি নেই, হাওয়া নেই...ঘরে—
ভালোবাসা নেই তার। সমুদ্রগ্রীবার থেকে মালা ঝরে ঝরে
উজ্জ্বল পাখিরা সব একদিন উড়ে গেল পরে......
বৃষ্টি এলো, হাওয়া এলো পৃথিবীর মূঢ় গৃহান্তরে।

॥ ৪ ॥

রণজি যখন ভারতে তখন অস্ট্রেলিয়া দল ইংলণ্ড সফরে এসেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে রণজির শক্তিশালী ব্যাট ছাড়া ইংলণ্ড দল যে কতখানি দুর্বল একথা ইংলণ্ডের জনসাধারণ বিশেষ করে ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা বেশ ভালভাবে বুঝতে পারেন। ফলে রণজিকে ভারত থেকে জাহাজে চড়তে হয় ইংলণ্ডের উদ্দেশ্যে। ক্রিকেটের সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্ক নেই। তাই রণজিকে যখন প্রথম টেস্ট খেলায় নির্বাচনের কথা ওঠে তখন রণজি নিজেই এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কয়েকদিন অনুশীলন করে নিজেকে তৈরী না করে কোনমতেই টেস্ট ম্যাচে তিনি খেলতে রাজী হন না।

প্রথম টেস্ট খেলা থেকে অব্যাহতি পেলেও ট্রেন্টব্রিজ মাঠে দ্বিতীয় টেস্টে রণজিকে অংশ গ্রহণ করতে হয়। ইংলিশ-ক্রিকেটের-জনক ডব্লিউ জি গ্রেস এই টেস্টেই শেষবার অধিনায়কত্ব করেন। খেলার শেষদিনে রণজি যখন দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নামেন তখন ইংলণ্ডের সমতালাভের জন্য ৩০০ রাণের প্রয়োজন, কিন্তু ১ ঘণ্টা ৫০ মিনিট সময়ে এ রান করা সম্ভব নয়। উইকেটে টিকে থেকে পরাজয় এড়ানোই প্রশ্ন। হাওয়ার্ডকে সহখেলোয়াড় নিয়ে রণজি প্রথম ঘণ্টায় ৬২ রান সংগ্রহ করার পর হাওয়ার্ড আউট হয়ে যান। খেলা শেষ হতে তখনো ৪০ মিনিট বাকী অথচ রণজি ছাড়া দ্বিতীয় নির্ভরশীল ব্যাটসম্যান নেই। রণজি এতটুকু ভীত না হয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে যান। প্রতি ওভারের শেষ মুখে রান নিয়ে সহখেলোয়াড়কে বোলারের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেন। খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। রণজি ৯৩ রানে নট-আউট থেকে নিজ দলকে পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা করে অগণিত জনতার অভিনন্দন কুড়োতে কুড়োতে প্যাভেলিয়ানে ফিরে আসেন। এই গৌরবোজ্জ্বল খেলা দিয়েই রণজির ১৮৯৯ সালের ক্রিকেট মরসুম শুরু হয়।

অবশ্য শুধু প্রয়োজনের সময়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণ রণজির কথা মনে করেছে এ কথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। রণজির অবর্তমানে স্যার সিমুর কিং পার্লামেন্টে প্রশ্ন করে জানতে চান "কেন রণজিকে অন্যায়ভাবে নবনগরের গদীচ্যুত করা হয়েছে? আর কেনই বা এ বিষয়ে উপযুক্ত তদন্তের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না?"

যাই হক, ১৮৯৯ সালে সাসেক্স দলের অধিনায়কের গুরুদায়িত্বও রণজির উপর চাপানো হয়। মরসুমে মোট ৩০০০ রান সংগ্রহ করে তিনি ক্রিকেট ইতিহাসে আর এক নুতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। কাউন্টি

ক্রিকেটের রাজকুমার

শ্রীখেলোয়াড়

ম্যাচে তাঁর এই রানসংখ্যার গড় হিসাব ছিল ৭৬·১৬ এবং সকল খেলায় ৬৩·১৮। এ ছাড়া সাসেক্স দলের হয়ে উপর্যুপরি তিনটি খেলায় মোট ৪৯৪ রান করেও রণজি এই বছর সকলকে তাক লাগিয়ে দেন।

ইংলণ্ডের ক্রিকেট মরসুম শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে 'এসোসিয়েটেড ক্লাব অফ ফিলাডেলফিয়া রণজিকে একটি শক্তিশালী ক্রিকেট দল নিয়ে আমেরিকা সফরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। একমাত্র সি বি ফ্রাই ছাড়া ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের নিয়ে দল গঠন করে রণজি আমেরিকা যাত্রা করেন। ঐতিহাসিক সম্বর্ধনার মধ্য দিয়া আমেরিকার জনসাধারণ রণজিকে গ্রহণ করে। ক্রিকেট খেলায় আমেরিকানদের হাত তখন বেশ কাঁচা। রণজি তাই বিপক্ষ দলগুলিকে ১৪ জনকে ফিল্ড করতে এবং ২২ জনকে ব্যাট করতে অনুমতি দেন। আমেরিকার জনসাধারণ খেলা থেকে রণজিকে নিয়েই বেশী ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

ইংলণ্ডের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের মনের মণিকোঠায় রণজি এ সময়ে কিরূপে আসন লাভ করেছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করে বলা সম্ভব নয়। রাস্তাঘাটে যখনই তিনি বের হতেন তখনি দলে দলে লোক এসে ভিড় করতো তাঁকে দেখতে। মাঠে ও মাঠের বাইরে রণজির জনপ্রিয়তার দু একটা দৃষ্টান্ত এখানে অবান্তর হবে না। "রণজি একদিন শ্লিপে ফিল্ডিং করছেন। ব্যাটসম্যান ভুল খেলায় রণজি শুয়ে পড়ে দর্শনীয়ভাবে একটি ক্যাচ ধরেন। আম্পায়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটসম্যানকে আউট হবার নির্দেশ দেন। ব্যাটসম্যানও প্যাভেলিয়নের দিকে ব্যাট হাতে রওনা হন। রণজি তখন চীৎকার করে সেই ব্যাটসম্যানকে আবার খেলা চালিয়ে যেতে অনুরোধ জানান। আম্পায়ারের কাছে গিয়ে তিনি বলেন বলটি নিয়ম অনুযায়ী তিনি ধরতে পারেন নি। আম্পায়ার পূর্ব সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করেন। সেই খেলোয়াড় মনে মনে রণজিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আবার খেলা শুরু করেন।' আর একটি ঘটনা। "নবনগরের একজন বিশিষ্ট রাজ-কর্মচারী এই সময় ফ্রান্সে এসেছিলেন। অপরিচিত লোক ও তার বিচিত্র পোশাক-আসাক দেখে অনেকে প্রশ্ন করে, 'কোথা থেকে আসছেন আপনি?' ভদ্রলোক উত্তর দেন, 'ভারত থেকে।' আবার প্রশ্ন করা হয়, 'ভারত তো একটা বিরাট মহাদেশ, তার কোন রাজ্য থেকে আপনি আসছেন?' ভদ্রলোক আবার উত্তর দেন, 'রাজপুতনা রাজ্য থেকে।' মুখচাওয়াচায়ি করে প্রশ্নকারীরা। বুঝতে পারে না তারা রাজপুতনা রাজ্য ভারতের কোন অংশে! ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে আবার উত্তর দেন, 'রাজপুতনার কাথিয়াবাড় রাজ্য থেকে তিনি আসছেন'। প্রশ্নকারীরা আরও বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। তখন ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করেন, 'নবনগর থেকে।' তখন সমস্বরে সকলে আনন্দে চীৎকার করে ওঠে, 'হাঁ, হাঁ, খুব জানি আমরা নবনগরের কথা, রণজির নবনগর তো।'"
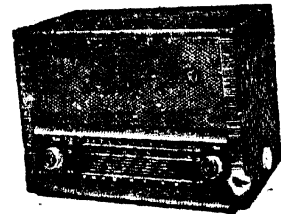
ব্যাটিং ও ফিল্ডিং ছাড়া রণজি বোলিং-এও আনাড়ী ছিলেন না। গ্রেসের অধিনায়কত্বে যখন তিনি লণ্ডন কাউণ্টি দলের হয়ে খেলতেন তখন একদিন কেম্ব্রিজের সংগে খেলায় কেম্ব্রিজের অধিনায়ক গ্রেসকে অনুরোধ করেন যে, তারা তো হেরে যাবেনই সুতরাং গ্রেস যেন নিয়মিত বোলারদের দিয়ে বল না করান। গ্রেস রণজির উপর বোলিং--এর দায়িত্ব দেন। রণজি সেদিন ১৩ ওভার বল করে মাত্র ৫৩ রানের বিনিময়ে বিপক্ষের ৬ জন ব্যাটসম্যানকে আউট করে দিতে সক্ষম হন। মিডিয়াম স্লো অফ ব্রেক বল রণজি বেশ ভালই করতে পারতেন। প্রথম জীবনে সাসেক্স দলের হয়ে খেলবার সময়ে অধিনায়ক মার্ডক তাঁকে বল করতে না দেওয়ায়, তিনি বোলিং-এ নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি বলে রণজি পরবর্তী জীবনে আক্ষেপও কম করেন নি।

১৯০০ সালে রণজি ইংলণ্ডের ক্রিকেট মাঠে আরও উন্নত প্রতিভায় আবির্ভূত হন। পর পর তিনটি খেলায় তাঁর মোট রান ওঠে ৬৬১। পরের খেলাটি কেণ্টের সংগে। বন্ধুবান্ধব রণজিকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, অন্যান্য কাউণ্টির বিরুদ্ধে তিনি শত রান করলেও কেণ্টের বিরুদ্ধে কোন সেঞ্চুরী করতে পারেন নি। কেণ্টের বিরুদ্ধে ১৯২ রানে নট-আউট থেকে রণজি বন্ধুবান্ধবের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এইভাবে একটার পর একটা সেঞ্চুরী হতে থাকে। লিস্টারের বিরুদ্ধে ২৭৫ রান করার পর প্রশ্ন ওঠে রণজি কি যে-কোন মাঠেই এভাবে রান করতে পারেন? কয়েকজনকে রণজির এ

জামনগরের জামসাহেবরূপে রণজি

ক্ষমতায় সন্দেহ প্রকাশ করতে দেখা যায়। তারা বলেন ব্রাইটনের টেস্ট উইকেটে রণজির যে পরবর্তী খেলা হবে তাতেই বোঝা যাবে তিনি কতবড় ব্যাটসম্যান। কারণ ব্রাইটনের পিচ সে বছর বোলারদের অনুকূলে করেই তৈরী করা হয়। রণজিকে এ কথা জানানো হলে রণজি হাসিমুখে ব্রাইটন মাঠে সমালোচকদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেন। ব্রাইটন মাঠে যখন শুধু সেঞ্চুরী নয় ডাবল সেঞ্চুরী করে রনজি প্যাভেলিয়ানে ফিরে আসেন তখন রণজির ক্ষমতায় সন্দিগ্ধ মুষ্টিমেয় সমালোচককে মাথা নীচু করে বসে থাকতে দেখা যায়। এই খেলায় রণজির ব্যক্তিগত রান ছিল ২০২। অন্য ১০ জন খেলোয়াড় মিলে রান করেছিলেন মাত্র ৩৪ এবং বিপক্ষ দলের ১১ জন খেলোয়াড়ের রান ছিল ১১৮। এই খেলার পরেই ... দর্পণ 'উইসডেনে' বড় বড় হরফে প্রকাশ করা হয় "যে-কোন মাঠে এবং যে-কোন অবস্থাতেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হলেন রণজি।"

১৯০০ সালে পাঁচবার ডবল সেঞ্চুরী এবং ছয়বার সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব সমেত ৪,৪৩৯ রান করে ইংলণ্ডের ব্যাটিং এ্যাভারেজে রণজি আবার শীর্ষস্থানের অধিকারী হন। উপর্যুপরি দু'বছরই তাঁর রানসংখ্যা তিন হাজার অতিক্রম করে যায়। অবশ্য সি বি ফ্রাইও এ বছর রণজির সমান ৪,৪৩৯ রান করেন; কিন্তু সি বি ফ্রাই-এর রানের গড় হিসাব যেখানে ছিল ৬৩ সেখানে রণজির রানের গড় ছিল ৮৫।

শিকার করা এবং মাছ ধরার প্রচণ্ড নেশা ছিল রণজির। সারারাত তিনি ছিপ নিয়ে জলের ধারে বসে থাকতেন। দুর্বল শরীরে এই অত্যাচার সহ্য হত না। সর্দি, কাশি,
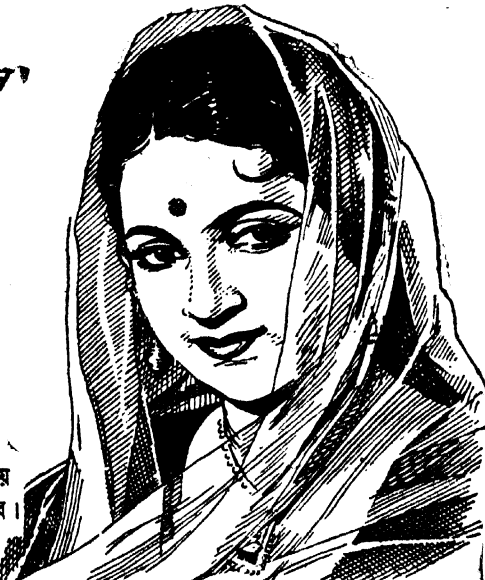
জবরে প্রায়ই ভুগতেন তিনি। তবুও চেষ্টা করে রণজির ছিপ ফেলার নেশা কাটা যেত না। রণজির কাউণ্টি দলের অধিনায়ক তাঁর প্রিয় খেলোয়াড়ের এ নেশার কথা ভাল-ভাবেই জানতেন, তাই যে-কোন বড় খেলার আগের দিন রাত্রে রণজিকে চোখ চোখে রাখতেন তিনি। এই রকম একটা ঘটনার কথা বলি। টনটন মাঠে সমারসেটের সঙ্গে খেলা। সমারসেট দল প্রথম দিন ব্যাট করে বেশ ভাল রান তুলেছে। তাই রণজির দলের অধিনায়ক মার্ডক রাত্রে খাবার টেবিলে বসে সকল খেলোয়াড়দের সকাল সকাল শুয়ে পড়তে উপদেশ দেন। যাতে পরের দিন সম্পূর্ণ সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে তারা বিপক্ষের রানে উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিতে পারে। খাবার পর মার্ডক নিজে রণজিকে বিছানায় লেপ চাপা দিয়ে শুইয়ে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে যান।

জ্যোৎস্না রাত। রণজি আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছেন সেদিন কোথায় ছিপ নিয়ে বসবেন। মার্ডক ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়তেই রণজি দুষ্টু ছেলের মত জুতো খুলে হাতে নিয়ে পা টিপে টিপে জানলা দিয়ে গলে বেরিয়ে পড়লেন। সারা রাত জেগে মাছ ধরে আবার সকালে কারো উঠবার আগে ঘরে ফিরে এলেন। যথাসময়ে হাজির হলেন চায়ের টেবিলে। দলের কোন খেলোয়াড় তার আগের দিনের রাতের মাছ ধরার কথা বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলেন না। খেলা শুরু হতেই রণজি ঝড়ের গতিতে রান করে চললেন। স্কোর বোর্ডে যখন তাঁর নিজের রান উঠলো ২৮৫ তখন বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ায় খেলা বন্ধ হয়ে গেল। প্যাভেলিয়ানে ফিরে এসে মার্ডক রণজির কাঁধে হাত রেখে অন্য খেলোয়াড়দের উদ্দেশ করে বলেন, "দেখলে তো তোমরা রণজিকে সকাল সকাল শুইয়ে দিয়ে এসেছিলাম বলে তার কি ফল।" রণজি হেসে অধিনায়ককে বলেন, "সত্যিই তাই।"

১৯০১ সালে ব্যাটিং এভারেজে তৃতীয় স্থানের অধিকারী হন রণজি। গড়ে ৭০·৫১ রানে মোট ২,৪৬৮ রান করেছিলেন তিনি ৪০ ইনিংসে। এই রানের মধ্যে তাঁর ৩টি ছিল ডাবল সেঞ্চুরী ও ৫টি ছিল সেঞ্চুরী। ইংলণ্ডের ক্রিকেট মরসুম শেষ করেই রণজি ভারতে ফিরে আসেন। ১৯০২ সালে আবার ক্রিকেট মরসুম শুরু হতেই তাঁকে ইংলণ্ডের মাঠে মাঠে দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৩টি টেস্ট খেলায় অবতীর্ণ হবার পর আহত হওয়য় চতুর্থ টেস্টে তিনি আর খেলতে পারেন না। তা ছাড়া সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসবে বহু দেশীয় নৃপতির লণ্ডন আগমনের ব্যাপারে রণজিকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে নিয়মিত সকল খেলায় যোগদান করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। তবুও কাউণ্টি খেলায় গড় রানে তিনি শীর্ষস্থানের অধিকারী হন এবং ব্যাটিং
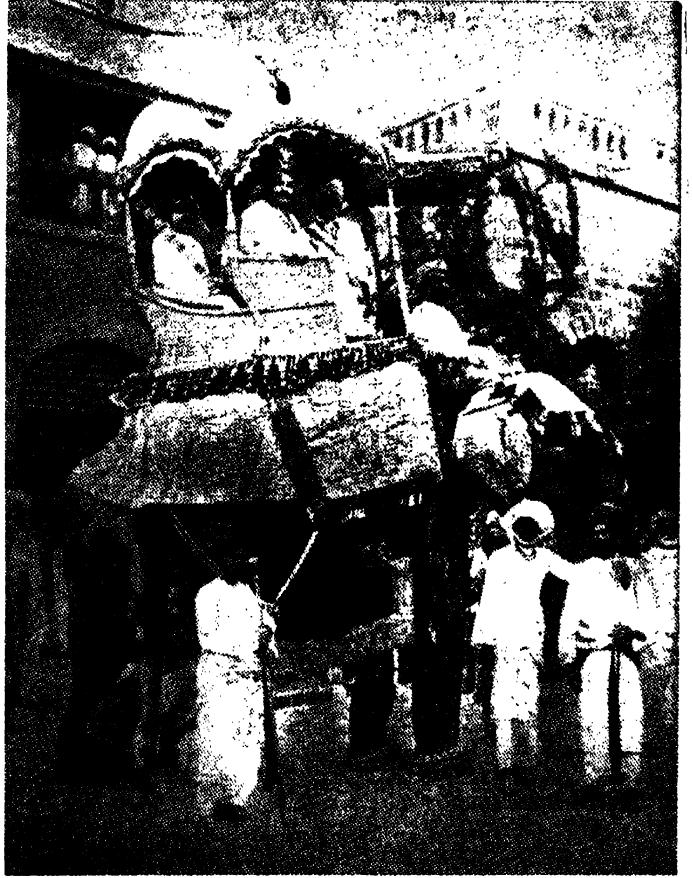
রাজ্যাভিষেকে চলেছেন রণজি

এভারেজে তাঁর স্থান থাকে দু'জনের নীচে। ১৯০২ ও ১৯০৩ সালে গিলিং-এ অবস্থান করে রণজি গ্রাম্য ক্রিকেটেই বেশী যোগদান করে। তবুও ১৯০৩ সালে ইংলণ্ডের ব্যাটিং তালিকায় তাঁর স্থান ছিল মাত্র একজনের নীচে।

রণজি এ সময়ে খুব অর্থের টানাটানির মধ্যে পড়েন। ব্যবসা করে এই অর্থাভাব দূর করবেন বলে স্থির করেন তিনি। ব্যবসা সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। দিলদরিয়া মন নিয়ে ব্যবসায় অবতীর্ণ হলে যে পরিণাম হয় রণজির ভাগ্যেও তাই
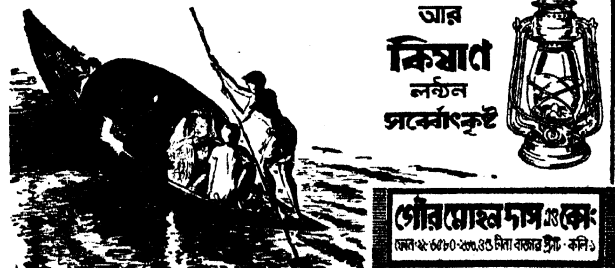
জড়িত থাকলো। এক ব্যবসা ছেড়ে আর এক ব্যবসায় হাত দেন। কিন্তু যেটাতেই তিনি হাত দেন সেইটাতেই কিছুদিনের মধ্যে লাল-বাতি'জবলে ওঠে। অবশ্য ব্যবসায় সুবিধা না হলেও ক্রিকেট সম্বন্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখে তিনি বেশ ভালই রোজগার করতে থাকেন। বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সানের' নিয়মিত লেখক ছিলেন তিনি।

১৯০৩ সালের বসন্তকালে নবনগরে যশোবন্তজীর রাজ্যাভিষেক। এই অভিষেকের কোন নিমন্ত্রণ রণজির কাছে পাঠান হয় না। মানসিক অশান্তি ও যন্ত্রণা [illegible] মুক্তির জন্য আবার তিনি তাঁর প্রিয় ক্রিকেটের মধ্যে মনপ্রাণ [illegible] দেন। ফলে সারের বিরুদ্ধে [illegible] রান, লেস্টারসায়ারের বিরুদ্ধে নট-আউট থেকে ১৬২ রান, ল্যাঙ্কাশায়ারের বিরুদ্ধেও নট-আউট থেকে ১৪৪ রান এবং নর্দান আরস-এর বিরুদ্ধে ১০৫ রান—এই-ভাবে একটার পর একটা সেঞ্চুরী বেরুতে থাকে তাঁর ব্যাট দিয়ে।

১৯০৪ সালটি রণজির স্মরণীয় ক্রিকেট-জীবনের শেষ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই বছর [illegible]রু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি খেলায় তি[illegible] ক্রিকেটের উন্নত কলাচাতুর্য দেখিয়ে [illegible] সারা ক্রিকেট বিশ্বকে হতবাক ক[illegible] দিয়েছিলেন। এই বছর তিনি শুধু ইংল্যান্ডের ব্যাটিং এভারেজে প্রথম স্থানের অধিকারী হননি, তাঁর খেলা সম্বন্ধে উইসডেনে [illegible]লেখা হয়েছিল,

"From the first to the last ball he was at the highest pitch of excellence, and beyond that the art of batting cannot go."

ইংলণ্ডের ক্রিকেট মরসুম শেষ করে রণজি লর্ড হককে সঙ্গী নিয়ে [illegible]তের পথে যাত্রা করেন। যশোবন্ত সিং[illegible] সরকারীভাবে জামনগরের গদিতে বসলেও তাঁর পাঁচটি বিবাহিত স্ত্রী তখনও কোন সন্তান দিয়ে ভবিষ্যতে রণজির দাবীকে একেবারে মুছে দিতে পারেননি বলে একটু সান্ত্বনা তার মনে তখনও বাসা বেঁধে ছিল। ভারতের অধিকাংশ নৃপতিদের কাছেই রণজি ছিলেন অত্যন্ত প্রিয়। তা ছাড়া বড়লাটের সঙ্গেও তাঁর বেশ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

নবনগরের যশোবন্ত সিংজী এবং তাঁর অনুচরেরা রণজির ঘন ঘন ভারতে আগমনে এবং বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের সঙ্গে মেলা-মেশাতে শঙ্কিত হয়ে পড়তে থাকেন। ভবিষ্যতে জামনগরের সিংহাসনে রণজি যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারেন সেই কারণে যশোবন্ত সিংজীর অনুচরেরা রণজির সম্বন্ধে নানারূপ কুকথা প্রচার করতেও কসুর করেন না। এমন কি রণজি দুশ্চরিত্র স্বভাবের জন্যই এ ভাবে দেনায় জড়িয়ে থাকেন একথা বলতেও তারা দ্বিধা করেন না। এ কথা শুনে রণজি সেদিন যেমন হেসেছিলেন তেমনি অন্তরালে বসেও আর একজন বোধ হয় হেসেছিলেন জাম-নগরের ভবিষ্যৎ দেখে।

কিছুদিনের মধ্যেই যশোবন্ত সিংজী অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুর্দান্ত টাইফয়েড রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হন তিনি। ২৪ বছরের যুবক যশোবন্ত সিংজী সে রোগের আক্রমণ থেকে রেহাই পান না। কয়েকদিনের মধ্যেই যশোবন্তের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয় রাজপ্রাসাদ থেকে।

রণজি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে একটুও বিলম্ব করেন না। সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে সকল প্রয়োজনীয় স্থানে তাঁর ন্যায্য দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করার অনুরোধ পাঠান। এছাড়া ভারতে এবং ইংলণ্ডে রণজির ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিয়ে দাবী তোলার লোকেরও অভাব হয় না। অনেক জল ঘোলা করে এবং অনেক আইন কানুনের বৈতরণী পার হয়ে অবশেষে ভারত সরকারের আদেশ বার হয়। জামনগরে জামসাহেব হন ক্রিকেটের রাজকুমার রণজি। (ক্রমশ)

মা

দাজীবন ভট্টাচার্য

"দুঃখ তাঁর পায়ে পায়ে পোষা বেড়ালের মত ঘুরে বেড়াবে চিরকাল।"

উজ্জ্বল দিনের মুখটা বেজার হয়ে যায় আস্তে আস্তে। পৃথিবীর সমস্ত রং মুছে কালো হয়ে যায় চারদিক। যেন দিনের বিশাল প্রসার এবার সংকুচিত হয়ে আসে ধীরে ধীরে। এখনো চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকা যায় না। স্নেহলতা উঠে বসেন।

সারাটা দিন কেটেছে ক্লান্তিকর নির্জনতায় একলা। কেউ ছিল না কাছে। একটা কথা বলার লোক পর্যন্ত না। হরিপদও ঘরের কাজ সেরে কোথায় চলে গেছে। সারাটা দুপুর বাইরে আড্ডা দিয়ে কাটিয়েছে। সেজন্যে কোন অভিযোগ নেই স্নেহলতার। চাকর বলে কোন জুলুম নেই হরিপদর উপর। সন্ধ্যা না হতেই ফিরে এসেছে হরিপদ। স্নেহলতার ঘুম ভাঙারও আগে। হরিপদ এসেছে। ঘর-দোর ঝাঁট দিয়ে দুপুরের এ'টো বাসন ধুয়েছে। জল তুলে উনোনে আঁচ দিয়েছে। স্নেহলতা এসব জানেন। কিন্তু টের পাননি আজ। জানালা দিয়ে দলা পাকানো কয়লার ধোঁয়া ঢুকেছে এ ঘরে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়েছে। নাক-মুখ জ্বালা করেছে। তন্দ্রার ঘোর কেটে গেছে স্নেহলতার।

স্নেহলতা ধীরে ধীরে বাইরে আসেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চুপ করে কাজ দেখেন হরিপদর। তারপর বাথরুমের দিকে এগিয়ে যান। পাঁচ মিনিটও লাগে না। মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে আসেন ফের। ঘড়ির গায়ে তখন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা।

স্নেহলতা চুপ চাপ বসে থাকেন। একটু আগের আলো এখন ছায়া হচ্ছে ধীরে ধীরে। ঘরের কোণে কোণে অন্ধকার জমছে। অন্ধকারটা আকার নিচ্ছে। বড় হচ্ছে। এগিয়ে আসছে সামনে। বাইরে পৃথিবী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ঘরের দেয়াল মিলিয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে। অন্ধকার, সব অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। স্নেহলতা একমনে তাই চেয়ে-চেয়ে দেখেন। বড় ক্লান্ত লাগে। বড় একলা মনে হয় নিজেকে। কেমন করুণ!

বুঝি সওয়া যায় না আর। রাক্ষুসে অন্ধকারটাকে আর দেখা যায় না চোখ মেলে। স্নেহলতা ডাকেন, 'হরিপদ, হরিপদ!'

উনোনে বাতাস করছিল হরিপদ। পাখা হাতে ছুটে আসে এ ঘরে। 'আমাকে ডাকছেন মা?'

নিজের ডাকে নিজেই চমকে ওঠেন স্নেহ-লতা। আশ্চর্য হন নিজের ব্যবহারে। যেন লজ্জা পান। নিস্তেজ গলায় বলেন, 'রাত হল, আলো জ্বালাবিনে?'

হরিপদ কী ভাবে। কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। হয়তো সে-ও অবাক হয়েছে কম না। দু' পা এগিয়ে দেয়ালের গায়ে সুইচটা টিপে দেয় হরিপদ। মুহূর্তে এক রাশ আলো ছড়িয়ে পড়ে ঘরময়। আলোর ঢেউ যেন! আর একটা তাড়া খাওয়া জন্তুর মতই অন্ধকারটা পালিয়ে যায়। ঘরে না, বাইরে। ভয়ে ভয়ে আড়চোখে তাকিয়ে দেখেন স্নেহ-লতা। হরিপদকে না। জানালার বাইরে দাঁড়ানো আকাশ সমান কাঁধ উঁচু করা একটা দৈত্যের মত বিশাল, আর পাথরের মত কঠিন গোঁয়ার মুর্খ অন্ধকারটাকে। দৈত্যটা দাঁড়িয়ে। যেন অপেক্ষা করছে কার। অন্ধকারটা ভয় পেয়েছে। এক ফোঁটা আলোর ভয়ে কাঁপছে থর-থর!

হরিপদ এখনো দাঁড়িয়ে। চেয়ে চেয়ে স্নেহলতাকেই দেখছে ও। একটা অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করছে যেন। যা কোনদিন দেখেনি। কোনদিন ভাবেনি হরিপদ। আজ তাই দেখছে। স্নেহলতার গলাটা যেন অস্বাভাবিক নতুন শুনিয়েছে আজ।

আচরণের অস্বাভাবিকতা বুঝি টের পেয়েছেন স্নেহলতা নিজেও। তাই তাকাতে পারছেন না। দেখতে পারছেন না হরি-পদকে। মুখ বুজে তাকিয়ে আছেন বাইরে। অন্ধকারের কালো ভূতটাকে দেখছেন এখনো।

আর বুঝি থাকা যায় না। ঘরে একজন থাকা সত্ত্বেও কিছু না বলা আরো অস্বাভাবিক মনে হয়। তাই মুখ খোলেন স্নেহলতা। বলেন, 'দাঁড়িয়ে রইলি যে! যা, কাজে যা তুই!'

হরিপদ আর দাঁড়ায় না। চলে যায়।

ছেলেটা কথা শোনে। শুধু এই ছেলেটাই। আর কেউ না। কাউকে বলা চলে না কিছু। কেউ শোনে না স্নেহলতার কথা। পাঁচ মেয়ের একটিও না। কিন্তু তারা শ্রদ্ধা করে। ভালবাসে তাদের মাকে। শুধু মানতে পারে না। অত ভাল, অত সুনাম যেই মেয়েদের তারা কেউ মায়ের বাধ্য না। স্নেহলতা তাই ভাবেন। ভেবে ভেবে মন খারাপ করেন মাঝে-মাঝে। এ সংসারে তার খেয়ে পরে বেঁচে থাকার স্বীকৃতিটুকু ছাড়া [illegible] কোন দাবী এরা মানে না। [illegible] কোন মূল্য নেই। যেন [illegible] নেই কোন কিছুতেই। সবাই আছে, সব-ই আছে স্নেহলতার। অথচ কিছুই নেই। কেউ নেই স্নেহলতার। নিজেকে নিয়ে এমনি আগলেছে, এমনি একা আর থাকা যায় না। এই নিঃসঙ্গতা আর সহ্য হয় না যেন।

বয়স বেশী না হরিপদর। বছর বারো হবে। এখনো ছেলেমানুষ। কেউ নেই ওর। ও একলা। ওকে তাই ভাল লাগে স্নেহলতার। একমাত্র ওকেই। ছেলেটার জন্যে মায়া হয়। কেমন এক স্নেহ। হয়তো প্রথম ছেলেটা বেঁচে থাকলে এতদিনে হরিপদর বয়সী নাতী হত স্নেহলতার। কিন্তু তা হয়নি। প্রথম ছেলেটাই বাঁচেনি স্নেহলতার। [illegible] শুধু মেয়ে। পর পর পাঁচটি মেয়ের মা হয়েছেন স্নেহলতা। আজ তারা বড় হয়েছে। অ[illegible] বড়।

বড় মেয়ের ব[illegible] পঁয়ত্রিশ। নাম বিমলা। এম এ পাশ করে [illegible] মাস্টারী করছে সে। আর কিছু না।

তারপর অমলা। এখান[illegible] হাসপাতালের লেডি ডাক্তার। তাকে দিয়ে [illegible] হবে না।

রমলার বয়স ত্রিশ। বছর [illegible]যেক আগে একবার বি এ পাশ করেছিল। তারপর আর কিছুই করেনি। এখন ঘরে বসে ব[illegible] পড়ে আর লেখে কি সব। সে নাকি লেখিকা।

নির্মলা তো রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত। মিটিং আর মিছিল ছাড়া তার কাজ নেই। ও মেয়ে ঘরে থাকে কম। প্রায় থাকেই না।

সব চেয়ে ছোট কণা। বয়স বছর বিশেক। শুধু নামে না, স্বভাবেও দিদিদের সঙ্গে ওর অমিল অনেক। মগজে খাদের মিশেলটা বুঝি একটু বেশী ওর। বছর খানেক আগে টেনে-টুনে আই এ পাশ করেছে। এখন ভা[illegible] চাকুরির আশায় শর্টহ্যান্ড শিখতে [illegible] কোথায়। এ মেয়েটাকে তবু বিশ্বাস [illegible] যায়। এখন ওকে ঘিরেই ভয়-ভয় আশা স্নেহ-লতার। কণা দিদিদের মতন না। ওদের [illegible] আলাদ। স্নেহলতার হাতেরপাঁচ এখন কণাই! মাঝে মাঝে এই মেয়েও চমকে দেয় মাকে। তখন আর বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় না স্নেহলতার। এক মুহূর্তেই সমাজ-সংসারের উপর সব আস্থা হারিয়ে ফেলেন। নিজেকে নিয়ে মেয়েদের সামনে দাঁড়াতে ভয় হয়। লজ্জা করে। অথচ স্নেহলতার হাতেই নিজেদের ছাড়া ছাড়া সংসারের সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে ওরা আজো নিশ্চিন্ত। স্নেহ-লতার তাই দুঃখ।

গরীবের ঘরে জন্ম। বামুন-পণ্ডিতের মেয়ে স্নেহলতা। এত বিদ্যে তাঁর পেটে ছিল না কোন দিন। চিঠি লেখা আর বাজারের হিসেব রাখা। শিক্ষা বলতে ঐটুকুই। আর কিছুই জানা নেই স্নেহলতার। অথচ কপাল-গুণে মাত্র ঐটুকু বিদ্যে সম্বল করেই গাটছড়া বেঁধেছিলেন একটা বিদ্যের জাহাজের সঙ্গে। বউয়ের থেকে বই-ই ছিল যার প্রিয়। তবু স্নেহলতার কষ্ট ছিল না। বেগ পেতে হয়নি কিছুই। নিঃসংকোচে স্বামীর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলেই এগিয়েছেন তিনি। নির্দ্বিধায়। কারণ সাংসারিক ব্যাপারে দীন-বন্ধুর মত অর্বাচীন এবং অপটু আর একটিও ছিল না। সংসার কিন্তু অচল হয়নি তাতে। নির্বিবাদ কেটে গেছে দিন।

স্নেহলতার মনের কথাটা বুঝি টের পেয়েছিলেন দীনবন্ধু। তাই সান্ত্বনার সুরে মাঝে মাঝে বলতেন, 'একটা ছেলের জন্য তোমার ভারি দুঃখ, না?'

স্নেহলতার তখন লজ্জা হত। স্বামীর মুখের দিকে তাকাতে পারতেন না।

দীনবন্ধু বলতেন, 'দুঃখ কর না। এই
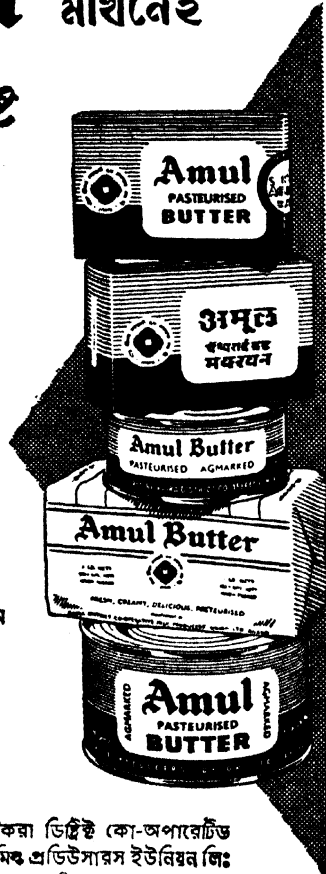
মেয়েরাই আমাদের ছেলের অভাব পূ... করবে। ক্ষমতার দিক থেকে কেউ-ই ক...। চাই শুধু উপযুক্ত শিক্ষা, আর রু... মেয়েদের আমরা তাই দেবো।'

কথা শুনে আহত হতে... স্নেহলতা। রুচি আর শিক্ষার কথা শু...য়ে বুঝি তাঁকেই আঘাত করতে চান ...নবন্ধু। স্নেহলতা তাই চুপ। কথা বল... স্পর্ধা হত না। ইচ্ছে হত না।

আলতো...ভাবে চিবুকটা ছুঁয়ে স্নেহলতার মুখ দে...তেন দীনবন্ধু। বলতেন, 'চুপ করে রইলে যে! বলবে না কিছু?'

'...কী বলবো? আমি কী বুঝি তোমার কথার?' স্নেহলতার মুখে-চোখে ছড়িয়ে পড়ত বেদনা আর সংকোচের আভা।

দীনবন্ধু বলতেন, 'এ কথা তা বোঝো, ওরা আমাদেরই মেয়ে? আর মেয়ে বলেই ওদের সম্পর্কে কোন অশ্রদ্ধা রাখা উচিত না আমদের মনে?'

'আমার মধ্যে কি তেমনি ভাব তুমি ...খেছো?'

'না। তাহলেও শোনো. মেয়ে মানে প্রথমে বাপের তারপর স্বামীর নিষ্কর ভূসম্পত্তি না। ওদের নিজের ইচ্ছে বলেও একটা বস্তু আছে। অধিকার আছে!' দীনবন্ধুর গম্ভীর গলার কথাগুলি সারা ঘরে গম গম করত।

আশা ব্যর্থ হয়নি দীনবন্ধুর। বর্ণে বর্ণে সত্যি হয়েছে তাঁর কথাই। মেয়েরা তাঁর মানুষ হয়েছে। বড় হয়েছে। স্বাধীন হয়েছে। বেঁচে থাকলে দীনবন্ধু এসব দেখে খুশিই হতেন। সব চেয়ে আনন্দ পেতেন তিনি।

কিন্তু স্নেহলতার দুঃখ ঘোচেনি। আশা অপূর্ণ থেকে গেছে আজো। একদিন ছিলেন স্বামীর স্ত্রী। আজ হয়েছেন মেয়েদের মা। আর কোন পরিবর্তন হয়নি। শুধু বয়সটা একটু বেড়েছে। চুলগুলি কালো থেকে রূপোলী রং ধরেছে আস্তে আস্তে। আর যা ছিলেন না, স্নেহলতা তাই হচ্ছেন, দিনকে দিন। কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছেন। বড় ক্লান্ত লাগে। চোখ দুটো আর বেশী দূরে চলে না। সব মনে হয় ঝাপসা। বেশীক্ষণ হাঁটা যায় না। পা দুটো টন টন করে ব্যথায়। রাত্রেও ভাল ঘুম হয় না স্নেহলতার। কিন্তু সে কারণ অন্য। অন্তত স্নেহলতার তাই ধারণা। মেয়েদের একটা গতি হলে তিনি নিশ্চিন্ত। ঘুম আসবে আবার। তখন নির্বিঘ্নে ঘুমোতে পারবেন স্নেহলতা। কিন্তু তা আর হল কই! আজো কিছু হচ্ছে না মেয়েদের। মেয়েরাই হতে দিচ্ছে না। যন্ত্রণা বলতে স্নেহলতার এ-ই। আর কিছু না। তাঁর হাতের মুঠোয় কেউ নেই।

তিনি একলা, অসহায়, স্নেহলতার ভয় হয়। নিজেকে নিয়ে ভীষণ আতঙ্ক। নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলি তাই এমন দুঃসহ। একলা ঘরে স্নেহলতার যেন কান্না পায় ...। যে কান্না এ সংসারে এসে একদিনও কাঁদেননি ...।

সাড়ে সাতটায় ট্রেন স্টেশন ...য়ে গেল। মাত্র কয়েক মিনিটের বিরতি। বাঁশি বাজিয়ে ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করে। গাড়ির চাকায়-চাকায় একটা অসহ্য ধাতব সঙ্গীত অনেকক্ষণ ধরে বেজে চলে। চমকে ওঠেন স্নেহলতা। নড়ে-চড়ে বসেন। খোলা জানালার ফাঁকে তাকিয়ে থাকেন একদৃষ্টে। এখান থেকে সব দেখা যায়। দেখতে পান স্নেহলতা। চলন্ত চিত্রের মত অনেক আলো অনেক মুখ নিয়ে কালো সরীসৃপটা তার দীর্ঘ শরীর নিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল পলকে। শব্দটা মিলিয়ে গেল দূরে থেকে দূরে। তারপর আর শোনা গেল না।

স্নেহলতার সম্বিত ফিরে এল। বাইরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল কার। না, এ ঘরে কেউ এল না। পাশের ঘরে শব্দ হচ্ছে খুট-খাট। কে এল? নির্মলা বুঝি। চারদিন বাড়ি নেই ও। ওদের পার্টির কংগ্রেস হচ্ছে পাটনায়। নির্মলা তাই বাড়ি-ছাড়া চারদিন। কথাটা স্নেহলতার জানা ছিল না। প্রয়োজন-বোধ করেনি কেউ জানানোর। স্নেহলতারও যেন আগ্রহ নেই। নির্মলার অভাববোধ করেননি তিনিও। শুধু আজ সকালে মনে হয়েছে কথাটা। স্নেহলতা লক্ষ্য করেছেন নির্মলা নেই। তারপর কণাই বলেছে মাকে। শুধু আজ না। আজ চারদিন নির্মলা বাড়ি ছাড়া। আবার আজকেই নাকি ফিরে আসার কথা। তবে কি ওঘরে নির্মলা? হয়তো হবে। কিন্তু স্নেহলতার যেন উঠবার শক্তি নেই। ইচ্ছে নেই ওঘরে যাবার।

'মা কোথায় রে হরিপদ?'

নির্মলা না। বিমলা। গলার স্বরে এবার চেনা যায়। স্নেহলতা বাইরে আসেন। বিমলা মাকে দেখে এগিয়ে আসে। বলে, 'চুপ-চাপ কী করছিলে একলা ঘরে?'

স্নেহলতা হাসেন। বলেন, 'এমনি বসেই-ছিলুম।'

বিমলা মায়ের মুখ দেখে। কেমন উদ্বিগ্ন মনে হয় বিমলাকে। কাছে এসে মায়ের কপালে হাত রাখে। বলে, 'শরীরটা কি ভাল নেই তোমার?'

স্নেহলতা যেন অস্বস্তিবোধ করেন। বলেন, 'না রে, না। শরীর আমার ভালই আছে।' তারপর হরিপদকে বলেন, 'হরিপদ চা দে তোর দিদিকে।'

বিমলা বাধা দেয়। 'না মা, না। চা লাগবে না। অনেকগুলি মিষ্টি আর চা খেয়ে এসেছি আমাদের সেক্রেটারীর ওখানে। এখন গলা জ্বলছে। হয়তো অম্বল হয়েছে। আজ আর কিছুই খাব না।'

...একে একে সবাই ফেরে। নির্মলা ছাড়া।

কণা কিন্তু দিদিদের ঘরে যায় না। স্নেহলতার ঘরেই ঢোকে। শুধু কণাই। তাছাড়া আর কেউ না। আর সবাই ওঘরে থাকে। চার বোনের আস্তানা ওটাই। চারটি পাখির নীড় ওটি। দিনের শেষে ওখানে সবাই ফিরে আসে। আবার রাত্রি শেষে কোথায় যে চলে যায় কে! শুধু কণা ছাড়া। কারণ এখনো ভালভাবে ডানা গজায়নি ওর। গজালে কণাও মাকে ছেড়ে যাবে। আর সব মেয়েদের মতই কণাও দূর হবে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে স্নেহলতার।

শাড়ি বদলে মায়ের কাছে আসে কণা। দুই হাতে জাপটে ধরে স্নেহলতাকে।

এ মেয়েটা এখনো ছেলেমানুষ আছে। স্নেহলতা বলেন, 'ছাড়্ ছাড়্! পিষে মেরে ফেলবি নাকি আমায়?'

কণা ছেড়ে দেয়। স্নেহলতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'মা তুমি কি খুব কেঁদেছো আজ?'

স্নেহলতা অস্বস্তিবোধ করেন। বলেন, 'কৈ না তো! কাঁদবো কেন?'

'তবে কি শরীর ভাল নেই তোমার? তোমার মুখটা কেমন দেখাচ্ছে মা।'

স্নেহলতার এ আরেক ভয়। বুঝি মনের ভাবনা-চিন্তাগুলি নিয়ে কখন হাতে-হাতে ধরা পড়ে যান মেয়েদের কাছে। তাই শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতই অস্বাভাবিক হাসি হাসেন স্নেহলতা। যা তাঁর স্বভাব না। যা তিনি নিজেও অপছন্দ করেন। স্নেহলতা বলেন, 'পাগল মেয়ে! কেন রে? আমার কি এ-ই কান্নার সময়!'

কণা বলে, 'না মা, তুমি কেঁদো না। মন খারাপ করে থেকো না। তখন তোমাকে দেখলে আমার মন কেমন করে। কাঁদতে ইচ্ছে হয় আমারও।'

স্নেহলতা ধমক দেন মেয়েকে। দরদভরা গলায় বলেন, 'কথা শোন মেয়ের। পাকামো দেখো। এই কি তোর কাঁদবার সময়!'

'তবে তোমার কাঁদবার সময় কিসে শুনি?'

'আমি তো কাঁদি না। আর যদি কাঁদি, সে মরে যাবার ভয়ে। বয়স তো হয়েছে। মরে গেলে কে তোদের দেখবে।'

'বয়স হোক। তোমার মত বয়সের মানুষ কি সংসারে নেই আর? তারা তো দিব্যি বেঁচে আছে। মরার কথা ভুলেও ভাবে না তারা। তা ছাড়া মরবে কেন তুমি। রোগ হবে? অত বড় ডাক্তার যার মেয়ে রোগ সারাবার চিন্তা কি তার?'

'দেহের অসুখ সারে। কিন্তু মনের অসুখের কি কোন ওষুধ আছে রে পাগলী?'

'না, মনেও তোমার অসুখ হতে দেবো না আমি।' কণা যেন আবদার করে।

স্নেহলতা হাসেন। বলেন, 'তুই না দিলে কী হবে। তোর বোনেরা কি একমত হবে তোর সংগে?'

কণা এইবার বোঝে। মায়ের মনের অসুখটা এই মুহূর্তে যেন ধরা পড়ে যায় কণার কাছে। কণা তাই কথা বলে না আর। এক সুখকর লজ্জায় চুপ করে থাকে। আর এই মুহূর্তেই কেন যেন রঞ্জনকে মনে পড়ে। সুতপার ভাই রঞ্জন। কণার কলেজের বান্ধবী সুতপা। মাকে কথাটা জানালে কি সত্যি খুশি হবে। নাকি অন্য কিছু। কণা সেই কথাই ভাবে। তারপর চলে যায়।

অনেক রাত্রে নির্মলা ফেরে। কিন্তু একা নয়। নির্মলার সংগে আরেকজন। মেয়ে না। পুরুষ। নির্মলা মায়ের সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়। অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধ কিছুদিন এখানে থাকবে। স্নেহলতা অনিরুদ্ধকে দেখেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন সব। বয়স বেশী না। নির্মলার চেয়ে বয়সে ছোটই হবে অনিরুদ্ধ। অন্তত স্নেহলতার তাই মনে হয়। মনটা তাই কুঁকড়ে আসে। কচ্ছপের শুঁড়ের মত গোপন আশংকা গুটিয়ে যায় মনের মধ্যে। তবু ভরসা হয়। অনিরুদ্ধ কিছুদিন থাকবে।

একে একে সব-ই জানা হয়ে যায়। অনিরুদ্ধ সম্পর্কে সমস্ত উৎসাহ এবং কৌতূহল মিটে যায় স্নেহলতার। বাপের একমাত্র ছেলে। রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই করে না। রাজনৈতিক প্রয়োজনে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। অকপটে সব কথাই স্নেহলতাকে বলে অনিরুদ্ধ। এবার নির্মলার সংগে দেখা পাটনায়। এ-ই প্রথম আলাপ ওদের। সংসারের ভাবনা ওর নেই। তাই নিশ্চিন্তে চলে এসেছে নির্মলার সংগেই। কিছুদিন থেকে হয়তো এখান থেকে চলে যাবে ফের। এ সব খেয়াল ছাড়া কিছু না। অন্তত স্নেহলতার তাই ধারণা। স্নেহলতা এমন অনেক দেখেছেন। অনেকেই এসেছে এখানে। কিন্তু সিঁড়িতে কালি পড়েনি কারো। স্নেহলতা জানেন, অনিরুদ্ধ তেমনি চলে যাবে। আর কোনোদিন এমুখো হবে না। যেমন হয়নি কেউ।

রাত বাড়ে। পাড়াটা নিঝুম। বড় শীত। স্নেহলতার অভিজ্ঞতায় গত দশ বছরেও এমন শীত বিশ্রী কলকাতায় পড়েনি। আর এই তো সবে পৌষের প্রথম। বাইরে কুয়াশা। টুপ টুপ শিশিরের শব্দ। ঠাণ্ডায় পাখিদের গলাও বুঝি বুজে এসেছে। ভুল করেও ডাকে না কেউ। কোন পাখিই ডাকে না। কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে বারান্দায়। লেপের তলায় তাপেও শান্তি নেই। হাড়ের ভেতরে কাঁপন ধরে স্নেহলতার। ঠক-ঠক করে শুধু কাঁপেন। অথচ কণাটা কি নিশ্চিন্ত! ভয়ংকর স্বার্থপরের মতই মায়ের পাশে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে ও। এ মেয়েটা এখনো আদুরে। মাকে ছাড়া ঘুম আসে না ওর। ওকে দেখে সত্যি হিংসে হয় স্নেহলতার।

শুধু আজ না। স্নেহলতার চোখে ঘুম নেই বহুদিন। যেদিন থেকে বিমলা বড় হয়েছে। তারপর এই মেয়েরা। দুশ্চিন্তায় স্নেহলতা বুড়িয়ে গেলেন ধীরে ধীরে। রাত্রে আর ঘুমোতে পারেন না। অঘুমের ক্লান্তিটুকুও দিবা নিদ্রায় পুষিয়ে নেবার ইচ্ছে হয় না কেবল ভাবেন আর ভাবেন। মনে হয় ভাবতে ভাবতেই একসময় মরে যাবেন স্নেহলতা।

বিছানায় পড়ে থাকা দায়। উঠে আসতে

হয় স্নেহলতাকে। দরজা খুলে বাইরে না এসে পারেন না। কণা এসব টের পায় না ওর ঘুম ভাঙে না। স্নেহলতারও ইচ্ছে হয় ওকে জাগাবার। কিন্তু যারা জেগে আছে! জেগে থাকাই যাদের রোগ, স্বভাবের স্বভাব! স্নেহলতা কী করবেন তাদের নিয়ে?

দরজার কড়া নড়ে। অমলা শোনে। বিরক্ত হয়।

অমলা টের পায়। উঠে বসে বিছানায়।

রমলা বিরক্ত হয়। কলমে ক্যাপটা পরিয়ে টান-টান হয়ে বসে চেয়ারে। এ এক উপদ্রব মনে হয় তার।

দরজার কড়া নড়ে। নির্মলা ঘুমোয়।

বিমলা কথা বলে না। অমলা চুপ। রমলা বিরক্ত হয়ে জিগ্‌গেস করে, 'কে?'

'আমি রে, আমি!' স্নেহলতার গলায় উৎকণ্ঠা।

'আমি তো সবাই। কে তুমি?' বড় কর্কশ শোনায় রমলার গলাটা। মাকেও চিনতে পারে না নাকি ও?

'তুমি আমি তোদের মা।' ভয়ে ভয়ে উত্তর করেন স্নেহলতা।

দরজাটা খুলে যায়। শাসনের সুরে জিগ্‌গেস করে রমলা, 'কী, শীত করে না তোমার? ঘুম নেই?'

'ঘুমোতে পারিনে।' স্নেহলতা কুঁকড়ে আসেন। যেন মেয়ের কাছে ভয়ে ছোট হয়ে যান। বলেন, 'বিমলা ঘুমিয়েছে?'

দরজা ছেড়ে দিয়ে রমলা বলে, 'না।'

স্নেহলতা এগিয়ে যান। বিমলার বিছানার পাশে সরে আসেন। অতি আস্তে শুধোন কথাটা। 'মাথা ধরাটা সেরেছে?'

করুণ গলায় উত্তর করে বিমলা, 'না। বুকটাও জ্বলছে।'

স্নেহলতা বলেন, 'সোডা খেয়েছিলি?'

'খেয়েছি। ওতে আর কিছু হয় না।'

অমলা মাকে রাগ করে। 'এ সব কথা কালকে জিগ্‌গেস করলে হত না?'

স্নেহলতা বড় করুণ চোখে অমলার দিকে তাকান। বলেন, 'একটা কথা বলতে এলাম।'

রমলা বলে, 'তাই বল। কিন্তু একটা কথার জন্য অত বড় ভূমিকার দরকার কী?'

স্নেহলতা এবার লাজ-লজ্জার মান খুইয়ে বলেই ফেলেন কথাটা। দু' তিনবার ঢোক গিলে নেন আগে। শেষে সকলের মুখের দিকে তাকান। বলেন, 'আমাকে একটা বাড়ি করে দে তোরা।'

মেয়েরা অবাক হয়। একসঙ্গে বলে সবাই। 'কেন!'

'আমি থাকবো। একলা থাকতে চাই আমি।' চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে স্নেহলতার।

'তোমার কথাটা ঠিক বুঝলাম না।' অমলার অস্বস্তিকর ঠেকে মাকে।

'আমাকে তোরা ছেড়ে দে এবার। মুক্তি দে আমাকে।' আকুল আবেদনের মতই স্নেহলতার কথা। কান্নায় ভাঙা-ভাঙা।

'তবে বাড়ি করবার কী দরকার? কোন তীর্থে না হয় কাটিয়ে এসো কিছুকাল।' রমলা বলে।

'না, তীর্থে আমি যাবো না। বাড়ি চাই আমার। যা মরে গেলে তোদেরই থাকবে।'

'আমি, ঘুমের ওষুধ আছে তোর কাছে? মাকে দে তো।' মাস্টার মেয়ে বিমলা তার ডাক্তার বোনকে বলে। কথাটা বিরক্তির। আদেশের। স্নেহলতাকে এঘর থেকে চলে যাবার নির্দেশ যেন। কথা শুনে স্নেহলতা আহত হন। মনে-মনে অপরিসীম দুঃখ নিয়ে বেরিয়ে আসেন বাইরে।

অম্বলের ব্যথায় বুকটা আবার জ্বালা করে বিমলার। ওর কাতরানি বাইরে থেকেও শোনা যায়। শুনতে পান স্নেহলতা।

ভয়ংকর গ্রাম্য মনে হয় মাকে। বিরক্তিতে মুখটা তাই কুঁচকে থাকে অমলার। তারপর বেশ ব্যস্ত হাতেই লেপটাকে বুকের ওপর টেনে নেয়।

এই মুহূর্তে মাকে একটা প্রাচীন পট ছাড়া কিছুই মনে হয় না রমলার। যেন রক্ত-মাংসে গড়া সজীব কোন সত্তা না। এক-রঙা একটা ছবি। এই কথা ভেবে পুরনো লেখার জের টেনে চলে রমলা ঠিক আগের মতই।

নির্মলা তখনো ঘুমে।

বাইরে দাঁড়িয়ে অনিরুদ্ধকে মনে পড়ে স্নেহলতার। নতুন এসেছে ছেলেটা। এ বাড়িতে কয়েকদিনের অতিথি। পাশের ঘরে ও নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছে এতক্ষণে। স্নেহলতা ভাবেন, ওকে দেখে আসা উচিত। এটা তাঁর কর্তব্য।

স্নেহলতা এগিয়ে যান। কিন্তু দরজা খোলে না অনিরুদ্ধ। ও এখন ঘুমে অচেতন।

সব দোরই বন্ধ। সবখানেই নিষেধ। ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসেন স্নেহলতা। নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল তুলে দেন এবার। কণার পাশেই শুয়ে পড়েন। যেন প্রতিজ্ঞা করেন মনে মনে, আর কোনদিন জাগবেন না। কাল সকালে বিছানা ছেড়ে উঠবেন না আর।

কিন্তু উঠতে হয়। হরিপদর ডাকে উঠে পড়তে হয় স্নেহলতাকে। অনেক বেলা অবধি বিছানায় পড়ে থাকতে তাঁরই লজ্জা করে কেমন। এখন অনেক কাজ স্নেহলতার।

আজ রোববার। বাড়িতে সব মেয়েরাই আছে। কাজের তাড়া নেই। কেউ কোথাও যাবে না। অন্তত তড়ি-ঘড়ির ব্যাপার নেই আজ সকালে।

শুধু রমলা এখন ব্যস্ত। লেখার চাপ বেড়ে গেছে ওর। মাসিকের ধারাবাহিক লেখাটা শেষ করতেই হবে। দু' একদিনের ভেতরেই কিস্তি দিতে হবে। তা ছাড়া আছে কয়েকটা জরুরী গল্প লেখার কাজ। রমলার তাই মরবার ফুরসত নেই। চিলে কোঠার নির্জনে বসে ও লিখছে। ওর লেখার ঘর ওটাই।

দিন কয়েক হল অনিরুদ্ধ চলে গেছে। নির্মলা সেদিন থেকে কোথাও যায় না। বাড়িতেই থাকে। স্নেহলতা আশ্চর্য হয়েছিলেন। ভয় পেয়েছিলেন প্রথমে। তারপর সব ভয় সমস্ত বিস্ময় কেটে এখন ভালই

লাগছে নির্মলাকে। আগের থেকে সহজ মনে হচ্ছে।

শুধু বিমলা রহস্য করে জিগ্গেস করেছিল সেদিন, 'একেবারে ডুমড়্ হয়ে গেলি যে! আবার কোন নতুন পলিটিক্সের প্যাঁচ আঁটছিস্ নাকি মাথায়?'

'তার মানে!' নাক-মুখ কুঁচকে দিদিকে মানে জিগ্গেস করেছিল নির্মলা।

'আবার কোন নতুন পার্টিতে যোগ দেবার কথা ভাবছিস নাকি, তাই জিগ্গেস করছি।' হেসে উত্তর করেছিল বিমলা।

নির্মলা রেগে যায়। বলে, 'না, আর কোন রাজনীতিই আমি করবো না। শুধু ...'

'তা হলে রাজনীতি ... শখের বল?' ঘাড় ফিরিয়ে ... কেটেছিল অমলা।

'শখের ... হোক, সময় কাটানোর জন্যে তো বটে!' ভারি বিরক্ত মনে হচ্ছিল নির্মলাকে। কেমন করুণ দেখাচ্ছিল সেদিন।

'তা হলে সময় কাটানোর জন্যে কী পেলি এখন?' বলে অমলা।

নির্মলা বলে, 'কিছু না।'

বিমলা হাসে। বলে, 'ঐ কিছু না-ই তো কিছু।'

বিমলা আর অমলা হেসে ওঠে এবার। একসঙ্গে। নির্মলাও বোকার মত না হেসে পারে না।

সুতরাং শুধু স্নেহলতা ছাড়া এ বাড়িতে সকলেরই ছুটি আজ। ব্যস্ত কেবল স্নেহলতা।

কণা সকালবেলা সেজে গুজে মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। এমন সকালবেলা নতুন বেশে নতুন রূপে স্নেহলতার বড় ভাল লাগে মেয়েটাকে। বলেন, 'চললি কোথায়?'

'রঞ্জনদা যেতে বলেছে। বোটানিক্যাল গার্ডেনে ফিস্ট করতে যাবো আমরা।' ভয় ভীতি কণার নেই। লজ্জা-শরমও দিদিদের চেয়ে কম। নির্বিকারভাবে মনের কথা প্রকাশ করার সাহস আছে ওর। রঞ্জনের কাছে যেতে হলে সুতপার কাছে যাবার নাম করে মাকে ভাঁওতা দেবার প্রবৃত্তি নেই ওর। স্পষ্ট কথা বলার অপরাধেই দিদিদের কাছে ও অনেক বিষয়ে এখনো ছোট।

কণাকে আড়ালে ডেকে মনের কথাটা আজ বলেই ফেলেন স্নেহলতা। 'তোর রঞ্জনদাকে দেখিনি আজো। একদিন আমার নাম করে নিয়ে আয় না এখানে!'

কণার মুখটা মায়ের অলক্ষ্যে লাল হয়ে ওঠে বুঝি। শত হলেও মেয়ে তো! তবু বলে, 'আচ্ছা।'

কণা চলে যায়। স্নেহলতা ভাবেন কাজটা ভাল হল কি? আবার খুশীও হন। ভাবেন, কাজটা মন্দ কি ভালো সে কথা এখন বিচার করে লাভ নেই। নিষ্কলুষ কুমারীত্বের গর্ব নিয়ে মরার মত যে চারটি মেয়ে বাঁচার মোহে মশগুল তাদের মুখের উপর কঠোর জবাব বুঝি কণা আর রঞ্জনকে দিয়েই সম্ভব।

জীবনধারণের পুরনো মানেটা অন্তত নিজের কাছ থেকে পুরোপুরি বাতিল করে দিতে পারেননি স্নেহলতা। আর যাই হোক, তার বিদুষী মেয়েরা মেয়েমানুষ। স্নেহলতা এই মোটা এবং সত্য কথাটা ভালভাবেই বোঝেন। সুতরাং বর যাচাইয়ের কষ্টিপাথর রূপ না। চাকরি কিংবা ব্যবসা আর বিদুষী মেয়ের যুগ্যি বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠতম পরীক্ষায় পাশ করা কয়েকটি চৌকস ছেলে বিয়ের বাজারে দুর্লভ কিনা স্নেহলতার সেকথা জানা নেই। কিন্তু বিয়ের নামে ...দের গায়ে জ্বর আসে, স্নেহলতা তা দেখে... দেখে ঘৃণা আর দুঃখের সংমিশ্রণে ...র মনটা পাথর হয়ে গেছে। মুখটা হয়ে ...ছ বোবা।

স্নেহলতার এ...রসম্পর্কের ভাই আছে। নাম তার সুবিনয়। ...ক সময় এ বাড়িতে যাতায়াত ছিল সুবিনয়ের। লোকটি খাটো এবং বেঁটে। কিন্তু সমাজের অনেক উঁচু মহলের সঙ্গে তার দহরম-মহরম। সেই সুবাদে বিয়ের বাজারে যারা খাঁটি রত্ন সুবিনয় তেমনি কয়েকটি পাত্রে খোঁজ দিয়েছিল স্নেহলতাকে। মেয়েরা ...কই এ বাড়ির বার করে দিয়েছে। ঐ একটিমা... অপরাধে চিরকালের মত এ বাড়িতে আসা বন্ধ হয়ে গেছে সুবিনয়ের। সুবিনয় আর আসে না। স্নেহলতাও মেয়েদের বিয়ের কথা ভাবতে চান না আর। অথচ মেয়েদের কথা না ভেবে থাকার ইচ্ছেটাই একটা দুরারোগ্য ব্যাধির মত তাঁকে কাবু করে ফেলছে দিন দিন।

বাইরে হরিপদ ডাকে। স্নেহলতা কাছে যান। রবিবারের বাজার একটু বিশেষ ধরনের। অনেক আনাজতরকারি এসেছে। মেয়েদের জন্যে কিছু মাছ-ও। স্নেহলতা সেদিকে তাকান না। ছেঁড়া-ময়লা জামা-কাপড়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর শরীরটা রি-রি করে। হরিপদকে দেখে ভারি রাগ হয় স্নেহলতার। বলেন, 'আর জামা-কাপড় নেই তোর?'

'আছে।' মুখ কাচু-মাচু করে উত্তর করে হরিপদ।

'তবে, এগুলো পরেছিস কোন্ দুঃখে?'

'সব ময়লা।'

'কেন, সাবান নেই ঘরে? কাচতে পারিসনে?'

'যাই, এখুনি কেচে আনি।'

হরিপদ পাশ কাটিয়ে চলে যেতেই গন্ধটা টের পান স্নেহলতা। এবং তাতেই জ্বলে ওঠেন আরো। বলেন, 'এদিকে আয় তো।'

হরিপদ কাছে আসে।

'হাঁ কর!'

হরিপদ হাঁ করে।

'কী খেয়েছিস্? বিড়ি?'

'না।'

'পাজি, মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে আবার?' ঠাস করে গালে একটা চড় মারেন স্নেহলতা। কচি গালে কয়েকটা আঙুলের ছাপ পড়ে স্পষ্ট। হাউ-মাউ করে কেঁদে ওঠে হরিপদ। মেয়েরা ছুটে আসে।

বিমলা বলে, 'বিড়ি খেয়েছে তো কী করবে তুমি?'

অমলা বলে, 'ভদ্র বানাতে চাও নাকি ওকে?'

স্নেহলতা বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বলেন,

'তোরা যা তো। তোদের কথা শুনতে চা[illegible] আর। ভাল লাগে না।'

তারপর হরিপদর দিকে তাক[illegible], বলেন, 'ছেড়ে দে কাপড়-জামা। তে[illegible] আর কাচতে হবে না।'

মেয়েরা যা ভাবে[illegible] পারে না তাই হল। অত বড় ছেলেকে [illegible]য় ন্যাংটো করে কাপড়-জামা ছাড়িয়ে [illegible]ান হাতে স্নেহলতা নিজেই কাচতে চলে [illegible]ান। লজ্জায় মেয়েরা এতটুকু হয়ে যায়[illegible] মায়ের ব্যবহারে বিস্ময়ের অন্ত থাকে ন[illegible] কারো।

রবিবারের দিনটা যেন অন্য জাতের। ঘটনাগুলো যেন অন্য দিনের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা মনে হচ্ছে আজ। দুপুরে হরিপদ আজ ছুটি পায়নি। স্নেহলতা ওকে পড়াতে বসেছেন আজ। অত্যন্ত অসহায়ের মতই হরিপদ ছাপার অক্ষর চেনার চেষ্টা করছে। যমন করে জেদ্দারো রুগী অনেক অনিচ্ছা [illegible] সাবুর বাটিতে চুমুক দেয়। হরিপদ আ[illegible] মায়ের কাণ্ড দেখে হাসি চাপতে পারে না মেয়েরা। দম ফেটে মরে যায় আর কি!

রমলা একটা প্রুফ দেখছিল। তার ভক্তটি ঠিক সেই সময়ে হাজির। কাজের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও দেবনারায়ণের সঙ্গে হেসেই কথা বলে রমলা। এই ভিনদেশী যুবকটি মাঝে মাঝে উৎপাত করে রমলাকে। রমলার তাইতে ভাল লাগে ওকে। এটা কেবল মানুষের বেলাই সত্য না। ভক্তদের প্রতি দেবতাদেরও সুনজর নাকি একটু বেশী সরল। কৃপার পারমিট ভক্তরা না চাইতেই পায়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক আলাপ করে দেবনারায়ণ উঠে দাঁড়ায়। রমলার উচিত ছিল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ানো। কিন্তু বসেই থাকে সে। দেবনারায়ণকে বসতে বলে আরেকটু। লেখার নেশাটা আপাতত আর নেই। সুতরাং রমলার ইচ্ছে হল দেবনারায়ণের সঙ্গেই বেরিয়ে পড়ার। কথা শুনে বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে দেবনারায়ণ। বলে, 'তবে চলুন সিনেমা দেখে আসি।'

রমলা বলে, 'তা-ই চলুন। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে না আর।'

রমলা চলে যায়। বিমলা দেখে। ভারি বিশ্রী লাগে তার রমলার এভাবে বেড়াতে যাওয়া।

অমলা শুয়েই ছিল। ছুটির দুপুরটা শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দেবে এমনি ইচ্ছা ছিল তার। একটু তন্দ্রাও বুঝি এসেছিল। ডাক্তার বসাকের চাকরটা ঠিক তখনই এসে হাজির। গল্প করার জন্য তাকেই ডেকেছে বসাক। ওপরওয়ালা। ডাকলে না গিয়ে উপায় নেই। অনিচ্ছার ভান করে অমলাকে তাই চলে যেতে হয়।

[illegible] এসব পছন্দ করে না। অমলার উপর রাগ [illegible] আর বসাককে মনে হয় অপদার্থ। বিয়ে না [illegible] ছুটির দুপুরে একটা মেয়েকে ডেকে গল্প করা[illegible] মানে কি? খেয়াল, না অন্য কিছু। বিমলা ভাবে, এসব অনাচার। সংসারে এর চেয়ে বড় অপমান মেয়েদের আর হয় না।

অনেক কথা ভাবতে ভাবতে নির্মলার খাটের দিকে নজর পড়ে। উপুড় হয়ে শুয়ে নির্মলা চিঠি লিখছে কাকে। হয়তো সেই বাউণ্ডুলে ছেলেটাকেই। দুদিন আগে অনিরুদ্ধ চিঠি লিখেছে নির্মলাকে। সে চিঠি নির্মলা কাউকে দেখায়নি।

বিমলার এসব ভাল লাগে না। এক সময় মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

সেক্রেটারী দিব্যেন্দু আসে তারও পরে। দিব্যেন্দু বড় একটা আসে না। বিমলা তাই ব্যস্ত হয়ে ওঠে। স্নেহলতা চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করেন।

দিব্যেন্দু বলে, 'এসব কিছুই খাব না। একটা কথা বলতেই কেবল আসা আমার।'

বিমলা উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। বলে, 'বলুন না।'

দিব্যেন্দু বলে, 'এখানে না। পার্কে চলুন।'

পার্কে এসেই কথা হল তারপর। দিব্যেন্দু বললে, 'বিয়ে করছি।'

নিস্পৃহের হাসি হেসে বিমলা জবাব দেয়, 'বেশ তো! একথাটা বাড়িতে বলতে বাধা ছিল কী?'

'বাড়িতে সকলের সামনে আপনাকে চেনা যেতো না। মুখটা দেখা যেতো না ভাল করে। তাই পার্কে টেনে আনলুম।'

মুহূর্তে পার্কটাকে একটা অরণ্য মনে

হল বিমলার। সেই অরণ্যে দিব্যেন্দুকে মনে হল সবচেয়ে হিংস্র আর লোভী একটা পশু। নিজেকে ভীষণ অপমানিত বোধ করে উঠে দাঁড়াল বিমলা। পেছনে না তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সামনে এগিয়ে যায়। যেন এই ... থেকে পালাবার পথ খোঁজে। ...তু ওঠার গরজ নেই দিব্যে... পরম বিস্ময়ে এবং আনন্দে ত... হয়ে ঘাসের ডগা চিবুতে-চিবুতে দিব্যেন্দু বিমলার অনেকদিনের অনেক আচরণের একটা যোগফল মনের মধ্যে মেলাতে চেষ্টা করে।

ছ'মাস পরে।

সংসারে অনেক ওলট-পালট হয়ে গেছে স্নেহলতার।

বিমলার স্কুলের সেক্রেটারী দিব্যেন্দুকে বিদায় হয়ে গেছে। আর দিব্যেন্দুর কালো কুৎসিত বৌয়ের মুখ দেখে কাউকে না জানিয়ে মাথা খারাপ করে ঘরে ফিরেছে বিমলা। চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে। তারপর সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে। অনেক যুক্তি-পরামর্শের পর বিমলাকে রাঁচী পাঠানো হয়েছে।

অনিরুদ্ধ কয়েকবার এসেছিল। একবার নির্মলাকে নিয়ে চলে গেছে। কয়েকদিন পরে এক-ই খামে ওরা চিঠি লিখেছে দুজনে। স্নেহলতার আশীর্বাদ চেয়েছে। দুঃখ আর বিস্ময়ের ঝোঁকটা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। স্নেহলতা উত্তর দেননি এখনো।

এদিকে শহরময় সেই কুৎসিত নিন্দার কথাটা মুখে-মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অমলা কিন্তু ডাক্তার বসাকের পাপের বোঝাটা দেহে ধারণ করেই কোথায় চলে গেছে। ডাক্তার বসাক-ও এ শহর ছেড়ে চলে গেছে।

শুধু রমলা। একমাত্র রমলাই দেবনারায়ণ সিংয়ের সঙ্গে তার সমস্ত বোঝাপড়ার শেষ করে মাকে জানিয়েছে কাল। আগামী মাসের শুরুতেই বিয়ের তারিখ পড়েছে ওদের। স্নেহলতা শুনেছেন। এখনো কিছু বলেননি। বলার ইচ্ছা-ও নেই যেন।

কেবল কণাকেই অবিশ্বাস করা যাচ্ছে না এখনো। ও এখনো শর্টহ্যান্ড শিখতে যায়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির দরখাস্ত করে। রঞ্জনকে নিয়ে সুতপাকে পাশে রেখে গঙ্গার ধারে বিকেলে বিকেলে এখনো নিয়মিত হেঁটে বেড়ায় ওরা। তাতে শারীরিক উন্নতি কিছু চোখে না পড়লে-ও কণার মানসিক পরিবর্তনটা যেন স্পষ্ট বুঝতে পারেন স্নেহলতা। আর ভয় পান। আবার দুশ্চিন্তার পোকাগুলি কিল-বিল করে মাথার ভেতরে।

সহজ-সরল জীবনের পরিচিত পথটা হারিয়ে গেছে। এক নতুন যুগ তার সমস্ত জটিলতা নিয়ে অতি পুরনো এক স্নেহলতার চার পাশে পাক খাচ্ছে অহরহ। সেই দেহ আর নেই। কয়েক মাসে আধখানা হয়ে গেছেন স্নেহলতা। সেই মন ... নেই। চিন্তার শক্তি দিন-দিন ভোঁতা হয়ে ...ছে। কিছুই আর ভাবতে পারেন না। ...তে কষ্ট হয় সব।

তবু ক...কে এখনো ভালবাসেন স্নেহলতা। অ... কণার প্রতি তাঁর পক্ষপাতিত্ব এখনো অটুট। এবং কণার জন্যই হয়তো আ... বেঁচে আছেন স্নেহলতা। আজ সেই ...ন্যেই ডেকে পাঠিয়েছেন রঞ্জনকে। হ...পদ গেছে রঞ্জনের কাছে। অনেক্ষণ হ... গেছে। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে স্নেহলতা রঞ্জনের আসার পথেই তাকিয়ে আছেন। আজ কণাকে নিয়ে সমস্ত চিন্তার ইতি ক... দিতেই উৎসুক স্নেহলতা। এই সর্বশেষ মেয়েটার পরিণতি না দেখে নিজেকে নিয়ে চূড়ান্ত ভাবনা ভাবতে পারছেন না।

রঞ্জন এল। হরিপদর সঙ্গেই। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কণা মায়ের সব কথাই শোনে। এবং রঞ্জনের-ও।

শেষে রঞ্জন চলে গেলে ঘরে ঢোকে কণা। মায়ের দিকে তাকিয়ে ব...ল, 'রঞ্জনদাকে ডেকেছিলে কেন? আমাকে ...য়ে দেবে? কিন্তু সাবধান, অমন কাজ করো না। আমি গলায় দড়ি দেব তবে।'

স্নেহলতা আর অবাক হন না। শুধু নিপুণ এক জহুরীর মত কণাকেই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। এবং বোঝেন, কণা বড় হয়েছে। ঠিক দিদিদের মতই বড়। এতদিনে নিজের ভুলটুকুও ধরা পড়ে স্নেহলতার কাছে। আজ সেই মহৎ ভুলের চেহারাটা দেখে প্রথমে লজ্জা; তারপর মনে হয় তিনি ছোট, ভয়ংকর ছোট হয়ে গেছেন মেয়েদের কাছে।

বাক্স-বিছানা গুছিয়ে কাছে আসে হরিপদ। ওকে মনেই ছিল না স্নেহলতার। এবার হরিপদর থমথমে মুখটা দেখে বললেন, 'কাঁদিস না। আমি তো মরে যাচ্ছি না। কাশী যাচ্ছি। মাঝে-মাঝে এখানে আসবো। ত... ছাড়া দিদিরাই তো আছে। তোর ভাবনা কি। আমি ওদের বলে যাবো, তোকে কেউ তাড়াবে না।'

হরিপদ এবার ছেলে মানুষের মতই কেঁদে ফেলে। বলে 'না মা, আমি এখানে থাকবো না। তোমার সঙ্গে যাবো আমি। আমার যে 'বর্ণ পরিচয়' এখনো সারা হয়নি মা।' হরিপদ জড়িয়ে ধরে স্নেহলতাকে।

স্নেহলতা কী ভাবেন। শেষে বলেন, 'হরিপদ বিছানা খুলে ফেল। বাক্সটা রেখে দে। আমি যাবো না।' বলতে বলতে স্নেহলতা হাসেন। ...ন হয়, নিজে চাইলে-ও সংসার ...কে ছাড়বে না কোনদিন। দুঃখ তাঁর পায়ে-পায়ে পোষা বেড়ালের মত ঘুরে বেড়াবে চিরকাল। এসব ছেড়ে মানুষ কোথাও যেতে পারে না। যে পারে সে বাঁচতে জানে না।

॥ ১ ॥
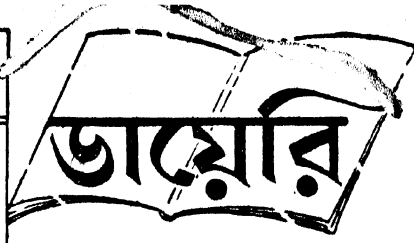
২৮শে নভেম্বর, ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—কাল খাবার সময় সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট আসিয়া বলিয়া গেলেন যে, আই জি জানাইয়াছেন, within cost diet vary করা চলে, আর p. c. থেকে vegetables খরিদ করা চলে। Accomodation সম্বন্ধে কাল আলোচনা করিবেন।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—সুপার-এর সঙ্গে কথা হইল। অফিস টি বি রোগীদের জেলের বাহিরে রাখার ব্যবস্থা করিবে। Sanitery measures improve করা হইবে। আমার বিছানাপত্র ইত্যাদি রোদ্রে দিবার অন্যত্র ব্যবস্থা করা হইবে। Ex. book, live fish প্রভৃতি সম্পর্কে rule or convention এঁরা অনুসরণ করিবেন—আমাকে ইহা আই জি প্রভৃতিকে জানাইতে হইবে। Accomodation in Hospital to continue.

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—গত চার পাঁচ দিন পর্যন্ত দুইজন নাইট ওয়াচার রাত্রে coughing এবং কিছু loud counting-এর দ্বারা ঘুমের ব্যাঘাত করে। আই জি-কে একাধিকবার ইহা জানানো হয়। কোনও ফল হইল না। কাল রাত্রে একটা হইতে প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত এই উৎপাত চলে। কাজেই ঘুম একদম হইল না। শরীর খুবই খারাপ। আজ আবার সব লিখিয়া ডি আই জি-কে জানাইলাম। আজ নাইট ওয়াচার বদল হইল।

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—কাল হইতে বিছানা রোদ্রে দেওয়া ইত্যাদি হয় তবে আনস্যাটিসফেকটরি। খইয়ের জন্য বলা হইয়াছে, করলার জন্যও, তবে এখনও পাওয়া যায় নাই। লিখিবার খাতাও পাওয়া যায় নাই।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—Asgar Ali Sahib tells me Jailor says......to be given when due and khai will be given at daily rate! গড় ও মিশ্র হেড্-ওয়ার্ডার-এর কাছে ফেরত দেই।

Now that the struggle is........ utmost coolness necessary—to maintain dignity—prevent mistakes due to heat.

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—কয়েক রাত্রে যে-কয়েকটি লোক অপরের ইঙ্গিতে গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া ঘুমের ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে তাহাদেরই প্রধান একজন কাল বৈকালে আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল—"বাবু, একটু ঘি চাই।" ঘি দিলাম।...... জেলভর এটা লইয়া হইচই হইয়াছে। সুপার এবং গবর্নমেণ্টকেও এ-বিষয়ে আমি লিখিয়াছি তা-ও সবাই জানে। এদের যে আমি innocent tools মনে করি এবং সুপার ও গবর্নমেণ্টকে লিখি, তা-ও জানা আছে।......এই লোকটি প্রথমে পাত্র আনে নাই। আমার সম্মতি লইয়া পরে পাত্র লইয়া আসিয়া ঘি লইয়া গেল। এর কি ভরসা ছিল না? অপরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছে কি? ইহাদের আচরণে আমার মানসিক অবস্থা যে-রূপ হইয়াছে তাহাতে এ আসিল কি করিয়া? সংকোচ বোধ করে নাই।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪ (রংপুর জেল)—ইনফ্লুয়েঞ্জা, সর্দি কাশি, tonsil troubles, flatulence, দন্তশূলে ইত্যাদি কতকগুলি অসুখ-বিসুখের টোটকার যে ফরমুলা জানা আছে দেখিতেছি এতে লোকের বেশ উপকার হয়। কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান দরকার। সাধারণ রোগ ও তাহার চিকিৎসা পদ্ধতি জানা দরকার।

(2) Minimum weight and maximum strength—what's the diet? Experience of these few days have helped. Among other things (a) maintenance of general health; (b) not loading the stomach at mealtime—(eat) a little less.

পাবনা জেল

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪ (পাবনা ডিস্ট্রিক্ট জেল, সকাল প্রায় সাড়ে পাঁচটা)—পরশু (২১।১২।৫৪) বেলা প্রায় ২টার সময় রংপুর জেল ত্যাগ করিয়া কাল সকাল প্রায় নয়টার সময় পাবনা ডিস্ট্রিক্ট জেলে পৌঁছিলাম।

সেদিন আসিবার পূর্বে রংপুর জেলের সুপার প্রভৃতি দেখা করিলেন—nice parting হইল। কিছুদিন পূর্বে তাঁহার সামনে জেলার সাহেবকে লইয়া যে তিক্ততা ঘটিল, সুপার বলিলেন যে, ইহা তাঁহারই ভুল হইয়াছে। জেলার সাহেব চলিয়া আসার পূর্বে, অফিসে বসিয়া সবটা আলোচনা করিয়া স্পষ্টই স্বীকার করিলেন যে, তাঁহার সেই কথাটা ভুল ও অন্যায় হইয়াছিল। ইহাই সত্য, সুপার যেটা তাঁহার ভুল বলেন সেটা, ততটা তাঁহার ভুল নয়। দোষ,

ত্রুটি, ভুল অন্যায় জেলার সাহেবের। জেলার সাহেব সেটা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন। আমিও আমার যে-ত্রুটি তাহা স্বীকার ...। তাহা হইতেছে এই যে ... কেন জেলার সাহেবের grave provocation (সম্পূর্ণ মিথ্যা একটা চার্জ) সত্ত্বেও নিজেকে শান্ত করিতে পারিলাম না। কেন আমি dignified, decent, calm, peaceful expression দিতে পারিলাম না, কেন শান্তভাবে and in a winning manner আমার বক্তব্য বলিতে পারিলাম না। এটা আমার আদর্শ হইতে চ্যুতি। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্রোধ যে প্রচণ্ড ক্ষতিকারক তাহা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উল্লেখ করিলেন, যদিও সবটা দোষ তাঁহার নিজের উপরে নিলেন। তাঁহার সহিত যখন সুন্দরভাবে কথা হইতেছিল তখন তাঁহার পক্ষে জেলার সাহেবকে ডাকাটাই ভুল হইয়াছিল। না ডাকিলে এই তিক্ততার সৃষ্টি হইত না। এই উষ্মা প্রকাশ ও কথা কাটাকাটির ফল আপাতদৃষ্টিতে যাহাই হউক পরে ইহা সুখকর হয় নাই। জেলার সাহেবের এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ শুধু জেলার সাহেবকে নয় সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকেও খুব অপদস্থ করিয়াছে আই জি-র কাছে, গভর্নমেণ্টের কাছে, অফিসারদের কাছেও।

জেলার সাহেবের সহিত কিছুদিন পূর্বে কথা প্রসঙ্গে বলিতেছিলাম যে, আমি এক মাসের মধ্যে বদলি হইব। তিনি বলিলেন, আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু গবর্নমেণ্ট বা আই জি আপনাকে এখান হইতে বদলি করিবেন না। আমি বলিলাম, এবার আপনারা যাহা লিখিয়াছেন (মুচির মৃত্যু লইয়া ... হইতেছে ইত্যাদি) তাহাতে আমাকে বদলি করিতে হইবেই। আমি নিজে চেষ্টা করিলে ১৫ দিনের বেশি লাগিবে না, তবে আপনারা অত তাড়াতাড়ি পারিবেন না।......Accommodation সম্বন্ধে আমি এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী, গবর্নমেণ্ট অব্ ইস্ট বেঙ্গলকে ২৪।১১ তারিখে লিখি। পাবনা আসিয়া দেখি আই জি আমার এখানে থাকার জন্য এখানকার নিরাপত্তা বন্দীদের দিনাজপুর বদলি করে। প্রথম দল ১১।১২, দ্বিতীয় দল অর্থাৎ রংপুরের এম এল এ সাহেবকে, ১৬।১২ তারিখে বদলি করে। কাজেই ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের প্রথম দিক দিয়াই আই জি প্রভৃতি ইহা সাব্যস্ত করেন। তাহাতে আমার যে বিশ্বাস এবং কথা ...। আমি লিখিলে ১৫ দিন এবং চেষ্টা করিলে মাসখানেক, তাহা মিলিয়াই গেল।

সুপার-এর সহিত বিদায় কালীন আলাপ বেশ ভাল হইল। আমি কালিপদ (বিচারাধীন) এবং কনভিকটদের শীতের কষ্ট এবং তার প্রতিকার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য আবার জানাইলাম। আসিবার সময় ডেপুটি সাহেবকে একটা স্লিপে উমেশ বর্মন এবং বজ্রুরগ আলী সম্বন্ধে বলিয়া আসিলাম। আসার সময় অফিসে শুনিলাম বজ্রুরগ আলী অফিসে গিয়াছে।

রংপুর জেলে শেষের দিক দিয়া এই ঝক্কি বেশ ভালই লাগিল। এই বয়সে, এই স্বাস্থ্য, একেবারে একাকী এই সব বিষয় লইয়া যে সংগ্রাম করিলাম, তাহাতে আমার শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্য, শক্তি, ইত্যাদির পরিচয় পাইতেও বেশ সাহায্য করিয়াছে। আমার সবলতা, দুর্বলতা, আদর্শ ইত্যাদির পরিচয় আমি অনেকটা পাইয়াছি।

রংপুরের এম এল এ হবিবুর রহমান এখানেই এই ঘরেই ছিলেন আমার আসার পূর্বে। তাঁহাকে এবং অন্য কয়েকজন নিরাপত্তা বন্দীকে দিনাজপুরে বদলি করিলেন। এখানে সব বুঝিয়া মনে হইল হবিবুর সাহেব সম্বন্ধে আমি যে রংপুর ডি আই ও-কে বলিয়াছিলাম ও লিখিয়াছিলাম তাহার ফল হইয়াছে। ডি আই-ও বুঝিয়াছে হবিবুর সাহেব কমিউনিস্ট নন। ফলে বিনা সর্তেই খালাস হইলেন। ইহাতে আমার বেশ তৃপ্তি হইল। রংপুর কলেজ-এর ছেলেরাও এমনি বিনাসর্তে মুক্তি লাভ করিতে পারিত যদি তাহারা কিছু ধৈর্য ধারণ করিতে পারিত। তবে ধৈর্য ধরার পথে কিছু অসুবিধাও ছিল। প্রথমত উহারা ছাত্র তদুপরি পরীক্ষার্থী। অনেকের পড়া হয়ত একেবারেই বন্ধ হইত। দ্বিতীয়ত আই বি

হইতে উঁহাদের এই বলিয়া ভয় দেখান হইতেছিল যে, সতীনবাবু লোক সুবিধ[illegible] নয়, উঁহার সহিত মিশিবে না, ৩০ বৎ[illegible] সে জেলে ভুগিয়াছে তোমরাও ভুগি[illegible] তাহার সহিত মিশিবে না, তাহার ক[illegible]শুনিবে না। এই দুই কারণে ছাত্ররা [illegible]সুবিধায় পড়িয়া গেল। কিন্তু হবিব[illegible]সাহেব শক্ত লোক, ফলও পাইলেন। [illegible]র আরো একটা লাভ হইল। তিনি যে কমিউনিস্ট নন তাহা তাহা ডি আই[illegible]র এবং গবর্নমেণ্টের কাছে পরিষ্কার হইল। ইহাতে তাঁহার বাহিরের কাজেরও সুবিধা হইবে। গবর্নমেণ্টের ধারণা পরিবর্তনের জন্য তাঁহাকে আর ভুগিতে হইবে না।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪ (পাবনা জেল)—এখানকার সংসার শুরু হইল। ডেপুটি সাহেব হাফিজুর রহমান ও কেরানী সাহেব আমার পরিচিত। ডেপুটি সাহেবের সহিত ভোট আন্দোলনের প্রথম দিক দিয়া রংপুরে ছিলাম। কেরানী সাহেবের সহিত ময়মনসিং জেলে ছিলাম।

রংপুরের পর্যায় ত একভাবে শেষ হইল। এখানকার দিনগুলি কি ভাবে কাটিবে?

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৪ (পাবনা জেল)—আজ আমার ওয়ার্ড-এই রান্না শুরু হইল। কাল মাঝরাত্রে একবার ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনেক দিনের একটা প্রশ্নের জবাব মনে আসিল। প্রশ্নটা কতকটা এই ধরণের—আমি পাকিস্তানের সেবা কীভাবে করিতে পারি। এই প্রশ্নের উত্তর কাল যেভাবে আমার মনে উদয় হইয়াছিল তাহা কতকটা এই-রূপঃ—জনসাধারণের অভাব অভিযোগগুলি জানো, বোঝো। নিজেকে তাহাদেরই একজন বলিয়া মনে করো।

আমার জীবনে রাজনীতি খুব ফলপ্রসূ হয় নাই। একটা সুনির্দিষ্ট মত চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ধরিয়া সেদিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়া, নিজেকে তৈরী করা intellectually ও morally এবং কাজের নির্দিষ্ট পথে সংগঠনী শক্তি লইয়া অগ্রসর হওয়া—ইহা কি জীবনে সফল হইয়াছে? অনেকটা দেশজোড়া আন্দোলনের জোয়ার চলিয়াছে। এই জাগরণ, এই আন্দোলনের একটা আদর্শের দিক আছে। যাহার ফলে আত্মবিশ্বাস লাভ করিয়াছি। তাহার ফলে অনেক ব্যক্তিগত স্থানীয় সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছি। Extraordinary অনেক traits দেখা গিয়াছে, অনেক extraordinary achivementও হইয়াছে। Local affairs, local issues প্রভৃতিতে যে leadership সম্ভব হইয়াছে, national issue-তে সেটা কথনও প্রস্ফুট হয় নাই।

[illegible] বয়সে, এই স্বাস্থ্যে—কেমন করিয়া এই ই[illegible] সফল করা?

২৮।১২।৫৪ (পাবনা [illegible])—কতকগুলি প্রাথমিক ব্যাপার বেশ [illegible]রতার সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দুই দিন যাবৎ আবার যেন ঢিলা দেখিতেছি। কতকগুলি ব্যাপারে বোধ হয় অভিজ্ঞতার অভাব আছে। যেমন স্টোভ, স্পিরিট, স্টোভার ইত্যাদি। এগুলি আমাকে দেওয়া সম্বন্ধে ইতস্তত করার জন্যই কি সময় নিতেছে? না, অন্য কিছু। জেল বিভাগের কর্তাদের কথায় তাই মনে হয়। ডাল ইত্যাদির পরিবর্তে ঘি দেওয়া সম্পর্কেও কি অভিজ্ঞতার অভাব? যদি অভিজ্ঞতার অভাব না হয়, যদি কোন অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে বিলম্ব কেন? যাহাই হউক, অসুবিধা থাকিলে আলোচনা করিয়া একটা কিছু সিদ্ধান্তে আসা উচিত। তাহাই বা হইতেছে না কেন? সাধারণভাবে আমার প্রতি ইহারা সদয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যে-লোকটি আমার রান্না করে তাহার ব্যবহারের যে পরিচয় পাই তাহাতে সময়ে সময়ে ধৈর্যচ্যুতি হয়। দুর্বল, ভীরু, মূর্খ—মিথ্যাবাদীও বটে। আজ দুপুরে চরমে গিয়াছিলাম। পরে দুঃখ অনুভব করিয়াছি। তারপর দিনটা ভাল যায় নাই। শীতকালের দিন। অত্যন্ত মেঘলা আবহাওয়া। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িয়াছে। এতেও মন ভাল ছিল না। এই কয়দিন পর্যন্ত পায়ে তেল ব্যবহার করার ফলেই বোধ হয় কাল হইতে শরীরটা খুব খারাপ লাগিতেছে। সারা সকালটা বমি বমি ভাব, শরীর অসুস্থ। কাল বিকাল হইতে তরকারি ঘিতে পাকানো শুরু করিয়াছে।

৪।১।৫৫—একই প্রদেশ, একই শাসন-যন্ত্র, একই আইন-কানুন। তবু এখানে আর রংপুরের এ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কত তফাত। পরশু কাগজে পড়িলাম বেলায়েত বরিশাল জেল হইতে ছাড়া পাইয়াছে। তবে বোধ হয় মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলে অন্তরীণ থাকিতে হইয়াছে। এতে ওর চিকিৎসার সুবিধা হইবে। মঞ্জর কি হইল?

১০।১।৫৫—পরশু দুপুরে খাবার পর আরাম কেদারায় রৌদ্রে শুইয়াছিলাম, তখন হঠাৎ জেলার সাহেব একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। বলিলেন যে জেলাশাসক তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছেন আমার সহিত দেখা করিয়া স্বাস্থ্যাদি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে। স্বাস্থ্য সম্বন্ধেই বেশী প্রশ্ন করিলেন। ডাক্তার সাহেবকেও বারে বারে খবর দেওয়া হইল, কিন্তু পাওয়া গেল না।

তার দিন দুই পূর্বে একজন পুলিস

অফিসার আসিয়া আঙ্গুলের ছাপ লইয়া গেলেন। বরিশালে একবার লওয়া হইয়াছে। আবার এখানে লওয়া। রংপুরে তো নেয় নাই। একি বিদায়ের প্রস্তুতি? যদি তাহাই হয়, তবে আমার সম্পর্কে জেলা-শাসকের খোঁজ-খবর লওয়ার সহিত ইহার কোনো সঙ্গতি আছে কি?

রংপুরে তো এতদিন ছিলাম। জেলা-শাসকের তরফ হইতে কখনও আমার প্রতি কোন উৎসাহ দেখান হয় নাই। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের জন্য যখন জেলে ছিলাম তখন পত্রিকায় আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু লেখালেখি হওয়ায় এবং বোধ হয় মাইনরিটি মিনিস্টারের তরফ হইতে নির্দেশ আসায় আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে তদন্ত হয়। এবারেও জেলা-শাসকের এই তদন্তের পিছনে এমন কিছু আছে কি?

কাল সন্ধ্যায় ইত্তেফাক পত্রিকায় কলিকাতার এক রিপোর্টে অন্যান্য কথার মধ্যে নিম্নলিখিত কথাগুলি পড়িলাম। দেশ বিভাগ এবং তৎকালীন ঘটনাবলী সকলের মন হইতে মুছিয়া যাইতেছে, সদ্ভাব, সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইতেছে, উভয় দেশের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উভয় দেশের প্রতিও সদ্ভাব ইত্যাদি বৃদ্ধি পাইতেছে। এ সত্ত্বেও পাকিস্তান হইতে অনবরত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভারতে চলিয়া যাইতেছে। ইহার জন্য বিশেষ কোনও একটি কারণ নির্দেশ করা যায় না। অনেক কারণ আছে। তবে অর্থনৈতিক কারণ বোধ হয় ইহার জন্য বেশী দায়ী। পাকিস্তানে চাকুরির ব্যাপারে হিন্দুরা সম-সুযোগ পাইতেছে না বলিয়া উদ্বেগ বোধ করে। তবে এটা সাময়িক কিনা এখনও বলা যায় না। বগুড়ার সুরেশবাবুর পত্রেও সেদিন হিন্দুদের পাকিস্তান ত্যাগের সংবাদ পাই।

হিন্দু নেতা ও কর্মী যাঁরা এখনও আছেন পাকিস্তানে তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই একটা firm conviction and determination-এর অভাব। এখানে থাকা সম্বন্ধে, এখানেরই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা যেন আস্থাহীন। আমার সঙ্গে কজনের এ বিষয়ে মিল?

এমনিভাবে যদি এরা চলিয়া যাইতে থাকে, দশ পনের বৎসর পরে কত হিন্দু থাকিবে? তাহাদের কি থাকা সম্ভব হইবে?

এই স্রোত কি বন্ধ করা যায়? আবার কি ভারত হইতে হিন্দুদের ফেরান যায়? হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই যাহারা দেশত্যাগ করিয়াছে তাহাদের সবাইকে না হইলেও বৃহৎ সংখ্যা কি ফিরাইয়া আনা সম্ভব? তাহার উপায়ই বা কি? এখানের অন্যান্য জরুরী কাজের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপন অন্যতম। সেই কাজের সহিত ইহাও অবলম্বন করিতে প্রবল ইচ্ছা আমার। আমি কি তাহা পারিব?

সহকর্মীদের সহিত জরুরী বৈঠকে বসিয়া অবস্থার সম্যক পরিচয় লওয়া অবশ্য কর্তব্য। বন্ধুরা যদি এ বিষয়ে একমত হন কর্মপন্থা ও কার্যসূচী প্রস্তুত করিতে হইবে। আবার গুড উইল মিশন ইত্যাদি অর্গানাইজ করিতে হইবে।

এবার General political situation-এ যে improvement হইয়াছে। ডাঃ খান সাহেব, মিঃ সুরাবর্দী, মিঃ আবুহোসেন সরকার প্রভৃতির কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করায় দেশের রাজনীতিক আবহাওয়ার কিছু উন্নতি লক্ষ্য করিতেছি। ভাসানি সাহেবও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

এই পরিবর্তন যদি টেঁকে আর যদি উন্নতি লাভ করে তাহা হইলে তাহার সুযোগ নিয়া উদ্বাস্তুদের ফিরাইয়া আনার প্রশ্নটা উঠানো খুব সুবিধাজনক হইবে।

১১।৯।৫৫—পরে বিশ্বস্তসূত্রে জানিলাম, জেলা-শাসক গভর্নমেন্ট হইতে কার্ডিওগ্রাফ পাইয়াছেন। তাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠাইয়া আমার ক্যানসার সম্বন্ধে সংবাদ নিলেন। কাল ডাক্তার সাহেবের সহিত কথা হইল। আজ হইতে মেডিকেল গ্রাউন্ড-এ আধ সের দুধ, এক ছটাক চিনি, দুটি লেবু ও দুটি ডিম দিতে শুরু করিলেন। Rangpur C. S. Vs. Pabna S. A. S.! এদিকে এখানকার অফিসাররা আমার জন্য খুব অসুবিধা ভোগ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যে, আমার খুব অসুবিধা হইতেছে। কতগুলি জিনিস সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না (খই, বৃং ররগর্ভ, আমলকী ইত্যাদি) এতো সত্য। অন্য সূত্রে অন্য খবর পাইতেছি। খরচের ভয় বিশেষভাবে জেলার সাহেব এবং সুপারও নূতন বলিয়া বটে। শুধু আমার ব্যাপার নয়, যে কোন খরচ সম্বন্ধে অতি সতর্ক। সেদিন জেলার সাহেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলিলেন, আমাকে চট্টগ্রাম অথবা ঢাকা বদলি করিলে ভাল হয়। কাল সকালে কেরানী সাহেবও আসিয়া নানাভাবে এই কথা বলিলেন, তারপরে প্রস্তাবই দিলেন, "আপনি বদলির জন্য দরখাস্ত করুন।"

তাহাদের দিক দিয়া প্রধান এবং কঠিন অসুবিধা কি? বেশ ত friendly way-তে চলিতেছি—কোন friction নাই। তবু তাহাদের এই মনের অবস্থা কেন? তাহারা তো খুব helpful। রংপুরের অনেক অসুবিধা এখানে আমার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে।

আমার অসুবিধা এমন আকার ধারণ করে নাই যাহাতে ইহাদের সহিত কোন friction দরকার বা transfer-এর চেষ্টা করা দরকার হয়।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

চিতোরগড়

অরুণবিকাশ লাহিড়ী

চম্বো উপত্যকায় এসে মুগ্ধ হয়ে গেলেন শেলী। সামনের ছোট নদীটি পেরিয়ে, পাইনের ঋজু বন ছাড়িয়ে তাঁর দৃষ্টি চলে গেল দূরে—সেখানে গোধূলির শেষ আলো মণ্ড্রাঁ-র তুষার ঢাকা চূড়াকে স্বপ্নলোক করে তুলেছে। তিনি অভিভূত হয়ে গেলেন, মনের মধ্যে জেগে উঠল ভাবের তরঙ্গ,

The everlasting universe of things
Flows through the mind, and rolls
its rapid waves.
Now dark, now glittering, now
reflecting gloom,
Now lending splendour....

চিতোর দুর্গের সান্নিধ্যে এসে অনুভব করলাম যে আবেগের কম্পন তা প্রায় শেলীর উপলব্ধিরই অনুরণন। আচরণে চপলা, কিন্তু নামে গম্ভীরা নদীটি পার হতেই স্পষ্ট দেখা গেল গড়, তার প্রাচীর ও মন্দির-চূড়াগুলি আর সেই সঙ্গে ভেসে উঠল কত উত্থানপতন, ত্যাগ ও স্বার্থপরতা, বীরত্ব ও দেশপ্রেমের অমরকাহিনী। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসে চিতোরের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে গৌরবময়। ইতিহাস বাদ দিলে এই গড়কে বোঝা যাবে না, চিতোরগড়কে শুধু কতকগুলি মন্দির, প্রাসাদ ও গৃহের সমষ্টি ভাবলে ঘোর অবিচার করা হবে।

মেবারের সমতলভূমির উপর প্রায় নিঃসঙ্গ এক পাহাড়, তারই চূড়ায় চিতোরগড়। দৈর্ঘ্য তিন মাইলের কিছু বেশী, প্রস্থ আধ মাইল এই পাহাড়টি সমতলভূমি হতে পাঁচশো ফুট উঁচু। গড়ের ভিতরে প্রায় একর জমি জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে বহু মন্দির, প্রাসাদ আর ঐতিহাসিক গৃহগুলি।

চারটি সমান্তরাল প্রাচীরের দ্বারা দুর্গ সুরক্ষিত। প্রত্যেক দুর্গ-প্রাচীর গাত্রে প্রায় দশ ফুট অন্তর অন্তর একটি করে ফাঁক আছে। দুর্গ আক্রান্ত হলে ঐ সব ফাঁকের মধ্য দিয়ে শত্রুদের উপর অস্ত্র ক্ষেপণ করা হত। ফাঁকগুলি এমন কৌশলে তৈরী যাতে প্রতিরোধকারীরা অদৃশ্য থেকে বাধা দিতে পারেন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হতে বোঝা যায় যে, দুর্গ দখলের জন্য হানাদারদের প্রতি পদে কি অপরিসীম সংগ্রাম করতে হয়েছে। দিল্লীর বা আগ্রার কেল্লার মত প্রধান ফটক দখলের সাথে সাথেই দুর্গের পতন হয়নি। অতীতের সেই রক্তাক্ত ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে আজও প্রবেশপথের দু ধারে দেখা যায় অগণিত শহীদ সেনাপতি ও সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভগুলি। এ দিক দিয়ে চিতোরগড় অনন্য।

এই দুর্ভেদ্য দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। অনেকের মতে, চিতোরগড় মৌর্যবংশের রাজাদের সৃষ্টি, চন্দ্রগুপ্তের সময় নাকি দুর্গ প্রথম নির্মিত হয়। মৌর্যবংশের সৃষ্টি হলেও চিতোর সর্বভারতীয় প্রাধান্য লাভ করে অনেককাল পরে। আজ থেকে প্রায় বারশো তিরিশ বছর আগে বাপ্পাদিত্য চিতোরের সিংহাসন দখল করেন। তাঁর সময় হতেই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে চিতোরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বাপ্পার প্রতিষ্ঠিত বাণমাতার মন্দিরটির ভগ্নাবশেষ আজও চিতোরে দেখা যায়।

বাপ্পার পরের যুগের যে অপূর্ব শিল্প-নিদর্শনটি দেখা যায় সেটি একটি জৈন-মন্দির। তাঁর রাজত্বকালের প্রায় চারশ' বছর পরে মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল। দেবালয়-সংলগ্ন কীর্তিস্তম্ভটি অপেক্ষাকৃত পুরাতন। প্রায় পঁচাত্তর ফিট উঁচু এই কীর্তিস্তম্ভ সে যুগের স্থাপত্যের অতি সুন্দর নিদর্শন। স্তম্ভটির গায়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা আছে। মূর্তিগুলির অধিকাংশই নগ্ন। অনুমান হয় মন্দিরটি দিগম্বর সম্প্রদায়ের ভজনালয় ছিল।

জৈনমন্দির নির্মাণকাল পর্যন্ত চিতোরের ইতিহাস প্রায় একটা সমৃদ্ধির ইতিহাস। এর পর হতেই ঘাতপ্রতিঘাতের শুরু হয়, নানা ঘটনায় চিতোরের স্বচ্ছন্দ জীবনধারা ব্যাহত হতে থাকে। রাণা লক্ষ্মণ সিংহ তখন রাজত্ব করছেন। তাঁর কাকা ভীম সিংহ সুদূর সিংহল থেকে পদ্মিনীকে বিয়ে করে নিয়ে এলেন। পুরনারীরা সেদিন নাকি বধূবরণ করতে গিয়ে অনুষ্ঠানের কথা ভুলে গিয়েছিলেন, পদ্মিনীর রূপ দেখে তাঁদের পলক

চিতোরগড়ে দুর্গের উপরিভাগে মন্দির

পড়েনি। এই আশ্চর্য রূপের কথা শীঘ্রই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। পদ্মিনীর রূপের বর্ণনা শুনে দিল্লীর বাদশা আলাউদ্দিন আর স্থির থাকতে পারলেন না, লক্ষ সৈন্য নিয়ে চিতোর অবরোধ করলেন। চিতোরের উপর এই প্রথম বিদেশীর আক্রমণ (১২৯৩ খৃঃ)।

কিন্তু পদ্মিনীকে লাভ করার চেয়ে সাগর ছেঁচে রত্ন সংগ্রহ করা বুঝি অনেক সহজ। বহুদিন হয়ে গেল, দুর্গ-প্রাচীরের একটি পাথরও নড়ানো গেল না। বাদশা নিরুপায় হয়ে আপোস প্রস্তাব পাঠালেন, দর্পণের ভিতর দিয়ে যদি একবার পদ্মিনীকে দেখবার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তিনি অবরোধ উঠিয়ে দিল্লী ফিরে যেতে প্রস্তুত আছেন। এ ত শর্ত নয়, এ যে আবেদন, বিরাট-হৃদয় ভীম সিংহের মন গলে উঠল, তিনি অনুমতি দিলেন। আলাউদ্দিনকে সাদরে নিয়ে আসা হল পদ্মিনী-মহলে।

গড়ের একদিকে, একটু নিরালায় প্রাসাদটি। পুরাতন পদ্মিনী-মহলকে সংস্কার করে প্রায় নূতন করে তৈরী করা হয়েছে। একটি হ্রদের চারপাশ দিয়ে প্রাসাদের বিভিন্ন মহলগুলি। [illegible] টলটল করছে পদ্মিনীসায়[illegible], তারই মধ্যে প্রাসাদের [illegible] অংশ, জলমহল।। প্রাসা[illegible] দুই অংশের যোগসূত্র ছোট্ট এক তরী আজও হ্রদের তীরে বাঁধা থাকে।

জলমহলের মুখোমুখি স্থল-প্রাসাদের এক ঘরে চার দেয়ালে চারটি প্রকাণ্ড মুকুর টাঙগানো আছে, আর মেঝের উপর রয়েছে এক জলচৌকি। আলাউদ্দিনকে নিয়ে আসা হয়েছিল সেই ঘরে আর পদ্মিনী দাঁড়িয়েছিলেন জলমহলের অলিন্দে। বাদশা জলচৌকিতে বসে দর্পণের ভেতর দেখলেন পদ্মিনীকে। যখন সম্বিত ফিরল, তখন পদ্মিনী আর নেই, অলিন্দ থেকে কখন অদৃশ্য হয়ে গেছেন। আলাউদ্দিন ফিরে চললেন তাঁবুতে। কিন্তু মনে শান্তি কই, নয়নের সামনে সে মূর্তি নেই বলেই বুঝি 'নয়নের মাঝখানে নিয়াছে সে ঠাঁই'। অমন যে পদ্মিনী-মহলের বাগান, চন্দ্রমল্লিকা, হাসনুহানা আর মরসুমী ফুলের ছড়াছড়ি, আলাউদ্দিন সেদিকে ফিরেও তাকালেন না। অতিথিকে পৌঁছে দিতে সঙ্গে চলেছেন ভীম সিংহ। চিতোর-গড়ের শেষ ফটক পাদন পোল* অতিক্রম করেছেন এমন সময় কয়েকজন পাঠান ভীম সিংহকে ঘিরে ফেলল। আলাউদ্দিনের হাতে ভীম সিংহ বন্দী হলেন।

আলাউদ্দিনের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, রাণা ভীম সিংহের বিনিময়ে পদ্মিনীকে সমর্পণ করবেন। হলও তাই, মহারাণা প্রস্তাব পাঠালেন যে বাদশা পদ্মিনীকে পাবেন, যদি ভীম সিংহকে মুক্তি দেন। দূত আরও আবেদন করল যে, পদ্মিনীরানীকে বাদশাহের শিবিরে পৌঁছে দেবার জন্য সঙ্গে আসবেন সাতশো পুরনারী, বাদশা যেন তাঁদের সম্মান রক্ষার বন্দোবস্ত করেন। আলাউদ্দিন আনন্দে আত্মহারা, পদ্মিনীর জন্য বিরাট এক তাঁবু তৈরী করালেন।

সাতশো পাল্কী সেই তাঁবুর ভেতর ঢুকল আর বেরিয়ে গেল, কেবল শেষদেখা করবার জন্য অনুমতি দিয়েছিলেন ভীম সিংহকে, তাঁর পাল্কী আর বেরোয় না।

অধৈর্য আলাউদ্দিন যখন খোঁজ নেবার জন্য সেই তাঁবুর ভেতর ঢুকলেন তৎক্ষণে সাতশো অনুচরের সঙ্গে ভীম সিংহ চিতোরগড়ে প্রায় পৌঁছে গেছেন। উল্কার বেগে বাদশা ছুটে চললেন দুর্গের দিকে কিন্তু ভীম সিংহ তখন তাঁর নাগালের বাইরে চলে গেছেন। ভীমকে গড়ের ভিতর পাঠিয়ে দিয়ে সিংহদ্বার রক্ষা করছেন পঞ্চাশ বছরের গোরা আর তার বারো বছরের ভাইপো বাদল। এই দুই অসমবয়সী সেনা-পতি ও মুষ্টিমেয় রাজপুত সেনার বীরত্বের কাছে হার মানলেন আলাউদ্দিন। দিনের শেষে নতশিরে অবরোধ উঠিয়ে নিলেন।

ভীম সিংহকে ফিরে পেলেন পদ্মিনী, কিন্তু এই আনন্দের দিনেও চোখে জল আসে, দূরের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বার-বার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। পদ্মিনী-মহল ছাড়িয়ে গড়ের একান্তে সাধারণ এক গৃহ, সেখানে থাকতেন গোরা আর বাদল। এঁরা ছিলেন পদ্মিনীর বাপের বাড়ির লোক, সিংহল থেকে তাঁর সাথে চিতোরে এসে-ছিলেন। পদ্মিনীর দেখাশোনার ভার ছিল গোরার উপর। সে দায়িত্ব তিনি পালন করলেন প্রাণ দিয়ে। সেদিনের যুদ্ধে ভীম সিংহ আর পদ্মিনী তাঁদের চিরঅনুগত-সেবক গোরাকে হারালেন। অনেক ভগ্নস্তূপ আর কাঁটা-ঝোপের মাঝখানে গোরা-বাদলের গৃহ আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

আলাউদ্দিন সেবারের মত নিরাশ হয়ে ফিরে গেলেন, কিন্তু হার মানবার পাত্র

* চিতোরে ফটককে 'পোল' বলা হয়। চিতোরগড়ের সাতটি ফটক আছে, রামপোল, লক্ষ্মণপোল, জরলাপোল, গণেশপোল, হনুমান-পোল, ভৈরবপোল ও পাদনপোল। গড়ে ঢোকবার সময়ে প্রথমে পড়বে পাদনপোল আর সবশেষে রামপোল।

তিনি ছিলেন না। তের বছর পরে আবার চিতোর আক্রমণ করলেন। এবার ঘাটি করলেন 'ছোট চিতোরীর' উপর। চিতোরগড়ের দক্ষিণে ছোট এক টিলা, তারই নাম 'ছোট চিতোরী'। টিলাটি সমতলভূমি থেকে প্রায় একশো তিরিশ ফুট উঁচু।

সেবার মেবারের বড় দুঃসময়। দুর্ভিক্ষ আর মহামারীতে দলে দলে লোক মারা যাচ্ছে। মহারাণা স্থির করলেন সন্ধি করবেন। আসন্ন অপমানের চিন্তায় সকলে বিষণ্ণ, কিন্তু উপায়ই বা কি, আলাউদ্দিনের অবরোধের জন্য এক কণা খাবারও বাইরে থেকে আনা যাচ্ছে না। ভক্তের অবস্থা দেখে দেবী এগিয়ে এলেন, চিতোরেশ্বরী উপায় নির্দেশ করে দিলেন।

পদ্মিনী-মহল যাওয়ার পথে পড়ে চিতোরেশ্বরীর মন্দির। গড়ের জমি থেকে বেশ একটু উঁচুতে মন্দিরটি। একক মন্দির হিসাবে গড়ের মধ্যে এইটিই বোধহয় সবচেয়ে বড়। সে আজ কতদিনের কথা, সূর্যবংশের অপমানের সম্ভাবনায় দেবী আর স্থির থাকতে পারলেন না। বাদিপাথরের প্রশস্ত সোপান বেয়ে নেমে গেলেন রাজ-অন্তঃপুরে। রাণা স্বপ্ন দেখলেন, দেবী বলছেন, 'ময় ভূখী হুঁ'। চিতোরেশ্বরী চাইছেন রাজরক্ত, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে রাজবংশ রক্ষার দায়িত্ব তাঁর।

দেবীর আদেশে রাজপুত্রের সব দ্বিধা কেটে গেল। রাজপুত্র অজয় সিংহ বংশরক্ষার জন্য গড় থেকে চলে গেলেন। ছোটবড় প্রত্যেকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন।

যুদ্ধের শেষ দিন। পাঠানের কোলাহল ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে। পদ্মিনী ও পুর-স্ত্রীরা জহরব্রতের জন্য উদ্যোগ করতে লাগলেন। শেষ স্নান করবার জন্য তাঁরা চললেন গো-মুখ কুণ্ডের দিকে।

গড়ের একপাশে দুর্গ-প্রাচীর ঘেঁষে এই গোমুখ-কুণ্ড। পাহাড়ের গায়ে একটি গো-মুখ, এরই ভেতর দিয়ে অবিরল ধারায় জল পড়ছে একটি ছোট ঘরের ভেতর, সেখানে কাকচক্ষু নির্মল জলের মধ্যে একটি সুন্দর শিবলিঙ্গ আছে। ঘর ছাপিয়ে জল গিয়ে পড়ে কুণ্ডের মধ্যে। মেবারের রাজপুতের কাছে এই গোমুখ কুণ্ডের জল বড় পবিত্র।

স্নান সেরে পদ্মিনী আর পুরনারীরা এলেন 'মহাসতী'র প্রাঙ্গণে। সেখানে সমস্ত মাঠ জুড়ে অগ্নি জ্বলছে আর শিখাগুলি অধৈর্য উল্লাসে কাঁপছে। পাঠান বোধহয় রামপোলের কাছে এসে গেল, কোলাহল বড় বেশী শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ভয় কি, সামনেই ঐ পাপতাপ নিবারণকারী অগ্নি, আর দুঃখই বা কি,

'আজ নাথ জিয় দীজিয়ে
অজ্ঞ অগিন হাম জুড়'

'আজ আমরা ত আগুনে স্বামীর সঙ্গেই সব জ্বালা জুড়াব'। মৃত্যু ত নয়, যেন উৎসব, গান গেয়ে 'লাজহরণ, তাপনিবারণ' অগ্নি প্রদক্ষিণ করে তাঁরা চিতায় উঠলেন।

চিতোরের মত অনেক রাজপুত দুর্গেই রাজপ্রাসাদ থেকে সামান্য দূরে একটি বিশেষ মাঠ আছে। পূর্বে পুরস্ত্রীরা সেখানে সহ-মরণে যেতেন, দুর্গ বিপন্ন হলে জহরব্রতে আত্মোৎসর্গ করতেন। এই সব শ্মশানগুলির নাম 'মহাসতী'।

আলাউদ্দিন যখন গড়ের ভেতর এসে পৌঁছলেন তখন 'মহাসতী'র আগুন নিভে এসেছে। আশাহত নবাব জৈনমন্দির আর পদ্মিনী-মহল বাদ দিয়ে কিছুই অটুট রাখলেন না। চিতোর দুর্গ এই প্রথমবার বিদেশীর পদানত হল (১৩০৩ খৃঃ)।

চিতোরেশ্বরী তাঁর প্রতিশ্রুতি ভোলেননি। কয়েক বছরের মধ্যেই অজয় সিংহের ভাইপো হাম্বীর চিতোরের সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। হাম্বীরের নাতি লখরাণার সময় পূর্বের সমৃদ্ধির দিন আবার ফিরে এল। জাওয়ারের রূপো ও টিনের খনি আবিষ্কার হওয়ায় রাজ্যের আয় অনেক বেড়ে গেল। ভাঙা ইমারতগুলির সংস্কার করে লখ-রাণা পূর্বের শ্রী আবার ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর ছেলে মকুলজী চিতোরে একটি নূতন মন্দির নির্মাণ করলেন।

এই মকুলজীর রাণা হওয়ার ইতিহাস কৌতুকময়। লখরাণা একদিন দরবারে বসে আছেন এমনসময় মারোয়াড়ের দূত এসে উপস্থিত হল। দূতের হাতে নারকোল দেখে রাণা বুঝতে পারলেন যে মারোয়াড়ের রাজ-কুমারীর সঙ্গে তাঁর বড় ছেলে চণ্ডের বিয়ের প্রস্তাব নিয়েই দূত এসেছেন। দূতের আকৃতি দেখে রাণার একটু রসিকতা করার শখ হল। পাকাদাড়িতে হাত বুলিয়ে লখ-রাণা দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, সুন্দর ফলটি তা হলে আমার জন্যই ত? চণ্ড এই পরি-হাস শুনে সভা ছেড়ে উঠে গেলেন। তার-পর হাজার চেষ্টা করেও চণ্ডের মত-বদলানো গেল না। তাঁর সেই এক কথা, বাবা যাঁকে

প্রথম জৈন তীর্থংকর আদিনাথের উদ্দেশে নির্মিত কীর্তিস্তম্ভ

তামাসা করেও চেয়েছেন, আমি তাঁর পাণি-গ্রহণ করতে পারি না। পরিহাসের ফল দেখে লখরাণা অত্যন্ত রেগে বললেন, আমার এই বিবাহের পর কোনও ছেলে হলে সেই সিংহাসনের অধিকারী হবে, চণ্ডের কোনও দাবী থাকবে না। সেই ছেলে এই মকুলজী। মকুলজী রাণা হয়ে একটি সুন্দর ত্রিমূর্তি শিবের মন্দির তৈরী করলেন। [illegible] পাথরের এই মূর্তি চিতোর[illegible] এক প্রধান দ্রষ্টব্য।

মকুল[illegible] ছেলে রাণা কুম্ভ মেবারের ইতি[illegible]সে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে ইনি রাজত্ব করেছিলেন। কুম্ভ অসাধারণ বীর ছিলেন, প্রতি যুদ্ধেই তিনি জয়লাভ করেছেন। তাঁর [illegible]সময়ের সবচেয়ে স্মরণীয় যুদ্ধ হয়েছিল মা[illegible]বের সমতলভূমিতে, সেখানে তিনি গুজর[illegible] ও মালবের মিলিত সৈন্যদলকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন ও মালবের সুলতান মহ[illegible]কে বন্দী করে চিতোরগড়ে নিয়ে আসেন (১[illegible]০ খৃঃ)। এই বিজয়ের স্মৃতি হিসাবে তি[illegible] চিতোর দুর্গে এক

বিরাট জয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন। প্রায় একশো কুড়ি ফুট উঁচু ও গোড়ায় তিরিশ ফুট ব্যাসযুক্ত এই জয়স্তম্ভ সে সময়ের হিন্দু-স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। স্তম্ভের নয়টি তলা আছে, বাহির থেকে বোঝা যায়। স্তম্ভের গায়ে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা আছে।

রাণা কুম্ভের প্রাসাদটিও একটি দেখবার জিনিস। প্রধানফটক সূর্য-তোরণ দিয়ে ঢুকেই সামনে পড়বে সূর্য-গোখরা আর তারই পাশ দিয়ে শৃংগার-চৌরী মন্দিরে যাবার রাস্তা। সূর্য-গোখরা আর রাণাদের বাস-গৃহের মাঝে গণেশ জীউর মন্দির। রাণার গৃহের সামান্য দক্ষিণে জেনানা-মহল, আরও দক্ষিণে যুবরাজের প্রাসাদ। যুবরাজ ও জেনানা-মহলের সামনে বিরাট অংগন, অংগনের একধারে একটি প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা। সমস্ত প্রাসাদটি বিরাট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা।

রাণা কুম্ভ একটি নূতন ধনভাণ্ডার তৈরী করেন। নয় লক্ষ টাকা নাকি এতে সর্বদাই মজুত থাকত, তাই এর নাম নৌলখা-ভাণ্ডার। এর থেকে রাণার সময়ের সচ্ছলতার আভাস পাওয়া যায়। গড়ে ঢুকেই ধন-ভাণ্ডারটি নজরে পড়ে।

একই অংগনের মধ্যে দুটি মন্দির পাশা-পাশি রয়েছে — একটি কুম্ভশ্যাম মন্দির, অপরটির নাম মীরাবাঈর মন্দির। মন্দির দুটির গঠন বহুলাংশে একধরনের, স্থাপত্যের দিক দিয়ে বিচার করলে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের সাথে এদের মিল আছে। পুরীর মতই মন্দিরের চূড়া, অভ্যন্তর চতুষ্কোণ স্তম্ভের মত। দেবালয় দুটির গঠন-শৈলীর উপর প্রাচীন হিন্দু-স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ্য করে ফার্গুসন বলেছেন, কুম্ভের সময় পূর্ব গৌরব পুনরুদ্ধারের যে চেষ্টা হয়েছিল মন্দির দুটি তারই সাক্ষী।

মীরার মন্দির কুম্ভশ্যাম মন্দিরের চেয়ে অনেক ছোট হলেও এর একটি বিশেষ আকর্ষণ আছে। মহারাণা কুম্ভ মীরাকে* বিয়ে করে চিতোরে নিয়ে এলেন, নববধূর সংগে এল গিরিধারী গোপালের এক ছোট মূর্তি, "মীরাকে প্রভু, পূরব জনমকে সাথী"। রাণা প্রথমে কোনও আপত্তি করেন নি, বরং একটি নূতন মন্দির তৈরী করে দিয়েছিলেন কিন্তু মীরা যখন সকলের সামনে সেই মন্দিরে নাচতে ও গান করতে লাগলেন তখন আর তিনি সহ্য করতে পারলেন না। মীরাকে প্রকাশ্যে নাচতে ও গান করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু মীরা সে নিষেধ শোনেন কি ক'রে, তাঁর যে ধারণা—

"তুমি খুশী [illegible] আমায় দেখে দেখে
আমি নেচে বেড়াই তোমা[illegible]গুনগানে",

তাঁর কাছে 'মেরে তো গিরিধারী গোপাল, দুসরা ন কোঈ'। অনেক কটু কথা শুনতে হ'ল, অনেক উপদেশ বর্ষণ হ'ল। কিন্তু মীরা যেন এসব শুনেতেই পান না, মীরার মনের সবটুকু জায়গা গিরিধারী দখল করে নিয়েছেন। তিনি হরির রঙে রাঙিয়ে আছেন, 'মীরা হরি রংগ রাতী'।

রাণা কুম্ভের বীরত্বের অসীম খ্যাতি ছিল। কোনও যুদ্ধে তিনি পরাজিত হননি কিন্তু নিজের স্ত্রীর কাছে হার মানলেন তিনি। মীরাকে শোধরানো গেল না। রাণা শেষে নির্বাসনের ভয় দেখালেন। মীরা নিজের থেকেই রাজপুরী ছাড়লেন, ক'দিন থেকেই তিনি বৃন্দাবনের ডাক শুনতে পাচ্ছিলেন। মীরার সাথে চিতোরের রাজ-লক্ষ্মীও বোধ হয় দুর্গ ত্যাগ করলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই মেবারের আকাশে কালমেঘের আনাগোনা শুরু হল। কুম্ভ তাঁর ছেলের হাতে প্রাণ দিলেন, 'ঘাতীরাও' রাণার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। ভ্রাতৃবিরোধ আর আত্মীয়-কলহের ফলে রাজ্যে দেখা দিল বিশৃংখলা। অনেক জায়গা মেবারের হাতছাড়া হয়ে গেল।

কুম্ভের নাতি রাণা সংগ পূর্ব গৌরব অনেকটা ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর সময় চিতোরের প্রতিপত্তি আর একবার চরম শিখরে উঠল। সেই শেষবার।

গড়ের মধ্যে আজ যেখানে পুরাতত্ত্ব বিভাগের কার্যালয় তারই পাশে একটি ঘরে অনেকগুলি কামান সারি সারি সাজানো আছে। এদের মধ্যে একটি বিরাট পিতলের কামান সত্যিই দর্শনীয়। এর মধ্যে বেশ কয়টি কামান, বিশেষ করে পিতলেরটি নাকি রাণা সংগ শত্রু পক্ষের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। সংগ কোনদিন আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেননি। শুধুমাত্র তরোয়াল ভরসা করে গোলন্দাজ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে বুঝি শুধু সংগই পারতেন।

খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের কাছে সংগ পরাজিত হলেন আর সেই গ্লানিতে বাসওয়ায় যখন দেহ রাখলেন, তখন এই অমিতবিক্রম যোদ্ধার পরিচয় আর একবার পাওয়া গেল। তরোয়ালের খোঁচায় এক চক্ষু অন্ধ, গোলার আঘাতে খঞ্জ, লোদী সুলতানের সংগে যুদ্ধে একটি হাত কাটা গেছে, সারা দেহে সব মিলিয়ে আশিটি অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন।

সংগের মৃত্যুর পর চিতোরের ইতিহাসে দুর্দিন ঘনিয়ে এল। অপদার্থ রাণা বিক্রমজিৎ তাঁর ব্যবহারে সামন্তদের ক্ষুব্ধ করলেন, রাজ্যের সর্বত্র বিশৃংখলা দেখা দিল। সুযোগ বুঝে গুজরাটের সুলতান চিতোর আক্রমণ করলেন। রাজমাতা কর্ণদেবী গড় রক্ষার কোনও উপায় না দেখে হুমায়ুনের কাছে সাহায্য চাইলেন। সাহায্য প্রার্থনা করে কোনও পত্র নয়, দূত হুমায়ুনের কাছে নিয়ে গেল এক রাখী। ভগ্নী বিপন্ন, ভ্রাতা কি ভগ্নীর সম্মান রক্ষা করবার জন্য এগিয়ে আসবেন না? হুমায়ুন সসৈন্যে গোয়া-লিয়র পর্যন্ত এগিয়ে এলেন, বাহাদুর শা' চিতোর অবরোধ তুলে নিলেন।

কিন্তু বিপদ কাটল না। উনিশ মাস পরে বাহাদুর শা' আবার চিতোর আক্রমণ করলেন। হুমায়ুন তখন নিজে বিপন্ন, কিছু করতে পারলেন না। রাজমাতার পরামর্শে বিক্রমজিৎ শিশু উদয়সিংহকে নিয়ে দুর্গ ত্যাগ করলেন। সকলে বুঝতে পারলেন, দুর্গ রক্ষার আর আশা নেই। গুজরাট-সৈন্যের গোলার আঘাতে দুর্গ-প্রাচীরের এক অংশ ভেঙে পড়ল। রাজমাতা কর্ণদেবী বর্ম পরে নিজে যুদ্ধ করতে লাগলেন, দেওলিয়ার সামন্ত বাঘসিং দুর্গের সব রাজপুতকে জড়ো করে একবার শেষ চেষ্টা করলেন, কিছু হল না। দিনের শেষে রক্তাক্ত পিচ্ছিল পথ বেয়ে গুজরাটের সুলতান যখন গড়ের ভেতর এসে উপস্থিত হলেন 'মহাসতীর' প্রাংগণে, তখনো ধিকি ধিকি আগুন জ্বলছে বার তের হাজার পুরনারীর

---

* কেউ বলেন যে, রাণা সংগ্রাম সিংহের ছোট ছেলে ভোজের স্ত্রী ছিলেন মীরা। টড সাহেবের মতে মীরা রাণা কুম্ভের রাণী ছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্যগুলির ক্ষেত্রে আমি টড সাহেবকেই অনুসরণ করেছি।

অকাল আত্মাহুতিতে সূর্যদেব বেদনায় পাণ্ডুর হয়ে গেছেন। চিতোরগড়ের দ্বিতীয়বার পতন হল (১৫৩৬ খৃঃ)।

হুমায়ুন কিন্তু রাখীর সম্মান রেখেছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বাহাদুর শাকে পরাজিত করে তিনি বিক্রমজিতকে চিতোরের সিংহাসন ফিরিয়ে দেন। ভাগ্য বিপর্যয়ের পরও রাণার চৈতন্য হল না। একদিন প্রকাশ্য দরবারে এক সামন্তকে অপমান করে বসলেন। সেইদিনই রাত্রে রাজ অন্তঃপুরে এক আর্ত কোলাহল উঠল, সূর্যবংশের ইতিহাসে রাণা এই প্রথম তাঁর এক সামন্তের হাতে প্রাণ দিলেন। সামন্তেরা সেই রাত্রেই বিক্রমজিতের কাকা পৃথ্বীরাজের পুত্র বনবীরকে চিতোরের সিংহাসনে বসালেন।

ধাত্রীপান্না তখন সবে উদয়সিংহ (সঙ্গের শিশুপুত্র) ও তাঁর নিজের ছেলেকে খাওয়ানো শেষ করেছেন। পুরস্ত্রীদের বিলাপ-ধ্বনি শুনে তাঁর মনে হল, অশুভ ঘটনাই ত অশুভ ভবিষ্যতের সূচনা করে। পান্নার কর্তব্য স্থির করতে দেরি হল না। রাজকুমারের পালঙ্কে শুইয়ে দিলেন নিজের শিশুপুত্রকে। নিষ্পলকভাবে চেয়ে আছেন ছেলের দিকে এমন সময় [illegible]ঁায় ছায়া পড়ল। বনবী[illegible]ন সিংহাসনের কণ্টক উদয়সিংহকে হত্যা করতে এসেছেন। যন্ত্রচালিতের মত রাজকুমারের পালঙ্কের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন পান্না, শিশুটি একবার মা বলবারও সুযোগ পেল না, বনবীরের ছোরার আঘাতে প্রাণ বেরিয়ে গেল। পান্না নির্বাকভাবে দাঁড়িয়ে দেখলেন, কাঁদলে হয়ত উদয়ের বিপদ হবে।

রাজপ্রাসাদের কাছে একটি গৃহ আজও আছে, এর নাম ধাত্রী পান্না মহল। সে আজ কতদিনের কথা। এই গৃহে পান্না নিজের ছেলের বিনিময়ে রাজপুত্রের প্রাণ বাঁচিয়ে ছিলেন, তারপর কত রাণা মেবারের সিংহাসনে বসেছেন, রৌদ্রে আর বৃষ্টিতে তাঁর মহল সমস্ত সৌষ্ঠব হারিয়ে আজ গতশ্রী তবু ধাত্রীপান্নার নাম আজও অমর হয়ে আছে, ইতিহাসের পাতায় পান্নার মতই জ্বলজ্বল করছে।

বনবীরের শুনতে দেরি হল না যে, তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি। কমলমীরে আশা শার আশ্রয়ে উদয়সিংহ সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন। বনবীর তখন দুর্গের মধ্যে এক নূতন প্রাচীর তুলতে আরম্ভ করলেন। কেউ বলেন, তাঁর অভিপ্রায় ছিল গড়কে দুভাগ করে এক ভাগ উদয়সিংহকে দিয়ে দেওয়া, আবার কারুর মতে দুর্গকে আরও সুরক্ষিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য যাই থাক, কোনটাই পূর্ণ হয়নি। উদয়সিংহের খবর পেয়ে তাঁকেই রাণা বলে মেনে নিলেন সর্দারেরা। বনবীরকে দুর্গ ছাড়তে হল। নৌলখা ভাণ্ডারের পাশে সেই অসমাপ্ত প্রাচীর আজও দেখা যায়, লোকে একে বনবীরের দেওয়াল বলে থাকে।

উদয়সিংহ রাণা হলেন। কিন্তু না হলেই বুঝি ভাল হত। কেউ আক্ষেপ করে বলেছেন, মেবারের ইতিহাসে এই রাণার নাম যদি না থাকত! আকবর চিতোর আক্রমণ করতেই উদয়সিংহ দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। তাঁর কাপুরুষতায় শিশোদীয়া বংশের গৌরবময় ইতিহাস কলঙ্কিত হল।

তবু দুর্গরক্ষার চেষ্টার ত্রুটি হল না। মেবারের রাজপুতের কাছে চিতোরগড় প্রাণের চেয়েও প্রিয়। যারাই অস্ত্র ধরতে পারে, তারা সবাই জড়ো হল দুর্গে। জয়মল ও পত্তের নেতৃত্বে সেই মুষ্টিমেয় সেনা অদ্ভুত বীরত্বের সঙ্গে চিতোরের দ্বার রক্ষা করতে লাগলেন। আকবর প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছেন। এমন সময় এক গোলা জয়মলকে আঘাত করল (সম্রাট দাবী করতেন, ঐ গোলাটি তাঁরই ছোঁড়া। এই গর্ব করার ইচ্ছা থেকে বোঝা যায় যে, সেদিনের যুদ্ধে জয়মল কি বীরত্বই দেখিয়েছিলেন!) দূরাগত এক গোলার আঘাতে মৃত্যু জয়মলের কাছে বড় অপমানকর বলে মনে হল। রামপোল খুলে খোলা তরোয়াল হাতে তিনি অগণিত মোগল সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেনাপতির আদর্শ সকলেই অনু[illegible]ণ করলেন। অপরাহ্নের আলোয় জয়মলের হাতে শিশোদীয়া বংশের সূর্যমূর্তি লেখা রাজপতাকা শেষবারের মত ঝলসে উঠল। এক[illegible]র শোনা গেল, ভগবান একলিঙ্গের জয়ধ্বনি, তারপরেই সব ছাপিয়ে বারবার একই সমুদ্র গর্জনের মত ধ্বনি শোনা যেতে লাগল—'আল্লা হো আকবর, বাদশা শাহানশা কি ফতে'। চিতোরগড়ের তৃতীয়বার পতন হল (১৫৬৮ খৃঃ)।

গড়ে আসার সময় প্রবেশ-পথের ধারে জয়মল ও পত্তের নামে উৎসর্গ করা দুটি স্মৃতিস্তম্ভ দেখে এসেছি, গড়ে এসে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরের পাশে দেখলাম এঁদের বাসগৃহ, জয়মল ও পত্ত মহল। উদয় সাগরের তীরে পলাতক রাণার প্রাসাদের তুলনায় হয়ত এই গৃহ কিছুই নয়, তবু দুই মহাপ্রাণ সেনাপতির স্মৃতিবিজড়িত এই ভগ্নাবশেষ মহলটি মর্যাদায় সেই বিলাসভবনের থেকে অনেক, অনেক বড়।

আকবরের দুর্গজয়ের ফলে চিতোরের প্রায় সাড়ে আটশো বছরের (৭২৮-১৫৬৮ খৃঃ) গৌরবময় ইতিহাসে যবনিকা পড়ল। সম্রাট দুর্গ চুর চুর করে ভাঙলেন, লুঠ করে নিয়ে গেলেন রাজকীয় আভিজাত্যের যাবতীয় নিদর্শন। এই ক্ষতি আর পূরণ হয়নি। নতুন রাজধানী তৈরি হয়েছে উদয়পুরে, চিতোরগড়ের সংস্কার হয়নি। আজ চিতোরের পুঁজি শুধু অতীত, পূর্বের প্রাণধারাটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়েছে। ভগ্নস্তূপের মাঝে কিছু লোক আজও কায়ক্লেশে দিন গুজরান করে, এদের কেউ পাথরের কারিগর, কেউ দিনমজুর, কেউ বা সীতা ফলের ভাণ্ডারী (সীতাফল-আতাফল গড়ে প্রচুর পাওয়া যায়)।

ভারী মন নিয়ে ফিরে চলেছি। ক্রমে সাতটা ফটক পেরিয়ে মেবারের সমতল ভূমিতে নেমে এলাম। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। ক্ষীণ চাঁদের আবছা আলোয় গড়ের কিছুই আর দেখা যায় না, শুধু রাণা কুম্ভের কীর্তিস্তম্ভের চূড়াটি ঝিকমিক করছে। যতই দূরে যাচ্ছি, কীর্তিস্তম্ভকে ততই উঁচু মনে হচ্ছে। সবকিছু ছাপিয়ে, সকলকে ছাড়িয়ে সে একক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ঐ স্তম্ভ শুধু রাণা কুম্ভের জয়ের নিশানা নয়, চিতোরের জন্যে সাড়ে আটশো বছর ধরে মেবারের রাজপুত যে ত্যাগ, দেশপ্রেম ও বীরত্ব দেখিয়েছে, এই কীর্তিস্তম্ভ তারই প্রতীক। ঐ কীর্তির তুলনা নেই, ক্ষয় নেই, এর মৃত্যু নেই।

গত সপ্তাহে বোম্বাইয়ের প্রখ্যাত শিল্পী পি জি সিরুর-এর চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল গ্র্যান্ড হোটেলের 'বলরুমের' ব্যালকনীতে। গ্র্যান্ড হোটেলে চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা সম্ভবত এইটিই সর্বপ্রথম। চিত্রপ্রদর্শনীর পক্ষে এ স্থানটি সত্যিই চমৎকার। আশা করি ভবিষ্যতে এখানে আরও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হবে। শ্রী সিরুর বোম্বাই নিবাসী। ইনি বোম্বাইয়ের টাইমস অব ইণ্ডিয়া কাগজের স্টুডিওতে বহুকাল 'কালার আর্টিস্ট' হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। এ'র রঙীন ছবির প্রিণ্ট আমরা ইলাস্ট্রেটেড উইকলী কাগজে এক সময় প্রায় প্রতি সপ্তাহেই দেখতে পেতাম। জে জে স্কুল অব আর্টস থেকে ইনি ১৯২৮ সালে পাশ করে বের হন। এ'র বয়স ৫২ বছর।

সবসুদ্ধ ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে ৬২টি। তার মধ্যে ১৯টি তৈল মাধ্যমে রচনা। বাকি জল রঙের রচনা। এ'র রচনা সবই সাদৃশ্য সত্য ধরে। ছবিগুলি মডার্নিস্ট শিল্পীদের চোখে 'ফটোগ্রাফিক' হলেও পাকা কারিগরির লক্ষণগুলি অস্বীকার করা চলে না। কাজ-গুলি সত্যই পরিণত; বিশেষ করে এ'র প্রতিকৃতি রচনাগুলি। জল এবং তৈল এ দুটি মাধ্যমেই এ'র দক্ষতা সমান। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'এ গার্ল ফ্রম লাধাক', 'ওয়াশিং টাইম, শ্রীনগর', 'ওয়ে সাইড সীন', 'নায়ার উওম্যান, মালাবার', 'ডাল লেক, কাশ্মীর' এবং তৈল মাধ্যমের প্রতিকৃতিগুলি। তবে এ'র জল রঙের প্রয়োগ কৌশল কিছুটা কমার্শিয়াল আর্ট ঘেঁষা। আকাশ মেঘ প্রভৃতি ওয়াশ টেকনিক-এ হলেও রচনার মধ্যে যখনই কোনও ফর্মের 'মডেলিং' করতে হয়েছে শিল্পী তখনই পোস্টার কালার ব্যবহার করেছেন। ফলে স্বচ্ছ ওয়াশ টেকনিকে যে সুষমা প্রস্ফুটিত হয় তা এ'র রচনায় নেই। অবশ্য ছবি ছেপে বার করতে হলে এ'র টেকনিকই বেশী উপযোগী। এই টেকনিকেই প্রায় সব কমার্শিয়াল আর্টিস্টই রঙীন ছবি এ'কে থাকেন। এ'র তৈল মাধ্যম ব্যবহার অত্যন্ত অ্যাকাডেমিক। তুলির টান-টোনের দাগ মুখশ্রী বা শরীরে কোথাও দেখা যায় না। মডেলিং-এর সময় স্লিকিং করে করে সব মিলিয়ে দিয়েছেন। সেই কারণেই ছবিগুলি অত ফটোগ্রাফিক মনে হয়। কম্পোজিশন অ্যানাটমী এ সবও ফটো-গ্রাফিক। অনেক সময় তাই মনে হয়েছে ছবিগুলি শিল্পী রচনা করেছেন সামনে কোনও ফটোগ্রাফ রেখে। প্রকৃতির দৃশ্য বৈচিত্রের মধ্যেই হোক বা মানুষের গড়া শহুরে দৃশ্যের মধ্যেই হোক অথবা নর-নারীর মুখশ্রীতেই হোক, এ'র প্রত্যেক রচনাতেই চিত্রের উপাদানগুলি সুসংস্থিত। কিরূপভাবে কোন স্থান থেকে দেখলে উপাদানগুলি পরস্পর বিরোধের দ্বারা চিত্রকে খণ্ডিত না করে একটা শৃংখলা ও সামঞ্জস্যের ভাব আনতে পারে সেটা শিল্পীর বেশ জানা আছে।

বিদগ্ধ চিত্ররসিকগণ এ'র চিত্রকলা দেখে হয়ত তেমন পুলকিত নাও হতে পারেন, কারণ আধুনিককালের বর্ণিকা, অ্যাবস্ট্রাক্ট কল্পনা, মডার্নিস্টিক রচনা কৌশল প্রভৃতির মাধ্যমে শিল্পীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ নেই এ'র চিত্রকল্পে; তবে যাঁরা প্রাকৃত রূপের প্রতিচ্ছবি দেখতে চান ছবিতে তাঁরা এ'র রচনা দেখে সত্যই আনন্দ পাবেন। ইনি যে একজন সুদক্ষ ইলাসট্রেটর সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই আমাদের। —চিত্রগ্রীব

এ ল্যান্ডস্কেপ —শিল্পী পি জি সিরুর

চক্রদত্ত

দক্ষিণ ভারতের টিউটিকোরিন থেকে বিশ মাইল দূরবর্তী তিনটি স্থানে আবার মুক্তা আহরণের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে, এখানে খুব কম করলেও মুক্তাসম্বলিত ৭৫ লক্ষটি ঝিনুক পাওয়া যাবে। গত বছর সর্বসমেত ১১০ লক্ষ ঝিনুক সংগৃহীত হয়, ফলে ভারত সরকার ৪½ লক্ষ টাকা কর সংগ্রহ করতে পারেন। এর মধ্যে মাত্র একবার আহরণ করেই একটিমাত্র মুক্তাসম্বলিত একটি ঝিনুক লাভ করেন এবং ঐ একটি মুক্তার দাম বাবদ ১৫০০, টাকা পান। ঝিনুক সংগ্রহের জন্য ডুবুরীরা জলাম নামক ডোঙায় করে জলে নামে। এইসব ডুবুরীরা কোনও বিশেষ ধরনের পোশাক ব্যবহার করে না। এরা সাধারণ পোশাকেই সমুদ্রের নীচে নামে। একটি দড়িতে খুব ভারী পাথর বেঁধে সেই পাথরে দাঁড়িয়ে থাকে আর পাথরের ভারে তারাও নীচে নামতে থাকে। এই উপায়ে খুব তাড়াতাড়ি নামা যায়। এরা সঙ্গে একটা থলে নিয়ে জলের নীচে নামে আর নীচে নেমেই আশপাশ থেকে ঝিনুক সংগ্রহ করে থলে ভরে নিয়ে জলের ওপরে উঠে এসে ঝিনুকগুলি ডোঙায় ঢেলে দিয়ে একটুখানি বিশ্রাম নিয়ে শূন্য থলি হাতে আবার জলের তলায় চলে যায়। এরা এক একবারে প্রায় ৬০ থেকে ৭০ সেকেণ্ড রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জলের নীচে থাকে আর ঐটুকু সময়ের মধ্যেই এক একবারে যতটা সম্ভব ঝিনুক সংগ্রহ করে আনে। এইভাবে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাজ করে যেতে পারে। এরা যত মুক্তা সংগ্রহ করে তার থেকে তিন ভাগের এক ভাগ তারা পায় আর বাকী দু' ভাগ ভারত সরকার পায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এইসব ডুবুরী অত্যধিক রোজগারের জন্য নিজেদের নিরাপত্তার কথা না ভেবে এইরকম কাজ বেশী করার জন্য হয় অল্পায়ু হয়, না হয় তো পঙ্গু হয়ে পড়ে।
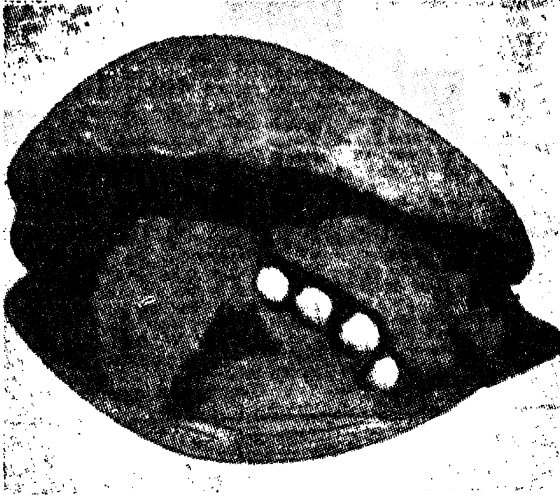
মুক্তাসম্বলিত ঝিনুক

*

মাতৃগর্ভে থাকাকালীন শিশুর শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ খবর রাখা কোনও ডাক্তারের পক্ষেও সহজসাধ্য নয়। অথচ ঠিক ঐ অবস্থায় এত অল্প কারণে শিশুর দেহের ক্ষতি বা উন্নতি হতে পারে যে, তখন প্রতি মুহূর্তের খবর রাখতে পারলেই যেন ভাল হয়। বিশেষত জন্মের পূর্বক্ষণে শিশুর অবস্থা জানার বিশেষ দরকার হয়ে পড়ে আর যদি সাধারণভাবে প্রসব না হয়, তাহলো তো খুবই প্রয়োজন হয়। অস্বাভাবিক প্রসবের সময় মায়ের ওপর ওষুধ, ইনজেকশন প্রয়োগের আগে মাতৃজঠরের শিশুর হৃদযন্ত্রের অবস্থা, শিশুর অবস্থিতি প্রভৃতি জানা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। লণ্ডনের কোনও বিশিষ্ট য়ুনিভার্সিটির গবেষকগণ মাতৃজঠরস্থ শিশুর হৃদযন্ত্রের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ ও স্পন্দন জানার উপায় নির্ধারণের জন্য বহু গবেষণা করেছেন। এরা বলেন যে, এই গবেষণায় সাফল্য লাভ করতে পারলে চিকিৎসা শাস্ত্রে এক নতুন আলোকপাত করা সম্ভব হবে। চিকিৎসকগণ গর্ভ ধারণের শুরু থেকে শিশু ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত শিশুর দেহের উন্নতির অবনতির সমস্ত খবর রাখতে পারবেন। এর জন্য ফোনোকার্ডিওগ্রাফ এবং ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ নামক দুটি যন্ত্রের প্রয়োজন হবে। ফোনোকার্ডিওগ্রাফের মাইক্রোফোনটি মায়ের তলপেটে রেখে দেওয়া হবে এবং শিশুর হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের শব্দ ফোনোকার্ডিওগ্রাফ সংলগ্ন একটি এমপ্লিফায়ারের সাহায্যে শোনা যাবে এবং তারপর একফালি চলন্ত কাগজের ওপর ঐগুলি লেখা হয়ে থাকবে। ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফটিও মায়ের তলপেটে রাখলে শিশুর হৃদযন্ত্রের পেশীতে উত্তেজনাবশত যে স্পন্দন জাগে, সেটাও লিখিত হয়ে থাকবে। মা যখন ঘুমিয়ে থাকেন কিংবা অত্যধিক উদগ্রীব হয়ে পড়েন তখন ফোনোকার্ডিওগ্রাফের সাহায্যে শিশুর হৃদযন্ত্র সংযত রাখা যেতে পারে। ফরসেপের সাহায্যে প্রসব করানোর সময়, মাকে অজ্ঞান করানোর সময় অথবা শিশুর পার্শ্ব পরিবর্তনের জন্যও ফোনোকার্ডিওগ্রাফের সাহায্য দরকার হবে। বিশেষ করে মাতৃজঠরে শিশুর অবস্থা কখন বিপজ্জনক হয়ে পড়ছে, সেকথা ফোনোকার্ডিওগ্রাফে সহজেই ধরা পড়বে। মায়ের এবং শিশুর দেহের বৈদ্যুতিক সঞ্চালন প্রায় একের সঙ্গে অন্যেরটি জড়িত থাকে, কিন্তু ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফের সাহায্যে দুটিই বোঝা যায় এবং একটি থেকে অন্যটি পৃথক করাও শক্ত হয় না। মায়ের গর্ভে যমজ সন্তান থাকলে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফে সহজেই ধরা পড়ে। কারণ তখন তিনটি স্পষ্ট স্পন্দনের কথা জানা যায়। এছাড়া গর্ভপাতের আশঙ্কা ঘটলে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ দিয়ে শিশু জীবিত কি মৃত অনায়াসেই জানা যায়।

কবিতা

যে আঁধার আলোর অধিক—বুদ্ধদেব বসু। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। দাম—আড়াই টাকা।

বুদ্ধদেব বসুর এই নতুন কবিতাসংগ্রহে প্রথমেই বিশেষভাবে নজরে পড়ে বিদেশী কবিদের জীবনপরিবেশ ও দৃষ্টির অভিজ্ঞতার ছায়া। বুদ্ধদেব বসু ইদানীং যে সমস্ত বিদেশী কবিদের কাব্যের অনুবাদ করেছেন, সেই সমস্ত কবির জীবন-কল্পনা ও প্রকাশ-ধর্ম তাঁকেও বেশ খানিকটা প্রভাবিত করেছে। সেই জন্যে অনেক কবিতার জীবনরস ও তার প্রকাশের বিশিষ্ট ভঙ্গি ঠিক যেন আমাদের আপন বলে মনে হয় না। যেমন,

(১) কিন্তু যদি আধেক তাকিয়ে তুমি
পাশ ফেরো, ফুটে ওঠে ফুলের
বিস্ময়
পৃথিবীর মাটিতে মদির ক'রে
চুমো খায়
উৎফুল্ল অঙ্কুরে।

(২) অনামী, অসংলগ্ন, ঢেউতোলা, অপ্রতিহত,
নতুন ভাষায়, শোনো, নক্ষত্রের নীত মন্দিরার
চরাচর, চিরকাল নিমন্ত্রিত তোমার শিরায়॥

(৩) ধন, প্রাণ, বীজের ভাণ্ডার
ভরে যায় মিনারে, মন্দিরে, যেন গম্ভীর ঘণ্টার
ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি ছিনিয়ে, দূরের
মতো হাওয়া
সিক্ত করে স্মৃতির স্বপ্নের বৃন্ত দুঃখের
ফোঁটায়।

এমন অজস্র বিদেশী পরিবেশ, ভাবাভঙ্গি, উপমা, বিশেষণ এই কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যাবে।

কিন্তু যেখানে কবি বিদেশী পরিবেশকে ফুটিয়ে তোলবার উদ্দেশ্যেই কলম ধরেছেন, সেখানে (যেমন কবি ঃ তরুণ ও প্রৌঢ়, মরুপথ) কবি সফল হয়েছেন। 'মরুপথ' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। মরুপথ-তাপ সহ্য করে যখন পথিক মরূদ্যান দেখতে পেল, তখন তার মনে এক নতুন জন্মলাভের যন্ত্রণা ফুটে উঠলো। সেই তৃষার্ত পথিকের আকণ্ঠ জলপানের দৃশ্য ও চারি ধারে নেমে-আসা মন্থর গম্ভীর মরু-সন্ধ্যা আরবাস্মৃতির উদ্রেক করে—

সিক্ত হাত, কনুইয়ের লোমকূপে ফলে ওঠে ফল
এবং
দর্শনে স্নিগ্ধ কণ্ঠ ঠেলে ফুটে ওঠে সন্ধ্যার
আজান॥

বুদ্ধদেব বসুর ক্ষেত্র যেখানে, সেখানে তিনি অনন্য। যেখানে কোনো বিদেশী ভাবনা নেই, যেখানে তাঁর মনের জমিতে এক পশলা বৃষ্টি ফেলে না কোনো বিদেশী মেঘ, সেখানে তিনি চমৎকার একটা সুরভিভাবের কবি। 'সমর্পণ' 'যাওয়া আসা', 'দেবযানীর স্মরণে কচ', 'অনুরাধা', 'প্রেমিকের গান'—এই কাব্য গ্রন্থের সত্যিকারের উপভোগ্য কবিতা। এই সমস্ত কবিতার পিছনে একটি নির্ভয় অতিস্বচ্ছল, নির্ভাবনার জীবন উঁকি দিচ্ছে—যা বুদ্ধদেববাবুর অতি-প্রিয় এবং কাম্য জীবনরস—যা তিনি কবিতা ছাড়াও গল্পে উপন্যাসের মধ্যেও ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। সেখানে বুদ্ধদেববাবু ঐতিহ্যকে মেনে চলেন অবাধে। রবীন্দ্রনাথকে বারে বারে মনে করিয়ে দেন—এমনকি কোথাও কোথাও অক্ষরে অক্ষরে—

সুদূর কালে হারিয়ে যাওয়া
দেশান্তরী উঠলো হাওয়া
ছেলেবেলার গন্ধভরা
অন্ধকার রাতে
আমার প্রেম রেখে এলেম
ঈশ্বরের হাতে॥

(সমর্পণ)

কিংবা, চলেছি নীল হাওয়ায় ভেসে
এরোপ্লেনে..............
পেরিয়ে যায় দাবার ছকে
গির্জে হোটেল নির্জনতা
ইতস্তত তুষার চূড়ায়
আর বছরের তন্ময়তা॥

কিংবা,

শুনি আপন বুকের দুরুদুরু
সেখানে এক মস্ত আগন্তুক
মস্ত কণায় তুলছে তোলপাড়
সেইটুকুতেই সুখ, আমার সুখ।

(ক্ষণিকার 'আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর' কবিতাটি স্মরণীয়।)

পরিশেষে একটি কথা। কেন জানি না এই কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতায় তাঁরই সমবয়সী ও সমযুগের কবি বিষ্ণু দে ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এই নিঃসংশয় আভাস বুদ্ধদেব বসুর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কোন ইঙ্গিত দিচ্ছে কিনা কে জানে। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

গোধূলির মতো হৃদয়েরে
করে তোলো সুস্বপ্ন, অভিলাষ, ব্যর্থতায়
অনুবন্ধময়
মন্থর, পুনরাবৃত্ত, অনিন্দ্য, পরিবর্তমান

অথবা,

অথচ, যেহেতু শুধু, অপেক্ষাই অক্ষয় মেয়াদ,
না যদি জাগাও, তবু এই ঘুম মানি রমণীয়॥

(২৭৫।৫৮)

হুইটম্যানের শ্রেষ্ঠ কবিতা। প্রেমেন্দ্র মিত্র। দীপায়ন প্রকাশনা ভবন। ২৮, মহিম হালদার স্ট্রীট, কলকাতা-২৬। দাম দু'টাকা।

ওয়েল্ট হুইটম্যানের কাব্যের মূলধর্ম হল তার প্রচণ্ড ইমোশন। ওই ইমোশনেই পাঠকের ব্যক্তিত্বের অহংকার ঘুচে যায়। কমলহীরের মতো সেই ব্যক্তিত্বের দ্যুতি হাজার রেখায় ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই এমন কবির কাব্যের অনুবাদে ভাষার অন্তর্নিহিত কণ্ঠটিকে উদাত্ত ও ব্যাপ্ত করতে হবে। নিরলঙ্কার ভাষা শরবৎ ছুটে গিয়ে পাঠকের মনকে তন্ময় করে তুলবে। প্রেমেন্দ্র মিত্র হুইটম্যানের অনুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর ব্যর্থতাকে মানতেই হয়।

অনেকস্থানেই তিনি ক্রিয়াকে আগে বসিয়ে ইমোশনের তীক্ষ্ণতাকে নষ্ট করেছেন। যেমন

(১) এই যে ভাবনা এ শুধু আমার
একার নয়
নয় আমার নিজস্ব:
সর্বকালের সর্বদেশের মানুষ যা
ভাবছে এ হোক তাই। ('ভাবনা')

(২) গাইছে মিস্ত্রিরা নিজের নিজের গান
জোরালো উল্লাস তাদের কণ্ঠে॥

প্রথম উদাহরণের তৃতীয় পংক্তিতে 'নয়' এবং দ্বিতীয় উদাহরণের 'গাইছে'—এই ক্রিয়া দুটিকে পরে বসালে বোধহয় ভালোই হোত। এরকম আরও কয়েকটি কবিতায় আছে।

দু একস্থানে অনুবাদের ত্রুটি নজরে পড়লো। যেমন Starting from Paumanok কবিতায় আছে:

Nations once powerful, now reduced, withdrawn or desolate.

এর বাঙলা করা হয়েছে 'দোর্দণ্ডপ্রতাপ যেসব জাতি উদ্ধত অথবা নিষ্প্রভ সংকুচিত ম্রিয়মাণ'। আর একটি কথা—'I hear America Singing'-এর বাঙলা 'শুনেছি আমেরিকার গান' কি যথেষ্ট ও সম্পূর্ণ? যাই হোক, এই সব সামান্য দোষত্রুটি অনবধানতায়, ধৈর্যের অভাবে ঘটেছে বলে মনে হয়।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হুইটম্যানের জীবনরস প্রেমেন্দ্র মিত্র উপযুক্ত ভাষার অঞ্জলিতেই পরিবেশন করেছেন। কারণ দুই কবির জীবনদৃষ্টি অনেকটা একমুখী। এবং সেইজন্যেই অনুবাদের আড়ষ্টতাকে স্বাভাবিক ইমোশান ঢাকা দিতে পেরেছে:

(১) ঘরে বাইরে আমার আকর্ষণ।
গোধন চরায় যারা উদার মাঠে,
আর মনে যাদের সমুদ্র কি অরণ্যের স্বাদ,
জাহাজ যারা গড়ে আর চালায়
কুঠারে কাটে কাঠ আর ঘোড়া ছুটোয়
তাদের আমি প্রেমিক।
দিনের পর দিন তাদের সঙ্গে খাওয়ায়,
শোয়ায় আমার বিরাগ নেই।

(আত্মীয়তা)

(২) যেন এক দৈবক্রিয়া কোন ভাগবতী মহিমা
আমার চোখের ঢাকনা খুলে দিচ্ছে;
ছায়াময় বিরাট আকার সমূহ বাতাস আর
আকাশের মধ্যে হাসছে;
আর দূরে সমুদ্রে তরঙ্গ অগণন
জাহাজ ভাসছে
আর নব নব কণ্ঠে বন্দনাগীতি আমায়
প্রণাম জানাচ্ছে।

(কলম্বাসের প্রার্থনা)

যাঁরা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যের সঙ্গে বিন্দুমাত্র পরিচয়লাভ করেছেন, তাঁরাই বুঝবেন হুইটম্যানের কবিজীবন কামনার সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কত সাদৃশ্য। অনূদিতের সঙ্গে অনুবাদকের এইখানেই জীবনে জীবনযোগ ঘটেছে।

যে সমস্ত কবিতা প্রেমেন্দ্র মিত্র অনুবাদের জন্যে বেছে নিয়েছেন সেগুলো অধিকাংশই নিঃসন্দেহে হুইটম্যানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। তবে 'নিখুঁত', 'তোমাকে', 'হে পাঠক' ইত্যাদি দু তিন পংক্তির নগণ্য কাব্য খণ্ডগুলোকে বাদ দিয়ে Song of Myself থেকে আরও কিছু কবিতা (যেমন

Walt Whitman, a Kosmos, of Manhattan the son, Turbulent fleshy, sensual, eating, drinking and breeding) কিংবা 'I sing the Body Electric'

ইত্যাদির মতো কবিতা অনুবাদ করলে বাঙলা সাহিত্যে হুইটম্যানের আরও কিছু ভালো কবিতার পরিচয় থেকে যেত। আর সেটা হোত সুযোগ্য অনুবাদকের হাতে মৌলিক শিল্পের মতই উজ্জ্বল। ২৮০।৫৮

আলোকিত সমন্বয়—আলোক সরকার। প্রকাশক—মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—বার টাকা।

সাম্প্রতিককালে যে কয়েকজন কবি আপন বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন আলোক সরকার তাঁদের একজন। কবিতার ধর্ম ও চারিত্র্যকে আজ নতুনভাবে বিচার করবার চেষ্টা চলছে এবং প্রচলিত কাব্যরীতির সঙ্গে আধুনিককালের কাব্যরীতির তফাতটাও দিন দিন দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ নিচ্ছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, কবিতার জন্য প্রেরণা ও কল্পনায় বিশ্বাসী হয়েও আজকাল অনেকেই শুধুমাত্র প্রেরণা আর কল্পনায় খুশি নয়, চিন্তা ও বুদ্ধিকেও একসঙ্গে সমমর্যাদা দিয়ে কাব্যরূপ সৃষ্টির প্রতি তাঁরা মনোযোগ দিয়েছেন। ফলে, তাঁদের অনেকের কবিতাই প্রচলিত ব্যাখ্যায় জাতিচ্যুত বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু সক্ষম কবির হাতে কবিতার এই নতুন রূপটিও যে সার্থক হয়ে ওঠে আলোক সরকারের আলোকিত সমন্বয় থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আলোক সরকার অত্যন্ত সংযমী কবি। তাঁর কবিচরিত্রের পক্ষে এ সংযম স্বাভাবিক। তথাপি বারবার এ-কথা পাঠকের মনে হতে পারে যে, চিন্তা ও বুদ্ধিকে যথার্থ মর্যাদা দিতে গিয়ে কখনও কখনও কবি তাঁর কাব্যধর্মকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। আশা করা যায় প্রতিশ্রুতিবান কবি তাঁর কাব্যরীতিতে সামগ্রিক ভারসাম্য খুঁজে পাবেন। অন্ততঃ আলোক সরকার সম্বন্ধে, সহজেই এ আশ্বাস রাখা চলে। ৫০৯।৫৮

বাংলার মনীষী ও সংস্কৃতি

বঙ্গ-প্রসঙ্গ—শ্রীসুশীল রায় কর্তৃক সম্পাদিত; প্রকাশ—পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭; মূল্য—৫ টাকা।

স্মরণীয়—শ্রীসুশীল রায়; প্রকাশ—ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২; মূল্য—৮ টাকা।

এই সচেতনতা আজ আমাদের মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, আমাদের এই বিংশশতকের অনেক প্রেরণার উৎসমূল রহিল ঊনবিংশশতকের ধ্যান-ধারণা-মননে। ঊনবিংশ

শতকের আমাদের জাতীয় জীবনের নবজাগরণকে আজ আমরা তাই খুব বড় করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি, এবং নানাদিক হইতে তাহাকে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি। এই বুঝিবার চেষ্টায় ঊনবিংশ শতাব্দী সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল ও শ্রদ্ধা ক্রমে বাড়িয়াই যাইতেছে।

ঊনবিংশশতকের বাঙ্গালী মনীষা আমাদের ধর্ম সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি প্রত্যেক ক্ষেত্রে কি নূতন দৃষ্টি ও চিন্তা আনায়ন করিয়াছিল মোটামুটিভাবে তাহার একটি সামগ্রিক পরিচয় জানিতে হইলে রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশশতকের শেষ-পাদের মনীষিগণের চিন্তাধারার সহিত অল্প-বিস্তর পরিচয় লাভ প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইয়াই শ্রীসুশীল রায় মহাশয় বর্তমান সঙ্কলন গ্রন্থখানি সুসম্পাদিত-ভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। এই সঙ্কলনে রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া বিনয়কুমার সরকার পর্যন্ত পঁয়ত্রিশজন মনীষীর লেখা নির্বাচিত হইয়াছে। নির্বাচন ব্যাপারে সম্পাদক মহাশয়ের এই একটি বিশেষ লক্ষ্য ছিল, যাহাতে লেখাগুলির ভিতর দিয়া আমাদের বাঙ্গালী জীবনের সামগ্রিক পরিচয়টি ফুটিয়া ওঠে। তাই রামমোহনের 'আদিবঙ্গ' লেখার পরেই রাসসুন্দরী দেবীর "সেকালের গৃহ-বধূ"র রেখাচিত্রটি পাইয়া মন খুশী হইয়া ওঠে, সেকালের সেই গৃহবধূটির চিত্রের মধ্যেও ত আমাদের সমাজজীবনের একটি রমনীয় পরিচয় রহিয়াছে। লেখাগুলির মধ্যে যেমন বাঙ্গলার ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা রহিয়াছে, তেমনই আবার বাঙ্গলার ভূগোল, বাঙ্গলার ইতিহাস, বাঙ্গলার গৌরব, বাঙ্গলার দুর্বলতা, বাঙ্গলার শিল্প, লিপি, বর্ণমালা—সব বিষয়েই কিছু না কিছু আলোচনা রহিয়াছে।

এ-জাতীয় একটি সঙ্কলন গ্রন্থের কথা পূর্বে খেয়াল হয় নাই; কিন্তু এখন পড়িয়া মনে হইতেছে, ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ঊনবিংশশতক সম্বন্ধে আজকাল নানাদিক হইতে বহুগ্রন্থ লিখিত হইতেছে; কিন্তু তাহার ভিতরেও এই গ্রন্থখানির সার্থকতা এইজন্য যে ইহার ভিতর দিয়া আমাদের পূর্ববর্তী একশত বৎসরের বাঙ্গলাদেশের যে পরিচয় পাইতেছি, তাহা সেইযুগের মনীষীদের লেখার ভিতর দিয়াই পাইতেছি। তাঁহাদের নিকট হইতে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের যুগের কথা শুনিবার একটা নিজস্ব আকর্ষণ অবশ্যই আছে। একথা সত্য যে তাঁহারা আমাদের ভূগোল, ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সকল তথ্য দিয়াছেন বা যে-সব আলোচনা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অনেক নূতন এবং বেশি নির্ভর-যোগ্য তথ্য এবং সেই তথ্যের আলোকে আরও কিছু কিছু স্পষ্ট দৃষ্টি হয়ত আমরা লাভ করিয়াছি; কিন্তু সে সকল ক্ষেত্রেও আমাদের পূর্বগামিগণ এ-সব ক্ষেত্রে কি কথা ভাবিতেন, কি করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতেন এবং সমগ্র জাতির পরিচয় প্রকাশের জন্য সেই তথ্যকে কি-ভাবে ব্যবহার করিতেন, সেই বিষয়ে আমাদের সশ্রদ্ধ কৌতূহল অতি স্বাভাবিক এবং শুভ। একটি সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে এইরূপে শ্রদ্ধেয় পূর্বগামী মনীষিগণের চিন্তাধারার সহিত আমাদিগকে পরিচিত হইবার সুযোগ দিয়া শ্রী রায় আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানি 'স্মরণী'য়ের বৈশিষ্ট্য আবার অন্যদিকে; সে বৈশিষ্ট্যের কথা যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ই সংক্ষেপে ভাল করিয়া বলিয়াছেন,—"জীবিত মানুষের জীবনী লিখিয়া আপনি বাংলা সাহিত্যে নূতন দিক আবিষ্কার করিলেন।" বস্তুত মানুষ মরিয়া না যাওয়া পর্যন্ত তাঁহার জীবনী লিখিবার প্রথা আমাদের মধ্যে তেমন সুপ্রচলিত নয়; আজকাল অবশ্য কিছু কিছু হইতেছে; অনেকে নিজের কথা নিজেও স্মৃতিরূপে লিখিয়া প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের যুগে জীবনের বিভিন্ন দিকে যাঁহারা সত্যই বরণীয় হইয়া উঠিতেছেন, তাঁহাদের মনীষার উজ্জ্বল দিকটি সম্বন্ধে আমরা হয়ত কিছু কিছু জানি; কিন্তু এই প্রতিভার উজ্জ্বল দিকটার পিছনকার ব্যক্তিজীবনটি সম্বন্ধেও আমাদের যথেষ্ট কৌতূহল এবং আকর্ষণ রহিয়াছে। সেই ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সংক্ষেপে একটা পরিচয় করাইয়া দিবার চেষ্টাই করিয়াছেন লেখক এই 'স্মরণীয়' গ্রন্থের মধ্যে। আমাদের যুগের তেত্রিশজন মনীষীর ব্যক্তি-জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাইতেছি এই গ্রন্থে। এই মনীষী নির্বাচনেও লেখকের কোনও পক্ষপাতিত্ব নাই; জীবনে যে-ক্ষেত্রে যিনি বড় হইয়াছেন, তাঁহাকেই লেখক তাঁহার তালিকাভুক্ত করিয়া-ছেন; সুতরাং এই মনীষিগণের মধ্যে দার্শনিক আছেন, ঐতিহাসিক আছেন, বৈজ্ঞানিক আছেন, সাহিত্যিক এবং ভাষাতাত্ত্বিক আছেন, আবার চিকিৎসক, শিক্ষক, সংগীতজ্ঞ, শিল্পী—সবাই আছেন।

এখানে যে সংক্ষিপ্ত জীবনীগুলি পাইতেছি তাহার খুব বড় একটা আকর্ষণ হইল, জীবনীর অন্তত খানিকটা মানুষটির নিজের কথাতেই পাইতেছি। লেখক তথ্য-সংগ্রহ যাহা করিয়াছেন, তাহাও যতটা পারেন মানুষটির নিজের কাছ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। এই উদ্দেশে তিনি শুধু বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়া নয় —বাঙ্গলার বাহিরেও বহুস্থানে গিয়া এই সকল মনীষিবৃন্দের সহিত দেখা করিয়াছেন এবং যতটা পারেন তাঁহাদের নিজেদের মুখের কথায়ই তাঁহাদের ব্যক্তি-পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি রচনার পশ্চাতে একদিকে যেমন আছে মহত্তের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, অন্যদিকে আছে অনুসন্ধিৎসার সততা এবং শ্রমস্বীকারের অকুণ্ঠা। গ্রন্থোল্লিখিত অনেক মানুষই আমাদের পরিচিত মানুষ, পরি-চিতের সঙ্গে আরও পরিচয় আমাদিগকে যথার্থই আনন্দ দিয়াছে। গ্রন্থে উল্লিখিত প্রত্যেক মনীষীর হস্তাক্ষরযুক্ত আলোকচিত্র গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব এবং আকর্ষণ অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে। ১৬, ১৭।৫৯

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্ত-গত হইয়াছেঃ—

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের স্বনির্বাচিত কবিতা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

ঝাঁপতাল—লীলা মজুমদার।

মহাভারতে অনুশীলন তত্ত্ব—শ্রীসত্যকিংকর সাহানা।

পাথেয় সন্ধানে—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশারী।

কয়লা কুঠির দেশে—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

Nandalal Bose and Indian Painting—Raymansur Sekhar Das.

Paramahansa Yogananda In Memoriam.

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায়।

ওল্ড কিউরিয়োসিটি শপ—চার্লস ডিকেন্স অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়।

বন্ধনহীন গ্রন্থি—বাসবী বসু।

ছবি ও ছড়ায় ভূগোল—১ম ভাগ—হাসি দাশগুপ্ত।

দীপ অনির্বাণ—হাসি দাশগুপ্ত।

অচিনতলা—মুকুল সেনগুপ্ত।

জীবন সম্পর্কিত—শুদ্ধসত্ত্ব বসু।

ভ্রম সংশোধন

এই সংখ্যার ৮৩১ পৃষ্ঠায় "চিতোরগড়" প্রবন্ধের লেখকের নাম মুদ্রাকর প্রমাদবশত তরুণবিকাশ লাহিড়ীর পরিবর্তে অরুণবিকাশ লাহিড়ী ছাপা হইয়াছে।

সম্পাদক, দেশ

অভয়ংকরনগরে কংগ্রেস সভাপতি মহাশয়কে ৬৪টি বলদবাহিত রথের শোভাযাত্রা করিয়া স্বাগতম জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"বলদের ভাগ্য ভালো যে, অন্তত দু'বার তার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে, শোভাযাত্রায় আর নির্বাচনে। বাকী সময় তো যে জাবর কাটা, সেই জাবর কাটা" !!

• • •

শ্রীনেহরু মন্তব্য করিয়াছেন—আমাদের হইল চল্লিশ কোটি লোকের একটি পরিবার। শ্যামলাল বলিল—"মাগ্গিগণ্ডার বাজারে চল্লিশ কোটির পরিবার বলেই তো দু' বেলা ঠিকমতো পাত পড়ে না" !!

• • •

অভয়ংকরনগরের সংবাদে শুনিলাম, এখন হইতে সংসদের সদস্যগণকে বৎসরে তিন চারবার নির্দিষ্ট সময়ে পর পর পদ-

যাত্রায় বাহির হইতে হইবে।—"কিন্তু যাঁরা পাদমেকং ন গচ্ছামি ব'সে পায়ে বাতারি তেল মালিশ করছেন তাঁদের অবস্থা সত্যিই কাহিল"—মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

ট্রামে-বাসে

এবার কংগ্রেসে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন মহিলা এবং ইনিই অভ্যর্থনা সমিতির প্রথম মহিলা সভাপতি। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"নূতন নূতন ক্ষেত্রে মহিলাদের নূতন নূতন আসন লাভ আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে—পুরনো ট্রাম-বাসের আসনটিতে তাঁদের সর্বাধিকার বরদাস্ত করতে পারিনে।"

• • •

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন বলিয়াছেন যে, রাজ্য সরকার খাদ্য-শস্যের ব্যবসার ভার হাতে লইবেন, ধীরে হইলেও সুনিশ্চিত পদক্ষেপে সরকার সেই লক্ষ্যের দিকেই অগ্রসর হইতেছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তা একটু ধীরে যাওয়াই ভালো। চোরাবালির না হোক, কাঁকরবালির পথ তো, পরিষ্কার ক'রে নিতে একটু দেরি হবে বৈকি" !

• • •

আটিস্ট্রি হাউসে" শাড়ি প্রদর্শনী চলিতেছে। শ্যামলাল বলিল—"সত্যি কথা বলতে—সাধারণ মানুষের টান কিন্তু টেনা-প্রদর্শনীতে" !!

• • •

শ্রীনেহেরু বলিয়াছেন—কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের বেতন সমান সমান হওয়া উচিত। —"তিনি যদি আশ্বাস দেন—ছোট-বড় ভেদ নাই, সকলি সমান, আমরাও তাহলে সবাই মিলে বলে দেবো—লংকা জিনিল বেটা বীর হনুমান"—গল্প স্মরণ করাইয়া দিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

বৃটেনের জনৈক বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদ-দাতা লিখিয়াছেন যে, পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগের সামরিক ঘাটিরূপে চন্দ্রলোক ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।—"পৃথিবী আগেই চন্দ্রাহত হয়েছে, এবারে বুঝি চাঁদমারীর পালা শুরু হলো"—বলেন বিশুখুড়ো।

• • •

এক সংবাদে শুনিলাম, মার্কিন ক্ষেপণাস্ত্র "থর" এখন রণক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু যাঁদের জন্য "থর" তাঁরা নিশ্চয়ই থরহরি কম্প হবেন না, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে হয়ত বলবেন—সেই থোড় বড়ি খাড়া"।

• • •

ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলার পর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিনড্ ইংলণ্ডের অধিনায়ক মে-র প্রশংসা করিয়াছেন এবং মে-ও করিয়াছেন বিনডের
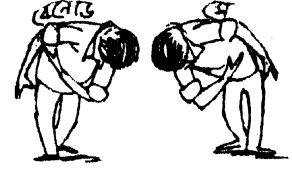
প্রশংসা।—"দুহুঁ জন দুহুঁ গুণ গাও, আর এই গুণকীর্তন খেলার শেষেই জমে ভালো।" —বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

ভারতের ক্রিকেট অধিনায়ক গোলাম আহাম্মদ পদত্যাগ করিয়াছেন। এই প্রসংগে তিনি বলিয়াছেন যে, বর্তমানে
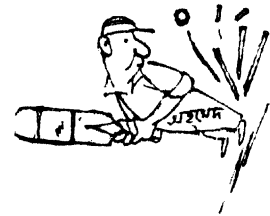
তরুণ খেলোয়াড়দের চান্স দেওয়া উচিত। শ্যামলাল বলিল—"স্ট্রেট্ বলে লেট্ কাট্ হয়ে গেল, গোলাম" !!

• • •

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ খেলার পর আমেদাবাদ হইতে জনৈক ক্রীড়ারসিক ক্রিকেট বোর্ডের সদস্যাদিগকে পেটিকোট, চুড়ি ও নানাবিধ প্রসাধন উপহার পাঠাইয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এই নিয়ে সবাই খুব হাসাহাসি করেছেন, কিন্তু আমরা করিনি। তার কারণ, অসামর্থ্যের জন্য পরোক্ষ হলেও লেডীস্‌দের প্রতি ইংগিত আমরা সমর্থন করিনে। দ্বিতীয় কারণ হলো, বোর্ডকে লেডীস্ পর্যায়ে ফেলে রসিকতা হয়ত খানিকটা করা গেল কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবেছেন কি,—সেই চিরাচরিত নিয়ম লেডীস্ ফার্স্ট থেকে গেল, ট্রামে-বাসের সীট ছাড়তে হলো এবং হয়ত বা দেহিপদপল্লবমুদারমও করতে হবে; বোর্ড কি তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন" !!!

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

শিশু রংমহলের উৎসব

২০শে ডিসেম্বর থেকে এক পক্ষকাল শিশু রংমহলের রঙের আসর চলল কলকাতায়। এটি এদের সপ্তম বার্ষিক উৎসব। ভারতবর্ষে শিশুরংমহলের গঠনমূলক কাজ আশ্চর্যভাবে এগিয়ে চলেছে। দিল্লী ও বোম্বাই শহরে এদের সেণ্টার কি করছে তা আমরা জানি না, কিন্তু চৌরঙ্গীর রঙীন দেয়ালের আড়ালে যে রূপ, ছন্দ ও সুরের আসর হয়ে গেল তার তুলনা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ষোল দিন ধরে বহু হাজার ছেলে-মেয়ে ও তাদের মা-বাবার ভিড়ে জমজমাট প্রেক্ষাগৃহে তিল ধরাবার জায়গা ছিল না, অথচ অভিনয়কালে একটি শব্দ কোথাও শোনা যায়নি।

এবারকার আসরে প্রায় তিরিশটি স্কুল অংশ নিয়েছিল। তা ছাড়া ছিল উড়িষ্যার শিশুমহল ও বিদেশ থেকে আগত চেক পুতুল নাচিয়েরা। শিশুরংমহলের আসরে যোধপুরী পুতুল নাচিয়েও এসেছিল। চেক দল কলকাতার নাগরিক ও শিশুদের মাতিয়ে দিয়েছে নতুন ধরনের পুতুল নাচ দেখিয়ে। আবহসংগীত, পুতুল-দের অংগভংগী, নাচিয়েদের কথা সব মিশিয়ে এক অপরূপ সৃষ্টি এই বিদেশী পুতুল নাচ। যোধপুরীদের কৃতিত্ব তাদের একক হাতের অদ্ভুত কলাকৌশলে, আর চেকদের কৃতিত্ব তাদের দলগত কর্ম-পদ্ধতিতে। আলোকসজ্জা, নেপথ্য সংলাপ ও পুতুলদের অংগভংগীর অসাধারণ Synchronization যদি আমরা আমাদের দেশের পুতুল নাচের প্রস্তুতিতে এনে দিই, তা হলে এদেশের কলাকারেরাও অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাতে পারবে আমাদের বিশ্বাস। শিশুরংমহলে CLT Puppet Club গঠনের কথা শুনে ভরসা হয় যে, পুতুল নাচের নতুন সাড়া দেখতে পাওয়া যাবে।

অভিনয় ও নাচের দিক থেকে শিশু-রংমহলে "অবনপটীয়া", "পাগলী" ও "সাত ভাই চম্পার" পুনরাবৃত্তি হয়েছে। "অবনপটীয়া" সত্যিই দেখবার মত সৃষ্টি। "সাত ভাই চম্পা" ছন্দচাতুর্যে অনুপম। কথা সুর ও ছন্দের অপরূপ মিশ্রণে "সাত ভাই চম্পা" ছোট-বড়দের ৭০ মিনিট মাতিয়ে রেখেছিল। দৃশ্যপট, পোশাক-পরিচ্ছদে শিশুরংমহলের কলাবিন্যাস পরিস্ফুট। "পাগলী" তেমন জমেনি। মনে হল, যথেষ্ট মহড়া হয়নি।

শিশুরংমহলের এ বছরের নতুন সৃষ্টি "হুসেনে বুড়ি জোনপরী", "ক্ষুদে ভূতের খেলা" (Elves at Play) ও "যাদুর দেশ" (Wizard of Oz)। তিনটি অভিনয়ই আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল। সুরের বৈচিত্র্য, অভিনয়ের চমৎকারিত্বে, পরি-কল্পনার মৌলিকতায়, দৃশ্যপট সজ্জার সৌন্দর্যে যেন এক নতুন জগতে নিয়ে গিয়েছিল দর্শকদের। গানের সুরের মাঝে কোথাও কোথাও ফিল্মের ছাপ এসে পড়ে-ছিল। সেটা বর্জন করতে পারলে ভাল হত। সব মিলিয়ে অবশ্য আনন্দ পরি-বেশনে কোথাও খুঁত ছিল না।

ছড়ার আসরে এবার অনেক নতুন ছড়া শোনা গেল। স্কুলঘরের উপযোগী ছড়া

হেমন্ত-বেলা প্রোডাকসন্সের "নীল আকাশের নীচে"র একটি বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ চরিত্রে স্মৃতি বিশ্বাস

সৃষ্টি শিশুরংমহলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে চমৎকার হয়েছে এবারকার প্রচেষ্টা। স্কুলগুলির অভিনয়ের ক্রমোন্নতি ও উৎকর্ষ শিশুরংমহলের প্রয়োজনীয়তার বিশেষ প্রমাণ।

আলোকসজ্জা তাপস সেনের হাতে যাদুর কাজ করেছে। আর যাঁরা পাঁচ শত শিশুর পোশাক পরিচ্ছদ পরিকল্পনা করেছেন তাঁদের ধৈর্য ও অন্তর্দৃষ্টির বাহবা দিই।

শিশুরংমহলের প্রধান সম্পদ তার মিউজিক। সুর ও গানের মায়ায় তাঁরা তাঁদের সুনাম অব্যাহত রেখেছেন। সারা-বছরের কাজের হিসাব নিকাশ করার শেষে তাদের জমার খাতায় অনেক মধু মজুত রইল। বাংলা দেশের শিশুদের জীবন আনন্দমুখর করার কাজে এদের গতি অব্যাহত হোক।

বিশ্বরূপায় শিশু-নাট্য শাখা

গত রবিবার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বিশ্বরূপায় নিয়মিত

শিশু-নাট্য শাখার উদ্বোধন করেন। শুধু শিশুদের জন্য এইরূপ নাট্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ভারতবর্ষে এই প্রথম। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন।

বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চের নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনার বহুমুখী কার্যধারার মধ্যে শিশু-নাট্য শাখা অন্যতম। শাখার উদ্বোধনের দিন শিশুশিল্পীরা শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি) রচিত "মায়াময়ূর" মায়া-নাটিকা তাঁরই পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেন। ষাট জনেরও অধিক শিশু শিল্পী এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে ভাষণদানকালে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বলেন, শিশুনাট্য শাখার মাধ্যমে শিশুরা শুধু অনাবিল আনন্দই নয়, তাদের মন ও দেহের উৎকর্ষ সাধনেরও সুযোগ লাভ করবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই শাখা দিনের পর দিন জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন, অন্যান্য দেশে আমোদ-প্রমোদের ভেতর দিয়ে শিশুদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা আছে। শিশুদের উন্নতিবিধানে বিশ্বরূপার এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি অবশেষে শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেন, তারা যেন সত্যিকারের শিল্পী হয়ে উঠতে পারে এবং জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে।

বিশ্বরূপার শিশুনাট্য শাখার পরিচালক শ্রীবিমল ঘোষ (মৌমাছি) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিবর্গকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, শিশুকল্যাণের জন্য এই সাংস্কৃতিক শাখার উদ্বোধন। এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলবার জন্য তিনি সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। অবশেষে তিনি ঘোষণা করেন যে, নাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের পারিশ্রমিক, বিনা খরচায় চিকিৎসার সুবিধা, বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ দেওয়া হবে।

বিশ্বরূপার কর্ণধার শ্রীরাসবিহারী সরকার উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

"মায়াময়ূর" প্রতি রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন অভিনীত হবে।

কাঁচা ফিল্ম সমস্যা

কাঁচা ফিল্ম বণ্টন সম্পর্কে সর্বশেষ সরকারী নীতি নিয়ে উদ্ভূত সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আহ্বানে বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজের চিত্রপ্রযোজকেরা সম্প্রতি কলকাতায় এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। কাঁচা ফিল্ম আমদানীর পূর্বতন হ্রাসের ৩০ ভাগ পুনরায় প্রবর্তন করা সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত নিয়ে বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রযোজকমহলে অসন্তোষের উদ্ভব হয় এবং ভারতের তিনটি প্রধান রাজ্যের চিত্রপ্রযোজকদের মধ্যে মত-

শিশু রংমহলের "অবন পটুয়া" যেন পুরোন হবার নয়। এই শিশু-শিল্পীরা এ বছরে নৃত্য-নাটিকাটিকে নতুনভাবে রূপে-রঙে সঞ্জীবিত করে তোলে।

ভেদের সৃষ্টি হয়। সংশ্লিষ্ট এই তিনটি রাজ্যের প্রযোজকদের মধ্যে এই বিষয়ে ঐক্য স্থাপনের জন্য মেহবুব খান, বি রেড্ডী, এম বি বিলিমোরিয়া ও মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে এবং ফিল্ম ফেডারেশনের সভাপতি এম বি বিলিমোরিয়ার সভাপতিত্বে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রযোজকবৃন্দ কলকাতায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে কাঁচা ফিল্মের পূর্বতন হ্রাসের ৫০ ভাগ পুনর্বহাল করা হলেও তা চলচ্চিত্রশিল্পের নিম্নতম চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয় এবং কাঁচা ফিল্ম-এর অপচয় ও অবৈধ সঞ্চয় বন্ধ করার জন্য এর নিয়মিত বণ্টনের সুব্যবস্থা আশু গ্রহণ করা কর্তব্য। এই সিদ্ধান্তের স্মারকলিপি যথাবিধি আমদানী বিভাগের প্রধান অধিকর্তার নিকট পেশ করা হয়।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহের মুক্তি-তালিকায় মাত্র একখানি নতুন হিন্দী ছবি—মুভী স্টারসের "আখরী দাঁও"। দর্শকদের হাসির খোরাক জোগানই এ ছবির প্রধান উদ্দেশ্য। নূতন, শেখর, মিনু মমতাজ, শোভা খোটে, জীবন, জনি ওয়াকার প্রভৃতি জনপ্রিয় শিল্পীদের সক্রিয় সহযোগিতায় এ কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছেন পরিচালক মহেশ কাউল। সুর জুগিয়েছেন মদন মোহন।

• • •

যে সব বাংলা ছবি আশু মুক্তির প্রতীক্ষা করছে তাদের মধ্যে রয়েছে "বিচারক", "মরুতীর্থ হিংলাজ", "ঠাকুর হরিদাস", "বিভ্রান্ত" ও "নীল আকাশের নীচে"।

প্রভাত প্রোডাকশন্সের "বিচারক" নানা কারণে চিত্ররসিকদের আগ্রহকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাংলার সব চেয়ে জনপ্রিয় নায়ক-অভিনেতা উত্তমকুমারকে সবাই যে ধরনের ভূমিকায় দেখতে অভ্যস্ত, তার চেয়ে ভিন্নতর ভূমিকায় তিনি এই ছবিতে দর্শকদের অভিবাদন করবেন। এর দুটি প্রধান স্ত্রীচরিত্রে অভিনয় করেছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও দীপ্তি রায়। তারাশংকরের মূল কাহিনী একদিকে যেমন ছবির আকর্ষণ বাড়িয়েছে, অন্যদিকে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর সুরযোজনায় সমৃদ্ধ এই প্রথম চলচ্চিত্রের রসগ্রহণ করতে দর্শকদের তেমনি আগ্রহ। প্রভাত মুখোপাধ্যায় ছবিখানির প্রযোজক ও পরিচালক।

অবধূতের "মরুতীর্থ হিংলাজ" গ্রন্থাকারে পাঠক সমাজে যে আলোড়ন এনেছিল, বিকাশ রায় প্রোডাকসন্স কৃত তার চিত্ররূপও সে বিষয়ে কম যাবে না—একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। মরুযাত্রী দুই প্রণয়ীর ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে এতে দেখা যাবে। বিকাশ রায় স্বয়ং নিয়েছেন গ্রন্থকর্তার ভূমিকা। ছবির পরিচালকও তিনি। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন চন্দ্রাবতী, পাহাড়ী সান্যাল, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি। হেমন্তকুমার এই ছবিতে সুরারোপ করেছেন। ছবিটি তুলেছেন বিকাশ রায় প্রোডাকশন্স।

রূপজ্যোতির "ঠাকুর হরিদাস" এক ভক্তের জীবনীকে রূপ দেবে ছবির পর্দায়। নাম-ভূমিকায় নির্মলকুমার অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বলে শোনা যাচ্ছে। চৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্রে রূপ দিয়েছেন নবাগত মলয়কুমার। সুমিত্রা দেবী, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, তপতী ঘোষ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শিশু শিল্পীদ্বয় বাবুয়া ও তিলক এর অন্যান্য চরিত্রে

প্রভাত প্রোডাকসন্সের "বিচারক"-এর ছবি তুলতে এই দলটি আসামে যান। গৌরীপুর রাজপ্রাসাদের সামনে এই দলটির মধ্য থেকে ছবির নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়কে বেছে বার করা শক্ত নয়। প্রযোজক-পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে টুপি-মাথায় দেখা যাচ্ছে। পিছনের বাড়ীটি স্বর্গত প্রমথেশ বড়ুয়ার পৈত্রিক আবাস।

চিত্রাবতরণ করেছেন। অনিল বাগচীর সুরযোজনায় এবং গোবিন্দ রায়ের পরিচালনায় ছবিখানি ভক্তিপিপাসু চিত্ররসিকদের খুশী করতে পারবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের বিশ্বাস।

• • • •

সম্প্রতি শিয়ালদহ স্টেশনে সত্যজিৎ রায়ের নতুন ছবি "অপুর সংসার"-এর কয়েকটি বিশেষ দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হয়েছে। সারারাত্রি ধরে শুটিং চলে। এই স্টেশনেই অপুর সঙ্গে তার স্ত্রী অপর্ণার শেষ ছাড়াছাড়ি। অপুর জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এটি। সব দিক দিয়ে এই অংশটি যাতে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে সে বিষয়ে ব্যবস্থার কোন ত্রুটি রাখা হয়নি। রেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় স্টেশন প্রাঙ্গণটি গভীর রাত্রেও কর্মচঞ্চল ও জনমুখর হয়ে উঠেছিল। ছবির অবশিষ্ট বহির্দৃশ্য গ্রহণ করতে প্রযোজক-পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁর দলবল নিয়ে আবার কলকাতার বাইরে গেছেন। ছবিখানি আসছে মাসের মধ্যে মুক্তিযোগ্য হয়ে উঠবে।

* * *

বীরভূমের পার্বত্য অঞ্চল পাঁচরাতে বহির্দৃশ্য তুলে পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় কলকাতায় ফিরে এসেছেন। সানরাইজ ফিল্মসের পতাকাতলে বনফুলের "কিছুক্ষণ" গল্পটির যে চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে, তার অধিকাংশই এমনিধারা বাইরে তোলা হবে। অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও অসীমকুমারকে এই ছবিতে নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে। একটি স্টেশনে আকস্মিকভাবে একখানি যাত্রীপূর্ণ ট্রেন কিছুক্ষণের জন্যে আটকে থাকে। ফলে যে নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাই নিয়ে এর কাহিনী।

কানু প্রেম কথা

এমন কতকগুলি কাহিনী আছে যার আবেদন চিরন্তন। রাধাকৃষ্ণের ব্রজমাধুরী-লীলা এমনি এক কাহিনী যা যুগে যুগে রসিক চিত্তকে আপ্লুত করেছে চিরন্তন মাধুর্যের ধারায়। প্রোডাকসন সিণ্ডিকেটের নবতম নিবেদন "নৌকা বিলাস" এই ব্রজলীলার অন্তর্গত একটি সুপরিচিত অধ্যায়কে নতুন করে রূপে-রসে-রঙে সঞ্জীবিত করে তুলেছে ছবির পর্দায়।

গল্প শুরু হয়েছে এই মাটির পৃথিবীর ঊর্ধ্বে এক রসধামে যেখানে রাধাকৃষ্ণ নিত্য অবিচ্ছেদ বিরাজ করেন। কৃষ্ণ লীলাময়, তাঁরই লীলায় শ্রীরাধা একদা বিরজা-কুঞ্জে প্রবেশাধিকার না পেয়ে দ্বাররক্ষী শ্রীদামকে অভিশাপ দিলেন, মর্তে কৃষ্ণদ্বেষী দৈত্যকুলে সে জন্মাবে। আর যে বিরজার জন্যে তাঁর লাঞ্ছনা, তার ওপর আদেশ হ'ল মর্তে নদীরূপ ধরে জলময় দেহে সে থাকবে। শ্রীদামও ছাড়বার পাত্র নয়। সে বল্লে, যদি আমার কৃষ্ণপ্রেম সত্য হয়, তাহলে তোমাকেও মর্তে একশো বছর ধরে কৃষ্ণবিরহে কাঁদতে হবে।

এই হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের ব্রজলীলার পটভূমিকা।

শ্রীরাধার অভিশাপে ভয় পেয়ে বিরজা শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হল। বল্লে: প্রভু, আমার অনেকদিনের সাধ একান্তভাবে রাধাকৃষ্ণের বিলাস-লীলা দেখব। তাই তোমাকে আহ্বান করেছিলুম আমার কুঞ্জে। কিন্তু এ কী হল?

শ্রীকৃষ্ণ বিরজাকে আশ্বাস দিলেন: কোন ভয় নেই, সখি। শ্রীমতীর অভিশাপে মর্তে তুমি হবে নদী যমুনা—আমি তোমারই তীরে তীরে করব আনন্দলীলা। আর তোমারই জলময় বক্ষে শ্রীমতীকে

নিয়ে নৌকা বিলাস করে তোমার মনোসাধ পূর্ণ করব।

নৌকা বিলাস কাহিনীর সূত্রপাত এইখানে। তারপর বৃন্দাবনের গোঠে মাঠে বাটে গোপ-গোপিনীর সাহচর্যে মিলন-বিরহের টানা-পোড়েন শুরু হয় দুই চির-প্রণয়ীর মধ্যে। বুড়ীমাই বেশিনী যোগমায়া নৌকাবক্ষে এ'দের মিলনের পথ প্রশস্ত করে দেন মথুরার হাটে রাধিকাকে নিয়ে যাবার ছলে। যুগল মিলনে কাহিনীর পরি-সমাপ্তি।

সুষ্ঠু পরিবেশের মধ্যে এবং যথোচিত শ্রদ্ধা সহকারে কাহিনীটি পরিবেশন করেছেন প্রযোজক-পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায়। অতিপরিচিত গল্পও পরিবেশনের গুণে নতুন করে সাড়া জাগিয়েছে দর্শকদের মনে। ছবির দৃশ্য-সজ্জা চমৎকার। ফটোগ্রাফি ও আঙ্গিকের অন্যান্য বিভাগে নিষ্ঠা ও যত্নের অসদ্ভাব ঘটেনি। যমুনাবক্ষে নৌকা বিলাসের দৃশ্যগুলি গেভাকলারে গৃহীত হওয়ায় ছবির বাহ্যিক সৌন্দর্য অনেকাংশে বেড়েছে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় রচিত চিত্রনাট্যে পরিণত হাতের ছাপ সুস্পষ্ট। তবে

উত্তমকুমারকে একটি নতুন ধরনের চরিত্রে দেখা যাবে "খেলাঘর" ছবিতে। ছবিটি সমাপ্তপ্রায়।

নৌকা বিলাস অধ্যায়ের বিস্তার হয় যে কথাকাটাকাটির মধ্যে এ ছবিতে তাকে নির্দয়ভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। হয়তো পূর্ববর্তী কোন ছবির পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে তার জন্যেই এই চেষ্টাকৃত সতর্কতা। কিন্তু এতে রস ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং যাঁরা নৌকা বিলাস পালা গানের সঙ্গে পরিচিত তাঁদের কিছুটা আশা ভঙ্গ হয়েছে।

গান এ ছবির অন্যতম সম্পদ। সবশুদ্ধ ছাব্বিশখানি গান ও স্তোত্র এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। এবং সেগুলি গেয়েছেন ধনঞ্জয়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র, ডাঃ গোবিন্দগোপাল, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধারাণী, মাধুরী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ প্রখ্যাত শিল্পীরা। সুরারোপে ও গান-গুলির সুষ্ঠু প্রয়োগে সংগীত পরিচালক পবিত্র চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাধিকামোহন মৈত্রের স্বরোদ বাজনা আবহ সংগীতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

"নৌকা বিলাসে"র অভিনয়াংশ দুর্বল। কৃষ্ণ ও রাধার ভূমিকায় যাঁরা অভিনয়

সানরাইজ ফিল্মসের "কিছুক্ষণ"-এর একটি বহির্দৃশ্যে অসীমকুমার ও গঙ্গাপদ বসু।

করেছেন—মিহির মুখোপাধ্যায় ও অনুরাধা গুহ, তাঁরা দুজনেই চিত্রজগতে নবাগত। চেহারার দিক দিয়ে তাঁদের সুন্দর মানালেও তাঁদের অভিব্যক্তি বা অভিনয় মনে ছাপ রাখে না। বৃন্দের ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় বা সুবলের ভূমিকায় অনুপকুমার অনুরূপ নিষ্ফল হয়েছেন সুযোগের অভাবে। জটিলাবেশিনী নিভাননীর অভিনয় অন্যান্যদের সঙ্গে তুলনায় উল্লেখযোগ্য। পূর্ণিমার কুটিলা যথাযথ। বুড়ীমাইরূপে পদ্মা দেবীকে মাত্র তিনটি সংক্ষিপ্ত দৃশ্যে দেখা যায়। তিনিও সুযোগের অভাবে উপেক্ষিত থেকে গেছেন।

"নৌকা বিলাসে"র আঙ্গিক সৌন্দর্য সাধনে যাঁরা কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ক্যামেরাম্যান দেওজীভাই, শব্দযন্ত্রী পরিতোষ বসু ও ভূপেন ঘোষ এবং শিল্প-নির্দেশক সত্যেন রায়চৌধুরীর নাম।

শচীন শঙ্কর সম্প্রদায়ের নৃত্যানুষ্ঠান

১৯৫৩ সালের ১৫ই আগস্ট বোম্বাইতে শচীনশঙ্কর ব্যালে ইউনিট স্থাপিত হয়। গত পাঁচ বৎসরে ইউনিটের প্রযোজনায় দুখানি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও কয়েকটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ব্যালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত হয়েছে। তাদের মধ্যে "ফিশারম্যান অ্যান্ড দি মারমেড" ও "রামায়ণ" জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছে।

স্বল্পমূল্যে শিক্ষামূলক এবং আনন্দদায়ক নৃত্যের মাধ্যমে শ্রমজীবিদেরও আনন্দদান ইউনিটের অন্যতম লক্ষ্য। ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই ব্যালে ইউনিট রাজস্থানের বিভিন্ন কমিউনিটি প্রোজেক্ট অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। ছাত্রসমাজ ও শিশুদের জন্যও ইউনিট কলকাতা, দিল্লী, বোম্বে, আমেদাবাদ, বরোদা ও সুরাটে কয়েকটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। সংগীত ও নাট্যকলার মাধ্যমে দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শচীন শঙ্কর পরিচালিত এই ইউনিটের অবদান অনস্বীকার্য।

এই ইউনিটের নবতম অবদান "সাঁঝ-সবেরা" বর্তমানে নিউ এম্পায়ারে প্রদর্শিত হচ্ছে। পরিকল্পনার বৈচিত্র্যে ও উপস্থাপনের উৎকর্ষে এই নৃত্যানুষ্ঠান রসিকজনকে আনন্দ দেবে।

দিল্লীতে বাঙলার লোকগীতি

দিল্লীর কনস্টিটিউশান হাউসের একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে সুখ্যাত পল্লীগীতিশিল্পী নির্মল চৌধুরী তাঁর দলবল নিয়ে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি দিল্লীতে যান। সেখানে অশোক হোটেলের কর্তৃপক্ষের আহ্বানে তিনি অনেক বিদেশী অতিথির সামনে বাংলার লোকগীতি পরিবেশন করেন। রাজধানীর এই অভিজাত হোটেলে বাংলা গানের আয়োজন এই প্রথম। এখানে কণ্ঠসংগীতের যে সমস্ত অনুষ্ঠান ইতিপূর্বে হয়ে গেছে তার মধ্যে বাংলা গানের এই অনুষ্ঠান সবচেয়ে মনোজ্ঞ বলে স্বীকৃতি পায়। ফলে আরো একদিন অশোক হোটেল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে নির্মল চৌধুরী সম্প্রদায় বাংলা পল্লীগীতি পরিবেশন করেন। বিদেশী অতিথিদের সুবিধার্থে গানগুলি ইংরেজীতে তর্জমা করে দেওয়া হয়। ফলে সুখ্যাতির মাত্রা বেড়ে যায়।

এরপর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর বাসভবনে শ্রীচৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায় বিশিষ্ট অতিথিদের সামনে বাংলা পল্লীগীতি শোনান। কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ গানগুলির তর্জমা করে শ্রোতাদের বোঝবার সহায়তা করেন। নির্দিষ্ট তিনখানি গান গাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী আরো শুনতে চান। তখন আরো দুখানি গান পরিবেশন করা হয়। শ্রীনেহরু শিল্পীদের অভিনন্দিত করেন এবং লোকগীতি প্রচারের জন্যে উৎসাহ দেন।

অতঃপর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে শ্রীচৌধুরী ও তাঁর সহশিল্পীবৃন্দ রাষ্ট্রপতি ভবনে ঘানার প্রধানমন্ত্রীর সামনে তাঁদের সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি অল ইন্ডিয়া রেডিও কর্তৃক আকাশবাণীতে প্রচারিত হয়। অনুষ্ঠান শেষে সম্মানিত অতিথি ঘানায় শ্রীচৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ জানান।

ভ্রম সংশোধন

গত সপ্তাহে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের যে ছবিটি এই বিভাগে প্রকাশিত হয়েছিল, তার পরিচয়-লিপিতে অনবধানতাবশত শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশের পরিবর্তে শ্রীনন্দগোপাল দাশের নাম ছাপা হয়েছে। এই ভুলের জন্যে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।
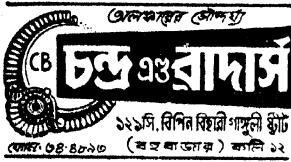
বিভাগীয় সম্পাদক।

কাইজার ফিল্মসের হিন্দী ছবি "আপনা ঘরে"র একটি ঘরোয়া দৃশ্যে মীত সাগর ও নন্দা। ছবিখানি মুক্তির প্রতীক্ষা করছে।

নতুন রেকর্ড

"এইচ এম ভি"

এন ৭৬০৭৪ঃ কিশোরকুমার ও রুমা দেবীর কণ্ঠে "লুকোচুরি" ফিল্মে গাওয়া রবীন্দ্র সংগীত "মায়াবনবিহারিণী হরিণী" এবং হেমন্তকুমার ও রুমা দেবীর কণ্ঠগীতি "তোমার গীতি জাগালো স্মৃতি"। এন ৭৬০৭৫।৭৬।৭৭ঃ রেকর্ডগুলিতে "ইন্দ্রাণী" বাণীচিত্রের পাঁচখানি গান পরিবেশন করেছেন গীতা দত্ত, মহম্মদ রফি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য শিল্পী। এন ৭৬০৭৮ রেকর্ডে সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "পুরীর মন্দির" বাণী চিত্রের "পতিত পাবন তুমি" ও "হে মাধব সুন্দর।"

কলাম্বিয়াঃ জি ই ২৪৯১৭ ও জি ই ২৪৯১৮ রেকর্ড দুটি পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীদের গাওয়া ধর্মমূলক গান। গেয়েছেন অমর পাল, শোভা রায়চৌধুরী, সুমিত্রা সেন ও বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিচলনায়—পঙ্কজ মল্লিক। জি ই ৩০৪০৬, ৩০৪০৭, ৩০৪০৮ রেকর্ড-গুলিতে "মরুতীর্থ হিংলাজ" বাণীচিত্রের গানগুলি "পথের ক্লান্তি ভুলে", "তোমার ভুবনে মাগো", "হে চন্দ্রচূড়" এবং "সর্বস্ব বুন্ধি রূপেন" গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। "তু নিশানে কে নিশা" গেয়েছেন শঙ্কর শম্ভু কাওয়াল প্রভৃতি এবং হারমোনিয়মে যন্ত্রগীতি বাজিয়েছেন মাস্টার সোনিক। জি ই ৩০৪০৯ ও ৩০৪১০ রেকর্ডে "যৌতুক" বাণীচিত্রের গানগুলি পরিবেশন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, লতা মঙ্গেশকর ও গীতা দত্ত। জি জি ৩০৪১১ রেকর্ডে "ইন্দ্রাণী" বাণীচিত্রের "সূর্য ডোবার পালা" ও "নীড় ছোট ক্ষতি নেই" গান দুটি গেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও গীতা দত্ত। জি ই ৩০৪১২ঃ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "পুরীর মন্দির" বাণীচিত্রের গান "মোর অন্তর আজ" ও "আমার গোপন কথাটি"। জি ই ৩০৪১৩, ৩০৪১৪ ৩০৪১৫ রেকর্ডগুলিতে "সূর্যতোরণ" বাণীচিত্রের গানগুলি পরিবেশন করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। জি ই ৩০৪১৬ঃ "না জানি কোন ছন্দে" ও "সরমে জড়ানো আঁখি"—"শিকার" বাণীচিত্রের গান দুটি পরিবেশন করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

ওম্ চিত্রমের "নিমাই"-এর প্রথম চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে এই পাঠশালার সেটে। পণ্ডিতমশায়বেশী তুলসী চক্রবর্তীর সামনে ও পিছনে রয়েছে তিলক ও বাবুয়া

খেলার মাঠে

একলব্য

কলকাতায় ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় টেস্ট খেলার বিশদ আলোচনার জন্য খেলাধুলোর কয়েকটি প্রধান বিষয়ের পর্যালোচনা করা সম্ভব হয়নি। এই সপ্তাহে কিছু কিছু বিষয়ের আলোচনা করছি। তার আগে তৃতীয় টেস্ট খেলা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা দরকার।

অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করা কোন খেলায় কোন দেশের পক্ষেই নতুন ঘটনা নয়। ক্রিকেট খেলায় তো নয়ই। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মত পরম শক্তিশালী দলকেও বহু খেলায় ইনিংসে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু পরাজয়ের প্রশ্ন তখনই দুঃখের কারণ হয়ে ওঠে যখন দেখা যায় খেলার মধ্যে খেলোয়াড়দের যেটুকু ভূমিকা গ্রহণের কথা ছিল সেটুকু তাঁরা গ্রহণ করেননি, কিংবা সুস্থ দেহ এবং সবল পা নিয়েও শুকনো মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়েছেন। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই খেলোয়াড়দের দোষ ত্রুটি পরাজয়ের একমাত্র কারণ নয়। পরিচালক সমিতির আভ্যন্তরিক কোঁদল এবং টানাপোড়েন বহু ক্ষেত্রেই দল গঠনের উপর এবং খেলোয়াড়দের খেলার উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ভারতের ক্ষেত্রে এর লক্ষণও সুস্পষ্ট। যেহেতু খেলাধুলোয় জাতীয় পরাজয়ের সঙ্গে জাতির মানসম্মানের প্রশ্ন জড়িত সেহেতু দেশের শোচনীয় পরাজয়ের ব্যাপারে সাংবাদিকরাও মুখ খুলতে বাধ্য। শুধু সাংবাদিক কেন? কানপুরের দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে ভারতের পরাজয়ের পর পার্লামেণ্ট সদস্যরাও এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু এটা আমাদের দেশের ক্রীড়া পরিচালকদের কাছে সুসংবাদ নয়। তাই তাঁরা তৃতীয় টেস্ট খেলার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনার জন্য গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে আয়োজিত নৈশ ভোজসভায় সাংবাদিকদের লেখার এবং পার্লামেণ্ট সদস্যদের আলোচনার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন। বলা বাহুল্য, এই ভোজসভায় সাংবাদিকদের নিমন্ত্রণ করেই তাঁরা শক্ত শক্ত কথা শুনিয়ে দিয়েছেন এবং খেলোয়াড় এবং পরিচালক সমিতির নামে সমালোচনা করে সাংবাদিকরা যে সুরুচির পরিচয় দেননি তা বলতেও কসুর করেননি। সুরুচির প্রশ্নে পরে আসছি। তার আগে বলি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়রা এখন আমাদের অতিথি। তাঁদের পৃথকভাবে তথাকথিত 'অফিসিয়াল ডিনার' বা নৈশভোজে সম্বর্ধনার আয়োজনের উদ্দেশ্য পারস্পরিক মিলে তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ আর তাঁদের গুণপনার স্বীকৃতি প্রকাশ। কিন্তু ভোজসভায় সেইটাই প্রধান না হয়ে অতিথির সামনে সাংবাদিকদের গালিগালাজ করাই প্রধান হয়ে ওঠে। এটা কি রকমের সুরুচির পরিচয় বুঝি না।

আমাদের দেশের খেলাধুলোর যাঁরা কর্ণধার তাদের অনেকেই বহুবার বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতার বড়াই করে থাকেন। কিন্তু বিদেশের সংবাদপত্রে কি ধরনের সমালোচনা হয়ে থাকে তা কি তাঁরা জানেন না। শুধু সমালোচনাই হয় না, জাতীয় পরাজয়ের বহু ক্ষেত্রে সেখানে চরম পন্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এই সেদিনও ইংলণ্ডের কাছে সোভিয়েট রাশিয়ার ফুটবল দলের শোচনীয়

ডেভিস কাপ

পরাজয়ের পর রাশিয়ার জাতীয় ফুটবল কোচ কাচালিনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আমাদের দেশের ক্রীড়া পরিচালকদের সৌভাগ্যের কথা, এখানে এমন কোন ব্যবস্থা নেই। থাকলে আজীবন গদীতে আসীন থেকে খেলাধুলোকে নিয়ে এঁরা এমন ছিনিমিনি খেলতে পারতেন না। আর সংবাদপত্রের সমালোচনায় লজ্জাবতী লতার মত স্পর্শকাতরতাও অনুভব করতেন না।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনার ব্যাপার নিয়ে আর একটি কথা বলতে চাই। নৈশ ভোজের পর গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে কিছু নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু সংক্ষিপ্ততম অঙ্গবাসে সুসজ্জিত বা অসজ্জিত শ্বেতাঙ্গ ললনার উর্বশী নৃত্যের ব্যবস্থা করা হ'ল কেন? অতিথির দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং হোটেলের আবহাওয়ায় ওটা হয়তো বে-মানান হয়নি। কিন্তু অন্যভাবে যদি কথাকলি বা মণিপুরী কিংবা অন্য কোন নৃত্যের ব্যবস্থা করা যেত তাহলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্রিকেট অতিথিরা ভারতীয় কৃষ্টির, ভারতের নিজস্ব নৃত্য সম্পদের কিছু পরিচয় পেতেন।

তৃতীয় টেস্ট খেলার সময় ইডেন উদ্যানে সুরা-সত্র বা পানশালা খোলার ব্যাপার নিয়েও সংবাদপত্রে এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদে আলোচনা হয়েছে। খেলার মাঠের প্রকাশ্য স্থানে, যেখানে ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের আনাগোনা বেশী সেখানে এভাবে পানশালা খোলা কেউই সমর্থন করতে পারেননি। এ যেন ইচ্ছে করেই যুব সম্প্রদায়কে উচ্ছন্নে যাবার ফিকির করে দেওয়া। পরিষদ সদস্য শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যালের প্রশ্নের উত্তরে এ সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় যে জবাব দিয়েছেন তা ডাঃ রায়ের মত সমাজহিতৈষীর কাছ থেকে কেউ আশা করেনি। ডাঃ রায় বলেছেন, পানশালাটি খোলা হয়েছিল বিদেশীদের জন্য। কিন্তু বিদেশী কোথায়? যে ব্লকে সুরা-সত্রটি খোলা হয়েছিল সে ব্লকে বিদেশী একজনও ছিলেন কিনা সন্দেহ। আর বিদেশীদের জন্য যদি সুরা-সত্র খোলা হয়ে থাকে তবে সেখানে কি ভারতীয়ের প্রবেশাধিকার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল? ডাঃ রায় আরও বলেছেন, পানশালায় যদি এতই আপত্তি থাকে তবে সেখানে কেউ না গেলেই পারে। এর উত্তরে বলা যায়, শহরে থেকে তবে পতিতালয় সরাবার প্রয়োজন কি? এক্ষেত্রেও তো একই নীতিবাক্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, যে সরকার মাদক বর্জনের নীতি গ্রহণ করেছেন সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর মুখে জবাবগুলো মোটেই মানায়নি।

ডেভিস কাপ

আন্তর্জাতিক টেনিসে বিজয়ী দেশের পুরস্কার হচ্ছে ডেভিস কাপ। ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশের খেলোয়াড়দের কৃতিত্ব যেমন সর্ববাদিসম্মত, তেমন তাদের সম্মানও অনন্য।

উপর্যুপরি তিন বছর ডেভিস কাপ অস্ট্রেলিয়ার দখলে থাকবার পর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে ৩—২ ম্যাচে পরাজিত করে ডেভিস কাপ পুনরুদ্ধার করেছে। ডেভিস কাপের খেলায় অস্ট্রেলিয়া শুধু উপর্যুপরি তিন বছরের বিজয়ী বললে সব কথা বলা হয় না। গত ১০ বছর ধরে আন্তর্জাতিক টেনিসে অস্ট্রেলিয়ার রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য। এক ১৯৫৪ সাল ছাড়া ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এই ৯ বছরের মধ্যে ডেভিস কাপ কোনবার অস্ট্রেলিয়ার ঘরছাড়া হয়নি। ১৯২৩ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করে আসছে। এর আগে অস্ট্রেলিয়া ছিল ডেভিস কাপের খেলায় নিউ জিল্যাণ্ডের অংশীদার; দুই দেশের যুগ্ম নাম ছিল

অস্ট্রেলেশিয়া। অস্ট্রেলেশিয়া হিসাবে পাঁচ-বার এবং নিউ জিল্যাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার পর অস্ট্রেলিয়া ৮ বার ডেভিস কাপ নিজেদের দখলে রেখেছে।

ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে টেনিস সমৃদ্ধ দুই দেশ অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাসও বেশ কৌতুকপ্রদ। এর আগে দুই দেশ ১৬ বার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এবং দুই দেশই বিজয়ী হয়েছে ৮ বার করে। এবার ১৭ বারের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে আমেরিকা এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এবার নিয়ে আমেরিকা সর্বসাকুল্যে ডেভিস কাপ লাভ করেছে ১৯ বার।

অস্ট্রেলিয়ার দুই কীর্তিমান খেলোয়াড় কেন রোজওয়াল ও লুই হোডের পেশাদার বৃত্তি গ্রহণের পর এমেচার টেনিস ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্ঠা হানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে গতবার থেকেই। কিন্তু অ্যাসলে কুপার, মল এণ্ডারসন ও মার্ভিন রোজের ক্রীড়ানৈপুণ্যে গতবারও চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অস্ট্রেলিয়া আমেরিকাকে পরাজিত করে ডেভিস কাপ দখলে রাখে। অস্ট্রেলিয়া দলে এবার রোজ নেই। তার উপর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরোপিত হয়েছে। অপরদিকে আমেরিকা শক্তিশালী হয়েছে দেশের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় হ্যাম রিচার্ডসন ও পেরুর কুশলী খেলোয়াড় এলেক্স অলমেডোর অন্তর্ভুক্তিতে। এখানে বলা প্রয়োজন, টেনিস খেলার ইতিহাসে আমেরিকা এই বছর সর্বপ্রথম অন্য দেশের একজন খেলোয়াড়কে নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ দিয়েছে। ডেভিস কাপের নিয়মানুযায়ী আমেরিকা অবশ্য কিছু অন্যায় করেনি। খেলার আগে একাদিক্রমে কোন দেশে ৩ বছর বসবাস করলেই সেই খেলোয়াড় বসবাসকারী দেশের পক্ষে অংশ গ্রহণের অধিকারী। অলমেডো ১৯৫৪ সাল থেকে লস এঞ্জেলসে বাস করছেন। আমেরিকান দলে গতবার অলমেডোও ছিলেন না, রিচার্ডসনও ছিলেন না। উঠতি খেলোয়াড় ব্যারী ম্যাকে আর বর্ষীয়ান খেলোয়াড় ভিক সেসাসকে নিয়ে আমেরিকার দল গড়া হয়েছিল।

ব্রিসবেনে ১৮ হাজার দর্শক সমাগমের মধ্যে এবার চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলা আরম্ভ হলে প্রথম দিনের দুটি খেলায় অলমেডো পরাজিত করেন অস্ট্রেলিয়ার মল এণ্ডার-সনকে, উইম্বলডেন চ্যাম্পিয়ান অ্যাসলে কুপার পরাজিত করেন আমেরিকার ব্যারী ম্যাকেকে। ফলে দুই দেশই একটি করে খেলায় বিজয়ী হয়। দ্বিতীয় দিন ডাবলসের খেলায় অল-মেডো ও হ্যাম রিচার্ডসন অস্ট্রেলিয়ার মল এণ্ডারসন ও নীল ফ্রেজারকে পরাজিত করায় আমেরিকা এগিয়ে থাকে ২—১ খেলায়। তৃতীয় দিন অলমেডো কুপারকে পরাজিত করবার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫৮

আমেরিকার পয়লা নম্বর টেনিস খেলোয়াড় হ্যাম রিচার্ডসন

সালের ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের খেলার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। বাকী খেলাটির আর আকর্ষণ থাকে না। এ খেলায় অবশ্য এণ্ডারসন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ম্যাকেকে পরাজিত করেন। অবশ্য এবারকার কোন খেলাতেই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব অনুভূত হয়নি। প্রতিটি খেলায় দুই দেশের টেনিস প্রতিনিধিদের মধ্যে চলেছে মরণপণ সংগ্রাম।

আন্তর্জাতিক টেনিসের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বহুমূল্য ডেভিস কাপ এখন সিডনীর কমনওয়েলথ ব্যাঙ্কের সেফ্ ভল্ট জমা রয়েছে। ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত কাপটি এখানেই থাকবে। তারপর আমেরিকার অধিনায়ক পেরী জোনস কাপটিকে আমে-রিকায় নিয়ে যাবেন। এখন কথা হচ্ছে, ডেভিস কাপ আর অস্ট্রেলিয়ায় ফিরবে কিনা কিংবা কবে ফিরবে। অস্ট্রেলিয়ার এক নম্বর ও দুই নম্বর খেলোয়াড় অ্যাসলে কুপার ও মল এণ্ডারসন ডেভিস কাপের খেলার পর জ্যাক ক্যামারের পেশাদার দলে যোগ দিয়ে টেনিসের পেশাদারবৃত্তি গ্রহণ করেছেন। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ার টেনিস ক্রীড়ামোদীদের মনে এক বড় জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে এর পর কি হবে?

নীচে ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের ফলাফল দেওয়া হল:—

প্রথম দিনের খেলা—এলেক্স অলমেডো (ইউ এস এ) ৮—৬, ২—৬ ও ৯—৭ ও ৮—৬ গেমে মল এণ্ডারসনকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

অ্যাসলে কুপার (অস্ট্রেলিয়া) ৪—৬, ৬—৩, ৬—২ ও ৬—৪ গেমে ব্যারী ম্যাকেকে (ইউ এস এ) পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলা—এলেক্স অলমেডো ও হ্যাম রিচার্ডসন (ইউ এস এ) ১০—১২, ৩—৬, ১৬—১৪, ৬—৩ ও ৭—৫ গেমে পরাজিত করেন মল এণ্ডারসন ও নীল ফ্রেজারকে (অস্ট্রেলিয়া)।

তৃতীয় দিনের খেলা—এলেক্স অলমেডো (ইউ এস এ) ৬—৩, ৪—৬, ৬—৪ ও ৮—৬ গেমে অ্যাসলে কুপারকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

মল এণ্ডারসন (অস্ট্রেলিয়া) ৭—৫, ১৩—১১ ও ১১—৯ গেমে ব্যারী ম্যাকেকে (ইউ এস এ) পরাজিত করেন।

অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া দল ৮ উইকেটে জয়লাভের পর মেলবোর্ন অলিম্পিক মাঠে দ্বিতীয় টেস্ট খেলাতেও অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে। ফলে ক্রিকেট ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার তো হয়েছেই, অ্যাসেস পুনরুদ্ধারেরও সম্ভাবনা দেখা

মেলবোর্নে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্টে নীল হার্ভে ট্রেভর বেলীর বল লেগের দিকে সুইং করে মারছেন।

দিয়েছে। অবশ্য প্রথম দুটি টেস্টে পরাজিত হয়েও রাবার লাভের ঘটনা নজির দিসে দেখানো যেতে পারে। আবার প্রথম দুটি বিজয়ী হয়ে 'রাবার' না পাবার ঘটনারও অভাব নেই। তবু অবস্থা ইংলণ্ডের অনুকূলে নয়, একথা জোর করেই বলা যেতে পারে।

মেলবোর্ন মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় টেস্ট খেলা আরম্ভ হয় ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখে, আর ৬ দিনব্যাপী টেস্ট খেলার উপর যবনিকা পড়ে পঞ্চম দিন মাত্র ১ ঘণ্টা খেলার পর। ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে এই টেস্টেও টসে বিজয়ী হয়ে প্রথম ব্যাটিং করবার সুযোগ পান। সূচনার বিপর্যয় কাটিয়ে ইংলণ্ড দল প্রথম দিন সংগ্রহ করে ৪ উইকেটে ১৭৩ রান। প্রথমদিকে ইংলণ্ডের ব্যাটিংয়ে শোচনীয় বিপর্যয় দেখা যায়। ন্যাটা পেস বোলার এলান ডেভিডসনের বোলিংয়ের ফলে মাত্র ৭ রান স্কোর বোর্ডে উঠতেই ইংলণ্ড ৩টি উইকেট হারায়। ডেভিডসনের এক ওভারে রিচার্ডসন, ওয়াটসন ও গ্রেভনি আউট হয়ে যান। অধিনায়ক পিটার মে ট্রেভর বেলীর সংগে দৃঢ়তার সংগে খেলে অবস্থার পরিবর্তন করেন। বেলী ও মের সহযোগিতায় চতুর্থ উইকেটে ৮৫ রান যোগ হয়। পঞ্চম উইকেটে মে ও কাউড্রে ৮১ রান যোগ করলে প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়। মে ৮৯ ও কাউড্রে ২৮ রান করে নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন ২৫৯ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর অস্ট্রেলিয়া ১ উই-কেট হারিয়ে ৯৬ রান তোলে। অধিনায়ক পিটার মে, যিনি পূর্বদিন ৮৯ রান করে নট আউট ছিলেন, তিনি ১১৩ রান করে আউট হন আর অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা চৌকস খেলোয়াড় ডেভিডসন লাভ করেন ৬৪ রানে ৬টি উইকেটে। এখানে বলা যেতে পারে, আর্চি ম্যাকলারেনের পর দীর্ঘ দিনের মধ্যে ইংলণ্ডের কোন অধিনায়ক অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সেঞ্চুরী লাভ করতে পারেন নি। ১৯০১—০২ সালে ম্যাকলারেন সেঞ্চুরী করেছিলেন, আর এবার পিটার মে সেঞ্চুরী করেছেন। মে'র জীবনের এটি ৭৫তম সেঞ্চুরী। দ্বিতীয় দিন অস্ট্রেলিয়ার সুনিপুণ ব্যাটস্‌ম্যান নীল হার্ভের ব্যাটিং খুবই উপভোগ্য হয়। তিনি ৬০ রান করে নট আউট থাকেন। সংগে নট আউট থাকেন ওপেনিং ব্যাটস্‌ম্যান ম্যাকডোনাল্ড অত্যন্ত সতর্কতার সংগে ১৪৮ মিনিটে ৩২ রান করে।

তৃতীয় দিন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিংয়ে আরও সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। সারাদিনে তারা ১৮৬ রান সংগ্রহ করায় দিনের শেষে ৬ উইকেটে তাদের সংগৃহীত হয় ২৮২ রান। অবশ্য নীল হার্ভের উঁচু মানের ব্যাটিং স্টেডিয়ামে সমবেত ৭০ হাজার দর্শককে বিপুল আনন্দ দেয়। হার্ভে ১৬৭ রান করে আউট হন। ১৯৫৪-৫৫ সালে ব্রিসবেন মাঠে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে হার্ভে ১৬২ রান করেছিলেন কিন্তু আর কোনবার ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এত রান করতে পারেননি। তৃতীয় দিন খেলা শেষ হবার আধ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার মাত্র ২ উইকেটে ২৫৫ রান উঠেছিল এবং প্রথম ইনিংসে বিপুল রান সংগ্রহেরও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু শেষদিকে মাত্র ৭ রানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার চারটি উইকেট পড়ে যায়। নতুন বলে স্ট্যাথাম ও লোডারের মারাত্মক বোলিং হয় এই বিপর্যয়ের কারণ।

চতুর্থ দিন বাকী ৪টি উইকেটে মাত্র ২৬ রান যোগ করে ৩০৮ রানে অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ করবার পর ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়—মাত্র ৮৭ রানে; পরে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলে ৯ রানের মধ্যে তাদেরও একটি উইকেট পড়ে যায়। এইভাবে চতুর্থ দিনে মাত্র ১২২ রান হয় এবং উইকেট পড়ে ১৫টি। এক পিটার মে ছাড়া কেউই বেশীক্ষণ ব্যাট ধরে টিকে থাকতে পারেন না। মে ১০০ মিনিট ব্যাটিং করে ১৭ রান করেন। দুই দলের ফাস্ট বোলারদের বল খুবই কার্যকরী হয়। ইংলণ্ডের স্ট্যাথাম প্রথম ইনিংসে ৫৭ রানে ৭টি এবং অস্ট্রে-লিয়ার আয়ান মেকিফ দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রানে ৬টি উইকেট পান।

চতুর্থ দিনের শেষে জয়লাভের জন্য অস্ট্রেলিয়ার আর মাত্র ৩০ রানের প্রয়োজন থাকে। পরের দিন বিরতি। একদিন বিরতির পর পঞ্চম দিনের খেলা আরম্ভ হলে ৫৭ মিনিটের মধ্যে আর একটি উইকেট হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে। ফলে দ্বিতীয় টেস্টেও

ইংলণ্ড পরাজিত হয় ৮ উইকেটে। দ্বিতীয় টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ডঃ—

ইংলণ্ডঃ—প্রথম ইনিংস—২৫৯ (পিটার মে ১১৩, ট্রেভর বেলী ৪৮, কলিন কাউড্রে ৪৪, জিম লেকার ২২; ডেভিডসন ৬৪ রানে ৬ উইকেট, মেকিফ ৬৯ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়াঃ—প্রথম ইনিংস—৩০৮ (নীল হার্ভে ১৬৭, সি ম্যাকডোনাল্ড ৪৭, নর্মান ওনীল ৩৭, এ ডেভিডসন ২৪; স্ট্যাথাম ৫৭ রানে ৭ উইকেট ও লোডার ৯৭ রানে ৩ উইকেট)

ইংলণ্ডঃ—দ্বিতীয় ইনিংস—৮৭ (পিটার মে ১৭; মেকিফ ৩৮ রানে ৬ উইকেট ও ডেভিডসন ৪১ রানে ৩ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়াঃ—দ্বিতীয় ইনিংস—(২ উইকেট) ৪২ (জিম বার্ক নট আউট ১৮; লেকার ৭ রানে ১ উইকেট ও স্ট্যাথাম ১১ রানে ১ উইকেট)

(অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে বিজয়ী)

জাতীয় টেনিস

কীর্তিমান টেনিস খেলোয়াড় আর কৃষ্ণন জাতীয় টেনিসের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করে ভারতীয় টেনিস ক্ষেত্রে পুনরায় নিজ শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। জাতীয় টেনিসের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ কৃষ্ণনের ক্ষেত্রে কোন নতুন সম্মান নয়। বহুবারই তিনি জাতীয় টেনিসে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। তবু এবার দেশ বিদেশের গুণী খেলোয়াড়দের যেভাবে অনায়াস-ভংগীতে হারিয়ে কৃষ্ণন এবার বিজয়ী হয়েছেন তা তাঁর উন্নত ক্রীড়াশৈলীর পরিচায়ক। ফাইন্যালে কৃষ্ণন স্ট্রেট সেটেই পরাজিত করেছেন ভারতের দুই নম্বর খেলোয়াড় ডেভিস কাপের অধিনায়ক নরেশ কুমারকে। কৃষ্ণন ও কুমারের ফাইন্যাল খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব থাকলেও দুইজনের হাতের বিভিন্ন স্ট্রোক ইংরাজী নববর্ষের প্রথমদিনে ক্যালকাটা সাউথ ক্লাবে সমাগত দর্শকদের কম আনন্দ দেয়নি। নরেশ কুমারের হাতে মারের রকমারি কিছু বেশী ছিল। তার টপ স্পিন সময়ে সময়ে কৃষ্ণনকে বেগও দিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণনের ব্যাক-হ্যান্ডের পাসিং শট, ড্রাইভ ভলি ছিল খুবই মারাত্মক। সেমি-ফাইন্যালে কৃষ্ণন গ্রানের হাইকে এবং নরেশ কুমার ডেনমার্কের উলরিচকে হারিয়ে ফাইন্যালে ওঠেন। এশিয়ান টেনিসের রানার্স হাইকে কৃষ্ণনের কাছে স্ট্রেট সেটে হার স্বীকার করতে হয়। কিন্তু সদ্য এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান উলরিচ কুমারের সংগে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পঞ্চম সেটে কোর্টের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁর পক্ষে আর খেলা সম্ভব হয় না। ফলে কুমার বিজয়ী বলে সাব্যস্ত হন। যে চারটি সেট খেলা হয়েছিল তার মধ্যে দুজনই লাভ করেছিলেন দুটি করে সেট।

পশ্চিম জার্মানীর লেগেনস্টিনকে সহ-খেলোয়াড় নিয়ে উলরিচ ডাবলসের ফাইন্যালে ওঠেন। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শে তিনি ডাবলস ফাইন্যালেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করায় ফাইন্যালের অপর জুটি কৃষ্ণন ও কুমার ডাবলসের বিজয়ী বলে ঘোষিত হন।

ডেনমার্কের খ্যাতনামা খেলোয়াড় উলরিচ, ফ্রান্সের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় হাইয়ে, পশ্চিম জার্মানীর লেগেনস্টিন ছাড়া

জাতীয় টেনিসের বিজয়ী রমানাথ কৃষ্ণন

বিদেশের আরও কয়েকজন খেলোয়াড় এবারকার জাতীয় টেনিসে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা হচ্ছেন যুগোশ্লাভিয়ার প্যানটোভিক, অস্ট্রেলিয়ার ওয়ারেন জ্যাকোয়েস, কিউবার ডেভিস কাপ খেলোয়াড় গ্যারিডো ও প্যারাগুয়ের আরগন। কিন্তু কারো খেলাতেই তেমন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

জাতীয় টেনিসের মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছেন ১৬ বছরের তরুণী মিস আপ্পাইয়া। গত বছর ইনি বালিকা বিভাগে ফাইন্যালে মিস এ লামসডেনের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। এবারের বালিকা বিভাগের ফাইন্যালেও মিস আপ্পাইয়া একইভাবে মিস লামসডেনের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। কিন্তু মহিলাদের ফাইন্যালে ইনি পরাজিত করেছেন জাতীয় টেনিসের প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ান মিসেস কে সিংকে। বালকদের বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন ভারতের উঠ্‌তি খেলোয়াড় এবং গতবারের রানার্স জয়দীপ মুখার্জি। জয়দীপ ফাইন্যালে অজিত কুমারকে স্ট্রেট সেটে পরাজিত করেন। ৬—৩ গেমে প্রথম সেটের মীমাংসার পর স্মরণীয় দ্বিতীয় সেটটির মীমাংসা হয় ১৩—১১ গেমে।

নীচে জাতীয় টেনিসের সমস্ত বিভাগের ফাইন্যাল খেলার ফলাফল দেওয়া হলঃ—

পুরুষদের সিংগলস ফাইন্যাল—আর কৃষ্ণন ৬—২, ৬—২ ও ৬—১ গেমে নরেশ কুমারকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইন্যাল—মিস ডি আপ্পাইয়া ২—৬, ৭—৫ ও ৬—১ গেমে মিসেস কে সিংকে পরাজিত করেন।

বয়েজ সিংগলস ফাইন্যাল—জে মুখার্জি ৬—৩ ও ১৩—১১ গেমে অজিত কুমারকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল—কৃষ্ণন ও কুমার উলরিচ ও লেগেনস্টিনের বিরুদ্ধে 'ওয়াক ওভার' পান।

মহিলাদের ডাবলস ফাইন্যাল—মিস আপ্পাইয়া ও মিসেস কে সিং ৭—৫ ও ৬—৩ গেমে মিস পাঞ্জাবী ও মিসেস কিরেণ দাশকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল—নরেশ কুমার ও মিসেস কে সিং ৬—৩ ও ৬—১ গেমে আখতার আব্বী ও মিস আপ্পাইয়াকে পরাজিত করেন।

বয়েস ডাবলস ফাইন্যাল—জে মুখার্জি ও ও ডি ব্যানার্জি ৪—৬, ৬—২ ও ৬—৪ গেমে বি ভাটন ও কোলীকে পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিংগলস ফাইন্যাল—মিস লামসডেন ৬—৪ ও ৬—৪ গেমে মিস আপ্পাইয়াকে পরাজিত করেন।

দেশী সংবাদ

৫ই জানুয়ারী—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬৪তম অধিবেশনের জন্য কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ঢেবর, শ্রীজওহরলাল নেহরু, পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আজ নাগপুর আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তানাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং পুরুলিয়া জেলায় পতিত জমির দ্রুত সংস্কার করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার উচ্চতম ক্ষমতাবিশিষ্ট বুলডোজার ও ট্রাক্টর ক্রয় করিতেছেন। প্রত্যেক উদ্বাস্তু পরিবারকে ছয় একর করিয়া জমি দেওয়া হইবে।

৬ই জানুয়ারী—যে সকল ব্যবসায়ী সরকারী ধান ও চাউল মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ বানচাল করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত অদ্য পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আগামী সোমবার হইতে ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফত চাউল সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্তও গৃহীত হয়।

৭ই জানুয়ারী—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ সন্ধ্যায় এখানে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঘরোয়া অধিবেশনে এই কথা বলেন বলিয়া প্রকাশ, সর্বোচ্চ কি পরিমাণ জোতের মালিক হওয়া যাইতে পারে তাহা স্থির করিয়া দিয়া ভূমি সংস্কার করিতে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ; কংগ্রেস এখন এই নীতি হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আজ কংগ্রেস সভাপতি পদ হইতে শ্রী ঢেবরের পদত্যাগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। নূতন সভাপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটি তাঁহাকে কাজ চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

৮ই জানুয়ারী—এবারে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত স্কুল ফাইন্যাল টেস্ট পেপার বিক্রয়ের ব্যাপারে একটা 'মুনাফাবাজের' মনোভাব দেখা দেওয়ায় পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবকদের বিশেষ বিব্রত হইতেছে বলিয়া জানা যায়।

আজ লোকসভার দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১১টার সময় দ্বিতীয় লোকসভার সপ্তম অধিবেশন আরম্ভ হইবে।

৯ই জানুয়ারী—কংগ্রেসের ৬৪তম অধিবেশনের বিষয় নির্বাচনী সমিতি অদ্য পূর্বাহ্নে সাড়ে চারি ঘণ্টাব্যাপী আলোচনার পর কৃষি-ব্যবস্থার সংস্কার বিষয়ক খসড়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে অনুপস্থিতি শুধু অভ্যন্তরেই নয়, কলিকাতার রাজনৈতিক, পার্লামেণ্টারী এবং কংগ্রেস মহলেও বিশেষ বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে।
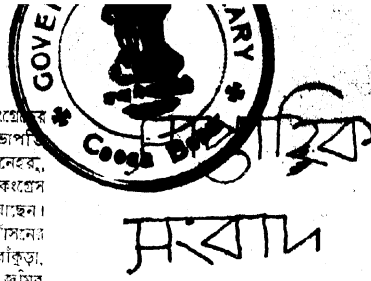
১০ই জানুয়ারী—আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মচারিগণ সোমবার ১২ই জানুয়ারী হইতে ধর্মঘট শুরু করিতেছেন। ঐ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ আর জি কর হাসপাতালে এমার্জেন্সি সহ সমস্ত বিভাগেই রোগী ভর্তি গতকল্য হইতে বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। অ্যাম্বুলেন্সকেও ঐ হাসপাতালে রোগী স্থানান্তরিত না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতার বৃহৎ কলেজগুলিতে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি রোধের আন্দোলন সম্পর্কে আজও ছাত্রগণ বর্ধিত হারে বেতন দানে বিরত থাকেন। ছাত্র-বেতন দান বিরতির ইহা চতুর্থ দিবস। বস্তুত পক্ষে ঐ কলেজগুলির পক্ষ হইতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে ছাত্র-বেতন বৃদ্ধি না করিবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা পালন করা হয় নাই।

১১ই জানুয়ারী—অদ্য অভয়ঙ্করনগরে বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দর্শনের জন্য এক বিরাট জনতা প্যাণ্ডেলের প্রধান প্রবেশপথ ভাঙিয়া ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করিলে এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিস ছয়বার লাঠি চালায়। ৬০ জন লোক আহত হয়।

উড়িষ্যার কোরাপুট জেলার জয়পুরের সরকারী মহিলা হাসপাতালে গত রাত্রে এক নারী দ্বিমস্তকবিশিষ্ট একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন বলিয়া জানা গেল। ডাক্তারগণ জানাইয়াছেন যে, নবজাত শিশু সুস্থ আছে।

বিদেশী সংবাদ

৫ই জানুয়ারী—পাকিস্তানের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ও অধুনালুপ্ত রিপাবলিকান দলের সদস্য শ্রীকামিনীকুমার দত্ত গতকাল শেষ রাত্রিতে কুমিল্লাস্থিত নিজ বাসভবনে হৃদরোগের আক্রমণে ৮৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ৫ টন স্ট্রেপটোমাইসিন বিমানযোগে ভারতের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে। উহাতে ৭০ লক্ষ ইনজেকশন হইবে। উহার মূল্য ২ কোটি ৫০ লক্ষ স্টার্লিং।

৬ই জানুয়ারী—মহাশূন্যে চালিত রুশ রকেট পৃথিবী হইতে ৪৯৭০০০ মাইল দূরে উঠিয়া গিয়াছে এবং প্রথম কৃত্রিম গ্রহরূপে ইহার কক্ষপথে প্রবেশ করিয়াছে। সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাদেমীর ভাইস প্রেসিডেণ্ট আলেক্সাণ্ডার টপচিভ এক সাংবাদিক বৈঠকে ইহা ঘোষণা করেন।

বেলুন ও নৌকাযোগে ২৪ দিনে অতলান্তিক অতিক্রম করিয়া "ক্ষুদ্র বিশ্বের" তিনজন পুরুষ ও একজন নারী আরোহী গতকল্য সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বারবাডোসে অবতরণ করিয়াছে।

৭ই জানুয়ারী—কিউবার নূতন প্রেসিডেণ্ট ডাঃ ম্যানুয়েল উরুতিয়া গতকল্য তাঁহার মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠান করেন এবং ঘোষণা করেন যে, কংগ্রেস ভাঙিয়া দেওয়া হইল, মন্ত্রিসভার শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ১২ হইতে ১৮ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

সোভিয়েট সংবাদ পরিবেশন সংস্থা তাস কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে যে, সোভিয়েট রকেট আজ কক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সূর্য প্রদক্ষিণ আরম্ভ করিয়াছে।

৮ই জানুয়ারী—জেনারেল চার্লস দ্য গল অদ্য ফ্রান্সের পঞ্চম রিপাবলিকের প্রথম প্রেসিডেণ্টরূপে অভিষিক্ত হন। গত জুন মাসে ক্ষমতালাভের পর তিনিই পঞ্চম রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

৯ই জানুয়ারী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার অদ্য কংগ্রেসের নিকট এক আনুষ্ঠানিক বার্তায় বলেন যে, আমেরিকা সর্বত্র সর্বপ্রকারে যুদ্ধ সংঘটিত না হওয়ার জন্য চেষ্টা করিয়াছে।

১০ই জানুয়ারী—রুশিয়া অদ্য প্রস্তাব করিয়াছে যে, দুই মাসের মধ্যে ওয়ারস অথবা প্রাগে পূর্ব ও পশ্চিমী শক্তিসমূহের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হউক এবং এই বৈঠকে জার্মানী সম্পর্কে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত ও স্বাক্ষরিত হইবে। এই চুক্তির জন্য একটি খসড়া প্রস্তাবও তাহারা পেশ করিয়াছে।

গতকল্য রাষ্ট্রপুঞ্জ 'সংখ্যালঘুর প্রতি বৈষম্যের বিলুপ্তি ও সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা বিধান' সাব-কমিটির বৈঠকে ভারতে ধর্মীয় বৈষম্যের অবসান ঘটাইবার চেষ্টায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুর অবদানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।

১১ই জানুয়ারী—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইতেছেন, রাশিয়ার আকাশচারী কুকুর "আলবিনা" তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছে। 'আলবিনা' কয়েকবারই সোভিয়েট রকেটযোগে মহাকাশ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার   সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পক্ক কেশ ছাড়া
নিশ্চিন্ত মনে
বার্দ্ধক্য
বরণ করুন
Loma
REGD.
লোমা
REGD.
এমন কোন পককেশ নেই যাহা লোমা কালো করতে অক্ষম হয়। লোমা কোন রঙ নয় কিন্তু স্বাভাবিকভাবে চুল কালো করার তৈল এবং তারই সহিত প্রাকৃতিক উপাদানসহ চুলের টনিক—উপরন্তু মধুর সুগন্ধযুক্ত।
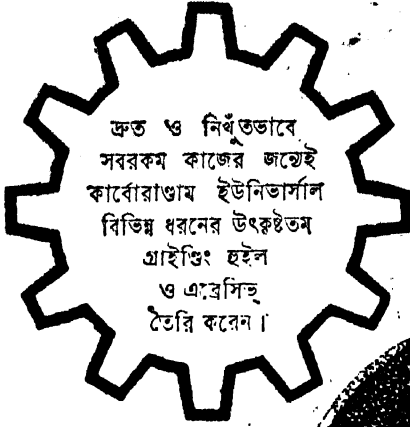
সবরকম কাজের জন্যেই
কার্বোরাণ্ডাম ইউনিভার্সাল
গ্রাইণ্ডিং হুইল
পাওয়া যায়
দ্রুত ও নিখুঁতভাবে
সবরকম কাজের জন্যেই
কার্বোরাণ্ডাম ইউনিভার্সাল
বিভিন্ন ধরনের উৎকৃষ্টতম
গ্রাইণ্ডিং হুইল
ও এ্যব্রেসিভ্
তৈরি করেন।
A PRODUCT BY
বণ্ডেড্
এব্রেসিভ্
গ্রাইণ্ডিং হুইল,
সেগমেণ্ট, রাবিং ব্রিক, স্টিক,
শার্পেনিং স্টোন (শানপাথর)
ভালভ্ গ্রাইণ্ডিং কম্পাউণ্ড,
প্রভৃতি।
কার্বোরাণ্ডাম ইউনিভার্সাল লিমিটেড
প্রধান কার্যালয় : "স্বস্তিক হাউস"
১০৬, আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, টেলিফোন : ২৯৪১ (৪টি লাইন)
কারখানা : তিরুভত্তিয়ুর, মাদ্রাজ
বিক্রয়-প্রতিনিধি :
মেসার্স উইলিয়াম্ জ্যাকস্ অ্যাণ্ড কোং লিমিটেড
কলিকাতা-১, বোম্বাই-১, মাদ্রাজ-১, নয়া দিল্লী, বাঙ্গালোর-১, কানপুর।
মেসার্স স্কট অ্যাণ্ড পিকস্টক প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১, বোম্বাই-১, মাদ্রাজ-১, নয়া দিল্লী,
বাঙ্গালোর, কানপুর, হায়দ্রাবাদ (দাক্ষিণাত্য)
শুধু বৈশিষ্ট্যের জন্য :
মেসার্স এইচ, এস, কন্ন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
২৪, রাম্পার্ট রো, বোম্বাই।
BOMAS CUZ-46 BEN
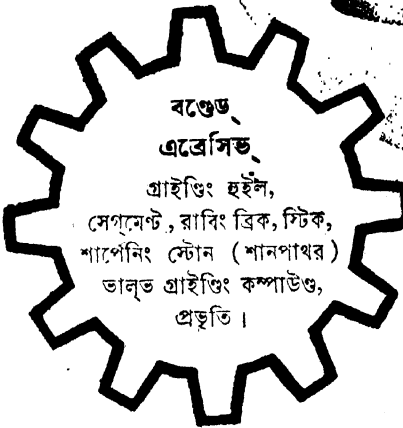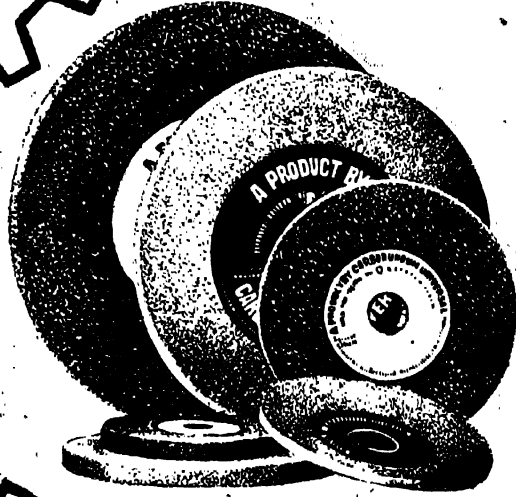
দেশ
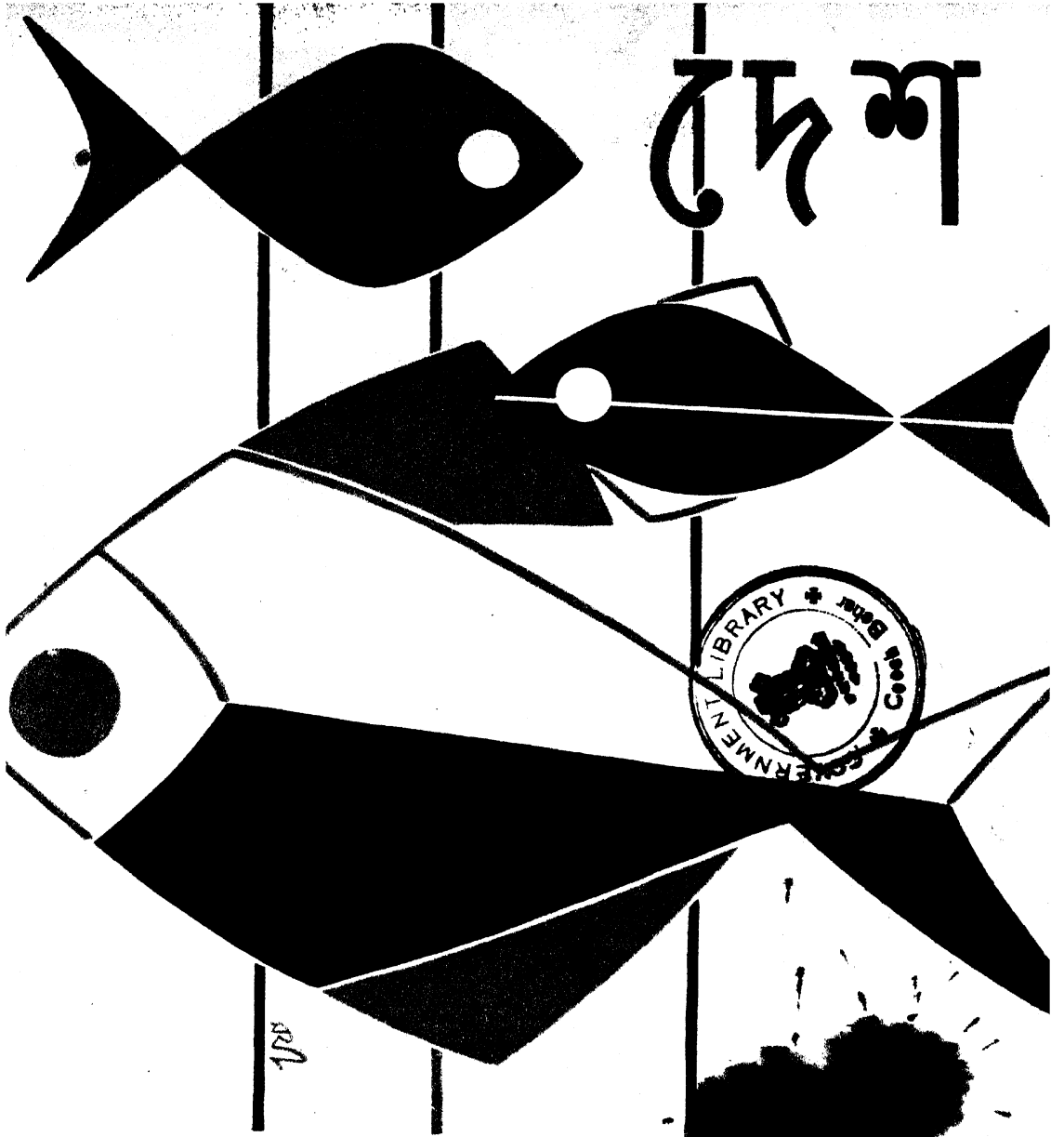
২৬ বর্ষ] শনিবার, ১০ মাঘ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 24th January ৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা

মিল্ক অব ম্যাগনেসিয়া
ম্যাগনেসিয়া ম্যাগমা ইউ. এস. পি.
ছোট ছেলেমেয়ে ও শিশুদের
নিরাপদ ও ফলপ্রদ
ও মৃদু বিরেচক
সব সময়েই কিনতে চেষ্টা করবেন....
MARTIN & HARRIS (PRIVATE) LTD. INDIA BURMA
এম এণ্ড এইচ ব্র্যাণ্ড
আমাদের প্যাকিং কিনা দেখে নিন
চার রকমের আকারে পাওয়া যায়।
MILK OF MAGNESIA
MANUFACTURED IN INDIA BY
MARTIN & HARRIS (PRIVATE) LTD.
1B ASHUTOSH MUKHERJEE ROAD, CALCUTTA 20

সূচীপত্র

যখন
আপনি
ক্লান্ত
হ'য়ে পড়েন
তখন
চা-ই
আপনার
অবসাদ
দূর করে
TEA BOARD INDIA
আমার নাম চা
দুঃখে-সুখে আমি আপনার বন্ধু
PST 203

সূচীপত্র

প্রথম সাফল্যের জয় গৌরব

আমাদের একার নয়। 'বিচিত্রা'র অসংখ্য অনুরাগীদের শুভেচ্ছা একান্ত সহযোগিতার ফলেই আজ সম্ভব হয়েছে এ অসাধ্য সাধন। তাই আমরা ভুলিনি এ জয় আমাদের শুধু নয়, আপনাদেরও। আজ সেজন্যই আপনাদের 'বিচিত্রা' জানাচ্ছে তার অন্তরের নতি।

বাইরের বহু এজেণ্ট পত্রিকা পাননি এবং অনেকে দেরীতে পেয়েছেন বলে অনুযোগ করেছেন। সত্যিই এ ত্রুটি আমাদের এবং সেজন্য আমরা লজ্জিত। ভবিষ্যতে এমন ভুল হবে না এ প্রতিশ্রুতি আমরা দিচ্ছি। সকলে যাতে নির্দিষ্ট সময়ে পত্রিকা পান তার ব্যবস্থা আমরা করবো। কোলকাতায় 'বিচিত্রা'র অত্যধিক চাহিদা বাড়ার জন্যই বাইরে পত্রিকা পাঠাতে দেরী হয়েছে, কারণ আবার করে ছেপে তবে পাঠিয়েছি আমরা। এবার বেশী করেই ছাপছি যাতে একসংগে কোলকাতা আর বাইরের চাহিদা একসংগে মেটানো যায়।

॥ এবার দিচ্ছি দ্বিতীয় সংখ্যার খবর ॥

যাঁরা লিখছেন !

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অমরেন্দ্র ঘোষ

আর

বাণী রায়

থাকছে একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস, একটি বড় গল্প আর ধারাবাহিক মধুর স্মৃতি চিত্রণ, তাছাড়া : 'বোম্বাইএর চিত্রজগতে', 'সেদিনের সেটে', 'নাট্যলোক', 'বিপুলা এ পৃথিবীর', 'পথবাসী ওরা', 'হরে-করে-কম্বা', 'যাঁরা গান ভালবাসেন', 'মেয়েদের জন্য', 'সাহিত্য-মেলায়' প্রভৃতি সুখপাঠ্য ফিচার। আর থাকবে বহু লোভনীয় ছবি (বোম্বাই আর কোলকাতার চিত্রজগতের)

[আরো জানার জন্য আগামী সংখ্যার 'দেশ' পত্রিকা দেখুন]

আমাদের কোলকাতা ও হাওড়ার সোল এজেণ্ট

ভগবত ওঝা

২, ড্রেপার লেন। কোলকাতা—১

বাইরের এজেণ্টরা এখনই অর্ডার পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হোন। আর সেজন্য খোঁজ নিন :

৮২বি যতীন্দ্রমোহন এভেনিউ, কোলকাতা—পাঁচ

ফোন নম্বর—৫৫-১২০৬

একটি বৈচিত্র্যধর্মী মাসিক পত্রিকা

পড়বার মত পত্রিকা

একটি বৈচিত্র্যধর্মী মাসিক পত্রিকা

পড়াবার মত পত্রিকা

একটি বৈচিত্র্যধর্মী মাসিক পত্রিকা

কেনবার মত পত্রিকা

একটি বৈচিত্র্যধর্মী মাসিক পত্রিকা

উপহার দেবার মত পত্রিকা

একটি বৈচিত্র্যধর্মী মাসিক পত্রিকা

(সি ৪০১৬)

সূচীপত্র

DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 24th January, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৩ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১০ মাঘ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

ভারতীয় সাধারণতন্ত্র দিবস

ছাব্বিশে জানুয়ারী ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস, সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার স্মরণ ও উৎসব। একটি সমগ্র জাতির সার্থক প্রতিজ্ঞা রক্ষার দৃষ্টান্তে এই দিবসটি মহীয়ান। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবানুযায়ী ১৯৩০ সালে পূর্ণ স্বাধীনতা যে ভারতের লক্ষ্য, তাহা এই দিবসেই ঘোষিত হইয়াছিল। পরে ভারত-ভাগ্যবিধাতার ইঙ্গিতে ও আশীর্বাদে সমগ্র জাতির ঐকান্তিক অধ্যবসায়ে কালক্রমে জাতির সে-প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইয়াছে, ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা লাভ করিলেও ছাব্বিশে জানুয়ারীতেই সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইয়াছে। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল।

বস্তুত ভারতের শাসনপদ্ধতি যে প্রাপ্তবয়স্কের ভিত্তিতে স্থাপিত সাধারণতন্ত্র হইবে, এ বিষয়ে স্বাধীনতা লাভের আগেও কাহারও মনে সন্দেহমাত্র ছিল না। জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ, জননায়কগণের অভিমত, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রবণতা সমস্তই এই পথের ইঙ্গিত করিয়াছে। যাহা পূর্বনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল, তাহাই রূপলাভ করিয়াছে। পূর্বনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হইলেও কার্যটি সহজসাধ্য ছিল না। কেননা, দীর্ঘকালের বিদেশী শাসন-পদ্ধতি জাতিকে এজন্য প্রস্তুত করে নাই, একটি কৃত্রিম ও কঠিন কাঠামোর সাহায্যে যান্ত্রিকভাবে বিদেশী শাসকগণ এদেশের শাসনকার্য চালাইয়া আসিয়াছে। তাহার মধ্যে গণতন্ত্রের আভাসমাত্র ছিল না। এ-শিক্ষা আয়ত্ত হইয়াছে অন্য কারণে ও অন্য পন্থায়। গণতন্ত্রের মূল হইতেছে দৃষ্টির উদারতা, পরমত-সহনের ক্ষমতা, প্রতিপক্ষের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সর্বপ্রকার ভাব আত্মসাৎ করিবার শক্তি। সত্য কথা বলিতে কি, ভারতাত্মা এই সব গুণে যেমন বলীয়ান, এমন অল্প দেশ। অতি প্রাচীনকাল হইতে এদেশের ধর্মগুরুগণ, সাধুসন্ত, সাধক ও মনীষিগণ ভাষান্তরে গণতন্ত্রের শিক্ষাই দিয়া আসিতেছেন। এই সেদিনও এক মহাসাধক 'যত মত তত পথ' বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তো প্রকৃত গণতন্ত্রের বীজ। ঐ মহতী বাণীকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া জীবনে ব্যাপকভাবে দেখিতে পারিলে বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, উহা গণতন্ত্রের দীক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কিছুদিন হইল গণতন্ত্রের প্রতি একটা অনাস্থার ভাব কোন কোন মহলে দেখা দিয়াছে। অল্পকালের মধ্যে আফ্রিকার ও এশিয়ার ব্যাপক অঞ্চলে কতকগুলি গণতন্ত্রের দীপ সহসা নিভিয়া যাওয়াতেই এই সংশয়ের সৃষ্টি। নির্বাপিত দীপ সেই সব দেশের ইতিহাসে মর্মস্থানে নিহিত। কাজেই দেখা যাইবে যে গণতন্ত্রের আসল শিক্ষা হইতেই তাহারা বঞ্চিত ছিল; খুব সম্ভব দেখা যাইবে যে, সেই সব দেশের মনীষী ও ধর্মগুরুগণ জাতীয় চিত্তকে এজন্য প্রস্তুত করিয়া রাখেন নাই। তাই প্রতিকূলতার প্রথম উত্তুরে-হাওয়াতেই গণতন্ত্রের শিক্ষা নিভিয়া গেল। কেবল রাজনৈতিক কারণে ও রাজনৈতিক শিক্ষাতে স্থায়ী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, তার জন্য চাই দীর্ঘকালের সাধনা।

ভারতবর্ষের দীর্ঘকালের ইতিহাস এই সাধনার ইতিহাস। এদেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সেই ঐতিহাসিক সত্যের স্বীকৃতিমাত্র। ইহা কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া নয়। উপর হইতে চাপাইয়া দেওয়া গণতন্ত্র অপেক্ষা নীচ হইতে উদ্ভূত গণতন্ত্র উপরের ঝড়ে টলিতে পারে, কিন্তু ভাঙিয়া পড়ে না।

যাঁহারা ভারতে গণতন্ত্রের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় করেন—সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তাঁহাদের আমরা বলিতে চাই যে, ভারতের গণতন্ত্র জাতীয় জীবন হইতে উদ্ভূত, ইহার মূল দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে খুব সম্ভব যে অকস্মাৎ ভাঙিয়া পড়িবে, এমন আশঙ্কা নাই। অন্য দেশের নজীর তুলিয়া লাভ নাই অন্য দেশের ইতিহাসে সেই সব নজীরের কারণ নিহিত। অন্য দেশের ইতিহাস সর্বক্ষেত্রে পর্যন্ত এদেশের ইতিহাস না হইতেছে (তাহা সম্ভব নয়) সুতরাং অন্য দেশের নজীর অপ্রাসঙ্গিক। ঐতিহাসিক কারণেই এদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আর ঐতিহাসিক কারণেই তাহা স্থায়ী হইয়া থাকিবে।

ভারতের সাধারণতন্ত্র জয়যুক্ত হোক।

প্রসঙ্গত

২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্রের জন্মতিথি। দিনটি বিস্মৃত হবার নয়। লক্ষ লক্ষ নগণ্যের আসা-যাওয়ার মাঝে কদাচিৎ এক একজন বরেণ্য আসেন, পাঁজির পাতার একটি সাধারণ দিন অসাধারণ হয়ে ওঠে জাতির জীবনে, স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে বেঁচে থাকে ভবিষ্যতের ইতিহাসে।

সুভাষচন্দ্রের জীবনী আমাদের অজানা নয়; আদর্শবান নির্ভীক অকুণ্ঠচিত্ত সংগ্রামী এই ভারত-সাধককে আমরা বহুরূপে দেখেছি, জেনেছি। তাঁর মহৎ স্বপ্নের কথাও ত অজানা নয়। তথাপি যদি ভ্রমবশে আলস্যবশে সাময়িক ভাবেও সে সাধনা-কথা ভুলে থাকি—২৩শে জানুয়ারীর পুণ্য মুহূর্তে যেন স্বতঃই তা স্মরণ করি।

■ ■ ■

এই সুন্দর ভুবনে মরতে আপত্তি শুধু কবির কেন, আমাদের সকলেরই। তবু মৃত্যুর নিয়ম অদ্যাবধি অমোঘই রয়ে গেছে। জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে—আমরা মেনে নিয়েছি। জন্মাবধি আমরা, বাঙালীরা, জেনেছি আমাদের আয়ু গড়ে বাইশ বছর। শিশুমৃত্যু, অকালমৃত্যু, প্রসূতি-মৃত্যুর সংবাদে অভ্যস্ত আমাদের কাছে মহামারীও গা-সহা। উত্তর-চল্লিশের বয়সগুলিকে আমরা উপরি পাওনার মত জ্ঞান করি। অতএব হঠাৎ যদি খবর পাই যে, আমাদের আয়ুর পরিমাণ দীর্ঘতর হতে চলেছে, গত দুই দশকেই গড়ে দশ বছর বেড়েছে, তবে নিজেদের প্রায় অমৃতস্য পুত্র জ্ঞান করি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য-বিভাগের ঘোষণাটি সেই কারণেই প্রাণে-প্রাণে উল্লাস সঞ্চার করেছে। উল্লাস অবশ্য বিস্ময়াবিমিশ্র; কেননা, একথাও ভাবতে হচ্ছে যে, বিধাতার এই আশীর্বাদ এল কোন্ পথে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত এখনও শুকায়নি। এখনও এদেশে পর্যাপ্ত অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, আর অন্নবস্ত্র যেখানে নেই, সেখানে আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ুর কথা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। তবু পরিসংখ্যান যদি মানি, তবে স্বীকার করতেই হয় যে, অপুষ্ট, জীর্ণ দেহ নিয়ে নানা প্রকারের হাঁচি এবং কাশি সত্ত্বেও আমরা বেঁচে আছি, অন্তত আগেকার তুলনায় বেশী দিন বাঁচছি। মৃত্যুর হার কেবল কাবু নয়, একেবারে আধখানা হয়ে গেছে। অনেক রোগ এখনো আর 'মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ' নয়, ম্যালেরিয়া ত পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় নির্বাসিত। প্রমাণ

—দার্জিলিং জেলার সরকারী সিঙ্কোনা বাগানে কুইনিনের খদ্দের নেই। কলেরা-উদরাময়ে মৃত্যুর হার অধোমুখ। অবশ্য যক্ষ্মার প্রভাব এখনও অপ্রতিহত। রাজ-কুলের মত এই রাজ-রোগটিকে আজও বিশ্বাস নেই। ক্ষয়রোগে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে কেন, তাও অবশ্য আমরা জানি। এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নতি ঘটেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে পথ্যও যে চাই রাজসিক। তার সংস্থান করা সম্ভব হয়নি। গত দশ বছরে শিশু-মঙ্গল, মাতৃসদন ইত্যাদিরও যথেষ্ট সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে, সুফলেই তার পরিচয় আছে। শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা কমেছে, প্রসূতি মৃত্যুর হারও পূর্ববর্তী দশকের তুলনায় অর্ধেকেরও নীচে। গত দশ বছরে বসন্তের প্রতিষেধক টীকা সম্পর্কে কুসংস্কার প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে, বি সি জি নিতেও বহু হাত প্রসারিত হয়েছে। বেড়েছে আমাদের ঔষধের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতাও। চিকিৎসা খাতে আমাদের মাথাপিছু ব্যয় আগে ছিল ০·৯৫ টাকা; এখন ২·৯৫ টাকা।

উপরের হিসাবের সবটাই খোসখবর। তবু একটু খতিয়ে দেখা ভাল। নিরাময়ের চেয়ে প্রতিরোধের প্রয়োজন জরুরী। আর প্রতিরোধের প্রাচীরের ভিত্তি হল ভাল খাওয়া, থাকা। উপযুক্ত আহার বাসের, সামগ্রিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না হওয়া অবধি নিছক মৃত্যুহার হ্রাস নিয়ে উদ্বাহু হবার হেতু নেই। মৃত্যুকে রোধ করলাম কিন্তু সেই সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে, বিনিময়ে পেলাম কী। প্রাণ? কিন্তু শুধু প্রাণধারণের গ্লানিও তো দুঃসহ।

■ ■ ■

প্রথমে কেন্দ্রীয় শিক্ষা পরামর্শদাতা বোর্ডের সভায়, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের ভাষণে শিক্ষা বিষয়ের কয়েকটি সমস্যার প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সমস্যাগুলি অবশ্য পুরাতন, নতুন করে তার ওপর আলোকপাত করা হল মাত্র।

শিক্ষা ব্যবস্থার যাঁরা কর্ণধার, তাঁরা বিচলিত হয়েছেন ছাত্রের সংখ্যাধিক্যে। এবং উচ্চশিক্ষার্থীর সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের নানা উপায় চিন্তা করছেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাধারণভাবে বাড়ছে, এটা বিস্ময়ের নয়, কেন না, বেড়েছে জনসংখ্যা, সেই সঙ্গে সাক্ষরতার হার। একে বরং দেশের অগ্রগতির অন্যতম লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করাই সঙ্গত। শিক্ষাগ্রহীর সংখ্যা বাড়ছে, সুলক্ষণ, কিন্তু কী শিখছে এই প্রশ্নে অনেকেই অধোবদন হবেন। পাঠ্য বিষয়বস্তু অপ্রয়োজনীয় তথ্যের বোঝায় ভারী, অনেকেই স্বীকার করেন, কিন্তু তার মৌলিক কোন পরিবর্তন ঘটাতে অদ্যাবধি কেউ অগ্রসর হয়ে আসেননি। স্কুল-পরীক্ষার সাফল্য একজন ছাত্রকে কতটুকু জ্ঞান দেয়? যা দেয় তার কতটা আবার প্রত্যহের জীবন সংগ্রামের জন্য তাকে উপযোগী করে করে তোলে? আমাদের পাঠ্যতালিকায় বাস্তব প্রয়োজন উপেক্ষিত।

সরস্বতীর পায়ে বছর বছর অঞ্জলি দিয়ে বিদ্যাং দেহি এই বর যারা প্রার্থনা করে অংগনে প্রবেশের অধিকারী তাদের অনেকেই নয়। প্রবেশের আগ্রহ বা উৎসাহও অনেকের নেই। তবু যে আসে সেটা অনেকটাই দলে পড়ে, গুরুজনের ইচ্ছায়; জানে আসাটাই রীতি। জ্ঞানার্জন পরোক্ষ লক্ষ্য। আসল লক্ষ্য চাকরি। ডিগ্রি থাকলেই যে চাকরি মিলবে সে স্থিরতা নেই কিন্তু না থাকলে যে জুটবে না, সেটা একরকম স্থির। চাকরির জন্যে ডিগ্রি আবশ্যক নয়, এই ঘোষণা ছাত্রসংখ্যা স্ফীতির সমস্যা আংশিকভাবে সুরাহা করতে সম্পূর্ণভাবে নয়।

শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার প্রয়াসীরা একথাও বিবেচনা করলে [illegible] করবেন যে, সাংবাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ, আজ যা ছাত্রদের অদৃষ্ট নিয়ে জুয়ার নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে তার অবসান ঘটানও সঙ্গত কি না। টিউটোরিয়াল ক্লাস, সাপ্তাহিক মৌখিক পরীক্ষা, প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহ [illegible] ইত্যাদির মাধ্যমে গুণাগুণ বিচারের অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে।

বিজ্ঞপ্তি

খ্যাতিমান কথাসাহিত্যিক শ্রীগৌরকিশোর ঘোষের নূতন উপন্যাস

জল পড়ে পাতা নড়ে

আগামী সংখ্যা হইতে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক 'দেশ'

২৬শে জানুয়ারী

বঙ্কিমচন্দ্র সেন

২৬শে জানুয়ারী ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস। একাদশ বৎসর পূর্বে এই দিন ভারতে নূতন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। দীর্ঘদিনের পরাধীনতায় অভিভূত ভারতের বিশ্বজগতে অভিনব স্বাধীন সাধারণতন্ত্র-স্বরূপে অভ্যুত্থান, সর্ববিধ পরকীয় প্রভাব বিনির্মুক্তভাবে ভারতের আত্মার এমন বলিষ্ঠ বিকাশ জগতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। অপর দেশও পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ইতঃপূর্বে নিজেদের সংবিধান নিজেরা রচনা করিয়াছে, কিন্তু সেই সব দেশের স্বাধীনতা লাভ এবং সংবিধান প্রণয়নের দ্বারা আত্ম-প্রতিষ্ঠার মূলে ভারতের মত এত জটিল সমস্যা জড়িত ছিল না। ভারত নানা জাতি, নানা সম্প্রদায় এবং বিবিধ ভাষায় বিভক্ত: এরূপ অবস্থায় ভারতের সর্বজনের সমানাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণতন্ত্রসম্মত সংবিধান রচনা এবং জনগণের সমর্থনে তাহার প্রবর্তনা সহজ ব্যাপার ছিল না; অথচ অপরাপর দেশের অপেক্ষা ভারতের পক্ষে এই কাজ সহজে সম্পন্ন হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সমষ্টিমনের মূলে ইহার জন্য পূর্ব হইতেই যেন প্রস্তুতি ছিল এবং এদেশের আত্মা এতদুপযোগী শক্তি সঞ্চয় করিয়া উন্মুখ ছিল। এজন্য নিতান্ত স্বাভাবিক কারণে সাধারণতন্ত্রস্বরূপে ভারতের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে।

কোথা হইতে আসিল এই শক্তি—জাগিল বহুদিনের সুপ্ত ভারতের পক্ষে আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্ররোচক এই প্রদীপ্তি? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে এদেশের ঐতিহ্যের মূলে আমাদিগকে যাইতে হয়। তাহার ফলে এই সত্যই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারত কোন দিনই নির্বিবাদে পরকীয় প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লয় নাই। বিভিন্ন জাতিকে আত্মস্থ করিয়া লইবার মত উদার চেতনা ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত শক্তিস্বরূপে কাজ করিয়াছে। ইহা সত্য, কিন্ত সে সত্য ভারতের আত্মাকে পিষ্ট করিতে পারে নাই। ভারত আত্মচৈতন্য হারায় নাই। প্রত্যুত ভারতের চৈতন্যসত্তার উপর পরকীয় প্রভুত্ব যখনই আঘাত করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখনই প্রতিরোধের শক্তি এখানে জাগিয়া উঠিয়াছে, সংঘর্ষ ছুটিয়াছে এবং ভারত-ভূমি শোণিতে সিক্ত হইয়াছে। আত্মনিষ্ঠ এই শক্তি ভারতের অন্তরে ছিল; ব্যক্তিত্বের আশ্রয় করিয়া সে শক্তি উদ্দীপ্ত হইয়াছে। তাহার মূলে ব্যাপ্তি ভাবনা ছিল না। শিবাজী, রণজিৎ সিংহ, হায়দার আলীর ন্যায় যোদ্ধা এদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন, কূটনীতিকের অভাবও এদেশে ঘটে নাই; তথাপি স্বদেশ-প্রেম বা জাতীয়তাবাদের ব্যাপ্তি ভারতের সমাজ-জীবনে আগ্নেয় বীর্য সঞ্চার করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহার ফলে এত বড় একটা দেশকে সুদীর্ঘকাল

পরাধীনতার গ্লানি ভার বহন করিতে হইয়াছে এবং বিশ্ব মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারত সমুচিত মর্যাদা লাভের অধিকারী হয় নাই।

এই দিক হইতে বিচার করিলে সিপাহী বিদ্রোহকে স্বাধীনতা লাভে ভারতের প্রথম উদ্যম বলা যাইতে পারে। কতিপয় বিশিষ্ট নেতার ব্যক্তিত্ব এই অভ্যুত্থানের মূলে কাজ করে ইহা সত্য; কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও অস্বীকার করা চলে না যে, তাঁহাদের সেই ব্যক্তিত্বের মূলে জনগণের ব্যাপ্তি-চেতনাও ছিল এবং সংহতির একটা ভাবও দানা বাঁধিয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সেই চেতনা পরকীয় প্রভুত্বকে উৎখাত করিবার মত ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষা তখন লাভ করিতে পারে নাই। এজন্য সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ইহার পরে স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেসের অবদানের প্রসঙ্গ সাক্ষাৎ- সম্পর্কে আসিয়া পড়ে। কিন্তু বাঙলা দেশের অগ্নিযুগের বৈপ্লবিক বীর্য কংগ্রেসের সাধনায় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের আদর্শকে একান্ত ও জীবন্ত করিয়া তোলে। সমগ্র ভারতের মনের মূলে সেই আন্দোলন সাড়া জাগায়। সেই আলোড়ন স্বদেশের স্বাধীনতার বেদী-মূলে আত্মাহুতির যে হোমানল প্রজ্বলিত করে, তাহার প্রদীপ্তিতে কংগ্রেস জনচিত্তে স্বদেশপ্রেমের ব্যাপ্তিশীল অনুভূতি সঞ্চারের সামর্থ্য লাভ করে। বিদেশী প্রভুদের বহু আবেদন-নিবেদনের হীনতা এবং দীনতা হইতে কংগ্রেস মুক্ত হইবার পথ পায় এবং জগতে সর্বপ্রধান জন-প্রতিষ্ঠানস্বরূপে সে আত্মশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ইহার পর ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে। অহিংসার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হন। অস্ত্রস্বরূপে মহাত্মাজীর অহিংসার সাধনা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে কতখানি শক্তি সঞ্চার করে, সে বিচারটি অপেক্ষাকৃত পরোক্ষ, প্রত্যক্ষভাবে গান্ধীজীর সাধনায় জাতির মর্মমূলে স্বাধীনতা লাভের ব্যাপ্তিশীল ভাবনা একান্ত এবং দুরন্ত বীর্যে সম্প্রসারিত হয়। এদেশের স্বাধীনতার সাধকগণ আত্মোৎসর্গের যে প্রেরণা জাতির অন্তরে ইতঃপূর্বে সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহার অনুবৃত্তির উপযোগী শক্তি সমাজের সকল স্তরে উজ্জীবিত হয় নাই—গান্ধীজী সর্বস্তরে সেই শক্তির উজ্জীবন সামর্থ্য সংযোগের সূত্র আত্মভাবে উন্মুক্ত করেন। সমাজের সকলের জন্য দুঃখ এবং বেদনা, অন্য কথায় সমাত্ম-ভাবনাই মহাত্মাজীর সাধনার প্রভাবে উদ্দীপ্ত হয়। গান্ধীজীরই নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম অহিংস নীতির মূলীভূত এই মানবতাবোধই বলিষ্ঠ এবং দুর্ধর্ষ হইয়া উঠে। সমুদ্দীপ্ত সমাত্মবোধের এই প্রশস্ততর ভিত্তিতে সুভাষচন্দ্রের আগ্নেয়বীর্য বিস্তার—এক অভাবনীয় ব্যাপার। ইহাতে বৈদেশিক শাসক শক্তি এদেশ হইতে উৎখাত হয়। বৈদেশিক শাসকের দল নিজেদের একান্ত অসহায়ত্ব উপলব্ধি করিয়া এদেশ হইতে সরিয়া পড়ে।

এশিয়ার কয়েকটি দেশের বর্তমান রাজনীতিক প্রতিবেশ গণতন্ত্রী ভারতের উদ্বেগের কারণ সৃষ্টি করিয়াছে। থাইল্যাণ্ড ও পাকিস্থানের অবস্থা এতৎসম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব দেশে সামরিক

একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ব্রহ্মের অবস্থা অনুরূপ না হইলেও সাধারণতন্ত্রের ভিত্তিকে সেখানেও বিপর্যস্ত করিয়াছে। এই সব কারণে এশিয়ার দেশগুলিতে সাধারণতন্ত্রের উপযোগী রাজনৈতিক প্রতিবেশ আজও গড়িয়া ওঠে নাই—প্রতীচ্য রাজনীতিকেরা মুখে না বলিলেও মনের কোণে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের পক্ষেও এইরূপ আশংকার কারণ আছে কি, এমন প্রশ্নও উঠিয়াছে।

আমরা কিন্তু এ সম্বন্ধে একটু উদ্বেগের কারণ দেখি না। প্রত্যুত ভারতে অনুরূপ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযোগী পরিস্থিতি ঘটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। বস্তুত এখানে তেমন উদ্যম অংকুরেই বিনষ্ট হইবে, জনগণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান দুই দিনেই তেমন অপচেষ্টার উৎখাত সাধন করিবে। ভারতের রাজনীতিক সংগ্রামের ঐতিহ্যের বলে জনসাধারণ এখানে এমনই সজাগ যে, ক্রীতদাসের মত একনায়কত্ব তাহারা একদিনের জন্যও মাথা পাতিয়া লইবে না। বলা বাহুল্য, পাকিস্থানের ঐতিহ্য যদি অব্যাহত থাকিত, তবে সেখানেও একনায়কত্বের হুকুম-বরদারী চলিত না। কিন্তু ভারত ও পাকিস্থানের ঐতিহ্য এক হইলেও পাকিস্থানের সাম্প্রদায়িকতামূলক ভেদবাদ সেই ঐতিহ্যের উৎখাত সাধন করিয়াছে। স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মদাতা সন্তানদের অবদানকে পাকিস্থানের রাজনীতিকেরা একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। তাহার স্থলে সাম্প্রদায়িকতামূলক ভেদবাদের উপর তাহারা অনবরত জোর দিয়াছেন। কিন্তু শুধু ভেদ-বিদ্বেষের উপর কোন গঠনমূলক কার্য সম্পন্ন হইতে পারে না; অধিকন্তু জনস্বার্থ রক্ষার যে আদর্শ সাধারণতন্ত্রের মূলে শক্তিস্বরূপে কাজ করে, জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার ও সেবার সেই আদর্শের উদ্দীপনা হইতে পাকিস্থান বঞ্চিত হইয়াছে। পাকিস্থানের রাজনীতির কর্ণধারগণ উপদলীয় স্বার্থের ভেদ-বিদ্বেষের কৃত্রিম ভিত্তির উপর নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সুতরাং জনশক্তি সেখানে রাষ্ট্রীয় আদর্শ রক্ষায় জাগ্রত হইতে পারে নাই। স্বদেশ-প্রেম বা জাতীয়তাবাদ সেখানে আগ্নেয়বীর্য উদ্দীপিত করে নাই। পাকিস্থান আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ ধারাটি ধরিতে পারে নাই, চাহেও নাই—পরন্তু পরকীয় শক্তির দুয়ারে সে নিতান্ত বশংবদভাবে ভিক্ষাপাত্র সম্প্রসারিত করিয়াছে এবং নিজের দৈন্যের ভাবই এইভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। পাকিস্থানের বিড়ম্বনার কারণ রহিয়াছে এইখানে।

একাদশ বৎসর হইল ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের সাধারণতন্ত্র বিশ্বজগতে বিঘোষিত হইয়াছে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই। আত্মশক্তির সংগঠনে এবং জাতির জনগণের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে ভারতের প্রচেষ্টা অতন্দ্রিত-ভাবে চলিতেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত আজ মর্যাদার শীর্ষদেশে অধিষ্ঠিত। আমাদের অভাব-অভিযোগের কারণ অনেক রহিয়াছে, কিন্তু জাতির রাষ্ট্রীয় আদর্শের দিক হইতে এইগুলি অপেক্ষাকৃত পরোক্ষ। প্রকৃতপক্ষে আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি এবং জনগণের সর্বাঙ্গীণ অধিকারের উপর সেই স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ভারত-বাসী বর্তমানে কাহারো দাস নহে। তাহারা প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পরিচালনায় অধিকারসম্পন্ন। মানবোচিত এই যে মর্যাদা ভারতীয় সংবিধানে সকল ভারতবাসীর জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাই বড় কথা। দুঃখ-কষ্ট আমাদের অগ্রগতির পথে আসে আসুক, সেজন্য আমরা শঙ্কা করিব না। সকল মহৎ সিদ্ধি পরম প্রয়াসে—শুধু নিজেদের স্বার্থ সুবিধার দিকে যাহাদের নজর, তাহারা মানুষ নয় এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের নাগরিকের মর্যাদাবোধ তাহার জাগে নাই। পশু প্রবৃত্তির তাহারা দাস। আমরা মানুষ—স্বাধীনতা আমাদের জন্মগত অধিকার। আপনার পূর্ণ অধিকার আমরা চাই। সেই অধিকার রক্ষার জন্য জীবনের সর্বকিছু উৎসর্গ করিতে আমরা প্রস্তুত থাকিব। ভারতের প্রজাতন্ত্রের আদর্শ মনুষ্যত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, স্বেচ্ছাচারের ছাপ এখানে নাই। আমরা অপরের হাতে ক্রীড়নক হইয়া চলিব না, বরং প্রয়োজন হইলে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করিয়া রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রণে আমাদের সকলের অধিকার রক্ষা করিব। সাধারণতন্ত্র দিবসে আমরা এই সংকল্প গ্রহণ করিতেছি। 'সর্বং আত্মবশং সুখং—সর্বং পরবশং দুঃখম'—ভারতীয় সংস্কৃতির ইহাই বাণী। এই বাণী আজ দিকে দিকে বিঘোষিত হোক। ভারতের সাধারণতন্ত্র বিশ্বমানবের মুক্তি সাধনাকে জয়যুক্ত করিয়া তুলুক।

॥ রঞ্জন ॥

আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবসোৎসব দেশের সর্বত্র বিপুল উৎসাহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হবে, তার সরব আয়োজন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। সামরিক কুচকাওয়াজের মহড়া হয়েছে কলকাতায়, পঁচিশে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি বেতারে ভাষণ দেবেন। উদ্দীপনা সব সময় স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে না, বাইরের প্রেরণা মাত্রই তা অশ্রদ্ধেয় নয়। আমাদের একাধিক উন্মাদনা বা উৎসাহের উৎস সন্ধান করলে বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটতে পারে। হয়তো দেখব, তার মূলে অনেকখানি আছে বাইরের বক্তৃতা, বিজ্ঞাপন বা প্রচারের পরোক্ষ প্রভাব। আমরা যারা মনে করি আমাদের সব মত স্বীয় স্বাধীন চিন্তার অবিসংবাদিত সন্তান, তারা ভুল করি। ডক্টর কেশকরের এ দাবি আদৌ অমূলক নয় যে, জ্ঞানত জনরুচি উপেক্ষা করে বেতারে রাগসংগীত প্রচার করে তিনি এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেছেন। আমাদের অনেক পছন্দ এবং অপছন্দ অনুরূপভাবে অপরের আরোপ। প্রজাতন্ত্র দিবসে বহুর উৎসাহ যদি তাই সরকারী প্রচারের ফলস্বরূপ হয়, তাহলে আমি অন্তত সেজন্য সরকারকে বা উৎসাহী জনতাকে দোষী করব না।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের আদর্শ অতি মহৎ। লিখিত আইনের চোখে প্রত্যেকের সাম্য, সুবিচারে সকলের অধিকার, জাতি বর্ণ ইত্যাদির দমন আমাদের জাতির মজ্জাগত নয়। সংবিধানের বহু অংশ বাইরে থেকে আমদানী করা এবং জাতিচরিত্রে সেগুলির স্থাপন সচেতন আয়াস ব্যতীত অসম্ভব। প্রজাতন্ত্র দিবসের সার্থকতাই এই যে, এদিন আমরা স্মরণ করব, আমাদের সংবিধান বর্তমান আকারে গ্রহণ করে আমরা নিজেদের স্কন্ধে কী গুরু দায়িত্ব বহন করবার শপথ নিয়েছি। এই শপথের কথা স্মরণ না করলে সকল উৎসব ব্যর্থ।

*

"ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত" অনেকের দাবিতে সংবিধানে এই কথা কটি অন্তর্ভুক্ত হয়। এ দাবির তাৎপর্য বৃহৎ। এই ভ্রান্ত ধারণা ব্যাপক যে, ভারতীয় সংবিধান ভারতীয় ইতিহাস ও জীবনাদর্শের প্রত্যক্ষ সন্তান। "ভারতীয়" কথাটির সঠিক সংজ্ঞা আমার অজানা, কিন্তু তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল সমালোচকদের একটি মতের সঙ্গে সায় দিতে আমি বাধ্য। কনস্টিটিউয়েণ্ট অ্যাসেম্বলিতে লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু বলেছিলেন—

"The ideals on which this Draft Constitution is framed have no manifest relation to the fundamental spirit of India....what is there in the Constitution to be proud of ?

আর শ্রীহনুমন্তায়া বলেছিলেন:

"We wanted the music of Veena or Sitar, but here we have the music of an English band."

তাই দরকার ছিল 'ইণ্ডিয়া'র পরে 'ভারত' যোগ করবার, যদিও পরে পাকিস্থানী পত্রিকাগুলি যখন 'ভারতী' লিখতে আরম্ভ করল, তখন আমাদের উষ্মার সীমা রইল না।

এখানি যোগ করা দরকার, উদ্ধৃত সমালোচনার সত্যতাই শুধু আমি মানি। উক্তিতে নিহিত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমার শত্রুতা সামগ্রিক।

*

আমি আদৌ লজ্জিত নই যে, ভারতীয় সংবিধানে খাঁটি স্বদেশী (তার মানে যাই হোক) অংশ অপ্রধান। আইডিয়ার রাজ্যের সীমানা নেই, অন্তত আমি তা মানিনে। দুই আর দুয়ে চার, এই সূত্রটায় যেমন কোনো দেশ, ব্যক্তি বা জাতির স্বত্বাধিকার নেই: মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্বে যেমন কারো মালিকানা নেই: 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' যেমন ভারতের সম্পত্তি নয়: তেমনি আমাদের সংবিধানে বাইরে-থেকে-আনা আদর্শগুলিতে আমাদের পূর্ণ অধিকার আছে। বীণা ও সেতার শুনতে আমি ভালোবাসি, কিন্তু পিয়ানো বা বেহালার প্রতি আমি বীতরাগ নই। ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আমার আনুগত্য অবিভক্ত। আমি গর্বিত যে, আমি রিপাবলিক অব ইণ্ডিয়ার নাগরিক।

তবু আমার আছে দ্বিতীয় রিপাবলিক, তার নাম রিপাবলিক অব লেটার্স। সে রিপাবলিকে সংকীর্ণ জাতীয়তা নেই, তার প্রতি আনুগত্য আর-সব আনুগত্যের ঊর্ধ্বে। 'ডক্টর জিভাগো' নামক উপন্যাসের লেখক বরিস পাস্তেরনাক সোভিয়েট রাশিয়া নামক দেশের অনুগত নাগরিক, কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। তিনি বিশ্বের রিপাবলিক অব লেটার্সের সম্মানিত নাগরিক। দুয়ে যদি বিরোধ বাধে, যেমন বেধেছে, তখন কোন আনুগত্য প্রথম হবে তা যাকে বলে দিতে হবে তাকে বলবার প্রয়োজনই নেই, কেননা তার সামনে এ সমস্যা দেখা দেবার সম্ভাবনাই অনুপস্থিত।

আমি এই দ্বিতীয় রিপাবলিক অব লেটার্সের বিনীত নাগরিক বলেই ভারতীয় সংবিধানের ভারতীয়ত্ব নিয়ে আমার ভাবনা অতি পরিমিত। আমি এর উচ্চাদর্শ নিয়েই সন্তুষ্ট। সংশয়ের কারণ অন্য।

*

আবার ফিরে যাই তাহলে হনুমন্তায়ার উপমায়। বীণা ও সেতার শুনতে আমাদের কান শৈশব থেকে অভ্যস্ত। স্বভাবতই শুনতে ভালো লাগে। পিয়ানো ও বেহালার জন্য চাই অর্জিত রুচি, সজ্ঞান অনুশীলন। আমাদের সংবিধান যদি সর্বাংশে জাতিচরিত্রের অনুগামী হোত, তাহলে এত পরিশ্রমের প্রয়োজন হোত না। যেমন চলছিলাম, তেমনি চলা যেত। আসলে আমরা দেশ ও জাতির পুনর্গঠনের জন্য এমন মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি, যা অনেক দিক থেকে আমাদের ঐতিহ্যের বিপরীত। অতএব সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের অর্থ হবে আমাদের জাতীয় আচরণে গভীর এবং ব্যাপক বিপ্লব, সমাজব্যবস্থার ও দৃষ্টিভঙ্গীর মৌল পরিবর্তন।

এতদিন ভেবেছি জাতিভেদের কথা, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের অমোঘ প্রভেদের কথা। সংবিধান দিয়েছে তাকে বেআইনী করে। এতদিন স্ত্রী-পুরুষের সাম্য ছিল শুধু সমাজের বিশেষ শ্রেণীতে আবদ্ধ। সংবিধান সে অধিকার দিয়েছে সবাইকে। জমিদার আর প্রজার সম্পর্ক এতকাল কী নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তা কারো অজানা নেই। প্রজাতন্ত্রে তার স্থান নেই, জমিদারিই বিলুপ্তপ্রায়।

সংবিধান ভালো কাগজে লেখাই যথেষ্ট নয়। তার মূলনীতি লেখা হওয়া দরকার প্রতি নাগরিকের হৃদয়ে। এটা শুধু সময়সাপেক্ষ নয়, আয়াসসাপেক্ষও বটে। এই আয়াসের শুরুই হয় না যদি না তার আগে এ সত্য স্পষ্ট স্বীকৃতি পায় যে, সংবিধান আমাদের স্বভাবপ্রসূত নয়, এ শুধু আমরা যা তার চাইতে ভালো হবার প্রতিজ্ঞা।

আমার কাছে ছাব্বিশে জানুয়ারীর দ্বিতীয় অর্থ নেই।
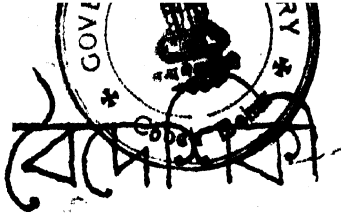
২১শে জানুয়ারী থেকে করাচীতে বাগদাদ প্যাক্ট কাউন্সিলের অধিবেশন হচ্ছে, কমিটিগুলির অধিবেশন তার একদিন আগেই আরম্ভ হবে। বর্তমান প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পূর্বেই করাচীর আলোচনার সংবাদ (যেটুকু বাইরে বলা যায়) কাগজে বেরিয়ে যাবে। কতকগুলি প্রশ্ন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা অনেকদিন আগে থেকেই অবশ্য চলছে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, যাকে নিয়ে গোড়াপত্তন, সেই ইরাকের সঙ্গে এই চুক্তির এখন কী সম্বন্ধ? ইরাকী বিপ্লবের পরে নানারকম উল্টোপাল্টা কথা শুনা গেছে। কখনো শুনা গেছে যে, ইরাকের নূতন সরকার বাগদাদ চুক্তির সংস্রব ত্যাগ না করে পারেনই না। আবার একথারও রটনা হয়েছে যে, কাসেম সরকার যে ইরাককে বাগদাদ প্যাক্ট থেকে বার করে নিয়ে আসবেনই, এমন কথা ধরে নেওয়া যায় না। প্যাক্ট কাউন্সিলের গত অধিবেশন লন্ডনে হয়, ইরাকী বিপ্লব সংঘটনের অব্যবহিত পরে। সেই গোলমালের অবস্থায় পরে কী হবে না হবে, কিছুই বুঝা যায়নি। বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুটা অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি করে রাখা হয়ত বিপ্লবী সরকারেরও ইচ্ছাকৃত ছিল। কিন্তু ইরাকী বিপ্লবের যে ধারা তাতে ইরাকের পক্ষে বাগদাদ প্যাক্টের ভিতরে থাকা কীরকম করে সম্ভব হতে পারে বুঝা যায় না, কারণ এই বিপ্লব (অথবা আরব জগতে অন্যত্র যেখানেই সে বিপ্লব ঘটুক) যে-ভাবশক্তির দ্বারা বিশেষ করে প্রণোদিত তার একটি মূল কথা হচ্ছে স্বাধীনতা এবং পররাষ্ট্রনীতিতে ব্লক নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা। পশ্চিমা শক্তিদেরই এতকাল আরব জগতের উপর আধিপত্য ছিল, সুতরাং আরব রাষ্ট্রগুলির জাতীয় পুনরভ্যুত্থানের প্রথম পর্যায়ে পশ্চিমা শক্তিদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। এই কারণে যে কোনো আরব বিপ্লবেরই সুর প্রথম দিকে পশ্চিমাবিরোধী এবং তুলনায় কিঞ্চিৎ সোভিয়েট-ঘেঁষা হতে বাধ্য, বিশেষত যখন পাল্টা সোভিয়েট প্রভাবের সাক্ষ্য অথবা পরোক্ষ চাপ ছাড়া পশ্চিমাদের হটাবার কৌশল আরব রাষ্ট্রগুলির জানা নেই। এ রকম অবস্থায় বাগদাদ প্যাক্টের মতো কোনো চুক্তির মধ্যে বর্তমান ইরাকের পক্ষে থাকা সম্ভব হতে পারে না। এক ব্লকের সঙ্গে জড়িত কোনো সামরিক প্যাক্টের মধ্যে থাকায় কোনো আরব রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী জনমতের সম্মতি থাকতে পারে না। তাছাড়া ইরাকে কাসেম সরকারের উপর কম্যুনিস্ট দলের অনেকটা প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে বলে প্রকাশ। সেই কারণে মার্কিন দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল এই কম্যুনিস্টবিরোধী প্যাক্টের ভিতর বৃটেন, তুর্কী, ইরান এবং পাকিস্তানের সঙ্গে ইরাক সাময়িকভাবে যুক্ত থাকবে এটা অসম্ভব মনে হয়। বাগদাদ চুক্তির শর্ত অনুসারে কাউকে ছেড়ে যেতে হলে আগামী বছরের মে মাসের আগে ছাড়া নোটিশ দেওয়া যায় না। সুতরাং ইরাক নোটিশ দিয়ে বাগদাদ প্যাক্ট থেকে বিযুক্ত হবে, এ রকম নাও হতে পারে। সম্ভবত কার্যত প্যাক্ট থেকে সরে আসার পলিসিই ইরাক নিয়েছে। ইরাকও কিছু ঘোষণা করবে না, কিছু ঘোষণা করার জন্য ইরাকের উপরও কোনো চাপ দেওয়া হবে না। প্যাক্টের দরুণ যদি ইরাকের অসামরিক এবং

অরাজনৈতিক কোনো সুবিধা বা সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা থেকে থাকে তবে সেগুলোকে বন্ধ করে দিতে আমেরিকাও না চাইতে পারে। এমন কি ইরাকের বাগদাদ প্যাক্টের বাইরে চলে যাওয়াটা ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষের অপছন্দ নাও হতে পারে। বাগদাদ প্যাক্ট পশ্চিমা শক্তিদের সঙ্গে আরব জগতের মনোমালিন্য বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ কেননা বাগদাদ প্যাক্ট আরব জগতের রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার একটি অস্ত্র বলে আরবগণ মনে করে। তারা মনে করে, আরব জগতে নাসেরের নেতৃত্বকে ক্ষুণ্ন করাই বাগদাদ প্যাক্টের একটি বড় উদ্দেশ্য। তার জন্য ইরাককে মিশরের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে খাড়া করার চেষ্টা হয়েছে। ইরাক একমাত্র আরব রাষ্ট্র যাকে বাগদাদ প্যাক্টের সূত্রে বেঁধে মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভেদের একটি ধ্বজা উড়িয়ে রাখা হয়েছিল। তাতে পশ্চিমা শক্তিদের যে কোনো লাভ হয়নি, বরঞ্চ অনেক ক্ষতি হয়েছে তার প্রমাণ গত তিন চার বছরের ইতিহাসে ছড়ানো রয়েছে। পশ্চিমা শক্তিদের মধ্যেও এখন এই চেতনা কিছুটা হয়েছে যে, যে-নীতি দৃশ্যত আরব জগতের ঐক্যের পরিপন্থী বলে আরবদের কাছে প্রতিভাত হবে সে নীতির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আরব জগতের জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক বিভেদের এমন অনেক কারণ থাকতে পারে এবং আছেও, যেগুলো বাইরের কোনো শক্তির প্ররোচনা ছাড়াই যথেষ্ট অকাজ করতে পারে। কিন্তু স্বভাবতই আরবদের দৃষ্টি তার চেয়ে সেই সব ব্যাপারের উপর বেশি করে পড়ে, যেগুলোর পিছনে বিদেশীর হাত আছে অথবা হাত আছে বলে সন্দেহ করা স্বাভাবিক। সে দিক দিয়ে প্যাক্টের বন্ধন থেকে ইরাককে 'হারানো'তে পশ্চিমা শক্তিদের পক্ষে নীতি পরিবর্তন করা সহজতর হবে। প্যাক্টের মধ্যে যদি কোনো আরব রাষ্ট্র না থাকে, তবে পশ্চিমা শক্তিদের নীতি সম্পর্কে আরবদের সন্দেহ কিছুটা প্রশমিত হবে, অবশ্য তার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অন্য দিকেও পশ্চিমা নীতি পরিবর্তনের কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের সঙ্গে পশ্চিমা শক্তিদের সম্বন্ধ পূর্বের চেয়ে ক্রমশ ভালো হচ্ছে। সম্প্রতি বৃটেনের সঙ্গে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের ঝগড়ানিষ্পত্তির একটা চুক্তি হয়ে গেছে। সুয়েজ ক্যানেলের জাতীয়করণ, তার পর সুয়েজ যুদ্ধ এবং মিশরে বৃটিশ ব্যবসাদির বাজেয়াপ্তকরণ, বৃটেনে মিশরের জমা টাকার উপর ক্রোক প্রভৃতি থেকে দুপক্ষের পরস্পরের বিরুদ্ধে যে সব ক্ষতিপূরণের দাবি ছিল তার অনেকগুলির মিটমাট করে চুক্তি হয়েছে। সুয়েজ যুদ্ধের পর থেকে এতদিন উভয় দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল, আবার সেই সম্বন্ধ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শীঘ্রই আবার কায়রোতে বৃটিশ রাজদূত এবং লণ্ডনে ইউনাইটেড আরব রিপাব্লিকের রাষ্ট্রদূত দেখা দেবেন। ইরাকের সঙ্গে ইউনাইটেড আরব রিপাব্লিকের সম্বন্ধ বর্তমানে তত মধুর নয়। নাসেরের (স্বদেশে) কম্যুনিস্টবিরোধী নীতির তীব্রতা এবং ইরাকে কম্যুনিস্ট-প্রভাব বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই সময়ে ইরাক যে বাগদাদ প্যাক্টের মধ্যে নেই, তাতে ইঙ্গ-মার্কিন নীতির পক্ষে ইউনাইটেড আরব রিপাব্লিকের সঙ্গে পুনরায় ভাল সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করার সুবিধা হচ্ছে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন নীতি যদি ইরাক ও ইউনাইটেড আরব রিপাব্লিকের বর্তমান মন কষাকষির বেশি 'সুযোগ' নেবার চেষ্টা করে তবে তার ফল খারাপ হবে। প্রেসিডেণ্ট নাসেরের পক্ষেও ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গে ভাব করার সঙ্গে সঙ্গে ইরাকের প্রতি বেশি বিরূপভাব দেখানো খুব নিরাপদ হবে না। ইরাক বেরিয়ে যাবার পরে বাগদাদ চুক্তির মধ্যে যে তিনটি এশীয় রাষ্ট্র অবশিষ্ট থাকল, তাদের সঙ্গে বৃটেনকে নিয়ে মার্কিন সাহায্যপুষ্ট যে সংস্থা থাকবে তার সম্ভাব্য ভূমিকা এবং আদি বাগদাদ চুক্তির পরিকল্পিত ভূমিকার মধ্যে পার্থক্য হবে।

১৯।১।৫৯

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুশীল রায়

"শৈলেশ, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে এখানে পাঠিয়ে দাও।"

শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখলেন পতিশরের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের কাছে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের (১৯০২) শ্রাবণ মাসের ঘটনা। এর মাস আষ্টেক আগে (৭ই পৌষ ১৩০৮) শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর সদ্য প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের অধ্যাপনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক অনুসন্ধান করছেন। পতিশর কাছারিতে নবনিযুক্ত সুপারিনটেনডেণ্টকে সম্প্রতি তিনি দেখে এসেছেন ও তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে এসেছেন। এঁকে যোগ্য ব্যক্তি বলে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, এইজন্যে জমিদারির কাছারি থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরেই তিনি খবর পাঠালেন তাঁর ম্যানেজারকে—সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে।

এই কর্মচারীটিই হচ্ছেন পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্র পাওয়া মাত্র হরিচরণ প্রস্তুত হয়ে নিলেন, নৌকাযোগে আত্রাই স্টেশনে এসে সেই রাত্রেই কলকাতায় পৌঁছে, পরদিন সকালের ট্রেনে শান্তিনিকেতনে এসে উপস্থিত হলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে।

নূতন কাজে নিযুক্ত হয়ে গেলেন পতিশর কাছারির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট — আশ্রমে সংস্কৃতের অধ্যাপনার কাজে।

১৩০৯ বঙ্গাব্দের (১৯০২) শ্রাবণের শেষাশেষি তাঁর শান্তিনিকেতনে আগমন; ছাপ্পান্ন বছর পরে ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের পৌষের শেষাশেষি শান্তিনিকেতন থেকে ঘটল তাঁর বিদায়গ্রহণ।

এ বিদায় চিরবিদায়। ২৮ পৌষ ১৩৬৫, ১৩ জানুয়ারি ১৯৫৯, মঙ্গলবার বেলা আড়াই ঘটিকার সময় শান্তিনিকেতনে শান্তিপূর্ণভাবে তিনি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় বিরানব্বই বৎসর।

তাঁর মৃত্যুর ষোলো দিন আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সেই দেখাই শেষ দেখা। ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৮ তারিখে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দুপুর বেলা। তিনি তখন আহারে বসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি শুনে পাশের ঘর থেকে ব্যস্ত হয়ে তিনি বারবার বলতে লাগলেন—'আসছি, আসছি'। বার বার তাঁকে তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করা সত্ত্বেও বুঝি কোনো কাজ হল না।

সরু বাঁশের একটা ছোট লাঠি দিয়ে তিনি দু পাশের দেয়ালে ঘা দিয়ে দিয়ে পথ চিনতে চিনতে এ-ঘরে এসে বসে পড়লেন চৌকিতে। চোখে একেবারেই দেখতে পান না।

বছর ছয় আগে, ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে, তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে তাঁর জীবনের কাহিনী শোনবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর সেদিনের চেহারা এবং সেদিনের গলার স্বর, আর সেদিনের চোখের দৃষ্টির কথা মনে পড়তে লাগল। এই ছয় বছরে অনেক দুর্বল ও অনেক বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছেন হরিচরণ।

আমরা শহরের অধিবাসী, তাই আমাদের উপর অনেক ভরসা বুঝি তাঁদের। চৌকির উপর বসে কুশল প্রশ্নাদি সেরে নিয়ে তিনি বলতে লাগলেন—তাঁর অনেকগুলি পাণ্ডুলিপি আছে, সেগুলি প্রকাশের জন্যে তিনি ব্যগ্র, কলকাতায় কোনো প্রকাশক জোগাড় করা সম্ভব কি না।

তাঁর কথার কোনো স্পষ্ট উত্তর দিতে পারিনি। বিরানব্বই বৎসর বয়সের একজন সুযোগ্য মনীষী ব্যক্তিকেও এভাবে প্রকাশকের জন্যে ব্যাকুলতা জানাতে হয়, এতে কেবল লজ্জিত হয়েছি। আর, অস্পষ্টভাবে ভেবেছি, নতুন নতুন এত বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে, এত রকমের সরকারী উদ্যোগের খবর পাওয়া যাচ্ছে—কিন্তু তার মধ্যে এইসব পাণ্ডুলিপির খবর রাখা হবে না কেন, সেগুলি প্রকাশ করার জন্যে ব্যাকুলতা জানানো হবে না কেন; নানা রকম চেষ্টা নিষ্ঠা ও শ্রম দিয়ে যিনি রচনা করবেন, প্রকাশের জন্যে ব্যাকুলতার দায়িত্বও তাঁর উপর চাপানো থাকবে কেন।

কিন্তু সব কেনর উত্তর পাওয়া যায় না।

দশের যা সাধ্য নয়, তিনি একা তা সমাধা করেছেন। নিষ্ঠা চেষ্টা ও পরিশ্রমের সমবায়ে একটানা একচল্লিশ বছর ধরে কাজ
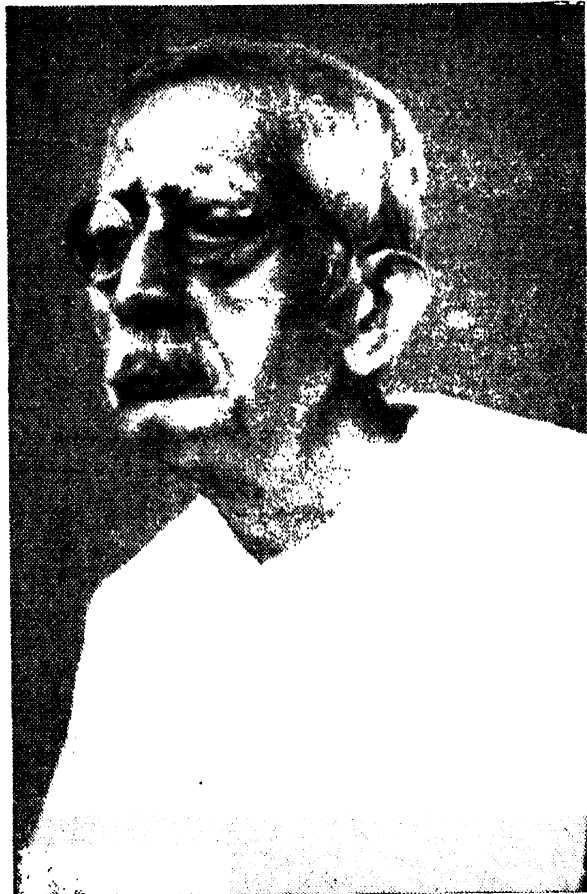
করে তিনি প্রণয়ন করেছেন বঙ্গীয় শব্দকোষ। অভিধান-রচনার কাজ অনেকের কাছে নীরস কাজ মনে হতে পারে। এই নীরস কাজে নিজেকে লিপ্ত রেখেও তারই মধ্যে তিনি সরস কাজও করেছেন। সেগুলি হচ্ছে—অমিত্রাক্ষর ছন্দে ম্যাথু আর্নল্ডের 'শোরাব রুস্তম' অনুবাদ—অর্চনা পত্রিকায় (১৩১৬) মুদ্রিত; অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত খণ্ডকাব্য 'বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র'—ব্রাহ্মণ পত্রিকায় (১৩১৭-১৮) মুদ্রিত; অধ্যাত্ম রামায়ণের পদ্যানুবাদ; 'কবিকথা মঞ্জুষিকা' নামে রবীন্দ্রনাথের উপরে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধ —দেশ যুগান্তর মাতৃভূমি পত্রিকায় মুদ্রিত; রামরাজত্বের বিশদ ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ 'রাজ্য ও রামরাজত্ব'—গান্ধীজীর মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত; 'সত্যনারায়ণলীলা'; 'রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম'—আশ্রমের প্রথম দিকের কথা। ইত্যাদি।

এইগুলিই গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্যে তিনি আগেও বিশেষ আগ্রহ জানিয়েছেন, এবারে যেন একটু ব্যাকুলতাই প্রকাশ করলেন। "কোনো উৎসাহী প্রকাশক যদি এগুলি ছাপার ভার গ্রহণ করেন তাহলে জীবনের শেষ ক'টা দিন পরম পরিতোষ লাভ করি।"

তাঁর এই কথা এখনো যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

এবং দেখতে পাচ্ছি তাঁর সেই চেহারাটিও। বার্ধক্যে কাবু হয়ে যাওয়া সেই চেহারা, দু পাশের দেয়ালে লাঠির ঘা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসার সেই চিত্রটি।

কিন্তু ছাপান্ন বছর আগে প'য়ত্রিশ বৎসর বয়স্ক যে মানুষটি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সংস্কৃত অধ্যাপকের কাজ নিয়ে এলেন, সে চেহারা আন্দাজ করা বড় শক্ত। তিনি এখানে নতুন চাকরি যেন পেলেন না, নূতন প্রেরণায় উজ্জীবিত হলেন এবং নতুন জীবনে অভিষিক্ত।

সেই জীবনই হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন।

যে-কাজে বহাল হয়ে তিনি এলেন, সেই কাজের জন্যে প্রবল ইচ্ছা তাঁর আগে থেকেই ছিল। হরিচরণের পিসতুতো দাদা যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সদরে খাজাঞ্চি ছিলেন। রোজ বিকেলে হরিচরণ তাঁর এই দাদার আপিসে যেতেন। তখন শান্তিনিকেতনে সবে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর দাদার কাছে সেখানকার অধ্যাপকদের অধ্যাপনার বিষয়ে এবং আশ্রম-জীবন সম্বন্ধে তিনি নানা কথা শুনতেন।

তাঁর কথাতেই বলি, "আমার বিদ্যা অল্পই, এই আশ্রমে অধ্যাপনার কথা আমি চিন্তা করতেই পারিনি।"

তাঁর দাদা রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর কথা বলেন। হরিচরণ যখন গ্রামের স্কুলের ছাত্র তখন রবীন্দ্রনাথ যে তাঁকে বৃত্তি দিয়েছিলেন সে কথাও উল্লেখ করে একটি কাজ দেওয়ার কথা বলেন। "এই প্রার্থনানুসারে কবি রাজসাহীর অন্তর্গত কালীগ্রামের জমিদারি কাছারি পতিশরে আমাকে সুপারিনটেন-ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করেন।"

দিন কয়েক পরে রবীন্দ্রনাথ পতিশরে যান। তারপর হরিচরণকে ডেকে পাঠান। এই ডাকে হরিচরণ বিস্মিত হলেন, "ভাবলাম, আমি নতুন লোক; আমাকে তিনি ডাকলেন কেন।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি বোটে গিয়ে দেখা করলেন। হরিচরণ এখানে দিনে কি কাজ করেন রবীন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন।

"বললাম, জমিদারি জরিপের চিঠা নিয়ে আমিনের সঙ্গে কাজ করি। কবি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রে কি কর। বললাম, সন্ধ্যার পরে সংস্কৃতের আলোচনা করি, আর ইংরেজি থেকে সংস্কৃত অনুবাদের পাণ্ডু-লিপির প্রেস-কপি প্রস্তুত করি। অনুবাদ পুস্তকের কথা শুনে কবি পাণ্ডুলিপি দেখতে চাইলেন। কিন্তু দেখে কোনো মন্তব্য করলেন না।"

এর পরেই তাঁর ডাক এল শান্তিনিকেতন থেকে। ম্যানেজারকে পত্র লিখে এই সংস্কৃতজ্ঞ সুপারিনটেনডেণ্টকে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দিলেন রবীন্দ্রনাথ।

অধ্যাপনাই হরিচরণের প্রকৃতির অনুরূপ কাজ। কিন্তু তাঁর বিদ্যা স্বল্প বলে এমন কাজ কখনো পাবেন, এমন কল্পনা করতেও ভরসা তাঁর হয়নি। বি এ পর্যন্ত পড়েছেন, কিন্তু বি এ পাস করা তাঁর হয়নি। তবুও এর দ্বারা লাভবান হলেন উভয়েই। রবীন্দ্র-নাথ পেয়ে গেলেন যোগ্য অধ্যাপক, আর যোগ্য অধ্যাপক পেয়ে গেলেন উপযুক্ত কাজ।

সংস্কৃত অধ্যাপকরূপে যোগ দিলেন হরিচরণ। তখন আশ্রমের বালকদের কোনো মুদ্রিত সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থ ছিল না। গৃহের ছেলেমেয়েদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি সংস্কৃত পাঠ লিখতে আরম্ভ করেন, এতে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। "এইরূপে প্রণালীতে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি দিয়ে কবি তদনুসারে একটা সংস্কৃত পাঠ্য লিখতে আমাকে বলেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে সংস্কৃতপ্রবেশ রচনা করে তিন খণ্ডে সমাপ্ত করি। এই পাঠ্যপুস্তক-রচনার সময়েই একদিন কবি কথাপ্রসঙ্গে বাংলায় একখানি ভালো অভিধান প্রণয়নের কথা বলেন। তাঁর সেই ইচ্ছা অনুসারে অভিধান-রচনায় নিরত হই। শব্দকোষ-

প্রণয়নের মূলে কারণ এই। তখন ১৩১২ সন।”

১৩১২ সনে কাজ আরম্ভ করে একটানা একচল্লিশ বছরের অধ্যবসায়ে ও যত্নে কাজ শেষ হয় ১৩৫২ সনে। এর চার বছর আগে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান ঘটে। এজন্যে আক্ষেপ জানিয়েছেন হরিচরণ, “কবি গ্রন্থটি শেষ দেখে যেতে পারলেন না।”

এই অভিধানের শব্দ-সংকলনের জন্যে অধ্যাপনার সময় ক্লাসে প্রাচীন বাংলা বই নিয়ে তিনি বসতেন ও বিশ্রামের সময়ে ক্লাসে বসেই পেন্সিল দিয়ে অভিধানের যোগ্য শব্দ চিহ্নিত ক'রে, পরে তা খাতায় তুলে নিতেন। বছরের পর বছর এই নিয়ম পালন ক'রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে অবশেষে এই অসাধ্যসাধন করলেন তিনি। দশের যা সাধ্য নয়, তা তিনি একের সাধ্য করে প্রমাণ দাখিল করে গেলেন যে, নিষ্ঠায় না হয় এমন কাজ নেই।

কিন্তু একে একে নিবিছে দেউটি। যাঁরা আমাদের স্মরণীয়, যাঁদের জীবনের ও জীবনধারণের প্রণালী আমাদের জীবনের ও জীবনধারণের নির্দেশ হয়ে থাকলে ভালো হ'ত, তাঁদের জীবনদীপ নির্বাপিত হচ্ছে একে একে।

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন, ১২৭৪ বঙ্গাব্দের ১০ই আষাঢ় চব্বিশ-পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত রামনারায়ণপুর গ্রামে মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃনিবাস যশাইকাটি গ্রামে। পিতা নিবারণচন্দ্র জমিদারি সেরেস্তায় কাজ করতেন। সংসারে অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল। মাতুলালয়ের গ্রামে তাঁর বাল্যশিক্ষা আরম্ভ। এখানকারই এক বাংলা স্কুল উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষায় পাস করে এক বছরের জন্যে কিছু বৃত্তি পান। তারপর পিতৃগৃহে যশাইকাটিতে এসে বাদুড়িয়া লণ্ডন মিশনারি স্কুলে পড়েন। এবং এর পরে কলকাতার জেনারেল আসেমব্লিজে। এখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন।

কলেজে পড়া এক সমস্যা বলে মনে হল। তাঁর এক বন্ধুর কাছে তিনি জানতে পারলেন যে, পটলডাঙার মল্লিক-পরিবারের ফণ্ড থেকে মেট্রপলিটন কলেজে (বিদ্যাসাগর কলেজ) কয়েকটি ছাত্রকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তিনি যখন তাঁর দেশের স্কুলে পড়েন তখন রবীন্দ্রনাথ এক বছর তাঁকে বৃত্তি দিয়েছিলেন, এই কথা তাঁকে জানালে তিনি একটি সার্টিফিকেট লিখে দেন। মল্লিক ফণ্ডের সভাপতি ছিলেন ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। এই সার্টিফিকেট কাজ হল। মেট্রপলিটনে ভর্তি হলেন তিনি। এফ এ পাস করলেন, তৃতীয় বার্ষিক বি এ ক্লাস পর্যন্ত পড়লেন, কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে বি এ পাস করা হল না।

কর্মহীন জীবন আরম্ভ হল তাঁর। কিন্তু উদ্যম যার মধ্যে আছে, তার পক্ষে কর্মহীন হয়ে বসে থাকা সম্ভব নয়। এই অবসরে তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণের বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদ আরম্ভ করে দুই বছরে সে কাজ শেষ করেন।

এর পর দুইটি হাইস্কুলে প্রায় তিন বছর শিক্ষকের কাজ করেন। তারপর মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজোলের রাজবাটীতে কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩০৮ সনে পূজার ছুটিতে বাড়ি আসেন। কলকাতায় টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল, এখানে তিনি প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন।

এর পরের কথা আমরা আগেই জেনেছি এর পরেই পতিশরের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, তারপরেই শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দ (১৯৩২) তিনি এই অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে সমাবর্তনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আচার্যরূপে শ্রীজওহরলাল নেহরু এঁকে 'দেশিকোত্তম' (ডি লিট) উপাধি দান করে সম্মানিত করেছেন।

শান্তি[illegible] আশ্রমিক সংঘের ছাত্রগণ ১৩৫১ [illegible] নববর্ষের প্রথম দিনে এঁকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন; পর বৎসর ফাল্গুন মাসে দ্বিতীয় সংবর্ধনা সভার অধিবেশন হয়। ১৩৫৩ সনে কবির জন্মোৎসব দিনে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এঁর কঠোর পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ এক হাজার টাকার তোড়া দিয়ে আম্রকুঞ্জে এঁর সংবর্ধনা করেন।

হরিচরণের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই কয়টি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে—বঙ্গীয় শব্দকোষ : পাঁচ খণ্ড; রবীন্দ্রনাথের কথা; সংস্কৃত-প্রবেশ : তিন ভাগ; ব্যাকরণ-কৌমুদী চার ভাগ; Hints on Sanskrit Composition & Translation; পালিপ্রবেশ; কবির কথা।

বঙ্গীয় শব্দকোষ দীর্ঘকাল দুষ্প্রাপ্য আছে। বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সাহিত্য অ্যাকাডেমির সংযুক্ত উদ্যোগে এই বিরাট অভিধানটি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। আনন্দের কথা এই—হরিচরণবাবু মৃত্যুর পূর্বে এ-সংবাদ জেনে গিয়েছেন।

তিনি আর আর নেই। পরম পরিতোষ লাভের সুযোগ তাঁর আর নেই। তাঁর যেসব রচনা পাণ্ডুলিপি আকারে আছে তার মধ্যে কিছু অন্তত যদি গ্রন্থাকারে এখনও মুদ্রিত হয়, দেশবাসীর অনেকে তাহলে তাঁর হয়ে পরম পরিতোষ লাভ করতে পারে।

মাথুর

নবনীতা দেব

[বকুলের বুকের ওপর
বারবার হাওয়া বয়, তবু
বসন্তের আকাশ পাথর।]

বসন্তের কে আর ফিরে আসে
নিসর্গের বৃন্দাদূতী ছাড়া
সব নদী মিলায় আকাশে।

বরং পাখিরা উড়ে গেলে
হুলুরব করুক বধূরা,
রাধা-অঙ্গ তমালের ডালে–

অভিষেক-উত্তপ্ত মথুরা॥

দ্বিতীয় সত্তাকে নিয়ে

শংকর চট্টোপাধ্যায়

দ্যাখরে গোপন দুঃখে পুড়ছে ঐ গৃহস্থ লোকটা
দেওয়ালে ঈশ্বর ঝুলছেন, মুগ্ধ দর্পণে সরছে ছায়া
প্রাথমিক তৃপ্তিগুলো তার শীর্ণ ঘরনীর মত
আঁচলে রেখেছে তাকে, কতকাল আলোক দেখেনি?

নিয়তি নির্দিষ্ট বৃত্ত, তবু মূঢ় দ্বিতীয় সত্তার অভিলাষী
সমর্পিত নদী যেন বুকে তার বিপুল উৎসব
তরঙ্গিত সমারোহ আত্মমগ্ন, কম্পিত ভুবন
দুঃসাহসী আলো কাঁপছে, শতছিদ্র দেওয়ালে, ক্যানভাসে।

অনাশ্রয়ী অন্ধকারে তীব্র দুঃখ রুগ্ন যন্ত্রণায়
আহা রে, তুলিটা টানছে ব্যর্থকাম গগ্যাঁর দোসর।

আলোর পাখি

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

পারো চোখে আনো অমারাত্রির ছায়া,
মেঘে মেঘে দাও নীল দিগন্ত ঢেকে ;
বিদ্যুৎ-জ্বালা এই বুকে যাও রেখে।

মনের গভীরে স্বপ্ন,—চাঁদের মায়া ;
তাকে কেড়ে নিতে পারবে না মন থেকে।

পারো চোখে আনো অমারাত্রির ছায়া ;
মেঘে মেঘে দাও নীল দিগন্ত ঢেকে।

আমার ভুবনে অপরূপ এক কায়াঃ
সব ভুলি তার স্নিগ্ধ মাধুরী দেখে ;
মন-বিহঙ্গ ডানা মেলে আলো মেখে।

পারো চোখে আনো অমারাত্রির ছায়া,
মেঘে মেঘে দাও নীল দিগন্ত ঢেকে ;
বিদ্যুৎ-জ্বালা এই বুকে যাও রেখে।

সন্তোষকুমার ঘোষ

[১৩]
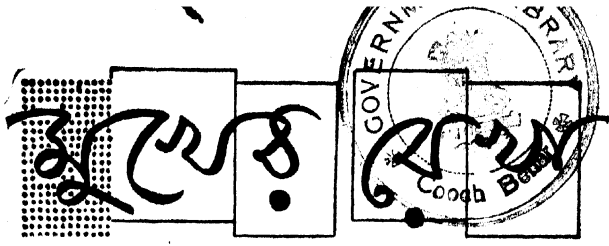
সেই চিঠি, তারপর আরেকটি, প্রতি সন্ধ্যায়ই একটি করে, পর-পর অনেকগুলি। সৌরর কাছে ওটা একটা রোজকার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজ, খানিকটা নেশার মতনও। রোজই সকালে উঠে সৌর প্রতিজ্ঞা করেছে, আর না, অর্থ-হীন সময়-অপচয় আর না, অথচ সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে সেই প্রতিজ্ঞা রোজই শিথিল হয়েছে। একটি কাগজে মনের কথা লিখে রাখার আগে, সব আবেগ ঢেলে দেবার আগে, কোন কিছুতে মন বসেনি।

ঠিক চিঠি কি? কোন ডাক-বাক্স ত ছিল না, সব চিঠিই জমা হত সৌরর সুটকেশটার নিচে-পাতা খবরের কাগজটার তলায়। বড় একটা টিনের সুটকেস, সৌর কলকাতায় আসবার সময় ওটা কিনে এনেছিল। ডালায় আঁকা ছিল বড় একটা গোলাপ ফুল। তখনকার সব টিনের সুটকেসেই গোলাপ ফুল আঁকা থাকত।

সেই সুটকেসের তলায় একটির পর একটি চিঠি জমা হতে থাকল। এক হিসাবে চিঠিই নয়, কেননা, তাদের লক্ষ্য যদিও ছিল একজন, তার হাতে কোন দিনই চিঠি-গুলো পৌঁছয়নি। যে লেখক, সেই পাঠক আবার সেই সংরক্ষক।

এই চিঠিগুলির প্রতি বহুদিন সৌরেশের বিশেষ একটা মমতা ছিল। লিখেই সে ক্ষান্ত ছিল না, ফিরে ফিরে পড়তও। এক সপ্তাহ পর পর, কখনও কখনও এক সপ্তাহেই বার দুয়েক পড়ত। পড়তে ভাল লাগত বলেই পড়ত। বাসী খাবার টাটকার সঙ্গে তুলনীয় নয়, কিন্তু তার স্বতন্ত্র একটু স্বাদ আছে।

চিঠিগুলি বিষয়বস্তুতেও যে শুধু চিঠিই ছিল, তা নয়। তাতে কুশল-জ্ঞাপন বা জিজ্ঞাসা একরকম ছিলই না। অনেক চিঠিতে সৌর হয়ত শুধু একটি দিনের হিসাব দিয়েছে, সারা দিনের অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা দিয়ে পাতার পর পাতা ভরেছে।

সৌরেশের পরবর্তী জীবনের "দিনান্ত লিপির" পূর্বাভাস হয়ত এই পত্রগুচ্ছই।

এই একতরফা খেলায় কেন পেয়ে বসে-ছিল সৌরকে। এই প্রশ্ন পরে সে নিজেকে কয়েকবার করেছে। ঠিক সদুত্তর পায়নি। একটি কারণ এই হতে পারে যে, খেলাটা যে একতরফা, এ-ধারণা তখন ছিল না। "ও চোখের দৃষ্টি দিয়ে যা বলে, আমি তারই উত্তর দিচ্ছি" সৌর চিঠি লেখার এই যুক্তি দেখিয়েছে। দ্বিতীয় খেলাধুলো, বাক্‌চাতুরি—সব রকম কাজে অনিপুণ এই ছেলেটির আত্মপ্রকাশের একটি উপায়ের প্রয়োজন ছিল। তার চেয়েও যেটা গূঢ় সত্য, সেটা এই যে, ওই বয়সেই নারীসঙ্গ বাসনা তার মধ্যে একটু একটু করে জমে উঠছিল।

জমে হয়ত সকলের মধ্যেই। কিন্তু অনেকেই বহির্মুখী—নানা কাজে ব্যস্ততার মধ্যে সেই অলক্ষ্য সঞ্চয়নের কথা ভুলে থাকে। সৌর যদি হত ছাত্র-ইউনিয়নের নেতা, কিংবা সুগায়ক, কলেজ সোস্যালে অংশগ্রাহক দক্ষ অভিনেতা, অথবা ক্লাব টীমের ফুল-ব্যাক, তবে হাজার কাজে ব্যস্ত শরীর আর ছড়িয়ে-পড়া মনকে একটি কেন্দ্রে লক্ষীভূত করবার সে অবসরই পেত না। যার হাতে কাজ নেই, মুখের ছোট-ছোট ফুসকুড়ি খোঁটার সময় সে-ই পায়। কোন খেলায় সৌর নেই, অন্তত খেলার মাঠে নেই, বিজনের টানাটানিতে পড়ে কোন কোনদিন গিয়েছে বটে, কিন্তু তাকে বসতে হয়েছে দর্শকের ভীড়ে, গ্যালারিতে, যেখানে সে নিরুৎসাহ, ঝিমিয়েছে সারাক্ষণ, যথা-সময়ে হাততালি দিতে বা সহর্ষ ধ্বনি করতেও ভুলেছে।

তাই একটি চিন্তাই তার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়েছিল।

এমন একজনকে তার চাই, যে কোমল স্মিত, সহৃদয়। তার কাছে যেতে চেয়েছে সৌর, তার কোলে মাথা রেখে অনর্গল কথা বলেছে। সেই মেয়েটি সৌরকে বোঝে, সৌর তাকেই বোঝাতে চায়। তার কাছে কিছু লুকোন নেই, তার কাছ থেকে কিছু লুকোতেও নেই। সে সৌরকে গ্রহণ করবে তার সব অপটুতা আর অক্ষমতা নিয়ে, এমন কি অপটুতা আর অক্ষমতাটুকুকে সে ভালও বাসবে। সৌর, রূপহীন, দ্যুতিহীন

সৌর—অন্যের কাছে যার কোন আকর্ষণ নেই, অন্তত একজনের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। কী দিয়ে, সৌর জানে না। কিন্তু মূঢ় কল্পনাকে লালন করতে ত বাধা নেই। একটি কিশোরী-মানসীকে পেয়ে সৌর সেই বয়সেই বেঁচে গিয়েছিল।

অথবা পায়নি, সৌর তাকে সৃষ্টি করে নিয়েছিল। নিপুণ হাতে সূক্ষ্ম একটি ওড়না সে পরম ধৈর্যের সঙ্গে বুনেছিল, ওই মেয়েটি যখন জানালায় এসে দাঁড়াল, অমনি সে মনে মনে বলে উঠল, "বাঃ, ওকে এই ওড়নাতে বেশ মানাবে।"

মেয়েটি হয়ত স্বতন্ত্র ছিল, তার আলাদা ব্যক্তিত্ব ছিল, কিন্তু যেই তাকে নিজের মনে-মনে তৈরি আবরণ দিয়ে ঘিরে দিল সৌর, অমনই সে সৌররই মনের মত হয়ে গেল।

কে জানে, সৌর আজও হয়ত এক এক-জনের পরিত্যক্ত সেই ওড়নাটাকেই আঁকড়ে ধরে আছে। আজ একে পরায়, কাল ওকে। বিভোর হয়ে দেখে, কেমন মানিয়েছে। মানায় সকলকেই। ওই ওড়নাটা যে পরে, সেই তখনকার মত তার মানসী, তার প্রিয়া। আসলে মন-গড়া মিহি একটা তন্তুজালকেই ভালবাসল বলে রক্ত-মাংসের কোন মানুষকেই সৌরর ভালবাসা হল না।

অথচ তার কল্পনা রক্ত-মাংস বাদ দিয়েও ছিল না। জৈব নিয়মেই, সহজাত বোধ, কৌতূহল আর আগ্রহ থেকেই, শরীরও এসেছিল। নির্বাণ-দীপ ঘরে নিঃসঙ্গ শয্যায় সৌর কল্পনায় ছায়া-বাসর রচনা করেছে। তখন ওই মেয়েটিই ছিল সঙ্গিনী। লাজুক সৌরর আচরণে বা ব্যবহারে তখন সঙ্কোচ বা সংযমের লেশমাত্র থাকত না। রোমাঞ্চিত তন্দ্রায় আর জাগরণে একটির পর একটি অস্থির-অধীর রাত্রি অতি-বাহিত হত। রক্ত-মোক্ষণের পর রোগী যে-চোখে তাকায়, সেই চোখ নিয়ে অবসন্ন ভোরে সৌরর চোখ খুলত।

[বহুকাল পরে শেষ-কৈশোরের সেই স্বপ্নমোহের মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে সৌরেশ তাঁর "দিনান্তলিপিতে" লিখে-ছিলেন :

"মন-দেওয়া-নেওয়া অনেক করেছি, কত-মরণে মরেছি তার হিসাব নেই, আর নূপুরের মত চরণে চরণে না বাজলেও, বাজতে চেয়েছি। এ-কথাও স্বীকার করা ভাল, মন যত দিয়েছি, তত নিতে পারিনি, হিসাব-নিকাশের খাতায় দেনার দিকটাই ভারী। বন্ধকী জিনিস বারবার এক জায়গা থেকে খালাস করে এনে অন্যত্র জমা করে দিতে হল, আমার সমগ্র যৌবনের অভিজ্ঞতা ত এই, শুধু এই?

"কিন্তু শেষ-কৈশোরের অস্পষ্ট-মধুর অনুভূতিটুকু আর ফিরে পাইনি। সে-বয়সটা যেন একটা আলখাল্লা, যেই পুরোন হল অমনি তাকে পরিত্যাগ করলুম, কিন্তু তার পকেটে, ভাঁজে-ভাঁজে কত কী-যে রয়ে গেল হাতড়েও দেখলুম না, খেয়ালও করলুম না।

"যার নাম জানি না, যাকে শুধু দেখেছি, কিন্তু একটাও কথা বলার সুযোগ ঘটেনি, তাকেই নিভৃত মুহূর্তে একান্ত আপনার মনে করার মধ্যে অবিশ্বাস্য ছেলেমানুষি আছে, আবার সরলতাও আছে। সেই সরলতা আর কোন দিন ফিরে পাব না।

"তাকে আমি কামনা করেছি, কাছে পেতে চেয়েছি, সত্য। আবার চাইনি, তাও সত্য। আগ্রহ যেমন ছিল, সঙ্কোচও তেমনই। সেই সঙ্গে ভয়। ভয়টাও একটু বিচিত্র রকমের।

"সেই সময়ে আমি প্রায়ই একটা স্বপ্ন দেখতাম। যেন একটি পল্লবিত লতা আমার জানালা দিয়ে ভিতরে এসে আমার বিছানার ওপরে নুয়ে পড়েছে। আমার শ্বাস পড়ছে, তার পাতা কেঁপে উঠছে। কিন্তু যেই আমি হাত বাড়িয়ে লতাটি ছুঁতে গেলাম, অমনই সে কুঁকড়ে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল, সব পাতা আমার বিছানাতেই পড়ল ঝরে।

"প্রথমে অর্থ বুঝিনি। পরে বার কয়েক একই স্বপ্ন দেখে দেখে আমার কেমন ধারণাই হয়ে গিয়েছিল, ওকে, জানালার ওই মেয়েটিকে শুধু দূরে থেকেই দেখতে হয়, কাছে চাইতে নেই, আনতে নেই। যেদিনই ওকে কাছে টানব, স্পর্শ করব, সেদিনই ওকে হারাব, অন্তত ও যা ছিল তা থাকবে না, স্পর্শমাত্র হয় আড়ষ্ট হবে, নয়ত সব শ্রী খোয়াবে। তার চেয়ে আমিও থাকি, ও-ও থাকুক, দূরে থাকুক, এই মোহ থাকুক।"]

কিন্তু বিজন অন্য রকমের কথা বলত। —"তুই যাকে ভালবাসা বলছিস, সেটা আসলে ভালবাসাই নয়, প্লেটনিক ব্যাপার, ক্লীবতা, কাপুরুষতা। মুখে দিলে জেলির মত গলে যায়। কিন্তু আসল প্রেম, যার মধ্যে পদার্থ আছে, তাতে দাঁতের গোড়াসুদ্ধ নড়ে যায়, বুঝলি।"

"যেমন তোর লতা বউদি?"

ইদানীং সৌরর সাহস বেড়েছিল, বিজনকে সোজাসুজি ঠাট্টা করতে মুখে আটকাত না।

আর, আ-চর্য, রাগ করত না বিজনও। সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করত, সায় দিত। —"হ্যাঁ, যেমন আমার লতা বউদি।" তার পরে আবহাওয়াটাই যেন হালকা করে দিতে বলে উঠত, "কিন্তু এ-সবের মর্ম তুই বুঝবি কী করে। থাকবার মধ্যে আছে ত ওই মেয়েলি চেহারা, প্রেম-টেমের ট্রিকও কিছু শিখিসনি। তাসের ম্যাজিক জানিস? পারিস যে-টেক্কাটাকে প্যাকে রেখে ওকে ভাঁজ করতে দিলি, সেটাই ওর আঁচলের ভেতর থেকে বের করে দিতে? পারিস না। চোখ বুজে ওকে একটা তাস ভাবতে বলে সেটাই দেখিয়ে দিয়ে অবাক করে দিতে পারিস না।"

"তুই পারিস?"

"কিছু কিছু পারি। পেশাদারের মত না, কিন্তু মেয়েদের আসর মাত করতে পারি। তা ছাড়া হাতের চালাকিতে যদি বা ফাঁকি আছে, কবজির জোরে ত আর নেই? তার প্রমাণও ওদের দিয়েছি। তোর ত গায়েও এক ফোঁটা জোর নেই।"

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী, অবহেলার সঙ্গে অনু-কম্পা মেশান। সৌর প্রতিবাদ করতে চেয়েও পারত না। সত্যিই তার গায়েও ত জোর নেই। মুখের গঠনে পৌরুষ নেই। হাতের আঙুলে যাদু নেই। কিছু নেই।

না, কিছু আছে। মন আছে। যে-মন ভাবতে জানে। এ-মন সকলের নেই, অন্তত বিজনের নেই। বিজন ভাবে না, ভাবতে জানেই না।

এই ভাবনার শক্তি দিয়েই সৌর লতা বউদির সঙ্গে বিজনের সম্পর্ক অনুমান করতে পেরেছিল।

লতা বউদি। এখনও চোখ বুজলে সৌরর চোখের সামনে একখানা গোল ছাঁদের হাসি-হাসি মুখ ভেসে ওঠে। কপালে বড় করে পরা একটা টিপ, মাজা-মাজা রং, প্রায় ময়লাই বলা চলে। নাকটা একটু চাপা, একটু মোটা, ডগা অনেকটা কড়ায়ের ডালের থ্যাবড়ান বড়ির মত। লতা বউদির ঠোঁটও ছিল পুরু, কিন্তু টুকটুকে। মনে হত রক্তপুষ্ট দুটি জোঁক এক সঙ্গে লেগে আছে। তারা আলাদা হলে দু' সারি সাদা দাঁত দেখা যেত। সামনের দাঁত বড় ছিল, আর কোণের একটা ছিল ভাঙা—লতা হাই না তুললে, কিংবা শব্দ করে হেসে না উঠলে, সেটা চোখে পড়ত না।

অথচ ওই ভাঙা দাঁতটাই লতা বউদিকে শ্রী দিয়েছিল, সুন্দর করেছিল। এমনিতে মোটাসোটা ময়লা মানুষটি, সাদাসিধে, গোলগাল, কিন্তু যেই সে হেসে উঠল, কৌতুকে ঝলসে উঠল তার চোখ দুটি, অমনি সে অপরূপ হল। তার ঠোঁট দুটি কখন ফাঁক হবে, কখন সেই ভাঙা দাঁতটা ঝলসে উঠবে, সেই আশায় সৌর কতদিন

যে লতা বউদির মুখের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে থেকেছে।

শুধু একটা দোষ ছিল লতা বউদির— পাতা কেটে চুল বাঁধতেন। ভাল করে পরিচয় হতে, সাহস বাড়তে সৌর বলেছিল, "এ-ভাবে চুল বাঁধলে আপনাকে মোটে মানায় না কিন্তু।"

"মানায় না? একটু সেকেলে লাগে—না? তা, কী করব ভাই আমরা হলাম সেকেলে মানুষ, তায় কুচ্ছিত, আমাদের খোঁপা-বাঁধা সেকেলে হবে না?"

বলে অল্প অল্প হাসতে থাকতেন লতা বউদি, সেই দাঁতটা একবার দেখা দিয়েই লুকোত, আর ঢিপঢিপ বুকে আবার কখন দেখা যাবে সেই আশায় সৌর বসে থাকত।

লতা বউদির আরও ছোট-ছোট ছবি মনে আছে। রেগে গেলে মোটা নাকের ডগা আরও স্ফীত হত, দপদপ করত চোখের পাতা, আর লতা বউদি তখন বিশ্রী-রকম জোরে জোরে নিশ্বাস নিতেন।

আর কাঁদলে? লতা বউদিকে কাঁদতেও দেখেছে বই কি সৌর, কিন্তু বেশিবার না। লতা বউদি হাসতেনই বেশি। ওই দাঁতটা বেরিয়ে পড়লে তাঁকে সুন্দর দেখায়, একথা কি তিনিও জানতেন?

হাসতেন লতা বউদি, মাঝে মাঝে হাত প্রসারিত করে কবজির সঙ্গে সেঁটে-থাকা চুড়িগুলোকে খুলতে চাইতেন। লাগত, নিজে টানতে গিয়ে নিজেই বলে উঠতেন, "উঃ।"

সৌর বলত, "খুলবে না বউদি, চুড়ি-গুলো ছোট হয়ে গিয়েছে।"

"ছোট হয়ে গিয়েছে?" লতা বউদি আবার হাসতেন, "চুড়ি ত ছোট হয়নি ভাই, আমিই ক্রমে আরও থপথপে মোটা হয়ে পড়ছি। রোজই এই শরীরটায় কমসে কম আধ-পোটাক বাড়তি মাংস আর চর্বি ত জমছে!"

অনেকটা নির্বোধের মত, অনেকটা একটা কিছু বলতে হয় বলেই সৌর বলল, "জমছে কেন?"

"কেন আবার—বয়স হচ্ছে না? তা-ছাড়া ভয় নেই, ভাবনা নেই।" গোল গোল হাত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতেন লতা বউদি, বলতেন, "ভাবনা নেই, আর খরচও নেই।"

শেষের দিকে একটু খেদ যেন বাজত লতা বউদির স্বরে। খরচ নেই কথাটা কী অর্থে বলতেন, সৌর বুঝতে পারেনি। লতা বউদির ছেলেপুলে নেই, কথাটার মানে কি তাই?

হয়ত তাই। আর লতা বউদি যে বলতেন, তাঁর ভয় নেই, সে-কথাটাও ঠিক। ভয় তাঁর একফোঁটা ছিল না, অন্তত তাঁর স্বামীর বিষয়ে ছিল না।

লতা বউদির স্বামী শচীপতি রায়ের সঙ্গেও সৌরর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল।

খুব ফর্সা, মাথার সামনের দিকটায় ছড়ান টাক, নীলচে চোখ, রোগা ধরনের ওই ভীতু মানুষটিকে সৌর খুব কাছে থেকে জানবার সুযোগ পেয়েছিল। সব সময়েই কেমন একটা ত্রস্ত ভাব, শচীপতি-বাবুর কথাগুলিও কেমন জড়িয়ে যেত। কারুর মুখোমুখি পড়লেই কুণ্ঠিত, আনত হয়ে পড়তেন, সরে যেতে চাইতেন।

মনে হত, শচীপতিবাবু যেন ফেরারী আসামী, সব সময়েই পালাতে চাইছেন। কোথা থেকে পালাতে চাইতেন শচীপতি-বাবু? সংসারের কাছ থেকে? লতা বউদির কাছ থেকে? নিজের কাছে নিজেই যেন জুজুর ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকতেন।

সব সময়ে না। মাঝে মাঝে নেশা করতেন শচীপতি। তখন তাঁর চোখ জ্বলত, সাহস বাড়ত, গলার নালী থেকে থেকে ফুলে উঠত, রক্তের ছোপ ধরত এমনিতেই টকটকে ফর্সা গালে।

তখন শচীপতির মুখ খুলে যেত। অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন।

অন্তত সৌরকে একদিন বলেছিলেন। সৌরর একদিন তার প্রতিটি কথা মুখস্থ ছিল। এখনও কিছু আছে। (ক্রমশ)

চক্রদত্ত

বিজ্ঞানের যূপকাষ্ঠে যত বলিদান দেওয়া হয় তার মধ্যে মোটর দুর্ঘটনা নিতান্ত চুনো-পুঁটির পর্যায়ে পড়লেও সংখ্যায় খুব নগণ্য নয়। অবশ্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রে চালকের অসতর্কতা বা নিয়মানুবর্তিতার অভাবেই এসব দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। ঠিক কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটলো—অপরাধ চালকের কী বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির, একথা ঠিকমত প্রমাণ করা সম্ভব হয় না বলেই প্রায়ই অপরাধী বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। টোকিওর ট্র্যাফিক পুলিশরা আজকাল, তাদের মোটর সাইকেলের সামনের দিকে একটি ফ্ল্যাশ
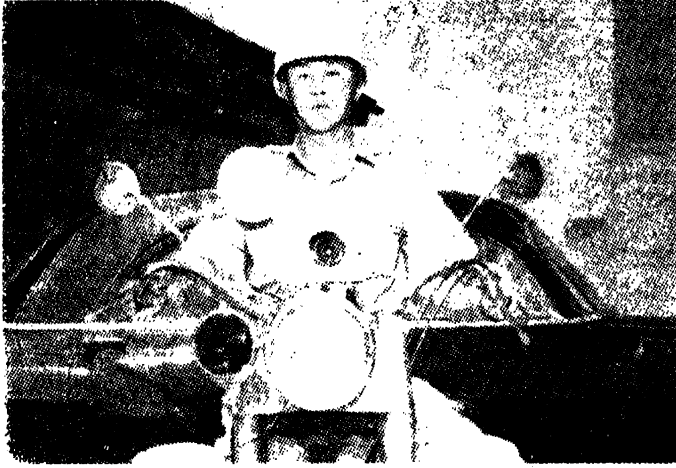
ক্যামেরাসহ ট্র্যাফিক পুলিস

লাইটসহ ৩৫ মিলিমিটারের ক্যামেরা রাখেন। রাস্তাঘাটে কোথাও নিয়মভঙ্গ-জনিত অপরাধ ঘটতে দেখলেই তৎক্ষণাৎ তার ফটো তুলে নেন। যদি পুলিস অকুস্থল থেকে দূরে থাকেন অথবা অপরাধী পালাবার চেষ্টা করে দূরবর্তী হয়ে যায়, তাহলেও ব্যবস্থানুযায়ী পুলিশের খুব অসুবিধা হবে না। মোটর সাইকেলের হ্যান্ডেলের সঙ্গেই একটি বোতাম থাকে এবং সাইকেলটি চালাতে চালাতেই বোতামটি টিপে দিলে আলোও জ্বলে উঠবে, আর ক্যামেরায় ছবি উঠতে থাকবে। এমন কি ঘটনা-পরম্পরায় ছবি তুলতে থাকলে ফিল্মও একটির পর একটি সরে সরে যাবে এবং নতুনটি বেরিয়ে আসতে থাকবে।

*

এ দুনিয়ায় কত রকমের যে ফাঁদ পাতা আছে, আর কখন কোন্ ফাঁদে কে যে পা দেবে, তার খবর আগের মুহূর্তে পর্যন্তও সে জানতে পারে না। নিউজি-ল্যান্ডের অকল্যান্ড নামক স্থানে পিসকোনিয়া ব্রুনোনিয়া বলে যে গাছটির খবর পাওয়া গেছে সেটি পক্ষীভুক গাছ না হলেও পাখীদের জন্য রীতিমত ফাঁদ পেতে রাখে। সাধারণত যেসব পতঙ্গভুক গাছের কথা এ পর্যন্ত জেনেছি, সেগুলিও ফাঁদ পেতে পতঙ্গ ধরে আর সেই পতঙ্গই তাদের খাদ্য হয়। কিন্তু এইসব পাখীধরা গাছ-গুলি পাখীগুলিকে তাদের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে না। এসব গাছ সাধারণ গাছের মতই মাটি-আলো-হাওয়ার দ্বারাই পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। পিসকোনিয়া গাছ-গুলি চিরহরিৎ—খুব সরু সরু লম্বা লম্বা পাতাগুলি কচি অবস্থায় বেশ নরম থাকে। শুধু পাতা নয়, এ গাছের কাঠও বেশ নরম আর ভঙ্গুর। গাছগুলো ১২ থেকে ৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। সাধারণত সমুদ্র-পৃষ্ঠা থেকে প্রায় ৫০০ ফুট উঁচু স্থানে পিসকোনিয়া জন্মায়। গাছে প্রায় সারা বছর ফল হয়। এ গাছের ফলই আসলে পাখীর ফাঁদ। লম্বা লম্বা ফলগুলিতে পাঁজরের মত পাঁচটি ভাঁজ থাকে আর সমস্ত ফলটি একরকম আঠার মত চটচটে বস্তু দিয়ে ঢাকা থাকে। কোনওরকম ছোট জাতের পাখী এইসব ফলের কাছে এলেই এই আঠার মত বস্তুতে তাদের একটি পালকও যদি কোনও রকমে আটকে যায়, তাহলে আর কিছুতেই তারা ছাড়া পায় না এবং শেষ পর্যন্ত মারা পড়ে। পাখীগুলি পিসকোনিয়ার ফলের মিষ্টি আঠার দ্বারাই প্রলোভিত হয়ে এমন করে মৃত্যুকে বরণ করে। অকল্যান্ডবাসীরা এই ক্ষুদ্র পাখীদের পিসকোনার হাত থেকে বাঁচাবার কোনও উপায় উদ্ভাবনের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তাঁরা বলেন যে, ঐ পাখীধরা গাছ ঐ দেশের কয়েক জাতীয় ছোট পাখীদের ক্রমশঃই ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, ফলে এমন একদিন আসবে যেদিন ঐ পাখীরা এ জগত থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সহজ উপায় হিসাবে কর্তৃপক্ষ পিসকোনিয়া গাছের ফলগুলি নষ্ট করার ব্যবস্থা করেছেন।

*

বৈজ্ঞানিকরা মানুষের দাঁত খারাপ হওয়ার এবং না হওয়ার কারণ খুঁজে বার করেছেন। দেখা যায় যে, অনেকে দাঁতের যত অযত্নই করুক না কেন, তাদের দাঁত কোন কারণেই খারাপ হয় না। এই সমস্ত লোকদের মুখের লালা নিয়ে পরীক্ষা করে এমন একটি রাসায়নিক বস্তু পাওয়া গেছে, যেটি দাঁতের ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়াকে নষ্ট করতে পারে। এই রাসায়নিক বস্তু যে কি, তা আজও সঠিকভাবে জানা যায় নি। যদিও লালাতে এই রাসায়নিক বস্তু খুব কম লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়, তবুও গবেষণা করার জন্য প্রায় ১৫ গ্যালন লালা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর থেকে চেষ্টা করা হবে যে, কোথা থেকে এবং কিরকমভাবে রাসায়নিক বস্তু লালাতে আসছে। আশা করা যায় যে, একবার এর সূত্র জানতে পারলে যে সমস্ত লোকের ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই, তাদের শরীরে কোনপ্রকারে এই নতুন রাসায়নিক বস্তু সৃষ্টি করা যেতে পারে। অথবা কৃত্রিম ভাবে এই বস্তু তৈরী করা যেতে পারে।

*

সৌর-চরকা "নির্টনিক" ভারতের এক নূতন অবদান। সৌরতেজ দ্বারা পরিচালিত এই জাতীয় চরকা বা ঐ জাতীয় যন্ত্রের কোনও কার্যকারিতা এর আগে ভারতে প্রদর্শিত হয় নাই। নির্টনিক—১ চরকার সৌরতেজ সম্ভূত ব্যাটারীটি আট ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করে বলে জানা গেছে। এক নম্বর নির্টনিকের মূল্য মাত্র ২৫, টাকা। এখন দু নম্বর নির্টনিক তৈরীর চেষ্টা চলছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, দু নম্বর নির্টনিক দিয়ে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির চাকা এবং সুতো কাটা সম্ভব হবে।

শার্ঙ্গদেব

পল রোবসন

ওল ম্যান রিভার—গানটি যখন শুনি তখন আমার বয়স কুড়ির নিচে। কৌতূহলের বশেই কতকগুলি ইংরেজি রেকর্ড শুনেছিলাম। সাধারণ দু-একটা গানের পর বাজল—অল' ম্যান রিভার। প্রশান্ত ভরাট একটি গম্ভীর এবং করুণ কণ্ঠের সুর আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলল। সেই প্রথম পল রোবসনের নাম শুনলাম এবং সেদিন থেকেই তিনি আমার স্বপ্নের মধ্যে রয়ে গেলেন। প্রকৃত সঙ্গীতের যে একটি সর্বজনীন আবেদন আছে তা সেদিনই বিশ্বাস করলাম নইলে প্রাচ্যদেশের একটি কিশোরকে পাশ্চাত্য সঙ্গীত এমনভাবে অভিভূত করল কি করে? মনুষ্যত্বই মানুষকে মহৎ করে—তার চরিত্রের নানা দিকে সেই মানবতার আশীর্বাদ ছড়িয়ে পড়ে। পল রোবসনের কণ্ঠে সেই সার্থক প্রীতি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য তিনি আজীবন সাধনা করেছেন, তাই মানুষের হাতেই তাঁকে অনেক কষ্ট-ভোগ করতে হয়েছে এবং সেই বেদনা পবিত্র ধারায় ঝরে পড়েছে তাঁর গানে। তার আবেদন কখনই নিষ্ফল হবার নয়।

পল রোবসন আশ্চর্য প্রতিভাবাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি গায়ক—শিল্পী; কিন্তু সেই শিল্পপ্রতিভা যেন তিনি স্বাভাবিকভাবেই পেয়েছেন,—কোন বিশেষ সাধনা তাঁকে করতে হয় নি। কোনও বিরাট সঙ্গীত অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পূর্বেও হয়ত তাঁকে সমাজতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যাবে এবং অনুষ্ঠানে প্রচুর সাফল্যের পরক্ষণেই হয়ত তিনি ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। যেটার ওপর সবচেয়ে গুরুত্ব তিনি অর্পণ করেন বলে সাধারণের বিশ্বাস সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সম্পন্ন হয়ে যায়—তার জন্য তিনি আদৌ বিব্রত বোধ করেন না।

পল রোবসন ষাট পেরিয়েছেন। ১৮৯৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সোমারভিল হাইস্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে ১৯২৩ সালে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে গ্রাজুয়েট হন। ১৯২১ সালে তিনি শ্রীমতী এসল্যাণ্ডার পাণিগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি তাঁর ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। সপরিবারে আনন্দে বাস করেন তিনি।

এই ষাট বৎসরের কর্মময় জীবনের হিসাবনিকাশ করবার সময় এসেছে। আজ পর্যন্ত তিনি কর্মঠ ব্যক্তি, এখনো পূর্ণোদ্যমে ভ্রমণের আগ্রহ তাঁর আছে—এখনো তিনি কনসার্ট দিতে তৎপর। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ছিলেন আমেরিকার একজন বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। অসাধারণ লম্বা-চওড়া জোয়ান চেহারা তাঁর, যা আমেরিকান

পল রোবসন

কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যেও সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু শরীরের তুলনায় তিনি আশ্চর্য শান্ত এবং ভাবপ্রবণ। নিতান্ত দায়ে পড়েই একবার খেলার ব্যাপারে তাঁকে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। হিতৈষীরা একবার তাঁকে মুষ্টিযোদ্ধা করে তুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে তিনি বিশেষ অনিচ্ছা জ্ঞাপন করেন। খেলোয়াড় হবার ইচ্ছাও তিনি পোষণ করেন নি কোনদিন। এদিকে,—সারাজীবন লেখাপড়া নিয়েই রয়ে গেলেন—গাইয়ে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও। ইস্কুল থেকে অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন, বৃত্তিও পেয়েছিলেন। আমেরিকার উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে বড় সম্মান তিনি পেয়েছেন: কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ল-গ্র্যাজুয়েট তিনি। ইচ্ছে করলে আইনজীবী হিসাবেও যথেষ্ট পসার করতে পারতেন। অভিনয়ে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ। শেকস্‌পীয়ারের ওথেলো নাটকে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইউজিন ওনীলের নাটক—অল গড্‌স্ চিলান গট উইংগস এবং এম্পারার জোন্‌স্-এ তাঁর কৃতিত্বের কথা ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকায় সুবিদিত। ১৯২৮ সালে ইংল্যাণ্ডে তাঁর "শো বোট্"-এ রিভারম্যান "জো"-র ভূমিকা তাঁকে অমরত্ব প্রদান করেছে। এই অভিনয়েই তিনি ওল' ম্যান রিভার গানটি গেয়ে তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। ওথেলোর অভিনয় উপলক্ষ্যে

শেক্‌স্‌পীয়ারের সমসাময়িক ইংরেজী সাহিত্য তিনি অভিনিবেশ সহকারে পড়েছিলেন এমনকি, সে সময়কার উচ্চারণ প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যও তাঁকে প্রচুর অধ্যয়ন করতে হয়। কেউ তাঁকে এসব করতে বাধ্য করেনি—অপর অভিনেতারা এ পরিশ্রম করতেনও না, কিন্তু অধ্যয়ন তাঁর চিরকালের অভ্যাস, জ্ঞানার্জনের জন্যই এই পরিশ্রম তিনি করেছিলেন। বহু ভাষাবিদ্ তিনি। প্রায় পাঁচশাট ভাষা সম্বন্ধে তাঁর ভাল ধারণা আছে, তার মধ্যে হিন্দুস্থানীও একটি বলে শুনেছি। রুশ ভাষা চমৎকার জানেন, চৈনিক ভাষাদিতেও তাঁর দক্ষতা আছে। এ ছাড়া আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং চীনের আদিবাসীদের ভাষা সম্পর্কেও তিনি বিস্তৃতভাবে পড়াশোনা করেছেন। ইউরোপের সর্বত্রই ভ্রমণ করেছেন তিনি, মিশরেও গিয়েছিলেন। এই বিপুল অভিজ্ঞতার সুযোগে পৃথিবীর বহু জাতির সংগে তিনি পরিচিত হয়েছেন এবং লোকসংগীতের নানা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে জানবার সুবিধাও পেয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে জীবনের সরল গানই সবচেয়ে চমৎকারভাবে বিকাশ লাভ করেছে। এই বিপুল বিদ্যা এবং সংস্কৃতির পরিচয় তাঁর সংগীতে সুস্পষ্ট। বিশেষ পরিমার্জিত রুচি এবং বুদ্ধি সাধারণ কলাকে কত উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে পারে পল রোবসন নিগ্রো স্পিরিচুয়াল এবং লোকসংগীতে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি অসাধারণ সুকণ্ঠের অধিকারী কিন্তু কণ্ঠের প্রসারের চেয়ে গাইবার গুণেই সে গান শ্রোতার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর সংস্কৃতিবোধই তাঁর সংগীত পরিবেশনকে মহত্ত্ব প্রদান করেছে।

অর্থ ও স্বীকৃতি লাভের জন্য পল রোবসন কোন কারণেই তাঁর মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ করেন নি। অভিনয় জগতে অনভিজ্ঞতার দরুণ সাধারণভাবে কনট্রাক্ট সই করে একবার তিনি ঠকেছিলেন। যে ভূমিকায় তিনি অভিনয় করলেন শেষ পর্যন্ত সেটি তাঁর কাছে অপমানকর মনে হয়েছিল। অতএব পরের বার তিনি সাবধান হয়ে গেলেন। প্রথমে ফিল্মের বিষয়বস্তুর সমর্থন না করে তিনি অভিনয়ে অগ্রসর হন নি। এই প্রখর মর্যাদাবোধের জন্য তাঁকে বহুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। তাঁকে অভিনয় ছাড়তে হয়েছে, লোভনীয় কনসার্ট বাতিল করতে হয়েছে, দেশ ছাড়তে হয়েছে, আবার—দেশে থেকেও বহু বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তথাপি শিল্পীর মর্যাদা তিনি সগৌরবে রক্ষা করে এসেছেন।

পল রোবসন সংগীতশিল্পী; কিন্তু সে সংগীতের মান কতকগুলি টেকনিক বা রূপবন্ধের বিচারে নির্ধারিত করা যায় না। যাকে ওস্তাদ বলা হয়, সে ধরনের গাইয়ে তিনি নন। একমাত্র সহৃদয়তা দ্বারাই তাঁর সংগীতের সার্থকতা নিরূপণ করা যায়। তাঁর সংগীত খুব চমকপ্রদ নয়, কিন্তু তা শ্রোতার হৃদয়ে একটি গভীর অনুভূতির সঞ্চার করে। তিনি নিজে নিপীড়িত হয়েছেন বলেই পৃথিবীর মানব তাঁর সংগীতের আকুতিকে হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারে।

পল রোবসন শীঘ্রই ভারতে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রুচি এবং সম্ভ্রমবোধসম্পন্ন এই মানবকল্যাণকামী সহৃদয় মহৎ শিল্পীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাবার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।
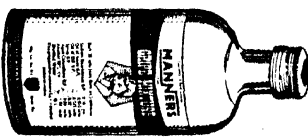
বেশীরভাগ লোকই রাগ হবার সময় বুকটা সংকুচিত করে এবং কাঁধ ঝাঁকুনি দেয়, যদিও তারা বুঝতে পারে না তারা কি করছে। "কিন্তু তা না করে যদি তারা কাঁধ চিতিয়ে ধরে তাহলে মেজাজ খারাপ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে।" লন্ডনের এক ডাক্তারের এই হচ্ছে অভিমত। তিনি বলেন, "এই করেই আমি পাঁচ বছরে একদিনও মেজাজ খারাপ করিনি।"

এক স্কচ মহিলা যার প্রায়ই মেজাজ চড়ে যেত তিনি দাবী করেন যে, মেজাজ চড়ার একটা প্রতিকার তিনি আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেনঃ

"রাগের উপক্রম হলেই বাগানে বেরিয়ে গিয়ে মিনিট পাঁচেক পায়চারি করে বেড়াতাম। রাগতভাব নিয়ে কেউ দীর্ঘকাল বাগানে একলা থাকতে পারে না।"

বৈজ্ঞানিকরা বদমেজাজের প্রতিশোধকের কথা চিন্তা করেছেন। [illegible] মধ্যে সার লডার ব্রান্টন এমন একটা ওষুধ বের করেছেন বলে দাবী করেন, যা জ্বরে কুইনিনের মত কার্যকরী। মেজাজ চড়বার উপক্রম হলেই বৈজ্ঞানিকের প্রেসক্রপসন নিয়ে কোন ডিস্পেন্সারীতে গিয়ে টেবলেট আকারের ওষুধটা খেলেই সেরে যাবে।

*

মহীশূরের স্বর্গত মহারাজা সুন্দরগজ নামে এক অতিকায় হস্তী কিনেছিলেন, যেটি কেবল আকারেই বিরাট নয়, নষ্টামিতেও তার জুড়ি কেউ দেখেনি।

তার আবাসের আশপাশের জঙ্গলে চরে বেড়ানোর চেয়ে, বাড়তি খোরাক জোটাতে ও চুপি চুপি গ্রামের ভিতরে ঢুকে পড়তো এবং কোন কুটিরের চালা উপড়ে শুঁড়ে ঢুকিয়ে রান্না-ভাত খেয়ে নিত। কোন্ পরিবারের কখন খাবার সময় সুন্দরগজের কাছে সব যেন নখদর্পণে।

চালা ফুঁড়ে শুঁড় ঢুকেছে দেখেই কুটিরের লোকে আর্তনাদ তুলে পালাতো। মহারাজের কাছে অভিযোগ যেতে লাগল এবং শেষে হাতীটিকে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন আস্তাবলে রাখার ব্যবস্থা হল। আস্তাবলে থাকতে সুন্দরগজ ওর পায়ের শিকল খুলে ফেলার কায়দাটা আয়ত্ত করে অন্ধকার হলেই চুপি চুপি বেরিয়ে আশপাশের ফলের বাগান এবং কলার ক্ষেত তচনচ করে বেড়াত। বাঁধন দৃঢ় করার জন্য শিকলের মুখে নাট-বল্টু পরিয়ে দেবার ব্যবস্থাও কাজে এল না, কারণ হাতীটা ওটারও প্যাঁচ খোলার কায়দা আয়ত্ত করে ফেলে। দোষটা অবশ্য ছিল ওর তত্ত্বাবধায়কের। মাহুতটা—কুড়ে বলে হাতীটাকে যথাসময়ে খাওয়াবার ব্যাপারে গাফিলতি করত। লোকটা প্রতি রাতেই সুরাপান করতো এবং ওর নেশা হলে সুন্দরগজ ওর ঝুপড়ির ধারে উপস্থিত হয়ে চালের মধ্যে দিয়ে শুঁড় ঢুকিয়ে যেটুকু সুরা থাকত পান করে নিত। মারধরে জানোয়ারটাকে সায়েস্তা করতে না পেরে মাহুত পানীয়ের পাত্র মাটিতে পুঁতে রাখার ব্যবস্থা করলে, কিন্তু সুন্দরগজ তার তীক্ষ্ন ঘ্রাণশক্তির জোরে পাত্রটি ঠিক বের করে নিতে লাগল। বিনা অনুমতিতে মদ চোলাই করা জেলে যাওয়ার সামিল অপরাধ বলে মাহুত আস্তাবলের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে নালিশও করতে পারে না।
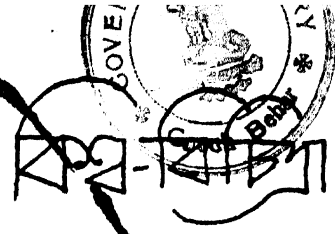
এর আবার উল্টো মতির হাতীরও কথা শোনা যায়। দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি মন্দিরে পট্টভি রমন নামে একটি হাতীর এক অতি মাতাল মাহুত ছিল। মাহুতটা কিন্তু হাতীটির দেখাশোনা করত ভালভাবে এবং ঠিক সময়ে খাবার দিত। কোনদিন শুঁড়িখানা থেকে পিঠে চড়ে ফেরবার অবস্থা না থাকলে পট্টভি তাকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে আস্তাবলে পেঁৗছে মাহুতের শোবার জায়গায় নামিয়ে দিত।

চট করে বোঝবার উপায় নেই, আসল না নকল পা—দুর্ঘটনায় পা কাটা যাবার পর প্লাস্টিকের পা পরে নৃত্যশিল্পী আনা মারিয়ানা রাস্তায় চলা অভ্যাস করছে

*

কিছুদিন আগে শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙককে বুদ্ধের এক বৃহৎ প্রতিমূর্তি স্থানান্তরিত করার সময় ক্রেনের একটা হুক অকস্মাৎ খুলে যায়। সাড়ে পাঁচ টন মূর্তিটি ঘাড়ে পড়ার আশংকায় শ্রমিকরা ছুটে দিলে। মূর্তিটি মাটিতে হুড়মুড়িয়ে পড়তে তার গায়ের ব্রোঞ্জের টুকরো ছিটকে লাগলো অনেকের গায়ে।

কিছুক্ষণ সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল। মূর্তিটা শত শত বছর ধরে রয়েছে, কিন্তু একটা আঁচড়ও পড়েনি তার গায়ে। কেবল স্থানীয় পুরোহিতরা ওটার ওখানে থাকা দরকার নেই বলায় ওটাকে সরাবার ব্যবস্থা হয়।

তারপর মূর্তিটির গায়ে যেখানটার ব্রোঞ্জের টুকরো ছেড়ে গিয়েছে, একজন সেখানটায় কিছু চক চক করতে দেখলে। লোকটা এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সে জায়গাটা খুঁটতে লাগল। পরে দেখা গেল, ঐ সস্তা ব্রোঞ্জের চাদরে ঢাকা মূর্তিটি খাঁটি সোনার তৈরি, যার দাম প্রায় আড়াই কোটি টাকা।

*

ইতালির নামকরা উঠতি ব্যালেরিনা তেইশ বছরের সুন্দরী আনা মারিয়ানা সেদিন বাড়ি থেকে বের হচ্ছে তাড়াহুড়ো করে, মা বললেন, "সাবধানে যেও"। মায়ের কথা, আনার কানে গেল কি গেল না, ও তখন প্রায় ছুটছে—সেদিন সকালে মিলানের এক অনুষ্ঠানে যোগদান করতে ট্রেন ধরতে হবে বলে।

স্টেশনে পেঁৗছে লাইনের অপর ধারে যাবার জন্য খট খট করে হিল-তোলা জুতোর আওয়াজ করে চললো। একটু ইতস্তত করলে বন্ধ ক্রসিং-গেটের সামনে, তারপর তার মধ্যে দিয়ে গলে পার হল।

কেবিনের মধ্যে থেকে ওকে পার হতে দেখে গেট-অপারেটর চেঁচিয়ে উঠল সাবধানে করে দিতে। আনা একবার লাইনের আপ দিকটা, একবার ডাউন দিকটা চকিতে দেখে নিয়েই চট করে লাইন পার হতে গেল। সে স্টেশনে বিরতি নেই একখানা এক্সপ্রেস হুমড়ি খেয়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। আনা শেষ লাইনটা পার হতে যেতেই ওর

ছিল লাইনের জোড়ের মুখে পড়ে আটকে গিয়ে ওকে ভূপাতিত করলে, দুটো পা-ই পড়লো লাইনের ভেতরে।

লাইন পার হবার জন্য আর সব যারা ট্রেন পার হবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, তারা চেঁচিয়ে উঠল, কতক লোক দৌড়ল আনাকে সাহায্য করতে। কিন্তু কিছুই করা গেল না। সত্তর মাইল বেগে এক্সপ্রেসখানি গর্জন করে যখন পার হয়ে গেল তারপর দেখা গেল আনার ঠিক গোড়ালির ওপর থেকে দুটো পা-ই গিয়েছে।

অচৈতন্যা আনাকে মিলানের হাসপাতালে তখনিই নিয়ে যাওয়া হল একটা জরুরী অস্ত্রোপচার করতে। কেউ ভাবতে পারেনি অমন সুন্দর মেয়েটির বাঁচবার কোন আশা আছে।

কিন্তু আনা বেঁচে উঠল, যদিও প্রাণ রক্ষার জন্য ওর দুটি পা-ই কেটে বাদ দিতে হয়েছে। আনা তখন ইতালির শ্রেষ্ঠা ব্যালেরিনা না হয়ে উঠলেও ওর বয়েস ছিল, দেখতে সুন্দর এবং নৃত্যেও ভাল। তার এই দুর্ভাগ্যের কাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এরকম অবস্থায় কেউ পড়লে সকলেরই তার ওপর সহানুভূতি জাগে, কিন্তু আনার ব্যাপারটা একটু ভিন্ন এই জন্যে যে, সে নাচিয়ে আর এখন তার পা নেই।

হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফেরার পর পৃথিবীর বহু স্থান থেকে ওর কাছে উৎসাহোদ্দীপক চিঠি টেলিগ্রাম আসতে লাগল। নানা প্রতিষ্ঠান নতুনভাবে জীবন শুরু করার জন্য ওর কাছে টাকা পাঠাতে লাগল; এবং ওরই মত যারা পঙ্গু তারা

তাকিয়ে রইল আনা কি করে দে, আনা পণ করলে পৃথিবীকে সে দেবে সে কি করতে পারে। বিস্মিত ক ও ঘোষণা করলে, "আমি আবার নাচব, ঈশ্বর যদি সহায় হন।" কথাটা সে বলে ওর দুর্ঘটনার আট মাস পরে এক টেলিভিসন সাক্ষাৎকারে।

চুপি চুপি আনা খোঁজ নিতে আরম্ভ করলেঃ কৃত্রিম পা লাগানো সম্ভব কি না, অনেক হতভাগ্য যে রকম জবরজঙ পা পরে সে রকম নয়; কিন্তু এমন সুন্দর পা যা এককালে নাচ দেখিয়ে যে উপার্জন করতো এমন একজনকে মানায়?

গোপনে আনা খবর পেলে একজন প্লাস্টিক সামগ্রী প্রস্তুতকারক মিলানে আছে যে ওর কাজে হয়তো আসতে পারে। একজন প্রতিনিধি এসে আনার সঙ্গে দেখা করলে, দেখলে আনার অবস্থা এবং অতি চিন্তিতভাবে চলে গেল।

গত বছর মার্চ মাসে, অর্থাৎ দুর্ঘটনার প্রায় এক বছর পর আনা সেই [illegible] কর্তৃক ওর জন্য গোপনে তৈরী প্লাস্টিক-ফাইবার কাঁচের তৈরী পা পরলে। ঠিক ফিট করলো। কিন্তু সাব্যস্ত হল যে এটা গোপন রাখতে হবে।

ক্রমে ক্রমে আনা মনে জোর পেতে লাগল এবং পায়ের ঠুঁটো ভাগটা প্লাস্টিক পায়ের খাঁজে পড়ে পড়ে শক্ত হয়ে উঠল; এখন আর ওর আট স্টোন ভারি দেহের চাপ পড়লে আনা আর ব্যথাও পায় না।

প্রথমে ও একটা মাত্র ক্রাচ নিয়ে পরীক্ষা করলে। এক মাসের মধ্যে বিনা ক্রাচেই ও ঘোরাঘুরি করা আয়ত্ত করলে এবং মায়ের বারণ না শুনে একা বাইরে যেতে আরম্ভ করলে—সিনেমায় বা কোন নৃত্যানুষ্ঠানে। কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, একা একা যে মেয়েটি বসে বসে প্রতিটি নাচ দেখছে সে আর কেউ নয়, আনা মারিয়ানি—যার সাহসের খ্যাতি ইটালির ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। কোন পুরুষ ওকে নাচের সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানালে ও শরীর ভাল নয় এই বলে বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে দেয়।

"আমার সবচেয়ে রোমাঞ্চ লেগেছিল," আনা সম্প্রতি বলছিল, "যেদিন একা একা থিয়েটারে গিয়েছিলাম। রাস্তা দিয়ে দোকানের শো-কেস দেখতে দেখতে যাবার সময় তিনজন যুবক আমার পানে চাইতে লাগল। আমি ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে চলেছি হঠাৎ পিছনে খুব জোরে শিস দেওয়ার শব্দ শুনলাম।

"আমি ঘাড় ফেরালাম দেখতে ওরা আমার দিকে দেখছে কিনা। প্রথমে ভেবেছিলুম বোধ হয় অন্য কোন মেয়েকে দেখে ওরা অমন করছে, কিন্তু রাস্তায় তখন মেয়ে আমিই একমাত্র।"

আনা শিস উপেক্ষা করলেও মনটা কিন্তু পার[illegible] আন[illegible] ব্যালে নাচ কারেনির স[illegible] অবশ্য আনার স[illegible] যে প্লাস্টিকের পা [illegible] সেটা জানত না [illegible] রেখেছিল। খবর [illegible] হাজির আনার বাড়িতে।

আনার মা যখন কার্লোকে [illegible] গেল আনা তখন একটা [illegible] কার্লোকে দেখেই আনা বলে উঠল, "[illegible] আমি আবার নাচব।" কার্লো [illegible] দিকে চাইলে, ওর দৃষ্টিটা পড়ল [illegible] ঢাকা আনার পায়ের দিকে।

"নাচবে [illegible] কার্লোর যেন বিশ্বাসই হয় [illegible]—"

"হ্যাঁ আবার আমি নাচতেই চাই—আমি জানি আমি আর কখনও ব্যালেরিনা হতে পারব না, কিন্তু আমার বয়েস রয়েছে, আমি আবার জীবন চাই। এই দেখ!"

আনা উঠে দাঁড়াল, কম্বল পড়ে গেল। ও ধরময় পায়চারি করতে লাগল আর কার্লো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল, তারপর আনা পায়ের সাহায্যে কয়েকটা নাচের ভঙ্গীও দেখালে।

"এখন অবশ্য নাচতে একটু বাধ বাধ লাগছে, কিন্তু একটু সাহায্য পেলে ওটা ঠিক হয়ে যাবে!"

কার্লো কারেনি লাফিয়ে উঠল, আনার

[illegible] সারা দেশকে চমকিত করে[illegible]

ছিল লাইনের জোড়ের মুখে পড়ে আটকে গিয়ে ওকে ভূপাতিত করলে, দুটো পা-ই পড়লো লাইনের ভেতরে।

লাইন পার হবার জন্য আর সব যারা ট্রেন পার হবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল, তারা চেঁচিয়ে উঠল, কতক লোক দৌড়ল আনাকে সাহায্য করতে। কিন্তু কিছুই করা গেল না। সত্তর মাইল বেগে এক্সপ্রেসখানি গর্জন করে যখন পার হয়ে গেল তারপর দেখা গেল আনার ঠিক গোড়ালির ওপর থেকে দুটো পা-ই গিয়েছে।

অচৈতন্য আনাকে মিলানের হাসপাতালে তখনিই নিয়ে যাওয়া হল একটা জরুরী অস্ত্রোপচার করতে। কেউ ভাবতে পারেনি অমন সুন্দর মেয়েটির বাঁচবার কোন আশা আছে।

কিন্তু আনা বেঁচে উঠল, যদিও প্রাণ রক্ষার জন্য ওর দুটি পা-ই কেটে দিতে হয়েছে। আনা তখন ইতালির ব্যালেরিনা না হয়ে উঠলেও ... ছিল, দেখতে সুন্দর এবং ... করা উচিত।" তার এই দুর্ভাগ্যের ... ন্যায় কথাই ... উদ্যোগপর্ব দেখে ... মানুষের মতো কাজ ... কথাটা মানুষের ভাষায়

ছড়িয়ে পড়লো ... পড়লে সকলে ... জাগে, ...

এই ... কলিকাতা ঘোড়দৌড়ে Ridiculer নামক ঘোড়া কুইনস কাপ জিতিয়াছে। —"কিন্তু এই পরিহাস কাকে? আমাদের অদৃষ্ট হলে বলব, এ পরিহাস নতুন-কিছু

নয়। আর আগেকার দিনের ভাইসরয়স্ কাপের সামিল কুইনস কাপে সে জেল্লা আর নেই ভেবে যদি পরিহাস করে থাক, তাহলে বলব অশ্বদেব, তুমি সত্যি ভদ্রলোক ... Noble animal যিনি তোমায় বলেছিলেন তিনি যে কতবড় ভুল করেছিলেন, তা তিনি জানেন না"—সহযাত্রী বোধ হয় সেদিন হেরে ঢোল হয়েছেন!

• • •

ক ... বুদ্ধি পাইতেছে—একটি ... শ্যামলাল বলিল—"এটা বোধ হয় চাউল নয়, মনে হয় চাল, বড়-র ও বড়ের চাল!!"

• • • •

কলিকাতায় একটি খুব বড় টাকা জালকারীর দল ধরা পড়িয়াছেন। সংবাদদাতা বলিতেছেন, এই দলে আটজন মহিলাও আছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"মায়াজালের পর টাকা জাল!"

• • •

ক্ষুদ্র সঞ্চয় সার্টিফিকেট বিক্রীর উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তারা নাগপুরে চিত্রতারকা সমাগমের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সংবাদে শুনিলাম কংগ্রেস নেতাদের চেয়ে চিত্রতারকা সন্দর্শনের জন্যই ভীড় বেশি হয়। আমাদের অন্য সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"হতেই হবে, কায়ার চেয়ে ছায়ার মায়া যে বেশি!!"

• • •

নাগপুর কংগ্রেসে টি বোর্ড যখন চা পরিবেশন করছিলেন, তখন বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন—আমাকে দার্জিলিং চা দিন, আধ কাপ চা-এর সঙ্গে আধ কাপ দুধ। সঙ্গে সঙ্গে আইন-মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন মহাশয় বলিলেন—আমাকে কড়া দার্জিলিং চা দিন। আমরা কড়া লোক, কড়া চা চাই। আমাদের জনৈক চা-রসিক সহযাত্রী বলিলেন—"হাল্কা হোক, কড়া হোক, চা হলেই হলো। চা চা, আপন প্রাণ বাঁচা।" সহযাত্রী শুধু চা-রসিক নন, সাহিত্য-রসিকও।

• • •

রাশ্যার উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রী মিকোয়ান আমেরিকার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন—"আমাদের মানুষের ...

শ্রী মিকোয়ান অন্যত্র বলিয়াছেন—স্তালিনের জীবিতকালে কেহ তাঁহার কথা অমান্য করিবার কথা ভাবিতেই পারিত না। এ প্রসঙ্গে খ্রুশ্চেভ বলিয়াছেন—একবার এক ভোজসভায় স্তালিন তাঁকে

নাচিতে বলেন এবং মেদবহুল দেহ নিয়াও তাঁকে নাচিতে হইল। শ্যামলাল বলিল—"নাচের পর এবারে খ্রুশ্চেভ গাইবেন এবং অন্য সবারই সে গান শুনতেই হবে, চান চা-ই না-ই চান!"

• • •

মস্কো বেতারে প্রকাশ যে, পৃথিবীর সকল স্থান হইতে ৬ হইতে ৬০ বছর বয়স্ক পর্যন্ত লোক নাকি স্বেচ্ছায় রাশ্যার মহাকাশযানের আরোহী হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। কোন কোন শিশু নাকি পত্র লিখিয়াছে—পূর্ণবয়স্করা কেন মহা-

কাশযানে বেশি স্থান দখল করিবেন, তার চেয়ে শিশুদের পাঠান। —"চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা-তে আর শিশুরা খুশী নয়, তারা চাঁদে গিয়ে বসতে চায়। শিশু-পাল বধ শুরু হতে আর দেরী নেই"—মন্তব্য করেন খুড়ো।
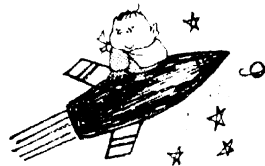
• • •

এক সংবাদে শুনিলাম মহাকাশচারী কুকুর "আলবিনা" তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছে। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"মহাকাশ ভ্রমণ করলে কি হবে, মাটির মায়া যাবে কোথায়? এখানে সেই চিরপুরাতনী কথা—ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে!!"

• • •

অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার মেকিফকে অনেকে "স্পুটনিক" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে ক্রিকেট সমালোচকরা বলিয়াছেন যে, ব্যাটসম্যানরা নৈশভোজ সভা বা অন্যান্য পার্টিতে কম যোগদান করে বেশিটা সময় যদি নেটে প্র্যাকটিস করেন, তাহলে বেশি উপকৃত হবে। —"ভাগ্যিস, সমালোচনা এ-দেশের ব্যাটসম্যান নিয়ে হয়নি, হলে ভোজসভায় তর্কের ভোজালি বেরিয়ে আসত"—যিনি মন্তব্য করলেন তাঁর মুখ দেখা গেল না।

• • •

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম পাকিস্তানে টেস্ট ক্রিকেট দল গঠনে নাকি গণ্ডগোল হইতেছে। এই গণ্ডগোল এমন স্তরে আসিয়াছে যে, নামজাদা বোলার খান মহম্মদের টেস্ট দলে না খেলার কানাঘুষাও শোনা যাইতেছে। —"তবে মিয়া ভাই, শুনেছিলাম না ভারতের সব কিছুই খারাপ। এখন তো দেখছি খেলায় দলাদলিটা ভারত থেকে বেমালুম চুরি"—বলিলেন বিশু-খুড়ো।

মেট্রিক প.

কে ভি ভেঙ্কটাচলম

দ কাছে অজানা কিছু নয়। গত বৎসর **দশমিক** পদ্ধতি এখন আর আমাদের জানুয়ারী মাস থেকে আবহাওয়া অফিস তাপমাত্রা সেণ্টিগ্রেডে, আর বৃষ্টিপাত মিলিমিটারে প্রকাশ করছেন। খবরের কাগজে আবহাওয়ার সংবাদ পড়ে এখন আমরা অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। আবার গত বৎসর এপ্রিলে দশমিক মুদ্রা চালু হয়েছে। এর মধ্যে শহরের লোক ত বটেই, গ্রামের লোকেরাও নয়া পয়সার হিসাবে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছে। আগামী অক্টোবরে দশমিক ওজন চালু করা হচ্ছে। আমাদের দেশে পরিমাপ ও ওজনের ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন [illegible]বিত হচ্ছে এগুলি তারই এক একটা ধাপ। এই সব ব্যবস্থার ফলে আগামী দশ বৎসরেই সমগ্র দেশে এক রকমের ওজন ও পরিমাপ প্রবর্তিত হবে, আশা করা যায়।

অনেকেই হয়ত বিস্মিত হয়ে ভাবছেন, যখন আমরা নূতন আর্থিক কাঠামো গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত, বিভিন্ন পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহে উৎকণ্ঠিত, তখন এই পরিবর্তন কিসে দরকার? আবার এখনও একদল আছেন যাঁরা এই পরিবর্তন প্রয়োজন মনে করেন, কিন্তু জাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে বলেন, বিদেশের মেট্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করবার কি প্রয়োজন? আমাদের ভারতীয় পদ্ধতিরই একটা মান নির্দেশ করে সর্বত্র চালু করলে ক্ষতি কি? কেউ কেউ আবার আশংকা করেন যে, রাতা-সম্পূর্ণ পদ্ধতি নেই, স্বভাবতই এর ফলে দেশে একটা দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

নির্দিষ্ট মানের প্রয়োজনীয়তা

সকলেই জানেন, ভারতে প্রায় একশত রকমের সের ও মণ এবং তরল দ্রব্যের অনেক রকমের **পরিমাপ** প্রচলিত আছে। তার বিঘার মাপ যে কত রকমের তা হিসাব করে বলা কঠিন। বহু শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ওজন ও মাপের এই গোলযোগ চলে আসছে। সবচেয়ে বড় অসুবিধার কথা হল এই যে, দৈর্ঘ্য, ওজন ও তরল দ্রব্য পরিমাপ করা যেতে পারে, এমন একটি সম্পূর্ণ পদ্ধতি নেই, স্বভাবতই এর ফলে অসুবিধা হয় বিস্তর। শুধু তাই নয়, এতে নানারকম চুরি-জুয়াচুরিরও সুযোগ থেকে যায়। কি ওজনে বিক্রী হচ্ছে তা' জানা না থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্য, এমন কি দৈনন্দিন কেনাবেচাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। প্রায়ই দেখা যায়, ওজনে—যেমন—পাউণ্ড [illegible] রাথাল প্রভৃতিতে লেনদে[illegible] ক্ষেত্রে তরল দ্রব্য সেরেও [illegible] পাত্রের মাপেও বিক্রী হয় [illegible] আবার সব জায়গায় এক রকম[illegible]

এইসব দিক বিচার করলে এক[illegible] মনে হয় না যে, বিভিন্ন রকমের [illegible]নে কারোরই সুবিধা হবে না। অথচ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ওজন ও পরি[illegible] অপরিহার্য। শিক্ষা, বিজ্ঞান, কারি[illegible], শিল্প, ক্রয়-বিক্রয়—সু[illegible] এর উপস্থিতি। একটা নির্দিষ্ট মানের ওজন সর্বত্র চালু থাকলে অনেক ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। সারা দেশে একরকম মুদ্রা প্রচলিত আছে বলে আমরা যে সুবিধাটা ভোগ করছি, এতেও ঠিক সেই সুবিধাটাই পাওয়া যাবে।

কোন্ পদ্ধতি চাই?

দেশে একরকম পরিমাপ চালু থাকা প্রয়োজন—এটা যদি মেনে নিই তা' হলে এর পরে প্রশ্ন হবে, কোন্ পদ্ধতিটা আমরা গ্রহণ করবো? উপযুক্ত পদ্ধতি আমরা তাকেই বলবো, যেটি সহজ অর্থাৎ জন-সাধারণ যা সহজে বুঝতে পারে ও ব্যবহার করতে পারে, পরিমাপের একক সর্বক্ষেত্রে একই হবে ও পরস্পর সংযুক্ত হবে, এককের কমতি বা বাড়তি পরিমাপ একই হার অনুসারে নির্দিষ্ট হবে এবং অন্তর্দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যে অনায়াসে ব্যবহার করা যাবে। এক কথায় পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত হওয়া চাই, আর দেশে-বিদেশে সমানভাবে গ্রাহ্য হওয়া চাই।

তবে যে পদ্ধতি সারা দেশে প্রযোজ্য হবে, তার জন্য স্বভাবতই দেশীয় পদ্ধতি-গুলি সর্বপ্রথমে বিবেচনা করে দেখা দরকার। দুঃখের কথা, ভারতে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি চালু নেই, যা এইসব চাহিদা মেটাতে পারে। আমাদের দেশে ওজনে সের ও পাউণ্ড দুটোই প্রচলিত আছে। সাধারণত ৮০ তোলায় সের হয়, আর ১৮০ রতিতে হয় এক তোলা। সেরকে ক্রমান্বয়ে ৪ বার অর্ধেক করে গেলে আমরা পাই ছটাক—এক সেরের ১৬ ভাগের এক ভাগ। কাজেই ৫ তোলায় হয় এক ছটাক। এই ছটাককে আরও ভাগ করতে গেলে তোলার ভগ্নাংশ এসে যাবে। তাতে ওজন অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়াবে। তেমনি দৈর্ঘ্য পরিমাপের

... প্রবল বাধা আর জটিলতার [illegible]ন হয়ে শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা [illegible]ত্যাগ করতে হয়েছিল। আজও সে অবস্থার যে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেছে তা নয়।

সে যাই হউক, এখন আমাদের সম্মুখে দুটি মাত্র পথ খোলা আছে—হয় দেশীয়

মাষায় এক সের কম। ...
সেরকে দশমিক পদ্ধতিতে ভাগ
সহজেই ব্যবহার করা যাবে। কথাটা ঠিক,
কিন্তু এতে মণ, তোলা, ছটাক সব বাদ দিতে
হবে। সেরের ভগ্নাংশ বা গুণিতক নূতন
করে নির্দেশ করতে হবে।

দৈর্ঘ্যের পরিমাপ গজের বেলায় অসুবিধা আরও বড় করে দেখা দেবে। গজকে দশমিক হারে ভাগ করলে ফুট ও ইঞ্চির দৈর্ঘ্য বদ্‌লে যাবে। আর যদি তা না করা হয়, তবে গোলমালটা বেশী হবে। তা ছাড়াও গজ বৃটেনের একক। আমরা ইচ্ছামত তার পরিবর্তন করতে পারি না। তরল পদার্থের বেলায় অবস্থাটা আরও সংকটাকার। কেন্দ্রীয় সরকার আজ পর্যন্ত পরিমাপের কোন এককই স্বীকার করেন নি। কাজেই আমাদের কোন একটি পদ্ধতির রদবদল করে তাকে সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এই অবস্থায় যেসব আন্তর্জাতিক পরিমাপ পদ্ধতি চালু আছে তারই একটিকে গ্রহণ করাই আমাদের একমাত্র পন্থা। এইরকম দুটি পদ্ধতি আছে—একটি ফুট-পাউন্ড, অপরটি মেট্রিক বা দশমিক পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতিটি বৃটেন, আমেরিকা ও কমনওয়েলথ দেশগুলিতে চালু আছে। দশমিক পদ্ধতি বিশ্বের সকল দেশে ব্যবহৃত হয়, এমন কি প্রথমোক্ত দেশগুলিতেও তা আইনত স্বীকৃত।

ফুট-পাউন্ড পদ্ধতি

ফুট-পাউন্ড পদ্ধতির এককগুলি হচ্ছে—পাউন্ড, গজ, গ্যালন। ৭ হাজার গ্রেণ বা ১৬ আউন্সে এক পাউন্ড হয়, কিন্তু ট্রয় ওজনে (মূল্যবান পাথর, স্বর্ণ প্রভৃতিতে ব্যবহৃত) ৫৭৬০ গ্রেণে বা ১২ আউন্সে পাউন্ড হয়। আবার ১৪ পাউন্ডে এক স্টোন, ২৮ পাউন্ডে এক কোয়ার্টার, ১১২ পাউন্ডে এক হান্ড্রেড ওয়েট ও ২০ হান্ড্রেড ওয়েটে হয় এক টন। গজের হিসাব আগেই বলেছি। তরল দ্রব্য পরিমাপের ৪ কোয়ার্টে বা ৮ পাইন্টে বা ৩২ গিলে বা ১৬০ ফ্লুইড আউন্সে বা ১২৮০ ড্রাকামায় অথবা ৭৬,৮০০ মিনিমে এক গ্যালন হয়। উপরের দিকে ২ গ্যালনে এক স্টোক, ৪ পেকে এক বুশেল, ৮
...দা।
...পাউন্ডে.
...গ্যালন হয়
...১৬০ আউন্সে
...এক কথায় বলা
...পদ্ধতি নামে এক
...সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।
...দর্শ পদ্ধতি যেভাবে
...দিক থেকে বিচার করলে
পাউন্ড পদ্ধতি সহজ তো
... পাউন্ডের মধ্যেও কোনরকম
যোগা... নেই। ওজনের ভগ্নাংশও
এমনভাবে ... দিষ্ট যে, তা মনে রাখা খুবই
কঠিন। তবে ... সুবিধা এই যে, এটা
আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে
প্রচলিত।

মেট্রিক পদ্ধতি

এইবার মেট্রিক পদ্ধতি বিচার করে দেখা যেতে পারে। মেট্রিক কথাটা এই পদ্ধতির মূল একক মিটার থেকে এসেছে।

নির্দিষ্ট অবস্থায় এক কিলোগ্রাম ওজনের জল যে আয়তন অধিকার করে থাকে, সেটাই হলো ঘনমানের একক—লিটার। কিলোগ্রামের সংজ্ঞা স্বতন্ত্রভাবে নির্দেশ করা হলেও এক ঘন ডেসিমিটার জলের বস্তুর সমান। যে কোনও মাপের অংশ তার নিম্নবর্তী অংশের দশগুণ। দশগুণ বা দশমাংশের প্রতিটি ধাপকে এক একটি বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়—যেমন কিলো ১০০০ গুণ, হেকটো ১০০ গুণ, ডেকা ১০ গুণ, ডেসি ১০ ভাগের ১ ভাগ, সেন্টি ১০০ ভাগের ১ ভাগ ও মিলি ১০০০ ভাগের ১ ভাগ। এই হলো সম্পূর্ণ মেট্রিক পদ্ধতি। এখন একটু ভেবে দেখলেও বোঝা যাবে যে, আমাদের আদর্শ পদ্ধতির সমস্ত গুণ এই মেট্রিক পদ্ধতিতে রয়েছে।

এখনই কেন ?

কাজেই সমস্ত ভারতে যদি কোন এক পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়, তবে মেট্রিক বা দশমিক পদ্ধতিই হবে শ্রেষ্ঠ। এটা যদি মেনে নিই, তা হলে তারপরে আসবে উপযুক্ত সময়ের কথা। আজ যখন বিভিন্ন উদ্যোগের জন্য অর্থের নিদারুণ প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, তখন দশমিক পদ্ধতি প্রবর্তন কি উচিত হবে ? আর দশ কি পনের বছর পর করলে চলে না ? আমাদের এতকালই যদি চলে গিয়ে থাকে, তবে আর কয়টি বছর অপেক্ষা করলে ক্ষতি কি ? দেশের বর্তমানে যে অবস্থা তাতে এই দশ পনের বছরে অনেকে কিছু এসে যাবে—
...র একমাত্র উত্তর।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারত ...বিপ্লবের ...দ্বারদেশে এসে পৌঁচেছে। ...শিল্পের সংগে ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতির অংগাঙ্গী সম্পর্ক। শিল্পায়ন অনেক দূর এগিয়ে গেলে, এই পরিবর্তন অনেক বেশী জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে দাঁড়াবে। ঠিক এই কারণেই শিল্প-সমৃদ্ধ বৃটেন ও আমেরিকাকে আজ দশমিক পদ্ধতি গ্রহণে এত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ভারত সবে শিল্পায়নের পথে চলেছে। এখনই যদি আমরা দশমিক পদ্ধতি গ্রহণ না করি, তবে ভবিষ্যতে সমস্যা দেখা দেবে। আজ পুরাতন পদ্ধতি অনুসরণ করে চললেও একদিন না একদিন আমাদের দশমিক পদ্ধতির শরণাপন্ন হতেই হবে। আর যত বেশী দেরী হবে, তত বেশী ব্যয়সাধ্য হবে এই পরিবর্তন।

সত্য বলতে কি, এরই মধ্যে আমরা প্রায় ৯০ বছর দেরী করেছি। ১৮৭০ সালেই দশমিক পদ্ধতি চালু হবার কথা ছিল। ভারত ... প্রয়োজনীয় আইনও রচনা করে রেখেছিলে। এ প্রসংগে একথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ক্ষমতা অধিকারের পর পরই বৃটিশ সরকার এদেশে দশমিক পদ্ধতি প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়ে সংগত কাজই করেছিলেন। যাই হোক, তৎকালীন বৃটিশ বণিকদের প্রবল বিরোধিতার ফলে প্রস্তাবিত সংস্কার কার্যকরী করা যায় নি। ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে এই প্রশ্ন আবার নূতন করে ওঠে। দীর্ঘকাল পরে আমরা সেই সংস্কারই কার্যকরী করতে চলেছি এবং বলতে বাধা নেই, আজই হলো তার শ্রেষ্ঠ সময়। এই শুভ মুহূর্তকে যদি আমরা অবহেলা করি, তবে ভবিষ্যতে এমন সুযোগ আর কখনো আসবে না।

পরিবর্তনের ধারা

এখন প্রশ্ন হতে পারে এই পরিবর্তন একদিনেই চালু করা হবে, না কয়েক বছর ধরে ধীরে ধীরে চালু করা হবে। বলাই বাহুল্য, রাতারাতি চালু করা অসম্ভব। যাতে ব্যবসা-বাণিজ্যের এবং দৈনন্দিন জীবনে কোন রকম অসুবিধা না হয় সে-দিকে দৃষ্টি রেখেই পর্যায়ক্রমে নূতন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। দৈনিক ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নূতন পরিমাপ অল্পদিনেই চালু করা যেতে পারে। কিন্তু শিল্প ও কারিগরী ক্ষেত্রে চালু করা সময়সাপেক্ষ। ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে দশ বৎসর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। তবে বহু অর্থ ব্যয় করে, উৎপাদনের ক্ষতি করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যে চালু করা যায় না এমন নয়। এই কারণেই ভারত সরকার নূতন পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে প্রবর্তনের জন্য দশ বছর সময় নির্দিষ্ট করেছেন।

ক্রিকেটের রাজকুমার

শ্রীখেলোয়াড়

১৯০৭ সালে ১০ই মার্চ রণজি জামনগরে উপস্থিত হন। এক রাকজীয় সম্বর্ধনার মধ্য দিয়ে জামনগরের জনসাধারণ তাদের এতদিনের ভাগ্যবিড়ম্বিত নতুন ভাগ্য-বিধাতাকে বরণ করে নেয়। জামনগরের জামসাহেব হিসাবে রণজির নতুন নামকরণ হয় জামরাওয়াল বিভাজী। রণজির গদি পুনরুদ্ধারের সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে হাজার হাজার অভিনন্দনের তারবার্তা আসে। ভারতের দেশীয় নৃপতিদের, ভারতীয় জনসাধারণের এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার অসংখ্য হিতৈষীর শুভেচ্ছা লাভ করলেও নিজের রাজ্যের মুষ্টিমেয় লোকের কাছে রণজির জীবন একেবারে নিরাপদ ছিল না। তাই জাম-নগরে রণজির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিরাপদ বসবাসের জন্য জুনাগড়ের রাজা নিজের হাতে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রভুভক্ত আরব প্রহরী এবং বিশ্বাসী সব ভৃত্য নিযুক্ত করা হয় নতুন জামসাহেবের জন্য। বিশেষ করে তাঁর খাবার দাবার এবং চলাফেরার সময়ে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয়।

কিছুদিন পরেই রণজির রাজ্যাভিষেক। ভারতের প্রায় অধিকাংশ নৃপতি এসে হাজির হন বিরাট বিরাট ও বহুমূল্য উপহারের ডালি নিয়ে। আলো, হাসি, গান ও উৎসবে ভরে ওঠে রাজধানী। শাস্ত্রসম্মত এবং রাজপুত প্রথামত অভিষেক উৎসবের পর আরম্ভ হয় সাধারণ অভিষেক উৎসব।

প্রতি [illegible]
সাহেব [illegible]
রণজি তাঁর [illegible]
বিদেশ থেকে [illegible]
পেয়ে সত্যই আ[illegible]
আমি শঙ্কিতও এই [illegible]
আমার এই গুরুদায়িত্ব [illegible]
করেছেন তাঁদের সে ম[illegible]
পারবো কি—না! আমি [illegible]
করবো সেবার মনোভাব নি[illegible]
রাজ্যের ভার আমি আজ গ্রহণ [illegible]
রাজ্যের ঘরে ঘরে আজ প্লেগ, [illegible]য়েড, বসন্ত প্রভৃতি মহামারীর তাণ্ডব লীলা চলেছে। রাজকো[illegible] প্রায় শূন্য। অনাচার, অত্যাচার [illegible] ব্যাভিচার এবং স্বেচ্ছাচার এতদিন যে শাসনযন্ত্রকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেই ভগুর

[illegible] কাজে পরিণত করার জন্যে [illegible]দিন থেকেই রণজি প্রাণপাত পরিশ্রম শুরু করেন। যেদিকে এগিয়ে যেতে চান সেইদিকেই অন্ধকার। তবে রণজির বুদ্ধি ও বিচারশক্তি আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত ছিল না। বিদেশে উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত, উচ্চমনা রণজি তাই ধীরে ধীরে ঠিক পথ ধরেই এগিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু এত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম তিনি সহ্য করতে পারলেন না। কিছুদিনের

রণজি এখন জামরাওয়াল বিভাজী

পড়ল।
...নের জন্য
রণজি আবার
...।

...হবার পর সেখানে
হলো—এখনকার নব-
কি আর আগের রণজির
...দ দেখাতে পারেবন?
...রণজি তাঁর পুরনো বন্ধু-
...কে পাঠান। যাদের কাছ থেকে
করেছিলেন তাঁদের ডেকে প্রাপ্য
...দেও অতিরিক্ত অর্থ দিয়ে ঋণ
পরি...ধ করেন। এতদিন অর্থের টানা-টানির জন্য যে সব সাধ এতদিন তাঁর অপূর্ণ ছিল ... সেই সাধ একে একে মেটাবেন বলে স্থির ... তিনি। লর্ড উইণ্টারটনের কাছ থেকে সাসেক্সে ... পার্কের জমিদারীটা তিনি ইজারা নিয়ে ফেলেন। ১৫,০০০ একর জমি সমেত বিরাট বাড়িটাকে মনোমত করে গুছিয়ে নিতে তাঁর দেরি হয় না। একটা সুন্দর ক্রিকেট পিচও তৈরী করা হয়। এরপর যেখানে যত বন্ধুবান্ধব আছেন সব একে একে সেখানে এসে হাজির হন। খাওয়া, দাওয়া, শিকার করা, ক্রিকেট খেলা এইসব চলতে থাকে দিনরাত। ক্রিকেটজনক গ্রেসও তখনকার ইংলণ্ডের কীর্তিমান খেলোয়াড়দের নিয়ে রণজির বাড়িতে অতিথি হয়ে ক্রিকেট খেলে হৈ হল্লা করে যান মাঝে মাঝে।

সম্পূর্ণ সুস্থ না হলেও এবং ডাক্তার বারে বারে রণজিকে নিষেধ করলেও তিনি ক্রিকেট মাঠের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারেন না। মরসুম শেষে দেখা যায়, সাসেক্স দলে রানের গড়পড়তায় রণজির নামই রয়েছে সকলের উপরে। ইংলণ্ডের ব্যাটিং এভারেজেও সপ্তম স্থানের অধিকারী হয়েছেন তিনি। ইংলণ্ডের জনসাধারণ রণজিকে আবার নিজেদের মধ্যে পেয়ে সুখী হয়। কিন্তু রণজি তখন চল্লিশের কোঠা পার হয়েছেন। তা ছাড়া, নিজ রাজ্যের গুরুদায়িত্ব ছেড়ে ইংলণ্ডে ব্যাটবল নিয়ে পড়ে থাকার মত সময়ও তখন তাঁর নেই। তাই মরসুম শেষ হতেই রণজি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে সরকারীভাবে বিদায় নিতে সিদ্ধান্ত করেন। রণজির এই ঘোষণায় সারা বিশ্বের ক্রিকেট রসিকদের মনে বিষাদের ছায়া নেমে আসে। ডেলি নিউজে লেখা হয়—

'The king of Cricket will come no more....Prince of a little state but king of a great game. There were giants before, but as a batsman the Indian will live as the supreme exponent of the Englishman's game. His play is as sunny as his face; he is not a miser hoarding up runs but a millionaire spending with yet judicious prodigality....His batting can be compared with Asquith's oratory, who exercises the same thrift in words as the Jam Saheb in action."

লর্ড সেলিসবেরী বলেছিলেন—

"here was a black man playing cricket for all the world as if he were a white man....He is the first Indian who has touched the imagination of our people....India could not have found a more triumphant missionary."

গ্রেস বলেছিলেন—

"....I assure you that you will never see a batsman to beat the Jam Saheb if you live for a hundred years...."

ইংলণ্ডের মাটিতে এবং সাহেব বন্ধুদের নিয়ে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটালেও তিনি ভারতীয় জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার বিষয়ে সকল সময়েই সচেতন ছিলেন। তাই তাঁর ... সম্বর্ধনা সভায় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং সম্ভ্রান্ত বনেদী ইংরেজদের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—

"The doors to Indian peoples have unfortunately been shut in Australia, and in Canada and South Africa. I cannot but regret it, and I think that the Home Government ought to try and make out some scheme by which Indians could give their labour and trade in our colonies. I honestly believe that the pressent agitation in India arose, not so much from any dislike of the British Government,....but when people got no employment they were apt, as in this country, to brew mischief....I leave England with a sorrowful heart. But I am starting a new career with this one ideal—to do my duty to my country and my people, to uphold the honour of my house and my race.."

অর্থাৎ রণজি বলেছিলেন—"অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, ভারতবাসীদের জন্য অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বার উন্মুক্ত নয়। ভারতবাসীরা যাতে এইসব কলোনীতে ব্যবসা বাণিজ্য ও কাজকর্ম করবার সুযোগ পায় ব্রিটিশ সরকারের সে বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে কিছু করা প্রয়োজন। আজ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। ভারতবাসীরা ব্রিটিশ সরকারকে পছন্দ করে না বলে এ আন্দোলন নয়—বেকারী এবং অন্নাভাবই এ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত কারণ। আমার দেশ ও দেশবাসীর প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এবং আমার ঘর ও আমার জাতির সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য আজ আমি দুঃখভারাক্রান্ত বিষাদ হৃদয়ে ইংলণ্ড ত্যাগ করছি।"

ভারতে ফিরে এসে রণজি নিজের রাজ্য সংস্কারের কাজে হাত দেন। কিন্তু কাজ

করতে নেমে তিনি দেখতে পান যে, তাঁর পূর্বপুরুষেরা প্রজাদের পয়সায় ভোগসুখ উপভোগ করেছে কিন্তু নিরী- প্রজাদের উন্নতির জন্য বিশেষ কিছুই করে যাননি। রাজকোট থেকে রাজধানী পর্যন্ত মাত্র ৫২ মাইল রেলপথ ছিল সারা জাম- নগরে। প্রজাদের চিকিৎসার জন্য ৯টি ডিস্‌পেন্সারী থাকলেও তা থেকে সময়মত এবং নিয়মমত ঔষধপত্র কিছুই পাওয়া যেত না। লেখাপড়ার ব্যবস্থাও ছিল তথৈবচ। এ সব তো গেল বাইরের কথা।

রাজ্যের কিছু কিছু কর্মচারী জেসাজীর আমলে যেমন অলস ও আয়াসের জীবন কাটিয়ে এসেছিলেন, রণজির আমলেও সেইভাবেই চলতে আরম্ভ করলেন। যাদের নিয়ে রণজি কাজ করবেন তাদের মধ্যেই যদি পাপ বাসা বেঁধে থাকে তাহলে তাঁর অগ্রগতি মন্থর হয়ে পড়বে এটা বেশ বুঝতে পারলেন তিনি। তাই দৃঢ় হাতে অক্ষম ও অপদার্থ কর্মচারীদের একে একে সরিয়ে দিতে তিনি একটুও দ্বিধা করলেন না। অনেকে ... এ ব্যাপারে ভয় ভীতি দেখালেও রণজি নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে অবিচল থাকলেন। প্রাসাদের কোন মহিলার যাতে কোনরূপ অযত্ন বা অসম্মান না হয় সেদিকেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। জেসাজী এবং বিভাজীর ভোগ্য এবং পোষ্য মহিলাদের অসুবিধা হতে পারে এই কথা ভেবে নিজে তিনি এসে উঠলেন গেস্ট হাউসে।

রাজ্য সংস্কারের জন্য দিনরাত কঠিন পরিশ্রমের মাঝে ডুবে থাকলেও রণজি তাঁর প্রিয় ক্রিকেট খেলাকে একেবারে ভুলে যেতে পারেন না। রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি নিজের মনোমত করে একটি সুদৃশ্য ক্রিকেট প্যাভেলিয়ান তৈরীর কাজ আরম্ভ করেন তিনি। ক্রিকেট উৎসাহী যুবকদের সেখানে গড়ে পিটে মানুষ করবেন এই ছিল তাঁর আশা। যদি তাঁর শিক্ষা সুফল প্রসব করে, তবে পার্শী দলের মত একটি রাজপুত ক্রিকেট দল নিয়ে সাগর পারে পাড়ি দেবেন একথাও মনে মনে তিনি ভেবে রাখেন।

রণজি ধীরে ধীরে প্রজাদের মন জয় করে নিচ্ছেন দেখে জেসাজীর অনুচরেরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। রণজির বিভিন্ন উন্নয়ন পরি- কল্পনার কথা শুনে ঐসব কুচক্রী লোকেরা নানা কথা প্রচার করে বেড়ায়। তাদের বক্তব্য, যে রাজ্যের ভাড়ারের হাঁড়ি শূন্য সে রাজ্যের উন্নতির কথা ভাবতে পারে তারাই যারা উন্মাদ ও নেশাগ্রস্ত। শুধু বিদ্রূপ বা শ্লেষ বর্ষণ করেই তারা ক্ষান্ত হয় না। লন্ডন থেকে ফেরার মুখে মার্সেলিস, এডেন অথবা বোম্বাই এই তিনটি বন্দরের মধ্যে যেখানেই যখন সুযোগ পাওয়া যাবে সেইখানেই রণজিকে হত্যা করা হবে এমন চক্রান্তও স্থির হয়ে যায়। একটি মূল্যবান জীবন এইভাবে নষ্ট হয়ে যায় এটা বোধ হয় বিধাতার ইচ্ছা

ভারতে ... রাজ্যের ... ব্যবস্থাকে ... রাজপুতনা মরু, এখানে বারোমাস ... সহজলভ্য নয়, সেখানে ... তো চিন্তাই করা যায় না ... চাতক পাখীর মত ... চাষীরা। যেবার বর্ষা ... দুর্ভিক্ষ ও মহামারী করাল ... ঘিরে ধরে। জলের জন্য ছটফট ... অগণিত প্রজা। সারা রাজ্য হাহাকা... যায়। রণজির আগে জামনগরের কোন জামসাহেবই প্রজাদের এই জলকষ্ট দেখে
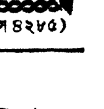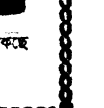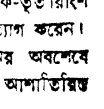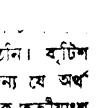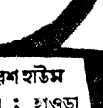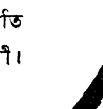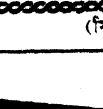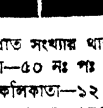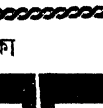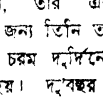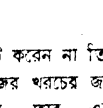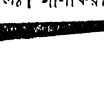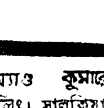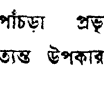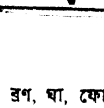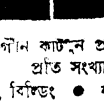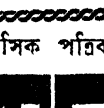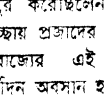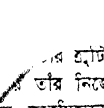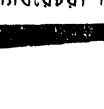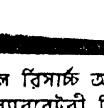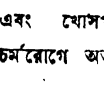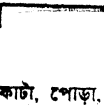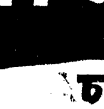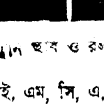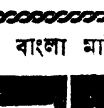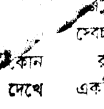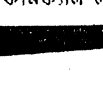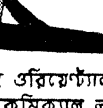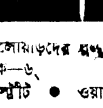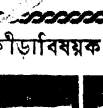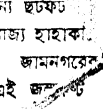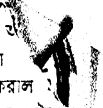
...র ত্রুটি করেন না তিনি। বৃটিশ ... তাঁর নিজের খরচের জন্য যে অর্থ ...র করেছিলেন, তার এক-তৃতীয়াংশ স্বেচ্ছায় প্রজাদের জন্য তিনি ত্যাগ করেন। রাজ্যের এই চরম দুর্দিনের অবশেষে একদিন অবসান হয়। দু'বছর আশাতিরিক্ত

ঘণ্টার জন্য রণজিকে কিন্তু রা... পাওয়া যেতো না। সে সময়ে রণজি... খ‍ুঁজতে হলে যেতে হতো ক্রিকেট মাঠে। নিজের মনোমত করে গড়া ক্রিকেট পিচে কোনদিন হয়তো দেখা যেতো রণজি ছেলেদের ব্যাট করা শেখাচ্ছেন। আবার কোনদিন হয়তো দেখা যেতো তাঁকে ফিল্ডিং বা বোলিং সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে। এই সময়টুকু জামরাওয়াল বিভাজী ভুলে যেতেন যে, তিনি জামনগরের জামসাহেব।

১৯১১ সালে পঞ্চম জর্জের দিল্লী

ফোনঃ ৪৭-২০৭৭

...জন্য ...স্থাপিত ...কেন না। ...যায়। ফলে ...আঘাত আসে। ...জন্য তিনি এত ...দুর্দিনে সেই ...কেই সাহায্য পাবেন, ...দ‍ুহাতে টাকা খরচ ...ন্তু কার্যক্ষেত্রে রণজি ...ছবি। আর্থিক সাহায্যের ...একজন বৃটিশ কর্মচারীকে আর্থিক ...পদেষ্টা হিসাবে নবনগরে রাখবার আদেশ হলো। রাজ্যের বিপদ জেনেও এই অপমানজনক শ... অর্থগ্রহণ করতে কিছ‍ুতেই রাজী হলেন ন...। শারীরিক ক্লান্তি ও মানসিক অশান্তিতে কাতর ... ভারত থেকে কোন সাহায্যের আশা না দেখে আবার জাহাজে চেপে বসলেন।

ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিয়ে ২৪ ঘণ্টা যেতে না যেতেই ব্যাট-বল নিয়ে রণজিকে লর্ডস মাঠে অন‍ুশীলন করতে দেখা গেলো। রণজির শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তি দ‍ূর করার সঞ্জীবনী মন্ত্র ছিল ক্রিকেট খেলার মধ্যে। দীর্ঘদিন প্রতিযোগিতা-মূলক ও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট থেকে দ‍ূরে তিনি সরে আছেন। তব‍ুও ক্রিকেটের দক্ষ শিল্পী রণজির নিজের উপর আস্থা ফিরে পেতে খ‍ুব বেশী সময়ের প্রয়োজন হলো না। মোট ২৮ ইনিংস খেলায় তাঁর গড় রানের হিসাব উঠলো প্রায় ৫০এর কাছা-কাছি। রণজির খেলা দেখে ইংলণ্ডের রণজি-প্রিয় অনেক ক্রিকেট উৎসাহী ইংলণ্ড সফরকারী অস্ট্রেলিয়ার বির‍ুদ্ধে রণজিকে ইংলণ্ড দলের অধিনায়করূপে দেখতে চাইল। কিন্তু রণজির তখন ক্রিকেট নিয়ে পড়ে থাকার সময় কোথায়? রাজ্যের যে গ‍ুর‍ুদায়িত্ব নিয়ে তিনি এতদ‍ূরে এসেছেন, সেই পথের সন্ধান খ‍ুঁজতেই তিনি তখন ব্যস্ত।

লণ্ডন থেকে ভারতে ফিরে রণজি তাঁর বিয়ে সম্বন্ধে নানা কানাঘ‍ুষো ও গ‍ুজব শ‍ুনতে পান। কেউ বলে তিনি নাকি কোন ইংরেজের মেয়েকে বিয়ে করছেন। কেউ বা বলে কোন আইরিশ মেয়েকে তিনি এবার ঘরে নিয়ে আসবেন। আবার একদল লোকের ম‍ুখে শোনা যায়, এক সম্ভ্রান্ত ওয়েলস য‍ুবতীর প্রতি তিনি নাকি অন‍ুরক্ত। সর্বশেষে কিছ‍ু কিছ‍ু প্রবীণ ব্যক্তি পাশের কোন এক রাজ্যের এক স‍ুন্দরী রাজকন্যাকে তাঁর বাগ্‌দান করে রাখার কথা বেশ রঙ দিয়েই প্রচার করে বেড়ায়। রণজি শোনেন ...সে হাসেন। কারো সঙ্গে ...া করা আর তাকে বিয়ে করা এক ... নয়। দেশ-বিদেশের কত সম্ভ্রান্ত ...ন্দরী য‍ুবতীই তো তাঁর কাছে এসেছে। বন্ধ‍ুভাবে তিনি মিশেছেন—হেসেছেন বা হৈ-হল্লা করেছেন তাদের সঙ্গে। নিজের ফেলে-আসা জীবনের দিকে ফিরে তাকিয়ে তন্ন তন্ন করে তিনি ভেবে দেখেন—খ‍ুঁজে দেখেন। কিন্তু কৈ কারো ছবিই তো তার হ‍ৃদয়পটে ভেসে ওঠে না। খেলোয়াড় জীবনের ধাপে ধাপে এগিয়ে যাবার চিন্তাতেই যে য‍ুবমন আচ্ছন্ন ছিল, সে মনে ক্রিকেটের ব্যাট-বল ছাড়া আর কিছ‍ুই তো আঁচড় কেটে যেতে পারেনি।

আত্মীয়স্বজনের বিয়ে ব্যাপারে রণজির মন ছিল অত্যন্ত উদার। ভাইপো-ভাইঝিদের তিনি নিজে থেকেই বলতেন—জীবনের সঙ্গী খোঁজার বিষয়ে তোমাদের স্বাধীনতায় কখনো আমি হস্তক্ষেপ করবো না। উপয‍ুক্ত বয়সে নিজেরাই তোমরা তোমাদের ...ন্দ্র বা পাত্রী ঠিক করে নেবে। শিক্ষার আলোক পেয়েছো তোমরা। বিচার-ব‍ুদ্ধিও তোমাদের যথেষ্ট হয়েছে। স‍ুতরাং তোমাদের চিরদিনের জন্য যে সঙ্গী-সাথী বা শ‍ুভাকাঙ্ক্ষী হবে, যে তোমাদের কর্মের প্রেরণা জোগাবে, সে নির্বাচনের ভার বা দায়িত্ব সম্প‍ূর্ণ তোমাদেরই। শ‍ুধ‍ু আমার একটি অন‍ুরোধ, এই নির্বাচনের ব্যাপারে সামাজিক বিধিনিষেধ বা জাতকুলকে প্রাধান্য দিয়ে নিজের নির্বাচনের সীমানাকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলো না। রাজপ‍ুতদের পর্দা-প্রথাকে রণজি বিশেষ সমর্থন করতেন না। মহিলাদের আড়ালে রাখলেই তাদের অন্তরের অসৎ অভিলাষ ধ‍ুয়ে-ম‍ুছে সব কটি সৎ-প্রব‍ৃত্তিকে জাগ্রত করে তোলা যায়, এ য‍ুক্তি ইউরোপীয় শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত রণজি কোনমতেই মেনে নিতে রাজী ছিলেন না।

রাজ্যের বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিল রণজির হাতে। বিচার আসনে বসে তিনি সব সময়েই প্রজাদের প্রতি দরদী মনোভাবের পরিচয় দিতেন। রণজির জীবন-দর্শন ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল। তিনি বলতেন—
"My religion teaches me to try and find out something good about people. Don't believe the bad about them until you found yourself wrong in thinking them good men and women."
অবশ্য সকলকেই সৎ ভাবতে গিয়ে তিনি যে কোন কোন সময়ে ভুল করেন নি বা ঠকেন নি এমন নয়। তবে কঠিন অপরাধ করলে বা দোষ করলে তিনি রেহাই দিতেন না দ‍ুষ্কৃতকারীদের। ফাঁসি দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী রণজি তাই নিষ্ঠ‍ুর হত্যার অপরাধে এক ব্রাহ্মণকে সর্বসমক্ষে ফাঁসি দেওয়ার হ‍ুকুম দিয়েছিলেন। ক্রমশ

॥ ১০ ॥
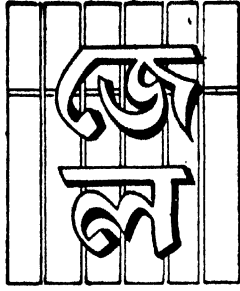
২১।১।৫৫—দিন পনের ষোল যাবত জ্বর হইতেছে। প্রথম ছয়-সাত দিন তেমনটা খেয়াল হয় নাই, ভাবিয়াছি অমনিই সারিয়া যাইবে। ১৩।১ তারিখ হইতে এস এ এসকে বলি—টেম্পারেচার রেকর্ড করা শুরু করি। প্রথম কয়েকদিন দুপুর ১২টা হইতে রাত্র ১২টা পর্যন্ত জ্বর থাকিত। কয়েকদিন কুইনিন মিকশ্চার ও অ্যালকেলিন মিকশ্চার ব্যবহারের ফলে সন্ধ্যা ছয়টা হইতে রাত বারোটা পর্যন্ত টেম্পারেচার চলিতে লাগিল। অধিক রাত্র পর্যন্ত ঘুম হইত না। টেম্পারেচার ১০১-এর উপর দেখি নাই। কাল এবং পরশু টেম্পারেচার উঠে নাই, তবে সন্ধ্যা হইতে জেনারেল আনইজিনেস ঠিক আসে, যেমন জ্বরের সঙ্গে। কানে তালা লাগিয়া গিয়াছে। আজ এস এ এস-এর ইনসট্রাকশানে এক দাগ খাবার পরে কুইনিন মিকশ্চার বন্ধ করা হইল। তবে ক্যালশিয়াম চলিতে লাগিল।

সেদিন মিঃ আবুহোসেন সরকার এম এল এ দেখা করিলেন। তিন-চার দিন পরে বই এবং ভেষজ ইত্যাদি ইত্যাদি সরবরাহ করিলেন। আজ বৃঃ রক্তগর্ভ ও মহাপিত্তান্ত রস সরবরাহ করিলেন।

ইতিমধ্যে তিন-চার দিন পূর্বে ডি আই ও আমার ঘরে আসিয়া দেখা করিলেন (বরিশালের বর্তমান ডি আই ওর পূর্বে যিনি ছিলেন)। জেলাশাসক সেদিন একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে এবং পুলিস সুপার একজন ডি আই ওকে পাঠাইয়াছেন।

এবার জেলে এই প্রথম অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিলাম, খুব বেশী পরিমাণে। শরীরের জ্বালা খুব। জ্বর আসে না বটে, কিন্তু যন্ত্রণা খুব, গ্রন্থি প্রভৃতির কষ্টও বেশ। যদি এটা সাধারণ জ্বর হয়, অন্য কিছু না হয়, তাহা হইলে মশার কামড়ই প্রধান কারণ মনে হয়। এই অসুখ রংপুরে হইলে মনে হয় অসুবিধা খুব বেশী হইত—ওখানকার যে পরিবেশ। ওখানে যে পরিস্থিতি দেখা দিয়াছিল, তাহার উৎপাত ত ছিলই, তদুপরি এই রোগের যন্ত্রণা। ওখানকার তুলনায় এখানকার অপেক্ষাকৃত ভাল। ওখানকার যে অসুবিধা (সাইড রুম ইত্যাদি) তাতেও যন্ত্রণা বেশী হইত।

২৫।১।৫৫—জানুয়ারী মাসভর স্বাস্থ্য খুব খারাপ যাইতেছে। জ্বরটা ম্যালেরিয়া মনে করিয়া কুইনিন মিকশ্চার ইত্যাদি দিলেন। তাহাতে জ্বরের কাঁপুনি কমিয়াছিল। আবার শুরু হইয়াছে। দুই-তিন দিন টেম্পারেচার ছিল না, জ্বর জ্বর ভাব ছিল সারা রাত্র এবং ঘুমও নাই। আজ ডাক্তার সাহেব বলিলেন, মল-মূত্রাদি পরীক্ষা করিতে হইবে।

রংপুর টি বি ওয়ার্ড হইতে কোন ছোঁয়াচে রোগ লইয়া আসিলাম কি? দেখা যাক। এবার জেলে পাবনাতে আসিয়াই প্রথম হাসপাতালের ঔষধ নিলাম।

যদি কঠিন কোন রোগ হইয়া থাকে এবং তাহা প্রাথমিক অবস্থাতেই ধরা পড়ে, রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসা হয় তাহা হইলে ভাবিবার কিছু নাই।

মুশরুওয়ালা ২০ বৎসর হাঁপানী রোগের সহিত কঠিন সংগ্রাম করিয়া তাঁহার বিরাট দায়িত্ব এবং কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন। সেনেটার টাফ্‌টও তাই। অনেক বড় লোকের জীবনে এটা দেখা যায়। অবিচলিতভাবে, ইন স্পাইট অব অ্যাকুটেস্ট অ্যাগোনি, নিজেদের দৈনন্দিন গুরুকর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন।

বরিশাল হইতে যে পত্র পাইয়াছি, তাহাতে দেখা যায় পত্রিকায় নাকি লেখা হইয়াছে আমার ক্যানসার-এর লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। সেদিন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আসিলেন। তিনিও সে রিপোর্ট পাইয়াছেন এবং ক্যানসার সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছেন।

পরে ডি আই ও আসিয়া প্রশ্ন করিলেন, স্পেসিফিক কোন অসুখ সম্বন্ধে নয়—সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। তিনি মন্তব্য করিয়াছিলেন রংপুর টি বি ওয়ার্ডের কাছে আমার থাকা উচিত হয় নাই। আমি তাঁহাকে বলি যে, প্রথমেই স্টেপ নেওয়া এবং শ্রেষ্ঠ ডাক্তারদের পরামর্শ করার সুযোগ পাই, তাহা হইলে ভাবনার কিছু নাই। বরং আমার ডায়েট কন্ট্রোল, নেচার কিওর ইত্যাদির আর একটা ভাল অভিজ্ঞতা হইবে—তবে মুক্ত না হলে শক্ত।

পাওয়া গেল না। কবিরাজ ম...

মনে হয়। তিনি বলিয়াছিলেন—ডায়াবেটিস নয়—অন্য কোনো রোগ, তা মহাপিত্তান্তক রসেই নিরাময় হইবে। যদি ডায়াবেটিস হইত, তাহা হইলে জেলে যে ডায়েট নিতেছি তাহাতে খুব বাড়িয়া যাইত।

২৯।১।৫৫—কাল মল-মূত্র ইত্যাদি পরীক্ষার রিপোর্ট আসিল। আজ সকালে জেল সুপারকে চিঠি দিলাম মেডিক্যাল অফিসারকে অনুরোধ করিতে, আমাকে যাতে অবশ্য দেখেন। কিছু পরেই হঠাৎ মেডিক্যাল অফিসার ও এস এ এস আসিলেন। মেডিকেল অফিসার বলিলেন অ্যাকসিডেণ্টাল কয়েনসিডেন্স। তিনি পূর্বেই ঠিক করিয়াছিলেন আসিবেন ও আমাকে দেখিবেন, ইতিমধ্যে আমার চিঠি পান।

বুক, জিহ্বা, পেট ইত্যাদি পরীক্ষা করিলেন। তিনি প্যাথলজিস্ট-এর রিপোর্ট দেখিয়াছেন। প্রেসক্রিপশন করিলেন—

...রি। ...কিন্তু ...রু হইত, ...ইল। এখনও ...দিন পরে এই ...ই কি পরিবর্তন ...লিলেন, মল আবার ...

...মাসটা দারুণ ভুগিতে ই... হইতে কি অবসান শুরু। কমলবা... তে তো গ্রহের ফের।

এস এ এস... সদর হাসপাতাল—প্রস্রাবে কেহই শুগার, অ্যালবুমিন ইত্যাদি পান নাই। শান্তির মতে ডায়াবেটিস এবং ডায়েট এখনও নিয়ন্ত্রণ করা উচিত (৫।... হয় পত্রে লিখিয়াছে)। অথচ দমদমের কবিরাজ মহাশয় প্রথম হইতেই বলিয়াছেন ডায়াবেটিস নয়, নর্মাল ডায়েট নেওয়া উচিত। প্রস্রাবে যেসব দোষ পাইয়াছেন, সেসব ডায়াবেটিস নয়, অন্য দোষ। নর্মাল ডায়েট এবং মহাপিত্তান্তক রস ব্যবহারেই দোষ যাবে। হইলও তাই। জেলে ঢুকিয়াই নর্মাল ডায়েট নিতেছি, মিষ্টিও প্রচুর খাইতেছি; কিন্তু ডায়াবেটিসএর কোন লক্ষণ পাওয়া গেল না। কবিরাজ মশায়ের কি অসাধারণ নাড়ীজ্ঞান—কত অদ্ভুত! ...র্ট প্যাথোলজিক্যাল এগজা-...ব ব্লাড, ইউরিন ইত্যাদি, আর ...জ মহাশয়ের শুধু নাড়ী—তাঁরই (কথা) সত্য হইল।

সন্ধ্যা ৭টা—যদিও অন্য দিনের অস্বস্তি নাই, কিন্তু টেম্পারেচার দেখি ৯৯ ডিগ্রী।

৩১।১।৫৫—মেডিকেল অফিসারের দেওয়া মিকশ্চার খাইবার পর ২ দিন ভাল গেল। কোনও জ্বর বা অস্বস্তি না।, ঘুমও ভাল হইতেছে। কিন্তু আজ দুপুরে টেম্পারেচার ৯৯ ডিগ্রী উঠিয়াছে, অস্বস্তি বোধ করিতেছি। তবে জ্বর বিকালেই নামিয়া যায় কিন্তু একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে থাকি। কাল আবার রক্ত পরীক্ষা করা হইবে। ব্যাপার কি কিছুই বোঝা যাইতেছে না।

Whatever the reasons, I should face it calmly—follow M.O.A. advice, at the same time lose no patience, continue studies and ideal in manners etc. Attend to study.

৪।২।৫৫ (রাত্রি প্রায় ৮টা)—কাস হইতে আবার বেশ কষ্ট শুরু হইয়াছে। জ্বর ৯৯ ডিগ্রী, ঘুম ভাল হইতেছে না। আজও দুপুর হইতে জ্বর ৯৯ ডিগ্রী......এখনও প্রায় এইরকম। দুপুরে শরীরে বেশ যন্ত্রণা ছিল, এখন কিছু কম।

এস এ এস বলিলেন, কালই ফাইন্যাল করতে চাই—

নানা হতাশাজনক উপসর্গ দেখা দিতেছে, শারীরিক ক্লেশও খুব বেশী। মুখে রুচি
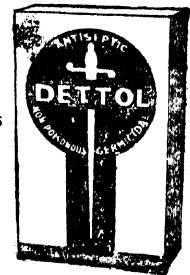
না থাকার আরো কষ্ট বেশী। বা... রটিয়াছে আমার ক্যানসার হই... এস-এ-এস'এর আশঙ্কা, আমার যক্ষ্মা হইয়াছে। চরম বিপদ। মনে কোন ভীতি নাই। শান্ত নম্রচিত্তে সকল বিপদের সম্মুখীন হইতে চাই, যাহাই হউক। যদি এর কোনটাই হয়, এবং তৎপরতার সহিত যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ভাবনার কিছু নাই। মরিলেই বা কি? মৃত্যু ত একদিন আসিবেই। তবে যে-ব্রত নিয়া আছি তাহার শেষ দেখিবার সাধ খুব বেশী। যদি দেখা না-ই হয়, আগেই যাইতে হয়, তবে শেষ পর্যন্ত নিজের কাজ করিয়া সান্ত্বনা। যদি দুটার কোনও একটা রোগে আক্রান্ত হই এবং এরাও চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা না করে বা আমাকেও মুক্ত করিয়া আমার পছন্দমত চিকিৎসা করিতে না দেয়, তাহা হইলে—tragedy। ইহার কোনও একটা রোগ হইলে আবার আমার ধৈর্যের একটা খুব বড় পরীক্ষা হই... কিন্তু আমার রাজনৈতিক করণীয় কর্তব্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে ভীষণভাবে।

৬।২।৫৫—এস-এ-এস'এর সহিত কথা হইল। তিনি বলিলেন final discussion-এর জন্য তিনি মেডিকেল অফিসারকে বলিবেন। মেডিকেল অফিসার আসিলেন, সব শুনিলেন। আজ সকালে এস-এ-এস বলিলেন, তিনি আরো চেষ্টা করিতে চান। তিনটা পেটেণ্ট (ঔষধ) প্রেসক্রাইব করিয়াছেন। ২টা পাওয়া যায় নাই। তবে লক্ষ্য হইল general improvement of health। আমার মনে হয়, চিকিৎসা ঠিক হইতেছে না। এস-এ-এস'এর ধারণা, আমার যক্ষ্মাই হইয়াছে। তিনি এ বিষয়ে একমত যে, আমাকে অবিলম্বে ঢাকায় বদলী করা উচিত। কাল আমি মেডিকেল অফিসারকে বলিব ভাবিতেছি। সকালে এস-এ-এস-এর সহিত পরামর্শ করিব।

৮।২।৫৫—কাল মেডিকেল অফিসারকে আমার এখানে আসিতে অনুরোধ করায় আসেন। আমার রোগ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করি। তাঁহার ডায়াগনসিস্-এর পক্ষে যে-সব অসুবিধা আছে তাহাও আলোচনা করি। বন্দীদের জন্য এক্স্-রে করার ব্যবস্থা নাই। প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার ব্যবস্থা আশাজনক ও নির্ভরযোগ্য নয়। সুতরাং রোগ নির্ধারণ ও তাহার চিকিৎসা সম্ভব নয়। তিনি এবং এস-এ-এস যথাসাধ্য করিতেছেন। কিন্তু এইসব অব্যবস্থার জন্য (which are beyond his control) relief পাইতেছি না। এ অবস্থায় আমাকে ঢাকা বদলী করা উচিত for better diagnosis & treatment। তিনি একমত হইলেন এবং আবারও বলিলেন, তিনি যে তিনটা patent medicine prescribe ...

দিতে...

আজ...

আজ হইতে... করিলাম। ... বিষয়ে স্বস্তি... সাধারণত যে অস... করি নাই। অসু... হইয়াছে। আজও এখন... কালকার মত বোধ করি... খাবার পর জ্বরভাব বোধ ... slight burning sensation ... the eye আছে।

১১।২।৫৫—কা... মেডিকেল অফিসার আই জি-র কাছে লিখিলেন আমাকে অবিলম্বে সম্ভব হইলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ-এ বদলী করার জন্য—

হয়ত রংপুর হইতেই এই রোগ আমাকে ধরিয়াছে। এই অসুখটা যদি রংপুরে হইত তাহা হইলে কত উদ্বেগ অশান্তি হইত। এখানে পরিবেশ অনুকূল থাকায় ইহা সহজে সহ্য করিতে পারিতেছি।

আজ সকালে খই প্রভৃতি না থাকায় ঘি দিয়া লপসী খাইলাম। পরে চিড়া ইত্যাদি, ডালের জুস্। বিকালে জুস্ দিয়া ভাত খাইলাম, অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী। দুর্বলতা শোধরাইবার জন্য নানা কৌশলে ভাত ইত্যাদি বেশী খাইবার চেষ্টা করি। আজ দুপুরে অন্যদিনের চেয়ে জ্বরভাব কিছু কম। সন্ধ্যার পরের অস্বস্তির ভাবও কিছু কম। কাল হইতে ৬টা করিয়া Calde-ferrum খাইতেছি।

১২।২।৫৫—পরশু ম্যালেনকভ পদত্যাগ করিল। কাল Sind Chief Court-এর রায় বাহির হইল। তমিজুদ্দিন খাঁর contention upheld হইল। তবে ফেডারাল কোর্ট-এ মামলা দায়ের করিতে ১৪ দিন সময় দিল। গোলাম মহম্মদ জুরিখ-এ, মহম্মদ আলী লণ্ডনে।

১৮।২।৫৫—নূতন চালটা ক্ষতি করিতেছে। কাল রাত্রে পেটে বায়ুর জন্য খুব কষ্ট পাইয়াছি। আজ সকালে একটা এবং বিকালে তিনটা চাপাটি খাই, ডাল শুধু দুপুরে। কাল নূতন চাল একবেলাও খাবার ইচ্ছা নাই। যদি প্রয়োজন হয় দুবেলাই চাপাটি খাইব।

২০।২।৫৫—কাল আই-জি মেডিকেল অফিসারকে অবিলম্বে আমার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিতে নির্দেশ দিয়াছে। কালই মেডিকেল অফিসার রিপোর্ট দিয়াছেন। অদ্ভুত ব্যাপার! আমাকে অবিলম্বে বদলীর জন্য মেডিকেল অফিসারের সুপারিশের জবাবে আবার পূর্ণ ... এবং আই-জি যদি পূর্ণ বিবরণ চায়—তা কি দোষের? Theoretical argument বাদ দিলেও, আমার actual condition-এর দিকে দৃষ্টি দিয়া আমার কি করা উচিত? যদি বুঝি চরম বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি, তাহা হইলে দ্রুত প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু ভিতরের কথা সঠিক বোঝা মুশকিল। ভিতরে হয়ত কঠিন কোন রোগ আছে, দেরীতে বিপদ হইতে পারে। যখন কতগুলি distressing symptoms দেখা দিতে থাকে তখন Pathological arrangement-এর অভাবে ডায়গনসিস্ হয় না। এটাই ত একটা ভয়ানক অবস্থা।

২৪।২।৫৫—পরশু অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীকে টেলিগ্রাম দিই। দুপুরে ডেপুটি জেলর সেটা হাতে করিয়া আসিয়া মেডিকেল অফিসারকে অনুরোধ জানান ওটা না দিবার জন্য। যদি আই-জি আকশন না নেয়, তিনি একটা কিছু ব্যবস্থা করিবেন। ডেপুটি বলিলেন, আই-জির দোষ নয়। মেডিকেল অফিসারের রিপোর্ট অসম্পূর্ণ। তাই বিস্তারিত বিবরণ চাহিয়াছেন। ৫।৭ দিনের মধ্যে বদলী নিশ্চিত। এইবারে মেডিকেল অফিসারের দোষই পড়িবে।

কাল দুপুরে দুই তিনবার প্রবল কাশি হইল, রাত্রে জ্বরভাবটাও বেশ।

২৮।২।৫৫—শোনা গেল, আমার রোগটা ছল চাতুরী কিনা তাহাও তদন্ত হইতেছে। কি criminal irresponsibility! C, S,

responsibility for prisoner
& others ত discharge করা সম্ভব

যদি মেডিকেল অফিসার টেলিগ্রাম reject অথবা refuse করিত, তাহা হইলে আমি একটা পথ নিতে পারিতাম, নিজের দায়িত্ব নিজেই লইতাম। কিন্তু ডেপুটি জেলারের মারফত সি এস্ এমন একটা আপীল পাঠাইলেন যে, তিনিই ইহার প্রতিকার করিবেন, আমি টেলিগ্রাম করিলে তাঁর এবং অফিসারদের উপর দোষ পড়িবে। তাই আমি আর চাপ দিলাম না টেলিগ্রামের জন্য। আবেদন-এ মন গলে—প্রত্যাখ্যানে নয়। কিন্তু আবেদনে এমন গলার মধ্যে একটা দুর্বলতা আছে কি? মন কি গলা উচিত? মেডিকেল অফিসার এবং অফিসাররা যে

... হয়,
... কোন
... ৪খানা
... চাহিলাম,
... তও করিলেন,
... আমি যেন অফিসের-
... representation না
... শীঘ্রই বদলী হইয়া
... স-এর সঙ্গে যেন কোন
... tion না হয়।" ভাল কথা।
... ceful relation-ই চাই। এই
প্রস্তাব ... বং অনুরোধের মধ্যে অফিসের অভিজ্ঞতার ... ভাব দারুণভাবে ফুটিয়া ওঠে। তখন পর্যন্ত জে... সাহেব আসেন নাই—এম-ও নূতন—ডি-আই-... নূতন। তাই কতকটা স্বাভাবিক।

৩।৩।৫৫—কাল ক্ষিতীশবাবু দেখা করিলেন। জেলা শাসককে লিখিয়াছিলাম। (১) মনোরঞ্জন ধর ক্ষিতীশবাবুকে লিখিয়াছে যে, আমার ইতিমধ্যে ছাড়া পাইবার নাকি কথা। ব্যাপার কি? ডি-আই-বি ভদ্রলোক বলিলেন, এটা বরিশাল ডি-আই-বির ব্যাপার। (২) নূতন জেলার সাহেব আসিলেন।......১।৩ তারিখে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও জেলার সাহেবের সঙ্গে আলাপ হইল medical এবং general ব্যাপার নিয়া। Articles in lieu of, papers, lantern ইত্যাদি সম্বন্ধে জেলার সাহেবের কতগুলি অসুবিধা ছিল; সুরাহা হইয়া গেল। (৩) নাইট ওয়াচার আহমেদকে আজ বদলী করাইলাম। বড় troublesome হইয়া উঠিয়াছিল। বেশী ফাজিল। কাল রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত করিয়াছে। স্পেশ্যাল ওয়ার্ডে থাকার অনুপযুক্ত।

নাইট-ওয়াচারের জন্য কয়েকদিন পর্যন্ত খুব মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম। কাল চরমে গেল। রংপুরের কয়েকটি troubled nights মনে পড়িল। এখানে এমন কোন দিন হয় নাই।

৪।৩।৫৫—হঠাৎ আজ শুক্রবার মেডিকেল অফিসার ওজন নিলেন। জেলময় রাষ্ট্র, আমার বদলী আসন্ন।

মনোরঞ্জনের পত্র পাইলাম।

সেদিন ক্ষিতীশবাবু কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "মনোরঞ্জন লিখিয়াছে, ইতিমধ্যে আমার ত ছাড়া পাইবার কথা।"

৬।৩।৫৫—আজ মনে হইতেছে, আই-জি'র কাছ হইতে বদলীর কোন অর্ডার আসে নাই। বোধ হয় ওজন দিতে ভুল করিয়াছিল তাই ৪।৩ তারিখে ওজন নেওয়া হইল। কি criminal irresponsibility

...e I, G,—আর C, S, & M, O-র ... ভীষণ দুর্বলতা—আর আমার কি danger। কাল আমি আবার তার দিতে পারি। এরা তো আবার ধরিবে না দিবার জন্য। আমার কি করা?

৭।৩।৫৫—কাল Asst, Secy, (Home) radiogram করিয়া কালই সন্ধ্যায় আমার report নেয়। আজ আমি সকালে তাকে এক্সপ্রেস্ তার দেই। বিকালে জেলার সাহেব বলিলেন, অর্ডার আসিয়াছে—কাল সকালে যাইতে পারি কিনা জানিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম—মেডিকেল অফিসারের আমাকে পরীক্ষা করিয়া decide করা দরকার—whether fit to travel। যদি fully fit না হই তাহলে necessary measures নেওয়া দরকার। আধ ঘণ্টার মধ্যে এস-ডি-ও আসিলেন, সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। আসিলে ... করিলেন আমার সম্বন্ধে কি করা হইতেছে......। মেডিকেল অফিসার বলিয়া গেলেন, কাল সকালে আসিয়া পরীক্ষা করিবেন। এস-ডি-ও'র সহিত বেশ ভাল-ভাবেই কথাবার্তা হইল।

......যদি কোন accident না হয়—যদি survive করি—তবে নূতন অধ্যায় শুরু।

৮।৩।৫৫—আজ S. A. S. (police) & M. O, heart examine করিলেন—Blood pressure-ও। Heart-এর condition-এর জন্য আজ যাওয়া স্থগিত রহিল। অনেক আলোচনা হইল। আমি request করিলাম—আমার ব্যাপারটা I. G. যে-ভাবে handle করিল তার ভিতর দিয়া M. O.-র শুধু prestige নয়, Govt. & তার responsibility-ও discharge করা সম্ভব নয়—সুতরাং এটা তার seriously take up করা দরকার in the interest of those under his care। আর এখানকার pathological & X' ray-র যে inadequate arrangement এটাও সংশোধনের জন্য তার fight করা দরকার। আমার ব্যাপারটার মধ্য দিয়া এই জিলার এই ত্রুটিগুলি যদি সংশোধন হয়—inspite of my suffering and loss—একটা satisfaction থাকিবে।

৯।৩।৫৫—S. A. S, & M. O, আজও examine করিলেন। কালকার চেয়ে better বলিলেন। কাল sedative dose দিয়াছিলেন—siedlitz powder। S. A. S,-এর ইচ্ছা পরশু যাই। M. O, বলিলেন, আজও ঔষধ continue করিতে—সম্ভব হইলে কাল যাওয়া। Escort party ready হইয়া থাকিবে—fit হইলে কাল, না হয় তার পরদিন। আজও অনেক আলাপ হইয়াছে।

সমাপ্ত
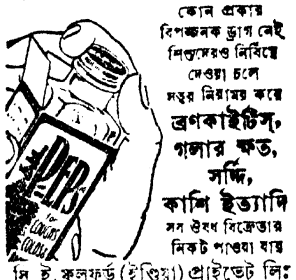
ওই বুক থেকেই সেটাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল পরসাদীকে, নদীতে ফেলে দেবার জন্য। অমনভাবে যেটা চলে যায়, সেটাকে পুড়তে নেই—তাই নদীগর্ভে ফেলা।

বাড়ির মধ্যে থাকবার সময় পরসাদী কাঁদেনি। চোখের কোণায় জল এলে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে লুকিয়ে মুছে নিচ্ছিল, পাছে আবার মনচনিয়া দেখে ফেলে সেই ভয়ে। মনচনিয়ার মুখের দিকে এতক্ষণের মধ্যে একবারও তাকায়নি। চোখাচোখি হলে লজ্জা পাবে। এইসব সময় কি তাকান যায় কারও দিকে। একে তো শোকে, লজ্জায় মরে রয়েছে মনচনিয়া; এখন কি তার দুঃখের বোঝা বাড়ান উচিত। পরসাদী কেঁদেছিল বাড়ির বাইরে গিয়ে।

এতকাল ধরে সবাই জানত যে, তার স্ত্রীর ছেলেপিলে হবে না। কত তুক তাক, মাদুলি, মানত, ওষুধ-বিষুধ এর জন্য! মরবার পর মুখে জল পাবার আর আশা কার না থাকে। তারপর যখন থেকে জানতে পারল যে, ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন, তবে থেকে অধীর হয়ে দিন গুনেছে। কী করবে ভেবে পায় না মনচনিয়াকে নিয়ে। কত জিজ্ঞাসা। কি খেতে ভাল লাগে? ছেলে হবে না মেয়ে হবে? কার মত দেখতে হবে? নড়ছে নাকি? পোড়ামাটি চিবুতে ইচ্ছা করে? আরও কত জল্পনা কল্পনা। চামারণীর সঙ্গেই কত কথা ফিসফিস করে। পাড়ার লোকে তার আধিকোতা দেখে হাসাহাসি করেছে।

......তারপর বুধে বুধে চৌদ্দ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি—এ সতর দিন তো হাতে স্বর্গ পেয়েছিল। সতর দিন পরে যাঁর জিনিস তিনি টেনে নিলেন কাছে। মানুষ কতটুকু কি করতে পারে!......যাবে না কেন—যায়। কতরকমে যায় কত লোকের ছেলে!...... গুড়ের নাগরির মধ্যে ডুবে ছেলে যেতে শুনেছে; গরম দুধের কড়ার মধ্য পড়ে ছেলে যেতে দেখেছে।...কিন্তু এরকমভাবে যাওয়া! ......আহা রে! ওই তো এক রত্তি রক্তর দলা!......একেবারে নীল হয়ে গিয়েছিল। নিঃশ্বাস নেবার প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ দুটো বড় হয়ে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল।......আহা রে!......

......চাটছিল বুঝি।...ভয় পেতে শিখবার আগে, বিপদ কি তা জানবার আগে।...... মায়ের বুকের ধস নেমেছিল হঠাৎ।...... জগদ্দল ননীর তালের নীচে বুকচাপা আঁধার। সে আঁধারের মধ্যে দিয়ে শেষ কান্নাটুকুও বার হতে পায়নি।......

মনচনিয়া জানত পারল অনেক পরে। কতক্ষণ কে জানে।......ওখানটায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে কেন?......কখন কখন অমন

হয় ওখানটায়। ঘুমের ঘোরে কম্বলখানা গায়ের উপর ভাল করে টেনে নেবার সময়ও মনে পড়েনি, অন্য একটা প্রাণীর কথা। এমনই ঘুমকাতুরে সে।......তবু ওখানটায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে কেন? 'কালীস্থান'-এ ঘণ্টা বাজছে; ভোর হবার আর দেরি নেই। ধড়মড় করে উঠে বসেছিল সে।......কাঁথা ভিজলে তো এরকম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগে না কম্বলের তলায়!......এ যেন অন্যরকম অনারকম লাগছে! কেঁপে উঠেছিল বুক। চারটে দেশলাই-কাঠি খরচ হল লণ্ঠনটা জ্বালতে। লণ্ঠনের শিষ বাড়িয়ে, বিছানার দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে মনের ক্ষীণ আশাটুকু নিভে যায়। তার চীৎকারে পরসাদী ওঠে।......কিন্তু আর কি ওই দেহ-টুকুতে উত্তাপ ফিরিয়ে আনা যায়। কিছুতেই কিছু হল না। সতর দিনের মাংসপিণ্ডটাকে বুকের জাঁতায় চটকে পিষে ফেলতে আর ভয় নেই মনচনিয়ার। চোখের জলে ওই বুকই ভাসে।

মনচনিয়ার বুড়ী কুকুরটা খানিক দূর পরসাদীর সঙ্গে গিয়ে ফিরে এসেছিল। এসে বসেছিল মনচনিয়ার পাশে। রঙ কালো, তাই কুকুরটার নাম কারিয়া। কারিয়া তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তার জলভরা চোখের দিকে, ছড়ান চুলের বোঝার দিকে। বুড়ী কুকুরটা অনেকদিন এদের সংসারে আছে। বোঝে সব। ঠিক বাড়ির লোকের মত।

মনচনিয়া কুকুরটাকে নিয়ে এসেছিল বাপের বাড়ি থেকে দ্বিরাগমনের পর আসবার সময়। ঠিক নিয়ে আসেনি; আপনা থেকে চলে এসেছিল কারিয়া তার সঙ্গে। সে কি আজকের কথা! তার বিয়ে হয়েছিল চার বছর বয়সে; দ্বিরাগমন হয় বিয়ের পনর

পাকানো লাঠি নিয়ে ...
কাছে। ঝগড়াঝাঁটি, লাঠালাঠি করে সে ... হকের বউকে নিয়ে আসে সেখান থেকে। গাঁয়ের বাইরে এণ্ডির ক্ষেতের পাশে যখন গরুরগাড়ি পৌঁছেছে, তখন প্রথম নজরে পড়ল যে, কালো কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে আসছে।

"কাদের কুকুর রে?"

... কি
... লড়াই
...ণ ইতস্তত

...?"

...কে কুকুরছানাটাকে টেনে ...চেষ্টা করতেই স্বামী বলে ... কি! তুই কি অত ঝুঁকতে পারিস... আর একটু সম্মুখের দিকে সরে ব'স।"

গায়ের কাপড় সামলে নিয়ে মনচনিয়া কুকুরটাকে টেনে তোলে গাড়িতে। দেখিয়ে

...মোটা হলেও সে অকেজো নয়। ...র মোটাসোটা চেহারা নিয়ে কিছু ...লেই কুণ্ঠিত হয়ে সে গায়ের কাপড় সামলে নেয়, দেহভার লুকোবার জন্য। প্রথম দিনই পরসাদী এ জিনিস লক্ষ্য করেছিল।

"কত ওজন মাথায় নিয়ে ঘুরতে পারিস?"

"এক মণ তো পারবই।"

"এক মণের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে রোদের মধ্যে তিন ক্রোশ ঘুরে বেড়াতে পারবি?"

আবার গায়ের কাপড় সামলে নিয়ে, মনচনিয়া জানায় যে, সে পারবে। চোখমুখে অপ্রস্তুতের ভাব সুস্পষ্ট। কথাবার্তায় সাবধান হয়ে যায় পরসাদী সেই থেকে। "হরদা-হাট আমাদের ওখান থেকে তিন ক্রোশ। সেখান থেকে পাইকারী দরে তরি-তরকারি কিনে এনে শহরে বিক্রি করি আমরা।"

এই হয়েছিল প্রথম কথাবার্তা তার স্বামীর ...। তার কুকুর, আর তার মেদবহুল দেহটা... নিয়ে কথা। স্বামী যতই হাট বাজার আর তরকারির কথা বলুক, মনচনিয়া বুঝতে পারে কথার ইঙ্গিতটা কোনদিকে।

এখানেই শেষ হয়নি। আরও খানিক দূর এসে দেখা তশীলদার সাহেবের সেপাই দুটোর সঙ্গে। তারা অপেক্ষা করছিল পরসাদীর জন্য। মালিকের [illegible] হুকুম ছিল মারধোর করবার। কিন্তু তারা অল্পতেই রেহাই দিল। মালিকের দুর্নাম করবার জন্য গালিগালাজ দিয়ে, শেষকালে রসিকতা করে গেল—"দু দুটো কালো কুত্তী নিয়ে চললি এখান থেকে—আমাদের গ্রাম যে একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে। মোটা কুত্তীটা কিন্তু রোগা কুত্তীটার চাইতে খাবে অনেক বেশী। দেখিস।"

হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে সেপাই দুটো। এ ঘটনা ঘটেছিল দশ বছর আগে; তারপর থেকে কুকুরটা এখানেই থাকে। সেই থেকে, মনচনিয়ার কথা মনে হলেই, তার কালো কুকুরটার কথাও সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে এখানকার লোকের। ইঁদারাতলায়, হরদাহাটে, গেরস্ত বাড়িতে যেখানে মনচনিয়া যাবে, সেখানেই কুকুরটা তার পিছনে পিছনে যাবে। শুটকী কারিয়া আর ধুমসী মনচনিয়ার কথা ছেলেপিলেরা এক নিশ্বাসে বলে হাসাহাসি করে। কেন যে ছেলেপিলেরা এত নিষ্করুণ হয় কে জানে। হয়ত তরকারির ঝুড়ি মাথায় নিয়ে, গলদ্-ঘর্ম হয়ে আসছে মনচনিয়া রাস্তা দিয়ে। ছেলেদের মার্বেল খেলা বন্ধ হয়ে যায়। চোখে চোখে ইশারা খেলে গেল। একজন সুর করে চেঁচায়—'ম-ন-চ-নি-য়া'। আর একজন সুর মিলিয়ে বলে—'ল-দ্-ব-দি-য়া'। মনচনিয়া, লদ্‌বদিয়া॥ মনচনিয়া লদ্‌বদিয়া॥

কারিয়া লেজ নীচু করে নিয়েছে। কাছে এসে গেলে, দলের সবচেয়ে ছেলেদ্বটো পথের দ্ব' পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। একজন মনচনিয়ার এ পাশে, আর একজন ও পাশে। তার চলনের নকল করে হাঁটছে তারা। দেহভঙ্গীর তালে তালে স্বর ওঠে—'লদর, বদর॥ লদর, বদর॥ লদর, বদর॥...'

মরমে মরে যায় মনচনিয়া। জিভের ধার তার কম নয়। অন্য কোন বিষয় নিয়ে এরা তার পিছনে লাগতে এলে, সে পালটা জবাব দিতে ছাড়ত না। গালাগালি, চীৎকার করে এমন অনর্থ বাধাত যে, ছেলেরা পালাবার পথ পেত না; কিন্তু এ যে তার দেহের বেঢপ গড়ন নিয়ে কথা। মুখে ফুটে ওঠে অপ্রস্তুতের হাসি। গায়ের কাপড় সামলে নেবার পর্যন্ত উপায় নাই, দু হাত দিয়ে মাথার ঝুড়িটা ধরে রয়েছে বলে। ছেলেদের হাত থেকে রেহাই পাবার পর খানিক দূরে গিয়ে কারিয়ার লেজ আবার খাড়া হয়ে ওঠে। ছেলেদের দিকে মুখ ফিরিয়ে কুকুরীটা দু'বার ডাকে ঘেউ ঘেউ করে। গোনা দু'বার। তারপর আবার একটা অতিপরিচিত গন্ধ নাকে নিতে নিতে পথ চলতে আরম্ভ করে।

মনচনিয়ার এই কুণ্ঠিত ভাবটা খানিকটা কেটেছিল গত কয়েক মাস থেকে। নূতন সম্ভাবনায় পৃথিবীর রঙ যখন বদলে যায়, তখন ভারী বোঝাও হালকা লাগে, বেমানান জিনিসও মানানসই হয়ে ওঠে, মনের জোর বাড়ে। তার সৌষ্ঠবহীন দেহের একটা মানে তবু সে এতদিনে খুঁজে পায়।...... কিন্তু এ আর ক'দিন!

সরব দিনের রাজপাট শেষ হয়ে গেল মনচনিয়ার।......যে অঙ্গ নিয়ে তার চির-কালের অস্বস্তি, যে অভিশাপের বোঝার কুণ্ঠায় সে লোকের কাছে মাথা হেঁট করে থাকে সব সময়, সেইটাই এতদিন পর তার পিছু...

অজানতে...

গিয়েছে কু...

পিঠে, পেটে, ...

গুলো আঙুলের...

যাচ্ছে। বুকের রে...

পাঁজড়ার হাড়গুলো হা...

বুকের উপর আঙুল চ...

ভাল করে সেদিকে ...

আঁচিলের মত ছোট ছোট। এ...

না দেখলে কালো লোমের ম...

নজরে পড়ে না। কারিয়ার কানের...

গুলোর চাইতেও ছোট ছোট বোঁটা...গুলো! বয়স হওয়ায় গত বছর থেকে বাচ্চা হওয়া বন্ধ হয়েছে বুড়ী কুকুরটার।......কিন্তু এও ভাল।......শতগুণে ভাল!

...তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে—একবার মনচনিয়ার মুখের দিকে, আর একবার ঘাড় কাত করে তার হাতের আঙুলের দিকে। বোঝবার চেষ্টা করছে। ঠিক আদরের মত লাগছে না তো, মনচনিয়ার চোখ-মুখের ভাব দেখে। তবে? বুকের বোঁটাগুলোতে সুড়সুড়ি লাগছে যে তার।

দুঃখ তো আছেই; কিন্তু এমনভাবে পেটের ছেলে চলে যাওয়ার, সে যে কী লজ্জা, বলে বোঝানো যায় না। সবাই যে তারই কথা আলোচনা করছে সরকারী ইঁদারা-তলায়। কত কী যে বলছে! বাড়ি থেকে বেরুতে সাহস পায় না মনচনিয়া। তবুও কি শান্তি আছে! পাড়ার লোকে আসে তাকে সান্ত্বনা দিতে। সান্ত্বনা না ছাই! সব বোঝে সে। চাদর মুড়ি দিয়ে সে চাটাইএর উপর শুয়ে থাকে, কেউ বেড়াতে...

...াটের দিকে তাকিয়ে, অতি কুণ্ঠার সে স্বামীকে বলেছিল সরকারী ...দারা থেকে জল এনে দিতে। খাওয়ার জল? মনচনিয়া চুপ করে থাকে। স্নানের? মনচনিয়ার চোখে জল এসে গিয়েছে। স্বামীকে কখন সরকারী ইঁদারা থেকে স্নানের জল আনতে বলতে পারে মেয়ে-মানুষে! একে মোটা মানুষ; স্নান না করলে তার চলে না। তার উপর গায়ে দুধ-পচা গন্ধ। নিজেরই গা ঘিন ঘিন করে। লজ্জার মাথা খেয়ে, তাই সে স্বামীকে স্নানের জল আনতে বলেছিল। ইঁদারা-তলায় লোকজনের মধ্যে জল আনতে যাবার লজ্জা যে আরও অনেক বেশী। পরসাদী মাটির কলসীটা নিয়ে বেরুচ্ছিল; মনচনিয়া বালতিটা হাতের কাছে আগিয়ে দেয়—পুরুষমানুষে সরকারী ইঁদারা থেকে কলসী করে জল নিয়ে এলে পাড়ার লোকে কি বলবে!

সহজ বুদ্ধিতে পরসাদী বোঝে, স্ত্রীকে এখন একটু অন্যমনস্ক রাখবার চেষ্টা করা উচিত সব সময়। উঠনভরা শাকসবুজির গাছ—মনচনিয়ার নিজ হাতে পোঁতা সেগুলোরও যদি একটু দেখাশোনা করে, তাহলে মনটা ভাল থাকে। কিন্তু করে

গেলেও বাধা এলে ...

তরকারির বাজার দর নিয়ে গল্প করাই ছিল তাদের চিরকালের অভ্যা- পরসাদী হয়ত আরম্ভ করল সীমের দরের কথা। "এখন দরটা যাচ্ছে ভাল। আর এক মাস পরে কে পুঁছবে কুকুরের কানের মত শক্ত শক্ত সীম। 'সাতপুত্তিয়' (সাত-পুত্রের) সীমের গাছেই লাভ বেশী; অফুরন্ত ফলন; থোবা থোবা ফলে; এক এক থোবায় থাকে সাতটা করে। উঠনের সীমগাছটা সেই দশহরার আগে থেকে ফল দিচ্ছে—মনে আছে তো সেই যেদিন খগবিয়া-হাটের দশহরার মেলা থেকে তোর জন্য দহিবড়া?......"

বলতে বলতে থেমে যায় পরসাদী। কথাটা তোলা ঠিক হয়নি। ছেলেটা তখন পেটে। স্ত্রী খেতে চেয়েছিল ওখানকাব দহিবড়া।

"হ্যাঁ হ্যাঁ অসময়ের শাকসব্জিতেই লাভ। সীম গাছটা এত আগে থেকে ফলতে আরম্ভ করেছে এবার, পুরনো গাছ বলে। গত বছরের গাছ। তুই তো তুলে ফেলতেই চেয়েছিলি মড়ুণ্ডে গাছটাকে। আমার কথাতেই তো বৈশাখ মাসে জল দিতে আরম্ভ করলি। বলেছিলাম কিনা, বল?"

আবার একটা কেমন কেমন যেন ভাব মনচনিয়ার চোখমুখে দেখতে পেয়ে পরসাদীকে থামতে হয়।

......"লাউগাছটার কি তেজ হয়েছে ... ওর ... বোধ ... ল পড়ছে ... আর পচে

... সে। স্ত্রীর মুখ- ... মাচু হয়ে গেল কেন? ... রয়ে গেল পরসাদীর। ... এত সামাল দিয়ে দিয়ে ... য়!

... য়ে বসলে হয়ত একটু অন্য- মন ... বে। স্ত্রীর কুর্তার জন খানিকটা ছিট নি... এল পরসাদী, তরকারি বেচে ফেরবার সময় ... মনচনিয়া দেখে বলে "এ কাপড়গুলো কাচ... রে বড্ড ছোট হয়ে যায়।"

"অত আঁট আঁট জামা করিস কেন; ... ঢিলে করে সেলাই করলেই পারিস।"

কিছু ভেবে বলা নয়। তবু মনচনিয়া নীচের দিকে চোখ নামিয়ে নেয়। কত কি গল্প করবে, ভেবে ঠিক করে এসেছিল পরসাদী। সব গুলিয়ে যায়, স্ত্রীর ওই অপরাধী ভাবটা লক্ষ্য করে।

তার চেষ্টার ত্রুটি নাই। পরের দিন সে ফিরল এক কুকুরছানা নিয়ে। এইরকম একটা কিছু পেলে হয়ত মনচনিয়ার মনটা একটু ভাল থাকবে—একেবারে খালি খালি লাগছে কিনা এখন। কুকুরছানাটা খুবই ছোট—সবে চোখ ফুটেছে। "ও আবার কি নিয়ে এলি?"

"কারিয়াটা বুড়ী হয়েছে। কবে মরে যাবে তার ঠিক কি। এখন থেকে একটা নতুন কুকুর পোষা ভাল। পথের ধারে শীতে কুঁই কুঁই করছিল; উঠিয়ে নিয়ে এলাম।"

... সেদিন কাজে বেরুবার যোগাড় ... আর কতদিন বাড়িতে বসে ... বে। বাড়িতে বসে থাকলে কি তাদের ... ত অবস্থার লোকের চলে। এরই মধ্যে স্বামী কুকুরছানা নিয়ে এসে হাজির।

......ফ্যাসাদ! এতকাল যখন কারিয়ার বছর বছর বাচ্চা হ'ত সাতগণ্ডা করে, তখন কুকুরের বাচ্চা পোষবার কথা খেয়াল হয়নি? কত শিয়ালে খেয়েছে, কত পাড়ার ছেলে-পিলেরা নিয়েছে। যতই পাতকুড়নো খেতে দাও, কুকুর পোষবার খরচ আছে তো! শুধু পাত কুড়নো খেতে দিলে কি কুকুর বাড়িতে থাকে! এক গেরস্তর আস্তাকুঁড় থেকে আর এক গেরস্তর আস্তাকুঁড়ে টহল মেরে বেড়ায় অষ্টপ্রহর।

তবু স্বামী যখন নিজে হাতে করে নিয়ে এসেছে, তখন এটাকে বাড়িতে জায়গা দিতেই হয়।

ঝুড়ি নামিয়ে মনচনিয়া কুকুরছানাটাকে হাতে করে নেয়। বাড়ি থেকে বেরুতে ... লজ্জা করছিল। যাক, তবু একটু সময় ... ওয়া গেল কুকুরের বাচ্চাটা আসায়। একবেলা ... দেরি করবার একটা অছিলা পেয়ে সে বাঁচে।

একেবারে বাচ্চা। পাশে বসালে কোলের উপর উঠে উঠে আসে। নাক বাড়িয়ে বাড়িয়ে শুঁকছে ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে করতে। কাপড়ের মধ্যে মুখ গুঁজতে চায়। লিকলিকে জিভের ডগা দিয়ে আঙুলে, তেলো, হাতের চামড়া চেটে চেটে দেখছে। মনচনিয়ার গায়ের গন্ধটা তার মনোমত। দুধের ঠিক ঠিক মাতা-মাতা গন্ধটা তার চেনা। হারিয়ে যাওয়া গন্ধ আবার ফিরে পাচ্ছে কুকুরছানাটা। সহজ-প্রবৃত্তিতে বুঝেছে যে এই গন্ধটাই তাকে উৎস-ধারার সন্ধান দেবে।

"বাবারে বাবা! এক মিনিটও নিশ্চিন্দি নেই। চুপটি করে বস্ এখানে!"

কোল থেকে নামিয়ে মনচনিয়া বাচ্চাটাকে চেপে পাশে বসাল।

কারিয়ার গলার মধ্যে দিয়ে একটা শব্দ বার হল—ঘর্-র্-র্-র্। নূতন আগন্তুকের কাণ্ডকারখানা তার অপছন্দ। আগাগোড়া ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কি রকম দাঁড়াল, সেটারও আন্দাজ করে নিচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। একবার কুকুরছানাটার কাছে গিয়ে সেটার গা শুঁকে নেয়। গন্ধের মধ্যে কি পেল না পেল সে-ই জানে। একটা হাই তুলে, বারান্দা থেকে নেমে গিয়ে সে ঝিমুতে বসল উঠনে। বাচ্চাটার সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ।

কুকুরছানার নরম নরম রোঁয়াগুলো হাতের উপর নেপটে যাচ্ছে মনচনিয়ার। রেশমের মত। বেশ আরাম লাগে। ওর মধ্যে দিয়ে আঙুল চালিয়ে আরাম নিতে গেলে কি রকম যেন গা সির সির করে।

অথচ সে সির্‌সির্‌নিটুকু থাচ্ছে
আঙুলের ডগায় একটা কোমল দেহে
একটু আনমনা করে দেয় মনচনিয়াকে
......গেলে গেলে তো রোজ ফেলেই দিচ্ছে
হয় দুধ। একটা টিনের কৌটোর ঢাকনিতে দুধ গেলে গেলে বার করে সে বাচ্চাটার সম্মুখে রাখে। চুক চুক করে খাচ্ছে বাচ্চাটা। শব্দটা শুনতে ভারী মিষ্টি। এক দৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে মনচনিয়া সেদিকে।

উঠনে কারিয়ার কান খাড়া হয়ে উঠেছে। তার উদাসীনা কেটেছে। ছুটে এল বারান্দায়, ঢাকনিটার কাছে। "তুই আবার এলি কেন? পাজা! যা বলছি।"

ঘ্যা-অ্যা-অ্যা করে একটা শব্দ বার করল কারিয়া গলা দিয়ে।

"এ কি তোর খাওয়ার জিনিস নাকি! রাগ দেখালেই অমনি হল! এতটুকু বাচ্চার সঙ্গে রেষারেষি! লজ্জা করে না। যা পাজা!"

ঘ-র-র্-র্-র্।

অর্থাৎ এ ব্যবস্থা কারিয়ার অপছন্দ; কিন্তু হুকুম না মেনে উপায় কি।

বাড়ির কাজকর্ম সেরে মনচনিয়া ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বার হয়ে উঠে থেকে। চিরকালের অভ্যাস মত কারিয়াও আড়মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

"তুই আবার উঠলি কেন? তুই থাক! আজ আর তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না! আবার কথা শোনে না! যা। যা বলছি বাড়ির মধ্যে!"

দরজার ঝাঁপ বাইরে থেকে বন্ধ করে মনচনিয়া যখন চলে গেল, কারিয়া তখন ঘেউ ঘেউ করে ডেকে পাড়া মাথায় করছে।

যার জন্য তার বাড়ির বাইরে যেতে কুণ্ঠা—ঠিক কি তাই হল! হাসির খোরাক পেলে ছেলেপিলেদের সত্যিই মায়া দয়া থাকে না! আজও মনচনিয়াকে আসতে দেখে তাদের মার্বেল খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।——আজ 'মুটকী-তরকারিউলিটা' একা কেন রে? শুটকী কুকুরটা নেই কেন রে?......আজ তারা ছড়া কেটে তার চলনভঙ্গীর নকল করে নাচেনি। শুধু নিজেদের মধ্যে পুতনা রাক্ষসীর কথা তুলে হাসাহাসি করেছে। মনচনিয়ার স্বকর্ণে শোনা। চোখ কান বুজে কোনরকমে সে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। তারপর যে বাড়িতে তরকারি বেচতে যায়, সে বাড়ির মেয়েরা দিনকয়েক আগেকার অঘটনটার সারা বৃত্তান্ত খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে।......পুলিসে যা ভাবেনি এরা হয়ত তাই ভেবে নিয়েছে! কে জানে! নইলে কোন মা কি এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে যার কপাল এমনভাবে পুড়েছে তাকে?......স্বামী তাকে এখন দু' তিনদিন বাড়ি বাড়ি শাকসবজি বেচতে যেতে বারণ করেছিল। বলেছিল, বাজারে গিয়ে বসতে তরকারি নিয়ে। ঠিকই বলেছিল। তখন বাজারে

বাড়ি [illegible]
ঝাঁপ খোলে [illegible]
সেজ নাড়তে না [illegible]
সাড়াশব্দ নেই। [illegible]
অন্যদিন হলে দেখা [illegible]
শুয়ে রয়েছে কাত হয়ে [illegible]
কুকুরছানাটা তার শুকনো [illegible]
চাটছে। মাঝে মাঝে [illegible]
এ বোঁটা ছেড়ে ও বোঁটা ধরছে [illegible]
কাছে গিয়ে বাচ্চাটাকে হাতে করে [illegible]
কারিয়া গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল [illegible]
অনেকক্ষণ আগলেছি এটাকে [illegible] দের কথামত, এখন তোমাদের [illegible] তোমরা বুঝে নাও। এক [illegible] শুয়ে শুয়ে একেবারে আড়ষ্ট [illegible] গিয়েছে গা হাত পা। [illegible] মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলে গেল বাড়ির বাইরে।

"এটার একটা নাম রাখতে হয় এখন থেকে। আমি তো ভেবেছি এটার নাম রাখব বাচ্চা।"

"হ্যাঁ বাচ্চা নামটা বেশ হবে।"

"বাচ্চা! ওরে বাচ্চা! আবার তাকান হচ্ছে প্যাটপ্যাট করে। আঙুল চাটিসনি বলছি! বোকা কোথাকার! ওটা কি খাওয়ার জিনিস! খিদে পেয়েছে বুঝি? তা তো পাবেই। কমক্ষণ সময় তো না। দুধের বাচ্চাদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। আয়!"

"কুঁই কুঁই করে যে শব্দটা করছে, ওটা হচ্ছে খিদে পাবার সময়ের ডাক, কুকুরছানাদের।"

পরিকল্পনার ইতিকথা

কানাইলাল বসু

ছয় ... আগের কথা। সেটা ছিল ... বিদেশী আমল। সকলের মুখেই এক ... বিদেশীর ... দেশকে মুক্ত করতে হবে। অনেক সাধনা, অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে সে উদ্দেশ্য সফল হলো—স্বাধীন হলো দেশ। কিন্তু সেইটাই সব নয়। স্বাধীন দেশকে গড়ে তুলতে হবে সব দিক দিয়ে তার উন্নতি করতে হবে। কিন্তু এ কাজও তো এলোমেলোভাবে হয় না। কী করব না করব, কী করলে কী ফলাফল হবে, আগে থেকে সেটা ভেবে চিন্তে ঠিক করে তবে কাজে নামতে হবে। তাই আগে দরকার পরিকল্পনার পরে সেই মত কাজ।

পরিকল্পনার কী দরকার

বছর আষ্টেক আগে দেশকে গড়ে তোলবার জন্য ভারত সরকার একটা পরিকল্পনা করলেন পাঁচ বছরের এই হলো ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা—সময়ের মেয়াদ ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৫৫-৫৬। এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়েছে। ভারত দেশটা বিশাল —তাই তার সর্বাংগীন উন্নতির কাজ মাত্র একটা পাঁচ বছরের পরিকল্পনায় শেষ হওয়া সম্ভব নয়। দরকার অনেক সময়ের—দরকার এই রকম আরও অনেক পরিকল্পনার। উন্নতির কাজে ব্রতী থাকতে হবে দীর্ঘকাল ধরে, ধারাবাহিকভাবে। দীর্ঘস্থায়ী ও ধারাবাহিক কাজ পরিকল্পনা ছাড়া হওয়া অসম্ভব। কাজেই একটা পরিকল্পনা তৈরী করে সেই অনুযায়ী কাজ করে তার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে তৈরী হবে দ্বিতীয় পরিকল্পনা—সেটার ফলাফলের ওপর তৈরী হবে তৃতীয় পরিকল্পনা—এমনি ধারাবাহিকভাবে চলবে উন্নতির কাজ।

প্রথম পরিকল্পনার আবহাওয়া

১৯৫০-৫১ সালে যখন ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা তৈরী হয় তখন দেশের আর্থিক আবহাওয়া ছিল অস্বাভাবিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে, কিন্তু তার অনিশ্চিত প্রতিক্রিয়া তখনও সম্পূর্ণভাবে কাটেনি। দেশে রয়েছে মুদ্রাস্ফীতির কুফল। খাবার জিনিস আর অন্যসব কাঁচামালের অভাব। কোরিয়াতে লড়াইয়ের দরুণ দেশে চড়া দামের রাজত্ব। এই রকম অবস্থার মধ্যে তৈরী হলো ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা। দেশের উন্নতির জন্য কোন্ কোন্ কাজ আগে করা দরকার—তার জন্য আমাদের কতটুকু ক্ষমতা—তারই একটা মোটামুটি হিসেব করে তার ভিত্তিতে তৈরী হলো প্রথম পরিকল্পনা, কাজও চালু হলো সেই মত।

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল

প্রথম পরিকল্পনার শেষে ফলাফলে দেখা গেল যে আগের তুলনায় দেশে মুদ্রাস্ফীতি কমেছে, খাবার জিনিসের অভাব কিছুটা মিটেছে, কাঁচামালেরও খুব একটা অভাব নেই, কারখানা শিল্পের উৎপাদন অনেক গুণ বেড়েছে। এই সময়ের মধ্যে প্রায় এক কোটি সত্তর লক্ষ একর নতুন জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন বেড়েছে প্রায় বার লক্ষ কিলোওয়াট। প্রথম পরিকল্পনার ভালর দিকের ছবি এই। অন্য দিকটাও অবহেলার নয়। প্রথম পরিকল্পনার কাজে বেকার সমস্যার সমাধান হয়নি বরং তার মাত্রা বেড়েছে। আবাদী জিনিসের দাম অনেক ক্ষেত্রে আগের চেয়ে কমে গেছে। তবু সব দিক বিচার করে বলা যেতে পারে যে প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল মোটামুটি অসন্তোষজনক হয়নি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

অনেক আলাপ আলোচনার পর প্রথম পরিকল্পনার ফলাফলের ভিত্তিতে তৈরী হলো দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার সংগে প্রথম পরিকল্পনার মূল পার্থক্য এই যে, প্রথম পরিকল্পনায় দেশের কৃষির ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল - দ্বিতীয়টিতে জোর দেওয়া হয়েছে কারখানা শিল্পের ওপর। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোটামুটি চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে—প্রথম, জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়াবার ব্যবস্থা করে দেশের লোকের খাওয়া পরার ব্যবস্থাটা একটু ভাল করা, দ্বিতীয়—কলকারখানা শিল্পের উন্নতি করা বিশেষতঃ মৌলিক শিল্পগুলো; তৃতীয়—দেশের লোকের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করা আর চতুর্থ—সামাজিক বৈষম্য দূর করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কি হবে?

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মেয়াদ ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত। প্রথম পরিকল্পনায় আবাদী পণ্যের যা উৎপাদন হবে বলে ধরা হয়েছিল দ্বিতীয় দফার কাজ শেষ হলে তার পরিমাণ বাড়বে শতকরা আঠারো ভাগ। খাবার জিনিসের উৎপাদন বাড়বে প্রায় এক কোটি টন, তুলো বাড়বে প্রায় শতকরা একত্রিশ ভাগ, পাট শতকরা পঁচিশ ভাগ, চা শতকরা ন' ভাগ, সেচের ব্যবস্থা আছে এই রকম নতুন জমির পরিমাণ বাড়বে প্রায় শতকরা একত্রিশ ভাগ, বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়বে শতকরা একশ' তিন ভাগ, কয়লার উৎপাদন বাড়বে শতকরা আটান্ন ভাগ, ইস্পাত শতকরা দশ' একত্রিশ ভাগ, সিমেণ্ট দুশ' দুই ভাগ, রেলের ইঞ্জিন তৈরী বাড়বে শতকরা একশ' উনত্রিশ ভাগ, রেলে মাল চলাচলের পরিমাণ বাড়বে শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ, জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য বাড়বে শতকরা সাত ভাগ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় দফার খরচ

ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় খরচ হয়েছিল প্রায় দু হাজার তিন শ' ছাপান্ন কোটি টাকা। দ্বিতীয় দফায় খরচের

পরিমাণ দাঁড়াবে চার হাজার আটশ' কোটি টাকা। এটা সরকারের খরচ। এ ছাড়া বেসরকারীভাবে খরচ হবে প্রায় দু হাজার চারশ' কোটি টাকা। সরকারী খাতে ঐ টাকাটা মোট খরচ হবে তার শতকরা ১১·৮ ভাগ হবে চাষবাসের উন্নতি জন্য শতকরা ১৯ ভাগ হবে সেচ ও শক্তি উৎপাদন বাবদ, শতকরা ১৮·৫ ভাগ হবে কারখানা শিল্প, খনি ও কুটীর শিল্পের উন্নতি বাবদ, শতকরা ২৮·৯ ভাগ হবে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বাবদ, আর শতকরা ১৯·৭ ভাগ হবে সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ বাবদ। অন্যান্য বাবদ খরচ হবে মোট খরচের শতকরা ২·১ ভাগ। খরচের ব্যাপারে শিল্প ও পরিবহনের ওপর এই যে জোর দেওয়া তার উদ্দেশ্য হতে পারে দেশের লোকের জন্য অধিক সংখ্যায় অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

টাকা কোথা থেকে আসবে?

দ্বিতীয় দফা পরিকল্পনার জন্যে যে খরচ হবে সেটা যোগাড় করবার জন্য আরও বেশী কর ধার্য করা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জনসাধারণের কাছে ধার নেওয়া এবং ঘাটতি ব্যয়—এই তিনটি পন্থা অবলম্বন করা হবে বলে স্থির হয়েছে। বিদেশী সাহায্য দরকার—নেওয়াও হবে, তবে শেষ পর্যন্ত কতটা পাওয়া যাবে সেটা অনিশ্চিত। কাজেই খরচ জোগাড়ের ব্যাপারে যতটা পারা যায় নিজেদের সামর্থ্যের ওপরই নির্ভর করতে হবে। সরকারী খাতে যে চার হাজার আটশ' কোটি টাকা খরচ হবে সেটা আসবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উদ্বৃত্ত রাজস্ব থেকে (যার মধ্যে বর্তমানের কর ও বাড়তি কর ধার্য দুই আছে) আটশ' কোটি টাকা, সাধারণের কাছ থেকে সরকার ধার নেবেন বারশ' কোটি টাকা, রেল বিভাগের উদ্বৃত্ত ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের জমা থেকে চারশ কোটি টাকা, বিদেশ থেকে সাহায্য আটশ' কোটি টাকা, ঘাটতি ব্যয় (বাড়তি নোট ছেপে) চারশ' কোটি টাকা। এত যায়গা থেকে টাকা নিলেও আরও চারশ' কোটি টাকার মত ঘাটতি থাকবে। সে টাকাটা জনসাধারণের ডাকঘরে রাখা জমা তহবিল ও অন্যান্য ছোটখাটো উদ্বৃত্ত তহবিল থেকে আসতে পারে। বেসরকারী খাতে যে দু হাজার চারশ' কোটি টাকা খরচ হবে সেটার মধ্যে আছে স্থায়ী শিল্প কারখানা ও খনি বাবদ পাঁচশ পঁচাত্তর কোটি টাকা, বাগিচা, বিদ্যুৎ, অন্যান্য পরিবহন বাবদ একশ' পঁচাত্তর; নির্মাণ শিল্প বাবদ এক হাজার কোটি, কৃষি ও কুটির শিল্প বাবদ তিনশ' কোটি এবং স্টক বাবদ চারশ' কোটি টাকা।

হিসেবে ভুল

দ্বিতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় বছর প্রায় শেষ হয়ে এলো। এখন দেখা যাচ্ছে যে, পরিকল্পনার খরচের মধ্যে হিসেবে ভুল হয়েছে যার জন্য আজ পড়েছে টাকার টানাটানি—টাকার অভাবে পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত হবার উপক্রম। কাজেই খরচের পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত পরিকল্পনাটা আবার ঢেলে সাজবার প্রয়োজন হয়েছে আর তা করাও হয়েছে। প্রথমে ঠিক হলো দ্বিতীয় পরিকল্পনার জন্য মোট খরচ হবে চার হাজার আটশ' কোটি টাকা। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে ঐ টাকায় কুলাবে না। সুতরাং মোট খরচের মাত্রা আরও চারশ' কোটি টাকা বাড়িয়ে মোট পাঁচ হাজার দুশ' কোটি টাকা করা হলো। কিন্তু তাতেও ঠিক হলো না—পরিকল্পনা রচয়িতারা দেখলেন যে এত টাকা পাওয়া অসম্ভব। কাজেই ন্যাশনাল ডেভালাপমেণ্ট কাউন্সিল খরচের অঙ্ককে কমিয়ে আবার সেই চার হাজার আটশ' কোটি টাকাই রাখলেন। মোটামুটি এই হলো ঢেলে সাজার ব্যাপার। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো তা হলে? ন্যাশনাল ডেভালাপমেণ্ট কাউন্সিল দেখলেন যে এত টাকা পাওয়া অসম্ভব। নতুনত্ব যেটুকু করলেন সেটা এই যে মোট খরচের অঙ্ক কমিয়ে চার হাজার আটশ' কোটি টাকায় এনে সেই অঙ্ককে দুটো ভাগ করলেন। প্রথম ভাগে রইল সাড়ে চার হাজার কোটি আর দ্বিতীয় ভাগে রইল মাত্র তিনশ' কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে সব কাজ একান্ত দরকার, যেগুলো না করলেই নয়, বা যেগুলোর কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেছে—এ অবস্থায় বন্ধ করলে কাজের ক্ষতি হবে—এই রকম কাজের জন্য রইল ঐ সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা—আর পরিকল্পনার অন্যান্য কাজের জন্য রইল বাকী তিনশ' কোটি টাকা। ঢেলে সাজার ব্যাপারটা মোটামুটি এই।

কঠিন বাস্তব

যে কোন জিনিসের হিসেব এক জিনিস আর তার বাস্তব প্রয়োগ অন্য জিনিস। ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনার এই ঢেলে সাজার ব্যাপারটাও অনেকটা তাই। পরিকল্পনার কাজগুলোর জন্য মোট চার হাজার আটশ' কোটি টাকা জোগাড় হওয়া দূরে থাকুক পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করেছেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে মোট চার হাজার দুশ' ষাট কোটি টাকার বেশী জোগাড় করা একেবারেই সম্ভব নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, একান্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলোর জন্য দরকার যে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা সেটাও জোগাড় তো হচ্ছেই না উপরন্তু মোট যা জোগাড় হবে বলে পরিকল্পনা কমিশন বলেছেন সেটাও এই একান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্ক থেকে দুশ' চল্লিশ কোটি টাকা কম। অবিশ্যি কমিশন একেবারে হাল ছাড়েন নি, তাঁরা বলছেন

এই দু'শ' চল্লিশ কোটি টাকার ঘাটতি জোগাড় হতে পারে যদি জনসাধারণের ওপর আরও কর বসিয়ে একশ' কোটি টাকা, জনসাধারণের কাছ থেকে ধার ও তাদের অল্প সঞ্চয় থেকে ষাট কোটি টাকা, আর সরকারী খরচে মিতব্যয়িতা এনে তার থেকে আশী কোটি টাকা পাওয়া যায়। যদিও এটা নিছক কল্পনা ও খাতা কলমের হিসাব তবু বলা যেতে পারে এই টাকাটা পাওয়া গেলেও চার হাজার আটশ' কোটি টাকার অঙ্ক [illegible] আরও তিনশ' কোটি বাকী থাকে—সেটা আসবে কোথা থেকে? শুধু তাই নয় কমিশন যে চার হাজার দু'শ' ষাট কোটি টাকা জোগাড় হবে বলেছে—সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদি জোর করে আমরা এই সন্দেহ নিরসনও করি তাহলেও দু'শ' চল্লিশ কোটি আর তিনশ' কোটি—মোট এই পাঁচশ' চল্লিশ কোটি টাকা ঘাটতি থাকে।

খাতা কলমের হিসেব যে কাজের সময় বাজে হয়ে যায়—কিছুদিন যেতে না যেতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কমিশন এখন বলছেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার "অবশ্য করণীয়" কাজগুলো করতে সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার যায়গায় দরকার হবে চার হাজার ছ'শ পঞ্চাশ কোটি টাকা—মানে আগের হিসেবের চেয়ে আরও দেড়শো কোটি টাকা বেশী। এই অঙ্কের সঙ্গে পাঁচশ' চল্লিশ কোটি টাকা যোগ হলে দাঁড়ালো ছ'শ নব্বুই কোটি টাকা। এই বিপুল অঙ্কের টাকা জোগাড় করবার আমাদের সত্যিকারের সামর্থ্য আছে কি? কাজেই দ্বিতীয় পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ন কতটা কি হবে বলা শক্ত। এখনও সময় আছে—পরিকল্পনা কমিশন সময় থাকতে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী পরিকল্পনাকে যদি আরও ছাঁটকাট করেন, তবে তা অবাঞ্ছনীয় হবে না।

দ্বিতীয় দফায় কি হচ্ছে

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার প্রথম দু বছর শেষ হয়েছে—চলছে তৃতীয় বছর। অগ্রগতিও হচ্ছে কিছু কিছু। তবে তার খুঁটিনাটি তথ্য এখন পাওয়া সম্ভব নয়। ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে নতুন আবাদী জমি সৃষ্টির লক্ষ্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ছিল প্রায় নব্বুই লাখ একর—এ যাবৎ মানে পরিকল্পনার মেয়াদের প্রথম তিন বছরে হয়েছে প্রায় প'য়ত্রিশ লাখ একর। রাসায়নিক সার ব্যবহারের পরিমাণও বেড়েছে কিছুটা। প্রায় চারশ' চল্লিশটি এন ই এস ব্লককে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে প্রায় এক কোটি কুড়ি লাখ একর নতুন জমিতে সেচের ব্যবস্থা করা হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল—ইতিমধ্যে করা হয়েছে প্রায় চল্লিশ লাখ একর জমিতে। দেশে সরকারী আওতায় বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন আরও ৭.৭০ লাখ কিলোওয়াট বেড়েছে এই তিন বছরে—আর বেসরকারী আওতায় বেড়েছে ১.৭৫ লাখ কিলোওয়াট। ভাকরা নাঙ্গল, রিহান্দ, চম্বল, কনা, দামোদরভ্যালী, কুন্দ ইত্যাদি পরিকল্পনার কাজ চলছে—আশা করা যায় দ্বিতীয় দফার মেয়াদের মধ্যে এগুলোর কাজ শেষ হবে। আলওয়াতে ডি ডি টি কারখানা, মহীশূরের সরকারী চীনা মাটির কারখানা, ব্যাঙ্গালোরে সরকারী সাবান কারখানা ইত্যাদি অন্যান্য যেগুলোর কাজ প্রথম পরিকল্পনায় শুরু হয়েছিল—সেগুলো ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। চলতি বছরে সিন্দ্রীর সম্প্রসারণের কাজ, ভিলাই ও রাউরকেল্লায় প্রথম চুল্লির নির্মানের কাজ, দুর্গাপুরের কোকচুল্লির কাজ, হিন্দুস্থান মেশিনটুল্‌স কারখানার কাজ ইত্যাদি শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

তৃতীয় পরিকল্পনার আভাস

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্ধেকের বেশী সময় পার হয়ে গেছে। এখন থেকেই শোনা যাচ্ছে তৃতীয় পরিকল্পনার কথা। গত বছরের নভেম্বর মাসে ভারতের প্রধান মন্ত্রী তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মন্তব্য থেকে মনে হয় তৃতীয় পরিকল্পনা দ্বিতীয় পরিকল্পনার চেয়ে আরও বড় হবে। এর পেছনে যুক্তি যে নেই তা নয়, যুক্তি অবশ্যই আছে। প্রথম পয়সার অভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অনেক কাজ করাই হয়নি। দ্বিতীয় ঐ একই কারণে অনেকগুলোর কাজ আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও অসমাপ্ত রয়ে গেছে—এই উভয়বিধ কাজগুলো শেষ করতে হবে। তৃতীয়,—তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশের লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটির মত বাড়বে; এদের খাবার চাই, আশ্রয় চাই, কাজ চাই। কাজেই এই বিষয়গুলো বিচার করলে মনে হয় তৃতীয় পরিকল্পনা দ্বিতীয়টির চেয়ে বড় হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা করবার সামর্থ্য আমাদের আছে কি? দ্বিতীয় দফার কাজ এখনও শেষ হয়নি অথচ এর মধ্যেই তো টাকার জন্য আমাদের নাভিশ্বাস উঠবার উপক্রম। কাজেই আরও বড় তৃতীয় পরিকল্পনার জন্য আমরা টাকা জোগাড় করবো কোথা থেকে? দেশের লোকগুলোকে চাপ দিলে আরও কিছু কর পাওয়া যাবে হয়তো, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় কতটুকু? বৈদেশিক মুদ্রার সুযোগও আমাদের আর বেশী নেই বোধ হয়। দ্বিতীয় দফার শেষে আমাদের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ হবে প্রায় হাজার কোটি টাকা—তৃতীয় দফার মেয়াদের মধ্যে তার অর্ধেক পাঁচশ' কোটি শোধ করতে হবে—এটা দেওয়া হবে কি করে? দিন দিন বিদেশের বাজারে ভারতীয় মালের প্রবল প্রতিযোগী জুটছে। রপ্তানী করে যে বিদেশী টাকা আসছে—আমদানীর খরচা মিটোতে আর নিত্য-নৈমিত্তিক সরকারী প্রয়োজনে সেটুকুও খরচ হয়ে যাচ্ছে। বিদেশী ঋণের কিস্তির টাকা দিতে দেরী হচ্ছে, যার ফলে আমাদের সুনাম বাইরে নষ্ট হওয়ার উপক্রম—যদি একবার নষ্ট হয় তো ভবিষ্যতে আর পর্যাপ্ত ঋণ পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। কাজেই আরও বড় ও ব্যাপক পরিকল্পনা করে কাজে নামা কতটা যুক্তিসংগত তবে সেটা বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার।

সাইপ্রাস

গুরুপ্রসাদ রায়

রাশিয়ার হাঙ্গেরী, ফ্রান্সের আলজিরিয়া আর বৃটেনের সাইপ্রাস—পৃথিবীর ইতিহাসে তিনটি দুরপনেয় কলঙ্কজনক অধ্যায়। হাঙ্গেরীতে যারা প্রাণ দিয়েছিল তারা হয়েছিল শহীদ, অন্তত প্রতীচ্যের চোখে। আজ যারা সেই একই কারণে সাইপ্রাসে প্রাণ দিচ্ছে তারা সেই প্রতীচ্যের চোখে হল 'টেররিস্ট'। রাজনীতির খেলায় মানুষের প্রাণ আজ বড় নয়, আজ বড় হল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সম্মান রক্ষা। এশিয়া, আফ্রিকা জগতের চতুর্দিকে স্বাধীনতার উন্মাদনার কাছে যেন এই শক্তিগুলি নিজেদের বিকিয়ে না দেয়। পূর্বপুরুষেরা যে সাম্রাজ্য তৈরী করে গেছেন, তা যে করেই হোক রাখতে হবে। না হলে জগৎসভায় সম্মান থাকে না বৃহৎ শক্তি বলে।

তুর্কী হতে প্রায় চল্লিশ মাইল এবং সিরিয়া হতে প্রায় সত্তর মাইল দূরবর্তী এই দ্বীপটি সিসিলি এবং সার্ডিনিয়ার পর ভূমধ্যসাগরের বৃহত্তম দ্বীপ বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। সাড়ে তিন হাজার বর্গ-মাইলে প্রায় চার লক্ষ লোকের বাস। শতকরা প্রায় বিরাশি জন গ্রীকভাষী ক্রিশ্চিয়ান, অবশিষ্ট তুর্কীভাষী ইসলাম ধর্মাবলম্বী।

ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, বহুবার এই দ্বীপটির হাত বদল হয়েছে। ছশো সাতচল্লিশ খৃষ্টাব্দ থেকে আরব, বাইজান্টিন, রোমান, তুর্ক—একে একে সকলে আধিপত্য করে গেছে। এগার শ চুরাশি খৃষ্টাব্দে আইজ্যাক কমন্যাশ নামে এক সাইপ্রাসবাসী সাইপ্রাসের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু ইংলন্ডের রাজা প্রথম রিচার্ডের ধর্মযোদ্ধাদের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করার জন্য রিচার্ড তাঁকে বন্দী করেন এবং সাইপ্রাসকে বিক্রি করে দেন জেরুসালেমের নামে-মাত্র রাজা দ্য লুসিগন্যানের কাছে। প্রায় তিন শতাব্দী পর ভেনিস এই দ্বীপটি অধিকার করে। পনের শ সত্তর খৃষ্টাব্দে তুর্কী সাইপ্রাস আক্রমণ করে; এবং প্রায় ছ' সপ্তাহ অবরোধের পর বর্তমান রাজধানী নিকোসিয়া অধিকার করে। অবরোধমুক্ত নগরীর প্রায় কুড়ি হাজার অধিবাসীর মৃত্যু হয় তুর্কী সৈন্যদের হাতে। অবশেষে প্রায় তিন বছর পর ভেনিস সাইপ্রাসের উপর তুর্কী সুলতানের অধিরাজত্ব স্বীকার করে নেয়। এরপর প্রায় দুশো বছর সাইপ্রাস ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনে যদিও সতের শ চৌষট্টি, আঠার শ চার এবং আঠার শ একুশ খৃষ্টাব্দে সাইপ্রাস বিদ্রোহ ঘোষণা করে। আঠারশো আটাত্তর খৃষ্টাব্দে ইংলন্ড এক চুক্তির দ্বারা সাইপ্রাসের অধিকার নেয়। মূল্যস্বরূপ তুর্কী সুলতানকে বছরে প্রায় বারো লক্ষ টাকা রাজস্ব দেয়। উনিশ শ চৌদ্দ সালে প্রথম যুদ্ধের শুরুতে সাইপ্রাস বৃটেনের পূর্ণ অধিকারে আসে। প্রায় এক বছর পর বৃটেন এই দ্বীপটি গ্রীসকে ছেড়ে দিতে রাজী হয় এক শর্তে। শর্ত ছিল বুলগেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত সার্বিয়াকে যদি গ্রীস সাহায্য করে। কিন্তু গ্রীস সেই শর্ত মেনে নিতে অস্বীকার করে। মহাযুদ্ধের শেষে প্রায় উনিশ শ চব্বিশ সালে লজান চুক্তি অনুসারে তুর্কী সাইপ্রাসের উপর বৃটেনের অধিরাজত্ব স্বীকার করে নেয়। সংক্ষেপে এই হল সাইপ্রাসের ইতিহাস।

এরপর সাইপ্রাসে গভর্নরকে শাসনকার্যে সহায়তা করার জন্য বৃটেন এক কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করে। এই কার্যনির্বাহক সমিতির সাতজন সদস্যের মধ্যে চারজন সরকারী এবং তিনজন বে-সরকারী। সকলেই গভর্নরের মনোনীত। বহু বছর ধরে সাইপ্রাসে গ্রীসের সঙ্গে যুক্তীকরণের জন্য আন্দোলন চলছিল। উনিশ শ একত্রিশ সালে যে বিরাট বিক্ষোভ দেখা দেয়, তাতে বহু প্রাণনাশ এবং গভর্নরের আবাসগৃহ ধ্বংস হয়। শাস্তিস্বরূপ বৃটেন কার্যনির্বাহক সমিতি ভেঙ্গে দেয় এবং সম্পূর্ণ শাসনক্ষমতা গভর্নরের হাতে তুলে দেয়। সেই থেকে সাইপ্রাসে গভর্নরের শাসন শুরু হয়।

বৃটেনের কাছে সাইপ্রাসের মূল্য কম নয়। মধ্য প্রাচ্যে বৃটেনের সামরিক শক্তির আজ শেষ ঘাঁটি সাইপ্রাস। মিশরে ছাপান্ন সালে বৃটিশসিংহের পরাক্রম প্রদর্শনের সময় সাইপ্রাস থেকে সমস্ত আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। ফরাসী এয়ার ফোর্সও সে সময় সাইপ্রাসকে ব্যবহার করে ইস্রায়েলকে সাহায্য করার জন্য।

আজ সাইপ্রাসে যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে—প্রতীচ্যের কাছে যা হল 'টেররিজম', তার নেতা হলেন কর্নেল গ্রিভাস। গ্রিভাস এর আসল নাম নয়। সাইপ্রাসের ত্রিকোমো নামে এক গ্রামে এঁর জন্ম হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গ্রীস যখন জার্মানীর অধিকারে যায়, তখন যাঁরা দেশের অভ্যন্তর হতে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছেন, গ্রিভাস তাদের অন্যতম। কিন্তু গ্রীস পুনরুদ্ধারের পর গ্রীসে তাঁর স্থান হলো না। গ্রীসের শত শত বিনাবিচারে কারারুদ্ধ রাজবন্দীদের সংখ্যা না বাড়িয়ে তিনি সাইপ্রাসে পালিয়ে এলেন। যাঁর জীবনের শুরু হয়েছে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে, তিনি সাইপ্রাসের এই পরাধীনতা সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা হল কি করে গ্রীকভাষী এই দ্বীপটির মিলন হয় গ্রীসের সঙ্গে। এর জন্য সহানুভূতি চাইলেন সকলের কাছ থেকে। বিশেষ করে 'গ্রীক অর্থোডক্স চার্চ'-এর কাছ থেকে। প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে সহানুভূতি দেখাতে থেমে রইল না গ্রীক চার্চ। সাইপ্রাসের মুখপাত্ররূপে আর্চবিশপ মাকারিয়সের আবির্ভাব ঘটল এখান থেকেই।

উনিশশো আটচল্লিশ থেকে উনিশশো চুয়ান্ন পর্যন্ত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে বৃটেন বার বার বলে এসেছে সাইপ্রাসের স্বাধীনতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। উনিশশো চুয়ান্ন সালে মিঃ হেনরী হপকিন্সন, 'মিনিস্টার অব স্টেট ফর দি কলোনিজ', সাইপ্রাস সম্বন্ধে বলেন,

". . . There are certain territories in the commonwealth which, owing to their particular circumstances, can never expect to be fully independent."

গ্রীসের সঙ্গে যুক্তীকরণের আন্দোলন তখন থেকে নূতন রূপ নিল। গ্রিভাস এগিয়ে এলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে। সাইপ্রাসের ইতিহাসে আর এক অধ্যায়ের সূচনা হল। সে অধ্যায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের।

গ্রিভাস দেখলেন, সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন, বিশেষ করে বৃটেনের রক্ষণশীল সরকার আপোস বা আলাপ আলোচনা বোঝে না। বিশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ডি ভ্যালেরা, কলিন্স, উইলিয়াম ওয়ালেস প্রমুখ নেতারা যে পথে গিয়েছিলেন সে পথই সাইপ্রাসের স্বাধীনতার একমাত্র পথ। সাইপ্রাসের বামপন্থী নেতারা তাঁর সঙ্গে একমত হলেন না—তাই আজ সাইপ্রাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁদের দান নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু এ[illegible] না হলেও তাঁরা অন্য কোন পথের সন্ধান দিতে পারেন নি। জনসাধারণের উপর থেকে তাঁদের প্রভাব আজ তাই ক্রমশ কমে এসেছে। সাইপ্রাসবাসীরা প্রথমে এই গেরিলা যুদ্ধকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন না করলেও আজ তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। দিনের পর দিন, শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অত্যাচার সহ্য করে আজ তারা স্বভাবতই গ্রিভাসের উপর সহানুভূতিশীল, উনিশ'শ ষোল থেকে উনিশ'শ একুশ সাল পর্যন্ত আইরিশ জনসাধারণ

হয়তো প্রত্যক্ষভাবে ইস্টার বিপ্লব এবং রিপাবলিকান আর্মি'র সমর্থক ছিল না, কিন্তু তার অর্থ এই হয় না যে, তারা বৃটিশ আর্মি এবং 'ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান'-এর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বরং ঠিক তার বিপরীত।

চুয়ান্ন সালে যখন এই সংগ্রাম শুরু হল তখন বৃটেন তার শেষ রাজনীতিক চাল চালল। সংখ্যালঘু তুর্কী ভাষীদের গ্রীক ভাষী সাইপ্রাসবাসীদের থেকে ক্রমশ পৃথক করে তাদের মনে স্বতন্ত্র সাইপ্রাসের স্বপ্ন জাগাল। তাদের বোঝাল সাইপ্রাস যদি গ্রীসের অধীনে যায় তাহলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠবে। অবশ্য একদিক থেকে এই আশঙ্কা অমূলক ছিল না। আজ যদি গ্রীসে শত শত রাজবন্দী গত যুদ্ধের পর হতে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়ে বা নির্বাসনে না থাকত, তা হলে এই আশঙ্কার পক্ষে কিছু বলার থাকত না। জার্মানীর নাৎসীরা বন্দীদের উপর যে অত্যাচার করেছে, শোনা যায়, আজ গ্রীসে ঐ শত শত রাজবন্দীদেরও সেইভাবে নির্যাতন করা হয়। সে যাই হোক, বৃটেনের এই পরোক্ষ উস্কানীতে সাইপ্রাসের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে মাকারিয়সের বিপক্ষ নেতা হয়ে এগিয়ে এলেন ডক্টর ফাদিল কুচুক। তাঁর দাবী হল সাইপ্রাসকে ভাগ করে তুর্কীভাষী অঞ্চল তুর্কী মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত করা। এই হল তাঁর স্লোগান।

"Partition and nothing but partition."—

গত চার বছর ধরে অনেক রক্তবন্যা বয়ে গেছে সাইপ্রাসে। বৃটিশ সরকার মাকারিয়সকে বন্দী করে নির্বাসনে পাঠাবার পর বৃটেনে বিপক্ষ দলের চাপে অবশেষে তাঁকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু সাইপ্রাসে তাঁর প্রবেশ বন্ধ। যতক্ষণ না তিনি এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, বিশেষ করে গ্রিভাসের বিরুদ্ধতা করেছেন ততক্ষণ কোনমতেই তাঁকে সাইপ্রাসে প্রবেশ করতে দেওয়া যেতে পারে না। মাকারিয়সকে বন্দী করে এবং সর্বশেষে সাইপ্রাসে তাঁর প্রবেশ বন্ধ করে বৃটিশ সরকার তাঁকে সাইপ্রাসবাসীদের কাছে তাদের একমাত্র মুখপাত্র করে তুললেন। তাই যখন তিনি 'এনোসিস' অর্থাৎ গ্রীসের সঙ্গে যুক্তীকরণের প্রস্তাব তুলে নিয়ে সাইপ্রাসের স্বায়ত্তশাসন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মধ্যস্থতায় ও সহায়তায় স্বাধীনতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার প্রস্তাব করলেন, তখন সাইপ্রাসবাসীরা তাই মেনে নিল। গ্রীস সরকারের কাছ থেকে এই প্রস্তাব আসেনি—তাই বৃটেন মাকারিয়সের প্রস্তাবকে আমল না দিয়ে 'পার্টনারসিপ প্ল্যান' বা 'মাকমিলান প্লান ফর সাইপ্রাস'—নামে এক 'সাত বছরের প্রস্তাব' আনল। সাইপ্রাসে শাসনকার্যে গভর্নরকে সহায়তা করার জন্য দুই সম্প্রদায়ের দুইটি পৃথক কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন হবে। স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উন্নতির প্রতি কার্যনির্বাহক সমিতি লক্ষ্য রাখবেন। গ্রীক এবং তুর্কী সরকার দুইজন প্রতিনিধি পাঠাবেন—যাঁরা সাইপ্রাসে থেকে দুই সরকারের 'কমিশনার'-রূপে দুই সম্প্রদায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। ধীরে ধীরে সাইপ্রাসকে বিভক্ত করে দুই দেশ—গ্রীস এবং তুর্কীর মন রাখা, এই হল বর্তমান পার্টনারসিপ প্ল্যান।

এই প্ল্যান সাইপ্রাসবাসীদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছে নানাকারণে। প্রথমত বৃটিশ সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাতে দ্বিধা করেননি। সাইপ্রাসে সরকারের অনুমতি ব্যতীত অস্ত্র রাখা নিয়মবিরুদ্ধ। এর ব্যতিক্রম হলে আদালত মৃত্যুদণ্ড দেবেন, তা অস্ত্র ব্যবহার করা হোক বা না হোক। বহু গ্রীকভাষী যুবক সেই দণ্ড নিয়েছেন। কিন্তু একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করবঃ একটি তুর্কীভাষী সাইপ্রিয়ট পুলিস 'অফ্ ডিউটি' থাকাকালীন রিভলবার সহ গ্রেপ্তার হন। আদালত তাঁকে জামিনে মুক্তি দেন, যদিও কোন গ্রীকভাষী সাইপ্রিয়ট এ সুযোগ পান না এরকম ক্ষেত্রে। জামিনে মুক্ত থাকাকালীন সেই তুর্কীভাষী সাইপ্রিয়ট তুর্কী মহাদেশে পালিয়ে যান। তাই তাঁর কোন বিচার হয়নি। আর একটি ঘটনাঃ কিছুদিন পূর্বে সাইপ্রাসে ভোর হওয়ার অনেক আগে বৃটিশ সিকিউরিটি পুলিস সকল সাইপ্রিয়ট নেতাদের গ্রেপ্তার করলেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা ফাদিল কুচুক পূর্বাহ্নে সংবাদ পেয়ে তুর্কীতে পালিয়ে যান। শোনা যায়, আজ গ্রীকভাষী সাইপ্রিয়ট পুলিস একজনও নেই সাইপ্রাসে। কিন্তু সাইপ্রাস পুলিসে তুর্কীদের স্থান আছে। এ ধরনের আরও বহু ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

এই প্ল্যানের পিছনে যে কোন শুভেচ্ছা নেই, তা বোঝা যায় আর একটি কারণে। কিছুদিন পূর্বে এক সাপ্তাহান্তিক বক্তৃতায় কলোনীয়াল সেক্রেটারী মিঃ লেনক্স বয়েড বলেন, সাইপ্রাসের তুর্কীর সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। সাইপ্রাসের দূরত্ব তুর্কী হতে মাত্র চুয়াল্লিশ মাইল। কিন্তু গ্রীস হতে বহুদূরে। তাই 'ইনটারনাল সিকিউরিটি'র জন্য তুর্কী এই দ্বীপটি দাবী করতে পারে। গত এগারোই ডিসেম্বর রক্ষণশীল দলের এক গোপন সভায় লেনক্স বয়েড বলেন, কোন বিশেষ অবস্থায় পার্টিসানই একমাত্র পথ।

'ন্যাটো'র মধ্যস্থতায় পূর্বে যে আপোস মীমাংসার চেষ্টা হয়েছিল তা ভেঙে যায় নানাকারণে। গ্রীস শুধু ত্রিপক্ষীয় আলোচনা চায়নি। আমেরিকা, নরওয়ে এবং আরও কয়েকটি দেশের অন্তর্ভুক্তি দাবী করে। গ্রীসের আশঙ্কা যে বৃটেন এবং তুর্কী জোট বেঁধে আলোচনা ভেঙে দেবে। ওয়াকিবহাল মহল থেকে শোনা যায় যে, 'ন্যাটো'র সেক্রেটারী মিঃ স্পাক চেয়েছিলেন বৃটেন তার 'পার্টনারসিপ প্ল্যান' কিছুটা পরিবর্তন করুক। কিন্তু বৃটেন তাতে নারাজ। গ্রীস বর্তমানে দুটি প্রস্তাব এনেছে। হয়, দুটি কার্যনির্বাহক সমিতির পরিবর্তে একটি কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করে সাইপ্রাসকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হোক এবং কিছুকাল পরে গ্রীসের সঙ্গে সাইপ্রাস যুক্ত হোক। নয়, সাইপ্রাসকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হোক। কিন্তু লণ্ডন থেকে বর্তমানে কোন প্রস্তাবের পক্ষেই আশাপ্রদ কিছু শোনা যায়নি। গত দশই ডিসেম্বর পার্লা-

মেণ্টে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী তাঁর 'পার্টনার-সিপ প্ল্যান'-এর কোন পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে বলেনঃ
"We should go quietly ahead with our measures."

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সাইপ্রাস সমস্যার কোন সমাধান করতে পারেনি। গতবারের মত এবারও আলাপ আলোচনার মধ্যস্ততায় মীমাংসার আশা জানিয়েই থেমে গেছে। সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার হল সাধারণ পরিষদে আমেরিকার অভিনয়। ছাপ্পান্ন সালে যে আমেরিকা মিশর আক্রমণ থেকে বৃটেনকে নিরস্ত করে সারা জগতের শ্রদ্ধেয় হয়েছিল, সাধারণ পরিষদে তার ব্যবহার সত্যিই মর্মান্তিক। কিন্তু একটু পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার তৈল সম্পদ রক্ষা করাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল বৃটেনকে সরিয়ে দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে নিজের আসন দৃঢ় করা।

সাধারণ পরিষদে আমেরিকার মর্মান্তিক ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে বৃটেনে নির্বাসনরত কয়েকজন গ্রীকভাষী সাইপ্রিয়ট বন্দী অনশন ধর্মঘট পালন করলেন একদিন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে বৃটিশ প্রতিনিধি বারবার মনে করিয়ে দিলেন বৃটেন সাইপ্রাস বিভাগ চায় না। কিন্তু ভারত যখন সাইপ্রাসের স্বাধীনতা এবং অখণ্ডতার উপর জোর দিয়ে প্রস্তাব আনল তখন বৃটিশ প্রতিনিধি তার তীব্র প্রতিবাদ করলেন। বললেন, এ প্রস্তাব পাস হলে সাইপ্রাসে আরও ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হবে। অবশ্য কি সে অবস্থা তা তিনি বলেননি। পাকিস্তান প্রতিনিধি আলি খান বৃটিশ প্রতিনিধির সে উদ্বেগ সমর্থন করলেন। বৃটেনের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা মন্তব্য করেছিলেন,
"Mayfair coming to the rescue of Whitehall."

আজ একটা কথাই বার বার মনে হয়। বৃটেন এবং তুর্কী দুই সাম্রাজ্যলোলুপ দেশ যেখানে জোট বেঁধেছে সেখানে আলাপ আলোচনার মধ্যস্থতায় কি কোন সমাধানে আসা সম্ভব? একটা বিষয় সকলেই ভুলে গেছে, কোন আলাপ আলোচনায় সাইপ্রাসবাসীদের আজ কোন স্থান নেই। যদি বৃটেন, গ্রীস এবং তুর্কীকে বাদ দিয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আজ সাইপ্রাসের ভার গ্রহণ করত তাহলে কি খারাপ হত। যদি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নির্বাচন পরিচালনা করত সাইপ্রাসে, যদি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করত স্বাধীন সাইপ্রাসের শাসনতন্ত্রে তাহলে অভিযোগের কিছু থাকত কি? 'লীগ অব নেশনসের' পতনই হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির স্বার্থ বজায় রাখতে গিয়ে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবার অনেক শক্তিশালী হয়েও কি সেই পথ ধরবে?

সাইপ্রাস প্রত্যাগত অনেককে প্রশ্ন করেছি সেখানকার দৈনন্দিন অবস্থা সম্বন্ধে। একটা উত্তরই পেয়েছি, সাইপ্রাস আজ নরককুণ্ড। সেই নরককুণ্ডের আর একটা রূপ দেখা দিয়েছিল অক্টোবরের তিন তারিখ অপরাহ্নে।

পয়লা অক্টোবর থেকে বৃটিশ পার্টনারসিপ প্ল্যান চালু করার ব্যবস্থা হল। E O K A—গ্রিভাস পরিচালিত দল এই প্ল্যানের বিপক্ষে শুধু তীব্র প্রতিবাদই জানাল না, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যে আরও দৃঢ় হবে তারই সতর্কবাণী জানাল। গ্রীস প্রতিবাদ জানাল এবং পয়লা অক্টোবর সরকার মনোনীত প্রতিনিধি পাঠাতে অস্বীকার করল। কিন্তু তুর্কী প্রতিনিধি এলেন। বৃটেন আর তুর্কী হাতে হাত মিলিয়ে শতকরা বিরাশীজনকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করল।

অক্টোবর তিন তারিখ বেলা প্রায় চারটের সময় ভরোশা শহরে হার্মেস স্ট্রীটে দুই বৃটিশ সার্জেণ্ট পত্নী আহত হলেন কোন এক বা ততোধিক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির গুলীতে। মিসেস কার্টলিফ নামে এক ভদ্রমহিলা তৎক্ষণাৎ মারা যান। অপরজন মিসেস রবিনসন হাসপাতালে সেরে উঠলেন। মিসেস কার্টলিফের কন্যার (তিনিও উপস্থিত ছিলেন ঘটনাস্থলে এবং কোন আঘাত পাননি) এবং মিসেস রবিনসনের বিবৃতি বিভিন্ন। একজন বলেন তিনি কালো মুখোস পরা একজনকে দেখেছেন। অপরজন বলেন, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি ছিল, একজন নয়। কে বা কারা গুলী করল তা এখনও রহস্যজনক। আর্চবিশপ মাকারিয়স এথেন্স থেকে বললেন, এ কাজ E O K A'র নয়। সাইপ্রাসের এক শহরের মেয়র বললেন, তিনি জানেন এ কোন গ্রীকভাষীর কাজ নয়। তিনি আততায়ীর সন্ধানের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন। কিন্তু রহস্যের কোন সমাধান হয়নি। এ কি তুর্কীভাষী E O KA'র প্রতিদ্বন্দ্বী দলটির কাজ? সিকিউরিটি পুলিসের মধ্যে 'Anti—E O K A' নামধারী যে দলটি আছে এ কি তাদেরই কারসাজি? কেউ জানে না এখনও। কিন্তু এরপর যে ঘটনা ঘটেছিল সেদিন, তা চূড়ান্ত বর্বরতারই প্রতীক।

এই দুই ভদ্রমহিলার আহত হওয়ার দশ মিনিটের মধ্যে সঙ্কেতসূচক সাইরেন বেজে ওঠে। রাস্তায় রাস্তায় 'রোড ব্লক' তৈরী করে পথচারীদের গ্রেপ্তার করা হয়। প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট পর শহরের মেয়রের কাছে প্রথম অভিযোগ আসে যে সৈন্যরা জোর করে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সকলকে প্রহার করেছে। এরপর অভিযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এত যে মেয়র পুলিস কমিশনারের কাছে প্রতিবাদের অবসর পাননি। প্রায় পাঁচটা বেজে পনের মিনিটের সময় ব্রিগেট কম্যাণ্ডার সৈন্যদের নিরস্ত হতে বলেন, কিন্তু সে বিবৃতি সন্ধ্যা ছটার আগে রেডিওতে ঘোষণা করা হয়নি। এই বিবৃতির পরই জানা যায় সাইপ্রাসের গভর্নর তাঁর এক 'ককটেল পার্টি' বন্ধ করে ভরোশায় আসছেন। গভর্নর স্যার হিউফুট এসে যা দেখলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী ঘটে গেছে এবং অনেক আগে। সরকারীভাবে গ্রেপ্তারের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ছ'শ। কিন্তু নিরপেক্ষ পত্রিকাগুলির সংবাদদাতারা বলেন, গ্রেপ্তারের সংখ্যা প্রায় দু হাজার। আড়াই'শ লোক গ্রেপ্তার বা জবানবন্দী দেবার সময় আহত হয়। তিন বা চারজনের মৃত্যু হয়। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ সে অপরাহ্নে কি ঘটে গেছে তার কোন বিবৃতি এখনও প্রকাশ করেননি।

প্রতি বাড়িতে বৃটিশ সৈন্যরা দরজা, জানলা ভেঙে প্রবেশ করে পুরুষদের বন্দুকের বাট, ছড়ি ইত্যাদির দ্বারা প্রহার করতে থাকে। জানা গেছে, সেই অত্যাচার দেখে ভয়ে একটি বার-তের বছরের মেয়ে মারা যায় হার্টফেল করে। একটি উনিশ বছরের যুবক আঁদ্রে লুকাস এবং

সাঁইত্রিশ বৎসর বয়স্ক পানায়োতিস ক্রিসোস-তমূরেও মৃত্যু হয়। যে সমস্ত গ্রীকভাষী সাইপ্রিয়ট সাক্ষী দিয়েছেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বলেছেন, সৈন্যদের প্রহারের কথা। যে গাড়িতে চৌদ্দজন বসার ব্যবস্থা সেখানে তিরিশ বা পঁয়তিরিশজনকে তুলে গাদা করা মৃতদেহের মত রাখা হয়। উপরোক্ত ঐ বয়স্ক ব্যক্তিটি ছিলেন সবার নিচে। তিনি নাকি বার বার কাতরোক্তি করছিলেন নিশ্বাস নিতে পারছিলেন না বলে। এ শুধু একটি মাত্র গাড়ির কথা নয়। প্রায় প্রত্যেকটি গাড়িই এইভাবে ভর্তি করে গ্রীকভাষীদের আনা হয় কাঁটাতারের এক খাঁচার মধ্যে জবানবন্দী দেবার জন্যে। এখানেও, এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাবার সময়ও বেটন ইত্যাদির দ্বারা প্রহার করা হয়। অনেকেই বলেছেন যে জবানবন্দী দেবার ঘর থেকে তাঁরা আর্তচীৎকার শুনেছেন। একজন সৈন্য আদালতের প্রশ্নে বিব্রত হয়ে স্বীকার করে যে, তার গাড়িতে কুড়ি, পঁচিশ বা ততোধিক লোককে তোলা হয়েছিল।

ক্রিসোসতমূরে মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের সময় জানা যায় যে, গ্রেপ্তারের সময় তিনি জীবিত ছিলেন, কিন্তু সন্ধ্যা ছ'টার সময় তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁর হার্টের অসুখ ছিল এবং সাতটি পঞ্জরাস্থি ভেঙে যাওয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু কি করে ক্রিসোসতমূরে পঞ্জরাস্থি ভাঙল, তা বলা হয়নি আদালতে। তাই আদালতও এ বিষয়ে আর কিছু বলেননি।

আঁদ্রে লুকাসের মৃত্যুর কারণ আরও রহস্যজনক। যে অফিসার এই যুবকটিকে দুই বন্ধু সহ গ্রেপ্তার করেন, তিনি আদালতে বলেন যে, একটি বাড়ির অন্ধকার এক ঘরে তিনি যখন এই তিনজনকে গ্রেপ্তার করতে প্রবেশ করেন, তখন তারা আক্রমণ করতে এগিয়ে আসে। তিনি তাঁর হাতের বেটন দ্বারা প্রত্যেককে প্রহার করেন এবং অবশেষে তাঁর সঙ্গী কুকুরটিকে লেলিয়ে দেন। যদিও এই যুবকটি হেঁটে এসে গাড়িতে ওঠে, পরদিন সকালে তার মৃত্যু হয়। ময়না তদন্তে প্রকাশ কোন ধারহীন অস্ত্র দ্বারা মাথায় আঘাতের ফলে মাথার খুলি ভেঙে যায়। আদালতে লুকাসের মৃত্যু রহস্যেরও সমাধান হয়নি। কাঁটাতারের খাঁচার চার পাশে প্রায় তিনশ সৈন্য ছিল। হয়ত তাদেরই আঘাতে লুকাসের মৃত্যু হয়েছে। তাই আদালত বলেছেন, কোন আজ্ঞাতনামা ব্যক্তির আঘাতের ফলে লুকাসের মৃত্যু হয়েছে। একজন সলিসিটারকেও সৈন্যরা প্রহার করে। অক্টোবর চার তারিখে রয়টারের এক সংবাদদাতার কাছে একজন সরকারী কর্মচারী অস্বীকার করেন যে, জবানবন্দী নেবার সময় ছ'জনের মৃত্যু হয়েছে, একজন বলেন, কেউ মারা যায়নি। সেদিন সাইপ্রাস সরকার পূর্ণ তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ পর্যন্ত তা প্রকাশ হয়নি। বার বার কলোনীয়াল সেক্রেটারী এবং যুদ্ধমন্ত্রী অস্বীকার করেছেন যে, সে সন্ধ্যায় সৈন্যদের মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সাইপ্রাস আদালতে করোনার তদন্ত শেষে বলেন:

"It is obvious from this inquest that during the arrests or there after there were used on some of those arrested a degree of force that would appear to be entirely unjustified. People were so assaulted and beaten that doctors were fully occupied at Karaolos Camp and the general hospital tending the wounded all evening".

বৃটেনের সাধারণ লোক কিভাবে এই ঘটনাকে নিয়েছে তার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। যে বৃটেনবাসীরা হাঙ্গেরীতে রাশিয়ার বর্বরতার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে, সুয়েজ কেলেঙ্কারীর কথা উঠলে যারা নীরব থাকে, তারা এ ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবেই নিয়েছে বলব। তাদের মতে কোন সরকারই আজ সাইপ্রাস সমস্যার সমাধান এর চেয়ে ভালভাবে করতে পারে না।

গ্রীস এবং সাইপ্রাস ঘুরে এসে শ্রমিক নেত্রী পার্লামেন্ট সদস্যা বারবারা ক্যাসল তীব্র ভাষায় বৃটিশ সিকিউরিটি ফোর্সের নিন্দা করেন। দক্ষিণপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন নেতা জিম ম্যাথুজ সেই বিবৃতির নিন্দা করে শ্রীমতী ক্যাসলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। শ্রমিক দলের নেতারা বিচলিত হয়ে তাড়াতাড়ি এক সাক্ষাৎকারের আয়োজন করলেন। সাক্ষাৎ শেষে বারবারা ক্যাসল নূতন বিবৃতি দিলেন। তা পূর্বের তীব্র প্রতিবাদের তীব্রতা হারাল।

সামরিক বিভাগে শ্রমিক দলের অনেক সমর্থক আছে। তাই আসন্ন নির্বাচনের মুখে

শ্রমিক নেতারা ভোট হারাবার ভয়ে প্রতিবাদও জানাতে পারলেন না। তাঁদের মত হল আসন্ন নির্বাচনে শ্রমিক দল জিতবে। নতুন শ্রমিক সরকার তখন সাইপ্রাস সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করবে। কিন্তু নির্বাচনে যদি শ্রমিক দল হেরে যায়? ভোট হারাবার ভয়ে যা অন্যায় তাও আজ মেনে নিলেন হিউ গেটস্কেল, নাই বিভান প্রমুখ শ্রমিক নেতারা। অন্যায় নির্যাতন তা যে দেশেই হোক, অন্যায়ই থেকে যায়। রাশিয়ার নির্যাতন বা নাৎসী নির্যাতন নীতির বিরুদ্ধে বৃটেনবাসীরা যে ঘৃণা পোষণ করেন, তার একাংশও যদি তাঁদের সরকারের নির্যাতন নীতির বিরুদ্ধে পোষণ করতেন, তাহলে আজ সাইপ্রাস সমস্যার এই সংকটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না হয়তো।

গত এগারোই ডিসেম্বর লণ্ডনের ডেনিসন হাউসে 'মুভমেণ্ট ফর কলোনিয়াল ফ্রিডম' এক সভার আয়োজন করেন। বলা বাহুল্য বিষয়বস্তু ছিল সাইপ্রাস। লণ্ডনের ওয়েস্টমিনিস্টার হলে এই সভার আয়োজন হয়েছিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নগর কর্তৃপক্ষ 'হল' ছেড়ে দিতে নারাজ হওয়ায় এই আন্দোলনের নেতা শ্রমিক সদস্য ফেনার-ব্রকওয়ে ডেনিসন হাউসে সভার আয়োজন করেন। সভার প্রথম থেকেই গোলমাল শুরু হয়। গ্যালারী থেকে সভার শ্রোতাদের উপর ন্যাশনাল লেবার পার্টির (লেবার পার্টি নয়) জন কতক সদস্য পুস্তিকা ছড়াতে থাকেন। 'keep Britain white' ছিল তাঁদের স্লোগান। পরে শোনা যায়, মঞ্চের উপর একটি নকল বোমাও ছোঁড়া হয়। পুস্তিকার বিষয়বস্তু ছিলঃ

'Cypriot murderers—how soft can we get ?' এবং 'Labour, Liberal and Tory politicians will not act. Only the national Labour Party is pledged to keep Britain for the British'. সেদিনকার সংবাদপত্রে আরও একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়ঃ কেনিয়ার লেবার ফেডারেশনের সহকারী সেক্রেটারী ঘানার রাজধানী আক্রাতে বলেন,

"A British member of Parliament told me in America that any more trouble in Kenya would be met with bombs, machine guns and tanks".

উপরোক্ত এই মন্তব্যের সঙ্গে সাইপ্রাসের কোন সম্বন্ধ না থাকলেও, এ মন্তব্য থেকে বোঝা যায় কতখানি শুভ কামনা নিয়ে বৃটেন আজ সাইপ্রাসে 'পার্টনারশিপ প্ল্যান' এনেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতা ফদিল কচুক লণ্ডনে এসেছেন সাইপ্রাস সমস্যা আলোচনার জন্য। কিন্তু গ্রীকভাষী সাইপ্রিয়টদের স্থান নেই কোন আলোচনায়। বারবার E O K A তার গেরিলা যুদ্ধ বন্ধ করতে চেয়েছে, কিন্তু প্রতিবারই তা ভাঙতে হয়েছে হতাশার তাড়নায়। শেষবার জাতিপুঞ্জে সাইপ্রাস সমস্যা সমাধানের আশায় গ্রিভাস যুদ্ধ বন্ধ রাখেন কিছু দিনের জন্য। গত চৌদ্দই ডিসেম্বর সে প্রতিশ্রুতি গ্রিভাস তুলে নিয়েছেন। E O K A-র নতুন পুস্তিকাতে গ্রিভাস লিখেছেনঃ

"A new phase in the battle of Cypras will begin with the slogan. 'We shall fight to the bitter end ....Terrorised by the echo of our just case at the United Nations, the British recoursed to the slave traders of democracy, the United States of Dulles. One rascal helped anoeher rascal. But both will oneday be brought to account."

সাইপ্রাসের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের বিবরণ পড়ে একটা কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। গ্রিভাসের পথ কি ভুল? ইতিহাস তার উত্তর দেবে।

কিছু দিন পূর্বে সাইপ্রাসের এক বামপন্থী নেতাকে এই প্রশ্নই করেছিলুম। তাঁর মতে সাইপ্রাসের আয়তনের জন্য কোন বিপ্লবই সফল হবে না। তুর্কী আমলে তিনটি বিপ্লবের কথা তিনি বললেন। হতাশায় তিনি স্বীকার করলেন, সাইপ্রাসের আজ কোন পথ খোলা নেই। এটা ভুললে চলবে না, শতাব্দীর পর শতাব্দী সাইপ্রাস সাম্রাজ্যলোলুপ শক্তিগুলির অত্যাচার সহ্য করেছে। দক্ষিণপন্থী, গ্রিভাস সমর্থক এক সাইপ্রিয়ট ডাক্তারকে প্রশ্ন করে জেনেছিলুম, সাইপ্রাসবাসীরা আজ মরীয়া। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অজস্র দৃষ্টান্ত দিলেন। বললেন, ভারত আর সাইপ্রাসের স্বাধীনতা আন্দোলনের পার্থক্যের কারণ সাইপ্রাসের আয়তন। তাই 'পার্টিশান' অসম্ভব। সাইপ্রাসে কোন আন্দোলনই কখন সফল হয়নি। আজ বৃটেন এই 'ভায়োলেন্স' থামাতে বলছে। কিন্তু যে দেশ এখনও বলে,

'Our action in Suez was honourable and justified',

যে দেশ আইসল্যাণ্ডের মাছের জন্য যুদ্ধ জাহাজ পাঠায়, তাদের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় কি?

কিন্তু সকলেই স্বীকার করেছেন আজ গ্রিভাস বা তাঁর সমর্থকদের জেলে পুরে বা ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে সাইপ্রাস সমস্যার কোন সমাধান হবে না। এক গ্রিভাসের স্থান শত গ্রিভাসে পূর্ণ হবে। একমাত্র দুই পক্ষের পূর্ণ শুভেচ্ছা এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

দুপক্ষের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাঝে ও'ডোনোভান রোসার সমাধি ক্ষেত্রে পিয়ার্সের সেই বিখ্যাত কথাটি মনে আসা স্বাভাবিক।

...."the fools, the fools, the fools !—they have left us our Fenian dead."

উনিশ শতকের সাহিত্য, সাধনা ও সংস্কৃতি

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন। পপুলার লাইব্রেরী। ১৯৫।১বি, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—পাঁচ টাকা।

উনিশ শতকের জ্ঞান, কর্ম ও ভাবসাধনাকে বিষয়রূপে গ্রহণ করে অনেক বই নানা নামে বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে। এই শতকটি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে উদ্দীপনার যুগ। সচেতন ব্যক্তি হিসেবে বাঙ্গালীর বিভিন্ন বৃত্তির অভূতপূর্ব বিকাশ ও সার্থকতা সেদিন ঘটেছিল এবং ভাব ক্ষেত্রে ছিল বহুতর। এর একটির সঙ্গে অন্যটির যোগ অচ্ছেদ্য; সঞ্জীবিত জাতি-চিত্ত বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে একটি অনির্বাণ অভিপ্রায়কে সঞ্চারিত করে দিয়ে সেদিনের যুগধর্ম গঠন করেছিল, সে যুগধর্মের ছাপ কেউই সেদিন অস্বীকার করতে পারেননি। উনিশ শতকের ভাবসাধনায় বা সাহিত্যরচনায় সেই একই যুগধর্ম কার্যকরী হয়েছিল। শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন মহাশয় তাঁর এই বইয়ে সেই যুগধর্মটিকে স্বীকার করে নিয়েই উনিশ শতকের সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। তাঁর এই পদ্ধতি যে যথার্থ তাতে সন্দেহ নেই। ত্রিপুরাশঙ্করবাবু রামমোহন থেকে শুরু করে বিহারীলাল পর্যন্ত, তত্ত্বালোচনায়, প্রবন্ধ-সাহিত্যে, নাটকে, মহাকাব্যে, আখ্যায়িকা কাব্যে ও গীতিকাব্যে সেই যুগধর্মের সূত্রটি অনুসরণ করতে চেয়েছেন এবং প্রয়োজনস্থলে সুযোগমত তিনি সেই সূত্রের অস্তিত্বকে তথ্য ও যুক্তির দ্বারা স্পষ্টও করেছেন। উনিশ শতকে চিন্তাজগতে যে ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ, স্বাজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেম এবং সেই সঙ্গেই পরাধীনতার জ্বালা তীব্র হয়ে উঠেছিল, সাহিত্যরচনার ব্যাপারেও যে কিভাবে তা প্রভাব বিস্তার করে জাতীয় সাহিত্যকে গঠন করেছে, তা সহজভাবে বুঝিয়ে বলাই বোধহয় ত্রিপুরাশঙ্করবাবুর উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্যটি ভাল সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থের লেখক যুগধর্ম আবিষ্কারের অত্যুৎসাহে খাঁটি সাহিত্যালোচনাকে গৌণ করেছেন বলেই মনে হয়। পদ্মিনী উপাখ্যান, কাঞ্চীকাবেরী, দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি রচনাকে কাব্য বলা চলে কিনা এবং এ রচনা পাঠকের রসপিপাসাকে কতটুকু তৃপ্ত করে, এ কাব্যগুলির বহুবিধ দোষত্রুটি কবির কল্পনা ও রচনাশক্তিরই দুর্বলতা না এর কারণ অন্যত্র ইত্যাদি বিষয় ত্রিপুরাশঙ্করবাবু আলোচনা থেকে বাদ দিয়েছেন। ত্রিপুরাশঙ্করবাবু হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের রচিত মহাকাব্য যে খাঁটি মহাকাব্যের সমুন্নতি ও গঠন সংহতি থেকে অনেকখানি বিচ্যুত হয়েছে, সে কথা স্বীকার করেও এই কবি দুজনকে প্রতিভাধর ও অতুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন বলেছেন। তিনি কি স্বাদেশিকতার বাণী প্রচার এবং নবধর্ম প্রচারকেই কবিত্বশক্তির পরাকাষ্ঠা বলতে চান? মনস্বিতার সঙ্গে কবিত্বের একটি বড় পার্থক্য আছে। মনস্বিতার সারবস্তুটি যখন কল্পনা ও অনুভূতির জারক রসে জারিত হয়ে জীবনের সজীব অভিপ্রায়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয় এবং তা ... আচরণের স্বাভাবিক পথ অনুসরণ করে, ... মনস্বিতাও কাব্যের বিষয়ীভূত হতে পারে। অন্যথায় তা অসংলগ্ন নীরস রচনা বা আরোপিত তত্ত্বালোচনায় পর্যবসিত হয়। এই দুই শ্রেণীর প্রথমটিতে হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে ফেলা যায় কি? ত্রিপুরাশঙ্করবাবু যুগধর্ম অন্বেষার মোহে পড়ে রসবিচারকে একটু অনাদর করেছেন বলেই আমাদের মনে হয়। তারই ফলে মধুসূদনের দৈবতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি দুটি স্থানে প্রায় বিপরীত কথা বলে ফেলেছেন, বোধহয় অজ্ঞাতসারেই। ১৪১ পৃষ্ঠায় তিনি মধুসূদনের কাব্যে হিন্দু ও গ্রীক অদৃষ্টবাদের দৈবত প্রভাবের কথা বলেছেন, আবার ২২৩ পৃষ্ঠায় মধুসূদনের কাব্যের গ্রীক নিয়তিবাদের সঙ্গে ভারতীয় আদর্শের যে কোনই যোগ নেই—এমন কথাও বলেছেন। উনিশ শতকের বাংলা কাব্যসাহিত্যের আলোচনায় এ গ্রন্থে এমন দু-একটি অসংগতি দেখা গেছে। বিহারীলালের

'সারদা'র স্বরূপ ব্যাখ্যাও আমাদের কাছে খুব বিশ্বস্ত ঠেকেনি। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মহাশক্তি, সাংখ্য দর্শনের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা এবং বিহারীলালের সারদা ত্রিপুরাশংকরবাবুর কাছে অভিন্ন। কিন্তু এ সিদ্ধান্তকে যুক্তিসিদ্ধ করতে লেখক কার্পণ্য করেছেন।

তুলনায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা স্বচ্ছ ও মনোজ্ঞ। এ'দের অন্তর্জীবন, জীবন-দর্শন ও সেই সংগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গঠনে এ'দের দান ও সহযোগিতার কথা লেখক অল্পায়তনে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। ত্রিপুরাশংকরবাবু অনুরাগী সাহিত্যপাঠক এবং তাঁর অনুরাগসন্দীপ্ত আলোচনার পরিধিও বিস্তৃত। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের ছাত্র এবং যে কোন সাহিত্যানুরাগী পাঠক উনিশ শতকের সাহিত্যসাধনার প্রসার ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এই বইটি পড়ে একটা ধারণা গড়ে নিতে পারবেন। যে কোন বই পড়েই তা সম্ভব হয় না। 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য' বাঙ্গালী পাঠকের মমতা দাবী করতে পারে। ২৯৬।৫৮

ভারতের মুক্তি-সন্ধানী—যোগেশচন্দ্র বাগল। পপুলার লাইব্রেরী। ১৯৫।১বি, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—পাঁচ টাকা।

'উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাস ভোলা যায় না। বিদেশী স্বৈরশাসকের নির্মম অত্যাচার ও পরাধীনতার গ্লানি এবং এই দুই এর আঘাতে জাগ্রত জাতীয় চেতনা ও তার পরিণামে যে দুঃখের আগুনে সারা ভারতবর্ষে—বিশেষ করে বাংলায়—জ্বলে উঠেছিল,—তার একদিকে ছিল তাপ, অন্যদিকে আলো। জাতিগঠনের কাজে উৎসর্গিত ভারত-সন্তান সেই তাপে দগ্ধ হয়েও আত্মিক স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতার যে আলো সেদিন দেখিয়েছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা-বেদীতে সেই আলোই অনির্বাণ ছিল। উনিশ শতক এই 'আলোকদর্শনে'র যুগ এবং সে যুগের সূচনা বাংলাদেশের মনীষায়। যুগচিত্তধর বিপিনচন্দ্র পাল এই আলোকদর্শনের ব্যাখ্যা করেই উনিশ শতকের নবজাগরণের চারটি মূল লক্ষণের উল্লেখ করেছিলেন। এরা হলো যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ, মানবতা এবং চিন্তা ও মননে স্বাধীনতা। শক্তিসাধক ও জাতীয়তার মন্ত্রবাহক সে যুগের বাঙ্গালী মনীষীদের জীবনকাহিনী এই আলোকদর্শনেরই সজীব ভাষা রচনা করেছে। স্বরাজ মূলত জন্মভূমির উপর স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকাশ করে; কিন্তু মুক্তি আত্মার ব্যাপার। সমস্ত জড়তাপাশ মোচন করে সক্রিয় উদ্দীপনা, চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে পরানুকরণের দীনতা মোচন করে জাতীয় মানস-শক্তির উপর আস্থা এবং ত্যাগ, সেবা ও প্রেমের মধ্য দিয়ে দেশ ও দেশবাসীকে প্রবুদ্ধচেতনা দান— একেই বলে আত্মিক মুক্তি। ভারতবর্ষ এই আত্মিক মুক্তি যদি লাভ করে, তবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এদেশে অলভ্য হবে না। কিন্তু তার আগে দেশের উপর বলিষ্ঠ সংকল্প নিয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দেশ সম্পর্কে অস্মিতাবোধ ও মমত্ববোধ না জাগালে দেশ আপনার হয় না। রবীন্দ্রনাথ একদা জানাইলেন যে, ভারত যে বৃটিশের অধীনে গেছে, তা বৃটিশের বাহুবল আছে বলে নয়, আমরা ভারতবাসীরা 'আত্মবল' হারিয়েছি বলে। উনিশ শতকের সাধনা তাই হয়েছিল কর্মে-চিন্তায়—অধ্যবসায়ে জাতির এই আত্মবলকে ফিরিয়ে আনার সাধনা। এই শতকের বাংলার মনীষিবৃন্দ জানতেন যে **স্বরাজিয়া সাধনা মহানিয়া সাধনা নয়।**

এই দৃষ্টি থেকেই শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বাগলের 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী' গ্রন্থের তাৎপর্য বুঝতে হবে। উনিশ শতকের ওই আলোকদর্শন—শ্রদ্ধেয় যোগেশবাবুর ভাষায় 'দেশ-জন-ধর্মের' সাধনা—কিভাবে মনীষী কর্মনায়ক বঙ্গসন্তানের জীবন থেকে শতরশ্মিতে বিচ্ছুরিত হয়েছে এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষের হতোদ্যম জীবনকে প্রাণরসে সঞ্জীবিত করে তুলেছে—সেই ইতিহাসই এ গ্রন্থে বারজন বঙ্গসন্তানের কর্মজীবনের আলোচনায় সজীব হয়ে উঠেছে। এ ইতিহাস বাঙ্গালীর গৌরবকেই সূচিত করে, এবং এ তার নিজস্ব ইতিহাস; অথচ এই মহাপুরুষদের সম্পর্কে বাঙ্গালী অল্পজ্ঞ। যোগেশচন্দ্র বাগল এই অল্পজ্ঞ 'আত্মবিস্মৃত' বাঙ্গালী পাঠকের কাছে তার জাতীয় জীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায় অপূর্ব নিষ্ঠার সংগে বিবৃত করেছেন। এ গ্রন্থপাঠে শুধু যে ইতিহাসের জ্ঞানেচ্ছাই তৃপ্ত হবে তা নয়, সেই সংগে আজকের হতোদ্যম নিষ্ক্রিয় এবং পরিচালনভ্রষ্ট বাঙ্গালী নতুন শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হওয়ারও সত্য লাভ করতে পারবে। রামগোপাল ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নবগোপাল মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ, অম্বিকাচরণ মজুমদার, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি স্বল্পজ্ঞাত ও স্বল্পস্তুত মুক্তিসন্ধানীদের ত্যাগ, দুঃখবরণ, অধ্যবসায়, শক্তিসাধনা ও একনিষ্ঠ কর্মতৎপরতা বাঙ্গালীর প্রাণে নতুন নির্মাণ-শক্তি (spirit of reconstructions) এনে দেবে। অল্প পরিচিত অথচ অসীম শক্তিসম্পন্ন এই সব মনীষীদের পরিচিত করিয়ে দিয়ে শ্রদ্ধেয় যোগেশবাবু বাঙ্গালীর অশেষ উপকার করলেন। লেখকের উদ্দেশ্যও তা-ই। তিনি গ্রন্থের 'নিবেদনে' নিজেই বলেছেন, 'বহুস্তুত মুক্তিসন্ধানীদের মর্মগাথা আলোচনা করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়।'

যোগেশবাবুর রচনাভঙ্গি প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণে উজ্জ্বল। তিনি যে বারোজন দেশপ্রাণ ব্যক্তির সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাঁদের জীবনের বিস্তৃত বা সমগ্র পরিচয় লেখা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র উনিশ শতকের আলোকদর্শন জ্ঞানে কর্মে চিন্তায় তাঁরা যেভাবে প্রতিফলিত করেছেন, সেই বৃত্তান্তই এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এই যুগসত্যকে যোগেশবাবু প্রচুর তথ্যপুঞ্জের সাহায্যে পাঠকের কাছে জীবন্ত করে তুলেছেন। এই বারোটি প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের দৃষ্টি ও উদ্দেশ্য এক এবং অখণ্ড। সেই দিক থেকে কর্মপ্রচেষ্টা বারোজনের হলেও, আদর্শ একটিই এবং সে আদর্শ উনিশ শতকের মুক্তিকামনা। এ জাতীয় আলোচনার উদ্দেশ্য যুক্তিবিচার বা সমালোচনা নয় (কারণ মুক্তিসাধনার মূলে তাৎপর্য বিবিধ কর্মের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করাই এ গ্রন্থের লক্ষ্য) এবং যোগেশবাবু তা করেননি—করবার চেষ্টাও করেননি। শ্রদ্ধাশীল অনুরাগীর প্রাণটি যোগেশবাবুর আলোচনার পাতায় পাতায়। যোগেশবাবুর এই অনুরাগ ও মনস্বিতার উপর অধিকার নিয়ে দুটি কথা বলবো। প্রথমত, অম্বিকাচরণ মজুমদার সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল তাঁর এখানকার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তৃপ্ত হয়নি। যোগেশবাবুর কাছ থেকে উনিশ শতকের যুগসত্যের আলোকে অম্বিকাচরণকে আমরা আরো বিস্তৃতভাবে পেতে চাই। দ্বিতীয়ত, 'ভারতের মুক্তিসন্ধানী' গ্রন্থ আমাদের এতো বেশী আশান্বিত করেছে যে, বাংলা ভাষায় যেমন 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' রয়েছে, তেমনি 'মুক্তি-সাধক চরিতমালা' লেখা হলে বাঙ্গালী পাঠক যোগেশবাবুর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। **এ কাজ যোগেশবাবুই পারেন।**

বাঙালী পাঠকের সে ইচ্ছা আশা করি অপূর্ণ থাকবে না। ২৮১।৫৮

বাংলার নব্য সংস্কৃতি—যোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—১·৪০ নঃ পঃ।

তেইশটি সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক সভা-সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতির উপর ভিত্তি করে উনিশ শতকে বাংলাদেশে যে নব্যচিন্তা ও নবনির্মিতির সূচনা ও প্রসার হয়েছিল নব্বই পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত আলোচনায় শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র বাগল তার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরেছেন 'বাংলার নব্যসংস্কৃতি' পুস্তিকায়। উনিশ শতকে ঘরে-বাইরে, নারী ও পুরুষের মধ্যে যে প্রবল উদ্দীপনা ও কর্মতৎপরতা নানা আকারে দেখা দিয়েছিল—এই সভাসমিতিগুলি তারই সাক্ষ্য দেয়। যোগেশবাবু নিজস্ব তথ্য-পূর্ণ সহজ ভঙ্গিতে প্রত্যেকটি সভার অনুষ্ঠান-পত্র উল্লেখ করে এঁদের উদ্দেশ্যাবলীকে প্রাঞ্জল-ভাবে উপস্থিত করেছেন। তবে আলোচনাপদ্ধতি সম্পর্কে একটি বক্তব্য আছে। যোগেশবাবু এই নব্যসংস্কৃতির ব্যাখ্যা করার জন্যে শুধু সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সভারই আলোচনা করতে চেয়েছেন এবং রাজনৈতিক সভাসমিতিকে বাদ দিয়েছেন। কিন্তু উনিশ শতকের নব্যসংস্কৃতির আলোচনায় তা কি সম্ভব? সে যুগে সাহিত্য-সভাগুলিতেও সমাজতত্ত্ব ও রাজনীতির অনায়াস প্রবেশ ছিল, কারণ তা-ই ছিল স্বাভাবিক। এবং যোগেশবাবু যে সব সাহিত্যসভার উল্লেখ করেছেন, তাদের অল্পই রাজনীতি ও সমাজ-তত্ত্বকে আলোচনা ও অনুষ্ঠানপত্র থেকে বাদ দিতে পেরেছে। আমাদের মনে হয়, ঐ শ্রেণী ভাগটি না করলেই ভাল হতো। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, বাংলার জাতীয় সংস্কৃতি-নির্মিতিতে ছোট বড় নানা সভাসমিতির যে কতখানি অবদান, এই ছোট্ট পুস্তিকা পাঠে তা জানা যায়। শ্রদ্ধেয় যোগেশবাবু ধন্যবাদার্হ এইজন্যে যে, তিনি উনিশ শতকের সামান্য ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা থেকেও তার অপরিমিত গুরুত্বটি বাঙালী পাঠককে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যোগেশ-বাবুর এই দুখানি বই বাংলার সংস্কৃতির ইতি-হাস রচনায় উল্লেখযোগ্য সংযোজন সন্দেহ নাই। ২৮৮।৫৮

সাহিত্য-আলোচনা

ত্রয়ী—শশিভূষণ দাশগুপ্ত। প্রকাশক—মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—ছয় টাকা।

একাধারে পণ্ডিত সমালোচক ও সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিক হিসেবে শশিভূষণ দাশগুপ্তের নাম আজ সর্বজনস্বীকৃতি পেয়েছে। সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনে প্রকৃত শিক্ষারও দরকার, কেবলমাত্র পরীক্ষা পাশের জন্যই সাহিত্য শিক্ষার আয়োজন নয়। সুতরাং নানাভাবে মহৎ সাহিত্য ও মহৎ সাহিত্যিককে চিনতে না পারলে একজন শিক্ষিত মানুষ সত্যিকারের সৎপাঠক হতে পারেন না। সৎপাঠক হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হলে যে সমালোচনাগ্রন্থ পাঠের একান্ত প্রয়োজন শশিভূষণ দাশগুপ্তের অনেক বই-এর মতো 'ত্রয়ী'ও তাদের একটি—এবং বিশেষ একটি।

এই বৃহৎ সমালোচনায় লেখক বাল্মীকি ও কালিদাস এবং কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বস্তুত এ আলোচনার ভূমি ভারতীয় সাহিত্যের আদি থেকে অধুনাকাল পর্যন্ত বিস্তৃত। শুধু তাই নয়, প্রসঙ্গত লেখক তুলনামূলক বিচারে এমন সূক্ষ্ম তত্ত্বের আলোচনায় গিয়ে পৌঁছেছেন যে, কখনও কখনও তাঁর রচনা সাহিত্য দর্শনের সীমা অতিক্রম করেও ভিন্নতর চিন্তাভূমিতে প্রসারিত হয়ে গেছে।

সুতরাং সাহিত্যের ছাত্র বা সাহিত্যপাঠকের জন্যই নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আস্থাবান এমন শিক্ষিত প্রতিজনেরই এই সমালোচনা গ্রন্থটি পড়া উচিত। 'ত্রয়ী' পাঠকের শিক্ষাকে বিস্তৃত করে। ৪০৮।৫৮

অনুবাদ

ওল্ড কিউরিয়সিটি শপ—চার্লস ডিকেন্স। অনুবাদ শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়। এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—২·০০ নঃ পঃ।

আলোচ্য বইটি চার্লস ডিকেন্সের একটি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। বইটির স্বচ্ছন্দ ও সহজ অনুবাদ দেখে আমরা আনন্দিত হয়েছি। অবশ্য মূল বইয়ের সবটা এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হয়নি। বিশেষ করে যে-অংশ ছোটদের উপযোগী, সেই অংশ এখানে আছে। সেই সঙ্গে সংক্ষেপে আগের ও পরের ঘটনা বলে দিয়ে গল্পটি পরিপূর্ণ করা হয়েছে।

ছোট মেয়ে নেল্ ও তার দাদামশাইকে নিয়ে এই গল্প। এ সেই

ঠাকুরদা ও নাতি
সাঁঝ পেল কি কুড়িয়ে পথে
প্রভাতকে তার সাথী

কাহিনীর মতই। এখানেও প্রভাতের মত ফুল্ল ছোট্ট মেয়ে নেল্ এবং সন্ধ্যার মত ধূসর দাদা-মশাইটি—দু জনে চলেছে একত্রে জীবনের অজানা এক নূতন জগৎ জয় করার অভিযানে। পথে কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাদের। ঠিক চমকপ্রদ বলব না, বলব চিত্তচমৎকারী ঐ সব চরিত্র।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় শিশুসাহিত্যরচনায় ব্যাপৃত আছেন বহুদিন থেকে, তিনি তাদের মনস্তত্ত্ব জানেন; এইজন্যেই ডিকেন্সের বিরাট গ্রন্থটির সারাংশ নির্বাচনে এবং অনুবাদের ভাষা ব্যবহারে তাঁর কোনো অসুবিধে হয়নি। এবং সেইসঙ্গে বইটি পড়ে রস আহরণের বিশেষ সুবিধে হয়েছে ছোটদের। ১১।৫৯

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থ 'আলোকিত সমন্বয়'র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের মূল্য ২ টাকা। মুদ্রাকর প্রমাদবশত ১২ টাকা হইয়াছে।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

আলজিরিয়া—মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়।
ঘূর্ণি—উমানাথ ভট্টাচার্য।
রামায়ণ কথামৃত—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক।
আলোর আকাশ—সুশীলকুমার গুপ্ত।
ঝড় ও বিহঙ্গ—তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।
উৎকল তীর্থে—শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী।
আমার ফাঁসি হল—মনোজ বসু।
জনপদবধূ—শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
আকাশ মাটি (কল্পতরু সংকলন)—সম্পাদক অরুণকুমার গুহ ও নিখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
নাট্যাচার্য ও বর্তমান নাট্য প্রবাহ—শ্রীসুললিতমোহন গোস্বামী।
নতুন শ্রেণী—মিলোভান জিলাস।
উত্তরায়ণ—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
চলচ্চিন্তা—রাজশেখর বসু।
সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার—অপূর্বমণি দত্ত।
পঞ্চদশী (গল্প সংকলন)—নির্মল দত্ত।
দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা।

চন্দ্রশেখর

মিনার্ভায় "ডাক্তার শুভংকর"

জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত এবং পরিচালিত "ডাক্তার শুভংকর" নাটকখানি নিয়ে মিনার্ভা থিয়েটারের পুনরুদ্বোধন হয়েছে বিগত বড়দিনের সময়ে। দীর্ঘকাল বন্ধ থাকার পর মিনার্ভার এই পুনরায় দ্বারোদ্ঘাটন কিন্তু নাট্যরসিকদের মধ্যে নতুন উৎসাহ ও সাড়া নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়েছে নাটক নির্বাচনের অসফলতায়।

"ডাক্তার শুভংকর" এমন একখানি নাটক যার বিষয়বস্তুর অসংলগ্নতা মনকে পীড়িত করে। নাটকটিকে দুই অংকে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংককে নাট্যকার 'বাস্তব' বলে বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয়টিকে বলা হয়েছে 'কল্পনা'। বাস্তব ও কল্পনার এই এলোপাতাড়ি ব্যাপারের মধ্যে একটি সংহত কাহিনী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

নাটকের প্রথম অংক শুরু হয় ডাঃ শুভংকর ও তার স্ত্রী সুজাতার দাম্পত্য কলহ নিয়ে। এই কলহ ডাক্তারেরই সাজানো। স্ত্রী কোন কলেজে অধ্যাপনা করে, স্বামীর সেটা পছন্দ নয়। স্ত্রী চাকরি ছাড়তে চায় না বলে সে নিজেও ডাক্তারী করা ছেড়ে দিয়েছে। সুজাতা স্বামীর এই খামখেয়ালীর অর্থ বুঝতে পারে না। দিনে দিনে শুভংকরের শাসন বেড়েই চলে। এমন কি সে তার বিপত্নীক ভায়রাভাই মনোহরের সঙ্গে সুজাতার মেলামেশা নিয়েও কটু মন্তব্য শুরু করে দেয়। সুজাতার মন ক্রমে ক্রমেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অন্তরে তার স্বামীর প্রতি অনুরাগ; স্বামীর খামখেয়ালীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে তার বিরুদ্ধচারিণী হয়ে ওঠে। সুযোগ পেয়ে শুভংকর স্ত্রীকে বলে, বিবাহবিচ্ছেদের

প্রশংসমান প্রধান মন্ত্রীর অভিনন্দন গ্রহণ করছেন সুরকার হেমন্তকুমার রাষ্ট্রপতি ভবনে হেমন্ত-বেলা প্রোডাকসন্সের 'নীল আকাশের নীচে'র বিশেষ প্রদর্শনীর পর।

আইন যখন পাশ হয়ে গেছে তখন তো সে সহজেই মনোহরের গলায় মালা পরিয়ে দিতে পারে। সুজাতার কাছে অসহ্য হয় শুভংকরের এই ব্যবহার। চরম অভিমান থেকেই সে মনোহরের সঙ্গে বিয়ের দিন ঠিক করে ফেলে।

এমন সময় শুভংকরদের শ্রদ্ধাভাজন পারিবারিক বন্ধু ডাঃ নন্দী এসে মনোহরের আসল রূপ ফাঁস করে দেয়। নীতিভ্রষ্ট মনোহর সুজাতার দিদিকে বিয়ে করবার আগেই মানসী বলে একটি মেয়েকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করে এসেছে। শুধু তাই নয়, ডাঃ নন্দীর বোনকেও সে প্রতারণা করেছে। ফলে সুজাতা মনোহরকে অপমান করিয়ে তাড়িয়ে দেয়।

এদিকে ডাঃ নন্দী ও সুজাতার বাবা মনোহরকে বাধ্য করে মানসীকে বিয়ে করতে। সুজাতা মনোহরকে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করত না, বিয়ের আগে আত্মহত্যা করবার জন্য সে লুকিয়ে নিজের কাছে বিষ এনে রেখে দিয়েছিল। শুভংকরও জানত সুজাতার পক্ষে সম্ভব নয় মনোহরকে বিয়ে করা। শুভংকরের খেলা শেষ হয়; ওদের দাম্পত্য জীবনের ভিত আবার শক্তভাবে গড়ে ওঠে।

নাটকের দ্বিতীয় অংকের যবনিকা উঠেছে বিশ বৎসর পরে। শুভংকরের একমাত্র কৃতী পুত্র খোকা বিয়ের এক মাস পরেই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। সে বিয়ে করেছিল মনোহর ও মানসীর কন্যা মীরাকে। সুজাতা তখন প্রায় অন্ধ। কিন্তু শুভংকর সুজাতাকে বোঝাবার চেষ্টা করে খোকার মৃত্যু সংবাদ মিথ্যে। বিদেশ থেকে তার মৃত্যু সংবাদ বহন করে যে টেলিগ্রাম এসেছে তা মনোহরের সাজানো, শুভংকরের সঙ্গে মনোহরের নতুনভাবে শত্রুতা করার চেষ্টা।

এদিকে মনোহর চেষ্টা করে তার বিধবা মেয়ে মীরার আবার বিয়ে দেবার। শুভংকর তাদের একমাত্র অবলম্বন মীরা'কে ছেড়ে দিতে চায় না। মীরাও রাজী নয় অসহায় শ্বশুর-শাশুড়ীকে ছেড়ে যেতে। কুচক্রী মনোহরের মীরাকে জোর করে নিয়ে বিয়ে দেওয়ার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে মীরার প্রাক বিবাহিত জীবনের সাথী মুরারীকে দেখে শুভংকর ভাবে দৃষ্টিশক্তিহীনা সুজাতার কাছে তাকেই দাঁড় করানো যাবে বছর দুই পরে খোকা বিলেত থেকে ফিরে এসেছে বলে। এই দুঃসহ প্রস্তাব মীরা মেনে নেয় শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখ চেয়ে। মুরারী আগে থেকেই ভালবাসত মীরাকে, মীরারও এককালে ওর প্রতি দুর্বলতা ছিল। কিন্তু বিয়ের পর সে মুরারীর স্মৃতি মন থেকে একেবারেই মুছে ফেলতে পেরেছিল। শুভংকরের এই প্রস্তাব তাকে এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন করল। এই অংকের চরম মুহূর্তে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে সুজাতা শুভংকরের মিথ্যাচারের কথা জানতে পেরে ক্ষোভে, দুঃখে শোকে প্রাণত্যাগ করে: আর নিঃসীম বেদনার ভারে বৃদ্ধ শুভংকরও ভেঙে পড়ে।

'বাস্তব' ও 'কল্পনা'র সংমিশ্রণে এই হ'ল "ডাক্তার শুভঙ্কর" নাটকের আখ্যানবস্তু। 'বাস্তব' বলে যে অংকটিকে নাট্যকার অভিহিত করেছেন সেটাই হয়ে পড়েছে অতি মাত্রায় অবাস্তব। ডাঃ শুভঙ্কর কেন যে হঠাৎ সুজাতার সংগে অতিমাত্রায় দুর্ব্যবহার আরম্ভ করে দিল তার কারণটিকে বোধগম্য করে নাট্যকার উপস্থিত করতে পারেননি। আর তার পক্ষে সরাসরি স্ত্রীকে অন্যের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দেবার প্রস্তাবটিও একান্তভাবে মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ। এই অংকে শুভংকরের সংলাপের ধারাটিও সুরুচি সংগত নয়। কয়েকটি সংলাপ অবশ্য কৌতুকরসে সিঞ্চিত এবং প্রেক্ষাগৃহে হাস্যরোলের সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় অংক—যাকে বলা হয়েছে 'কল্পনা'—তা'ও কষ্টকল্পনারই নিদর্শন। মুরারীকে খোকা বলে সুজাতার কাছে উপস্থিত করার ব্যাপারটি কোন রকমেই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। যেমন বুদ্ধিগ্রাহ্য নয় শুভংকরের পক্ষে সদ্য বিধবা মীরার জীবনে মুরারীকে এনে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করা। আর সুজাতা মুরারীকে খোকা বলে ভুল করবে সেটা ভাবতে অবাক লাগে।

মোট কথা, নাট্যকারের কল্পনায় এমন অনেক কিছু এসে নাড়া দিয়ে গেছে যেগুলিকে তিনি একটি পূর্ণাংগ নাটকের সংহতরূপ দিতে সক্ষম হননি। নাটকের প্রথম অংকের সংগে দ্বিতীয় অংকের নাট্যসূত্র যেটুকু রয়েছে তা খুবই ক্ষীণ। দাম্পত্য জীবনের সুখ ও সার্থকতার ওপর মনস্তাত্ত্বিক আলোকসম্পাত ও একালের বিবাহ-বিচ্ছেদের হিড়িক নিয়ে ব্যংগরসের অবতারণা থেকে আরম্ভ করে একটি 'ভিলেন' চরিত্রের পরিকল্পনা, সদ্য বিধবার জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও এক আদর্শবাদীর চরিত্রাংকণ পর্যন্ত অনেক কিছুই এই দুই অংকের নাটকের কাঠামোটুকুতে সন্নিবেশিত করবার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। ফলে অসংলগ্ন কতকগুলি ঘটনার জংগলেরই সৃষ্টি হয়েছে শুধু, ঘটনার বাঁধনীতে সমৃদ্ধ কোন পরিপূর্ণ নাটকের রস থেকে দর্শকেরা বঞ্চিত হয়েছেন। নাট্যরূপদাতা নাটকের কোথাও পরিণত নাট্যমুহূর্ত গড়ে তুলতে পারেননি। সামগ্রিক আবেদনের দিক দিয়েও যে নাটকখানি ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ এর গঠনভংগী, যা অনেকটা বেতার নাট্যের মত। নাটকের পাত্র-পাত্রীদের সংলাপ আওড়ে যাওয়ার মধ্য দিয়েই শুধু কাহিনীকে বিস্তার করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এর ফলে মানসী, খোকা, ডাঃ নন্দীর বোন প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান চরিত্র সামনে হাজির না করালেও নাট্যকার দর্শক মনে তাদের অস্তিত্ব অনুভব করিয়ে দেবার কৃতিত্ব যেমনি অর্জন করেছেন, তেমনি সংলাপ-সর্বস্ব এই নাটকখানির গতিও মন্থর হয়ে এসেছে। ফলে মুখের বিবৃতিতে ঘটনার বিবরণ প্রকাশ দর্শকদের একখানি রসসমন্বিত নাটক উপভোগ করার বাসনাকে অতৃপ্ত রেখে দেয়।

তবে নাটকের বিশেষ আকর্ষণের দিক হ'ল নামভূমিকায় অসিতবরণের অভিনয়। প্রাণোচ্ছল অভিনয়ে তিনি দর্শকদের মনযোগকে মঞ্চের দিকে আবদ্ধ রেখে দেন। দ্বিতীয় অংকে পুত্র শোকাতুর হিসাবে তাঁর অভিব্যক্তি খুবই প্রশংসনীয়। সুজাতার চরিত্রে সীতা দেবীর অভিনয় চরিত্রানুগ: প্রথম অংকে তিনি বিশেষভাবেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর স্বাভাবিক অভিনয়ের জন্য। মীরার ও ডাঃ নন্দীর ভূমিকায় যথাক্রমে মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায় ও ঠাকুরদাস মিত্রের অভিনয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। নীতিভ্রষ্ট কুচক্রী মনোহরের চরিত্রটিকে বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বাভাবিক-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্যান্য চরিত্রে রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন চট্টোপাধ্যায়, গোপাল চট্টোপাধ্যায়, প্রীতিকণা দেবী, আভা মণ্ডল ও ম্যালকমের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। সুরারোপে সীতা দেবী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর গাওয়া দুটি গানই সুখশ্রাব্য।

দৃশ্যসজ্জা ও সামগ্রিক অংগশোভা খুব

উঁচুদরের না হলেও একেবারে অনুল্লেখ্য নয়।

"পথের পাঁচালী"

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মাঝে নতুন শিল্পসেতু

ইস্তাম্বুলে তুরস্ক-ভারত সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে সেখানকার হিল্টন হোটেলে বিশিষ্ট অতিথিবর্গের উপস্থিতিতে সত্যজিৎ রায়ের যুগান্তকারী চিত্র "পথের পাঁচালী"র একটি প্রদর্শনী সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ইস্তাম্বুলের বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা "হাভাডিসে"র ২৬শে ডিসেম্বরের সংখ্যায় আইকুট গোর্কি লিখিত একটি সুচিন্তিত ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখক "পথের পাঁচালী"র প্রদর্শনীকে একটি উল্লেখযোগ্য ও চিত্তাকর্ষক ঘটনা বলে অভিহিত করে ছবিখানি বিশ্বজয়ের যে নতুন ইতিহাস রচনা করেছে তাঁর প্রবন্ধে সেটুকু ব্যক্ত করেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁর নিম্নোক্ত মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : "হোটেলের অল্প-পরিসর স্থানে অনেক অসুবিধার মধ্যে ছবিখানি দেখানো হলেও আমরা ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের এই অক্ষয় কীর্তি দেখবার পরম আনন্দ পরিপূর্ণভাবে অনুভব করেছি। ছবির জগতে ভারতের স্থান অনেক উর্ধ্বে। আমাদের চলচ্চিত্ররুচিকে প্রভাবান্বিত করবার মত কোন ছবি এর আগে ভারত থেকে আসেনি। ভারতীয় চলচ্চিত্রকে আমরা এমন অকুণ্ঠ প্রশংসায় অভিষিক্ত করবার সুযোগ পাইনি, "পথের পাঁচালী" দেখবার পর যা সম্ভব হয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে এমনভাবে যে একটি শিল্পসেতু যুক্ত করেছে এবং প্রাচ্যে চলচ্চিত্র সংস্কৃতি যে এমনভাবে গড়ে উঠেছে তা আমাদের জানা ছিল না। "পথের পাঁচালী" নিঃসন্দেহে নতুন দিক-দর্শনের সম্ভাবনাকে প্রশস্ত করেছে। শিশুর অনাবিল স্নিগ্ধ হাসি যারা দেখতে ভালোবাসেন তাদের কাছে ছবিখানি পরম রমনীয় হয়ে ধরা দেবে। এই রূপ এর আগে আর কোন ছবিতে কোন ক্যামেরাই তুলে ধরতে পারেনি। দুঃখক্লিষ্ট না হয়েও এ ছবিতে দুঃখকে আমরা অনুভব করি, অন্ধকারের মধ্যে অন্তর-আলোকের সন্ধান পাই। উষার সূর্যকে এই ছবিতে দেখতে পাই না, কিন্তু তার আভায় আমাদের মন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সমস্ত দিক দিয়ে "পথের পাঁচালী" একখানি পরম মূল্যবান ছবি।

শিবাজী প্রোডাকসন্সের হিন্দী ছবি "অমর দীপ"-এর একটি নৃত্য-গীত-মুখর দৃশ্যে রাগিনী ও জনি ওয়াকার। ছবিখানি আগামী সপ্তাহে মুক্তিলাভ করবে।

এই ছবি দেখে আমরা ভারতবর্ষকে নিবিড় ভাবে ভালোবাসতে শিখেছি এবং সেখানকার সরলপ্রাণ শিশুদেরও।"

চিত্রালোচনা

এ হপ্তায়ও কোন বাংলা ছবি মুক্তি পাচ্ছে না। নতুন হিন্দী ছবির সংখ্যা দুটি—"মিলন" ও "রাইফেল গার্ল"।

এন সি ফিল্মসের "মিলন" মধ্যবিত্ত সমাজের হাসি-কান্নার চিত্র। নলিনী জয়ন্ত, অজিত, ডেজি ইরাণী, তেওয়ারী, নিশি, মারুতি ও হেলেনকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। কেদার কাপুর ছবিখানি পরিচালনা করেছেন।

পিপলস্ পিকচার্সের "রাইফেল গার্ল" সাধারণত যাকে "স্টাণ্ট" ছবি বলে সেই শ্রেণীর।

• • •

গত সোমবার রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের তৃতীয় ছবি "সখের চোর"-এর শুভ মহরৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অংশগুলিতে উত্তমকুমার, বাসবী নন্দী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল ও তরুণকুমার এ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছেন। পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়েছে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর ওপর—যিনি এই প্রতিষ্ঠানের আগের ছবি দু'খানিও (মুক্তিপ্রাপ্ত "যমালয়ে জীবন্ত মানুষ" ও মুক্তি-প্রতীক্ষিত "ভ্রান্তি") পরিচালনা করেছিলেন। "সখের চোর"-এর কাহিনীকার সুকু সেন এবং তাকে চিত্রনাট্যে রূপান্তরিত করেছেন জ্যোতির্ময় রায়।

• • •

শ্রীমতী পিকচার্সের পরবর্তী ছবি হবে শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত"-র প্রথম ভাগ অবলম্বনে। ছবিটির নাম রাখা হয়েছে "ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি"। ইন্দ্রনাথের ভূমিকায় সম্ভবত একজন নবাগত কিশোর অভিনেতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। "রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত" আরম্ভ করবার আগেই প্রযোজিকা কানন দেবী জানিয়েছিলেন যে, শ্রীকান্তর বাল্য জীবনের ঘটনা নিয়ে তিনি পরে ছবি তুলবেন। এতদিনে তাঁর সে
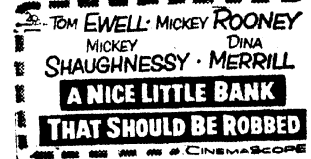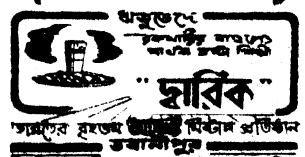
ডি-ল্যুক্সের আগামী নিবেদন "সাগর সংগমে"র একটি অবিস্মরণীয় মুহূর্তে ভারতী দেবী ও নবাগতা মঞ্জু অধিকারী। ছবি খানি পরিচালনা করেছেন দেবকী বসু।

সংকল্প কাজে পরিণত হতে চলেছে। আগের ছবিটির মতই হরিদাস ভট্টাচার্য এর চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

• • •

নিউ থিয়েটার্সের পূর্ণ গৌরবের দিনে যাঁরা প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম দেবকীকুমার বসু, রাইচাঁদ বড়াল ও অমর মল্লিক—এই তিন প্রতিভার নতুন করে সম্মেলন হয়েছে "সাগর সংগমে" ছবিটিতে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই সুখ্যাত গল্পটি এই তিনজনের মিলিত প্রতিভায় ছবির পর্দায় মর্মস্পর্শী রূপ নিয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। এর প্রধান দুটি ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ভারতী দেবী (ইনিও নিউ থিয়েটার্সের আবিষ্কার) ও নবাগতা বালিকাশিল্পী মঞ্জু অধিকারী। দুজনকার অভিনয়ই শুধু হৃদয়গ্রাহী নয়, প্রাণরসে উচ্ছল যা চিরকালের মণিকোঠায় স্থান করে দেবে এই শিল্পীদ্বয়ের। দেবকীকুমারের পরিণত পরিচালনার পরিচয় বহন করে ও রাইচাঁদের সংগীত সমৃদ্ধ হয়ে অমর মল্লিকের প্রযোজনায় "সাগর সংগমে" ছবির পর্দায় আশু মুক্তির প্রতীক্ষা করছে।

• • •

যমালয়ে জীবন্ত মানুষকে নিয়ে গেলে কি কাণ্ড ঘটে চিত্ররসিকরা আগেই তা প্রত্যক্ষ করেছেন একখানি ছবিতে। এবার হাসবার পালা মর্তের মর্ত্যে আগমনে। ছবিখানির নামও তাই "মর্তের মর্ত্যে আগমন" তুলছেন নবগঠিত মিরাকল্‌স্ ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড। পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে ছবিখানির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আগের ছবিটির মত এরও শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করছেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাসবী নন্দী। অন্যান্য চরিত্রে আছেন ছবি বিশ্বাস, তপতী ঘোষ, তুলসী চক্রবর্তী, জহর গাঙ্গুলী, হরিধন, জহর রায় প্রভৃতি।

• • •

এভারেস্ট সিনে কর্পোরেশনের প্রথম ছবি "চলাচল" এই প্রতিষ্ঠানটির যশের পথ যেমন সুপ্রশস্ত করে দেয়, তেমনি নবীন পরিচালক অসিত সেনকেও বিখ্যাত করে তোলে। শশধর মুখোপাধ্যায়ের নবগঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠান ফিল্মালয় এই বাংলা ছবিটিকে হিন্দীতে রূপান্তরিত করবার সংকল্প গ্রহণ করেছে। অসিত সেনই ছবিটি পরিচালনা করবেন। নায়িকার ভূমিকায় সুচিত্রা সেন নির্বাচিত হয়েছেন।

হাসির ছবিতে ফাঁসির দায়

হিন্দী ছবির নির্মাতারা ক্রাইম-ঘেঁষা কাহিনীর এত অনুরাগী হয়ে উঠেছেন যে নিছক হাসির ছবিতেও অপরাধীর ছোঁয়াচ এড়িয়ে তাঁরা চলতে পারেন না। এর নবতম উদাহরণ মুভী স্টার্সের 'আখরী দাও।'

মহেশ কাউল পরিচালিত এই ছবির মূল উদ্দেশ্য যে হাস্যরস পরিবেশন করা তা এর আকৃতি ও প্রকৃতি দেখে বুঝতে দেরী লাগে না। কিন্তু গল্প এগুবার সংগে সংগে এর প্রধান চরিত্রগুলিকে এমন একটি নাইটক্লাবে এনে হাজির করা হয়েছে, যেখানে জুয়াখেলা থেকে শুরু করে খুন-জখম, নারীহরণ ইত্যাদি সব রকমের অবৈধ ব্যাপার সংঘটিত হয়। ফলে গল্পের রস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে কমেডি ও ক্রাইম ড্রামার দোটানায়।

গল্পের নায়ক রাজু একজন মোটর

মেকানিক। নাইটক্লাবের যিনি মালিক তাঁর প্রকাণ্ড মোটরগাড়ীটা তাদের কারখানায় সারাতে এসেছে। রাজুর এক বন্ধুর লণ্ড্রী আছে। সুতরাং বড় গাড়ী ও দামী সুটের সহায়তায় শীলা নামে একটি মেয়ের মাথা ঘুরিয়ে দিতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। কিন্তু গোল বাধল যখন তাকে এই নকল ভূমিকার জের টেনে যেতে হল প্রেমিকার কাছে নিজের মানরক্ষা করতে গিয়ে। ফলে একটার পর আর একটা—এবং তার পরে আরো একটা—এমনিভাবে নানা হাস্যোদ্দীপক পরিস্থিতির মধ্যে তার নাকালের একশেষ!

শীলার ঘাড়ের ওপর দেনার মস্ত বোঝা। সেটা হাল্কা করতে রাজু জুয়া খেলতে গেল নাইটক্লাবে। দরকার মত টাকাও সে জুয়াতে জিতল, কিন্তু কুচক্রীদের চক্রান্তে টাকা নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারল না সে। এদিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধার শোধ করতে না পারলে শীলার সমূহ বিপদ। রাজু মরিয়া হয়ে ট্রেনে এক সহযাত্রীর পকেট মারল। সে জানত না যে ট্রেনের যাত্রীটি শীলারই বাবা, গহনাপত্র বন্ধক রেখে তিনি তাকেই বাঁচাতে চলেছেন। ভাগ্যচক্রে আর একজন পকেটমার রাজুর পকেট থেকে টাকাটি নিজের আত্মসাৎ করল হাতসাফাইয়ের কৌশলে।

এদিকে রাজু যার সঙ্গে নাইটক্লাবে জুয়া খেলতে ঢুকেছিল, সে সেই রাত্রেই খুন হয়েছে। পুলিশ রাজুকে খুঁজে বেড়াচ্ছে হত্যাকারী সন্দেহে। রাজুর বাঁচবার উপায় —সে যদি প্রমাণ করতে পারে নাইটক্লাবে যখন খুন হয়েছে তখন সে সেখানে ছিল না, ট্রেনের কামরায় তখন সে একজন সহযাত্রীর পকেট মারছে! ট্রেনের সেই কামরাতেই একজন আর্টিস্ট রাজুর অপকার্য লক্ষ্য করেছিল। পুলিস যাতে পকেটমারকে সনাক্ত করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে আর্টিস্ট রাজুর একটি স্কেচ (মন থেকে) এঁকে শীলার বাবাকে দিল। তিনি সেই স্কেচ মেয়েকে দিলেন থানায় দিয়ে আসবার জন্যে। স্কেচ দেখে রাজুকে চিনতে শীলার ভুল হল না। যাতে পুলিশ তাকে চিনতে না পারে সেই জন্যে শীলা ছবির মুখে দাড়ি-গোঁফ এঁকে রাজুর ভোল পাল্টে দিল। তার তখনও বিশ্বাস, রাজু সত্যিকার এক-জন সম্ভ্রান্ত ও সৎ লোক।

শীলার জন্যে টাকা সংগ্রহ করতে তখনও রাজুর চেষ্টার বিরাম নেই। এক ভদ্রলোকের স্থূলাঙ্গী মেয়েকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতিতে সে অগ্রিম পণ হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করল। ঠিক সেই সময়ে পুলিসও তাকে গ্রেপ্তার করল খুনের পলাতক আসামী হিসাবে।

তারপর কেমন করে এক বন্ধুর চেষ্টায় রাজু হত্যাপরাধ থেকে নিষ্কৃতি পেল এবং চুরির অভিযোগে দুমাস কারাবাসের পর বাইরে বেরিয়ে পেল শীলার বরমাল্য, তাই নিয়ে ছবির শেষাংশ। কিন্তু তখনও রাজুর দুর্ভোগের শেষ হয় নি। যে স্থূলাঙ্গী কন্যাকে বিয়ে করবার প্রতিশ্রুতিতে সে পণ গ্রহণ করেছিল, তাকে বিয়ে করতে রাজুকে একরকম বাধ্য করা হল। তারপর মিলনান্তক নাটকের প্রচলিত প্রথা অনুসারী শেষ মুহূর্তে এক আকস্মিক বিস্ময়ের মধ্যে সর্বসমস্যার সমাধান ও নায়ক-নায়িকার মধুর মিলন।

ছবিটির আগাগোড়া হাসির সঙ্গে সাসপেন্সের এমনিধারা সংমিশ্রণ। দেখতে মজা লাগে, তবে তাতে মন ভরে না। বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে নি কোন চরিত্র বা ঘটনা। সবটাই মনে হয় একান্তভাবে সাজান ব্যাপার। কেবল হাসির ছবি হিসাবে একে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু ক্রাইম ড্রামার ছাঁচে গড়তে গিয়ে এর রসহানি হয়েছে।

মহেশ কাউলের নাম সংবেদনশীল ছবির পরিচালক হিসাবে। এ ছবিতে তাঁর খ্যাতির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে নি। তবে ছবিতে গল্প দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার কৃতিত্ব তাঁর।

অভিনয়ের ব্যাপারে ছবিটিতে মণি-কাঞ্চন সংযোগ হয়েছে বলা চলে। রাজুর ভূমিকায় নেমেছেন শেখর, তাঁর দয়িতার চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন নূতন এবং রাজুর বন্ধু সেজেছেন জনি ওয়াকার। তিন জনের অভিনয়ই অনিন্দনীয়। রঙ্গাভিনয়ে শেখরের এটি প্রথম প্রচেষ্টা হলেও জনি ওয়াকারের মত ওস্তাদ-কমিকের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়েছেন তিনি—এটা কম গৌরবের বিষয় নয়।

নাইটক্লাবের মালিকই গল্পের ভিলেন বা খলনায়ক। এই চরিত্রে কমল কাপুরের

অভিনয় যথাযথ। অন্যান্য ভূমিকায় শাম্মী, শুভা খোটে, জীবন, নাজির হোসেন ও মিনু মমতাজ যথোচিত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

ছবিখানির আলোকচিত্র ও অন্যান্য টেকনিক্যাল কাজ বেশ পরিচ্ছন্ন। মদন-মোহনের সুর মামুলি ধরনের। তবে কয়েকখানি গান শুনতে ভাল লাগে।

বিবিধ সংবাদ

গত শনিবার দিল্লীর রাষ্ট্রপতি ভবনে 'নীল আকাশের নীচে'র একটি বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন, প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী ও অন্যান্য বিশিষ্ট অভ্যাগত এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। ছবিটি দেখবার পর শ্রী নেহরু ও অন্যান্য বিশিষ্ট অভ্যাগত ছবির যুগ্ম প্রযোজক হেমন্তকুমার ও বেলা মুখোপাধ্যায়কে তাঁদের অভিনন্দন জানান। ছবির পরিচালক মৃণাল সেনও প্রযোজকদ্বয়ের সংগে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। 'নীল আকাশের নীচে' ফেব্রুয়ারীর গোড়াতেই কলকাতায় মুক্তিলাভ করবে।

• • •

হলিউডের যশস্বী অভিনেতা জেমস স্টুয়ার্ট আসামের জংগলে বাঘ শিকার করতে সম্প্রতি এদেশে এসেছেন। তাঁর সংগে এসেছেন তাঁর স্ত্রী গ্লোরিয়া স্টুয়ার্ট এবং শিকারী-বন্ধু কার্ট জনসন। কলকাতায় দু' রাত্তির কাটিয়ে তাঁরা জংগলের পথে পা বাড়িয়েছেন। এখানকার সাংবাদিকদের কাছে আমেরিকার এই বিখ্যাত চিত্রতারকা স্বীকার করেছেন যে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কিছু জানাশোনা নেই। এমন কি যে 'পথের পাঁচালী'র বন্দনায় আজ সারা বিশ্ব (আমেরিকাও বাদ যায়নি) মুখরিত, তার নাম পর্যন্ত তিনি শোনেননি। পাঁচ হপ্তার ছুটি পেয়ে তিনি ভারত ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তার তিন হপ্তা কাটবে আসামের জংগলে। বাকী সময়টায় এখানকার ফিল্ম কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করবার তাঁর বাসনা আছে।

শোক সংবাদ

বাঙলার প্রবীণতম পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৮ই জানুয়ারী একাত্তর বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ম্যাডান থিয়েটার্স লিমিটেডের প্রযোজনায় তোলা প্রথম নির্বাক ছবি 'বিল্বমঙ্গল' থেকে শুরু করে নির্বাক ও সবাক চিত্র মিলিয়ে তিনি প্রায় ৮০খানি ছবি পরিচালনা করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি এদেশে—এবং সম্ভবত সারা পৃথিবীতে—অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁরই পরিচালিত ছবিতে কানন দেবী, ধীরাজ ভট্টাচার্য প্রমুখ বহু বিখ্যাত চিত্রশিল্পী তাঁদের অভিনেতৃ জীবন শুরু করেন। জ্যোতিষবাবু নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর বিধবা পত্নী বর্তমান।

গত ১২ই জানুয়ারী যশস্বী চিত্র পরিচালক ও আলোকচিত্রশিল্পী অজয় করের পিতৃবিয়োগ হয়েছে। তাঁর পিতা প্রমোদ কর একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর ৮১ বৎসর বয়স হয়েছিল।

প্রখ্যাত চিত্র-সাংবাদিক গিরীন্দ্র সিংহের (শ্রীঅরূপ) পিতা ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ এম ডি (আমেরিকা) গত ১৭ই জানুয়ারী ৭১ বৎসর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ডাঃ সিংহ বাঙলার একজন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং একাদিক্রমে কুড়ি বছর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিন্সিপ্যাল ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের জেনারেল কাউন্সিল এণ্ড স্টেট ফ্যাকাল্টির প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন।

আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারদের আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি।

একলব্য

পাকিস্থানের কীর্তিমান ওপেনিং ব্যাটসম্যান হানিফ মহম্মদ ব্যক্তিগত রানের এক নতুন রেকর্ড করেছেন। করাচীতে করাচী ও ভাওয়ালপুর রাজ্যের মধ্যে কায়েদে আজম ট্রফি খেলায় গতবারের বিজয়ী ভাওয়ালপুরের বিরুদ্ধে হানিফ ৪৯৯ রান করে ম্লান করে দিয়েছেন প্রথম শ্রেণীর খেলায় স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ব্যক্তিগত রানের বিশ্ব রেকর্ড। প্রায় ৩০ বছর আগে নিউ সাউথ ওয়েলস ও কুইন্সল্যান্ডের খেলায় নিউসাউথ ওয়েলসের পক্ষে নট আউট থাকার কৃতিত্ব সমেত ব্র্যাডম্যান ৪৫২ রান করেছিলেন। প্রথম শ্রেণীর খেলায় এই রানই এতদিন ব্যক্তিগত রানের বিশ্ব রেকর্ড ছিল। হানিফ এই রেকর্ড ম্লান করে দিয়ে দেশ বিদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের অভিনন্দনের পাত্র হয়েছেন। অভিনন্দন লাভও করেছেন বিশ্ববন্দিত খেলোয়াড় ব্র্যাডম্যানের কাছ থেকে। কায়েদে আজম ট্রফির খেলা ভারতের রণজি ট্রফির অনুরূপ প্রতিযোগিতা। সুতরাং হানিফের এ রেকর্ড বিশ্ব রেকর্ডের মর্যাদা লাভ করবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ক্রিকেট খেলায় হানিফের কীর্তির কথা কারো অজানা নেই। বিশ্ব রেকর্ড করার কৃতিত্বও তার এই প্রথম নয়। টেস্ট খেলায় দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাট করার কৃতিত্বেও তিনি বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী। গত বছর জানুয়ারী মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রিজ টাউন মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলায় হানিফ দীর্ঘ ১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ধরে অসীম দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করে ৩৩৭ রান করেছিলেন। টেস্ট খেলায় আজ পর্যন্ত কোন দেশের কোন খেলোয়াড়ই এত দীর্ঘ সময় ব্যাট ধরে টিকে থাকতে পারেননি। টেস্ট খেলায় বেশী রান করার দিক দিয়েও হানিফের স্থান তৃতীয়। গারফিল্ড সোবার্স ও লেন হাটনের পরে।

সাধারণ ধরনের ক্রিকেট বা প্রীতি ক্রিকেট খেলায় অনেক বেশী রান করবার নজির থাকলেও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ৪০০-র বেশী রান করা বিশ্বের বেশী খেলোয়াড়ের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পঞ্চম খেলোয়াড় হিসাবে হানিফ এই কৃতিত্ব লাভ করেছেন। আর যে ৪জন ৪০০র বেশী রান করেছেন, তারা হচ্ছেন ডন ব্র্যাডম্যান (৪৫২ নট আউট, নিউ সাউথ ওয়েলস : কুইন্সল্যান্ড), বি বি নিম্বলকার (৪৪৩ নট আউট, মহারাষ্ট্র: পশ্চিম ভারত রাজ্য) বিল পনসফোর্ড (৪৩৭; ভিক্টোরিয়া : কুইন্সল্যান্ড এবং ৪২৯: ভিক্টোরিয়া : টাসম্যানিয়া) এবং আর্চি ম্যাকলারেন (৪২৪; ল্যাংকাশায়ার : সামারসেট)। ক্রিকেট ইতিহাসের রেকর্ডের মধ্যে সাধারণ খেলায় সবচেয়ে বেশী রান করার কৃতিত্ব রয়েছে ইংলণ্ডের এ ই জে কলিন্সের। ১৮৯৯ সালে ক্লিফ্টো কলেজে একটি জুনিয়ার খেলায় কলিন্স প্রায় পাঁচদিন উইকেটে টিকে থেকে ৬২৮ রান করেছিলেন।

হানিফ মহম্মদের ৪৯৯ রান করতে এবার ১০ ঘণ্টা ১৩ মিনিট সময় লেগেছে। এর মধ্যে একবারও তিনি ভুল করেননি। নিপুণ হাতে ক্রিকেটের ব্যাকরণসম্মত খেলায় তিনি রান সংগ্রহ করেছেন।
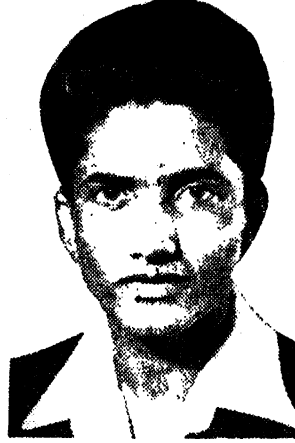
পাকিস্থানের কীর্তিমান ব্যাটসম্যান হানিফ মহম্মদ। হানিফ সম্প্রতি প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ৪৯৯ রান করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন

• • •

পাকিস্থানের ক্রিকেট খেলা প্রসঙ্গে একটি কথা বার বারই মনে আসছে। খেলাধুলায় বিশেষ করে ক্রিকেট খেলায় পাকিস্থান যথেষ্ট উন্নতি করেছে। ব্যাটসম্যান এবং বোলার হিসাবে অনেকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইংলণ্ডের মাটিতে টেস্ট খেলায় শক্তিশালী ইংলণ্ডকেও পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে পাকিস্থানের কাছে। কিন্তু সম্প্রতি ক্রিকেট নিয়ে পাকিস্থানে যে ঘরোয়া গোলমাল দানা বেঁধে উঠেছে, তাতে খেলার বৈশিষ্ট্য থাকবে তো? ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাজনীতি ঢুকলে তার ফল বড় বিষময় হয়। ভারত হাড়ে হাড়ে তার প্রমাণ পাচ্ছে। ক্ষমতার লোভ এবং স্বার্থের সংঘাতে পাকিস্থানের ক্রিকেট পরিচালনার ক্ষেত্রেও কুটিল রাজনীতি প্রবেশ করেছে। যার ফলে খেলোয়াড় ও পরিচালকরা একে একে পদত্যাগপত্র দাখিল করছেন।

ভারত সফর শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের পাকিস্থান সফরের ব্যবস্থা পাকা হয়ে আছে। তার দিনও নিকটবর্তী। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে টেস্ট খেলবার জন্য পাকিস্থানের যেসব খেলোয়াড়কে প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হয়েছে, তার মধ্যে চৌকস খেলোয়াড় সুজাউদ্দিন ও ব্যাটসম্যান মাকসুদ আমেদের নাম নেই দেখে খ্যাতনামা খেলোয়াড় খান মহম্মদ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। খান মহম্মদ সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিয়ে বলেছেন পাকিস্থানের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক এবং বর্তমানে খেলোয়াড় নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান আব্দুল হাফিজ কারদার ব্যক্তিগত কারণে সুজাউদ্দিন ও মাকসুদকে দলভুক্ত করেননি। একই কারণে পাকিস্থান টেস্ট টীমের নির্বাচিত সহ-অধিনায়ক ইমতিয়াজ আমেদও পদত্যাগ করেছেন। কারদারের আচরণের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রেও যথেষ্ট বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত কারদারও নির্বাচক কমিটির সভাপতি পদে ইস্তফা দিয়ে পাকিস্থান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সদস্য পদেও ইস্তফা দিয়েছেন। আশা করা যায়, উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সালিশীর ফলে সব কিছুর একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হবে, পাকিস্থানও ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ভাল খেলবে। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাকিস্থান যদি তার ক্রিকেট সম্মান বজায় না রাখতে পারে, তবে বুঝতে হবে পাকিস্থানের ক্রিকেটেও 'ঘুণ' ধরেছে।

• • •

অস্ট্রেলিয়ায় ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম দুটি টেস্ট খেলায় পর পর জয়লাভ করবার পর সিডনী মাঠে দুই দেশের তৃতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া দল ব্রিসবেন মাঠের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডকে ৮ উইকেটে পরাজিত করে, মেলবোর্ন মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলাতেও অস্ট্রেলিয়া একই ফলাফলে পরাজিত করে ইংলণ্ডকে। সিডনী টেস্টেও অস্ট্রেলিয়া দল জয়লাভের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু কতকটা দুর্ভাগ্য এবং কতকটা ইংলণ্ড ব্যাটসম্যানদের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের ফলে জয়লাভ করতে পারেনি। দুর্ভাগ্য বলছি এই জন্য যে,

বৃষ্টির জন্য খেলার প্রায় একটা দিন মাটি হয়ে যায়। এই দিনে অস্ট্রেলিয়ারই ব্যাটিং করবার কথা ছিল। অবশ্য একে আবার সৌভাগ্যও বলা যেতে পারে। কারণ বেশী বৃষ্টি না হয়ে অল্প ভিজে মাঠ যদি খেলার উপযোগী থাকত, তবে সেই অবস্থায় ব্যাট করলে অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যা অতিক্রম করতে পারত কি না সন্দেহ। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে আরও সৌভাগ্যের কথা বৃষ্টির পরের দিনটি ছিল খেলার বিরতি দিবস। সুতরাং শুকিয়ে-ওঠা মাঠে অনুকূল পরিবেশের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া ব্যাটিং করবার সুযোগ পেয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার দুর্ভাগ্য এবং সৌভাগ্যের কথাই যখন বলছি, তখন এ কথাও বলা দরকার, নিতান্ত প্রয়োজনের সময় অস্ট্রেলিয়া তার পরম নির্ভরযোগ্য ফাস্ট বোলার আয়ান মেকিফের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। পঞ্চম দিনের খেলায় মাংসপেশীতে টান ধরায় মেকিফ বোলিং করতে পারেননি। যাই হক সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সংমিশ্রণে তৃতীয় টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের সুযোগ ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে বাকি টেস্ট খেলার আকর্ষণও জীইয়ে আছে।

তৃতীয় টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে বলেছেন 'অ্যাসেস' এবারও যে তাদের অধিকারে থাকবে, এবিষয়ে তিনি আস্থাশীল। এ বড় জোরের কথা। অ্যাসেস ইংলণ্ডের অধিকারে থাকবে একথা বলার অর্থ ইংলণ্ড বাকি দুটি খেলাতেই জয়লাভ করবে। বাকি দুটি খেলার একটি খেলায় অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী হলে তো কথাই নেই, কোন খেলা ড্র হলেও রাবার লাভ করে অ্যাসেস পুনরুদ্ধার করবে অস্ট্রেলিয়া। সুতরাং ইংলণ্ড খেলোয়াড়দের সামনে এখন অগ্নি পরীক্ষার সমতুল্য পরীক্ষা। কিছুটা মনোবলও সঞ্চয় করেছে ইংলণ্ড। দেখা যাক কি হয়!

তৃতীয় টেস্টের পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই এ টেস্টেও ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে টসে বিজয়ী হয়ে প্রথম ব্যাটিং করবার সুযোগ পান। কিন্তু এ টেস্টেও ইংলণ্ডের ব্যাটিংয়ের সূচনা ভাল হয় না। মাত্র ২৩ রানের মধ্যেই ওপনিং ব্যাটসম্যান ট্রেভর বেলী আর্থার মিল্টন আউট হয়ে যান। টম গ্রেভনি ও পিটার মের দৃঢ়তায় তৃতীয় উইকেটে ৬৮ রান যোগ হয়। ৯১ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট পড়ে। ৯৭ রানের মাথায় পড়ে চতুর্থ উইকেট। আর এক রান যোগ হলে পঞ্চম উইকেটও পড়ে যায়। আর সোয়েটম্যান যিনি এইবারই সর্বপ্রথম টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন, তিনি কলিন কাউড্রের সঙ্গে খেলে ষষ্ঠ উইকেটে ৩৪ রান সংগ্রহ করেন এবং নিজে ৩৬ রান করে নট আউট

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার তৃতীয় টেস্ট খেলায় একমাত্র সেঞ্চুরীর অধিকারী কলিন কাউড্রে

থাকেন। দিনের শেষে ইংলণ্ড দল সংগ্রহ করে ৬ উইকেটে ১৯০ রান। ইংলণ্ডের সোয়েটম্যানের মত অস্ট্রেলিয়ার কিথ স্লেটারও এই ম্যাচে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলেন। মিডিয়াম পেস ও অফ স্পিন বোলার স্লেটার প্রথম দিনে ৪০ রানে লাভ করেন ২টি উইকেট।

দ্বিতীয় দিন বৃষ্টির জন্য দুই দলের খেলোয়াড়দের অধিকাংশ সময় প্যাভিলিয়নে বসে থাকতে হয়। মাত্র শেষ ৭৫ মিনিটের খেলায় ইংলণ্ড দল বাকি ৪টি উইকেটে ২৯ রান যোগ করে ২১৯ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করার পর অস্ট্রেলিয়া কোন উইকেট না হারিয়ে ৩ রান সংগ্রহ করে। ভিজে মাঠে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি

ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে

বিনোড এইদিন মারাত্মকভাবে বোলিং করে মাত্র ৯টি বলের মধ্যে সোয়েটম্যান, লেকার ও ট্রুম্যানের উইকেট দখল করেন। অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডিং হয় খুবই প্রশংসনীয়। নীল হার্ভের একটি ক্যাচ মনে রাখবার মত।

একদিন বিরতির পর তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হলে ৮৭ রানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার তিনটি উইকেট পড়ে যায়। ৮৭ রান করতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা অতিবাহিত হয়। বাকি ২ ঘণ্টায় অস্ট্রেলিয়ার 'নতুন ব্রাডম্যান' নর্মান ওনীল ও লেস ফেভেল অসমাপ্ত চতুর্থ উইকেটে ৯৭ রান যোগ করে দুইজনই নট আউট থাকেন। ৩ উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার সংগৃহীত হয় ১৮৪ রান।

চতুর্থ দিন ৩৫৭ রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না হারিয়ে ইংলণ্ড ১ রান সংগ্রহ করে। ইংলণ্ডের দুই খ্যাতনামা স্পিন বোলার জিম লেকার ও টনি লকের মারাত্মক বোলিংয়ের ফলে চতুর্থ দিনের খেলার সূচনায় অল্প রানের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার আর তিনটি উইকেট পড়ে গিয়ে ৬ উইকেটে ২০৮ রান ওঠে। কিন্তু সপ্তম উইকেটে ন্যাটা ব্যাটসম্যান কেন ম্যাকে ও এলান ডেভিডসন দৃঢ়তার সঙ্গে অথচ নিপুণ হাতে মেরে খেলে ৩ ঘণ্টায় ১১৫ রান যোগ করেন। প্রথম ইনিংসের খেলায় অস্ট্রেলিয়া ১৩৮ রানে অগ্রগামী হওয়ায় খেলায় জয়লাভ সম্পর্কে ইংলণ্ডের যে ক্ষীণ আশা ছিল, তা লুপ্ত হয়ে যায়। এখন পরাজয়ের আশংকা।

পঞ্চম দিন মাত্র ৬৪ রানের মধ্যে ইংলণ্ডের বেলী, মিল্টন ও গ্রেভনি পর পর আউট হয়ে যাওয়ায় আশংকা প্রবল হয়ে ওঠে। বিপদের মুখে অনমনীয় মনোবল নিয়ে ব্যাটিং করতে থাকেন অধিনায়ক পিটার মে ও কলিন কাউড্রে। এ দিন আর কোনই উইকেট পড়ে না। সংগৃহীত হয় ৩ উইকেটে ১৭৮ রান। অস্ট্রেলিয়ার ন্যাটা ফাস্ট বোলার আয়ান মেকিফ তৃতীয় ওভারের বোলিংয়ের সময় মাংসপেশীর টানে কাতর হয়ে মাঠ পরিত্যাগ করেন।

পিটার মে ৬৩ এবং কাউড্রে ৫০ রান করে নট আউট থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের আশংকা শেষদিন কি হয়? অবস্থা বুঝে শেষদিন মে এবং কাউড্রেও দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করতে থাকেন। চতুর্থ উইকেটে ইংলণ্ডের দুই কীর্তিমান খেলোয়াড়ের সহযোগিতায় ১৮২ রান যোগ হবার পর ৯২ রানের মাথায় মে আউট হন। এর পর ৭ উইকেটে ২৪৭ রান উঠলে পরাজয়ের আশংকা নেই দেখে মে ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কাউড্রে ১০০ রান করে নট আউট থাকেন। জয়লাভের জন্য ১৫০

রানের প্রয়োজন এবং খেলার ১১০ মিনিট বাকি এই অবস্থায় অস্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করে। ২ উইকেটে হারিয়ে তারা ৫৪ রান করলে ৬ দিনব্যাপী টেস্ট খেলার উপর যবনিকা পড়ে। খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড—

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস—২১৯ (পিটার মে ৪২, আর সোয়েটম্যান ৪১, কলিন কাউড্রে ৩৪, টম গ্রেভনি ৩৩, টনি লক ২১; রিচি বিনোড ৮৩ রানে ৫ উইকেট, মেকীফ ৪০ রানে ২ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস—৩৫৭ (নর্মান ওনীল ৭৭, এলান ডেভিডসন ৭১, কেন ম্যাকে ৫৭, এল ফেভেল ৫৪, কলিন ম্যাকডোনাল্ড ৪০; জিম লেকার ১০৭ রানে ৫ উইকেট, টনি লক ১৩০ রানে ৪ উইকেট)।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস—(৭ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড) ২৮৭ (কলিন কাউড্রে নট আউট ১০০, পিটার মে ৯২, ট্রেভর বেলী ২৫, টম গ্রেভনি ২২; রিচি বিনোড ৯৪ রানে ৪ উইকেট, জিম বার্ক ২৬ রানে ২ উইকেট)।

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বিনোড

অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস—(২ উইকেট) ৫৪ (নীল হার্ভে নট আউট ১৮; জিম লেকার ১০ রানে ২ উইকেট)।

জাতীয় টেবল টেনিস

জাতীয় ও আন্তঃ রাজ্য টেবল টেনিস প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল এবার আমেদাবাদে। টেবল টেনিসে ভারতের শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের প্রতিযোগিতায় এবারও বোম্বাইয়ের সর্ববিষয়ে হয়েছে জয়জয়কার। আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করা ছাড়াও পুরুষদের সিংগলস ফাইন্যালে বোম্বাইয়ের খেলোয়াড় গোতম দেওয়ান তাঁর নিজ রাজ্যের খেলোয়াড় এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান সুধীর থ্যাকার্সেকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। এবার নিয়ে গোতম দেওয়ান উপর্যুপরি তিন বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে ভারতের টেবল টেনিস ক্ষেত্রে এক নতুন ঘটনার সৃষ্টি করেছেন। পুরুষদের সিংগলস ফাইন্যালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গোতম দেওয়ান এবং সুধীর থ্যাকার্সের খেলায় আগাগোড়াই টেবল টেনিসের উন্নত কলাচাতুর্য প্রত্যক্ষ করা যায় এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে পুরো পাঁচটি গেম খেলার পর দেওয়ান বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন। এখানে বলা যেতে পারে, দেওয়ান ও থ্যাকার্সে সেমি-ফাইনালেও বোম্বাইয়ের দুই খেলোয়াড় যোস ও ভোরাকে হারিয়ে ফাইন্যালে উঠেছিলেন। শুধু সিংগলসের সেমি-ফাইন্যালেই বোম্বাইয়ের ৪ জন খেলোয়াড় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। পুরুষদের ডাবলসের ফাইন্যালেও বোম্বাইয়ের ৪ জোড়া খেলোয়াড়কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যায় এবং শেষ পর্যন্ত দেওয়ান ও থ্যাকার্সে যতীন ব্যাস ও বি যোসকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন। বোম্বাইয়ের প্রাধান্যের এখানেই শেষ নয়। বালক বিভাগেরও চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন বোম্বাইয়ের এইচ বি ভকিল ফাইন্যালে হায়দরাবাদের আজমকে পরাজিত করে। বোম্বাইয়ের কুমারী জয় ডি'সুজাকে হারিয়ে মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন মহারাষ্ট্রের টেবল টেনিস পটিয়সী কুমারী মীনা পরান্ডে।

উপর্যুপরি তিন বছরের জাতীয় টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন গোতম দেওয়ান

জাতীয় প্রতিযোগিতায় ভারতের বহু-সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা প্রতিযোগী ছাড়া আন্তঃ রাজ্য প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে এবার ২০টি রাজ্য, মহিলা বিভাগে ১৫টি রাজ্য এবং বালক বিভাগে ১৮টি রাজ্য যোগ দিয়েছিল। নীচে জাতীয় প্রতিযোগিতার ফাইন্যালগুলির ফলাফল দেওয়া হল:—

পুরুষদের সিংগলস ফাইন্যাল—গোতম দেওয়ান (বোম্বাই) ১৯—২১, ২১—১৯, ২১—৮, ১১—২১ ও ২১—১৭ পয়েন্টে সুধীর থ্যাকার্সেকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইন্যাল—মীনা পরান্ডে (মহারাষ্ট্র) ২৫—২৩, ২১—১৬ ও ২৫—২৩ পয়েন্টে জয় ডি'সুজাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

বালকদের সিংগলস ফাইন্যাল—এইচ বি ভকিল (বোম্বাই) ২১—১১, ২১—১৮ ও ২১—১৬ পয়েন্টে এম আজমকে (হায়দরাবাদ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যাল—গোতম দেওয়ান ও সুধীর থ্যাকার্সে (বোম্বাই) ২১—১৯, ২১—১৭, ১৬—২১, ১৫—২১ ও ২১—১৪ পয়েন্টে যতীন ব্যাস ও বি যোসকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইন্যাল—কে নাগরাজ ও উষা সুন্দররাজ (মহীশূর) ১৪—২১, ২১—৪, ২১—১৭ ও ২১—১৪ পয়েন্টে সুধীর থ্যাকার্সে ও মীনা পরান্ডেকে পরাজিত করেন।
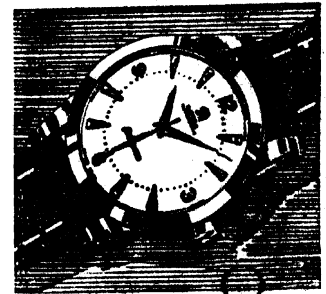
দেশী সংবাদ

১২ই জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গে কারেন্সী নোট জালের অপরাধ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। গত দুই দিনে পশ্চিমবঙ্গ গোয়েন্দা পুলিস নোট-জালকারী দুইটি দলকে ধরে। গত চার মাসে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে পুলিস নোট ও মুদ্রা জালকারী ছয়টি দলকে ধরে এবং এই সম্পর্কে আটজন স্ত্রীলোক সহ ৩১জনকে গ্রেপ্তার করে।

অদ্য সরকারী দপ্তর ভবনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত এক সাক্ষাৎকালে তিনি সাংবাদিকদিগকে জানান যে, গত কয়েকদিন যাবত কলিকাতায় চাউলের পাইকারগণ ক্রম-বর্ধমান পরিমাণে চাউল আমদানী করিতেছেন।

১৩ই জানুয়ারী—খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অদ্য সাংবাদিকগণকে বলেন, আগামী পনর দিনের মধ্যে উড়িষ্যা হইতে ছয় হাজার টন মিহি এবং অতিমিহি চাউল কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিতেছে। সরবরাহ ব্যবস্থার এরূপ উন্নতিতে শীঘ্রই সরকার বাঁধা দরে রাজ্যব্যাপী চাউল বিক্রয় হইতে পারিবে বলিয়া তিনি আশা রাখেন।

ভারতস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত শ্রীএলস্‌ওয়ার্থ বাঙ্কার অদ্য কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে মন্তব্য করেন, "যে-দেশই ভারতকে আক্রমণ করুক না কেন, আমেরিকা তাহার পক্ষ গ্রহণ করিবে না।" তিনি বলেন, "ভারতের প্রতি আমাদের মনোভাব অতি পরিষ্কার।"

১৪ই জানুয়ারী—কলিকাতা কর্পোরেশনের যে সকল কর্মচারী উক্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক হিসাব প্রস্তুত করার জন্য 'ওভার টাইম' এবং ছুটির দিন কাজ করেন, তাহাদের সাধারণত কত অতিরিক্ত ভাতা দিতে হয়, তাহা অনেকেই জানে না। এক সংবাদে প্রকাশ যে, একমাত্র গত ১৯৫৬-৫৭ সালের হিসাব প্রস্তুতির জন্য অ্যাসেসমেণ্ট, কলেকশন, ল' এবং অ্যাকাউণ্টস বিভাগের কর্মচারীদের অতিরিক্ত ভাতা বাবদ প্রায় এক লক্ষ টাকা ধার্য হইয়াছে।

সাগরসঙ্গমে মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে মন্ত্র ও স্তোত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তিন লক্ষাধিক নরনারী আজ পুণ্যস্নান করেন। গত বৎসরের তুলনায় এইবার যাত্রী সমাগম অনেক বেশী।

১৫ই জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ১৯৫৮ সালে গৃহীত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অসাধু উপায় গ্রহণের জন্য মোট ৩৪০ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তন্মধ্যে ২৬৮জন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী। ঐ সালের আগস্ট মাসে গৃহীত স্কুল ফাইন্যালের কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষায় যে ২২জনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তন্মধ্যে ২২জনই প্রাইভেট পরীক্ষার্থী।

গত কয়েক সপ্তাহে খাদ্য দপ্তরের পক্ষ হইতে অভিযান চালাইয়া কলিকাতা এলাকা হইতে লক্ষাধিক 'মালিকহীন' রেশন কার্ড আটক করা হয়।

১৬ই জানুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর বিশেষ সহকারী শ্রী এম ও মাথাইয়ের মাতার নামানুসারে অভিহিত একটি পাবলিক চ্যারি-

টেবল ট্রাস্টের বিরুদ্ধে এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে যে সমস্ত অভিযোগ করা হইয়াছে সেই সমস্ত অভিযোগের বিরুদ্ধে যাহাতে তিনি স্বাধীন-ভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারেন, তজ্জন্য ঐ পদ ত্যাগ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া শ্রী মাথাই প্রধানমন্ত্রীর নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছেন।

১৭ই জানুয়ারী—আজ রাষ্ট্রপতি ১৯২২ সালের ভারতীয় আয়কর আইন সংশোধন করিয়া একটি অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন। এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কয়েকটি হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় হইতে উদ্ভূত কিছু অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে অর্ডিন্যান্সটি জারি করা হইয়াছে।

শিলংএর সংবাদে প্রকাশ, আজ ভোর হইতে ভারতীয় এলাকা ভোলাবেটা, কারইগোরা ও লেনটার বিস্তৃত অঞ্চলে পাক সশস্ত্রবাহিনী আরও প্রচণ্ডভাবে গুলীবর্ষণ শুরু করিয়াছে।

১৮ই জানুয়ারী—যুগোস্লাভ প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো আজ হায়দরাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সভায় বলেন যে, ভারত ও যুগোস্লাভিয়া যাহাতে পরস্পরের সমৃদ্ধ, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সমসাময়িক কৃতিত্ব সম্বন্ধে আরও অধিক জানিতে পারে, তজ্জন্য সংস্কৃতিক ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা আবশ্যক।

১৯শে জানুয়ারী—গত ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারী শ্রীরামপুর টাউন হলে যে কথা-সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) ও শ্রীশিব-রাম চক্রবর্তীকে প্রথম দিন এবং দ্বিতীয় দিন তরুণ কথাসাহিত্যিক শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র ও শ্রীবিমল করকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সম্মেলনে প্রখ্যাত বহু সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন।

বিদেশী সংবাদ

১২ই জানুয়ারী—আজ করাচীতে পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, যত শীঘ্রই সম্ভব ভারতের সহিত সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইলে পাকিস্তান বিশেষ আনন্দিত হইবে। নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তৎসম্পর্কে তিনি উপরোক্ত মর্মে মন্তব্য করেন।

মস্কো বেতারে প্রকাশ, পৃথিবীর সকল স্থান হইতে হাজার হাজার লোক—তাহাদের বয়স ৬ হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে—স্বেচ্ছায় রাশিয়ার মহাকাশ যানের প্রথম আরোহী হইবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে।

১৩ই জানুয়ারী—বেলজিয়াম সরকার আজ বেলজিয়াম কঙ্গোকে "স্বীয় স্বাধীনতা নির্ধারণে সক্ষম এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র" হিসাবে গড়িয়া তোলার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ও 'ক্ষুদে' পার্লামেণ্ট গঠন করা হইবে।

ব্রাজিল দূতাবাস হইতে আজ রাত্রে ঘোষণা করা হয় যে, জেনারেল হামবার্তো দেল্গাদোকে ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়াছেন। জেনারেল দেলাদো গত বৎসর পর্তুগালের প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য নির্বাচনে দাঁড়াইয়া সালাজারের নিকট পরাজিত হন।

১৪ই জানুয়ারী—প্রকাশ, পাকিস্তান সরকার কোন পাকিস্তানী নাগরিক কর্তৃক পাকিস্তানে বসবাসকারী নহেন, এইরূপ কোন ব্যক্তি অথবা তাহার এজেণ্টকে (পাকিস্তানের নাগরিক হইলেও) কোন প্রকার অর্থ প্রদান বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতীয়দের প্রাপ্য লক্ষ লক্ষ বকেয়া টাকা পরিশোধ করিতেও পাকিস্তানীরা অসম্মতি জ্ঞাপন করিতেছে।

১৫ই জানুয়ারী—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইতেছেন, খ্যাতনামা সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের মতে আগামী একশত বৎসরের মধ্যে চন্দ্রলোক ভ্রমণ নিত্যকার ব্যাপার হইয়া উঠিবে। ক্যান্সার রোগ এখনকার বসন্ত রোগের চাইতে মারাত্মক কিছু বলিয়া গণ্য হইবে না এবং মানুষের পক্ষে দুই এক ঘণ্টার বেশী ঘুমের প্রয়োজন হইবে না।

সহকারী সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীমিকোয়ান গতকল্য রাত্রিতে নিউ ইয়র্কে এক ভোজসভায় সহস্রাধিক লোকের নিকট বলেন, মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায় সম্পর্কে সোভিয়েট ইউনিয়নে 'বহু সংশয়' রহিয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান আজ করাচীতে বলেন যে, পাকিস্তানে প্রতিনিধিমূলক নূতন সরকার গঠনে বৎসর দুয়েক সময় লাগিতে পারে।

১৬ই জানুয়ারী—আজ কায়রোতে ঘোষিত হইয়াছে যে, বৃটেন ও মিশর তাহাদের দুই বৎসর পূর্বের আর্থিক বিরোধের অবসান ঘটাইতে একমত হইয়াছে। অদ্য রাত্রিতে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আজ করাচীতে বলেন যে, বাগদাদ চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্র-গুলির নিকট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিশক্তি সামরিক চুক্তির যে পাকাপাকি খসড়া পেশ করিয়াছে, তাহাতে বহিরাক্রমণ সম্পর্কে পাকিস্তানের দাবী মানিয়া লওয়া হয় নাই। শুধু কম্যুনিস্ট নয়, ভারত ও আফগানিস্তান সমেত যে কোন রাষ্ট্রের যে কোন প্রকার আক্রমণের হাত হইতে রক্ষার জন্য পাকিস্তান পুরাপুরি গ্যারাণ্টি দাবী করিয়াছিল।

১৭ই জানুয়ারী—সোভিয়েট উপপ্রধান মন্ত্রী শ্রীআনাস্তাস মিকোয়ান আজ ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট আইসেন হাওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকার শেষে শ্রীমিকোয়ান সাংবাদিক-দের বলেন, আমরা সকলেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, মত-বিনিময়ের প্রয়োজন ছিল।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার — সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা
কলিকাতা বার্ষিক ২০, টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।
মফস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫, টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

॥ বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

২৬ বর্ষ

(প্রথম সংখ্যা হইতে ত্রয়োদশ সংখ্যা পর্যন্ত)

REG. NO. C. 2109

দেশ

৬ বর্ষ] শনিবার, ১৭ মাঘ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 31st January, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১৪

খেলায় হার-জিতে
কিছু আসে যায় না,
যদি খেলা সত্যি ভালো হয়,
আর চা এনে দেয়
উৎসাহ-উদ্দীপনা!

সূচীপত্র

কেশরী কুটীরাম প্রাইভেট লিঃ

রয়াপেটা, মাদ্রাজ—১৪

কলিকাতার ডিস্ট্রিবিউটরস ঃ

মেসার্স এস কুশলচাঁদ এণ্ড কোম্পানী,

১৬৭, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট,

কলিকাতা।

নোঙ্গর ⚓ চিহ্ন

নির্মিত

নব-তাল

নতুন ধরণের পিতলের তালা
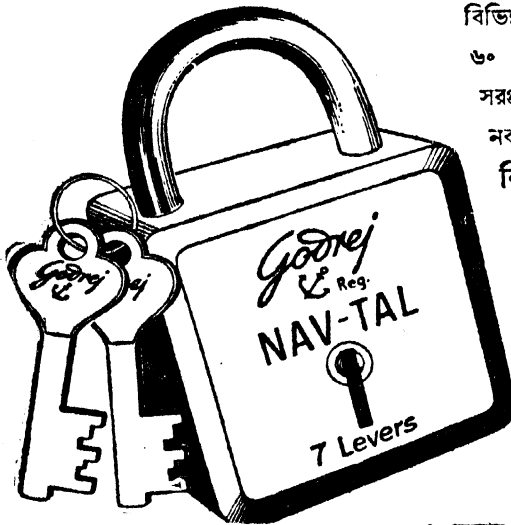
বিভিন্ন প্রকারের উন্নত তালা নির্মাণে ৬০ বছরের অভিজ্ঞতা প্রসূত, বিশিষ্ট সুক্ষ্ম সরঞ্জাম সম্বলিত মজবুত ও সুন্দর গোদরেজ নব-তাল তালা ভাঙ্গা অসম্ভব। একমাত্র **নিজস্ব** চাবীতেই এই তালা খোলা সম্ভব।

Godrej Reg.
NAV-TAL
7 Levers

★ পিতলের লেভার ও বহিরাবরণ

★ মজবুত করে তৈরী

★ রিভেট-হীন-যন্ত্রের চাপ সহযোগে সুক্ষ্মভাবে জোড়া

★ ক্যাডমিয়াম্ লাগান আংটা (জং নিরোধক আংটা)

৭ লেভার

মাপ—২॥"

৮ টাকা, **৫০** নয়া পয়সা মাত্র

নিরাপত্তা রক্ষার সরঞ্জাম নির্মাণে অগ্রণী

গোদরেজ শো-রুম, ষ্টকিস্ট, হার্ডওয়্যার দোকানে পাওয়া যায়...

সূচীপত্র

"যত আস্তে যাবে
—তত লোকসান"
বিমানে মাল পাঠান
— সঙ্গে সঙ্গে কাটতি হবে
সপ্তাহে ৭ বার লণ্ডনে বিমান যায়—পথে দামাস্কাস, বেইরুট, কায়রো, রোম, জেনিভা, জুরিখ, প্রাগ, ডুসেলডর্ফ ও প্যারিস ধরে।
আস্তে চলার দিন আর নেই — মন্থরগতি যানবাহনে মাল পাঠালে বাজার হাতছাড়া হবে। পশ্চিমের বড় বড় বাজারগুলি চটপট মাল পেতে চায়, তাই আজকের দিনে প্রবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে "বিমানে মাল পাঠালেই সবার আগে বাজার ধরা যায়!"
এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনালের বিমানে ক'রে আপনার মাল লণ্ডনে চালান দিন—কারণ সপ্তাহে অন্ততঃ সাতবার আমাদের বিমান লণ্ডনে যায়, মাল যাতে নষ্ট না হয় তার জন্যে আমরা অত্যন্ত যত্ন নিই! আর মনে রাখবেন, বিমানে ক'রে মাল চালান দিতে খরচ কম এবং ঝুঁকিও নেই বললেই চলে — এতে পয়সা বাঁচে, আয়ও বেশি হয়।
এয়ার-ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশনাল

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

LUX
For gentle washing of lovely clothes

DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 31st January, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৪ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৭ মাঘ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

রাজশেখর বসু

যোগ্যপাত্রে সম্মান জানাইলে সম্মানের মূল্য বাড়ে, নিজেকেও সম্মানিত করা হয়। বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনার জন্য আকাদেমি হইতে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর নামে এবারে পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে। পুরস্কারের মর্যাদা ইহাতে বাড়িয়াছে বলিয়াই আমরা মনে করি। সাহিত্য-আকাদেমির আপন সম্মানও ইহাতে বৃদ্ধি পাইবে। যে-পুরস্কার এ-দেশের সাহিত্যক্ষেত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার, বাংলা দেশের গুরুস্থানীয় লেখক রাজশেখর বসুর নামটিকে বহু পূর্বেই তাহার সহিত যুক্ত করা যাইত। দেরিতে হইলেও আকাদেমি যে এ-কাজ করিয়াছেন তজ্জন্য এই প্রতিষ্ঠান আমাদের ধন্যবাদার্হ হইলেন। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর সাহিত্যকৃতি অবশ্য আজ আর কোনও লৌকিক স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। দেশের শিক্ষিত সাহিত্যরসপিপাসু সমাজের অন্তরে অনেক আগে হইতেই এক গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার আসনে তিনি অধিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। তবু, নূতন করিয়া তাঁর এই আনুষ্ঠানিক সম্মান লাভের শুভমুহূর্তে আমরাও আজ আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে আমাদের বিনম্র অভিনন্দন জানাই।

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর নাম যে আজ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়, তাহার কারণ একাধিক। কারণটা শুধু ইহাই নহে যে, তিনি এক অগ্রণী সাহিত্যস্রষ্টা; অথবা শুধু ইহাও নহে যে নানা শাস্ত্রের পার তিনি দর্শন করিয়াছেন। বস্তুত, বিশেষ কোনও একটি ক্ষেত্রের চতুঃসীমার মধ্যে তাঁহার প্রতিভার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাইবে না। জীবনের নানা ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার প্রতিভার [illegible]-স্পর্শ রাখিয়াছেন যাহা-কিছু তিনি স্পর্শ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রতিভার প্রভায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কী কারণে দেশের নানা স্তরের মানুষের এত অকুণ্ঠ প্রীতি, এত গভীর শ্রদ্ধা তিনি লাভ করিয়াছেন, তাহা জানিতে হইলে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত তাঁহার কর্মকাণ্ডেরও সামগ্রিক পরিচয় লওয়া প্রয়োজন।

মূলত যাঁহারা সাহিত্যরসপিপাসু, রাজশেখর বসু সম্পর্কে তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা এই যে, তিনি এমন এক
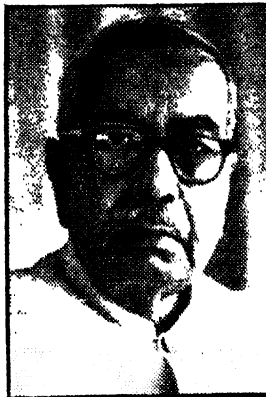
অগ্রণী সাহিত্যস্রষ্টা, যিনি কিনা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও আপন প্রতিভার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। আবার মূলত যাঁহারা বিজ্ঞানের ছাত্র, তাঁহাদের অনেকেই দেখি মনে করেন যে তিনি এমন এক অশেষবিৎ বিজ্ঞান-সাধক, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও যিনি কিনা কম দক্ষতা দেখান নাই। কোনও পক্ষের সম্পর্কেই এমন কথা বলিব না যে রাজশেখর বসুর পরিচয় তাঁহারা জানেন না। শুধু ইহাই বলিব যে, তাঁহার যে খণ্ড-পরিচয় তাঁহারা জানেন, সেই খণ্ড-পরিচয়ের ফুলগুলিকে ঠিকমত গাঁথিয়া তুলিতে পারিলেই রাজশেখর বসুর সামগ্রিক প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

রাজশেখর বসুর অন্যতম পরিচয় এই যে, সাম্প্রতিক কালের তিনি এক অগ্রগণ্য সাহিত্য-নায়ক। আবার সাহিত্যের আপন বিশাল পরিধির মধ্যেও তাঁহার একাধিক পরিচয় বর্তমান। প্রধান পরিচয় এই যে, তিনি এক অদ্বিতীয় রসস্রষ্টা। সাহিত্য-সরিতের যে মজিয়া-ওঠা শাখাটি উপযুক্ত প্রতিভার অভাবে কালক্রমে প্রায় শুকাইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে তিনি নূতন করিয়া আবার এক প্রবল জলধারা বহাইয়া দিলেন। জীবন-যুদ্ধে বিপর্যস্ত হইয়া আমরা যখন হাসিতে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তখন তিনি নূতন করিয়া আমাদের মুখে আবার হাসির আশীর্বাদ আঁকিয়া দিলেন। বাংলা দেশে এমন কোন্ পাঠক আছেন, পরশুরামের অবিস্মরণীয় চরিত্র গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়াকে যিনি চেনেন না? এমন কোন্ পাঠক আছেন, ভুশণ্ডীর মাঠের সেই কারিয়া পিরেতের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে গিয়া যিনি হাসিয়া খুন হন নাই?

প্রবন্ধের গদ্য এ-দেশে এখন শৈশব ও বাল্য অতিক্রম করিয়া যৌবনে উপনীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্বীকার করা ভাল যে, একটা স্ট্যাণ্ডার্ড গদ্য এখনও এ-দেশে গড়িয়া ওঠে নাই। বহু বিখ্যাত লেখকের গদ্য-রচনাতেও অদ্যাপি যে শৈলীর শৈথিল্য, ভাবোচ্ছ্বাসের প্রবলতা ও যুক্তিনিষ্ঠার অভাব দেখা যায়, তাহা গৌরবের বিষয় নহে। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর ভাবালুতাবর্জিত, যুক্তিনিষ্ঠ, স্পষ্টোচ্চার গদ্যকে আমরা আমাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের তাহাতে লাভ বই লোকসান হইবে না।

প্রসঙ্গত

৩০শে জানুয়ারী মহাত্মাজীর তিরোভাব তিথি; আবার সর্বোদয় দিবস। জাতির জনকের মৃত্যু দিনেই আমরা সর্বমানুষের সঞ্জীবনের সংকল্প গ্রহণ করি। তমসা থেকে জাতিকে জ্যোতি-তে পৌঁছে দিয়াছেন মহাত্মাজী, আপনি মৃত্যু থেকে অমৃতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। নির্ভয়, নির্মল প্রাণ জনমানসে চিরায়ত শুভ্রচ্ছটায় দীপ্যমান। মৃত্যু তাঁর কাছে পরাভূত, তিনিই মৃত্যুঞ্জয়।

অপরাধের শৃঙ্খলে, আপন বলির কাছে বাঁধা নতশির জাতির প্রশ্ন : "কে আমাদের পথ দেখাবে।" উত্তর-ও সে জানে—"আমরা যাকে মেরেছি, সেই দেখাবে।" সংশয়ে আমরা তাঁকে অস্বীকার করেছি, ক্রোধে তাঁকেই আমরা হনন করেছি, এখন তাঁকেই গ্রহণ করতে হবে প্রেমে। কেননা, মৃত্যুর দ্বারা তিনি আমাদের সকলের মধ্যে সঞ্জীবিত। তিনি মহা মৃত্যুঞ্জয়।

* * *

মৃত্যু সর্বদাই শোকাবহ, বিশেষত অকাল-মৃত্যু। আবার কাল পূর্ণ হলে যাঁরা গত হন, তাঁদের বিচ্ছেদের বেদনাও আমাদের মনে কম বাজে না। কেননা, কাল পূর্ণ হলেও অনেক সময় কাজ অপূর্ণ থাকে, বিয়োগ-ব্যথার সঙ্গে সেই ক্ষতির অনুভূতি যুক্ত হয়। আবার মৃত্যু যদি অপ্রত্যাশিত হয়, তবে পরিতাপের পরিসীমা থাকে না।

মাত্র একদিনের ব্যবধানে যে দু'জন মানুষকে আমরা হারিয়েছি তাঁদের কাছে আমাদের ঋণ সামান্য নয়। একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ অন্যজন ভারতের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও শিল্পপতি শ্রীবিঠল চন্দভারকর। জ্ঞানচন্দ্রের প্রাথমিক পরিচয় তিনি রাসায়নিক, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র যখন ভারতীয় রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করেন, তখন যে-কয়েকজন কৃতী ছাত্রের সহায়তা ও সাহায্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, জ্ঞানচন্দ্র ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। জ্ঞানচন্দ্রের উপরই আচার্য সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছিলেন। আর তাঁর আস্থা যে অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি তার নিঃসংশয় প্রমাণ জ্ঞানচন্দ্র দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যখন প্রথম পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের পত্তন হল, তখন দেখা গেল জ্ঞানচন্দ্র রসায়ন শাস্ত্রের লেকচারার নিযুক্ত হয়েছেন, যদিচ বয়সে তিনি একজন তরুণ ছাত্রেরই সমবয়সী। জ্ঞানচন্দ্রের তৎকালীন কিছু রচনা পাশ্চাত্ত্যের বৈজ্ঞানিকদের শুধু যে প্রশংসা পেয়েছিল তাই নয়, তাঁদের গবেষণারও সহায়ক হয়েছিল। ছাত্র জীবনের শুরু থেকেই জ্ঞানচন্দ্র অসাধারণ মেধার পরিচয় দিয়েছেন। রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি, পালিত স্কলারসিপ ডি এস সি উপাধি, এ সব সম্মানের কোনটিই তাঁর অলব্ধ ছিল না। উত্তর জীবনে তিনি ভারতের বিজ্ঞান-সাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বীকৃতি, জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করার গৌরবও অর্জন করেছিলেন। কর্মী জ্ঞানচন্দ্রকেও আমরা নিশ্চয়ই বিস্মৃত হব না। ঢাকা, বাঙ্গালোর, কলকাতা দিল্লী, খড়্গপুর, তাঁর কর্মনিষ্ঠার ও নৈপুণ্যের স্বাক্ষর সর্বত্র, সর্বত্র তিনি সমান সমাদর পেয়েছেন। জ্ঞানচন্দ্রের প্রেরণা ও পরিকল্পনা ব্যতিরেকে হিজলির বন্দীশিবির বিজ্ঞান মন্দিরে —ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে—হয়ত রূপান্তরিত হতে পারত না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন অল্পকালই। কিন্তু সেই অল্পকালও তাঁর গুণগ্রাহীদের স্মৃতিতে দীর্ঘায়ু হয়ে আছে। জাতীয় প্ল্যানিং কমিশনের অন্যতম বাঙালী সদস্য হিসাবে জ্ঞানচন্দ্রের কর্মযজ্ঞে পূর্ণাহুতি এখনও বাকি ছিল। জাতীয় উন্নয়ন সংকল্পকালে তাঁর তিরোভাবের ক্ষতি—সার্থক অন্য শব্দের অভাবে বহু-ব্যবহৃত শব্দটিই ব্যবহার করছি—অপূরণীয়।

শ্রীচন্দভারকরের মৃত্যুর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসীর এক ক্ষোভের স্মৃতি জড়িত হয়ে রইল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে চন্দভারকর নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সে নিমন্ত্রণে যোগ দিতে তাঁর বাধা হয়নি, অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি এসেছিলেন, কেননা আমাদের সাম্প্রতিক শিক্ষা সমস্যা সম্বন্ধে এই প্রবীণ শিক্ষাবিদের বলবার কথা ছিল। তাঁর বক্তব্য তিনি জানালেন, কিন্তু ঘরে ফেরা হল না। বোম্বাইয়ের এই শিক্ষাবিদের মনে বাঙালীদের জন্যে কোথায় যেন একটু মমত্ববোধ সঞ্চিত ছিল। তাঁকে আমরা বলতে শুনেছি "বাঙালীদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ পঁচাত্তর বছরের। বাংলায় এখনও আমার অনেক আত্মীয় রয়েছেন।" সমাবর্তন অনুষ্ঠানে দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ যে অভিমত তিনি সেদিন প্রকাশ করেছেন তা প্রণিধান যোগ্য। এতদিন আমরা জেনেছি অথবা শুনে এসেছি, শিক্ষায়তনে যাবতীয় বিশৃঙ্খলা এবং অশিষ্ট আচরণের সব দায় ছাত্রদের। কিন্তু চন্দভারকরই বোধহয় প্রথম এই ধারণার মূলে আঘাত করলেন। তিনি বলেছেন সব অপরাধ ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে লাভ নেই। এই অসঙ্গতির মূল খুঁজতে হবে অন্যত্র এবং খুঁজলে এটা আবিষ্কার করা হয়ত কঠিন হবে না যে, আমাদের পারিবারিক, সামাজিক জীবনে সংযমের যে অভাব ঘটেছে, ছাত্রদের মধ্যে তারই সংক্রমণ দেখতে পেয়ে আমরা আতঙ্কিত হয়েছি। এ রোগ দূর করতে হলে গৃহপরিবেশকেও নির্মল করতে হবে অর্থাৎ চ্যারিটির মত কিওর-ও "বিগিনস অ্যাট হোম।"

চুয়াত্তর বছরের দীর্ঘ জীবনে চন্দভারকর জীবিকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করেছেন। অধ্যাপনা থেকে ব্যারিস্টারী; বোম্বাইয়ের একজন শিল্পপতি হিসাবেও তাঁর খ্যাতি নগণ্য নয়। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র যে কোনদিনই ছিন্ন হয়নি, আমাদের শিক্ষা সংস্কারের প্রয়াস সম্পর্কেও যে তিনি সদা-সচেতন ছিলেন তার প্রমাণ সমাবর্তন উৎসবে তাঁর শেষ ভাষণ। অপ্রিয় সত্যভাষণের কুণ্ঠাহীনতার জন্য তাঁর এই "লাস্ট টেস্টামেণ্ট চিহ্নিত হয়ে রইল।"

অমৃতবাদ

মো. ক. গান্ধী
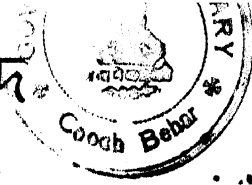
দৈনন্দিন জীবনে আমাদের পরস্পরের প্রতি আচরণ অহিংসা নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এ সত্য আমরা কখনও বুঝি সচেতনভাবে, কখনও আবার এ সম্পর্কে অচেতনই থেকে যাই।

আমি যে দেখেছি ধ্বংসের রুক্ষ দুই কূলের মধ্য দিয়ে জীবননদীর দুরাভিসার। তাই ত না মেনে পারি না যে ধ্বংসের, বিনাশের, মৃত্যুর নীতিই সব নয়। তাই নিঃসংশয়ে মানি এর চেয়ে মহত্তর নীতি বিদ্যমান।

আর শুধু সেই নীতির দ্বারা শাসিত সমাজই সার্থক। সেই নীতির দ্বারা পরিচালিত জীবনই নিরর্থক নয়।

একেই আমি বলি অমৃতবাদ। বলি জীবনের মহানীতি।

এই নীতিকেই রূপ দিতে হবে প্রতিদিনের ভাবনায় ও কর্মে। জীবন রচনার ছন্দে যখনই আসবে অমিলের অভাস, যখনই মুখোমুখি হতে হবে কোন প্রতিপক্ষের—তখনই সে অমিল দূর করার জন্য, সে প্রতিপক্ষকে জয় করে নেবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। আর তা করতে হবে এই মহানীতিরই সাহায্যে।

যত স্থূলভাবেই হোক না কেন, আমার জীবনে এই নীতির রূপায়নের জন্য চেষ্টা করেছি। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, সব সমস্যার সমাধান হয়েছে। কিন্তু এটুকু বুঝেছি যে, এই মহানীতি যেমন সাড়া জাগিয়েছে, ধ্বংসনীতি তেমনটি কখনই পারত না।

মানসস্তরে এই নীতি অবিচল রাখতে হলে বেশ কঠোর রকমের অভ্যাস এবং শিক্ষানবীশীর দরকার।

দৈনন্দিন জীবনযাপনেও এজন্য বেশ কিছুটা শৃঙ্খলাবোধের চর্চার প্রয়োজন। অনেকটা সৈনিকের জীবনের মতো। অবশ্য আমি স্বীকার করি যে, মনের ঠিক-ঠিক সহযোগিতা ব্যতীত এই নীতির বাহ্যিক আচরণ একপ্রকার বাতাবরণ মাত্র। সকলের পক্ষেই এটা ক্ষতিকর। কায়মনোবাক্যের সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ সহযোগিতার সাহায্যেই এই আচরণ নিখুঁত হতে পারে। কিন্তু সর্বদাই এজন্য তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব অনুভব

করতেই হবে।......আর এই দ্বন্দ্বে জয়ী হবার পর ব্রতী স্পষ্টই বোধ করবেন যে, পূর্বের চেয়ে তিনি অনেক বেশি শক্তিমান হয়েছেন। প্রেম বীরের অস্ত্র। দুর্বলের হাতে এ সহজেই ভণ্ডামির রূপ নেয়।

ভয় ও ভালবাসা বিপরীতার্থক শব্দ। ভালবাসা যা দেয়, হিসাব করে দেয় না। প্রতিদানের আশাও রাখে না। ভালবাসাকে যুঝতে হয় সারা পৃথিবীর সঙ্গে। নিজের সঙ্গেও। অন্য সব আবেগ, সব প্রবৃত্তির চেয়ে বড় ভালবাসা। সব কিছুর ওপর এর কর্তৃত্ব।

আমার আর আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন—আমাদের সকলের অভিজ্ঞতা এই যে, সত্যের নীতিকে, অহিংসার নীতিকে যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রক নীতি হিসেবে মেনে নিতে পারি বিনা শর্তে ও বিনা দ্বিধায়, তাহলে প্রতিটি সমস্যারই সমাধানের সন্ধান পাওয়া যাবে। কারণ, সত্য আর ভালবাসা (বা অহিংসা) এ দুই একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

মানুষ কি সচেতনভাবে মেনে নেবে ভালবাসার এই নীতি? জানি না। কিন্তু এ নিয়ে আমাদের বিচলিত হবার কিছু নেই। এ নীতি তার কাজ করে যাবে। কী এসে যায় মাধ্যাকর্ষণের নীতি যদি না মানি আমরা। সে নীতি চলছে তার কাজ করে। এও তেমনই। আর বিজ্ঞানী যেমন প্রাকৃতির নিয়মগুলি জেনে, তাদের অনুসরণ করে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারেন, ঠিক তেমনই বৈজ্ঞানিক-নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রয়োগ করলে এ-নীতির প্রয়োগকর্তাও অধিকতর বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারেন, কারণ প্রেমের শক্তি প্রাকৃতিক যে কোন শক্তির চেয়ে অনন্ত গুণ বেশি।

প্রেমের অমেয় শক্তির প্রথম সন্ধান যিনি দিয়েছেন, তিনি যে কোন আধুনিক বিজ্ঞানীর চেয়ে মহত্তর। শুধু আমরাই পারিনি আরও এগিয়ে যেতে, পারিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এর প্রয়োগ-পদ্ধতিকে নিখুঁত করতে, এ মহাশক্তিকে যথাযথ ব্যবহার করতে।

আর তাই ত এই শক্তির পূর্ণ লীলা অগোচর রয়ে গেল। তবু এই বিশ্বাস (হতে পারে মতিভ্রম) চিত্তে নিয়েই আমি কাজ করে চলেছি।

যতই চর্চা করছি এই অমৃতবাদ, ততই অনুভব করছি নিবিড় জীবনানন্দ, ততই বুঝেছি এই বিশ্ব এক বিরাট আনন্দ-নিকেতন। অন্তরে লাভ করছি গভীর শান্তির স্পর্শ। বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যের যবনিকা উন্মোচিত হচ্ছে ধীরে ধীরে। সে অনুভূতি অনির্বচনীয়॥

অনুবাদঃ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
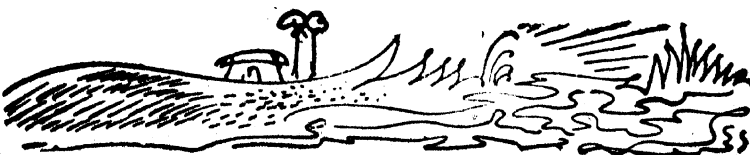
শিখা অনির্বাণ

গোবিন্দ চক্রবর্তী

নয় শুধু অনুর্বর প্রাণহীন মাটি,
দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত আর দুর্জয় প্রাকার,
গুহা-খাদে আরণ্যক গ্রন্থি-জটিলতা—

ইতিহাসে মানুষের যা-কিছু বারতা
সংগ্রহ-সঞ্চয়

শুধুই ঘৃণা ও হিংসা, লোভ বুঝি নয় :
আছে, আছে, আছে তার—আরো-কি অন্বয়
সূর্যশুচি নীলিমা যেমন।

অফুরন্ত শস্য-স্নেহ, স্বপ্ন আর সম্ভাবনাময়
এই নদী-উপত্যকা, মৃত্তিকা-আকাশ
হরিতে-শ্যামল স্নিগ্ধ অজুত আশ্বাস
তৃপ্তি, শান্তি, সুখ ঃ
অহরহ হৃদয়ের ব্যঞ্জনা-কৌতুক
সাগরের নিরন্তর কল্লোলের মত—
দেবতা সে না-ও যদি হয়,
এ সংকীর্ণ পুঁজিতেই—মাটির এ গ্রহ
হ'লেও ত' হ'তে পারে পূর্ণ দেবব্রত।

আকণ্ঠ নিমগ্ন পঙ্কে
কণ্টকিত বাঁচার প্রয়াসে,
আবিলতা-পরিকীর্ণ খণ্ডিত জীবনে
যদিও সে ভাষ্য হাস্যকর—
শত মেঘে, বৃষ্টি, ঝড়ে
মলিন কি তথাপি অম্বর?
প্রভাহীন কবে বা ভাস্কর।

আদিম বন্যতাটুকু,
বুঝি সেই বৃষ্টি আর মেঘ—
বাধা ও বেষ্টনীগুলি—আমাদেরই মনের উদ্বেগ
ছোটো হাতে নিতে গিয়ে মাপ
জড়ো করে যা' শুধু সন্তাপ
আনে রাত-অপঘাত—
ক্লিষ্ট করে মন :
উন্মুক্ত অঙ্গনে যাব হাতে দেবো হাত
দ্বারে দেখে তারে বন্ধ করি বাতায়ন।

তবু স্বর্গ যায় বুঝি আনা।
যুগান্তের আসন্ন সন্ধ্যায়
দিয়ে গেলে তুমি সেই নির্ভুল নিশানা
ইতিহাসপুরুষপ্রবর!

নম্র হয় কি-স্নেহে পাথর,
সোনা হয় ধূলিমুঠি-খড়,
পঙ্ক হ'তে মলয়চন্দন;

খণ্ড সত্য নয় কোনো—অখণ্ড জীবন
ঘিরে যেন হ'ল সূর্যোদয়।
জয় জ্যোতির্ময় দীপ্তি, অনির্বাণ শিখা জয়—জয়।

বিজ্ঞানসাধক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

পিতা যেমন তাঁর সন্তানের গৌরবে গর্ব অনুভব করেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তেমনি গর্ব বোধ করতেন তাঁর ছাত্র-বৃন্দের গৌরবে। তিনি বলতেন—'I shine in the reflected light of my students'. আচার্য রায়ের এই যশস্বী ছাত্রবৃন্দ নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদানের দ্বারা বিজ্ঞান জগতে ভারতের মুখ উজ্জ্বল করেন। ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এই ভারতগৌরব বিজ্ঞানসাধকদেরই অন্যতম।

বিশ্ববিশ্রুত মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সমসাময়িক ও সহপাঠী ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র। ১৮৯৪ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর হুগলী জেলায় তাঁর জন্ম। তাঁর বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয় বাংলার বাইরে গিরিডিতে। কারণ তাঁর পিতা রামচন্দ্র ঘোষ অভ্র ব্যবসায় উপলক্ষে সেখানেই তখন বসবাস করতেন।

জ্ঞানচন্দ্রের ছাত্রজীবন অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। ১৯০৯ সালে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। এরপর আই এস সি পড়বার জন্যে তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন। এখানেই সহপাঠীরূপে পান মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু প্রভৃতিকে। প্রেসিডেন্সী কলেজে তখন স্বনামধন্য আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র অধ্যাপনায় নিযুক্ত। ১৯১১ সালে জ্ঞানচন্দ্র আই এস-সি-তে চতুর্থ এবং ১৯১৩ সালে বি এস-সি-তে রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন। এই কৃতী ছাত্রটির প্রতি আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্বভাবতই তখন দৃষ্টি পড়ে। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় জ্ঞানচন্দ্র যখন রসায়নে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন, তখন আচার্য রায়ের অতি প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠেন।

এই সময় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের পত্তন করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন মেঘনাদ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্ঞানচন্দ্রকে তিনি এই বিভাগের অধ্যাপনার ভার গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানালেন। জ্ঞানচন্দ্র রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু শুধু অধ্যাপনায় তিনি ব্যাপৃত রইলেন না, অধ্যাপনার সঙ্গে গবেষণায়ও ব্রতী হলেন। শক্তিশালী ইলেকট্রোলাইট-এর অস্বাভাবিকত্ব সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি যে নতুন তত্ত্ব পেশ করেন, তা বিশ্বের বিজ্ঞানী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পরবর্তীকালে বিশিষ্ট রসায়ন-বিজ্ঞানী ডিবাই এবং হাকল্ সেই তত্ত্ব গ্রহণ করে তার সম্প্রসারণ সাধন করেন।

এই সময় জ্ঞানচন্দ্রের কয়েকজন কৃতী সহপাঠী ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমনে উদ্যোগী হন। জ্ঞানচন্দ্রও তখন ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁকে বললেন, বিদেশী ডিগ্রীর জন্যে লালায়িত না হয়ে যদি এদেশ থেকে ডক্টরেট হয়ে বিদেশে গবেষণার উদ্দেশ্যে গমন করেন তাহলে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। জ্ঞানচন্দ্র গুরুর কথা মান্য করে ১৯১৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি এস-সি ডিগ্রী অর্জন করেন। এই বছর তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ এবং পালিত বৃত্তিও লাভ করেন। ভাগ্যের এই শুভ যোগাযোগে তাঁর বিলাত গমনের পথ প্রশস্ত হলো।

১৯১৯ সালে জ্ঞানচন্দ্র বিলাতে গিয়ে লণ্ডনে অধ্যাপক ডোনারের অধীনে কিছু-কাল গবেষণা করেন। ১৯২১ সালে তিনি জার্মানীতে যান এবং সেই বছরই ভারতে ফিরে আসেন। ফিরে এসে নবগঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ বছর তিনি এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কর্মরত ছিলেন। ১৯২৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স-এর ডীন ছিলেন এবং ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত ঢাকা হলের প্রভোস্ট ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন জ্ঞান-চন্দ্র সেখানে রাসায়নিক গবেষণার একটি বিরাট গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। তাঁর অনু-প্রেরণাময় নির্দেশনায় এই গবেষকগোষ্ঠী

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

বহু মূল্যবান গবেষণা করেন। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলোর প্রভাব সম্পর্কে তাঁদের গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডঃ ঘোষ এবং তাঁর সহকর্মীদের ফটো-ভোল্টায়িক সেল এবং প্রতিপ্রভ ফলের পরিমাপ সংক্রান্ত গবেষণা রসায়ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক নতুন আলোকপাত করে এবং এই বিষয় একটি অতি মূল্যবান অবদানরূপে বিবেচিত হয়।

গ্যাসে রাসায়নিক বিক্রিয়ার কারিগরী ও তাত্ত্বিক বিষয়েও তিনি গবেষণা করেন। এই পথে গবেষণা চালিয়ে হাইড্রোকার্বন সিন্থেসিসে তিনি ফিশার-টোপস প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন করেন। দেশজ উপকরণ থেকে বিভিন্ন প্রকারের অত্যাবশ্যক রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের কাজে তিনি তাঁর ছাত্র ও গবেষক-দের পরিচালিত করেন। তার ফলে আজ ভারতীয় উপকরণে বহু রাসায়নিক দ্রব্য এদেশে উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

১৯৩৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিয়ে জ্ঞানচন্দ্র বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স-এর অধিকর্তার পদ গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি ওই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে নতুন নতুন দিকে তিনি তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা পরি-চালিত করেন। তাঁরই চেষ্টায় এখানে বিমান ইঞ্জিনীয়ারিং, ধাতুবিদ্যা ও কম্পাশন তিনটি সম্পূর্ণ নতুন বিভাগ খোলা হয়।

১৯৪৭ সালে তিনি ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। এর পর খড়্গ-পুরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। এই কারিগরী বিদ্যামন্দির প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে ও কর্মপ্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে ও উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। গভীর ছাত্রপ্রেম ও অপূর্ব কর্মদক্ষতার গুণে তিনি এখান-কার ছাত্রদের হৃদয়ে এক সুদুর্লভ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাই, ১৯৫৪ সালে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে তাঁকে নিয়োগের কথা ঘোষিত হয়, তখন এই বিদ্যামন্দিরের ছাত্ররা তাদের অতিপ্রিয় অধ্যক্ষকে অন্যত্র নিয়োগের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করেছিল।

১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মভার গ্রহণ করে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত জ্ঞান-চন্দ্র ওই পদে কাজ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এই স্বল্পকালের মধ্যেও প্রীতি-স্নিগ্ধ চরিত্রমাধুর্যে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধনের প্রয়াসে তিনি ছাত্র ও শিক্ষক উভয় সম্প্রদায়ের চিত্ত জয় করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ও স্নাতকপূর্ব ছাত্রছাত্রীদের 'হল'-এর ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৫৫ সালে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যের গুরু দায়িত্ব বহনের আহ্বান আসে জ্ঞানচন্দ্রের কাছে। এই তাঁর শেষ দায়িত্বপূর্ণ পদ। ডক্টর শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু ভারতের বিজ্ঞান গবেষণামন্দির-গুলিকে 'ভাটনগর এফেক্ট' নামে অভিহিত করেছিলেন। এই 'ভাটনগর এফেক্ট'-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে জ্ঞানচন্দ্র তার সার্থক রূপায়ণে প্রভূত সহায়তা করেন।

এ ছাড়া, ১৯২৪ সালে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার মূলে জ্ঞানচন্দ্র ছিলেন অন্যতম উদ্যোক্তা এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে সোসাইটির সভাপতি পদে বৃত হন। ১৯২৫ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের রসায়ন শাখায় তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং ১৯৩৯ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে মূল সভাপতিরূপে মনোনীত হন। ১৯৪২-৪৭ সালে তিনি ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ছিলেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মিশনের সদস্যরূপে তিনি যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা পরিদর্শন করেন। ১৯৪৬ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত এম্পায়ার সায়েন্স কনফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে তিনি যোগদান করেছিলেন।

জীবনের বিভিন্ন সময়ে যখনই যে পদে জ্ঞানচন্দ্র অধিষ্ঠিত হয়েছেন সেই কাজে তিনি অপূর্ব দক্ষতা, দূরদর্শিতা ও মননশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। একা-ধারে বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও সংগঠকরূপে তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা কোনোদিন ম্লান হবার নয়।

বৈদেশিকী

সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসে মিঃ খ্রুশ্চেভের "গোপন" বক্তৃতায় স্তালিনের দুস্কৃতির ইতিহাস প্রথম পার্টির সম্মুখে ব্যক্ত হয়। তার প্রায় তিন বছর পরে আবার পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। এই তিন বছরে কিন্তু সোভিয়েট নেতাদের অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকে গত পার্টি কংগ্রেসের সময় পর্যন্ত বাহ্যত যৌথ নেতৃত্বের ঠাট বজায় ছিল, যদিও এখন জানা যায় যে, গত কংগ্রেসের সময়েই নেতাদের মধ্যে অন্তর্বিবাদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্তালিনের দুস্কৃতির কথা প্রকাশ করার পক্ষে মলোটভ ম্যালেনকভ এবং কাগানোভিচের মত ছিল না। স্তালিন নীতির যথাসম্ভব বজায় রেখে চলার এ'রা পক্ষপাতী। এই ধারণা এখন প্রচলিত হয়েছে যদিও স্তালিনের মৃত্যুর পরে এক সময়ে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে, ম্যালেনকভ স্তালিন নীতির নাগপাশ থেকে রাশিয়াকে ধীরে ধীরে মুক্ত করতে চান। তখন পর্যন্ত খ্রুশ্চেভ নিঃস্তালিন করণ নীতির প্রধান ধারক হিসাবে খ্যাত হন নাই। ম্যালেনকভ যখন প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত হন, তখনও তার কারণ সম্বন্ধে কোনো সঠিক ধারণা করা সম্ভব হয় নি, নানা লোকে নানা কথা বলেছে, তবে মিঃ খ্রুশ্চেভের সঙ্গেই যে দ্বন্দ্ব চলছে এবং সে দ্বন্দ্বে যে মিঃ খ্রুশ্চেভই ধীরে ধীরে জয়লাভ করছেন সেটা কেবল নিশ্চিত বুঝা গিয়েছিল। মলোটভ এবং কাগানোভিচ কখনই স্তালিনের পদাঙ্কিত পথ থেকে দূরে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। এ বিষয়ে ম্যালেনকভ ও কাগানোভিচের দলের সঙ্গে মিঃ খ্রুশ্চেভের দলের বিরোধ চলে। অবশ্য ক্ষমতার লড়াইয়ের ব্যাপারে নীতিগত মতবিরোধের সঙ্গে আরো অনেক কিছু কারণ জড়িত থাকে। যাই হোক, ম্যালেনকভ মলোটভদের দলে যোগ দিলে ১৯৫৭ জুন মাসে প্রেসিডিয়ামের এক মিটিং-এ তাঁরা প্রেসিডিয়াম থেকে খ্রুশ্চেভকে বাদ দেওয়া এবং পার্টির প্রধান সেক্রেটারীর পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করার এক প্রস্তাব পাশ করেন। পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির নিকট খ্রুশ্চেভ এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপীলে আত্মরক্ষা করেন। কমিটি প্রেসিডিয়ামের সেই প্রস্তাব বাতিল করে দেন। এই সময়ে বুলগানিন খ্রুশ্চেভের পক্ষ নেন না। তার ফল পরবর্তীকালে বুলগানিনের পক্ষে কী হয়েছে তা সকলেরই জানা। মলোটভ, কাগানোভিচ ও ম্যালেনকভ সেন্ট্রাল কমিটি থেকে বিতাড়িত হন। বুলগানিন কিছুকাল পরে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত হন, কিন্তু তার কর্মভোগ এখনো কাটে নি। কিছুকাল পূর্বে "অ্যাণ্টি-পার্টি" দলের অর্থাৎ মলোটভ কাগানোভিচ্ প্রভৃতির সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারী বলে খ্রুশ্চেভ প্রকাশ্যে তাঁর প্রতি দোষারোপ করেন। গত ডিসেম্বর মাসে বুলগানিন কিছুটা দোষ স্বীকার করেন কিন্তু তাতে খ্রুশ্চেভের সন্তুষ্টি হয়নি, খ্রুশ্চেভ বুলগানিনকে আরো পরিষ্কার করে দোষ স্বীকার করতে বলছেন। তা না করলে বুলগানিনের বিপদ আছে, এরূপ ইঙ্গিতও করা হয়েছে। ম্যালেনকভ, মলোটভ প্রভৃতি কিছু বলছেন না যদিও তাঁদের উপরও নিশ্চয় আত্মদোষ স্বীকার করার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। মলোটভকে আউটার মঙ্গোলিয়ায় সোভিয়েট রাজদূত করে পাঠানো হয়। তিনি সেইখানে বসে

খ্রুশ্চেভবিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করছেন বলে শুনা যায়।

আরো শুনা যায় যে, মলোটভ চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন এবং সেদিক থেকে নাকি সহানুভূতিও পাচ্ছেন। তাতে চীনা নেতাদের উপর খ্রুশ্চেভ বোধ হয় বিরক্ত হয়েছেন। সম্প্রতি একজন মার্কিন সেনেট-সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মিঃ খ্রুশ্চেভ নাকি চীনা "কম্যুন"গুলিকে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলে অভিহিত করেন। চীনা কম্যুনিস্ট নেতাদের উপর কেবল বিরক্তি প্রকাশ করার জন্য মিঃ খ্রুশ্চেভ এরূপ কথা বলবেন তা সম্ভব নয়। মার্কসিস্ট মতবাদের দিক থেকে বিচার করলে চীনা "কম্যুন"গুলিকে একভাবে "প্রতিক্রিয়াশীল" হয়ত বলা যায়, তবে চীনাদের উপর বিরক্ত না হলে এরূপ শক্ত কথা মিঃ খ্রুশ্চেভ বলতেন না নিশ্চয়ই।

চীনা কম্যুনগুলি সম্বন্ধে যে-সব বিবরণ শুনা যায় তাতে অবাক হতে হয়। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে এই কম্যুন আন্দোলন চীনের গ্রামাঞ্চলে যে-ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা সত্যই আশ্চর্যজনক। জমি, জমা, ঘর-বাড়ি, থাকা খাওয়া সমস্ত যৌথ হয়ে গেছে। পুরো কম্যুনিজম্ হলে সমাজ-জীবনের যে-ব্যবস্থা হবার কথা তাই হয়েছে। জীবন-যাত্রার মান অবশ্য বেশি উঁচু হয়নি, তবে অনাহার অর্ধাহারেও কেউ আর নেই, কিন্তু লোকের আহার বিহার সবকিছু একসঙ্গে সামাজিক ব্যবস্থায় হচ্ছে—ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন সংসার বা ভিন্ন বাড়ি বা ভিন্ন খেতখামার বলে কিছু নেই। মার্কসিস্ট বা মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট মতবাদ অনুসারে শিল্প-শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বেই সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তন হবে। সেইজন্য কম্যুনিজম্-এর প্রতিষ্ঠা শিল্প বিস্তারের উপর নির্ভরশীল। কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠিত হলে নাগরিক ও গ্রাম্য জীবনের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকবে না, কারণ কৃষিও তখন যন্ত্র-চালিত শিল্পের সঙ্গেই তুলনীয় হবে। তাই যদি হয় তবে চীনে যে কম্যুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলি প্রকৃত কম্যুনিজম্ অনুসরণকারী সংস্থা হতে পারে না কারণ মার্কসিস্ট মতবাদ অনুসারে শিল্প-শ্রমিক শ্রেণীর পরিবর্তে কৃষক শ্রেণীর দ্বারা প্রথমে কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, বিশেষ করে যদি সেই কৃষক শ্রেণী আদিমকালের লাঙ্গল, খন্তা, কুড়ুলের সাহায্যে খেতি করে।

চীনের কম্যুনিস্ট নেতাদের মধ্যেও চীনা কম্যুন-এর সম্বন্ধে কিছু মতভেদ থাকতে পারে। আসলে কম্যুনগুলি কৃষকদেরই সৃষ্টি, কম্যুনিস্ট পার্টি অথবা গভর্নমেণ্ট ওপর থেকে আদেশ দিয়ে এগুলি সৃষ্টি করায় নি। জমিদার শ্রেণীর উচ্ছেদের পর যৌথ প্রথায় কৃষির প্রসার এবং সরকারী ফার্ম সৃষ্টি চলতে থাকে। এরই মধ্যে কৃষক শ্রেণীর নিজেদের প্রেরণায় কম্যুন আন্দোলন আরম্ভ হয় এবং দেখতে দেখতে প্রসার লাভ করতে থাকে। ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যজনক। কম্যুনগুলির পরিচালক বা পরিচালিকা সবই অত্যন্ত সাধারণ মানুষ যারা হয়ত দু' তিন বৎসর পূর্বে সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিল। পরিচালকদের মধ্যে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যের সংখ্যাও নগণ্য। আসলে এটাকে পুরোপুরি গণ-আন্দোলন বলা যায়। এই আন্দোলন গভর্নমেণ্টের প্রেরণায় বা তাড়নায় হয়নি। অবশ্য এর শক্তি দেখে গভর্নমেণ্টও একে স্বীকার করে স্বীয় প্ল্যানের অন্তর্গত করে নেন। এই কম্যুন আন্দোলনের দ্রুত বিস্তার দেখে অনেক বিশিষ্ট সরকারী নেতা ঘোষণা করেন যে, অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই চীনে পুরো সাম্যবাদী কম্যুনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই আশার সুরে এখন কিঞ্চিৎ স্তিমিত হয়েছে। বোধ হয় কম্যুনিস্ট পার্টির মার্কসিস্ট মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া থেকেও সমালোচনার সঙ্গে উপহাসের সুর ভেসে এসেছে। গ্রামাঞ্চলে কম্যুন আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া শহরাঞ্চলের শিল্পাদির উপর ঠিক কিরূপে হয়েছে জানি না। হয়ত সেদিক দিয়েও তাড়াতাড়ি সামঞ্জস্য আনতে বেগ পেতে হচ্ছে। যাই হোক, গত ডিসেম্বর মাসে চীনের কম্যুনিস্ট পার্টি দেশের পুনর্গঠন পরিকল্পনা সম্পর্কে যে-দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তাতে কম্যুন আন্দোলনে অতিদ্রুত প্রসার সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। ইহার অর্থ কী সেটা পরে বুঝা যাবে। সুতরাং কম্যুনগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটু অনিশ্চয়তার ভাব এসেছে। তাহলেও কম্যুনগুলির কাজ যাঁরা দেখেছেন তাঁরা আশ্চর্য হয়ে এইটা লক্ষ্য করেছেন যে, অতি সাধারণ এবং প্রায়-নিরক্ষর লোকেরা নিজেদের নেতৃত্বে এমন সব দায়িত্বপূর্ণ এবং কঠিন কাজ সম্পন্ন করছেন যা সম্ভব বলে পূর্বে ধারণা করা যেত না।

২৭।১।৫৯

এক

একে শনিবারের বারবেলা, তায় ভর আমাবস্যে। লোহাজঙার সা'দের কুড়োনের মা ঘাটে গিয়েছিল ভর সন্ধ্যেয়। গাও ধোয়া হবে, এক কলসী জলও আনা হবে।

কুঠির ঘাটটা জায়গা ভাল নয়। আশ-শ্যাওড়া, বুনো কুল আর বাবলা গাছের জঙ্গলে ভর্তি। আর জঙ্গলের মধ্যে, এখন যেখানে নজর যায় না, নীল জাগ দেবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাড়ি আকাশ পানে মুখ তুলে রাক্কসের মত হাঁ করে সব বসে আছে। যাকে পাবে তাকেই গিলবে এই ভাব।

কুঠির মাঠে নাকি বাঘ ভাল্লুকও যায় না। কুঠির ঘাটে সন্ধ্যেবেলায় যেতে সাহসী পুরুষও দ্বিধা করে।

কিন্তু সা'দের বাড়ির কুড়োনের মার কথা আলাদা। সে পুরুষ মানুষের কাঁধে পা দিয়ে চলে। ভয় ডর কুড়োনের মার ছায়া মাড়ায় না।

এ দিগরের মধ্যে কুড়োনের মাই একমাত্র মনিষ্যি যে নিত্য সন্ধ্যায় কুঠির ঘাটে গা ধুতে আসে আর জল নিয়ে ফেরে। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা নেই। বাধা বিপত্তি গেরাহ্যি নেই।

সেদিনও গা ধুতে এসেছিল কুড়োনের মা। এই চোত সংক্রান্তির আগের দিন। গা ধুয়ে উঠে ভরা কলস কাঁখে নিয়ে রোজ দিনের মতই হনহন করে এগিয়ে যাচ্ছিল বাড়ির দিকে। কুঠির মাঠের মাঝ বরাবর আসতেই কুড়োনের মা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এই অসম্ভব স্থানে চাপা কান্নার আওয়াজ আসছে কোত্থেকে? এই অসময়ে? ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে কাঁদে? কোথায় কাঁদে?

কুড়োনের মা এদিক ওদিক চেয়ে দেখল। তার মনে হল, কুঠি মাঠের মাঝ বরাবর, কাছারি দালানের খিলেনটা যেখানে অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে দাঁড়িয়ে, যেখানে একটা বুড়ো বট আর খেজুর গাছ জড়াজড়ি করে আগাছাদের দাই দিয়ে মাথায় তুলেছে, অন্ধকার যেখানে কালো পাথরের মত জমাট, কান্নাটা যেন সেখান থেকে আসছে।

ওখানে গিয়ে এই সন্ধ্যেবেলায় কার আবার কান্নার শখ চাপল? কুড়োনের মা দস্তুরমত অবাক হল। বয়েস কম হয়নি কুড়োনের মার। অঙ্ক জানে না তাই সঠিক হিসেব দিতে পারবে না হয়ত। তা মেয়ের কোলে কুড়োনের বয়েসই তো বিয়ের যুগ্যি হয়ে উঠেছে। বহুদিন মারা গেছে ওর বাপই। তার এতখানি বয়সে আজকের মত এমন অঘটন আর দেখেনি কুড়োনের মা।

জল ভরা বড় ঘড়াটা এক কাঁখে বাথা ধরিয়ে দিয়েছিল। কাঁখ বদলে স্বস্তি পেল। তারপর সে ডাক দিল।

"ওগো বাছা, তুমি কে গা? কে কাঁদছ ওখানে বসে বসে?"

কান্নাটা স্পষ্ট করে শুনতে না পেলেও কুড়োনের মা সেটা মেয়েমানুষের কান্না বলেই আন্দাজ করেছিল। দেখল ভুল করেনি। তার ডাক শুনে কান্না থামল। শুকনো পাতার উপর খসখস পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর পাথরকালো অন্ধকার ঠেলে কুড়োনের মার সামনে এসে দাঁড়াল অল্প-বয়সী অপরিচিত এক গেরস্ত বৌ। অমনি রূপে যেন চারিদিক আলো হয়ে উঠল।

কুড়োনের মা দেখল, বৌটির মুখ প্রিতিমের মত সুন্দর। আর কি চুল! যেন মাথা থেকে কালো জলের ঢেউ নেমেছিল, পাছা ছাপিয়ে পায়ের গোছ পর্যন্ত নেমে সে ঢেউ জমে গেছে। পরনে চওড়া লাল পাড় শাড়ি। কপালে আর সিঁথেয় সিঁদুর। শাড়ির লাল আর সিঁদুরে লাল টকটক হয়ে যেন জ্বলছে। এ কাদের বাড়ির বৌ? একে কোথাও দেখেছে বলে তো কুড়োনের মার মনে পড়ল না।

"তুমি কে বাছা? কাদের বৌ? তোমাকে তো এর আগে কখনো দেখিনি। এই বিজন বনে জনমনিষ্যি ঢোকে না। ওখানে বসে বসে কাঁদছ কেন? তোমার সংগে লোক কে আছে?"

কুড়োনের মা একসংগে এত কথা জিজ্ঞেস করে বসল। বৌটি মৃদু মধুর গলায় যখন সব কথার জবাব দিয়ে গেল তখন কুড়োনের মার মনে হল, সে যেন সুন্দর একখানা গান শুনল।

"আমার বাড়ি অনেক দূর মা, অনেক দূর। আমার দুঃখের কথা শুনলে পাষাণও গলে যায়। সংসার আছে, সোয়ামী পুতের ঘর আছে। কিন্তু সোয়ামী যার উপর নির্দয়, তার সব থেকেও কি লাভ বল। সোয়ামী আমার মানুষ নয় গো, পাষাণ। সতীন তার মাথার মণি, আমি দুচক্ষের বিষ। নৌকোয় করে আমার সোয়ামী আমায় বাপের বাড়িতে রাখতে যাচ্ছিল। কি মতি উদয় হল তার, আমাকে এই বিজন বনে নির্বাসন দিয়ে নৌকো নিয়ে চলে গেল। ঘরের বৌ পথ চিনিনে, তার উপর এই আমাবস্যের রাত। কোথায় যাব? কার বাড়ি আশ্রয় পাব? জানিনে। তাই মা বনে বসে মুখ লুকিয়ে কাঁদছিলাম। তোমায় দেখে বল পেলাম। দোহাই ধর্মের, আমাকে এখানে ফেলে তুমি চলে যেও না। রাতের মত তোমার ঘরে মা, আমাকে একটু ঠাঁই দাও।"

কি কাকুতি। কি আকুতি। আহা, বেচারা। কুড়োনের মা গলে গেল। তার চোখ দুটো ভরে উঠল জলে। সংগে করে নিয়ে চলল বাড়িতে। কুড়োনের মা আগে আগে, বৌটি তার পিছনে। বাড়িতে ঢুকে

রান্নাঘরের বারান্দায় ভারি ঘড়াটা নামিয়ে একটু হাফ নিয়ে, "বসো বাছা" বলে পিছনে ফিরতেই কুড়োনের মা দেখে ফাঁকা। কেউ নেই।

বারে, কোথায় গেল বৌটা? তবে বোধ হয় চেগারের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে। লজ্জা পাচ্ছে ঢুকতে।

"আসো মা আসো। লজ্জা কি? পুরুষে মানুষ কেউ নেই এখন। থাকার মদ্যি আমার তো ঐ শিবরাত্তিরির সলতে-টুকুন—ঐ কুড়োন। তা সে বাবু সন্ধ্যের আগে ভেড়ি বাগায়ে বেরোন, ফিরতি মদ্যি রাত।"

বলতে বলতে কুড়োনের মা চেগারের কাছে এগিয়ে গেল। বাঁশ ছেঁচে চেগার তৈরী করেছে কুড়োন। যত্ন করে। নিজের হাতে আড়াল তুলে দিয়েছে। ভিতর থেকে বাইরেটা দেখা যায় না।

কুড়োনের মা বাইরে বেরিয়ে গেল। না, এখানেও তো কেউ নেই। বৌটা গেল কোথায়? একটু আগেও তো ছিল। হরলাল কামারের বাড়ি ছাড়িয়ে এসেও সে তার পায়ের শব্দ শুনেছে। তাহলে এই-টুকুর মধ্যে আর যাবে কোথায়? বেশ মজা তো। সে ভাবল, বৌটা কি তবে পাগল? লক্ষণ তো বোঝা গেল না। নাকি নষ্ট-টষ্ট? উঁহু, মুখ চোখের অমন ভাব নষ্ট মাগীর হয় না।

কুড়োনের মা হরলাল কামারের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

হরলাল দরজার সামনে পিদিম জেবলে, নিকেলের চশমা নাকের ডগায় নামিয়ে এনে ঠুকুর ঠুকুর কাজ করছে। কুড়োনের মাকে ফিরতে দেখে একবার তার দিকে চেয়েই আবার ঠুকুর ঠুকুরে মন দিল।

"কিগো বৌদি, কি খোঁজছ?"

"ও কামার ঠাউরপো, আমার সঙ্গে যে বৌডা আসছিল, সে কি তুমাগের বাড়ি ঢুকে পড়ল?"

হরলাল আশ্চর্য হল।

"কোন বৌর কথা বলছ? তুমার সঙ্গে আবার বৌ গেল কার, তা তো দেখলাম না। ছেলের বিয়ে দিলে কবে?"

কুড়োনের মা চটে গেল। ঠাউরপোর সব তাতেই ঠাট্টাবাজী।

"রংগরস রাখোদিন। শুনলি গা জ্বালা করে। বলি দুটো চখির উপর দুখান পরকলা তো চাপায়েছ বেশ জম্পেশ করে, তাউ অমন, জলজ্যান্ত মনিষ্যিডেরে দেখতি পালে না। সেই ঘাটের থে আমার পিছন পিছন আসতিছে। কাঁদে কুকায়ে ক'লো সোয়ামীতি ফ্যালায়ে গেছে। রাত্তিরডে দয়া করে এটটু আশ্রয় দ্যাও। মনডা নরম হ'লো। ভাবলাম, সোমত্থ মেয়ে, কাঁচা বয়েস, তার উপর প্রিতিমের মত রূপ—এসব নিয়ে যাই-ই বা কনে। কলাম, চল আমার বাড়ি। তা দ্যাখদিন, এখন গেল কনে।"

এবার হরলাল সত্যিই বিস্মিত হল।

"ধর্মত বলছি বৌদি, তুমার সঙ্গে আমি কারুর যাতি দেখিনি। রোজ যেমন একা একা ফের আজো তাই ফিরিচ। কামারের চোখ এড়ায়ে, জানত, মাছি পর্যন্ত যাতি পারে না। আমার মনে হয়, তুমি ভুল দেখিচ।"

"অত ভুল আমার হয় না। আর ভুল কিসির। কথা কলাম। তারে দ্যাখলাম। পিছন পিছন পায়ের শব্দ পালাম। সব ভুল! তুমার মত আমার তো ভিমরতি ধরেনি। বলি পথ হারায়ে ফ্যালেনি তো।"

হরলাল এবার বিরক্ত হল। অনর্থক কাজ নষ্ট। কুড়োনের মায়ের ভিমরতিই ধরেছে। জলজ্যান্ত একটা মানুষ আমার চোখের উপর দিয়ে চলে গেল আর আমি দেখতেই পেলাম না। হ্যাঃ। আমার চোখে তো ছানি পড়েনি! বলে কি পথ হারাবে? জবাব দিল, ঠুক ঠুক করতে করতেই।

"সুজা রাস্তা আবার হারাবে কি? দ্যাখ গে, আগেই হয়ত ঢুকে পড়েছে ঘরে। তবে পরের ফ্যাসাদ আবার ঘরে আনলে ক্যান। বিহান বেলাতেই বিদেয় করে দিও।"

কিন্তু কুড়োনের মা এই পরামর্শ মত চলবার আর ফুরসৎ পেল না। শেষ রাত্তিরে শুরু হল তার ভেদবমি। বিহান না হতেই শেষ। ওলাইচণ্ডীকে ঘরে ডেকে আনার ফল হাতে হাতে পেল কুড়োনের মা। কুড়োনের মা গেল, ধরল কুড়োনকে। কুড়োনও দুপুরের মধ্যেই গেল। তারপর গেল হরলাল কামার, তার বৌ, তিন ছেলে, দুই বেটার বৌ। নির্বংশ। তারপর গেল গ্রাম-খানা। তারপর, আঠারোখাদা, বিনোদপুর, ধপধপি, কুড়োল, নলসি—একে একে ওদিগরের সব গ্রাম।

দম নেবার জন্যই বোধকরি বুদো ভুঁয়ে থামল। বেশ বলে বুদো। যেন প্রত্যক্ষদর্শী। মড়ক হয়েছিল এবার। বুদো ভুঁয়ে সবিস্তারে সেই কাহিনীই শোনাচ্ছিল এত-ক্ষণ। এবার দম নিতে থামল। থামার সঙ্গে সঙ্গেই আকাশ ফাটা এক গর্জন। চকিতে কানে তালা লেগে গেল সবার। বেশ করে তামাক সেজে নরা কল্কেটা বামুনের হুঁকোয় পুরতে যাবে, দেয়ার ডাকে আচমকা হাত কেঁপে কল্কে পড়ে গেল।

সরকার মশায় হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

"দশ বছর বয়েস হল ছ্যামড়ার এখনো কাজকম্মো শিখলো না। কি রে ভাঙলি নাকি?"

স্যান কবিরাজ বললেন, "ও বাবা সরকার মশায়ের কল্কে, ভাঙলি কি রক্ষে আছে?"

সরকার মশায় ছোঁ মেরে যেন স্যান কবিরাজের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলেন।

"আরে ব্যাস্, ওকি যে সে কল্কে নাকি? এতদ্দেশে আর ওর জুড়ো নেই। আমার জামাইয়ের ভাগ্নিপোত এলাহাবাদের উদিক

কোন শহরে যেন ডাক্তারি করে। সেই আমার জামাইরি এই কল্কেডা আনে দিইছিল। তা জামাই ক'লো বাবা উডা আপনিই নিয়ে যান। যেসব কুমোর নবাব বাদশাদের কল্কে বানায়, তাদের হাতের জিনিস। ভাঙলি ও আর পাব কনে?"

বুধো ভুঁয়ে ফোড়ন কাটল, "নবাবি জিনিস কি চাষাভুষোর হাতে ছা'তে দিতি হয়? জামাই এত কণ্ট করে আপনারে যখন একটা নবাবি কল্কেই পাঠাতি পারল, তখন একজন হুঁকো বরদার পাঠায়ে দিলিই পারত।"

সরকার মশায় অন্যদিকে চেয়ে কাশতে লাগলেন ঘন ঘন। এইসব ছেলে ছোকরা-দের টিপ্পনীর জবাব দেওয়া মানে মানসম্মান খোয়ান।

নরা এবার খুব সতর্ক হয়ে তামাক সেজে বামুনের হুঁকোটা পুরুত ঠাকুরের হাতে দিল। হুঁকোটা বেশ করে মুছে রিদয় ঠাকুর টানতে শুরু করলেন।

বৃষ্টিটা ধরব ধরব হয়ে এসেছিল। আবার জোরে শুরু হল। ঘনমেঘ ভরা আকাশের দিকে চেয়ে মেজকর্তার মন কিছুটা বিষন্ন হয়ে উঠল। আকাশের গতিক ভাল নয়। বৃষ্টি আজ ধরবে কিনা সন্দেহ।

মেজকর্তা অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "নরা, তোর বাবা কইরে?"

নরার পিলে চমকে গেল। কি জানি কেন, মেজকর্তাকে দেখলে সে ভয়ে জড়সড় হয়ে যায়। এক মুখ লম্বা দাড়ি, মাথায় টাক, কথাবার্তা কম বলেন, সেই কারণে? নাকি বিদেশে থাকেন, দেখা সাক্ষাৎ কম, সেই কারণে? কি জানি কেন, মেজকর্তা সম্পর্কে নরার ভয়, সেই ছোটবেলা থেকে। জ্ঞান হওয়া ইস্তক নরার কাছে মেজকর্তা পরম ভয়ের বস্তু। ছোটবেলায় যখনই নরা দুষ্টুমি করেছে, অমনি বাপ বলেছে, "দাঁড়া, মাজে কত্তারে ডাকি", আর নিমেষে নরা শান্ত। বড়কর্তা তেজি লোক, ছোটকর্তা ডাকসাইটে দারোগা, বাঘে গরুতে তাঁর নামে এক ঘাটে জল খায়। কিন্তু ও'দের দেখে অত ভয় হয় না নরার। ও'দের সামনে গিয়ে নানা ফরমায়েশ খেটেছে, তামাক সেজেছে বহুবার। এমন কি, ছোটকর্তার গায়ে তেল পর্যন্ত মাখিয়ে দিয়েছে। তেমন কিছু তো ভয় হয়নি তার।

যত ভয় মেজকর্তায়। দুবছর আগে বড়-মেয়ের বিয়ে দিতে এসেছিলেন। তখন নরা আরও ছোট। ভিড়ের মধ্যে মিশেটিশে দিন কাটিয়ে দিয়েছে। এবার তার অদৃষ্টে কি আছে, কে জানে? মেজকর্তার কাছে কাছেই দেখি থাকতে হচ্ছে। তাই তো, কি যেন একটা জিজ্ঞেস করলেন মেজকর্তা? যাঃ শুনতেই পায়নি ভাল করে। না, শুনতে পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু মনে করতে পারছে না। হেই মাকালী, কি যে হবে। এক ছুটে পালিয়ে যাবে বাড়ি? আর এ মুখো হবে না জীবনে?

"নরা, তোর বাবা কি করছে?"

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। এই কথাই আগে আরেকবার জিজ্ঞেস করেছেন মেজকর্তা। কি বলবে, কর্তা না বাবু না হুজুর?

"বাবা? বাবা কুঁড়ে বাঁধছে।"

যাক, জবাব দিতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল তার। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়।

"আচ্ছা বাবু (বাবুই বেরুল মুখ দিয়ে) আমি দেখে আসছি।"

রিদয় ঠাকুর বললেন, "তুমারে যেন চিন্তিত দেখাচ্ছে মহি?"

মেজকর্তা বললেন, "দাদা বাড়ি নেই। কাল ঝিনেদায় গিয়েছেন। মামলা আছে। এদিকে আজ সকাল থেকে বুড়ির বাথা উঠছে একটু একটু করে।"

রিদয় ঠাকুর বললেন, "আরে তার জন্যি কিচ্ছু ভাবে না। মঙ্গলময়ী মায়ের ইচ্ছেয় সব কিছু মঙ্গলে মঙ্গলেই হয়ে যাবেনে।"

রিদয় ঠাকুরের বিশ্বাসভরা আশ্বাসে একটু আরাম পেলেন মেজকর্তা।

বললেন, "না, ঠিক সেজন্যে চিন্তা করছিনে। ভাবছি বৃষ্টির জন্যে। যেভাবে শুরু হয়েছে, থামলে হয় আজ।"

বুদো ভুঁয়ে বললেন, "ভগবানের লীলা বুঝা ভার। এই বিষ্টির পিত্যেশে আমরা এদ্দিন মাথা খুঁড়ে মরিছি। বোঝলেন মাজে খুড়ো, ইবার একটার পর একটা যা আপদ আমাগের মাথার উপর দিয়ে গেল, তা আর কহতব্য নয়। ওলাদেবীর দয়ার কথা তো আপনারে আগেই কলাম। শুধু আমাগের গিরামডায় তিনি দয়া করে খাবলডা মারেননি। তাও পুবির পাড়ায় রিয়াজদ্দি গাজী আর ইরফান স্যাখের বাড়ির জনাচারেক গিয়েছে। মড়কের সময় বিষ্টির দেখা ধারে কাছেও মেলেনি। তখন যদি একটু বিষ্টিও হয়, তাহলি এই ষাঁড়ে সব্বনাশটা আর হয় না। কিন্তু কনে বিষ্টি? আজ তিনি ছিষ্টি ভাসায়ে দেচ্ছেন।"

হুঁকোটা ঘুরে ঘুরে এতক্ষণে বুদো ভুঁয়ের হাতে এসে পৌঁছাল। ফতুয়ার পকেট থেকে একটা সরু কাঠের নল হুঁকোতে লাগিয়ে বুদো ভুঁয়ে গোটা কতক টান তাড়াতাড়ি দিয়ে পাশের লোকের হাতে হুঁকোটি তুলে দিলেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে সুখটা মালুম করে নিলেন।

তারপর শুরু করলেন, "যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্যি রাজার পুণ্যি দেশ। তা মাঘ তো দূরির কথা ফাল্গুন, চৈত গেল, বোশেখ গেল, এক ফোঁটা বিষ্টি নেই। জষ্টিও কাবার হল। কুথায় বিষ্টি। খাল বিল শুকোয়ে খটখট কচ্ছে। নবগংগা হাঁটে পার হচ্ছে লোকে। অদ্যাবধি কারো মাঠে লাঙগল পড়েনি। পড়বে কি করে, মাঠের

মাটি শুকোয়ে পাথর হয়ে গেছে। আম কাঁঠালের বোল মুচি ধরতি না ধরতি মাটিতি ঝরে পড়েছে। মাছ নেই। ঘাস নেই। চারিদিক হাহাকার। তার উপর মড়ক। কি ভাগ্যি, আজ শেষ রাত্তিরির থেকে আকাশ মুখ তুলে চালেন। এখন গব্‌গব্‌ করে না ঝরলি মাঠ ভেজবে না। পাটের দফা রফা তো ইবারের মত হলই। ধান যদি কিছুডা হয়।"

স্যান কবিরাজ বললেন, "পাট লাগায়েও যে কোন চতুবর্গ ফল হত, তাও তো বুঝিনে। বছর বছর দর তো দেখি হু হু করে নামে যাচ্ছে। এখন তো দেখি চাষের খরচও ওঠে না। সব তে বেশি মার খাচ্ছে মিঞারা।"

"আরে, ওগের কথা ছাড়ান দ্যাও।" সরকার মশাই তাচ্ছিল্যের সংগে বললেন, "ওগের সবই উল্টো বুঝলি রাম। আমরা যা করব, উরা তার উল্টো করবে। আমরা পুব-মুখি আহ্নিক করি, উনারা পশ্চিম মুখি নমাজ পড়েন। আমরা বাইরির থে বাড়ি আসে আগে পায়ে জল দিই উনারা আগে হাতে জল দেন। কত আর কব?"

স্যান কবিরাজ সরকার মশাইয়ের কথার ধরনে হেসে ফেললেন।

বললেন, "যা বলেছ। দ্যাখছে, পাটের দাম পড়ে যাচ্ছে তবু পরের বার বেশি করে বোনছে। ইডা বোঝে না মাল বেশি হলি দাম আরো কমে যায়।"

সরকার মশাই বললেন, "বলি বুঝাতি চাও কারে? মিঞারে? ওরা যদি কিছু বোঝবেই তাহলি আর চিরকাল লাঙগলা চাষা হয়ে থাকে? আমার জামাইয়ের ভাগিনপোত পশ্চিমির যে শহরে ডাক্তারি করে, সে নাকি জামাইরি কয়েছে ওদিকির মিয়ারা উকিল, ডাক্তার এমন কি জজ ম্যাজিস্টেরও হয়। শুনে তো আমি অবাক। চোদ্দ শাস্তর পড়ে যদি মোছমমানের পোলা, তবু তার নাহি যায়, নাত নোদ নাঙগা শাক, ত্যাল ব্যাল ক্যালা। রাত রি যারা নাত, রৌদ্দির নোদ, তেলেরে ত্যাল কয় তারা আবার জজ হয় কি করে তা তো বুঝিনে।"

মেজোকর্তার মনে পড়ল সরকার এইমাত্র যে শোলোকটি বলল, ছোটকাল থেকেই সেটা তাঁরা শুনে আসছেন। যদি না তিনি কিছু লেখাপড়া শিখতেন, যদি না কলকাতায় কাটাতেন কিছুকাল, তাহলে চিরকাল এদের মতই অজ্ঞ থেকে যেতেন। এদের মতই বিশ্বাস করতেন মিঞারা চিরকাল লাঙগলই চালায়।

হঠাৎ তাঁর প্রথম যৌবনের দিনগুলোর কথা মনে পড়তে লাগল। উজ্জ্বল প্রাণোচ্ছল কলকাতার কথা। কলেজ দিন-গুলোর কথা। মনে পড়ল ঋষিতুল্য প্রোফেসরদের কথা। ডাঃ হাসানের কথা।

এরা, এইসব কূপমন্ডুকেরা কিই বা দেখেছে, কতটুকুই বা জেনেছে। দুরন্ত যৌবনে রক্ত যখন গরম ছিল মেজোকর্তার তখন এইসব মূর্খ অশিক্ষিত লোকেদের তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন তিনি। তখন এই ধরনের মন্তব্য শুনলে তাঁর রক্তে কে যেন আগুন ঢেলে দিত। তাঁদের মন্তব্য যে কত ভুল তা প্রমাণ করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতেন, প্রচণ্ড তর্ক করতেন, শেষ পর্যন্ত ঝগড়া বাধিয়ে দিতেন।

আজ এই উনপঞ্চাশ বছরের দেহে সে তেজ নেই, সে বোকামিও নেই। তর্ক করে শুধু তর্কই করা যায়, আর কিছু না। প্রৌঢ়ত্ব তাঁকে সে জ্ঞানটুকু দিয়েছে। তাছাড়া এদের অজ্ঞতার জন্য আজ আর এদেরকে আগের মত ষোল আনা দোষী করতে ইচ্ছা যায় না। জ্ঞানের আলো এদের চোখে জ্বালাবার চেষ্টাই বা কি হয়েছে? কে করেছে? এখন বরং এদের জন্য মেজ-কর্তার করুণাই হয়। করুণা হয় তাঁর নিজের জন্যও। কিই বা করলেন তিনি?

পাটের ব্যাপারে দু একটা কথা বরং তিনি বলতে পারেন। পাটের আফিসেই কাজ করেন মেজকর্তা। আমদানী বাবু। রংপুর জেলার পাটের মোকাম ডোমার। সেখানকার বার্ক মায়ার কোম্পানীর আমদানী বাবু তিনি। তিনি জানেন, পাট চাষে পাটরাণী পোষার দিন চলে গেছে চাষীর। সাহেবদের কারখানায় পাটের চাহিদা দিন দিন কমে আসছে। এবারও তাঁদের আফিসে কলকাতা থেকে হুকুম এসেছে প্রথম বাজারে পাট না কিনতে। দাম কতদূর নামে তা দেখার জন্য যেন নিস্পৃহভাবে অপেক্ষা করা হয়।

মেজকর্তা গলা ঝেড়ে বলতে যাবেন এমন সময় আরেকবার মেঘ ডেকে উঠল জোরে আর সংগে সংগে বাড়ির ভিতর থেকে যেন গোলমাল শোনা গেল একটা। মেজকর্তার বুকটা কে যেন শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে আবার চট করে ছেড়ে দিল। মুখটাও শুকিয়ে গেল।

রামকিষ্টো ভিজতে ভিজতে এসে হতাশ হয়ে বলল, "মাজেকত্তা, কুড়েডা ভাংগে পড়ে গেল।"

মেজকর্তা ঘাবড়ে গেলেন। তাহলে উপায়?

রামকিষ্টো বলল, "উঠোনে পিরায় এক হাঁটু জল দাঁড়ায়ে গেছে।"

হুঁ, গতিক সুবিধের ঠেকছে না। মেয়েটার কপালে কি আছে কে জানে? বোকার মত রিদয় চক্কোত্তির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকলেন।

পুরুত ঠাকুর সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "মহি, আমি বলছি, তুমি মোটেও ভাবে না। নার্তনির গর্ভ বিধিমতে শোধন করা আছে। সুপ্রসব না হয়েই যায় না।"

বুদো ভুঁয়ে বলে উঠলেন, "মাজে খুড়োর মেয়ের ঘরে আসছেন বটে একজন। খরা আর মড়ক পিছনে রাখে, বিষ্টি মাথায় করে একেবারে ছিষ্টি জানান দিতি দিতি আসছেন।"

রামকিষ্টো বলল, "তাতো তিনি আসছেন বুঝলাম, কিন্তু আসবেন কনে। কুঁড়ে বাঁধি কুথায়?"

রিদয় ঠাকুর বললেন, "তুমি পাকা ঘরামি রামকিষ্টো। যেখেনে সুবিধে পাও সেখেনেই বাঁধ গে। মহি একেই ঘাবড়ায়ে গেছে, ওরে আর ভয় পাওয়ায়ে দিয়ো না।"

রামকিষ্টো চলে যায় দেখে মেজকর্তা বললেন, "তুমি একা না সংগে লোক আছে রামকিষ্টো?"

রামকিষ্টো বলল, "এ সব কাজ কি একা হয় কত্তা, ছোলেমান নিকিরিরিও ডাকে আনিছি। ও-ও খুব সরেশ ঘরামি। কথা তা না। উঠোনে জল জমেই কাজের বীজ মারে ছাড়েছে। অত উঁচো করে পুতা বাঁধলাম, তা এই সুমুন্দির বিষ্টির কাজডা দ্যাখলেন তো, জল পিরায় হাঁটু ছাড়ায়ে উঠতি চায়। ওর মদ্যি কি মাটি বসান যায়? সব একেবারে ঢেয়োয়ে দেচ্ছে।"

মেজকর্তা বললেন, "যদি শেষ পর্যন্ত কুঁড়েটা বাঁধতে না পারে, তাহলে ঘরের মধ্যেই না হয় আঁতুড় হবে। করা যাবে কি? কলকাতায় তো হাসপাতালেই প্রসব হচ্ছে।"

মেজকর্তার কথা শুনে সবাই যেন আকাশ থেকে পড়ল। ঘরে হবে আঁতুড়! মেজকত্তার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল? নাকি খিরিস্টার হয়ে গিয়েছে? কলকাতার রং আজও মেজকর্তা তাহলে মুছে ফেলতে পারেন নি।

রিদয় ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, "মহির আমাদের চিরটাকাল এক রকম গেল! ও রামকিষ্টো, আর দাঁড়ায়ে আছে ক্যান বাবা, চিন্টা চারিত্তির করে দ্যাখগে। ঘরে কি প্রসব হয়?"

ভিতর থেকে চাঁপা ছুটে এল। বড়-কর্তার ছোট মেয়ে।

হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "মাজে কাকা, শিগগির ভিতরে আস। বড় মা ডাকছে। বড়দির ব্যাথা বাড়তিছে।"

ধ্বক করে হৃদপিণ্ডে একটা জোর ধাক্কা লাগে। বলিস কি? সর্বনাশ! এখনও যে কুঁড়ে বাঁধা হয়নি। আঁতুড় হবে কোথায়? তবে কি বুড়িকে ঐ উঠোনেই নামিয়ে দিতে হবে? মরে যাবে যে মেয়ে। বড়দা এখনও কেন আসছে না? কেন আসছে না?

গলামুখ শুকিয়ে গেল মেজকর্তার। অস্থিরতা বেড়ে উঠল মনের। বুক সমান দাড়িতে ঘন ঘন হাত বুলোতে লাগলেন। যেন এইটেই তাঁর এই মুহূর্তের একমাত্র করণীয়।

চাঁপা তাড়া লাগাল, "চল শিগগির!"।
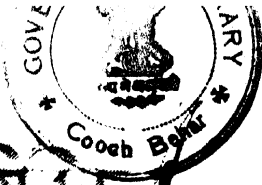
(ক্রমশ)

সংসারে এমন অনেক জিনিস আছে, যেগুলো বছরের পর বছর ঋতুর পর ঋতু একভাবে এক অবস্থায় নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে টিকে থাকে, কোন পরিবর্তন নেই এদের; পরিবর্ধন নেই, না কোনো বৃদ্ধি। যেমন ধরুন আপনার বাড়ির সামনে রাস্তার পাশের লাইট-পোস্ট বা আমার ঘরের সামনের নর্দমা ডিঙোবার ছোট একটা কংক্রীটের কালভার্ট। আজ যে রকম চেহারা দেখছি, কালও তাই দেখব, দু'বছর আগেও এই ছিল। যেমন ধরুন সুকিয়া স্ট্রীটের একটি গলির মাথার মিষ্টির দোকানের সাইনবোর্ডটা। আজ চৌদ্দ বছর আমি ওটাকে এক অবস্থায় ঝুলে থাকতে দেখছি। যেন কোণার দিকের একটা পেরেক ঢিলে হয়ে উঠে আসার দরুণ সাইনবোর্ডটা একটু বেঁকে আছে। আছে তো আছেই। দোকানের মালিক শ্রীনাথ বাকুলীর সেদিকে দৃষ্টি নেই। কোনদিন দৃষ্টি পড়বে কিনা বলা শক্ত। কেননা সাইনবোর্ড থাক না থাক, তাতে তার মাথা-ব্যথা নেই। বাকুলী জানে তার দোকানের আসল বিজ্ঞাপন হল কাচ-পরানো কাঠের বাক্স-আলমারীটা আর তার মধ্যে সাজিয়ে রাখা ভেজিটেবল ঘি দিয়ে ভাজা সিঙাড়া, নিমকি, জিলিপি, দানাদার। যতক্ষণ এগুলো আছে, ততক্ষণ তার খদ্দের আছে। সাইনবোর্ড পড়ে কেউ কিছু খাবার খেতে আসে না। খদ্দের সাইনবোর্ড হয়তো চোখে দেখল, কিন্তু পড়ল না। একবার তাকাল মাত্র, কিন্তু মনোযোগ নেই সেদিকে তার এক বিন্দু। এইরকম। এরকম অনেক কিছু আমাদের ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে আছে,—আছে তো আছেই। আমরা সেকেণ্ডের একটা ভগ্নাংশও সেসব তাকিয়ে দেখতে ব্যয় করি না। আমরা এত ব্যস্ত থাকি, আপনি এত উদ্বিগ্ন (টাকা-পয়সা, অসুখবিসুখ, চাকুরি, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী যে কারণে হোক) থাকেন যে—

অনেকে তো দুবেলা চৌরঙ্গী পার হন। কিন্তু যদি বলি গড়ের মাঠের অত বড় মনুমেণ্টও তাদের চোখের আড়ালে থেকে যায়, তবে কি মিথ্যা বলা হবে? তার মানে এই নয় যে, মনুমেণ্ট হারিয়ে গেছে, পড়ে গেছে; মনুমেণ্ট ঠিক জায়গায় আছে, যেমন লাইটপোস্ট তার জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, কালভার্ট কালভার্টের জায়গায় শুয়ে আছে, জিলিপির দোকানের মাথার সাইনবোর্ডটা তেমনি ঝুলছে, আপনি দেখছেন না, তারা আপনাকে দেখছে,—শুধু দেখা নয়, ভাল করে দেখছে আপনি বিষণ্ণ কি প্রসন্ন, উত্তেজিত কি ক্লান্ত,—হতাশ কি অতি আশা নিয়ে একটা কিছুর জন্য ছুটে চলেছেন। অর্থাৎ সংসারে আপনি অনেক কিছু দেখেন না, অনেককে দেখেন না, আপনাকে অনেকেই দেখছে, অনেক কিছু স্থির দৃষ্টি মেলে আপনার দিকে তাকিয়ে থাকে। ধরুন না, সুকিয়া স্ট্রীটের গলির মোড়ের আয়ুর্বেদ ভবনের ভুসভুসে ছাই রং শার্ট গায়, নিকেলের চশমা চোখে, বিরলকেশ, খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ, মুখ রোগা চেহারার নগেন দত্ত। আপনি কখনো তাকে দেখেছেন? দেখেন নি। দুবেলা তো রাস্তাটা পার হন। নগেন দত্তও কিছু আয়ুর্বেদ ভবনের আলমারীর পিছনে কি বার্নিশ চটে যাওয়া ঢাউস টেবিলটার তলায় লুকিয়ে থাকে না। প্রকাশ্য রাস্তার ওপর দোকানের চার-কপাটের প্রকাণ্ড দরজা খুলে মেলে দিয়ে মানুষটা চেয়ারের ওপর বসে থাকে। সকাল সাতটা থেকে বেলা একটা। বিকেল তিনটে থেকে রাত দশটা। শনিবার আধবেলা ও রবিবার পুরো ছুটির দিনটি ছাড়া। কিন্তু বাকি সাড়ে পাঁচদিন? হ্যাঁ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত; আটচল্লিশ সাল, আটান্ন সাল—এক, একই অবস্থা, একরকম। কাজেই আপনি দেখতে পান না বলে নগেন দত্ত আপনাকে দেখে না মনে করাটা কিছু না। আপনি মাসের পয়লা তারিখ পকেট গরম করে হৃষ্টচিত্তে ঘরে ফিরছেন কি মাসের শেষদিকে মুখ আমসি করে পথ চলেন নগেন দত্ত বেশ দেখতে পায়। আপনাকে আমাকে এবং সুকিয়া স্ট্রীট ধরে যারা চলে সবাইকে। এইটে চমৎকার। নগেন দত্তকে কেউ দেখে না, নগেন দত্ত সবাইকে দেখে সব কিছু দেখে। শুধু দেখা না; দেখা এবং ভাবা। এক একটা মানুষের চলাফেরা হাবভাব আচরণবিধি লক্ষ্য করে নগেন রীতিমত চিন্তান্বিত হয়, শঙ্কিত হয়, অবাক হয়, হতাশ হয় এবং বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না। ভুসভুসে রঙের শার্ট গায়ে বেঁটে, রোগা মানুষটি আয়ুর্বেদ ভবনের চ্যবনপ্রাস মকরধ্বজ অনঙ্গ বটিকা ও ভাস্কর লবণের

শিশি, কৌটো সাজানো আলমারীর সামনে চুপচাপ বসে থেকে আপনার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ভাবছে তা আপনার পক্ষে টের পাওয়া মুশকিল বৈকি। আপনাকে এবং রাস্তার আর পাঁচজনকে নিয়ে নগেন দত্তর এত চিন্তা ভাবনা করার কারণ আছে। একটা না একশটা কারণ। আপনি বাজার করে ঘরে ফিরছেন। আপনার ডান হাতে ঝোলানো থলের ভিতর কি আছে, তা দেখা যায় না; সুতরাং নগেন তার কথা চিন্তা করে না। কিন্তু আপনার বাঁহাতে ঝোলানো বাঁধাকপিটা লক্ষ্য করে নগেন বিষণ্ণ হয়ে আছে। কেন? ছ'আনা সের এখন নতুন বাঁধাকপির। আপনার হাতের জিনিসটির আয়তন দেখে যে-কেউ অনুমান করতে পারে ন'আনা দশ আনা দাম নিয়েছে কপিওয়ালা। যদি ওজনে চুরি করে থাকে তো আরো দু' আনা। মানে বারো আনা। ভাল। আপনি হৃষ্টমনে ঘরে ফিরছেন শীতের পয়লা নতুন ফসলের স্বাদের কথা ভেবে। আর নগেন চিন্তা করছে আপনার লোকসানের কথা। আপনার গৃহিণী কপি পাতা সিদ্ধ করে সবটুকু জল নিংড়ে বার করে দিয়ে তারপর তেল দিয়ে, মুচমুচে করে ভাজবেন, তারপর কৈ-চিংড়ি কি আলু গরমমশলা দিয়ে চমৎকার ব্যঞ্জন তৈরী করবেন। আপনার রসনা তৃপ্ত হবে। কিন্তু শরীর? নগেন দত্ত শিউরে উঠছে আপনার এবং আপনার গিন্নীর অজ্ঞতার কথা ভেবে। নুন দিয়ে অল্প আঁচে বেশ ভাল করে পাত্রটি ঢেকে সব্জি সিদ্ধ না করলে তার খাদ্যগুণ উড়ে যায় এবং তারপর ভাজতে গেলে কপিপাতার কোমল ভিটামিন পুড়ে খাক্ হয়ে যায় একথা আপনাকে ডেকে বলতে পারে না বলে নগেন এত ছটফট করে। 'আমি বারো আনা পয়সা জলে না ফেলে চার পয়সার পালং শাক আনি।' আয়ুর্বেদ ভবনের চেয়ারে বসে নগেন নিজের মনে বিড়বিড় করে। 'বরং পালং শাকের খাদ্যগুণ অনেক বেশি।' হায়রে রসনার তৃপ্তি! এই তৃপ্তির কথাই নগেন চিন্তা করছিল বকুলবীর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের পাশের রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আসা ছোকরাটিকে দেখে। হুঁ চপ কটলেট খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে যুবক পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট কিনছে। তার চোখে মুখে তৃপ্তির গাঢ় ছাপ। আর নগেনের চোখে-মুখে শঙ্কার প্রগাঢ় ছায়া। কেন? রেস্টুরেন্টের খাবার তৈরী করতে কী সব মাল-মশলা ব্যবহার করা হয় এক নাগাড়ে উনিশ বছর সুকিয়া স্ট্রীটের গলির মোড়ে বসে থেকে নগেন দত্তর অজানা নেই। কেবল কি তাই। খাবার দোকানের বাসনপত্র! নিশ্চয় কেতাদুরস্ত যুবকটি কটলেট ছিঁড়ে খেতে কাঁটা চামচ ব্যবহার করেছে। তার মানে কাটলেটের এক একটি টুকরোর সঙ্গে কয়েক লাখ করে যক্ষ্মার বীজাণু নির্বিবাদে শরীরে ঢুকিয়ে অভাগা দোকান থেকে বেরিয়ে এল। রসনার তৃপ্তি! তার মানে ইন্দ্রিয়ের পরিচর্যা। এই করতে গিয়ে না সেদিন শ্যামবাজারের সেই ভদ্রলোক গাড়ি চাপা পড়ল। কার দোষ, গাড়ির ড্রাইভারের? মোটেই না, দোষ ভদ্রলোকের। কি কারণে তিনি সুকিয়া স্ট্রীটে এসেছিলেন জানা যায় নি। কিন্তু কেন তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে এই ফুটপাথ থেকে সেই ফুটপাথে ছুটে যাচ্ছিলেন পৃথিবীর আর কেউ না জানুক নগেন জানে। নগেন দত্ত বেশ কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল। এই ফুটপাথের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে হরলিকস্-এর দর জিজ্ঞেস করতে করতে হাজারবার কি তিনি সেই ফুটপাথের দিকে ঘাড় ফেরান নি? তারপর আর কি। বই বগলে করে সারদা বোসের মেয়ে রোজ যেমন স্কুলের বাস ধরতে সার্কুলার রোডের দিকে যায়, সেদিনও যাচ্ছিল। মেয়েটি কাছাকাছি আসতে ভদ্রলোক পড়িমড়ি করে রাস্তা ক্রস করতে গেছেন। হুঁ, একটা লরী। পুলিস, এম্বুলেন্স এবং মানুষের ভিড় সরতে একটু সময় লেগেছিল বটে। কিন্তু তার পরও ফাঁকা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে নগেন অনেকক্ষণ কথাটা চিন্তা করছিল। হরলিকস্ কিনতে কিনতে হঠাৎ কি আর জিলিপি খেতে উল্টোদিকের ফুটপাথের মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দিকে ছুটে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক। না সিগারেট কিনতে? তাঁর হাতে সিগারেট জ্বলছিল। সুতরাং—

বিষণ্ণ ক্লান্ত হতাশ নগেন। গোটা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থেকে তার মনের এ-অবস্থা হয়েছে। না হয়ে উপায় কি। কোনোদিকে চোখ রেখে যদি বা একটু সময়ের জন্য নগেন দত্তর বুকের ভিতর আশার আলো জ্বলতে আরম্ভ করে, সেই আলোই শেষটায় দেখা যায় দাবানল হয়ে; নগেনের চোখের সামনে জগতটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে গেল। সারদা বোসের দাদা বরদা বোস ভয়ঙ্কর সিনেমা দেখত। ভাল। পয়সা আছে। একটা নির্দোষ আনন্দ উপভোগ করতে রোজ বিকেলে সেজেগুজে আয়ুর্বেদ ভবনের সামনের রাস্তা দিয়ে বরদাকে সিনেমায় যেতে দেখে নগেন, তবু আশ্বস্ত হয়েছে। কেননা সারদা বোস বরদা বোস দু'ভায়ের বাবা অনঙ্গ বোস যদি এরকম একটা নির্দোষ নেশার জন্য পয়সা ব্যয় করত তো সুকিয়া স্ট্রীটের অত বড় বাড়ি হাতছাড়া হয়ে দু'ভাইকে আজ ভাড়াটে বাড়িতে বাস করতে হত না। যাক সে সব কথা। এখন বরদার এই সিনেমার নেশাই যে তলে তলে এমন সর্বনাশ ডেকে আনবে বরদার সংসারে, তা এমন সূক্ষ্মদর্শী নগেন দত্ত পর্যন্ত বুঝতে পারেনি। কি না বাবার মত বরদার বারো বছরের ছেলের সিনেমার শখ লেগে গেছে। একটা ছবি না, একদিন না, রোজ তিনটে করে শো দেখতে পারলে ছেলে তাই দেখে। বাড়িতে চোখ রাঙানি এবং দরকার মতন চড়-চাপড় চলেছে। জঙ্গলের ছবি সমুদ্রের ছবি বাঘ-ভালুকের সার্কাসের খেলার (আজকাল এসব নিয়েও অনেক ছবি তোলা হয় নগেন শুনেছে) ছবি যে বাপ ছেলেকে সুযোগ সুবিধা মতন না দেখিয়ে আনে তা-ও না, কিন্তু তাতে কি আর নিত্যিকার নেশার টান বজায় থাকে। কাজেই প্রথম প্রথম মা মাসি কাকা কাকী দাদা দিদির কাছে সিনেমা দেখতে পয়সা চাওয়ার পালা চলল। কিন্তু সুবিধা হয় না। একদিন দেয় তো ছ মাসে আর দেওয়ার নাম করে না। সুতরাং তারপর চলল মার বাক্স হাতড়ানো, কাকীর থলে হাতড়ানো, মামা মামীর, দাদা দিদির গুপ্ত সঞ্চয়ের সতর্ক অনুসন্ধান। তারপর আর কি। মামীর দু ভরির সোনার হার পকেটে পুরে বরদার বারো বছরের খোকনমণি একদিন সোজা চলে আসে এই সুকিয়া স্ট্রীটেরই হারান কর্মকারের দোকানে। হুঁ, বিক্রী করলে বছর ভরে তিনটে করে শো দেখা চলবে। লোভী হারান হার রেখে একটা পাঁচ টাকার নোট খোকনের হাতে গুঁজে দেয়। খোকন তাতেই খুশি। খুশি হয়ে তখনই ছুটে গেছে মাণিকতলার সিনেমাঘরে টিকিট কাটতে। বিধি বাদ সাধল, কেননা ঠিক তখন খোকনের ছোট মামা কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে সিনেমার টিকিট কাটছে। ভাগ্নের হাতে পাঁচ টাকার নোট দেখে মামার সন্দেহ হয়। সিনেমা দেখা স্থগিত রেখে ভাগ্নেকে কানে ধরে হিড়হিড় করে বাড়িতে টেনে

আনে। তারপর চলে জেরা—জেরা, তারপর চড় চাপড় কিল, তারপর সব ফাঁস হয়ে যায়। পুলিস এসে যখন হারানের সোনার দোকানের দরজায় গাড়ি থেকে নামছে, তখন বুঝি হারটা গালিয়ে ফেলতে হারান নতুন করে হাপরের আগুন জ্বালাচ্ছিল।

এই সব। এত সব ঘটনা। নগেন এমনিও সিনেমা দেখে না। কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে সিনেমা জিনিসটার ওপরই নগেনের বিতৃষ্ণা তো বটেই, ভয় জন্মে গেছে। আর পাঁচটা নেশার মতন এই নেশার পরিণামও ভয়ংকর। চিন্তা করে সে।

নগেন দত্ত সিনেমা দেখে না, খেলার মাঠেও যায় না। খেলার মাঠ, সিনেমা, রেস্টুরেন্ট দূরের কথা সাধারণ সভা সম্মেলনগুলোও নগেনকে কোনোদিন টানতে পারেনি। সেসব জায়গায় মানুষকে বাচাল হতে হয়, বিশ্রী উত্তেজনা নিয়ে মাতামাতি করতে হয়। সেবার ঢাকুরিয়ায় আয়ুর্বেদ সম্মেলনে কী বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল! দু' দলের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে শেষটায় মারামারি। একদল আয়ুর্বেদ শাস্ত্রজ্ঞ হয়েও এলোপ্যাথির সমর্থক। কিন্তু আর একদল এলোপ্যাথির ঘোর বিরোধী। তারা অবশ্য দলে ভারি ছিল। নগেন এমনিও যেত না সম্মেলনে। তার নিমন্ত্রণ ছিল না। সে ঠিক চিকিৎসক নয়। আয়ুর্বেদ ভবনের কর্মচারী। তা হলেও প্যাণ্ডেলে ঢুকতে পারার মতন জানাশোনা অনেকেই ছিলেন। যাক সেকথা। যায়নি যায়নি। পরদিন সকালে খবর-কাগজে সম্মেলনের খবর দেখে নগেন মনে মনে হেসেছিল। হেসেছিল এবং বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল।

না, পৃথিবীর কোনো উত্তেজনা, অস্থিরতা, আবেগ, মোহ, তর্জন-গর্জন উত্থান-পতনের মধ্যে নগেন দত্ত নেই। স্থাণুর মত স্থির, দেয়ালের মত নিশ্চুপ হয়ে নগেন কাঠের চেয়ারে বসে থাকে। তার কারণ, নগেন জানে যে, যেখানে যত বেশি বেগ উদ্দামতা হাসি মোহ অস্থিরতা উন্মাদনা, সেখানে যাত্রা তত সংক্ষিপ্ত, জীবন তত বিক্ষুব্ধ, বিপন্ন।

হ্যাঁ, এই সুকিয়া স্ট্রীটের নীরদ দাস অনেক উপার্জন করেছেন, অনেক খেয়েছেন, কিন্তু কতকাল তা চলল! পঞ্চাশ পুরবার আগে করোনারি থ্রম্বসিস,—জীবনের সুখ-সম্ভোগ লীলাখেলা উপার্জন প্রতিপত্তি সাঙ্গ হল। এই হয়। কাজেই আমি উঠব, আমি ছুটব, তার পাঁচজনকে পিছনে ফেলে রেসে জিতব এই মনোভাবটাই খারাপ। নগেন তা ঘৃণা করে। ভয় পায়। কথা হচ্ছে যে, আমার চলে গেলেই হল। থাক না বছরের পর বছর আমার গায়ে আড়াই টাকা দামের মোটা ছিটের শার্ট, পরনে মোটা কাপড়, সস্তা রবারের জুতো,—মাথার চুল বড় হয়েছে মুখের দাড়ি-গোঁফ পুরু হয়েছে,

হয়েছে হতে দাও, সাংঘাতিক দুর্ভাবনা নিয়ে রাত কাটিয়ে (আজকাল রাতেও সেলুনগুলোতে চুল ছাঁটানো দাড়ি কামানো চলছে,—নগেন দত্ত সতর্কভাবে সেই সব ভয়াবহ পরিবেশ বর্জন করে আসছে) সকাল না হতে তাড়াহুড়া করে আরশি সাবান ক্ষুর নিয়ে বসাটা কিছু না, পাগলামি তো বটেই, বিপদও ডেকে আনে, এনেছে; তার শালা কুমারেশের কী হল? ব্যস্তবাগীশ কুমারেশ গালে ক্ষুর চালাতে গিয়ে ব্রণের মাথা কেটে ফেলল। তারপর আর কি। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মেডিকেল কলেজ থেকে বিকৃত বীভৎস ফুলে ওঠা চেহারার কুমারেশের ডেড-বডি বার করে আনতে হল।

তার মানে, বাড়াবাড়ি করতে যাওয়াটাই ভুল। ব্রণ মজে গেলে দুদিন পর দাড়ি কামানো চলত। তাতে কুমারেশকে চিনতে কিছু কষ্ট হত না। কিন্তু মানুষ এসব চিন্তা করে কি।

আর, এভাবে সকলের মতন ছুটতে না পারার দরুণ নগেন পিছনে পড়ে আছে কি। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয়। বাইরের লোক কেন, নগেন দত্তর ঘরের মানুষটিরও ধারণা, লোকটা চিরকালের জন্য থেমে আছে। কিছুই হল না, কিছুই করল না সে। পঁয়তাল্লিশ বছর পার করেছে এভাবে, সুতরাং বাকী জীবন,—তা টেনেটুনে যত লম্বা করে ধরা হোক, আড়াই টাকা দামের ছিটের শার্ট গায়ে দিয়ে আর সস্তা রবার সু পরে কাটবে। আয়ুর্বেদ ভবনের পিছনে লাল তিনতলা বাড়ির একতলার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ঘর থেকে নগেন তো নরই, আর দুটি মানুষেরও (স্ত্রী ও ছেলে) মুক্তি নেই। পায়রার মতন থেকে থেকে রুষ্ট নগেন-গিন্নী বক্‌বকম করে এই জীবনের ব্যর্থতা ও অসারতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ধ্বনি তুলে তুলে ক্লান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আবহাওয়ার রকমফের দেখতে মানুষ যেমন অভ্যস্ত, তেমনি সরযূর রাগ দুঃখ ক্ষোভ কান্না ও দীর্ঘশ্বাসগুলো দেখতে শুনতে নগেন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিছুই গায়ে মাখে না। বরং ঘরের মানুষটি বাড়াবাড়ি করলে নগেন আঙুল দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখায়। তেতলা বাড়ির ওপর দিকের বাসিন্দা সারদা বরদাকে দেখায়। সুকিয়া স্ট্রীটের নীরদ দাসের পরিবারকে দেখায়। বেশি হতে চেয়ে বেশি খেতে চেয়ে করতে গিয়ে কী হল তাদের! বরং ওরাই থেমে আছে, থেমে গেছে। আমি থামিনি। আমার গতি অদৃশ্য। কেননা যে-অর্থে, যে-চোখে মানুষ মানুষের চলা বলা যাওয়া পরা হওয়া না-হওয়া দেখে ও বিচার করে, আমি তাদের দলে নই। আমার মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ির জঙ্গল দৃষ্টিকটু! তা হোক। সুদর্শন হতে গিয়ে আমি কুমারেশের মতন চব্বিশ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিইনি। একটা দৃষ্টান্ত। এমন ডজন ডজন দৃষ্টান্ত নগেন হাতের মুঠোয় জড়ো করে রেখেছে। দরকার মতন সেগুলো স্ত্রী পুত্রের চোখের সামনে তুলে ধরে। একটু আগে নরহরি (নগেনের বারো বছরের একমাত্র পুত্র-সন্তান) আয়ুর্বেদ ভবনের রং-চটা টেবিলের ওপাশে লোহার চেয়ারে বসে বাবার কাছে চাণক্যশ্লোক বুঝে গেছে। সর্বেন্দ্রিয়ানি সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো জনঃ। দেশ কালোপপন্নানি সর্বকার্যানি সাধয়েৎ॥ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ বকের ন্যায় সমস্ত ইন্দ্রিয়কে নিজের বশে রেখে এবং দেশ কাল ও শক্তি বিচার করে সুযোগ বুঝে আপন কাজ সিদ্ধি করে।

শ্লোক মুখস্থ করতে করতে হঠাৎ বুঝি নরহরি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। দোকানের দরজায় কাঁচ পরানো টিনের বাক্সে ব্যাণ্ডেজের তুলোর রংএর গোল গোল রেশমী মেঠাই পুরে লোকটা এসে দাঁড়াতে নরহরি লোলুপ দৃষ্টি মেলে সেদিকে তাকিয়েছিল। নগেন ছেলেকে ধমক দিয়েছে। হাত নেড়ে রেশমী মেঠাইওয়ালাকে দরজা থেকে সরে যেতে আদেশ করেছে। যারা বুদ্ধিমান পণ্ডিত তারা ইন্দ্রিয়কে নিজের বশে রাখে, রাখতে পারে। যারা বোকা অজ্ঞান তারা পারে না। ফলে তারা ভোগে, মরে। খারাপ দুধ চিনি দিয়ে এসব খাবার তৈরী করা হয়। খেয়ে পেটের অসুখ, টাইফয়েড, যক্ষ্মা অনেক কিছু হতে পারে, হচ্ছে। বাইরের এসব খাবার খায় বলে শহরের মানুষ এত বেশি ভোগে, মরে। কথা বুঝতে শিখেছে যেদিন থেকে সেদিন থেকে নরহরি বাবার উপদেশ শুনে আসছে। চাণক্যশ্লোকের সংগে হুবহু মিলে যায়। ছোটবেলায় বাবার মুখে শুধুই নিবৃত্তির কথা শুনে রাগ করেছে অভিমান করেছে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে কেঁদেছে। এখন সে সবই বুঝতে পারছে। তার ওপর পুঁথিপত্রে এসব উপদেশ লেখা আছে দেখে নরহরির প্রবৃত্তির দাঁত-নখ সব ভোঁতা হয়ে এসেছে, যাচ্ছে। আজ সে রেশমী মেঠাই খেতে চায়নি, শুধু সেদিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু এই তাকানোটাই নগেনকে পীড়া দিয়েছে। তাই পুত্রকে ধমক, চোখ-রাঙানি, উপদেশ। লজ্জায় অধোবদন হয়ে বইয়ের দিকে চোখ রেখে চুপ করে বসে ছিল নরহরি। নগেন দেখছিল ছেলের চওড়া কপাল সরু থুতনি মাংসহীন শুকনো শীর্ণ গালের ওপর ডাঙ্গামতন চোয়াল দুটো। অনেকটা সরযূর মুখের আকৃতি। নগেন কালো বেঁটে। সরযূ লম্বা ফর্সা। নরহরির রং আরো বেশি ফর্সা। মার মতন শরীরের লম্বাটে ধাঁচ পেয়েছে বলে এমন রোগা দেখায়। এটা অবশ্য থাকবে না। এখন বয়ঃসন্ধি চলেছে নরহরির। বছর দুই পার বোঝা যাবে শরীরের আসল কাঠামো। সে যাক। নগেন চিন্তা করে অন্য কথা। পুরুষের গায়ের রং এতটা ফর্সা হওয়া বাঞ্ছনীয় কি না। যদি শরীরের শক্ত মজবুত গড়ন থাকে, তবে গৌরবর্ণে আপত্তি নেই। যদি রোগা হয় আর তার ওপর রং অতিরিক্ত উজ্জ্বল হয়, তবে সেই পুরুষকে পুরুষই মনে হয় না। বলতে কি, সেই পুরুষের পৌরুষ সম্পর্কে সন্দেহ জাগে, মনে হয় তার মধ্যে স্ত্রী প্রকৃতির আধিক্য রয়েছে। এই রকম স্ত্রী-প্রকৃতিসম্পন্ন দু-দশটা পুরুষকে নগেন রোজই সুকিয়া স্ট্রীটের রাস্তায় দেখছে। দেখছে আর তাদের সম্পর্কে নানারকম আশংকা উদ্বেগ কৌতূহল দুর্ভাবনা নগেনকে পীড়িত ক্লান্ত করছে। তার কারণ আছে। সংসারের হাজার ঝড়-ঝাপটা প্রলোভন প্ররোচনা পুরুষকেই পুরুষ থাকতে দিচ্ছে না। তার ওপর যদি কোনো পুরুষ নারীসুলভ কোমল অন্তঃকরণের অধিকারী হয়, তবে তার বিপদ নিশ্চিত।

এসব ভেবে নরহরি সম্পর্কে নগেনকে একটু বেশিরকম সজাগ ও সচেতন থাকতে হচ্ছে। ছেলেকে দেখতে দেখতে নগেন দত্ত হঠাৎ

চমকে উঠল। ছেলের শার্টের পকেটের দিকে নগেনের শ্যেন দৃষ্টি।

'ওটা কি, খোকা?'

যেন নতুন করে ভয়ে পেল, নতুন করে চমকে উঠল নরহরি। বই থেকে মুখ তুলে বাবাকে দেখল।

ছেলে কোনো কথা বলার আগে নগেন হাত বাড়িয়ে ছেলের জামার পকেট থেকে বস্তুটা টেনে বার করল। সুদৃশ্য একটা টর্চ-লাইট। নিকেলের আংটা পরানো। খুব নতুন না। একদিকের রং ঈষৎ চটে গেছে।

টর্চ হাতে নিয়ে নগেন দত্ত হতবাক।

নরহরিও কথা বলছে না।

নগেন ঢোক গিলল।

নরহরি চাণক্যশ্লোকের ওপর আবার ঝুঁকে পড়েছিল।

"কথা বলছিস না যে!' নগেন এবার হুঙ্কার ছাড়ল। হাতের জিনিসটা ঠক্ করে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল, তারপর অস্পৃশ্য বস্তুর দিকে মানুষ আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে যেভাবে তাকায়, সেরকম প্রবল ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা নাকে চোখে ও ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে নগেন বিকৃতস্বরে প্রশ্ন করল, 'কোথা থেকে এল এটা, কোথায় পেলি?'

ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে নরহরি। কথা বোঝা যায় না। ঠোঁটের কোমল লাল রং দেখে সরযূর ঠোঁট জোড়া মনে পড়ে নগেনের। তাই যেন তার মাথাটা আরো বেশি গরম হয়।

'মুখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে? তোর জিভের রস নেই?'

'পেয়েছি।' নরহরি মুখ খুলল।

নগেন দু হাত লম্বা করে দিয়ে এবার ছেলের কান দুটো ধরে প্রবল ঝাঁকুনি দিল। 'পেয়েছি, কোথায় পেয়েছিস? রাস্তায়?'

নরহরির গৌরবর্ণ মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আবার চুপ।

কান ছেড়ে দিয়ে নগেন কটমট করে ছেলের মুখ দেখে।

'কি, কথা বলছিস না যে?'

'ইস্কুলে একটা ছেলে ফেলে গিয়েছিল।' নরহরি কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'আমি, আমি—'

'তুই অমনি ওটা তুলে নিয়ে এলি, কেমন?'

নরহরি আবার চুপ।

'যাও, যেখান থেকে টর্চ কুড়িয়ে আনা হয়েছে সেখানে রেখে এসো গে।'

'আজ ইস্কুল ছুটি।'

তাও বটে। আজ রবিবার।

একটু চিন্তা করে নগেন বলল, 'বেশ, কাল স্কুলে গিয়েই হেড-মাস্টারবাবুর কাছে ওটা জমা দেবে। হুঁ, ক্লাসে ঢোকার আগে হেডমাস্টারের কাছে যাবে। সত্য কথা বলবে। বলবে ওটা কে ফেলে গিয়েছিল। শনিবার

দিন আমি কুড়িয়ে পেয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলাম। এখন প্রকৃত মালিককে আপনি ডেকে দিয়ে দিন, স্যার।'

নরহরি ঘাড় কাত করল।

নগেন কিছুটা স্বস্তিবোধ করল। সোজা হয়ে বসল।

'পরের জিনিস না বলে নিজের কাছে একবেলার জন্য রাখাও পাপ, চুরি এটা। ছোটখাট চুরি থেকে বড় বড়—' চৌর্যবৃত্তির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে নগেন দীর্ঘ বক্তৃতা করল।

বক্তৃতা শুনে নরহরি আরো কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে থেকে পরে বই তুলে একসময় উঠে পড়ল। একলা চুপ করে কাঠের চেয়ারে বসে থেকে নগেন সবটা ব্যাপার আবার গভীরভাবে চিন্তা করল। ফ্যান্সী জিনিস চোখে পড়েছে তাই কুড়িয়ে এনেছে খোকা। আবার ফিরিয়ে দেবে, এরকম একটা ইচ্ছা তার মনে আছে। না হলে আমার সামনে ওটা পকেটে করে এখানে পড়তে আসত না। আমার ছেলে, আর যা-ই হোক, চোর ছ্যাঁচোড় হবে না। হতে পারে না। তা হলে আর এতকাল কী শিক্ষা দিলাম।

নগেনের চিন্তায় ছেদ পড়ল।

লোকটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে ভিক্ষা চাইছে। নগেন কথা না কয়ে হাত তুলে তাকে চলে যেতে ইঙ্গিত করল। সারা দিনে এমন পাঁচ সাতটা ভিক্ষুক আয়ুর্বেদ ভবনের দরজায় এসে দাঁড়ায় আর পাঁচ সাতবার হাত তুলে তাকে চলে যেতে ইশারা করে। না, নগেন কাউকে ভিক্ষা দেয় না। তার কারণ আছে। এদের মধ্যে যে অনেকেই পেশাদার ভিক্ষুক রয়েছে এবং অনেকেরই ভিক্ষার উপার্জন অপর লোকের তহবিলে গিয়ে জমা হয় নগেনের জানা আছে, কিন্তু তার ভিক্ষা না দেবার কারণ ঠিক সেটা নয়। সকলের যেমন ভিক্ষা করার অধিকার থাকে না, তেমনি সকলেরই ভিক্ষা দেবার অধিকার আছে নগেন স্বীকার করে না। সকলের অধিকার থাক বা না থাক, নগেনের নেই এটা সে অত্যন্ত ভাল করে জেনে নিয়েছে সাত বছর আগে। হ্যাঁ, এই আয়ুর্বেদ ভবনের দরজায় মেয়েটা এসে নগেনের কাছে মুড়ি খাবে বলে একটি পয়সা চেয়েছিল। এক পয়সার মুড়ি খেয়ে ওর ক্ষুধা মিটবে না চিন্তা করে নগেন পকেট থেকে একটা ডবল পয়সা তুলে দরজার বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছিল। তারপর কী বিশ্রী ব্যাপার ঘটল! পয়সাটা পেভমেণ্ট থেকে গড়িয়ে রাস্তায় চলে যায়। ডবল পয়সা দেখে খুশিতে দিশাহারা হয়ে ভিক্ষুকনী ওটা কুড়িয়ে আনতে রাস্তায় ছুটে যায়। হুঁ, একটা ভারি লরী। সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটা শেষ হল। আর সে দিন থেকে নগেনও প্রতিজ্ঞা করল আর কোনো দিন সে হাত বাড়িয়ে কাউকে কিছু——

এটা একটা প্রকাণ্ড অভিজ্ঞতা হয়ে আছে নগেনের জীবনে। কিছু চাইতে যাওয়া পেতে চাওয়ার মধ্যে যেমন সংযম ও সাবধানতার প্রশ্ন ওঠে, তেমনি দিতে চাওয়া দিতে যাওয়ার সময়ও সংযমী হতে হয় মানুষকে, অতিমাত্রায় সতর্ক হতে হয়। না হলে বিপদ নিশ্চিত।

কাজেই এখন ভিক্ষুক দেখলে তাকে চোখ বুজে চলে যেতে বলতে নগেন একটুও অস্বস্তিবোধ করে না। এখনও করল না। সুকিয়া স্ট্রীটের ধোঁয়াটে রঙের শীর্ণ আকাশের দিকে চোখ মেলে দিয়ে নগেন আর একটা কি কথা যেন চিন্তা করতে যাবে। চিন্তায় ছেদ পড়ে। সারদা বোস। নগেনের ওপরতলার বাসিন্দা। সব-চেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী। বলতে কি, সারদাকে দেখে নগেন কোনোদিনই শান্তি পায় না। কেমন যেন একটা দৈহিক যন্ত্রণা-বোধের মতন যন্ত্রণাবোধ করতে থাকে সে, যতক্ষণ সারদা টেবিলের উল্টোদিকের লোহার চেয়ারটায় বসে থাকে, গল্প করে। নগেন বন্ধুস্থানীয় সারদার সঙ্গে কথা বলে যায় বটে, কিন্তু তার ভিতরের অশান্তির মাত্রাটা ক্রমেই বাড়তে থাকে। কারণ আছে। কারণ সারদার দেহের সাংঘাতিক স্থূলত্ব, অপরি-মিত মেদ চর্বি। মানুষটা বসে থেকেও হাঁপাতে থাকে,—যেন বসে থাকাটাও তার কাছে শ্রান্তিকর। মেদের বোঝা পাপের বোঝা। সারদার থলথলে হাত-পা'র দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে নগেন নিজের শীর্ণ শুকনো হাড় দুটো দেখে, পা দুটো দেখে। দেখে প্রগাঢ় শান্তি পায়। না হঠাৎ সে মরবে না। মরতে হয় সারদাই আগে মরবে। অ্যাকসিডেণ্টের কথা হচ্ছে না। অসুখে হয়েই মরবে। এত মোটা হতে থাকলে সারদার হার্টের ব্যারাম হতে বেশি দিন না। বা ডায়বেটিজ, ব্লাড প্রেসার। প্রেসারের পরিণতি থ্রম্বসিস। আসল কথা হচ্ছে সারদা অসংযমী। শাক-ভাত খাক কি মাংস-ভাত খাক, যখন খেতে আরম্ভ করে সারদার নিশ্চয়ই খেয়াল থাকে না কী পরিমাণ সে ভিতরে ঢোকাচ্ছে। অবশ্য বন্ধু হিসাবে নগেন যে সারদাকে সাবধান করে না দিচ্ছে এমন নয়। আলু খাবে না, চিনি খাবে না। রাত্রে ভাত না খেয়ে দুখানা চাপাটি দিয়ে কাজ সারবে। চর্বি জাতীয় খাদ্য একেবারে অচল। কিন্তু শোনে কে। যদি শুনত সারদার আজ এই অবস্থা হত না। দুখানা? রাত্রে দশ-বারোখানা হাত-রুটি এবং প্রচুর তরকারী ছাড়া সারদার পেট ভরে না। একই বাড়ির ওপরতলা আর নিচতলা। কাজেই প্রতিবেশী সারদার খাওয়া পরার কিছু কিছু কাহিনী নগেনের কানে আসে। নগেন আড়চোখে সারদাকে দেখতে দেখতে এখন সে-কথাই ভাবছে। মূর্খ,—অপরিণামদর্শী। তোমার সর্বনাশ তুমি নিজে ডেকে আনছ...

'কি বললে, কিসের কথা বলছ?' নগেন থুতনি নাড়ল, ভুরু কুঁচকাল। সারদা খবর-কাগজের পাতায় চোখ রেখে বিড়বিড় করে কি বলছিল। নগেন প্রশ্ন করতে সারদা কাগজ থেকে চোখ তোলে।

'আরে ব্রাদার, সকাল থেকে মনটা এমন খিঁচড়ে আছে!'

'কেন, কি হয়েছে?' নগেন হাত নেড়ে টেবিলের মাছিটা সরিয়ে দেয়। 'গিন্নীর সঙ্গে ঝগড়া করে এলে নাকি!' নগেন হাসল।

সারদা হাসল না। মাথা নাড়ল। গাল গলার মাংস চর্বি থলথল করে উঠল।

'তা না, তা নয়। ঐ বাচ্চাকাচ্চাগুলোর যন্ত্রণায় বাড়িতে তিষ্ঠোন দায়।'

নগেন চুপ করে থাকে।

'বুঝলে ব্রাদার, আমি পই পই করে বারণ করি শুয়োরগুলো যেন আমার ঘরে না ঢোকে, আমার টেবিল না ছোঁয়, তা শুনেছে না তো।' সারদা চেহারাটাকে বিকৃত করে ফেলে। তার তিনটি সন্তান, তার দাদা বরদা বোসের চারটি। নগেন মনে মনে হিসাব করে। কথা বলে না। সারদার হাতের মোটা চ্যাবচেবে আঙুলগুলো দেখে। যেন জলে ভর্তি। শাঁস বলতে ভিতরে কিছু নেই! 'তুমি মরে যাবে, তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।' চিন্তা করে নগেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সারদা চোখ বুজে আছে। চোখের পাতা দুটোও যেন জল টুসটুসে।

'কি হয়েছে, কী করেছে বাচ্চাগুলো?' নগেন এতক্ষণ পর আলগাভাবে প্রশ্ন করল। সারদা চোখের পাতা খুলল।

'আর বলো না ব্রাদার,—' সিমেণ্টের থলের মতন গাল দুটো ঝুলিয়ে দেয় সারদা। 'কদিন থেকে ভাবছি ব্যাটারী ফুরিয়েছে, ব্যাটারী কিনে টর্চ-লাইটটা আবার ব্যবহার করব,—কাল বিকেল থেকে দেখছি ওটা টেবিলে নেই,—নেই—নেই—নেই......'

'কি হয়েছে? কোথায় গেল ওটা!' তেতো-মতন একটা ঢোক গিলল নগেন এবং বেশ

সতর্কভাবে প্রশ্ন করল, 'কত বড় টর্চ তোমার?'

'এইটুকুন, খুব বড় না—মানে পকেটে রাখা-টাখা যায় এমন সাইজ।'

নগেন চুপ করে থাকে।

সারদা ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

'দাদার ছেলেমেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম—জানিনে; —আমার গুলোকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম—জানিনে; দেখিনি। বৌ জানে না, বৌদি জানে না, পিসিমা জানে না, ঝি জানে না। তবে আমার টর্চটা গেল কোথায়? ওটার পাখা আছে!' সারদা হাঁ করে থাকে। তার চওড়া লাল জিহ্বাটা দেখা যায়। নগেন অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সারদা বলল, ''একটা শখের জিনিস, বুঝলে না ব্রাদার—আমার অনেক দিনের টর্চ, সেই যখন কলেজে পড়তাম।'

'অনেক দিনের কথা, বেশ বয়েস হয়েছিল তোমার টর্চবাতির।' নগেন হঠাৎ হাল্কাভাবে হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু সারদার মুখের ভাব দূর হল না।

'অনেক দিন হয়েছে বলেই তো হারিয়ে মনটা খারাপ লাগছে।' যেন সারদা এবার তেতোমতন ঢোক গিলছে। নগেন অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নেয়। তারপর অনেকটা ওষুধের আলমারীকে সম্বোধন করার মতন করে বলে, 'তোমরা এত সব বাড়তি জিনিস মানে বাজে জিনিস ঘরে রাখো কেন, আমি বুঝি না। ঘরে ইলেকট্রিক আছে, রাস্তায় আলো থাকে—পাড়াগাঁ না এটা, ঝাড়জঙ্গল, খানাখন্দর নেই। তবু একটা টর্চলাইট রাখতে হবে, থাকতে হবে কেন, বুঝি না।'

সারদা নীরব।

কিছুক্ষণ থেমে থেকে নগেন আরম্ভ করে, 'একটা টর্চ রাখতে হবে, দরকারে আসুক না আসুক, একটা ছুরি রাখতে হবে, ছড়ি রাখতে হবে, হ্যান্ড-ক্যামেরা থাকবে, সাইকেল থাকবে—সাইকেল, হার্মোনিয়াম—কি রেডিওকেও আমি অপ্রয়োজনীয় জিনিস মনে করি। কিচ্ছু দরকার নেই। এমনি ত কলকাতা শহরে চারদিক হৈ-হল্লা, গানে-বাজনায় মাতোয়ারা। ঘরের ভিতর আর গোলমাল বাড়ানো কেন।' চোখ দুটো দার্শনিকের মতো ওপর দিকে তুলে দিয়ে নগেন বলল, 'থাকলে হাঙ্গামা, মেরামত করতে দাও দোকানে, চাবি ভেঙে গেছে, ব্যাটারি ফুরিয়েছে, কিনে আন চাবি, নতুন ব্যাটারি, নতুন......আর হারিয়ে গেলে, চুরি গেলে বুক চাপড়ানো, হায়-হুতাশ করা—ভারি বিশ্রী!'

সারদা হাঁ করে তাকিয়ে থেকে শুনল। তার ডাবডেবে চোখ জোড়া দেখলে বোঝা যায়, ভিতরে ভিতরে সে অত্যন্ত বেদনাবোধ করছে। এত কথার পরও টর্চলাইটের শোক তার হৃদপিণ্ডকে কামড়ে ধরে আছে বোঝা যায়। সারদা বোসকে অনুকম্পা করা ছাড়া আর কি করতে পারে নগেন দত্ত ভেবে পেল না।

আর একটু সময় হাতের কাগজটা নাড়া-চাড়া করে সারদা চেয়ার ছেড়ে উঠল। একটা আধ-ময়লা গেঞ্জি গায়ে। চর্বির ঠেলায় পিঠের দিকটা ফেটে গেছে। ক'দিনের মধ্যে যে ওর কলজে ফেটে যাবে না কে বলবে, নগেন চিন্তা করল।

'চলি ব্রাদার; ওবেলা আসব।' ঘাড় না ফিরিয়ে সারদা কথা বলে।

'আচ্ছা, আজ তো রবিবার, তোমার ছুটি, ওবেলা এসো।' নিস্পৃহ কণ্ঠে নগেন বলে। বলতে হয় বলে বলা। না হলে তেমন কিছু একটা আকর্ষণ নেই মেদসর্বস্ব মানুষটার যে, নগেন খুব একটা আগ্রহ নিয়ে তাকে...

সারদা বেরিয়ে গেল।

নগেন রাস্তা দেখে। মেঘলা দিন। সব কিছুর কেমন ঘোলাটে চেহারা। গাড়ির রং, জুতোর রং, রিস্টওয়াচের রং, রিক্সার রং, রাস্তার পীচের রং, মিস্টির দোকানের সাইনবোর্ডের রং, ওপারের স্টেশনারী দোকানের শো-কেস-এর বার্নিশ সব এক-রকম দেখাচ্ছে। একটা থেকে আর একটার একটুও আলাদা চেহারা নেই। মাঝে মাঝে এরকম হয়। এরকম দেখানোটা এক দিক দিয়ে ভাল। সিল্ক, সুতী, নাইলন, খদ্দর সোনা, রোঞ্জ, রবার প্লাস্টিকের বৈষম্য দূর হয়। অন্তত কিছু সময়ের জন্য মানুষ মানুষের কাছে আসে। নগেনের এটা ভাল লাগে।

'খোকন!'

'কি বাবা?'

পড়া শেষ করে নরহরি সম্ভবত খেলতে যাচ্ছিল। বাবার ডাক শুনে ভিতরে ঢোকে।

এখন আর ধমক চোখ-রাঙানির সময় না নগেন ভাবল। ঐ যা একবারই হয়েছে। সারদার টর্চ আর স্কুলের সহপাঠীর টর্চ এক কথা। ওখান থেকে আনা আর এখান থেকে আনার মধ্যে বেশকম কিছু নেই। আনাটাই সত্য। এবং তা ফিরিয়ে দেওয়া।

নগেন এক মিনিট চুপ করে ছেলের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আমায় কিছু করতে হবে বাবা?'

'হুঁ,' নগেন ঘাড় কাত করল, 'ওপরে সারদাদের ঘরে বারান্দায় অত হুটহাট যাওয়া আমি পছন্দ করি না। আর, সেই-আঙুলে পুরনো টর্চ, ওটা যে মানুষের কী কাজে লাগে, জানি না—যাকগে, যেভাবে যেখান থেকে তুলে আনা হয়েছে, সেটা এখনি গিয়ে আবার সেখানে সেভাবে রেখে এসো।'

নরহরির মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে, কি হাওয়া-ছাড়ানো বেলুনের মত চুপসে গেছে তাকিয়ে দেখতে মোটেই গ্রাহ্য করল না নগেন। ঐরকম একটা কিছু হয়েছে আন্দাজ করে নরহরি দ্রাক্ষারিষ্টের বোতলের গায়ের লেবেলটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে।

'কি দাঁড়িয়ে যে?' নগেন চোখ ফেরায়।

'ওদের ঘরে এখন লোক আছে, রাখতে গেলে ধরা পড়ব।' অধোবদন নরহরি পায়ের আঙুল দিয়ে মেঝে ঘষে।

'বেশ, যখন লোক থাকবে না, তখন রেখে আসবে। মোট কথা, আজ রাত হবার আগে ওটা সারদার টেবিলে রেখে আসা চাই। না হলে রাতে ও ঘুমোতে পারবে না। দেড় টাকা দামের পুরনো রং-চটা টর্চও কারো কারো চোখের ঘুম হরণ করে।'

নরহরির ঠোঁটের কোণা ঈষৎ নড়ে ওঠে। বাবার কথাটা সুড়সুড়ির মত লাগে যেন। কিন্তু প্রাণখুলে হাসতে পারে না। এখানে সে এক নম্বরের আসামী তাই।

'ভূতের মতন দাঁড়িয়ে থাকলে হবে কি—যা বলা হয়েছে সেরে ফেল।' নগেন দত্ত ছোট মতন একটা হুঙ্কার ছাড়ে। নরহরি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নরহরি বেরিয়ে যেতে নগেন চেয়ারে স্থির হয়ে সোজা হয়ে বসে, হাল্কাবোধ করে। হাল্কাবোধ করে এই কারণে যে, একটু আগে যেটা স্কুলের সহপাঠীর দ্রব্য ছিল, এখন সেটা সারদার হয়ে গেছে শুনে নরহরি একবার প্রতিবাদ করল না। তার মানে চুরি করার মন নিয়ে সে ওটা তুলে আনেনি। নগেনের ছেলে চুরি করতে পারে না। নগেনের মধ্যে চুরির প্রবণতা নেই, কোনোদিন ছিল না। সুতরাং নরহরিও—

হৃষ্টমনে নগেন দত্ত মেঘলা দিনের মলিন আলোয় রাস্তা, রাস্তার মানুষ, গাড়ি-ঘোড়া দেখে কাটাল।

হ্যাঁ, তখন বেলা তিনটে হবে। হোস-পাইপ খুলে দিয়ে ভিস্তিওয়ালা রাস্তা ভিজিয়ে দিয়ে গেছে। দুপুরের ঝিমুনি কাটিয়ে সুকিয়া স্ট্রীট আবার সরগরম হতে আরম্ভ করেছে। হাসতে হাসতে সারদা বোস আয়ুর্বেদ ভবনের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকল। যেন এক দুপুরের মধ্যে তার শরীরটা আরো থলথলে হয়ে গেছে। চোখের পাতা টুসটুসে হয়ে আছে। তিনদিন তিনরাত এক নাগাড়ে ঘুমিয়ে ওঠার পর কি তিন তিনটে মৃত্যুর শোকে বিস্তর কাঁদাকাটা করার পর মানুষের চোখের পাতার এমন ফোলা ফোলা চেহারা হতে পারে। চিন্তা করে নগেন মনে মনে হাসল এবং সারদা বোসকে নতুন করে ঘৃণা করল। এতটুকু সংযম নেই লোকটার। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খেয়ে খেয়ে ও যে আয়ুর বারোটা বাজিয়ে ফেলেছে, যদি একদিন একবারও চিন্তা করত!

'কি বলছ, কিসের কথা বলছ?' অপ্রসন্ন ভুরু জোড়া সারদার পাকা পেঁপের মতো, এখানে-ওখানে টোল খাওয়া গাল দুটোর দিকে ধরে রেখে নগেন বলল, 'ভায়াকে বেজায় খুশি-খুশি দেখাচ্ছে—কি ব্যাপার?'

'পেয়ে গেছি—ঘুমিয়ে উঠে দেখি, টর্চটা আবার ঠিক টেবিলের ওপর রয়েছে। যেমনটি ছিল হা-হা।'

সারদার ডান হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা রং-চটা টর্চটার ওপর দৃষ্টি পড়ল নগেনের। কথা বলল না এবং টর্চ ফিরে পেয়ে সারদার এত আহ্লাদ হয়েছে যে, চেয়ার টেনে বসতে পারছে না এমন, নগেন লক্ষ্য করল।

'সাংঘাতিক এক মূল্যবান সম্পদ উদ্ধার করেছ আর কি।' সারদার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে নগেন বিকৃতস্বরে মন্তব্য করে। কিন্তু সারদা তা গায়ে মাখে না।

'বুঝলে ব্রাদার, বাড়িতে একপাল ছেলে-মেয়ে তো—কোন দুষ্টুটা জানি সরিয়ে রেখেছিল—চোটপাট করতে আবার কোন্ ফাঁকে জানি রেখে গেছে, হা-হা।'

'তা চেয়ারটায় বোস না, বসতে দোষ কি।' নগেন বিড় বিড় করার মতন করে বলে, 'দেড় টাকা দামের পুরনো একটা টর্চ......' নগেনের শেষের দিকের কথাগুলি একেবারেই বোঝা যায় না। ঠোঁটের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।

কিন্তু বুঝতে পারলেও সারদা বড় একটা গ্রাহ্য করত কি?

'এটা কি আমার আজকের জিনিস, সেই কলেজের আমলের।' সারদা সারদার কথা বলে যায় আর ডান হাতের মুঠো থেকে বাঁ হাতের মুঠোয় টর্চলাইট চালান দিয়ে কি ভেবে যেন ঘুরে দাঁড়ায়। কোথায় যাচ্ছে ও?

'কোথায় যাচ্ছ, কোথায় চললে?' নগেন একটু অবাকই হয়।

'বোস বোস ব্রাদার, আমি এখুনি আসছি—স্টেশনারী দোকানটা খুলেছে'—যেন কেমন উদভ্রান্তের মতো সারদা দরজার কাছে সরে যায়। 'অনেকদিন ব্যাটারি ফুরিয়েছে আমার বাতির, আজই এখুনি একটা ব্যাটারি কিনে ফেলা যাক।' বলতে বলতে শিশুর মতো, পাগলের মতো হয়ে গিয়ে সারদা বোস চৌকাঠের বাইরে নেমে গেল।

এবং আয়ুর্বেদ ভবনের নীরব অন্ধকারে পুরনো কাঠের চেয়ারটায় চুপচাপ বসে থেকে নগেন দত্ত উল্টো ফুটপাথের স্টেশনারী দোকানে যাবে বলে মেদসর্বস্ব মানুষটার থপ থপ করে রাস্তা ক্রশ-করা দেখতে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল। যেমন এই চেয়ারে বসে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শীতে-গ্রীষ্মে, বর্ষায়-হেমন্তে সে রাস্তার সবকিছু দেখে, সবাইকে দেখে। অথচ তাকে কেউ দেখে না। যেমন পায়ের নিচের কালভার্ট রাস্তার পাশের লাইট-পোস্ট, ময়দানের মনুমেণ্ট কারোর চোখে পড়ে না। হ্যাঁ, এখনও নগেনকে কেউ দেখল না। রোগা বেঁটে ভুসভুসে ছাই-রং শার্ট গায়ে দার্শনিক নগেন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব দেখল। পুলিস সরে গেল, এম্বুলেন্স ফিরে গেল, ভিড় ভেঙে গেল। দেখার আগেই নগেন দত্ত জিনিসটা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু একথা সে কাউকে ডেকে বোঝাতে চায় না। বোঝালেও বুঝবে না বলে নগেনের চুপ করে থাকা। কেবল তার কাঁচা পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে দেশলাইয়ের কাঠির নিভন্ত আগুনের মতো একবার একটুখানি হাসি চিকিয়ে ওঠে আর এক দিনের ছবিটা মনে পড়ে। এই সারদা বোসেরই স্কুলে-পড়া বেণী দোলানো মেয়েকে দেখতে দেখতে রাস্তা পার হতে গিয়ে ভদ্রলোক সেদিন—

দেশলাইয়ের কাঠি ছাই হয়ে যায়। নগেন দত্তর কালো শীর্ণ ঠোঁট মরা শিং মাছের মতো শক্ত হয়ে ওঠে। সব অসংযমই অসংযম। দেড় টাকা দামের রং-চটা টর্চ বলে সারদা অব্যাহতি পেল কি! গভীর নিশ্বাস ফেলে নগেন নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করে।

[১৪]

সেদিন দরজা খুলে দিয়েছিলেন শচীপতি। খুলে দিয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পথ ছেড়ে দেননি। অনেকক্ষণ নির্নিমেষ চোখে সৌরর দিকে চেয়েছিলেন। পাকা জহুরী যেন যাচাই করে নেবে, মালটা সোনা না পিতল, সাচ্চা না ঝুটো। সেই দৃষ্টিতে কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাবও ছিল। পরে আশ মিটিয়ে দেখা সারা হলে হাতটা নাড়ু দেবার ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শচীপতি বলে উঠলেন, "নেই।"

"নেই?" সৌরর গলায় প্রশ্নটা প্রতিধ্বনির মত বেজে উঠল।

শচীপতি আবার বললেন, "নেই।"

তিনবার চৌকাটের সামনে একটা শব্দই উচ্চারিত হল, যে শব্দটা প্রশ্ন, সেই শব্দই উত্তর। একবার, মাত্র একবারই, সৌরর গা ছমছম করে উঠেছিল: মনে হয়েছিল, কোন গুপ্তচক্রের সাংকেতিক ভাষায় সে পাঠ নিচ্ছে।

একটু পরে অবশ্য আড়ষ্ট ভাবটা আর ছিল না। শচীপতি ওকে ঘরের ভিতরে ডেকে নিয়েছিলেন।

যতদূর মনে পড়ে, সেটা শনিবারের কোন বিকাল। হঠাৎ কী কারণে যেন ছুটি হয়ে গেল। হুড়মুড় করে সকলে রাস্তায় এসে দাঁড়াল। সৌর ভাবছিল, এর পরে কী। বিজনের দিকে চেয়ে মনে হল, সে-ও একই কথা ভাবছে। অল্প অল্প হাওয়া দিচ্ছিল, আকাশে মেঘ ছিল। তবে হেমন্তের মেঘ, সব ময়লা ধুয়ে, নিংড়ে কাচা কাপড়ের মত ধোপদুরস্ত। "কোথায় যাবি", সৌর একবার ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করেছিল। বিজন অন্যমনস্ক ছিল, বলল, "কোথাও না।"

"সিনেমায়?"

"না। সব বাজে ছবি।"

সৌর বুঝল, বিজনের ইচ্ছে নেই, শুধু একটা ইংরিজী ছবির নাম করল। বিজন তাই শুনে বলল, "দূর! ট্রাশ, ট্রাশ একেবারে। ছবিটার আমি ট্রেলার দেখেছি। কোন থ্রিল নেই, খালি ফ্যাচ-ফ্যাচ কান্না, আর হা-হুতাশ।

সৌর বলল, "ও" তার খারাপ লাগছিল। এই মেঘলা দুপুর আর জুড়োন রোদ, এর সঙ্গে মন খারাপ হয়ে যাওয়ার সূক্ষ্ম একটা সম্পর্ক আছে। কাটা ফলওয়ালার ডালার টকটকে বাতাবি নেবু আর ফিকে সবুজ শসার ফালির চারপাশে মাছি উড়ছিল, আর যার গলায় ঝোলান কাচের বাক্সে গোলাপী রঙের লাড্ডু আছে, সেই পশ্চিমা ফিরিওয়ালা শোকসংগীতের সুরে খদ্দের ডাকছিল। ওই ফোলা ফোলা লাড্ডুগুলো হাওয়ায় মিইয়ে যায়, মুখে দিলে আঁশ আঁশ তুলোর মত লাগে, কিন্তু গলে যায়, জিভ রাঙা হয়ে একটুখানি মিষ্টতার স্বাদ ধরে রাখে। একটা ছাগল কোথা থেকে ছাড়া পেয়ে ডাস্টবিনের পাশের কলাপাতায় মুখ দিয়েছে, তার বাঁটগুলি থলথলে ভরাভরা, তার গলায় ঘণ্টি বাজছে।

সৌর দেখছিল, যত দেখছিল, ততই তার মন খারাপ লাগছিল। পরিণত বয়সে মন খারাপ হলে লোকে তাকে নিজের ভিতরে

লুকিয়ে রাখে, একা হতে চায়, কিন্তু তখন মনে হত, অন্য কাউকে আমার অনুভূতির ভাগ দিই। আমি পেয়ালায় চুমুক দিই, পাশে বসে সে-ও প্লেটে ঢেলে ঢেলে খাক। আড়চোখে বিজনের দিকে চেয়ে সৌর বুঝতে পারছিল, সে-লোক বিজন নয়। ওকে কিছু ঢেলে দেওয়া চলবে না।

তবু, কী করি, এই দুপুরটা নিয়ে কী করি। সৌর অস্থির হয়ে উঠছিল। আকাশের দিকে চাইছিল, ওই সাদা পুরু মেঘটা কেটে গিয়ে নিষ্পাপ-নীল আকাশের একফালিও দেখা যায় কিনা, সেই আশায়। দেখতে পেলেই যেন সে মনস্থির করে ফেলতে পারবে। হঠাৎ-পাওয়া ছুটিটা হঠাৎ-পাওয়া কিছু খুচরো পয়সার মত ভারী হয়ে ঝুলেছে, তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেলতে না পারলে সৌরর স্বস্তি নেই।

বিজন হঠাৎ বলল, "চলি।" বলেই পা বাড়াল।

"কোথায় যাবি?"

"আমার ভাইয়ের অসুখ। তাকে একবার বিকেলের দিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।" বিজন কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, ওর ব্যস্ততা স্পষ্ট, যেন দৌড়চ্ছে, যেন পালাচ্ছে।

সৌর বুঝতে পেরেছিল, বিজন মিথ্যে কথা বলছে। সৌর বিজনকে ঢোঁক গিলতে দেখেছিল।

লক্ষ্যহীনভাবে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর (বৈঠকখানা রোড ধরে বৌবাজার, বৌবাজার থেকে শেয়ালদা; সৌর অনেক লোকাল গাড়ির ছাড়া আর পেঁছন দেখল; শেয়ালদা থেকে কলেজ স্ট্রীট, ফুটপাথে ছড়ান পুরনো বই ঘাঁটাঘাঁটি করে, অনেক ট্রামের টিকিতে ফসফস করে আগুন-জ্বলানো দেখতে দেখতে) সৌর অবশেষে অনির্দেশ্য ইঙ্গিতে, অনিবার্যভাবে লতা বউদিদের বাসার দরজায় নিজেকে দেখতে পেল। সেদিনে আকাশের মেঘ আর ঠাণ্ডা হাওয়া নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছু আগেই সন্ধ্যাকে ডেকে এনেছে।

শচীপতি বলছিলেন, "ব'স ব্রাদার।"

ঘরের ভিতর দিয়ে ওরা ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসেছিল। সেখানে গোল একটি টেবিলের সামনে একটিমাত্র চেয়ার; আর-একটা শচীপতি নিজেই যেন কোথা থেকে টেনে আনলেন।

চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সৌর দেখছিল। সিমেণ্টে গাঁথা রেলিং, কিন্তু এখানে ওখানে আস্তর খসেছে। টবে-রাখা, জল-না-পাওয়া উপোসী একটা পাম গাছ কবে মরে গিয়েছে। সৌর নুয়ে পড়ে টব থেকে শক্ত পাথুরে মাটির একটা ডেলা তুলে নিয়েছিল, আঙুলের চাপে তাকে ফের ঝুরঝুরে ধুলো করে ফেলছিল। আর মনে মনে বিজনকে বলছিল, "মিথ্যুক, মিথ্যুক।"

শচীপতি হাসছিলেন। ফর্সা মুখে কপালের পাশের শিরাগুলো আরও নীল হয়ে ফুটে উঠছিল, রেখাগুলি কখনও মুখে গভীর চিহ্ন আঁকছিল, কখনও মসৃণভাবে মুছে যাচ্ছিল। ছোট ছোট দুটি কাচের গুলী শচীপতির চোখে থেকে থেকে ঝলসে উঠছে। মানুষের চোখের মণি এত নীল হয়? সামনের দিকের চুল উঠে যাচ্ছে, সেটা ঢাকতেই শচীপতি এত লম্বা চুল রেখেছিল কিনা কে জানে।

"তুমি হেরে গেছ" শচীপতি বললেন সৌরকে।

সৌর বলতে গেল "কিসে", কিন্তু স্বর ফুটল না, শুধু মূঢ় পিপাসাটাই মুখে ফুটে রইল।

"তুমি হেরে গেছ" শচীপতি বললেন আবার, "বিজন এই খানিক আগে এসে লতাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।"

"কতক্ষণ আগে?"

হাতঘড়িতে সময় দেখে শচীপতি বললেন, "ঠিক আধ ঘণ্টা আগে। কেন, বিজন তোমাকে বলে আসেনি?"

শচীপতি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন, শচীপতির নীল চোখ জ্বলছিল। "বুঝেছি", শচীপতি একটু পরে বললেন আস্তে আস্তে, "ও তোমাকে না বলে এখানে এসেছে। আর তুমিও ওকে বলে আসনি। দুজনেই দুজনকে লুকোতে চেয়েছ।"

শচীপতি মৃদু হাসছিলেন। একটা পরমাশ্চর্য মমতা ওঁর চোখ দুটিকে উদ্ভাসিত করে তুলেছিল।

সৌরের গায়ে কাঁটা দিয়েছিল, মাথা নিচু করে সে জিভ বুলিয়ে থরথর ঠোঁট দুটিকে সাহস দিচ্ছিল। হঠাৎ কোথায় একটা বিড়াল ডেকে উঠল, সৌরের মনে হল তার চেয়ারের পায়ার ঠিক নীচেই। আড়ষ্ট হয়ে সে তাড়াতাড়ি পা তুলে বসল। চেয়ে দেখে, শচীপতি নেই। হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

একটু পরে ফিরে এলেন শচীপতি, হাতে একটি বোতল আর দুটি গ্লাস। ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "ভয় পেও না ব্রাদার, মুষড়ে প'ড় না। এক রাউণ্ড হেরেছ, পরের রাউণ্ডে জিতবে, না হয় তার পরের রাউণ্ডে।"

সৌর বুঝতে পারছিল না, শচীপতির বক্তব্য কী। দুটি গ্লাস, একটি বোতল আর গাঢ় একটি কণ্ঠস্বর ওর মস্তিষ্কের কোষে-কোষে ছোট ছোট বিজলী-তরঙ্গ হয়ে আঘাত করছিল।

"কোন-না-কোন রাউণ্ডে তুমি জিতবেই পরে হয়ত আবার হারবে। এ-খেলায় যেটা সুবিধে, অসুবিধাও সেটাই। কোন ফাইন্যাল রাউণ্ড নেই।"

সৌর শচীপতিকে বলতে শুনেছিল, অথবা শচীপতি বলছিলেন না, শুধু সৌর-ই শুনেছিল। শচীপতি একবারই উচ্চারণ করেছিলেন কথা কয়টি, উচ্চারণমাত্র তারা অনন্তের সংগে গ্রথিত হয়ে গেল. একটি ডিস্‌ক নিরন্তর ঘুরে ঘুরে, পিনের ছোঁয়া পেয়ে বাজতে থাকল,—"এ-খেলার শুরু আছে, শেষ নেই। যাকে শেষ বলে ভাবছ, তার পরে ফের শুরু আছে।"

রেকর্ডটা আবার বাজছে সৌরর কানের কাছেই, কানের ভিতরেই, মগজে; অথবা কবিরা যা বলেন, সেইখানে—মরমে। বার বার শুনে শুনে সৌর ক্লান্ত হয়ে পড়ল, তার কান গরম হল, কথা কয়টি তার স্পষ্ট, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রইল না, এক হয়ে গেল। তখন এক ঝাঁক ঝিঁঝি পোকার ডাকই শুধু অবশিষ্ট রইল।

সৌর ভয় পেয়েছিল। ঠিক কেন, মনে নেই। ঠিক কাকে, জানে না। আপাত বিচারে মনে হতে পারত, শচীপতিকে। কিন্তু আসলে শচীপতিকে নয়। ওই আধ-অন্ধকার বারান্দা, বোতল, গ্লাস, থমথমে কণ্ঠস্বর, শীর্ণ-দীর্ঘ শচীপতির বসবার ভঙ্গি, তাঁর মাথার টাকটাকে এখন আর চেনা যায় না, কেননা আঙুল চালিয়ে চালিয়ে পিছনের চুলগুলো তিনি কপালের সামনে নিয়ে এসেছেন—এরাই কিলবিল করে যুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র একটি সত্তা হয়ে উঠেছিল, সৌর ভয় পেয়েছিল তাকে। সে স্পষ্টই অনুভব করছিল, এখানে শচীপতি ছাড়াও অন্য একজনের উপস্থিতি আছে, সে আদিতে হয়ত শচীপতির ভিতরেই ছিল, কিন্তু নিষ্ক্রান্ত হয়ে শচীপতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে, শচীপতিকেও আচ্ছন্ন করেছে। চোখ তুলে সৌর সেই আমৃত্তিকা-গগন বিস্তৃত ধূমল অবয়বের অবধি দেখতে পেল না।

সৌর ভয় পেল। এই ভয়টা নিরাকার, বায়বীয় নয়, কঠিন এবং স্পর্শসহ। সৌর তার অগ্রভূতে আঙুলগুলিও দেখতে পাচ্ছে। কী করবে সে এবার—ওর কণ্ঠনালী চেপে ধরবে, নাকি ওকে তুলে ধরে পলকে ছুঁড়ে দেবে মহাশূন্যে, যে-মহাশূন্য এখনও আদিম ভয়ে তারায় তারায় রোমাঞ্চিত হয়ে আছে।

এই ভয়টা যে স্নায়ুবিকার, দুর্বল মস্তিষ্কের কল্পনা, বহু পরে ডাক্তারদের মুখে বার বার শুনেও সৌর বিশ্বাস করেনি। দুর্বল কল্পনার সন্তান কি এত প্রবল, এত পরাক্রান্ত হয়? স্রষ্টা নিজে সৃষ্টির করতলগত কীটের মত অসহায় হয়ে পড়ে?

সৌর সেদিন মূর্ছিত হয়নি, হলে দেখতে পেত না শচীপতি তার মুখের কাছে গ্লাস ধরেছেন, তাঁর গলাও শুনতে পেত না। শচীপতি বলছিলেন, "খাও, খেয়ে ফেল, সাহস পাবে।"

সৌর দ্বিরুক্তি করেনি, রোগশয্যায় শুয়ে জ্বরের বিকারে ঢক ঢক করে ওষুধ গেলার অভ্যাস ত ছিলই, সেইভাবেই পরম তৃষ্ণার্তের মত গ্লাসের তরল আগুন গলায় ঢেলেছে। বিস্বাদ লেগেছিল, লাগুক, ওষুধও ত বিস্বাদ লাগে। গলা জ্বলছিল, বুক জ্বলছিল, জ্বলুক, সেই মহাকায় ভয়ের মায়াশরীরটা ত নিমেষে চোখের সমুখ থেকে মুছে গিয়েছে।

হাত বাড়িয়ে সৌর অস্ফুট গলায় বলল, "আরেকটু।"

শচীপতি ওর গ্লাসে আরও একটু ঢেলে দিলেন।

সৌর আর ভয় পায়নি।

যে অনুভূতিটা তারই ভিতর থেকে বেরিয়ে সাকার, বিস্তৃত, দৃষ্টি-স্পর্শগ্রাহ্য হয়ে উঠেছিল, সে পলকে অন্তর্হিত হয়েছে। তার সমুখে যে-লোকটি গ্লাস হাতে করে তাকেই লক্ষ্য করছে, এতক্ষণে সৌর যেন তাকে চিনতে পেরেছে। ভয়াচ্ছন্ন নয়নে এই লোকটাও কিছু আগে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, কিন্তু যেই চোখ থেকে কালো কাজল মুছে গেল, অমনিই লোকটাকে তার প্রকৃত স্বরূপে চিনতে পেরেছে; ওই ত শচীপতি, লতা বউদির স্বামী। মধ্যবয়স্ক শীর্ণ ভদ্রলোক, যিনি স্ত্রীর ভালবাসা পাননি, অথবা পেয়েও হারিয়েছেন। এখন ঈষৎ-পীত পানীয়ের

মুকুরে নিজের খণ্ডিত মুখবিম্ব দেখছেন। অকিঞ্চিৎকর, রুগ্ন, সামান্য।

পায়ের কাছে, একটা বিড়াল ডাকছিল.

সৌর তাকেও ভয় পেল না, গ্রন্থে পা তুলে নিল না। একেও সে চিনে নিয়েছে। নিরীহ, সহিষ্ণু একটি পোষা জীব, যে পাতের কাছে থেকে শুধু প্রসাদ চায়। এখন, সৌরর জুতোর ঠোকর খেয়ে টেবিলের উপরে বসেছে, লেজ নাড়ছে, যদিও ওর চোখের মণি এই অন্ধকারে চকচকে এবং বিস্ফারিত, তবু ওর কণ্ঠস্বরই ধরিয়ে দিচ্ছে ও কী ভীরু, নিরুপায়, অকৃতার্থ।

ওই বিড়ালটা মাঝে মাঝে শচীপতির মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছিল। কিঞ্চিৎ উত্তেজিত, অতএব বিকৃত, চিন্তাপ্রয়াস নিয়ে সৌর বুঝতে পারছিল, বিড়ালটা আলাদা কিছু নয়, শচীপতিরই সত্তার একাংশ। শচীপতির ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসছে, আবার লীন হবে শচীপতিতেই। ওর নখ হয়ত কোনদিন ছিল, এখন ক্ষয়ে গিয়ে থপথপে নরম থাবার মধ্যে লুকিয়েছে, আর কখনও দেখা যাবে না, শুধু ওর চোখে এই অন্ধকারে ফসফরাসের মত সবুজ হিংসা, অক্ষম খানিকটা ক্ষোভ জ্বলবে।

"আমার একদিন নখ ছিল" শচীপতি বলেছিলেন, "ঘন বাবরি চুল ছিল, আমি রাগলে রোঁয়ার মত ফুলে উঠত। ওরা আমাকে ভয় করত, তুমি জান না। বাড়ি-সুদ্ধ সবাই ভয় করত। নতুন চাকরি, নতুন বয়স, আমার পায়ের ভরে বাড়িটা কাঁপত। জুতোর নীচে শক্ত নাল পরিয়ে নিয়েছিলাম, চলতে ফিরতে ঠকঠক শব্দ হত, মেঝের সিমেন্টের ছাল উঠত। আমার সে রূপ তোমরা দেখনি। হাত দু'খানা কনুই-এর কাছে ভাঁজ করলে বাইসেপ সাপুড়ের বাঁশীর মত ফুলে উঠত।

"ফলশয্যার রাত্রে কী করেছিলাম জান? না, না, আদর-টাদর নয়। একটি একটি করে ফুলের পাপড়ি ফোটান নয়, ও-সব ধৈর্যই আমার ধাতে নেই, ঘোমটা খোলানর জন্যে সাধ্য-সাধনার দরকার আছে বলে আমি বিশ্বাস করিনে। আমি জানি, গোড়া ধরে নাড়া দেব, সব পাতা, পাপড়ি, কুঁড়ি, ফুল আপনা থেকেই ঝরে পড়বে।

"লতাকে কোলে তুলে নিয়ে ওপরে ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। আর একটু হলে সীলিং-এর গাটায় ঠেকত। লতা যখন নীচে পড়ছিল, তখন ওকে আমি লুফে নিলুম। লতা মূর্ছিত হয়ে আমার কোলেই পড়েছিল।

"আমাদের বাসর এইভাবেই শুরু।

"এ-রকম ঘটনা আর ক'দিন আর কতবার ঘটেছিল, তোমাকে বলব না, শুধু জেনে রাখ, লতা আমাকে ভয় করত। আমার হাতের মুঠোয় এতটুকু হয়ে যেত। সম্পূর্ণ-ভাবে আমার বশ হয়েছিল। তার ভঙ্গিটাই ছিল বাধ্যতার, আত্মসমর্পণের। হয়ত তার সবটাই ভয়। কিন্তু ভয়কেই আমি ভালবাসা বলে ধরে নিয়েছিলাম।

"আমি ওকে যন্ত্রণা দিতাম, বেদনায় ও বিবর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু কখনও নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে যায়নি, চায়নি। সকালে রোজই এক পেয়ালা গরম চা নিয়ে আমার বিছানার পাশে ফিরে এসেছে। তখন তার মুখে অল্প অল্প হাসি। দৈহিক যন্ত্রণা কখন যেন অসহ সুখে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

"সেই সুখকে প্রথমে বিরাগ, পরে অনাসক্তি, ক্রমে করুণায় পরিণত হতেও আমিই দেখেছি। করুণা আবার ঘৃণা হয়েও ওর মুখে ফুটেছে। তাও সয়েছি।"

ফিস্ ফিস্ করে সৌর জিজ্ঞাসা করল,—"কী করে?"

এক হাত তুলে শচীপতি বরাভয় দিলেন। অন্য হাতে গ্লাসটাকে ঠোঁটের কাছে নিয়ে এলো।—"বলব, বলব, সবই বলব। রোসো। তার আগে একটু সাহস সঞ্চয় করে নিই। তুমিও শোনবার জন্যে নিজেকে তৈরী কর।"

সৌর'র শূন্য গ্লাস শচীপতি ফের ভরে দিলেন।

সৌর'র ভয় তখন ছোট্ট দুটি বিস্ময়ের বিন্দু হয়ে তার চোখের মণিতে জ্বলছিল। ঔৎসুক্য হাতের টলমল গ্লাসে পানীয়ের মত কাঁপছিল। (ক্রমশ)

ক্রিকেটের রাজকুমার

শ্রীখেলোয়াড়

॥ ৬ ॥

এবার রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কারে অগ্রণী হন রণজি। বিনা খরচায় ধনী দরিদ্র সকলের জন্যেই প্রাথমিক শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কয়েক বছর যেতে না যেতেই মাধ্যমিক শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয়ভারও রাজকোষ থেকে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত করেন রণজি। এ ছাড়া রাস্তাঘাট, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, ট্রামওয়ে, হাসপাতাল এবং বাড়িঘর সংস্কার ও নির্মাণের জন্য তাঁর ২৫ বছরের পরিকল্পনা লণ্ডনের স্বাস্থ্য দপ্তর কর্তৃক উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। কৃষিব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্যে রণজির আগ্রহের সীমা ছিল না। চাষীরাই যে রাজ্যের মেরুদণ্ড এটা ভালো করেই জানতেন তিনি। কেম্ব্রিজে পড়ার সময়ে মাঝে মাঝে খামারে গিয়া বাস করে তিনি উন্নত কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করেছিলেন। জামসাহেব হবার পর নিজের তিন ভাইপোকে কেম্ব্রিজে পাঠিয়ে কৃষিব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের দেশে ফিরিয়ে আনেন। কিন্তু ভাইপোদের কেম্ব্রিজের শিক্ষায় সন্তুষ্ট না হয়ে উন্নত চাষ আবাদ বিষয়ে আরও বেশী জ্ঞান লাভের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্য রণজি আবার তাদের আমেরিকায় পাঠান।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। রণজি তাঁর তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে রাজার পাশে এসে দাঁড়ান। নিজ রাজ্যের সবকটি উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ বন্ধ রেখে সমস্ত অর্থ যুদ্ধ তহবিলে উজাড় করে ঢেলে দিতে থাকেন তিনি। কিন্তু এত সব করেও তাঁর মন তৃপ্ত হয় না। রাজার বিপদে নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকা কাপুরুষের কাজ বলেই মনে হয় তাঁর। রাজ্যসুখ ছেড়ে অনাহার, অনিদ্রা এবং নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি থাকতে হবে জেনেও রাজপুত রণজি যুদ্ধে যোগ দেবেন বলে মন স্থির করেন। রাজ্য পরিচালনার ভার মেজর বার্থনের উপর ন্যস্ত করে এবং বড় ভাইপো কুমার প্রতাপ সিংজীকে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচিত করে একদিন রাজ্য ছেড়ে চলে যান তিনি। শুধু যাবার আগে বিশ্বাসী জ্যোতিষী পণ্ডিত হরেশ্বরকে ডেকে তাঁর কাছে একটিমাত্র প্রশ্ন করেন—"এ-যুদ্ধ থেকে ফিরে আসতে পারবো তো?" জ্যোতিষী গণনা করে বলেন—"জীবনহানি না ঘটলেও তাঁর দেহের কোন একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।" বিপদ সম্পর্কে জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী শুনেও রণজি যাত্রার নির্দিষ্ট দিনের কোন পরিবর্তন করেন না। জেনারেল কুকসনের অধীনে তাঁকে মেজরের পদ দেওয়া হয়। সৈনিক জীবনের কর্তব্যের আহ্বানে তিনি ফ্রান্সের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

নিয়তির বজ্রমুষ্টিকে শিথিল করার চেষ্টা করেননি রনজি কখনো। কপালের লেখাকে মুছে ফেলা যায় না, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। জীবনের চরম দুঃখ বা কষ্টের দিনে তাই তিনি নিজেকে অবিচলিত রাখতে পারতেন। যুদ্ধের অনিয়ম এবং অত্যাচারে রণজির রুগ্ন শরীর আবার ভেঙে পড়ে।
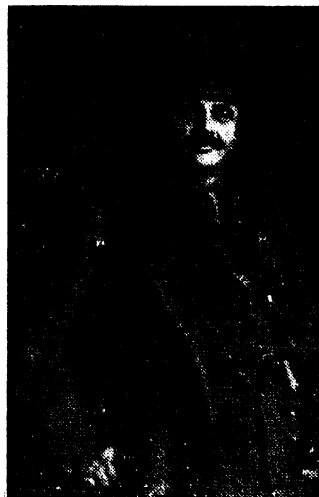
প্রথম মহাযুদ্ধে মেজরের পোশাকে রণজি

পুরনো ব্যাধি সর্দি, কাশি এবং হাঁপানীতে আবার তিনি আক্রান্ত হন। প্রথম প্রথম মনের জোরে রোগকে অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিছানা নিতে হয়। এত দুর্বল হয়ে পড়েন রণজি যে, ডাক্তারেরা অবিলম্বে তাঁকে বায়ু পরিবর্তনের আদেশ দেন। ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য লণ্ডনে ফিরে আসেন রণজি। লণ্ডনের উন্নত চিকিৎসা এবং পরিপূর্ণ বিশ্রামে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে ওঠেন।

পুরনো বন্ধু রত্লমের মহারাজা এই সময়ে লণ্ডনে ছিলেন। রণজি আনন্দে তাঁকে কাছে টেনে নেন। শিকারী বন্ধুকে নিয়ে ইংলণ্ডে শিকারে বেরোবেন এই উদ্দেশ্যে ইয়র্কশায়ারে এক শিকার অভিযানের ব্যবস্থা করে ফেলতে তাঁর দেরী হয় না। কিন্তু শিকারে রওনা হবার কিছু আগে রত্লমের মহারাজা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে অন্য যাদের যাবার কথা ছিল, তাদের নিয়েই রণজি বেরিয়ে পড়েন। মিস বরিশ এবং ডাক্তার হেজম্যান ছাড়া আরও কয়েকজন নতুন শিকারীও দলে যোগ দেন।

প্রথম দিনের শিকার বেশ নির্বিঘ্নেই কাটে। দ্বিতীয় দিনের শিকার শুরু হতেই একজন আনাড়ী শিকারী এমন এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে থাকে, যাতে দলের যে কোন লোকের যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়। রণজি বিপদ দেখে সেই শিকারীকে ঐভাবে গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করেন। কিন্তু অনভিজ্ঞ শিকারী সামনে উড়ন্ত পাখি দেখে এমন উত্তেজিত হয়ে যান যে, রণজির সাবধানবাণী উপেক্ষা করে আবার সেইভাবে গুলি চালান। পাখিটি পাখা মেলে নীল আকাশে উড়ে যায়। আর গুলিটা সোজা এসে বেঁধে রণজির ডান কাঁধে। ডান চোখটির মধ্যেও গুলির টুকরো ঢুকে যায়।

স্থৈর্য ও ধৈর্যের প্রতিমূর্তি রণজি এতবড় আঘাতের কথা কাছে-বসা মিস বরিশকে পর্যন্ত জানতে দেন না। ডান হাত থেকে বন্দুকটাকে বাঁ হাতে নিয়ে যেন কিছুই হয়নি এইভাবে আবার শিকার চালিয়ে যান তিনি। ঐভাবে মারাত্মক আহত হওয়ার পরেও রণজি যে ১২ বার গুলি ছোঁড়েন, তার মধ্যে মাত্র দুবার ছাড়া বাকী দশবারে দশটি পাখি আছড়ে এসে মাটিতে পড়ে। রণজির কাঁধ থেকে তখন রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরুতে শুরু করেছে। তাজা রক্তে লাল হয়ে গেছে রণজির জামা। কিন্তু এতটুকু চাঞ্চল্য নেই। রণজির দিকে হঠাৎ মিস বরিশের নজর পড়তেই তিনি চীৎকার করে ডাক্তার হেজম্যানকে ডাকেন। হেজম্যান ছুটে এসে রণজিকে প্রশ্ন করতে রণজি

ধীরে ধীরে বলেন, "একটা গ্নলি এসে লেগেছে ডান কাঁধে। ডান চোখটাতেও কিছ্ন দেখতে পাচ্ছিনে।"

তখনি রণজিকে হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়। হাসপাতালের তিন মাইল দীর্ঘ পথে ডাক্তার হেজম্যান বা মিস বরিশ' কেউ রণজির ম্নখ থেকে ব্যথা বা যন্ত্রণার একটি শব্দও শ্ননতে পান না। ডাক্তার পরীক্ষার পর জানান—রণজির ডান চোখটা চিরতরে নষ্ট হয়ে গেছে এবং ঐ চোখটাকে তুলে ফেলা ছাড়া উপায় নেই। রণজি শান্তভাবেই ডাক্তারের আদেশ শোনেন। শ্নধ্ন একটিমাত্র প্রশ্ন ডাক্তারের উদ্দেশে তাঁর ম্নখ থেকে বেরিয়ে আসে "আমার আর একটি চোখ ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এই আঘাতে।" ডাক্তারের কাছ থেকে অপর চোখটি সম্বন্ধে আশ্বাস পেয়ে আবার নিশ্চিন্তে চোখ ব্নজে থাকেন তিনি। তৃতীয় দিনে রণজির ডান চোখ তুলে ফেলা হয়।

আহত হয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার আগে রণজি দলের সকলকে কাতর অন্নরোধ করে যান শিকারীর নাম কেউ যেন ঘ্নাক্ষরে প্রকাশ না করে। খবরটা শেষ পর্যন্ত হয়তো চাপা থাকবে না এই ভয়ে তিনি বড় ব্যাকুল হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিজের যন্ত্রণা ও কষ্ট থেকে ঐ চিন্তাই বেশী উদ্বিগ্ন করে তোলে তাঁকে। জীবিত অবস্থায় রণজির ম্নখ থেকে কোন আত্মীয়-স্বজন বা সাংবাদিক কেউ সেই শিকারীর নামটি কখনো জানতে পারেন নি। এত মহৎ ছিলেন রণজি। রণজিকে যিনি গ্নলি করে-ছিলেন সেই ভদ্রলোক দ্নঃখিত ও লজ্জিত হয়ে রণজিকে লেখেন—"What can I

রাজ্যের শিক্ষিত ঘোড়াগুলিকে যুদ্ধের সাহায্যের জন্য পাঠানো হচ্ছে

possibly do to atone?" রণজি উত্তরে জানান—"Come and shoot with me as my guest again" রণজির অন্তর যে কত বিরাট ছিল, কত মহীয়ান ছিলেন তিনি তা তাঁর ঐ ছোট্ট উত্তরটুকু থেকেই বোঝা যায়।

এই ঘটনার পর রণজির স্থৈর্য ও ধৈর্য সম্বন্ধে লর্ড হিউয়ার্ট লিখেছিলেন—the greatest story of self control that he had ever heard.

রণজির আহত হবার সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত, ইংলণ্ড, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং বিশ্বের আরও অনেক দেশ থেকেই অসংখ্য তার আসতে থাকে। এমন কি রাজা পঞ্চম জর্জ পর্যন্ত রণজির জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। লর্ড স্টামফোরডাম রাজার বার্তা পাঠাতে গিয়ে রণজিকে লিখেছিলেন—

"আপনার যে চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সদ্ব্যবহার করে আজ সারা বিশ্বে আপনি বন্দিত, সেই অমূল্য চোখ দুটির একটি হারানোতে মহামান্য রাজা গভীরভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আপনার আর একটি চোখ ঐরূপ মারাত্মক আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে অবশ্য তিনি আনন্দিতও হয়েছেন। আপনি ডান চোখে মারাত্মকভাবে আঘাত পাবার পরও অব্যর্থ লক্ষ্যে যেভাবে শিকার চালিয়ে গেছেন, তার জন্য রাজা আপনাকে বিশেষভাবে তাঁর অভিনন্দন জানাতে বলেছেন। ঐভাবে আহত হয়ে শিকার চালিয়ে গিয়ে এবং তিন মাইল দীর্ঘ পথ সমস্ত যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করে হাসপাতালে ফিরে এসে আপনি শুধু আপনার সাহসের পরিচয় দেননি, আপনার অপরিসীম স্থৈর্য ও ধৈর্য প্রকাশ পেয়েছে। মহামান্য রাজা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ভবিষ্যতে আপনি আর কখনো এ জাতীয় দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন না।"

এতবড় আঘাত রণজি যে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন, তার সঠিক বিবরণ জানতে হলে আমাদের রণজির নিজের লেখা চিঠির খুলিটি ঘাঁটতে হবে। চোখের ব্যাণ্ডেজ খোলার পর ডাক্তারের কাছ থেকে চিঠি লেখার অনুমতি পেয়ে মেজর বার্থনের কাছে প্রথম যে চিঠিখানা তিনি লিখেছিলেন, তার অংশবিশেষ এখানে তুলে দিলাম—

"I have been unlucky, and have been shot right through the right eye. It is no use worrying about it. It was destiny....one consolation of this unfortunate episode is that I kept absolute control of myself and behaved in a manner you would like a friend of yours to behave, and worthy, I hope, of a Rajput, and in a manner my mother would wish me to act in like circumstances....I am perfectly cheerful and resigned, and according to my religious beliefs (which have given me great consolation) my sins (whatever they may have been) have been duly atoned for in this life by this punishment, which otherwise would have fallen to my lot in the next life or hereafter. I hope therefore that you will not grieve for me, but rejoice that the great and good Almighty has thought fit to forgive me with so little a loss...."

অর্থাৎ "আমার ডান চোখে গুলি লাগার ঘটনাটিকে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি বলব। ব্যাপারটি নিয়ে এখন আর উদ্বিগ্ন হয়ে কোন লাভ নেই—এ আমার অদৃষ্টের লিখন। অবশ্য এই দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যেও আমি যে নিজেকে সংযত রেখে বন্ধুর মতই ব্যবহার করতে পেরেছি সেইটাই আমার শান্তি ও সান্ত্বনা। আশা করি, প্রকৃত রাজপুতের মত এবং এ জাতীয় অবস্থায় আমার মা যেরকম ব্যবহার করতে শিখিয়েছিলেন, আমি তা করতে সক্ষম হয়েছি। আমার মনে এখন আর এতটুকু ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। ধর্মে আমার বিশ্বাস আছে। সেই বিশ্বাসবলেই আমার ধারণা যে, আমার সঞ্চিত পাপের কর্মফল আমি ভোগ করছি। এ জন্মে ভোগ না করলে যা পরবর্তী জন্মে আমাকে ভোগ করতেই হতো। সেই জন্যেই তোমরা দুঃখিত হয়ো না। সেই পরম শক্তিমান পরমেশ্বর আমার এই সামান্য ক্ষতির বিনিময়ে যে আমায় ক্ষমা করেছেন, তার জন্যে তোমরা আনন্দিত হবে বলে আমার বিশ্বাস আছে।"

যুদ্ধে যোগদান করে জামনগর ছেড়ে আসার সময়ে প্রথম ভাইপো প্রতাপ সিংজীকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে নির্বাচিত করে এলেও রণজির সে মনোভাবের এ সময়ে পরিবর্তন হয়। প্রতাপ সিংজীর ছোট ভাই দিগবিজয় সিংজী, যিনি তখন লন্ডনে আই সি এস পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন, তাঁকেই বেশী যোগ্য বলে বিবেচনা করায় রণজি নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। উত্তরাধিকারী হিসাবে দিগবিজয় সিংজীর নির্বাচন যে রাজ্যের ভবিষ্যতের পক্ষে কত মঙ্গলকর হয়েছিল, সেটা জামনগরের পরবর্তী ইতিহাস থেকেই পাওয়া যায়।

এর কিছুদিন পরে রণজির ছোট বোনের সঙ্গে যোধপুরের মহারাজার বিয়ের ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যায়। রণজি বিলেত থেকে জামনগরে ফিরে আসেন। ভারতে রওনা হবার আগে রণজি নিজের বাঁ চোখের মত আর একটি পাথরের নকল চোখ খুঁজে বের করার জন্য দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়ান। চোখহানির কথা বৃদ্ধা মাতা, আত্মীয়স্বজন বা ভৃত্যদের মধ্যে জানাজানি হলে একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে বলে তিনি নকল একটি চোখের জন্য অত বেশী ব্যাকুল হন। অবশেষে মনের মত একটি পাথরের চোখ তিনি খুঁজে পান। ঐ পাথরের চোখটি ডান চোখে এমন সুন্দর মানায় যে, খুব কাছে থেকেও সহজে চোখ দুটির পার্থক্য বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। যুদ্ধের এবং রাজ্যের নানা রকমের অভাব অভিযোগের মধ্যেও রণজি তাঁর প্রিয় ছোট বোনটির বিয়েতে কোন আড়ম্বরের ত্রুটি রাখেন না।

কিন্তু বিয়ের উৎসব মিটে যেতে না যেতেই জামনগর প্রাসাদে এক বিষাদের ছায়া নেমে আসে। রণজি মাতৃহীন হন। বৃদ্ধা মাতার মৃত্যুতে মাতৃভক্ত রণজি একেবারেই মুষড়ে পড়েন। পৃথিবীতে মায়ের চেয়ে প্রিয় ও পূজনীয় আর কেউ ছিল না তাঁর। রণজির জীবনী যাঁরা লিখে গেছেন, তাঁরা সকলেই স্বীকার করেছেন যে, রণজি তাঁর জীবনের অধিকাংশ সুশিক্ষা পেয়েছিলেন এই মহীয়সী জননীর কাছ থেকে। মার মৃত্যুর পর তাঁর একখানা ছোট ছবি সব সময় রণজির পকেটে পকেটে থাকতো। লন্ডনে একবার মায়ের ঐ ছবিখানা রণজির পকেট থেকে হারিয়ে যাওয়ায় সমস্ত সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। প্রায় তিন বছর পর ছবিটা পুনরায় রণজির হাতে ফিরে আসে।

যুদ্ধ শুরু হওয়া থেকে যুদ্ধ তহবিলে রাজ্যের অধিকাংশ অর্থ, সামর্থ্য ও শক্তি দুহাতে উজাড় করে ঢেলে দেওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে পুরনো দেনার জন্য রণজি ঘন ঘন তাগিদ পেতে থাকেন। অর্থের তাগিদ রণজি নিজে যেমন কাউকে কখনো করেননি, তেমনি প্রাপ্য অর্থের জন্য কেউ তাঁর কাছে কাবুলিওয়ালা সাজুক, এটা একেবারেই তিনি পছন্দ করতেন না। প্রাপ্য অর্থ কখনো রণজি কাউকে ফাঁকি দেননি। কারো ব্যবহারে সেই সুর প্রকাশিত হতে দেখলে নিজেকে বড় অপমানিত মনে করতেন তিনি। নানা অসুবিধার মধ্যেও রণজি সুদ সমেত সমস্ত অর্থ পরিশোধ করে দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। অর্থ জোগাড় করার পর ব্যাংকের মাধ্যমেই ঐ দেনা ইচ্ছা করলে তিনি পরিশোধ করে দিতে পারতেন। কিন্তু সরকারের ব্যবহারে রণজি তখন এত বেশী ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, তাঁর ঋণের শেষ কাণাকড়িটি পর্যন্ত গুনে গুনে ফেরত দেবেন বলে স্থির করেন। ৫ লক্ষ রুপোর টাকা সংগ্রহ করা হয়। টাকাগুলোকে বাক্স-বন্দী করে সশস্ত্র পাহারার মধ্যে এক বিরাট গরুর গাড়ির মিছিল রাজকোটের বৃটিশ দপ্তরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। গরুর পায়ের খুরের ধুলোর চিহ্ন বাতাসে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের জ্বালারও উপশম হয়।

১৯১৮ সালে শুভ নববর্ষের দিনে রাজ সম্মানের তালিকায় রণজিকে লেফটন্যান্ট কর্নেলের পদমর্যাদা দেওয়া হয়। তা ছাড়া জামনগর রাজ্যের রাজা হিসাবে রণজি যেখানে যখনি যাবেন, তখন ১৩ বার তোপধ্বনি এবং তাঁর ব্যক্তিগত সম্মানের জন্য ১৫ বার তোপধ্বনি লাভ করবেন বলে ঐ সম্মানের তালিকায় রাজ-আদেশ থাকে। কিন্তু এর পরেও তাঁকে আবার মহারাজা উপাধি দেওয়া হচ্ছে বলে জানতে পারায় তিনি মনে মনে একটু বিরক্ত হন। তিনি বলেন—মহারাজা হবার বংশগত অধিকার তো আগেই আমি লাভ করেছি। সে সম্মানের যোগ্য দাবীও আমার আছে। সুতরাং একই সম্মান নূতন করে পাওয়া আমার কাছে অর্থহীন। রণজি তাই তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে বন্ধুবান্ধবদের জানান—

"That has been heriditary title all my life. I have a clear right to the title, dating many years back. I feel it is an unpleasant thing to quibble about these matters, specially as I am one who is so casual about such things."

রণজির জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র ক্রিকেট-উৎসাহী জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, একথা বললে ভুল বলা হবে। ভারতীয় নৃপতিদের তিনি এত প্রিয় ও বিশ্বাসী ছিলেন যে, কোন ভোটাভুটি ছাড়াই ভারতীয় নৃপতি সভার স্থায়ী সভাপতি হিসাবে তিনি মনোনীত হন। এই দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ায় রণজিকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। নরেন্দ্রমণ্ডলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্য-প্রণালী এবং অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি জরুরী কাজ তাঁর সামনে এসে পড়ে। বিশেষ করে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র তৈরীর ব্যাপারে নরেন্দ্রমণ্ডল থেকে যে স্মারকলিপি পেশ করা হবে, তার জরুরী আলোচনার জন্য রণজিকে বিভিন্ন নৃপতিদের সঙ্গে ঘন ঘন মিলিত হতে হয়। (ক্রমশ)
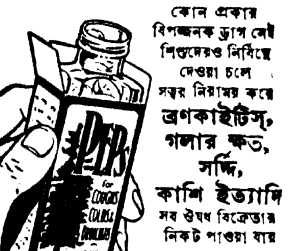
"আপ্ কলকত্তেকে আদমী বহুত্ জাদুগর হোতে হেঁ"

কথাটা বললে বিশন আহির। পেশী-বহুল মেহনতী চেহারা। এতটুকু অতিরিক্ত মেদ নেই শরীরে। মাথায় পাগড়ি। গায়ে একটা হাতকাটা ময়লা কামিজ।

চালের বাতা থেকে যে-লণ্ঠনটা ঝুলছিল, তার আলোয় চকচক্ করছে তার চোখ। উঠে দাঁড়িয়েছে উত্তেজনায়। হাতে তার বাতাসে-ফাঁপানো আমার বালিশটা। অতি সন্তর্পণে ধরে আছে। সদ্যোজাত শিশুর মত।

আরও প্রায় ত্রিশ জোড়া চোখ সেই আবছা আলোয় চকচক্ করছে বিশনের চারিদিকে। লণ্ঠনের আলোটা নীচের কালো বলয়কে ছাড়িয়ে তাদের গায়েও গিয়ে পড়েছে। সেই শীতের রাত্তিরে কাছাকাছি ঠেসাঠেসি করে উবু হয়ে বসে আছে লোক-গুলো। প্রায় সকলেরই মাথায় বড় বড় পাগড়ি। কামিজ কারো আছে, কারো নেই। ভিড় করে এসেছে সবাই কলকাতা থেকে যে-সাহেব আসবেন তাকে দেখবে বলে।

আমার পৌঁছতে অনেক দেরী হয়েছে। পৌঁছব আশা করেছিলাম সন্ধ্যাবেলায়; এখন রাত দশটা। তবু একজনও নড়েনি। ঠায় বসে আছে আমার অপেক্ষায়।

এরা কেউ আমার পরিচিত নয়। আট বছর আগে সেই যে দেখেছিলাম, তারপরে আর দেখাও হয়নি তাদের কারও সঙ্গে। তবু সেই বহুদিন আগেকার-দেখা ছবিটা এখনও স্পষ্ট ভাসছে চোখের সামনে। এখনও দেখতে পাচ্ছি, গোবর-লেপা দাওয়াটার গায়ে দুটো সাইকেল হেলান দেওয়া রয়েছে। দাওয়ার সামনের উঠোনে বসে আছে বিশন আহিরের দলবল। অল্প আলোয় তাদের চোখমুখের খুঁটিনাটি ভাল করে না দেখা গেলেও তাদের বড় বড় পাগড়ি আর কৌতূহলে চকচকে চোখ বেশ দেখতে পাচ্ছি। দাওয়ার ওপরে দুটো দড়ির খাটিয়া আশ্রয় করেছি আমি আর স্বামীদয়াল। সেদিনকার মত সেই খাটিয়াতেই রাত্রিবাস। এ-বাড়ির যিনি গৃহস্বামী, তিনি বসে আছেন স্বামী-দয়ালের খাটিয়াতে। বৃদ্ধ লোক, কিন্তু খুব কর্মঠ চেহারা। তাঁর মুখে চোখেও কৌতূহলের আভাস।

চালের বাতা থেকে একটা আঁকশিতে লণ্ঠনটা ঝুলছে বাড়ির ভেতরে যাবার নীচু পথের ঠিক ওপরে। এই পথের দু' পাশেই উঁচু দাওয়া। আর উঠোনে, উপবিষ্ট লোক-গুলোর মাঝখানে, বাতাসের বালিশটা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে বিশন আহির। একটু থেমে থেমে, প্রগাঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সে বললে—"আপ্ কলকত্তেকে আদমী বহুত জাদুগর হোতে হেঁ।"

সারাদিনের পথশ্রমে আমরা অত্যন্ত ক্লান্ত। দু'টি খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব এই আশায় কম্বল আর চাদর বিছিয়েছিলাম খাটিয়ার ওপর। তারপর ফুঁ দিয়ে ফুলিয়েছিলাম সেই বাতাসের বালিশটাকে। লক্ষ্য করিনি, মুগ্ধ জনতা অবাক বিস্ময়ে আমার এই ইন্দ্রজাল দেখেছে। ফোলানো বালিশটা তোয়ালে ঢাকা দিয়ে বিছানার ওপর রাখতেই সবচেয়ে ষণ্ডাগুণ্ডা লোকটি, দর্শকদের মধ্য থেকে উঠে এল। সেই-ই বিশন আহির। অতি সন্তর্পণে, প্রায় ভয়ে ভয়েই, তর্জনী দিয়ে বালিশটাকে টিপে দেখল দু' একবার। দিব্যি নরম ঠেকছে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।......

লণ্ঠনের আলো অল্প হলেও, বিশনের চোখের দিকে এক নজর তাকিয়েই বুঝলাম, সে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে। বাতাসে ফাঁপানো বালিশ সে এর আগে আর দেখেনি। কল্পনাও করেনি। এত সহজে যে তাকিয়া বানানো যায় এ তার ধারণার বাইরে। বিশনের সঙ্গীসাথীরাও কৌতূহলে অধীর। বালিশটা হাতে নিয়ে তারাও টিপেটুপে দেখতে চায় ব্যাপারখনা কি। বিশনের হাতে বালিশটা তুলে দিলাম। দেখাতে বললাম সবাইকে।

কনুই দুটোকে কোমরের কাছে ঠেকিয়ে প্রসারিত দুই হাতের ওপর আলগোছে বালিশটাকে নিলে বিশন। এই শক্ত সমর্থ জোয়ান লোকটার অবস্থা দেখে হাসি পেল আমার। কিন্তু পরিবেশটা একটুও হাস্যকর নয়। শুধু বিশন নয়, এখানে উপস্থিত এই গ্রামের তাবৎ লোক মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, চোখের সামনে এমন এক জাদু দেখছে তারা যা কলকাতার আদমীদের কাছে মামুলি একটু হাতসাফাই ছাড়া আর কিছুই নয়।

ততক্ষণে উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠেছে কয়েকজন। এক হুংকার দিলে বিশন। এমন দুর্লভ ইন্দ্রজালটাকে কি হৈ-হুল্লোড় করে নষ্ট করবে এরা? হাত দিয়ে ছোঁয়া যায়, হাতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এহেন জাদুকে দেখতে বুঝতে হয় তারিয়ে তারিয়ে। বিশনের ধমকে ততক্ষণে বসে পড়েছে সকলে। বিশন আশ্বাস দিলে—কোনো ফিকর নেই; সবাই হালহদ্দ দেখতে পাবে এই জাদুর। তারপরে, সেই বালিশ কোলে করে সকলের কাছে পরিবেশন করলে ঘুরে ঘুরে। টিপেটুপে দেখলে সবাই। অত্যন্ত সাহসী যারা তারা বালিশটাকে উল্টে পাল্টে দেখল ভাল করে।

দাওয়ার ওপর গৃহস্বামী এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। তাঁরও আগ্রহ কম নয়। জাদুটা তাঁর কাছেও নতুন। তবে তাঁকে ঠাট্‌বাট্‌ বজায় রেখে চলতে হয়। এ-গ্রামের ভূস্বামী তিনি। তিনিই পঞ্চায়েতের মুখিয়া। অত্যন্ত বিনীতভাবে বিশন তাঁর কাছে বালিশটা নিয়ে এল শেষকালে। তারপরে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে তার প্রসারিত হাতের আশ্রয় থেকে বালিশটা তুলে নিলাম।

এই আমার আদ্যিকালের ভারতবর্ষ! শত শত বৎসরেও এই ভারতবর্ষের কোনো পরিবর্তন হয়নি। এই বিশন আহিরদের আমি মোটামুটি চিনি। অন্তত, শহরের কেতাদুরস্ত পুরুষ আর এনামেল-করা মহিলাদের থেকে অনেক বেশী চিনি বলেই বিশ্বাস। অল্প সময়ের পরিচয়ে একেবারে নির্ভুলভাবে এদের চিনতে পারা যায়। কাঁচকে হীরে ঠাউরে পস্তাতে হয় না শেষকালে। শহরের কথা স্বতন্ত্র। শহরের সবকিছুই স্বতন্ত্র। এদের দুঃখ সুখের সংগে বহুবার জড়িয়েছি নিজেকে। আবার বেদনার সংগে সে-বাঁধন কেটে নতুন জালে নিজেকে জড়িয়েছি অন্যত্র। এদের আশ্রয়ে এদের স্নেহ ভালবাসায় অনেক দুর্লভ সুখের দিন আমার কেটেছে।......

সবচেয়ে কাছের রেল-স্টেশন থেকে চুরাশি মাইল দূরে, মধ্যভারতের উত্তর সীমায় এই গ্রামে এসে জুটেছি আমার ফোটোগ্রাফীর ধান্ধায়। নানা রঙের কয়েকটি উজ্জ্বল দিন আমার কাটবে এখানে। তারপরে, গাঁঠ্‌রি বেঁধে আবার ভেসে যাব অন্য দিগন্তে, অন্য ঠিকানায়।......

• • •

আজ এই ভ্রমণ-কাহিনী লিখতে বসে মনে পড়ছে সেদিন এই সরল গ্রাম-বাসীদের অন্ধ বিশ্বাস একটু শিথিল করবার চেষ্টা করেছিলাম। বলেছিলাম, কলকাতার লোক সব জাদুকর হতে যাবে কেন? বাতাস বার হতে না পারে এরকম একটা থলে বানিয়ে তাতে ফুঁ দিলেই যে তাকিয়া হবে একথা কে না জানে?

অবিশ্বাসের ভংগিতে তাবৎ পাগড়ি নড়তে লাগলো। বিশন বললে, আরে না বাবুসাহেব, ইয়ে তো কলকাত্তেকা জাদুকা ছোটাসা এক নমুনা। কলকাতার আদমীরা মর্জি হলেই দেহাতী আদমীকে জাদু করে উড়িয়ে দিতে পারে। বাতাসে বিলকুল মিশিয়ে দিতে পারে একেবারে। দিয়েছেও বহুত বার। তা না হলে এ-তল্লাটের গ্রাম থেকে এই যে কিছু কিছু লোক মাঝে মধ্যে কলকাতায় যায় তাদের বেশীর ভাগই আর গ্রামে ফেরে না কেন?

বললাম, কলকাতায় যে-কাজ তাদের জোটে তা থেকে ছুটি পায় না হয়ত। তাছাড়া, কলকাতার হরেক কিসিম সুখ-সুবিধা ছেড়ে কে আর সহজে ফিরে আসতে চায় এই অজ পাড়াগাঁয়ে?
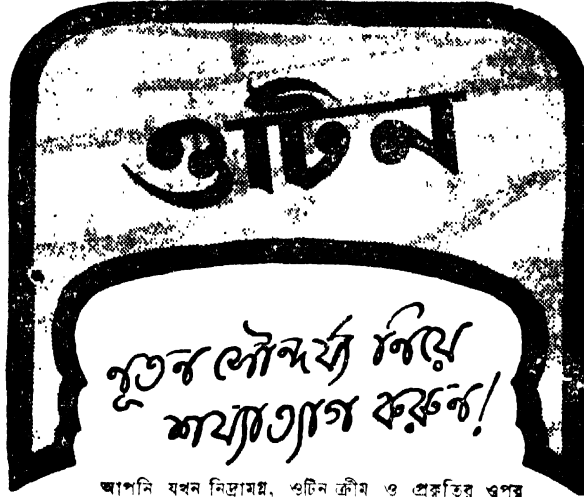
যুক্তিগুলো একটুও দাগ কাটল না কারও মনে। এই গৃহবিমুখ প্রবাসীদের যে কলকাতার লোকেরা জাদু করে একদম উড়িয়ে দিয়েছে সে বিষয়ে কারো মনে সন্দেহমাত্র নেই।

আমার সংগী স্বামীদয়াল শহুরে মানুষ। পান্না থেকে সে আমার সংগে এসেছে। মধ্যভারতের এককালীন দেশীয় রাজ্যের রাজধানী পান্নাকে শহরই বলা চলে। সেখানকার ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউসের সে মেকানিক। তেলকালিমাখা জামা-কাপড়ে হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে জাদুফাদুর অলীক কল্পনা তার মন থেকে উবে গেছে কোনদিন। আমাদের এই আজগুবী তর্কে সে একবারও অংশ গ্রহণ করেনি; মাঝে মাঝে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছে শুধু। এইবার বিশন আহিরের আখিরী জবাব শুনে সে নীরবে খাটিয়ায় শুয়ে পড়ল। গৃহস্বামী একটু সরে বসে তার শোবার জায়গা করে দিলেন।

"আরে সাহব", তর্কের একেবারে উপসংহার করে বিশন বললে, "আপ তো কহতে হেঁ কলকত্তেকে আদমী জাদুগর নহী। তো শুনিয়ে, কলকত্তা যা কর্ ঝাঁসিকা এক ধোবীকা ক্যা হাল হুয়া।"

এই বলে, ঘন ঘন সমর্থনের মধ্যে, বিশন ঝাঁসির ধোপার গল্পটা বললে। ঝাঁসি কাছাকাছি বড় শহর। গল্পের ঘটনাটা তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে। কেউ যে তা অবিশ্বাস করতে পারে এ-কল্পনা তাদের কল্পনাতীত। আমি আর স্বামীদয়াল ছাড়া সে-কাহিনী আর সকলে যে অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করে তার নির্ভুল প্রমাণ তাদের মুখে চোখে, তাদের মাথা নাড়ায়। গল্পটা বিশ্বাস না করতে পারলেও, এ-বিষয়ে তাদের প্রত্যয় যে কত দৃঢ় তা বুঝতে একটুও কষ্ট হয়নি।

তখন যুদ্ধের সময়। ঝাঁসির এক ধোপা পল্টনে ভর্তি হয়ে কলকাতায় এল। লোকটা এমনিতেই খুব চৌকস্ ছিল। পল্টনী আবহাওয়ায় আরও তোখোড় হওয়া বিচিত্র নয়। তাই কলকাতায় বেশ কিছুদিন থাকা সত্ত্বেও কলকাত্তিয়ারা তাকে জাদু করে উড়িয়ে দিতে পারেনি। এমন কি, সে নিজেই তাদের কাছ থেকে লোক ওড়ানো, অন্য জানোয়ারের চেহারা নেওয়া প্রভৃতি নানারকমের জাদু শিখে একবার ছুটিতে ঝাঁসি ফিরে এল। ভাই বেরাদরদের কাছে কথাটা লুকিয়ে, তার এই নয়া কেরামতির কথা রাত্তিরে পাড়ল বউয়ের কাছে। বলল, কলকাত্তায় আয়সা বড়িয়া জাদু শিখেছি যে, এক লহমায় আমি শের হয়ে যেতে পারি আবার পাখিও হয়ে যেতে পারি। বউ বললে—আবার মানুষ হবে কি করে? তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ঝাঁসির সেই ধোবী তার পল্টনী গোঁফে দুই মোচড় দিলে। বললে, আরে, সে তর্কিব না করে কেউ কি জানোয়ার বনে যায়? হাঁ করে চেয়ে রইল বউ। তার চিরকালের তোখোড় স্বামীর দিকে অনেকবারই তাকে এভাবে তাকাতে হয়েছে। তবে এবারের কিস্সাটা বড় বেশী তাজ্জব। ভয় ঢিপ্ ঢিপ্ করতে লাগল বউয়ের বুক। স্বামীর হাত ধরে বললে, কাজ নেই এমন জাদুতে। তোমার শের হয়েও কাজ নেই, পাখিও না।

ঝাঁসির ধোবীর পল্টনী মেজাজ ততক্ষণে চাংগা হয়ে উঠেছে। বউটা বেওকুফ্ তাতে সন্দেহ নেই। তবু এত মেহনত-করে-শেখা জাদুর খেলা দু' একটা তাকে দেখাবে না? তাছাড়া, ভাই বেরাদরদের যে তাক লাগিয়ে দিতে হবে কাল সকালে। আজ তার একটু মহড়া দিয়ে রাখা ভাল।

একটা বাটিতে একটু জল নিয়ে এল ধোবী। বিড়্‌বিড়্ করে সেই জলের ওপরে কী সব মন্ত্র পড়ল। ঘোমটা টেনে ঘরের এক পাশে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে রইল তার বউ। প্রতিবাদ করে কোনোদিন কোনো ফল হয়নি; আজও হবার আশা কম।

বাটির জল মন্ত্রপূত করে সেই পল্টন—ম্যাজিসিয়ান বীরদর্পে তার বউকে বললে, দ্যাখ্, এইবার আমি শের বনে যাব। তখন তুই এই বাটির জল আমার গায়ে ছিটিয়ে দিস্। তা হলেই মানুষ হয়ে যাব আবার। কেমন বুঝেছিস্?

কথা সরল্‌ না বউয়ের মুখে। পায়ে পায়ে সে এগিয়ে গেল বাটির দিকে, আর, ঠিক সেই মুহূর্তেই, দেখল তার স্বামী কোথায় মিলিয়ে গেছে; সেখানে বসে ল্যাজ ঝাপ্টাচ্ছে ইয়া কেঁদো এক বাঘ!

কোথায় বা রইল জলের বাটি, কোথায় বা রইল কি! বাপ্‌রে, মারে বলে বউ তো ঘর ছেড়ে উঠনে, উঠন পার হয়ে পড়শীদের বাড়ি গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল চক্ষের নিমিষে। অজ্ঞান হবার আগে যা দু' একটা কথা বলতে পেরেছিল তাতে বোঝা গেল যে, যে-উপায়েই হোক্, এক মস্ত শের তার ঘরে ঢুকে বসে আছে।

আর কোথায় যায়! লাঠিসোটা, বল্লম, শড়কি সংগ্রহ হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। মশালের আলোয় হাতিয়ারবন্ধ জনতা ধোবীর বাড়ি ঘেরাও করল চারিদিক থেকে। শোরগোলে বাঘ বেরিয়ে এল উঠনে। তারপরে, লাঠি সড়কির দু' দশ ঘা খেয়ে সেই যে জংগলের দিকে দৌড়ল আর তাকে ধরা গেল না।

"তব্ সোচিয়ে", বিশন উপসংহার করল তার গল্পের, "কলকত্তেসে জাদু শিখকর উস্ ধোবীকা ক্যা হাল হুয়া!"

তাবৎ জনতা নিরুত্তর। আমার মুখেও কোন কথা যোগাল না। সত্যিই তো, কলকাতার জাদুকরের হাতে পড়ে বাতাসে মিলিয়ে না গেলেও এ তো একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবারই সামিল!......

এই-ই আমাদের আদিম ভারতবর্ষ! সনাতন, অবিকৃত, চিরন্তন ভারতবর্ষ!

রেল লাইনের ধারে ধারে আর শহর-গঞ্জের ঘাটেপথে আধ্নিক সভ্যতার যে জল্‌স-পালিশ তা এখানে এখনো পেণছয়নি। কতদিনে পেণছবে কে জানে! চারিদিকে অবশ্য জোর চেষ্টা চলছে। পেণছতে হয়ত দেরী হবে না।

তখন কি হবে? আমরা, শহ্‌রে লোকেরা, উঠতে বসতে যে-কুটিলতা নিয়ে জীবন কাটাই, সেই অবিশ্বাস আর সন্দেহের ঢেউ নিরন্তর এসে লাগবে এইসব দ্‌র গ্রামের ক্‌লে ক্‌লে। বিশন আহির আর তার পড়শীরা তখন আমাদের মতই যা ভাববে তা আর বলবে না, যা বলবে তা আর ভাববে না। বেশ যে সভ্য হয়ে উঠবে তখন তাতে সন্দেহ নেই। ফলাও করে সেই চেষ্টাই চলছে চতুর্দিকে।

ভোরবেলায় দাওয়ার ওপর সেই খাটিয়ায় শ্‌য়ে বিশন আহিরদের এই আশ্‌ উন্নতির কথা ভাবছিলাম। সত্য বিষয়ে হোক, অলীক বিষয়ে হোক, প্রত্যয়ের এই যে দ্‌ঢ়তা, এদের জীবন থেকে তা অপস্‌ত হলে ফল ভাল হবে কি মন্দ হবে সে-বিষয়ে আমি অন্তত নিশ্চিন্ত নই।

পাশের খাটিয়ায় স্বামীদয়াল অকাতরে

ঘুমুচ্ছে। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। কোন্‌ দিকটা পূর্বদিক কে জানে। আকাশ মেঘলা না পরিষ্কার সে-খবর আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে আমার পাওয়া দরকার। ক্যামেরা-হাতে সারাদিনটা কাটবে এক আশ্চর্য নেশার ঘোরে। আলোর তারতম্যে আমার অনেক কিছু আসে যায়। কালিঞ্জর দুর্গের বিখ্যাত তোরণগুলির ওপর সকালের সূর্য আলো ফেলবে, না বিকেলের—এসব তথ্য আমার কাছে বহু মূল্যবান। কম্বল মুড়ি দিয়ে উঠে এলাম বিছানা থেকে। আকাশ পরিষ্কার এই শুভ বার্তাটুকু সংগ্রহ করে দিনের কাজের জন্য তৈরী হতে লেগে গেলাম।

এলাহাবাদ থেকে যে মেন রেল লাইন জব্বলপুর গেছে, তার মধ্যবর্তী স্টেশন সাতনায় নেমেছি কয়েকদিন আগে। তারপর, বাসে করে বিয়াল্লিশ মাইল দূরে পান্না। পান্না থেকে আবার বাসে করে কুড়ি মাইল দূরে অজয়গড়। অজয়গড়ে বাসের ছাত থেকে সাইকেল নামিয়ে, কালিঞ্জর অবধি বাকি বাইশ মাইল অতি কায়ক্লেশে এসেছি আমি আর স্বামীদয়াল। বিশন আহিরেরা আমার লক্ষ্য নয়। তাদের এই গ্রামও নয়। এ-গ্রামের আজ হয়ত বিশেষ কোনো মূল্যই নেই। এই বাড়িতে এসে জুটেছি এইজন্য যে, স্থানীয় ভূস্বামীমশায় স্বামীদয়ালের আত্মীয়। আবার স্বামী-দয়ালকে আমার সঙ্গে দিয়েছেন আমার এক আত্মীয় যিনি পান্নার ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউসের ইঞ্জিনীয়ার। কালিঞ্জর গ্রামে ডাক বাংলো বা হোটেল নেই; সম্ভবত বিশ ত্রিশ মাইলের মধ্যেও নেই। এখানে এলে কৃষকের দাওয়ায় খাটিয়া আশ্রয় করাই একমাত্র গতি।

এক সময়ে কিন্তু বড় জমজমাট ছিল এই গ্রাম। সে প্রায় সাড়ে চারশো বছর আগেকার কথা। শেরশাহ্‌ শূর তখন ভারত-সম্রাট। গ্রামের লাগোয়া যে-সমতলশীর্ষ পাহাড়, তার ওপরে ছিল কালিঞ্জরের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কেল্লা। উন্নতশির, স্পর্ধিত, অপরাজেয়। নীচে শহরতলী। এখনও জঙ্গলে-ঢাকা ইতস্ততবিক্ষিপ্ত পোড়ো বাড়ি সেই সমৃদ্ধির দিনের সাক্ষ্য দেয়।

এই দুর্গ জয় করতে এলেন সম্রাট শের শাহ্‌। সাক্ষাৎ যুদ্ধে ইতিপূর্বে কেউ এ-দুর্গ দখল করতে পারেনি। আবার সমগ্র ভারত-ইতিহাসে শের শাহের মত সমরকুশল সেনাপতিও বিরল। পাহাড়ের চারদিক অবরোধ করে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল।

কালিঞ্জর পাহাড়ের সমতলশীর্ষের ঠিক নীচেই দুশো তিনশো ফিট সিধা খাড়াই। সেখানে পাথর-বার-হওয়া পাহাড়ের গায়ে গাছপালা নেই, কিছুই নেই। রুক্ষ পাথরের এই চওড়া বেল্ট পাহাড়ের চারদিক ঘিরে আততায়ীকে পরিহাস করেছে আবহমান-কাল। বহু পরিশ্রমে পাহাড়ের গা কেটে একটিমাত্র পথ ওপরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর, দুই পায়ের ফাঁকে সেই পথ আগলিয়ে যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে পর পর সাতটি তোরণ। প্রত্যেক তোরণের সুরক্ষিত আশ্রয়ে অসংখ্য সশস্ত্র সৈন্য ওত পেতে বসে থাকে। একের পর এক এই সাতটি তোরণ অধিকার করতে পারলে তবেই দুর্গে পৌঁছন সম্ভব। এই অজেয় কেল্লা দখল করতে এসেছেন শের শাহ্‌।

অবরোধ যখন অনেকদিন চলেছে, তখন একদিন গোলন্দাজ সৈন্যদের মধ্যে দাঁড়িয়ে সম্রাট স্বয়ং তোরণগুলির ওপর কামানের আক্রমণ পরিচালনা করছিলেন। কাছাকাছি শিবিরে বারুদের স্তূপে রক্ষিত ছিল। হঠাৎ একটি কামানের গোলা সুদৃঢ় সপ্তম তোরণ থেকে প্রতিহত হয়ে পড়ল এসে সেই বারুদের স্তূপে। অতি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন হ'ল অনেক গোলন্দাজ সৈন্য। শের শাহের ছিন্নভিন্ন শরীর ধরাধরি করে তাঁর তাঁবুতে নিয়ে এল তাঁর দেহরক্ষীরা। এক দুর্ধর্ষ ভারত-সম্রাটের শেষ নিঃশ্বাসবায়ু কালিঞ্জর প্রান্তরের বিষণ্ণ বাতাসে মিলিয়ে গেল।......

ইতিহাসখ্যাত এই কালিঞ্জর দুর্গ "কভার" করতে এসেছি। এই পাহাড় আর এই কেল্লার চারপাশ দিয়ে ইতিহাসের অনাসক্ত স্রোত বয়ে গেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী। পুরাবৃত্তের পাতায় সে-কাহিনী সবিস্তারে লেখা আছে। রাজ্য গড়েছে। রাজ্য ভেঙেছে। উঁচু মাথা মিশেছে ধূলোয়। আবার অখ্যাত শির অহমিকায় ফণা মেলেছে। সব দেখেছে এই দুর্গ। বর্মচর্ম পরে, পাথরের বেদীতে বসে, দিগন্তপ্রসারী নিষ্পলক দৃষ্টিতে একান্ত উদাসীনতার সঙ্গে লক্ষ্য করেছে জীবনমৃত্যুর এই আবর্তকে। মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হয়নি কোনোদিন। পাথরের দেহে, পাথরের মত মন নিয়ে, শতাব্দীর হানাহানি আর তুচ্ছ কলহকে উপেক্ষা করেছে পরম বৈরাগ্যে। কালিঞ্জর-বিধৌত কালস্রোতে শের শাহের অকালমৃত্যু গণ্য একটা বুদ্বুদ মাত্র। আপনি উঠে আপনিই মিলিয়ে গিয়েছে—কোনদিন। কালিঞ্জরের সে কথা আজ মনেও নেই।......

অন্তত, বিশন আহিররা যে এই ইতি-হাসের ভারে পীড়িত নয় সেকথা বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রায় সাড়ে চারশো বছর কেটে গেছে শের শাহের মৃত্যুর পর। ভগ্নপ্রায় দুর্গ, জীর্ণ তোরণ ও নীচের পোড়ো বাড়িগুলি ছাড়া সে-স্মৃতির আজ আর কিছুমাত্র অবশেষ নেই। এই দীর্ঘ সময়ে, বিশন আহিরেরা ফসল বুনেছে, ফসল তুলেছে ঘরে। দু'হাতে মাটিতে লাঙল চেপে ধরে হয়ত কখনো অকারণে তাকিয়েছে কালিঞ্জর পাহাড়ের দিকে। পুরাবৃত্তের কোনো দুরন্ত ছায়াও পড়েনি সে-দৃষ্টিতে। এই পাহাড়ের চারিদিকে পুরুষানুক্রমে বাস করেছে বিশন আহিরেরা। কাজিয়া করেছে, দাঙ্গা করেছে প্রতিবেশীর সঙ্গে। আবার, সবকিছু ভুলে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছে সেই প্রতিবেশীরই ঘরে। অনাবৃষ্টির কালে অনাহারে শুকিয়েছে দিনের পর দিন। আবার ফসলের মরসুমে রুপোর গয়না গড়িয়ে দিয়েছে মেয়েকে বউকে। বংশ-পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে প্রত্যহের ছোট ছোট দুঃখ সুখ। আর সেই প্রবাহের পলিমাটির নীচে চাপা পড়ে গেছে শের শাহের ইতিহাস।

আজকের এই অখ্যাত কালিঞ্জর গ্রাম মধ্যভারতের অন্য যে-কোনো গ্রাম থেকে পৃথক নয়। স্বতন্ত্র অস্তিত্বের আজ আর কোনো দাবী নেই তার।

তবু, আমাদের মত শহুরে বুদ্ধিজীবী, কালিঞ্জরের ঐতিহ্যের যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা হয়ত পথশ্রম উপেক্ষা করে এখানে আসেন কখনও কখনও। দু' একদিন থাকতে হলে, গ্রামের কারো বাড়িতে ওঠেন আমারই মত। গ্রামের লোকেরা কিন্তু তাঁদের দ্রষ্টব্য নয়। দ্রষ্টব্য এই উন্নতশির প্রাচীন দুর্গ।

আমিও এই মনোভাব নিয়েই কালিঞ্জরে এসেছিলাম। একটু গোলমাল হয়ে গেল

আমার প্ল্যানের। কালিঞ্জরের এই অতি-সাধারণ মানুষগুলোর দুঃখ সুখের সংগে নিজেকে জড়ালাম দু'দিনের মেয়াদে। অনেক ছবির মিছিলের মধ্যে নিতান্ত গ্রাম্য একটি বিরহ-মিলন-কথার স্মৃতি আজও মন থেকে মুছে যায়নি। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই দুর্গের কাহিনী থেকে সে-উপাখ্যান আমার কাছে কিছু কম রমণীয় নয়।

• • •

আমাদের গৃহস্বামীর অতিথিসংকারের ব্যবস্থা অতি পরিপাটি। তাঁর মত বিপত্নীকের পক্ষে একটু আশ্চর্য রকম পরিপাটিই বলতে হবে। ইন্দ্রজালমুগ্ধ বিশন আহিরের দল বিদায় নিলে, সেদিন রাত্রে যখন বাড়ির ভেতর খেতে এলাম, তখন দেখি ভেতরের দাওয়ায় পরিচ্ছন্ন তিনটি আসন পাতা। আসনের সামনে বড় বড় কাঁসার থালা আর জলভরা গেলাস। কপাটের আড়াল থেকে বাড়ির কিষাণকে পরিবেশনের নির্দেশ যে দিল, পারিপাট্যের মূলে যে সে-ই, গৃহস্বামী নয়, একথা বুঝতে দেরী হয় না। জমিজমা, বিষয়-আষয়ে লিপ্ত থাকলেও, গৃহস্বামী মহেন্দর সিং আসলে ভোলাভালা লোক। অন্তরালবর্তিনীর সজাগ উপস্থিতির কথা তিনি সহজ সরলতার সংগে নিজেই প্রকাশ করে দিলেন। বললেন, এই মা-মরা মেয়েটাকে নিয়েই তাঁর সংসার। এর হাতে ঘর-গেরস্থালি দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত। বছর কুড়ি আগে, তাঁর এই আদরিনীর শৈশবে, তার মা পরলোকে গেছেন। তারপরে, প্রচলিত গ্রাম্য প্রথার মধ্যে এক বিস্ময়ের মত, তিনি আর বিবাহ করেন নি। আশংকা করেছিলেন বিমাতার হাতে শিশুর অযত্ন হবে। এক বিধবা বোন ছিল সংসারে। দুলারীকে বড়সড় করে, তার বিয়ে দিয়ে, তিনিও পরলোকে গেছেন। জমিজমা, খেতখামার দেখোশোনা বাবদে মহেন্দর সিংয়ের অধিকাংশ সময় বাইরে বাইরেই কাটে। ঘরদোর দেখে দুলারী।

পারিবারিক প্রসংগ থেকে বৃদ্ধ সহসা অতিথি সংকারের প্রসংগে ফিরে এলেন। বাচ্চা মেয়ে তাঁর। আয়োজনে হয়ত অনেক ত্রুটি রয়ে গেল। আর একখানা রুটি দিক; আর একবাটি ক্ষীর দিক; এই আচারটা দুলারীই নিজে বানিয়েছে—এই সব পীড়া-পীড়িতে দুলারীর কাহিনী চাপা পড়ে গেল।

দুলারীর চিন্তাটা কিন্তু আমার মনে চাপা পড়ল না অত সহজে। বিবাহিতা দুলারী বাপের কাছে থাকে কেন? হয়ত বেড়াতে এসেছে দু'দিনের জন্য। কিন্তু এই যে মহেন্দর সিংহ বললে তার হাতে ঘর-সংসার ছেড়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত, এতো দু'দিনের সাময়িক ব্যবস্থা হতে পারে না। দুলারী কি তা হ'লে বিধবা? বিধবা হ'লে, এই কম-বয়সী মেয়েটির আবার বিয়ে দেয়নি কেন তার বাপ? এরকম বিয়ে এই দূরে পাড়াগাঁয়ে এখনও বেমানান নয়।

স্বামীদিয়ালকে যেচে জিজ্ঞাসা করে এসব কৌতূহলের নিরসন করতে পারি না। সে গৃহস্বামীর আত্মীয়। তাদের পারিবারিক ব্যাপারে আমার অনুসন্ধিৎসাকে হয়ত ভাল চোখে দেখবে না। অথচ এ-কৌতূহল দূর করাও শক্ত। পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত না হলে, সে-রাত্রে ঘুম আসতে হয়ত দেরীই হত।

কিন্তু স্বামীদিয়াল খবর রাখে। পরের দিন সকালে, কালিঞ্জর পাহাড়ের চড়াই ভাঙতে ভাঙতে ক্লান্ত হয়ে যখন বিশ্রাম করছি, তখন কথাটা তুললে স্বামীদিয়াল। বললে, জামাইয়ের সংগে খুব কাজিয়া হয়ে গেছে মহেন্দর সিংয়ের। মেয়েকে তাই নিজের কাছে এনে রেখেছে। পাঠাবার কথা উঠলেই ক্ষেপে ওঠে। লোকমুখে মহেন্দর সিং শুনেছিল যে দুলারীর সংগে নাকি দুর্ব্যবহার করে তার জামাই। অমনি একদিন হুট করে গিয়ে মেয়েকে নিয়ে এল নিজের বাড়িতে। জামাই বুধন, পঞ্চায়েতের দ্বারস্থ হয়েছিল। বিশেষ কোন ফল হয়নি। কেননা, মহেন্দর সিংয়ের বিরুদ্ধে যাবে এমন সাহস পঞ্চায়েতেরও নেই। তারা রায় দিয়েছে যে গ্রামসুদ্ধ লোককে খাওয়াতে হবে জামাইয়ের। দেহাতে প্রায়শ্চিত্তের এই-ই চিরাচরিত রীতি। তাছাড়া, মহেন্দর সিংয়ের বিশেষ শর্ত এই যে, গোটা পঞ্চায়েতের সামনে জামাইকে নাক খত দিয়ে হলপ করতে হবে যে, ভবিষ্যতে দুলারীর কণামাত্র অনাদর সে করবে না। কথার খেলাপ হলে ভয়ংকর শাস্তি হবে জামাইয়ের।

পাহাড়ে ওঠবার শুরু থেকে এক গ্রাম্য যুবা আমাদের সংগ নিয়েছে। কাল রাত্তিরে বিশন আহিরের দলের মধ্যে তাকে যেন দেখেছিলাম। চড়াই রাস্তায় একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল লোকটা। স্বামীদিয়াল বললে, ও-ই মহেন্দর সিংয়ের জামাই।

নিজের মনে সে পাহাড়ে উঠছে। তাকে বিশেষ গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি। হয়ত আমাদের কাছাকাছি একটু বেশী ঘুরে ঘুরে করছে। তাতেও আমাদের আপত্তির কি থাকতে পারে?

আরও অনেক চড়াই ভেঙে, সব কটা তোরণ পার হয়ে, কালিঞ্জর পাহাড়ের সমতলশীর্ষে যখন গিয়ে পৌঁছলাম, ততক্ষণে বুধনের সংগে অল্পস্বল্প আলাপ হয়েছে। তার ঘুর ঘুর করা দেখে তাকে সিগারেট খেতে দিয়েছি দু একবার। মুঠো-করা হাতের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট চেপে ধরে সে জোরে জোরে টান দিয়েছে।
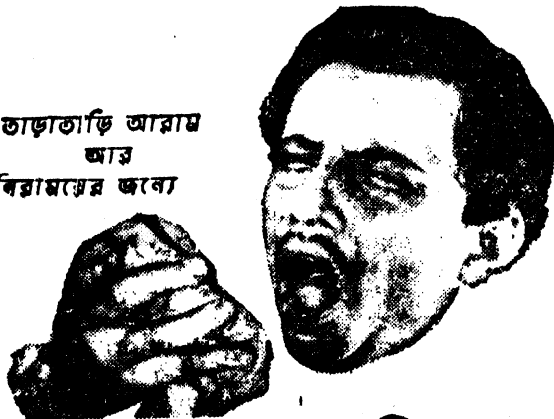
একটা কিছু বক্তব্য আছে বুধনের সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু বলি বলি করেও বলতে পারছে না। বলল অবশেষে অনেক পরে। সূর্য তখন মাথার ওপর এসেছে। পাহাড়ের সমতলশীর্ষে কাকচক্ষুজল যে এক দীঘি আছে তাতে হাত মুখ ধুয়ে নিম গাছের ছায়ায় আমরা তখন বসেছিলাম।

বুধন বললে, একটা আরজি আছে সাহেব। তার সমস্যাটা মোটামুটি জানি। তবে, তার আরজিটা ঠিক কি ধরনের হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত নই। উৎসাহ পেয়ে বুধন সেই কথাই বললে যা স্বামীদয়াল ইতিপূর্বেই আমাকে বলেছে। দুর্ব্যবহারের অভিযোগটা সে অবশ্য স্বীকার করে না। তবে তাদের বহু-পরিজনের সংসারে সে হয়ত দুলারীকে ততটা আরামে রাখতে পারে না যা সে নির্ঝঞ্ঝাট বাপের বাড়িতে পেতে অভ্যস্ত। তবে এ-কথাও ঠিক যে দুলারী তার আর্থিক অবস্থা ভালভাবেই বোঝে। এ-রকম অসম্ভব আরামের কামনাও সে করে না।

তবে আটকাচ্ছে কোথায়? পঞ্চায়েতের রায় মেনে নিয়ে একটা ভোজ দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। বুধনের সমস্যাটা এইখানেই! অবস্থা তাদের এক সময়ে ভালই ছিল। কিন্তু, এখন শুধু বসতবাড়ি আর চাষের জমিটুকু সম্বল। পরিজনও বিস্তর। গ্রামশুদ্ধ লোক খাওয়াতে পারে এমন সামর্থ্য তার নেই। সে প্রায় পঞ্চাশ ষাট টাকা খরচ।

লোকটার অবস্থা দেখে মায়া হয়। উস্কোখুস্কো চুল। গোঁফদাড়ি কামায়নি কতদিন। অবিন্যস্ত বেশবাস। জবরদস্ত শ্বশুরে তার বউকে কেড়ে নেবার পর যেন একেবারে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে।

আর সবাইকে ছেড়ে আমার কাছে কেন হাজির হয়েছে, বুধনকে এ-কথা জিজ্ঞাসা করলাম। উৎসাহে ঝক্‌ঝক্‌ করে উঠল তার চোখ। সহসা আমার পায়ের ধুলো নিয়ে হাত জোড় করে বসল আমার সামনে। বললে, আপ কলকত্তেকে আদমী, আপ জরুর জাদুগর হোঙ্গে। কোঈ কুছ্ কর্ সকে, তো আপহি সকেঙ্গে।

এ এক মহা যন্ত্রণায় পড়েছি! এই যে গ্রামসুদ্ধ লোক আমাকে পাকা জাদুকর ভাবছে, এ-ধারণাকে কি করে হটাবো কে জানে! কালকে বিশন আহিরদের সঙ্গে এ-নিয়ে অল্পবিস্তর তর্ক করেছি। কোনো ফল হয়েছে বলে মনে হয় না। ফল হবার আশাও নেই। কেননা, বহুদিন ধরে কলকাতা-প্রত্যাগতেরা এই গ্রামাঞ্চলে কলকাতার বাড়িঘর, কলকাতার ট্রামবাস, বিশেষ করে হাওড়ার পুলে সম্বন্ধে যে-সব রোমহর্ষক কাহিনী রটিয়েছে তাতে আমার ওকালতি অকেজো হতে বাধ্য। খালের ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে পায়ে-চলা সাঁকো বানানো মানুষের পক্ষে সম্ভব। বাঁশের খুঁটি পুঁতে নালার এপার-ওপার যাতায়াতের পথও করা যায় বটে। কিন্তু "হবুরেকা পুল?" সিরফ্ জাদুগরি ছাড়া তা আর কি হ'তে পারে?......

বুধনকে সাহায্য করা দরকার। যে-সমস্যার সে মীমাংসা করতে পারছে না, আমি যদি তার সমাধান করে দিই, তা হ'লে কলকাতার জাদুবিদ্যার ওপর তার শ্রদ্ধা আরও বাড়বে মাত্র। এ ছাড়া আর কোনো চিন্তা তার মাথায় ঢুকবে না। আমার কাছে যে খুব কৃতজ্ঞ বোধ করবে তাও নয়। মরজি হলে কলকাতার লোক হামেশাই এরকম ভোজবাজি করে থাকে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার বউয়ের মনোভাবটা কি? সে কি তোমাদের সংসারে ফিরে আসতে চায়, না বাপের কথামত তার কাছেই থাকতে চায়?

আশ্বাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠল বুধনের চোখ। আমি তা হলে একটা কিছু কিনারা করবার কথা ভাবছি! বললে, এই দুমাসে আমার কি হাল হয়েছে বাবুসাহেব—ও সব জানে, সব খবর রাখে। ফিস্ ফিস্ করে বললে, কেউ জানে না বাবুসাহেব, মহেন্দর সিং যখন বাড়ি থাকে না, তখন দেখাও করেছি তার সঙ্গে কয়েকবার। ও নিশ্চয়ই আমার কাছে আসতে চায়। তা ছাড়া, আপনি ত ওদের বাড়িতেই আছেন। আপনিই খুদ তাকে পুছতাছ করে দেখবেন।

দুলারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা আমার আয়ত্তের বাইরে। আমার সঙ্গে কথা বলা ত দূরের কথা, আমার সামনে সে বারই হবে না। ভরসা স্বামীদয়াল। তার কাছে হয়ত মুখ খুললেও খুলতে পারে।

ফোটোগ্রাফীর তাড়নায় সারাদিন ঘোরাঘুরির পর সন্ধ্যার সময় যখন বাড়ি ফিরলাম তখন বাড়িতে দুলারী ছাড়া আর কেউ নেই। আদায়-উশুলের তাগাদায় মহেন্দর সিং গেছে দূরের এক গ্রামে। ফিরতে রাত হবে।

কাল সকালেই কালিঞ্জর ছেড়ে চলে যাব। বুধন-দুলারীর একটা বিহিত করতে হলে, নষ্ট করবার মত আর সময় নেই। আমার উপরোধে স্বামীদয়াল উঠে বাড়ির ভেতরে গেল। তারপরে, বাইরের দাওয়ায় খাটিয়ায় বসে তার সব কথা শুনলাম।

দুলারীর অবস্থা বুধনের মতই শোচনীয়। আর্ত, অসহায় একটি নারী-হৃদয় স্বামীর কাছে ফিরে যাবার জন্য আকুলিবিকুলি করছে। কিন্তু কারও কাছে মুখ ফুটে সেকথা বলতে পারে না। স্বামীদয়ালের কাছেও পারে নি। শুধু বলেছে, জাদুগর সাহেব তার বাবাকে একবার অনুরোধ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

অবশ্য, স্বামীদয়ালেরও নিজস্ব মতামত আছে এ-বিষয়ে। কী দরকার এসব ফইজতে নিজেদের জড়িয়ে, এই তার মত। গ্রামদেশে এরকম কাজিয়া দুবেলা হচ্ছে। আবার যথাসময়ে মিটেও যাচ্ছে নিজের নিয়মে। দুলারীর বাপের কাছে কথাটা পাড়লে, রগচটা বুড়ো হয়ত হঠাৎ ক্ষেপে উঠবে। এমন কি, তার ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে আমার মত অপরিচিতজনের এই অনধিকার কৌতূহলকে সে অপমানজনক বলেও মনে করতে পারে।

একটা সমস্যায় পড়লাম। স্বামীদয়ালের কথায় একেবারে যে যুক্তি নেই তা নয়। আবার বুধন-দুলারীর আবেদনকে অবহেলা করতে পারি এত নির্দয় হওয়াও কঠিন।

একটু বেশী রাত্রে বাড়ি ফিরে এল মহেন্দর সিং। খাওয়া-দাওয়া সেরে বাইরের দাওয়ায় এসে বসেছি তিনজনে। ইতিপূর্বে অনেক মিনতি করে আমার পক্ষ সমর্থন করতে রাজি করিয়েছি স্বামীদয়ালকে।

কালিঞ্জর-দুর্গ কি রকম দেখলাম, জিজ্ঞাসা করল মহেন্দর সিং। কথায় কথায় বুধনও যে ছিল আমাদের সঙ্গে সে-খবরটা শোনালাম তাকে।

কেন? বুধন কেন সঙ্গে ছিল? এই টুকুতেই ক্ষেপে উঠল মহেন্দর সিং। বুধনকে সে একেবারেই সহ্য করতে পারছে না দেখলাম। অথচ এ-মামলার একটা কিনারা করব বলে কোমর বেঁধেছি। নিশ্চয় জানি, যদি হারি, আজ হোক কাল হোক দুলারীর
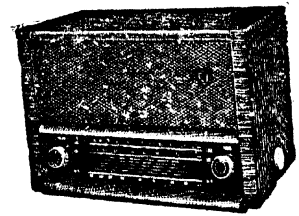
আর একটা বিয়ে দিয়ে দেবে তার বাপ। এই পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের হৃদয়ের থেকে পুরুষের অহংকারের দাম অনেক বেশী।

আরম্ভ হল দীর্ঘ তর্ক। নানান যুক্তির অবতারণা করে, আমার বাগ্মিতার সবটুকু প্রয়োগ করে অনেকটা নরম করে আনলাম মহেন্দর সিংকে। স্বামীদয়ালও মাঝে মাঝে যে-সায় দিয়েছে তাতে উপকার অল্প হয়নি। প্রতিপক্ষ যেখানে দু'জন, সেখানে একজনের প্রত্যয় খুব দৃঢ় না হলে তাকে হটানো কঠিন নয়। তাছাড়া, মনে মনে মহেন্দর সিং বিলক্ষণ জানে যে, কাজটা সে খুব ভাল করেনি।

মেয়ের দুঃখ বাপ যে বোঝে না তা নয়। বেশ বোঝে যে, জামাইয়ের জন্য তার বেটীর মন গোপনে কাঁদে। তবু অহমিকাই প্রধান অন্তরায়। গ্রামের পঞ্চায়েতে যে-বিচার হয়ে গেছে তার হেরফের করতে গেলে, পঞ্চায়েতের মুখিয়া মহেন্দর সিংকে সামাজিকভাবে ছোট হতে হয়। তা সে কিছুতেই পারবে না। দুলারীর প্রতি বাৎসল্যের তাগিদেও নয়।

বুধনকে গ্রামসুদ্ধ লোককে খাওয়াতেই হবে। সামাজিক অনাচারের এই-ই চিরা-চরিত প্রায়শ্চিত্ত। এর কোনো বিকল্প-ব্যবস্থা নেই। তবে খরচটা যাতে কমের দিকেই হয় সে-বিষয়ে বিবেচনা চলতে পারে। আর, নাকে খত দিয়ে হলফ করবার যে-শর্ত ছিল মহেন্দর সিংয়ের, তা সে প্রত্যাহার করতে পারে। ভেবে দেখলে, এ-রকম শর্ত অনাবশ্যক। কেননা, জামাই ভবিষ্যতে আবার বাঁদরামি করলে তাকে কিভাবে শায়েস্তা করতে হবে মহেন্দর সিং তা বিলক্ষণ জানে।

বড় হালকা মন নিয়ে ঘুমোতে গেলাম সেদিন। কাল সকালে যে-কোনো অছিলায় বুধন নিশ্চয়ই দেখা করতে আসবে একবার। তখন এ-মামলার হয়ত একটা কিনারা করতে পারব।

• • • •

অজয়গড় থেকে কালিঞ্জর এই বাইশ মাইল পথ আজীবন মনে রাখবার মত। পথ বলাই হয়ত ভুল। আসবার সময়, চষা খেতের ওপর দিয়ে কত মাইল যে সাইকেল হাঁটিয়ে এনেছি তা বলা মুশকিল। ফিতেয়-ফিতে-বাঁধা জুতো সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে অগভীর নদীও যে পার হয়েছি কতগুলো তার সীমা-সংখ্যা নেই। কালিঞ্জর গ্রামে পৌঁছবার ঠিক আগেই একটু বড়সড় এক নদী পার হয়েছিলাম মনে আছে। তার পরেই ঢুকেছিলাম গ্রামে।

এই পথেই আবার ফিরে যেতে হবে। এখানকার দু'দিনের ঘরকন্না শেষ হল। শুধু গাঁঠরি পিঠে ফেলে পা বাড়ানোর অপেক্ষা। একটু ভোর ভোরই বেরনো ভাল। অজয়গড় অবধি বাইশ মাইল যেতে কতখানি সময় লাগবে কে জানে!

সকাল হয়েছে। সাইকেলের কেরিয়ারে জিনিসপত্র বেঁধে উঠনে এসে দাঁড়িয়েছি আমি আর স্বামীদয়াল। বিশন এসেছে। আরও এসেছে দশবিশ জন। কিন্তু বুধনকে দেখছি না কেন? সে কি আসবে না? এত কাঠখড় পুড়িয়ে মহেন্দর সিংকে নরম করে এনেছিলাম। তার মামলাটা কি তবে এমনি মাঝপথে ঝুলিয়ে রেখে চলে যেতে হবে? নিম্নকণ্ঠে স্বামীদয়ালকে বললাম কথাটা। সে অন্য অছিলায় একটু এদিক-ওদিক দেখে এল। না, বুধন আসেনি।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল।

কালিঞ্জর গ্রাম থেকে যে-রাস্তা অজয়গড় যাবার সড়কে এসে পড়েছে, সেই মোড় অবধি মহেন্দর সিং, বিশন আহির ও অন্য সকলে আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল। কিন্তু এই খোলা মাঠের মধ্যেও বুধনকে ত' কোনোদিকে দেখছি না। দুলারীর একটা মন-গড়া মুখ কল্পনায় ভেসে বেড়িয়েছে এ-ক'দিন। সেই কাল্পনিক মুখখানা মনে পড়ল। মনে পড়ল বুধনের উস্কোখুস্কো চেহারা। এদের সুখী করে যেতে পারব ভেবেছিলাম। কিন্তু তা বোধ হয় আর হল না।

গ্রামবাসীদের কাছে বিদায় নিয়ে, আমি আর স্বামীদয়াল সেই শিশিরে-ভেজা ধুলোর রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে দিলাম। মনে হল, একটা লজ্জাকর পরাজয়কে ভুলে যাবার জন্য, পেছনে ফেলবার জন্য, যেন তাড়াতাড়ি পালাবার চেষ্টা করছি।

কিছুদূরে গিয়েই পথ ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীর দিকে। সকালের রোদ্দুর সোনালি বালির ওপর পড়েছে; পড়েছে এসে ঝিরঝিরে ঝকঝকে জলের ওপর। খালি পায়ে সাইকেল নিয়ে নদী পার হয়ে এলাম। এপারের পাড় বেয়ে ওপরে উঠে শেষবারের মত পিছনে-ফেলে-আসা কালিঞ্জর গ্রাম ও কালিঞ্জর পাহাড়কে দেখব একবার। তার-পরে, আমাদের সাইকেল চলে যাবে অজয়-গড়ের দিকে। আর হয়ত এই গ্রামে আসব না কোনো দিন। বুধন আর দুলারীর বিরহ-শোক মন থেকে মুছে যাবে যথাসময়ে।...

এ পারের ঢালু পথটুকু পার হয়ে ওপরে উঠে এসেছি। সাইকেল ঘুরিয়ে কালিঞ্জরের দিকে পিছন ফিরতেই অবাক হয়ে গেলাম। বুধন দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে! বোধ হয় কোনো ঝোপের আড়ালে বসেছিল এতক্ষণ। আমাদের আসতে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে।

"আমার কি নতীজা করলেন সাহেব?" হাতজোড় করে আমাদের দিকে এগিয়ে এল বুধন। যাক, দেখা পাওয়া গেছে বুধনের। শেষরক্ষা বুঝি করা যাবে এবার।

মহেন্দর সিংয়ের সঙ্গে আমাদের আলো-চনার কথা সংক্ষেপে বললাম তাকে। এখন ভোজটা লাগিয়ে দিলেই আর কোনো প্রতিবন্ধক নেই।

নিতান্ত অসহায়ের মত দু'হাতে আমার সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরল বুধন। বলল, সে যে অনেক টাকা সাহেব! এত টাকা আমি কোথায় পাব? আমার ঘরে খানেওয়ালা যে আট দশটা মুখ। কায়ক্লেশে তাদের খোরাক জুটিয়ে আর যে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না আমার!

আমি মনস্থির করেই এসেছিলাম। মণিব্যাগ থেকে পাঁচটা দশটাকার নোট বার করে বুধনের হাতে দিলাম। বিস্ময়ে, কৃতজ্ঞতায় একেবারে অসাড় হয়ে গেল বুধন। তার কাঁধে ছোট্ট একটা চাপড় দিয়ে পা রাখলাম সাইকেলের পেডালে।...

পিছন ফিরে তাকিয়েছিলাম একবার। নোটগুলো হাতে নিয়ে তখনও পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে বুধন। জানি, এ-জড়ত্ব তার কেটে যাবে। এ-যুগের পাশুপত অস্ত্র দিয়ে এসেছি তার হাতে, যার গুণে অনেক বড় বড় জখম বেমালুম আরাম হয়ে যাবে। বুধন দুলারীর জন্য আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই আমার মনে।...

"অজয়গড় থেকে পান্নার বাস কখন ছাড়ে স্বামীদয়াল?" —সাইকেল চালাতে চালাতে জিজ্ঞাসা করলাম স্বামীদয়ালকে। সে যে ঠিক কি উত্তর দিয়েছিল সে কথা আজ আর মনে নেই।...

শ্রীকৌটিল্য

তৃতীয় পরিকল্পনায় ছোট শিল্পের ভূমিকা আমাদের বর্তমান সংখ্যার আলোচ্য বিষয়। অধিকাংশ শিল্পই প্রয়োজনমতো বড়ো অথবা ছোট হতে পারে; সুতরাং ছোট শিল্প কেন?

ছোট শিল্প বলতে আমরা মনে করব, সেই জাতীয় শিল্প যা প্রত্যেকটি উৎপাদন এককে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ উৎপাদন করে এবং যাতে শ্রমিক নিয়োগের জন্য মাথাপিছু পুঁজি অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজন হয়। সুতরাং ছোট শিল্পের সংজ্ঞা থেকেই তার অস্তিত্বের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হয়। আমাদের দেশে উৎপাদনের প্রকরণ স্বল্প, উৎপাদন কৌশল নিম্ন স্তরের, শাসনযন্ত্র দুর্বল, অথচ বেকারের পরিমাণ বিপুল। এদেশের পরিকল্পনায় অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন কৌশল কিংবা পুঁজির অবস্থা উন্নত করবার যখন কোন বিরাট আশা নেই এবং তথাচ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে এবং প্রচুর লোককে অবিলম্বে কাজ দিতে হবে, তখন শিল্পোন্নয়নের উপযোগী pattern খুঁজে বার করা আমাদের অন্যতম প্রথম কর্তব্য। ছোট শিল্পের যৌক্তিকতা এই উপযোগী pattern-এর প্রসঙ্গেই উপলব্ধি সাপেক্ষ। ভারতবর্ষে শিল্পায়নের সাফল্যের একটা মাপকাঠি এই হবে যে, বর্তমানে প্রচলিত নানারকম নিম্নস্তরের কৌশলসম্পন্ন শিল্পগুলিকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে বরং তাদের ন্যূনতম বিপর্যয়ের মাধ্যমে কতটা পুনর্গঠন করা যায়; অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষমতা উন্নত করতে হবে অথচ কাঠামো চট করে ভাঙা চলবে না। চীনের শিল্প বিপ্লবের বর্তমান পর্যায়ে আমরা এই পন্থায় পুনর্গঠনের এক বিস্ময়কর সাফল্য দেখতে পাই। অবশ্য এ থেকে এরকম ইঙ্গিত কেউ যেন না পান যে, ছোট শিল্পের উৎপাদন কৌশল অনিবার্যভাবে নিম্ন স্তরে থাকবে। আমাদের স্বীকার শুধুমাত্র এই যে, উৎপাদন কৌশলের নিম্নমান সাধারণত ছোট শিল্পের গণ্ডীতেই উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে রাখে। আরেক কথা, বড়ো শিল্প এবং ছোট শিল্প একই বিষয়ের উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়কে পরস্পর ভাগাভাগি করে নিতে পারে বলে এই দুই ধরনের শিল্প একে অন্যের বিরোধী নয়। চীনে জাপানে এবং পশ্চিমের অনেক অঞ্চলে এই দুই ধরনের শিল্পের সহযোগিতার জ্বলন্ত উদাহরণ মোটেই বিরল নয়; এবং ভারতবর্ষে এই নীতি অনুসৃত না হবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই।

উৎপাদন কৌশলের কথা থেকে নিয়োগের দৃষ্টিকোণে আসা যাক। তৃতীয় পরিকল্পনার অন্য অনেক দায়িত্ব আছে, কিন্তু সে দায়িত্ব পালনের পথে নিয়োগের সমস্যাটি অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে থাকবে। এমন কি, অর্থনীতিক যুক্তিকে অতিক্রম করে রাজনীতিক যুক্তিই হয়তো অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত স্থির করবে। সুতরাং ছোট শিল্পের ভূমিকা নির্ধারিত হবে তার নিয়োগ ক্ষমতা (employment potential) অনুযায়ী। বলা বাহুল্য, নিয়োগ ক্ষমতার দিক দিয়ে ছোট শিল্প আমাদের দেশে সর্বাগ্রে স্থান পাবে। মাথাপিছু নামমাত্র অথবা অপেক্ষাকৃত অল্প পুঁজিতে এই জাতীয় শিল্পে নিয়োগ সম্ভবপর। বস্তুত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অকৌশলী শ্রমিককে দ্রুত নিযুক্ত করবার উদ্দেশ্যেই অধ্যাপক মহলানবীশ, শুধু ছোট শিল্প নয়, এমন কি অত্যন্ত আদিম উপকরণযুক্ত 'hand industries'-এর স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনার pattern সম্বন্ধে আর একটি প্রয়োজনীয় কথা এসে পড়ে। ছোট শিল্পকে যথার্থই সার্থক করতে হলে তাকে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। এর এক কারণ এই যে, যে গ্রামীণ জনসাধারণকে শিল্পের কাজে লাগাতে হবে, তাদের গ্রামীণ জীবন থেকে খুব বেশি বিপর্যস্ত করা সমীচীন হবে না। এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আগেই একবার করেছি। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলের রসদ যদি শিল্পে খাটাতে হয়, তা হলে আমাদের মতো দরিদ্র দেশে ছোট শিল্পগুলিকে গ্রামের মধ্যে কিংবা আশেপাশে ছড়িয়ে দিতে হবে। এতে উপরন্তু আরো লাভ যে, পরিবহন ব্যয় এবং কাঁচা মালের পরিবহনকালীন অপচয় অনেক কম হয়। গ্রামীণ শিল্পগুলিকেও এই ধরনের শিল্পায়নের আওতায় এনে শক্তিশালী করা হয়তো সম্ভবপর। কিন্তু এইসব ব্যাপারেই যথেষ্ট যত্ন নিতে হবে, যেন সম্পূর্ণ উৎপাদনচক্রের কোনো পর্যায়ে অন্য এক পর্যায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে দাঁড়ায়। অসম উৎপাদন কৌশলের ব্যবহারেই সচরাচর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ নিহিত থাকে। চীন থেকে এদিক দিয়েও আমাদের শিখতে হবে যে, সর্বোন্নত শিল্পকৌশল এবং সর্বনিম্ন উৎপাদন প্রকরণ কীভাবে পাশাপাশি অবস্থান করে একে অন্যের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে বরং সম্পূরক হয়েছে।

সবশেষে গ্রামাঞ্চলের রসদ এবং সঞ্চয়ের সার্থকতম ব্যবহারও একমাত্র সম্ভব ছোট শিল্পের গ্রামভিত্তিক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে। প্রসঙ্গত চীনের অনুসরণে ভারতবর্ষেও আঞ্চলিক (regional) ভিত্তিতে শিল্পায়ন কার্যকরী হতে পারে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্নতা এত বেশি এবং রসদ ও চাহিদার তারতম্যও এত প্রকট যে, আঞ্চলিক ভিত্তিতে শিল্পায়নের পক্ষে চীনের যুক্তি ভারতবর্ষেও প্রযোজ্য। আঞ্চলিক রসদ ও সঞ্চয়ের আঞ্চলিক শিল্পে ব্যবহারের সঙ্গে জনসাধারণের কর্ম প্রেরণার (incentive) বিশেষ যোগ আছে। পূর্ববর্তী সংখ্যায় একথা বলেছি। প্রত্যেক অঞ্চলে একজন পরিকল্পনার গোড়াতেই একটা রসদ-পরিমাপক অন্বেষণ (resource estimating investigation) দরকার। তারপর সেই অঞ্চলের উপযুক্ত শিল্প গঠন ও তার উৎপাদনের জন্য আঞ্চলিক চাহিদা ও বাইরের চাহিদার দুটো পৃথক হিসেব করতে হবে। প্রত্যেকটি অঞ্চলই তার ভিতরের এবং বাইরের চাহিদা সাধ্যমতো মেটাবে এবং আঞ্চলিক পুঁজি প্রস্তুতের

জন্য চেণ্টা করবে। ভারতবর্ষের অর্থ-নীতিতে ছোট শিল্পের ভূমিকার সার্থকতা এইভাবে তার যথাযোগ্য শিল্পবিন্যাসের উপরেই শেষ পর্যন্ত নির্ভর করবে। অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনায় ছোট শিল্পের প্রয়োজন আছে কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর। বরং কীভাবে ছোট শিল্পকে সবচেয়ে ভাল-ভাবে কাজে লাগানো যাবে, সেই চিন্তাই করতে হবে। কিছু কিছু ছোট শিল্পের নির্বিশেষ যাথার্থ্যও আছে: যথা সাবান শিল্প। এই শিল্পের অন্য সব ছোট শিল্প-গুলির অনুরূপ গুণ ছাড়াও পুঁজি উৎপাদন হারের (ক্যাপিটাল আউটপুট রেসিও) নিম্নতা লক্ষ্যণীয়। সাবান শিল্পে পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে যে, বড়ো শিল্পের (large scale industries) তুলনায় ছোট শিল্পে পুঁজি উৎপাদন হার আপেক্ষিকভাবে নিচু। এই হারটি যে একমাত্র সাবানের ক্ষেত্রেই ছোট শিল্পের পক্ষে যাচ্ছে তা নয়, পরিসংখ্যান নিয়ে এরকম আরো কয়েকটি শিল্পে অনুরূপ ঘটনাই লক্ষিত হয়েছে। এই শিল্পগুলিকে এই যুক্তিতে যথাসাধ্য ছোট শিল্পের উৎপাদন কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

আটপুরের শিল্পকীর্তি

প্রভাতকুমার দত্ত

আটপুর হুগলী জেলার একটি ছোট গ্রাম। মার্টিন রেলওয়ের হাওড়া ময়দান স্টেশন থেকে চাঁপাডাংগা লাইনে এই গ্রামে যেতে হয়। হাওড়া থেকে এর দূরত্ব মাত্র পঁচিশ মাইল। গ্রাম হিসাবে আটপুর অবশ্য খুবই সাধারণ, তবে শিল্প-কীর্তির দিক থেকে এই গ্রামের অসাধারণত্ব আছে। এই অসাধারণত্ব আলোচনার জন্য বর্তমান প্রবন্ধের সূত্রপাত। আটপুরের শিল্প-কীর্তির বিস্তৃত আলোচনা করার আগে কয়েকটি কথা বলা দরকার। বাংলা দেশের যে সমস্ত গ্রামে প্রাচীন শিল্পকীর্তি এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে, সেগুলির কোনটার ইতিহাসই তিন চার শ' বছরের বেশী পুরোনো হবে না। অবশ্য বাংলাদেশে তিন চারশ' বছরের চেয়ে অনেক পুরোনো গ্রাম আছে। কিন্তু সেই সমস্ত গ্রামের শিল্পকীর্তির বেশীর ভাগই নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের প্রাচীন শিল্পকীর্তির মধ্যে পোড়ামাটির ভাস্কর্য-খচিত মন্দির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের মন্দির বাংলাদেশে এখনও যা চোখে পড়ে, তার কোনটাই তিন চারশ' বছরের আগেকার নয়। বেশীরভাগ মন্দিরই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত। আটপুরের শিল্প-কীর্তির সূত্রপাত এই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে। এখন বাংলার গ্রামে মন্দিরকেন্দ্রিক শিল্পকীর্তিগুলি কিভাবে গড়ে উঠেছিল তার একটা চমৎকার সামাজিক ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাসই আমরা অল্প কথায় বর্ণনা করার চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশের গ্রামে তিন চারশ' বছর আগে মন্দির চণ্ডীমণ্ডপ ইত্যাদি যে শিল্প-কীর্তি নির্মিত হয়েছিল সেগুলির নির্মাতা ছিলেন গ্রামের প্রভূত বিত্তবান ও প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তিগণ। এই প্রভূত বিত্তবান ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরা ছিলেন মুসলমান বাদশা-নবাব ও প্রাদেশিক শাসক এবং পর-বর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসক-দের সাহায্যপুষ্ট ব্যক্তি। আমাদের দেশে হিন্দু যুগ থেকেই দৈনন্দিন দেশ শাসন-কার্য পরিচালনার জন্য, যাকে আমরা 'ব্যুরোক্রেসি' বলি অর্থাৎ আমলাতন্ত্র, তার উপস্থিতি ছিল। মৌর্যযুগে চাণক্য ক্ষমতা বজায় রাখা ও সুষ্ঠু দেশ শাসনের জন্য আমলাশ্রেণী গড়ে তোলার প্রতি প্রথম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ বিষয় সর্দার কে এম পানিকর তাঁর 'সার্ভে অব ইণ্ডিয়ান হিস্‌টোরি' পুস্তকে চমৎকার আলোচনা করেছেন। যাই হোক, আমাদের ইতিহাসের একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এখানে রাজা-বাদশা বদল হতো বটে, কিন্তু আমলাশ্রেণী মোটামুটি একই থেকে যেত। মুসলমানেরা যখন তাঁদের ইসলাম ধর্মের উগ্র উৎসাহ নিয়ে এদেশে এসে দেশ শাসন আরম্ভ করেন, তখন অনেকে আশা করে-ছিলেন যে, পুরনো আমলাশ্রেণীকে একে-বারে নাকচ করে তার জায়গায় কেবলমাত্র মুসলমানদের নিয়ে নতুন আমলাশ্রেণী গড়ে উঠবে। কিন্তু আসলে তা হয়নি। মুসল-মান শাসকেরা শাসন বিভাগের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদ ছাড়া অন্যান্য পদে হিন্দু আমলাদেরই নিযুক্ত রেখেছিলেন। এ ব্যাপারে পানিকরের উপরিউক্ত পুস্
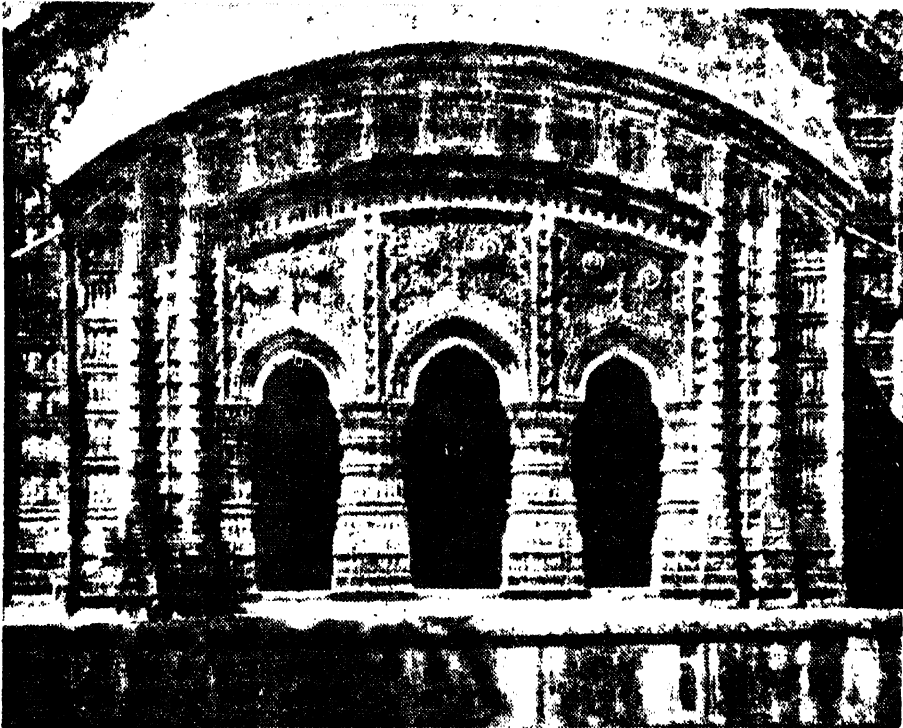
আটপুর রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সম্মুখভাগ
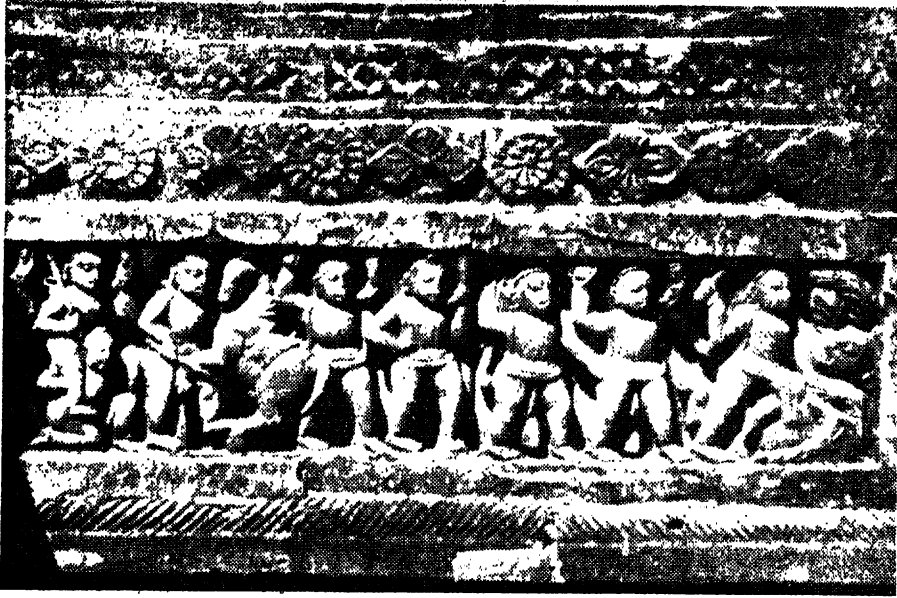
আটপুরঃ রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের ভাস্কর্য প্যানেল

সুন্দর ইঙ্গিত আছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা তা পড়ে দেখতে পারেন। শাসন-ব্যবস্থা ও রাজস্ব বিভাগে হিন্দু আমলাদের বাতিল না করে মুসলমান নবাব-বাদশারা রাজনৈতিক বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। কারণ ধর্মান্তরিতদের কথা বাদ দিয়ে মুসলমানেরা সংখ্যায় এমন বেশী ছিলেন না যে, শাসনযন্ত্রের নীচ থেকে উপর পর্যন্ত সব কিছু দায়িত্ব তাদের নেওয়া সম্ভব হত। তাছাড়া হিন্দুরা বংশানুক্রমে বহুদিন ধরে আমলার কাজ করে আসছেন এবং ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশকে শাসন করতে হলে তাঁদের অভিজ্ঞতাকে মোটেই অস্বীকার করা যায় না। এরই জন্য আমরা দেখি, মুসলমান রাজত্বকালে বহু হিন্দু জায়গীরদার, দেওয়ান, কানুনগো হিসাবে অসীম প্রতিপত্তি ও সম্মানের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেছেন। এঁরা মুসলমান দরবারের কর্মচারী হলেও নিজেদের এলাকায় প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বাংলাদেশে এই সমস্ত বাঙালী আমলারা খানিকটা তাঁদের প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির চিহ্নস্বরূপ এবং অনেকটা ধর্মভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের জন্মস্থানের গ্রাম বা যে গ্রামে তাঁরা বেশীরভাগ সময় থাকতেন, সেই সমস্ত গ্রামে নানা কীর্তিসৌধের দ্বারা শ্রীমণ্ডিত করে তুলতেন। এই সমস্ত কীর্তি-সৌধের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ইটের তৈরী ও পোড়ামাটির ভাস্কর্যখচিত ছোট-বড় দেব-মন্দিরগুলি: এছাড়া তৈরী হত খড়ের চলা করা ও ভিতরে কাঠের কারুকার্যশোভিত ফ্রেমের চণ্ডীমণ্ডপ। কখনও কখনও আমরা দেখতাম মন্দিরের প্রাঙ্গণ এলাকায় দোল-মঞ্চ ইত্যাদি; সুন্দর ঘাটবাঁধানো বড় পুষ্করিণীও নির্মাণ করা হত সমগ্র দেব-স্থানটির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য। এইভাবে বাংলার গ্রামে কীর্তিসৌধগুলি গড়ে ওঠায় একদিকে যেমন তখনকার মানুষের ধর্ম-প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হবার সুযোগ হয়েছিল, তেমনি অপরদিকে সৃষ্টি হয়েছিল বাংলার শিল্পকলার পরিপূর্ণ বিকাশের অপূর্ব পরিপ্রেক্ষিত। সে সময়কার বাংলার গ্রামের ধর্মগত জীবন ও সংবাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই সুপরি-কল্পিত ও সুসজ্জিত দেবস্থানগুলি। গ্রামের নানা বৃত্তির (প্রফেসন) লোকেরাও আর্থিক দিক থেকে এই সমস্ত দেবস্থানের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। মোটামুটি তখনকার গ্রাম-বাংলার জীবন অনেকটা বিবর্তিত হত এই দেবকীর্তিগুলিকে কেন্দ্র করে। মুসলমান আমলের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগে অনেক বাঙালী হিন্দু কোম্পানীর ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করে ও পরে জমিদারী লাভ করে প্রচুর বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। এঁরাও তাঁদের স্ব স্ব গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট অর্থব্যয় করেন।

যাই হোক, আমাদের আলোচনার বিষয় হল আটপুর গ্রামের শিল্পকীর্তি। সেই প্রসঙ্গেই আমরা উপরোক্ত মন্তব্য করলাম। আটপুরের মিত্রবংশই হচ্ছে সবচেয়ে প্রখ্যাত। এই গ্রামের দেবমন্দির ইত্যাদির নির্মাতা এই মিত্রবংশ। বংশটি প্রাচীন এবং এদের পূর্বপুরুষেরা বর্ধমানের রাজ-দরবারে দেওয়ানীর কাজ করতেন। এই দেওয়ানীর কাজ থেকেই এই বংশের সমৃদ্ধির সূত্রপাত। মিত্রদের দেশঘর ছিল আটপুর। এখন অবশ্য মিত্র পরিবারের সেই সমৃদ্ধি আর নেই। সম্পত্তির মধ্যে প্রাচীন শিল্পকীর্তিগুলি বাদ দিলে আটপুর এমনি একটা সাধারণ গ্রাম। তবে অনুমান করা হয় আলোচ্য গ্রাম এক সময়ে বিখ্যাত ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানদের আগে পাঠান আমলে ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার অনেকটা অংশ নিয়ে গড়ে উঠেছিল। এই রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল ভূরিশ্রেষ্ঠ যা বর্তমানে ভূরশুট নামে পরিচিত। এই ভূরশুট গ্রাম আটপুর থেকে খুব বেশী দূরে নয়। ভূরি-

শ্রেষ্ঠ রাজ্য পাঠান আমলে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এবং মুঘল আমলে দিল্লীর দরবারে নজরানা পাঠানো হলেও কার্যত ভূরিশ্রেষ্ঠ স্বাধীন ছিল। আটপুরে অবশ্য ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ আমলের কোন প্রাচীন কীর্তি চোখে পড়ে না।

আটপুরে মিত্রবংশীয়দের শিল্পকীর্তির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রাচীর-বেষ্টিত সুবৃহৎ রাধাকৃষ্ণের মন্দিরটি। এই ধরনের সুউচ্চ মন্দির শুধু হুগলী জেলা কেন পশ্চিম বাঙলার অন্যান্য জেলাতেও খুব কম লক্ষ্য করা যায়। এই মন্দিরটিকে গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। দুয়েরই মোটামুটি গড়ন একরূপ। অবশ্য বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের গায়ে কোন পোড়ামাটির ভাস্কর্য কাজ নেই। কিন্তু আটপুরের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের সমগ্র সম্মুখভাগ এবং দু'পাশের খানিকটা করে অংশ অজস্র পোড়ামাটির ভাস্কর্য প্যানেল দ্বারা শোভিত। ভাস্কর্য প্যানেলের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে। হস্তী, হংস, অশ্ব প্রভৃতি নানা জীবজন্তুর সারি, যুদ্ধের বিভিন্ন দৃশ্য, ফিরিঙ্গী বণিক, কৃষ্ণের বাল্য ও গোষ্ঠলীলার বিভিন্ন আলেখ্য, পাশা খেলা ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ হয়েছে এখানে। বেশীরভাগ প্যানেলগুলিই অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এগুলি একটি একটি করে দেখতে দেখতে মনে হয় যেন আমাদের চোখের উপর দিয়ে কত না দৃশ্য-পটের পরিবর্তন হচ্ছে। আড়াইশো তিনশো বছর আগেকার বাঙলার গ্রামের জীবনযাত্রার ছবি আমরা এতে পাই এবং এ ছবি পুঁথিতে বর্ণিত ঘটনার চেয়ে অনেকক্ষেত্রে বেশী জীবন্ত। আটপুরের রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের নির্মাণকাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বলেই অনুমান করা হয়। রাধাকৃষ্ণ মন্দির ছাড়াও মিত্রবাটীর প্রশস্ত চত্বরে আরো দু'একটি ছোট ইটের শিব-মন্দির আছে। তবে এগুলির অবস্থা মোটেই ভালো নয়। কারুকার্য খুব কম, আর যা ছিল তাও সব নষ্ট হয়ে গেছে। আলোচ্য চত্বরের এক অংশে একটি সুন্দর দোলমঞ্চ প্রত্যেক দর্শকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দোললীলার সময় রাধাকৃষ্ণের দোদুল্যমান যুগলমূর্তি আর ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে এই দোলমঞ্চ এক নবরূপ ধারণ করে। দোলমঞ্চ হিন্দুদের এক অপূর্ব কল্পনামধুর মনের সৃষ্টি। এই দোলমঞ্চটি থাকার জন্য মন্দির-চত্বরের মাধুর্য যেন শত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মিত্রবংশের আর একটি বিশিষ্ট শিল্প-কীর্তি হচ্ছে কাঠের কারুকার্য করা চণ্ডী-মণ্ডপ। উড়িষ্যায় যেমন ভগবত-ঘর, আসামে যেমন নামঘর, তেমনি বাঙলাদেশের হচ্ছে চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের সঙ্গে বাঙলার গ্রামীণ সংস্কৃতির ওতপ্রোত সম্পর্ক। বাঙলার গ্রাম-জীবন বহুদিন ধরে এই চণ্ডীমণ্ডপকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চণ্ডী-মণ্ডপ হচ্ছে মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালের ঘর আর সামনে খানিকটা দাওয়া। এখানে বাৎসরিক প্রধান পূজা অর্থাৎ দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, আর অন্যান্য সময়ে চলে গ্রামের মাতব্বর লোকেদের আড্ডা। তবে কিছু চণ্ডীমণ্ডপ আছে যেগুলির গড়ন বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই সমস্ত চণ্ডী-মণ্ডপে মাটির বদলে ইটের দেওয়াল থাকে, আর উপরে খড়ের চাল হলেও তলাকার কাঠের ফ্রেম সমস্তটাই থাকে কারুকার্য-খচিত। কাঠের ফ্রেমের কোন অংশই সাদা রাখা হয় না; হয় থাকে ফুল-লতাপাতা বা জীবজন্তুর নকশা, না হয় মানুষের মূর্তি। এমন কি মণ্ডপের মূল ঘুঁটিগুলিও কারু-কার্যশোভিত থাকে। আটপুরের মিত্রদের চণ্ডীমণ্ডপটি হচ্ছে ঠিক এই ধরনের। মণ্ডপটি পর্যবেক্ষণ করলে বাঙলার পুরনো তক্ষণ শিল্পের চমৎকার নিদর্শনগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। মণ্ডপটির বর্তমানে মোটামুটি ভাল অবস্থাতেই আছে। চণ্ডী-মণ্ডপে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত হচ্ছে কাঠের ফ্রেমের উপরিভাগের যুগল, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি বড় মূর্তিগুলি। নির্মাণরীতি ও কৌশলের দিক থেকে এগুলি অনবদ্য। এছাড়া তলার দিকে মূল ঘুঁটিগুলির গায়ে কতকগুলি মানুষ ও জন্তুর নিচুর দিকে মাথা করা মূর্তিগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সর্বোপরি দর্শকেরা বিস্মিত হবেন মূর্তিগুলি সংস্থাপনের অভিনব কৌশল দেখে। এখানে আমরা স্থাপত্য-বিদ্যা ও শিল্পজ্ঞানের এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করি।
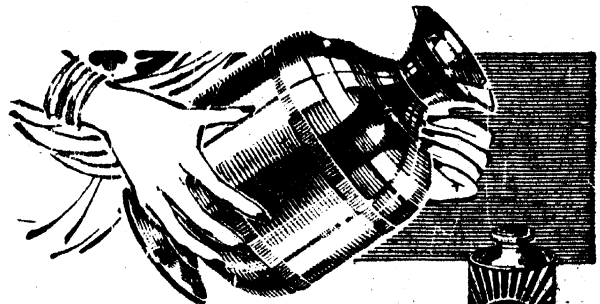
ট্রামে-বাসে

দিল্লীতে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধনী ভাষণে শ্রী নেহরু মন্তব্য করিয়াছেন—বৈষয়িক অর্থে বিজ্ঞানের সর্বাংগীণ উন্নতি ছাড়াও মানুষের হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করাও বিজ্ঞানের কর্তব্য। বিশুখুড়ো মন্তব্য করিলেন—"সময়োচিত পরামর্শই তিনি দিয়েছেন। কিন্তু কথা হলো

অনেকের যে হৃদয় বলে কোন পদার্থই নেই, আর যাদের আছে তাঁরা সবাই থ্রম্বসিসের রোগী!!"

* * *

প্রসংগত সোবিয়েৎ বিজ্ঞানীদের ঘোষণার কথা মনে পড়িল। তাঁহারা বলিতেছেন—আগামী একশত বৎসরের মধ্যে চন্দ্রলোকে ভ্রমণ নিত্যকার ব্যাপার হইয়া উঠিবে। শ্যামলাল বলিল—"সকালে চা খাবার পর চাঁদের বাজার সেরে এসেও হাতে অফিসে যাবার যথেষ্ট সময় থাকবে।"

* * *

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষদ তাঁদের এক অধিবেশনে হাতুড়ে চিকিৎসার নিন্দা জ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন।—"অতঃপর পাঁচ পয়সা বা সপাঁচ আনার

সিন্নি মানত বন্ধ হলে আর দেখতে হবে না, পরম দার্শনিকের মতো 'স্থিরত্বম'-এর ইচ্ছা ত্যাগপূর্বক সোজা যমমন্দিরম"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

মেদিনীপুর হইতে প্রেরিত এক সংবাদে জানা গেল সেখানে জনৈক অভিভাবক নাকি কোন এক শিক্ষককে প্রহার করিয়াছেন।—"প্রথমে শিক্ষক ছাত্রদের প্রহার করেছেন, পরে ছাত্র শিক্ষককে প্রহার করেছে, এবারে অভিভাবক শিক্ষককে প্রহার করেছেন। কলির তিনপো হয়ে গেছে। মেরে কেটে আর একপো হলেই শিক্ষা ষোল কলায় পূর্ণ হয়"—মন্তব্য করিলেন অন্য সহযাত্রী।

* * *

উন্নততর চাকরির শর্তের দাবীতে কর্মচারীদের বিক্ষোভ প্রসঙ্গে বোম্বাইয়ের একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল নাকি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মেয়েদের কান্নাও বিক্ষোভের পর্যায়েই পড়ে। বিশু খুড়ো বলিলেন— "পুরুষদের বিক্ষোভে শুধু যানবাহন চলা বন্ধ হয়, কিন্তু মেয়েদের কান্নার বিক্ষোভে ঘর-সংসারই হয় অচল। একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল বাংলা কবিতা পড়েছেন কি না জানিনে—শাসন সেরা শাসন, নীরব অভিমান, আঁচলে মুখ ঢাকা।"

* * *

দিল্লীর সরকারী দপ্তরে অসংখ্য পায়রার বাসা লইয়া কর্তৃপক্ষ বিষম ফাঁপরে পড়িয়া গিয়াছেন। কিছুতেই তাঁহারা পায়রা তাড়াইবার ফন্দি বাহির করিতে পারিতেছেন না। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"সংবাদটা মোটেই তুচ্ছ নয়। মনে পড়ছে—"কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে বাঁধি নীড়, থাকে সুখে"—রামরাজ্যে বন-বাসের ইংগিত নয় তো!!"

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ জনৈক ব্যক্তি কোন এক সেলুনে গোঁফ ছাঁটাইতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর পছন্দ মতো গোঁফ ছাঁটা হয় নাই বলিয়া তিনি পয়সা দিতে অস্বীকার করেন। এই লইয়া নাপিতের সঙ্গে প্রথমে বচসা হয় এবং তারই ফলে তিনি নাপিতের পেটে লাথি মারেন, তাহাতেই নাকি তাহার মৃত্যু হয়।—"সুকুমার রায়ের হেড অফিসের শান্ত বড়বাবু গোঁফ চুরির জন্য সবাইকে জরিমানাই শুধু করেছিলেন। কিন্তু সংবাদ সত্য হইলে এ যে দেখছি গোঁফ ছাঁটা ঠিক মনের মত না হলে প্রাণদণ্ড। অত্যন্ত দুঃখের সংবাদ, রসিকতা করা যায় না তবু কবির ভাষাতেই বলতে হয়—গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি তাই দিয়ে যায় চেনা।"

* * *

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম কাশ্মীরের ডাল হ্রদের জল জমিয়া বরফে পরিণত হইয়াছে। শ্যামলাল বলিল—কাশ্মীরের উল্লেখ মাত্রই যাদের মাথা গরম হয়ে যায় তারা নিঃসন্দেহে অফুরান বরফের জোগানে উপকৃত হবেন।"

* * *

বিদেশী এক পুরাতত্ত্ব অভিযানকারী দল নাকি বাহারিনে একটি স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এখানেই প্রাচীন ইডেন উদ্যান ছিল। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"উদ্যানটি ঠিক কোথায় ছিল তা অবশ্য আমরা জানিনে, কিন্তু নিষিদ্ধ ফলের উদ্যানের অভাব সে আজ আর নেই তা, আমরা বেশ ভালো করেই জানি!!"

* *

আমাদেরই কাগজ 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' সম্প্রতি কলিকাতার কুয়াশার একটি ছবি দেখিলাম। ঘন কুয়াশায় সমস্তই ঢাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই

অস্পষ্টতার মধ্যেও পথচারী দুইটি গরুর ছবি বেশ ভালোই দেখা গেল।—"সব ঢেকে গেলেও পথের গরু অম্লান থাকবেই, জয় ধর্মের জয়, ধর্মের ষাঁড়ের জয়!!"

* * *

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল মাদ্রাজে চতুর্থ টেস্ট ম্যাচে ৫০০ শত রান তুলিয়া তাঁহাদের প্রথম ইনিংস সমাপ্ত করিয়াছেন। ভি জি এই প্রসংগে তাঁর একটি প্রবন্ধে বলিয়াছেন—চিরাচরিত প্রথা অনুসারে উপবাস আর প্রার্থনা ছাড়া ভারতের আর অন্য গতি নাই। "উপোস হয়ত করছিনে কিন্তু বলে বলে 'বাবা তারকেশ্বর' আর 'হে মা কালী' কি কম করছি, কিন্তু ও'রা যে বুনো ওল, বাঘা বল্‌ না হলে উপায় নেই" বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

এই বাঘা বল্‌ অর্থাৎ বাম্পার বোলার ছাড়া আন্তর্জাতিক খেলায় যোগদান কারো সংগত নয়—বলিয়াছেন মুস্তাক আলি।—"ইনি দেবার্য নন, প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় মুস্তাক আলি। সুতরাং কর্তারা এখনো ভেবে দেখুন।"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রিটোরিয়া থেকে কৃষি বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ সি ই এম টিডমার্শ ইংলণ্ডের কেমব্রিজে তার বন্ধু ডাঃ এ এস ওয়াটের ছ পেনি বাঁচাবার জন্যে বড়দিনের সম্ভাষণ-কার্ডে লিখে দেনঃ "দেখতে পাবে আমি আমার নামটা পেনসিলে লিখেছি যাতে তুমি রবার দিয়ে মুছে আবার ওটা ব্যবহার করতে পার।" সেটা হল ১৯৩৮ সালের কথা।

পরের বছর যুদ্ধ আরম্ভ হল, কিন্তু ডাঃ টিডমার্শের সেই কার্ডখানি এবার ডাঃ ওয়াটের পেনসিলে লেখা সই নিয়ে ফিরে এল। এইভাবে বছরের পর বছর ধরে কার্ডখানি ইংলণ্ড আর দক্ষিণ আফ্রিকা আনাগোনা করে আসছে এবং বোধহয় যতদিন ভাল অবস্থায় থাকবে বন্ধু দুজনে কার্ডখানিকে ঐভাবে বছর বছর কাজে লাগিয়ে কার্ড কেনার খরচ বাঁচিয়ে যাবেন।

*

ঋতু বদলের সঙ্গে পাখিরা যে দেশান্তরে যায় সেটা অনেকেরই জানা আছে। অনেক মাছ আছে যারা বছরের বিশেষ একটা সময়ে স্থানান্তরে চলে যায়। স্থলচর জানোয়ারদের মধ্যে ঋতু-অনুকূলে বিচরণ স্থান পরিবর্তন বড় একটা দেখা যায় না, হলেও তেমন কিছু দেখবার মত হয় না।

কিন্তু এক বিরাট ব্যতিক্রম ছিল আমেরিকার বাইসন। উত্তর আমেরিকার সমতলভূমির প্রাচুর্যের দিনে এদের বার্ষিক দেশান্তর গমনের যে দৃশ্য ঘটত স্থলচর জীবের ইতিহাসে তা দেখা যায়নি। তার পরবর্তিকালের ইতিহাস হচ্ছে, নির্বিচারে ওদের হত্যা করে করে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে একদিন যারা সংখ্যায় গণনার সাধ্যাতীত ছিল তারা প্রায় লোপ পেয়ে যেতে বসেছে।

শ্বেতাঙ্গরা যখন প্রথম আমেরিকায় পদার্পণ করে সে সময়ে বাইসনের পালগুলি ছিল সম্ভবত পৃথিবীর স্থলচর জানোয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী একজোট। একটা হিসেব করে দেখা গিয়েছে যে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ওরা সংখ্যায় ছিল অন্তত দু' কোটি। প্রতি বসন্ত ও শরৎকালে ওরা জায়গা বদলাতো। শরৎকাল এসে গেলেই ওরা উত্তর অঞ্চলের শীতের কষ্ট থেকে বাঁচবার জন্যে দক্ষিণ দিকে চলে যেত এবং বসন্ত এলেই আবার উত্তরে ফিরে আসত।

সেই অগণিত বাইসন পালগুলির যাত্রা একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হত। ১৮৩২ সালে রকি পর্বতমালা পর্যন্ত যাত্রার একটা বিবরণে লেখা আছেঃ "যতদূর দৃষ্টি যায় মনে হয় যেন সারা দেশটাই অসংখ্য বাইসন পালে কৃষ্ণাঙ্গ হয়ে গিয়েছে।"

সেই একই বছরের আর একটি বিবরণ থেকে জানা যায়ঃ "সন্ধ্যার দিকে একটা পাহাড়ের মাথা থেকে হঠাৎ এমন একটা দৃশ্য চোখে পড়ল যা দেখে আমাদের দলের বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তিরাও বিস্মিত হলেন। সমগ্র উপত্যকাটা, যতদূর চোখ যায়, যেন একটা বিরাট বাইসন পালে ঢেকে গিয়েছে।" উক্ত লেখক বাইসন পাল কর্তৃক আবৃত ভূভাগটি আশি বর্গ মাইল বলে হিসেব করেন। একটা সাধারণ হিসেব ধরলেও ঐ জায়গায় তখন অন্তত চল্লিশ লক্ষ বাইসন ছিল। চল্লিশ লক্ষ জানোয়ার যাদের এক একটিরই ওজন প্রায় আধ টন করে!

বসন্তকালে ওদের উত্তরাঞ্চলে প্রত্যাবর্তনের কাহিনী শোনা গিয়েছে যে, ওদের যাওয়াটা হুটোপাটিতে পরিণত হতো যার ফলে শত শত বাইসন বরফ-ভাসা নদী পার হতে ডুবে যেত এবং ডুবে ডুবে এমনি উঁচু পাঁজা হয়ে উঠতো যে সেই সব মৃতদেহগুলিই তখন অপর বাইসনদের পারাপারের সেতু হয়ে দাঁড়াত।

কথিত আছে যে, মিসিসিপি ও মিসৌরির অনেকগুলি দ্বীপ বাইসনদের অস্থি জমে জমে গড়ে উঠেছে। বসন্তকালের প্রত্যাবর্তনের সময় রেড ইণ্ডিয়ানরা বাইসন শিকার করতো। শ্বেতাঙ্গরা আসবার আগে রেড ইণ্ডিয়ানদের প্রধান জীবিকাই ছিল বাইসন শিকার। বাইসন ওদের অনেক কাজে আসতো। চামড়ায় ওদের বাড়ির ছাউনি, বিছানার আচ্ছাদন হত; তন্ত্রীতে হতো ধনুকের ছিলা, শিং থেকে চামচ এবং মাংস যা ওদের খাদ্যের প্রধান অংশ হতো।

ঘোড়ার পিঠ থেকে তীর-ধনুকের সাহায্যে ওরা বাইসন মারতো। বছরে নিহতের সংখ্যা হতো বিপুল কিন্তু তাতে দাবাগ্নি, যাত্রাপথে হুটোপাটির বা নেকড়ে ও ভল্লুকের হাতে মারা পড়ার চেয়ে বেশী ক্ষতির ছাপ পালের ওপর পড়তো না।

তবে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে বনাপশু হিসেবে বাইসনের অস্তিত্ব খতম হবার উপক্রম হল। শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হতে রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে নতুন রুচি সঞ্চারিত হল। ওরা তৈরী জিনিসের ভক্ত হয়ে উঠল, যেমন ছুরি, আগ্নেয়াস্ত্র এবং হুইস্কিরও ওরা অনুরক্ত হয়ে পড়ল। এই সব এবং আরো অনেক জিনিস ওরা বাইসনের চামড়ার বিনিময়ে

শ্বেতাঙ্গদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে লাগল।

নতুন হাতিয়ার রাইফেলের সাহায্যে ওরা ওদের তীর-ধনুকের চেয়ে অনেক বেশী বাইসন মারতে লাগল। শুধু এইটেই ওরা বুঝতে অক্ষম হল যে বাইসন মেরে শেষ করে ওরা নিজেদের স্বাধীনতাই বিসর্জন দিতে চলেছে। শ্বেতাঙ্গরা দেখলে যে বাইসন যদি লোপ পাইয়ে দেওয়া যায়, তাহলে রেড ইণ্ডিয়ানরা পেটের দায়ে শ্বেতাঙ্গদের অনুগত হতে বাধ্য হবে। অবশ্য একমাত্র রেড ইণ্ডিয়ানরাই বাইসন উৎখাত হবার উপক্রম করেনি, যদিও তারা কোন কোন অঞ্চলে সংখ্যা কমিয়ে দিতে পেরেছিল। যে ব্যাপারটা বাইসন ধ্বংসের প্রকৃত কারণ হয়েছিল তা হচ্ছে ১৮৬৩ সালে ইউনিয়ন প্যাসিফিক আন্তঃমহাদেশ রেলপথ গঠন। শত শত শ্রমিককে খাওয়াবার দরকার হয়ে পড়ে এবং সবচেয়ে সস্তা উপায় ছিল, হাতের-কাছে সদাই-হাজির বাইসন মারা। কাজেই একটু ঘুরিয়ে বলা যায় যে রেলপথটা একরকম তৈরী হয়েছিল বাইসনের অস্থির ওপরে।

রেলপথ একটু একটু করে চালু যেমন হতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে পেশাদার শিকারিরাও আসতে আরম্ভ করে হাজারে হাজারে বাইসন হত্যা করে চামড়া ছাড়িয়ে আর জিভ কেটে নিয়ে দেহটাকে ফেলে রেখে দিতে পচে নষ্ট হতে। জিভ, যা খুব মুখরোচক বলে পরিগণিত হত, আর চামড়া রেলে পূর্বাঞ্চলের শহরগুলিতে পাঠানো হতো যেখানে ওর খুব চাহিদা থাকতো।

১৮৬৭ থেকে পনের বছরের কিছু বেশি কাল সময়ে বাইসন প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। এমন কি ১৮৭১ সালে তখনও বিপুল সংখ্যক ছিল এবং সেই বছরই বহু লক্ষ বাইসনের একটা বিরাট পালকে শেষ করা হয়। কিন্তু ১৮৭০ থেকে ১৮৭৫ পর্যন্ত বছরে অন্তত পাঁচিশ লক্ষ করে হত্যা করা হয়।

এইভাবে হত্যার ফলে ১৮৮৩ সালে উত্তর ডাকোটায় মাত্র হাজার দশেকের একটা পাল অবশিষ্ট রইল, বাকি সব তখন ধরাপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত করে ফেলা হয়েছে। তবুও কিন্তু শিকারিরা ছাড়বার পাত্র নয়। সেপ্টেম্বর মাসে একদল শিকারি বাকিগুলিকে নিঃশেষিত করবার অভিপ্রায়ে বেরিয়ে প্রথম দিনের শিকারেই এক হাজারের বেশি হত্যা করে। নভেম্বরের মধ্যে ওদের অভিপ্রায় পূরিত হল এবং সেই সঙ্গে আমেরিকায় বন্যজন্তু হিসেবে বাইসনের অস্তিত্বও একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল।

আমেরিকার অধিবাসীদের অনেক দেরিতে বিবেক জাগতে বাইসন হত্যা বেআইনী করে দেওয়া হল। সৌভাগ্যবশত যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার কয়েক জায়গার উদ্যানে উদ্যানে আধা-গৃহপালিত অবস্থায় কিছু বাইসন পাওয়া গেল। এদের থেকেই ক্রমে বাইসন বংশ আবার কিছুটা উদ্ধার করা হয়।

১৮৮৯ সালে দেশের নানা জায়গায় ছোট ছোট দলে ছড়ানো অবস্থায় পাঁচশ একচল্লিশটি বাইসন দেখা যায়। আজ সেই থেকে সংখ্যা হাজার দশেকে দাঁড়িয়েছে।

•

ভিক্ষা-ব্যবসা এবং সেই ব্যবসায় পাকা করে তোলার জন্য লোক তৈরি করা আমাদের দেশেই শুধু নয়, ইওরোপেও কতক স্থানে ছিল। দক্ষিণ ইতালিতে শেষ 'ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষালয়টি' সম্প্রতি পুলিস থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানকার ভিখারিরা স্বীকারোক্তি করে যে 'হেড-মাস্টার' তাদের 'অন্ধ' লেখা বোর্ড এবং কাচ দিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে ভিক্ষে করা শেখাতো।

প্যারিসে এক সময়ে 'ভিক্ষাবৃত্তির মহাবিদ্যালয়' ছিল যার প্রতিষ্ঠাতা পা-কাটা এক ব্যক্তি বড় বড় রাস্তাগুলিতে ট্রলি করে বেড়াতো এবং খানকয়েক বাড়ির মালিক ছিল।

এক সময়ে লণ্ডনে ভিখারিদের বিরাট দল ছিল, কিন্তু ওদের সংখ্যা কমে আসছে। বছর কয়েক আগে এক তদন্তে দেখা যায় যে, লণ্ডনে প্রায় এক হাজার ফন্দিবাজ ভিখারি আছে, যারা পাকা অভিনেতার নৈপুণ্য দেখিয়ে নিজেদের রুগ্ন ব্যক্তি বলে প্রকাশ করে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে লণ্ডনের ওয়াটারলু ব্রীজের কাছে জীর্ণবসন শুভ্রকেশ এক বৃদ্ধকে সকল ঋতুতে প্রতিদিন দশ ঘণ্টা বসে ভিক্ষে করতে দেখা যেত। বহু লোক ওর প্রসারিত হাতে কিছু-না-কিছু দিতে ভুলতো না। কিন্তু লোকে যেটা জানতো না সেটা হচ্ছে, প্রতি সন্ধ্যায় একটা দু ঘোড়ার গাড়ি এসে ব্রীজের কিনারে দাঁড়াত। বৃদ্ধ ভিক্ষুক এক ফাঁকে চুপি চুপি গাড়িটিতে গিয়ে বসতো এবং গাড়ি গিয়ে উপস্থিত হত কেনসিংটনে তার বাড়িতে যেখান থেকে, পরে প্রকাশ পায়, লোকটি শহরের এক সৌখিন ব্যক্তি হয়ে বাস করতো।

*

একজন মানুষের দেহে যে পরিমাণ রাসায়নিক ও অন্যান্য পদার্থ থাকে জগতের বাজার দরে তার দাম দেড়শ টাকাও হয় না।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, অন্যান্য পদার্থের মধ্যে আমাদের দেহে আছে:

চর্বি যতটা তাতে সাবানের সাতটা বার হতে পারে।

কার্বন যা আছে তাতে ন হাজার সিসের পেনসিল তৈরী হতে পারে।

ফসফরাস যা আছে তাতে বাইশ শ দেশলাই হতে পারে।

চুণ যা আছে তাতে একটা মুরগীর খুপরি চুণকাম করা যেতে পারে।

যা লোহা আছে তাতে মাঝারি মাপের দুটো পেরেক তৈরী হতে পারে।

তবে দাম ভাল পাওয়া যায় অস্থির জন্য। ডাক্তারি পড়তে কাজে লাগে এবং ভাল নর-কঙ্কালের দাম বেশ হয়। অস্থির প্রসঙ্গে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে মানুষ জন্মায় দু'শ সত্তরটি হাড় নিয়ে, কিন্তু মারা যাবার সময় থাকে দু'শ ছ'টি। বাকি চৌষট্টিটা কোথায় যায়? দেহতত্ত্ববিদরা বলেন, ও হাড়গুলি শৈশবেই অন্যান্য হাড়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, আরো অন্তত দু' হাজার বছর যদি মানুষের দেহ সম্পর্কে অনুশীলন করা যায় তবে সম্পূর্ণ তত্ত্ব লাভ করা যাবে। হৃদপিণ্ডের কথাই ধরা যাক। ওজন মাত্র আট-ন আউন্স কিন্তু প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় আড়াই হাজার গ্যালন রক্ত পাম্প করে, এবং গড়পড়তা জীবনকালে সাড়ে পাঁচ কোটি গ্যালন। একজন বিশেষজ্ঞ হিসেব করে দেখেছেন যে, একজন মানুষের একদিনের হৃদস্পন্দনকে যদি পুঞ্জীভূত করা যায় তাহলে তার জোরে এক টন ওজনের লোহা একশ ফিট শূন্যে নিক্ষেপ করা যাবে।

স্বল্প সঞ্চয়
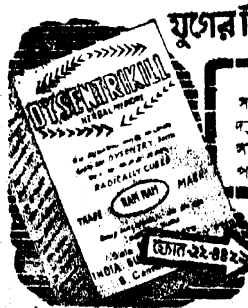
মহাশয়,—স্বল্প সঞ্চয় সম্পর্কে আলোচনা (দেশ, ১৭ই জানুয়ারী) করতে গিয়ে শ্রীকৌটিল্য যে সমস্ত মন্তব্য ও তথ্য পরিবেশন করেছেন, তার অনেকগুলি যথার্থ নয় এবং তথ্যকেও অবিকৃত রাখা হয়নি। স্বল্প পরিসরে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। সুতরাং সংক্ষেপে আমি আমার বক্তব্য বলছি। প্রথমত তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, "বাইরের দেশ থেকে সাহায্য ভিক্ষা না করাটাই বাঞ্ছনীয়।" 'ভিক্ষা' শব্দটি তিনি কোন অর্থে ব্যবহার করেছেন, আমার জানা নেই। যদি বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ অর্থে ব্যবহার করে থাকেন, তা হলে নিশ্চয়ই আপত্তি করবার আছে। উন্নয়নের প্রয়োজনে মূলধন অপরিহার্য, এবং সেই মূলধন যথাসম্ভব দেশ থেকে সংগৃহীত হলে ভাল হয়। কিন্তু বিদেশী মূলধনও কম অপরিহার্য নয়। বিদেশী মূলধন স্বদেশে সংগৃহীত মূলধনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি করে থাকে। শিল্পোন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে রপ্তানী দ্বারা আমদানী ব্যয় নির্বাহ সাধারণত সম্ভব হয় না, বিশেষ করে যে সমস্ত দেশ দ্রুত শিল্পোন্নয়নে আগ্রহী। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট অবশ্যম্ভাবী। বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ বৈদেশিক মুদ্রার সংকটকে দূর করতে সাহায্য করে, এছাড়া, দক্ষ কারিগর প্রভৃতি সৃষ্টির মারফত বিদেশী মূলধন কোন দেশের শিল্পোন্নয়নের গতিকে দ্রুত করে থাকে। শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে যে দেশগুলি সবচেয়ে বেশী বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ করেছে, সেই দেশগুলি হল আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেণ্টিনা। বিদেশের উপনিবেশগুলিকে শোষণ, দাস ব্যবসার মুনাফা এবং স্বদেশের শ্রমিক শ্রেণীকে অর্ধাহারে রাখা সত্ত্বেও ইংলণ্ডকে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে হল্যাণ্ডের কাছ থেকে ঋণ করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে পশ্চিম জার্মানী অল্পদিনের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়ে অন্য দেশকে সাহায্য করতে পারছে অনেকটা বিদেশী সাহায্যের কল্যাণে। সীমান্তের অপর পারে পূর্ব-জার্মানীর শোচনীয় অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে বোঝা যাবে, বিদেশী মূলধন পশ্চিম জার্মানীকে কি পরিমাণে পুনর্গঠনে সাহায্য করেছে। বিদেশী মূলধন বিনিয়োগের বিপক্ষে সবচেয়ে জোরালো যুক্তি হল, ঋণ-গ্রহীতা দেশের সার্বভৌমত্বের অবসান। সার্বভৌমত্বের অবসান হয় অন্যান্য আরও অনেক কারণে। উপরোক্ত দেশগুলি বিদেশী মূলধন বিনিয়োগ করেও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিল। সুতরাং বিদেশী মূলধনের বিপক্ষে উক্ত রাজনৈতিক যুক্তি অচল। পক্ষান্তরে স্বল্প আয়ের দেশ বিদেশী মূলধন ব্যতিরেকে দ্রুত শিল্পোন্নয়নে আগ্রহী হলে দেশের লোককে অনাহারে রাখতে হয় এবং একনায়কত্ব সরকার ভিন্ন তা সম্ভব নয়। রাশিয়া এবং চীনের মত ভারতবর্ষকে একনায়কত্বের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্যই কি শ্রীকৌটিল্য উপরোক্ত মত প্রকাশ করেছেন? একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চীনও রাশিয়ার কাছ থেকে কম সাহায্য পায়নি। রুশ তাঁবেদারীতে থেকেও পোলাণ্ড উল্লেখ-যোগ্য বৈষয়িক উন্নয়ন করতে না পারায় ১৯৫৭ সাল থেকে আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য নিতে শুরু করেছে।

দ্বিতীয়ত স্বল্প সঞ্চয় যে-দেশের শিল্পোন্নয়নে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে, সেই জাপানের নাম শ্রীকৌটিল্যের জানা নেই। অথচ কৌটিল্য চীন দেশের নাম উল্লেখ করেছেন। শ্রীকৌটিল্য স্বল্প সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্যে আর্থিক প্রলোভনের

উল্লেখ করায় সম্ভবত তিনি স্বল্প সঞ্চয়ীদের স্বেচ্ছাকৃত সঞ্চয়ের কথা বলতে চেয়েছেন। অন্যান্য বিষয়ের মত সঞ্চয়ের ক্ষেত্রেও চীনের জনসাধারণের স্বাধীন ইচ্ছা কার্যকরী নয়। তা ছাড়া, চীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পরিসংখ্যান যে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য নয়, সে বিষয়ে কি সন্দেহের আছে। ভুল ধরলে শূন্য বসানো বেশী হয়ে গেছে, এসব ব্যাখ্যা করতে চীন সরকার একেবারে অনভ্যস্ত নয়। পক্ষান্তরে জাপানের শিল্পোন্নয়নে স্বল্প সঞ্চয়ের ভূমিকা অদ্বিতীয়। শিল্পোন্নয়নের প্রারম্ভে পোস্ট্যাল সেভিংস মারফত সারাদেশ থেকে স্বল্প সঞ্চয় সংগৃহীত হত। পরবর্তীকালে ব্যাঙ্ক ব্যবসার ব্যাপক প্রসারের ফলে পোস্ট্যাল সেভিংস মারফত সংগ্রহের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস পায়। তা সত্ত্বেও ১৯৩৬ সালে পোস্ট্যাল সেভিংস-এর পরিমাণ জাপানের সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মোট জামানতের এক-চতুর্থাংশ ছিল। সংখ্যাটি যে নিতান্ত সামান্য নয় তা বোঝা যাবে ১৯৩১ সালের পরিসংখ্যান লক্ষ্য করলে। ১৯৩১ সালে পোস্ট্যাল সেভিংস ও ব্যাঙ্কগুলির মিলিত জামানত জাতীয় আয়ের সমান ছিল। তৃতীয়ত চীনের পরিকল্পনার কথা বলতে যেয়ে শ্রীকৌটিল্য বাস্তব ঘটনাকে বিকৃত করেছেন। জনসাধারণের আবেগপূর্ণ সহযোগিতা নিয়ে যে দেশ উন্নয়নে ব্রতী হয়েছে, সে দেশ ইজরাইল। যুগোশ্লাভিয়া ও পশ্চিম জার্মানীর নামও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যুগোশ্লাভিয়ার 'ওয়ার্কার্স কাউন্সিল' এবং পশ্চিম জার্মানীর 'কো-ডিটারমিনেশান' এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু চীনের নাম কদাচ করা চলে না। শিল্পোন্নয়ন করতে যেয়ে চব্বিশ ঘণ্টা জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। এবং অসন্তোষ পাছে বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহের রূপ নেয়, এই আশঙ্কায় সারা দেশকে সামরিক শিবিরে রূপান্তরিত করতে হয়েছে। চীনের 'কমিউন' সম্পর্কে নিকিতা ক্রুশ্চেভের বিরূপ মন্তব্য নিশ্চয়ই কৌটিল্যের দৃষ্টি এড়ায়নি।

স্বল্প সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রলোভন সবসময়ে কার্যকরী হয় না। আয় বাড়লেই খরচ করতে চাইবে। ডোজেনবেরীর 'ডেমোনেস্ট্রাশান এফেক্ট'ও কম কার্যকরী নয়। শিল্পোন্নয়নের জন্যে একেবারে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, সেই দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী করতে না পারলে আয় বাড়লে, প্রলোভন সত্ত্বেও সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করা যাবে না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে আয়বৃদ্ধি সত্ত্বেও সঞ্চয়বৃদ্ধি না পাওয়ায় স্পেন শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে একেবারেই পিছিয়ে পড়ে। তিনি ঠিকই বলেছেন যে, আঞ্চলিক উন্নয়নে উক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের "সহযোগিতা এবং তার নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট প্রসাদ উপভোগের ব্যবস্থা" মারফত স্বল্প সঞ্চয় বৃদ্ধি পেতে পারে। স্বল্প সঞ্চয় কিভাবে ব্যয় হচ্ছে, যথার্থভাবে অপচয় বন্ধ হয়েছে কিনা—এসব প্রশ্নও স্বল্প সঞ্চয়ের পরিমাণকে প্রভাবান্বিত করে থাকে। নমস্কারান্তে। —নিরঞ্জন হালদার, কলিকাতা-৩১।

লেখকের উত্তর

মহাশয়,—শ্রীনিরঞ্জন হালদার আমার ১৭ই জানুয়ারী সংখ্যার আলোচনা সম্পর্কে কয়েকটি আপত্তি তুলে আলোচ্য বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সমালোচনা সম্ভবত আমার বক্তব্যকে খানিকটা পাশ কাটিয়ে গেছে।

প্রথম, "সাহায্য ভিক্ষা" কথাটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। বিদেশের কাছে আর্থিক সাহায্য ভিক্ষা করলে ভারতবর্ষ আক্ষরিক অর্থে ভিখারী হয়ে যাবে একথা আমি বলতে চাই নি। পৃথিবীতে অধিকাংশ স্বাধীন দেশই তাদের উন্নয়নের প্রয়োজনে বিদেশী পুঁজি গ্রহণ করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে, এ সত্য আমরা সকলেই জানি। ভারতবর্ষও যদি উপযুক্ত ও অনুকূল চুক্তিতে বিদেশী সাহায্য সংগ্রহ করতে পারে তাতে আমাদের আপত্তির কারণ উঠবে না। কিন্তু বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে "উপযুক্ত ও অনুকূল" অবস্থা সচরাচর কোনো দরিদ্র এবং দায়গ্রস্ত দেশের ভাগ্যে জোটে না। বিদেশী পুঁজি গ্রহণ করে ভারতবর্ষ তাই যদিও ভিখারী হিসেবে পরিগণিত হবে না, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এই চোরাগলির সুযোগ নিয়ে সাহায্যকারী দেশ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করতে পারে। একথা শ্রীহালদার না মানলেও ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত মানেন এবং তৃতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনা পর্যায়ে তিনি একাধিকবার বিদেশী সাহায্য গ্রহণকে ন্যূনতম স্তরে আনবার জন্য সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেছেন। ইতিহাসে বিদেশী সাহায্য গ্রহণের যেসব নজির সমালোচক দেখিয়েছেন তার অধিকাংশই যে সম্পূর্ণ ভিন্ন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সম্ভব হয়েছিল সে কথা তাঁর বিবেচনা করা উচিত। অপর পক্ষে, বর্তমানকালে বিদেশী সাহায্যের অক্টোপাস অনেক দুর্বল দেশকে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই কিভাবে নিষ্পেষিত করেছে সে আলোচনা বিশদীকৃত করতে গেলে প্রসঙ্গান্তর হবে। কিন্তু এসব রাজনৈতিক যুক্তি বাদ দিলেও, আমাদের দেশের শোচনীয় বিদেশী মুদ্রা ঘাটতির এবং অনুৎসাহজনক রপ্তানী পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশী সাহায্যের বোঝা তথা তার জন্য বাৎসরিক সুদের দায় বহন করার বিরুদ্ধে বিশুদ্ধ আর্থিক যুক্তি আছে। "বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট অবশ্যম্ভাবী"—এই উক্তির পরেই শ্রীহালদার "বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগ বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটকে দূর করতে সাহায্য করে" বলে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা উপলব্ধি করতে পারছি না।

আমার আলোচনায় ভারতবর্ষকে একনায়কতন্ত্রের দিকে ঠেলে দেবার যে ইঙ্গিত শ্রীহালদার আবিষ্কার করেছেন তার জন্য আমি বিস্মিত ও দুঃখিত। বিদেশী ঋণের বোঝা যথাসাধ্য কমাবার এবং দেশের সম্পদকে নানাভাবে নিয়োগোপযোগী করবার উদ্দেশ্যে (এমন কি, অব্যবহিত ভবিষ্যতে দেশের সর্বস্তরের লোকের ভোগের মাত্রাকে ন্যূনতম করবার পক্ষে) আবেদন জানানোর সঙ্গে গণতন্ত্রের বিরোধ কি অবশ্যম্ভাবী? চীনের নাম অনেকবার করেছি অথচ জাপানের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করিনি—এর পিছনে কোনো অভিসন্ধি ছিল না। তবে স্বল্প সঞ্চয়ের সার্থক ব্যবহারের উপায় ভাবতে গিয়ে চীনের আঞ্চলিক আত্মসংস্থানিক পন্থার (regional self-financing scheme) কথা মনে এসেছে। তাই চীনের উল্লেখ নিতান্ত আকস্মিক নয়। অবশ্য চীন সরকারের অগণতান্ত্রিক নীতি অথবা মিথ্যা পরিসংখ্যান পরিবেশন বিষয়ে সমালোচকের মন্তব্যের জবাব দেবার দায়িত্ব আমার নয়। প্রসঙ্গত, পশ্চিম জার্মানী, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে বিদেশী সাহায্যের সুফল সম্বন্ধে তিনি যে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন সে বিষয়েও আমি কোনো মন্তব্য করবার অর্থ বুঝি না। এসবই তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার।

আর্থিক প্রলোভনের মারফত স্বল্প সঞ্চয় বাড়ানো সম্ভব একথা সকলেই মনে করেন, তবে প্রলোভনের বিষয় ও প্রকৃতির উপরেই স্বল্প সঞ্চয় আন্দোলনের সার্থকতা নির্ভর করবে। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে বর্তমান পরিস্থিতিতে Duesenberry effect-এর ভূমিকা কতখানি প্রাসঙ্গিক তা শ্রীহালদার হয়তো জানেন; তবে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক প্রলোভন দিয়েও হয়তো সঞ্চয় বাড়াতে না পারবার অনেক কারণ ঘটতে পারে একথা স্বীকার করি। কিন্তু তাঁর আলোচনার উপসংহারে শ্রীহালদার আমার সঙ্গেই আবার একমত হয়েছেন দেখে এই প্রসঙ্গে আর কিছু বলবার থাকছে না। বিনীত—শ্রীকৌটিল্য।

ওয়াশিং —চিত্রা দত্ত

প্রদর্শনী

দি মর্নিং লাইট —চিত্রা দত্ত

এ সপ্তাহে দুটি চিত্র প্রদর্শনী চলছে। আর্টিস্ট্রী হাউসএ শ্রীমতী চিত্রা দত্তের চিত্র প্রদর্শনী এবং গবর্নমেণ্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ামএ শ্রীগোপেন রায়ের চিত্র প্রদর্শনী। দ্বিতীয় প্রদর্শনীটির ব্যবস্থা হয়েছে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট-এর উদ্যোগে।

শ্রীমতী চিত্রা দত্ত বর্তমানে দিলীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত 'স্টুডিওর' সভ্যা। ইনি গবর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফট-এর প্রাক্তন ছাত্রী। ছবি পেশ করেছেন ষাটটি। তেলরঙ, জলরঙ এবং প্যাস্টেলের রচনা। শিল্পী প্যাস্টেলেই অপেক্ষাকৃত বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বলে মনে হয়। এঁর অঙ্কনধারা উগ্র আধুনিকও নয়, আবার প্রথাগতও নয়। ইমপ্রেশনিজম-এর ঠিক পরবর্তী কালের পাশ্চাত্য ধারার অনুরূপে এঁর প্রথা প্রকরণ। শিল্পীর মন যে শিল্প রসিকের সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই আমাদের, কিন্তু শিল্পকর্মী হিসাবে এখনও ইনি কোনও স্বকীয়তায় পেঁাছাতে পারেননি। দিলীপবাবুর স্টুডিওর আরও কয়েকজন শিল্পীর (বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে) রচনার সঙ্গে খুব মিল রয়েছে এঁর রচনার। এঁদের উপর দিলীপবাবুর অঙ্কনধারার প্রভাবটা খুব বেশী বলে মনে হয়। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'দি ব্ল্যাক ট্রেসেস', 'রিপোজ', 'দি মণিপুরী ডান্সার', 'রসিদ', 'ব্যালকনী', 'ফার ক্যাপ', 'দি মর্নিং লাইট', মিসেস ব্যালফুর এবং আর্ট লাভার। প্রদর্শনীটি খোলা আছে ২২শে জানুয়ারী অবধি। প্রতিদিন বেলা ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত।

গোপেনবাবু ছবি পেশ করেছেন ৫৩টি। এগুলির মধ্যে আছে 'ঘুমের দেশে', 'রাজা ও টুনটুনির কথা' এবং 'ঘুমন্ত পুরী' চিত্রমালার কিছু কিছু নিদর্শন এবং পৌরাণিক, দার্শনিক ও ল্যাণ্ডস্কেপ রচনার কিছু কিছু নমুনা। শ্রীরায় 'বেঙ্গল স্কুলের' শিল্পী হিসাবে যথেষ্ট প্রখ্যাত। সুতরাং এখানে তাঁর পরিচিতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করি। প্রদর্শিত রচনাগুলি সবই ম্যাসোনাইট বোর্ডের ওপর টেম্পারা রঙে রচিত হয়েছে। প্রতিটি রচনাই শিল্পীর নিপুণভাবে কাজ করবার ক্ষমতার পরিচয় দেয়। টানটোন অতি সূক্ষ্ম এবং রচনাগুলি অলংকারপ্রধান। শিল্পী যে ভাব ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, তার সহায়তার জন্যে অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন। কাজেই আকারগুলি অবাস্তব সে কথা বলাই বাহুল্য। শিল্পী বিচিত্র সব রূপ রচনা করেছেন। শিল্পী চিত্রবর্ণিত বিষয়ের চিন্তায় ধ্যানস্থ হয়ে মনশ্চক্ষে যে রূপ দেখেছেন, সেই সব রূপেরই প্রতিচ্ছবি। গগনেন্দ্রনাথের মত অচেনা অজানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করার ইচ্ছা এঁরও। রচনা কৌশলেও গগনেন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এঁর রচনায়। তবে মাধ্যম ভিন্ন হওয়ায় শিল্পীকে স্বতন্ত্র বর্ণ প্রয়োগ কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। সম্ভবত সেই জন্যেই গগনেন্দ্রনাথের রচনার মেজাজ উপলব্ধি করা যায় না এঁর রচনায়। এগুলি একটু যেন বেশী মাত্রায় পুস্তক-চিত্রন ঘেঁষা। ঠিক পেইণ্টিং-এর গভীরত্ব নেই ছবিগুলিতে। তা হলেও রসরচনার অভাব নেই। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি', 'চাঁদের মা বুড়ি', 'ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী', 'টাকার ঘরে টুনটুনি', 'যা যা উড়ে গেল', 'ঘুমন্ত পুরী', 'সূর্যোদয়', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'লাল কুয়াশা' এবং 'মহাকাল'। প্রদর্শনীটি প্রতিদিন বেলা ১২টা থেকে রাত্রি আটটা অবধি খোলা থাকে। প্রবেশ পথ—২১নং চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ।

—চিত্রগ্রীব

কাঞ্চনজঙ্ঘা —গোপেন রায়

ব ন্য দো ল

বিষ্ণু দে

মনে হল যেন দাউ দাউ জ্বলে আগুন,
টিলায় টিলায় ছুটে গেল জোড়া বাঘ;
প্রাচীন রক্তে কিংশুকে লাল ফাগুন,
প্রকৃতির সাধ! সুন্দরে এ কি মৃত্যুর অনুরাগ!

শালে ও সেগুনে শিসুতে ও গমহারে
সরকারী বনে কার সাড় ভাঙে, কারা ভাঙে আড়ামোড়া!
তীব্র বিধুর রূপের এ সম্ভারে
নিঠুর দরদী গোখুরা চন্দ্রবোড়া।

তবু গাছে গাছে মৃদুল ফুলের গন্ধ,
ঝোপে ঝাড়ে চুপিসাড়ে ভ'রে যায় ঘ্রাণ,
হরেক পাখিতে চোখেকানে লাগে ধন্ধ,
হরিণের ডাকে স্পষ্ট পুলকে মৃত্যুর সম্মান।

এ যেন দেশের দশের প্রাকৃত তুলনা ঃ
স্মৃতির তাড়সে আশা-আনন্দ ক্ষিন্ন,
এ যেন দেশজ প্রেমেই দশকে ভাবতে হয়েছে ঘৃণা,
সমাজেই বুঝি প্রকৃতির মৃত তুলনা?

মনে হল রাতে পাহাড়ে পাহাড়ে নাচে আগুনের মালা,
কানে এল কত অগ্নিচক্ষু আরণ্য পদপাত:
এদিকে দূরের বসতিতে হল ফাল্গুনী মাতোয়ালা,
নাগড়াবাঁশিতে ভাঙে গড়ে প্রেমে পূর্ণিমা সারারাত।

প্রৌ ঢ়ে র উ ক্তি

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

শৈশব, কৈশোর আর বাঞ্ছিত যৌবন
এ প্রৌঢ়ত্বে পাশাপাশি আছে।
আজকে তোমার কাছে
শিশু আমি, আমিই কিশোর—
আসতে পারি যে নিয়ে সুনির্মল ভোর,
আমি যুবা—দিতে পারি বসন্তের মন,
পল্লবিতা তোমার শরীরে।

দুর্বার এ সমুদ্রের তীরে
এসোনা এসোনা তুমি মেয়ে।
এসো যদি দেখবে কী চেয়ে?—
দুপুরের নীলাক্ত সাগর
ফেনময় যেন কেউ ছড়িয়েছে যুঁই;
ইচ্ছে হবে ছুঁই,
ছুঁলেই দেখবে, মেয়ে, ভেঙে গেছে ঘর।

ভ্রমণ কাহিনী

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর। রাহুল সাংকৃত্যায়ন। শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। পাঁচ টাকা।

নিষিদ্ধ দেশ অর্থে তিব্বত। এই বই লেখকের প্রথম তিব্বতযাত্রার বিবরণ। আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে রাহুল সাংকৃত্যায়ন অনেক বিপদ-আপদ মাথায় করে, অনেক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করে প্রথম বার সেই দুর্গম দেশে পদার্পণ করেন। এ-বই নিছক ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়, এক মহাপণ্ডিতব্যক্তির জ্ঞানান্বেষণের অভিযান কাহিনী। তিব্বতে যাওয়ার জন্যে যখন তিনি প্রস্তুত হয়েছেন, এবং সিংহল থেকে রওনা হয়ে ভারতভূমিতে পদার্পণ করেছেন, তখন লেখক বলছেন, "ধনুস্কোডিতে নামিয়া কাস্টম কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমার প্রায় পাঁচ মণ পুস্তক—অধিকাংশই ত্রিপিটক ও তাহার 'অট্‌ঠকথা', অর্থাৎ ভাষ্য উদ্ধার করিয়া রেলযোগে পাটনা রওয়ানা করিলাম"। তাঁর সঙ্গের বইয়ের বিষয়ও দুরূহ, ওজনও কম নয়। এই সব গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে তিনি তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হন।

'নিষিদ্ধ দেশে'র এই কাহিনী যে-কোনো পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষক বোধ হবে। এতে কেবল দেশের ভূবৃত্তান্তই অবগত হওয়া যাবে, এ ধরনের ভ্রমণকাহিনী এটি নয়। এতে দেশের আচার-আচরণের সঙ্গে যেমন পরিচিত হওয়া যাবে, সেই সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ সংযোগ লাভ ঘটবে।

অনুবাদক তাঁর ভূমিকায় বলেছেন "প্রথম-বারের তিব্বতযাত্রায় তিনি (রাহুল) বাইশটি অশ্বতর বোঝাই তিব্বতী পুঁথি চিত্রাবলী আনয়ন করেন। দ্বিতীয়বারের (১৯৩৪) যাত্রায় তিনি চল্লিশ খণ্ড প্রামাণ্য পুস্তকাদিও আনয়ন করেন। তৃতীয়বারে (১৯৩৫-৩৬) তিনি তিব্বতের শাক্য ঙোর এবং শালু বিহারে ১৫৬টি নূতন গ্রন্থের আবিষ্কার করেন।"

এই উক্তি থেকে ভ্রমণকাহিনীর গুরুত্ব কিছুটা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে বলে মনে হয়। রাহুল সাংকৃত্যায়নের এই অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি নিজে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে অক্ষয় কীর্তিমান হয়েছেন বটে, কিন্তু সে তাঁর নিজস্ব এবং ব্যক্তিগত লাভ। তাঁর এই অধ্যবসায়ের ফলে যেসব মহামূল্য গ্রন্থ আমরা লাভ করেছি, সে-লাভ আমাদের জাতীয় লাভ। ভারতবর্ষ এজন্যে বহুকাল এই অদম্য সাহসী জ্ঞানান্বেষীকে স্মরণে রাখবে।

বইটি তিন ভাগে বিভক্ত—উদ্যোগ পর্ব, উপস্থিত পর্ব ও প্রত্যাবর্তন পর্ব।

আমাদের গৃহের অতি নিকটের এই দেশটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় বড় সামান্য। বহুদূর-দূরান্তের দেশ সম্বন্ধে আমরা যতটা খবর রাখি, এ দেশ সম্বন্ধে সম্ভবত ততটুকুও রাখিনে। এর অবশ্য কারণ আছে। দেশটি দুর্গম তো বটেই, তার উপর সেখানকার আবহাওয়া আমাদের পক্ষে বিশেষ সুখকর নয়। বৃষ্টি কম, গাছপালা সামান্য, কিন্তু শীত প্রচণ্ড। এই সব কারণে বাইরের জগতের সঙ্গে এর যোগাযোগও নেই। অনেকটা যেন রহস্যেই আবৃত হয়ে আছে এই দেশটি।

রহস্যে আবৃত হয়ে আছে বলেই এর সম্বন্ধে জানার কৌতূহল আমাদের প্রবল। লেখক খুঁটিনাটিভাবে এই কাহিনী বিবৃত করায় আমাদের কৌতূহল বহু পরিমাণে পূরণ হয়েছে।

অনেকগুলি চিত্র সংযুক্ত করায় এই বইটির আকর্ষণ আরও বেড়েছে। —৩৩৭।৫৮

লণ্ডন তীর্থে—ডক্টর মতিলাল দাশ। প্রকাশক—আলোক-তীর্থ, প্লট ৪৬৭, নিউ আলিপুর, কলিকাতা—৩৩। দাম—চার টাকা।

বিদেশ ভ্রমণ করলেই জ্ঞান জন্মে না, সে-জ্ঞানকে আয়ত্ত করতে হয় দৃষ্টি ও বুদ্ধির ভেতর দিয়ে। লেখক লণ্ডন শহর ও বিলেত দেশটাকে দেখেছেন তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে এবং তার ফলে তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনীকে প্রচলিত পন্থায় পাঠকের কাছে উপস্থিত করেননি। ঋজুভাবে জানা দেশটাকে পাঠক আর একবার নতুনভাবে জানতে পেরে আনন্দিত হবেন। লেখক শিক্ষিত রুচিবান এবং সাহিত্যিক। সুতরাং বিদেশের শিল্প সংস্কৃতিকে তিনি একটি সুরুচিসম্পন্ন মন দিয়ে ধরতে চেয়েছেন, যা রুচিবান পাঠকের কাছে ভালো লাগবেই। ৪৫৭।৫৮

উপন্যাস

মৎস্যগন্ধা—অচ্যুত গোস্বামী—ডি এম লাইব্রেরী। ৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—পাঁচ টাকা। ৩০১।৫৮

'মৎস্যগন্ধা' মহাভারতীয় উপাখ্যান নয়। বাংলা দেশের দক্ষিণপ্রান্তে মৎস্যজীবী যে একটি বৃহৎ সম্প্রদায় রয়েছে, এ বইয়ে তাদেরই সুখদুঃখের কাহিনী লেখা হয়েছে। এই নিরক্ষর প্রবৃত্তি-পরিচালিত কর্মঠ মানুষগুলির জীবনে সমস্যা অনেক। এদের জমি নেই, শিক্ষা নেই, স্বাধীন-ভাবে মাছের চাষ করবার মতো সংস্থানও নেই। এরা কর্মঠ এবং কর্মেচ্ছুও বটে। কিন্তু কাজ পাওয়া এদের জীবনে একটা বড় সমস্যা। তার জন্যে অনেকখানি দায়ী এদেরই দুর্বলতা। পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ দলাদলি, চুরি এবং বহুচারিতা এই মৎস্যজীবীদের জীবন ও চরিত্রের মধ্যে অনিবার্য প্রকৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমস্যা আরো আছে। জমিদার ও ভেড়িওয়ালাদের অনুদার আচরণ এবং নির্যাতন এই সব সহজ মানুষের মনে যেমন ক্ষোভ, তেমনি বিদ্বেষও সৃষ্টি করে; কিন্তু সেই বিদ্বেষ সংহত সামাজিক প্রতিবাদে পরিণত হতে পারে না। এইভাবে নানা সংকটে ঈষৎ চঞ্চল অথচ স্তিমিত গুটিকয়েক মানুষের কথা নিয়ে 'মৎস্যগন্ধা' উপন্যাস লেখা হয়েছে। অনুন্নত এই সম্প্রদায়ের জীবনকাহিনী লিখতে হলে এদের আশা-নিরাশা, শক্তি ও দুর্বলতা সুখ ও দুঃখ পূর্বোল্লিখিত ঐ সব সমস্যা সংকটের মধ্য দিয়ে কিভাবে প্রকাশ পায়, তারই উপর জোর দেওয়া উচিত। অচ্যুত গোস্বামী তাঁর উপন্যাসে এ প্রসঙ্গগুলি বস্তুত এদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গী-ভূত কয়েকটি প্রশ্নরূপেই উল্লেখ করেছেন; কিন্তু তাঁর কাহিনীটি এগিয়েছে এবং লেখক তাকে উপাদেয় করতে চেষ্টা করেছেন অন্য উপায়ে। সে উপায়টি বহু পরিচিত নারী ও ধর্মের সমস্যা। অচ্যুতবাবুর লেখা কাহিনী পড়তে পড়তে মনে হয় যে, এই মৎস্যজীবীদের জীবনে যদি কোন সমস্যা তীব্র হয়, তবে তা নারী। যে কয়টি নারীচরিত্র এ কাহিনীতে স্থান পেয়েছে, যেমন, পরী, সুভদ্রা, খেঁদীর মা, গোপা রাধা প্রভৃতি—এদের মধ্যে একটিকেও ঠিক ঠিক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মৌল সমস্যার সঙ্গে জড়িত, এমন কথা বলা যায় না। অন্যান্য পুরুষ চরিত্রগুলিও কেমন যেন স্থবির, প্রাণ-হীন। চাঞ্চল্য কিছু পরিমাণে অবশ্য মোড়ল অটবীর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে—কিন্তু পরীর সংসর্গে আসার পর এই প্রাণবন্ত মানুষটাও ঝিমিয়ে গেছে। থিতিয়ে-যাওয়া মনে এই সংকট-তাড়িত সম্প্রদায়ের দুটি প্রধান পরিচালক অটবী ও বলরাম যথাক্রমে পরী ও সুভদ্রার স্বপ্নে কালহরণ করেছে। চিন্তার ক্ষেত্রে, ভবিষ্যৎ-ভাবনার ক্ষেত্রে এদের মনে সম্প্রদায় গৌণ হয়ে প্রেম ও জৈবকামনার প্রসঙ্গই মুখ্য হয়েছে। 'বিবেচক' বলরামকে দিয়ে সুভদ্রার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পেষণ করার চিত্র অথবা গোঁসাই-সান্নিধ্যে নিরাসক্ত অটবীর সঙ্গে খেঁদীর মার গোপনে রাত্রিযাপন প্রভৃতি প্রসঙ্গ ঐ সিদ্ধান্তেই নিয়ে যায়। লেখক অবশ্য ভূমিকায় নীতির বিকৃতি সম্পর্কে অজুহাত দিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ন' বছরের মেয়ে আর বার বছরের ছেলের উলঙ্গ হয়ে নির্জন কক্ষে ক্রীড়াকুতূহল কি কোন সাম্প্রদায়িক জীবনা-চারের (এমনকি আদিমতারও) দোহাই দিয়েও সাহিত্যে বর্ণনা করা চলে? জানি না, হয়ত মৎস্যজীবীদের মধ্যে এমন বিধি এবং তার সমর্থন যথাযথ। কিন্তু এমন জীবন এবং এমন নীতিকে বাস্তব বলে চালান যায় কি? যা আছে, যা হয় এবং যা হওয়ার ও পাওয়ার জন্য মানুষমাত্রেরই স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে—এই দুইকে নিয়েই বাস্তব। তাই সেই বস্তুই বাস্তব, যা জীবন্ত। বলরাম, অটবী বা অন্য কেউই সংহত সমাজ শক্তি ও কুচক্রী কাঞ্চন রায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার বলিষ্ঠ স্পৃহা প্রকাশ করেনি। এই স্পৃহাটি এদের মনপ্রাণের সঙ্গে জুড়ে দিলে হয়তো অটবী বলরাম প্রভৃতি চরিত্রগুলি জীবন্তরূপে বাস্তব হয়ে উঠতো!

জীবনকে তার যথাপ্রাপ্ত পরিবেশেই গভীর-ভাবে আঁকড়ে ধরার আকাঙ্ক্ষা, জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও অনুরাগ এবং আত্মগঠন ও সমাজগঠনের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রাণবহ্নি বিশেষ করে মৎস্যগন্ধা-জাতীয় কাহিনীর মধ্যে পাঠকমাত্রেই আশা করেন। কারণ এ কাহিনী একটি হতভাগ্য সম্প্রদায়ের কাহিনী। অচ্যুতবাবু শুধুমাত্র যথাস্থিতে অবস্থার উপরই নির্ভর না করে যদি এদিক থেকে অগ্রসর হতেন, তা হলে বোধহয় ভাল হতো।

এ উপন্যাসের কয়েকটি জায়গা বেশ ভাল। যেমন—জমিদারের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ বলরামের স্বগতচিন্তা, নিজ সম্প্রদায়ের ভীতদুর্বল অবস্থাকে ধিক্কার দেওয়ার ব্যাপারে অটবীর বিদ্রূপ, এবং সমগ্রভাবে পরী চরিত্র। অনুন্নত ভাগ্যহীন বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় নিয়ে বাংলা ভাষায় আরো কয়েকটি উপন্যাস লেখা হয়েছে। এই জাতীয় উপন্যাসের শ্রেণীতে অচ্যুত গোস্বামীর 'মৎস্যগন্ধা' আর একটি প্রয়াস।

শিশুসাহিত্য

কুলাই নদীর বাঁকে—লরা ইংগালস্ ওয়াইল্ডার। অনুবাদক ঃ হিমাংশুকুমার ঘোষ। পরিচয় পাবলিশার্স, ১৭৫-এ, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭। ১·৫০।

ছোটদের জগৎ বাড়ছে, রূপকথার তেপান্তর মাঠের ঝাপসা ছবি ছাড়িয়ে, রাজপ্রাসাদ আর রাক্ষসপুরী, পেত্নী-পরীর দেশ সব ডিঙিয়ে শিশুর রাজ্য বিস্তৃত হচ্ছে। অবশ্যই এটি গল্পের জগৎ, ছাপা অক্ষরের বইয়ের জগৎ। ছোটদের মনের পরিসর এইভাবেই বাড়ে,

ভৌগোলিক ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ছোঁয়া লেগে লেগে। লরা ইঙ্গালস্ ওয়াইল্ডারের on the banks of plum creekএমনই একখানি আরণ্যক গল্প গ্রন্থ, যার মধ্যে সুদূর আমেরিকার বনাঞ্চলের ছায়া ভরা আছে। শিহরণভরা ঘটনা এবং উদ্দীপক পরিবেশের মধ্যে ছোট ছেলেমেয়েদের মন নিঃসন্দেহে মেতে উঠবে। 'কুলাই নদীর বাঁকে' এই উল্লেখযোগ্য বৈদেশিক গ্রন্থেরই বাংলা অনুবাদ। অনুবাদকের ভাষা এবং ভঙ্গি শিশু মনোস্পর্শী এবং প্রাঞ্জল হয়েছে। কিছু কিছু বানান ভুল নজরে পড়ল। ৫৮১।৫৮

অনুবাদ সাহিত্য

প্রাচীন ফিলাডেলফিয়ার বেন ফ্র্যাঙ্কলিন—মার্গারেট কাজিনস্ঃ অনুবাদক—শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দেড় টাকা।

অজানা রহস্যের প্রতি মানুষের চিরকালের আকর্ষণ, এবং তারই ফলে পৃথিবীতে জন্ম নিচ্ছে নিত্য নতুন আবিষ্কার। যাঁরা সমগ্র জীবনের সাধনা দিয়ে পৃথিবীর উপকার করে যান, তাঁদের জীবনকেও বিশেষভাবে জানার দরকার আছে। ভবিষ্যতের মানুষ তাঁদের পথকেই অনুসরণ করে সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলে।

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন তেমনি একজন অনন্যসাধারণ পুরুষ। বাংলাদেশের কৃতী সাহিত্যিক বিমলাপ্রসাদ সুন্দর ভাষায় অনুবাদ করেছেন তাঁর জীবন-কাহিনী। রচনাভঙ্গির গুণে গ্রন্থটিকে অনুবাদ বলে মনে হয় না। এ বই-এর প্রচার একান্তভাবেই বাঞ্ছনীয়। ৩১৩।৫৬

সঙ্গীত

সংগীতদর্শিকা—প্রথম খণ্ড। শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বেঙ্গল মিউজিক কলেজ, ৪, হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা-২৯। পাঁচ টাকা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-মিউজ এবং লখনউ ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ধারিত হওয়ায় এই বইটি আবশ্যক পাঠবস্তু সমন্বিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকার ভাতখণ্ডেকে অনুসরণ করেছেন এবং জানিয়েছেন যে ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন ধারার আস্বাদ গ্রহণে সহায়তা করা ও সাধনা অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রয়োগের পন্থা নির্দেশ করাই এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন এবং জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি যত্নসহকারে সরল ও সুবোধভাবে সন্নিবেশিত করেছেন। এছাড়া বাংলার প্রচলিত গীতরূপ সম্বন্ধেও সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থিগণ এই গ্রন্থপাঠে যথেষ্ট উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। ৬০২।৫৮

প্রবন্ধ

সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা—ডাঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। ছ'টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

সংস্কৃত সাহিত্যে যাঁরা উচ্চশিক্ষায় অগ্রসর হয়েছেন গ্রন্থটি প্রধানত তাঁদের জন্য রচিত হলেও পাঠকসাধারণও এই গ্রন্থটি পাঠ করে সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা সম্বন্ধে যথেষ্ট জানবার অবকাশ পাবেন। গ্রন্থকার নির্ভরযোগ্য বহু গ্রন্থ থেকে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি আহরণ করে স্বল্পপরিসরে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করেছেন। এই ধরনের গ্রন্থ বাংলায় বেশি নেই অথচ সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল অনেকের আছে। এই আয়াসসাধ্য কর্তব্যটি সুচারুভাবে নিষ্পন্ন করে গ্রন্থকার ছাত্র এবং পাঠক উভয়েরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এই গ্রন্থে—বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, মহাকাব্য, দর্শন, কাব্যসাহিত্য, গদ্যকাব্য, ঐতিহাসিক কাব্য, গল্পসাহিত্য প্রভৃতি বিষয় নৈপুণ্যসহকারে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির বহুল প্রচার কাম্য।

রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব—শ্রীবিমলকান্তি সমদ্দার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

রবীন্দ্রকাব্যে কালিদাসের প্রভাব একটি বিশেষ গবেষণার বিষয়। এসম্বন্ধে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু আলোচনা হলেও সর্বাঙ্গীণ আলোচনার উদ্যোগ ইতিপূর্বে হয়নি। গ্রন্থকার বিশেষ পরিশ্রমসহকারে এই দুই মহাকবির ভাবধারার ঐক্য অনুসন্ধানপূর্বক ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর এই গবেষণাটি সার্থক হয়েছে এবং গ্রন্থটি অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সমাদর অর্জন করবে। বস্তুত প্রভাব বলতে কি বোঝায় এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বকীয়তা অক্ষুণ্ণ রেখেও কিভাবে কালিদাসের রচনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন গ্রন্থকার সেটি নিপুণভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছেন। উভয় কবির মানসসাদৃশ্য প্রস্ফুটনে গ্রন্থকারের প্রয়াস বিশেষ প্রশংসনীয়। ৫৯৩।৫৮

মহাভারতে অনুশীলন-তত্ত্ব—শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ। শরৎ বুক হাউস, ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। (মূল্য উল্লেখিত নাই)

অশীতিপর প্রবীণ গবেষক শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদের বহু প্রশংসিত তথ্য ও তত্ত্বমূলক রচনা 'মহাভারতে অনুশীলন-তত্ত্ব' গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সনে। সেই সময়েই দেশের বিজ্ঞ ও সুধীসমাজ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। প্রকৃতই তিনি অতি সুমধুর এবং ললিতগম্ভীর ভাষায় মহাভারতের একাদশটি চরিত্র বিশ্লেষণপূর্বক দেখাইয়াছেন যে আপাতদৃষ্টিতে আমরা রামায়ণ-মহাভারতের যে সৃষ্টিবৈচিত্র্য দর্শনে মুগ্ধ হই, অন্তর্দৃষ্টিতে তাহার সে বৈচিত্র্য কত অধিকতর, কত স্ফুটতর।' তিনি মহাভারত চরিত্র বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া কোথাও গতানুগতিক মন্তব্য করেন নাই, নিজের অভিমতকে অসংকোচে প্রকাশ করিয়াছেন এবং যুক্তি ও প্রমাণের উপর তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ হওয়ায় বর্তমানকালের অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের নিকট ইহা সহজপ্রাপ্য হইল। ৬৩১।৫৮

বিবিধ

প্রথম দশজন—প্রকাশক : স্কলার্স সিন্ডিকেট, ১৭০-এ, অপার সার্কুলার রোড (স্কুল ফাইনাল ১৯৫৮) কলিকাতা-৪। ৭৫ নঃ পঃ।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ পরিচালিত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ১৯৫৮ সালে যে দশটি ছাত্রছাত্রী প্রথম দশটি স্থান অধিকার করেছিল তাদেরই সচিত্র সংক্ষিপ্ত জীবন-পরিচিতি এই পুস্তিকায় ছাপা হয়েছে। পরীক্ষার অর্জিত নম্বর, বিশেষ অনুরাগ, শখ, জীবনযাপন ও অধ্যয়ন পদ্ধতি, স্বভাব ইত্যাদি বিষয়ের বিবরণ সংকলিত হয়েছে। পরবর্তীকালের ছাত্রছাত্রীদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করবে আশা করি। ৩৫৬।৫৮

গ্রন্থাগার—কর্মী ও পাঠক—রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৭। দাম—এক টাকা।

জনশিক্ষার প্রশস্ততম স্থান গ্রন্থাগার। অধুনা সমগ্র দেশে গ্রন্থাগার-প্রসারের ব্যাপক চেষ্টা চলছে। এ-সময়ে গ্রন্থাগার সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য জনসাধারণের জানা একান্ত প্রয়োজন। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের কর্তব্যই সব নয়, পাঠকেরও গুরু দায়িত্ব আছে। দু দিকের সম্পূর্ণ সহযোগিতা ও সহানুভূতির ওপর ভিত্তি করেই এক-একটি গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে গড়ে উঠতে পারে। ছোট-ছোট কয়েকটি প্রবন্ধে লেখক মোটামুটিভাবে এ বিষয়ে একটি সামগ্রিক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। ক্ষুদ্র গ্রন্থ, কিন্তু প্রতিটি পংক্তি অত্যন্ত মূল্যবান। এ-বই পাঠক মাত্রেরই পড়া উচিত। ২৩২।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছেঃ—

ভিক্টোরিয়া—কুট হামসন অনুবাদক—শীলভদ্র।

Boris Pasternak—K. K. Sinha.

উটরোগ (কৌতুক নাট্য)—উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ঘুমভাঙানি—রবিদাস সাহারায়।

সাবিত্রী (নবম পর্ব প্রথম সর্গ)—শ্রীঅরবিন্দ।

বিদ্রোহী বালক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

নির্বাচিত গল্প—এড্গার অ্যালেন পো অনুবাদক—শতদল গোস্বামী।

নির্বাচিত গল্প—ও' হেনরি। অনুবাদক—রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষা পরিক্রমা—ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য।

চন্দ্রশেখর

এত আলো, তবু এত অন্ধকার

মানুষ অমর নয়, খ্যাতির ক্ষেত্রেও উত্থান-পতন আছে। কিন্তু তাবাতে অবাক লাগে, যে ফিল্ম শিল্প আজ দেশের বৃহৎ ব্যবসায়গুলির অন্যতম, তারই একজন এক নিষ্ঠ সাধক—প্রায় আশীখানি নির্বাক ও সবাক ছবির সঙ্গে যাঁর নাম পরিচালক হিসাবে সংশ্লিষ্ট—তিনি একান্ত অবজ্ঞাত ভাবে শেষ জীবন কাটিয়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন।

জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন মতিহারিতে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যু হল গত ৮ই জানুয়ারী তারিখে হাওড়ায়। সাধারণ মানুষের জীবনে জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে ৭১ বছরের ব্যবধান কিছু কম নয়। কিন্তু তবুও মৃত্যুর আকস্মিকতা মানুষকে বিহ্বল করে, আর যখন স্বজন, আত্মীয় বিয়োগ তাঁদের বুকে যে ব্যথা হানে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু ভাবাবেগের ঊর্ধ্বে আর একটি বড় সত্য এক্ষেত্রে এমনভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে যাকে উপেক্ষা করা চলে না। এদেশে চিত্রশিল্পের জন্মকাল থেকে যিনি তাকে পালন করে এসেছেন—একদিন দু'দিন নয়, দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে—তিনিই অথচ, অবজ্ঞাত রয়ে গেলেন তার ক্রমবর্ধমান গৌরবের দিনে। শুধু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেই কি তাঁর শেষকৃত্য করবে বাংলার ফিল্মশিল্প?

এক আত্মীয়ের আনুকূল্যে আমাদের হাতে জ্যোতিষবাবুর জীবন-সায়াহ্নে লেখা কয়েকখানি কাগজ এসে পড়েছে। মৃত্যুর ঠিক কুড়ি দিন আগে (১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৫৮) তিনি লিখেছেন : "এবার রওনা দিতে হবে। * * * দুরারোগ্য রোগে ধরেছে। শয্যায় পেড়ে ফেলেছে। হাত পা মাথা সবই আছে, কিন্তু কোন কাজ করবার শক্তি নেই। চিন্তা যা করি, তাও অর্থহীন। গলার স্বর
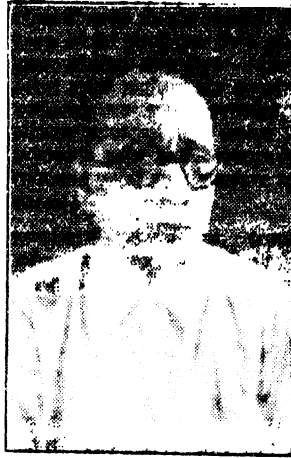
জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একেবারে বসে গেছে। কথা বলি ফিস ফিস করে। সে কথা কেউ শুনতেও চায় না। টাকা-কড়ি কিছু রাখতে পারিনি। একেবারে রিক্তহস্ত। পথের ভিখিরীরও সঞ্চিত অর্থ থাকে, আমার একটি পয়সাও নেই। কে আমার কথা শুনবে? কেউ জিজ্ঞাসাও করে না কেমন আছি। * * * ভাগ্যবিধাতার বিধানে এক রকম দিন ভালোই কেটেছে। স্বপ্নে স্বপ্নে অতীত কাটিয়েছি। আজ সে স্বপ্ন ভেঙে গেছে। জোৎস্না নিভে গেছে। সুখের প্রাসাদ চূর্ণ হয়ে গেছে। আজ নিদ্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। আহারে রুচি নেই। সারা দেহটাকে কাবু করে ফেলেছে। রক্ত হিম হয়ে এসেছে। শ্বাস রোধ হয়ে আসে। তাই বলছি—এবার রওনা দিতে হবে।"

মৃত্যুর ঠিক একদিন আগে তাঁর শুশ্রূষাকারী দৌহিত্রকে উদ্দেশ করে লিখেছেন : "বকু, যদি হঠাৎ আমার মৃত্যু হয় তখন ঘাবড়ে যাবে নিশ্চয়। কিন্তু সামলে নেবে। প্রথমে ডাক্তারবাবুকে খবর দেবে। তারপর—" কাকে কাকে খবর দিতে হবে, কোন আত্মীয়কে টাকা ও লোকজনের ব্যবস্থা করবার কথা বলতে হবে, কে মুখাগ্নি করবে—এই সব বিষয়ে নির্দেশ আছে লেখাটির মধ্যে। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি নির্দেশ : "আমার ছবির সংশ্লিষ্ট কোন লোককে কিছু বলতে হবে না। তাঁরা কেউ নিজেরা আসেন সে আলাদা কথা।" কী নিদারুণ অভিমান নিয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এই কটি কথার মধ্যে তার আভাষ পাওয়া যায়।

জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত নির্বাক ও সবাক ছবির একটি তালিকা এইখানে দেওয়া হল মুক্তির কালানুক্রমে :

নির্বাক যুগে—১৯১৯ : বিল্বমঙ্গল ১৯২০ : মহাভারত। ১৯২১ : ধ্রুব চরিত্র, মা দুর্গা, নল দময়ন্তী। ১৯২২ : রত্নাবলী, রামায়ণ, নর্তকী তারা। ১৯২৩ : মাতৃস্নেহ। ১৯২৪ : নবীন ভারত। ১৯২৫ : জেলের মেয়ে, সতীলক্ষ্মী। ১৯২৬ : প্রফুল্ল। ১৯২৭ : চণ্ডীদাস। ১৯২৮ : ভ্রান্তি, শাস্তি কি শান্তি, বিষবৃক্ষ। ১৯২৯ : যুগলাঙ্গুরীয়, রজনী। ১৯৩০ : রাধারাণী, ইন্দিরা। ১৯৩১ : রাজসিংহ, মৃণালিনী, শকুন্তলা, কেরাণীর মাস-কাবার, বিশ্বামিত্র, বিবাহ বিভ্রাট। ১৯৩২ : মাধবী কঙ্কন।

সবাক যুগে—১৯৩১ : জোর বরাত, ঋষির প্রেম। ১৯৩২ : বিষ্ণুমায়া, কৃষ্ণকান্তের উইল। ১৯৩৩ : জয়দেব। ১৯৩৪ : দক্ষযজ্ঞ। ১৯৩৫ : মানময়ী গার্লস্ স্কুল, কণ্ঠহার। ১৯৩৬ : অহল্যা, রজনী। ১৯৩৭ : কাণ্ডারী, মালাবদল, কচি সংসদ। ১৯৩৮ : বেকার নাশন, একলব্য, রূপোর বন্দুক। ১৯৩৯ : নরনারায়ণ, রুক্মিণী,

বামন অবতার। ১৯৪১ ঃ কর্ণার্জুন, শকুন্তলা, শ্রীরাধা। ১৯৪২ ঃ ভীষ্ম, মিলন। ১৯৪৩ ঃ দেবর। ১৯৪৫ ঃ কলঙ্কিনী। ১৯৪৮ ঃ বঞ্চিতা, কালো ঘোড়া। ১৯৪৯ ঃ রবীন মাষ্টার। ১৯৫০ শেষবেশ।

ওপরের তালিকাভুক্ত বাংলা সবাক ছবিগুলি ছাড়াও জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকগুলি হিন্দী, উর্দু, তামিল ও তেলেগু ছবি পরিচালনা করেছিলেন। তাদের মধ্যে এইগুলি প্রধান—শিরী ফরহাদ, লয়লা মজনু, বিল্বমঙ্গল, গণেশ জন্ম, আঁখ-কি-তারা, নাগম ও প্রেম-কি-দুনিয়া।

পরলোকে সিসিল বি ডিমিল

১৯৫৯ সালের এই প্রথম মাসটি চলচ্চিত্র-শিল্প জগতের এমন একজনকে চিরকালের মতো সরিয়ে নিয়েছে যাঁর সমকক্ষ—অন্তত তাঁর ক্ষেত্রে—কেউ ছিলেন না এবং হয়ত হবেন না। তিনি সিসিল বি ডিমিল—যে-নাম ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রনির্মাণের ক্ষেত্রে কতকটা প্রবাদবাক্যেই পরিণত হয়েছে। হলিউডের এই প্রখ্যাত প্রযোজক-পরিচালক গত ২১শে জানুয়ারী ৭৭ বছর বয়সে প্রাণত্যাগ করেছেন। সাতাত্তরকে অবশ্যই পরিণত বয়স বলা যায়। কিন্তু সিসিল বি ডিমিল ঐ বয়সেও প্রায় আগের মতোই সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম ছিলেন। যে অসামান্য সৃজনক্ষমতা এবং কল্পনাশক্তির বলে তিনি একদা হলিউডের প্রাণশক্তির প্রতীকরূপে পরিচিত হয়েছিলেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্তই সেই পরিচয় তাঁর অক্ষুণ্ণ ছিল। মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে না নিলে সারা পৃথিবী তাঁর শেষ ছবি 'দি টেন কম্যান্ডমেন্টস'-এর মতোই হয়ত আবার এমন কিছু অবিস্মরণীয় শিল্পসৃষ্টি পেত যা চিরকাল মানুষকে আনন্দ দিতে সক্ষম, যা চিরকাল আলোচনা করার যোগ্য। তাই এই অপূরণীয় ক্ষতির কথা চিন্তা করে আজ চিত্ররসিকমাত্রই ব্যথিত হবেন।

১৯১৩ সালে ডিমিল চিত্রনির্মাণের আসরে নেমেছিলেন। নির্বাকযুগের সেই বছরে তাঁর প্রথম উপহার 'দি স্কোয়াও ম্যান' আজও স্মরণীয়। সেই ছবিতেই হলিউড তার কৈশোর কাটাল। লোকে জানল, একটি নতুন, শক্তিমান শিল্পমাধ্যমের উদ্ভব সত্যই হয়েছে। ১৯১৫ সালে তিনি দিলেন বহুল দৃশ্যযুক্ত 'কারমেন', ১৯১৮তে 'জোন দি উওম্যান'। শেষোক্ত ছবিটিতে যুদ্ধের যে-সব দৃশ্য ছিল, তখনকার দিনে সত্যিই তা অকল্পনীয়। ওতে ডবল-এক্সপোজারের একটি দৃশ্য তখনকার চিত্রামোদীদের চমকিত করেছে।

১৯১৩ থেকে ১৯৫৭ এই ৪৪ বছরের মধ্যে ডিমিল মোট ৭০ খানি ছবি করেছেন। এই ৭০-এর মধ্যে যে কয়েকটির নাম চলচ্চিত্ররসিক মাত্রই জানেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দি কিং অব কিংস', 'দি সাইন

সিসিল বি ডিমিল

অব দি ক্রস', 'ক্লিওপেট্রা', 'দি ক্রুসেডস', 'দি গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ' এবং অবশ্যই, এখন যেটি কলকাতায় দেখান হচ্ছে, 'দি টেন কম্যান্ডমেন্টস'।

বাস্তবধর্মী সেট এবং এক বিশেষ ধরনের আলোকসম্পাতের (প্রতি শিল্পীর উপর ছায়াময় আলোকের প্রয়োগ যাকে 'রেমব্রাঁ লাইটিং' বলা হয়) প্রবর্তন তিনি করেছিলেন। এই দুটি ব্যাপারে চলচ্চিত্রশিল্প তাঁর কাছে একান্তভাবেই ঋণী।

বহুল ব্যয়ে আঙ্গিকের দিকে বিশেষ নজর দিয়ে ছবি করার প্রবর্তন সিসিল বি ডিমিলই করেছিলেন। বহু লোকজন, কলাকুশলী, শিল্পী, নানা বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং বিশেষভাবে শিক্ষিত লোকের সাহচর্যে তিনি ছবি করতেন। লোকে যা দেখবে তা যেন দর্শনীয় হয় এই দিকে সযত্ন লক্ষ্য রাখতেন। 'স্টার সিসটেম' বলতে আজ যা বোঝায় তারও সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তাঁকেই ধরা হয়। তবু ছায়াচিত্রের এই সব বহিরঙ্গের উৎকর্ষের জন্য তাঁর ছবি জনপ্রিয়, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন: "দৃশ্যের ছটায় ছবির সাফল্য নির্ণীত হয় না, শিল্পীর নামেও না, এমন কি পরিচালনার কৃতিত্বেও না। দরকার কেবল একটি জিনিসের—গল্প, সত্যিকার গল্পের।"

টেলিভিশনের আগমনে আমেরিকার চিত্রনির্মাতারা যখন হতাশ হয়ে পড়েছেন, তখন তাঁর কাজে কিন্তু এতটুকু শৈথিল্য দেখা যায়নি। কারণ তিনি বরাবর বিশ্বাস করে

এসেছেন যে, ভালো ছায়াছবির আবেদন ফুরিয়ে যাবার নয়। তিনি বলতেনঃ 'রসোত্তীর্ণ চলচ্চিত্র দর্শককে আজ আনন্দ দেয়, চিরকালই তা দেবে।'

অস্কার প্রতিযোগিতায় "অপরাজিত"

"অস্কার" কথাটি চলচ্চিত্রের অনুরাগীদের কাছে সুপরিচিত। আমেরিকার অ্যাকাডেমি অফ মোশান পিকচার আর্টস্ অ্যাণ্ড সায়েন্সেস্ প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ চিত্র এবং শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও কলাকুশলীদের যে ব্রঞ্জ মূর্তিটি উপহার দেন তাকেই বলা হয় "অস্কার"। বহু ব্যবহারের ফলে এখন যে কোন প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠ সম্মান "অস্কার" আখ্যা লাভ করেছে। তাই বৃটিশ ফিল্ম অ্যাকাডেমি প্রতি বছর শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে যে পুরস্কার দেন তাও "অস্কার" নামে অভিহিত।

এদেশের চিত্ররসিকরা শুনে খুশী হবেন, এ বছর বৃটিশ "অস্কার" প্রতিযোগিতায় সত্যজিৎ রায়ের "অপরাজিত" অন্যতম প্রতিযোগী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। দুজন ভারতীয় শিল্পীও স্ব স্ব ক্ষেত্রে এই সম্মানের দাবীদার। চারজন অভিনেত্রীর মধ্য থেকে বছরকার শ্রেষ্ঠা বৃটিশ অভিনেত্রী বাছাই করা হবে। যেহেতু ভারতবর্ষ কমনওয়েলথ ভুক্ত, তাই "অপরাজিত"-তে অভিনয়ের জন্যে করুণা বন্দোপাধ্যায় এই চারজনের তালিকায় স্থান পেয়েছেন। অন্য তিনজনের নাম—হারমিয়নী ব্যাড্‌লী ("রুম অ্যাট দি টপ"), ভার্জিনিয়া ম্যাককেনা ("কার্ভ হার নেম উইথ প্রাইড") ও আইরিন ওয়ার্থ ("অর্ডারস্ টু কিল")। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হবে সাতজনের ভেতর থেকে। তাদের মধ্যে ভারতের আই এস জোহর ("হ্যারি ব্ল্যাক অ্যাণ্ড দি টাইগার") একজন। বাকী ছ'জন হচ্ছেন মাইকেল ক্রেগ ("সী অফ স্যাণ্ড"), লরেন্স হার্ভে ("রুম অ্যাট দি টপ") ডোনাল্ড উলফিট (ঐ), ট্রেভর হাওয়ার্ড ("দি কী"), এণ্টনী কুয়েল ("আইস কোল্ড ইন অ্যালেক্স") ও টেরী-টমাস ("টম থাম্ব")।

প্রাথমিক ছাটাইয়ের পর চোদ্দটি ছবির ওপর ভোট নেওয়া হবে শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচন করবার জন্যে। ভারতবর্ষের "অপরাজিত" ছাড়া এই তালিকায় আছে আমেরিকার পাঁচখানি ছবি—"ক্যাট অন এ হট টিন রুফ", "দি ডিফায়াণ্ট ওয়ানস্", "নো ডাউন পেমেণ্ট", "শিপম্যান" ও "দি ইয়ং লায়ন্স", বৃটেনের পাঁচখানি—"আইস কোল্ড ইন অ্যালেক্স", "ইনডিসক্রীট", "অর্ডারস্ টু কিল", "রুম অ্যাট দি টপ" ও "সী অফ স্যাণ্ড"—ইটালী ও ফ্রান্সের যুক্ত প্রচেষ্টা "ক্যাবিরিয়া", সোভিয়েট রাশিয়ার "দি ক্রেনস্ আর ফ্লাইং" এবং সুইডেনের "ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ্"।
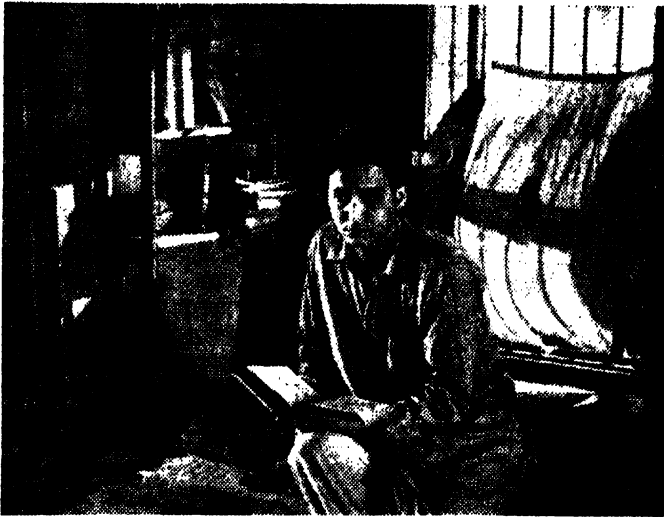
সত্যজিৎ রায়ের নির্মীয়মাণ ছবি "অপুর সংসার"-এর একটি স্মরণীয় দৃশ্যে চিন্তাচ্ছন্ন নায়কের বেশে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ইংরেজীতে "অপরাজিত"-র নাম রাখা হয়েছে "দি আনভ্যাংকুইশড্"। আগামী ১৮ই মার্চ লণ্ডনের স্যাভয় হোটেলে একটি ভোজসভায় এই প্রতিযোগিতার ফলাফল ঘোষণা করা হবে।

চিত্রালোচনা

শিবাজী প্রোডাকসন্সের হিন্দী চিত্রার্ঘ "অমর দীপ" এ হপ্তার একমাত্র নতুন ছবি। মাদ্রাজে তোলা যে সব হিন্দী ছবি সারা ভারতে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে এই নতুন প্রতিষ্ঠানের নব অবদান। দৃশ্যপটাদির জাঁকজমকের সঙ্গে অভাবনীয় অভিনেতৃ সমাবেশ করা হয়েছে এই ছবিতে। শিল্পীদের পুরোভাগে আছেন দেবানন্দ, বৈজয়ন্তীমালা, পদ্মিনী, রাগিনী, জনি ওয়াকার, প্রাণ, মুকুরি, বিপিন গুপ্ত, ডেভিড, আনোয়ার হোসেন, রণধীর, ওম্ প্রকাশ প্রভৃতি। টি প্রকাশরাও ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সি রামচন্দ্রের সুর ছবিটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। সংলাপ ও গান রচনা করেছেন রাজেন্দ্র কৃষ্ণ। এই ছবির তিনজন নায়িকাই নৃত্যশিল্পী হিসেবেও সুবিখ্যাত। এই ছবিতে তাঁদের নাচ দর্শকদের নতুন করে মুগ্ধ করবে। মাদ্রাজের জেমিনী ষ্টুডিওতে এই নৃত্যগীতসমৃদ্ধ ছবিখানি তোলা হয়েছে।

• • •

তিন হপ্তার মধ্যে একখানিও নতুন বাংলা ছবি দেখা যায় নি। অথচ মুক্তির প্রতীক্ষা করছে এমন ছবির সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য নয়। তাই ফেব্রুয়ারীতে নতুন ছবির রীতিমত ভিড় লাগবার সম্ভাবনা।

প্রভাত প্রোডাকসন্সের "বিচারক" ও বিকাশ রায় প্রোডাকসন্সের "মরুতীর্থ হিংলাজ"—এই দুটি ছবি ফেব্রুয়ারীর গোড়াতেই মুক্তি পাবে। একটির রচয়িতা তারাশংকর, অপরটির অবধূত। সাহিত্য ক্ষেত্রে দুজনেই দিগ্বিজয়ী। তাঁদের রচনা ছবির জগতে নতুন করে আলোড়ন সৃষ্টি করবে একথা অনায়াসে ধরে নেওয়া যায়। দুটি ছবিরই নায়ক উত্তমকুমার। নায়িকার ভূমিকায় তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন "বিচারকে" অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও "মরুতীর্থ হিংলাজে" সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। প্রথম ছবিখানির পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও দ্বিতীয়টির বিকাশ রায়।

ফেব্রুয়ারীতে মুক্তি-প্রতীক্ষিত আর একখানি ছবিরও নায়ক উত্তমকুমার। ছবিটির নাম "চাওয়া পাওয়া"। টাইম ফিল্মস্-এর প্রথম নিবেদন এটি, পরিচালনাও করেছেন একটি নতুন গোষ্ঠী "যাত্রিক" ছদ্মনামে। এবং যে তারকা-জুটি দর্শকদের সব চেয়ে প্রিয় সেই সুচিত্রা-উত্তমকে আবার একত্রে দেখতে পাওয়া যাবে এই ছবিতে।

ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে আসছে হেমন্ত বেলা প্রোডাকসন্সের "নীল আকাশের নীচে"। সুরশিল্পী হেমন্তকুমার ও তাঁর পত্নী বেলা মুখোপাধ্যায়ের প্রযোজনা ক্ষেত্রে এই প্রথম প্রবেশ। তাঁদের প্রথম নিবেদন ইতিমধ্যেই দিল্লী, কলকাতা, বোম্বাই এই তিন জায়গায় বিশেষ প্রদর্শনীতে রাষ্ট্রনেতা থেকে শুরু করে

যেখানে দেড়শো খোকার সমাবেশ সেখানে কাণ্ড একটা ঘটবেই। তরুণকুমার তারই সম্মুখীন হয়েছেন কে জি প্রোডাকসনের "দেড়শো খোকার কাণ্ড" ছবির এই দৃশ্যে

সমালোচক ও সাংবাদিকদের দেখান হয়েছে এবং তাঁদের সকলকারই অবিমিশ্র প্রশংসা লাভ করেছে। এইবার চিত্ররসিকদের পালা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবার। এর প্রধান দুটি ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও মঞ্জু দের অভিনয় ভোলবার নয়। ছবিখানি পরিচালনা করেছেন মৃণাল সেন।

এগুলি ছাড়াও দেবকীকুমার বসু পরিচালিত "সাগর সংগমে", কে জি প্রোডাকসন্সের "দেড়শো খোকার কাণ্ড", রূপজ্যোতির "ঠাকুর হরিদাস" প্রভৃতি আশু মুক্তির প্রতীক্ষা করছে।

সমরেশ বসুর "মদনের স্বপ্ন" গল্প অবলম্বনে ছবি তুলতে ব্রতী হয়েছেন এস্কার পিকচার্স। ছবিটির নাম রাখা হয়েছে "ধূলি-মাটির গান"। ২৫শে জানুয়ারী ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে এর শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তরুণেশ দত্ত।

* * *

ইউনাইটেড আর্টিস্টের "চায়না ডল" (চীনের পুতুল) এ হপ্তায় এলিট সিনেমার আকর্ষণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় এক আমেরিকান পাইলট ও এক চীনা রমণীর ভালবাসাকে কেন্দ্র করে এর গল্প। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় নেমেছেন ভিক্টর মেচিওর ও চীনা অভিনেত্রী লি লি হুয়া। এঁদের অভিনয় গুণে কাহিনীর মানবীয় আবেদন চিত্ররসিকমাত্রের অন্তর স্পর্শ করবে। পরিচালক ফ্রাঙ্ক বর্জেজ বহুকাল বাদে মনে রাখবার মত আবার একটি ছবি উপহার দিলেন।

হীরেন বসু প্রোডাকসন্সের "দেবর্ষি নারদের সংসার"-এর একটি কৌতুকপূর্ণ দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস সম্ভবত জহর রায়কে বলছেন, "অমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না।"

সাবাস তোমায়, সারমেয়

হিন্দী পর্দার 'ক্রাইম' ছবির ভিড়ের মধ্যে বৈচিত্র্যের স্বাদ নিয়ে এসেছে এন সি ফিল্মসের "মিলন"। নাইট ক্লাব আর খলনায়কের পাপাচার বাদ দিয়েও যে সাধারণ হিন্দী ছবি বেশ আমুদে হয়ে উঠতে পারে, ছবিখানি তারই প্রমাণ। ছবির মূল কাহিনীর মধ্যে পারিবারিক 'মেলোড্রামা'র গতানুগতিকতা থাকলেও এর উপস্থাপন ও বিন্যাসে এমন সব উপাদান সংযোজিত হয়েছে, দর্শকচিত্তবিনোদনে যেগুলির সাফল্য অনস্বীকার্য। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় একটি অ্যালসেশিয়ান কুকুরের কথা, ছবিতে যার ভূমিকা কাহিনীর নাট্য-পরিণতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সারমেয়ের ভূমিকা কোন ছবির পক্ষে যে কত সরস উপাদান হতে পারে 'মিলনে' তারই প্রমাণ মেলে।

আলোচ্য ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে লাহোরের বাসিন্দা এক সুখী দম্পতিকে কেন্দ্র করে। অজিত ও রূপা বিয়ের পর সন্তানের মুখ দেখতে পায়নি বলেই ছিল তাদের যত অশান্তি। কিন্তু সত্যই যেদিন রূপা সন্তানসম্ভবা হল এবং সন্তান-প্রসবের সময়ও এগিয়ে এল তখন অজিতকে লাহোর ছেড়ে অফিসের কাজে কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যেতে হল। অজিতের অবর্তমানে দেশবিভাগের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ঝড় এসে পৌঁছলো লাহোরে। দাঙ্গার এই ঘূর্ণিবাত্যায় ছিন্নমূল হয়ে রূপা ছিটকে গিয়ে পড়ল শরণার্থীদের এক হাসপাতালে। সেখানে সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করে।

অনেক খোঁজাখুঁজির পর অজিত যায় সেই হাসপাতালে রূপার সন্ধানে। সেখানকার কর্তৃপক্ষ রূপার নামাঙ্কিত একটি হার দেখিয়ে তাকে বলে যে তার স্ত্রী একটি কন্যা প্রসব করে মারা গেছে। আসলে রূপা তার হারটি দাঙ্গার কয়েক দিন আগে তার এক প্রতিবেশী বান্ধবীকে সাধ করে পরতে দিয়েছিল। সেও ছিল সন্তানসম্ভবা এবং উভয়েই আশ্রয় পেয়েছিল একই হাসপাতালে। অজিত সেই শিশুকে নিজের কন্যা ভেবে নিয়ে আসে নিজের কাছে। এদিকে অসহায়া রূপা স্বামীর ব্যর্থ অনুসন্ধানে অনেককাল ঘুরে তার ছেলেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত দেরাদুনে এক সহৃদয় বৃদ্ধের বাড়িতে আশ্রয় নেয়।

কয়েক বৎসর এমনিভাবে কেটে যায়। সেই দেরাদুনেই নতুন চাকরি নিয়ে আসে অজিত। সঙ্গে রীতা থাকে—যাকে নিজের

কন্যা ভেবে হাসপাতাল থেকে সে নিয়ে এসে-ছিল। অজিতের সংগে আর আছে টমি—তার আদরের কুকুর, লাহোরে অজিত ও রূপোর কাছে পালিত। দেরাদুনে থাকা কালীন আহত টমিকে একদিন রূপোর ছেলে রাজু বাড়িতে নিয়ে এসে সুস্থ করে তোলে। টমি ধীরে ধীরে গভীরভাবে রাজুর দিকে অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এই টমিকে উপলক্ষ্য করেই অজিতের সংগে রাজুর পরিচয় হয়। অজিত রাজুর দিকে এক অদৃশ্য আকর্ষণ বোধ করে। দেরাদুনে এমনিভাবে পাশাপাশি দিন কাটায় অজিত, তার নিজের ছেলে ও হারিয়ে যাওয়া তার জীবনসঙ্গিনী। কিন্তু মিলন তাদের আর হয়ে ওঠে না।

অজিতের সংগে সেখানেই আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যায় শ্যামার। শ্যামা লাহোরে অজিতের অফিসে কাজ করত এবং অজিতের প্রতি ছিল তার গোপন অনুরাগ। শ্যামার আদর-যত্নে মাতৃহারা রীতা তার প্রতি এমন অনুরক্ত হয়ে পড়ে যে, তাকে ছেড়ে থাকতে চায় না। এদিকে অবিবাহিতা শ্যামার পক্ষে অজিতের বাড়িতে থাকাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। অথচ রীতাকেও সামলানো যায় না। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেই অজিত শ্যামাকে বিয়ে করতে মনস্থ করেন এমনি সময়ে আকস্মিক-ভাবে শ্যামার সংগে দেখা হয়ে যায় রূপোর। রূপো তখন অসুস্থ। রূপো জীবিত থাকতে অজিতকে পাবার কোন আশা নেই শ্যামার। মরিয়া হয়ে সে অসুস্থ রূপোকে গোপনে বিষ খাইয়ে দিয়ে আসে। অজিত এ সমস্ত কিছুই জানে না। সে একদিন রূপোর হারটি তার ভাবী স্ত্রী শ্যামাকে দেয় পরতে। হঠাৎ এমনি সময়ে তীরবেগে ছুটে আসে টমি এবং লাফিয়ে উঠে শ্যামার গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়ে দৌড়ে পালায়। কুকুরটিকে তাড়া করতে গিয়ে অজিত এসে দাঁড়ায় রূপোর রোগশয্যার পাশে। ডাক্তার তখন রূপোকে বিষের প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচাতে ব্যস্ত। শেষ পর্যন্ত রূপো রক্ষা পায়। অনুতপ্তা শ্যামা এসে ক্ষমা চায় তার অপরাধের জন্যে। ইতিমধ্যে লাহোরের প্রতি-বেশী বন্ধুর সন্ধান অনেকদিন পর পেয়ে অজিত তাকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিল নিজের বাড়িতে। রীতা যে তারই মেয়ে সে পরিচয়ও পাওয়া গেল। আর দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর অজিত ও রূপোর জীবন আবার মিলনের আনন্দে ভরে উঠল।

ভাবসম্পদের দিক দিয়ে ছবির এই আখ্যানবস্তু নতুনত্বের দাবী করতে না পারলেও এর সামগ্রিক নাট্য আবেদন উপেক্ষনীয় নয়। স্বামী-স্ত্রীর জীবনে বিচ্ছেদ ও মিলনের এই অধ্যায়ের বিন্যাসে আবেগ সৃষ্টির পরিকল্পনায় পরিচালক কেদার কাপুর বহু ব্যবহৃত উপাদান পুরো-পুরি বাদ দিতে না পারলেও সামগ্রিকভাবে চিত্ররূপায়ণটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ছোটখাট অসংগতি ছবিতে যে নেই তা নয়; দেরাদুনে স্বামী-স্ত্রীর অবশ্যম্ভাবী নাটকীয় পুনর্মিলনটিকেও অযথা বিলম্বিত করা হয়েছে। কিন্তু শহুরে আবহাওয়ার বাইরে মনোরম পরিবেশ ও এর সহজ সরল পাত্র-পাত্রীদের জীবনে সুখ-দুঃখের আলোড়ন দর্শকমনে একটি সরস অনুভূতির সাড়া জাগিয়ে দেয়। তা বাদে টাইগার' নামক অ্যালসেশিয়ান কুকুরটির বুদ্ধিমত্তা ছবিখানিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ছবির অন্তর্নিহিত রসের সংগে এর সুস্থ রুচির দিকটাও বিচারশীল দর্শকদের আনন্দ দান করবে। শ্যামার চরিত্রটি নিয়ে পরিচালক আগাগোড়া যে সংযম রক্ষা করেছেন তা প্রশংসনীয়। রূপোকে বিষ খাওয়াবার মধ্য দিয়ে শ্যামার খলচরিত্রের রূপের পরিবর্তে প্রণয়াভিলাষিণীর বেপরোয়া ভাবটাই যে বেশী ফুটে উঠেছে তার জন্যেও পরিচালক

অভয়ংকরনগরে কংগ্রেস অধিবেশনের শেষে চলচ্চিত্র-শিল্পী ও কলাকারদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রধানমন্ত্রীর সামনে মাথা হেঁট করে বসে আছেন বিখ্যাত অভিনেতা দেবানন্দ ফটো—দেশ

প্রশংসা পাবেন। লাহোর ও দেরাদুনে নাইট ক্লাবের অনুসন্ধান না করে পরিচালক যে স্বাভাবিক পরিবেশে চিত্তাকর্ষক ভাঙরা নাচের মাধ্যমে দর্শকদের আনন্দ দিতে চেয়েছেন তার জন্যেও তিনি ধন্যবাদার্হ হবেন।

ছবির অন্যতম সম্পদ নায়িকার ভূমিকায় নন্দিনী জয়ন্তের হৃদয়গ্রাহী অভিনয়। স্বামীর অদর্শনে বিরহিনীর মনোবেদনাকে তিনি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

নায়ক চরিত্রে অজিতের অভিনয়ও সংযত ও সাবলীল। ডেজি ইরাণীর অভিনয় এ-ছবির অন্যতম আকর্ষণ। এই শিশু-শিল্পীর সুখ-দুঃখের প্রাণোচ্ছল অভিব্যক্তি যে কোন দর্শকচিত্তকেই নাড়া দেবে। শ্যামার চরিত্রে নিশির অভিনয়ও চরিত্রানুগ। অন্যান্য ভূমিকায় কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন তেওয়ারী, মারুতি ও বেবী শোভা।

সংগীত পরিচালনায় হংসরাজ ভেলের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সব কয়টি গানই সুর-সমৃদ্ধ ও সুগীত। কলাকৌশল ও অঙ্গ-সজ্জার দিক দিয়ে ছবিখানি প্রশংসার দাবী রাখে। রণযোধ ঠাকুরের চিত্রগ্রহণ মনোরম। 'মিলনে'র কাহিনী ও সংলাপ রচনা করেছেন ব্রিজ কাটিয়াল; শব্দগ্রহণ, শিল্প-নির্দেশ ও নৃত্যপরিচালনায় রয়েছেন যথাক্রমে এন আর যোশী, এস সন্ত সিংহ ও বদরীপ্রসাদ। ছবিখানি প্রযোজনা করেছেন গুলশাম ভেল।

'মর্মবাণী' ও 'অবিশ্বাস্য'

লেখিকা প্রতিভা বসু সম্পাদকের দপ্তরে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। তাতে তিনি জানাচ্ছেন যে, 'মর্মবাণী' নামক সম্প্রতি প্রদর্শিত বাঙলা ছবির কাহিনী তাঁর 'অবিশ্বাস্য' নামে একটি গল্পের নকল। ছবিতে দেখান প্রাচীন মিশর নিয়ে ব্যাপার-গুলো ছাড়া 'মর্মবাণী'র সংগে 'অবিশ্বাস্য'র আর কোথাও তিনি গরমিল খুঁজে পাননি। যদিও সিনেমার গল্পের রচয়িতার নাম জানান হয়েছে, মনোজ ভট্টাচার্য, তবু এ-দুয়ের মধ্যে প্রায়-পুরোপুরি মিল দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন।

এই সংগে শ্রীমতী বসু আরও জানিয়ে-ছেন, তাঁর ঐ 'অবিশ্বাস্য' বছর খানেক আগে এক ভদ্রলোক সিনেমার জন্য কিনতে আসেন। দক্ষিণা নিয়ে মতভেদ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত গল্পটির স্বত্ব তিনি বিক্রি করেননি। এই দুটো ব্যাপার একসংগে ভেবে তিনি বিভ্রান্ত বোধ করছেন।

শ্রীমতী বসুর 'অবিশ্বাস্য' গল্পটি ১৩৬৩ সালের পুজোসংখ্যা 'জন্মভূমি'তে প্রকাশিত হয়।

বিবিধ সংবাদ

গত শনিবার জার্মান ট্রেড রিপ্রেজেন্টে-শনের সৌজন্যে এবং ক্যালকাটা ফিল্ম সোসায়েটির উদ্যোগে লাইটহাউস মিনিয়ে-চার থিয়েটারে ডেফা-প্রযোজিত বহুপ্রশংসিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছবি 'মার্ডারার্স আর অ্যামাং আস্' দেখান হয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মাণীর পটভূমিতে পরিচালক W. Standte যে-কাহিনী দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন তাতে মানবতার আদর্শ যেমন ফুটে উঠেছে তেমনই ধ্বনিত হয়েছে একটি প্রশ্ন—যে-প্রশ্ন দেশে দেশে আজ মানুষকে চিন্তাক্লিষ্ট করে তুলেছে। তা হলঃ মানুষকে নির্যাতন করতে যাদের বাধে না, পরপীড়নের মধ্য দিয়ে যারা আত্মসুখসৌধ গড়ে তোলে, আবার একদা সমাজের কাছে যারা অন্যায়-ভাবে মহৎ বলে পরিচিত হয় সেই সব বিবেকহীন লোকের মুখোশ কি কেউ খুলে দেবে না? ছবিটি দর্শককে চিন্তার খোরাক জোগায়।

* * *

ইংলন্ডপ্রবাসী বাঙালী প্রযোজক বিশু সেন ভারতের পটভূমিকায় একখানি ইংরেজী ছবি তুলবেন 'দি সিংগিং মাউনটেন' এই নামে। ছবিটি তুলতে খরচ হবে এক কোটি টাকা এবং তা দিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন হান্টিংডন হার্টফোর্ড নামক জনৈক আমে-রিকান কোটিপতি। উনবিংশশতকের শেষ ভাগে লরেন্স হোপ ছদ্মনামে এক ইংরেজ জেনারেলের পত্নী 'ভারতীয় প্রেমগাথা' শীর্ষক কবিতাবলী লিখতেন। প্রস্তাবিত ছবিটি তোলা হবে তাঁরই জীবনকাহিনী অবলম্বনে। এই ছবির দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে রিচার্ড টড ও আই এস জোহর নির্বাচিত হয়েছেন। নায়িকার ভূমিকায় নামবার মত একজন ভারতীয় অভিনেত্রীর খোঁজে বিশু সেন সম্প্রতি এদেশে এসেছেন। বিখ্যাত ইংরেজ পরিচালক কম্পটন বেনেটের পরিচালনায় এ বছরের শেষের দিকে ছবিটির চিত্রগ্রহণ সুরু হবে।

* * *

ভারতীয় ছবিতেও বিদেশী পটভূমিকা সংযুক্ত করবার একটা চেষ্টা দেখা যাচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে। সিঙ্গাপুর থেকে এদেশে ফিরে পরিচালক ফণী মজুমদার কিশোর

কুমারের ছবি 'নীল আসমানে'র পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন। ছবিটি ইস্টম্যান কালারে গৃহীত হবে এবং বালীদ্বীপের কয়েকটি দৃশ্য থাকবে এর মধ্যে। বহির্দৃশ্য গ্রহণের স্থান নির্বাচন করতে প্রযোজক কিশোর কুমার পরিচালক সহ শীগ্‌গিরই ইন্দোনেশিয়ার পথে রওনা হবেন। এই ছবিতে সংগীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কিশোর কুমার নিজে।

* * *

নৃত্যভারতীর উদ্যোগে আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে পাঁচদিনব্যাপী একটি সর্বভারতীয় নৃত্যোৎসব অনুষ্ঠিত হবে বালিগঞ্জের সিংহী পার্কে। এই নৃত্যোৎসবে যোগ দেবেন ভারতনাট্যমের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী বালা সরস্বতী, তাঞ্জোরের উমা দেবী, কথকনৃত্যের বিখ্যাত কলাকার বিরজু মহারাজ ও সিতারা দেবী, মণিপুরী নৃত্যের গুরু আতম্বা সিং ও তাঁর সম্প্রদায়। এ ছাড়া নামকরা স্থানীয় নৃত্যশিল্পীরা প্রাচীন, আধুনিক ও লোকনৃত্যে তাঁদের কৃতিত্ব প্রকাশ করবেন। যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে যাঁরা এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করবেন, তাঁদের মধ্যে আছেন তিমিরবরণ ও তাঁর সম্প্রদায়, বিলায়েৎ হোসেন, ইমরাত হোসেন, শান্তা প্রসাদ প্রভৃতি। উৎসবের উদ্বোধন করবেন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

ডোভার লেন সংগীত সম্মেলন

গতবারের মতো এবারও বছর শুরুতে ডোভার লেন সংগীত সম্মেলনের আসর বসে। ৯, ১০ এবং ১১ই, জানুয়ারীর এই তিন দিন ধরে দক্ষিণ কলিকাতার ঐ পরিচিত জায়গার মনোরম পরিবেশে সম্মেলনের তিনটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল।

প্রথম দিনের আসরে কণ্ঠসংগীতে ছিলেন বড়ে গোলাম আলি খাঁ, যন্ত্রসংগীতে পণ্ডিত রবিশঙ্কর। খাঁ সাহেব ছায়া, হাম্বীর, কল্যাণ এবং বাহার রাগে খেয়াল, খাম্বাজে ঠুংরি এবং কাফি রাগে ভজন গেয়েছিলেন। পুত্র মুনাব্বার খাঁ তাঁর সংগে কণ্ঠ দিয়েছিলেন, সারেংগী ও তবলায় ছিলেন যথাক্রমে সাগিরুদ্দীন এবং মহাপুরুষ মিশ্র। পণ্ডিত রবিশংকর সেতারে চারুকেশরী রাগের রূপটি প্রকাশ করে পরে গারা রাগে ঠুংরি বাজান। আল্লারাখা তাঁর সংগে সংগত করেন। এ-ছাড়া সেদিন সুস্মিতা ভট্টাচার্য কথক নৃত্য পরিবেশন করেন।

দ্বিতীয় রাতে নজাকত আলি ও সালামত আলি ইমনকল্যাণ রাগে খেয়াল গাওয়ার পর একটি ঠুংরি শোনালেন। আল্লারাখা তবলায় ছিলেন। প্রতিমা বসুর ঠুংরি ও দাদরার অনুষ্ঠানের পর আলি আকবর খাঁ সরোদে গৌরীমঞ্জরী, মিশ্র শিবরঞ্জনী এবং অবশেষে মিশ্র মান্দ বাজালেন। তবলায় সহযোগিতা করেন আল্লারাখা খাঁ।

কিশোরকুমার ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়—এই দুই হাসির রাজাকে একত্রে দেখা যায় সাম্প্রতিক একটি অনুষ্ঠানে।

শেষ দিনের সারারাতব্যাপী অনুষ্ঠানে কণ্ঠসংগীতে ছিলেন ভীমসেন যোশী, সুনন্দা পট্টনায়ক ও পণ্ডিত যশরাজ, যন্ত্রে পিয়ারা হোসেন (শানাই), ভি জি যোগ (বেহালা) ও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতার) এবং নৃত্যে গোপীকৃষ্ণ। পণ্ডিত যোশী ললিত ও যোগিয়াতে খেয়াল গেয়ে ভৈরবীতে ঠুংরি পরিবেশন করেন। শ্রীমতী পট্টনায়ক শুদ্ধ কল্যাণ রাগে খেয়ালের পর ভূপকল্যাণে তারাণা গাইলেন। আর পণ্ডিত যশরাজ গেয়েছিলেন গোপীবসন্ত রাগে। পিয়ারা হোসেন পূরিয়া ধানেশ্রীতে আলাপের পর পূরবী রাগে ধুন বাজিয়েছিলেন তাঁর শানাইয়ে। পণ্ডিত যোগ বেহালায় দেশী-টোড়ী ও ভৈরবী বাজান। সেতার-শিল্পী শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ললিত পঞ্চমে আলাপ, জোড় ও ঝালার পর একটি গৎ পরিবেশন করেন। গোপীকৃষ্ণ কথক ছাড়া নিজস্ব কিছু নৃত্যও আসরে পরিবেশন করেছিলেন।

নিখিল ভারত যদুভট্ট সংগীত সম্মেলন

মেদিনীপুর বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরে যদুভট্ট সংগীত সংঘের পরিচালনায় ২৪শে ও ২৫শে জানুয়ারী নিখিল ভারত যদুভট্ট সংগীত সম্মেলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সংঘের সভাপতি শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করেন। সম্পাদক সংগীত সুধাকর পণ্ডিত শচীন্দ্রনাথ সাহা তাঁর ভাষণে যদুভট্ট সংগীত সংঘের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন।

সংঘের একটি অধিবেশনে মেদিনীপুর মিউজিক কলেজের ছাত্রছাত্রীগণ অংশ গ্রহণ করে এবং প্রশংসার সহিত নিজ নিজ কুশলতা প্রদর্শন করে।

সম্মেলনে ওস্তাদ দবীর খান, এ কানন, প্রসূন বন্দোপাধ্যায়, চিন্ময়ী দাশ, নিখিল ব্যানার্জি, জয়শ্রী সাহা, মালবিকা কানন, দীপা রায়, বাহাদুর হোসেন, নাজাকৎ আলি, সালামৎ আলি, সওকত আলি, বাল্লু খান, পণ্ডিত যশরাজ, নানকু মহারাজ, রমানাথ মিশ্র ও যমুনা নাগ অংশ গ্রহণ করেন।

অংশ গ্রহণকারী শিল্পীরা প্রত্যেকেই প্রখ্যাত গুণী। তাঁদের প্রত্যেকের অনুষ্ঠান শ্রোতৃবর্গ আনন্দের সহিত উপভোগ করেন। শচীনবাবুর সুযোগ্যা কন্যা কুমারী জয়শ্রী সাহার দেড় ঘণ্টাব্যাপী বেহাগ রাগের আলাপ পাঞ্জাবী ধুন এই সম্মেলনের স্মরণীয় অনুষ্ঠান। কলিকাতার উদীয়মানা শিল্পী শিপ্রা চক্রবর্তীর খেয়ালও প্রশংসা অর্জন করে। কলিকাতার আকাদমীর পরেশ মজুমদারের খোলবাদন মেদিনীপুরবাসীকে আনন্দ দান করে অন্যান্য অনেক বাজনার চেয়ে অনেক বেশী।

ভারতের দশম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ভারত সরকারের কাছ থেকে যাঁরা খেতাব বা উপাধি পেয়ে সম্মানিত হয়েছেন, তাঁদের নামের তালিকায় এবার দুইজন ক্রীড়াবিদের নাম দেখে ক্রীড়ামোদী মাত্রেই সুখী হয়েছেন। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী সাঁতারু মিহির সেন এবং দৌড়বীর মিলখা সিং লাভ করেছেন 'পদ্মশ্রী' উপাধি।
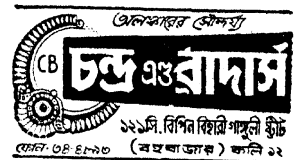
১৯৫৮ সালে ভারতের খেলাধুলার ক্ষেত্রে এই দুইজন ক্রীড়াবিদের কীর্তি

পদ্মশ্রী মিহির সেন

বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ভয়াবহ এবং দুরতিক্রম্য ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের কষ্টসাধ্য অভিযানে বার বার ব্যর্থ হয়েও অটুট মনোবলসম্পন্ন সাঁতারু মিহির সেন সংকল্পচ্যুত হননি। শেষ পর্যন্ত গত সেপ্টেম্বর মাসের ২৬ তারিখে ইংলণ্ডের সেক্সপীয়ার ক্লিফ্ থেকে সাঁতার আরম্ভ করে পরের দিন ফ্রান্সের উপকূলে পৌঁছে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই, তা সে যত কষ্টসাধ্য অভিযানই হক। তাই ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের দুঃসাহসী অভিযানে সাফল্যের জয়তিলক পরে তিনি যখন দেশে ফিরেছিলেন তখন দেশবাসীর কাছ থেকে স্নেহ, ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পেতে তাঁর একটুও বিলম্ব হয়নি। আজ ভারত সরকারও তর কৃতিত্বের মূল্য দিয়ে তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এখানে বলা যেতে পারে, ইংলিশ চ্যানেল অভিযানের ক্ষেত্রে এবং চ্যানেল অতিক্রমের ব্যাপারে মিহির সেন ভারতের প্রথম এবং একমাত্র সাঁতারু বললে সব বলা হয় না। ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত চ্যানেল অতিক্রমের অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য অভিযানে তিনিই এশিয়ার একমাত্র সাঁতারু। লেবাননের

খেলার মাঠে

একলব্য

সাঁতারু তৌকিয়া ব্রিক এবং পাকিস্থানের সাঁতারু ব্রজেন দাস ফ্রান্স থেকে সাঁতার আরম্ভ করে অপেক্ষাকৃত সহজ পথে চ্যানেল অতিক্রম করলেও আজ পর্যন্ত এশিয়ার দ্বিতীয় কোন সাঁতারু ইংলণ্ড থেকে সাঁতার আরম্ভ করে চ্যানেল অতিক্রম করেননি।

ভারতীয় সামরিক বিভাগের অ্যাথলীট মিলখা সিং টোকিওর এশিয়ান গেমে দুটি স্বর্ণপদক এবং কার্ডিফের এম্পায়ার ও কমনওয়েলথ গেমে একটি স্বর্ণপদক লাভ করে আন্তর্জাতিক খেলাধুলার ক্ষেত্রে ভারতের সুনাম অনেকখানি বৃদ্ধি করেছেন। দৌড়বীর মিলখা সিং এশিয়ান গেমে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন দুশো ও চারশো মিটার দৌড়ে, আর কমনওয়েলথ গেমে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন ৪৪০ গজ দৌড়ে। দুশো মিটারে মিলখার সময় হয়েছিল ২১'৬ সেকেণ্ড, আর ৪০০ মিটারে সময় হয়েছিল ৪৬'৬। কার্ডিফে ৪৪০ গজে তিনি কমনওয়েলথ গেমের রেকর্ড (৪৬'৬ সেকেণ্ড) স্পর্শ করে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। দুশো মিটারে মিলখার জাতীয় রেকর্ড অবশ্য আরও উন্নত। ২১'২ সেকেণ্ড। সম্প্রতি তিনি ৪৬'৩ সেকেণ্ডে চারশো মিটার অতিক্রম করে দৌড়ের মান আরও উন্নত করেছেন। এশিয়ান গেমের পরই ভারতের সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁর পদোন্নতির কথা ঘোষণা

পদ্মশ্রী মিলখা সিং

করেছিলেন। আজ ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মশ্রী' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দেশের কীর্তিমান ক্রীড়াবিদদের উপাধি লাভ এই প্রথম নয়। শিক্ষায়, দীক্ষায়, সাহিত্যে, কলাবিজ্ঞানে, সমাজ সেবায় এবং সামরিক কীর্তিতে যাঁরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন সেই সব গুণীজনদের সম্মানিত করবার সময় ভারত সরকার খেলোয়াড়দেরও সম্মানিত করবার নীতি অনেকদিন আগেই গ্রহণ করেছেন। এর আগে 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেছেন ক্রিকেট খেলোয়াড় সি কে নাইডু ও বিজয়নগরের মহারাজকুমার 'ভিজি', হকি যাদুকর ধ্যানচাঁদ এবং পোলো খেলোয়াড় রাজারাও হনুৎ সিং: 'ভারতশ্রী' উপাধি পেয়েছেন মেলবোর্ন অলিম্পিকে ভারতের হকি অধিনায়ক বলবীর সিং। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে ভারতের হকি অধিনায়ক দিগ্বিজয় সিংকেও (বাবু) 'পদ্মশ্রী' উপাধি দেওয়া হয়েছে। এবার মিহির সেন ও মিলখা সিংয়ের 'পদ্মশ্রী' উপাধি নিয়ে এ পর্যন্ত ভারত সরকারের কাছ থেকে খেতাব পেয়েছেন আটজন ক্রীড়াবিদ। এতে একদিকে যেমন ভারত সরকার খেলাধুলো সম্পর্কে তাঁদের আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে তেমন স্বীকার করে নিয়েছেন খেলাও জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ, খেলোয়াড়ও দেশের বরেণ্য গুণীজনদের অন্যতম।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সংগেই বলতে হচ্ছে কয়েকজন প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে খেতাব বিলিয়ে আর রাজকুমারী অমৃতকুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনার মাধ্যমে কিছু অর্থ খরচ করেই ভারত সরকার এই বিশাল দেশে খেলাধুলোর উন্নতির জন্য তাঁর যথাকর্তব্য পালন করেননি। রাজকুমারী অমৃতকুমারীর শিক্ষা পরিকল্পনার জন্য যে অর্থ খরচ হয়েছে তা এই বিশাল দেশের পক্ষে নিতান্তই তুচ্ছ। খেতাব বিতরণের জন্যও একটু কাগজ কালি ছাড়া আর কিছু খরচ হয়নি। ৪০ কোটি নরনারী অধ্যুষিত এই দেশের খেলাধুলোর উন্নতির জন্য আরও অনেক কিছু করা উচিত ছিল। স্বীকার করি ভারত সরকারের নানা রকমের সমস্যা আছে। দেশ বিভাগজনিত সমস্যা এবং খাদ্য সংগ্রহের সমস্যা ছাড়াও নানা সমস্যায় সরকার জড়িত। মাথার উপর এত দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তো তাদের পরিকল্পনার অভাব নেই। কিন্তু কৈ খেলাধুলোর উন্নতির জন্য কোন ব্যাপক পরিকল্পনার কথা তো কানে আসে না। কলকাতার মত শহরে আজও স্টেডিয়ামের স্থান খালি পড়ে আছে। সরকারের উদ্যোগে অন্য কোন শহরেও একটি স্টেডিয়াম গড়ে

বুলগেরিয়ান ফুটবল টীম, যারা ক্যালকাটা মাঠে আই এফ এ-র সঙ্গে প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় ১—১ গোলে অমীমাংসিত-ভাবে খেলা শেষ করেছে

ওঠেনি। গ্রামে গ্রামে মাঠেরও ব্যবস্থা করা হয়নি। সেদিনই কাগজে পড়ছিলাম খেলা-ধুলোয় বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা সত্ত্বেও সোভিয়েট রাশিয়া দেশের খেলাধুলোর আরও উন্নতির জন্য কি বিপুল পরি-কল্পনা করেছে। ১৯৪৮ সালে ছোট বড় মিলিয়ে রাশিয়ায় যেখানে ৫১৭টি স্টেডিয়াম ছিল সেখানে ১৯৫৮ সালে স্টেডিয়ামের সংখ্যা হয়েছে ১৬৫৪টি। অর্থাৎ দশ বছরে আরও ১১৩৭টি ছোট ছোট বড় স্টেডিয়াম তৈরী হয়েছে। ১৯৪৮ সালে রাশিয়ায় ফুটবল মাঠ ছিল ১১০০০টি এখন মাঠের সংখ্যা ২৭০০০। দশ বছরে ভলিবল খেলার জন্য এক লক্ষ নতুন মাঠ সৃষ্টি হয়েছে, সুইমিং পুলের সংখ্যাও বেড়ে হয়েছে ৫৩৮। খেলাধুলোর উন্নতির সুবিধার কি বিপুল অগ্রগতি!

স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশে মাঠ ও স্টেডিয়ামের সংখ্যা তেমন না বাড়লেও খেলাধুলো কিছু বাড়েনি, এমন নয়। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে রাইফেল ক্লাবের সংখ্যা। বেড়েছে বললে অবশ্য একটু ভুলই বলা হবে। স্বাধীনতা পাবার আগে দেশে রাইফেল ক্লাব একটিও ছিল না। কিন্তু আজ সারা ভারতে রাইফেল ক্লাবের সংখ্যা ৩১০টি। বেসরকারী প্রচেষ্টার মধ্যেই ক্লাব সৃষ্টি হয়েছে। ক্লাবের কর্মকর্তার পদ গ্রহণ করেছেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাজ্যের ও কেন্দ্রের মন্ত্রী এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মী। কিন্তু হলে কি হবে? ক্লাব আছে ক্লাবে কর্মতৎপরতা নেই। রাইফেল নেই, রাইফেল চালাবার গুলী নেই। সেদিন কথা হচ্ছিল বাংলার বিখ্যাত এক রাইফেল চালকের সঙ্গে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'তোমরা তো রাইফেল চালনায় বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছিলে হঠাৎ ঝিমিয়ে পড়লে কেন?' উত্তর এলো—'হবে কি বলুন? রাইফেল নেই, গুলী নেই, নেই প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। আমাদের কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ কোথায়?' ব্যাপারটা যখন তিনি বুঝিয়ে দিলেন তখন বুঝলাম। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ছাড়া ইংলণ্ডে যেখানে আটটি বড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে, আমেরিকায় আছে ১৪।১৫টি প্রতিযোগিতা, সোভিয়েট রাশিয়ায় ৩০টি, সেখানে ভারতে আছে বছরে মাত্র দুটি কি তিনটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। প্র্যাক্টিস করবার জন্য ইংলণ্ডে যে গুলীর প্রতি ১০০-র দাম সাড়ে তিন টাকা, আমেরিকায় পৌণে ছ' টাকা, 'ডিউটি'র প্রসাদে সেই গুলী এখানে কিনতে হয় কুড়ি টাকা বা বাইশ টাকা দরে। যে রাইফেলের দাম ইংলণ্ডে আট শ' টাকা সেই রাইফেলের দাম এখানে ষোলশ' টাকা। শুধু তাই নয়। একজন রাইফেল চালককে পটু হয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে হলে প্রতি মাসে আড়াইশ থেকে পাঁচ হাজার গুলী ছুড়তে হয় অনুশীলনের জন্য। রাশিয়ায় এই গুলী রাষ্ট্র থেকেই সরবরাহ করা হয়। আর আমাদের দেশে সরবরাহ তো দূরের কথা—শিক্ষার জন্য গুলীর উপর থেকে ডিউটি বা ট্যাক্স তুলে দেবার আবেদন নিবেদনেও সরকার কর্ণপাত করেননি। অথচ সরকার বলতে যাদের বোঝায় সেই হোমরা-চোমরারাই রাইফেল ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক। এই যেখানে নীতি সেখানে উন্নতি কি করে সম্ভব? তাই বলছিলাম ক্রীড়াবিদদের দুই একটি খেতাব দিলে আর নিতান্ত লোক-দেখানো গোছের কিছু অর্থ সাহায্য করলেই খেলাধুলোর ক্ষেত্রে সরকারের কর্তব্য করা হয় না। এর জন্য বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর দরকার। আর দরকার ব্যাপক পরিকল্পনার।

* •

গত সপ্তাহে ক্যালকাটা মাঠে আই এফ এ ও বুলগেরিয়া দলের মধ্যে অসময়ের প্রদর্শনী ফুটবল খেলা ১-১ গোলে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। খেলা আরম্ভ হবার পর দুই মিনিট কাটতে না কাটতে আই এফ এ একটি গোল করে বসে, খেলাটি শেষ হবার ঠিক এক মিনিট আগে বুলগেরিয়া দল গোলটি পরিশোধ করে দেয়। মাঝের ৫৬ মিনিট খেলার মধ্যে বুলগেরিয়া দলেরই সুনিশ্চিত প্রাধান্য বজায় থাকে। খেলার মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তেরও অভাব হয় না। কিন্তু আই এফ এ-র রক্ষণভাগের খেলোয়াড়দের অনমনীয় দৃঢ়তা এবং বুলগেরিয়ার পুরোভাগের খেলোয়াড়দের গোল করবার ব্যর্থতায় আর কোন গোল হয়নি। খেলাটি দেখবার জন্য ক্যালকাটা মাঠের সমস্ত দর্শক গ্যালারীর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। বলা যায় ময়দানে সৃষ্টি

হয়েছিল ফুটবল মরসুমেরই উৎসাহ উদ্দীপনা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় বুলগেরিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বুলগেরিয়ার ফুটবল মান খুবই উন্নত। বুলগেরিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবাধীন রাষ্ট্র। খেলার ক্ষেত্রেও রাশিয়ার ধারা এবং রাশিয়ার প্রভাব ও ছাপ সুস্পষ্ট। রাশিয়ার মতই এখানকার খেলাধুলো রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। তবে অন্যান্য খেলায় এরা রাশিয়ার মত পারদর্শী নয়। ফুটবলই বুলগেরিয়ার সব চেয়ে জনপ্রিয় খেলা। দেশের জনসংখ্যা ৭১ লক্ষের কিছু বেশী। এর মধ্যে ফুটবল খেলোয়াড়ের সংখ্যাই এক লক্ষ, ক্লাবের সংখ্যা ৭ হাজার। ছাত্র ও যুব সম্প্রদায় থেকে আরম্ভ করে ক্ষেতখামারের চাষী, কলকারখানার শ্রমিক সবাই বুলগেরিয়ায় ফুটবল খেলা নিয়ে মেতে উঠেছে। দেশময় ছড়িয়ে আছে মনোরম ক্রীড়ানিকেতন।
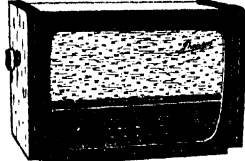
মেলবোর্ন অলিম্পিকে বুলগেরিয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করলেও আন্তঃর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফুটবল পণ্ডিতদের অভিমত অলিম্পিকে বুলগেরিয়াই ছিল পরম-শক্তিশালী এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ দল। নিতান্ত দুর্ভাগাবশতঃই সেমি ফাইন্যালে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে বুলগেরিয়াকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। বুলগেরিয়ায় সুপটু এবং কীর্তিমান খেলোয়াড়ের অভাব নেই। অবশ্য মহা-যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক ফুটবলে যারা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তাদের অনেকেরই গৌরবের দিন শেষ হয়ে গেছে। তাই ফুটবল কর্তৃপক্ষ এখন তরুণ খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে জাতীয় দল গঠনের পরিকল্পনা করেছেন। যে দলটি ইন্দোনেশিয়া সফর সেরে কলকাতায় খেলতে এসেছিল এটি বুলগেরিয়ার বিভিন্ন ক্লাবের খেলোয়াড় নিয়ে গড়া একটি জাতীয় দল। ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকের প্রস্তুতি হিসাবেই এদের এই সফর। এদের মধ্য থেকেই গড়া হবে রোম অলিম্পিকে বুলগেরিয়ার জাতীয় ফুটবল দল। এ দলে তেমন খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের দেখা না পাবার আরও একটি কারণ আছে। ১৯৫৮ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা বা জুলেস রিমেট কাপে বুলগেরিয়ার যেসব খেলোয়াড় অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং যারা মনোনীত হয়েছিলেন অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে আন্তর্জাতিক ফুটবল ফেডারেশনের ফতোয়া অনুযায়ী অলিম্পিকে খেলার তাঁরা অধিকার হারিয়ে-

বুলগেরিয়া ও আই এফ এর প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় আই এফ এ গোলের মুখের এক উদ্বেগজনক অবস্থা
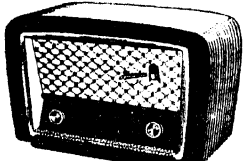
ছেন। কাজেই বুলগেরিয়া ফুটবল কর্তৃপক্ষের সন্ধানী দৃষ্টি এখন উঠতি খেলোয়াড়ের দিকে, সম্ভাবনাপূর্ণ তরুণের দিকে।

স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, বুলগেরিয়া দলের খেলা দেখে কলকাতার দর্শকদের মন ভরেনি। এর প্রধান কারণ বোধকরি এদের গোল করবার ব্যর্থতা। দু'চারটি গোল করতে পারলে এদের সম্বন্ধে দর্শকদের ধারনা হয়তো উঁচুই হত। কারণ যতই খেল গোল করতে না পারলে সে খেলা বাজে খেলা। আর বাজে খেলেও যদি গোল করতে পার তবে তুমি ফুটবলের নিপুণ শিল্পী। সত্য কথা বলতে কি আমার চোখে বুলগেরিয়ার খেলা মন্দ লাগেনি। গোল করবার দুর্বলতা ছাড়া এদের খেলার ধারা পুরোপুরি ফুটবলের ব্যাকরণ সম্মত। গতিবেগ অত্যন্ত ক্ষিপ্র। বল নিয়ে অহেতুক কালক্ষেপ নেই। পায়ের কেরামতি আর ঘাসের উপর দিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে যাবার ভঙ্গি দর্শকচোখের আনন্দদায়ক। আক্রমণের সময় পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনের পদ্ধতি তিন ব্যাক প্রথার খেলার ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। খেলা দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না এদের খেলার পেছনে অনুশীলন আছে, অধ্যবসায় আছে, সাধনা ও শিক্ষা আছে। বিশেষভাবে বলবার বিষয় কলকাতায় এক ঘণ্টা খেলার মধ্যে বুলগেরিয়ার খেলোয়াড়দের একবারও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে বাজে শট করতে দেখা যায়নি—খেলায় সুতীব্র গতিবেগ বজায় রেখে আক্রমণ করা সত্ত্বেও একবার কোন খেলোয়াড় অফসাইড হননি। অথচ আক্রমণ এরা কম করেছে একথা কেউ বলতে পারবে না। আক্রমণ এরা অনেক বেশী করেছে, অনেক সময় কোণঠাসা করে রেখেছে আই এফ এ-কে। তুলনামূলক বিচারে আই এফ এ আক্রমণ করেছে অনেক কম। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে বুলগেরিয়ার সঙ্গে আই এফ এর খেলোয়াড়রা যে গতিবেগ বজায় রেখে এবং যেরকম উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে খেলেছেন বাইরের কোন দলের সঙ্গে এ পর্যন্ত এমন খেলতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। প্রথম গোল করার অনুপ্রেরণার জন্যই হক, কিম্বা শীতকালে ফুটবল খেলার জন্যই হক, কি মরসুমে সপ্তাহে তিন চারটি ম্যাচ খেলার ক্লান্তিকর পরিশ্রম কাটিয়ে উঠবার ফলেই হক আই এফ এর খেলোয়াড়রা বুলগেরিয়ার সঙ্গে সত্যই ভাল খেলেছেন। খেলায় ভুলচুক না করেছেন, এমন নয়। বল নিয়েও অহেতুক সময় কাটাতে দেখা গেছে, শেষ সময়ের আর একটু দৃঢ়তার অভাবে জেতা-খেলাকে 'ড্র' খেলায়ও পরিণত করেছেন, তবু বলবো এরা আমাদের হতাশ করেননি।

আরও একটি কথা আই এফ এ দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে তাদের অভ্যাসবর্জিত তিন ব্যাক প্রথায়। 'স্টপার' হিসাবে আমেদ হোসেন যেটুকু খেলেছেন মরসুমে সেণ্টার হাফব্যাক হিসাবে সেটুকু খেলতে পারেননি। গত বছর আমাদের লীগ খেলা থেকে যখম 'উঠানামার' বিধান তুলে দেওয়া হয়েছিল তখন যুক্তি দেখান হয়েছিল এতে ক্লাবগুলো নির্ভয়ে তিন ব্যাক প্রথার বিজ্ঞানসম্মত খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে। কিন্তু কই এক লীগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব ছাড়া আর কোন টীমই তো তিন ব্যাক প্রথায় খেলেনি। তিন ব্যাক প্রথার খেলায় রেল দল লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। আজ তিন ব্যাক প্রথার খেলায় বুলগেরিয়ার সঙ্গে আমরা প্রশংসনীয়ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। তবু কি আমাদের চোখ খুলবে না! ফুটবল মরসুম আরম্ভ হতে খুব বেশী দেরী নেই। ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্লাব তিন ব্যাক প্রথার খেলা অনুশীলন করলে সুফল দেখা দিতে পারে।

দেশী সংবাদ

১৯শে জানুয়ারী—ভারতের বৃহত্তম নগরী কলিকাতায় দৈনিক পাঁচ লক্ষেরও বেশী লোক্যাল টেলিফোন কল হয় এবং দৈনিক ৫৫০০ ট্রাংক-কল এখানে আসা-যাওয়া করে। কলিকাতার লোক্যাল টেলিফোন কল হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকা আয় হয়।

১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা পূর্ব বৎসর অপেক্ষা প্রায় চল্লিশ হাজার বৃদ্ধি পাইয়া দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারে পৌঁছায়। ১৯৫৭ সালে উহাদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক দুই লক্ষ।

২০শে জানুয়ারী—বরানগর পুলিস অদ্য বরানগর পৌরসভার সদস্য শ্রীবসন্তকুমার দাস সহ পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। সরকারী নল-কূপের নল আত্মসাৎ, ঐগুলি অপসারণ দ্বারা জনসাধারণের অসুবিধা সৃষ্টি এবং চোরাই মাল রাখার ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার অভি-যোগে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয় বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতা শহরের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য অদ্য কলিকাতা পৌরসভা ভবনে মেয়রের কক্ষে বাঙ্গলা সরকার ও পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গের এক বৈঠক বসে। ঐ বৈঠকে বস্তী অপসারণ, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, খাটাল অপসারণ, খাদ্যে ও ঔষধে ভেজাল নিরোধ ইত্যাদি সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২১শে জানুয়ারী—ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেশবরেণ্য বিজ্ঞানী ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ অদ্য বেলা ১১-৪৫ মিনিটে নিউ আলি-পুরস্থিত তাঁহার নিজস্ব বাসভবনে পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর হইয়াছিল।

অদ্য পাণ্ডে পালাম বিমান ঘাটি ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন থাকায় ডিউক অব এডিনবরা যে বিমানে ভারতে আগমন করেন, সেই বিমানখানিকে ঘুরাইয়া আগ্রায় অবতরণ করান হয়।

২২শে জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে পৌরসভা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং ২১ বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পৌরসভার নির্বাচনে ভোটাধিকার দিবার সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

লখিমপুর খেরি হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, দেওখালি ও ফর্দম স্টেশনের মধ্যে চলন্ত ট্রেনে চারিজন ডাকাত স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার লখিমপুর খেরি শাখার ক্যাশিয়ারকে ও তাহার সশস্ত্র রক্ষীকে গুলী করিয়া হত্যা করে। উক্ত ক্যাশিয়ারের সহিত ক্যাশ বাক্সে নাকি দুই লক্ষ টাকা ছিল।

প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ ও শিল্পপতি শ্রীবিঠল চন্দ্রভারকর অদ্য সকালে নাসিক রোড স্টেশনের কাছে ট্রেনের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষে ভাষণ দানের পরে তিনি বোম্বাইতে ফিরিতেছিলেন। মৃত্যুকালে

তাহার বয়স ৭২ বৎসর হইয়াছিল।

২৩শে জানুয়ারী—কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না অদ্য এক সাংবাদিক বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন সমস্যার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, এখনও শিবিরে আছে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত এইরূপ দুই লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের বিষয়কেই তিনি এখন অগ্রাধিকার দিতেছেন।

২৪শে জানুয়ারী—একশ্রেণীর বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর 'চক্রান্ত' কলিকাতা বন্দরে অধিকসংখ্যায় ভারতীয় নাবিক নিয়োগের কাজে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাকিস্তানী নাবিকদের প্রতি ঐ সকল কোম্পানীর পক্ষ-পাতিত্বহেতু স্বাধীনতা লাভের প্রায় একযুগ পরেও ভারতের জলযান বিদেশী রাষ্ট্রের 'হাতের পুতুল' হইয়া আছে।

সরকারী চাকুরিয়াদিগকে সাধারণত সাময়িক-ভাবে বা কোন উপলক্ষে অন্যত্র চাকুরি করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না, এমন কি সে চাকুরি অফিস সময়ের পরে হইলেও অনুমতি দেওয়া হইবে না।

২৫শে জানুয়ারী—অদ্য প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁহার বেতার ভাষণে বলেন, প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমি আমার দেশবাসীর নিকট কিছু বলিবার এই সুযোগে তাঁহাদিগকে আমি অভিনন্দন ও আমার শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আজ দেশের বিভিন্ন অংশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়-সমূহ হইতে বাছাইকরা ৩২জন শিক্ষককে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রশংসনীয় কাজের জন্য জাতীয় পুরস্কার দিয়াছেন। *

বিদেশী সংবাদ

১৯শে জানুয়ারী—প্রেসিডেণ্ট আইসেন-হাওয়ার আজ কংগ্রেসে ১৯৬০ সালে (আর্থিক) ৭ হাজার ৭ শত কোটি ডলার ব্যয়ের এক বাজেট প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের শতকরা ৫৯ ভাগ যুক্তরাষ্ট্র ও উহার মিত্ররাষ্ট্রসমূহের প্রতিরক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে।

মস্কো বেতারে প্রকাশ, ঘণ্টায় ১৬১ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিতে সক্ষম এক নূতন ধরনের প্লাস্টিকের মোটর গাড়ি সোভিয়েট ইউনিয়নে নির্মিত হইয়াছে। মোটরখানার 'বডি' ইস্পাতের ন্যায়ই দীর্ঘস্থায়ী।

২০শে জানুয়ারী—সোভিয়েট উপপ্রধানমন্ত্রী শ্রীআনাস্তাস মিকোয়ান গতকল্য ন্যাশন্যাল প্রেস ক্লাবের এক ভোজসভায় বলেন, আমেরিকা পরি ভ্রমণ করিয়া তাঁহার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে আমেরিকার জনসাধারণ এবং ব্যবসাবাণিজ্যে নেতৃগণ 'ঠাণ্ডা লড়াই'-এর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয় পড়িয়াছেন, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার তা জীয়াইয়াই রাখিতে চাহেন।

২১শে জানুয়ারী—বাগদাদ চুক্তি সংস্থ মহলের সংবাদে প্রকাশ, ভারত সরকারে 'উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্যে' পূর্ব পাকিস্তা এলাকায় অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ পরিচালি হইতেছে বলিয়া পাকিস্তান বাগদাদ চুক্তি 'অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ প্রতিরোধ কমিটি' সমক্ষে অভিযোগ আনয়ন করিবে।

আজ করাচীতে জানিতে পারা গিয়াছে যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে নূতন করিয় বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পাকিস্তা এই মাসের শেষ নাগাদ ভারতবর্ষে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ করিতেছে।

২২শে জানুয়ারী—সলসবেরি প্রান্তে অবস্থিত প্রতিরক্ষা সংস্থাসমূহের বৃটি বৈজ্ঞানিকগণ এমন এক প্রকার জীবাণ আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা সমগ্র পৃথিবী লোকসংখ্যা নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে পারে

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কেবলমাত্র শ্বেতকা ছাত্রদের গ্রহণ করার এবং আফ্রিকান, এশিয়ান অশ্বেতকায় ছাত্রদের জন্য বিশেষ কলেজসমূহ স্থাপনের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার পার্লা মেণ্টের অধিবেশনকালে এক আইন প্রণয় করিবেন। আগামীকল্য পার্লামেণ্টের অধিবেশ আরম্ভ হইবে।

২৩শে জানুয়ারী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনী উত্তর পশ্চিম পাকিস্তানে অ্যাটলা নামক একটি আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রে ঘাটি নির্মাণ করিতেছে বলিয়া লণ্ডনের এক খানি সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে আজ মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ হইতে দৃঢ়তার সহিত সেই সংবাদ অস্বীকার করা হয়।

২৪শে জানুয়ারী—জেনারেল আয়ুব খাঁ অদ রাত্রে এক বেতার বক্তৃতায় পশ্চিম পাকিস্তানে সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটাইবার জন্য আমূ ভূমি সংস্কারের কথা ঘোষণা করেন।

নভাদার সংবাদে প্রকাশ দুইজন লোক এক খানা উড়ন্ত হালকা বিমানে ১২০০ ঘণ্টা ১ মিনিট আকাশে অবস্থান করিয়া আন্তর্জাতি রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা আরও দশ দিন আকাশে থাকিবেন বলিয়া বেতারযোগে জানাইয়া দিয়াছেন।

২৫শে জানুয়ারী—সোভিয়েট সংবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান 'তাস' আরব রাষ্ট্র গুলিকে বলেন যে, আগামী সপ্তাহে করাচীতে বাগদাদ চুক্তি পরিষদের যে সভা আহবান কর হইয়াছে, তাহা আরব রাষ্ট্রগুলির স্বার্থের পরিপন্থী।

সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি সম্পাদনের বিরুদ্ধে এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন এই চুক্তিকে পাকিস্তান সংলগ্ন তাহার এলাকা-সমূহের পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া মনে করে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা ষাণ্মাসিক ১১ ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
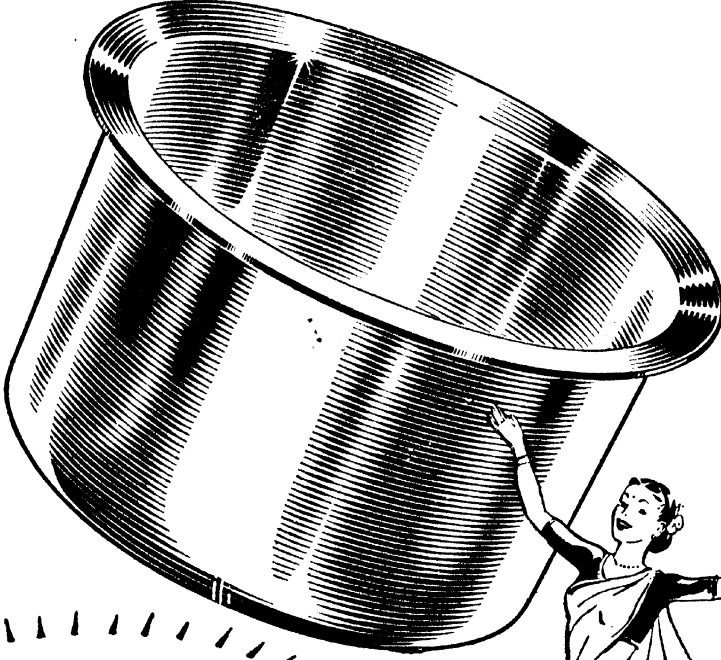
ঝকঝকে
—যা একমাত্র ভিমই করতে পারে!
আপনার বাসনপত্র, রান্নার প্যান ইত্যাদি ভিম দিয়ে পরিষ্কার করে দেখুন—দেখবেন এর থেকে ভাল পরিষ্কারের জিনিষ হতে পারেনা। ভিম আপনার রান্নার জিনিষপত্র থেকে নোংরা আর তেলতেলে দাগ তুলে দিয়ে ঝকঝকে করে তোলে—শুধু তাই নয় ভিম দিয়ে পরিষ্কার করলে বাসনপত্র সবই নিরাপদ কারণ ভিম হচ্ছে স্বাস্থ্যসম্মত পরিষ্কারের পাউডার। ভিম ব্যবহার করে দেখুন—আপনার কাঁচের বাসনপত্র, স্নানের ঘর, মেঝে এবং টালি কিরকম ঝকঝকে হয়ে ওঠে। ভিমের সাহায্যে বাড়ীর জিনিষপত্র ঝকঝকে রাখুন।
আপনার বাড়ীর জন্যে দরকার ভিম
VIM
VIM
for quick, spotless clea
HOW TO USE VIM

REG. NO. C. 2109

দেশ

বর্ষ] শনিবার, ২৪ মাঘ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 7th February, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১৫

ফুলের মত...

আপনার লাবণ্য রেক্সোনা
ব্যবহারে ফুটে উঠবে
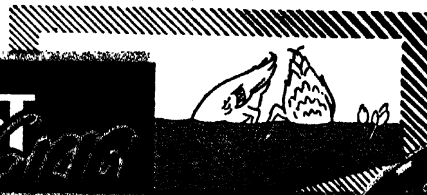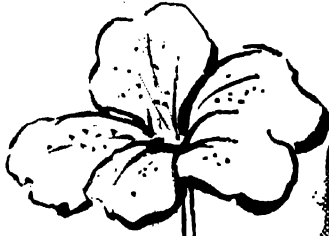
রেক্সোনা সাবানে থাকে ক্যাডিল
অর্থাৎ ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষাকারী
কয়েকটি তেলের এক বিশেষ
সংমিশ্রণ যা আপনার
স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে
বিকশিত করে তোলে।

একমাত্র ক্যাডিলযুক্ত টয়লেট সাবান

আরও কমখরচে!
পরিবারের সকলের জন্যই একটিমাত্র ট্যাল্ক
PROTEX
All Purpose
TOILET POWDER
প্রোটেক্স্
সর্বপ্রয়োজনের টয়লেট পাউডার
জায়েন্ট সাইজের সঙ্গে একটি সুন্দর পাফ্ থাকে।

তাড়াতাড়ি...
নিরাপদে...
নিরাময় হয়!
অর্শ (HAEMORRHOIDS)
এবং
ভগন্দর (FISSURES) থেকে
হ্যাডেনসা
সর্বত্র পাওয়া যায়
Hadensa
DCZ-I BEN

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে পাওয়া যাইবে।
নূতন পুস্তক!! নূতন পুস্তক!!

— ভগিনী নিবেদিতা —

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা প্রণীত
রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত

ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কিত অনেক নূতন তথ্য ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

স্বামিজীর মানসকন্যা ভারতগতপ্রাণা তপস্বিনী, বিদুষী ভগিনী নিবেদিতার ত্যাগময় জীবনের বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে।

তেরটি হাফটোন ছবি যুক্ত, ৪৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ
মূল্য ৭৷৷০

রামকৃষ্ণ মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল কর্তৃক প্রকাশিত।

প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়
১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা-৩
অদ্বৈত আশ্রম
৪নং ওয়েলিংটন লেন, কলিকাতা-১৪

শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর রম্যরচনা

এলার্জি ৩৲

শ্রীবাসব-এর সার্থক উপন্যাস

এক মুঠো মাটি ৪৲

প্রফুল্লকুমার মণ্ডল

বনতুলসী ৩·৫০ নঃ পঃ

বরেন ঘোষালের উপন্যাস

পুনশ্চ ২৲

রত্না সেনের প্রেম ১·৭৫ নঃ পঃ

রাসবিহারী মণ্ডল

নতুন পাতা ৩৲

প্রদীপ ও শিখা ২·৫০ নঃ পঃ

॥ **বিশ্ববাণী** ॥

১১।এ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭
(আমাদের বই সব দোকানে পাওয়া যায়)

মহেন্দ্র পুস্তক ভবনের প্রকাশিত

নীহাররঞ্জন গুপ্তর
আনকোরা নতুন উপন্যাস

নিশিপদ্ম

॥ মূল্য সাড়ে চার টাকা ॥

আশাপূর্ণা দেবীর
উপন্যাস

কল্যাণী ৩৲

প্রমথনাথ বিশীর

অমনোনীত গল্প

॥ তিন টাকা ॥

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ : শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কোলকাতা বণাম মধুপুর

চায়ের দোকানে বেজায় তর্ক চলছিল। ভুতোদা থাকেন মধুপুরে। কোলকাতায় বেড়াতে এসেছেন কয়েকদিনের জন্যে। ওঁকে ক্ষেপাবার চেষ্টা করছিল ছেলেছোকরার দল।

বিমলঃ কি ভুতোদা, সহর দেখতে এসেছেন? সামলে চলবেন। রাস্তায় ট্রাম চাপা পড়বেননা।

ভুতোদাঃ (অপ্রসন্ন মুখে) হ্যাঃ যা তোদের সহরের ছিরি।

বিনয়ঃ সেকি ভুতোদা, কোলকাতার মত এত পেল্লায় সহর আর পাবেন কোথায়?

ভুতোদাঃ সহর না ছাই। রাস্তায় বেরোনোর জো নেই। একটু ধীরেসুস্থে চলেছো কি কুড়িজন ঘাড়ের ওপর হামলে পড়বে। সেদিন কি বিপদেই পড়েছিলাম। বিমল তুই বলনা—তুই তো ছিলি আমার সঙ্গে।

বিমলঃ ভুতোদা চৌরঙ্গীতে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু আয়েস করে পানজর্দা খাচ্ছিলেন। আর যাবে কোথায় খ্যাঁচ খ্যাঁচ করে প্রায় পঞ্চাশটা গাড়ী ওঁর ইঞ্চি কয়েক দূরে আটকে গেল। উনি পানজর্দা মুখে দিয়ে, চারিদিকে তাকিয়ে 'ভাল জ্বালা' বলে বিরক্তমুখে রাস্তা পেরিয়ে এলেন। ট্র্যাফিক পুলিসেরা জীবনেও এরকম ঘটনা দেখেনি। তাই বেটন ফেটন নিয়ে হাঁ করে সবাই ভুতোদাকে দেখতে লাগল।

ভুতোদাঃ আচ্ছা তোরাই বল। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে একটু আরাম করে পানজর্দাও খেতে পারবনা? একি সহরের ছিরি! আমার সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

বিমলঃ মধুপুর আর কোলকাতা! জানেন কোলকাতায় পয়সা দিলে বাঘের দুধ পর্যন্ত পাওয়া যায়। আপনার অজাপাড়াগাঁয়ে—

ভুতোদাঃ যাঃ যাঃ তোদের কোলকাতায় পয়সা দিলেও সব পাওয়া যায়না।

বিমল বিনয় (একসঙ্গে): কি! কি!!

বিনয়ঃ বলুন কি চাই আপনার—এরোপ্লেন? রাজহাঁসের ডিম? এনসাইক্লোপিডিয়া?

ভুতোদাঃ (হাসিমুখে) তাজা ফুরফুরে হাওয়া। বিমল আর বিনয় একেবারে চুপসে গেল।

ভুতোদাঃ সকালবেলা যখন পাহাড় জঙ্গল নদীর ওপার থেকে মাটীর গন্ধ মেখে সে হাওয়া সর্বাঙ্গে আদর করে যায় তখন মনে হয় স্বর্গে আছি।

এ ধোঁয়া কালি সিমেন্টের গরাদখানায় সে হাওয়ার মর্ম তোরা বুঝবিনারে। কিন্তু শুধু খোলা হাওয়াই না। আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়না তোদের এ সহরে। বিমল আর বিনয় ঘাবড়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাল। বেজায় জব্দ করছেন ভুতোদা ওদের। আবার কি যে ছাড়েন।

ভুতোদাঃ কাল বাজারে গিয়েছিলাম। সখ হোল একটু মাছটা যলটা কেনার। কিন্তু মুদীর দোকানে যা ব্যাপার দেখলাম।

বিনয়ঃ কি ব্যাপার?

ভুতোদাঃ এক খদ্দের মুদীকে কি নাজেহালটাই করলো! হোত আমাদের মধুপুর মুদী চেলাকাঠ নিয়ে পেটাতো।

বিমলঃ বলুননা কি করলে?

ভুতোদাঃ খদ্দের চেয়েছে 'ডালডা'। মুদী যেই 'ডালডার' টিনে হাতটা ঢুকিয়েছে খদ্দের রেগে খুন। বলে "তুমি লোক ঠকাবার জায়গা পাওনি? 'ডালডা' তো পাওয়া যায় শীলকরা টিনে। খোলা আজেবাজে কি গছাচ্ছ আমায়?" তারপর আমার দিকে ফিরে বলে "দেখুন তো মশাই 'ডালডার' এত কাটতি বলে এরা সব আজেবাজে জিনিষ 'ডালডার' নামে বিক্রী করছে। ডালডা কখনও খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।"

বিনয়ঃ আপনি কি বললেন ভুতোদা?

ভুতোদাঃ আমি তো হেসেই অস্থির! ভদ্রলোককে বললাম—মশাই আপনার সহরের হালচালই আলাদা। মধুপুরে বিপিন মুদীর কাছ থেকে খোলা 'ডালডা' তো আমরা কিনে থাকি। ভদ্রলোক গেলেন বেজায় চটে। বললেন—"আপনি 'ডালডা' কেনেন না আরো কিছু। কেনেন যত খোলা জিনিষ যাতে ধুলোময়লা আর মাছি বসে" বলে গট্ গট্ করে চলে গেলেন। (ভুতোদার অট্টহাসি, বিমল আর বিনয় আরো জোরে হেসে উঠল। ভুতোদার হাসি গেল মিলিয়ে। উনি ভেবেছেন বেজায় জব্দ করেছেন ওদের কিন্তু ওদের হাবভাব দেখে তো তা মনে হচ্ছেনা। বিমলঃ খোলা হাওয়া আর খোলা 'ডালডা'—আহাহা কি ডায়েট—হাঃ হাঃ

ভুতোদাঃ হাসির কি হোল?

বিনয়ঃ ভদ্রলোক আপনাকে ঠিকই বলছেন। 'ডালডা' কখনও খোলা অবস্থায় বিক্রী হয়না। ভুতোদা (চটে): তবে মধুপুরে আমরা কি খাই? বিনয়ঃ ভদ্রলোক যা বলেছেন তাই। কারণ 'ডালডা' কোন জায়গাতেই খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়না।

ভুতোদাঃ দ্যাখ? বাঙ্গালকে হাইকোর্ট দেখাচ্ছিস?

বিমলঃ আপনি এই রেষ্টরেন্টের মালিক হরেনদাকে জিজ্ঞাসা করুন। বাড়ীতে মিনুদিকেও জিজ্ঞাসা করবেন।

হরেনদাঃ হ্যাঁ, ওরা ঠিকই বলেছে। আমার 'ডালডা' নিয়েই তো কারবার। 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা বায়ুরোধক টিনে—হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে।

বিনয়ঃ শীলকরা টিনে 'ডালডা' তাজা ফুরফুরে হাওয়ার মতই ভাল অবস্থায় পাওয়া যায়।

ভুতোদা চুপসে গেলেন। শুধু মিনমিন করে একবার বললেন "খোলা হাওয়া তো নেই এখানে।"

বিমলঃ একটা লেগেছে ভুতোদা। সেকেণ্ডটা মিসফায়ার হয়ে গেল।
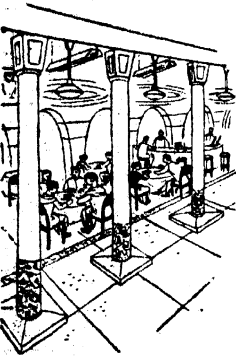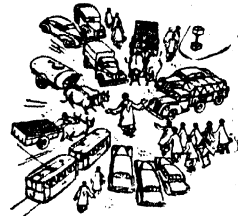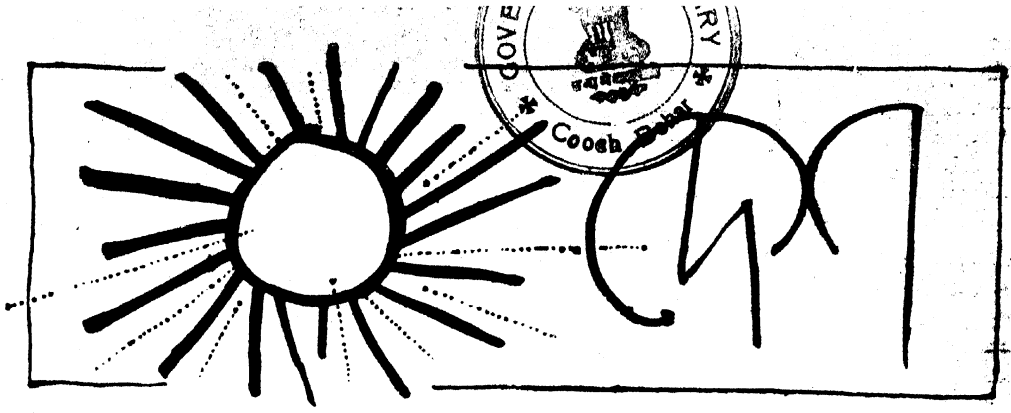
DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 7th February, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৫ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৪ মাঘ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

ছাত্রসমাজ ও প্রত্যক্ষ রাজনীতি

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় জনৈক অধ্যাপক সদস্য ছাত্রসমাজকে প্রত্যক্ষ রাজনীতির আওতা হইতে দূরে রাখিবার উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন আহ্বানের কথাও চিন্তা করা হইতেছে।

"আরও প্রকাশ, প্রস্তাবিত সম্মেলনে কলিকাতা, বিশ্বভারতী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রতিনিধি, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের নেতা, অধ্যক্ষ পরিষদ, প্রধানশিক্ষক সমিতি, পঃ বঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিদের আহ্বান করার কথাও উঠিয়াছে। প্রস্তাবে নাকি উল্লেখ করা হইয়াছে যে, 'রাজনীতির দাবাখেলায়' ছাত্রদের ব্যবহার না করার জন্য একটি 'ভদ্রলোকের চুক্তি' হউক এবং ছাত্রসমাজকে সক্রিয় রাজনীতি হইতে দূরে রাখার জন্য সম্মেলনে উপায় উদ্ভাবন করা হউক।"

সত্য কথা বলিতে কি এই উদ্যম আমাদের অত্যন্ত আনন্দ ও আশা দান করিয়াছে। কেন তাহা খুলিয়া বলাই বাহুল্য। আজকার দিনে তামাম ভারতবর্ষে শিক্ষা, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সমস্যা যেমন সংকটের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন বোধ করি আর কোন সমস্যা নয়। কোন একটি মাত্র কারণে এমন ঘটে নাই। তবু যদি কোন একটা কারণকে এই অবস্থার জন্য দায়ী করা যায় তবে আমাদের মতে নিঃসন্দেহে তাহা শিক্ষা জগতের উপরে রাজনীতির প্রত্যক্ষ ও অবাঞ্ছিত প্রভাব। কিছুদিন হইল দেশের চিন্তাশীল সমাজ এ বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠিতেছেন। মাদ্রাজ বিধানসভার জনৈক সদস্যের অনুরূপ উদ্যম তাহার প্রমাণ। কিন্তু এ পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে ও ব্যাপকভাবে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হইয়াছে বলা যায় না। না হইবার কারণ যথেষ্ট। যাহারা সাপ তাহারাই রোজা হইলে সমস্যার সমাধান হইবার কথা নয়। প্রত্যক্ষ 'রাজনীতির দাবাখেলায়' যাঁহারা রাজা এবং মন্ত্রী, ছাত্রসমাজ (এবং অনেকাংশে শিক্ষক সমাজও বটেন) যে তাঁহাদেরই 'বড়ে'। 'বড়ে'র ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে কিন্তু সেটুকু বাদ দিলে যে খেলাই সম্ভব হয় না। এই অতি সরল ও প্রাথমিক কারণেই এ পর্যন্ত ছাত্রসমাজকে রাজনীতির প্রত্যক্ষ আক্রমণ হইতে বাঁচাইবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

আমরা অনেকবার বলিয়াছি, এই সুযোগে পুনরায় বলি যেদিন হইতে ছাত্রসমাজের উপরে শিক্ষকের প্রভাব কমিতে শুরু করিয়াছে সেইদিন হইতে শিক্ষা জগতের দুঃসময় আরম্ভ হইয়াছে। অতিরঞ্জনের আশংকা না করিয়া অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে বর্তমানে ছাত্রসমাজের উপরে শিক্ষকের প্রভাব শূন্যের কোঠায় নামিয়াছে, আর রাজনীতিকের প্রভাব অবাঞ্ছিতরূপে প্রবল। অধিকাংশ ছাত্রই সম্পূর্ণ অপরিচিত, হয়তো নামে মাত্র শ্রুত রাজনীতিককে পথপ্রদর্শক, চিন্তানায়ক ও বান্ধব মনে করে শিক্ষককে নিতান্ত শত্রু মনে না করিলেও Necessary Evil মনে করে। অবস্থা যেখানে এরূপ বুঝিতে হইবে সেখানে তলাতে ছিদ্র হইয়াছে, যতই রস ঢালো না কেন তাহা অতলে না তলাইয়া পারে না। প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশনের সভাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই শিক্ষার উন্নয়ন সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন। তলার ছিদ্র মেরামত না হইলে সব চিন্তাই নিরর্থক। তলার ছিদ্র রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব। তাহা দূর করা সম্ভব হইবে কি?

আগেই উল্লেখ করিয়াছি যে সাপ রোজার মূর্তি ধরিয়াছে। আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে অনেকক্ষেত্রে রোজাও সাপের মূর্তি ধরিয়াছে। আজ শিক্ষকের ছদ্মবেশধারী রাজনীতিকরূপে শিক্ষা জগতের শনিরূপে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছে। জাতে শিক্ষক পেশায় রাজনীতিক শিক্ষকের সহিত কে না আজ পরিচিত? ইঁহারা তাক করিয়া পেঁচা ও বাদুড় মারেন। চিন্তার আলোআঁধারির সুযোগে ইঁহারা শিক্ষার ক্ষেত্রে কাঁটা গাছের বীজ বপন করিয়া চলিয়াছেন। বাহির হইতে প্রত্যক্ষ রাজনীতিকের ও ভিতর হইতে ছদ্মবেশ শিক্ষক-রাজনীতিকের সাঁড়াশি আক্রমণে শিক্ষা জগতে আজ ভূতের নাচন চলিতেছে। যে-সব শিক্ষক এখনো রাজনীতির কাজে আত্মসমর্পন করিয়া নাম কাটা সেপাই হন নাই তাঁহারা কোনক্রমে মান, মাথা ও চাকুরি বাঁচাইয়া অবসরপ্রাপ্তির দিন গনণা করিতেছেন। এই তো অবস্থা। এহেন সময়ে একজন শিক্ষক যে অবস্থার প্রতিকারের জন্য উদ্যত হইয়াছেন ইহা অন্ধকারে আলোর শিক্ষা। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষগণের এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া উচিত, আর একটা স্থায়ী প্রতিকার যাহাতে হয় তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য। এই শুভ উদ্যোগকে আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিতেছি।

প্রসঙ্গত

প্রতিভার প্রকৃত স্বীকৃতি তার সহৃদয় সমাদরে। এবং সে-হৃদয়, বলা বাহুল্য, দেশের সর্ব-সাধারণের ভিড়ের ভিতর থেকে প্রতিভাবানকে বেছে নিতে তারা প্রায়ই ভুল করে না। যদি করে, তবে সে-ক্ষেত্রে শিল্পীর কবি-কথিত নিরবধি কাল আর বিপুলা পৃথ্বীর উপর ভরসা রাখা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু সাধারণের স্বীকৃতির বাইরে গুণী-জ্ঞানী-দের প্রতি কাল-স্বীকৃত একটা সরকারী দায়িত্বও আছে। সে-দায়িত্ব এদেশের সরকারও মেনে নিয়েছে, কিছুটা সাবেকী ধারার অনুসরণে কিছুটা স্বেচ্ছা-প্রণোদিতভাবে। তাই ২৬শে জানুয়ারীর শুভলগ্নে প্রতি বছর দিল্লী থেকে ধারাসারে সরকারী সম্মানের পুষ্পবৃষ্টি হয়। পুষ্পও আবার নানা বর্ণ-গন্ধ-আভিজাত্যের। কোনটির নাম পদ্মভূষণ, কোনটির পদ্মবিভূষণ, কোনটি বা পদ্মশ্রী। এই সম্মানের গন্ধ পুষ্প শিরোধার্য করবার জন্য সব মাথা ঈষন্নত হয়ে আছে, বলতে চাইনে, কিন্তু মাথায় ফুল পড়লে মাথা নেড়ে তা ফেলে দিয়েছেন এমন ঘটনাও বিরল।

* * *

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভারত সরকারের পদ্মভূষণ পদবী প্রত্যাখ্যান করেছেন। এ-প্রসঙ্গে একথা স্মরণযোগ্য যে বেসরকারী "নাট্যাচার্য" পদবী তিনি প্রত্যাখ্যান করেননি। তাঁর আপত্তি তবে সরকারী খেতাবেই। এই বিরাগের কারণ কি? শুধু কি সরকারী গন্ধ? সম্ভবত নয়। সরকার এখন স্বদেশী এবং এদেশ তাঁরও দেশ, রায় বাহাদুর আর পদ্মভূষণের পার্থক্য তাঁর মত লোকের কাছে অবিদিত না থাকার কারণ নয়। তবু তিনি পদ্মভূষণকে রায় বাহাদুরের চেয়ে স্বতন্ত্র বেশী কিছু ভাবতে পারেননি। পারেননি, তার কারণ তাঁর মতে সরকারী খেতাব বিতরণের মধ্যে দম্ভের পরিচয় যতটা আছে , গুণগ্রাহিতার পরিচয় ততটা নেই। তা যদি থাকত তাহলে সরকারী ভূষণে ভূষিত হবার আগেই তিনি জানতে পারতেন তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হবে। পূর্বে তাঁর সম্মতি নেওয়া হত। শুভ সংবাদের তারবার্তা তাঁর তিন বছরের পুরনো ঠিকানায় তাঁকে খুঁজে বেড়াত না, এ অভিযোগ সরকারী অনবধানতার। সরকারের তরফের ত্রুটি এটা নিশ্চয়ই, কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় অভিযোগ আরও গুরুতর, নাট্যাচার্য বলেছেন সরকারের খেতাব গ্রহণ করে তিনি খয়ের খা'র দল ভারি করতে রাজি নন। তাঁর এ অভিযোগকে হয়ত একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। সরকারী খেতাব যাঁরা প্রত্যাশা করেন এবং যাঁরা গ্রহণ করেন, তাঁদের অনেকেই যে সরকারের অনুগ্রহ বা প্রীতিভাজন, এমন ধারণা ইতিমধ্যেই বহুর মধ্যে ছড়িয়েছে। উদারহস্তে বিতরণ করতে গিয়ে ভারত সরকারের কিছু খেতাব যে অপাত্রে পড়েছে দেশের লোকের দ্বারা পরিলক্ষিত না হয়েছে এমন নয়। পাত্রাপাত্রের বিচার যদি সূক্ষ্ম না হয় তাহলে সম্মানের মূল্য হ্রাস পাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি। সম্মান মূল্যহীন হয় আরও একটা কারণে। যেখানে দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সম্পর্কের অভাব ঘটে। অন্তত শিশিরকুমারের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। তাঁর কাছে এ খেতাব একটা দপ্তরের খবর ছাড়া কিছু নয়। খেতাব পাঠানোর মানে সরকার তাঁর জীবনের খবর নেননি, জীবিকার খবর রাখেননি। সংবাদ নেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেননি যে উত্তর-সত্তর এই মহৎ শিল্পীকে কী মহৎ ক্ষুধার আবেগ পীড়ন করছে। তাঁর দুরন্ত প্রার্থনা কী। তাঁর আজও আশা ছিল, সরকারী পৃষ্ঠপোষণায় দেশে তিনি নতুন করে রঙ্গমঞ্চ খুলবেন। অতএব শিশিরকুমারের অভিমান অকারণ বা উষ্মা অসঙ্গত নয়। অত্যন্ত ক্ষোভের বশেই তিনি সরকারী সম্মান প্রত্যাখ্যান করলেন। অবশ্য অনেকে হয়ত বলবেন, সরকারদত্ত এই সম্মান তিনি গ্রহণ করতেও পারতেন। কেননা, পদবী গ্রহণ করার পর সরকারের সমালোচনা করার অধিকার তাঁর থাকত। তিনি যা বলতে চেয়েছেন পরেও তা বলতে পারতেন। স্বদেশের সরকারের প্রতি এই সৌজন্যটুকু দেখালেই হয়ত শোভন হত।

* * *

বর্ণবৈষম্যের বিরোধিতায় বহির্বিশ্বে অন্য সকলের সঙ্গে আমরা যখন সুর মিলিয়েছি তখন হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করা গেল, আমাদের ঘরের কোণে, কলকাতাতেই বর্ণ-বিদ্বেষের একটি কাঁটা এখনও তোলা বাকি। এই হঠাৎ আবিষ্কারের কৃতিত্ব অবশ্যই সাঁতারু মিহির সেনের প্রাপ্য। পৌরসভায় প্রদত্ত ভাষণের উত্তরে তিনি বলেছেন, ক্যালকাটা স্যুইমিং ক্লাবে ভারতীয়দের সাঁতার কাটার অধিকার নেই। সম্প্রতি পৌরসভাতেই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে অচিরে এই কাঁটা নির্মূল করতে হবে। শুধু ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবেই নয় ঐ জাতীয় যে সব ক্লাবে ভারতীয়দের পাশপোর্ট নেই সে সব ক্লাবে ভারতীয়দের ঢুকতে দিতে হবে নয়ত ক্লাবগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই মর্মে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইন প্রণয়ন করা কর্তব্য। পৌরসভার সংকল্প সাধু, প্রস্তাব অবশ্য প্রশংসার্হ। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এ প্রস্তাব উঠেছে কিঞ্চিৎ বিলম্বে। অন্তত মিহির সেনের অঙ্গুলি নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে নয়। এর জন্যে পৌর প্রতিষ্ঠানকে অপেক্ষা করতে হল একটি বিদেশী দম্পতির প্রতিবাদের জন্য। হেলডেন দম্পতি সংবাদপত্র মারফৎ শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের হীন আচরণের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। [illegible] সংবিধানের আইনের নজিরও তুলেছেন। শ্বেতাঙ্গের এই আচরণ শুধু যে অসুজনসুলভ তাই নয়, সংবিধানের ১৫ ধারা অনুযায়ী বে-আইনীও, তাঁরা কর্তৃপক্ষকে অভয় দিয়ে একথাও বলেছেন যে, ক্লাবের আইন-কানুন নিতান্তই ক্লাবকারীদের মর্জি মত, এর পিছনে বহত্তর ইউরোপীয় সমাজের কোন সমর্থন আছে ভাবলে ভুল করা হবে। অতএব এখন আর আইন প্রণয়নে সম্ভবত কোন বাধা নেই। পৌরসভার কোনও কাউন্সিলরই জানিয়েছেন, বোম্বাই-এও কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই "ধবল ব্যাধি" ছিল। নাগরিকদের উৎসাহে সরকার মারফৎ তার প্রতিকার হয়েছে। কলকাতায় হতেও বাধা নেই। বোম্বাই কাল যা করেছে, কলকাতা অন্তত আজ তা করুক। করুক।

স্বদেশীয় কম্যুনিস্টদের চেপে রেখেও প্রেসিডেণ্ট নাসের এতদিন পর্যন্ত রাশিয়া এবং কম্যুনিস্ট ব্লকের অন্যান্য গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে খাতির পেয়ে আসছিলেন। এইবার হাওয়া উল্টোদিকে বইতে আরম্ভ করেছে। মস্কোতে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির যে কংগ্রেস চলেছে তাতে মিঃ খ্রুশেচভ প্রেসিডেণ্ট নাসেরের নীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, কম্যুনিস্টরাই আরব জগতে জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে অকৃত্রিম ধারক, কম্যুনিস্টদের নষ্ট করার চেষ্টা করে নাসের আরব জাতীয়তাবাদের শিরশ্ছেদ করার কাজ করছেন। সোভিয়েট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নাসেরের এইরূপ প্রকাশ্য নিন্দায় ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক স্বভাবতই চটেছে। সোভিয়েট নেতার মন্তব্য ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সামিল বলে কাইরোর সংবাদপত্রগুলি অভিযোগ করেছে। কিন্তু সোভিয়েট যখন একবার মুখ খুলেছে তখন একটা লক্ষ্য স্থির করেই তা করেছে। প্রেসিডেণ্ট নাসেরের উপর চাপ দিয়ে তাঁর বর্তমান নীতির পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা রাশিয়া করবে। আসোয়ান বাঁধের প্রথম পর্যায়ের কাজের জন্য রাশিয়া ইউনাইটেড আরব রিপাবলিককে সাহায্য দেবে বলে চুক্তি করেছে। সে চুক্তি ভেঙে দিয়ে সাহায্য দিয়ে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করলে প্রেসিডেণ্ট নাসের আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা মুশকিলে পড়বেন বটে, কিন্তু তাতে রাশিয়ার বদনাম হবে এবং প্রেসিডেণ্ট নাসেরের প্রতি আরব জাতিসমূহের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা বেড়ে যাবে। আমেরিকান সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহারের ফল প্রেসিডেণ্ট নাসেরের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির পক্ষে কিরকম লাভজনক এবং পশ্চিমা শক্তিদের পক্ষে কীরকম ক্ষতিজনক হয়েছিল তা সর্বজনবিদিত। সোভিয়েট রাশিয়া সে-ভুল করবে না। যে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে রাশিয়া চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সেটা সে দেবে কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে তার যা আসল অস্ত্র সেটির কাজও চলতে থাকবে। সর্বত্র আরব কম্যুনিস্টরা প্রেসিডেণ্ট নাসেরের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠবে। কোন কোন আরব কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা অনেক দিন থেকেই নাসেরের বিরুদ্ধতা করার জন্য মস্কোর অনুমতি চেয়ে আসছিলেন; কিন্তু মস্কো এতদিন সে অনুমতি দেয়নি অথবা খুব স্পষ্টভাবে না করে গোপনে গোপনে নাসেরের বিরুদ্ধতা করার অনুমতি দিয়েছিল। কিন্তু বিরুদ্ধভাব গোপন থাকেনি। কম্যুনিস্টরা মিশরের সঙ্গে সিরিয়াকে মিলিয়ে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক তৈরী করার বিরোধিতা করেছে। ইরাকী বিপ্লবের পরে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের সঙ্গে ইরাকের সংযুক্তি প্রেসিডেণ্ট নাসের হয়ত আকাঙ্খা করেননি; কিন্তু নাসের চান বা না চান ইরাকের কম্যুনিস্টরা তা একেবারেই চায়নি এবং হতেও দেয়নি; কাসেম সরকারের উপর কম্যুনিস্টদের প্রভাব উত্তরোত্তর

বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। ফলে এখন কম্যুনিস্টদের পক্ষে প্রেসিডেণ্ট নাসেরের বিরুদ্ধে কাজ করা একটি আরব রাষ্ট্রের সরকারের সহযোগিতায় হোক অথবা আড়াল থেকেই করা চলছে। সুতরাং এখন বাগদাদ থেকে সারা আরব জগতে একটি নাসের বিরোধী আন্দোলন চলতে পারবে এবং চলেছেও। বাগদাদ ও কাইরো রেডিও বর্তমানে পরস্পরের প্রতি দোষারোপে মুখর। নুরি পাশার অধীনে বাগদাদে পশ্চিমা শক্তিসমূহের প্রভাব প্রবল ছিল, তখন কাইরো বাগদাদকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর ক্রীড়নক বলে গাল দিত। এখন সেই বাগদাদ থেকে পশ্চিমা শক্তির প্রভাব লুপ্ত প্রায়, সে স্থলে কম্যুনিস্টদের প্রভাব বেড়ে চলেছে। এখন কাইরো ইরাকী গভর্নমেণ্টের কম্যুনিস্ট প্ররোচিত কার্যাবলীর নিন্দা করে এবং বাগদাদ বলতে আরম্ভ করেছে যে, নাসের গভর্নমেণ্ট ধীরে ধীরে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের দিকে ঝুঁকছে। মিঃ খ্রুশ্চেভ কর্তৃক প্রেসিডেণ্ট নাসেরের প্রকাশ্য নিন্দার পরে আরব জগতের সর্বত্র কম্যুনিস্টরা নাসেরের বিরুদ্ধাচরণ করার স্বাধীনতা পেয়েছে বলে ধরে নেবে। ঘটনাচক্রে এতদিন প্রেসিডেণ্ট নাসেরের নিরপেক্ষ নীতি কার্যত পশ্চিমা-বিরোধী হয়েই পড়েছে। তার জন্য নাসেরের আভ্যন্তরীণ নীতি কম্যুনিস্ট-বিরোধী হলেও মস্কোর আদেশ অনুযায়ী আরব জগতের কম্যুনিস্ট পার্টিগুলি নাসেরের বিরুদ্ধে লাগেনি। এখন সে আস্থা নেই।

সারা আরব জগতের সকল কম্যুনিস্ট পার্টির বিরোধিতা নাসেরের পক্ষে বেশ সঙ্গীন এমন কি গুরুতর সংকট সৃষ্টি করতে পারে। সোভিয়েটের উপর রাগ করে কিংবা কম্যুনিস্টদের উৎপাত বৃদ্ধির ফলে নাসের নিজেকে বিপন্ন বোধ করে যে পশ্চিমা শক্তিদের দিকে একটু ঝুঁকলেন তাতেও বিপদ আছে। কারণ তাহলে আবার রব উঠবে যে নাসের সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন, আরব জাতীয়তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

এতদিন দুকূল রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, প্রকৃত পক্ষে এক অর্থে দুকূল রাখার দরকারই ছিল না কারণ পশ্চিমা শক্তিদের মুরুব্বিআনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দুটো কড়া কথা বল্লে বরঞ্চ লোকেরা খুশীই হত। কিন্তু এখন সোভিয়েট সরকার এবং স্বজাতীয় কম্যুনিস্টদের বিরোধিতা সত্ত্বেও পশ্চিমা শক্তিদের দিকে বেশি এগুনো চলবে না কারণ তাহলেই বদনাম এবং তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। নাসেরের প্রতি কম্যুনিস্টদের বিরোধিতা দেখে নাসেরের প্রতি সদয় হয়ে অথবা কম্যুনিস্ট-দের প্রতি নাসেরের বিরুদ্ধভাবে দেখে খুশী হয়ে পশ্চিমা শক্তিরা যদি নাসেরের প্রতি বেশি আদর দেখাতে চায় তবে নাসের পক্ষে সেটা হিতে বিপরীত হতে পারে। এ বিষয়ে যুগোশ্লাভিয়ার টিটো সরকারের চেয়ে নাসেরের মুশকিল আরো বেশি কারণ টিটো সরকারকে কেবল যুগোশ্লাভিয়ার লোকের মতামতের খাতির করতে হয়, কিন্তু নাসেরের প্রতিপত্তির মূলে কেবল ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের জনগণেরই সমর্থন মাত্র নয়, নাসেরকে সারা আরব জগতের মুখের দিকে চেয়ে চলতে হয়। আবার আরব জগৎও এখন পর্যন্ত সবটা স্বাধীন হতে পারেনি। আরব জগতের মধ্যে এমন দেশও রয়েছে—যেমন আলজেরিয়া—যে দেশ এখনও অন্যতম পশ্চিমা শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত। এই রকম অবস্থায় একদিকে সোভিয়েট ও স্বদেশীয় কম্যুনিস্টদের ধাক্কা সামলানো ও অন্যদিকে পশ্চিমা শক্তিদের স্পর্শ দোষ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলা অথচ বাইরে থেকে অর্থনৈতিক সাহায্যও পাওয়া চাই—প্রেসিডেণ্ট নাসের এই সংকটের তিন মোহানীতে পড়েছেন।

২।২।৫৯

দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

জাতীয় ইতিহাসের বারো আনাই কল্প-কথা, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে বিস্মৃতিতে ঘেরা। আমাদের বেলায় বিপদ দ্বিগুণ, কেননা আমাদের ইতিহাস প্রথম লিখলেন বিদেশীরা এবং তাঁদের অনেকের মনে প্রেমের চাইতে বিদ্বেষ ছিল বেশি। পরের অঙ্কে আমাদের আবির্ভাব এবং অনেকটা পুরোনো অন্যায়ের শোধ নেবার জন্যেই আমরা যে ইতিহাস রচনা করলাম, তার মধ্যে কল্পনার প্রাধান্য রইল বেশ কিছু। পদানত জাতীয়তাবাদ ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠা চায় অতীতের দৌলতে আর সে অতীতে যদি দৈন্য থাকে তবে দৌলত উদ্ভাবন করতে হয় ঐতিহাসিক সত্যকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে। পরে জানবারই উপায় থাকে না কী সত্য আর কী সত্য নয়। ইতিহাসের নায়ক-নায়িকারা বিদায় নেন, সাক্ষীদের মৃত্যু ঘটে, আর ইতিহাসের মুখোস পরে বিরাট অসত্য বিরাজ করে একটা গোটা জাতির চিত্ত লোপে। একটু কোথাও সন্দেহ প্রকাশ করো, একটু কোথাও প্রশ্ন শুধাও, আর অমনি তুমি দেশদ্রোহী বলে নিন্দিত হবে, ইষ্টক বর্ষণ করবে তোমার উপর দেশপ্রেমিকরা। সাবধান।

পুরোনো মিথ্যার বয়স বেশি, বৃদ্ধ সে। সাম্প্রতিক মোহের আছে যৌবনের জোর, ঠিক সেই পরিমাণে সে অসহিষ্ণু ও সন্দেহের প্রতি অসহনশীল। স্বাধীনতার পরে নানা সরকারী চেষ্টা হয়েছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার। ফলে সত্য হয়েছে নব রূপকথা। পূর্ণ সত্যের পূর্ণ উদ্ঘাটনের মুহূর্ত আজো আসেনি। সৌভাগ্যের সূচনা, সত্যাংশের আংশিক উন্মোচন শুরু হয়েছে। মৌলানা আজাদের সদ্যপ্রকাশিত আত্মজীবনী —India Wins Freedom (Orient Longmans, Calcutta, Rs. 12.50) একাধিকার্থে ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

*

কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতে যে জাতীয় আন্দোলন হয়েছিল, তার ইতিহাস আদৌ অগৌরবের নয়। এ-আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন এমন কয়েকজন ব্যক্তি, যাঁরা যে কোনো বিচারে নিঃসন্দেহে মহান। সমগ্র-ভাবে দেশ যেভাবে সাড়া দিয়েছিল, তা মোটেই লজ্জাকর নয়, বিশেষ করে যখন স্মরণ করি যে, আমাদের শুধু ঢাল-তরোয়াল ছিল না নয়, আমরা স্বেচ্ছায় অস্ত্রের শরণ নিইনি। কিন্তু রাজনীতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পরবর্তী ইতিহাসে সে আন্দোলনের চিত্রে আঁচড়টুকু নেই, একটিও নেই আঁচিল। মৌলানা আজাদের আত্ম-জীবনীতে দেখা গেল, আন্দোলনে ফাঁক ছিল মেলা, ফাঁকি ছিল বেশ কিছু, আর নেতাদের অনেকের পা ছিল কাদায় তৈরী। মৌলানা আজাদের প্রধান উদ্দেশ্য exposure নয়, বড়োকে ছোট করা নয়; তিনি যা করেছেন, তা শুধু cutting those stuffed giants down to size —এ-কাজের প্রয়োজন ছিল।

ভারতের ইতিহাসের এক সংকটাকীর্ণ অধ্যায়ে কংগ্রেসের কর্ণধার ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। তাঁর ভাষ্য তাই নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধেয়, কখনো কখনো তা অপ্রীতিকর হলেও। প্রিয় মিথ্যার মোহ ত্যাগ না করলে আত্ম সমালোচনার শুরুই হয় না, আর আজ আমাদের প্রথম প্রয়োজন নির্মোহ আত্মবিশ্লেষণ। মৌলানা আজাদের আত্মজীবনী সেই আত্মবিশ্লেষণের সহায়ক হলে তবেই সার্থক হবে। অপ্রকাশিত প্রথম খণ্ড বন্দী থাক ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে, আমরা মোহমুক্ত হই প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করে।

*

সহ-নেতাদের সম্বন্ধে মৌলানা আজাদের অকপট মন্তব্যগুলি ইতিমধ্যেই প্রচার লাভ

করেছে এবং তাতে ক্ষতি হয়নি কারো। কিন্তু পাঠকের মনোযোগ ওই দিকেই নিবন্ধ থেকে নিঃশেষিত হয়ে গেলে আলোচ্য গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। মৌলানা আজাদের প্রধান উদ্দেশ্য, আমার মতে, আমাদের জাতি-চরিত্রের বিশ্লেষণ এবং তার কয়েকটি সাম্প্রতিক অশুভ প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ। কংগ্রেস দলে যে দলাদলি চিরকাল ছিল, এটা পুরোপুরি নব আবিষ্কার নয়, কিন্তু সে তো দেশের বৃহত্তর বিভেদেরই প্রতিফলন মাত্র।

গণ-আন্দোলন আহ্বান করবার পূর্বাহ্নে প্রতিবার কংগ্রেসী নেতৃত্বকে স্মরণ করতে হয়েছে জনগণের নিহিত দুর্বলতার কথা। সে দুর্বলতা কখনো চাপা পড়েছে মুখর চিৎকারের তলায়, কিন্তু তার অস্তিত্ব গোপন থাকেনি মৌলানা আজাদের কাছে। এমনকি ১৯৪২-এর আন্দোলনেরও আগে মৌলানা আজাদ মহাত্মাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, এ সফল হবে না, ফল হবে শুধু পরাজয়ের পর জাতীয় মনোবলের দীর্ঘ বিদায়। তিনি বলেছিলেন, এতদিনের পরাধীনতার পরে দেশ আর দেশবাসী দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলনের অপরিহার্য ত্যাগস্বীকারে অসমর্থ। অপ্রিয় মন্তব্য, কিন্তু অসত্য কি? বহু ভারতীয় সব কিছু ত্যাগ করেছেন স্বাধীনতার জন্যে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে জাতির ত্যাগস্বীকারের যে ছবি আমাদের হৃদয়ে আঁকা আছে, তার মধ্যে কালো রঙের পরিমাণ অবহেলা না হতে পারে।

*

মৌলানা আজাদের হৃদয় ভাঙল যখন দেশটা ভেঙে দু টুকরো হোলো। তার সঙ্গে এলো ব্যাপক পাশবিকতা এবং মৌলানা আজাদ ব্যথিত বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, নিকটতম সহকর্মীদের মধ্যেও এমন লোক আছেন, যাঁরা প্রায় খুশি যে রক্তের বন্যা বইছে। সারা জীবন তিনি মুসলিম লীগের বিরোধিতা করেছেন, তাঁর সম্প্রদায় যখন সাম্প্রদায়িকতায় আচ্ছন্ন, তখনো তিনি জাতীয়তাবাদী। পরে যখন দিল্লীতে চারদিকে চেয়ে দেখলেন মুসলমান উদ্বাস্তুর মিছিল, তখন যদি তাঁদের জন্য তাঁর হৃদয় কেঁদে থাকে, তবে সেজন্য আমি অন্তত তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলতে পারব না। যদি তখন তাঁর মনে এমন সংশয়েরও উদয় হয়ে থাকে যে, তিনি কংগ্রেসে যোগ দিয়ে হয়তো হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের বাহুতে বল দিয়েছেন, তাহলেও তাঁকে আমি দোষ দিতে পারব না।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশ থেকে আপাতত অন্তর্হিত। কিন্তু বিদ্বেষ কি পুরোপুরি বিলুপ্ত? এ-প্রশ্নের উত্তর দেবার দায় আজাদের আত্মজীবনীর প্রতি অ-মুসলমান পাঠকের।

[১৫]

প্রাজ্ঞ আত্মস্থ, চিত্তদর্শী ইত্যাদি বিশেষণ শুনলেই বহুদিন অবধি সৌরর মনে একটি ছবি ভেসে উঠত—শচীপতির। অন্তত তাঁরই মধ্যে সৌর সর্বপ্রথম এইসব গুণের সমাবেশ দেখেছিল। যেমন মোহিতদার মধ্যে প্রথম নমুনা দেখেছিল প্রাণোচ্ছল যৌবনের, যা বস্তুতেই সুখ খোঁজে, চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-ত্বক ইত্যাদি ইন্দ্রিয়-নিচয়ের তৃপ্তিতেই যার চরিতার্থতা এবং তুষ্টি। বিজনের মধ্যে সৌর পেয়েছিল তারুণ্য, অংশত যা চিত্তাকৃত জ্ঞানশূন্য, সম্ভবত অগভীর, সুতরাং উদ্দাম।

শচীপতির মধ্যে পেল স্থিরতর, যা অনেক টাল সামলে ভারসাম্য পেয়েছে।

প্রথম যৌবনে শচীপতির বাবুত্ব ছিল, এ-কথা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সেই রূপ সৌর প্রত্যক্ষ করেনি, বর্ণনা থেকে যতটা সম্ভব ধরে নিয়েছে। সেই প্রথম জীবনের পরাক্রান্ত, অসুর-শক্তি মানুষটির কতটুকু ছাপ আছে এই ভেঙে-পড়া দেহটির মধ্যে? একটা হয়ত আছে নীল চোখে, যা এখনও মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে, নিবে যায়, তাকে আবার জ্বালিয়ে তুলতে পানপাত্রে ফের চুমুক দিতে হয়। পানীয়ই শচীপতির জীবনের বিকাশ রেখায় সাহস-সলতের তেল।

এই মানুষটি সৌরকে অভিভূত করেছিল।

সৌর সেদিন স্তম্ভিত হয়ে তাঁকে দেখছিল, কেবলই দেখছিল। শচীপতি তাকে বলেছিলেন, "যতক্ষণ আমার মদ্যপান সারা না হয়, মূঢ়, ততক্ষণ অপেক্ষা কর।" ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন শচীপতি, তাঁর হাত কাঁপছিল, চোখের পলক পড়ছিল।

আর যান্ত্রিকভাবে সৌর নিজেও তার গ্লাসে চুমুক দিয়ে গিয়েছে। গলা জ্বলেছে, জিভে বিশ্রী ঠেকেছে, কণ্ঠনালীতে দাহজ্বালা অনুভব করেছে, কিন্তু তবু গ্লাসটা সরিয়ে রাখতে পারেনি। আসলে সে যে গর্হিত কিছু করছে, এই খেয়ালটাই সৌরর তখন মদ্যপানের অভিজ্ঞতা, নিষিদ্ধ পানীয়ের ছিল না। একটা অপ্রাপ্ত বয়সী কিশোরের স্বাদগ্রহণের পাঠ যেন অগোচরে, স্বপ্নাবেশে ঘটে গেল।

কেননা, সৌর আর কিছু ভাবছিল না, ভাববার ক্ষমতাই তার ছিল না, সৌর দেখছিল, কেবল দেখছিল।

কাকে? যেন ধ্বংস স্তূপে আকীর্ণ প্রান্তরে একটি বিধ্বস্ত মূর্তিকে, যিনি একদা ইতিহাস প্রসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন।

"আমার সন্তানহীনতাই আমাকে জীর্ণ করেছে", শচীপতি ধীর-গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করেছেন, "নিষ্ফলতাই আমাকে ভেঙেচুরে মাটির সংগে মিশিয়ে দিয়েছে।"

সৌর মূঢ় চোখে তাকিয়েছিল। দৃষ্টি যথাসম্ভব একাগ্র উৎসুক করে; যেন শুধু শ্রবণ দিয়ে শচীপতির কথার পূর্ণ তাৎপর্য হৃদয়গত করা যাবে না, চক্ষুরিন্দ্রিয় দিয়েও অনেকখানি আহরণ করতে হবে।

তবু শচীপতি কী বলছিলেন, সৌর বিশেষ বুঝতে পারছিল না, তাকে মাঝখানে রেখে কতকগুলো তীর ইতস্তত ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

একবার সৌর বুঝি প্রশ্ন করে বলল, "আপনি নিজেই যে দায়ী, কী করে বুঝলেন।" নিজের কণ্ঠস্বর সৌরর নিজের কানেই অপরিচিত শোনাল।

"আমি জানি" শচীপতি বললেন ভগ্নস্বরে, "তবে জানতে আমার—আমাদের—অনেক দিন লেগেছে।"

সৌরর মুখের ওপর শচীপতির মুখের ছায়া পড়েছিল। শচীপতি বললেন, "তুমি এবার প্রশ্ন করবে, দেরী হল কেন। তোমার বয়স কম, তবু জন্মরহস্যের যেটুকু জেনেছ, তাই দিয়েই বুঝতে পারবে, এসব জিনিস আবিষ্কার করতে বেশী সময় লাগে না।

"কিন্তু আমাদের লেগেছিল। প্রথম দিকে সন্তান চাইনি ত, তাই সতর্ক থাকতাম। এইভাবে প্রায় দু'বছর কাটল।"

সৌর বলল, "তারপর?"

"তারপর প্রথমে ওর মনে ইচ্ছেটা এল। অথবা বলতে পারে যে ইচ্ছেটা দীঘির তলায় ঘুমিয়ে ছিল, সেটা ওপরে ভেসে উঠল। আমি তখনও বুঝিনি, তখনও কিছু দেখতে পাইনি। সেই ইচ্ছেটা ক্রমে ওর মুখে, পরে নানা আচরণে ফুটে উঠল, স্পষ্ট হল। আমি তখন তাকে দেখলাম, চিনতে পারলাম। একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি সত্যিই চাও? আমার বুকের মধ্যে রাখা ওর মুখ একবার যেন নড়ে উঠল। কথায় ও বলতে পারল না, ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে টের পেলাম, ও চায়, সত্যিই চায়। মৌনই সম্মতি। ওর ঠোঁটে হাত রাখলাম, কপালে, চোখে, বুকে, গালে। সর্বত্র ওর ইচ্ছেটা যেন কাঁপছিল। সেই ইচ্ছেটাকে আমি স্পর্শ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছেটা আমারও হলো; আমার দেহে মনে সঞ্চারিত হল। আমরা তখন থেকেই চাইতে থাকলাম।

"কিন্তু যাকে ডাকলাম সে এল না। কেউ এল না। কেউ-ও না।"

শচীপতি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, নিঃশেষিত-প্রায় গ্লাসটাকে আবার তুলে নিলেন হাতে। "একদিন যা ছিল স্বস্তির, পরে তাই-ই অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়াল। অবশেষে একদিন টের পেলাম, যে ইচ্ছেটাকে প্রয়াসের পৌনঃপুনিকতার মধ্য দিয়ে সত্য করে তুলতে চাইছি সে কোনদিনই সার্থক হবে না। বোবা অক্ষমতা আমাকে অস্থির করে তুলল। অনুভব করলাম, সতর্কতার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। দস্যুর ভয়ে দেয়াল তুলে অন্ধকারে যে বাস করে সে যেদিন টের পায় বৃথাই সে প্রাচীর তুলেছে, দস্যু কোথাও নেই, কোনদিন ছিল না, কোনদিন আসবে না তখন তার মনের শূন্যতা অনুভব করতে পার? ব্যর্থতাবোধও আমাকে ছেয়ে ফেলল। বুঝলাম ত্রুটি আমারই ভেতরে কোথাও আছে।"

"ত্রুটি যে আপনারই কী করে টের পেলেন?"—সৌর জিজ্ঞাসা করল। "ত্রুটি ত লতা বৌদিরও হতে পারে।"

"না, তার নয়।" শচীপতি ধীরে ধীরে বললেন, "আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, পরীক্ষা করিয়েছিলাম, জেনেছিলাম, নিষ্ফল আমি নিজেই।"

সৌর বলল, "ও।" অনেকক্ষণ কোন কথা হল না। সূক্ষ্ম বা স্থূল, কোনরকম বিচারশক্তিই তখন তার অবশিষ্ট ছিল না, তবু সামান্য একটু ধন্দ থেকেই গিয়েছিল। শুধু মাত্র সন্তান-হীনতাই কি একটা মানুষকে একেবারে ব্যর্থ করে দিতে পারে। বিশ্বাস হয় না।

এই অবিশ্বাসের ছাপ শচীপতি ওর মুখে লক্ষ্য করে থাকবেন। বললেন, "তুমি ছেলেমানুষ, সবটা তোমাকে খোলাখুলি বুঝিয়ে বলতে পারছি না। তা ছাড়া, নেশা কেটে এসেছে কিনা, আমারও বলতে বাধছে। একটু বসো।"

আবার সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে আবার বলতে শুরু করেছেন শচীপতিবাবু। তন্ময় সৌর শুনেছে।

শুনেছে, নিষ্ফলতা-বোধ কী করে একটি দাম্পত্য-সম্পর্ককেই মিথ্যা করে দিল।

(ক্রমশ)

ব্যক্তিগত

হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

ব্যক্তিগত কথাটার চারিদিকে গণ্ডি বাঁধা। অধিকার ও অনধিকারের প্রশ্ন দিয়ে জটপাকানো। শব্দটা যেন চক্ষু-লজ্জার বেড়াজাল। শুনলে দু দণ্ড চিন্তা করতে হয়। নাক বাড়াতে গিয়ে শেষে জুটবে নাকানি চোবানি, তাই এক পা এগোলে দু-পা পেছোই। পরম আগ্রহ নিয়ে চরম উদাসীন সাজি।

এ যদি এতই একান্ত ব্যাপার তবে পত্রিকায় ফলাও করে ব্যক্তিগত কলম ছাপা হয় কেন—ঢাকঢাক গুড়গুড় নিয়ে ঢাকঢোল পেটান—তাও গাঁটের কড়ি খরচ করে।

ইংরাজীতে অবশ্য দুটো নির্দিষ্ট শব্দ আছে। 'পারসোনাল' এবং 'কনফিডেন-সিয়াল'। শেষটার বাংলা অনুবাদ করা যায় গোপনীয় বা অপ্রকাশ্য। কিন্তু দুটোই অচল। ভাষার দৈন্য নয়, ব্যবহার বিধির কার্পণ্য। অপ্রকাশ্য কথাটা একটু ভালগার। গোপনীয়র মধ্যে ষড়যন্ত্রের আভাস। তাই ঝালে ঝোলে অম্বলে চালাতে হয় ব্যক্তিগত শব্দ।

ঘটনা দুর্ঘটনায় মাথাটা যখন ভারী হয়ে যায়, অথচ হাতে অফুরন্ত সময়, কি করব ভেবে পাই না। তখন হাল্কা কিছু খুঁজি। এ রোগের প্রেসক্রিপশন সবার জানা—ডিটেকটিভ বই খুলে বসলেই হয়। কিন্তু গোলাগুলি খুনজখমে ছোটবেলা থেকে আমার ভয়। সুতরাং স্বয়ং অশ্বিনীকুমার লিখে দিলেও ও বিধান আমার জন্যে নয়। এদেশের লোক সে সমস্যার সুচারু সমাধান করেছে। শব্দশৃঙ্খলা পূরণ করতে বসে। অনেকে কেবল শব্দশৃঙ্খলার তাগিদে কাগজ কেনে। সকালের কাগজেও মন ওঠে না। বিকেলে অফিস থেকে বেরিয়ে আড়াই পেনি দিয়ে কিনে নেয় সান্ধ্য পত্রিকা—'ইভনিং নিউজ', 'স্ট্যাণ্ডারড' বা 'স্টার'-এর যে কোন একটা। পাতা উল্টে বের করে নেয় ক্রস-ওয়ার্ড। তারপর গভীর মনঃসন্নিবেশ। ঠাসাঠাসি টিউবের মধ্যে ঢুকে বাঁ কনুই দিয়ে যখন ভিড় ঠেকায় ডান হাতে পেনসিল চলে শূন্যস্থান পূরণ করে।

একটা ঘটনা মনে পড়ল। বিলেতের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী সার অ্যান্থনী ইডেন-এর পদত্যাগ-এর কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সুয়েজ নীতির ব্যর্থতার ওপর অনেকে জোর দেন। কিন্তু তাঁর অসুস্থতাকে কোনমতে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সুয়েজের প্রতিক্রিয়া তিনি সহ্য করতে পারেননি। স্নায়ু তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। অসুস্থ হয়ে পড়েন। ডাক্তাররা চিন্তিত হয়ে পড়েন তাই তাঁর আশু পদত্যাগ। একে কাকতাল বললে বুঝতে হবে কাকই তাল ফেলার কর্মকর্তা। রাজনীতির তর্ক আমার লেখার উদ্দেশ্য নয়। মূল বিষয়বস্তু ভিন্ন। ইডেন খাঁটি মানুষ ছিলেন। কঠোর পরিশ্রম করতেন। অফিসের কাগজপত্র যতদূর সম্ভব নিজে দেখতেন। কেবল পারতেন না কাজের মধ্যে মনকে একটু বিশ্রাম দিয়ে নিতে।

চার্চিল এ বিষয়ে খুব দক্ষ ছিলেন। কাজের পাহাড়ে চাপা পড়েছেন, হঠাৎ ঘড়ির দিকে চেয়ে উঠে পড়লেন। লাঞ্চ খাবার

অবসরে মন থেকে ঝেড়ে ফেললেন বোঝা। তারপর বসলেন ক্রসওয়ার্ড পূরণ করতে। আধ ঘণ্টা বাদে যখন ফাইলের স্তূপে ফিরে এলেন তখন আর ক্লান্তি নেই।

আর কিছুতে না হোক শব্দশৃংখলা সমাধানে চার্চিলের চেলা হবার চেষ্টা করেছিলাম। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার কথা অমনি হয়ত আপনাদের মনে পড়ছে। অলংকার শাস্ত্র একথা মানতে রাজী নয়। উপমা কালিদাসস্য এবং কালিদাস স্বয়ং মহাকাব্য রচনার মুখবন্ধে নিজের সম্বন্ধে ওই মন্তব্য করে গেছেন। তবে এও ঠিক, উচ্ছৃংখল শব্দশৃংখলা পূরণ করতে গিয়ে মস্তিষ্কের বিশৃংখলা দেখা দিল—নার্ভের উত্তেজনা শিথিল করতে গিয়ে নার্ভাস হয়ে পড়লাম। তাই ওপথ ছাড়লাম। ধরলাম "ব্যক্তিগত" কলম পড়তে। কখন বা লেখা ছেড়ে লেখকের পেছনে মন ঘোরাফেরা করে। উক্ত ফেলে অনুক্তের আস্বাদ নেই—ইংরাজীতে যাকে বলে read between the lines। বিজ্ঞাপন ফেনিয়ে ছবি।

বাংলা কাগজে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের কলমে "ব্যক্তিগত" বিষয় থাকে না বললেই চলে। আমাদের দেশের ইংরাজী কাগজে অল্প সল্প ছাপা হয়, এদেশে "ব্যক্তিগত" বিজ্ঞাপনে কলম ভরে যায়।

অন্যান্য কাগজের প্রথম পাতার হেডলাইন পড়লেই বিশ্বের অর্ধেক খবর জানা হয়ে যায়। টাইমস সবার ওপর স্থান দিয়েছে জন্মমৃত্যু বিবাহের। তৃতীয় কলমে শুরু ব্যক্তিগত। প্রথমটা কিন্তু কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় এবং বিজ্ঞাপনও নয়—তত্ত্বকথা। ". . . . it is better, if the will of God so, that ye suffer for well doing, than for evel doing"—Peter iii 17

এক কথায় দাঁড়ায়, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। বা
"I am with thee, saith the Lord, to save thee".—Jeremiah XXXII.

যা ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায়, প্রভু বলিলেন,—জলে স্থলে অন্তরীক্ষে আমি তোমার সহায়।
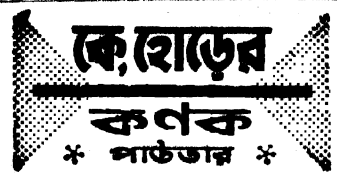
তারপরই হয়ত আছে, "শ্রীমতী পাওয়েল কোন, ডিউক এভিনিউ, লণ্ডন, স্বামীর মৃত্যুতে যারা সমবেদনা জানিয়েছে এবং ফুল পাঠিয়েছে তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে এবং অত্যন্ত দুঃখের সংগে জানাচ্ছে সংখ্যাধিক্যের জন্যে বর্তমানে তার পক্ষে সকলকে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।" বা "মেজর মেরিডিথ সহানুভূতিপূর্ণ চিঠির জন্যে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছে। যথাসময়ে প্রত্যেককে উত্তর পাঠান হবে।"

তারপরই পেলেন—

"সুবর্ণজয়ন্তীঃ শ্রী ও শ্রীমতী জে চার্লি চ্যাপলিন, অণ্টারিয়ো, কানাডা, পূর্বনিবাস হ্যাডেনহাম বাক্স, ইংলণ্ড ১৭ই অগাস্ট বিবাহের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ণ হওয়ায় তাঁহাদের সন্তান ডাঃ সি ই চ্যাপলিনের গৃহে উৎসবের আয়োজন করেছেন।"

অথবা দেখতে পেলেন—"এডিথ হোমস (কুমারী নাম মিনস) বিধবা, আকস্‌ব্রিজ রোড, মিডলসেক্স-এর বাসিন্দা, উক্ত ভবনে গত ২৫শে এপ্রিল দেহরক্ষা করিয়াছেন। প্রায় লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁর আত্মীয় যেন ট্রেসারি সলিসিটারের কাছে আবেদন করেন।

কোন সৌভাগ্যবতী রাতারাতি লক্ষপতি হবে তাই ভাবছিলাম। অমনি নজরে পড়ল—"আমি প্রতিদিন একটা করে গান রচনা করতে পারি। প্রয়োজন থাকলে যোগাযোগ করুন।" কিংবা—"সাংবাদিক প্রবন্ধ, রিপোর্ট, বক্তৃতা এবং পুস্তিকা লেখায় অভিজ্ঞ। লিখুন বক্স নম্বর...।" আরও দেখি, "বেস্ট সেলার বই-এর প্লট আছে মাথায়, একজন অভিজ্ঞ লেখকের সংগে যোগাযোগ করতে চাই।" "টেনজিং এভারেস্ট হিরোর অটোগ্রাফ দেওয়া স্লিপিং ব্যাগ। কত দাম দিতে প্রস্তুত? উইনওয়ার্ড, ম্যানসে, আকশন।"

"মৃতদার। ৬৮। ইঞ্জিনীয়ার। কর্মঠ। সময় কাটানর জন্যে যে কোন কাজ চায়। বিনিময়ে বাসস্থান। মাইনে বড় কথা নয়। যুক্তিসংগত কোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবে না।" "কৃষ্টিসম্পন্ন ইংরাজ বালিকা ২৬। গৃহকর্মে সাহায্যকারীর কাজ চায়। ছেলেদের দেখাশোনা করতে ভালবাসে। অভিজ্ঞ ঘোড়সওয়ার।" ছেলে দেখা আর ঘোড়ায় চড়ার মধ্যে যোগসূত্রটা খুঁজছিলাম। সোনায় সোহাগা না মণি ও কাঞ্চন। আবার পেলাম, "অল্পবয়স্ক, স্নাতক, শিক্ষিকা, প্যারালিসিস বেড়ে যাওয়ায় চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। শীঘ্র তাকে সেবা করার লোকের প্রয়োজন হবে। আপনার সাহায্য তার এবং তাদের মত অন্যান্য ভাগ্যহত মধ্যবিত্তদের একমাত্র সম্বল—ব্রিটিশ হোম এণ্ড হসপিটাল ফর ইনকিয়োরেবেলস্‌, ক্রাউন লেন স্ট্রেথাম।"

নদীর এপার এবং ওপারের বিসংবাদ স্থান কাল পাত্রের অপেক্ষা রাখে না। দেখতে পেলাম, "চার্টার্ড একাউণ্টেণ্ট। বয়েস ২৪। একাউণ্টেন্সি ছাড়া যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত, যে কোন দেশে যেতেও আপত্তি নেই।"

"যুবক ডাক্তার। বয়েস ৩৫। চিকিৎসা ব্যবসায়ে ঘৃণা ধরে গেছে। সাংবাদিকতা বা শিক্ষকতা করার বাসনা। তবে যে কোন কাজ গ্রহণে ইচ্ছুক।"

"কর্মপ্রিয়, সুশিক্ষিত, অবিবাহিত। ৩৮। ফ্যাক্টরি ম্যানেজার। কারখানার নোংরা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বীতশ্রদ্ধ। সামান্য সঞ্চয় দিয়ে ব্যবসা শুরু করার ইচ্ছা। পথ নির্দেশ চায়।"

কিছু কিছু আপাত দুর্বোধ্য বিজ্ঞাপনও দেখা যায়।

"ম—আমি কি ধন্যবাদ জানাতে পারি এবং কামনা করতে পারি ভগবান তোমার মংগল করুন।"

"র—ধন্যবাদ সাদরে গৃহীত হয়েছে, অবশ্য তার প্রয়োজন ছিল না।"

"০৯২—শুক্রবারের খবর শুভ। সবাই ভালো। ছুটি নেবার মত আবহাওয়া কই। শুভ কামনা। ম-৫০।

"প্রাণপ্রিয় বিল, অত্র কুশল। চমৎকার গরম পড়েছে। নিশ্চয় সব ভালো। ভালবাসা নিয়ো—এলি।"

"ম—চিঠি আশার অতীত। প্রতিনিধির কথা ভাবতেও আনন্দ। তবে শূন্যস্থান অপূরণীয়। তোমা বিহনে ভ্রমণ অর্থহীন। কিন্তু প্রেতাত্মা আঁকড়ে ধরে আছে। সংবাদের জন্যে উৎসুক থাকব। আশা করি, ভালো। প্রাণের ভালবাসা—বিল।"

"চ—অবিলম্বে ৩৯৩৭৯কে ফোন কর। আর ভয় নেই—হ।"

ব্যর্থ প্রেম ছেড়ে অন্য কিছু দেখা যাক। একদিন দেখতে পেলাম—"নেপোলিয়নের ব্যবহৃত জিনিস আছে। কেউ কি বলে দিতে পারেন কিভাবে তা বিক্রি করা সম্ভব।" আরও আছেঃ

"ভূতপূর্ব মডেল বন্য কেনাডিয়ান মিনক কোট বিক্রি করতে চায়। ৩৫০ পাউণ্ড" (প্রায় পাঁচ হাজার টাকা)। "ওয়েস্ট এণ্ড দুখানা শোবার ঘরযুক্ত লাকসারী ফ্ল্যাট। ভাড়া সপ্তাহে ৪০ পাউণ্ড" (মাসে দু হাজার টাকার ওপর)। সংগী তথা শিক্ষক ঃ দুজন ভারতীয় রাজকুমারীর (১৩, ১৪) জন্যে আবশ্যক। ভালো বংশের হওয়া চাই, সুশিক্ষিত এবং ৩৫ বছরের কম। ভারতবর্ষে দু বছর কাটাতে রাজী থাকা চাই।" রাজা বিনা রাজ্য চলে, স্বাধীন ভারতে রাজা বিনা রাজার সন্ধান পাওয়া যায়।

অন্যদিকে চোখ ফেরান যাক।

"কুমারী। ২২ বছর। দেশ ঘোরার শখ। কাজের বিনিময়ে বিদেশ যাত্রার খরচ চাই। কোন সৎকাজে বিতৃষ্ণা নেই।"

"মহিলা। যুবতী ৩৫। কৃষ্টিসম্পন্ন।

বি বি সি টেলিভিশনের গায়িকা। দেশ-ভ্রমণে অভিজ্ঞ। মানুষের সংগে মিশতে ভালোবাসে। প্রাইভেট পার্টিতে অংশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক—ককটেল বারে।"

ধনঞ্জ দেহি যে কথার উল্লেখ নেই। সুরা এবং সংগ পেলেই সন্তুষ্ট।

"সুদর্শনা ২৬। সুশিক্ষিতা। রসগ্রাহী। পার্টিতে প্রাণপ্রাচুর্য ঢেলে দিতে পারে। গাড়ি চালাতে সক্ষম। সেক্রেটারীর কাজে সুদক্ষ। বৈচিত্র্যপূর্ণ কাজ চায়। যে কোন দেশে যেতে প্রস্তুত। কোন কাজ করতে আপত্তি নেই—বে-আইনী না হলেই হল।"

ভাবছিলাম সীমারেখাটা কোথায়? একদিন দেখি ব্যক্তিগত কলমে লেখা "ধর্ম-যাজকরা সাবধান। বিশদভাবে জানতে হলে পঞ্চম কলম পড়ে দেখুন।" আচ্ছা তাই দেখা যাক ঃ

এই ইংলণ্ড!

"যাজকের দোষ"

আমি যাজককেই দোষ দেব। একটু উত্তেজিত তাই ল্যাজে কামড় দিয়ে গল্প শুরু করছি। গত মাসে একজন সৎ মিষ্টভাষী অমায়িক যাজকের সংগে মিলিত হই। তাঁর স্ত্রী অতিথিপরায়ণ। বিরাট বাড়ি। মস্ত বাগান। দুই ছেলে স্কুলে পড়ে। আদর্শ সংসার। কিন্তু আকাশ থেকে পড়লাম যখন শুনলাম, বছরে তিনি মাইনে পান মাত্র ৫২০ পাউণ্ড। এই সামান্য পয়সায় সংসার চালাতে হয়! আরও আছে। বিশ্বাস করতে বাধে সপ্তাহে ওই সামান্য দশ পাউণ্ডে চিঠি পাঠাবার ডাকটিকিট, টেলিফোন বিল এবং পেট্রোল খরচ যোগাতে হয়। যদিও তার অধিকাংশ খরচ হয় চার্চের আনুষঙ্গিক ব্যাপারে।

ভুল হয়ে গেছে। তাঁকে বাড়িভাড়া দিতে হয় না। কিন্তু এই মস্ত বাড়ির আজ দরজা রঙ করা, কাল জানলা সারান, পরশু জলের ট্যাংক মেরামত—সব ওই পয়সা থেকে। লম্বা রাস্তা আর বিস্তৃত বাগানটা সুসজ্জিত করে রাখার দায়িত্ব তাঁর। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এমন দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্যে এত সামান্য মাইনের বিজ্ঞাপন দিতেও লজ্জা বোধ করবে।

আরও কিছু খুঁজে পেয়েছি। মৃত ব্যক্তির সৎকার করে যাজক দক্ষিণা পান সাড়ে সাত শিলিং। যে চারজন কুলি গাড়ি থেকে শবাধার বহন করে আনে তারা প্রত্যেকে মজুরী পায় পনের শিলিং করে। কুলিরা ট্রেড ইউনিয়নের চাপে যখন তিন পাউণ্ড পাচ্ছে পুরোহিত পাচ্ছেন তিনটে হাফ-এ-ক্রাউন (আড়াই শিলিং-এর মুদ্রা)—এ কি দক্ষিণা না ভিক্ষা—ভগবানের প্রতি-নিধির উপযুক্ত মর্যাদা বটে!

নথিপত্রে চার্চটা সুপ্রতিষ্ঠিত। সুন্দর পল্লীর মধ্যে। আমার বদ্ধমূল ধারণা সেখানে সমবেত হন হৃদয়বান সুশিক্ষিত মধ্যবিত্তের দল। যদিও আমার সাহসে কুলোয়নি। তবে একথা কর্মকর্তাদের কানে তুললে তারা নিশ্চয় সহানুভূতি মিশিয়ে বলতেন—'তা ঠিক'। তারপর পরম গাম্ভীর্যের সংগে যোগ করতেন—'ব্যাপারটা আমার আয়ত্তের বাইরে। প্যারিস চার্চ কাউন্সিল সর্বেসর্বা। আর আমার কাছে খরচের যা লম্বা ফিরিস্তি রয়েছে তাই কি করে কুলে দেব ভেবে পাচ্ছি না।'

হায় ভগবান! আমি যদি যাজক হতাম! এবং আমার খরচের কথা বিবেচনা করতে কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করত। তা পরম বিনয়ের সংগে করলেও তাদের 'আমেন' বলার আগে নৈবেদ্যের ডালিতে আমার পদত্যাগপত্র পেশ করতাম।

এবার শেষ করি। প্রথমে যা বলেছি আবার তাই বলছি। দোষ ত যাজকদের। কেন তারা এ অবস্থা মেনে নেয়। মজার কথা, যতদূর আমি জানি, যাজকের কাজকে বলা হয় প্রাণপ্রাচুর্যময় বৃত্তি। হায় ভগবান! এরই নাম প্রাণপ্রাচুর্য। আমার যাজক বন্ধুরা অনেক সময় বহু বিলম্বে পত্রের উত্তর দেয়। কারণটা এতদিনে সুস্পষ্ট হল। আসলে সময়ের অভাব নয়, লেখার অনিচ্ছা নয়, অভাব ডাকটিকিট কেনার পয়সার।

শাঙ্গদেব

আজকাল কলকাতায় লোকসংগীত পরিবেশনের একটা বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই সব আসরে আমাদের মধ্যে প্রায়ই একটা বিতর্কের উদ্ভব হয়েছে যার সমাধান এ পর্যন্ত হয়নি। বিতর্কের বিষয় হচ্ছে এই যে লোকসংগীত যখন পরিবেশন করা হয় তখন তার আদিম এবং অকৃত্রিম রূপটি নাকি শতকরা একশ ভাগ কোনো ক্ষেত্রেই বজায় থাকে না, শ্রোতা এবং শিল্পীর রুচি অনুযায়ী কিছুটা পরিমার্জিত হয়ে একটু সুসংস্কৃত রূপ ধারণ করে। লোকসংগীতের এই রকম পরিবেশন মনোজ্ঞ হলেও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রকার পরিমার্জনার পক্ষপাতী নন। তাঁদের মতে লোকসংগীত মূলেত যে রকম থাকে পরিবেশনও ঠিক সেই রকম হওয়া উচিত নইলে ইতিহাস এবং লোকসংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষিত হয় না। অপর পক্ষের অভিমত এই যে স্থান, কাল, পাত্র ও স্তরভেদে পরিবেশন প্রণালীতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আনা নিতান্ত প্রয়োজন; তবে মূল সংগঠন, রূপ এবং আবেদনের তারতম্য যাতে না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রেখেই এই পরিমার্জনা করা উচিত।

এই ধরণের বিতর্কে কার মত ঠিক এবং কার মত ঠিক নয় সেটা নির্ধারণ করা সুকঠিন। মনে মনে বহু আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত ভাবলুম প্রকাশ্যেই এই আলোচনার অবতারণা করা যাক—দেখি সুধী পাঠকগণ এ বিষয়ে কি বলেন।

অ্যাকাডেমিক বা তত্ত্বের দিক থেকে বিচার করতে গেলে লোকসংগীতে এতটুকু অদলবদল করা চলবে না এটা ঠিক কেননা সেখানে লোকসংগীত গবেষণার বিষয়। নানা পরিপ্রেক্ষিতে তার যখন বৈজ্ঞানিক বিচার হচ্ছে তখন বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন মিশ্রণ আনা কোনরকমেই যুক্তিসংগত নয়। সেক্ষেত্রে এ সব গানের ঘটনাস্থল থেকে টেপ রেকর্ডিং করাই সবচেয়ে ভাল উপায়। কিন্তু এণ্টারটেনমেণ্ট বা রসসম্মত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এতটা যথাযথভাবে লোকসংগীতের অনুসরণ যে সব শ্রেণীর শ্রোতাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না এটাও পরীক্ষিত সত্য। এখানে এটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, শ্রোতারা হচ্ছেন বিদগ্ধ শহরবাসী এবং স্থান শহরের কনসার্ট হল। এই পরিবেশে কতকগুলি নিছক গ্রাম্য ভঙ্গি পরিবেশকের কণ্ঠে এসে বাধা পায় এবং সে সব ক্ষেত্রে রুচিসংগত পরিবর্তনটা প্রায় স্বাভাবিকভাবেই ঘটে যায়। স্থান, কাল, পাত্র অনুসারে শিল্পীকে আমরা এই একটু পরিবর্তন থেকে নিরস্ত করি কি উপায়ে? এতে যে লোকসংগীতের মূল-বৈশিষ্ট্য বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় এমন নয়। অতএব এই স্বাধীনতাটুকু শিল্পীকে ছেড়ে দিতে আমাদের দিক দিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের বোধহয় আপত্তি নেই। আগরতলায় থাকতে সাহেব আলি নামক একজন গ্রাম্য শিল্পীকে দু-একটি গান গাইতে শুনেছি যেগুলি শচীন দেববর্মণের রেকর্ডেও শুনতে পাওয়া যাবে। সেই প্রায় গ্রাম্য পরিবেশে আমাদের বাড়ির সজনে গাছের তলায় সাহেব আলির গান আমার ভালই লেগেছিল কিন্তু কলকাতায় সম্পূর্ণ অন্য পরিবেশে শচীন দেববর্মণের রেকর্ড চমৎকার লেগেছে। এখানে সাহেব আলির গান মানাবে না। আজকাল কেউ কেউ শচীন দেববর্মণের এই সব গানের মূল সংগঠন সম্বন্ধে অনেকরকম সন্দেহ ব্যক্ত করেন। কিন্তু শচীন দেববর্মণ স্বকীয় স্পর্শ যতটুকুই রাখুন না কেন লোকসংগীতের মূল আবেদনকে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করেননি এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যে সব গান তিনি প্রচার করেছেন সেগুলি কোন পরিবেশে গাওয়া হয় তা তিনি জানেন এবং ভিন্ন পরিবেশে সেগুলির স্থাপন করতে গেলে কি করা উচিত, তাও তিনি ভালভাবেই জানেন। নির্মল চৌধুরীর গান সম্বন্ধেও অনেকের অভিযোগ যে তিনি লোকসংগীতে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন এনে থাকেন। কিন্তু লোকসংগীত সম্বন্ধে নির্মলবাবুর পরিচয় এবং অভিজ্ঞতাও কম নয়। পরিবেশনের ব্যাপারে তিনিও সুদক্ষ। যাঁরা শিল্পী তাঁরা জানেন যে কোনও বস্তুর হুবহু নকল সব সময় সম্ভব হয় না, কিছুটা তারতম্য ঘটনা ও পরিবেশ অনুযায়ী হয়ে থাকেই, তাতে শাস্ত্র অশুদ্ধ হয় না। লোকসংগীত যখন ভিন্ন পটভূমিকায় একটা আর্টের উদাহরণস্বরূপ পরিবেশিত হয় তখন যে বৈষম্য দেখা দেয় সেটা অল্প নয়। গ্রাম এবং সহর, গ্রাম্যরুচি এবং নাগরিক রুচি, সুশিক্ষিত শ্রোতা এবং অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শ্রোতা, গ্রাম এবং নগরের সংস্কৃতি—এসবের মধ্যে আজও প্রভেদ বিস্তর। অতএব তর্কের খাতিরে যতই বলা যাক না কেন কাজের বেলায় শিল্পীকে একটু হিসেব করে সংগীত পরিবেশন করতে হবেই। আমাদের তো মনে হয় লোকসংগীতের ক্ষেত্রে শিল্পীর এই স্বাধীনতাটুকুকে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। তবে পরিবর্তন ততটুকুই করা যেতে পারে যতটুকু একান্তভাবে দরকার, তার বেশি নয়। আর, তার বেশি হলে শিল্পী নিজেই বাহুল্যের জন্য শ্রোতাদের কাছে নিন্দাভাজন হবেন, কেননা শিক্ষিত শ্রোতাদের কানও লোকসংগীত সম্বন্ধে কোনটা খাঁটি এবং কোনটা ভেজাল সেটা নির্ণয় করতে সমর্থ।

কিন্তু, এই স্বাধীনতাটুকুর সমর্থন করছি বলে পাঠকগণ ধরে নেবেন না যে লেখক সর্বক্ষেত্রেই এই স্বাধীনতার সমর্থক। অনুরূপভাবে যদি কোন শিল্পী রবীন্দ্রসংগীতের ক্ষেত্রে নিজের বিবেচনা অনুযায়ী পরিবর্তনপ্রয়াসী হন, তাহলে প্রবল আপত্তি জানাব। তখন অনাদিকুমার দস্তিদারের মত বলব—দোহাই আপনার রবীন্দ্রসংগীতের ওপর আর ইমপ্রুভ করতে যাবেন না। রবীন্দ্রনাথ যে স্তরে থেকে তাঁর সংগীত রচনা করেছন, আমরাও সেই একই স্তরের অধিবাসী। অতএব এখানে পরিবেশের তারতম্যের প্রশ্ন ওঠে না। এক্ষেত্রে যাঁরা পরিবর্তনে ইচ্ছুক হবেন তাঁদের ইচ্ছাটাই বড় কথা, কোন সমস্যা নয়। বিনা কারণে একটি মহৎ কম্পোজিসনকে পরিবর্তন করবার ইচ্ছাটা যে সদিচ্ছা নয় সেটা বলাই বাহুল্য। লোকসংগীতকে তার পরিবেশের বাইরে শৌখিনভাবে পরিবেশনের সমস্যা অনেক। সেই সব কারণেই তাকে একটু মানানসই করে নিতে হয়—এইটাই হচ্ছে লেখকের বক্তব্য।

পর্বত বিজয়ে হাতেখড়ি

প্রদ্যোৎকুমার রায়

একটা চলতি কথা আছে, Man proposes and God disposes কিন্তু গড্ যখন প্রপোজ করেন মানুষ তখন কি করে? দুরূহ প্রশ্ন। তবু মীমাংসা যেন আপনা থেকেই হয়ে যায়। স্বপ্নেও ভাবিনি, ঘরকুনো বাঙালীর ছেলে হঠাৎ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে সুযোগ পাব হিমালয়ের বুকে।

কলেজের অ্যানুয়াল পরীক্ষা প্রায় এসে গেল। মনে মনে বেশ ভয় হচ্ছিল। সারা-বছরের পড়াশুনার হিসাব নিকাশ করতে আতঙ্ক যে খানিকটা না হয় এমন নয়। এমনই সময়ে, এক রবিবার সকালে এন সি সি প্যারাডে নোটিশ পেলুম। আগামী শনিবার ৯ই মার্চ (১৯৫৭) পর্বতারোহণ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন হবে কলকাতা এন সি সি ক্লাবে। কি ভেবে নাম দিয়েছিলুম জানি না, তবে নাম দেওয়ার পর ভাবলুম, সুযোগ না হয় নাই পেলুম, সাহস করে ইণ্টারভিয়ু দিতে আপত্তি কি?

শনিবার ৯ই মার্চ। হুগলী মহসীন কলেজের চারজন ক্যাডেট কলকাতা এন সি সি ক্লাবে গিয়ে দেখল, পশ্চিম বাংলার সমস্ত ব্যাটেলিয়ন থেকে বহু ক্যাডেট এসেছে ইণ্টারভিয়ু দিতে। মনের মধ্যে যে কি আলোড়ন হচ্ছিল বোঝানো কষ্টকর। বোধহয় আশা নিরাশার দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলছিল!

ফার্স্ট বেঙ্গল ব্যাটেলিয়নের ইণ্টারভিয়ু হয়ে গেল। সেকেণ্ড বেঙ্গলও শেষ। এই-বার আমাদের পালা (থার্ড বেঙ্গল ব্যাটেলিয়ন)। এবার আমার ডাক। শুনে-ছিলুম দার্জিলিঙ পর্বতারোহণ শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ শ্রীজয়াল পরীক্ষা নিচ্ছেন—কি অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় কে জানে? যাই হোক, বুকের দুরু দুরু বুকেই চেপে রেখে 'স্যালুট' করে দাঁড়ালাম। এর জন্য এত ভয় পাচ্ছিলাম! অত্যন্ত সহজভাবে কয়েকটি প্রশ্ন তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন। মাত্র পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে নির্বাচনী পরীক্ষার পালা শেষ।

বেলা দুটো, মার্চের রোদ্দুর মাথার উপর, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন ক্রমশ হিম হয়ে আসছে। ইণ্টারভিয়ুর ফল এখুনি বার হবে। ওই যে পরীক্ষক বেরিয়ে আসছেন হাতে একটা কাগজ। একে একে এগারো জনের নাম পড়লেন তিনি। আশ্চর্য! তার মধ্যে আমার নামও রয়েছে।

সেদিনই ফোর্ট উইলিয়ামে এন সি সি সার্কল কম্যাণ্ডার গুরুদয়াল সিং আমাদের নির্বাচন সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানালেন। সেখানেই যাতায়াত খরচ ইত্যাদি পাওয়া গেল।

ক্লাস শুরু হবার মাঝে মাত্র একটি দিন সুতরাং পরদিন সকালেই রওনা হতে হবে। একটু কষ্ট করেই বাড়ির সম্মতি আদায় হল। তার পর?

ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকে বর্ধমান। বর্ধমান থেকে সকরিগলি ঘাট, তারপরে স্টিমারে মণিহারী ঘাট এবং অবশেষে শিলিগুড়ি হয়ে দার্জিলিঙ। চব্বিশ ঘণ্টার কিছু বেশী পথ।

ব্যাণ্ডেলে আমরা মাত্র দুজন ছিলাম। পথে অন্যান্য নির্বাচিত ক্যাডেটদের সঙ্গে দেখা হল। দার্জিলিঙে যখন নামলুম তখন আমরা সকলেই একত্র এবং একদিন আগে যাদের সঙ্গে পরিচয়মাত্র ছিল না তারা তখন আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

দার্জিলিঙ স্টেশনে আমাদের নিয়ে আসার জন্য মাউণ্টেনিয়ারিং কলেজের গাড়ি ছিল। কিন্তু ছোট একটি ল্যাণ্ডরোভার; এদিকে আমরা দশ জন, তৎসহ মালপত্র। সুতরাং প্রথম ব্যাচে আমাদের মালপত্র ও চারজন ক্যাডেট গেল। দ্বিতীয় ব্যাচের জন্য আমরা বাকি ছ'জন অপেক্ষা করে রইলুম।

ইতিপূর্বে দার্জিলিঙ আসার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কেন জানি না মনে হল পাহাড়ের কোলে এই ছোট্ট [illegible] সুন্দর শহরটি আমার জীবনে একটা বড়ো রকম [illegible] ছাপ রেখে যাবে। ল্যাণ্ডরোভারে চড়ে আ[illegible] স্টেশন থেকে রওনা হলাম। ড্রাইভার ছাড়া [illegible] একটি নেপালী ছেলে ছিল গাড়িতে—সে [illegible] শহর দেখাতে দেখাতে নিয়ে চলল।

অবশেষে লোকালয় পেরিয়ে একটি [illegible] জায়গায় এসে আমাদের গাড়ি থামল। আ[illegible] নেমে পড়লাম। উপরে চেয়ে দে[illegible] পাহাড়ের উপর একটি সুন্দর তিন[illegible] বাড়ি। পাহাড়ের গা দিয়ে রাস্তা উঠে গিয়েছে। সামনে একটি বড়ো সাইন বোর্ডে লেখা—

Indian Himalayan Mountaineering Institute, Darjeeling.

খাড়াই পথ ধরে বাড়িটা অবধি পৌঁছানোও কি পর্বতারোহণ শিক্ষার পর্যায়ে পড়ে?—সেখানে পৌঁছে হাঁপ ছাড়তে ছাড়তে ভাবলাম। বোধহয় কি রকম শিক্ষার সম্মুখীন হতে হবে তারই নমুনার একটা ভগ্নাংশ এই পথটুকু।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বাড়িটির দরজায় নেপালী দারোয়ান সেলাম করে দাঁড়াল। প্রত্যভিবাদন করে আমরা একটি ঘরে গিয়ে বসলাম। সুন্দর রুচিসম্মত-ভাবে সাজান গোছান ঘরটি। আধুনিক কায়দায় সোফা সেট রেডিও ইত্যাদি আছে। ঘরটির শোভা বহুলাংশে বাড়িয়ে দিয়েছে দেওয়ালে ঝোলানো চমৎকার পর্বতারোহণ বিষয়ক ছবিগুলি। প্রথম পরিচয় হল স্টোর ইনচার্জ শ্রীরায়ের সঙ্গে। তাঁর নির্দেশমত একটি লাল খাতায় আমাদের নাম ঠিকানা, বয়স, এন সি সি ট্রুপ নম্বর ইত্যাদি লিপি-বদ্ধ করে নেওয়া হল। তিনি উপরে নিয়ে গেলেন আমাদের যথানির্দিষ্ট ঘর দেখিয়ে

কাঞ্চনজঙ্ঘার উপত্যকা [illegible] অধ্যক্ষ শ্রীজয়াল, শ্রীতেনজিং (বাঁদিক থেকে ষষ্ঠ ও সপ্তম) ও শেরপা ওস্তাদদের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা

ঘরে জায়গা হল ...ডেটের। ফ্লাইং ক্যাডেট ...গর্লি, ক্যাডেট বিষয়ী, ক্যাডেট সফিয়াল, কম্পানী ...র তরফদার ও আমি যে যার সেই ঘরে গোছগাছ করে নিলাম। ...টি ঘরে কম্পানী সার্জেণ্ট মেজর ...ও সার্জেণ্ট সোম জায়গা পেলো। ...ন্যে এই ক'জন আমরা এক সময়েই ...ছি।

আজকাল ক... বেশনের এক... যায়। এই... একটা বি... এ পর্য... যে ... তখ... ন...

বেয়ারা এসে বলল—"লাঞ্চ রেডি, প্লিজ কাম ডাউন টু দি ডাইনিং হল।" প্রথমত একটু অবাক লেগেছিল—বেয়ারা পর্যন্ত ইংরেজী বলছে? তারপর বুঝলাম এই রকম কসমোপলিটান জায়গায় ইংরেজী একমাত্র মাধ্যম।

এরপর প্রথম দিন ডাইনিং হলের অভিজ্ঞতার কথা না বললে বর্ণনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বেশ একটু অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল বিলেতী টেবল ম্যানার্সের সম্মুখীন হয়ে। আর তা ছাড়া প্রথম প্রথম ছুরি কাঁটা 'ম্যানেজ' করা যে কি ব্যাপার ভুক্তভোগী মাত্রেই তা জানেন। অথচ এ অবস্থা কাউকে জানতে দেওয়া চলবে না—সে স্নাবারি পুরোমাত্রায় আছে। খাবার দিল—ভাত, ডাল, সব্জির তরকারি, স্যালাড, চিকেন কারি এবং অবশেষে পুডিং। মনে করুন—ঠিক যে জিনিসগুলো আপনি খেতে ভালোবাসেন, আপনার সামনে বসে অন্য একজন সেগুলো গলাধঃকরণ করছে আর আপনি অনভ্যস্ত হাতে ছুরি কাঁটা চালাচ্ছেন বলে ভালোভাবে খেতে পারছেন না। এত বিরক্তি লাগছিল কি বলব। বাধ্য হয়ে খুব তাড়াতাড়ি এই বিলেতী আদব কায়দা আয়ত্ত করে নিতে হয়েছিল। কিন্তু এই প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা মনে চিরস্থায়ী হয়ে রইল।

খাওয়ার পরে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে আগত অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে আলাপ হল। গাড়োয়াল থেকে এসেছেন সুবেদার নটিয়াল, কাশ্মীর থেকে ক্যাপ্টেন শাহ, নিউদিল্লী থেকে লেফটেনাণ্ট মল্লিকরাজ, পূর্ব পাঞ্জাব থেকে এসেছেন ক্যাপ্টেন খান্না, বম্বে থেকে কমাণ্ডার অফ ইণ্ডিয়ান নেভী জন পেরেরা (ইনি ১৯৪৮ অলিম্পিকে ইংলণ্ডের পক্ষ নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে হকি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন), বম্বে থেকে আরও এসেছেন পাইলট অফিসার বশিষ্ট, গয়া থেকে ক্যাপ্টেন দাস, ইনি বাঙালী। কলকাতা থেকে এসেছেন ক্যাপ্টেন গুরুং ও লেফটেনাণ্ট সরমা। বাঙ্গালোর থেকে এসেছেন এয়ারফোর্স অফিসার চৌধুরী, ইনিও বাঙালী। শিলিগুড়ি থেকে অপর একজন অফিসার এসেছেন তিনি হলেন ক্যাপ্টেন পন্থ।

শিক্ষাকেন্দ্রের পরলোকগত অধ্যক্ষ জয়াল

এ'দের মধ্যে ক্যাপ্টেন দাস ও ক্যাপ্টেন খান্না দু'জন ডাক্তার। বৈকালিক চায়ের পর জন পেরেরার সম্মতি নিয়ে আমরা শহর দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। বার্চহিলের উপর দিয়ে, রাজভবনের পাশ দিয়ে, চৌরাস্তা, ম্যাল রোড, বাজার ইত্যাদি ঘুরে ক্যাপিটাল সিনেমা হলের সামনে এসে পড়তেই বৃষ্টি শুরু হল। দার্জিলিঙ মজার জায়গা—এখানে মেঘের নোটিস না দিয়েই হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হয়। রাত আটটার মধ্যে হস্টেলে ফিরবার কথা অথচ বৃষ্টি থামবার নাম করে না। সুতরাং মোটরে করে ফিরতে হল।

শিক্ষাকেন্দ্রের ডাইরেক্টর শ্রী তেনজিং

ফিরেই রাতের ডিনার। পদগুলোর নাম করব না, আমার মত ভোজনবিলাসী অনেকেই আছেন, তাঁরা মনোকষ্ট পাবেন। গরম গরম কফি দিয়ে ভোজন পর্ব শেষ করে আমরা বিশ্রামের জোগাড় দেখলুম।

পরের দিন সকাল। অধীর হৃদয়ে অপেক্ষা করছি। আজ আমাদের অধ্যক্ষ, মাউণ্টেনিয়ারিং কলেজের ডিরেক্টর প্রভৃতিরা আসবেন এবং পর্বতারোহণের উপযুক্ত পোশাক পরিচ্ছদ আমাদের দেওয়া হবে।

ব্রেকফাস্ট সেরে ইনস্টিটিউটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। সকালের মিষ্টি রোদ্দুর গায়ে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে আর চোখের সামনে চিরবিস্ময় দিয়ে গড়া তুষার শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা। চোখ ফেরাতে ইচ্ছে হয়না তবু মাঝে মাঝে পথের দিকে চেয়ে দেখতে হচ্ছে প্রিন্সিপাল ও ডিরেক্টর আসছেন কিনা।

কিছুক্ষণ পরে একটি ল্যাণ্ডরোভার ও আর একখানি গাড়ি এসে দাঁড়াল ইনস্টিটিউটের সামনে।

অনেকজন নামল গাড়ি দুটি থেকে। তার মধ্যে একজনকে খুবই চেনা চেনা লাগছে! ইনিই না বিশ্বখ্যাত শ্রীতেনজিং নোরগে যিনি হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের চূড়ায় ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়ে এসেছেন? ঘুচিয়ে দিয়েছেন এভারেস্টের অপরাজিত গৌরব! শ্রীতেনজিং নোরগে এই ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর। এরপর পরিচয়ের পালা। জগতের প্রতি প্রান্ত যে লোকটির নাম জানে তাঁর সঙ্গে হাত মেলাতে পেয়ে দেহের প্রতি শিরাতে যে আনন্দ হিল্লোল বয়েছিল তা বোঝাব কি করে?

হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এন সি সি ক্যাডেট?"

আমি বলি, "ইয়েস স্যর"

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, "ইয়োর নেম?" নাম বললাম। তারপর তিনি বললেন হিন্দিতে "পাহাড় মে চড়নে সেকেঙ্গে?" তৎক্ষণাৎ জবাব দিই, "জরুর সার।" এরপর আমরা ইনস্টিটিউটের লেকচার রুমে (এ ঘরটি কাচের তৈরী) গিয়ে যে যার আসন নিই। অধ্যক্ষ জয়াল প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে কিছু বললেন।

১৯৫৩ সালে এভারেস্ট বিজয়ের পর ভারত সরকার দার্জিলিঙে এই পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রটি স্থাপন করেন। তত্ত্বাবধায়ক হন আন্তর্জাতিক গৌরবসম্পন্ন পর্বতবিজয়ী শ্রীতেনজিঙ। সভাপতি হলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, সহ-সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিধানচন্দ্র রায়। তা ছাড়া, কমিটির মধ্যে আছেন সিকিম, নেপাল ও ভুটানের মহারাজারা। এই প্রতিষ্ঠানের টার্ম বিয়াল্লিশ (৪২) দিন। প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভারের শতকরা সত্তর ভাগ

কেন্দ্রীয় সরকার বহন করেন, বিশ ভাগ দেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বাকি দশ ভাগ ডোনেশন থেকে সংগ্রহ হয়।

এরপর তেনজিংকে কিছু বলতে অনুরোধ করলেন অধ্যক্ষ। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, "আমার কাজ বক্তৃতা দেওয়া নয়, আমার কাজ পাহাড়ের উপরে।" তিনি বললেন, তাঁর আমেরিকা যাবার প্রোগ্রাম তিনি বাতিল করে দিয়েছেন এবং আমাদের সঙ্গেই তিনি যাবেন। অপরাপর শেরপা ইনস্ট্রাকটরদের সঙ্গে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এরপর আমাদের পোশাক পরিচ্ছদ দেওয়া হল। এয়ার ম্যাট্রেস, উইন্ড প্রুফ জ্যাকেট, ফেদার জ্যাকেট, স্লিপিং ব্যাগ, গরম ট্রাউজার, মাউন্টেনিয়ারিং বুট ইত্যাদি আটত্রিশ রকমের জিনিস।

পরদিন থেকে আমাদের রুটিন শুরু হল। দার্জিলিঙে সাতদিন ক্লাশ হয়েছিল নানা বিষয়ের। তখন আমাদের দৈনিক কর্মসূচী ছিল—সকাল ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত পি টি (ফিজিক্যাল ট্রেনিং) অবশ্য এন সি সি পি টি নয়। মাউন্টেনিয়ারিং বুট পরে পিঠে রুক স্যাকে তিনখানা কম্বল নিয়ে দার্জিলিঙ পাহাড়ের রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলা। তারপর আটটায় ব্রেকফাস্ট। নটা থেকে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত লেকচার। বারটায় লাঞ্চ। তারপর দুটো থেকে চারটে পর্যন্ত পুনরায় লেকচার। সাড়ে চারটেয় বৈকালিক চা। তারপর বেড়ান অথবা বিশ্রাম। রাত আটটায় ডিনার তারপরে মজা করে ঘুম। প্রিন্সিপাল বেশ কড়া লোক, প্রায়ই পড়া ধরতে ছাড়েন না, এদিকে অথচ বেশ মাইডিয়ার লোক।

এ সময় মাঝে মাঝে ক্যাপ্টেন সিনেমার আমাদের নানাপ্রকার ফিল্ম, অ্যাডভান্স কোর্স ইত্যাদি দেখান হত। পার্বত্য বনজন্তু ও পশু পক্ষী সম্বন্ধে দার্জিলিঙ ন্যাশনাল মিউজিয়ামে শিক্ষা দেওয়া হত। পাহাড়ি গাছ, ফুল ফল ইত্যাদি সম্বন্ধে শেখানো হত বটানিকাল গার্ডেনে।

১৭ই মার্চ: পরদিন আমাদের ব্যবহারিক (প্র্যাকটিক্যাল) জ্ঞান অর্জনের জন্য হিমালয়ের বুকে পাড়ি জমাতে হবে। আজ সম্পূর্ণ ছুটি। আমাদের কলেজের প্রাক্তন প্রফেসর দীপ্তিভূষণ দত্ত আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। দার্জিলিঙ শহর থেকে গোটা কতক প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নিলাম। চুল ছেঁটে নিলাম ভালো করে—কারণ আগামী এক মাসে আর চুল ছাঁটা হবে না।

১৮ই মার্চ, ভোর বেলা। স্বপ্ন দেখছিলুম অপরাজেয় কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে গিয়ে পৌঁছেছি আর নীচে থেকে সঙ্গীদল হুল্লোড় করে আমাকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছে। হৈ চৈ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলাম কুলিরা এসে গিয়েছে। সামনের জানলা

দার্জিলিং থেকে ৭।৮ মাইল দূরে প্রথম বিশ্রাম—পিছনে তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা

দিয়ে চেয়ে দেখলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার শীর্ষে সোনার রোদ্দুর এসে পড়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা যেন হাসিমুখে আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে।

বেড টি খেতে খেতে সেই দিকে চেয়ে আছি, আমার ইনস্ট্রাকটর মিঃ আংথাপ্পা এসে ডাকলেন, "হ্যালো মিঃ রায়, কি দেখছো? ভয় কোরো না কিছু।" তিনি আমার কিটস্ ঠিকমত প্যাক করে দিলেন, আমিও যথাশীঘ্র তৈরী হয়ে নিলাম। এক একজন ইনস্ট্রাকটরের অধীনে ছ'জন করে শিক্ষার্থী। আমার গ্রুপে আছেন আমি ছাড়া, ক্যাপ্টেন গাই, ক্যাপ্টেন পন্থ, ক্যাডেট গাঙ্গুলি, ক্যাডেট ব্যানার্জি ও সি এস এম তরফদার।

আমাদের কিটস্ ২০ পাউন্ডের বেশি হওয়া চলবে না। কারণ এক একজন কুলি তিনটি করে কিটস্ ও নিজের জিনিসপত্র নেবে। আমার রুক স্যাকের ওজন হল সাতাশ পাউন্ড। বেশ ভারি লাগছে। মনে হচ্ছে এত ওজন বয়ে ভারি ভারি বুট পরে উঠতে পারবো তো?

ভালো ভাবে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম—আজ বহু দূরে যেতে হবে। সঙ্গে লাঞ্চ দিয়ে দিল, একটি অমলেট, দুটি কলা, দুটি কাটলেট, দুটি সিদ্ধ আলু ও চারটি টোস্ট। আমরা সকলে শর্টস, পুরো মোজা, পি টি কের্ডস্, শার্ট ও সোয়েটার পরে পিঠে রুক-স্যাক বেঁধে, হাতে আইস অ্যাক্স নিয়ে নিচে নেমে এলাম। কুলিরা গোল গোল ছোট ছোট চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। মিঃ তেনজিঙের সাথে দেখা হল। তাঁর পরণে নীল গরম শর্টস, লাল গরম সার্ট, রঙ্গীন মোজা, লাল জুতো ও মাথায় সাদা রঙের উলেন ক্যাপ। সঙ্গে তাঁর কুকুর, কুকুরটাও যাবে। যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থানের পথের সঙ্গী যেন। 'গুড় মরনিং' জানালাম মিঃ তেনজিঙকে। হাসতে হাসতে প্রত্যভিবাদন করলেন তিনি। প্রিন্সিপালকেও সম্ভাষণ জানালাম। প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, কোয়ার্টার মাস্টার চৌধুরী কুলিদের সঙ্গে সার।" ইনস্ট্রাকটররা এবং আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার চৌধুরী কুলিদের সঙ্গে ব্যবস্থাদি করতে ভীষণ ব্যস্ত।

সত্তর জন কুলি মালপত্র নিয়ে লাইন করে নামতে লাগল পথ ধরে। ইনস্টিটিউটের বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রিন্সিপাল আমাদের বহু প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন এবং নানা করণীয় কাজ স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারপর শ্রীতেনজিঙ আধা হিন্দী আধা ইংরেজীতে কয়েকটি কথা বললেন: তিনি বললেন, "দেখিয়ে আপলোগ প্লেন ল্যান্ড কা আদমি হৈঁ, বড়িয়া বড়িয়া ফ্যামিলিসে আ রহে হৈঁ। আপলোগ্ পাহাড়, আগ ঔর পানি সে দিল্লাগি মৎ কিজিয়ে, নহী তো আগ, পানি ওর পাহাড় আপলোগোঁ কো জান লেকে দিল্লাগি করে গা।" (অর্থাৎ, আপনারা সমতল ভূমির লোক, ভাল ভাল পরিবার থেকে আসছেন। আপনারা পাহাড়, আগুন আর জল এই তিন বস্তুর সঙ্গে তামাশা করবেন না, তাহলে পাহাড়, আগুন ও জল আপনাদের প্রাণ নিয়ে তামাশা করতে পারে।)

চারজন ওস্তাদ—বামদিক থেকে: শ্রীআথোপ্পা, শ্রীদানুগিয়াল, শ্রীতোপকে ও শ্রীগালছেন

তিনি আরও বললেন, সমতল ভূমির বহু লোক ভালো ভালো ক্যামেরা নিয়ে দার্জিলিঙ, মুসৌরি, হরিদ্বার বেড়াতে যায় এবং সেখান থেকে ফটো তুলে নিয়ে গিয়ে দেশে দেখায় আর বলে—'দেখো আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম।' কিন্তু তারা জানে না হিমালয়ের প্রকৃতি কেমন, আবহাওয়া কেমন, সেখানে থাকলে প্রকৃত পক্ষে কেমন লাগে। ওই যে সামনে কাঞ্চনজঙ্ঘা পাহাড় দেখা যাচ্ছে এখান থেকে তার খুব ভালো ফটো নেওয়া যায়; কিন্তু সে ফটো নকল। আসল ছবি নিতে গেলে এখান থেকে একশ মাইল যেতে হবে। আপনারা দেখতে পাবেন আসল পাহাড় কেমন, কি করে তাতে চড়া যায়; আপনারা পাহাড়ের সব কিছু জানতে পারবেন। পরিশেষে বললেন, "আপলোগ্ ডর মৎ কিজিয়ে, আপলোগ্ হিন্দুস্থানকে নওজোয়ান হৈঁ।"

প্রিন্সিপাল ও তেনজিঙের সাথে আমাদের একটি গ্রুপ ফোটো তোলা হল। তারপর ইনস্ট্রাকটর গালছেনের নেতৃত্বে আমাদের দল রাস্তায় নামল।

আমাদের পর্বতারোহী দলটি নেহাত ছোট নয়—সত্তর জন কুলি, একুশ জন শিক্ষার্থী, ছ'জন ইনস্ট্রাকটর এবং শ্রীতেনজিঙ। প্রায় একশ জন লোক। পথের পাশে পাশে দাঁড়িয়ে দার্জিলিঙের পথচারীরা আমাদের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কি ভাবছে ওরা কে জানে?

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পাশের রাস্তা দিয়ে নামছি। আজ অনেকদূর যেতে হবে, আর সমস্ত পথটাই উত্তরাই অর্থাৎ নামবার রাস্তা। ক্রমশ গতিবেগ বাড়ছে। কেউ কেউ গান জুড়ে দিয়েছে। ছোট ছোট নেপালী বস্তির ভেতর দিয়ে যাচ্ছি আমরা বেশ গরম লাগছে। ঘণ্টা দুই চলবার পর এক জায়গায় সামান্য বিশ্রাম নিলাম আমরা, সোয়েটার ও জামা খুলে শুধু গেঞ্জি পরে চলতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে চা-বাগান। সেখানে নেপালী মেয়েরা অদ্ভুত সুরে গান গাইতে গাইতে চা গাছের কচি কচি পাতা কাটছে, পিঠে তাদের ঝুড়ি বাঁধা।

আমরা নামছি তো নামছিই, পথ শেষ হবার নাম নেই। পায়ের হাঁটুগুলো যেন গরম হয়ে উঠছে, বেশ ব্যথা করছে। ভয় হতে লাগল—সামান্য এইটুকু চলতেই হাঁটুর এই অবস্থা, এর পরে কি করব? আর কোন জনবসতি দেখা যাচ্ছে না। অনেক নীচে

একটি রূপোলী সুতোর মত নদী দেখিয়ে ইনস্ট্রাকটর বললেন—আজ ওই নদী পার হতে হবে। বলে কি! আরও অত নীচুতে নামতে হবে? ওয়াটার বটল খুলে জল খেলাম—পুরো বোতল ভর্তি জল শেষ হয়ে গেল। বেলা প্রায় এগারটা। গতকাল ক্যাডেট গাঙ্গুলি কোয়ার্টার মাস্টার চৌধুরীকে ক্যারম খেলায় হারিয়ে এক পাউন্ড চকোলেট বাজি জিতেছিল। তাই খেতে খেতে আমরা নামছি। যে রাস্তা দিয়ে আমরা যাচ্ছি সেটা ভারত সিকিম সীমান্তে যাবার পথ। জীপ বা ল্যান্ড রোভার চলতে পারে। যত নীচে নামছি নদীর গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। ক্রমশ সেই গুঞ্জন গর্জনে পরিণত হল। বেলা প্রায় সাড়ে বারটার সময় আমরা তিস্তা নদীর প্রথম ব্রীজ পার হলাম। এই ব্রীজটি ঝুলন্ত (Hanging bridge)।

এবার চড়াই পথ। এতক্ষণ প্রায় সকলেই গান গাইতে গাইতে বা ঠাট্টা তামাশা করতে করতে পথ চলছি—এখন সমস্ত বন্ধ হয়ে গেল। প্রচণ্ড গরম, বেশ কষ্ট হচ্ছে, আর তা ছাড়া পায়ের হাঁটু দুটিও যেন ব্যথায় গরম হয়ে উঠেছে। অসহ্য ক্লান্তি চেপে রেখে ধীরে ধীরে পা ফেলে কোনক্রমে উঠতে হচ্ছে। তারপর দেখি শুধু আমি নয়, দল-শুদ্ধ সকলেরই প্রায় একই অবস্থা। প্রত্যেকেরই দেখলাম মুখ শুকিয়ে গেছে।

বেলা একটায় পৌঁছলাম শিংলা নয়া বাজারে। এখানে চার পাঁচটি দোকান রয়েছে আর কয়েকটি কাঠের বাড়ি। একটি দোকানে আমরা চা খেলাম। তেনজিং জিজ্ঞাসা করছেন "কেমন লাগছে?" আমার তখন প্রাণ যায় যায় অবস্থা, রুকস্যাক যেন পাথর দিয়ে ভরা আর যেন নড়তে পারছি না। তবু মুখে হাসি ফুটিয়ে জবাব দিই, "বেশ ভালোই আছি।" অনেক অফিসার দেখলাম ক্লান্তি দূর করতে বটগাছের তলায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছেন।

আবার চলা শুরু হল, বেশ কিছুদূরে এগিয়ে দেখি সামনে একটি চমৎকার বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। শুনলাম এটি ভারত সীমান্তের শেষ পুলিস স্টেশন ও পোস্ট অফিস। ইনস্ট্রাকটর গালছন বললেন—আমরা প্রায় আমাদের ক্যাম্পের জায়গায় পৌঁছে গেছি। বাস্তবিকই তাই, কিছুদূর এগুবার পরই দেখা গেল একটি সুন্দর নরম সবুজ ঘাসের কার্পেট বিছানো মাঠ আর তার পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দে দুরন্ত বেগে একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। এই মাঠেই আমাদের প্রথম ক্যাম্প হবে। আরাম করে নদীর জলে স্নান করে একটি দ্বীপের মত পাথরে বসে আমরা লাঞ্চ খেলাম। পাথরটির দুধার দিয়ে পাহাড়ি নদী দুরন্ত বেগে বয়ে যেতে লাগল।

আমাদের কুলিরা এসে পৌঁছালো। এদের মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক। তাদের কর্ম-ক্ষমতা ও শক্তি দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। তাদের কাছ থেকে যে যার কিট্স বেছে নিয়ে এলাম। তেনজিং-এর নির্দেশে ঠিক হল একটি তাঁবুতে দুজন করে থাকবে। আমার পার্টনার হল আমাদেরই সি এস এম তরফদার। তাঁবুগুলির মেঝে, বাতাস, জল ও বরফ প্রতিরোধ করবার মত করে তৈরী। এয়ার ম্যাট্রেস ফুলিয়ে শুয়ে পড়লাম তাঁবুতে। শরীর ঠাণ্ডা রাখার জন্য সকলকে লেমন ওয়াটার দেওয়া হচ্ছে। ওদিকে রান্নার ব্যবস্থাও হচ্ছে—দিব্যি পাথরে উনুন বানিয়ে। খানিকক্ষণ বাদে চায়ের বাঁশি পড়ল। চা ও চারখানা বিস্কুট দিয়ে জলযোগ সেরে সীমান্তে বেড়াতে গেলাম। নদীর এপারে ভারতবর্ষ ওপারে সিকিম। এপারে W. B. P. লেখা পশ্চিমবঙ্গের পুলিস দাঁড়িয়ে, ওপারে সিকিমের বর্ডার-ম্যান S. S. P. সিকিম স্টেট পুলিস। সিকিম পুলিসের পরিধানে খাকি পোশাক, মাথায় এন সি সি'র মত অলিভ গ্রীন টুপি। বর্ডারম্যানদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করলাম, সিকিম বর্ডারম্যান আমাদের ভাষা বুঝতে পারলো না।

ক্রমে পাহাড়ের বুকে সন্ধ্যা নেমে এলো। এই বিস্তীর্ণ পটভূমিকা যেন বুঝিয়ে দিল বিজ্ঞান মানুষকে এত উঁচুতে উঠিয়ে নিয়ে এলেও মানুষ এখনও প্রকৃতির ক্রীড়নক মাত্র।

সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। ডিনারের বাঁশি পড়ল। নিজের নিজের বাসনপত্র নিয়ে লাইন করে খাবার নিলাম। মনে হচ্ছে আমাদের এন সি সি ক্যাম্পের কথা। খোলা মাঠে মাটির উপর বসে গরম খাবার খাচ্ছি। আহা, যেন অমৃত।

খাওয়ার পর শ্রী তেনজিং বলে দিলেন, আগামীকাল ভোর পাঁচটায় বেড সাইড টি, সাড়ে পাঁচটায় ব্রেকফাস্ট এবং সাড়ে ছটায় স্টার্ট।

(ক্রমশ)

ট্রামে-বাসে

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ স্বপ্নের ভারত গঠনের জন্য ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছেন। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"স্বপ্নের ভারত নির্মাণে ত্যাগের প্রয়োজন নেই। সমস্যা হলো বাস্তব ভারতকে নিয়ে। শুনেছি, কোন ব্যক্তির লুচি ভক্ষণের স্বপ্ন বাস্তবে কাঁথা চিবোনতে পরিণত হয়েছিল।"

* * *

সংবাদে প্রকাশ, প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লী এবং কলকাতায় চলমান মৎস্য-শিকার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।—"মাছ ধরাটা প্রদর্শনীর বিষয় বলেই গণ্য হবে তার লক্ষণ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অতঃপর মৎস্য সম্বন্ধে তৃতীয় রিপোর্টকে যাতে কেউ প্রশ্রয় না দেয় তার জনাই প্রদর্শনীর মারফতে লোকশিক্ষা দেওয়া হলো কিনা তা ঠিক বোঝা গেল না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শ্রী জিতপ্রসাদ জৈন মহিলা খাদ্য পরিষদের অধিবেশনে ঘোষণা করিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আমাদের এক সহযোগী বলিলেন—"মহিলা খাদ্য পরিষদ হয়ত হাতা-বেড়ি নিয়ে তৈরি হয়েছেন। কিন্তু লাঙ্গল জোয়াল নিয়ে যারা তৈরি হবেন তারা যে পরিষদের ধারে কাছেও ছিলেন না"!!

* * *

একটি নূতন আবিষ্কার সংবাদ শুনিলাম, পৃথিবীটা গোল নয়, নেশপাতির মতো। শ্যামলাল বলিল—"অথচ

পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো এই কথাটা প্রাণপণে মুখস্থ করবার জন্য বহু বছর আগে একটি ছেলেকে পড়তে শুনেছি—পৃথিবীটা.ক, পৃথিবীটা.ক, মলালে, মলালে, বুর মতো"!!

* * *

শ্রী নেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, অর্থের পরিমাপে মানুষের মর্যাদার মান নির্ণয় অবশ্যই নিন্দনীয়।—"আমরা কিন্তু হালচাল দেখে

ময়মনসিংহের স্বর্গত কবি রামু মালীর টপ্পার একটি চরণ ভুলতে পারছিনে। তিনি গেয়েছিলেন—"টাকা থাকলে রামমাণিকবাবু, টাকা না থাকলে হয় রামা।" এই প্রসঙ্গেই তিনি অন্যত্রও বলেছেন—"গণ্ডমূর্খ ভেড়াকান্ত, হয় যদি সে লক্ষ্মীমন্ত, সভার মধ্যে বসলে পরে দশজন তারে "হয় হয়" করে!"

* * *

আই এফ এ শীল্ডের স্থগিত খেলায় ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে এক গোলে পরাজিত করিয়া শীল্ড পাইয়াছে।

আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"সংবাদপত্র না পড়েই সংবাদটা আঁচ করেছিলাম। সরস্বতী পুজোর দিনের জোড়া ইলিশের আগেই দেখেছি ইলিশের বাজারে কাড়াকাড়ি"!!

* * *

শিল্ড প্রদানের সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী মহাশয় শ্রোতাদের শুনাইয়াছেন যে, সরকার নাকি কলিকাতা স্টেডিয়াম নির্মাণের কথা নূতন করিয়া চিন্তা করিতেছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"বাণিজ্যমন্ত্রী মশাই বোধ হয় জানেন না যে, কোলকাতার মাটি স্টেডিয়াম নির্মাণের পক্ষে উপযোগী নয়। তাছাড়া, স্টেডিয়ামটা আমাদের সয়ও না।" আমাদের অন্য সহযাত্রী বুঝাইয়া বলিলেন—"মানে, আমাগো আসা নাই আর কি"!!

* * *

অন্ধতা নিরোধ সংস্থার সেক্রেটারী শ্রী মুন্সী বলিয়াছেন যে, ১৯৩১ সাল হইতে এই পর্যন্ত অন্ধদের কোন পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয় নাই। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"স্বাভাবিক অন্ধের সঙ্গে রাজনৈতিক মতলবী অন্ধদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে, কাগজের দুষ্প্রাপ্যের বাজারে অন্ধদের পরিসংখ্যানটাই বাদ দিতে হয়েছে"!!

* * *

ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল চতুর্থ টেস্টে জয়লাভ করিয়া রাবার লাভের গৌরব অর্জন করিয়াছেন। বিশ্বখুড়ো বলিলেন—"আলেকজেন্ডারের দিগ্বিজয় সম্পূর্ণ হলো। সৈন্যাধ্যক্ষ আলেকজেন্ডার একদিন বলেছিলেন—সত্য সেলুকস, কী বিচিত্র এই দেশ — — — অগণ্য উজ্জ্বল জ্যোতিঃপুঞ্জে যখন এর আকাশ ঝলমল করতে থাকে তখন আমি বিস্মিত আতঙ্কে চেয়ে থাকি। অধিনায়ক আলেকজেন্ডারও হয়ত বলেছিলেন—সত্যি কী বিচিত্র এ টিম! হলু গিলক্রিস্টের বলের সামনে যখন এরা কাঁপতে থাকে তখন আমি অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।"

* * *

ইংলন্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলায় প্রাক্তন ফাস্ট বোলার লিন্ডওয়ালকে আবার টিমে নেওয়া হইয়াছে। লিন্ডওয়াল নাকি বলিয়াছেন যে, এই গৌরব তাঁর স্ত্রীরই প্রাপ্য। তিনিই তাঁকে তাগিদ দিয়া দিয়া সকালে ঘুম হইতে উঠাইয়াছেন, পাহাড়ে উঠা-নাবা করিয়া শরীরটাকে মজবুত রাখিতে সাহায্য করিয়াছেন ইত্যাদি প্রভৃতি। শ্যামলাল বলিল—"আমরা শুধু স্ত্রী ভাগ্যে ধনের কথাই ভেবেছি, ফাস্ট বোলারের কথা ভাবিনি"!!

* * *

আই এফ এ শীল্ডের খেলায় দু পক্ষের খেলোয়াড়রাই নাকি খুব মারামারি করিয়া খেলিয়াছেন।—"প্রসঙ্গত মনে পড়িল, বহু বছর আগে ইস্টবেঙ্গলের শ্রী গুহ যখন বলেছিলেন যে, মোহনবাগান হলো ইস্টবেঙ্গলের বড়দার মতো তখন আমরা বলে-

ছিলাম—তিনি তো ভাই পাতালেন, কিন্তু অন্যরা যে স্ত্রীর ভাই পাতিয়ে রেখেছে। এই প্রসঙ্গে চক্রপাণি 'অকালের খেলায়' লিখেছেন—রেফারী বোধ হয় মাঠে ছিলেন না। আমরা বলি ছিলেন। আর তিনি অর্থাৎ রেফারী বলেন ছিলাম, কিন্তু দিয়েছি সবারে আপন বুকেতে ফুটিতে"!!

শ্রীকৌটিল্য

বাঙলা দেশের অর্থনীতির ছাত্রদের কাছে গত সপ্তাহের সবচেয়ে বড় খবর হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলন উৎসব। গত ৩১শে জানুয়ারী এবং ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে অর্থনীতি বিভাগের নবনির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে এই পুনর্মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবল একটিমাত্র বিভাগের জন্য নূতন ভবন নির্মাণ করা থেকে জাতীয় জীবনে অর্থনীতিবিদদের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের স্বীকৃতি বোঝা যায়। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় বাঙলা দেশের অর্থনীতিবিদেরা তাঁদের যোগ্য ভূমিকা পালন করছেন কিনা। এই প্রশ্নের আলোচনা করবার আগে সাধারণভাবে এবং ভারতবর্ষের বর্তমান বিশেষ অবস্থায়, অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা দরকার (অর্থনীতিবিদ বলতে আমরা এখানে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ-গুলিতে শিক্ষকরত অধ্যাপকদের কথাই প্রধানত বলছি)।

একটা মত এই হতে পারে যে, অর্থনীতি-বিদ মুখ্যত কেবলমাত্র জ্ঞানানুশীলনের জন্যই অর্থনীতির চর্চা করবেন—তাঁর গবেষণার ফল যদি দেশের আশু সমস্যার সমাধানে ব্যবহার করা যায়, তবে সেটা উপরি লাভ। দ্বিতীয় আর একটা মত হতে পারে এই যে, অর্থনীতিবিদের সমস্ত গবেষণা প্রভৃতির প্রধান উদ্দেশ্য হবে আমাদের বর্তমানের জরুরী সমস্যাগুলির সমাধান করা। যদি একথা মেনে নেওয়া হয় যে, অর্থনীতির চর্চা একেবারে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা নয়, তবে একথাও মানতে হয় যে, সমসাময়িক সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারে, এমন গবেষণাই আমাদের বেশী প্রয়োজন। প্রসঙ্গত অধ্যাপক মহলানবীশের একটি বিখ্যাত উপমা মনে পড়ছে :

When a practising physician gives medical treatment to a patient he uses much scientific knowledge, and may even do some research, but his chief aim is to cure the patient. His observations or experiments on the patient may add to medical knowledge but the treatment given is not primarily for purposes of research. The distinction is important.

কিছুদিন আগে (খুব সম্ভবত) একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এই বলে অভিযোগ করেছেন যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাহায্য করবার মত কোন কাজ বিশেষ হচ্ছে না। এই অভিযোগ সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য না হলেও একথাও বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না যে, জাতীয় উন্নয়নের থিওরেটিক্যাল লিডারসীপ এখনো অপেশাদার অর্থনীতিবিদ আর সরকারী কর্মচারীদের হাতেই আছে।

অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা সম্পর্কে আমার সহানুভূতি উপরে-বর্ণিত দ্বিতীয় মতের সঙ্গে। সেদিক থেকে দেখলে প্রথম পঞ্চ-

বর্ষ পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বিগত ৮ বছরের ইতিহাস বাঙালী অর্থনীতিবিদদের পক্ষে খুব গৌরবের সাক্ষ্য বহন করে না। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় কার্যকরীভাবে সাহায্য করতে হলে বিচ্ছিন্ন বা একক প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হওয়া কঠিন। তার জন্যে বোধ হয় একটু সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা দরকার। অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রদের এই রি-ইউনিয়নের পটভূমিকায় তাই আমরা একটি প্রস্তাব করতে চাই। এক কথায় প্রস্তাবটি হল 'ক্যালকাটা ইকনমিক সোসাইটি' বা এই জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হোক। কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে সরকারী আনুকূল্যে বিভিন্ন বিষয়ে সার্ভে এবং গবেষণা কার্য চালানো হচ্ছে। এই চারটি প্রতিষ্ঠানে সমবেত অর্থনীতিবিদেরা যদি মাঝে মাঝে মিলিত হন, তবে আমাদের প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে রূপ নিতে পারে এবং গবেষকরাও পারস্পরিক সাহায্য লাভে উপকৃত হতে পারেন। শুনেছি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটুটের প্ল্যানিং বিভাগ থেকে কয়েকজন নাকি এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন—আশা করি অবশ্যম্ভাবী প্রাথমিক ব্যর্থতায় তাঁরা ভগ্নোৎসাহ হবেন না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় সাহায্য করতে হলে অর্থনীতিবিদদের সংঘবদ্ধ হওয়া আবশ্যক কিনা। সংঘবদ্ধ হতেই হবে এবং না হলে কিছুই হবে না, এমন কথা আমরা বলছি না। বিচ্ছিন্ন বা একক প্রচেষ্টার চেয়ে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় অবদানের গুরুত্ব এবং কার্যকারিতা (এফেক্টিভনেস) অনেক বেড়ে যায়—এটাই আমাদের বক্তব্য। এই বক্তব্যের পক্ষে ত্রিবিধ যুক্তি উপস্থিত করা যায়। প্রথমত, নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন মত—সেটা যতই সঠিক হোক না কেন—ব্যক্তিবিশেষের মত হিসেবে এলে যতখানি গুরুত্ব পাবে, একটি প্রতিষ্ঠানের বা গোষ্ঠির মত হিসেবে এলে তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব পাবে এবং সেই মত গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনাও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়ত, সমসাময়িক সমস্যা সম্পর্কে কোন একজন ব্যক্তির (তিনি যত বড় পণ্ডিতই হোন না কেন) বক্তব্য বা মত খুব সহজেই একপেশে হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেই বক্তব্য যদি একটা চক্রের মধ্যে দিয়ে আলোচিত হয়ে আসে, তাহলে তার একপেশে ভাবটা সংশোধিত হতে পারে। যেহেতু আমরা বিভিন্ন সূত্রের আশু-প্রয়োগযোগ্যতা সম্পর্কেই অধিক আগ্রহশীল সেইহেতু আমাদের মতে কোন বক্তব্য যত বেশি সংশোধিত এবং পূর্ণাঙ্গরূপে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা হয় ততই ভাল। তৃতীয়ত, আঞ্চলিক ভিত্তিতে অর্থনীতিবিদদের মিলিত হবার মত প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ভারতবর্ষের মত দেশে অপরিহার্য। ভূমিব্যবস্থা থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক পরিবেশ পর্যন্ত সর্ববিষয়ে এদেশের বৈচিত্র্য এতই বিস্ময়কর যে, কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের এবং জনসম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের কোন পরিকল্পনা রচনা প্রায় অসম্ভব। বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক-অর্থনীতিক অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানে সেই অঞ্চলের অর্থনীতিবিদেরা যে পরিমাণ সাফল্যলাভ করবেন কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তা সম্ভব নয়। অথচ এই পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান যতদিন না আয়ত্ত হবে, ততদিন উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পাবার রাস্তাও অজ্ঞাত থেকে যাবে। দুয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। বাঙলাদেশে সম্প্রতি খাদ্য-সমস্যা স্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়েছে—একথা আমরা রোজ সংবাদপত্রে দেখি এবং পশ্চিম বাঙলা পৃথিবীর বৃহত্তম উদ্বাস্তু সমস্যার কবলে পড়েছে—একথাও আমরা জানি। সমস্যা দুটি যদি বাঙালী জাতির জীবন-মরণ সমস্যা হয়, তাহলে তার সমাধানেও জীবন-পণ করেই নামা উচিত। কিন্তু বাঙালী অর্থনীতিবিদেরা—যাঁদের দায়িত্ব এ ব্যাপারে সর্বাধিক—আজ পর্যন্ত এই সমস্যা দুটি সম্পর্কে কী বলেছেন ? বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দুয়েকটি খুচরো প্রবন্ধের কথা বাদ দিলে একথা বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, সামগ্রিকভাবে বাঙালী অর্থনীতিবিদেরা বাঙালী জাতির প্রধান সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন। বাঙলাদেশের প্রত্যেক জেলায় একাধিক কলেজ আছে। আমাদের প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে এই সমস্ত কলেজগুলির সাহায্যে পালাক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে বাস্তব পরিকল্পনা উপস্থিত করা যায়। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনাগুলি তাহলে আর কেবলমাত্র সরকারী কর্মচারীদের 'রুটিন ওয়ার্ক' না হয়ে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে। এর ফলে আরো একটা সুবিধা এই হবে যে, ছাত্ররা শিক্ষাজীবনেই ফলিত অর্থবিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভ করতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েই সম্পূর্ণভাবে অপারেশনাল কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে 'অর্থনীতি' নামে যে পত্রিকা বেরিয়েছে তার সম্পর্কেও দুয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। আমাদের মতে, পত্রিকাটির উচ্চমান বজায় রাখতে হলে এর শতকরা অন্তত ৫০ ভাগ বরাদ্দ থাকা উচিত বিভিন্ন সার্ভে এবং অনুসন্ধানের ফলাফল আলোচনার জন্যে। কেবলমাত্র তাত্ত্বিক আলোচনাপূর্ণ পত্রিকা চলাও যেমন কঠিন চালানোও তেমনি অসুবিধা। তাছাড়া কার্যকারিতার দিক থেকে তার প্রয়োজনও অপেক্ষাকৃত কম।

॥ দুই ॥

বাড়ির ভিতর ঢুকতে মেজকর্তার আর পা সরে না। বুড়ি বড় আদরের মেয়ে। একমাত্র মেয়ে। মেজবৌয়ের নয়নের মণি, মেজবৌ সেই মেয়ের মায়া কাটিয়েও কবে স্বর্গে চলে গেছে। তা প্রায় দশ বছর হ'ল বৈ কি। কিন্তু মনে হয় যেন সেদিন।

শেষ সময় সে কি উৎকণ্ঠা মেজবৌ-এর। ছবিটা এখনও চোখে ভাসে। ঘর ভর্তি লোক। খাটে শুয়ে কেমন ছটফট করছে মেজবৌ। কাকে যেন কি বলতে চাইছে, কিন্তু বলতে পারছে না। সবাই বুঝতে পারছে যে মেজবৌয়ের সময় হয়ে এসেছে।

হঠাৎ, বড় বৌঠানের খেয়াল হ'ল, মেজবৌ বোধ হয় কিছু বলতে চায়। কানের কাছে মুখ নিয়ে বড়বৌ জিজ্ঞাসা করলেন, ও মেজবৌ কিছু বলবি? মেজবৌ কথা বলল না, শুধু মেজকর্তার দিকে একবার চাইল। দুফোটা জল গড়িয়ে পড়ল চোখের কোণা দিয়ে।

বড়বৌ বুঝলেন। বললেন, সব ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। সরলা কিছু বলতে চায় মেজকর্তাকে। ঘর খালি হয়ে গেল। মেজকর্তা এগিয়ে গেলেন, মেজবৌয়ের মাথার কাছে। মেজকর্তার হাত দুটো ধরে মেজবৌ ধীরে ধীরে বলল, বুড়ি থাকল। যেন ভেসে না যায়। মেজকর্তা ইঙ্গিতটা বুঝলেন। বললেন, কথা দিচ্ছি বুড়ির অযত্নের কোন কারণ ঘটাব না। মেজবৌ অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল। বলল, একটু পায়ের ধুলো দাও। পায়ের ধুলো মাথায় মাখল মেজবৌ। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, কথা দাও, বুড়ির বিয়ে দেবার আগে কলকাতায় যাবে না। প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিলেন মেজকর্তা। এত থাকতে হঠাৎ কলকাতার কথা উঠল কেন? এই সময়ে? মুহূর্তে মনে পড়ে গেল কলেজ জীবনের কথা। একটা মহা বোকামির কথা। তা সে ব্যাপার তো কবেই চুকে গেছে। সংসার পাতার পর একদিনের তরেও মেজকর্তা কলকাতার কথা তুলেছেন বলে তো মনে পড়ে না। মেজবৌ এতদিন ধরে মনে মনে সেটাও গিরে বেঁধে রেখেছে। আশ্চর্য! মেজকর্তা বলেছিলেন, কলকাতার কথা ভেবে কষ্ট পেয়ো না মেজবৌ। কলকাতায় যাবার কোন সাধই আমার নেই।

মেজবৌয়ের বুড়ির আজ সন্তান হবে। মেজবৌ থাকলে কি খুশীই না হ'ত। মেজকর্তাকেও এত দুশ্চিন্তা মাথায় করে ঘুরে বেড়াতে হ'ত না।

বড়বৌয়ের গলার আওয়াজে মেজকর্তার ভাবনা ছিঁড়ে গেল। ফোঁস্ করে যে টানা নিঃশ্বাসটা পড়ল তাতেই যেন বুক খানিকটা হাল্কা হয়ে গেল।

বড়বৌ বললেন, "ও মাজে তুমার কি কি জ্বর আলো নাকি?"

বড়বৌ আর মেজকর্তা এক বয়সী। বড়বৌয়ের যখন বিয়ে হয় তখন তার বয়েস আট। মেজকর্তারও তাই। সেদিন থেকে দুজনের সম্বন্ধ চুলোচুলিরও যত, গলাগলিরও তত। বরাবর তাদের মধ্যে তুই তোকারি চলে এসেছে। ছেলেপুলে হবার পর তুই থেকে তুমিতে উঠেছেন তাঁরা। হাজার হোক বয়েসটা বেড়েছে তো?

"কি, মুখে কি কুলুপ আঁটিছ?" বড়বৌ বললেন, "রা কাড়ছ না যে বড়। জ্বর আয়েছে নাকি?"

মেজকর্তা একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, "বড়বৌ, বুড়ির কি হবে?"

যেন দৈবজ্ঞ ঠাকুর হাত গুণছেন, বড়বৌ তেমনি গম্ভীর চালে বললেন, "হয় একটা ছেলে, আর না হয় একটা মেয়ে।"

বড়বৌয়ের পরিহাসে পরিবেশ হাল্কা হয়ে গেল। তবে বোধ হয় তেমন সাংঘাতিক কিছু ঘটেনি। দুর্ভাবনার ভারী বোঝা নেমে গেল মেজকর্তার কাঁধ থেকে।

একটু হেসে মেজকর্তা বললেন, "পাকা গণৎকার হয়ে উঠলে কবে?"

বড়বৌ বললেন, "যবের থে দ্যাখলাম পুরুষে মানুষ মায়েদের অধম হয়ে দাঁড়ায়েছে। দ্যাখ মাজে, তোর এত দুশ্চিন্তা কিসির কাদিনি। বাড়ীতি কি লোকজন নেই, না এ বাড়ীতি তোর মেয়েই প্রথম বিয়োচ্ছে?"

মেজকর্তা বললেন, "বুড়ির কোন অমঙ্গল টমঙ্গল—"

কথা শেষ না হতেই বড়বৌ ধমকে উঠলেন।

"ও ছাড়া তুমার মনে আর কোন চিন্তা নেই? ভাল আমার বাপ হয়েছেন। বালাই ষাট। তুমি এখন যাও দিন, কুড়েডা যাতে তাড়াতাড়ি বাঁধা হয়, তার চিন্তা দ্যাখ।"

মেজকর্তা ধমক খেয়ে একটু চুপ মেরে গেলেন। তারপর আমতা আমতা করে বলেই ফেললেন কথাটা।

"বড়বৌ, বলছিলাম কি, এই ইয়ে, বুড়িকে ঐ ভিজে কুঁড়েতে না পাঠিয়ে ঘরে রাখলে হ'ত না?"

বড়বৌ আকাশ থেকে পড়লেন।
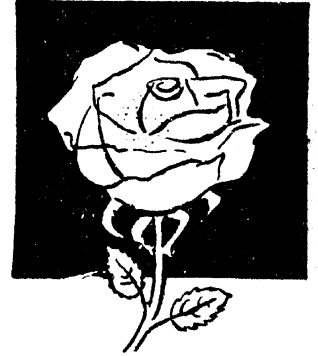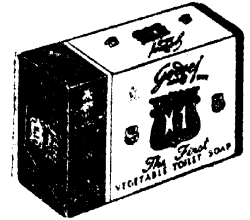
"ও মা'জে কও কি? পোয়াতি খালাস হ'বে ঘরে? এমন কথা তো আমার চোদ্দ পুরুষেও কেউ শোনে নি।"

মেজকর্তা বললেন, "তোমাদের চোদ্দ পুরুষে তো অনেক কিছুই হয় নি। তোমাদের বাবা তো রেল গাড়িও চড়েন নি। তা বলে তুমি কি আর রেলে চড়বে না। কলকাতায় তো হাসপাতালেই সব হয়।"

বড়বৌ মেজকর্তার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকলেন। মিচকি মিচকি হাসতে লাগলেন। মেজকর্তা দেখলেন, ছেলেবেলার দুষ্টু হাসি বড়বৌয়ের চোখে ঝিলিক খেলে বেড়াচ্ছে।

মেজকর্তা সাবধান হ'তে চেষ্টা করলেন; তিনি জানেন, এর পরেই আসবে একটা আক্রমণ

বড়বৌ বললেন, "কলকাতার বাবুর মনের যে কলকাতার জন্যে দরদ বুড়ো বয়সেও গেল না, দেখছি। কলকাতায় তো অনেক কিছু থাকে। সেখেনে তো আমাগের মত পেত্নী থাকে না, শুনিছি ড্যানাকাটা পরীরে থাকে। কলকাতার শাস্তর কলকাতায় চলুক, দেশে তো তা চলবে না। এখেনকার নিয়ম হচ্ছে, যে ঘরে ছেলেপুলে হয়, সে ঘরডা নোয়ার কামানের দিন ভাঙ্গে ফেলতি হয়। না হলি পোয়াতির উপর দিষ্টি লাগে। তা তুমি কি তোমার মেয়ের জন্যি এই বাড়িডা ভাঙ্গে ফেলতি চাও?"

মেজকর্তা অতটা তলিয়ে দেখেন নি। বড়বৌয়ের কথার তোড়ে ঘাবড়ে গিয়ে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন।

বড়বৌ বললেন, "বাজে চিন্তা ছাড়ে দিয়ে, এখন যাও দিন উদিকি। রামকিষ্টো কি ক'রলো দ্যাখ গে। কুঁড়েডা যেন শক্ত ক'রে বাঁধে। পুতাডা যেন বেশ উঁচো হয়। ডুয়া যেন ভাঙ্গে না পড়ে। আর হ্যাঁ, বুনো পাড়ায় লোক পাঠায়ে অন্ন দাইরি ডাকায়ে আনো। সে নবাবের বিটির আজ তো দর্শনই পাওয়া যাচ্ছে না।"

অন্ন দাইয়ের খোঁজে মেজকর্তা লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারপর ভিতর বাড়ির উঠোনে চললেন কুঁড়ে বাঁধার তদারক করতে। ভিতরের উঠোনে উঁকি মারতেই তাঁর আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। গবগব শব্দে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ার ঠ্যালা। রামকিষ্টো আর ছোলেমান নিকেরির সঙ্গে নরাও হাত লাগিয়েছে।

তিনজনে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। মেজকর্তার মুখ কালো হয়ে গেল দুর্ভাবনায়। একে তো কুঁড়ে বানান অসম্ভব, তায় কুঁড়ে যদি বানাতে পারেও, তার মধ্যে বুড়িকে রাখা আরও অসম্ভব। চঞ্চল হয়ে উঠলেন মেজকর্তা। বাইরের বাড়িতে চললেন।

নালা নর্দমা কেটেও উঠোনের জল কমাতে পারেনি রামকিষ্টো। সেই হাঁটু-জল উঠোনে, ঝুড়ি ঝুড়ি মাটি ফেলেছে ছোলেমান। পোঁতা আর তুলতে পারছে না। ভিজে ভিজে গায়ের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। শীত লেগে দাঁত কাঁপছে ঠকা-ঠক। নরাকে কড়া করে তামাক সেজে আনতে বলেছে রামকিষ্টো। তা সে শুয়োরের বাচ্চা গিয়েছে তো গিয়েছেই। ফেরার নাম গন্ধও নেই। বারবাড়ির থেকে তামাক সেজে এখানে আনতে কলিযুগ না শেষ হয়ে যায়।

রামকিষ্টো বলল, "ছোলেমান, যা দি'ন বা'রবাড়ি। দ্যাখেক তো হারামজাদাডারে যমে ধ'রল নাকি। দ্যাখা পালিই শালার পিঠি মারবি দুই লাথি। ঐ যে আসছেন নবাবপুত্তুর। ইচ্ছে হচ্ছে কি এই উঠোনের জলেই ব্যাটারে পা'লেট ক'রে ছাড়ে দিই। তাড়াতাড়ি আন।"

নরা এসে দাঁড়াতেই ঠাস ঠাস বাপের হাতের চড় খেল।

"কি করছিলি এতক্ষণ, অ্যাঁ। তোরে কলাম এক ছিলিম তামুক সা'জে আনতি। তা তুই কি সেখেনে তামাকের চাষ শুরু করিলি নাকি? হ্যাঁরে এই হারামজাদা।"

নরা সেই প্রলয় চড় খেয়ে চোখে সর্ষের ফুল দেখল। কেঁদে ফেলল ভ্যাক ক'রে।

বলল, "ইচ্ছে ক'রে দেরি করিছি নাকি। বাবুগের জন্যি চার কল্কে তামুক সা'জে দিয়াস্‌তি হ'ল। তা আমি করব কি?"

এদিকে কড়া তামাকের ধোঁয়া পেটে যেতেই রামকিষ্টোর মেজাজ চট করে নেমে গেল। কল্কেটা ছোলেমানের হাতে দিয়ে নরাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিল।

বলল, "চুবো বাবা চুবো। এই বিষ্টির জলে তুমি আর চোখির জল ঢালো না। মা'রাডে অলেহাই হয়েছে আমার। ন্যাও, এখন একটু তামুক টানো।"

বলেই হাঁক পাড়ল, "ছোলেমান, বামুনির মত কল্কে চোষাটডা ছাড় দিন। ঐ দুধের ছাওয়ালডারে এট্টু পিসসাদ দ্যাও। দিয়ে কাজে লাগ দিন। শিগ্‌গির চালাডা বানায়ে ফ্যাল।"

ছোলেমান বলল, "মাঠ কাদা কাদা হয়ে উঠল রামকিষ্টো চাচা। ভোর না হতিই মাঠে গিয়ে পড়তি হবেনে।"

রামকিষ্টো বলল, "এই ছোলেমান তোগের পাড়ায় সেদিন অত আলো জ্বলছিল কেন? যাত্রারা হচ্ছিল নাকি?"

চালা তুলতে তুলতে ছোলেমান বলল, "না না যাত্তরা না। মাগরোর পীর ছাহেব আয়েলেন। তাই মেদ্দা ছাহেব বললেন, কোরাণ ছরিফ পাঠ হোক, তাই হচ্ছিল। মেদ্দা ছাহেবের জামাই মুক্তার হয়েছে কি না, তাই। তা বুঝলে চাচা, পীর ছাহেব যেমন এক কছমের নুর রা'খেছে দেখলি রামচরণের ছাগলডার কথা মনে হয়। পাঠ করার সময় নুরডা আবার বাতাস দিয়ে দিয়ে নাড়ে। ঠিক মনে হয় যেন রাম-ছাগলে কাঁঠাল পাতা চিবোচ্ছে।"

নরা হি হি করে হাসতে লাগল। রাম-কিষ্টো তাকে কড়া ধমক দিল। ধমক দিল ছোলেমানকেও। পীর, মৌলভী, গুরু, পুরোহিত—ওনারা সব গুণীন লোক। ওনাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা রাম-কিষ্টো বরদাস্ত করতে পারে না।

চালা তুলতে হিমসিম খাওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রমে কুঁড়েটা খাড়া করে তুলল রামকিষ্টোরা। বাকি ডুয়া বাঁধা। সেই কাজটা আরও কঠিন।

পরিশ্রম গিয়েছে খুব। বৃষ্টির জলে সমানে ভিজে হাড়ে ওদের শীত ধরেছে। তাই নতুন কাজে হাত দেবার আগে ওরা একটু শক্তি সঞ্চয় করে নিচ্ছিল। পুবের ঘরের বারান্দায় গিয়ে আশ্রয় নিল। এক মালসা আগুনও এনে ফেলল নরা। আনল সেরখানেক দাকাটা তামাক। বসে বসে তাই টানতে লাগল।

রামকিষ্টো বলল, "দ্যাখ ছোলেমান, বিষ্টির যা বহর দেখছি তাতে ভুয়া বাঁধা শুধু তোর আর আমার কম্ম না। এক কাজ করেক দিন। সন্দার পাড়ার থে গুড়া চারেক জুয়ান মদ্দ ধ'রে নিয়ে আয়। সবাই মিলে হাত লাগালি তাড়াতাড়ি কাজডা হয়ে যাবে নে।"

ছোলেমান লাফিয়ে উঠল।

"লাখ কথার এক কথা বলিছ চাচা। তুমি যে ক্যান ল্যাহাপড়া শিখলে না, তাই ভাবি।"

প্রশংসাটা ভালই শোনায় রামকিষ্টোর কানে। আত্মপ্রসাদে চোখ চকচক করে। মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে কলকেটা ছোলেমানের হাতে দ্যায়।

বলে, "ক্যানে রে? ও কথা ক'লি ক্যানে। ল্যাখাপড়া শিখলি আমার কি আর দুডো হাত গজাতো?"

ছোলেমান ফস ফস করে কলকেয় টান মারছিল। রামকিষ্টোর কথা শুনে টান থামাল।

বলল, "তা'লি চাচা, তুমার হাতে আর চাষ লাঙলা নড়ি উঠতো না। মেন্দা ছাহেবের জামাইর মতোন চাখি চশমা আর পায় ইস্টাকিন আটে সিগারেট ফুকোতি ফুকোতে সদরে যাতি পারতে মুক্তারি কত্তি।"

নরার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল বিস্ময়ে। মেন্দা সাহেবের জামাই-এর পোশাকে বাবাকে কল্পনা করল নরা। সে দেখেছে মোক্তার মিঞাকে। মোক্তারি পাশ করার পর থেকেই তাদের গ্রামে মেন্দা ছাহেবের জামাই-এর নাম মোক্তার মিঞা হয়ে গেছে। বাবার চাখি চশমা হি হি। হাঁসি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে নরার। বাবার পায়ে ইস্টাকিন, ইস্টাকিন আবার কি জিনিস।

নরা জিজ্ঞাসা করল, "হ্যাঁ দাদা, ঐ যে ইস্টাকিন না কি বললে, সিডা কি?"

ছোলেমান বলল, "মুজো গো মুজো। ছোট কলা পইরে আইসেন না? তাই। বাবুরা তারেই কন ইস্টাকিন। মেন্দা ছাহেবের জামাই এখন তো ফুলবাবু। দেখলি, কিডা করে যে ও হ'ল রিয়াজুদ্দি গাজীর ছাওয়াল কটকে। এখন তিনি মুক্তারবাবু।"

'বাবার পায়ে ইস্টাকিন' হি হি হি। হেসে গড়িয়ে পড়ল নরা।

রামকিষ্টো ছেলের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হল। ক্যান, ইস্টাকিন পরা, কি এমন শক্ত কম্ম। অবিশ্যি পায়ে পরলে কুটকুট করতে পারে। ঐ কারণেই রামকিষ্টো পিরেনও পরতে পারে না। জামা গায়ে দিলেই তার দম বন্ধ হয়ে আসে। না হলে, বাবু সাজতে যে পারে না, তা নয়। লেখাপড়া শিখতে গিয়েও তো রামকিষ্টো ছেড়ে দিয়েছিল। সে কবেকার কথা। সেই সেবার মেজবাবু কলকেতা থেকে লেখাপড়া শিখে ফিরে এলেন। গ্রামে ইস্কুল খোলার তখন খুব ঝোঁক উঠেছিল তাঁর। আর জাতবেজাতের হাতে জল খাবার ঝোঁক। পাঠশালা খুলেছিলেন মেজবাবু। প্রথম প্রথম বেশ চলেছিল দিন কতক। দিনের পাঠশালায় রামকিষ্টোরা যেতে পারত না। মাঠে তা হলে লাঙল দেবে কে? বেশ কথা, মেজবাবু বললেন, তাহলে তোদের জন্য রাত্তিরেই আর একটা পাঠশালা খুলব।

মেজবাবু সে পাঠশালাও খুলেছিলেন। হিন্দু মোছলমান সব পাড়ায় ঘুরে ঘুরে পড়ুয়া জোগাড় করেছিলেন। বই পত্তরও আনিয়েছিলেন মেলা। তোড়জোড় করে পড়াশুনা আরম্ভ হয়েছিল। তারপর একদিন সব ভেস্তে গেল। বাছবিচার না করে মেজবাবু সেই জল চালাবার চেষ্টা করলেন সবার, অমনি গ্রামে যেন প্রলয় কাণ্ড ঘটে যাবে, এমন অবস্থা হল। রটে গেল যে, মেজবাবু বেহ্মজ্ঞানী হয়ে এসেছেন। বেহ্মজ্ঞানী কি, রামকিষ্টো তা জানে না। তবে তখনকার গ্রামের হাবভাব দেখে রামকিষ্টোর মনে হয়েছিল, হয় মেজবাবু পাগল, নয় সাংঘাতিক রকমের কিছু।

প্রথমেই দিনের পাঠশালা উঠে গেল। রাতেরটাও যায় যায়। দেওয়ানবাড়িতে তখন রাতদিন কান্নাকাটি, তর্ক, তর্জন, গর্জন চলেছে। কত্তাবাবু কত্তামা তখনও বেঁচে। সেই কত্তাবাবু, যিনি নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন, বয়েস কালে যার দাপটে বাঘে গরুতে জল খেত, সেই কত্তাবাবুর শাসনও মেজবাবুকে টলাতে পারেনি। ত্যাজ্য পুত্তুর করতে চেয়েছিলেন মেজবাবুকে। তবু মেজবাবু তাঁর কোট ছাড়েননি। একটু একটু মনেও আছে রামকিষ্টোর, মেজবাবুর সেই আমলের দু চারটে কথা। একটা কথা মেজবাবু প্রায়ই বলতেন, ঈশ্বর এক। সকলকেই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর চোখে উঁচু জাত নিচু জাত নেই। ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে মানুষ। মানুষ মাত্রেই মানুষের ভাই। ভাইএর হাতের জল ভাই খাবে বইকি।

রোজ পাঠশালায় এই কথাগুলো বলতেন মেজবাবু। কেন বলতেন, তা রামকিষ্টো জানে না। ও কথাগুলোর মানে কি তাও তারা বুঝতে পারত না। তবে শুনতে খারাপ লাগত না। আর এটাও বুঝত না রামকিষ্টো এতে এমন কি খারাপ কথা আছে, যা শোনামাত্রই গ্রামসুদ্ধু মাতব্বররা চটে যেত। বিশেষ করে পুরুত মশায়। তিনিই তো বাড়ি বাড়ি ঘুরে বলে বেড়াতেন, যে শশীর পাঠশালায় ছেলে পাঠাবে, সে জাতিচ্যুত হবে, সে উচ্ছন্নে যাবে। পুরুত ঠাকুর খুব তেজী লোক। আটখানা গাঁয়ে তাঁর বিধান চলে। তাঁর কথা অমান্য করবে কে? পাঠশালায় কেউ ছেলে পাঠাল না। মনের দুঃখে মেজবাবু সাহেবের পাটের অফিসে চাকরি নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। তারপর থেকে তো দেশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই প্রায় উঠে গিয়েছিল। মেয়ের অন্নপ্রাশনও বিদেশেই সেরেছিলেন। কর্তাবাবু মারা গেলে সবাই ভেবেছিল, তিনি বোধ হয় শ্রাদ্ধশান্তি আর করবেন না। দেখা গেল, সে ধারণা ভুল। দেশেও এলেন। নিয়মমতই তিনি সেসব করলেন। কর্তামার বেলাতেও নিয়মের কোন লঙ্ঘন করেননি। মেজ মার বেলাতেও না। মেজমা মারা যাবার পর বড়দিকে বাড়িতে রেখে মেজবাবু একাই গেলেন কর্মস্থলে। তারপর থেকে আবার দেশের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ শুরু হল। তবে এ মেজবাবুর সঙ্গে রামকিষ্টো আগের মেজবাবুর কোন যোগই কোথাও দেখতে পেল না। শুধু যে দাড়িই রেখেছেন মেজবাবু তা নয়, তাঁদের সকলের কাছ থেকেই যেন দূরেও সরে গেছেন।

কত দিনকার কথা। মেজবাবুর পাঠশালাটি টিঁকে থাকলে রামকিষ্টোর লেখাপড়া হয়ত হতেও পারত। না হবার কি আছে। মোক্তারও যে হতে পারত না, তাই
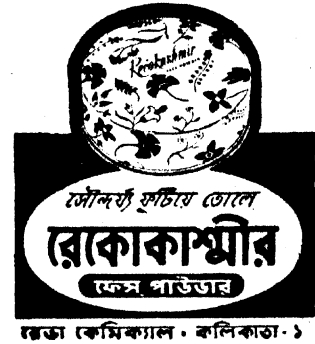
যা কে বলল? মেন্দা সাহেবের জামাই. ঐ ফটিক মিয়া, ও কি আর লাঙ্গল ঠেলেনি? ঠেলেছে। কিন্তু সুবিধে পেতেই লেখাপড়া শিখতে চলে গিয়েছে। শিখেছেও খুব কষ্ট করে। এখন পাঁচজনে তাকে মান্য তো করবেই।

যাকগে, ওসব আবোল তাবোল ভেবে লাভ কি? যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল রামকিষ্টো।

বলল, 'যা বাবা, তাড়াতাড়ি বুনো পাড়াডা ঘুরে আয়। হাতের কাজ নামায়ে ফেলি চটপট।'

ছোলেমান ছুটল বুনোপাড়ায়।

মেজকর্তা অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন বারবাড়ির ভিতর। যারা সকালে জটলা পাকাচ্ছিল, তারা কেউই আর নেই। ফাঁকা ঘরের শূন্যতায় তাঁর অসহায় ভাব আরও বেড়ে গেছে। বুড়িকে উঠানে নামাতে কিছুতেই তাঁর মন সায় দিচ্ছে না। কুসংস্কারে এরা কি পরিমাণ আচ্ছন্ন ভেবেই অবাক লাগে মেজকর্তার। পৃথিবীর কত দ্রুত যে পরিবর্তন হচ্ছে, তাঁর কোন খবর এদের কানে পৌঁছয় না। তিরিশ বছর আগেও এদের ধ্যান ধারণা যা ছিল, এখনও তাই-ই আছে। তা থাকুক, সে জন্য আর দুঃখ হয় না তাঁর। সে জন্যে আর মাথা ব্যথাও নেই। তাঁর ভাবনা, বুড়ির জন্য। ঐ জলের মধ্যে ভিজে কুঁড়েতে নামালে মেয়েকে তাঁর হারাতে হবে। কোন ভুল নেই। অসম্ভব। এ ব্যবস্থা চলতে দিতে তিনি পারবেন না।

কড়ড় কড় বাজ পড়ল। মেজকর্তা একটু চমকে গেলেন। কাছেই কোথাও পড়েছে নিশ্চয়। জিনিকে তাঁর চোখে প্রায় ধাঁধাঁ লাগে এমন অবস্থা। ভেতর বাড়িতে যাবেন এমন সময় দেখলেন, অন্নদাই বড় একখানা মান কচুর পাতা মাথায় দিয়ে আসছে। ভিজে সপসপ করছে তার সর্বদেহ।

মেজকর্তা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, কোথায় ছিলি তুই? বড় বউ যে তোর জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে।'

এমনভাবে মেজকর্তার একেবারে সামনে পড়ে যাওয়াতে অন্ন একটু হকচাকিয়ে গেল। চট করে ঘোমটা টেনে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল। সেখানে পড়বি তো পড়, একেবারে বড় বউয়ের সামনে।

বড় বউ ধমকে উঠলেন, 'এই যে, লবাবের বিটি। বলি সিংঘির পাচ পা দেখিছ না কি?'

অন্ন কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বড় বউ লাগালেন আরেকটা ধমক।

'বলি তোর আক্কেলটা কি গিলে খাইছিস?'

অন্ন কাতরভাবে বলল, 'দোহাই মা, আগে আমার কথাডা শুনে ল্যাও, তারপর তুমার প্রাণে যা চায়, তাই বলো। লুহাডাঙার বদন নিকিরি সেই রাত থাকতি আইসে আমারে পিরায় পাঁজাকুলা করে ধরে নিয়ে গেল। কত করে তারে কলাম তুমাগের বাড়ির কথা। কিছুতিই শুনলো না। ওর বউর অনেক রাত্তিরির থেই ব্যাথা উঠেছিল। তা মা, মংগলে সুমংগলে কাজডা উদ্ধার হতে তবে গিয়ে তুমার এই ছাড়া পালাম। করব কি মা কও দিন। এখনও পয়মন্ত দাঁতে একটা দানা কাটিনি। বড়দির জনি্য তুমি ভাবে না। পেরথম পুয়াতি তো চট করে কিছু হবে না। সময় নেবে। নিজিগেরও তো হয়েছে দুডো একটা। জান তো সবই। এখন দুডো খাতি দ্যাও দিন। একেবারে ভুখচানি পড়ার জুগাড় হয়েছে।"

অন্নকে দেখে, তার কথা শুনে বড় বউ-এর প্রাণে জল এল। বড় ননদকে ডাক দিলেন।

"ও দিদি, তুমার রান্না হয়েছে? একবার বেরোও তো?"

শুভদা নিরামিষ ঘরের থেকে বেরিয়ে এলেন।

"ওমা অন্ন, আসে পড়িছ। যাক বাঁচালে। বড় ভাবনায় ফেলিছিলে।"

বড় বউ বললেন, "ওরে নিয়ে টানাটানির তো শেষ নেই। ভোর রাত্তির লুহাজাঙগায় ধরে নিয়ে গিছিল। খালাস টালাস করে এই আসছে। এখনও কিছু মুখি দিতি পারেনি। তুমার ঘরে হয়েছে কিছু? ওরে দিতি পারবা খাতি?"

"রান্না তো হয়েছে। এখন ওরে দ্যায় কিডা? দ্যাখ দিনি বউ ওঘরে ফুলি আছে নাকি? থাকলি, দে পাঠায়। আমি ভাত ডাল বাড়ে দিই। ও অন্নরে একটু ধরে দিক। যা অন্ন, একখান পাতা টাতা কাটে আন।"

অন্ন বলল, "হ্যাঁ, আমি আর বিষ্টির মধ্যি নামিছি। পায় আমার হাজা ধরে গেল। এই কচু পাতখান মাথায় দিয়ে আইছি। এইখানাই পাতে বসলাম এই গুদোমের বারান্দায়। এই পাতেই খাব। তুমি ভাত পাঠায়ে দ্যাও।"

"তোর বাপু সব তাতেই অনাসিষ্টি", বলেই শুভদা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

অন্ন ডাকল, "ফুলিদিদি, ও ফুলিদিদি।"

আঁষের হেঁসেল থেকে মুখ নাড়তে নাড়তে বছর তেরর ফুলেশ্বরী বেরিয়ে এল। কথা না বলে, মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করল, কি?

অন্ন ফুলিকে দেখে অবাক হয়ে গেল। বলল, "তুমার গালে কি?"

কোঁত করে ঢোক গিলে ফুলি বলল, "আ মোলো, চ্যাঁচায়ে পাড়া মাথায় কত্তিছ ক্যান? গলা নামায়ে শুধোতি পার না? আমের আচার খাচ্ছি। বড়পিসি জানতি পারলে পেটে পাড়া দিয়ে বের করবে নে। তুমি খাবা একটু আচার?"

অন্ন হেসে বেললা, 'ওমা, কও কি? আচার কি অমন ক'রে খায়? তা ভাল। হাতের জানে গেছে তুমার কীত্তি। এই যে, এই পরে ব'সে আছে।"

বড় বউ ওঘরে আছে শুনে ফুলির মুখ কালো হয়ে গেল। ভাগ্য ভাল, বড় বউ ফুলিকে আচার নিয়ে কোন কথাই বললেন না।

বললেন, "দ্যাথ মা, দিদির ঘরের থে আসগোছে ভাত তরকারি আনে অন্নরে খাওয়ায়ে দ্যাও। আঁতুরে ঘটিটি করে এক ঘটি জলও ওরে খাতি দিও, কেমন?"

অন্নর খাওয়া মাঝ বরাবর এগিয়েছে, অন্ন ডাক দিল, "বড়মা, শোনো?"

বড় বউ বেরিয়ে এলেন।

অন্ন বলল, "আসল কথাডা ভুলেই গিছিলাম। লুহাজাঙগায় যাওয়াডা এক পক্ষে ভালই হয়েছে, বুঝলে। তাঁতি বউর পা ধুয়ানো জলও আ'নে রাখিছি। পেরথম পুয়াতি। বলা তো যায় না, কখন কোনডে দরকার লাগে।"

এ অঞ্চলে তাঁতি বউ-এর খুব সুনাম। আট দশটা ছেলেপুলের মা। একটি ফোঁটা কষ্ট কোনোটার জন্য পায়নি। ব্যথা উঠেছে কি প্রসব হয়ে যায়। তাই এ-অঞ্চলের দাইরা তাঁতি বউ-এর পা ধোয়ান জল এনে রাখে। যে প্রসূতি বেগ দেয়, প্রসব হতে যাদের খুব কষ্ট হয়, দাইরা সেইসব প্রসূতিকে তাঁতি বউ-এর পা ধোয়ানো জল খাইয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে অব্যর্থ ফল।

ভিতরের ঘরে গিরিবালা শুয়ে ছিল। অন্নর কথা শুনে তার গা গুলিয়ে উঠল। এবার দুর্গা পূজার সময় তাঁতি বউকে সে দেখেছে। বারোয়ারিতলায় ঠাকুর দেখতে এসে এবাড়িও বেড়িয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে গল্পও করেছে তাঁতি বউ। গিরিবালা সেই সময় দেখেছে তার দুই পায়ে হাজা। সেই পা ধোয়ানি জল ওকে খেতে দেবে নাকি? ওয়াক ওয়াক। হড়হড় করে বমি করে ফেলল গিরিবালা?

"ওমা, কি হল মেয়ের? কি হল?" বড় বউ ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

(ক্রমশ)

ক্রিকেটের রাজকুমার

শ্রীখেলোয়াড়

বিপদে আপদে রণজি প্রজাদের পাশে এসে দাঁড়াতেন একথা আগেই বলেছি। কিন্তু রাজ্যের চরম দুর্দিন ঘনিয়ে এলে রণজির বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতা কিভাবে সেই দুর্দিনের অবসান ঘটাতে সক্ষম হতো, রণজির দরদী মনোভাব প্রজাদের ভাংগা মনে কিভাবে শক্তি ও সাহস এনে দিতো সে কথা বলার সুযোগ হয়নি। দরদী ও প্রজা-হিতৈষী রণজির সে ছবি দেখতে হলে ১৯১৮ সালের জামনগরের ইতিহাসের পাতা খুলে বসতে হবে।

রোদ নয়, যেন আগুনের হোলী খেলা চলছে জামনগরে। আকাশে কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। ধরিত্রীবুক তৃষ্ণায় বিদীর্ণ। বৃক্ষলতা পাতা শূন্য। চাষের জমি খাঁ খাঁ করছে। চাষীদের ঘরে ঘরে হাহাকারের রোল। রাজ্যের ব্যবসায়ীদের হাতে খাদ্য-শস্য যা মজুত ছিল তা রাজ্যের বাইরের ব্যবসায়ীদের কাছে চড়া দামে বিক্রি হয়ে গেছে। সেই শস্য আরও বেশী দামে যখন আবার জামনগরের বাজারে ফিরে আসছে, তখন তার নাগাল পাওয়া ক্ষমতার অসাধ্য। খাদ্যবস্তুই শুধু নয়, প্রয়োজনীয় সব কিছুর দামই হু হু করে বেড়ে গেছে।

এই চরম খাদ্যাভাবের মাঝে মহামারী তার রুদ্র রূপ নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ও প্লেগের হাতছানিতে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। মৃতদেহ সংকারের লোক নেই। কুকুর, শিয়াল, শকুনেরা দিনের আলোতে রাজপথে বসেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে সেই দেহ। মাংসলোভী শকুন-শিয়ালের সাহস এতদূর পর্যন্ত বেড়ে গেছে যে তারা ঘরে ঢুকে মুমূর্ষু রুগীকে আক্রমণ করতে পর্যন্ত এতটুকু ভীত হচ্ছে না। গলিত শবের পূতিগন্ধে বাতাস বিষাক্ত। এক কথায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর এমন করাল মূর্তি জামনগর রাজ্যে এর আগে কেউ দেখেনি।

জামসাহেবের হাসিভরা মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছে। চোখে তাঁর নিদ্রা নেই। আহারে রুচি নেই। গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন তিনি। রোগ কিভাবে সংক্রামিত হচ্ছে—মৃত্যুর পদধ্বনি কোথায় দ্রুত, কোথায় শ্লথ, নিজের চোখে সে ছবি তিনি দেখতে চান। কিন্তু দর্শক হিসাবেই জামসাহেবের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। যেখানে যখন যেরূপ প্রয়োজন সেই অনু-যায়ী প্রজাদের কষ্ট লাঘবের আদেশ হয়। রাজ্যের খাদ্যশস্য বাইরের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা বেআইনী বলে ঘোষণা করেন রণজি। দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের উপর থেকে আমদানী কর কমিয়ে নেওয়া হয়। রাজ্যের কম বেতনভূক কর্মচারীরা সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে যাতে সেবার কাজে এগিয়ে যেতে পারে—অভাবের তাড়না যাতে তাদের মনকে বিন্দুমাত্র চঞ্চল বা উন্মনা না করে তাই তিনি এক বিশেষ সাহায্য ভাতা মঞ্জুর করেন।

রণজির ১৯০৯ সালের ছবি

রণজি বেঁচে থাকতে তাঁর প্রিয় প্রজারা তাঁরই সামনে মৃত্যু বরণ করবে এ কিছুতেই সহ্য করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন রণজি। রাজ্যের খরচায় এক বিরাট স্বল্প মূল্যের দোকান খোলা হয়। খাদ্য ও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সব কিছুই সেই দোকানে জড়ো হতে থাকে বোম্বাইয়ের আশে পাশের রাজ্য থেকে। ৬০,০০০এরও বেশী লোক এই দোকান থেকে নিয়মিত সাহায্য লাভ করে। গ্রামে গ্রামে গাড়ি ভর্তি খাদ্য-শস্য নিয়ে রওনা হয় দলে দলে কর্মচারী। যারা অক্ষম ও অসমর্থ তারা যাতে ঘরে বসেই ঔষধ ও পথ্য লাভ করতে পারে, তার জন্যে রণজি বিশেষ আদেশ দেন কর্মচারীদের। মুমূর্ষু রুগী এবং শিশুদের বিভিন্ন কেন্দ্রে জড়ো করার নির্দেশও দেওয়া হয়।

আহার্য বস্তু ছাড়া দৈনন্দিন জীবন-ধারণের জন্য মানুষের অর্থের প্রয়োজনীয়-তার কথা রণজি এ অবস্থাতেও ভুলে যাননি। পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রজারা অর্থ উপার্জন করুক তার পথও খোলা রাখেন। রাস্তা, ঘাট, কুয়া, পুকুর প্রভৃতি রাজ্যের প্রয়োজনীয় সংস্কারের সংগে সংগে প্রজারা দু পয়সা রোজগারের সুযোগ পায়। এ ছাড়া দুর্ভিক্ষ তহবিলও খোলা হয়। ঐ তহবিলে প্রথম দাতা হিসাবে রণজির ব্যক্তিগত অর্থ থেকে লক্ষাধিক টাকা দান দেখে রাজ্যের ব্যবসায়ী ও ধনী সম্প্রদায় পিছিয়ে থাকতে পারে না। দেখতে দেখতে দুর্ভিক্ষ তহবিলের থলি ভার হয়ে ওঠে।

প্রয়োজনীয় ঋণের জন্য কোন প্রজা এসে হাত পেতে দাঁড়ালে শূন্য হাতে ফিরিয়ে না দেবার আদেশ দিতেন রণজি। যে করে হোক প্রজাদের বিপদমুক্ত করার এক কঠিন নেশা তখন তাঁর মাথায় চেপে বসেছে। রাজ্যের অর্থ এইভাবে খরচ হওয়ায় দু চারজন প্রবীণ কর্মচারী এসে রণজিকে সাবধান করে বলে যান ২০০,০০০ পাউণ্ডের বেশী ইতিমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু রণজি নির্বিকারভাবে বলেন —"মানুষের জীবন একবার গেলে আর তো ফিরে পাবো না। ওরা যদি বাঁচে তবে আবার আমার সুদিন আসবে এবং সে সুদিনের পথ ওরাই আমাকে দেখিয়ে দেবে।"

যাই হোক এই দুর্ভিক্ষ ও মহামারী থেকে রণজি এক নূতন শিক্ষা লাভ করলেন। অন্যান্য সব উন্নয়ন পরিকল্পনা বন্ধ করে দিয়ে আগে প্রজাদের জলকষ্ট দূর করবেন বলে মন স্থির করে ফেললেন তিনি। ১৯১৯ সালে জামনগরে এক বিরাট জলসরবরাহ ব্যবস্থার উদ্বোধন করলেন বিকানীরের মহারাজ। রাজ্যে যেখানে কুয়ার সংখ্যা ছিল ৬,০০০ দেখতে দেখতে সেই সংখ্যা এসে দাঁড়ালো ৩০,০০০এ। প্রজা-

দের জলকষ্ট নিবারণের জন্য সে দিন থেকে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল, তার ফলে জামনগরের কোন প্রজা ভবিষ্যতে আর কখনো জলাভাবে মৃত্যুবরণ করেনি।

ভারতীয় নৃপতিদের মধ্যে রণজি ছিলেন শান্তি দূত। রাজায় রাজায় ঝগড়া বা কোন মনকষাকষির সৃষ্টি হলে সব সময় রণজির ডাক পড়তো। এমন কি রাজাদের গৃহ-বিবাদে ও সাংসারিক গোলযোগেও তাঁকে মেটাবার জন্য টানাটানি পড়ে যেতো। অনেক রাজা আড়ালে তাই রণজিকে বলতেন 'ও আমাদের বুড়ো ঠাকুমা'। নরেন্দ্রমণ্ডলীর মধ্যে যদি কোন ফাটলের সৃষ্টি হয় তাহলে বৃটিশ সরকারের ভারী রোলার কোন রাজারই মেরুদণ্ড অটুট রাখবে না একথা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন রণজি। তাই সব সময় ভারতীয় নৃপতিদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ থেকে মুক্ত রাখতে তিনি চেষ্টা করতেন। রাজাদের ঘর এবং বার দু-ই সামাল দিতে হতো তাঁকে। রণজির অপরিসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলেই 'প্রিন্সেস প্রটেকশান বিল' পাস হয়েছিল।

রাজাদের দাবী নিয়ে রণজি যেমন আন্দোলন করতেন, তেমনি রাজাদেরও রাজ্য পরিচালনায় প্রজাদের দরদী মনোভাব দেখানর জন্যও উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন—"আমাদের পূর্বপুরুষেরা তলোয়ার ঘুরিয়ে এবং চোখ রাঙিয়ে যেভাবে রাজ্যশাসন চালিয়ে গেছেন সেই পথে অগ্রসর হলে আজ বিপদকে গভীর ও ব্যাপকভাবে ঘরে ডেকে আনা হবে। ইতিহাসের ধারা পাল্টে গেছে। শান্তি এবং শৃঙ্খলার মধ্যে রাজ্য পরিচালনা করতে হলে প্রজাদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সমব্যথায় ব্যথী হতে হবে রাজাদের।" ভারতীয় নৃপতিদের এ বিষয়ে চোখ খুলে দেবার জন্যে রণজি নিজের রাজ্য পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য এক 'উপদেষ্টা সভা' স্থাপন করেন। এই উপদেষ্টা সভার অধিকাংশ সভ্য মনোনীত হতো রাজ্যের কৃষকদের মধ্য থেকে। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকেই এই সভায় স্থান দেওয়া হতো।

মণ্টেগু চেমসফোর্ড আইন তৈরীর সময়ে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের একটা খসড়া তৈরীর জন্য যে চারজন নৃপতির উপর ভার দেওয়া হয়েছিল তার অন্যতম ছিলেন রণজি। অন্যতম বললেই অবশ্য সবটুকু বলা হয় না, রণজির প্রখর রাজনৈতিক জ্ঞান ও ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি দেখে বৃটিশ সরকার পর্যন্ত চমকিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয় মণ্টেগু চেমসফোর্ড আইন পাস করানো এবং কার্যে পরিণত করার ব্যাপারেও রণজির অবদান ছিল সর্বাধিক। প্রফেসর রাসব্রুক উইলিয়ামস মণ্টেগু চেমসফোর্ড আইনে রণজির অবদান সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলেছেন—

—"But it may well be doubted whether the Government of India Act of 1919 would ever have been passed if the Ministry and the back-benchers alike had not seen same thing of 'Ranji' in the lineaments of the Indian whom they pictured in their minds as the subject of their legislation."

এডউইন মণ্টেগু রণজির রাজনৈতিক জ্ঞানে এত বেশী মুগ্ধ হয়েছিলেন যে পরস্পরের মধ্যে চিরকালের জন্য এক গভীর বন্ধুত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। রণজি তাঁর এই প্রিয় বন্ধুর এক মর্মরমূর্তি নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করে বন্ধুত্বের স্বাক্ষর অম্লান রেখেছিলেন।

রণজি খুব পরিহাস প্রিয় ছিলেন। বন্ধুদের মাঝে মাঝে চক্রান্ত করে ঠকিয়ে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। রণজির প্রিয় বন্ধুদের মধ্যে ক্রিকেট খেলোয়াড় স্যার আর্থার প্রিস্টলি ছিলেন অন্যতম। লণ্ডন থেকে প্রায়ই আর্থার প্রিস্টলি জামনগরে বেড়াতে আসতেন। জামনগর প্রাসাদের বাবুর্চিদের রান্না পাখির রোস্ট তাঁর খুব প্রিয় খাবার ছিল। এই পাখির রোস্ট দুবেলা না হোক অন্তত দুপুরের খাবারের সময়ে তাঁকে দিতেই হতো। দুই বন্ধু একসাথেই মধ্যাহ্ন ভোজনে বসতেন। একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে প্রিস্টলি রণজিকে অফিস ঘরে ডাকতে গিয়ে দেখেন রণজি খুব গম্ভীর হয়ে একমনে কাজ করে যাচ্ছেন। প্রিস্টলি রণজিকে মধ্যাহ্ন ভোজনের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে রণজি বলেন—"এক নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ এই মাত্র পেয়ে তিনি খুব বিচলিত সুতরাং আহারে বসা তাঁর পক্ষে এখন সম্ভব নয়।" প্রিস্টলি একাই ফিরে আসেন ডাইনিং হলে। খাবার টেবিলে বসতেই খানসামা কয়েকখানা শুকনো রুটি ও একটু নিরামিষ তরকারি প্রিস্টলির সামনে রেখে দিয়ে যায়। খাবার দেখে তো প্রিস্টলির চক্ষু চড়কগাছ। কোথায়

তার প্রিয় রোস্ট ও আরও নানা রকমের সুস্বাদু আহার? তার পরিবর্তে এই শুকনো রুটি আর ঘ্যাট। প্রিস্টলি এ জাতীয় খাবার দেবার উদ্দেশ্য কি জানতে চাইলে খানসামা জানায় যে জামসাহেবের কোন আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু হলে অশৌচ না যাওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় খাবারেরই ব্যবস্থা হয় সকলের জন্য। প্রিস্টলি তখনি রেগে টেবিল থেকে উঠে রণজির কাছে গিয়ে জানতে চান—"গৃহস্থের বাড়ির লোকের জন্য যদি কোন নিয়মকানুন থাকে সেটা অতিথির 'পরেও জোর করে চাপিয়ে দেওয়া কোন্‌দেশী ভদ্রতা?" রণজি তেমনি গম্ভীরভাবেই জবাব দেন—"উপায় নেই বন্ধু।" প্রিস্টলি তখনি তাঁর লোকজনকে বাক্স বিছানা বেঁধে ফেলতে বললেন, পরের ট্রেনেই লণ্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন বলে। জিনিসপত্র গোছগাছ করে এবং নিজে তৈরী হয়ে রণজির কাছ থেকে বিদায় নিতে এসে প্রিস্টলি দেখেন রণজি তখন পাখির রোস্ট ও তাঁর প্রিয় খাবার-গুলির সদ্ব্যবহার করতে ভীষণ ব্যস্ত। তাঁর জন্যেও টেবিলে ঐ সব খাবার দিয়ে প্লেট সাজানো। প্রিস্টলি রণজির রসিকতা বুঝতে পেরে হাসতে হাসতেই বসে পড়েন খেতে। বন্ধুকে তিনি বলেন—"রণজি তোমার রসিকতা সত্যই উপভোগ্য। এত সুন্দরভাবে তুমি এগুলো অভিনয় করো যে কারো পক্ষে এতটুকু সন্দেহ করার অবকাশ পর্যন্ত থাকে না।" রণজির উচ্চ হাসিতে তখন ঘর ভরে ওঠে। বাবুর্চি খান-সামারা তাদের প্রিয় জামসাহেবের সঙ্গে সে হাসিতে যোগ দেয়।

আর একটি ঘটনা। লণ্ডন থেকে একবার রণজির খেলোয়াড় জীবনের দুই পুরানো বন্ধু জামনগরে বেড়াতে আসেন। বাঘ শিকার করার ইচ্ছা তাদের। অথচ শিকারের কোন অভিজ্ঞতাই তাদের নেই। বন্ধু দুজন রণজিকে দু বেলা তাগিদ দেন—'কৈ শিকারের কি ব্যবস্থা করলে? রণজি বলেন—দু' চার দিনের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়বো শিকারে। শিকারে বেরোবার আগে রণজি বন্ধুদের বলেন—"দেখ, তোমাদের শিকারের তো কোন অভিজ্ঞতা নেই। অথচ পাখিটাখি শিকার করে হাত না পাকিয়েই একেবারে তোমরা বাঘ শিকার করতে চাও। কিন্তু তোমরা বোধ হয় জান না যে বাঘ শিকারে অনেক বিপদ আছে। যেমন মনে করো হয়তো আমরা বনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি, হঠাৎ সামনে বা কাছাকাছি কোথাও বাঘ দেখা গেলো। তখন কিন্তু এতটুকু ঘাবড়ে যাবে না তোমরা। বাঘ দেখলেই তাক করে গুলী ছুঁড়বে। আর গুলী ছুঁড়েই কাছাকাছি যে গাছ পাও তাতে দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়বে। কারণ বাঘ যদি একেবারে মরে না গিয়ে থাকে, তবে তোমাদের ফিরে এসে আক্রমণ করতে পারে।" বন্ধু দুজন রণজির উপদেশ খুব মন দিয়েই

ইংলণ্ডের ক্রিকেট মাঠে শেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় ব্যাট করতে নামছেন রণজি

শোনেন। বনের মধ্যে কিছুদূরে যাবার পর রণজি চুপি চুপি বন্ধুদের বলেন, "ঐ দেখো ঐ ঝোপটার ধারে আমাদের দিকেই তাকিয়ে একটা বাঘ শুয়ে আছে বলে আমার মনে হচ্ছে।" বন্ধুরা সেদিকে তাকিয়ে রণজির কথার সমর্থন জানায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের হাতের বন্দুক থেকে বাঘের উদ্দেশ্যে গুলী বেরিয়ে আসে। গুলী ছোঁড়া শেষ করেই দুজনে বন্দুক মাটিতে ফেলে দিয়েই ছুটে গিয়ে সামনে যে গাছ পান তাতেই চড়ে বসেন। রণজিও তাদের মত আর একটা গাছে উঠে যান। গাছের 'পরে বসে উঁকিঝুঁকি মেরে কিছুক্ষণ পর রণজি বলেন,—"যখন কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না এবং বাঘটা যেখানে শুয়ে-ছিল সেখান থেকে একটুও নড়ছে না, তখন নিশ্চয়ই মারা গেছে বাঘটি। তোমরা এখন নিশ্চিন্তে গাছ থেকে নেমে মরা বাঘটাকে টেনে নিয়ে আসতে পারো।" বন্ধু দুজন তো তখনি লাফ দিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়েন। শিকারের প্রথম সুযোগেই তাঁরা সাফল্য লাভ করেছেন। আর এ যে-সে শিকার নয় একেবারে জ্যান্ত বাঘ মারা। ছুটতে ছুটতে তারা বাঘের কাছাকাছি যেতেই দেখতে পান যে বাঘটি আগে ঠিক যেভাবে ছিল গুলী খাবার পরও ঠিক সেইভাবেই রয়েছে। শুধু বাঘটার কানের কাছে একটা জায়গায় একটা বড় গর্ত হয়ে গেছে। আরও একটু কাছে যেতেই তারা বুঝতে পারেন যে জ্যান্ত বলে এতক্ষণ তারা যে বাঘটিকে মনে করেছিলেন সেটা আসলে একটি মাটির বাঘ। আগে থাকতেই বাঘটিকে ঐভাবে অন্ধকার জায়গায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। বন্ধুরা রণজির তামাশা বুঝতে পেরে ফিরে যেতে যেতে দেখেন রণজি তখনো গাছের ডালে বসে পা দোলাচ্ছেন আর গুণ গুণ করে গান গাইছেন। দুই বন্ধু কাছে যেতেই তিনজনের উচ্চহাসিতে বনভূমির নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়।

রাজকার্যের নানারকমের গুরুদায়িত্ব ও কর্তব্য রণজির ক্রিকেট খেলার সময়কে ক্রমশঃই সংক্ষিপ্ত করে দিলেও সুযোগ পেলেই তিনি ক্রিকেট মাঠে এসে হাজির হতেন। ১৯১৫ সাল পর্যন্ত রণজি জাম-নগরে নিয়মিত না হলেও প্রায়ই ক্রিকেট মাঠে হাজির হয়ে উৎসাহী ও তরুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের হাতে কলমে শিক্ষা দিতেন। এখানে শিক্ষার্থী এক বোলার একদিন রণজিকে জানায় যে বল করায় তার হাত এখন যে রকম হয়েছে তাতে বোধ হয় কয়েক ওভারের মধ্যে সে এখন যে কোন ব্যাটসম্যানকে আউট করে দিতে পারে। কাকে উদ্দেশ্য করে কথাটি বলা হলো সেটা বুঝতে রণজির দেরী হয় না। মনে মনে তিনি খুব দুঃখিত হন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভা আজ অস্তাচলগামী। তবু দু-এক বছর বল করেই যারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোলার বলে নিজেদের মনে করে এবং

রণজিকে কয়েকটা বলেই আউট করার দুরাশা যারা পোষণ করে তাদের অহমিকা ভেঙে দেওয়া উচিত বলে মনে হয় তাঁর। রণজি তখন ঐ বোলারকে চারটে স্ট্যাম্প ও বল নিয়ে মাঠে নেমে পড়তে অনুরোধ করেন। তিনটে স্ট্যাম্প নিয়মমাফিক মাটিতে পুঁতে উইকেট তৈরী করা হয়। ব্যাটের বদলে বাকী স্টাম্পটি হাতে নিয়ে রণজি ঐ বোলারকে বল করতে বলেন। বোলার একটার পর একটা বল করেন আর রণজি স্ট্যাম্প দিয়ে প্রত্যেকটি বল 'কাট' ও 'গ্লাইড' করে যান। বোলার নিজের বিদ্যার দৌড় বুঝতে পারেন। রণজি তখন ঐ বোলারকে কাছে ডেকে নিয়ে বলেন, "ক্রিকেট খেলা এত সহজ খেলা নয়। শুধু দীর্ঘদিনের সাধনা ও অধ্যবসায়ে ক্রিকেট খেলায় পারদর্শিতা লাভ করা যায়। খেলা না শিখেই বা একটু শিখেই যারা নিজেদের ক্ষমতা সম্বন্ধে উচ্চাশা পোষণ করে তাদের পক্ষে কোনদিনই কুশলী খেলোয়াড় হওয়া সম্ভব নয়।"

একমাত্র পোলো খেলা ছাড়া রণজি নিজের রাজ্যে আর সবরকম খেলাতেই উৎসাহ দিতেন। পোলো খেললে যুবক সমাজ মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়বে বলে তাঁর দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল। যুবকদের আদর্শ খেলা হলো শিকার ও টেনিস, এই কথাই বলতেন রণজি।

কাথিয়াবাড় রাজ্যকে বোম্বাই সরকারের হাত থেকে ভারত সরকারের পরিচালনাধীনে নেবার চেষ্টায় ১৯২০ সালের বসন্তকালে রণজি লণ্ডনের পথে পা বাড়ান। প্রিয় সুহৃদ মণ্টেগুর প্রচেষ্টায় এবং নিজের যুক্তি-পূর্ণ সওয়ালে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মনে তিনি এমন বিশ্বাসের সৃষ্টি করেন যে, বিলেত থেকে প্রয়োজনীয় আদেশ বেরুতে মোটেই দেরি হয় না।

ইংলণ্ডের রাজা রণজিকে আবার ক্রিকেট মাঠে নামার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। দীর্ঘ ১২ বছর ইংলণ্ডের ক্রিকেট মাঠ থেকে অনুপস্থিত থাকার পর রাজার অনুরোধে আবার রণজি ব্যাট হাতে নিয়ে মাঠে নামেন। সাসেক্সের অধিনায়ক এইচ এল উইলসন তাদের আদর্শ খেলোয়াড়কে দলে পেয়ে অধিনায়কের দায়িত্ব রণজির হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। এসেক্সের বিরুদ্ধে রণজি যখন ব্যাট হাতে মাঠে নামেন তখন উপস্থিত প্রত্যেকটি দর্শক আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে তাদের প্রাণমাতানো মনভোলানো খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানায়। এই স্বতঃস্ফূর্ত অভি-নন্দনে রণজি বিচলিত হন। একটা চোখের অভাবে আগের মত তিনি কি আর সর্শক-দের আনন্দ দিতে পারবেন, এই চিন্তাই তাঁকে ব্যথিত ও ব্যাকুল করে তোলে। অন্তরের গভীর ব্যথায় রণজির চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে ওঠে। কিন্তু রণজি—রণজিই। নাই বা থাকুক একটা চোখ। হোক না দেহ অপটু বা অসমর্থ। খেলার বয়সের সীমা পার হয়ে গেলেও ক্রিকেটের রাজকুমার তিনি। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাই পরের দিন সংবাদপত্রে তাঁর খেলার সমালোচনায় লেখা হয়—

—"Ranji has started again now, and will play everything to leg, of any length. The off side is neglected, but his innings in the first match was pure platinum."

এই খেলার পর আরও দুটি খেলায় মাঠে নেমেছিলেন রণজি। কিন্তু রণজির ক্রিকেট জীবনের উপর চিরদিনের মত যবনিকা টেনে দিতে ভাগ্যদেবী যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন একথা তাঁর গৌরবোজ্জ্বল প্রথম দিনের খেলার পর কে ভাবতে পেরেছিলো? তৃতীয় খেলাটিতে একটা বল সোজা এসে তাঁর কাঁধে লাগে। অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেন কাঁধে। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানান কাঁধের একটা হাড় সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছে। কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় অস্ত্রোপচার করতে কিছুতেই তাঁকে রাজী করানো যায় না। ডাক্তার রণজির চোখের সামনেই তাঁর কাঁধে ছুরি চালিয়ে যান। একটু নড়তে, বিচলিত হতে বা যন্ত্রণাকাতর কোন শব্দ রণজির মুখ থেকে কেউ শুনতে পায় না। এই ঘটনার পর জনগণমন জয়ী ক্রিকেট শিল্পী রণজি চিরদিনের মত ইংলণ্ডের ক্রিকেট মাঠের কাছ থেকে বিদায় নেন।

(ক্রমশ)

আফ্রিকার জনজীবন

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

আফ্রিকার উত্তর উপকূলে জ্বলেছিল বিশ্ব-সভ্যতার প্রথম আলো। তার পশ্চিম উপকূলে মানুষ-ধরার-দল হামলা শুরু করেছিল পাঁচশ বছর আগে। পর্তুগীজ নাবিক বার্থোলমিউ দিয়াজ তার দক্ষিণ অন্তরীপের শেষ বিন্দু স্পর্শ করেছিলেন ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে, আর ভাস্কো দা গামা সে অন্তরীপ অতিক্রম করে ভারতে পৌঁছেছিলেন তারও এগারো বছর বাদে। অথচ এত বড় মহাদেশটির অভ্যন্তর অঞ্চল সম্পর্কে একশ' বছর আগেও সভ্যজগতের মানুষের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। কারণ, তার অভগ্ন উপকূল, উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের দুস্তর মরুভূমি, ভীষণ স্রোত, অনাব্য নদী আর হিংস্র প্রাণীতে ভরা ভয়ঙ্কর অরণ্য এমন এক নিবিড় রহস্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাকে যে, সভ্যজগতের মানুষ তার নাম দিয়েছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ।

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুংগোপার্ক, স্ট্যানলী, লিভিংস্টোন, পিক, ব্রুস প্রমুখ দুঃসাহসী অভিযাত্রীদলের বারংবার আঘাতে সে রহস্যের জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আর তার ফলে ইউরোপের ভূমি-লোলুপ সাম্রাজ্যবাদী মহলে দেখা দিল নতুন আলোড়ন। কারণ সারা পৃথিবীতে তখন লুঠ করার মত এক ইঞ্চি জায়গাও আর পড়ে ছিল না। তাই ক্ষুধার্ত পশুর মত তারা ছুটল দলে দলে অরণ্য-আদিম আফ্রিকার দিকে। বর্তমান সভ্যতার উজ্জ্বল আলোয় চোখ ঝলসে গেল আফ্রিকাবাসীর। কিন্তু সে সম্মোহ কাটল যখন, তখন দেখল তাদের সর্বাংগে শৃংখল। ভদ্রবেশী বর্বরতার এই নিষ্ঠুর ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন,—

> এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
> নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,—
> এল মানুষ-ধরার দল
> গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা
> অরণ্যের চেয়ে।
> সভ্যের বর্বর লোভ
> নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।

ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই কেমুজের মত আফ্রিকাকে ফালা ফালা করে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ভাগ করে নিয়ে নিল নিজেদের মধ্যে। ইউরোপের চেয়ে প্রায় তিনগুণ আর বর্তমান ভারতের চেয়ে প্রায় দশগুণ বড় আফ্রিকার শুধু লাইবেরিয়া আর আবিসিনিয়া ছাড়া সকল অঞ্চলই হারাল তাদের স্বাধীনতা। আমেরিকার মুক্ত ক্রীতদাসদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লাইবেরিয়া রাষ্ট্র। সেই কারণেই তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার সাহস ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির হয়নি। কিন্তু আবিসিনিয়ার পক্ষে শেষ পর্যন্ত তার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদীদের নিষ্ঠুর নখরের আঁচড় থেকে সে কোনমতে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলেও বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যভাগে ইতালীর ফ্যাসীবাদী শাসকদের বর্বর আক্রমণের কাছে তাকে নিতান্ত অসহায়ের মত নতি স্বীকার করতে হয়। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে একমাত্র তেতাল্লিশ হাজার বর্গমাইল আয়তনবিশিষ্ট লাইবেরিয়া ছাড়া আফ্রিকার এক কোটি পনেরো লক্ষ বর্গমাইল ভূমির এক ইঞ্চিও সাম্রাজ্যবাদীদের কবলমুক্ত ছিল না।

কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে গত ক' বছরের মধ্যে আফ্রিকার জনজীবনে যে দ্রুতগতিতে পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে তা প্রায় কল্পনাতীত ঘটনা। এখন আফ্রিকায় সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের সংখ্যা হ'ল দশটি—মরক্কো, টিউনিসিয়া, লিবিয়া, ইজিপ্ট, সুদান, ইথিওপিয়া, গিনি, ঘানা, লাইবেরিয়া আর দক্ষিণ আফ্রিকা। আগামী বছর স্বাধীনতা অর্জন করবে আফ্রিকার সর্ব-বৃহৎ রাষ্ট্র নাইজেরিয়া। তারপর অনতিবিলম্বেই স্বাধীন রাষ্ট্রের দলে যোগদান করবে লাইবেরিয়া ও গিনির প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিয়েরো লিয়োন। আফ্রিকার শৃংগ অঞ্চলের বৃটিশ সোমালিয়া ও ইতালীয় সোমালিয়ার সম্মিলনে এক বছরের মধ্যেই গড়ে উঠবে আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা আর ফরাসী বিষুব আফ্রিকাকেও আগামী ছ'মাসের মধ্যে নিজ ভাগ্য নির্ধারণের পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন জেনারেল দ্য গল। সুতরাং তারাও হয়ত অনতিবিলম্বেই গিনির পথ অনুসরণ করবে। এছাড়া নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, গাম্বিয়া আর টোগোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার দিনও যে অনতিদূরে, এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই। এখনও পর্যন্ত যে উপনিবেশগুলির ভাগ্যের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য হল বৃটিশ অধিকৃত উগাণ্ডা, কেনিয়া, টাঙ্গানিকা, পর্তুগীজ অধিকৃত মোজাম্বিক আর এংগোলা, বেলজিয়াম অধিকৃত কঙ্গো আর ফরাসী অধিকৃত আলজিরিয়া।

আফ্রিকার রাজনীতিক জীবনের এই দ্রুত পরিবর্তনের সংগে সংগে তার সামাজিক, অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তাও সম-পরিমাণে বিস্ময়কর। গত পঞ্চাশ বছরে আফ্রিকা যেন পাঁচ হাজার বছরের পথ অতিক্রম করে এসেছে। একমাত্র পর্তুগীজ অধিকৃত আফ্রিকার আট লক্ষ বর্গমাইল এলাকাটুকু বাদ দিলে সর্বত্রই দেখতে

পাওয়া যায় কর্মযজ্ঞের বিপুল উদ্দীপনা। বৃটিশ ও ফরাসী উদ্যোগে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কিম্বারলিতে হীরকখনি আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত সাহারা মরুভূমির দক্ষিণ-ভাগের আফ্রিকায় শিল্পসমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মূলধন নিয়োজিত হয়েছে প্রায় ছয় কোটি ডলার। যুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের সহ-যোগিতায় এই কর্ম-উদ্যোগ আরও বহু পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে।

শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে উন্নতি ঘটেছে, তাও নেহাত অনুল্লেখ্য নয়। গত পঞ্চাশ বছরের চেষ্টায় নাইজেরিয়া, ঘানা প্রভৃতি দেশগুলিতে নিরক্ষরতার হার শতকরা একশ থেকে কমিয়ে প্রায় ৮৫তে দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে। আমাদের স্বাধীন সরকার গত এগারো বছরে প্রায় সাধ্যাতীত চেষ্টা করে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে উন্নতিটুকু অর্জনে সমর্থ হয়েছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বৈদেশিক শাসকদের উদ্যোগে অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকায় যেটুকু জ্ঞানের আলো প্রবেশ করেছে, তা সামান্য নয়। নাইজেরিয়া, ঘানা, সিয়েরো লিয়োন প্রভৃতি দেশগুলিতে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক পত্রগুলির প্রচারবাহুল্যই প্রমাণ করে দেয় যে, আধুনিক শিক্ষা সেসব দেশে কতখানি বিস্তার লাভ করেছে। নাই-জেরিয়ায় ইংরাজী দৈনিক 'ডেলী টাইমস'এর বিক্রয়-সংখ্যা প্রায় সাতানব্বই হাজার, আর ঘানা থেকে প্রকাশিত ইংরাজী দৈনিক 'ডেলী টেলিগ্রাফে'র প্রায় তিয়াত্তর হাজার। এমন বহুলপ্রচারিত ইংরাজী দৈনিকের সংখ্যা ভারতেও খুব বেশি আছে বলে মনে করি না।

আফ্রিকার এই যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মূর্ত প্রতীক হলেন কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকার অবিসংবাদিত নেতা ডাঃ এনক্রুমা স্বয়ং। ঘানার নুজাম জেলায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে কুয়েমে এনক্রুমা যে পর্ণকুটিরে জন্মগ্রহণ করেন, সেই দীন আবাসে সূর্যের আলোর মত জ্ঞানের আলোও কখনো প্রবেশ করেনি। তিনি তাঁর মায়ের একমাত্র সন্তান হলেও তাঁর ভাইয়ের অভাব ছিল না। কারণ ডাঃ এনক্রুমার বাবা ছিলেন বহুপত্নীক। তাঁর নাম কুয়েমে হওয়ার কারণ তিনি জন্মে-ছিলেন শনিবারে—কুয়েমে কথার অর্থ শনিবার।

উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্যে ডাঃ এনক্রুমা যে অসাধ্য সাধন করেছেন, তার তুলনা নেই। কিন্তু তবুও একথা অনস্বীকার্য-ভাবে সত্য যে, বৈদেশিক শাসনের মাধ্যমে আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসার সুযোগ যদি তিনি জীবনে না পেতেন, তাহলে তাঁর পিতৃপুরুষদের মতই অজ্ঞাত অখ্যাত অবস্থায় তাঁর জীবনেরও অবসান হত এবং আজ যেভাবে তিনি তাঁর মাতৃভূমি তথা সমগ্র আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানব-সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগের মহান সুযোগ পেয়েছেন, তা কোনমতেই সম্ভব হত না।

স্কুলে কলেজে ইংরাজ ও ফরাসী জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস পাঠ করেই আফ্রিকার তরুণ সমাজের মনে নতুন করে স্বাধীনতার স্বপ্ন জেগে ওঠে। এ সম্পর্কে আরও বেশি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে দলে দলে আফ্রিকার তরুণ দেশপ্রেমিকের দল যাত্রা করেন ইউরোপ ও আমেরিকায়। আর এই প্রবাসী নিগ্রো তরুণদের উদ্যোগেই ১৯২০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে গড়ে ওঠে পশ্চিম আফ্রিকা জাতীয় কংগ্রেস। ঘানার দেশপ্রেমিক জোসেফ কেসলি হেয়ফোর্ড হলেন এই সঙ্ঘের মূল প্রতিষ্ঠাতা। এই সংগঠনটির প্রচারের ফলে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানব-সমাজ সর্বপ্রথম সাহারার দক্ষিণভাগে সমগ্র কৃত্রিম ব্যবধান তুচ্ছ করে একটি অখণ্ড নিগ্রো সংযুক্ত রাষ্ট্র গড়ে তোলার কথা চিন্তা করতে সমর্থ হন, কিন্ত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে হেয়ফোর্ডের মৃত্যু হওয়াতে তাঁর গঠিত প্রতিষ্ঠানটির কাজও সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ডক্টর ডিউ বইস, জি প্যাডমোর, জোমো কেনিয়াট্টা প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় প্যান-আফ্রিকান আন্দোলন আবার প্রবল হয়ে ওঠে এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁদের উদ্যোগে ম্যাঞ্চেস্টার
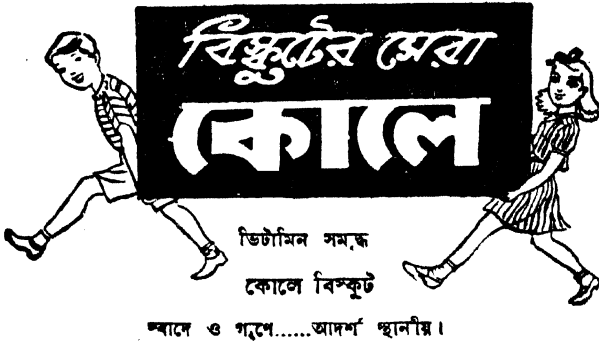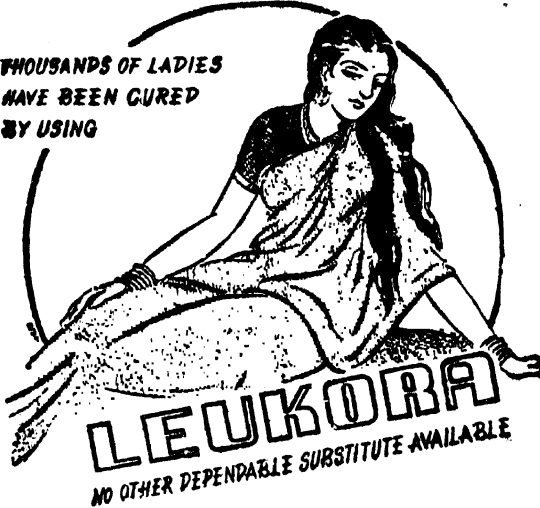
শহরে পঞ্চম আফ্রিকান মহাসম্মেলন আহূত হয়।

ডাঃ এনক্রুমা সেই বছরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছিলেন বৃটেনে, লণ্ডনের স্কুল অফ ইকনমিকসে তাঁর থিসিস প্রস্তুতির উদ্দেশ্য। গ্রেজ ইনেও তিনি যোগ দিয়েছিলেন আইন অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে। কিন্তু আফ্রিকান মহাসম্মেলনের কথা শোনামাত্রই তাঁর পড়াশুনা মাথায় উঠে গেল। তিনি সেই সম্মেলনে যোগ দিলেন এবং কেনিয়াট্টা প্রমুখ মহান আফ্রিকান নেতাদের সংস্পর্শে এসে পেলেন অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা। প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেসের নতুন কমিটির তিনি হলেন সহ-সম্পাদক, আর পশ্চিম আফ্রিকা ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি। তাছাড়া আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলনের মুখপত্র 'নিউ আফ্রিকার' সম্পাদনার দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পিত হ'ল। প্যান- আফ্রিকান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হ'লেন ডাঃ নামদি এজিকুয়ে, যিনি বর্তমানে পূর্ব নাইজেরিয়ার প্রধানমন্ত্রী।

অনতিবিলম্বেই ডাঃ এনক্রুমা লেখনীর মাধ্যমে তাঁর দেশবাসীর কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদেরই আহ্বানে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখে তিনি দেশে ফিরে এলেন। এসেই তিনি গোল্ড কোস্টের স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠন ইউনাইটেড গোল্ড কোস্ট কনভেনশনে যোগদান করলেন এবং অনতিবিলম্বেই ঐ প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হ'লেন। কিন্তু তাঁর আপস-বিরোধী মনোভাবের সঙ্গে কনভেনশনের অন্যান্য নেতাদের বেশিদিন পাল্লা দিয়ে চলা সম্ভব হ'ল না। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই অন্তর্বিরোধ প্রবল হয়ে উঠল এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড গোল্ড কোস্ট কনভেনশন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে গেল। এনক্রুমা তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গড়ে তুললেন নতুন দল 'দি কনভেনশন পিপলস্ পার্টি', যার মূলমন্ত্র হ'ল অনতিবিলম্বেই গোল্ড কোস্টের পূর্ণ স্বাধীনতা।

দলের গৃহীত কর্মপন্থার বাস্তব রূপায়ণের জন্যে ডাঃ এনক্রুমা ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আক্রায় এক সম্মেলন আহ্বান করেন এবং মহাত্মা গান্ধী অনুসৃত অহিংস অসহযোগের মাধ্যমে অনতিবিলম্বে গোল্ড কোস্টের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের শপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু সে কর্মপন্থা নিয়ে অগ্রসর হওয়ার আগেই তিনি বৃটিশ শাসকদের হাতে বন্দী হন। ডাঃ এনক্রুমার এই আকস্মিক গ্রেফতারীতে সমগ্র গোল্ড কোস্ট বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সমবেতকণ্ঠে তাঁর মুক্তি দাবি করে। ঠিক ঐ বিক্ষোভের মুহূর্তে গোল্ড কোস্টে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। ডাঃ এনক্রুমা বন্দী থাকা সত্ত্বেও তাঁর সদ্যগঠিত দল সেই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেন এবং ৩৮টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে ৩৪টি অধিকার করে নিলেন। ডাঃ এনক্রুমার জনপ্রিয়তা কতখানি, বৃটিশ সরকার তা ভাল করেই বুঝতে পারলেন এবং সে কারণে অনতিবিলম্বেই তাঁর মুক্তির নির্দেশ দিলেন। কারামুক্ত হয়ে এসেই তিনি গঠন করলেন ঘানার নতুন সরকার। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার আগেই তিনি দেশের সামগ্রিক উন্নতির উদ্দেশ্যে গ্রহণ করলেন একটি পঞ্চবার্ষিক যোজনা এবং তার পূর্ণ সাফল্য সুনিশ্চিত করার জন্যে আর একবার যাত্রা করলেন ইউরোপ ও আমেরিকায়, সে সব দেশ থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেকনিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি সংগ্রহ করে আনতে।

স্বদেশের উন্নতির জন্যে এত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও ডাঃ এনক্রুমা কিন্তু কোন সময়ের জন্যেই তাঁর বৃহত্তর কর্তব্যের কথা ভোলেননি। সাহারার দক্ষিণে বসবাসকারী সমগ্র নিগ্রো সমাজ যতক্ষণ পর্যন্ত না সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল পাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘানার অর্জিত স্বাধীনতা সার্থক হ'বে না, একথা তিনি বলেছেন বারবার। আর এই উদ্দেশ্যেই ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি আহ্বান করেন প্রথম সর্ব আফ্রিকা ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলন। তারপর ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে আক্রায় অনুষ্ঠিত হয় এগারোটি নিগ্রো রাষ্ট্রের আর একটি প্রতিনিধি সম্মেলন এবং সেখানে তাঁরা আলোচনা করেন সমগ্র আফ্রিকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্পর্কিত নানা সমস্যাবলী। এই সম্মেলনের শেষে ডাঃ এনক্রুমা এগারোটি নিগ্রো রাজ্যই পরিভ্রমণ ক'রে আসেন।

এই সম্মেলন ও পারস্পরিক মত বিনিময় ও সহযোগিতার ফলে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানব সমাজের ঐক্য ও সংহতি আজ কতখানি অগ্রসর হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল গত ৮ই ডিসেম্বর আক্রায় অনুষ্ঠিত আফ্রিকার ২৮টি রাজ্যের প্রায় ২০ কোটি মানুষের সার্ধ-শিক্ষিত প্রতিনিধি সম্মেলনে। পাঁচ দিন ধরে আক্রা মুখরিত হয়েছিল দূর দেশাগত প্রতিনিধিদের উদ্দীপনাময়ী ভাষণে, রাস্তায় রাস্তায় পতাকার শোভায় আর উদ্দীপ্ত ঘানাবাসীদের জয়ধ্বনিতে। প্রতিনিধিদের মধ্যে সব চেয়ে অভাবিত এবং সেকারণে সব চেয়ে বেশি সম্বর্ধিত হয়েছিলেন রুই ভেনটিউস; তিনি এসেছিলেন পর্তুগীজ উপনিবেশ, এঙ্গোলা থেকে; রহস্যজনকভাবে পর্তুগীজ প্রহরীদের সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন কেনিয়ার ফেডারেশন অফ লেবারের সাধারণ সম্পাদক মিঃ টম মবোয়া এবং উদ্বোধন করেছিলেন সম্মেলনের আহ্বায়ক ডাঃ এনক্রুমা। তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে তিনি স্পষ্ট ক'রে একথা জানিয়ে দেন যে, আফ্রিকার যে কোন অঞ্চলের মুক্তি সংগ্রামকে ঘানা তার সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করবে। সে সংগ্রাম অহিংস হোক, এই তাঁর কাম্য, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের আঘাতের জবাবে তিনি আফ্রিকাবাসীদের নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে উপদেশ দেবেন না। তাঁর ভাষণে তিনি আফ্রিকাবাসীদের সম্মুখে চারটি প্রধান কাজ তুলে ধরেন। সেগুলি হ'ল—স্বাধীনতা অর্জন, তারপর অর্জিত স্বাধীনতার সুরক্ষণ; শেষে স্বাধীন-রাষ্ট্রগুলির সম্মেলনে বৃহত্তর রাষ্ট্রগঠন ও সেই বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির সমবেত প্রচেষ্টায় সমগ্র আফ্রিকার আর্থিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ সাধন। বক্তৃতার শেষে একজন প্রকৃত বিপ্লবীর মত সারা আফ্রিকার মুক্তিকামী মানুষের কাছে উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন,—সারা আফ্রিকার মানুষ এক হও, শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই আমরা হারাব না।

সম্মেলনের অপর বক্তা, আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রামের নেতা ডাঃ ওমর বলেন, 'ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামে তাঁরা অবতীর্ণ হয়েছেন তা প্রকৃতপক্ষে অহিংস সংগ্রাম। কারণ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আত্মশক্তি প্রয়োগ হিংসা নয়। পরিশেষে সম্মেলনের সভাপতি মিঃ মবোয়া তাঁর সংক্ষিপ্ত অথচ দীপ্ত ভাষণে বলেন, 'আজ আফ্রিকার কুড়ি কোটি মানুষ সমবেত কণ্ঠে তাদের মুক্তির শপথ ঘোষণা করছে। সম্মেলনের অধিবেশন পাঁচদিনে শেষ হলেও গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত তার কাজ শেষ হবে না।' তারপর সম্মেলনে উপস্থিত সকল প্রতিনিধিকে তিনি আহ্বান জানান, তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সারা আফ্রিকার মানুষের হয়ে ইউরোপীয় শোষণবাদীদের উদ্দেশে বলতে, 'বেরিয়ে যাও আফ্রিকা থেকে।'

সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে আক্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি স্থায়ী সেক্রেটারিয়েট, যার কাজ হবে আফ্রিকার সর্বাঙ্গীণ মুক্তি-সংগ্রাম ও উন্নয়ন প্রয়াসকে শক্তিশালী করে তোলা। দক্ষিণ আফ্রিকার মানবতাবিরোধী

শ্বেতাঙ্গ শাসকদের সঙ্গেও সকল প্রকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত এই সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে।

ভবিষ্যতে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত হয়ে কি ধরনের যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তুলবে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে ডাঃ এনক্রুমা গত ১২ই ডিসেম্বর ঘানার পার্লামেন্টের অধিবেশনে বক্তৃতা দানকালে বলেছেন, ঘানা আর গিনির মিলনে যে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠবে তা হবে সব আফ্রিকা মিলনের প্রথম পদক্ষেপ। দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি, মুদ্রা প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে সকলের স্বার্থ সমানভাবে জড়িত সেইগুলির শাসন দায়িত্ব তাঁরা পরিচালিত করবেন হাতের মত অবিচ্ছিন্ন হয়ে, আর যে সকল স্থানীয় ও গার্হস্থ্য বিষয়ে আছে তাঁদের মৌলিক পার্থক্য, সেইখানে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হবেন আঙুলের মত। এই পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে যে বিশাল আফ্রিকান ব্যক্তিত্ব জেগে উঠবে, বিশ্বসমাজ জানাবে তাকে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি।
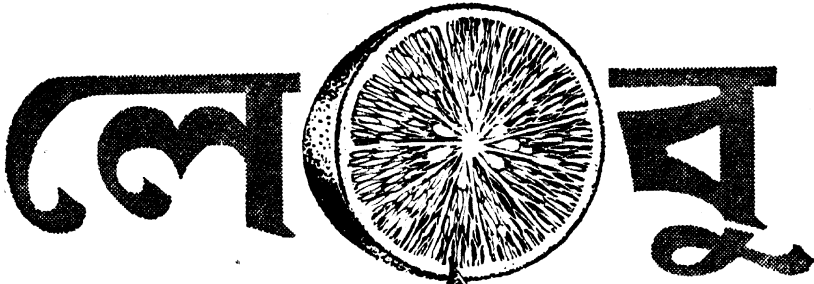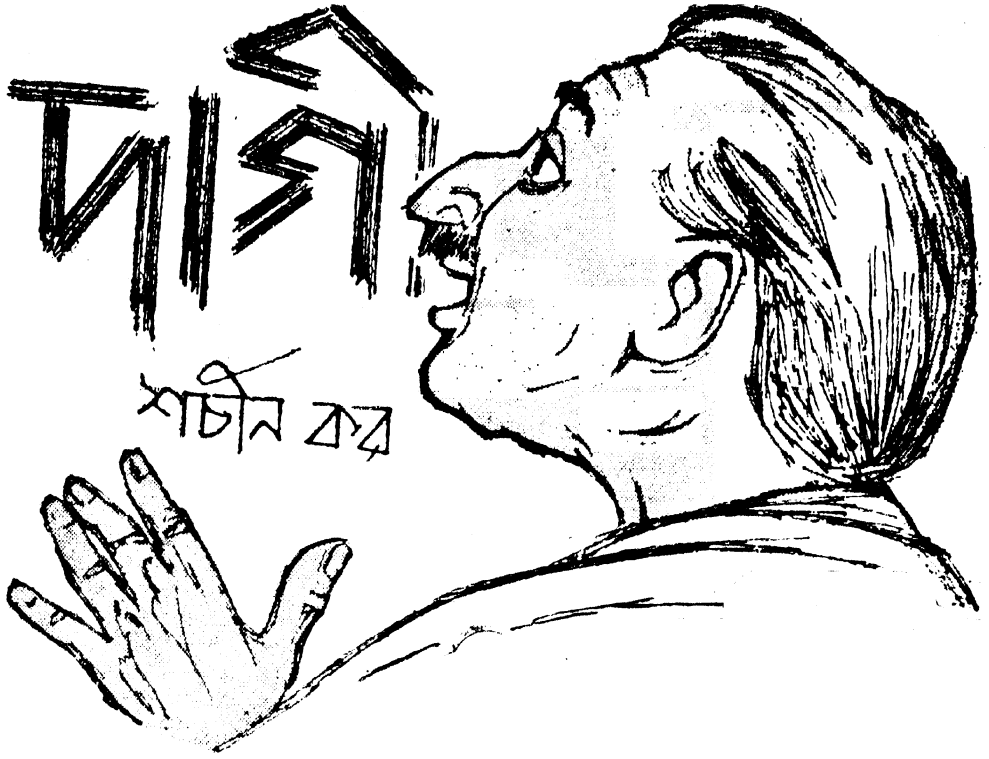
লালবাজারের নথিভুক্ত দাগী তিনি নন। নামও তাঁর ঠিক দাগীর মতন নয়, তারাপদ ব্যানার্জি। কিন্তু কপালের এক-ধারে একটা গভীর ক্ষতের দাগ থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি দাগী নামেই চিহ্নিত হলেন। এই ক্ষতের কাহিনী যেমন বিচিত্র, তেমনি গভীর রহস্যে আবৃত। এই রহস্যের আবরণ উন্মোচন করলেন তারাপদ নিজেই।

শহরতলীর একটি অখ্যাত পাড়ায় তারা-পদ ব্যানার্জির সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। এপাড়ায় তার আকস্মিক আবির্ভাব একটু অভিনব বটে। তাঁর সাজ-পোশাক, চাল-চলন এপাড়ার অকুলীন জীবনযাত্রায় সত্যিই বেমানান। তাই পাড়া প্রতিবেশীর তাঁর সম্বন্ধে কানাকানির অন্ত নেই। কিন্তু পরিচয় সম্বন্ধে জানাজানি হলো না কিছুই।

কেউ বল্লেন,'লোকটা উন্নাসিক। সে যে এপাড়ায় অন্য দশজনের চেয়ে চালে-চলনে বড়, একথাটা স্পর্ধা করে ঘোষণা করাই তাঁর উদ্দেশ্য।'

কেউ বল্লেন—'লোকটার নিশ্চয়ই মতলব খারাপ। যা দিনকাল পড়েছে, তাতে সহজে কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। ওর সম্বন্ধে একটু সতর্ক থাকাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ'।

কিন্তু তারাপদ একদিন সবারই বুদ্ধি গুলিয়ে দিলেন। উন্নাসিক ও মতলববাজ বলে আখ্যাত তারাপদ নিতান্ত সাধারণ মানুষের মতোই একদিন পাড়ার ছেলেদের আসরে এসে উপস্থিত হলেন। সেদিন ছেলে-দের কী একটা ফুটবল ম্যাচ ছিল। পাড়ার মাঝখানে এক ফালি পতিত জমি। একদিকে বৃষ্টির জল দাঁড়িয়ে আছে। আর বাকি সারা মাঠটাই কাদায় ভরতি। এই মাঠেরই দুদিকে থান ইট দিয়ে গোলপোস্ট করে একটা তালিমারা ফুটবল নিয়ে ছেলেরা প্রতিবেশী পাড়ার সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ খেলায় মেতে উঠেছে। আর তারাপদ মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ম্যাচ খেলার দর্শকের মত সমঝদারি করছেন। তাও নয় হলো। কিন্তু এপাড়ার ছেলেরা একটি জয়সূচক গোল করার পর তারাপদ যখন গোল গোল করে নৃত্য করতে লাগলেন, তখন পাড়ার লোকদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। লোকটা পাগল নয়ত।

পাগল ছাড়া আর কী। নইলে যে-তারাপদ পাড়ার কারও সঙ্গে মেশেন-টেশেন না তিনি খেলার শেষে ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে আড্ডায় বসে গেলেন। আর বসলেন জলকাদা ভরা মাঠের মাটিতেই। কোন একটি ছেলে ছুটে গিয়ে বসবার জন্য একটা মোড়া নিয়ে এলো। তারাপদ মোড়াটা **একধারে সরিয়ে রেখে বলতে লাগলেন—**

'১৯১১ সালে মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড জিতেছিল, সে কথাটা তোমরা সবাই জানো। কিন্তু যে-কথাটা তোমরা জান না সেইটেই বলছি। আই এফ এর খেলা তখনও শুরু হয়নি। মোহনবাগান ক্লাবের কর্তারা মহা মুশকিলে পড়লেন আমাকে আর অভিলাষকে নিয়ে। অভিলাষ সেণ্টর ফরোয়ার্ডে খেলে। আমিও তাই। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখেন।

অভিলাষ কয়েকদিন ফ্রেণ্ডলি ম্যাচে খেলা দেখাবার চান্স পেয়েছে। সেদিন এমনি একটা ম্যাচে আমাকে সেণ্টার ফরোয়ার্ডে খেলতে দেওয়া হলো। এক অভিলাষ ছাড়া শিবু-বিজয়-কানু সবাইকে নিয়ে মোহনবাগানের ফুল টিমই খেলতে নামল। কিন্তু কী যে হলো, সেদিন জানিনে। সারাক্ষণ আমরাই বিপক্ষ দলকে চেপে রইলাম, কিন্তু গোল আর কিছুতেই হয় না। শিবু পাগলের মতো সারা মাঠ চষে বেড়াতে লাগল, বিজয় মরিয়া হয়ে উঠল, কানু বেচারা বুঝি প্রায় কেঁদে ফেলে। দর্শকরা চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন—'দু দিন পর আই এফ এ খেলতে যাচ্ছেন গোরাদের সঙ্গে। আরে ছো ছো একি আর একটা খেলা।' ছোট ছোট ছেলেরা যারা খেলার কিছুই জানে না তারা পর্যন্ত দুয়ে দুয়ো করতে লাগল। রাগে দুঃখে **নিজের চুল নিজে বুঝি ছিঁড়তে লাগলাম।**

খেলা শেষ হতে আর এক মিনিট বাকি। দর্শকদের অনেকেই তখন বিরক্ত হয়ে মাঠ ছেড়ে চলে গেছেন। ঠিক এই সময় কানু একটা উঁচুর সট্ মেরে বলটাকে বার ঘেঁষে পাস করে দিল। আমি হে মা কালী বলে মরিয়া হয়ে লাফিয়ে উঠে হেড নিলাম। মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম বল গোলে ঢুকেছে। কিন্তু সংগে সংগেই কী একটা অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার করে মাটিতে পড়ে গেলাম।

তারপর কী হলো কিছুই জানিনে। যখন জ্ঞান হলো, তখন আমি হাসপাতালে। শুনলাম হেড নিতে গিয়ে বারে লেগে আমার কপাল ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। হাসপাতালে শুয়ে শুয়েই একদিন শুনলাম মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড জিতেছে। সেদিন কী আনন্দ। নার্সদের সাধ্যি কি আমায় ধরে রাখে। বারান্দায় ছুটে গিয়ে গোল গোল করে পাগলের মতো নৃত্য করতে লাগলাম। অবশ্য দুঃখও হলো। আমার কপাল ফেটে যাওয়ায় অভিলাষই শেষ পর্যন্ত চান্স পেয়ে গেল। তা নইলে ১৯১১ সালের মোহনবাগান টিমে তারাপদ বানার্জির নামও হয়ত অমর হয়ে থাকত। কিন্তু সবই কপাল"—তারাপদ তাঁর কপালের দাগটায় করাঘাত করে ছেলেদের থেকে বিদায় নিলেন।

বিদায় নিলেন এপাড়া থেকেও। অল্প ক' দিনের মধ্যেই। এখানে কেউ তাঁকে আবাহন করে আনেননি, সুতরাং তাঁর অকাল-বিসর্জনে ক্ষুণ্ণও হননি কেউ। অপরিচিতের মতোই তিনি এসেছিলেন, অপরিচিতের মতোই একদিন নিঃশব্দে বিদায় নিলেন। শুধু পাড়ার ছেলেরা ক'দিন একটু মনমরা হয়ে রইল। তারাপদ তাদের একটা নূতন ফুটবল কিনে দিয়েছিলেন। তাছাড়া ১৯১১ সালের মোহনবাগান টিমে যাঁর চান্স হতে-হতে-মাটি হয়ে গেল, শুধু কপাল দোষে তিনি এপাড়ায় থাকলে ফুট-বল খেলাটা শেখা যেতো ভালো, ছেলেরাই এসব কথা বলেছে। তারাপদর সুখ্যাতিতে তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

২

তারাপদর প্রতি প্রীতিতে গদগদ হয়ে ওঠে দিল্লীর যুব সম্প্রদায়ও। তাদের পৃথিবীতে অফুরন্ত রঙের সমারোহ, অন্তরের গভীরে প্রেমের ফল্গু। নরনারীর চিরন্তন অভিষ্ট সম্বন্ধে চোখে তাদের অদম্য কৌতূহল। এই নূতন যৌবনের দূতকে চিরযুবা তারাপদ কৌতূহলী করে তোলেন তাঁর বিচিত্র কাহিনীর মায়া জালে।

"কুতবমিনার দেখতে গিয়েছিলাম। দেখা হয়নি, তার বদলে দেখে এলাম দুটি তরুণ-তরুণীর মানসমিনার।"—নূতন যৌবনের দূতরা উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। তারাপদ বলতে থাকেন—

'কুতবের নির্জন পরিবেশে দুটি তরুণ-তরুণী হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে একজন অন্যজনের কাছে। একটা গাছের অন্তরাল ছিল বলে তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থিতি সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল না। তাই তাদের কানে কানে বলা গোপন কথার দু একটি টুকরো কানে এসেছে। তারা বলেছে পূর্ণ নিবিড় মিলনের প্রতীক্ষা করবে তারা দুজনেই, আমরণ। আর যদি কোনও দিন কোন বাধা....'যমুনার জল কত গভীর তা কি দেখতে পারব না'—বলেছে তরুণীটি। 'কুতবমিনার কত উঁচু তাও তাহলে আমায় দেখতে হবে' বলেছে সংগী তরুণ।

এমনি অনেক কথাই তারা বলেছে। নূতন কোন তথ্য বা তত্ত্ব এতে নেই। তবু তাঁদের পরস্পরের সান্নিধ্যে এই যে ক'টি মুহূর্ত আশায় আনন্দে ঝলমল করে উঠল সে তো তুচ্ছ নয়। তাদের মনের রঙ বুঝি লাগল আমারও মনে, বহুদিন বিস্মৃত মনের কোনও নিভৃত আলেখ্যে রঙের প্রতিফলন। কিন্তু সে কথা থাক।

কখন তারা উঠে গেল টের পাইনি। কখন সন্ধ্যা নেমেছে সেদিকেও হুঁশ নেই। এদিকে আবার অকস্মাৎ বৃষ্টি এলো। আর দেরি করা চলে না। আমায় দিল্লী ফিরে যেতে হবে।

কনকনে হাওয়ায় বেশ শীত লাগছে। গায়ের চাদরটা ভালো করে মুড়ি দিয়ে টাঙ্গাওলার গজলের টুকরো সুর ও কথা শুনছি।—'মিটগায়া যব মিটনেওয়ালো, ফের পয়াম আয়া তো কোয়া।' একি শুধু একটা গানের গান, না এখানেও ছিল কোন অমরণ প্রতীক্ষার প্রতিশ্রুতি? সব যখন চুকেবুকে গেল, লগ্ন গেল উত্তীর্ণ হয়ে, তখন নিঃস্ব নিঃসম্বল মুহূর্তে এলো তার বার্তা, এ দিয়ে এখন আর কী হবে? সুর তো নয়, যেন বঞ্চিতের বুকফাটা আর্তনাদ হাওয়ায় হাওয়ায় ফেটে পড়ছে। শ্রোতা শুধু মৌন বধির আকাশ। অকস্মাৎ—

অকস্মাৎ নারী কণ্ঠের আর্তনাদ। যে-টাঙ্গাটা আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল, সেটা হঠাৎ থেমে গেল। অন্ধকারে কিছুই ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। রাস্তার ধারের আলোও পর্যাপ্ত নয়। তবু মনে হলো তিন চারটে লোক বুঝি লাঠিসোটা নিয়ে সামনের টাঙ্গাটাকে ঘিরে ফেলেছে। নারী কণ্ঠের আর্তনাদও ভেসে আসছে সেদিক থেকেই।

ভাববার আর এক মুহূর্ত সময় নেই। টাঙ্গা থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে গেলাম ঘটনাস্থলে। যা ভেবেছিলাম তাই। গুন্ডারা টাঙ্গা আক্রমণ করেছে। তিনজনে মিলে একটি যুবকের মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তাকে টাঙ্গার চাকার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধছে। আর একজন মেয়েটিকে নিয়ে ধ্বস্তাধস্তি করছে। মেয়েটি আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজকে গুন্ডার কবল থেকে মুক্ত করতে। টাঙ্গাওলা কোথায় সরে পড়েছে জানিনে। দূরের ক্ষীণ আলোতে দেখলাম কুতবমিনারের প্রাঙ্গণে দেখা সেই দুটি তরুণ আর তরুণী।

মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করে যে-গুন্ডাটা তরুণীটিকে নিয়ে টানাটানি করছিল, ক্ষিপ্র গতিতে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সজোরে তার ঘাড়টা কামড়ে ধরলাম। সে একটা অব্যক্ত আর্তনাদ করে মেয়েটিকে ছেড়ে দিল। কামড়ে তার ঘাড়ের খানিকটা মাংসই বুঝি ছিঁড়ে এল। অন্য একটা গুন্ডা সঙ্গীর সাহায্যে ছুটে আসতেই তার বাবরি চুলের মুঠো টেনে ধরলাম। আর সেই-সঙ্গে কপালে একটা প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম। তারপর কী হলো জানিনে। যখন জ্ঞান হলো, তখন আমি হাসপাতালে। এই সেই আঘাতের দাগ কপালে।'

তারাপদ তার কপালের গভীর দাগটা দেখিয়ে দেন। নূতন যৌবনের দূতেরা প্রায় সমস্বরেই বুঝি 'ইস' করে ওঠে, শ্রদ্ধা আর সহানুভূতিতে বিগলিত হয়ে পড়ে। 'কিন্তু সেই তরুণ আর তরুণীর কী হলো—' জিজ্ঞাসা করে তারা।

তারাপদ বলতে থাকেন—'তরুণের কথা জিজ্ঞেস করো না তোমরা। তাঁর খোঁজ নিইনি, নেওয়ার ইচ্ছেও নেই।' যুবকেরা তারাপদর কথায় বাধা দেয়। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করে, 'তাহলে কি সেই তরুণই...।'

'না, তার চেয়েও মারাত্মক অপরাধে সে অপরাধী। সে কথাটা ক্রমে বলছি। তরুণীটির কথাই আগে শোন।'...

'ঘাড়ে কামড়ের চিহ্ন দেখেই পুলিস গুন্ডাকে গ্রেপ্তার করে। তার স্বীকার উক্তির সূত্র ধরেই পরে অন্যান্য সব কটা গুন্ডাকেই ধরা হয়। মামলার শুনানী হলো। সেই মামলায় প্রধান সাক্ষী ছিলাম আমিই। যথা সময়ে মামলার রায়ও বেরুলো,—সব কজনের কঠোর কারাদণ্ড হলো। শুধু দণ্ড হলো না তাদের—যারা একটি অসহায় নিরপরাধ তরুণীকে মানুষের মতো মানুষ হয়ে বাঁচবার অধিকার থেকে বঞ্চিত করল। তরুণীটিকে ঘটনার প্রায় এক মাস পর

গুণ্ডাদের আস্তানা থেকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু মামলা শেষ হয়ে যাবার পর আর তার পিতৃগৃহে স্থান হলো না। কী দুঃখে যে সে একদিন নীরবে গৃহত্যাগ করে গেল তা তার অন্তর্যামীই জানেন। এই নির্বান্ধব পৃথিবীতে একটি মাত্র নির্ভর তার দায়িত্বের কাছে সে দিয়েছিল একথা অনুমান করতে বেশ কষ্ট হয় না। কিন্তু এখানেও যে সে আশ্রয় পায়নি, এ অনুমান করাও শক্ত নয়। এত বড় প্রবঞ্চনার আঘাত সহ্য করতে পারেনি বলেই তরুণী তার কথা রেখেছে, যমুনার জল কত গভীর তা দেখতে গেছে। ওকলার বাঁধের জলে তার মৃতদেহ ভাসতে দেখা গেল। এইতো দেশ, এইতো সমাজ।'

৩

দেশের কথায় তারাপদ পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। কিন্তু সে অন্য এক পরিবেশ। কোনও জনকল্যাণ সমিতির এক ঘরোয়া সভা। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সমাজের ব্যাপক দুর্নীতি নিরোধের পন্থা আবিষ্কার। বক্তারা একে একে তাঁদের বক্তব্য বলে গেলেন। এক বাক্যে সবাই স্বীকার করলেন দুর্নীতি আজ আমাদের সমাজে ব্যাপক হয়ে উঠেছে। সবারই সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, দুর্নীতি নিরোধে সমাজ উদাসীন, সরকার অসহায়, পুলিস পঙ্গু। যে-শক্তির অকৃপণ সহযোগিতায় সমাজ থেকে এই পাপচক্রের মূলোচ্ছেদ সম্ভব হতে পারে, সে হলো দেশের যুবশক্তি।

'কিন্তু যুবকরা কোথায়?' প্রশ্ন করেন তারাপদ। সবাই নিরুত্তর। তারাপদ নিজেই বলতে থাকেন...

'বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর হাতে দেশ-মাতৃকার লাঞ্ছনায় দেশের যুব সমাজ একদিন গৃহসুখে আগুন জেলে দিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। আহ্বান জানিয়েছিল কোটি কোটি নরনারীকে—কে আছ মায়ের মুখপানে চেয়ে, এসো কে কেঁদেছ নীরবে। নিজেদের নিতান্ত অক্ষম ও দুর্বল ভেবে ক্ষণেকের তরেও যাঁদের মনে দ্বিধা জেগেছে তাদের উদ্দীপ্ত উজ্জীবিত করে তুলেছিল এই বলে—যার মাতৃকণ্ঠে বাজিছে শৃঙ্খল দুর্বল-সবল সে কি ভাবিবে, এসো কে কেঁদেছ নীরবে। আজ কে জানাবে আহ্বান, আর সাড়াই বা দেবে কে?

'বিদেশী শাসক আজ আর নেই। কিন্তু দেশের লাঞ্ছনা তো তবু ঘুচল না। এ আরো মর্মান্তিক এই হেতু যে, আমরা নিজেরাই দুর্নীতির পঙ্ক-উৎসবে মত্ত হয়ে দেশ ও সমাজের কপালে কলঙ্ক লেপন করছি। এই সর্বনাশা আত্মঘাতী নীতির বিরুদ্ধে অমিতবীর্য নিয়ে আজ যারা দাঁড়াবে তারা কি সমাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? যে আদর্শের আলোকবর্তিকা ঘন-তমসাচ্ছন্ন দুঃখ-রজনীতে পথের সন্ধান দিয়েছে, সে-আদর্শ কি আজ নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল? কিন্তু যাঁরা ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেল, জীবন মৃত্যুকে যারা পায়ের ভৃত্য ছাড়া মনে করত না, তারা এই দেশেরই মাটি-জল-আলো-বাতাসে গড়া মানুষ। সেই মানুষের মতো মানুষের পুনরাবির্ভাব এখানে নিতান্তই অসম্ভব, একথা বিশ্বাস করতে মন চায় না।

'মনে পড়ে ১৯০৫ সালের ঘটনা। বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনের দিন। মনে পড়ে বরিশালের চিরঞ্জীবী যুবক চিত্তরঞ্জনের কথা। মনে পড়ে তাঁর ওপর পুলিসের বর্বর অত্যাচার। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে চিত্তরঞ্জনের কম্বু কণ্ঠে বন্দে মাতরম ধ্বনি। সরকারের হুকুমনামা, পুলিসের হুমকি, রেগুলেশান লাঠির প্রচণ্ড আঘাত সমস্ত হেলায় তুচ্ছ করে চিত্তরঞ্জন দৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন বন্দে মাতরম। প্রবল পরাক্রান্ত রাজশক্তির বিরুদ্ধে একটি নগণ্য, নিরস্ত্র যুবকের এই স্পর্ধা পুলিসকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। শুরু হলো বৃষ্টিধারার মতো লাঠি চালনা। চিত্তরঞ্জন মার খান আর বলেন—বন্দে মাতরম। আবার চলে লাঠি, আবার বলেন বন্দে মাতরম। মার খেয়ে খেয়ে একরকম অর্ধ চৈতন্য হয়ে তিনি পড়ে যান এক পুকুরের জলে। তবু মার থামে না, থামে না বন্দে মাতরম। জলের তলা থেকে মাথা তুলতেই পড়ে প্রচণ্ড লাঠির আঘাত, চিত্তরঞ্জন ডুবে যান। আবার মাথা তোলেন আর বলেন বন্দে মাতরম। কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে গেছে, তবু শোনা যায় বন্দে মাতরম। কতক্ষণ এই অমানুষিক অত্যাচার চলেছে মনে নেই। শুধু দেখলাম চিত্তরঞ্জন আর মাথা তুললেন না। তবে কি তলিয়ে গেলেন জলের তলায়? এ যে সারা দেশের ভরাডুবি হয়ে গেল।

'কথাগুলি ঠিক এমনি করেই ভেবে-ছিলাম কিনা মনে নেই। শুধু মনে আছে চিত্তরঞ্জনকে আর ভাসতে না দেখে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে-ছিলাম। ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম বুকের মণিককে বুকে করে জলের তলা থেকে টেনে তুলতে। সঙ্গে সঙ্গে রেগুলেশান লাঠি গিয়ে পড়ল আমারই কপালে।'

তারাপদ তাঁর কপালের গভীর দাগটা দেখিয়ে দেন। সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ নির্বাক বিস্ময়ে তারাপদর কপালের দাগটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। ইতিহাসের একটি অনধীত অধ্যায় বুঝি মুখর হয়ে ওঠে তারাপদর কণ্ঠে।

কিন্তু জনকল্যাণ সমিতির সভা শেষে আর কেউ তারাপদকে দেখতে পেল না। অনেক দিন পর শুনলাম তারাপদ ব্যানার্জি নাকি লালদীঘির সরকারী দপ্তরে ঘন ঘন যাতায়াত করছেন। সেখানে কপালের দাগের আর কোন্ নিগূঢ় ব্যাখ্যা তিনি করেছেন, সে তথ্য প্রশাসনিক গোপনতা থেকে উদ্ধার করা সত্যিই শক্ত।

অবাক পৃথিবী 'পেত্রা'

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার গাইডকে রাতের মতন আমি বিদায় দিলুম। অবাক পৃথিবীতে একা আমি যেন বন্দী। চারিদিকে পাহাড়; আরো পাহাড়। পাহাড়ের বুকে খোদাই করা ইতিহাসের ভুলে যাওয়া এক শহর। জর্ডান রাজ্য। নাম না জানা ফুলের সুগন্ধ। নীল আকাশে তারার মেলা। আকাশ; আরো আকাশ; মুঠো মুঠো আকাশ।

বহু বছর আগে সবে যখন ইতিহাসের অ আ ক খ পড়তে শুরু করেছি, ডব্লুডু লিবির একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম যার নাম ছিল 'দি স্ট্রেঞ্জেস্ট সিটি ইন আওয়ার প্ল্যানেট।'

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম পেত্রার আশ্চর্য বিবরণ। আরো পরে পড়েছিলাম পেত্রা থেকে লেখা লরেন্স অব অ্যারেবিয়ার ছাপানো একটি চিঠি—যতক্ষণ তুমি এখানে না আসছো কিছুতেই বুঝবে না আমি আজ কোন্ অবাক বিশ্বে। কল্পনাও করতে পারবে না পৃথিবীতে কত সুন্দর হতে পারে একটি স্থান!

ঘুমন্ত রাজ-প্রাসাদ। নিদ্রারত শহর। জনমানবহীন নরম সোনালী রাত। অব্যবহৃত মোমবাতিটা পাশেই পড়ে আছে। নীচে আরো নীচে দু-হাজার বছর ধরে ঘুমন্ত এক শহর। এক সভ্যতা থেকে অন্য আরো নানান সভ্যতার বিকাশ হয়েছে। পেত্রার তবু ঘুম ভাঙেনি।

ভাঙেনি ঘুম। বীতশ্রদ্ধ সে বুঝি সভ্যতার প্রতি। আর সে জাগবে না। কখনও না। জাগবে না কারণ সে আজ মৃত—'ডেড অ্যাজ ডাক্।' ওর ভগবানও বুঝি মরেছে, কারণ গোলাপী রঙের এই শহরটি 'ইজ হাফ অ্যাজ ওল্ড টাইম!'

বন্দী আমি। বন্দী পেত্রা। পাহাড়ের গায়ে উঠেছে পাহাড়। উপত্যকা। তারপর আবার পাহাড়। অনেক দূরে অবশ্য একটা জনপদ—মান। তারও পিছনে আকাবা উপসাগর, ঐ সেই লোহিত সাগরের ধারে! কিন্তু এখানে শুধু পাহাড়ের বিরাট এক ঢেউ আর পাহাড়ের বুকে খোদাই করা একটা ভুলে যাওয়া দিনের সমৃদ্ধশালী রাজধানী।

প্রাচীর ঘেরা রাজধানী। মহাবীর আলেকজেন্ডারেরও সেনাপতি হয়েছিল এখানে পরাজিত। নাবাটেইয়ান সভ্যতার হাজার বছরের স্মৃতি। গ্রীক সভ্যতা ও রোমানদের আক্রমণে একদিন যে পরাভূত হলো সে পেত্রা আর জাগেনি। ইতিহাসের পাতা থেকেও আজ বুঝি ওরা আত্মগোপনের পথ খুঁজছে!

সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে আমি ক্লান্ত। ইতিহাসের কথাই আগে মনে এলো, ইতিহাস থেকেও অবাক এ পৃথিবী। শিল্প আর স্বপ্ন। স্বপ্নমাথা এ-শহরে সূর্যের প্রথম অরুণিমায় আজ আমি যা দেখলাম তা ভুলবার নয়। রামধনুর রঙে রঞ্জিত পাহাড়ের বিরাট ঢেউ। গোলাপী পাথরের পেত্রা শহর। এক একটা পাহাড়, স্বচক্ষে না দেখলে অবিশ্বাস হয়, এক একটা রং। লাল পাহাড়। নীল পাহাড়। সবুজ গিরিখাত। হলদে গিরিশৃঙ্গ। কালো শৈলশিরা। সব-কটি রং মিশে সৃষ্টি হয়েছে এখানে পাহাড়ের আদিগন্ত এক অবাক স্বর্গ। স্বপ্ন নয়। সত্যি। ঘুমিয়ে নেই। আমি জেগে।

বেদুইন কিশোরটি যখন নীচের ঐ খাদের গ্রাম থেকে আমার দুপুরের খাবার আনতে গেল তখন দগ্ধ করছিল আমায় জুলাইয়ের মার্তণ্ড। জনমানবহীন রোমান অ্যাম্পিথিয়েটারের একটা সিঁড়িতে বসে দিনমানে হয়েছিলাম আমি ভীত। পাহাড়ের বুকে পাথর কেটে কেটে তৈরী বিশাল অ্যাম্পিথিয়েটার। অর্ধচন্দ্রাকারে সারি সারি পাথরের সোপান। হাজারো দর্শক একদিন এখানে বসতো। দেখতো—কি দেখতো আমি জানি না। বাতাসহীন উত্তাপ। স্তম্ভিত বিস্ময়। ঐ ছেলেটিই যেন এতক্ষণ আমাকে আগলে রেখেছিল এই সময়েরও ভুলে যাওয়া
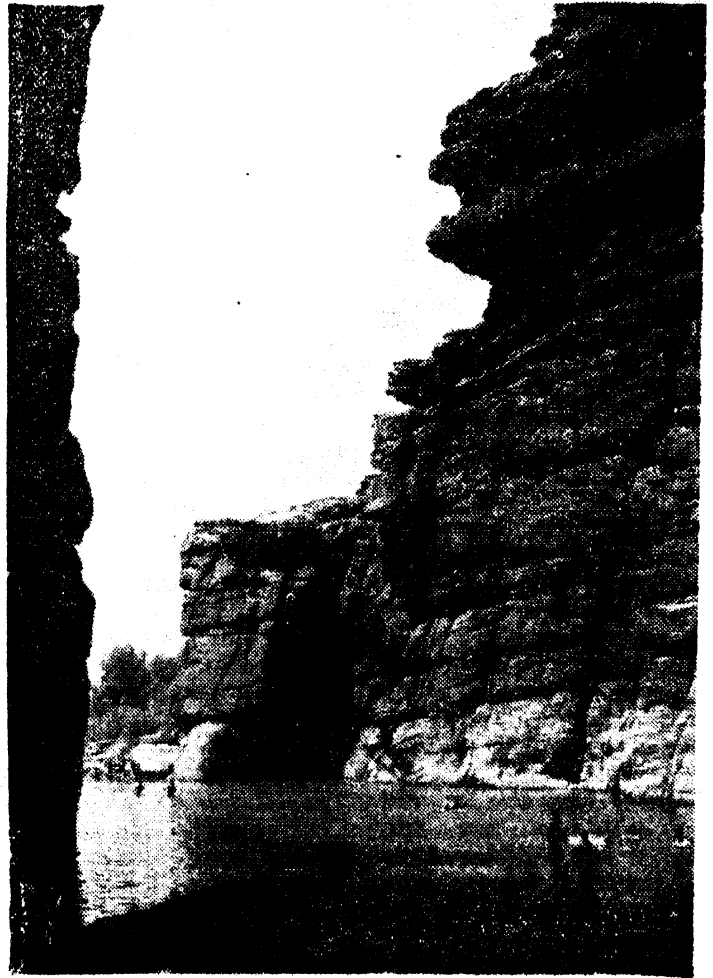
লাল রঙের পাহাড়, সবুজ নুড়ি, হলদে মাটি; ঝরনায় স্নানরত বেদুইন

নাবাটেইয়ানদের একটি বিশাল মন্দির: চতুর্থ শতাব্দীতে ক্রুসেডররা এটিকে গির্জায় পরিণত করে

অবাক পৃথিবী থেকে। ও গেল। চারিদিকে শ্মশান এক পৃথিবী। প্রাচীরের এক একটি গম্বুজে এক একটি রথী মহারথীর কবর। এখন ভাবতেও কেমন যেন মনে হয়—ভয় পেয়েছিলাম বুঝি?

তিন হাজার ফুট উঁচু এই পাতালপুরীর ধ্বংসস্তূপে একা বসে সত্যিই আমি ভয় পেয়েছিলাম। এমনই এক দুপুরে লরেন্সের মতন নিজেকে আমি বলতে পারলুম না—না, আমি একটুও ভীত হইনি।

অদূরেই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। নরবলি হতো একদিন এখানে। দেবতার উদ্দেশে নরবলি। সে যূপকাঠটি আজও বর্তমান। ঐ যে সামনের অনুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, এন-নজর, শুনেছি ও ছিল নাবাটেইয়ানদের দেবতা; জাগ্রত দেবতা।

শরীরটা সির সির করে উঠলো। মস্ত-বড় একটা ঈগল পাখি টলতে টলতে হঠাৎ উড়ে এসে চিৎকার দিলো। পাশের ডুমুর গাছের ঝোপে কে বুঝি ফিস ফিস করলো। কিন্তু না; আমি বোধহয় সত্যিই ভয় পাইনি। ওইতো দাঁড়িয়ে আছে আমার সাদা ঘোড়াটা। চিবুচ্ছে ও গাছের সবুজ পাতা। শুনেছি ঐ গাছে নাকি ফুল হয় না। বীজ জন্মায় পাতার নীচে। কিন্তু মাছি নেই কেন ঘোড়ার নাকের ডগায়? কিম্ভূত ঈগলটাকেও-তো আর দেখছি না!

বেদুইন গফুর এলো। ছাগলের দুধের পনির। এক ঘটি গরুর দুধ। রুটি। এক মগ ডুমুর দেওয়া দুম্বার মাংস। ঘাসের উপর বসে দুজনে আমরা লাঞ্চ খাই। আমার খাপছাড়া ব্যাকরণ বর্জিত আরবী গফুর বোঝে না। কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো। ওর গুণে আছে কিছু ইংরেজী-বুলি।

গাইড নিয়ে কোথাও আমি দ্রষ্টব্য দেখি না জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য। ওরা আমায় জ্ঞান দেয় না। দেয় অজ্ঞান। ব্যাবিলোনের সেই গাইডটার কথা ভাবলে আজও হাসতে হাসতে দম বন্ধ হবার জোগাড়। রাণী সেমিরামিস নাকি আজও প্রতি রাতে ঝুলন্ত-বাগানে হাওয়া খেতে আসে। হেসেছিলাম। নিজের মাথার পাগড়িটা শক্ত করে চেপে ধরে ও গম্ভীর মুখে বললে—রাত্রে আসবেন? কিন্তু গফুর শুধু আমার গাইডই নয়। ও আমার কম্প্যানিয়ন। সাথী। ভারী রগুড়ে।

ও যখন রাজপ্রাসাদের একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে আমায় বল্লে এটা ছিল শহরের ডাকখানা, আমি তখন বললুম—তুমি কি করে জানলে দু-হাজার বছর আগে এটা ছিল ডাকখানা?

আমার অবিশ্বাসে ও বোধহয় মর্মাহত হলো। ছোট্ট মুখখানিকে গম্ভীর করে বললো—বিশ্বাস হয় না বুঝি?

হাসতে হাসতে বললাম—হবে, বুঝিয়ে দাও।

গম্ভীর মুখে এবারে এলো হাসি। বললো—ঐ দেখুন না চিঠির খোপ। দেওয়ালের গায়ে কত খোপ রয়েছে দেখছেন না?

দেখলাম। কিন্তু দশ-বারো ফুট উঁচুতেও অনেকগুলো খোপ। সন্দেহ প্রকাশ করতেই গফুর বললে—ও, আপনি বুঝি জানেন না, তখন যে এখানকার লোকেরা ছিল এগারো ফুট লম্বা!

এবারে আমি আর হাসিনি। হাসিনি, কারণ হাসলে ও বিরক্ত হতো। হয়তো আমি সঙ্গীহীন হতেম। ছোট্ট শহর পেত্রা। দূর থেকে শহরের ক্ষুদ্রতম অংশও দেখা যায়না। সুউচ্চ পর্বত শ্রেণীর মধ্যে দশ-বারো মাইল লম্বাচওড়া একটি উপত্যকা। এরই মধ্যে পেত্রা। পূবে পশ্চিমে দক্ষিণে তিন দিকে দুর্গম পাহাড়। উত্তরের পাহাড়ে দু-মাইল লম্বা একটি গিরিপথ। একটি মাত্র উট চলতে পারে এমন পথ। কিন্তু তবু এক-হাজার বছর ধরে এই পেত্রা ছিল পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণের একমাত্র ক্যারাভানসারায়—টাউন। এখানে একদিন ছিল বিশাল সব মুসাফিরখানা। দুনিয়ার ব্যাপারী আনতো এখানে তাদের পণ্যদ্রব্য। আসতো এখানে চীনের সিল্ক, ভারতের মলমল, মশলা, মুক্তা, ইরানের আতর, গালিচা, ব্যাবিলনের খেজুর। এখান থেকে নতুন উট বোঝাই হয়ে যেত ডামাসকাস, যেত গিজ্জা, সেখান থেকে মিশর হয়ে যেত ভূমধ্যসাগর পারে—এথেন্সে, রোমে আরো দূরে।

ইতিহাসের পাতায় লেখা আছে, সেদিন পেত্রায় রাজত্ব করত নাবাটেয়ান সভ্যতার লোকেরা। ওরা ছিল আরব। ওদের ছিল গণতান্ত্রিক এক রাজ্য। সবাই মেহনত করত। রাজাও। কারু কোনও ব্যক্তিগত চাকর ছিলনা। রাজারও না। খাবার টেবিলে বসে রাজাকেও পরিবেশন করতে হতো ভোজ্য। কিন্তু তখন পেত্রার নাম ছিলনা 'পেত্রা'। ছিল নাম তখন ওসাদি—মুসা। পেত্রা নাম

দিয়েছিল পরে গ্রীকরা। পেত্রা মানে পাহাড়। ওয়াদি-মুসা মানে?

মুসা হলেন স্বয়ং মসেস। হেব্রু পুরানে বলে ইজরাইলের সন্তানরা মিশর থেকে পালিয়ে এখানে এলো। কিন্তু জলহীন এই মরুময় দেশে এসে তারা শুধু তৃষ্ণাতেই ছটফটালোনা, নানা মরীচিকায় হলো বিভ্রান্ত। মুসার নির্দেশে ওরা মিশর ছেড়েছিল, দেখেছিল মুসার অলৌকিক ক্ষমতা। চিৎকার করে ভীত ইহুদীরা বললে—মুসা, আমরা যে মরলাম? কোথায় তোমার সেই 'প্রমিসড্ ল্যান্ড'?

হেব্রু পুরাণে বলে, মুসা তখন তার পথ চলার লাঠি দিয়ে সামনের পাহাড়টিকে দুবার আঘাত করলেন।

হেব্রুপুরাণ ইতিহাস নয়। কিন্তু প্রমিসড্ ল্যান্ড ঐতিহাসিক সত্য হয়ে রইল। অতি সত্য কথা, আজ এখানে কলকল করে যে নদীপ্রপাত প্রবাহমান—নাবাটেইয়ানদের সময়ে তা ছিল সুন্দর মিষ্টি জলের আঁকা-বাঁকা পাহাড়ে এক ছোট্ট নদী। ডামাসকাস আর গিজার মধ্যখানে পেত্রা। মক্কায় তখনও হয়নি হজরতের আবির্ভাব। চারিদিকের এই বিস্তীর্ণ মরুভূমির ত্রিসীমানায় ছিলনা পেত্রার মতন অফুরন্ত মিষ্টি স্বচ্ছ জল।

জল। অফুরন্ত মিষ্টি জল। জীবন। প্রাকৃতিক দুর্গ। তাই এখানে গড়ে উঠেছিল একদিন একটি সভ্যতা। মরুভূমির সভ্যতা। একটা অপরূপ মরূদ্যানে ছোট্ট একটি রাজধানী। উটের আস্তানা। পথিকের স্বর্গ। কারাভানের একটা আশ্রয়।

ইহুদীদের দীক্ষাগুরু মুসা এখানে এসেছিলেন বলে নাবাটেইয়ানরা তাদের রাজধানীর নাম দিয়েছিল—ওয়াদি মুসা। মুসার উপত্যকা।

আড়াই হাজার বছর আগের মরুভূমির এক ক্ষুদ্র সভ্যতা, বিজাতীয় এক মহাপুরুষের স্মৃতি জড়িয়ে রাখল চিরতরে তাদের রাজধানীর সঙ্গে। গ্রীক সভ্যতা সেই শহরের নতুন নামকরণ করলো শুধু 'পাহাড়' পেত্রা। আগামী দিনে গ্রীসকে দীক্ষা দিল, সমগ্র ইউরোপকে আলো দেখালো, এই নাবাটেইয়ান সভ্যতারই এক প্রতীক—জিসাস ক্রাইস্ট।

মাটি খুঁড়ে যে সব বাসন পাওয়া গেছে সে সব দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অনায়াসে বলতে পারেন, কবেকার তৈরী সে বাসন। নাবাটেইয়ানদের মাটির বাসন দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলেছেন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে এমন সুন্দর কারুকার্যময় ব্যবহারিক বাসন তারা আর দেখেননি। সমসাময়িক ইউরোপে তো নয়ই।

নাবাটেইয়ানদের সময়কার যেসব জিনিস ভূগর্ভ থেকে বেরিয়েছে তা দেখে বলা যায় ওরা ছিল সুসভ্য এক জাতি। কিন্তু অতি সভ্য জাতও কোথায় কবে স্বস্তিতে, শান্তিতে টিকে থাকতে পেরেছে? ওরা একদিন ডামাসকাস শহর করেছিল অধিকার। পরবর্তী যুগে মহাবীর আলেকজেন্ডারের বিরাট এক সেনাবাহিনীকেও করেছিল ওরা প্রতিহত, লোহিত সাগরে মিশরী রাণী ক্লিওপেট্রার নৌসেনাকেও ওরা করেছিল পরাজিত। কিন্তু কালের গতিতে ওরা তাল রাখতে পারেনি। গ্রীস একদিন ওদের অচমকা পরাস্ত করলো। দিল স্বায়ত্ত-শাসন। অটোনমি। দিল নতুন এক সভ্যতা। দিল স্বপ্নে মাথা নতুন ভাস্কর্য, যা আজও পেত্রার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যমান।

আড়াইহাজার বছর আগেকার কোষাগারের কিয়দংশ

কিন্তু গ্রীসও টিকে থাকতে পারলোনা। একটা সাম্রাজ্যের পতন মানে আর একটা সাম্রাজ্যের উত্থান। এলো এবার পরাক্রান্ত কুটিল রোম। দুহাজার বছর আগে সম্রাট ট্রাজান নাবাটেইয়ান সভ্যতার দিল সমাধি। দিল অমঙ্গলের প্রথম উদ্বোধন। সেই যে ঐ সুখের জাতিটি হারিয়ে গেল পৃথিবীর বুক থেকে আর ওদের খুঁজে পাওয়া গেল না। কোথাও না।

রাতে কি সুন্দর হাওয়া। মৃদু বাতাস। মিষ্টি বিরাট একখানা সোনালী চাঁদ। দিনে এরা কোথায় ছিল? দিনের বেলায় রোমান অ্যাম্পিথিয়েটারে বসে আমি যখন দেখছিলাম দিগন্তের ঐ পাহাড় তখন কেন ছিলনা ঝরনার জলের কুল-কুল গান, ফুলের মৃদু স্পন্দন? ঘুমন্ত পুরী অসাড় হয়ে এখনও ঘুমুচ্ছে; নিদ্রামগ্না বিধ্বস্তা নগরী। ভুলে যাওয়া অতিপরিচিত একটা গানের সুর। কিন্তু সেই দুপুরে কেন মনে হলো—এ-যে একেবারে মৃত?...

একটা গোলাপী পাহাড়ের উপর অন্য একটা নীল পাহাড়ের ঢেউ, লাল পাহাড়ের আঁচল। ওদের গায়ে খোদাই করা বিশাল এক অসমাপ্ত ক্যাথিড্রাল। নীল, গাঢ়ো নীল পাহাড়ী ঝরনা। সবুজ পাথর। সাদা নুড়ি। অনুভূতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করি অজানা এক অপার বিস্ময়। বিভ্রান্ত চোখে স্তম্ভিত-প্রায় তাকিয়ে থাকি প্রকৃতির উম্বেল এই আত্মহারা আবির্ভাবে। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি কি এখানেই পেয়েছিলেন তাঁর ক্যানভাসের পরিপ্রেক্ষিত? মরুময় অজানা এই দুনিয়ায় কে সৃষ্টি করলো অবাক এই পৃথিবী? রঙের এই অপূর্ব উর্দিধ?

রং বদলালো। পেত্রা ঘুমিয়ে থাকল বেশ কয়েক শতাব্দী, অজানা কয়েক শতাব্দী। জনমানবহীন পাতালপুরী ঘুমোলো পরিচিত পৃথিবীর অলক্ষ্যে।

মৃত্যুর দূত খৃশ্চান ক্রুসেডাররা এলো পেত্রায়—'অব অল প্লেসেস।' জেরুজেলামের

পথে ওরা ডেরা বাঁধলো পেত্রায়। দূরে ঐ পাহাড়ের বাঁকে আজও দাঁড়িয়ে ক্রুসেডারদের দুর্গ শোবেক। শোবেকের পাশে ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘর। কুঁড়ে ঘরটিতে আজই সকালে আমি কফি খেয়েছিলাম না?

আমি ওখানে কফি খেয়েছিলাম। বেদুইন বুড়িমার হাতে তৈরী কফি। কিন্তু ক্রুসেডাররা এখানে আসেনি কফি খেতে। তারা আসেনি শুধু যীশুর সমাধি আরবদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে। ওরা এসেছিল আরও এক কুটিল উদ্দেশ্যে।

বিকেল বেলায় আমি গিয়েছিলাম নাবা-টেইয়ানদের আমলের কোষাগারে। গ্রীক রোমান সবারই ছিল ঐ একই কোষাগার। গ্রীক ভাস্কর্যের রূপময় এক নিদর্শন। রাজ্যের উট পেত্রায় আস্তানা নিত দুনিয়ার পণ্যদ্রব্য বোঝাই হয়ে। রাজ্যের উট, কারা-ভান, এখান থেকে ছড়িয়ে পড়তো বৃহত্তর এক দুনিয়ায়—টেসিফনে, তাব্রিজে, ইস্পা-হানে, ভারতে। পেত্রা দিত বণিকদের নিরাপত্তা। দিত আশ্রয়। দিত অনন্যা সুন্দরী রমণীর প্রিয় সঙ্গ। পরিবর্তে পেত্রা পেত লক্ষ লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা। তাই এ কোষাগার। একটা নয় তিন তিনটে যুগের কোষাগার। নাবাটেইয়ান, রোমান, গ্রীক।

কোষাগার আমি দেখলাম। পাহাড়ের ঢালু দিকটা খোদাই করে তৈরী অপূর্ব এ ট্রেজারী। একটির পর একটি খোদাই করা ঘর দেখলাম। উবড়ো খাবড়ো ঘরের মেজে। ভাঙ্গাচোরা প্রাচীর। যক্ষের লুকোনো ধনের কে বুঝি এখানে পেয়েছিল আশাতীত সন্ধান। তাই সে অসীম অধৈর্যে খুঁড়েছে চারিদিক। তছনছ করেছে ভাস্করের ভাস্কর্য। ইতিহাসের প্রতীক। সৌন্দর্যের এক মূর্তি। আজ যা দেখলুম তা শুধু খোলস। অন্তঃ-সারহীন একটা বিকলাঙ্গ খোলস।

রোমানদের পরে এখানে এসেছিল ধর্মোন্মাদ রোমান পোপের চর ক্রুসেডাররা। একশত বছর ধরে ওরা আরবীদের দিয়েছিল মৃত্যুযন্ত্রণা। দিয়েছিল অমানুষিক অপমান। যীশুকে ওরা পেয়েছিল কিনা আমি জানি না। কিন্তু যা সত্যিই ওরা পেয়েছিল তা ছিল বহুবছরের সঞ্চিত অফুরন্ত এক ধন-ভাণ্ডার।

কত সে টাকা? পোপ কি পেয়েছিল এই লুটের ভাগ? ইতিহাস এ প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। কিন্তু ইতিহাস একথা বলেছে যে, প্রতিটি পৈশাচিক আক্রমণের পর ক্রুসেডাররা গাধা বোঝাই করে ইউরোপে নিয়ে গিয়ে-ছিল সোনা মণি মুক্তো বহুমূল্য রত্নখচিত পারস্য গালিচা। নিয়ে গিয়েছিল তাঁবুভর্তি আরব সুন্দরী, বেদুইন নারী। নিয়ে গিয়েছিল লুটেরার ছাপ। কালিমার দাগ। আজও সে দাগ মোছেনি ইউরোপের বুক থেকে। তার সাক্ষী জেরুজেলাম।

রাতের চন্দ্রমালোকে আজ আমি দেখছি দেড় হাজার বছর আগেকার সুন্দর একটি জনাকীর্ণ রাজধানী। ঘরে ঘরে চলছে উৎসব। উৎসব, কেননা এসেছে আজ এখানে দেশ-বিদেশের বণিক। কারাভান। এনেছে ওরা নানা দেশের বৈভব। মসলিন, আতর, গুলাল, মুক্তোর মালা, নীলম, নরম গালিচা। ছড়িয়েছে ওরা সোনার মোহর, দোকানে দোকানে ভিড়। মুসাফিরখানায় চলেছে খানাপিনা নৃত্য জলসা। প্রবাহিত হয়েছে সুরার দরিয়া, লাস্যের চকমকি হাসি।

হঠাৎ যেন কোন উল্কাপাতে, কোন এক বজ্রপাতে পেত্রার বুক হলো বিদীর্ণ। ধ্বংস হলো এমনভাবে পেত্রা যে, শহরের লোক-গুলোর আজও কোনও হদিস পাওয়া গেল না।

আকাশে বাতাসে আজও এখানে গোঙানি। ভয়াবহ আশ্চর্য এ-শহর। গুমরে গুমরে কাঁদনে এ শহর। অতি সুন্দর ভয়ংকর এ-শহর। পশ্চিম এখানে শুধু আজ দেখেছে অপূর্ব ভাস্কর্যের এক নিদর্শন। রঙের অলৌকিক খেলা। কিন্তু আমি দেখছি আরো একটা জিনিস এখানকার আকাশে বাতাসে, যার নাম—হাহাকার।

ক্রুসেডের পর সাত শত বছর আবার আত্মগোপন করলো পেত্রা। সাত শত বছর কেউ জানলো না পেত্রার অস্তিত্ব। আজ হতে মাত্র দেড় শত বছর আগে এখানে এলো আলখাল্লাধারী মুসলমান এক মৌলভী পরিব্রাজন। মক্কা ফেরত সে এলো পেত্রায়। দেখলো সে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাওয়া নাবাটেইয়ানদের রাজধানী। অবাক হলো 'মৌলানা' শেইখ ইব্রাহিম।

অবাক হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী। পেত্রার অস্তিত্বের খবর পেল দুনিয়া সুইস এক অসমসাহসিক পরিব্রাজকের কাছে—নাম যাঁর জন লুদিক বুরখার্ডট। কিন্তু শেইখ ইব্রাহিমকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ছদ্মবেশের দাড়ি কামিয়ে আলখাল্লা ফেলে তিনিই তখন পরিব্রাজক বুরখার্ডট।

উপলব্ধি করলাম কেন বুরখার্ডট পেত্রাকে বলেছেন—'এ রোজ রেড রক সিটি।' গোলাপী পাহাড়ের ঢেউয়ের গায়ে অপূর্ব এ শহর। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে আমার মনে হলো গোলাপী শহর এ নয়। এ হলো আগুনের শহর। লেলিহমান মূর্তিমান আগুনের উত্তাপে পেয়েছি এখানে পাগলাটে এক মার্তণ্ড। সূর্যের দেশের ছেলে আমি। দেখেছি গ্রীষ্মের রাজপুতানার দুপুরের সূর্য। দেখেছি সাহারার বুকের ভয়াবহ সূর্য। কিন্তু এ কেমন সূর্য?

বিরাট দিগন্ত। একদিকে পাহাড়ের অন্ধ-কার। অন্যদিকে সূর্যের ঝলকানি। একদিকে ঝরনা-জড়ানো বিশাল পাহাড়। অন্যদিকে মরুময় বিস্তীর্ণ লাল মাটি। আরো দূরে লম্বা একটা পথ। পাহাড়ী দুর্গম পথ মধ্য-খানে হাজারো বছরের হাজারো প্রাণের ... দেহের সমাধিময় এই পেত্রা। ভাঙা সমাধি। তছনছ করা লুণ্ঠিত সমাধি। রোমান শিল্পানুকরণে মোটা মোটা থামওয়ালা হল-ঘর। দরবারের প্রাঙ্গণ। রাণী মহল। অতিথিশালা। হাজারো শাবলের দাগ। দগদগে ঘা। একদিন যা ছিল 'ফরবিডন সিটি' আজ তা উষার মতন উন্মুক্ত, শ্মশানের মত অবারিত। উন্মুক্ত পেত্রা, 'পেত্রা দি টেরিবল', 'পেত্রা দি ওয়ানডার-ফুল', 'পেত্রা দি মিসটেরিয়াস।' কিন্তু সত্যিই কি পেত্রার দরজা আজ খোলা?

নিশীথ রাত্রির চন্দ্রালোকিত উচ্ছ্বাসে পেত্রা আমার ভাল লাগছে। একা আমি। একান্ত একা। সম্মোহিত আমি। পচা গলা শুকনো ছেঁড়াখোঁড়া কবর। মিষ্টি ডুমুর ফুলের সুগন্ধ। অদৃশ্য মৃদু বাতাস বয়ে আনছে সোপেনহাওয়ারের সঙ্গীত, গঙ্গা-রচিত শিল্পের মৃদু কম্পন। ধূপ জ্বালিয়েছি। স্টোভে চা হচ্ছে। প্রচুর তামাক। পাইপে তামাক ভরবো। স্বপ্ন দেখব জেগে। স্বপ্ন দেখব ওয়াদি-মুসার যখন লাস্য ছিল এখানকার অভিজ্ঞান। স্নিগ্ধ ছিল এখানকার জীবন। মধুমাখা ছিল এখানকার রাত।

কাজ হচ্ছে বাঁশবেড়েতে। লম্বা লম্বা ব্যারাক তৈরি হচ্ছে। রাজমিস্ত্রি, মজুর, কামিন খাটছে। গাড়ি বোঝাই চুন আসছে, বালি আসছে। আসছে পাথর কুচি, ইট। সুরকি ভাঙা হচ্ছে। সরকারী কনট্রাক্ট। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে। সামনেই বর্ষা। তাই খুব তোড়জোড়।

সকাল বেলায়ই বাবু এসে হাজির হন। যান সেই সন্ধ্যায়। কিন্তু কখনো কখনো রাতেও কাজ চলে বড় বড় আলো জ্বালিয়ে। রাত নটা দশটা অবধি। তখন ওভারসিয়ার-বাবু চলে যান। আর সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে মজুরের দল যায় গঙ্গায়। অনেকক্ষণ পড়ে থাকে জলে।

একসময় তাঁবুতে তাঁবুতে আগুনটি জ্বলে ওঠে। চাপাটি তৈরী। জ্বালের ফোড়নের গন্ধে জায়গাটা ভরে যায়। খাওয়া দাওয়া চুকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব নিঝুম। কখনো লোলাকের শব্দ শোনা যায়। কোথাও বসে তাসের আড্ডা, হাড়িয়ার আসর, দেহাতি কণ্ঠের গান। চুপি চুপি কথার আওয়াজ আসে কোন তাঁবু থেকে, কখনো বা চাপা হাসির আওয়াজ, মেজাজে এসেছে বুঝি কোন কামিনের। বাইরে তখন চাঁদের আলোর ফিনিক ফুটছে।

তারিণীকে থাকতে হয় রাতে। সকালে বাবুকে নিয়ে আসে বাড়ি থেকে। পৌঁছে দিয়েই চলে যায় স্টেশনে। নিয়ে আসে নানা মালমশলা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। দুপুরে যায় বাবুর বাড়ি খাবার আনতে। সন্ধ্যায় বাবুকে পৌঁছে দিয়ে আসে। তারপর ছুটি। পরের দিন সকাল পর্যন্ত। কখনো দূরেও যেতে হয়। কলকাতা, শ্রীরামপুর, নৈহাটি।

কিন্তু একদম ভাল লাগে না এ কাজ। কতদিন ভেবেছে ছেড়ে দেবে, অন্য একটা কাজ জুটিয়ে নেবে। অভাব কী কাজের? আজকাল ড্রাইভারের চাকরির ভাবনা? ঢুকবে কোন ভাল কোম্পানীতে। বাঁধা সময় কাজ করবে। বাড়ি আসবে। ভাল লাগে না তাই সকাল থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত এই কাজ। অথচ ছাড়তেও না। বছর দুয়েক ত হল। কাজ করছে মিত্তিরবাবুর কাছে। হাঁ কাজ করে সুখ ছিল বটে। টাকার পরোয়া করত না বাবু। আর কার জন্যেই বা করবে? 'তিনই বা কে আপনার বলতে?' কী যে হল হঠাৎ কারবার গুটিয়ে চলে গেলেন। তারিণীকে লাগিয়ে দিয়ে গেলেন অশ্বিনী-বাবুর কাছে। বড় ভালবাসতেন তারিণীকে। সেসব কথা মনে হলে মনটা যেন কেমন হয়ে যায়।

মাস দুই তিন ধরে ও অবশ্য বাবুর বাড়ি যাচ্ছে। এর আগে বাইরেই কাজ করত। কিন্তু এ ক' মাসেই চাকরি ছাড়ার ইচ্ছাটা ক্ষীণ হয়ে গেছে। যেন তত জোর নেই আর। এখন দুপুরে খাবার আনতে যেতে ভালই লাগে। আগে তারিণী সদরেই যেত। খবর দিত। টিফিন বাক্সয় খাবার আসত ভিতর থেকে। কিন্তু অনেক অসুবিধা তাতে। সদরে বাবুর দপ্তর। নানা লোকজন থাকে সেখানে। তাদের মধ্যে দিয়ে খাবার আনা। তাই মা বলে দিয়েছেন রান্নাঘরের কাছে যেতে। তা অবশ্য ও যায় না। সে ড্রাইভার। তার কাজ খাবার আনার নয়। খিড়কির দরজার কাছে দাঁড়ায়। গোবিন্দকে হাঁক দেয়। একেবারে যে ভিতরে যেতে ইচ্ছা করে না তা নয়। একদিন খুব ইচ্ছা হয়েছিল।

অশ্বিনীবাবুর ছেলে খোকন। বছর আট দশ বয়স হবে। হাফ প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট গায়ে খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। চমৎকার শার্টটা। নানা রঙের কাপড় দিয়ে তৈরী। তারিণী অবাক হয়ে দেখেছিল সেই জামা। গোবিন্দকে ডাকতে ভুলে গেল। ফুটফুটে ছেলেটিকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'বেশ জামাটি ত তোমার খোকাবাবু।'

খোকাবাবু খুশী হয়ে তাকিয়েছিল।

তারিণী জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কে কিনে দিয়েছে?'

খোকন বলেছিল, 'দূর কিনবে কেন? জন্মদিনে দিদি তৈরি করে দিয়েছে।'

আর তখনি খোকনের দিকে চেয়ে মনে মনে দিদির একটা ছবি গড়ে নিল তারিণী। সেইদিন ভীষণ ইচ্ছা হয়েছিল ভিতরে যেতে। যদি ছবিটা যাচাই করা যায়। যদি—।

ভিতরে যাওয়ার ইচ্ছাটা এমনি জোর হয়ে উঠছে ক্রমশ। ছবিটা শুধু যাচাই করার ইচ্ছা। অথচ তা হয়ে উঠছে না। একদিন বাড়িতে ঢুকতে চোখ আটকে গেল দোতলার বারান্দায়। একটি মেয়ে। খোলা চুলে রোদ

পড়েছে। হাতে বই। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে শাড়ির কিছু কিছু দেখা যাচ্ছে—আবছা আবছা। ঠিক যেন একটা ছবি। মনের ছবি আর যাচাই করা হল না। ছিল একটা ছবি, হল দুটো।

ভাঙা দেওয়ালের ধারে প্রকাণ্ড এক গাছের নীচে গোবিন্দের আড্ডা। দেরী থাকলে তারিণী সেখানে গিয়ে বসে মাঝে মাঝে। সময় থাকলে গোবিন্দ গল্পটল্প করে একটু আধটু। একদিন উঠল দিদিমণির কথা। দিদিমণি? দেখতে একবারে অপ্সরী। একেবারে। তারিণী বলে, 'ক'টা অপ্সরী দেখেছিস আজ অবধি শুনি?'

গোবিন্দ কান দেয় না সে কথায়। অনর্গল বলে যায়। কী সুন্দর গান করেন আর কত পড়েন। কেমন চমৎকার কথাবার্তা। সবাই যেন তার আপনার। শুনতে বেশ লাগছিল তারিণীর, কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মনটা বিগড়ে গেল। ইচ্ছা হল দেয় এক থাপ্পড় বসিয়ে। কেবল সুন্দর আর সুন্দর। তাতে তারিণীর কী? অথচ শুনতেও ইচ্ছা করে। গোবিন্দর ওপর রাগও হয়, হিংসাও হয়। অথচ ওর গল্প শুনতেও খারাপ লাগে না ত।

সারা দিনের খাটুনির পর ঘুমে চোখ জুড়ে আসে। তাঁবুতে বাঁশের খাটিয়ায় শুয়ে ছটফট করে তারিণী। ওপাশে ব্রিজকিশোর ঘুমে অচেতনা। যখন ঘুম আসে না তখন গোবিন্দর কথাগুলো মনে আসে। মনে আসে বারান্দার সেই ছবিটা। মাথা ঘুলিয়ে যায়। উঠে বসে বিড়ি ধরায় তারিণী। তাঁবুর এক কোণে রাখা বালতিতে মাথা ধুয়ে নেয়। ভাবে, দুত্তোর কী সব বাজে চিন্তা। যখন কিছুতেই ঘুম আসে না তখন গিয়ে বসে গানের আড্ডায়। কখনো

খায়ও দু এক পাত্তোর। টলতে টলতে তাঁবুতে ফিরে এসে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকে।

একটা যেন নেশার মত হয়ে গেছে। একটা ব্যারাম বোধ হয়। বিশেষত সেই দিন থেকে। মাস দুই আগে যখন ও রান্নাঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেদিন প্রথম দেখেছিল দিদিমণিকে মাত্র কয়েক হাত দূরে থেকে।

গোবিন্দ ডাকলে, "তারিণীদাদা ভিতরে এসে খাবারটা নিয়ে যাও। আমার হাত জোড়া।"

ভিতরে ঢুকেই থমকে গিয়েছিল তারিণী। বারান্দার এক ধারে বসে আছে দিদিমণি। ওর দিকে পিছন ফিরে। ভিজে ভিজে চিকন চুলের রাশ। পিঠ ছাপিয়ে পড়েছে। কিছু পড়েছে আশে পাশে। তার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে ডান দিকের গালের একটা অংশ। গলা পর্যন্ত। ডান হাতে টিফিন বাক্সর বাটিগুলো সাজাচ্ছে। ঢাকা বন্ধ করছে। মিষ্টি সুরে ডাকল, "খোকন।" খোকনের হাত দিয়ে টিফিন বাক্স এল তারিণীর হাতে। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তারিণী। ছবি ততক্ষণ মুছে গেছে। বিস্ময়ের ঘোর কাটাতে সময় লেগেছিল। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখেও তারিণীর মনে হয়নি সে ড্রাইভার। মনে ছিল তখন সেই গালের অংশটুকু। বিশেষ করে চিবুকের খাঁজটা। গাড়ি চালাতে চালাতে সেই অংশটুকু বহুবার হাত দিয়ে ছুঁয়েছিল মনে মনে। বরাত জোরে দুর্ঘটনা ঘটতে ঘটতে বেঁচে গেল।

সেদিন সারাদিন মুষড়ে ছিল। রাত্রে গিয়েছিল আড্ডায়। কোন কথা বলেনি। শুধু তাড়ি খেয়েছিল এক্তার।

নিবারণ একটু ঠাট্টা করতে চেয়েছিল কাসিম সুর্তিয়াকে নিয়ে। তারিণী কান দেয়নি। বাবুর নতুন মেয়েমানুষ নিয়ে কত গল্প হল। কত কাদিনের নাড়ী নক্ষত্রের আলোচনা হল। তারিণী ঠায় বসে রইল।

নিবারণ বললে, "কী তারিণীদা আজ হয়েছে কী তোমার?"

তারিণী হঠাৎ চটে উঠল, "যা শালারা কী বাজে বকিস। শুধু মদ আর মেয়েমানুষ। যত সব ছোটলোকের কাণ্ড।"

মেজাজ চড়িয়ে নিবারণ বললে, "কী আমরা ছোটলোক?"

"নয় তো কী? ভদ্দর? বা-বে—আমার ভদ্দরলোক রে—" বলে একটা অশ্লীল রসিকতা করলে তারিণী।

নিবারণ তখন মদে চুর। এমনিতে সে ঠাণ্ডা। কিন্তু মত্ত অবস্থায় ভয়ানক। সহ্য করল না। দিল এক ঘা বসিয়ে ছোট লাঠি দিয়ে। তারিণী পাল্টা জবাব দিল। হৈ হৈ থেকে হায় হায় হয়ে গেল। রক্ত দেখে তারিণী ফিরল নিজের তাঁবুতে। ব্রিজকিশোর ডেকে আনল সুর্তিয়াকে।

ওর ধারণা তারিণী সুর্তিয়াকে পেয়ার করে। সুর্তিয়ারও ধারণা তাই। সারারাত ধরে সে তারিণীর সেবা করল। সকালে এল জ্বর। দুদিন সে উঠল না।

যখন উঠল সুর্তিয়া তখন কাজে গেছে। দুদিনের খবরটা জানা গেল না তখনি। পরে শুনল সবই। সুর্তিয়া কেমন সেবা করেছে। কেমন রাত জেগে কাটিয়েছে। ওষুধ দিয়েছে সময়মত। পথ্য দিয়েছে। তারিণীর মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছিল। দুর্বল দেহ। কিছুক্ষণ ঘুরলেই কষ্ট হয়। তবু গেল লাইনে। সুর্তিয়াকে অনেক মেহেরবাণী দিল। ইট বইছিল সুর্তিয়া। ঝুড়িটা নামিয়ে রেখে কাছে এল। ধরে বসিয়ে দিতে গেল তারিণীকে। মুখটা তারিণীর মুখের কাছাকাছি এসেছিল, নজর পড়ল ওর গালের ওপর। কালো-কর্কশ ঘাসে-ভেজা দুর্গন্ধ। তারিণীর বমি করতে ইচ্ছা হল। হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দিল সুর্তিয়াকে।

আজকাল তারিণী খাবার আনতে যেতে পারে না। গোবিন্দই নিয়ে আসে। এসে বসে তারিণীর কাছে। বলে, "মা তোমার জন্য বড় ভাবছে তারিণীদাদা। কেবল আমায় শুধোয় তোমার কথা।"

তারিণী বলে, "আর কী বলে মা?"

"আর কী বলবে। তোমার খোঁজ খবর নেয়। বলে অসুখ শরীরে একটু সাবধানে থেকো। এমনি কত কথা। মা তোমায় বড্ড ভালবাসে কিন্তু।"

"তাই না কি?" শীর্ণ মুখে হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করে তারিণী, "খোকনের খবর কি?"

"ওঃ তুমি জান না বুঝি? সে ত মামা-বাড়ি চলে গেছে। তুমি যেদিন অসুখে পড়লে সেই দিন। আজকালের মধ্যেই আসবে অবিশ্যি।"

এরপর শুরু করে সুখ-দুঃখের কথা। ঠাকুরটা যা হয়েছে। একেবারে উপোস করিয়ে মারবে সকলকে। মা-ই ত ওকে আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলেছে। আহা অমন রান্না আর কেউ করতে পারে না। তা পারবে কেন? একবার মুখে দিলে আর গিলতে ইচ্ছা করে না। আজকাল আবার সারদার সঙ্গে— গোবিন্দ চোখ টিপে ইশারা করে।

তারিণী কিন্তু তা দেখে না। ও তখন দেখছে সুরকি-ভাঙা কলটা। ছোট ক্রেণটা বিকট আওয়াজ করে রাশি রাশি ইট তুলছে। সিমেন্টের বস্তা তুলছে। দেখে ভারার ওপর দাঁড়ান ওভারশিয়ারবাবুকে। খাকি-রঙের শোলার টুপি মাথায়। দেখে বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে মশলা নিয়ে যারা উঠছে।

কংক্রীট মশলা মেশান কলটা বিকট আওয়াজ তুলছে। তারিণীর মাথা ঝিম

ঝিম করে উঠল। চোখ বন্ধ করল। সব যেন ঘুরছে। ঝিম হয়ে রইল অনেকক্ষণ।

গোবিন্দ বললে, "কী হল তারিণীদাদা, শরীর খারাপ লাগছে না কি?"

তারিণী বললে, "হ্যাঁ, তুই এখন যা গোবিন্দ।"

আস্তে আস্তে উঠে তাঁবুতে গেল তারিণী। খাটিয়ায় শুয়ে রইল চুপচাপ।

ঘুম আসে অথচ আসে না। ঘোর রয়েছে একটু। মাঝে মাঝে তন্দ্রা আসছে। মাঝে মাঝে মনে আসছে দোতলা বারান্দার কোন এক ছবি। আবছা আবছা। ভাসা ভাসা একখানা মুখ। গাল গলার খানিকটা ফর্সা ধব্‌ধবে। একটু গোলাপী বুঝি বা। আলো নেই কোথাও। ক্ষণে ক্ষণে তারা ফুটছে, ঝরছে— একটু আলো—শুধু একটি ক্ষণ। আবার কালো। মন অবশ। নড়তে ইচ্ছা করে না। চুপচাপ শুয়ে থাকতে ইচ্ছা হয়। ঠিক ঘুম নয়। ঠিক জাগাও নয়।

ভারী গলার আওয়াজ এল, "তারিণী।"

উঠে বসতে গেল। কিন্তু ইচ্ছা হয় না। শুয়ে শুয়েই সাড়া দিল "আজ্ঞে"।

বাবু ভিতরে এলেন না। তাঁবুর মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, "আবার কী হ'ল? এমন ফ্যাসাদ বাধাও তোমরা। নিজেরা মারামারি করে মরবে আর কাজের ক্ষতি হবে আমার। দূর করে দেব সব। আবার কী হল তোমার শুনি? বেশ ত চাঙ্গা হয়ে উঠেছিলে!"

তারিণী জানে বাবুর কথা বলার ধরনই ওই রকম। দেখাবেন কত কঠোর রুক্ষ। কিন্তু ভিতরে একদম নরম। ও বললে, "আজ্ঞে! কিছুই ত হয়নি, মাথাটা একটু ঝিম ঝিম করছিল তাই—'

বাবু তেড়ে উঠলেন, "আমাকে তোমরা কী একটুও রেহাই দেবে না? পাছে ভাল হয়ে কাজ করতে হয় তাই অসুখ চেপে পড়ে থাকবে? মরবে, সব মরবে—তবে শুধু মরবে না ত আমাকে মেরে তবে মরবে। উঠে এস দেখি।"

উঠে এল তারিণী। তাকে ট্রাকে করে পাঠিয়ে দেওয়া হল চুঁচড়ো। ডাক্তারের কাছে। হুকুম হল যতদিন না চাঙ্গা হয় বাবুর বাড়িতেই থাকতে হবে। ওখানে থাকবার ঘর আছে তারিণীর। গোড়ায় ওখানেই থাকার কথা হয়েছিল। রাজী হয়নি তারিণী। এখন আর উপায় কী। যা জেদ বাবুর। এক কাণ্ডই করবেন হয়ত। ভালই হবে। কয়েকটা দিন হট্টগোলের হাত থেকে বাঁচা যাবে। নির্ঝঞ্ঝাটে থাকা যাবে। ভালমন্দ খাওয়াও জুটতে পারে কপালে। কেন জানি সেই ছবিটা মনে এল। সেই যে সেই দোতলার বারান্দায়—।

ডাক্তার বললেন বিশ্রাম নাও। কিছু ওষুধও দিলেন। না দিলে নিজের মান থাকে না। যে পাঠিয়েছে তারও মান থাকে না। তারিণী এমন অনেক দেখেছে। তাই বুঝল ওষুধটা বাজে। কিন্তু ঠিক করল খেতে হবে মন দিয়ে যাই-ই হোক।

আউট হাউসের ওপরে ঘর মিলল। বেশ ভাল ঘর। দুটো জানলা ছোট ছোট। ঘরটা একটেরে। পাশের ঘরে থাকে ঠাকুর। ঝিরা থাকে একতলা আর-একটা আউট হাউসে। আশেপাশে অনেক গাছ। বেশ বড় বড় পুরান। কে জানে কী গাছ। চেনা চেনা যেন। হাল্কা খাটের ওপর শতচ্ছিন্ন সতরঞ্জে শুয়ে তারিণী ভাবে—কী গাছ ওগুলো? কতদিনের?

সেদিন রাত্রে গোবিন্দই খাবার নিয়ে এল। খানকয়েক রুটি আর কিছু তরকারি। বললে, "নাও তারিণীদাদা খেয়ে নাও। আমায় গিয়ে আবার রান্নাঘরটর ধুয়ে মুছে সাফ করতে হবে। তুমি খাও বসে বসে। আমি চলি।"

তারিণী বলে, "তুই কী আমায় একেবারে অথর্ব করে দিতে চাস না কি? গিয়ে খেয়ে আসতে পারব খুব। কাল থেকে আর আনতে হবে না।"

গোবিন্দ বলে, "আরে না না। অসুখ-শরীরে তোমায় আর যেতে হবে না। আমিই এনে দেব এখন। ক' দিন আর।"

ধমক দেয় তারিণী, "বাজে বকিস না। কাল থেকে আমিই যাব।"

গোবিন্দ বলে, "তা হলে মা আমার ওপর ভয়ানক রাগ করবে। ভাববে নিশ্চয়ই আমি কিছু বলেছি তোমায়। দিদিমণি খেয়ে ফেলবে আমায়।"

তারিণীর হাত থেমে গেল। মুখ তুলে চাইল। ভাবলে হারামী নিশ্চয় মিথ্যে বলছে। হারামী একেবারে হারামী। বললে, "যাঃ, যাঃ ভাগ।"

পরদিন তারিণী নিজেই গেল রান্নাঘরের কাছে। কলাপাতা পেতে বসল। পরিবেশন করল ঠাকুর। গিন্নীমা বসেছিলেন দাওয়ায়। দু একটা কথা বললেন। বেশ লাগল তারিণীর। খেতে খেতে শুনতে পেল, "মা, চাবিটা কোথায়?" চোখ তুলে দেখল দোতলার ঝুল-বারান্দায় গলা বাড়িয়ে রয়েছে দিদিমণি।

মা বললে, "কেন?"

"একটা শাড়ি বের করব।"

"কেন তোর শাড়ি বাইরে নেই?"

"পারিনে বাপু অত কৈফিয়ত দিতে। চাবিটা কোথায় বল।"

"কোণের ঘরে দেরাজের টানার মধ্যে দেখ-দিকি।"

তারিণী একবার চোখ তুলেছিল। মাত্র একবার। কিছু দেখেনি। এক রাশ চুলের মধ্যে একটি ফুল যেন। ফুল না মুখ। আর

দেখতে পারেনি। চোখে চোখ পড়ার আগেই মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। অনেক দেরি করে খেয়েছিল। টানার মধ্যে যদি চাবিটা না পাওয়া যায়!

ঘরে ফিরতে ফিরতে নিজের ওপর রাগ হল তারিণীর। খাটের ওপর বসল। কী দরকার দিদিমণিকে নিয়ে মাথা ঘামাবার? ওরা বাবুর জাত। আমি ড্রাইভার। ওদের কথা নিয়ে এমন করে ভাবা ঠিক নয়। উচিত নয়। উচিত কী? লাভ কী শুধু শুধু বাজে ভাবনায়। ও ত আকাশকুসুম। ওতে সুবিভর আশা কেন? মনের ওপর জোর থাকলে কথা ছিল না। ভাবনা হাত-ধরাও নয় মন-ধরাও নয়। ইচ্ছা করলেই ভোলা যায় না। ইচ্ছা করে মনে আনা যায় [illegible] ত। ছোটলোক! নিবারণ ঠিকই বলে। ছোটলোক ছোটলোকের মতই থাকবে। 'আমি ড্রাইভার', তারিণী বললে একটু জোরে। 'আমার ঘোড়ারোগ কেন?' কেন, কেন? তারিণী নিজের গালে চড় মারতে লাগল। কানের কাছে ক্ষতটা একেবারে ভাল হয়নি। নখ লেগে রক্তপাত হল। বারান্দার কোণে ঘোলাজলের কলে সেটা ধুয়ে ফেলল তারিণী। মাথাটাও ধুয়ে এল একবার। তারপর শুয়ে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়ল।

...এ আবার কোন দেশ! চেনা যায় না। বড় বড় চওড়া রাস্তা। দুধারে শুধু খাবারের দোকান। মানুষ খাবার কিনছে খাচ্ছে। বড় বড় কাঁচের বাক্সে আলমারিতে নানা রকমের খাবার। রাস্তা থেকে কাঁচগুলো ছোঁয়া যায়। একটা দোকানের সামনে গোটা দুই গরু। নাক দিয়ে কাঁচটা ছুঁয়ে রয়েছে। জিভ বার করছে। কাঁচের ভিতরের সন্দেশ, রসগোল্লা রাজভোগ দেখছে আর ফোঁস ফোঁস করছে। হঠাৎ শিং দিয়ে গুঁতো মারল কাঁচে। ঝন ঝন করে কাঁচ ভেঙে পড়ল। গরু-দুটো ছুটতে আরম্ভ করেছে ভয়ে। রাস্তার মানুষ ভয়ে ছুটছে চারদিকে। চেঁচিয়ে উঠল তারিণী। ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে অন্ধকার। ঝির ঝিরে হাওয়া দিচ্ছে। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। কেমন একটা অস্বস্তি। পাশ ফিরে শুল তারিণী। কানের ক্ষতটায় বেশ ব্যথা হচ্ছে। কাল হয়ত আরও বেড়ে যাবে। একটু একটু করে আবার ঘুমিয়ে পড়ল তারিণী।

...জি টি রোডের ওপর দিয়ে ট্রাক চলেছে। বোঝাই ট্রাক। পাশে বসে আছে ক্লীনার। মুখটা চেনা-চেনা অথচ ঠিক ধরা যাচ্ছে না। হেড লাইটের আলোয় আঁধার সরিয়ে গাড়ি চলেছে। থর থর কাঁপছে স্টিয়ারিং হুইল। রাস্তার বাঁকের মুখে তিনজন লোক। হাত তুলেছে। সঙ্গে বোধ হয় একজন মেয়েছেলে। গাড়ি থামান উচিত নয়। জায়গাটা ভাল নয়। ডাকাতি হয় মাঝে মাঝে। মেয়েছেলে দেখে গাড়ি থামাল। ক্লীনার হাত চেপে ধরছে না—না—। এগিয়ে চল। গাড়ি তৎক্ষণাৎ থেমে পড়েছে। গাড়িতে উঠে পড়েছে তিনজনেই—মেয়েছেলেটিও। বড় বিপদ—একটু দূরে নামিয়ে দিলেই হবে। মেয়েলোকটির অত সাজ কেন? পাউডারে মুখ ভর্তি। মরুকগে। গাড়ি চলল আবার হু হু করে। কিছুক্ষণ বাদে ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা মত লাগল। ঘাড় একটু ফেরাতেই দেখল সেই মেয়েলোকটি—ওর ঘাড়ের ওপর কী যেন ধরে রয়েছে। পিস্তল কী? হাঁ পিস্তলই। চাপা গলায় একজন বলল, শীগগির গাড়ি থামাও, নেমে যাও আস্তে আস্তে।" আবার ঘাড় ফেরাতেই দেখা গেল ক্লীনারকে—মুখ হাত বাঁধা তার পাশেই বসে আছে। গাড়ি থামল। শেষ চেষ্টা হিসেবে এক ঝাপটা মারল সেই মেয়েলোকটিকে। পিস্তলের আওয়াজ হল। গুলীটা উড়ে গেল ওর কানের একটু অংশ নিয়ে। যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়ল তারিণী। অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল।

অনেক রাতে গোবিন্দ ডেকে তুলল। শুধোলে, "কী—আবার শরীর খারাপ নাকি? মুখ চোখ শুকনো। কানের দিকে নজর পড়তেই বললে, "আরেঃ কান কী হ'ল তোমার? দেখি দেখি—"

ওকে সরিয়ে দিয়ে তারিণী উঠল। কানটা ধুয়ে ফেলল আবার। তারপর বসে রইল চুপচাপ জানলার বাইরে চেয়ে। সবে চাঁদ উঠছে। ওপরের ডালের পাতাগুলো চিক চিক করছে। পরিষ্কার রাত।

সিমেণ্টের অভাবে সেদিন কাজ বন্ধ। বাবু সেদিন বাড়িতে। সিমেণ্টের জন্য ছোটাছুটি করলেন খুব। দুপুরে বাড়িতেই খেলেন। গড়গড়ার নল হাতে নিয়ে তারিণীর খাওয়া দেখলেন।

বললেন, "তোমার শরীর কেমন হে।"

তারিণী বললে, "আজ্ঞে ভাল।"

"তা হলে এক কাজ কর না। মেয়েরা আজ কোথায় পিকনিকে যাবে। স্টেশন ওয়াগনটা নিয়ে তুমিই যাও না। জিনিসপত্তর অবশ্য আমি ব্রিজকিশোরকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব। তুমি আর গোবিন্দ ওদের নিয়ে—।"

তারিণী বললে, "আচ্ছা। আপনি যাবেন ত?"

"আরে না না—আমি কোথায় যাব? ছেলেমানুষদের ব্যাপার। তা ছাড়া বিকেলের দিকে আমার একটু কাজ আছে।"

তারিণী মনে মনে হাসল। কাজ আছে মানে মেয়েমানুষ। শখ আছে বটে মানুষটার। যার অতবড় মেয়ে অমন জগদ্ধাত্রীর মত বউ। যাকগে বড়মানুষের ব্যাপার।

দুপুর থেকেই হৈ হৈ। নতুন মেয়ে এল কয়েকজন। দিদিমণির বন্ধুরা সব। কিন্তু ওর মত সুন্দর কেউ নয়। এল জন দুই তিন ছেলে। একজনের নাম বুঝি অশোক। তাকে দেখিয়ে গোবিন্দ বলছিল 'জান তারিণীদা ওর সঙ্গে দিদিমণির বিয়ে হবে। তা বেশ মানাবে দিদিমণির সঙ্গে।' দিদিমণির কথা মনে হতেই ছবিগুলো ভেসে উঠল চোখের সামনে। রেলিংয়ের আড়ালে, বারান্দায় বসে খাবার সাজান, 'মা চাবিটা কোথা?' খেয়ে ফিরতে ফিরতে দূরে এক গাছের নীচে দেখল ওদের দুজনকে। দিদিমণি আর সেই ছেলেটি। দুটো বেতের চেয়ারে দুজনে বসে আছে গাছের ছায়ায়। মুখোমুখি বসে গল্প করছে। আর একটি মেয়ে যাচ্ছে ওদের দিকে। হাত দিয়ে রোদ আড়াল করেছে। আর—

তারিণী আর দেখেনি। বাবুর কাছে গিয়ে শুধাল, "কখন বেরুতে হবে বাবু।"

বাবু বললেন, "সে তুমি ওদের জিজ্ঞেস করে নিও। তবে বাপু তাড়াতাড়ি ফিরে এস, বেশী রাত কর না। ওদের ত কাণ্ডজ্ঞান নেই। ফুর্তিতে মেতে থাকবে। তোমার শরীর ভাল নেই। তাড়া দিয়ে নিয়ে এস ওদের।"

তারিণী বললে, "আচ্ছা।"

গোবিন্দ খবর দিলে বেরুতে হবে সাড়ে তিনটে নাগাদ। এখান থেকে মাইল পনের হবে। গঙ্গার ওপর কাদের যেন বাগান-বাড়ি। সেখানে বসবে ওদের চায়ের আসর।

তারিণী নিজের ঘরে এল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে গাছতলাটা দেখল। মেয়েটি তৎক্ষণে পৌঁছে গেছে। দিদিমণির চেয়ারের হাতলে বসেছে বোধ হয়। হাসিতে নুয়ে নুয়ে পড়ছে দিদিমণির ওপর। কী এত হাসি? যত সব ন্যাকামি। কই দিদিমণি ত হাসছে

না। ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়ল তারিণী। একটু বিশ্রাম চাই।

তারিণী নামল না। গাড়িতেই বসে রইল। অনেকদিন পর গাড়ি চালাচ্ছে। পনের মাইলেই কী ক্লান্তি। চোখ বুজে বসে রইল। মনে মনে ভেসে এল সেই সব ছবি। ভাবলে এও এক রকমের নেশা নিশ্চয়ই। না হয় পাগল হয়ে গেছি। স্বপ্নে দেখা গরুটার কথা মনে হল, নিজের অতীতের কথা মনে আনার চেষ্টা করল। ঠিক স্পষ্ট হল না। এই মুহূর্তে কোন কথা মনে এল না। সব এলোমেলো হয়ে গেল। সেই গরুটার সঙ্গে নিজের তুলনা করে একটু জোরেই বোধ হয় হেসে ফেলেছিল তারিণী।

গোবিন্দ বললে, "কী তারিণীদাদা স্বপ্ন দেখছ না কি? নাও চা খাও।"

চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল তারিণী। বেশ আছে এই গোবিন্দ। আচ্ছা, আমার মত ও কী ভাবে দিদিমণির কথা? বললে, "শুধু চা-ই দে। আর কিছু খাব না। শরীরটা ভাল নয়।

গোবিন্দ বললে, "তা কি হয়। দিদিমণি নিজে পাঠিয়ে দিলেন। খেয়ে নাও কিছু।"

তেরিয়া হয়ে উঠল তারিণী, "যা যা আদিখ্যেতা করিসনে।"

হাঁ হয়ে রইল গোবিন্দ। লোকটার কী মাথা খারাপ হয় মাঝে মাঝে?

তারিণী বললে, "আর কত দেরি? অন্ধকার হয়ে আসছে। রাস্তাটাও ভাল নয়। একটু তাড়াতাড়ি করতে বল।

গোবিন্দ বলে, "তাড়াতাড়ি করতে হবে না। অন্ধকার হলে ওদের নিজেদেরই তাড়া হবে।"

তারিণী বললে, "রাস্তাটায় ভয় টয় আছে কী না। বাবু বিশেষ করে বলে দিয়েছেন। কিছু লোককে ব্রিজকিশোরের সঙ্গে পাঠাতে হবে। ও গেছে ওর এক বন্ধুর বাড়ি—কাছেই। আমি গাড়িতে তেল ভরে নিয়ে আসছি। ওকে অমনি পাঠিয়ে দেব।"

গাড়িতে কিন্তু তেল ছিল। তারিণী সরে যেতে চাইল ওখান থেকে। একা একা ভাল লাগে না। গেল ব্রিজকিশোরের বন্ধুর বাড়ি। সেখানে তখন জমজমাট আড্ডা। খুব হুল্লোড় চলছে। খুব খাতির করে তারিণীকে বসাল তারা। মাটির ছোট ভাঁড় এল। মহুয়ার মদে ভর। দেশ থেকে আমদানী। অতি সরেস জিনিস। তারিণী কিন্তু তা ছুঁল না। বললে, শরীর খারাপ, এখন ওসব চলবে না। ব্রিজকিশোরকে পাঠিয়ে দিয়ে এ ধার ও ধার ঘুরল খানিক।

তখন রাত নেমেছে গঙ্গায়। ঢেউগুলো ছলাৎ ছলাৎ করে কিনারায় আছড়ে মরছে। আস্তে আস্তে গাড়ি চালাচ্ছে। তবুও ঢেউয়ের আওয়াজ তার কানে যাচ্ছে না। গঙ্গার ওপারে আলোর ফোঁটা সার সার। ছোট ছোট জেলে নৌকা ভাসছে জলে। পালগুলো আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। একটা গরম ভাপ উঠছে যেন জল থেকে। খুব মৃদু। পারের বাতাস কেটে তারিণীর গাড়ি চলেছে। চাঁদ উঠতে অনেক দেরি। তারাগুলো জ্বল জ্বল করছে। সামনেই সেই বাগানবাড়ি।

তারিণী দেখল অনেক দূরে কয়েকজন জটলা করছে রাস্তার ধারে। অনেক দূরে। হেড লাইটের আলো পৌঁছায় না সেখানে। গাড়ির গতি দ্রুত হল। মানুষগুলো এগিয়ে আসছে—কাছে আসছে। আলো পড়ছে ওদের গায়ে। একটু একটু করে ফুটে উঠছে এক একটা মানুষ। ওই ত খোকন। একটু দূরে গোবিন্দ কী? হ্যাঁ গোবিন্দই ত।

আলো পড়েছে সামনের মেয়েটির ওপর। তীব্র শাদা আলো। চোখ ঢাকছে মেয়েটি হাত দিয়ে। দিদিমণি কী? হ্যাঁ দিদি-মণিই। অপেক্ষা করছে তারিণী কখন গাড়ি নিয়ে আসবে। আরও আরও কাছে। ওই ত সেই গাল। সেই মুখ। মুখ না ফুল। চুলগুলো টান করে পিছনে বাঁধা। খোঁপায় ফুল। দিদিমণিই। দিদিমণি না স্বপ্ন? কাচের মধ্যে খাবার দেখা আর নয়। শেষ হোক হয় খাবার। না হয় দেখা।

গাড়ি এসে পড়েছে ওদের ওপর। গতি বেড়ে চলেছে। ত্রিরিশ। চল্লিশ। তারিণী যেন বেহোঁশ। একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। সামনের প্রকাণ্ড গাছটা রাস্তা আটকাল। প্রচণ্ড আওয়াজ করে ইঞ্জিনটা বুঝি ফেঁসে গেল। তারিণী লুটিয়ে পড়ল।

এবার নিজের পরিচয়টা দেওয়া দরকার। এতক্ষণ তারিণীই এ গল্প বলল। আমিই তারিণী। ওটা যে ঠিক দুর্ঘটনা এ-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সন্দেহের কারণগুলো বড় অস্পষ্ট। অনেক ভেবেছি এই হাজতে বসে বসে। হাসপাতালে দূরের কেবিন থেকে যখন দিদিমণির কাতরানি শোনা যেত তখনও ভেবেছি। এখন আর ভাবিনে। শুনেছি দিদিমণির ডান পা-টা নেই। ডান-দিকের গালের কিছু অংশও বাদ গেছে। আর শুনে খুব দুঃখ পেয়েছিলাম যে খোকন নেই। কিন্তু অশোকের কোন খবর পাইনি। তার কী হল? সেও কী আমার মত কয়েকটা আঁচড়ের ওপর দিয়েই অব্যাহতি পেয়েছে?

চক্রদত্ত

দেহে অতিরিক্ত পেনিসিলিন প্রয়োগের ফলে দেহের মধ্যে যে পেনিসিলিন প্রতি-রোধকারী ক্ষমতা উৎপন্ন হয় একথা বৈজ্ঞানিকরা ভাল করেই জেনেছেন। আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পেনিসিলিনের এই অপকারকারী ক্ষমতাটুকুও নষ্ট করার ব্যবস্থা করেছেন। পেনিসিলিনেজ নামে প্রোটীন এনজাইম ইনজেকশন করার ফলে রক্ত মধ্যস্থ পেনিসিলিন নষ্ট হয়ে যায়, ফলে পেনিসিলিনের কুফলের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিকরা চার বছর আগে অপরিস্রুত নির্যাস নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন, বর্তমানে সাধারণের ব্যবহারার্থে এটি পরিস্রুত অবস্থায় আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে পাওয়া যায়। এই ইনজেকশনটি প্রয়োগ করার ফলে খুব দ্রুত পেনিসিলিনকে পেনিসিলিয়াক এসিডে পরিণত করে আর এই পেনিসিলিয়াক এসিডের অ্যান্টি-বায়োটিক কার্যকারিতা থাকে না। দেখা গেছে যে, অতিরিক্ত পেনিসিলিন নেওয়ার দরূণ দেহে যে পেনিসিলিন প্রতিরোধকারী ক্ষমতা জন্মায় প্রোটীন এনজাইম ইনজেকশন নেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সে ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

*

দেখতে হেলিকপটারের মত এবং নামেও "কপটার" হলেও এটি শুধুমাত্র খেচর নয়, জলচরও। মোটর বোটের মতই এটি জলে চলতে পারে। এই কপটারটি উভচরের
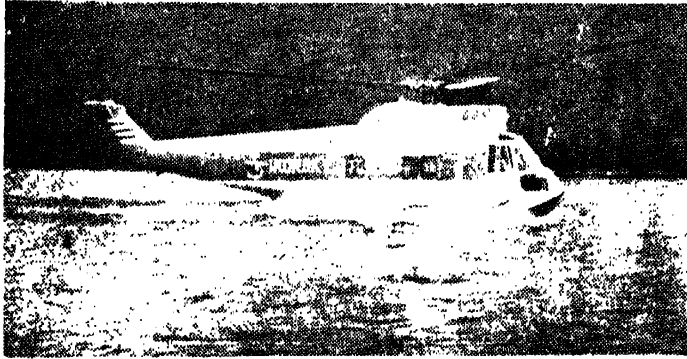
উভচর হেলিকপটার

আকারে গঠিত, তবে সর্বচরই বলা যায়। এটার মধ্যে এমন বন্দোবস্ত আছে যে, দরকার হলে জলে নামান হয় এবং তারপরেও দরকার হলে মোটর বোটের মত জল কেটে কেটে চলতে পারে।

*

সাধারণভাবে আমরা জানি যে, স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য "নিদ্রা" অপরিহার্য কাজ বিশেষ। খুব শরীর খারাপ বোধ করলে খানিকক্ষণ ঘুমের পর একটু যে সুস্থ বোধ করি না এমন নয়। কিন্তু আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, ঘুমের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সোজাসুজি কোনও সম্বন্ধ নেই। ক্যালিফোর্নিয়ার ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির" বৈজ্ঞানিক-গণ বলেন যে, ঘুমের অভাবে দেহের বিশেষ ক্ষতিসাধন হয় না, কারণ দিনের পর দিন না ঘুমোলেও রক্তচাপও বাড়ে না, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়াও স্বাভাবিক থাকে, পেশীসমূহও যথারীতি সুস্থ থাকে। ঘুমের অভাবে বিশেষ ক্ষতি হয় স্নায়ুকেন্দ্রের এবং মস্তিষ্কের। ফলে মনোরাজ্যেও বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি হওয়ায় ভাবপ্রবণতা ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত দেহেরও ক্ষতি সাধন হওয়া অসম্ভব নয়।

*

শীতকালের চেয়ে গরমকালে মাছ তাড়া-তাড়ি পচে যায়। সেইজন্য গরমকালে মাছ বেশী বরফ দিয়ে রাখতে হয়। এর কারণ হচ্ছে অন্যান্য প্রাণীদের মতই জীবন্ত মাছের শরীরের ভেতরে এবং বাইরে ব্যাকটেরিয়া থাকে। মাছ মারা যাবার কিছুক্ষণ বাদেই এইসব ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে —ফলে মাছে পচন আরম্ভ হয়। এই বংশ বৃদ্ধি তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। তাপ যদি বেশী হয় তাহলে ব্যাকটেরিয়া তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করতে থাকবে আর যদি তাপমাত্রা কম হয় তাহলে ধীরে ধীরে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ৩২° ডিগ্রী ফার্ন-হাইট (বরফের তাপ) একটা থেকে দুটো ব্যাকটেরিয়া হতে প্রায় ছ' ঘণ্টা সময় লাগবে। ৪০ ডিগ্রীতে ব্যাকটেরিয়ার ৩২° ডিগ্রীর চেয়ে দ্বিগুণ তাড়াতাড়ি আর ৫০ ডিগ্রীতে ছগুণ তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি হবে। সাধারণ অবস্থায় মাছ ভাল অবস্থায় রাখার জন্য বরফ ব্যবহার করা হয়। বরফ গুঁড়ো করে দিলে বড় বড় বরফের টুকরোর চেয়ে মাছ আরও ভাল রাখে কারণ সমস্ত মাছটা বরফে ঢাকা পড়ে। মাছ জল থেকে ধরার পর থেকে আরম্ভ করে বাজারে বিক্রি পর্যন্ত বরফ ব্যবহার করা ভাল—কারণ তাহলে কোন অবস্থায়ই মাছ বেশী গরম আবহাওয়া পায় না।

*

পৃথিবীর আকৃতি যে কমলা লেবুর মত তা আমরা এতদিন জেনে এসেছি। সম্প্রতি তিনজন বৈজ্ঞানিক মত প্রকাশ করেছেন যে, পৃথিবীর আকৃতি নেসপাতির মত। প্রায় ১০ মাস আগে 'ভ্যানগার্ড' নামক যে ক্ষুদে উপগ্রহটি পৃথিবীর চার ধারে ঘোরবার জন্য আকাশে ছাড়া হয়েছিল সেইটি থেকেই পৃথিবীর এই নতুন আকৃতির তথ্য সংগ্রহ করা গেছে।

*

টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ হেমাও উমিজাওয়া সম্প্রতি 'কেনামাইসিন' নামক এক নতুন অ্যান্টিবাওটিক আবিষ্কার করেছেন। এটি জাপানের ফুলে বাগানের মাটি থেকে পাওয়া গেছে। এই নতুন অ্যান্টি-বাওটিকটি কম করলেও ৫০টি চিকিৎসা কেন্দ্রে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কেনা-মাইসিন স্টাফাইলোকক্কাস জীবাণুর ওপর খুব বেশীরকম কার্যকরী হয়। এ ছাড়াও যক্ষ্মারোগের জীবাণু এবং মূত্রথলিতে যে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া থাকে তাদের ধ্বংস করতে সাহায্য করে।

*

ইঞ্জিন বললেই আমরা সাধারণ একটা দৈত্যদানবাকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ বুঝি। কিন্তু ছোট ইঞ্জিনের কথাও শোনা যায়। জনৈক সোভিয়েট ইঞ্জিনীয়ার মাত্র আড়াই সের ওজনের একটি ইঞ্জিন তৈরী করেছেন। শোনা যাচ্ছে যে, এই ইঞ্জিনের সাহায্যে এক-খানি স্কুটার সাইকেল ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে চলতে পারবে।

বিশ্ব-[illegible]
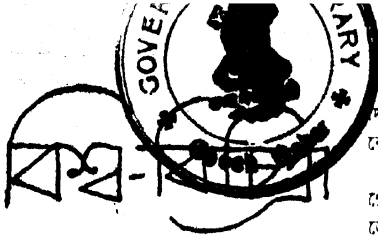
বছর দুই আগে ফ্রান্সের এক হৃদয়বান জেল-ওয়ার্ডারকে তিন বছরের জেল-সাজা দেওয়া হয় এই জন্যে যে সে জেলখানাকে যাকে বলে কয়েদীদের স্বর্গরাজ্য করে রেখেছিল। কয়েদীরা যা ইচ্ছে তাই করতোই শুধু নয়, এমন কি নিজেদের মধ্যে কে কবে মুক্তি পাবে তাও নিজেরাই ঠিক করে নিত।

এ ব্যাপার ঘটে নর্মাণ্ডীর এক জেলে ১৯৪৬ সালে ফার্নাণ্ড বিল্লা নামক এক ব্যক্তি ওয়ার্ডার পদে আসা থেকে। বিয়াল্লিশ বছরের বিল্লা ছিল বেশ আমুদে লোক এবং সতের বছর যাবৎ জেলের কাজে বেশ অনুগত কর্মচারি ছিল। যুদ্ধকালে ফ্রান্স শত্রুপক্ষের হাতে যাওয়ায় জর্মানীতে বন্দী অবস্থায় থাকাকালে বিল্লা কয়েদীদের ওপর সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু ওর একটা দুর্বলতা ছিল যেটা ওর পতনের কারণ হয়ে ওঠে: বিল্লা মদের গ্লাসের অতিরিক্ত ভক্ত ছিল।

নর্মাণ্ডীর এই জেলখানাটা যার একদিকে ম্যাজিস্ট্রেট-আদালত, আর একদিকে থানা, বিল্লার ভারী পছন্দ হয়েছিল. কিন্তু সাতচল্লিশ জন কয়েদী আর মাত্র তিনজন ওয়ার্ডার থাকায় বিল্লার পক্ষে ইচ্ছে মত স্থানীয় পানাগারে যাওয়া সম্ভব হতো না।

সৌভাগ্যবশত বিল্লা ওর কয়েদীদের মধ্যে মরিস টিউমার নামে একজনকে পায় যার দপ্তরের কাজ চালানোর ক্ষমতা ছিল এবং তার নিজের যে বিষয়ে দক্ষতা কম ছিল। বিল্লা ওকে রেকর্ড রক্ষার ভার দিলে। তাছাড়া ম্যাজিস্ট্রেট এবং কর্তৃপক্ষের সংগে চিঠিপত্তর লেখার বিরক্তিকর কাজ, সে ব্যাপারেও ওরা ঠিক করলে যে টিউমার চিঠিগুলো লিখে বিল্লার নামে সই করে পাঠিয়ে দেবে।

টিউমার ছিল পাকা জালিয়াৎ এবং কদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল। বিল্লার আরো সৌভাগ্য বলতে হবে যে ১৯৪৭ সালের মার্চে টিউমারের কয়েদের মেয়াদ শেষ হয়ে যেতেই রেনি গ্রেনভিল নামে আর এক কয়েদী জুটে গেল।

বলিষ্ঠ চশমাপরা গ্রেনভিল ছিল দেউলিয়া এবং ওস্তাদ জালিয়াৎ। এসেই সে বিল্লাকে দুবোতল মদ উপহার দিলে। প্রতিদানে বিল্লা তাকে তার নাম জাল করতে শেখালে, তারপর নিজের ডেস্কে বসিয়ে তার হাতে রেজিস্টার তুলে দিলে, চিঠিপত্র লেখার ভার দিলে, ওয়ার্ডারের রিপোর্ট তৈরী করতে দিলে, সব কাজই তার হাতে তুলে দিলে কেবল সিন্দুকের চাবি ছাড়া।

সেইদিন থেকেই, নামে না হোক, কার্যত গ্রেনভিল প্রধান ওয়ার্ডার হয়ে দাঁড়াল। জেলের রেজিস্টারে কয়েদীদের মুক্তির দিন হিসেব করে টুকে রাখতে লাগল, কার শাস্তিভোগ কত কমছে টুকতে লাগল এবং কর্তাব্যক্তিদের টেলিফোন এলেই বলতো: "প্রধান ওয়ার্ডার বিল্লা বলছি।" গ্রেনভিল কয়েদীদের মধ্যে থেকে বেশ কাজের লোক বেছে নিলে ওকে সাহায্য করার জন্যে এবং এই এরা কজনে মিলে জেলখানাটার পুরো ভারটাই হাতে তুলে নিলে।

মদ এবং সবরকমের খাদ্যের ব্যবস্থা হয়ে গেল; প্রচুর খাদ্য। কতক কয়েদী তাদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে খাদ্য-পার্সেল এবং মনি-অর্ডারে অর্থ পেতে

পৃথিবীর ভূভাগে সরীসৃপ জাতীয় জীব, প্রধানত ডায়নোসরদের অস্তিত্ব ছিল সাত কোটি থেকে আঠার কোটি বছর আগে। এই দানবীয় যুগের সবচেয়ে সাম্প্রতিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জীবকে বলা হয় ক্রিটেসিয়াস। কানাডার মধ্য এলবের্টায় রেডডিয়ার নদী অঞ্চলের চেয়ে পৃথিবীর আর কোথাও অত ক্রিটেসিয়াসের প্রস্তরীভূত কংকাল পাওয়া যায়নি। এলবের্টার রাজধানী ক্যালগারির অধিবাসীরা শিল্পী জন ক্যানের্ডাকে দিয়ে ব্রনটোসরাসের একটা মূর্তি তৈরি করায়। সেটা হল ১৯৩৫ সালের কথা। মূর্তিটা জনসাধারণের কাছে এত কৌতূহলজনক হয় যে কানের্ডাসে তখন ক্যালগেরির চিড়িয়াখানার সারো ডায়নোসরের মূর্তি তৈরী করতে দেখা হয়। এখন সেখানে তেতাল্লিশটি পাথরের তৈরী অতিকায় মূর্তি রয়েছে। ওপরের ছবিটি হচ্ছে কোরিথোসরসের—হংসচঞ্চু ডায়থোসর যার অস্তিত্ব ছিল সাড়ে ছ কোটি বছর আগে; এরা ছিলসর্বভুক এবং ভাল সাঁতার কাটতে পারত

লাগলো। কিন্তু সবচেয়ে আর্থিক সাহায্য আসতে লাগল রেমণ্ড নোভা নামক এক ব্যক্তির কাছ থেকে যার সংগে গ্রেনভিলের আলাপ হয়েছিল লিও'র জেলখানায়। বত্রিশ বছর বয়সের এবং সুপুরুষ নোভা আটবার তহবিল তছরূপ এবং চোরাই মাল রাখার অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং এবার তার জেল হয় তার পানাগারের রেফ্রিজারেটরে এক ট্যাক্স ইন্সপেক্টরকে বন্ধ করে রাখার অপরাধে।

নোভা জেলখানার কাছে এক পানাগারে একাউণ্ট খোলে যাতে আসল প্রধান ওয়ার্ডার বিল্লা (এখন আর যাকে কোন কাজই করতে হয় না) যখন খুসী গিয়ে যতোখুসী মদ্যপান করতে পারবে বিনা পয়সায় তবে সর্ত হচ্ছে এর বদলে 'গুণী' কয়েদীদের ইচ্ছেমত বাইরে যেতে এবং ফিরে আসতে দিতে হবে।

একদিন বিল্লা বাইরে রাস্তায় মাতাল হয়ে পড়ে থাকতে কজন কয়েদী মিলে ধরাধরি করে তাকে তার কামরায় এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়, এবং গরম জলের বোতলও চাদরের নিচে রেখে দিতে ভোলেনি।

কয়েদীদের অভ্যেস হয়ে যায় দেরীতে ঘুম থেকে উঠতে এবং বিছানায় বসেই প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করতে। জাঁ মেংগায় নামক এক কয়েদী সিল্কের ড্রেসিং গাউন পরে বাইরের এক কাফেতে গিয়ে প্রাতঃরাশ সম্পন্ন করে আসতো। একদিন এক ম্যাজিস্ট্রেট তাকে কাফেতে দেখে ফেলে এবং ওখানে ওর কি দরকার জানতে চায়। মেংগায় বিনীতভাবে জানায় যে কারণটা সে বলতে বাধ্য নয়। ম্যাজিস্ট্রেট একেবারে অবাক হয়ে চলে যায়।

প্রতিদিন অপরাহ্ণে কয়েদীরা বাস্কেটবল খেলতো জেলের অংগনে এবং কোনদিন বৃষ্টি হলে রাস্তার অপর পারে পানাগারে গিয়ে তাস নিয়ে বসতো। নতুন নিয়মে কয়েদীদের চব্বিশ ঘণ্টা ছুটিও মঞ্জুর করা হতে লাগল। নোভা প্রতি সকালে কয়েদীদের বাজি জুয়াড়ীদের হাতে দিত।

জেলখানায় বড়দিন ও নববর্ষ বেশ ধুমধামের সংগেই উদ্‌যাপিত হতো। ঝুড়ি ভর্তি মুরগী, বোতল বোতল মদ প্রত্যেককে পরিবেশন করা হতো। 'গুণী' কয়েদীদের স্ত্রী বা বান্ধবীদের আর সেই সংগে বিল্লা ও কর্মরত ওয়ার্ডারকে উৎসবে যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানানো হতো।

গরমকালের জন্য অন্যরকম প্রমোদ ব্যবস্থা। কয়েদীদের একটা প্রিয় চিত্তবিনোদন ছিল ট্যাক্সী নিয়ে সমুদ্রতটে বেড়াতে যাওয়া। কয়েকজন কয়েদী তাদের নিজেদের গাড়ি আনিয়ে নিত। গাড়িতে বেরিয়ে সমুদ্রতটে বেড়ানো, স্নান করা, রেস খেলা, পানাগারে হুল্লোড় করা সবই হতো।

কিন্তু সবেরই একটা শেষ আছে। এক নতুন ওয়ার্ডার এসে ব্যাপারটা কর্তৃপক্ষের কানে তুললে যার ফলে একটা তদন্তের হুকুম হলো। অপরাধের ইতিহাসের এই অদ্ভুদ ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটলো বিল্লা ও তার সহচরদের শাস্তিলাভে।

* * *

জাপানে, যে দেশে গত বছরে সাড়ে তেইশ হাজার লোক আত্মহত্যা করেছে এবং বছরে শতকরা পাঁচ করে আত্মহত্যার হার বেড়ে চলেছে, সেখানকার এক মিঠাই কারবারি একত্রিশ বছর বয়স্ক আকিরা ইমোতো অনেকদিন থেকে আত্মহত্যাকারীদের তালিকাভুক্ত হবার চেষ্টা করে আসছে। ভেবে ভেবে আকিরা ঘুমোবার পিল বেশী মাত্রায় খেয়েছে এবং গত বছর বিষপান করারও চেষ্টা করেছিল। তারপর সে তার বন্ধুদের জানায় যে এমন একটা কাণ্ড সে করবে যা সমগ্র জাতিকে চমকে দেবে।

আকিরার জীবনের প্রতি নৈরাশ্য কাটাবার জন্যে ওর বাবা ওর বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। যদিও বাপ-মায়ের পছন্দ করা কনে তাহলেও আকিরা তার বধূ চিয়েকোকে পেয়ে খুসীই মনে হল এবং চিয়েকোও মনে হল তাই। যথেষ্ট অর্থ হাতে না থাকায় ওদের মধুযামিনী সম্পন্ন হতে দেরী হল। মাসখানেক আগে একদিন আকিরা খুসী হয়ে জানালে যে ইয়াকুনি থেকে তার কাকা জানিয়েছেন ওরা যেন তার ওখানে গিয়ে মধুযামিনী অতিবাহিত করে এবং যাবার জন্যে তিনি টিকিটও পাঠিয়ে দিয়েছেন।

আকিরা তার সদ্য পরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে বিমানে উঠল এবং স্ত্রীকে সামনের দিকের একটা আসনে বসিয়ে নিজে আসন নিলে বিমানের দরজার কাছে। বিমানের স্টুয়ার্ডেস দেখল কিভাবে সে দরজাটা বন্ধ করছে আকিরা তা ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখছে তবে অন্য কিছু তখন সে ভাবেনি। বিমান ছাড়বার পর আকিরা স্পষ্টতই অশান্তভাবে তিনবার বিমানের শৌচাগারে গেল এবং প্রতিবারই সংগে নিয়ে গেল নীল রঙের একটা ক্যানভাস ব্যাগ। তৃতীয়বার যাবার পর আকিরা তার আসনে ফিরে এল সেই নীল ব্যাগ নিয়েই। ওকে অসুস্থ দেখাচ্ছিল এবং এক গ্লাস জলও চাইলে। জল নিয়ে ফিরে আসতেই স্টুয়ার্ডেস দেখলে আকিরা বিমানের দরজা খুলে তেইশ শ ফিট নীচের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

আকিরার স্ত্রী এবং বিমানের আরো পঁচিশজন যাত্রী ও চালকদের সৌভাগ্য যে আকিরা যতটা বলেছিল ওর অন্তর্ধান ততটা চমকপ্রদ হয়নি। ওর ক্যানভাসের ব্যাগে ছ ছড় ডিনামাইট পাওয়া গেল। বিমানের শৌচাগারে পাওয়া গেল পঁচিশ ছড় ডিনামাইট, একটা পড়ে যাওয়া সলতে এবং একটা পারকিউশন ক্যাপ যা বিস্ফারিত হতে পারেনি।

* * *

গ্রীসের সালোনিকা শহরে একদল চোর নিকোলাস ইউনিয়াসের তোষাখানা তছনছ করে সিন্দুকের ভেতর থেকে পাওয়া চেক বইগুলো সব পুড়িয়ে একটা চিরকুট লিখে রেখে যায় এই বলে যে পরের বার থেকে যেন কিছু অর্থ রেখে দেওয়া হয়।

* * *

ক্যালিফোর্নিয়ার টুলারে শহরে রবার্ট ব্রাউন নামক এক ব্যক্তি শহরের জেলে রাত্রি যাপন করতে চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে এমন হৈ চৈ তোলে যে ওকে আদালতে যেতে হয় এবং লাভ হয় ছমাসের জেল।

* * *
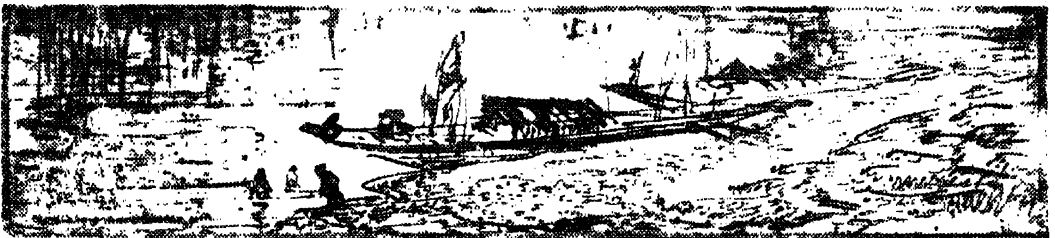
শিশুসাহিত্যের ইতিহাস

শতাব্দীর শিশুসাহিত্য—খগেন্দ্রনাথ মিত্র। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। সাত টাকা।

বাংলার লোক-সাহিত্যের মতই শিশু-সাহিত্যেরও আদিম ধারাটি অলিখিত, অর্থাৎ মৌখিক। গানে গল্পে ছড়ায় শিশুমনোরঞ্জনী কাহিনীগুলি যুগপরম্পরা বয়ে এসেছে আমাদের কালের সীমানা পর্যন্ত। পরে শিক্ষার প্রসার এবং মুদ্রণ সৌভাগ্যে বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শিশু সাহিত্যের পাঠক জুটতে লাগলো। শ্রব্য ধারাটি ক্রমে ক্রমে পাঠ্য হয়ে উঠতে লাগলো। সত্য বলতে কি তখনই যথার্থরূপে সাহিত্য হয়ে উঠলো। প্রাচীন রূপ কথা এবং ছড়ার রাজ্যেই বসে রইল না, শিশু সাহিত্যের সাম্রাজ্য সীমা ধীরে ধীরে প্রসারিত হতে থাকলো বিবিধরূপে, বিদেশী তর্জমায়। যে শিশুসাহিত্যকে অনেকেই অপাংক্তেয় করে রেখেছিলেন, কখনোই বয়স্ক সাহিত্যের সমপর্যায় গুরুত্ব দিতে রাজী হননি, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র তারই বিস্তারিত আলোচনাগ্রন্থ রচনা করে সাহিত্যিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কালপরিধি হিসাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সময় বেছে নিয়েছেন। আলোচনার ক্ষেত্রকে তিনি দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নিয়েছেন: পত্রিকা প্রসঙ্গ ও গ্রন্থ প্রসঙ্গ। দীর্ঘ একশ বছরের সাহিত্য, সাহিত্যের গহন এবং সাহিত্যিক তাঁর গবেষণার বিষয় হয়েছে। সাবলীল ভঙ্গিতে তিনি এই উদ্দেশে সংযুক্ত নিবন্ধ গ্রন্থটি রচনা করে কৌতূহলী পাঠকের রসাস্বাদনের স্পৃহা এবং ক্ষমতাকে উদ্বোধিত করেছেন সন্দেহ নেই। প্রাচীন আধুনিক অনেকগুলি লেখকের ছবি এই গ্রন্থটির শোভা বৃদ্ধি করেছে। বইটি সমাদৃত হবে আশা করি। ৬০৮।৫৮

শিশুসাহিত্য

'নাজাস্তা ও তার বন্ধুদের অভিযান'। লেখক—এন নসোব। সঙ্গে ছবি এঁকেছেন আ লাপতেভ। প্রকাশক—ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানীর পক্ষে শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। মূল্য তিন টাকা।

ছোটদের জন্যে লেখা এই রুশ গল্পটির অনুবাদ করেছেন শ্রীজয়ন্তকুমার। কেতাবটি কি বড় কি ছোট সকলের কাছেই সুখপাঠ্য। 'সোভিয়েত লেখক সংঘ' এই বইটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্যে মনোনীত করেছিলেন। সোভিয়েত দেশে এন নসোব একজন কুশলী শিশু-সাহিত্যিক রূপে স্বীকৃত। এঁর বহু রচনাই ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে। তবে আলোচ্য কেতাবটি মূল রুশ গল্পের ঝর ঝরে বাংলা অনুবাদ। পাতায় পাতায় পাকা শিল্পীর আঁকা মজার মজার ছবি সত্যিই আনন্দ দেয়। ২০৩।৫৭

'ছবি আঁকা' (ক)—শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক লিখিত। মূল্য সাতাশী নয়া পয়সা।

সহজভাবে ছবি আঁকা শেখাবার চেষ্টা করেছেন লেখক। পুস্তিকাটি শিশুদের কতটা উপযোগী বলতে পারি না। তবে ছবি আঁকার যাঁরা শিশু এমন সব বড়দের পক্ষে সত্যিই উপকারী। যেসব বিদেশী বইয়ের সাহায্য নিয়েছেন লেখক সেগুলি ঠিক শিশুদের

উদ্দেশ্যে রচিত নয়। পরিপ্রেক্ষিতে, 'ম্যাটাস্টিক প্রিন্সিপ্যাল' প্রভৃতি শিশুরা ঠিক গ্রহণ করতে পারবে বলে মনে হয় না। যাই হোক বড়রা যাঁরা শখ করে ছবি আঁকা শিখতে চান এ পুস্তিকাটি তাঁদের কাজে লাগবে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ১৯৮।৫৭

কবিতা

আলোর আকাশ—সুশীলকুমার গুপ্ত। এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দুই টাকা।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার গুপ্তের এটি দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ। প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'রৌদ্র জ্যোৎস্না'র তুলনায় বর্তমান গ্রন্থে কবির অগ্রস্মৃতি প্রশংসনীয়। উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি পূর্বের চেয়ে গভীর, শব্দ প্রয়োগের সময় অধিকতর শিল্প সচেতন হয়েছেন। সে-কারণে, তাঁর প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে রোমান্টিক ভাব-বিলাসিতার পরিবর্তে হার্দ্য যন্ত্রণার রূপক-চিহ্ন অংকুরিত হয়েছে। মাত্র ছেচল্লিশটি

কবিতার মধ্য দিয়েই তাঁর সমগ্র কবি-চরিত্রটি চিত্রিত হতে পেরেছে এটি সৌভাগ্যের কথা। ছন্দের ক্ষেত্রে কবি নিজেকে সংকুচিত করে রেখেছেন এটি মনে লাগলো। এই প্রতিশ্রুতিবান কবির প্রতি ভবিষ্যতে আশা রাখবো। ছাপা ও প্রচ্ছদ সুন্দর। ৬।৫৯

ছন্দা—ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বুক নিউজ, ৩৯।৪, রামতনু বোস লেন, কলিকাতা-৬। এক টাকা।

বাঁশরী—রমেশ মজুমদার। প্রকাশিকা: শ্রীপ্রভাবতী দেবী, যদুবেড়িয়া। দু'টাকা।

বন্ধু—সমুদ্রগুপ্ত। প্রবীরকুমার বিশ্বাস, ২৭।৩ রামকমল স্ট্রীট, কলিকাতা-২৩। দেড় টাকা।

রঙবৃষ্টি—দেবতোষ ঘটক। গ্রন্থজগৎ, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। এক টাকা।

মায়ামৃগ—সুধারঞ্জন চক্রবর্তী। নবপল্লী, পোঃ বারাসত, ২৪ পরগণা। এক টাকা।

পাঁচখানি কবিতার বই, অপরিণত হাতের রচনা। এমনকিছু বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে না যাতে কোন একখানাকে অপরগুলির থেকে পৃথক করে চেনা যায়। তবু এদের মধ্যে সুধারঞ্জন চক্রবর্তীর মায়ামৃগ এবং দেবতোষ ঘটকের রঙবৃষ্টি একেবারে নিরাশ করে না। উভয় লেখকই তরুণ মনসম্পন্ন এবং কিছুটা আধুনিক। স্বল্প পরিমাণে হলেও কোন কোন কবিতায় অতর্কিত দক্ষতা দেখিয়েছেন।

৩৯১, ৪৫৬।৫৮; ৬০৭, ১৩১।৫৭; ৬৩০।৫৬

শিল্প আলোচনা

NANDALAL BOSE AND INDIAN PAINTING—By Ramyansu Sekhar Das. Published by Tower Publishers, Calcutta. To be had of W. Newman & Co. Ltd., Calcutta. Price Rs 4.00.

এ পুস্তিকার মূল আলোচ্য বিষয় নন্দলাল বসুর চিত্রকলা এবং ভারতীয় চিত্রকলা। তবে লেখক প্রসঙ্গক্রমে পাশ্চাত্ত্য নানা চিত্রধারা এবং নানা শিল্পীর কথা লিখেছেন। অনেক সময় মূল বক্তব্য চাপা পড়ে গিয়ে ঐসব চিত্রধারার কথাটাই বেশী হয়ে পড়েছে। নন্দলাল বসুর চিত্রকলা সম্বন্ধে যাঁরা আগে কিছু শোনেননি তাঁরা অনেক কিছুই জানতে পারবেন বটে; কিন্তু শিল্পরসিক এবং শিল্পী মহলে এগুলি সবই শোনা কথা; লেখকের নিজস্ব বিচার বিশ্লেষণ বিশেষ কিছু নেই।

ছোট গল্প

মধুমালঞ্চ—রেণা সোম। মালঞ্চ, ১৯।১, গোপাললাল ঠাকুর রোড, কলিকাতা-৩৬। এক টাকা।

সাতটি ছোট গল্পের সংগ্রহ। লেখিকার প্রথম গ্রন্থ সম্ভবত। গল্পগুলির মধ্যে প্রথম প্রয়াসের সর্ববিধ চিহ্নই বিদ্যমান। কিন্তু সেই সঙ্গে একটি কোমলপ্রাণময়তা প্রতিটি রচনার মধ্যেই সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে। গল্পের আঙ্গিক কৌশল হয়ত লেখিকার সম্পূর্ণরকম অধিগত হয়নি, কিন্তু অন্তরঙ্গ আন্তরিকতা সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছে। নিষ্ঠার সঙ্গে সাহিত্য চর্চা করলে শ্রীযুক্তা রেণা সোম উন্নতিলাভ করবেন আমরা বিশ্বাস করি। ৫১৩।৫৮

ভ্রম সংশোধন

গত ১৭ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'বিজ্ঞান সাধক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ' প্রবন্ধে লেখক অনবধানবশত একটি বিষয় উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। '১৯০৯ সালে তিনি (জ্ঞানচন্দ্র) প্রথম স্থান অধিকার করে এণ্ট্রান্স পাশ করেন'—এই স্থলে '১৯০৯ সালে তিনি.....ছোট নাগপুর বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে.....পাশ করেন'—পড়তে হবে।

সঃ দেশ

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

প্রাথমিক হাওয়াইয়ান গীটার শিক্ষা—প্রদ্যোৎ দাস।

বাহাদুর—শ্রীনন্দগোপাল মজুমদার।

শ্রীসীতারাম নাম বিলাস—শ্রীশিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

সংসারতত্ত্ব-দর্শন ও প্রেমাঞ্জলি—বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষাল।

ছোটদের রঙমহল—সুনীল দত্ত ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার।

আলোচনা প্রসঙ্গে—৩য় খণ্ড—সংকলয়িতা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস।

ইসলাম প্রসঙ্গে—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র কথিত।

সত্যানুসরণ—শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র।

কেমন তাঁকে দেখি—২য় খণ্ড—শ্রীনাথ।

জিজ্ঞাসা—শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

স্বাধীন ভারতের রূপ ও গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারত—ডাঃ মাখনচন্দ্র শাস্ত্রী।

কি জানি

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেমই তার শেষ সম্বল কিনা
তাই এতো বেশী অভিমান
প্রেমের দীর্ঘ দুর্গম পথে অভিযান
তাই, বাঁধে প্রাণচঞ্চল বীণা।

তার নিষ্ঠার শেষ নেই, তাই
প্রেমের অনেক দিয়েছে মূল্য
পরিশেষে তবু সেই কি ভুললো?
দগ্ধদাহনে পুড়েছে নিত্য অমরতাই।

কি জানি সে ভালো বোঝেনা, তবুও
ভালোবাসবার সাধে বুঝি শুধু দুঃসাহসী
পাথর বেঁধেছে বুকে, নিশ্চুপ অশ্রুরাশি
কেন সে মোছেনি। মোছেনা কভুও॥

সাড়া

আরতি দাস

যখন সমস্ত শান্ত পারাপার শুধু ধূসরতা
নৈশ বিস্মৃতির ক্ষণ, তখনো ত দেখেছি তোমার
ক্ষুব্ধ অনিবার মত্ত অবিরাম কলমুখরতা
আশার তরঙ্গভঙ্গ। তখনো ত শ্বেতযূথিকার
মাল্যরচনায় যত্ন সফেন সাগর উপকূলে,
তোমার বসন্ত স্বপ্ন। তখনো দেখেছি সব ভুলে
যা কিছু যন্ত্রণা দুঃখ বাতাসের ছড় টেনে তুলে
জলের কল্লোল ছন্দে কি বাজাও পিপাসার সুর
আমার সমস্ত রাত্রি একখানি আলোর মুকুর
ভয়ের আচ্ছন্ন চিত্র লেখে আর মোছে বার বার
তীরের আশংকালগ্ন এই মন সাড়া পাবে কার?

শীত

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

তুমি কি কাঁদবে আজ, সন্ধ্যেবেলা পাতা ঝ'রে গেলে,
শীত, বড় শীত, এই অন্ধকার ঘরের ভেতরে
কাচের দেয়াল ঘেঁষে চোখ রাখা যায় না বিকেলে।

এখন তো পাতা ঝরে; একদিন, বিকেলের গলি
যখন গাছের ছিলো, দ্যাখোনি কি—ধুলোয় না ঝ'রে
চতুর পাখির মতো উড়ে যায় পাতার রুপোলী॥

চন্দ্রশেখর

সেন্সর বোর্ড সম্পর্কে

গত সপ্তাহে কলকাতায় কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের একটি সভা আহূত হয়েছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, বোর্ডের সভাপতি এম ডি ভাট ছাড়া অন্য কোন সভ্য সভায় যোগ দিতে কলকাতায় আসবার কণ্ট স্বীকার করেন নি। সরকারী মনোনয়নের ফলে যাঁরা ফিল্মশিল্পের ওপর গুরুমশায়গিরি করবার গুরু দায়িত্ব পেয়েছেন, তাঁদের কর্তব্যনিষ্ঠার এই কি উদাহরণ?

চিত্রনির্মাণ কেন্দ্রগুলিতে পালা করে কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের অধিবেশনের পিছনে যে সাধু উদ্দেশ্য আছে, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায় এই ধরনের দায়িত্ববোধবর্জিত আচরণে। কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই—এই তিনটি কেন্দ্রেই আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ড বর্তমান। নিজ নিজ এলাকায় নির্মিত ছবির ছাড়পত্র স্থানীয় সংস্থাগুলির অনুমোদনক্রমেই কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড দিয়ে থাকে। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির বিচার পদ্ধতির মধ্যে যাতে অনৈক্য না ঘটে তা দেখবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালিত হতে পারে। কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের বর্তমান সদস্যেরা এই দায়িত্ব পালন সম্বন্ধে যে কতদূর উদাসীন তা তাঁদের আচরণেই প্রকাশ।

বোম্বাইয়ের আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ডের সুপারিশে যে ধরনের হিন্দী ছবি আজকাল সার্বজনীন প্রদর্শনের ছাড়পত্র পাচ্ছে সে সম্বন্ধে এখানে ও অন্যত্র নানা বিরূপ সমালোচনা হয়েছে। আমরা আশা করেছিলুম, কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের যাঁরা সদস্য তাঁরা এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। পার্লামেণ্টে পর্যন্ত রুচিবিগর্হিত হিন্দী ছবির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে। কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা, তার ওপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার তাঁর নেই—এই অজুহাতে তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডঃ বি ভি কেশকার ফিল্মবিচারনীতির প্রশ্নটি সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু আইন যাঁদের হাতে প্রতিকারের ক্ষমতা দিয়েছে, নিজেদের দায়িত্ব পালনে তাঁরা যে কতখানি সক্ষম সে বিষয়ে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে।

কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ড আইনত স্বয়ংশাসিত সংস্থা হলেও, তার সদস্য নির্বাচনের ভার তথ্য ও বেতার দপ্তরের ওপর ন্যস্ত। ডঃ কেশকারের মূল দায়িত্ব সেইখানে। সুতরাং তাঁর দপ্তরের নির্বাচিত সেন্সর বোর্ডের সদস্যবৃন্দ যদি নিজেদের কর্তব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত না হন, তাহলে সে অগৌরবের অংশ তাঁকেও নিতে হবে।

কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সদস্যদের সম্মিলিত অনুপস্থিতিতে কলকাতায় বোর্ডের পূর্বনির্দিষ্ট সভার অনুষ্ঠান সম্ভব না হলেও, বোর্ডের সভাপতি শ্রী ভাট বেঙ্গল মোশান পিকচার এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাঁর কলকাতা সফর বিফল হতে দেন নি।

কলকাতায় ফিল্ম পরীক্ষার কাজ যে নির্বিবাদে সম্পন্ন হচ্ছে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—১৯৫৮ সালে এই কেন্দ্রে মাত্র একখানি ছবিকে ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করা হয়। চিত্রনির্মাতা যখন ছবির আপত্তিজনক অংশগুলি বাদ দিয়ে একটি পুনর্সম্পাদিত সংস্করণ আঞ্চলিক বোর্ডের কাছে পেশ করেন, তখনই ছবিটি সার্টিফিকেট পেয়ে যায়।

অবধূত রচিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ'-এর চিত্ররূপ দিয়েছেন বিকাশ রায় প্রোডাকশন্স। তাতে থিরুমল ও কুন্তীর ভূমিকায় উত্তমকুমার ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়কে দেখা যাবে। ছবিটি আগামী সপ্তাহে মুক্তিলাভ করবে

রঞ্জনা বন্দোপাধ্যায় ছবির পর্দায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করবেন অগ্রগামীর "হেডমাস্টার" চিত্রে।

বি-এম-পি-এর সভাপতি মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় কয়েকটি ছোটখাট ব্যাপারে শ্রী ভাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বর্তমান ব্যবস্থায় আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ডের অনুমোদনক্রমে সার্টিফিকেট দেন শ্রী ভাট। যেহেতু কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের কার্যালয় বোম্বাইতে অবস্থিত এবং যেহেতু শ্রী ভাটকে মাঝে মাঝে বোম্বাই ছেড়ে অন্যত্র যেতে হয়, তার ফলে কলকাতায় ছবির পরীক্ষা ও বোম্বাই থেকে সেন্সর সার্টিফিকেট আসার মধ্যে বেশ খানিকটা সময়ের ব্যবধান থাকে। ছুটি পড়ে গেলে এই ব্যবধান আরো দীর্ঘতর হয়ে যায়। শ্রী চট্টোপাধ্যায় তাই প্রস্তাব করেন, আঞ্চলিক সেন্সর অফিসারের হাতে যাতে সার্টিফিকেট দেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রস্তাব সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ছবির অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া সম্বন্ধে। অনেক সময়ে দেখা গেছে, ছবি মুক্তির পর তার অংশ বিশেষ দর্শকসাধারণের অসন্তুষ্টির কারণ হয়েছে। সেক্ষেত্রে ছবির নির্মাতা আঞ্চলিক সেন্সর অফিসারের অনুমতির অপেক্ষা না করেই দরকার মত অংশ বাদ দিতে পারবেন, এবং প্রথম সুযোগে তা উক্ত অফিসারের গোচরে আনলেই তা বিধিসংগত হবে—শ্রী চট্টোপাধ্যায় এই দাবী জানান।

শ্রী ভাট এই দুটি বিষয়েই কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের অভিমত গ্রহণ করে সত্বর তা বি-এম-পি-একে জানাবেন—এই আশ্বাস দেন।

বি-এম-পি-এ সভাপতির আর একটি অনুযোগও এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, প্রথম যখন কেন্দ্রীয় ফিল্ম সেন্সর বোর্ড গঠিত হয়, তদানীন্তন বেতার ও তথ্যমন্ত্রী আর আর দিবাকর তখন জানিয়েছিলেন যে, ফিল্মশিল্পের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রীয় বোর্ডে একজন এবং প্রত্যেক আঞ্চলিক বোর্ডে দুজন করে সদস্য নেওয়া হবে। শ্রী দিবাকরের আমলে এই প্রতিশ্রুতি যথোচিত পালিতও হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। এখানকার আঞ্চলিক বোর্ডে শুধু যে ফিল্ম-শিল্পের কোন প্রতিনিধি নেই তা নয়, কেন্দ্রীয় বোর্ডেও যে একজন ফিল্মের লোক আছেন তাঁকেও কোনক্রমেই ফিল্মশিল্পের প্রতিনিধি বলা চলে না।

আরো মজার কথা, দেশের ও বিদেশের ছবির সঙ্গে যাঁদের সম্বন্ধ সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ, সেই চিত্র-সমালোচক ও চিত্র-সাংবাদিকদের কোন স্থান নেই কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক সেন্সর বোর্ডে। সরকারী বিচারে ছবি সম্বন্ধে বেশী জানাশোনা সম্ভবত সেন্সর বোর্ডের সদস্য হবার পক্ষে দোষের কথা!

সিনেমার প্রাচীরপত্রের সেন্সর

বৃটেনে এতকাল ছবির প্রচার পরিচালনা সম্পর্কে সেন্সরের কোন কড়াকড়ি ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি ভীতিরোমাঞ্চমূলক ও যৌন-আবেদনযুক্ত ছবিগুলির নিম্নপ্রবৃত্তি উত্তেজক এবং আসুরিক ও নারকীয় দৃশ্যাবলী সমন্বিত প্রাচীরপত্রগুলি জনসাধারণের সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মযাজক সম্প্রদায়, পুলিস ও জননীতি সংস্থা থেকে এ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপন করা হয়েছে। বৃটেনের বিশটি চিত্রগৃহের প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরী কিনেমেটোগ্রাফ রেণ্টার্স সোসাইটি সম্প্রতি একটি কমিটি গঠন

ইংকা প্রোডাকশন্সের নির্মীয়মান ছবি "নূত্যেরি তালে তালে"র একটি নৃত্য দৃশ্যে সুবিখ্যাত কথক-নর্তক গোপীকৃষ্ণ ও দক্ষিণ ভারতের সুদর্শনা নৃত্যশিল্পী শুকু মারী।

করেছেন। চিত্রপ্রদর্শকদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, এখন থেকে মুক্তি-প্রতীক্ষিত সমস্ত ছবির প্রাচীরপত্র প্রেক্ষাগৃহে অথবা অন্যত্র ব্যবহারের পূর্বে এই কমিটির অনুমোদনের জন্যে পাঠাতে হবে। কিনেমেটোগ্রাফ রেণ্টার্স সোসাইটির সভাপতি এক বিবৃতিতে বলেন, জনসাধারণকে পীড়িত করে এমন প্রাচীরপত্রের ব্যবহার বন্ধ করাই কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য। প্রেক্ষাগৃহের মর্যাদা রক্ষায় এই ব্যবস্থার প্রতি বৃটেনের চিত্রপ্রদর্শকদের পরিপূর্ণ সহযোগিতা রয়েছে বলে জানা গেছে।

চিত্রালোচনা

ফেব্রুয়ারীর গোড়াতেই যে-সব বাংলা ছবির মুক্তি পাবার কথা ছিল, তাদের প্রদর্শনীর কাল কেবলি পেছুচ্ছে চলতি ছবিগুলির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাওয়ায়। অর্থাৎ যে ছবিগুলি ইতিমধ্যে উঠে যাবে বলে মনে হয়েছিল, সেগুলি এখনও যথেষ্ট পরিমাণে দর্শক আকর্ষণ করায় ছবিঘরগুলি জোড়া হয়ে রয়েছে। ব্যবসায়ের দিক থেকে এটি নিশ্চয়ই সুসংবাদ, যদিও চিত্রপ্রিয়দের "চিত্ত পিপাসিত রে"—নতুন ছবির জন্যে।

মুক্তির নির্ঘণ্ট আপাতত এই রকম স্থির হয়েছে: ১২ই ফেব্রুয়ারী সরস্বতী পূজার দিন বিকাশ রায় প্রোডাকশন্সের "মরুতীর্থ হিংলাজ" দর্শকচিত্ত জয় করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসছে। তার পরের হপ্তায় ২০শে ফেব্রুয়ারী হেমন্ত-বেলা প্রোডাকসন্সের "নীল আকাশের নীচে"র যাত্রারম্ভ করবার কথা। দুটি ছবিই প্রাক-মুক্তি প্রদর্শনীতে চিত্র সমালোচকদের দেখান হয়েছে এবং সকলকার অবিমিশ্র প্রশংসা লাভ করেছে। ফেব্রুয়ারীর ২০শে অথবা ২৭শে টাইম ফিল্মসের "চাওয়া-পাওয়া"র মুক্তির তারিখ নির্ধারিত হয়েছে।

দেবকী বসুর "সাগর সঙ্গমে", প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "বিচারক", কে জি প্রোডাকশন্সের "দেড়শো খোকার কাণ্ড" বা রূপজ্যোতির "ঠাকুর হরিদাস"—এদের কোনটিই মার্চের আগে মুক্তি পাবে না।

• • •

এ হপ্তায় দুখানি নূতন হিন্দী ছবির দর্শন মিলেছে। দুটিই হাল্কারসের ছবি। একটির নাম "আনাড়ী", অপরটির "চল্‌তি কা নাম গাড়ী"। বোম্বাইতে তোলা হলেও দুটি ছবিরই পরিচালক বাঙালী। "আনাড়ী" তুলেছেন সম্পাদক-পরিচালক হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়, "চল্‌তি কা নাম গাড়ী"র পরিচালক হচ্ছেন সত্যেন বসু।

"আনাড়ী"র ভূমিকালিপিতে আছেন রাজ কাপুর, নূতন, ললিতা পাওয়ার, মতিলাল, শুভা খোটে, মুকরি, নানা পলশিকর, অসীমকুমার ও হেলেন। এর গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন ইন্দর রাজ আনন্দ। শঙ্কর ও জয়কিষণ এর যুগ্ম সংগীত পরিচালক। এল বি ফিল্মসের পতাকাতলে ছবিটি নির্মিত হয়েছে।

"চল্‌তি কা নাম গাড়ী"র নির্মাতা কে এস ফিল্মস। অশোককুমার, অনুপকুমার কিশোরকুমার এই তিন ভাইকে এক সঙ্গে এই ছবির তিনটি মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে। নায়িকার ভূমিকায় চিত্রাবতরণ করেছেন মধুবালা। অন্যান্য চরিত্রে আছেন বীণা, কে এন সিং, সজ্জন, ব্যানার্জি, হেলেন, কাক্কু, কমল প্রভৃতি। গল্প লিখেছেন সত্যেন বসু। সুরসৃষ্টির কৃতিত্ব শচীনদেব বর্মণের

• • •

ধনঞ্জয় বৈরাগীর "রুপোলী চাঁদ" অবৈতনিক রঙ্গমঞ্চের একটি বহু অভিনীত নাটক। সত্যজিৎ রায়ের তত্ত্বাবধানে ও তরুণ রায়ের পরিচালনায় নাটকটি চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করবার উদ্যোগ আয়োজন

চলছে। প্রধান পুরুষ চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত হয়েছেন। গত বৎসর থিয়েটার সেণ্টার আয়োজিত নাট্যোৎসবে মুখোস সম্প্রদায় নাটকটি প্রথম সাধারণের সামনে উপস্থিত করেন। তাঁদের শিল্পীরাই এই চিত্র সংস্করণেও অধিকাংশ ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

"একদিন রাত্রে" ও "জাগতে রহো"র যুগ্ম লেখক ও পরিচালক শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র এবার তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার পতাকাতলে ছবি তুলবেন। তাঁদেরি লেখা গল্প "শুভ বিবাহ" হবে এই নবগঠিত প্রতিষ্ঠানের প্রথম নিবেদন। প্রত্যেক বিবাহই শুভ কামনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু ক'জন দম্পতীর পরবর্তী জীবন সত্যিই শুভ ও সুন্দর হয়ে ওঠে—তাই নিয়ে এর গল্প। পাহাড়ী সান্যাল, ছবি বিশ্বাস, তৃপ্তি ও শম্ভু মিত্র কয়েকটি প্রধান চরিত্রে রূপ দেবেন। তাছাড়া প্রযোজক পরিচালকরা কয়েকটি নতুন মুখ খুজছেন বিশেষ কয়েকটি চরিত্রের জন্যে। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে এই মাসের শেষের দিকে "শুভ বিবাহে"র চিত্রগ্রহণ শুরু হবে।

৩০শে জানুয়ারী রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে শক্তি ফিল্ম প্রোডাকশন্সের প্রথম অর্ঘ্য "পরিহাস"-এর শুভ মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুক্তিপদ দাশ বিদ্যাবিনোদ এর কাহিনীকার ও প্রযোজক। হিরণ্ময় সেন ছবিটি পরিচালনা করবেন।

• • •

অগ্রগামীর নতুন ছবি "হেড মাস্টার" এক শিক্ষকের চরিত্রকে কেন্দ্র করে তোলা হচ্ছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি বিখ্যাত গল্পের চিত্ররূপ এটি। নাম-ভূমিকায় অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস। "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত"-খ্যাত করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। রঞ্জনা বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একটি নতুন তারকারও সন্ধান পাওয়া যাবে এই ছবিতে। ছবির কাজ চলছে ন্যাশনাল সাউণ্ড স্টুডিওতে। তারাশংকরের লেখা গান হবে এই ছবির একটি বিশেষ আকর্ষণ। সুর যোজনার ভার নিয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত।

ফরমাশী কান্না-হাসি

দর্শকদের চিত্তবিনোদন করা যে-সব ছবির প্রধান লক্ষ্য, শিবাজী প্রোডাকসন্সের "অমর দীপ" তাদের পর্যায়ভুক্ত। বলতে বাধা নেই, এই ধরনের যে ক'টি হিন্দী ছবি দক্ষিণ ভারত থেকে এর আগে এসেছে, তাদের মধ্যে চোখে পড়বার মত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়েছে এই ছবিটি।

ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র আদুরে মেয়ে অরুণা'কে নিয়ে কাহিনীর শুরু। অরুণার বাবা তার বন্ধুপুত্র প্রাণের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন স্থির করে রেখেছেন। বন্ধুর মৃত্যুর পর প্রাণকে তিনি নিজের বাড়িতে ছেলের মতোই এনে মানুষ করে তুলেছেন এবং নিজের ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্বও তার হাতে তুলে দিয়েছেন। কিন্তু প্রাণ অশিষ্ট আচরণ ও দুর্বিনীত স্বভাবের জন্যে অরুণার মনে কোনদিনই শ্রদ্ধার আসন পায়নি। অরুণা যখন জানতে পারল যে, তার বাবা প্রাণকেই কন্যার পাত্র হিসাবে মনোনীত করে রেখেছেন, তখন অতি দুঃখেই সে একদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। অরুণার গৃহত্যাগে তার বাবা কাতর হয়ে পড়েন। প্রাণ খুঁজে বেড়ায় অরুণাকে।

এদিকে অরুণা শহরের এক নির্জন প্রান্তে একটি ভাঙ্গা ট্রাকের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রাত্রির মতো আশ্রয় নিতে গিয়ে পরিচিত

টাইম ফিল্মসের মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবি "চাওয়া-পাওয়া"র একটি দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমার।

হয় অশোক নামে একটি বেকার যুবকের সঙ্গে। অশোক গ্রাজুয়েট, কিন্তু জীবনযুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত হয়ে সে পথে পথে চাকরির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। এই ভাঙ্গা ট্রাকেই তার নিবাস। অশোকের চরিত্রমাধুর্যে তার প্রতি অনুরক্তা হয়ে পড়ে অরুণা। অনুরাগ ক্রমে প্রণয়ে পরিণত হয়। অরুণা তার পরিচয় গোপন রাখে অশোকের কাছে।

কিন্তু বেশীদিন কাটলো না এমনিভাবে। শহরের পথে হঠাৎ একদিন প্রাণ দেখা পেয়ে যায় অরুণার এবং তাকে জোর করে নিয়ে তোলে গাড়িতে। ছুটে অরুণাকে বাঁচাতে এসে অশোক গাড়ি চাপা পড়ে এবং অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে গিয়ে ওঠে।

অরুণার প্রত্যাবর্তনে তার বাবার মন আনন্দে ভরে ওঠে। উকিল ডেকে মৃত্যুর পূর্বে তিনি অরুণার নামে উইল করে তাকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যান। আর বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্যকে বলে যান, অরুণা যেন তার জন্মপরিচয় জানতে না পারে।

মোটর দুর্ঘটনায় অশোক মস্তিষ্কে সাংঘাতিক চোট খেয়ে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পথে পথে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়ায় সে। নিজের পরিচয় ও নাম কিছুই তার মনে নেই। একদিন রাস্তায় এক বাজীকরের দলের নাচনেওয়ালী মেয়ে রূপাকে এক দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে সে তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। অশোকের প্রতি রূপার কৃতজ্ঞতা দিনে দিনে নিবিড় প্রেমে রূপান্তরিত হয়। অশোকও ভালোবেসে ফেলে রূপাকে।

অশোক চাকরি পায় অরুণাদের মোটর কারখানায়। প্রাণ সেই কারখানার পরিচালক। শ্রমিকদের প্রতি প্রাণের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে অশোক একদিন গিয়ে হাজির হয় অরুণাদের বাড়িতে। অশোকের অদর্শনে কাতরা অরুণা অনেকদিন পর তাকে দেখে উতলা হয়ে পড়ে। অশোক চিনতে পারে না অরুণাকে। ক্রমে অরুণা জানতে পারে অশোকের সব কথা, প্রকাশ করে তার মনোবেদনা, কিন্তু কেঁদে ফিরে যেতে হয় তাকে।

অশোককে আপন করে পাওয়ার জন্যে অরুণার চেষ্টাকে বিষনজরে দেখে প্রাণ। সে অশোককে অরুণার জীবন থেকে একেবারেই সরিয়ে দিতে চায়। টাকা দিয়ে গুণ্ডা ঠিক করে অশোককে মেরে ফেলতে। কিন্তু গুণ্ডার আঘাতে অশোক মরে না, মাথায় চোট খায় ভীষণভাবে। এই আঘাতে তার অতীতের স্মৃতি আবার ধীরে ধীরে ফিরে আসে। রূপাদের বাড়িতে অরুণা যখন আহত অশোকের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন অরুণার হাত ধরে তার সঙ্গে চলে আসতে অশোকের বাধলো না।

তখন রূপা যায় আত্মহত্যা করতে। কিন্তু তার বাবা এসে তাকে আটকায় এবং আশ্বাস দেয় যে, তাকে সে সুখী করে তুলবে। সেই রাত্রেই রূপার বাবা হাতে ছোরা নিয়ে ঢোকে অরুণার ঘরে রূপার সুখের প্রতিবন্ধককে পৃথিবীর বুক থেকে সরিয়ে দিতে। দেওয়ালে টাঙানো অরুণার বাবার ছবি দেখে সে চমকে ওঠে। অরুণার দয়ায় মুক্তি পেয়ে অনুতপ্ত হৃদয়ে সে বাড়ি ফেরে।

ইতিমধ্যে অরুণা ও অশোক পরস্পরের সান্নিধ্যে আবার সুখী হয়ে ওঠে। ওরা যায় রূপার সঙ্গে দেখা করতে—রূপা অশোকের জন্যে যা করেছে তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানাতে। ক্ষোভে, দুঃখে রূপা তার বাবার সেই ধারালো ছুরি নিয়ে মারতে যায় অরুণাকে। এমন সময় তার বাবা এসে তার হাত ধরে ফেলে এবং সকলকে অবাক করে দিয়ে বলে নিজের সহোদরাকে খুন না করতে। অরুণার পিতৃপরিচয় প্রকাশ পায়। সে রূপারই ছোট বোন। অভাবের তাড়নায় দরিদ্র পিতা তাকে বিক্রী করে দিয়েছিল নিঃসন্তান ধনী ব্যবসায়ীর কাছে অতি শৈশবে। রূপা তখন আর চায় না সহোদরার সোহাগ কেড়ে নিতে।

এমন সময় জিঘাংসায় অন্ধ হয়ে প্রাণ ছুটে আসে অশোককে জন্মের মত সায়েস্তা করতে। দুজনের মধ্যে অনেক ধস্তাধস্তির ও হাতাহাতির পর যখন প্রাণ অশোককে লক্ষ্য করে রিভলবারের গুলী ছোঁড়ে, তখন রূপা ছুটে এসে দাঁড়ায় অশোকের সামনে। গুলীবিদ্ধ হয়ে তার দেহ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। ইতিমধ্যে রূপার বোন চম্পা ও তার প্রণয়ীর তৎপরতায় পুলিসও এসে হাজির হয় এবং প্রাণকে গ্রেপ্তার করে। মৃত্যুর পূর্বে অশোক ও অরুণার হাত দুটি এক করে দিয়ে যায় রূপা। আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে তার প্রেমের দীপশিখা অনির্বাণ হয়ে থাকে।

আগেই বলেছি, আনন্দ দানই এ ছবির মুখ্য উদ্দেশ্য। কাহিনীর বিভিন্ন চরিত্র ও নানা ঘটনা যে বাস্তব বিচারের ধোপে টেঁকে তা নয়। একাধিক নাটকীয় পরি-

স্থিতিকে মনে হয় ফরমাশী; কাহিনীর নাট্যপরিণতিও দর্শকদের প্রথম থেকে আঁচ করে নিতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু পরিচালক টি প্রকাশ রাওয়ের কৃতিত্ব হ'ল, দর্শকদের আকৃষ্ট করবার মত আমোদের উপকরণ তিনি ছড়িয়ে রেখেছেন ছবির সর্বত্র। পরিচালনায়ও বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ পাওয়া যায়। একটি পুরুষকে কেন্দ্র করে দুটি নারীহৃদয়ের প্রেম-অভিসারের উপাখ্যান মনকে মাতিয়ে রাখে। আর কাহিনীর বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে কৌতুক, গান ও নাচের সমাবেশ। কৌতুকাবতার জনী ওয়াকারের কৌতুক পরিবেশন ছবির বিশেষ আকর্ষণ; তাঁর সঙ্গে রয়েছেন রাগিণী ও মুকরি—কৌতুকপ্রদ পরিস্থিতিতে তাঁদের অবদানও কম নয়। নৃত্যপটিয়সী ত্রিবাঙ্কুর ভগ্নীদ্বয়—পদ্মিনী ও রাগিণী—এই ছবিতে তাঁদের নৃত্যপ্রতিভার বিস্ময়কর প্রমাণ দিয়েছেন। দর্শক মনোরঞ্জনে এই দুই নৃত্যপ্রতিভাময়ী শিল্পীকে এমন আকর্ষণীয়ভাবে এর আগে আর উপস্থিত করা হয়নি। বৈজয়ন্তীমালার একটি নৃত্যাংশও বিশেষ উপভোগ্য।

অভিনয়ে সর্বাগ্রে প্রশংসা পাবেন নায়ক-চরিত্রে দেবানন্দ। তাঁর অভিনয় সহজ ও সাবলীল. বিশেষ করে দুর্ঘটনায় স্মৃতি-বিলুপ্তির পর অন্তর-নৈরাশ্যের রূপটিকে তিনি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। রূপার চরিত্রে পদ্মিনী প্রথম প্রেমের মধুর অনুভূতি এবং পরে বিরহিণীরূপে সহজেই দর্শকমন জয় করে নেন। বৈজয়ন্তীমালা অরুণার মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি ও প্রিয়তমকে কাছে পেয়েও না পাওয়ার বেদনাকে সুন্দর ফুটিয়েছেন। প্রাণের চরিত্রের অশিষ্ট প্রকৃতি, জিঘাংসা ও কুচক্রী মনোবৃত্তিকে প্রাণ সহজভাবেই রূপ দিয়েছেন তাঁর এই জাতীয় চরিত্ররূপায়ণের স্বাভাবিক দক্ষতায়। জনী ওয়াকার তাঁর উপস্থিতিতে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। অন্যান্যদের মধ্যে স্বচ্ছন্দ অভিনয় কৃতিত্বের প্রমাণ দিয়েছেন বিপিন গুপ্ত, ডেভিড, রাগিণী ও মুকরি।

সংগীত পরিচালনায় সি রামচন্দ্র মন-মাতানো সুরের কয়েকটি গানের জন্য প্রশংসা পাবেন। কলাকৌশল ও আঙ্গিক পরিপাট্যের দিক দিয়ে ছবিখানি বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে পারে। ছবির চিত্রগ্রহণ খুবই উঁচু-দরের; শব্দগ্রহণও বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

ছবির কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীধর, সংলাপ ও গীত রচনা করেছেন রাজেন্দ্রকৃষ্ণ।

নাট্যাভিনয়

গত রবিবার "বৈশাখী"র সভাবৃন্দ নিউ এম্পায়ারে জ্যোছন দস্তীদার রচিত "দুই মহল" নাটকখানি মঞ্চস্থ করেন।

সমাজের দুটি স্তরের কাহিনী নিয়ে নাটকের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। একটি স্তরের ভিত্তি উন্নাসিকতা, লোভ ও স্বার্থান্ধতা—যার জন্যে যে কোন কুশ্রীতাকে গ্রহণ করে মিথ্যা আত্মম্ভরিতার মধ্যে বেঁচে থাকতেই তারা ভালোবাসে। অপর স্তর ক্লেদাক্ত, ঘৃণ্য এক পরিবেশ—আত্মবিকাশের পথ না পেয়ে সেখানে গিয়ে পড়ে ভাগ্যাহতের দল। কিন্তু তাদের অন্তরের সব সৌন্দর্য নিঃশেষে মুছে যায়নি। নাটকের প্রধান চরিত্র সমাজের ওপরের উন্নাসিক স্তরের মধ্যমণি রঞ্জন সান্যাল। কোন পাপাচারই তার কাছে ঘৃণ্য নয়। মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে এনে তাকে বিকলাঙ্গ করে পাপ-ব্যবসায়ে অর্থ রোজগারেও তার বিবেক বাধা

হেমন্ত-বেলা প্রোডাকশন্সের "নীল আকাশের নীচে"র নায়িকা মঞ্জু দে। ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই ছবিটি মুক্তি পাবে।

টেলিভিশনে প্রদর্শনের জন্যে যাদুরত্নাকর এ সি সরকারের ম্যাজিকের ছবি তুলছেন মার্কিন কলা কুশলীবৃন্দ।

পায় না। কিন্তু তার নিজের ছেলে যখন পিতার ঘৃণ্য জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে তাকে ছেড়ে চলে যায় তখন বুঝি রঞ্জন সান্ন্যালের মন বিবেকের দংশনে কাতর হয়ে পড়ে। কিন্তু রঞ্জন সান্ন্যালের এমন ঘৃণ্য পাপাচারের কারণ নাটকের কোথাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। নাটকের পরিণতিও সুখকর হয়নি এই কারণে যে, দর্শকদের দরদ কেড়ে নেয় যারা তারা মুক্তি পেল না রঞ্জন সান্ন্যালের নারকীয় আধিপত্যের হাত থেকে।

সম্মিলিত অভিনয়-সৌকর্য এই নাটকের এক বিশেষ সম্পদ। শৌখিন নাট্যশিল্পীদের এই কৃতিত্ব পেশাদারী শিল্পীদের চাইতে কম নয়। অভিনয়ে সর্বাগ্রে প্রশংসা পাবেন অতীনলালের ভূমিকায় নাট্যকার জোছন দস্তীদার। অন্যান্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সুবীরের চরিত্রে কমল চ্যাটার্জি, মনুয়ার ভূমিকায় শান্তিরঞ্জন দে, ভজহরির চরিত্রে চণ্ডীদাস চক্রবর্তী ও ওসমানীর ভূমিকায় শিখা দ... মঞ্চসজ্জা ও অঙ্গসজ্জা বিশেষ প্রশংসনীয়। স্থান বিশেষে আবহসংগীত উঁচুদরের। তাপস সেনের আলোকসম্পাত মুগ্ধকর। নাটকখানির পরিচালনায় কমল চ্যাটার্জি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

নিখিল বঙ্গ নাট্য সাহিত্য সম্মেলন

বাংলা দেশে নাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছে আজ নয়, বেশ কিছুকাল আগে থেকে। বহু নাট্যসংস্থা এই আন্দোলনকে রূপায়িত করবার চেষ্টা করছেন—তাঁদের অভিনীত নানা নাটকের মাধ্যমে, নানা আঙ্গিকে, মৌলিক নাটকে, অনূদিত নাটকে ও উপন্যাসের নাট্যরূপ অভিনয়ের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে।

এই বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন এবং একক প্রচেষ্টাগুলির একটা সামগ্রিক রূপ ও শক্তি অনুধাবন করবার মহৎ সংকল্প নিয়ে বিশ্বরূপা প্রবর্তন করেছিলেন নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা, নিখিল নাট্য উৎসব ও শৌখিন নাট্য প্রতিপ্রতিযোগিতা। পেশাদার ও অপেশাদার নাট্যশিল্পীবৃন্দের তথা নাট্যপিপাসু জনসাধারণের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করবার বাসনায় সৃষ্টি হয়েছে নিখিল নাট্যপ্রেক্ষাগারের। নাট্যচেতনাকে শিশু ও কিশোর মনে সঞ্চারিত করবার জন্য উদ্বোধন হয়েছে শিশুনাট্য শাখার। একটিমাত্র পেশাদার থিয়েটারের পক্ষে এতগুলি বিরাট কাজে ব্রতী হওয়া সত্যই কল্পনাতীত। কিন্তু বিশ্বরূপা তার পরিকল্পনা কমিটির সদস্যবৃন্দের সুপরামর্শ ও সহযোগিতায় ... অদ্যাবধি উপরোক্ত প্রত্যেকটি কর্তব্য সুসম্পাদন করেছেন।

কিন্তু নাট্য উন্নয়নই যদি কাম্য হয়, তবে সে উন্নতিকে সর্বাঙ্গীন করবার প্রয়োজন আছে একথা উন্নয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ মনে করেন। এই সত্য তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে, কেবলমাত্র মঞ্চনাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে চলবে না, এর সঙ্গে যোগ করতে হবে চিত্রনাট্য ও বেতার নাটককে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দেশে আজও বাংলা ভাষায় নাটক রচনার এমন কোন সূত্র বা সংজ্ঞা সমন্বিত নির্দেশ গ্রন্থ রচিত হয়নি, যা পরবর্তীকালে নাট্যকার বা নাট্যশিল্পীর পথ নির্দেশ করতে পারে।

দেশের এই বিরাট অভাব পূরণ করতে প্রতি বৎসর নিখিল বঙ্গ নাট্য সাহিত্য সম্মেলনের প্রস্তাব নিয়ে পুনরায় বিশ্বরূপা এগিয়ে এসেছেন। এই বিরাট নাট্য সাহিত্য সম্মেলনে যে কেবলমাত্র নাট্যকার বা নাট্যশিল্পীই উপস্থিত থাকবেন, তাই নয়, থাকবেন উভয় বঙ্গের ও প্রবাসী সাহিত্যিকবৃন্দ। এই সম্মেলনের তিনদিন ধরে যে অধিবেশন হবে তাতে মূল সভাপতি থাকবেন একজন, আর থাকবেন শাখা বিভাগীয় সভাপতিগণ। প্রতি বৎসর ইস্টারের ... এই সম্মেলনের অধিবেশন বসবে ... প্রাঙ্গণ মণ্ডপে।

এই সম্মেলনে মঞ্চ নাটক, চিত্রনাটক ও বেতার নাটক প্রভৃতির সর্বাত্মক আলোচনার জন্য নিযুক্ত হবেন একটি উপদেষ্টা পরিষদ। তাঁরা রচনা করবেন নাট্য সাহিত্যের নূতন ভাষা, নাটকের নূতন সূত্র ও নূতন ব্যাকরণ। এই সম্মেলন অনুপ্রাণিত করবে বাংলার শক্তিশালী সাহিত্যিকবৃন্দকে নাটক রচনা করতে—যাতে তাঁরা ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসেন মঞ্চ, চিত্র ও বেতার নাট্য রচনার দিকে। শ্রেষ্ঠ কবিদের এই সম্মেলন অনুরোধ করবে নাট্যকাব্য রচনা করতে, এবং শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের পুরস্কৃত করবে শাশ্বত কালোপযোগী নাটক রচনার জন্য। আগামী ইস্টারের ছুটিতে এই সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন বসবে।

বিবিধ সংবাদ

এই শনি ও রবিবার কিশোর সংগীত সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে মার্বেল প্যালেসে (৪৬, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট)। তিনটি আসরের এই অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে কিশোর শিল্পীরা শহরে এসেছে। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত এবং নৃত্যে যারা অংশ নেবে তাদের মধ্যে আছে হৈমন্তী শুক্ল, ডি এস সুধারাও, রূপা জায়ানি, বিশাখা গান্ধী, অনিল গান্ধী, পঙ্কজ সেনচৌধুরী,

মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, মায়া চক্রবর্তী, অনুভা মিত্র, শর্মিষ্ঠা মিত্র, সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে পাঁচদিনব্যাপী নিখিল ভারত নৃত্যোৎসবের যে অধিবেশন বসবার কথা ছিল, অনিবার্যকারণে তা ২৭শে মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। বালীগঞ্জ সিংহী পার্কে ২৭শে থেকে ৩০শে মার্চ পর্যন্ত এই অধিবেশন চলবে।

* * *

গত ৩১শে জানুয়ারী ও ১লা ফেব্রুয়ারী নোপানি বিদ্যালয়ে নিখিল ভারত শিশু সংগীত সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়েছে। বাংলা ও বাংলার বাইরে নানা জায়গা থেকে শিশু সংগীত শিল্পীরা এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন।

* * *

যাদুরত্নাকর এ সি সরকারের কয়েকটি যাদু প্রদর্শনী যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনে দেখাবার জন্যে সম্প্রতি চিত্রাকারে গৃহীত হয়েছে। একদল আমেরিকান চলচ্চিত্র নির্মাতা সেই উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসেছিলেন। টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে একটি সেট তৈরী করে কয়েকটি খেলার ছবি তোলা হয়।

* * *

দক্ষিণীর শিক্ষা-ভবন-সম্প্রসারণ তহবিলের সাহায্যার্থে দক্ষিণীর নাট্যবিভাগ আগামী ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী নিউ এম্পায়ার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প "রাসমণির ছেলে"র নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করবে। গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন প্রতিভা গুপ্ত এবং এটি পরিচালনা করবেন আশীষ মুখোপাধ্যায়। অভিনয়াংশে দক্ষিণীর তিরিশজনের বেশী শিল্পী অংশ গ্রহণ করবেন।

"মর্মবাণী" লেখকের বক্তব্য

গত ১৭ই মাঘ ১৩৬৫'র 'দেশ' পত্রিকায় খবরটি দেখে বিস্মিত হলাম যে লেখিকা প্রতিভা বসু সম্পাদককে জানিয়েছেন যে, 'মর্মবাণী' চিত্রের কাহিনী তাঁর 'অবিশ্বাস্য' গল্পের নকল। প্রতিভা বসুর লেখা 'অবিশ্বাস্য' গল্পটি আমার পড়বার সৌভাগ্য হয়নি এবং 'জন্মভূমি' কাগজটির নামও এই প্রথম শুনি—। বর্তমানে জন্মভূমি কাগজের অস্তিত্ব না থাকায় বহু অনুসন্ধান করেও প্রতিভা বসু উল্লিখিত সংখ্যাটি, আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি—সুতরাং 'অবিশ্বাস্য' কাহিনীটি জনসাধারণের দৃষ্টিপথে আসার সম্ভাবনা, নিশ্চয়ই সুদূর-পরাহত। অস্তিত্বহীন পত্রিকার উল্লেখ জনসাধারণের কাছে কাহিনী দুটির মৌলিকত্ব বিচারে বিশেষ সহায়ক হবে বলেও মনে হয় না। দুটি গল্পের সাদৃশ্য বুঝতে হলেও কাহিনীটি সকলের জানা থাকা প্রয়োজন। আমার মর্মবাণীর সম্পূর্ণ চিত্ররূপ আমি দেখিনি, কিন্তু বহু জনসাধারণ তা সম্প্রতি দেখেছেন—সুতরাং প্রতিভা বসুর অধুনা লুপ্ত পত্রিকার 'অবিশ্বাস্য' কাহিনীটি তিনি যদি আমার এবং সাধারণের জ্ঞাতার্থে কোন বহুল প্রচারিত কাগজে প্রকাশ করেন তবে নিঃসংশয়ে সকলেরই বিস্ময়ের নিরসন হয়।

অধিকন্তু সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি—প্রতিভা বসুর গল্পটি ১৩৬৩ সালে প্রকাশিত—কিন্তু আমার গল্পের (তখন নাম ছিল—"মন মর্মর") রচনাকাল তার অনেক আগে—১৯৪৭ (ইং) সাল। সেই সময়ে "মন-মর্মরের" বাঙলা চিত্রস্বত্ত্ব বিক্রী হয়—একবার নয়, পর পর তিনবার। কিন্তু প্রাচীন মিশরের ঘটনার চিত্ররূপ দিতে বহু অর্থ ব্যয় প্রয়োজন এই ধারণায় কোন বারেই তখন তা চিত্রে রূপায়ন সম্ভব হয় না। সম্প্রতি প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক সুশীল মজুমদার এর চিত্ররূপ দেন এবং তিনিই নতুন নামাকরণ করেন—"মর্মবাণী।"

"মর্মবাণীর" কাহিনীটি চিত্র জগতের অনেকেই জানেন। প্রতিভা বসু চলচ্চিত্রের সহিত সংশ্লিষ্টা, হয়ত তিনিও কারো মুখে শুনে থাকবেন এবং তাঁর অজ্ঞাতে "মর্মবাণীর" প্রভাব তার 'অবিশ্বাস্য' কাহিনীতে এসে পড়া অসম্ভব নয় এবং যেহেতু প্রতিভা বসুর গল্পটি আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত— যদি কোন সাদৃশ্য থেকে থাকে তবে এ ছাড়া অন্য কোন যুক্তি অনুমান করা আমার অসাধ্য।

ইতি—বিনীত মনোজ ভট্টাচার্য

নির্মল চৌধুরীর সংবর্ধনা

৩১শে জানুয়ারী ২নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে এক মনোজ্ঞ পরিবেশের মধ্যে বাংলার জনপ্রিয় লোকসংগীত শিল্পী নির্মল চৌধুরী ও তাঁর সহশিল্পীবৃন্দকে 'ইন্ডিয়া ব্রাদারহুড সোসাইটি' কর্তৃক বিপুলভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মুরারিচরণ লাহার পৌরোহিত্যে সভার কার্য শুরু হয়।

সোসাইটির সহঃ সম্পাদক শ্রীগৌরীশংকর রায় শ্রীনির্মল চৌধুরীর শিল্পীজীবনের পরিচয় দান করেন। তিনি বলেন যে, বিশ্ব যুব উৎসবে যোগদান করে এবং ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের শিল্পী হিসাবে শ্রী চৌধুরী বহির্ভারতে নানাস্থানে বাংলার লোকগীতির বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেছেন। লোক-সংগীতের অবিকৃত ও শুদ্ধ পরিবেশনই তাঁর কাছ থেকে দেশবাসী কামনা করে।

সংবর্ধনার উত্তরে শ্রী চৌধুরী আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলেন যে, তিনি পল্লীর অন্তস্থল থেকে নূতনতর রস আহরণ করে দেশবাসীর নিকট অকৃত্রিমভাবে তা পরিবেশন করবার ব্রতই গ্রহণ করেছেন। তাঁর আদর্শ ও সাধনা যাতে জয়যুক্ত হয় সেজন্য তিনি সকলের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা কামনা করেন।

ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য লোকগীতির সামাজিক ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ ও সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

অনুষ্ঠান শেষে নির্মল চৌধুরী ও তাঁর সম্প্রদায় কর্তৃক সুন্দর বাজনা সহযোগে বাংলার বিভিন্ন লোকগীতি যথা, বারমাসী, ভাটিয়ালী, ছাদ পেটার গান, আউল, বাউল, ধামাইল, সারিগান, গাজীর গান, বেদের গান প্রভৃতি পরিবেশিত হয়।

শ্রীনির্মল চৌধুরী ও সম্প্রদায় কর্তৃক পরিবেশিত শ্রীহট্টের লুপ্তপ্রায় "বৌ নাচ"টি নৃত্যের সহজ ভঙ্গিমার মধ্যেও অনবদ্য হইয়া উঠেছিল। বিশেষ অনুরোধে শ্রী চৌধুরী কর্তৃক গীত "আমার যেমন বেণী তেমনি রবে" গানটি সত্যই অবিস্মরণীয়। সমস্ত গানগুলি টেপ রেকর্ডিং যন্ত্রে গৃহীত হয়।

একলব্য

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ক্রিকেট খেলায় তাদের প্রাধান্যের পর্যাপ্ত প্রমাণ দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে এবারও 'রাবার' লাভ করেছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের মাটিতে দুই দেশের প্রথম টেস্ট যুদ্ধেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল 'রাবার' লাভ করেছিল। ১৯৫৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজেও তারা 'রাবার' পেয়েছিল ভারতের বিরুদ্ধে। প্রথমবার পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জেতে মাত্র একটি খেলায়, বাকী চারটি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। দ্বিতীয়বারও একই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি ঘটে। অর্থাৎ ভারত একটি খেলাতেও জিততে পারে না। দুইবারের ১০টি খেলার মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জেতে মাত্র দু'টি খেলায়,। আর এবারকার ৪টি টেস্ট খেলার মধ্যেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তিনটি খেলায় বিজয়ী হয়েছে সর্ব-বিষয়ে তাদের সুবিস্তৃত প্রাধান্যের পরিচয় দিয়ে। শুধু টেস্ট খেলাই নয়। কানপুর, কলকাতা ও মাদ্রাজের টেস্ট খেলা নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এ পর্যন্ত ৯টি জয়লাভের মধ্যে ৮টি খেলাতেই উপর্যুপরি জয়লাভ করেছে। ভারতের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে আজ পর্যন্ত কোন দল এভাবে পরপর ৮টি খেলায় জিততে পারেনি। এই ৮টি খেলার মধ্যে সব খেলাতেই ভারতের বোলার ও ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতা চরমভাবে ফুটে উঠেছে।

বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর কানপুর ও কলকাতার টেস্ট খেলায় বিজয়ী হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যখন 'রাবার' লাভের মুখে পৌঁছল, তখন অতীতের নজির টেনে অনেকে দেখাতে চেষ্টা করলেন দুটি টেস্টে পরাজয় স্বীকার করেও টেস্ট পর্যায় সমান সমানভাবে শেষ করার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। লেন হাটনের ইংলণ্ড দল এভাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের 'রাবার' লাভের আশা নিরাশ করে দিয়েছে। চিথামের দক্ষিণ আফ্রিকা দল এভাবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট খেলার সম্মানের সমান অংশীদার হয়েছে। ডন ব্র্যাডম্যান প্রথম যেবার অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হন সেবার গাবি এলেনের ইংলণ্ড দলের কাছে প্রথম দুটি টেস্টে হেরে গিয়েও পরে 'রাবার' লাভ করেন। ১৯৩৫-৩৬ সালে জ্যাক রাইডারের অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে ভারতও প্রথম দুটি টেস্টে হেরে গিয়ে পরের দুটি টেস্টে জয়লাভ করে। কিন্তু নজির থাকলে কি হবে? ক্রিকেট খেলায় ভারতের যে আজ দেউলিয়া হবার অবস্থা। আর অধিনায়কও তো একজন নন। পাঁচটি টেস্টে অধি-নায়ক হয়েছেন ৪ জন। মাদ্রাজ টেস্টে মানকড়ের অনুপস্থিতিতে রামচাঁদের অধি-নায়কত্বের সময়টুকু হিসাবের মধ্যে ধরলে অধিনায়কের সংখ্যা হয় পাঁচ। সুতরাং কার কড়ি কে ধারে? এভাবে অধিনায়ক বদলের দৃষ্টান্ত বিরল। এতে দলের মধ্যে সংহতি থাকে না, নেতার প্রতি আস্থা থাকে না, খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকে না আত্ম-বিশ্বাসের মনোভাব।

মাদ্রাজের চতুর্থ টেস্ট খেলা- মর্যাদা সমান রাখবার জন্য যে খেলায় জয়লাভ করা ছাড়া ভারতের গত্যন্তর ছিল না, সেই টেস্ট খেলার প্রাক্কালে অধিনায়ক নিয়ে আবার সমস্যা আরম্ভ হল। একজন অসুস্থ খেলোয়াড়ের শূন্যস্থানে অন্য একজন খেলোয়াড় নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচিত অধিনায়ক পলি উমরিগরের সঙ্গে বোর্ড-সভাপতির মতদ্বৈধতা দেখা দিল। তার ফলে উমরিগর অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। নতুন অধিনায়ক হলেন বিনু মানকড়, যিনি প্রথম তিনটি টেস্ট থেকে দূরে সরে ছিলেন বা সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ক্রিকেট খেলায় অধিনায়কের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। খেলা আরম্ভের অব্যবহিত আগে যদি সেই অধি-নায়ক নিয়ে এমনিধারা সমস্যা দেখা দেয় তবে তার পরিণাম কখনো ভাল হতে পারে না। আগে থেকেই তো ভারতীয় খেলোয়াড়-দের মনোবল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তার উপর দল গড়ার গোলমাল, অধিনায়ক নিয়ে গোলমাল! এর ফলে খেলার ফলাফল যা হবার তাই হয়েছে। এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারতকে পরাজিত করেছে ২৯৫ রানে।

চতুর্থ টেস্টের ধারাবাহিক আলোচনার কিছু প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ এ খেলা আরম্ভের আগে থেকেই সাধারণের আগ্রহ কমে এসেছিল, ভারতের পরাজয়কেও তারা স্বতঃসিদ্ধ ঘটনার মত মনে করেছিলেন। তাই পরাজয়ের পর বলবার আর কি আছে? তবু সব টেস্ট খেলারই যখন পর্যালোচনা করছি তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ টেস্ট সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করতে হচ্ছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঞ্জ আলেকজাণ্ডার আগের তিনটি টেস্টেই টসে বিজয়ী হওয়ায় প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ টেস্টেও তিনি টসে জয়-লাভ করে প্রথম ব্যাটিং করবার সিদ্ধান্ত করেন। ভারতের মাটিতে ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট খেলার ক্ষেত্রে এটা অবশ্য নতুন ঘটনা নয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের

মাদ্রাজে ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ টেস্ট খেলায় ওয়েসলী হল মাটিতে শুয়ে পড়ে বোরদের ক্যাচ ধরে বোরদেকে আউট করছেন

অধিনায়ক লালা অমরনাথ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক জন গডার্ডের কাছে পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই টসে পরাজিত হয়েছিলেন। যাই হক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ব্যাটিং করতে আরম্ভ করে প্রথম দিনের খেলায় ৫ উইকেট হারিয়ে ২৮৩ রান সংগ্রহ করে। রোহান কানহাই, যিনি কলকাতা টেস্টে ব্যাটিংয়ের অপূর্ব ছলাকলা দেখিয়ে ২৫৬ রান করেছিলেন, তিনি ৯৯ রানের মাথায় দুর্ভাগ্যবশত রান আউট হয়ে সেঞ্চুরী পূর্ণ করতে পারেন না। ওপেনিং ব্যাটসম্যান জন হোল্টের ৬৩ রান দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। ভারতের বোলারদের মধ্যে অধিনায়ক বিনু মানকড়ের বোলিংই সবচেয়ে কার্যকরী হয়। মানকড় পান ৫৫ রানে ৩টি উইকেট।

দ্বিতীয় দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা ভারতের বোলিংকে কিছুমাত্র সমীহ না করে হাত খুলে বল মারতে আরম্ভ করেন। বেসিল বুচার আগেরদিন ৩২ রান করে নট আউট ছিলেন। তিনি উইকেটের চারিদিকে পিটিয়ে খেলে ১৪২ রানের মাথায় আউট হন। এখানে বলা যেতে পারে বুচার কলকাতার টেস্টেও সেঞ্চুরী (১০৩) করেছিলেন। ফলে পর পর দুটি টেস্টে তিনি সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেন। ঠিক ৫০০ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংস শেষ হবার পর ভারতীয় দল ৭০ মিনিটের ব্যাটিংয়ে ১ উইকেট হারিয়ে ২৭ রান করলে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়।

তৃতীয় দিন ভারতের ব্যাটসম্যানরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে ব্যাট চালাতে থাকলেও প্রথম ইনিংসে ভারত ২২২ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারে না। এর মধ্যে কৃপাল সিংয়ের ৫৩, পি রায়ের ৪৯ আর রামচাঁদের ৩০ উল্লেখ করবার মত রান। ২২২ রানে ভারতের ইনিংস শেষ হবার অর্থ তাদের 'ফলো অনের' বিধানে পড়া। কিন্তু প্রথম ইনিংসের খেলায় ২৭৮ রানে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারতকে 'ফলো অন' না করিয়ে নিজেরাই আবার দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে যায়। ইনিংসে জয়লাভ করার সুযোগ হাতে পেয়েও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের যে সুযোগ গ্রহণ না করবার একাধিক কারণ থাকতে পারে। আবার দুর্বল ভারতীয় দলকে তারা কিছুটা করুণার চোখেও দেখতে পারে। ভারতকে 'ফলো অনে' বাধ্য না করাবার এক কারণ হতে পারে গারফিল্ড সোবার্স, যিনি আগের তিনটি টেস্টে সেঞ্চুরী করেছেন এ টেস্টেও তাকে সেঞ্চুরী করবার সুযোগ দেওয়া। দ্বিতীয় কারণ হতে পারে ম্যাচ যখন হাতের মধ্যে তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পরিশ্রান্ত বোলারদের আবার খাটিয়ে কি লাভ? তার চেয়ে ব্যাট করাই ভাল। তা ছাড়া প্রতিপক্ষকে ফলো অন করানো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অধিনায়কদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যও নয়।
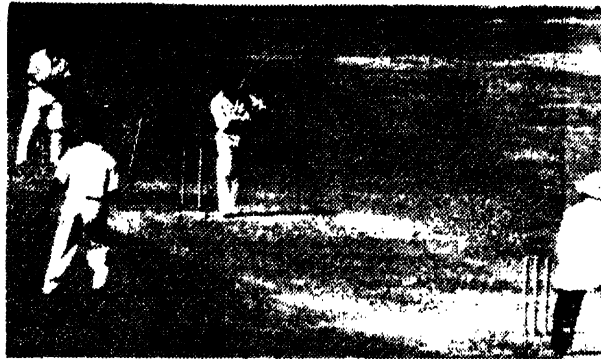
চতুর্থ টেস্টে রামচাঁদের বলে বেসিল বুচারের মিডল স্টাম্প উৎপাটিত হয়ে দূরে ছিটকে পড়ছে।

যাই হক প্রথম ইনিংসে ২৯ রান করবার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলেও কীর্তিমান ব্যাটসম্যান সোবার্স সেঞ্চুরী করতে পারেননি। মাত্র ৯ রান করেই আউট হয়ে গেছেন। তবে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পাবার ফলে এই খেলাতেই সোবার্স টেস্ট খেলায় দু'হাজার রান পূর্ণ করেছেন।

তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসের

ইস্টবেংগল ও মোহনবাগানের ফাইন্যাল খেলায় ইস্টবেংগল গোলরক্ষক এস শেঠ কে পালের মাথার উপর দিয়ে একটি বল ফিস্ট করছেন

খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল কোন উইকেট না হারিয়ে ৮ রান তুলেছিল। চতুর্থ দিন ৫ উইকেটে ১৬৮ রান তুলে তারা ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলে দিনের শেষে ভারতীয় দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৩ উইকেটে ৪৮ রান তোলে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৪৯৬ রানে এগিয়ে থাকে।

ভারতের কঠিন সমস্যা। এ অবস্থায় ৭টি উইকেট সম্বল করে সারাদিন টিকে থাকা একরকম শিবের অসাধ্য। ৭টি উইকেটের মধ্যে আবার অধিনায়ক মানকড়ের উইকেট বাদ দিতে হচ্ছে। হাত ফুলে গিয়ে তাঁকে খেলার অনুপযোগী করে তুলেছে। আর উইকেটে টিকে থেকেই বা লাভ কি? রাবার তো একরকম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অধিনায়ক ফ্রাঙ্ক আলেকজাণ্ডারের পকেটে। তবু পরাজয় এড়াতে কেউ কেউ চেষ্টা না করলেন এমন নয়। সবচেয়ে দৃঢ়তা দেখালেন তরুণ খেলোয়াড় চাঁদু বোরদে। বহু সময় উইকেটে টিকে থেকে তিনি করলেন ৫৬ রান। মধ্যাহ্ন ভোজের কিছু পরে ১৫১ রানে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়লাভ করলো ২৯৫ রানে।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড:—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—৫০০ (কোলী স্মিথ ১৪২, রোহান কানহাই ৯৯, জন হোল্ট ৬৩, জো সলোমান ৪৩, কনরাড হাণ্ট ৩২, এরিক আটকিনসন নট আউট ২৯, ওয়েসলী হল ২৫; ভি মানকড় ৯৫ রানে ৪ উইকেট, সি বোরদে ৮০ রানে ২ উইকেট)

ভারত—প্রথম ইনিংস—২২২ (কৃপাল সিং ৫৩, পি রায় ৪৯, জি রামচাঁদ ৩০, গারফিল্ড সোবার্স ২৬ রানে ৪ উইকেট, রয় গিলক্রিস্ট ৪৪ রানে ২ উইকেট, ওয়েসলী হল ৫৭ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—(৫ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড) ১৬৮ (জন হোল্ট নট আউট ৮১, কনরাড হাণ্ট ৩০; সুভাষ গুপ্তে ৭৮ রানে ৪ উইকেট)

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস—১৫১ (সি

১৯৫৮ সালের আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। খেলোয়াড় পরিচিতি—(বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে) রাম বাহাদুর, হাসান, সুভাশীষ গুহ, আমেদ, বি বসু (ফুটবল সম্পাদক), সি চন্দ্র, বীর বাহাদুর, মুসা ও এস শেঠ; (বাঁদিক থেকে বসে) নারায়ণ, বলরাম, নীলেশ সরকার ও টি চৌধুরী

বোরদে ৫৬, পলি উম্রিগর ২৯; রয় গিলক্রিস্ট ৩৬ রানে ৩ উইকেট, ওয়েসলী হল ৪৮ রানে ৩ উইকেট, গারফিল্ড সোবার্স ৩৯ রানে ২ উইকেট।

* * *

১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের কাছ থেকে 'রাবার' লাভ করতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলকে রীতিমত বেগ পেতে হয়েছিল। ১৯৫৩ সালেও তাদের 'রাবার' লাভ সহজসাধ্য হয়নি। আর এবার এত সহজে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল 'রাবার' পেয়েছে যে, দুই দলের খেলার তুলনামূলক বিচার করলে মনে হবে, ভারত যেন ক্রিকেট খেলায় নিতান্ত শিশু। ওরেল, উইকস ও ওয়ালকটের মত বিশ্বের তিনজন কীর্তিমান খেলোয়াড় সমন্বয়ে গড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টীম বেশী শক্তিশালী ছিল না এবারকার সফরকারী দল বেশী শক্তিশালী এ তর্ক তুলতে চাই না। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, ভারতের ক্রিকেট মান আজ খুবই নিম্নস্তরের। পরিচালক সমিতির আভ্যন্তরিক গোলমাল এবং খেলোয়াড়দের সংগে তাদের মনকষাকষির ভাব অবস্থা আরও কাহিল করে তুলেছে। এক কথায় বলা যায়, ভারতীয় ক্রিকেট আজ নানা ব্যাধিতে জর্জরিত। আজ তার গায়ে জ্বর, মাথায় ব্যথা, পেটে পিলে, দাঁতে পোকা, পায়ে গোদ, সর্বাংগে দুষ্টক্ষত। তাই আজ তার এই দৈন্য দশা। চতুর্থ টেস্ট খেলার শেষে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক প্রাক্তন সভাপতি এবং ভারতের একজন প্রাক্তন টেস্ট অধিনায়ক দুঃখ করে লিখেছেন—

"The story of the 1958-59 Test series for India takes after Solomon Grunday. It can be said that India fell ill at Bombay, grew worse at Kanpur, died at Calcutta, the body then taken to Madras and the cremation scheduled at Delhi".

অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালের টেস্ট পর্যায় ভারতীয় ক্রিকেট বোম্বাইতে অসুস্থ হয়ে পড়ে, কানপুরে অবস্থা সংগীন হয়, কলকাতায় হয় তার মৃত্যু; মৃতদেহ এখন মাদ্রাজে পৌঁছেছে, দিল্লীতে চলছে সৎকারের আয়োজন।

বিশ্ববরিদিত ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় আরল্যাণ্ড কপস

কত দুঃখে এবং কত ব্যথায় একথা লিখতে হয়েছে তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। ১৮৮২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের শোচনীয় ব্যর্থতার পর ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকা 'স্পোর্টিং টাইমস' এইভাবে বিলাপ করেই লিখেছিল, ১৮৮২ সালের ২৯শে আগস্ট ওভাল মাঠে ইংলিশ ক্রিকেটের মৃত্যু হয়েছে, সৎকারের পর ছাই বা 'অ্যাসেস' অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। এর থেকেই 'অ্যাসেস' কথার সৃষ্টি। সেই অ্যাসেস দখলে রাখার সম্মান নিয়ে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলা ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু আজ আর এ সম্বন্ধে কিছু লেখার স্থানাভাব। আগামী সংখ্যায় অস্ট্রেলিয়ার 'অ্যাসেস' পুনরুদ্ধারের খবরের সংগে এ সম্বন্ধে আলোচনা করবার ইচ্ছে রইল।

* * *

১৯৫৮ সালের আই এফ এ শীল্ডের প্রতীক্ষিত ফাইন্যাল খেলা শেষ পর্যন্ত ১৯৫৯ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ইস্ট-বেংগল ক্লাব তাদের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মোহন-বাগান ক্লাবকে ১—০ গোলে পরাজিত করে ষষ্ঠবার শীল্ড লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এই প্রসংগে বলা যায়, একমাত্র ক্যালকাটা ক্লাব ছাড়া আজ পর্যন্ত অন্য কোন ক্লাব ছ'বার আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যালে বিজয়ী হতে পারেনি। ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব আই এফ এ শীল্ড পেয়েছে ৯ বার। ফাই-ন্যালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ভারতের দুই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী ফুটবল ক্লাব মোহন-

বাগান ও ইস্টবেঙ্গল এবারকার ফাইন্যাল খেলার আগে পাঁচবার করে শীল্ড ঘরে তুলেছে। এবারের ফাইন্যালের পর ইস্ট-বেঙ্গল এক ধাপ এগিয়ে গেছে। শীল্ড ফাইন্যালে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে ইস্টবেঙ্গলের জয়ের সংখ্যাও বেশী। এ পর্যন্ত দুই দল ফাই-ন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে পাঁচবার। এর মধ্যে চারবারই ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে পরাজিত করেছে।

এবারকার ফাইন্যাল খেলাতেও ইস্ট-বেঙ্গলের জয়লাভ ক্রীড়াধারার সংগতিসূচক ফলাফল। মোহনবাগান ক্লাব তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি। বেশীর ভাগ সময়ই তাদের এলোমেলোভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গেছে।

ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় ভারতের দুই শক্তিশালী দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা গেলেও খেলাটিকে কোনভাবেই উচ্চাঙ্গের খেলা বলে অভিহিত করা যায় না। অবশ্য ৭০ মিনিট-ব্যাপী খেলায় কোন সময়েই তীব্র প্রতি-দ্বন্দ্বিতার অভাব হয়নি, খেলোয়াড় তথা দর্শক সমর্থকদের উৎসাহ উদ্দীপনাও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু দুই দলের কয়েকজন খেলোয়াড়ের নৈপুণ্য দেখানোর বদলে বলং দেহি ভাবের ফলে খেলার মাধুর্য এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎকর্ষ নষ্ট হয়ে যায়। রেফারীর দুর্বল পরিচালনাও যুদ্ধং দেহি খেলোয়াড়দের অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিপোষকতা করে। এই খেলায় দুই দলের কয়েকজন খেলোয়াড় এমন বিশ্রীভাবে ফাউল করে মাঠের মধ্যে এমন আচরণ করেছেন যা খেলোয়াড় নামধারী কোন ব্যক্তির পক্ষেই অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল দুটি ক্লাবেরই প্রতিষ্ঠার পেছনে বহু লোকের বহু সাধনা আছে, বহু লোকের দান আছে। দেশের ছোট ছোট ক্লাবের কাছে দুটি ক্লাবই অনুকরণীয়। সেই ক্লাবের খেলোয়াড় খেলার সময় যদি অখেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দেন তবে তা খুবই পরিতাপের বিষয়। মাঠের মধ্যে এবং মাঠের বাইরে আদর্শ ক্লাবের খেলোয়াড়দেরও আদর্শ আচরণ করতে হবে। খেলোয়াড়দের বোঝা উচিত, অযথা ফাউল করে খেললে বা বলের বদলে মানুষকে লক্ষ্য করে খেললে কিছুই লাভ হয় না। নিজের খেলাও নষ্ট হয়, দলের খেলাও নষ্ট হয় আর সুনামের পরিবর্তে লাভ হয় দুর্নাম। ফাইন্যাল খেলার বিবরণ লিখতে গিয়ে এক সাংবাদিক তো স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন—'খেলা দেখিনি, খানিকটা গুতোগুতি দেখে এসেছি।' কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের পক্ষে এটা মোটেই গৌরবের কথা নয়। রেফারীর পক্ষেও অগৌরবের কথা। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এই দুটি জনপ্রিয় নাম যদি তাকে মোহাচ্ছন্ন করে তবে এদের খেলায় তার বাঁশী না ধরাই উচিত।

• • •

ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানশিপের বিপুল উদ্যোগ আয়োজন একরকম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। পূর্ব ভারত ব্যাড-মিণ্টনের পরিচালক প্রতিষ্ঠান শোভাবাজার ব্যাডমিণ্টন অ্যাসোসিয়েশন প্রতিযোগিতাকে আকর্ষণীয় এবং সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেন নি। কিন্তু ভারত, পাকিস্থান এবং ইন্দোনেশিয়ার কীর্তিমান খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সম্মতি জানিয়েও শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেন নি। ফলে বাইরের একমাত্র অংশ গ্রহণকারী প্রতিযোগী বিশ্ববন্দিত খেলোয়াড় আরল্যাণ্ড কপসের একক প্রাধান্যের মধ্যে প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে। অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়ান ডেনমার্কের সুনিপুণ খেলোয়াড় আরল্যাণ্ড কপস ফাইন্যালে বাঙলার প্রণব বসুকে ১৫—৫ ও ১৫—৪ পয়েণ্টে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছেন। আশা করা গিয়েছিল, খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের সমাগমে পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানশিপের খেলা এবার খুবই জমে উঠবে। এই উদ্দেশ্যে মাঝপথে কয়েকদিন প্রতিযোগিতা বন্ধও রাখা হয়েছিল, প্রতিযোগিতা কমিটির সম্পাদক নন্দু নাটেকার, অমৃত দেওয়ান, ত্রিলোক শেঠ প্রভৃতি ভারতের নাম-করা খেলোয়াড়দের আনবার জন্য বিমানযোগে বোম্বাইতেও ছুটে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, কেউ কেউ আসা-যাওয়ার খরচ নিয়েও শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছেন নি। ডেনমার্কের বিশ্ববন্দিত খেলোয়াড় আরল্যাণ্ড কপস এদের সঙ্গে খেলার জন্য ভারতে ছুটে এলেন আর এরা তাঁকেও নিরাশ করলেন; ব্যাডমিণ্টন ক্রীড়ামোদীদেরও নিরাশ করে ভারতের এক বিশিষ্ট প্রতিযোগিতার মর্যাদা নষ্ট করলেন। আশা করি, ভারতের ব্যাডমিণ্টন সংস্থার এ সম্বন্ধে কিছু করণীয় থাকলে তাঁরা সে কর্তব্য পালন করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

কলকাতায় নিখিল ভারত পুলিস স্পোর্টসের উদ্বোধন দিনে দিল্লী ও উড়িষ্যার মধ্যে ভলিবলের সেমিফাইনাল খেলার দৃশ্য

দেশী সংবাদ

২৭শে জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বাগনান কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী ডাঃ রাজেন্দ্রকুমার ঘোষচৌধুরী বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কম্যুনিস্ট প্রার্থীকে পরাজিত করিয়াছেন প্রায় সাত সহস্রাধিক ভোটের ব্যবধানে।

স্ট্যাণ্ডিং এডুকেশন কমিটি কর্তৃক কলিকাতা কর্পোরেশনের অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলির সকল শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতনের হার বৃদ্ধির সুপারিশ করা হইয়াছে।

২৮শে জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতা ও শিল্পাঞ্চলে এবং রাজ্যের অন্যান্য ঘাটতি এলাকায় খাদ্যশস্য সরবরাহের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত আছেন। তবে কোথাও পুরাপুরি রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হইবে না।

আজ রাত্রে গৌরীপদ মুখার্জি লেনের (হাওড়া) একটি গৃহে যখন দুইটি বিশেষ-ভাবে নির্মিত চুল্লীতে বড় কড়াই-এ সুগন্ধি ঘি-এর এসেন্স মিশ্রিত করিয়া ভেজাল ঘি প্রস্তুত হইতেছিল সেই সময় হাওড়া পুলিস অতর্কিতে হানা দিয়া ১৪ জনকে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করে ও প্রচুর ভেজাল ঘি ও বনস্পতি উদ্ধার করে।

২৯শে জানুয়ারী—বরানগরে ভারতীয় পরি-সংখ্যান পরিষদ জাতীয় পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করিয়া গত কয়েক বৎসরে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করে। কিন্তু অডিট সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত মতভেদের ফলে এই প্রতিষ্ঠান এক্ষণে গুরুতর সংকটের সম্মুখীন বলিয়া প্রকাশ।

ডালমিয়া মামলায় সরকার পক্ষের কৌঁসুলী শ্রী জে সি ভাট তাঁহার সওয়ালে বলেন যে, ভারত ইনসিওরেন্স কোম্পানীর পক্ষে ভারত ইউনিয়ন এজেন্সিকে ঋণদানের কোন প্রশ্নই ওঠে না। গৃহীত সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় যে, ঐ ঋণ স্বয়ং চেয়ারম্যানকেই দেওয়া হইয়াছে।

৩০শে জানুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ ঘোষণা করেন, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে সংকল্প ঘোষিত হইয়াছে, এই সংকট সময়ে তাহার অন্যথাচরণ করা হইবে না। যদি করা হয়, তবে তাহা জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হইবে।

কেন্দ্রীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ আমেদাবাদ হইতে ৬০ মাইল দূরে লোথালে ৬ শত ফুট লম্বা ও ৯১০ ফুট চওড়া একটি বৃহৎ ইষ্টক নির্মিত কাঠামো আবিষ্কার করিয়াছেন। জল আটকাই-বার ব্যবস্থা সম্বলিত একটি জলপ্রণালীর সহিত ঐ কাঠামোটি যুক্ত ছিল। সরকারী-ভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে যীশু খৃষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে ঐ স্থানে উন্নত নাগরিক সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল।

কলিকাতার যে কয়েকটি ক্লাবে এখন পর্যন্ত ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার নাই সেই ক্লাব-গুলিকে অবিলম্বে ঐরূপ "ভারতীয় বিদ্বেষী নীতি" প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব আজ পৌর সভায় গৃহীত হয়।

৩১শে জানুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার মুনাফাবাজী নিরোধ আইনের বিধানবলে কলিকাতা ও রাজ্যের অন্যান্য জেলা ও মহকুমা এলাকায় কেরোসিন তেলের পাইকারী ও খুচরা সর্বোচ্চ বিক্রয়মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশে কলিকাতা এলেকায় ২২ আউন্স বোতলের কেরোসিন তেলের দাম ২২ নয়া পয়সা ধার্য হইয়াছে।

কলিকাতা কোল কণ্ট্রোল দপ্তর কর্তৃক জনৈক কয়লা ব্যবসায়ীর নামে মঞ্জুরীকৃত একটি পারমিট হইতে তাহার অজ্ঞাতসারে কিছু পরিমাণ কয়লা উঠাইয়া লইয়া তৎপরে ঐ পারমিট (উদ্দিষ্ট ব্যক্তির নামে) প্রেরণের এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

১লা ফেব্রুয়ারী—অদ্য বরানগরে ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষদের কর্মপরিষদের সভায় স্থির হয় যে আগামী ১লা এপ্রিল হইতে পরিষদের সকল কর্মচারীকে (সংখ্যায় প্রায় দুই হাজার) চাকুরির বর্তমান সর্তাদি খারিজ করিয়া ছাঁটাই করিয়া দেওয়া হইবে।

অদ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত এক সম্বর্ধনার উত্তরে চেয়ারম্যান ডাঃ সি ডি দেশমুখ কলিকাতার ও মফস্বলের কয়েকটি বড় বড় কলেজে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি সম্পর্কে বলেন যে, এক্ষণে ছাত্র বেতন বৃদ্ধির কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। তিনি আশা করেন যে, সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষসমূহ ছাত্র বেতন বৃদ্ধি বাতিল করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

বিদেশী সংবাদ

২৭শে জানুয়ারী—আজ মস্কোতে অনুষ্ঠিত রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির একবিংশতিতম কংগ্রেসের অধিবেশনে রুশ প্রধান মন্ত্রী খ্রুশ্চেভ বলেন যে, রুশিয়ার সাত-সালা বৈষয়িক পরিকল্পনা চলতি বছরেই চালু হইবে। ইহার বিরাটত্ব ইতিহাসে অতুলনীয়।'

আজ করাচীতে বোগদাদ চুক্তি সংস্থার মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা (সিয়াটো) ও বোগদাদ চুক্তি সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য আলাপ-আলোচনা চালাইবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে বলিয়া বোগদাদ চুক্তি সংস্থা মহলের সংবাদে প্রকাশ।

২৮শে জানুয়ারী—অদ্য সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির ২১শ কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধির সম্মুখে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি-বিরোধী গোষ্ঠীকে আক্রমণ করা হয়।

একজন বৃটেন সহ ৫০ জন মহাশূন্য বিশেষজ্ঞ যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই মানুষ মহাশূন্যে এক বিরাট 'স্টেশন' নির্মাণ করিতে পারিবে।

২৯শে জানুয়ারী—বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, জেনারেল আয়ুব খাঁ তিন মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে জঙ্গী প্রশাসনের অধীনে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন। পূর্ববর্তী মুখ্যমন্ত্রী মিঃ নুরুল আমিন এই মন্ত্রিসভার নায়ক হইবেন।

আজ সকালে রাওলপিণ্ডিতে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর দুই ইঞ্জিনযুক্ত একখানি মালবাহী বিমান দুর্ঘটনার ফলে ভূপতিত হয়। ইহার ফলে ৭ জন নিহত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৫ জন পাকিস্তানী ও অন্য ২ জন মার্কিন বলিয়া জানা গিয়াছে।

৩০শে জানুয়ারী—মার্কিন রাষ্ট্রদপ্তর হইতে বলা হয় যে, গত মঙ্গলবার রুশ কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসে শ্রীখুশ্চেভের বক্তৃতা চিরাচরিত রুশ পররাষ্ট্র নীতির "কঠোর ও আপসহীন বিবৃতি" বলিয়া মনে হয়। রুশ-মার্কিন সম্পর্কে, বার্লিন, জার্মান সমস্যা ও নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কেই বিশেষ করিয়া এই বাক্য প্রযোজ্য।

দেশ বিভাগের ফলে পাকিস্তানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লাভের পর হইতে এ পর্যন্ত পাক সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক যে সকল মূল্যবান দলিলপত্র রক্ষিত হইয়াছিল, আজ অপরাহ্নে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে তাহার সবই ধ্বংস হইয়াছে।

৩১শে জানুয়ারী—সামরিক আইন অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তানে আটটি সামরিক আদালত স্থাপিত হইয়াছে। এইসব আদালতে রাষ্ট্র-বিরোধী কার্যকলাপ ও চোরা কারবার এবং দুর্নীতির গুরুতর অভিযোগে আনীত মামলা-সমূহের বিচার হইবে।

'তাস' কর্তৃক প্রচারিত এক বিবৃতিতে বলা হয় যে ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালে রুশ সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী হইতে যে ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য ছাঁটাই করা হয়, তদতিরিক্ত গত ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত আরও ৩ লক্ষ সৈন্যকে বিদায় দেওয়া হইয়াছে।

১লা ফেব্রুয়ারী—নির্ভরযোগ্য ইতালীয় সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'এজেন্সি কণ্টি-নেণ্টাল' এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, গত মার্চ মাসে যে দুই বৎসর শেষ হইয়াছে ঐ সময়ের মধ্যে ক্ষেপণাস্ত্র লইয়া সোভিয়েটের পরীক্ষা কার্যের ফলে যে সব শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে ২৪০০ জন লোক প্রাণ হারাইয়াছে।

বিদেশে পাকিস্তানের যে সমস্ত কূটনৈতিক প্রতিনিধি আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা "রাজনীতিক অথবা ভূতপূর্ব রাজনীতিকদের বন্ধু ও আত্মীয়", পাকিস্তান সরকার তাঁহাদের সকলকেই দেশে ফিরাইয়া আনিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার — সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা ষাণ্মাসিক ১১ ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REG. NO. C. 2109

দেশ

৬ বর্ষ] শনিবার ২ ফাল্গুন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 14th February, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১৬

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

ইলেকট্রিক মোটর
ও
ডিজেল ইঞ্জিন
লিস্টার, ব্ল্যাকস্টোন ডিজেল ইঞ্জিন ও পাম্পিং সেট এবং
"বিকো" ইলেকট্রিক মোটর সর্বদা পাওয়া যায়
বামা লরী এণ্ড কোম্পানীর এজেণ্ট
এস. কে. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
১৩৮, ক্যানিং ষ্ট্রীট - দোতালা, কলিকাতা-১

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 14th February, 1959

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৬ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২ ফাল্গুন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

চাষে সমবায় প্রথা

অবস্থা-বৈগুণ্যে সুভিক্ষ আর দুর্ভিক্ষে প্রভেদ রহিল না। নূতন ধান উঠিতেই চাউলের টানাটানি দেখা দিল। এ বছরে ধান ভাল হইয়াছে। অন্ততঃ আগের দুই বছরের মত অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। সরকার ধানের দাম ও চাউলের দাম বাঁধিয়া দিয়াছেন। তারপর হইতে খোলা বাজারে চাউল অদৃশ্যপ্রায়। ধান যে বছর ভাল না হয় সে বছরেও মাঘ মাসে অন্তত এমন অবস্থা হয় না। এরূপ হইবার কারণ কী? কারণ যাহাই হোক, ব্যাপারটা লইয়া রাজনীতির চরকাত্তা বহিতে শুরু করিয়াছে। সরকার পক্ষ বলিতেছেন, মুনাফাশিকারিগণ অধিক দাম পাইবার আশায় সরকারী পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে এমন চক্রান্ত করিতেছেন। সরকার-বিরোধী পক্ষ বলিতেছেন, সরকার মমত্ব-বশত মুনাফাশিকারিগণের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেছেন না। খুব সম্ভব, দুই পক্ষের কথাতেই কিছু সত্য আছে। মোট কথা এই যে, চাউল খোলা-বাজারে অদৃশ্যপ্রায়।

আমরা সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষের বাদ-প্রতিবাদের ভিতর প্রবেশ না করিয়া তৃতীয় একটি সূত্রকে অনুসরণ করিব। খুব সম্ভব সেটিও বর্তমান অবস্থার একটি প্রধান কারণ। গত কয়েক বৎসরে চাষীর অবস্থার সর্বাধিক উন্নতি হইয়াছে, একথা বোধ করি কেহ অস্বীকার করিবেন না। সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার্য যে, মধ্যবিত্তের অবস্থার অনুভবযোগ্য উন্নতি ঘটে নাই। অর্থাৎ চাউল বিক্রেতার উন্নতি ঘটিয়াছে, চাউল ক্রেতার ঘটে নাই; বিক্রেতা দর-কষাকষির শক্তি পাইয়াছে, ক্রেতার সে শক্তি নাই; বিক্রেতা প্রবল, ক্রেতা দুর্বল। সরকার ধানের দর বাঁধিয়া দিয়াছেন সত্য, কিন্তু চাষী ধান বিক্রয় না করিলে সরকার তাহাকে কিছু বলিতে পারেন না। চাষীর অবস্থা ভাল হইয়াছে, ধান ধরিয়া রাখিবার শক্তি তাহার হইয়াছে, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে অধিক দর পাইবার আশায় ধান ধরিয়া রাখিতে সে পারে। কাজেই সরকারী নির্দিষ্ট দামে বাজারে ধান না আসিলে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। যখন চাষীর অবস্থা ভাল ছিল না, তখন না খাইয়া বা আধ-পেটা খাইয়া ধান ছাড়িয়া দিত। এখন তাহার অবস্থা ফেরায় উচ্চ দরের আশায় ধান ধরিয়া রাখিবে, ইহা কিছু অস্বাভাবিক নয়। এখন 'পরিকল্পনা' যত অগ্রসর হইবে, এই অবস্থা ক্রমে অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিবে। ইহার এক প্রতিকার হইতে পারিত, চাষীর ও মধ্যবিত্তের, বিক্রেতা ও ক্রেতার অবস্থা সমতালে উন্নত হইলে। কিন্ত তাহা হয় নাই, হইবে এমন আশাও দেখি না। তাহা হইলে এই ক্রমবর্ধমান চাউল-সঙ্কটের প্রতিকার কী? প্রতিকারের উপায় অগোণে আবিষ্কার করিতে না পারিলে কেবল ধান ও চাউলের দর বাঁধিয়া দিলে সমস্যার সমাধান হইবে না।

কিছুদিন হইল সমবায় প্রথায় চাষের কথা উঠিয়াছে। নাগপুর কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রাজাজী শ্রী কে এম মুন্সী ও শ্রীকৃপালনী মন্তব্য করিয়াছেন যে, সমবায় প্রথার অপরিহার্য পরিণামরূপে সরকারী জবরদস্তি আসিয়া পড়িয়া গণতন্ত্রকে একনায়কতন্ত্রের দিকে অগ্রসর করিয়া দিবে। কথাটা প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তাঁহারা সমবায় প্রথা (Co-operative) ও যৌথ প্রথায় (Collectivo) গোল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন। একনায়কতন্ত্রের রাষ্ট্রে যৌথ প্রথা আছে—আর অবশ্যই তাহাতে সরকারী জবরদস্তি আছে। কিন্তু সমবায় প্রথায় তেমন হইবার কথা নয়। স্যার হোরেস ম্যাণ্ডেটের নেতৃত্বে আয়ারল্যাণ্ডে ব্যাপক সমবায় প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেখানে জবরদস্তি প্রয়োজন হয় নাই। ভারতে ঐ প্রথা চলিলেও প্রয়োজন হইবে কেন মনে করিব?

কিন্তু ইহাই আমাদের বক্তব্য নয়। এদেশে সমবায় প্রথা ও ব্যক্তিগত চাষের প্রথা দুই-ই পাশাপাশি চলিতে দেওয়া যাইতে পারে। বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্র হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে প্রাইভেট সেক্টর (Private Sector) ও পাবলিক সেক্টর (Public Sector) পাশাপাশি চলিতেছে। ইহাদের মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতা আছে, তেমনি পরিপূরকতাও বর্তমান। একে অন্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। চাষী নির্দিষ্ট মূল্যে ধান বিক্রয় করিতে রাজি না হইলে সমবায় খামার হইতে নির্দিষ্ট মূল্যে ধান ছাড়িলেই চাষী ধানের দর ঐ মূল্যে নামাইয়া আনিতে বাধ্য হইবে। বর্তমানে উহা সম্ভব নয়। কেননা, সরকারের হাতে নিজস্ব ভূমি না থাকায় ধান নাই। ধানের দরের দ্বারাই ধানের দর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। অন্যথা শূন্য হাতে ধানের দর বাঁধিয়া দিলেও ধান বাজারে না আসিতে পারে। —এখন যেমন হইতেছে এবং কালক্রমে আরও প্রবলভাবে যাহা হইবে। চাষের ব্যবস্থায় পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টরের অনুরূপ সমবায় প্রথা ও ব্যক্তিগত প্রথা পাশাপাশি চলিলে ইহার প্রতিকার হওয়া সম্ভব বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। জবরদস্তির আশংকা অমূলক। বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে তাহার লক্ষণ নিশ্চয় দেখা যায় নাই।

প্রসঙ্গত

কী বিচিত্র এই দেশ! দিনে এর মাঠে-ময়দানে বক্তৃতার লাভাস্রোত বয়ে যায়. আর রাত্রে—না, জ্যোৎস্নাধারার প্রলেপে নিরন্ন জনতার যন্ত্রণা তখন কতখানি শান্ত হয়ে আসে তা জানিনে, শুধু এইটুকু জানি যে. রাত্রির নির্জন মুহূর্তেই এর গুদাম থেকে চালের বস্তা উধাও হয়ে যায়।

বাজারে চাল নেই। আর তা নিয়ে যে উপর-মহলে কারও মাথাব্যথা আছে, এমন কথাও মনে হয় না। থাকলে দু-একটা রাঘব-বোয়াল এতদিনে ধরা পড়ত. দু-চার বছরের জন্যে ঘানি ঘোরাতে বাধা হত। নেহরুজী এককালে বলেছিলেন, চোরাকারবারীদের ক্ষমা করা হবে না, ধরা পড়বামাত্র তাদের ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। দেশটা গণতান্ত্রিক, তাই অতটা আমরা আশা করিনে। আর আমাদের প্রধান-মন্ত্রীও যে-রকম ক্ষণে-রুষ্ট ক্ষণে-তুষ্ট মানুষ, তাতে মনে হয়, তাঁরও মতামত ইতিমধ্যে বেশ-খানিকটা পালটে গিয়েছে। কিংবা ল্যাম্পপোস্টেরই হয়ত অভাব ঘটে থাকবে। তা সে যা-ই হক, চালের বাজারে নেহাতই দু-একটা চুনো-পুঁটি ছাড়া আর কাউকে, এখনও পর্যন্ত অন্তত, ছোঁয়া হয়নি। হবেই বা কেন। মন্বন্তরকে ত আমরা ভয় পাই না, মারী নিয়ে ঘর করাটাই যে আমাদের বাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কথাগুলি লঘু সুরে বলেছি বটে, কিন্তু সুরটা লঘু হলেও সমস্যাটা গুরুতর। আর প্রধানমন্ত্রীকে এর মধ্যে টেনে এনে কোনও লাভ নেই। সমস্যাটা যেহেতু—প্রধানত—পশ্চিমবঙ্গের। এবং এর প্রতিবিধানের জন্য যা-কিছু করা দরকার, রাজ্য-সরকারকেই তা করতে হবে। রাজ্য-সরকার ইতিমধ্যে নানা আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন বটে, কিন্তু নিছক আশ্বাসে কারও—পেট ত দূরের কথা—মন ভরবে কিনা, তাতে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ আছে। সন্দেহের সঙ্গে দুটি প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। প্রথম প্রশ্নঃ সরকার এ-কথা বুঝতে পেরেছেন কিনা যে, সরকারী ব্যবস্থার শৈথিল্যের জন্যই চোরাকারবারীদের চাতুরির কাছে সরকারী সদিচ্ছার পরাজয় ঘটেছে। সরকার যে-দাম বেঁধে দিয়েছিলেন, সে-দামে চাল পাওয়া যাচ্ছে না। ফলত যে নিদারুণ সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে, একটা সভ্য দেশের সরকারের পক্ষে সেটা গৌরবের নয়। বস্তুত গভীর লজ্জার। দ্বিতীয় প্রশ্নঃ জনসাধারণের মধ্যে এর ফলে যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে, সেটা যাতে একটা তীব্র ক্রোধে রূপান্তরিত না হয়, তার জন্য কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। এখনও আশা রাখি, মানুষের ক্ষুধার অন্ন যাতে তার নিরুদ্দেশ-যাত্রার পথ থেকে আবার প্রকাশ্য বাজারে ফিরে আসে, সরকার তার জন্য নিশ্চয়ই কিছু করবেন। তবে যা-কিছুই তাঁরা করুন, তা যেন দ্রুত করা হয়। কেননা, মনে রাখা ভাল, মানুষের ধৈর্য কিছু নিঃসীম নয়। ধৈর্যের সীমা থাকে।

• • •

ওদিকে চাল নেই, এদিকে মুর্শিদাবাদ জেলার চার হাজার একর জমি—প্রায় নিঃশব্দে—পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হল। প্রায় কেন, সম্পূর্ণই নিঃশব্দে। শুধু জমি কেন, হাজার দশেক মানুষকেও। বিধান-পরিষদে শ্রীযুক্ত শশাঙ্কশেখর সান্যাল এ নিয়ে খানিকটা হৈ-চৈ তুলেছেন। তুলবার প্রয়োজন ছিল। অতঃপর দেশের আবহাওয়া ও মানুষের মন যে দিনকয়েক খুব উত্তপ্ত হয়ে থাকবে, তা জানি। কিন্তু এও জানি যে, সে-উত্তাপ ঝিমিয়ে যেতেও খুব দেরি হবে না। দিনে-দিনে অবস্থা যা হয়ে উঠছে, তাতে মনে হয়, এ বড় অদ্ভুত এক সময়ের মধ্যে, বড় বিচিত্র এক পরিবেশে আমরা বাস করছি। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে একটু খুশী রাখবার জন্য, আগে থাকতে একটু সতর্ক হবার অবকাশমাত্র না দিয়ে কখন যে কোন্ অঞ্চলকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হবে, কারও পক্ষেই তা বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু, প্রশ্ন হল, এই করেই কি পাকিস্তানকে খুশী করা যাবে? তার লোভের বাটিতে যদি একটার-পর-একটা খাদ্য তুলে দেওয়া হয়, তাতে তার লোভকেই কি আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে না? পাকিস্তান আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, তার সঙ্গে সদ্ভাব রাখা দরকার, সদ্ভাব না থাকলে দু-পক্ষেরই তাতে ক্ষতি হবার আশঙ্কা,—এ-সবই আমরা বুঝি। কিন্তু তাই বলে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সাশ্রুলোচনে যদি প্রশ্ন করি "কেন মারিবে ভাই," এবং উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা না করে রাজ্যপাটের এক-একটা অংশ যদি তার হাতে আমরা তুলে দিতে আরম্ভ করি, তাতেই কি তার ভালবাসা পাওয়া যাবে? সমস্যা মিটে যাবে?

যাবে না। শুধু তা-ই নয়, ভারত-রাষ্ট্রের কোনও অঞ্চলকে এইভাবে অন্যের হাতে তুলে দেবার অধিকার কারও আছে কিনা, সেটাও ভেবে দেখতে হবে। ইতি-মধ্যেই এ নিয়ে সংবিধান-লঙ্ঘনের অভি-যোগ উঠেছে।

• • •

এত সব ডামাডোলের মধ্যে একটা শুধু সুখবর আছে। পশ্চিমবঙ্গের সতরটি হাসপাতালে গত ১০ই ফেব্রুয়ারি থেকে যে ধর্মঘট শুরু হবার কথা ছিল, সেটা স্থগিত রাখা হয়েছে। একেই ত আমাদের হাসপাতালে প্রয়োজনের তুলনায় বেডের সংখ্যা অনেক কম; তার উপরে সেই অল্প-কটি শয্যাকেও যদি গুটিয়ে রাখা হত, তাহলে আর কথা ছিল না। দুঃখের ঘড়াটি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যেত। তবে সঙ্গত কারণেই আমরা আশা করব, হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারিগুলিকে অত্যাবশ্যক সংস্থা বলে ঘোষণা করে রাজ্য-সরকার যে আদেশ জারী করেছেন, তার সুযোগ নিয়ে হাসপাতাল-কর্মীদের দাবিদাওয়া-গুলিকে ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা হবে না। তাঁদের দাবিগুলিকে সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করে দেখতে হবে, এবং নিতান্ত অযৌক্তিক যদি না হয়, তাহলে সেগুলিকে মেটাবার চেষ্টাও করতে হবে। যাঁর হাত থেকে সেবা নিচ্ছি, তাঁর ক্ষোভের কারণগুলিকে জিইয়ে রাখাটা কোনও কাজের কথা নয়।

• • •

শীত এল, আবার চলেও গেল। কিন্তু কখন যে এল, আর কখন যে গেল, সেইটেই ঠিক ধরতে পারা গেল না। ময়দানের রুক্ষ বিবর্ণ বৃক্ষশাখা আবার হরিৎ-আনন্দে হেসে উঠেছে। আকাশ এখনও ঘোলাটে, উত্তরের জানালা এখনও বন্ধ রাখতে হয়। তবু বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, বৃদ্ধ শীত এবার বানপ্রস্থে যাবেন। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর সিংহাসন থেকে নেমে এসেছেন। তবে আর ভয় কী। "এবার মিলন হাওয়ায় হাওয়ায় হেলতে হবে, ধরা দেবার খেলা এবার খেলতে হবে।" ভয় ত সেইজন্যেই। 'বসন্ত' জাগ্রত দ্বারে। শেষকালে তারই হাতে না ধরা দিতে হয়।
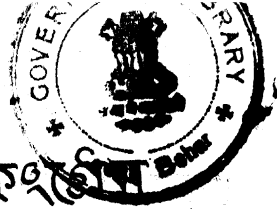
বিজ্ঞান কংগ্রেস

মনুজেন্দ্রলাল চৌধুরী

এ বারকার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৬তম অধিবেশন সাঙ্গ হইল কয়েকদিন আগে পুরনো দিল্লীতে। এ ভালই হইয়াছে যে, নয়া-দিল্লী তার রাজনৈতিক বর্তমানকে লইয়া দূরে রহিল আর বিজ্ঞান-ভারতের যাত্রীরা মিলিত হইলেন নিভৃতে, অতীতের স্মৃতি যেখানকার প্রতিটি ধূলিকণায় মিশিয়া আছে। বিগত বৎসরের কাজের সমালোচনা আর ভবিষ্যতের পদযাত্রায় অতীত ভারতকে সামনে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। দিল্লী অতীত ভারতের প্রতীক। অধিবেশনের মূল সভাপতি ডক্টর মুদালিয়র তাঁর এক ভাষণে এবারকার দিল্লী অধিবেশনের এ তাৎপর্যের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "এই দিল্লীর উদ্দেশ্যে একদিন সারা ভারতে স্লোগান উঠিয়াছিল, 'চলো দিল্লী পুকারকে—এ দিল্লী আমাদের, এ দিল্লী সর্বভারতের।" সুতরাং এবারকার অধিবেশনে সেই ঐতিহ্যের মর্যাদা রক্ষা হইবে সেই আশা লইয়াই সারাভারত হইতে বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানকর্মী, ছাত্র আর দর্শনার্থীর ভিড় জমিয়াছিল দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায়, শামিয়ানার নীচে।

আমার পক্ষে যখন অধিবেশনে যোগ দেওয়া স্থির হইল হাতে তখন সময় অতি অল্প। যাত্রার টুকিটাকি গুছাইয়া লইতেই সেই সময়টুকু কখন পার হইয়া গেল, বোঝা গেল না। আগেকার দিন হইলে এই দিল্লী যাত্রার পথের বিবরণ একটা পথের পাঁচালী হইতে পারিত; কিন্তু আজ নাগরিক ভারতে ধানবাদ হইতে দিল্লীর পথ শুধু রেল কোম্পানীর সময়-সারণীর এক কোণে একটুখানি পাতা আছে। সেখানেও ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী। অথচ এই প্রায় আট শত মাইল পথের দু'পাশে উত্তর ভারতের কত গ্রাম কত জনপদ ছড়ান, সেদিকে দৃকপাত করার সময় না আছে রেল কোম্পানীর, না আছে যাত্রীদের। প্যাসেঞ্জার ট্রেন হইলে তবু ওরই মধ্যে গাড়ি ঝাঁকানি দিয়া বারবার থামিত। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে কোন নাম-না-জানা স্টেশনের টিমটিমে লণ্ঠনের আলোয় হয়ত বিজ্ঞান-ভারত আর গ্রামীণ ভারতের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিত। আর সে শুভক্ষণে অদূরে জঙ্গলের অন্ধকারে ঝিল্লীর মাঙ্গলিকী শোনা যাইত। কিন্তু কালকা মেল যখন ছুটিল তখন সেই অবকাশটুকুও ছিল না। তবু বাইরে তাকাইয়া ছিলাম। বিহারের মালার মত দোলানো পথে গাড়ি ছুটিয়াছে। এখানে ওখানে ধরিত্রীর পীনোন্নত বুকের উপর অন্ধকারের আঁচল চাপা। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। জাগিয়া উঠিয়া দেখি ক্ষেতখামারের ধরন, পাখির চলন বলন বদলাইয়াছে। মাঝে মাঝে উটের সারি, এখানে ওখানে ময়ূর, সারস, অথবা জলার ধারে এক-বিঘৎ-চওড়া-চঞ্চু স্টর্ক পাখি নিবিষ্ট দাঁড়াইয়া আছে। মুঘলসরাই, ফতেপুর শিকোহাবাদ, টুন্ডলা পার হইয়া গেল। গাড়ি ছুটিয়াছে, হঠাৎ চোখে পড়ে মাটির দেয়াল ধসিয়া-পড়া বসতি, কুয়ার ধারে সাবেককালের কাঠের কপি-কল—জল

তোলার কল! কুয়ার পাড়েই মহিষের আস্তানা, পাশেই বিস্তর ঘুটে দেওয়ার সরঞ্জাম, মাটির দেয়ালে প্রাক্তনদের পদাঙ্কের কলঙ্ক। আর তারই পাশ দিয়া গাড়ি ছুটিয়াছে, তার কামরায় কামরায় বিজ্ঞানী-দের ভিড়, হয়ত আলোচনা চলিয়াছে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা অথবা পরমাণু শাস্ত্রের।

পূর্বাহ্নেই বিজ্ঞান কংগ্রেসের স্থানীয় সম্পাদককে চিঠি দিয়া মাথা গুঁজিবার ঠাঁই ঠিক করা সম্ভব হয় নাই, তাই ভাবনা ছিল শেষকালে হয়ত হোটেলে আস্তানা লইতে হইবে। অবশ্য সেখান থেকে দিল্লীর বিদ্যালয় দূরের পথ নয়। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতিকে ধন্যবাদ, স্টেশনেই প্রতিনিধিদের স্বাগত জানাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ওঁদের গাড়িতে যখন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল প্রাঙ্গণে পেঁছাইলাম তখন একবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মনে না হইয়া পারে না। বৃটিশ আমলের বড়লাটের বিরাট বাগানবাড়ি এখন দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের করতলে, সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে আশুতোষ বিল্ডিং-এর নীচ তলায় কাপড়ের কারবার। মনে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস ভবন কলেজ স্ট্রীটে, বিজ্ঞান হয় রাজাবাজার আবার প্রাণীতত্ত্ব বালীগঞ্জে। আর কি ঠাসাঠাসি। ঠিক মনে নাই, বোধ হয় মহাত্মাজী বলিয়া-ছিলেন যে স্বাধীন ভারতে বড়লাট ও ছোট-লাটদের প্রাসাদগুলো কল্যাণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। সেদিক হইতে দিল্লী ভারতের সামনে শিক্ষার প্রতি মর্যাদার আদর্শ স্থাপন করিয়াছে বলা চলে।

প্রিন্স ফিলিপ

আমাকে জায়গা দেওয়া হইয়াছিল সেন্ট স্টিফেন্স ছাত্রাবাসে। পরদিন রাত্রে ওখানকার ছাত্ররা দেখা করিতে আসিলেন। দু-জনেই এম এ পড়েন, একজন গোয়ালিয়রে বাড়ি আর একজন পাতিয়ালার। ওখানে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের ক্লাস হয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নাম থাকে কলেজের ভর্তির খাতায়। উঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল সৌজন্য জ্ঞাপন অর্থাৎ অতিথির কুশল জিজ্ঞাসা। কথাবার্তার পর ওরা যখন "Sir you are ours" (স্যর আপনি আমাদের) বলিয়া বিদায় লইলেন তখন যে কথাগুলো আমার মনে লাগিয়া-ছিল সে কেবল সৌজন্য নয় অথবা বাংলার ছাত্রদের তুলনায় ছাত্র দুটির স্বাস্থ্য নয়, সে বাংলার ছাত্রদের সম্বন্ধে কৌতূহল। ওরা কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলেন "বাংলার ছাত্রদের মান যে নীচের দিকে তার কারণ কলিকাতার কলেজগুলোতে ছাত্রদের অপরিমিত ভিড় কি? সেজন্য উদ্বাস্তু সমস্যা কতটা দায়ী?" বাংলার ছাত্রদের মান নীচের দিকে এ যেন ওরা মুখস্থের মত বলিয়া গেল। যতটুকু বলা উচিত বলিলাম কিন্তু আমি একটু শঙ্কিত না হইয়া পারি নাই। তবে কি বাংলার বাইরের ছাত্ররা ভাবিতে শুরু করিয়াছেন যে বাংলার ছাত্ররা পিছু হটিতেছে। তারপরের প্রশ্ন ছিল ওদের বিশ্ববিদ্যালয় আমার কেমন লাগিল। বলিলাম "তোমাদের মত চমৎকার ব্যবস্থা কটা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আছে বল? বড়লাটের রাজকীয় বাগানবাড়ি এখন তোমাদের।" ও'রা কিন্তু এতে খুশী নন। অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, "বাগান সত্যি ভাল এবং জায়গাও ঢের কিন্তু বিদ্যাভবনগুলো মোটেই ইম্প্রেসিভ্ নয় অর্থাৎ দালানগুলোর জৌলুস নাই মোটেই।" আমি ত অবাক, বলে কি! ওরা কি দিওয়ানই-খাস আশা করে নাকি। অন্তত সেইরকম একটা কিছু না হইলে বিদেশী বিজ্ঞানীদের কাছে দেশের নাকি মুখ রক্ষা হয় না। এই মনোভাব একান্ত ওদের ব্যক্তিগত, বিজ্ঞান কংগ্রেস হইতে ফিরিয়া একথা বলিতে পারিতেছি না।

পরদিন শ্রীনেহরু বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করিলেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহাই হউক মুখ্য ভিড় যে শ্রীনেহরুর উপস্থিতির জন্যে তাতে বোধ হয় সন্দেহ নেই। ২১শে জানুয়ারী সকাল ১১টায় উদ্বোধনের কথা ছিল, কিন্তু আগের রাতের ঝড়জলের তাণ্ডবে প্যাণ্ডেলের এক-দিক বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। পরদিন যথা-সময়ে শামিয়ানা ঠিক করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং অনুষ্ঠান পিছাইয়া গেল বেলা তিনটা পর্যন্ত। উদ্যোক্তারা কিছুটা বিব্রত হইয়াছিলেন। প্রিন্স ফিলিপ ডিউক অব এডিনবরো ছিলেন অন্যতম প্রধান অতিথি। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে বিশেষভাবে সমাদর জানান হইল। ভাবে বোধ হইল যেন ভারত ব্রিটেনের সহিত সদ্য ফেলিয়া আসা অতীত তিক্ততার কথা ভুলিতে চায়। এদিকে আবহাওয়া শুদ্ধ মান্য অতিথির মনোরঞ্জনের যোগ্য: গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, মেঘলা আকাশ আর কনকনে হাওয়া যাকে বলে একেবারে "হোম ওয়েদার"।

তিনটার অনেক আগেই প্যাণ্ডাল একদম ভর্তি। আমার যাইতে কিছু দেরি হইয়া-ছিল, সুতরাং যথানির্দিষ্ট ব্লকেও অনেকের পিছনে যায়গা লইতে হইল। শোভাযাত্রা করিয়া ও'রা অর্থাৎ শ্রীনেহরু, উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ। এবারকার অধিবেশনের মূল সভাপতি ডঃ মুদালীয়র ও প্রিন্স ফিলিপ

ডঃ মুদালীয়র

অন্যান্যদের সঙ্গে মঞ্চে গিয়া উঠিলেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা সঙ্গে ছিলেন। অনবরত ক্যামেরার ক্লিক্ ক্লিক্ শব্দ আর ফ্ল্যাশ লাইটের চমক চোখে পড়িয়া জনাসাতন করিতেছিল। বরাবরই বিদেশী প্রতিনিধি-দের মঞ্চের উপর স্থান দেওয়া হয়, কারণ তাঁহারা ভারতের অতিথি। সবচেয়ে নিকট বিদেশী প্রতিনিধি আসিয়াছেন দু-জন পাকিস্তান হইতে। এবার অভারতীয় প্রতিনিধি আসিয়াছেন প্রায় আশী জন। অস্ট্রেলিয়া, ব্রেজিল, কানাডা, সিংহল, যুগোশ্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, জর্মনী ডেমো-ক্র্যাটিক রিপাবলিক, জর্মনী ফেডারাল রিপাবলিক, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, সুইজার-ল্যাণ্ড, ইংলণ্ড, রাশিয়া, আমেরিকা। এছাড়াও আরও আছে। পৃথিবীর কোনও দেশই প্রায় বাদ যায় নাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসিয়াছেন সবচেয়ে বেশী। ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন দুই সহস্রের উপর। এ'দের মধ্যে অনেকে গবেষণার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন। হয়ত কোনও প্রাদেশিক সরকারের বিশেষ বিভাগ হইতে মনোনীত হইয়া আসিয়াছেন, অথবা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে।

—মঞ্চের উপর মঙ্গল কলস, তাহাতে আম্র-পল্লব, পাশে থালায় শঙ্খ, দীপ, পুষ্প চন্দন, মঞ্চে আলপনা আঁকা—ভারতের নিজস্ব

আতিথেয়তার উপকরণ। কিন্তু এরই সংগে চারদিকের সামঞ্জস্য পাওয়া কঠিন। জানি না যাঁরা মংগল কলস স্থাপন করিয়াছেন, যাঁদের কণ্ঠে অতীত ভারতের মর্মবাণী অধিবেশনে বার বার ধ্বনিত হইতেছিল বর্তমান ভারতের আসল রূপ তাঁহাদের চোখে কেমন? কেন না সমস্ত আঙিনা-ভরা সমস্তই অভারতীয়। আদব কায়দা, নিখুঁত সজ্জা সমস্ত বিজাতীয়। ইংরাজীতে কথা আছে "When in Rome do as the Romans do." কিন্তু এ যে দেখিতেছি উল্‌টো। "নিজ বাসভূমে পর-বাসী"র মতই সবাই সজ্জিত। অবশ্য রসভংগ করিয়াছেন শ্রীনেহরু ও ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ। শ্রীনেহরু তাঁহার নিজস্ব সজ্জায় আর ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ একেবারে ধুতি আর গলাবন্ধ কোট পরিহিত। অবশ্য আরও দুই চারজন বাঙালী (একজন অবাঙালীও নয়) আসিয়াছিলেন ভারতীয় পোশাকে। এক সময় স্বাদেশিকতার প্লাবনে বাংলা দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল, বাকী ভারতও ডুবু-ডুবু হইয়াছিল। কিন্তু আজ ভাঁটা পড়িল কিসে? তবে কি আমরা জাতীয়তার গণ্ডি হইতে আন্তর্জাতিকতায়, ঘরের সংকীর্ণতা হইতে "বসুধৈব কুটুম্বকমে"র উদার চরিত্রতায় উত্তীর্ণ হইয়াছি? তবে ঐ জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অবশিষ্টটুকুই বা কেন?

অধিবেশনের প্রথম উদ্বোধন সংগীত। ভারতীয় প্রথায় ভাগবত হইতে স্তব গান দিয়া সভার কাজ আরম্ভ হইল। গাওয়া হইলঃ—যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা (যাঁর অন্ত নিখিল চরাচরে কেউ জানেন না), ধ্যানাবস্থিতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ (ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গত চিত্ত যোগীরা যাঁকে দেখিতে পান) দেবায় তস্মৈ নমঃ (সেই দেবতাকে প্রণাম)। জানি না এই স্তোত্র ইচ্ছাকৃত নির্বাচন কিনা। কেন না সমস্ত অভিভাষণেই আজ বিজ্ঞান যে তার অপরিমেয় শক্তি লইয়া অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ডের এক পার হইতে অনন্তের দিকে ধাবিত হইতে চলিয়াছে, গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে বিজয় অভিযান শুরু করিয়াছে, সেই সন্ধিক্ষণে কি বিজ্ঞানীদের স্মরণ করিয়া দেওয়া হইল "যস্য অন্তং ন বিদুঃ সুরাসুর গণাঃ? শ্রীনেহরু গীতার শ্লোক অনুসরণ করিয়া বিজ্ঞানকে বন্দিত করিলেন, "সহস্র সূর্যের জ্যোতি আজ তোমার করতলে।" তেমনি মূল সভাপতির ডক্টর মুদালিয়র বলিলেন, সেই একই কথা তবে অন্যভাবে। তাঁর বক্তৃতায় উদাস দার্শনিকতার সুর। তিনি স্তব করিলেন মহান অজ্ঞেয়ের প্রতি, যাঁকে বলা হইস The great unknown. তিনি বলিয়া চলিলেন Jean Paul Reachter-এর স্বপ্নের কথা; দেবদূত মানুষকে ডাকিয়া লইল অন্তহীন ব্রহ্মাণ্ড দেখাইবার উদ্দেশ্যে। সেই কাল ও স্থানের অপরিমেয় যাত্রার মাঝপথে ক্লান্ত মানুষ দীর্ঘশ্বাস ও চোখের জল ফেলিয়া বলিল, "হে দেবদূত, ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ততা আমার আত্মাকে পীড়িত করিতেছে। ঈশ্বরের মহিমা অসহ্য। আমি তার বৈভব সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমাকে সমাধির প্রশান্ত শান্তি দাও।" ডক্টর মুদালিয়র বিজ্ঞানী হইলেও ভারতীয়, তাঁর এই দার্শনিকতা ভারতীয় মনকে স্পর্শ করিবে। তিনি অবশ্য বিদেশী আখ্যান না বলিয়া তার চেয়ে প্রাচীন গীতায় বিশ্বরূপ দর্শন হইতে অর্জুনের স্তব তুলিতে পারিতেন। কিন্তু বোধ হয় বিদেশী বিজ্ঞানীদের কাছে Jean Paul Reachter's dream অধিক পরিচিত; তাই তিনি সেই আখ্যান হইতেই উপসংহার করিলেন "End is there none to the Universe of God and to also there is no beginning".

(ঈশ্বরের এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত নাই আর দেশএর আদিও নাই) বিদেশী বিজ্ঞানীরা কি ভাবিতেছিলেন জানি না। আমরা কজন কিন্তু কৌতুক করিতেছিলাম যে, আজ রক্ষা নাই, দার্শনিকদের খপ্পরে পড়া গেছে। মনে হইল ডঃ মুদালিয়র যেন বলিতে চান যে আজকের বিজ্ঞানের বলে মানুষের এই যে গ্রহ হইতে গ্রহান্তর যাত্রা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সন্ধানে ধাবিত হওয়া, এই স্থলে ঘটনার পশ্চাতে একটা সূক্ষ্ম তাৎপর্য আছে। এ যেন ঐ রিকটারের স্বপ্নের মানুষকে অন্তহীন যাত্রায় আহ্বান, মানুষকে স্রষ্টার অপরিসীম বৈভব দেখানই এর উদ্দেশ্য! আর একদিন মানুষ শ্রান্ত হইয়া হয়ত বলিবে, "Angel I will go no farther. Insufferable is the glory of God," (হে দেব, এইখানে এ যাত্রা ক্ষান্ত হউক তোমার ঐশ্বর্য অসহনীয়।)

উদ্বোধন সংগীতের পর শুরু হইল অভ্যর্থনা। স্বাগত জানাইলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডঃ ভি কে আর ভি রাও, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকুলপতি। সাদর সম্ভাষণের পর অভিভাষণ দিলেন। ডঃ রাও মনে করেন যে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের এখন বিজ্ঞানের প্রয়োগ অর্থাৎ ফলিত-বিজ্ঞানের উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। ভারতের আর্থিক বুনিয়াদ যাহাতে গড়িয়া উঠে সেই হউক ভারতীয় বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য। যুগ যুগ ব্যাপী যে কুসংস্কার জনসাধারণকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে তাহাকে দূর করিতে হইলে বিজ্ঞানীদের উচিত জনসাধারণের দরজায় বিজ্ঞানের অমৃত ভাণ্ড বহিয়া নেওয়া, তাহার অর্থ জনগণের ভাষায় বিজ্ঞানের প্রসার চাই, ইংরাজী ভাষায় নহে। অবশ্য ডঃ রাওয়ের এই দ্বিতীয় মত যতটা অকুণ্ঠ সমর্থন পাইয়াছে প্রথমটি তত নয়, এমন কি মূল সভাপতি ডঃ মুদালিয়রও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করা, ফলিত-বিজ্ঞানকে সর্বস্বত্ব দেওয়া যে কোনও ক্রমেই যুক্তিযুক্ত হইবে না, সে কথা অতি জোরের সংগেই ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য ডঃ মুদালিয়রের এর চেয়েও মূল্যবান যে কথার উপর উপস্থিত সমস্ত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানীকর্মী সমস্বরে করতালি দিয়াছেন, সে ঐ অতি সামান্য দাবী অর্থাৎ বিজ্ঞানীদের ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধাররা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করুন, বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রের অন্য যে কোনও দায়িত্বের অন্ততঃ সমান মর্যাদা দেওয়া হউক। আজও যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের পেশা বিজ্ঞানের নেশার চেয়েও অনেক বেশী লোভনীয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি কথাটি বলিয়াছেন।

ডঃ রাওয়ের পর শ্রীনেহরু বক্তৃতা দিলেন। তিনি শুধু আজ নয়, বৎসর বৎসর ধরিয়া অক্লান্তভাবেই বলিয়া চলিয়াছেন বিজ্ঞানকে শান্তির দূত হইতে হইবে। এবার তাঁহার কথায় একটু নতুনত্ব ফুটিয়াছে। তাহার প্রধান কারণ বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক বিস্ময়। মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন, গ্রহে উপগ্রহে অভিযানে বিজ্ঞানের অগ্রগতি। এই প্রসংগে তিনি বিদেশী উপাখ্যান হইতে একটি উপমা দিলেন। জানুয়ারী মাসের অধিষ্ঠাতৃ দেবতার দুই মুখ (আমাদের ব্রহ্মা যেমন চতুরানন); একদিকে বরাভয়, অন্য মুখে ধ্বংসের নেত্রানল। বিজ্ঞানকেও এই দুই রূপে আজ দেখা যায়। মানুষ বাছিয়া নিক কে তাহার উপাস্য। প্রকৃতিকে জয়ের গৌরবে সুখ ঐশ্বর্যে ভরা স্নিগ্ধ আশীর্বাদ অথবা ধ্বংসের আগুন। আজ পৃথিবীব্যাপী যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক বিজ্ঞানীরাই তাহার জন্য দায়ী। মন্দ উদ্দেশ্যে তাঁহারা আবিষ্কার করেন নাই। কিন্তু এও সত্য যে, ধ্বংসের গরল আর লক্ষ্মীর স্বর্ণঘট দুইই একই মন্থনের ফল। তাই শ্রীনেহরু আন্তরিকভাবে বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন জানাইয়াছেন "বিজ্ঞান এই সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে, বিজ্ঞানীকেই এর সমাধান দিতে হইবে। কারণ আর কাহারও পক্ষে এর সমাধান দেওয়া সম্ভব নয়।" তাঁর সেই কথা ধ্বংস নয় মুক্তি, যুদ্ধ নয় শান্তি। বিজ্ঞানের সংগে ভারতের শাশ্বত ধর্মের বাণীকে গ্রথিত করিতে বলা হইল। তিনি ভারতীয় পুরাণ হইতে আখ্যান বলিলেন, যুগে যুগে অসুরেরা শক্তির মদে অন্ধ হইয়াছে, কল্যাণকে উপহাস করিয়াছে। কিন্তু বারবারই সেই অকল্যাণের উদ্ধত শির ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়াছে। বিজ্ঞানীরা যেন ইতিহাসের এই শিক্ষাকে না ভোলেন, ইহাই ছিল তাঁহার আবেদন।

শ্রীনেহরুর বক্তৃতার পর ডক্টর মুদালিয়র কিছু নূতন কথা শুনাইলেন। কিন্তু তিনি যে কেন একমাত্র ইংরাজী ভাষাকে বিজ্ঞান অনুশীলনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বলিলেন তাহা বোঝা গেল না। তবে ডঃ রাও ফলিত বিজ্ঞানকে যতটা গুরুত্ব দিয়াছেন ডঃ মুদালিয়র ঠিক ততটা সমর্থন করিয়াছেন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে, বস্তুত ইহাই ভারসাম্যের নীতি। যাঁহারা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন তাঁহাদের কাছে ডঃ মুদালিয়রের এই মত যে আন্তরিক সমর্থন পাইবে বলাই বাহুল্য। অর্থ-ভার-হীন বিজ্ঞান যদি পথ না দেখায় তবে ফলিত বিজ্ঞান পথ পাইবে কোথায়? "ধর্মেই ধর্মের শেষ" সেই কথাকে অনুসরণ করিয়া আমরাও বলিতে চাই জ্ঞানেই জ্ঞানের শেষ, Science for its own sake এই নীতি স্বীকৃত হউক। ডঃ মুদালিয়র প্রয়োগ বিজ্ঞানী হইয়াও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রতি যে অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইলেন সে সত্যই তাঁহার দূরদর্শিতার পরিচয়। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের মূল্য যে সহজে লোকে বুঝিতে চায় না তাহার কারণ বণিক বুদ্ধি, তার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না বলিয়া। এ সম্বন্ধে তিনি একটা চমৎকার গল্প বলিলেন। তখন বিজ্ঞানের জয়যাত্রা সবে শুরু হইয়াছে। ইংরাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্যারাডে তখন খ্যাতিমান। তিনি এক সভায় তাঁহার এক চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের বিষয় যন্ত্রপাতির সাহায্যে দেখাইতেছিলেন। সেই সভায় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী গ্ল্যাডস্টোনও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কিছুটা নৈরাশ্যের সংগে বিজ্ঞানী ফ্যারাডেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সবই ত দেখিলাম, কিন্তু এতে লাভ কি?" বিজ্ঞানী ফ্যারাডে পরিহাসের সংগে বলিলেন, "স্যার আমার বিশ্বাস আপনি শীঘ্রই এই আবিষ্কারের উপর ট্যাক্স আদায় করিতে পারিবেন।" বিজ্ঞানী ফ্যারাডের সেই অনুমান মিথ্যা হয় নাই। সেদিনকার সেই আবিষ্কারের বিষয় অর্থাৎ "একটা চুম্বককে যদি গোলাকার তারের কাছে হঠাৎ আনা যায় তবে ঐ তারের মধ্যে বিদ্যুতের স্রোত সৃষ্টি হয়" সেদিন নিতান্তই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান ছিল। অথচ আজ সেই আবিষ্কার হইতে ইলেকট্রিক কারেণ্ট অর্থাৎ বিদ্যুতের স্রোত কী যুগান্তরই না আনিয়াছে। আজ যে ঘরে ঘরে আলো জ্বলে, পাখা ঘোরে, পথে ট্রাম চলে সে কথা সেই সভায় কি কেহ ভাবিতে পারিতেন! অবশ্য আগেই বলিয়াছি ডঃ মুদালিয়র সবচেয়ে করতালি পাইয়াছেন বিজ্ঞানের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া।

ইহার পর তিনি তাঁহার দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের অভিজ্ঞতা চিকিৎস-বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে বলিলেন। মানুষের রোগ-জয়ের অভিযানে বিজ্ঞানীরা মরু জয়ের সেনা। বিজ্ঞানী ফ্লেমিং-এর আবিষ্কৃত পেনিসিলিন, আর তারপর স্ট্রেপ্টোমাইসিন, অরিও-মাইসিন, ক্লোরো-মাইসিন ইত্যাদি গোষ্ঠী অ্যাণ্টি-বায়োটিক্স গোষ্ঠীর আবিষ্কারের কাহিনী বলিলেন। তারপর আসে সালফা গ্রুপের কথা, আসে ভিটামিনের আশ্চর্য কাহিনী। মানুষ জন্মসূত্রে মাত্র আয়ু লাভ করে, আর বিজ্ঞান সেই আয়ুকে করে পরমায়ু অর্থাৎ

পরম বাঞ্ছিত আয়ু। ডঃ মুদালিয়র তাঁহার ভাষণ শেষ করিলেন। তাহাতে ছিল দার্শনিকতার সুর, এক মহান অজ্ঞেয় সত্তায় বিশ্বাস, সে কথা আগেই বলিয়াছি।

ইহার পর চলিল বিদেশী বিজ্ঞানীদের পরিচয় প্রদান। তাহার পর হইতে বিদেশের নাম করা বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান ও বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের পক্ষ হইতে ভারতের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রতি যে শুভেচ্ছা বাণী আসিয়াছে সেগুলি পড়া হইল। তাহার পর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর্ব; সর্বশেষে জাতীয় সঙ্গীত।

সভা শেষ হইল। ইহার পর অভ্যর্থনা সমিতি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে চায়ের আয়োজন করিয়াছিলেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উদ্যানে। আপনা হইতেই অভ্যাগতরা দলে দলে আলাদা হইয়া যান। অবশ্য কিছু কিছু নূতন পরিচয়ের সূত্রপাত এইখানে চলিতে থাকে।

সন্ধ্যার পর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। নাচ গানের মধ্যে সেদিনকার অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হইল।

এরপর প্রতিদিন নানা অধিবেশন। সারাদিন ঠাসা প্রোগ্রাম। ২২ তারিখ ছিল রাষ্ট্রপতি ভবনে চায়ের আসর। অনেক লোক জড় হইয়াছিলেন, অনেক ছাত্রও দেখিলাম। গাড়িতে করিয়াই আমাদের লইয়া গেল। রাষ্ট্রপতি ভবনের সম্মুখের আঙ্গিনা হইতে লম্বা লম্বা সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া একেবারে দোতলা পর্যন্ত উঠিলাম। প্রথম ঘরে প্রবেশ করিয়াই চোখে পড়ে বুদ্ধদেবের মূর্তি, হাতে অভয় মুদ্রা, মুখে অপরিসীম প্রশান্তি। ডানদিকের ঘরে ছোট একটা মিউজিয়মের মত। এইখান হইতে নানা দলে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে অভ্যাগতদের স্থান হইল। বড় ঘর, মার্বেল পাথরে মোড়া, ছাদের ভিতর দিকটায় মুঘল আমলের নানা ফ্রেস্‌কো নানা রঙের, নানা ধরনের। এক পাশে খাওয়ার টেবিল, মোটা থামগুলোর গায়ে গায়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় সান্ত্রীরা লম্বা নিশান হাতে ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। তবে কিছু বেশী ভিড় ছিল। ব্যবস্থাপনায় অনেকেই খুশী হইতে পারেন নাই। রাষ্ট্রপতি এই ভিড়ের মধ্য মিশিয়া গেলেন। এই ভিড় তিনি সহ্য করিতে পারিবেন কি না এ রকম আশংকা আমরা করিয়া-ছিলাম। তবে প্রিন্স ফিলিপ সঙ্গে ছিলেন এবং দেহরক্ষীরাও রাষ্ট্রপতিকে গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি হইতে আড়াল করার চেষ্টা করিতেছিলেন। শেষে রাষ্ট্রপতি ভবনের পিছনে মুঘল উদ্যানে বেড়ান গেল।

এমনিতর রোজই একটা না একটা চায়ের আসর আর অভ্যর্থনা লাগিয়াই ছিল। অনেক বন্ধু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, "আর কিছু নয় ভায়া স্রেফ এই at-home (ভোজ-পর্ব) গুলোর মায়া ছাড়িতে পারি না তাই আসা, আর"... একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "আর ঐ রাতের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো! বিজ্ঞান-কংগ্রেস জিন্দাবাদ।" কিন্তু ২৩ তারিখে দিল্লীর নাগরিকদের অভ্যর্থনা এমন নিরেট বন্ধুদেরও মন স্পর্শ করিয়াছিল। আমি বলিলাম, "হইবেই ত', নারীর কল্যাণ দৃষ্টি যেখানে আছে।" তাও শুধু নারী নন, মহীয়সী নারী, দিল্লীর পৌরসভার মেয়র শ্রীযুক্তা অরুণা আসফ আলী। তিনি দিল্লীর নাগরিক-বৃন্দের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা জানালেন আজাদ পার্কে দিল্লীর টাউন হলের সামনে। পাহারা ঘেরা বাগানের চারিদিকে তখন দলে দলে দিল্লীর নাগরিকরা ভিড় করিয়া ছিলেন, উদ্যানে প্রবেশের তোরণ গুলি ফুলের মালায় সাজান। তোরণে তোরণে দিল্লীর স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা হাতে ফুল উপহার দিয়া সমাদর জানাইলেন। সভায় হাতে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হইল। বিজ্ঞানীদের জন্য এতটা করা হইবে এ কেউ আশা করেন নাই। "আপকো স্বাগত করতে হ্যায়" এই অভ্যর্থনা সঙ্গীতের মধ্যে কোথায় যেন একটা অকপট আন্তরিকতার স্পর্শ ছিল, যা মন কাড়িয়া না নিয়া পারে নাই। তবে পাঞ্জাবী ভাইরা যা ভাংরা নৃত্য দেখাইলেন অর্থাৎ পাঞ্জাবের লোক নৃত্য, তাতে মঞ্চ ভাঙ্গিয়া না যায়, এ রকম ভয় হইতেছিল। গুজরাটি ছাত্রছাত্রীদের "গরবা নৃত্য" বেশ আকর্ষণীয় হইয়াছিল।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য কি অথবা কি হওয়া উচিত তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু এই অধিবেশন মূলত বার্ষিক উৎসব, বিজ্ঞানীদের সামাজিক সম্মেলন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহারাও সামাজিক জীব সুতরাং যাঁহারা এই অধিবেশনে কেবলই গুরুগম্ভীর ব্যাপারাদি আশা করেন তাঁহারা বিজ্ঞানীদের প্রতি অবিচার করিবেন। কে একজন বলিয়াছেন সম্মেলন মানে সং আর মিলন, সুতরাং এখানেও কিছুটা সং থাকিবে আশ্চর্য নয়। তবে মিলনটুকুও তেমনি সত্য। নূতন পরিচয়, নানা আলোচনা,—কখনও গভীর, কখনও হাল্‌কা, স্মৃতির কোঠায় মধুর হইয়া জমা হয়, ভারতের নানা দূর অঞ্চলের প্রাণের স্পন্দন কিছুটা এইখানে অনুভব হয়। এখানে নূতন পরিচয় ও ভাব-বিনিময়ের সুযোগ অযাচিতভাবে আসে। ভিন্ন প্রদেশের অনেকের সঙ্গেও মেলামেশা হইল। তাহার মধ্যে কেহ বা পুণা হইতে, কেহ মালাবার, কেহ বা সুদূর কেরল হইতে আসিয়াছেন। কাহারও গবেষণার বিষয় প্রাণীতত্ত্ব, কাহারও মনস্তত্ত্ব, কাহারও বা মৎস্যতত্ত্ব, কাহারও অন্য শাস্ত্র। যোগাযোগ মন্দ হয় নাই, আমি যে ঘরে ছিলাম তাহার পাশেই ছিলেন কালিকটের এক মৎস্যতাত্ত্বিক। খানায় দুই

বেলা স্থলচর আমিষের আস্বাদ আর সেই সঙ্গে শ্রীজেকভের জলচর আমিষতত্ত্ব! হায় ভগবান কোথায় মৎস্য! এযে যথা বঙ্গ দেশ তথা দিল্লী; সর্বত্রই দেখি—"মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ"-এর নীতি। শ্রীজেকভের সঙ্গে আলোচনা চলিতেছিল তাঁর গবেষণার বিষয়ে। তিনি মৎস্যাশী, কিন্তু মনুষ্য জিভের সঙ্গে মৎস্যকুলের খাদ্যখাদক সম্পর্কে যদি একটা গাণিতিক ফরমুলা পাওয়া যাইত তবে বাঙালীর স্থান কোথায় —এই পর্যন্ত হইতেই ঘরে ঢুকিল শ্রীকরণ সিং, আমাদের আবাসিক ব্লকের ভৃত্য। দিল্লীর নানা শ্রেণীর সঙ্গেই পরিচয় হইয়াছে। কলেজের অধ্যাপক, ছাত্র, পথচারী, বাসচারী দোকানী নাগরিক। কলিকাতার মত দিল্লীর বাসে মহিলা আসন নাই। ইহাতে মহিলাদের সমমর্যাদা দেওয়া হইয়াছে হয়ত; কিন্তু গাড়িতে ওঠার সময় নির্বিচারে যেভাবে কনুই-যুদ্ধ দেখা গেল তাহাতে শালীনতাবোধ সম্বন্ধে কিছু শঙ্কিত হইতে হয়। অন্যদিকে হোস্টেলের পরিদর্শকের মধুর অমায়িক ব্যবহার ভোলার নয়। কিন্তু এই সঙ্গে করণ সিং এর কথা না লিখিলে দিল্লীর একটা শ্রেণী দেখা হয় না। ইহারা মিশনারিদের সৃষ্টি, ভৃত্য না বলিয়া ভৃত্যবাবু বলা চলে। মোটাসোটা গোলগাল মানুষ, হাতে হাত-ঘড়ি, পরনে উত্তম প্যাণ্ট কোট, সেবায় অতুলনীয়। কখনও তুম কখনও জী হুজুর কখনও নমস্কারম্ বলিয়া আসিয়া দরজায় দাঁড়ায়, মুখে এক গাল হাসি। কোথা হইতে করণ সিং এক হেড ফোন জোগাড় করিয়াছে, খোদায় মালুম। সেই তার ধ্যান জ্ঞান। যখন তখন ফুরসুত পাইলেই দেখিবেন কানে-হেডফোন লাগান, দেয়ালে ঠেস্ দেওয়া কড়িকাঠের দিকে চোখ রাখা সেই নাদুসনুদুস মানুষটি। দিল্লী আকাশ-বাণীর কি প্রোগ্রামে সে এমন মত্ত থাকিত কে জানে। তাহার উপর সেই এক গাল হাসি। দেখা মাত্র ওর কলিজার ঝাঁঝরিটা পর্যন্ত যেন দেখিতে পাইতাম। আসার সময় সেই যে "নমস্তে" বলিয়া আমার দুই হাত তার বিরাট থাবার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছিল সে এখনও মনে পড়ে।

মনে পড়ে মহারাষ্ট্রীয়ান শ্রীজয়গীরদারকে। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত তাঁহার সহিত আলাপ হইল। আড্ডার প্রধান স্থান খাওয়ার টেবিল অথবা চায়ের আসর। শ্রীজায়গীরদার মনস্তাত্ত্বিক। বোম্বেতে এ বিষয়ে ও'রা কি কাজ করিতেছেন সেই লইয়া আলাপ হইল। [illegible]-বাদের সহিত আধুনিক মনস্তত্ত্বের কোথায় বিরোধ, প্ল্যাঞ্চেট, থটরিডিং প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, বিদেহী চৈতন্যের অস্তিত্ব আর তাহার সহিত প্রাকৃত জগতের যোগা-যোগ নিয়া আমেরিকা ও জর্মনীতে যে গবেষণা চলিতেছে তাহার সহিত তাঁহাদের যোগাযোগের কথা বলিলেন। এক আমেরিকান ধনী বিধবা, শিক্ষিতা ত' বটেই, ভারতবর্ষে আসিয়াছেন এখানকার যোগাশ্রম-গুলি ঘুরিয়া মনস্তত্ত্বের এই সব জটিল প্রশ্নের কিছু সুরাহা হয় কিনা তারই খোঁজে। ও'র কাছে সেই ভদ্রমহিলার চিঠি দেখিলাম। ও'দের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইতিমধ্যেই তাঁর যোগা-যোগ হইয়াছে। তাঁহার চিঠিতে আছে যে, ভারতবর্ষের আশ্রমে বছরের পর বছর যদি ডাল ভাত খাইয়াও থাকিতে হয় তবু তিনি এ সমস্যার সমাধানের জন্য সব কষ্ট স্বীকার করিবেন। কেননা আমেরিকায় অনেকের নাকি ধারণা ভারতবর্ষই এর সমাধান দিবে। আখ্যানের এইখানে পৌঁছিয়া আমরা দুজনেই হাসিলাম। বলা ভাল, বিজ্ঞান-কংগ্রেস অর্থ শুধু সাংস্কৃতিক সম্মেলন নয়। এরই মধ্যে সকাল ৯টা হইতে বিকাল চারটা পর্যন্ত চলিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞানের আলোচনা-সভা, কে কি গবেষণা করিয়াছেন তার উপরে বিবৃতি। অবশ্য আহারের জন্য ১ ঘণ্টা ছুটি ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত। ১৯১৪ সনে স্বনামধন্য স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কলিকাতায় এশিয়াটিক হলে প্রথম বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অনুষ্ঠান হয়। তখন বিজ্ঞান কংগ্রেস নামে মাত্র ভারতীয়, পরোক্ষভাবে বাংলা—তখনকার কার্যবিবরণীর সঙ্গে আজকের অনেক তফাৎ। দিল্লীতেও ১৯৪৪ ও ১৯৪৭ সালে আরও দুইবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে। সুখের বিষয় আজ এই প্রতিষ্ঠান সত্যই ভারতীয়। কিন্তু এবার অন্যান্য বারের চেয়ে গবেষণা প্রবন্ধ নিয়া আলোচনায় উৎসাহ যে বেশী একথা অংশগ্রহণকারী মাত্রেই স্বীকার করিবেন। তবে একটা বিষয়ে মন্তব্য না করিয়া পারা যায় না। গবেষণা প্রবন্ধের নির্বাচন আরও একটু কঠোর হওয়া বোধ হয় সংগত, যদি বিজ্ঞান কংগ্রেসের গবেষণা পুস্তিকাকে যথোচিত মর্যাদা পাইতে হয়।

বিজ্ঞান আলোচনা সভার যেদিন প্রথম উদ্বোধন হইল সেদিন প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান ছিল করুণ। সেই মাত্র সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ভারতের পরি-কল্পনা কমিশনের সদস্য ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পরলোকে। বৃদ্ধ বিজ্ঞানীদের মুখে বেদনার ছায়া, তারই মধ্যে কর্তব্য শুরু হইল।

বিজ্ঞান কংগ্রেস উপলক্ষে দুইটি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। ভারতে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পের অগ্রগতি দেখান ছিল একটির উদ্দেশ্য। দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কলা-ভবনের চত্বরে, নীচতলা ও দোতালা জুড়িয়া নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান তাঁদের যন্ত্রপাতি সাজাইয়া ছিলেন। অবশ্য অগ্রগতি আশানুরূপ নয় স্বীকার করিতে হয়। দ্বিতীয় প্রদর্শনী দিল্লী বিশ্ববিদ্যা-লয়ের নূতন গ্রন্থাগার ভবনে তার আকর্ষণ উপেক্ষা করা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। শুধু নূতনত্বে নয়, আত্ম-সমীক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র বলিয়াও বটে। ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্য কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাই ছিল প্রদর্শনীর বিষয়। গণিত, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদ-তত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, সমাজনীতি প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা বিষয়ের বই ও পত্র-পত্রিকার আয়োজন। গোটা হল ঘরটার অর্ধেক জুড়িয়া ছিল শুধু বাংলা ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞান সাহিত্যের সম্ভার। বাকী অর্ধেকেই স্থান-সংকুলান হইয়াছে বাকী বারটি ভাষার। হিন্দী ভাষীদের ধন্যবাদ যে তাঁহারা অনেক পরে শুরু করিয়াও আজ বাংলা ভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইয়াছে। যদিও যতটা বিস্তৃতিতে ততটা গভীরতায় নয়। কিন্তু এই আত্মতৃপ্তি মূল্যহীন। বরং আমাদের পক্ষে আফসোসের বিষয় যে স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বিপুল কলেবর রচনাবলীর মত সম্পদ যে সময় বাংলা ভাষায় আসিয়াছিল, তারপর আমাদের গতি প্রায় শম্বুকগতিতে দাঁড়াইয়াছিল। নতুবা এতদিনে আমাদের ইংরাজী ভাষার প্রতিযোগী হওয়ার আশা করাই ছিল স্বাভাবিক। এ বিষয়ে সবচেয়ে অনগ্রসর কাশ্মীরী ভাষা। মাত্র দুখানা বই আসিয়াছে। বাকী ভাষাগুলির মধ্যে তামিল তেলেগু ও কানাড়া বেশ অগ্রসর।

বিজ্ঞান-সাহিত্যে বাংলা ভাষায় আবার উদ্দীপনা আসিয়াছে। শুধু বিজ্ঞান-সাহিত্যে কেন, বিজ্ঞান গবেষণাতেও। এরই সঙ্গে একটা জাতীয় উদ্দীপনার স্ফুলিঙ্গ অনুভূত হইয়াছে। তাই এবারকার গবেষণা পুস্তিকার কলেবরও বিপুল। একটা নূতন সাড়া দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সংগোপনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে সে কথা এখানে আসিয়া অনুভব করিয়াছি বলিয়াই বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনে আসা সফল।

গ্রন্থাগারিক বিপিনচন্দ্র

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজনীতি ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্র পালের প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্য পরিচয় ঢেকে রেখেছে। বিপিনচন্দ্র যে কিছুকাল গ্রন্থাগারিকের কাজ করেছেন সে কথা কম লোকেই জানেন।

১৮৯০ সালের অগাস্ট মাসে বিপিনচন্দ্র কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন নানা কারণে লাইব্রেরির পূর্ব গৌরব ম্লান হয়ে এসেছিল। ১৮৩৫ সাল থেকে এই গ্রন্থাগার কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছে। গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসী-দের নিকট থেকেও অকুণ্ঠ সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল। স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলন শুরু হবার পর থেকে নগরীর সাংস্কৃতিক জীবনে য়ুরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সময় যে-সব ইংরেজ উদ্যোগী ছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই ভারত ত্যাগ করেছেন। বাঙালী অংশীদাররাও* বোধ হয় কেউ আর জীবিত ছিলেন না। তাঁদের বংশধরদের মধ্যে কম লোকেরই বিদ্যাচর্চার আগ্রহ ছিল। সুতরাং পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে গ্রন্থাগারের তখন মুমূর্ষু অবস্থা।

এই গ্রন্থাগারকে বাঁচিয়ে না রাখলে নগরীর সাংস্কৃতিক জীবনের যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা সকলেই উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন। তাই কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে সরকারের তরফ থেকে এককালীন কিছু আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেল। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিও নিয়মিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিল একটি শর্তে। সেই শর্তটি এই যে, গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য একটি কাউন্সিল থাকবে। কাউন্সিলের মোট বারোজন সভ্যের মধ্যে ছয়জন নির্বাচন করবে মিউনিসিপ্যালিটি; ছয়জন থাকবে অংশীদারদের প্রতিনিধি। লাইব্রেরিয়ান হবেন কাউন্সিলের সেক্রেটারী।

১৮৯০ সালের ১০ই এপ্রিল কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি মিউনিসিপ্যালিটির প্রস্তাব অনুযায়ী নবগঠিত কাউন্সিলের পরি-চালনাধীনে আসে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মিঃ লী হলেন কাউন্সিলের সভাপতি। মিউনিসিপ্যালিটির মনোনীত সভ্যদের মধ্যে ছিলেন ঐতিহাসিক বিভারিজ, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মৌলভী সিরাজুল ইসলাম প্রভৃতি।

তখন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ আঙলো-ইণ্ডিয়ান এম গ্রেগরি। গ্রন্থাগারে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবার মতো উদ্যম ও কর্মক্ষমতা তাঁর ছিল না। কাউন্সিল তাঁকে গ্র্যাচুটি দিয়ে চাকরি থেকে বিদায়

দিলেন। লাইব্রেরি বাঁচাতে হলে কর্মক্ষম উদ্যমশীল উপযুক্ত ব্যক্তি আনতে হবে। লাইব্রেরিয়ানের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। পদের বেতনক্রম ১০০৲-১৫৲-২০০৲ টাকা। সে যুগে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে এই বেতন লোভনীয় ছিল। কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থসম্পদের অবাধ ব্যবহারের সুযোগও ছিল আর একটি বড় আকর্ষণ। সুতরাং সত্তর বছর পূর্বেও একটি পদের জন্য প্রায় ২২০টি আবেদনপত্র পাওয়া গেল।

১৮৮৯ সালে বিপিনচন্দ্র লাহোর 'ট্রিবিউনের' দেড়শ' টাকা বেতনের চাকরি ছেড়ে কলকাতা ফিরে এসেছেন। ১৮৯০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিপিনচন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। বিপিনচন্দ্র আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে চাকরির সন্ধান করছিলেন। পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিকের পদ তাঁকে আকৃষ্ট করল। তিনি আবেদন করলেন। আবেদনের সমর্থনে বিপিনচন্দ্রের কোনো প্রশংসাপত্র ছিল না। প্রশংসাপত্রের পরিবর্তে তিনি তাঁর কয়েকটি বক্তৃতার মুদ্রিত কপি কাউন্সিলের সভ্যদের নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি প্রত্যেক সভ্যকে জানিয়ে দিলেন যে আহ্বান করলে তিনি তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন। একমাত্র কাউন্সিলের সভাপতি মিঃ লী বিপিনচন্দ্রকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

প্রায় ২২০ জন প্রার্থীর মধ্য থেকে ৬ জনকে নির্বাচিত করে ১৮ই অগাস্ট (১৮৯০) সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হয়। বিপিনচন্দ্র সর্বসম্মতিক্রমে গ্রন্থাগারিকের পদের জন্য মনোনীত হন। অবশ্য হাইকোর্টের উকীল এবং কাউন্সিলে অংশীদারদের প্রতিনিধি অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই বিপিনচন্দ্র পাল কে? অন্যান্য প্রার্থীদের মতো তিনি তো আমাদের বাড়িতে দেখা করতে যাননি!" তার উত্তরে বিভারিজ বলেছিলেন, 'বিজ্ঞাপন বের হবার পর থেকে উমেদারের জ্বালায় আমাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বিপিনচন্দ্র যে বাড়ি গিয়ে আমাদের বিরক্ত করেননি সে জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।"

১৮৯০ সালের ২০শে অগাস্ট বিপিনচন্দ্র কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক এবং লাইব্রেরি কাউন্সিলের সম্পাদক হিসাবে কাজে যোগদান করেন।

কাজে যোগ দিয়েই বিপিনচন্দ্র স্বেচ্ছায় একটি দায়িত্বের ভার গ্রহণ করলেন। লাইব্রেরি কাউন্সিলের গ্রন্থাগার পুনর্গঠন পরিকল্পনার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল নতুন পদ্ধতিতে ক্যাটালগ সংকলন করা। শুধু এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করবার জন্য অতিরিক্ত লোক নেবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। বিপিনচন্দ্র বললেন, নতুন পদ্ধতিতে তিনিই লাইব্রেরির বই ক্যাটালগ করবেন; নতুন লোক নিযুক্ত করবার প্রয়োজন নেই। বিভারিজ সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী বিপিনচন্দ্র কয়েকজন সহকর্মীর সহায়তায় অল্প সময়ের মধ্যেই নতুন পদ্ধতিতে ক্যাটালগ সম্পূর্ণ করেন। পূর্বে বইগুলি প্রায় কুড়িটি বিষয় অনুসারে ভাগ করে

* কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শেয়ার বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল।

প্রত্যেক ভাগের জন্য পৃথক লেখক সূচী করা হত। কোন বই কোন বিভাগের অন্তর্গত তা জানা না থাকলে, অথবা সঠিকরূপে অনুমান করতে না পারলে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে বই খুঁজে পাওয়া এক সমস্যা ছিল। বিপিনচন্দ্র বিষয়-বিভাগের সংখ্যা খুব কমিয়ে এবং প্রচুর পরিমাণে ক্রস্-রেফারেন্স ব্যবহার করে পাঠকদের সহজে প্রয়োজনীয় বই খুঁজে পাবার সুযোগ করে দিলেন।

সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটি নিঃশুল্ক রীডিং রুম খোলবার শর্তে মিউনিসিপ্যালিটি আর্থিক সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছিল। সুতরাং বিপিনচন্দ্রকে এই রীডিং রুম জনপ্রিয় করবার দায়িত্বও নিতে হয়েছিল। তাঁর চেষ্টা যে সফল হয়েছিল তা সমসাময়িক পরিসংখ্যান থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে। ১৮৯০ সালের জুলাই মাসে রীডিং রুমে গড়ে ২১ জন পাঠক প্রতিদিন আসত; পর বৎসর মার্চ মাসে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল অ্যাশির কোঠায়। মেটকাফ হলের এই রীডিং রুম সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকত। আর লেনডিং বিভাগ খোলা থাকত বেলা ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

বিপিনচন্দ্র আগ্রহ সহকারে কাজ শুরু করলেও বেশীদিন শান্তিতে থাকতে পারলেন না। তার প্রধান কারণ এই যে, কাউন্সিলের বারোজন সভ্যই নিজেকে গ্রন্থাগারিকের প্রভু বলে মনে করতেন। বিপিনচন্দ্র যা কর্তব্য মনে করতেন সেই কাজ করে যেতেন। সবাইকে সন্তুষ্ট করবার মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না। সুতরাং শীগ্গিরই বিরোধ দেখা দিল। বর্তমানেও যাঁরা কোনো কমিটির অধীনে কাজ করেন তাঁদেরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা আছে।

প্রথম সংঘাত দেখা দিল বিপিনচন্দ্রের উপস্থিতির সময় নিয়ে। সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত রীডিং রুম খোলা থাকত বলে বিপিনচন্দ্র কোনো নির্দিষ্ট সময়ে লাইব্রেরিতে আসতেন না। কখনো সকালে কখনো দুপুরে আসতেন। গ্রন্থাগারের কাজ কি রকম চলছে তা দেখবার জন্য এক এক দিন এক এক সময়ে আসা তাঁর নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। কিন্তু কাউন্সিলের একজন সভ্য বিপিনচন্দ্রের উপস্থিতির নির্দিষ্ট সময় নেই দেখে, হাজিরা খাতায় অপমানজনক মন্তব্য করে যান। বিপিনচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে সেই সভ্যকে জানিয়ে দিলেন যে, লাইব্রেরিয়ানের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে তিনি যেন সে বিষয়ে কাউন্সিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; আফিসে প্রবেশ করে এরূপ অভদ্র মন্তব্য করলে লাইব্রেরিয়ান তাঁকে বের করে দিতে বাধ্য হবেন। বিপিন-চন্দ্রের এই প্রতিবাদ কাউন্সিলের কোনো কোনো সভ্য অপমানকর বলে মনে করলো। তার উপর অডিট রিপোর্টে বিপিনচন্দ্রের বিরুদ্ধে কতকগুলি অভিযোগ থাকায় অবস্থা আরো জটিল হয়ে উঠল।

অডিট রিপোর্টে তাঁর বিরুদ্ধে দুটি প্রধান অভিযোগ ছিল। একটি হল এই যে, অনুমোদিত নিয়ম লঙ্ঘন করে লাইব্রেরির অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। আর একটি এই যে, বিপিনচন্দ্র অন্যায়ভাবে নিজের জন্য লাইব্রেরির অর্থ ব্যয় করেছেন। রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, তিনি বাড়ি থেকে লাইব্রেরিতে আসবার জন্য গাড়ি ভাড়া নিয়েছেন; এবং নিজের স্বাস্থ্যের জন্য লাইব্রেরির অর্থে আরাম-কেদারা কিনেছেন। রিপোর্টের সিদ্ধান্ত এই:

Babu Bepin Chandra Pal has altogether been fallinng in his duties as Secretary......

বিপিনচন্দ্র একাধারে পাবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক ছিলেন। সম্পাদক হিসাবে তাঁকে লাইব্রেরির আফিস পরি-চালনা করতে হত। এই কাজে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি বলে রিপোর্টে অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগারিক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে কখনো প্রশ্ন ওঠেনি।

বিপিনচন্দ্র অডিট রিপোর্টে উত্থাপিত অভিযোগের যুক্তিপূর্ণ দীর্ঘ উত্তর দিয়ে-ছিলেন। অনভিজ্ঞতার জন্য যে কিছু ভুল করেছেন একথা স্বীকার করতে তিনি দ্বিধা করেননি। যাই হোক, ক্রমশ এই পরিবেশে কাজ করতে অস্বস্তিবোধ করায় বিপিনচন্দ্র পদত্যাগ করেন। লাইব্রেরি কাউন্সিলের সভাপতি মিঃ লী কিছুদিন পরে বিপিন-চন্দ্রকে মিউনিসিপ্যালিটির লাইসেন্স ইনস্পেক্টরের চাকরি দিয়েছিলেন। বিপিন-

চন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলি সত্য হলে লী তাঁকে এই চাকরি দিতেন না।

বিপিনচন্দ্র মাত্র বছর দেড়েক কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি গ্রন্থাগারের সম্পদ ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে গগনচন্দ্র হোম তাঁর "জীবন-স্মৃতি"তে* লিখেছেনঃ "সুহৃদ্বর বিপিনচন্দ্র যখন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির—এখন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—সম্পাদক, তখন আমি সিটি কলেজ ছাড়িয়া তাঁহার সহকারীর কার্য গ্রহণ করি। আমার এই কাজ লইবার প্রধান প্রলোভন ছিল অধ্যয়নের সুযোগ। যে কয় বৎসর পাবলিক লাইব্রেরির কাজে ছিলাম, সে কয় বৎসর প্রাণ ভরিয়া নানা বিষয়ে পড়িয়া লইয়াছিলাম। আমার এ জ্ঞানচর্চায় সঙ্গী ও উৎসাহদাতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র। লাইব্রেরিতে কোন নূতন বই আসিলেই তিনি নিজে তাহা না পড়িয়া ও আমাকে না পড়াইয়া ছাড়িতেন না।"

বিপিনচন্দ্রের পরে রাধারমণ মিত্র গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। কিন্তু কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরির অবস্থার উন্নতি হল না। ১৯০২ সালে ভারত সরকার অংশীদারদের টাকা দিয়ে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি ক্রয় করেন এবং পর বৎসর নতুন ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির দ্বার জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরি ছিল সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য বিভাগীয় গ্রন্থাগার। নতুন ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে বিপিনচন্দ্র "নিউ ইণ্ডিয়ায়" (জুন ২, ১৯০২) যে মন্তব্য করেছিলেন নিম্নে তার মর্মানুবাদ দেওয়া হল ঃ

"প্রত্যেক সভ্য দেশে পাবলিক স্কুল, পলিটেকনিক, মিউজিয়াম ইত্যাদির ন্যায় সাধারণ গ্রন্থাগারও সরকারী অর্থে পরিচালিত হয়ে থাকে। ভারত সরকার এ বিষয়ে তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন দেখে আমরা আনন্দিত। অনেক দেশে—বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে—রাজ্য সরকার অথবা মিউনিসিপ্যালিটি শুধু যে গ্রন্থাগারে বসে বই পড়বার সুযোগ দেয় তাই নয়; অবসর সময়ে পড়বার জন্য নাগরিকদের নির্দিষ্ট সংখ্যক বই বাড়িতেও নিতে দেওয়া হয়। এর জন্য চাঁদা দিতে হয় না। বোস্টন শহরে যদি এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়ে থাকে তাহলে কলকাতায় তার প্রয়োজন আরো বেশী। সেখানে এমন অনেক লোক আছে যারা অবসর ভোগ করে; এমন নরনারী আছে সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চাই যাদের জীবিকার্জনের পথ। তাদের পক্ষে লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনা করতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু কলকাতার নাগরিকদের তেমন সুযোগ নেই। জীবিকার্জনের জন্য তাদের উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হয়। কাজের ফাঁকে হয়ত আধঘণ্টা পড়বার সুযোগ হতে পারে। সুতরাং বই বাড়ি এনে পড়বার সুযোগ থাকা অত্যাবশ্যক। আমরা জানি কলকাতা লণ্ডন নয় এবং মেটকাফ হলের লাইব্রেরিকে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের সঙ্গে তুলনা করা চলে না। তথাপি একথা বলা চলে যে, এই গ্রন্থাগারকে কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের সহায় এবং যথার্থ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে উৎসুক হন তাহলে সকাল ছ'টা থেকে রাত্রি সাড়ে ন'টা পর্যন্ত পাঠকদের বই পড়বার সুযোগ দিতে হবে এবং বিনা চাঁদায় বাড়িতে বই নেবার ব্যবস্থাও থাকা চাই।"

বিপিনচন্দ্রের আদর্শানুযায়ী নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার কলকাতায় আজও স্থাপিত হয়নি। শীঘ্র হবার লক্ষণও দেখা যায় না। বিপিনচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবের পটভূমিকায় এরূপ স্বীকৃতি আমাদের পক্ষে পরিতাপের বিষয়।

* গগনচন্দ্র হোমের "স্মৃতি-কথা" শ্রীযুত অমল হোমের সৌজন্যে দেখবার সুযোগ পেয়েছি।

চিত্র প্রদর্শনী

গত সপ্তাহে মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। ইনি ছবি প্রদর্শন করেছিলেন সব সমেত ৬০টি। জল রঙের ছবির সংখ্যাই ছিল বেশী। তেল রঙ এবং গ্রাফিক আর্ট-এর নিদর্শনও প্রদর্শন করা হয়েছিল। সংখ্যায় অল্প হলেও তেল রঙের ছবিগুলিই অপেক্ষাকৃত রসোত্তীর্ণ মনে হয়েছে আমাদের কাছে। রাত্রিকালে কৃত্রিম আলোয় চারপাশের অন্ধকারের মধ্যে অতি বাস্তব উপাখ্যান-বস্তুও যে রূপকথায় রূপান্তরিত হতে পারে তা পরিণত বর্ণকৌশলে শিল্পী প্রকাশ করেছেন তাঁর তেল রঙের ছবি 'এ ট্রিপ অন দ লণ্ড', 'ইটিং হাউস', 'গ্যাদারিং', 'ইমারসন' প্রভৃতি রচনায়। শিল্পী তাঁর মনের কথা প্রকাশ করেছেন স্পষ্টভাবে। এসব ছবি উপভোগ করতে দর্শককে কিছুমাত্র মাথা ঘামাতে হয় না। অথচ লক্ষ্য করবার বিষয়, প্রকৃতির কোনও একটা চাক্ষুষ পরিচয়মাত্রকে শিল্পে ব্যক্ত করে শিল্পী মনে করেননি যে যথেষ্ট হল। শিল্পী বেশ অনুভব করেন যে তাঁর চোখ তাঁকে যেটুকু দেখায় কেবল সেটুকুই তদ্বৎ করে আঁকলেই তাঁর মনের কথাটা ঠিক বলা হয় না। এসব কারণেই মাঝে মাঝে যতটা দেখেছেন তার থেকে বাড়িয়ে বলেছেন। কিন্তু কোথাও অনাবশ্যক অপ্রাসঙ্গিক অতিস্পষ্ট, অত্যুক্তি নেই। সুতরাং আদর্শ বিপর্যয় ঘটেনি। 'দি উইকলী ভিলেজ মার্কেট', 'স্কেয়ারক্রো' এবং 'শপারস' এ কটি তৈলচিত্রও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৈল চিত্রণে ইনি প্রায় সব ক্ষেত্রেই গাঢ় এবং উজ্জ্বল বর্ণ প্রয়োগ করেছেন কিন্তু জল রঙের ছবিতে ঐ গাঢ় এবং উজ্জ্বল বর্ণের উপস্থিতি নেই। জলরঙের রচনাগুলি মৃদু ওয়াশ প্রকরণে বর্ণিত। অনেক সময় হাল্কা সিলোয়েট-এর মত মনে হয়েছে। ইচ্ছাকৃত হলেও শিল্পীর এ শৈলী মনে হয় ড্রইং'। স্টুডিওর মধ্যে বসে যত্ন নিয়ে ঐসব স্টাডীগুলিকে বড় পেইন্টিং-এর আকার দেবার চেষ্টা শিল্পী করেননি। সুতরাং আমরা জলরঙের স্কেচ হিসেবেই এগুলিকে বিচার করব; ঠিক জল রঙের পেইন্টিং-এর মর্যাদা এগুলিকে দেওয়া যায় না। যাই হোক, উল্লেখযোগ্য রচনা 'এ বড়বাজার লেন', 'দি মিউলস', 'পাম ট্রী' এবং 'অন দি ওয়ে'। যেন ছবিগুলিকে অসম্পূর্ণ রেখে দিয়েছে। বিশেষ বিশেষ স্থানে দু-চারটি বলিষ্ঠ বর্ণের রেখা অথবা আরও দু-একটি রঙের পোঁচ পড়লেই মনে হয় যেন ছবিগুলি সম্পূর্ণ হত। যেসব রচনাগুলিতে গাঢ় রেখার বেষ্টনীর মধ্যে শিল্পী আকৃতিকে ধরে ওয়াশের প্রয়োগ করেছেন সেগুলি অপেক্ষাকৃত রসোত্তীর্ণ বলে মনে হয়েছে। এ'র বেশীর ভাগ জলরঙের ছবিই স্পট গ্রাফিক আর্ট-এ শিল্পী মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন 'আনকোয়েণ্ড', 'রিটার্নিং', 'দি হওক' এবং 'গসিপ' এ কটি রচনায়।

শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর চিত্রকলায় মডার্নিস্টিক আর্টের মেজাজ নেই। যাঁরা প্রথাগত ড্রইং, বর্ণিকা পরিপ্রেক্ষিত, কম্পোজিশন প্রভৃতি দেখে পুলকিত হন তাঁরা এ'র চিত্রকলা দেখে আনন্দ পেয়েছেন নিশ্চয়। —চিত্রগ্রীব

'পাম ট্রী'

'অন দি ওয়ে'

তিন

বড় বউ হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন গিরিবালা খাটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে মেঝেয় বমি করছে।

বছর পনের বয়েস গিরিবালার। শ্যামবর্ণ। মাঝারি গড়ন। এক মাথা কোঁকড়ান কালো চুল। দু-চারগাছি কপালের উপর এসে পড়েছে। প্রথম মাতৃত্বের লাবণ্যের ঢল নেমেছে গিরিবালার গোটা শরীরে। যেন নতুন বর্ষার বিল একখানা।

গিরিবালা শ্রান্ত চোখ দুটো তুলে বড় বউয়ের দিকে চাইল। তারপর মৃগী রোগীর মত লাফিয়ে উঠে জাপ্টে ধরল বড় বউকে।

হাউমাউ করে চেঁচাতে লাগল গিরিবালা।

"বড়মা, ও বড়মা, তুমার দুটো পায় পড়ি বড়মা, আমার মাথার দিব্যি, তুমার ঠাকুরির দিব্যি, আমারে ঐসব ছাইভস্ম খাওয়ায়ে না। আমি আর তালি বাঁচব না। ও বড়মা, তুমারে ব্যাগ্যাতা করি......"

গিরিবালার কাণ্ড দেখে বড় বউ ঘাবড়ে গেলেন।

"ও মা বুড়ি, অমন উতলা হচ্ছ ক্যান? কি হয়েছে? ঠাণ্ডা হও। কিসির কথা কতি চাচ্ছ, কও দিন। সুস্থির হয়ে কও।"

গিরিবালার উত্তেজনা এক নিমেষে জুড়িয়ে গেল। অবসাদ এসে তাকে গ্রাস করল। খাটের উপর নেতিয়ে পড়ে চোখ বুজে হাঁফাতে লাগল। বড় বউ তার সারা গায়ে, মাথায় পরম আদরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

কাঁদো কাঁদো গিরিবালা অতি ক্ষীণস্বরে বলল, "অন্ন যা আইনছে তা আমারে খাওয়ায়ে না, দোহাই তুমার।"

বড় বউ আরও আশ্চর্য হলেন।

"কি আইনছে অন্ন, হ্যাঁ মা, কও দিন? আমি তো বুঝতি পারতিছি নে।"

কথাটা স্মরণমাত্রেই আবার পেট গুলিয়ে উঠল গিরিবালার। ওয়াক্ তুলল বার দুই। তবে এবার আর বমি হ'ল না। এইটুকু পরিশ্রমেই হাঁফিয়ে উঠল গিরিবালা। হাপরের মত বুকখানা উঠানামা করতে লাগল। ধামার মত পেটটায় বার কয়েক চাপ পড়ল।

গিরিবালা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "ঐ যে তাঁতি বউয়ের পা ধুয়োনো জল আনিছে অন্ন। আমি সে বউডেরে দেখিছি। তার দুডো পায়েই হাজা। একেবারে থ্যাক থ্যাক করছে......ওয়াক্ ওয়াক্......ও আমি মরে গেলিউ খাতি পারব না......ওয়াক্......খাতি গেলেই মরে যাব।"

গিরিবালার পেটে ঈষৎ একটা মোচড় লাগল। কপালে ঘামের বিন্দু ফুটে উঠল। বড় বউ আঁচল দিয়ে গিরিবালার মুখ মুছিয়ে দিলেন। হাতপাখার বাতাস করলেন কিছুক্ষণ।

বললেন, "দ্যাখ দিনি মেয়ের কাণ্ডজ্ঞান। ও চাঁপা, এক ঘটি জল আন, ফুলির মারে ক' তো, মাঝেড়া মুছে দিয়ে যাক। ও মা, বুড়ি! ভয় নেই, ওসব ছাইভস্ম তুমার খাতি হবে ক্যান? বালাই ষাট!"

গিরিবালার ধড়ে এতক্ষণে যেন প্রাণ এল। অজানা এক আতঙ্কে দেহের স্নায়ুগুলো ধনুকের ছিলের মত এতক্ষণ টান টান হয়ে ছিল। এবার তারা শিথিল হ'ল। চাঁপা জল আনল। বড় বউ একটু একটু করে জল নিয়ে গিরিবালার মুখ, চোখ, কপাল, ঘাড়, দু-কানের পিছনটা বেশ করে ধুয়ে দিলেন। ফুলির মা এসে ঘর মুছে দিল।

বড় বউ জিজ্ঞাসা করলেন, "ও ফুলির মা, রান্না হয়েছে?"

ফুলির মা ঘাড় নাড়ল। হ্যাঁ।

"তবে যাও, মা'জে কত্তারে খাতি দাও গে। ছোট বউরি চ্যান করায়ে দিতি কও। ও ফুলির মা, একটু দাঁড়াও, তুমার গুড়োর কোটোডা দেখি।"

ফুলির মা গুড়ো তামাকের কোটো আঁচলের গিঁট খুলে বের করে দিল। বড় বউ বেশ করে দাঁতে মিশি মেখে নিলেন, উঠে গিয়ে উঠোনে পিচিৎ করে খানিকটা থ্যাপ ফেলে ফুলির মার হাতে কোটোটা ফেরত দিয়ে গিরিবালার পাশে এসে বসলেন। সস্নেহে চাঁপাকে ডাকলেন।

"মণিরে, যাও চ্যান ক'রে নাও গে। আজ একা একাই নায়ে নিও কেমন? দিদির শরীরডে খারাপ হয়েছে কি না, আমি একটু ওর কাছে থাকি।"

বড় বউয়ের কথার সঙ্গে সঙ্গে মিশির গুড়ো ফস ফস করে এদিক ওদিক উড়ে যাচ্ছিল।

চাঁপা খিল খিল করে হেসে উঠে বলল, "বড় মা, কথা কয়ে না, তুমার মুখির গুড়ো তালি বড়দির চোখে উড়ে পড়বেনে।"

বড় বউ হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। তারপর হেসে ফেললেন।

বললেন, "মেয়ের দিনকের দিন বিচ্ছি হচ্ছে, অ্যাঁ। ফাজলেমি রাখে যা কই মন দিয়ে শোন। বেশ করে তেল মাখবা,

বুঝিছ। গায়, মুখে, পায়ে। তেল মাখে আমারে দেখায়ে তারপর চ্যান করতি যাবা। বুঝলে?"

বড় বউয়ের কথা শেষ না হতেই চাঁপা অদৃশ্য। বড় বউএর মনটা খচখচ করতে লাগল। তেলটা ভাল করে চাঁপা মাখবে কি না কে জানে? তেলে জলেই শরীর। ঐ টুকু মেয়ে, ওকি আর নিজে নিজে মাখতে পারে তেল? নাঃ।

বড় বউ ডাক দিলেন, "ও চাঁপা, তুই আমার কাছেই আয়। তেলের বোতলডা নিয়ে আয় এখেনে।"

ব্যাচারি চাঁপা! ভেবেছিল এই একটা দিন যদি বড়মার কবল থেকে রেহাই পায়! বড়মার হুকুমে মুখখানা ব্যাজার করে তেলের বোতলটি নিয়ে হাজির হ'ল।

গিরিবালা শুয়ে শুয়ে রগড় দেখছিল। বড়মার কাছে তেল মাখা যে কি শাস্তি, গিরিবালা তা জানে। বড়দাও জানে। বাইরে চাকরিতে গিয়ে বড়দা বেঁচে গেছে। শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে সেও বেঁচে যাবে। তখন সব কোপ গিয়ে পড়বে চাঁপার উপর।

বড় বউ ততক্ষণে চাঁপার বিনুনি খুলে ফেলেছেন। চিরুনি চালাচ্ছেন তার চুলে। মুখ গোমড়া করে দুই হাঁটুতে মুখ ঠেকিয়ে চাঁপা বসে আছে।

গিরিবালার হাসি পেল।

বলল, "এই চাঁপা, মুখখানারে বেগুন বেচা ক'রে রাখিছিস ক্যানে।"

সে কথার জবাব না দিয়ে চাঁপা চেঁচিয়ে উঠল, "উঃ বড়মা, লাগে।"

চাঁপার রকম দেখে গিরিবালা মনে মনে হাসতে লাগল। চাঁপাকে চটাবার জন্য বলল, "লাগে না হাতি। মেয়ে একেবারে ফুলির ঘায় মুচ্ছো যাবেন।"

চাঁপা খরখর করে উঠল, "দ্যাখ বড়দি, তুই রুগী রুগীর মত থাক, ফোড়ন কাটিসনে তো।"

বড় বউ ধমকে উঠলেন, "আ গেল যা। মেয়ের কথার ছিরিডে দ্যাখ দিন। ও রুগী হতি যাবে ক্যান। বালাই ষাট।"

চাঁপা অপ্রস্তুত। গিরিবালা মুখ গুঁজে হাসতে লাগল। বড় বউ কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে চাঁপার চুলের জট ছাড়াতে লাগলেন। দাঁত ভাংগা চিরুনি। মাঝে মাঝে চুলের মধ্যে আটকে গিয়ে পট পট করে চুল ছিঁড়তে লাগল। ব্যথা লাগলেও প্রচণ্ড অভিমানে চাঁপা মুখ বুজে থাকল। উচ্চ-বাচ্য করল না। জানে, করলেও ফল হবে না। বাঘে ধরলেও কখনও কখনও নিস্তার মেলে, কিন্তু বড়মার কাছ থেকে ছাড়ান নাস্তি। চাঁপা জানে, এখন জবজবে করে সারা শরীরে তেল মাখতে হবে। তারপর খইল দিয়ে সর মেশান হলুদ বাটা দিয়ে ঘষে ঘষে তা তুলতে হবে। তারপর পুকুরের জলে নেবে দুটি কি তিনটি ডুব। ব্যস্। গায়ে যত খুশি জল ঢাল আধ ঘণ্টা না হয় জলে গলা ডুবিয়ে বসে থাক। কিন্তু মাথায় বেশি জল দেওয়া চলবে না। চুলের তেল ধুয়ে ফেলা চলবে না। মাথা রুক্ষ হয়ে গেলে রং জ্বলে যাবে চুলের। কালো কুচ-কুচই যদি করতে না থাকল, তবে সে আর চুল কি? বড় বউএর এসব দিকে বড় কড়া নজর।

চার

কড়া নজর ছোট বউয়েরও।

অয়েল ক্লথটা পরিপাটি করে ছেলেকে যত্ন করে শুইয়ে দিলেন। রাজপুত্তুর ঘুমিয়ে পড়ল। ও ঘুমিয়েই থাকে। পাখার বাতাস করতে করতে ছোট বউ ভাবলেন, তা এক রকম ভালই। ডাইনি মাগীদের চোখের আড়াল পড়বে। জানতে পারলে কি রক্ষে রাখবে না কি, ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে না রাজপুত্তুরকে। তাই তো এত সতর্কতা ছোট বউয়ের। তাই এত কড়া নজর।

একটা সুন্দর কাঁথা দিয়ে ছোট বউ আপাদ মস্তক ঢেকে দিলেন রাজপুত্তুরকে। একটু নিশ্চিন্ত হয়েছেন কি, কড় কড় করে বাজ পড়ল। চমকে উঠলেন ছোট বউ। ষাট ষাট। রাজপুত্তুরের গায়ে আদরে হাত বুলিয়ে দিলেন। যদি চমকে উঠে পড়ত? কেঁদে উঠত রাজপুত্তুর? তাহলে? তাহলে আর কি, ভারি সুবিধে হ'ত ডাইনিটার। কান্নার শব্দ শুনে শুনে এই ঘরে এসে হাজির হ'ত। তারপর রাজপুত্তুরের গলাটি মটটাস্। মটরশুঁটির কাঁচ ডগার মত ভেংগে দিয়ে যেত হারামজাদি।

হঠাৎ ছোট বউএর মাথায় ঝিলিক খেলে গেল। সুর করে বলে উঠলেন, "কিন্তু গলাটা পেতে কোথায়, গলাটা পেতে কোথায়। হুঁ হুঁ, নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে। দেখ, খুঁজে দেখ, কোথায় রাজপুত্তুর। কোথায়, বের কর।" ছোট বউ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অকস্মাৎ হাততালি দিয়ে নাচতে শুরু করলেন। গান ধরলেন। "খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি। খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।" বাতাসকে লক্ষ্য করে বললেন, "খোঁজ হারামজাদি, খোঁজ। ভাবছিস খাটের উপর শুয়ে আছে। এই দ্যাখ।" একটানে কাঁথাটা তুলে ফেললেন ছোট বউ। একটা কোল বালিশ শোয়ান রয়েছে সেখানে।

ডাক দিলেন, "কই আয়? গলা ছেঁড়?" খলখল করে হেসে উঠলেন প্রচণ্ড উল্লাসে। "কলা খা, কলা খা। দুয়ো দুয়ো দুয়ো।"

আবার সশব্দে একটা বাজ পড়ল। ছোট বউ একছুটে জানলার কাছে গিয়ে আকাশ পানে চেয়ে তারস্বরে ধমক দিলেন, "এই ও, চোপরাও।"

নরা ছোট বউএর ঘরের দাওয়ায় বসে তামাক সাজছিল। পিছনে ছোট বউয়ের ধমকের আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠেই দিল দৌড়। এক দৌড়ে একেবারে বাপের কাছে।

রামকিস্টো জিজ্ঞাসা করল, "কি রে?"

ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে নরা ছোট বউয়ের ঘরের দিকে আংগুল দেখিয়ে বলল, "পাগল।"

রামকিস্টো বলল, "তাতে হয়েছে কি?"

নরা বলল, "আজ খুব বাড়ছে মনে হচ্ছে।"

রামকিস্টো বলল, "বাড়ুক, তোর তাতে কি?"

নরা ভয়ে ভয়ে বলল, "যদি মারে?"

রামকিস্টো ভীষণ চটে গেল। বুনো পাড়ার সর্দাররা কজন এসে গেছে। হাতে হাতে কাজ চলেছে জোর। অমানুষিক পরিশ্রমে ওরা কুঁড়েটা খাড়া করে ফেলেছে। চারিদিকে পগার কেটে উঠোনের জলও কমিয়ে ফেলেছে। ভালমত একটা বেড়া এবার বেঁধে দিতে পারলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। এই কি তার ন্যাকরা করার সময়। রামকিস্টো মনে মনে তার বউকে গাল দিতে

লাগল। কি এক গুণধরই বিইয়েছিল মাগী। জন্মাসেই মরেছে ছেলেটা।

রামকিষ্টো ছেলের গালে ঠাস করে একটি চড় মারবার ইচ্ছে অতিকষ্টে দমন করল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "দ্যাখেক যদি আপান খাতি না চা'স তো আমার সামনের পথ সরে যা।"

নরা ভয়ে ভয়ে বাপের কাছ থেকে সরে গিয়ে ছোলেমান নিকিরির পায়ে পায়ে ঘুরতে লাগল।

নতুন কুঁড়েটার উপর ছোট বউয়েরও চোখ পড়ল। খুব গম্ভীর হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরামিদের কাজ দেখতে লাগলেন তিনি। প্রথমে মাথায় কিছুতেই ঢুকল না, ওরা ওখানে জড় হয়ে করছে কি? বৃষ্টিতে ভিজছে। তা ভিজুক। দরজায় যে বাইরের থেকে শিকল দেওয়া। নইলে তিনিও একটু ভিজতেন।

ও সর্বনাশ! এক পলকে ছোট বউ সব বুঝে ফেললেন। ওরা যে কুঁড়ে বানাচ্ছে! আবার এক রাজপুত্তুর আসছে তাহলে।

কি একটা কথা, কি একটা ব্যথা যেন ছোট বউয়ের অন্তরের অন্তস্তল থেকে ভেসে উঠতে চাইছে। কিন্তু পারছে না। মানসিক জটিলতার গোলকধাঁধার ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে। কথাটা স্পষ্ট হয়ে ফুটছে না, ব্যথাটা তীব্র হয়ে উঠছে না। কেমন যেন অস্বস্তি। লাগছে ছোট বউয়ের। অনেকক্ষণ ধরে শান্ত হয়ে আছেন। জানালার গরাদের উপর বুকটা জোর করে চেপে ধরে বুক-ঝিমঝিম ভাবটার উপশম চাইছেন। ঝরঝর করে বৃষ্টি ঝরছে। মক মক মক, ব্যাঙেরা ঐকতান গান জুড়েছে পাছ দুয়ারের পুকুরটাতে। গোয়াল থেকে রাঙগী গাইটা হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়ছে। সব যেন নতুন করে শুনতে পাচ্ছেন ছোট বউ। এমন কি পুবদোরের পাশের হাজারি গাছটার রসখাজা-কাঁঠালগুলোও যেন ছোট বউয়ের চোখের উপর নতুন স্বপ্নের মত ফুটে উঠল।

হ্যাঁ, একটু একটু করে যেন তাঁর মনের উপরকার ভারি পর্দাটা সরে যাচ্ছে। বছর বারো আগেও যেন এই রকম একটা সমারোহ এই বাড়িতে হয়েছিল। ঐ রকম একটা উদ্বেগ ছোট বউয়ের মনের সেই বউকে যেন তার মধ্যে ঢোকান হয়েছিল। তারপর? হ্যাঁ, তারপর যেন কি হ'ল? কি হ'ল তারপর? মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না। মনের যে ঘটের মধ্যে এই সব কথা জমান তার উপর একটা পাথর পড়ে আছে। ভারি পাথর। নাম-না-জানা একটা উদ্বেগ ছোট বউয়ের মনের সেই ঘটটা ধরে প্রাণপণে ঝাঁকি দিতে শুরু করল। তার মনের কোন কোণের অন্ধকারে যন্ত্রণার একখানা ধারাল ছবি যেন ঝুলে ছিল। ঝাঁকি মেরে সেইখানাই খুলে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ছোট বউয়ের অন্তরাত্মা প্রচণ্ড আঘাতে দু ফাঁক হয়ে গেল। কি যন্ত্রণা, কি অসম্ভব প্রদাহ।

হঠাৎ ছোট বউয়ের দিব্য চক্ষু খুলে গেল। সব মনে পড়ে গেল। সব। এক রাজপুত্তুর এসেছিল তাঁর কোলে। হিংসেয় সব মাগীর বুক ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। হবে না কেন? আর সবার কোলে বাঁদরছানা, শুধু তাঁর কোলেই এসেছিল রাজপুত্তুর। সহ্য হবে কেন ওদের। সব চাইতে বজ্জাত ঐ ননদটা। ওটা আসলে ডাইনি। ভাতার-পুতের মাথা চিবিয়ে খেয়ে এ বাড়িতে এসেছে। ঐ ডাইনিই তো তাঁর রাজপুত্তুরের ঘাড় মটকে রক্ত চুষে খেয়েছে। তারপর রাংতার কাদায় পুঁতে রেখে এসেছে রাজপুত্তুরের দেহটা। রাজপুত্তুর কিন্তু মরেনি। ওরা তো মরে না, শুধু দেহ বদলায়। ঐ যে সুন্দর শালুক ফোটে, লাল টুকটুকে পদ্ম ফোটে বাওড়ে, ও গুলো কি? ওরাই তো রাজপুত্তুর। শালুককুমার, পদ্মকুমার।

ছোট বউএর শান্তভাব আবার কেটে যেতে থাকে। অস্থিরতা বাড়ে। মাথা গরম হয়ে ওঠে। ডাইনি মাগীর উপর আক্রোশ ফেটে পড়ে। তাকে মারবার নানা ফন্দী মাথায় ভাসতে থাকে। ওতো আর এমনি মরবে না। ভাতুড়ে পুকুরের পশ্চিম কোণায় জলের নিচে রূপোর একটা কৌটো পোঁতা আছে। কৌটোর মধ্যে আছে এক কালো কুচকুচে ভোমরা। সেই ভোমরাই ডাইনি মাগীটার প্রাণ। আমাবস্যের ঘুরঘুটি রাতে, এলোচুলে এক নিঃশ্বাসে ডুব দিয়ে কৌটোটা তুলে আনতে হবে। তারপর ভোমরাটা বের করে দুই আঙুলে ধরে একটানে ঘাড়টা ভেঙে ফেলতে হবে। বাস্, তাহলেই আপদের শান্তি। ছটফটিয়ে মরবে মাগী। মনটা খুশিতে ভরে ওঠে
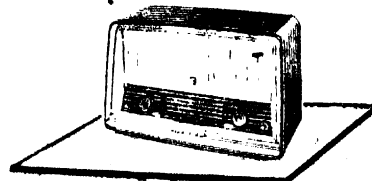
ছোট বউএর। মাথাটা অনেক হাল্কা হয়ে যায়। গরাদে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে হি হি করে হাসতে থাকে আপন মনে। নরা দূরে থেকে ভয়ে ভয়ে চায়।

তারদিকে ছোট বউয়ের নজর পড়তেই হাঁক ছাড়েন তিনি, "এই বরকন্দাজ, ইধারে আও।"

নরা পড়িমড়ি করে লাগায় ছুট।

পাঁচ

গিরিবালার ব্যথা উঠল বেলা থাকতে থাকতেই। যন্ত্রণার চেয়ে লজ্জাটাই প্রথমে বড় হয়ে উঠেছিল ওর কাছে। তাই কাউকে কিছু বলেনি। কেমন এক অজানা আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল ওর মনে। ক্রমেই অসহায় বোধ করেছিল সে। বারকয়েক পায়খানায় গেল। স্বস্তি পেল না। বিছানায় এসে এলিয়ে পড়ল। মাঝে মাঝে দুহাত দিয়ে তলপেট চেপে ধরতে লাগল। শেষে অস্থির হয়ে উঠল।

গিরিবালার মনে হল সাক্ষাৎ এক আগ্নেয়গিরি বাসা বেঁধেছে তার উদরে। প্রথমে ভ্রূণ পরে একটু একটু করে পুষ্ট হয়েছে অঙ্কুর। অঙ্কুর পুষ্ট হয়ে হয়ে এখন ফেটে পড়বার মত বিরাট শক্তি সঞ্চয় করেছে সে। সে আর বাধা মানবে কেন? তাকে বাধা দেবে কে? বাইরের আলো-বাতাস, মুক্তি তার প্রতীক্ষায় আকুল হয়ে আছে। সে কি আর ভিতরের অন্ধ গুহায় বৃথা কালক্ষেপ করতে পারে? এখন বেরিয়ে আসবার পথ চাই তার। তারই সন্ধানে সে ব্যস্ত।

গিরিবালা ক্রমেই কাতর হয়ে উঠতে লাগল। নিদারুণ বেদনা তার সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। আজ সকাল থেকেই এই ব্যথা তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা শুরু করেছে। প্রথম দিকে খুব লঘুপায়ে তার আনাগোনা শুরু হয়েছিল। তখন গিরিবালা পরিণাম বুঝতে পারেনি। কাউকে কিছু বলেও নি। শুধু একবার যখন বেশ বড় রকমের একটা মোচড় খেল, তখন লজ্জার মাথা খেয়ে বড়মাকে কথাটা বলে ফেলেছিল। তারপর থেকেই বড়মা তাকে চোখে চোখে রেখেছেন। পরে কোথায় যেন লুকিয়ে পড়ল ব্যথাটা। অনেকক্ষণ আর কিছু টের পায়নি। গিরিবালা ভাবল, যাক, এবার বোধ হয় নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। অনেকটা হাল্কা মনেই খাওয়া দাওয়া সারল।

বিকালের দিকে গিরিবালা প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল। অতর্কিত আক্রমণে হকচকিয়ে গিয়েছিল সে। সামলে উঠতে না উঠতেই আরেক ঝাঁকি খেল সে। তার মনে হ'ল এই দুই ঝাঁকিতেই তার মর্মস্থল বুঝি উপড়ে এল। কঁকিয়ে উঠল প্রচণ্ড বেদনায়। চোখে অন্ধকার দেখল। মৃত্যুর আতঙ্ক ফুটে উঠল তার মুখে চোখে।

কি করলে পরিত্রাণ মিলবে, বুঝে উঠতে পারল না গিরিবালা। বুঝতে পারল না, তার এখন কি করা উচিত। একটু একটু বিরতির পর ঢেউয়ের পর বেদনার ঢেউ এসে গিরিবালাকে নাস্তানাবুদ করতে লাগল। প্রতিবার তার মনে হতে লাগল, এই বুঝি তার প্রাণটা ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। গিরিবালা ছটফট করতে শুরু করল। উঠে বসল। শুয়ে পড়ল। চিত হল। উপুড় হল। আবার চিত হল। হাঁটু দুটো মুড়ে তলপেটে চাপ দিয়ে যন্ত্রণার উপশম করার চেষ্টা করল। বাইরে গেল। একটু পায়চারি করল। পায়খানায় গেল। কিছুতেই আরাম পেল না, তখন আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে গোঙাতে লাগল।

বড় বউ পাশের ঘরে বসে কাঁথা সেলাই করছিলেন। চাঁপা ঘুমিয়ে পড়েছে সমানে। বড় বউ মাঝে মাঝে হাত নেড়ে তার গা থেকে মাছি তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। গিরিবালার অস্পষ্ট গোঙানি তাঁর কানে গেল। ধড়মড় করে উঠে তার কাছে গিয়ে বসলেন। দেখেন, গিরিবালার মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে। বেশবাস আলুথালু। দরদর করে ঘাম ঝরছে গিরিবালার।

"মণিরে, বাথা উঠল নাকি?"

গিরিবালা কথা বলতে পারল না। বড় বউয়ের একখানা হাত প্রাণপণে চেপে ধরে থাকল।

বড় বউ ব্যস্ত হয়ে ননদকে ডাক দিলেন, "ও মাজদি, আইসা দিন। বুড়িরি বোধ হয় নামাতে হবে।"

শুভদা নিকেলের চশমা পরে ভাগবত পড়ছিলেন। চশমা খুলতে খুলতে এসে পড়লেন।

বললেন, "বড় বউ, অন্নরে ডাক। সাধের সাড়িডে পাড়ে আন। আর মহিরিক ঠকুর মশাইরি আনতি লোক পাঠায়ে দিক।"

বড় বউ চলে গেলে শুভদা গিরিবালার পাশে গিয়ে বসলেন। আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে আশ্বাস দিলেন।

বললেন, "ভয় পায়ে না মা। এমন দিন সব সময়েই আসে কোন ভয় নেই।"

তিনি গিরিবালার খোঁপা খুলে চুল এলো করে ডগায় একটা আলগা গিঁট বেঁধে রাখলেন। গায়ের গহনাগুলো সব খুলে ফেললেন। অন্নদা এসে দরজায় দাঁড়াল।

শুভদা বললেন, "অন্ন, যা, কুঁড়েডা ঠিক করগে। মালসয় আগুন কর। ফুন্সির মারে জল গরম করতি ক'।"

মেজকর্তা হন্তদন্ত হয়ে এলেন। ভয়ে ভাবনায় মুখ চুপসে গিয়েছে। দাড়িতে হাত চলছে ঘন ঘন।

জিজ্ঞাসা করলেন "বুড়ি আছে কেমন?" স্বরে একরাশ উৎকণ্ঠা। ভয়ে বিছানায় শোয়া মেয়ের দিকে চাইতে পর্যন্ত পারলেন না।

শুভদা জবাব দিলেন, "ব্যথা উঠিছে। ভয় নেই। ভয় কি? তুই লোক পাঠালি ঠাকুর মশায়ের কাছে?

মেজকর্তা বললেন, "হ্যাঁ। আচ্ছা মেজদি, যা জল পড়ছে তাতে কুঁড়েটা তো ভিজে শপ্ শপ্ করছে। নাই বা নামালে বুড়িকে। গুদোমের পশ্চিমের বারান্দাটা না হয়, ঘিরে দিই। আর একটা ডাক্তার নিয়ে আসি। আঠারোখাদার গোবিন্দ ডাক্তারের তো বেশ হাতযশ আছে।"

শুভদা বললেন, "মহি, তুই কি মেয়ের চিন্তায় সত্যিই পাগল হলি? ছেলেমেয়ে কি এই বাড়িতে নিহাৎ কম হয়েছে। কুঁড়ে ছাড়া কোনডে ঘরে হয়েছে ক' দিনি। নিয়ম রীত মানতি হবে তো, না কি? ডাক্তার বরং একডা আনতি পারিস। তাতে বুড়ির উপকার হোক না হোক, তোর মাথা ঠাণ্ডা হবে তালি আর দেরি করিস নে, এখনই লোক পঠায়ে দে।"

মেজকর্তা আর কথা বাড়ালেন না। লোকও পাঠালেন না। ঘোড়া বের করে নিজেই ছুটলেন আঠারোখাদায়। আকাশের আক্রোশ তখনও কিছুমাত্র কমেনি।

গিরিবালা কাটা পশুর মত ছটফট করছে কুঁড়েখানার ভিতর। একটানা গোঙানি শোনা যাচ্ছে তার। উপশমহীন যন্ত্রণার অনন্ত সমুদ্রে সে ভাসছে। দোসরহীন। একেবারে একা। কোথায় তার এই বেদনার উৎস? পেটে? তলপেটে? গিরিবালা তার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। অসহায়ভাবে আত্ম-সমর্পণ করেছে বেদনার কাছে। মৃত্যুর কাছে। গিরিবালা জানে তার মৃত্যুর আর দেরি নেই। তবে আর দেরি কেন? মরণ হোক তার। সে আর পারছে না। তার প্রাণটা যেন ভারী এক ভোঁতা জাঁতার মধ্যে পড়ে গেছে। একটু একটু করে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে।

শুভদা ঠাকরুণ কুঁড়ের মধ্যে গিয়ে বসেছেন। তিনি গিরিবালার চুলের ডগের গিঁটটাও খুলে দিলেন। কি একটা শিকড় বেঁধে দিলেন এলোচুলে। বড় বউ লেপের ওয়াড়, বালিস তোশকের ওয়াড় খুলে ফেললেন। সব বন্ধন মুক্ত করা চাই। বাইরের বাঁধন খুলে দিলে যদি গিরিবালার পেটের বাঁধন আলগা হয়। তখন যদি ত্বরায় প্রসব হয়। বাক্সের তালা, কাঠের সিন্দুক, হাত বাক্সের ডালা খোলা। কুঁড়ের বেড়া কেটে দাও। নিয়মরীতি মেয়েদের যা জানা ছিল, সব তারা পালন করলেন। ফল কিছু হল না। বিদয় ঠাকুর এসে মন্ত্র পড়লেন, অস্তি গোদাবরি তীরে জম্ভোলি নামা রাক্ষসী, তস্যা স্মরণমাত্রেন সুখপ্রসবং ভবেৎ। কিন্তু জম্ভোলির স্মরণেও প্রসব হ'ল না।

শুভদা বললেন, "ও অন্ন বুড়ির বগলে হাত পুরে ওরে খাড়া করে তোল, তারপর হাঁটাতি থাক। ও অন্ন ইবারে বুড়ির উপুড় করে শুয়া, শুয়ায়ে আস্তে আস্তে বুড়ির মাজায় চাপড় মার।"

সব রকম করা হল। কিন্তু কোন কৌশলই খাটল না।

সব প্রক্রিয়াই ব্যর্থ হল। গিরিবালা ক্রমশই নির্জীব হয়ে পড়তে লাগল।

সন্ধ্যে গেল। রাত হ'ল। ছোট বউ গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা সব দেখতে লাগলেন। দেখলেন, ডাইনি আবার তার কাজ শুরু করেছে। আবার এক রাজপুত্তুর আসছে। আবার তার ঘাড় মটকাবার আয়োজন চলেছে।

ছোট বউ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। প্রবল উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। দাঁড়াও, দ্যাখাচ্ছি এই বারে মজা। খুঁজে পেতে ঘর থেকে বার করলেন পুরনো আমলের মর্চে ধরা এক খাঁড়া। দুমদাম লাথি মারতেই দরজার শিকল খুলে গেল।

পা টিপে পা টিপে কুঁড়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন। সেই মুহূর্তে অন্ন একা ছিল কুঁড়েটাতে। একটু আগে শুভদা গরম জল আনতে গেছেন। ছোট বউ খাঁড়া হাতে "মাগী তোর রক্ত খাব" বলে হুংকার দিয়ে কুঁড়ের ভিতর ঢুকলেন। তা দেখেই অন্নর প্রাণ খাঁচা ছাড়বার উপক্রম করল। বাপরে মারে করে সে দিল এক ছুট। ছোট বউ চোখের পলকে গিরিবালাকে পাঁজাকোলা করে এনে নিজের ঘরে ঢুকলেন। তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েই ঝপ করে দরজায় খিল এঁটে দিলেন।

ছয়

ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগল সবার। শুভদা আর বড় বউয়ের ধমকে অন্ন হাউমাউ থামিয়ে আসল খবরটা যখন সে বলল, তখনও তার কাঁপুনি থামেনি।

বিষয়টা হৃদয়ংগম হবার পর সবার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। বড় বউ তো ভয়ে ভাবনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। শুভদা গুম মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হঠাৎ শুভদা বললেন, "অন্ন একখানা মুটা লাঠি আমারে আনে দে তো। পাগলের পাগলামি আজ বের ক'রে দিই।"

রাগে শুভদার চোখ বাঘের মত জ্বলতে লাগল।

বললেন, "আর যা, তুই শিগ্‌গির রামকিষ্টোরে ডাকে আন। বাঁড়িতে পুরুষ মানষে একটা থাকা ভাল। বড় বউ তুই আয় আমার সংগে।"

দুজনে চললেন ছোট বউয়ের ঘরে।

ছোট বউয়ের আজ ভয়ানক দুশ্চিন্তা। চারিদিকে শত্তুর। রাজপুত্তুরকে বাঁচাই কি করে। একবার করে তিনি ছুটে ছুটে গিরিবালার কাছে যাচ্ছেন। তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। ভয় নেই, ভয় নেই করে সাহস দিচ্ছেন তাকে। পরমুহূর্তেই খাঁড়া বাগিয়ে দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। কেউ ঢুকেছে কি ঘ্যাচ করে এক কোপ। একেবারে দুফাঁক।

এমন সময় যা ভেবেছেন তাই, বাইরে থেকে দুমদাম দরজায় ঘা। এ ঐ ডাইনির কাজ। ঠিক তাই। অমনি শুভদার গলা শোনা গেল।

"এই হারামজাদি, খোল দরজা। ভাল চাস তো এক্ষুণি দরজা খোল। নাইলি মা'রে তোর হাড় গুঁড়োয়ে দিবানে।"

ছোট বউ ভিতর থেকে হুংকার দিলেন, "ঢুকেছিস্‌ কি ঘ্যাচ্, দুখান করে দেবো। রক্ত খাওয়া তোর জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবো। ডাইনি কোথাকার। ঢুকে দ্যাখ একবার, আমার হাতে মন্তর পড়া খাঁড়া রয়েছে।"

এমন সময় শুভদার চিৎকার শোনা গেল।

"মাই, শিগ্‌গির আয়। সব্বোনাশ হয়ে গেছে। পাগল বুড়িরি আঁতুড়ির থে তুলে ওর ঘরে নিয়ে গেছে। খাঁড়া হাতে দরজায় দাঁড়ায়ে আছে। কি সব্বোনাশ যে হ'ল কে জানে?"

"বলো কি?" মেজকত্তা আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁর পায়ের তল থেকে মাটি যেন সরে গেল।

"এখন উপায়?"

উপায় ছোট বউই বাতলে দিলেন। মেজ ভাসুরের উপর তাঁর অগাধ ভরসা। জানলা খুলে ভাসুরকে ডাক দিলেন।

বললেন, "আমি দরজা খুলছি, কিন্তু খবর্দার, ঐ ডাইনিগুলো যেন না আসে। আর আমি ওদের কারো রক্ত চুষতে দিচ্ছিনে। আপনি বলুন, কথা দিন, ওদের এ ঘরে ঢুকতে দেবেন না। বড় গিন্নী ইচ্ছে করলে ঢুকতে পারেন। কিন্তু ডাইনিটিকে ঢুকতে দিচ্ছিনে।"

মেজকত্তা যেন কূল পেলেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

বললেন, "হ্যাঁ মা, তাই হবে। ও তো তোমারই মেয়ে। তুমি যা বলবে তাই হবে।"

ছোটবউ খুব খুশি। দরজা খুলে দিলেন তাড়াতাড়ি। হুড়মুড় করে সবাই ঢুকতে যাচ্ছিল, মেজকর্তা বাধা দিলেন। মেজকর্তা ডাক্তারবাবুকে নিয়ে ঢুকলেন। আর এল অন্ন। আর কাউকে ঢুকতে দিলেন না মেজকত্তা।

এত যে ব্যাপার ঘটল গিরিবালা তার কিছুই জানে না। দুঃসহ বেদনায় ভরে আচ্ছন্ন সে। তখন খেয়া মারছে চৈতন্য আর অচৈতন্যের মাঝখানের ঘাটে।

বিন্দুমাত্র শক্তিও আর তার অবশিষ্ট নেই। গোঙানির তেজও নিভু নিভু। চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমেছে। মাঝে মাঝে অস্ফুট শোনা যাচ্ছে, মা, মা, আর পারিনে। ছোট বউয়ের চোখে জল।

বাইরে প্রকৃতি হিংস্র। মাতাল। বৃষ্টি আর ঝড়ে মাতামাতি শুরু হয়েছে।

ডাক্তারবাবু গিরিবালাকে পরীক্ষা করলেন। মেজ কত্তাকে বললেন, "আপনি বাইরে যান। একটা জোরাল বাতি পাঠিয়ে দিন।" অন্নকে বললেন, "গরম জল আর সাবান আন। ফর্সা ছেঁড়া কাপড় নিয়ে আয়।" ছোট বউএর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। বললেন, "খাঁড়াটা মেজবাবুকে দিয়ে দিন। আপনি গোলমাল করবেন না কিন্তু।"

ছোট শিশুর মত ছোট বউ ডাক্তারবাবুর কথা মেনে নিলেন। মেজ ভাসুর তো শিব। ভোলানাথ।

ডাক্তারের অভ্যস্থ নিপুণ হাত প্রায় অচেতন গিরিবালার অংগস্পর্শ করতে লাগল এখানে সেখানে।

বেদনার সমুদ্রে গিরিবালা হালভাঙ্গা নৌকোর মত ভেসে বেড়াচ্ছিল। উঠছিল, নামছিল, হাবুডুবু খাচ্ছিল। কতক্ষণ ধরে সে জানে না। হঠাৎ সে টের পেল পুঞ্জীভূত বেদনার স্তূপ থেকে তাকে এক ধাক্কায় কে যেন উপশমের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ছুড়ে ফেলে দিল। তার ভারী দেহটা মুহূর্তের জন্য যেন হাল্কা ঠেকল। অবসাদ আর আরামের অন্তহীন গহ্বরে সে ক্রমশ নেমে যেতে লাগল। একটা কথা সে যেন স্বপ্নের ঘোরে শুনতে পেল, ছেলে।

গিরিবালার অচৈতন্য ঠোঁটে পরিব্যাপ্ত এক টুকরো মৃদু হাসি একাদশীর চাঁদের মত ভেসে উঠল। একটু সলজ্জ, সৃষ্টির কৃতিত্বে একটুবা গর্বিতও।

বাইরে ঝড় থেমেছে। বৃষ্টি পড়ছে মুষল ধারে। দুরন্ত দুর্নিবার বৃষ্টি। সমস্ত বিশ্ব করুণ-করুণ। (ক্রমশ)

চক্রদত্ত

মহাশূন্যে মানুষের অভিযান নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে চলেছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে অভিযানকারীদের খাদ্য এবং খাদ্য গ্রহণ প্রণালী। আবহাওয়ার চাপের তারতম্যের জন্য ঊর্ধ্বাকাশে এদের সাধারণ খাদ্য সাধারণভাবে গ্রহণে অসুবিধা হবে। চাপের এতই তারতম্য ঘটবে যে খাদ্য নেবার সময় সেটা ঠিকমত মুখে পোরা যাবে না। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য টিউবের ভেতর খাদ্য পোরা থাকবে—যেমন দাঁত মাজার পেস্ট থাকে। খাদ্য গ্রহণের সময় এই
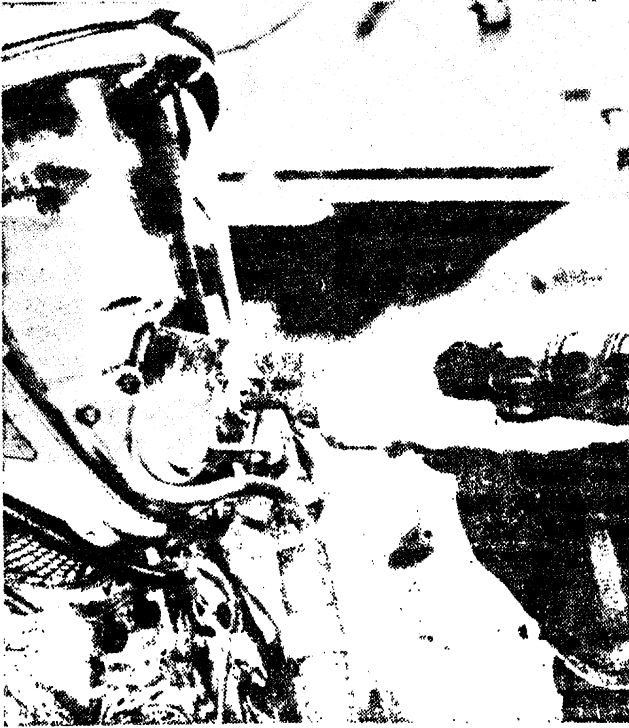
মহাশূন্যে অভিযাত্রী টিউব থেকে খাবার খাচ্ছে

টিউবের সরু নলটা মুখোশের সামনের একটা সরু গর্ত দিয়ে মুখের ভেতর পুরে দিয়ে টিপে খাবারটা নিয়ে নেওয়া হবে। এক-একটা টিউবে এক-এক রকম খাবার পোরা থাকবে।

*

কোন কারণে মাথাব্যথা, শরীরের কোন জায়গায় যন্ত্রণা হলে আমরা ব্যথা, যন্ত্রণা দূর করবার একটা বড়ি জল দিয়ে খেয়ে ফেলি। বাজারে এই জাতীয় অনেক বড়ি কিনতে পাওয়া যায়। 'ফেনাসেটিন' ঐ জাতীয় একটি বড়ি। সম্প্রতি ডেনমার্কে এবং সুইটজারল্যাণ্ডে ডাক্তাররা লক্ষ্য করছেন যে, বেশী পরিমাণে ফেনাসেটিন খাওয়ার ফলে লোকদের কঠিন কিডনীর অসুখ করছে। কিডনীর ক্ষতি হওয়ার জন্য রক্তের মধ্যে যে সব জীবাণু আছে তারা রোগ সৃষ্টির সুযোগ পাচ্ছে। সাধারণত সুইটজারল্যাণ্ডের লোকেরা দিনে মাথার ব্যথা সারাবার জন্য সাতটারও বেশী বড়ি খায়। এর ফলে এক বছর পরে একজন লোক খুব কম করেও ২½ পাউণ্ড ফেনাসেটিন খায়। দেখা গেছে যে, ইংরাজরা আসপিরিন বড়ি ব্যথার জন্য বেশী পছন্দ করে। কিন্তু এও মানুষের ক্ষতি করছে বলে খবর পাওয়া গেছে। বেশী পরিমাণে অ্যাসপিরিন খেলে পাকযন্ত্রের ক্ষতিসাধন করে। যার ফলে রক্তবমি হতে পারে।

*

আমেরিকায় এক জাতীয় বিষাক্ত পিঁপড়ে পাওয়া যায়, তাদের 'ফায়ার অ্যান্ট' বলা হয়। এই সমস্ত পিঁপড়ের হুলে এক-জাতীয় বিষ থাকে। এই পিঁপড়ে বিভিন্ন ধরনের শস্যাদি নষ্ট করে এবং গৃহপালিত প্রাণীদের আক্রমণ করে। সময় সময় এরা মানুষকে আক্রমণ করে হুল ফুটিয়ে দেয়। হুল ফোটাবার স্থানটি পুঁজে ভর্তি হয়ে ফুলে উঠে চারদিকে লাল চাকার সৃষ্টি করে এবং খুব যন্ত্রণা হয়। অনেক সময় জ্বরও হয়। সম্প্রতি লোউসিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষ নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। তারা এই বিষ দিয়ে কীট পতঙ্গ মারবার পরীক্ষা করছেন। এ ছাড়াও এঁরা দেখবার চেষ্টা করছেন যে, এই বিষের কোন বীজাণু মারবার ক্ষমতা আছে কিনা। তাহলে এটি ক্যানসার কোষের উপর পরীক্ষা করে দেখা হবে। এই পিঁপড়ে থেকে বিষ সংগ্রহ করবার জন্য একটা পিঁপড়ে ছোট চিমটে দিয়ে ধরা হয়। তারপর একটা পাতলা ফাঁপা কাচের নল দিয়ে পিঁপড়ের পেটে আস্তে আস্তে আঘাত করা হয়। এর একটু পরেই পিঁপড়ের হুলের ডগাতে ফোটা ফোটা বিষ এসে জমা হতে থাকে এবং সেটা তখন ঐ ফাঁপা কাচের নলে সংগ্রহ করা হয়। আশা করা যাচ্ছে এই বিষ ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করা যাবে।

*

মানুষের সব ক্ষমতাই সীমাবদ্ধ। খুব ভালো খেলোয়াড় খুব বেশীক্ষণ বা বেশীদিন ধরে খেললে তার ক্ষমতার অবসান একসময় বা একদিন ঘটবেই। সাধারণত কোনও খেলোয়াড় খুব বেশীক্ষণ খেললেই তার পায়ের পেশী ও শিরা টেনে ধরে এবং অনেকক্ষণ মালিশ করার পর আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। গায়কদের পক্ষেও ঠিক একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। কোনও গায়ক একটানা অনেকক্ষণ গান করলে গলার শিরাগুলি টেনে ধরে এবং সে ক্ষেত্রেও মালিশ করলে উপকার পাওয়া যায়। দেখা গেছে যে, অল্প বয়সে এই শির টেনে ধরা রোগের উৎপাত বেশী হয় না। কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সের পর এরকম ঘন ঘন হতে থাকে। ডাঃ প্রেডিজ্লো বলেন যে, অধিকদিন পরিশ্রম করার ফলে অত্যধিক ক্লান্তিবশতই এমনটা ঘটে।

পুস্তক ব্যবসায় সঙ্কট

শিশির সেন

খুব বেশীদিনের কথা নয় আচার্য পি সি রায় বাঙালীকে ব্যবসাতে আত্মনিয়োগ করবার জন্য বহু চিন্তাশীল প্রবন্ধ ও বক্তৃতার অবতারণা করেছিলেন। তারই ফলে কিছু কিছু বাঙালী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে তৎকালীন মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকদের পুস্তক-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পুস্তক ব্যবসা এতদিন বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই বিশেষ ব্যবসাও বাঙালী আর বেশীদিন নিজেদের মধ্যে রাখতে পারবে না।

পুস্তকের উপর বিক্রয়-কর অর্থাৎ জ্ঞানের উপর কর (Taxes on Knowledge) দেশ স্বাধীন হবার বার বৎসর পরেও পশ্চিমবঙ্গে চেপে বসে আছে। তারপর সম্প্রতি ঘোষিত কেন্দ্রীয় বিক্রয়-কর এই বিশেষ ব্যবসার মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে দেবে। কেন দেবে তা একটু লক্ষ্য করুন। বাংলাদেশ হতে আপনি যদি অন্য প্রদেশে কোন ব্যক্তিকে বই পাঠাতে চান তাহলে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়ায়। পাটনা হতে একটি ভদ্রলোক কলকাতায় প্রকাশিত একটি ফিজিক্স বই কিনতে চান। কারণ তিনি বরাবরই কলকাতা হতে বইপত্র কিনে থাকেন। কিন্তু গত ১লা অক্টোবর, ১৯৫৮ সালের পরে একটি দশ টাকার ফিজিক্স বই ভি পি পি যোগে আনতে গিয়ে দেখলেন দশ টাকার উপর টাকায় সাত নয়া পয়সা করে সত্তর নয়া পয়সা বিক্রয়-কর যোগ করা হয়েছে। তার উপর ডাক মাশুল তো আছেই। পাটনার ভদ্রলোকটি ভাবলেন বড় বেকুবের মত কাজ হয়েছে। দিল্লী বা বোম্বাই হতে কিনলে এই সত্তর নয়া পয়সা বিক্রয়-কর হিসেবে তাকে দিতে হতো না। কারণ ওসব রাজ্যে বই-এর উপর কোন বিক্রয়-কর নেই। ডাক মাশুলে কলকাতা হতেও যা দিল্লী-বোম্বাই হতে নিলেও একই খরচ। নভেম্বর মাস হতেই অন্য প্রদেশের ক্রেতারা চালাক হয়ে গেছেন। তাঁরা আর কলকাতায় বড় একটা বই-এর অর্ডার পাঠান না।

কলকাতার কয়েকটি প্রসিদ্ধ পুস্তক-ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপে জানা যায় কেন্দ্রীয় বিক্রয়-কর প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে ক্রয়-বিক্রয় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় এক চতুর্থাংশের বেশী হয় নি। ক্রেতা আর একটু চালাক হলে ব্যবসা শূন্যের অঙ্কে এসে দাঁড়াবে। এই চিত্র এতটুকুও অতিরঞ্জিত নয়। এ-আঘাত যে কত বড় নির্মম ও চরম আঘাত তা পুস্তক ব্যবসায়ী মাত্রেই জানেন।

তারপর ধরুন যদি একটি অন্য প্রদেশের আন-রেজিস্টার্ড পুস্তক-ব্যবসায়ী কলকাতা থেকে বই ক্রয় করবার প্রয়োজনবোধ করেন তবে কি দাঁড়ায়? বই-এর উপর সাধারণ ট্রেড ডিসকাউণ্ট হচ্ছে শতকরা পনের টাকা। তার মধ্যে সাত টাকা বিক্রয়-কর হিসেবে দিতে হবে। শতকরা অন্তত তিন টাকা যাবে ফ্রেট্ বা মালের ভাড়া। দশ টাকা আনুষঙ্গিক খরচা গেলে বাকী রইল পাঁচ টাকা। এখন ভাবুন কত টাকা বিক্রী হলে পাঁচ পার্সেণ্ট ব্যবসার টানাপোড়েন করা চলে?

পশ্চিমবঙ্গের ভিতরে বই কেনা-বেচা হলে ক্রেতাকে শতকরা পাঁচ টাকা হারে বিক্রয়-কর দিতে হয়। আর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য প্রদেশে পাঠালে শতকরা সাত টাকা দিতে হয়।

ভারতের অধিকাংশ প্রদেশেই বই-এর উপর বিক্রয়-কর নেই। যথা, দিল্লী, হিমাচল প্রদেশ, কেরলা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং উত্তর প্রদেশ। এমন কি সুখের বিষয় গত ১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫৮ হতে বোম্বাই সরকারও সমস্ত পুস্তকের উপর বিক্রয়-কর সম্পূর্ণভাবে তুলে দিয়েছেন।

অন্ধ্র ও মহীশূরে শতকরা দু টাকা হারে, আসাম ও বিহারে চার টাকা হারে এবং পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায় পাঁচ টাকা হারে পুস্তকের উপর বিক্রয় কর আদায় করা হয়।

যে প্রদেশে বিক্রয় কর নেই, সেই প্রদেশ যখন অন্য প্রদেশে বই পাঠাবে, তখন কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর প্রযোজ্য হবে না। তাহলে দেখুন উপরের তালিকায় যেসব প্রদেশে বিক্রয় কর নেই, তাদের কোন চিন্তা

নেই। বাঙালীর বই-এর ব্যবসাতে যে এক কোণঠাসা নীতি অবলম্বিত হয়েছে, তা আজই বিশেষভাবে ভাববার সময় এসেছে। বোম্বাই সরকার সেলস ট্যাক্স এনকোয়ারী কমিটির রিপোর্টের উপর নির্ভর করেই বিক্রয় কর উঠিয়ে দিয়েছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও অতি সত্বর সেলস ট্যাক্স এনকোয়ারী কমিটি গঠন করা উচিত। সত্যি সত্যি আমরা পুস্তকের উপর হতে বৎসরে কত টাকা কর আদায় করি? এবং এই টাকা আদায় না হলে কি রাজ্য শাসন সত্যই অচল হয়ে পড়ে? ভাবাবেগের প্রশ্ন নয়। ভারত একটি অনগ্রসর এবং অশিক্ষিত দেশ। শতকরা শিক্ষিতের সংখ্যা কত, সে হাস্যকর সংখ্যার আর পুনরাবৃত্তি করব না। সত্যিকারের জ্ঞানের আলো যদি সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিতে হয়, তবে ক্ষতি হলেও আমাদের সে ক্ষতি সরল ও আনন্দ চিত্তে মেনে নিতে হবে। তা না হলে স্বাধীন আর পরাধীন দেশে তফাৎটা কোথায়? দেশের ও দশের সুবিধা অনুযায়ী যদি আমরা আইন প্রণয়ন না করি, তবে সে আইনসভার সার্থকতা কি?

কথা প্রসঙ্গে পুস্তক ব্যবসায়ীদের কাছে আরও জানা যায়, ভারতের ফেডারেশন অফ পাবলিশার্স ও বুক সেলার্স এসোসিয়েশন এবং বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা ভিন্ন ভিন্নভাবে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রীর কাছে পুস্তকের উপর বিক্রয় কর উঠিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করে স্মারক-লিপি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থ দপ্তরের সচিবদের কাছ থেকে যে উত্তর পাওয়া যায়, তা গভীর নৈরাশ্যজনক। বিক্রয় কর পুস্তকের উপর না ওঠাবার পক্ষে যুক্তি দিয়ে প্রথম পঞ্চম বার্ষিকী, দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী ও সরকারের নানাবিধ গঠনমূলক সংস্থার উল্লেখ করে কর ধার্যের ন্যায্যতা সম্বন্ধে চিঠি মারফৎ জানিয়েছেন। তারপর উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কেরলা এবং এমন কি সভ্য দেশ আমেরিকাতেও পুস্তকের উপর বিক্রয় কর আছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। পুস্তক ব্যবসায়ী বললেনঃ আমেরিকান এমব্যাসি স্পষ্টই জানিয়েছেন,

'The United States Government imposes no taxes on books, either sales or purchase.'

কিন্তু আমেরিকার ব্যাপারে আমাদের প্রয়োজন নেই। উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং কেরলা হতেও এই মর্মে চিঠি পাওয়া গেছে যে, সেখানে পুস্তকের উপর কোন বিক্রয় কর নেই। চিঠি লিখতে বসে যদি বিষয়বস্তু ভাবাবেগের দ্বারা যুক্তিকে অতিক্রম করে, তবে তা পত্র রচয়িতার দৈন্য বলতে হবে। একথা আমরা অনেক সময় ভুলে যাই, কথা বলাই কথা নয়। অনভি-প্রেত কথার চাইতে বাক সংযম অধিক কাম্য। সুতরাং বলতে হয়, আমাদের মত দেশে পুস্তকের উপর বিক্রয় কর জীবন-বিধাতার এক নির্মম পরিহাস।

এশিয়ার নবজাগরণে জাতি গঠন ব্যাপারে জনগণ রাষ্ট্রের কাছে অনেক আশা রাখে।

বই বাজারে এসে কথা বলতে আমার ভাল লাগে। কথা শুনলে আরও কথা জানতে ইচ্ছে হয়। এ যে কী দুর্নিবার আকর্ষণ, তা বলে বোঝান যাবে না। প্রকাশক মহাশয় বললেন, যখন একটি কলেবরে স্ফীত বই-এর মূল্যের উপর বিক্রয় কর যোগ করতে যাই, তখন নিজেই যেন নিজের কাজের জন্য লজ্জা পাই।

জাতির জনক গান্ধী এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখা বইও করের আওতার বাইরে পড়ে না। এটা জাতির পক্ষে দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। গান্ধী ও রবীন্দ্র-নাথের বই ধর্মগ্রন্থের সামিল। জীবন বেদের মর্মকথা আমরা পাই এই মনীষীদের রচনায়। কিন্তু আমাদের কি গান্ধী রবীন্দ্রনাথের বইও কর ছাড়া কিনবার উপায় নেই? বিষয়টি একবার নিজে নিজে মনে মনে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করুন।

কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর চালু হবার পর অনেক বড় ব্যবসায়ী কলকাতা থেকে অন্য প্রদেশে গিয়ে তাঁদের শাখা অফিস খুলেছেন। কারণ তা না হলে ব্যবসা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আর এই বেকার সমস্যার যুগে যেখানে বাঙালী কর্মচারী নিযুক্ত হতে পারতো, সে স্থলে ঐসব শাখা অফিসে অবাঙালী স্থানীয় বাসিন্দারা এইসব কাজে নিযুক্ত হচ্ছেন। কিন্তু এদিকে ঘরের ছেলের মুখে অন্ন জোটে না।

ফলতায় রবিবার

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কেউ কি শহরে যাবে? কেউ যাবে? কেউই যাব না।
বরং ঘনিষ্ঠ এই সন্ধ্যার সুন্দর হাওয়া খাব,
বরং লুণ্ঠিত এই ঘাসে-ঘাসে আকণ্ঠ বেড়াব
আমি, অমিতাভ আর সিতাংশু।
সিতাংশু, এই ভাল,
শহরে ফিরব না। দ্যাখো, অমিতাভ, কতখানি সোনা
ডুবে গেল নদীর শরীরে। দ্যাখো, তরঙ্গের গায়ে
নৌকার লণ্ঠন থেকে আলো পড়ে, আলো কাঁপে, আলো
ভেঙে ভেঙে যায়।

কেউ কি শহরে যাবে? কেউ যাবে? কেউই যাব না।
শহরে প্রচণ্ড ভিড়, অকারণ তুমুল চিৎকার,
নগ্ন নিয়নের আলো। শহরে ফিরব না কেউ আর।
বরং চুপ করে দেখি, অন্ধকারে নদী কত কালো
হতে পারে, অপচয়ী সূর্য তার সবটুকু সোনা
কী করে ওড়ায়; দেখি, মৃদুকণ্ঠ তরঙ্গমালায়
নৌকার লণ্ঠন থেকে আলো পড়ে, আলো কাঁপে, আলো
ভেঙে ভেঙে যায়।

আত্মদর্শন

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

শৈশবের সুগন্ধি উঠোনে
হালকা সবুজের প্রথম প্রলেপে
ঘাসের টাটকা কোমল ফুলে
কাঁচা রোদ্দুরে অবুঝ উজ্জ্বল
প্রজাপতির জন্মের আনন্দের
আমার ছবিটি মিলিয়ে গেলে,

মাঠে মাঠে উন্মনা
নীল চোখের মায়া-আয়নায়
প্রতিফলনের প্রথম থেকে
আমার অকাল প্রেমে লজ্জিতা,
ছবির মত দূরে থেকে
কিশোরকে কেউ রাঙিয়ে গেলে,

খুশিতে পেখম মেলে
যৌবনের নাচে উদাস
প্রবল প্রাণের বারমাসী জ্বালায়
জ্বালানি হয়ে জ্বলতে চেয়েছিল
মানব-প্রেমের প্রেরণায়
যখন বিষণ্ণ মন,

হে নিরাভরণ,
আকাশ থেকে তখন
তোমার আলো বেঁকে পড়ছিল
অঙ্করেখায়, দ্রাঘিমায়, শস্যে,
বৈশ্য যুগের সমুদ্রে নদীতে
আমার আত্মদর্শনের পরতে,

সঙ্গে সঙ্গেই নহবতে মিলিয়েছি
অপ্রিয়ের কানে প্রণয়ের
মুমূর্ষুর বুকে জীবনের
পাথরের কাছে হৃদয়ের
তোমার নবজন্মের সুরে
আমার অসামান্য চেতনাকে।

[১৬]

অনেক কাটাকুটির পর, অনেক আবরণে মুড়ে সৌরেশ 'দিনান্ত-লিপি'তে বহু দিন পরে শচীপতির জীবনের আসল ট্র্যাজিডির কথা লিখতে পেরেছিলেন। কেননা, বৃত্তান্তটা কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নয়, জৈব রীতিগত, যদিও তার মূলে হয়ত মনে।

'দিনান্তলিপি'র পুরানো পৃষ্ঠায় সে-ইতিহাস সৌরেশের নিজস্ব ভাষায় অনেকটাই ইশারায় লেখা আছে।

যে-মিলনে ফল নেই, ফলবার আশাও না, সে-মিলনে বিতৃষ্ণা এসেছিল, শচীপতি বলেছিলেন। জীবন বিস্বাদ হয়ে গিয়েছিল। বিতৃষ্ণা ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছিল অক্ষমতায়। তাঁর অকাল-জড়তা শচীপতি প্রথম যেদিন টের পেলেন, সেদিন চমকে উঠেছিলেন। এ ত তিনি চাননি। প্রথমে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু সত্য পাথরের মত, ফুঁ দিয়ে তাকে নড়ান যায় না। শচীপতি দিন কতক পাগলের মত হয়ে গিয়েছিলেন। একবার আত্মহত্যাও করতে যান। সফল হননি। সেই ব্যর্থতা তাঁকে আরও অস্থির করে তুলেছিল। কেননা শচীপতি বুঝেছিলেন, শুধু দেহের নয়, মনের জোরও তিনি হারিয়ে ফেলেছেন, আত্মহত্যা করবার ক্ষমতাটুকু তাঁর নেই। আসলে শচীপতি তাঁর আত্মাকে ত হত্যা করতে চাননি—আত্মা ত অমর, মৃত্যুর পর দেবলোকে, প্রেতলোকে বা শূন্যে বায়ুভূত হয়ে থাকে—তিনি বিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন, তাঁর অপটু শরীরটাকেই। প্রাণের ভারবাহী এই বাহনটা একেবারে শেষ হয়ে যাক। হয়নি। অকর্মণ্য খোলসটাকে ঝেড়ে ফেলে মুক্তির স্বাদ পাওয়ার সাধ শচীপতিকে বিসর্জন দিতে হয়েছে।

সে-দিন নিজের ভবিষ্যৎ নিজের চোখে দেখতে পেয়েছিলেন শচীপতি। ভেঙে মুচড়ে, শুকিয়ে, যেন এতটুকু হয়ে গিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, এত কাল যে পৃথিবীতে মাথা তুলে দৃপ্ত ভঙ্গিতে হেঁটেছেন, সেখানেই বাকি দিনগুলি হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হবে। কিন্তু শরীরটাই ত শুধু ভেঙেছিল, সেই সঙ্গে তেজী মনটা কোথায় গেল?

যে-বাড়িতে একদা অত্যাচারী শাসকের ভূমিকা ছিল তাঁর, সেই বাড়িতেই তিনি নিজের জন্যে কুণ্ঠিত একটি কোণ বেছে নিয়েছিলেন। খবরের কাগজে মুখ ঢেকে থাকতেন, অফিস ছিল, সুতরাং একবার বের হতেই হত, ফিরে এসে আবার সেই কোণটাতেই জড়সড় হয়ে বসতেন। কারও দিকে চোখ তুলে চাইতে পারতেন না, বিশেষ করে লতা বউদির দিকে ত নয়ই।

তাকে শচীপতি পরিহার করেই চলতেন।

এইভাবেই কাটল বছর দুই। অবশেষে শচীপতি একদিন হঠাৎ অনুভব করলেন, এরও কোন মানে নেই। এই ক্লীব অস্তিত্বের ভার তাঁকে যেন আরও জীর্ণ করে ফেলছে। একে সরাসরি, সামনাসামনি অস্বীকার করাও যাবে না, বরং পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাই ভাল।

সে-পথও খুঁজে পেলেন।

যে-জীবনকে স্বাভাবিকভাবে উপভোগ করা তাঁর আর সাধ্যায়ত্ত নয়, তাকে অন্য-ভাবে যাপন করার উপায় আবিষ্কার করলেন। উপায়টা বিকৃতির, উত্তেজনার, ডুবিয়ে রাখার।

মদে জোয়ার। শচীপতি বলেছিলেন, 'জানতাম, আমি বাঁকাচোরা কোন পথেই কিংবা নিরন্তর ডুব-সাঁতার কেটেও পুরানো ঘাটে ফিরতে পারব না, কিন্তু খানিকটা মজা ত পাব। কেঁচোর মত বেঁচে থাকাতে যে কিছুই নেই। রাজত্ব হারিয়েও নকল রাজা সেজে থাকা যায়। জমকালো সাজ-পোশাকটা না হারালেই হল।'

সৌর জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আর?' যে-জবাব পেয়েছিল, সেটা তার পরবর্তী কালের স্মৃতিনির্ভর 'দিনান্তলিপি'তে লেখা আছে।

মদ ধরে শচীপতি দেখলেন, দৃষ্টিগ্রাহ্য পৃথিবীর রঙ আবার যেন একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে। সবই ছিল বিবর্ণ ধূসর, তাতে লাল-হলদে-নীলের ছোপ নতুন করে লাগল। আবার আকাশের পাখি চোখে পড়ল শচীপতির, পার্কের রেলিং-এর কোণের

বেগনি ফুল, পম গাছের সবুজ পাতা, ঘরের দেয়ালের রঙীন প্রজাপতি।

সবচেয়ে বড় কথা, তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলেন, দৃষ্টি স্পষ্ট হল, এক দিন দেখলেন, লতা বউদির দিকে চোখ তুলে কথা বলতে গেলেও পলক পড়ে না।

কিন্তু সেটা যতক্ষণই নেশার ঘোর থাকে, ততক্ষণই। ততক্ষণ আপনা থেকেই দৃষ্টি কেমন বিস্ফারিত হয়ে থাকে, সঙ্কোচের নেশাও থাকে না, এমন কি একটা দুটো হালকা ঠাট্টাও মুখে আপনা থেকেই এসে যায়।

যতক্ষণ নেশা থাকে, মাত্র ততক্ষণই। নেশা ছুটলেই ভিতরটা ফের যেন নেতিয়ে পড়ে, শচীপতি আবার সেই জড়সড়, ছোট্টটি হয়ে যান।

'ঘুম-কাতুরে লোককে যেমন বারবার ডাকের আওয়াজ করে জাগিয়ে রাখতে হয়', শচীপতি বলেছিলেন, 'গলায় বিষ ঢেলে ঢেলে তেমনই আমাকে সাহসটুকু জাগিয়ে রাখতে হল।'

এই সাহসের বশে কিংবা নেশার ঘোরে শচীপতি মাঝে মাঝে এক-একটা কাজ করে বসতেন। এক-একবার মাথায় তাঁর অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হত। দু হাতে কপালের রগ টিপে বসে থাকতেন। ভয় হত, শিরা ফেটে ফিনিক দিয়ে সব রক্ত বুঝি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, সেই সঙ্গে তাঁর উত্তেজনা, তাঁর কৃত্রিম সাহস।

তখন একটা অবসাদ শচীপতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলত। নেশা দিয়েও যদি সাহস না আসে, তবে কী নিয়ে বাঁচবেন তিনি? তবে ত দ্বিতীয়বার তাঁর মৃত্যু ঘটবে।

সাহসটুকু একেবারে উবে যাবার আগে তাই শচীপতি উঠে দাঁড়াতেন। আয়নায় দেখতেন নিজেকে। চোখ টকটকে লাল, পা টলছে। 'এখনও এটুকু আছে' শচীপতি বলতেন মনে মনে, 'এর পরে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাব। তার আগে, ফুরিয়ে যাবার আগে একবার, অন্তত একবার কিছু করে নিই।' কিন্তু কী করা যায়, কিছুতেই ভেবে পেতেন না। লতা বউদির খোঁজ করতেন, সে নেই। কোনদিন থাকত না। কোথায়, শচীপতি জানতেন না। লতা বউদি জানাবার প্রয়োজনও বোধ করতেন না। ক্ষোভে শচীপতির হাত দুটি আপনা থেকেই মুষ্টিবদ্ধ হয়ে যেত। আবার মনে মনে বলতেন, 'আমাকে ও তুচ্ছ করে। অথচ একদিন ভালবাসত, ভয় পেত।' এই চিন্তার সুতো ধরে ধরেই শচীপতি একটি সিদ্ধান্তের প্রান্তে পৌঁছে যেতেন। শেষ পর্যন্ত এই রকম একটা বিশ্বাসই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর যে, আবার যদি লতা বউদি তাকে ভয় করতে শুরু করে, তবে হয়ত ভালও বাসবে। শচীপতির মনের কোন নিগূঢ় কোণে ভয় আর ভালবাসা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে ছিল। ভয়নিরপেক্ষ ভালবাসার কথা তিনি ভাবতেও পারতেন না। 'লতাকে আবার আমি ভয় দেখাব, আবার আমি বাঁচব,' শচীপতি প্রতিজ্ঞা করতেন।

ভয় দেখাবার বিচিত্র, খেয়ালী, প্রায় ছেলেমানুষী-ঘেঁষা কয়েকটি পদ্ধতিও তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। লতা বউদির পোষা ময়নার ডানা কেটে দিয়ে, তার বিড়ালটার গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢেলে শচীপতি হাসতে থাকতেন। তখনও তাঁর চোখ জ্বলছে, থরথর করে হাত-পা কাঁপছে। শচীপতি যেন বলতে চাইতেন, 'দেখ, আমি কত নিষ্ঠুর, কত ভয়ংকর। আমাকে তোমার মনে নেই? সেই আমি? যে তোমাকে উলের তুলতুলে বলের মত একদিন ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিয়েছে। মনে নেই? আমাকে আর ভয় কর না তুমি, ভালবাস না, কেননা আমি জুড়িয়ে গিয়েছি আমার পৌরুষ নেই। আমাকে ছেড়ে এখন

তুমি ওদের দিকে ঝুঁকেছ, পাখি আর পোষা বেড়াল নিয়ে আছ। আমি কিন্তু জড়িয়ে যাইনি, এখনও ভয়ঙ্কর হতে পারি। এই দেখ না, তোমার প্রিয় ময়নাটাকে কেবল যন্ত্রণা দিলুম, আর ভিজে মেনি বেড়ালটার ত শুধু মরতেই বাকি আছে।'

ফল হয়নি।

আগে ছিল, পাখি আর নিরীহ প্রাণী, সেদিকে বাধা পেয়ে লতা বউদি এবারে মানুষের দিকে ঝুঁকলেন। সবই সৌরকে অকপটে জানিয়েছিলেন শচীপতি।

"রাম দিয়ে ধুলে তবে তামাকের পাইপের ময়লা সাফ হয়, জান? আমিও আজ দিলটাকে ধুয়ে একেবারে খোলসা করে দিয়েছি, তোমার কাছে কিছু ঢাকব না। হ্যাঁ, তখন থেকেই লতা বাইরের মেলামেশাটা মাত্রায় বাড়িয়ে দেয়।"

সৌর বলে উঠল, "ওঃ", যে-অব্যয়টির প্রকৃত ব্যঞ্জনা 'তাই বুঝি।" অথচ সে নিজেই বুঝছিল না, আর কী করতে পারতেন লতা বউদি—কী আচরণ তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক হত!

ওর মনের কথা অনুমান করে নিয়েই শচীপতি যেন বললেন, "না, আর কিছু সে করতেও পারত না। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। লতা হাতে জপের মালা তুলে নেবে বা গরদ পরে ঠাকুরঘরে গিয়ে ঢুকবে—আমার আশা করাই অন্যায় হত। সবাই ত এক ধাতুতে গড়া নয়।"

কতকটা আত্মগত, কতকটা দার্শনিকের ভঙ্গীতে শচীপতি বলে গেলেন, "ধাতু মানে শরীর। এক-একটা শরীরের এক-এক রকমের প্রয়োজন, চাহিদা। এক-এক দিকে ঝোঁক। লতার যা চাই, তাকে তা থেকে বঞ্চিত করবার অধিকার আমার কী। তোমরা হয়ত বলবে, ওটা স্থূল ব্যাপার। শরীরটা একেবারে বাইরের বস্তু, তাকে নিয়ে অতটা বাড়াবাড়ি করাটা ঠিক নয়। আমি তা মানিনে। আসল তবে কোন্‌টা, আত্মা? আত্মা ত নিরাকার, অজর, অমর। তাকে শস্ত্র ছিন্ন করে না, পাবক দহন করে না। সোজা করে বলি। —আত্মার কোনদিন মাথা ধরে না, দাঁত কনকন করে না। দাঁতের যন্ত্রণা নিয়ে কোনদিন পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখে? সবই যেন বদলে গিয়েছে, একথা মনে হয়নি? দুনিয়ার সব কয়টা মানুষকে তখন এক-একটা আস্ত শয়তান বলে মনে হয়নি? কিংবা পেটে চনচনে খিদে নিয়ে রোদ্দুরে, রাস্তা দিয়ে হাঁটবার সময় মনে হয়নি যে, চারধারে চিতা দাউ-দাউ জ্বলছে? তবেই দেখ, শরীর গোটা জীবনদর্শনকেই কতখানি বদলে দিতে পারে। আবার শরীর থেকে প্রাণ বের করে নাও, তখন সে ঠাণ্ডা, পাথর—কিছু পারে না। তা হলে দেখছ, আলাদা-ভাবে প্রাণ আর শরীর কিছুই পারে না। অথচ এই দুইয়ে যুক্ত হলেই জীবন হয়।'

একটানা বক্তৃতা দিয়ে শচীপতি হাঁপাতে থাকলেন। হাত বাড়িয়ে দেখলেন, গ্লাস শূন্য, তখন যেন ঝিমিয়ে পড়লেন। টেবিলের ওপরে রাখা একখানি হাতে আস্তে আস্তে গাল কাত করে রাখলেন, সৌর'র মনে হল, শচীপতি বুঝি ঘুমিয়ে পড়বেন। কাত-হয়ে-পড়া গ্লাস থেকে তখন পীতাবশেষ একটি ক্ষীণ ধারায় গড়িয়ে পড়ছিল। গ্লাসের কিনারে অল্প-স্বল্প ফেনা তখনও লেগেছিল। শচীপতিরও ঠোঁটের কোণে একটি কষের রেখা দেখা দিয়েছিল। শূন্য গ্লাস আর পাংশু মুখ—এই দুইয়ের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে সৌর চমকে উঠেছে সেদিন, ভয় পেয়েছে।

এই বিচিত্র দাম্পত্য-কাহিনীর অপরার্ধ আরও কিছুদিন পরে সে জানতে পারে—লতা বউদির কাছ থেকে।

(ক্রমশ)

ক্রিকেটের রাজকুমার

শ্রীখেলোয়াড়

॥ ৮ ॥

হীরা, মণি, মুক্তা, চুনি, পান্না প্রভৃতি গ্রহরত্ন সংগ্রহ করার এক তীব্র নেশা ছিল রণজির। সুন্দর ও দুর্লভ মণিমুক্তা দেখলে যত দাম দিয়ে হোক রণজি তা কিনতে কখনো দ্বিধা করতেন না। ইংলণ্ডে বা ভারতের বাইরে কোথাও যাবার সময়ে তিনি তাঁর এই প্রিয় জিনিসগুলিকে কখনো কাছ-ছাড়া করতেন না। চার পাঁচটা স্যুটকেশ ভর্তি মণি-মুক্তা, হীরা, জহরত তাই রণজির সংগে সব সময় দেখা যেতো। এমন কি, কোথাও বেড়াতে যাবার সময়ও তিনি দু পকেট ভর্তি করে ঐসব মণিমুক্তা সংগে নিয়ে যেতেন।

দুষ্প্রাপ্য ও শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আঁকা ছবি দিয়ে ঘর সাজানোর আর এক অদ্ভুত খেয়াল ছিল রণজির। এই খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে তিনি দুহাতে টাকা খরচ করতেন। নেপোলিয়ন ছিলেন রণজির আদর্শ বীর। আদর্শ বীরের স্মৃতিকে অন্তরে সদাজাগ্রত রাখার জন্য তিনি বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করে নেপোলিয়নের ব্যবহৃত দু চারটি জিনিস নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দিয়েছিলেন।

দিনকয়েকের জন্য রেসের ঘোড়া কিনে বাজী জেতার আর এক অদ্ভুত খেয়াল হয় রণজির। সংগে সংগে ইংলণ্ড থেকে বাছা বাছা কয়েকটা ঘোড়া তিনি কিনে ফেলেন। পর পর কয়েকটা বাজী জিতে ঘোড়ার নেশা বেড়ে উঠলো। মনে মনে ঠিক করলেন, এবার ভারতের মাটিতে তাঁর ঘোড়ার ডেঁংক [illegible]। রণজি সম্পূর্ণ খেলোয়াড়োচিত মনোভাব নিয়েই ঘোড়দৌড়কে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অন্য সকলেও তাঁর মত মনোভাব নিয়েই ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু তাঁর এ স্বপ্ন ভেংগে যেতে বেশী দেরি হলো না। একদিন বোম্বাইয়ের এক ঘোড়দৌড়ে তাঁর ঘোড়া নিশ্চিত জিতবে বলে তিনি ধরে রেখেছিলেন। সেদিনের সে রেসে রণজির ঘোড়ার সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন ঘোড়া ছিল না। অথচ রেসের মাঠে এসে তিনি কানাঘুসা শুনতে পেলেন যে, তাঁর ঘোড়া নাকি সে রেসে জিতবে না। কথাটা প্রথমে তাঁর বিশ্বাস হলো না। দৌড় শেষে তিনি দেখলেন, লোকে যা বলেছিল সেইটাই ঠিক। সেদিন থেকেই তাঁর ঘোড়ার নেশার ঘোর অনেকটা কেটে গেলো।

রণজির প্রখর রাজনৈতিক জ্ঞান ও আবেগময়ী বক্তৃতার সুখ্যাতির কথা বৃটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কানে গিয়ে পৌঁছেছিল। লীগ অব নেশনের প্রথম সভায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার জন্যে তিনজন প্রতিনিধির নামের তালিকায় স্যার উইলিয়াম মেয়ার এবং স্যার সৈয়দ আলি ইমামের সংগে রণজির নামও প্রকাশিত হতে দেখা গেলো।

ঘরের ও বাইরের নানারকমের কাজের চাপে রণজি ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। বয়স বাড়ার সংগে সংগে খাটবার ক্ষমতাও তাঁর কমে আসছিল। তাই বছরে কয়েক মাস ইংলণ্ডে চুপচাপ শান্তিতে বিশ্রাম করে নিজের কর্মশক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করে আবার তিনি জামনগরে ফিরে আসতেন। লণ্ডনের কাছকাছি স্টেনসে সেইজন্যে তিনি এক বিরাট জমিদারী ভাড়া নিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ইংলণ্ডে রণজি এসেছেন এ সংবাদ জানাজানি হলেই দলে দলে বন্ধু-বান্ধব আসত তাঁর সংগে দেখা করতে। খাওয়া দাওয়া, হৈ হল্লায় রণজির বিশ্রামের পরিবর্তে পরিশ্রম হতো বেশী। দিনের পর দিন এইভাবে চলতে থাকায় স্টেনসের আস্তানা তুলে ফেলবেন বলে তিনি ঠিক করলেন। আয়ার্ল্যাণ্ডে ৩০,০০০ একর জমি সমেত এক নতুন জমিদারির সন্ধান পেয়ে তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডেই নতুন বাসা বাঁধলেন।

ইংলণ্ডের ক্রিকেট মাঠে দর্শক হিসাবে রণজিকে তখন আর নিয়মিত দেখা যেতো না। তবে কোন বিশেষ ক্রিকেট খেলা হলে বিশিষ্ট দর্শকদের আসনে একটু উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখলেই রণজির হাস্যোজ্জ্বল মুখের সন্ধান মিলতো। রণজি মাঠে উপস্থিত

হয়েছেন জানতে পেলে সাংবাদিকেরা ছুটে আসতেন। "কি রকম খেলা তিনি দেখছেন, কার খেলা ভালো হচ্ছে, কার কি ভুল ত্রুটি হচ্ছে, রণজির আমলের খেলা থেকে এখনকার ক্রিকেট খেলা উন্নত হয়েছে কি না" এই ধরনের নানারকমের প্রশ্নের জবাব দিতে হতো তাঁকে। ১৯২৫ সালে ঠিক এই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

"People seem to play for their personal averages more than for their side these days, But I think that cricket is better now than it was in 1914."

খেলাধুলোর জগতে রণজি বিশ্বমন জয় করে নিলেও ভারতের মাটিতে মুষ্টিমেয় ইংরেজদের এক ক্লাব রণজিকে সভ্য হিসাবে গ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল—এ সংবাদ শুনলে আজ অনেকেই হয়তো বিস্মিত হবেন। কিন্তু ঘটনাটি সত্য। রণজি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই ঘটনার কথা বন্ধুবান্ধবদের বলতেন আর হাসতেন। তিনি বলতেন—'যে দেশের মহামান্য রাজা আমার সঙ্গে বসে আহার করতে অপমানিত বোধ করেন নি, আমাকে ক্রিকেট মাঠে নামবার জন্য যিনি বহুবার অনুরোধ করেছেন, এমন কি আমার চোখে আঘাত লাগার সংবাদে ব্যক্তিগত তারবার্তা পাঠিয়ে উৎকণ্ঠা জানাতে যিনি এতটুকু সংকোচ করেন নি—সেই রাজার মুষ্টিমেয় বেতনভুক কর্মচারীর এ ঔদ্ধত্য দেখে হাসবো ছাড়া আর কি করবো? যে দেশের গণ্ডায় গণ্ডায় লর্ড ও

স্যার উপাধিধারী আমার জামনগর প্রাসাদে এসে দিনের পর দিন অতিথি হিসাবে বাস করে যাচ্ছে, সে দেশের মুষ্টিমেয় কিছু লোকের ব্যবহার আমার মনকে পীড়া দেবে কেন!"

ক্রিকেট অনুরাগী অনেকেরই হয়তো ক্লাবটির নাম জানা আছে। ক্লাবটি হলো বোম্বাইয়ের 'জিমখানা ক্লাব'। অবশ্য কয়েক বছর পর ক্লাব কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে রণজিকে সভ্য পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ পাঠান, তখন রণজি সে অনুরোধ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন।

রণজির বহু সাধে ও বহু অর্থব্যয়ে গড়া বেদী বন্দর এবং রাজ্যের শুল্ক ব্যবস্থায় সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপে রণজি ব্যথিত ও বিস্মিত হন। এই ব্যাপার নিয়ে সরকারের সঙ্গে তাঁর তীব্র মতান্তর ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়। অনেকে ভেবেছিলেন, এই ব্যাপারের পর রণজি হয়তো ভবিষ্যতে আর রাজকর্ম-চারীদের আগের-মত সুনজরে দেখবেন না। কিন্তু আতিথেয়তার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যাপারকে জড়িত করে রণজি ভারতীয় আতিথেয়তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে ম্লান করে দিতে রাজী হন না। বোম্বাইয়ের গভর্নর, এমন কি বড়লাট পর্যন্ত জামনগরে এসে রণজির আতিথেয়তা দেখে বিস্মিত হয়ে যান। লর্ড আরউইনের ৬৪ ঘণ্টা জামনগর ভ্রমণের জন্য রণজির ব্যয় হয় ২২.৫০০ পাউন্ড।

১৯৩০ সালে লণ্ডনে এসে সাসেক্স দলের আর্থিক দুরবস্থার কথা রণজির কানে আসে। অর্থের অভাবে শক্তিশালী দল গঠন করা সম্ভব হচ্ছে না একথাও জানতে পারেন তিনি। প্রিয় দলের এই দুরবস্থার কথা শুনে রণজি চুপ করে থাকতে পারেন না। এক হাজার পাউণ্ডের একখানি চেক তিনি ক্লাব কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেন। এছাড়া, চারজন পেশাদার খেলোয়াড়ের মরসুমের মাইনে ও অন্যান্য খরচ পত্র নিজের পকেট থেকে দেবেন বলে এক প্রস্তাব পাঠান। ক্লাবসভারা তাদের পুরনো দিনের দিকপাল খেলোয়াড়কে ক্লাব হিতৈষী হিসাবে পেয়ে সভাপতি পদে বরণ করে নেয়। নিজ ক্লাবের খেলোয়াড় ছাড়াও সমসাময়িক বা পরবর্তী-কালের ইংলণ্ডের কুশলী খেলোয়াড়দের জন্যে রণজির এক বিশেষ দুর্বলতা ছিল। কোন খেলোয়াড়ের সাহায্যের জন্য কোন প্রদর্শনী খেলার আয়োজনের কথা কানে এলে রণজি ভারতে থাকলেও সাহায্য পাঠাতে কখনো ভুলে যেতেন না।

দলীপ সিংজী ইংলণ্ডের ক্রিকেট মাঠে ধীরে ধীরে সুনামের অধিকারী হচ্ছেন দেখে রণজি খুব সুখী হন। এর পর যেদিন তিনি জানতে পারেন যে, তাঁর মত তাঁর ভাইপোও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের টেস্ট দলে নির্বাচিত হয়েছেন, সেদিন তাঁর আনন্দের আর সীমা থাকে না। খেলার নির্দিষ্ট দিনে রণজি অনেক আগে গিয়েই মাঠে হাজির হন। আট বছর বয়স পর্যন্ত দলীপকে তিনি হাতে-কলমে ক্রিকেট খেলা শিখিয়েছেন। তারপর এই দীর্ঘদিন সময় ও সুযোগের অভাবে দলীপের খেলার ভুল ত্রুটি শুধরে দিতে পারেন নি, সেই দলীপ কি পারবে তাঁর মুখ রাখতে? পারবে কি দলীপ তাঁর মত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলায় নেমে শতরানের গৌরব লাভ করতে?—এইসব চিন্তাই রণজিকে ব্যাকুল করে তোলে। দলীপ সিংজী একটার পর একটা রান করে যান আর রণজির ব্যাকুলতা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। দলীপের রান যখন শতরানের কাছাকাছি তখন রণজি আরও বিচলিত হয়ে ওঠেন। বহু শতরানের অধিকারী যে রণজিকে নিজের শতরানের সীমানায় কেউ কখনো বিন্দুমাত্র বিচলিত হতে দেখেনি, সেই রণজির মুখে অস্থির চঞ্চলতার সুস্পষ্ট ছবি ফুটে ওঠে। দলীপ সিংজীর শতরান পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্যান্য দর্শকের মতই লাফিয়ে উঠে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান। সাংবাদিকরা রণজির মনোভাব জানার জন্যে তাঁকে ঘিরে ধরতেই তিনি হাসিমুখে বলেন—

"I am the proudest man in England. I have realised one of my greatest ambitions, and am basking in reflected glory. I watched every stroke of his play with the enthusiasm of a school boy; but I felt nervous for him, as I had coached him when he was eight years old, and until he went to Cheltenham."

সাংবাদিকরা আবার প্রশ্ন করেন, "কেমন দেখলেন টেস্ট খেলা?"

রণজি উত্তরে বলেন—"বোলিং-এর মান আজ নিম্নগামী। টম রিচার্ডসন, ট্রাম্বেল বা জর্জ লোম্যানের মত দুর্ধর্ষ বোলার একজনও দেখলাম না।" ব্র্যাডম্যানের খেলা সম্বন্ধে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—"ব্র্যাডম্যানকে ট্রাম্পার, হিল বা

জামবিজাজীর আমলের জামনগরের রাজপ্রাসাদ

রণজির তৈরী জামনগর রাজপ্রাসাদ

ম্যাকার্টোনির পর্যায়ে ফেলা চলে না। কারণ ঐসব ধুরন্ধর ব্যাটস্‌ম্যান যে ধরনের উন্নত বোলিং-এর বিরুদ্ধে তাঁদের নৈপুণ্য প্রকাশ করে গেছেন ব্র্যাডম্যানকে আজ সে ধরনের বোলারের সম্মুখীন হতে হচ্ছে না।"

ক্রিকেট খেলার মাঠ থেকে অনেকদিন আগে বিদায় নিলেও, কি খেলোয়াড়, কি দর্শক, সকলের কাছেই রণজির জনপ্রিয়তা তখনো পূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। ক্রিকেটের রাজকুমারকে ক্রিকেট মাঠে দেখতে পেলে সকলে এসে ঘিরে ধরে,—তাঁর সংগে আলাপ করার একটু সুযোগ পেলে খেলোয়াড়েরা সুখী হয়। রণজি ভীড়ের ভয়ে চুপি চুপি মাঠে ঢোকেন আর খেলা ভাংগলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। দলীপ সিংজী নিজের গৌরবোজ্জ্বল ক্রিকেট জীবনের মধ্যাহ্নেও রণজির এই অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা দেখে মুগ্ধ হয়ে লিখেছিলেন—

"They flocked round him. I then realised what a wonderful hold he

প্রথম মহাযুদ্ধের সম্মানের পদকসহ রণজি।

had in the public imagination. I myself worshipped him like a god, and played cricket only to please him."

দলীপ সিংজীর খেলাকে রণজি সব সময় প্রশংসা করতেন একথা ভাবলে রণজিকে ভুল বোঝা হবে। ভালো খেললে তিনি যেমন উৎসাহ দিতেন আবার খারাপ খেললে তাঁর তিরস্কারের হাত থেকে দলীপ সিংজী কখনো রক্ষা পেতেন না। তবে রণজি খেলার সমস্ত অবস্থা পুংখানুপুংখরূপে বিচার করে তবে মন্তব্য করতেন। জামনগরে থেকেও তিনি দলীপ সিংজীর প্রত্যেকটি খেলার ফলাফল গভীর মনোযোগের সংগে লক্ষ্য করতেন এবং খেলা শেষ হলে তাঁর অভিমত লিখে পাঠাতেন। একবার কোন একটি টেস্টে দলীপ সিংজী খুব খারাপ খেলায় রণজি টেলিগ্রাম পাঠান, "Go and play tennis with Betty Nuthall."

আবার শূন্য রানে আউট হয়েও দলীপ সিংজী স্থান কাল বিশেষে রণজির প্রশংসা পেয়েছেন এমন নজীরও আছে। ১৯২৭ সালে দলীপ সিংজী খুব কঠিন রোগে পড়েন। অনেকদিন ক্রিকেট মাঠের সংগে তাঁর কোন যোগাযোগ থাকে না। দীর্ঘ ব্যবধানের পর ব্রাইটন মাঠে দলীপ যেদিন খেলতে নামেন সেদিন রণজিও মাঠে। কোন রান করার আগেই দলীপ আউট হয়ে যান। দর্শক বা খেলোয়াড়দের সমালোচনা থেকে তাঁর সবচেয়ে ভয় রণজি কি বলেন! খেলার পর রণজি দলীপকে তাঁর গাড়িতে উঠতে বলেন। দলীপ তো তখন মনে মনে ইষ্টনাম জপ করছেন আর প্রতি মুহূর্তে ভাবছেন, এখুনি হয়তো রণজি বলবেন—আর কেন, অনেক খেলেছো, এবার খেলা ছেড়ে দাও। গাড়ি চলতে থাকে। রণজির মুখে কোন কথা নেই। গভীর চিন্তামগ্ন তিনি। গাড়ি তিন চার মাইল পথ পার হবার পর রণজি ধীরে ধীরে বলেন—"তোমার আজকের খেলার প্রতিটি মুহূর্তে আমি গভীর মনোযোগের সংগে লক্ষ্য করেছি। তোমার শরীর এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি। শতকরা ১০০ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ৯৯ জন খেলোয়াড়ই এ অবস্থায় মাঠে নামতে সাহসী হয় না। তোমার সে সাহস দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভবিষ্যতে ইংলন্ডের এগারজন খেলোয়াড়ের অন্যতম হিসাবে তুমি নিজের পরিচয় দিতে পারবে।" রণজির সে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল এবং দলীপ সেই বছরেই পরের ছয়টি খেলাতে শতরান করার গৌরব লাভ করেছিলেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

প্রদ্যোতকুমার রায়

২

১৯শে মার্চ, সকালে ঘুম ভাঙল ইনস্ট্রাক্টর শ্রী আংথাপ্পার ডাকে। চটপট উঠে তাঁবু খুলে, কিটস্ প্যাক করে, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে তৈরী হয়ে নিলাম। ব্রেকফাস্ট খেয়ে ও সংগে লাঞ্চ নিয়ে আবার পথে নামলাম। আজকে ভারত সীমানা অতিক্রম করে সিকিমের মাটিতে পা দিয়েছি। পাহাড়ের গা ঘেঁষে সরু রাস্তা দিয়ে কিছুটা উঠে সমতল ভূমিতে একটি বড় বাজারে এসে পড়লাম, সে জায়গাটির নাম 'শিংলা বাজার'। আজকের রাস্তা বেশ ভালোই। প্রায় হাজার ফিট নিচে প্রচন্ড বেগে বয়ে চলেছে রংগিত নদী। একটা নতুন রাস্তা তৈরী হচ্ছে শিংলা বাজার থেকে গেজিং পর্যন্ত।

কিছুদূরে এগিয়েই দেখি, মুশকিল! কোন রাস্তাই নেই—সমস্ত ভেঙে গেছে। অনেক কুলি কাজ করছে সেখানে। খুব সাবধানে ঢালু রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে নেমে চলেছি। আমার সামনে ছিলেন এয়ার ফোর্সের শ্রী বশিষ্ঠ। হঠাৎ দেখি পা ফসকে তিনি হুড় হুড় করে নেমে চলেছেন। তাড়াতাড়ি একজন নিচের কুলি তাঁকে ধরে না ফেললে আজ তাঁর বরাতে ঐ প্রচন্ড রংগিত নদীতে সলিল সমাধি অবধারিত ছিল। খুব বেঁচে গেছেন ভদ্রলোক। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে ভাঙা পথটুকু পার হলাম।

বেলা দেড়টা, একটি ছোট নদীর ধারে আমরা স্নান সেরে খাবার খেলাম। আজ ক্যাম্প হবে খুব কাছেই, রংগিত নদীর তীরে ঋষি নামে এক জায়গায়। বেলা দুটোয় ক্যাম্প খাটান হ'ল। বাকি দিনটুকু বিশ্রাম।

পরের দিন ভোরে আবার চলা শুরু হ'ল। প্রতিদিন আমরা প্রায় বারো তেরো মাইল হাঁটছি। অবশ্য সমতল ভূমির বারো তেরো মাইলের সংগে এই পার্বত্য দূরত্বের আসমান জমিন তফাত। বেলা সাড়ে বারোটায় পৌঁছলাম সিকিমের বিখ্যাত গেজিং বাজারে। সমতল ভূমি থেকে প্রায় সাড়ে ছ হাজার ফিট উঁচু, ঠিক যেন দার্জিলিঙের মত আবহাওয়া এখানকার। অনেক দোকান-পত্তর রয়েছে। একটি বিরাট দোকান দেখলাম, সব কিছুই পাওয়া যায় সেখানে। বলা বাহুল্য, দোকানটির মালিক মাড়োয়ারী। একটি দোকানে আমরা চা চাইলাম। যে যার লাঞ্চ বার করল, দোকান থেকে কিছু মিষ্টিও নেওয়া হ'ল। একজন সাহেবী পোশাক পরা ভদ্রলোক মিঃ পেরেরার সংগে কথা বলছিলেন। পেরেরা তাঁকে কি যেন বলে আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ভদ্রলোক আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন ইংরেজীতে, "আপনি বাংলা দেশ থেকে আসছেন? আপনার নাম কি?" জবাব দিলুম, "হ্যাঁ" আর নামও বললুম। ভদ্রলোক তখন বাঙলায় জিজ্ঞাসা করলেন—কায়স্থ না ব্রাহ্মণ? ক্রমশ ভদ্রলোকের সাথে আলাপ জমে উঠল। ইনি সিকিম গভর্ণমেণ্টের ডাক্তার, বাড়ি পূর্ববংগে খুলনা জেলায়। সিকিমে প্রায় পাঁচ বৎসর আছেন।

আমরা যে দোকানে বসে লাঞ্চ করলাম তার সামনে ও দেশীয় ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের ভিড় জমে গেছে। তারা আমাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

অপর এক বাঙালী ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হ'ল। তিনি এখানকার দুটি স্কুলের হেড মাস্টার। কথায় কথায় হেড মাস্টার মশায় জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা ওই যে ভদ্রলোক লাল জামা পরে ব্যস্ত হয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, উনি আপনাদের কে?"

তাঁকে জানালাম, উনিই হচ্ছেন এভারেস্ট বিজয়ী শ্রী তেনজিং। সংগে সংগে হেড মাস্টার মশায় তাঁর সংগের নেপালী অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেড মাস্টারদের বললেন, একটি সম্বর্ধনা সভার ব্যবস্থা করতে। কিন্তু তেনজিং বললেন, তিনি এখন ভয়ানক ব্যস্ত, আমাদের ফিরতি পথে যদি এ সমস্তের ব্যবস্থা হয় তবে তিনি খুব আনন্দিত হবেন। হেড মাস্টার মশায় দুটো স্কুলই ছুটি দিয়ে দিলেন শ্রী তেনজিং ও তাঁর দল-বলকে দেখার জন্য। ভাবতে পারেন, এক মাঠ ছেলে মেয়ে বুড়ো আমাদের দেখবার জন্য ভেঙে পড়েছে। যার যার ক্যামেরা ছিল তারা স্কুলের ছেলেমেয়েদের সংগে তেনজিং ও আমাদের ছবি নিলেন।

বিশ্রামের পালা শেষ করে আমরা আবার চলতে শুরু করলাম। একেবারে খাড়াই রাস্তা। দুটি একটি বাড়ি এদিকে ওদিকে দেখা যাচ্ছে। চারধারে জায়গায় জায়গায় বুদ্ধ পতাকা উড়ছে। ক্যাপ্টেন গুরুং বললেন, পাপী লোকেরা তাদের জীবনের সমস্ত পাপের বিবরণ একটি কাপড়ে লিখে দেবমন্দিরের কাছে বাঁশ পুঁতে টাঙিয়ে দেয়। তাদের বিশ্বাস, ওই পতাকা যতো হাওয়ায় উড়বে ততই তাদের পাপ মুছে যাবে। শুনেছি, এই ধরনের রীতি অন্যত্রও প্রচলিত আছে।

বিকেল সাড়ে তিনটের সময়ে আমরা একটি বনে এসে উপস্থিত হলাম। শ্রী তেনজিং ও অপরাপর ইনস্ট্রাক্টররা ক্যাম্পের জন্য জায়গা খুঁজতে লাগলেন। বেশ শীত করছে। আমরা সকলে ফুল শিলভ পুলওভার গায়ে দিয়ে নিলাম। নিচে একটি ভুট্টা ক্ষেতে আমাদের ক্যাম্পের জায়গা

সমতলভূমি থেকে ১৩০০০ ফিট উঁচুতে আমাদের জংরি ক্যাম্প

ঠিক হল। উঁচু নিচু জমি, পাথর। আমার পার্টনার তরফদার এখনো এসে পৌঁছায়নি। আমি বসে রইলুম না। ভালো একটি জায়গা বেছে নিয়ে আইস অ্যাক্স দিয়ে জমি সমান করতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে ওরা এলো, তাঁবু খাটান হ'ল, তৎক্ষণে চা-ও তৈরী। বেশ সুন্দর জায়গাটা। যেদিকে তাকাই সেদিকেই মেঘের মত পাহাড়ের সারি। ঘননীল সমুদ্রের ঢেউরা যেন হঠাৎ স্থির হয়ে গেছে। ওই যে নীচে সেই গেজিং বাজার।

ক্রমে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, পাহাড়গুলো অন্ধকারের আস্তরণে মুখ লুকালো যেন।

ঝিক মিক করে দু একটা তারা ফুটছে আকাশে। ওই যে একটা, ওই আরেকটা— নাঃ গোনা যায় না, অনেক! আজ একাদশী না? তাই চাঁদ ওই আধভাঙা মুখ নিয়ে উঁকি দিচ্ছে।

ক্যাডেট সাহা আর বিষয়ীর সঙ্গে তাঁদের টেণ্টে বসে গল্প করছি, এমন সময় কে যেন চিৎকার করে উঠল, "মেল! মেল!" অর্থাৎ ডাক এসেছে। যে যার টেণ্ট থেকে দৌড়ে গেলাম। সবাই পেলো একটা দুটো করে, মুখভরা হাসি সকলের। নাঃ আমার কোনো চিঠি আসেনি। একটু হতাশ মনে তাঁবুতে ফিরলাম। আর তখুনি যেন এই সদ্য পাওয়া দুঃখে সান্ত্বনা দেবার জন্য ডিনারের বাঁশি বেজে উঠল। সেদিনকার মত আরাম করে খেয়ে তোফা ঘুম।

২০শে মার্চ, প্রভাত ভোজন সেরে বার হবার আগে তেনজিং সকলকে হুঁশিয়ার করে দিলেন। আজ থেকে সকলকে এক সাথে যেতে হবে, কেননা, অন্যান্য দিনের মত একটিমাত্র পথ আজ আর নেই, আজ চতুর্দিকে অনেক পথ। একবার পিছিয়ে পড়লে বিপদের সীমা থাকবে না। আমাদের সমস্ত দলটিকে দু ভাগ করা হ'ল। যাঁরা বেশ তাজা এবং স্ট্রং রয়েছেন, তাঁদের প্রথম দলে যেতে দেওয়া হ'ল। অপেক্ষাকৃত দুর্বল যারা তারা পিছনের দলে যেতে লাগল।

আজকে বনের মধ্যে দিয়ে পথ, কতো জানা অজানা সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ রয়েছে। রয়েছে রডোডেনড্রনের ঝোপ, মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যাগ্নোলিয়া গ্র্যাণ্ডিফ্লোরার গাছ। বেশ কিছুক্ষণ চলবার পরে চারদিকে আগের মত বুদ্ধ পতাকা দিয়ে ঘেরা একটা পাথরের গেট দেখা গেল। আমরা যত এগিয়ে যাই বুদ্ধ পতাকা ততই বেশি বেশি দেখা যায়। জানতে পারলাম, এ জায়গাটার নাম হচ্ছে প্রেমাংসি। রাজর্ষি ধর্মাশোকের প্রতিষ্ঠিত সিকিমের বিখ্যাত বুদ্ধ মন্দির এখানে রয়েছে। চারদিকে সব লামাদের বাড়ি পেরিয়ে মন্দিরের কাছে গেলাম। লামারা আমাদের আগমন বার্তা পেয়ে যে যার পুঁথিপত্র নিয়ে আসতে লাগল। লাল টকটকে গায়ের রঙ আর লাল ঝোলা পোশাকে তাদের চমৎকার দেখাচ্ছে। রুক স্যাক এবং চামড়ার জুতো খুলে রেখে আমরা গুম্ফা বা মন্দির দেখতে ঢুকলাম। মন্দিরটি দোতলা। অপরাপর বৌদ্ধ দেবদেবীর সঙ্গে এখানে ভগবান তথাগতের সেই প্রসন্ন সহাস মূর্ত্তি বিরাজ করছে।

একজন লামা দেখি পিতলের বাটিতে করে সাদা সাদা জমানো কি একটা জিনিস অনেককে দিচ্ছে। ইনস্ট্রাক্টর গালছেন বুঝিয়ে দিলেন, ওই কাপের ভিতর জমানো মোম-বাতি, পুজার নিদর্শনস্বরূপ ভগবান বুদ্ধের চরণে এই বাতি জ্বালিয়ে দিলে অশেষ পুণ্যের অধিকারী হওয়া যায়। এক একটি বাতির দক্ষিণা দেড় টাকা।

মন্দিরের সামনে থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সিকিমবাসীরা কাঞ্চন-জঙ্ঘাকে দেবী বলে মনে করে—সকলের ওই পর্বতে ওঠবার অধিকার নেই। উঠতে হলে এখানকার দালাই লামার কাছে অনুমতি নিতে হয়।

আবার উতরাই পথে নামলাম। সকাল থেকে যতো পথ উঠেছি প্রায় তার ডবল নেমে এলাম। পথে সুন্দর একটি গ্রাম পড়ল। গম, যব আর মকাইয়ের চাষ হচ্ছে ক্ষেতে। মাঝে মাঝে চার পাঁচটা কমলা লেবুর গাছ। গ্রামটির নাম বীরগাঁও।

প্রচণ্ড গর্জন করতে করতে বয়ে যাওয়া একটি নদীর ধারে এসে থামলাম আমরা। এই নদী এবার পার হতে হবে। এখানে দেখি তেনজিং আর তাঁর ভাইপো ইনস্ট্রাক্টর গোম্ফু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা তো অবাক! এঁরা আমাদের অনেক পিছনে আসছিলেন।

নদীর দিকে তাকিয়ে আর পার হবার উপায় দেখে ভগবানের নাম নিতে হল। এখানে বাঁশের ব্রিজ। দুটো বাঁশ নিচে পাতা আর উপরে একটা বাঁশ বাঁধা। উপরেরটা ধরে নীচের বাঁশ দুটোর উপর দিয়ে পার হতে হবে। নদীর ওপারে গোম্ফু এবং এপারে তেনজিং দাঁড়িয়ে কিভাবে আইস অ্যাক্স পিঠে গুঁজে নদী পার হতে হবে তার নির্দেশ দিচ্ছেন। ব্রিজ দিয়ে যেতে যেতে টের পাচ্ছি পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। একবার পা ফসকালে আর দেখতে হবে না। নিঃশ্বাস বন্ধ করে একটু একটু এগোচ্ছি আর মনে মনে বলছি, "হে ভগবান বুদ্ধ, ভালোয় ভালোয় তোমার মুলুক থেকে ফিরিয়ে দাও বাবা, ঘরের ছেলে যেন ঘরে ফিরতে পারি।"

যাক্, পেরিয়ে এসেছি। গোম্ফুকে জিজ্ঞাসা করলাম, ক্যাম্প কি কাছেই হবে? কোন উত্তর না দিয়ে সে একটু হাসল শুধু, হাসলে আবার তার চোখ দুটো বুজে যায়। লোকপরম্পরায় শুনলুম, আরও মাইল আটেক রাস্তা বাকি।

বেশ কিছু চড়াই উতরাই পার হয়ে আবার এক পাহাড়ী নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলাম। এখানেও সেই বাঁশের সেতু। না, এবারে আর তত ভয় করছে না। নদী পার হয়ে পাথরের উপর রুকস্যাক রেখে বসে বসে জিরোতে লাগলাম। এখানেই লাঞ্চ খাওয়া হ'ল। অনেক খাবার, সব খেতে পারলাম না, অর্ধেক একজন শেরপা কুলিকে দিয়ে দিলাম।

এখানে একটি জলপ্রপাত রয়েছে, সেই-জন্যেই নদীর গর্জন এত জোর। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ ফিট উপর থেকে প্রচণ্ড তোড়ে জল পড়ছে। নীচে শুধু সাদা সাদা ফেনা,

যেখানে জলটা পড়ছে তার এক পাশ দিয়ে জল উথলে পড়ে নদীর মতন বয়ে চলেছে।

আবার চড়াই শুরু হল। এবারের পথ খুব খাড়াই। উঠতে বড় কষ্ট হচ্ছে। পায়ের মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে টনটন করছে। যদি দশ মিনিট চলি তবে পাঁচ মিনিট বসে বসে বিশ্রাম নিতে হয়। তবু ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছি আর চোখে পড়ছে পাহাড়ী ক্ষেতগুলো। ঠিক যেন সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে নেমে গেছে পাহাড়ের গায়ে। পাহাড়ী গ্রাম বলতে চার পাঁচটি ঘর এক সাথে। এখানে জল সরবরাহের ব্যবস্থাটি ভারি চমৎকার। ফাঁকা বাঁশের গাঁটগুলো বাদ দিয়ে একটার পর একটা বাঁশ বেঁধে নলের মত করা হয়েছে। সেই নল দিয়ে কোনো ঝরনা থেকে জল যায়। প্রত্যেক গ্রামে আবার সেই জল চার পাঁচটি নলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি বাড়ি দিবারাত্র জল পায়।

বিকেল সাড়ে তিনটের সময় আমরা ইয়কসামে পৌঁছলাম। একটা মালভূমির মাঝে এটি একটি ছোট গ্রাম। ক্ষেতে চাষ হচ্ছে ভুট্টা, যব, গম, আলু ও মটরশুঁটি। গ্রামের লোকেরা মুরগি শুয়োর ইত্যাদিও পোষে। এদের বাড়িগুলোও বেশ মজার। দেখলে ঠিক গোয়াবাগানের গোয়ালাদের আস্তাব কথা মনে হয়। নিচের তলায় ছাগল, মুরগি, গরু, শুয়োর ইত্যাদির খোঁয়াড়। তার উপর প্লাটফর্ম করে মানুষ থাকবার বাড়ি। দূরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের হলদে রঙের টেণ্টগুলো খাটানো হয়েছে।

ক্যাম্পে পৌঁছেই গরম গরম চা আর বিস্কুট পাওয়া গেল। বেশ মজা লাগছে—আগামীকাল পুরো দিনটা বিশ্রামের জন্য ছুটি। বলতে ভুলে গিয়েছি, আমাদের যাত্রাপথে একুশটা ছাগল, ভেড়া ইত্যাদিও সংগী হয়েছিল। আজকে তাদের একজনকে কাটা হ'ল। এখানকার আবহাওয়া বেশ সুন্দর—শীতও নেই অথচ গরমও নয়। আমি অবশ্য গায়ে জামা দিয়েই শুলাম। আমার এয়ার ম্যাট্রেসটা লিক হয়ে গেছে। রাত্রে পুরো হাওয়া দিয়ে শুই আর সকালে উঠে দেখি একেবারে হাওয়া নেই, মাটির সংগে মিশে গেছে। ইনস্ট্রাক্টর আংথাম্পাকে 'লিক' সেরে দেবার জন্য বলেছিলাম, তিনি বললেন, আগামীকাল সেরে দেবেন।

মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙল। বাইরে বেরিয়ে দেখি পেরেরা, মুস্‌কুরাজ, থাম্পা, গুরুং প্রভৃতি অফিসাররা বিস্ফারিত চোখে একটা পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে। চেয়ে দেখি পাহাড়ের গায়ে সারি সারি আগুন জ্বলছে। কেউ বললে, মঠ মন্দির ইত্যাদি আছে, কেউ বা বললে, কোন গ্রামবাসী আগুন জ্বালিয়ে থাকবে, কিংবা দাবানলও হতে পারে। রাত্রি বাড়ছে, ফের তাঁবুতে ফিরে গেলাম।
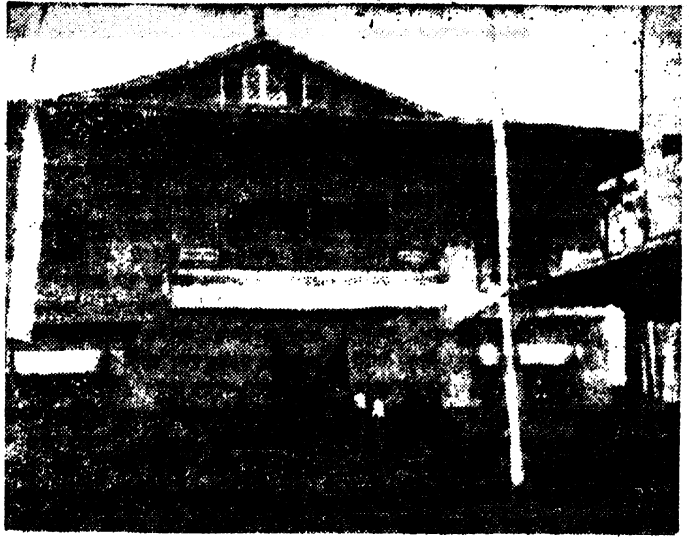
২১শে মার্চ, ভোরবেলা টি বয়ের ডাকে ঘুম ভাঙল। টেণ্টের দরজা খুলে চা নিয়ে ফিরব এমন সময় সামনে চোখ পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। দুটি মেঘের মত ঘনকৃষ্ণ পাহাড়ের ফাঁক থেকে দর্শন দিচ্ছে তুষারমৌলি নগাধিরাজের একটি চূড়া। সূর্যের আলো তার শীর্ষে সোনার রঙ ফলিয়েছে।

সিকিমের বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির

আজকে ছুটি, বেরোবার তাড়া নেই, উতরাই, চড়াই আর নদী পার হওয়ার চিন্তা থেকে অন্তত আজকের মত অব্যাহতি পাওয়া গেছে। আজকে লাঞ্চও হ'ল ছোট খাট ভোজের মত। বিকেলে ইয়কসামের কাজির বাড়ি বেড়াতে গেলাম। গ্রামের মধ্যে কাজিই সবচেয়ে ধনী লোক।

ইনস্ট্রাক্টর গোম্ফু এবং ক্যাপটেন গুরুং কাজির সংগে কথাবার্তা কইলেন। কাজির মেয়েরা আমাদের চায়ের নিমন্ত্রণ জানালো, কিন্তু তখন আমাদের ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছিল। আমরা বললাম, ফিরতি পথে তাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করব। ইয়কসামে 'তুম্বা' বলে একরকম মদ পাওয়া যায়, কমলালেবুর রস দিয়ে তৈরী এবং অকল্পনীয় সস্তা। আজকে দু বেলা মনের সুখে স্নান করে নিলাম, কারণ আজকেই স্নানের পালা শেষ। আগামীকাল থেকে আমরা বরফের রাজ্যে প্রবেশ করব। আগামীকাল থেকে আর শর্টস পরে পি টি কেডস পায়ে দিয়ে চলবে না। সুতরাং বাড়তি জিনিসপত্র ইয়কসামের স্টোরে রেখে দিয়ে যেতে হবে। বাঁচলাম, রুকস্যাকটা তবু কিছু হাল্কা হবে।

২২শে মার্চ, খুব ভোরে বাঁশি পড়ল উঠে পড়বার। তাড়াতাড়ি কিটস প্যাক করে, প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে সারতেই ব্রেকফাস্টের ডাক পড়ল। ব্রেকফাস্ট সেরে সংগে লাঞ্চ নিয়ে পথে বার হলাম। আজকে সংগে প্রচুর লজেন্স চকোলেট ইত্যাদি দিয়ে দিয়েছে। আজ আমাদের অন্য পোশাক। গরম ট্রাউজার, মাউন্টেনিয়ারিং বুট; আমি আর মাউন্টেনিয়ারিং বুট পায়ে দিলাম না। যা ভারি! কোথায় লাগে আমাদের অ্যামুনিশন বুট। এক এক পাটির ওজন পাঁচ সেরের কাছাকাছি। কাজির মেয়েরা বিষণ্ণ মুখে পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। তেনজিং ওদের সংগে কথা বলে হাত নেড়ে বিদায় নিলেন। চৌধুরী দেখছি বেশ সিকিমী ভাষা জানেন।
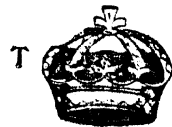
তিনি ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন আর অনেক চকোলেট দিলেন। তাঁর একটি কলেজের বন্ধু সিকিমবাসী ছিল, তার কাছেই শিখেছেন বললেন।

পাহাড়ের গা বয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে আমরা চলতে লাগলাম। কিছুটা চড়াই উতরাই আবার খানিকটা সোজা পথ। দু'জন আগে চলে গেছে রাস্তা মেরামত করার জন্য। বরফ পড়ে আগের সব রাস্তাই ভেঙে ধসে গিয়েছে। আজকে প্রায় প্রাণ হাতে করে পথ চলতে হচ্ছে। অবশ্য পথও ঠিকমত নেই। কোথাও বা গাছের শিকড় ধরে পাহাড়ের গা বেয়ে একরকম ঝুলতে ঝুলতে এগোতে হচ্ছে। আবার কোথাও দেখছি বুনো গাছ কেটে বানানো সেতুর উপর দিয়ে যেতে হচ্ছে। এইরকম সেতু পার হবার সময় নিচুর দিকে তাকালেই মাথা ঘুরে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। আজ আর রৌদ্রের কষ্ট নেই বটে কিন্তু চড়াই উতরাইয়ে যেন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। আজ আমাদের ক্যাম্প হবে ন' হাজার ফিট উঁচুতে। ইস্কুলে সেই বাঁদরের অঙ্ক কষেছিলুম যে, এক হাত ওপরে ওঠে আর দু হাত নিচে নেমে যায়। আমাদের ঠিক তারই মত অবস্থা হয়েছে। যদি এক হাজার ফিট উঠি তো আবার দু হাজার ফিট নেমে যাই। এইরকম চলল প্রায় বেলা বারটা পর্যন্ত। একটা নদীর ধারে এসে পৌঁছলাম। এখানকার সেতু তৈরী হয়েছে খুব মোটা এবং মজবুত একটি গাছ কেটে। এই সেতুর উপর দিয়ে আর স্থানীয় অধিবাসীরা যাতায়াত করে না। শেষ লোকবসতি আমরা ইয়কসামেই ছেড়ে এসেছি। নদীর ধারে দুপুরের খাওয়া হল। চারখানা চাপাটি, খানিকটা মাখন, দুটো মুরগির ডিম, খানিকটা জ্যাম এবং একটা আপেল। আংথাপ্পা আবার দেখি থার্মোফ্লাস্কে করে কফি নিয়ে এসেছেন। গরম গরম কফিতে দেহমনের সমস্ত অবসাদ দূর হয়ে গেল। বসে বসে বিশ্রাম করছি এমন সময় কুলির দল এসে পৌঁছল। সকলের হাসি হাসি মুখ। পিঠে ওই বিরাট বোঝা নিয়ে কি করে ওরা এই দুর্গম রাস্তা দিয়ে এলো! বাস্তবিক এদের অসীম ক্ষমতা।

শিক্ষার্থীরা প্রায় সকলেই নদীর ধারে পাথরের উপর চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছে—যেন সব কৌতূহল মিটে গেছে, পর্বতারোহণে আর স্পৃহা নেই।

তেনজিং এসে সকলকে উঠতে বললেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আর কত পথ বাকি?" তিনি বোধ হয় একটু রেগেই জবাব দিলেন, "জিজ্ঞাসা করবেন না, জিজ্ঞাসা করলেই কি পাহাড়ে চড়তে পারবেন, না, তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবেন। যেখানে আমাদের নিশ্চয়ই যেতে হবে সে জায়গা কতদূর জিজ্ঞাসা করে লাভ কি?"

সত্যিই লাভ কি? এত পরিশ্রান্ত হয়ে এখন যদি শুনি যে আরও পাঁচ সাত মাইল পথ বাকি, তবে নার্ভাস ব্রেকডাউন হতে এক মুহূর্তও লাগবে না।

পরক্ষণেই তেনজিং পিঠ চাপড়ে বললেন, "আপলোগ নওজোয়ান আদমি, ফিকর্ মৎ করিয়ে।"

তরফদার, ব্যানার্জি, গাই, পন্থ ও ভাস্ দাস দেখি আর উঠতে চাইছে না, আমরা বাকি সকলে আবার চলতে লাগলাম। অত্যন্ত খারাপ রাস্তা। হাতে পায়ে ভর দিয়ে রীতিমত গুঁড়ি মেরে চলতে হচ্ছে। ইনস্ট্রাক্টর তোপকে বললেন, আর উতরাই নেই, এবার খালি উপরে উঠতে হবে। নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। ঘড়ি ধরে নিজেদের পাল্স্ দেখলাম—বেশ জোর কদমে চলতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে আমরা ক্যাডেটরা বসে পড়ি—জন পেরেরো ও গুরুংকে বলি আস্তে চলতে, যা বড়ো বড়ো পা ফেলে চলতে শুরু করেছেন ও'রা। আর গুরুং তো একজন পাকা পাহাড়ী দেশের লোক। চেয়ে দেখছি পাহাড়ের চূড়ায় বরফ জমে রয়েছে। চূড়ার চারদিক ঘিরে কেমন সাদা কুয়াশার মত। মেঘগুলো স্থির হয়ে রয়েছে আকাশে, কিন্তু পাহাড়কে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।

বেলা তিনটের সময় আমরা একটা সমান জমিতে এসে পৌঁছলাম। শুনলাম, এখানেই আমাদের ক্যাম্প হবে। কুক এবং অন্যান্য লস্কররা আগেই এসে গেছে। তারা রান্নার জন্য জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি সংগ্রহ করেছে। বেশ শীত শীত করছে, আমরা ফুলস্লিভ পুলোভার চড়িয়ে নিলাম, যে যার টেণ্ট খাটাবার জায়গা ঠিক করে নিতে লাগল। আমাদের টেণ্ট বয়ে নিয়ে আসত যে জোয়ান নেপালী ছোকরা, তার কাছ থেকে দশ নম্বর টেণ্ট নিয়ে এলাম। আইস অ্যাক্স দিয়ে জমি সমান করে টেণ্ট খাটাতে আংথাপ্পা অনেক সাহায্য করলেন, আমার পার্টনার তরফদারের এখনও দেখা নেই।

তরফদার, গাই, পন্থ, সাহা, মুলেকরাজ প্রভৃতিরা নিজেদের একটা দল করে নিয়েছে। ওরা ভীষণ পিছিয়ে পড়ে। আমাদের মধ্যে ওরা "তরফদার পার্টি" বলে খ্যাত হয়ে গেছে। ওদের আসতে দেখলেই সকলে ঠাট্টা করে চেঁচাতে থাকে। ওদের দলে মজার মজার লোকও আছে বেশ। ক্যাপ্টেন গাই খুব হিউমার করতে পারেন, এক একটা কথা বলেন হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। ওদের ইনস্ট্রাক্টর গোম্ফুও খুব হাসাতে পারেন। ওদের দলে কেউ তাড়াতাড়ি কিছু করতে গেলেই তিনি বলেন, "স্লোলি স্লোলি ক্যাচ দি মাংকি! (slowly slowly catch the monkey.)"

এখানে খুব জলের কষ্ট। জল আনতে গেলে অনেক নিচে নামতে হবে—আর সে জলও পান করার উপযুক্ত নয়। রাত্রে ডিনারের পর ভালো করে প্লেট ধোবার উপায় নেই। কোনক্রমে সামান্য একটু গরম জল দিয়ে বাসনপত্র ধুতে হ'ল। বেশ ঠাণ্ডা এখানে। পালকের স্লিপিং ব্যাগের আরামে চোখের পাতা আপনা থেকেই বুজে এলো।

(ক্রমশ)

নলিন ঠাকুর বিকেল করে বাড়ি থেকে বেরোলেন। রোজই বেরোন, বড় ছেলের বৌ কুমুদ গা ধুয়ে কলতলা থেকে যখন ঘরে ঢোকে। সস্তা সাবানের গন্ধে নোংরা ঘিঞ্জি বাড়ির বাতাসটা যখন মাতালের মতন টালমাটাল করতে থাকে তখন হুঁকোয় শেষ টানটা দিয়ে কিরকম সশব্দে একটা নিশ্বাস ছাড়েন নলিন ঠাকুর। ওপরে চালের বাতায় ঝুলিয়ে রাখা লাঠিটা নামিয়ে দু' একবার মাটিতে ঠুক্ ঠুক্ করে ঠোকেন। কুমুদ শাড়ি ছাড়ছে আর গুনগুন করছে। নলিন ঠাকুর বেরিয়ে পড়েন বাড়ি থেকে। একেবারে নিয়মিত। কোনদিন এদিক ওদিক হয় না।

কসবার এদিকটায় রাস্তাঘাট তেমন হয়নি এখনও। মাঠ ভেঙে কি বাড়ির আনাচ কানাচ দিয়ে, বজবজের লাইন পার হয়ে নলিন ঠাকুর খাস বালীগঞ্জের লেক পাড়ের বাঁধানো রাস্তায় এসে ওঠেন। আর ঠিক তখন থেকে যতক্ষণ তিনি রেল লাইনের এদিকে থাকেন, অদ্ভুত. বেমানান দেখায় তাঁকে। যেন একটা কিম্ভূত কিছু। এমন কি, লেকে হাওয়া-খেতে-আসা কেউ কেউ তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়েও থাকে কিছুক্ষণ। একটা আশ্চর্য লম্বা দেহ। গায়ের রং কালো; অন্ধকার। দীর্ঘদিনের ব্যবহারে জীর্ণ একটা সুতির কালো কোট। বুক খোলা। গেঞ্জির ওপর কোঁচা দিয়ে পরা একটা ময়লা কাপড়। মাথায় পিঠ পর্যন্ত লম্বা কয়েকগাছি চুল। মাঝে মাঝে খোঁপাও বাঁধেন। এই অপরূপ পোশাকে লেকের এই বাঁধানো রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়াতে কি দাঁড়িয়ে থাকতে নলিন ঠাকুর কোনদিন কোন অসুবিধে বোধ করেননি। সন্ধ্যে না হওয়া পর্যন্ত লাঠি ঠুকে ঠুকে হাওয়া খাবেন। তারপর এগিয়ে যাবেন উত্তরদিকে। সাদার্ন এভিনুার ওপর সাদা রঙের সেই চারতলায়।

লেকের ধার দিয়ে দিয়ে এগিয়ে চলেন নলিন ঠাকুর। সারাদিনের কসবার সেই ঘিঞ্জি বাড়ির গরমের পর লেকটা সত্যি মনোরম। লেকের চারপাশ জুড়ে নানা রঙের আলো জ্বলে উঠেছে। হাওয়া বইছে। সাদার্ন এভিনুার সেই চারতলা বাড়ির সামনে যখন নলিন ঠাকুর এলেন, তখন আকাশে বাতাসে কোথাও বিকেলের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট নেই। অন্ধকার ঘোর হয়ে গেছে। চারতলা বাড়ির একেবারে চারতলায় থাকেন তাঁরা। তাঁরা মানে প্রাণেশ, প্রাণেশের মা, বোন। নীচের তিনটে তলায় ভাড়াটে।

সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠতে নলিন ঠাকুর হাঁপিয়ে ওঠেন। বুকের ওপর চাপ পড়ে। তবু উঠতে হয়। রোজ ওঠেন। নিয়মিত। সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে বারান্দা। তারপর বারান্দাকে ঘিরে চারটে ঘর। মাঝখানের ঘর পার হয়ে উত্তর দিকে ব্যালকনি। এ সময়ে ওরা ব্যালকনিতেই থাকে। ওরা তিনজন—প্রাণেশ, সারদা দেবী আর লেখা। ছোট গোল ব্যালকনি। আলো নেই। কিন্তু অনেক নীচের সাদার্ন এভিনুার আলোতে ছায়া-ছোঁয়া। যেন প্লানচেটে বসেছে এমনি নিঃশব্দে ওরা বেতের চেয়ারগুলোতে আড় হয়ে ছিল। নলিন ঠাকুর ওপরে এলেন অবিকল এক আত্মার মতন। ফাঁকা একটা চেয়ারে বসলেন। বেতের ছোট্ট টেবিলে পড়ে থাকা বিড়ির বাণ্ডিলটা ঢুকিয়ে রাখলেন কোটের পকেটে। রোজ রাখেন। কেননা,

রোজই টেবিলটাতে এক বাণ্ডিল বিড়ি পড়ে থাকে। তবে নলিন ঠাকুর আর ক'টা বিড়ি খান। যত সময় বাইরে আছেন ততক্ষণই। তারপর বাকী বিড়ি বাড়ি নিয়ে একটা তক্তার ওপরে রেখে দেন। তখন খায় হরি, খায় রতন, হয়তো গণেশও খায়। একটা বিড়ি নিয়ে ধরালেন নলিন ঠাকুর। দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে কেমন ফস্ করে একটা শব্দ হল। তা হোক। কষে বিড়িতে একটা টান মেরে নলিন ঠাকুর ডাকলেন, "বাবা প্রাণেশ...।"

চমকে প্রাণেশ সাড়া দেয়, "ঠাকুরমশাই"।

"সাতাশিটা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে আসতে বেশ কষ্ট হয় আজকাল। হাঁফ ধরে যায়।"

"একটা সালসা খান না।"

"সালসা! সালসা খেলে কি আর এ বয়সে পুরোন জোর ফিরে পাব?"

"পাবেন। ওরা তো বিজ্ঞাপনে তাই লেখে।"

"লিখেছে বুঝি?" হাওয়ায় এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে নলিন ঠাকুর হাসলেন, "কোথায় লিখেছে? কাগজে?"—কথাটা বলে ভাবলেন, বেশ হয় কিন্তু। হঠাৎ রাতারাতি যৌবনটা ফিরে পাওয়া গেলে মন্দ কি? বেশ হয়। রামায়ণে না মহাভারতে যেন কে একজন পেয়েছিল? নলিন ঠাকুর লেখার ছায়াটার দিকে ফিরে তাকালেন, "বলাইকে এক গ্লাস জল আনতে বলতো মা। বুকের ধড়াস ধড়াসটা বোধ হয় কমল একটু।"

লেখা উঠে ভেতরে গেল। যেতেই সারদা দেবী হঠাৎ বিষম খেলেন। যখন তখন বিষম খাওয়া রোগ দাঁড়িয়ে গেছে সারদা দেবীর। কাশতে কাশতে গলা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে চায়। চোখ দুটো ঠিকরে আসে।

প্রাণেশ বললে, "অরুণ মনে করছে মাকে।"

"অরুণ কে?" নলিন ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন।

"সরকার মশায়ের ছোট ছেলে। দেখেন নি? এবার বি এ দিল।"

"দেখেছি বোধ হয়। কিন্তু সে বৌঠানকে ভাববে কেন বাবা?"

প্রাণেশ হাসলো। "মা তাকে নিয়ে কাল পুরী যাচ্ছে।"

সারদা দেবী কাশির ধকল সামলে উঠেছেন। লেখা জল নিয়ে ফিরে এল। নিজেই নিয়ে এল। নলিন ঠাকুর জল খেলেন। কেউ কথা বলছে না আর। ব্যালকনির পরিবেশটা আবার আগের মতই স্তব্ধ হয়ে গেল। অনেক নীচে সাদার্ন এভিন্যুর ওপর দিয়ে ছুটে যাওয়া দামী মোটরের মসৃণ আওয়াজ আসছিল। মাথার ওপর, ছাদে বেঁধে রাখা লেখার অ্যালসেশিয়ানটা কাঁদছিল টেনে টেনে। এছাড়া, আর কোন শব্দ নেই। সাদার্ন এভিন্যুর সাদা বাড়ির চারতলার চারজনকে ঘিরে আত্মা-নামানো ভয়াবহ নির্জনতা লেকের হাওয়ায় কিরকম গম্ভীর হয়ে উঠলো। প্রতিদিন এ সময়ে নলিন ঠাকুরের ভয় ভয় করে। লেকের ভিজে হাওয়ায় সমস্ত শরীর সিরসির করে। লেক, রেল লাইন, কাঁচা রাস্তা সব পার হয়ে কসবার সেই ঘিঞ্জি বাড়ির হ্যারিকেন-জ্বালা নোংরা ঘর, রক, রান্নাঘর, কলতলা নলিন ঠাকুরের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রাণেশ ডাকলো, "ঠাকুরমশাই।"

নলিন ঠাকুর চমকে মুখ তোলেন।

"দিনকাল খুবই খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তাই না?"

"যাচ্ছে বৈকি বাবা?" নলিন ঠাকুর সজোরে নিশ্বাস ছাড়েন। "আমাদের কাল কি আর আছে?"

"আমরা যা দেখলুম তাই বা আছে কোথায়?"

"না না কিছু নেই। কিছু নেই।" আচমকা গলা ছোট করে ফিস্ ফিস্ করে উঠলেন নলিন ঠাকুর, "এখন খুড়তুতো ভাই বোনে বিয়ে হয়। মামা ভাগ্নী প্রেম করে। এমন কথা ভেবেছ কোনদিন। কি দিনই যে এল।"

চেয়ারের ওপর আড় হয়ে থাকা তিনটে ছায়াদেহ হঠাৎ নড়ে উঠে নলিন ঠাকুরের দিকে এগিয়ে এল। এগিয়ে এসে তারা কেউ ফিস্ ফিস্ করে উঠলো, 'এসব কথা সত্যি?'

"সত্যি বৈকি। একশোবার সত্যি।" নলিন ঠাকুর চেয়ারের ওপর টান হয়ে বসলেন। আর একটা বিড়ি ধরালেন। দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে কেমন ফস্ করে একটা শব্দ হল। তা হোক। নলিন ঠাকুর আরম্ভ করলেন: "যোগেনকে মনে আছে না? যোগেন? পরাণপুরের যোগেন। তার বড় মেয়েটা। শ্যামলী না কি নাম যেন। কোন মামার কাছে গান শিখত। গান শেখাতো অছিলা, বাড়িতে, রাস্তায়, অনেক রাত পর্যন্ত দুজনে সে কি ঢলাঢলি। কেলে-ঙ্কারীর একশেষ। শেষ পর্যন্ত সেই মামাকেই...।" নলিন ঠাকুর গল্প শেষ হবার আগেই টান হয়ে থাকা তিনটে ছায়াদেহ চেয়ারের ওপর নিঃশব্দে এলিয়ে পড়ল। যেন অনেক আশা করেছিল তারা। চোখ বুজে প্রাণেশ ডাকল, "ঠাকুরমশাই—।"

নলিন ঠাকুর চমকে তাকালেন।

"আজও কোন নতুন সংবাদ নেই?"

"নতুন সংবাদ? আছে বৈকি বাবা।" আবার শুরু করলেন নলিন ঠাকুর, "বড় বাড়ির শশাঙ্ক মহারাজের ছেলে বেণী, তোমাদের এখানে আগে খুব আসতো দেখেছি, ইদানীং ফুলে ফেঁপে বেশ লাগসই হয়ে উঠেছিল। একটা হাসপাতালের নার্স, বয়সে বোধ করি বেণীর চেয়ে সাত আট বছরের বড়ই হবে......"

"ঠাকুরমশাই!"

"আঁ", নলিন ঠাকুর আবার চমকে উঠলেন, "কি বলছ বাবা?"

"কোন নতুন সংবাদ আজও যোগাড় করতে পারেন নি?"

"নতুন সংবাদ? করেছি বৈকি বাবা। আমাদের দেবেন হালদারের বৌটা? একেবারে হালফ্যাশানের খবর। কি করেছে জান? ......ছিঃ ছিঃ।"

সেই সন্ধ্যে থেকে সারদা দেবী একটাও কথা বলেন নি। এমনভাবে চেয়ারের ওপর চোখ বুজে পড়েছিলেন, মনে হবে ঘুমুচ্ছেন। এখন হঠাৎ উঠে বসলেন। বসে বললেন, 'নলিনী, তুমি নেহাৎ বুড়ো হয়ে গেছ। কাল থেকে তোমার বড় ছেলে হরিকে পাঠিও।'—বলে সশব্দে চেয়ার টেনে উঠে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে লেখাও উঠে দাঁড়াল। তার আলসেশিয়ানটা ভীষণ কাঁদছে। দুটো চেয়ার শূন্য করে দিয়ে লেখা আর সারদা দেবী ব্যালকনি থেকে বেরিয়ে গেলেন। অন্ধকারে লেক থেকে ভেসে আসা হাওয়ায়

নলিন ঠাকুরের নিশ্বাস পড়ল। ভীষণ দুর্বল একটা বাতিল লোকের মতন চেয়ারে এলিয়ে ছিলেন তিনি। প্রাণেশ আগের মতই চোখ বুজে চেয়ারে আড় হয়ে আছে। এক গভীর ভয়াবহ স্তব্ধতায় কিছুক্ষণ নির্জীব হয়ে পড়ে থেকে নলিন ঠাকুর ডাকলেন, "প্রাণেশ।"

"ঠাকুর মশাই—"

"পাঁচটা টাকা দাও বাবা।"

প্রাণেশের চোখ বুজে থাকা মুখে একটি রেখারও পরিবর্তন হল না। কিরকম অক্লেশে বললে, 'না।'

নলিন ঠাকুর সংকোচে গুটিয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেলেন। তবু ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় বললেন, "না ক'র না বাবা। কোলের ছেলেটার ঘামাচিগুলো পেকে পেকে সারা গায়ে দগদগে ঘা হয়ে গেছে। পাড়ার শ্যামল ডাক্তার বলেছে দশ টাকা তার হাতে তুলে না দিলে এ ঘা সারবে না।"

প্রাণেশের মুখ যেন পাথর কুঁদে তৈরি। রাগ, অনুরাগ, বিরাগ কিছুই খেলা করে না সে মুখে। কেবল অন্ধকারে স্তব্ধ দেখায়। আর আলোতে উজ্জ্বল। প্রাণেশ উঠে বেরিয়ে গেল। টাকা কি এতই সস্তা।

এখন চারতলা বাড়ির বালকনিতে নলিন ঠাকুর একলা। নীচে সাদার্ন এভিন্যুর ওপর দিয়ে দামী মোটর ছুটে যায়। মসৃণ আওয়াজ হয়। চারপাশে আলো জেলে রূপসীর মত লেক আড় হয়ে শুয়ে থাকে। হাওয়া বয়। কিন্তু নলিন ঠাকুর বড় ক্লান্ত। লেকের এই মিষ্টি হাওয়ায় কি এত ক্লান্তি দূর হয়? এই ক্লান্তি বয়ে বয়ে আরও কতদিন বাঁচতে হবে, কে জানে? কিন্তু তার আগে নলিন ঠাকুর এখন ওপরে যাবেন। আরতি করে ঠাকুর শোয়ান বাকী এখনও। মন্ত্র? মন্ত্র কিসের? মন্ত্র নলিন ঠাকুর বলেন না। সকালের কি বিকেলের পুজো, কোন সময়েই মন্ত্র বলেন না নলিন ঠাকর। জোরে জোরে ঘণ্টা বাজান, মুদ্রা করেন, ফুল ছিটিয়ে দেন। কিন্তু মন্ত্র মনে আসে না। কেন আসে না কে জানে? বোধ হয় নলিন ঠাকুর জেনে ফেলেছেন, শ্যামল ডাক্তারকে টাকা না দিলে কোলের ছেলেটার ঘা কোনদিন সারবে না।

কসবার ওপর দিয়ে পর পর তিনদিন খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেল। দমকা বাতাসের সঙ্গে জোরে জোরে মুষলধারে বৃষ্টি। ঠিক বিকেলের দিকে। নলিন ঠাকুরের বড় ছেলের বৌ কুমুদ যখন গা ধুয়ে কলতলা থেকে ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। রকে বসে হুঁকোয় শেষ টান দিয়ে নলিন ঠাকুর যখন ভেবেছেন বাতা থেকে ঝুলিয়ে রাখা লাঠিটা নামাবেন কিনা —ঠিক তখন সমস্ত আকাশ কালো হয়ে গিয়ে একটা বুনো মোষের মত গোঁ গোঁ করেছে। তারপর উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে ছুটে এসেছে ক্ষ্যাপা হাওয়া। হাওয়ার নাচা-নাচির সঙ্গে পড়েছে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। অতএব...

অতএব এ তিনদিন সাদার্ন এভিন্যুর সেই সাদা বাড়ির চারতলাতে নলিন ঠাকুরের যাওয়া হয়নি। যেতে পারেন নি। ঝগড়া করে, গালাগালি করে, একরকম জোর করে হরিকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু শুধু কি ঝড়, শুধু কি বৃষ্টির জন্যে যাওয়া হয়নি নলিন ঠাকুরের? কোনরকম মানসিক বিকার, একটা ভীষণ ভয়ানক ক্রুদ্ধ অভিমান কিছুই কি সে রাতে ফেরার পথে মনের মধ্যে গুমরে ওঠেনি? বারবার কি নলিন ঠাকুরের ইচ্ছে হয়নি পূর্বপুরুষদের মত একটা অমোঘ শক্তিতে জ্বলে উঠে চারতলার বাড়িটাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেন? হয়েছিল। হয়েছিল বৈকি। না হলে ঝড় বৃষ্টি অগ্রাহ্য করেও যেতেন তিনি। আগে তো তাই গেছেন।

দু' হাতের মধ্যে মাথা রেখে খাটের ওপর উবু হয়ে বসেছিলেন নলিন ঠাকুর। ছোট, একমানুষি খাটটা এ ঘরের পরিবেশে বিশ্রী, বেমানান। সম্প্রতি একটা শ্রাদ্ধে তিনি খাটটা পেয়েছেন। তাই খাট এবং খাটের ওপর পাতা বিছানা, বালিশ এত পরিচ্ছন্ন। তাই ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র, হাঁড়ি, সরা, কড়াই, বাসন, এমন কি নলিন ঠাকুরের স্ত্রী কিছু নীচে যে বিছানায় ছেলেপুলেদের নিয়ে শুয়ে আছে, তাদের সকলের থেকে এতটা স্বতন্ত্র। এই খাটের নরম বিছানায় শুতে কি বসতে, কি বসে ভাবতে ভারি ভালো লাগে নলিন ঠাকুরের। নিজেকে কিরকম স্বতন্ত্র বলে ভাবতে পারেন তিনি। বিন্দু নীচে শুয়ে আছে কাত হয়ে। না। কাপড় চোপড়ের কোন ঠিক নেই। অবশ্য ওসব বালাই নেই বিন্দুর। মানুষটা কেমন যেন। আধপাগলাটে। ধ্যাও চ্যাও নেই। বছরে বছরে প্রসব করে আর মোটা হয়। চোখ দুটো ছোট ছোট; দেহের তুলনায় নেই বলেই মনে হয়। অথচ চোখের পাতা দুটো ভারি ভারি। কারও মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে হলে মনে হয় বিন্দু যেন চোখটাকে উল্টে দিয়েছে। বিন্দুর এক পাশে শুয়েছে দেড় বছরের কোলের ছেলেটা। সারা গা ঘায়ে থকথকে। তবু তো গরমটা কম আজ। আর ওদিকে শুয়েছে একপাল। বুড়ি, দুগ্গা, কেষ্ট, খোকন। বলাইটাকেও জোরজার করে ঘুম পাড়িয়েছিল বিন্দু। কিন্তু সকালে ঘুমতেই পালিয়েছে হতভাগা।

নলিন ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের রকে এলেন। সামনের বেড়ার রোদদুর এরই মধ্যে বাঁকা হয়ে গেছে। বোধ করি, চারটে বাজে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন নলিন ঠাকুর। না, আজ আর মেঘ নেই আকাশে। তবে কিছু কি বলা যায়। কখন, কোত্থেকে ছিটকে আসবে এক খণ্ড মেঘ। সারা আকাশ ছেয়ে গিয়ে শুরু হবে ঝড় বৃষ্টি। কিছুই স্থিরতা নেই। কলতলা থেকে হাত মুখ ধুয়ে এসে নলিন ঠাকুর তামাক সাজতে বসলেন। পাশের ঘর থেকে হরির গলার আওয়াজ আসছিল। কুমুদেরও। একটু পরেই সেজে গুজে ঘর থেকে বেরোল হরি। পাটভাঙ্গা একটা পাঞ্জাবি পরেছে। গলায়, ঘাড়ে পাউডার মেখেছে জবজবে করে। ভালো নাকি তবলা বাজায় হরি।

টিকে ধরাতে ধরাতে নলিন ঠাকুর জিজ্ঞেস করেন, "বেরোচ্ছিস কোথায়?"

"একবার যাদবপুরে যাব।"

যাদবপুরে হরির শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু কুমুদ চৌকাটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে নলিন ঠাকুর রাগটাকে সামলে নিলেন।

বললেন, ফেরার পথে বালীগঞ্জ হয়ে আসিস।"

"আমার ফিরতে রাত হবে।" চাপা আর উদ্ধত শোনাল হরির কণ্ঠস্বর। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ওপর আলতো আলতো চেপে ধরেছিল সে। বললে, "আজ যতন কিংবা গণেশকে পাঠিও না।"

যতন নলিন ঠাকুরের মেজ ছেলে। গণেশ সেজ। যতন একটা জুতোর দোকানে কাজ করে। ফিরতে রাত ন'টা। আর ফিরে এলে এক মুহূর্ত দেরী করবে না সে। বেরিয়ে যাবে। যা[illegible] দিনান্তে সেখানে তার একবার না গেলেই নয়। রোজগেরে ছেলে। বেশী কিছু বলা চলে না। অতএব বালীগঞ্জ সে যাবে না। বাকী থাকে গণেশ। গণেশ অবশ্য সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরবে। যাক্‌গে।

হরি চলে যাচ্ছিল। নলিন ঠাকুর পেছন থেকে বললেন, "আর একটা কথা ছিল যে।"

হরি দাঁড়িয়ে পড়ল। "কি কথা?"

"পাঁচটা টাকার কথা বলেছিলুম।"

"টাকা আমি জোগাড় করতে পারিনি।"

"পারনি?..." বলে থমকে মুখ তুলে তাকালেন নলিন ঠাকুর—"তাহলে ছেলেটা ঐভাবে ভুগবে? চিকিৎসা হবে না?"

হরির মুখে চোখে একটা বিশ্রী ক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বললে, "চিকিৎসা না হলে আমি কি করব?"

"না, তুমি আর কি করবে?" নলিন ঠাকুর হাসলেন, "তুমি তো এ বাড়ির কেউ নও। কে থাকলো, কে বাঁচলো, তাতে তোমার কি? সকালে বিকালে তোমার চারটি খাওয়া জুটলেই হল।"

উদ্ধত একটা ভঙ্গি করল হরি। বললে, "যখন তখন মেয়েদের মতন খাওয়ার খোঁটা দেন কেন? সোজা বলে দিলেই হয় বৌকে নিয়ে আমি চলে যাই।"

বলে কি ছেলেটা! কল্কেতে ফুঁ দেওয়া বন্ধ করে হরির দিকে অবাক হয়ে তাকালেন নলিন ঠাকুর। "হারামজাদা, এত বড় কথাটা বললি, একটু আটকালো না মুখে? এমন অমানুষ হয়ে গেছিস? তিন বছর ধরে বসে আছিস্‌, ক' পয়সা দিয়েছিস্‌ সংসারে?"

ভারি অসহায় দেখাচ্ছিল হরিকে। বললে, "এক পয়সা আয় নেই আমার......"

"মিথ্যে কথা!" বাধা দিয়ে নলিন ঠাকুর ধমকে উঠলেন। "এক পয়সা যদি তোর আয় না থাকবে, এত নতুন নতুন জামা, পাউডার এসব জোটাস কি করে? কোথায় পাস? এসব কেনবার সময় তোর পয়সা জোটে আর ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মরে গেলেও তোর কাছে পয়সা নেই।"

হরি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামছিল। আর যত ঘামছিল, ততই রাগ বাড়ছিল তার। রাগ হচ্ছিল নলিন ঠাকুরের ওপর। বিন্দুর ওপর। সকলের ওপর। সমস্ত সংসারটার ওপরই তার রাগ ছড়িয়ে পড়ছিল। আশ্চর্য উদ্ধত হয়ে উঠলো সে। বললে, "পয়সা আমার নেই, আপনি ষাঁড়ের মত চ্যাঁচালেও আমার পকেট থেকে এক পয়সা বেরোবে না।"

ভীষণ কথা। আরও ভীষণ রেগে গেলেন নলিন ঠাকুর। থমকে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর আচমকা তামাক রাখা মাটির পাত্রটা ছুঁড়ে মারলেন হরিকে লক্ষ্য করে। "হারামজাদা, বাবাকে বলে ষাঁড়।" নীচে পড়ে বাটিটা ভেঙে গেল। ভেতরের তামাক ছড়িয়ে প'ড়ল চতুর্দিকে। হুঁকোটা কোনরকমে মাটিতে নামিয়ে রেখে নলিন-ঠাকুর কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন। "এতদূর আস্পর্ধা তোমার! যা মনে আসে তাই। জুতো মেরে মুখ ছিঁড়ে দেবো না।"

বাড়ির মধ্যে আকস্মিক সোরগোল পড়ে যায় আচমকা ঘুম ভাঙায় বিন্দু মোটা দেহটা নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসে। 'কি হয়েছে? আঁ, হল কি?' ছেলেমেয়ে-গুলো অহেতুক চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। হরির ঘরের মেঝেতে নলিন ঠাকুরের বড় মেয়ে ঘুমুচ্ছিল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে এসে সে নলিন ঠাকুরের হাত ধরল। 'ও বাবা, বাবা!' তারপর অবিকল একটা ছোট্ট মেয়ের মতন ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল লক্ষ্মী।

কিন্তু আশ্চর্য কুমুদ। সমস্ত কাণ্ডটা তার চোখের সামনে ঘটছে দেখেও সে নির্বিকার। হরির সঙ্গে যেভাবে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল, এখনও তেমনি রইল। যেন কিছুই ঘটছে না। বিকেলবেলা গা ধুয়ে ঘরে এসে যে নির্জন মুহূর্তটিতে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে সে গান গায়, যেন সেই মুহূর্তটি তার চারপাশে থম্‌ থম্‌ করছে। ভারি আশ্চর্য মেয়ে কুমুদ। বিন্দু চোখটাকে উল্টে নিয়ে সমস্ত ঘটনাটা বোঝবার চেষ্টা করছিল। হরির গায়ে ধাক্কা দিয়ে বললে, "যা না। যেখানে যাচ্ছিস যা না হতভাগা। রাগী মানুষটার সামনে অমন ত্যারছা হয়ে দাঁড়িয়ে কেন? মারবি নাকি? আঁ?"
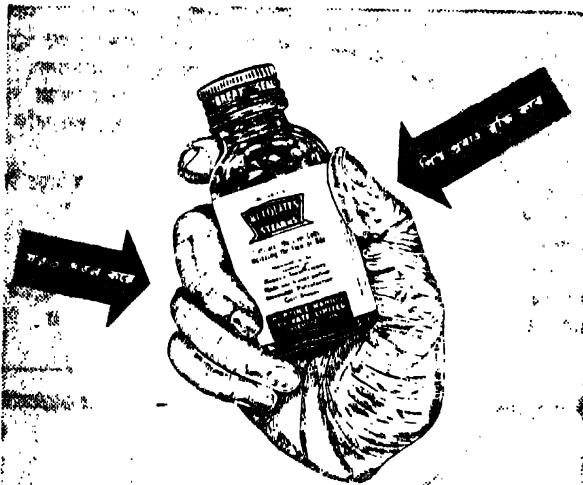
নলিন ঠাকুর কাঁপছিলেন থর থর করে।

মারবেন বলে জুতো তুলেছিলেন একটা। সেটা হাতেই আছে। না, মারেননি ছুড়ে। আর তাই পারে নাকি কেউ? এত বড় ছেলে। ঘরে বৌ আছে। মারলেই হল? রাগ চণ্ডাল। তাই আচমকা বাটিটা ছুড়ে মেরেছিলেন। না হলে......। আর রাগটা তো কিছু অহেতুক নয়। বুড়ো দামড়া ছেলে, বাবাকে বলে ষাঁড়। এদিকে আবার মুরোদ নেই কানাকড়ির। নলিন ঠাকুর বিড় বিড় করে বলছিলেন, "মানুষ নাকি? গরু। একটা গরু জন্মেছে। তিন বছর ধ'রে বসে আছিস। ভাইদের ওপর খাচ্ছিস। ভাই দুটো মুখের রক্ত তুলে টাকা আনছে। আর তোর দ্বারা নিয়মিত এই সামান্য কাজ-টুকুও হবার নয়। তুই সেজেগুজে হাওয়া খেতে যাচ্ছিস। ফিরতে রাত হবে। যতন কি গণেশকে পাঠিও। লাটসাহেব।"

নীচে দাঁড়িয়ে হরিও বকছিল। "ব'লব না, একশোবার বলবো। শুধু তো ষাঁড় বলেছি। আপনার কিছু কি জানতে বাকী আছে আমার। সব জানি। সব ফাঁস না করে দিয়েছি একদিন তো আমার নাম হরি নয়।"

কি জানে হরি? নলিন ঠাকুরের কি জানে? বিন্দু তার ছোট চোখ দিয়েই অতি কষ্টে কটমট করে তাকাল হরির দিকে। "চুপ কর। চুপ কর হতভাগা। তোর বাবা হয়। হ্যাঁ রে ও হরি চুপ করলি?"

ছেলেমেয়েগুলোর কান্নার প্রথম দমকাটা কমেছে। এখন ভেজা চোখে অবাক হয়ে দেখছে সব। বাবাকে, মাকে, দিদি, দাদা, বৌদি, সকলকে। লক্ষ্মী কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। জোর করে কান্না থামাতে গিয়ে মেয়েটা হেঁচকি পাড়ছে এখন। বিন্দু লক্ষ্মীকে ধমকে উঠল, 'অমন মরাকান্না কিসের? আঁ, কান্না থামালি। এই লক্ষ্মী।' বিন্দুর গতর নাড়তে কষ্ট হয়। তবু এক-রকম ঠেলতে ঠেলতেই সে হরিকে বার করে দিল। ফিরে এসে ধপাস করে বসল রকের ওপর। হাঁফাতে হাঁফাতে কাত হয়ে থাওয়া কল্কেটা তুলে তামাকটাকে ঠিক করল। ঠিকে নলিন ঠাকুর আগেই ধরিয়েছিলেন। কল্কে সাজিয়ে নিয়ে ফু দিতে দিতে বিন্দু বললে, "নাও। বস। খুব বীরত্ব দেখিয়েছ। এখন তামাক খাও।" লক্ষ্মীকে বলল, "হতভাগী, হাঁ করে দেখছিস কি। হাত ধরে বসা না। বসিয়ে মাথায় বাতাস কর একটু। এই যে.........এই নে পাখা।"

মানুষের ব্যবহার বড় বিচিত্র। ঘুম থেকে উঠে নলিন ঠাকুর যখন রকে এলেন, তখন কি একবারও ভেবেছিলেন এমন একটা কাণ্ড এক্ষুনি ঘটবে। কি করে যেন ঘটে যায়। ঠিক থাকে না কিছু। চারদিকের এত অভাব, অভিযোগ, অঘটনের মধ্যে কি মাথা ঠাণ্ডা থাকে কারও। ইস্, বাপের মাথায় নলিন ঠাকুর বাটিটা ছুড়ে মারলেন, যদি লাগতো। কপাল কি মাথাটা যদি ফাটতো হরির। হ্যাঁ। এখন অনেকটা স্থির হয়ে তামাক টানছিলেন নলিন ঠাকুর। উদ্বেগটা কমেছে। এখন আর হাত-পাগুলো ঠক ঠক করে কাঁপছে না। সমস্ত পরিবেশ এখন পালটেছে। সব ভুলে গিয়ে ছেলেমেয়ে-গুলো গুড় দিয়ে রুটি চিবুচ্ছে এখন। বহুকষ্টে বাইরের শুকনো কাপড়চোপড়-গুলো তুলে নিয়ে এল বিন্দু। কলতলায় দুপুরের একরাশ বাসন নিয়ে কুমুদ মাজতে বসেছে। সত্যি কুমুদ অদ্ভুত। এমন কাণ্ডটা চোখের ওপর নির্বিকার দাঁড়িয়ে দেখল। একটা টু শব্দ করল না। আশ্চর্য! তা ঐরকমই কুমুদ। কেমন কেমন। কথা বলে কম। টিপে টিপে হাসে। রোগা মুখে নাকটা একটু বেশী লম্বা। বিন্দু বলে অসৎ-চরিত্র। কুমুদ কি অসৎচরিত্র? তা নয়। ঐ একরকম। কল-ঘরে চান করছে। কিন্তু মাথায় জল ঢালবার সময় তিন পা পেছিয়ে আসবে। অত পেছনে কেন? অত পেছনে তো আড়াল নেই। ও কি জানে না তখন তার শ্বশুর রকে বসে নিবিষ্ট হয়ে তামাক খান। বিন্দুর ধারণা, কুমুদ সব বোঝে। কিন্তু অসৎচরিত্র বলেই অমন টিপে টিপে হাসে। যেন কত রহস্য।

লক্ষ্মী ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। ঘর ঝাঁট দিয়ে এখন বাইরে এল রকে। রকটা ঝাঁট দেবে। "বাবা, হুঁকো নিয়ে ঘরে যাও।"

নলিন ঠাকুর বাড়ি থেকে বেরোলেন বিকেল করে। কুমুদ গা ধুয়ে ঘরে ঢোকবার পর। বেরোতে হল ছেলেটোর জন্যে। দশটা টাকা চাই। যা চেহারা হয়েছে ছেলেটার। তাকানো যায় না। তাছাড়া পাঁচজনের কাছে গেলে এক-আধটা নতুন খবর যদি পাওয়া যায়। খবর দিতে পারলে অবশ্য টাকাটা প্রাণেশই দেবে। ফেরবার পথে অমনি শ্যামল ডাক্তারের ওখানেও হয়ে আসবেন একবার। শ্যামল ডাক্তার দয়া করে একটু দেখুক ছেলেটাকে। একটু ওষুধ দিক। সামনের তারিখে একটা বিয়ে আছে। সব টাকা তিনি গুণে গুণে দিয়ে দেবেন। না। এক পয়সাও

মারবেন না। "লক্ষ্মী, গণেশ এলে প্রাণেশদের ওখানে পাঠিয়ে দিস মনে করে।"

আসলে দিনকাল একেবারে পালটে গেছে। চেনা মানুষগুলোকেও কিরকম অচেনা মনে হয়। মনে হয়, মানুষগুলো সব সময় ভেতরে ভেতরে রেগে আছে। সুযোগ পেলেই খেঁকিয়ে উঠবে। ভাবতে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। গুরুজন নেই, শ্রদ্ধা ভক্তি নেই, এ এক অদ্ভুত অরাজকতা। অথচ নলিন ঠাকুরদের ছেলেবেলায়......? নলিন ঠাকুর কি ভাবতে পারেন, তিনি তাঁর বাবার সামনে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছেন? অসম্ভব। বাবা ঘাড় থেকে মাথাটা টেনে ছিঁড়ে দিতেন কিনা বলতে পারেন না নলিন ঠাকুর, তবে দাঁড়াতেই পারতেন না তিনি। গুরুজনদের ভয় করতে হয় এই শিক্ষাই পেয়েছেন ছোটবেলা থেকে। আর সারা জীবন ভয়ই পেয়েছেন। ভয়। হাঁ। বিন্দুর নিজের চোখে দেখা। বিয়ের পর, তিন চারটে ছেলেপুলে হয়ে গেছে তখন পর্যন্ত নলিন ঠাকুর বাবাকে ভয় করতেন যমের মতন। কান্ড দেখে বিন্দুর তো মাঝে মাঝে হাসি পেত।
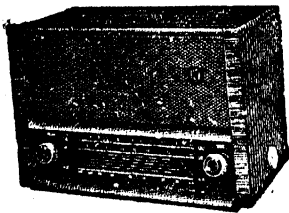
রকের এক পাশ ঘিরে নিয়ে রান্নাঘর। লক্ষ্মী রান্না করছিল। পাশে বসে কোলের ছেলেটাকে মাই দিচ্ছিল বিন্দু। কথা বলছিল আর ছেলেটার দগ্‌দগে ঘায়ের ওপর আঙুলে বুলিয়ে আরাম দিচ্ছিল। অল্প দূরে বসেছিল কুমুদ। মুখ টিপে হাসছিল সে। আজই জানা গেছে বিন্দুর আবার ছেলে-পুলে হবে। নাঃ। বছর বাদ যাবে না বিন্দুর। ভাতের ফ্যান গালছিল লক্ষ্মী। হাসছিলও। কুমুদের চোখে চোখ পড়তেই হাসছিল সে। বিন্দু লক্ষ্য করেছে ব্যাপারটা। বললে, "ফ্যান গালতে গালতে অত হাসি কিসের হতচ্ছাড়ি মেয়ে? হাত পুড়ে যাবে যে......।"

লক্ষ্মী মুখ ঘুরিয়ে বললে, "তুমি আমাকে হাসতে দেখলে কোথায়? হাসছে তো বৌদি।"

বিন্দু কি ভেবে আড়চোখে ছেলের বউয়ের দিকে চেয়ে বিড় বিড় করে বললে, 'যদি বেঁচে থাকি আমরাও দেখব।'

ছেলেটা কোলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বিন্দু ঘুমন্ত ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছিল। ঘুম কি? সব সময়েই তো ঘুমিয়ে আছে ছেলেটা। আগে তবু কাঁদতো কখনও সখনও। ক'দিন ধরে জ্বর হচ্ছে। তাই সাড় নেই। না। বাঁচবে না।

রাত কত হল কে জানে। নলিন ঠাকুর ফেরেন নি এখনও। গণেশ ফিরেছিল। বালীগঞ্জ গেছে। ঘর থেকে ছেলেমেয়ে-গুলোর গলার আওয়াজ আসছে না। এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়ে পড়েছে সব। বিন্দু অতি কষ্টে দাঁড়াল। ছেলেটাকে শোয়াতে হবে। বেরোতে বেরোতে বললে, "বৌমা, একটু সরে বোসো। ও যা মেয়ে হয়েছে......।"

মায়ের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। লক্ষ্মী ভাবল এবং হাসল।

বাইরে জুতোর আওয়াজ পাওয়া গেল। লক্ষ্মী বললে, "ঐ, মেজদা এল।"

মুখ বাড়িয়ে কুমুদ অন্ধকারে তাকাল। হ্যাঁ। যতনই।

যতন রকে উঠেই হাঁক দিল, "বৌদি"—যেন ঘোড়ায় জিন চড়িয়ে এসেছে: নতুন জুতোর মসমস আওয়াজ করতে করতে যতন কুমুদের ঘরে ঢুকে চৌকির ওপর বসল। কমিয়ে রাখা হারিকেনটা বাড়িয়ে দিল হাত বাড়িয়ে।

কুমুদ ঘরে এল। "কি? অত চ্যাঁচাচ্ছেন কেন?"

"এসেছিল নাকি?" যতন চোখের ইঙ্গিত করল।

"না।"

"একবারও আসেনি।"

"না তো।"

অতএব উঠে দাঁড়াল যতন। "বইটা হয়ে গেছে তো? দিন।"

কথা না বলে কুমুদ বইখানা এগিয়ে দিল যতনের দিকে।

"কেমন লাগল?" যতন জিজ্ঞেস করল।

"আমাদের আবার লাগা!" অদ্ভুত ভঙ্গি করে কুমুদ বললে, "একেবারে আসল জায়গায় গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন।"

"তার মানে?"

"মানেও জিজ্ঞেস করবেন তাকে, মালতীকে।"

যতন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বৌদি, ঝগড়া করেছেন নাকি?"

"না, ঝগড়া করব কার সঙ্গে?" হাসলো কুমুদ, "আগে ঘরে আনুন, তারপর তো ঝগড়া।"

"ধোৎ। ফের ভূতে ধরেছে আপনাকে।" দরজার দিকে এগোল যতন, "চললুম।"

বাইরে এসে যতন দেখল লক্ষ্মী জানলার কাছে দাঁড়িয়ে।

"কি করছিলি এখানে?" যতন শক্ত করে একটা হাত চেপে ধরল লক্ষ্মীর।

"কি আবার? এমনি দাঁড়িয়েছিলুম।"

যতন ভেংচে উঠলো, "এমনি দাঁড়িয়ে-ছিলুম। ইয়ারকি পেয়েছ। মারবো টেনে চড়।"

লক্ষ্মী ভারি গলায় বললে, "হাত ছাড়। লাগছে।"

যতন হাত ছেড়ে দিল। "ফের যদি কোনদিন দেখি তো মেরে ফেলবো তোমায়।"

মারবে! একটু সরে গিয়ে বিড়বিড় করছিল লক্ষ্মী। মারলেই হল?

বিন্দু ভেতর থেকে জড়িয়ে জড়িয়ে চেঁচিয়ে বললে, "যতন, বেরুচ্ছিস্ নাকি? অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ।"

"কিছু খেলি? খেয়েছিস্?"

না না। যতন এখন খাবে কি? সময় কই?

"বেশী দেরী করিসনি বাবা, বুঝলি। সকাল সকাল ফিরিস।"

অন্ধকারে যতনের জুতোর আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে এল। রাত এখন কত? আটটা? সাড়ে আটটা? দরজায় দাঁড়িয়ে-ছিল লক্ষ্মী। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল

বাইরেটা। বাইরেটা অন্ধকার। হাওয়া নেই। কেমন বিশ্রী গুমোট। বিন্দু বোধ করি ঘুমিয়ে পড়ল। খা গতর একখানা। কুমুদ তার ঘর থেকে বেরোয়নি আর। বৌদি কি রাগ করেছে। লক্ষ্মীর কি দোষ? মরুক গে। লক্ষ্মীর তো ভারি বয়েই গেল। আসলে লক্ষ্মী ভাবতে চাইছিল যতনের কথা। যতন আর মালতী। ওরা ভালোবেসেছে। যতন ভালোবেসেছে। সমস্ত শরীর কি রকম অবশ হয়ে আসছিল লক্ষ্মীর।

নলিন ঠাকুর বাড়ি ফিরলেন সকলের আগে। কোন সুবিধে হয়নি। টাকা পাননি নলিন ঠাকুর। আর সত্যিই তো, কে দেবে টাকা? হাত মুখ ধুয়ে তামাক খেতে বসলেন নলিন ঠাকুর। তামাক খাওয়া শেষ হতে হতে গণেশ ফিরল। গণেশের পর এল হরি। অন্ধকারে প্রায়-অবশ-হয়ে-পড়ে-থাকা বাড়িটা হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে জেগে উঠলো যেন। ঠকাঠক পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করলো লক্ষ্মী। অতি কষ্টে চোখ মুছতে মুছতে বিন্দু উঠে এল। ঘুম ভেঙে ছেলেমেয়ে-গুলো কেঁদে উঠলো আচমকা। যারা খাবে রাত্রে বিন্দু ধরে ধরে এনে রকে বসিয়ে দিল তাদের। লক্ষ্মী হরিকে ডাকল, "বড়দা, খাবি আয়।"

না। হরি খাবে না রাত্রে।

বিন্দু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। "কেন? খাবি না কেন?"

"শরীর খারাপ।"

শরীর খারাপ! লক্ষ্মী বিন্দুর দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করল। হ্যাঁ। রাগ করেছে হরি। খাওয়া মিটুক ওদের। তারপর বিন্দু খাওয়াবে হরিকে।

নলিন ঠাকুর একটা কথা বললেন না। খেলেন। তামাক টানলেন। তারপর শুয়ে পড়লেন। ছেলেমেয়েগুলোকে খাইয়ে, আঁচিয়ে, শুইয়ে দিয়ে বিন্দু হরির ঘরে ঢুকলো। "হরি, ও হরি ঘুমুলি নাকি?"

না। ঘুমোয় নি হরি। চোখ বুজে পড়ে আছে চৌকির ওপর। হারিকেনটা দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে। নীচে একটা ছেঁড়া মাদুর বিছিয়ে অসাড়ে ঘুমুচ্ছে কুমুদ।

"রাগ করিস নি বাবা। না খেয়ে থাকলে শরীর খারাপ হবে। হরির কপালে চুলে হাত বুলোচ্ছিল বিন্দু। "আয়। উঠে আয়। এক মুঠো খেয়ে যা।"

"বিরক্ত ক'রছ কেন?" স্পষ্ট ধমকে উঠলো হরি। চোখ খুললো না! একটু নড়ল না পর্যন্ত।

"তুই কি ছেলেমানুষ হবি?" বিন্দু হাসল। "তুই না খেলে উনি কষ্ট পাবেন না?"

"বড় জ্বালাতন ক'রছ মা। আমি খাব না বললুম যে।"

বিন্দু কোপ প্রকাশ করে বললে, "খাবি না? কেন খাবি না? কি হয়েছে?"

"বলছি তো, শরীর খারাপ হয়েছে।"

"মিথ্যে কথা।"

"মিথ্যে তো তাই। সোজা কথা। আমি খাব না রাত্রে।" রাগের চোটে হরি বিছানার ওপর উঠে বসল। গলা চড়িয়ে বললে, "তোমরা কি শান্তিতে একটু শুতেও দেবে না? আমার চাকরি নেই। তিন বছর ধরে ভাইদের ঘাড়ে বসে খাচ্ছি। আমার কি বিবেক নেই? আজ রাতটুকু শান্তিতে থাকতে দাও মা। তোমার পায়ে পড়ি—।" সত্যি সত্যি হরি দু হাত জোর করে কপালে ঠেকাল।

বিন্দু মুখ কালো করে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। খাবার জন্যে কুমুদকে ডাকতেও লজ্জা করছিল তার। খাবার ইচ্ছে তারও ছিল না। ছেলেটা না খেয়ে শুয়ে থাকলো, সে খায় কি করে?

রকের মাঝখানে বিছানা করে শুয়ে পড়েছে গণেশ। সকলেই শুয়ে পড়েছে। যতনের খাবার ঢেকে-ঢুকে রেখে দিয়ে বিন্দুরা খেতে ব'সল। লক্ষ্মী, কুমুদ আর বিন্দু।

"বড়দাটা যেন দিন দিন কেমন হচ্ছে? না?" খেতে খেতে বলে লক্ষ্মী।

কুমুদ মুখ তোলে। "রাত্রে খেল না বুঝি?"

"না। রাগ হয়েছে!" লক্ষ্মী হাসে।

"কুঁড়ে লোকদের রাগই বেশী।" কুমুদও চেষ্টা করে হাসতে। হাসে।

তারপর আরও রাত্রে ঘরের খিল তুলে দিয়ে কুমুদ হরিকে ডাকলো, "ঘুমুলে নাকি?"

আশ্চর্য! তখনও ঘুমোয়নি হরি। কুমুদ জানতে চাইল, "খেলে না কেন?"

"ইচ্ছে হল না।"

"ইচ্ছে হল না, না ও বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছ?"

হরি হাসতে হাসতে উঠে বসল। "সুখবর আছে।"

"সত্যি।" খুশী হয়ে উঠে কুমুদ, "তোমার মেজাজ দেখে আমি তো অন্য কথা ভাবলুম।"

"না। সুখবর। একেবারে কাল থেকে বেরোতে হবে।"

"আঃ!" পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিশ্বাস নিল কুমুদ। "তাহলে তুমি আর এ বাড়িতে থাকছ না?"

"না।"

"আর আমি?"

"চার পাঁচদিন বাদে তোমাকে নিয়ে যাব।"

"কোথায়?"

"যাদবপুর। এ মাসটা ও বাড়িতেই থাকতে হবে। তারপর একটা ঘর দেখে আশে পাশে কোথাও উঠে গেলেই চলবে।"

তা চলবে। সমস্ত গা ছেড়ে দিয়ে ছেঁড়া মাদুরটার ওপর গড়িয়ে পড়ল কুমুদ।

কসবার এই ঘিঞ্জি বাড়িতে এমনি রাত নেমেছে অজস্র। প্রায় দশ বছর হল, নলিন ঠাকুর এদেশে এসেছেন। তা কম করেও তো সাড়ে তিন হাজার রাত। গরমের দিনে ঘুমুতে পারেন নি। ছটফট করেছেন সারা রাত। কথা বলেছেন। আবার ওরই মধ্যে ঘুমিয়েছেন। শীতকালটা তবু ভালো। কিন্তু ঘর টিনের। তাই নীচের বিছানায় ঠাণ্ডা লাগে ভীষণ। শুধু একটা কাঁথা কি কম্বলে শীত মানতে চায় না। সবচেয়ে ক্ষতি হয় বর্ষাকালে। ঘরের চারদিক দিয়ে জল পড়ে। বিছানা ভেজে। জিনিসপত্র ভেজে। নিজেদেরও ভিজতে হয়।

নলিন ঠাকুর যখন প্রথম দেশ ছেড়ে এলেন, তখন আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না। প্রতি রাত্রে ঘুমবার আগে ভাবতেন, কাল ভোরে নিশ্চিত কোন পরিবর্তন আসবে। পরিবর্তন মানে অর্থ। অর্থ মানে সুখ। সোয়াস্তি। কিন্তু আজ পর্যন্ত সাড়ে তিন হাজার রাত ভোর হয়েছে অথচ সেই আশ্চর্য পরিবর্তন আসেনি। তবে আজকাল আর নলিন ঠাকুর পরিবর্তনের কথা ভাবেন না। ভাবতেই পারেন না। কিছুই ভাবতে পারেন না। সব যেন কেমন হয়ে গেল। হরি, যতন, গণেশ, লক্ষ্মী, সমস্ত সংসারে এদের অস্তিত্ব স্বতন্ত্র। এরা মিলে মিশে এক হয়ে উঠতে পারল না। পারবে না। কোনদিন পারবে না।

সকালে সকলের আগে ঘুম ভাঙে বিন্দুর। কিন্তু বিন্দু ওঠে না। হাত বাড়িয়ে লক্ষ্মীকে ডাকে। ছোটগুলোকে ডাকেঃ 'এই। ওঠনারে। এই লক্ষ্মী। এই বলাই। কেল্ট। ওঠ বাবা। ওঠ আর ঘুমোসনি। দেখ, রোদদুর উঠে গেল বুঝি। ও লক্ষ্মী, উঠলি?' বিন্দু নিজে উঠতে পারে না। এই ভোরের দিকেই ঘুমটা যেন চেড়ে আসে। শুয়ে শুয়ে দুর্গা দুর্গা করল সে। লক্ষ্মী দরজা খুলে বাইরে এল। রকে। ভোরবেলা, যতক্ষণ অন্ধকার অন্ধকার থাকে, সূর্য ওঠে না, বাইরেটাকে বেশ লাগে। বেশ। একটা হাই তুলল লক্ষ্মী। তারপর অবাক হয়ে দেখল বাইরের রকে গণেশ শুয়ে রয়েছে একলা। একলা কেন? যতন? মেজদা? লক্ষ্মী রক থেকে নেমে কলঘরের দিকে যেতে যেতে দেখল, বাইরের দরজা খোলা। এত ভোরে বেরোল নাকি কোথাও? কিন্তু চোখে মুখে জল দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে দেখল, যতনের ভাত ঢাকা পড়ে আছে। তাহলে রাত্রে ফেরেনি যতন।

"মেজদা কাল রাত্রে ফেরেনি মা।" বিন্দু উঠতে লক্ষ্মী বলল।

"সে কি!"

গণেশের ঘুম ভাঙিয়ে জিজ্ঞেস করা হল। যতন এসেছিল নাকি রাত্রে? গণেশ কিছু বলতে পারল না। সে জানে না কিছু। অঘোরে ঘুমিয়েছে। যতন এসে থাকলেও টের পায়নি।

তাহলে?

কুমুদ ঘুম চোখে বললে, "কই? আমায় কিছু বলেনি তো। একখানা বই ছিল নিয়ে গেল। মালতীদের ওখানে খোঁজ নিয়েছেন......?"

নলিন ঠাকুর তামাক খেতে খেতে গোল হয়ে বসে বললেন, "আমি জানতুম, ক'দিন ধরে আমার মন বলছিল, একটা কোন বিপদ ঘটবে।"

মালতীদের ওখানে খোঁজ নেওয়া হল। রাত এগারোটা পর্যন্ত যতন সেখানে ছিল। তারপর তারা জানে না কিছু। বলাই খোঁজ আনতে গিয়েছিল। একটা দশ এগারো বছরের ছেলে। কিন্তু কিরকম সব বোঝে। কাকে কি বলতে হয় জানে। কলঘরে কুমুদের কাছে গিয়ে বলাই বললে, "বৌদি, মেজদা ফেরেনি শুনে মালতীদি না কাঁদছিল।"

মালতী কাঁদছিল! কুমুদ অবাক হল। "সকলের সামনেই কাঁদছিল মালতী?"

"সকলের সামনে কাঁদবে কেন?" বলাই বললে, "আমাকে আলাদা ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করল যে।"

"তা হবে, কে জানে?"

সূর্য উঠে গেছে। বেলা বাড়ছে ক্রমশ। রকের ওপর রোদ এসে পড়ল। না। যতন রাত্রে ফেরেনি বলে কোথাও কাজ বন্ধ নেই কোনও। কুমুদের বাসন মাজা হয়ে গেল। রকে বসে ছেলেমেয়েগুলো বাসি রুটি চিবুচ্ছে। উনুনে আঁচ দিল বিন্দু।

এই সকালে হরি বেরোচ্ছে কোথায়? তামাক টানতে টানতে নলিন ঠাকুর চোখ তুলে দেখলেন। মনে হ'ল, বলেন, যতনের জুতোর দোকানে খোঁজ নিস্ একবার। কিন্তু বললেন না। না, বলবেন না। নিজেই যাবেন। কিংবা গণেশকে পাঠাবেন। গণেশ? "গণেশ কোথায় গেল?"

বিন্দু বলল, "চ্যাঁচাচ্ছ কেন অমন করে?"

"গণেশ কোথায় গেল?"

"যতনের খোঁজ নিতে বেরিয়েছে। যেখানে যেখানে থাকতে পারে......।"

সংসার বড় বিচিত্র। কোলের ছেলেটার সারা গায়ে ঘা। বড়টার চাকরি নেই তিন বছর। যে রোজগার করে আনছিল, সেও কিনা শেষ পর্যন্ত......। ঈশ্বরের বিচারই এমনি। আর ছেলেগুলোও কি মানুষ। কোথাও যাবার কথা ছিল, বাড়িতে বলে গেলেই হত। এমন ভাবতে হত না।

কুমুদ বাসন মেজে স্নান করছিল কলঘরে। নলিন ঠাকুর রকে বসে তামাক টানছিলেন। উঠবো উঠবো করেও উঠতে পারছিলেন না। সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসে। বুকের মধ্যে প্রাণটা যে আছে টের পাওয়া যায়। বিন্দু ছেলে কোলে করে পাশেই বসে আছে। বিন্দুর চোখ দুটো বড় বেশী ছোট। তবে আজ, যতনের জন্য একটা অদ্ভুত উদ্বেগ বোধ করছিলেন নলিন ঠাকুর। অসহায়ের মত বসে থেকে থেকে এক পলক তাকিয়ে উঠে পড়লেন আজ।

"কোথায় চললে?" বিন্দু জিজ্ঞেস করল।

"জুতোর দোকানটা দেখে আসি একবার।"

নলিন ঠাকুর বেরিয়ে যাবার পরও কুমুদ হাসে। কিরকম মুখটেপা হাসি।

"চান করতে করতে কি যে হাস তুমি।" লক্ষ্মী হাত ধুতে গিয়ে একটু জল ছিটিয়ে দিল কুমুদের গায়ে।

কিন্তু যত রহস্যেই হাসুক কুমুদ, সময় বসে থাকছে না। যতন রাত্রে ফেরেনি বলে কি সময় থমকে গেছে? সময় ঠিক গড়িয়ে চলল। সকাল শেষ হয়ে হয়ে দুপুর হল। রোদ উঠলো। রান্না হল। খাওয়া হল। নলিন ঠাকুর তামাক খেলেন। এমন কি, ঘুমবার জন্যে খাটে গিয়ে শুলেন পর্যন্ত। যতনের খবর পাওয়া গেছে। রাত্রে দোকানে শুয়েছিল। বাড়ি ফেরেনি কেন? তারা বলতে পারেনি। এখন কোথায়? তাও জানে না তারা। ভোরে উঠে কোথায় চলে গেছে। আজ ছুটি নিয়েছে সে।

দিন গড়িয়ে চলল। দুপুর গড়িয়ে হল বিকেল। যাবেন না যাবেন না করেও বেরোলেন নলিন ঠাকুর। ঠিক সেই সময়। কলঘর থেকে গা ধুয়ে কুমুদ যখন ঘরে ঢুকলো। ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়তে ছাড়তে যখন গান গাইছিল কুমুদ, নলিন ঠাকুর বেরোলেন। বেরোবার আগে জিজ্ঞেস করলেন একবার কুমুদকে, "হরি দুপুরে ফিরল না যে বৌমা।"

ঠোঁট কামড়ে কি রকম হাসল কুমুদ। বললে, "আমায় কিছু বলেনি তো।"

নলিন ঠাকুর বেরিয়ে পড়লেন। না, হরি নয়। যতনের কথাই ভাবছেন তিনি। যাক। মরেনি। না মরে যখন বেঁচে আছে ছেলেটা, যা খুশী করুকগে। নলিন ঠাকুর আজ আবার শ্যামল ডাক্তারের কাছে গেলেন। "ব্রাহ্মণের ছেলে, এমন বিনা চিকিৎসায় মরে যাবে বাবা?"

রোগ হলে সকলেই মরে। শ্যামল ডাক্তার কি করবে তার? না। টাকা না দিলে পারবে না সে চিকিৎসা করতে।

প্রাণেশের ওখানে যাবেন নাকি একবার? না। যাবেন না। কি নিয়ে যাবেন নলিন ঠাকুর, সংবাদ কই? সকাল সকাল নলিন ঠাকুর ফিরে এলেন বাড়িতে। যতন ফেরেনি এখন। গণেশ বালীগঞ্জ গেছে।

"এখন খাবে নাকি?" বিন্দু জিজ্ঞেস করল।

"না। পরে খাব।" গণেশ আসুক। বলে বসে তামাক টানলেন নলিন ঠাকুর। তারপর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। ভারি অবসাদগ্রস্ত মনে হয় নিজেকে। যেন গড়িয়ে গড়িয়ে টিকে থাকা। প্রতি মুহূর্তে উদ্বেগ লেগেই আছে। ছেলেমেয়েগুলো মেঝেয় বিছিয়ে রয়েছে। লক্ষ্মী আর কুমুদ গল্প করছে ওঘরে। হরি ফেরেনি এখনও। বিন্দু ঘরে ঢুকলো। এগিয়ে এসে কোন রকমে নলিন ঠাকুরের মাথার কাছে খাটের ওপর বসল। "ঘুমুলে নাকি?"

"না।"

একটু চুপ করে থাকলো বিন্দু। তারপর ফিসফিস করে বললে, "যতন একটা সব্বনাশ বাধিয়েছে।"

"সর্বনাশ!" নলিন ঠাকুর চমকে উঠলেন। "কি ক'রেছে?"

"দত্তদের মালতীকে......।"

বাধা দিয়ে নলিন ঠাকুর বললেন, "বিয়ে করেছে নাকি?" উদ্বেগে উঠে বসলেন বিছানার ওপর।

"না।" বিন্দুর কণ্ঠ আরও ছোট হয়ে এল। "মেয়েটার সব্বনাশ করেছে যতন।"

"সব্বনাশ মানে!" ভ্রূ কুঁচকে নলিন ঠাকুর বিন্দুর অন্ধকার মুখের দিকে তাকালেন।

বিন্দু চোখ পিট্‌পিট করে বললে, "মেয়েটার তিন মাস।"

নলিন ঠাকুর খাট থেকে নেমে পড়লেন। একটা ভীষণ অস্থিরতা শুরু হয়েছে মনের মধ্যে। বললেন, "যতনই যে, কি করে জানলে?"

"মেয়েটা বলেছে।"

নলিন ঠাকুর গায়ে কোট চড়ালেন। উদ্বিগ্ন হয়ে বিন্দু জিজ্ঞেস করল, "যাচ্ছ কোথায়?"

কণ্ঠ আশ্চর্য উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে নলিন ঠাকুরের। বললেন, "আসছি।"

বিন্দুও উঠে দাঁড়াল। "আসছি মানে? কটা বাজলো খেয়াল আছে। এত রাতে...।"

বাতা থেকে লাঠিটা নামালেন নলিন ঠাকুর। ব'ললেন, "চেঁচিও না। ফিরব এখুনি।" ভয়ে, আশঙ্কায় বিন্দুর চোখ দুটো আরও ছোট হয়ে এল। চ'লল কোথায় লোকটা? মাথা খারাপ হল না তো? ভয়ে ভয়ে বিন্দু বললে, "কিন্তু যাচ্ছ কোথায়?"

নলিন ঠাকুর রক থেকে নীচে নামলেন। মোটা দেহটা নিয়ে বিন্দু ভীষণ অসহায় বোধ করল। তবু মুখ বাড়িয়ে বললে, "একটা কথা বলি। ছেলে বড় হয়েছে' দেখা হলে গায়ে টায়ে হাত দিও না যেন।"

"আচ্ছা, আচ্ছা।" দরজা দিয়ে নলিন ঠাকুর অন্ধকারে বেরিয়ে গেলেন।

আশ্চর্য মানুষের মন। এত বড় একটা ঘটনা। অথচ তেমন করে নলিন ঠাকুর রেগে উঠতে পারছিলেন না। খুব যে দুঃখ বোধ করছিলেন, তাও নয়। আসলে কিছুই নয়। কিছুই মনে হয়নি নলিন ঠাকুরের। না। যতনকে খুঁজে বের করতে এত রাতে বেরোননি তিনি। অন্য কাজ আছে। ভিন্ন কাজ। প্রায় ছুটছিলেন। সেই পথ। কসবার নোংরা পায়ে চলা রাস্তা। বজবজের রেল লাইন। খাস বালীগঞ্জের লেক। লেক পাড়ের সুন্দর পিচঢালা রাস্তা। নলিন ঠাকুর ছুটছিলেন।

সাদার্ন এভিনুর চারতলা বাড়ির সাতাশিটা সিঁড়ি ভেঙে তিনি যখন ওপরে এলেন, তখন রীতিমত হাঁফাচ্ছেন। কথা বলবার ক্ষমতা নেই। সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরলেন কলিং বেলের বোতাম। রাত কত এখন? ভেতরে বেলটা বাজছিল।

দরজা খুলে দিল প্রাণেশ। খুলেই অবাক। "ঠাকুর মশাই! এত রাত্রে!"

নলিন ঠাকুর হাঁফাচ্ছিলেন। ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসলেন। বললেন, "আগে একটু বিশ্রাম করি বাবা। সেই কসবা থেকে দৌড়েছি।"

সেকি?

জোরে জোরে দম নিচ্ছিলেন নলিন ঠাকুর। অবিকল একটা জন্তুর মতন। যেন প্রাণটা যাই যাই করছে। বললেন, "হ্যাঁ, খুব দৌড়েছি আজ। বাবা প্রাণেশ, তোমাদের ঘড়িতে কটা বাজলো এখন?"

"দশটা হবে। কিন্তু আপনি দৌড়লেন কেন?" প্রাণেশ এখনও অবাক হয়ে আছে। হাঁফটা বোধ হয় একটু কমল নলিন ঠাকুরের। একটু কমতেই বেশ উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, "সংবাদ এনেছি বাবা। নতুন সংবাদ।"

সত্যি? প্রাণেশ একেবারে নলিন ঠাকুরের মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল। "কোথায় পেলেন?"

"পেয়েছি।" অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঠোঁট চেপে হাসছিলেন নলিন ঠাকুর। "দত্তদের মনে আছে? অক্ষয় দত্ত? নিবারণ দত্ত? তোমাদের বাড়ির লাগোয়া পশ্চিমে বাড়ি ছিল ওদের?"

"অক্ষয় দত্ত? মনে আছে বৈকি।" আগ্রহে আরও ঝুঁকে পড়ল প্রাণেশ।

হাতের লাঠিটাকে ঘোরাচ্ছিলেন নলিন ঠাকুর। ব'ললেন, "সেই অক্ষয় দত্তের মেয়ে—।"

বাঁ চোখটা ছোট করে আশ্চর্য ইঙ্গিত করলেন একটা, "এখন তিন মাস—।"

"পুরুষটি কে?" প্রাণেশ ফিসফিস করে উঠলো।

নলিন ঠাকুর হাসছিলেন। "আমার মেজ ছেলে। যতন।"

যেন একটা সাপ হিস হিস করে উঠলো কানের পাশে এমনি আকস্মিকতায় ছিটকে তিন হাত পেছনে সরে গেল প্রাণেশ। নলিন ঠাকুর এখনও হাসছেন, বললেন, "বাবা, আজ একেবারে টাট্‌কা খবর দিলুম। দাও পাঁচটা টাকা।"

প্রাণেশ বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল। বোকার মত হাসলো একটু। বললে, "না না, আজকের খবরের জন্যে পাঁচ টাকা কেন? দশ টাকা। দাঁড়ান এনে দিই।"

নলিন ঠাকুর টেনে টেনে হাসছিলেন। বিস্ফারিত হাসি। গলা দিয়ে কি রকম ঘড়ঘড় আওয়াজ হচ্ছিল। প্রাণেশ টাকা আনতে ভেতরে গেছে। বারান্দাটা ফাঁকা। বিশ্রী ফাঁকা। লেকের ঠাণ্ডা হাওয়ায় নলিন ঠাকুরের সারা দেহ সিরসির করে উঠলো। পাঁচ টাকা নয়। একেবারে দশ টাকা পেয়ে গেলেন নলিন ঠাকুর। দশ টাকা। একটা চাপা হাওয়া বইছিল মনের ভেতর। আনন্দের হাওয়া। স্ফূর্তির। গান গাইবেন নাকি? অন্তত গুন গুন করে! কসবার সেই ঘিঞ্জি বাড়িটার কথা মনে পড়ছিল নলিন ঠাকুরের। হারিকেন জ্বলা সেই ঘর, রান্নাঘর, রক, কলতলা সব কি রকম স্পষ্ট হয়ে উঠছিল চোখের সামনে। দশ টাকার নোটখানা হাতে নিয়ে নলিন ঠাকুর নীচে নেমে এলেন। নীচে। বাইরে। লেক পাড় ফাঁকা ফাঁকা। নির্জন। না! নলিন ঠাকুরের মনে কোন রাগ নেই। ক্ষোভ নেই। এখন যদি কেউ নলিন ঠাকুরের মুখের দিকে তাকায় তো অবাক হয়ে যাবে। কেননা কোলের ছেলেটার ঘা ভালো করতে তো শ্যামল ডাক্তার দশ টাকা চায়নি। চেয়েছে পাঁচ টাকা। নলিন ঠাকুর হন হন করে হাঁটছিলেন। বাকী পাঁচ টাকায় একটা সালসা কিনবেন তিনি।

ট্রামে-বাসে

"বাজার হইতে চাউল উধাও কেন?" বিধান সভায় বিরোধী দলের একটি প্রশ্ন। সরকার কি জবাব দিয়াছেন জানি না। বিশুখুড়ো চিরপরিচিত প্রশ্নের গল্প বলিলেন—'কেন রে মেঘ হল না? ব্যাঙ কেন ডাকে না। কেন রে ব্যাঙ ডাকিস নে? সাপে কেন খায়। কেন রে সাপ খাস? খাবার জিনিস খাবো না? - - - সুতরাং Q. E. D."!!

* * *

রেশনশপ্ ও ন্যায্যমূল্যের দোকান গুলিতে সাত আনা সেরের যে আতপ চাউল দেওয়া হইতেছে, সংবাদে শুনিলাম সরকারী গুদামে সেই চাউলের নামকরণ করা হইয়াছে 'ইজিপশিয়ান ডগ্ রাইস"। সংবাদদাতা বলিতেছেন ইহার সংগে সারমেয়র কোন সংশ্রব নাই। শ্যামলাল বলিল—"আর থাকলেই বা ক্ষতি কি? ইজিপশিয়ান না হতে পারে, অনেকে তো ন্যায্যমূল্যের চালকে লেডি ডগ্ রাইস বলেই নাম দিয়েছেন"!!

* * *

এডিনবরার ডিউকের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রীকে পরিচয় করাইয়া দেওয়ার পর ডিউক নাকি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনার হাতে যথেষ্ট খাদ্য মজুত আছে তো? —"আমরা সংবাদে শুনেছি ডিউক নাকি খুব রসিক। কিন্তু এ যে দেখছি তাহা বেরসিকের প্রশ্ন"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

নানা রাজ্যে কংগ্রেসসেবীরা পদযাত্রায় বাহির হইয়াছেন—"আমরাও হাততালি
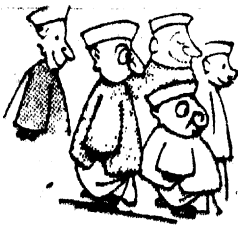
দিয়ে দিয়ে বলছি—হাঁটি-হাঁটি পা-পা"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, সেচ, উন্নয়ন ও মৎস্য বিভাগের জন্য বরাদ্দ টাকার মধ্যে এক কোটি টাকাই নাকি খরচ করা হয় নাই। —"সঞ্চয়ীরা সুখী হয়" সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় একটি ছবি দেখিলাম —খুশ্চেভ মদের পাত্রটি পাশে রাখিয়া দিয়া অন্য পাত্রে ফলের রস ঢালিতেছেন। সংবাদে বলা হইয়াছে ইহা

নাকি মাদকদ্রব্য বর্জনেরই ইঙ্গিত। ভিড়ের মধ্য হইতে জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন, —"কিন্তু মা ফলেষু কদাচন নীতি অস্বীকার করে ফলের পাত্র নিয়ে টানাটানিতে কি মংগল হবে"!!

* * *

প্রতিরক্ষা সচিব শ্রীকৃষ্ণ মেনন নাকি বলিয়াছেন যে, নারীজাতির মুক্তি না ঘটিলে জাতির অর্ধাংশ পঙ্গু হইয়া থাকিবে। খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি—রাখে কৃষ্ণ মারে কে।"

* * *

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শহর ও গ্রামগুলিতে নূতন প্রাণস্পন্দন দেখিতে পাইয়াছেন বলিয়া সংবাদ শুনিলাম। শ্যামলাল আমাদিগকে শুনাইল—"কিন্তু তিনি কি অক্সিজেনটাও দেখেছেন? যমে-মানুষে টানাটানির সময় ঐ অক্সিজেন-ই যে যা একটু স্পন্দন ধরে রেখেছে"!!

* * *

মুর্শিদাবাদের কোন এক অঞ্চলে জনৈক চাষী চাষ করিবার সময় তার লাঙলের ফলাতে একটি সদ্যজাত মৃত কন্যাসন্তান পাইয়াছে। সংবাদদাতা ঘটনাটিকে "সীতা-কল্প" বলিয়া সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"তাই তো ভয়,—অতঃপর বনবাস, লংকাকাণ্ড, অগ্নিপরীক্ষা এবং পরিশেষে পাতাল প্রবেশ, সতীই চির-দুঃখিনী সীতা"।

* * *

অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং ব্যাটসম্যান বিল্-লরের শিক্ষক ম্যাকডোনাল্ড-এর অপূর্ব ব্যাটিং-চাতুর্যের কথা শুনিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। —"আমাদেরও প্রয়োজন একটি শিক্ষকের। ভারতের ক্রিকেট যে-পর্যায়ে নেমেছে তাতে পাততাড়ি থেকে শুরু না ক'রে উপায় নেই"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ম্যানেজার টেস্ট খেলায় তাঁহাদের জয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ফাস্ট বোলার এবং প্রথম ব্যাট করিবার সুযোগ তাঁহাদের জয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছে। ভারতীয়দের শোচনীয় ব্যর্থতার প্রসংগে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সংগে ইংলণ্ডের শোচনীয় ফলাফলের কথা উল্লেখ করেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আমরা আমাদের ব্যর্থতায় কোন সান্ত্বনাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না, ভাগ্যিস ম্যানেজার সাহেব ইংলণ্ডের কথাটা মনে করিয়ে দিলেন"!!

* * *

ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্টের শেষের দিনের খেলায় গ্রেভনি খুব ভালো খেলিয়াছেন। —"কিন্তু গ্রেভনির এ

খেলা কোন কাজেই লাগেনি, Grave তৎক্ষণ খোঁড়া হয়ে গেছে"—বলেন জনৈক ক্রিকেট-রসিক সহযাত্রী।

* * *

রাস্তায় শুনিয়া আসিলাম:—ট্রামের অসম্ভব ভিড়ের মধ্যে কোন এক আরোহী অন্য এক আরোহীর পায়ের উপর দাঁড়াইয়া গেলে ভদ্রলোক নাকি বলিয়াছেন —"যথেষ্ট বয়স তো হলো, এবার একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুন"।

আমেরিকার আলেকজান্দ্রিয়া শহরের আইনজীবীর ছেলে মাইকেল ওয়াহলডার আইন পাশ করায় ওর বাবা খুশি হয়ে ওকে ইউরোপ বেড়াবার টাকা দেন। মাইকেল গত সেপ্টেম্বরে ইউরোপ যাত্রা করে। বছর চব্বিশ বয়েস, সুপুরুষ, নিজের খেয়াল নিয়েই থাকে।

ইউরোপ ভ্রমণসূত্রে মাইকেল তখন এমস্টারডামে। একদিন হাতে পড়ল ইসরায়েল গভর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত একটি ভ্রমণ সংক্রান্ত পুস্তিকা। মাইকেলের দৃষ্টি পড়ল মলাটের ছবিখানির ওপর। একটি মেয়ের মুখ—মাইকেলের ভাল লাগল মুখখানি, বলতে গেলে মাইকেল ছবিখানির প্রেমেই পড়ে গেল। মাইকেল ছুটল তেল আভিভের পথে।

ওখানে পৌঁছে কিন্তু, মলাটের সেই মেয়েটির সন্ধান পাওয়া যতটা সহজ মাইকেল মনে করেছিল, দেখলে তা নয়। মেয়েটির নাম জানা নেই, আর সরকারী ট্যুরিস্ট এজেন্সীও নাম জানাতে রাজী নয়। সপ্তাহ খানেক ধরে খোঁজাখুঁজির পর ব্যর্থ হয়ে সব আশা ত্যাগ করবে সংকল্প করতে যাবে, এমানুয়েল নামে এক গাইড মাইকেলকে জানালে যে মেয়েটির মায়ের এক বান্ধবীর সঙ্গে সে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। সেই রাত্রেই এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হল।

দেখার পর মাইকেল তার বাপমাকে টেলিগ্রাম পাঠালে: "চমৎকার দেখতে মেয়েটিকে, দিব্যি কটা চুল আর সবুজ বড় বড় চোখ, যা কল্পনা করেছিলাম তার চেয়েও চমৎকার।

মেয়েটির নাম ইনগ্রিড ইল্লানা নিউরিথ পিলজার, সংক্ষেপে নিউরিথ যার মানে ইসরাইলের পার্বত্য অঞ্চলে জাত বুনো ফুল। বয়েস উনিশ। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান। গত যুদ্ধের সময় ওরা ভিয়েনা থেকে পালিয়ে এসে তেল আভিভে বসবাস করছে।

দেখা হওয়াই সব নয়, মাইকেলকে মেয়েটির মনে ধারণা জন্মাতে হল যে সে উপযুক্ত পাত্র; তার বাপ-মাকে বিশ্বাস করাতে হল যে সে দুদিন ফুর্তি করে সরে পড়বার লোক নয়; ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের আইনগত বাধা অপসারিত করতে হল। মাইকেল একের পর এক বাধাগুলো সব দূর করলে। অবশেষে গত জানুয়ারীর প্রথম দিকে তেল আভিভে ওদের বিবাহ সম্পন্ন হয়।

*

কাকতালীয় ব্যাপার যে কতরকমের হয় তার কোন ইয়ত্তা নেই। লণ্ডনের হার্লি স্ট্রীটের এক খ্যাতনামা ডাক্তার এক অদ্ভুত ঘটনার কথা বলেন। এক ব্যক্তি পুরনো জিনিসের দোকানে একটি ছড়ি দেখে সেটি কিনে বাড়িতে এসে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে যে একটা রুপোর চাকতিতে তারই নামের আদ্যাক্ষর খোদাই করা রয়েছে। শুধু তাই নয়, আরো খুঁটিয়ে দেখতে তার জন্মের তারিখও খোদাই করা পাওয়া গেল। অথচ খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে তাদের পরিবারের কেউ কোনদিনই ছড়ি ব্যবহার করেনি।

এক সাব-লেফটন্যাণ্ট নৌসেনা বিভাগে জাপানীদের হাতে হংকংয়ে বন্দী গ্রীণ নামে তার এক বন্ধুর খবর নিতে যায়। মাস কতক ধরে আট-ন বার গিয়ে গিয়েও বন্ধুর কোন হদিশ করতে পারলে না। এর পর সাব-লেফটন্যাণ্ট তার বন্ধুর খোঁজ নেওয়া থেকে বিরত হল।

দক্ষিণ আফ্রিকার এই বৃহৎ সারস পাখির অতিকায় চঞ্চু দেখে কথা উঠেছিল যে, টেরোডাকটাইলের অস্তিত্ব এখনও আছে। কিন্তু পাখীটির সম্পূর্ণ চেহারা দেখে ওরকম বিশ্বাসের কোন কারণ থাকতে পারে না। ১৯২০ সালে ইওরোপীয় ভ্রমণকারীরা এটিকে দেখে টেরোডাকটাইল বলে প্রচার করে, কিন্তু পরে তাদের সে-ধারণা খণ্ডিত হয়।

শেষবার খবর নেবার পরদিন নৌসেনা দপ্তরের ঠিক সামনে ট্রাফিক-আলোতে তাকে গাড়ি থামাতে হল। ঠিক তার সামনে দিয়ে তখন রাস্তা পার হতে দেখা গেল তার সেই বন্ধুকে। জাপানীদের হাত থেকে রোমাঞ্চকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয় এবং সেইদিনই সে ইংলণ্ডে পদার্পণ করেছে।

কবি ওয়াল্টার দ্য লা মেয়ার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তার এক বন্ধু —যার নাম ধরা যাক জন ব্রাউন স্মিথ জোন্স, কাম্বারল্যাণ্ডে পদব্রজে ভ্রমণকালে, রাতে এক হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করে। হোটেলের খাতায় নাম সই করতে গিয়ে সবিস্ময়ে সে দেখলে যে খাতায় শেষ যে নামটি সই করা রয়েছে সেটি তারই নাম—জন ব্রাউন স্মিথ জোন্স। সে লোকটি কে তা কবিবন্ধু জানতে পারেনি কারণ লোকটি রাত কাবার হতেই চলে যায়। কবিবন্ধু যখন কার্কারি সন্সডেলে পৌঁছয় এবং একটি হোটেলে যায় রাত্রিবাসের জন্য। সেখানে হোটেলে আগন্তুদের নামের খাতায় লেখা পেলেঃ জোন্স স্মিথ ব্রাউন জন—অর্থাৎ তারই নাম উলটো করে লেখা!

কতকগুলি ব্যাপার ঘটে যা বিশ্বাস করা কঠিন এমন কি সত্যি বলে তার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও। বেশি দিনের কথা নয়, এক লেখক জন ও' গ্রোটস থেকে ল্যাণ্ডস এণ্ড পর্যন্ত পদব্রজে যাত্রা করে. উদ্দেশ্য তার সেই ভ্রমণ সম্বন্ধে একখানি বই লেখা। ঠিক একই দিনে আর একজন লেখক উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ ল্যাণ্ডস এণ্ড থেকে জন ও' গ্রোটস পর্যন্ত পদব্রজে যাত্রা করে এবং একই উদ্দেশ্যে। অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, এরা দুজনে মাঝপথে একই হোটেলে রাত্রি যাপন করে এবং তাদের প্রকাশকদের কার্যালয় একই রাস্তায় ঠিক সামনাসামনি।

*

ইংলণ্ডে বার্কশায়ারের এক ব্যক্তি মানুষের কেশ অভিনবভাবে কাজে লাগাচ্ছে। একটা গ্রামের মডেল তৈরীতে কুটিরের ছাদের জন্য রঙ করা কেশ সে ব্যবহার করছে।

উত্তর অস্ট্রেলিয়ায় কোন কোন অঞ্চলের আদিবাসীরা মানুষের মাথার কেশ দিয়ে বেশ শক্ত এবং মোটা একরকম সুতো তৈরী করে। এই কেশ তারা সংগ্রহ করে স্ত্রীদের মাথা মুড়িয়ে।

জার্মানীতে বহুকাল থেকেই মানুষের কেশ একপ্রকার বয়নের কাজে লেগে আসছে। নাপিতের দোকান থেকে ঝাড়ু দিয়ে কুড়িয়ে সেগুলি বেছে পরিষ্কার করে এক ধরনের কার্পেট ও ফেল্ট তৈরী করা হয়।

পরচুল প্রস্তুতকারকরা অবশ্য প্রচুর কেশ ব্যবহার করে। লণ্ডনের পরচুল প্রস্তুতকারকদের কাছে দৈনিক গড়ে পঞ্চাশটি পার্সেল কেশ পৌঁছয়।

ফ্রান্সে মানুষের কেশের ব্যবসা জোর চলে। কোন কোন অঞ্চলে কেশ বিক্রীর রীতিমত হাট বসে, যেখানে সংগ্রহকারী ও দালালরা কেশ-ব্যবসা বিষয়ে কথাবার্তা বলতে সমবেত হয়।

যুদ্ধের আগে কোন কোন স্থলে বড় বড় ছাতার নিচে কেশ-ব্যবসায়ীদের বসতে দেখা যেত। কেশ বিক্রীর অভিপ্রায়ে মেয়েরা তাদের কাছে যেত এবং দাম ঠিক হলে ওখানেই টাকার ব্যবস্থা থাকত এবং কর্তিত কেশ বস্তায় ভরা হ'ত। একজন কেশ সংগ্রহকারী দু'বছরে প্রায় তিন লক্ষ টাকা লাভ করে বলে শোনা যায়।

*

একটা হাই তোলাও আজকাল আন্তর্জাতিক ঝঞ্ঝাট সৃষ্টি করতে পারে। এক রোগিনী হাসপাতালের জানলার ধারে গিয়ে হাই তোলে। হাই তোলার সময় তার দু-পাটি কৃত্রিম দাঁতই খুলে নিচে আগাছার ঝোপে পড়ে যায়। হাসপাতালের ধারে ঝোপের ঐ অংশটি ছিল জেরুশালেমের সীমান্তে এবং 'নো-ম্যানস-ল্যাণ্ড'রূপে ইসরায়েল ও আরবদের প্রহরাধীনে ছিল।

পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচারের পর সম্পূর্ণ সুস্থ হবার জন্য মহিলার দরকার ছিল ঘন খাদ্য গ্রহণ করার, যার জন্যে দাঁতের দরকার; তাই ওয়ার্ডের নার্স অবিলম্বে হাসপাতাল পরিচালকের কাছে ব্যাপারটা জানালে। পরিচালক ব্যাপারটা জানালেন সীমান্ত পুলিসকে, সেখান থেকে ব্যাপারটা পৌঁছল সংযুক্ত রাষ্ট্র সন্ধি পরিচালন সংস্থার কাছে, সেখান থেকে প্রতিনিধি গেল ইসরায়েল ও জর্ডনের সংযুক্ত যুদ্ধচুক্তি কমিশনের প্রধান দুজনের কাছে। একটা আন্তর্জাতিক সংকট দাঁড়াল।

কমিশনের প্রধান দুজন তখন দিনকতক ধরে আলোচনায় অতিবাহিত করলেন। হাসপাতালের কোন পরিচারিকা চুপিসাড়ে গিয়ে ঝোপের মধ্যে দাঁতের পাটি জোড়া খুঁজে দেখতে পারত, কিন্তু সেক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ সন্দেহে তার গুলী খাবার সম্ভাবনা ছিল। কাজেই রোগিণীকে দুগ্ধ পথ্যেই থাকতে হল, আর ওদিকে তখন সংযুক্ত রাষ্ট্রের যন্ত্র কাজ করে যেতে লাগল।

শেষে দুপক্ষের ক'জন করে অফিসার হাজির হলেন সেই জানলার নিচে ঝোপের কাছে এবং একজন নার্স ওপরের জানলা থেকে রোগিণীর নির্দেশমত জায়গাটা দেখিয়ে দিতে দাঁতের পাটি জোড়া পাওয়া গেল।

তারপর আরো খুঁটিনাটি ব্যাপার, প্রস্তাব রচনা ইত্যাদি ঝামেলার ফলে রোগিণীকে তার দাঁত ফিরে পেতে আরো ক'দিন সময় কাটাতে হয়।

শ্রীকৌটিল্য

প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার রিপোর্টে আর্থিক উন্নয়নের প্রধান ডিটারমিনেন্টগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, উৎপাদনপদ্ধতি এবং জনসাধারণের উন্নয়নের ইচ্ছা ও ক্ষমতার উপরে সামাজিক ও অন্যান্য শক্তির প্রভাবের কথা ছাড়াও আর্থিক উন্নয়ন নির্ভর করবে প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর। এই বিষয় তিনটি হচ্ছেঃ (ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, (খ) সমাজের মোট আয়ের কত অংশ ক্যাপিটাল ফরমেসন বা পুঁজি প্রস্তুত করবার জন্য নিয়োজিত হয়, তাহা এবং (গ) এইভাবে যে অতিরিক্ত পুঁজি নিয়োগ করা হয়, তার ফলে অতিরিক্ত উৎপাদন কত হয়, তাহা।

এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে আজকে আমরা কেবলমাত্র দ্বিতীয় বিষয়টির একটি দিক সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই। সেটি হল পুঁজি প্রস্তুতের পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত সমস্যা। শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এই সমস্যা যত সহজ আমাদের মত অনুন্নত দেশে সমস্যাটি মোটেই তত সহজ নয়। সুতরাং পুঁজি প্রস্তুতের পরিমাণ নির্ধারণ বা এস্টিমেটস্-এর পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন না হলে যে পরিসংখ্যান আমরা পাব, তার থেকে অনেক ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সম্ভাবনা থেকে যাবে।

অনুন্নত দেশগুলিতে সাধারণত যে পদ্ধতিতে পুঁজি প্রস্তুতের হিসাব করা হয় তাকে বলা যায় উৎপাদন ভিত্তিক (প্রোডাকসন অর কমোডিটি-ফ্লো মেথড) এই পদ্ধতিতে পুঁজির যোগানোর দিক থেকে হিসেব করে জাতীয় সমষ্টি বা ন্যশনাল টোটাল নির্ণয় করা হয়। অনুন্নত দেশে, এই পদ্ধতিতে স্বভাবতই বৈদেশিক বাণিজ্যের বিস্তারিত হিসেব খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ স্থান অধিকার করে। প্রসঙ্গত বলে রাখা যায় যে, আমেরিকার মত উন্নত দেশও কিন্তু এই উৎপাদন ভিত্তিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। তবে সে-দেশে আমাদের বিপরীত ক্রমে দেশের অভ্যন্তরস্থ উৎপাদনের বিস্তারিত হিসেবই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসেব নয়। কোন কোন দেশ দ্বিতীয় আর একটি পদ্ধতিতে পুঁজি প্রস্তুতের হিসেব করে। এই পদ্ধতিকে বলা যায় ব্যয় ভিত্তিক (এক্সপেনডিচার মেথড)। এই পদ্ধতিতে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগে প্রতি বৎসর কী পরিমাণ অর্থ পুঁজি প্রস্তুত করার কাজে ব্যয় করা হল, তার হিসেব নেওয়া হয়। এইগুলির সমষ্টি থেকে তারপর মোট জাতীয় পুঁজির হিসেব করা হয়। কোনও দেশ যত শিল্পোন্নত হয় এবং তার পরিসংখ্যানের অবস্থা যত ভাল হতে থাকে এই পদ্ধতি গ্রহণ করার সম্ভাবনা তত বেশি হয়। কিন্তু তাই বলে একথা মনে করা ভুল হবে যে, প্রথম পদ্ধতি থেকে এই পদ্ধতি উন্নততর। প্রকৃতপক্ষে প্রথম পদ্ধতিতে নির্ণীত হিসেবের সত্যতা পরীক্ষা করা এবং তৈরী পুঁজির জাতীয় সমষ্টি ছাড়াও বিভাগীয় হিসেব প্রস্তুত করতে সাহায্য করাই দ্বিতীয় পদ্ধতির প্রধান অবদান।

অনুন্নত দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসেব থেকে পুঁজি প্রস্তুতের হিসেব করতে গেলে প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেটা হল কোন্ কোন্ দ্রব্যকে আমরা পুঁজির মধ্যে ধরবো। যা প্রত্যক্ষ ভোগে লাগে না অথবা যার আয়ু অন্তত এক বৎসর—এই ভাগে দ্রব্যগুলির বিভাগ করলেও মেরামত এবং সংরক্ষণের জন্য যে ব্যয় করতে হয়, তার কতটা অংশ পুঁজি প্রস্তুতের হিসেবের মধ্যে ধরবো এই প্রশ্নটি থেকে যায়। আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসেবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন যন্ত্রপাতির অংশ আমরা প্রচুর পরিমাণে আমদানী করি। এই অংশগুলির হিসেব বহু সমস্যার সৃষ্টি করে। অংশগুলি প্রধানত দুটি কাজে ব্যবহার করা হয়ঃ—প্রথমত, মেরামত করবার কাজে, দ্বিতীয়ত অংশগুলি এদেশে জোড়া দিয়ে মূল যন্ত্রপাতি তৈরী করার কাজে। সুতরাং প্রথম স্থির করতে হয়, আমদানীকৃত অংশগুলির কতটা অংশ মেরামতি কাজে লাগানো হবে। দুঃখের বিষয়, এই সম্পর্কে কোন সঠিক হিসেব পাওয়া একেবারে অসম্ভব। তাছাড়া যেখানে মেরামতি কাজে ব্যবহৃত অংশের মোট পরিমাণ জানা যায়, সেখানেও অসুবিধা হয় এই যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেরামতের ফলে যন্ত্রপাতির আয়ু বেড়ে যায় ও কিছুটা উন্নতিসাধনও হয়। সুতরাং মোট আমদানীকৃত যন্ত্রাংশকে একটি বিশেষ অনুপাতে বিভক্ত করে তৈরী পুঁজির হিসেবের মধ্যে গ্রহণ করলে অনেক ত্রুটি থেকে যাবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যেখানে আমদানীকৃত অংশগুলিকে একত্র করে দেশের মধ্যেই নতুন দ্রব্য করা হয়, বিশেষ নজর রাখা দরকার যাতে জাতীয় সমষ্টিতে দু'বার করে এই যন্ত্রাংশগুলির মূল্য ধরা না হয়। যে সমস্ত দ্রব্য এদেশে প্রস্তুত অংশ দিয়েও তৈরী করা হয় এবং আমদানীকৃত অংশ দিয়েও তৈরী করা হয়, সেগুলির ক্ষেত্রেই এই ভুল হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসেবের পরই আলোচনা করতে হয় দেশের ভিতরে যে ক্যাপিটাল গুডস্ তৈরী হয়, তার কথা। এদিক থেকে অনুন্নত দেশগুলির, বিশেষ করে আমাদের ভারতবর্ষের পরিসংখ্যানের অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। শিল্প-জাত দ্রব্যের দুটি মাত্র বিস্তারিত হিসেব এদেশে পাওয়া যায়ঃ সেন্সাস অব ইণ্ডিয়ান ম্যানুফ্যাকচারস্, (২) স্যাম্পল সার্ভে অব ম্যানুফ্যাকচারিং ইণ্ডাস্ট্রিজ। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনটিতেই ধাতু এবং ভারী শিল্প-গুলিতে তৈরী দ্রব্যগুলির বিস্তারিত তালিকা পাওয়া যায় না—মোট উৎপাদনের মূল্য পাওয়া যায়। সুতরাং পুঁজি প্রস্তুতের হিসেবকারী কোন সময় সামান্য অনুসন্ধানের ভিত্তিতে অথবা কোন সময় একেবারে অনুমানের সাহায্যে এক একটি অনুপাত ঠিক করেন বিভিন্ন শিল্প সম্পর্কে এবং বিভিন্ন শিল্পের মোট উৎপাদনকে পুঁজি এবং প্রত্যক্ষ-ভোগ্য এই দুই ভাগে ভাগ করেন।

পুঁজি প্রস্তুতের হিসেবের সামান্য দুই একটি সমস্যার কথা আমরা আলোচনা করলাম—প্রত্যক্ষ হিসেবকারীকে এইরূপ আরো শত শত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমাদের আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য দুটিঃ প্রথমত, সচরাচর যে সমস্ত হিসেব পাওয়া যায়, সেগুলির সীমিত মূল্য ও ব্যবহার-যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন থাকার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা এবং দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসেবের এবং বিশেষ করে দেশের অভ্যন্তরস্থ উৎপাদনের হিসেবের আরও উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা।
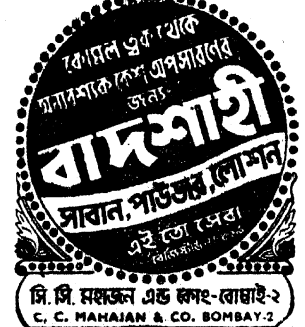
যে কোন উপলক্ষে
হাল-ফ্যাশানের
পোশাকের জন্যে...
ডিসিএম
সিল্ক
প্রাপ্তিস্থান :
ডি সি এম রিটেল ষ্টোর্স
১৭, পার্ক ষ্ট্রীট
কলিকাতা
১২৮/১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

জীবনী

আচার্য জগদীশচন্দ্রের সাধনা—অনাদিনাথ পাল। আসাম বুক ডিপো, ২১, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা—৯। বার আনা।

ঋষি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের জীবনী ও গবেষণা সম্পর্কে ছোট-বড় অনেক জীবন-চরিতই প্রকাশিত হ'য়েছে। আচার্যের জীবনীর সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যত তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা ও আবিষ্কারের কাহিনীই এই সব গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়। মাত্র চৌত্রিশ পৃষ্ঠার স্বল্প পরিসরে আলোচ্য গ্রন্থটিতেও জগদীশচন্দ্রের জীবন বৃত্তান্তের কাহিনী যেমন রয়েছে, তেমনি তাঁর বিভিন্ন আবিষ্কারের কথাও সংক্ষেপে রয়েছে, রয়েছে স্বদেশে ও বিদেশে সকল বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে আচার্যের অবিরাম সংগ্রামের অপরূপ কাহিনী। কিন্তু এটুকুই বইখানির সব নয়। যে দেশানুরাগ জগদীশ-চন্দ্রের সকল কাজের উৎস ও মূলাধার এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর চরিত্রের বীর্যবত্তা, অনমনীয় দৃঢ়তা ও সংগ্রামী রূপটিও বইটিতে ফুটিয়ে তোলার বিশেষ প্রচেষ্টা করেছেন লেখক; আর এই দিক থেকেই বইখানি অভিনবত্বের দাবী রাখে। বইখানি যাদের জন্য লেখা তারা বইখানি পড়ে যেমন উপকৃত হ'বে, তেমনি বইখানি পড়তে বসে আনন্দও যে পাবে তা' অনায়াসে বলা যেতে পারে। ৬৯৬।৫৮

কবিতা

জাতক—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সি, আই, টি, বিল্ডিং, ক্রিস্টোফার রোড, কলিকাতা—১৪। এক টাকা।

বাংলাদেশের যে কয়েকজন আধুনিক কবি কালের ইঙ্গিতকে অস্বীকার করেননি, অথচ যাদের রচনা কবিতাই হ'য়েছে ছন্দোবদ্ধ, রচনাতেই সীমাবদ্ধ হয়নি, বীরেনবাবু তাদেরই একজন। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের স্বল্প পরিসরে তিনি আরেকবার তাঁর কবিমনের ফসল এনে উপস্থিত করেছেন বাঙালী পাঠকদের সামনে, এবং একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে রসিক মন এই বইখানি পড়ে তৃপ্তই হ'বে। মোট সতেরটি কবিতা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। তারমধ্যে ভাবানুভূতি ও আঙ্গিকের দিক থেকে মায়ের মুখ, তীর্থ-বিপণির ভিড়ে ও ভাইয়ের মুখ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য কবিতাগুলোতেও যে গভীর জীবন-বোধ ও প্রত্যয়ের স্বাক্ষর রয়েছে, তা পাঠক-মনের মনেই সাড়া জাগাবে।

কাগজ ও ছাপা ভালো, প্রচ্ছদপট সুন্দর। এমন একটি সুরুচিপূর্ণ ও পরিচ্ছন্ন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশক কৃতিত্বের দাবী রাখেন। ৬১৫।৫৮

উপন্যাস

জীবন বুদ্বুদ—শৈলেন্দ্র দাস। হানিকম্ব পাবলিশার্স, ৬০৬এ, লাল্টান রায় রোড, কলি-কাতা—৩৯। দুই টাকা।

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি। নিতান্ত আকস্মিকভাবেই কটক হতে পুরীর পথে উর্মি হল তাই সৈকতের 'পথে নাসী অর্জিতা'। আর তা অতি দ্রুততার মধ্য দিয়েই পরিণত হল ঘনিষ্ঠতায়। কিন্তু বিধি বাম। তাই হঠাৎ বিচ্ছেদ আসতেও দেরী হল না। দেশদ্রোহিতার অপরাধে সৈকতের হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। লেখকের অবশ্য বক্তব্য, কাহিনীর এই অংশটুকুই হল ভূমিকা।

তারপর দীর্ঘ পনের বছর কেটে যায়। কারাবাসের মেয়াদ শেষে সৈকত ফিরে আসে আবার কলকাতায়। চাকুরীর সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে চলে উর্মির সন্ধান। অবশেষে মধুমতী কলিয়ারীর মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করে মধুমতী এসে আবার আকস্মিক-ভাবেই সন্ধান মেলে উর্মির—কিন্তু উর্মি এখন মিসেস সান্যাল, কলিয়ারী ম্যানেজার প্রশান্ত সান্যালের স্ত্রী। শুরু হয় মানসিক দ্বন্দ্ব, উর্মির এবং সৈকতেরও। আর শেষ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে সৈকতের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। এটুকুই মূল কাহিনী।

লেখকের ভাষা ও লেখার ঢংএ সাহিত্যিক রস বর্তমান। কিন্তু কাহিনীর গতি বড় দ্রুত, তাতে জীবন বোধের গভীরতা নেই, নেই জীবনাদর্শের ব্যাপ্তি। তাই তা পাঠকমনকে স্পর্শ করে না।

প্রচ্ছদপটটি অভিনবত্ব ও সুরুচির দাবী রাখে। ৫২৩।৫৮

সত্যমিথ্যা—গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থ-জগৎ, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দুই টাকা।

"সোজা পথ একটা ছিল অনিলা কিন্তু সে পথটা পছন্দ নয় অনুশীলার"। অনুশীলার, অর্থাৎ আলোচ্য গ্রন্থের নায়িকার। তাই দ্বিধা না করে জঞ্জালের পথই যেমন সে বেছে নেয়, জীবনের চলার পথেও বাঁকা পথই তার চিরদিন প্রিয়। আর সেই বাঁকা পথেই চলতে গিয়ে তার জীবনে কী দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠল, আর সেই দুর্যোগের মধ্য দিয়ে কী করে শেষ পর্যন্ত যাত্রাপথের প্রান্তে এসে সে উপস্থিত হল তারই বিচিত্র কাহিনী আলোচ্য গ্রন্থখানি। লেখকের ভাষায় ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি থাকলেও, কাহিনীর অবিশ্বাস্যতা মনকে পীড়া দেয়, রসাস্বাদন বিঘ্নিত করে। সেদিক থেকে অবশ্য লেখকের দেওয়া বইয়ে 'সত্যমিথ্যা' নাম হয়ত সার্থক। ৪৪৭।৫৮

তিস্তর নদীর দলং—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দু টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

চা-বাগানের পটভূমিকায় রচিত আলোচ্য গ্রন্থখানিতে চা-শ্রমিকদের জীবনের যে ছবি

লেখক ফ্যুটিয়ে তুলেছেন তা অপূর্ব। তাদের সমাজ ও সামাজিক নিয়মনিষ্ঠার ছবিও সুন্দর-ভাবে দেখানো হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। ঘটনার বৈচিত্র্যে, ঘাত-প্রতিঘাতে ও বর্ণনা-ভঙ্গীতে উপন্যাসখানি উপাদেয় ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। শুধুমাত্র যে অভিযোগ বইখানি

শেষ হবার পর পাঠক মনে থেকে যায় তা হচ্ছে নায়িকা নবমী চরিত্রের পরিণতি বেশ খানিকটা পলায়নধর্মী। বড়বাবুর বোনের চরিত্র তাকে চিরদিন উদ্বুদ্ধ করেছে, তার কাছ থেকে শোনা কথা শহরে মানুষ মানুষ থাকে না তার মনে দাগ কেটে গেছে; শেষ পর্যন্ত সেই শহরেই কিন্তু সে মুক্তির পথ সন্ধানে ব্রতী হয়েছে, এড়িয়ে গেছে তার চিরদিনের পরিবেশ। তবে, একথা অনস্বীকার্য যে নবমী চরিত্র এতদসত্ত্বে সংবেদনশীলতায় পাঠকমনকে মুগ্ধ করার দাবী রাখে। ৫২০।৫৮

শিশুসাহিত্য

এক যে ছিল রাজা—সুকমল দাশগুপ্ত। ইস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানী, ৬৪-এ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩। দুই টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম পথিক রামমোহনের জীবনকে কেন্দ্র করে একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থটিতে শ্রী দাশগুপ্ত রাজা রামমোহনের জীবনী ছোটদের উপযোগী করে কবিতায় রচনা করেছেন। কল্পনাও খানিকটা এতে যে নেই, তা নয়। কিন্তু সেই কল্পনা সত্যকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে, তা বাস্তবকে অস্বীকার করেনি কোথাও বা কোথাও প্রাধান্যও বিস্তার করেনি। ভাষা সহজ, ছন্দ সাবলীল, বলার ঢংটি সুন্দর। বইখানি ছোটদেরই যে শুধু ভালো লাগবে তা নয়, বড়দেরও পড়তে ভালোই লাগবে। ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদ সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ। ৫৪০।৫৮

মহাবিজ্ঞানী নিউটন — ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। এক টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা।

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী দেশবিদেশের বিজ্ঞানসাধকদের সঙ্গে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েদের পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য সম্প্রতি যে 'বিজ্ঞান-সাধক চরিতমালা'র প্রবর্তন করেছেন তারই দ্বিতীয় গ্রন্থ মহাবিজ্ঞানী নিউটন। লেখক শ্রী ভট্টাচার্য মশাই এই বইখানিতে শুধু যে নিউটনের জীবনীই বর্ণনা করেছেন তা নয়, মহাবিজ্ঞানীর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূল কথাও সংক্ষেপে ও সহজভাবে বর্ণনা করেছেন। আর এই কাজে তাঁর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হল, বইখানির কোথাও পাণ্ডিত্য প্রকাশের অযথা প্রচেষ্টা নেই। ছোটরা যতটুকু বুঝে উপভোগ করতে পারে সেটুকুর দিকেই সব সময় লক্ষ্য রাখা হয়েছে। ছোটদের জন্য এমনি ধারা বই রচনা নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের ব্যাপার। বইখানির গোড়ায় নিউটনের জীবনের যে ঘটনাপঞ্জী সন্নিবেশিত হয়েছে তা মূল্যবান। ৫৮৭।৫৮

বিবিধ

যুগে যুগে যার আসা—স্বামী সত্যানন্দ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন। ২ প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬। পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন, ভাবজীবন ও সাধনমার্গের এক সামগ্রিক আলেখ্য অঙ্কন করেছেন স্বামী সত্যানন্দজী আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। তাঁর সাধনপথের জ্বালাময়ী উৎকণ্ঠা, তাঁর আপাত অবোধগম্য বচন ও আচরণ প্রভৃতির যে ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা ভক্তিরস-পিপাসু পাঠকমাত্রেরই ভালো লাগবে। বিশেষত এই রচনায় সর্বত্র লেখকের যে অপরোক্ষ নিবিড় অনুভূতির ছাপ বর্তমান সেটাই পাঠকমনকে বেশী নাড়া দেয়।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। লেখকের লেখার ভঙ্গীটি, বিশেষ করে অসমাপ্ত বাক্য প্রয়োগের ঝোঁক কিন্তু স্থানে স্থানেই রচনার রস গ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে, রচনাকে অযথা দুর্বোধ্য করে তুলেছে।

পুস্তকের শেষে যে দুটি পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে, বিশেষত, "দর্শনে ও মনোবিজ্ঞানে শ্রীঠাকুর" শীর্ষক পরিশিষ্টটি বিশেষ মূল্যবান। ৫৩৭।৫৮

The Immortals of the Bhagavat—Dilip Kr. Roy. Lakshmi Narain Agarwal, Educational Publishers, Agra. Rupees Five.

ভারতীয় মহাকাব্যসমূহের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের পরেই ভাগবতের স্থান। কিন্তু বিদেশী পাঠকদের কাছে রামায়ণ ও মহাভারত যত পরিচিত, ভাগবত তত নয়। তার একটা প্রধান কারণ, এ পর্যন্ত ভাগবতের কোন ভালো ইংরেজী অনুবাদ হয়নি। আলোচ্য গ্রন্থে ভাগবতের ছয়টি কাহিনীর সাবলীল ইংরেজী ছন্দ-অনুবাদ করে শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় মশাই সেই অভাব পূরণ করে ভারতবাসীমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। এই অনুবাদকার্যে শুধুই আক্ষরিক অনুবাদ তিনি করেননি, ভাগবতের যা প্রধান বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ রূপকের অপূর্ব প্রয়োগ, প্রয়োজনমত তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। আর সেই ব্যাখ্যা শুধুমাত্র বুদ্ধি ও মননের ফলে উদ্ভূত নয়, তা অনুভূতিসঞ্জাত, ভক্তিরসে সিঞ্চিত।

পরিশিষ্টে রামকৃষ্ণকথামৃতের যে বিশটি রূপককাহিনীর ইংরেজী কাব্যানুবাদ সংযোজিত হয়েছে তাও বিশেষ মূল্যবান। ৫২২।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

টমাস পেন-এর রাজনৈতিক রচনাবলী—অনুবাদক—প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
প্রেম মৃত্যুহীন—১ম ও ২য় খণ্ড—আরভিং স্টোন—অনুবাদিকা—গীতা দেবী।
শিল্পপতির আসন—ক্যামেরন হলি—অনুবাদক—যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শান্তির নবদিগন্ত—চেস্টার বোলজ—অনুবাদক—পরিমলকুমার ঘোষ।
যোগী আর শাসনকর্তা—আর্থার কোয়েসলার—অনুবাদিকা—কমল মুস্তাফি।
মনোমর্মর—শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ।
অপরা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য।
বৃত্ত—সঞ্জয় ভট্টাচার্য।
আঙুরলতা—বিমল কর।
মাইকেল—মণি বাগচি।
রামমোহন—মণি বাগচি।
দেবধূপ—গোষ্ঠবিহারী কুইলা।
এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ—জুল ভার্ন—অনুবাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন—জুল ভার্ন—অনুবাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈদেশিকী

দ্য গলের ফরাসী গবর্নমেণ্ট ও ডাঃ এ্যাডেনয়েরের পশ্চিম জার্মান গবর্নমেণ্টের মধ্যে একটা নূতন ঘনিষ্ঠতা কিছুদিন থেকে গড়ে উঠছে দেখা যায়। বার্লিনের সমস্যা সম্পর্কে উভয়েই মনে করেন বা মনে করেন বলে বলেন যে, রাশিয়া ভাঁওতা দিচ্ছে, পশ্চিমা শক্তিরা যদি নরম না হয় তবে রাশিয়া পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হবে। জার্মানীর পুনরেকীকরণ সমস্যা সম্পর্কেও রাশিয়ার কাছে নরম হওয়ার পক্ষপাতী এঁরা নন। ডাঃ এ্যাডেনয়েরের গোঁড়া মনোভাব এ ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট দ্য গলের দ্বারা সমর্থিত হওয়ায় বৃটেন এবং আমেরিকাও কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত হয়ে পড়েছে। কারণ মিঃ ডালেস বাহ্যত রাশিয়ার মতলব সম্বন্ধে যত সন্দেহই প্রকাশ করুন না কেন রাশিয়ার সঙ্গে মিটমাট করব না বা করতে চাই না, একথা তিনিও বলতে পাচ্ছেন না, সেটা আমেরিকার জনমতের বিরুদ্ধতা করা হবে। বৃটেনেও রাশিয়ার সঙ্গে মিটমাটের পক্ষেই জনমতের গতি। অর্থাৎ এই ব্যাপারে যেন অনেকটা একদিকে ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী এবং অন্যদিকে আমেরিকা ও বৃটেন হয়ে যাচ্ছে। প্যারিস ও বনের এই বিষয়ে মিতালির ধরণ দেখে মিঃ ডালেস য়ুরোপে ছুটে এসেছিলেন, কারণ যদি ডাঃ এ্যাডেনয়ের ও জেনারেল দ্য গল এমন কোনো একটা কট্টর নীতির সঙ্গে প্রকাশ্যে যুক্ত হয়ে পড়েন যা থেকে তাঁদের সরে আসা কঠিন হবে তা হলে পশ্চিমা শক্তিদের পরস্পরের মধ্যে একতা রক্ষা করে রাশিয়ার সম্মুখীন হওয়া সহজ হবে না। মিঃ ডালেস লণ্ডন, বন ও প্যারিসে এসে কথাবার্তা বলে মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে গেলেন যাতে পশ্চিমা শক্তিদের মধ্যে মতভেদ না বাড়ে। আগামী মাসের কোনো সময়ে পশ্চিমা শক্তিদের পররাষ্ট্র সচিবদের একটা বৈঠক হবে বলে স্থির হয়েছে। খুব সম্ভব প্যারিসে এই বৈঠক হবে। সোভিয়েট ও পশ্চিমা শক্তিদের মধ্যে একটা মিটমাটের আলোচনার জন্য কনফারেন্স করতে হলে তার আগে পশ্চিমা শক্তিদের নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিতে হবে সেই কনফারেন্সে কী নীতি অবলম্বন করা উচিত হবে। পশ্চিমা পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠক মার্চ মাসের মাঝামাঝি হওয়ার সম্ভাবনা। রাশিয়ার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ২৭ মে তারিখের মধ্যে বার্লিনের রুশ-অধিকৃত অঞ্চল থেকে সোভিয়েট সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হবে এবং পটস্‌ডাম চুক্তি অনুযায়ী সেখানে সোভিয়েটের যে সব অধিকার আছে, সেগুলি পূর্ব জার্মান গবর্নমেণ্টের হাতে সমর্পন করা হবে। ঐ তারিখের পূর্বেই সোভিয়েটের সঙ্গে পশ্চিমাদের একটি আপোষ হওয়া দরকার, তা না হলে কী ঘটে বলা যায় না। সোভিয়েট যদি সত্যই বার্লিন থেকে সরে যায় তবে পূর্ব জার্মানীর গবর্নমেণ্টের অস্তিত্ব কার্যত স্বীকার না করে থাকার চেষ্টা করলে একটা সংঘর্ষ বাঁধার সম্ভাবনা রয়েছে। সেরূপ সংঘর্ষ কোনো পক্ষেরই অভিপ্রেত নয়, কারণ তা থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হতে পারে। ডাঃ এ্যাডেনয়েরের ধারণা হচ্ছে এই যে, সংঘর্ষ যখন রাশিয়াও চায় না এবং রাশিয়া যদি বুঝে যে পশ্চিমা শক্তিরা পূর্ব

জার্মানীর গবর্নমেণ্টকে স্বীকার করতে সহজে রাজী হবে না এবং বার্লিন থেকে সরবেও না; তাহলে সংঘর্ষের সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে এবং সোভিয়েট ভয় পেয়ে তার চরমপত্র প্রত্যাহার করবে। কিন্তু ভয় কেবল সোভিয়েটই বা কেন পাবে? সংঘর্ষের ভয় কি পশ্চিমাদের নেই? সুতরাং ডালেস-এ্যাডেনয়ের সাক্ষাৎকারের পরে এই মর্মে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে যে পশ্চিমা শক্তিরা নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য দৃঢ়তা থেকে বিচ্যুত হবে না তার মধ্যেও কিছুটা ভাঁওতা আছে বলে সোভিয়েটের সন্দেহ হতে পারে।

* * *

ইরাকের আভ্যন্তর রাজনৈতিক আবহাওয়া ঠিক কী রকম তা বুঝা সহজ নয়। কর্নেল আরেফ যিনি বিপ্লবের কার্যে কাসেমের সহযোগী ছিলেন এবং পরে উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সামরিক কোর্টে তাঁর বিচার হয়ে প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়েছে। অবশ্য কোর্ট প্রাণদণ্ড মকুব করার জন্য সুপারিশ করেছেন। কর্নেল আরেফ ইরাক ও ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের সংযুক্তি চেয়েছিলেন। প্রথম তাঁকে মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে বিদেশে একটি রাষ্ট্রদূতের কাজে পাঠানো হয়, কিন্তু আরেফ সে কাজে যোগ না দিয়ে দেশে ফিরে আসেন এবং পরে গ্রেপ্তার হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে তিনি ইরাকের নিরাপত্তার বিরোধী কাজ করেছেন এবং কাসেমের প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করেছেন। মিলিটারি কোর্টের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলেও আরেফ কাসেমকে হত্যা করার চেষ্টায় ছিলেন একথা বহুলোক বিশ্বাস করবে না। অবশ্য কাইরো-বাগদাদের পরস্পরের প্রতি গালিগালাজের ফলে যে আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে তাতে নাসেরের প্রতি আনুগত্য এবং ইরাককে ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টাকে ইরাকের নিরাপত্তা-বিরোধী কাজ বলে ইরাকে অনেকের পক্ষে মনে করা অসম্ভব নয়। আবার আরেফের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে কাসেম সরকারের নীতির সমালোচকও ইরাকে আছে। এমন কি মন্ত্রিমণ্ডলীর মধ্যেও এরূপ সমালোচক ছিলেন দেখা যাচ্ছে, কারণ একটি সংবাদে প্রকাশ যে, ইরাকের ছয়জন মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন, এঁদের মধ্যে পররাষ্ট্র-মন্ত্রীও আছেন। কর্নেল আরেফের বিচারের ঔচিত্য সম্বন্ধে মন্ত্রিসভার মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল। এর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে কি না বলা যায় না। নাসের ও কাসেমের মধ্যে একতার অভাব সারা আরব দুনিয়ার পক্ষে একটা মুশকিলের ব্যাপার হয়েছে। অধিকাংশ আরব রাষ্ট্রেরই বোধ হয় কাইরোর দিকে ঝোঁক। কাসেম কম্যুনিস্টদের দ্বারা চালিত হচ্ছেন বলে একটা অভিযোগ কাইরো থেকে শনা যায়, কিন্ত সে কথা বোধ হয় বেশি লোক বিশ্বাস করে না।

৯।২।৫৯

দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

আর্থার কোসলারের সঙ্গে অতি সামান্য পরিচয় হয়েছিল মাস কয়েক আগে প্যারিসে। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ সেদিন কলকাতায়। অতি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ, অতি পরিমিত বাক্যাবিনিময়, কিন্তু সময়ের অপচয় নয় আদৌ।

সাহিত্যিকদর্শন সাধারণত অনর্থক কালক্ষেপ। খ্যাতিমানের সান্নিধ্যে আমার অনীহা প্রবল, আমার নানা ত্রুটির মধ্যে অন্তত এই শ্রেণীর স্নবারি অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বিতীয়ত, লেখকের শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁর সাহিত্যে। তিনি দেখতে উত্তম না হতে পারেন, বাচনে তিনি হয়তো একান্তই অনুজ্জ্বল, ব্যবহারে তিনি হয়তো নিতান্তই সাধারণ, তাঁর সব ধার হয়তো শুধু লেখাতেই। কী হবে এমন লোকের সঙ্গে দেখা করে—তাঁর ও আমার সময় নষ্ট ছাড়া? তাছাড়া লেখকের জীবনকে জড়িয়ে তাঁর সাহিত্যের ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণে আমার উৎসাহ সাধারণত পরিমিত। এমন শিল্পী অসংখ্য যাঁদের সৃষ্টি মহৎ এবং জীবন আদৌ আদর্শ নয়। এবং vice versa।

ব্যতিক্রমদের মধ্যে অন্তর্গত আর্থার কোসলার। বলা শক্ত তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের কতটুকু কল্পনা আর কতখানি স্বীয় অভিজ্ঞতার নিরাভরণ পরিবেশন। তাঁর সাহিত্যের উপকরণ প্রধানত তাঁর জীবন, বিশেষ করে রাজনীতিক জীবন। আমাদের সাক্ষাতে সাহিত্যের উল্লেখ ছিল ঠিক একবার, তাঁর সর্বাধুনিক গ্রন্থ "দি স্লীপওয়াকারস" সম্বন্ধে। রাজনীতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে দ্বিধা ছিল, কেননা এ সম্বন্ধে তিনি আর লিখবেন না বলে পণ করেছেন। তাহলে কী নিয়ে কথা হল? বিশেষ কিছু না। আমি শুধু লক্ষ্য করছিলাম ভদ্রলোককে।

*

আর্থার কোসলারের প্রথম সমস্যা ছিল ভ্রমণ নিয়ে। যেদিন দেখা তার পরদিনই তিনি যাবেন গোহাটি আর শিলং—ভেরিয়ার এলুইনের সঙ্গে আদিবাসীদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে। বুকিং ঠিক আছে তো? তারপর ফেরার তারিখে প্লেনে জায়গা পাওয়া যাবে তো? হাতে টিকিট রয়েছে, টিকিটে মোটামুটি স্পষ্ট করেই তারিখ লেখা আছে, তবু যেন দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। সব ঠিক কখন অঠিক হয়ে যাবে কে জানে? বহু ভ্রমণ সত্ত্বেও আমি আজো ভ্রমণ-কাতুরে। গাড়ি ছাড়বার এক ঘণ্টা আগে গিয়ে বসে থাকি স্টেশনে, প্লেন ছাড়বার দু ঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টে। কিন্তু কোসলারকে দেখে মনে হল, তাঁর অনিশ্চয়তা আরো বেশি এবং মৌলিক। শুধু মানুষে অনাস্থা নয়, শুধু বুকিং কেরানীই ভুল করতে পারে না, যেন জড় পদার্থগুলিও অসহযোগ বা বিদ্রোহ করতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে কী করে ঠিক দরকারের সময় কলমের কালি ফুরিয়ে যায়, জুতোর ফিতে খুলে যায়, দেশলাইয়ের বাক্সে কাঠি থাকে না, তাঁদের বুঝিয়ে বলতে হবে না যে জড় পদার্থ মাত্রই পুরোপুরি জড় নয়। কিন্তু কোসলারের অস্থিরতা যেন আরো গভীর। কোসলার এখন বৃটেনের নাগরিক, রানী এলিজাবেথের অনুগত প্রজা। ইংল্যাণ্ডে বাড়ি কিনেছেন, যদৃচ্ছ ঘুরে বেড়াতে পারেন, পুলিশ এখন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে না দিনরাত। কিন্তু এই স্থিতি তো অতি সাম্প্রতিক। তার আগে বেচারীর সারা জীবন কেটেছে পথে আর জেলে বা সরাই-

খানায়। হাঙ্গেরিয়ান, কিন্তু শৈশব কেটেছে ভিয়েনায়। তারপর পর পর এদেশ থেকে ওদেশে—জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, আমেরিকা ইংল্যাণ্ড—আর সঙ্গে সঙ্গে এভাষা থেকে ওভাষা। আজ তিনি শ্রেষ্ঠ ইংরেজী লেখকদের অন্যতম, কিন্তু তারও আগে তাঁর খ্যাতি ছিল জার্মান ও ফরাসী সাহিত্যে। পরভাষায় সামান্য প্রারদর্শিতা অর্জন করা দুঃসাধ্য নয়, কিন্তু তিন তিনটি অতি উন্নত সাহিত্যে মূল রচনার গুণে স্বীকৃতি

লাভ করা সোজা কথা নয় নিশ্চয়ই। কোসলারের এই কৃতিত্বের মূল্য আমার কাছে অধিক হয়তো এই কারণে যে, আমি একাধিক ভাষায় লিখতে চেষ্টা করি এবং জানি এর দুরূহতা।

*

ভাষান্তরে চিন্তান্তর প্রায় অবশ্যম্ভাবী এবং আংশিক চরিত্রান্তরও বোধ হয় অপরিহার্য। দেশান্তরের প্রভাবও সামান্য নয়। সন্দেহ করি, কোসলার সারা জীবন একই ভাষার চর্চা করলে এবং একই দেশে বাস করলে একেবারেই অন্য লোক হতেন। তিনি নিজেই লিখেছেন কেন তিনি স্পেন থেকে আমেরিকা যাননি। যদিও পালিয়ে যাবার সুযোগ ছিল। তিনি বলেছেন, য়ুরোপ থেকে সরে গিয়ে আমেরিকার আশ্রয় নিলে তিনি বাকি জীবন নিজেকে পলাতক বলে মনে করতেন এবং কখনো নিজেকে ক্ষমা করতে পারতেন না। য়ুরোপে সংকটের সঙ্গে তাঁর নাড়ীর যোগ, বিতাড়িত হলেও য়ুরোপের কোথাওই তাঁকে থাকতে হবে।

এমন য়ুরোপীয়ান—কোসলার সত্যকার য়ুরোপীয়ান—ভারতে এসেছেন কিসের সন্ধানে? তিনি নিজে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করে বিশেষ কিছু বলেননি। তাঁর শেষ বই পড়ে সন্দেহ করি, স্পষ্টতায় বোধ হয় আজ তাঁর আস্থা পরিমিত। নতুন বইয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শুধু যুক্তি ও চিন্তার পুরস্কার নয়। প্রায় যেন স্বপ্নপ্রাপ্ত ওই আবিষ্কারগুলি। আকস্মিকতার ভূমিকা অকিঞ্চিৎকর নয়, অনেক মৌলিক আবিষ্কারের উপর আবিষ্কারক প্রায় হোঁচট খেয়ে পড়েছেন। কিন্তু যুক্তি আমি জানি, তা নিয়ে তর্ক করতে পারি। স্বপ্ন আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, প্রেরণা আমার নাগালের অতীত। কোসলারের নবলব্ধ বিশ্বাসে আমি অবিশ্বাসী নই, কেননা সব কিছুর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা আমি জানিনে, কিন্তু স্বপ্ন ও বিধিদত্ত প্রেরণার উপর নির্ভর করতে আমার দ্বিধা। আমি আজো আঁকড়ে রইলাম যুক্তিকে। সুপ্তি-ভ্রমণে আমার ভয়।

... শিখান্ তারে—
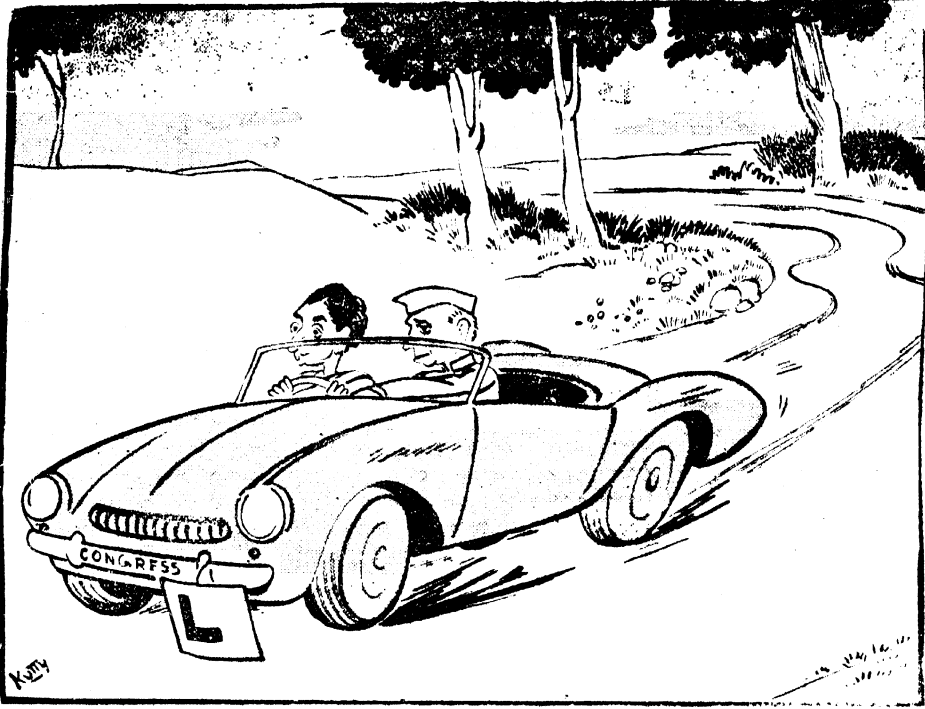
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস সভানেত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন

খোয়া নুত্তী

মিস্টার ফিরোজ শা কোটলা উঠাইয়াছে
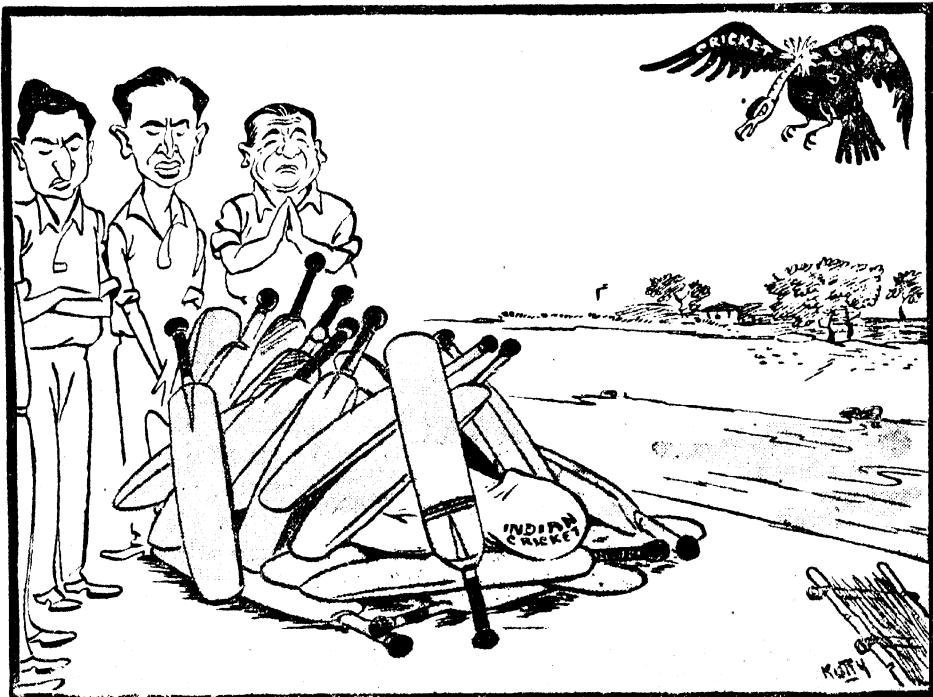
চন্দ্রশেখর

চিরন্তন মানুষের মিছিল

রম্যসাহিত্যের রসোত্তীর্ণ চিত্ররূপের ভেতর দিয়ে বাংলা ছবি যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে, তারই প্রকৃষ্ট বাহকরূপে এসেছে বিকাশ রায় প্রোডাকসন্সের "মরুতীর্থ হিংলাজ"। অবধূতের এই জনপ্রিয় সাহিত্য সৃষ্টিকে রূপে-রসে-বিন্যাসে স্মরণীয় ও রমণীয় চিত্রার্ঘ্যরূপে দর্শকদের কাছে উপস্থাপিত করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন প্রযোজক-পরিচালক বিকাশ রায়। বাংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এ ছবি একটি অভিনন্দনযোগ্য অবদান।

"মরুতীর্থ হিংলাজ" উত্তপ্ত মরুভূমির ওপর দিয়ে মুক্তিকামী তীর্থংকরদের দুশ্চর তীর্থযাত্রার বিবরণই শুধু নয়। এই তীর্থযাত্রার মধ্যে কাহিনীকার ভাবনেত্রে আবিষ্কার করেছেন আশানিরাশা, সার্থকতা বিড়ম্বনার দ্বন্দ্বে দোলায়িত চিরন্তন মানুষের মিছিল। তাই পথচলার সঙ্গে গড়ে উঠেছে পথের পাঁচালী।

অশেষ দুঃখবরণের ভেতর দিয়ে তারা চলেছে দুর্গম মরুভূমির ওপারে দেবী হিংলাজকে দর্শন করতে। মহাদেবের স্কন্ধ থেকে সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র এসে পড়েছিল নির্জন মরুভূমির এই প্রান্তে। অনাদিকাল থেকে তাই ওখানে গড়ে উঠেছে দেবী হিংলাজের পীঠস্থান। তারই অনতিদূরে রয়েছে চন্দ্রকূপ। চন্দ্রকূপের দেবতা তীর্থযাত্রীদের স্বকৃত পাপের অকপট স্বীকারোক্তি শুনে প্রকাশ করেন তাঁর অস্তিত্ব ভক্তদের কাছে কূপের ফুটন্ত বুদ্বুদের মধ্য দিয়ে। চন্দ্রকূপ দেবতার কৃপা হলে দেবী হিংলাজকে দর্শন করবার অধিকার জন্মায়। তীর্থযাত্রী গোপতলাল ব্যক্ত করেছে তার পাপের কথা এই দেবতার কাছে। বারো বছর ধরে অপেক্ষা করেছিল সে এই লগ্নটির আশায় যখন অতীতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিধবা স্ত্রী'র সঙ্গে তার পাপাচারের কথা চন্দ্রকূপ-দেবতার কাছে স্বীকার করে সে উদ্ধার পাবে। সুন্দরলালের জীবনেও ছিল অপরাধের কালিমা। তাকেও শেষ পর্যন্ত অকপটে স্বীকার করতে হল সব কথা।

তীর্থযাত্রীদের নায়ক অবধূত, পথ-প্রদর্শক ছড়িদার রূপলাল। কেবল পুণ্যার্জনই নয়, আত্মিক জিজ্ঞাসার প্রেরণায় অবধূত বেরিয়ে পড়েছেন এই দুর্গম তীর্থপথে। ভৈরবী চলেছেন তাঁর সঙ্গে। রূপলাল আপনভোলা, ভগবানের নাম-গানে সকলকে উদ্বুদ্ধ করে তোলে সে। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ জয়শংকর গোঁড়া। দলের মধ্যে রয়েছে উটচালক গুল মহম্মদ ও দিল মহম্মদ এবং আরও অনেকে।

বিচিত্র এই তীর্থযাত্রীদের দলের মধ্যে এসে ভিড়ল দুটি আলাদা রকমের মানুষ—থিরুমল ও কুন্তী। জীবন-তীর্থের তীর্থংকর ওরা। তারা চেয়েছিল জীবন, প্রেমে ভরা জীবন। সমাজ-সংসার তারা মানে নি। রাজপুতানার এক বর্ধিষ্ণু ঘরের কুলবধূ কুন্তী। স্বামীর নিরুদ্দেশ-

ভিন্নতর রসের ছবি "মরুতীর্থ হিংলাজ"-এর একটি নাটকীয় মুহূর্তে দুই প্রণয়ীর ভূমিকায় সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও উত্তমকুমার। ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন বিকাশ রায়।

কালে একা থিরুমলের হাত ধরে সে বেরিয়ে পড়েছে পথে। থিরুমল সংসারে একা। তার ছন্নছাড়া জীবনকে রূপে-রসে-রঙে ভরিয়ে দিল কুন্তী। পথে পথে গান গেয়ে ওরা জীবিকা অর্জন করত, কুন্তী নাচত। কিন্তু এমনিভাবে বেশীদিন কাটে না।

সুন্দরী যুবতী কুন্তীকে মানুষের লালসার লুব্ধ দৃষ্টি থেকে বাঁচাবার জন্যে থিরুমলকে পালিয়ে ফিরতে হয় নানা জায়গায়। এমনিভাবে ওরা এসে পড়ে করাচীতে। সেখানেও এক দুরাচারীর হাতে কুন্তী হয় লাঞ্ছিতা তাই উত্তপ্ত মরুভূমিতে পা বাড়ায় ওরা তীর্থযাত্রীদের আশ্রয়ে শান্তিলাভের আশায়।

কিন্তু লোকালয় হতে অনেক দূরে মরুভূমির বুকেও কুন্তী রেহাই পেল না মানুষের লালসার হাত থেকে। থিরুমল মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অসহায় এ দুটি প্রাণীকে তুলে নিয়ে আসেন অবধূত।

এ ঘটনা কুন্তীর মনে গভীর প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে। আত্মগ্লানিতে ভরে ওঠে তার মন। নিজেকে সে শুদ্ধ, পবিত্র করে তুলতে চায় দেবী হিংলাজের শরণ নিয়ে। যে বন্ধনে সে সুখ পেল না তাতে আর সে নিজেকে জড়াতে চায় না। তাই থিরুমলকেও মন থেকে সরিয়ে দিতে চাইল সে। অশান্তির আগুনে জ্বলছিল থিরুমলের মন আগে থেকেই। কুন্তীর প্রত্যাখ্যানে সে অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ল। অবধূত চেষ্টা করেন তার মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে। এমনিভাবে অল্পকাল কাটবার পর একদিন তীর্থযাত্রীরা কুন্তীর শীলতাহানি করেছিল যারা সেই দুর্বৃত্ত দল কর্তৃক আক্রান্ত হয়। দুর্বৃত্তদের মেরে চরম উত্তেজনার পর থিরুমলের মনের প্রকৃতিস্থ ভাব আবার ফিরে আসে। তার জীবনের একমাত্র সম্বল কুন্তীকে সে পেতে চায় সম্পূর্ণভাবে। কুন্তীর মানসিক পরিবর্তন ঘটায় সে বিষ নজরে দেখে তীর্থযাত্রীদের।

মরুভূমির ক্লেশ সহ্য করতে না পেরে জয়শংকর একদিন মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। তাকে পিঠে তুলে নিয়ে চলে থিরুমল। তার পিঠেই সে মারা যায়। মৃত জয়শংকরের কঠিন শীতল দুটি হাত চেপে ধরে থিরুমলের গলা। এই নিদারুণ ঘটনা থিরুমলকে আবার অপ্রকৃতিস্থ করে তোলে। তীর্থযাত্রীরা কুন্তীকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে এই ধারনা তার মনে। কুন্তীকে যাতে ওরা অধিকার করতে না পারে তাই একদিন রাত্রে থিরুমল তার গলা টিপে ধরে। সবাই জেগে উঠলে ছুটে পালায় সে এবং মরুভূমির মধ্যেই সাময়িক নিরুদ্দেশ হয়।

এদিকে সবাই যখন প্রার্থনা জানায় চন্দ্রকূপ দেবতার কাছে, তখন কূপের অপর পারে দেখা দেয় থিরুমল। কুন্তীকে ডাকে, তার কাছে আসবে বলে এগোয় এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে চন্দ্রকূপের ফুটন্ত বুদ্বুদের মধ্যে। আর ওঠে না সে। কুন্তীর মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে; যে দেবতা শুধু দুঃখই দেয় তার কাছে মাথা নত করতে পারে না সে। মরুভূমির তপ্ত বুকে অন্তরের তাপ বয়ে নিয়ে চলার কালে সে যেন শুনতে পায় থিরুমলের আপন করে কাছে ডাকার ডাক। সেই ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে কুন্তীও চিরকালের জন্যে হারিয়ে যায় মরুপ্রান্তরে। অবধূতের মন বলে, জীবনে যারা শান্তি পায়নি, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে হয়তো তাদের মিলন সম্পূর্ণ হবে।

চলচ্চিত্রের পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের বিষয়বস্তু, ভিন্ন ধরণের এর উপাদান ও আঙ্গিক। অথচ মানুষেরই দ্বন্দ্ব, ব্যথা, বঞ্চনা ও আশার সূত্রে গাঁথা দুর্বার নাট্যরসে সিঞ্চিত এ-ছবির আখ্যানবস্তু। এর আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ, বিভিন্ন চরিত্রের যথার্থস্বরূপে এবং বিশেষত কুন্তী ও থিরুমলের প্রণয়োপাখ্যানটির বিন্যাসে পরিচালক বিকাশ রায় যে নিষ্ঠা, পরিমিতি জ্ঞান ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্যে অকৃত্রিম প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য। ছবির শুরু থেকেই অনাস্বাদিত কোন রস উপভোগ করবার বাসনা সহজেই জেগে ওঠে দর্শক-মনে। তাদের অনুভূতি সুগ্রথিত চিত্রনাট্যের নাট্যপ্রবাহধারায় উদ্বেলিত হয়ে গিয়ে পৌঁছয় কাহিনীর আবেগনিবিড় পরিণতিতে।

আখ্যানবস্তুর পটভূমিকা হিসাবে বিশাল মরুভূমির বাস্তবানুগ ও মনোরম দৃশ্যসম্ভার ছবিখানিকে ঐশ্বর্যশালী করেছে। উটের পিঠে ভৈরবী ও হাতে যষ্ঠি নিয়ে ক্লান্ত, অবসন্ন তীর্থযাত্রীদের মরুভূমি

আক্রমণের দৃশ্যগুলি ছবিখানিকে অনবদ্য আঙ্গিক সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছে। অনিল গুপ্তের আলোকচিত্র গ্রহণের কাজও হয়েছে তেমনি চমৎকার যা মরুভূমির শুষ্ক, রুক্ষ্ম পরিবেশকে যথাযথ ফুটিয়ে তোলে।

ছবির অভিনয়-সম্পদও বড় কম নয়। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় অবধূতের চরিত্রে বিকাশ রায়ের মনোগ্রাহী অভিনয়। অবধূত কেবল পুণ্যার্থী নয়, দ্রষ্টাও বটে। দ্রষ্টার নির্লিপ্ততা অদ্ভুতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। তেমনি সুন্দরভাবে মূর্ত করে তুলেছেন তিনি চরিত্রের মানব-দরদের রূপটি। থিরুমলবেশী উত্তমকুমার চরিত্রটির অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব চমৎকার-ভাবে রূপায়িত করেছেন। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় কুন্তীর চরিত্রের প্রণয়াবেগ এবং পরে বঞ্চিত ও দ্বন্দ্বক্লিষ্ট মনের রূপটি হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। পোপতলালের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যালের সুষ্ঠু অভিনয় মনে দাগ কেটে যায়। এ'দের পরেই অভিনয় যাঁরা উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অনিল চ্যাটার্জি ও মণি ঘোষ। রূপলালের চরিত্রটিকে প্রাণোচ্ছল অভিনয়ে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়। আর সংযত অভিনয়ে মূল্যবান করে তুলেছেন জয়শঙ্করের চরিত্রটি মণি ঘোষ। ভৈরবীর ভূমিকায় চন্দ্রাবতীর অভিনয় চরিত্রানুগ। এ বাদে গুল্লে মহম্মদ, দিল মহম্মদ, শুকেলাল, সুন্দরলাল ও গোকুল-চাঁদের চরিত্রগুলিও সুঅভিনীত। ছোট্ট একটি ভূমিকায় প্রতাপ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় ভোলবার নয়।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এর সাঙ্গীতিক আবেদন দর্শকদের অভিভূত করে। হেমন্তকুমারের সুরারোপে ও তাঁর কণ্ঠদানে কয়েকটি গান ও স্তোত্র মন ভরিয়ে দেয়। আবহসঙ্গীতও অপরূপ হয়ে উঠেছে স্থান বিশেষে। লতা মুঙ্গেশ-কারের কণ্ঠদানও ছবির আরেকটি সম্পদ।

ছবির বিভিন্ন পাত্রপাত্রীদের রূপসজ্জা, বিশেষত কুন্তী ও থিরুমলের, অপূর্ব। সামগ্রিক অঙ্গশোভা ও কলাকৌশলের কাজও উঁচুদরের। সব কিছুর মধ্যেই পরিচালকের শিল্পীমনের পরিচয় পাওয়া যায়।

উপভোগ্য কমেডি

চিত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে হৃষীকেশ মুখার্জি যে মোটেই আনাড়ী নন তার প্রমাণ পূর্বেই পাওয়া গিয়েছিল। আবার নতুন করে তা পাওয়া গেল এল বি ফিল্মস-এর হিন্দী ছবি "আনাড়ী"তে। নিতান্ত মামুলী একটি গল্প পরিচালনার সৌকর্যে কত হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠতে পারে তারই নিদর্শন আলোচ্য ছবিখানি।

কাহিনীর নায়ক রাজ। সবাই তাকে বলে আনাড়ী। জীবনযুদ্ধে সে হুঁসিয়ার সৈনিক নয়। ছলা-কলাও তার ধাতে সয় না। বিবেকের অনুশাসন যখন বাধা দেয়, তখন যে কোন বৈষয়িক সৌভাগ্যকে সে ছুঁড়ে ফেলে দিতে রাজী। সরলপ্রাণ এই যুবকটিকে ছেলের মত স্নেহ করে বৃদ্ধা ও বিধবা মিসেস ডি'সা। মিসেস ডি'সার বাড়িতে রাজ ভাড়াটে। দিনে দিনে হয়ে উঠল সে মিসেস ডি'সার নয়নমণি। বৃদ্ধা তাকে স্থান দিল তার মৃত পুত্রের জায়গায়। খৃষ্টান মিসেস ডি'সা তার হিন্দু পুত্রকেই মৃত্যুর পূর্বে উইল করে দিয়ে গেল তার সব সম্পত্তি।
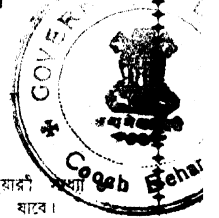
সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার" চিত্রে অপুর শিশুপুত্র কাজলকে রূপায়িত করছে এই নবাবিষ্কৃত শিশুশিল্পী অলোক চক্রবর্তী

ছবির অপর উপাখ্যান গড়ে উঠেছে রাজ ও আরতি'কে কেন্দ্র করে। ধনীর দুলালী আরতির সংগে রাজের হঠাৎ পরিচয় দিনে দিনে রূপ নিল নিবিড় প্রেমের সম্পর্কে। আরতিরই খুল্লতাতের অফিসে চাকরী পায় রাজ। রাজের গুণের পরিচয় পেয়েই আরতির কাকা তাকে চাকরী দেয়। কিন্তু আরতির কাকা যেদিন জানতে পারল যে তার আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রী মন-প্রাণ সমর্পণ করেছে তারই অফিসের এক কর্মচারীর কাছে, তখন তাঁর অর্থ-কৌলিন্যের দম্ভ মেনে নিতে পারল না উভয়ের সহজ স্বাভাবিক মিলন।

এদিকে আরতির কাকা তার ব্যবসার এক মুনাফাখোর অংশীদারের পাল্লায় পড়ে বাজারে ছেড়ে দিল বিষ মেশানো ভেজাল ওষুধ। সেই ওষুধ খেয়ে মারা যায় মিসেস ডি'সা। রাজ জানতে পারে সে কথা এবং শাসিয়ে যায় আরতির কাকা'কে পুলিসকে সব কথা জানাবে বলে। আরতির কাকার সাথী সেই কুচক্রী ব্যবসায়ী রাতারাতি বাজার থেকে সব ভেজাল ঔষধ সরিয়ে ফেলে আদালতে রাজকেই মিসেস ডি'সার হত্যাকারী বলে প্রতিপন্ন করে। সম্পত্তির লোভে সে বিষ দিয়েছে মিসেস ডি'সাকে এবং সে বিষ রাজ তার কোম্পানীর মার্কামারা শিশিতে ভরে দিয়েছে আইনের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে। রাজের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্রই জানতে পারে আরতি এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে সে গৃহত্যাগ করে। রায় বেরুবার দিন আরতি গিয়ে তার কাকার বিবেকবুদ্ধিকে আঘাত করে তীব্রভাবে। ফলে অপরাধীর সুপ্ত মনুষ্যত্ব জেগে ওঠে। আদালতে দাঁড়িয়ে অকপটে সে স্বীকার করে স্বীয় অপরাধের কথা। রাজ মুক্তি পায়। আরতি জীবন-সঙ্গিনীরূপে এসে দাঁড়ায় তার পাশে।

কাহিনীর প্রথম দিকটা 'কমেডি'র রসে সিঞ্চিত। রাজের কাছে আরতির ছদ্ম পরিচয় গ্রহণ করা থেকে আরম্ভ করে তার আসল পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়া পর্যন্ত ছবিখানি আমোদের প্রমোদের মধ্য দিয়ে বেশ তর তর করে এগিয়ে চলে। মিসেস ডি'সা ও রাজের সহজ সুন্দর সম্পর্কটিও মনে দাগ কাটে। কিন্তু পরে যখন কাহিনীতে অপরাধ-নাট্যের উপাদান এসে উঁকি মারে, তখন ছবিটি তার স্বাভাবিক আবেদন কিছুটা হারিয়ে ফেলে। এ বাদে হিন্দী ছবির বহু ব্যবহৃত উপাদানের সাক্ষাৎও মেলে একাধিক দৃশ্যে।

তবে সুখের কথা এই যে, পরিচালক হৃষীকেশ মুখার্জি কাহিনীর বিন্যাসে আগাগোড়া রুচির পরিচয় দিয়ে গেছেন। বিভিন্ন ঘটনার উপস্থাপনে এবং দৃশ্য-গ্রহণেও তিনি পরিচালক এবং সম্পাদক হিসাবে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মিসেস ডি'সা ও নায়ক রাজের চরিত্র দুটিকে মর্মস্পর্শী করে উপস্থাপিত করার ব্যাপারে তাঁর অনবদ্য কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। এক কথায়, পরিচালনার গুণে ছবিখানি সাধারণ আমুদে হিন্দী ছবির তুলনায় অনেক উঁচুস্তরের।

রাজের ভূমিকায় রাজকাপুরের মনোজ্ঞ অভিনয় ছবির এক বিশিষ্ট আকর্ষণ। সত্যিকারের একটি আনাড়ীর চরিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন ছবিতে। মিসেস ডি'সার সামনে রাজকাপুরের হৃদয়াবেগের কতকগুলি অভিব্যক্তি অপূর্ব। এ বাদে অনবদ্য অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন ললিতা পাওয়ার মিসেস ডি'সা রূপে। রাজের সংগে তার মান-অভিমানের প্রকাশভঙ্গী অতি চমৎকার। বাইরের কঠোরতার আড়ালে স্নেহকাতর, দরদী মনের রূপটিও তিনি খুব প্রশংসনীয়ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নায়িকার চরিত্র রূপায়ণে নূতন তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর বিরহ-বেদনার প্রকাশ মনে দাগ কাটে। কুচক্রীর এক ছোট ভূমিকায় নানা পলসিকর বেশ ছাপ রেখে যান। মতিলালের অভিনয়ও চরিত্রানুগ।

পূর্ব রেলওয়ে শিশু ও কিশোর সম্মেলনের শেষদিনে যোগদানকারী শিল্পীর দল। পিছনের সারিতে আকাশবাণীর ইন্দিরা দেবী ও সম্মেলনের সম্পাদক বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে।

নায়িকার সঙ্গিনী হিসাবে শুভা খোটে প্রশংসার দাবী রাখেন। অন্যান্য যাঁরা বিশেষভাবে নজরে পড়েন তাঁদের মধ্যে আছেন অসীমকুমার, মুকরি, পক্ষ মহেন্দ্র এবং নৃত্যে হেলেন।

সঙ্গীত পরিচালনায় শঙ্কর-জয়কিষণ কয়েকটি উপভোগ্য গানের জন্যে প্রশংসা পাবেন। কলাকৌশলের দিক দিয়ে ছবিখানি বেশ ঝকঝকে; আলোক চিত্রের কাজও উচ্চস্তরের।

ছবির কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন ইন্দ্ররাজ আনন্দ; আলোক চিত্রগ্রহণে আছেন জয়ন্ত আর পাথারে, শব্দগ্রহণে আলাউদ্দিন এবং শিল্পনির্দেশে এম আর আচরেকর।

রায়ের 'মরুতীর্থ হিংলাজ', মৃণাল সেনের 'নীল আকাশের নীচে', দেবকী বসুর 'সাগর সঙ্গমে', [illegible] গাঙ্গুলীর 'দেড়শো খোকার কাণ্ড'—শেষোক্ত তালিকার মধ্যে পড়ে।

যে ছবিই সরকারী মনোনয়ন লাভ করুক, মৌলিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাঙালীর প্রতিভা নিজেকে কত বিচিত্রভাবে প্রকাশ করছে এই সব ছবিতে তারই নিদর্শন রয়েছে। যে কোন শিল্পের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। আশার কথা তো বটেই।

• • •

গত সপ্তাহে দুখানি নতুন বাংলা ছবির মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উদয় ফিল্ম কর্পোরেশন "নীলাচলে মহাপ্রভু" তুলে চিত্রামোদীদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিলেন, তাঁদের দ্বিতীয় ছবি "আন্দামান"-এর শুভ মহরৎ গত সোমবার

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ বিকাশ রায় প্রোডাকসন্সের 'মরুতীর্থ হিংলাজ'। চার সপ্তাহ বাদে একখানি নতুন বাংলা ছবির মুক্তি, শুধু এই কারণেই ছবিটি উল্লেখযোগ্য নয়। বাংলা সাহিত্যের একটি যুগান্তকারী রচনা থেকে এর আখ্যানভাগ নেওয়া হয়েছে। এর বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, চন্দ্রাবতী, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি সুখ্যাত শিল্পীরা। এর পশ্চাদপটের অভিনবত্ব ও আয়োজনের বিরাটত্ব একে বহুর মধ্যেও অনন্য করে তুলেছে। ছবিখানির সমালোচনা এই সংখ্যাতেই দেওয়া হল।

ডিলুক্স ফিল্মসের হিন্দী ছবি 'লাজবন্তী' এ সপ্তাহের দ্বিতীয় আকর্ষণ। মোহন সায়গল এর প্রযোজক। ছবিটি পরিচালনা করেছেন নরেন্দ্র সুরী। নার্গিস এর মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর সহশিল্পীদের মধ্যে আছেন বলরাজ সহানী, বেবি নাজ, প্রভুদয়াল, রাধাকিষণ প্রভৃতি। শচীন দেববর্মণ এতে সুরযোজনা করেছেন।

• • •

রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্যে ছবি নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়েছে। গুণের দিক থেকে বাংলার পাল্লা এ বছরে রীতিমত ভারী বলে মনে হচ্ছে। ১৯৫৮ সালে প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে সত্যজিৎ রায়ের 'জলসাঘর' ও 'পরশ পাথর', অগ্রগামীর 'ডাকহরকরা', ঋত্বিক ঘটকের 'অযান্ত্রিক' প্রভৃতি ছবি নিশ্চয়ই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সম্মানের আসন পাবে। এগুলি ছাড়াও গত বছরে সেন্সরের অনুমোদন লাভ করেছে অথচ মুক্তি পায়নি এমন কতকগুলি ছবিরও প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। অগ্রগামীর 'লাল ভুল', বিকাশ
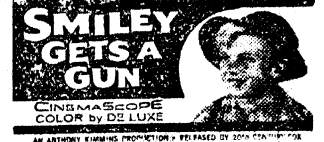
নিখিল ভারত শিশু সংগীত সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে ডি এস সুধ রাও, মায়া চট্টোপাধ্যায় ও জয়ন্তী মুখোপাধ্যায় ভরত-নাট্যম নৃত্যে কৃতিত্ব প্রকাশ করে।
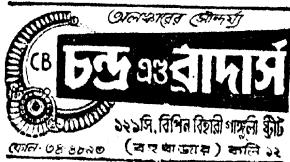
স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটির স্টুডিওতে সম্পন্ন হয়েছে।

হিরন্ময় সেনের পরিচালনায় "নেতাজী সুভাষ" তুলতে ভারতী চিত্রম ব্রতী হয়েছেন। ছবিখানির মহরৎ গত বৃহস্পতিবার ইন্দপুরী স্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

● ● ●

আরো কয়েকটি নতুন ছবির প্রাথমিক কাজ এগিয়ে চলেছে।

তপন সিংহ এবার তাঁর নিজের লেখা কাহিনী অবলম্বনে তুলবেন 'ক্ষণিকের অতিথি'। রুমা গাঙ্গুলী ও অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রধান ভূমিকা দুটিতে নির্বাচিত হয়েছেন। ছবিটি তোলা হবে এস বি ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেডের পতাকা তলে।

স্কীণ প্রোডাকসন্সের তৃতীয় নিবেদন "অন্তরালে"র স্যুটিং শীগ্গিরই সুরু হবে। ছবিটি পরিচালনা করবেন মানু সেন এবং প্রধানাংশে থাকবেন উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন। এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য লিখেছেন জ্যোতির্ময় রায়।

সপ্তরথী ছদ্মনামে আর এক পরিচালক-গোষ্ঠী "তৃষ্ণা এলো চোখে"র চিত্র গ্রহণ সুরু করে দিয়েছেন। কমলা মুখোপাধ্যায়কে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে। অন্যান্য ভূমিকায় অসিতবরণ, কমল মিত্র, শোভা সেন ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত হয়েছেন।

● ● ●

কার্তিক চট্টোপাধ্যায় বোম্বাইতে একটি হিন্দী ছবি তোলবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। ছবির নাম "কাম ঔর দাম"। ভূমিকালিপির পুরোভাগে থাকবেন দেবানন্দ, মালা সিংহ, নিম্মি ও আই এস জোহর। রূপমায়ার পতাকা তলে ছবিটি নির্মিত হবে এবং শঙ্কর ও জয়কিষণ এতে সুরারোপ করবেন।

ফিল্ম উপদেষ্টা কমিটি

ভারত সরকার কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটিগুলি পুনর্গঠিত করেছেন। কাঁচা ফিল্মের ব্যাপারে প্রত্যেক অঞ্চলের বরাদ্দ নির্ধারণ করা এবং তার বণ্টন সম্বন্ধে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার জন্যে এইসব কমিটি গঠিত হয়েছে।

আমদানী ও রপ্তানির প্রধান নিয়ামক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি এবং কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের যুগ্ম নিয়ামক আঞ্চলিক কমিটিগুলির সভাপতি হবেন।

সভাপতি ছাড়াও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন—বোম্বাইয়ের এম বি বিলিমোরিয়া, মেহবুব খাঁ, জে বি রুংতা, কলিকাতার বি এন সরকার, প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং মাদ্রাজের বি নাগি রেড্ডি, এ রামায়া।

কলিকাতার আঞ্চলিক কমিটির সদস্যদের নাম—মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়, সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার, সুশীল মজুমদার, খগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ও এ কে সরকার।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় আঞ্চলিক কমিটিরও সদস্য থাকবেন।

প্রতিভা বসুর পত্র

শ্রীমনোজ ভট্টাচার্য দাবী করেছেন, সিনেমার 'মর্মবাণী' নামের গল্পটি সর্বতোভাবে তাঁর রচনা এবং রচনা কাল ১৯৪৭ সন। তিনি যদি অনুগ্রহ করে জানান, ১৯৪৭ সনে কোন কাগজে তাঁর এই গল্প মুদ্রিত হয়েছিলো, তা হলে বাধিত হই। 'জন্মভূমি' নামক কাগজটি অধুনালুপ্ত হলেও তার অস্তিত্ব যে অনস্বীকার্য, সেটা আশা করি, মনোজ ভট্টাচার্য জানেন। কাগজটির কপি আমার কাছে তো আছেই, অন্য অনেক পাঠকের কাছে থাকাও অসম্ভব নয়। তাছাড়া কাগজ যাঁরা বার করেছিলেন, তাঁরাও আশা করি, কাগজের সঙ্গে সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাননি এবং কর্মকর্তাদের কাছে অবশ্যই তার কপি আছে।

আরো একটি কথা, আমি প্রায় কুড়িখানা বই লিখেছি, শতাধিক গল্প লিখেছি, আমার পক্ষে একজন শ্রীমনোজ ভট্টাচার্য নামক কোনো ব্যক্তির কোনো কল্পিত গল্প লোকমুখে শুনে নিজের গল্প বলে চালানো শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, অসম্মানকরও। এই অসম্মানকর উক্তিও আমি শ্রীমনোজ ভট্টাচার্যকে প্রত্যাহার করতে বলি—বিনীত প্রতিভা বসু।

শিশু ও কিশোর সম্মেলন

শিয়ালদহস্থিত নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটের ছোটদের মহল-এর উদ্যোগে সম্প্রতি পূর্ব রেলওয়ে শিশু ও কিশোর সম্মেলন এক সপ্তাহ ধরে সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সম্মেলনে ছেলে-মেয়েদের তৈরি জিনিস, দেশ-বিদেশের শিশু সাহিত্য এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে ছোটদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করবার সুন্দর আয়োজন করা হয়েছিল। গান, বাজনা, আবৃত্তি ও জীবনচরিতের অভিনয় দেখে শিশু দর্শকদের জানতে হয়েছিল গান ও কবিতাগুলি কার লেখা, বাজনাটা কি এবং কোন সুর বাজান হয়েছে এবং কার জীবনী থেকে নাটকের আখ্যানবস্তু সংগৃহীত।

এছাড়া "পথ চলবে জেনে" পর্যায়ে কলিকাতা পুলিশ কমিশনারের দপ্তর থেকে ঐ সংক্রান্ত সবাক চিত্র এবং "দেশ বিদেশের ছেলেমেয়ে" প্রসঙ্গে জাপানের রঙীন ছায়াচিত্র দেখান হয়। "ছোটদের মনের মত ছায়াছবি" পর্যায়ে "পথের পাঁচালী" প্রদর্শিত হয়।

ছোটদের মুখে পল্লীগীতি, রামপ্রসাদী গান, রবীন্দ্র সংগীত, ছড়া ও তবলা লহরা খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল। তাদের মধ্যে ন' বছরের ছেলে সঞ্জীব চক্রবর্তী ও চার বছরের মেয়ে অনুরাধা মুখোপাধ্যায়ের তবলা সংগত ও সাঁওতালী নৃত্য ভোলবার নয়।

অনুষ্ঠানের সাফল্যের জন্যে সম্মেলনের সম্পাদক ও আনন্দানুষ্ঠানের পরিচালক বিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

বিবিধ সংবাদ

সুখ্যাত শিল্পী-পরিচালক শম্ভু মিত্র সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করে ফিরেছেন। গত রবিবার তিনি একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে ঐ সব দেশের রঙ্গমঞ্চ, নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে তাঁর নিজের যে ধারণা হয়েছে তা বিবৃত করেন। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল থিয়েটার সেন্টারের প্রেক্ষাগৃহে এবং শম্ভুবাবু দু ঘণ্টা ধরে তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। একমাস ষোল দিন তিনি বিদেশে ছিলেন। তার মধ্যে পঁয়ত্রিশটি অভিনয় দেখবার তাঁর সুযোগ হয়েছিল। নাটকের অভিনয়ই তিনি বেশী দেখেছিলেন এবং কিছু কিছু অপেরা, ব্যালে, কমেডি, পুতুল নাচ ও ফিল্ম। সোভিয়েট রাশিয়া বাদে তিনি গেছলেন পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়াতে। 'দেশে'র পাঠকদের কাছে শম্ভুবাবু তাঁর অভিজ্ঞতা শীগগিরই পেশ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

* * * *

এদেশে ফিল্ম নির্মাণের সঙ্গে যে সব কলাকুশলী জড়িত তাঁদের অধিকাংশকেই হাতে-কলমে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে। ভবিষ্যতে যাঁরা কলাকুশলী হবেন তাঁদের শিক্ষার যথোচিত ব্যবস্থা যাতে করা হয় সে বিষয়ে ফিল্ম অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল। এতদিন বাদে ভারত সরকার সেই সুপারিশ অনুযায়ী বোম্বাইতে একটি ফিল্ম ইনস্টিটিউট স্থাপন করবেন বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এখানে ফটোগ্রাফি, শব্দগ্রহণ, পরিচালনা, সম্পাদনা ইত্যাদি ফিল্ম নির্মাণের সকল বিভাগেই শিক্ষা দেওয়া হবে। ফিল্মস ডিভিসনের সহকারী প্রযোজক কে এল খাণ্ডপুর প্রস্তাবিত ফিল্ম ইনস্টিটিউটের পাঠ্য-তালিকা, পরিচালনা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে খসড়া তৈরি করবার ভার পেয়েছেন।

* * *

আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ কলিকাতার অবৈতনিক নাট্য-প্রতিষ্ঠান অনীক্ অস্কার ওয়াইল্ডের 'অ্যান আইডিয়াল হাজব্যান্ড' অবলম্বনে রচিত বাংলা নাটক 'আদর্শ স্বামী' মহারাষ্ট্র নিবাস হলে মঞ্চস্থ করবেন। এর আগে ইবসেন, ইউজিন ওনীল, গলস্‌ওয়ার্দি প্রমুখ বিখ্যাত নাট্যকারদের রচনা বাংলায় মঞ্চস্থ করে অনীক্ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

* * *

ভ্রম সংশোধন

গত ৩১শে জানুয়ারীর "দেশে" ডোভার সংগীত সম্মেলনের বিবরণীতে একটি ভুল খবর ছাপা হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে সুস্মিতা ভট্টাচার্য ভরতনাট্যম নেচেছিলেন, কত্থক নয়।

খেলার মাঠে

একলব্য

অস্ট্রেলিয়ার 'অ্যাসেস' পুনরুদ্ধার

ক্রিকেট মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহাসিক টেস্ট-যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সারা ক্রিকেট-বিশ্বে আলাপ আলোচনা, গুজব গবেষণা এবং উৎসাহ উদ্দীপনার যে ঢেউ উঠেছিল অস্ট্রেলিয়ার 'রাবার' লাভ এবং 'অ্যাসেস' পুনরুদ্ধারের সংগে সংগে স্বাভাবিকভাবেই তা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অবশ্য দুই দেশের এ পর্যায়ের একটি টেস্ট খেলা এখনো বাকী। কিন্তু সে খেলার আর আকর্ষণ নেই। নিয়ম মাফিক খেলার জন্যই সে খেলার প্রয়োজন। আর প্রয়োজন ক্রিকেট ইতিহাসের পাতায় অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট-যুদ্ধের অধ্যায়কে পূর্ণ করবার জন্য সে খেলার সংখ্যাতত্ত্ব এবং ব্যাটিং বোলিংয়ের হিসাব নিকাশ।

ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ক্রিকেট উৎসাহী নানা দেশের মধ্যে টেস্ট খেলার ব্যবস্থা থাকলেও ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার মর্যাদা আলাদা। এ দুটি দেশই হচ্ছে ক্রিকেট তথা টেস্ট ক্রিকেটের পথিকৃৎ। কালের কোন এক অখ্যাত অধ্যায়ে এই দুই দেশের মধ্যে প্রথম টেস্ট খেলার সূত্রপাত হয় পুঁথিপত্র ঘেটে তার হদিস পাওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু সেদিনের টেস্ট খেলার আয়োজন ছিল নিতান্তই তুচ্ছ। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার সাধারণ লোককে সে খেলা যেমন উৎসাহিত করতো না তেমন বিশ্বের আর কোন দেশেরই সে খেলা নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না। সময়ের সংগে সংগে এবং খেলাধূলার জনপ্রিয়তা বাড়বার সংগে সংগে এবং সমারোহ আর মর্যাদার সমন্বয়ে সে খেলা আজ এক বিরাট এবং আকর্ষণীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

ইংলণ্ডই ক্রিকেটের জন্মভূমি। এই খেলার প্রতি ইংলণ্ডবাসীর আছে অকৃত্রিম অনুরাগ। ইংলণ্ড যেখানেই রাজ্য বিস্তার করেছে সেখানেই সাথে করে নিয়ে গেছে ক্রিকেটকে—সেখানকার মাটিতেই পুতেছে উইকেট। অস্ট্রেলিয়াও ক্রিকেট খেলা শেখে ইংলণ্ডের কাছ থেকে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট খেলায় বেশী পটু হয়ে গুরুমারা বিদ্যায় ইংলণ্ডকে পরাজিত করতে আরম্ভ করে।

১৮৬১ সালে ইংলণ্ডের একটি ক্রিকেট টিম সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর করলেও সেই দলের সংগে অস্ট্রেলিয়ার যে খেলা হয় সে খেলা আনুষ্ঠানিকভাবে টেস্ট খেলার স্বীকৃতি পায় না। ১৮৭৬-৭৭ সালে জেমস লিলি হোয়াইটের নেতৃত্বে যে পেশাদার ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফর করে সেই দলের খেলাই ইতিহাস-স্বীকৃত টেস্ট খেলার মর্যাদা পায়। তারপর দুই দেশের মধ্যে কতবার সফর ও পাল্টা সফর হয়েছে, খেলার সময় কত ঘটনা ঘটেছে, কিভাবে 'অ্যাসেস' কথাটির জন্ম হয়েছে, খেলার মধ্যে দুই দেশের ধুরন্ধর ও দিক-পাল খেলোয়াড়দের স্মৃতি জড়িয়ে আছে তার ইতিহাস শুধু দীর্ঘই নয়, বিচিত্রও। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট খেলার ঘটনা ইংলণ্ডের সাহিত্যিক এবং কবিদেরও সাহিত্য ও কাব্যের কম উৎস হয়নি। তাই অ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট খেলাকে কেন্দ্র করে দেশে দেশে এত আলোড়ন। অস্ট্রেলিয়ার এডিলেড মাঠে এ পর্যায়ের চতুর্থ টেস্ট খেলা পর্যন্ত দুই দেশ সর্বশুদ্ধ টেস্ট খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে ১৭৭ বার। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৭৩টি টেস্ট খেলায়, ইংলণ্ড ৬২টিতে। ৪২ বার খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। এ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত চারটি খেলার মধ্যে ব্রিসবেন মাঠের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে বিজয়ী হয়, মেলবোর্ন মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলায় একই ফলাফলে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে অস্ট্রেলিয়া 'রাবার' লাভের পথ সুগম করে রাখে। সিডনী মাঠের তৃতীয় টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। এডিলেড টেস্টে ইংলণ্ডকে ১০ উইকেটে হারিয়ে রাবার পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দীর্ঘ ১৯ বছর ধরে অ্যাসেস অস্ট্রেলিয়ার অধিকার থাকবার পর ১৯৫৩ সালে হাটনের অধিনায়কত্বে ইংলণ্ড নিজের দেশে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে অ্যাসেসের পুনরুদ্ধার করে। তারপর দুই দেশের মধ্যে আরও দুটি টেস্ট পর্যায় শেষ

'সাবাস রিচি'—দু' বছর পরে অস্ট্রেলিয়া দল এ্যাসেস পুনরুদ্ধার করায় এডিলেড ৫.৩.৫ চতুর্থ টেস্ট খেলার শেষে ইংলণ্ডের অধিনায়ক পিটার মে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বিনোড কে অভিনন্দিত করছেন

হয়েছে। এ দুটি পর্যায় অর্থাৎ ১৯৫৫ এবং ১৯৫৬ সালেও ইংলণ্ড পরাজিত করেছে অস্ট্রেলিয়াকে। ৬ বছর পরে অস্ট্রেলিয়া আবার অ্যাসেস পুনরুদ্ধার করল তাদের প্রাধান্যের পর্যাপ্ত প্রমাণ দিয়ে।

* * *

তৃতীয় টেস্টে খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর ইংলণ্ড অধিনায়ক পিটার মের আশা ছিল বাকী দুটি টেস্টে বিজয়ী হয়ে তিনি অ্যাসেস অধিকারে রাখবেন, অস্ট্রেলিয়াকেও বঞ্চিত করবেন রাবার লাভের কৃতিত্ব থেকে। কিন্তু পারেননি। অবশ্য চেষ্টা তিনি যথেষ্টই করেছেন, টসে জয়লাভ করেও হারবার ঝুঁকি নিয়ে প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াকে। সম্মান রক্ষার জন্য জয়লাভ করার চেষ্টা ছাড়া যে খেলায় অন্য কোন পথ নেই সেখানে জেতার জন্য হারার ঝুঁকি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে বলেই ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন। কারণ প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয় হলেই ইংলণ্ডের জয়ের সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু তা হল না। অস্ট্রেলিয়া ভালই খেলল এবং প্রথম ইনিংসে তারা যখন ৪৭৬ রান সংগ্রহ করল তখনই এক রকম হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার রাবার ও অ্যাসেস লাভের প্রশ্নের মীমাংসা। অস্ট্রেলিয়ার ৪৭৬ রানের প্রত্যুত্তরে প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ড দল ২৪০ রানের বেশী সংগ্রহ করতে না পারায় ফলো অন করে তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে হল। দ্বিতীয় ইনিংস ২৭০ রানে শেষ হবার পর জয়লাভের জন্য অস্ট্রেলিয়ার যে ৩৫ রানের প্রয়োজন রইলো কোন উইকেট না হারিয়ে অস্ট্রেলিয়া সেই রান সংগ্রহ করলো ষষ্ঠদিন খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের সওয়া ঘণ্টা আগে।

চতুর্থ টেস্ট সম্বন্ধে কিছু লিখতে হলে প্রথমেই অস্ট্রেলিয়ার দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান কলিন ম্যাকডোনাল্ডের ১৭০ এবং জিম বার্কের ৬৬ রানের কথা উল্লেখ করতে হয়। এরাই গড়ে তোলেন অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের ভিত্তি। চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে একটু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই দল গড়তে হয়। উদীয়মান ফাস্ট বোলার আয়ান মেকিফ অসুস্থ থাকায় এ খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে চতুর্থ টেস্টে ডাক পড়ে আর একজন নতুন ফাস্ট বোলারের। ইনি হচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার ২০ বছর বয়স্ক ফাস্ট বোলার গর্ডন রোরকে। ইনি বাঁ হাতে ব্যাট করেন, কিন্তু তীব্র গতিতে বল করেন ডান হাতে। রোরকের সঙ্গে আরও একজন ফাস্ট বোলারকে দলভুক্ত করা হয় বোলিংয়ের শক্তি বাড়াবার জন্য। ইনি অস্ট্রেলিয়ার

মেরিলীবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবে বহু যত্নে রক্ষিত এ্যাসেস বা ছাই ভর্তি মৃৎপাত্র

কীর্তিমান বোলার রে লিণ্ডওয়াল। বলা বাহুল্য রোরকে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংসে মাত্র ২৩ রানে ৩টি উইকেট দখল করে তার টেস্ট জীবনের শুভ সূচনা করেছেন। অতীতের খ্যাতিমান ফাস্ট বোলার লিণ্ডওয়ালও এই খেলায় তিনটি উইকেট পেয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববন্দিত বোলার ক্লারি গ্রিমেটের বোলিংয়ের টেস্ট রেকর্ড প্রায় ধরে ফেলেছেন। টেস্ট খেলায় গ্রিমেট লাভ করেছেন ২১৬টি উইকেট। এই রেকর্ড স্পর্শ করতে লিণ্ডওয়ালের আর একটি উইকেট বাকী আছে।

আর তিনটি টেস্টের তুলনায় ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা এ টেস্টে অনেক ভাল খেলেছেন সন্দেহ নেই কিন্তু পরাজয় এড়াতে পারেননি। চতুর্থ টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড:--

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস--৪৭৬ (কলিন ম্যাকডোনাল্ড ১৭০, জিম বার্ক ৬৬, নর্মান ও'নীল ৫৬, রিচি বিনোড ৪৬, এলান ডেভিডসন ৪৩, নীল হার্ভে ৪১; ফ্রেডি ট্রুম্যান ৯০ রানে ৪ উইকেট, ব্রায়ান স্ট্যাথাম ৮৩ রানে ৩ উইকেট)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস--২৪০ (কলিন কাউড্রে ৮৪, টম গ্রেভনি ৪১, পিটার মে ৩৭, ব্রায়ান স্ট্যাথাম ৩৬; ডবলিউ ওয়াটসন ২৫; রিচি বিনোড ৯১ রানে ৫ উইকেট, রোরকে ২৩ রানে ৩ উইকেট)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—২৭০ (টম গ্রেভনি ৫৩, পিটার মে ৫৯, পিটার রিচার্ড-সন ৪৩, ডবলিউ ওয়াটসন ৪০, ফ্রাঙ্ক টাইসন ৩৩; রিচি বিনোড ৮২ রানে ৪ উইকেট, এলান ডেভিডসন ১৭ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস (কোন উই-কেট না হারিয়ে) ৩৬ (জিম বার্ক নট আউট ১৬, লেস লেভেল নট আউট ১৫)

* * *

অস্ট্রেলিয়ার অ্যাসেস পুনরুদ্ধার সম্পর্কে অনেক কথাই লেখা হল। শুধু 'অ্যাসেসের'--উৎপত্তির ঘটনাটুকু লেখা হয়নি। এ ঘটনাও কম বিচিত্র নয়। তাই এখানে অ্যাসেসের ইতিবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করছি।

১৮৮২ সাল। ইংলণ্ডের "ওভাল" মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার নবম টেস্ট খেলা। ১৮৭৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে যে ৮টি টেস্ট খেলা হয়েছে তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৪টি খেলায়, ইংলণ্ড দুটিতে, বাকী দুটি খেলায় জয় পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। সুতরাং ইংলণ্ডের বড় আশা নবম খেলায় অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে জয়ের ঘাটতি কিছুটা পূরণ করবে। এ টেস্টে জয়লাভের পথও হল ইংলণ্ডের পক্ষে যুক্তি অনুকূল। "টসে" জিতে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট করে সংগ্রহ করলো মাত্র ৬৩ রান। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হল ১০১

রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ১২২ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারলো না। সুতরাং জয়ের জন্য ইংলণ্ডের প্রয়োজন রইল মাত্র ৮৫ রানের। এখানে বলে রাখা ভাল, এ টেস্ট খেলার সময় 'ওভ্যাল' মাঠের 'পীচের' অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। পীচ ছিল বোলারদের সহায়ক। তাই কোন পক্ষই বেশী রান করতে পারেনি। তবুও যেখানে মাত্র ৮৫ রান করতে পারলে জয়লাভ অনিবার্য, জয়লাভ সম্পর্কে যেখানে রঙীন আশার হাতছানি, সেখানে ৮৫ রান করা ক্রিকেট স্রষ্টা ইংলণ্ডের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য নয় এ ধারণা ইংলণ্ডবাসী মাত্রেরই বদ্ধমূল ছিল। জয়লাভের উদগ্র আশা নিয়ে ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং করলেন। ৫০ রানের মধ্যে ইংলণ্ডের পড়লো দুটি উইকেট। জয়ের জন্য প্রয়োজন আর মাত্র ৩৫ রানের। হাতে ৮টি উইকেট, ৮ জনের ব্যাট থেকেই প্রচুর রান আসতে পারে। আর সময় তো অফুরন্ত। জয়ের আশায় ইংলণ্ডের বুক ফুলে উঠলো। 'ওভ্যাল' মাঠের দর্শকরা হয়ে উঠলেন আনন্দে উৎফুল্ল, খেলোয়াড়-দের—চোখেমুখে ফুটে উঠলো আত্মতৃপ্তির আনন্দ। জয় অনিবার্য জেনে অনেক দর্শক মাঠ ছেড়েও চলে গেলেন। কিন্তু গ্লোরিয়াস আনসার্টেনটি যে ক্রিকেট খেলার প্রধান বৈশিষ্ট্য এ কথা তখন বোধ করি তাদের ভাল করে জানা ছিল না, তাই নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস অলক্ষ্যে তাদের ধিক্কার দিয়েছিল।

৫০ রানের মাথায়ই পড়ে গেল ইংলণ্ডের আর একটি উইকেট। কৃতী ব্যাটসম্যান উলেট প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। ৫৩ রানের মাথায় আর একটি। এবার আউট হলেন সেকালের ধুরন্ধর খেলোয়াড় গ্রেস। থয়েলের বলে ক্যাচ তুললে ব্যানারম্যান ক্যাচ ধরতে কোনই ভুলচুক করলেন না। বাকী রইলো ৬টি উইকেট। ইংলণ্ড-ব্যাটসম্যান-দের তখন অসম্ভব সতর্কতা। অস্ট্রেলিয়ার দুই সর্বনাশা বোলার স্পোফোর্থ আর থয়েলের ভয়ে সবাই চঞ্চল। পঞ্চম উইকেটে লুকাস ও লিটলটন মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। বল মারবার কোন চেষ্টাই নেই। ব্যাট থেকে শিকড় নেমে যেন উইকেটের মধ্যে ঢুকে গেছে। স্পোফোর্থ আর থয়েল বলও করছেন অমিত বিক্রমে, কিন্তু হলে কি হবে। লুকাস-লিটলটনের ব্যাটিংয়ে অনমনীয় দৃঢ়তা। স্পোফোর্থ আর থয়েল দুজনে পর পর ১২টি মেডেন পেলেন। হাতের নৈপুণ্যে কাজ হচ্ছে না দেখে স্পোফোর্থ ও থয়েল তখন মাথার বুদ্ধি খাটালেন। লোফ্‌ফা লোফ্‌ফা বল দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করলেন ব্যাটসম্যানদের। স্পোফোর্থের ফাঁদতে ধরা পড়লেন লিটলটন। মেরে খেলতে চেষ্টা করেই ৬৬ রানের মাথায় তিনি আউট হলেন স্পোফোর্থের বলে। ইংলণ্ডের হাতে তখনো ৫টি উইকেট, জয়ের জন্য বাকী ১৯ রান। আশা ছাড়ার মত এমন কিছু অবস্থা নয়। তবুও লুকাসের সংগে—খেলতে এসে স্টীল আত্মরক্ষার নীতি গ্রহণ করলেন। এদিকে স্পোফোর্থ আর থয়েলও আক্রমণমুখী। স্পোফোর্থের বল দিয়ে তখন যেন আগুন বেরুচ্ছে। সেই আগুনে ইংলণ্ডের ক্রিকেট দম্ভ পুড়ে ছাই হবার উপক্রম। মারাত্মকভাবে বল করে আর ৯ রানের মধ্যে স্পোফোর্থ দখল করলেন ইংলণ্ডের আর তিনটি উইকেট। স্টীল, মারিস ও রিড পর পর আউট হয়ে গেলেন। মাঠে তখন প্রবল উত্তেজনা। ইংলণ্ড সমর্থকদের মুখ পাংশু। একে একে নিভিছে দেউটি। তবে কি ইংলণ্ড জিততে পারবে না এ খেলা—এই প্রশ্নই সবার মুখে মুখে ঘুরতে লাগলো। জয়ের জন্য ইংলণ্ডের আর মাত্র ১০ রানের দরকার, তখনো হাতে দুটি উইকেট। বার্নেস নবম উইকেটে খেলতে মাত্র দুই রান করেই পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। ইংলণ্ডের তখন হারাধনের মত অবস্থা। হারাধনের বাকী ছেলেটি যখন ব্যাট করতে এলো তখন মাঠে প্রবল উত্তেজনা। উত্তেজনার মধ্যে এক দর্শক গ্যালারীর উপর থেকে নীচে পড়ে গেলেন। তাকে আর জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল না। কয়েকজন দর্শক চকোলেট মনে করে ছাতার বাট চুষতে আরম্ভ করলেন। স্কোরার ভুল করে স্কোর বইতে এমন সব কথা লিখতে আরম্ভ করলেন যার অর্থ তার নিজের কাছেই বোধগম্য নয়। ওভাল মাঠে তখন এক চরম অবস্থা। তবুও শেষ খেলোয়াড় পীট যখন স্টাডের সংগে যোগ দিলেন তখন নিদারুণ নৈরাশ্যের মধ্যেও একটুখানি আশা ছিল ইংলণ্ড সমর্থকদের মনে। আটটি মাত্র রান শুধু দুটি বাউণ্ডারী। কিম্বা একটি বাউণ্ডারী আর চারটি রান, কিম্বা এক দুই করে আটটি রান হবে না কি? হবে না কি? ইংলণ্ড কৌতূহলী মনে শুধু এই জিজ্ঞাসা। কিন্তু হবে কি করে? হলে কি আর 'অ্যাসেস' কথাটির সৃষ্টি হত! স্পোফোর্থের অগ্নিবর্ষী বলের মধ্যেই যে লুকিয়ে ছিল পরবর্তী কালের 'অ্যাশেস' বা 'ছাই' সৃষ্টির বীজ-মন্ত্র স্পোফোর্থের মারাত্মক বলের জনাই হোক কিংবা অদৃষ্টের বিধানের ফলেই হোক ৮ রান দূরের কথা ইংলণ্ডের শেষ জুটি ১ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারলো না। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে ৭ রানে সে টেস্ট খেলায় বিজয়ী হলো অস্ট্রেলিয়া। ইংলণ্ডের মাটিতে ক্রিকেটস্রষ্টা ইংলণ্ড প্রথম পরাজয় স্বীকার করলো।

এই পরাজয়ের বেদনা ইংলণ্ডের বুকে কতখানি বেজেছিলো পরের দিন খবরের কাগজের পাতায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল। তখনকার বিখ্যাত পত্রিকা 'স্পোর্টিং টাইমস' শোকসূচক কালো বর্ডারের মধ্যে লিখলো—

"In affectionate remembrance
of
English Cricket
which died at the Oval
on
29th August, 1882
Deeply lamented by a large circle
of sorrowings friends and
acquaintances
R. I. P.
N.B. The body will be cremated
and the Ashes taken to
Australia."

অর্থাৎ—

"১৮৮২ সালের ২৯শে আগস্ট তারিখে
ওভ্যাল মাঠে
উপস্থিত অসংখ্য স্বজন ও বন্ধুকে.
শোক-সাগরে ভাসিয়ে
ইংলণ্ডের যে ক্রিকেট খেলার
মৃত্যু ঘটেছে
তার স্মরণে।

বিঃ দ্রঃ—অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর মৃতের ভস্ম-
রাশি অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়া
হবে।"

অ্যাশেস কথাটি সৃষ্টির এই হল প্রথম ঘটনা। এর পরের বছর আইভো ব্লাজ, পরে যিনি লর্ড ডার্নলে নামে অভিহিত হন তার নেতৃত্বে ইংলণ্ড খেলাতে যায় অস্ট্রেলিয়ায়। প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করলেও পরের দুটি টেস্টে বিজয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করে। তৃতীয় ও শেষ টেস্ট খেলায় শেষ হবার সংগে সংগে একদল অস্ট্রেলিয়ান তরুণী ক্রিকেট মাঠের স্টাম্পগুলি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেন। পাঁচ ইঞ্চি উঁচু একটি মাটির পাত্রে সেই ছাই ভর্তি করে ছাইসুদ্ধ মৃৎপাত্রটি উপহার দেন ইংলণ্ড অধিনায়ক আইভোকে। তারা অনুরোধ করেন পাত্রটি ইংলণ্ডে নিয়ে যাবার জন্য। ভস্মাধারটির গায়ে লিখে দেওয়া হয়:—

"When Ivo goes back with the
Urn the Urn
Studds, Steel, Read and Tylecote,
return, return,
The Welkin will ring loud
The great crowd will feel proud,
Seeing Barlow and Bates with
And the rest coming have with
the Urn the Urn
the Urn."

এর অর্থ—ইংলণ্ডের আর খেলোয়াড়দের সংগে বার্লো, বেটস, স্টাড, স্টীল, রিড ও টেলীকোটকে নিয়ে আইভো যখন দেশে ফিরবেন, তখন তার সংগে এই মৃৎপাত্রটি দেখে ইংলণ্ডের জনতা গর্ব অনুভব করবে।

লর্ড ভার্নলে অস্ট্রেলিয়ার মহিলাদের দেওয়া এই ছাই ভর্তি পাত্রটি দেশে নিয়ে যান—জীবনের স্মৃতি হিসেবে শেষ দিন পর্যন্ত সযত্নে নিজের কাছে রাখেন। লর্ড ভার্নলের মৃত্যুর পর ১৯২৮ সালে এম সি সি অর্থাৎ মেরিলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের হাতে ভস্মাধারটি অর্পণ করা হয়। সেই থেকে মেরিলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবে স্মৃতি এবং দর্শনীয় বস্তু হিসেবে একটি কাচের পাত্রে ভস্মাধারটিকে সযত্নে রাখা হয়েছে। ১৮৮২-৮৩ সাল থেকে দুই দেশের মধ্যে চলছে ছাই নিয়ে টেস্ট খেলার লড়াই। ইংলণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়া যে দলই রাবার পাক বিজয়ী দল কিন্তু সত্যি সত্যি এই ছাই ভরা মৃৎপাত্রটি উপহার পায় না। 'অ্যাশেস' লাভ একটা চলতি সম্মানের কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

* * *

নিখিল ভারত পুলিস স্পোর্টসের সপ্তাহব্যাপী ক্রীড়ানুষ্ঠান কলকাতার খেলাধুলোর ক্ষেত্রকে বেশ কিছুটা সরগরম করে শেষ হয়ে গেছে। এই স্পোর্টস উপলক্ষে ভারতের ১৮টি পুলিস সংস্থার প্রায় ছ'শ পুলিস কর্মী ও অফিসার কলকাতায় এসে বিভিন্ন খেলাধুলোয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের মূল-প্রতিযোগিতা ছাড়া ফুটবল, হকি ভলিবল, জিমন্যাস্টিকস ও কুস্তি ছিল প্রতিদ্বন্দ্বিতার আর কটি বিষয়। অবশ্য ফুটবল, হকি ও ভলিবলের আঞ্চলিক খেলাধুলো বিভিন্ন কেন্দ্রে আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে শেষ পর্যায়ের সেমি ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলা। ফুটবল ও হকি খেলা হয়েছে ক্যালকাটা মাঠে, ভলিবল খেলা ময়দানের ভলিবল ফেডারেশন মাঠে, কুস্তি, জিমন্যাস্টিকস ও অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের আসর বসেছিল ইডেন উদ্যানে। জানুয়ারীর ৩১ তারিখ থেকে আরম্ভ করে ফেব্রুয়ারীর ৩ তারিখ পর্যন্ত অ্যাথলেটিক স্পোর্টস ছাড়া আর সব খেলাধুলোই শেষ হয়ে যায়। ফেব্রুয়ারীর ৪ তারিখে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ইডেন উদ্যানে অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের উদ্বোধন করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু সাফল্যমণ্ডিত খেলোয়াড় ও অ্যাথলিটদের পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিলিয়ে নিখিল ভারত পুলিস স্পোর্টসের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বলা বাহুল্য সামরিক নিয়ম শৃঙ্খলা এবং অলিম্পিক প্রথামত পুলিস স্পোর্টস পরিচালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের উদ্যোক্তা সমিতি এই ক্রীড়ানুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি করেননি। অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের উদ্বোধন এবং সমাপ্তির দিনে সামরিক বাদ্য সম্ভারের তালে তালে অ্যাথলিট ও খেলোয়াড়দের মার্চপাস্ট এবং মার্চপাস্টে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের অভিবাদন গ্রহণের দৃশ্য খুবই হৃদয়গ্রাহী হয়। অ্যাথলেটিক স্পোর্টস দেখবার জন্য ইডেন উদ্যানে দর্শক সমাগমও হয় যথেষ্ট। হকি ফুটবল ভলিবল জিমন্যাস্টিকস ও কুস্তি দেখবার জন্যও বিপুল দর্শকের সমাবেশ হয়েছে প্রতিদিন। ভারতের পুলিস-প্রধান ডিরেক্টর অব ইণ্টেলিজেন্স ব্যুরো শ্রী মল্লিক থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিস বিভাগের গণ্যমান্যরা এই খেলাধুলোর জন্য কলকাতায় এসে সমবেত হয়েছিলেন। এসেছিলেন পাঞ্জাবের ইনস্পেক্টর জেনারেল, ইণ্টেলিজেন্স ব্যুরোর জয়েণ্ট
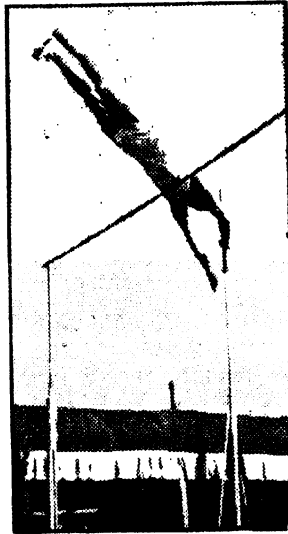
পোল ভল্টে নতুন পুলিস রেকর্ড করছেন পাঞ্জাবের লাখবীর সিং

ডিরেক্টর সর্দার বলবীর সিং, মাউণ্ট আবুর সেণ্ট্রাল পুলিস ট্রেনিং কলেজের কম্যাণ্ডাণ্ট শ্রী জি কে হাণ্ডু,—সোভিয়েট রাশিয়ার বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী মিঃ বুলগানিন এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মিঃ ক্রুশ্চেভের ভারত সফরের সময় সিকিউরিটি অফিসার হিসাবে যে পক্ককেশ ভদ্রলোককে সব সময় ছায়ার মত তাদের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যেত। এসেছিলেন বিভিন্ন রাজ্যের আরও অনেক পুলিসপ্রধান। এ ছাড়া কলকাতার আই পি, জি পি'রা তো ছিলেনই। সবচেয়ে কর্মতৎপর ছিলেন উদ্যোক্তা কমিটির সেক্রেটারী পশ্চিম বাঙলার ট্রাফিকের ডি আই জি এবং কলকাতার এ্যাডিসনাল পুলিস কমিশনার শ্রী পি কে সেন।

খেলাধুলোর মধ্যে ফুটবল খেলার প্রধান আকর্ষণ ছিল অন্ধ্র পুলিস, ভারতের ফুটবল ক্ষেত্রে হায়দরাবাদ পুলিস নামে যাদের খ্যাতি তাদের খেলা, হকিতে পাঞ্জাবের, ভলিবলে দিল্লীর। পাঞ্জাব পুলিসের হকি টীম ভারতের কয়েকজন অলিম্পিক খেলোয়াড় এবং পাঞ্জাব রাজ্যের নিপুণ খেলোয়াড়ে সমৃদ্ধ। দিল্লীর ভলিবল টীমও ভারতের কয়েকজন খ্যাতনামা ভলিবল খেলোয়াড়ে পুষ্ট ছিল। বলা বাহুল্য ফুটবলে অন্ধ্র, হকিতে পাঞ্জাব এবং ভলিবলে দিল্লী বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। জিমন্যাস্টিকের দলগত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে মাদ্রাজ, ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দিল্লী পুলিসের রাম দত্ত। কুস্তির আটটি বিষয়ে বিজয়ীর সম্মান ভাগযোগ করে নিয়েছেন দিল্লী, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবের মল্লবীরেরা।

এ্যাথলেটিক স্পোর্টসই ছিল নিখিল ভারত পুলিস স্পোর্টসের প্রধান আকর্ষণ। পাঞ্জাব পুলিসের ভারতীয় রেকর্ডধারী কয়েকজন খ্যাতনামা এ্যাথলিট এ অনুষ্ঠানে তাদের রেকর্ডকে ম্লান করে দেবেন বলে আশা করা গিয়েছিল। অবশ্য নয়টি বিষয়ে নতুন পুলিস রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এক অজিত সিংয়ের উঁচু লাফের রেকর্ড ছাড়া আর কোন বিষয়ে নতুন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অমৃতসহরের দীর্ঘদেহী সাব ইনস্পেক্টর অজিত সিং উঁচু লাফে ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও সবচেয়ে বেশী পয়েণ্ট পেয়ে এ্যাথলেটিকসের ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছে পাঞ্জাব দল অনেক বেশী পয়েণ্ট সংগ্রহ করে। নীচে বিভিন্ন রাজ্যের অর্জিত পয়েণ্টের হিসাব দেওয়া হলঃ—

	এ্যাথঃ স্পোর্টস	অন্য খেলা	মোট পঃ
পাঞ্জাব	৩১০	৩৬	৩৪৬
উত্তর প্রদেশ	৮৯	৪৮	১৩৭
মাদ্রাজ	৬৭	৩৮	১০৫
কেরালা	৭৫	১৬	৯১
বিহার	২৩	৪৮	৮১
দিল্লী	৮	৭২	৮০
নিমাচ	৭৮	×	৭৮
অন্ধ্র	১১	৪০	৫১
পশ্চিমবঙ্গ	১	৪৮	৪৯
বোম্বাই	২৮	×	২৮
মহীশূর	২৮	×	২৮
রাজস্থান	২৬	×	২৬
মধ্যপ্রদেশ	১১	×	১১
উড়িষ্যা	৬	×	৬
হিমাচল প্রদেশ	১	×	১

মাউণ্ট আবুর পুলিস ট্রেনিং কলেজ, মণিপুর এবং ত্রিপুরা কোন পয়েণ্ট পায়নি। নিমাচ একটি জায়গার নাম, এটা পুলিসের সেণ্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্সের কর্মকেন্দ্র।

দেশী সংবাদ

২রা ফেব্রুয়ারী—আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী সোমবার লোকসভার তের সপ্তাহব্যাপী বাজেট অধিবেশন আরম্ভ হইবে। কয়েকটি বিতর্কমূলক বিষয় এই অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়বস্তু নির্ধারিত থাকায় অধিবেশনটি বেশ জমিবে বলিয়া মনে হয়।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার অতি সম্প্রতি এক নির্দেশবলে এই প্রদেশের বিদ্যালয়সমূহের চতুর্থ শ্রেণীর লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীদের এই বৎসর হইতে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় শিক্ষার্থী, শিক্ষাদাতা এবং অভিভাবক সকলকেই এক অপ্রত্যাশিত জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে।

৩রা ফেব্রুয়ারী—পুরাতন অনেক তিক্ত স্মৃতি পিছনে ফেলিয়া বাঙ্গালী উদ্বাস্তুর প্রথম দলটি অদ্য রাত্রে নাগপুর প্যাসেঞ্জারযোগে রায়পুরের পথে দণ্ডকারণ্য অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১লা জানুয়ারী ১৯৫৯ হইতে জেলা বোর্ডগুলির স্বাস্থ্য বিভাগের ভার সরাসরি গ্রহণ করায় সরকারী 'লালফিতা'র টালবাহানায় এই রাজ্যের ১৪টি জেলা বোর্ডের প্রায় ১২ শত কর্মচারী গত মাসের বেতন না পাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট হাসপাতালের ঔষধপত্র চুরি ও বিক্রয়ের অভিযোগে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে মামলা চলিতেছিল অদ্য সেই মামলার রায় দিয়াছেন। এই মামলায় হলওয়েল লেনের বরদাকান্ত দাস প্রমুখ ৬ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট ২ জনকে মুক্তি দিয়াছেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধিবেশনে খোলা বাজার হইতে চাউল উধাওয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের এক মন্তব্যকে কেন্দ্র করিয়া অকস্মাৎ সভাকক্ষে উত্তেজনার ঝড় উঠে। ক্ষুব্ধ বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন আসন হইতে শ্রী সেনকে লক্ষ্য করিয়া নানা ক্রুদ্ধ ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্যাদি বর্ষিত হইতে থাকে।

জোতের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ ও পল্লী সমবায়ের ভিত্তিতে ভূমি সংস্কারের যে সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে, প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য তাহা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী—নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা উচ্চমূল্যে যে সব সমাধু চাউল ব্যবসায়ী ক্রেতাদের নিকট চাউল বিক্রয় করে অথবা নির্ধারিত মূল্যে চাউল বিক্রয় করিতে অস্বীকার করে তাহাদিগকে নিরাপত্তা আইনে বন্দী করার জন্য অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে বিরোধী দলের জনৈক সদস্য দৃঢ়ভাবে দাবী জানান।

কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীআলুরী সত্যনারায়ণ রাজু অদ্য হায়দরাবাদে বলেন, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে শক্তিশালী কায়েমী স্বার্থবাদী দল সর্বাধিক জোত এবং সমবায়মূলক চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তনে বাধা সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ১৯৫৯ সাল শেষ হইবার পূর্বেই ভূমি সংস্কার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের কাজ আরম্ভ হইবে।

৬ই ফেব্রুয়ারী—হাসপাতালের ধর্মঘট প্রসঙ্গে অদ্য পরিস্থিতি কিছুটা নূতন দিকে মোড় ঘুরিবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্মী বিরোধ সম্পর্কে আপোস মীমাংসার আলোচনা সফল না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তর ঐ বিরোধের ব্যাপারটি বিচারার্থ চতুর্থ শিল্প ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করেন।

৭ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের সতেরটি হাসপাতালের আনুমানিক ষোল হাজার কর্মীর আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে যে ধর্মঘট করার কথা ছিল, তাহা স্থগিত রাখা হইয়াছে।

অদ্য রাজ্য বিধান সভায় রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে দ্বিতীয় দিনের বিতর্ককালে সরকার সমর্থক কংগ্রেস ও বিরোধী পক্ষের কয়েকজন সদস্য পশ্চিমবঙ্গে তীব্র বেকার সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই রাজ্যের অধিবাসিগণকে অগ্রাধিকার দিবার দাবী উত্থাপন করেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী—অল্পকালের মধ্যে চন্দননগর শহরে বিভিন্ন নামে কয়েকটি ঘি তৈরীর কারখানা হঠাৎ গজাইয়া উঠিয়াছে। কি উপায়ে এই "বিশুদ্ধ গব্যঘৃত" তৈরী হয় তাহাও জানা গিয়াছে। কিছু পরিমাণ মাখন এবং তাহার দ্বিগুণ পরিমাণ ডালডা ও লটকান ফলের মিশ্রণে অভিনব পন্থায় আগুনে ফুটাইয়া এইভাবে ঘি তৈয়ারী প্রতি রাত্রে চলিতেছে। প্রকাশ, পৌর স্বাস্থ্য অফিসারের টালবাহানার ফলে ভেজাল ঘি প্রস্তুত ও বিক্রয়ের ব্যবসা বন্ধ করার কার্যে বিলম্ব হইতেছে।

বিদেশী সংবাদ

২রা ফেব্রুয়ারী—ইণ্ডিয়ানার মরুই রোজ কিরবি নামক ১৭ বৎসরের এক বালিকা ৭১ ফুট উঁচু একটি দণ্ডের মাথায় একটি কাঠের বাক্সের উপর এক নাগাড়ে ২৬৯ দিন যাবত বসিয়া আছে। ১২ই ফেব্রুয়ারী সে নীচে নামিবে বলিয়া জানাইয়াছে।

৩রা ফেব্রুয়ারী—অদ্য রাত্রে ওয়াশিংটনে এই মর্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীডালেস জার্মান সমস্যা সম্পর্কে একটি পাল্টা প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন। সোভিয়েট রাশিয়া ইতোপূর্বেই জার্মান সমস্যা সমাধানের জন্য একটি প্রস্তাব করিয়াছেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—গতকল্য মধ্য রাত্রের কিছু পূর্বে চার ইঞ্জিনযুক্ত একটি বিরাট মার্কিন যাত্রীবাহী বিমান লা গার্ডিয়া বিমান বন্দরের রানওয়ে অতিক্রম করিয়া ইস্ট নদীতে নিমজ্জিত হয়। বিমানটিতে মোট ৭২ জন আরোহী ছিলেন। আরোহীদের মধ্যে ৬৭ জন যাত্রী এবং ৫ জন বৈমানিক ছিলেন। এয়ার লাইনের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, বিমান দুর্ঘটনায় ৬৫ ব্যক্তি হয় নিহত বা নিখোঁজ হইয়াছেন।

৫ই ফেব্রুয়ারী—আজ লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাকমিলান আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী বিমানযোগে সাত হইতে দশ দিনের জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন পরিদর্শনে যাত্রা করিবেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসেলুইন লয়েড তাঁহার সঙ্গে যাইবেন।

গতকল্য বাগদাদে গণ-আদালত ভূতপূর্ব ইরাক সরকারের আরও তিনজন নেতার প্রতি মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদান করিলে আদালতে সমবেত নরনারিগণ হাততালি দিয়া ও উল্লাস ধ্বনি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে।

৬ই ফেব্রুয়ারী—পাকিস্তান রেডিওর ঢাকা কেন্দ্র হইতে ভারত বিরোধী প্রচারকার্য চালাইবার জন্য প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে 'ইস্রাফিল' নামে বাংলা অনুষ্ঠানে যে ভারত বিরোধী প্রচারকার্য করা হইত তাহা অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গত বৎসর নবেম্বর হইতে ঢাকা বেতার কেন্দ্রে এই অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হইয়াছিল।

লণ্ডনের এক খবরে প্রকাশ, গত কতিপয় বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর আবর্তন মন্থর হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু বৃটেনে এক আণবিক ঘড়ির সাহায্যে দেখা গিয়াছে ঐ গতি আবার দ্রুততর হইতেছে।

৭ই ফেব্রুয়ারী—ওয়াকিব মহলে জানা গিয়াছে যে, শ্রীম্যাকমিলানের মস্কো হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের একটি শীর্ষ সম্মেলন এবং আদেনাওয়ার, দ্য গল ও আইসেনহাওয়ারের সহিত শ্রীম্যাকমিলানের আলোচনার যে ব্যবস্থা হইতেছে, তাহা ছাড়াও বসন্তকালে রাশিয়াকে লইয়া শীর্ষ পর্যায়ের একটি সম্মেলন আহ্বানের ব্যাপারে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ও শ্রী ডালেস একমত হইয়াছেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী—'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, সমগ্র বিশ্বের শক্তিশালী রেডিও রিসিভার ও রাডার যন্ত্র সমাবেশ করিয়া পশ্চিম শক্তিবর্গ এখন সোভিয়েটের যে কোন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে প্রচারিত বেতারবার্তা শ্রবণ করিতেছেন।

পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট সম্প্রতি ভূমি সংস্কার সম্পর্কে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, উহা কার্যে পরিণত করিবার জন্য অদ্য রাত্রে এক নূতন সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। এই আইন অনুযায়ী কেহই ৫০০ একরের বেশী সেচ ব্যবস্থাযুক্ত জমি এবং এক হাজার একরের বেশী সেচ ব্যবস্থাহীন জমি এবং ইহার অতিরিক্ত একশত একরের বেশী বাগান অধিকার করিতে পারিবে না।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যাঁরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন তাঁরা সবসময় লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করেন।

L. 273-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই কর্তৃক প্রস্তুত

REG. NO. C. 2109

দেশ

২৬ বর্ষ] শনিবার ৯ ফাল্গুন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 21st February, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা

সূচীপত্র

অ্যাসোসিয়েটেড-এর
গ্রন্থতিথি

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

যদি আপনি
পেপ্‌স্
গলার ও বুকের বড়ি গ্রহণ করেন

পেপ্‌স্ মুখে রেখে দিন—বুঝতে পারবেন এর আরোগ্যকারী ভাপ্‌ গলার ক্ষত, ব্রণকাইটিস্, কাশী ও সর্দির জন্য বাধা বা তার জীবাণু ধ্বংস করছে। পেপ্‌স্ দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে আরাম পাওয়া যায় ও সত্বর নিরাময় হয়।

কোন প্রকার
বিপজ্জনক ড্রাগ নেই
শিশুদেরও নির্বিঘ্নে
দেওয়া চলে
সত্বর নিরাময় করে
ব্রণকাইটিস্, গলার ক্ষত, সর্দি, কাশি ইত্যাদি
সব ঔষধ বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়

সি. ই. ফুলফর্ড (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

FPY-55-BEN

পরিবেশক—মেসার্স কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
৩২বি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

অতি সুস্বাদু এই

বাটারস্কচ্ পুডিং

পরখ করুন

⅓ কাপ কারো সিরাপ, ⅛ চা চামচ লবণ, ৫ টেবল চামচ ব্রাউন এণ্ড পলসন পেটেণ্ট কর্ণফ্লাওয়ার, ২⅓ কাপ দুধ, ৬ ফোঁটা ভ্যানিলা নির্যাস, ½ চা চামচ রেক্স সালাড তেল।

দুধ ও সিরাপ গরম করুন। সামান্য ঠাণ্ডা দুধে মেশান রেক্স সালাড তেল, নুন ও ব্রাউন এণ্ড পলসন পেটেণ্ট কর্ণফ্লাওয়ার এতে যোগ করুন। বড় প্যানে রান্না করুন ১০ মিনিট ধরে—যতক্ষণ পর্যন্ত না জমে—সর্বদা নাড়তে থাকুন। ভ্যানিলা মেশান, ছাঁচে ঢালুন, ঠাণ্ডা করার পর চেরী ও মিষ্টি ক্রীমের সহিত পরিবেশন করুন।

ইংরাজী, হিন্দী ও তামিল ভাষায় চমৎকার নতুন পাক প্রণালীর পুস্তিকার জন্য নীচের কুপন ভর্তি করে পাঠান। (যে ভাষার প্রয়োজন নেই তা কেটে বাদ দিন)

এই সঙ্গে ১৫ নঃ পঃ ডাকটিকিট পাঠালাম
মিঃ / মিসেস / মিস্.................
....
ঠিকানা.............................
....
ডিপার্টমেণ্ট DSH—11
কর্ণ প্রোডাক্টস কোং
(ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড,
পোষ্ট বক্স নং ৯৯৪, বোম্বে ১

ব্রাউন ও পলসন্ কর্ণফ্লাওয়ার পেটেণ্ট করা। বিশুদ্ধতার এই পরীক্ষা করুন:—

একগ্লাস সিদ্ধ করা ঠাণ্ডা জলে দুই চা চামচ ব্রাউন ও পলসন পেটেণ্ট কর্ণফ্লাওয়ার নেড়ে নিন। এমনকি ২৪ ঘণ্টা বাদেও গন্ধবিহীন, ময়লাবিহীন ও ক্ষতিকর জীবাণু-বিহীন থাকবে। অত্যন্ত উন্নত গুণসম্পন্ন বি এণ্ড পি সামগ্রী:— রেইসলী কাষ্টার্ড পাউডার, (গন্ধযুক্ত) কর্ণফ্লাওয়ার।

কর্ণ প্রোডাক্টস কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ

ভারতের এজেন্ট:—প্যারী এণ্ড কোং লিমিটেড

সূচীপত্র

আপনার ক্যাপস্টান হাজির !

DESH 40 Naye Paisa.
Saturday, 21st February, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৭ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৯ ফাল্গুন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

আমাদের উৎসব

কিছুদিন আগে শ্রীপঞ্চমী উৎসব গেল। এই উৎসবটিকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদের উৎসব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতে পারে।

বাংলা দেশে সার্বজনীন সামাজিক উৎসব বলিতে প্রধানত দুর্গোৎসব কালীপুজো, শ্রীপঞ্চমী ও দোলকে বুঝায় ঐ সঙ্গে রবীন্দ্র জন্মোৎসব ও নেতাজী জন্মোৎসবকেও ধরা উচিত। এসব ছাড়া অন্যান্য উৎসব আছে, অন্যসব মহাপুরুষদের স্মরণোৎসব আছে সত্য, কিন্তু পূর্বোক্তগুলির বিশেষ ব্যাপকতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। এগুলিকে বাঙালীর প্রধান জাতীয় উৎসব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। উৎসবের মধ্যে সমাজের চিত্র যেমন ফুটিয়া ওঠে, এমন বোধ করি আর কিছুতে নয়। বাঙালীসমাজে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে এখন পালা-বদল চলিতেছে। এই পালা-বদলের চিহ্ন বহন করিতেছে পুজো অনুষ্ঠানে পালাবদল। পারিবারিক পুজোর সংখ্যা দ্রুত কমিতেছে, সার্বজনীন পুজোর সংখ্যা দ্রুত বাড়িতেছে। আগেকার দিনে গ্রামে একখানি সার্বজনীন পুজো যদি হইত, পাঁচখানি হইত পারিবারিক পুজো। অনেক গ্রামে পারিবারিক পুজোর সংখ্যা এত অধিক ছিল যে, সার্বজনীন পুজোর প্রয়োজন অনুভূত হইত না। এখন ঠিক তাহার বিপরীত হইতে চলিয়াছে। পুজোর বিপুল ব্যয় বহন করিবার শক্তি অধিক লোকের নাই—কাজেই সার্বজনীন পুজো ছাড়া আর গত্যন্তর কি। তারপরে পূর্ববঙ্গে যাঁহাদের গৃহে পুজো হইত, বর্তমানে উদ্বাস্তু বলিয়া তাঁহাদের পারিবারিক পুজো বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সার্বজনীন উৎসবই এখন তাঁহাদের মিলনের ক্ষেত্র। সার্বজনীন পুজোর সংখ্যাধিক্য অর্থনৈতিক পালাবদলের একটি চিহ্ন।

যাঁহাদের-বা পুজোর ব্যয় বহন করিবার মত সামর্থ্য আছে তাঁহাদেরও অনেকে পুজোর ঝামেলা বহন করিতে রাজি নন, পাড়ার সার্বজনীন পুজোর মোটা অঙ্কের চাঁদা সঁপিয়া দিয়া তাঁহারা কর্তব্য সমাপন করেন। দুর্গোৎসবের সমস্ত বিধিবিধান অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে গ্রামের সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুকে টানিবার ব্যবস্থা ছিল। উহা গ্রামকেন্দ্রিক উৎসব। এখন সেই গ্রামকেন্দ্রিক উৎসব কলিকাতা শহরে অনুষ্ঠিত হইতে চলিলে গৃহস্থের পক্ষে তাহা বিড়ম্বনা না হইয়া যায় না। কাজেই যিনি অর্থসামর্থ্যে বলীয়ান, তিনিও পুজোর দায়িত্ব একাকী বহন করিতে চান না—চাঁদা দিয়া ক্ষান্ত হন। সার্বজনীন পুজো বৃদ্ধির ইহাও অন্যতম কারণ। সুখের বিষয়, সার্বজনীন পুজোয় বর্ণভেদ গণ্য হয় না, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই পুজামণ্ডপে প্রবেশের অবাধ অধিকার। যাঁহারা মূর্তি পুজোয় বিশ্বাস করেন না, তাঁহারাও চাঁদা দেন ও উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। বস্তুত, অনেকেই ব্যাপারটাকে একটা সমাজিক মিলনের উপলক্ষ্য বলিয়া মনে করিয়া মূর্তির প্রতি তেমন লক্ষ্য দেন না। ইহাও সামাজিক মতিগতির একটা চিহ্ন।

এসব গেল আমাদের উৎসবের ভালোর দিক। এবারে মন্দের দিকের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সার্বজনীন পুজোয় যে প্রভূত অর্থ ব্যয় হয় তাহার বেশীর ভাগকেই অপচয় বলা যাইতে পারে। একটা হিসাব দেখিয়াছিলাম যে সার্বজনীন দুর্গোৎসবে কলিকাতায় পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু তাহার অধিকাংশই যায় আলোকসজ্জায়, মণ্ডপসজ্জায়, বিসর্জনের লরী ভাড়ায় এবং লাউডস্পীকারযোগে অশ্রাব্য হিন্দি গান পরিবেশনে। এই শেষেরটি সত্যই দুঃখদায়ক। সূক্ষ্ম রুচিবোধ বাঙালীর বৈশিষ্ট্য, অন্তত তাহাই বিশ্বাস করিতে ভালো লাগে। কিন্তু যখন কানে চাবুক মারে এমন সুরে অতি অশ্রদ্ধেয় সঙ্গীত তারস্বরে গীত হইতে শুনিতে পাই, নিজের উপরেই অশ্রদ্ধা দেখা দিতে থাকে। অন্য কথায় কাজ কি, রবীন্দ্রজন্মোৎসবেও এমন ঘটনা বিরল নয়। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সভায় রবীন্দ্র-সঙ্গীত বলিয়া অন্যের গান শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে। ইহা সামাজিক মনের লক্ষণ কি না জানি না, তবে সেভাবে বিচার করিতে মন স্বভাবতই বিমুখ।

আমাদের সার্বজনীন উৎসবসমূহে যে বিপুল অর্থব্যয় হয়, তাহার সদ্ব্যয় সম্ভব কি না চিন্তার সময় আসিয়াছে। আর কিছু না হোক, লাঠিখেলা ছোরাখেলা যাত্রাগান ও কবিগান প্রভৃতির চর্চা এই সব উপলক্ষ্যে হইতে পারে, হওয়া উচিত, হইলে অর্থের অন্ততঃ আংশিক সদ্ব্যয় হইল মনে করা অন্যায় হইবে না। সামাজিক মনের প্রকাশ উৎসবে, সামাজিক শক্তির বিকাশ এইসব উপলক্ষ্যে—সেই সামাজিক শক্তি যাহাতে স্পৃহনীয় খাতে প্রবাহিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত সমাজকল্যাণকামী ব্যক্তিগণের।

প্রসঙ্গত

কলকাতায় সম্প্রতি গুরুত্বপূর্ণ এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়-সম্মেলন। [illegible] রকমের সমস্যায় এই রাজ্যটির জীবনযাত্রা যখন জর্জর হয়ে উঠেছে, এবং এমন কোনও চিত্র যখন চোখের সামনে ফুটে উঠছে না, [illegible] ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যাতে আমরা কিছু আশ্বাস পেতে পারি, ঠিক তখনই এই সম্মেলনে বলিষ্ঠ একটি আশার সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। উঠবার প্রয়োজন ছিল। চারদিকেই যখন নৈরাশ্যের অন্ধকার, তখন একটা আশার আলো জ্বালিয়ে তোলা দরকার। আলো এখনও জ্বলে ওঠেনি বটে, কিন্তু জ্বালিয়ে তোলা হবে, জ্বালিয়ে রাখা হবে, এমন একটা আশ্বাস অন্তত পাওয়া গেল। তারও গুরুত্ব বড় সামান্য নয়।

গত কয়েক বছর ধরেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে ক্ষতিকর একটি প্রবণতার প্রসার লক্ষ্য করা গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক পরিস্থিতি তেমন শান্তিপূর্ণ নয়, এই ধরনের একটা অজুহাত দেখিয়ে কিছু কিছু শিল্প-প্রতিষ্ঠান তাঁদের কর্মকেন্দ্রকে ধীরে ধীরে এই রাজ্যের বাইরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এখনও যাচ্ছেন। স্বদেশী এবং বিদেশী—দুই ধরনের প্রতিষ্ঠানই এর মধ্যে আছে। কেউ বা তাঁদের ব্যবসায়ের কেন্দ্রগুলিকে এখান থেকে গুটিয়ে নিয়েছেন, কেউ বা তাঁদের ব্যবসায়ের প্রসারসাধনের ব্যাপারে আপন কর্মক্ষেত্রকে আর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে আবদ্ধ রাখছেন না। যদিও এই রাজ্যের মধ্যেই সেই প্রসার ঘটান যেত। নানা দিক দিয়ে উপেক্ষিত অবহেলিত এই রাজ্য থেকে ধীরে ধীরে অন্যত্র সরে যাবার এই যে প্রয়াস, এর পরিণাম—বলাই বাহুল্য—আমাদের পক্ষে অত্যন্তই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের পুনর্বিন্যাসের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আমরা যথেষ্ট মার খেয়েছি; এখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মক্ষেত্রও যদি আবার ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হতে শুরু করে, ব্যাধি তাহলে দুরারোগ্য হয়ে দাঁড়াবে, তাগা বাঁধবার আর জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেই ত বেকার-সমস্যার চাপে আমরা ন্যুব্জ হয়ে আছি। তার উপর আছে আরও হাজার রকমের সমস্যা। শিল্পক্ষেত্রে এই অশুভ প্রবণতা লক্ষ্য করে তাই স্বতই আমরা আতঙ্ক বোধ করেছি।

অথচ এই সত্য কথাটা এতদিন তেমন স্পষ্টভাবে কেউ ঘোষণা করেননি যে, পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক-পরিস্থিতি সত্যিই খুব উদ্বেগজনক নয়। অন্তত ততটা ত নয়ই, যতটা উদ্বেগজনক বলে একে দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মঘট কি এ-রাজ্যে হয় না? হয়। তবে কোন্ রাজ্যেই বা না হয়?...এমন রাজ্য কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি, শিল্পক্ষেত্রে যেখানে শ্রমিক-মালিক সম্প্রীতির স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রায়কে ধন্যবাদ, সম্মেলনে এ-সম্পর্কে তাঁর স্পষ্টভাষণের জন্য।

ব্যবসায়-সম্মেলনের একটা আশু শুভ প্রতিক্রিয়া এই হতে পারে বলে আমরা আশা করছি যে, অতঃপর বাঙালী যুব-সমাজের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হবে। চিরটা কাল এই একই অভিযোগ আমরা শুনে এলাম যে, স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত উৎসাহ অথবা উদ্যোগ বাঙালী ছেলেদের নেই। বি-এ, এম-এ পাশ করে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের খাতায় নাম লিখিয়ে কোনক্রমে একটা চাকরি যোগাড় করতে পারলেই তারা খুশী। দশটা-পাঁচটা অফিস করব, অতঃপর মাসের পয়লা তারিখে মাইনেটি গুনে নিয়ে বাড়ি ফিরব, তাদের উচ্চাশা এর বেশী আর এগোতে চায় না। অভিযোগটা মিথ্যা নয়, এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় থেকে শুরু করে অনেকের তিরস্কারই এ নিয়ে আমাদের শুনতে হয়েছে। ব্যবসায়-সম্মেলনে বিভিন্ন প্রখ্যাত বাঙালী শিল্পপতিও এই পুরনো প্রশ্নটাকে আবার নতুন ভাবে তুলেছেন। তবে শুধু যুবসমাজের কাছে আবেদন জানিয়েই তাঁরা ক্ষান্ত হননি; সেই সঙ্গে সরকারকেও অনুরোধ জানিয়েছেন, বাঙালী ছেলেরা যাতে ব্যবসায়ের নতুন নতুন ক্ষেত্রের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, তার জন্য যেন অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়। সে-পরিবেশ যত তাড়াতাড়ি সৃষ্ট হয়, ততই মঙ্গল।

সম্মেলন সম্পর্কে আর মাত্র একটি কথা বলেই আমাদের বক্তব্য শেষ করব। কলকাতা এবং মফস্বলের থেকে প্রায় হাজার দুয়েক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। স্বভাবতই আশা করা গিয়েছিল যে, সম্মেলনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সমস্ত শ্রেণীর ব্যবসায়ীর অভিমতই ব্যক্ত হবে। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে মফস্বলের ছোটখাটো ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে। তাঁরা বলছেন যে, তাঁদের অভাব-অভিযোগগুলিকে ঠিকমত এতে ব্যক্ত করা হয়নি। এ খুবই আক্ষেপের কথা। বৃহৎ শিল্পপতিদের কণ্ঠস্বরের পিছনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কণ্ঠস্বর যাতে চাপা পড়ে না যায়, ভবিষ্যতে সে-বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

* * *

গত সপ্তাহে এমন আরও একটি আলোচনা-চক্রের অনুষ্ঠান এই শহরে হয়েছিল, ব্যবসায়-সম্মেলনের চেয়ে যার গুরুত্ব কিছু কম নয় বলেই আমরা মনে করি। আলোচনা হল সাহিত্য নিয়ে। বিষয়বস্তু ছিল বিশ্বাস ও সাহিত্য। আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন করলেন আর্থার কোয়েসলার। এ-দেশের বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চিন্তাব্রতী এতে যোগ দিয়েছিলেন। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনায় নীতিগত, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক বিচার-বিবেচনার মূল্য কতখানি, আদৌ আছে কি না, এ নিয়ে যে-আলোচনার অবতারণা এখানে হয়েছে, তার জের আশা করি এইখানেই শেষ হয়ে যাবে না। আশা করব অতঃপর আমাদের সাহিত্যিকরা তাঁদের অবসরমত এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করবেন এবং আপনাপন মতামতগুলিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে ঘষে নিয়ে তবেই কোনও ইজমএর দিকে পা বাড়াবেন, আদৌ যদি বাড়ান।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের এক প্রতিনিধিদল সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ডঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ডঃ রায় নাকি তাঁদের জানিয়েছেন যে, প্রাথমিক শিক্ষকরা যাতে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও গ্রাচুইটির সুবিধে পান, সরকার তার ব্যবস্থা করতে সম্মত আছেন। তাঁদের পুত্রকন্যারা যাতে বিনা বেতনে শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, তারও ব্যবস্থা করা হবে। এটুকু পর্যন্ত ভাল খবর। পরের খবরটা নৈরাশ্যজনক। বেতন এবং দুর্মূল্য-ভাতা বৃদ্ধি সম্পর্কে ডঃ রায়ের কাছ থেকে কোনও আশ্বাস পাওয়া যায়নি। অথচ এই আশ্বাস পাবার প্রয়োজনই ছিল সব চাইতে বেশী। শিক্ষকদের বেতনের হার এখনও এ-দেশে যে-স্তরে পড়ে আছে, তাতে দুঃখটা শুধু শিক্ষকদের হতে পারে, কিন্তু লজ্জাটা আমাদের সকলেরই। যা আমাদের জাতীয় লজ্জা, তার অপনোদনে যদি না আমরা এগিয়ে আসি তাহলে উত্তরপুরুষের কাছে জবাবদিহি করবার মতন মুখ আমাদের থাকবে না। সরকার এ-বিষয়ে আবারও ভেবে দেখবেন বলে আমরা আশা করি। এখনও আশা করি।

আর্থিক সমীক্ষা
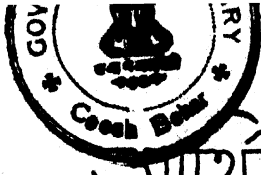
শ্রীকৌটিল্য

আগের সপ্তাহে আমরা আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের তালিকা থেকে পুঁজি প্রস্তুতের হিসাব করবার কয়েকটি অসুবিধার কথা আলোচনা করেছি। এবারে অন্যান্য দুয়েকটি অসুবিধার কথা আলোচনা করা যেতে পারে। বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব থেকে আমরা যন্ত্রপাতির যে মূল্য পাই, সেটা সাধারণত যন্ত্রপাতির দাম, ইন্সিওরেন্স ও বন্দরে পৌঁছানো পর্যন্ত অন্যান্য খরচের সমষ্টি। কিন্তু যন্ত্রপাতিগুলি বন্দর থেকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া, ব্যবহারোপযোগী করে বসানো (installation), আমদানী শুল্ক প্রভৃতির জন্য আমদানীকারককে আরো কিছু অর্থ ব্যয় করতে হয়। সুতরাং পুঁজি প্রস্তুতের মোট ব্যয় নির্ণয় করতে হলে ঐ আনুষঙ্গিক খরচগুলিও ধরতে হবে। অধিকাংশ দেশেই এই আনুষঙ্গিক খরচগুলির জন্য যন্ত্রপাতির মোট মূল্যকে শতকরা দশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এখন যেহেতু অনুন্নত দেশগুলিতে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির পরিমাণ দেশের অভ্যন্তরে প্রস্তুত যন্ত্রপাতির চেয়ে অনেক বেশি, সেই জন্য আমদানী মূল্যকে শতকরা ঠিক কত ভাগ বর্ধিত করা হল তার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। সাধারণত যানবাহনের ভাড়া, নির্মাণকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরী প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এই বর্ধিতাংশের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মনগড়া একটি অনুপাত দিয়েও এই বাড়ানোর কাজ করা হয়। তাছাড়া আমাদের মত বিরাট দেশে—যেখানে যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানাগুলি কয়েকটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত এবং প্রত্যক্ষ উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত করবার জন্য যন্ত্রগুলিকে দেশের অভ্যন্তরে অনেক দূরে নিয়ে যেতে হয়—দেশী কারখানাজাত যন্ত্রপাতিগুলির মোট মূল্যকেও একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বাড়ানো দরকার।

পুঁজি প্রস্তুতের হিসাব তালিকায় যন্ত্রপাতির পরই আসে নির্মাণকার্যের (construction) পরিমাণ নির্ণয় করবার সমস্যা। নির্মাণকার্যের পরিমাণ নির্ধারণ করবার যে কটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তার সাহায্যে অনুন্নত দেশে সঠিক হিসাব লাভের আশা খুবই কম। শহর অঞ্চলে বাস্তু নির্মাণের অনুমতিপত্র থেকে স্যাম্পল বা নমুনা হিসাবে কয়েকটি করে নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য মাথাপিছু বা পরিবারপিছু নির্মাণকার্যের একটা পরিমাণ ঠিক করা যায় এবং তার থেকে জাতীয় সমষ্টিতে পৌঁছানো যায়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে দেশের সমস্ত অঞ্চলের নির্মাণকার্যের হিসাব পাওয়া যাবে না, কারণ গ্রামাঞ্চলে গৃহাদি নির্মাণের জন্য ইউনিয়ন বোর্ড বা ঐ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানেরই

অনুন্নত দেশগুলিতে সাধারণত নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত প্রধান প্রধান দ্রব্যগুলির (ইস্পাত, সিমেন্ট, ইঁট প্রভৃতি) উৎপাদন এবং আমদানীর পরিমাণ থেকে মোট নির্মাণকার্যের পরিমাণ হিসাব করা হয়। নমুনা অনুসন্ধানের ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরণের নির্মাণকার্যের মোট ব্যয়ের কত অংশ ইস্পাত, সিমেন্ট বা ইঁটের জন্য ব্যয়িত হয়, প্রথমে সেটা নির্ণয় করা হয়; তারপর ঐ প্রধান দ্রব্যগুলির কোন একটির মোট মূল্যকে তার আনুপাতিক গুরুত্ব অনুযায়ী বর্ধিত করে মোট নির্মাণকার্যের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। গ্রামাঞ্চলের নির্মাণকার্যের পরিমাণ নির্ধারণের সমস্যা এই পদ্ধতিতেও থেকে যায়। ইস্পাত, সিমেন্ট বা ইঁটের ব্যবহার গ্রামাঞ্চলে খুব কম বা প্রায় নাই বলা যায়। তাছাড়া ক্ষুদ্র সেচের কাজের জন্য নির্মিত বাঁধ, খাল, পুকুর এবং রাস্তা, শস্য গোলা ইত্যাদি নির্মাণের কোন হিসাবই এই পদ্ধতিতে করা সম্ভব নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নির্মাণকার্যের মোট পরিমাণ নির্ধারণ করতে হলে শহর এবং গ্রামের জন্য পৃথক পৃথক হিসাব প্রস্তুত করতে হবে। তাছাড়া কৃষকরা যে সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ স্বেচ্ছাশ্রমের দ্বারা করে, তার জন্যও একটা মূল্য ধরবার প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত মজুরির হার দিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমের পরিমাণকে গুণ করে তার আরোপিত (imputed) মূল্যের পরিমাণ স্থির করা যেতে পারে।

উপরে যে সমস্ত অসুবিধার কথা আলোচনা করা হল, সেগুলি প্রধানত অনুন্নত দেশে উৎপাদন ভিত্তিক পদ্ধতিতে পুঁজি প্রস্তুতের পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত। এবং তার মধ্যেও কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত যন্ত্রপাতির, যেগুলি সাধারণত কৃষিকার্য ও কুটির শিল্পে ব্যবহৃত হয়, পরিমাণ নির্ধারণের সমস্যা ধরা হয় নাই। তাছাড়া এতক্ষণ পর্যন্ত পুঁজি প্রস্তুতের যে হিসাবের কথা বলা হয়েছে, সেটা হল সাধারণভাবে মোট (gross) হিসাব। কিন্তু কোন কিছু উৎপাদন করতে গেলে তো বটেই, এমন কি যন্ত্রপাতিগুলি অব্যবহৃত অবস্থায় ফেলে রাখলেও কিছু পরিমাণ পুঁজি ক্ষয় (depreciation) হয়। সুতরাং নীট পুঁজির পরিমাণ পেতে হলে মোট (gross) পুঁজি থেকে বাৎসরিক পুঁজিক্ষয় (depreciation) বাদ দিতে হবে। কিন্তু এই কাজটি খুব সহজ নয়, কারণ বাৎসরিক পুঁজিক্ষয়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে কোন নির্দিষ্ট সময়ে জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত বিভাগে মোট কত পুঁজি নিযুক্ত আছে, সেটা জানা দরকার। পরবর্তী বৎসরে উৎপাদনের ফলে ঐ পুঁজির শতকরা কত ভাগ ক্ষয় হয়েছে নির্ণয় করে নতুন বৎসরে প্রস্তুত পুঁজির হিসাব থেকে সেটা বাদ দিলে এক বৎসরে নীট পুঁজি প্রস্তুতের হিসাব পাওয়া যাবে।

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় কোন ঝোঁক বা ঈপ্সিত পরিবর্তন আনতে হলে বাৎসরিক পুঁজি প্রস্তুতের হিসাব সর্বাগ্রে দরকার হয়। বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য হল অর্থনীতিবিদদের এই হিসাবের কয়েকটি দুর্বল দিক সম্পর্কে সচেতন করা। সাধারণভাবে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে সহজলভ্য যে কোন হিসাবকেই নির্বিচারে গ্রহণ করবার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ঠিক এই জায়গাতেই সতর্ক হওয়া বিশেষ দরকার। পরিসংখ্যানের বর্তমান অবস্থায় অনুন্নত দেশগুলিতে প্রাপ্ত পুঁজি প্রস্তুতের হিসাবকে সাধারণভাবে একটি দেশের অর্থনীতিক অবস্থার স্তর নির্দেশক হিসাবে গ্রহণ করা গেলেও সেই হিসাবকে ব্যবহার করে এবং তার ভিত্তিতে গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে সেই দেশের অর্থনীতিক উন্নতির পথরেখা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা বোধ হয় উচিত নয়। কারণ আমাদের আলোচনা থেকে এটা বোধ হয় স্পষ্ট হয়েছে যে, বাস্তব অসুবিধাগুলির কথা ছেড়ে দিলেও আলোচ্য হিসাবের মধ্যে ব্যক্তিগত ঝোঁকের (bias) প্রভাব থাকা খুবই সম্ভব।

[১৭]

লতার কোলে সৌর মাথা রেখে শুয়ে ছিল, লতা ওর এলোমেলো চুলের রাশিকে সিঁথির দু' পাশে ভাগ করে রাখছিল, এসব আরও কতদিন পরের কথা? অন্তত ছ' মাস ত হবে। এখন, এতদিন পরে, আগেকার সেই দিনগুলি একটি আরেকটির সঙ্গে লেগে যেন একাকার হয়ে আছে, তাদের আলাদা কোন অস্তিত্বই নেই। বছরগুলো পর্যন্ত মিলে-মিশে, গুদাম-ঘরে পরিত্যক্ত জিনিসের মত স্তূপীকৃত হয়ে আছে, তাদের একটাকে খুঁজে তুলতে গেলে অন্ধকারে আরেকটায় হাত লেগে যায়, অন্যটাই উঠে আসে।

যখন ঘটছিল, তখন কিন্তু প্রত্যেকটি দিন ক্ষণ আলাদা ছিল। বৃষ্টির ফোঁটার মতই তারা বিচ্ছিন্নভাবে ঝরেছিল, কিন্তু এখন পুরনো কালের পুকুরটার মধ্যে এক হয়ে আছে। আলাদা স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ—কিছু নেই।

অথবা সাঁতরে সাঁতরে দীর্ঘ একটা দীঘি যেন পার হয়ে এলাম। তখন, দু' হাত দিয়ে জল টানবার সময়ে ক্লান্ত লাগছিল, ভাবছিলাম, যেন ফুরবে না, যেন পার নেই। কই, এখন ত পারে পৌঁছে গিয়েছি, পিছন ফিরে দীঘিটাকে তেমন দীর্ঘ ঠেকছে না ত। ওইটুকু ত ওর প্রসার—তাই পাড়ি দিতে আমার এতটা সময় লেগেছে?

অথবা দিনগুলি কালো কালো পিঁপড়ে, তাদের প্রতিটির দংশন আছে, তারা মিছিল করে চলেছে, এখন এখান থেকে দেখলে সে মিছিল কালো একটা রেখা বই কিছু না। অথচ পিঁপড়েগুলি কিন্তু একটু একটু করেই এগচ্ছে।

সৌরও একটু একটু করেই এগিয়েছিল। লতা বউদিও একটু একটু করে তাকে টেনে থাকতে পারেন। মোটের ওপর তার কোলে মাথা রেখে শোবার সাহস সঞ্চয় করতে, অনুমতি বা প্রশ্রয় পেতে সৌরর পুরো দুটি মাস কেটে গিয়েছিল।

লতা আঙুলে বুলিয়ে ওর চুলের গভীরে হারান সিঁথিটিকে খুঁজে বার করছিল, আবেশে সৌরর চোখ বুজে আসছিল, কিন্তু সে ঘুমিয়ে পড়েনি, এক একবার লতার চোখে চোখ রাখছিল। আর হাত বাড়িয়ে লতার ঠোঁটে আঙুল রাখছিল। আর লতার আঙুল টেনে এনে এনে রাখছিল নিজের ঠোঁটে।

—'এখানে সাদা এটা কী। চুন লেগে আছে? পান খেয়েছ বুঝি?'

—'না, সিগারেটের কাগজ হতে পারে।' লতারই আঙুল দিয়ে নিজের ঠোঁটের কোণ ঘষে ঘষে সৌর জবাব দিল।

'খুব সিগারেট খাও বুঝি? তাই তোমার আঙুল এত হলদে। এত খাও কেন।'

'এত খাই কোথায়, না ত। কিন্তু তোমার হাতের আঙুল এত হলদে হল কেন? সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে দিয়ে?'

'না, আজ শিউলি-বোঁটার রস লাগিয়েছি। শিউলি ফুলের বোঁটা হলদে, জান না?'

সৌর বলল, 'জানি। ছেলেবেলায় কত মালা গেঁথেছি। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই

সকলের সিগারেট ধরিয়ে দাও। আমারই ত কতদিন দিয়েছ।'

'দিয়েছি ত, দিই-ই ত', লতা স্বীকার করল। 'ধরিয়ে দিয়েছি, পুড়িয়ে দিতে চেয়েছি।'

'শুধু চেয়েছ? পারনি?'

ওর চোখে পূর্ণ দৃষ্টি রেখে লতা বলল, 'না। একজনও ছাই হয়নি। না, একজনও না।'

সৌর অস্বস্তিতে নড়ে উঠল।—'কিন্তু ফোসকা লাগাতে পার, জ্বালা ধরাতে পার। যেমন আমার ধরিয়েছ।' বলতে বলতে সৌর শক্ত করে লতার হাত চেপে ধরল, 'আরও কতজনের ধরিয়েছ, বল। বলতেই হবে।'

লতা তবু নড়ল না, ভয় পেল না। মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, 'যদি বলি এক-জনেরও না?'

'মিথ্যুক। তবে আমাকে জ্বালালে কেন।'

'সহজে যায় বলে। তুমি যে সহজেই জ্বল। পাশের জানালার মেয়েটিকে দেখে একদিন জ্বলেছিলে, মনে নেই?'

সৌর জবাব দিল না।

'সে আর জ্বালায় না? জানালায় এসে দাঁড়ায় না?'

'দাঁড়ায়, কিন্তু আমি ও-দিকে চাইনে। আমি জ্বলিনে।'

ওর গাল টিপে দিয়ে লতা বলল, 'তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। কিংবা, শুধু এইটুকু হয় যে, তুমি জ্বল যত তাড়াতাড়ি, তত তাড়াতাড়িই নেব।'

[কিন্তু এখন আমি জ্বলছি, সৌর বলছিল মনে মনে, জ্বলছি হিংসায়, স্পর্শে, শিহরণে। আমার বুক জ্বলছে, চোখ জ্বলছে, জ্বলছে দুই ভুরুর মাঝখানে কপালের অংশটুকু—মেয়েরা যেখানে টিপ পরে। ও যেখানে পরেছে। এই জ্বালা ও জুড়িয়ে দিতে পারে। ও কেন নুয়ে পড়ছে না, আমার যেখানটা জ্বলছে, সেখানে কেন ঠোঁট রাখছে না?]

অধীর হয়ে সৌর উঠে বসে লতার গলা জড়িয়ে ধরল। কঠিন, নিষ্ঠুর হয়ে বলে উঠল, 'তুমি শুধু খেলছ, শুধু লুকচ্ছ। আরও কতজনকে জ্বালিয়েছ, এখনও বলনি।'

'শুনে লাভ?'

'তবু শুনব।'

'যদি বলি, অনেক, অনেক। সব নামও আমার মনে নেই?'

'বিশ্বাস করব না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লতা, কিংবা হাই তুলল। বলল, 'সত্যিই অনেক। তুমি ক'জনের কথা শুনতে চাও?'

আর তখনই লতার কোলে অবশ সৌর মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। যেন লাল ফুল ভেবে এতক্ষণ 'দাও, দাও' বলে বায়না ধরেছিল, ফুলটা যেই কেউ ওর হাতে ফেলে দিল, অমনিই সৌর চমকে উঠে টের পেল, যেটাকে লাল ফুল মনে করেছিল সেটা আসলে ফুলই নয়, জ্বলন্ত এক টুকরো কয়লা।

ধরা-ধরা গলায় সৌর বলল, 'একজনের নাম জানি। বিজন।'

লতা বলল, 'হ্যাঁ, বিজন একজন। আরও ছিল। তার আগেও আরও কতজন এসেছে।'

সৌর মৃঢ় গলায় শুধু বলতে পারল—'তাদের নাম বল।'

'শুধু নাম? গল্পও নয়?'

সৌর বলল, 'গল্পও।'

লতা বলেছিল। কতটা গল্প, কতটা বানানো, সৌর জানে না, কিন্তু সেদিন হৃৎস্পন্দ বন্ধ করে শুনেছিল। সব নাম আজ এতদিন পরে মনে নেই, সব ঘটনাও নয়। আবার সবগুলোকে ভোলেওনি।

সরিৎ মজুমদারই বোধ হয় এসেছিল প্রথম। শচীপতিরই বন্ধু, আইনের পরামর্শ দিতে এ-বাড়িতে মাঝে মাঝে আসত। তার একটা বর্ণনাও লতা দিয়েছিল বলে মনে পড়ছে। কালো, দীর্ঘাঙ্গ, তীক্ষ্ণনাসা। মুখের ওই নাকটাই নাকি সরিতের ছিল আশ্চর্য। পোশাক সর্বদাই একরকম পরত —কালো আলপাকার কোট, সাদা জিনের প্যাণ্ট।

অধৈর্য সৌর বাধা দিয়ে বলেছিল, 'এ-সব শুনতে চাই না। কী ঘটেছিল তাই বল।'

কী ঘটেছিল? একদিন এ-বাড়ি আসতে সরিতের আলপাকার কোটটাই ভিজে গিয়েছিল।

'তাই কী?'

'তাড়াতাড়ি সেই কোটটা খুলে দিয়েছিলুম আমি।'

'আর?'

'খুলতে গিয়ে তার হাতে আমার হাত লেগেছিল।'

'আর?'

লতা হেসে উঠে বলল, 'আর কিছু নেই। তখনই নেই।'

'তার মানে পরে ছিল, পরে হয়েছিল?'

সৌরর নাকটা ধরে নেড়ে আদর করে লতা বলল, 'ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ। আর শুনতে চেও না।'

হাতটা ঠেলে দিয়ে সৌর বলে উঠল, 'নির্লজ্জ। বল, আর কী, আর কে, আরও কতজন।'

নীতীশ রায় সম্পর্কে লতার বড় জায়ের ভাই। 'তার সঙ্গে রোজ ঘুরেছি' লতা বলল, 'সিনেমা দেখেছি। পবিত্র রায় ছিল নীতীশেরই বন্ধু। নীতীশের সঙ্গেই মাঝে মাঝে আসত।'

'নীতীশের কী হ'ল?'

'বা রে, নীতীশ বিয়ে করল যে। দু'শো টাকা মাইনে হল, অমনি কনে পছন্দ করে বিয়ে করল।'

'তুমি?'

'আমি সেই বিয়েয় নেমন্তন্ন খেলুম। ফুলশয্যার আসরে গান গাইলুম, আসবার সময় নতুন বউ-এর ঘোমটা ধরে একটু নেড়ে দিলুম। আমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিতে এল পবিত্র রায়।'

'তুমি বুঝি পৌঁছে দিতে বললে?' সৌর এই নিরর্থক প্রশ্নটা কেন করল সেই জানে।

'না। ও নিজেই আসতে চাইল। আমি বললুম, চলুন।'

'তারপর?'

'তারপর তখন ত ট্রাম নেই, ট্যাক্সি পেলাম না, রিক্সায় উঠলুম।' খানিকটা দম নিল লতা, বলল, 'পবিত্র রায় আমাকে অনেকগুলো দামী জিনিস প্রেজেণ্ট করেছিল।'

রুদ্ধ গলায় সৌর বলল, 'আর তুমি?'

'আমি?' আঁচল ভাল করে টেনে লতা সংবৃত হল। 'আমিও দিয়েছি বইকি। তবে দামী জিনিস কিনা জানি না।'

দাঁতে দাঁত চেপে সৌর বলল, 'অসতী কোথাকার।'

আশ্চর্য, রাগ করল না লতা, বরং হাসল। —'কী বিশ্রী কথা বল ভাই তুমি! কিন্তু শুনতে কই খারাপ লাগল না ত। আরও শুনবে? রথীন গুপ্তের কথা? সে ছিল রাজনৈতিক নেতা। তার পাল্লায় পড়ে দিন-কতক দেশোদ্ধার নিয়েও খেপে উঠেছিলুম। একবার ত সাত দিন সাত রাত্তির এক সঙ্গে বাংলার মাঠে-মাঠে ঘোরাঘুরিও ক'রে এলুম।'

'তারপর?'

রহস্যময় ভ্রূভঙ্গী করে লতা বলল, 'তারপর নীরদ এল।'

সৌর অধৈর্য হয়ে উঠছিল। বার বার লতা তাকে বহুদূর অবধি তুলে নিয়েই যেন নামিয়ে দিচ্ছে। অথবা একটি গ্রাস মুখের কাছে বার বার এসেও ফিরে যাচ্ছে। শেষ কথাটি জানা আর হচ্ছে না। লতা একটি গল্প না ফুরতেই অন্য গল্প শুরু করছে।

কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটল। ভাঙা ভাঙা গলায় সৌর বলল, 'শচীপতিদা কিছু বলতেন না? বলেন না?'

লতা বলল, 'না।'

'আশ্চর্য ধৈর্য ভদ্রলোকের—অসীম ক্ষমা আর সহিষ্ণুতা!'

'আমিও আগে তাই ভাবতাম', লতা বলল, 'এখন এই ক্ষমার কারণটাও জেনে ফেলেছি।'

'কী কারণ? ও'র জরা?'

লতা বিষণ্ণ-শান্ত গলায় উচ্চারণ করল, 'না, তাও না। প্রথম যে এসেছিল, তাকে দেখে উনি বিচলিত হয়েছিলেন। তাকে সহ্য করতে পারেননি। আমাকে একদিন আঘাতও করেছিলেন। পরে দেখলেন, সে গেল, অন্য লোক এল। তখনও সন্দিগ্ধ হয়েছিলেন। ও'র নাকের ডগা কতদিন ফুলে ফুলে উঠতে দেখেছি। মুখ যেন থমথম করত। উনি স্বাভাবিক হয়ে এলেন পরে। হয়ত পরে বুঝতে পেরেছিলেন, যারা আসছে তারা কেউ থাকবে না, আসবে আর যাবে। কতজন ত এল, গেল-ও, সকলেরই শেষ দৌড় কতদূর উনি জানতেন। জানতেন, সকলেই যাবে, শেষ অবধি একমাত্র উনিই আছেন, উনিই থাকবেন।'

একটু দম নিয়ে লতা বলল, 'থাক্, আর বাজে বকবক করে না।' বলে সৌরর মুখের ওপর আনত হয়ে হাসতে থাকল।

(ক্রমশ)

দি ন রা ত

জগন্নাথ চক্রবর্তী

গভীর রাত্রিতে এক পাখি আসে উড়ে
অন্ধকার আকাশের মহাদেশ থেকে
তারা-জ্বলা মানসের চূড়ে।

সে আসে অরণ্যদেশ নদী পার হয়ে
ঘুমন্ত মনের হ্রদে অশরীরী ছায়া
তারপর হ্রদ থেকে হ্রদে
তার আসা-যাওয়া।
একালের সেকালের চোখের পাতায়
ভিজে ভিজে কথাগুলি সব পড়ে নিয়ে
সে শুধু মনের কোণে জোনাকির মতো
আলোর আলপনা যায় দিয়ে।

স্বপ্নের বুদ্বুদ ভেঙে কি যে তার খেলা
উজ্জ্বল আঁধার পটে কী রঙের মেলা!
যে ঘাসে শিশির পড়ে, যে শিশিরে ছায়া
সেইখানে বাসা তার, সেই তার মায়া।
রজনীগন্ধার ঘ্রাণে চিনে নিয়ে পথ
নিঃশব্দে দুয়ার খোলে খসায় কবাট,
মুখ থেকে কথা কাড়ে মন থেকে স্মৃতি
স্বপ্ন দিয়ে সুখ কাড়ে——
এই তার রীতি।

ঘুমের সমুদ্রতীরে আমরা একাকী
বালি দিয়ে ঘর বাঁধি, বালি দিয়ে ঘর;
আকাশের মোমগুলি তারা হয়ে গলে
ঘাসের উপর।

অন্ধকার সরোবরে ডুব দিয়ে উঠে
জরামৃত্যু মুছে ফেলে মাটির মানুষ
আমরা নতুন জন্মে বেঁচে উঠি,—যদিও ক্ষণিক—
তখন নিদ্রিত গ্রাম, নিদ্রিত শহর
'কে জাগে?'—উত্তর আসে,
'বসন্ত-প্রহর।'

আরেক পৃথিবী জাগে
সদ্যোজাত ফেনানিভ শিশুর মতন,
এই সব চেনামনে জন্ম নেয়
অন্য এক মন।
যতক্ষণ সূর্য থাকে, রোদ থাকে মেঘে,
কর্ম কোলাহল থাকে দিনের আবেগে,
দুধ দেয় কালো গাই
গান গায় নদী——
এই মতো দিন কাটে
সূর্যাস্ত অবধি।

তারপর এ পৃথিবী—দিনের পৃথিবী—
থেমে যায়, মুছে যায়, নিভে যায় ঘুমে
তারার বিদ্যুৎ-দেহ জন্ম নেয় কাঁপে ইতস্তত
জোনাকির মতো।

দিগন্তে সেতার কাঁপে
কাঁপে দেহ মন,
জ্যোৎস্নার জোয়ারে লাগে
সুরের প্লাবন।
আকাশ, অথবা জাগে আকাশের পাখি
পূর্ণ হয় সেই গান ছিল যাহা বাকি।

যা কে ভু লে যে তে হ বে

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

তোমাকে ভুলবনা সখি এ-প্রতিজ্ঞা নিই যতবার
যতবার মুখ তুলি ছল ছল চোখে রাখি চোখ
ব্যাকুল দুখানি হাত যতবা হাতে নিই আর
ততবারই অন্ধকার মুছে দেয় সমস্ত আলোক
ভুলে যাই সেই কথা যা করে হৃদয় তোলপাড়!

বড় ছোট এ-জীবন, জানিনা এখনো কতদিন
বাঁচব আমি, কতদিন, কতদিন এই দীর্ঘপথ
ভাঙব, আর বার বার আশ্বিনে বোশেখে ক্লান্তিহীন
উচ্চারণ করে যাব শুধু এই একই শপথ!
এও কি সম্ভব? নাকি প্রেম বলে কিছু নেই, যার
আগুন নিয়ত জ্বলে দিনে-রাতে প্রতিটি প্রহরে
অস্তিত্বকে দগ্ধ করে, রাখে মাত্র একটি ইচ্ছার
আকুতিকে, রে জীবন, কেন প্রতি বিদায়ের আগে
যাকে ভুলে যেতে হবে, তারই ম্লান মুখ চোখে জাগে।

মাছ ধরা

প্রভাত দেবসরকার

ভোঁড়ের পুকুরে জাল নামবে রাত দুটোয়। তার আগে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে খানিক বিশ্রাম করে নিতে হবে। তার পরে আর সময় নেই। মাছ-ধরা, মাছ-বাছা, বিলি-ব্যবস্থা করা। ঐ রাতটুকুর মধ্যে। চালানি মাছ বেশীক্ষণ থাকে না, রোদ উঠলে ফুলে ঢোল হয়ে যায়। হরিণডাঙার বাজারে না কাটলে কলকাতা পর্যন্ত ছুটতে হবে। সাতটার গাড়ি ধরা চাই। ঝাঁকা মাথায় কলকাতা পর্যন্ত ছোটা মুখের কথা নয়। বিশ-পঁচিশ কোশ পথ!

পুকুর পাড়ে একটা চালাঘরের দাবায় জেলেদের আড্ডা পড়েছে। বিশ-পঁচিশজন জোয়ান মদ্দ। দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে, কেউ জাল সারছে, কেউ নেতার মত রঙ-চটা তাস নিয়ে বিন্তী খেলছে। কেউ চেটাই-এর ওপর গামছা বিছিয়ে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে নতুন যাদের হাতে খড়ি, এ পাশে তারা একত্র হয়ে ইতিপূর্বে মাছ-ধরার অভিজ্ঞতার গল্প করছে।

একধারে ভুবন দলের মধ্যে সবচেয়ে বয়েসে বৃদ্ধ এবং অভিজ্ঞতা, আপনমনে তামাক খাচ্ছে। মাঝে মাঝে পিক ফেলে নিজেকে শুনিয়ে বলছে, শালা সমুন্দিরা, হুঁকোর জলটা পর্যন্ত ফিরিয়ে রাখেনি...... থু! থু!

বেশ রাত হয়েছে। সামনে ভোঁড়ের পুকুরের কালো ঝুল জল যেন পাথর। অন্ধকার কুপ-কুপ করছে। পুকুর পাড়ে এই চালার ওপর এই কজন মানুষ ছাড়া এ তল্লাটে বুঝি আর কেউ জেগে নেই।

আগুনে মালসাটা একধারে সরিয়ে রেখে ভুবন বললে, কিরে মদ্দরা, আজ আর খাই-দাই হবেনি? কি খাচ্ছ হলো?

কথাটায় বুঝি কেউ তেমন কান দিলে না। ও-বুড়োর পেটের জ্বালা ধরেছে। সন্ধে-কালে এক ধামা মুড়ি গিলেছে।

কিন্তু কথাটা যার জন্যে বলা, ঠিক তার কানে গেল। চালাঘরে ওধার থেকে উত্তর দেলে, আর দেরি নাই, পাত পেড়ে বসগা তোমরা!

দেখা গেল পেটের জ্বালা কেবল বুড়োর একার নয়। পাত-পাড়ার আহ্বানে সবাই সক্রিয় হয়ে উঠলো। সাজ-সাজ রব।

মাটির ওপর উবু হয়ে সামনে কলাপাতা বিছিয়ে নুনের মালা আর জলের পাত্র নিয়ে সারবন্দী সব বসে গেল। সধূম কেরোসিন কুপির আলো অস্পষ্ট!

খেয়াল ভুবনই করলে। বললে, সবাই তো যে-যার বসে পড়লি, তর সইলনি! সব ঐ মেয়েমানুষটা একাই করবে নাকি?

পংক্তির একজন বললে, তুমি গিয়ে সাহায্যি কর না কেন। সবার আগেই তো পাত পেড়ে বসো!

ভুবন রেগে উত্তর দিলে, আমি কেন, তোরা কি করতে আছিস! কেবল গিলবি বসে বসে!

ছেলেটি বললে, মাগনা গিলচি যে! তুমি খাওয়াচ্ছ বড় কুটুমকে?

সামনে গিয়ে একজন বললে, তর্কের দরকার নাই, যার কম্ম, সে ঠিক করবে'খন!

ভুবন গাল দিতে গিয়ে থেমে গেল, যত সব চেঙড়ার কাণ্ড, মাগীর কি মতি-গতি হয়েছে আজকাল যাকে পাচ্ছে দলে ভর্তি করছে! মরবে বেসামাল হয়ে কোনদিন!

এক হাতে ভাতের বালতি এক হাতে হাতা, মদনের মা এসে সামনে দাঁড়াল। সব চুপ, মায় ভুবন স্তব্ধ।

পরিবেশন করতে করতে মদনের মা বললে, তর্ক কিসের গো! খিদে চাড় আগ হয়েছে?

ভুবন আমতা আমতা করলে, তর্কের কিছু নাই, এই তোমার কথা হচ্ছিল, একলা হাতে সব করবে.....ওদের বলছিলুম!

মদনের মা বললে, তোমার কথা ওরা শুনলে না?

সখেদে ভুবন বললে, তোমার আসকারায়!

হেসে মদনের মা বললে, কায়েত হলে না-হয় কথা ছিল, আমার জাতে বড়রাই ছোটদের পরিবেশন করে। ছেলেরা করবে কেন!

ভুবন গজ্-গজ্ করে বললে, না গিলবে কেবল!

মদনের মা বললে, তুমিও গেল।

সব পাতে ভাত পড়ে গেছে, ভাতের মধ্যে গর্ত করে ডালের জন্যে অপেক্ষা। নুনের মালা হাত-ফিরতি হতে লাগল। নুন-ভাতও কেউ কেউ মুখে পুরলে, ডাল আসতে আসতে আর একপ্রস্থ ভাত নেওয়া যাবে।

ভাত, ডাল আর কুমড়োর ঘ্যাঁট! ওতেই সারতে হবে। তবু ভুবন জিজ্ঞোস করলে মাছ নাই?

মদনের মা পরিবেশন করতে করতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, আজ নাই, কাল খেও!

ভুবন বললে, সব বেচে দিবি, তা থাকবে কোত্থেকে!

এবার মদনের মা প্রতিবাদ করলে, বেচলুম কোথায়! সেই কবে মাছ ধরেছিলি খেয়াল আছে!

আছে না! খুব খেয়াল আছে ভুবনের, কারো পরামর্শ মত চলে না মদনের মা, খুশিমত যা ইচ্ছা তাই করে এতগুলো লোকের পরিশ্রমের ফল নিয়ে।

তর্কের মীমাংসা করছে কে, কাল মাছ ধরা হয়েছে বামুনতলার দিঘীতে, সেই মাছ কলকাতায় গেছে, হাটে-বাজারে বিক্রী হয়েছে মনে করে ভুবন আর কোন খোঁজ রাখে না! এখন ভুবনের দরকার কি, পরামর্শের লোক জুটেছে মেলা!

পংক্তির মাঝখান থেকে একজন ফুট কাটলে, রোজ মাছ জুটবে তার কথা কি, বাড়িতে কি সব কালিয়া-পোলাও খাও জানতে বাকি নেই!

দলের লোকের খাওয়া নিয়ে এমন খোঁটা অবশ্য দিতে চায় না মদনের মা। বিশেষ করে এই বৃদ্ধ লোকটি সম্পর্কে। একদিন ভুবন তাকে বাঁচিয়েছে, ভুবন হতেই তার কারবারের সূত্রপাত—মাছ ধরা, মাছ বেচা! কিচ্ছুই জানতো না মদনের মা!

মদনের মা বললে, ওকথা নয়, তোমাদেরই ভুল......এসেচ, সেই কোন-খান বেলায়, জালটাকে নাবিয়ে আবার মাছ ধরে নিলেই পারতে......আমি কি মানা করেচি কখনো!

করেনি; কিন্তু কাজটা অত সহজ নয়, দু-পাঁচ সের খাবার মাছের জন্যে ঐ মহাজাল ভিজিয়ে আবার তাকে 'সাইজ' করে কার্য-কালে ব্যবহার করা মুখের কথা নয়! হিমসিম!

ও একরকম মানাই। খেপলো জাল সঙ্গে নেবার হুকুম নেই। যা করে ঐ মহাজাল—দশজন মন্দ বইতে পারে না। জাল নয় জগদ্দল! প্রকাণ্ড একখানা বাঁশের মাঝখানে জালটা গুটিয়ে পাল্কির মত বয়ে বেড়ান। হেঁইও! হেঁইও!

ভুবন একবার ঠাট্টা করে বলেছিল, মদনের মা, তুই আর আমাদের সঙ্গে কষ্ট করিস কেন, ঐ জাল ধরে ঝুলে পড়, আমরা বয়ে নিয়ে যাই! বিবির বাজার কি এখানে!

মাঠের মাঝখানে রোদের তাপ প্রচণ্ড, ঠেঁটেঁ ফাটিফাটা মেঠো পথ। হাওয়ার তুফানটা না থাকলে বুঝি পথিকসুজন হেজে মজে যেত মাঝপথেই। মদনের মা খর খর পা চালিয়ে চলেছে অগ্রগতি জালি-দের লক্ষ্য করে। গায়েবাস অবিন্যস্ত, হাওয়ায় সামলান দায়।

মদনের মা ভুবনের কথায় উত্তর দিলে, পোড়া কপাল, অভাগার দশা! কাঁধে করবার লোক থাকলে কি আর এমনি ওদ-রুদে ঘুরে মরি!

গদগদস্বরে ভুবন লঘু করে বললে, তুই রাজী হলে আমরা তোকে কাঁধে নিয়ে বেড়াব।

মাঠের মাঝখানে একটুখানি দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে মদনের মা বললে, অত সুখ সহ্য হবেনি!

পাঁচ বছর আগে বুঝি এত বুড়ো ভাল দেখাত না ভুবনকে। ভুবনও দাঁড়িয়ে পড়েছে মাঠের মাঝখানে, পাশাপাশি। গদগদস্বরে ভুবন বললে, সুখ চাইলে সুখ হয়! তুই যদি বুঝসু করিস শুধু-শুধু।

রোদে ঘেমে জবজবে, বুকের কাপড় ভিজে সপসপ করছে। ঘর্মাক্ত চুলগুলো মুখের ওপর থেকে ফিরিয়ে মদনের মা হেসে বললে, আর সুখে কাজ নেই...চল, ওরা কদ্দূরকে চলে গেল।

ভুবন মাথা গুঁজে খেতে লাগল। সেসব কথা আজ হয়তো মনে নেই মদনের মার।

মাছ-ভাত খাওয়াতে বয়ে গেছে, খাওয়াবে আর একজনকে।

খাওয়া মিটতে এক প্রহর রাত। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে ভুবন। থম্‌-থম্‌ করছে, কি তারা ফুটেছে আজ! ভারি একটা জল হবে খুব শীগ্‌গির। এবারে মাছ ধরায় বেগড়া দেবে। আষাঢ় পর্যন্ত চলবে না, চাষ এগিয়ে আসবে। আষাঢ়েই পুণ্যে করতে হবে!

আজকাল সহজে ঘুম আসে না ভুবনের। কতক্ষণ এমনি চিত হয়ে শুয়ে কত আবোল-তাবোল কথা ভাববে। ভূত, ভবিষ্যৎ!

চিরকাল মাছই ধরলে ভুবন! লোকে বলে ভুবনের কাছে যেমন-তেমন মাছ জব্দ, মাছেদের নাকি জ্বর আসে ভুবন জল ছুঁলে। পুকুরে ভোঁদড় নামাও যা, ভুবন নামাও তাই। মেছো ভুবন!

পেটের দায়ে মাছ-ধরা বিদ্যা আয়ত্ত করেছিল ভুবন। যে ঘরে তার জন্ম, তারা কেউ কোনদিন জাল নিয়ে কারবার করেনি। চাষাবাদ, দিনমজুরী করেই চিরকাল কাটিয়েছে। অনেকখানি বয়েস পর্যন্ত এমনিভাবে অনিশ্চিত রোজগারের ওপর নির্ভর করতে হতো ভুবনকে—মাঠের ধান উঠলে ভাবনা ধরে যেত, এর পর কি ব্যবস্থা পেট-চলার? ঝাড়া-ঝাড়া শেষ, হাঁড়ি ঢনঢন। জ্ঞান হওয়া থেকে দেখছে ভুবন, তার বংশের জোয়ানেরা তারপর নানা ফন্দি-ফিকির করে কাজ যোগাড় করে—মাটি কাটে, ইঁট তৈরি করে, ঘরামি হয়, কোঠাবাড়ির জোগাড়ে হয়, কখনো বা মুটেগিরি করে গঞ্জে-বাজারে। বর্ষা নামলে আবার যে-যার ঘরে ফিরে আসে, চাষ আবাদের কাজে লেগে যায়। বড় কদর তখন মরদগুলোর। বড়জোর তিনটে মাস সুখ, তারপর কার্তিকে-টানার সে-সুখ নিঙড়ে নেয়। বনহোগলার মানুষ-গুলোর সে-এক বিচিত্র কাহিনী জীবন-যাত্রার। কিছু ঠিক নাই, সবই অনিশ্চিত খাওয়া-পরা-বাঁচা।

এমনি একবার চাষ উঠে যেতে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল ভুবন। দু দিনের হাঁটাপথে এসে পড়ল রায়মণির হাটে।

হাটের একটা পুকুরে তখন জাল দিয়ে মাছ ধরা হচ্ছে। পুকুর পাড়ে বসে চুপটি করে দিনভোর মাছ-ধরা দেখলে ভুবন। দু-চার পয়সার মুড়ি আর বেসনের ফুলুরি কিনে দিনের আহার শেষ করলে। রাতটা হাটেই কাটাবার মনস্থ করলে। আলাপ হলো জেলের দলের একজনের সঙ্গে। কাজের ভাবনা করতে হলো না। ভুবনকে আর। রায়মণির হাট থেকে পাকুড়তলা, সেখান থেকে বনরতলা আবার সেখান থেকে চিংড়ি খোলা! বর্ষা পর্যন্ত নির্ভাবনায় কেটে গেল। গায়ে গতর খাটলে আর ভাবনা কি! মাছ-ভাতের অভাব নাই।

জেলের দলের কর্তা রাধানাথ ভুবনকে বরাবর দলে রাখতে চেয়েছিল। বলেছিল, এবার তারা নদীতে মাছ-ধরা আরম্ভ করবে—ইলিশ মাছ! ফলতা-বিরিশি, ডায়মণ্ড-হারবার যাতায়াত করবে। মজুরী বাড়বে ভুবনের। জাত জেলে নয় ভুবন, রাজী হয়নি। এই যা হলো এই ভাল। আবার দেখা যাবে।

জেলে রাধানাথ বললে, একটা বাঁধা ব্যবস্থা হওয়া ভাল হে, এমনি ঘুরে-ঘুরে আর কতদিন রোজগার করবে?

ভুবন উত্তর দেয়নি, কিন্তু ও-প্রশ্নের উত্তরই হয় না। শুভানুধ্যায়ীরা এমনি চিরকাল জিজ্ঞেস করেন, কিছু হয় না। যেমনি চলছে, তেমনিই চলবে চিরকাল। সারা দুনিয়ায় কত উলোট-পালট হয়ে গেল বনহোগলার রাজবংশীদের অবস্থা যে-কে সে-ই—গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত শীত বসন্ত এক-ই ভাব। রোজগারের জন্যে সারা বছর নানা ফন্দি-ফিকির আঁটতে হয়, সন্ধানে থাকতে হয়। সব কাজ আয়ত্ত করে রাখতে হয়। কোন পছন্দ-অপছন্দ নেই জীবিকার! ঘর ছাইতে যে পারে, ধান কাটতেও সে পারে আবার মোট বইতেও পারে! পেট-চলা নিয়ে কথা। চলে গেলেই হলো দিন।

শেষে ঐ মাছ-ধরা প্রধান জীবিকা করলে ভুবন। বনহোগলার রাজবংশীদের অবস্থা তখন কাহিল, দিনমজুরী সম্বল! তাও অনিশ্চিত, টেনেটুনে বছরে তিন মাস।

রায়মণি হাটের জেলেদের কাছে শিক্ষা নিয়েছিল ভুবন। মাঠের ধান উঠে গেলে, এদিক-ওদিক চেয়ে দেখবে, কোথায় কার পুকুর-ডোবা আছে—জলে মাছ ফুরিয়ে নেবে, কপাল ভাল হলে টাকায় টাকা লাভ।

ভুবন জিজ্ঞেস করেছিল, জল দেখে মাছের আন্দাজ হবে কি করে?

রায়মণি হাটের বৃদ্ধ জেলে বলেছিল, ঐখানেই তো কারিকুরি, আসল! শোন তা হলে, জল ছাড়া মাছ নাই; আবার জলই আছে কেবল আঁশটি পর্যন্ত নাই! দেখে বুঝতে হবে মাছেদের মতিগতি।

শেষে রাধানাথ বলেছিল, জল দেখে মাছের আন্দাজ করা বড় শক্ত বিদ্যা। পুকুর-ডোবা একদিন দেখলে হবে না, অনেক দিন দেখতে হবে। এমন ভাব করবে যেন পুকুরে খাঁদা-পুঁটিও নাই। সকালে দেখবে, দুপুরে দেখবে, সন্ধ্যাকালে দেখবে। চুপটি করে পুকুর পাড়ে বসে থাকবে—মাছের সাড়া-শব্দ চিনবে, বুঝবে। সন্ধ্যাকালে ঠিক সময়—গাছপালার রোদ যখন নেমে এসে পুকুরের খোলে পড়বে, চারদিক নিঝুম হয়ে যাবে, তখন দেখবে পুকুরে একটা মাছ থাকলেও সেটা জলের ওপর উঠে তখন সাড়া করবে—এ একটা ভুল! তার নয় তো গভীর রাতে এসে জলের ওপর মাছেরা বড় সাড়া দেয় তখন।

সেবার মাঠের ধান উঠে যেতে ভুবন পুকুরের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল। রাধানাথের সকল কথা তার মনে ছিল। এদিক-ওদিক দু-পাঁচটা পুকুর দেখলে, দরে বনিবনা হলো না। শুধু মাছের দর নয় জলেরও দাম চায় মহাজন।

ছোট্ট মত একটা পুকুর পেল ভুবন গোপালপুরে। পঞ্চাশ টাকা ফুরন। জল
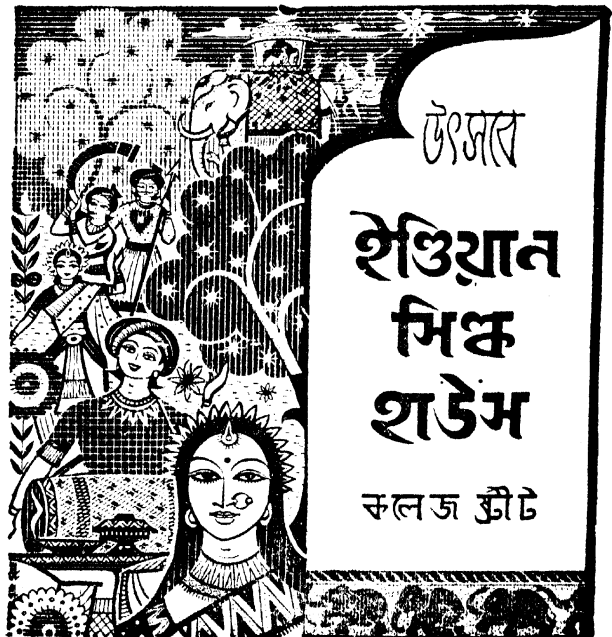
ছেঁচে মাছ ধরে নেবে ভুবন, মালিককে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে আগাম। কদিন খুব ঘোরাঘুরি করলে ভুবন, নানাভাবে পরখ করলে পুকুরটাকে। তেমন কিছু আশাপ্রদ দেখলে না। কোন সময় কোন সাড়া-শব্দ নেই, মছেদের টিকির ঠিকানাও না। ঝোঁকের মাথায় 'ফুরন' করাটা বুঝি ঠিক হয়নি, টাকাটা বরবাদ যাবে।

পুকুরের মালিক টাকা আগাম চেয়েছে। আগে টাকা তারপর কাজ। ধারে বরাতে কাজ নেই, লাভ হয় তোমার, লোকসান হয় তোমার—মালিকের সম্পর্ক টাকার সঙ্গে।

আরো দুজন সংগী জুটিয়ে নিলে ভুবন। জল ছেঁচবার জন্যে একটা তালের ডোঙা সংগ্রহ করলে, মাঠের মাঝখানে কুঁড়ে বেঁধে রইল কদিন। পঞ্চাশ টাকার ওপর আরো কোন না পঁচিশ টাকা খরচ হয়ে গেল। বড় দুর্ভাবনায় কদিন কেটেছিল ভুবনের, প্রথম হাতে খড়ি—গোড়াপত্তন। মোটা মানসিক করেছিল ভুবন গোপালপুরের পঞ্চাননতলায়। দেখো বাবা যেন লাভ হয়।

তিন দিন, তিন রাত ডোঙা-কলে জল ছেঁচার পর একটু যেন আশার সঞ্চার হলো, মাছের মুখ দেখা গেল। ভুবনের চোখে ঘুম নেই, অল্প জলে মাছগুলো কিলবিল করে, ভুবন তাদের পিছনে পিছনে ছুটে বেড়ায়। কোমরে একফালি নেকড়া জড়ান, গা ময় কাদা সে এক মূর্তি ভুবনের। তাক-বাগ বোঝে না, চরকির মত ঘুরে বেড়ায় পুকুরময়।

কিন্তু প্রথম লাভ হয়েছিল ভুবনের। মোটা না হোক, কমও নয়। মাছের দরও পেয়েছিল খুব। পঁচিশ টাকা মণ, পাঁচ মণ মাছ উঠেছিল। জাওলা মাছের হিসেব করেনি। কাকে-বকেও খেয়েছিল অনেক। সে এক উত্তেজনা!

সেই সূত্রপাত কর্মান্তরের। শূন্য মাঠে ফাগুনের তাত ফুটলে, খাল-বিল-পুকুর-ডোবা শুকোতে আরম্ভ করলে কাজ আরম্ভ হয় ভুবনের।

তা বলে খুব সুখের কারবার ছিল না ভুবনের। সেই টানা-ছেঁড়া, এখান-ওখান। মাছের দরই বা কি ছিল তখন! কাজে-কর্মে যা একটু পদে উঠতো, দশ-বিশ টাকা মণ হাঁকা যেত। পুকুর ডোবায় তখন মাছও যেন আপনি জন্মাত। এখনকার মত অত আদিখ্যেতা ছিল না মাছ নিয়ে, এত মারা-মারি কাটাকাটি, কাকুতি-মিনতি! কি হলো মাছের বাজার দিনে দিনে। যারা মাছের নামে নাক সিঁটকাতো তারা পর্যন্ত এগিয়ে এল মাছ নিয়ে কারবার করতে। মাছের গন্ধ পদ্ম গন্ধ হয়ে গেল। মাছের মর্যাদার সংগে রাজবংশীরা অনেকে মর্যাদা হারালে, ডালায় করে হাটে-বাজারে মাছ বিক্রী করতে লাগল। বৌ-ঝিরাও এল, ঝাঁকা মাথায় নথ নাকে, পাছাপাড় শাড়ি পরনে। হরিণডাঙগার বাজার এখন গুলজার! মাছের চেয়ে মেছুনীর সংখ্যা বেশী!......

সহজে ঘুম আসে না আজকাল ভুবনের। বুড়ো হয়েছে নানা চিন্তা মাথার মধ্যে পাক খায়। উঠে আগুনে মালসাটার সন্ধান করলে। খুঁচিয়ে আগুনে বার করলে, সিগারেটের টিনে থেকে তামাক নিয়ে কলকের সাজলে। হুঁকো হাতে পুকুর পাড়ে এসে হুঁকো টানতে লাগল আপন মনে। হাজার টাকায় পুকুর জমা নিয়েছে মদনের মা। ভুবন বারণ করেছিল, অত টাকার মাছ পাবি না, লোকসান হবে! মদনের মা শোনেনি। পরামর্শ-দাতা জুটেছে!

তাই ভাবছে বসে বসে ভুবন। শোনা কথায় বিশ্বাস করতে নেই। এ কি তোর শোল শাল লেটা যে আপনি জন্মাবে, পোনা মাছ চাষ করতে হয়। পাঁচ ভাগের পুকুর, ক' পয়সার মাছ ফেলেছে তার ঠিক কি। দর হাঁকালেই হলো! মাগীর পয়সাটা নির্ঘাত বরবাদ হবে, তখন বুঝবে।

পিছনে একটা শব্দ হতে ভুবন পিছন ফিরে দেখলে। মদনের মা দাঁড়িয়ে। ওরও ঘুম হয়নি।

মদনের মা জিজ্ঞেস করলে, কি বুঝলে? টাকা মিলবে? ভুবন উত্তর দিলে না। আপন মনে তামাক টানতে লাগল।

অনেককালের শান-বাঁধান ঘাট ভোঁড়ের পুকুরের, ভেঙে-চুরে যেটুকু বাকি আছে না থাকার সামিল। ক' খানা ইঁটের পাঁজায়, চুনসুরকির চাবড়া। একধারে এসে জলের দিকে চেয়ে বসল মদনের মা। জল দেখা যায় না, ভোঁড়ের পুকুরের এধারে অন্ধকার বড় বেশী যেন!

হঠাৎ একটা বিকট শব্দ হলো পুকুরের মাঝখানে। যেন একটা তাল গাছ ভেঙে পড়ল জলের মধ্যে। ভুবনের হুঁকোর শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। মদনের মার গলায় খুশীর ঢেউ উঠল। বললে, তবে যে বল মাছ নেই পুকুরে! ঐ তো—তো! শুনলে?

ক্ষোভের সুরে ভুবন বললে, আমি কখন বললুম! আমি বলতে যাব কেন?

মদনের মা বাঁকা সুরে বললে, তা বলবে কেন, মহা পাতক হবে যে! মদনের মার উল্টো চাপ। ভুবন চুপ করে থাকে। হয়তো পুকুরের একটা-দুটো সেয়ানা মাছ আছে—তাতে টাকা পোষায় না।

মদনের মার সে-খেয়াল বুঝি আছে। হাজার টাকার হিসেব সে কম করেনি। দশ মণ মাছ উঠলেই পুষিয়ে যাবে। কত বছর জাল নামেনি ভোঁড়ের পুকুরে শরিকে শরিকে মন-কষাকষি করে। খবর নিয়েছে মদনের মা লোক পরম্পরা। সবই কি মিথ্যে, বাজে?

ইদানীং ভুবনের কেমন কোন ব্যাপারে উৎসাহ নেই। আগের মত নিজের মতটা জোর করে বলে না ভুবন। উড়ো-উড়ো, ছাড়-ছাড় কেমনতর ভাব যেন। লোকসান হবার কথাটা তখন জোর করে বললে কি সে আর শুনতো না। লোকসান হবে—ব্যস, আর কোন কথা নেই, যুক্তি পরামর্শ নেই একটা! সর্বক্ষণ তেতেই আছেন। কি যে কারণ?

সব কাজকর্ম আজকাল তাই রতিকান্তকে দিয়ে করাতে হয়। রতিকান্তই ভরসা। ফড়েকে ফড়ে, জেলেকে জেলে। খাটতেও পারে অসুরের মত রতিকান্ত জানপ্রাণ দিয়ে।

ভোঁড়ের পুকুর-পাড়ে ভাঙা ঘাটে দুজনে চুপ করে বসে রইল।

হাউই বাজির মত একটা তারা বুঝি সরে গেল আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। মুখের আগুনে মুহূর্তেই নিবন্ত।

যেন শুনিয়ে শুনিয়ে মদনের মা বললে, তারা খসল একটা, লক্ষণ ভাল নয়!

তবুও ভুবন চুপ। হাতের হুঁকো নিভে গেছে। লক্ষণ ভাল-মন্দে তার কিছু যায় আসে না। পুকুর বিলি-ব্যবস্থা নিয়ে সে
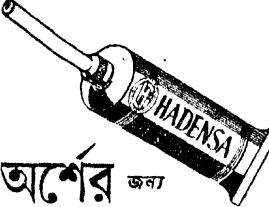
কারবার করে না আর। লাভ-লোকসান তার নয়! মদনের মার।

হঠাৎ বেঁকা সুরে মদনের মা বললে, যার ভাল না লাগে দলে না থাকতে পারে! ন' শ' পঞ্চাশ কারো খেয়ে রাখিনি!

ভুবন মুখ তুলে চেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে। অনেক কথা শোনাতে পারে মদনের মা আজ-কাল। বোল ফুটেছে। পয়সার গরম হয়েছে!

সুরটা চড়া করে মদনের মা বললে, অমন করে চাইবার কি আছে! না-পোষালে কাউর পায়ে ধরে সাধবুনি তা বলে।

ভুবন বললে, সাধতে তোকে কে বলেচে?

মদনের মা বললে, সাধতে বলিনে কিন্তুক গোঁসা আছে?

ভুবন বললে, আতদুপুরে ঝগড়া করবি পুকুর পাড়ে বসে?

মদনের মার গলার স্বরটা বুঝি ভেঙে যায়ঃ কেন তুমি অমন করে থাকবে? অশান্তি কেবল আটপহর!

ভুবন বললে, বেশ আমি চলে যাব, তা'লে তোরা সুখে থাকবি!

কথাটা বুঝেও যেন বুঝতে পারে না মদনের মা। রেগে ফেটে পড়ে, সব শেষ করে এখন তো বলবে ও-কথা—এই না হলে পুরুষ মানুষের কথা!

বুঝি বিস্ময় বোধ হয় ভুবনকে। মদনের মা গুরুতর অভিযোগ করেছে, আজ সাহস হয়েছে! কি সর্বনাশ, চিৎকার করবে নাকি মেয়েমানুষটাকে—কার সর্বনাশ? না, থাক।

ভুবন বললে, পুরুষমানুষ হলে কি আর মেয়েমানুষের নাক নাড়া খাই পড়ে পড়ে!

মদনের মার রাগ যেন বেড়ে ওঠে। বললে এখন মেয়েমানুষ তো খারাপ! উচিত কথা বললে গায়ে জ্বালা ধরে!

ভুবন কথা বাড়ায় না। লাভ নেই। বুঝেছে তার দিন ফুরিয়েছে। মদনের মা যতই বলুক। স্বাধীন মেয়েমানুষ, হাতে পয়সা হয়েছে—মূল্য কত তার!

জ্বালা কিন্তু মদনের মার। এ পথে তাকে ভুবনই একদিন দয়া করে এনেছিল। বড় খাতির করেছিল। হাতের দোসর ছিল সে। ভুবনের কথায় উঠতো-বসতো সে। ছেলে কোলে করে বিধবা হয়েছিল। সেই ছেলে মরতে অসহায় হতে ভুবনই তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। বড় অবস্থান্তরে পড়েছিল সেদিন মদনের মা। সে-কৃতজ্ঞতা তার আছে। কিন্তু তার জন্যে এত কেন? অমানি সে করে না ভুবনকে। কেন ভুবন বোঝে না সে-কথা? তফাত থেকে তাকে এমনি অপমান করবে? নিজ হাতে পয়সা নাড়ে বলে তার হিংসে? অত যদি, নিজে কেন কারবার দেখলি না—কে বলেছিল? মদনের মা কি করতে পারে তার! তবু বলছে তো, মেয়েমানুষ আমি, সব দিক দেখতে পারি না, তুমি দেখ! রতিকান্তর কথাই আসে না।

আবার দুজনে পিঠ ফিরিয়ে চুপ করে বসে থাকে। আকাশে হয়তো আরো একটা তারা খসে গেল। মদনের মা লক্ষ্য করে না। যা হবার হবে, হাজার টাকা ঘেঁটে গেলে তার দুঃখ নেই। দরকার হলে মাছ ধরা কারবার ছেড়ে দেবে, ধান-ভেনে-কুটে খাবে! অত লোকের মনস্তুষ্টি করতে পারে না সে! বয়ে গেছে তার!

বনহোগলার রাজবংশীরা তখন মরে বেঁচে আছে। দেড় টাকা মণের ধান, তাই সংগ্রহ করতে উদয়-অস্ত নাকে দড়ির বেহদ্দ! টাকায় আটটা জন-মজুর, আট দিন খাটলে তবে পেট ভরে, পরনে কাপড়, মাথায় তেল ওঠে। দিন চলাই দায়। মজুরী নাই। চাষ ফুরতে কদিন! ফন্দি-ফিকিরও শেষ হয়ে যায়, মাটি কাটা, কোদাল কোপান, মুটে গিরি কদিন চলে? দেশে-গাঁয়ে কাজ কোথায়?

রাজবংশীর জোয়ান জোয়ান মদ্দগুলো প্রায় বারো মাস নিষ্কর্মা! শুয়ে-বসে-ঘুমিয়ে দিন কাটে না। নেশা-ভাঙ-এ চুর হয়ে থাকে। বিকল্প উপবাস!

জাত-ব্যবসা ছেড়ে ভুবন তখন মাছের কারবার শুরু করেছে। দু পয়সা রোজগার হচ্ছে এদিক-ওদিক করে। যেন একটা প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে সে! কেউ ভাল বলে, কেউ মন্দ বলে। কিন্তু অত কথায় ভুবনের কান দেবার সময় নেই কদিনই বা গাঁয়ে থাকে! কাঁহা-কাঁহা মুলুকে ঘুরে বেড়াতে হয় পুকুরের সন্ধান করে! সময় কোথায় গ্রামের 'বিত্তান্ত' করে। মাঝে মাঝে এসে ঘর-সংসার দেখে যায়, কখনো এক বেলা, কখনো এক রাত। এলো-কেশীকে সাবধান করে যায় খুব সাবধান! বড় ছ্যাঁচড়ের উৎপাত, খবরদার!

নতুন কাজে বড় উৎসাহ পেয়েছিল ভুবন। ধ্যান-জ্ঞান কেবল। জল আর মাছ, দুনিয়ায় আর কিছু যেন নেই। বর্ষার দিনেও রেহাই দিতো না ভুবন—বাঁধ জমা নিয়ে কুঁড়ে বেঁধে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিতো। ঘনি-মগরিতে মাছ উঠতো অজস্র, হাটেবাজারে বিকোত। বর্ষায় খাল-বিল-মাঠ ডুবে একাকার হয়ে যেত, স্রোতের মুখে বাঁশের খাঁচা পুঁতে, জাল পেতে মাছ ধরতো ভুবন—চিংড়ি, পুঁটি, ট্যাংরা, কই, মৌরলা চুনোচানা রাশি-রাশি! কিন্তু মাছের আঁশটে গন্ধে কাছে ঘেঁষতে চাইতো না এলোকেশী। জেলের পরিবার নাকি সে? সৎচাষীর ঘরে বাপ-মা তার বিয়ে দিয়েছিল। ভুবন জাত-ধর্ম খোয়াতে পারে, কিন্তু এলোকেশী পারবে না। জেলেনী হবে না সে।

ভুবন রেগে-মেগে রাত দুপুরে কাণ্ড বাধাতো। মার-ধোর, বকা-ঝকা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা! দাসপাড়ায় হৈ-হৈ! এলোকেশীর পক্ষে সবাই—সত্যিই তো, জেলের গলায় মালা দেয়নি তো মেয়ে! গায়ের গন্ধে ভূত পালিয়ে যায় মানুষ তো কোন ছার! ছি ছি, জাত-জন্ম সব খোয়ালে ভুবন। কত বড় বংশ এই রাজবংশী ভুবন জানে না!

ভুবন চিৎকার করে বলতো, বংশ নিয়ে ধুয়ে খাগে যা তোরা, মাগ-ছেলে নিয়ে উপোস দে, পেটে চাবি দিয়ে বংশের চন্দনমেত্ত খা তোরা! আমি মানি না! না, যা—

তারপর এলোকেশী স্বামীর ঘর করেনি। ওরা করতে দেয়নি। ভুবনও কেমন বাউণ্ডুলে হয়ে গিয়েছিল। মাঠে-ঘাটে ব্যবসা নিয়ে দিন কাটিয়ে দিতো। পরিবারের কথা বললে বলতো, ইচ্ছে করলে অমন বিশটা মাগী রাখতে পারি। সত্যি-মিথ্যে পরখ হয়নি।

কিন্তু বেদম নেশা করতে আরম্ভ করেছিল ভুবন।

সেবারে বছরটা খুব 'শুকো' গিয়েছিল। খাল-বিল পুকুর শুকিয়ে খটখট। ভুবনের কারবার বন্ধ। বাধ্য হয়ে কদিন বাড়ি এসে বসেছিল ভুবন। নতুন বাড়ি-ঘর বানিয়েছিল, লাল টালির চাল, গরাণের খুঁটি, তিন চালা।

শূন্যে মাঠের দিকে চেয়ে দাবার ওপর চুপ করে বসেছিল ভুবন। চোখের ওপর দিগন্ত ঘোলাটে। শীগ্‌গির বৃষ্টির কোন আশা নেই। এ বছরে কারবার ঘেঁটে গেল। মালিকের ইচ্ছে! নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় ভুবনের—সত্যিই জাত-ই গেল পেট ভরলো না! বসে থাকেনি সে সত্যি, কাজ সে পেয়েছে বারোমাস, কিন্তু তাতে কি! অবস্থার তার কি উন্নতি হয়েছে? কিছু না, যতক্ষণ আয় ততক্ষণ—তারপর দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই নেই, সে-ই। তার আশে-পাশে যারা ভাগ্যকে মেনে নিয়ে জাত-ধর্ম আঁকড়ে পেটে কিল মেরে পড়ে আছে, দেশের মাটি কামড়ে তাদের সঙ্গে তার তফাতটা কোথায়? সেই দৈন্য!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল ভুবনের। তাও শান্তি থাকতো, এলোকেশী যদি অমনি করে পাঁচজনের কথায় চলে না যেত। কি না মাছের গন্ধ গায়ে একটা বাজে অজুহাত, শুরু থেকেই এলোকেশী খুঁত খুঁত আরম্ভ করেছিল। সেবারে সঙ্গে ওষুধ এনেছিল ভুবন—ফুলেল তেল, গন্ধ সাবান!—তা কি বার করতে দিলে এলোকেশী? চেঁচামেচি করে পাড়া মাথায় করলে। যাক, যাবি অমন কেলেঙ্কারী করবার কি দরকার?

সব জানে ভুবন। কার মনে কি, কোথায় কি। চুপ করে আছে। ঘরের কথা ঘাঁটিয়ে লাভ কি। নষ্ট মেয়ে এলোকেশী, নিষ্কর্মা রাজবংশীদের কেউ সাধু নয়!

চোখের ওপার ঝলসান দিগন্ত দপ দপ করছে। ভুবন ঘরের মধ্যে উঠে গেল। টলতে টলতে খানিক পরে ফিরে এল বেহুঁশ মাতাল! সারা গ্রীষ্মটা এমনি করে ঘরে।

সেবার বর্ষার প্রথমটায় ভুবন বেরব বেরব করছে। আবার সব ডেকে-ডুকে জুটিয়ে নিতে হবে। দল বাঁধা সে এক হাঙ্গামা! একে পাওয়া যায় তো তাকে পাওয়া যায় না, তাকে পাওয়া যায় তো ওকে পাওয়া যায় না! ছুটোছুটি!

দুর্দিম বৃষ্টি হয়ে একটু তাত কমেছে। দূরে থেকে দিগন্ত সবুজ মনে হয়। অনন্ত, প্রমথ, বিপিন, যোগীন্দ্র ভিন্ গাঁ থেকে আজ আসবে সবাই, কথাবার্তা পাকা হয়ে যাবে, কোথায় কি ভাবে যাওয়া হবে মাছ ধরতে। কাটা-খালি না দিঘীরপাড়, না হিঙ্গেবেড়ে? এখন বাঁধ জমা নিতে হবে বড় দেখে! মাঠে জল লাগলে মাছের ভাবনা হবে না!

নজর বুঝি কিছু মোটা হয়ে গেছে ভুবনের। প্রথমটা চিনতেই পারেনি, তারপর বসে কাটিয়ে দিলে ভুবন।

যখন চিনলো অবাক হয়ে গেল। কি ব্যাপার? স্বজাতির কেউ বড় একটা খোঁজ-খবর নেয় না তার। একঘরে সে! কৈবর্তর ছেলে মাছ ব্যবসা করে!

আথালু-থালু রুক্ষ বেশ, কেমনতর যেন হয়ে গেছে মেয়েটা। সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। ভুবন বললে, কাঁদচিস কেন? উঠে আয় ইদিক, কি হয়েচে বল!

কেঁদে-ককিয়ে মদনের মা নিজের অবস্থাটা জানালে। তার স্বামী মরেছিল অনেক দিন, কোলের ছেলেটাকে নিয়ে সে শ্বশুর বাড়ি পড়েছিল লাথি-ঝাঁটা খেয়ে—তারপর ছেলেটা মরতে নির্যাতনের একশেষ। টিকতে পারলে না আর। পালিয়ে আসতে পথ পেলে না। কিন্তু এখানেও সেই অবস্থা, নির্যাতন নাই থাক, ভাত-কাপড় নেই কারো ঘরে—রাজবংশীরা সর্বস্বান্ত হয়ে আছে! আজ চারদিন উপোস করেছে, আপদবালাই বলে বাপ-ভাই দূর-ছাই করছে।

ভুবন বললে, আমি তার কি করবো? ঘরে ভাত নাই জাত আছে!

মদনের মা বললে, তুমি একটা বেবস্থা কর দাদা, না তো বল গলায় দড়ি দিই তোমাদের সামনে!

ভুবন চুপ করে রইল। কি ব্যবস্থা সে করবে? মদনের মাকে ছোটকাল থেকে সে দেখে আসছে। কি বাপের ঘর, কি স্বামীর ঘর কোনখানেই সুখ নেই! কপালে সুখ তাদের জন্যে নয়, অনিশ্চিত জীবিকার যা প্রাপ্য! বনহোগলার রাজবংশীদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা হবে কেন!

ভুবন বললে, আমার কাজ অতি ছোট, মাছ ধরা! কি তোর জন্যে করি বলদিকি!

মদনের মা বললে, বড় কাজের মানুষ তো দেখলুম জনমভোর, করলুমও তো কত! এবার ছোট কাজ করে দেখি, বাঁচি কি মরি!

ভুবন বললে, বাঁচতে যদি চাস তা হলে আসতে পারিস, আমি মাছ ধরবো, তুই সে-সবের বিলিব্যবস্থা করবি!

মদনের মা বললে, তাই করবো দাদা, তুমি আমাকে সঙ্গে নাও।

সঙ্গে নেওয়া মুখের কথা নয়। অনেক ফন্দি-ফিকির করে তবে দলে টানতে পেরেছিল ভুবন মদনের মাকে। বনহোগলার রাজবংশীদের জাত-মান তখনো খুব! মদনের মাকে নিয়ে ভুবন গ্রাম ছেড়েছিল। অনেক বদনাম রটেছিল। পুকুর জমা-নেওয়া মাছের ব্যবসা জমিয়েছিল।—তারপর যা হয়, হাতে কাঁচা পয়সার যা পরিণতি—নেশা ভাঙ-এ বদখেয়ালে রাতদিন মশগুল হয়ে থাকতো ভুবন। দেখাদেখি তখন আরো অনেকে এ কারবারে নেমেছে, জোর প্রতিযোগিতা চলছে—পুকুরের গেঁড়ি-গুগ্‌লিরও তখন দাম হয়েছে। মদনের মা সাবধান করে আগলে আগলে পারে না, মানুষটা একেবারে বেহেড হয়ে গেছে। শেষে নিজ হাতে রাশ টেনে ধরলে, মদনের মা। নিজেই মহাজন, ফড়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালালে, ছোটাছুটি করতে লাগল এদিক-সেদিক! যেন ভুবন তাকে মাইনে করা চাকরানী রেখেছে! অনেক কষ্টে কারবারটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল মদনের মা। অনেক খোয়ার তার হয়েছে এ পথে এসে। সাধে কি আর সে আজ এমনি হয়েছে। মূলে সন্ন্যাসী নষ্ট হয়ে গেলে যা হয়!

যারা একদিন বদনাম রটিয়েছিল, দূর-ছাই করেছিল আজ তারাই এসে মদনের মার দলে যোগ দিয়েছে। বনহোগলার রাজবংশীরা তো এখন জেলে, ঘরে ঘরে মাছের কারবার করে! চাষবাস কবে ঘুচে গেছে! জাত-ব্যবসা এখন মাছ ধরা, বেচা-কেনা! কোন দুর্ণাম নেই, কোন অপমান নেই, মেছো বলে ঘৃণা নেই। মদনের মার অনেক খাতির, অনুগত অনেকে!

বুড়ো-হাবড়া, বেয়াড়া লোক দিয়ে কারবার চলে না। অনেক কায়দা করে বঙ্কু-বিহারীর দল থেকে রতিকান্তকে ভাঙিয়ে এনেছে মদনের মা। সেই রতিকান্তর ওপর যত আক্রোশ ভুবনের। কেবল রাগ আর রাগ! রতিকান্ত যেন ওর ভাত-ভিত নষ্ট করে দিলে! রতিকান্তর মতলব ভাল নয়! মানিয়ে চলবার, সম্মান করবার অনেক চেষ্টা করেছে মদনের মা কিন্তু ভুবন বোঝেনি—সেই এক ভাব, আড়-আড় ছাড়-ছাড়! যেন দয়া করে দলে আছে, কৃতার্থ করছে।

না আর সহ্য করবে না মদনের মা। মাছধরা কারবার ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না। এতগুলো লোকের রানী সে! মধ্যমণিও!

ভোঁড়ের পুকুরের মাঝখানে সেয়ানা মাছের সাড়া হলো। যেন ভুবনের মুখের ওপর অবজ্ঞা ভরে ভোঁড়ের পুকুর জবাব দিলে—মাছ নেই তবে যে বলিস্ বুড়ো হাবড়া! দেখ!

কোন কথা বললে না ভুবন। চুপ করে উঠে দাঁড়াল। আবার একটা জোর শব্দ হলো

জলের ওপর বড় মাছ উল্টে পড়ার। আজ সবাই মিলে ভুবনকে ঠাট্টা করছে! মাছগুলোর পর্যন্ত ভয় ডর নেই, ভুবন দাস পাড়ে বসে আছে সে-খেয়াল নেই। ইচ্ছে করলে এক ডুবে সব কটার টুঁটি ছিঁড়ে আনতে পারে!

পাশ কাটিয়ে চালা ঘরটার দিকে হুঁকো হাতে এগিয়ে গেল ভুবন। রতিকান্ত এসে দাঁড়িয়েছে পুকুরপাড়ে। মাগীর সঙ্গে কারবারের কথা হবে! ভুবন জানে তার কথা নিয়ে হাসাহাসি করবে!

রাতের বেলায় আশানুরূপ মাছ ওঠেনি ভোঁড়ের পুকুরে। ভোরের দিকে আর একদল নেমেছে জাল নিয়ে। পাড়ে দাঁড়িয়ে মদনের মা তদারক করছে, পাশে রতিকান্ত।

রতিকান্ত বললে, ভাববার কিছু নেই, ও ঠিক পুষিয়ে যাবে! জাল তাই ভাল করে টানতে পারলো একবারও? লাফ কেটে কত মাছ পালাল ওপর দিয়ে! সেয়ানা মাছ অনেক আছে!

বিশ্বাস বুঝি হারিয়েছে মদনের মা। সূচনা আশাপ্রদ নয়। রাতে জাল টেনে মাত্র মণ খানেক মাছ উঠেছে! মজুরিই পোষায়নি। প্রথম টানে যদি মাছ না হলো, আর কবে হবে? জাল-ছেঁড়া, পোলো ভাঙা আর কটা আছে যে, টাকা ভরবে! টাকাটা গেল!

রতিকান্ত আশ্বাস দিলে, আজকের পুকুরের জল দেখে মাছের বিচার করবে! এখনো কমসে কম দশ মণ মাছ আছে, এক সের আধ সের না, পাঁচ-দশ সের করে এক একটা মাছ!

মিইয়ে মদনের মা বললে, রাতের বেলা একটাও বড় মাছ উঠতে নেই?

রতিকান্ত বললে, উঠবে। ভাল করে জালই টানলে না সব, ভয়ে মরল! কি না কি পুকুরে জোঁক আছে! ফাঁকিবাজ সব!

মদনের মা বললে, কাঁহার মাঝখানে জাল আটকে গিছলো! উড়িয়ে দিয়ে রতিকান্ত বললে, ও কিছু না, কোন গাছফাছ পড়ে আছে বোধ হয়—পুরোন পুকুর!

দিনের বেলাও সেই ভয়ে যারা জলে নেমেছে, পরস্পরকে পরস্পর আঁকড়ে আছে জালের কাছি ধরে—বুক জলে কাদার মধ্যে পা পুতে পুতে সাবধানে এগিয়ে চলেছে জালীরা! নিস্তব্ধ পুকুরপাড়, লোকালয় থেকে অনেকদূরে ভোঁড়ের পুকুর—চারপাশে তাল-খেজুরের ছায়ায় জলের রঙ কালো কাক-পক্ষ!

প্রায় দম বন্ধ করে মদনের মা দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে রতিকান্ত জালীদের নির্দেশ দিচ্ছে—এই কর, সেই কর!

পুকুরের মাঝখানে এসে মহাজাল আটকে গেল। অনেক টানাটানি করে জাল ছাড়ান গেল না। দুদিক থেকে টান দিয়ে জালীরা প্রাণান্ত। উল্টো টান দিয়েও জাল ছাড়ান যায় না। শেষটা ডুবে ছাড়ানর কথা হলো। কিন্তু কেউ সাহস করে না! ভোঁড়ের পুকুরের অনেক দুর্নাম। জোঁক আছে। পুকুর প্রতিষ্ঠার দিন যে শিশুকন্যার প্রাণ উৎসর্গ করা হয়েছিল সে নাকি অপদেবতা হয়ে আজো পুকুরের মাঝখানে বাস করছে। ডুবলে আর রক্ষা নেই, ঘাড় মটকে পাঁকে পুতে দেবে আর ভেসে উঠতে হবে না!

কোন উৎসাহ বাক্য কেউ তুললো না। কারো সাহস হলো না ডুবে দেখতে জাল আটকেছে কিসে। জালীদের কেউ কেউ আতঙ্কে বললে, জালটা টেনে নিচ্ছে কেউ পুকুরের মাঝখানে। পাড়ে দাঁড়িয়ে রতিকান্ত অকথ্য গালাগাল দিলে, এত যাদের ভয় তারা মাছ ধরতে আসে কেন! দর কাষি করলেই জালি হলো! মাগনা পয়সা!

জালীদের একজন বললে, কাজটা করে তুমি দেখিয়ে দাও না কেন! ডাঙা থেকে ফাঁট্টুনি অমন অনেকে করতে পারে! মাতব্বর হয়েছো বড়।

রতিকান্তর মাথায় রাগ চড়ে গেল। কোন কথা না বলে কাঁধের গামছাটা কোমরে জড়িয়ে নিলে। পরনের কাপড়টা দলা পাকিয়ে পাড়ে ফেলে দিয়ে ঝপাত করে জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। মদনের মা হা হা করে উঠলো।

অনেকক্ষণ সময় গেল জলের শব্দটা মিলিয়ে যেতে। জালীরা দুধার থেকে জালের দড়ি বাগিয়ে ধরল। রতিকান্ত ডুবল, খানিক পরে আবার উঠলো, আবার ডুবল। নিঃশ্বাস বন্ধ সবার! জাল ছাড়ান যায় না। রতিকান্তর দম বুঝি ছুটে যায়! পাড় থেকে স্পষ্ট শোনা যায় না রতিকান্তর কোন কথা—কি অভিজ্ঞতা তার ডুবে দেখার।

তবুও জালীদের কেউ এগিয়ে যায় না রতিকান্তকে সাহায্য করতে। যেন সবাই আড়ষ্ট হয়ে আছে অজানা ভয়ে। মদনের মা জনে জনে অনুরোধ করে, তোরা একটু এগিয়ে দেখ না বাপ সকলরা! মানুষটা একলা কাহিল হয়ে পড়েছে।

কখন ভুবন এসে পাড়ে দাঁড়িয়েছিল কেউ লক্ষ্য করেনি। চোখ দুটো ভার-ক্লান্ত জানোয়ারের মত স্তিমিত। ডুবে ডুবে রতিকান্ত যেন তার পৌরুষকে ধিক্কার দিচ্ছে। এ সময় পাড়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখা কাপুরুষেরই লক্ষণ! রতিকান্তর সাহস আছে। জাল ছাড়াতে না পারুক ডুবে দেখাচ্ছে ভোঁড়ের পুকুরের তলদেশ, যকের রাজ্য।

মদনের মা প্রায় সকলকে রতিকান্তর সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যেতে বললে, সবাই মিলে ডুবে দেখুক মহাজাল আটকেছে কিসে। রতিকান্ত একলা হাঁপিয়ে উঠেছে যে!

লক্ষ্য করেও যেন মদনের মা লক্ষ্য করে না ভুবনকে। হয়তো ভুবনকে একজন বলেই স্বীকার করে না সে আর। কি সামর্থ্য আছে, শক্তিই বা কি? বাতিল করে দিয়েছে তাকে মদনের মা অনেকদিন।

অভিমানে মুখটা থম থমে হয়ে উঠলো ভুবনের। দৃষ্টিটা যেন ঝাপসা হয়ে এল। ঠাট্টা করে সে মদনের মাকে বললে, তুই জলে ঝাঁপ দেনা, তোর আঁচল ধরে কান্ত উঠে আসবে! আহা বেচারা ডুবে মরবে!

কোন কথা বললে না মদনের মা। সজল চোখে ভুবনের মুখের দিকে চাইলে। ভুবনের বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠলো। ভুবন ঝপাং করে জলে ঝাঁপ দিলে। যেন আক্রোশে দুজনেই একসঙ্গে ডুব দিলে জাল ছাড়াতে। ভুবন, রতিকান্ত!

পুকুরপাড় নিস্তব্ধ! যেন নিশ্বাস বন্ধ সবার অস্থির চরাচরের। ভোঁড়ের পুকুরের জলে কোন সাড়া নেই। অজস্র বুদ্বুদ উঠছে কেবল!

খানিক পরে রতিকান্ত ভেসে উঠলো জলের ওপর। হাত নেড়ে ইশারা করলে জাল টানতে। জালীরা জালে টান দিলে দুদিক থেকে। মহাজাল এগিয়ে চলল পুকুরের ওপারে।

কিন্তু ভুবন যে আর জলের ওপর ভেসে ওঠে না। জলের মধ্যে কি করছে এখনো? এত দম পেলে কোত্থেকে। পাড়ে দাঁড়িয়ে মদনের মা চিৎকার করলে, ভুবনদা কই, ভুবনদা কই? দেখ না তোরা উঠছে না কেন!

কে দেখবে? রতিকান্তর দম ছুটে গেছে। চিৎ হয়ে জলের ওপর ভেসে দম নিচ্ছে। মনে হচ্ছে জলের ওপর নিশ্চিন্ত খেলা করছে। আর ভয় নেই!

মহাজাল পাড়ে উঠলো। অনেক খোঁজাখুঁজি হলো আবার জাল নামিয়ে। ভুবনকে পাওয়া গেল না। বেলা শেষ হয়ে এল। মদনের মা ঘাটের ওপর চুপ করে বসে রইল স্তব্ধ হয়ে, ভোঁড়ের পুকুরের জলের মত স্থির।

কে তাকে ভুবনের খবর দেবে—সান্ত্বনা দেবে এই বিপরীত কাণ্ডের? স্বার্থপর মানুষগুলো এখন যে-যার নিয়ে ব্যস্ত!

সর্বভাষা কবি-সভা

অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়

বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্রের টীকাকার যশোধর বা যশোধরেন্দ্র কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে আশ্চর্য-সুন্দর কতকগুলো চারু-কলার উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতের সমাজ-জীবনে কাব্য রচনা, কবিতার আলোচনা ও কবিতা পাঠ ছিল অত্যন্ত বেশী আদরণীয়। যশোধরের উক্তি হ'ল, 'এতাঃ প্রহেলিকাদয়ঃ ষড় বচনকৌ শল্যান্তরা কলা ইত প্রায়শ উপযুজ্যন্তে ইতি সংগৃহীতাঃ।' কাব্যের ছত্রে ছত্রে প্রহেলিকা বা হেঁয়ালি সৃষ্টি করা অতি উঁচু দরের কাব্যকলা বলে গণ্য হত। কবিতার মাধ্যমে কথার খেলা দেখিয়ে আমোদ সৃষ্টি করা, পাঠকদের বা শ্রোতাদের ঠকিয়ে নিজের বিদ্যা জাহির করার চেষ্টাও এই কাব্যকলার সাহায্যে কবিরা করতেন। কাব্যতত্ত্বের আর একটি কলার প্রচলন ছিল সে যুগে, তা হ'ল দুর্বাচকযোগ—এমন সব কথা বা শব্দ কবিতার মধ্যে ব্যবহার করা, যার উচ্চারণ ও অর্থ বোঝা খুবই শক্ত। যেমন, একটি কথা হ'ল, 'বাশ্চারেড্‌ধ্বজধ্বক'। 'বাঃ' অর্থ 'বারি', অর্থাৎ জল, 'চার'—যে চরে। 'বাশ্চার' অর্থ হ'ল জলচর। 'ইট' অর্থ হ'ল শ্রেষ্ঠ। 'বাশ্চারেট্' অর্থ হ'ল, জলচরের প্রধান অর্থাৎ মকর। 'বাশ্চারেড্‌ধ্বজ' অর্থ হ'ল মকরধ্বজঃ অর্থাৎ কামদেব। তাকে যিনি পুড়িয়ে মেরেছেন, অর্থাৎ শিব। কাজেই 'বাশ্চারেড্‌ধ্বজধ্বক' শব্দটির অর্থ হ'ল শিব। সেকালে কাব্যচর্চার আর একটি উল্লেখযোগ্য কলা হ'ল কাব্যসমস্যা-পূরণ। একজন কবি হয়তো একটি কবিতার এক ছত্র উপস্থিত মতো তৈরি করে বললেন, সেই ছত্রটির সঙ্গে মিল রেখে ও বেশ খাপ খাইয়ে পুরো একটি শ্লোক রচনা করাই হ'ল এই কলার উদ্দেশ্য। এই কলাটি অলংকার শাস্ত্রের মধ্যে পড়ে। সংস্কৃত কবিদের মধ্যে এ ধরনের সমস্যা পূরণের খুব চল ছিল। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কবিদের মধ্যেও এই প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র খুবই কাব্যরসিক ছিলেন, তাঁর রাজসভায় এই ধরনের সমস্যা পূরণের ঢেউ বয়ে যেত। আজ থেকে প্রায় একশ বছর পূর্বে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সময়ে রসসাগর নামে একজন কবি কৃষ্ণনগরের রাজসভায় ছিলেন। কবিতার ছত্রে ছত্রে রসসাগর যেভাবে সমস্যা পূরণ করতেন, তা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। একদিন তাঁর দরবারের কবিসভায় মহারাজ গিরিশচন্দ্র কবিতার একটি মাত্র ছত্র বললেন, 'অমাবস্যা গেল আবার পূর্ণিমা আসিল'। কবিতার ছত্রটি শোনা মাত্র রসসাগরকে আর ভাবতেও হ'ল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে হেসে উত্তর দিলেন—

বেতো রুগী কেঁদে বলে কোন দিন বা ভালো
অমাবস্যা গেল আবার পূর্ণিমা আসিল।

রসসাগর যখন বৃদ্ধ, বিদ্যাসাগর মশায়ের তখন যৌবন। কাজেই এই সব ঘটনা খুব বেশী দিনের পুরানো নয়। বাংলা দেশে কবির লড়াই, তরজা, পাঁচালীকারদের ছড়া কাটা, এই সব কিছুর মধ্যেই কাব্য সমস্যা পূরণের অনেক রকমের চর্চা হত। অশিক্ষিত বা প্রায় অর্ধশিক্ষিত পল্লী কবিয়ালরা এই সব বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে কবিয়ালদের মুখে মুখে কবিতা রচনা করার আশ্চর্য ক্ষমতা ও উপস্থিত বুদ্ধি বিস্ময়কর। গ্রাম্য কবিয়ালদের উপস্থিত বুদ্ধি ও বাক্ চাতুরী সম্পর্কে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। অনেক সময় কিন্তু আবার এই সব গ্রাম্য কবিয়ালদের রচনায় শালীনতাবোধ, এমন কি ভদ্রতাবোধেরও অভাব দেখা যেত। কবিতার ছত্রে ছত্রে ও মাঝে মাঝে অশ্লীলতা, কবির বংশ মর্যাদা, সম্প্রদায় বা জাতি সম্পর্কেও অশোভন উক্তি প্রকট হয়ে উঠত। আজ থেকে প্রায়

'সর্বভাষা কবি-সভা' অনুষ্ঠানে 'রবীন্দ্র বন্দনা' শীর্ষক সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাচ্ছেন শ্রীচিন্তামন দেশমুখ। শ্রী দেশমুখের ডানদিকে আছেন হিন্দী কবি ভগবতীচরণ বর্মা, গুজরাতী কবি সুন্দরজী বেতাই এবং হিন্দী কবি ডক্টর হরিবংশ রায় বচ্চন। শ্রী দেশমুখের পেছনদিকে আছেন তামিল কবি তিরুলোক সীতারাম এবং শ্রী দেশমুখের বামে পাঞ্জাবী কবি সন্তোষ সিং ধীর ও শ্রীকালিদাস রায়

পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে পূর্ব বাংলায় হরি আচার্য নামে একজন বিখ্যাত কবিয়াল ছিলেন। ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা অঞ্চলে হরি আচার্য মশায়ের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। একবার ঢাকা শহরে এক কবির লড়াইয়ে হরি আচার্য মশায় উপস্থিত। আচার্য মশায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীও একজন খুব নামজাদা কবি। সেই প্রতিদ্বন্দ্বী কবি ঢাকা শহরের শঙ্খশিল্পী বা শাঁখারী সম্প্রদায়ভুক্ত। সেই শাঁখারী সম্প্রদায়ভুক্ত কবি কিছুতেই কোনক্রমেই হরি আচার্য মশায়কে ঠকাতে পারছেন না, কবিতার ভাষায় জিগ্যেস করেন, মুখের কথা ফুরোতে না ফুরোতে হরি আচার্য মশায় চমৎকার ছড়া বেঁধে তার উত্তর দিয়ে দেন—হরি আচার্যের ওষ্ঠাগ্রে যেন স্বয়ং দেবী সরস্বতীর অধিষ্ঠান। বার বার পরাভূত হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী কবির মাথায় রোখ চেপে যায়। হঠাৎ তিনি আচার্য মহাশয়কে জিগ্যেস করে বসলেন, 'বলুন তো দেখি, আকাশে ধূমকেতু উঠে কেন?' এই সব পল্লী কবিয়ালরা বিজ্ঞানসম্মত কারণের বিশেষ ধার ধারতেন না, কথায়, ছন্দে, মিলে চটকদার উত্তর খাড়া করতে পারলেই খুশী, প্রতিপক্ষও নিশ্চুপ। আকাশে কেন ধূমকেতু উঠে—এর উত্তরে কবিয়াল হরি আচার্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী কবিকে উদ্দেশ করে কবিতায় উত্তর দিলেনঃ

> শঙ্খেতে যে লক্ষ্মীর বাস
> তারে তুই কাটিয়া করিস ক্ষয়,
> শাঁখারী রে, সেই পাপেতে
> আকাশেতে ধূমকেতুর উদয়।

কাব্যসমস্যা পূরণের অনেক নজীর হাল আমলের কোন কোন সাহিত্যিক আড্ডা বা মজলিসী বৈঠক থেকেও পাওয়া যায়। ১৯৩৩-৩৪ সালের কথা, কাজী নজরুল ইসলাম তখন কলকাতায় গ্রামোফোন কোং-র গীত রচয়িতার উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। বৈশাখের মাঝামাঝি সময়ে একদিন দুপুরবেলা নলিন সরকার স্ট্রীটে গ্রামোফোন কোম্পানীর 'রিহার্স্যাল রুমে' তখনকার কালের কয়েকজন সংগীত শিল্পী বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে অপেক্ষা করছেন, একটু বাদেই কাজী সাহেব আসবেন; কাজী সাহেব এলে পরে তাঁর নতুন লেখা গানটিতে তিনি যে সুরারোপ করেছেন, তা নিয়ে শিল্পীরা মহড়া শুরু করবেন। কাজী সাহেবের আসবার সময় প্রায় হয়ে এল। ততক্ষণ শিল্পীরা মিলে খুব জমাটি আড্ডা দিচ্ছেন, নানা খোস গল্প করছেন। হঠাৎ কাব্যসমস্যা পূরণের বাতিক দেখা দিল কারো কারো। একজন বলে উঠলেন, 'অলস বৈশাখে', এদিকে কাজী সাহেব তৎক্ষণাৎ ঐ ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, 'অলস বৈশাখে' কথাটি আধ-খোলা দরজার আড়াল থেকে কাজী সাহেব শুনতে পেয়েছিলেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'কলস কৈ কাঁখে।'......সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল।

প্রাচীন কালের সংস্কৃত কবিদের মধ্যে কবি সম্মেলনে বা কবি-সভায় একত্রে মিলিত হয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করার রীতি খুবই শ্লাঘার বিষয় ছিল। যে কবি বিভিন্ন সম্মেলন বা সমারোহে আমন্ত্রণ পেতেন না, তিনি শুধুমাত্র যে কবি সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হতেন, তাই নয়, তিনি কোনোকালেও কবি হিসেবে আখ্যা পেতেন না, সাহিত্যিক সমাজে তিনি কোনো রকম প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত পেতেন না। অবশ্য দেশের রাজা বা কাব্যরসিক ধনী ব্যক্তিরাই মাঝে মাঝে কবিসভার আয়োজন করতেন। সংস্কৃত কবিদের মতে কবি সভায় কবির যোগ দেওয়ার কারণ হ'ল 'অনুরাগ— [illegible] আত্ম বিনোদার্থং চ'।

কবি সম্মেলনের সমারোহ পারসীক ও উর্দু কবিদের মধ্যেও খুব বেশী ছিল। মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের মধ্যে অনেকেই উঁচু দরের কাব্যরসিক ছিলেন। উর্দু কবিরা কবি সম্মেলনকে বলেন মুসাইরা আর মুসাইরায় যোগদানকারী কবিদের বলা হয় সাহের। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে কিন্তু মুসাইরার খুব প্রচলন ছিল না বা সাহেরদের খুব বেশী খাতিরও দেখা যেত না। সম্রাট আকবর সংগীতের আর শাহজাহান চিত্রকলা ও স্থপতি শিল্পের বেশী পরিপোষক ছিলেন। আওরংজেবের মৃত্যুর অনেক পরে মুহম্মদ শাহ্ যখন দিল্লীর তখত্-এ-তাউসে অধিষ্ঠিত, যখন মোগলের গৌরব রবি প্রায় অস্তমিত, সেই সময়ে উর্দু কবিদের মুসাইরা মোগলদের খোদ রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করে, তখন সাহেরদের কলরোলও সবচেয়ে বেশী জীবন্ত হয়ে উঠে। তারপর অযোধ্যার নবাবেরা একাধারে সংগীত, কাব্য ও নাটকের খুব বড় সমঝদার ছিলেন। অযোধ্যার নবাবগণ মুসাইরা অনুষ্ঠানকে উর্দু কবিদের জাতীয় সম্মেলন ও জাতীয় অনুষ্ঠানে রূপায়িত করে তোলেন। তাঁদের আমলে সাহেররা অজস্র শিরোপা পেতে থাকেন। মুসাইরা

অনুষ্ঠানকে নিন্দা করার বা মুসাইরা সম্পর্কে কটূক্তি প্রকাশ করার মত কবিরও কিন্তু অভাব ছিল না। প্রায় একশ বছর আগে কানপুরের কাছাকাছি ফাকুদ বলে এক জায়গার অধিবাসী একজন প্রখ্যাতনামা উর্দু কবি ছিলেন. কবি হিসেবে তাঁর ছদ্ম নাম ছিল, 'আহমক্' (বাংলাতে এই একই শব্দের রূপান্তর হ'ল 'আহম্মক'); আহমক লিখেছিলেন—

সাহেব নওয়াজিয়ে'—এহেলে আদাব মা—
আজ আল্লা
মুসাইরো মে অব্ আহমক বুলাই যাতে হে'।

আহমক্-এর এই বয়েত্‌টির অর্থ হ'ল, 'কবিতার কি আদর, বলিহারি যাই! আহমককে পর্যন্ত মুসাইরা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।' বলা বাহুল্য এখানে 'আহমক্' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। কবি নিজের কথা বলছেন, তাঁকে পর্যন্ত মুসাইরাতে আহ্বান করা হয়। অন্যদিকে তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অন্যান্য সাহেবদের প্রতিও কি ইংগিত করছেন না? মুসাইরাতে যখন সাহেবেরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন, সমবেত শ্রোতারা নানা রকম ধ্বনি ক'রে কবির রচনার প্রশংসা করেন। কিন্তু মুসাইরার শ্রোতাদের কাছ থেকে বাহবা না পেলেও সাহেব যেন মনে না করেন তাঁর রচনা ভালো হয়নি, মুসাইরাতে প্রশংসা না পেলেও কবি যেন কখনো নিরাশ না হন। আরস্ মালসিয়ানী নামে একজন উর্দু কবি বলছেন,

আরসা দাদে' সখন না মিলনে সে
লাতুফে আস—আর কম নেহি হোতা.

কবি নিজেই নিজকে উদ্দেশ করে বলছেন, 'দেখো আরস্, মুসাইরাতে যদি তোমার কবিতা সত্যিকারের প্রশংসা না পায়, তার জন্য একটুও নিরাশ হয়ো না, দুঃখিত হয়ো না। তোমার কবিতার রূপ-রস মুসাইরার বাহবা না পেলেও বিন্দুমাত্র বিনষ্ট হবে না।'

কবি সম্মেলন ও কবিতা মেলার ঐতিহ্য এমনি প্রাচীন আর নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ গত তিন বছর ধরে প্রজাতন্ত্র দিবসের পূর্ব দিন রাত্রিতে ভারতের সংবিধান স্বীকৃত তেরটি ভাষা ও সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠতম কবিদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির ব্যবস্থা ক'রে আসছেন। এই বছরেও ২৫শে জানুয়ারীর সন্ধ্যায় সর্বভাষা কবিসভার আয়োজন করা হয় আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্রের মহাধিকরণ ভবনের প্রাঙ্গণে। এইবারে সর্বভাষা কবিসভার চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হ'ল। ভারতের প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার একজন সেরা কবি তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার কবির বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র, সুর স্বকীয়, প্রত্যেকের কবিতার রূপ, রস-রং সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা। সেই সব বিবিধ বৈচিত্র্যের কিছু কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া হ'ল। এবারের কবি সম্মেলনের সুরুতে সংস্কৃত কবিতা পাঠ করে শোনান শ্রীচিন্তামন দেশমুখ। শ্রীদেশমুখ বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ও অত্যন্ত সুদক্ষ প্রসাশক। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ভারতের নানা কর্মক্ষেত্রে তিনি তাঁর অলৌকিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি গ্র্যাণ্টস্ কমিশন ও ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, এই দুইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থারই তিনি চেয়ারম্যান। ভারতের নানা অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পুনর্গঠনের কাজে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। শ্রীযুক্ত দেশমুখ প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত এবং সংস্কৃতে তিনি অনেক অনুপম কবিতা রচনা করেছেন। এই বছরের কবি সভার উদ্বোধন করে তিনি কাব্যতত্ত্ব ও কাব্যবিচারের মাপকাঠি সম্পর্কে চমৎকার একটি ভাষণ দেন। তারপর শ্রীযুক্ত দেশমুখ সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁর 'রবীন্দ্র বন্দনা' শীর্ষক কবিতা পাঠ করে শোনান। শ্রী দেশমুখের এই সংস্কৃত কবিতাটি অপূর্ব। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এমন অতুলনীয় কবিতা সংস্কৃত ভাষায় আজ পর্যন্ত আর কেউ রচনা করেন নি। আমরা এখানে পুরো কবিতাটি ও তার বাংলা অনুবাদ উদ্ধৃত করে দিলাম।

রবীন্দ্র বন্দনা

রাজ্ঞোঽন্তিকং রিক্ত করো ন যায়াৎ
পুরো গুরূণাং ন বিদায়শূন্যঃ।
ন মন্দিরং নিস্মৃত গন্ধমাল্যো
দ্রষ্টুং চ বন্ধুং ন বিনোপহারম্॥
রাজা বৃহদ্ বাঙময় সংসদেকত্বম্
গুরুর্নিরোদ্ধার পরায়ণানাম্।
নব্বীশ্বরো ভারত ভাবনা নাং
সর্বস্য বন্ধুর্বসুধা কুটুম্বঃ॥
উপস্থিতোঽহং তব দর্শনায়
কবীশ কিং তে গুরু কল্পয়েঽর্ঘ্যম্।
মন্দ প্রবোধস্ত মসাবৃতো জ্ঞা
রবীন্দ্র মৃৎপাত্র ইব প্রদীপঃ॥
স্মরামি রামায় তু বন্য রামা
দন্ত ব্রণাংকানি দদৌ ফলানি।
মেঘার্থ মর্ঘ্য কুট জ প্রসূনৈঃ
শচকার যক্ষঃ কৃপণে বিবাসে॥
পূগীফলং মানামবিত্ত দত্তং
ভবেৎ কদাচিৎ বিজয়াহব তিথ্যাম্।
শম্যাশ্চ চামীকরমেব পত্রং
দানার্ঘ্যমাসুর্গণনাবলম্বি॥
অস্মাৎ করে সাহসমাতনোমি
কৃতাঞ্জলিস্তে কবনোপহারম্।
সমর্পয়ামি স্খলিতানুবিদ্ধং
বিবক্ষুরূপং হৃদয়োত্থিতং যদ্॥
ধন্যোঽস্মি যদ্দর্শন মাপ্তবাংস্তে
আর্য্যাপ্রথামর্ম বিচক্ষণস্য।
বাগ্বৈজয়ন্তী ধরনায়কস্য
মনুষ্য কল্যাণ ধৃত ব্রতস্য॥
তত্ত্বঃ সমিদ্ধা হৃদয়ে স্ফুলিঙ্গা
যে যে জনানাং বিবিধাসু দিক্ষু।
তেষাং জ্বলত্যন্যতমা মমাপি
হৃদি প্রবিশ্যান্তররাতিং বিনাশ্য॥
আশাসমেষা যদয়ং স্ফুলিঙ্গঃ
সম্বর্ধমানো জ্বলতু প্রকাণ্ডম্।
সৈব প্রদেয়া গুরুদক্ষিণা তে
সন্দেশ পূর্তিঃ কথমন্যরূপা॥
অলং প্রলাপেন ন রুন্তকায়া
উদ্বেজনীয়া গুরবঃ শ্রমার্তাঃ।
শান্তিঃ সদা শান্তিনিকেতনে তে
বিরাজতাং স্বান্ত বিশাখজন্য॥

রাজদরবারে শূন্য হাতে কেউ যান না, গুরুর কাছেও উপযুক্ত দক্ষিণা হাতে না নিয়ে যাওয়ার রীতি নেই। দেবমন্দিরেও কেউ যান না সুগন্ধ পুষ্পমালা হাতে না নিয়ে, আত্মীয় বন্ধুর কাছেও কেউ উপহার ছাড়া যান না।

বিশাল এই শব্দ রাজ্যের তুমি রাজা, সব মানুষের তুমিই আশ্রয়দাতা গুরু, ভারতীয় ভাবনা রাশির তুমিই মূর্তিমান ঈশ্বর, পৃথিবীর সকলেরই তুমি একনিষ্ঠ বন্ধু।

আজ আমি এসেছি তোমাকে দর্শন করতে, হে মহাকবি, তোমার যোগ্য কি উপহার আমি তোমাকে দেব? আমার স্বল্প জ্ঞান তমসাচ্ছন্ন; হে আকাশ-সম্রাট, আমি সামান্য মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে এই অন্ধকারকেই বাড়িয়েছি মাত্র।

আমার এখন মনে পড়ে সেই বন-বালিকার কথা যে রামচন্দ্রকে তার নিজের দাঁতে-কাটা বুনো ফল উপহার দিয়েছিল আর নির্বাসিত যক্ষ মেঘকে উপহার দেয় সামান্য কুটজ ফুল।

দরিদ্রের নিজ হাতে দেওয়া সামান্য একটি সুপারীও উপযুক্ত উপহার, বিজয়াদশমীর দিনে বন্ধুজনকে উপহার দেওয়া, শমী পত্র ও সোনার জিনিস উপহার দেওয়ার মতোই শ্রদ্ধেয়। দাতা যা মনে করে উপহার দেন, দাতার সেই অনুভূতির উপরেই জিনিসের মর্যাদা নির্ভর করে।

হে কবি, আমিও তাই আজ সাহস করে এসেছি আমার এই অঞ্জলিবদ্ধ হাতে তোমারই জন্য কবিতার মালা নিয়ে, আমার অন্তর মথিত করে গান গেয়ে-ওঠা, অজস্র ভুলে-ভরা আমার এই অতি নগণ্য রচনা আমি কৃতাঞ্জলি হয়ে তোমাকে সমর্পণ করছি।

তোমার দর্শন লাভ করে আজ আমি ধন্য, ভারতীয়তার মর্মজ্ঞের ঋষি আর বাক্যরূপ পতাকা বাহিনীর অধিনায়ক, মানুষের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ তুমি, হে মহাকবি, আজ তোমার দর্শন লাভ করে আমি ধন্য।

তোমার প্রতিভার বিদ্যুৎদীপ্ত দিক্-

দিকে পড়েছে ছড়িয়ে, বহু মানুষের হৃদয়ে প্রতিভার সেই দীপ্ত শিখা ছায়াপাত করেছে, আর তারই একটি শিখা আমার অন্তরেও এসে প্রবেশ করেছে, ফলে আমার সকল অহমিকা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

এই আমার আশা যে তোমার অলৌকিক প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ আমার হৃদয়ে যেন অনন্ত বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে দিতে পারে, তাতেই আমার তোমাকে উপযুক্ত গুরুদক্ষিণা দেওয়া সম্ভব হবে। তা ছাড়া আর কি উপায়ে তোমার শব্দ, তোমার কথা আমার মনে প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে, আমার হৃদয়ে উদ্দীপনা জাগাতে পারে?

আর কোন কথা নয়, আমি নানা কথার জাল বিস্তার করে তোমার মনে আর উদ্বেগের সঞ্চার করব না, কারণ তুমি এখন রুগ্ন, তোমার শান্তিনিকেতনে তুমি পরম শুদ্ধ শান্তিতে চিরদিনের জন্য বিরাজ কর।

শ্রী দেশমুখের সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তির পরে অসমীয়া কবি শ্রীরত্নকান্ত বরকাকতী তাঁর 'গান্ধী তর্পণ' শীর্ষক অসমীয়া কবিতা পাঠ ক'রে শোনালেন। মূল অসমীয়া কবিতাটির প্রথম কয়েক ছত্র হ'লঃ

করিম তর্পণ কিবা কবিতারে আজি হে তোমাকে
লিখি আরু নতুন কবিতা?
জীবন্ত কবিতা তুমি আপুনি মহাত্মা
বাজি গলা আজীবন
জীবন বাঁহিরে,
ফকীরি মরণ বন্ধ জীবন উচ্ছ্বাসে
তুচ্ছ করি মরণকে
অনিবার তোমার সি অমর বাঁহিরে।
নুবুজে কোন সি অমৃতলোক
আজি যত বিরাজিলা তুমি,
কেনেবা পোহর তার
কেনেবা আন্ধার?
লভিলা এতিয়া তুমি কিবা নব জাগরণ?
নতু সি সুষুপ্তি চির
চির তমসার?
যোর পরা তুমি আরু
কোনি দিনে কেতি আঁও
নুঠিয়া এবার,
চিরশিশু সুপ্তি যায়ো
চির তমসার?

আজ নতুন করে কবিতা লিখে আমি কিভাবে তোমার জন্য অর্ঘ্য রচনা করব? হে মহাত্মা, তুমি নিজেই জীবন্ত কবিতা; তোমার নিজেরই জীবন-বাঁশির সুরে তুমি তোমার সমস্ত জীবন ছন্দে গানে পরিপূর্ণ করে রেখেছ। মৃত্যুর বন্ধ দিয়ে তুমি বাঁশির সুরে জীবনের জয়গান গেয়েছ, মৃত্যুকে তুমি পরোয়া করনি, তুচ্ছ করেছ তাকে তোমার অপরাজেয় স্মিত হাসি দিয়ে। তোমার বাঁশি মৃত্যুঞ্জয়। জানি না কোন অমৃতলোকে তুমি গিয়ে উপস্থিত হয়েছ? সেই অমৃত তীর্থের আলোর স্বরূপ কী, সেখানকার অন্ধকারের রূপই বা কি রকম, তাও আমি জানি না। সেখানে কি তুমি নতুন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছ? অথবা সেখানে কি তুমি অন্তহীন অন্ধকারের অন্তরালে গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছ, যে ঘুম থেকে তুমি কখনো জেগে উঠবে না?

আর একবার আমরা শুনতে পাবো না তোমার পার্থিব কণ্ঠের ধ্বনি? সেই অন্তহীন অমৃত-ধারা আর একবার কি প্রবাহিত হবে না?

অসমীয়া কবিতা আবৃত্তির পরে ওড়িয়া ভাষার কবি শ্রীমনমোহন মিশ্র 'মাফ কর' শীর্ষক ওড়িয়া কবিতা পড়ে শোনান। ওড়িয়া কবিতাটি বেশ চমৎকার। ওড়িয়া কবির মূল কবিতার একটু উদ্ধৃতি দেওয়া হ'লঃ

কথায়ে কহিবি মাফ কর
(তোর) মন—নর্দমা সাফ কর,
আজির এ যুগে লগন রে
সূর্য ধাইঁছি গগন রে,
কোটি কোটি পথে আলোকরধারী
ধইঁছি পাগল পবন রে,

বিপুলো পৃথ্বী শত শত জাতি
নীড়ে পড়িয়াছি কোলাহল
তুন্দ্রা তুষার গঙ্গা কিনার
নীল নদীতট উচ্ছল,
সে আলোক নহে তুমর মোহর
সে আলোকে দাবী সভিংকর,
নূতন যুগর সূর্য দেউলে
কোটি নরনারী ভাস্করঃ
কহি দেলি বলি মাফ কর,
মন-নর্দমা সাফ কর।

তোমাকে একটি কথা বলছি, মাফ কর। তোমার মন-নর্দমা সাফ কর। আজকের এই যুগে সূর্য আকাশ পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। কোটি কোটি পথে আলোক রেখা পাগল হাওয়ায় এগিয়ে যাচ্ছে।

এই বিরাট পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের ঘরে কোলাহল শুরু হয়েছে। তুন্দ্রার তুষার ভূমিতে আর গঙ্গার জলে বান ডেকেছে, নীল নদের তীর জেগে উঠেছে। এ আলোক তোমার নয়, আমার নয়, এ আলোক সকলের। নতুন যুগের যে সূর্য-মন্দির গড়ে উঠছে, তাতে সব নরনারীই শিল্পী। তোমাকে এ কথা বললাম বলে মাফ কর, তোমার মন-নর্দমা সাফ কর।

* * *

তুমর মোহর অনুগ্রহ
শত উদ্ধত আয়োজন
এ আলোকধারী নাহি মানে
ন রখে কাহারি প্রয়োজন,
গুটিয়ে শর্ত জীবনর
এ আলোক খালি নিয়ে মানি,
মৃত্যুর এ যে দুশমন
তার তুলে ইয়ার রাহাজানী।
ক্ষুদ্র কাহারো স্বার্থ নিগড়ে
ছন্দিত যেতে ইমারত,
এহার জড়নে যায় জ্বলি
জ্বলি যায় যথা তাসঘর,
মন-নর্দমা সাফ কর
কহি দেলি বলি মাফ কর।

* * *

সূর্য ডেয়াঁছি গগনরে
তো রীতিরে কর আবাহন
সৃষ্টির মহা অঙ্গনে
ভরি দিও তোর মহা ধন,
তুহর মাটির প্রাণ রসে
তুহর প্রতিভা তেও গড়া,
তুহরি শত হৃল্লোহুলি,
রোলে ত বিপণি হেও বড়া,
তুল নাহি তোর মহা জাতি
এতে কি বিপুল বড় বহে,
মহা জনতার কানে কানে
ইতিহাস এহি কথা কহে
মন-নর্দমা সাফ কর
ফিটায়ি কহি মাফ কর।

সূর্য আকাশে জেগেছে, তোমার রীতিতে তাকে আবাহন কর। সৃষ্টির মহা অংগনে তোমার ঐশ্বর্য ভরে দাও। তোমার মাটির প্রাণ রসে তোমার প্রতিভা গড়ে উঠুক, তোমার শস্যের আওয়াজের মধ্যে তোমার পণ্য সম্ভার পরিবেশিত হক। তোমার জাতির মহত্ব আজও গৌরবযুক্ত, তার বীর্য এখনো সুপ্রচুর, ইতিহাস একথাই জাতির কানে কানে ঘোষণা করছে: মন-নর্দমা সাফ কর। এ কথা থলে বললাম বলে আমাকে মাফ কর।

ওড়িয়া কবিতা আবৃত্তির পরে উর্দু কবিতা পড়ে শোনালেন প্রখ্যাতনামা উর্দু কবি জমীল মজহরীর, কবিতার নাম 'ফরিয়াদ।' এখানে মূল উর্দু কবিতাটি থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি প্রকাশিত হ'লঃ

কিসসে পুছুঁ কি পয়ে হাংগামা
এ হাসতী কেয়া হ্যায়,
এ পাসনু কেয়া হ্যায়,
জোনো কেয়া হ্যায়,
ইয়ে মসতী কেয়া হ্যায়;
ওয়ার্ক ইয়ে আবরকী হর চাঁথ লে
হাসতী কেয়া হ্যায়
যব বোলন্দী কি ইয়ে ফিতরত হ্যায়,
ত পসতী কেয়া হ্যায়,
মেহেরে নূর পর ইয়ে পরদায়ে'
জুলমত কেঁও হ্যায়,
ইয়ে ওজালেকো আন্ধেরে কি
জরুরত কেঁও হ্যায়।
হজরতে' থালী কে নেয় রঙ্গ
তামাসায়ে' মজাজ,
এ তেজরী হ্যায় কি পরদাও তবস্সুম
হ্যায় কি রাজ,
যিস তরফ যাইয়ে এক পরহাসে দূর দরাজ,
যিস তরফ যাইয়ে এক মরহালে' দূর দরাজ,
যিস তরফ দেখিয়ে এক মারকে নাজো
নেওয়াজ;
জরে' সিমটে হুয়ে বৈঠে হ্যায়
বয়াবাঁ কেয়া হ্যায়,
কতরে কতরে মে' গোরে জা হ্যায়
এ তুফান কেয়া হ্যায়।

প্রতিদিনের জীবনে এত গোলমাল, এত ঝঞ্ঝাট কেন, কি কারণে? এ সবের অর্থ কী? দুনিয়ায় এত দুঃখ কেন, কেন এত ব্যথা? জীবনে কেন এত মোহ? আকাশে কেন বিদ্যুৎ চমকায়, কেনই বা কালো মেঘের এত সমারোহ? দুনিয়ায় অনেকে আছেন উঁচুতে, আবার অনেক কিছু আছে, নীচের দিকে—কেন এই তফাৎ? আকাশের চাঁদে কেন কালো ছায়া? আলোর পরে আবার কেন অন্ধকার দেখা দেয়? দুনিয়ায় এত রঙ তামাসা কেন?......কখনো আলো, কখনো অন্ধকার। কখনো হাসি, কখনো অশ্রু। কেন?

তুমি যেদিকেই যাও, দেখতে পাবে তোমার চলার পথ অনেক দূর; যেখানেই যাবে, দেখবে সেখানেই এক কঠিন সমস্যা; চোখ মেলে যেদিকেই তাকাবে, দেখবে সেখানেই প্রেমের খেলা চলেছে!

দুনিয়ার বিচিত্র এই কর্মশালা দেখে আমি হতভম্ব হয়ে বসে আছি; ছোট ছোট ব্যাপারেই আমার ভয়, আর এত সব বিচিত্র কর্মকাণ্ড আমাকে আরো বেশী ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুলেছে।

জমীল মজহরীর উর্দু কবিতাটির অন্য একটি অংশের মধ্যে মহৎ কাব্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট। সেই অনুপম অংশটি হ'ল নিম্নরূপঃ

আপনি খোয়াহেস কা গোলাম,
আপনি তবিয়ত কা গোলাম
আপনি নফরত কা গোলাম,
আপনি মহব্বত কা গোলাম,
আপনি মজহব কা গোলাম,
আপনি শেয়াসত কা গোলাম
কভী ফিতরত সে' মুবরাজ,
কভী ফিতরত কা গোলাম;
হসলাঁ ইতনী গোলামী কে ভী আজাদী কা
শেদ এ পারবাস্তা মগর শখ ভী সৈয়াদী কা।

তুমি তোমার বাসনার দাস, তোমার ইচ্ছার দাস, তুমি তোমার ঘৃণার ভাবের দাস, তোমার প্রেমের দাস; তুমি তোমার ধর্মের দাস, রাজ-নৈতিক মতবাদের দাস, কখনো তুমি প্রকৃতিকে ঘৃণা কর, কখনো তাকে ভালোবাসো, আবার কখনো তার দাস হ'য়ে পড়। এমনিভাবে তুমি হাজারো জিনিসের অধীন হয়ে আছ, তবু তুমি হতে চাও স্বাধীন, হতে চাও মোহমুক্ত; দুনিয়ার রীতিই এই;—তুমি-আমি, দুনিয়ার সবাই এত বন্ধনের মধ্যে বাঁধা থাকা সত্ত্বেও মুক্তি পেতে চাই; মুক্তি লাভ করে স্বাধীন হতে চাই।

জমীল মজহরীর উর্দু কবিতা আবৃত্তির পরে কন্নড় ভাষার কবি ডক্টর আর এস মুগেসী তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠ ক'রে শোনালেন। কন্নড় ভাষায় কবিতাটির নাম 'নবযুগের রবি': এখানে কন্নড় থেকে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি দেওয়া হ'লঃ

নবযুগের রবিইন্দ মূডনদী মূডুতিহন,
মর্নাগরুব জন মনদ কওসেয় দাডুতুহনু,
চিম্মুতিরে দিমে দিসেগে বিড়ুগড়েয় চেনুবেবকু
জারুতিরে কারিরুল কুরুড়ু কিরুমনদ কোসেক।
ইদকারি তানিসিদেব, যুগযোগদি জামিমিদেবু
ইদকারি সমপোক যাতপেয় সতিসিদেব।
হেখরাদ ধুলিয়েল্লি হুপুকোগ হোরাপিদেবু।
সিডিলাগি সিডিদেদ্দু মংগরকে তেরালিদেবু।
ধীর ধীরর জীবরস হিংডি হোরেদেগেদু,
কোম্মিড় কম্মীর ধারেয়েনু ইয়েরেদেদু,
কাদিদেবু কুদি কুদি দু বিড়ুগড়েয় পাককাগি
ইংদিনী অমৃত যোগদ সুখেয় সৌখ্যাকাগি
মুড়িতীরবি হিংদে রুষিয়েদেয় গবিয়ল্লি।

নির্জীব মানুষের মনের অন্ধকার দূর করে দিয়ে নতুন যুগের সূর্য পূর্বদিকে উদিত হচ্ছে। স্বাধীনতার নতুন আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে; অজ্ঞানতার অন্ধকার, মনের সংকীর্ণতা আর সব রকমের পঙ্কিলতা দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে। এই স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য আমরা কত তপস্যা করেছি, কত ত্যাগ স্বীকার করেছি, কত ধূলিমলিন পথ পেরিয়ে এসেছি। তারপর একদিন বজ্রকঠোর শক্তিতে জেগে উঠে আমরা সংগ্রাম শুরু করি। চোখের জল আর দেহের রক্তের স্রোত অবিরল ধারায় বয়ে যায়। স্বাধীনতা লাভ করার জন, আজকের দিনের এই সমৃদ্ধি এই ঐশ্বর্য অর্জন করার জন্য, এই শুভ মুহূর্তগুলোকে লাভ করার জন্য আমরা কি তীব্রভাবেই না লড়াই করেছি!

কন্নড় কবিতা আবৃত্তির পরে কাশ্মীরী কবি আবদুল কদুস রসা জাবেদানী কাশ্মীরী ভাষায় কবিতা পাঠ করে শোনান। কাশ্মীরী কবিতাটি কবিতার আকারে একটি কাশ্মীরী 'গজল'। এই ধরনের কবিতা উত্তর ভারতীয় কবিরা গান গেয়ে গেয়ে আবৃত্তি করে শোনান। এখানে মূল কাশ্মীরী কবিতাটির সবটুকুই উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'লঃ

ওয়ানন জাহীদ সেঠা রাতবদ স'রাবস
হাকুল না সুখ ন গাম পারহেস আবস।

যাঁরা মদ পান করেন না, তাঁরাই মদের নিন্দা করেন। সুযোগ পেলে তাঁরা কিন্তু ঘুষ নিতেও ছাড়েন না। যে কোন অন্যায় কাজও তাঁরা করতে পারেন; কিন্তু মদ, যা সামান্য জল, সেই মদ কিন্তু তাঁরা পান করবেন না।

কেরীম না পে এস সোদাগীর নাব
খোদা জানেত কিওপা কারে সওদাবস।

অনেকে ঈশ্বরের নাম করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের তালে থাকেন; তা কিন্তু আসলে ধর্ম-চর্চা নয়। ধর্মের নামে স্বার্থসিদ্ধির যে চেষ্টা তা বৈরাগ্যও নয়।

আমার দিল চানী পার তাঁত চা নী রো ইয়ুক
মুকাবল দেতো সবনাম আবুহারস।

তোমার মুখের সৌন্দর্য দেখামাত্র আমার হৃদয় নেচে ওঠে, যেমন ভোরের শিশির রোদের তাপ পাওয়া মাত্র শুকিয়ে যায়।

নমুনা চা'র রোক সারেক ছু তাতা মানষু
তাওয়াই মুসোতাক গাঁও বুলবুল গোলাবাস।

তোমার মুখে অনেকটা গোলাপফুলের মতো দেখতে, বুলবুল গোলাপ ফুল খুবই ভালো-বাসে; তোমার মুখ দেখেও কত লোকের অন্তর যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার কি ইয়ত্তা আছে?

ময়ই নাগমী দো ডুমে সাজন নয়ই সোজ
ইনায়াৎ চোন সন্তোরস রবাবস।

আমি নতুন সুরে, নতুন ছন্দে গান রচনা করেছি; আমার গীতি-যন্ত্রগুলো নতুন নতুন সুরে বেঁধে নিয়েছি। একমাত্র তোমারই প্রভাবের ফলে তা সম্ভব হয়েছে।

পায়াপাই নামো রসহন সুঁজ ইয়ারস
দিলুকেত শোক ছাপ্রাবাণ জওয়াবস।

আমি ক্রমাগত চিঠি আর খবর পাঠিয়ে যাচ্ছি আমার প্রিয়তমের উদ্দেশে, তার উত্তরও আমি আশা করি না, কারণ আমার অন্তরের যে তীব্র ব্যাকুলতা তা কখনো তার উত্তরের অপেক্ষায়

থাকতে পারে না। তার উত্তর না পেয়েও আমাকে ক্রমাগত চিঠি লিখেই যেতে হয়।

কাশ্মীরী কবিতা আবৃত্তির পরে গুজরাতী ভাষার কবি শ্রী সুন্দরজী বেতাই 'বন্দর ছ দূরে ছে'' শীর্ষক গুজরাতী কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনালেন।

গুজরাতী কবিতাটি অপূর্ব। আরব সাগরের ধার দিয়ে এক তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ নদীতে নৌকা বেয়ে মাঝিরা গান গেয়ে চলেছে, বাংলা দেশের পূর্ববঙ্গের মাঝিরা যেমন ক'রে সারি গান গায়। এই গুজরাতী কবিতাটির মধ্যে গুজরাতী লোক-সংগীতের সুর আশ্চর্যভাবে ধরা পড়েছে। এখানে সুন্দরজী বেতাইয়ের মূল গুজরাতী কবিতার সবটুকুই উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল:

আল্লাবেলী আল্লাবেলী
যাও' জরুর সে'
বন্দর ছ দূরে ছে'
বেলি তারো বেলি তারো
বেলি তারো তুঝ সে'
বন্দর ছ দূরে ছে',
ফাগ্গোলে তুফানী তিখাতো ভায়রা
মুঝায়ে অন্তর না হয়ে যে কায়রা,
তারা হাইয়া মা যো সাচী সবুর ছে'
ছ ত এ দূরেসে',
আকাশী নৌকা নে' ভীচ্' দেত্তি কাটকা
তারি নৌকা নেও দেতী এ মাট্‌কা
মধ দরীয় মস্তিমী ছ চকসুর সে',
বন্দর ছ দূরে ছে',
আঁখো না দিবা বুঝাবে আ রাতরী,
ধরকে' নে ধরকে'
যে ছোটেরী ছাতরী,
তারি হাতিমী জোহেরো কোঁ হে
ছনে' এ দূরে ছে';
আল্লাবেলী আল্লাবেলী
যাও' জরুর ছে'
বন্দর ছ দূরে ছে',

ঈশ্বর তোমাকে পথ দেখাবেন, ঈশ্বরই ভরসা; তোমাকে অনেক দূরে যেতে হবে, বন্দর যে অনেক দূর..... ঈশ্বর তোমাকে পথের নিশানা জানিয়ে দেবেন, বন্দর যত দূরেই হোক না কেন, তুমি নিজেই নিজের পথ চিনে যেতে পারবে।

যারা ভীরু, তাদেরই হৃদয় ভয়ে কেঁপে ওঠে, তাদের সামনেই জোরে হাওয়া বইতে থাকে। ধৈর্যের পরীক্ষা যদি তুমি দিতে পারো, বন্দর যত দূরেই হোক না কেন, তুমি ঠিক সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে পারবে।

আকাশের বিদ্যুৎ তোমার নৌকাকে টলমাটাল করে দিচ্ছে, জলের ঢেউ নৌকাকে মোচার খোলার মতো করে খেলা করছে; সমুদ্র বিপদসঙ্কুল, নগ্ন উল্লাসে জলের ঢেউ মাতামাতি করছে। তবু বন্দর যত দূরেই হোক না কেন, তুমি ঠিক সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবে।

আজকের এই রাতে ক্লান্ত চোখে ঘুম নেমে আসছে, ভীরু মন কেঁপে উঠছে, শঙ্কিত হচ্ছে। বন্দর যত দূরেই হক না কেন, তোমার যথেষ্ট শক্তি আছে, অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার। ঈশ্বর তোমাকে পথ দেখাবেন, ঈশ্বরই একমাত্র ভরসা; বন্দর যত দূরেই হক না কেন তোমাকে এগিয়ে যেতেই হবে।

গুজরাতী কবিতা আবৃত্তির পরে তামিল ভাষার কবি শ্রীতিরুলোক সীতারাম 'ওসিয়ম ইরুলুমে' শীর্ষক তামিল কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনালেন। 'ওসিয়ম ইরুলুম' কথাটির হিন্দী অনুবাদ হ'ল 'প্রকাশ ঔর অন্ধকার', এখানে মূল তামিল কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে দেওয়া হ'ল:

সুদেনদির ফেরুন্দী চুলনীড়ম্ ইন্বা
থিরনল আতানীল থেইয়া থারেল ইম্
কুডি মাকি ইল ইন তিড়ুইম্ কুল্লাই
মা কি ইল ইস চি ইল্,
পায়িংগু পোইর রুই ইউ ইম্
পাংগুডাইন এন্নাম।
পইক্‌কি ঈড়বে ল-ইম্ পুরুন্তু কুড়ুঙ্গু
ছাম্ কালী কু বাঁড়ুইম, পদ্দু
থিসাই বেলী উল্লম্ থিরাই কুড়ুত্তু
ইরুনদেইন।

আজকের এই দিন বড়ই আনন্দের দিন, স্বাধীনতার নতুন আলো দিকে দিকে ভাস্বর দীপ্তিতে ছড়িয়ে পড়েছে; এই শুভ দিনে সমস্ত জাতি নতুন উল্লাসে জেগে উঠেছে।

এই আনন্দ-উল্লাসের সমারোহে আমিও অংশ নিতে চাই, নতুন দিনের প্রভাতের কথা ভেবে ভেবে সারা রাত আমি ঘুমুতে পারিনি; বিছানার উপর কেবল এপাশ-ওপাশ করেছি আর কতক্ষণে ভোরবেলা মোরগ ডেকে উঠবে তার জন্য প্রতীক্ষা করেছি।

কাল সন্ধ্যায় সূর্যদেব বিশ্রাম নেওয়ার জন্য পর্বতমালার আড়ালে গা-ঢাকা দেন, খুব সকাল থেকে সূর্য আবার তাঁর কাজ আরম্ভ করেছেন—ধীরে ধীরে পূর্ব গগনে সূর্য উদিত হচ্ছেন।

তামিল কবিতাটির অন্তিমে তামিল কবি লিখছেন:

ইক্কী এলাম ওলী ইল ওরইনদিত নেইনজিল
অন্দিয়া ইরুলুম উলকম্ কলী ইলান্দি,
ওরং কিডা নেইনজিল ওঙ্গিডং অলিউম
কান পাওর বিনদাই কারইথি এনেও।

বাইরে রাত ছিল অন্ধকারে মেশা, আর আমার অন্তরে আলো অপূর্ব জ্যোতির্ময় আলো, যে আলো উজ্জ্বলতায় আর দীপ্ত শিখায় ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছে। বাইরে অন্ধকার, ভিতরে আলো; কি অদ্ভুত অসংগতি, তাই নয় কি?

তামিল কবিতা আবৃত্তির পরে তেলুগু কবি শ্রীরায়প্রোলু সুব্বারাও। তেলুগু কবিতার নাম 'সান্ধ্য' মূল তেলুগু কবিতাটি থেকে কয়েকটি অনুচ্ছেদ নীচে দেওয়া হ'ল:

কা বি কোং গুলু কাপিকোনি ডন
কণক ভাণ্ডমু তোড বির বির
আগি পোয়ে জো মন্দে চেরাদি
মদ ডিমপড়ু এয়োরোল।

মুসুকোনে আসাক বাটমু
মুসুগোভডে আকাশদীপমু
আলসিগুন কলধপা ইয়মু
অংকারমু পে কো ল্পু।

বংসলুং কানটুচ্চু ঈ প্রবাহাকোং
কাশ্মেরী রেগেরী নল্লপ্র ১ টেং,
দাটে দলচিনো তৌন্দিরিং পড়ুং।
বাট সারলু তৈলিভি রোণ

কালবাৱুং তৈরহি চিকাটী
কবিয়ু চুয়াদো ভুগ্গু ভাদিরী,
বৈগিরিমপড়ু এটি কাঙলী
কেগ দলচিনো কাত্রি কোলামু।

ওগো সন্ধ্যাসুন্দরী, তোমার গেরুয়া রংয়ের আঁচল গায়ে সামলে নিয়ে আর সোনার কলসী কাঁখে নিয়ে তুমি দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যাচ্ছ।

হে সংগী মুসাফির, তুমিও তৎপর হও। আশা-রূপী দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আকাশের সব দীপ একে একে নিভে গেছে। তুমি যদি দেরী কর, তা হলে পথে অনেক বিপদ দেখা দিতে পারে। চারদিকে অন্ধকারও ঘনিয়ে আসবে। এখানে পাহাড়ী নদী খুব জোরে কল কল আওয়াজে সর্পিল গতিতে বয়ে যাচ্ছে; নদীর ওপারে যদি তুমি যেতে চাও, খুব সাবধানে তোমাকে যেতে হবে, নদী-পথে অনেক বিপদ।

তেলেগু কবিতা আবৃত্তির পরে পাঞ্জাবী ভাষার কবি শ্রীসন্তোখ সিং ধীর 'হিন্দুস্থান' শীর্ষক পাঞ্জাবী কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনালেন। মূল পাঞ্জাবী কবিতাটির অংশ বিশেষও এখানে উদ্ধৃত করা হ'লঃ

হ্যায় কি কুড়ে হানেরে হ পক্ষী
দেখ, কিরণা দি জনজ আ পে'হৈছি,
জাগ উঠি পুকার, জানন দি
জাগদা না কি জাগদা হা মে'।

টুটে দি রাত বদল দে পহীরে'
দে ত চলে তে দেবতে আয়ে,
এস মানে নু কোন ন মানে
জাগদা হা কি জাগদা হা মে'।

রাত কালী তে বিজলী লিসকে'
ইসক তরদা হানজুয়া দি হিকতে',
এস ইসকে পার জানায়'
জাগদা হা কি জাগদা হা মে'।

মায় নু চেতে হ্যায় কাণ্ডারাভীদা
মায় নু চেতে হ্যায় জালিনাওয়ালা,
ভুলি প্রতিজ্ঞা নু ভীষম নু,
জাগদা হা কি জাগদা হা মে'।

চারদিকে আলোর মিছিল, আলোক ধারা জীবন্ত হয়ে জেগে উঠে আওয়াজ তুলে বলছে, আমরা জেগে উঠেছি, জেগে উঠেছি। রাত শেষ হয়ে যাচ্ছে, প্রহর অতিবাহিত হচ্ছে। দৈত্যরা বিদায় নিচ্ছে, দেবতারা আসছেন। কে না স্বীকার করবে এই সত্য?—আমরা জেগে উঠেছি, জেগে উঠেছি। রাত অন্ধকার, আকাশে বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছে; অশ্রুজলের স্রোতে মনের ভালোবাসা বয়ে যাচ্ছে আর আমরা জেগে উঠেছি, জেগে উঠেছি আমরা। আমাদের আজ মনে পড়ে রাভী নদীর তীর, মনে পড়ে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা; মহাভারতের ভীষ্ম কি কখনও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভুলতে পারেন? আমরা জেগে উঠেছি, জেগে উঠেছি আজ আমরা।

পাঞ্জাবী কবিতা আবৃত্তির পরে বাংলা কবিতা পড়ে শোনালেন কবিশেখর কালিদাস রায়। শ্রীযুত কালিদাস রায় বাংলা দেশের প্রাচীনতম কবিদের অন্যতম। সর্বভারতীয় কবিসভার অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ ক'রে আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কালিদাস রায়ের কবিতাটিও ভালো হয়েছিল। এখানে কবি-সভায় কালিদাস রায়ের 'স্বপ্নদূত' শীর্ষক কবিতাটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া হ'লঃ

এই স্বপ্নশিশুগুলি যাদেরে করেছি রূপদান
যাহারা আমারে ঘোর তোলে আজ হর্ষ কলতান
জানে নাক এরা হায় বিদায়ের সাথে সাথে মম
এরাও শুকায়ে যাবে ছিন্ন শাখে পুষ্পদল সম—
ভাবিতে শিহরি উঠে এ হৃদয় বৎসল ব্যথায়
সৃষ্টির উল্লাসটুকু তার তাপে কোথা উবে যায়।
সর্বাঙ্গে বুলাই পাণি স্নেহভরে। ইহাদেরি লাগি
দুর্বহ হলেও এই জীবনের আয়ুষ্মত্তা মাগি।

সান্ত্বনার লাগি ভাবি, হলে আমি লোকান্তর গত
ইহাদের দশা হেরি নীড় হারা শাবকের মতো,
হয়তো বা দিয়া ঠাঁই হৃদয়ের কবোষ্ণ কুলায়ে
দরদী বান্ধব কোন রেখে দেবে বাঁচায়ে ভুলায়ে।

* * *

এ কল্পনা জাগে যবে স্নেহ মোর শিহরিয়া উঠে
নির্বিচারে সবারেই টেনে লই বক্ষ পক্ষপুটে।
জানি না তো কে বা যাবে।
ভাবি আমি দুরাশার ভরে
ইহাদেরই একজনও যাত্রী হবে যুগ-যুগান্তরে।

বাংলা কবিতা 'স্বপ্নদূত' পঠিত হওয়ার পরে মারাঠী কবি শ্রী বি বি শিরবাডকর 'ঘরমালক' শীর্ষক মারাঠী কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনালেন। মারাঠী কবি শ্রীশির-বাডকরের কবি হিসেবে লেখক নাম 'কুসুমাগ্রজ'; এখানে মূল মারাঠী কবিতাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হ'লঃ

আসে' কসে হো' ঘরমালক হে',
ঘর আমহালা দিলে
ফুটকেয়া কৌলারাতুনি গলতী
নক্ষত্রাণ্চী ফুলে'
অভেদ্য ভিনতীসে' তট ভ'বতী
গাকললেসী হাওয়া
কডাড় খিড়কী নসে', দিসে না
বাটেবরচা দিবা
পেঠ কোঠলী, নগর কোঠলে
মূলুখ কোনতা করী
চিয়া চি-গাওর মারুনি ধড়কা
প্রজ্ঞা ফুটতে ঠরণী,
দোন দিশানা দোন ভুয়ারে'
রহদারী হবাবয়া
কালো খাচ্যা দরীত তেথে' না
কিরণাঞ্চী দয়া
শত শতকাংচী ধূলে সাঁচলী, ভূমীবর এথল্যা
খাম্বচোথ-পাবরতী ওপত্যা,
হজার ত্যা সাংবল্যা
প্রকাশ আহে পরন্তু ত্যাসা,
অন্ধারাচী বাধা
জীবন আহে ত্যাস বিলগলী,
পণ মরণাচী কথা,
গহন সনাতন চিরে' বংদয়া,
তমাত কা রহানে'?
মাতীচা সৈয়েবর স্বপ্নে',
মেদী বিন পাহানে'?

সেই গৃহস্বামী কি ধরনের যিনি আমাকে এমন একটি ঘর দিয়েছেন, যে ঘরের ছাত ফাটা, ছাতের ঐ ফাটা দিয়ে তারার ফুলেরা আকাশ থেকে নেমে আসছে; ঘরের চারদিকে ভগ্ন-স্তূপ। ঘরের কোন জানালা নেই, ঘরের মধ্যে সব সময়ই বন্ধ হাওয়া; ঘরে গিয়ে পৌঁছুবার রাস্তায় কোথাও কোন বাতি নেই। ঘরটি যেখানে রয়েছে সেই শহরের নাম কি তাও আমরা জানি না, যে রাস্তায় ঘরটি রয়েছে, সেই রাস্তার নামও আমাদের জানা নেই। ঘরের দিকে মাত্র দুটি পথ, সে পথও মাটির তলা দিয়ে। একটি ঘর থেকে বেরোবার পথ, আর অন্যটি ঘরের দিকে যাওয়ার পথ। এক চির-অন্ধকার উপত্যকার মধ্যে ঘরটি রয়েছে, সেই উপত্যকায় কোন দিন বিন্দুমাত্র আলোক রেখাও প্রবেশ করে না। বড় বড় স্তম্ভের কালো ছায়া ঘরটিকে আরো অন্ধকারময় ক'রে রেখেছে; যে জীবন মৃত্যুর খুব কাছাকাছিতে, সেই জীবনের কি অর্থ আছে? এমনি চিরঅন্ধকার ঘরের মধ্যে থেকে লাভ কি? তিনি আমাদের ঘর দিয়েছেন বটে, কিন্তু এই ঘরের মধ্যে থেকেও আমরা যেন অন্তহীন নির্জনতার মধ্যেই রয়েছি।

মারাঠী কবিতা আবৃত্তির পরে মালয়া-লাম ভাষার কবি শ্রী পি কুনহিরামন নায়ার মালয়ালাম ভাষায় তাঁর কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান মূল মালয়ালাম কবিতার অংশবিশেষ এখানে দেওয়া হ'লঃ

গীতাকু মহনীয় ভূমিয়ে দগ্ধমিত
মগাভৌনিকরু কর্মযোগিয়ে প্রসবিক্কু
হিমবৎ বিন্ধ্যাচল মধ্যদেশত্তে কান্নু
সমাসে মিজিয়েকো মিথুনম সিংহত্তে
গঙ্গায়মুক্কুরুম নন্ধীলে শারিঞ্জিত
মঙ্গলম কৈকাকুম কল্পপাদপ মুদ্রাই বরু।

যে প্রাচীন দেশভূমিতে গীতার মতো গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সে দেশই আমাদের গুরুর মতো মহা-মানবকে ধারণ করতে সক্ষম। হিমালয় আর বিন্ধ্যপর্বতমালার মধ্যবর্তী দেশই সেই পুরুষসিংহের যোগ্য জন্মভূমি, যিনি প্রেমের মহিমা প্রচার করেছেন আর হিংস্রভাবকে ঘৃণা

করেছেন; গংগানদীর ধারায় প্রবাহিত এই দেশেই এমনিতরো কল্পবৃক্ষের জন্ম হওয়া সম্ভব।

মালয়ালাম ভাষায় কবিতা আবৃত্তির পরে হিন্দী সাহিত্যের দুইজন প্রখ্যাতনামা কবি তাঁদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনালেন। শ্রীসিয়ারাম শরণ গুপ্ত 'অশোক কী ঘোষণা' শীর্ষক হিন্দী কবিতা এবং শ্রীসচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎস্যায়ন 'নয়া কবি' শীর্ষক হিন্দী কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। এখানে প্রথমে 'অশোক কী ঘোষণা' কবিতার অংশবিশেষ ও পরে 'নয়া কবি' শীর্ষক কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হ'লঃ

হে কলিংগ বসুন্ধরে
স্বপ্ন তক মেঁ ইহ কভি সোচা ন থা
মুত বৎসে উহ তুঝেঁ হ্যায় শোক যো
এক কন খসুকা মজন আত্মীয় যেত্র
বাট দেগি ইসু পরম পরকীয় কো
প্রণতি মায় কৈসে তুঝেঁ অর্পিত করুঁ
অচল হিমগিরি সেঁ তরংগিত সিন্ধুতক
নিজ চামু সে কর যাতা ভি মায় গায়া,
সুখ দিয়া উপহার মেঁ সব নে সতত
মাত্র তু যিসনে দিয়া হ্যায় দুঃখ ইহ
দুঃখ ইহ যো আর্যসত্য কহা গায়া;
ঔর কায়া ইস্‌সে অধিক হো
ইষ্ট অব্ চরণ মিসকে ছু রহা তল পে পরা
জলধি নিজ কল্লোল ভুজকর উন্নমিত
উস্ জগন্ময় তীর্থ মেঁ তেরে ইহ।
বোধিলাভ হুয়া মুঝেঁ সুনবীন হ্যায়।

হে কলিংগভূমি, আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবি নি তুমি আমাকে এমন দুঃখ দেবে, যে দুঃখ মানুষ নিজের সন্তান মারা গেলে, তার শোক থেকেই শুধু পায়। আমি কি করে তোমার উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করবো? নগাধিরাজ হিমালয় থেকে শুরু করে তরংগ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত আমি যেখানেই গিয়েছি আমার সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে সব জায়গাতে সব সময়েই আমি আনন্দ পেয়েছি। একমাত্র তুমিই আমাকে দিয়েছো দুঃখ, যে দুঃখ আর্যসত্যেরই নামান্তর। এই দুঃখ পাওয়ার চেয়ে অধিকতর বাঞ্ছনীয় কি আছে তা আমার জানা নেই। তোমার এই পবিত্র তীর্থভূমি যার পাদপ্রান্ত সমুদ্র-ঢেউয়ের প্রার্থনারত দুই ঊর্ধ্বোখিত বাহুর দ্বারা পূতীকৃত, সেই তীর্থভূমিতে আমি নতুন বোধিলাভ করে ধন্য হয়েছি।.........

'অশোক কী ঘোষণা' শীর্ষক কবিতা আবৃত্তির পরে সচ্চিদানন্দ হীরানন্দ বাৎস্যায়ন 'নয়া কবি' শীর্ষক কবিতা পাঠ করে শোনান। এখানে 'নয়া কবি' কবিতা থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেওয়া হ'লঃ

শক্তি কা মাত্ গর্ব কর
তু উপশমন কা কর,
নহিঁ রূপাকার কো, উসমেঁ
ছিপী হ্যায় সার যো, ভাই ওর
অনুভূতি মেঁ মাত ডর
মগর পাখণ্ড উসকে দর্দ কা মন কর,
নহিঁ আপনে আপ যো স্পন্দন ওসে
তেরি ধমনীয়োঁকো হাচাকী কপকপীমেঁ
ঝুট মত্ আভাস উসকা স্বয়ং,
আপনে কো দিখানে কি
উতাবলী সে ডর।

নিজের শক্তির গর্ব না করে ধৈর্য ধরতে শেখ। কখনো বাইরের আকার নিয়ে গর্ব করো না, ভিতরে সার বস্তু যা আছে সেই বিষয়ে অবহিত হও। বাইরের নানা ধরনের অনুভূতিকে কখনো ভয় করো না, বাইরের দুনিয়ার হাসি, অশ্রু, সুখ, দুঃখ যদি তোমার মনে সত্যিকারের স্পন্দন জাগাতে না পারে, তবে কখনো তুমি নিজে এমন ভাব দেখিয়ো না যে তুমি বাইরের কোন ভাবধারার দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছ।

গের কো মাত কোটু
তু লেহুছান আপনা পানা
চুনৌতি হ্যায় যাহাঁ,
তু অভিকম্প সাহস কর
ইহ। প্রতিরোধ দুর্বল হ্যায় সুলভ জয় শৌচ,
এাইসা, সাহসিক মত বনু,
অভিযান মেঁ জিন খাইয়োঁ মেঁ
কুদনা হ্যায় কুদঃ
ভরা হ্যায় উনমে আঁধেরা ইস্‌লিয়ে
আপনে নয়ন মাত মুদ।

কখনো কাউকে বিরক্ত করো না, লোকের পিছে লাগার চেষ্টা করো না; নিজকে জানতে শেখ, বুঝতে শেখ, তাতেই জীবনের প্রকৃত শিক্ষা হবে। তুমি সাহস করে কোন কাজ আরম্ভ করলে সব সময়ই সব ক্ষেত্রেই সেই সাহস দেখাবে; সময় বিশেষে স্থান বিশেষে সাহস দেখাবার চেষ্টা করো না। তোমার যাত্রা-পথে যদি বিপদ আসে, বাধা আসে, তবে তা জয় করবার চেষ্টা সব সময়ই করবে। যদি বিপদের অন্ধকার কখনো ঘনিয়ে আসে, তবে তুমি ভয়ে বা শংকায় চোখ বন্ধ করো না।

অখিল ভারতীয় সর্বভাষা কবিসভার অনুষ্ঠান এই বছর আকাশবাণীর মূলকেন্দ্র ভবনে ২৫শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬টার সময় আরম্ভ হয়। বিভিন্ন ভাষার কবিদের আবৃত্তি রেকর্ডে গৃহীত হয় এবং ২৫শে জানুয়ারী রাত সাড়ে নয়টায় কবি-কণ্ঠের ঐ সব রেকর্ড আকাশবাণী দিল্লীর মূল-কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়। প্রত্যেকটি আঞ্চলিক বেতার কেন্দ্র থেকে সেই সেই অঞ্চলের ভাষায় প্রতিটি কবিতার অনুবাদ পাঠ করে শোনানো হয়। উর্দু ছাড়া প্রতিটি ভাষার কবিতার হিন্দীতে কাব্যানুবাদ এক-একজন প্রখ্যাতনামা হিন্দী কবি মূল কবিতাটি পঠিত হওয়ার পরে আবৃত্তি ক'রে শোনান। শ্রীযুত দেশমুখের 'রবীন্দ্র বন্দনা' শীর্ষক সংস্কৃত কবিতাটির হিন্দীতে কাব্যানুবাদ ক'রে শোনান শ্রীজানকীবল্লভ শাস্ত্রী। অসমীয়া ও গুজরাতী কবিতার হিন্দীতে কাব্যানুবাদ পড়ে শোনান ভবানীপ্রসাদ মিশ্র: ওড়িয়া ও কন্নড় ভাষার কবিতার হিন্দী অনুবাদ পড়েন নরেন্দ্র শর্মা; কাশ্মিরী ও পাঞ্জাবী কবিতার হিন্দীতে কাব্যানুবাদ শোনান ডক্টর হরিবংশরায় বচ্চন। তামিল কবিতার হিন্দীতে কাব্যানুবাদ ভগবতীচরণ বর্মা, তেলুগু কবিতার কাব্যানুবাদ সুমিত্রানন্দন পন্থ, বাংলা কবিতার কাব্যানুবাদ হংস-কুমার তেওয়ারী, মারাঠী কবিতার কাব্যানু-বাদ গিরিজাকুমার মাথুর এবং মালয়ালাম কবিতার কাব্যানুবাদ রামেশ্বর শুক্ল 'অঞ্চল' আবৃত্তি ক'রে শোনান।

চক্রদত্ত

খুব কম করলেও পৃথিবীতে ৪৫০ রকমের প্রাণী বা পতঙ্গভুক গাছপালা আছে। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই উষ্ণমণ্ডল এবং নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে পাওয়া যায়। শুধু ১১ রকমের গাছ শীত প্রধান দেশে জন্মায়। এই সমস্ত প্রাণীভুক উদ্ভিদের মধ্যে কিছু আবার আছে ছোট ছোট। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রাণীভুক গাছটি মানুষখেকো গাছ বলে পরিচিত। আমরা পুরাকালের পুঁথি-পত্র থেকে মানুষখেকো গাছ সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পারি। এবং বস্তুত এই মানুষখেকো গাছ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তার কিছুটা কাল্পনিক, কিছুটা বাস্তবিক। মানুষ-খেকো গাছের মধ্যে মাদাগাস্কারের ডেভিল গাছই বিশেষ বিখ্যাত। মাদাগাস্কারের ডেভিল গাছের কথা বহু ভ্রমণকারীর ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লিখিত হয়। ১৯৩০ সালে একজন বৃটিশ সৈন্য ঐ দ্বীপে পৌঁছে স্থানীয় আদিম অধিবাসিদের সাহায্যে গাছটি খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেন; কিন্তু স্থানীয় লোকেরা গাছটিকে ভগবান বলে মনে করে বলেই বৃটিশ সৈন্যকে গাছটি দেখায়নি, ফলে ঐ গাছ দেখার সুযোগ তার ঘটেনি। অবশ্য ঐ গাছ সম্বন্ধে যে বিবরণ তিনি সংগ্রহ করেন তার থেকে জানা যায় যে, মানুষখেকো গাছটির রং বাদামী এবং অনেকটা তাল গাছের মত দেখতে আর পাতার গা থেকে অক্টোপাশের শুঁড়ের মত কতকগুলো শুঁড় বেরিয়ে থাকে। পাতা-গুলি শক্ত ও কাঁটাওয়ালা এবং পাতাগুলো ভিতর দিকে মোড়া থাকে। ঐ দেশের লোকেরা বৃটিশ সৈন্যটিকে বলেছিল ঐ গাছটি প্রথমে গাছের মধ্যে আটকে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত গ্রাস করে ফেলে। ঐখানের আদিম অধিবাসিগণ গাছটিকে ভগবান বলে এমনই অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করে যে, দেবতার প্রীত্যর্থে মাঝে মাঝে একটি করে কুমারী মেয়েকে গাছটির মধ্যে ফেলে দেয়। আধুনিক উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক-দের মধ্যে অনেকেই এইরকম গাছের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। এরা বলেন যে, "সান ডিউ" নামে যে ক্ষুদ্র প্রাণীভুক গাছের নাম জানা আছে তারা শুধু মাত্র মক্ষিকুলের জন্যই ফাঁদ পেতে রাখে। এদের পাতার ওপরে ছোট ছোট আঠালো মিষ্টি গন্ধওয়ালা রোঁয়া-গুলি সূর্যের আলোয় ঝলমল করতে থাকে আর কীটপতঙ্গরা এদের রূপে রসে গন্ধে মুগ্ধ হয়ে ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তারপরে পাতাগুলি গুটিয়ে যায় এবং পতঙ্গটি সম্পূর্ণভাবে এর মধ্যে আটকা পড়ে যায়। ক্রমে ঐ পতঙ্গের দেহ ভেঙ্গে উদ্ভিদটির দেহ পুষ্ট হতে থাকে। এই পতঙ্গটির দেহের সারাংশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করার পর গাছটির পাতাগুলি খুলে যায় এবং ঐ পতঙ্গের দেহের বাকী অংশ অর্থাৎ ছিবড়ে বিশেষ পরিত্যক্ত হয়, তখন অন্য শিকার ধরার চেষ্টা চলে। "ব্লাডার ওয়াটার"ও এইরকম পতঙ্গভুক আর একটি জলজ উদ্ভিদ। এছাড়া পানিকলস বা পিচার প্লান্ট গাছের কথা আমরা অনেকেই জানি। এই সবের জন্যই বৈজ্ঞানিকদের বিশ্বাস যে, মানুষখেকো গাছেরাও এইভাবেই শিকার সংগ্রহ করতে পারে। বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে, ঐ গাছগুলি তাদের পাতার শুঁড় দিয়ে মানুষকে টেনে নিয়ে সপ্তাহখানেক আটকে রেখে দেয়। তারপর আস্তে আস্তে মানুষের দেহের মাংস হজম করে নেওয়ার পর পাতার ভাঁজ যখন খুলে ফেলে তখন হাড়গুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য ডেভিল গাছের বাস্তবিকই কোনও অস্তিত্ব আছে কী না সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে, তবে এই জাতীয় উদ্ভিদ থাকা যে অসম্ভব নয় সে বিষয়ে কারো কোনও সন্দেহ নেই। আর্জেন্টিনাতে "বাদুড় গাছ" বলে যে গাছটি পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে একটা ঘুমপাড়ানি গন্ধ আছে এবং ঐ গন্ধের সাহায্যে বাদুড় গাছগুলি তাদের শিকারকে সুপ্ত করে ফেলে, তারপর তাদের দেহের রক্ত চুষে খেয়ে ফেলে। ভেনেজুয়েলাতে "বাঘ গাছ" বা "টাইগার ট্রি" নামে একরকম ঐ জাতীয় শিকারী গাছ আছে। এগুলো তাদের শিকারের উপর একরকম অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক এসিড নিক্ষেপ করে। যাভাতে "উপাস" নামে একরকম গাছ দেখা যায় যাদের দেহ-নিঃসৃত একরকম বিষাক্ত বাষ্প এদের শিকারের অস্ত্র বিশেষ। এই বাষ্পের বিষক্রিয়া এত প্রবল যে উপাস গাছের আশেপাশে কোনও জীবন্ত গাছপালা বা প্রাণী থাকলে বাঁচতে পারে না। কোনও কারণে যদি কোনও পাখী এই গাছের ওপর দিয়ে কিংবা কাছ দিয়ে উড়ে যায় তাহলে তৎক্ষণাৎ সেটি মারা পড়ে। এমনকি উপাস গাছের কাছাকাছি যদি কোনও জলাশয় থাকে আর ঐ জলাশয়ের মৎস্যকুলের মধ্যে কোনও একটি যদি কোনওক্রমে ঐ গাছের কাছে আসে তাহলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। ব্রেজিলের "মানচিনেল" গাছের ফুলের মধ্যে খুব তীব্র বিষ থাকে। যদি কোনও ভ্রমণকারী ঐ গাছের ফুলের শোভায় মুগ্ধ হয়ে গাছের কাছে যায় তাহলে ফুলের রেণু বিন্দু গায়ে পড়ার দরুণই তার মৃত্যু ঘটে। দক্ষিণ আফ্রিকায় "এডনা" গাছের বিষ আর্সেনিক কিংবা স্ট্রিকনিন এসিডের চেয়ে হাজার গুণ বেশী। এডনার বিষক্রিয়ার ফলে শুধু যে মানুষের মৃত্যু ঘটে তা নয়, মৃত্যুর পর মৃতদেহে বিষের চিহ্নমাত্রও পাওয়া যায় না।

*

সাংশ্লেষিক হর্মোন দিয়ে তৈরী "হেক্সা-ডেকাড্রল" নামক নতুন ওষুধটি আথ্রাইটিস রোগের চিকিৎসার্থে বার করা হয়েছে। আথ্রাইটিসের জন্য সাধারণভাবে "হাইড্রো-কোর্টিজন" "প্রেডনি সোলোন" ব্যবহার করা হয়। "হেক্সাডেকাড্রল" "হাইড্রোকোর্টি-জনের" চেয়ে পঁচিশ গুণ এবং "প্রেডনি সোলোন"-এর চেয়ে ছয় গুণ বেশী শক্তিশালী। হেক্সাডেকাড্রল এ পর্যন্ত ১৮ জন রোগীর ওপর প্রয়োগ করে বেশ সুফল পাওয়া গেছে, অথচ ঐসব রোগীর ওপর হেক্সাডেকাড্রল প্রয়োগের আগে অন্যান্য প্রচলিত ওষুধ প্রয়োগ করে কোনই ফল পাওয়া যায়নি। হেক্সাডেকাড্রল আপাতত বাজারে ছাড়া হবে না, কারণ এটি আরও পরীক্ষা করে দেখার জন্য আরও কিছুদিন সময় লাগবে।

*

আমেরিকার মনস্তত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের মতে স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব শিশুরা জন্মায় তারা অস্বাভাবিক অবস্থায় জন্মান শিশুদের চেয়ে বুদ্ধিমান হয়। এই প্রতিষ্ঠান ১১০টি শিশু নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন, এর মধ্যে ৬১টি শিশু অস্বাভাবিকভাবে জন্মেছে। এদের তিন বছর বয়েসে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, অস্বাভাবিক অবস্থায় জন্মান শিশুরা স্বাভাবিক অবস্থায় জন্মান শিশুদের চেয়ে অনেক কম নম্বর পেয়েছে।

*

সানফ্রান্সিসকো শিশু হাসপাতালের ডাঃ এডওয়ার্ড শ' বলেন যে, "মামস" রোগটা শৈশবাবস্থায় হলে তত ভয়াবহ হয় না কিন্তু বড় হওয়ার পর মামস হলে খুবই ভীতিজনক হয়। কারণ দেহের অন্য অনেকরকম জটিলতা বেড়ে যাওয়ার দরুণ মামস হওয়ার পর অন্য কোনও রোগের উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নয়। এজন্য ডাঃ শ'র মতে শৈশবেই ছেলেদের মামসের জীবাণুর সংস্পর্শে আসতে দিয়ে যাতে তাদেরও ঐ বয়সে মামস হয় সেই চেষ্টাই করা উচিত।

পর্বত বিজয়ে হাতেখড়ি

প্রদ্যোতকুমার রায়

৩

২৪শে মার্চ, আজকে ভীষণ শীত করছে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না, তবু উঠে পড়তে হল। টেণ্ট ও কিটস প্যাক করে দিলাম। শীতের দাপটে তাড়াতাড়ি পোশাক পরিচ্ছদ পরে নিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। সঙ্গে লাঞ্চ দিয়ে দিল, চাপাটি, মাখন চীজ, টিন ফিশ, আমের আচার আর আপেল। আজকে বরফের অভ্যর্থনা যাতে অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি তার জন্য আমাদের পরনে মাউণ্টেনিয়ারিং বুট, গেটার্স (একরকম হোস, যাতে পায়ে বরফ না ঢোকে) গরম ট্রাউজার এবং পুল-ওভার।

যতোই উপরে উঠছি, ততই জঙ্গল, ক্রমশ বনজঙ্গল কেটে কেটে পথ করে নিতে হচ্ছে। উপরদিকে দেখছি বাঁশ জাতীয় গাছই বেশী এবং গাছের উচ্চতা কম। বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চলেছি, আজ সকালেই তরফদারের পার্টির লোক। বেশ আরামে চলেছি। এ দলের ইঞ্জিন হল ক্যাপ্টেন গাই আর গার্ড হল তরফদার। মজার গাড়ি—থামতে বললেই থামে, চলতে বললে নড়বার নামও করে না। চড়াই ক্রমশই বেড়ে চলেছে। শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে আইস অ্যাক্সে ভর দিয়ে এক পা এক পা করে এগুচ্ছি। সান্ত্বনা এই যে, রুকস্যাকটা আর ভারি মনে হচ্ছে না, ওতে বাস্তবিক পক্ষে এখন কিছুই নেই বললেও চলে।

চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবর্ণনীয়। কতো রডোডেনড্রন ফুটে রয়েছে বন আলো করে, ম্যাগনোলিয়া গ্র্যাণ্ড ফ্লোরার সুগন্ধ ছুটেছে বাতাসে। যে দিকে তাকাই, নানা রকম ফুল আর ফল। জীবনে কখনও ভাবতে পারিনি প্রকৃতি রাণী তাঁর প্রকৃত সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্রে আমাদের প্রবেশ করতে দেবেন।

কি অ্যাণ্টি ক্লাইমেক্স। এখানের এই ফুলের সুগন্ধের সাথে সাথে নাকে আসছে এক পাল ছাগল ভেড়ার দেহনিঃসৃত গন্ধ। ওরাও আমাদের সঙ্গে চলেছে, যাত্রা পথে আমাদের জঠরাগ্নিতে ইন্ধন জোগাবার না।

হঠাৎ ক্যাডেট গাঙ্গুলী চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে বরফ এসে গেছে।' দারুণ আগ্রহে আমরা সকলেই হৈ হৈ করে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায়? কোথায়?" গাঙ্গুলী আইস অ্যাক্স দিয়ে নির্দেশ করল একটা গাছের তলায়। সেখানটায় নুনের মত পেঁজা বরফ পড়ে সাদা হয়ে রয়েছে। ছেলেবেলায় অভিভাবকদের বারণ না মেনে লুকিয়ে যে রকম 'পাংখা বরফ' খেতাম, অনেকটা সেইরকম। ভারি মজা লাগল, শিশুর মত আনন্দে আইস অ্যাক্স দিয়ে বরফের উপর লিখে দিলাম—এন সি সি। কিছুক্ষণ বাদে এমন জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলাম, যেখানে আর মাটি দেখা যাচ্ছে না, কেবল শাদা শাদা উঁচু নীচু জমি আর ছোট ছোট রডোডেনড্রন গাছ। কোথাও আবার গাছের ওপরে বরফ জমে রয়েছে। এ কিন্তু বাজারে সের দরে কেনা বরফ নয়, নরম নরম বরফ, একে বরং তুষার বা ফেনা বলা যেতে পারে। যতই উপরে উঠি, ততই বরফ বাড়ছে। হঠাৎ আওয়াজ শুনতে পেলাম 'হো হো!' তারপর বুঝলাম আমাদের আগের দল ডাকছে আমাদের। আমরাও জবাব দিলাম, হো হো শব্দে। এক জায়গায় দেখি আমাদের আগের দল বরফের উপরে বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানেই বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া গেল। অতঃপর ঠিক হল, এবার সকলেই এক সাথে যাবে—কারণ বরফের রাজত্বে পিছিয়ে পড়লে বা এগিয়ে গেলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা।

তেনজিং আস্তে আস্তে পা ফেলে চলছেন সকলের আগে আগে আর আমরা তাঁর পায়ের দাগের উপর পা ফেলে ফেলে চলেছি। গেটার্সের ফাঁক দিয়ে ভিতরে বরফ ঢুকে গেছে। পায়ের কাছটা কেমন চিন চিন করছে। ওঃ কি শীতরে বাবা! হাড়ের ভিতর পর্যন্ত জমে যাচ্ছে যেন। তরফদারের দেখছি বেশ মজা। সারাপথ পিছনে পিছনে এসে আজ সে সকলের আগে আগে যাচ্ছে বেশ কদম চালেই। ছাগলগুলো আর এগুতে পারছে না। শীত আর ভয়ের দুদু কাঁপুনি ওদের অবসন্ন করে দিয়েছে। কয়েকজন কুলির পায়ে জুতোও নেই, তাদের অবস্থা চোখে দেখা যায় না। বেলা বারটা নাগাদ বরফের উপরে বসে লাঞ্চ সারা হল। আজ একেবারে খেতে ইচ্ছা নেই, বিশ্রী লাগছে। ছাগলগুলোকে খাবার দিলাম—ওরাও খেলো না; সর্বভূক ছাগলরা বরফের দেশে এসে অনাহারী-বাবা হয়ে গেল নাকি?

চেয়ে চেয়ে দেখি কারো অবস্থাই আমার চেয়ে ভালো নয়। তেনজিংয়ের কুকুরটার অবস্থা খারাপের দিকে। গোমড়া ভীষণ মুখ গোমড়া করে বসে আছে। নাঃ, আর বসলে চলবে না, বিকালের মধ্যে জংরি (১০০০০ ফিট) পৌঁছতে হবে। সেইখানেই ক্যাম্প।

আমরা এঁকে-বেঁকে দার্জিলিঙের ছোট ছোট রেলের মত জিগ জ্যাগ পথে চলেছি। বরফ, চারিদিকে শুধু বরফ! শুধু মাত্র

রক ক্লাইম্বিং শিক্ষা

প্যাডাস রেস্‌কিউ : অর্থাৎ খাদ থেকে উদ্ধার শিক্ষা

রডোডেনড্রনের পাতাগুলো বরফের উপর জেগে রয়েছে। মাঝে মাঝে পা পিছলে যাচ্ছে। হঠাৎ সামনে থেকে ক্যাপ্টেন খাম্না চিৎকার করে উঠলেন, 'পাকড়ো, পাকড়ো'—তাঁর কোমর পর্যন্ত বরফে ঢুকে গেছে। ইনস্ট্রাক্টরদের নির্দেশ মত যে যার জায়গায় আইস অ্যাক্স পুঁতে দাঁড়িয়ে গেলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে তাঁকে তুলতে পারা গেল। ঠিক শীতের পরেই আমরা এসেছি বলে অনেক নিচুতেই বরফ দেখা যাচ্ছে। আমার শরীরটা বেশ খারাপ খারাপ লাগছে। একটু একটু করে দল থেকে পিছিয়ে পড়ছি। প্রথম প্রথম ক্যাডেট বিষয়ী সঙ্গে ছিল, সেও দেখি অনেকটা এগিয়ে গেছে। অবশ্য পেছনে এখনও গাই, পন্থ ইত্যাদিরা আছেন। পথ ভুলবার সম্ভাবনা নেই, কারণ বরফের উপর পায়ের ছাপ বেশ স্পষ্টই ফুটেছে। কিন্তু ভয় পেয়ে একবার পিছিয়ে পড়লে আর এগুবার উপায় থাকবে না। কুলির দল পিছনে এসে পড়েছে। এক-পাশে সরে দাঁড়িয়ে তাদের পথ করে দিলাম, কিন্তু তারা আমাকে আগে আগে চলতে বলল, বুঝতে পারছি, ওরা আমার অবস্থা টের পেয়েছে। ক্রমাগত অভয় দিচ্ছে তাই। বরফে উৎরাই পথে নামতে ভীষণ ভয় পাচ্ছি, মাথার ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। নামতে গিয়ে হঠাৎ পা স্লিপ করে এমন জায়গায় গিয়ে পড়লুম, আমার কোমর পর্যন্ত বরফে ঢুকে গেল। একজন কুলি হাত ধরে টেনে তুলে আমার প্রাণ বাঁচাল, নয়ত নিজেকে ওই বরফের গর্ভেই জমা দিয়ে আসতে হ'ত। ওকে যে ধন্যবাদ জানাব, তারও মত অবস্থা আর নেই। দেহ ভীষণ অসহযোগ করছে। বেলা তিনটের সময় কোনক্রমে ক্যাম্পের জায়গায় পৌঁছলুম। তরফদার দেখি আজ আগেই এসে টেন্ট খাটিয়ে ম্যাট্রেস খুলিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। খানিকটা গরম চা খেয়ে টেন্টে শুয়ে পড়লাম। ভালো করে বিছানা করারও সময় নেই, মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। গতিক সুবিধের নয় বুঝে ক্যাপ্টেন দাসের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তিনিও দেখি টেন্টের বাইরে বসে দুহাতে মাথা চেপে ধরে বমি করছেন। টলতে টলতে গেলাম ডাক্তার খাম্নার কাছে। তিনি সকলকে পরীক্ষা করে ওষুধপত্র দিচ্ছেন। ক্যাম্পসুদ্ধ সকলেরই একই অবস্থা প্রায়। ডাক্তারের কাছ থেকে দুটি ট্যাবলেট নিয়ে এলাম—একটি এখন এবং একটি শোবার আগে খেতে হবে। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। এক জায়গায় দেখলাম আগুন জ্বালানো হয়েছে, সকলে তার চারপাশে বসে হাত পা গরম করে নিচ্ছে। সেখানেই বসে গেলাম—শীতের প্রকোপ আর সহ্য করা যাচ্ছে না। চারধারে কেবল বরফের পাহাড়, একপাশ দিয়ে একটি ঝরনা বয়ে গেছে—উপরদিকটায় বরফ, খানিকটা নীচে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যের পরেই ডিনারের বাঁশি বাজল। একেবারেই খিদে নেই—খাবার ইচ্ছাও নেই এতটুকু। তেনজিং জানতে পেরে খুব জোর করে বললেন, "এক বাটি চিকেন-সুপ, আর একটা চাপাটি খেতেই হবে।" পাহাড়ের হালচাল জানা নেই, তার ওপর নেতার হুকুম, "উই আর নট টু রিজন হোয়াই" কোন রকমে খাবারগুলো খেলুম—যেন কুইনাইন খাচ্ছি।

শুনলাম, জংরিতে এসে সকলেরই একবার এই অবস্থা হয়। তাই, বেশি উচ্চতার আবহাওয়া সহ্য করে নেবার জন্য এখানে একটা ক্যাম্পের জায়গা ঠিক করা হয়েছে। এখান থেকে আমাদের বেস ক্যাম্প আর মাত্র সাত আট মাইল দূর। এক কাপ কফি খেয়ে শুতে গেলাম। এই কনকনে ঠাণ্ডায় গরম কফিই সবচেয়ে বড় উত্তেজকের কাজ করে।

২৫শে মার্চ টি-বয়ের ডাকে ঘুম ভাঙল। আর মাথার যন্ত্রণা নেই, শরীরটা বেশ ঝর-ঝরে লাগছে। গলার আওয়াজ শুনে পাশের টেন্ট থেকে ক্যাপ্টেন খাম্না জিজ্ঞাসা করলেন, "রায়, আজ কেমন আছ?" গুড-মর্নিং জানিয়ে জবাব দিলাম, 'ভালোই আছি।' কিন্তু ক্যাপ্টেন দাস ও ক্যাডেট ব্যানার্জির অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। আজকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া হবে। নিঃশ্বাস নিতে এখন থেকেই বেশ কষ্ট হচ্ছে, বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ কম। শীতের জন্য আজ পুরো পোশাকের উপর ফেদার জ্যাকেট গায়ে দিতে হল। তেনজিং যে জ্যাকেটটা পরে এভারেস্টে উঠেছিলেন, সেটা এখন আমাদের ইনস্টিট্যুটের মিউজিয়মে রেখে দেওয়া হয়েছে। আমার জ্যাকেটটার রঙ ঠিক সেই জ্যাকেটটার মত হলদে।

রাত্রে ডিনারের সময় ঠিক হল ক্যাপ্টেন দাস ও ক্যাডেট ব্যানার্জী আগামীকাল দার্জিলিঙ ফিরে যাবেন। ক্যাপ্টেন খাম্না আমাকে বললেন, শরীর যদি খারাপ থাকে তাহলে আমিও যেন ফিরে যাই, অসুস্থ

শরীরের আর এগনো ঠিক নয়। আমি ভাবলাম, এখন তো বেশ ভালোই বোধ করছি, আর মাত্র সাত আট মাইল বাকি, কিছুতেই ফেরা চলবে না।

২৬শে মার্চ, ভোরবেলা ফের পথচলা শুরু হ'ল। ক্যাপ্টেন দাস এবং ব্যানার্জী কিছুতেই ফিরে যেতে রাজি হল না। তেনজিং একধারে দাঁড়িয়ে মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলতে লাগলেন। খানিকক্ষণ চলবার পরে ছোট ছোট ঘাসে ভরা একটি বিস্তীর্ণ মালভূমিতে এসে পড়লাম। মাঝে মাঝে বরফের আস্তরণ আর তার মাঝে জায়গায় জায়গায় সবুজ ঘাসের ছোপ। একধারে একটা বিরাট আস্তাবলের মত ছাউনি। ওস্তাদদের (ইনস্ট্রাক্টর) কাছে শুনলাম ওটা সিকিম মহারাজের ঘোড়ার গ্রীষ্মকালীন আস্তাবল।

আজকে যাত্রাপথ বেশ কঠিন। মাত্র একজন একজন করে যাবার মত রাস্তা। বরফ বেশ কঠিন, আর পা ঢুকে যাচ্ছে না, অবশ্য মাঝে মাঝে নরম তুষারও রয়েছে। তেনজিং আজ সকলের পিছনে থেকে গোটা দলটার উপর নজর রাখছেন। চারধারে ছোট ছোট গিরিচূড়া, এগুলো কাঞ্চনজঙ্ঘারই ছোট ছোট শৃংগ। সিকিম মহারাজার নির্দেশ অনুযায়ী এগুলোতে চড়বার অনুমতি নেই। সামনে মাজার মত পর্বত-শৃংগ দেখা যাচ্ছে—ওই পর্যন্ত সিকিম রাজ্য, তারপরে নেপালের সীমানা।

আজ একটু চলতেই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। নিঃশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, আর সারা শরীরটা যেন অসাড় হয়ে গেছে। কেমন যেন গা বমি বমি করছে, সব মিলিয়ে অসহ্য কষ্ট। মনে ভাবছি, সমতলভূমির যেসব লোক ভাবছে আমরা পাহাড়ে গিয়ে বেশ আরামে আছি, তাদের একবার সামনে পেলে হয় এখন। ওস্তাদেরা বমির ভাবটা দূর করার জন্য খুব চকলেট খেতে বলছেন। আর কতদূর, জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেন—বেশি নয়, আর সামান্যই দূর। আবার কেউ কেউ বলেন, আর দু'মাইল বাকি। বলে কি! এখনও দু মাইল! মনে হচ্ছে অন্তত দশ-বারো মাইল চলে এসেছি। পরে বুঝলাম—পাহাড় অঞ্চলে সব দূরত্বই বোঝান হয় দু'মাইল দিয়ে। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের দু-পোয়া পথ যেমন।

খুব সরু রাস্তা; মাঝে মাঝে আইস অ্যাক্স দিয়ে পথ কেটে নিতে হচ্ছে। অতি সাবধানে এক পা এক পা করে এগোচ্ছি। একবার পা ফসকালে আর চিহ্নমাত্র থাকবে না। চারধারে ধোঁয়ার মত কুয়াশা জমে আছে। ক্যাডেট ব্যানার্জীর অবস্থা খুবই খারাপ। নাড়ীর বেগ একশ' পঞ্চাশ। ক্যাপ্টেন খান্না ওর জন্য খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। ক্যাপ্টেন দাসের অবস্থাও বেশ খারাপ হয়ে পড়েছে। বেশ ভাবনা লাগছে

দড়ির সাহায্যে নীচে নামা অর্থাৎ র‍্যাপেলিং

ওদের জন্য। ক্রমে আমরা একটা নদীর খাতে এসে পড়লাম। আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু স্রোত দেখা যাচ্ছে না। মাটির নীচে দিয়ে নদী বয়ে চলেছে। এখানে এসে চলা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল, দু-পা চলতেই যেন জিভ বেরিয়ে আসছে। লোকে বোধ হয় মরবার আগেও এরকম কষ্ট পায় না। তেনজিং বললেন, এই জায়গায় এসে প্রতিবার প্রতিটি শিক্ষার্থীকেই এই রকম কুকুরের মত জিভ বার করে হাঁপাতে হয়। বেলা এগারটা নাগাদ, এক জায়গায় পৌঁছালাম, সেখানে পানীয় জলের স্রোত জমে যায়নি। এখানেই লাঞ্চ হল। বমি হয়ে যাবার ভয়ে কিছু খেতে চাইছিলাম না, তেনজিংয়ের ধমকে বাধ্য হয়ে কিছু খেতে হ'ল। ক্যাপ্টেন খান্নাকে বললাম, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে; তিনি একগাদা চকলেট দিয়ে বললেন, "চলবার সময় এক একটা করে অনবরত খেয়ে যাও"। বাস্তবিক খান্না আদর্শ ডাক্তার; পরে শুনলাম তিনি নিজের চকলেটগুলোও আমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন, বমি যাতে না হয়। ভালো অবস্থা দেখলাম চৌধুরী, মূলুকরাজ, তরফদার এবং পন্থের। ক্যাপ্টেন খান্নার কথা আলাদা, উনি নিজে বেশ কষ্ট পাচ্ছেন বলে মনে হয়; কিন্তু বাইরে মোটেই প্রকাশ করছেন না।

কঠিন বরফ কেটে হিমবাহে উঠতে শিক্ষা দিচ্ছেন শ্রী তেনজিং

বশিষ্ঠ, গাঙ্গুলী, সোম ও সানিয়াল এতক্ষণ বেশ ভালোই ছিল; কিন্তু এখন তাদেরও খুব বমি হতে লাগল।

শুনলাম, গতবারের কোর্সের একজন শিক্ষার্থী, কর্নেল পুরী, এখানেই হঠাৎ হার্টফেল করেছিলেন। পর্বতারোহণ শিক্ষা শেষ করে ফিরছিলেন ইনি; কিন্তু দেশ অবধি ফিরবার ভাগ্য করে আসেননি। পাহাড় তাঁকে বরাবরের জন্য আপন কোলে আশ্রয় দিল। এই রাস্তার পাশে পাথরের তলায় তাঁকে সমাহিত করে রাখা হয়েছে। পাথরের উপর কেবল তাঁর নাম ও মৃত্যু-তারিখ লেখা। এই হতভাগ্য শিক্ষার্থীর কথা ভাবতে গিয়ে এই অসহ্য কষ্টের মধ্যেও মনটা যেন কেমন উদাস হয়ে গেল।

আমরা আগের দলের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছি। তেনজিং, তরফদার, পেরেরা, গুরুং, শর্মা, পন্থ, নটিয়াল ও লস্করদের দল অনেক এগিয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন গাই, যিনি এত পথ আমাদের হাসির খোরাক জুগিয়ে এসেছেন তাঁর শরীর খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। চৌধুরী ও মুলুকরাজ আমাদের নানারকমে উৎসাহিত করে তোলার চেষ্টা করছেন। লেমন ওয়াটার দিচ্ছেন সকলকে, কাউকে বা হাত ধরে তুলছেন। দুঃসহ ক্লান্তিতে যখন শুয়ে পড়েছি, তখন দূরে গোম্ফু আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছেন, "ওই দেখ, ওইখানে আমাদের বেস ক্যাম্প।" চেয়ে দেখি অনেক দূরে পাহাড়ের উপর ছোট ছোট পুতুলের মত কয়েকজন লোক উঠছে।

দেখে যেন যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল। নাক দিয়ে আগুনের মত গরম নিঃশ্বাস পড়ছে।

শেষ পর্যন্ত গোম্ফু, ক্যাডেট ব্যানার্জিকে পিঠে তুলে নিয়ে চলত শুরু করলেন। তোপকে নিলেন ক্যাপ্টেন দাসকে। ক্যাপ্টেন খান্না ইত্যাদিরা উদ্বিগ্ন চিত্তে ও'দের অনুসরণ করতে লাগলেন। আংথাম্পা ক্যাপ্টেন গাইকে তুলে নিলেন। ওঃ কি অবস্থা, সকলেই আধমরা হয়ে পড়েছি। এইভাবে অনেক দূর এগিয়ে গেছি, কুলিরা এসে আমাদের চা দিয়ে গেল। সত্যি এদের অভাবনীয় ক্ষমতা দেখে অনেক সময় মনে হয়েছে ওরা অমানুষিক শক্তির অধিকারী। আমি আর চা খেলাম না, পাছে বমি হয়ে যায়। রুকস্যাকগুলো চৌধুরী আগেই আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নিয়েছিলেন। দুরূহ পথের আশ্চর্য মহিমা—এখানে সমস্ত মুখোশ খুলে গিয়ে ভিতরের খাঁটি মানুষটি বেরিয়ে পড়ে।

বাকি পথটুকু কুলিরা আমাদের হাত ধরে আস্তে আস্তে নিয়ে গেল।

বেস ক্যাম্পে পৌঁছেছি। বেলা এখন প্রায় পাঁচটা। এসে দেখি তাঁবু খাটানো। এয়ার ম্যাট্রেস ফোলানো; সবই লস্কররা করে দিয়েছে। ওরা আগেই বুঝতে পেরেছিল সব বাবুই আজ কাবু হয়ে পৌঁছাবে।

পাহাড়ের উপর এক সমতল জায়গায় সারি সারি তাঁবু পড়েছে। কিচেনটা বেশ সুন্দর তৈরী করেছে এবং পাথর সাজিয়ে দেওয়াল তৈরী হয়েছে, মাথার উপর ত্রিপলের ছাদ। আমাদের বেস ক্যাম্পের চারদিকে কাঞ্চন জঙ্ঘার ছোট ছোট চূড়াগুলি। ওদের নাম, কাবরু ডোম, ছোট কাবরু, বড় কাবরু, টংরিকাং ইত্যাদি। প্রত্যেকটি চূড়াকে সিকিমবাসীরা দেবতার অধিষ্ঠান বলে মনে করে। তাই ওগুলোয় উঠবার অনুমতি নেই। তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। হঠাৎ চট্‌কা ভেঙে দেখি মাথার কাছে বসে আংথাম্পা মাথা টিপে দিচ্ছেন। ডিনারের বাঁশি পড়ল, আমি কিছুতেই খেতে গেলাম না। আংথাম্পা খালি খালি বলছেন, ভালো খাবার খেলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আমি তবুও গেলাম না দেখে তিনি নিজের বড়ো কাপে করে এক কাপ মুরগির সুপ এনে জোর করে খাওয়ালেন।

২৭শে মার্চ, গায় হাতে অসহ্য ব্যথা। তবু মনে হল মাথা ব্যথাটা কিছু কমেছে। খান্না পাল্‌স্ দেখলেন আগের থেকে একটু ভালোই। তেনজিং বললেন। দু'তিন দিন এখানে থাকলেই শরীর ঠিক হয়ে যাবে। আজকেও পুরো বিশ্রাম। আজকেও খাবার ইচ্ছা বা রুচি একদম নেই তবু তেনজিং ও ওস্তাদদের পীড়াপীড়িতে কিছু খেতেই হ'ল। নাঃ শরীরটা এখন একটু ভালোই মনে হচ্ছে। ক্যাপ্টেন দাস, ক্যাপ্টেন গাই, ক্যাডেট ব্যানার্জি ও ক্যাডেট সানিয়ালের অবস্থা রীতিমত খারাপ। খান্না ওদেরকে নানা রকম ইনজেকশন দেওয়াতেও বিশেষ উপকার হ'ল না। ওরা কেউই খেতে পারছে না। সারাদিন খালি বমি করছে। শরীর নীল হয়ে গেছে। সকলেই ওদের জন্য খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

বিকেলের দিকে বরফ পড়া শুরু হ'ল। সাদা সাদা গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ চারদিকে কুয়াশার মত ছড়িয়ে পড়ছে। দেখতে দেখতে সমস্ত জায়গা সাদা হয়ে গেল। প্রায় দেড়ফুট গভীর হয়ে বরফ পড়েছে। এই তুষারপাতই বোধহয় শরীর থেকে মাউণ্টেনিয়ারিং সিক্‌নেসের চিহ্নটুকু মুছে দিল।

২৮শে মার্চ ভোরে চা খেয়ে বুট, গেটার্স জ্যাকেট, টুপি, চশমা লাগিয়ে বরফ সরিয়ে তাঁবুর বাইরে এলাম। তেনজিং আজ বড় ব্যস্ত—অসুস্থ দাস, ব্যানার্জি, গাই এবং সানিয়ালের জন্য। খাম্না বললেন, এত উঁচু জায়গায় রাখলে এ'দের বাঁচান মুশকিল হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং আলাপ আলোচনার পর ঠিক হ'ল, যে করেই হোক আজ এ'দের দার্জিলিঙের পথে বাকিম ক্যাম্পে (৯০০০ ফিট) পেঁছে দিতে হবে। গোম্ফু পনের জন কুলিকে সঙ্গে নিয়ে এ'দের পেঁছে দিতে রওনা হলেন। ক্যাপ্টেন দাসের আর চলৎশক্তি নেই। কুলিরা তাঁকে ডুলি করে নিয়ে গেল। ও'রা কারুর সঙ্গে কথাই বলতে পারছেন না।

আজ থেকে তেনজিংয়ের "পাহাড়ের উপরের কাজ" শুরু হ'ল। আজ তিনি সকলকে দড়ির নানা প্রকার নট (knot) বাঁধতে শেখালেন—এল্ ম্যান নট (L man knot), মিড্‌ল ম্যান নট (Middle man knot), ডাব্‌ল (Double knot) ইত্যাদি। প্রত্যেকটিই পর্বতারোহণের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়। কি ভাবে দড়ির নট্ বেঁধে পাহাড়ের উপর দল বেঁধে চলতে হয় তাও শেখান হ'ল আজ। তারপর তুষার পাত শুরু হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসের পালাও শেষ।

২৯শে মার্চ, আজ আকাশ চমৎকার পরিষ্কার আছে। বরফ পড়ে প্রায় ফিট দুয়েক গভীর হয়ে আছে। বরফের উপর সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে পাছে আমাদের চোখ ঝলসে যায় তার জন্য আমরা—রঙ্গীন চশমা ব্যবহার করতে শুরু করেছি। ব্রেকফাস্টের পর পর্বতারোহণ (Rock climbing) শেখবার জন্য আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম ওস্তাদদের সঙ্গে। আমাদের গ্রুপের ওস্তাদ হচ্ছেন ইনস্ট্রাক্টর আংথাম্পা। এ দলে আমি ছাড়া আরও আছে তরফদার, গাঙ্গুলী এবং ক্যাপ্টেন পন্থ। দলের মধ্যে তরফদার আর গাঙ্গুলি বেশ রক ক্লাইম্বিং করতে লাগল। পন্থ কিছুদূর এগিয়ে আবার নেমে এলেন হুড় হুড় করে। দেখে ভারি মজা লাগছিল। আমায় হাসতে দেখে তিনিও হাসতে হাসতে বললেন, "Dont laugh! Dont insult me." আমি ছিলাম দলের মধ্যে সবচেয়ে ফাঁকিবাজ। খালি খালি খুব সোজা পথ খুঁজে উঠতাম। ওস্তাদ আমায় খালি বলেন, "তুমি চালাকি করে কাজ সারছো।" অবশ্য
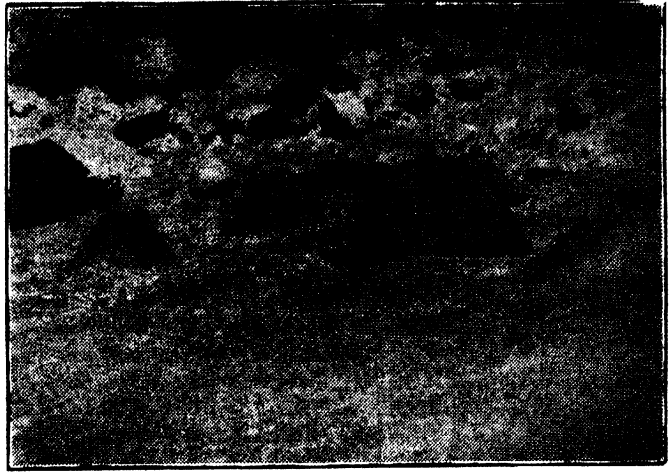
বেস ক্যাম্প (১৫০০০ ফিট)

আমি যে পাহাড়ে চড়তে পারতাম না ভালো রকম, তার কারণ আমার বুট জোড়া ছিল দলের মধ্যে সবচেয়ে ভারি। সুতরাং কোন জায়গায় উঠতে না পারলেই আমি ওস্তাদকে আমার জুতার অজুহাত দেখাতাম। তিনি আমার কথা শুনে হাসতেন। তেনজিং আমাদের গ্রুপ দেখতে আসছেন শুনেই খুব সোজা পথে ঘুরে গিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে ওস্তাদের কাছে পেঁছে বসে থাকতাম, যেন আমি কত আগে 'রক ক্লাইম্বিং' সেরে বসে আছি। তেনজিং এসে জিজ্ঞাসা করলে বলি, আমার আগেই হয়ে গেছে, ওস্তাদও কিছু বলতেন না।

পর্বতারোহণের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন হ'ল চিম্‌নি ক্লাইম্বিং (chimney climbing) অর্থাৎ দুটি খাড়া পাহাড়ের মাঝের সরু ফাঁক দিয়ে হাত পা ও শরীরের চাপ দিয়ে ওঠা। ফাঁকি দিয়ে রক ক্লাইম্বিংয়ের অন্যান্য ভাগ সেরে, এই চিম্‌নি ক্লাইম্বিং শিখতে গিয়েই পড়লাম মুশকিলে। ইদানিং তরফদারকে সকলে 'হিলারী' বলে ডাকত। চিম্‌নি ক্লাইম্বিং-এর দিন অকুস্থলে যেতেই রব উঠল "মিঃ হিলারীকা গ্রুপ আ গয়া!" দেখি অন্যান্য গ্রুপের শেখা হয়ে গেছে, সকলেই সেখানে রয়েছে। তেনজিং একটা পাথরের উপর বসে। আমি চেয়ে দেখলাম কুড়ি পঁচিশ ফিট উঁচু একটি পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে উঠতে হবে। আজ তো দেখছি সব চালাকি ফাঁস হয়ে যায়! ওস্তাদ আংথাম্পার কানে কানে বলি, "ওস্তাদজি, জারা ম্যানেজ করকে রশি টাইট কর না, নহী তো মর জাউঙ্গা।" ওস্তাদ হেসে ফেলে বললেন, "ফিকর্ মৎ কিজিয়ে!"

মিঃ পন্থ কোনো রকমে উঁ আঁ শব্দ করে উঠে গেলেন। এবার আমার পালা। ভগবানকে স্মরণ করে কোন রকমে খানিকটা উঠে গেলাম, পন্থ উপর থেকে আমার কোমরের দড়ি ধরে টানছেন। বাকিটুকু আর কিছুতেই উঠতে পারছি না—তেনজিং কেবল নীচে এসে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন, তিনি জানেন, আমি একজন ভালো পাহাড় চড়িয়ে। নীচে বন্ধুরা হাসাহাসি করছে। কোনক্রমে ওপরে উঠে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালাম।

রোপেলিং বা দড়ি ধরে উপর থেকে নীচে নামা জিনিসটা যত সহজ ভেবেছিলাম ততটা সহজ নয়। রোপেলিং পাঁচ রকম—তার মধ্যে সাইড অ্যান্ড স্টম্যাক রোপেলিং হচ্ছে সবচেয়ে বিপজ্জনক ও কঠিন। সমস্ত শরীরটা সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে দু হাতে ধীরে ধীরে দড়ি ছেড়ে নীচে নামতে হয়। হাত থেকে দড়ি ফসকে গেলে যে কি হবে চিন্তা করারও সময় থাকবে না।

দুপুরে লাঞ্চের পর ক্লাস হ'ল না। আজকে আকাশ পরিষ্কার, তায় সন্ধ্যে বেলা চাঁদ উঠেছে। বরফের শুভ্রতায় চাঁদের রুপোলি আলো পড়ে যে শোভা ধারণ করল তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার অন্তত নেই।

বেস ক্যাম্পে ক'দিন প্রকাণ্ড আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে ডিনার হত। আর ডিনারের পর হত নাচ গানের জলসা। গুরুং পেরেরা প্রভৃতিরা গান গাইতেন এবং অপর সকলে আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মত আগুনের চারধারে ঘুরে ঘুরে প্লেট ও ফর্ক বাজিয়ে নাচত। মাঝে মাঝে নেপালী গানও হ'ত।

৩০শে মার্চ সকালে ডাক এলো। তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে দেখি আমার চারখানা চিঠি এসেছে। সামান্য চারটুকরো লেখা কাগজ যে কতো অমূল্য মনে হতে পারে তার প্রমাণ পেলুম পনের হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ে ঘেরা এই বেস ক্যাম্পে। একখানা লিখেছেন, এন সি সি হেড

কোয়ার্টার থেকে আমাদের ব্যাটেলিয়নের মেজর, আর একটা লিখেছেন বাঙ্গালোর থেকে আমার জামাইবাবু, অপর দুটো এসেছে আমার দুই কলেজের বন্ধুর কাছ থেকে।

আজ আমরা সাড়ে সাতটার সময় রওনা হলাম। রটং হিমবাহ আজ আমাদের গন্তব্য স্থল। ছোট একটা পাহাড়ের চূড়া পার হয়ে বরফের উপর দিয়ে চলছি আমরা। এখানকার দৃশ্যগুলি ঠিক যেন সিনেমায় দেখা মেরু প্রদেশের ছবির মত। হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজে আমাদের কানে তালা ধরে যাবার উপক্রম হল। কি আওয়াজ! যেন একশটা কামান একসঙ্গে গর্জে উঠল। পাহাড়ের গায়ে গায়ে তার প্রতিধ্বনি অনেকক্ষণ ধরে ধ্বনিত হতে লাগল। তেনজিং এবং অপরাপর ওস্তাদরা বললেন, ও হচ্ছে অ্যাভালাঞ্চের (Avalanche) আওয়াজ। দার্জিলিংএ প্রিন্সিপ্যাল যখন অ্যাভালাঞ্চ বা হিমানী সম্প্রপাতের কথা (সোজা কথায় যাকে আমরা ধস নামা বলি।) পড়াচ্ছিলেন তখন কল্পনাও করতে পারিনি ধস্ নামলে এই রকম আওয়াজ হয়! এই ধস নেমে যে কত শত পর্বতারোহীর জীবনাবসান ঘটেছে তার সংখ্যা নেই।

প্রায় পাঁচ ছয় মাইল হেঁটে আমরা রটং গ্লেসিয়ারে পৌঁছলাম। রটং পাহাড় থেকে এই হিমবাহটি নেমেছে বলে এর নাম রটং হিমবাহ। রটং পাহাড় এখান থেকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট মাইল দূরে। তেনজিং বললেন, দশবারো বছর আগে এই হিমবাহ আমাদের বেস ক্যাম্পের কাছে ছিল, এখন ক্রমশ ছোট হয়ে যাচ্ছে। আমরা হিমবাহের উপর চলবার জন্য জুতোর তলায় (এক প্রকার কাঁটা) লাগিয়ে নিলাম। শক্ত বরফের উপর চলতে গেলে ক্র্যাম্পনের সাহায্য অপরিহার্য। তেনজিং শেখালেন গ্লেসিয়ারের উপর দিয়ে চলবার কৌশল। দল বেঁধে চলতে লাগলাম আমরা। খুব সাবধানে জোরে পায়ের কাঁটা বরফে গেঁথে সামনের লোকের কোমরের দড়ি এক হাতে ধরে এগোতে হয়, কেননা সামনের লোক পা পিছলে পড়ে গেলে তাকে বাঁচাবার দায়িত্ব আমার। অবশ্য আমার পিছনেও লোক আছে আমাকে বাঁচাবার জন্য, আমার কোমরের দড়ি ধরে।

বেলা একটার সময় আমরা সিকিম-নেপাল সীমান্তে গিয়ে উপস্থিত হলাম। একটা পাহাড়ের রিজ (Ridge) পার হলেই নেপাল পৌঁছানো যায়। সেখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন সারা হ'ল, চাপাটি, টিন ফিশ, মাখন, শুকনো খেজুর, বিস্কুট এবং কফি বা কোকো দিয়ে। বরফের উপরেই সাদা সাদা ছোট একরকম ফুয়েল কেক (Fuel cake) জ্বালিয়ে কফি বা কোকোর জল গরম করা হ'ল। যেন আমরা পিকনিক করতে এসেছি রটং গ্লেসিয়ারে।

প্রায় সন্ধ্যের সময় বেস ক্যাম্পে ফিরে এলাম। ডোনাট সহযোগে গরম চা আমাদের পথের ক্লান্তি দূর করে দিল। সন্ধ্যা উত্তরোত্তেই ডিনারের বাঁশি বাজল। খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে মাথায় উইন্ড প্রুফ ঢাকনা দিয়ে তাঁবুতে ঢুকলাম—ডিনারের মাঝখানেই বরফ পড়া শুরু হয়েছিল। ভীষণ শীত আর অবিরাম বরফ পড়ছে। স্লিপিং ব্যাগের ঈষদুষ্ণ আরামে শুয়ে শুয়ে কুলিদের কথা মনে পড়ল। ওরা একটা পাথরের ছাউনির তলায় সারারাত্রি আগুন জ্বালিয়ে শুয়ে থাকে। ওদের মজুরিও উপযুক্ত নয়; দৈনিক একপোয়া চাল ও ডাল, নগদ চার টাকা এবং এক প্যাকেট 'স্টার' সিগারেট (খুবই কমদামী) পায় ওরা।

৩১শে মার্চ, সকালে ফের টি-বয়ের হাঁকে ঘুম ভাঙল। ছেলেটা যেন আমাদের কাছে ঘড়ির অ্যালার্মের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ তাঁবুটার উপরে প্রায় ছ' ইঞ্চি পুরু হয়ে তুষার জমে আছে। আমরা খাবার প্লেটে করে তুষার সাফ করতে লেগে গেলাম। সেই ভোরে তেনজিং তাঁর মুভি ক্যামেরায় ফোটো তুলতে লেগে গেছেন। মুখে সর্বদা জ্বলছে একটা সিগারেট আর মাথায় লাল পশমের ক্যাপ। তেনজিং এর সঙ্গে আমাদের খুব হৃদ্যতা হয়ে গিয়েছিল। উনি খুব চকলেট খেতে ভালোবাসেন আর আমার পকেটে সব সময়ে তা স্টক করা থাকে। প্রায়ই তাঁকে চকলেট 'অফার' করতাম। তিনি তাঁর মুভি ক্যামেরায় আমাদের বহু মজার মজার অবস্থার ছবি নিয়েছেন। কোন দিন হয়ত ভোরবেলা তাঁবুর দরজা খুলে মাথাটা বার করে খাবার প্লেট দিয়ে বরফ সরাচ্ছি এমন সময় উনি ছবি নিয়ে নিয়েছেন।

আজও ব্রেক ফাস্টের পরে আইস কাটিং (Ice cutting) শেখবার জন্য আমরা রটং গ্লেসিয়ারের দিকে চললাম। মুখে ভাল করে ক্রীম মেখে নিলাম, যাতে চামড়া না ফাটে। আজ সকাল থেকেই কেবল ধস্ নামার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আবহাওয়া বেশ খারাপ। ওস্তাদরা বলছেন আজ খুব বরফ পড়বে। আজকে শেখানো হ'ল আইস অ্যাক্স চালিয়ে কি করে বরফে গর্ত করে, স্লোপ (slope) কেটে উপরে উঠতে বা নীচে নামতে হয়। বারটা নাগাদ লাঞ্চ সেরে নিলাম। যে দিকেই তাকাই সে দিকে কাঞ্চনজঙ্ঘার গগনচুম্বী তুষার শৃঙ্গ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

দুপুরে সাড়ে তিনটার সময় বেস ক্যাম্পে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই তুষার পাত শুরু হল। তুষারের চাপে তাঁবুগুলো ভেঙে পড়ার উপক্রম। কুলিরা এসে শিক্ষার্থীদের তাঁবুতে আশ্রয় নিচ্ছে। বোধ হয় আজই সব শেষ। পনের হাজার ফিট উঁচুতে এই বেস ক্যাম্পের জায়গায় হয়ত আগামী টার্মের শিক্ষার্থীরা এসে আমাদের তুষার সমাধিস্থ কঙ্কালগুলো আবিষ্কার করবে। এই ঝড় বোধ হয় থামবে না আর।

আমাদের তাঁবুতে একজন কুলি আশ্রয় নিয়েছিল। সে খালি বলছে "ভয় পাবেন না, বরফ পড়া এখনি থেমে যাবে।" ওরা অভিজ্ঞ লোক, আমাদের নার্ভাস শক্ (Nervous shock) থেকে বাঁচাবার জন্য ওরা ওদের আগের আগের তুষারপাতের অভিজ্ঞতার গল্প শুরু করল। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে বাইরে বেরিয়ে তাঁবুর উপর থেকে তুষার সরিয়ে দিল।

তুষারপাত চলছে, এমন সময়ে আজ তাঁবুতে খাবার দিয়ে গেল। আজ আর বেশি রান্নার হাঙ্গামা নেই, শুধু মাংস ও শাক-সব্জির 'স্টু' এবং কফি।

যতো রাত্রি বাড়ে ততই ঝড় আর বরফ পড়া বাড়তে থাকে। আমাদের তাঁবুর ওস্তাদ বাইরে বেরিয়ে গেল। বাইরে তেনজিং, শেরপা ও কুলিরা ভীষণ ব্যস্ত। আমাদের ওস্তাদ মাঝে মাঝে এসে বরফ সরিয়ে দেন আর চিৎকার করে ডাকেন। "রায় তরফদার কি শুয়ে আছ! বাইরে এসে বরফ সরাও!" অনেক রাতে ঝড় কমল।

তাঁবুর মধ্যে অনেক বরফ ঢুকে গেছে। খাবার প্লেটের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে হ'ল। আমার পার্টনার দেখি, চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে বিড় বিড় করে তেত্রিশ কোটি দেব দেবীর নাম আউড়ে যাচ্ছে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

ক্রিকেটের রাজকুমার

শ্রীখেলোয়াড়

॥ ৯ ॥

১৯৩০ সালে ডিসেম্বর মাসে। ইংলণ্ডে রণজি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। সর্দি-কাশি, জ্বর এবং বাত এক সংগে আক্রমণ করে বসে তাঁকে। বড়দিন এমন কি শুভ নববর্ষের উৎসবের আনন্দে বিছানা থেকে ওঠার ক্ষমতা পর্যন্ত থাকে না। একটু সুস্থ হয়ে এবং গোলটেবিল বৈঠকের কাজ মিটিয়ে তিনি ভারতে রওনা হবার তোড়জোড় করেন। এত দুর্বল শরীরে ভারত যাত্রা ঠিক হবে না বলে ডাক্তার ও বন্ধুবান্ধব রণজিকে অনেক উপদেশ দেন। কিন্তু রণজি কারো কথাতেই যাত্রার দিনের পরিবর্তন করতে রাজী হন না। নিজের শরীরের গতিক বিশেষ সুবিধার নয় এটা তখন বেশ তিনি বুঝতে পেরেছেন। পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে রাজ্যের অনেক অসমাপ্ত কাজ তাঁকে শেষ করে যেতে হবে। তাঁর অবর্তমানে যাতে জামনগর আদর্শচ্যুত না হয় তার প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়ে যেতে হবে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীকে। তাই সকলের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি জাহাজে চেপে বসেন।

রণজির স্মৃতিশক্তি অদ্ভুত ছিল। তাঁর রাজ কার্যের বা জীবনের স্মরণীয় ঘটনাবলীর সাল তারিখ এমন কি দিনক্ষণ পর্যন্ত কোন কাগজপত্র না দেখে ঠিক ঠিক বলে দিতে পারতেন। কোন খেলায় কত রান করেছিলেন বা কিভাবে আউট হয়েছিলেন, সেই সব খেলায় উল্লেখযোগ্য কি কি ঘটেছিল—মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বন্ধু বান্ধবদের সংগে এ সব গল্প করে তিনি আনন্দ পেতেন।

ভারতে ফিরে কিছুদিন বিশ্রাম করে শরীরটাকে খাড়া করে তুলবেন বলে রণজি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন। কিন্তু ভারতে বেশী দিন থাকা তাঁর সম্ভব হ'ল না। সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়েই ১৯৩১ সালে নরেন্দ্রমণ্ডলীর জরুরী কাজে আবার তিনি লণ্ডনে ফিরে এলেন। ভারতীয় নৃপতিদের অধিকারের জন্য অসুস্থ শরীরেও তাঁকে কঠিন শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়। হাউস অফ কমন্সে পার্লামেন্টের উভয় সভার সভ্যদের কাছে তিনি দেশীয় রাজাদের অধিকার নিয়ে যে বক্তৃতা দেন তা সারা বিশ্বে প্রশংসা লাভ করে। কিন্তু এত পরিশ্রম সহ্য করার মত শক্তি তখন আর রণজির ছিল না। ফলে আবার তাঁকে বিছানা নিতে হল।

১৯৩২ সালে জামনগরের রাজা হিসাবে রণজির ২৫ বছর পূর্ণ হয়। রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করার জন্য তিনি ভারতে ফিরে আসেন। ১৮৭৯ সালে একদিন চুপি চুপি সতর্ক পাহারার মাঝে বিভাজী যে দ্বারকাপুরী মন্দিরে তাঁকে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সেই মন্দিরেই পূজো হোম প্রভৃতির শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। গংগা-স্নান সেরে রাজকীয় পোশাকে রূপোর রথে চড়ে রণজি দ্বারকাপুরী মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এক বিরাট শোভাযাত্রাও রণজির সংগে সংগে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। পথের দুধারের আলিন্দ থেকে পুরনারীরা পুষ্প বৃষ্টি করে। হঠাৎ একটা শোরগোল শুনে রণজি তাঁর রথচালককে রথ থামাতে বলেন। তিনি তাকিয়ে দেখেন এক বৃদ্ধকে জোর করে তাঁর সৈন্যরা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর সেই বৃদ্ধ প্রাণপণ চীৎকার করছে—"আমার প্রিয় জামসাহেবের পায়ে আমি নিজের হাতে মালাটা উপহার দেবো, দোহাই তোমাদের আমাকে সে সুযোগ থেকে তোমরা বঞ্চিত করো না। একবার শুধু এক মুহূর্তের জন্য আমার পথ তোমরা ছেড়ে দাও।"—এই কথা শুনে রণজি গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দেন—"ওর পথ ছেড়ে দাও।" রণজির এ আদেশ শুনে দুচারজন বৃদ্ধ কর্মচারী দৌড়ে এসে বলেন "এ কি করছেন আপনি। আপনি গংগা স্নান করে, শুদ্ধ বস্ত্র পরে মন্দিরে যাচ্ছেন। এ নীচু জাতের লোক, ও আপনাকে ছুঁয়ে দিলে আবার আপনাকে স্নান করতে হবে, কাপড় পাল্টাতে হবে।" রণজি ঐ গোড়া হিন্দুদের বলেন—"মানুষকে ছুঁলেই তার জাত যায় না। যারা মনে করে যে ঐ বৃদ্ধ আমার পায়ে মালাটা দিলেই আমি অশুদ্ধ বা অশুচি হবো তাদের মন্দিরে যাবার প্রয়োজন নেই।"

বৃদ্ধকে রণজি ইংগিতে কাছে আসতে বলেন। বৃদ্ধ কাছে এসে রণজির পায়ে মালাটা রাখতে যেতেই রণজি বলেন—"না-না ওখানে নয়"—বলে নিজের গলাটা এগিয়ে দেন বৃদ্ধের দিকে। বৃদ্ধের হাত দুটো কেঁপে ওঠে। যা তার কল্পনার বাইরে—তার স্বপ্নের বাইরে সেই জিনিস সম্ভব হচ্ছে দেখে সে নিশ্চল হয়ে যায়। রণজি আবার বৃদ্ধকে বলেন, "কই দাও, পরিয়ে দাও তোমার মালা আমার গলায়।" আনন্দে বৃদ্ধের চোখ জলে ভরে ওঠে। ভগবানের কাছে রণজির জন্য মনে মনে

ইংলণ্ড থেকে ভারতের পথে রণজির শেষ যাত্রা। পাশে তাঁর প্রিয় পাখি পাপসী

প্রার্থনা জানিয়ে সে তার প্রিয় জামসাহেবের গলায় মালাটি পরিয়ে দেয়।

মন্দিরে হোম, পূজা, যজ্ঞ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান শেষ হবার পর শুরু হয় সাধারণ উৎসব। রজত জয়ন্তী উৎসবে রণজিকে রূপো দিয়ে ওজন করা হয়। ওজন করা সমস্ত রূপোই রণজি দু হাতে দুঃস্থ প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। ৮০ হাজার গরীব প্রজাকে পেট ভরিয়ে খাওয়ানো হয়। তা ছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিরা ভিন্ন ভিন্ন দিনে জামসাহেবের সংগে নৈশ আহারের সুযোগ পান। উৎসব শেষ হতে না হতেই আবার ভারতীয় নৃপতিদের স্বার্থে দুর্বল শরীর নিয়ে তাঁকে ইংলণ্ডে ছুটতে হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে এসে কয়েক-দিন কঠিন পরিশ্রমের পরে আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৯৩২ সালে বড়দিনের ছুটিতে শেষ-বারের মত রণজি ইংলণ্ড থেকে ভারতের পথে রওনা হন। এই যাত্রা যে তাঁর শেষ যাত্রা এটা ভালোভাবেই বুঝতে পারেন তিনি। বহু স্মৃতি বিজড়িত ইংলণ্ডের মাটির কাছ থেকে মনে মনে বিদায় নিতে গিয়ে তাঁর চোখ ঝাপ্সা হয়ে ওঠে। কৈশোরের পাঠ্য জীবনের কথা, গৌরবোজ্জ্বল ক্রিকেট জীবনের কথা, হাসিখুশী ও হৈ-হল্লায় ভরা মধুর দিনগুলির ছবি, এমন কি বার্ধক্যের নিরিবিলি অথচ নিরবচ্ছিন্ন শান্তিময় জীবনের স্মৃতিগুলি তাঁর মানসপটে একে একে উদয় হয়ে তাঁকে ভীষণভাবে উন্মনা করে দেয়। রণজির ভারত যাত্রার কথা জানাজানি হওয়ায় খবরের কাগজের ফটো-গ্রাফাররা স্টেশনে ছবি তুলতে আসেন। অন্যান্যবারে রণজি নানাভাবে ছবি তোলার বাধা সৃষ্টি করলেও এবার ফটোগ্রাফারদের ইচ্ছামত ছবি তোলার অনুমতি দেন।

রণজি যে ট্রেনে আসছিলেন সেটা প্যারিসে পৌঁছুলে গাড়ির দরজার কাছে তিনি একটা গণ্ডগোল শুনতে পান। ব্যাপার কি জানতে চাইলে তাঁর এ ডি সি বলেন, এক বৃদ্ধ রণজির সংগে দেখা করার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। রণজি বৃদ্ধকে তাঁর কাছে আসতে বলেন। বৃদ্ধ লোকটি রণজির সামনে এসে জানায় সে কালুভার (বিভাজীর প্রথম দত্তকপুত্র) ছেলে লাখুভার বন্ধু। লাখুভা এখন খুব অসুস্থ এবং চিকিৎসা করার মত অর্থও লাখুভার নেই। লাখুভার অনুরোধেই সে সাহায্যের জন্য রণজির কাছে এসেছে। লাখুভা যে রণজির রাজ্য থেকে নিয়মিত ভাতা পান এটা রণজি ভালো করেই জানতেন। তা ছাড়া এই লাখুভাই তাঁকে গদীচ্যুত করার জন্য কতবার যে দল পাকিয়েছে এবং রণজির বিরুদ্ধে কত অপবাদ ছড়িয়েছে সে সব কথাও তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু রণজির হৃদয় ছিল এত বিরাট যে অভাব বা প্রয়োজনের কথা শুনে শত্রু মিত্র কাউকেই তিনি খালি হাতে বিদায় দিতেন না। সংগে সংগে একখানি এক হাজার পাউণ্ডের চেক লিখে তিনি বৃদ্ধের হাতে দিয়ে বলেন "প্রয়োজন হলে আমাকে জামনগরে খবর পাঠাবেন, আরও অর্থ আমি পাঠিয়ে দেবো।"

ভারতের পথে জাহাজে ওঠার আগে ইংলণ্ডের দুটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের প্রতিনিধি রণজির সংগে এসে দেখা করে জানান যে, রণজি যখন সমুদ্রের বুকে জাহাজে থাকবেন তখন অস্ট্রেলিয়াতে ইংলণ্ড টেস্ট খেলবে অস্ট্রেলিয়ার সংগে। রেডিওতে খেলার ধারাবিবরণী শুনে রোজ একটা করে খেলার সমালোচনা পাঠাতে তাঁরা কাতর অনুরোধ করেন রণজিকে। ক্রিকেট খেলায় সমালোচনার শেষ সুযোগ তিনি গ্রহণ করেন। অসুস্থ শরীর নিয়েও খেলার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব খবর মন দিয়ে তিনি শুনতেন। তারপর নিজের মন্তব্য পাঠিয়ে দিতেন সংবাদপত্র অফিসে। ইংলণ্ডের সর্বশ্রেণীর ক্রিকেট উৎসাহীদের কাছে রণজির সমালোচনা এক বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে দুর্বল শরীরে নরেন্দ্রমণ্ডলীর বার্ষিক সভায় যোগদানের জন্য রণজিকে দিল্লী আসতে হয়। গোল-টেবিল বৈঠকে নরেন্দ্রমণ্ডলীর পক্ষ থেকে কি কি দাবী করা হবে বার্ষিক সভায় তাই নিয়ে বিকানীর ও পাতিয়ালার মহারাজার সংগে রণজির মতবিরোধ দেখা দেয়। বিকানীর ও পাতিয়ালা ছাড়াও আরও কয়েকজন নৃপতি রণজির অভিমতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করায় তিনি এত বেশী ব্যথিত ও বিচলিত হন যে ঐ সভায় বড়লাটের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি নিজের লিখিত বক্তব্য অর্ধসমাপ্ত রেখেই বসে পড়েন। নরেন্দ্রমণ্ডলীর সভাপতির পদেও সেইদিনই তিনি ইস্তফা দেন। এতদিন যাদের স্বার্থের জন্য তিনি নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে এমন কি নিজের রাজ্যের বহু জরুরী কাজের ক্ষতি করে সিমলা, দিল্লী ও ইংলণ্ড করে বেড়িয়েছেন, ভারতীয় কোন নৃপতির কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সাহায্য এমন কি উৎসাহ পর্যন্ত না পেয়েও যাদের জন্য তিনি এতদিন পার্লামেণ্টে গোলটেবিল বৈঠকে মণ্টেগু চেমস ফোর্ড আইন তৈরীতে এমন কি প্রিন্সেস প্রটেকশান বিল পাশ করানোর ব্যাপারে দিবারাত্র শারীরিক ও মানসিক

পরিশ্রম করেছেন আজ তাদের কাছ থেকে এই আঘাত তিনি সহ্য করতে পারেন না। এই আঘাতই রণজির জীবনদীপের অবশিষ্ট তেলটুকু শুকিয়ে দেয়।

২৭শে মার্চ রণজি দিল্লী থেকে জামনগরে ফিরে আসেন। স্টেশনে দিগ্‌বিজয়সিংজী রণজির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গাড়ি থেকে নেমেই রণজি দিগ্‌বিজয়ের হাত ধরে বলেন, "তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম। চলো শেষবারের মত রাজধানীটা একবার ঘুরে দেখে আসি।" রণজির এ কথায় দিগ্‌বিজয় ভেবেছিলেন রণজি ইংলণ্ড রওনা হচ্ছেন বলেই যাবার আগে শেষবারের মত তিনি রাজধানীটা একবার প্রদক্ষিণ করতে চান। দিগ্‌বিজয় বলেন, "আপনার জিনিসপত্র কাপড় চোপড় সব গোছানো হয়ে গেছে। স্টেনসের বাড়িটিও ঠিকঠাক করে রাখার জন্য দেওয়ান সাহেব রওনা হয়ে গেছেন।" রণজি দিগ্‌বিজয়ের কথায় একটু শুধু ম্লান হাসি হেসেছিলেন। সারাদিন গাড়ি করে রণজি দিগ্‌বিজয়কে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ান। কোথায় কোন রাস্তা কি ভাবে তৈরী করতে হবে, বাজার, ব্যাংক, পোস্ট অফিস কোথায় হবে, দিগ্‌বিজয়কে দেখিয়ে দেন। বুঝিয়ে দেন, যে কাজগুলি আরম্ভ হয়েছে সেগুলি কি করে শেষ করতে হবে। সবশেষে রণজি বলেন, "আমার প্রত্যেকটি কাজই অনেক চিন্তা ও দূরদৃষ্টি নিয়ে শুরু করছি, এ পলিসির কোন পরিবর্তন করার চেষ্টা তুমি করো না। কোন কাজ আরম্ভ করে তা ফেলে রেখো না। তোমার জন্যে আলাদা কোন বাড়ি আমি ইচ্ছা করেই করিনি। কারণ আমি চাই তুমি নতুন রাজপ্রাসাদেই থাকো। যদি সম্ভব হয় তবে তোমার ভাইদের জন্য আলাদা আলাদা বাড়ি করে দিও।"

রাত্রে শোবার আগে আত্মীয়স্বজন যে যেখানে আছে সকলকে ডেকে পাঠান রণজি। পরের দিন ভোর থেকেই বিছানা থেকে উঠবার আর তাঁর ক্ষমতা থাকে না। ডাক্তারেরা পাঁচদিন দিনরাত চেষ্টা করেও রণজিকে মৃত্যুর অমোঘ হাত থেকে ফিরিয়ে আনতে পারেন না। ১৯৩৩ সালের ২রা এপ্রিল রাত তিনটায় তাঁর হৃদয়ের স্পন্দন চিরদিনের মত থেমে যায়।

রণজির মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার প্রজা চোখের জল ফেলতে ফেলতে ছুটে আসে নবনগর রাজ বাড়িতে। দোকান পাট, হাট বাজার সব বন্ধ হয়ে যায়। রাজ প্রসাদের সব থেকে বড় ঘরখানিতে চির নিদ্রায় নিদ্রিত রণজির পা দুটি শেষবারের মত স্পর্শ করে প্রজারা চোখের জল ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে আসে। চার মাইল

রণজির মর্মর মূর্তি

দীর্ঘ এক বিরাট শোকযাত্রা রণজির মৃতদেহ বহন করে শ্মশানে নিয়ে যায়। চন্দনকাঠ ঘি ও সুগন্ধি গন্ধদ্রব্যে তাঁর চিতা সাজানো হয়। বৈশ্বানরের স্পর্শে ধীরে ধীরে রণজির নশ্বর দেহ ছাই হয়ে যায়।

রণজির মৃত্যু সংবাদে সারা বিশ্বে কি আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, গণমন তিনি যে কতখানি দখল করে রেখেছিলেন, অন্তরের অন্তস্তলে তাঁর আসন কত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার কিছুটা আভাস দেশী ও বিদেশী সংবাদপত্রের বিবরণীতে ফুটে ওঠে। কয়েকটি বিবরণী দিয়েই ক্রিকেটের রাজকুমারের লেখা শেষ হচ্ছে। 'দি মর্নিং পোস্ট' লিখলে।

East and West met in him, what a glorious innings his life has been! In the present crisis in the fortunes of India the loss of his statesmanship first of all will be lamented."

"দি ডেলী হেরাল্ড' খবর বেরোল—

"He was as great a sportsman and a fine friend as he was a famous cricketer."

'ডেলী মিরর' বলেছিল—

"He was a good cricketer in the fullest sense of the expression.

'ডেলী এক্সপ্রেসে' খবর বেরিয়েছিল—

"He will be mourned as the greatest cricketer India has ever produced, and as a grand example of his countrymen."

'টাইমস অব ইণ্ডিয়ার' মন্তব্য—

He was the first Indian who touched the imagination of the British people as a whole, and for that reason it may be said of him that few men did more to bring about a sympathetic understanding between East and West."

বড়লাট লর্ড উইলিংডন বলেছিলেন—

"It is a terrible shock to me to hear of the death of my oldest Indian friend."

'ডেলী মেলে' যা লেখা হয়েছিল তার অর্থ—উনবিংশ শতকে ইংলণ্ড ক্রিকেট গৌরবের সর্বোচ্চ সীমায় উঠেছিল, সে গৌরবের অনেকখানি রণজি একাই দাবী করতে পারেন। রণজির অবিশ্বাস্য ক্রিকেট প্রতিভা ছাড়াও তাঁর অমায়িক ও খেলোয়াড়োচিত ব্যবহারের কথাও কেউ কখনো ভুলতে পারবে না।"

স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন উইসডেনে লিখেছিলেন—"রণজি আমার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। খেলোয়াড়জীবন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক জীবনেও আমরা পরস্পর পরস্পরকে জানবার বহু সুযোগ পেয়েছি। ক্রিকেট খেলায় তাঁর এমন প্রতিভা ছিল যা হয়তো ভবিষ্যতে আর কারো মধ্যে দেখার সুযোগ আমাদের হবে না। খেলোয়াড় হিসাবে এবং মানুষ হিসাবে তিনি ইংলণ্ডের জনসাধারণের মন জয় করে গেছেন। ক্রিকেট কি ভাবে খেলতে হয় তা রণজি দেখিয়ে গেছেন। আমি দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে খেলবার সুযোগ পেয়েছি। আমি বিশেষ ভাবেই জানি তিনি শুধু ক্রিকেটের শিল্পীই ছিলেন না সারা বিশ্বে ক্রিকেট খেলা ছড়িয়ে দিতে তাঁর অবদান বোধকরি সবচেয়ে বেশী।

সমাপ্ত

ট্রামে-বাসে

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনে কংগ্রেসের বামপন্থীদের জয় সূচিত হইয়াছে কিনা এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনেহরু বলিয়াছেন যে, তিনি ইহাকে বাম বা দক্ষিণ-পন্থীর দৃষ্টিতে বিচার করিবেন না। —"হয়ত জবাবটা এড়িয়ে গেলেন নেহরুজী। আমরা বলব বামের জয় না হোক, বামার জয় তো বটেই। শতায়ু হোন ইন্দিরা"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

"বাঙ্গালোরের কয়েকজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, নুন খাওয়া ছেড়ে দিলে আট দশ দিনের মধ্যেই রক্তের চাপ ঢের কমে যায়"—একটি উদ্ধৃতি। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"আবিষ্কারটা বাঙ্গালোরে সত্য হতে পারে, আমরা কিন্তু অন্যত্র দেখেছি যে নুন ছেড়ে দিয়েও রক্তের চাপ একটুকুও কমেনি। অবশ্য এ সাদা নুনে নয়, ফিরোজা নুনে"!!

• • • •

মাখন, বনস্পতি ও লটকান ফলের সাহায্যে নাকি কোন এক কারখানায় ঘৃত প্রস্তুত হইতেছে। —"চার্বাক বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই বলতেন পণং কৃত্বা ঘৃতং বর্জেৎ" বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

কোচবিহারের সংবাদে প্রকাশ জনৈক চোরাকারবারীর পেটে নাকি ৬০ ভরি সোনা পাওয়া গিয়াছে। —"সোনার

পেটে এতও ছিল"—সংক্ষেপে মন্তব্য করে শ্যামলাল।

• • •

কলিকাতার বাজারে ডাল ও মশলার দর বৃদ্ধি পাইয়াছে। —"ভাবনা আমাদের ডালের জন্যই বেশি। শাকপাতায় মশলার প্রয়োজন বেশি নেই"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় খাল বন্ধ-করণ বিল গৃহীত হইয়াছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু কুমীর আগমন নিরোধ বিল গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত জনসাধারণ স্বস্তিবোধ করবে না"।

• • •

হ্রস্ব বা দীর্ঘ যে-কোন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যেই সোভিয়েৎ-এর বার্তা প্রেরিত হোক না কেন, মার্কিন ও তার মিত্রশক্তি নাকি তা

কান পাতিয়া শুনিতে পারেন।—"এই আড়ি পাতা থেকে শেষ পর্যন্ত না আড়ি-আড়ি হয়ে যায়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

• • •

উত্তর প্রদেশ সরকার নাকি "লাল মুনিয়া" বা শুধু "লাল" নামে পাখীটিকে "সংরক্ষিত" পাখী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।—"শামু চাচা এটাকে উত্তর প্রদেশ সরকারের "লাল" প্রীতি যেন না মনে করেন। এ লাল সে লাল নয়। আমরা বহুদিন আগে থেকেই—দিদি, লাল পাখীটি আমায় ধরে দে-নারে—বলে আবদার করেছি"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

"বসন্তকালে রাশিয়া সহ শীর্ষ সম্মেলনের সম্ভাবনা"—একটি সংবাদ শিরোনামা। —"বসন্তের প্রতিষেধক হিসেবে সম্মেলনে যোগদানকারীরা নিশ্চয়ই টিকে নিয়ে যাবেন"—টীকাকার জনৈক সহযাত্রী।

• • • •

প্রসঙ্গত অন্য এক সংবাদে শুনিলাম খ্রুশ্চেভ প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারকে রাশিয়াতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ বাঞ্ছনীয়, একথাও হয়ত তিনি জানাইয়াছেন"!!

• • •

নিউ ইয়র্কের হীরার বাজারে একটি হীরার দোকানে আগুন লাগার সংবাদ পাঠ করিলাম। বিশুখুড়ো বলিলেন —"হীরার জন্য আমাদের মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু তবু ভুলতে পারিনে আগুন না লাগলেও কত হীরের ধার ভেড়ার শৃঙ্গে পড়ে ভেঙে গেছে!"

• • •

একটি সদ্য প্রকাশিত সংবাদে শুনিলাম, কোন এক ক্লাবের এক সভ্য ময়দানে তাঁদের হকি খেলার আগে ক্লাবের জামা পরিয়া মাঠে খেলিতে নামেন। তিনি মনোনীত খেলোয়াড় নহেন কিন্তু যেহেতু তাঁহার পিতা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সেই দাবীতেই নাকি তিনি পুত্র হিসাবে খেলিবার জন্য জেদ করেন। —"কথাটা হকির হলেও একেবারে না-হকি কথা নয়। তার শুধু দোষ নয়, বিশ্বকর্মার পুত্রের দাবীতে অনেক গন্ধমূষিকই কত জায়গায় গদি জেঁকে বসে আছেন"!!

• • •

দিল্লীতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট টিমকে রাষ্ট্রপতি ভবনে চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রপতি রোহান কানহাইকে একটি ব্যাঘ্রমুণ্ড উপহার দিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন,—"টেস্ট খেলাটা সর্বভারতীয় হলেও কানপুরের পর কোলকাতাতেই লেজে-গোবরেটা শুরু হয়েছিল। সুতরাং মুণ্ডপাতটা বোধ হয় রয়েল বেঙ্গলেরই হলো"!!

• • •

চাঁদু বোড়ে দিল্লীতে অপূর্ব ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।—

"একেই বলে বোড়ের চাল"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

• • •

কেন্দ্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহাশয় স্টেডিয়ামের জন্য কলিকাতা ময়দানের খানিকটা জমি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছেন এই সংবাদ আমাদিগকে শুনাইয়াছেন শ্রীজ্যোতি বসু।—"কিন্তু মাঠে ময়দানের খেলাধুলার প্রতিরক্ষার নামে যাঁরা "খেইল" দেখাচ্ছেন তাঁরা মাঠের মাটি কামড়ে পড়ে আছেন, যাকে বলে একেবারে লক্-জ" মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

(সাত)
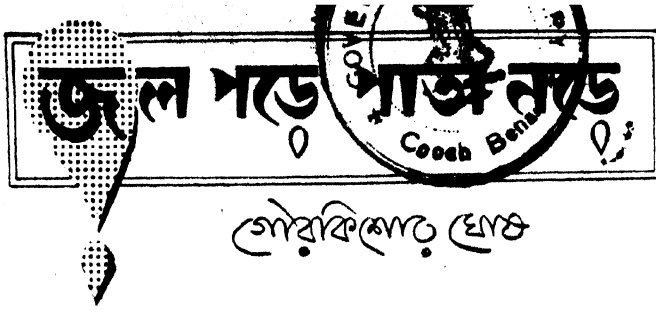
তার কাছে কেউ ছিল না। সে একা। এই বিশাল পৃথিবীতে, এই অন্তহীন শূন্যতার সমুদ্রে দিকভ্রষ্ট সে। ভেসে চলেছে একা। কে তাকে চেনে? সে কাকে চেনে? একাকীত্বের বিশাল অজানা মহাসাগরে সে শুধু হাবুডুবু খেয়ে চলেছে। কখনো ভুস্ করে ভেসে উঠছে উপরে, কখনো বা টুপ করে তলিয়ে যাচ্ছে গভীর তলদেশের উদ্দেশে। কত দূরে, কত গভীরে, কোন্ অতলে, সে জানে না। সে তলিয়ে যেতে চায় না। ডুবতে চায় না। প্রাণপণে হাত পা ছোঁড়ে। হয়ত প্রতিবাদ জানায়। ছোট ছোট দুটি কচি মুঠোয় শূন্যকেই বার বার আঁকড়ে ধরে আশ্রয় পেতে চায়। কিন্তু শূন্য কি আশ্রয় দিতে পারে? আশ্রয় সে পায় না। ডুবতে থাকে অনিচ্ছায়। অসহায়। হঠাৎ ভয় পায়। প্রবল ভয়। কাঁকিয়ে কেঁদে ওঠে। ওয়াঁ ওয়াঁ।

তার চারিপাশে গাঢ় অন্ধকার। ভয় ওৎ পেতে তার শিওরে বসে আছে। সংশয় হিংস্র থাবা উঁচিয়ে অপেক্ষা করছে পায়ের কাছে। সন্দেহ অস্থির পায়ে লেজ আছড়াতে আছড়াতে তার চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় সে যাবে? কোনখানে আশ্রয় নিলে সে পরিত্রাণ পাবে? তার সন্ধান সে জানে না। এখানে সে যে নব আগন্তুক। সব যে তার অচেনা। তার হয়ত ধারণা এটা তার শত্রুপুরী। ষড়যন্ত্র আর মৃত্যুর জটলা তার চারিপাশে। এ কোথায় সে এল? কেন এল এখানে? ভয়ে সে চোখ বোজে। চোখ বুজে শুধু কাঁদে। ওয়াঁ ওয়াঁ ওয়াঁ।

ভয়ে সে অস্থির হয়ে ওঠে। পালাতে চায়। হাত ছোঁড়ে, পা ছোঁড়ে প্রাণপণে। কিন্তু গতিহীন তার কোমল দেহটা বিছানায় বন্দী হয়ে থাকে। এক চুলও সরে না। সরে না মৃত্যুর আর ভয়ের সান্নিধ্য থেকে। অসহায়-ভাবে তাই শুধু কাঁদে। ওয়াঁ ওয়াঁ ওয়াঁ য়াঁ।

অকস্মাৎ নিজের তুলতুলে হাতখানা মুখে ঠেকে তার। নিজের দেহের উষ্ণতার স্বাদ পেয়ে নিজেই প্রচণ্ড বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায়। এ আত্মীয়তার স্পর্শ থেকে মুক্তি পেতে চায় না। ছোট ছোট উষ্ণতাটুকু যেন আনা আত্মসাৎ করতে চায়। শক্ত মুঠি মুখে পুরে চুকচুক চাখতে থাকে। উত্তাপ, আরও উত্তাপ পেয়ে খুশী হয় সে। উল্লাসে পশুর মত শব্দ করে রুম্ রুম্ রুম্।

এতক্ষণ সে ভয়ে চোখ বুজে ছিল। এইবার সে চোখ মেলে চায়। দিশে হারিয়ে যায় তার। আবার সেই শূন্য শূন্য শূন্য। দিগ্‌দিগন্তহীন মহাশূন্যের মধ্য দিয়ে তার দৃষ্টির নিরিখ পথ হারিয়ে ফেলে। ঘরের মটকা অনেক দূরে। দেয়াল তো কয়েক যোজন। অতদূরে কচি নজর কি পৌঁছাতে পারে। আবার সে চোখ বোজে ভয়ে। বোজে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার খোলে। তার শুধু ভয়ই নেই, কৌতূহলও আছে। আছে অজানা পরিবেশকে জানার আগ্রহ। অন্ধকারই নেই শুধু, আছে আলোর ঝলকও। মৃত্যুর আতঙ্কই শেষ সত্য নয়, সত্য প্রাণের নব প্রেরণাও। চোখ খুললেই সূর্যের উজ্জ্বল আলো তার চোখ থেকে অন্ধকার আর মন থেকে মৃত্যুভয় দূর করে। তার প্রাণে তেজ সঞ্চারিত হয়। প্রাণের সমারোহে তার পুলক লাগে। খুশীর হাসি উপচে পড়ে তার মুখ চোখ বেয়ে। সে অকারণেই হাসির ঢেউ তুলে তুলে জীবনের নতুন নতুন গান রচনা করতে থাকে। অপরূপ খেয়ালে।

শুধু জেগে থাকলেই যে সে এমন করে তা নয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তার রচনা সে করে যায়। তার ঘুম আর জাগরণের সীমানায় কেউ শক্ত হাতে প্রাচীর তুলে দেয়নি। তাই দুই রাজ্যে গমনাগমন তার এত অবাধ। ঘুমের ঘোরেও সে ভয় পেয়ে কাঁদে, আহ্লাদে হেসেও ওঠে।

মাথায় আস্ত-সর্ষের বালিশ আর দুই ধারে দুই নরম পাশ বালিশ চাপা দিয়ে তাকে রোদে শুইয়ে রাখা হয়েছিল। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে এইমাত্র উঠল। ভয়ানক নিঃসঙ্গ বোধ হল তার। কাঁথাটা ভিজে গেছে। খুব অস্বস্তি ঠেকছিল। আর দেহের কোন যন্ত্রে যেন একটু বেদনাও অনুভব করছে। মোটের উপর ভাল লাগছে না তার। দু একবার খুঁত খুঁত করে কাঁদল। কেউ শুনল না। কেউ এলোও না তার কাছে। তখন দুরন্ত অভিমানে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। কেউ নেই, ওর ব্যথার ব্যথী কেউ নেই এই সংসারে। ও একা, একা, একা।

চাঁপা ছুটতে ছুটতে এলো। দেখল, ছেলে একেবারে কেঁদে ফেটে পড়ার যো হয়েছে। তাড়াতাড়ি ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে ও ও ও করে আদর করতে লাগল।

"সুনা আমার, মনি আমার, কাঁদে না,

কাঁদে না, কি হয়েছে, কি হয়েছে, ও ও ও, কিডা মা'রেছে আমার সুনা'র কিডা মারেছে, তারে আমি মা'রে দিয়াসে, এই দিলাম এক চড়, কাঁদে না, কাঁদে না, ও আমার বাবা, ও আমার সুনা, না না, অত রাগ কি করতি হয়, টিয়ে পাখি নিবা ঝুমঝুমি নিবা।"

চাঁপা ঝুমঝুমিটা নিয়ে ওর মুখের কাছে নাড়তে লাগল। অদ্ভুত রকমের আওয়াজ শুনে সে প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়ে কান্নাটা কিছুক্ষণের জন্য থামিয়েছিল, কিন্তু ভিজে কাঁথার অস্বস্তি নিরন্তর খোঁচা মারতে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাঁদতে লাগল। কেউ যে ওর কান্না লক্ষ্য করছে, ওর কান্নার যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তা ওর সহজাত বোধ ওকে বলে দিল। তাই আরও সুবিধা আদায় করবার জন্য সে পরিত্রাহি কঁকিয়ে কঁকিয়ে কাঁদতে লাগল।

থামাতে না পেরে চাঁপা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। অতি কষ্টে তার ঐ নাদুস নুদুস ভারী শরীরটা চাঁপা কোলের উপর তুলে নিল। তারপর হাঁটু ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ওকে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করল।

"ও ও ও, সুনা আমার, মণি আমার, বাবা আমার, চুপ করো, চুপ করো, আমস্বত্ব খাবা, কুলির আচার খাবা, ও দিদি, শিগ্‌গির আয়, না না না, কাঁদে না, কাঁদে না, অত কি কাঁদে, ছি ছি, না না, বকিনি, বকিনি ও ধন ও ধন, ও সুনা। ধ্যাত্তেরি।"

এবার চাঁপা রেগে গেল।

"আচ্ছা ছেলেরে বাবা, কানাই বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করলেন তো তার আর ক্ষ্যামা নেই। ও দিদি, ও বড়মা, কানে কি সব তুলো ঠাসে রাখিছ। ছেলে যে এদিক আকাটা হয়ে গেল।"

চাঁপা অত ভারী ছেলেটাকে ভাল করে নড়াতেও পারে না। এতক্ষণ কোলে নিয়ে ওর পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে গিয়েছে, তাই ছেলেটাকে যেই একটু নড়াতে গেল, অমনি, টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে খাটের উপর থেকে মেঝেয় পড়ে গেল। ছেলেটা ক্যাঁক করে একবার শব্দ করেই চুপ মেরে গেল। চাঁপা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

"দিদিরে শিগ্‌গির আয়, তোর ছেলে বুঝি মরে গেল।"

ভাত খেতে খেতে গিরিবালা ছেলের কান্না শুনতে পাচ্ছিল। উঠি উঠি করেও উঠতে পাচ্ছিল না। আজকাল রাক্ষসের মত ক্ষিদে পায় তার। সে এমনিতেই বড় লাজুক। চেয়ে খেতে পারে না, নিয়ে তো নয়ই। বার বার খাই খাই করাটাও সে পছন্দ করে না। তাই দুপুরের খাওয়াটা একটু বেশি করেই খায়। বড়মা বসে থাকেন সামনে, পিসিমা তদারক করেন, তাতেই গিরিবালা যেন লজ্জায় থালার সঙ্গে মিশে যায়।

আজ রান্নাটাও চমৎকার হয়েছে। বিশেষ করে বড়ি দিয়ে টাটকিনি মাছের ঝোলটা। এ জিনিস খুব ভালবাসে গিরিবালা। তাই তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল। হঠাৎ চাঁপার চিৎকার শুনে খাওয়া মাথায় উঠে গেল তার। মরে গেল তার ছেলে! দুম করে কে যেন তার মাথায় ডাণ্ডস মারল। বোঁ করে বাড়ী ঘরগুলো ঘুরে গেল একবার। গিরিবালা উঠতে চেষ্টা করল, প্রথমবার পারল না। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে উঠতেই পাগলের মত দিল ছুট।

হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকে গিরিবালা দেখল ঘর ফাঁকা। চাঁপা নেই, তার ছেলে নেই। সব ফাঁকা। কিছু বুঝতে পারল না গিরিবালা। ফ্যাল ফ্যাল করে তার ছেলের শূন্য বিছানার দিকে চেয়ে রইল। তার হৃদপিণ্ডটা বুকের ভিতর প্রবল শব্দে হাতুড়ি পিটতে শুরু করেছে। হাত পা, সর্বশরীর তার কাঁপতে লাগল থরথর করে। কি করবে সে, কি তার করা উচিত, বুঝে উঠতে পারছিল না।

চাঁপা ঢুকল ঘরে। চাঁপার চোখের জল তখনও শুকোয়নি। গিরিবালার দিকে চেয়ে অপরাধীর হাসি হাসল চাঁপা।

বলল, "ধন্যি ছেলে তোর দিদি। আমার কোলে একটুও চুপ করলো না। পড়ে ধড়ে একেবারে আকাটা হয়ে গেলেন। যেই ছোটকাকীমা আসে কোলে তুলে নেলেন, অমনি চুপ। দিব্যি খেলা করছেন হাত পা নাড়ে।"

কি বলল চাঁপা? হড়বড় করে কি বলল? কাকীমার কোলে খেলা করছে? হাত পা নাড়ছে? তবে মরেনি? বেঁচে আছে? বেঁচে আছে। গিরিবালা অনেক কষ্টে তার এলোমেলো চিন্তাকে মগজের মধ্যে গুছিয়ে নিল। বেঁচে আছে তার ছেলে! এবার সে অনেক স্পষ্টভাবে তা বুঝতে পারল। কিন্ত

কৈ, তার অস্বস্তির, তার মানসিক যন্ত্রণার তো উপসম হ'ল না। হাতুড়ি আরও দ্রুত-তালে পিটে চলল তার বুক, তার দেহের কম্পন আরও বেড়ে গেল। বসে না পড়লে মাথা ঘুরে পড়েই যেত গিরিবালা। খাটের কোণায় বসে পড়ল। তার ছেলে বেঁচে আছে। আঃ! ভগবান, ভগবান, ভগবান!

তার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে একটা যন্ত্রণাদায়ক বাতাস এতক্ষণ ধরে পাক খেয়ে খেয়ে ঠেলে উঠছিল, এবার একটা দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে হুস্ করে বেরিয়ে গেল। সেটা বেরিয়ে যেতেই গিরিবালার বুক নিমেষে হাল্কা হয়ে গেল। এতক্ষণের সব দুশ্চিন্তা, ভয়, আতঙ্ক গলে জল হয়ে তার দুই চোখের কোণ দিয়ে টস টস করে ঝরে পড়তে লাগল। আঃ, কি শান্তি, কি শান্তি!

দিদির কান্না দেখে চাঁপার হাসি শুকিয়ে গেল। সে ভাবল, ছেলেকে ফেলে দিয়েছে বলে দিদি রাগ করেছে। মুহূর্তে চাঁপার চোখেও জল এসে গেল।

দিদির কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে কাঁদতে সে বলল, "সত্যি দিদি, বিশ্বাস কর, আমি ইচ্ছে করে ওরে ফেলিনি। কান্না থামাতে আমি ওরে কোলে তুলে নিছিলাম। কিন্তু আমি ঐ খাটাসরি সামলাতি পারব ক্যান? এমন ঝাঁকি মারল, আমি সুদ্ধু নিচে চিৎপটাং। ভাগ্যির দিন, যে ওর কিছু হয়নি। আমার দোষটা কমা ক'।"

গিরিবালার মনের মেঘ কেটে গেল। সে সস্নেহে চাঁপার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। না, আর কোন যন্ত্রণা নেই গিরিবালার মনে। এখন শুধু একটা ইচ্ছে জেগে উঠেছে তীব্র পিপাসার মত। তার নাটি স্তন টন টন করছে দুধের ভারে। এখন একবার ছেলেটাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে গিরি-বালার। মুখখানা দেখতে ইচ্ছে করছে সোনা-ধনের। ব্যস্, আর কোন আকাঙ্ক্ষা, আর কোন বাসনা তার নেই। একবার ভাবল, চাঁপাকে আনতে বলে, আবার ভাবল, নিজেই যায় একবার কাকীমার কাছে। তার ছেলে যে সে নয়, খুব পয়মন্ত। কাকীমার পাগলামি একেবারে সারিয়ে দিয়েছে ছেলে। নাতি নিয়েই আত্মহারা হয়ে আছে।

হঠাৎ চাঁপা খরখর করে উঠল, "তুই কিরে, পিচেশ! এখনও আঁচাস্ নি? আর ঐ আঁটো হাত তুই আমার গায় মাথায় বুলোয়ে দিলি?"

গিরিবালা একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। চাঁপার ধমকে থতমত হয়ে দেখে, আরে সত্যিই তো সে আঁচায়নি। ছি ছি, কি কাণ্ড বল দিকি। পিসিমা জানতে পারলে সৃষ্টি ধুইয়ে তবে ছাড়বে।

চাঁপাকে মিনতি করল গিরিবালা, "মনিরে, তোর দুখ্খানি পায়ে পড়ছি চেঁচাস নে। আমি এক্ষুণি আঁচায়ে আসছি। বড় হয়ে ছোটোর পায় পড়লাম কিন্তু, একথা আবার কয়ে দিয়ে না কারুরেই। তালি দে'খ কি হয়? পোক পড়বে ঐ পায়। বুঝলে।"

॥ আট ॥

এই শিশু তার! তারই দেহের অংশ! ভাবলে বিস্ময় লাগে গিরিবালার। রীতিমত বিস্ময়।

ও শুধু বোকার মত, হাবার মত, চেয়ে থাকে, নির্নিমেষ চেয়ে থাকে তার ছেলের ঘুমন্ত মুখখানার দিকে। চোখের পলক ফেলতেও ইচ্ছে হয় না তার।

লোকজন থাকলে সে দূরে সরে থাকে। এখনও লজ্জা ভাঙেনি গিরিবালার। বাবাই হোন আর বড়মা, কি পিসিমা, এমন কি চাঁপার সামনেও সে সহজ হতে পারে না। কোলে তুলতে চায় না। পাড়া প্রতিবেশী কেউ এলে, ওর সমবয়সী কোন মেয়ে এলে, এসে ওর ছেলের কথা জিজ্ঞেস করলে, তৎক্ষণাৎ লজ্জায় লাল হয়ে যায় তার মুখ। আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে পড়ে। কিন্তু সরে পড়েও কি নিস্তার আছে? কেউ কেউ আসে দস্যুর মতন। গিরিবালাকে টানাটানি করে বের করে আনে। জবরদস্তি তার কোলে ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে মজা দেখে তারা। এইসব অবস্থায় গিরিবালা না পারে ছেলে সামলাতে, না পারে নিজেকে সামলাতে।

সব থেকে বিপত্তি হয় ও পাড়ার গোয়াল দিদি এলে। সম্পর্কে ঠাকুরমা হয় গিরির। তাই ইয়ার্কির কোন বাঁধন থাকে না বুড়ির ফোকলা মুখে। গোয়াল দিদির ত্রিসীমানায় থাকতে চায় না গিরিবালা। তাকে ভালও বাসে বুড়ি। খুব ভালবাসে। যখনই আসে, সর বাটা ঘি আনে, ক্ষীর আনে। কাঁচা পোয়াতি। ওদের কি আর ক্ষিধের আদি অন্ত আছে? অষ্ট প্রহর পেটে জ্বলতেই থাকে রাবণের চিতা। বুড়ি এসেই ওকে ডেকে আনবে, কাছে বসাবে, ছেলেকে তুলে দেবে ওর কোলে। তারপর বাটির থেকে ক্ষীর হোক, সর হোক, ছানা হোক, যখন যা আনবে, একটু একটু করে নিজের হাতে তুলে দেবে গিরিবালার মুখে। চাঁপা একদিন চেয়েছিল, ও গয়ালদি, আমারে এট্টু সর দাও না। খরখর করে উঠেছিল বুড়ি: ওরে আমার নোলারে। সোহাগের সুখতনি। আগে একটা বিয়োয়ে নে দিদির মতন, তারপর গয়ালদির কাছে সুহাগ খাতি আসিস।

কিন্তু গোয়ালদির সোহাগ খেয়ে হজম করাও শক্ত। গিরিবালার মনে পড়ল সেদিনের কথা, যেদিন গোয়ালদি ওকে মাই খাওয়াবার কায়দা শিখিয়ে দিয়েছিল। কি কাণ্ড! কোলের উপর ছেলে কাঁদছে। গিরিবালা বুঝতে পারছে, ক্ষিদে পেয়েছে তার। কিন্তু তখন সেখানে জোর জটলা চলেছে মেয়েদের। অত লোকের মাঝে গিরিবালা মরে গেলেও দুধ খাওয়াতে পারবে না ছেলেকে। উঠতেও পারে না। গোয়ালদিদি তার চুলের জট ছাড়িয়ে দিচ্ছেন। উঠবার কথাটা বলব বলব করেও মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। গোয়ালদিদি ধমক দিলঃ কিরে, কোন্ রাজ্যি আছিস? ছেলের গলা যে শুকোয়ে কাঠ হয়ে গেল। মাই খাওয়া? গিরিবালা লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করে বসে থাকল। গোয়ালদিদি ফোড়ন কাটলেনঃ মেয়ের লজ্জা লাগছে। বলিহারি লজ্জার! ভাতারের কোলে উবুদো হয়ে শুতি লজ্জা হয়নি, লজ্জা হ'ল ছেলের মুখে মাইয়ের বুটা ঢুকোতি। এক চড়ে ছিনালি ভাঙেগ দিতি হয়। নে, মাই বের কর, খাওয়া ছেলেরে।

কি যাচ্ছেতাই কথা গোয়ালদির। বড়মা, পিসিমা ও পাড়ার জ্যেঠি খুড়িরা সব বসে রয়েছেন। গিরিবলার কান মুখ গরম হয়ে উঠল। মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, ধরণী দ্বিধা হও। কিন্তু এক গিরিবালা ছাড়া সেই মজলিসের আর কেউ গোয়ালদির মন্তব্যে বিচলিত হ'ল না। বরং গিরিবালার বিব্রত ভাব দেখে যেন সবাই আমোদই পেল।

বিয়ের আগে এই মজলিসের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পায়নি গিরিবালা। হুকুম ছিল না বড়দের। দৈবাৎ কোন কাজে যদি এসেও পড়ত বড়দের মুখ বন্ধ হয়ে যেত। থমথম করত মজলিস। স্পষ্ট মনে হত, সে অনধিকার প্রবেশ করেছে। বুঝতে পারত, কেউ তার উপস্থিতি বরদাস্ত করতে পারছে না। ভয়ে ভয়ে কাজের কথাটি সেরে সরে পড়ত সেখান থেকে। বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচত। সেই গিরিবালার এই সভায় এখন অবাধ প্রবেশ। এখন তার অধিকার মেয়ের নয়, মায়ের। তার পদোন্নতি ঘটেছে।

গিরিবালা এখন মা। পৃথিবীর সব মায়েদের পংক্তিভোজে বসার অধিকার

মিলেছে তার। কোন যাদু বলে এমন আশ্চর্য কান্ড ঘটে গেল?

এই যাদুর বলে। এই যে সেই যাদু। আমার যাদুমনি।

গিরিবালা ঘুমন্ত ছেলের কাতর মুখের দিকে চেয়ে রইল অপলক। কত ছোট্ট, কতটুকু জীব, আঁ। কি তাড়াতাড়ি বুকটা উঠছে নামছে, দ্যাখ। গিরিবালা নিজেই নিজেকে ডেকে ডেকে দেখাতে লাগল তার খোকাকে। ঐ দ্যাখ, ঐ দ্যাখ, ঠোঁট নড়ছে। কথা বলছে ষষ্ঠী ঠাকরুণের সঙ্গে। খুব কথা চলে এখন দুজনের মধ্যে। কি কথা বলিস, ও খোকা? ইচ্ছে হয় জিজ্ঞাসা করে। পাগল নাকি গিরিবালা? খোকা এখন মানুষের সঙ্গে কথা বলতে শিখেছে কি, যে জবাব দেবে? এখন সব কথা ওর ষষ্ঠীর সঙ্গে। ঐ ঐ, ঐ দ্যাখ, স্পষ্ট ঠোঁট নড়ল, এবার একেবারে বুড়ো মানুষের মত। মুখখানা বেশ রাগী রাগী হয়ে উঠেছে বাবুর। তার মানে নালিশ করা হচ্ছে। কেন বাপু, আবার নালিশ কেন? আমি কি যন্ত্রণা দিই, কষ্ট দিই? কৈ, মনে তো পড়ে না। যাই হোক, অজান্তে যদি দোষ ঘাট কিছু করেও থাকি, তার জন্য অপরাধ নিও না, মা ষষ্ঠী। তোমার দাসের সর্বদা মঙ্গল ক'র। যে প্রার্থনা গিরিবালা ছোটবেলা থেকে বড়মা পিসিমার মুখে হাজারবার উচ্চারিত হতে শুনেছে, মনে মনে ষষ্ঠীর উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করে সেই প্রার্থনাই নিজে আবার করল।

না, জেনে শুনে কোন দোষ করিনি। গিরিবালা মা ষষ্ঠীকেই শোনাল। কোন অযত্ন করিনি। ষষ্ঠী ঠাকরুণ যেন বিচারের আসনে ছড়ি উঁচিয়ে বসে আছেন। ফরিয়াদী তার খোকা, সোনার খোকা। আর গিরিবালা আসামী। জগতের সমস্ত মায়েদের হয়ে সে যেন জবানবন্দী দিতে এসেছে।

বিরক্ত হইনে আমি। অধৈর্য হইনে। খোকা কি কম বিরক্ত করে? কম জ্বালায়? প্রথম প্রথম ঘুমোত। রাতদিন ঘুমোত। মাঝে মাঝে ওর মুখে জল মধু দিলে কি মাইয়ের বোটাটা ওর মুখে চেপে ধরলে, মাঝে মাঝে ভিজে কাঁথা বদলে দিলে, ও অকাতরে ঘুমোত। ওকে ইচ্ছে মতন নাড়চাড়, চান করাও, কাজল পরাও, সোহাগ কর, কিছু বলত না ও। সে সময়টা ছিল যেন ওর ঘুমের বয়েস। তখনও কি আমি নিশ্চিন্তে থাকতে পেরেছি? ওর ঐ অকাতর ঘুম দেখে হঠাৎ মনটা ছ্যাঁক করে উঠেছে। এতক্ষণ সাড়া নেই, শব্দ নেই, তবে কি ও মরে গেল? বেজায় ভয় পেয়ে গিয়েছি। সত্যি বলছি মা, তখন আদর করার ছলে ওর গাল টিপে, ওকে দুমদাম চুমু খেয়ে ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। ঘুম ভেঙে বিরক্ত হয়ে ও কতবার ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে উঠেছে। ওর কান্না শুনে আমার প্রাণে জল এসেছে। আবার তাড়াতাড়ি ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। পরক্ষণেই দেখেছি ঠোঁট নেড়ে নেড়ে তোমার কাছে ও নালিশ জানাচ্ছে। আনাড়ি মায়ের প্রাণের শংকা যদি অপরাধ হয়, তবে স্বীকার করছি, সেই অপরাধে আমি অপরাধী। রাত্রে ও ঘুমিয়ে থাকে, সাড়া শব্দ দেয় না। পাশে আমি শুয়ে থাকি। কিন্তু আমার তো ঘুম আসে না। এই বুঝি ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল, এই বুঝি কাঁথাটা ওর মুখে এসে পড়ল, এই বুঝি আমার ঘুমন্ত ভারী দেহের চাপে ওর কচি শরীর থেঁতলে গেল। কত রকম ভয় যে হয়, কি বলব? কতবার আমাকে উঠতে হয়। কতবার আমার আঙুলে নিয়ে যে ওর নাকের ডগায় ধরতে হয়, ওর নিঃশ্বাস পড়ছে কি না বুঝতে হয়! একবার দুবারে কেন যে ছাই তা বুঝে উঠতে পারিনে, তাও জানিনে। একবার মনে হয় শ্বাস বুঝি পড়ছে, পরক্ষণেই দেখি, না তো, নিঃশ্বাস পড়ছে না তো। তখন যে মনের অবস্থা হয়, তোমাকে কি বলব। তখন আমার বুদ্ধি শুদ্ধি গুলিয়ে যায়। চেতনা অবলুপ্ত প্রায়। পাগলের মত ওর নাকের কাছে আমার হাতের ওপিঠ নিয়ে যাই, গাল নিয়ে যাই। বুঝতে পারিনে। ওর বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ি, কান ঠেকিয়ে ওর বুকের ধুকধুক শব্দ শুনতে চেষ্টা করি। বুঝতে পারিনে। একটুও বুঝতে পারিনে। তখন এক হ্যাঁচকা টানে বাচ্চাকে বুকে তুলে ফেলি। ওর ঘুম ভেঙে যায়। বিরক্ত হয় আচমকা ঘুম ভেঙে। প্রবল অভিমানে কেঁদে ওঠে। আঃ, সেই শব্দে, কি বলব, সেই শব্দে আমার মরা প্রাণ বেঁচে ওঠে আবার। ও খুব মিথ্যে নালিশ তোমাকে করে না। খুব বিরক্ত করি ওকে।

অপরাধী গিরিবালা স্বীকার করে অকপটে। এবার উল্টো চাপ দেয় পাকা উকীলের মত। বিচারককে এনে দাঁড় করায় আসামীর কাঠগড়ায়। বলে, এ তোমার দোষ, ঠাকরুণ। সব দোষ তোমারই। তুমি মায়ের কোলে সন্তান দাও, তার বুকে স্নেহ দাও। তার মনে কেন নির্ভরতা দিতে পার না? কেন তাকে নিশ্চিন্ত করতে পার না? সব সময় এক হারাই হারাই আশংকার পাথারে তাকে নাকানি চুবানি খাওয়াও কেন?

এর জবাব মা ষষ্ঠী গিরিবালাকে দিলেন না। হয়ত তার খোকনের কানে কানে দিয়ে থাকবেন। গিরিবালার নজর পড়ল তার খোকনের মুখের উপর।

খোকন তখন মুখ টিপে টিপে হাসছে।

দুধের বলকের মত গিরিবালার মনের আবেগ তাই দেখে হঠাৎ উথলে উঠল। গিরিবালা ছেলেকে বুকে সাপটে ধরে তার মুখে গালে পাগলের মত চুমু খেতে লাগল।

বলল, "ওরে দুষ্টু, ওরে দুষ্টু, দুজনে মিলে আমায় জব্দ করার ফাঁদ পাতিছ, আঁ।"

(ক্রমশ)

খেয়ালের ইতিবৃত্ত

শার্ঙ্গদেব

ভারতীয় সংগীতে "ধ্রুবপদ" শব্দটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। পণ্ডিতেরা অনেকেই এবিষয়ে মাথা ঘামিয়েছেন কিন্তু খেয়াল সম্বন্ধে সেই তুলনায় আলোচনা প্রায় হয়নি বললেই চলে। আমরা যে "খেয়াল" গান করি সেটা যে একটি ফার্সী শব্দ এবং নিছক খেয়ালের বশেই ধ্রুপদীরা ধ্রুপদ ভেঙে এই বস্তুটি রচনা করেছেন এটাই শুধু সাধারণের নয় পণ্ডিতগণেরও বিশ্বাস। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় আবার খেয়াল যে ইতি-পূর্বে সভ্যসমাজে প্রচলিত ছিল এটা মানতেও রাজি নন। এ সম্বন্ধে তাঁর উক্তিটি বেশ কৌতুকরসাশ্রিত।

"খেয়াল পারস্য শব্দ; ইহার অর্থ দুর্বাসনা বা যথেচ্ছাচার; বোধ হয় সংগীতেও ঐ অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। পূর্বে সভ্য-সমাজে খেয়াল প্রচলিত ছিল না; ওস্তাদ গায়কেরা ধ্রুপদই গাইতেন। পরে যখন খেয়াল প্রচলিত হয় তখন তৎকালের ধ্রুপদ গায়কেরা বোধ হয় ব্যঙ্গ করিয়া ঐ রীতির গানকে গায়কদিগের 'খেয়াল' অর্থাৎ যথেচ্ছার বলিতেন; তদবধি ঐ নাম হইয়া থাকিবে।"

একটি জটিল সমস্যার বেশ সহজ সমাধানই করেছেন বলতে হবে। তবে কৃষ্ণধনবাবু অপরদিকে যুক্তিবাদীও ছিলেন। খেয়ালের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি আরও যেটুকু লিখে-ছেন সেটুকুও উদ্ধৃত করা কর্তব্য।

"কাপ্তেন উইলার্ড সাহেব তাঁহার কৃত হিন্দু সংগীত বিষয়ক ইংরেজী গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, সুলতান হোসেন শিকী নামক জোয়ানপুরের এক অধীশ্বর খেয়ালের সৃষ্টি করেন; ইহা খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর কথা। কিন্তু খেয়াল কেহ যে নূতন সৃষ্টি করিয়া চালাইয়াছেন, ইহা যুক্তিসংগত কথা নহে। খেয়ালীয় রীতির গান পূর্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সভ্যসমাজে তাহার আদর ছিল না। উক্ত সুলতান হোসেন হয়ত ঐ রীতির গান পছন্দ করিতেন এবং খেয়াল গায়কদিগকে সমধিক উৎসাহ প্রদান করিতেন; তদবধি খেয়াল সভ্য সমাজে গাওয়া প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। দিল্লীর ঐ দিকে 'কাবাল' (কাওয়াল) নামে সংগীত ব্যবসায়ী এক জাতি আছে, খেয়াল তাহাদের জাতীয় গান। ইহারা সর্বদা যে তালে গান গায়, সেই তালের নাম কাওয়াল রাখা হইয়াছে।"

এ যুগেও অনুসন্ধানের দিক দিয়ে আমরা এর বেশি এগিয়েছি বলে মনে হয় না। এখনো সংগীতবিষয়ক যেসব পাঠ্য পুস্তক বা গ্রন্থাদি দেখি তাতে সুলতান হোসেন শিকীই যে খেয়ালের প্রবর্তন করেন এটাই সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে। অনেকে অবশ্য এটা স্বীকার করেন না তাদের মতে আমীর খস্রু খেয়ালের প্রবর্তন করেন। আবার, অনেকে এমন মত পোষণ করেন যে, সদারঙ্গ ধ্রুপদ ভেঙে খেয়াল সৃষ্টি করে শিষ্যদের শিখিয়েছেন কিন্তু নিজের বংশে প্রচার করেন নি।
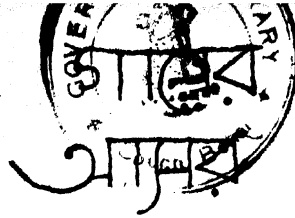
মোটামুটিভাবে খেয়ালের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুটি মতবাদ প্রচলিত। এক শ্রেণীর ধারণা কাওয়াল থেকে খেয়ালের সৃষ্টি হয়েছে অপর শ্রেণী বলেন ধ্রুপদ থেকেই খেয়াল সৃষ্ট হয়েছে এবং ধ্রুপদীরাই খেয়ালের সৃষ্টি-কর্তা। দুটিই অবশ্য বিশ্বাস—যুক্তিহীন ধারণাই বলতে হবে।

কাওয়াল থেকে খেয়ালের সৃষ্টি হয়েছে এই ধরাণার মূলে রয়েছে দুটি শব্দের উচ্চারণগত ঐক্য। তাছাড়া খেয়ালের স্বাধীনতার ধারাটাও কিছুটা কাওয়ালের অনুরূপ যদিও তফাৎ রয়েছে বিস্তর। কিন্তু "কাওয়াল" শব্দটি কি করে এলো এ সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করেন তাহলে তৎক্ষণাৎ উত্তর পাবেন যে ওসব ফার্সী ব্যাপার—আমীর খস্রু খাস পারস্যের সংগীত থেকে এই ঢংটি এনে ভারতীয় সংগীতের সংগে মিলিয়ে দিয়েছেন। অমনি আমাদের কৌতূহল মিটে গেল আর কোন প্রশ্ন আমাদের মনে ওঠে না।

এদিকে ধ্রুপদ থেকে খেয়ালের উৎপত্তি হয়েছে এটা বিশ্বাস করাও কঠিন ব্যাপার। ধ্রুপদীরা কেনই বা তাঁদের উত্তম সুসম্বদ্ধ ধ্রুবপদকে খেয়ালের ঢঙে ভাঙতে যাবেন? আর যদি ভেঙেই থাকেন, তবে নামটা "খেয়াল" দেবেন কেন? আরও অনেক ভাল নামই তো দিতে পারতেন। ধ্রুপদ থেকে খেয়াল হয়েছে এটা যাদের পছন্দ নয় তাঁরা কৃষ্ণধনবাবুর মতে বিশ্বাসী অর্থাৎ ধ্রুপদীরা ব্যঙ্গ করেই এই জাতীয় গানের নাম দিয়েছেন খেয়াল।

আসলে আমার মনে হয় সমস্ত ভ্রান্তির মূলে রয়েছে "খেয়াল" এই শব্দটি। প্রচলিত অর্থ থেকেই আমরা এর উৎপত্তি নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছি। ফলে এ সম্বন্ধে উর্ধিকতর অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তাও অনেকে বোধ করেন না।

খেয়ালের উৎপত্তি সম্বন্ধে অন্য নির্ভর-যোগ্য সূত্র অবলম্বন করা আবশ্যক। সংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ধ্রুবপদ এবং খেয়াল দুটি বিভিন্ন গীতিগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যেহেতু ধ্রুবপদের প্রাধান্য আমাদের বর্তমান সংগীতে স্বীকৃত সেহেতু অপর একটি প্রধান গীত-রূপ যে ধ্রুবপদের স্নেহচ্ছায় বিকশিত এবং বর্ধিত হয়েছে এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। বরঞ্চ কেতাবি প্রমাণ অনুসারে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে খেয়ালের মূল রূপটি যে গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সেটি ধ্রুব-জাতীয় গীতির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কৌলীন্য দাবী করতে পারে। এই গোষ্ঠী শাস্ত্রীয় সূড় নামক বিশিষ্ট বংশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে আর ধ্রুবপদ অপেক্ষাকৃত মিশ্র গীত-রূপ ছায়ালগ বা সালগসূড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অতএব বংশমর্যাদায় খেয়াল উপেক্ষণীয় নয়। তথাপি অনুকূলে অঙ্গ-সংস্থানের ফলে ধ্রুবপদ নানাভাবে সৌষ্ঠব-মণ্ডিত হয়ে উঠেছে সেটা সর্বজনস্বীকৃত। প্রকৃতি অনুসারেই খেয়ালকে ধ্রুবপদের মত রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। কেতাবি প্রমাণ অনেকের কাছে উপহাসের বস্তু। তাঁদের মতে শাস্ত্রকারগণ আসলে ছিলেন কবি এবং তাঁদের কল্পনা বর্তমানকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ অতীতাশ্রয়ী হয়েছিল। এর কিছুটা হয়ত সত্য হতে পারে কিন্তু সবটা নয় কেননা বর্তমানকে উপেক্ষা করা অসম্ভব। শাস্ত্র-কারগণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা অতীত এবং বর্তমান—দুটিকেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার পরিচয় গ্রন্থাদিতে রেখে গিয়ে-ছেন। ওস্তাদ পরম্পরা যে গালগল্প চলে সেগুলির সংগে ইচ্ছাপ্রণোদিত সিদ্ধান্তকে মিলিয়ে মিশিয়ে ইতিহাসের স্বপ্নজাল বোনার চেয়ে বিজ্ঞব্যক্তিদের স্বাক্ষরসমন্বিত প্রামাণিক গ্রন্থাদির সাক্ষ্যগ্রহণপূর্বক ঐতি-হাসিক সূত্র রচনা করা অনেক বেশী যুক্তি-যুক্ত পদ্ধতি। অতএব দেখা যাক শাস্ত্রীয় উল্লেখ বিশ্লেষণ করলে কি পাওয়া যায়।

পূর্বে যে সূড় পর্যায়ের গীতের উল্লেখ করেছি সেটি প্রাচীন যুগে বিভিন্ন জনপদে প্রচলিত দেশী-সঙ্গীতাদির শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই পর্যায়ের অন্তর্গত একটি শ্রেণীর নাম ছিল "কৈবাট।" এই গীত-রূপটিই বর্তমান খেয়ালের আদিতম রূপ বলে আমার বিশ্বাস। বৃহৎ—দেশী নামক গ্রন্থে (৫ম—৭ম খৃঃ) প্রাচীন শাস্ত্রকার মতঙ্গ উক্ত কৈবাট এর উল্লেখ করে বলছেন যে এই জাতীয় গানে প্রধানত মৃদঙ্গের বোল আবৃত্তি করা হত এবং বস্তুতঃ পাটাক্ষর-দ্বারাই এটি বিরচিত হত। অর্থাৎ ধা ধা ধিগ্ ধিগ্—এই ধরণের নানা বোল গ্রথিত করে তাল সংযোগে এই গানটি গাওয়া হত। মতঙ্গ বিশেষভাবে বলছেন যে গান্ধর্বগণ এই গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এতে

গানটি যে বেশ উচ্চশ্রেণীর সংগীতজ্ঞ সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। এইটি হচ্ছে বর্তমান তেলেনা (তারানা) খেয়ালের আদিরূপ।

এর পর পার্শ্বদেব (৯ম—১১শ খ্রীঃ) তাঁর সংগীতসময়সার গ্রন্থেও এটুকুই উল্লেখ করে গেছেন। তবে তাঁর সময় নামটি "কৈবাড়"-এ পরিণত হয়েছে।

এখানে এটুকু বলা আবশ্যক যে, আসল নামটি "কৈবাট" বা "কৈবাড়" কোনটিই নয়। আদিতে নামটি ছিল "করপাট" কেননা মৃদঙ্গ বাদ্য এবং তদীয় বোলই ছিল এই গানের মুখ্যবস্তু। কিছুকাল পরে এটি হয়ে দাঁড়াল "করবাট" এবং যথানিয়মে মূলে শব্দটি প্রাকৃত ভাষায় বিকৃত হয়ে "কৈবাট" বা "কৈবাড়" নামে পরিচিত হল। রত্নাকরের টীকায় কল্লিনাথ এটি বুঝিয়ে বলেছেন।

এই যুগ থেকেই এই গানটি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। সংগীতরত্নাকরের যুগে (১২১০—১২৪৮ খ্রীঃ) আমরা এই গানটির কয়েকটি প্রকারভেদের সংগেও পরিচিত হই।

রত্নাকরের বর্ণনা অনুসারে জানা যায় যে, এই গানটিতে তখন পদ (বাক্য) স্বর যুক্ত হয়েছে এবং বর্তমান স্থায়ী এবং অন্তরার পদ্ধতি অনুসারে গাওয়া হচ্ছে। রত্নাকরের যুগে এই গানটি ছিল দুরকমের—সার্থক এবং অনর্থক। এই দুটি আবার শুদ্ধ এবং মিশ্র—এই দুই প্রকারে বিভক্ত হয়েছিল। সার্থক এবং অনর্থক এই দুটি শব্দ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সার্থক শ্রেণীটিতে বোল, স্বর প্রভৃতির সংগে অর্থযুক্ত পদও যোজিত হয়েছে; আর অনর্থক শ্রেণীটিতে কতকগুলি অর্থহীন শব্দ যোজিত হয়েছে। বর্তমান তেলেন বা তারানায় তুম, তা, না, দারে দানি, ওদানি, তানুম প্রভৃতি অক্ষরের ব্যবহার এই সুপ্রাচীন অর্থহীন-কৈবাড় থেকেই চলে এসেছে। এর সংগে মৃদঙ্গের বোলও উচ্চারিত হত। এ যুগেও তেলেনায় তবলার বোল উচ্চারণ করা হয়। এই অর্থহীন অক্ষরগুলি আবৃত্তির উদ্দেশ্য একটি ছন্দোবদ্ধ ধ্বনির সৃষ্টি। মৃদঙ্গের আওয়াজের সংগে অনুরূপ অর্থহীন অক্ষরগুলি একত্র হয়ে এমন একটি বিচিত্র ছন্দের সৃষ্টি করে, যা পদবদ্ধ সংগীতে সম্ভব নয়। শুদ্ধ এবং মিশ্র—এই দুটি ভেদ পরিকল্পিত হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে পাট, স্বর, পদ রাগ প্রভৃতির নানারূপে মিশ্রণ এই সংগীতে স্বীকৃত হয়েছে। এই গীতের চারটি ভেদের উল্লেখ আমরা পেয়েছি—সার্থক শুদ্ধ কৈবাড়, অর্থহীন শুদ্ধ কৈবাড়, সার্থক মিশ্র কৈবাড় এবং অনর্থক মিশ্র কৈবাড়।

ক্রমে এই কৈবাড় শব্দটি কৈবাল'এ পরিণত হল এবং পরবর্তী যুগে আমরা দেখছি যে, এই শব্দটি 'কায়বাল' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। একটি সংকলন গ্রন্থে এই শব্দটি উল্লেখ করে যে লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে, সেটি কৈবাড়-এরই লক্ষণ। তবে এইখানে আভোগের পরিকল্পনাও করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আভোগ অংশে পদাদি রচনা করা যেতে পারে। এই 'কায়বাল' শব্দটিই একদিকে কাওয়াল এবং অপর দিকে 'খেয়াল'রূপে পরিচিত হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এই গীতের কয়েকটি প্রকারভেদ ছিল। এরই একটিকে অবলম্বন করে সুচতুর এবং সুবিদগ্ধ আমীর খসরু কাওয়াল নামে গান রচনা করলেন। আইন-ই-আকবরি বলছেন যে, দিল্লীতে প্রচলিত গান ছিল কাওয়াল এবং তারানা। এই দুটি গানই দিল্লীর আমীর খসরু, ভারতীয় এবং পারসিক সংগীতের সংমিশ্রণে তাতার এবং সমিত নামক দুই ব্যক্তির সহায়তায় প্রবর্তন করেন। ভারতীয় সংগীতের কোন পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া গেল কিন্তু পারস্য দেশীয় সংগীতের কতটুকু কি উপায়ে তিনি নিয়েছেন সেটি আমরা এখনো জানতে পারিনি। কবিকে ধন্যবাদ যে, তিনি ভারতীয় প্রাকৃত শব্দ 'কায়বাল' (কাই-ওয়াল — কাওয়াল)-এর পরিবর্তন করেন নি। অনুরূপভাবে উক্ত গীতের আর-একটি রীতিকেও তিনি 'তারানা' নামে পরিচিত করেন। এর পরিচয়ও পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। কৈবাড় গীতির মূল রূপটিও কালোচিত বেশে সুসজ্জিত হয়ে 'খয়াল' বা খেয়াল নামে পরিচিত হয়েছিল। সম্ভবত জৌনপুরের সুলতান হোসেন শিকী এই প্রচেষ্টায় একজন বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এটি আরো কিছুকাল পরের ঘটনা। শোনা যায়, হোসেন শিকী যে খেয়ালের প্রবর্তন করেন, তাতে সওয়ারীর মত বিন্যাসও ছিল অর্থাৎ এতে চারটি কলিই বর্তমান ছিল। এর মূলে সত্য আছে বলেই আমার বিশ্বাস। এরও নজীর শাস্ত্রে আছে। চতুর্দণ্ডীপ্রকাশিকা নামক গ্রন্থে (১৬২০ খ্রীঃ) সুপণ্ডিত গ্রন্থকার বেংকটমখি জানিয়েছেন যে, তাঁর সময়ে এক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, যাঁরা আভোগটিকে পৃথকভাবে যোজনা করে এক-প্রকার গানের অনুষ্ঠান করতেন এবং কৈবাড় শ্রেণীর গীতেই এই প্রচেষ্টা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হত। কিভাবে আভোগটি রচিত হত, সেটি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন যে, আভোগটিকে দুটি ভাগ করে তার প্রথম অর্ধটি রাগালাপের আলাপের মত গাওয়া হত; দ্বিতীয় অর্ধটি তালযুক্ত করে গাওয়া হত। প্রথম অর্ধে গায়কের নামযুক্ত ভণিতা থাকত আর দ্বিতীয় অর্ধে থাকত বর্ণ বা নায়কের নাম। বলা বাহুল্য, আভোগের এই পৃথক অংশটিই সঞ্চারী হিসাবে ব্যবহৃত হত। কোনো সম্প্রদায় হয়ত এই অংশও ত্যাগ বর্জন করতেন না।

এই সমস্ত বর্ণনা থেকে এইটাই ধারণা হয় যে, কৈবাড় নামক গীতই খেয়ালের আদি রূপ। ক্রমিক বিবর্তনের পদ্ধতিতে এটি এইভাবে খেয়ালের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে :—

করপাট—করবাট—কৈবাট—কৈবাড়—কৈবাল—কায়বাল—খয়াল—খেয়াল।

নানা ঘরের খেয়ালে রত্নাকরবর্ণিত বিভিন্ন প্রকার কৈবাড় গীতির বৈশিষ্ট্য রক্ষিত আছে। পূর্বেই বলেছি, তেলেনায় অনর্থক শ্রেণীর কৈবাড়ের বিশেষত্ব এখনো বর্তমান। এই সেদিন পর্যন্ত ত্রিবট নামক একরকম খেয়াল গাওয়া হত, যার তিনটি কলি—একটিতে পদ একটিতে তেলেনা এবং একটিতে মৃদঙ্গের বোল। এই তিনটি কলির সংগে সরগম জুড়ে দিলেই সেটি হত চতুরঙ্গ। এগুলির সংগে মিশ্র কৈবাড়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

অতএব খেয়াল—একটি ফারসী শব্দ, এইভাবে ভাবতে আরম্ভ করলে সেই চিন্তাধারা সমীচীন এবং যুক্তিসংগত হবে না। আর ধ্রুবপদের সংগে খেয়ালের সম্বন্ধ নির্ণয় না করাই ভাল কেননা, উভয়ের বংশপরিচয় এক নয়।

এঁরা লিখতেন এবং আঁকতেনও

নিখিল সরকার

তেষট্টি থেকে আশি। তেরো বছরে সাকুল্যে দু হাজার ছবি এঁকেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মহাকবি রবীন্দ্রনাথ।

সে ছবিকে আজ আর কেউ 'ছবিতা' বলে না। বলতে সাহসী হয় না। তার কারণ যদিও রবীন্দ্রনাথের চিত্রাভাস বিদ্যালয় নিরপেক্ষ এবং যদিও তার করণ-প্রকরণ ও গূঢ়ার্থ নিয়ে সংশয়-সন্দিহানতার অবকাশ অবশ্যই আছে, তবুও এগুলো যে বাস্তবিকই চিত্র এবং তাতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সমুপস্থিত, এ সত্য আজ চক্ষুষ্মানদের কাছে দিবালোকের মতোই স্পষ্ট।

বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ জনৈক বিদেশী অধ্যাপক নাকি কবির ছবি দেখে মন্তব্য করেছিলেন, টেগোরের ছবি দেখে তিনি যে বাস্তবিকই মহাকবি ছিলেন, আমার সে ধারণা প্রত্যয়ে পরিণত হলো।

কবির চিত্রকলার এর চেয়ে বড়ো প্রশস্তি আর কিছু হতে পারে না বলেই আমার বিশ্বাস। এবং আমি মনে করি একই হাতে কলম এবং তুলি ধারণের ফলে খণ্ডাকারে হলেও পৃথিবীতে শিল্পকলার সম্পর্কে যে সব তথাকথিত সমস্যাদি উদ্ভূত হয়েছে এই উক্তির মধ্যে তার চূড়ান্ত সমাধান ঘটে গেছে।

আঁকা এবং লেখা—ফলাফলের দিক থেকে দৃশ্যত ভিন্ন হলেও, ঘটনাটি এক এবং তার নায়ক— অদ্বৈত অভিন্ন পুরুষ।

ভাস্কর্যকে অনেকে মৌন কবিতা বলেছেন। সিমঁ দ্য বোঁভ্যা চিত্রকে বলেন, কান-কালা কবিতা।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি কবিতাকে আখ্যা দিই 'রঙকানা ছবি' তবে শিল্প অর্থ দাঁড়ায় সর্বেন্দ্রিয় রহিত এক নৈর্ব্যক্তিক চেতনা যা বাহ্য প্রতীতির অগম্য।

তাকে বোধগম্য করাতে হলে নর্তকীর পায়ের ছন্দ, গায়কের সুরের মূর্ছনা, কবিতার দিব-পদ স্পর্শ-পদ অথবা চিত্রকরের রং-রেখার [illegible] ছাড়া আমাদের গতি নেই। শিল্প [illegible] এখানেই প্রাণলক্ষণাক্রান্ত। স্পর্শগ্রাহ্য, চেতনাগম্য এবং বাঙ্ময়। সে কথা বলে, কানে শোনে এবং চোখে দেখে। কখনও একসঙ্গে মাত্র একখানা ইন্দ্রিয়ই তার সক্রিয়, কখনও দুটি, কদাচিৎ সব কটি।

যে কবির কবিতায় চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সর্বরস উপস্থিত, সে কবি যেমন ভাগ্যবান, তেমনি যে শিল্পী সর্ব মার্গবিহারী তিনিও ভাগ্যবান। এ নরলোকে উভয়ই সম্ভব। এতে আধিভৌতিক কিছু নেই, হঠকারিতার কিছু নেই এবং গবেষণাযোগ্য বিরাট সমস্যাও কিছু নেই।

ঘটনাটি একান্তই সরল। সবাই যেমন কবিতা লিখতে পারেন না, তেমনই সকল কবিই ছবি আঁকতে পারেন না। এতে তাঁর শিল্প-পৌরুষ মূর্ছা যায় না, কারণ তিনি স্বভাবে একেশ্বরবাদী।

একেশ্বরবাদীর ভগবানও ঈশ্বর।
তাঁর সিদ্ধ ভক্তও বুদ্ধ।
শিল্পী মাত্রই সিদ্ধার্থ, বুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ দ্বৈতবাদী বুদ্ধ। তিনি লিখেছেন এবং এঁকেছেনও। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে অদ্বিতীয় নন। যদিও আমার ধারণা যারা এই উভয় কর্মে যুগপৎ সার্থক হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তিনিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। যদি ইতিহাস দিয়ে শুরু করা যায়, তবে জ্ঞাত ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী হিসেবে পাওয়া যাবে, ইউরিপেডাস, পেত্রার্ক, ভারতবর্ষের গুপ্ত রাজারা এবং প্রাচীন চীনের 'বাবু চিত্রকরদের' মধ্যে।

চীনা দরবারী বাবুরা রাজকার্য করতেন। অবসরে ছবি আঁকা, কবিতা লেখা এবং হস্তাক্ষর চর্চা ছিল তাদের নিত্যকর্ম। নইলে দরবারে খাতির থাকে না, সমাজে মুখ দেখানো যায় না। ভদ্রলোকদের এ বিশেষণগুলো অপরিহার্য।

ওয়াং উই (৬৯৯-৭৬৯) ছিলেন এমনি

রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি।

গ্যেটের আঁকা ছবি

একজন ভদ্রলোক। তিনি রাজকার্য করতেন, গান গাইতেন, হরফ লিখতেন, ছবি আঁকতেন, কবিতা গাঁথতেন এবং বাগান করতেন।

সু য়ুং পো (১০৩৬-১১০১) চীনের সবচেয়ে খ্যাতিমান ভদ্রলোক। তিনিও রাজকর্মী ছিলেন। নদীতে বাঁধ দেওয়াতেন। কয়েদীদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করতেন এবং বোধ হয় পৃথিবীতে তিনিই সর্বপ্রথম খুলেছিলেন দরিদ্রের সন্তানদের রক্ষার্থে অর্থ ভাণ্ডার। 'চিলড্রেন ফণ্ড'। তিনি কবিতা লিখতেন। গীতি কবিতা। ছবি আঁকতেন। মুখ্যত বাঁশ বনের ছবি।

তাঁর কথা ছিল, মাংস ছাড়া বাঁচা যায়, কিন্তু বাঁশ ছাড়া নয়। মাংসের অভাবে লোকে শুকিয়ে যাবে সত্য, কিন্তু বাঁশের অভাবে লোক যাবে বর্বর হয়ে।

ছবির খাতা ছিল তাঁর কবিতা লেখার খাতা। তিনি বলতেন, ওয়াং উই'র কবিতা যখন পড়ি, তখন তার মধ্যে আমি ছবি দেখি। আর তাঁর ছবি যখন দেখি, তখন তাতে পড়তে পাই কবিতা।

সু য়ুং পোর কবিতা এবং ছবিতেও রসিকেরা তাই দেখেন এবং পড়েন। বোধ হয় অবনীন্দ্রনাথের ব্যাপারেও এমনটি ঘটে। অনেকেই তাঁর লেখা পড়তে ছবি দেখেন, অনেকে তাঁর ছবি দেখেও কবিতা পড়েন (ভগিনী নিবেদিতার 'সাজাহানের মৃত্যু'র সমালোচনা দ্রষ্টব্য)।

বস্তুত ছবি-লেখক অথবা চিত্রকর কোন অবনঠাকুর বড়ো তা নিয়ে আজও আমার মনে ধাঁধা লেগে আছে। তবে যেহেতু তিনি এ-ব্যাপারে মিকালেঞ্জেলোর মতো সুপ্রতিষ্ঠিত তাই মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে সাহসী হই না।

রাফেল সনেট লিখতেন এবং মিকালে-ঞ্জেলোর সনেট ইতালীয়ান সাহিত্যে রীতি-মত সম্পদ বলে গণ্য।

বাংলা দেশে অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্মও তুল্য মর্যাদার দাবী রাখে। তিনি সোগাগোড়াই বাংলা দেশের মিকালেঞ্জেলো; সব্যসাচী।

ইউরোপের রেনেসাঁস যুগের কর্মক্ষেত্র এমনি অনেক সব্যসাচী দেখা গেছে। দা দ্যভিঞ্চি ছিলেন, চিত্রকর, ইঞ্জিনীয়ার, ভেষজ-বিদ এবং অ্যানাটমিস্ট। সিলিনি লেখক, স্বর্ণকারিগর এবং চিত্রকর। উইলিয়াম ব্লেক চিত্রকর এবং কবি।

খোদাই কারিগর ব্লেকের কবিতাগুলো যে নেহাৎ পাগলের প্রলাপ নয় আজ দু'শ বছর পর হিন্দী, জাপানী এবং বাঙ্গালী কবিরা তা অনুবাদের চেষ্টা করে বলতে চাইছেন।

উন্মাদের মতো এই লোকটি একটি একটি করে কবিতা লিখেছেন তারপর তাকে চিত্রিত করেছেন। একটি একটি পাতা করে খোদাই করেছেন এবং তা ছাপা হলে স্ত্রীকে নিয়ে বসে রং লাগিয়েছেন। পতিগতা স্ত্রী এলিনরও বলতেন, মিঃ ব্লেক ইজ অলওয়েজ ইন প্যারাডাইস।

সমস্ত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ তার কথাটাকে ব্যঙ্গ বলেই গ্রহণ করেছিল বোধহয় সেদিন।

কিন্তু আজ দু'শ বছর পরে ব্লেকের কর্মকাণ্ডের যে সমাদর দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে তাতে মনে হয়—এলিনরকে তারা ভুল বুঝেছিলেন। মিঃ ব্লেকের প্রত্যাশাই ঠিক :

Yet I laugh and sing, for if on Earth neglected, I am in Haven a Prince among Princes.

ছ' বছর বয়েস থেকে উইলিয়াম ব্লেক জানালায় পরী দেখেছেন, তাঁর বৈঠকখানায় আর্ক এঞ্জেলদের সঙ্গে তাঁর বাক্যালাপ ছিল এবং ফরাসী বিপ্লবের মতো ঘটনা তাঁর হাত দিয়ে Tiger Tiger Burning Bright ! কবিতা লিখিয়েছে—তিনি তাই স্বতন্ত্র আলোচ্য।

...

উইলিয়াম ব্লেককে অনন্যপ্রতিভা হিসেবে এড়িয়ে গেলেও রেনেসাঁস কালের এবং উনিশ শতকের লেখক-শিল্পীদের সম্পর্কে এখানে একটা প্রশ্ন তোলা যায়। যদিও প্রশ্নটি স্থূল এবং উত্তরটি ততোধিক, তবুও তা উত্থাপন করছি। উদ্দেশ্য : পাঠক। অনেক পাঠকই জানতে চান লেখক কিংবা কবিরা ছবি আঁকেন কেন?—কালে ভদ্রে তাদের এ প্রেরণা আসে কোথা থেকে?

তার উত্তর এ প্রবন্ধের গোড়ায় দেওয়া আছে।

ব্রাউনিং উত্তর দিয়েছিলেন : প্রেম।

কবিদের ছবি আঁকার পেছনে আছে প্রেম। নরনারীর ভালোবাসা। একটি হৃদয় যখন আর একটি হৃদয়ে সঙ্গম খোঁজে তখন তার মোহনায় মোহনায় এমনি ব-দ্বীপের উদয় হয়। সেখানে নিজে নিজে ফুল ফোটে। সে ফুলে অর্ঘ হয়, মালা হয়। দান্তেকে প্রশ্ন করেছিলেন ব্রাউনিং : কার মুখে হাসি ফুটাতে ছবি আঁকছ তুমি?—Whom to please?

—You Whisper Beatrice নিজেই উত্তর দিয়েছিলেন তাঁরা। বিয়াত্রিচের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে দান্তে সত্যিই বসেছিলেন তুলি হাতে। 'এঞ্জেল' আঁকবেন তিনি।

রোসেত্তি চিত্রকর দান্তের ছবিটি এঁকে গেছেন।

রোসেত্তি (Dante Gabriel Rossetti) নিজেও ছিলেন কবি এবং চিত্রকর তো বটেই। র‍্যাফেল-পূর্ব চিত্রান্দোলনের তিনিই জনক।

যা হোক, নরনারীর প্রেম যে অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে লেখকদের ছবি আঁকার পশ্চাদ্‌ভূমি তার কারণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত না হলেও অনুমান হতে বাধা নেই, তার নজীর আছে।

দান্তের পরী আঁকা আর হয়নি। কেননা—

certain people of importance......
Entered and would seize forsooth, the poet. Says the poet "Then I stopped my painting."

কিন্তু এডগার এলেন পোকে নিরস্ত করা যায়নি। তিনি তিন তিনটে ছবি এঁকেছিলেন জীবনে। প্রথম নিজের সম্পাদিত একখানা সাময়িকীর মলাট, দ্বিতীয় স্ব-চিত্র এবং তৃতীয় ও সর্বশেষ এলমিরা রয়েস্টারের একখানা প্রতিকৃতি।

রয়েস্টার মেয়েটি ছিল তাঁর জীবনের আকাশে একমাত্র তারা। পো'র আবাল্য সাহচর্য এবং যৌবনের স্বপ্নকে ছিন্ন করে যেদিন তার বিয়ে হয়ে গেল জনৈক দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে সেদিন তিনি বসে বসে লিখেছিলেন তাঁর Lenore নামে বিখ্যাত কবিতাটি আর একখানা ছবি।

রয়েস্টারের নামে আঁকা শেষ উপহার।

ইতিমধ্যে বিধবা এলমিরা আবার নতুন স্বপ্ন হলেন পো'র জীবনে।

দুজনে সম্মত হলেন।

এবার পো' আর এলমিরা এক হবেন। এবার তাঁদের বিয়ে হবে।

এলমিরার ছবি আঁকলেন পো। তাঁর নিজের হাতে নিজের মানুষের ছবি।

এটিই এডগার এলেন পো'র শেষ ছবি।

সহসা এলমিরার মানস সাম্রাজ্য লুঠ হয়ে গেল। তাঁর সম্রাট অন্তর্ধান করেছেন। অকালে দেহরক্ষা করেছেন এডগার এলেন পো।

এলমিরা রয়েস্টারের সম্বল এখন তাঁর একখানা ছবি। স্ব-প্রতিকৃতি।

আর একখানা ছবি তার নিজের।

রবার্ট ব্রাউনিংএর সমর্থনে চিত্রকর এডগার এলেন পো'র নিজের হাতে আঁকা একটি যুবতী মেয়ের ছবি।

বিয়াত্রিচের মতো কবির হৃদয় সে মেয়ে।

বদলেয়ারের আঁকা ছবি

সে মেয়ে কবির কবিতা এবং চিত্রকরের ছবি।

একটি মেয়েও এমনি করে এঁকেছিলেন একটি পুরুষকে।

সে মেয়েটির নাম মাদাম দ্যুদেভাঁত। আমরা বলি—জর্জ স্যাণ্ড। বিশ্বে এ নামেই তিনি পরিচিত।

স্বামীর সঙ্গে চিরকালের জন্যে সম্পর্ক চুকিয়ে মাদাম দ্যুদেভাঁত যেদিন প্যারীতে এসে নামলেন সেদিন অভ্যর্থনাকারীরা হকচকিয়ে গিয়েছিল তাঁকে দেখে।

গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামলেন যিনি তাঁর পরিধানে মোটা শিকারীর ট্রাউজার, মাথায় শিকারীর টুপি, গায়ে ভেলভেটের জ্যাকেট, পায়ে পুরুষের বুট।

অতঃপর সাহিত্য জগতে তিনি নাম নিলেন—জর্জ স্যাণ্ড।

দিনে দশ ঘণ্টা ছবি এঁকেছেন তিনি। **প্রথম জীবনে নিজের অন্নসংস্থানের জন্য,** শেষ জীবনে নাতনির বিয়ের যৌতুকের জন্যে। তার মধ্যে স্বভাবতই নানা ধরনের ছবি আছে। এবং আছে একটি প্রতিকৃতিও।

দীর্ঘ চুল, ধারালো নাসিকা—একটি পুরুষের প্রতিকৃতি।

তাঁর নাম—শোপাঁ (chopin)।

জর্জ স্যাণ্ডের জবানবন্দী অনুযায়ী তিনিই তাঁর জীবনে একমাত্র স্থির পুরুষ

"He is the only man who ha devoted himself entirely to me, wit no regret, for the past, and n reservation about the future."

সেদিনের প্যারীতে (১৮২০) এই মেয়েটিকে ঘিরে শিল্পী সাহিত্যিকের যে মধুচক্র রচিত হয়েছিল তার এখানে উল্লেখ প্রয়োজন।

একাদশ দ্বাদশ শতকের চীন ছাড়া প্রাচ্যখণ্ডে সেদিনের প্যারীর শিল্প-জীবনের কোন তুলনা নেই।

পূর্বোল্লেখিত স্যুয়ং পোকে নেমন্তন্ন করেছেন মি ফি।

দ্‌জনের সামনে দ্‌'টি বড়ো বড়ো টেবিল। টেবিলে কুজো ভরা মদ এবং নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য। আর এক পাশে তিনশ' শিট করে তুলট কাগজ, নানা আকারের তুলি এবং কালি।

ঘরে ঢ্কে বন্দোবস্তটা দেখেই 'হো হো' করে কিছ্ক্ষণ হাসলেন য়্য়ং পো। তিনি প্রকাশ্যেই স্বীকার করলেন মদ খেলে তাঁর হাত খ্লে যায়।

শ্রু হলো খাওয়া, সেই সঙ্গে আঁকা। খেতে খেতে সন্ধ্যে গড়িয়ে এলো। মদের কুজোটা এলো ফাঁকা হয়ে সেই সঙ্গে ফ্রিয়ে এলো কাগজও।

দ্‌জনে উঠলেন। নিজের হাতের কাগজের বাণ্ডিলটা দিয়ে দিলেন অমোর হাতে। তারপর—ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায়।

এ জীবন প্যারীতেও ছিল। গত শতকের শেষে এবং এ শতকের গোড়ার দিকে। প্যারীর রেস্তোরাঁয় রেস্তোরাঁয় অনেক শিল্পী জন্মেছেন, মরেছেন, অনেকে বড়ো হয়েছেন, হারিয়েও গেছেন অনেকে। জর্জ স্যাণ্ডের আড্ডারও এ খ্যাতি ছিল। তাতে ছিলেন ম্যাসেত (Alfred de musset), মিয়ামের (Prosper Meremee) মতো অনেক অনেক মান্ষের ভিড় জমতো যাদের কাছে শিল্প ছিল—মহাসাগর। যার মধ্যে বাঁধ বাঁধার কোন চিন্তাই কোনদিন পীড়িত করেনি তাঁদের।

ম্যাসেত আইন পড়েছিলেন—আইনজীবী হবেন; ডাক্তারী পড়েছিলেন চিকিৎসক হবেন, গান শিখেছিলেন এবং ছবিও

হান্স ক্রিশ্চান অ্যাণ্ডারসনের আঁকা ছবি

আঁকতেন—যদিও তাঁর পরিচয় কবি হিসেবেই।

জর্জ স্যাণ্ডেরও একখানা ছবি এঁকেছিলেন তিনি। জীবনে এ মেয়েটির সঙ্গে বন্ধ্ত্বই ছিল নাকি ম্যাসেতের একমাত্র সান্ত্বনা।

মিয়ামের ছবির মধ্যেও জর্জ স্যাণ্ড আছেন। যদিও তিনি বিশ্বখ্যাত তাঁর ছোট গল্পের জন্যে—তব্ও ছবি আঁকার নেশা ছিল তাঁর। সাধারণত ব্যঙ্গ চিত্র আঁকতেন তিনি। আর আঁকা শেষ হয়ে গেলেই পোড়া সিগারেটের মতো ছ্ড়ে ফেলে দিতেন যেদিকে তাঁর ইচ্ছে। জর্জ স্যাণ্ডের ছবিটিও ক্যারিকেচার। সিগারেট ছোঁড়ানোর মতোই সহজ হাতে আঁকা, এগ্লো ছাড়া মিয়ামের চিত্রকর জীবনে আসল ফসলও ছিল। সে অন্য একজনের গোলা-জাত করা সম্পত্তি।

তাঁর এক প্রস্ত জল-রংয়ে আঁকা ছবি রাকি দিয়ে গিয়েছিলেন—এমন একটি হাতে যে হাত প্রার্থনা করে গেছেন তিনি দীর্ঘ কুড়িটি বছর। সে প্রার্থনার অঞ্জলি ছিল এই এক প্রস্ত ছবি। মিয়ামের রোমাঞ্চকর জীবনের, রং মেশানো অধ্যায়ট্কুর স্বাক্ষর সে ছবি।

আবার একটা বিরাট জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতির ইতিকথাও বোধহয় এগ্লো। কুড়ি বছর ধরে আঁকলেও মিয়ামে ব্যর্থ হয়েছিলেন। জলে আঁকা ছবি তার সে মনে টিকেনি। কুড়ি বছর পরে এ খবরটা সহ্য করার মতো রং তখনও মিয়ামের মনে অবশিষ্ট না থাকারই কথা।

তিনি আহত হয়েছিলেন।

অনেকে বলেন—সে ঘটনায়ই তিনি নিহত হন।

এদিকে ফরাসী দেশের এই শিল্প-সায়রের আর্তনাদের মধ্যে খালের ওপারে বসে আঁকছেন তখন শার্লোট্রণ্টে (১৮১৬-৫৫)। ইংলণ্ডে এককালে এই বাংলাদেশের মতোই কুমারী মেয়েরা ছবি আঁকতেন। গান গাওয়া, নাচ জানা, ছবি আঁকা ছিল স্লক্ষণা পাত্রীর অন্যতম লক্ষণ। 'প্রাইড

এণ্ড প্রেজুডিসের' পাতায় জেন অস্টেন বলছেন :

A woman must have a thorough knowledge of music, singing, drawing, dancing and the modern languages to deserve the word accomplished.

মিঃ রুচেস্টার জেনের ছবির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন :—তুমি কি সুখী ছিলে জেন, এগুলো যখন আঁক তখন? জেনের মুখ দিয়ে উত্তর দিচ্ছেন স্বয়ং শার্লট :

I was absorbed sir; yes, and I was happy. To Paint them in short was to enjoy the keenest pleasures I have known.

ইয়র্কশায়ারে শার্লট ব্রন্টের বাসগৃহটি আজ তীর্থ। তার দেওয়ালে দেওয়ালে ঝুলছে 'জেন আয়ারে'র লেখিকার নিজের হাতে আঁকা ছবি। সে ছবির নৈপুণ্য দেখে কারও একবারও সন্দেহ হয় না যে, শার্লট সত্যিই আত্মস্থ হয়ে গিয়েছিলেন এগুলো আঁকার সময়ে। সত্যই সুখী ছিলেন তিনি সেদিন।

শার্লট ব্রন্টের মতো আঁকতেন আশ্চর্য মানুষ বোদলেয়ার। রোম্যাণ্টিক শ্রেষ্ঠ বোদলেয়ার। বেশির ভাগ নিজের ছবি এবং বেশির ভাগ কার্টুন।

আঁকতেন পুশকিন, লোরকা এবং দুর্ধর্ষ ডি এইচ লরেন্সও। পুশকিন এঁকেছিলেন ওনেজিনকে। লরেন্স ছবি আঁকা ধরেছিলেন শেষ বয়সে। মৃত্যুর দু'বছর আগে (১৯২৮) লণ্ডনে তাঁর ছবির প্রদর্শনীও আয়োজিত হয়েছিল একবার। যদিও তৎকালিন ইংলণ্ডের প্রবল নৈতিকতা দর্শকদের ছাড়পত্র দেয়নি সেখানে উঁকি দেবার। কেউ দেখবার আগেই অশ্লীলতার নামে পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছিল সে প্রদর্শনীর দরজা।

আজও তার পুনরায়োজন হয়নি। জীবন-যন্ত্রণার কি কাহিনী লরেন্স তাতে দেখিয়েছিলেন তা জানি না, কিন্তু তাঁর আঁকা একখানা ছবি দেখলেই জানতে বাকী থাকে না যে শিল্পী হিসেবে কোন বিশৃংখলাই ছিল না তাঁর মধ্যে।

যদিও কৃতবিদ শিল্পী লরেন্স জীবনে অবশ্যই বিশৃংখল ছিলেন। জীবনে বিশৃংখলা Strindgerg (১৮৪৯-১৯১২) এর জীবনেও ছিল। বার কয় উন্মাদও হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে সুইডিশদের কাছে তিনিই শ্রেষ্ঠতম এবং প্রিয়তম। তিরিশ হাজার লোক তাঁর মৃত্যুর দিনে শবাধার ঘিরে কেঁদেছিল। সে কান্না সুইডেনে কেউ কোনদিন দেখেনি। ছবি আঁকা ছিল Strindgerg-এর কাছে জীবনে শৃংখলা আনয়নের একটা আন্তরিক চেষ্টা। সে চেষ্টায় ইম্প্রেশানিস্টদের দলে না
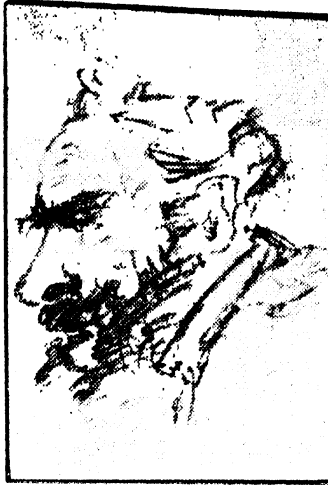
টলস্টয়ের আঁকা ছবি

ভিড়েই নাট্যকার Strindgerg সুইডেনের অন্যতম ইম্প্রেশানিস্ট শিল্পী।

এমনি অনেক শিল্পী আছেন পৃথিবীতে যাঁরা প্রধানত কলমের কারণেই বিশ্বখ্যাত। ভুলক্রমেই ছবি আঁকাটাকে আমরা মনে করি অ্যাক্সিডেণ্টাল বা আকস্মিক ঘটনা। অবহেলার খেলা হলেও ওটি যে রীতিমত কলাকারণের ফল এবং কলম-প্রক্রিয়ার কোন বিপরীত প্রক্রিয়া নয়—তাদের জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করলে সে সত্যটা ধরা পড়ে।

এখানে তার সম্পূর্ণ চেষ্টা অবান্তর। শুধু মাত্র লেখক শিল্পীদের নামোল্লেখেই অনেকখানি জায়গার প্রয়োজন। তাছাড়া এমন অনেকে আছেন যাঁদের নামও আমরা জানি না।

তাই সে চেষ্টায় বিরত থেকে তিনজন জগৎখ্যাত কবি লেখকের উল্লেখ করছি যাঁদের বাদ দিলে এ কাহিনী সম্পূর্ণতেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

এই তিন পুরুষ : গোটে ভিক্টর হুগো এবং টলস্টয়। রবীন্দ্রনাথের পাশে এই তিনের সাধনা উল্লেখযোগ্য এবং বিচিত্র।

তৎকালের রীতি অনুযায়ী বালক গোটে একজন শিল্প শিক্ষক পেয়েছিলেন। কিন্তু এহ তুচ্ছ। দেশে দেশে স্কুলের ছেলেরা এমনি ড্রইং শিক্ষক অনেকেই পায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি এমন একটি জিনিস পেয়েছিলেন যা অনেকেই পান না। সেটি নিয়ত শিল্পী-সাহচর্য। জীবনভর নানা শিল্পী ঘিরে রয়েছেন তাঁকে। এবং মহাকবি গোটের ধারনা ছিল ইচ্ছে এবং তদনুযায়ী চেষ্টা করলে তিনিও আঁকতে পারেন তাঁদের মতো।

মানবের অফুরন্ত শক্তিতে রবীন্দ্রনাথের মতোই আস্থা ছিল তাঁর। তিনি বলতেন : "One should be able to make oneself master of any subject." যে কেউ ইচ্ছে করলে যা খুশী হতে পারে। মহাকবি গোটেও চিত্রকর হতে পারেন।

গোটে তুলি ধরলেন।

অন্যরা সময়কে যখন সিগারেটের ধোঁয়া করে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় গোটে তখন ছবি আঁকেন।

কম কথা এবং বেশি ছবি আপাতত তাঁর জীবনাদর্শ।

"প্রকৃতির মতো আমিও চাই বাক্যালাপ সম্পূর্ণ বন্ধ করে আমার ভাব-ভাবনাকে চিত্রে প্রকাশ করতে।"

কিন্তু ভেতরের কড়া সমালোচক বাদ সাধলেন।

I lacked everything needed to succeed.

সঙ্গে সঙ্গে শৌখিন শিল্পী উত্তর দিলে—

But I persisted stubbornly.

বাইশখানা ড্রয়িংয়ের একখানা অ্যালবামও প্রকাশিত হলো শেষ পর্যন্ত।

আবার সমালোচকের রূঢ় কণ্ঠস্বর শোনা গেল তার ভেতরে।

"এমন কোশলে আমি ছবি এঁকে চলেছি যার পরিণতি মানে—শূন্য।"

কিন্তু শিল্পী হার মানতে নারাজ। তিনি উত্তর দিলেন "শূন্য হলেও নৈরাশ্যের কিছু নেই।"

Since I practice in the same way as others smoke tobacco, it does not matter much."

শেষ অবধি কিন্তু চিত্রকর গোটের উপর সমালোচক গোটে জয়ী হলেন। তার রায়ই বহাল রইলো। গ্যেটে ঘোষণা করলেন ঃ "আমার ছবি আঁকার বাসনাটা আসলে মেকী বাসনা।

ছবি আঁকায় আমার বোধ হয় স্বাভাবিক কোন আকর্ষণ নেই। সে কারণেই স্বতস্ফূর্তভাবে শিল্পের কাছাকাছিও কিছু আমার মধ্যে পুষ্টিলাভ করতে পারলো না। Despite all my efforts I did not become an artist."

গোটের এই উক্তি যে বিনয় মাত্র তা মনে করার পক্ষে বাইশখানা ড্রয়িংয়ের একখানাই যথেষ্ট। আর সাক্ষাৎ প্রকৃতি থেকে আঁকা নিসর্গ চিত্রগুলো যদি তাঁকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত করেছিল অনুমান করি তবে তার কারণও অবশ্যই গোটের হাতের দুর্বলতা নয়, সমসাময়িক একাডেমিক চিত্রীদের সচারু সাফল্যই বোধ হয় দায়ী এ অন্যায় সিদ্ধান্তের জন্যে।

তবে এটা ঠিক কবি প্রতিভায় মহাকবি গ্যেটে অহরহ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুল্য হলেও চিত্রশিল্পে এই বাঙালী কবির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি অবশ্যই অক্ষম।

বরং এক্ষেত্রে ভিক্টর হুগোকে বলা চলে কবিগুরুর একমাত্র প্রতিযোগী।

হুগো এবং রবীন্দ্রনাথের চিত্রচর্চার ধারাটি প্রায় এক, যদিও স্বভাবতই দু'জনের মীমাংসা ভিন্ন।

হুগো কোনদিন তুলি হাতে শিক্ষকের সামনে বসেননি। অথচ হুগো-মিউজিয়ামে ছবির সংখ্যা সাড়ে চার'শ। তার মধ্যে স্ট্যাম্পের মতো ছোট মিনিয়েচার যেমন আছে, তেমনি আছে ইজেল সাইজের চেয়েও বড়ো বড়ো ছবি।

হুগোর ছবিও অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়েসের ফসল। তবে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কম বয়েসের বটে।

স্ত্রী ছবি আঁকতেন হুগো দেখতেন। বন্ধুরাও আঁকেন—হুগো দেখেন।

দেখতে দেখতে নিজেও বসলেন একদিন।

বসলেন বলা ভুল। চলতে চলতেই এঁকেছিলেন হুগো তাঁর প্রথম ছবি। জুলেত্তিকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন নর্মাণ্ডি এবং ব্রিটানীতে।

সেখানেই শুরু। এটা ১৮৩৬ সালের কথা।

তিন বছর পরেই দেখা গেল—এ শুরুর শেষ নেই।

হুগো অফুরন্ত। এবং হুগো রবীন্দ্রনাথের মতো যদৃচ্ছ। এনভেলাপে একটা কালির ফোটা পড়েছে কিংবা একটুখানি কফি।

হুগোর হাতে তা ল্যাণ্ডস্কেপে পরিণত হয় অথবা একটা প্যালেসে।

রবীন্দ্রনাথের মতো ফুলের পাপড়ি নিঙড়ানো রস হুগোর ছবির রংয়ের কাজ চালাতো না বটে, তবে এ ব্যাপারে তাঁরও প্রক্রিয়াটিও ছিল নিজস্ব!

সাদা কাগজটিকে কালো কফিতে একবার ভিজিয়ে নিতেন তিনি। শুকোলে সেটি সুন্দর বাদামী রং ধরতো। সেই বাদামী রংয়ের পটভূমি ছিল বৈপরীত্যে শিল্পী ভিক্টর হুগোর প্রিয় পটভূমি। কখনও কখনও আকাশে গতি আনার চেষ্টায় ঢেউ-খেলানো গরম লোহা চেপে ধরতেন তিনি রংয়ের ওপর।

তার ফলাফল তাঁকে খ্যাতি দিয়েছিল ঃ রাতের টানার। হুগোর ছবির বক্তব্য আলো-ছায়ায় বোধহয় আরও স্পষ্ট। মৃত্যু দণ্ডের বিরুদ্ধে হুগো অনেক বলেছেন।

কিন্তু ফাঁসি কাঠে ঝুলন্ত মানুষের ছবিতে তাঁর বক্তব্য যেমন বাঙ্ময়, তেমন আর কিছুতে নয়।

চার চারটি ছবি এঁকেছিলেন তিনি শুধু এই ফাঁসি কাঠটির। দুঃখের বিষয় তুলি হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ ছবি প্রকাশের কারণে ভিক্টোর হুগোর এই মহৎ প্রতিভা পূর্ণতার আগেই বিচারের ভুলে পড়েছিল। ফলে ব্যক্তিত্বের কারণে যথেষ্ট কৌতূহল জাগালেও জীবতকালে হুগো তাঁর প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা পাননি।

অবশ্য থিয়োফিল গতিয়ের-এর মতো মানুষ সমসাময়িক প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের তালিকায় তাঁকে ঠাঁই দিয়ে ছিলেন। কিন্তু সে নীচের দিকেই সম্ভব ছিল তখন।

আজকের সমালোচকরা তাঁকে টেনে তুলতে চান গয়া, রেমব্রাঁ এবং পিরানেসির সারিতে।

হুগোর ছবি এ সারির নীচে পড়ার কোন কারণ নেই বলেই মনে হবে যে কোন দর্শকের।
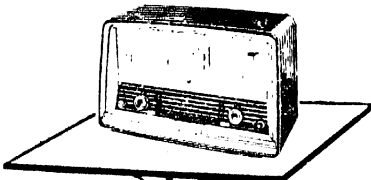
লিও টলস্টয় অবশ্য এ সারিতে আসেন না।

তিনি আরও অনেক ব্যক্তিগত এবং অনেক বেশি শৌখিন শিল্পী। তাঁর ছবি সংক্ষেপে একটি কথাই বলে : টলস্টয় তাঁর কাহিনীর নায়কদের চিনতেন।

দ্বিতীয় বক্তব্য যদি টলস্টয়ের ছবির কিছু থাকে তবে তা তাঁর কল্পনার ব্যাখ্যা। ছোটদের জন্যে জুলেভার্নের কাহিনী চিত্রিত করেছিলেন তিনি। এবং এঁকে-ছিলেন রুশ ছেলেমেয়েদের জন্যে ক-খ'র বইও (Abecederium)!

এগুলো তাঁর কল্পনার ছবি।

বড়দের ছবিগুলো ককেশাসের সুরুক্ত মানুষের স্কেচ। জীবন থেকে নেওয়া এবং জীবন দিয়ে আঁকা।

টলস্টয়ের ছবি মানুষেরই ছবি।

এবং সাহিত্যের মতো টলস্টয়ের হাতে তুলিতেও তারা জীবন্ত।

ছোটদের বইয়ের ছবি প্রসঙ্গ তুলে এড়িয়ে যাওয়া বাংগালী লেখকের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, এদেশে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, সুকুমার রায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, যোগীন সরকার জন্মেছেন। এবং আমার ধারণা এদের যে কেউ যখন তখন হ্যানস্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসন, হরমান হাস, লুই ক্যারল কিংবা রুডিয়ার্ড কিপলিংয়ের পাশে এসে বসতে পারেন।

হ্যানস্ ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের মার ইচ্ছে ছিল তিনি দরজী হন। ছোট বেলায় সেই উদ্দেশ্যেই একখানা কাঁচি তুলে দিয়ে-ছিলেন ছেলের হাতে। অ্যান্ডারসন জগৎখ্যাত হয়েও সে কাঁচি হাত ছাড়া করেননি।

কাগজ-কাটা ছবি করতেন তিনি তাঁর রূপকথার সাজ হিসেবে।

সে ছবি অ্যান্ডারসনের রূপকথার মতোই যাদু মাখানো।

লুই ক্যারলের 'এলিস ইন ওয়ান্ডার-ল্যান্ডের' ছবি এঁকেছিলেন বিখ্যাত পেশাদার ইংরেজ চিত্রকর টেনিয়েল।

কিন্তু লুই ক্যারল ওরফে লাটউইজ ডজন তাঁর বন্ধু কন্যা কিশোরী এলিসের কপিটি এঁকেছিলেন নিজের হাতে।

আমেরিকানরা সে কপিটির দাম দিয়েছে সাতান্ন হাজার ডলার।

এলিসেরা দেখে বড়ো বড়ো চোখের বিস্ফারিত দৃষ্টি।

যে দৃষ্টিতে বিস্ময় আছে, কিন্তু আতংক নেই।

কিপলিংএর বাবা ছিলেন চিত্রশিক্ষক। পুত্রের "জাংগল বুকের" ছবিগুলো তাঁরই আঁকা। কিন্তু "জাস্ট সো স্টোরিজের" ছবি কিপলিংএর নিজস্ব।

ছবি আঁকা ছিল কিপলিংএর প্রিয়তম নেশা। সময় সময় বসে বসে পুরোনো দলিল দস্তাবেজ জাল করতেন তিনি। সেগুলোকে হুবহু করার জন্যে চেষ্টার অন্ত ছিল না তাঁর। তাছাড়া নাটকে কোন রাজার মণি বসানো মুকুটের দরকার হলে কিংবা পোশাকের অভাব দেখা দিলে কিপলিং কল্পতরু হতেন।

তাঁর আঁকা ছোটদের জন্যে ছবিগুলো সে তরুরই পাকা ফল। নিজের ছোট-বোনদের প্রার্থনা পুস্তকের নামে দুনিয়ার শিশুদের জন্যে আঁকা।

কিপলিং কন্যা তাতে খুশী হয়েছিলেন বলেছেন।

বোধ হয় আমাদের কেদারও এগুলো নিয়ে খুঁত খুঁত করবেন না।

কারণ কিপলিং সাহেবের ক্যাঙ্গারু সত্যিই দৌড়ায় এবং তাঁর তিমিমাছ সত্যিই মিটমিট করে তাকায়।

এবার উপক্রমণিকার উপসংহার।

কিন্তু একথা এখনও এ বিচিত্র কাহিনীর শেষ নেই। [illegible] বলেছেন : আমি [illegible] ছাত্র ছিলাম। [illegible] আমি যতখানি লেখক, ঠিক ততখানি চিত্রকর। আমাকে বাদ দেওয়ার কোন কারণ নেই। আমি নিজে আঁকি, [illegible]।

মায়াকোভস্কির দাবিও কম নয়। তাঁর বিপ্লবের কবি, আমি বিপ্লবের শিল্পী। কমপক্ষে তিন হাজার কার্টুন করে দিয়েছি আমি মস্কোর [illegible]। মস্কোর পথে ঘাটে আমার আঁকা [illegible] বই পাবে?

[illegible] ডেড সোল (Dead Soul)-এর মলাট এঁকেছি আমি নিজে। স্টিভেনসন বলেন—'ট্রেজার আয়ল্যান্ডের' ম্যাপ দেখনি? ওটি আমার আঁকা।

—ভারী তো ম্যাপ? ম্যাপ দেখবে তো ১৮৭০ সালের ২রা অক্টোবর তারিখের 'নিউইয়র্ক হেরাল্ড'খানা খুলে দেখ। গম্ভীর ভাবে বললেন মার্কটোয়েন। ম্যাপ এঁকে-ছিলাম বটে একখানা। প্যারীর ম্যাপ। দেখে নেপোলিয়ান, বিসমার্ক সব তাজ্জব! সত্যি বটে, ভুলক্রমে লেখাগুলো উল্টো হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কি? আয়নার সামনে ধরে পড়!

এ দিকে থ্যাকারে আর এইচ জি ওয়েলস এর দাবীও কম নয়। ঔপন্যাসিক থ্যাকারের 'স্কেচ' আশিটি কার্টুন ছাপা হয়েছিল 'পাঞ্চের' মতো কাগজে।

আর এইচ জি ওয়েলস ডাইরী লিখেছেন ছবিতে।

ছবি মানে পিকচার নয়, ওয়েলস তার নাম দিয়েছেন পিকসুয়া (Pieshua)।

ওয়েলস বলেন : কি—পিকসুয়া বলে হাসির লাগছে না? কিন্তু জানবে এগুলোও দেখবার মতো জিনিস। দেখবার কেন, ভাববার মতো জিনিসও বটে।

These may seem at first glance to be the most idle scribblings but in fact they are acute statements in personal interpretation.

[illegible] লেখকদের ছবি সম্পর্কেও একটি [illegible] কথা। [illegible] ছবি রং ও রেখায় [illegible]।

[illegible] ভালো জানেন [illegible] এগুলোর জন্মদাতা।
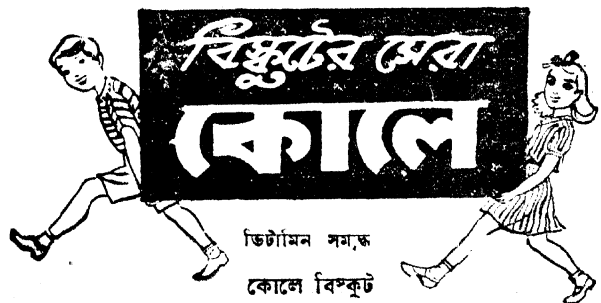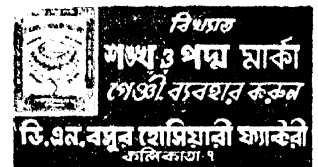
গত সপ্তাহে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ এবং অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর ব্যবস্থায় বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম-এ।

১৯২১ সালে বিনোদবিহারী শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তার আগে ইনি ছবি আঁকা শিখতেন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ করের কাছে। কলাভবনের শিক্ষা শেষ করে সেখানেই শিক্ষকতা গ্রহণ করেন ১৯২৯ সালে। কিছুদিন মধ্যে তিনি জাপানের বিখ্যাত শিল্পী তাকি'র কাছে শিল্পশিক্ষা লাভ করেছিলেন। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করার পর ইনি কাজ নিয়ে নেপালে যান। তারপর মুসৌরীতে একটি ছোট আর্ট স্কুল গড়ে তোলেন এবং সেখানে কিছুকাল অবস্থানের পর পাটনা সরকারী আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ক্রমশ এ'র দৃষ্টি ক্ষীণ হতে থাকে এবং পাটনায় থাকতেই ইনি সমস্ত দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেন। বহু চিকিৎসার পরেও ইনি আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাননি। সম্প্রতি ইনি শান্তিনিকেতনে ফিরে এসেছেন এবং সেখানে কলাভবনে ইনস্ট্রাক্টর নিযুক্ত হয়েছেন।

বিনোদবিহারীর বহুধাবিভক্ত প্রতিভার নিদর্শন হিসাবে ২৭৬টি শিল্পকর্ম সাজানো হয়েছে এ প্রদর্শনীতে। এগুলির মধ্যে আছে তৈলমাধ্যমের কাজ, টেম্পারার কাজ, জলরঙের কাজ, কাঠখোদাই, লিথোগ্রাফ, এচিং, পেপারকাট, ক্যালিগ্রাফিক ড্রইং মডেলিং এবং বাটিক। শিল্পীর ফ্রেস্কোর কিছু ফটোগ্রাফও রাখা হয়েছে। এর আগে ১৯৪৩ সালে কলকাতায় বিনোদবিহারীর চিত্রকলা প্রদর্শিত হয়।

যদিও ইনি নন্দলাল বসুর শিষ্য তবুও মনে হয় অবনীন্দ্রনাথের মতটাই ইনি মেনে চলেছেন প্রতি পদে। নানা শিল্পের নানা প্রথা প্রকরণ দেশ বিদেশ থেকে আদায় করেছেন। ভারতীয়, চীনা, জাপানী এমনকি কোন কোন ইউরোপীয় ধারারও সমন্বয়ে এবং শিল্পীর ব্যক্তিত্বের রসে পরিপূর্ণ হয়ে এ চিত্রকলা এক বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে। ভারতীয় চিত্রধারার লক্ষণ আছে, কিন্তু সেইটেই বড় হয়ে ওঠেনি। ভারত শিল্পের আভিজাত্য বজায় রাখতে পারম্পর্যতের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি আপন মানসরূপ প্রকাশ করবার উপযোগী প্রথাপ্রকরণ যেখান থেকে যা পেয়েছেন চটপট তা কাজে লাগিয়েছেন। বিনোদবিহারী এমন একটি জগতের সৃষ্টি করেছেন যা অন্যেরা কখনও দেখেনি। এদিক থেকে বলা যায় ইনি মেজাজে কতকটা ফরাসী ফভিস্টদের মত। প্রকৃতি থেকে মাল মশলা সংগ্রহ করেই কল্পনার ঘর তুলেছেন শিল্পী। বাস্তব জগতই এ'র চিত্রকল্পনার উৎস। কিন্তু বাস্তব রূপের কেবল প্রকার টুকুই গ্রহণ করেছেন, আকারটা এ'র নিজস্ব সৃষ্টি। এ'র বর্ণের ছোপ, রেখার ভঙ্গী এসবের মধ্য দিয়ে উপাখ্যান বস্তুর ত্রিমাত্রিক রূপও কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে, আবার ছন্দ-

প্রধান এবং আলংকারিক নক্সার ভাবটাও ফুটে উঠেছে। কম্পোজিশন-এ প্রতিটি রেখা, প্রতিটি বর্ণের টানটোন, প্রতিটি ফাঁকা স্থানের সমন্বয় যেন অবিচ্ছেদ্য। এসবে মিলে প্রতিটি রচনাই অপরূপ মূর্চ্ছনায় প্রাণবন্ত। বিনোদবিহারী যে ভাব ব্যক্ত করতে চেয়েছেন তার সহায়তার জন্যে যাকে বলা হয় নির্ভুল ড্রইং তা বর্জন করে এক বিচিত্র ক্যালিগ্রাফী আবিষ্কার করেছেন, তুলির টানে একই সঙ্গে পেইন্টিং-ও করেছেন আবার ড্রইং-ও করেছেন। চিত্রের উপাদানগুলি আনন্দোচ্ছলভাবে সংস্থিত করার উদ্দেশ্যে পরিপ্রেক্ষিতের নিয়মগুলি উপেক্ষা করতে হয়েছে শিল্পীকে তাঁর অনেক রচনায়। বর্ণকাতেও সাদৃশ্য সত্যের কোনও ছাপ নেই। একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আদর্শের অনুযায়ী করে বর্ণ প্রয়োগ করেছেন। প্রাকৃত মোটিফ-এ এতটা স্বাধীনতা গ্রহণ করবার মত সাহস খুব কম শিল্পীর মধ্যেই দেখা যায়। এ ব্যাপারে ফরাসী শিল্পী দুফীর সঙ্গে এ'র খুব মিল। দুফী বলতেন, nature is only a hypothesis। মনে হয় বিনোদবিহারীরও মত তাই। ব্যক্তিগত হস্তাক্ষর যেমন অনুকরণ করা দুঃসাধ্য, বিনোদবিহারীর চিত্রকলাও তেমনি অনুকরণ করা সম্ভব নয়। এ'র রেখা কখনও বক্র, কখনও ঋজু, কখনও সমান্তরাল, আবার কখনও নদীর মত আঁকা বাঁকা। কতকটা শর্টহ্যাণ্ড লেখার মত অত্যন্ত ক্ষিপ্র টানটোনে ইশারা ইঙ্গিতে বক্তব্য বুঝিয়েছেন, বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা নেই। এভাবে যে কাব্যের অবতারণা করেছেন শিল্পী তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা দিয়ে এবং মন্থর গতিতে রচনা করলে কখনই সম্ভব হত না।
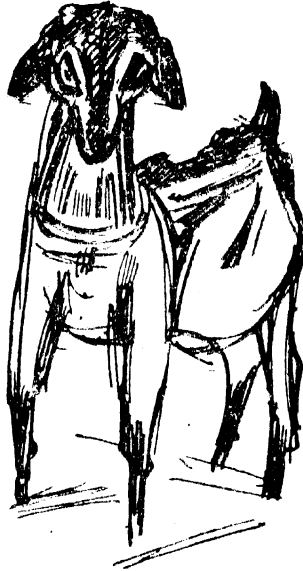
ইনি যে পাকা ড্রাফটসম্যান সে কথা অনস্বীকার্য, তা হলেও মুখ্যত ইনি রঙের কারিগর। স্টেলা ক্রামরিশ বিনোদবিহারীকে এক সময় কেবল দৃশ্যচিত্রকর হিসাবেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ প্রদর্শনী দেখলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর মত পরিবর্তন করতেন। বিনোদবিহারীর প্রতিভা যে বহুধাবিভক্ত তা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। উডকাট, এচিং, পেপারকাট, ক্যালিগ্রাফী মডেলিং এসব বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্মেও যে ইনি অনন্যসাধারণ শিল্পী তারও পরিচয় এ প্রদর্শনীতে পাওয়া যায়। এ'র প্রত্যেকটি শিল্পকর্মই উপভোগ্য।

পরিশেষে এই প্রদর্শনীটির ব্যবস্থার জন্যে কলকাতার কলারসিক জনসাধারণের পক্ষ থেকে আশ্রমিক সংঘ এবং অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসকে ধন্যবাদ জানাই। প্রদর্শনীটি আরও কিছুদিন খোলা থাকলে জনসাধারণের সুবিধে হত। কারণ, কোনও পথিকৃৎ শিল্পীর এতগুলি শিল্পকর্ম উপভোগ করতে হলে বেশ কয়েকদিন ধরে দেখার দরকার হয়।
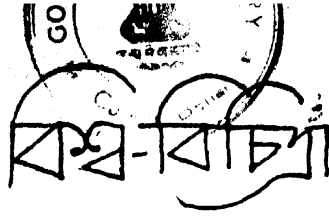
সমগ্র ভূতত্ত্বের ইতিহাসে চমকপ্রদতম আবিষ্কার হয়েছে সাহারায়। মাটির নীচে এক গুহায় দেওয়াল-চিত্র পাওয়া গিয়েছে যা দেখে বিশ্বাস দৃঢ়তর হয় যে, আজ যেখানে কেবল ধু ধু বালুকা রাশি এক সময়ে সেখানে শ্যামল ভূমি ছিল।

তবে চিত্রের বয়েস নির্ধারণ করা যায় না কারণ সাহারার শুষ্কতা যে কোন সামগ্রীকে অগণিত শতাব্দী ধরে রক্ষা করতে পারে এবং বৈজ্ঞানিক অনুমান এক লক্ষ থেকে দশ লক্ষ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

জে মর্টিমার শেপার্ড নামক এক পরিব্রাজক লিখেছেন যে বালুকা-তরণী ও জিপে চড়ে মধ্য পশ্চিম সাহারা পার হবার সময় তিনি ফোর্ট ট্রিংকেটের কাছে ছোট পাহাড়-শ্রেণীর মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি পূর্বে অদৃষ্ট গুহা দেখেন।

উপযুক্ত সরঞ্জামের অভাবে তিনি গুহাগুলির খুব ভিতরে প্রবেশ করে ব্যাপক ও গভীর কোন অভিযান চালাতে পারেননি। কিন্তু একটি গুহার প্রথম কয়েকটি কামরা দেখা ব্যতিরেকে অব সবকটিতে তিনি অদ্ভুত কতকগুলি দেয়ালচিত্র দেখতে পান।

এইসব গুহাগুলির দেয়াল-চিত্রের ধারা-প্রকৃতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে সাহারা বহু অতীতে ব্যাপকভাবে মনুষ্য অধ্যুষিত ছিল এবং এমন শ্রেণীর পশুরা থাকত, যাদের পক্ষে প্রভূত শ্যামল ক্ষেত্র ছাড়া থাকা সম্ভব হত না।

এই প্রতিপাদ্যকে নতুন বলা যায় না, বহুদিন থেকেই জানা আছে যে সাহারা এককালে শ্যামল ক্ষেত্র ছিল।

কিন্তু ঐ সমস্ত চিত্রের এমন কতক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অনেক কথার অবতারণা করে।

যেমন একখানি ছবির বাঁদিকের কোণে এমন একটা প্রতিকৃতি আছে, যাকে ঠিক শিল্পীর কল্পনাপ্রসূত বানর জাতীয় কোন জীব বলে মনে হয় না, এর মাথায় কোন চুল নেই এবং যত বিকৃতভাবেই আঁকা হোক না কেন এর আকৃতিটা মানুষেরই [illegible]

এছাড়াও দেখা গেল যে কতকগুলো চেহারা একেবারে কাল রঙ হলেও অন্যান্য চেহারাগুলো সাদা রংয়ের। তাহলে কি বুঝতে হবে যে তখন দুটো শ্রেণী ছিল একটা অব একের দাস কিংবা দুই শ্রেণীই মিলেমিশে থাকত?

কেউই গুহাগুলির গভীরে বিশেষ দূরে পর্যন্ত যেতে পারেনি যদিও পথ অনেকগুলি রয়েছে দেখা গেল, যেগুলো দিয়ে এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যাওয়া যায়। কতক পথ ওপর দিকে গিয়েছে, কতক নীচের দিকে।

* * *

জাহাজের হালে শামুক জড়িয়ে থেকে জাহাজের গতি কমিয়ে দেয় বলে শামুক নিধনের নানা উপায় নিয়ে বিভিন্ন দেশের নৌ বিভাগকে মাথা ঘামাতে হয়।

নানা রকমের শামুক আছে, এক এক দেশের সাগরে এক এক রকম। কোথাও হালে শামুক জড়ায় কম, কোথাও বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে হাত দিয়ে পরিষ্কার করলেই চলে, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এত জড়িয়ে থাকে যে বন্দর কর্তৃপক্ষকে মোটা নলের মধ্যে দিয়ে বালির তোড় ছেড়ে শামুক পরিষ্কার করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আগুনের হল্কা দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়।

বিশেষজ্ঞরা বলেন শামুক হালে জমে জমে এমন অবস্থা করে তোলে যাতে জাহাজের গতি কমে যায়। জাহাজ ডকে গেলে শামুক পরিষ্কার করা হয় বটে কিন্তু ওর হাত থেকে সম্পূর্ণ রেহাই পাবার কোন ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিকরা করে উঠতে পারেননি।

• • •

সুন্দরী লুইজ রুশজট বুডাপেস্টের থিয়েটারে এক আগস্টের সন্ধ্যায় গেল তখন তার সঙ্গে কেউ নেই, একা। তার প্রণয়ী তাকে ত্যাগ করে গিয়েছে এবং একদিন যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছিল এখন সেখানটা ফাঁকা।

মাঝে বিরতীকালে লুইজ কাগজ নিয়ে রাস্তার ধারে শ্বাসরুদ্ধ করে নিহত এক রহস্যময়ী নারীর কাহিনী পড়লে। মহিলাটির তখনও কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি; তার দামী ফেশনদুরস্ত পোশাক ছিন্নভিন্ন এবং আততায়ী ধরা পড়ার সব চিহ্ন অপসারিত।

"মাপ করবেন!" স্বরটা লুইজকে চমকে দিলে। মুখ তুলে দেখলে একটি লোক মৃদু হাসিমুখে মাটিতে পড়ে যাওয়া তার একটা দস্তানা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

লুইজ তাকে ধন্যবাদ দিলে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজনের আলাপ জমে উঠল। অভিনয়ের পর আগন্তুক লুইজকে অনুরোধ করে এক রেস্তরাঁয় নিয়ে গেল। বললে তার নাম হফম্যান এবং সেও বড় একা। যদি লুইজের অসুবিধে না হয় তাহলে পরদিন রাতে তার সঙ্গে ডিনারে যোগ দিতে পারে কি না? লোকটির দৃষ্টিতে কি যেন ছিল, লুইজ রাজী হয়ে গেল।

এর পরের সাক্ষাৎ, যাকে বলে প্রণয় অভিসার, দানিয়ুব নদীর তীরে স্বল্পালোকিত এক রেস্তরায় খেতে বসা, জিপসীদের বেহালার তালে নৃত্য। সেটা ১৯২৩ সনের কথা।

"তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না," হফম্যান একটু যেন কিন্তু হয়ে বলে লুইজের হাতটা নিজের হাতে নিয়ে। "আমি কিন্তু ভাগ্য গুণে বলতে পারি—যদি বল তো দেখতে পারি তোমার, মানে আমাদের ভবিষ্যতে কি আছে। আমার স্ফটিক গোলকটা দেখে সব বলে দিতে পারি। সেই গোলকের ভিতরে একটা পর্দা আছে
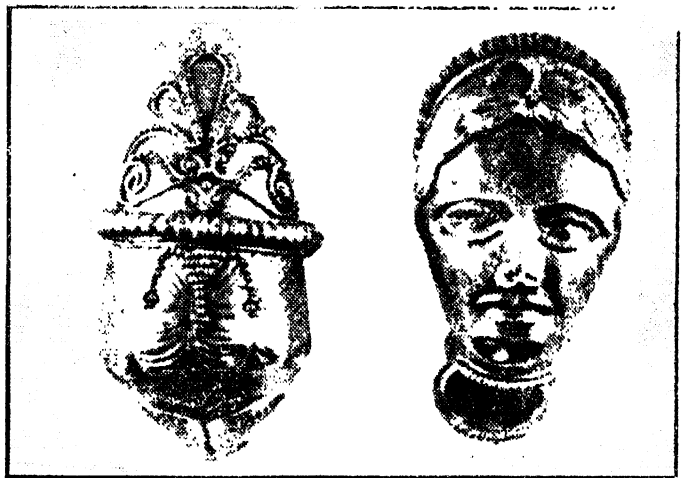
ইতালির স্পিনাতে খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত আড়াই হাজার বছর আগে ইট্রাসকান স্বর্ণকারদের তৈরী সোনার কানবালা। তখনকার কারিগর হানাতোলা ও খোদাই করা উভয়বিধ রীতিতেই দক্ষ ছিল বোঝা যায়।

যার ওপরে সত্যি যা হবে তাই প্রতিফলিত হয়।

এর পরই লুইজকে দেখা গেল সহাস্য-বদন হফম্যানের ফ্ল্যাটের দিকে যেতে। হঠাৎ লুইজের মনে পড়ে গেল কাগজে পড়া শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নিহতা স্ত্রীলোকটির কথা। ভয় হল লুইজের; হত্যাকারী তখনও পলাতক!

"তোমায় গম্ভীর লাগছে," হফম্যান বললে, "চলো একটু পা চালিয়ে যাই।"

একটা অন্ধকার পথ দিয়ে ওরা চলছিল এবং এমন একটা পল্লীতে পৌঁছল যা লুইজের অপরিচিত ছিল। হফম্যান পকেট হাতড়ে একটা চাবি বের করে দরজা খুললে। যে ঘরটায় নিয়ে গেল সেটায় আলো কম। টেবিলের ওপর একটা কাল কাপড় এবং হফম্যান সেটা সরাতেই দেখা গেল একটা স্ফটিক গোলক।

হঠাৎ ভীষণ ভয়ে লুইজ আচ্ছন্না হয়ে পড়ল। ওর মনে তখন একটি চিন্তা, সেই স্বল্পালোকিত ঘর থেকে বের হওয়ার। কিন্তু হফম্যান দাঁড়িয়ে লুইজ আর দরজার মাঝখানে। লোকটার মুখ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু চোখমুখ জ্বলজ্বল করছিল। আর তার হাতে ছিল ফাঁস দেওয়ার মত করে বাঁধা একগাছা দড়ি।

হফম্যানের প্রসারিত হাত থেকে এক তিলের জন্য নিজেকে বাঁচিয়ে লুইজ দরজার দিকে ছুটল। সৌভাগ্যবশত দরজাটায় চাবি দেওয়া ছিল না; চীৎকার করে রাস্তায় এসে পড়ল। পিছনে না তাকিয়ে দৌড়ে দৌড়ে শহরের আলোকিত রাস্তায় এসে হাঁফ ছাড়লে। "পুলিস" লুইজ দম নিতে নিতে ঠিক করলে, "পুলিসকে জানাতে হবে।"

বুদাপেস্ত পুলিস সদরে যখন লুইজ ঘটনা বিবৃত করতে থাকে তখন ইনস্পেক্টর রেশ্চ ভাবলেন, এবারে তিনি শ্বাসরোধে নিহতা মহিলার হত্যাকারীর সন্ধান করতে পারবেন। কিন্তু লুইজকে স্বীকার করতে হল যে, সে এত ভয় পেয়েছিল যে, বাড়িটা সঠিকভাবে সে চিনে রাখতে পারেনি।

সেই অজ্ঞাত হফম্যানের ব্যাপক খোঁজ আরম্ভ হল। কিন্তু তদন্ত ব্যর্থ হতে ইনস্পেক্টর বিস্মিত হলেন না, কারণ বোঝাই গেল লোকটি নাম ভাঁড়িয়েছে।

দু' সপ্তাহ পার হয়ে গেল—আবার ঘটল শ্বাসরোধের আর এক ঘটনা। এবার আক্রান্ত হয় মারিয়া হেজম্যান নামে অভিজাত বংশীয়া এক সুন্দরী মেয়ে।

হেজম্যান জানায়, এক দোকানে চমৎকার একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। লোকটি তার জিনিসগুলি বাড়ি পৌঁছে দিতে সাহায্য করে এবং তারপর এক রোমান্টিক রেস্তরাঁয় নিয়ে যায়। হেজম্যানও লোকটির স্ফটিক-গোলক সম্পর্কে মিষ্টি কথায় ভুলে যায় এবং ওর ফ্ল্যাটে গিয়ে উপস্থিত হয়। হেজম্যানের মনে পড়ে ওর গলায় ফাঁসটা পরাতেই চেঁচিয়ে ওঠার কথা।

কিন্তু ভাগ্যক্রমে হত্যাকারী ফাঁসটা ভালভাবে লাগাতে পারেনি। হেজম্যান এক অন্ধকার রাস্তার ধারে পড়ে থাকা অবস্থায় জ্ঞান ফিরে পায়, গলাটা তার ফুলে উঠেছে আর জ্বালা করছে।

লুইজের মত, হেজম্যানও ইনস্পেক্টরকে লোকটির চেহারার বিবরণ দিলে—বিরাট দেহ, চওড়া কাঁধ। গম্ভীর এবং ধীর কণ্ঠস্বর যা সহজেই তার কথার ওপর প্রতীতি জন্মায়। কিন্তু এথেকেও গোয়েন্দারা খুনীর কোন সন্ধান করে উঠতে পারলে না।

কয়েক মাস অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু নতুন কোন হদিশই পাওয়া গেল না। এরপর এল ১৯১৪ সনের যুদ্ধ; হফম্যান মামলাটা ধামা চাপা পড়ে গেল এবং ইনসপেক্টর রেশ্চ গুপ্তচর ধরার কাজে লেগে গেলেন। শ্বাসরোধকারী রহস্যময় আততায়ীর আবার খবর ঘটতে ১৯১৬ এসে গেল। বুদাপেস্তের কাছে সলিমার নামক এক স্থানে এক ব্যক্তি জমিতে লাঙল দেবার সময় মাটির নিচে এক উলঙ্গ নারীদেহ পায়। একটা সরু দড়ি দিয়ে তার শ্বাসরোধ করা হয়েছে।

অল্পকাল পরে আরও একটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা জানা গেল। সলিমার থেকে অল্প দূরেই জিনকোটা নামক এক গ্রামের এক মাঠে আর একটি নারীর মৃতদেহ পাওয়া যায়, তার ঘাড় ভাঙা। কাছাকাছি জায়গায় তদন্ত করা হল। তার ফলে আরো একটি মৃতদেহ পাওয়া গেল, এক সুইস মহিলার যিনি ১৯১৬ থেকে বুদাপেস্তে ছিলেন বলে জানা যায়।

তদন্তকালে ইনসপেক্টর রেশ্চ স্থানীয় লোকের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, ১৯১৩-র গ্রীষ্মকালের এক রাত্রে একখানি দ্রুতগামী গাড়িকে গ্রাম পার হয়ে যেতে তারা দেখেছে। রেশ্চ এরপর ডিটম্যান নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, প্রাইভেট গাড়ির পেট্রল সরবরাহ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যার একটা গোলযোগ চলছিল। ডিটম্যান জানায় যে, সে তার এক বন্ধুর পেট্রল গুদাম দেখাশুনা করার কালে গভর্নমেণ্ট সমস্ত ব্যক্তিগত অড়ৎ বাজেয়াপ্ত করে নেয়। তার সেই বন্ধুর স্ত্রী, খোঁজ পাওয়া গেল, বছর কয়েক আগে বাড়ি থেকে পালায় এবং তার বন্ধু তখন এক বয়স্কা গৃহপরিচারিকা নিযুক্ত করে। এই মহিলা ডিটম্যানকে জানায় যে, সে তার প্রভুকে একটা ঘরে দেখেছে যেটা তিনি সদাই চাবি দিয়ে রাখেন। সেই ঘরে সুরার বড় বড় পিপে আছে। রেশ্চ আরো জেনে নেন যে, ডিটম্যানের সেই বন্ধুর নাম বেলা কিস।

রেশ্চ তার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে ডিটম্যান জানায় যে, সেটা আর সম্ভব নয়। এই বলে ডিটম্যান সারবিয়ার যুদ্ধপ্রান্তে আহত হয়ে বেলগ্রেড হাসপাতালে আনীত হবার পর বেলা কিসের মৃত্যুর এক সার্টিফিকেট দেখায়।

ঠিক পথে এগিয়ে আসা বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে রেশ্চ এক তল্লাসী পরোয়ানা সহ একদল গোয়েন্দা নিয়ে বেলা কিসের বাড়িতে হাজির হলেন। তালা ভেঙে বন্ধ ঘরটার ঢুকে তাঁরা খুব শক্ত করে সীল করা পাঁচটা মদের পিপে দেখতে পেলেন। কুড়ুল দিয়ে একটা পিপের ওপরের ডালা ভেঙে ফেলা হল। তার ভেতরে পাওয়া গেল পেট্রল নয়, অমিশ্রিত সুরাসার। আর তাতে জিরান রয়েছে শ্বাসরোধ করে নিহত এক নারীদেহ। অন্য পিপেগুলিতেও নারীদের অনুরূপ মৃতদেহ পাওয়া গেল।

রেশ্চ তখন তাঁর লোকজনকে সেই বাড়ির আশপাশে আগাছায় ঢাকা জমি খুঁড়তে বললেন। এই ঘটনাটা সারা পৃথিবীতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল—কারণ মাটি খুঁড়ে ছাব্বিশটি মৃতদেহ আবিষ্কার করা হয়।

জীবনী সাহিত্য

ভগিনী নিবেদিতা—প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা। প্রকাশিকা প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা; রামকৃষ্ণ মিশন, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, নিবেদিতা লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। সাড়ে সাত টাকা।

সিস্টার নিবেদিতার সম্বন্ধে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই পর পর কয়েকখানি পুস্তক বাহির হইয়াছে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে এই মহা-মনস্বিনী লোকান্তরে গমন করেন, তাহার পর তাঁহার সম্বন্ধে বহুদিন পর্যন্ত বিশেষ কোন আলোচনাই হয় নাই। তাঁহার প্রবর্তিত নিবেদিতা বিদ্যালয়টিও স্বামী সারদানন্দের মহাপ্রয়াণের পর অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হয়। সম্প্রতি সেই নিবেদিতা স্কুলের ছাত্রীদের দ্বারাই তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হয়। এবং এই পুস্তকখানির রচয়িত্রী ও প্রকাশিকা উভয়েই নিবেদিতা বিদ্যালয়ের পরিচালিকা এবং উভয়েই সন্ন্যাসিনী।

একচল্লিশ পরিচ্ছেদ ও ১৭৭ পৃষ্ঠায় এই জীবনচরিতখানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। পরিচ্ছেদ-গুলি জীবনীর ধারাবাহিকতা অবলম্বন করিয়া সুসম্বন্ধভাবে সজ্জিত হইয়াছে। নিবেদিতা-সম্বন্ধীয় যে সকল গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা হইতে এই জীবনীর উপকরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে গ্রন্থের শেষ দিকে রচয়িত্রী তাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া নিবেদিতাকে লিখিত স্বামীজীর ও অন্যান্যের পত্র এবং নিবেদিতার নিজের লিখিত পত্রাবলী এবং নিবেদিতার স্বরচিত গ্রন্থাবলী যাহা এক হিসাবে তাঁহার আত্মজীবনীই বলা চলে সেগুলি হইতেও এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াছে। সুতরাং জীবনীতে যে তথ্যগুলি পরিবেশিত হইয়াছে, তাহার ভিতর কোন কল্পনা বা অবান্তর প্রসঙ্গ নাই নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে।

বস্তুত জীবন চরিত লেখা অতি কঠিন ব্যাপার। রচয়িতার নিজের অজ্ঞাতসারেই হয়তো তাঁহার নিজের মনের ভাবই যাঁহার জীবনী লেখা হইতেছে, তাঁহারই মনের ভাব বলিয়া বর্ণনা করা হয়, অথবা স্বকল্পিত কাহিনীগুলিই সাবলীল ভাষায় এমনভাবে রচনা করা হয় যে, বস্তুত পুস্তকখানি জীবনীর পরিবর্তে উপন্যাস হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ছাড়া সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব অথবা অতিরঞ্জন প্রভৃতি দোষও জীবনী গ্রন্থকে দোষগ্রস্ত করিতে পারে। সুখের বিষয় এই গ্রন্থখানিকে বিশেষ সতর্কতার সহিত সে সকল দোষ হইতে মুক্ত রাখা হইয়াছে।

গ্রন্থারম্ভে রচয়িত্রী লিখিয়াছেন, "জীবনী অপেক্ষা জীবন মহত্তর। জীবনের সম্পূর্ণ-কাহিনী জীবনী রচনায় ব্যক্ত করা সম্ভব নহে।" এই কথা অতি সত্য; বিশেষত ভগিনী নিবেদিতার চরিত্র বর্ণনা করা এইজন্যই অতি কঠিন, সেই চরিত্রে এত বিভিন্ন ভাব ও শক্তির এমন সমাবেশ হইয়াছিল যে, অনেক সময় তাহা পরস্পরের বিরোধী বলিয়াই মনে হওয়া অসম্ভব নয়। একাধারে সিংহিনীর ন্যায় দৃপ্ত স্বভাব আবার একান্ত অনুগতা শিষ্যার ভাব তাঁহাতেই সম্ভব হইয়াছিল। নিজ ব্যক্তিত্বে দৃঢ়তা আবার সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন একমাত্র নিবেদিতাতেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। যাঁহারা নিবেদিতার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ অনুভূতির দিক দিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। অবনীন্দ্র-নাথ ঠাকুর দেখিয়াছেন, তাঁহাকে তপস্বিনী মহাশ্বেতারূপে, আবার গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'বৎসে নিবেদিতা' বলিয়া নিজের একান্ত স্নেহপাত্রী রূপেই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছেন। এইরূপে আচার্য জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, যদুনাথ সরকার প্রভৃতি মনীষিগণ সকলেই তাঁহাকে নিজের নিজের ভাবে অনুভব করিয়াছেন। মতিলাল ঘোষ বলিয়াছিলেন, "নিবেদিতা যেন একটি সরলা বালিকা, যেন একটি পূজার ফুল।" তবে একথা সত্য, সকলের উক্তির ভিতরেই যে একটি কথা সুস্পষ্ট হইয়াছে সেটি নিবেদিতার অসাধারণত্ব। নিবেদিতার মধ্য দিয়া যে এক দৈবীশক্তির বিশেষভাব প্রকাশ পাইয়া-ছিল তাঁহার মহাপ্রয়াণের পরেও তাহার প্রভাব লুপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের নব জাগরণের প্রত্যেক অগ্রগতিতেই আজিও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—ভারতীয় নারীগণের নবভাবে নিজ কুলক্রমাগত মহত্ত্বের অনুভূতিতে, সমগ্র জন-গণের জাতীয় ভাবের নব জাগরণে, শিক্ষায়, সেবায়, সাহিত্যের উপলব্ধির মধ্য দিয়া মনো-বিকাশে, এবং বিজ্ঞান ও বীরত্বের বিকাশে।

নিবেদিতা 'জাতীয়তা' এই কথাটিকে এক

বিশেষ তাৎপর্যদান করিয়াছেন। তাঁহার এই 'জাতীয়তা' কোনও ভৌগোলিক ভূমিখণ্ডের বেষ্টনে সীমাবদ্ধ নয়, এই 'জাতীয়তা' বিশ্ব-মানবের প্রীতি এবং ঐক্যের যেন প্রতীক স্বরূপ।

তিনি লিখিয়াছেন, "আমি বিশ্বাস করি বেদ ও উপনিষদের বাণীতে, ধর্ম ও সাম্রাজ্যসমূহের সংগঠনে, মনীষিগণের জ্ঞান চর্চায় এবং মহা-পুরুষগণের ধ্যানে যে শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই আর একবার আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে, এবং আজিকার দিনে উহারই নাম 'জাতীয়তা'।"

নিবেদিতার জীবনী একভাবে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনেরই প্রকাশ বা প্রতিচ্ছায়া, সুতরাং নিবেদিতার জীবনী আলোচনায় স্বামীজীর জীবনী আলোচনা অপরিহার্য। এইজন্য এই গ্রন্থে নিবেদিতার জীবনের আনুষংগিক রূপে স্বামীজীর জীবনীও আলোচিত হইয়াছে। এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সাধুদের সম্বন্ধেও কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রী মা এবং তাঁহার দুই সংগিনী গোলাপ মা ও যোগীন মা এবং গোপালের মা প্রভৃতির সম্বন্ধেও আলোচনা স্বতঃই উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীমা,—একান্তভাবে নিবেদিতা তাঁহাকেই পরমাশ্রয়রূপে পাইয়াছিলেন। পাইয়াছিলেন সেই মাকে, যে মায়ের নিকট স্বদেশ বিদেশ বা জাতি অজাতির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, কেননা সকলেই তাঁর সন্তান।

গ্রন্থখানি অতি সুলিখিত, রচনার মধ্যে কোনখানে অতিশয্য বা অস্পষ্টতা নাই। বস্তুত এই জীবনী যে একখানি শ্রেষ্ঠ জীবনচরিত পাঠকের তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিবে না। সকল মহান জীবনই দুঃখ ও আঘাতের সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই পরিপূর্ণ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। নিবেদিতার জীবনেও তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত শেষের দিকে তিনি উপর্যুপরি আঘাত পাইয়াছিলেন। সেই আঘাতের মধ্যে সিস্টার ক্রিশ্চিনার সহিত বিচ্ছেদ, সুধীরার নিবেদিতা বিদ্যালয় ত্যাগের ইচ্ছা, সারার মৃত্যু প্রভৃতি তাঁহাকে বিশেষ আঘাত দিয়াছিল।

শেষবার যখন দার্জিলিং যান তখন মৃত্যু সম্বন্ধে যেন তিনি নিশ্চিত হইয়াই ছিলেন। তাই তাঁহার অর্থ সম্বন্ধে 'উইল' করিয়া ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জাতীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের জন্য তিনি বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। তাই তিনি সেজন্যও উইলে কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহার মহাপ্রয়াণের বর্ণনাটি সংক্ষেপে এই গ্রন্থ হইতেই তুলিয়া দিতেছি:—

১৩ই অক্টোবর, ১৯১১, শুক্রবার। ....

রায়ভিলার সম্মুখে লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছে।......শহরের বিশিষ্ট হিন্দু মহিলা ও ভদ্রলোকগণ প্রায় সকলেই নিবেদিতাকে শেষ বিদায় দিবার জন্য একত্র হইয়াছেন।

ইঁহাদের মধ্যে ছিলেন, ডক্টর জগদীশচন্দ্র বসু, বসু, শ্রীমতী অবলা বসু, ডক্টর প্রফুল্ল-চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যক্ষ শশিভূষণ দত্ত, সুবোধচন্দ্র মহালনবীশ, ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকার, মিসেস সরকার, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ বসু, শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ইন্দুভূষণ সেন, মিঃ পি এডগার, মিস্ পিগট, এস এন ব্যানার্জি, ডক্টর মহেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি। তাঁহার অতি স্নেহপাত্র সন্তানতুল্য ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথও

তাঁহার শেষ কার্য সম্পাদনের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন।

চিতা জ্বলিল। গণেন্দ্রনাথ মুখাগ্নি করিলেন। ভগবান অগ্নিদেব বহিয়্বসীর মরদেহ নিজের অঙ্গে মিশাইয়া লইলেন, ধীরে ধীরে নশ্বর দেহ ভস্মে পরিণত হইল। রাত্রি আটটার পর চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া সকলে অশ্রুপূর্ণনেত্রে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নীরবে প্রত্যাবর্তন করিলেন। (বেঙ্গলী সংবাদপত্র হইতে) হিমালয়ের নির্জন অঙ্কে আজিও আছে একটি স্মৃতি ফলক। যেখানে নিবেদিতার পবিত্র দেহের ভস্ম সমাহিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতের সেটি একটি মহা পুণ্যস্থান। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে নিবেদিত নিবেদিতার শেষ চিহ্ন। সেই স্মৃতিতীর্থ।

নিবেদিতার অপ্রকাশিত দুটি রচনা 'মৃত্যু' ও 'প্রিয়তম' এই গ্রন্থে ইংরাজীতে এবং তাহার অনুবাদে প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি একাধারে মহামূল্যবান সংগ্রহ ও সুলিখিত জীবনচরিত। আশা করি বাংলাদেশের প্রত্যেক গৃহেই এই পুস্তকের যথাযোগ্য সমাদর হইবে।

৬৬/৫৯

কবিতা

নিরন্ত নির্ঝর—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়। শর্তভিষা প্রকাশনী, ১এ, বিজয় মুখার্জি রোড। মূল্য—তিন টাকা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বিখ্যাত বইয়ের মলাটের মতোই গোপাল ঘোষের আঁকা 'নিরন্ত নির্ঝরের' প্রচ্ছদের মেজাজ। এবং এই সূত্রে প্রথমেই মনে হয়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথেরই উজ্জ্বলতম উত্তরসূরী। বলা বাহুল্য, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব মানসিকতা এর দ্বারা বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয়নি, বরং সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে। 'কবিতার জন্যই কবিতা' বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় এই মতবাদে আস্থা রাখেন। তারি স্বাক্ষর 'নিরন্ত নির্ঝরে' বিকীর্যমান। কবিতায়-কবিতায় ছন্দের বহুধা বৈচিত্র্য ও সাবলীল ভাবনা-বিহার—এই হলো আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য। জীবনের উপর স্তরে যত দোলা যত দোলাচল, জীবনের গহন-স্তরের থেকে যে তাদের দীপ্তি কম নয়, এই বোধ কবিতাগুলিকে আস্বাদ্য ক'রে তুলেছে।

'নিরন্ত নির্ঝর' নামকরণে যে উচ্ছলতা, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিমানসেও সেই প্রাণোচ্ছল প্রবাহ। এই প্রবাহকে একটি স্থিরত্বে বিবৃত ক'রে তিনি যে আমাদের ভবিষ্যতে অধমর্ণ করবেন, তারি অব্যর্থ ইঙ্গিতে এই কাব্যগ্রন্থটি মর্মিতার বাঁধনে বাঁধতে।

৫৪৬।৫৮

বহু যুগের ওপার হতে—সুধাংশু গুপ্ত। প্রকাশক—সুনীতি গুপ্ত, ১৪ বারোয়ারীতলা রোড, কলিকাতা—১০। দুই টাকা।

মোট চল্লিশটি কবিতা আলোচ্য গ্রন্থখানিতে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থখানির নাম বা অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু লেখকের যে সুকুমার কবি-মনের পরিচয় বহন করে, দুঃখের সাথে বলতে হয়, কবির ইচ্ছাকৃত আঙ্গিক অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রকাশের সহায়ক তো হয়ইনি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বাধারই সৃষ্টি করেছে। তার শব্দ-চয়নও এজন্য বহুলাংশে দায়ী। একটি সুন্দর কবিমনের প্রকাশ, তাই চোখ ঝলসানোতেই সীমিত হয়েছে, ব্যর্থ হয়েছে পাঠকমনকে সহ-মর্মিতার বাঁধনে বাঁধতে।

৫৪৬।৫৮

ছোট গল্প

পান্থশালা—আশুতোষ ভট্টাচার্য। প্রকাশক—চন্দ্রানিলয়, পর্ণশ্রী পল্লী, কলিকাতা—৩৪। এক টাকা চারি আনা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি ছয়টি ছোটগল্পের এক-খানি সংকলন। গল্প কয়টি একপ্রকার। ইতিপূর্বে শ্রীভট্টাচার্য তাঁর খেয়াঘাট ও বন-মল্লিকা উপন্যাসে যে রসবোধের প্রতিশ্রুতি জানিয়েছিলেন, এই বইখানিতে তারই খানিকটা পরিণত রূপের স্বাক্ষর রয়েছে। গল্পগুলির স্বল্প পরিসরে যে টুকরো টুকরো ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তা ভাল লাগে। আর এই চিত্রধর্মীতাই তাঁর রচনাকে রসোজ্জ্বল করে তুলেছে। আমরা লেখকের উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের কামনা করি।

৪৬৬।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

দরদী শরৎচন্দ্র—মণীন্দ্র চক্রবর্তী।
রাগ ও তাল—অধ্যাপক নীহারবিন্দু চৌধুরী।
শ্রীমতী মিন্টু সেন—বীরেন রায়।
কেমন করে স্বাধীন হলাম—মণি বাগচি।
ভারত যুগে যুগে—কালিপদ দাস।

মন-মাতানো বাংলা ছবি

যে নব দিগদর্শনের পথে সাম্প্রতিক কালে বাংলার চলচ্চিত্র যাত্রা শুরু করেছে, তারই সাফল্যের সংবাদ বহন করে এনেছে হেমন্ত বেলা প্রোডাকসন্সের প্রথম চিত্রার্ঘ্য "নীল আকাশের নীচে"।

সহজ সরল একটি ছোট গল্পকে ঘিরে এ ছবির আখ্যানভাগ। অথচ তারই মধ্যে ফুটে উঠেছে সর্বকালীন মানুষের নিরবচ্ছিন্ন জীবনযাত্রার এক প্রাণময় রূপ। নীল আকাশের নীচে সব মানুষই এক। রূপ ও বর্ণের, সংস্কার ও সংস্কৃতির বিভেদ নীলিমার নিঃসীম ছায়ায় কোথায় যেন তলিয়ে যায়। মানুষের হৃদয়-সৈকতে গড়ে ওঠে মিলনের বন্দর। এমনিভাবেই মানুষ দেশে-বিদেশে খুঁজে পায় নিজের ঘর, তার আপন জন।

তাই বুঝি কলকাতায় এক চীনা ফেরি-ওয়ালা ভুলে যায় তার ভৌগোলিক সত্তা—ভুলে যায় যে, সে একজন বিদেশী। এই

চন্দ্রশেখর

মহানগরীর ভিড়ের ভেতরে খুঁজে পায় তার হারিয়ে-যাওয়া বোনকে বাঙ্গালী কুলবধূ বাসন্তীর মধ্যে। তার দরজায় চীনা সিল্ক বিক্রি করতে এসে সে শোনে ভ্রাতৃ সম্বোধন—যে ডাকে নাড়া পায় অতৃপ্ত, ব্যথাহত এক ভাইয়ের অন্তর।

এক পরম প্রাপ্তির আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ফেরিওয়ালা ওয়াং লুর মুখ। পুলকে চঞ্চল হয়ে ওঠে সে। প্রাণের আবেগে বার বার বাসন্তীকে ডাকে সে, 'সিসতার, সিসতার'। বাসন্তীর দরজায় এসে আর হাঁকে না ওয়াং লু, আপন করে ডাকে তার বোনকে।

দেশের মুক্তিসাধনায় নিবেদিত-প্রাণ বাসন্তী। একদিন এক বেআইনী রাজনৈতিক সভা ছত্রভঙ্গ করবার পর পুলিস তার পিছু নেয়। বাসন্তীর প্রতি লক্ষ্য রেখে তার পিছু পিছু চলে ওয়াং। অগত্যা পুলিসের চোখে যখন ধুলো দেবার কোন উপায় নেই বাসন্তীর, তখন ওয়াং মুহূর্তের মধ্যে তার কাছ থেকে বেআইনী কাগজপত্র নিয়ে পোরে তার পোঁটলার মধ্যে। পুলিস সে যাত্রায় বাসন্তীকে জেলে পুরতে পারে না। এই ঘটনার পর বাসন্তী নতুন চোখে দেখে ওয়াং লুকে। আপন করে তাকে কাছে টেনে নেয়।

বাসন্তীর সান্নিধ্যে ওয়াং লুর মনে ভেসে ওঠে অতীতের বেদনা-বিধুর দিন-গুলির স্মৃতি। ভেসে ওঠে তার মনে কত-দিনের ফেলে-আসা গ্রাম সাণ্টুং। ভাই-বোনের ছোট সংসার। ভাই হাল নিয়ে মাঠে যায় জমি চাষ করতে, ছোট বোন ঘর সামলায়। একদিন ওয়াংয়ের বোন দুরাচারী গ্রাম্য জমিদারের নজরে পড়ে। জমিদারের পাওনা খাজনা শোধ করে উঠতে পারেনি ওয়াং। বদমতলবী জমিদার তাই প্রস্তাব করে ওয়াং লুর কাছে সে যেন তার বোনকে পাঠিয়ে দেয় ওর বাড়ীতে দাসী বৃত্তি করে টাকা শোধ করতে। ওয়াং সময় চেয়ে নেয়। এর মধ্যে একদিন ওয়াং ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভাইকে বাঁচাবার কোন উপায় না দেখে তার বোন বাক্স থেকে পুরনো একটি হার বের করে জমিদারের কাছে যায় টাকা সংগ্রহ করতে। টাকা সে পায়, হারও ফেরত নিয়ে আসে, কিন্তু জমিদারের ঘৃণ্য লালসার কাছে বিকিয়ে আসে তার নারীত্ব। চরিত্রহীন জমিদারের বাড়ীতে সে গিয়েছিল জেনে ওয়াং ক্রোধে অন্ধ হয়ে তাকে বাড়ী থেকে বের করে দেয়। এর পর অনেক খুঁজেছে সে তাকে। পাহাড়ী নদীর তীরে তীরে আকুল হয়ে সে ডেকেছে তাকে। নদীর গর্জনে তার ডাক গেছে ডুবে। অভিমানিনী বোনকে সে আর খুঁজে পায়নি।

মনে পড়ে যায় ওয়াংয়ের সেসব দিনের কথা। হারিয়ে-যাওয়া বোনের শূন্য স্থান সে পূর্ণ করে তার নতুন 'সিসতার'কে দিয়ে। তাই চীনা নববর্ষের দিন সে নতুন সাজে সেজে হাতে উপহার নিয়ে এসে দাঁড়ায় বাসন্তীর সামনে। ওয়াংকে কেন্দ্র করে আগে থেকেই চলছিল বাসন্তী ও তার স্বামী রজতের মধ্যে মন কষাকষি। একজন সাধারণ ফেরিওয়ালার সঙ্গে মাখামাখি পছন্দ করে না ব্যারিস্টার রজত। সেদিন ওদের বাড়ীতে ওয়াংয়ের উপস্থিতিতেই শুরু হয় ওদের কথা কাটাকাটি। ওয়াং বুঝতে পারে তাকে কেন্দ্র করেই ঝড় উঠেছে। সে নিঃশব্দে বেরিয়ে চলে আসে।

এর পর বাসন্তী নিজেই গিয়ে একদিন হাজির হয় বস্তী এলাকায় ছোট এক গলিতে ওয়াংয়ের ঘরে। সেখানে সে দেখা পায় মাকির। বাসন্তী বুঝতে পারে মাকির

হেমন্ত বেলা প্রোডাকসন্সের "নীল আকাশের নীচে"র একটি স্মরণীয় দৃশ্যে চীনা ফেরিওয়ালাবেশী কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ভগিনসমা বাঙালীর মেয়ে মঞ্জু দে-কে চীনা নববর্ষের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছেন

মনে রয়েছে ওয়াংয়ের প্রতি অনুরাগ। মাকি রূপোপজীবিনী, হোটেলের খদ্দেরদের তদারক করে সে। ওয়াং ঘৃণা করে মাকিকে এবং বাসন্তীকে বলে সে কথা। বাসন্তী তাকে বোঝায় এদেশে এমনিভাবে অনেক হতভাগিনী অভাবের তাড়নায় একদিন নিজেদের সম্ভ্রম বিকোতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে ওয়াংয়ের মনে পড়ে যায় তার বোনের কথা। ওয়াংয়ের কাছ থেকে তার অতীতের সব কথা শোনে বাসন্তী।

ওয়াংয়ের অতীত জীবনের ব্যর্থ-বঞ্চনার কাহিনী শোনে রজতও। লজ্জায় তার মাথা হেঁট হয়ে আসে। আর সেইদিনই বাসন্তী দেশের মুক্তি আন্দোলনে গ্রেপ্তার হয়।

কয়েক বছর কেটে যায়। ওয়াং জেলে-খানার চার পাশে ঘুরে বেড়ায় যদি কোন ফাঁকে বাসন্তীর দেখা পায়। তারপর এক দিন মুক্তি পেল বাসন্তী। তখন ওয়াংয়ের দেশেও শুরু হয়েছে জাপানী আক্রমণের তান্ডব। তার দেশের অগণিত নরনারী-শিশুর প্রাণনাশের সংবাদে অস্থির হয়ে ওঠে ওয়াংয়ের মন। অসহায় জন্মভূমির ডাক যেন সে শুনতে পায় অহরহ। দেশে ফিরে যাওয়ার সংকল্প করে সে। বাসন্তী আন্তরিক সমর্থন জানায় ওয়াংয়ের প্রেরণাকে। দেশে ফিরে যাওয়ার আগে ওয়াং বাসন্তীকে দিয়ে যায় স্মৃতিচিহ্ন-রূপে তার বোনের সে হার। আর জাহাজ ঘাটে ভাইকে বিদায় জানাতে এসে বোন পরিয়ে দেয় তার হাতে পবিত্র রাখী। রাখী-বাঁধনে অক্ষয় হয়ে থাকে বাঙালী বোন ও চীনা ভাইয়ের নিবিড় স্নেহের সম্পর্ক।

পদ্মবিভূষণ মহাদেবী বর্মার সরল অথচ অসামান্য এই কাহিনীর ছন্দোবদ্ধ ঘটনারাজি বৃত্তায়িত হয়েছে এক অপরূপ নাট্যরস-বিন্দুতে যা রূপে-বিস্তারে-বিন্যাসে রসোত্তীর্ণ করে চলচ্চিত্রপটে উপস্থাপিত করেছেন তরুণ-পরিচালক মৃণাল সেন। মানবিকতার স্পর্শে উজ্জ্বল এই ছবির চিত্র-নাট্যের সঙ্গে মিশে রয়েছে দর্শকের অনু-ভূতিকে ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত, বিস্মিত ও উদ্দীপিত করে তোলার মতো দুর্বার নাট্য সংবেদন। পরিচালক প্রতি দৃশ্যে ছড়িয়ে রেখেছেন এমন সব ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা, যা সমস্ত ছবিখানিকে আবেগমধুর করে তুলেছে। শুধু কাহিনীর অন্তর্লীন ভাব-বিন্যাসেই নয়, চিত্র-প্রতীকের দিক দিয়েও ছবিখানি অনবদ্য রূপ-সুষমায় মণ্ডিত।

শিল্পীর তুলির টানের মতো ছোট্ট কয়েকটি দৃশ্যে পরিচালক রচনা করেছেন ভারতের জাতীয় সংগ্রামের পটভূমিকা কাহিনীর কাল নির্ণয়ের জন্য। বাসন্তী ও রজতের দাম্পত্য জীবনের বেসুরো মুহূর্তগুলি নিয়ে একটি আলাদা নাট্য উপাদান পরি-বেশন করার কৃতিত্বও দেখিয়েছেন তিনি। ভাঙা ভাঙা ইংরেজি ও বাংলা শব্দ দিয়ে ওয়াং লুর সংলাপ রচনার মধ্যেও পরি-চালকের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সর্বোপরি মৃণাল সেনের পরিচালনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় সহজ সরল কটি মানুষের আনন্দ-বেদনার রস অতি সহজভাবে দর্শকদের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়ার মধ্যে। এই আবেগ-সঞ্চার আনন্দাশ্রুর বন্যা বইয়ে দেয় সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে।

ফ্ল্যাসব্যাকে ওয়াং লুর জন্মভূমির রূপাঢ্য ও বাস্তবানুগ পরিবেশ রচনায় পরিচালক ●

ছবির শিল্পনির্দেশক অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন। এক নিবিড় শান্তরস যেমন ছবির সমস্ত অংগে আলিপ্ত, তেমনি নয়নাভিরাম এর সামগ্রিক দৃশ্য সৌন্দর্য। তারই পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছোট ছোট ঘটনা, ছোট ছোট কথা, ও গানের মধ্য দিয়ে কাহিনীর মূল বক্তব্য।

বক্তব্য ও ব্যঞ্জনার এমন হৃদয়গ্রাহী সমন্বয় সচরাচর নজরে পড়ে না। মধ্য রাত্রিতে ওয়াং লুর গংগার তীরে ছুটে আসা এবং নেপথ্যে 'ও নদীরে—একটি কথা শুধোই শুধু তোমারে' গানের দৃশ্যের তুলনা বাংলা ছবিতে বিরল। অতুলনীয় দৃশ্যের বিন্যাস রয়েছে ছবিতে আরও অনেক। এই সব কিছুর মধ্য দিয়েই মৃণাল সেন একজন সৃজনধর্মী পরিচালকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

দর্শকদের অভিভূত করবার মত রয়েছে ছবির অভিনয়-সম্পদ। চীনা ফেরিওয়ালার চরিত্রে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় শুধু এ ছবিরই নয়, ভারতীয় চলচ্চিত্রেরও একটি অম্লান গৌরব। একটি বিদেশী চরিত্রকে এমন অপূর্ব স্বাভাবিকতায় রূপায়িত করেছেন তিনি, যে দেখে বিস্মিত হতে হয়। চরিত্রের বিভিন্ন ভাবের নাটকীয় অভিব্যক্তিও এই শক্তিমান অভিনেতা যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এর পরেই অনবদ্য অভিনয় কৃতিত্বের জন্য প্রশংসা পাবেন মঞ্জু দে বাসন্তীর চরিত্রে অভিনয়ের এমন সাবলীল ভংগী চলচ্চিত্রে এক দুর্লভ বস্তু। বিকাশ রায় রজতের ভূমিকাটিকে ছবির অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্ররূপে গড়ে তুলেছেন। তাঁর মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তিও প্রশংসনীয়। মাকির চরিত্রটিকে বিশ্বাসযোগ্য ও নজরে পড়বার মতো করে ফুটিয়ে তুলেছেন স্মৃতি বিশ্বাস। রজতের মায়ের ভূমিকায় সুরুচি সেনগুপ্তার স্বচ্ছন্দ অভিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পার্শ্ব চরিত্রে অজিত চট্টোপাধ্যায়, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরাজ চক্রবর্তী ও চীনা শিল্পী লিউ চ্যাং চিং, ইয়ং চিন তিয়েন, জিয়াও তাই শেং প্রমুখ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

সংগীত পরিচালনায় প্রযোজক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর শিল্পী জীবনের এক অক্ষয় কীর্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে দিয়েছেন এই ছবিতে। তাঁর গাওয়া 'ও নদীরে' ও 'নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী' গান দুটি অপূর্ব। তাঁর রচিত আবহ সংগীতও ছবির অন্যতম সম্পদ। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গীত রচনা ভূয়সী প্রশংসার দাবী রাখে।

রূপসজ্জা পরিচালনায় শক্তি সেন ও অনন্ত দাস, শিল্প নির্দেশনায় সুনীতি মিত্র, সংগীত গ্রহণে মিনু কাত্রাক ও শব্দানুলেখনে অতুল চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আলোকচিত্র গ্রহণে শৈলজা চট্টোপাধ্যায় অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। তাঁর ক্যামেরায় রাত্রির দৃশ্য এবং বিশেষত চীনের পটভূমিকায় তোলা দৃশ্যগুলি ছবিখানিকে রমণীয় করে তুলেছে। ছবির অন্যান্য কলাকৌশল সামগ্রিকভাবে উঁচুদরের।

তুষার মঞ্চে নৃত্য প্রদর্শনী

কলকাতার নাগরিক জীবনের নানা আমোদ-আয়োজনের মধ্যে সম্প্রতি যেটি বিশেষভাবে স্থান করে নিয়েছে তা হ'ল বরফের উপর মার্কিন শিল্পীদের নৃত্য প্রদর্শনী। এর নাম দেওয়া হয়েছে "হলিডে অন আইস"।

যাদুঘরের উল্টোদিকে ময়দানে উন্মুক্ত আকাশের নীচে তৈরী হয়েছে পাঁচ হাজার বর্গফুট এলাকা জুড়ে সুবৃহৎ তুষার মঞ্চ। প্রায় দশ হাজার দর্শকের স্থান সংকুলান হতে পারে এমন অতিকায় স্টেডিয়াম তৈরী করা হয়েছে তুষার মঞ্চটিকে ঘিরে। নানা বিচিত্র বর্ণের আলোর ঝলকানি ও সুমধুর ঐক্যতানের মধ্য দিয়ে পঁচিশটিরও বেশী নৃত্যাংশ সমন্বয়ে কলকাতায় এই অভূতপূর্ব আনন্দ-আয়োজনের উদ্বোধন হল গত রবিবার। কলকাতার আমোদ-ব্যবস্থার ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

শিল্পীদের নৃত্যচাতুর্য, তুষারের উপর তাদের স্বচ্ছন্দ বিহার ও বিচিত্র বর্ণের রূপসজ্জা দর্শকদের মনে স্বপ্নলোকের আভাস এনে দেয়। সাবলীল গতিছন্দে বরফের উপর দিয়ে তুষার সুন্দরীদের নৃত্যচঞ্চল পরিক্রমা মেঘের-কোলে-উড়ে-যাওয়া পরীদের মতোই অপরূপ লাগে। তুষারমঞ্চে প্রদর্শিত সব কয়টি নৃত্যাংশই দর্শকদের বিস্ময়-বিমূঢ় করে রাখে। অনুষ্ঠানে

এ ভি এম-এর নতুন হিন্দী ছবি "বাপ বেটে"-র দুই মুখ্য চরিত্রে শ্যামা ও বাবুরাও পেন্ধারকর

কয়েকটি কৌতুকাংশও আছে, সেগুলিও উপভোগ্য।

অনবদ্য আলোকসম্পাত ও শিল্পীদের নাচের সঙ্গে সঙ্গে সুরের ঐকতান প্রথম থেকেই দর্শকদের মনে যে মায়াজাল বুনতে শুরু করে, তার আবেশ প্রদর্শনী শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও দর্শকদের মনে অনুরণিত হতে থাকে। তুষার মঞ্চ নির্মাণে "হলিডে অন আইসে"র কর্মকর্তারা যে প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা নেই। প্রদর্শিত অংশগুলির মধ্যে "নীল উচ্ছ্বাস", "পিটার প্যান", "গতিময় কবিতা", "সুয়েজের পথে", "পুরোনো ভিয়েনায়", "তিউনিসীর যমজ" প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনীর ব্যবস্থার মধ্যে যে দুটি ত্রুটি বিশেষভাবে নজরে পড়ে তা হ'ল স্টেডিয়ামের অল্পপরিসর প্রবেশপথ এবং স্টেডিয়ামের বাইরে আলোর অব্যবস্থা। এতে দর্শকদের অশেষ ক্লেশভোগ ঘটা বিচিত্র নয়।

চিত্রালোচনা

হেমন্ত বেলা প্রোডাকশন্সের প্রথম চিত্রার্ঘ "নীল আকাশের নীচে" দিগ্বিজয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এই সপ্তাহে আত্মপ্রকাশ করছে। ছবিখানি ইতিমধ্যেই দেশের দিকে দিকে সাড়া জাগিয়েছে অপ্রকাশ্য প্রদর্শনীতে গুণীজনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। চিত্রামোদী সাধারণ উদগ্র আগ্রহে অপেক্ষা করছে এই বহুপ্রশংসিত ছবিটি নিজের নিজের মন দিয়ে যাচাই করতে। পদ্মবিভূষণ মহাদেবী বর্মার সংক্ষিপ্ত হিন্দী কাহিনী "চীনি ফিরিওয়ালা" বাংলা ছবির পর্দায় যে অপরূপ রূপ নিয়েছে, তার আবেদন দেশ-কালপাত্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বময় প্রসারিত। ছবিটি হেমন্ত ও বেলা মুখোপাধ্যায়কে যেমন প্রযোজক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবে, তেমনি খ্যাতির উচ্চ শিখরে তুলবে এর পরিচালক ও চিত্রনাট্য-রচয়িতা মৃণাল সেনকে। একটি সঙ্গীতাকারের স্মরণীয় ছবি তুলেছেন এঁরা। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জু

দে, বিকাশ রায়, স্মৃতি বিশ্বাস, লী চিউ ফং, লট শাও ওয়েন, সুরুচি সেনগুপ্তা, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতিক নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত। সুরযোজনা করেছেন হেমন্তকুমার নিজে। ছবিটির সমালোচনা এই সংখ্যাতেই দেওয়া হল।

*　　*　　*

এ ভি এম প্রোডাকশন্সের নতুন হিন্দী ছবি "বাপ বেটে" এ সপ্তাহের অন্যতম আকর্ষণ। সামাজিক ছবির ক্ষেত্রে মাদ্রাজের এই প্রতিষ্ঠানটি যে সুনাম অর্জন করেছে, তারই ঐতিহ্য বহন করে হাজির হয়েছে এই তারকা-দীপ্ত নতুন ছবিটি। ভূমিকা-লিপির পুরোভাগে আছেন অশোককুমার শ্যামা, বাবুরাও পেণ্ডারকর, কানহাইয়ালাল, চিত্রা, ললিতা পাওয়ার, জগদীশ প্রমুখ বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর দল। এ ভি মায়াপ্পনের প্রযোজনায় ও রাজা পারঞ্জপের পরিচালনায় ছবিটি তোলা হয়েছে। মদনমোহন এতে সুরসৃষ্টি করেছেন এবং রাজেন্দ্রকৃষ্ণ এর সংলাপ ও গান রচনা করেছেন।

আরো একখানি হিন্দী ছবি এ সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে—সি এম ত্রিবেদী প্রযোজিত "জঙ্ বাহাদুর"। জি পি পাওয়ার ছবি-খানির পরিচালক। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন পূর্ণিমা, শশিকলা ও চন্দ্রশেখর। অবিনাশ ব্যাস এতে সুর দিয়েছেন।

*　　*　　*

বাংলা ছবিতে গল্প ও পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে নতুনত্ব সাধনের যে প্রয়াস চলছে তারই নবতম নিদর্শন দেখা যাবে সানরাইজের নির্মীয়মাণ ছবি "কিছুক্ষণ"-এ। বনফুলের এই বহুপঠিত গল্পটি একদল ট্রেনের যাত্রীকে কেন্দ্র করে রচিত। ঘটনাচক্রে একটি ছোট্ট স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্যে একটি এক্সপ্রেস ট্রেনকে আটক থাকতে হয়। ফলে যাত্রীদের মধ্যে নানা নাটকীয় সমস্যার উদ্ভব হয়। তাই নিয়েই গল্প। পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় বীরভূম অঞ্চলে বহির্দৃশ্য গ্রহণ করে বর্তমানে ছবিটির আভ্যন্তরীণ শুটিং-এ মনোনিবেশ করেছেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, অসীমকুমার, গঙ্গাপদ বসু, জীবেন বসু, শিশির বটব্যাল, শোভা সেন, নিভাননী এবং লেখকের সপ্ততিবর্ষীয়া ভগিনী হেমাঙ্গিনী দেবী। নচিকেতা ঘোষ সঙ্গীত পরিচালনা করছেন।

*　　*　　*

চিত্রাঞ্জলি পিকচার্সের "জল-জঙ্গল" ও সুলেখা পিকচার্সের "নিত্যানন্দ প্রভু" মুক্তির প্রতীক্ষা করছে।

সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পশ্চাৎপটে তোলা "জল-জঙ্গল" মনোজ বসুর একটি অনন্য-সাধারণ কাহিনীর চিত্ররূপ। কার্তিক চট্টোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করেছেন এবং এর প্রধান ভূমিকাগুলিতে নেমেছেন অসীম-কুমার, মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, তুলসী চক্রবর্তী, জহর রায়, সুখেন প্রভৃতি। প্রাকৃতিক দৃশ্যসৌন্দর্য এর অন্যতম আকর্ষণ।

মহাপ্রভুর প্রধান পার্শ্বচর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের অপরূপ জীবন কাহিনী চিত্রিত হয়েছে "নিত্যানন্দ প্রভু"-তে। নাম-ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় তাঁর শিল্পী জীবনের স্মরণীয় কৃতিত্ব হিসেবে গণ্য হবে বলে শোনা যাচ্ছে। মহাপ্রভু-চরিত্রে রূপ দিয়েছেন নব-গোপাল। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন সন্ধ্যা রায়, পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী ও শীলা পাল। কীর্তনকলানিধি রথীন ঘোষের সুরসমৃদ্ধ এই ছবিটির পরিচালনা করেছেন অসীম পাল।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের "পিতাচারিণী" গল্পটিকে ছবিতে রূপান্তরিত করতে ব্রতী হয়েছেন নবগঠিত নিও ফিল্মস্ ইণ্টারন্যাশনাল।

পরিচালনার ক্ষেত্রে নবাগত সমীরণ দত্ত এই রূপান্তরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

"যৌতুকে"র পরিচালক জীবন গাঙ্গুলীর নতুন ছবির নাম "উত্তর মেঘ"। জে এম পিকচার্সের পতাকাতলে ছবিটি বর্তমানে গঠনপথে। উত্তমকুমারের বিপরীতে সুপ্রিয়া চৌধুরীকে এই ছবিতে প্রথম দেখা যাবে।

সোভিয়েৎ পুতুল-নৃত্যশিল্পী দল

ভারত সরকারের আমন্ত্রণে মস্কোর "স্টেট সেণ্ট্রাল পাপেট থিয়েটার"-এর একটি দল দেড় মাসের জন্যে ভারত-সফরে এসেছেন। এঁরা ভারতের বিভিন্ন শহরে পুতুল-নাচ দেখাবেন। সংগৃহীত অর্থ ভারতের প্রধান-মন্ত্রীর সাহায্য-তহবিলে যাবে।

দলে ৩৬জন পুতুল-নৃত্যশিল্পী আছেন। স্টেট সেণ্ট্রাল পাপেট থিয়েটারের প্রধান পরিচালক সেরগেই ওব্‌রাজ্‌ৎসফ এই দলের নেতা।

প্রতিনিধি দলটি ১৯শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় এসে পৌঁছেছেন। ২০শে, ২১শে, ২২শে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী স্থানীয় মহাজাতি সদনে পর পর চারদিন এঁরা পুতুল-নাচ দেখাচ্ছেন।

মস্কোর কেন্দ্রস্থলে ভ্লাদিমির মায়াকোভ্‌স্কি স্মৃতিসৌধের কাছে একটি বাড়ির দেওয়ালে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা আছে "পুতুল-নৃত্যনাট্যশালা"। এই বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের দু হাজার পুতুল "বসবাস" করে। এই বিচিত্র জগতের সবগুলিরই সৃষ্টি হয়েছে "সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের জন-শিল্পী" উপাধিধারী প্রতিভাবান সেরগেই ওব্‌রাজ্‌ৎসফের অফুরন্ত কল্পনাশক্তি থেকে। ওব্‌রাজ্‌ৎসফ স্টেট সেণ্ট্রাল পাপেট থিয়েটারের প্রধান পরিচালক এবং সোভিয়েৎ পুতুল-নাচের অবিসংবাদী নেতা। ওব্‌রাজ্‌ৎসফ-পরিচালিত এই পুতুল-নৃত্যনাট্যশালার শিল্পকৌশলের মধ্যে সূক্ষ্ম সৌন্দর্য, উচ্চাঙ্গের শিল্পরুচি ও পরিচ্ছন্ন সহজ-বোধ্যতার সমন্বয় ঘটেছে। তারই ফলে এই পুতুল-নাচ ছোট-বড়ো সকলের কাছেই সমাদৃত হয়েছে।

সব বয়সের, সবরকমের দর্শক আসে এই পুতুল-নাচ দেখতে। প্রতিষ্ঠার দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই কেন্দ্রীয় পুতুল-নৃত্যনাট্যশালায় প্রায় ২০ হাজার অনুষ্ঠান হয়েছে এবং প্রায় ৯০ লক্ষ নরনারী, শিশু ও কিশোর-কিশোরী পরম আগ্রহের সঙ্গে তা দেখেছেন। লণ্ডন আর প্যারিসের শহুরে রুচিসম্পন্ন দর্শক এবং সাইবেরিয়ার দূরতম গ্রামের দর্শক সমান আগ্রহ-ঔৎসুক্য নিয়ে ওব্‌রাজ্‌ৎসফের পুতুল-নাচ দেখে আনন্দ লাভ করেছেন।

"মৃগরাজ", "অভূতপূর্ব ঐকতান", "বিবাহ-বিচ্ছেদ", "শয়তানের কল" প্রভৃতি নাটক যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই অনুভব করেছেন, ওব্‌রাজ্‌ৎসফের পুতুলগুলি সাধারণ পুতুল নয়, মানব-অন্তরের সকল অনুভূতিই এরা প্রকাশ করতে সক্ষম।

ওব্‌রাজ্‌ৎসফ তাঁহার পুতুলচরিত্রগুলিকে যাদু ও রূপকথার কাব্যময় জগতে ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন, সর্বকালের ও সর্ব-জাতির লোক-কাহিনীর যথাযোগ্য নায়ক-নায়িকা হতে পারে এইসব পুতুল।

মস্কোর এই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় পুতুল-নৃত্যনাট্যশালা গত বৎসর এর প্রতিষ্ঠার পঞ্চবিংশ বার্ষিকী উদ্‌যাপন করেছে। এই পুতুল-নৃত্যনাট্যশালা মস্কোর রঙ্গমঞ্চ-[illegible]ের গৌরব। এই পুতুল-নাচ প্রতিষ্ঠানে [illegible] প্রতিভাবান অভিনেতা, পরিচালক, শি[illegible] ও নিজস্ব নাট্যকার আছেন। সক[illegible] পরম উৎসাহী এবং সকলেই শিক্ষা[illegible] করেছেন ওব্‌রাজ্‌ৎসফের কাছে।

বিবিধ সংবাদ

পশ্চিম বাংলা সরকারের প্রচার ও জ বিভাগ এই প্রদেশের জীবনযাত্রাকে ন করে ডকুমেণ্টারি ছবি তুলছেন অ মান ধরে। সে সব ছবি এতদিন হত। সিনেমার মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে প্রদর্শ কারের গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে কেন্দ্রী পশ্চিম ফিল্মস্ ডিভিসনের মাধ্যমে দেখাবার বাংলার প্রতি সিনেমাগ বার নিউ বন্দোবস্ত হয়েছে। গতনীতে এই এম্পায়ারে একটি বিশেষ চিত্র চিত্র-পর্যায়ের পাঁচখানি গুলির নাম— সাংবাদিকদের দেখান মন যাহা চায়", "সূর্য্য যখন পাটে এবং "সমস্যা ও সমাধান"। "যেমন", "যেমন অনেক জিনিস আছে, তেমনি জানবার ও উপকরণ। ছবিগুলি আছে আনন্দোনে তোলা হয়েছে। বিজন সেনে

* * *

উন্নয়ন-পরিকল্পনা কমিটি বিশ্বরূ যে, আগামী মে মাস থেকে স্থির কপর্যন্ত "গিরিশ নাট্য প্রতি-জুলাই যোগিতা একাঙ্ক" নামে একটি একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বরূপায় প্রতি শনিবার এই প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত নাটক অভিনীত হবে। আগামী শুক্রবার (২৩শে ফেব্রুয়ারী) থেকে আবেদনপত্রের ফর্ম ইত্যাদি বিশ্বরূপায় পাওয়া যাবে। যাঁরা এই প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে ইচ্ছুক ১৫ই মার্চের মধ্যে তাঁদের আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিল্পাধিকার কর্মি-বৃন্দের নাট্য সংস্থা শিল্পাধিকার রংগচক্র গত ১১ই ফেব্রুয়ারী নিখিল ভারত তাঁত সপ্তাহ উপলক্ষে সাফল্যের সংগে শরৎচন্দ্রের "বৈকুণ্ঠের উইল"-এর অভিনয় করেন। প্রতিটি ভূমিকা নিখুঁতভাবে অভিনীত হওয়ায় অভিনয়ের সামগ্রিক সৌকর্য সকলকার অভিনন্দন লাভ করে।

* * *

বোম্বাইয়ের একটি খবরে প্রকাশ যে, ইংলণ্ড-প্রবাসী বাঙালী প্রযোজক বিশু সেন "দি সিঙিং মাউণ্টেন" নামে যে ইংরেজী ছবিটির প্রাথমিক তোড়জোড় করতে এদেশে এসেছেন তার প্রধান দু'টি চরিত্রে অশোক-কুমার ও আই এস জোহরকে নির্বাচিত করেছেন। এর প্রধান নারীচরিত্রে বৃটিশ অভিনেত্রী অ্যান হেউড অথবা হলিউডখ্যাতা জোন কলিন্সকে দেখা যাবে। ছবিটি পরি-চালনা করবেন বিখ্যাত ইংরেজ পরিচালক ক্যাপটেন বেনেট।

* * *

বাংলার নমিতা সিংহ বোম্বাইতে যাচ্ছেন সিপ্পি ফিল্মসের হিন্দী ছবি "পাইলট"-এ অভিনয় করতে। এর প্রধানাংশে নামছেন দেবানন্দ ও মালা সিংহ।

এদিকে বোম্বাইয়ের অচলা সচদেব প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী বাংলা ছবির জন্যে নির্বাচিত হয়েছেন। অবশ্য শ্রীমতী সচ-দেবকে দেখা যাবে এক পাঞ্জাবী মহিলার ভূমিকায়।

* * *

সোভিয়েট রাশিয়া ভারতবর্ষের সংগে যুক্তভাবে একটি ছোটদের উপযোগী ছবি তুলবে বলে খবর পাওয়া গেছে। এদেশ থেকে ওদেশে শীগগিরই একটি ফিল্ম ডেলি-গেশন যাবে, যার মধ্যে শিশুচিত্র আন্দো-লনের সংগে জড়িত অনেকে আছেন। কয়েক বছর আগে একটি ভারতীয় কাহিনী অবলম্বনে রাশিয়াতে একটি ছেলেদের ছবি তোলা হয়েছিল। ছবিটি জনপ্রিয় হওয়ায় রুশ-ভারত যুক্ত-প্রচেষ্টায় ও-দেশের সরকার উৎসাহী হয়েছেন। পাঠকদের মনে থাকতে পারে, বছর দুই আগে অনুরূপ ব্যবস্থায় 'পরদেশী' নামক একখানি পূর্ণাংগ ছবি তোলা হয়েছিল।

নতুন রেকর্ড

"হিজ মাস্টার্স ভয়েস"

এন্ ৮২৮০৭—উৎপলা সেনের কণ্ঠে দু'খানি আধুনিক গান "মল্লিকা চেয়েছে যে" ও "আঁধার নেমেছে দূরে"। এন্ ৮২৮০৮ দু'খানি ছোটদের গান "আগডুম বাগডুম" ও "দোল দোল দুলুনী"—গেয়েছেন আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়। এন্ ৮২৮০৯ মহম্মদ রফি দু'খানি আধুনিক বাংলা গান গেয়েছেন—"এ জীবনে যদি" ও "ঐ দূরে দিগন্ত পারে"। এন্ ৮২৮১০—দু'খানি আধুনিক গান "একটি তারা ডাকে" ও "আকাশের তারা" গেয়েছেন কৃষ্ণা দত্ত। এন্ ৮৭৫৫৩—"লুকোচুরি" বাণীচিত্রের "মুছে যাওয়া দিনগুলি" ও "এক পলকের একটু দেখা" গানের সুর ইলেকট্রিক গীটারে পরিবেশন ক'রেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

কলম্বিয়া

জি ই ২৪৯১৯—সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দু'খানি আধুনিক গান "আঁধারে লেখে" ও "ডাগর নয়ন মেলে"। জি ই ২৪৯২১—"গোলাপের পাপড়ী ঝরা" এবং "ঝিনুক ঝিনুক" আধুনিক গান দু'টি গেয়েছেন শৈলেন মুখোপাধ্যায়। জি ই ২৪৯২১—পান্নালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে দু'খানি রামপ্রসাদী গান—"চাই না মাগো রাজা হতে" ও "মন তোমার এই ভ্রম গেল না"। জি ই ২৪৯২২—গায়ত্রী বসুর কণ্ঠের আধুনিক গান—"ওই পাখী জানে" ও "প্রথম মুকুল তুমি"।

খেলার মাঠে

একলব্য

সার্থক সফর

ভারত সফর শেষ করে এবং টেস্ট পর্যায়ে ভারতের কাছ থেকে 'রাবার' নিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল পাকিস্তান সফর আরম্ভ করেছে। ভারতের কাছ থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল শুধু 'রাবার'ই লাভ করেনি, পাঁচটি টেস্ট খেলাতেই তারা ব্যাটিং ও বোলিংএ উৎকর্ষতার পর্যাপ্ত প্রমাণ দিয়ে বিজয়ী হয়েছে তিনটি টেস্ট খেলায়। বাকী দুটি টেস্ট খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে গেলেও এ দুটি খেলাতেও হাওয়া সব সময়ই বয়েছে তাদের স্বপক্ষে। জেতার এ দুটি খেলায় তারা জিততে [illegible]। আরও

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক
ফ্রাঞ্জ আলেকজাণ্ডার

বলবার বিষয় টেস্ট সমেত ভারতে ১৭টি খেলার মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল একটি খেলাতেও পরাজয় স্বীকার করেনি। তিনটি টেস্ট সমেত জিতেছে ১১টি খেলায়। ভারতের ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে আর কোন আগন্তুক দল এমন জয়ের গৌরব নিয়ে আর খেলার চটক দেখিয়ে সফর করেছে কিনা সন্দেহ। ১৯২৬-২৭ সালে আর্থার গিলিগানের এম সি সি দল এবং ১৯৫০-৫১ সালে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দল অবশ্য অপরাজয়ের গৌরবের সঙ্গে সফর শেষ করেছিল কিন্তু খেলার দিক দিয়ে কোন দলই এমন চটক দেখাতে পারেনি; তাছাড়া ঐ দু'টিই ছিল আন--অফিসিয়াল বা বেসরকারী সফর। সরকারী সফরের মধ্যে ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ান দলও অপরাজয়ের গৌরবের সঙ্গে রাবার নিয়ে দেশে ফিরেছে। কিন্তু ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ান দলের সফরকেও কোনভাবেই সফর বলা চলে না। ইংলণ্ড থেকে দেশে ফেরবার পথে অস্ট্রেলিয়া দল ভারতে মাত্র তিনটি টেস্ট খেলে দেশে ফিরেছিল। এবারের ভারত সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের গুণাগুণের আলোচনায় পরে ঘুরে আসছি। তার আগে দিল্লীতে ভারত ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলার পর্যালোচনা করা যাক।

বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর কানপুর, কলকাতা ও মাদ্রাজের তিনটি টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারতকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে রাবার লাভ করলে দিল্লী টেস্ট সম্পর্কে সাধারণের আগ্রহ আপনা থেকেই কমে যায়। ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কেও সকলের মনে দেখা দেয় গভীর নৈরাশ্য। তারপর কলকাতা টেস্টের পর পূর্বনির্বাচিত অধিনায়ক গোলাম আমেদের পদত্যাগ এবং মাদ্রাজ টেস্টের প্রাক্কালে পরে নির্বাচিত অধিনায়ক উমরিগরের সাথে [illegible] মতের উদ্ভূত পরিস্থিতি সমস্যাকে আরো ঘোরালো করে তোলে। পঞ্চম টেস্টের জন্য অধিনায়ক নির্বাচিত হন বর্ষীয়ান খেলোয়াড় হেমু অধিকারী, টেস্ট ক্রিকেট থেকে ভারতের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ অলিখিত অনুজ্ঞায় যার নির্বাসন দণ্ডই ঘোষণা করেছিলেন। মাদ্রাজ টেস্টে মানকড়ের অনুপস্থিতকালে রামচাঁদের অধিনায়কত্ব করার সময়টুকু হিসাবের মধ্যে ধরলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই সফরে অধিকারী হন পঞ্চম অধিনায়ক। স্বীকার করতে বাধা নেই, পঞ্চম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার ফলে ভারতের নষ্ট গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার হয়েছে। গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার হয়েছে বললে অবশ্য ভুল বলা হয়। বলা উচিত কিছুটা মুখ রক্ষা হয়েছে। পঞ্চম টেস্টেও ভারত পরাজয় স্বীকার করলে ভারতীয় সমর্থকদের নৈরাশ্য আরও গভীর হত।

পূর্বের চারটি টেস্ট খেলার তুলনায় পঞ্চম টেস্টে ভারত অপেক্ষাকৃত ভালই খেলেছে। চাঁদু বোরদের কৃতিত্বে এই পর্যায় ভারতের একটি টেস্ট সেঞ্চুরীও হিসাবের তালিকায় স্থান পেয়েছে। আরও বলবার বিষয়, চোটলাগা এবং আঘাত পাওয়া কয়েকজন খেলোয়াড়কেও নিয়ে ভারত প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে জুঝে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করেছে;

ভাগ্যদেবীও এ খেলায় ভারতের প্রতি একটু প্রসন্না ছিলেন। ১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ভারত সফরের সময় তৎকালীন ভারতের অধিনায়ক লালা অমরনাথ পাঁচটি টেস্টেই 'টসে' পরাজিত হয়েছিলেন! মাদ্রাজ-টেস্ট পর্যন্ত এবারও চারটি টেস্টের মধ্যে ভারতের কোন অধিনায়ক 'টসে' জিততে পারেননি। কিন্তু পঞ্চম অধিনায়ক হেমু অধিকারী পঞ্চম টেস্টের 'টসে' বিজয়ী হয়ে, প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ পান। দিল্লীর ফিরোজ শা

ব্যাটিং এভারেজে শীর্ষস্থান অধিকারী
গারফিল্ড সোবার্স

কোটলা মাঠ চিরদিনই ব্যাটসম্যানের অনুকূল। বোলাররা এ মাঠে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন না। ফলে ভারত প্রথম ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে প্রথম ইনিংসে সংগ্রহ করে ৪১৫ রান, যে রান এ সফরে সংগ্রহ করা ভারতের ব্যাটসম্যানদের পক্ষে কল্পনাতীত ছিল।

নরী কণ্ট্রাক্টর ও পলি উমরিগরের প্রশংসনীয় ব্যাটিংয়ের ফলে প্রথম দিনের খেলায় ভারতের ৪ উইকেটে ২৩৬ রান ওঠে। কণ্ট্রাক্টর ও উমরিগরের সহযোগিতায় দ্বিতীয় উইকেটে যোগ হয় ১৩৭ রান। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, উইকেটেরও এটা এবারকার প্রথম সেঞ্চুরী পার্টনারশিপ। নরী কণ্ট্রাক্টর মাত্র ৮ রানের জন্য নিজস্ব টেস্ট সেঞ্চুরী লাভের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হন। তিনি সওয়া পাঁচ ঘণ্টা

অত্যন্ত প্রশংসার সংগে ব্যাটিং করে ৯২ রানের মাথায় আউট হন। প্রথম দিন ভারতের ব্যাটিংয়ের সূচনা আশা ব্যঞ্জক হলেও উমরিগর এবং মঞ্জরেকার হাতে আঘাত পাওয়ায় দ্বিতীয় ইনিংসে এদের ব্যাট করা সম্পর্কে সংশয় উপস্থিত হয়। তাছাড়া উমরিগরের মত বোলারের হাতে চোট থাকাও ভয়ের কথা।

যাই হক, দ্বিতীয় দিন ৪১৫ রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল কোন উইকেট না হারিয়ে সংগ্রহ করে ৬৪ রান। ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে বরোদার চৌখস খেলোয়াড় চাঁদু বোরদে, যিনি আগের দিন ৩৪ রান করে নট আউট ছিলেন তিনি ১০৯ রান করে আউট হন। এই পর্যায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় ভারতের একজন ব্যাটসম্যান করেন প্রথম সেঞ্চুরী। ১০৯ রানের মধ্যে বোরদে একবারও ভুল করেন না। তার হাতের নিপুণ মারগুলি দর্শকদের খুবই আনন্দ দেয়। অধিনায়ক অধিকারীর দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ের ৬৩ রানও যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে।

দ্বিতীয় দিনের শেষ সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংসের শুভ সূচনার সন্তোষজনক পরিণতি ঘটে তৃতীয় দিনের সমাপ্তি সময়ে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সংগ্রহ করে ৪ উইকেটে ৪০৮ রান। ওপেনিং ব্যাটসম্যান জন হোল্ট ভারতে তাঁর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী (১২৩) করেন। অপর ওপেনিং ব্যাটসম্যান কনরাড হাণ্ট মাত্র ৮ রানের জন্য শতরান লাভের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হন। বুচার ৭১ রানে আউট হন, কোলী স্মিথ নট আউট থাকেন ৭০ রান করে।

একদিন বিরতির পর চতুর্থ দিনের খেলায় স্মিথের শতরান পূর্ণ হয়। জো সলোমনও জীবনের প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী করে নট আউট থাকেন। ৮ উইকেটে ৬৪৪ রান করে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। এখানে বলা যেতে পারে ভারতের প্রথম ইনিংসের রান অতিক্রম করবার পর জয়লাভের জন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যেভাবে দ্রুত রান সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল তারা সেভাবে রান করেনি। স্মিথ ও সলোমনের সেঞ্চুরী করবার আশাই তাদের দ্রুত রান সংগ্রহের প্রতিবন্ধকতা করে। ফিরোজ শা কোটলা মাঠের নির্জীব পীচে ভারতের বোলাররাও সুবিধা করতে পারেননি। তবু বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তরুণ ইন সুইং বোলার রামকান্ত দেশাইয়ের ১৬৯ রানে ৪টি উইকেট লাভ প্রশংসার বিষয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসের ৬৪৪ ভারতের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় তাদের সবচেয়ে বেশী রানের ইনিংস। ১৯৪৮-৪৯ সালে দিল্লীর প্রথম টেস্টে তারা ৬৩১ রান করেছিল। এতদিন

ভারতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী রান করায় কৃতিত্ব অর্জনকারী রোহান কানহাই

এই রানই ছিল তাদের ইনিংসের বেশী রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ৮ উইকেটে ৬৪৪ রান করে প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করবার পর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ভারত ১ উইকেট হারিয়ে ৩১ রান করলে চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হয়।

উমরিগর ও মঞ্জরেকারের হাতে চোট। বোরদেরও তৃতীয় দিন আঙ্গুলে আঘাত

টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে একমাত্র সেঞ্চুরী করেছেন চাঁদু বোরদে

পেয়েছেন। ভারতের একটি উইকেটও পড়ে গেছে। দ্বিতীয় ইনিংসের ৩১ রান বাদ দিলে এখনো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এগিয়ে আছে ১৯৮ রানে। খেলার বাকী একদিন। এ অবস্থায় ভারত পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে কিনা এই প্রশ্নই সবার মুখে মুখে ঘুরতে থাকে। ভরসার কথা পীচ বোলারদের সহায়ক নয়। ভারতের ব্যাটসম্যানরা মন্থর এবং দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিংয়ে সময় কাটাতে থাকেন। সময় অতিবাহিত হবার সংগে সংগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজও জয়ের আশা ছেড়ে দিয়ে লঘুভাবে বোলিং করতে থাকে। এক সময় ঘন ঘন কয়েকটি উইকেট পড়বার ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয়ের আশাও রঙীন হয়ে ওঠে। এদিকে চাঁদু বোরদে এ ইনিংসেও শতরান লাভের দিকে এগুতে থাকেন। প্রথম ইনিংসের রানের ক্ষয়ক্ষতি মিটিয়ে ভারত এগিয়েও যায় কিছু রানে। তবু শংকা দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল পিটিয়ে এ রান তুলে খেলায় বিজয়ীও হতে পারে। এই অবস্থার মধ্যেই শেষ মুখে ভারতের ২৭৪ রানের মাথায় অষ্টম উইকেট পড়ে গেল—বাকী রইলেন দুই আহত খেলোয়াড় উমরিগর ও মঞ্জরেকার। বোরদের রান সংখ্যা তখন ৯৫। খেলার আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকী। বোরদের সেঞ্চুরীর জন্যই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতে ব্যাট করতে এলেন মঞ্জরেকার। ব্যাট করতে বলা যায় না—ঠেকা দিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বোরদের। আর এক রান করে শেষ ওভারে গিলক্রিস্টের বল বাউণ্ডারী মেরে সেঞ্চুরী করতে গিয়ে তিনি হিট উইকেট আউট হয়ে গেলেন। পরপর দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করে হাজারের রেকর্ডকে স্পর্শ করার সাধ তার অপূর্ণ রয়ে গেল। খেলার উপর যবনিকা পড়লো। দিল্লীর ফিরোজ শা কোটলা মাঠে টেস্ট খেলায় ভারতের অপরাজিত থাকার রেকর্ড অব্যাহত রইল। একমাত্র বিজয় হাজারে ছাড়া টেস্ট খেলায় ভারতের আর কোন ব্যাটসম্যান একই টেস্টে পর পর দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করতে পারেননি। ১৯৪৭-৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার এডিলেড মাঠে চতুর্থ টেস্ট খেলায় ব্র্যাডম্যানের অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে হাজারে প্রথম ইনিংসে ১১৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৪৫ রান করেছিলেন।

পঞ্চম টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড:—

ভারত—প্রথম ইনিংস—৪১৫ রান (চাঁদু বোরদে ১০৯, নরী কণ্ট্রাক্টর ৯২, পলি উমরিগর ৭৬, হেমু অধিকারী ৬৩, ভি মানকড় ২১; ওয়েসলী হল ৬৬ রানে ৪ উইকেট, রয় গিলক্রিস্ট ৯০ রানে ৩ উইকেট, কোলী স্মিথ ৯৪ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—(৮ উইকেট ডিক্লেয়ার্ড) ৬৪৪ রান (জন হোল্ট ১২৩, জো সলোমন নট আউট ১০০, কোলী

টেস্ট এভারেজে শীর্ষস্থান অধিকারী জো সলোমন

স্মিথ ১০০, কনরাড হাণ্ট ৯২, গারফিল্ড সোবার্স ৪৪, রোহান কানহাই ৪০, এরিক অ্যাটকিনসন ৩৭, ফ্রাঞ্জ আলেকজান্ডার ২৫; রামকান্ত দেশাই ১৬৯ রানে ৪ উইকেট, হেমু অধিকারী ৬৮ রানে ৩ উইকেট।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস ২৭৫ রান (চাঁদু বোরদে ৯৬, পি রায় ৫৮, ডি কে গাইকোয়াড় ৫২, হেমু অধিকারী ৪০; কোলী স্মিথ ৯০ রানে ৫ উইকেট, রয় গিলক্রিস্ট ৬২ রানে ৩ উইকেট।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা ব্যাটিং বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে গেছেন ভারতের ক্রিকেট রসিকদের মন থেকে তা সহজে মুছবার নয়। এদের অনবদ্য ব্যাটিং নৈপুণ্য আগের ভারত আগত বহু খ্যাতিমান খেলোয়াড়ের নৈপুণ্যকে ম্লান করে দিয়েছে। বোলিংয়ে দুই ফাস্ট বোলার রয় গিলক্রিস্ট ও ওয়েসলী হল ভারতের ব্যাটসম্যানদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে গেছেন। ৫টি টেস্টে হল ৩০টি উইকেট এবং ৪টি টেস্টে গিলক্রিস্ট ২৬টি উইকেট পেয়েছেন। ব্যাটিংয়ে সবচেয়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিশ্বের অন্যতম সুনিপুণ ব্যাটসম্যান গারফিল্ড সোবার্স ও রোহান কানহাই। কলকাতার তৃতীয় টেস্টে কানহাইয়ের ২৫৬ রান ভারতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী রান করার কৃতিত্বে উজ্জ্বল। অধিনায়ক এবং বিশ্বের একজন প্রথম শ্রেণীর উইকেট কিপার হিসাবে ফ্রাঞ্জ আলেকজাণ্ডারের সাফল্যও উল্লেখযোগ্য। বোলিং এভারেজে রয় গিলক্রিস্ট শীর্ষস্থান লাভ করলেও ওয়েসলী হলের ৯২৯ রানে ৬৫টি উইকেট লাভের ঘটনা কম উল্লেখযোগ্য নয়।

টেস্ট খেলার ব্যাটিং এভারেজে শীর্ষস্থানে রয়েছেন জো সলোমন। তারপর সোবার্স ও কানহাইয়ের স্থান। কানপুরের দ্বিতীয় টেস্ট থেকে সলোমনের টেস্ট জীবনের সূচনা হয়েছে। সফরের ব্যাটিং এভারেজে অবশ্য গারফিল্ড সোবার্সের স্থানই সবার উপরে। সোবার্স এবং কানহাই সফরের সহস্র রানও পূর্ণ করেছেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৭ জন খেলোয়াড় সফরে মোট সেঞ্চুরী করেছেন ১৬টি এর মধ্যে কানহাইয়ের ডবল সেঞ্চুরীও ধরা হয়েছে। সোবার্স ৫টি, হোল্ট ৩টি, কানহাই, বুচার ও কোলী স্মিথ দুটি করে এবং সলোমান ও হাণ্ট একটি করে সেঞ্চুরী করেছেন।

দেশী সংবাদ

৯ই ফেব্রুয়ারী—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আজ নয়াদিল্লীতে সংসদের বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করিয়া বলেন যে, তাঁহার সরকারের নীতি ও প্রচেষ্টা হইতেছে এরূপ এক গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী সমাজ গঠন করা যাহাতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ও সম্মতি দ্বারা প্রগতি লাভ করা যাইতে পারে।

খাদ্যের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরাসরি উড়িষ্যা হইতে কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা মণ প্রতি আট আনা অধিক মূল্যে যে চাউল ক্রয় করিতেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এক আদেশ জারী করিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল।

১০ই ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে রাজ্য সরকার গত দশ দিনের মধ্যে খাদ্যের ঘাটতি পূরণের জন্য উড়িষ্যা হইতে পাঁচ হাজার টন চাউল আমদানী করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যা হইতে চলতি বৎসরে আপাততঃ আড়াই লক্ষ টন চাউল কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মাধ্যমে সরবরাহ করিতে সম্মত হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

শিক্ষা আন্দোলন সমন্বয় কমিটির আহ্বানে এবং প্রধানত বেতন বৃদ্ধির দাবীতে অদ্য বিকালে পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কয়েক সহস্র শিক্ষক শিক্ষিকা রাজ্য বিধানসভা অভিমুখী এক অভিযানে যোগ দেন। গ্রন্থাগারিক, করণিক প্রভৃতি বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণীর কর্মচারীরাও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য অপরাহ্নে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অর্থমন্ত্রিরূপে রাজ্য বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৫৯-৬০ সালের বাজেট পেশ করেন। উহাতে দেখা যায় যে, আগামী বৎসর (১৯৫৯-৬০) রাজ্য সরকারের রাজস্বখাতে আনুমানিক ৩ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণের জন্য নূতন কর ধার্যের কোন প্রস্তাব নাই।

বসন্ত পঞ্চমী উপলক্ষে গঙ্গা-স্নানার্থীদের চাপে গঙ্গার উপরস্থ একটি ভাসমান সেতু ভাঙ্গিয়া পড়ায় ত্রিবেণী সঙ্গম-এর (এলাহাবাদ) নিকট ১২ ব্যক্তি জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। নিহতদের মধ্যে ৪জন স্ত্রীলোক, ৩টি শিশু এবং অপর ৫জন বয়স্ক পুরুষ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনকল্যাণমূলক যেসব দপ্তর বরাদ্দমত অর্থ ব্যয় করিয়া উঠিতে পারে নাই, তাহার মধ্যে জনস্বাস্থ্য বিভাগই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সনে ঐ বিভাগে খরচ না হইয়া যে টাকা পড়িয়া রহিয়াছে তাহার পরিমাণ ১,০৬,০৮,০০০ টাকা।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য লোকসভায় প্রশ্নোত্তরের সময় নেহরু-নূন চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়ি ইউনিয়ন পাকিস্তানের নিকট হস্তান্তরিতকরণ এবং উক্ত ভারতে রাখিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত অনুরোধসূচক প্রস্তাব বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু লোকসভাকে এই আশ্বাস দেন যে, "আমরা এই ব্যাপার সম্বন্ধে গভীর উদ্বিগ্ন। আমরা এই বিষয়ের প্রত্যেক দিক অধিকতম মনোযোগের সহিত বিবেচনা করিব।"

১৪ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য শ্রীঅরবিন্দের পবিত্র দেহাবশেষ কলিকাতা আসিয়া পৌঁছাইলে কলিকাতা নাগরিকবৃন্দের পক্ষ হইতে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়। অপরাহ্ন ৪-৫ মিনিটে মাদ্রাজ মেলযোগে উহা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছায়।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষকগণের জন্য প্রভিডেণ্ড ফণ্ড প্রচলনের কথা স্থির হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রধানমন্ত্রী ডাঃ রায় কর্তৃক শিক্ষক প্রতিনিধিদের সরকারী সিদ্ধান্তের কথা জ্ঞাপন করা হয়।

সরকারী মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনী ইচ্ছাপূর্বক আসাম সীমান্তে গুলীবর্ষণের ব্যাপকতা বৃদ্ধি করিয়াছে এবং লাতু বাজার ও মহীশাসনের ন্যায় জনবহুল গ্রামগুলিতেও গুলীবর্ষণ শুরু করিয়াছে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য হাওড়া পৌরসভা ভবনে পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল কর্মচারী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সরকার নিযুক্ত ন্যূনতম বেতন নির্ধারণ কমিটির সিদ্ধান্ত এখনও গৃহীত না হওয়ায় আগামী ২০শে মার্চ উহার প্রতিবাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ৮৬টি মিউনিসিপ্যালিটির ২০ হাজার পৌর কর্মচারীকে প্রতীক ধর্মঘট পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

অদ্য কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গ ব্যবসায়ী সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে বিশিষ্ট বক্তারূপে প্রখ্যাত শিল্পপতি ডাঃ এ রামস্বামী মুদালিয়র এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও শিল্পপতির মধ্যে দুর্নীতির প্রচলনে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলেন যে এই দুর্নীতি সামগ্রিকভাবে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের সুনাম ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

৯ই ফেব্রুয়ারী—মার্কিন রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্র কমিটির গোপন বৈঠকে বলেন, কুয়েময় ও মাৎসু দ্বীপে কম্যুনিস্ট চীনের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হইলে সমগ্র পূর্ব এশিয়ায় স্বাধীন জগতের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিবে। এত বড় মূল্য দিতে আমরা স্বীকৃত হইতে পারি না।

১০ই ফেব্রুয়ারী—হোয়াইট হাউস হইতে গতকল্য রাত্রে ঘোষণা করা হয় যে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জন ফস্টার ডালেস স্বাস্থ্যের কারণে 'কিছুদিনের জন্য' পররাষ্ট্র মন্ত্রীর কার্যভার ত্যাগ করিয়াছেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্থানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের বিশেষ প্রতিনিধি মিঃ জর্জ মেঘি ও মার্কিন সেনানীমণ্ডলের অধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল রাডফোর্ড অদ্য রাত্রিতে করাচী আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

থাইল্যাণ্ডের রাজা ফুমিফন আদুলদেত গতকল্য ১৫জন সদস্য লইয়া একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন এবং ফিল্ড মার্শাল সরিত থানারাতকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ফিল্ড মার্শাল সরিত থানারাত গত অক্টোবর মাসে রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের পর থাইল্যাণ্ডের শাসনক্ষমতা দখল করেন।

১২ই ফেব্রুয়ারী—রাজা মহেন্দ্র আজ এক রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা নেপালের জন্য এক সংবিধান প্রদান করিয়াছেন। ৭৭টি অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট এই সংবিধানে নেপালে পার্লামেণ্টারী শাসন ব্যবস্থার বিধান দেওয়া হইয়াছে। সংবিধান কোন তারিখ হইতে বলবৎ হইবে তাহা রাজা পরে নির্ধারণ করিয়া দিবেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল নে উইন অদ্য সকালে প্রতিনিধি পরিষদে বলেন যে, তিনি প্রেসিডেণ্টের হস্তে তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, দেশের পরিস্থিতি সন্তোষজনক না হওয়ায় বর্তমান কার্যকালের পূর্বে দেশে অবাধ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

১৪ই ফেব্রুয়ারী—ইন্দোনেশিয়ার কৃষিমন্ত্রী ডাঃ সাজোর গতকল্য বলিয়াছেন, ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের যে সকল রবার বাগিচা রহিয়াছে, সেগুলি রাষ্ট্রীকরণের সিদ্ধান্ত গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার অদ্য ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। আক্রমণের তীব্রতা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। চিকিৎসার জন্য তাঁহার ছুটি চলিতে থাকিবে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—আগামী মঙ্গলবার সাইপ্রাসের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য লণ্ডনে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হইবে, তাহাতে যোগদানের জন্য সাইপ্রাসের গ্রীক সম্প্রদায়ের নেতা আর্চ বিশপ মাকারিওস আজ বিমানযোগে লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি বলেন, লণ্ডন সম্মেলন ঠিকভাবেই সাইপ্রাস বিরোধের মীমাংসা করিবে বলিয়া তিনি আশা করেন।

মার্কিন নৌবিভাগের অ্যাডমিরাল অরলে এ বার্ক সেনেটের একটি কমিটির নিকট জানাইয়াছেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর আকস্মিকভাবে সোভিয়েট সাবমেরিন আক্রমণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং এই ব্যাপারে নৌবিভাগের যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হইয়াছে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার | সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা
কালকাতা বার্ষিক ২০ টাকা ষাণ্মাসিক ১০ ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।
মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা ষাণ্মাসিক ১১ ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REG. NO. C. 2109

দেশ

২৬ বর্ষ] শনিবার ১৬ ফাল্গুন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ DESH Saturday, 28th February, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ১
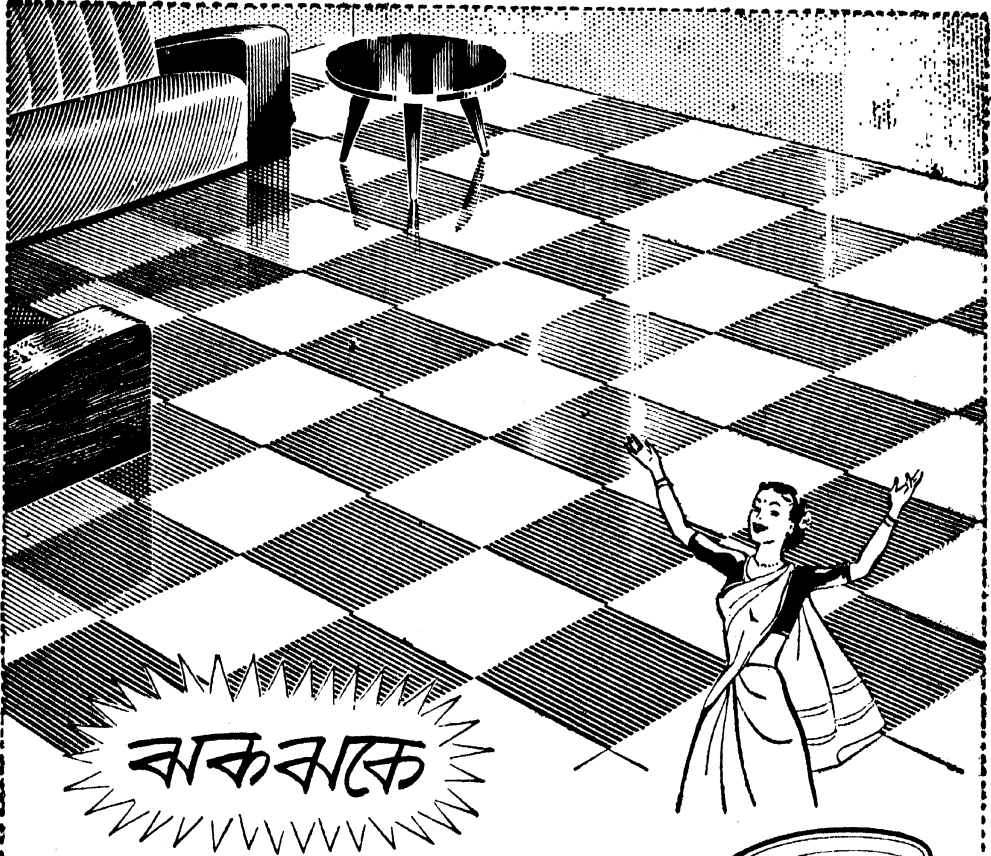
যা একমাত্র ভিমই করতে পারে!

ঝকঝকে, নিখুঁত পরিষ্কার মেঝে সুরুচীসম্মত জীবনযাত্রার পরিচায়ক। আপনার বাড়ীর মেঝে **ভিম** দিয়ে পরিষ্কার করে দেখুন—ময়লা আর তেলতেলে ভাব তাড়াতাড়ি উবে যাবে—আপনার বাড়ীর মেঝে ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। অন্য কোন উপায়ে আপনি কখনই মেঝে এত পরিষ্কার করতে পারেননি। **আপনার বাড়ীর মেঝে আপনার গর্বের বিষয় করে তুলুন—সপ্তাহে একদিন মেঝে ভিম দিয়ে পরিষ্কার করা অভ্যাস করুন।**

আপনার চিনেমাটীর বাসন, কাঁচের জিনিষ, রান্নাঘরের বাসনপত্র এবং বেসিন পরিষ্কার করার জন্যেও **ভিম** ব্যবহার করুন। সর্বদা **ভিম** হাতের কাছে রাখুন।

VIM

for quick, spotless clean

আপনার বাড়ীর জন্যে দরকার ভিম

V. 96-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

(১) মোহন (২) কারাগারে মোহন (৩) মোহন ও রমা (৪) রমার বিয়ে (৫) আবার মোহন (৬) রমাহারা মোহন (৭) নাগরিক মোহন (৮) মোহনের জার্মানী অভিযান (৯) মোহনের অজ্ঞাতবাস (১০) ব্যবসায়ী মোহন (১১) নারীত্রাতা মোহন (১২) রহস্য-সীমান্তে মোহন (১৩) মুখোস মোহন (১৪) মোহনের তূর্যনাদ (১৫) মোহন ও জল্লাদ (১৬) দস্যু মোহন (১৭) মোহন ও স্বপন (১৮) মোহান্ত দমনে স্বপন (১৯) স্বপনের সীমান্ত সংঘর্ষ (২০) গেষ্টাপো-যুদ্ধে মোহন প্রভৃতি ২০৪ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি খণ্ড ২৲। সম্পূর্ণ তালিকার জন্য পত্র লিখুন, কিম্বা ২৯-১১-৫৮ তারিখের 'দেশ' দেখুন।

* দীনেন্দ্রকুমার রায়ের কয়েকখানি ক্লাসিক রহস্যোপন্যাস। প্রত্যেকটি ২।০

চীনের নব-নায়ক
দুলের হীরার দুল
মুগুরে দাওয়াই
অদৃশ্য-সংগ্রাম
সাংঘাতিক উইল

শ্রীবিমলপ্রতিভা দেবীর উপন্যাস

নতুন দিনের আলো

ব্রিটিশ আমলের বাজেয়াপ্ত আদেশ জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রত্যাহৃত। মূল্য ৩৲

শ্রীশৈলেশ বিশী বি-এল রচিত

শরৎচন্দ্রের জীবন উপন্যাস

শরৎচন্দ্রের জীবন ছড়িয়ে রয়েছে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে। শরৎচন্দ্রের বিশিষ্ট বন্ধু তাদেরই নূতন করে প্রাণ-সঞ্চার করেছেন এই গ্রন্থে। কোন্ চরিত্র কি ভাবে শরৎচন্দ্রের জীবনে এসে দেখা দিয়েছিল, তা জানতে পারবেন এই গ্রন্থ পাঠ করলেই। মূল্য ৪৲

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন

শ্রীকান্ত, অভয়া, কমলা, অচলা রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি চরিত্রগুলির মূল কোথায়? সর্বোপরি বহু জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন—রাজলক্ষ্মী, পিয়ারী বাঈজি কি তার জীবনের মূলাধার? সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন এই গ্রন্থে। মূল্য ২৲

সুভাষ-স্মৃতি ২৲

শশধর দত্তর উপন্যাস

অভিমন্যুর লক্ষ্যভেদ ৩৲
তুমি দেবী-তুমি দানবী ৩৲
সর্বজয়ী প্রেম ৩৲
প্রগতি ৩৲ নারী ২৸০
অভিনব ৩৲ মুক্তাগড় ৩৲
শঙ্করের নবজন্ম ১৸০
চীনের পুতুল ২৸০
এ-যুগের মেয়ে ৩৲
হিংসা না অহিংসা ৩৲
কমলা না সাবিত্রী ৩৲

বিজয়রত্ন মজুমদারের উপন্যাস

নূতন বধূ ২৲ মহাতীর্থ ২৲
স্ত্রীর চিঠি ২৲

বিশ্ব-গল্পিকা গ্রন্থমালা

[বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প-সঞ্চয়ন]

ফরাসী শ্রেষ্ঠ গল্প [৩য় সং] ২৲
ইংরাজী শ্রেষ্ঠ গল্প [২য় সং] ১।০
আমেরিকার শ্রেষ্ঠ গল্প [২য় সং] ১।০
রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ গল্প [২য় সং] ১।০
জার্ম্মাণীর শ্রেষ্ঠ গল্প [২য় সং] ১।০
ইটালীর শ্রেষ্ঠ গল্প [২য় সং] ১।০
রুশযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ গল্প ১।০
বালজাকের শ্রেষ্ঠ গল্প ১।০

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় রচিত

পরলোকের বিচিত্র কাহিনী

পরলোকের গল্প

পরলোক সম্বন্ধে অর্ধশতাব্দীর গবেষণা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত বহু বিচিত্র কাহিনী। গল্পগুলি সত্য হলেও রোমাঞ্চকর ও অপূর্ব রহস্যময়! এই গ্রন্থদ্বয়ে বাঙলার বহু বিখ্যাত লোকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা জানতে পারবেন। প্রত্যেকটি ২।০

শেষ পর্য্যন্ত ৩৲

স্ত্রী-ভাগ্যে ২৲ কাঁচা ও পাকা ৩৲
সবগুলিই নূতন ধরণের কমেডি উপন্যাস

এ লেডিজ ম্যান ৩৲

মোপাসার বিখ্যাত উপন্যাসের ভাবানুবাদ।

বাবলা ২।০ সহসা ২৸০

চলচ্চিত্রে রূপায়িত

স্রোত বয়ে যায় ৪৲
বঞ্চিতা ৩৲ ভাঙন ২৷৷৵০
মেঘ-কজ্জলী ২৲ কালরাত্রি ১।০
কাশী ডাক্তার ১৸০ বধূ বিপ্লব ১৸০
দুর্জ্জয়ময়ী ১৸০
সোনার কাঠি ২৲ আলোছায়া ২৲

রবীন্দ্র-স্মৃতি

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ও সাহিত্য-সাধনার উপর নূতন আলোক সম্পাত করেছেন সৌরীন্দ্রবাবু এই স্মৃতি-কাহিনীতে। বহু অপরিজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান পাবেন এই গ্রন্থে। দেশ, যুগান্তর, আনন্দবাজার, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চপ্রশংসিত। মূল্য ৩।০

পূর্ণশশী দেবীর নূতন উপন্যাস

স্রোতের মুখে ২৲

চিত্ত ও বিত্ত ২৲ মরু-নির্ঝর ১।০
মনের মানা নাই ৩৲

যশস্বী নাট্যকার শচীন্দ্র সেনগুপ্তের

মরণ-মহল (রহস্যোপন্যাস) ২৲
বাঙলার মেয়ে—আশালতা ২৲
প্রেম ও খুন—কেশব গুপ্ত ২৲

চিত্র-তারকাদের কাহিনী

রূপলোকের নর-নারী ২৲
ছায়ালোকের শ্রীমতীরা
১ম ১৷৷৵০ ২য় ১৸৵০

সাধারণ পাঠকেরা অনূন দশ টাকার বই ভি, পি-তে নিলে ডাক-ব্যয় লাগবে না।

শিশির পাবলিশিং হাউস ২২।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

সূচীপত্র

সূচীপত্র

LUX
For gentle washing
of lovely clothes

সূচীপত্র

মেট্রিক পদ্ধতির ওজন ও মাপ
আমাদের দুটি বড়ো উপকার
করবে। অসংখ্য রকমের ওজন ও মাপ
যে বিভ্রান্তি ও ক্ষতির কারণ হয়,
দেশ, তা থেকে মুক্তি পাবে।
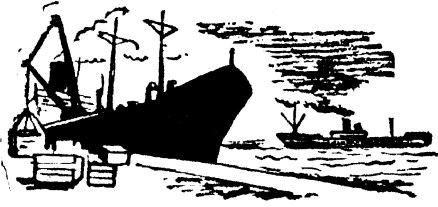
আমরা সেই সঙ্গে পাবো
আন্তর্জ্জাতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত
একটি পদ্ধতি। সমগ্র বিশ্বে এই
মেট্রিক পদ্ধতি স্বীকৃতি পেয়েছে।

এই দুইমুখীন উদ্দেশ্য সফল করার
প্রথম ব্যবস্থা হোল মেট্রিক ওজন
ব্যবহার করা। বিভিন্ন রাজ্যের
নির্ব্বাচিত অঞ্চলে ও শিল্পে ইতিমধ্যেই
এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছে।

সরলতা
ও
অভিন্নতার
জন্য

DA-58/433 BEN

ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রচারিত
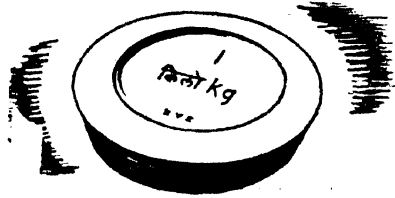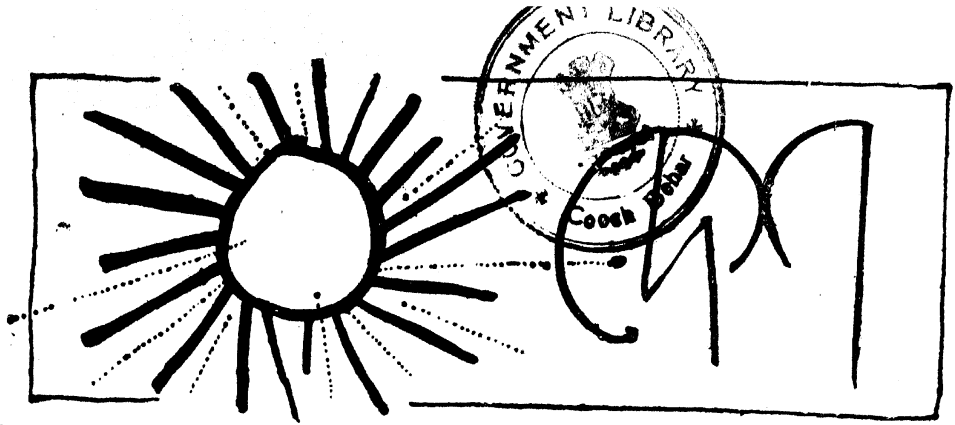
DESH 40 Naya Paisa.
Saturday. 28th February, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৮ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৬ ফাল্গুন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

নূতন কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী সহযোগিতার আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, নীতিগতভাবে যে-সব রাজনৈতিক দলের সহিত কংগ্রেসের বিরোধিতা নাই, তাহাদের কর্তব্য অবিলম্বে কংগ্রেসে যোগদান। খুব সম্ভব তাঁহার মনে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের কথাই ছিল। সত্যই প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের সহিত কংগ্রেসের নীতিগত বিরোধ সামান্য, কংগ্রেস ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের বিরোধ প্রধানত কর্মরীতিগত। তারপরে যখন মনে পড়ে যে, উক্ত দলের অধিকাংশ প্রধান সদস্যই এককালে নিষ্ঠাবান কংগ্রেস সদস্য ছিলেন, তখন রীতিগত বিরোধের ব্যবধান আরও কমিয়া আসে। কল্পনায় এই দুই দলের সহযোগিতাদর্শন অসম্ভব নয়। কংগ্রেস সভানেত্রীর অভিভাষণের পরে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের অন্যতম প্রধান আচার্য কৃপালনীজী লোকসভায় বলেন যে, কেবল দলীয় স্তরে সহযোগিতা করিলে ফলোদয় হইবে না। তিনি বলেন যে, কংগ্রেস সত্যই যদি সহযোগিতা কামনা করে, তবে সরকার গঠনেও সে নীতিকে গ্রহণ করিতে হইবে। সরল কথায় তিনি জাতীয় সরকার গঠনের পরামর্শ দেন। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনি প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের ন্যায় যেসব গণতান্ত্রিক দল নীতিগতভাবে কংগ্রেসের কাছাকাছি আছে তাহাদের সঙ্গেই একযোগে জাতীয় সরকার গঠনের পরামর্শ দিয়াছেন। সর্বশেষে তিনি জানাইয়াছেন যে. এই অভিমত তাঁহার নিতান্তই ব্যক্তিগত, দলের মত বলিয়া যেন ইহাকে গ্রহণ না করা হয়।

সর্বশেষে প্রধান মন্ত্রী নেহরু লোকসভায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্তমানে

কংগ্রেস সভানেত্রীর আহ্বান ও তারপরে

জাতীয় সরকার গঠনের কারণ নাই বা তাহা সম্ভবও নয়। তবে তিনি মূলত গণতান্ত্রিক দলগুলির সহযোগিতা কামনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্যে কংগ্রেস সভানেত্রী ও আচার্য কৃপালনী দুজনেরই কথার উত্তর পাওয়া গেল। কংগ্রেস সহযোগিতা প্রার্থনা করে, কিন্তু জাতীয় সরকার গঠন অবধি যাইতে চাহে না। নেহরু প্রকাশ করিয়া জানাইয়াছেন যে. কংগ্রেস দলের মধ্যে যে পরিমাণ মতভেদ আছে. বিরোধী দলগুলির মধ্যে মতভেদ তাহার চেয়ে কম নয়। এমন দুস্তর ব্যবহিত সদস্য লইয়া সরকার গঠন করিতে গেলে তাহা কখনোই শক্তিশালী হইবে না. শক্তি বর্ধন করিতে গিয়া শক্তির অপহ্নব ঘটিবে। নেহরুর আশঙ্কা মিথ্যা নয়। এরকম বিষম উপাদানে জাতীয় সরকার গঠন একমাত্র জাতীয় সঙ্কটের সময়েই কর্তব্য। জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই। আমরা অন্য কারণে বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেস ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের মিলনে জাতীয় সরকার বা সরকার গঠনের বিরোধী। সেটি গুরুতর কারণ। কংগ্রেসকে বাদ দিলে বোধ করি প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলই একমাত্র রাজনৈতিক দল. যাহার ভিত্তি গণতান্ত্রিক অভীপ্সা। অন্যান্য সরকার-বিরোধী দলগুলি সম্বন্ধে একথা শপথ করিয়া বলা যায় কিনা সন্দেহ, অনেকেই অন্যরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। একথা সকলেই জানেন যে, গণতান্ত্রিক সংবিধানের রেলগাড়ি দুই চাকায় চলে—তজ্জন্য দুইটি রেল-লাইনের আবশ্যক। এখন সেই দ্বিতীয় চাকার ও দ্বিতীয় লাইনের লোপে যেসব দল মূলত গণতান্ত্রিক নয়, তাহারা প্রবল হইয়া উঠিবে। আর সেভাবে প্রবল হইয়া উঠিলে কালক্রমে এদেশে গণতন্ত্র লোপ পাওয়া অসম্ভব হইবে না। ভারতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল। জানি যে, এখনও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল যথেষ্ট প্রবল নহে, কিন্তু কখনও প্রবল হইয়া উঠিবে না বলা চলে না। বরঞ্চ অনেকেই আশা করেন যে. আগামী নির্বাচনে উক্ত দল কোন কোন রাজ্যে সরকার গঠন করিতে সক্ষম হইবেন। আর গণতন্ত্রের ভিত্তি বেশ কায়েম হইয়া উঠিলে কোনকালে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দল ভারত সরকারের দায়িত্ব বহন করিবেন, এমন আশাও নিতান্ত ভিত্তিহীন নয়। কিন্তু কোন কারণে সেই দল যদি কংগ্রেসের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়, তবে সে সম্ভাবনা ও আশা এককালে লুপ্ত হইয়া ভারতীয় গণতন্ত্রকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে। প্রধানত এই কারণেই আমরা কংগ্রেস ও প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের একীভবন সমর্থন করি না. তাহারা দূরত্ব ও স্বকীয়ত্ব রক্ষা করিয়াই অভীষ্ট সিদ্ধি করিতে সক্ষম, ইহাতেই তাহাদের শক্তি ও সার্থকতা। এক্ষেত্রে Unity is Strength নীতি অচল, বরঞ্চ বলা উচিত Strength in diversity।

কংগ্রেস সভানেত্রী সম্যক্ বিবেচনা করিয়া আহ্বান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। নেহরুর ব্যাখ্যাই যথার্থ। তবে যে তিনি সহযোগিতার প্রার্থনা জানাইয়াছেন—সে সম্বন্ধে আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে—"স্ত্রীলোকের মনোভাব দেবতারাও জানিতে অক্ষম," সেই সঙ্গে "রাজনীতিকের মনোভাব"—কথা দুটিও যুক্ত হওয়া উচিত।

আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে, ভারত-রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে এমন কয়েকজন মানুষকে আমরা পেয়েছি, যাঁদের সততা প্রশ্নাতীত। মহৈশ্বর্যেও যাঁরা নম্র থাকেন এবং মহাদৈন্যেও নত হন না। যন্ত্রণার অগ্নিপরীক্ষায় তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন। কর্মশক্তি তাঁদের বিপুল, কর্মের স্পৃহা বিপুলতর। এক মহান লক্ষ্যের উপরে তাঁদের দৃষ্টিকে তাঁরা নিবদ্ধ রেখেছেন। ভারত-ভূমির ভবিষ্যৎ-সমৃদ্ধিই সেই লক্ষ্য। এবং সেই লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য উপস্থিত মুহূর্তের প্রয়োজনটাকে তাঁরা কখনও বড় করে দেখেননি।

অন্তত এতকাল তা-ই জানতাম। প্রথম এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচী দেখে অনেকে যখন আতঙ্কিত হয়েছেন, আশু প্রয়োজনের তাগিদকে তাতে আদৌ প্রাধান্য দেওয়া হয়নি দেখে অনেকে যখন আর্ত বেদনায় ধিক্কার দিয়ে উঠেছেন, তখনও আমাদের বিশ্বাস বিচলিত হয়নি। আমরা জানতাম, আশু লাভটা কোনও কাজের কথা নয়—চূড়ান্ত লাভ যাতে হবে, সেইটেই গ্রাহ্য। অন্য গতি নাস্তি। অন্তত এদেশে নয়। বর্তমান সময়ে নয়।

এখন মনে হচ্ছে, অন্য গতিও ছিল। কয়েকটি ব্যাপারে অন্তত দেখা গেল, আশু লাভের তাগিদটাকেই সবচাইতে বড় করে দেখা হয়েছে। চোখের সামনের বুড়ো আঙুলটাই দূরের পাহাড়কে ঢেকে দিয়েছে। উদ্দেশ্যের কাছে আদর্শ পরাভূত হয়েছে। পলিটিক্সের কাছে স্টেট্‌সম্যানশিপ।

দৃষ্টান্ত মুর্শিদাবাদ জেলার চার হাজার একর জমি। ইতিমধ্যেই যা পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দৃষ্টান্ত বেরুবাড়ি। অনতিকালের মধ্যে যাকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেবার আয়োজন চলেছে। নেহরু-নুন চুক্তির পূর্ণ বিবরণ আজও প্রকাশিত হয়নি। যবনিকার অন্তরালে নয়াদিল্লীর ঘরোয়া রঙ্গমঞ্চে কোন্ রহস্যময় নাটক যে অভিনীত হয়ে গিয়েছে, সাধারণ মানুষ তার খবর রাখে না। যাঁরা অসাধারণ মানুষ, তাঁরা নীরব হয়ে আছেন। তবু দৃষ্টান্ত দুটি থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, নাটকটা ছিল বিয়োগান্ত। ভারতীয় স্বার্থের বিচারে। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, অন্তত এই একটা ব্যাপারে আশু লাভের মোহটাই শ্রী নেহরুর মনে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল। পরিণামে, আশু লাভটাও তাঁর ঘটেনি। 'সুখের লাগি' তিনি সন্ধি চেয়েছিলেন। যে-কোনও শর্তে। সন্ধি মেলেনি। সুখ দূরে চলে গিয়েছে।

প্রসঙ্গত

ভেবে দেখা যাক, আশু লাভটা কী হতে পারত। সীমান্তে শান্তিরক্ষা। পাকিস্তানের দৌরাত্ম্য যখন চরমে উঠেছিল, সীমান্তবর্তী ভারতীয় অঞ্চলের নাগরিকদের জীবন যখন দুর্বহপ্রায়, খবরের কাগজ খুললেই যখন পাকিস্তানী হামলার নিত্য নূতন বিবরণ চোখে পড়ত, তখন—সেই অস্বাভাবিক অবস্থার পটভূমিকায়—আয়োজন হল নেহরু-নুন বৈঠকের। চুক্তি সম্পাদিত হল। শ্রী নেহরু নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন, এতে করে আর কিছু না হক, সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। সে-আশা মরীচিকার মতই মিলিয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের

বিজ্ঞপ্তি

১৯৫০ সালে নেপালে রাণাসাহীর বিরুদ্ধে গণবিপ্লবের ইতিহাস লিখেছেন ভোলা চট্টোপাধ্যায়। লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ এই ইতিবৃত্ত 'উনিশ শ' পঞ্চাশের নেপাল' আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক 'দেশ'

দৌরাত্ম্য আজও বিন্দুমাত্র কমেনি, সীমান্তবর্তী ভারতীয় অঞ্চলগুলির নাগরিকদের জীবন এবং সম্ভ্রম আজও সমান অনিশ্চিত, এবং খবরের কাগজ খুললে পাকিস্তানী হামলার সেই একই রকমের ভয়াবহ সব বিবরণ আজও চোখে পড়ে।

অথচ, পাকিস্তানের কার্যকলাপের সামান্যমাত্র খবরও যিনি রাখেন, তিনিই জানেন, ভারতের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপনের বিন্দুমাত্র বাসনা তার নেই। পাকিস্তানের এই ভারতবিরোধী ভূমিকা কিছু অস্বাভাবিকও নয়। ভারতের সঙ্গে বিরোধটাকে জিইয়ে রাখাই তার স্বার্থের অনুকূল। বিরোধকে জিইয়ে রাখার উপরেই তার সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। সে জানে, এ-বিরোধ মিটে গেলেই তার জনসাধারণের দৃষ্টি পড়বে অন্যান্য সমস্যার উপর। ভারতীয় জুজুর ভয় দেখিয়ে যাদের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে, তারা তখন ভাত চাইবে, কাপড় চাইবে, বর্ষাকালে মাথার উপরে একটা ছাদ চাইবে। যা দেবার সাধ্য পাকিস্তানের নেই। সে কেন ভারতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করবে? সাধ করে সমস্যার সৃষ্টি করবে?

প্রশ্ন হল, শ্রী নেহরু কি একথা জানতেন না? জেনেও কেন যে-কোনও মূল্যে তিনি তার বন্ধুতা অর্জন করতে গিয়েছিলেন? তার চাইতেও বড় প্রশ্ন, যে-কোনও মূল্য দেবার ক্ষমতা তাঁর আছে কিনা। হয়ত তাঁরও নেই। যত বড় হও, তুমি ত রাষ্ট্রের চেয়ে বড় নও। বেরুবাড়ি সম্পর্কে যে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছে, তাতে এই কথাটাই শ্রী নেহরুকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি স্বীকারও করেছেন, এ-ব্যাপারে তাঁর হয়ত একটা ভুল হয়ে থাকবে। ভুল যদি হয়েই থাকে, তাকে সংশোধন করবার মতন সৎসাহসই বা তাঁর হবে না কেন?

• • •

কলকাতায় ছাত্র-ধর্মঘট অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত নিবারিত হয়েছে। বড় কয়েকটি কলেজের অধ্যক্ষবৃন্দ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁদের কলেজে যাতে ছাত্রদের বেতন বাড়ান না হয়, তার জন্য কর্তৃপক্ষকে তাঁরা অনুরোধ জানাবেন। সংকট কেটে গিয়েছে, সুখের কথা। তবু প্রশ্ন জাগে, অকারণে—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে—কেন এই সমস্যার সৃষ্টি করা হয়েছিল। এখন যে-হারে বেতন নেওয়া হয়, সেইটুকু দেবার সাধ্যও যে অধিকাংশ ছাত্রেরই নেই, তা কি তাঁরা জানতেন না? কলেজ চালাবার খরচা বৃদ্ধি পেতে চলেছে, সন্দেহ নেই, কিন্তু তার জন্য ছাত্রসমাজ দণ্ড দেবে কেন? যে-শিক্ষা তারা পায়, তার মান ত ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পায়নি। শ্রী দেশমুখ সম্প্রতি এই কথাটাই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ-কথা বুঝতে আরও কিছু সময় লাগল।

উৎকর্ষ না বাড়ালে যে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায় না, তা অবশ্য নয়। অর্থনীতির ছাত্রমাত্রেই জানেন, চাহিদা বাড়লেও খোলা বাজারের দাম অনেক সময় বেড়ে যায়। চালের দাম বাড়ে, তরকারির দাম বাড়ে, মাছের দাম বাড়ে। শিক্ষারও উৎকর্ষ বাড়েনি, কিন্তু চাহিদা বেড়েছে। মুশকিল এই যে, শিক্ষাকে ঠিক চাল-ডালের মতন একটা পণ্যদ্রব্য বলে ভাবতে এখনও আমরা অভ্যস্ত হইনি। অথবা শিক্ষারতীদের আর-পাঁচটা সাধারণ ব্যবসায়ীর মতন। দেশবাসী তাঁদের শ্রদ্ধা করেন। সেই শ্রদ্ধার সম্মান তাঁরা রেখেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

কলেজ চালাবার জন্য যে বাড়তি টাকাটার দরকার হবে, আশা করব তার ব্যবস্থা করতে সরকারী উৎসাহে অতঃপর শৈথিল্য দেখা দেবে না।
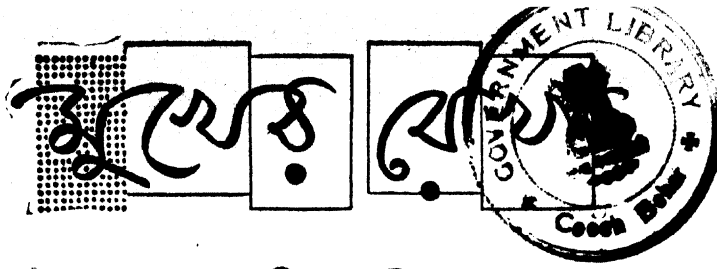
[১৮]

বিজনকে দেখে সৌর অবাক হয়েছিল। মাথায় ছয় ফুট হবে, এ-ঘরে ঢুকতে হলে বিজনকে মাথা হেঁট করে ঢুকতে হয়, তার মুখোমুখি দাঁড়ালে সৌর নিজেকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে। পানের দোকানে বিজনের পাশাপাশি দাঁড়াতে বরাবর সে অস্বস্তি বোধ করেছে। কারণ, পানের দোকানে আয়না থাকে, আয়নায় ছায়া পড়ে, রোগা, ছোট্ট সৌর কুণ্ঠায় আরও যেন ছোট হয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চায়।

বিজন ক'দিন থেকেই কলেজে আসছিল না, বিজনের সঙ্গে তার দেখা হচ্ছিল না। সত্যি কথা বলতে কী, বিজন ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল, অনেকটাই সরে গিয়েছিল। তার চেয়েও সত্যি কথা এই যে, বিজন, কলেজে যে তার একমাত্র বন্ধু, সে যে আসছে না, পাশে এসে বসছে না, এটা সৌর প্রথমে লক্ষ্যই করেনি। যেদিন লক্ষ্য করল, সেদিন সে বরং স্বস্তিই পেয়েছিল। বিজনের সান্নিধ্যে সৌর কিছুদিন থেকেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল না। কোথায় যেন সুর কেটে গিয়েছে, তাল মিলছে না। বিজনের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না সৌর, একটা অপরাধ বোধ ওকে আড়ষ্ট করে দিত। মামুলী কথা হত, আবহাওয়া নিয়ে, খেলার খবর নিয়ে, বড় জোর পাঠ্য বইয়ের নোট্-এক বিষয়ে—তার বেশী না। যেন দু'দিক থেকে দু'জন একটা বেড়া অবধি এসে, সীমানা না ডিঙিয়েই ফিরে যাচ্ছে। কিংবা, পিছল, পাথরে বাঁধান পথে দু'জনেই পা টিপে টিপে এগোচ্ছে, ভয়ে ভয়ে, সন্তর্পণে, পাছে টাল সামলাতে না পারে, পাছে পড়ে যায়। ফলে দু'চার কথা হতে না হতেই থেমে যেত, অস্বস্তিকর একটা নীরবতা, দু'জনের মাঝখানে আড়াল তৈরি করত।

ছুরি দিয়ে পেনসিল কাটত সৌর, আর আড়চোখে চাইত।—ও কী জেনেছে, ও কতটুকু জেনেছে, ও কি কিছুমাত্র জেনে ফেলেছে? এ কি সম্ভব যে, লতা বউদি ওকে কিছু বলেন নি? মুখে না বললেও তাঁর কোন আচরণ থেকেও কি বিজন কিছু অনুমান করতে পারেনি, কিংবা আভাস পায়নি মুখভঙ্গি থেকে। অনেক কাহিনী ত মানুষের নির্বাক মুখেও লেখা থাকে।

বিজন আসছিল না, সৌর ভেবেছিল এই ভাল। যে-সখ্যটা শুকিয়ে এসেছে, কতগুলো মিথ্যের ভান দিয়ে তাকে সজীব করে তোলার প্রয়াস আর করতে হবে না।

কিন্তু বিজন এল।

যেদিন এল, সেদিন বোধ হয় কোন একটা ছুটির দিন, কিন্তু সকাল থেকেই বৃষ্টি, বেরব-বেরব করেও বাড়ি ছেড়ে বের হতে সৌরর ভরসা হয়নি।

ঘরে বসেই কিছু লিখছিল বোধ হয়, অথবা পড়ছিল, ভাবতেও পারেনি, আজ কেউ আসবে, বা আসতে পারে। সারাদিন বৃষ্টি, কলকাতার গলি নিশ্চয়ই আকণ্ঠ ভরে উঠেছে। দরজা ভেজান ছিল।

কবাটে যখন টোকা পড়ল, সৌর তখন শুনতে পায়নি। কবাট একটু ফাঁক হল, পুরনো কবজা মৃদু প্রতিবাদের মত অস্ফুট শব্দ করল, সৌর তখনও ভেবেছিল জোলো হাওয়া। গায়ে চাদরটা আরও ভাল করে মুড়ে নেবে কিনা ভাবতে ভাবতেই, অন্যমনস্কভাবে দরজার দিকে চেয়েছিল।

কবাটের ফাঁকে ততক্ষণ একটা মুখ উঁকি দিয়েছে। সৌর চমকে উঠল।

কবাট দুটো প্রায় তখনই একেবারে আলগা

হয়ে গেল, ঘরে প্রকাণ্ড একটা শরীরের ছায়া পড়ল। সৌরর চিনতে দেরি হয়নি, সেই ছায়া বিজনের। বলে উঠল, 'তুমি!'

ভিজে জুতোর ছাপে ঘরের মেঝে যে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল, বিজন সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না, সোজা হেঁটে এসে একেবারে সৌরর টেবিলের পাশে দাঁড়াল।

ঘরে দ্বিতীয় চেয়ার ছিল না। সৌর তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বস।'

ওকে উঠতে দিল না বিজন। জোর করে বসিয়ে দিল। সৌর জানত, তবু সেদিন নতুন করে টের পেল, বিজনের কব্জিতে কত জোর।

বিজন টেবিলেই বসল পা ঝুলিয়ে। ওর জুতোর তলা ঘরের মেঝে স্পর্শ করল। ভিজে এসেছে বলেই হক, বা অন্য কোন কারণেই হক, বিজনের চুল কিছু অবিন্যস্ত, তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। জামাটা শপশপে ছিল একেবারে, আরশোলার শুঁড়ের মত বুকের দু' চারটে লোম ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। বিজনের যে-চোখ দুটি অল্প-অল্প লালচে, একটা সিগারেট ধরিয়ে তার ধোঁয়ায় সেই চোখ দুটিকে সে আড়াল করে নিল। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "তোর সংগে কয়েকটা কথা আছে।"

কী কথা, সৌরও যেন আন্দাজে বুঝতে পেরেছিল। সে-কথা সে শুনতে চায় না, এখনই না, এই বর্ষা-দিনের বিকালে নিসাক্ষী ঘরে অরক্ষিতভাবে বসে থেকে না। তাই থেকে থেকে সে উসখুস করতে থাকল, একবার হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট চাইল, একবার বলল, 'চা করতে বলি?'

বিজন ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, দরকার নেই।'

'জামা-কাপড়—অন্তত এই শার্টটা ছেড়ে ফেল।'

দৃষ্টি আনত করে নিজেকে একবার দেখে নিয়ে বিজন বলল, 'না, ঠিক আছে। গায়েই শুকিয়ে যাবে।'

সৌর বলল, 'তুমি অনেকদিন আসনি।'

জবাবে বিজন শুধু হাসল। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠছিল, তবু সৌর হাসিটা দেখতে পেল। যেন সেই হাসি থেকে প্রেরণা পেয়ে, কিংবা সেই হাসিরই খানিকটা ধার করে সৌর নিজেও একটু হাসল। বলল, আমি ভেবেছিলাম, তোমার অসুখ করেছে।'

'যাক, কিছু ভেবেছিলে তা হলে।'

'দু'দিন তোমাদের বাসাতেও গিয়েছিলাম।' বিজন তারই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে অনুভব করে, সৌর তাড়াতাড়ি যোগ করল, 'কিন্তু তোমার দেখা পাইনি।'

'বাসায় গিয়েছিলে, দেখা পাওনি, তবু ভেবেছিলে আমার অসুখ?' বিজন মোটা গলায় বলে উঠল, হাসল, কিন্তু সৌর এবার হাসল না, হাসতে পারল না, তার কান গরম হয়ে উঠল, সে মাথা নিচু করে রইল টের পেল, মিথ্যে কথাটা বিজনের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে।

একবার সৌর ভাবল, আলো জ্বালি, তা-হলে হয়ত এই থমথমে ভাবটা দূর হবে, আবার ভাবল, কেন এই ত বেশ, অন্ধকার আছে, তাই কিছু আড়ালও আছে, আলো জ্বাললেই আরও বেশী করে ধরা পড়ে যাব।

চুপ করে বিজন সিগারেট টানছিল,

একটার পর একটা, একটা না ফুরোতেই আরেকটা, টুকরোগুলো ঘরের মেঝেতেই ছুঁড়ে ফেলছিল, বিশ্রী লাগছিল সৌরর, ও বড় নোংরা, বড় অসাবধান, আগুনটাও নেবায় না কেন, যদি কিছু জ্বলে ওঠে, তখন কী হবে, তখন আমি কী করব, তার চেয়ে এখনই কোন কিছু জ্বলে ওঠার আগেই, আমিই কেন তৎপর হই না, সিগারেটের টুকরো-গুলো নিবিয়ে ফেলি না?

স্যাণ্ডেল দিয়ে ঘষে ঘষে সৌর সিগারেটের টুকরোগুলো নেবাতে থাকল।

বিজন কথা বলতে আরম্ভ করল আরও অনেক পরে। তখন বৃষ্টি থেমেছে, ওর প্যাকেটের সব সিগারেট ফুরিয়েছে, স্যাণ্ডেলের গোড়ালি দিয়ে একটি টুকরো নেবাতেও সৌরর বাকী নেই।

সব টুকরো নিবিয়ে নিবিয়ে সৌরও ওর মনের সাহস যেন ফিরে পেয়েছিল। বিজন এসেছে, আসুক না, বসে আছে থাকুক না, ও আমার কী করবে, সৌর মনে মনে কথাটা ভূত-তাড়ান জপমন্ত্রের মত আউড়ে চলছিল। ওর শরীর আমার চেয়ে ঢের বড়, ওর কবজিতে অনেক জোর, তাতে কী। ও কি এগিয়ে আসবে, আমাকে শক্ত করে চেপে ধরবে, ওর কঠিন হাতের মুঠোয় আমি কি মুচমুচে মুড়ির মত গুঁড়িয়ে যাব? গলা চিরে একটা শেষ আর্তনাদ করবারও সময় পাব না?

সৌর মনে মনে বিচার করছিল, আর নিজেকে বলছিল, দূর তা কী হয়। ও-ভাবে কেউ কাউকে শেষ করতে পারে! আমার দিক থেকে আমি যদি ওর কোন ক্ষতি না করি, ওকে এগিয়ে আসবার সুযোগই না দিই, তবে ও আমাকে ধরবে কী করে! আঘাত করতে হলেও একটা ছুতো ত চাই। সেই ছুতোর ও অপেক্ষা করে আছে, সৌর স্থির করল, কিন্তু আমি ওকে তা দেব না। আমি ত খাঁটি আছি, আর আমি যদি খাঁটি থাকি, তবে আমার ভয় কী। আমার গায়ে জোর বেশী নেই, কিন্তু মনের জোর হারাব কেন।

মনের জোরও যে জোর, তাই দিয়ে শারীরিক শক্তিকেও যে তুচ্ছ করা চলে, এ-কথা সৌর সেদিন, সেই অস্বস্তি-কণ্টকিত সন্ধ্যায় প্রথম টের পেয়েছিল। দেহগত ক্ষীণতার জন্য তার মনে অতঃপর আর কোন হীনতা-বোধ ছিল না, চিত্ত সম্পূর্ণভাবেই ভয়মুক্ত হয়েছিল।

ভয় দূর হতেই সৌর ভাবল, আমি যা-তা কী-সব চিন্তা করছি। বিজনের মনে খারাপ কোন অভিসন্ধি আছে তাই বা ধরে নিয়েছি কেন। তা যদি থাকত তবে ত তখনই ও অসহায় আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত, এতক্ষণ ও বসেই বা থাকবে কেন। সে-সব ত কিছু নয়, আমাকে কিছু বলতে এসেছে, হয়ত ওর কিছু প্রার্থনা আছে, সঙ্কোচ জয় করতে পারছে না বলেই ওর মুখ ফুটছে না।

যে-মুহূর্তে বিজনকে প্রার্থী হিসাবে সৌর কল্পনা করতে পারল, সেই মুহূর্তেই ওর বিপুল শরীর সৌরর চোখে যেন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেল। পরাক্রান্ত এই মানুষটা দুর্বল, অসহায়, পরাভূত, পদানত।

সৌর বিজনকে করুণা করতে আরম্ভ করেছিল।

বিজন এলোমেলো দু' একটা কথা দিয়ে শুরু করেছিল। সৌর ধরতে পারছিল না, তার লক্ষ্য কী। এই অসংলগ্ন কথা কয়টির ইঁটে পা রেখে রেখে কোন্ বিন্দুতে সে পৌঁছতে চায়।

বুঝতে দেরী হল না, বিজন হঠাৎ অস্বাভাবিক গলায় বলে উঠল, 'ভাই সৌর, আমি সব জানি। সবই বুঝেছি।'

'লতা—লতা বউদি বলেছে?' সৌর জিজ্ঞাসা করল মিষ্টি মিষ্টি চোখে চেয়ে।

বিজন বলল, "না, না। আমি এমনিতেই জেনেছি। এসব জিনিস আপনা থেকেই টের পাওয়া যায় না?"

বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই, তবু সৌর বলল, "যায়।"

সৌর লক্ষ্য করছিল বিজনকে। বিজনের হাতের আঙুল কাঁপছে, বিজন—রূঢ়ভাষী বিজন, এখন সীলিং-এর দিকে চেয়ে আছে। কথা বলবার সময় ওর ঠোঁটের কোণ কেমন বেঁকে চুরে যাচ্ছে। বিজনের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।

বিজনের কষ্টটাই ভিতরে গিয়ে অস্থির করে তুলল সৌরকে। সৌর অভিভূত হল, সৌরর কান্না পেল। একটা অনুতাপ ওর সত্তাকে মথিত করছে, সেই অনুতাপ সৌরকে সান্ত্বনায় মহৎ করল। প্রবল আবেগে সে হাত দুটি জড়িয়ে ধরল বিজনের। ধরা গলায় বলল, "ভাই বিজন, আমি তোমাকে ঠকিয়েছি। আমাকে ক্ষমা কর।"

বিজন হাত ছাড়িয়ে নিল। খুব আস্তে বলল, "না। তুমি আমাকেও ঠকাওনি। আমরা দুজনেই ঠকিয়েছি শচীপতিদাকে। আমাদের সব অন্যায় তাঁর কাছে।"

সৌর মাথা নেড়ে নেড়ে বলল, 'ছি-ছি, ছিঃ!'

বিজন বলল, 'তোমার ধিক্কার এখন এল ভাই, আমার এসেছে অনেকদিন আগে। তুমি সেই ম্যাজিক দেখনি সৌর, হাতের মুঠোয় একটা টাকা পুরে দিয়ে যাদুকর বলে, এবারে হাত খুলুন ত? যেই মুঠো খুললে তুমি, দেখলে কিছু নেই, ফাঁকা! আসলে, ম্যাজিকের টাকা নয়, সব পাওয়ার মধ্যেই সংসারে বিশ্রী একটা ফাঁকি আছে। আমি অনেকদিনই টের পেয়েছিলাম। যে-জিনিস পাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে যাই, আবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা মূল্যহীন হয়ে যায়, নাড়াচাড়া করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে সাধ হয়।'

সৌর তন্ময় হয়ে শুনেছিল। অবাক হয়ে ভাবছিল, বিজন এমন গুছিয়ে কথা বলতে শিখল কবে। যে-বিজনকে সে চিনত, এ ত সে নয়। এই কদিনের অজ্ঞাতবাসকালে বিজন বুঝি নিজেকেই শুধু বিচার করেছে। তবু, কথা বলার এই ধরনটুকু সে আয়ত্ত করল কবে।

সৌর বিজনকে বলে যেতে শুনল, "লতাকে একদিন সত্যিই চেয়েছিলাম। ওকে একটু দেখতে, ওকে একটু ছুঁতে; ছুঁলে জড়িয়ে ধরতে দিন-রাত চেয়েছি। একটু-একটু করে দেখা, ছোঁয়া, জড়ান—সব অধিকারই পেলাম। তখন মনে হল, সস্তা—এত সস্তা? সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ছাতে উঠে কখনও চারদিকে চেয়েছিস? অবসাদ বোধ করিসনি? আর কিছু করবার নেই, আরও ওঠবার মত ওপর নেই, এটা ভেবে খারাপ লাগেনি? আমার লেগেছিল। আমি ভেবেছিলাম, এর জন্যে এত কষ্ট? কী লাভ হল কষ্ট করে ওপরে উঠে, যার পরে একমাত্র কাজ নীচে নেমে যাওয়া?"

বিজন একটু দম নিল। বলল, "আমি অস্থির হয়েছিলাম। হয়ত পাগল হয়ে যেতাম, আমার শূন্যতাবোধই আমাকে শেষ করে দিত, কিন্তু শচীপতিদা আমাকে বাঁচালেন।"

"শচীপতিদা?"

"শচীপতিদা। আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। সব খুলে বলেছিলাম।"

"তিনি কী বললেন?"

"কিছু না। একটি কথাও না। আমি বলে উঠলাম, আপনার হিংসে হয় না? শচীপতিদা বললেন, না। আমি শেষটাও জানি যে। আমি বললাম, কী রকম? শচীপতিদা বললেন, একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলি। ধর, এক দেশে যদি অত্যাচারী কোন রাজা মাথা তোলে, প্রজারা হাহাকার করে, কাঁদে, তাকে অভিশাপ দেয়, হয়ত ষড়যন্ত্রও করে। কেবল একজন করে না। সে কে, জান? সে হল সেই জ্যোতিষী, সূতিকায় যে রাজপুত্রের করকোষ্ঠী বিচার করেছিল। আর কেউ জানে না, কিন্তু সে জানে, এই রাজার পরমায়ু কতদিন, কবে তার খেলা ফুরবে। মৃদু মৃদু হেসে শচীপতিদা বললেন, আমিও সেই জ্যোতিষী। অনেক দেখে দেখেই ত্রিকালজ্ঞ হয়েছি। জানি, কার খেলা কবে ফুরবে।"

প্রায় এইরকমই একটা কথা সৌর লতার কাছেও শুনেছিল, তাই বিস্মিত বা বিচলিত হল না। বিজনকে সে বাধাও দিল না। বোধ হয় কথায় পেয়েছিল বিজনকে, সে বলে গেল, "আজ আমি সবচেয়ে ভালবাসি শচীপতিদাকে। অনেক নিষ্ঠুরতাও তিনি করেছেন। আমি আর লতা যখন একলা আছি, হঠাৎ এসে পড়েছেন, আমরা, অন্তত আমি, মনে মনে কামনা করেছি, ও যাক, সরে যাক, কেননা এই মুহূর্তে উত্তেজিত শরীর আমাদের তার ধরে রাখতে পারছে না। তখনও শচীপতিদা নড়েননি, একখণ্ড ভারী পাথরের মত দুজনের মাঝখানে বসে থেকেছেন। আমাদের যন্ত্রণা দিয়ে যেন নিষ্ঠুর মজা পেয়েছেন। এ যেন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতিরই একটা রকমফের। ওই একটুখানি মজা পাবার বিলাস শচীপতিদা নিজের জন্যে রেখে দিয়েছিলেন।"

সৌর আজও চোখ বুজলে শচীপতির শান্ত সৌম্য রূপ দেখতে পায়। ওই শান্তির রহস্যটুকুও সে জানে। সেদিন শান্ত ধ্যানাসনে বসে কী বর প্রার্থনা করেছেন শচীপতিদা? তিনি নিজে বুড়ো হয়ে পড়েছেন, লতাও কবে বুড়ি হবে, সেইজন্য কি দিন গোনেননি? বয়সের যে-ধাপটিতে উঠে শচীপতিদা এখন হাঁপাচ্ছেন, সেখানে বসে

বার বার কি তিনি লতাকে ডাকেননি, তুমিও এস, এখানে আমার পাশে ব'স! তাঁর নিজের বাসনার কবেই ত নিবৃত্তি ঘটেছে, লতারও যেদিন ঘটবে, সেদিন দুজনে আবার মিলতে পারবেন। প্রৌঢ় শচীপতি সেই বীত-বাসনা, নিঃসঙ্গ, অনুদ্বেল যৌথ দাম্পত্য-জীবনের প্রতীক্ষা করছিলেন। উৎসুক হয়ে একটির পর একটি দিন গুনছিলেন।

সব কথা ফুরিয়ে যাবার পরও বিজন সেদিন আরও কিছুক্ষণ ছিল। একদৃষ্টে সৌরর দিকে চেয়েছিল। সৌরও ছিল মূঢ়, লজ্জিত স্তূপের মত, হাঁটুতে মুখ গুঁজে। অনেক পরে বিজন উঠে দাঁড়াল। বলল, "না সৌর, তোর ওপর আমার কোন রাগ নেই। যাই।"

সৌর জিজ্ঞাসা করেছিল, "কোথায়।"

"আপাতত বাড়ি। কাল সকালে অনেক লম্বা পাড়ি দেব। সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া। একটা ফরেস্ট অফিসে কাজ পেয়েছি।"

সৌর বলে উঠল, "নির্বাসন!"

বিজন হাসল, "বলতে পারিস। আসলে এখানে আমার আর ভাল লাগছে না। ওখানে শিকার-টিকার নিয়ে দিনগুলো একভাবে কেটে যাবে, কী বলিস? চলি, আর হয়ত দেখা হবে না।"

কোন প্রয়োজন ছিল না, তবু সৌর জিজ্ঞাসা করে বসল, "লতা বউদিকে জানিয়েছিস?"

"না। জানাবার দরকারই বা কী।"

"কিচ্ছু না। এমনি। একদিন ত সে তোকে—তোকে" কথার সুতো জড়িয়ে গিয়ে সৌর শেষ করতে পারছিল না।

বিজনই করে দিল।—"ভালবাসত, বলবি ত?"

"হ্যাঁ।"

"আরে, দূর, দূর।" বিজন ফিরে এসে সৌরর কাঁধে একটা হাত রাখল। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "সৌর, লতা আমাকে কোনদিন ভালবাসেনি। তোকেও এখন ভালবাসছে না। তুই শুনে আঘাত পাবি, কিন্তু আসল কথাটা এই। আমাকে না, তোকে না, মানুষ হিসাবে ও আমাদের কাউকে ভালবাসেনি। ও ভালবেসেছে শুধু আমরা ওকে যে স্থূল সুখটুকু দিয়েছি, দিতে পারি, তাকে। তাতে ওর প্রয়োজন ছিল, নইলে ও ভালবাসে শচীপতিদাকেই।"

বিজন আর দাঁড়ায়নি।

স্তম্ভিত, বজ্রাহত সৌর সেদিন তারপরেও বহুক্ষণ ধরে বিজনের শেষ কথা কয়টি মনে মনে বিচার করেছে। জীবনে প্রথম যে-নারীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে, সে যে তাকে ভাল-বাসেনি, ভালবেসেছে তার দেওয়া স্থূল সুখকে, এ-কথা সহজে মেনে নিতে মন চায়নি। এই ভাবনাই তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। মানুষ গন্ধমাদন আর সুখটাই বিশল্যকরণী?

চাওয়া-পাওয়ার এই যদি শেষ ব্যাখ্যা হয়, তবে এর মূল্য কী। কানাকড়িও না। গোটা জীবনটাই, তখনকার মত, সৌরর কাছে কানাকড়ির মত তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

পরে অবশ্য চাওয়া-পাওয়ার অন্য অর্থও সৌর আবিষ্কার করেছে। শুধু সুখ নয়, মানুষও। কেবল দানটুকুই নয় দাতাও। প্রথমে হয়ত সুখ, পরে মানুষ। প্রথমে হয়ত দানটাকেই বড় করে দেখি, পরে যে বার বার দিল, দিয়েই চলেছে, তার দিকেও চেয়ে দেখি। তাকেও, সব নিয়েই, শেষ অবধি গ্রহণ করি। সুখের সিঁধপথেই তাকে কখনও কখনও ঘরে তুলতে হয় বটে, পরে কিন্তু তারই জন্য ঘর-জোড়া আসন পাতা থাকে।

এ-সব কথা আরও অনেক পরে, অনেক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে সৌর জেনেছিল।

(ক্রমশ)

গৌরকিশোর ঘোষ

নয়

গিরিবালা স্বপ্ন দেখছিলঃ

ভূষণ এসেছে। খবর নেই, বার্তা নেই, হুট করে এসে গেল ভূষণ। এসেছে টাট্টু ঘোড়ায়। মালকোচা মেরে ধুতি পরেছে। পিরেণটা ধুতির ভিতর গোঁজা। তার উপর বুক খোলা আলপাকার কোট। কোটের ভিতর পকেট থেকে স্টেথিসকোপের হলদে ডাণ্ডির উপর বসান হাতির দাঁতের মুখ দুটো উঁকি মারছে। পায়ে গার্টার দেওয়া মোজা আর ডার্বি জুতো আর মাথায় সোলার হাট-টুপি। নতুন কেনা ঘোড়ার জিনের এক পাশে কালো একটা বাক্স আঁটায় ঝোলান। গিরিবালা চিনল, ওটা ভূষণের চিরসংগী হোমিওপ্যাথি ওষুধের বাক্সটা। কিন্তু জিনের ওপাশে, চকচক করছে, ওটা কি? গিরিবালা আশ্চর্য হল। ঠাহর করে চেয়ে দেখল, ওটা সাইনবোর্ড। নতুন লেখা রুপোলি আর সোনালি অক্ষরগুলোয় রোদ পড়ে চিকচিক করছে। আর্তকল্যাণ দাতব্য চিকিৎসালয়। কলিকাতা কলেজের পাশ করা, গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত, ভূতপূর্ব হাউস ফিজিসিয়ান, ডাঃ ভূষণচন্দ্র বসু, এম বি (হোমিও)। সাইনবোর্ডটা বাংলায় লেখা, তাই গিরিবালার পড়তে অসুবিধা হল না। কিন্তু গিরিবালার বিদ্যায় সব কথার মানে বুঝতে পারল না।

তবে, এই সব সাইনবোর্ড তো সচরাচর দোকানেই টাঙান থাকে। অন্তত গিরিবালা তো তাই দেখে এসেছে বরাবর। ঘোড়ার পিঠে আবার সাইনবোর্ড ঝোলায় কে? তাও শ্বশুরবাড়ি আসবার সময়?

না না, শ্বশুরবাড়িতে বিজ্ঞাপন দিতে আসেনি ভূষণ। ঝিনেদার এক চিত্রালয়ের মালিকের কঠিন অসুখ হয়েছিল, ভূষণের চিকিৎসায় ভাল হয়ে উঠেছে, পয়সা কড়ি দিতে পারেনি ডাক্তারকে, ভালবেসে সাইনবোর্ডখানা লিখে দিয়েছে। আসবার সময় ঘোড়ার জিনে সেই বেঁধে দিয়েছে। পাঁচখানা গ্রামের মধ্যে দিয়ে যাবেন ডাক্তারবাবু। দেখুক না লোকে।

তাও ভাল। গিরিবালা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ভূষণের কৈফিয়ৎ শুনে। ছেলে দেখে ভূষণ খুব খুশি। অবিকল নাকি তার মত দেখতে হয়েছে। কি জানি বাপু, হবেও বা। কিন্তু গিরিবালা কিছু বুঝতে পারে না। এইটুকু ছেলে দেখে বোঝা যায় নাকি কিছু?

তবে, এখন, পাঁচজনের কাছ থেকে কথাটা শুনতে শুনতে তারও বিশ্বাস হচ্ছে, খোকা বাপের মতই দেখতে হবে। তা খোকা দেখতে যার মতই হোক, ভূষণ যে খুশি হয়েছে তাকে দেখে, গিরিবালা তাতেই খুশি। যেন এতদিন সে ভূষণের ধন নিজের কাছে গচ্ছিত রেখেছিল, ভূষণ এখন সেটা অবিকল ফেরৎ পেয়ে ওকে রসিদ লিখে দিল।

ভূষণ সেই দিনই ওদের নিয়ে রওনা হল। একটুও অপেক্ষা করল না। সেজ ভাশুর কলকাতায় থাকেন। তিনি খোকাকে দেখতে চেয়েছেন। এখন ওরা কলকাতায় যাবে। ফিরে এসে ভূষণ ঝিনেদায় বসবে নতুন ডাক্তারখানায়। তাই তার মোটেই সময় নেই।

ঝড়ের মত এল ভূষণ, ঝড়ের মতই ওদের নিয়ে চলে গেল। এখান থেকে ঝিনেদা পর্যন্ত ভূষণ গেল ঘোড়ায়, ওরা পালকিতে। ঝিনেদা থেকে চুয়াডাঙ্গায় ওরা গেল বাস-মোটরে। চুয়াডাঙ্গা থেকে কলকাতায় যেতে হবে রেলে। চাকা মেলে।

রেলগাড়ি আসছে না, আসছে না। গিরিবালা ছেলে কোলে প্লাটফর্মে বসে আছে। ভূষণ কাছে এসে দাঁড়াতেই খোকা তার কোলে যাবার জন্য যেই ঝোঁক দিয়েছে, অমনি প্রচণ্ড শব্দে গাড়ি এসে পড়ল, আর ইঞ্জিনটা যেন ছোঁ মেরে গিরিবালার কোল থেকে খোকাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। স্টেশন সুদ্ধু লোক গেল গেল ধর ধর করে উঠল। ইঞ্জিনের পিছু পিছু সব ছুটল।

গিরিবালা দেখল, ইঞ্জিনের ধোঁয়া কালো কালো হাত বের করে খোকাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে চোঙের মধ্যে ঢুকিয়ে নিতে চাইছে। খোকা প্রাণপণে কাঁদছে, লোকগুলো গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, ভূষণ খোকাকে ধরবার জন্য হাত বাড়িয়ে লাফাচ্ছে, নাগাল পাচ্ছে না। গিরিবালাকে কে যেন পেরেক মেরে প্ল্যাটফর্মের সংগে গেঁথে দিয়েছে। উঠতে পারছে না। উঠবার জন্য মাথামুড় খুঁড়ছে গিরিবালা। পারছে না, একটুও উঠতে পারছে না, কিছুতেই না। দরদর করে ঘাম বেরুচ্ছে গিরিবালার। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। দম আটকে আসছে তার। বুক যেন ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আর পারে না গিরিবালা। একটু বাতাস, একটু বাতাস!

এমন সময় গিরিবালার ঘুম ভাঙল। ঘামে সর্বাংগ ভিজে গেছে তার। ঘর অন্ধকার, হারিকেন কখন নিভে গেছে। গিরি-

বালা হাঁফাচ্ছে। হাঁফাতে হাঁফাতে অভ্যাস বসে খোকার বিছানায় হাত দিল। খোকা নেই। ছ্যাঁক করে উঠল তার বুক। আশে-পাশে হাত দিল। খোকা নেই। কি হল? তড়াক করে লাফিয়ে উঠল গিরিবালা। বসে পড়ল বিছানায়। গোটা খাটটায় হাত বুলিয়ে নিল। কোথায় খোকা। গিরিবালা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। দ্বিগুণ বেগে ঘামের স্রোত বয়ে চলল তার দেহে।

হঠাৎ খাটের নিচ থেকে খোকার কান্না শোনা গেল। সর্বনাশ! নিচে পড়ে গিয়েছে খোকা! যেন ছোঁ মেরেই তুলে নিয়ে এল খোকাকে। বুকে চেপে ধরে কান্না থামাল। মাই খাইয়ে ঘুম পাড়াল। শতবার ধিক্কার দিল নিজের দায়িত্বহীনতাকে, অভিসম্পাত দিল অঘোর ঘুমকে। কপাল ভাল, কিছু হয়নি এবার। কিন্তু কিছু একটা খারাপ হলে, কে ঠেকাত? ষাট! ষাট! ষাট!

কোলে তুলে, দুলিয়ে দুলিয়ে, চাপড় মেরে মেরে গিরিবালা ছেলের চোখে ঘুম ঢেলে দিল। খোকার চোখে ঘুম এল, এল না গিরিবালার চোখে।

ছেলের পাশে শুয়ে বারবার ঘুমাতে চেষ্টা করল। ঘুম নেই। কে কেড়ে নিয়েছে। কে আবার নেবে, ভূষণ ছাড়া?

স্বপ্নে খোকাকে হারিয়েছিল গিরিবালা, ভূষণকে পেয়েছিল। ঘুম ভেঙে সে খোকাকে পেল, কিন্তু ভূষণকে হারাল। এ এক আশ্চর্য অবস্থা তার। ছিল এক গিরিবালা, যখন সে জন্মাল তখন থেকে বিয়ের দিন পর্যন্ত গিরিবালা তো একটাই ছিল। এক ঘর, একটি পরিবার জুড়েই তার যা কিছু ধারণা গড়ে উঠেছিল। সে তখন দেওয়ান-বাড়ির মেয়ে। ঐ একটি বাড়ির সুখে তার সুখ, দুঃখে তার দুঃখ, একটি বাড়ির আশা আকাঙ্ক্ষার সংগেই তার আশা তার আকাঙ্ক্ষার ছিল লেনদেন।

যেই তার বিয়ে হ'ল, গিরিবালা দেখল, সে অমনি দুটো বাড়ির মানুষ হয়ে পড়ল। যেন ভোজবাজি। ওদিকের জন্যও তার ব্যথা, এদিকের জন্যও তার ব্যথা। বিয়ের আগে গিরিবালা ছিল যেন ফোয়ারা, একটিই ছিল তার আধার। বিয়ের পর, গিরিবালা হয়ে উঠল নদী, দু দিকে তার দুটি তীর। একটি বাপের বাড়ি, আরেকটি শ্বশুরে বাড়ি।

তবু, তাও এক রকম ছিল। কিন্তু যেই মা হল গিরিবালা, অমনি আর এক ভোজ-বাজি ঘটল। এবারে, গিরিবালা নিজেই দুটো গিরিবালা হয়ে গেল। খোকার মা আর ভূষণের বউ।

ঠিক, ঠিক, সে তো ভূষণের বউও। আগে সে ভূষণের বউ, তার পরে তো সে খোকার মা। এতদিন শুধু খোকাকে নিয়েই সে মত্ত ছিল, তার মনে যে জায়গা এতদিন শুধু ভূষণের জন্যেই ছিল মৌরসী, সেই জায়গা থেকে গিরিবালা ভূষণকে কখন যেন উচ্ছেদ করে দিয়েছে। তাই ভূষণের অভিমান হয়েছে। তাই সে আসেনি। আসছে না। খোঁজ খবরও দিচ্ছে না।

ভূষণের বউ যেন এতদিন গিরিবালার মনের কোণার ভাঙ্গা বাক্সের গাদায় আশ্রয় নিয়েছিল, এইবার সে সুযোগ পেয়ে খোকার মাকে ঠেলতে ঠেলতে সেই কোণায় পাঠিয়ে দিল।

ঐ যে, যে-গিরিবালা এখন খোকার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জানলার দিকে পাশ ফিরে শুল, শুয়ে শুয়ে অন্ধকার আকাশের গায়ে ফোটা সহস্র নক্ষত্রের মুখে অনেক দিনের না-দেখা স্বামীর মুখখানি মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করতে লাগল, ঐ গিরিবালাই ভূষণের সেই বউ।

গিরিবালা দেখল অনেক তারা ফুটেছে আকাশে। কৃষ্ণপক্ষ তাই চাঁদ নেই। ঘরের ভিতরে অন্ধকার। হারিকেনের একফালি আলোয় অন্ধকারের জাত নষ্ট করা হয়েছে। বাইরে নিটোল রাত। বিরাট কালো একদলা কর্পূর কে যেন বসিয়ে রেখেছে। একটু একটু করে এক সময় সব রাতটুকু উবে যাবে। সকাল হবে।

কিন্তু কখন সকাল হবে? এখন কত রাত?

মাঠে মাঠে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। কখনও কখনও ঝটপট ঝটপট পাখা ঝাড়ছে বাদুড় কি পেঁচা। তখ্‌খক, তখ্‌খক—মটকা থেকে তক্ষক ডেকে উঠল। ভুতুম ভুতুম, তুই থুলি না মুই থুলি, কত রকম ডাক শুনতে পেল গিরিবালা। অথচ ভয় পেল না একটি ফোঁটাও। আর আগে? ওরে বাব্বা, রাত্রি হলেই রাজ্যের ভয় এসে ঘিরে ধরত গিরি-বালাকে। আর তুই থুলি মুই থুলির ডাক শুনলে? ভয়ে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যেত। কতদিন জড়িয়ে ধরেছে মা বড় মাকে?

কেন ভূষণের গলা জড়িয়ে ধরেনি, বিয়ের রাতে?

কথাটা গিরিবালার মনে পড়তেই টিকটিকি ডেকে উঠল। থপ্‌ করে একটা ভারী মত কি যেন পড়ল মশারীর চালে। মশারীর ভিতরে অন্ধকার। মশার পনপনানি শুনতে লাগল গিরিবালা। বুঝল, ভিতরে মশা ঢুকেছে বেশ। ভাবল, উঠে একবার ঝেড়ে নেয় মশারী। কিন্তু পারল না উঠতে। বেজায় আলসা লাগছে তার। ভয়? ভয় আর এখন পায় না গিরিবালার। ভয়-তাড়ান মন্তর যে তার ছেলেই।

চুপচাপ শুয়ে ভূষণের কথা ভাবতে লাগল। স্বপ্নে দেখা সাইনবোর্ডটার কথা মনে পড়ল
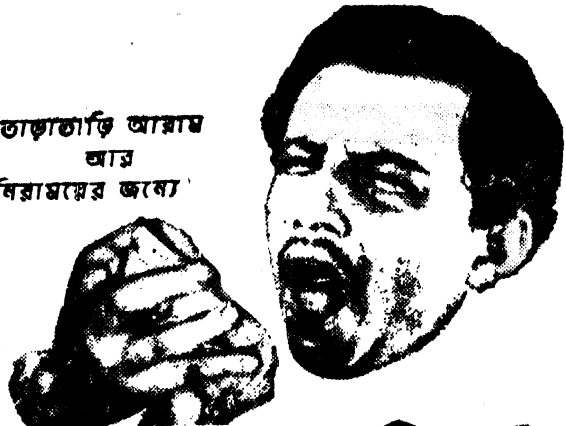
গিরিবালার। ঐ রকমভাবে আসবে নাকি ভূষণ? কিছুই বিচিত্র নয় তার কাছে। হয়ত সত্যিই কোনও সাইনবোর্ডওয়ালাকে বাঁচিয়ে তুলেছে ভূষণ, আর সে পয়সার বদলে সাইন-বোর্ড লিখে দিয়েছে।

গহর নিকিরিকেও তো ভূষণ অমনিভাবে বাঁচিয়ে তুলেছিল। টাকা দেয়নি গহর। ঘটকালি করে বিয়ে দিয়ে দিল তার ডাক্তারবাবুরে।

সত্যি, গিরিবালার বিয়েটা কি অদ্ভুতভাবেই না ঘটেছে। গহর তাদের প্রজা। গিরিবালাদের গ্রামের নিকিরি জেলেদের খুব নামডাক আছে ও-অঞ্চলে। ক্রিয়াকর্মে মাছ জোগানোর বায়না ওদের কাছে আসত দূর দূর গ্রাম থেকেও। গহর আবার নিকিরিদের মোড়ল। তার প্রতাপ প্রতিপত্তি রাজার মতই।

দু বছর আগে একদিন গহর গিয়েছিল মাছের জোগান দিতে ভূষণদের গ্রামের কাছেই। নেমন্তন্নটা ভালভাবেই উশুল করেছিল সে। খাওয়াটা তার একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। আর তখন সময়টাও তেমন ভাল ছিল না। ওলাউঠায় ধরল গহরকে। সে যাত্রাই শেষ যাত্রা হয়ে যেত গহরের, কিন্তু বাঁচিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু। বয়সে ছোকরা হলে হবে কি, ডাক্তার বটে ভূষণবাবু। গিরিবালা জানে, গহর এইভাবে বলে বলে তার বাবা জ্যাঠা আর খুড়োর মন ভূষণের দিকে ফিরিয়েছিল। ভূষণের নামে গহর আটখানা হয়ে উঠত। প্রায়ই এসে জ্যাঠামশাইকে বলত: বড়বাবু, দিয়ে দ্যান বিয়েটা। এই ঘরে পড়লি দিদি আমার সুখিই থাকবেনে।

খবর পেয়ে গিরিবালার বাবাও এসে পড়লেন। গহর তাঁকে জানাল, ডাক্তারবাবুরা চার ভাই। ডাক্তারবাবুই ছোট। বড় আর ছোট বাড়িতে আছেন। সেজভাই কলকাতায়। মেজ থাকেন যশোরে। গহরের কথা নিয়ে বাড়িতে এত আলোচনা হয়েছে যে, গিরিবালার সব কিছু প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে।

আর তখন সব থেকে মজা করত চাঁপা। কার মুখ থেকে কি শুনত আর তাই নিয়ে এমন সব কাণ্ড করত যে বাড়ি সুদ্ধ সবাই হেসে কুটি কুটি হত।

একদিন খেতে বসেছে সবাই, চাঁপা হঠাৎ পাকা গিন্নীর মত জিজ্ঞাসা করল, "তা নেবে থোবে কি?"

প্রথমে কেউ বুঝতে পারেনি চাঁপার কথা। চাঁপা নিজেই পরে বুঝিয়ে দিল।

বুড়োদের মত মাথা নেড়ে বলল, "বলি বিয়ে তো দেচ্ছ মেয়ের, তা উরা নেবে থোবে কি?"

এইবার হেসে গড়িয়ে পড়ল সবাই। তখন থেকে চাঁপার নামই হয়ে গেল, নেবে থোবে কি। কি ক্ষ্যাপান ক্ষেপে যেত চাঁপা তাকে ঐ নামে ডাকলে। কত আর বয়েস তখন চাঁপার। সাতও পেরোয় নি। তখন থেকেই ওটা এমন টরটরে।

জব্দ শুধু শ্যাম রাণারের কাছে। শ্যাম রাণারকে দেখলেই চাঁপা ভয়ে কোথায় পালাবে তার দিশে পেত না। শ্যাম রাণারের সঙ্গে গিরিবালার কিন্তু খুব ছোটবেলা থেকেই ভাব। গিরিবালা যখন খুব ছোট, তখন তাদের বারবাড়িতেই পোস্টাপিস ছিল। বছর কতক হল, সেটা এখন হাটে উঠে গিয়েছে। এখন নাকি মেন্দা সাহেবের গদিতে হয়েছে পোস্টাপিস। দেখেনি গিরিবালা, শুনেছে।

তাদের বাড়িতে যখন পোস্টাফিস ছিল তখন থেকেই তার ভাব শ্যাম রাণারের সঙ্গে। শ্যাম রাণারের একটা বল্লম ছিল, ঘণ্টি বাঁধা বল্লম। তার একদিকে ডাকের থলি ঝুলিয়ে নিয়ে ঝুনুৎ ঝুনুৎ ছুটে চলত শ্যাম রাণার। আর ফিরে এসে যখন খেতে বসত তখন কত গল্প বলত। তার মুখ থেকে নানা বিবরণ সংগ্রহ করেই তো গিরিবালা জগৎ সম্পর্কে একটা ভৌগোলিক ধারণা গড়ে তুলেছিল তার মনে।

জেনেছিল, ওদের এই গ্রাম ছাড়িয়ে কিছুদূরে গেলেই মধুপুরে বলে এক গ্রাম আছে। সেখানে আছে টুইডি সাহেবের কুঠি। সেই কুঠির দেওয়ান ছিলেন তার ঠাকুরদার বাবা, তার ঠাকুরদাদাও। মধুপুরে পার হয়ে আরও এগিয়ে যাও। গেলেই পাবে ধোপাঘাটা। এমন এক ভয়ঙ্কর দহ আছে সেখানে, কেউ নাকি তার উপর দিয়ে পাকা পুল বাঁধতে পারেনি, সাহেবেরাও না। ডোঙা নৌকোয় পারাপার চলে। ধোপাঘাটার পরেই ঝিনেদা শহর। এসব গল্প সবার আগে গিরিবালা শ্যাম রাণারের মুখে শুনেছে। তার অনেক পরে, বাবার সঙ্গে যখন ডোমার গিয়েছে, বিয়ে হয়ে যখন শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছে, তখন গিরিবালা এসব দেখেছে নিজের চোখে। গিরিবালার হঠাৎ মনে পড়ল, শ্যাম রাণার খুব খেতে পারত। আস্ত আস্ত কাঁঠাল সে খেয়ে ফেলত নিমেষে। ভুতুড়ি, বিচি, এসবও ফেলত কিনা সন্দেহ।

গিরিবালার বাবা যেদিন সম্বন্ধ করতে যান, সেদিন কিসের যেন এক স্নান ছিল। ওরা সবাই ঘাটে যাচ্ছিল চান করতে। বড়মারা এগিয়ে গিয়েছেন, ও আর চাঁপা পড়েছে পিছিয়ে। ওরা রাস্তায় উঠতেই ঝুনুৎ ঝুনুৎ শব্দ শুনল। শ্যাম রাণার আসছে দৌড়তে দৌড়তে। অনেক দিন দেখেনি তাকে। গিরিবালা দাঁড়িয়ে পড়তেই চাঁপা ভয়ে তার পিছনে গিয়ে লুকোলো।

ছবির পর ছবি ফুটে উঠছে গিরিবালার চোখে। শ্যাম রাণার দাঁড়িয়ে পড়ল গিরিবালার সামনে। ঘাম মুছে বলল, দিদিমণি তুমার বিয়ে হবে গো, বেশ বেশ। বিয়ের কথা শোনামাত্র লজ্জায় প্রায় নুয়ে পড়ে গিরিবালা। কিন্তু আশ্চর্য, শ্যাম রাণারের মুখ থেকে

বিয়ের কথা শুনতে তার তো তেমন অস্বস্তি লাগল না। বরং মজাই লাগল তার। গিরিবালা জিজ্ঞাসা করল, তুমি কার কাছে শুনলে? শ্যাম রাণার বলল, গহর যে ঘাটে নৌকোয় ছই বাঁধছে। মা'জে বাবু আজ পাত্তর দেখীতি যাবেন যে। বেশ বেশ দিদিমণি খুব ভাল কথা। ভগমান তুমারে সুখি করুন। আর দাঁড়াল না শ্যাম। ঝুনুং ঝুনুং ঝুনুং ঝুনুং ঘণ্টির ধ্বনি তুলে তুলে শ্যাম রাণার ফিকে ধুলোর ঘূর্ণি উড়িয়ে উড়িয়ে গিরিবালার দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

চান করে ফিরবার সময় দেখে মেজকত্তা আর গহর সেজেগুজে ঘাটের দিকে চলেছেন। লজ্জায় গিরিবালা চোখ নিচু করে পথের এক পাশ দিয়ে তার কুমারী শরীরটাকে অতিকষ্টে টানতে টানতে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু চাঁপাটা এমন অসভ্য, চেঁচিয়ে উঠল, ও মা'জেকাকা, কনে যাচ্ছ? জবাব দিল গহর, বর খুজতি গো ছোড়দি। চাঁপা দুই হাতে তালি দিয়ে নেচে উঠল, জানি গো মশাই, জানি। বড়দিও জানে। নারে বড়দি? কিরকম পাজী হয়েছে মেয়েটা বল দিকিনি। রাগে গিরিবালার ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল। মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, চল বাড়ি, তুমার নাচা কুঁদা ভাঙে দিবানে। কিন্তু এসবে চাঁপার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে সমানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছে, রাংগা টুকটুকে বর আনবা কিন্তু, আর আস্ত দেখে আ'নো ভাংগা হুলি নেব না, বুঝলে। চাঁপার কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠল। অতি কষ্টে চাঁপার মুখটি বন্ধ করে সেদিন গিরিবালা ওকে নিয়ে বাড়ি ফিরতে পেরেছিল।

ছেলে একটু শব্দ করতেই গিরিবালা পাশ ফিরল। ফিরে এল ঘাটের রাস্তা থেকে, ফিরে এল অতীত থেকে, এসে গেল একেবারে মশারীর মধ্যে, তার ছেলের পাশে।

উস্‌খুস্‌ করছে ছেলে। গিরিবালা হাত বাড়িয়ে টের পেল ছেলে তার কাঁথা ভিজিয়েছে। শিওরে ডাঁই করা অনেক কাঁথা ছিল। শুয়ে শুয়েই তার থেকে একটা শুকনো দেখে টেনে নিয়ে নিপুণ হাতে বদলে দিল। এর মধ্যেই গিরিবালা একেবারে পাকা কারিগর হয়ে উঠেছে। প্রথম প্রথম এই কাঁথা বদলান নিয়েই তাকে কি কম ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়েছে। আনাড়ি হাতের খোঁচা খেয়ে খোকার ঘুম ভেঙে যেত। কেঁদে উঠত খোকা। কত কেলেঙ্কারীই না হত। কিন্তু চার মাস যেতে না যেতেই গিরিবালা কতবড় ওস্তাদ হয়ে পড়ল। এখন তার খোকা বিন্দু বিসর্গও টের পায় না।

কাজের তাড়া খেয়ে যেসব স্মৃতি এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, গিরিবালার হাতের কাজ ফুরোতেই আবার সেগুলো পরিষ্কার অবয়ব ধরে ফিরে ফিরে আসতে লাগল।

ছায়াবাজীর খেলা দেখছে যেন গিরিবালা অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

......গিরিবালার বিয়ে। বাড়ি ভর্তি লোকজন। পাইকপাড়া পলেনপুর থেকে জ্যেঠি খুড়িরা এসেছেন, বিনোদপুর থেকে এসেছেন মামী মাসিরা, ছত্তরপাড়া থেকে এসেছেন জ্ঞাতিগোষ্ঠি কুটুম্বের দল। আমোদ করছে, ফূর্তি করছে, মৃতদের উদ্দেশে অশ্রুবর্ষণও চলছে, পরক্ষণেই সুবিধা অসুবিধা নিয়ে তারস্বরে ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে। এই হট্টগোলের মধ্যে গিরিবালাই শুধু তফাৎ তফাৎ আছে। তার কোন কিছুই ভাল লাগছে না। কেন, তা কে বলবে? কেন এই বিমনতা, কিসের অস্বস্তি? তাও জানে না গিরিবালা। তার ভাল লাগছে না।......

......আচ্ছা, তার বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন বাড়ির সবাই? সে কি মাথামুণ্ড খুঁড়েছিল বিয়ে দ্যাও, বিয়ে দ্যাও বলে। তবে? বাবার উপর প্রচণ্ড অভিমান হল তার। বড়মা, পিসিমা, জ্যেঠামশাই, কাকার উপরও। বড়দাও কম না। সেও ও দলে যোগ দিয়েছে। ওদের ভালবাসা, স্নেহ, সব উপরে উপরে। আসলে গিরিবালা ওদের গলায় বেঁধা কাঁটা। সাত তাড়াতাড়ি নামাবার জন্য তাই এত বিড়ালের পায়ে ধরে সাধাসাধি। বিড়াল কে? কেন, ঐ যে ভূষণ না কে? যাকে এত সাধ্য সাধনা করে ও'রা ডেকে আনছেন গলার কাঁটা নামাবার জন্য?......

......বিয়ে হলেই এখান থেকে অন্ন উঠবে গিরিবালার? এই ঘর, এই বারান্দা, এই উঠোন, এই গ্রাম, গিরিবালার পরিচিত পৃথিবী, তার আপন জগৎ, যা কিছু অবলম্বন করে সে এতদিন বেড়ে উঠেছে, যার যার সঙ্গে তার নাড়ির যোগ, সে সবই তার 'পর' হয়ে যাবে? বড়মা, পিসিমা, চাঁপা, তার সই মহামায়া—এদের সবার চোখে সে হবে ভিন গেরামের বউ?......

......এদের ছেড়ে, এই পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে গিরিবালা যে বাঁচতে পারে, কৈ, কোনদিন ঘুণাক্ষরেও তো সে কথা তার মনে স্থান পায়নি? ভগবান জানেন, এদের ছাড়া সে কখনও আর কারও কথা ভাবেনি। তবে?......

......তবে এরা তাকে পরের ঘরে ঠেলে দেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠল কেন? তাকে পর করে দেবার জন্যই বা এদের এত তাড়াহুড়ো কেন? সে কি কোন অন্যায় করেছে? গুরুতর অপরাধ কিছু করেছে? সে কথা গিরিবালার জানতে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে প্রবল এক অস্বস্তি তার মনের মধ্যে ঢুকে ঝড় তুফান তোলে। সে সময় গিরিবালা আর কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারে না। মার মৃত্যুর পর ফুল দিয়ে সাজিয়ে যে ফটোখানা তোলা হয়েছিল, সেই ঝাপসা ফটোখানার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঝোর ধারা ঝরিয়ে কাঁদে। কেঁদে কেঁদে বুকের পাষাণ নামায়।......

......কেন তা গিরিবালা জানে না, তবে এই সময়টাতে মৃত্যুকে বড় নিকট আত্মীয় বলে মনে হত গিরিবালার। মুহূর্তের জন্যও তার বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করত না। তার কেমন দৃঢ় ধারণাই জন্মে গিয়েছিল, সে বিয়ের আগেই মরে যাবে। মরে মার কাছে গিয়ে আশ্রয় পাবে। চিরদিনের মত নিশ্চিন্ত আশ্রয়। কিন্তু মরল না গিরিবালা

জামাইবাবুর প্রত্যাবর্তন
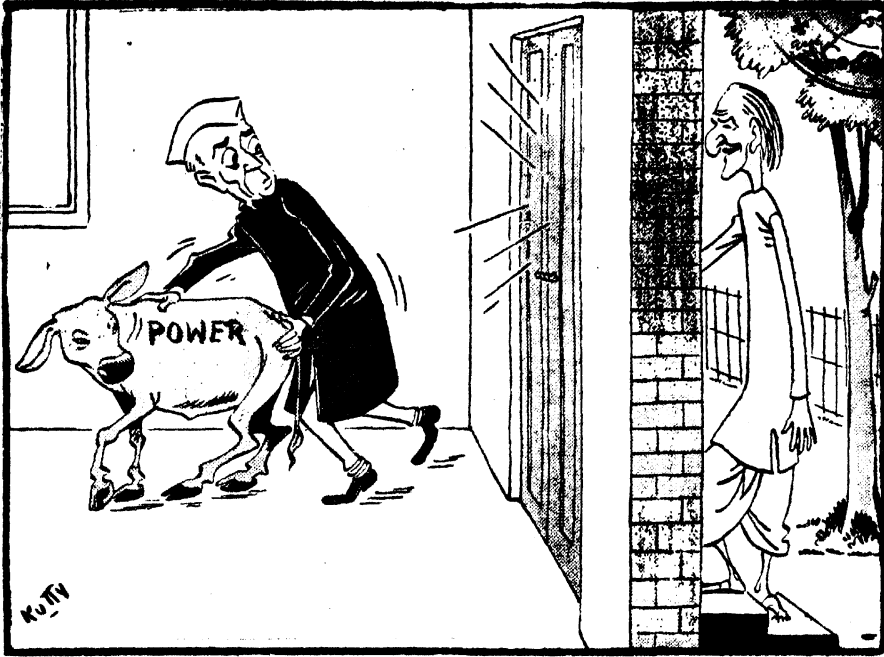
লোকসভায় আচার্য কৃপালনীর পরামর্শের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, সর্বদলীয় সরকার গঠন আপাতত অসম্ভব

উপরন্তু সেই ভয়াবহ দিনটি ধীরে ধীরে এক পা দু পা করে এগিয়ে আসতে লাগল। বিয়ের কদিন আগে সে বিকট এক দুঃস্বপ্ন দেখল। সে স্বপ্ন চিরকাল তার মনে গাঁথা থাকবে। গিরিবালা স্বপ্ন দেখলঃ প্রকাণ্ড একটা কোলাব্যাঙ তার বুকের উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে মুখের কাছে এগিয়ে এল, লকলক জিভ বের করে আকাশ পাতাল হাঁ করল। এবারে গিলে ফেলবে তাকে। ভয়ে আকাঠ হয়ে গিরিবালা চোখ বুজতে যাবে, হঠাৎ তার নজর পড়ল ব্যাঙটার মাথার উপর। ব্যাঙের মাথায় একটা টোপর। এই তবে তার বর! হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে উঠল গিরিবালা। এক ছুটে চলে গেল বড়মার ঘরে। বড়মার কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল।......

......শুভদৃষ্টির সময় সে চোখ খোলেনি। বাসরে এসেও না। সে জানে চোখ খুললেই ব্যাঙের মুখ দেখতে হবে। কি বোকাই না ছিল গিরিবালা! কোথায় ভূষণ আর কোথায় কোলাব্যাঙ!

বাজনদার পাড়ার থেকে কুঁকড়োর ডাক শোনা গেল। যাক, রাত তাহলে পোহাল। কি সব আজেবাজে চিন্তায় রাতটা কাটল। এখন একটু ফর্সা হলেই গিরিবালা বাঁচে। সে উঠতে পারে।

কিন্তু গিরিবালা স্মৃতির হাত থেকে রেহাই পেল না। যতই সে ঢেউ দিয়ে সরিয়ে দিক, একটু সুযোগ পেলেই কুচো-পানার মত স্মৃতি তার মগজে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

......আশ্চর্য লোক ভূষণ। তার হাবভাব সবই আশ্চর্য লাগে গিরিবালার কাছে। বাসি বিয়ের দিন কি কাণ্ডটাই না করল। গহর এক মণ মাছ ধরে দিয়ে গেল। এ তার ঋণ শোধ।

......বড়বউ নামকরা রাঁধুনি। জামাই-ভোজের রান্না একা হাতেই তিনি রাঁধলেন। সাত আট রকম শুধু মাছেরই ব্যঞ্জন। বড় থালার চারিপাশে বাটি সাজিয়ে জ্ঞাতি কুটুম্বের মাঝখানে জামাইয়ের সামনে যেই সে থালা ধরে দেওয়া হল, অমনি জামাই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। যেন বিষধর সাপ তার সামনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হাঁ-হাঁ, করেন কি, করেন কি, জামাই পরিত্রাহি চেঁচিয়ে উঠলেন, মাছ মাংস স্পর্শ করাও যে নিষেধ। সে কি, সে কথা কি কেউ জানিয়ে দেয়নি? সভাসুদ্ধ লোক অপ্রস্তুত। ভোজটাই বুঝি পণ্ড হয়ে যায়। হঠাৎ ভূষণ হাতজোড় করে বলল, অপরাধ আমাদের, আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করে খেতে বসুন। আমিও বসছি। আমাকে নিরামিষ রান্না এনে দিন। জামাইয়ের বিনয়ে সবাই খুশি হলেন। দুঃখ থেকে গেল শুধু গহরের। তার পরিশ্রম বৃথাই গেল।......

ছোট বড় আরও নানান নাটকীয় কাণ্ড ঘটিয়েছে ভূষণ। আজ মাস আড়াই তার কোন খবরই নেই। ছেলে হল, সবাই এসে দেখে গেল। শ্বশুরবাড়ির থেকে বড় ভাসুরের ছেলে এসেও দেখে গেল। শুধু ভূষণেরই পাত্তা নেই। কোটচাঁদপুরে না কোথায় যেন আছে, ভাসুরপোও ঠিকমত জানে না। কি ধরণের মানুষ!

গিরিবালার বুকটা টনটনিয়ে উঠল। অভিমানে জল এল চোখের। সে না হয় ফ্যালনা, ভাবলে খোকন সোনা, তার কথাও কি মনে পড়ে না ভূষণের, দেখতে ইচ্ছে হয় না। চোখের কোণা দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে বালিশ ভিজিয়ে দিতে লাগল। খোকার গায়ে হাত রেখে গিরিবালা মনে মনে বলল, তোর বাবা আমারে বড় কাঁদায়, তুইও কি অমন করে কাঁদাবি, হ্যাঁ খোকা।

খোকা ততক্ষণে জেগে উঠে হাত পা ছুঁড়ে খেলা করতে সুরু করেছে।

গিরিবালা তার মুখে চুমু খেতে খেতে বলল, "ধন আমার সুনা আমার বাবারে ডাকে আনতি পার না?" (ক্রমশ)

প্রকাশিত হবে ২রা মার্চ
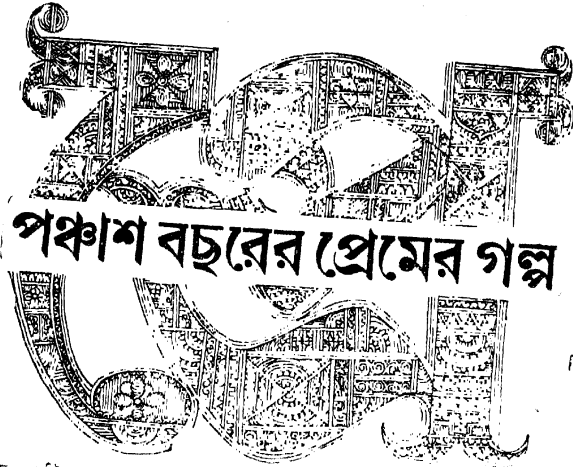
পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প

পঞ্চাশ বছর কালসমুদ্রে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিন্দু মাত্র। কিন্তু মানুষের জীবনে এই পঞ্চাশ বছর বিরাট কাল। এই সময়ের মধ্যে মানুষের জীবনে তথা সমগ্র সমাজের জীবনে বহু নাটকীয় উত্থান-পতন, বহু ভাঙাগড়া, বহু পটপরিবর্তন ঘটে। স্মরণাতীত কাল থেকে নরনারীর প্রেম চিরন্তন। তার চাওয়া-পাওয়ার অভীপ্সা নিত্য। কিন্তু অঘটনঘটন-পটিয়সী সময়ের স্রোতের টানে পড়ে প্রেমের রূপ পাল্টায়, তার প্রকরণ বদলে যায়, তার বিন্যাস নব নব রূপ পরিগ্রহ করে। আর তার প্রভাব যেমন পড়ে মানুষের মনে, তেমনি তার প্রতিবিম্ব ভাস্বর হয়ে ওঠে সাহিত্যের দর্পণে। "পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প" হল সেই সাহিত্যিক দর্পণ যে দর্পণে প্রেমের সার্থকতম রূপায়ণ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে একেবারে হালের সাহিত্যিকদের প্রেমের গল্প পর্যন্ত এই সুবৃহৎ গ্রন্থে সযত্নে সংকলিত হয়েছে। এক‌েকটি গল্পে প্রেমের সমস্যা একেকভাবে দেখা দিয়েছে। কোনোটি বিয়োগান্ত, কোনোটি মিলনান্ত। কোনোটি প্রেমের পূর্ণতায় উজ্জ্বল, কোনোটি বিরহের বেদনায় ভারাক্রান্ত। কোথাও বাল্য-প্রণয়, কোথাও পূর্ণ যৌবনের দুকূলপ্লাবী আবেগ, আবার কোথাও বা স্থিতমিত প্রৌঢ় মনের অতীত রোমন্থন। একেকজন লেখকের একেক রকম লেখার হাত, দেখার চোখ, অনুভূতির বৈচিত্র্য। তাই সমস্ত মিলিয়ে "পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প" বাংলা প্রকাশনা জগতে একটি অভিনব সংযোজন, একটি অসামান্য প্রচেষ্টা। সম্পাদনা করেছেন সুবীর রায়চৌধুরী।

'পঞ্চাশ বছরের প্রেমের গল্প'র লেখকবৃন্দ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জলধর সেন, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরশুরাম, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শান্তা দেবী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, পরিমল গোস্বামী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সরোজ রায়চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশি, যুবনাশ্ব, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবরাম চক্রবর্তী, সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রবোধকুমার সান্যাল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, আশাপূর্ণা দেবী, সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রতিভা বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষ ঘোষ, ননী ভৌমিক, সমরেশ বসু, বিমল কর ও রমাপদ চৌধুরী।

ডবল ডিমাই সাইজে স্মল পাইকা হরফে মুদ্রিত প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থ। কাপড় বাঁধাই। উপহার-শোভন অঙ্গসজ্জা।

দাম সাড়ে বারো টাকা। ভি-পি ডাকে চোদ্দ টাকা।

বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত পুস্তিকার জন্য চিঠি লিখুন

নতুন সাহিত্য ভবন ॥ ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা—২০

কলিকাতা ও মফঃস্বলের পুস্তক-বিক্রেতারা কলেজ স্ট্রীটের নিম্নোক্ত কেন্দ্র থেকে বই নিতে পারেন :

১। **পুস্তক**, ৮।১বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।
২। **ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ**, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা।
৩। **স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স**, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা।

চতুর্মাস্তুল জাহাজ' হেরজোগিন সেসিলি'র ক্যাপ্টেন শ্ভেন এরিকসনের পাইক নামে একটা এলসেসিয়ান কুকুর ছিল যার সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে একটা রেকর্ড ছিল পর পর আট বছর কেপ হর্ন চক্কর দিয়ে আসার।

কুকুরটা তার প্রভুর কাজ করে দিতে বড় ভালবাসত এবং নিচ থেকে একখানা বই কি চটি জোড়া বা টুপিটা আনতে বললে তার যেন খুশীর অন্ত থাকত না। ভুল জিনিস এনে ফেললে,—যেমন লাল রঙের বইয়ের বদলে হয়তো এনে দিলে নীল রঙের বই, তাহলে ঠিক বইখানি আনতে ওকে আবার পাঠানো হতো।

একবার অস্ট্রেলিয়ায় জাহাজের ওপরে একটা বড় পার্টি'র পর, যাতে অন্যান্য ফিনীয় জাহাজের ক্যাপ্টেনরা যোগ দিয়েছিল তার ছবি নেবার জন্য সংবাদপত্র থেকে ফটোগ্রাফার আসে। এরিকসন সকলকে ডেকের উঁচু পৈঠেতে দাঁড়াতে বলে দেখলেন তার ক্যাপটা তিনি পরেননি। তার টুপিগুলো চার্টঘরে টাঙানো ছিল। পাইককে পাঠানো হল একটা নিয়ে আসতে কিন্তু ও নিয়ে এল এমন একটা যেটা অতিথিদের সামনে বড় বেমানান।

"দেখ পাইক", এরিকসন ওকে ডেকে বললেন, "দেখছ না, আমি আমার সেরা পোশাক পরেছি, যাও আমার সেরা টুপি নিয়ে এস।

পাইক একবার চারদিকের সোনালি ফিতে জড়ানো ক্যাপগুলো দেখে নিলে এবং তারপরই ছুটে গিয়ে এনে দিলে এরিকসনের সবচেয়ে চটকদার টুপিটা।

শ্ভেন এরিকসনের স্ত্রী পামেলা জাহাজটি সম্পর্কে তার গ্রন্থে লিখেছেন যে, শ্ভেন পাইককে পেয়েছিলেন ফ্রেডেরিকস্টাডে যেখানে পাইক এমন ভয়ানক হয়ে উঠেছিল যে, সবাই ওকে মেরে ফেলা ঠিক করেছিল।

শ্ভেন ও একজন পুলিসের বাঁধন ছিঁড়ে ও পালিয়ে আসে ওর কর্ত্রীর কাছে। যখন ওকে শেষ পর্যন্ত জাহাজে টেনে তোলা হল তখন ও অনশন আরম্ভ করলে, যতক্ষণ না ওর কর্ত্রী ওকে খেতে দিতে এল। আবার ও বাঁধন ছিঁড়ে পালাল পাটাতনে কর্মরত নাবিকদের মাঝ দিয়ে যারা ওকে রুখতে সাহস করলে না। কিন্তু ওর কর্ত্রীর সহায়তায় শেষ পর্যন্ত ওকে ধরে জাহাজে আনা গেল।

কোনরকম সদয় ব্যবহারই ওকে স্পর্শ করতে পারলে না। যাকে সামনে পেত কামড়ে দিত, সামান্য সহৃদয়তায়ও দাঁত খিঁচিয়ে উঠত এবং এমন আচরণ করতে লাগল যা স্থলে ওর কুখ্যাতির সমর্থন করে যেতে লাগল। দুর্দান্ত শক্তিশালী বেপরোয়া পশু এবং একটা লম্বা হুক দিয়ে ওকে দূরে থেকে বাগিয়ে না ধরলে ওকে ধরা অসম্ভব ছিল।

সহৃদয়তা ওর ক্ষেত্রে কোন কাজের হবে না বুঝে শ্ভেন ঠিক করলেন, বদমায়েসি করলে ওকে উত্তমমধ্যম দেবেন, কিন্তু প্রথম সে চেষ্টায় মন্দের কিছু ভাল হল। এর পর হল নক্সাঘরের পিছনে ঝাঁঝরির ওপরে যেখানে পাইকের পা ঠিক রাখা অস্বস্তিকর ছিল। কেউ বলতে পারে না কি ঘটেছিল কিন্তু তার পর থেকে পাইক তার প্রভুকে ভালবাসতে সম্মান করতে আরম্ভ করলে।

মেয়েদের কিন্তু ও বরদাস্ত করতে পারত না, বিশেষ করে খুব উগ্র সাজগোজকরা এবং যারা মুখ চেপে হাসত। কখন নাচের ব্যবস্থা হলে ওকে কোথাও বন্ধ করে রাখতে হত কারণ শ্ভেন কোন মেয়েকে নাচতে বললেই পাইক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। শ্ভেনকে কেউ স্পর্শ করবে সেটা ওর সহ্য হত না এবং কোন পুরুষ বা নারীর সঙ্গে শ্ভেন করমর্দন করতে গেলেও চুপচাপ থাকবে বলে ওকে বিশ্বাস করা চলত না।

আফ্রিকার নাইজিরিয়াতে ব্রোঞ্জ নির্মিত প্রচুর শিল্প কাজ ১৮৯৭ সনে বৃটিশ বিজয়ের পর আবিষ্কৃত হয় এবং সবচেয়ে বেশী পরিমাণ সামগ্রী পাওয়া যায় বেনিন নামক স্থানে। এই শিল্প কাজগুলি বেনিনের ওবাস রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় দু'শ বছর ধরে নির্মিত হয়। ওপরের ছবিটি হচ্ছে ব্রোঞ্জের একটি বেদীর অংশ। বেদীটি নির্মিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহেনুয়া নামক এক মহান যোদ্ধার সম্মানার্থে এবং এতে তারই বীরমূর্তির রূপ দেওয়া হয়েছে

পামেলা মোটেই হাস্যমুখরা ছিলেন না, কিন্তু পাইককে প্রথম দেখবার পর ওর রোষভরা চোখ দেখে তিনি স্বর নামিয়ে ফেলেন এবং হাসিটা পুরুষের মত জোর করে নেন। অনেকবার এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে পাইকের তাড়া খেয়ে মাস্তুলের রসারসির আড়ালে লুকিয়ে বেঁচেছেন।

একটা রীতি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে, শ্ভেন ডেকের চত্বরে এলে পাইকই প্রথম তার প্রভুকে অভিবাদন জানাবে। এটা না জেনে, একবার, শ্ভেনকে গ্যাঙওয়ে দিয়ে আসতে দেখে পামেলা এগিয়ে যান। পাইক তাই দেখে পামেলার হাতে কামড় দিয়ে ধাক্কা মেরে এগিয়ে গেল রীতি অনুযায়ী তার প্রভুকে প্রথম অভিবাদন জানাতে।

কখনো কখনো স্নেহে গদগদ হয়ে পাইক শ্ভেনের হাত চাটত এবং শ্ভেন তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিত এবং নিজের মাথা নেড়ে বলত, "ভাল কুকুরেরা গা চাটে না!" শুনেই পাইক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শ্ভেনের পায়ে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ত।

একেবারে একটা একগুঁয়ে স্বভাব, সমুদ্রে ক্যাপ্টেন ছাড়া আর কাউকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। শ্ভেন বন্দরে তীরে নেমে গেলে পাইক প্রধান মেটের পদ নিত কিন্তু সেলুনে কখনো ঢুকত না, ক্যাপ্টেনের কেবিনের সামনে সে নিজের ডেরা করে নিত।

নাবিকদের কাউকে গ্রাহ্যই করত না। একবার একটি ছেলে ও ঘুমিয়েছে ভেবে একটা পিন ফুটিয়ে ওর অবজ্ঞার শোধ নেবে মনে করেছিল, কিন্তু পিনটা বসাবার আগেই পাইক ছেলেটির একেবারে টুঁটি চেপে ধরলে এবং সময়মত শ্ভেনের চীৎকার না শুনলে একটা খুনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত।

জাহাজখানি, নতুন কনে হিসেবে পামেলার প্রথম ফিরতি যাত্রায় ১৯০৬ সনে কুয়াশায় পড়ে হ্যামস্টোন পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙে যায়, রেড ক্রুশের লোকেরা আসে ওকে ওদের শ্ভেনের কুকুর-শালায় নিয়ে যেতে।

পাইকের জীবনের সেটা বড় দুঃখের সময়। একটা খাঁচা ওর জন্যে আনা হয়েছে। শ্ভেন ওর মেজাজ বুঝে ওকে বুঝিয়ে বললেন ওর ভিতরে প্রবেশ করতে, বললেন যারা ওকে নিয়ে যাচ্ছে তারা অতি ভাল লোক এবং যতদিন আবার দেখা না হয় ওদের কাছে যেন দেখিয়ে দেয় কেমন চমৎকার কুকুর সে। 'চমৎকার' কথাটায় পাইক খাঁচার ভিতরে প্রবেশ করল যেন ওটা ওর আজীবনের বাসা।

শেষে ও যখন সামুদ্রিক জীবন সমাপ্ত করে ফিনল্যান্ডে এসে উপস্থিত হল তখন বহু মাস ধরে অন্য কুকুরদের দিকে ফিরেও চাইত না কিন্তু শেষে এক কুক্কুরীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তাকে নিয়েই বাকি জীবন কাটিয়ে দেয়।

• • •

ইতালির বার্গামো শহরে ঢুকে থিয়েটারের আসন অর্ধেক খালি। "লা বোহেম" অপেরায় আলফ্রেড চরিত্রের গায়ক কেবলই ভুল গেয়ে লোকের বিদ্রূপ ও টিটকারির কারণ হতে থাকে।

"আমার এখন সুদিন যাচ্ছে না।" গায়ক স্বীকার করেন।

"ঠিকই বলেছ", প্রেক্ষাগৃহ থেকে লোক চেঁচিয়ে ওঠে। "তুমি বাড়ি ফিরে যাও রয় এন্ডারসন।"

ইতালিতে "লা বোহেম"-এ গাইবার সম্মান অর্জন করার জন্য আমেরিকার সর্বাধিক প্রতাপশালী প্রকাশক রয় এন্ডারসন বার্গামো থিয়েটার ভাড়া নেন, একদল শিল্পী ও বাদ্যকর নিযুক্ত করেন এবং নিউ ইয়র্ক থেকে দৃশ্যপট ও সাজসজ্জা নিয়ে আসেন। খরচ : একটি অভিনয়ের জন্য কয়েক লক্ষ টাকা।

এন্ডারসন প্রথমে মিলানে গিয়েছিলেন ১৯৫৫ সনে ওখানকার শ্রেষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহ লা স্কালা কর্তৃক নিয়োজিত হবার আশায়। যৌবনকাল থেকেই গানের প্রতি ওঁর প্রচণ্ড ঝোঁক, কিন্তু শ্রোতা কখনও পাননি।

"নিজেকে তাই প্রশ্ন করলাম", এন্ডারসন জানান, "ইতালির জনসাধারণের কাছে নিজেকে পরিচিত করার উপায় তাহলে কি। এমনিই মনে হল পাল্লাটি উপস্থাপনের যাবতীয় খরচটা তাহলে আমাকে দিতে হয়।"

তারপর এল সেই মহাদিন : এন্ডারসনের স্ত্রী অপেরা আরম্ভ হবার ঘণ্টা কয়েক আগে নিউ ইয়র্ক থেকে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু হায়!—রাত এগারোটার সময় প্রেক্ষাগৃহে তিনিই একমাত্র দর্শক!

• • •

জাপানে বহু যুগ ধরেই নাভির ওপর বিশেষ সচেতনতা দেখা যায়। নবজাত শিশুর নাভির আকৃতি নিয়ে কথা উঠবেই এবং নাভির মুখটি যদি নিম্নমুখী হয় তাহলে শিশু রুগ্ন হয়ে তাদের দুঃখের কারণ ঘটাবে বলে বাপ মা ধরে নেয়। প্রবচন আছে যে, বিরাট শিং, দীর্ঘ শুঁড় এবং ভীষণ হুঙ্কার বাজ বজ্রের দেবতা রাইজীনের বড় লো[ভ] কচি নাভির ওপর আর তাই মায়েরা ছোট[...] দের দেহ ভাল করে ঢেকে রাখার জন্য সদা ঘ্যানঘ্যান করে। কিন্তু নাভি নিয়ে যে[...] কিছু হোক ওটা কখনো একটা কাল্ট[...] পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়নি। এতদিনে এবার দে[...] দিয়েছেন কোজি মুরাটা নামে কল্পনাপ্রব[ণ] এবং নিষ্ঠাবান এক অবসরপ্রাপ্ত সেক্রেটারি।

শৈশবে রুগ্ন, মুরাটা, যৌবনকালে স্বাস্থ্য বাতিক হয়ে ওঠেন এবং বৌদ্ধ পুরোহিতদে[র] সহিষ্ণুতা শিক্ষার রহস্য জানতে গবেষণা[য়] রত হন। ১৯৫১ সনে পঞ্চান্ন বছর বয়েস কালের মধ্যেই স্বাস্থ্যের ওপর নাভির প্রভাব নিয়ে একটা শাস্ত্রই তিনি গড়ে তোলেন। মুরাটা এরপর হেসোতে[ন] (নাভি স্বর্গ) সমিতি গড়ে তোলেন অফিস ও কারখানায় গিয়ে গিয়ে প্রচার করতে থাকেন "স্বর্গমুখী (ঊর্ধ্বমুখী) নাভি ওপরেরই আশীর্বাদ লাভ করে।" বয়স্ক শ্রোতাদের তিনি জানান যে, নাভি হচ্ছে "কৃষ্টির এক পদক যা নিয়ে প্রত্যেকে জন্মায়। ওটাকে পালিস কর। ওর মূল্য দাও।"

বছর পার হতে হতে ক্ষীণকায় কেরানী এবং পরিশ্রান্ত কর্মাধ্যক্ষরা মুরাটার উপদেশ অনুসারে দিনে দুবার করে নাভির ব্যায়াম অভ্যাস করতে থাকে। প্রচারক স্বয়ং, যাকে বয়সের তুলনায় পনের বছর ছোট দেখায়, তিনি তাঁর বাণী প্রচার করতে কয়লা খনিতে পর্যন্ত নামতে লাগলেন। বেতারে বক্তৃতা দিতে লাগলেন এবং যেসব হোটেলে তিনি থাকতেন সেখানকার পরিচারিকাদের দেখাতে লাগলেন কিভাবে ঘর ঝাড়পোঁছ করার সময় নাভির ব্যায়াম করতে হয় (পদ্ধতি হচ্ছে : ফুসফুস থেকে অল্প অল্প করে শ্বাস বের করা এবং প্রত্যেকটুকু শ্বাস বের করার সময় নাভির চতুর্দিকের পেশী শক্ত করে তোলা)। ওর এই প্রচারে ফল হল। কর্মাধ্যক্ষরা অনেক কম উদ্বিগ্ন ভাব বোধ করতে লাগলেন, কর্মচারীরা কর্মে অধিকতর উন্মুখ হয়ে উঠতে লাগলেন। আজ জাপানের একশ ষাটটি প্রতিষ্ঠান "নাভি স্বর্গ" সমিতির সভ্য।

অবশেষে সপ্তাহ দুই আগে মুরাটার মতবাদসমন্বিত দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে। বইখানি হুড় হুড় করে বিক্রী হতে থাকলেও মুরাটা কিন্তু, তার পেশায় এখন সে আর একা নয়। জাপানের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য-শিল্পী শ্রীমতী আইকো ইয়ামানো সুগন্ধী জলপাইয়ের তেলের সঙ্গে লীনোলীন মিশিয়ে বাজারে ছেড়েছেন মেয়েদের জন্য এই উপদেশ দিয়ে যে, তারা যেন শয়নের পূর্বে নাভিতে কয়েক ফোঁটা ঢেলে নেন।

পর্বত বিজয়ে

প্রদ্যোতকুমার রায়

৪

১লা এপ্রিল। ঘুম ভেঙে তাঁবুর বাইরে দেখি বরফ জমে প্রায় বুকের কাছে দাঁড়িয়েছে। আজকের আবহাওয়া দেখে মনেই হয় না গতকালই প্রকৃতি দেবী আমাদের সঙ্গে কি নিদারুণ পরিহাস করে-ছেন। কয়েকদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর আজকে সম্পূর্ণ ছুটি। ব্রেকফাস্ট সেরে আগুনের চারধারে জমিয়ে বসে আমরা নানা পত্র-পত্রিকা ও চিঠিপত্রের বাণ্ডিল খুললাম। খানিকক্ষণ বাদে কিন্তু আর বসে থাকতে ভালো লাগল না, কয়েকজন ক্যাডেট গেল টেন্টে তাস ইত্যাদি খেলতে, আর আমরা বাকি সকলে চললাম বরফ যুদ্ধে, পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে একদল কুলির সঙ্গে আমাদের ঠাণ্ডা যুদ্ধ (?) শুরু হল। ঠাণ্ডা যুদ্ধ এই জন্য যে, এই যুদ্ধের অস্ত্র হচ্ছে বরফ। না, আমরা কুলিদের কাছে ক্রমশই হেরে যাচ্ছি, ওরা অনেকটা নরম বরফের তাল ছুড়ে মারছে—ঠিক আমাদের মুখে এসে লাগছে সেগুলো। আমাদের অবস্থার পতনের গতিরোধ করার জন্য অফিসাররা এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ওদিকে তেনজিং ও অন্যান্য ওস্তাদেরাও উপস্থিত। ওস্তাদরা আমাদের বিপক্ষে লড়াই করতে লাগলেন। তুমুল বরফ যুদ্ধ শুরু হল। তেনজিং কোন দলে? আমাদের দলে তো নেই, তবে কি বিপক্ষে যোগ দিলেন? না। ওই যে উনি নিরপেক্ষ দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন। শেষ পর্যন্ত উনিই মধ্যস্থ হয়ে যুদ্ধ থামালেন। তুষার সংগ্রাম শেষে গরম গরম চায়ের পেয়ালায় দু' দলের সন্ধিপত্র রচনা হল।

দার্জিলিঙ থেকে আমাদের জন্য যে সব টাটকা সব্জী আনা হয়েছিল সবই প্রায় ভিটামিন শূন্য হয়ে গেছে। এই জন্য আজ থেকে খাবারের সঙ্গে দুটো করে ভিটামিন ট্যাবলেট খেতে হচ্ছে। রাত্রে ভাত ডাল, চাপাটি, মাংস, ভিটামিন ট্যাবলেট ও গরম কফি দিয়ে ডিনার সারার পর আগুনের ধারে আমাদের নাচ গানের আসর বসল আগের মতই।

২রা এপ্রিল, আজকে শেখানো হবে 'ক্রাভার্স রেসকিউ' অর্থাৎ পর্বতারোহণ কালে যদি কেউ খাদে পড়ে যায় তবে তাকে কি ভাবে তুলতে হয়। ব্রেকফাস্টের পর আমরা বেরিয়ে পড়লাম রটং গ্লেসিয়ারের দিকে। ওখানে একটি সত্তর আশি ফিট গভীর খাদে ক্রাভার্স রেসকিউ শেখানো হবে। এই ভাবে বিপন্নকে উদ্ধার করতে মোট চারজন লোকের প্রয়োজন। যে খাদে পড়ে গেছে, তার কি অবস্থা জানবার জন্য একজন প্রথম 'রোপেলিং' করে (দড়ির সাহায্যে) খাদে নেমে যায় এবং তার পর তাকে 'ফার্স্ট এড' দিয়ে সংগীদের সাহায্যে দড়ি বেঁধে উপরে ওঠাবার ব্যবস্থা করে। তেনজিং-এর কাছে শুনলাম, এভারেস্ট বিজয়ের অভিযানে হিলারী একটি একশ' গজ গভীর খাদে পড়ে গিয়েছিলেন, তেনজিঙ একা তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন, আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচায়ক বইকি! যে কাজে অন্ততঃ চারজন লোকের প্রয়োজন হয়, সে কাজ তিনি একা করেছেন!

সামান্য মাত্র অবসর পেলেই আমি তেনজিং ও অপরাপর শেরপা ওস্তাদদের সাথে তাঁদের পর্বত অভিযানের গল্প শুনতাম। তাঁদের গল্প শুনে অনেক সময় মনে হয়েছে, তাঁদের বর্ণনা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে, আমিও যেন তাঁদের সঙ্গে সেই সব অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছি। তেনজিং বললেন, "পৃথিবীর অনেক জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু কলকাতায় যে রকম জনসাধারণের অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন পেয়েছি, তেমন আমার ভাগ্যে অন্য কোথাও জোটেনি।" তাই বোধ হয় কলকাতা তথা বাংলার শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা একটু বেশি।

দিনের শেষে তাঁবুতে ফিরে এলাম। গত দুয়েকদিন রাত্রে ঘুম হচ্ছে না ভালো। ডাক্তার খান্না শুনে ঘুমের ওষুধ দিলেন খাবার জন্য। আজকেও বরফ পড়তে শুরু হল, তবে গত রাত্রের মত গুরুতর ভাবে নয়।

আমাদের 'অ্যালার্ম ঘড়ি' টি বয়ের হাঁক শুনে ঘুম ভাঙল। চা খাওয়ার পর আবার একটু স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়লাম —বাইরে যা হাওয়া বইছে এখন কিছুতেই বিছানা ছেড়ে ওঠা যায় না। কিন্তু গা এলিয়ে দিতেই মনে পড়ল—গতকাল আমাদের সমস্ত শিক্ষনীয় বিষয় শেষ হয়ে গেছে— আজ হচ্ছে চরম পরীক্ষা। আজকে আমাদের কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্বতের কোন একটি শৃঙ্গে উঠতে হবে। ব্রেক ফাস্ট খেয়ে সঙ্গে লাঞ্চ নিয়ে, 'দুর্গা নাম' স্মরণ করে দল বেঁধে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। শেরপা ওস্তাদরাও দেখি মনে মনে প্রার্থনা করে নিচ্ছেন।

আজকের আবহাওয়া মোটামুটি ভালই—জোর হাওয়াই যা একটু প্রতিবন্ধক, তবে আকাশে মেঘ নেই। একের পর এক বরফের পাহাড় পার হয়ে শৃঙ্গের পানেই আমরা চলেছি। ষোল হাজার ফিট উঁচুতে এক জায়গায় বসে আমরা বিশ্রাম নিলাম। সেখান থেকে দার্জিলিঙ পাহাড় দেখা যাচ্ছে অনেক নীচুতে। মাঝে মাঝে সূর্যের আলো পড়ে কি যেন একটা ঝিকমিক করে উঠছে?—ওটা রাজভবনের চূড়া। টাইগার হিলটাই দেখলাম সব চেয়ে উঁচু দার্জিলিঙের মধ্যে।

আবার উপরে উঠতে শুরু করলাম আমরা। যতই এগোই ততই যেন কষ্ট বাড়তে থাকে এবার। ক্রমশ যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। পা যেন লোহার মত ভারি। পথও বিপজ্জনক। হাতুড়ি দিয়ে বরফের গায়ে গর্ত (Hand hole) বানিয়ে আস্তে আস্তে উঠছি। তেনজিং আগে আগে চলেছেন পথ দেখিয়ে। আমাদের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে

বরফের পাহাড় পেরিয়ে বেস্ ক্যাম্পে ফেরা

পশ্চিমবংগের ৬ জন এন সি সি ক্যাডেট

গেছে। কুকুরের মত জিভ বার করে আওয়াজ করে হাঁপাচ্ছি সকলেই। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হল সেই মাথাধরা আর বমির ভাব। আমরা উঠছি এমন জায়গা দিয়ে যেখানে এখুনি বরফের ধস নামতে পারে—আর তা যদি নামে তাহলে এই বিস্তীর্ণ বরফের জগতে কীটস্য কীট আমাদের দলটার আর কোন চিহ্নই থাকবে না। খানিকটা উঠেই মনে হচ্ছে বহুদূর উঠে এসেছি। তারপর অলটিমিটার দেখছি আর মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে! কাঞ্চনজঙ্ঘার সব চেয়ে উঁচু চূড়াটি এখান থেকে বেশ কাছে মনে হচ্ছে—ওটা আটাশ হাজার ফিট উঁচু। ওখানে উঠতে গেলে যে কি অবস্থা হবে তা এই সতের হাজার ফিটেই আমাদের খুবই হৃদয়ংগম হচ্ছে। আরও এগার হাজার ফিট যদি উঠতেই হয়, তবে কাঞ্চনজঙ্ঘা কেন, একেবারে স্বর্গলোকে গিয়ে উপস্থিত হব।

আঠার হাজার ফিট উঁচু একটি চূড়োয় এসে আমরা থামলাম; সেখানে গরম কফি বা কোকো খাওয়া হ'ল। ভীষণ কুয়াশা আর অন্ধকার। সেই চূড়োয় তেনজিং সফলকাম শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানালেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিলেন ন' জন অফিসার ও সাতজন ক্যাডেট।

আমরা ঠিক করছিলাম যে, আঠার হাজার ফিট পর্যন্ত যখন উঠতে পারা গেছে—তখন আমরা কুড়ি হাজার ফিট উঁচুতে উঠব। শুনেছি আমাদের আগে মাত্র একটি দল (Fifth course-এর শিক্ষার্থীরা) কুড়ি হাজার ফিট উঠে ইনস্টিট্যুট থেকে একটি স্মারক ব্যাচ পেয়েছিল।

কিন্তু তেনজিঙ কিছুতেই রাজি হলেন না, কারণ তখন বেলা আড়াইটা বেজে গিয়েছিল আর তাছাড়া ওখানে ধস নামার ভীষণ ভয়। ফিরবার পথে যদি তুষারপাত শুরু হয় তবে বেস ক্যাম্পে পৌঁছবার আগেই তুষার সমাধি হয়ে যাবে আমাদের। এখানকার রুদ্র প্রকৃতির হাতে আমাদের জীবনের কোন মূল্য নেই।

তাড়াতাড়ি করে কোনরকমে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিলাম। বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ সমতলভূমির তুলনায় অনেক কম। সংগে অবশ্য গ্যাস আধার আছে।

বেস ক্যাম্পে ফিরতে হবে, আর বেশি সময় নেই, সুতরাং আমরা অন্য সহজ পথ শুনেছি আমাদের আগে মাত্র একটি দল গ্লিসেডিং হচ্ছে বুটের তলার ক্রাম্পন খুলে বরফের সমন্তরালে পা রেখে আইস অ্যাক্সের উপর বসে আস্তে আস্তে পিছলে নেমে যাওয়া। শুনতে বেশ মজার লাগে বটে এবং গ্লিসেডিং করতেও প্রথমটা, কিন্তু কিছুদূর এইভাবে চললেই মজাটা টের পাওয়া যায়। গতিবেগ ক্রমশ বাড়তে থাকে, শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ওস্তাদ ক্যাপ্টেন পন্থকে আগিয়ে দিলেন সর্বপ্রথমে, তারপরেই আমি এবং আমার পর তরফদার। সব শেষে রইলেন ওস্তাদ নিজে। উনি কিন্তু ক্রাম্পন খোলেননি। কেননা পথে যদি কেউ বিপদে পড়ে তবে তাঁকে বাঁচাবার দায়িত্ব ও'রই।

ক্যাপ্টেন পন্থ ভগবানের কৃপায় বেশ ওজনে ভারি আছেন। ফলে ওর গতিবেগও অনেক
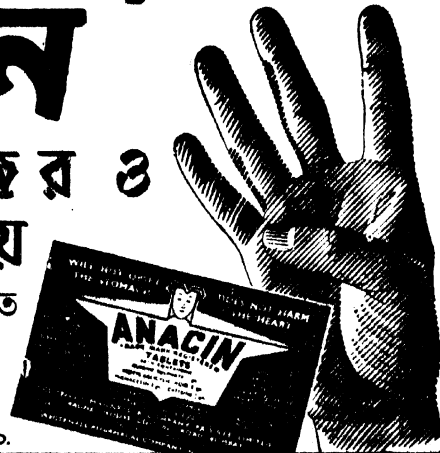
বেড়ে যাচ্ছে।' ব্যালান্স রাখতে পারছেন না আর আমার পক্ষে তাঁর কোমরের দড়ি ধরে মণ তিনেক ওজন সামলান সম্ভব হচ্ছে না আর সেই জন্য নিজেও বারবার আছাড় খাচ্ছি। আমার কাণ্ড দেখে পিছনের তরফদারও নাজেহাল হয়ে পড়েছে। মজা দেখে ওস্তাদ খুব হাসছেন। যাই হোক, কোন রকমে শরীর অক্ষত রেখে, বিকেল সাড়ে চারটের সময় বেস ক্যাম্পে পৌঁছলাম। ক্যাডেট গাঙ্গুলী আর সোম বেরিয়ে এসে আমাদের কাছে সব অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনতে লাগল আর নিজেদের হাত কামড়াতে লাগল অনুশোচনায়। কেন তারা আজকে ক্যাপ্টেন আমাকে দিয়ে 'সিক্ রিপোর্ট' করিয়ে তাঁবুতে শুয়েছিল।

আজকে 'ক্লাইম্বিং' সেরে ফিরে এসে সকলেই খুব আনন্দে আছে! বৈকালিক চায়ের পরই আমাদের নাচগান শুরু হ'ল—শেষ হ'ল রাত্রের ডিনারের পর।

৫ই এপ্রিল, আজকের প্রোগ্রাম হচ্ছে রক রোপেলিং। সকাল সাতটায় আমরা বেস ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পড়লাম অনেক নিচুতে কোন একটি পাহাড়ের দিকে যেখানে বরফ নেই। প্রায় দেওয়ালের মত খাড়া দুটি পাহাড়, একটি পঞ্চাশ গজ, আর একটি একশ' গজ (আনুমানিক) উঁচু। একে একে প্রত্যেকে রক ক্লাইম্ব করে উপরে উঠল আবার রোপেলিং করে নেমে এলো। তেনজিং নীচে একপাশে দাঁড়িয়ে তাঁর মুভি ক্যামেরায় প্রত্যেকের ছবি নিতে লাগলেন। কেউ নীচের দিকে তাকালেই রেগে যান। কারণ নীচে তাকিয়ে যদি দেখে যে কতো উপরে উঠেছে তবে ভয়ে আপনা থেকেই হাতের দড়ি ছেড়ে যাবে। একশ গজের খাড়াইটা উঠতে উঠতে বুঝি আর শেষ হতে চায় না। হাত পা কাঁপতে শুরু করল, হৃৎস্পন্দন চলছে দ্রুততালে। 'সাবাস্ সাবাস্, ঔর তেজসে, ডোণ্ট বি নারভাস, জাম্প!' তেনজিংয়ের অভয়বাণী শুনতে শুনতে নেমে এলাম। তেনজিং নিজের হাতে আমার কোমরের দড়ি খুলে দিলেন।

শেরপা লস্করেরা এখানে ওখানে আগুন জ্বালিয়ে চা তৈরী করল। ছোট ছোট পাথরের ঢিবির উপর বসে আমরা মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে নিলাম।

লাঞ্চের পর কিছুক্ষণ রক ক্লাইম্বিং করে আমরা বেস ক্যাম্পে ফিরে গেলাম।

কন্‌কনে ঠাণ্ডায়, গন্‌গনে আগুনের চারপাশে বসে ঠিক হ'ল আগামী কাল, আমাদের বেস-ক্যাম্পে বাসের শেষ দিনে, রাত্রি বেলায় 'ক্যাম্প ফায়ার' হবে এবং তাতে দলের প্রত্যেককে অংশ গ্রহণ করতে হবে, এমনকি লস্কররাও যেন বাদ না পড়ে। সেই উপলক্ষে আগামী কাল সম্পূর্ণ ছুটি থাকবে।

৬ই এপ্রিল। আজ সকালে বেস ক্যাম্পকে যেন বড়ো ভালো লাগছে। কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফ ঢাকা চূড়োগুলো যেন রুপোর তৈরী মন্দির। সেই সব তুষার শীর্ষে সূর্যের সপ্তাশ্ববাহী রথ যেন আসছে নেমে সোনালী আলোর ধারায়।

ব্রেক ফাস্টের পর যে যার কিট্‌স্ গুছোতে ব্যস্ত হ'ল। আজকেই বেস ক্যাম্পে শেষ-দিন—আগামী কাল এতক্ষণে আমরা ফিরতি পথে যাত্রা শুরু করেছি।

দুপুরে লাঞ্চের পরে আমরা রাত্রের ক্যাম্প ফায়ারের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলাম। আমি ঠিক করলাম গোটা কতক গল্প বলব; এবং সকলে মিলে কয়েকটা বাংলা ও হিন্দি গান গাইব। সারা দুপুর এই সবের প্রোগ্রাম চলল।

জ্বলন্ত সূর্য ক্রমশ লালচে হয়ে আসছে—বিকেল গড়িয়ে পড়েছে গোধূলিতে—লালচে আভায় গড়া গোল সূর্য হঠাৎ ডিগ্‌বাজী খেয়ে তুষারশুভ্র পাহাড়ের আড়ালে ঢলে পড়ল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল—পরিষ্কার আকাশে একটি দুটি তারা ফুটে উঠল। পাহাড়ের কোণ থেকে বাঁকা চাঁদ বেরিয়ে এল, যেন বলল, আজকের উৎসবে আমি হব অতিথি।

রাত্রে আজকে ভোজ। পোলাও মাংস এবং পায়েস রান্না হয়েছে—পরিশেষে গরম কফি। উৎসব বোধ হয় খাওয়া থেকেই শুরু হ'ল।

উৎসব!—আগুনের ধারে সকলেই এসে জড়ো হয়েছে, তেনজিং, ওস্তাদরা, কুলি ও লস্কররা; আর শিক্ষার্থী দলের সদস্যরা তো আছেই। তেনজিং উঠলেন প্রথমে। নাতি-দীর্ঘ একটি ভাষণে তিনি আমাদের পর্বতারোহণ শিক্ষা সমাপ্তির ঘোষণা করলেন এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানালেন। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন কমাণ্ডার জন পেরেরা। তারপর ক্যাডেটরা 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা'

গানটি গাইল। বিচিত্রানুষ্ঠান চ'লল। সব শেষে ছিল—পার্বত্য লোকনৃত্য। প্রায় আধ ঘণ্টার এই নৃত্যানুষ্ঠানে যোগদান করলেন শ্রীতেনজিং, ওস্তাদগণ ও সমস্ত শেরপা কুলিরা।

অনুষ্ঠানের শেষে আর এক দফা গরম কফি এল। তারপর 'গুড নাইট টু এভ্রি বডি।'

৭ই এপ্রিল। স্বপ্ন দেখছি বিরাট হিমালয়ের তুষারমানব এসেছে আমাদের সঙ্গে মোলাকাত করতে। তাঁবুর দরজা বন্ধ দেখে ডাকাডাকি লাগিয়েছে বাইরে থেকে। ঘুম ভেঙে গেল। সত্যিই তো বাইরে থেকে কে ডাকছে—দরজা খুলে দেখি তুষারমানব নয়—আমাদের ওস্তাদ আংথাম্পা। উনি খুব তাড়াতাড়ি কিট্‌স্ গুছিয়ে নিতে নির্দেশ দিলেন— আজকে যে রকমেই হোক ন' হাজার ফিট বাকিমে নেমে যেতেই হবে। বেস ক্যাম্পের পালা শেষ।

সকাল ছটায় পিঠে রুকস্যাকে লাঞ্চ নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ফিরতি পথে।—একটু একটু যাচ্ছি আর মনে হচ্ছে আজ আর সন্ধ্যার আগে এখানে ফিরে আসব না—আগুনের চারধারে আমাদের সেই আনন্দ উৎসবের দিন গেছে শেষ হয়ে। যেতে যেতে খালি ফিরে তাকাচ্ছি বেস ক্যাম্পের দিকে দিকে—দেখতে পেয়ে ক্যাপ্টেন খান্না ধমকে উঠলেন, "তুমি কি বেস ক্যাম্পে ফিরে যেতে চাও নাকি?"

অনেক দূর এসে পড়েছি। এখন আর পিছন ফিরে তাকালেও বেস ক্যাম্প দেখা যায় না। আমাদের আগের দল অনেক এগিয়ে গিয়েছে; এখন আমরা ওস্তাদ তোপকের দলে চলেছি। মিঃ চৌধুরীর পায়ে ফোস্‌কা পড়েছে—ভালো করে চলতে পারছেন না, ফলে আমরাও ও'র সঙ্গে আস্তে আস্তে যাচ্ছি। সাত আট মাইল চলার পরই প্রচণ্ড তুষারপাত শুরু হ'ল। আমরা যদিও স্নো প্রুফ জ্যাকেট ও ট্রাউজার পরে নিয়েছি তা হলেও চলতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। পথ চিনবার উপায় নেই—চারদিক বরফে সাদা। যত নীচে নামছি দেখি তুষারের বদলে বৃষ্টি পড়ছে। বরফপড়া যদিও বা সহ্য করা যায় বৃষ্টির ছাট একেবারেই অসহ্য। বরফের উপর জল পড়েছে বলে বার বার পা পিছলে যাচ্ছে। ক্ষিদে পেয়ে গেছে খাবার সময়ও হয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় বসে খাই? অবশেষে ইন্‌স্ট্রাক্টর তোপকে একটি বরফ ঢাকা গুহা খুঁজে বার করলেন। আইস অ্যাক্স দিয়ে বার বার ঠুকে দেখে নিলেন ওটা সত্যি গুহা, অথবা কোনো জলভরা গুহা যার ওপরটা বরফে জমে গেছে। সেইখানে বসে লাঞ্চ সেরে নিয়ে আমরা বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম—সেই রক্ত-হিম-হয়ে-যাওয়া শীতের বৃষ্টি থামবার নামও করে না বরং ক্রমশ বেড়ে চলে। বেলা দুটোর সময় আমরা মরিয়া হয়ে বেরিয়ে পড়লাম, আরও দশ বারো মাইল পথ বাকি আছে। কিছুদূরে যাওয়ার পর ভাগ্যক্রমে বৃষ্টি একেবারে থেমে গেল। ফের আমরা রডোডেনড্রন গাছের আওতায় এসে পড়েছি—বরফ গলে কাদা হয়ে গিয়েছে এবং তার মধ্য দিয়ে আমরা পথ করে নিচ্ছি। অনেক দেরী হয়ে গেছে। আমাদের আগের দল নিশ্চয়ই বাকিম পোঁছে গেছে এতক্ষণে। রুদ্ধশ্বাসে হেঁটে বেলা সোয়া পাঁচটায় অমরা বাকিম পোঁছলাম। তেনজিং প্রায় রুদ্রমূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তারপর সে কি অভ্যর্থনা। ওস্তাদ তোপকের থেকে শুরু করে আমি পর্যন্ত কেউই সে বকুনির থেকে রেহাই পেলাম না। সেই দলে অন্যান্যরা ছিলেন—ক্যাপ্টেন খান্না, ক্যাপ্টেন পন্থ, লেফটেনাণ্ট মুলুকরাজ এবং এয়ার ফোর্সের চৌধুরী ও বশিষ্ঠ।

খোঁজ নিয়ে জানলাম, আমাদের আগের দল বেলা বারটায় বাকিম পোঁচেছে। অর্থাৎ আমরা যখন তুষারপাতের মধ্যে ওরা তখন বৃষ্টিতে ভিজছে। ভিজেছে সকলেই। প্রত্যেকে আগুনের চারধারে ভিজে জামা-কাপড় শুকোচ্ছে। তেনজিং-এর বকুনির রি-অ্যাকশন্ দেখা গেল রাত্রে খাওয়ার সময়। বশিষ্ট ও চৌধুরী রাগ করে খেতেই এলো না। ক্যাপ্টেন খান্না ও জন পেরেরায় বাঁধল তুমুল ঝগড়া। আর আমি আগুনের ধারে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ডিনার খেতে লাগলাম। হঠাৎ পিঠের উপর হাত পড়তেই দেখি শ্রী তেনজিং। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "অপরাপর অফিসারদের কি হ'ল?"

আমি বললাম, "কিছু বলতে পারি না স্যার।"

তেনজিং গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, "কিছু মনে করো না মিঃ রায়, তুমি তো আমার ছেলের মত।"

খাওয়ার পর তো গিয়ে দেখি আমার স্লিপিং ব্যাগ ভিজে জবজব করছে এবং আমার টেণ্ট-পার্টনার তাঁবুর ভিতর আরামে নিদ্রাগত। গিয়ে ওস্তাদ আংথাম্পাকে বললাম এই ব্যাপার। একে সারাদিন ভিজে কষ্ট পেয়ে এসেছি তায় রাত্রে যদি ভিজে স্লিপিং ব্যাগে শুতে হয় তবে নির্ঘাৎ নিউ-মোনিয়া। আংথাম্পা তাড়াতাড়ি আমার জন্য একটা শুকনো ব্যাগের বন্দোবস্ত করলেন।

৮ই এপ্রিল, আজকে সকালে আমাদের দলকে দুটি ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছে—প্রথম দলে আছে সুস্থরা এবং দ্বিতীয় দলে অসুস্থরা। আমাকে সুস্থ দলের সঙ্গে যেতে হ'ল। কিন্তু পেরেরার লম্বা লম্বা পায়ের সঙ্গে তাল রেখে চলা কষ্টকর। কিছুদূরে যাওয়ার পর আমি আমার ক্যাডেট বন্ধুদের বললাম যে, আমি পিছনের দলে গিয়ে যোগ দেব। তাদেরও দেখি সেই ইচ্ছা। যাই হোক, এই প্রথম দলে থাকাকালীন আমরা ফিরতি পথে প্রথম ব্রীজ পার হলাম। ওঃ,

কতদিন বাদে আবার নদীর মুখ দেখলাম। জামাকাপড় খুলে শর্টস পরে গায়ে মাথায় খুব জল দিয়ে নিলাম। সকলে আমাকে তাড়া দিতে লাগল। আমি দেখলাম, এই সুযোগ। বললাম, আমার শরীরটা একটু খারাপ লাগছে, আমি এখনেই একটু অপেক্ষা করব এবং পরের দলের সংগে আসব। তরফদার, ক্যাপ্টেন পন্থ, সোম ও গাঙ্গুলী আমার সংগে রয়ে গেল।

পিছনের দলে ছিলেন তেনজিং। উনি আর ওস্তাদ গালছেন দেখি নানা দুষ্প্রাপ্য অর্কিড গাছ সংগ্রহ করছেন। বেলা সাড়ে এগারটার সময় একটি ঝরনার ধারে বসে আমরা মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে নিলাম। লাঞ্চের পর তেনজিং এগিয়ে গেলেন। আংথাপ্পা আমাদের সংগে রইলেন। এবার আমরা সিকিমের গ্রামাঞ্চলে এসে পড়েছি। বেলা দুটোর সময় আমরা 'ইয়কসামে' এসে পেশছলাম। এসে দেখি, টেণ্ট পাতা হয়ে গেছে—রান্না চড়েছে এবং শেরপা লস্কররা তুম্বার সন্ধানে এধার ওধার ঘুরছে। বহুদিন বাদে ভাল করে সাবান মেখে স্নান করলাম, তারপর মুরগির মাংস আর ভাত। রাতে শুতে যাব এমন সময়ে টুং টুং ঘণ্টা বাজিয়ে ইনিষ্টিট্যুটের রানার এসে উপস্থিত। আমার চারখানা চিঠি এল। আরও এসেছে গত আট দিনের খবরের কাগজ।

৯ই এপ্রিল, আজকে ছুটি। আমরা ঝরনার ধারে গিয়ে দেখি, সিকিমি মেয়েরা বাঁশের নলে করে জল বয়ে নিয়ে চলেছে ঝরনা থেকে। আজকে ইয়কসামের অধি-বাসীরা এল আমাদের কাছে ওষুধ নিতে। শিক্ষা শেষ করে ফিরে আসবার সময় প্রতিবার যা ওষুধ বেঁচে যায় তা দেওয়া হয় এইখানকার পার্বত্য অধিবাসীদের। ক্যাপ্টেন থাপার সংগে আমরাও লেগে গেলাম ওদের শুশ্রূষা করতে। মুশকিল হচ্ছে এই যে, ওদের কথাবার্তা বোঝা যায় না মোটেই। ওস্তাদরা দোভাষীর কাজ করলেন। লাঞ্চের পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা কাছের বুদ্ধমন্দির দেখতে গেলাম। মন্দিরের প্রধান পূজারিনী এক বৃদ্ধা মহিলা। তিনি আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কি আকর্ষণে আমরা সুন্দর দার্জিলিঙ ছেড়ে এখানে এসেছি। প্রত্যুত্তরে বললাম, আমাদের দল গিয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘায়—ফিরতি পথে আমরা এসেছি এখানে। উনি আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন—আমরা ভাগ্যবান তাই এই কমবয়েসে দেবী কাঞ্চনজঙ্ঘার দর্শন পেয়েছি। তিনি এইখানে থাকেন, বৃদ্ধা হয়ে পড়েছেন, তথাপি তাঁর সে সৌভাগ্য হ'ল না।

কাজির বাড়িতে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। আজকে শীত অনেক কম—আর স্লিপিং ব্যাগের আশ্রয় নিতে হ'ল না।

১০ই এপ্রিল, আমরা সকালে পথে বেরিয়ে পড়েছি। ইয়কসামে আমরা যাদের চিকিৎসা করেছিলাম তারা পথের ধারে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে আমাদের বিদায় দিল। তেনজিং ও ওস্তাদদের দেখাদেখি অনেক অফিসারও লেগে গেলেন অর্কিড সংগ্রহ করতে। কিছু পথ চলে আমরা একটি সুন্দর গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। জায়গাটির নাম চম্বু। ধাপে ধাপে সিঁড়িক্ষেত নেমে গেছে। এখানে একটি মন্দির দেখলাম—সেখানে বুদ্ধমূর্তি নেই—অন্যান্য নাম না জানা দেবদেবীর পূজা হচ্ছে, উপকরণ হ'ল তুম্বা। মন্দিরের পাশে একটি ছোট পাঠ-শালা। সবচেয়ে উঁচু ক্লাশের শ্রেষ্ঠ ছাত্র গুরুমশায়ের অনুপস্থিতিতে ক্লাশ চালাচ্ছে। ওরা আমাদের দেখে অবাক হয়ে গেল। আমরা প্রত্যেক ছেলেকে চারটে ক'রে চকোলেট দিলাম। অবাক বিস্ময়ে ওরা সেগুলো হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে দেখে একজন বলল, ওগুলো মিষ্টি। সে কথা শুনে আরও যেন অবাক হয়ে গেল ওরা। প্রতিদানে ওরা আমাদের গান শোনালো।

আবার শুরু হ'ল পথ চলা। বেলা সাড়ে তিনটেয় এসে পেশছলাম গেজিং বাজারে। এখানেই ক্যাম্প হবে। আমরা ফিরে এসেছি

শুনে এখানে একটা সাড়া পড়ে গেল। সেই হেডমাস্টার মশায় এলেন দেখা করতে—তিনি তাঁর স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটি নাচ গানের আসর জমালেন। আজকে খাবার সময়ে প্রচুর তাজা শাকসব্জী পাওয়া গেল। বেশ কয়েকদিন আমরা টাট্‌কা সব্জীর বদলে ভিটামিন্‌ ট্যাবলেট খেয়ে চালিয়েছি।

পরের দিন ভোরে আবার রওনা হয়ে পড়লাম। আমরা ঠিক করলাম—পথে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমন্দির আছে—সেটা দেখে যাব। সুদূর নেপাল, তিব্বত, ভুটান থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে এই মন্দির দর্শন করতে। ওখানে একটা উষ্ণ প্রস্রবণও রয়েছে। অনেক দূর নেমে আমরা একটি পাহাড়ী নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। নদীর উপরের বাঁশের সাঁকো পার হয়ে আমরা তীর্থস্থানে উপনীত হলাম। দূরযাত্রীদের বিশ্রামাগারে গিয়ে সংগের মালপত্র রেখে এসে আমরা মন্দির দর্শন করতে গেলাম। প্রধান পূজারী আমাদের স্বাগত জানালেন। দেবস্থান দেখেই তো চক্ষুস্থির। সরু লম্বা একটা গুহা, বসে বসে হাঁটু মুড়ে এগুতে হয়। আস্তে আস্তে গিয়ে গুহার শেষ প্রান্তে পৌঁছান গেল। সেখানে মোমবাতি জ্বলছে এবং দু চারটি ফুলও পড়ে রয়েছে। সেইখানেই দেবতার অধিষ্ঠান। সুন্দর ধূপের গন্ধ বার হচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে এলাম। এরপর ওস্তাদরা বললেন, পাপগুহায় যেতে, শুনলাম, এই গুহায় একবার ঢুকে বার হয়ে আসতে পারলে শুধু আমার কেন, আমার ঊর্ধ্বতন এবং অধস্তন চতুর্দশ পুরুষের পাপ কেটে গিয়ে নির্বাণ লাভের পথ সুগম হবে। ওস্তাদরা ঢুকে বেরিয়ে এলেন। দু একজন অফিসার ঘুরে এসে বললেন, শরীর তাঁদের খুব খারাপ। তারপর আমিও কৌতূহলের বশে ঢুকে পড়লাম সেই গুহায়। পাপগুহাকে গুহা না বলে ওটাকে একটা সোজা গর্ত বলা যায়—সিধে উপরে উঠে গেছে, খুব সরু। রক ক্লাইম্বিং শিক্ষা এইখানে কাজে লাগল। বেশ কিছুটা উঠে দেখি, উপরে ঠিক বাংলা দুই অক্ষরের মত একটা বাঁক। ইতিমধ্যেই শরীরটা শক্ত হয়ে গিয়েছিল গর্তটা সরু বলে, তারপর সেই বাঁক পার হতে গিয়েই গেলাম আটকে। না পারছি উপরে উঠতে, না পারছি নীচে নামতে। একেবারে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। মনে হচ্ছে, প্রাণটা যেন গলার কাছে পৌঁছে গেছে—শরীরটা বাঁক থেকে বার করার আগেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে দেহ ছেড়ে। উপরে ওস্তাদরা জিজ্ঞাসা করছেন উদ্বিগ্ন হয়ে, কি ব্যাপার, দেরী কেন! ব্যাপার শুনে সকলে নানা উপায় বাতলাতে লাগলেন—কিন্তু কোনটাই কাজে লাগাতে পারছি না। খালি ভগবানের নাম করছি—তারপর কি করে জানি না বেরিয়ে এলাম। বাইরে এসে বুঝতে পারলাম, জীবন্তে এই নরক যন্ত্রণা

ভোগ করে নিলে নিশ্চয়ই নির্বাণের পথ সুগম হবে।

পরলোকে নির্বাণের পথ প্রশস্ত করে রেখে আপাতত আমরা গেলাম উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করতে। জলটায় গন্ধকের গন্ধ। শুনলাম, এই জল খেলে অনেক দুরারোগ্য রোগ ভাল হয়। সত্যিই হয় কিনা জানি না, তবে পাপগুহার অবসাদ এই প্রস্রবণের গরম জল অনেকটাই দূর করে দিল।

পরের দিন খুব ভোরে আমরা 'ঋষি' থেকে নেমে এলাম শিংলায়। এখান থেকে তেনজিং ঘোড়ায় চড়ে দার্জিলিং ফিরে গেলেন। সন্ধ্যার সময় পর্বতারোহণ শিক্ষা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ এলেন আমাদের শিক্ষা সমাপ্তির সম্ভাষণ জানাতে। আর তাঁর সংগে যারা এল তাদের সম্বর্ধনা জানালাম আমরা ষোড়শোপচারে। তারা হ'ল দার্জিলিঙ থেকে আনা সেরা জাতের মিষ্টি।

তারপর দিন রাত্রির অন্ধকার থাকতেই আমরা পথে বেরিয়ে পড়লাম। আজকেই আমরা দার্জিলিঙ পেঁছাব। অসুস্থরা অধ্যক্ষের সংগে মোটরে ফিরে গেল। আমরা হাঁটতে হাঁটতে চললাম শহরের দিকে। লোকালয়ে ফিরে এসেছি আবার। চারদিকে নেপালীদের গ্রাম, চা বাগান ইত্যাদি। যতই উঠছি দার্জিলিঙ শৈলনিবাস ছবির মত ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। ক্রমে আমরা দার্জিলিঙের পথে এসে পড়লাম। আকাশে মেঘ করে রয়েছে। ইনস্টিট্যুটে পেঁছলাম বেলা দশটার সময়। ঢুকেই প্রথম যাদের দেখা পেলাম তারা হ'ল একদল নাপিত। ওরা ঠিক খবর পেয়েছে আজ ওদের মরসুম।

এতদিনে আমাদের শরীর একেবারে অর্ধেক হয়ে গেছে, গায়ের রঙ গেছে পালটে। যারা ফরসা ছিল তারা লাল হয়ে ফিরেছে—যাদের রঙ কালো তারা গেছে নীল হয়ে। ইনস্টিট্যুটে এক সপ্তাহ বিশ্রাম করে আমরা যে যার বাড়ি ফিরে যাব।

সেই শেষের সাত দিন কাটল আনন্দ করে। প্রত্যেক দিনই কেউ না কেউ আমাদের নিমন্ত্রণ জানালেন। দু' তিন দিনে আমাদের শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠল। বাড়ি ফেরার আগের দিন বিকালে আমাদের চায়ে আপ্যায়িত করলেন তেনজিং এবং তাঁর পরিবারবর্গ। এতদিন আমরা এক সংগে ছিলাম বলে ওঁর সংগে যেন এক আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল—ওঁকে তাই ছেড়ে যেতে মন চাইছে না।

দীর্ঘ বিয়াল্লিশ দিন পরে আমরা দার্জিলিঙ পর্বতারোহণ শিক্ষা কেন্দ্র থেকে বিদায় নিলাম। কি জানি, কি এক অদৃশ্য আকর্ষণে এই শিক্ষা কেন্দ্র আমাদের টেনে রেখেছে যার জন্য নিজের বাড়ি ফিরে যেতেও পা উঠছে না। তবু ছেড়ে আসতে হ'ল দার্জিলিঙ পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র—আমার স্মৃতি ছড়িয়ে রেখে গেলাম ওইখানে।

বাড়ি ফিরে এসেছি। প্রিয়জনদের কাছে পেয়ে মন উল্লসিত হয়ে উঠেছে। দৈনন্দিন কাজে যোগ দিতে হয়েছে ফের। কিন্তু তবু মনটা মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যায়—বোধ হয় ফিরে যায় পনের হাজার ফিট উঁচুতে সেই বেস ক্যাম্পে, যেখানে গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছে, জমে থাকা বরফের উপর সূর্যের সোনালী আলো পড়ে মুক্তোর মত ঝক্‌ঝক্‌ করছে। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে, পাহাড়ী ঝরনার ছল্‌ ছল্‌, বাতাসের সোঁ সোঁ আর অ্যাভালাঞ্চের গুড় গুড় আওয়াজ।

সমাপ্ত

গা থেকে লেপটা সরিয়ে উঠতে যাচ্ছিল রেবা; হেমন্ত ওর একটা হাত ধরে ফেললো। হাত ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করে রেবা একটু হাসলো। তারপর বললো, 'ওকি, আবার ধরলে যে! ছাড়ো!'

হেমন্তর মধ্যে তেমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। রেবার হাতটা তেমনিভাবে ধরে, বরং একটু কাছে টেনে বললো, 'এর মধ্যেই চলে যাচ্ছো!'

রেবা বললো, 'বা-রে, এই বেলা পর্যন্ত শুয়ে থাকলেই চলবে! ও দিকে মা বোধ-হয় সাত সকালে উঠে উনোনে আগুন দিয়েছেন।'

'তা দিক।' রেবার অন্যমনস্কতায় হাত ছেড়ে কোমর জড়ালো হেমন্ত। 'বুড়ো হাড়ে সব সহ্য হয়। একদিন না হয় মা—'

হেমন্তর কথা শেষ হবার আগেই ওর মুখে হাত চাপা দিলো রেবা। 'ছি, ছি। মা-কে কষ্ট দিতে বুঝি তোমার ভালো লাগে!'

হেমন্ত হেসে বললো, 'বড় যে দরদ! মা কিন্তু শুনলে বিশ্বাস করবে না, তার বউ এমন শাশুড়ি ভক্ত।'

রেবা একটু গম্ভীর হলো। বললো, 'কেন, আমি বুঝি মাকে গ্রাহ্য করি না!'

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালো হেমন্ত। রেবার চোখের কোলে যেন এখনো একটু একটু ঘুম রয়েছে। সন্ধ্যাবেলায় কপালে গোল করে সিঁদুরের টিপ পরেছিল; রাত্রি-শেষে এখন সে-সিঁদুর নাকের পাটায়, গালে, চিবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। থুতনির ওপর ছোট্ট ঘন বাদামী রঙের একটু কাটা দাগ হাল্কাভাবে মিলিয়ে গিয়েছে। পাতলা লালচে ঠোঁট দুটো একটু বাঁকানো, কাঁপানো। মৃদু হেসে হেমন্ত বললো, 'তা নয়। আসলে মা তোমাকে হিংসে করে।'

রেবাকে আরো একটু কাছে টানলো হেমন্ত। দরজার ফাঁক দিয়ে সরু আলোর রেখা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। কোণের দিক-গুলো এখনো অন্ধকার। বাইরে একটা কাক ডাকছিলো।

রেবা বললো, 'যাঃ, তুমি ভারি ইয়ে—অসভ্য। এখন ছাড়ো তো।'

এই বার একটু জোর করলো রেবা। কিন্তু কিছুই হলো না। হেমন্তর জোর অনেক বেশি। বললো, 'না, লক্ষ্মী, আরো একটু থাকো না। বড্ড শীত করছে।'

হেমন্তর গলা এইবার কেমন একটু করুণ!

স্বামীর মুখের দিকে তাকালো রেবা। হেমন্তর জন্য হঠাৎ কেমন যেন মায়া হলো। রেবা তাকিয়ে ছিলো হেমন্তর শরীরের দিকে। সত্যি, বেচারা! গায়ে মাত্র একটা পুরনো গেঞ্জি। শোবার সময় নতুন গেঞ্জি পরতে চায় না হেমন্ত। জামা তো নয়ই। বিছানায় শুলে জামা-কাপড়ের ভাঁজ নষ্ট হয়, দাগ পড়ে, ময়লা হয় তাড়াতাড়ি। হেমন্তর তাই ভয়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হেমন্তকে দেখছিলো রেবা। বগলের পাশ দিয়ে বুক পর্যন্ত গেঞ্জিটা অনেকখানি ছেঁড়া, পাশে গুটিয়ে গিয়েছে। ওপরে লেপ থাকলেও তাতে শীত আটকায় না। তার ওপর এ বছর শীতের দাঁতগুলো এত বড় বেশি ধারালো। নভেম্বরের শুরুতেই রাঙা চোখ দেখিয়েছিল। ডিসেম্বরে কামড় বসালো। রেবার গায়ে ছিটের ব্লাউজ, ব্লাউজের নিচে ছোট জামা। যন্ত্রণাটা তবু হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। হেমন্তর দোষ কী!

হাত বাড়িয়ে হেমন্তর বুক ছুঁলো রেবা। ছেঁড়া জায়গাটায় হাত রাখলো। হেমন্তর বুকটা থিরথির করছে। আস্তে আস্তে হাত বুলোলো রেবা। তারপর হাতটা তুলে হেমন্তর কপালে দিলো। হেমন্তর মাথার চুলগুলো ঘন, বড় বড়, চুলের যত্ন নেয় না হেমন্ত। অগোছাল চুলের ভেতর রেবার আঙুলগুলো কিছুক্ষণ স্থির থাকলো। এরপর হেমন্তকে কী বলবে। ভাবছিলো রেবা।

হেমন্তও একটু অবাক হয়েছিলো। রেবার চোখ দুটো কেমন উদাস, বিষণ্ণ, থমথমে। ক' পলক দেখে হেমন্ত বললো, 'কী ব্যাপার, শুতে বললুম, শুলে না! ফ্যাল ফ্যাল ক'রে অতো দেখছো কী!'

রেবা কিছু বললো না। হাতটা আগেই ছেড়ে দিয়েছিলো হেমন্ত। পা গুটিয়ে আস্তে আস্তে নামালো রেবা। হেমন্ত দেখলো রেবা নেমে যাচ্ছে।

দরজার কাছে গিয়ে রেবা দাঁড়ালো। ডান দিকের গালে একটুকুরো ফিকে-ফিকে আলো। কয়েক মুহূর্ত সেইভাবেই স্থির নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফিরলো রেবা। পা পা করে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

হেমন্তর কোমরের কাছে লেপটা গুটানো ছিলো। গা খোলা; ছেঁড়া গেঞ্জিটা হাঁ-করা রুগ্ন মুখের মতো দেখা যাচ্ছে। লেপটা হেমন্তর গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে রেবা বললো, 'তুমি ঘুমোও।'

'তারপর?'

'তুমি শুয়ে থাকবে। যতক্ষণ আমি না আসি।'

হেমন্ত হাসলো। কিছু বললো না।

রেবা পাশ ঘুরলো। তারপর বুকের কাছে শাড়িটা গুছিয়ে দরজার খিল সরালো।

বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো রেবা। একটুখানি বারান্দা। দেওয়ালগুলো কুয়াশায় অস্পষ্ট। মাঝখানে একটুকরো উঠোন; পেঁপে গাছটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। হুস ক'রে একটা কাক উড়ে গেল। রেবা কাঁপছিলো। কি বিশ্রী শীত। হাত-পাগুলো যেন সিঁটিয়ে যাচ্ছে। কনকন করছে দাঁতের মাড়ি। হেমন্তর কথা শুনলে হতো! কিন্তু;—শাড়িটা ভালো ক'রে শরীরে জড়িয়ে উঠোনে নামলো রেবা।

খাপ্‌রার চালের মাথায় ধোঁয়া উড়ছিলো। এই সকালেই উনোনে আগুন দিয়েছেন বিনোদিনী। ধোঁয়ায়, কুয়াশায় বিনোদিনীর দেহটা আবছা একটা মূর্তির মতো দেখাচ্ছিলো। বিনোদিনীর শীত করে না; এই তীব্র শীতেও উনি শুধু ব্লাউজের ওপর ধুতি জড়িয়ে কাজ করছেন।

রান্নাঘরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো রেবা।

'আপনি এতো সকালে উঠলেন কেন, মা?'

বিনোদিনী তাকালেন। 'সকাল আর আছে কোথায়, বউমা; সাড়ে ছ'টা বেজে গেল। যা কুয়াশা, কিছুই ঠাহর হয় না।'

বিনোদিনীর মুখের দিকে তাকালো রেবা। সাদা, ফ্যাকাশে মতন কেমন ভিজে ভিজে মুখ বিনোদিনীর। ধোঁয়ার আড়ালে ছোটোখাটো একটা কঙ্কালের মতো দেখাচ্ছে। রেবা কখনো কঙ্কাল দেখেনি। শুধু একবার——

'চায়ের জলটা তুমি চাপিয়ে দাও। আমি স্নানটা সেরে আসি।'

ধোঁয়া সরিয়ে কুঁয়োর দিকে এগিয়ে গেলেন বিনোদিনী। একটু পরেই জলের ছড়ছড় শব্দ শোনা গেল। স্নান করছেন বিনোদিনী।

গল গল করে কাঁচা ধোঁয়া বেরুচ্ছে; কিন্তু আগুনের দেখা নেই। চোখ জ্বালা করছিলো রেবার। ভাঙা পাখাটা নিয়ে জোরে জোরে হাওয়া দিতে লাগলো।

সোয়া ন'টার মধ্যে বেরুতে হবে হেমন্তকে। ন'টা সাতাশের লোক্যালটা ধরতে না পারলে ঠিক সময় অফিসে পৌঁছুতে পারবে না। গতকাল একটু দেরী হয়ে গিয়েছিলো। অফিসে তাই কথা শুনেছে হেমন্ত। দোষটা অবশ্য হেমন্তর নয়। কিন্তু রেবারও কি? শুধু ডাল-ভাত আর আলু সেদ্ধ দিয়ে কাউকে কি ভাত দেওয়া যায়! ফিরবে তো সেই কোন্ সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা, সাতটায়। উঠোনে তখন অন্ধকার থিক-থিক করছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। না, রেবা তাকে যেতে দেয়নি। হেমন্ত অবশ্য দেরি হওয়ার জন্য খুব অনুতপ্ত নয়; বরং হেসে হেসেই বাড়ি ফিরে রেবাকে সব কথা বলেছে।

রেবা কিন্তু হাসতে পারেনি। অল্পক্ষণের জন্য হ'লেও হাসতে গিয়ে মুখ কালো করেছে।

কিন্তু আজ আর দেরী করা যায় না। সাড়ে ছ'টা বোধহয় এতক্ষণে সাতটার চৌকাট পেরুলো। রেবা চোখ তুললো। কেটলির ভেতর জল ফুটছে, বুড়বুড়ি কাটছে। কুয়াশা বোধহয় একটু পরিষ্কার হয়েছে। পেঁপে গাছটা এখন স্পষ্ট। কিন্তু হাওয়ার দাপট যেন বেড়েছে। রোদের মুখ দেখা যাচ্ছে না। ন'টার মধ্যে কী রোদ উঠবে?

আঁচলে হাতল চেপে সাবধানে কেটলিটা নামালো রেবা।

হেমন্ত চায়ে বেশি দুধ পছন্দ করে। ওকে আজ একটু গরম জল ফুটিয়ে দিতে হবে। নইলে স্নান করতে পারবে না হেমন্ত। বিনোদিনী অবশ্য বরফেও গা ধুতে পারেন; একটুও ভয় পান না। এই রকম কতোগুলো ব্যাপারে বিনোদিনী পটু। কিন্তু মা যা পারে, ছেলেরা তা পারে না। ছেলেরা সব সময়েই ছোট। ছোট। বেশ ছোট। রেবার গা সিরসির করছিলো। ঠোঁট টিপে হাসলো রেবা।

হেমন্তও ছেলেমানুষ। হ্যাঁ, ছেলে-মানুষ ছাড়া আর কী! ত্রিশ বছরের হেমন্তর ওপর সংসারের দায়িত্ব চাপানো যায় না। তেইশ বছরের রেবা বরং ওর চেয়ে বুড়ো। হেমন্তর কী চাই, না চাই; কী খাবে, পরবে, কোন্ ধুতিটা বা কোন্ শার্টটা (অবশ্য বাছ-বিচার পছন্দ করে পরবার মতো কয়েক জোড়া ধুতি বা শার্ট হেমন্তর নেই); সব দেখতে হবে রেবাকে। রেবা না দেখলে, রেবা না বললে, রেবা না শুনলে কোনো কাজে হাত উঠবে না। হেমন্তর, কোনো কথা মনে পড়বে না। শীত পড়েছে। শীতে হি-হি করে হেমন্ত। অথচ বলবে না, সোয়েটারটা বের করে দাও, কী, আজকে স্নানের জন্য একটু গরম জল

করে দিও। সোয়েটারটা বের করতে গিয়ে রেবা দেখেছে, ও জিনিস আর গায়ে দিতে পারবে না হেমন্ত। গত বছরই ছিঁড়ে-ছিলো; পুরনো সোয়েটার; পরতে অসুবিধে হতো। রেবা ভেবেছিলো, সময় থাকতে ওটায় হাত দেবে। কিন্তু সোয়েটারও বাক্স-বন্দী হলো, রেবাও ভুললো। হেমন্তকে তাই উল এনে দিতে বলেছিলো; দ্রুত হাত চালিয়ে পাঁচ ছ দিনের মধ্যেই একটা সোয়েটার বুনে দিতে পারতো রেবা। হেমন্ত শোনেনি। রোজই আনবো আনবো করে, অথচ ফেরে শূন্য হাতে। রেবা কিছু বলবার আগেই কৈফিয়ত দিয়ে যায় হেমন্ত। রেবা হাসে, হেসেছে; এবং বুঝতেও পারে রেবা, আসলে হেমন্তর পকেট শূন্য। পুজোর মাসে মাইনে অ্যাডভান্স নিয়েছিলো; নভেম্বর মাসটা তাই ফাঁকা; এর ওর কাছে ধার করে কাটিয়েছে। এ মাসে তার কিছু কিছু শোধ দিতে হচ্ছে। হেমন্ত অবশ্য সেজন্য খুব একটা চিন্তিত নয়। কিন্তু ছেঁড়া গেঞ্জি দেখলে, মুখ কালো হসে—হয়তো তা দাড়ি না-কামানোর জন্যে; রেবার বুক জ্বালা করে। রেবা বলেছিলো, 'পুজোয় আমার জন্যে কিছু কিনবে না; যা আছে তাতেই বেশ চলবে। বরং নিজের দিকে নজর দাও। মনে থাকে যেন, এরপর ধুতি চাইলে আমি দিতে পারব না।'

হেমন্ত হেসে বলেছে, 'ভাবছো কেন, তোমায় তো এখনই ধুতি পরতে হচ্ছে না। আরো কিছুদিন অন্তত শাড়ি-টাড়ি পরো। তারপর আর কিনে আনবো না......অবশ্য তখন যদি আর কাউকে 'নিকে' করো, সে আলাদা কথা।'

একমুহূর্ত কিছু বলতে পারেনি রেবা। তারপর চটেছে খুব।

এরপর কিন্তু রেবাকে খুব কাছে টেনেছে হেমন্ত। এবং তারপর যা করেছে, ভাবলে এখনো রেবার হাত থেকে কাপ-ডিস পড়ে চুরমার হয়। রেবা পাউডার মাখে না। ওর রঙ এমনিতেই ফরসা। কিন্তু সেদিন ও ফরসা মুখ লাল করে একমুঠো পাউডার ঘষেছে কোনো ফল হয়নি। সারাটা বিকেল ঘরে কাটিয়ে, অন্ধকার হয়ে এলে বাইরে বেরিয়েছে। হেঁটেছে পা টিপে টিপে।

হেমন্তটা, সত্যি, ভারি দুষ্টু! এই রকম ছেলেমানুষি স্বভাব ওর। ধমক দিলে দাঁত বের করে, হাসে; বারণ করলে শুনবে না। রেবার শাড়ি হয়েছে, ব্লাউজ হয়েছে। জুতো, রুমাল, এমন কি চুলের ফিতে পর্যন্ত। বিনোদিনীর কথাও হেমন্ত ভোলেনি। বিনোদিনী ওর মা।

কিন্তু শুধু বৌ আর মা-র কথা ভাবলেই হেমন্তর চলে না। পুজো পার্বণ ছাড়াও প্রত্যেক মাসেই আরো কিছু কিছু দায় রয়েছে হেমন্তর।

ছোট ভাই সুমন্ত কলকাতায় থাকে; বি-এ পড়ে। শুধু ট্যুইশন সম্বল করে তার চলে না। সুমন্তকে মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা পাঠাতে হয়। একশো পঁচানব্বই টাকার প্রথম পঞ্চাশ এইভাবেই চলে যায়।

তারপর দ্বিতীয়। বিয়ের তিন বছর পরেই ছোট বোন মিনতি বিধবা হয়েছে একটি ছেলে নিয়ে। ছ'সাত বছর কেটেছে তার পর। মিনতি কলকাতায় মেটারনিটি হোমে নার্সিং পড়ে। ছেলে বড় হয়েছে, স্কুলে পড়ছে; থাকে কাকাদের কাছে নৈহাটিতে। মিনতি মোটামুটি নিজের খরচ চালাতে পারে। তবু হেমন্ত ওকে দশ টাকা করে পাঠায় হাত-খরচ হিসেবে। মিনতির ছেলে কাকাদের কাছে কোনো অসুবিধেয় নেই। তবু কর্তব্য ভেবে মাইনে পেয়েই কাকাদের নামে কুড়ি টাকা মনিঅর্ডার করে হেমন্ত।

বাকি যা রইল, তা কিছুই নয়। একশো পনেরো টাকায় তিনজন মানুষের ছোট সংসার হলেও নেচে-গেয়ে চলে না। মাসের শেষে হাত টানতে হয়। রেবার মনে হয়, হাত পাততেও হয় হেমন্তকে। তবু ভালো, হেমন্ত এবং রেবা, দুজনেই এখনো সংসারে তৃতীয় মানুষ আনতে ভয় পায়।

'রেবা, এই টাকা তোমার।'

ভাই, বোন আর ভাগ্নের পর স্ত্রীর সামনে এসে দাঁড়ায় হেমন্ত। টাকাগুলো নিতে গিয়ে হাত কাঁপে রেবার। শুধু টাকা নয়; হেমন্তর আঙুলগুলো যেন ইচ্ছে করেই রেবাকে স্পর্শ করে। এ স্পর্শের ধরন আলাদা, অন্য সকলের চেয়ে পৃথক করে চেনা যায়, অনুভব করা যায়। রেবা কাঁপে, কাঁপে। রেবা ঃ আশা, আশ্বাস। শুধু টাকা নয়; টাকার সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাতটাকেও যেন ধরবার জন্যে এগিয়ে দেয় হেমন্ত। আমি আছি, থাকবো; তোমার ভয় কী! এ-কথা হেমন্ত কোনোদিন মুখ ফুটে বলেনি, বলে না। তবু শুনতে পায় রেবা। হেমন্তর হাতটাকে টাকার সঙ্গে সঙ্গেই খিমচে ধরে ও কাঁপে। এই সব মুহূর্ত-গুলোয় কোনো কোনোদিন ভীষণ কাঁদতে ইচ্ছে করে রেবার।

রেবা হাসে।

গ্রীষ্মকালে সকাল ন'টার টা টা রোদ্দুরে মৌরি চিবুতে চিবুতে একশো পনেরো টাকার হেমন্ত হন হন করে হাঁটে। ন'টা সাতাশের লোক্যালটা ওর শত্রু। জানালায় দাঁড়িয়ে রেবা দেখে, হেমন্ত মাথায় হাত রাখলো; ধুতিটা কোমরের কাছে আরো একটু গুঁজলো। গলার কাছে পাঞ্জাবিটা ছিঁড়ে গেছে; ধুতিটা ময়লা।

রেবা হাসে। হেমন্ত ওকে কাঁদতে দেয় না। কাঁদতে পারে না বলে রেবা হাসে।

বিনোদিনীর তসরের চাদরটা এখন পুরনো হয়ে গিয়েছে। বিনোদিনী অনেক কাল ব্যবহার করেন না। সকাল ন'টায় অফিসে বেরুবার আগে, শীতকালের ভারি নিরুত্তাপ রোদ্রে হেমন্ত চাদরটার দিকে হাত বাড়ায়।

হাতের তেলোয় মৌরির কুটো বাছতে বাছতে রেবা বলে, 'ইস্, ওই চাদরটা কেন যে নাও! ওটা গায়ে দিলে তোমাকে কেমন বুড়ো বুড়ো দেখায়।'

মুখের অল্প-ফাঁক গহ্বরে একসঙ্গে অনেকগুলো, তারপর একটা দুটো করে

মোরি ফেলতে ফেলতে হেমন্ত বলে, 'বুড়োকে বুড়ো দেখাবে না তো কী বাচ্চার মতো দেখাবে!' একটু থেমে, 'নিজে যতই বুড়ো হই না কেন, বউটা কিন্তু কচি।'

'যাঃ, তুমি ভারি অসভ্য।' আস্তে হেমন্তকে একটু আঘাত করে রেবা। চুড়ির শব্দ হয়।

হেমন্ত হাসে; একটু শব্দ হয়। তারপর এগিয়ে যায়। রেবা হাসে। মেজেয় পায়ের ছাপ পড়ে না। নইলে দেখা যেত, হুবহু হেমন্তকে অনুসরণ করছে রেবা।

ন'টা সাতাশের লোক্যাল ধরবার জন্য হন্ হন্ করে হেঁটে যায় হেমন্ত।

চায়ের কাপ হাতে বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো রেবা। চোখ বন্ধ করে জেগে আছে হেমন্ত। মুখটা কেমন শুকনো, ছাই-ছাই, খস্‌খসে। কুঁকড়ে, একটু যেন জড়োসড়ো হেমন্ত। শীতটা আজ অসহ্য। শীতে কুঁকড়ে গেছে হেমন্ত। গলার কাছে লেপটা ধরে কোমর পর্যন্ত নামিয়ে দিলো রেবা।

'ইস্, এই শীতে দিলে তো লেপটা সরিয়ে! ঠাণ্ডায় মরে যাচ্ছি যে!' কাঁধের দু পাশে দু হাত জড়ো করে হেমন্ত বললো।

রেবা বললো, 'নাও, ওঠো। সোয়া সাতটা বাজছে। চা-টা খেলেই দিব্যি গরম হয়ে যাবে।'

হেমন্ত একটু সরলো, গা মুড়লো। কিন্তু কোমর ভাঙলো না। রেবা ওর পাশে বসেছে। রেবার একটা হাত হেমন্তর গায়ে, পা দুটো একটু বেঁকে নিচের দিকে ঝুলছে। হেমন্তর বুকে হাত রাখলো রেবা। গেঞ্জির ছেঁড়া মুখটার ভেতর দিয়ে নরম,

রোমশ চামড়া স্পর্শ করলো। এইভাবে কিছুক্ষণ থেকে, তিনটে আঙুল গুটিয়ে মুড়ে নিলো রেবা। স্ত্রীর ধরনে হেমন্ত হাসলো। রেবা চোখ তুললো। তারপর এক আঙুলের সরলরেখায় গেঞ্জির ছেঁড়া অংশটা টেনে, ছিঁড়ে, বুকের প্রান্ত পর্যন্ত নামিয়ে দিলো।

'ও কি, বুকটা চিরে দিলে যে!' বিস্মিত হলেও হাসছিলো হেমন্ত, 'স্বামীর বুকে ছুরি বসাচ্ছো।'

রেবা বললো, 'স্বামী জানে, ছুরি বসালেও তার কিছু হয় না। কিন্ত এবার স্ত্রী-ই নিজের বুকে ছুরি দেবে।'

'কেন, কেন!' চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়ালো হেমন্ত, 'আত্মঘাতিনী হবার কারণটা কি?'

তীক্ষ্ম চোখে হেমন্তকে দেখলো রেবা। তারপর ভেঙে পড়লো।

'আচ্ছা, তুমি কি, বলো তো! ভাই, বোন, মা—সকলের সবকিছু ঠিক ঠিক হচ্ছে। অথচ নিজের দিকে একবারও তাকাও না কেন।'

হেমন্ত হেসে বললো, 'আর বউয়ের জন্যে বুঝি কিছু হচ্ছে না?'

রেবার দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ম হয়ে হেমন্তর মুখের ওপর থমকে থাকে। চোখ দুটো প্রথমে শুকনো ছিলো, ধীরে ধীরে ভিজে চকচক করতে লাগলো। এবার সত্যিই অবাক হলো হেমন্ত।

রেবা বললো, 'তাই। বউয়ের হয় বলেই তোমার হয় না।' গলা কাঁপছিলো রেবার। ভেবো না, বউ কিচ্ছু বোঝে না। বেশ, এরপর আমার জন্যে কিছু আনো; নেবো না, ছোঁবো না।'

'এই, করছো কী!' বিব্রত স্বরে হেমন্ত বললো, 'খুব ছেলেমানুষী শুরু করলে যা হোক।'

স্ত্রীকে কাছে টানলো হেমন্ত। চিবুক তুলে ধরলো, 'রেবা, ও-কথা বলছো কেন! কতোটুকু আর দিতে পারি তোমাকে! আমার চেনা-জানা বন্ধুরা তাদের বউদের যা দেয়, আমি তোমাকে তা দিতে পারি না। তবু ইচ্ছে কী যায় না আমার। তাও যদি তুমি না নাও—'

হেমন্ত থেমে গেলো।

হেমন্তকে দেখছিলো রেবা। গাল দুটো ভাঙা, কিন্তু এখন যেন ও-দুটো গর্তে ঢুকে গেছে। ঠোঁট কাঁপছে। হেমন্তর কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিলো রেবা। তারপর অল্প হেসে বললো, 'সেভাবে আমি বলিনি। শুধু নিতে ক'জনের ভালো লাগে! আমাকে শাড়ি, জামা দিলে আমিই পরবো। কিন্তু তোমারও তো কিছু চাই। এই যে শীতে হি-হি করছো; কতোদিন বলেছি, উল এনে দাও সোয়েটার বুনে দেবো। বলে বলে জিব খসে গেলো, তবু তুমি দিলে না! আমাকে দিলে আমিই শুধু ভরবো; তোমার শীত-গ্রীষ্ম ঘুচবে না।'

হেমন্ত বললো, 'তুমি ভরলেই আমি ভরি। সতীর পুণ্যে পতির পুণ্য। বুঝলে। তাছাড়া আমি কিছুই পাই না, এ-কথাও তো মিথ্যে। আমায় কী সত্যিই কিছু দাও না তুমি?'

বোকার মতন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো রেবা। তারপর হেমন্তর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে চোখ নিচু করে এবং ঠোঁটের কোণে অল্প হেসে বললো, 'যাঃ, তোমার শুধু বাজে কথা! আজে-বাজে কথা বলেই তুমি আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাইছো! আসল কথা কিছুতেই শুনছো না!'

হেমন্ত সোজা হয়ে বসলো। 'যথা আজ্ঞা। বলুন, কী করতে হবে?'

হেমন্তের ভঙ্গি দেখে রেবার হাসি পেলো। তবু হাসলো না। একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললো, 'মাইনে পেলেই এবার তুমি একটা কোট করাবে।'

'হুঁ, তারপর?' হেমন্ত নির্বিকার।

'তারপর আর কি, কোট পরবে।'

'একেই বলে স্ত্রী-বুদ্ধি!' হেমন্ত বললো, 'একটা কোট করাতে কতো খরচ জানো?'

'কতো?'

'কম করে চল্লিশ টাকা।'

'মোটে!' রেবা ঠোঁট ওলটালো, 'আমি ভেবেছিলুম আরো কতো! যাক্‌গে, তাই করাবে।'

'তারপর, সংসার চলবে কি করে?'

'যেমন করে চলে। সে তো আমার ভাবনা। আপনি কী সংসার চালান?'

'না, আপনিই চালান, বুঝলাম। কিন্তু—'

বাম হাতে হেমন্তর ঠোঁট চাপা দিলো রেবা। 'না, ওসব কিন্তু টিন্তু শুনবো না। তিন দিন পরে তুমি মাইনে পাবে। এক সপ্তাহের মধ্যে যেন কোট গায়ে তুলতে পারো।'

হেমন্ত তখনো ইতস্তত করছিলো। কিন্তু রেবা তাকে আর সুযোগ দিলো না। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরে ছুটলো। আটটা বাজে প্রায়। বেরুতে বেরুতে ঘাড় ঘুরিয়ে রেবা বললো, 'আমি গরম জল করে দিচ্ছি। তুমি তৈরী হয়ে নাও।'

অফিসে বেরুবার আগে, অন্য দিন যেমন, বিনোদিনীর চাদরটার দিকে হাত বাড়ালো হেমন্ত। কিন্তু রেবা, অন্য দিন যা করে না, ছোঁ মেরে চাদরটা তুলে নিলো। চিলটা উড়ে গেছে, ছেলেটা নাগাল পাচ্ছে না। ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছে। হেমন্ত দেখলো চোখ বড় বড় করে। কিছু বললো না।

রেবা হাসলো। হেসে, তারপর চাদরটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, 'আজ নিচ্ছো নাও; কিন্তু সাত দিন পরে কিন্তু—মনে থাকে যেন।'

হেমন্ত বললো, 'থাকবে, থাকবে।'

নিরুপায় হয়ে রেবা বললো, 'না, সত্যি।'

হেমন্ত নিরুত্তর। এক পা এগুলো, দু
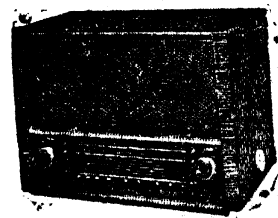
পা এগুলো। তারপর থেমে ঘাড় ঘোরালো। হাসলো। শীতের হাওয়া দিচ্ছে। কটকটে, শুকনো। কতগুলো পাতা ঝরলো। রেবার গাল দুটো সিরসির করলো, কপালে টান ধরলো। হেমন্ত ঠোঁট দুটো খড়খড়ে, ফাটা, ছাল-ওঠানো। অল্প অল্প রক্তের আভাস।

রেবা হাসলো না।

হেমন্ত বেরিয়ে গেলো।

লোক্যাল ট্রেন, জোরে ছোটে না। ছুটলেও, গতি বাড়বার সংগে সংগেই আবার থামতে হয়। আজ কিন্তু হেমন্তর মনে হলো, ট্রেনটা জোরে ছুটছে। আজকে কি ভিড় কম! হেমন্ত স্পষ্ট করে দেখলো। না, তা নয়। আজকে অনেক বেশি লোক বসতে পেরেছে। অন্য দিন ওরা বসতে পায় না, বসতে দেয় না, যারা বসে তারা আরো সরে সরে গুছিয়ে জায়গা নিয়ে বসে। আজ কিন্তু অন্য রকম। সবাই জড়োসড়ো, গায়ে গায়ে, কেউ বসতে চাইলে আরো জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। শীত, শীত, শীত। একজন দাঁত ঘষলো, একজন হাঁটুতে হাঁটু জড়ালো। হাওয়া দিচ্ছে। বেলা ন' টার তপ্ত নয়। ঝকঝকে, আঁশ-সাদা রোদ হাওয়ার দাপটে রোষ ভুলে ক্রমশ নরম হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মেঘ এলো। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে কেমন এক ধরনের আকস্মিক ছায়া ঘনালো। এতোক্ষণ ছুঁচ ফুটছিলো, এবার যেন তীর ছুঁড়তে লাগলো কেউ। বিনোদিনীর চাদরটা টানাটুনি করলো হেমন্ত। পুরনো, ফেঁসে-যাওয়া পাতলা চাদর, আরো বেশি শীত করছে। হাতের লোমগুলো শুঁয়োপোকার শরীর। ঠোঁটের কোণ দুটো জ্বালা করছে। হেমন্ত দেখলো, এই দীর্ঘ অনাড়ম্বর কামরায়, পঞ্চাশজন যাত্রীর মধ্যে সে সবচেয়ে বেশি অসহায়। জানালাগুলো ট্রেনে বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু দরজাটা খোলা। খোলা দরজা দিয়ে কনকনে হিম ঢুকছে। হেমন্ত বসেছে একেবারে ধারে, দরজার গা-ঘেঁষে। বাঁ দিকের গালটা ক্রমশ যেন অসাড় হয়ে এলো। হেমন্ত দাঁত ঘষলো, কপাল মুছলো, গালে হাত বুলালো। চোখে জল এসে গিয়েছিলো। তাই চোখটা বন্ধ করে ফেললো। চোখ বন্ধ করে ভাবলো, একটা কোট থাকলে, সত্যি, এই দুর্গতি হতো না। মনে মনে ভাবলো, আজ মাইনে পেলে, আজকেই সে একটা কোটের জন্য চেষ্টা করতো, প্রথমেই। কিন্তু পরশুর আগে মাইনে পাবে না। শীত—পরশু; পরশু—শীত। হেমন্তর চুলের গোড়ায় ঠাণ্ডা তেল-তেলে একটা পদার্থ যেন জমে হয়ে যাচ্ছে।

উত্তরপাড়ায় ট্রেন থামতেই দরজা ঠেলে একজন মহিলা উঠলেন। হেমন্ত মুখ তুললো। আর কেউ কী উঠবে! ধোঁয়া ধোঁয়া আঁধারে সমস্ত প্ল্যাটফর্মটাকেই কেমন দূর-দূর বলে মনে হচ্ছে। না, ট্রেন ছেড়ে দিলো।

হেমন্ত দেখলো, ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। দেয়াল ধরে কাঁপছেন। মাজা-মাজা রঙ, নিরক্ত ঠোঁট। কব্জিতে বাঁধা তেঁতুল বিচির মতো ছোট্ট রিস্টওয়াচ। কপালটা স্নিগ্ধ, স্বেদ নয়, কুয়াশার রেণু। কেউ তাকালো না, কেউ দেখলো না, দেখবার চেষ্টা করলো না। হেমন্ত দেখলো।

মুখটা কেমন চেনা-চেনা। অবশ্য পরিচয় নিশ্চয় নেই। লোক্যাল ট্রেনের যাত্রীদের মুখগুলো সকলেরই পরিচিত, দেখে দেখে দৃষ্টি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ওকে কারুর বসতে দেওয়া উচিত; হেমন্ত ভাবলো। কিন্তু এই ট্রেনের সব যাত্রীই যেন মৃত; হাসলে, হাসি ফুটছে না; তাকালে, মরা মাছের মতো ঠাণ্ডা চোখে কোনো ভাব ফুটছে না। হেমন্ত দেখলো, ভদ্রমহিলার চোখদুটো চিকচিক করছে।

আবার একটা হাওয়া ঢুকলো। তীক্ষ্ন নখে যেন বিক্ষত করে ছাড়লো। কানের পর্দায় কেমন একটা ভোঁ ভোঁ গর্জন। বিনোদিনীর চাদরে মুখ মুছে উঠে দাঁড়ালো হেমন্ত।

'আপনি বসুন।'

'ঠিক আছে, আমি দাঁড়াতে পারবো। আর তো কিছুক্ষণ।'

'তাতে কী, বসুন।'

ভদ্রমহিলা বসলেন। হেমন্ত তার জায়গা নিলো। বসে বসে কোমরটা যেন আড়ষ্ট

হয়ে গেছে। পা দুটো ঠাণ্ডা, শক্ত, অসাড়। দুঃসহ শীত। সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে যাচ্ছে।

হাওড়া স্টেশনে ইন করছে ট্রেনটা।

ভিড় ঠেলে কোনোরকমে প্লাটফর্মের বাইরে এলো হেমন্ত। দশটা বাজছে প্রায়। ট্রেন কী লেট ছিলো! না, রোজ রোজ অফিসে দেরি করলে, কথা শুনতে হলে বিপদ। জোর জোর পা ফেলে বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে ছুটে যায় হেমন্ত।

পাঁচ নম্বর বাস ধরে ড্যালহৌসি। প্রথম বাসটায় উঠলো হেমন্ত। ভিড়। তবু একটা লেডিজ সিট এখনো শূন্য। হেমন্ত বসলো। জানালার কাচগুলো নামানো। কুয়াশায় অপরিচ্ছন্ন বাইরেটা দেখা যাচ্ছে না। কানের ভেতর কনকনে হাওয়া ঢুকছে। বিনোদিনীর চাদরে কান ঢাকতে চেষ্টা করলো হেমন্ত।

কিন্তু, বাস ছাড়বার আগেই হেমন্তকে সিট ছাড়তে হলো। তত্‌ক্ষণে আরো কয়েকজন উঠেছে। সেই মুহূর্তে বাসটা স্টার্ট করেছে। ভালো করে জড়োসড়ো হয়ে বসবার আগেই উঠতে হলো হেমন্তকে। লেডিজ উঠেছে। কণ্ডাক্টর হাঁকলো। হেমন্ত দেখলো, ট্রেনের সেই মহিলা, বসবার জন্য ছটফট করে এগিয়ে আসছে। মনে মনে ক্ষুব্ধ হলো হেমন্ত। কেন কে জানে, ভদ্রমহিলা এবং সমস্ত মেয়ে জাতটার ওপর কেমন এক ধরনের রাগে জ্বলছিলো হেমন্ত। কিন্তু, ব্যাপারটা, হেমন্তর জ্বালাটাকে জল করে দিয়েই যেন অন্যরকম দাঁড়ালো। নিজে বসে হেমন্তকে দেখে, হ্যাঁ, এবং একটু হেসেই, ভদ্রমহিলা বললেন, 'বসুন।'

হেমন্ত ইতস্তত করছিলো। মাথার ওপর রড ধরে এ-ওর গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে আরো অনেকে দাঁড়িয়ে হেমন্তকে লক্ষ্য করছে। হেমন্ত জানে, এই এতোগুলো অকাতর চক্ষুর মধ্যে সৌজন্যবিহীন একটু ঈর্ষাও রয়েছে। ভদ্রমহিলা আবার বললেন, 'বসুন!' এক ভদ্রলোক, ঠাট্টা করেই কিনা কে জানে, বললেন, 'বসুন না, বলছেন যখন!'

মহিলার পাশে বসে এই শীতেও অদ্ভুত একটা অস্বস্তিতে একটু একটু ঘামছিলো হেমন্ত। কুয়াশায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না; নইলে যাহোক কিছু দেখত হেমন্ত। জি পি ও'র পরের স্টপে হেমন্ত উঠলো। নামলো। নেমে দেখলো, ভদ্রমহিলাও নেমেছেন। যেন একসঙ্গে একই গন্তব্যের যাত্রী দু'জনে।

এইখানে হাওয়া নেই। ফুটপাথের ওদিকে লালদিঘীর কায়াটা পর্যন্ত অদৃশ্য। পাশ দিয়ে কে একজন হেঁটে গেলো। হেমন্তর মনে হলো, এক মুঠো বরফের কুচি কেউ তার মুখের মধ্যে ভরে ঠোঁট সেলাই করে দিয়েছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল হেমন্তর।

সাদা প্রেতিনীর মতো ভদ্রমহিলার রোগা ফ্যাকাশে চেহারাটা ওর পাশে দেখতে পাচ্ছিলো হেমন্ত। সারা মুখে জল; সাদা, ধবধবে চোয়ালের কৌণিক হাড়গুলো প্রকট।

হেমন্ত সরে যাচ্ছিলো।

'কী ঠাণ্ডা দেখেছেন!' ভদ্রমহিলা অস্ফুটে বললেন।

'হ্যাঁ।' হেমন্ত সায় দিলো।

'আমাদের তবু অফিস করতে হয়।'

'উপায় নেই।'

দেরি হয়ে যাচ্ছে। দু'পা এগুলো হেমন্ত।

'বিপদ সময় দেখে আসে। এই হাড়-জমানো শীতে আমার—'

ভদ্রমহিলা কোনো আক্ষেপের কথা বলছিলেন। হেমন্ত শুনতে পেলো না। অফিসের সামনে এসে দেখলো, সাদা, শক্ত, ঘন নীল কুয়াশায় অস্পষ্ট মূর্তির মতো রাস্তা পার হচ্ছেন ভদ্রমহিলা।

অফিসে ঢুকে পড়লো হেমন্ত।

'রেবা, এই টাকা তোমার।'

মাইনে পেয়ে স্ত্রীর হাতে সব টাকা তুলে দিলো হেমন্ত। অন্যবারের মতো রেবা একটু কাঁপলো; দাঁড়িয়ে থাকলো এক-মুহূর্ত। তারপর হেমন্তর মুখের দিকে তাকালো। রেবার চোখ দুটো জ্বালা-জ্বলা, ঠোঁট দুটো কঠিন।

'আমার কথাটা কি ভুলে গেছো?'

'কোন্ কথা!' হেমন্ত যেন সত্যিই মনে করতে পারছে না।

রেখা ভুরু কোঁচকালো।

'কোটের কি হলো?'

'ইস্, একদম ভুলে গেছি।'

বিছানার ওপর নোটগুলো রেখে দিয়ে, রেবা বললো, 'ওই টাকা রইল। যা ইচ্ছে যা খুশি করো। আমি কিছু জানি না।'

গলা কাঁপছিলো রেবার। হেমন্ত দেখলো, রেবা বেরিয়ে যাচ্ছে।

শূন্য ঘরের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে হেমন্ত। বলতে কী, রেবাকে সে মিথ্যে কথাটাই বলেছে। কোটের কথা সে একেবারে ভুলে যায়নি। কিন্তু, এই ক'দিন মনের মধ্যে অসংখ্য বিচার, বিবেচনা এবং বিশ্লেষণ করেও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি হেমন্ত। বস্তুত চল্লিশটা টাকা শুধুমাত্র একটা পোশাকের পিছনে হুট করে খরচ করতে তার বিবেক কিছুতেই সায় দিচ্ছে না। বাকি যা থাকে, তাতে সংসার চলবে না; অফিসে সহকর্মীদের কাছে হাত পাততে হবে। নতুন কোট পরে লোকের কাছে টাকার জন্য হাত পাতার ব্যাপারটা হেমন্তর ঠিক সহ্য হয় না।

হেমন্ত চেষ্টা করেছিলো, যদি রেবা বুঝতে পারে শেষ পর্যন্ত। রেবা কিন্তু
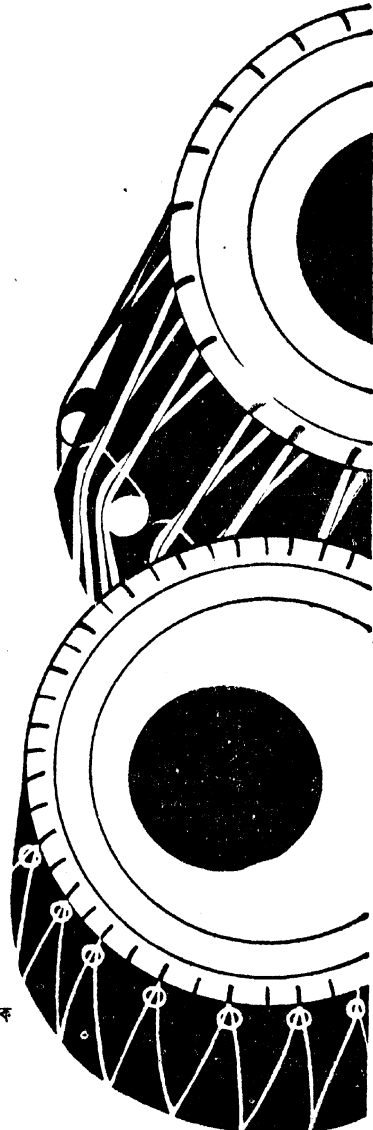
কিছু শুনলো না। সারাটা সন্ধ্যে, রাত্রি এবং পরদিন সকাল পর্যন্ত মুখ কালো করে থাকলো; নেহাত প্রয়োজন ছাড়া হেমন্তর সংগে একটি কথা বললো না।

তিন বছরের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম রেবাকে অটুট দেখছে হেমন্ত। এবং বুঝতে পারছে না, কী করে নিজের মনের কথাটা রেবাকে বলবে।

এইভাবে সারাটা সন্ধ্যা কাটিয়ে, সমস্ত রাত্রি হেমন্তর নিবিড় সোহাগ ও সান্নিধ্য উপেক্ষা করে, পরদিন সকালে অবশেষে রেবা সন্ধি করলো।

'বেশ, তুমি নিজে না করো, আমি করাবো। আমাকে একদিন সংগে নিয়ে চলো।'

হেমন্ত দ্বিধান্বিত। বললো, 'শোন না, কী দরকার ওসব ঝামেলার! বরং চলো, একদিন কলকাতায় সিনেমা দেখে আসি দুজনে।'

'আমি কিছু শুনবো না।' রেবা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। বললো, 'তুমি যদি না নিয়ে যাও, আমি একলা যাবো। কোটের ব্যবস্থা করে আসবো।'

এরপর হেমন্তর পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব হয় না। হয়নি। হেমন্ত বললো, 'থাক, এমনি বেড়াতে যাবে, যেও। কিন্তু কোটের জন্যে আর নয়। সে আমি যা হয় দেখেশুনে কিনবো।'

'লাস্ট ওয়ার্নিং কিন্তু।' ভ্রূকুটি করলো রেবা। তারপর হেসে বললো, 'এবার যেন ভুলে যেও না।'

হেমন্ত ভুললো না। ভুললেও, রেবা ওকে ভুলতে দিচ্ছে না। রেবার প্রতিটি মুহূর্ত, রেবার প্রতিটি কথা, রেবার প্রত্যেক দৃষ্টিটাই যেন সব সময় মনে করিয়ে দিচ্ছে। তবু, এই সমস্যার সমাধান করতে পারে না হেমন্ত। একে একে কেটে যাচ্ছিল দিন-গুলো। কবে মাসের সাত তারিখ পিছু হটতে হটতে অদৃশ্য হলো; সতেরোও বুঝি পার হয়ে যায়। কলকাতা শহরে সস্তায় সেকেন্ডহ্যান্ড গরম পোশাক কিনতে পাওয়া যায় অনেক দোকানে। অফিসে এক বন্ধুর পরামর্শ শুনে হেমন্ত একদিন সেইসব জায়গায় ঘুরে দেখেও আসে। কিন্তু তবু, কিনবো কিনবো করেও কিসের এক সংকোচ যেন ওকে ঘিরে রেখেছে।

পৌষের কনকনে শীতে হেমন্তর শরীরের প্রত্যেক রোমকূপে মেদের ছিটেগুলো বরফের কুচির মতন জমতে থাকে। পাঁজর-গুলো জড়াজড়ি করে কুঁকড়ে যায়। শীত তার সংগে শত্রুতা করছে। বিনোদিনীর চাদরে আর তাকে বাধা দিতে পারছে না হেমন্ত। এমন কি রেবা—আগুনের মতো রেবা, সে পর্যন্ত ক্রমশ যেন হিম হয়ে যাচ্ছে। ইদানীং রেবার উৎসাহ কমে এসেছে। হেমন্ত দেখে, রেবার চোখদুটো শুকনো, অভিমানে নিথর। প্রত্যাশায় জল হয়ে যাচ্ছে রেবা; তপ্ত হতে ভুলে যাচ্ছে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শীতে হি-হি করে হেমন্ত। হি-হি করতে করতে হাসে। রেবা বলে, 'লেপটা ভালো করে ঢাকো।'

বলে, নিজের অংশটুকু হেমন্তর দিকে ঠেলে দেয় রেবা।

হেমন্ত বলে, 'ওকি, তুমি!'

'আমার না হলেও চলবে।'

মৃদু হেসে হেমন্ত স্ত্রীকে বুকের মধ্যে জড়ায়—তারপর ঠাট্টা করে বলে, আজকাল যে কোটের কথা বলো না?'

অদ্ভুত হাসে রেবা, ঠোঁট কাঁপে। 'বললেই তো তুমি শোনো! আর আমি কিছু বলবো না।'

হেমন্ত বলে, 'না, আর একবার বলো। এবার ঠিক শুনবো।'

রেবা চুপ করে থাকে। যেন স্থির শান্ত মন দিয়ে হেমন্তর মনটাকে বুঝে নিচ্ছে রেবা। তারপর বলে, 'আট দিন পরে আমাদের সেই দিন।'

হেমন্ত উৎসুক হয়।

'আমার মনে ছিলো না!'

'থাকবে কী করে! ভুলতে পারলেই তো বাঁচো।'

'তুমি মনে করিয়ে দাও বলেই তো ভুলতে ভালোবাসি।'

'ওই দিন যেন গায়ে কোট ওঠে। নইলে—'

হেমন্ত ফিস্‌ফিস্ করে, 'নইলে কি?'

রেবা ঠোঁট ওল্টায়।

হেমন্ত হাসে। রেবাও হাসে।

কাছাকাছি শুয়ে প্রাণপণে শীতকে বাধা দিতে চেষ্টা করে দুজনে।

দেখতে দেখতে সাতটা দিন কেটে যায়।

অফিস ছুটির আগে হেমন্ত পথে পা দিয়েছে। রেবা বলেছিলো, তাড়াতাড়ি ফিরতে। হেমন্ত বলেছে, ফিরবে। তার আগে একটা কোট কিনতে হবে। কোট গায়ে না দিলে আজকের দিনে মুখ ভার করবে রেবা।

পকেটে টাকা নিয়ে ধর্মতলায় পুরনো পোশাকের দোকানে ঘুরছে হেমন্ত। নেড়ে-চেড়ে দেখছে, পছন্দ হচ্ছে না, রেখে দিচ্ছে। দ্রুত কেটে যাচ্ছে সময়। হেমন্ত ছটফট করে। দোকানদার হাসে। হেমন্তর কপালে স্বেদ চিকচিক করে।

'ওই কোটটার দাম কতো?'

'আগে জিনিস দেখো।'

'না, দাম আগে।'

'তেত্রিশ টাকা।'

'উঁহু, বড্ড বেশি। ওইটা?'

'কালা?'

'না।'

'ইয়ালো?'

'না, না। তার পাশে। লাল রঙ। রেড্।'

'ওটা লেডিজ কোট।'

লেডিজ! হেমন্ত থেমে গেলো। চোখ-দুটো পলক ফেলছে না। নিঃশ্বাস রুদ্ধ। তিন শো পঁয়ষট্টি দিনে এক বছর। এক বছর পরে একদিন। মটরমালার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটলো হেমন্তর কপালে, ভুরুর পাশ দিয়ে গড়িয়ে গেলো ভুরুর পাশ দিয়ে। বুকের ভেতর একটা নিঃশ্বাসের গুমোট যেন হাঁসফাঁস করছে।

রেবার রঙ ফরসা। শক্ত, মজবুত, কোমল শরীর রেবার। পুরো-হাতা মোটা ব্লাউজ গায়ে দিয়ে শীত ঢাকছে। গাঢ় লাল ওই কোট পরলে কী সুন্দর মানাবে রেবাকে! পকেট থেকে রুমাল বের করে গাল, গলা, কপাল মুছলো হেমন্ত। তারপর অদ্ভুতভাবে হাসলো।

'দেখি, ওটা।'

'লেডিজ!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, লেডিজ।'

'নিন।'

'কতো দাম?'

'ভালো জিনিস। বত্রিশ টাকা দাম। কিন্তু আপনার তো জেণ্টলম্যান!'

হেমন্ত হাসে। তারপর টাকা বের করে।

দোকানদার অবাক হয়ে তাকিয়ে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করছে, লোকটা নিজের জন্যে কোট চেয়েছিলো, কুড়ি টাকার মধ্যেই যদি কিছু হয়!

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেলো হেমন্ত।

হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে চাপলো হেমন্ত। তাড়াতাড়ি করতে গিয়েও হলো না। এই ট্রেনটাও যে কতোক্ষণ ছাড়বে। সিটে বসে ছটফট করে হেমন্ত। সন্ধ্যা উতরে গেল। এখন রাত্রি।

হঠাৎ চমকে উঠলো হেমন্ত। সেই ভদ্রমহিলা। ট্রেনের স্টেশনের, বাসের; কুয়াশায় আচ্ছন্ন পথে হেমন্তর পাশাপাশি একদিন হেঁটেছিলেন। তারপরও মাঝে মাঝে ট্রেনে কী স্টেশনে দেখেছে হেমন্ত। জায়গা খুঁজতে খুঁজতে এগিয়ে আসছেন মহিলা। সাদা, শুকনো মুখ; রুক্ষ চুল-গুলো কপালের কাছে উড়ছে। এই কমপার্টমেন্টে ভিড় কম। হেমন্ত মুখ বাড়িয়ে দিলো। ভদ্রমহিলা ওকে দেখেছেন; উঠবেন কিনা ভাবছেন।

'উঠে পড়ুন।' হেমন্ত বললো।

ভদ্রমহিলা বসলেন, হেমন্তর মুখোমুখি।

'বেশ শীত আজ।' হেমন্ত সহজ হতে চেষ্টা করছে।

'হ্যাঁ।' মহিলা হাসলেন। 'শীতটা এবার একটু বেশি।'

এদিক-ওদিক তাকালেন ভদ্রমহিলা।

'গরম কাপড়ের দামও অত্যন্ত বেশি। হাত দেওয়া যায় না।'

'হ্যাঁ, তা তো হবে।' মহিলা সংক্ষিপ্ত হতে চাইছেন।

'একটা লেডিজ কোট কিনলাম। বত্রিশ টাকা বেরিয়ে গেলো।' পোষা জন্তুকে আদর করার মতো প্যাকেটটায় হাত বোলালো হেমন্ত।

মহিলা কোনো জবাব দিলেন না। হতাশভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল হেমন্ত।

রাত করে বাড়ি ফিরলো হেমন্ত।

নির্জন পথ। হু হু করে হাওয়া বইছে। কুয়াশায় চতুর্দিক অন্ধকার। খোলা বুকের মধ্যে বরফের মতো কনকনে হাওয়া ঢুকছে। চুল উস্কোখুস্কো; জামা, কাপড় ময়লা। কাপড় ময়লা।

জানালায় কপাল পেতে দাঁড়িয়েছিলো রেবা।

হেমন্ত ঘরে ঢুকলো। বাড়িটা এতো নির্জন! বারান্দার কোণে টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলছে। পেঁপে গাছটা কুয়াশায় অদৃশ্য।

হেমন্তর সামনে রেবা দাঁড়িয়ে।

'এতো দেরি করলে যে!'

'হয়ে গেলো দেরি।'

'কেন, দিনটা মনে ছিলো না বুঝি!' কম্পিত স্বর রেবার।

হেমন্ত বলে, 'কী জানি, কেন যে দেরি হয়ে গেলো!'

বলে একটু হেসে, হাতের মোড়কটা রেবার দিকে এগিয়ে দেয় হেমন্ত। ব্যস্ত হাতে মোড়কটা খুলে ফেলে রেবা।

রেবা সাদা, রেবা শক্ত। স্থির হয়ে, দু'চোখ অপলক করে হেমন্তকে দেখছে রেবা।

'আজকেও আনলে না!' রেবার গলার স্বর রুদ্ধ।

উজ্জ্বল উষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে হেমন্ত। তারপর হঠাৎ, সেই দুঃসহ শীতে, ধোঁয়া ধোঁয়া ঘন কুয়াশার মধ্যে আকস্মিক ক্ষিপ্রতায় রেবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপতে থাকে।

'কোটের দরকার কী রেবা' তুমি আমার কাছে থেকো, সব সময় আমায় ঢেকে রেখো। তাহ'লেই আমার শীত ঘুচবে।'

রেবার বুক ভিজে গেলো। হেমন্ত হাসছে।

বর্মায় জেনারেল নে উইন গভর্নমেণ্টের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। কারণ তিনি দেখেছেন যে ছ মাসের মধ্যে যে তিনটি প্রধান কাজ সম্পন্ন করার ভার নিয়েছিলেন সেগুলি ঐ সময়ের মধ্যে করে তোলা সম্ভবপর নয়। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা, দ্রব্যমূল্য হ্রাস এবং সুষ্ঠুভাবে সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান---এই তিনটি কাজ ছ মাসের মধ্যে তিনি করবেন, এই আশাতেই উ নু জেনারেল নে উইনকে তাঁর ইচ্ছামত মন্ত্রিমণ্ডলী নিয়োগ করে গভর্নমেণ্ট চালানোর ক্ষমতা দেবার প্রস্তাব করেন এবং সেই প্রস্তাবে পার্লামেণ্ট গ্রহণ করে। সুতরাং একদিক থেকে দেখলে সামরিক কর্তার হাতে শাসন-ভার গেল বটে, কিন্তু সেটা একরকম বিধানসম্মত ভাবে পার্লামেণ্টের সম্মতিক্রমেই হয় এবং সে সম্মতি ভয় দেখিয়ে আদায়-করা সম্মতি নয়। জেনারেল নে উইন চার মাস প্রধানমন্ত্রী পদে কাজ করেছেন। এই চার মাসে কাজ কোনও ক্ষেত্রেই এতটা এগোয়নি, যাতে আশা করা যায় যে, বাকী দু মাসের মধ্যে সেগুলো সম্পন্ন করা যাবে। শান্তি ও শৃঙ্খলার অবস্থার আগের চেয়ে হয়ত কিছু উন্নতি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু বৃহৎ পরিবর্তন কিছু হয়নি---বিদ্রোহ শান্তির লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না। দুর্নীতি দমনের জন্য জেনারেল নে উইন তৎপর হয়েছেন এবং অনেক পদস্থ অন্যায়কারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তার মধ্যে AFPFL (অ্যাণ্টি-ফাসিস্ট পিওপিলস্ ফ্রিডম লীগ)-এর দুই উপদলেরই চাঁই গোছের লোকও বেশ কয়েকজন আছে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সাধারণ অবস্থার উন্নতি এখনো তেমন সুস্পষ্ট নয়। সাধারণ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার পক্ষে অনুকূল অবস্থা এবং প্রস্তুতি কোনটাই এখনও হয়নি এবং বাকী দু মাসের মধ্যে যে হবে তারও সম্ভাবনা নেই। সুতরাং ছ মাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে প্রতিশ্রুতিগুলি পূর্ণ করার সম্ভাবনা নেই দেখে জেনারেল নে উইন পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন।

এখন পার্লামেণ্ট কী সিদ্ধান্ত করে তার উপর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। জেনারেল নে উইনের হাতেই শাসনক্ষমতা থাক, এই যদি পার্লামেণ্টের সিদ্ধান্ত হয় তাহলে কনস্টিট্যুশনের কিছু পরিবর্তন আবশ্যক হবে, অথবা কনস্টিট্যুশনের বাধা এড়াবার জন্য একটা ফন্দি বার করতে হবে, তা না হলে ছ মাসের পরে জেনারেল নে উইনকে প্রধান-মন্ত্রীর পদে রাখা যাবে না। কিন্তু নে উইন সরকার আশানুরূপ ফল দেখাতে না পারলেও তার বিকল্প উদ্ভাবন সহজ নয়। যে রকম অবস্থা তাতে নতুন ইলেকশনের পূর্বে বর্তমান পার্লামেণ্টের কোনও দল বা একাধিক দলের কোনো কোয়ালিশনের দ্বারা গভর্নমেণ্ট গঠনের প্রস্তাব কার্যকর হবে বলে মনে হয় না। বর্তমান অবস্থায় কোনও দল বা দলের কোয়ালিশন দায়িত্ব নিতে সাহসও করবে না এবং তাতে জনমতেরও সায় পাবার কোনও আশা নেই। সুতরাং আরও কিছুকাল জেনারেল নে উইনই দায়িত্বভার বহন করে চলুন, এই প্রস্তাবই বোধ হয় হবে। কিন্তু তাতে একটা মুশকিল আছে। গত চার মাসের অভিজ্ঞতা থেকে এবং জেনারেল নে উইনের নিজের স্বীকৃতি থেকেই বুঝা যাচ্ছে যে, যে উদ্দেশ্যসাধনের জন্য তাঁকে শাসনভার দেওয়া হয়েছিল তার পক্ষে তাঁর এতাবৎ অনুসৃত নীতি এবং কার্যপদ্ধতি যথেষ্ট রূপে ফলদায়ী হয়নি। সফলতা লাভ করতে হলে এতে কুলবে না। জেনারেল নে উইনের রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ আছে, এরূপে প্রমাণ তাঁর গত চার-মাসের কাজ থেকে নাকি পাওয়া যায়নি, কিন্তু যেমন চলছিল যদি তেমনি চলতে থাকে, তবে জনমত বা জেনারেল নে উইন কারোই সন্তুষ্ট থাকার কথা নয়। সুতরাং জেনারেল নে উইন যদি দায়িত্ব বহন করে যেতে সম্মত হন তাহলে তিনি হয়ত নতুন কিছু করার চেষ্টা করবেন এবং তাতে হয়ত ক্ষমতার প্রয়োগ আরো ব্যাপকরূপে দেখা দিতে পারে। বিদ্রোহীদের সঙ্গে কোনো রকম রাজনৈতিক রফা করার চেষ্টায় সার্থক-তায় জেনারেল নে উইন বিশ্বাসী বলে মনে হয় না। যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত না হলে বিদ্রোহীরা দমিত হবে না, এই বোধহয় তাঁর বিশ্বাস। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জেনারেল নে উইনের পুনর্নিয়োগ হলে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপরতা বৃদ্ধির চেষ্টা বোধ হয় হবে। কিন্তু সেদিক দিয়ে বর্মা সরকার কতটা শক্তি সামর্থ্যের সংহতির পরিচয় দিতে পারবেন বলা যায় না। তবে এই সমস্যা-সংকুল অবস্থার মধ্যেও বর্মায় গণতান্ত্রিক বিধানগত নিষ্ঠা যে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি বরঞ্চ তা রক্ষা করার এতটা আগ্রহ রয়েছে এটা প্রশংসার্হ।
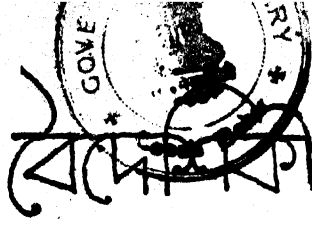
• • •

মালয়ের প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুর রহমান পদত্যাগ করেছেন। কারণ বলেছেন, ক্লান্তি। কিছুদিন বিশ্রামের পর তিনি পার্টির (UMNO ইউনাইটেড ম্যালেন্
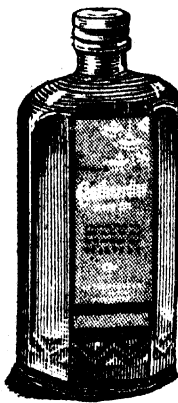
যাও পাখি বোলো তারে—
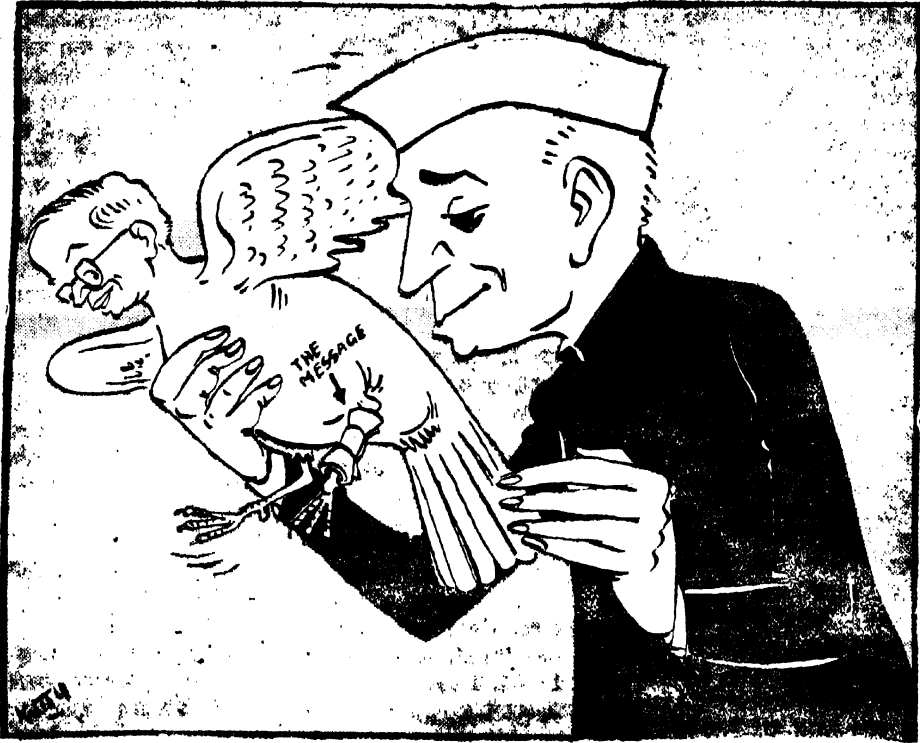
কেরলের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি রাশিয়া পরিভ্রমণান্তে দেশে ফিরিয়া প্রধান মন্ত্রীকে জানাইয়াছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক অধিকতর বৃদ্ধির সুযোগ আছে

ন্যাশনাল অরগ্যানাইজেশন) কাজে আত্ম-নিয়োগ করবেন। আগামী নির্বাচনেও UMNO-র সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের সম্ভাবনা। সুতরাং টেংকু আবদুর রহমানের পুনরায় মালয়ের প্রধানমন্ত্রী হবারও সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁকে দলের নেতৃত্ব থেকে সরাবার চেষ্টা কেউ করছে বলে শুনা যায় না, সুতরাং তাঁর বর্তমান পদত্যাগ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। আর এক কারণে এর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। 'ছাড়ব, ছাড়ব' করে কর্তার পদ অনেকে ছাড়তে পারেন না, কিন্তু এঁর ছাড়ার আগে কোনো কথাই শুনা যায়নি।

• • •

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে জার্মানীর সংগে কিন্তু আইনত শান্তি এখনো স্থাপিত হয়নি। শান্তি চুক্তি সম্পাদন এখনো বাকী আছে। বার্লিন সম্পর্কে সোভিয়েট যে-প্রস্তাব দিয়েছে তার সংগে জার্মানীর শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য একটি কনফারেন্স আহবানের প্রস্তাবও আছে। সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট ২৮টি দেশের প্রতিনিধি নিয়ে কনফারেন্স করতে চান। এই প্রস্তাবের উত্তরে পশ্চিমা শক্তিরা জানিয়েছে যে, সোভিয়েট প্রস্তাবিত ওরূপ অতিকায় কনফারেন্স ডাকার কোনও সার্থকতা নেই, জার্মানীর বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স এবং সোভিয়েট এই চার রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠক করতে তারা রাজী আছে। এই বৈঠকের সময় পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানীর প্রতিনিধিদের উপদেষ্টা হিসাবে ডাকা যেতে পারে। পশ্চিমা শক্তিদের দ্বারা পূর্ব জার্মান গভর্নমেণ্টের এতখানি স্বীকৃতি পূর্বে কখনও হয়নি। তবে বার্লিন সম্পর্কে পশ্চিমা শক্তিরা জানিয়েছে যে, তারা সহজে হটছে না।

চতুঃশক্তির পররাষ্ট্রসচিবদের বৈঠক এপ্রিলের মাঝামাঝি অথবা মে মাসের গোড়ার দিকে করার প্রস্তাব করা হয়েছে, বোধহয় মিঃ ডালেসের অসুস্থতার কথা ভেবে। মিঃ ডালেস এখন হাসপাতালে। তাঁর অপারেশন হয়েছে। অপারেশনের পরে সুস্থ হতে তাঁর কয়েক সপ্তাহ লাগবে। প্রস্তাবিত পররাষ্ট্র-সচিবদের কনফারেন্সে মিঃ ডালেস যোগ দিতে পারবেন, এই সম্ভাবনার সংগে সামঞ্জস্য রেখেই কনফারেন্স এপ্রিল অথবা মে মাসে করার প্রস্তাব করা হয়েছে বলে মনে হয়। অন্ততপক্ষে মিঃ ডালেসের সম্পর্কে কোনো রকম অনিশ্চয়তার ভাব কারো মনে না আসে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। মিঃ ডালেসের হার্নিয়ার অপারেশন হয়ে গেছে গত শুক্রবার। কিন্তু তিনি ক্যানসারেও ভুগছেন বলে শুনা যাচ্ছে। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসেও মিঃ ডালেসের একটা অপারেশন হয়—কোলোনে ক্যানসারের জন্য। পরের বছরের ডিসেম্বর মাসে আবার তাঁকে কোলোনের প্রদাহের দরুণ হাসপাতালে যেতে হয়। মিঃ ডালেসের বয়স ৭০ বৎসর। এই বয়সে এই রকম কঠিন রোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁর কর্মক্ষমতা ও পরিশ্রম করার শক্তি সত্যই আশ্চর্যজনক।

১৭।২।৫৯

জনসংখ্যার সমস্যা

জিতেশ বসু

সম্প্রতি (১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে) নয়াদিল্লীতে 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' সম্পর্কে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেল। বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী স্যার জুলিয়ান হাক্সলী উক্ত সম্মেলনে 'জনসংখ্যার আধিক্য ও মানুষের উৎকর্ষ' সম্পর্কে এক ভাষণ দান করেন। তিনি বলেছেন যে, আণবিক অস্ত্রের চাইতেও পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা অধিকতর আতঙ্কের কারণ। কেবলমাত্র ১৯৫৮ সালেই পৃথিবীর জনসংখ্যা ৪৭০ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৫৯ সালে ৫ কোটি বৃদ্ধি পাবে। যদি এই হারে জনসংখ্যা বাড়তেই থাকে, তবে অদূরভবিষ্যতে খাদ্য, বাসস্থান ও জীবিকার সমস্যা এক রকম সংকটজনক অবস্থায় পৌঁছবে। তিনি আরও বলেছেন যে, বর্তমানেই পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোকমাত্র ভালভাবে খেতে-পরতে পারে।

জনসংখ্যার এই ক্রমবর্ধমান চাপ পৃথিবীর যাবতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার পথে বিপুল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও অভাবনীয় সংকটের সৃষ্টি করবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির খতিয়ান

রাষ্ট্র সংঘের ১৯৫৭ সালের (১৯৫৬ সাল সংক্রান্ত) বিবরণীতে প্রকাশ, সমগ্র পৃথিবীতে লোকসংখ্যা শতকরা ১·৬ হারে বেড়ে যাচ্ছে। ১৯২০ সালে যেখানে সারা মানবজাতির সংখ্যা ছিল ১৮১ কোটি, বিশ বৎসর বাদে (১৯৪০) উহা এসে দাঁড়ায় ২২৪·৬ কোটিতে। আরও দশ বৎসর বাদে (১৯৫০) উহা বেড়ে হয় ২৪৯·৫ কোটি। তারপর ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি সংখ্যাটা এসে দাঁড়িয়েছে ২৭৩·৭ কোটিতে। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে দৈনিক প্রায় ১ লক্ষ ৩৭ হাজার করে। আগামী ২।৩ বৎসরের মধ্যেই পৃথিবীর জনসংখ্যা তিনশ' কোটিতে পৌঁছে যাবে। পণ্ডিতদের অনুমান, একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই সংখ্যা প্রায় ছয়শ' কোটিতে পৌঁছে যাবে। আরও এক শতাব্দী বাদে অর্থাৎ আগামী দেড়শ' বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বারশ' কোটিতে গিয়ে ঠেকবে। তখন হয়ত প্রতিটি মানুষের জন্য দাঁড়াবার বেশী স্থান থাকবে না।

আয়র্লণ্ড ও পূর্ব জার্মানী এবং ফ্রান্স ছাড়া মোটামুটি পৃথিবীর সকল দেশেই ১৯৫০-৫৬ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। আয়র্লণ্ড ও পূর্ব জার্মানীতে এই সময় জনসংখ্যার হ্রাস হয়েছে। ফ্রান্সে হ্রাসবৃদ্ধি বৃদ্ধি কিছুই হয়নি। পূর্ব জার্মানীর হ্রাসের কারণ হয়ত প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ অধিবাসীর পশ্চিম জার্মানীতে চলে আসা।

ভারতে বর্তমান জনসংখ্যা ৪০ কোটির ওপর এবং আগামী ১৯৬১ সালের মধ্যে ৪২ কোটিতে পৌঁছবে। ভারতে প্রতি বৎসরে মোটামুটি ৫০ লক্ষ করে অর্থাৎ দৈনিক ১৪ হাজার করে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৮৯১-১৯২১, এই ত্রিশ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা বেড়েছিল ১ কোটি ১০ লক্ষ, সেখানে ১৯২১-৫১, এই ত্রিশ বৎসরে বেড়েছে ১১ কোটি ১৬ লক্ষ। আশঙ্কা করা যায় ১৯৫১-৮১, এই ত্রিশ বৎসরে লোকসংখ্যা ৬০ কোটিতে এবং একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ৮০ কোটিতে গিয়ে পৌঁছবে, যদি বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকে। অব্যাহত থাকার আশঙ্কাই যুক্তিসংগত। কারণ ১৯৫১ সালে যেখানে জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে ২৪·৯ এবং মৃত্যুহার ১৪·৪ সেখানে জন্মহার ক্রমাগত বেড়ে এবং মৃত্যুহার কমে ১৯৫৫ সালে জন্মহার এসে দাঁড়িয়েছে ৩০·৫ এবং মৃত্যুহার ১২·৭। কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই গত দশ বৎসরে (১৯৪৪-৫৪) মৃত্যুহার ১৮·১ থেকে হ্রাস পেয়ে হাজারে ৯ জনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও মোটামুটি জন্মহার বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার হ্রাসের দিকেই। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫১ সালে প্রতি হাজারে জন্মহার ছিল ২৪·৫ এবং মৃত্যুহার ৯·৭ সেখানে ১৯৫৫ সালে জন্মহার ২৪·৬ এবং মৃত্যুহার ৯·৩। চীনে বর্তমান জনসংখ্যা ৬৪ কোটি এবং প্রতি বৎসর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে ১ কোটি ২০ লক্ষ থেকে দেড় কোটি। যদি এই বৃদ্ধির হার বজায় থাকে (যদিও চীন বর্তমানে জন্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে এবং তার ফলে জন্মহার হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু সেই সংগে মৃত্যুহারও হ্রাস পাওয়ায় অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিতই আছে) তবে আগামী ত্রিশ বৎসরে চীনের জনসংখ্যা একশ' কোটির অনেক ওপরে উঠে যাবে।*

রাশিয়ার জনসংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধির দিকে এবং মৃত্যুহারও যথেষ্ট হ্রাস পাচ্ছে। রাশিয়ার বর্তমান লোকসংখ্যা ২০ কোটির ঊর্ধ্বে।

রাশিয়া বাদে এশিয়ার জনসংখ্যা (১৯৫৬) ১৫১·৪ কোটি, ইউরোপের ৪১·১ কোটি, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার ৩৭·৪ কোটি, আফ্রিকার ২২ কোটি আর

(China: An Economic perspective, by Joan Robinson and Sol Adler, Fabian International Bureau, London)

ওশানিয়া মহাদেশের ১·৫১ কোটি (রাষ্ট্র সংঘের তথ্যপঞ্জী, ১৯৫৭)।

শিল্প, খনি ও কৃষিজাত উৎপাদন

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে শিল্প, খনি ও কৃষিজাত পণ্যের উৎপদন আদৌ সন্তোষজনক নয়।

রাষ্ট্র সংঘের তথ্যপঞ্জী থেকে দেখা যায় যে ১৯৫৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার শিল্প ও খনিজাত কয়েকটি দ্রব্যের উৎপাদন সমগ্র পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগ বা তারও বেশী। যথাঃ--কয়লা—যুক্তরাষ্ট্র ৩০ রাশিয়া ১৯; পেট্রল--যথাক্রমে ৪২ আর ১০; বিদ্যুৎ—৪১ আর ১১; সিমেন্ট—২৫ আর ১১; ইস্পাত—৩৭½ আর ৩৭½; মোটরগাড়ী—৬০ আর ৪।

উপরোক্ত দুইটি দেশ ছাড়া পশ্চিম জার্মানী, যুক্তরাজ্য, জাপান প্রভৃতি দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির হারও আশাজনক। এ ছাড়া চীন, ভারত, যুগোশলাভিয়া প্রভৃতি দেশও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে (১৯৬১) ভারতের ইস্পাত উৎপাদন বর্তমানের উৎপাদনের চাইতে (১৭ লক্ষ টন) ৪ গুণ বেড়ে ৬০ লক্ষ টনে পৌঁছবে। বর্তমান বৎসরে চালের উৎপাদনও পূর্ববর্তী রেকর্ডকে (১৯৫৬-৫৭) ছাড়িয়ে যাবে। চীনের লৌহ উৎপাদনও ১৯৫৭ সালে ৫৩·৫ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ১৯৫৮ সালে ১১০ লক্ষ টন **এবং** ১৯৫৯ সালে ১৮০ লক্ষ টনে **পৌঁছবে। কয়লাঃ** ১৯৫৭ সালে ১৩ কোটি টন, ১৯৫৮ সালে ২৭ কোটি টন এবং ১৯৫৯ সালে ৩৮ কোটি টন। খাদ্যশস্যঃ ১৯৫৭ সালে ১৮·৫ কোটি টন, ১৯৫৮ সালে ৩৭·৫ কোটি টন এবং ১৯৫৯ সালে ৫২·৫ কোটি টনে পৌঁছবে। রাষ্ট্র সংঘের রিপোর্টে প্রকাশ, বর্তমান বৎসরে চীন চাল উৎপাদনে সমগ্র পৃথিবীর মোট উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু সে সত্ত্বেও এই বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল রাখতে পারছে না।

অধিকন্তু দু' একটি দেশের অগ্রগতি দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর বিচার করা চলে না এবং সমগ্র পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দু' একটি দেশের অগ্রগতি খুবই নগণ্য। রাষ্ট্র সংঘের প্রদত্ত নিম্নের বিবরণী (১৯৫৭) থেকেই উহা বুঝতে পারা যাবে।

কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি ছাড়া পৃথিবীর বাকী অংশে ১৯৫৬ সালে খনি আর কারখানাগুলি থেকে যত উৎপাদন হয়েছে, তা' ১৯৩৮ সালের উৎপাদনের তুলনায় মাত্র সওয়া দু' গুণ (শতকরা ১২৭ ভাগ) বেশী। আর ১৯৫৫ সালের তুলনায় শতকরা ৪২ ভাগ বেশী। শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন আরও শোচনীয়। ১৯৫০ সালের অনুপাতে ১৯৫৬ সালে চালের উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ৩২ ভাগ। আর গম ১৬, ভুট্টা ২২, যব ৪২ এবং আলু বেড়েছে শতকরা ৬ ভাগ মাত্র। তুলোর উৎপাদন ছ' বৎসরে বেড়েছে শতকরা ৩১ এবং তামাক ৩৩ ভাগ।

ম্যালথাস ও আল্ডুস হাক্সলী

এক শতাব্দী পূর্বে জার্মান পণ্ডিত ম্যালথাস জনসংখ্যার তথ্য সম্পর্কে এক যুগান্তকারী প্রবন্ধ লেখেন। তৎকালীন রাষ্ট্রনায়ক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে এ নিয়ে তুমুল আলোড়ন শুরু হয়। ঐ প্রবন্ধে তিনি বলেন যে আর্থিক দারিদ্র্যের সঙ্গে বিপরীত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং ধনোৎপাদনের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র ও সভ্যতা সজাগ না হলে পৃথিবীতে এমনদিন আসবে যখন মানুষের জন্য খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে উঠবে।

বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক অধ্যাপক আল্ডুস হাক্সলীর ভবিষ্যৎবাণী হলো জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং শিল্প-কারখানায় স্বয়ংক্রিয় (automation) যন্ত্র প্রচলনের জন্য জনসাধারণের খাদ্য ও বাসস্থানের অপ্রাচুর্য, বেকারী ও দারিদ্র্য বৃদ্ধির হেতু বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক দল ও সরকারসমূহ যতই সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হবে ততই রাজনৈতিক দলের আধিক্য ঘটবে। কিন্তু যেহেতু কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই সমস্যা সমাধান সম্ভব হ'বে না, ততই জনসাধারণ দল ও রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে। ফলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ ও হতাশার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন দেশে একনায়কত্বের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। মিশর, ফ্রান্স, ইরাক, পাকিস্থান, সুদান ও ব্রহ্মদেশে তারই ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কি না কে জানে!

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের প্রচলন কিরূপ ভয়াবহ বেকার সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে তার এক দৃষ্টান্ত সর্বোদয়নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের মুখে শুনতে পেয়েছিলাম। যতদূর স্মরণ আছে, তিনি বলেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রে (বোধ হয় ক্যালিফোর্নিয়ায়) ৭৫ লক্ষ ডলার ব্যয়ে এক গ্যাস প্ল্যাণ্ট নির্মিত হয়েছে যেখানে শ্রমিক মাত্র ২ জন। ভারতে ঐ টাকায় অন্তত ৪৫ হাজার শ্রমিককে কুটির শিল্পে, ১২৫০০ শ্রমিককে ক্ষুদ্রতর শিল্পে, ৪৬০০ শ্রমিককে বৃহৎ শিল্পে অথবা ১২৫০ জন শ্রমিককে ভারি শিল্পে নিযুক্ত করা সম্ভব হতো। Automation-এর কথা বাদ দিলেও ভারতে কেবলমাত্র ভারি শিল্পে পুঁজি নিয়োগের ফলেই শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা কতটা সংকুচিত হ'তে পারে, নাগপুরে কংগ্রেস সভাপতির প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত নিম্নের পরিসংখ্যান থেকে তা' বোঝা যাবে। ভারতে শ্রমিক পিছু গড় ব্যয় মোটামুটি নিম্নরূপঃ—

(শ্রমিক পিছু)

কুটির ও গ্রাম্য শিল্পে	৫০০৲-৮০০৲ টাকা।
ক্ষুদ্রতর শিল্পে	৩০০০৲ টাকা।
বৃহৎ শিল্পে	৮০০০৲ টাকা।
খনিতে	১৫০০০৲ টাকা।
ভারি শিল্পে	৩০০০০৲ টাকা।
বিদ্যুৎ শিল্পে	২৫০০০০৲ টাকা।

সুতরাং আল্ডুস হাক্সলীর অভিমত অনুসারে একথা মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে যে automation ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিণামে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ডিক্টেটরসিপের আবির্ভাব ঘটবে। ঠিক একই কারণে ম্যালথাস থিওরীরও আপাতত সত্য বলেই মনে হয়।

বিবাহ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান পরিস্থিতিতে

বিবাহ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। উন্নতিশীল ও শিক্ষায় অগ্রসর দেশে সাধারণত নারী-পুরুষ উভয়েরই কিঞ্চিৎ বেশী বয়সে বিয়ে করে থাকে। কিন্তু বেশী বয়সে বিয়ের প্রয়োজনটা অতিরিক্ত ঘনবসতি, অনগ্রসর ও দারিদ্র দেশেই অধিক জরুরী। তাই ভারত (জনসংখ্যা প্রতিবর্গ মাইলে ৩৫০), চীন (প্রতি বর্গমাইলে আনুমানিক ২৫০ শত) প্রভৃতি দেশে এ সম্পর্কে কঠোর আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগ দরকার, যাতে পুরুষরা ৩০-এর নীচে এবং নারীরা ২৫-এর (নারীর গর্ভধারণ ক্ষমতা সব চাইতে বেশী ১৫ থেকে ২৫-এর মধ্যে) নীচে বিবাহের অধিকার না পায়। ৪০ বৎসর বা আরও কম বয়সের কোন পুরুষ অনাধিক ২টি সন্তান সহ বিপত্নীক হ'লে পুনর্বিবাহের অধিকারী হ'বে, কিন্তু ৪০-এর ঊর্ধ্বে কোন পুরুষ (সন্তান থাক আর না-ই থাক) গর্ভধারণে অক্ষম (বন্ধ্যা, প্রাকৃতিক নিয়মে ৫০ বা তার কাছাকাছি বয়সে যাঁদের গর্ভধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় (এ ক্ষেত্রে

বয়সের মাপকাঠি ৫০ ধরা হবে) অথবা অপারেশন দ্বারা যাঁদের গর্ভধারণ ক্ষমতা (এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে) নষ্ট করা হয়েছে এমন নারীকে ছাড়া অপর কোন নারীকে বিয়ে করবার অধিকারী হবে না। আর অনধিক ৩৫, যে কোন বয়সের নারী ২টি সন্তান সহ বিধবা হ'লে তাঁরাও পুনরায় ৫০ বৎসর (কারণ ঐ বয়সকে স্বাভাবিক নিয়মে গর্ভধারণে অক্ষম বলে ধরে নেয়া হবে) বয়সের পূর্বে বিয়ে করতে পারবে না। ৩৫-এর ঊর্ধ্বে এবং ৫০-এর নীচে কোন বিধবা নারী (পূর্বের সন্তান থাক আর না-ই থাক) পুনর্বিবাহ করতে পারবে না। কোন দম্পতির তিনটির অধিক সন্তান হলেই চতুর্থ সন্তান থেকে প্রতি সন্তানের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে জন্ম কর (birth tax) দিতে হবে।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতিটি ইউনিয়ন বোর্ড বা তালুক এলাকায় কমপক্ষে একটি করে পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক স্থাপন করা দরকার। ঐ সব ক্লিনিকের বিশেষ ধরনের শিক্ষিত নার্সরা গ্রামে গ্রামে মহিলা-দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে তাঁদের জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ও বিভিন্ন দ্রব্যাদির প্রয়োগ পদ্ধতি বুঝিয়ে দেবে। সম্ভব হ'লে গ্রামের লোকেদের বিনামূল্যে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন দ্রব্যাদি দিতে হবে। এ-ছাড়া বিভিন্নরূপ প্রচার পত্রিকা, পোস্টার গ্রামে গ্রামে দেয়া দরকার, যাতে লোকে এ বিষয়ে সহজেই আকৃষ্ট হ'তে পারে। সরকারী উদ্যোগে প্রতি বৎসর সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 'জন্মনিয়ন্ত্রণ' সপ্তাহ পালিত হওয়া দরকার, এই উপলক্ষে জিলা, মহকুমা বা থানায় থানায় প্রদর্শনীর আয়োজন, ম্যাজিক ল্যাণ্ঠার্ন সহযোগে বক্তৃতা বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত চলচ্চিত্র প্রদর্শন বিশেষ কার্যকরী। বেতার, ও দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিয়মিত প্রচারের ব্যবস্থা করাও বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু সরকারী ও বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল, ক্লাব ও মহিলা সংগঠনগুলিরও এ বিষয়ে সরকারী প্রচেষ্টায় সাহায্য ও সহযোগিতা করা এবং সম্ভব হ'লে তাঁদের নিজেদের উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত।

জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য খাওয়া যায় এরূপ নির্ভরযোগ্য 'ট্যাবলেট' অবিলম্বে আবিষ্কৃত হওয়া প্রয়োজন; কারণ (Rythmic বা Contraceptive পদ্ধতি জনসাধারণ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। Contraceptive প্রক্রিয়ায় ঝামেলা ও অর্থব্যয়ের প্রয়োজন আর ছন্দায়িত (Rythmic) প্রক্রিয়া আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়। জনসাধারণের স্বাভাবিক বিরাগ ও সংস্কার ছাড়াও 'অপারেশনে' অর্থের প্রয়োজন এবং সুদূরে পল্লীগ্রামে অপারেশনের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। আর একটি কার্যকরী উপায় হলো গর্ভপাতকে জাপানের মত বৈধ ও আইনসম্মত বলে স্বীকৃতি দেয়া।

এ সব চেষ্টা সত্ত্বেও আশংকা হলো পল্লী-গ্রামের অশিক্ষিত ও দরিদ্র জনসাধারণ জন্মনিয়ন্ত্রণকে ভালভাবে গ্রহণ করতে বেশ-কিছু দিন সময় নেবে। ফলে শহরে, শিক্ষিত, ও সংগতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হ্রাস পাবে, গ্রামের জন-সাধারণের মধ্যে সেই হারে হ্রাস পাবে না। স্বভাবতই মানুষের তথা সভ্যতার উৎকর্ষ-তার মান হ্রাস পাবার আশংকা আছে। অবশ্য তাই বলে আমরা বিবাহ বা জন্মনিয়ন্ত্রণ করব না তা' নয়। এ সব আশংকা সত্ত্বেও আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

জন্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্যতা

সাধারণত আমাদের দেশের কম্যুনিস্ট বন্ধুরা এবং ধর্মভীরু ও রক্ষণশীল ব্যক্তিরা জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী। কম্যুনিস্ট বন্ধুদের কাছে আমার বক্তব্য হলো—সম্প্রতি চীনও জন্মনিয়ন্ত্রণের ন্যায্যতা স্বীকার করে নিয়ে বাস্তবে তার প্রয়োগ করছে। ম্যালথাস, আল্ডুস হাক্সলী প্রভৃতি পণ্ডিতদের কথা বাদ দিলেও অথবা অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

নারীর ঘন ঘন গর্ভধারণ করা তাঁদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনুকূল বা বাঞ্ছনীয় নয়। অধিক সন্তান দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনকে অসুখী করে। অধিক সন্তানের প্রতি উপযুক্ত যত্ন নেয়া পিতামাতার পক্ষে সম্ভব হয় না ফলে সন্তান উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। তা' ছাড়া অধিক সন্তানের ক্ষেত্রে পিতামাতাকে প্রতিদিনই কোন না কোন ঝামেলা পোহাতে হয়। এক মেয়ে আজ অসুখ থেকে উঠল তো, কাল এক ছেলে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলো। পরশু এক ছেলে কারও সঙ্গে ঝগড়া ও মারপিট করে এল বা কোন দুর্ঘটনা ঘটাল ইত্যাদি। পিতা-মাতাকে বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে হ'লেও অসুবিধে হয়। রাস্তা-ঘাটে একপাল ছেলেপিলে নিয়ে চলা ফেরার অসুবিধে ছাড়াও যাদের কাছে যাওয়া যায় তাঁদেরও অসুবিধে।

সুতরাং অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও মাতার স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনে, পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে সুখী হ'তে হ'লে এবং সর্বোপরি সন্তানকে নিজেদের কাছে পারিবারিক পরিবেশে রেখে উপযুক্তভাবে মানুষ করতে হলে সন্তান সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ রাখতেই হবে।

ধর্মভীরু ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদের কাছে আমার বক্তব্য বিশেষ কিছুই নেই। তাঁদের কেবলমাত্র স্মরণ করিয়ে দেব যে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা'র দিন চলে গেছে। অনাগত সন্তানের জন্মকে স্বাগত না করলে জীব-হত্যার নামে যাঁরা আঁতকে ওঠেন, তাঁরা

সন্তানের জননীদের বৎসর বৎসর সন্তান উপঢৌকন দিয়ে ধন্য করেন এবং জননী ও শিশুদের অকালমৃত্যুর কারণ হন। তাঁরাই নারীর পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার মানতে অসম্মত, হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহে ও বিবাহ বিচ্ছেদে হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল বলে মনে করেন। তাঁদেরই পূর্ব-সূরীরা সদ্য বিধবা হিন্দু নারীদের মৃত স্বামীর চিতায় তুলে জোর করে পুড়িয়ে মেরে সতীদাহের মহিমা প্রচার করতেন।

নারী আজ সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বা পুরুষের দাসী নয়। তাঁর পুরুষের সমান মর্যাদাসম্পন্ন অংশীদার, তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার মূল্য কোন অংশে কম নয়।

উপরোক্ত দুই দল ছাড়াও কিছুসংখ্যক লোক আছেন, দেশরক্ষা ও সামরিক শক্তির প্রয়োজনে জনশক্তি বৃদ্ধির যুক্তি দিয়ে থাকেন। তাঁদের এ যুক্তিও গ্রাহ্য নয়। সাত সমুদ্দুর, তের নদী পার হয়ে এসে ৪ কোটি ইংরেজ ৪০ কোটি ভারতবাসীকে ২০০ বৎসর পরাধীন রেখেছিল মাথাগুনতির জোরে নয়। বর্তমান কালের শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি রাশিয়া বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রের চাইতে কম। নেপোলিয়ন, হিটলার অথবা ইতিহাসের দিগ্বিজয়ী বীরেরা সংখ্যা শক্তির জোরেই শক্তিমান ছিলেন না। বিশেষ করে আণবিক অস্ত্রের যুগে জনশক্তির গুরুত্ব আরও হ্রাস পেয়েছে।

বাসস্থান ও খাদ্যের সম্ভাব্য সমাধান

বিবাহ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রচলিত হ'লেও জনসংখ্যাকে এক যায়গায় ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। হয়ত জন্মহার কিছুটা কমে যেতে পারে। কারণ রাষ্ট্র নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু করতে যতদিন সময় লাগবে (এর মধ্যে যে সব রাষ্ট্রে জনসংখ্যার চাপ কম তাঁরা অদূর ভবিষ্যতেও হয়ত জন্মনিয়ন্ত্রণ তেমনভাবে প্রচলন করবে না। কারণ তাঁরা অধিকাংশই সমগ্র পৃথিবীর সমস্যার কথা চিন্তা করবে না, কেবলমাত্র নিজেদের রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা বুঝেই অগ্রসর হবে। তা'ছাড়া সভ্যতার আলোক থেকে বঞ্চিত আদিবাসী, অথবা নিরক্ষর দরিদ্র পল্লী-বাসীদের মধ্যে এর প্রচলন করতে বহু বৎসর কেটে যাবে।) ততদিনে মানব সভ্যতা হয়ত চরম সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। একদিন না একদিন, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যার চাপে খাদ্য ও বাসস্থানের সমস্যা খুবই কঠিন হয়ে উঠবে। হয়ত তখন আমরা বেঁচে থাকব না; কিন্তু সেদিনের অবস্থা কল্পনা করতে ক্ষতি কি? সমস্যার সমাধান অবশ্যই বিজ্ঞানকে করতে হ'বে, তবে বিজ্ঞান সম্ভাব্য কোন পথে সমস্যার সমাধান করতে পারে আলোচনা করে দেখা যাক।

বাসস্থানের জন্য সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যাকে সমভাবে সকল রাষ্ট্রের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হবে, যাতে সর্বত্র লোক সংখ্যার ঘনত্ব সমান থাকে। তারপর পৃথিবীর সমস্ত অব্যবহৃত চাষের অনোপযোগী জমি (পর্বত শীর্ষ থেকে শুরু করে গভীর অরণ্য, নির্জন দ্বীপ মরুভূমি প্রভৃতি) পুনরুদ্ধার করে বাসগৃহ করা হবে। পৃথিবীর যাবতীয় রেললাইন তুলে দিয়ে টিউব রেলওয়ের পত্তন ও সর্বপ্রকার গুদামঘর, যানবাহনের ডিপো, গ্যারেজ প্রভৃতি মাটির নীচে স্থানান্তরিত করা হবে। নিউ ইয়র্কের 'এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং'য়ের চাইতেও উচ্চতল বিশিষ্ট (সম্ভব হলে ২৫০, ৩০০, বা ৫০০ বা আরও উচ্চতলের) বাড়ি সম্ভবপর স্থানে নির্মিত হবে তা'তেও যদি না হয়, তবে নদী ও সমুদ্রে হাজার হাজার, লক্ষ-লক্ষ ভাসমান বাড়ি তৈরী করা হবে এবং মাটির নীচেও ১৫০।২০০ তল বিশিষ্ট বাসোপযোগী বাড়ি গড়ে উঠবে। এ সমস্ত করার পরেও যদি সংকুলান না হয় তবে চন্দ্রলোকে, মঙ্গলগ্রহে বা অপরাপর গ্রহে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। অবশ্যই আমার আশা করতে পারি যে আগামী ১০০।১৫০ বৎসরের মধ্যে মানুষ চন্দ্রে বা মঙ্গল গ্রহে গিয়ে বসতি গড়ে তুলতে পারবে। এটা আজ আর কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বিজ্ঞান তথা মানুষ আজ মহাশূন্যে জয়ের পথে অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার 'ম্যেচতা' সেই সম্ভাবনার দ্বারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

খাদ্য সম্পর্কে বলা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়লেও শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হবে না, আমার মনে হয় ভবিষ্যতে মানুষকে বাতাস ও সমুদ্র থেকেই খাদ্য সংগ্রহ করতে হবে। বায়ু ও সমুদ্রের জলে এমন বহু খাদ্যের উপাদান থাকতে পারে যাকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় হয়ত একদিন সংগ্রহ করা সম্ভব হ'বে। যেমন ধরুন আমরা আমাদের খাদ্য লবণ সমুদ্রের জল থেকেই সংগ্রহ করি। তা'ছাড়া জলের ওপরও আমরা খাদ্যের চাষ করতে পারি। যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরা সমুদ্রের 'আলজী' নামক একপ্রকার আগাছা যে পুষ্টিকর খাদ্য তা' আবিষ্কার করেছেন এবং তাঁরা নতুন ধরনের একপ্রকার 'আলজী' উৎপাদনেও সক্ষম হয়েছেন যা' প্রতিদিন হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়। তা' ছাড়া পানিফল বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা অপর কোন জলজগাছ যদি খাদ্য উৎপাদনক্ষম করে তোলা সম্ভব হয় (ধরুন যদি কচুরীপানাকে বৈজ্ঞানিক কোন প্রক্রিয়ায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে সক্ষম করে তোলা যায়) তবে নদী বা সমুদ্রের জলে ব্যাপক চাষ করা যেতে পারে। অধিকন্তু মহাসমুদ্রের সর্বত্র খাদ্যোপযোগী মাছের চাষ যদি ব্যাপক ভাবে সম্ভব হয় তা'তেও কিছুটা সমাধান হতে পারে।

সর্বোপরি বিজ্ঞানের কল্যাণে এমনও হতে পারে যে মানুষের কোন খাদ্যেরই প্রয়োজন হবে না অথবা হয়ত স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীরে ক্ষয় পূরণের জন্য যেটুকু 'ক্যালোরী' ও 'ভিটামিন' প্রয়োজন তা' গবেষণাগারে প্রস্তুত একটা ট্যাবলেট খেলেই হয়ে যাবে। সেদিন চিরকালের জন্যই খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে। মানুষ তখন পাল-পার্বনে, উৎসবাদি উপলক্ষ্যে, ন'মাসে-ছ'মাসে শখ করে হয়ত কিছু আহার করবে। তারও পরে, হয়ত হাজার বছর বাদে, পুরাকালের খাদ্য ইতিহাসের গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়াবে।

চারটি দেশের থিয়েটার

শম্ভু মিত্র

আমরা গিয়েছিলাম রাশিয়ায় সরকারী ডেলিগেশনে। আমরা পাঁচজন। তার মধ্যে একজন গানের, একজন নাচের ও একজন থিয়েটারের লোক। অপর দুজনের মধ্যে একজন দৈনিক কাগজের সম্পাদক, আর একজন সংস্কৃত ও পালির অধ্যাপক। ফলে আমরা বেশীর ভাগ সময়েই আলাদা আলাদা ঘুরেছি, যে যার নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় অনুসারে।

দেড় মাসের এই ভ্রমণে অপর কার কী লাভ হয়েছে জানি না, কিন্তু আমি যে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি সেকথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করতেই হয়। এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া এবং কিছু কিছু অপরিহার্য সান্ধ্য-পার্টিতে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও এই সময়ের মধ্যে আমি অন্তত ৩৫।৩৬টি অনুষ্ঠান দেখেছি। তার মধ্যে অবশ্য নাটকাভিনয়ই সব চেয়ে বেশী, তবে ব্যালে, অপেরা ও কিছু চলচ্চিত্রও আছে। এ ছাড়া অভিনয় শিক্ষার ইস্কুল, নাচ শেখার ইস্কুল, গান শেখার ইস্কুল ও বিভিন্ন নাটকের মহলা দেখবারও সুযোগ হয়েছে। তেমনি আবার বহু মঞ্চের ভিতরে গিয়ে তাদের আলোর ব্যবস্থা, তাদের দৃশ্যপট সাজানোর পদ্ধতি, তাদের নেপথ্য-কৌশলের খুঁটিনাটি—এ সমস্ত খুঁটিয়ে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। এবং এর জন্য এই ভরা শীতেই যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। কারণ গরমকালে থিয়েটারের মরসুম নয় সেখানে। মরসুম হল শীতের সময়ে।

যা দেখেছি, তার সম্পূর্ণ বিবরণ এই স্বল্পপরিসরের মধ্যে দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এর মধ্যে বহু টেকনিক্যাল কথা আছে যা সাধারণ পাঠকের বিশেষ মনোরম মনে হবে না। কিন্তু কিছু টেকনিক্যাল কথা আমাকে বলতেই হবে নইলে ওখানকার থিয়েটারের মোটামুটি চেহারা বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া ও যুগোস্লাভিয়া। এই চারটি দেশ আমরা ঘুরেছি এবং এর সর্বত্রই থিয়েটার সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় চলে। খরচের টাকা আসে হয় পৌরসভা থেকে, নয়তো সংস্কৃতির দপ্তর থেকে। টিকিট বিক্রীর উপর কাউকেই নির্ভর করতে হয় না, ফলে একদিকে যেমন কোনও বেকার নেই, অপর দিকে তেমনি দৃশ্যপটাদির জাঁকজমকেরও কোনও ত্রুটি নেই। বিশেষ করে রাশিয়ায়।

রাশিয়ায় যে সমস্ত অভিনয় দেখেছি তার মধ্যে নাম করলেই যে-নাটকগুলো চিনতে পারা যাবে সেগুলো হল হ্যামলেট, আন্না-কারেনিনা, দস্তয়েভ্স্কির ইডিয়ট ও সংস্কৃত মৃচ্ছকটিকের অনুবাদ। এ ছাড়া আধুনিক নাটকও দেখেছি। হ্যামলেট দেখেছি দুটো থিয়েটারে, মায়াকভস্কি ও ভাক্তানগোভ্-এ। রাশিয়ায় হ্যামলেটকে গামলেৎ বলা হয়, হোরাশিওকে গোরাৎশিও, শোপেনহাওয়ারকে শোপেনগাওয়ার। যাই হক, প্রথম দেখেছিলাম মায়াকভ্স্কি থিয়েটারের গামলেৎ। শুরুতে দেখা গেল স্টেজভর্তি দুটো দরজার পাল্লা। সেই পাল্লাগুলোর উপরে আবার স্লাইডিং ঢাকা। সেটাকে উপরে তুলে নিলে দেখা যায় যে, পাল্লাগুলো প্রায় ৬।৭ ফুট মোটা এবং তিনতলা উঁচু। তারই মধ্যে সিঁড়ি আছে, যেটা দিয়ে উঠে রাজারানী দোতলার সিংহাসনে বসেন অভিনয় দেখার দৃশ্যে। এবং প্রথম দৃশ্যে যখন গামলেৎ-এর পিতার প্রেতমূর্তি আসে তখন প্রেতের আবির্ভাব হয় ডান দিকের (অভিনেতার ডান দিকের) দোতলায়, মধ্যের খুপরিতে। আর গামলেৎ ইত্যাদিরা থাকে বাঁদিকের পাল্লার নীচের খুপরিটার সামনে।

এই বিরাট পাল্লা দুটো আবার খুলে যায় পোলোনিয়াসের দৃশ্যের জন্য। সেটা সাজানো থাকে ভিতরে। এক কথায় এলাহি ব্যাপার। কিন্তু—

প্রথম যখন একটা খুপরির মধ্যে প্রেতের আবির্ভাব হয়, তখনই মনে একটা কিন্তু জেগেছিল, কারণ অন্ধকার রাত্রে একটা ফাঁকা জায়গার যে অনৈসর্গিক পরিবেশ তার তো কিছুই আসে না এই খুপরি-কাটা ঘরের মধ্যে। মনে ভাবলাম যে হয়ত নির্দেশক একটা বিশেষভাবে নাটকটা দেখাতে চান, কিন্তু কোনও শিল্পগত বৈশিষ্ট্য দেখলাম না। খালি আড়ম্বর এবং খুব মোটা দাগের অভিনয়। সত্য কথা বলতে কি, বেশ একটু ভড়কে গেলাম। কারণ এতদিন যে রাশিয়ান থিয়েটার সম্পর্কে এত কথা শুনে এসেছি, সেই রাশিয়ান থিয়েটারে প্রথম অভিনয়

মস্কোর মায়কোভস্কি থিয়েটারে অভিনীত "হ্যামলেট"-এর এই বিরাটকায় সেট ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। যে প্রকোষ্ঠে অভিনয় চলে শুধু তারই যবনিকাটুকু তুলে রাখা হয়। নাটকের প্রয়োজন অনুযায়ী একাধিক প্রকোষ্ঠে অথবা সারা সেট জুড়ে অভিনয়ের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়
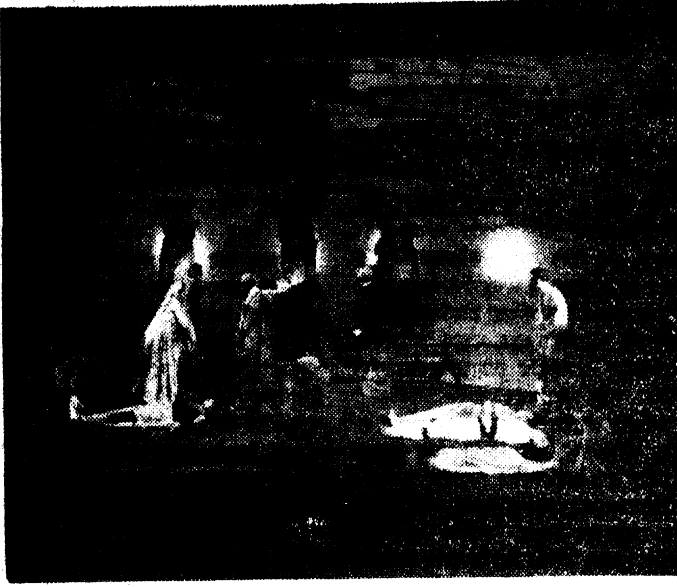
পোল্যান্ডের নোভাহুতো থিয়েটারে অভিনীত একটি নাটকের প্রতীকধর্মী দৃশ্যসজ্জা

দেখছি। এককথায় খারাপ বলতে ভরসা হচ্ছে না, অথচ ভালোও মনে হচ্ছে না। ধৈর্য ধরে সমস্তটা দেখলাম এবং ফেরবার পথে দোভাষীকে বললাম কথাটা। দেখলাম, তাঁরও ভালো লাগেনি।

তারপরে আবার হ্যামলেট দেখলাম ভাক্তানগোভ থিয়েটারে। মায়াকভস্কি থিয়েটারে যিনি হ্যামলেট করেছিলেন—সামোইলভ্—তিনি একজন পিপলস্ আর্টিস্ট, আর এস এফ এস আর। এবং ভাক্তানগোভ থিয়েটারে যিনি হ্যামলেট তিনি হলেন পিপলস্ আর্টিস্ট অফ এস এস এস আর; অর্থাৎ যেটা নাকি সেখানকার শ্রেষ্ঠ উপাধি। নাম আস্তানগোভ।

এ'র বয়স কিছুটা বেশী, কিন্তু ভালো অভিনেতা। এ'র ওফেলিয়ার সঙ্গে দৃশ্যে (Get thee to a nunnery দৃশ্যে) অভিনয় বেশ ভালো। মোটেই লরেন্স অলিভিয়ের-এর মত ভায়োলেণ্ট নয়, বরঞ্চ ভালোবাসা ও তিক্ততার একটা মিশ্রিত আবেগ, তাতে অনেক বেশী বৈচিত্র্য এসেছে, মনের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে এবং শেষে চলে যাবার সময়ে আবার যখন নানারিতে যাবার কথা বললেন, তখন সেটা হাহাকারের মত। এককথায় ভালো অভিনেতা।

কিন্তু বাকি লোকেরা তা নয়। তারা যথেষ্ট সাধারণ। অথচ সেখানে এতো অভিনয় শিক্ষার ইস্কুল, চার বছর ধরে অভিনয় শিক্ষা দেওয়া হয়, ইস্কুলে ঢোকবার জন্যেই প্রায়শ হাজার দু হাজার ছেলেমেয়ে পরীক্ষা দেয়, নেওয়া হয় মাত্র ২৫।৩০ জনকে। এতো করেও তো সাধারণ মান এমন কিছু একটা উন্নত নয়। এক আধজন ভালো শিল্পী পৃথিবীর সব জায়গাতেই থাকতে পারে, আমাদের দেশেও কিছু কম নেই, কিন্তু সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কই?

ভাক্তানগোভ থিয়েটারে যিনি এই নাটকের নির্দেশক, তিনিও একজন পিপলস্ আর্টিস্ট, জাকহাভা। এমনিতে বেশ লোক, তাঁর সঙ্গে আমার আলাপও হয়েছে ভালো, কিন্তু তাঁর নির্দেশনা ভালো লাগেনি।

যে-দৃশ্যে হ্যামলেট অন্যদের এড়িয়ে তার বাবার প্রেতমূর্তির সঙ্গে একলা কথা কইতে এল সেটার দৃশ্যসজ্জা দারুণ। সমস্ত উইংসগুলো কালো, পুরো স্টেজটা খোলা, পিছনে—প্রায় ৩০।৪০ ফুট পিছনে—একটা পাহাড়ের টিলা, তার পিছনে ঝিমঝিমে একটা আকাশ। কিন্তু অমন নাটকীয় দৃশ্যে দুটো মেঘের যন্ত্র থেকে মেঘ ওড়ানো হচ্ছে পিছনের আকাশে। তাও আবার একটা যন্ত্র থেকে মেঘ যাচ্ছে ডানদিক থেকে বাঁয়ে, আর অপরটা থেকে যাচ্ছে বাঁ থেকে ডাইনে। এরকম একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে ঘটতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। একে তো এইরকম আবেগের দৃশ্যে মেঘ ওড়ানো, তাও আবার ঐরকম ক'রে। এবং এই শেষ নয়, হঠাৎ কানে এল পিছনে যেন অনেক শুকনো ছোলা থেকে থেকে ছড়িয়ে পড়ছে। একটু ভালো ক'রে মন দিয়ে শুনে বুঝলাম যে, পাথরের উপর সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। —এই যে আমার মনটা বিক্ষিপ্ত হল, নিশ্চয় অন্য সকলেরও হয়েছে, তাতে কি নাটকের ভালো হল, না মন্দ হল?

এইগুলো দেখে খুব কষ্ট পেয়েছি, কারণ যে-দেশে স্তানিস্লাভ্স্কি দানচেঙ্কোর মত লোক Inner Truth খুঁজে পেতে প্রাণপাত করেছেন, সেদেশে তো এরকম অগভীর নাট্যানুষ্ঠান দেখব ব'লে আশা করিনি।

এসব কথা এমন খোলাখুলি বলায় হয়ত আমার বিপদ ঘটতে পারে। কারণ, যাঁদের শিল্পের প্রতি অনুরাগ কম, এবং তুচ্ছ রাজনৈতিক দলাদলির মধ্যেই যাঁদের আনন্দ বেশী, তেমন লোকের কাছে যদি আমি রাশিয়ার প্রশংসা করতাম তাহলে একদল আমাকে ও-পক্ষের দালাল বলতেন, এবং যদি প্রশংসা করতে না পারি তাহলে আরেক দল বলবেন যে, আমি এ-পক্ষের দালাল। এ অতিসহজ গালিপাড়ার আবহাওয়ার মধ্যে আমি কেবল সবিনয়ে বলতে পারি যে, নাট্যশিল্পের প্রতি এবং রাশিয়ার বিস্ময়কর নাট্যঐতিহ্যের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা থাকার জন্যেই এই কথাগুলো মনে হয়েছে, এবং সেগুলো বলছি। যদি অশ্রদ্ধা করতাম তাহলে কিছু বলতামই না।

হ্যামলেট সম্পর্কে এতো বিশদ আলোচনা করার কারণ এই যে, নাটকটি আমাদের সকলেরই জানা এবং এর সম্পর্কে যত আলোচনা হয়েছে পৃথিবীময় তাও কিছুটা কিছুটা ক'রে আমাদের অনেকেরই জানা।

এছাড়া, মস্কো আর্ট থিয়েটারের কথা বলি। প্রথম যেদিন সেখানে গেলাম,—সেই বিশ্ববিখ্যাত যবনিকা, সীগাল্ আঁকা,—দেখে কী যে ভালো লাগল তা বর্ণনা করা শক্ত। কেবলই মনে হ'তে লাগল, এই প্রেক্ষাঘরে বসেই স্তানিসলাভ্স্কি মহলা দেখতেন, এইখানে তাঁর গলার আওয়াজ শোনা যেত, এই করিডোর দিয়েই তিনি এবং দানচেঙ্কো কথা বলতে বলতে হাঁটতেন। এইসব ভেবে সত্যিই আমার গায়ের মধ্যে কীরকম করতে লাগল।

কিং লীয়ারের ভূমিকায় চেকোশ্লোভাকিয়ার সুখ্যাত অভিনেতা স্তেপানেক

নাটক যেটা দেখলাম সেটার নাম Fox and the Grapes· ঈশপের গল্প নিয়ে নাটক। এখানকার অভিনয় অনেক ভালো। আমাদের মতো অতিকৃত নয়, কিন্তু যে নিবিড়তার জন্যে ঐ থিয়েটার বিখ্যাত সে জিনিস আর নেই। ভালো অভিনয়,—কিন্তু সেটা এমন কিছু নয় যা আমাদের দেশে দেখিনি। দৃশ্যসজ্জা ভালো, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আমাদের এখনকার পেশাদারী থিয়েটারের চেয়ে ভালো বইকি, কিন্তু সেটা আর কতোটুকু হওয়া।

আন্না কারেনিনা দেখলাম ঐ থিয়েটারেই। বহুদিন আগে দানচেংকো এটা রূপায়িত করেছিলেন। আজও তাঁর হাতের ওস্তাদি কাজ আবছাভাবে ধরা যায়। কিন্তু আধুনিক অভিনেতা অভিনেত্রীরা মোটেই সে ক্ষমতার অধিকারী নয়, যে ক্ষমতা ছিল মসকভিন বা কাচালভ বা সমসাময়িক অন্যদের মধ্যে।

দুটো নাটকেই প্রধান নারী চরিত্রে নেমেছিলেন এ এম আন্দ্রিয়েভা। ইনি একজন honoured artiste· ঈশপের ভূমিকায় নেমেছিলেন পিপ্‌লস্‌ আর্টিস্ট অফ্‌ এস্‌. এস্‌. এস্‌. আর তোপোরকভ। এঁর গলা বেশ ভালো, শুরুতে মনে হয়েছিল আমাদের ছবি বিশ্বাসের মতো অভিনেতা, অর্থাৎ ধীরে এবং মাপে বাঁধা অভিনয়। কিন্তু শেষের দিকে মনে হল যে, গভীরতার দিক থেকে তুলনায় ছবিবাবু অনেক ভালো।

আন্না কারেনিনা নাটকের শেষ দৃশ্যে যেখানে ট্রেনের সামনে আন্না আত্মহত্যা করে, সেই দৃশ্যে ট্রেন স্টেজের উপর আসে। এ সম্পর্কে অনেকদিন আগেই আমার পড়া ছিল, কিন্তু লিখে যে কিছুই বলা দেওয়া যায় না প্রত্যক্ষ দেখে তাই বুঝলাম। এক কথায়, আমার ধারণার অতীত। অভিনয় ভালো লাগছিল না, নাট্যরূপ বিভিন্ন দৃশ্যে ভীষণ খণ্ডিত মনে হচ্ছিল, কিন্তু তবু নির্দেশক দানচেংকোর শেষ মার আমাকে বিহ্বল ক'রে দিলে।

ট্রেনের খালি তিনটে আলো দেখা যায়, তাও মোটেই ট্রেনের আলোর মতো জোরালো নয়। ট্রেন আসার আওয়াজ হয়, তাও মোটেই সত্যিকার আওয়াজের মতো জোর নয়। তবু সব লোক চীৎকার ক'রে ওঠে। আশ্চর্য, অদ্ভুত, অবর্ণনীয়!—ব্যাপারটা মোটেই naturalistic representation নয়, বরঞ্চ ট্রেন আসার ব্যাপারটাকে টুকরো টুকরো ক'রে ভাগ ক'রে পুনরায় তাকে re-create করা হয়েছে। আমি মনে মনে বার বার সেই আশ্চর্য ধীমানকে নমস্কার করেছি।

সামগ্রিক অভিনয় খুব ভালো দেখেছি মালী থিয়েটারে। খুবই ভালো। কিন্তু গভীরতা বুঝতে পারিনি, কারণ নাটকটা তুচ্ছ। নাটকের নাম—কামেন্নোয়ে গ্নেজ্‌দো —ইংরেজী মানে stone nest· এখানে

কৌতুকাভিনেতা বোরিথ (ডানদিকে) প্রাগের থিয়েটারে এ ৰি লি-র অভিনয়ের আসর মাতিয়ে রাখেন

আভেরিন বলে একজন অভিনেতাকে খুব ভালো লাগে। এবং সাল্টিকোভা নামে একজন বর্ষীয়সী অভিনেত্রীও খুব ভালো। কিন্তু সবচেয়ে ভালো হল এঁদের সামগ্রিক অভিনয়। খুব ভালো ন্যাচারালিস্টিক দৃশ্য-সজ্জা ও অভিনয়।

ওদের দেশে থিয়েটারের acoustics এতো ভালো হওয়া সত্ত্বেও কেন যে সকলে এতো চেঁচিয়ে অভিনয় করেন এইটা আমাকে সর্বদাই বিস্মিত করত। মনে করেছিলাম যে, এদের ভাষাটাই বোধ হয় ঐরকম। কিন্তু মালী থিয়েটারে ও লেনিনগ্রাদে ইডিয়টে যিনি মিশকিন-এর অভিনয় করেছিলেন তাঁদের দেখে মনে হল, এইতো বাপু দিব্যি আস্তে ও আত্মস্থ হয়ে অভিনয় হয় এই ভাষায়। ইডিয়ট নাটকে একটি বড়ো সুন্দর কৌশল দেখেছিলাম। প্রত্যেক অঙ্কের শুরুতে দস্তয়েভস্কির বইয়ের এক একটা পরিচ্ছেদের প্রথম পাতাটি পর্দার ওপরে প্রোজেক্ট করা হচ্ছিল। ফলে আদি লেখার একটা মাধুর্য সব সময়ে মনে পড়ে যাচ্ছিল। যদিও মিশকিন ছাড়া অন্যের অভিনয়ে দস্তয়েভস্কির অন্ধকার গম্ভীর জগৎ প্রতিফলিত হচ্ছিল না।

এছাড়া, থিয়েট্রিক্যাল ম্যুজিয়মে কাচালভ ও তারাসোভা অভিনীত 'থ্রী সিস্টার্স'-এর খানিকটা রেকর্ডিং শুনলাম ম্যাগনেটিক টেপ থেকে। তাছাড়া, লোয়ার ডেপ্‌থ্‌-এ ব্যারন ও সাটিন দুজনের ভূমিকায় একই সঙ্গে কাচালভ গলা বদলিয়ে করেছেন তারও টেপ বাজিয়ে শুনলাম। ভালো অভিনেতা ছিলেন। যদিও এ লেখাটায় অন্যসব বাদ দিয়ে কেবল থিয়েটারের কথাই আলোচনা করা হচ্ছে তবুও একটা কথা না বলে পারছি না। ঐ ম্যুজিয়মে শালিয়াপিন অভিনীত বোরিস গোদুনভের একটা টুকরো শুনি।

যেখানে সে এক শিশুকে হত্যা করার পর রাত্রে ঘুমোতে পারছে না। —কতবার যে নিজেকে ধন্য মনে করেছি তা বলতে পারি না।

এইবারে সেখানকার মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কে সামান্য বিবরণ দিই। বিখ্যাত বলশয় থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহ ছ' তলা। অবশ্য এটা নাচের থিয়েটার। নাটকের

থিয়েটারের প্রেক্ষাঘরগ্‌লো এত বড় নয়। তব্‌ও আমাদের দেশের তুলনায় যথেষ্ট বড়। এবং লোকে অপেরাগ্লাস নিয়ে থিয়েটার দেখে। আমার মত ক্ষীণদৃ‌ষ্টির লোকের পক্ষে এটা খ্‌বই ভালো। তাতে মূকাভিনয়ের প্রত্যেকটি খ্‌‌টিনাটি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। যাদের অপেরাগ্লাস নেই তারা থিয়েটারেই ভাড়া নিতে পারে। বোধ হয় তিন র্‌ব্‌ল্‌ করে ভাড়া। এটা খালি রাশিয়ায় নয়, ঐ চারটে দেশেই এই ব্যবস্থা।

মঞ্চের মোটের মাথায় মাপ হল—

চওড়া হচ্ছে ৪০ ফ্‌ট বা তার কিছ্‌ বেশী,

গভীরতা হচ্ছে ৪০ ফ্‌ট থেকে ৫৫ ফ্‌টের মতো,

উচ্চতা হচ্ছে ২৪ ফ্‌টের কিছ্‌ বেশী। দরকার পড়লে ৪০।৪৫ ফ্‌ট পর্যন্ত বাড়িয়ে নেওয়া যায়।

রিভল্‌ভিং বোর্ড হচ্ছে ৩৭।৩৮ ফ্‌ট থেকে আরও বেশী। তুলনায় এখানকার সাধারণ মাপ হচ্ছে,—

চওড়া—২৭ থেকে ৩০ ফ্‌ট,

গভীরতা—খ্‌ব বেশী হলে ৩০।৩২ ফ্‌ট

উচ্চতা—১২ থেকে ১৫ ফ্‌ট।

রিভল্‌ভিং বোর্ড—গোটা ২৭ ফুট।

অবশ্য নিউ এম্পায়ারের চওড়া এবং উচ্চতা আর একটু ভালো, কিন্তু গভীরতা কম।

এইবারে আলোর কথা। খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে আমি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। তাই এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, এখানে ফিল্ম স্টুডিয়োর একটা ফ্লোরে যতো আলো থাকে তার চারগুণ আলো থাকে ওখানে একটা স্টেজে। তাছাড়া, ঝড়বৃষ্টি বরফ পড়া ইত্যাদি কৌশল দেখাবার জন্যে বহু ব্যবস্থা।

আমাদের রঙ্গকরবীতে এক জায়গায় একবার একটা মেঘের ছায়া পড়ে, তাই দেখে কলকাতার অনেক দর্শক হাততালি দিয়ে উঠতেন। আমাদের একটু লজ্জা লজ্জা করত, কারণ মেঘ দেখানোর মধ্যে কোনও শিল্পকর্ম ছিল না, ওটা কেবল একটা বিশেষ মুড আনবার জন্যে। যাই হোক, রাশিয়ায় ঐরকম আগুনে ধরে যাওয়া বা বরফ পড়ার দৃশ্য দেখলে লোকে হাততালি দেয়, কেবল ঐ স্টাণ্টটার জন্যে। দেখে শুনে মনে হল যে, পৃথিবীময় মানুষ কী ভীষণ মানুষের মতো।

কিন্তু রাশিয়ার থিয়েটার যেরকম কনজার-ভেটিভ ঠেকেছে, পোল্যাণ্ড বা চেকো-শ্লোভাকিয়ার থিয়েটারকে তা মনে হয়নি।

পোল্যাণ্ডে যুদ্ধের মধ্যে বহু শক্তিশালী অভিনেতা মারা গেছেন, ফলে এখন প্রায় নতুন ও অল্পবয়স্ক লোকের যুগ। এবং সেখানে প্রচুর এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট হচ্ছে, যদিও আজও কোনও বিশেষ পোলিশ বৈশিষ্ট্য বা মান তৈরী হয়নি। রাশিয়ার সব মিলিয়ে যাই হক একটা চেহারা আছে, পোল্যাণ্ডে তা এখনও হয়নি।

হ্যাঁ, একটা কথা বলা হয়নি। রাশিয়ায় মৃচ্ছকটিক ও পাঞ্জাবী একটা বিখ্যাত লোক-কথা ভিত্তি ক'রে বলবন্ত গার্গীর লেখা সোহ্‌নীমহীওয়াল দেখেছিলাম। দুটোই পরম বাজে।

ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওখানে সর্বত্র ভীষণ কৌতূহল, কিন্তু কারা যে পরামর্শদাতারূপে গিয়ে পড়ে, ফলে আমাদের দেশের একটা ভুল রূপই সেখানে ফোটে।

পোল্যাণ্ডের কথায় ফিরে আসি। নোভা-হুতা ব'লে একটা জায়গায় একটি নতুন থিয়েটার হয়েছে যার এখন ভীষণ নাম। এ'রা ফ্রান্সের থিয়েটার-উৎসবে গিয়ে খুব খ্যাতি পেয়েছেন। এখানে কামু-র একটা নাটক দেখলাম।

পোল্যাণ্ডে টেনেসি উইলিয়াম্‌স্‌, সার্ত্র, বেকেট, আওনেস্কো, কাফ্‌কা,—এ'দের নাটক অবাধে অভিনয় হয়। যা রাশিয়ায় কখনো দেখিনি, শুনিওনি। আমি একজন কর্তা-ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনারা সকল রকম নাটক অভিনয় করতে দেন কেন, এতে

গ্যালিলিওর ভূমিকায় ওয়াল্টার তাউব

আপনাদের সমাজ-ব্যবস্থায় কোনও অসুবিধে হবে না?

তাতে তিনি উত্তর দেন যে, যে-নাটক উগ্রভাবে সামাজিক নীতির বিরুদ্ধে তাকে নিশ্চয়ই আমরা বন্ধ করব। কিন্তু কোনও নাটকে যদি এমন ফিলজফি থাকে যা হয়ত আমাদের ঠিক মনে হয় না, তাকে আমরা বন্ধ করি না। কারণ লোকে সেটাকে দেখুক, সেটা নিয়ে কাগজেপত্রে আলোচনা চলুক, তাহলেই আমাদের দেশের বোধের মান উন্নত হবে।

আরও বললেন—যদি কোনও নির্দেশক ভাবেন যে, একটা ঐরকম নাটকে তাঁর শিল্প-কৌশল দেখাবার প্রচুর সুযোগ আছে, বা কোনও ভালো অভিনেতার পক্ষে খুব অভিনয়োপযোগী একটা ভূমিকা আছে, তাহ'লে বিনা বাধায় সে সব নাটকের ব্যবস্থা করা হয়।

ব্যক্তিগতভাবে এ কথা আমাকে মুগ্ধ করল।

চেকোশ্লোভাকিয়াতে প্রথমেই দেখলাম কিং লীয়র। অত্যন্ত ভালো দৃশ্যসজ্জা ও কম্পোজিশন। এবং প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন স্তেপানেক। ইনি ন্যাশনাল আর্টিস্ট। অপূর্ব অভিনেতা। তাঁর বিস্তৃতি, তাঁর অভিনয়ের ছন্দ, অত্যন্ত ভালো। বলতে পারি, এক মাসের বেশী খোঁজার পর একজন ভালো শিল্পীর সাক্ষাৎ পেলাম।

তাছাড়া, এর দৃশ্যসজ্জা সম্পর্কে এখানে বিবরণ দেওয়া অসম্ভব, ছবি যা আমার কাছে আছে তাতে পুরো স্টেজের ছবি নেই, কারণ আমি দেখেছি একেবারে প্রথম রজনীতে, তখনও ছবি তোলা হয়নি। কয়েকদিন পরে কেবল অভিনেতাদের ছবি পাওয়া গেল।

কিন্তু সে মঞ্চসজ্জা খুব সুন্দর। খুবই কল্পনাগভীর।

এই থিয়েটার হল চেকোশ্লোভা-কিয়ার জাতীয় থিয়েটার। সাধারণ লোকের চাঁদায় এই থিয়েটার গড়া হয়েছিল যখন চেকরা পরাধীন। গড়া হবার কিছুদিনের মধ্যেই আগুন লেগে এটা পুড়ে যায়। তখন আবার দেশের লোকে চাঁদা দিয়ে পুনরায় এটাকে গ'ড়ে তোলে। তাই আজ এটা চেক-দের সবচেয়ে প্রিয় থিয়েটার।

ভাবতে অবাক লাগে যে, কতোটুকু দেশ এই চেকোশ্লোভাকিরা, অথচ পরাধীন অবস্থায় এরা এতো বড় একটা জাতীয় কাজ করতে পারল। অথচ আমরা তো পারিনি। এই বাংলা দেশে শিল্পী কিছু কম জন্মায়নি। কিন্তু একমাত্র শিশিরবাবু ছাড়া আর সকলকেই পেশাদারী মালিকের তাঁবে চাকরী করতে হয়েছে। আমরা গর্ব করি আমাদের থিয়েটার নিয়ে কিন্তু কার্যত এখনও প্রায় কিছুই করিনি।

প্রাগে আর একটা অভিনয় দেখেছিলাম, নাম প্রোপ্‌নোস্তা মেস্তোপ্লে। এরও মঞ্চসজ্জা ও আলোক-পরিকল্পনা মুগ্ধকর। নাটকও আধুনিক। কিন্তু ফরমুলাবাঁধা নয়, জোর ক'রে আশার বাণী শুনিয়ে দেওয়া নয়। নাট্যকার একজন বিখ্যাত কবি। নাটকটা যাকে ইংরেজিতে বলে—intriguing.

ভাবায়। এ নাটক হচ্ছে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থার সংগে যারা নিজেদের মেলাতে পারছে, এবং যারা পারছে না তাদের গল্প। অথচ প্রোপাগ্যাণ্ডার কোনও চিহ্ন নেই। মঞ্চের সামনেটা মাঠ, পিছনে একটা বিস্তীর্ণ জলা। সেটা যে কোথায় শেষ হয়ে আকাশ শুরু হয়েছে তা বোঝা যায় না। তেমনি আকাশের গায়ে মেঘ যেন আছে কি নেই। অপূর্ব wash drawing-এর মতো।

আর একটা থিয়েটার, নাম এ বি সি থিয়েটার। সেটা বেশ একটা মজার আঙ্গিক, খানিকটা গল্প, খানিকটা music hall-এর মতো, সব মিলিয়ে খুব সফল। এর যিনি সৃষ্টিকর্তা বেরিখ্ তাঁর নাম। তিনিই প্রধান ক্লাউন। অত্যন্ত তীক্ষ্মবুদ্ধি লোক। তেমনিই তীক্ষ্ম তাঁর মঞ্চের ওপরকার সংলাপ।

তাছাড়া, ব্রেখ্টের গ্যালিলিও দেখলাম। ওয়াল্টার তাউব সেজেছিলেন গ্যালিলিও। এঁর সংগে যথেষ্ট বন্ধুত্ব হয়েছিল। একদিন সন্ধ্যায় এম্ব্যাসিতে ককটেল পার্টি ছিল, আমরা দুজনে স'রে প'ড়ে বরফের মধ্যে দিয়ে হেঁটে একটা নির্জন সরাবখানায় বসে রাত বারোটা পর্যন্ত বকর্ বকর্ করলাম। ভারতীয় থিয়েটার কী সেই সম্পর্কে। চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষ, চিন্তার ক্ষেত্রে অনেক বেশী পরিণত। এঁদের সংগে কথা কয়ে অনেক বেশী আনন্দ পেয়েছি।

এইরকমই এক্সপেরিমেণ্টের সুযোগ আছে দেখলুম যুগোশ্লাভিয়ায়। সেখানে একটি বিশিষ্ট থিয়েটার আছে, নাম স্টুডিয়ো ২২০। সেখানে মাত্র দুশো কুড়ি জনেরই আসন। কিন্তু এর নাটক সব সময়েই এক্সপেরিমেণ্টাল নাটকের দিক থেকে। তাই স্টেজ অত্যন্ত ছোট। এঁরা সাধারণ থিয়েটারের যে কোনও অভিনেতা অভিনেত্রীকে প্রয়োজনমতো নিয়ে থাকেন আলাদা আলাদা নাটকের জন্যে। এবং অভিনয়ের মান সত্যিই উন্নত। আমি এখানে দেখলাম সার্ত্র-র Behind the closed door খুব ভালো অভিনয়। এইখানে যুগোশ্লাভিয়ার শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর অভিনয় দেখলাম একটি lesbian মহিলার ভূমিকায়। এর আগে তাঁকে দেখেছিলাম ভ্রুরোবাচ্কা ট্রিলোগিয়াতে। শক্তিময়ী অভিনেত্রী। এঁর কণ্ঠে ভাষাটা সংগীতময় লাগে। তাছাড়া, এঁকেই দেখলাম লাইনের মধ্যে modulation যা প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা অভিনেত্রী ছাড়া আর কেউ পারে না।

আর একটা জিনিস বোঝা গেল যে, থিয়েটারের মূল সমস্যা পৃথিবীর সকল দেশেই এক। প্রথম হল, সমাজ ও ব্যক্তিকে ব্যালান্স ক'রে প্রকাশ করা ও দ্বিতীয় হল রিয়্যালিটির গভীর অর্থকে বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে কাব্যের মধ্যে প্রকাশ করা। যেরকম চেষ্টা চলেছে তাতে ওরা সফলকাম হবে। আমরা হব কিনা সেটা আমাদের সততার উপর নির্ভর করছে।

এইবারে যাকে বলে legitimate থিয়েটার তার কথা ছেড়ে আর একটা অত্যদ্ভুত শিল্পের কথা বলি। সেটা হল রাশিয়ার পুতুল নাচ। এই দল সম্প্রতি কলকাতার এসেছে ব'লে একটু বলতে ইচ্ছা হল।

পুতুল নাচের দু' তিনরকম পদ্ধতি আছে। বাংলা দেশে যে পুতুল নাচ হয় তাতে পুতুলগুলো একটি লাঠির উপর থাকে। তবে আমাদেরগুলো অনেক মোটা দাগের। জাভার পুতুল নাচ নাকি খুব ভালো, সেখান থেকে ইভান ইয়েফিমভ ব'লে এক ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী নিনা এই রীতি ও কৌশল রাশিয়ায় আমদানী করেন। তাঁদেরই বলা যায় পায়োনীয়র।

জাভা থেকে আনা ব'লে অনেক জাভার নাম এখনো র'য়ে গেছে। যেমন মধ্যেকার লাঠিটার নাম গাপিতো। হাতের রড্ দুটোকে বলে চম্পারীথে।

যাই হক, ইয়েফিমভ-এর পর ওব্রাজ্তসভ। ইনি একজন জীনিয়াস। অদ্ভুত শোম্যান্-শিপের ক্ষমতা। তাঁকে বাদ দিয়ে কোনও কাজ হয় না। এমন হয়েছে যে, অন্যলোককে নতুন প্রোগ্রাম তৈরী করতে ব'লে তিনি হয়ত অন্যত্র চ'লে গেছেন, ব্যস্, এ নতুন প্রোডাক্শন যেন কীরকম জোলো হয়ে গেল। তারপর তিনি হয়ত সেইটা নিয়ে এক মাস খাটলেন (খুব যে কিছু একটা করলেন তা নয়, খানিকটা বাদ দিলেন, সামান্য কিছু ঢোকালেন, দু একটা পুরানো মুভমেণ্টকে নতুন ছাঁদে করালেন, ব্যস্) তাইতেই সমস্ত চেহারাটাই বদলে গেল।

তাঁর সংগে কাজ করবার জন্যে অনেকগুলি লেখক আছে। তিনি এক এক সময়ে একটা দৃশ্য বিশবার ক'রে লেখান যতক্ষণ না তাঁর পছন্দ হয়।

এই State Central Puppet Theatre শুরু হয় ১৯৩১ সালে। প্রথম প্রদর্শনী হয় '৩২ সালে। প্রথমে ছোটদের জন্যেই হত, পরে ১৯৪০ সাল থেকে বড়দের জন্যে প্রোগ্রাম শুরু হয়। এরই একটা আমরা দেখেছিলাম, An unusual concert. এটাও কলকাতায় দেখানো হয়েছে। এর তীক্ষ্ম সংলাপ চমকপ্রদ। কিন্তু তার চেয়েও চমকপ্রদ হচ্ছে পুতুলগুলোর ব্যবহার। অবিশ্বাস্য range তাদের, তাদের দিয়ে যা ইচ্ছে করানো হয়।

এমনিতে একটা পুতুল অনেক ভংগী করতে পারে না, তাই ছাঁচে ঢেলে একই পুতুলের অনেক ডাব্ল্ তৈরী করা হয়। এবং আলাদা আলাদা ভংগীর জন্যে আলাদা আলাদা পুতুল ব্যবহার করা হয়। এই থিয়েটারে একটা পুতুলের ১৩টা double করা হয়েছিল।

এটা একটা দেখবার মতো জিনিস।

এইবারে উপসংহার। যা দেখেছি, যা শুনেছি তাতে কেবলই মনে হয়েছে যে, আমাদের দেশ যদি নতুন থিয়েটারকে একটু সুযোগ দেয় তাহলে আমাদের ঐশ্বর্যও অঢেল।

শ্রীমতী অমৃত মাথুর তাঁর ৭৫টি চিত্ররচনার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন গত সপ্তাহে। প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয় আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। তেল রঙ জল রঙ এবং প্যাস্টেল এই তিনটি শিল্পীর চিত্ররচনার মাধ্যম। জল রঙ অপেক্ষা তেল রঙ এবং প্যাস্টেলেই শিল্পী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন মনে হয়। মুখ্যত ইনি প্রতিকৃতি শিল্পী এবং প্রতিকৃতিগুলি সবই হয় তেল না হয় প্যাস্টেলের রচনা। জল রঙে রচনা করেছেন পাহাড়ী দৃশ্য, নদী, সমুদ্র তীর, শহরের রাস্তা বাড়ি ঘর প্রভৃতি। বিষয়বস্তু জল রঙের উপযোগী নির্বাচিত হলেও রচনাগুলিকে রসোত্তীর্ণ বলে দাবী করা যায় না। এগুলি পেইন্টিং-এর প্রাথমিক ড্রইং হিসাবেই চলতে পারে। পেইন্টিং-এর গভীরত্ব এগুলিতে প্রকাশ পায়নি। প্রকৃতপক্ষে তেল রঙের যতটা শক্তি জল রঙেরও শক্তি ততটাই। কিন্তু এসত্য আমাদের দেশের বেশীর ভাগ শিল্পী উপলব্ধি করেন না। আগেকার দিনে চীনে এবং মিশরে রেখাচিত্রকে কিছুটা অতিরঞ্জন করার উদ্দেশ্যে হাল্কা জলের একরঙা ওয়াশ-এর প্রয়োগ করতেন শিল্পীরা। তারপর পাশ্চাত্যে জল রঙ ব্যবহৃত হয় কোনও দৃশ্যের কেবল প্রাথমিক ড্রইং করার উদ্দেশ্যে। স্টুডিওতে পরে ঐ প্রাথমিক ড্রইং-কে পেইন্টিং-এর রূপ দান করা হত তৈল মাধ্যমে। কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্যের শিল্পীরা জল রঙেই সরাসরি পেইন্টিং করে ফেলেন, কারণ এ কালের শিল্পীরা এ সত্য উপলব্ধি করেছেন যে জল রঙের শক্তি তেলে রঙ অপেক্ষা কোনও অংশে কম নয়, উপরন্তু এর কতকগুলি এমন গুণ আছে যার জন্যে দৃশ্যচিত্রগুলি অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তবে জল রঙ প্রকরণ আয়ত্তে আনা বেশ শক্ত। সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে আরও গাঢ় এবং রকমারী বর্ণে অনুশীলন করলে শ্রীমতী মাথুর যথার্থ রসোত্তীর্ণ জল রঙের রচনা করতে পারবেন বলেই আমার বিশ্বাস। রঙ দেখতে পাবার ক্ষমতা, রচনাবোধ, ড্রইং করার শক্তি প্রভৃতি গুণগুলি শিল্পীর আছে, এ'র তৈলমাধ্যমের দৃশ্যচিত্রগুলি থেকে তা বোঝা যায়। গাঢ় অথবা জোরালো জল রঙ ব্যবহার না করলে শুকিয়ে যাবার পর জল রঙ অত্যন্ত ফিকে হয়ে যায়, সেকথা যেন শিল্পী স্মরণ রাখেন। তুলির টানটোনের শেষে ঘনভাবে রঙ জমে যে ভাব সৃষ্টি হয়েছে এ'র কোন কোন রচনাতে তা আদৌ প্রীতিকর নয়।

প্যাস্টেলের রচনাগুলিও স্কেচ-এর পর্যায়ে উঠতে পারেনি। কাগজের সাদা অংশগুলিও যদি শিল্পী রঙ দিয়ে ঢেকে দিতেন তা হলেই এগুলি থেকে পেইন্টিং-এর মেজাজ প্রকাশ পেতো। তবে জলরঙের রচনা অপেক্ষা এ'র প্যাস্টেলের রচনা অনেক উপভোগ্য, বিশেষ করে 'স্টিল শিল্পী, 'সিরিয়াস স্টুডেন্ট', 'মাইসিস্টার' এবং'চার্মিং মডেল'-এ শিল্পী তাঁর রসিক মন এবং পাকা রচনা কৌশলের যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন। তৈল মাধ্যমের প্রতিকৃতিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'ব্ল্যাক ড্রেস', 'এক্সপ্রেসন' 'টীন এজ' এবং 'নুলিয়া'। এ'র প্রতিকৃতি করণ-কৌশল কতকটা সেজানের অনুরূপ। দু একটি তৈলচিত্রে ইনি পয়েন্টিলিজম প্রকরণও প্রয়োগ করেছেন।

শ্রীমতী মাথুর কলকাতার গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফ্ট থেকে পাশ করে বর্তমানে দিলীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত 'স্টুডিও'-তে যোগ দিয়েছেন। দিলীপবাবুর 'স্টুডিও'-র সভাসভ্যাদের অনেকেরই একক চিত্রকলা প্রদর্শনী দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছে। 'স্টুডিও'-র গ্রুপ প্রদর্শনীও আমরা দেখেছি কয়েকবার। এ শিল্পী গোষ্ঠী যে বেশ শক্তিশালী সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই। তবে লক্ষ্য করছি, বিশেষ করে মহিলা সভ্যাদের মধ্যে সকলেই যেন একই আদর্শ অনুসরণ করেন। ছবিতে নাম সই না থাকলে ধরা মুশকিল কোনটি কার রচনা। শিল্পী ব্যক্তিত্বের রসে পরিপূর্ণ হয়ে যদি তাঁর রচনা বিশিষ্ট রূপ না লাভ করে তা হলে তার সার্থকতা কোথায়!

কর্ণার
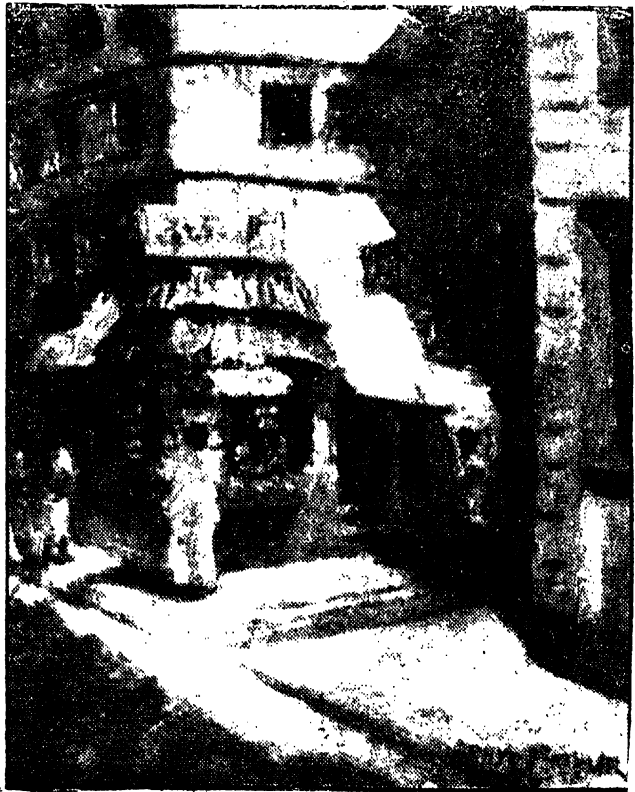
ইতিহাস

India's fight for freedom or the Swadeshi movement (1905-1906)—Prof Haridas Mukherjee & Prof Uma Mukherjee, Firma K. L. Mukhopadhyay, 6/1 A, Banchharam Akrur Lane, Calcutta-12. Price Rs. 7.50

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে

পুস্তক পরিচয়

(১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৫) চ্যান্সেলার লর্ড কার্জন প্রসঙ্গক্রমে ঘোষণা করলেন, "সত্যের চূড়ান্ত আদর্শ প্রধানত পাশ্চাত্য প্রতীতি এ কথা বলে, আমি আশা করি, মিথ্যা বা উদ্ধত দাবী করছি না। এর দ্বারা আমার দাবী এই নয় যে, য়ুরোপীয়রা সার্বজনীনভাবে বা সাধারণত সত্যবাদী এবং তার থেকে কম আমি মনে করি, এশিয়াবাসিগণ স্বেচ্ছায় বা স্বভাবক্রমে সত্য থেকে বিচ্যুত। একটি ধারণা অসম্ভব এবং অপরটি অপমানজনক। কিন্তু প্রাচ্যে সত্যের স্থান সম্মানিত হবার অনেক আগে থেকেই পাশ্চাত্য নীতিবোধে সত্য সর্বোচ্চ-সম্মানিত স্থানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, একথার মধ্যে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।"

সাম্রাজ্যগর্বী গভর্নর জেনারেলের উক্তি উপস্থিত ভারতীয়গণকে আহত ও অপমানিত করেছিল। উৎসবে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে বসেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, তিনি এই মিথ্যাবাদে মর্মাহত হলেন। অনুষ্ঠান শেষ হলে তিনি স্যার গুরুদাসের বাড়িতে গিয়ে লর্ড কার্জনের লিখিত 'প্রোবলেমস অব দি ফার ইস্ট' গ্রন্থটি সংগ্রহ করে অমৃতবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষের কাছে একটি তেজোদৃপ্ত প্রবন্ধের মালমশলা পৌঁছে দিলেন। পরদিন পত্রিকায় 'বিভিন্ন ক্ষমতায় লর্ড কার্জন' শীর্ষক স্মরণীয় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল। এই প্রবন্ধে লর্ড কার্জনের পূর্ব উক্তি ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করা হল, স্বয়ং কার্জন জঘন্য মিথ্যাবাদে দুষ্ট। শুধু পত্রিকা নয়, তৎকালীন প্রত্যেকটি ভারতীয় পত্রিকায় ('ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' সমেত) দিনের পর দিন কার্জনের উক্তি ও প্রস্তাবিত বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ ও চরম বিক্ষোভ প্রকাশিত হতে লাগলো। কিন্তু জনমতকে কিছুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত স্বেচ্ছাচারিতার মারাত্মক পরিকল্পনা ঘোষিত হল : বঙ্গভূমিকে দু'টুকরোয় বিচ্ছিন্ন করা হবে।

ইংরেজের এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ১৯০৫-৬ সালে বাঙলাদেশে যে অনির্বাণ দেশপ্রেমের বহ্নি জ্বলে উঠেছিল, তারই ক্রম-পরিণতিতে জন্ম হয়েছে ১৫ই আগস্ট। স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার এই অসমসাহসিক দেশপ্রেমের তুলনা নেই। বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসে এই যুগ একটি অবিস্মরণীয় সুবর্ণ যুগ হিসেবে চিহ্নিত। অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় এই যুগকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সর্ব-প্রথম সর্বাঙ্গীণভাবে তুলে ধরেছেন। তাই এই গ্রন্থটিকে অভিনন্দন জানাতে কোন বুদ্ধিজীবী পাঠক কার্পণ্য করবেন না। কিন্তু একটা কথা জানাই, তথ্যের সমাবেশ ও মনোরম রচনাশৈলীর সমন্বয় হলেও সেই যুগের মৌল পরিচয় সম্পর্কে গ্রন্থকারদ্বয়ের কোন মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর নেই গ্রন্থে। তবুও একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য হিসেবে গ্রন্থকারদ্বয়ের এই কষ্টসাধ্য ও প্রায়-সার্থক চেষ্টাকে বিশেষ প্রশংসা করি। ৫০৭।৫৮

উপন্যাস

আমার ফাঁসি হল—মনোজ বসু। ত্রিবেণী প্রকাশন, ২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ৩·৫০ নঃ পঃ।

এই উপন্যাসের নায়কের শেষ পর্যন্ত ফাঁসি হল। ফাঁসির আসামী নিজের জীবন কাহিনী বলে চলেছে, ফাঁসির আগের তো বটেই, ফাঁসির পরেরও। কাহিনী বিন্যাসে একটু কৌশল প্রয়োগ করেছেন লেখক। ছোট গল্পের মত বৃত্তাকারে কাহিনীকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। গল্পটা যদিও সাদা মাটা, একটি নিটোল প্রেমের গল্প। তার মধ্যে খুব কিছু অন্তর্দ্বন্দ্বের অবকাশ নেই, নেই উপকাহিনীর বুনন। জটিল চরিত্রও নেই আশে পাশে। যাঁরা রয়েছেন তাঁদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গল্প নেই আলোচ্য উপন্যাসের গল্পকে তরঙ্গিত করবার জন্যে। কিন্তু সব মিলে অনেকগুলি কৌতূহলপ্রদ চরিত্রের একটি রহস্যব্যূহ তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে তরুণ নায়কের স্বপ্নভরা জীবন ধীরে ধীরে একটি অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে। সর্পে রজ্জু ভ্রম হয়েছিল প্রথমটা, পরে ফনা দেখা দিল। অনেক রঙে রসে যে ফাগুনী রচনা করেছিল মনে মনে, তাসের ঘরের মতই একদিন ভেঙে পড়লো চোখের সামনে। নায়কের জীবনে প্রেমের ছদ্মবেশে সেই প্রথম ফাঁসি, সেই প্রথম মৃত্যু হল। তারপর থেকে জীবনের মানে গেল বদলে, এক জীবন পার হয়ে অন্য জীবনের ইশারা এসে পৌঁছালো। মনোজবাবুর অতি-প্রাকৃতের প্রতি আকর্ষণ প্রথম যুগের লেখার মধ্যেও দেখেছি আমরা, এখানেও দেখলাম। কিন্তু কত অনায়াসে অতি-

প্রকৃতিকে নিয়ে খেলা ক'রেছেন তিনি আলোচ্য গ্রন্থে, স্বপ্নে জাগরণে অতি সুকৌশলে মিলিয়ে দিয়েছেন, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। ঈষৎ তরল ভঙ্গিমায় লেখা হলেও ভাষার মধ্যেও লেখকের মুন্সিয়ানা স্পষ্ট। চিত্রকরের মতই তিনি স্বল্প রেখায়, নিপুণ রঙে ঘটনাবহুতা বজায় রেখেছেন, চরিত্রকে চলন্ত করে তুলেছেন। দয়ালহরি, হরিশ প্রভৃতি পার্শ্ব চরিত্রগুলিও মনে রেখাপাত করে।

গ্রন্থের মুদ্রন পারিপাট্য এবং প্রচ্ছদ প্রশংসনীয়। ১৮।৫৯

মৌন নূপুর—সুশীল ঘোষ। প্রকাশক—মিত্রালয়, ১২, বঙ্কিম চাটুজ্জ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—৪।।০।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে উপন্যাসের স্থানই সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত। এইজন্যেই উপন্যাস রচনায় লেখকরা যে নিত্য নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন, তা পাঠক সম্প্রদায় খুব স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করতে পারছেন। সকল লেখকই সে সার্থকতার স্তরে উত্তীর্ণ হতে পারছেন, এ কথা হয়তো জোর করে বলা যায় না, তথাপি এই পরীক্ষা যে সাহিত্যকে একটি প্রাণবন্ত অগ্রগমনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে, তাতে আর সন্দেহ কি!

মৌন নূপুর তেমনি একটি পরীক্ষার স্তর বিশেষ। এ ধরনের রচনার দোষগুণ উভয়ই এ উপন্যাসে উপস্থিত। প্রথমত, লেখন-ভঙ্গির প্রশংসা না করে উপায় নেই। এমন ক্ষুরধার গতি সাম্প্রতিককালের কথা-সাহিত্যে বড় একটা চোখে পড়ে না। লেখক যে আবেগে ভেসে যান না, বুদ্ধিকেও তার উপযুক্ত স্থান দিয়ে রচনাকে দীপ্ত করে তুলতে চান, তা বইটির যে কোন অংশ পড়লেই পাঠকের চোখে ধরা পড়বে। দ্বিতীয়ত, নায়ক নায়িকা নির্বাচনেও লেখক নতুনত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অন্তত বাংলা উপন্যাসের প্রচলিত চরিত্র প্রবাহ মৌন নূপুরে এসে ভিড় জমাতে পারেনি। বরং বলা উচিত, লেখক সচেতনভাবেই সেই প্রচলিত ধারাকে পরিহার করেছেন।

কিন্তু ভাষা ভঙ্গি ও চরিত্র সৃষ্টিতে নতুনত্ব আনার সচেতন চেষ্টার জন্যই বোধ হয় কাহিনী ভালোমতো দানা বাঁধার সুযোগ পায়নি। এবং লেখন চাতুর্যে কখনও কখনও কাহিনীর গতির প্রতি লক্ষ্য না রেখে অনাবশ্যক-ভাবে এগিয়ে চলেছে। এদিকে দৃষ্টি রাখলে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করতে পারতো। ৪০৭।৫৮

চায়না টাউন—বারীন্দ্রনাথ দাশ, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। চার টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

দুশো বছরের বয়স শহর কলকাতার, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নগরগুলির তুলনায় প্রায় নবীন। তথাপি কলকাতার ইতিহাস বিচিত্র, বিচিত্র তার রকমারি অধিবাসীদের বিস্তার কাহিনী। কলকাতার বুকে চীনাবাসীদের পাড়ার নাম চায়না টাউন, কিছু মুসলমান আর কিছু অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের মাঝখানে চীন দেশীয় আচার আচরণ, ভাষা আর মানুষের চেহারার মিছিল। তারা কলকাতায় থেকেও বাংলার মাটির কেউ নয়, যেমন নয় অ্যাংলো ইন্ডিয়ানরা।

বারীন্দ্রনাথ দাশ কলকাতার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সমাজ নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছেন 'বেগমবাহার লেন'। চীনাপাড়ার মানুষদের নিয়ে সম্প্রতি তাঁর 'চায়না টাউন' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি টুকরো গল্পকে একটি ভালোবাসার কাহিনীর সুতো দিয়ে গেঁথেছিলেন পূর্ববর্তী উপন্যাসে। আলোচ্য উপন্যাসে একটি কাহিনীর মালায় টুকরো টুকরো নানা বিচ্ছিন্ন ইতিহাস আর উপকথা আর গল্প ছিটিয়ে দিয়েছেন। সিঙ্গাপুর, শাংহাই, নিউইয়র্ক, মূলে চীন ভূমি, মালয়, ভারত মহাসাগর নানা দেশে নানা যুগে ঘুরে বেড়িয়েছেন লেখক, কিন্তু তথাপি সাহিত্যিকের সত্য দৃষ্টি দিয়ে তিনি দেখতে পারেননি কোন মানুষকে। উপন্যাসের নায়ক দিলীপ অসাধারণ ছাত্র, প্রেম করেছে পৃথিবীর সব জাতের মেয়ের সঙ্গে, তার বাবা বাঙালী আর মা ইংরেজ। নায়িকা জেনী ওয়াং একটিন কাজ করেছিল এক চীনা লন্ড্রীতে। দুদিন ব্যবসায় সূত্রে আলাপ থেকে প্রণয় আর সেই প্রণয়ের কাহিনী বলতে লেখক বিশ্বজোড়া প্রণয় জুড়ে দিয়েছেন। সব অদ্ভুত কাহিনীর আলো ফেলে ফেলে পাতার পর পাতা এগিয়েছেন; কিন্তু মানুষের জীবনে আলো ফেলতে পারেননি। না চীনাপাড়ার ছেলে-মেয়েদের উপর, না বাঙালীর।

জীবনকে উপর থেকে দেখার আর অগভীর-ভাবে জানার একটি সাহিত্যচেষ্টা এই উপন্যাস। অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জীবন নিয়ে লেখকের পূর্ব রচনায় যে মুন্সিয়ানার পরিচয় ছিল, এ বইয়ে তা অনুপস্থিত। বিষয়-বৈচিত্র্যের দাম নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু উপলব্ধির গভীরতা উপন্যাস রচনার প্রাথমিক ভিত্তি হওয়া উচিত। ৫৮০।৫৮

একটি বহ্নি শিখা। তারক হালদার। শ্রীদুর্গা লাইব্রেরী, ১৮এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২। দাম—তিন টাকা।

খ্যাতনামা লোকের প্রশংসাপত্র ললাটে নিয়ে যেসব উপন্যাস বাজারে আসে, তাদের সম্পর্কে অভিযোগ এই যে, এগুলি অনেকক্ষেত্রে সমালোচককে তাঁর নিরাসক্ত হয়ে বিচার করার অধিকার থেকে অনেকখানি বঞ্চিত করতে চায়। এই উপন্যাসের সামনে-পিছনে এইরকম নানা-জনের প্রশংসাপত্র জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সাহিত্য-রসিক থেকে মাননীয় মন্ত্রী—সকলের কাছ থেকেই দু'একছত্র পাওয়া গেছে। যাই

হোক, লেখক অনেকটা নতুনত্ব আনতে চেয়েছেন। ঘটনা সংস্থান বাংলাদেশে, আসামে আর আফ্রিকার মরুপ্রান্তরে। নায়ক সাম্পিক বেদুইন-কন্যার প্রেমে পড়ল। মিশরের পিরামিড, নীল নদ তার পটভূমি। জানি না, লেখকের এইসব দেশের সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কতটুকু। শুনেছি শখ করে অস্কার ওয়াইল্ড নানা নাম-ধাম বই পড়ে মুখস্থ করতেন। আক্ষেপ শুধু ওয়াইল্ডের মতো প্রতিভা যদি হালদার মশাইয়ের থাকত! একে নির্জলা রোমান্স, তার ওপর প্লটটাও বড় বাসি। বেদুইন কন্যা নওয়ারা আত্মদান করলে সাম্পিককে অনীতার হাতে তুলে দিয়ে। প্রেমের মধ্যে যেই সমস্যা দেখা দিল অনীতার পুনর্জন্মের পর, আমি লেখক নওয়ারার বুকে মহত্ত্ব জাগিয়ে পাশ কাটিয়ে গেলেন।

লেখকের আবেগ,—অথবা উচ্ছ্বাস—প্রচুর। ভবিষ্যতে হয়তো তাঁর কলম দিয়ে উৎকৃষ্ট কিছু বেরুবে, তবে আবেগের এইরকম তোড় থাকতে নৈব নৈব চ। (৫৬১।৫৮)

নীলকণ্ঠ—মুকুল পাল চৌধুরী। বাগ্‌ধারা, ৯১ চৌরঙ্গী, কলি-২০। দাম—২॥৹।

লেখকের উপন্যাসটি পড়ে একটি প্রশ্ন মনে আসে। 'নীলকণ্ঠ' কে? ঘোরতর বৈজ্ঞানিক উপন্যাসের নায়ক শংকর, অথবা প্রকাশক স্বয়ং। এত কম পুঁজিপাটা নিয়ে যে কেউ সাহিত্যের আসরে নামতে পারে, এই বইটির মতো বই না পড়লে বিশ্বাস করা দুষ্কর। গল্প মাথামুণ্ডু যাই হোক, মুদ্রাস্বিয়ানা আছে ষোল আনা আদ্যোপান্ত। অবশ্য আর একটিমাত্র সামান্য ত্রুটি আছে। লেখক বাংলা ভাষাটি আদৌ আয়ত্ত করতে পারেননি। ছাপার হরফে এমন পরিচয় খুব কম ঘটে। 'হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন!' (৫৬৯।৫৮)

বিবিধ

তাঁত ও রং—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ বসু প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান রাউৎভোগ, ঢাকা। সাড়ে আট টাকা।

বৃহৎশিল্পের সঙ্গে কুটীরশিল্প একযোগে যাতে দ্রুত অগ্রসর হয়, তারজন্য ভারত সরকার সচেষ্ট। বিশেষ করে গ্রাম-বাংলার কুটীরশিল্পের মধ্যে বয়নশিল্প অন্যতম, সে-শিল্পের প্রসারের জন্য প্রচেষ্টার অন্ত নেই। আলোচ্য গ্রন্থটি এই শিল্পকর্মে নিযুক্ত নরনারীর অশেষবিধ প্রয়োজনে লাগবে। তাঁতের কাপড় বুননপদ্ধতি ও তার নক্সার বিজ্ঞানসম্মত পরিচয় এ-গ্রন্থে আছে, আর আছে সুতো বা কাপড় রং করার মূল্যবান নির্দেশ। হাতের কাছে উপযুক্ত শিক্ষক যদি নাও থাকে, এই বই তার অভাব দূর করতে পারবে। সুতরাং তাঁতের কাজে নতুন শিক্ষার্থীদের কাছে এই বই অপরিহার্য। ৩২।৫৭

নাটক

বিনোদিনী ফিল্ম কোম্পানী—মণীন্দ্রনাথ ঘোষাল। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি ব্যঙ্গ নাটিকা। সিনেমা জগৎ-এর একটা দিককে কেন্দ্র করে এই ব্যঙ্গ রূপায়িত হয়েছে। লেখক বইখানির আগাগোড়া প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়েছেন সত্য, কিন্তু তা একেবারেই superficial, মনের গভীরে তা স্পর্শ করে না। নাটকে বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের পরিস্থিতিও লেখক সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাতে চরিত্রগুলোর যে স্বাভাবিক বিকাশ ঘটেছে, তা বলা যায় না। সব মিলিয়ে বইটি তাই সার্থক সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠতে পারেনি। অবশ্য একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য লেখকের ভাষার ওপর দখল রয়েছে, আঙ্গিকের কৌশলও তাঁর জানা, সংলাপ রচনাতেও তিনি পটু। বৃহত্তর জীবনবোধ তাঁর ভবিষ্যৎ রচনাকে সমৃদ্ধ করবে এই আশা রাখি। ৪৬১।৫৮

সুপ্রভাত—যোগজীবন মুখোপাধ্যায়। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা—৯।

কেরানীকুলের সমস্যাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে আলোচ্য নাটকখানি। তাদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই নাটকটিতে। কিন্তু তা করতে গিয়ে কোথাও অহেতুক করুণ রসে বইখানিকে ভারাক্রান্ত করে তোলা হয়নি, এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। শেষ দৃশ্যে যে আঙ্গিকের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে, নাটকখানি মঞ্চস্থ হলে তা দর্শকদের মনকে মঞ্চের সাথে ঘনিষ্ঠ সূত্রে বেঁধে দিতে সহায়ক হবে আর তাতেই নাটকের সার্থকতা। ৬১।৫৭

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে :—

The Law of Confession—Dr. Matilal Das.
The welfare Economics of India—Rabin Banerjee.
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে—গোপালদাস মজুমদার।
ললিততীর্থে—অসিতকুমার হালদার।
স্কুলের মাশুল—শ্রীমহেন্দ্র ঘোষ।
কালিদাসের শকুন্তলা—শতুজিৎ দাশগুপ্ত।
কাঠের ঘোড়া—কুমারেশ ঘোষ।
রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী—বিভাস রায়চৌধুরী।
যুদ্ধের ইয়োরোপ—বিক্রমাদিত্য।
[illegible]
Soviet science and the National Economy of the U S S R—Oleg Pisarz Levsky Soviet Army.

অভিনন্দনযোগ্য সরকারী নীতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগের অধিকর্তা পি এস মাথুর সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রামাণ্য চিত্র প্রযোজনা সম্পর্কে এক নতুন সরকারী নীতির কথা ঘোষণা করেন। প্রত্যেক প্রেক্ষাগৃহে প্রতি সপ্তাহে ফিল্মস ডিভিসনের যে ২০০০ ফুট তথ্যচিত্র দেখাবার নিয়ম আছে, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই প্রদর্শনীর আধাআধি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত ১০০০ ফুটের প্রামাণ্য চিত্র বাঙলাদেশের প্রতি সিনেমায় দেখান হচ্ছে। এই ব্যবস্থার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বছরে অন্তত ৫২টি প্রামাণ্য ছবি তৈরী করতে হবে।

শ্রীমাথুর জানান রাজ্য সরকার এই ৫২টি ছবির মধ্যে ৩২টি ছবির প্রযোজনার কাজ বাইরের প্রযোজকদের উপর ন্যস্ত করতে রাজী আছেন। বাইরের প্রযোজকেরা এই নতুন সরকারী নীতির সুযোগে যে সব ছবি করবেন, সেগুলির প্রদর্শন সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষ। প্রযোজনার ব্যয় ও লভ্যাংশ প্রযোজকদের। কিন্তু কাঁচা ফিল্ম সংগ্রহের সুযোগ তাঁরা রাজ্য সরকারের কাছ থেকেই পাবেন।

রাজ্য সরকারের এই নতুন নীতিকে উপস্থিত সাংবাদিকবর্গ অভিনন্দন জানান। প্রামাণ্য চিত্র প্রযোজনায় উৎসাহী প্রযোজকেরা এই নতুন ব্যবস্থায় নতুন প্রচেষ্টার সুযোগ পাবেন।

সাংবাদিক বৈঠকের পূর্বে নিউ এম্পায়ারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকখানি সাম্প্রতিক প্রামাণ্য চিত্র দেখান হয়। তার মধ্যে "সূর্য যখন পাটে নামে" (গ্রাম্য সন্ধ্যার মনোময় রূপ), "মন যাহা চায়" (নতুন শহর কল্যাণী সম্বন্ধে তথ্যমূলক চিত্র), "যখন যেমন" (খাদ্য সমস্যাবিষয়ক), "সার-মর্ম" (জমির সার সংক্রান্ত) এবং "সমস্যা ও সমাধান" (হরিণঘাটা দুধ সরবরাহের সুফল) উল্লেখযোগ্য। ছবি ক'টি তথ্যের দিক ছাড়াও শিল্পরুচিসম্মত পরিচালনার গুণে উপভোগ্য হয়েছে।

"পুতুল শিল্পীদের" আশ্চর্য অনুষ্ঠান

মস্কো স্টেট পাপেট থিয়েটারের চারদিনব্যাপী প্রদর্শনী গত সপ্তাহের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মহাজাতি সদনে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। রাশিয়ার এই শিল্পিদল প্রধানত দুটি 'পালা' দর্শকদের সম্মুখে উপস্থিত করেন: 'অপরূপ ঐকতান' এবং 'আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ'। প্রথমটি মুখ্যত বড়দের জন্য, দ্বিতীয়টি ছোটদের আনন্দ দেবার

চন্দ্রশেখর

প্রেস পিকচার্সের "শশীবাবুর সংসারে"র একটি দৃশ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী।

উদ্দেশ্যে। এ-ছাড়া একটি বিশেষ অনুষ্ঠানও তাঁরা টীকাসহ পরিবেশন করেন।

'অপরূপ ঐকতান' এক কথায় একটি ব্যঙ্গরসাত্মক পালা। শিল্পের ক্ষেত্রে যে রসবিকার এবং অনাচার আজ একটি অনিবার্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, 'সজীব' পুতুলদের দিয়ে তাকে উপহসিত করবার আয়োজন এই পালায়। যে-সব পুতুল 'চরিত্র' এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়, তাদের নৃত্যগীত বিদ্যা যতটুকু আছে বুঝি ততটুকু শিল্পবোধ নেই। রসসৃষ্টির ভঙ্গি দিয়ে এ-অভাব পূরণ করতে গিয়ে তারা সমস্ত ব্যাপারটি বিরস, হাস্যকর করে তোলে।

'আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ' আরব্য উপন্যাসের সেই বহুপরিচিত কাহিনীটি নিয়ে। রূপকথার আশ্চর্য গল্পটি 'পুতুল শিল্পীরা' আশ্চর্যভাবেই পরিবেশন করেছে।

সেরগেই ওবরাজৎসেফের পরিচালনায় নেপথ্য-শিল্পীরা পালা দুটি পুতুলদের দিয়ে যেভাবে পরিবেশন করিয়েছেন, তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। অপূর্ব প্রয়োগ-কুশলতার গুণে পুতুলরা মানুষেরই মতো মঞ্চে সহজভাবে হাঁটা-চলা করেছে, কথা বলেছে, গান গেয়েছে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে এবং বুঝি মানুষের পক্ষে সম্ভব কোন কিছুই তারা করতে বাকী রাখেনি। তাদের অনুষ্ঠানে ছোটদের সঙ্গে বড়রাও পুলকিত হয়েছেন।

যুদ্ধোত্তর যুগে সোভিয়েট রাশিয়ায় পুতুল-নাচের জনপ্রিয়তা যেমন বেড়েছে, তেমনই কলাকৌশলের উন্নত 'প্রয়োগ-নৈপুণ্যে এ-শিল্পের মাধ্যমে রসসৃষ্টির ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়েছে ক্রমশ। এই লোক-শিল্পের মাধ্যমে আজ রাশিয়ায় শুধু আনন্দ বিতরণই করা যায় না, সেই সঙ্গে ভাব এবং চিন্তাও দর্শকের মনে সঞ্চারিত করে দেওয়া যায়। এ-সত্যের প্রমাণ মস্কো স্টেট পাপেট থিয়েটারের এই দল আমাদের দিয়েছেন।

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে তিনখানি নতুন ছবি মুক্তি পেয়েছে—একখানি বাঙলা ও দুখানি হিন্দী।

বাঙলা ছবিটির নাম "চাওয়া পাওয়া"। টাইম ফিল্মসের প্রযোজনায় এবং যান্ত্রিক নামধারী একদল তরুণ কলাকুশলীর মিলিত পরিচালনায় ছবিটি তোলা হয়েছে। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন। অন্যান্য অংশে আছেন—ছবি বিশ্বাস, জীবেন বসু, ভারতী দেবী, অমর মল্লিক, তুলসী চক্রবর্তী, রাজলক্ষ্মী, অনিল চট্টোপাধ্যায়, শুভেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এর কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। সুর-যোজনা করেছেন নচিকেতা ঘোষ।

হরিশচন্দ্র-শৈব্যার আত্মত্যাগের অনুপম কাহিনী নতুনভাবে রূপায়িত হয়েছে প্রভা পিকচার্সের হিন্দী পৌরাণিক চিত্র "হরিশ-চন্দ্র"। সুলোচনা ও সাহু মোদককে পুরোভাগে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। কানাইয়ালাল, নিরঞ্জন শর্মা, চেতনকুমার প্রভৃতি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন। ধীরুভাই দেশাই ও সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

নিওলাইট ফিল্মসের হিন্দী চিত্রার্ঘ্য "সন অফ সিন্দবাদ" আরব্যোপন্যাস-খ্যাত সিন্দবাদ কাহিনীর অনুসরণে গঠিত। অভিনয়াংশে আছেন—প্রেমনাথ, শকীলা, পূর্ণিমা, নির্শি, শাম্মী, সুন্দর ও ভগবান। নানাভাই ভাট ছবিটি পরিচালনা করেছেন। সুর-যোজনা করেছেন চিত্রগুপ্ত।

* * *

সত্যজিৎ রায় এবার হিন্দীতে "মহাভারত" তুলবেন। খবরটি যেমন অভিনব তেমনি চমকপ্রদ। মহাকাব্যের কোন অংশ ছবিটিতে রূপ পাবে, কে কে অভিনয় করবেন, কোথায় তোলা হবে এবং কবে—এসব সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় নি। তবে ছবিটি আরম্ভ করতে দেরী হবে। কারণ "অপুর সংসার" শেষ করেই সত্যজিৎ রায় রবীন্দ্রনাথের ওপর ভারত গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবিত জীবনী-চিত্র নির্মাণে ব্রতী হবেন।

সত্যজিৎ রায়ের তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যে আর একখানি বাঙলা ছবি তোলা হবে। ছবির নাম "রুপোলী চাঁদ"—ধনঞ্জয় বৈরাগীর লেখা নাটকের চিত্ররূপ। গত শনিবার থিয়েটার সেণ্টার অডিটোরিয়ামে একটি প্রীতি অনুষ্ঠানের মধ্যে ছবিটির মহরৎ সুসম্পন্ন হয়। সত্যজিৎবাবু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, মুখোশ সম্প্রদায় কর্তৃক এই নাটকের অভিনয় দেখে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ হন এবং নাটকটি চিত্রান্তরিত হবে শুনে তিনি চিত্রনাট্য রচনা ও অন্যান্য ব্যাপারে এঁদের সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিমল মল্লিক প্রোডাকসনের পতাকাতলে ছবিটি যুগ্মভাবে পরিচালনা করবেন তরুণ রায় ও শৈলেন দত্ত। এর প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করবেন নবাগত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ("অপুর সংসার"-এর অপু) এবং সুবিখ্যাত কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রিল মাস থেকে ছবিটির নিয়মিত সুটিং আরম্ভ হবার কথা।

* * *

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র তাঁদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান চলচ্চিত্র প্রয়াস সংস্থার প্রথম নিবেদন "শুভ বিবাহ"-এর চিত্রগ্রহণ ইতোমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন। স্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ সোসাইটির স্টুডিওতে ছবিখানির প্রথম সেটের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, তৃপ্তি মিত্র, ছায়া দেবী, অমর গাংগুলী, শম্ভু মিত্র প্রভৃতিকে নিয়ে ছবিটির ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। চিত্রগ্রহণ করছেন দেওজীভাই, শব্দ ধারণের ভার নিয়েছেন শ্যামসুন্দর ঘোষ ও সুশীল সরকার।

আরো যে সব নতুন ছবির কাজ চলছে, তার মধ্যে সপ্তরথী পরিচালিত "তৃষ্ণা জলো চোখে" অন্যতম। পূর্ববর্তী একটি সংখ্যায় খবর বেরিয়েছিল কমলা মুখোপাধ্যায় এ ছবির নায়িকা। সপ্তরথীর প্রচারসচিব জানাচ্ছেন, উক্ত অভিনেত্রী এর নায়িকা নন, কারণ এতে সব চরিত্রই প্রধান। আরো একটি খবর তিনি দিয়েছেন—অসিতবরণ ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ ছবিতে নির্বাচন করা হয়নি।

ফ্যাকচুয়্যাল ফিল্মস্ এণ্টারপ্রাইজ নামে আরো একটি নতুন প্রতিষ্ঠানের পত্তন হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর "তিথিডোর" অবলম্বনে এর প্রথম ছবি তোলা হবে। নিখিলেশ লাহিড়ী চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

পারিবারিক মেলোড্রামা

হিন্দী ছবিতে কাহিনীর তুলনায় প্রমোদের উপকরণ মাত্রা ছাড়িয়ে যায়—এইটেই সাধারণ নিয়মে দাঁড়িয়েছে। দেখে সুখী হওয়া গেল, এ-ভি-এম-এ'র অধুনাতম হিন্দী ছবি "বাপ বেটে"র মধ্যে নাচ-গান-হাসি-তামাশার ছড়াছড়ি থাকলেও তারই প্রবাহে একটি রসপুষ্ট পারিবারিক কাহিনী তলিয়ে যায়নি।

নবোদয় ফিলমসের মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবি "বিভ্রান্ত"-এর একটি দৃশ্যে কমল মিত্র, কানু বন্দোপাধ্যায়, আশীষকুমার, পাহাড়ী সান্যাল ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

দুটি পরিবারকে কেন্দ্র করে ছবিটির আখ্যানভাগ রূপ পেয়েছে। ধরমদাস, তার চার ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে একটি পরিবার। অপর পরিবারে আছে রায় বাহাদুর আত্মারাম ও তার একমাত্র মেয়ে কমলা।

ধরমদাসের চার ছেলের প্রকৃতি চাররকমের। বড় ছেলে মোহন পুলিস ইন্সপেক্টর। কর্মজীবনের কর্তব্যই তার কাছে বড়, হৃদয়াবেগকে সে প্রশ্রয় দেয় না। দ্বিতীয় ছেলে উকিল, তার নাম মদন। সব সমস্যার সমাধান সে করতে চায় আইনের সাহায্যে। সেজ ছেলে রাজন আত্মারামের মিলের ফোর-ম্যান এবং শ্রমিক সংঘের একজন নেতা। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় সে নিবেদিতপ্রাণ। ছোট ছেলে সুমন তরল-প্রকৃতির তরুণ। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে রসায়ন শাস্ত্রে তার যতটুকু ব্যুৎপত্তি হয়েছে, তাই সম্বল করে সে সোনা-তৈরির পরীক্ষায় নিযুক্ত। বাকী সময়টা তার কাটে ভালবাসার পাত্রীকে প্রেম নিবেদন করে।

ধরমদাস নিজে রায় বাহাদুর আত্মারামের একান্ত অনুগত মুনিমজী। আত্মারামের মেয়ে কমলা সর্বদিক দিয়েই ধনীর দুলালী—যা ধরে তা না করে ছাড়ে না।

ছবির গোড়া থেকেই পুলিস ইন্সপেক্টর মোহনকে নিয়ে কমলার অত্যুগ্র কৌতূহলের কথা দর্শকেরা জানতে পারেন। কি করে উভয়ের পরিচয় ঘটে এবং কমলা মোহনের প্রণয়াভিলাষিণী হয় তা ছবির একটি সরস উপাদান। ছবির অন্য রোমান্টিক উপাদান ধরমদাসের কনিষ্ঠ পুত্র সুমনের সংগে শীলার প্রণয়।

কিন্তু কাহিনীর নাট্যসংঘর্ষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে যখন ধরমদাসের তৃতীয় পুত্র রাজন মিলের শ্রমিক ধর্মঘটে তারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশে পুলিসের লাঠিচার্জে আহত হয়ে গ্রেপ্তার হয়। পুলিসের হেফাজত থেকে পালিয়ে সে বাড়িতে মোহনের চোখে ধুলো দিয়ে মায়ের স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় নেয়। পরে যখন সেই স্নেহের আশ্রয় থেকে মোহনই আবার তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায় তখন ধরমদাসের পরিবারে ভাঙন ধরতে শুরু করে।

পুলিসের হেফাজত থেকে পালাবার জন্যে তার দুমাসের জেল হয়। কিন্তু তাদের পরিবারের ভাঙন চরমে ওঠে যখন মোহন তার বাবাকে সোনার চোরাই কারবারে সংশ্লিষ্ট দেখতে পায়, এবং বাড়িতে চোরাই সোনা আবিষ্কার করে। ধরমদাস ও আত্মারাম এক সংগে সোনার চোরাই কারবারে লিপ্ত। শেষ পর্যন্ত আত্মারামের কুচক্রে ধরমদাসের পুলিসের হাতে ধরা পড়বার উপক্রম হয়। কর্তব্যনিষ্ঠ মোহনের জীবনে আসে কঠোর দ্বন্দ্ব। পিতার সম্মান বাঁচাতে সে নিজেই সব অপরাধ মাথায় তুলে নেয়।

মোহন অপরাধী একথা বিশ্বাস করে না কমলা। সে নিজের চোখে দেখেছে তার বাবাকে চোরাই সোনা ভর্তি স্যুটকেস ধরমদাসের হাতে তুলে দিতে। সে তার বাবাকে বলে, মোহনের প্রতি এই অন্যায় অবিচার সে সহ্য করবে না।

মোহনকে কমলা তখনও নিজের ক'রে পায়নি। কমলা ও মোহনের বিয়ের প্রস্তাব আত্মারামের মুখের ওপর মোহন প্রত্যাখ্যান করেছে আগেই। কিন্তু কমলা মোহনের প্রতি তার প্রণয়ের তাগিদে আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দিল বাবার বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত আত্মারাম বিবেকের অনুশাসনকে উপেক্ষা করতে পারে

না। আদালতে এসে স্বীকার করে নিজের অপরাধ। বিবেকের দংশন আদালতে টেনে নিয়ে আসে মোহনের পিতা ধরমদাসকেও। নিজের দোষ স্বীকার করে পুত্রের কলঙ্ক মোচন করে। দুই পিতা ও তাদের সন্ততি-দের জীবনের নাট্যদ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি ঘটে; আর কমলা ও মোহনের জীবন মিলনের আনন্দে মধুর হয়ে ওঠে।

পারিবারিক এই 'মেলোড্রামা'র নাট্য-পরিণতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কণ্টকল্পিত ঘটনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে কোন-কোন জায়গায়। কিন্তু অল্পস্বল্প বৈসাদৃশ্যের মধ্যেও ছবিখানি যে দর্শকদের মনোযোগ ধরে রাখতে সক্ষম হয় তার কারণ এর গতিশীল চিত্রনাট্য। ছবিটি গোড়া থেকেই বেশ একটা জমাটি ভাব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং ধরমদাসের পরিবারকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি রসাল দৃশ্যের স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ দর্শকেরা সহজেই পান। কিন্তু কাহিনীর শেষের দিকে ধরমদাসকে চোরাই কারবারে জড়িয়ে নিয়ে একান্ত স্বার্থান্বেষী ও লোভী করে তোলার ব্যাপারটি দর্শকমনে অস্বস্তির সৃষ্টি করে। গল্পের রোমাণ্টিক উপাদানগুলিও ফরমাশী হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি দুটি পরিবারের ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও রাস্তায় অস্বাভাবিক অবস্থার ভেতর দিয়ে কমলা ও মোহনের পরিচয়টাও যেন কেমন একটু অবাস্তব মনে হয়। আমোদ উপ-করণের দিকে জগদীপকে দিয়ে ছবিতে উপভোগ্য কৌতুকরসের অবতারণা করা হয়েছে। এ-বাদেও নাচ-গানের সম্ভার রয়েছে ছবিতে প্রচুর। সব কিছু মিলে ছবিটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এর জন্য পরিচালক রাজা পরাঞ্জপে সহজেই প্রশংসা-ভাজন হবেন।

মোহনের ভূমিকায় অশোককুমারের অভিনয় মর্মস্পর্শী। সংযমের সঙ্গে এই প্রখ্যাত অভিনেতা চরিত্রটির অন্তর্দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কমলারেশী শ্যামা ধনীর আদুরে মেয়ের রূপ এবং প্রণয়িনীর আশা-অভীপ্সা চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন তাঁর অভিনয়ে। দুয়েকটি নৃত্যাংশে তাঁর কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। আত্মারাম ও ধরমদাসের ভূমিকায় যথাক্রমে বাবুরাও পেণ্ডারকার ও কানাইয়ালাল চরিত্রানুগ অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন। স্নেহশীলা জননীর চরিত্রটিকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ললিতা পাওয়ার। রাজনবেশী বিনোদ শর্মা মনোজ্ঞ অভিনয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। কৌতুকাভিনেতা হিসাবে জগদীপ উল্লেখযোগ্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। এ-বাদে আর যাঁরা বিশেষভাবে নজরে পড়েন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন চিত্রা, রমেশ দেউ, কৃষ্ণকান্ত ও নানা পলসিকর।

সংগীত পরিচালনায় মদনমোহন কয়েকটি সুখশ্রাব্য গানের জন্য চিত্ররসিকদের সাধুবাদ

অর্জন করবেন। যদিও জগদীপ এবং চিত্রার মুখের দুটি গান অতিরিক্তমাত্রায় 'রক-এন-রোল'-ধর্মী হয়ে পড়েছে। ছবির একটি ভাঙরা নাচের দৃশ্য চিত্তাকর্ষক।

রাজেন্দ্রকৃষ্ণ গীত রচনার চেয়ে কাহিনীর সংলাপের জন্যই প্রশংসা পাবেন বেশী। আলোকচিত্র এবং সামগ্রিক কলাকৌশল ও অংগসজ্জার দিক দিয়ে ছবিখানি উঁচুদরের।

ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন যথাক্রমে এ পি নাগরজন ও জি ডি মদগুল্কার। আলোকচিত্রে আছেন টি মুথুস্বামী এবং সংগীতানুলেখনে মুকুল বোস ও মিনু কাতরাক।

বংগ সংস্কৃতি সম্মেলন

আগামী ৮ই মার্চ তারিখ থেকে কলকাতার মার্কাস স্কোয়ারে বংগ সংস্কৃতি সম্মেলনের ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হবে। এবারও সম্মেলন পক্ষকালব্যাপী—অর্থাৎ ২২শে মার্চ পর্যন্ত চলবে।

সম্মেলনের উদ্যোক্তাবৃন্দ এবছরও সম্মেলনের বিভিন্ন দিনের অধিবেশনে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বহু গুণী গ্রামীণ শিল্পীদের তাঁদের স্ব স্ব জেলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাচারগুলি পরিবেশনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত করবেন। এর মধ্যে মানভূমের ছৌ নাচ, দাঁড়শালা নাচ, লাঠি নাচ, টুসু গান, বীরভূমের সাঁওতাল উপজাতিদের নাচ, ঝুমুর নাচ ও গান, লেটো যাত্রা ও রায়বেঁশে; জয়নগর মজিলপুরের পুতুল নাচ; উত্তরবংগ ও দার্জিলিং-এর বিভিন্ন লোক-নৃত্য ও গান; পূর্ববংগের রাজেন বর্মণ ও সম্প্রদায় কর্তৃক কবিগান; মুর্শিদাবাদের শেখ গুমানী দেওয়ান ও বীরভূমের লম্বোদর চক্রবর্তী কর্তৃক কবির লড়াই; মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী ও সম্প্রদায় কর্তৃক নোয়াখালির মাঝিদের গান ও বীরভূম বাঁকুড়া ও মালদহের বাউল সম্প্রদায়ের বাউল গান উল্লেখযোগ্য।

এবছর সর্বসমেত সাতখানি নাটক সম্মেলনে নির্দিষ্ট হয়েছে, যথা—শিশিরকুমার ভাদুড়ির পরিচালনায় শরৎচন্দ্রের "ষোড়শী"; শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় বহুরূপী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়"; রূপকার কর্তৃক তুলসী লাহিড়ী ও কালী সরকার পরিচালিত "দুঃখীর ইমান"; লিটল থিয়েটার কর্তৃক উৎপল দত্ত ও শোভা সেন অভিনীত "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" ও "একেই কি বলে সভ্যতা?", ইনস্টিটিউট গ্রুপ কর্তৃক অমৃতলাল বসুর "খাসদখল" ও হাওড়া সমাজ কর্তৃক "নীলাচলে লীলা" যাত্রাভিনয়।

আধুনিক সংগীতের গতি-প্রকৃতি নিয়ে এবার সম্মেলনে আলোচনা হবে এবং আলোচনা করবেন বোম্বাই প্রবাসী সুর-শিল্পী শ্রীসলিল চৌধুরী। শ্রীসন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় সুরমন্দির কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা" ও বিভিন্ন শিল্পীদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের গানও এবছর সম্মেলনে বিশেষ আকর্ষণ হবে। প্রাচীন বাংলা গানে শ্রীমতী ইন্দুবালা, শ্রীমতী আঙ্গুরবালা, শ্রীমতী কমলা ঝরিয়া, শ্রীকালীপদ পাঠক প্রমুখ অংশ গ্রহণ করবেন।

এবছর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ও সম্প্রদায় "রাইরাজা" পালাকীর্তন পরিবেশন করবেন। প্রখ্যাত লোকসংগীত গায়ক শ্রীনির্মল চৌধুরী ও সম্প্রদায় নৃত্যসহযোগে এবছর পূর্ব বাংলার লোকসংগীত পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। বৃহত্তর বংগের সাংস্কৃতিক উপাচারগুলি সম্মেলনর উদ্যোক্তাবৃন্দ গত

বছর থেকে সম্মেলনে উপস্থিত করছেন; তন্মধ্যে গত বছর উড়িষ্যা সরকার প্রেরিত পাইকনৃত্য দর্শকদের স্মরণযোগ্য। এবছর ডাঃ ভূপেন হাজারিকার পরিচালনায় ও শ্রীমতী বড়ুয়ার তত্ত্বাবধানে আসামের একটি দল সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবেন এবং গৌরীপুর রাজপরিবারের স্বর্গত প্রমথেশ-চন্দ্র বড়ুয়ার স্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই দলটি কলিকাতায় আসছেন। উড়িষ্যার ওড়িষীনৃত্য এবার সম্মেলনের অন্যতম আকর্ষণ। এবার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সারারাত চলবে এবং বিশিষ্ট শিল্পিবৃন্দ তাতে যোগদান করবেন।

সম্মেলন সম্পর্কে যাবতীয় সংবাদ সম্মেলনের কার্যালয় ৩০, বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা—৭ (ফোন ৩৪—২৯৩৮)এ পাওয়া যাবে।

বিবিধ সংবাদ

স্টার থিয়েটার অচিরেই মনোজ বসুর "ডাক বাংলো" মঞ্চস্থ করবেন। মূল গল্পকে নাট্যরূপান্তরিত করেছেন—এ বিষয়ে যাঁর জুড়ি নেই, সেই দেবনারায়ণ গুপ্ত। বহুকাল বাদে ছবি বিশ্বাসকে এই নাটকের প্রধান ভূমিকায় আবার পাদপ্রদীপের সামনে দেখা যাবে। নতুন নাটক মহলা দেবার জন্যে গত সপ্তাহ থেকে স্টারের নিয়মিত অভিনয়ের আসর বন্ধ রাখা হয়েছে।

• • •

বিশ্বরূপায় মৌমাছি রচিত ও পরিচালিত শিশুনাট্য "মায়া-ময়ূরে"র অভিনয় ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল মহলেই সাড়া জাগিয়েছে। গত রবিবার রুশ পুতুল নাচের দলের অধিনায়ক সেরগেই ওব্‌রাজৎসফ ও তাঁর স্ত্রী "মায়া-ময়ূরে"র অভিনয় দেখে এতদূর আকৃষ্ট হন যে, বিশ্বরূপার শিশুশিল্পী দলকে রাশিয়াতে গিয়ে অভিনয় করবার জন্যে তাঁরা আমন্ত্রণ জানান।

• • •

গত শনিবার রঙমহলে "মায়ামৃগ" নাটকের দ্বিশততম অভিনয়োৎসব মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সম্প্রদায়ের শিল্পী ও কর্মিবৃন্দকে কর্তৃপক্ষ স্মারক উপহার দানে আপ্যায়িত করেন। নীহাররঞ্জন গুপ্ত লিখিত এই নাটকের দুটি প্রধান চরিত্রে সরযূবালা ও কেতকী দত্ত যে নাট্যনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা নাট্যামোদীরা সহজে ভুলতে পারবেন না। পরিচালনা ও সঙ্গীতের সাফল্যের জন্যে কৃতিত্ব যথাক্রমে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও অনিল বাগচীর প্রাপ্য।

• • •

২৮শে ফেব্রুয়ারী চতুর্মুখ নামক অবৈতনিক নাট্য প্রতিষ্ঠান সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'থানা থেকে আসছি' নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। শ্রদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য পরিচালনার ভার পেয়েছেন।

খেলার মাঠে

একলব্য

কলকাতার ফুটবল মরসুম আরম্ভ হতে এখনো দু' আড়াই মাস বাকী। কিন্তু ক্লাবে ক্লাবে এখন থেকেই ফুটবলের তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেছে। বড় বড় ক্লাবের কর্ম-কর্তাদের মাথাব্যথা দল-গড়ার ব্যাপার নিয়ে। কে কতখানি শক্তিশালী করে দল গড়তে পারে তার জন্যই তাদের চিন্তা। ছোট ক্লাবের এ ভাবনা নেই। কোন মতে টি'কে থেকে দিনগত পাপক্ষয়ের মত খেলা চালিয়ে যাওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। গতবার থেকে লীগ খেলার যে নতুন নিয়ম চালু হয়েছে তাতে টি'কে না থাকবার অবশ্য কোন কারণ নেই। কোনো ডিভিসনের কোনো ক্লাব যদি একটি পয়েণ্টও সংগ্রহ করতে না পারে তাহলেও তো তারা নীচের ডিভিসনে নামবে না। লীগ খেলা থেকে 'ওঠানামার' বিধান নাকচ করে দিয়ে আই এফ এ-র সমাজপতিরা ফুটবলের পংক্তিভোজে সব শ্রেণীর জন্যই রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করেছেন। এখন ফুটবল লীগে কৌলীন্যের মর্যাদা শুধু চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন নিয়ে। এই মর্যাদার জন্য বড় বড় ক্লাব নতুন নতুন খেলোয়াড়দের খোঁজ করছেন।

ফেব্রুয়ারীর ১৫ তারিখ থেকে খেলোয়াড়দের দল অদল বদল আরম্ভ হয়ে গেছে। কয়েকজন খেলোয়াড় ইতিমধ্যেই নতুন ক্লাবে যোগ দিয়েছেন। কয়েকজন নতুন ক্লাবে নাম লিখিয়ে আবার পুরনো ক্লাবে ফিরে এসেছেন। এটা অবশ্য আইনের ফাঁক। আই এফ এর সংবিধান হচ্ছে, একজন খেলোয়াড় এক বছরে মাত্র একটি ক্লাবই পরিবর্তন করতে পারে। একটি ক্লাবের পক্ষে নাম লিখিয়ে আবার একটি নতুন ক্লাবে নাম লেখাবার অধিকার নেই। কিন্তু পুরনো ক্লাবে ফিরে আসবার অধিকার আছে। অর্থাৎ মোহনবাগানের কোনো খেলোয়াড় যদি ইস্টবেঙ্গলে খেলবার জন্য আই এফ এ-র 'ছাড়পত্র' সই করেন তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবার মোহনবাগানে ফিরে আসতে পারেন। অন্য কোন ক্লাবে যেতে পারেন না। নির্ধারিত সময় পার হয়ে গেলে মোহনবাগানেও ফেরবার উপায় থাকে না। আইনের এই ছিদ্রপথেই ক্লাব কর্তৃপক্ষ নিজ ক্লাবের খেলোয়াড়দের হাত পা বেঁধে রাখেন। এ'রা কি করেন? না, খেলোয়াড়দের ছোট একটি ক্লাবে নাম সই করিয়েই পুরনো ক্লাবে খেলবার আবেদন পেশ করেন। ব্যস্, এক বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। এ ব্যবস্থা না করেও ক্লাব কর্তৃপক্ষের উপায় থাকে না। কারণ খেলোয়াড়দের উপর তো বিশ্বাস নেই। কখন তাঁরা কোন্ ক্লাবে যোগ দিবেন তার স্থিরতা নেই। তাই আইনের নাগপাশে তাঁদের বেঁধে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এতদিন জানুয়ারী মাসের ১০ তারিখ থেকে মার্চ মাসের ২৫ তারিখ পর্যন্ত খেলোয়াড়দের দল অদলবদলের সুযোগ ছিল। কিন্তু সময়ের বিস্তৃতি কমিয়ে এনে এবার থেকে নিয়ম করা হয়েছে ফেব্রুয়ারীর ১৫ তারিখ থেকে মার্চের ১৫ তারিখের মধ্যে খেলোয়াড়দের দল অদলবদল করতে হবে। তাই ক্লাবে ক্লাবে কর্মতৎপরতাও বেড়ে গেছে।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা এখন পর্যন্ত শেষ না হওয়ায় অন্য রাজ্যের কিছু কিছু খেলোয়াড়েরও এ বছর কলকাতায় খেলবার সম্ভাবনা আছে। হায়দরাবাদের সেণ্টার ফরোয়ার্ড কানন ইতিমধ্যে কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলবার জন্য আবেদন করেছেন। অন্য রাজ্যের আর কে কে কলকাতায় খেলবেন তা জানা যাবে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর। মাদ্রাজে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ পর্যায়ের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানে খেলোয়াড়দের গুণাগুণ দেখে বড় বড় ক্লাবের কর্মকর্তারা অনেককে বাঙলায় আনবার চেষ্টা করবেন। তাই বাঙলা দলের সঙ্গে বড় বড় ক্লাবের কর্মকর্তারা রওনা হয়েছেন মাদ্রাজের দিকে। মাদ্রাজে ৮টি রাজ্য জাতীয় ফুটবলের শেষ পর্যায়ের খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। বোম্বাই, মহীশূর, সার্ভিসেস ও বিহার একটি গ্রুপে আছে, আর একটি গ্রুপে আছে হায়দরাবাদ, বাঙলা, দিল্লী ও মাদ্রাজ দল। লীগ প্রথায় দুটি গ্রুপের খেলা শেষ হবার পর প্রতি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সকে নিয়ে নক আউট প্রথায় অনুষ্ঠিত হবে ভারতের পঞ্চদশ বার্ষিক জাতীয় ফুটবলের সেমি-ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলা। সুতরাং ভারতের খেলাধুলোর বড় আকর্ষণ এখন মাদ্রাজে।

* * *

কলকাতায় হকি লীগের খেলা আরম্ভ হলেও হকির উন্মাদনায় ময়দান এখনো সরগরম হয়ে ওঠেনি। হকি খেলার আবেগে অধীর দিনগুলি এখনো অনেক দূরে।

যখন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের প্রশ্নে খেলা জমে উঠবে, বাইরের নাম-করা ক্লাবগুলোকে নিয়ে আরম্ভ হবে বেটন কাপের খেলা, তখন কলকাতার হকি সাধারণের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। কলকাতার হকি মরশুম স্বল্পস্থায়ী। সব মিলিয়ে এখানে হকি খেলার স্থায়িত্বকাল আড়াই মাসের মত। ক্রীড়ামোদীর মনে খেলার রং ধরতে ধরতেই হকি মরশুম পালিয়ে যায় ফুটবলের পদধ্বনি কানে আসবার সঙ্গে সঙ্গে। তাছাড়া, ক্রীড়ামোদীদের মনে রং ধরানোর মত কলকাতার হকিতে কি আর আগের জলুস আছে? ভারতের হকি ক্ষেত্রে বাঙলার দান কম নয়। কোন বাঙালী খেলোয়াড় আজ পর্যন্ত ভারতের অলিম্পিক হকি টীমে স্থান না পেলেও বাঙলার বহু খেলোয়াড় ভারতীয় হকি টীমকে সমৃদ্ধ করেছেন। কলকাতার হকি মরশুমকেও এরা রূপে রসে ভরে তুলেছেন খেলার মধ্যে অপরূপ রূপ সৃষ্টি করে। ক্রিকেটের মত হকিও বিজ্ঞান-সম্মত খেলা। সূক্ষ্ম নৈপুণ্য দেখানোর প্রচুর সুযোগ রয়েছে হকি খেলায়। প্রায় ছাতার বাটের মত সরু একখানা স্টিকের সাহায্যে শুধু মাত্র কব্জীর কারসাজিতে হকি খেলায় যে ভেল্কি দেখানো যায়, খেলায় যে মায়াজাল সৃষ্টি করা যায়, দর্শকদের কাছে তার রূপগুণ প্রত্যক্ষ। বাঁশী বাজা থেকে সুরু করে শেষ বাঁশী না বাজা পর্যন্ত হকি খেলার মধ্যে তীব্র গতিবেগ সঞ্চালিত থাকে, খেলোয়াড়ের নৈপুণ্যের পরশে খেলা হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। কলকাতার হকি মাঠে একদিন এই প্রাণবন্ত খেলাই দেখা গেছে। কিন্তু সূক্ষ্ম নৈপুণ্য ও হাতের কারিগরির পরিবর্তে আজকের হকি খেলা হার্ড হিটিং ও লং পাসিংয়ের গেমে পরিণত হয়েছে। তাই খেলায় আর সে জলুস নেই।

কলকাতার হকি মাঠে অবশ্য এ বছরও বাইরের কয়েকজন গুণী খেলোয়াড়ের সমাবেশ ঘটেছে। নবাগত খেলোয়াড়দের মধ্যে কেউ কেউ কিছুটা নৈপুণ্যেরও পরিচয় দিয়েছেন। তবু খেলা দেখে দর্শকদের মন ভরছে না।

শুধু কলকাতার কেন? ভারতের হকিমান বহুদিন থেকেই নিম্নমুখী। ভারতের হকি মহলে এখন সন্দেহ দেখা দিয়েছে পর পর ছয়টি অলিম্পিকের বিজয়ী ভারত ১৯৬০ সালে রোম অলিম্পিকেও বিজয়ী হতে পারবে কি না? তাই দেশের তরুণ ও সম্ভাবনাযুক্ত খেলোয়াড়দের মধ্য থেকে অলিম্পিক দল গঠনের তোড়জোড় চলছে। কথা উঠেছে ভারতকে চারটি

অঞ্চলে ভাগ করে এক একটি অঞ্চল থেকে ৪০ জন করে উদীয়মান খেলোয়াড় বাছাই করা হবে। উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে এই সব খেলোয়াড় একটি কেন্দ্রে থেকে খেলা অনুশীলন করবেন। তারপর এই ৪০ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে হতে একটি দল গড়া হবে। এইভাবে চারটি কেন্দ্রের চারটি দল লীগ প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং সেই লীগ প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়দের গুণাগুণ দেখে গড়া হবে রোম অলিম্পিকের জন্য ভারতের হকি দল। উদ্দেশ্য মহৎ। পরিকল্পনার পেছনেও যথেষ্ট যুক্তি আছে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে সুফল দেখা দেবে সন্দেহ নেই।

• • •

মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলাতেও ইংলণ্ড দলকে ৯ উইকেটে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। এ খেলাটি নিয়ে ইংলণ্ড এবার পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে চারটি খেলাতেই পরাজয় স্বীকার করলো আর দুই দেশের টেস্ট যুদ্ধের ইতিহাসে পরাজয় স্বীকার করলো ৭৪ বার। ১৮৭৬ সাল থেকে দুই দেশের মধ্যে টেস্ট খেলা আরম্ভ হয়েছে। দীর্ঘ এই ৮৩ বছরে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা হয়েছে ১৭৮ বার। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৭৪টি খেলায় ইংলণ্ড ৬২টিতে, ৪২টি খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। এবার ব্রিসবেন মাঠের প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে। মেলবোর্ন মাঠের দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া একই ফলাফলে বিজয়ী হয়। সিডনী মাঠের তৃতীয় টেস্টে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। এডিলেড মাঠের চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ১০ উইকেটে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে রাবার ও 'অ্যাসেস' পুনরুদ্ধারের পর পঞ্চম টেস্টেও ইংলণ্ডকে ৯ উইকেটে পরাজিত করেছে। অর্থাৎ সব খেলাতেই অস্ট্রেলিয়া দিয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের পর্যাপ্ত পরিচয়। ভারতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে আমরা তিনটি টেস্টে পরাজয় স্বীকার করেছি, বাকী দুটি খেলা শেষ করেছি অমীমাংসিতভাবে। আর ক্রিকেট-স্রষ্টা ইংলণ্ডও অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাজিত হয়েছে আরও শোচনীয়ভাবে।

মেলবোর্ন মাঠের পঞ্চম ও শেষ টেস্ট খেলায় ইংলণ্ডের শোচনীয় পরাজয় অধিকতর বেদনাদায়ক এই কারণে যে, জয়লাভের আশায় ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক পিটার মে আগের টেস্ট খেলাটিতে টসে জিতেও অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম ব্যাটিং করতে দিয়ে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন। আর এ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক রিচি বিনোড একইভাবে টসে জিতে ইংলণ্ডকে প্রথম ব্যাটিং করতে দিয়ে খেলায় জয়লাভ করেছেন। এ যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া—তোমরা যা পারনি আমরা তা পারলাম। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া আর কাকে বলে?

পঞ্চম টেস্টের ধারাবাহিক আলোচনা করলে দেখা যাবে খেলার সব সময়ই অস্ট্রেলিয়া তার সুবিস্তৃত প্রাধান্য বজায় রেখে ইংলণ্ডের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। প্রথমদিন ইংলণ্ড ৭ উইকেটে ১৯১ রান সংগ্রহ করে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান পিটার রিচার্ডসন এবং ৮ নম্বর ব্যাটসম্যান জে মর্টিমোর ছাড়া আর কেউই বেশী রান করতে পারেন না। গ্লস্টারশায়ারের চৌত্রিশ খেলোয়াড় জন মর্টিমোরের এইটিই ছিল জীবনের প্রথম টেস্ট খেলা। ১২৮ রানের মধ্যেই ইংলণ্ডের ৭টি উইকেট পড়ে গিয়েছিল। মর্টিমোর অষ্টম উইকেটে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন করেন। প্রথম দিনের শেষে ৪১ রান করেও তিনি নট আউট থাকেন।

দ্বিতীয় দিন ২০৫ রানে ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর অস্ট্রেলিয়া দল ৩ উইকেটে ১৫০ রান করে। অস্ট্রেলিয়ার কীর্তিমান ওপেনিং ব্যাটসম্যান কলিন ম্যাকডোনাল্ড, যিনি আগের টেস্টে ১৭০ রান করেছিলেন, তিনি ৯৮ রান করে নট আউট থাকেন।

তৃতীয় দিন ৩৫১ রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়। সমাপ্তির সময় ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় সংগ্রহ করে ২ উইকেটে মাত্র ২২ রান। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে ম্যাকডোনাল্ডের ১৩৩, গ্রাউটের ৭৪ এবং অধিনায়ক রিচি বিনোডের ৬৪ রান লাভের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ দিন ২১৪ রানে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে গেলে জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার আর ৬৯ রানের প্রয়োজন থাকে। এই ৬৯ রানের ১৫ রান সংগৃহীত হয় চতুর্থ দিনের শেষ সময়ে। বাকী ৫৪ রান সংগ্রহ করতে পরের দিন ৫১ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। অবশ্য এর মধ্যে একটি উইকেট পড়ে যাওয়ায় অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে বিজয়ী হয়।

কলিন ম্যাকডোনাল্ডের সেঞ্চুরী ছাড়া পঞ্চম টেস্টের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা

অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা ফাস্ট বোলার রে লিণ্ডওয়ালের বোলিংয়ে নতুন রেকর্ড করার কৃতিত্ব। অস্ট্রেলিয়ার স্বনামধন্য বোলার ক্লারি গ্রিমেট টেস্ট খেলায় ২১৬টি উইকেট পেয়ে যে রেকর্ড করে রেখেছিলেন এতদিন কেউই সে রেকর্ড ভাংগতে পারেনি। লিণ্ডওয়াল এ টেস্ট খেলায় ৪টি উইকেট নিয়ে মোট ২১৯টি উইকেট দখল করেছেন। ইংলণ্ডের 'শিকড় আটা' ব্যাটসম্যান ট্রেভর বেলীকে প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট করে তিনি গ্রিমেটের বোলিং রেকর্ড স্পর্শ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে আবার যখন লিণ্ডওয়াল বেলীকে শূন্য রানে আউট করে গ্রিমেটের রেকর্ড অতিক্রম করেন তখন মাঠের ৩০ হাজার দর্শক তাকে অভিনন্দন জানায়। এরপর লিণ্ডওয়াল মারাত্মক ধরনের একটি বলে যখন ইংলণ্ড অধিনায়ক পিটার মের উইকেট দখল করেন তখন দর্শকদের আর আনন্দ ধরে না। মেলবোর্ন মাঠে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়।

অস্ট্রেলিয়া সফর শেষ করে ইংলণ্ড দল নিউজিল্যাণ্ড যাত্রা করেছে। এখানে তাদের তিনটি টেস্টের প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হবে এই মাসের ২৭ তারিখে ক্রিস্টচার্চে। ১৯৬১ সালে অস্ট্রেলিয়া দল ইংলণ্ডে পাল্টা সফর করবে।

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পঞ্চম ও শেষ টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ডঃ—

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—২০৫ (পি রিচার্ডসন ৬৮, জে মর্টিমোর ৪৪, এফ ট্রুম্যান ২১, কলিন কাউড্রে ২২; রিচি বিনোড ৪৩ রানে ৪ উইকেট, এলান ডেভিডসন ৩৮ রানে ৩ উইকেট, আয়ান মেকিফ ৫৭ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—৩৫১ (সি ম্যাকডোনাল্ড ১৩৩, ডবিউ গ্রাউট ৭৪, রিচি বিনোড ৬৪, কেন ম্যাকে ২৩; ফ্রেড ট্রুম্যান ৯২ রানে ৫ উইকেট, জিম লেকার ৯৩ রানে ৪ উইকেট)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস—২১৪ (টম গ্রেভনি ৫৪, কলিন কাউড্রে ৪৬, এফ ট্রুম্যান ৩৬, পি রিচার্ডসন ২৩; রে লিণ্ডওয়াল ৩৭ রানে ৩ উইকেট, রোরকে ৪১ রানে ৩ উইকেট, ডেভিডসন ৯৫ রানে ২ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—(১ উইকেট) ৭০ (সি ম্যাকডোনাল্ড নট আউট ৫১)

• • •

গত সপ্তাহে ভারতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সফরের সংক্ষিপ্তসারের আলোচনার সংগে এ পর্যন্ত সরকারী টেস্ট খেলায় ভারতের পক্ষে এবং ভারতের বিপক্ষে যারা সেঞ্চুরী করেছেন তার খতিয়ান প্রকাশের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্থানাভাববশত সম্ভব হয়নি। তাই এ সপ্তাহে প্রকাশ করা হল।

১৯৩৩-৩৪ সাল—ভারত বনাম ইংলণ্ড		
এল অমরনাথ—	১১৮	(প্রথম টেস্ট—বোম্বাই)
বি এইচ ভ্যালেণ্টাইন—	১৩৬	(প্রথম টেস্ট—বোম্বাই)
সি এফ ওয়াল্টার্স—	১০২	(তৃতীয় টেস্ট—মাদ্রাজ)
১৯৩৬ সাল—ইংলণ্ড বনাম ভারত		
বিজয় মার্চেণ্ট—	১১৪	(দ্বিতীয় টেস্ট—ম্যাঞ্চেস্টার)
মুস্তাক আলী—	১১২	(দ্বিতীয় টেস্ট—ম্যাঞ্চেস্টার)
ওয়ালী হ্যামণ্ড—	১৬৭	(দ্বিতীয় টেস্ট—ম্যাঞ্চেস্টার)
ওয়ালী হ্যামণ্ড—	২১৭	(তৃতীয় টেস্ট—ওভাল)
টি এস ওয়ার্দিংটন—	১২৮	(তৃতীয় টেস্ট—ওভাল)
১৯৪৬ সাল—ইংলণ্ড বনাম ভারত		
বিজয় মার্চেণ্ট—	১২৮	(তৃতীয় টেস্ট—ওভাল)
১৯৪৭-৪৮ সাল—অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত		
বিনু মানকড়—	১১৬	(তৃতীয় টেস্ট—মেলবোর্ন)
ভি এস হাজারে—	১১৬ ও ১৪৫	(চতুর্থ টেস্ট—এডিলেড)
ডি জি ফাদকার—	১২৩	(চতুর্থ টেস্ট—এডিলেড)
বিনু মানকড়—	১১১	(পঞ্চম টেস্ট—মেলবোর্ন)
ডি জি ব্র্যাডম্যান—	১৮৫	(প্রথম টেস্ট—ব্রিসবেন)
ডি জি ব্র্যাডম্যান—	১৩২ ও ১২৭ নট আউট	(তৃতীয় টেস্ট—মেলবোর্ন)
এ আর মোরিস—	১০০ নট আউট	(তৃতীয় টেস্ট—মেলবোর্ন)
ডি জি ব্র্যাডম্যান—	২০১	(চতুর্থ টেস্ট—এডিলেড)
এস জি বার্নেস—	১১২	(চতুর্থ টেস্ট—এডিলেড)
এ এল হ্যাসেট—	১৯৮ নট আউট	(চতুর্থ টেস্ট—এডিলেড)
নীল হার্ভে—	১৫৩	(পঞ্চম টেস্ট—মেলবোর্ন)
১৯৪৮-৪৯ সাল—ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ		
হেমু অধিকারী—	১১৪ নট আউট	(প্রথম টেস্ট—দিল্লী)
রুসি মোদি—	১১২	(দ্বিতীয় টেস্ট—বোম্বাই)
ভি এস হাজারে—	১৩৪ নট আউট	(দ্বিতীয় টেস্ট—বোম্বাই)
এস মুস্তাক আলী—	১০৬	(তৃতীয় টেস্ট—কলিকাতা)
ভি এস হাজারে—	১২২	(পঞ্চম টেস্ট—বোম্বাই)
সি ওয়ালকট—	১৫২	(প্রথম টেস্ট—দিল্লী)
গেরি গোমেজ—	১০১	(প্রথম টেস্ট—দিল্লী)
এভার্টন উইকস—	১২৮	(প্রথম টেস্ট—দিল্লী)
এ ই রে—	১০৪	(দ্বিতীয় টেস্ট—বোম্বাই)
এভার্টন উইকস—	১৯৪	(দ্বিতীয় টেস্ট—বোম্বাই)
এভার্টন উইকস—	১৬২ ও ১০১	(তৃতীয় টেস্ট—কলকাতা)
সি ওয়ালকট—	১০৮	(তৃতীয় টেস্ট—কলকাতা)
এ ই রে—	১০৯	(চতুর্থ টেস্ট—মাদ্রাজ)
জে বি স্টলমায়ার—	১৬০	(চতুর্থ টেস্ট—মাদ্রাজ)
১৯৫১-৫২ সাল—ভারত বনাম ইংলণ্ড		
ভি এম মার্চেণ্ট—	১৫৪	(প্রথম টেস্ট—দিল্লী)
ভি এস হাজারে—	১৬৪ নট আউট	(প্রথম টেস্ট—দিল্লী)
পি রায়—	১৪০	(দ্বিতীয় টেস্ট—বোম্বাই)
ভি এস হাজারে—	১৫৫	(দ্বিতীয় টেস্ট—বোম্বাই)
ডি জি ফাদকার—	১১৫	(তৃতীয় টেস্ট—কলকাতা)
পি রায়—	১১১	(পঞ্চম টেস্ট—মাদ্রাজ)
পলি উমরিগর—	১৩০ নট আউট	(পঞ্চম টেস্ট—মাদ্রাজ)
এ জে ওয়াটকিনস—	১৩৮ নট আউট	(প্রথম টেস্ট—দিল্লী)
টম গ্রেভনি—	১৭৫	(দ্বিতীয় টেস্ট—বোম্বাই)
১৯৫২ সাল—ইংলণ্ড বনাম ভারত		
বিজয় মঞ্জরেকার—	১৩৩	(প্রথম টেস্ট—লীডস)
বিনু মানকড়—	১৮৪	(দ্বিতীয় টেস্ট—লর্ডস)
এল হাটন—	১৫০	(দ্বিতীয় টেস্ট—লর্ডস)
টি জি ইভান্স—	১০৪	(দ্বিতীয় টেস্ট—লর্ডস)
এল হাটন—	১০৪	(তৃতীয় টেস্ট—ম্যাঞ্চেস্টার)
ডি এস শেফার্ড—	১১৯	(চতুর্থ টেস্ট—ওভাল)

১৯৫২ সাল—ভারত বনাম পাকিস্থান

ভি এস হাজারে—	১৪৬ নট আউট	(তৃতীয় টেস্ট—বোম্বাই)
পলি উমরিগর—	১০২	(তৃতীয় টেস্ট—বোম্বাই)
দীপক সোধন—	১১০	(পঞ্চম টেস্ট—কলকাতা)
নজর মহম্মদ—	১২৪ নট আউট	(দ্বিতীয় টেস্ট—লউনউ)

১৯৫৩ সাল—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারত

পলি উমরিগর—	১৩০	(প্রথম টেস্ট—পোর্ট অব স্পেন)
এম এল আপ্তে—	১৬৩ নট আউট	(তৃতীয় টেস্ট—পোর্ট অব স্পেন)
পলি উমরিগর—	১১৭	(পঞ্চম টেস্ট—কিংসটন)
পি রায়—	১৫০	(পঞ্চম টেস্ট—কিংসটন)
ভি মঞ্জরেকার—	১১৮	(পঞ্চম টেস্ট—কিংসটন)
এভার্টন উইকস—	২০৭	(প্রথম টেস্ট—পোর্ট অব স্পেন)
বি পেয়ারেডো—	১১৫	(প্রথম টেস্ট—পোর্ট অব স্পেন)
এভার্টন উইকস—	১৬১	(তৃতীয় টেস্ট—পোর্ট অব স্পেন)
জে বি স্টলমায়ার—	১০৪ নট আউট	(তৃতীয় টেস্ট—পোর্ট অব স্পেন)
সি ওয়ালকট—	১২৫	(চতুর্থ টেস্ট—জর্জ টাউন)
ফ্রাঙ্ক ওরেল—	২৩৭	(পঞ্চম টেস্ট—কিংসটন)
এভার্টন উইকস—	১০৯	(পঞ্চম টেস্ট—কিংসটন)
সি ওয়ালকট—	১১৮	(পঞ্চম টেস্ট—কিংসটন)

১৯৫৫ সাল—পাকিস্থান বনাম ভারত

পলি উমরিগর—	১০৮	(চতুর্থ টেস্ট—পেশোয়ার)
হানিফ মহম্মদ—	১৪২	(দ্বিতীয় টেস্ট—ভাওয়ালপুর)
আলীমুদ্দিন—	১০৩ নট আউট	(পঞ্চম টেস্ট—করাচী)

১৯৫৫-৫৬ সাল—ভারত বনাম নিউজিল্যাণ্ড

পলি উমরিগর—	২২৩	(প্রথম টেস্ট—হায়দরাবাদ)
ভি এল মঞ্জরেকার—	১১৮	(প্রথম টেস্ট—হায়দরাবাদ)
কৃপাল সিং—	১০০ নট আউট	(প্রথম টেস্ট—হায়দরাবাদ)
বিনু মানকড়—	২২৩	(দ্বিতীয় টেস্ট—বোম্বাই)
ভি এল মঞ্জরেকার—	১৭৭	(তৃতীয় টেস্ট—দিল্লী)
পি রায়—	১০০	(চতুর্থ টেস্ট—কলকাতা)
জি এস রামচাঁদ—	১০৬ নট আউট	(চতুর্থ টেস্ট—কলকাতা)
বিনু মানকড়—	২৩১	(পঞ্চম টেস্ট—মাদ্রাজ)
পি রায়—	১৭৩	(পঞ্চম টেস্ট—মাদ্রাজ)
জে ডব্লিউ গায়—	১০২	(প্রথম টেস্ট—হায়দরাবাদ)
বার্ট সাটক্লিফ	১৩৭	(প্রথম টেস্ট—হায়দরাবাদ)
বার্ট সাটক্লিফ—	২৩০	(তৃতীয় টেস্ট—দিল্লী)
জন রিড—	১১৯	(তৃতীয় টেস্ট—দিল্লী)
জন রিড—	১২০	(চতুর্থ টেস্ট—কলকাতা)

১৯৫৬ সাল—ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়া

জি এস রামচাঁদ—	১০৯	(দ্বিতীয় টেস্ট—বোম্বাই)
জিম বার্ক—	১৬১	(দ্বিতীয় টেস্ট—বোম্বাই)
নীল হার্ভে	১৪০	(দ্বিতীয় টেস্ট—বোম্বাই)

১৯৫৮-৫৯ সাল—ভারত বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

চাঁদু বোরদে—	১০৯	(পঞ্চম টেস্ট—দিল্লী)
গারফিল্ড সোবার্স—	১৪২	(প্রথম টেস্ট—বোম্বাই)
গারফিল্ড সোবার্স—	১৯৮	(দ্বিতীয় টেস্ট—কানপুর)
গারফিল্ড সোবার্স—	১০৬ নট আউট	(তৃতীয় টেস্ট—কলকাতা)
রোহান কানহাই—	২৫৬	(তৃতীয় টেস্ট—কলকাতা)
বেসিল বুচার—	১০৩	(তৃতীয় টেস্ট—কলকাতা)
কোলী স্মিথ—	১৭২	(চতুর্থ টেস্ট—মাদ্রাজ)
কোলী স্মিথ—	১০০	(পঞ্চম টেস্ট—দিল্লী)
জন হোল্ট—	১২৩	(পঞ্চম টেস্ট—দিল্লী)
জো সলোমান—	১০০ নট আউট	(পঞ্চম টেস্ট—দিল্লী)

দেশী সংবাদ

১৬ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধীপক্ষ হইতে স্পীকার শ্রীশংকরদাস ব্যানার্জি এবং কংগ্রেস পরিষদ দলের সাধারণ সম্পাদক কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ—সরকারের আর্থিক স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ একটি সুগার মিলের ডাইরেক্টর রহিয়াছেন বলিয়া অভিযোগ উত্থাপিত হইলে সভাকক্ষে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ অদ্য রাজ্যসভায় বলেন যে, 'সর্বভারতীয় চাকুরি'তে নিযুক্ত কতিপয় ব্যক্তির কলিকাতায় বোটানিক্যাল গার্ডেনস্-এ উদ্বাস্তু রমণী লইয়া ব্যবসায়ে (মধুচক্র) জড়িত থাকার অভিযোগের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একজন স্পেশ্যাল অফিসার নিযুক্ত করিয়াছেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাজেটের সাধারণ আলোচনাকালে বিরোধীপক্ষ হইতে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি দিল্লীর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের সহানুভূতিহীন মনোভাব সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। কম্যুনিস্ট দলের ডেপুটি লিডার শ্রীবঙ্কিম মুখার্জি ঐ অভিযোগ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরূপ মনোভাবের দরুণ পশ্চিমবঙ্গে নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না, বড় বড় শিল্প বোম্বাই অঞ্চলে সরাইয়া লওয়া হইতেছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—আজ লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হইলে পাকিস্থানের নিকট বেরুবাড়ি ইউনিয়ন হস্তান্তর সম্পর্কে জনৈক সদস্য প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের অভিযোগ করিলে তিনি উহা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় অস্বীকার না করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় অধিবেশনে বাজেট সম্পর্কে তৃতীয় দিবসের আলোচনাকালে কংগ্রেস সদস্য শ্রীনেপাল রায় বিভিন্ন সরকারী বিভাগে দুর্নীতির অস্তিত্ব সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করিয়া দেন। অতঃপর সুন্দরবন অঞ্চলে হেরোভাঙ্গা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কেন্দ্র পরিচালনে বিভাগীয় একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বিরুদ্ধে অব্যবস্থা ও বিপুল পরিমাণ অর্থ চুরির অভিযোগ করিয়া বলেন যে, ঐ কেন্দ্রের ব্যয়ের জন্য পরিকল্পনার ৩৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ২০ লক্ষ টাকাই চুরি হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম অদ্য লোকসভায় ১৯৫৯-৬০ সালের রেলওয়ে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেন যে, আগামী আর্থিক বৎসরে বর্তমান যাত্রি ভাড়ার বা মাল-ভাড়ার কোন পরিবর্তন হইবে না।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—আজ লোকসভায় রাষ্ট্রপতির ভাষণ সংক্রান্ত বিতর্কের জবাবদান প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী বেরুবাড়ির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের সহিত পরামর্শ করা হইয়াছিল। তিনি বলেন, "এই ধরনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো আমার পক্ষে অচিন্তনীয়।"

২০শে ফেব্রুয়ারী—কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ কংগ্রেসের নূতন ওয়ার্কিং কমিটির মোট ২১ জনের মধ্যে ১৭ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করিয়াছেন। তালিকায় প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর নাম নাই। এই প্রথম শ্রী নেহরুহীন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গঠিত হইল।

২১শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে নাগরিকদের এক মহতী সভায় নেহরু-নুন চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়ি ইউনিয়নের কিয়দংশ পাকিস্তানে হস্তান্তরের প্রস্তাব এবং মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা অঞ্চলের কিয়দংশ পাকিস্তানকে অর্পণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

বীরভূমের চিনিকল কর্তৃপক্ষ একই সম্পত্তি একবার রাজ্য সরকারের নিকট এবং আবার ঐ সম্পত্তিই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বন্ধক দিয়া প্রায় ৪৭ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে। এই সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় তুমুল কাণ্ড হইয়া গিয়াছে।

২২শে ফেব্রুয়ারী—জোড়হাট হইতে সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, প্রায় চারি মাস চুপচাপ থাকার পর নাগা সশস্ত্র বিদ্রোহিগণ জোড়হাট মহকুমার দক্ষিণে চা-বাগান এবং গ্রামগুলির উপর বিক্ষিপ্তভাবে হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে স্থাপিত কয়েকটি আদর্শ থানার সাফল্য লাভে অনুপ্রাণিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ রাজ্যের মোট ২৯৭টি থানাই 'আদর্শ থানা'য় রূপান্তরিত করার কাজে হাত দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৬ই ফেব্রুয়ারী—জনৈক আমেরিকান অক্সফোর্ডের এক পুরাতন পুস্তকের দোকান হইতে "তেজস্ক্রিয় পদার্থ" নামক একখানা পুস্তক ক্রয় করিয়া দেখিতে পান যে, পুস্তকখানার ভিতর দিকের মলাট হইতে আলফা রশ্মি বহির্গত হইতেছে এবং প্রতি মিনিটে কি পরিমাণ রশ্মিকণা বিকীরণ হইতেছে, তাহাও তিনি যন্ত্রের সহায়তায় গণনা করিয়াছেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—আজ সকালে লণ্ডনে সাইপ্রাস সম্পর্কে গোল টেবিল বৈঠক আরম্ভ হইলে বৃটেনের পক্ষ হইতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি দেওয়া হয়। বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসেলুইন লয়েড বৃটেনের পক্ষ হইতে এই বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে সাইপ্রাস সমস্যা সমাধানের জন্য বৃটেনের পক্ষ হইতে ৪ দফা দাবী পেশ করা হয়।

ঢাকার এক সংবাদে প্রকাশ, পূর্ববঙ্গের কয়েকজন বিখ্যাত জমিদারের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় সাময়িকভাবে বন্ধ রাখিতে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনার ডাঃ পূর্ণেন্দুকুমার ব্যানার্জি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতেছেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—আজ সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'তাস' জানাইতেছে যে, সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিকিতা খুশ্চেভ গতকাল মস্কোর দক্ষিণে অবস্থিত তুলায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই মর্মে এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন যে, বার্লিনের সহিত পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের বিমান 'সেতুপথ' বরদাস্ত করা হইবে না।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—সাইপ্রাস সম্পর্কে লণ্ডনে যে গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইতেছে, আজ সেই বৈঠকে সাইপ্রাস স্বাধীন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, পাকিস্তান যদি নিজ দেশে বিদেশী সামরিক ঘাটি প্রতিষ্ঠা করিতে দেয়, তাহা হইলে এই কার্যের জন্য তাহাকে ফলভোগ করিতে হইবে। উপরোক্ত সতর্কবাণী সম্বলিত সোভিয়েট সরকারের বিবৃতি 'তাস' কর্তৃক প্রচারিত হইয়াছে।

২১শে ফেব্রুয়ারী—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী শ্রী হ্যারল্ড ম্যাকমিলানের মস্কো আগমনের মাত্র দুই ঘণ্টা পরেই তিনি আজ ক্রেমলিনে শ্রী নিকিতা খুশ্চেভের সহিত প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা করেন।

মার্কিন অর্থনীতিক দপ্তরের উপ-সচিব শ্রী সি ডগলাস ডিলন প্রতিনিধি সভায় বলেন, "বর্তমান পৃথিবীতে যেসব উন্নয়ন পরিকল্পনা লইয়া কাজ চলিতেছে, তাহার মধ্যে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়নের কাজই হয়ত বর্তমানে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

২২শে ফেব্রুয়ারী—আজ বিকাল হইতে সাইপ্রাসের রাজনৈতিক আটক বন্দীদিগকে ব্যাপকভাবে মুক্তিদান আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে। ১৯৫৫ সালে গৃহীত আটক আইন অনুযায়ী এইসব ব্যক্তি দ্বীপের কয়েকটি শিবিরে সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে বিনা বিচারে আটক ছিল।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার **সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা— ৪০ নয়া পয়সা

কালকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, ষান্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষান্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতার কিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আমুল মাখনের উৎকর্ষ ঠিক রাখার জন্য দৈনিক গড়পড়তা ১৩৭০ বার পরীক্ষা করা হয়।
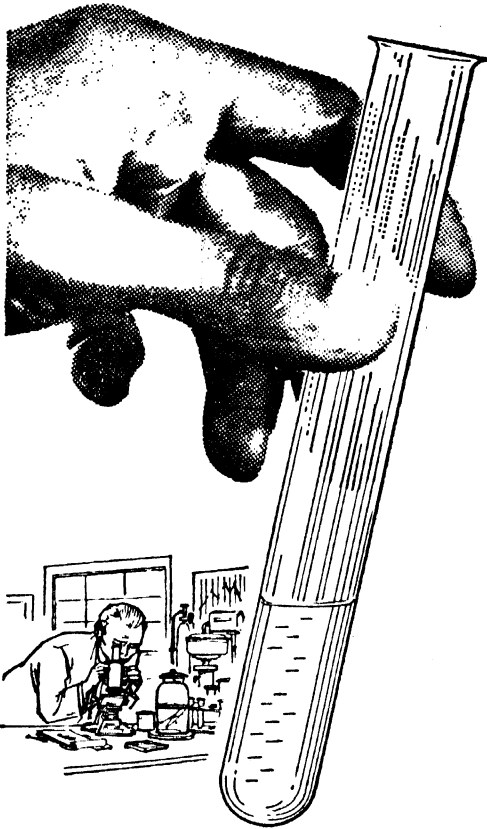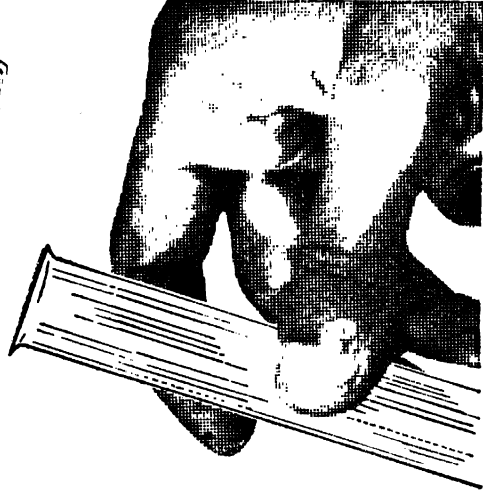
টাটকা দুধ থেকে সুরু করে, মাখন উৎপাদনের প্রত্যেকটি পর্য্যায়ে আমুল মাখন বারবার পরীক্ষিত হয়—টাটকা, বিশুদ্ধতা এবং স্নেহপদার্থের পরিমাণ সম্বন্ধে। এছাড়া, গুণ এবং বিশুদ্ধতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবাণুতত্ত্ব সংক্রান্ত পরীক্ষাও করা হয়। একমাত্র আমুল মাখনেই সর্বপ্রকার রোগবহনকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে এই অতিরিক্ত সতর্কতা আপনি পাবেন। সেইজন্যই আমুল মাখনের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা যখন দৈনিক গড়পড়তা ১৩৭০ বার পরীক্ষা করার কথা দাবী করি, তখন তা মোটেও অত্যুক্তি বলে ভাববেন না।

ভারত সরকারের এগ্রিক্যালচারাল মার্কেটিং এডভাইজরের নিকট থেকে খাঁটি পাস্তরাইজড মাখন বলে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত আমুল মাখন, বিদেশী ডেয়ারী বিশেষজ্ঞরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মাখনের সমতুল্য বলে মনে করেন। তাই টাটকা ও বিশুদ্ধতার প্রতীক—আমুল চাইবেন।

PSKMP-1859

মাখন চাইবেন—আমুল সবচাইতে খাঁটি

কৈরা ডিষ্ট্রিক্ট কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসারস্ ইউনিয়ন লিঃ আনন্দ (পশ্চিম রেলওয়ে)

REG. NO. C. 2109

দেশ
২৬ বর্ষ]   শনিবার ২৩ ফাল্গুন, ১৩৬[illegible] বঙ্গাব্দ   DESH   Saturday, 7th March, 1959   মূল্য—৪০ নয়া পয়সা   [সংখ্যা ১৯
গ্লিসারিন
স্বচ্ছ স্নেহস্পর্শময়
অনিন্দনীয় প্রসাধন
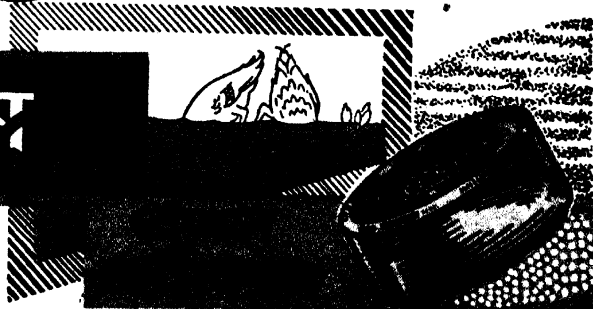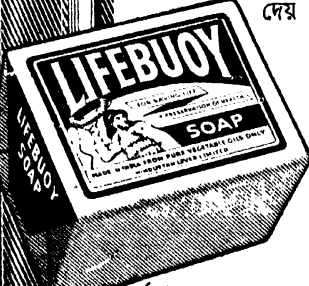
যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য
ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে
স্নান করেন
খেলাধুলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধুলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজাণু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজাণুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
LIFEBUOY
SOAP
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন-এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।

L. 280-X52 BG

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

প্রচ্ছদঃ শিল্পী ওয়াই, ডি, দেওলালীকর (বোম্বাই)

DESH 40 Naya Paisa.
Saturday, 7th February 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ১৯ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৩ ফাল্গুন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

ভারতের মানচিত্র

গত সপ্তাহে আমরা বেরুবাড়ী ও ছিটমহাল সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছি। এ সপ্তাহে পুনরায় যে সে বিষয়ে মন্তব্য করিতে বাধ্য হইতেছি তাহার কারণ বিষয়ের গুরুত্ব ও অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন। কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভার বর্তমান অধিবেশনেই বেরুবাড়ী হস্তান্তর বিল আনিবেন ঠিক ছিল, কিন্তু এখন প্রকাশ পাইয়াছে, বর্তমান অধিবেশনে বিল উপস্থাপিত না হইতেও পারে, কেন্দ্রীয় সরকার সকল দিক বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের মতামত গ্রহণ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিলম্ব সেইজন্য। 'অশুভস্য কালহরণম্' নীতি মন্দের ভালো। কিন্তু ইহা যদি সুকৌশলে ও ধীরে ধীরে বিলটিকে সমূলে পরিত্যাগ করিবার ভূমিকা হয় তবে আরো ভালো। রাজনীতিতে এমন নজির আদৌ বিরল নয় বলিয়াই আশা হইতেছে।

নেহরু-নুন চুক্তির অন্তর্গত বেরুবাড়ী ও ছিটমহাল হস্তান্তর সম্পর্কে যে প্রবল প্রতিবাদ পশ্চিমবঙ্গে তথা দেশের অন্যত্র ঘটিয়াছে তাহা উপেক্ষা করা সহজ নয়, তাহা লঙ্ঘন করা অসমীচীন। খুব সম্ভব শেষমুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিবাদের আন্তরিকতা ও নিজেদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়াছেন। আমাদের অনুমান সত্য হইলে আনন্দের কথা। কিন্তু সত্য হোক বা না হোক, এই জাতীয় তোষণনীতির এককালীন অবসান ঘটা আবশ্যক। এ দেশের ও বিদেশের ইতিহাসে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে যে, তোষণ নীতির দ্বারা লোভের অবসান ঘটানো যায় না, কেবল [illegible] [illegible] যায় মাত্র। এইরূপ তোষণ-নীতির পরিণামেই পাকিস্থানের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। এখনো দেখিতেছি তাহার বিরাম ঘটিল না। পাকিস্থান সৃষ্টি হইবার পর হইতে নানা অছিলায় উক্ত রাষ্ট্র ভারতের উপরে হামলাবাজী করিয়াই চলিয়াছে। আর ভারত ক্ষণস্থায়ী সুবিধা পাইবার বৃথা আশায় তাহাকে তোষণ করিয়াই চলিয়াছে। ব্যাপারটা নিতান্তই বিরক্তিকর। আসাম সীমান্তে পাকিস্থান যখন গুলীবর্ষণ করিয়াই চলিয়াছে তখন অবাস্তব চুক্তি রক্ষার অজুহাতে তাহাকে রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দেওয়া ঐ গুণ্ডাশাহীর জয়-জয়কার নয় কি? আর চুক্তি কাহার সঙ্গে? যে রাষ্ট্র চুক্তি করিয়াই ভাঙিতেছে, ভাঙিবার জন্যই চুক্তি করিতেছে তাহার সঙ্গেও কি পুনরায় চুক্তি করিতে হইবে? পাকিস্থানের পক্ষ হইতে এই জাতীয় চুক্তি যে অভিসন্ধিমূলক তাহা কি বুঝিবার সময় এখনও আসে নাই? কেহ দেখিয়া শেখে, কেহ ঠেকিয়া শেখে, কিন্তু হাজারবার ঠেকিয়াও যাহার শিক্ষা না হয় তাহাকে কি বলিব?

আর যাহাই হোক এক বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত যে পাকিস্থানের কোলে নিজেদের ভাত ঠেলিয়া দিয়া উদারতা দেখাইবার প্রয়োজন মোটেই নাই। অপরের অভিসন্ধির কূট মারপ্যাঁচের খেলায় জানিয়া শুনিয়া নির্বোধ সাজিবার মতন মহত্ত্ব আমাদের নাইবা থাকিল। অপর পক্ষে বাস্তবের দিকে নজর দিলেই বুঝিতে পারিব যাহাদের অকারণে যাইতেছে তাহাদের অধিকার রক্ষা করাকেই ন্যায় বলিয়াছে।

তারপরে দেখা যাইতেছে যে সমস্ত ব্যাপারটার গোড়ায় মানচিত্র সম্পর্কিত একটা ভুল বোঝাবুঝি আছে। (আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪শে ফেব্রুয়ারীর বিবরণ) যে অংশ হস্তান্তরের প্রস্তাব হইয়াছে তাহার মূলে আছে একখানি ভুল মানচিত্র—ঐ ভুল মানচিত্রের উপর নির্ভর করিয়া পাকিস্থানের দাবী নাকি মানিয়া লওয়া হইয়াছে! কী সর্বনাশ! এমন ভুল মানচিত্র হঠাৎ কোথা হইতে আসিল, এ জন্যে দায়ী কে, তাহার সম্যক তদন্ত হওয়া আবশ্যক। কেন না, প্রসঙ্গান্তরে আবার একখানি ভুল মানচিত্রের যে আবির্ভাব হইবে না তাহারই বা স্থিরতা কি? যে-সাক্ষীর সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে আদালত বাধ্য নয়। এক্ষেত্রে ভারত সরকারেরও বাধ্যবাধকতা আর থাকিতে পারে না। এখন তাঁহারা স্বচ্ছন্দে বিবেকের দংশন অনুভব না করিয়াই নিরস্ত হইতে পারেন। আর একবার যদি ভুল মানচিত্রের সাক্ষ্য স্বীকৃত হয়, সেই অনুসারে রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দিবার নীতি গৃহীত হয়, তবে শ্রাদ্ধ কতদূর গড়াইবে পূর্বাহ্নেই ভাবিয়া দেখা উচিত। ভারতের মানচিত্রের কতক অংশ যদি কোন প্রবল রাষ্ট্র নিজের বলিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখে তবে একদিন সেই রাষ্ট্রও যে চিহ্নিত অংশের দাবিদার হইয়া দাঁড়াইবে। তখন বেরুবাড়ী হস্তান্তর তাহার অনুকূলে নজির হইবে না কি? আমাদের এ দৃষ্টান্ত কাল্পনিক নয়, সকলেরই পরিজ্ঞাত, অন্তত পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত। তাই বলিতেছি কোন যুক্তিতেই, কোন চুক্তিতেই ভারতের রাজ্যাংশ আর হস্তান্তরিত হওয়া উচিত নয়। যথেষ্ট হইয়াছে। আর নয়।

প্রসঙ্গত

কলকাতা শহরের অনেক দোষ। কিন্তু গুণও যে কিছু নেই, তা নয়। একটা গুণ এই যে, আপন মনোভাব সে গোপন করে না। যখন তার মনে হয়, অনাদরে তাকে দূরে ঠেলে রাখা হচ্ছে, সে তার প্রতিবাদ জানায়। এবং খুব দুর্বল গলায় জানায় না। তার কণ্ঠ বরাবরই একটু উঁচু পর্দায় বাঁধা। এই মুক্ত কণ্ঠের জন্যই তার খ্যাতি। অখ্যাতিও এইজন্যই।

দেশ যখন স্বাধীন হয়নি, কলকাতা তার অভাব-অভিযোগের কথা তখন উঁচু গলাতেই জানিয়েছে। এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে, শ্রীনেহরুর সেটা ভাল লাগত না। দেশ স্বাধীন হবার পরেও কলকাতা মৌনাবলম্বন করেনি। প্রমাণ আছে যে, শ্রীনেহরুর এটা ভাল ঠেকছে না। কিছুদিন আগে এই শহরটাকে তিনি মুমূর্ষু বলে ধিক্কার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কলকাতা তাঁর কাছে একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে। এখন আবার বলছেন, এটাকে মিছিলের মহানগরী বললেই ভাল হয়। বুঝতে পারা যায়, শ্রী নেহরু এই শহরের উপর ঈষৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তাঁর এই বিরূপ মনোভাবের একটা কারণ এই হতে পারে যে, কলকাতার অভাব-অভিযোগ মেটাবার দায়িত্ব এখন আর বিদেশী সরকারের নয়। সে-দায় স্বদেশী সরকারের। শ্রীনেহরু স্বয়ং যার কর্ণধার।

অভাব যার আছে, সে তা জানাবেই। সেটা দোষের ব্যাপার নয়। বরং সেইটাই স্বাভাবিক। কলকাতাও জানিয়েছে। জানিয়ে দোষ করেনি। যাঁদের কাছে জানিয়েছে, তাঁরা তার অভাব মেটাতে পারেননি। এখন তাঁরা যদি জানান যে, মেটাবার মতন ক্ষমতা অথবা সামর্থ্য তাঁদের নেই, তবে সেটাও কিছু দোষের হয় না। মুশকিল হয়েছে এই যে, একে ত অভাব মিটছে না, তার উপরে সেই স্বীকৃতিটারই অভাব ঘটেছে। কলকাতার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আসলে ত্রুটিকে ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখনও হচ্ছে। কথাটা আক্ষেপের, তাতে সন্দেহ নেই।

* * *

কিন্তু শ্রী নেহরু যা-ই বলুন, বন্দর হিসেবে এই শহরের গুরুত্ব এখনও অপরিসীম। কলকাতা যদি না বাঁচে, ভারতীয় বাণিজ্যের উপরে তার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া ঘটবার আশঙ্কা। দেখে আমরা সুখী হয়েছি যে, শ্রীযুক্ত জে ডি কে ব্রাউন এই সত্য কথাটা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছেন, ফরাক্কা বাঁধকে এখন অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। কর্তৃপক্ষ যদি এ-ব্যাপারে তাঁদের হাত গুটিয়ে বসে থাকেন, শিল্প এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তার পরিণাম বড় মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে। শুধু যে উত্তর-পূর্ব ভারত তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা নয়, ক্ষতিগ্রস্ত হবে সমগ্র ভারতবর্ষ।

শ্রীযুক্ত ব্রাউন যা বলেছেন, তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নেই। এবং কথাটা কিছু নতুনও নয়। সকলেই জানেন, হুগলী নদীর অবস্থা বড় শোচনীয় হয়ে উঠেছে। পলিমাটি জমে জমে তার বুক ক্রমেই ভরাট হয়ে আসছে; ভাল করে যে নিশ্বাস নেবে, এমন ক্ষমতা তার নেই। এখন তার মধ্যে নতুন করে যদি আবার এক প্রবল জলধারা বইয়ে দেবার ব্যবস্থা করা না হয়, তা হলে অনতিকালের মধ্যেই তার অস্তিত্ব হয়ত ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। সেই সঙ্গে কলকাতার অস্তিত্বও। গবেষণা ভাল জিনিস। কিন্তু আপন অস্তিত্বকে গবেষণার বস্তু হতে দেওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। কলকাতাকে বাঁচাতে হবে। তার জন্যে হুগলী নদীকে বাঁচানো দরকার। এবং তার জন্য দরকার ফরাক্কা বাঁধের। নয়াদিল্লী কি তা জানে না? জানে। তৎসত্ত্বেও এই পর্যন্ত অকারণে কালক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু এখন আর নষ্ট করবার মতন সময় নেই। এখন আমরা শুনতে চাই যে, যে-অসুবিধেই থাক, আর হবে না দেরি। যে-মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, কলকাতাকে তার পথ থেকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। তার জন্য যে-মূল্যই দিতে হক।

* * *

বাঙালী তার নিজবাসভূমে খানিকটা পরবাসীর মতন হয়ে থাকে। তার একটা প্রধান কারণ তার আর্থিক দুর্গতি। তারও কারণ আছে। সরস্বতীকে সে তুষ্ট করতে পেরেছে, কিন্তু লক্ষ্মী তার প্রতি বিরূপ। ব্যাবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে সে তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেনি। মাত্রই অল্প কটি ব্যাবসাকে সে তার আপন হাতে রাখতে পেরেছে। দুঃখের কথা, সেই অল্প কটির মধ্যেও আবার একটির—পুস্তক-ব্যবসায়ের—অবস্থা আজ সঙ্কটাপন্ন।

পুস্তক-ব্যবসায়ে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার কারণ বহুবিধ। প্রধান কারণ দুটি: কাগজের মূল্যবৃদ্ধি এবং করের বাহুল্য। তার উপরে রয়েছে স্বল্পমূল্য বিদেশী বইয়ের প্রতিযোগিতা। কাগজ যে শুধু দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে, তা-ই নয়, দুষ্প্রাপ্যও। বেশী দাম দিয়েও কাগজ জোটানো এখন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। যদি বা জোটানো যায়, বইয়ের দাম না বাড়িয়ে উপায় থাকে না। অথচ বাঙালী ক্রেতৃসমাজের এমন সাধ্য নেই যে, চড়া দামে বই কিনবেন। নিছক ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করতেই মাইনের একটা মোটা অংশ যেখানে বেরিয়ে যায়, সেখানে বই কিনতে পারেন ক'জন? তার উপরে বইয়ের দাম যদি বাড়ে, ক্রেতার সংখ্যা তাহলে শূন্যের কোঠায় গিয়ে ঠেকবে।

সরকারকে এই সমস্ত কথা বিবেচনা করে দেখতে হবে। সমস্যার যাতে সুরাহা হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। একটা কাজ তাঁরা এখনি করতে পারেন। কর-প্রত্যাহার। প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয়, এই দুই সরকারের করের কড়ি যদি গুনতে না হয়, প্রকাশন-ব্যবসায় তাহলে এই নিদারুণ সঙ্কটের মধ্যেও একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারবে। সরকারকে মনে রাখতে হবে, শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রসারের প্রশ্নটিও এর সঙ্গে জড়িত। গান্ধীজী বলেছিলেন, স্বাধীনতার জন্যে বরং অপেক্ষা করতে পারা যায়, শিক্ষার জন্য পারা যায় না। স্বাধীনতা লাভের পর তাঁর এই উক্তিটিকে যদি আমরা বিস্মৃত হই, সে বড় দুঃখের কথা হবে।

* * *

বিদেশী কবি বলেছেন, শীত যদি আসেই, ভয় কী, অদূরেই ত বসন্ত। ভয় এইজন্য যে, বসন্ত বড় ক্ষীণায়ু। তার আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এল। এবার গ্রীষ্ম আসবে। অশ্বখুরে তার ধূলিরাশি উৎক্ষিপ্ত হবে, নিশ্বাসে অগ্নিজ্বালা। বাতাস ত ইতিমধ্যেই তপ্ত হয়ে উঠেছে। আরও হবে। গ্রীষ্ম যেন এক কাপালিক ঋতু। হৃদয়কে কঠিন করে দিয়ে সেই কাপালিকের প্রতীক্ষাতেই এখন বসে আছি।

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণে উপন্যাস "মুখের রেখা" এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না। আগামী সংখ্যা হইতে নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।

সম্পাদক, 'দেশ'

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের সোভিয়েট ভ্রমণ বৃটেনের পক্ষে অথবা পশ্চিম শক্তিগোষ্ঠীর পক্ষে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছে বলে মনে হয় না। বরঞ্চ মিঃ ম্যাকমিলান একটু মনঃক্ষুন্ন হয়েই ফিরে আসছেন বোধহয়। বলা বাহুল্য রাশিয়ানরা মিঃ ম্যাকমিলানকে খাইয়েছে দাইয়েছে ভালো কিন্তু কাজের কথা কওয়ার দিক দিয়ে বিশেষ আমল দেয়নি। হয়ত এড়িয়ে গেছে, অথবা এমন কথা বলেছে যাতে ম্যাকমিলানের মস্কো গমন নিরর্থক বলে মনে হতে পারে। মিঃ ম্যাকমিলান যখন রাশিয়ায় উপস্থিত তখন মিঃ খ্রুশ্চেভ এমন একটি বক্তৃতা করলেন যা থেকে মনে হবে যে বার্লিনের ব্যাপারে রাশিয়া যা বলেছে তার এক-কড়াক্রান্তির ব্যতিক্রম করে মিটমাটের আলোচনা করতে তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। মিঃ ম্যাকমিলান বলেছেন যে, তিনি রাশিয়া এবং পশ্চিমাশক্তিদের মধ্যে মিটমাটের শর্ত আলোচনা করতে আসেননি। (সে-সব উভয় পক্ষের পররাষ্ট্র সচিবদের বৈঠকে অথবা তারপর শীর্ষ সম্মেলনে হতে পারে), তিনি রাশিয়ার মনের সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছেন, তাতেও বিশ্বশান্তির সেবা হবে ইত্যাদি। কিন্তু মিটমাটের শর্ত আলোচনা করতে যিনি পারেন না তাঁর কাছে সোভিয়েট নেতারাও নিজের মনের পরিচয় দিতে ঔৎসুক্য দেখালেন না। বৃটেনের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করতে সোভিয়েট রাজী আছে, একথা ঘোষণা করে মিঃ খ্রুশ্চেভ যেন আরো ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে মিঃ ম্যাকমিলানের তরফ থেকে যখন আসল বক্তব্য কিছু নেই তখন রাশিয়াও ফাঁকা কথা ছাড়া কিছু বলবে না। কারণ বন্ধুত্বের চুক্তি করা না করায় বিশেষ কিছু আসে যায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে সোভিয়েট ও বৃটেনের মধ্যে একটা বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদিক হয়েছিল না? বৃটেন কর্তৃক সুয়েজ আক্রমণের সময়ে সোভিয়েট (সম্ভবতঃ আরবদের প্রতি সৌহার্দ্য দেখাবার জন্য) সেই চুক্তি একতরফা বাতিল করে দেয়। সুতরাং এরকম বন্ধুত্ব বা অনাক্রমণচুক্তি খুব একটা বড়ো জিনিস নয়। বিশেষত যখন একলা বৃটেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা কেউ ভাবছে না। গোলমাল হলো কম্যুনিস্ট ও পশ্চিমা শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে—বার্লিন নিয়ে, নির্উক্লিয়ার অস্ত্র ব্যবহার বন্ধের বন্দোবস্ত নিয়ে, ইত্যাদি। এই সব বিষয়ে মিঃ খ্রুশ্চেভ প্রকাশ্যে যে সব কথা বলেছেন তা থেকে দু রকম সিদ্ধান্ত করা যায়—সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট যা বলেছেন তাতেই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবেন অর্থাৎ পশ্চিমা শক্তিরা যাকে ভাঁওতা বা বহ্বারম্ভ বসে মনে করছিল সেটা ভাঁওতা নয় রাশিয়া যা বলেছে তা থেকে সে নড়বে না, অথবা রাশিয়ার 'শেষ কথা বলে দিয়েছি'র ভাবটা ভাঁওতা হলেও এটা যে ভাঁওতা তা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে ফাঁস হতে দেবে না অথবা কখন ফাঁস হতে দেবে তা আন্দাজ করতে দেবে না। সুতরাং মিঃ ম্যাকমিলানের বিশেষ কিছু লাভ হবে বলে মনে হয় না।
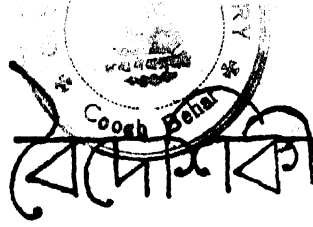
মিঃ ম্যাকমিলানের মুশকিল হচ্ছে তিনি নেহাতই ছোটতরফের প্রতিনিধি। সোভিয়েটের আসল প্রতিপক্ষ হচ্ছে আমেরিকা। এই সময়ে মিঃ ডালেস গুরুতরভাবে পীড়িত হয়ে পড়ায় সোভিয়েটের সঙ্গে এই কূট-নৈতিক খেলায় পাল্লা দেওয়া পশ্চিমা শক্তি-দের পক্ষে আরও বেশি কঠিন হয়ে পড়ছে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের যে রকম শারীরিক অবস্থা তাতে তিনি অনেকদিন থেকেই প্রেসিডেণ্টের পুরা দায়িত্ব বহন করছেন না। মার্কিন বৈদেশিক নীতির রচনা ও পরিচালনা—ভালো হোক মন্দ হোক—তা মিঃ ডালেস একাই করে আসছিলেন। মিঃ ডালেস এখন শয্যাশায়ী, তিনি ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাঁর আরোগ্য লাভের আশা একরকম নেই বললেই চলে। প্রথমে তাঁর রোগ সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচারিত হয় এখন শুনা যাচ্ছে যে তার চেয়ে অবস্থা অনেক বেশি নৈরাশ্যব্যঞ্জক। এই সময়ে শ্রী ডালেসের অশক্ত হয়ে পড়া কেবল আমেরি-

কার পক্ষে নয় সমস্ত পশ্চিমা শক্তিগোষ্ঠীর পক্ষেই খুব মুশকিলের কারণ হয়ে উঠেছে। পশ্চিমা শক্তিদের মধ্যে যাদের মিঃ ডালেসের ধরনধারন ভালো লাগত না, অনেক সময়ে বিপজ্জনক বলে মনে হতো তারাও এই সময়ে মিঃ ডালেসের নেতৃত্বের অভাব অনুভব করছে। আমেরিকা যদি পশ্চিমাদের খুঁটো না হতো তাহলে এমন হতো না। এখানে মুশকিল হচ্ছে এই যে মার্কিন রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে বুঝা যায় না যে, শ্রী ডালেসের জায়গা কে নিতে পারে। এই অবস্থার সুযোগ সোভিয়েট ইউনিয়নের কূটনীতিজ্ঞরা নিশ্চয়ই নেবে। বার্লিন সম্পর্কে পশ্চিমাশক্তিরা কী করতে অথবা কী করার শক্তি তাদের আছে, সে সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা বাড়ছে।

*

সাইপ্রাসে শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু যে-সব শর্তে বিবাদভঞ্জন হবে বলে ধরে নিচ্ছি সেগুলির মধ্যেও ভবিষ্যত বিবাদের কিছু কিছু বীজ উপ্ত থাকবে বলে আশংকা হয়। বলাবাহুল্যে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁদের মত বদলেছেন। আগে যা অসম্ভব বলা হতো তাই এখন সম্ভব বলে ঘোষিত হচ্ছে। অবশ্য গ্রীস ও তুর্কী সরকারের প্রতিনিধিরা যে একটা মিটমাটের রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন এটাও কম আশ্চর্যের কথা নয়। তাঁদের সেই মিটমাটের ভিত্তির উপরই লণ্ডনে ত্রিপক্ষীয় কনফারেন্স বসে এবং তাতে বৃটেন, গ্রীস এবং তুর্কী যোগ দেয়। মিটমাটের প্রধান শর্তগুলি হচ্ছেঃ (১) সাইপ্রাস স্বাধীনতা লাভ করবে, তবে সাইপ্রাসের দু জায়গায় বৃটেন সামরিক ঘাটি রাখতে পারবে এবং সেই ঘাটির দু জায়গা সম্পর্কে সার্বভৌম অধিকার বৃটেনের থাকবে; (২) সাইপ্রাসের স্বাধীনতা সম্পর্কে বৃটেন, গ্রীস এবং তুর্কীর গ্যারাণ্টি থাকবে; (৩) সাইপ্রাসের অন্য কোনও দেশের সংগে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সংযুক্তির প্রচেষ্টা অথবা সাইপ্রাসকে ভাগ করার প্রচেষ্টা অবিধেয় হবে এবং সে রকম প্রচেষ্টা সাধ্যমত নিবারণের দায়িত্ব বৃটেন, গ্রীস ও তুর্কী স্বীকার করছে; (৪) সাইপ্রাস রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট হবেন সাইপ্রাসের গ্রীকজাতীয় ব্যক্তি, ভাইস প্রেসিডেণ্ট হবেন একজন তুর্কীজাতীয় সাইপ্রাস অধিবাসী এবং মন্ত্রিমণ্ডলী, প্রতিনিধিসভা এবং সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে গ্রীক ও তুর্কীর অনুপাত হবে ৭·৩ এবং সৈন্যবাহিনীতে হবে ৬·৪। উপরোক্ত এবং অন্যান্য ধারা সম্বলিত একটি কনস্টিটিউশন তৈরী করার জন্য একটি যুক্ত কমিটি নিযুক্ত হয়েছে, এক বছরের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পূর্ণ হয়ে নূতন কনস্টিটিউশন চালু হবে। সাইপ্রাস বৃটিশ কমনওয়েলথে থাকবে কিনা সেটা স্বাধীনতা লাভের পরে সে স্থির করবে।

সাইপ্রাসের ভূমি ভাগ হল না বটে (বৃটিশ অধিকৃত ঘাটিগুলির কথা এখন বাদ রেখে বলছি) কিন্তু সাম্প্রদায়িকভাবে উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ভাগ হলো। এরূপ বিভক্ত রাষ্ট্রের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা সহজ হবে না। যে-সব শর্ত হলো, সেগুলো ভংগ হলে তার প্রতিকার করা তিন গ্যারাণ্টর গভর্নমেণ্টের কর্তব্য হবে এবং তাঁরা যদি একমত হতে না পারেন, তবে তাঁরা পৃথক পৃথকভাবে স্ব স্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন। এ থেকে বিবাদ উপস্থিত হওয়া সহজ। বর্তমান আপোস মীমাংসায় অনেক লোক খুশী হবে না। গ্রীক পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে যে বিতর্ক হয়েছে তাতে এই মিটমাটের পক্ষে বেশি ভোট হলেও বিরুদ্ধেও বেশ ভোট ছিল। এই বিরুদ্ধতা সাইপ্রাসেও কিছুটা প্রতিবিম্বিত হবে। তবে আর্কবিশপ ম্যাকারিওস এই আপোস মীমাংসায় সম্মতি দিয়েছেন—তিনি লণ্ডন কনফারেন্সেও যোগ দিয়েছিলেন—সেইজন্য আশা করা যায় যে সাইপ্রাসে গ্রীকদের মধ্যে অনেকে সন্তুষ্ট না হলেও চুক্তিটা চালু হবে, কিন্তু চলাটা বাধাবিহীন হবে না। ১।৩।৫৯

বাজেট প্রসঙ্গে
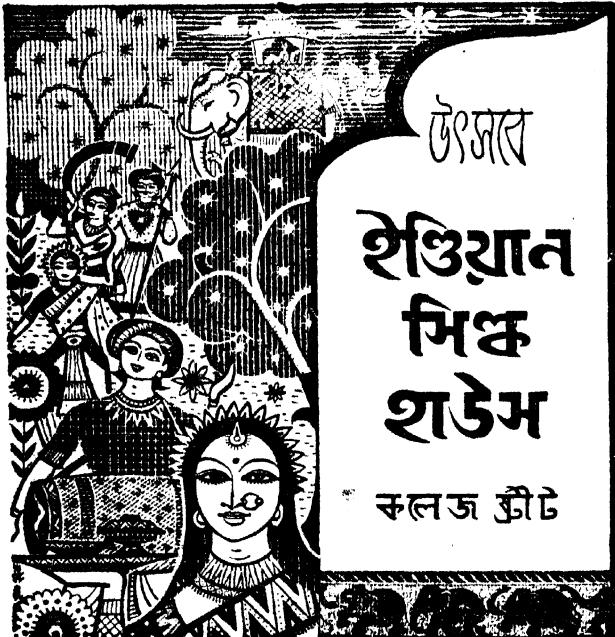
অজিতকুমার দাশ

শনির শেষে, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ভারতের অর্থমন্ত্রী লোকসভায় তাঁর ১৯৫৯-৬০ সালের বাজেট পেশ করেছেন।

বহু আশা-আশঙ্কার দোলা দেবার পর বাজেট এসেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যাঁদের যত টাকা সরকারী বাজেট সম্পর্কে, তাঁদের ভয় ও উৎকণ্ঠা থাকে তত বেশী। আর ঠিক বাজেটের আগে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে, বিশেষ করে যাঁরা বিনা বিজিনেস-এর অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের আর দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না।

এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তার কারণও ছিল। এটা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তৃতীয় বছরের বাজেট।

আর তার চেয়েও বড় কথা ছিল—এটা মোরারজী দেশাই-এর বাজেট।

ভারত সরকারের টানাটানির কথা কারও অবিদিত নেই। পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এই পরিকল্পনার পরিমাপ, প্রধান মন্ত্রী বারবার বলছেন, লভ্য বা সহজে গ্রহণযোগ্য অর্থের পরিমাণের ভিত্তিতে করলে চলবে না; করতে হবে দেশের দরিদ্র জনগণের ন্যূনতম প্রয়োজনের ভিত্তিতে। সুতরাং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ছাঁটাই চলবে না, আর তৃতীয় পরিকল্পনাটিও ছোট হলে চলবে না। অথচ হাতে যখন টাকা নেই, আয়ের চেয়ে ব্যয়ের প্রস্তাবিত অঙ্কটা অনেক বেশী, তখন নিশ্চয়ই ট্যাক্স বাড়বে এবং রাষ্ট্রীয় শিল্প ও ব্যবসার সুযোগ গ্রহণ করতে লোককে মূল্য দিতে হবে বেশী।

সবচেয়ে বড়ো ভাবনা ছিল মোরারজীকে নিয়ে। বারবার ব্যবসায়ীদের তিনি সাবধান করে 'স্পষ্ট কথা' বলে দিয়েছিলেন, "ট্যাক্সের হার তো কমবেই না, বাড়বে না যে তাও বলতে পারি না। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান মন্ত্রী নেহরুও একাধিকবার রক্তচক্ষু দেখিয়ে বড়ো ব্যবসায়ীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন,—"কোনও আবদার শুনব না। তোমরা নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেবার জন্য সরকারী শিল্পগুলির বিরুদ্ধে ভাড়াটে লেখক আর সমালোচকদের দিয়ে জেহাদ ঘোষণা করেছ। আমরা আমাদের পরিকল্পনায় এগিয়ে যাব—টাকার ব্যবস্থা কেমন করে করতে হয়, তা আমরা ভাবব। তোমরা সৎভাবে কারবার কর। নিজের চরকায় তেল দাও।"

গত বাজেট পেশ করেছিলেন সাময়িক অর্থমন্ত্রী হিসাবে আমাদের প্রধান মন্ত্রী নেহরু। তার আগের বাজেট পেশ করেছিলেন শ্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী। গত বছরের বাজেটও কিন্তু কৃষ্ণমাচারীই তৈরী করেছিলেন। উপস্থাপন করেছিলেন মাত্র নেহরুজী।

যিনিই পেশ করুন, বাজেট তো ভারত সরকারের। তবু অর্থমন্ত্রীর নামের সঙ্গে জড়িয়ে বাজেটের নামকরণ করাটাই এখনকার রেওয়াজ। তার কারণও আছে। যতই দলীয় বা রাষ্ট্রীয় নীতি মেনে তৈরী হক না কেন, প্রতি বাজেটেই অর্থমন্ত্রীর নিজের ব্যক্তিত্বের একটা ছাপ পড়েই।

সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে কৃষ্ণমাচারী ও মোরারজীর বাজেটে অনেক নীতিগত তারতম্য চোখে পড়ে। কৃষ্ণমাচারী ব্যবসায়ে সাফল্যের পর রাজনীতিতে এসেছিলেন। হঠাৎ চিন্তামণি দেশমুখ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করাতে

তাঁর ভাগে অর্থমন্ত্রিত্ব এসে যায়। ব্যবসায়ী কুল বরাবরই কৃষ্ণমাচারীকে "আমাদের কৃষ্ণমাচারী" বলতেন। তাঁর কাছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অনেক আশাও ছিল। তাঁর দোষগুণের আলোচনা এখানে করব না। তবে মোরারজী দেশাইর বাজেট দেখে একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, কৃষ্ণমাচারীর চেয়ে মোরারজীর মনটাই বেসরকারী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য কেঁদেছে অনেক বেশী।

১৯৫৯-৬০ সালের বাজেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, বড় বড় ব্যবসায়ীরা এতে আশাতীতভাবে খুশি হয়েছেন। তেমনি সাধারণ করদাতারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অতি চালাক বা অতি সাবধানী অনেক ব্যবসায়ী বা তাঁদের প্রতিষ্ঠান হয়তো আনন্দটা চেপে গেছেন, কিন্তু শেয়ার বাজারে শনিবারের সন্ধ্যায় বাজেট প্রকাশিত হবার পর আনন্দের রোল উঠেছিল—কারণ একথা সবাই স্বীকার করবেন যে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কুলীনরা ট্যাক্সের ব্যাপারে অনেক সুবিধে পেয়েছেন। কোম্পানীর ওপর থেকে ওয়েলথ ট্যাক্স ও এক্সেস ডিভিডেন্ড ট্যাক্স তুলে নেওয়া হয়েছে। তার বদলে যে ট্যাক্সের ব্যবস্থা সর্বসাকুল্যে শতকরা ৪৫% বসান হয়েছে—তাতে এদের ৬% ট্যাক্স কমে গেল, শেয়ার বাজারে অন্তত শনিবারে এই ধারণা ছিল। পরে কথা উঠেছে এই নতুন ব্যবস্থা ১৯৫৯-৬০ অথবা ১৯৬০-৬৬তে চালু হবে, সেটা বড়ো কথা নয়। অন্যদিকে সাধারণ লোকের সাধ ও সাধ্যের দুকূল রক্ষা করে যেসব জিনিসের ব্যবহার ক্রমেই বাড়ছিল, সরকার তাতে বাদ সেধেছিল। কৃত্রিম রেশমী কাপড় পরে যাঁরা মুর্শিদাবাদী সিল্কের সখ মেটাবার অপচেষ্টা করতেন, ঘি'র বদলে বনস্পতি দিয়ে যাঁরা সুখ ও সামাজিকতা রক্ষা করতেন, দুটো জিনিসই তাঁদের এর পর বেশী দাম দিয়ে কিনতে হবে, ট্যাক্স বেড়ে গেছে। সিগারেটের বদলে বাবুরাও অনেকে বিড়ি ধরলেন বলে।

আরও যেসব নতুন ট্যাক্স বাড়ল। তার ঠেলাও জনসাধারণকে সামলাতে হবে। গাড়ির টায়ার, ডিজেলের ট্যাক্স বাড়ল। গাড়ি নেই বলেই সাধারণ লোকের মুক্তি নেই। বাসভাড়া বাড়ল বলে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আশা-আশঙ্কার

খেলায় বড় ব্যবসায়ীর অনেক আশা অপ্রত্যাশিতভাবে পূর্ণ হয়েছে। জনসাধারণ আশংকার চাইতে বেশী ধাক্কা খেয়েছে। জনসাধারণের করের বোঝা নতুন করে অনেক বেশী বাড়ল এমন কথা হয়তো বলা যাবে না। তবে নীতিগতভাবে একথা মানতে হবে যে, সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে খোলাখুলিভাবে না হলেও, প্রচ্ছন্ন-ভাবে আরও টাকা আদায়ের চেষ্টা করছেন। যুক্তি—এই টাকায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সার্থক হবে, জনসাধারণেরই আর্থিক উন্নতি হবে।

সাধারণ করদাতা প্রশ্ন করতে পারেন—কবে, কারা, আমাদের কোন পুরুষ এর ফল পাবে। জনসাধারণের মনের ভাবটার কাছাকাছি একটি কথা একটি বিদেশী সৈনিকদের কবরের পাশে প্রস্তর ফলকের কথা দিয়ে হয়তো বোঝান যাবে। কোহিমাতে আমেরিকান সৈনিকদের গোরস্থানের গায়ে লেখা—

"When you go home, tell them of us and say, for their tomorrow we gave our today."

জনসাধারণকেও যেন অনাগতদের আগামী-কালের জন্য নিজেদের আজকাল বিকিয়ে দিতে বলা হচ্ছে।

প্রশ্ন জাগে এই গত তিন বছরের বাজেটের মূলনীতি কি? এই নীতি কার অবদান? এই সম্পর্কে অনেকেই অধ্যাপক ক্যালডরকে স্মরণ করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিকোলাস ক্যালডরকে ভারত সরকারের অর্থমন্ত্রণালয় ১৯৫৬ সালে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলেন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কর-ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে সুপারিশ করতে। এখানকার অবস্থা দেখে তো অধ্যাপকের চোখ ছানাবড়া। তিনি বললেন, ভারত সরকার টাকা নেই, টাকা নেই বলে দিবারাত্রি হা-হুতাশ করেন—অথচ সরকারের নাকের ডগায় শেঠজিরা বৎসরে অন্ততঃ ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা কর ফাঁকি দিচ্ছে। তিনি বললেন, এটি বন্ধ করতে পারলেই অনেক অভাব দূর হবে। এটা বন্ধ করা হোক, তাহলে করের হার কমানো সম্ভব হবে; অথচ কর বাবদ আদায় কমবে না। ব্যবসায়ীরা তাঁর কাছে অভিযোগ করলেন, করের চাপে কারবার করাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে, করের ভয়ে নতুন ব্যবসায়ে কেউ আসতে চায় না। উদ্বৃত্ত আয় লোকেরা সঞ্চয় করতে চায় না, অথচ সঞ্চয়েতেই নতুন মূলধনের সূত্রপাত। সব দেখেশুনে ক্যালডর বললেন আয়ের শতকরা ৪৫ ভাগের বেশী কর বাবদ নিয়ে নিলে, ব্যবসায়ের নতুন উৎসাহ (ইনসেনটিভ) থাকবে না। আর করের হার কমলে আয় ফাঁকি দেবার চেষ্টাও

কমবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সম্পত্তি কর, দান কর ইত্যাদি নতুন করের সুপারিশও করেছিলেন। কৃষ্ণমাচারী শেষোক্ত দুটি কর আগেই প্রবর্তন করেছিলেন। এবার মোরারজী ব্যবসায়ীদের করের হার কমিয়ে ৪৫%এ আনার ব্যবস্থা করলেন।

কিন্তু কৃষ্ণমাচারী বা মোরারজি কেউ কর ফাঁকি বন্ধ করা সম্পর্কে অধ্যাপক ক্যালডরের কথা শুনলেন না। তিনি বলেছেন, যেসব ব্যক্তিবিশেষের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকার ঊর্ধ্বে এবং যেসব ব্যবসায়ের আয় ৫০,০০০এর ঊর্ধ্বে তাঁরা নিজেরাই দেখান, সরকার থেকে তাঁদের খাতাপত্র হিসাবপরীক্ষক দিয়ে পরীক্ষা করা হোক; ট্যাক্সের ব্যাপারে পুকুর-চুরিটা ধরা পড়বে।

বাজেটের সময় ছোট-বড়, প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন যে কোনও নূতন করের যত সামান্য বোঝাই চাপান হোক না কেন, সাধারণ মানুষ এই কথা ভাববেই—কেন কর-ফাঁকি বন্ধ না করে আমাদের ঘাড়ে বোঝার ওপর শাকের আঁটি চাপান হচ্ছে। এক পয়সার লড়াই এদেশের লোকেরা করে, কারণ "অল্প লইয়া থাকি তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।"
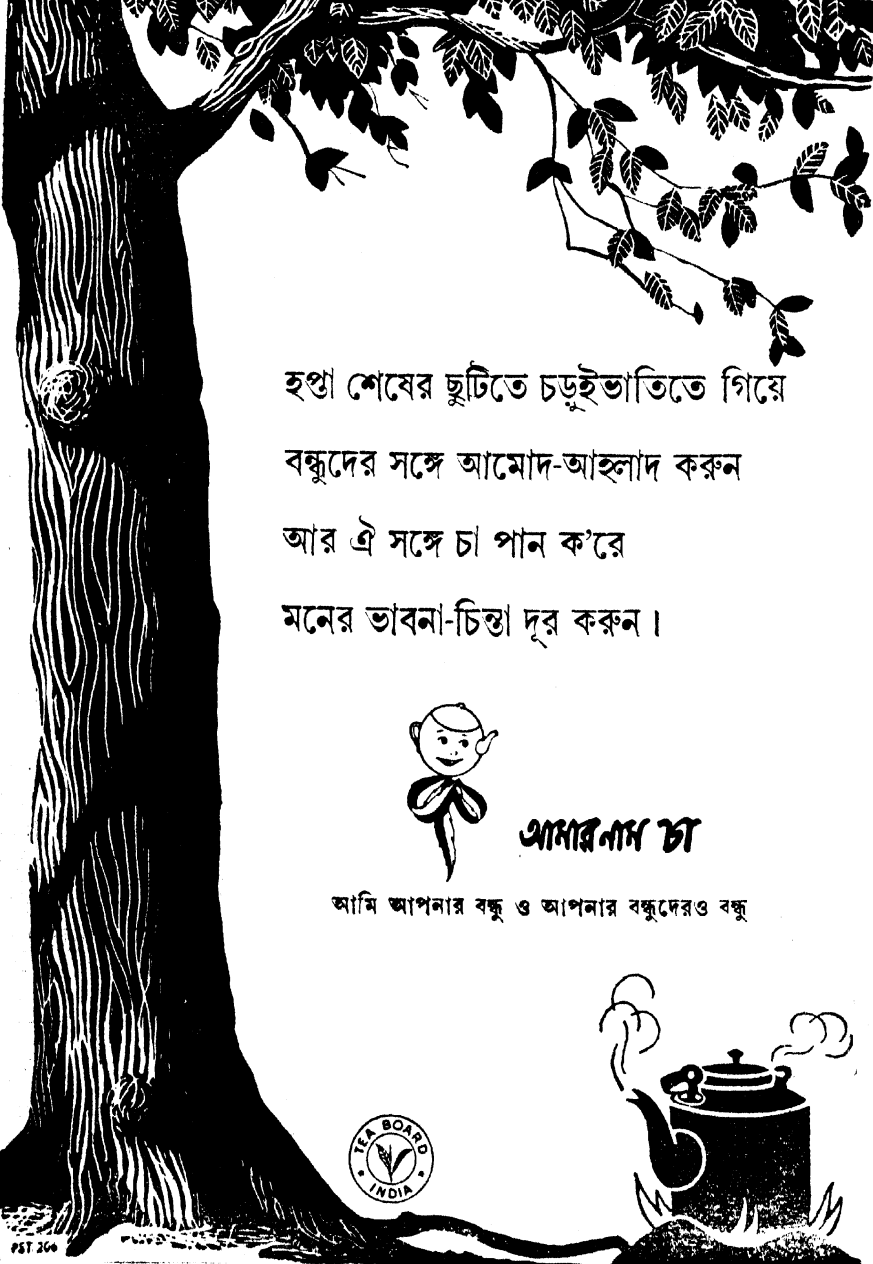
১০

এমন কিছু পেল্লায় বোঝা সোনা মিঞা চাপায়নি তার গাড়িতে। পাঁচ মণ পাটও আছে কিনা সন্দেহ। সমুন্দির গরু তাও টানতে পারে না। রাগে কসকস্ করছে সোনা মিঞার শরীর। দ্যাখ দিকিনি, দ্যাখ দিকিনি, শালার গরুর রকম দ্যাখ দিকিনি। সোনা মিঞা বিপদ বুঝে চঞ্চল হয়ে উঠল। বাঁয়ের গরুটার লেজ মলে, ডাইনের গরুটার পেটে পায়ের গুঁতো মেরে মেরে, হেই গরুটি বাঁ বাঁ, বাঁ বাঁ বা, হেই হেই, করতে করতেই তার গাড়ি খানায় পড়ল। ভাদ্দর মাসের কড়া রোদ, পিঠের উপরকার প্রকাণ্ড মস্তে দাদখানায় রোদ পড়ে অসহ্য জ্বলুনি ধরিয়েছে, যেন করাত দিয়ে কেউ তার পিঠের মাংস কেটে নিচ্ছে। দরদরে ঘাম আবার তার উপর নুনের ছিটে মারছে।

সোনা মিঞার মাথায় খুন চেপে গেল। লাফ দিয়ে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। বিরাট একটা লাঠি বের করে, দুহাত দিয়ে ধরে গায়ের জোরে গরুদুটোর পিঠে মারল দুই বাড়ি। হাড় জিরজিরে গরু দুটোর শিব-দাঁড়া দুটো বেঁকে গেল নিচের দিকে। হুড়মুড় করে তারা এগোবার চেষ্টা করল। প্রাণপণ শক্তিতে। কিন্তু গাড়ির চাকা শক্ত কাদায় ঠেকেছে। এক চুলও নড়াতে পারল না। বাঁ পাশের গরুটার পিঠে বড় বড় ঘা। ফেটে রক্ত বেরুতে লাগল। ডান পাশের গরুটা ধ্যাড় ধ্যাড় করে খানিকটে ধোঁড়িয়ে দিল। তবু গাড়ি এগোল না।

সোনা মিঞার চেহারা তার বলদ দুটোর চেয়ে কিছুমাত্র উন্নত নয়। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে সে নিজেও তার জেলার আর দশজন চাষীর মত হাড্ডিসার। বড় লাঠির দুটো ঘা কষিয়ে সে যেমন তার গরুদুটোকে কাবু করল, তেমনি ঐটুকু পরিশ্রমে নিজেও কাহিল হয়ে হাঁফাতে লাগল।

বলদ দুটোর চেহারা সত্যিই একটু অদ্ভুত ধরনের। সৃষ্টিকর্তা যেন প্রথমে পেট মোটা দুদিক সরু দুটো বৃহৎ নারকেলে কুল বানিয়েছিলেন। তারপর তাঁর বলদ বানাবার স্পৃহা জাগরূক হওয়ায় সেই নারকেলে কুলেরই একদিকে মাথা এবং অন্যদিকে লেজ জুড়ে নিচের দিকে চারটি করে খুর-ওয়ালা পা বসিয়ে দিয়েছেন।

অবশ্য, সোনা মিঞা সেজন্য পরিতাপ করল না। তার গায়ের জোর কমে এলেও রাগের তেজ কমেনি। কারণ, আর একটু-খানি পথ এগিয়ে গেলেই সে খেয়াঘাটে পৌঁছাত এবং একটু সকাল সকাল পৌঁছাতে পারলে সে দু একটা নতুন ফড়ে ধরে তার পাটগুলো গস্ত করতে পারত। নতুন ফড়েদের কাছে পাট বেচার সুবিধে এই, দামটা নগদ পাওয়া যায়। আর মামু আড়তদারদের চাইতে তারা লোকও একটু ভাল হয়। দামটাও ওরা দু এক আনা বেশি দেয়।

পাটের আড়তদারদের মধ্যে সব থেকে ঘুঘু ঐ কানা মাড়োয়ারী আগরওয়ালা। ঐ শালাকে দুচক্ষে দেখতে পারে না সোনা মিঞা। অবশ্য না দেখতে পারার প্রধান কারণ, সোনা মিঞা আজ আট দশ বছর ওর কাছে কিছু টাকা ধারে। যুদ্ধের মধ্যে পাটের দাম হু হু করে বেড়ে গিয়েছিল। পাট তখন সোনার দামে বিকিয়েছে। সোনা মিঞার তখন বোলবোলাও অবস্থা। বৌয়ের জন্য মল খাড়ু কিনেছে, কাঁসার থালায় ভাত খেয়েছে, ভাইকে সাইকেল কিনে দিয়েছে, ঘরের চালে টিন তুলেছে, চালের মাথায় আবার শখ করে পাকা মিস্তিরি লাগিয়ে টিন কেটে ময়ূরও বসিয়েছিল। তখন সোনা মিঞা প্রকৃত মিঞাদের মতই চলাফিরা করেছে। পশ্চিম দেশের দামী বদনাই কিনেছিল চারটে। ঘন ঘন দাওয়াত দিয়েছে বাড়িতে। তখন সে মাতব্বর। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বর। যে সে লোক নয়। তাদের গ্রামে সিল্কের লুঙ্গি, জুতো আর ইস্টাকিঙের চল সেই প্রথম করেছিল। চশমা কেনবার ইচ্ছেও ছিল। মেন্দা সাহেব যে চশমা চোখে দেন, সেই কছমের একটা। সে শখটাই শুধু মেটেনি সোনা মিঞার।

তার আগেই নসিবে আগুন লাগল। যুদ্ধ থেমে গেল। পাটের দাম নামতে লাগল। চার বছরের মধ্যেই কি হয়ে গেল দ্যাখ।

সেই উঠতি সময়ে ঐ আগরওয়ালা মাড়োয়ারি সোনা মিঞাদের একেবারে বুকে করে রেখেছিল। চাইলেই টাকা দিত, বাঁধ বাঁধ টিন দিত, সাইকেল, ঘড়ি, লণ্ঠন, নাও না, কে কি নেবে। দাদনের চিটেয় সই মারো, না হয় বুড়ো আঙুলের টিপ ছাপ দাও, দিয়ে মাল নিয়ে চলে যাও, পাট দিয়ে দাম শোধ করো।

সেই টিপছাপের মারপ্যাঁচে কি করে যেন সোনা মিঞাকে দেনার জালে জড়িয়ে ফেলেছে ঐ মাড়োয়ারি সুমুন্দির পো। প্রথমে ছিল তিরিশ টাকার দেনা। বাড়তে বাড়তে

এখন সেটা নাকি ষাট টাকায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে। ঐ দেনা দেখিয়ে দেখিয়ে প্রতি বছর ওর কাছ থেকে সস্তা দরে পাট নিয়েছে। জবরদস্তি করে নিয়েছে। বাজারের দর যখন কুড়ি টাকা, তখন মাড়োয়ারি দর দিয়েছে আঠারো। শালা কানা হলে হবে কি, পেটে পেটে বুদ্ধি। এক চোখ কানা যার বিরোআশি বুদ্ধি তার। সারা হাটে শালা লোক বসিয়ে রাখে। খাতকরা যে ফাঁকি মেরে অন্যের কাছে মাল গস্ত করে পালাবে, তার উপায় নেই।

পলেনপুরের বদু কলু এই ব্যবসায় নতুন নেমেছে। তার সংগেই সোনা মিঞার কথা হয়েছিল। হাটে না ঢুকে, সোনা মিঞা পাশ কাটিয়ে খেয়াঘাটে যাবে। সেখানেই বদু কলুকে মাল গস্ত করে দেবে। বদু কলু একটু সকাল সকাল যেতে বলেছিল। তার পুঁজি কম। যার মাল আগে পাবে তারটাই কিনে ফেলবে। তবে? এর মধ্যে যদি অন্য লোকের মাল কিনে ফেলে বদু?

তড়াক তড়াক করে রক্ত সোনা মিঞার মাথায় উঠতে লাগল। বড় লাঠি রেখে দিয়ে পাচন-নড়িখানা তুলে নিল হাতে। ডানদিকের গরুটোর পিছনে মারল খোঁচা। তবু গাড়ির চাকা এক বিন্দু নড়ল না। সোনা মিঞা পাগলের মত ধাই ধাই পিটতে থাকল বলদ দুটোকে।

আর পাগলের মত চেঁচাতে থাকল, "সুমুন্দির গরু, বাড়ি যা'য়ে আজ তোগের জবাই করব। শালা বলদ না হলি এতদিন তো পাঁচ ছাওয়ালের বাপ হতিস, আজউ জান বাঁ সড়গড় হ'লো না। খানায় গাড়ি ফেলে ভাবিছ, দিনির মত কাজ চুকোয়ে দিলাম, এখন ব'সে ব'সে জাবর কাটবা। তোল গাড়ি। ভাল চা'স তো শিগ্গির শিগ্গির টানে তোল। না হলি তোগের একদিন কি আমার একদিন, তা বুঝোয়ে দিবানে আজ।"

সোনা মিঞা চেঁচায় আর গরু দুটোর পিঠে ধপাস ধপাস পাচনের ঘা কষায়। মার খেয়ে বলদ দুটোর পিঠে অজস্র কালশিরে পড়ে গেল। বলদের সাদা সাদা পিঠের উপর কালো কালো দাগ, মনে হ'ল, কে যেন সাদা কাঁথায় কালো সুতোর ফোঁড় তুলেছে। বলদ দুটো যথাশক্তি ঘাড় পিঠের শক্তি দিয়ে বারবার গাড়ি টানতে লাগল। ওদের দু কস্ বেয়ে ফেনা ঝরতে লাগল কিন্তু গাড়িকে একটু নড়াতে পারল না। হঠাৎ ডানদিকের গরুটো হাঁটু মুড়ে শুয়ে পড়ল। পাচন-নড়ির ভোঁতা মাথার গুঁতো দিয়ে সোনা মিঞা বদলটাকে তুলতে চেষ্টা করল। পারল না। তখন সোনা মিঞা তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বলদটার তলপেটে অবিশ্রান্ত পাচন-নড়ির গুঁতো দিয়ে চলল। তার তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে।

রামকিষ্টো গোটা চারেক কেঁড়ে আর বড় এক খালুই হাতে নিয়ে হাটে যাচ্ছিল। সোনা মিঞার কাণ্ড দেখে ভয় পেয়ে গেল। কেঁড়েগুলো আর খালুইটা রাস্তার এক পাশে রেখে ছুটতে ছুটতে এসে সোনা মিঞার হাত চেপে ধরল। কর কি, কর কি, বলে পাচন-নড়ি কেড়ে নিল।

ধমকে বলল, "ওরে আমার চাষার ঘরের পাঁঠা, বলদ মরলি যে তুমিও মরবা। দ্যাখ দিকি, কি করিছ, মা'রে মা'রে যে শেষ করে আনিছ।"

হাঁফাতে হাঁফাতে সোনা মিঞা বলল, মারব না তো করব কি? শালার গরু থানায় গাড়ি ফেলিছে। বেলা গেলি হাটে যারে ও কুণ্ঠা কার মুখে ঠাসব, ঐ গরুর না আমার?"

রামকিষ্টো বলল, "সুনা ভাই, ক্ষ্যামতা না থাকলি মা'রে কি গাড়ি তুলতি পারবা? বাঁজা বউর সাধ খাওয়ালিই কি তার পেটে ছাওয়াল জন্মায়?"

রামকিষ্টোর কথা শেষ হতে না হতেই ডানদিকের গরুটো ঘাড় কাত করে এলিয়ে পড়ল। তার চোখ দুটো বুজে আসতে লাগল। গলার দড়িটা তখনও গাড়ির জোয়ালে বাঁধা। ফাঁস পড়ার উপক্রম হ'ল। বলদটার চোখের কোল, মুখের কস্ আর নাক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রামকিষ্টো তাড়াতাড়ি করে বলে উঠল, "সুনা ভাই, গলার দড়ি খুলে দ্যাও। শিগ্গির।"

রামকিষ্টো তাড়াতাড়ি জোয়াল উঁচু করে ধরল। সোনা মিঞা দড়ি খুলে দুটো বলদই আল্গা করে দিল। রামকিষ্টো ডানদিকের বলদের চোখে মুখে ফুঁ দিতে লাগল। ব্যাপার দেখে সোনা মিঞা ঘাবড়ে গেল। ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল। ইয়া আল্লা, বলদটা মরে যাবে নাকি! তবে তো সর্বনাশ! বাঁদিকের গরুটা নির্বোধ চোখে এতক্ষণ ধরে তার সাথীটার উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চলছিল তা দেখছিল। এখন ড্যাবা ড্যাবা চোখ তুলে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল মৃতপ্রায় সংগীটির দিকে। কি মনে হ'ল তার হঠাৎ, হয়ত সাড়া নেবার জন্যই, ভয়ে ভয়ে ভাংগা গলায় ডেকে উঠল হাম্বা। তারপর কোন সাড়া না পেয়ে, ধীরে ধীরে রাস্তার পাশে ছুটে গিয়ে খুঁটে খুঁটে ঘাস খেতে লাগল। একটা চিল কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উড়ে গেল উপর দিয়ে। একখানা ফংগবেগে মেঘ খুব আলতো করে একটু ছায়া বুলিয়ে দিয়ে গেল।

ফুঁ দিতে দিতে রামকিষ্টোর মুখ ব্যথা হয়ে উঠলো, সোনা মিঞা এগিয়ে এল ফুঁ দিতে।

রামকিষ্টো বলল, "ঐ কাঁড়েগুলোয় করে শিগ্গির জল ভ'রে আনোদিন। মনে হচ্ছে ভিরমি খায়েছে। মারির চোটে ওর পিরাণডা তো কণ্ঠায় তুলে ছাড়িছ। ছিঃ!"

রামকিষ্টোর ভর্ৎসনা গায়ে মাখল না সোনা মিঞা। সে দোষী, দোষ করেছে। ন্যায্য অপরাধে এখন তাকে জুতিয়ে দিক না রামকিষ্টো, সোনা মিঞা তাকে একটি কথাও বলবে না।

সোনা মিঞা কেঁড়েগুলো ছোঁবে ছোঁবে, হঠাৎ রামকিষ্টোর খেয়াল হ'ল।

চেঁচিয়ে উঠল রামকিষ্টো, "আরে রও রও, সুনা ভাই, ও কাঁড়ে বাবুদের, ছুঁয়ে না, ছুঁয়ে না। তুমি এদিক আ'সো, বসে বসে চাখি মুখি ফুঁকোও, তলপেটটা আস্তে আস্তে ডলে দ্যাও। আমি বরং জল আ'নে দিই।"

সোনা মিঞা অপ্রস্তুত হয়ে হঠে এল। রামকিষ্টো দুটো কেঁড়ে নিয়ে জল আনতে ছুটল। সোনা মিঞা বলদটার কাছে বসে বসে কখনও তার মুখে চোখে ফুঁ দিতে লাগল, কখনও তলপেটে মোলায়েমভাবে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, কখনও বা পিঠে, শির-দাঁড়ায় জল দিল পরম যত্নে। রাগের ধার পড়ে এসেছে। ভয়ের একটা শুলুনি মাঝে মাঝে তার মগজে গুঁতো মারছে। ধীরে ধীরে সহানুভূতির এক অব্যক্ত বেদনা জন্ম নিতে থাকল সোনা মিঞার মনে।

১১

বেলা-পড়া তেজালো রোদ গদীর সামনেকার কড়ুই গাছটার ফাঁক দিয়ে ঝপ করে মেন্দা ছাহেবের চোখে গিয়ে পড়ল। রোজই পড়ে। সাহেবালি মৃধার মনটা অমনি আনচান করে উঠল। বুঝলেন চা পানি খাবার সময় হয়েছে। চকচকে রোল্ডগোল্ডের টন্‌ক চশমাটা বাঁ হাতের টানে খুলে ফেললেন। সংগে সংগে পাকা পাকা ভুরু দুটো ঈষৎ ঝুলে পড়ল। ভারী কাঁঠাল কাঠের একখানা পোক্ত ডেস্ক সামনে, ডেস্কের উপর জাবেদা খাতা। খোলা। চশমাটা খাপে পুরে খাতার উপর রেখে দিলেন। তারপর গদী থেকে নেমে রুপোলী রঙের চকচকে বদনাটা হাতে নিয়ে খড়ম পায়ে গাঙের পাড়ে চললেন। অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। তলপেট টনটন করছে। এবার একটু হাল্কা হওয়া দরকার।

এটা তাঁর নৈমিত্তিক কর্ম। এবার গিয়ে গদীতে বসলে আর বিষয়কর্ম হয় না। সন্ধ্যে পর্যন্ত গল্পগুজোব চলে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট তিনি। তার কাজকর্মও কিছু হয়। দফাদার চৌকিদারেরা আসে। চা পানি আর তামাক ঘন ঘন সরবরাহ হয়। আজ হাটবার। ভিড় একটু বেশিই হবে।

মেন্দা ছাহেব কলকাতার আদমজী হাজী দাউদ কোম্পানীর এজেণ্ট। এই তল্লাটের পাট, ঐ কোম্পানীর চটকলে যত চালান যায়, তার সবই যায় মেন্দা ছাহেবের হাত দিয়ে। অবস্থা যুদ্ধের আগে এমন বিশেষ কিছু ভাল ছিল না তাঁর। তবে যুদ্ধের বাজারে আল্লার কুদরতে তাঁর নসিবের রঙ বদলে গিয়েছে। এখন তিনি ২২নং ইউনিয়নের পনেরখানা গ্রামের মাতব্বর।

গাঙের পাড়ে মেন্দা ছাহেবের বড় বড় দুটো পাটের গুদোম। আগে আমদানির সময় পাট ধরত না তার ভিতরে। আর এখন, কি যে মতলব কোম্পানীর বুঝতে পারছেন না মেন্দা ছাহেব, তাই প্রাণ ধরে পাট কিনতেও পারছেন না, গুদোমে অনেক-খানি জায়গা খালি পড়ে থাকছে। যুদ্ধের মধ্যে তিন হাজার, চার হাজার মণ মাল পাঠিয়েও মন পাননি কোম্পানীর। আরও পাঠাও আরও পাঠাও বলে হুকুম ঝেড়ে ঝেড়ে জান পরেসান করে দিয়েছে। আর এখন, হাজার, পাঁচ শ মণ মাল পাঠালেই টেলিগ্রাম আসে, ব্যস্ করো, আর না। বছর বছরই দেখি পরিমাণ কমে আসছে। গত বছরের মালই পড়ে আছে গুদোমে। এবারের আমদানির সময়ও তো এসে গেল। কলকাতা থেকে পরিষ্কার কথা এখনও এল না। বড়ই সমস্যায় পড়েছেন মেন্দা ছাহেব। আগরওয়ালা অবিশ্যি কিনছে। কিন্তু ওর সংগে টক্কর মেরে চলবার মত কুদরত এখনও মেন্দা ছাহেবের হয়নি।

আর আগরওয়ালার সংগে তাঁর তুলনাও চলে না। ব্যাটা এক নম্বরের চশমখোর। কেনাবেচার ব্যাপারে ও যতটা শক্ত হতে পারে, তিনি ততটা কি করে পারবেন? আগরওয়ালা এ গ্রামের কে? কেউ না। এখানকার লোকেদের সংগে ওর কি সম্পর্ক? আগরওয়ালার ব্যবসার মন্ত্র হচ্ছে ফ্যাল কড়ি মাখো তেল। আগরওয়ালা জানে, টাকা তার হাতে। চাষীরা যতই ফুটুনি করুক, তেজ দেখাক প্রথমে, শেষ পর্যন্ত তার পায়েই গড়াতে হবে। যে দাম সে বলবে, সেই দামেই তার কাছে চাষীকে মাল গস্ত করে যেতে হবে।

কিন্তু মেন্দা ছাহেব এখানকারই মানুষ। যদিও তিনি জানেন, মনে মনে জানেন, আগরওয়ালার রাস্তাই ব্যবসার ঠিক রাস্তা, তবু ও পথে তিনি স্বচ্ছন্দে পা বাড়াতে পারেন না। যদি পারতেন তাহলে গত বছর অত মাল তিনি কিনতেন না। মাল তো আগরওয়ালাও কিনেছে, তাঁর থেকে অনেক কম দাম দিয়ে কিনেছে। তিনি চেষ্টা করেও অত কম দাম দিতে পারেন নি। কোন প্রাণে দেবেন? এখন তিনি আতর মাখেন, সেখ ফসীউল্লার গোলাপজল পালা পার্বনে পিচ্‌কিরি দিয়ে ছড়ান, তা সত্ত্বেও তাঁর গায়ের পসিনা থেকে যে বদ্‌বু বের হয়, তা যে নাঙগলা চাষারই। এই আর্ত, বেকা

চাষীগুলো যে তাঁর আত্মার আত্মীয় সেই সত্যটাকে এখনও তিনি জবাই করতে পারেননি।

তবে, মেন্দা ছাহেব এও বুঝতে পারছেন, এভাবে ব্যবসা চালালে তাকে অচিরেই লাল বাতি জ্বালাতে হবে। কি যে তিনি করবেন, বুঝে উঠতে পারছেন না।

মেন্দা ছাহেব দেখলেন, নদীতে পাট বোঝাই নৌকো সার বেঁধে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর পাড়ে গরুর গাড়িতেও পাট আমদানি হয়েছে বেশ।

মেন্দা ছাহেব বদনাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে, মাথার নক্সিকাটা গোল টুপিটা বাঁ হাতে উঁচু করে ধরে টাকে খানিক হাওয়া লাগিয়ে নিলেন। তারপর ডান হাতের তেলো দিয়ে টেকো মাথার ব্রহ্মতালুটা বারকয়েক ডলে নিলেন। দেখলেন, তার গোমস্তা তুফান মিঞা হাওয়াগাড়ি সিগারেট খাইয়ে বকের মত ডিঙি মেরে মেরে বেশ্যামাগীদের ঘরগুলোর কাছে ঘুর ঘুর করছে। ভাবলেন, ব্যাটার তো বড় পাখনা গজিয়েছে।

তার মানে দেদার পয়সা মারছে।

হাঁক ছাড়লেন, "এই তুফানে!"

কর্তার ডাকে চমক খেয়ে ফিরে তাকাতেই তুফান মিঞা হকচকিয়ে গেল। সিগারেট আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। মনে মনে বলল, শালার বুড়োর সব দিকে চোখ। মুখখানা পরম বেকুবের মত করে, গুলে গুলে চোখে মেন্দা ছাহেবের দিকে চেয়ে, মেহেদি দিয়ে রঙ করা আঙ্গুলের নখ দাঁতে খুঁটতে লাগল।

মেন্দা ছাহেব ধমক দিলেন, "এই হারাম-জাদা, এখানে কি করছিস?"

তুফান মিঞা তুড়ুক জবাব দিল, "হুজুর, আমদানী দেখছি?"

ছোকরার তো রস আছে। আমদানী দেখছেন এখানে! কি জানি কেন, জবাবটা শুনে মজাই লাগল মেন্দা ছাহেবের। রাগটা খপ করে পড়ে গেল। টুপিটা মাথায় বসিয়ে দিলেন। হয়ত গুরুত্ব বাড়াবার জন্য।

গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলেন, "কোন্ আমদানী দেখতিছ?"

"কোস্টার আমদানী হুজুর?"

তেমনভাবেই হুকুম দিলেন মেন্দা ছাহেব, "হু"। তা দ্যাখ। তবে লালি ছাড়া ছুঁয়ো না। আর এটটু বাছবিচার ক'রো।"

গদীর দিকে দু পা এগুতেই মেন্দা ছাহেব দেখলেন, মেজকত্তা যাচ্ছেন।

ডাক দিলেন, "আরে ও মা'জেবাবু আচ্ছালাম ওয়ালেকুম। নাতি পা'য়ে যে ভুলেই গেলেন আমাদের।"

মেজকত্তা বললেন, "সেলাম, প্রেসিডেণ্ট সাহেব।"

মেন্দা ছাহেব বললেন, "নাতি বুঝি বুকি বুকিই থাকে। একেবারে যে ডুমুরির ফুল হয়ে ওঠলেন?"

মেজকত্তা বললেন, "বুকে থাকা তো দূরের কথা। আমার মুখ দেখলেই আঁতকে ওঠে নাতি। দাড়ির জঙ্গল সাফ না হ'লে বাবু কোলে উঠবেন বলে তো মনে হয় না।"

মেজকত্তার কথায় হো হো করে হেসে উঠলেন মেন্দা ছাহেব।

"হাঃ হাঃ হাঃ, তবে তো ক্ষুদ্দুরে বদ-মাইসডে বড় কলে ফেলেছে আপনারে। হাঃ হাঃ হাঃ। সখের দাড়ি আর পিরাণের নাতি, কার টানের জোর বেশি, ইবার দেখা যাবে, কি কন? হাঃ হাঃ হাঃ।"

মেন্দা ছাহেবের রকম দেখে মেজকত্তাও হেসে ফেললেন।

বললেন, "বিচারের আশায় আবার না প্রেসিডেণ্ট সাহেবকে সালিশ মানতে হয়।"

মেন্দা ছাহেব বললেন, "তার জন্যি ভাবনা কি? ঝোলের লাউ আর অম্বলের কোদু আমি তো আছিই। চলেন এক পিয়ালা চা-পানি খা'য়ে যান।"

এই গ্রামে চা খাবার চল করেছেন মেন্দা

ছাহেব। বিকাল থেকে তাঁর গদীতে চায়ের আসর বসে, বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সমানে চা চলে। একটা বড় হাঁড়িতে জল অনবরত ফোটে। একটা লোক আছে চা বানাবার জন্য। তার মাইনে পাঁচ টাকা।

হিন্দু মাতব্বররা বিশেষ কেউ এ আসরে যোগ দেয় না। তবে ছোকরার দল এসে জোটে। মেজকর্তার কোন বাছবিচার নেই। এ তো চা, কলেজ জীবনে কলকাতায় বন্ধু-বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে মুসলমান হোটেলে অনেক শক্ত জিনিসও খেয়েছেন।

হিন্দু মাতব্বররা এই কাজটাকে বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখেন। বুদো ভুঁয়ের ধারণা, এটা মেন্দা ছাহেবের জাত মারার ফন্দি। প্রকাশ্যে সে কিছু বলে না। প্রেসিডেণ্ট ক্ষমতাবান লোক। ঘন ঘন শহরে যায়, এস ডি ও, মুন্সেফ, ডি এস পি, টি এস পির সঙ্গে দহরম মহরমও আছে। কাজেই সামনে কিছু বলে না। আড়ালে ঘোঁট পাকায়।

এই নিয়ে তার সঙ্গে মার্তণ্ডগনী টেলারিং-এর প্রোপ্রাইটার সুশীল দত্তর সঙ্গে প্রায়ই খিটিমিটি বাধে। বুদো ভুঁয়ে বলে, নাড়ের গায়ে যে রোজ গিয়ে গা ঘষিস, কি পাস, বল্ দিন। সুশীল দত্ত হেসে জবাব দেয়, ওমা, বুদোদাদা, তাও জান না, আতরির বাস-নাই। তুমিও দিনকতক ঘষে দ্যাখ না, তুমার গায় ঐ পাঁকের গন্ধে কেমন গুলাপের খোশবু ভুর ভুর করবেনে। বুদো চটে যায়। বলে, অত মাখামাখি ভাল না সুশীল, ভাল না। একদিন যদি মোল্লা ডাকে ঐ মেন্দা তোগের কলেমা পড়ায়ে না ছাড়ে তো আমার নামে কুকুর পুষিস। আর এই বয়সে ছুন্নৎ করলি কেমন লাগে, তখন বুঝবা। সুশীল রাগে না। বলে, নিজিরডা সামলে রাখো, তালিই আমাদের ধম্ম রক্ষা পাবে। এরপর দোকান সুদ্ধ হাসির যে গররা ওঠে, বুদো তা আর সইতে পারে না। রাগে গর গর করতে করতে সুশীল দত্তের সিঙ্গার মেশিনের উপর রাখা বিড়ির ব্যাণ্ডিল থেকে একটা বিড়ি বেছে নিয়ে বিশেবসদের দোকানমুখো সরে পড়ে।

এবং মেন্দা ছাহেবের আসরে লোক সমানে বাড়ে।

চা খাবার পালা শেষ হতে না হতেই সেদিন দফাদার ভক্ত ঘোষ গদীতে ঢুকল।

মাথা নুইয়ে মেন্দা ছাহেবকে সেলাম করল, মেজকর্তার পায়ের ধুলো নিল, তারপর হাতের বিরাট লাঠিটা গদীর ছক্কা পাঞ্জা ছাপ মারা পুরু অয়েল পেপারে মোড়া মেঝেতে শুইয়ে রেখে, এক পাশে উবু হয়ে বসল।

এক গাল হেসে মেন্দা ছাহেবকে বলল, "হুজুর, এট্টুসখানি চা কি এই অধীনির বরাতে জোটবে?"

ওর কথার ঢং-এ গদীর লোক হেসে ফেলল।

মেন্দা ছাহেব হাসতে হাসতে বললেন, "দফাদার আমাগের বিনয়ে একেবারে মা গোঁসাই। তুমি দফাদার না হয়ে ভক্ত, বোরেগী হলিই পারতে।"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ভক্ত বলল, "ইচ্ছে তো তাই ছিল হুজুর। কিন্তু গিরামের বোরেগী যে ভিক্ষে পায় না। তাই তো দফাদার হলাম। বাঁশরীর বদলে হাতে তাই তো বাঁশ ধরতি হ'ল। নামাবলীর বদলে মাথায় বাঁধলাম সরকারের লাল পাগড়ী, কাঁথার ঝুলোর বদলে কাঁধে নিলাম এই নীলমণি ঝুলোখান। তা দফাদারের ঝুলো হুজুর, দেখিছেন তো একেবারে শ্যাম বন্ন। ধরে নেন, এর মধ্যিই শ্যাম আছেন।"

আবার সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

মেন্দা ছাহেব হাসতে হাসতে বললেন, "ভক্তর সঙ্গে কথায় পারবে কিডা? ওরে, ভক্তরে এট্টু চা পানি দে।"

সঙ্গে সঙ্গে ভক্তর জন্য চা এসে গেল। একটা জার্মান-সিলভারের গেলাসে। গেলাসটা গনগনে গরম। হাতে তাত লাগায় ভক্ত পাগড়িটা খুলে তার এক মুড়ো দিয়ে গেলাসটা ধরে ফুঁ দিয়ে দিয়ে সুপ সুপ করে চা খেতে লাগল।

মেন্দা ছাহেব বললেন, "ন্যাও, ইবার এট্টু কাজের কথা কও দিন। ঝিনেদায় গিছিলে?"

ভক্ত চা খেতে খেতে মাথা জানাল, হ্যাঁ।

"দ্যাখা হ'ল দারোগাবাবুর সঙ্গে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর।"

চায়ের গেলাসটা ঠকাস করে নামিয়ে রেখে ভক্ত জবাব দিল।

বলল, "আপনার বাঘের হিসেব চুকোয়ে দিয়ে আলাম। শুনে সুখী হবেন হুজুর, আপনার ইউনিয়ন ছাড়া আর কেউ হিসেব বুঝ দিতি পারেনি। দারোগাবাবু খুব চটেছেন ওগের উপর।"

সংবাদে সত্যিই খুশি হলেন মেন্দা ছাহেব।

বললেন, "বিস্তারিত কও দিন শুনি।"

ভক্ত নড়ে চড়ে বসল। চায়ের গেলাসে আর একটা চুমুক দিল।

তারপর বলল, "হুজুর গিয়ে দেখি, দফাদারদের ভিড়ে থানা ভর্তি। এক এক জন দারোগাবাবুর ঘরে ঢোকছে, হিসেব দিতি পারছে না, আর দারোগাবাবুর দাবড় খায়ে মুখখানারে চুনির গুদোম করে বেরোয়ে যাচ্ছে। আমারে ডাকে দারোগাবাবু এক দাবড় মারলেন, কি হিসেব আনোনি তো। আমি হাতজোড় করে কলাম, সে কি কথা হুজুর। আপনি মা বাপ, একডা হুকুম দিয়েছেন, তা কি অমান্য করতি পারি? পরিষ্কার হিসেব আনিছি। দারোগাবাবু অমনি নড়ে চড়ে বসলেন। কলেন, বেশ, তুমার ইউনিয়নে বাঘের সংখ্যা কত। কলাম, হুজুর, আগে সাতটা ছিল, বর্ত্তমানে ছয়। দারোগাবাবু কলেন, আরেকটা গেল কনে? কলাম, হুজুর সিডা সঠিক কতি পারব না। তবে পা'র দাগ দেখে আন্দাজ হয়, একুশ নম্বরের দিক হাটা দিয়েছে। দারোগাবাবু কলেন, ক্যান, তুমার ইউনিয়ানের উপর তেনার এত বীতরাগ হ'ল ক্যান? কলাম, হুজুর জুড়া পাচ্ছিল না, তাই। দারোগাবাবু কলেন, বেশ, যে কডা আছে তার বাঘ, বাঘিনী? কলাম, হুজুর তিনডে বাঘ, তিনডে বাঘিনী। দারোগাবাবু কলেন, ঠিক জান তো? কলাম, হুজুর না জানলি ঠিক ঠিক কচ্ছি কেমন করে? দারোগাবাবু কলেন, সিডাও একটা কথা বটে। তারপর খুশী হয়ে দুডো টাকা বকশিশ দিয়ে দারোগাবাবু কলেন, তুমার প্রেসিডেণ্টরে আমার ছালাম দিও।"

ভক্ত ঘোষের বিবরণে মেন্দা ছাহেব খুব খুশি। তিনিও তাকে দু টাকা বকশিশ দিলেন।

মেজকর্তা বাঘের হিসেব কি বুঝতে পারছিলেন না।

জিজ্ঞাসা করলেন, "বাঘের হিসেব কি?"

মেন্দা ছাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, "সরকারের খেয়াল, আবার কি? হুট করে হুকুম এল, দেশে কত বাঘ আছে গোন। গুনে এক হপ্তার মধ্যি থানায় গিয়ে তার রিপোর্ট দ্যাও। যত ঝামেলা।"

ভক্ত বলল, "হুজুর হিসেবডা বুঝ করাই হ'ল আসল। না হলিই ঝামেলা। সরকারী কাজের রগড়ই হ'ল ঐডো যে বুঝিছে সে মজিছে।"

মেন্দা ছাহেব বললেন, "তা যা বলিছ।"

মেজকর্তা ভাবলেন, ভক্ত একেবারে সার বুঝে গেছে।

ভক্ত বলল, "হুজুর, ঝিনেদায় এক নতুন কথা শুনে আলাম। উকিলবাবুদের মধ্যি খুব আলাপ হচ্ছে। কি যেন হয়েছে কল-কেতায়, কি, হিন্দু মুসলিম প্যাক্টো না কি, তাই। ইবার নাকি ভোট হবে।"

মেন্দা ছাহেব আর মেজকর্তা দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠলেন।

মেন্দা ছাহেব উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, "এট্টু খোলসা করে কও দিন, শুনি।"

(ক্রমশ)

কেমন লাগছে এ-বেলা?

প্রথমে লঘু পায়ের শব্দ হত। তারপর রোজ দুপুরে স্নিগ্ধ কণ্ঠের শুধু একটি প্রশ্ন। ক' মিনিট ধরে কোন কথা নয়। বেডের গায়ে ঝোলানো রিপোর্টের পাতা ওলটাতে ওলটাতে কেটে যেত দু' মিনিট। মাথার উপর পাখা ঘুরত বনবন করে। ক'টা জ্বরের রোগী এপাশ ওপাশ করত নিরন্তর। কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠত। তবু সারা ওয়ার্ডটা ভারী নিশ্চুপ আর বেজায় মায়াময় মনে হত ঠিক দুপুরে। রাবারের কর্ড ঝুলিয়ে, দু' পাশের বেডগুলোর মাঝ দিয়ে বুক নিচু করে মেডিসিনের ছোট্ট ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে সিস্টার পুষ্প এসে যখন সিরিঞ্জ সাফ করতে গিয়ে ফিচ্ ফিচ্ করে স্পিরিট ছিটাত, বড্ড ভালো লাগত, ঘাড় তুলে তাকাতাম তখন। চোখ তুলে তাকাতাম ওর পানে, সিস্টার পুষ্পকে ডিঙিয়ে। একটু হাসত ও। শুভ্র দু' পাটি দাঁত ঝকঝক করে উঠত পবিত্র হাসিচ্ছলে।

স্পঞ্জ করেছিস? মিঠে কণ্ঠে শুধাত ও।

রাজী হলেন না তো উনি। সিস্টার পুষ্প বলত কখনো কখনো।

কালকে অবশ্যি করে দিস, ভাই পুষ্প।

তারপর চলে যেত ও আমার বেডটার উপর দিয়ে আরেকবার সতৃষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে। হয়ত বলত, আমার দু' নম্বরের পেশেন্টকে টেরামাইসিন দেবার সময় হল। আসি, পুষ্প। ভিজিটরদের আসবার সময় হয়ে এল।

সিস্টার পুষ্প বলত, আপনার পেনিসিলিন, উঠবেন একটু?

নড়ে চড়ে উঠলেই আবার বলত, না, থাক থাক। অমনিতেই থাকুন। ওতেই চলবে।

তারপর সিরিঞ্জ তুলত সিস্টার পুষ্প। টিপে টিপে দেখত হাতের পেশী। ক'দিন ধরে চার ঘণ্টা অন্তর সূঁই দিতে দিতে ফুলে শক্ত হয়ে গেছে দু' হাতের পেশী।

বলতাম, বেজায় ব্যথা করে সিস্টার।

করবে না আর। তা ছাড়া, একটু করবেই তো। নইলে সারবেন কি করে। এইতো সেরে উঠলেন। পেনিসিলিনে আর তেমন ব্যথা কই? সিস্টার পুষ্প বলত।

তারপর ঘণ্টা পড়ত নিরন্তর। ভিজিটরদের মৃদু গুঞ্জনে ভরে উঠত সারা ওয়ার্ড। রোগীদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আসত দেখা করতে। যারা রোগমুক্তির পথে অথবা যাদেরকে আজ বা কালকে রোগমুক্তির সার্টিফিকেট দেওয়া হবে তারাও একযোগে কঁকিয়ে কঁকিয়ে আরো করুণ আর বিষময় করে তুলত এই আর্ত পরিবেশ।

ভারী অসহ্য মনে হত ওই সময়টুকু।

একদিন ব্যতিক্রম ঘটল হঠাৎ। রোজ দুপুরের সেই স্নিগ্ধ কণ্ঠের প্রশ্ন নেই। লঘু পায়ের শব্দ বাজল না কানে। বেডের কোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রিপোর্টের পাতা ওলটাল না কেউ। বনবন করে মাথার উপর পাখা ঘুরল শুধু। গলায় রাবারের কর্ড ঝুলিয়ে দু' পাশের বেডগুলোর মাঝ দিয়ে ক্যাচ ক্যাচ করে মেডিসিনের ছোট্ট ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে সিস্টার পুষ্প এসে সূঁই দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ হল। একথা ওকথা ভেবে শেষ নাগাত মন বিষিয়ে উঠল।

বিকেলে নিরুদি এল ওর স্বামীকে নিয়ে। অনেক কমলা, কাস্টার্ড বিস্কিট আর এটা সেটা এনেছে অনেক। প্রথমে কথাই বলতে ইচ্ছে হল না। ভাবলাম, বলি, চলে যাও তোমরা এখান থেকে। দরকার নেই তোমাদের!

কিন্তু কোলের বাচ্চাটাকে ওর স্বামীর কোলে ঠেলে দিয়ে চুপচাপ বেডটা টেনেটুনে আঁটসাঁট করে দিল নিরুদি। এক সময় ওই বলল, নীনা আসে নি?

কেন আসবে? ও কি এই ওয়ার্ডের সিস্টার, যে রোজই আসবে একটা ভিন

ওয়ার্ডে? শুধু মনে মনেই তৈরী করে রাখলাম জবাবগুলো। কিছু বললাম না নিরুদিকে। একটু পরে এই আসছি বলে নিরুদি চলে গেল বেডের কাছ থেকে।

মাসখানেক আগে যেদিন প্রথম ভর্তি হলাম প্লুরিসি হয়েছে ভেবে, নিরুদি আর ওর স্বামীই এসেছিল সঙ্গে। সিস্টার নীনা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নিরুদিকে দেখে। সিস্টারকেবিনে ডেকে নিয়ে মুখে চুমকুড়ি কেটে নিরুদির বাচ্চাটাকে টুক করে বুকে জড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে শুধু বলেছিল, নিরু! তুই এখেনে?

আমার ছোট ভাই, বলে শেষ না করতেই সিস্টার নীনা কেড়ে নিয়েছিল নিরুদির কথা। মুখে এক টুকরো চটুল হাসি টেনে টেনে বলেছিল, সেই তোর, ওই ভাইটি!

নিরুদিও হাসল একটু। বলেছিল, রেখে দে'না ভাই এখন ওসব কথা। ডাক্তার প্লুরিসি বলে সন্দেহ করছে।

হঠাৎ কেমন কালো হয়ে গিয়েছিল সিস্টার নীনার প্রশান্ত মুখ, তা' কিছুতেই বোঝানো যাবে না।

কি যেন ভেবেছিল ও দু'মিনিট। কামরাঙগী নাকটা মনের কি এক নিদারুণ ব্যথায় ঈষৎ তরঙ্গায়িত হচ্ছিল। তারপর একটু স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল সিস্টার নীনা। ঠাস করে আলমিরার কপাট খুলল। ফাইল বার করল একটা শোঁ করে। শিট জুড়ে দিল একটা ফাইলে। নাম-ঠিকানা লিখল। বয়েস লিখল মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে।

দু'মিনিটে সত্যি আবার সাবলীল হয়ে গিয়েছিল যেন সিস্টার নীনা।

যাবার বেলা নিরুদি বলেছিল, একটু দেখবি, ভাই নীনা।

ছিঃ বলছিস কি নিরু? তবে জানিস কি, আজকে মাসের শেষ। কাল থেকে দু'নম্বরে যাবার হুকুম হয়েছে। আর্জিশা, তাই বলে ভাবতে হবে না। সিস্টার পুষ্প আসবে। ওকে বলে দেব। তা'ছাড়া পাশেই দু'নম্বর।

নিরুদি এল কতক্ষণ বাদে। কি যেন ভাবল দু'মিনিট। বলল, আজকে আসেনি নীনা। ওর ওয়ার্ডেরও কেউ কিছু ঠিক ঠিক বলতে পারল না।

সিস্টার পুষ্প এল একটু পরে। নিরুদি বলল, নীনা নেই, সিস্টার?

থাকবে না কেন?

দেখা পেলাম না যে?

মাস শেষ হল কিনা। আজ রাত থেকে এ ওয়ার্ডেই বদলি হয়েছে ও।

সিস্টার পুষ্পর মুখের দিকে তাকালাম। মৃদু হাসলেন সিস্টার পুষ্প মুখ ফিরিয়ে। তারপর টেম্পারেচার নিলেন। দুটো ভিটামিন মুখে গুঁজে দিয়ে চলে যেতেই নিরুদি জিগ্যেস করল, নর্মাল, তাই না?

ভাবনার কিছু নেই। এক্সরেতেও কিছু পাওয়া যায়নি। শুধু শুধু ভড়কে দেয়া ছাড়া আর কি! হাঁটতে হাঁটতে জবাব দিলেন সিস্টার পুষ্প।

হাতের ফাইলটা মেডিসিন টেবিলে রেখে আবার আসলেন। আঁট-সাঁট করে বেডটা বিন্যস্ত করলেন। নিরুদি পাশে দাঁড়িয়ে। বাচ্চাটা ওর স্বামীর কোলে। এক সময় সিস্টার পুষ্প হঠাৎ বলে উঠলেন, বাসায় কে দেখছিলেন?

নিরুদি বলল, ওর এক বন্ধু ডাক্তার।

সিস্টার পুষ্প বলল, তাই বলুন। তা'ছাড়া আপনার ভাইটিও ভারী সেন্সিটিভ। কখন আমি মেডিসিনের ট্রলি ঠেলতে ঠেলতে এদিকে আসব ফাইলের ঠোকাঠুকি শুনেই তা' ঠিক ঠিক বুঝতে পারেন। বলেই একটু হাসলেন।

আবার ঘণ্টা পড়লে সিস্টার পুষ্প চলে গেলেন। নিরুদিও চলে গেল কটা কমলার কোয়া তুলে দিয়ে।

কাস্টার্ড বিস্কিটের টিন খুললাম। কমলার কোয়া তুললাম আরো। তারপর ব্যালকনিতে গিয়ে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ওয়ার্ড-বয়কে জানালাম রাত্তিরে আর ডায়েটের দরকার নেই। একটু পরেই ডাক্তার চৌধুরী এলেন গলায় স্টেথসকোপ ঝুলিয়ে। তাড়া-তাড়ি এসে শুয়ে পড়লাম বেডে। ভালো কি লাগল শুয়ে শুয়ে। ডায়েটসেফ খুলে বই বার করলাম। মনটা উড়ু উড়ু করল কেবল। পড়া হল না। ডাক্তার চৌধুরী এসে বুকে, পিঠে আর পাঁজরে ডুগডুগিয়ে ও কান পেতে কি শুনলেন স্টেথসকোপ চেপে চেপে তা' শুধু উনিই জানলেন। একটু হেসে উঠে
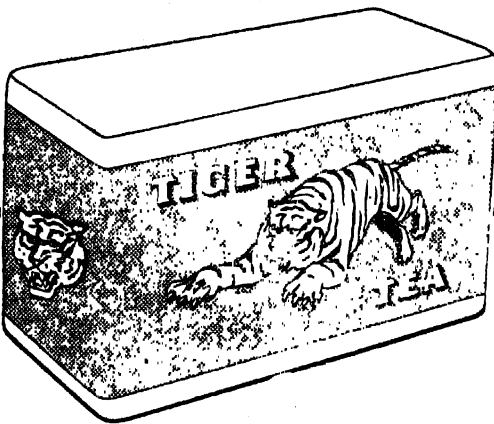
বললেন, কিছুই নেই। লাংস ক্লিয়ার একেবারে। নিমোনিয়ার পরে একটু ভয় ভয় করেই। তবু আরো ক'টা দিন থেকে যান।

তা'হলে বাড়ি চলে যাওয়াই তো ভালো, আমি বললাম।

ভালো কি আমরা বুঝিনে মিস্টার জসীম, বলেই মৃদু হাসলেন ডাক্তার চৌধুরী।

ধন্যবাদ। ঠিক তা' নয়। মনটা উড়ু উড়ু করছিল কিনা তাই বলছিলাম, বলে আমিও হাসলাম একটু।

ডাক্তার চৌধুরী চলে যাবার পর মনটা ভাবনাহীন হতেই কখন ঘুমিয়ে পড়লাম তা' বলতে পারব না। আবার কত রাতে জাগলাম তাও না। কিন্তু জেগে দেখি সারা ওয়ার্ড এক আশ্চর্য নীরবতায় চুপ মেরে আছে। মাঝে মাঝে শুধু জ্বরের নতুন রোগীটি হাত-পা ছুড়ছে। বকাবকি করছে জ্বরের ঘোরে। আমার বেডের ডায়েটসেফটার কপাট খোলা। পাশ ফিরে তাকালাম, সিস্টার নীনা কেবিনে বসে গোলাপী শেড-বালবের নিচে ক্রৌঞ্চগ্রীবা ভঙ্গিতে এক ঝাড় কালো চুল এলিয়ে কি যেন পড়ছে তন্ময় হয়ে।

চোখ ফিরালাম আমি। পাশ ফিরে শুয়ে জানালা দিয়ে দৃষ্টি গলিয়ে দিলাম বাইরে। দক্ষিণের ব্যালকনিতে শরদিন্দুর আলপনা। পাহাড়ী বন ছোঁয়া মিঠে মিঠে উতলা হাওয়া বইছে জানালা দিয়ে। ভাবনাহীন মন আমার অধীর হয়ে উঠল ব্যালকনিতে যাবার জন্যে। গায়ে চাদর টেনে দিলাম। চুপি চুপি গিয়ে বসলাম ব্যালকনির ইজিচেয়ারে। সারা পাহাড়ী শহরটা অঘোর ঘুমে বিভোর। দক্ষিণে বাঁক খেয়েছে চিরযৌবনা কর্ণফুলী। এপাড়ে ওপাড়ে শুধু ঋতুস্নাত সবুজের সমারোহ। মাঝখানে রূপোলী চাঁদের রূপশ্রীতে চক চক করছে ক্ষুদে ক্ষুদে তরঙ্গ-মালা অবিরত। এক ঝাঁক রাজহাঁস যেন শুভ্র ডানা মেলে ভেসে বেড়াচ্ছে শারদীয় আকাশগঙ্গায়।

এক সময় পা টিপে টিপে এসে পাশে দাঁড়াল সিস্টার নীনা। কি এক আশঙ্কা যুক্ত হয়ে উঠল যেন আমাকে ব্যালকনিতে দেখে।

ইস, ভড়কে দিয়েছিলেন আর কি!

আমিও যেন এ যাযাবর জীবনের স্বর্গ-গঙ্গায় মন-পবনের দাঁড় বেয়ে চলেছি শুধু। কিছু খেয়াল নেই। শুধু মিষ্টি কণ্ঠের কি যেন বাজল কানে। ঘাড় ফিরে তাকালাম। দেখলাম, সিস্টার নীনা দাঁড়িয়ে আছে তেমনি খোলা চুলে। হাতে বই।

ইস, ভড়কে দিয়েছিলেন আর কি!

একটু ঢোক গিলে আবার বলল, দেখুন না, পাজ্‌স দেখুন!

আমিও বলে উঠলাম প্রায় একই সঙ্গে, তাকান না, একটু বাইরে তাকান। দেখি চোখ ফেরান কেমন করে।

স্তব্ধ হয়ে গেল যেন সিস্টার নীনা আমার কথায়। বাইরে তাকাল টানা টানা চোখ তুলে। ক'গাছি উড়ু উড়ু চুল কাঁপল হাওয়ায়। আকাশে চাঁদ হাসল। সিস্টার নীনা হাসল না। সোঁ সোঁ ঝড় উঠল যেন হঠাৎ কর্ণফুলীর ওপারে, আচমকা পাহাড়ী বন কাঁপিয়ে। তীর খেয়ে পালাল যেন শুভ্র-ডানা রাজহাঁস। রিমিঝিমি বৃষ্টি নামল পাহাড়ী শহরে। সিস্টার নীনার পানে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। বৃষ্টি নামল যেন সিস্টার নীনার দু'চোখেও অঝোরে। তবু অপরূপ মনে হল সিস্টার নীনাকে।

এ যাযাবর জীবনে ভুলতে কি পারব আমি কখনো বৃষ্টিনামা সে রাত!

কয়েক মাস পরের কথা। নিরুদির স্বামী বদলি হয়েছেন করাচীতে। বাসায় শুধু আমি আর নিরুদি। ওর খোকা। বাসার ঝি-চাকর। আর শুধু বই। ভিতরের রুমটায় বসে বসে কিসের যেন পাতা ওল্টাচ্ছিলাম একা একা। দক্ষিণের জানালা খোলা। সন্ধ্যে হয়েছে। নিরুদি এসে বলল, একটু ঘুরে এস বাইরে থেকে। ওভাবে মনমরা আর ঘরকুনো হয়েই তো ডেকে আনছিস সব। চা করছি। খেয়ে বেড়িয়ে এস।

চা খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম ভরসন্ধ্যেয়। লালদিঘীর পাড়ে গিয়ে বেঞ্চিতে বসলাম। এদিক-ওদিক পায়চারি করলাম কতক্ষণ। তারপর বেরিয়ে পড়লাম এক সময় পার্ক থেকে। রাত বেশি নয়। একটা রিকশায় করে ঢিবি ঢিবি পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে গেলাম লাভলেনের দিকে। পনের মিনিটে এসে গেলাম একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ির সামনে। দরজার কড়া নাড়তেই ভিতর থেকে কে যেন বাইরের বালবের সুইচটা নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল ধাঁ করে। আবছা আলোয় আমাকে দেখে খুট করে

মাবার জেবলে দিল সুইচটা। মাথাটা বার করল একটু কপাটের ফাঁক দিয়ে। চোখে চাখ রাখলাম। পরনে কনকচাঁপা রঙের শাড়ি। কবরী বেঁধেছে সিস্টার নীনা। কি যন ভাবলাম এক সেকেণ্ড মাথা নিচু করে। ভারী লজ্জা করল এ সময় এসে।

আসুন! ইস, একটু পরে আসলেই মার পাচ্ছিলেন না আর কি! ছবি দেখতে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। তাছাড়া আর সময় কই। ভিতরের ঘরে আসুন।

মুখোমুখি বসলাম দু'জন।

তাই ভাবছিলাম। এসে ভুল করলাম, আমি বললাম।

ইস, বলেন কি, ভুল করলাম!

একটু চুপ করে সিস্টার নীনা আবার বলল, বাধা দিতে পারবেন না, মাত্তর দু'মিনিট, বসুন চা করি।

সিস্টার নীনা চা করতে গেল। কনকচাঁপা শাড়ি বদলাল না। বেরিয়ে যেতে হাওয়ায় উড়ল শুধু স্কার্টটা।

দু'মিনিট শেষ হয়ে প্রায় দশ মিনিট কেটে গেল। একটা সিগ্রেট ধরালাম। কতক্ষণ পরে এল সিস্টার নীনা। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম মুক্তোর মত চিক্ চিক্ করছে আলোয়। কপালের ক'গাছি চুল উড়ু উড়ু করছে খোঁপা ছেড়ে। বলল, আসুন, ভিতরের বারান্দায় বসব।

বারান্দায় টিপয় দিয়েছে ঝি। বেতের চেয়ার টেনে বসলাম সে এক মুগ্ধ পরিবেশে। মুখ ধুয়ে এসে সিস্টার নীনাও এসে বসল মুখোমুখি হয়ে। ছোট্ট পিরিচ ভরে নারকোলের শাদা শাদা সরু চিঁড়ে দেয়া হয়েছে। পথ ভুলে এক ঝলক হাওয়া বারান্দা দিয়ে বেরিয়ে যেতেই কনকচাঁপা শাড়ির আঁচল কাঁপল একটু।

চায়ের কাপে চুমুক দিলাম।

চিনতে পারলেন বাড়ির নম্বর? সিস্টার নীনা শুধাল।

দু'বছর কাটিয়ে গেলাম চাটগায়!

বিকেলে আসলেই পারতেন!

কালকে গ্রীন অ্যারোতে চলে যাচ্ছি কিনা। ভাবলাম দেখা করে যাই।

কি যেন ভাবল সিস্টার নীনা। বলল, কেন, ভালো লাগছে না বুঝি এখেনে?

না ঠিক তা নয়। তবে ভালো লাগলেই কি সব সময় থাকা যায় সিস্টার?

চুপ করে রইল সিস্টার নীনা ক'মিনিট। বলল, নিরুর স্বামী বদলি হয়ে গেছে বুঝি?

সে তো কয়েক মাস হয়ে গেল। আমি জানালাম।

আমাদের এখেনে আসলেই তো পারে মাঝে মাঝে। আশ্চর্য মেয়ে বাবা! এক সাথে পড়তাম আমরা, জানেন বোধ হয়।

না তো?

কতক্ষণ পরে গীর্জার ঘণ্টা বাজল ঢং ঢং করে। রাত দশটা।

এবার উঠি সিস্টার, আমি বললাম, বকবে আবার!

চাঁদ উঠেছে আকাশে পাহাড় ডিঙিয়ে। সিস্টার নীনা এল গেট পর্যন্ত। একটা রিক্শা ঠিক করলাম। মিষ্টি কাঠের শব্দ বাজল কানে রিক্শায় উঠতে উঠতে।

আরো ক'দিন থেকেই যান না হয়। ভালো লাগবে আপনার এ পাহাড়ী শহর!

একটু থমকে গেলাম। বললাম, ভেবে দেখি সিস্টার।

বাসায় ফিরতে রাত সাড়ে দশটা বেজে গেল। নিরুদি বসে আছে খাবার নিয়ে।

ফিরলেন তাহলে! মাথা খারাপ তোর? নিরুদি বলল।

তুমিই তো ঠেলে পাঠিয়ে দিলে তখন। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বললাম।

টুকটাক কি খেলাম তা' মনে নেই। ভিতরের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ব পড়ব। নিরুদি এসে জিগগেস করল, কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

চেয়ার টেনে বসলেন নিরুদি।

তোমার সতীর্থের বাড়ি। আমি উত্তর দিলাম।

নীনার বাড়ি?

হ্যাঁ।

খেলি কিছু?

ধুস, কেবল চা-চিঁড়ে।

চিঁড়ে?

মানে, নারকোলের চিঁড়ে।

জানিসনে তুই, ভারী আশ্চর্য মেয়ে এই নীনা।

এক সংগে পড়তে নাকি তোমরা?

নিরুদি বলল, চার বছর পড়েছি ওর সংগে। সে এক আশ্চর্য মেয়ে নীনা। ক্লাসে ফাস্ট হত সব সময়ই। আই এস সিতেও ফার্স্ট হয়েছিল বাইওলোজি নিয়ে। ঢাকায় পড়তে গেল। ওর বাবা সরকারী চাকরি করত এখেনে। মা নেই। বড়ো দু'ভাই চাকরি করে বিদেশী ফার্মে। হঠাৎ ওর বাবা মারা গেলেন। ভাইগুলো ছোটলোক, পড়ার খরচ বন্ধ করে দিলে ফার্স্ট ইয়ারেই। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের কিছু টাকা ছিল। দু'ভায়ে ভাগ করে নিল। নীনাও পেল কিছু। কিন্তু তা দিয়ে কি আর ডাক্তারী পড়া চলে মেয়েদের?

কোন আত্মীয়ের বাসায় উঠতে পারল না সেখেনে? আমি শুধোলাম।

বা-ব্বা, যা তেজী মেয়ে ও! হঠাৎ চিঠি পেলাম একদিন ওর। সত্যি, মনটা আমার কেঁদে উঠেছিল সেদিন হতভাগীর জন্যে। চিঠির জবাব দিলাম শুধু সান্ত্বনার সুরে। কিন্তু তা' দিয়ে কি আর চিঁড়ে ভিজে!

তারপর?

তারপর শুনলাম একদিন, মেডিকেলের একটা ছাত্রকে বিয়ে করেছে ভাইদেরকে না জানিয়ে। জানাবেই বা কেন ছোটলোকগুলোকে! কিন্তু অদৃষ্টের লীলা-খেলা বোঝা বড় শক্ত। বছর দেড়েক বাদে প্লুরিসিতে ভুগে ছেলেটি মারা গেল। হতভাগী মা হতে যাচ্ছিল তখন।

সিগ্রেটটা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল আঙুলের ফাঁকে। একটু আনমনা হয়ে গেলাম যেন।

নিরুদি বলল, তারপরই তো নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে এক বছর ধরে স্টাফ নার্স হিসেবে চাকরি করছে। এ হাসপাতালে এল সেদিনটায়। যে বাড়িটা দেখলি ওটা ভাইদের অধিকারেই ছিল এতদিন।

খাবার বেলায় নিরুদি বলল, ঘুমিয়ে পড়, রাত অনেক হল।

ঘুম কি এল চোখে! একটা সিগ্রেট ধরালাম। পৃথিবীটা মনে হল যেন শুধু সিগ্রেটের ধোঁয়া।

হিন্দুশাস্ত্রে নির্দেশ আছে শয্যা ত্যাগ করার পূর্বে ব্রাহ্মমুহূর্তে কয়েকটি প্রাতঃস্মরণ স্তোত্র আবৃত্তি করতে হবে। এই সকল স্তোত্রের একটি হচ্ছে পঞ্চকন্যার বন্দনাগান। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী এই কন্যাগণ জীবনের দুরূহ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আপন আপন ক্ষেত্রে ত্যাগ-দ্বারা তপস্যা দ্বারা অনন্যমহিমা অর্জন করেছিলেন। তাই তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়া। কিন্তু পুরাণ ছেড়ে ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করলেও আমরা এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে যুগে যুগে এমন সকল নারীর দেখা পাই, যাঁরা পুরাণবর্ণিতা পঞ্চকন্যার মতই গরীয়সী; যাঁদের নাম স্মরণে আমাদের সুপ্রভাত হয়। এমনি একজন প্রাতঃস্মরণীয়া ভারতকন্যা হচ্ছেন গৌরীমা।

আমার বাল্যকালে একবার তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর জীবনের লোকোত্তর কীর্তিকাহিনীর কথা তখন কিছুই জানা ছিল না। সেদিন তাঁকে দেখে বা তাঁর কথা শুনে আমার মনে হয়নি কোন অতি-মানবীকে আমি দেখছি। মনে হয়েছিল খুবই ঘরোয়া, সাধাসিধে। আমাদেরই পরিবারের ঠাকুরমা, দিদিমার মতই একান্ত আপন কেউ। যাঁরা তাঁর নিকট সাহচর্যে মানুষ হয়েছেন, তাঁদেরও অনেকের কাছে শুনেছি, তিনি স্নেহে, মমতায়, আদরে, আবদারে, কৌতুকে, রসিকতায় তাঁদের ঠাকুরমার মতই ছিলেন। কিন্তু তাঁর অনন্যসাধারণত্ব ছিল এইখানে যে, অতি কাছের মানুষ হয়েও একমুহূর্তে তিনি আবার অনেক দূরের মানুষ হয়ে যেতেন, তখন তিনি যেন আর এই পৃথিবীর লোক নন। সংসারে নির্লিপ্ত, শান্ত, উদাসীন এক সন্ন্যাসিনী।

ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ মহাকবি মিলটনের প্রশস্তিতে লিখেছেন,

"Thy soul was like a star, and dwelt apart,
Thou hadst a voice whose sound was like the Sea,
Pure as the naked heavens, majestic, free;
So didst thou travel on life's common way
In cheerful godliness; and yet thy heart
The lowliest dulies on her-self did lay."

এই বর্ণনাটি গৌরীমা সম্বন্ধে সুপ্রযোজ্য বলে আমার মনে হয়। গৌরীমার আত্মাও যেন সুদূর আকাশের তারা, সহস্র মানুষের মধ্যবর্তী হয়েও নিঃসঙ্গ; তাঁর কণ্ঠস্বর যেন সমুদ্র-কল্লোল, শ্রোতার কানের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করে মর্মমূলে বিদ্ধ হতো; এক জ্যোতির্ময় ঐশ্বরিক মহিমা বিকীর্ণ করে
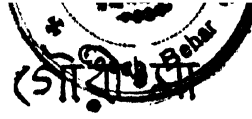
সুপ্রভা চৌধুরী

তিনি পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াতেন, অথচ অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যকেও তিনি 'তুচ্ছ' বলে কখনও অবহেলা করেননি।

আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা যেমন পরমাণবিক শক্তিকে লোকজীবনের সহস্রবিধ মঙ্গলকর্মে ব্যবহার করে সার্থক করতে চান, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তেমনি তাঁর অনন্যা-শিষ্যার মধ্যে এক দুর্লভ বীর্যের দীপ্তি প্রত্যক্ষ করে বাংলা দেশের 'জ্যান্ত জগদম্বাদের' গড়ে তোলার কাজে তা ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। "সাধনভজন তো অনেক হলো, এই তপস্যাপূত জীবনটা মায়েদের সেবায় লাগাও", এই বলে তাঁর অতি স্নেহের গৌরীদাসীকে আদেশ দিয়েছিলেন, 'কলকাতা টাউনে' বসে কাজ করার জন্যে। এইভাবে এই সংসারত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়েছিল।

গৌরীমার কর্মজীবনের স্বরূপটি সম্যক উপলব্ধি করতে হলে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের অন্তঃপুরের দৃশ্যটি উদ্ঘাটন করে, তখনকার সমাজে মেয়েদের স্থান কোথায় ছিল আমাদের একটু অনুধাবন করতে হবে। তখন ছিল বাল্যবিবাহের যুগ, গৃহকর্ম ছাড়া মেয়েদের করণীয় আর কিছু থাকতে পারে বলে লোকের বিশ্বাস ছিল না। রাসসুন্দরী দাসী তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, "আমার অদৃষ্টক্রমে তখন মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিত না। তখনকার লোকে বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবে। ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না।" কেশবচন্দ্র সেনের জননী সারদাসুন্দরী তাঁর আত্মকথায় বলেছেন, "এখন যেমন মেয়েরা স্বচ্ছন্দে লেখাপড়া করিতে পারে এবং কত ভাল ভাল বিষয় শিক্ষা পায়, আমাদের এ সকল কিছুই ছিল না। তখন ধারণা ছিল, যে মেয়ে লেখাপড়া করে সে বিধবা হয়।" সুখের বিষয় গৌরীমার পিতৃপুরুষের আদর্শ একটু ভিন্ন রকমের ছিল। নবজাগরণের যে ভাবধারা উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটিয়েছিল, তার হাওয়া পার্বতীচরণের অন্তঃপুরেও পৌঁছেছিল। গৌরীমার জননী গিরিবালা সুশিক্ষিতা ও সুকবি ছিলেন। গৌরীমাও বাল্যকালে লেখাপড়া শেখার ভালো সুযোগ পেয়ে ভবানীপুর হিন্দু-বালিকা বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারে তখনকার দিনের সমাজে মেয়েকে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হবে একথা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। সুতরাং যথানিয়মে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা হোল। দামোদরে সমর্পিত-প্রাণা কন্যা আপত্তি ও প্রতিবাদ জানিয়ে ব্যর্থকাম হয়ে অবশেষে বিয়ের রাত্রে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। শুধু তাই নয়, অল্পদিন পরেই সংসারও ত্যাগ করলেন তিনি, হলেন পরিব্রাজিকা। সংসারের মায়া ও আত্মীয় পরিজনের স্নেহ মোহ বন্ধন কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন ভারতের তীর্থপরিক্রমায়। যৌবনে যোগিনী হয়ে এই দুরন্ত সাহসিকা মেয়ে কত দুর্গম তীর্থে একাকিনী ঘুরে বেড়ালেন, সহায় নেই; সম্বল নেই, অনাহারে, অনিদ্রায় কেটেছে কতদিন, কত রাত। কখনও হিংস্র পশু, কখনও পশুর চেয়ে হিংস্রতর মানুষ পিছু নিয়েছে, তবু দুর্লভ ধনকে দুঃখের পণ দিয়ে জয় করে নেবার প্রতিজ্ঞা তাঁকে করেছে অশঙ্কিনী, বুকের কাছে ঝুলিয়ে-রাখা সোনাঠাকুর দামোদরের প্রেম তাঁকে করেছে মহাবীর্যবতী। পথের সব বাধা জঞ্জাল সরে গিয়ে পথ হয়েছে অবারিত। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষ তাঁকে জেনেছে 'মাতাজী' বলে। তাঁর স্বদেশবাসী তাঁকে বুঝতে শিখেছে, তাঁর পায়ে দিয়েছে তাদের ভালবাসার অর্ঘ্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আদেশ মাথায় নিয়ে গৌরীমা বাংলা দেশের মেয়েদের মানুষ করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। ভারত পরিক্রমাকালে বিভিন্ন প্রদেশের মেয়েদের আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতাপ্রিয়তা লক্ষ্য করে বাংলাদেশের মেয়েদের দুরবস্থা তিনি ভাল [illegible] উপলব্ধি করেছিলেন, তাই গুরু[illegible] নির্দেশকে নিজের জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করলেন। প্রথমে কয়েকটি মাত্র মেয়েকে নিয়ে বারাকপুরে গঙ্গার ধারে একটি কুটিরে তাঁর 'সারদেশ্বরী আশ্রমে'র প্রতিষ্ঠা হোল। অর্থবল, লোকবল কোনটিই ছিল না, সম্বল কেবলমাত্র গুরুবাক্যে অবিচলিত আস্থা। আর নিজের অদম্য মনোবল। কোনও কাজই তাঁর কাছে তুচ্ছ নয়। মুষ্টিভিক্ষা করে লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে তাঁর আদর্শের কথা বুঝিয়ে দিয়ে দান সংগ্রহ
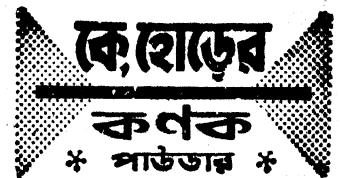
করতেন গৌরীমা। আবার ভিক্ষালব্ধ চাল-ডালের ভোগ নিজের হাতে রান্না করে আশ্রমকন্যাদের খাওয়াতেন তিনিই। ক্রমশ দেশের লোক তাঁর ত্যাগ ও আদর্শকে মর্যাদা দিতে শিখল এবং তাদের তিল তিল দান দিয়ে গড়ে উঠলো কলকাতার আশ্রম যা এখন একটি বিরাট স্ত্রী-বিদ্যালয় ও সন্ন্যাসিনী-সঙ্ঘে পরিণত হয়েছে।

আজ যখন আমাদের দেশে শিক্ষাজগতে একটা আমূল সংস্কার ও পরিবর্তনের পরিকল্পনা চলেছে তখন শিক্ষক হিসাবে গৌরীমার আদর্শটি বুঝে দেখতে চেষ্টা করলে জাতীয় কল্যাণ হবে বলে মনে করি। তাঁর কাছে শিক্ষকতার অর্থ ছিল শিক্ষাব্রত; শিক্ষার লক্ষণ তাঁর মতে শব্দশিক্ষা মাত্র নয়, পুঁথিগত মুখস্থ বিদ্যাও নয় যা পরীক্ষার খাতায় উদ্গীর্ণ হয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়; অর্থকরীও নয় অথবা ইংরেজীয়ানার সস্তা অনুকরণও নয়। তাঁর মতে এ সব কুশিক্ষার চেয়ে অশিক্ষাও অনেক ভাল। তিনি বলতেন, মেয়েদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তাদের চিত্তবৃত্তিসমূহ সম্যকরূপে বিকশিত হয়, যাতে তারা স্বদেশের শাস্ত্র ও প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়, আবার দেশবিদেশের নানা উন্নত নব নব ভাবধারার প্রতিও মনকে উন্মুক্ত রাখে। শিশুরূপে ভবিষ্যৎ জাতি তাদের কোলেই গড়ে উঠছে, তাই নারীশিক্ষার দায়িত্ব এত বেশী।

গৌরীমা আমাদের দেশের মেয়েদের শিখিয়েছেন নির্ভীক হয়ে মাথা উঁচু করে শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে; আত্মসচেতন ও স্বাবলম্বী হতে; মানবাত্মার মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে শিখিয়েছেন, আর শিখিয়েছেন সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হতে।
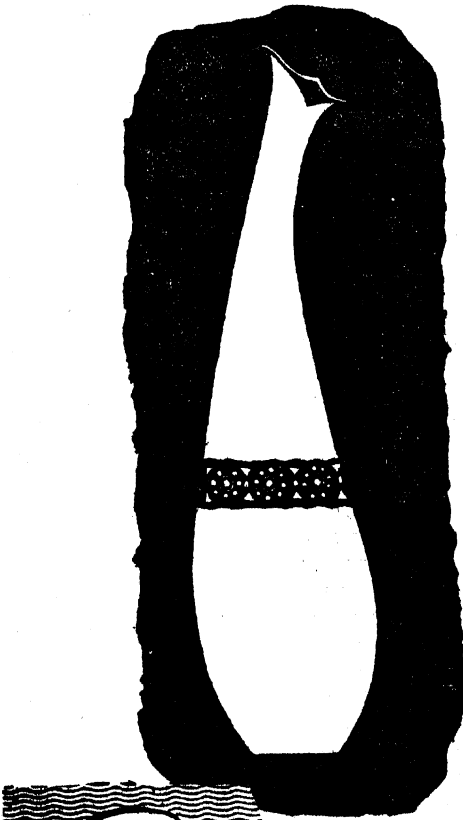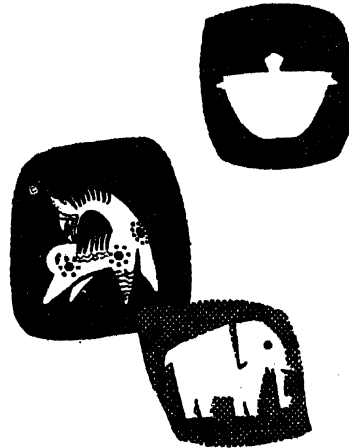
গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ড্রাফটস্‌ম্যানশিপ-এর ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক চারু ও কারুকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। অন্যান্যবারের মত এবারেও এঁরা অসংখ্য নিদর্শন সাজিয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। ফাইন আর্ট, অ্যাপলায়েড আর্ট, গ্রাফিক আর্ট, মডেলিং এবং ড্রাফটসম্যানশিপ এসব কটি বিভাগেরই কাজ প্রদর্শন করা হয়েছিল। ব্যবহারিক শিল্প বিভাগে পোস্টার, প্রেস-লে-আউট, শো-কার্ড, ডাইরেক্ট মেল, প্যাকেজিং, প্রচ্ছদপট, ক্যালেণ্ডার, ফোল্ডার প্রভৃতি বিভিন্ন বিজ্ঞাপন শিল্পের নিদর্শন পেশ করেছিলেন ছাত্রছাত্রীরা। এ বিভাগের কাজের মান কিছুটা উন্নত হয়েছে গতবারের তুলনায়, কিন্তু টাইপোগ্রাফী এখনও অত্যন্ত দুর্বল। অনুকরণ করার ঝোঁকটাও প্রবল। কয়েকজন বিশিষ্ট কমার্শিয়াল আর্টিস্ট-এর কাজের লক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে কয়েকটি কাজের মধ্যে। অক্ষর অংকনে বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন এ বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের। উল্লেখযোগ্য পোস্টার শ্যামল চক্রবর্তীর এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার-ন্যাশনাল, মহম্মদ শামিউল্লার ভিজিট দি জু, রতীশচন্দ্র সাহার হ্যাণ্ডলুম ফ্যাব্রেক, প্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের ডল-শো এবং সত্যরঞ্জন কর্মকারের ডালডা। মহম্মদ শামিউল্লার বুক বণ্ডের শোকার্ডটিও উত্তম রচনা। প্রচ্ছদপট এবং প্রেস-লে-আউটের মধ্যে খুব চিত্তাকর্ষক নক্সা চোখে পড়েনি। ফাইন আর্টে জল রঙের ছবির মান বেশ উন্নত। সত্যই পরিণত রচনা অরবিন্দ আইচের ব্রিজ কর্নার, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রিফ্লেকটিভ ভিউ, অর্ধেন্দু চক্রবর্তীর উইণ্টার সিজন, আশুতোষ ঘোষের নির্জন, সুশীল গুপ্তের বিফোর দি-রেন ও মাই ডিয়ার ভিলেজ, অজিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের ব্লাইণ্ড লেন ও স্ট্রীট কর্নার এবং প্রশান্তকুমার রায়ের অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইণ্টিং। তৈল-চিত্রের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেইন জেটি, পরিমল ভৌমিকের সিজন ফ্লাওয়ার, হরেকৃষ্ণ দেবনাথের স্টিল লাইফ, যদুনাথ রায়ের রাশিয়ান গার্ল এবং মদন সরকারের গ্রীন ও টেণ্ট। তৈল চিত্রের মানও গতবারের তুলনায় উন্নত। মডেলিং-এ খগেন্দ্র বাগের রিডার্স ও টয়েলেট, রমেশ পালের কম্পোজিশন ও হেড স্টাডী এবং লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহের রিডার প্রশংসা দাবি করে।

ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজে মডেলিং ক্লাসটি খুব বেশী দিনের নয়, কিন্তু লক্ষ্য করছি মানের বিচারে এই বিভাগের কাজ অন্যান্য বিভাগের কাজের অনেক ওপরে। গ্রাফিক আর্টের লক্ষণীয় নিদর্শন ছিল চিত্তরঞ্জন দাশের উড কাট, রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের হোয়াইল এবং পাঁচুনারায়ণ গুপ্তের উই আর থ্রী।

*

গত সপ্তাহে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ শ্রীসুদর্শন বেনেগল তাঁর ৬০টি চিত্রের

প্রতীক্ষায়, — শিল্পী সুদর্শন বেনেগাল

একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রী বেনেগল গভর্নমেণ্ট স্কুল অব আর্ট থেকে ১৯৪৫ সালে পাস করে বেরিয়েছেন। বর্তমানে ইনি শিল্পী শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত 'স্টুডিও'-র সভ্য। প্রকৃতির একটা চাক্ষুষ পরিচয় মাত্রকে শিল্পে ব্যক্ত করেই যদি কোনও শিল্পী মনে করেন তাঁর কাজ ফুরলো তাহলে অনেক স্থলেই তাঁর বলাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পাকা শিল্পী হলেন তিনি যিনি অনুভব করতে পারেন যে, তাঁর চোখ তাঁকে যেটুকু দেখায় কেবল সেইটুকুই হুবহু আঁকলে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হয় না এবং মনের কথাও মনের মধ্যেই রয়ে যায়। শ্রী বেনেগল হলেন পাকা শিল্পী। রিয়ালিজম শিল্পের মূলে ভিত্তি আইডিয়ালিজম-এ তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং উভয়ের সমন্বয়ে পূর্ণ সফলতা—এই তন্ত্র ধরেই ইনি এঁর সৃষ্টিকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। অত্যুক্তি আছে এঁর রচনায় কিন্তু তা ভাব এবং বস্তুজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। টেনে ফেনিয়ে অতিরিক্ত ব্যাপক করে তুলে অত্যাচারে পরিণত করেন নি কোথায়ও। এঁর তৈল মাধ্যমের রচনাগুলিই অপেক্ষাকৃত উপভোগ্য। তৈল মাধ্যমের করণকৌশল এঁর বেশ দখলে। শারীর-স্থান, পরিপ্রেক্ষিত, আলোক-বিজ্ঞান এসব চিত্রবিদ্যার ব্যাকরণেও শিল্পী বেশ পাকা। আখ্যানবস্তু বাছাই করতে এঁকে মাথা ঘামাতে হয় না। যা দেখেন তাকেই চিত্রবর্ণিত বিষয় রূপান্তরিত করে ফেলেন। কখনও প্রকৃতির দৃশ্য-বৈচিত্র্যের মধ্যে, কখনও নরনারীর মুখশ্রীতে, কখনও বা তাদের দেহ-ভংগিমায় ইনি বর্ণনীয় বিষয় দেখতে পান। কেমন করে রচনা করলে উপাদানগুলি সুসংস্থিত হয় অর্থাৎ তারা পরস্পর বিরোধের দ্বারা চিত্রকে খণ্ডিত না করে একটা শৃংখলা ও সামঞ্জস্যের ভাব আনে সে জ্ঞানও এঁর পরিণত। ইনি বেশীর ভাগ রচনায় প্রথমে 'স্পট স্কেচ' করে এনে সুবিধামত পরে কম্পোজ করেছেন তৈল মাধ্যমে স্টুডিওর মধ্যে বসে। সেই কারণেই রচনাগুলি সুনিয়ন্ত্রিত পেইণ্টিং-এর রূপ লাভ করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'মাই ফ্রেণ্ড', 'স্প্রিং ইণ্টারলিউড', 'ব্যাক লাইট', 'ট্রাইবসম্যান', 'দি ডাল', প্রতীক্ষায় 'থটফুল', 'মিস্টি মর্নিং', 'ইন গ্রীন অ্যাণ্ড রেড', 'হুইল মেকার', 'ব্যালকনী', 'রিনোভেশন' এবং 'কর্নার শপ'। জলরঙের রচনাগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে পারলাম না। যদিও শিল্পীর ব্যক্তিগত মতে জল এবং তেল এ দুটি মাধ্যমেই ইনি সমান সাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন; কিন্তু রচনায় উৎকর্ষ বিচার করে দেখলে স্পষ্টই ধরা যায় তৈল মাধ্যমেই ইনি সাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন বেশী।

ট্রামে-বাসে

ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ মন্তব্য করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যদি তাহাদের শিক্ষা-মন্ত্রীর অনুসরণ করে, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা যা হইবে, তাহা ভাবিতেও তাঁর ভয় হয়। —"কিন্তু ছাত্রগণের ভীত হওয়ার কোন কারণ দেখছিনে; বেকার বাজারে মন্ত্রীর গদি তো লুফে নেবার জিনিস"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম মাদ্রাজে নাকি প্রথম মহিলা ডাক-পিয়ন নিযুক্ত করা হইয়াছে। —"বহুদিন পর আবার বৃন্দে

দূতীর কথা মনে পড়ল" —বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

বিদেশে যে-সমস্ত প্রতিনিধি যাইবেন তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে বাছাই করিতে হইবে বলিয়া শ্রী নেহরু পরামর্শ দিয়াছেন। —"সাপ্টার দর একটু সুবিধে হতো সেটি আর হবে না, মাঝখান থেকে বাছাইতে শুধু টাকা গচ্ছা" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

ম্যাকমিলান-খ্রুশ্চেভ বৈঠক প্রসঙ্গে সংবাদদাতা বলিতেছেন—তাঁরা ঠান্ডা লড়াইয়ের বরফ গলাইবার কাজে আত্ম-

নিয়োগ করিয়াছেন। —"বরফ জমিয়ে রাখলেও কাজ হবে, বরফ-নৃত্য জমবে ভালো" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একদিন নাকি নির্দিষ্ট সময়ে মন্ত্রীরা কেহই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। —"দশটা-পাঁচটার বাবুদের মতো লেট্ হয়ে বড় সাহেবের ঘরে গিয়ে খাতা সই করতে হলে মন্ত্রী মশাইরা টের পেতেন" —বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ভারতে প্রশ্ন উঠিয়াছে নেহরুর পর কে? আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন —"নেহরুর পর আপনি, আমি, পদি পিসি কত আছেন, ক'জনের নাম করব!!"

* * *

চীনা পদ্ধতিতে চাষের কথা শুনিতেছি। —"চাষের পদ্ধতিটা চীনা হলেও ধানের বণ্টন পদ্ধতি হবে নির্ভেজাল ভারতীয়, সুতরাং হাঁড়ির ঠকঠকানি যেমন আছে তেমনি থাকবে" —বলেন বিশু খুড়ো।

* * *

পানের উপর বিক্রয়-কর প্রবর্তনের প্রস্তাবে পান ব্যবসায়ীরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। —"হবারই কথা। এতে ঘুমপাড়ানী মাসিপিসীদের বাটা ভরে পান দেওয়া যাবে না এবং একখান কথা কও বা না কও, পান খেয়ে যাও বলেও বধূকে ঘাটে ডিঙা লাগাতে অনুরোধ করা যাবে না" —মন্তব্য করে শ্যামলাল।

* * *

জনৈক আফিংখোর নাকি ২০ বৎসরে ৫ লক্ষ টাকার আফিং খাইয়াছেন। বর্তমানে তিনি নিঃস্ব হইয়া রিকশা টানিতেছেন। সংবাদে প্রকাশ, তিনি নির্যাতিত আফিংখোর হিসাবে সরকারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছেন। —"আফিং কেনার সঙ্গতি তার হয়ত নেই, কিন্তু 'গুলি' ছুড়বার কায়দাটি এখনো বেশ আয়ত্তে আছে" —বলে শ্যামলাল।

* * *

কলিকাতার মেয়র নগরপিতাদের নূতন আচরণবিধি প্রবর্তনের প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কিন্তু পিতারা ছেলেমি ছাড়বেন কি?"

* * *

হরমোন কি? এই প্রশ্নের উত্তরে জনৈক আই এ এস পরীক্ষার্থী নাকি বলিয়াছেন যে, হরমোন হইল হারমোনিয়াম আবিষ্কর্তার নাম। আমাদের শ্যামলাল

একটি অসমর্থিত সংবাদ উদ্ধৃত করিয়া বলিল—"এই পরীক্ষার্থীটি তার খাতায় আই এ এস ইংরেজীতে লিখেছেন—I am ass!!"

* * *

ভারতের ক্রীড়ামানের, বিশেষ করিয়া ক্রিকেটের, অধোগতি সম্বন্ধে লোকসভায় বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। —"তবে তো আর কথাই নেই, ইংলণ্ডগামী ভারতীয় দলের নির্ঘাৎ কেল্লা মার দিস্ অবস্থা" —শ্যামলালও ক্রিকেটের কথা বলে।

* * *

অস্ট্রেলিয়ায় ইংলন্ডের শোচনীয় পরাজয়ের পর অনেকেই পাদ্রী শেফার্ডের হাতে দলের অধিনায়কত্ব অর্পণের প্রস্তাব করিয়াছেন। —"তিনি রাজী না হলে বাংলা পদ্ধতিতে 'বাবা তারকেশ্বর' বা 'হে মা কালী' মন্ত্র শিখে নিলেও কাজ চলবে" —বলেন আমাদের এক ক্রীড়ারসিক সহযাত্রী।

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম বরিশালের "অশ্বিনীকুমার হল"টি নাকি "আয়ুব খাঁ হলে" রূপান্তরিত হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"অতঃপর বরিশালের নদী কীর্তনখোলাকে জাতি-খোলাতে রূপান্তরিত করলেই কীর্তিনাশার আর এক নূতন রূপ প্রত্যক্ষ করব!"

মিনিটে মিনিটে পর্বতটা কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে। আর তা যখন হয়, বরফের ছায়ায় ঢাকা রয়েছে সুইস গ্রামের অধিবাসীদের বুকটা তখন ভয়ে দুরুদুরু কাঁপতে থাকে। দিনকতক আগে ওরা দেখে আল্পসের অন্তর্গত চোদ্দ হাজার দুশ' ছ ফুট উঁচু অ্যাডেলহর্ন পর্বতের গায়ে দশ লক্ষ টন বরফের স্তূপ ও উপলখণ্ড ধীরে ধীরে হারব্রিগেন গ্রামের পানে বন্ধুর পর্বতের গা থেকে হেলে পড়ছে গর্জন করতে করতে।

পর্বত পাহারাদারদের অধিনায়ক স্মরণীয়-কালের মধ্যে ভীষণতম শ্লথগতি ধসটি প্রথম দেখামাত্র হারব্রিগেনের দু শ পরিবার তাদের আসবাব নিয়ে তুষারাচ্ছন্ন পথ ভেঙে প্রতিবেশী গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হয়। কেবলমাত্র জন-বারো লোক কিনারের কাঠের বাড়িতে থেকে যায় পাহারা দেবার জন্য—তাদের আশা তারা পরিত্রাণ পাবে।

ধসটি যদি অনিবার্যভাবে এসেই পড়ে তাহলে প্রমোদক্ষেত্র জেরমাটের পাঁচ হাজার অধিবাসী ও শীতকালীন ক্রীড়ামোদীরা অনন্ত সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে জগতের সঙ্গে যাদের প্রধান সংযোগ হচ্ছে হারব্রিগেনের মধ্যে দিয়ে বসানো রেলপথের মাধ্যমে। কিন্তু বিপদ ঐ গ্রামটিকে ঘিরেই। ধসটা নামবে কখন?

আল্পসের উদ্ধারকারী দলের নায়ক হের্মান গিগার চালু জায়গাটায় হেলিকপ্টার নামিয়ে প্রহরী-কুঠরীর দ্বিগুণ মাপের উপলখণ্ডগুলোর দিকে চেয়ে বরফকে আর্তনাদ করে চিড় খেতে শোনে এবং জানায় যে, এখনো পর্যন্ত কেবল ঠাণ্ডা আবহাওয়াই রুখে রেখেছে। গরম হাওয়া উঠলেই গলতে আরম্ভ করে ধসটাকে গ্রামে নামিয়ে দেবে।

হারব্রিগেনের তিন হাজার ফুট ওপরকার তুঙ্গস্থানে ধসটাকে দাঁড়ে বসার মত অবস্থায় থাকতে দেখে একজন গ্রামবাসী বলে, "এইভাবে আমরা অনন্তকাল ধরে থাকতে পারি না। রোজ আমরা ক ঘণ্টার জন্য এসে সন্ধ্যায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি যে উষ্ণ রৌদ্রের বিপদ পার হয়ে গেল। পরদিন সকালে আবার দুঃস্বপ্ন। এখন এমন হয়েছে যে, আমাদের ভিতর কেউ কেউ চায় যা হবার হয়ে যাক।"

যদিও কেউ বলতে পারে না ধসটা কবে নামবে—দিন কয়েকের মধ্যেই না বসন্তকালে—কিন্তু শহরটার কোন আশা নেই। গ্রামবাসীদের আশঙ্কা নিয়ে অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু নেই।

*

ইতালির মিলান শহরে গ্যাস্টোন সাইনডি নামক এক ব্যক্তি আত্মহত্যার এক ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল তার স্ত্রীর ইয়ারিং জোড়া, নিজের

বিয়ের আংটি এবং হাতঘড়িটা গিলে ফেলে।

*

১৯৫৪-র নভেম্বরের সেই দুর্ভাগ্যের রাতের কথা জন ফ্রিম্যানের মনে পড়ে আবছা, ইতঃস্তত টুকরো টুকরো চিন্তার মধ্যে। ওর মনে পড়ে ট্রেন চাপা পড়ার কথা, মনে পড়ে সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে করতে লাইন ধরে নিজেকে টেনে নিয়ে যাওয়া, আর মনে আছে রাতটার দিন হয়ে যাওয়া। ব্যাস, ঐ পর্যন্তই।

ফ্রিম্যান বলতে পারে না কি কারণে সে ওহিওর (যুক্তরাষ্ট্রে) কলম্বাস শহরের ইউনিয়ন স্টেশনের প্লাটফর্মে গিয়েছিল: দুর্ঘটনাটি ঘটার ছত্রিশ ঘণ্টা আগের কোন ঘটনা ওর মনে নেই। রেলকর্মীরা ওকে দেখতে পেয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাবার আগে মাঝরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত বারোটি দুর্বিসহ ঘণ্টা সে লাইনে পড়ে থেকেছে, কিন্তু তাও ওর কিছু মনে নেই। দুটো পা-ই ওর বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে—একটা জানু থেকে, আর একটা হাঁটুর নিচে থেকে—কিন্তু জানেনা কি করে। নিদারুণ আঘাত এবং স্মৃতিবিলোপ ওর দুঃস্বপ্নের এই অংশটুকু ছাড়া সবই মন থেকে মুছে গিয়েছে।

এর দু মাস পর যা ঘটল তা উপন্যাস পাঠকদের মনোমত ঘটনার মতো। ফ্রিম্যান স্মৃতিলোপের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ মরিস বি রুসফের কাছে হাজির হল একদিন। প্রশ্নের উত্তরে ফ্রিম্যান কোনরকমে এইমাত্র ভেবে পেলে যে, দুর্ঘটনার দিন ওর কর্মস্থলের কাছে একটা ঘরের খোঁজে ছিল।

ডাঃ রুসফ তখন পৌনে চার গ্রেণ
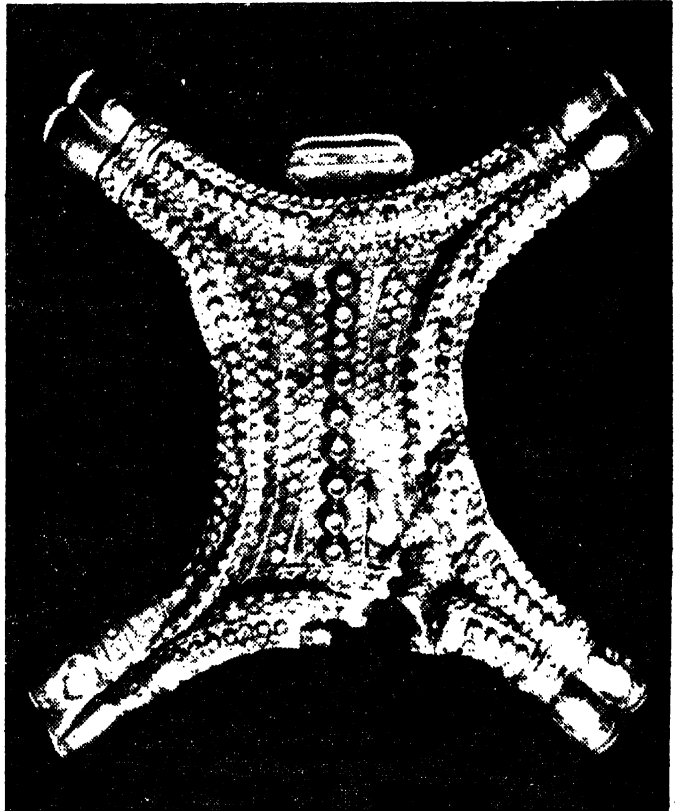
স্পেনে সেভিলের কাছে এল ক্যারামবোলো পাহাড়ের ধারে গত সেপ্টেম্বরে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত একুশটি ২৪-ক্যারাট সোনার তৈরি গহনার একটি—এই বক্ষবন্ধনী এবং অপর গহনাগুলির কারুকার্য দেখে অনুমান করা হচ্ছে যে, এগুলি ব্রোঞ্জ যুগের শেষ ও লৌহযুগের প্রারম্ভকালের টার্টেসিয়ান সংস্কৃতির নিদর্শন

সোডিয়াম এমিটাল—যাকে "সত্যভাষণ সিরাম" বলে অভিহিত করা হয়—ইনজেকশন করে প্রয়োগ করলেন। ধীরে ধীরে, থেমে থেমে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ হতে লাগল :

পানাগারে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়... টেলিভিসনে ওরা ওহিও-মিচিগান ফুটবল খেলা দেখে......দুটি মেয়ে জোটে এবং অত্যধিক বীয়ার পান করে......মিচিগানের এন আর্বার স্টেশনগামী রাত এগারটার ফুটবল-স্পেশাল ট্রেনটিতে মেয়ে দুটির কোন পরিচিত ব্যক্তি যাচ্ছিল......ওরা ট্রেনে গিয়ে ওঠে এবং একটি কামরার এক হুল্লোড়ের দলে যোগদান করে......হঠাৎ ট্রেনটি চলতে শুরু করে......ফ্রিম্যান লাফিয়ে নেমে প্লাটফর্ম ধরে চলতে থাকে......এক কন্ডাক্টরের সঙ্গে দেখা হয় এবং ওদের দুজনের ঝগড়া হয়......কন্ডাক্টর ওকে ধাক্কা দিয়ে লাইনের ওপর ফেলে দেয়......ওর পিঠে আঘাত লাগে এবং ও উঠতে অপারগ হয়......একটা ট্রেন ওর পায়ের ওপর দিয়ে চলে যায়।

ওষুধের প্রকোপে বিস্মৃত ঘটনার বিবরণের জোরে ফ্রিম্যান রেল কোম্পানীর নামে প্রায় বার লক্ষ টাকার ক্ষতিপূরণের এক মামলা রুজু করে। জেমস ব্রিট ও মেলভিন বেলি নামক দুজন উকীল ফ্রিম্যানের মামলাটা হাতে নিলেন একটি কারণে : ফৌজদারী মামলায় যদিও বা কখনো সোডিয়াম এমিটাল প্রয়োগে বিবৃত সাক্ষ্য স্বীকার করা হয়েছে, কিন্তু দেওয়ানী মামলায় এ ব্যাপার এই প্রথম।

বিচারকালে আইনঘটিত প্রশ্ন উঠল "সত্যভাষণ সিরাম" দ্বারা নিষ্কাশিত বিবৃতি গ্রাহ্য করা হবে কি না। কিন্তু বেলি ও ব্রিট ডাঃ রুসেফ ও আরো আটজন বিশেষজ্ঞকে হাজির করলেন পদ্ধতিটি ও তার দ্বারা প্রাপ্ত ফল সম্পর্কে বুঝিয়ে দেবার জন্য। ফ্রিম্যানের বিবরণ আদালত গ্রহণ করলে।

কাঠগড়ায় ধূসরকেশ নীলাক্ষ যুবক ফ্রিম্যান বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষী হল। এখন ও কৃত্রিম পায়ে চলে, আগেকার প্রতিষ্ঠানে কাজও করে। হাসপাতালে যে ছাত্রী-নার্স ওর সেবায় নিযুক্তা ছিল তাকে বিবাহ করে এবং ওদের দুটি সন্তান হয়েছে। এ অবস্থায় যে কোন জুরীরই সহানুভূতি জাগা স্বাভাবিক।

সোডিয়াম এমিটালের দ্বারা প্রভাবিত বিবৃতির বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কেও কোন প্রশ্ন ওঠেনি। জুরীরা সেটা আলোচনার প্রথম পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঠিক করে ফেলেন। কিন্তু তবুও যখন জুরীরা ক্ষতিপূরণের দিকটা বিবেচনা করতে বসলেন, তখন হিসেবটা ফ্রিম্যানের প্রকৃত খরচের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দিলেন। ওরা ধরলেন নকল পায়ের খরচ (প্রতি চার বছর অন্তর ছিয়াত্তর শ টাকা হিসেবে), বিশেষ গার্ডার জন্য অতিরিক্ত খরচ (প্রতি পাঁচ বছরে সাড়ে আট শ টাকা হিসেবে), এমন কি ফ্রিম্যানের আয়কর থেকে কত বাদ যাবে সেটাও হিসেবে ধরলেন। তারপর তাঁরা ক্ষতিপূরণ বাবদ মোট প্রাপ্য নির্ধারিত করলেন এক লক্ষ সাড়ে বিরাশি হাজার টাকা।

ক্ষতিপূরণের টাকার পরিমাণে সন্তুষ্ট না হয়ে ফ্রিম্যানের উকীলরা আপীলের কথা ভাবছেন। তবে একটা বিষয়ে তাদের জয় তাঁরা দাবী করতে পারেন : "সত্যভাষণ সিরাম" দ্বারা প্রভাবিত বিবৃতিকে আইনের স্বীকৃতি পাইয়ে দিয়েছেন।

*

ইন্দোনেসিয়ার জকার্তাতে পুলিসের স্ত্রীদের জাতীয় সংস্থা প্রতি পুলিসের একজন মাত্র স্ত্রীর সভ্যা হবার অধিকার সাব্যস্ত করেছে।

*

জনকল্যাণ রাষ্ট্র ইংল্যান্ড সম্প্রতি একটা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছিল। কারণ ঘটিয়েছিল ডাডলি শহরের জো নিউ নামে এক ব্যক্তি যে তার স্ত্রী, এক রক্ষিতা এবং দশটি সন্তানকে প্রতিপালন করছিল নব্বই টাকা হপ্তার বেকার-বীমার অর্থ দিয়ে (সেই সঙ্গে সন্তানদের জন্য পঞ্চাশ টাকা হপ্তায়)। স্ত্রী মার্গারেট স্বামী জোকে সাতটি সন্তান উপহার দিয়েছে এবং অষ্টমটি আগতপ্রায়। রক্ষিতা স্যান্ডি জোকে উপহার দিয়েছে তিনটি সন্তান এবং সেও আসন্নপ্রসবা।

স্ত্রীলোক দুটি, ওদের সন্তানেরা এবং জো বছর কতক আগে, স্যান্ডির প্রথম অন্তঃস্বত্বা অবস্থা থেকে, সরকারি সাহায্যে নির্মিত কম ভাড়ার ঘরে বাস করে আসছে। স্যান্ডিকে যখন প্রথম বাড়িতে এনে রাখে পাড়ায় তখন এ নিয়ে কাণাঘুষা হতে থাকে।

কিন্তু শেষে শহরেও কথা আরম্ভ হয়। মাস তিনেক আগে স্থানীয় পৌর সমিতি খবরটা জানতে পেরে ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন শিশু পালনাগারে পাঠিয়ে দেয়। তাতে প্রতিকার কিছু হল না। ছেলেমেয়েগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হল; ওদের মায়েরা জোকে হারাল; আর জো চিন্তায় শুকিয়ে যেতে লাগল। উপরন্তু ছেলেমেয়েগুলোর ভরণপোষণ বাবদ বোর্ডের খরচ হতে লাগল মাসে প্রায় চার হাজার টাকা।

সপ্তাহ দুই আগে কর্তৃপক্ষের কাছে দুই মায়ের অনুরোধে এবং এই কথার ওপর জোর দেওয়ায় যে, "আমরা ব্যভিচারকে ক্ষমা করছি না"—পৌর সমিতি নিউ'দের জানায় যে তারা আবার একত্রিত হতে পারে; এবং সপ্তায় বিশ টাকা ভাড়ায় কাউন্সিলের ভাড়াবাড়িতে গিয়ে "ওদের নিজেদের মত" হয়ে থাকুক।

তুলনামূলক সাহিত্য

অমিয় দেব

আমেরিকায় কবিতা-লেখার ক্লাশ আছে। ক্লাশে ভর্তি হ'য়ে কবিতা-লেখা শেখা যায় কিনা জানি না, তবে কবিতা-পড়া যে শেখা যায় তা দু' বছর যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের ক্লাশ ক'রে জেনেছি। সাহিত্যপাঠের রুচিও যে শিক্ষণীয় এবং ক্লাশ যে সেই শিক্ষার তীর্থ হ'তে পারে একথা যাদবপুরে না এলে আমার হয়ত জানাই হ'ত না। যখন ভর্তি হই, বন্ধুদের কেউ কেউ বিস্মিত হয়েছিলেন। কম্পারেটিভ লিটারেচার—সে আবার কী! কী তা শুনে দু'একজন মৃদু হাসলেন, ও তাই বল, রিডার্স ডাইজেস্ট গোছের ব্যাপার।

স্ক্যাপরিডিং-সাহিত্যপাঠ অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু হজম না ক'রে আস্ত আস্ত বই গেলারও কোন মানে হয় না। টলস্টয় ডস্টয়েভস্কির সব ক'টা বই প'ড়েও যদি কারও কাছে তাঁদের শিল্পী-স্বভাবের দূরত্ব অননুভূত থাকে, তাহ'লে বলতেই হবে সে পাঠ অসার্থক। তার ষোলআনাই শৌখিনতা। তাকে দিয়ে সাহিত্যবীক্ষণ দূরের কথা, সত্যিকারের সাহিত্যপ্রীতিও অসম্ভব। কেননা, সাহিত্যপ্রীতি তো আর সব বই প'ড়ে ফেলার মত্ততাটুকুই নয়, বই প'ড়ে সচেতন আনন্দ কুড়নোও অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পাদনে যাঁরা সমুৎসুক, সচেতনতায় উৎসাহী, শুধু পড়তে নয়, প'ড়ে কেমন লাগছে সেই প্রশ্ন করতেও ভালবাসেন, তাঁরাই যথার্থ শিল্প-রুচির অধিকারী। শেকস্‌পীয়র এবং দান্তের, কিম্বা কালিদাস এবং সোফোক্লিসের তফাৎ বোঝার মত চোখ তাঁদের আছে। আছে ব'লেই তাঁরা সহৃদয়হৃদয়সংবাদী। সাহিত্য তাঁদের কাছে সুন্দর। সেই সুন্দরকে যেমন স্পর্শ করতে হবে হৃদয় দিয়ে, তেমনি জানতে হবে বুদ্ধি দিয়ে। সেই সুন্দরের কাছেই অভিসার, পূর্বরাগে যার বুদ্ধির দীপ্তি, মিলনে অনুভবের তীব্রতা। কতটা দিতে পারে রিডার্স ডাইজেস্ট? আলোও নয়, অন্ধকারও নয়; আলোর নাম ক'রে জলুস, অন্ধকারের নাম ক'রে ক্লীবত্ব। দিতে পারে একধরণের আত্মতৃপ্তি, যা শুধু নিশ্চেতনার আপাতস্বর্গেই সম্ভব। বিশ্বসাহিত্যের অন্তরমহলে রিডার্স ডাইজেস্টের প্রবেশ নিষেধ; তার রাজত্ব হাটে বাজারে, যেখানে মানুষ পুতুল খুঁজে ফেরে।

রবীন্দ্রনাথ কম্পারেটিভ লিটারেচারের নামকরণ করেছিলেন বিশ্বসাহিত্য। গ্যেটের weltliteratur[১] সর্বতুলনামূলকতার উৎস। রবীন্দ্রনাথ ও গ্যেটে দু'জনেই উদার ছিলেন; তাই সাহিত্যচিন্তায় সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামীর হাত থেকে মুক্তিলাভ তাঁদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। সত্যিকারের সাহিত্যসরণ যে শুধু কোন বিশেষ দেশের বা ভাষার সাহিত্যপ্রীতি নয়, সর্বদেশের সর্বকালের সাহিত্যকে মাথায় তুলে নেওয়া—এ বোধ এই দুই বিশ্বনাগরিকের ছিল।

হোমর পড়তে পড়তে বাল্মীকি-রামায়ণের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। মনে হয়, ইলিয়াডের সঙ্গে রামায়ণের কাহিনীর সাদৃশ্যের জন্যেই নয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য হিসেবে গ্রীক সংস্কৃত তুলনীয় ব'লেও। চব্বিশ হাজার শ্লোকের রামায়ণ এবং শত-সাহস্রীসংহিতা মহাভারত যেমন পরবর্তী ভারতীয় সাহিত্যের প্রধানতম উৎস, তেমনি হোমরও, শুধু গ্রীক কেন, লাটিন এবং অংশতঃ পরবর্তী য়ুরোপীয় সাহিত্যেরও অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রভাব। যাকে পশ্চিমী কৃষ্টির জনক বলা হয় অনেক সময়, সেই ভর্জিল ঈনীড লিখেছিলেন হোমরের ভাব-শিষ্য হ'য়ে। আর দান্তে, যিনি এলিঅটের মতে জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি, ভর্জিলকে গুরু ব'লে মেনে নিয়েছেন গোটা 'ডিভাইন কমেডি' জুড়েই। স্পষ্টতঃ, সাহিত্য শুধু বিচ্ছিন্ন কীর্তিস্তম্ভ নয়; তাদের অন্তরালে আছে এক প্রবাহ, যাকে আবিষ্কার করাই সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে আমাদের প্রাথমিক কাজ। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক কিছু পড়তে গেলে রামায়ণ মহাভারত ওল্টাতে হয়। হয়ত, রামায়ণ মহাভারতের দেশের মানুষ ব'লেই এ সম্বন্ধে আমরা তত সচেতন নই। য়ুরোপীয় সাহিত্য পড়তে ব'সে যখন পাতায় পাতায় গ্রীক লাটিনের ডাক পড়ে তখন স্পষ্ট হয় ব্যাপারটা। ইংরিজি পড়ার সময় আমরা শুধু ইংরিজিই পড়ি না, খানিকটা গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, জর্মনও প'ড়ে নিই। কেন পড়ি? না পড়লে চলে না ব'লেই। কিন্তু কতটা পড়ি? ঠিক যতটা ইংরিজির স্বার্থে প্রয়োজনীয় ততটা। অথচ এই পড়াটাই যখন আরও অনেক সহৃদয়, অনেক উদার হবে, তখন দেখতে পাব, শুধু ইংরিজিই নয়, অন্য সাহিত্যও সত্যি ক'রে পড়ছি। এই সহৃদয়তা আর উদারতাই তুলনামূলক সাহিত্যের জন্ম-মুহূর্ত।

জানি, কেউ কেউ বলবেন, তাহ'লে ইংরিজি, বাংলা, ফরাসী, জর্মন আলাদা সাহিত্য হিসেবে পাঠ্য হবে না? কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে। তবে তুলনামূলক সাহিত্যের মত অত বিস্তার আর ঐক্যবোধ থাকবে না সেই পাঠের। এক সাহিত্য কেন, এক কবি, এক নাট্যকারকে নিয়েই তো সারা জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। আর কাটানোর উদাহরণ কি খুব বিরল? শেকস্‌পীয়রকে নিয়ে বুঁদ হয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে কি কম লোককে? মালার্মে, ভালেরি, রিল্‌কে আমার ভাললাগে, এ'দের নিয়ে নিশ্চিন্তে অতি-

১। world-literature

বাহিত করতে পারি অনেক কাল। কিন্তু ঐ ভাললাগাই তো সাহিত্যের ছাত্রের কাছে সব নয়। তাকে পেরিয়ে আছে অন্তর্দৃষ্টি। মালার্মে, ভালেরি, রিল্‌কে পড়তে পড়তে স্পষ্ট হবে প্রতীকী কাব্যের সেই ধারা যার জনক বোদলেয়ার, পুরোধা মালার্মে এবং উত্তরসাধক শুধু ভালেরি রিল্‌কেই নন, ইয়েট্‌স্‌ও। সমালোচকের কাছে অন্যতম প্রধান কথা এই আবিষ্কার। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, মালার্মে ভালেরি রিল্‌কেকে শুধু প্রতীকীকাব্যের ইতিহাসের অংশ হিসেবেই দেখা হবে। কবি মালার্মে আর কবি ভালেরি নিঃসন্দেহে আলাদা, কে বড় কে ছোট সে বিচার না ক'রেও রিল্‌কে ভালেরিকে সম্বর্ধিত করা যায়, তবু প্রতীকী কাব্যের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ—যোগাযোগের আবিষ্কার হয়েছে তাঁদেরই কবিতা পড়তে পড়তে—কখনও এড়ানো যায় না। এবং যায় না ব'লেই তারা একই সঙ্গে স্বতন্ত্র ও গোষ্ঠী।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রত্যেক কবিই স্বতন্ত্র। সেই স্বাতন্ত্র্যেই তাঁর কাব্যের সিদ্ধি। এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের সান্নিধ্যে এসে যে আনন্দ তার কোন সংজ্ঞা নেই; তার সবটাই বিশুদ্ধ, ব্যক্তিগত, অনন্ত। ব্রহ্মস্বাদের মত ব্রহ্মস্বাদসহোদরও বর্ণনাতীত। কিন্তু তাই ব'লে যস্মিন কস্মিনের লভ্য নয় এই আনন্দ, এর দ্বারে পৌঁছোনোর অধিকার অর্জনের ধৈর্য এবং নিষ্ঠা কেবল মৈত্রেয়ীদেরই আছে। রাস্তাটাও নেহাৎ ফেল্‌না নয়, সহজসিদ্ধি থেকে শুরু ক'রে সব মোহই এর বাঁকে বাঁকে ওৎ পেতে থাকে। আলোর দরকার এখানেই; সুবুদ্ধির সারথ্য অপরিহার্য। আর সুবুদ্ধি মানেই সেই অন্তর্দৃষ্টি, যার আলোয় শেক্‌স্‌পীয়র-দান্তের কবি-স্বভাবের দূরত্ব কিম্বা কালিদাস-ভর্জিলের স্বাজাত্য আবিষ্কৃত হয়। সাহিত্যের ছাত্রের কাছে, বলা বাহুল্য, এই অন্তর্দৃষ্টির প্রশ্নই প্রধান। সচেতন, বিচার-নির্ভর সাহিত্যপাঠ প্রাথমিক ভাললাগা এবং চূড়ান্ত আনন্দের মাঝখানে এক প্রয়োজনীয় সেতুবন্ধ; তাকে বাদ দিয়ে সেই আনন্দের স্বর্গে যাওয়া যায় না, যে স্বর্গ চিরকালীন, যে স্বর্গ মুহূর্তে ভেঙে পড়বে না। প্রাথমিক ভাললাগায় মাদকতা আছে, মাধুর্য নেই। হরপার্বতীর মিলনের জন্যে শুধু মদনকেই ভস্ম হ'তে হয়নি, পার্বতীকেও বল্কল ধারণ করতে হয়েছিল। সচেতন সাহিত্যপাঠ একদিকে যেমন প্রাথমিক ভাললাগাকে উত্তরণ, অন্যদিকে তেমনি সেই অন্তর্দৃষ্টির সাধনা যার আলোয় সকল সাহিত্যের অন্তরলোক উদ্ভাসিত।

শেলি কীট্‌স্‌ কোল্‌রিজ ওয়ার্ডস্বার্থ; বিচ্ছিন্নভাবে এঁদের প্রত্যেকের অনেক কবিতাই আমাদের ভাললাগে। ইতিহাসে তাঁরা কী নামে চিহ্নিত সেকথা না ভেবেও কীটসের সনেট বা ওড, কিংবা কোল্‌রিজের এ্যান্‌শিয়েণ্ট ম্যারিনার প'ড়ে মুগ্ধ হ'তে পারি। Thou still unravish'd bride of quietness | Thou foster-child of silence and slowtime কিংবা Alone alone all all alone | Alone on a wide wide sea-র অভিঘাতে চঞ্চল হ'য়ে ওঠার মত রসবোধ আমাদের আছে। তবু পড়তে পড়তে একটা সময় আসে যখন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, শেলি কীট্‌স্‌ কোল্‌রিজ ওয়ার্ডস্বার্থের মধ্যে কি কোন মিল ছিল না? অনুধাবনে আবিষ্কৃত হয়, শুধু পরস্পরের মধ্যে কেন, সমকালীন ফরাসী জর্মন কবিদের সঙ্গেও এঁদের সাদৃশ্য ছিল। সাহিত্যের ঐতিহাসিকরা যদি এই সাদৃশ্যের বিশ্লেষণ ক'রে তার নামকরণ ক'রে থাকেন রোমাণ্টিসিজম্‌, তাহ'লে নিশ্চয়ই ভুল করেননি, বা বাড়াবাড়ি রকমের পণ্ডিতি করেননি। এই আবিষ্কারের পর যখন পুনরায় শেলি কীটস্‌ কোল্‌রিজ্‌ ওয়ার্ডস্বার্থে হাত দিই, তখন তাঁদের জগতের সঙ্গে আমরা অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছি; কবিতার নিরঞ্জন আনন্দলোকের পথ তখন অপেক্ষাকৃত সুগম হ'য়ে উঠেছে। আসল কথা, সমালোচনাই বলি আর সাহিত্যের ইতিহাসই বলি, সবই প্রাথমিক। শুধু আনন্দই অন্তিম, আনন্দই গন্তব্য। তবু সু-সাহিত্যপাঠের পক্ষে এদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য; এবং সেই কারণে ইস্কুলে কলেজে সাহিত্য পড়া কোনকালেই নিছক পাগলামো নয়। অনেকগুলো সিঁড়ি পেরিয়েই তবে ঘরে পৌঁছতে হয়। সিঁড়ি কক্ষনো ঘর নয়, অথচ তাদের ছাড়া চলে না। দূর থেকে ঘরের চেহারা দেখে তৃপ্তি লাভ করার মধ্যে উন্মাদনা থাকতে পারে, সিদ্ধি নেই।

যখন বলি, কীট্‌স্‌ শেলির চাইতে ভাল

কবি, তখন আর বিশুদ্ধভাবে কীটস্ কিংবা শেলির পাঠক থাকা সম্ভব হ'ল না আমাদের পক্ষে; খানিকটা তুলনামূলকতায় তখন আমরা আক্রান্ত হ'য়ে উঠেছি। সত্যি কথা বলতে গেলে, কোন সচেতন সাহিত্যপাঠই পুরোপুরি বিশুদ্ধ হ'তে পারে না। আমাদের বিচারবুদ্ধির অনেকটাই তো আপেক্ষিক। প্রত্যেক ভাললাগার কিংবা মন্দ-লাগার পেছনে পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতার ভূমিকা অংশতঃ হ'লেও সক্রিয়। কোথায় যেন সব জমা হ'য়ে থাকে; নূতন কিছুর সময় এলেই উঁকি মারে, নূতনের পাশে এসে দাঁড়ায়, নূতনকে হয় দীপ্ত নয় ম্লান ক'রে তোলে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও দীপ্ত কিংবা ম্লান হ'য়ে ওঠে। তুলনামূলকতার হাত এড়াব কেমন ক'রে—তুলনামূলকতা যে আমাদের বুদ্ধির রাজ্যে মানী সচিব। তাকে বাদ দিয়ে কোন্ কাজটা সার্থক হতে পারে? ইংরিজি সাহিত্যের ক্লাশে তাকে ছাড়া চলে না। সংস্কৃত, বাংলা, ফরাসী, জর্মনের বেলাও তার উপস্থিতি অপরিহার্য। কিন্তু তার শ্রেষ্ঠ তীর্থ কম্পারেটিভ লিট্রেচার। কম্পারেটিভ লিট্রেচারে এসেই তুলনামূলকতা আর শুধু প্রবৃত্তি থাকল না, ধর্ম হ'য়ে উঠল।

শুধু সহজাত ব'লে নয়, পারস্পরিক আলোকপাতে দুই ভিন্ন সাহিত্যকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারে ব'লেও, তুলনামূলকতা ধর্ম হ'য়ে ওঠার দাবি রাখে। গ্যেটে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন মানসিকতা আশ্চর্যভাবে একরকমের, কিংবা ইয়েট্স্ ভালেরির; তাঁদের লেখা পাশাপাশি রেখে পড়লেই যেমন গ্যেটের তেমনি রবীন্দ্রনাথের, কিংবা যেমন ইয়েট্সের তেমনি ভালেরির, শিল্পী-স্বরূপ স্পষ্ট হবে। মতাদর্শে দুই মেরুর দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও ডিভাইন কমেডির মতই মহৎ কাব্য ভগবদ্গীতা। ভার্জিল অপেক্ষা কোন অংশেই খাটো কবি নন কালিদাস। বাল্মীকি নিঃসন্দেহে হোমরের তুলনীয় মহাকবি। এইসব আবিষ্কার শুধু মূল্যায়ণের প্রশ্নেই প্রয়োজনীয় নয়, সাহিত্যপাঠেও এদের সহযোগিতা স্বাগত। সুতরাং তুলনামূলকতা যেমন সহজাত, তেমনি সহযোগী। যখনই আমরা কবিতা পড়ি, কিংবা উপন্যাস, নাটক, ছোট গল্প, তখন ভেতরে ভেতরে তুলনা করি, মিলিয়ে দেখি; মিলিয়ে দেখা স্বাভাবিক ব'লে, মিলিয়ে দেখা বাঞ্ছনীয় ব'লেও। তাতে আমাদের ঈপ্সিত আনন্দে কোন টান পড়ে না, বরঞ্চ আনন্দলাভের পথ সুগম হয়। সাহিত্যপাঠে আনন্দ চিরকালই পথশেষের গন্তব্য; তুলনামূলকতা পথপার্শ্বের আলোকস্তম্ভ।

তুলনামূলকতাকে বাদ দিয়ে সাহিত্যের ইতিহাস রচনাও অসম্ভব। ইতিহাস মানে তো নিছক গ্রন্থপঞ্জী নয়, গ্রন্থলোকের অন্তরালে যে ভাব-রূপের দ্বৈত তাদের বিবর্তন অনুধাবন করাই ঐতিহাসিকের প্রকৃত কাজ। সূচনায় যার ছিল গ্রীক কবিতা, সেই পশ্চিমী সাহিত্য কেমন ক'রে কালক্রমে এত বিচিত্রবিরাট হ'য়ে উঠল তার কারণ খুঁজে পেতে পারেন তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্ররাই। কেননা, গ্রীস থেকে রোম, তারপরে মধ্যযুগ, মধ্যযুগ পেরিয়ে রেনেসাঁস—এই অন্তর্প্রবাহের অন্বেষণ তুলনামূলকতারই নামান্তর। প্রত্যেক যুগ স্বতন্ত্র, অথচ কোন না কোনভাবে প্রত্যেক যুগই তার পূর্ব ও উত্তরকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই স্বাতন্ত্র্য, এই সম্পৃক্তি বিশেষভাবে ধরা পড়ে, যখন বিভিন্ন যুগের সাহিত্যে সাহিত্যে তুলনা করি। হোমরের পাশাপাশি ভার্জিল পড়লেই দেখা যায়, হিরোইক এপিকের কবি হোমরের ভাবশিষ্য হ'য়েও ভার্জিল ক্লাসিকল্ এপিক লিখেছেন। কালিদাসও নানাভাবে বাল্মীকির অধমর্ণ—কাহিনী বিন্যাসে তো বটেই, রস পরিবেশনে, এমন কি চিত্রকল্প রচনায় কালিদাসের উপর বাল্মীকির প্রভাব সুস্পষ্ট—তবু বাল্মীকির সেই আদিকবি-জনোচিত স্বাচ্ছন্দ্য কালিদাসে দুর্লভ, কিংবা কালিদাসের বৈদগ্ধ্য বাল্মীকিতে অভাবনীয়। কালিদাসের তুলনায় বাল্মীকি সহজকবি, আবার বাল্মীকির পরিপ্রেক্ষিতে উপনিষদ সহজতর কাব্য। কালিদাসের চেয়েও ঢের বেশি রীতি-নির্ভর কবিজনের আবির্ভাব সংস্কৃত-সাহিত্যে ঘটেছিল; তাঁদের অনেকে অলংকারকেই কবিতার সারাৎসার ব'লে জেনেছিলেন। বাল্মীকি, কালিদাস স্বতন্ত্র; ভারবি, মাঘ, ভট্টিও; তবু মিলিয়ে দেখলে যোগসূত্র বেরিয়ে পড়েঃ—বাল্মীকি থেকে কালিদাস—মহাকাব্য থেকে রীতিকাব্য; কালিদাস পেরিয়ে ভারবি, মাঘ, ভট্টি—রীতি সর্বস্বতার জয়যাত্রা।

মিলিয়ে দেখাটাই বড় কথা! বাল্মীকি কেন সহজ, কালিদাস ততটা নয়, তা স্পষ্ট হয় মিলিয়ে দেখলেই। স্পষ্ট হয় হোমর ভার্জিলের দূরত্বটাও। স্পষ্ট হয় প্রাচীন আধুনিকের কালান্তর। উপনিষদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের, বা দান্তের সঙ্গে এলিঅটের,

যে সম্পর্ক তা শুধু ব্যক্তিগত বিন্যাসের নয়, কালগত উত্তরাধিকারেরও। রবীন্দ্রনাথ যেমন উপনিষদের উত্তরসূরী, তেমনি উপনিষদও রবীন্দ্রনাথের পূর্বসূরী। তাই, এলিঅটের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলতে হয়, রবীন্দ্রনাথ যেমন উপনিষদের অধমর্ণ, তেমনি উপনিষদও রবীন্দ্রনাথে এসে নবতর অর্থ-গৌরবে সমৃদ্ধ হ'য়ে তার কাছে ঋণী। কোন মহৎ সাহিত্যকেই কালের গণ্ডিতে বেঁধে রাখা যায় না। রামায়ণ মহাভারতের বয়স দু' হাজার বছরের কাছাকাছি, সোফোক্লিসের 'ঈডিপাস রেক্স' প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো লেখা, হোমর আরও প্রবীণ—অথচ এ'দের কাউকেই আমরা ভুলিনি। শুধু যে ভুলিনি তা নয়, যুগে যুগে এ'দের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ঘটেছে, এখনও ঘটছে। বিশ শতকেও জয়েস 'য়ুলিসিস' লিখেছেন, জাঁ কক্‌তো 'ঈডিপাস রেক্স'-এর নবরূপ প্রতিষ্ঠা করেছেন, টমাস মান বাইবেলের কয়েক লাইন নিয়ে হাজার পাতার যোসেফ সিরিজ রচনা করেছেন। তাতে হোমর, 'ঈডিপাস রেক্স' বা বাইবেলের কোন ক্ষতি হয়নি, বরঞ্চ নতুন আলোকপাতে তাঁদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি, শুধু তাৎক্ষণিক আবেদনেই হোমর, 'ঈডিপাস রেক্স', বাইবেল সমৃদ্ধ নয়, চির-কালের অনুভবে, চিন্তায় আলোড়ন জাগানোর মত ঐশ্বর্য তাঁদের আছে। সেই ঐশ্বর্যেই তাঁদের মহত্ত্ব। সুতরাং বিচ্ছিন্ন-বিরাটের উপাসক হ'য়ে যদি তাঁদের দেশ-কালের সীমায় আটকে রাখি, তাহলে সেই ঐশ্বর্যের স্পর্শ পাব না, তাঁদের মহত্ত্ব আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে। তাহলে শেক্‌স্‌পীয়রকে 'ষোড়শ শতকের ইংরেজ কবি' জেনেই তৃপ্ত থাকতে হবে। তাঁর হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, ইয়াগো বা tomorrow and tomorrow and tomorrow......যে আমাদের মর্মজীবনের অংশীদার হ'য়ে উঠেছে, সেকথা ভুলে যেতে হবে। কিংবা মহাভারত, যার অষ্টাদশ পর্বে বিচিত্র মানুষের জীবনরঙ্গ উৎকীর্ণ, আমাদের কাছে নেহাৎই মহাকাব্যের যুগের জীবন-যাত্রার স্বাক্ষর হিসেবে মূল্যবান হ'য়ে থাকবে। মৌষলপর্বের বিষাদ বা মহাপ্রস্থানিক পর্বের শূন্যতা বর্তমানের হৃদয়ে দোলা জাগাবে না, কঙ্কালের মত অতীতের স্মৃতি বহন ক'রেই ক্ষান্ত হবে।

যেহেতু সাহিত্য মানে একধরনের সজীবতা, সচলতা, যার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা চিরকালের, তাই সাহিত্যের প্রবাহ অনন্ত, সাহিত্যের ইতিহাস অবিচ্ছিন্ন। আপাত-বিচ্ছিন্ন, বিচিত্র বিশ্বসাহিত্যের অন্তরালে এই অন্তহীনতার, অবিচ্ছিন্নতার অন্বেষণই কম্পারেটিভ লিট্‌রেচারের সাধনা। বিভিন্ন কালের, বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্মে নেমে যে মুক্তো তুলে আনে কম্পারেটিভ লিট্‌রেচার, তারা একই ইচ্ছার প্রকাশ, একই উৎসাহের স্ফূর্তি। একই আনন্দের, দুঃখের, দৈন্যের, দ্বিধার, যন্ত্রণার, প্রেমের, পাপের, মৃত্যুর, মুক্তির, সংশয়ের, শূন্যতার, বিরহের, বিচ্ছেদের, বিশ্বাসের, বোধের স্পন্দন। তাদের আলোয় এসে সময়ের অস্থিরতা নির্বাসিত, সকল ব্যবধি উত্তীর্ণ; প্রাচীন আধুনিকের কালান্তর — প্রাচ্য প্রতীচ্যের দেশান্তরও — অতিক্রান্ত। শতকের ম্লান চিহ্ন অপসারিত। তাদের আলোয় অবগাহন ক'রে ক্ষণিকের জন্যেও আমরা শাশ্বতের সঙ্গলাভ করি। সমস্ত প্রশ্ন, সকল জিজ্ঞাসা নত হ'য়ে ওঠে। চেতনা ভ'রে ওঠে গানে গানে।

সাহিত্য সেই সৌধ, সময়ের মাটিতে যার ভিৎ, সময়কে ছাড়িয়ে অনন্ত আকাশে যার উৎক্রান্তি। পাঠক হিসেবে সময়কে নিয়েই আমাদের আরম্ভ; ক্রমে আমরাও সময় পেরিয়ে আসি, সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সবচেয়ে উঁচু জানালায় যেয়ে দাঁড়াই, জানালা খুলে আকাশে হাত বাড়াই। ইতিহাস-সচেতন সাহিত্যসরণ কম্পারেটিভ লিট্‌রেচারের; সময়ের সব ভিৎ তার চেনা, তাই সময়কে অতিক্রম ক'রে সবচেয়ে উঁচু জানালায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব তারই।

ঠিক ঘুম নয়, অনেকটা আচ্ছন্নতা। ঠিক যে অবস্থায় মনের চিন্তাগুলো হিজিবিজি স্বপ্নের মত চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। জেগে আছি বোঝা যায় অথচ চোখ খুলতে ইচ্ছে করে না। তবু একরকম জোর করেই চোখ দুটো খুলল মন্দিরা। উঠে বসল। লেপটা কাঁধের কাছ থেকে গড়িয়ে পড়ল হাঁটুর ওপর। লেপটা পড়ে যাওয়াতেই যেন চমকে উঠল সে, সামান্য একটু চমকানো আর তার সঙ্গে সঙ্গে গা সির সির করা একটু শীত। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়লো যে, একটু আগে পাশের বাড়ির বুড়ো ভদ্রলোকটিকে সে স্বপ্নে দেখেছে। মনে পড়তেই একটু হাসি পেল তার।

তারপর ঠান্ডা মেঝেতে পা রাখা। ভাঁজ করা হাঁটু দুটো খুলতে গিয়ে একটু যেন আড়ষ্ট মনে হয়, একটু যেন ব্যথাও লাগে উরুতে, পায়ের ডিমে। তারপরই মেঝেতে পা দুটো রাখতে হয়। ঠান্ডা মেঝেটি পায়ের নিচে একটা হিলহিলে সাপের মতো নড়ে উঠেই যেন স্থির হয়ে যায়।

উঠে দাঁড়াল মন্দিরা। দাঁড়িয়ে বিস্রস্ত শাড়িটাকে আগে ঠিক করল। গলাটা শুকিয়ে গেছে; জিভটা চটের মতো খস-খসে। কোণের টুলটার ওপর নকশা-কাটা কালো কুঁজোটা। সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে বিছানাটার দিকে একবার তাকাল মন্দিরা। শান্ত শুয়ে আছে; এদিকে মুখ ফেরানো। শান্ত ঘুমোচ্ছে। লেপটা পায়ের নিচে সরে গেছে। বেঁকেচুরে একটা দ'য়ের মত শুয়ে আছে লোকটা। যে হাতদুটো এতক্ষণ মন্দিরার পিঠ আর ঘাড় জড়িয়ে ছিল, সে দুটো এখন অসহায়ভাবে বিছানায় পড়ে আছে।

শান্তর শোয়া বড্ড বিশ্রী। এমন যাচ্ছেতাই ভাবে শোয়। এগিয়ে গিয়ে লেপটা শান্তর গলা পর্যন্ত টেনে দিতে দিতে ভাবলো মন্দিরা।

কুঁজোটা কাত করবার জন্য বাঁ হাতটা বাড়িয়ে ডান হাত দিয়ে এলোমেলো চুল-গুলোকে পিঠের দিকে সরিয়ে দিতে গিয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে এক পলক তাকাল মন্দিরা। বিকেল। বিবর্ণ হলুদ পাতার মত বিকেল। জল গড়িয়ে নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল মন্দিরা, মাথাটাকে পেছনের দিকে হেলিয়ে দিয়ে আলতো-ভাবে জলটা খেল। ঠান্ডা জলের স্পর্শ থেকে দাঁতগুলোকে বাঁচাবার জন্যে। কিন্তু দাঁতগুলো চিন চিন করে উঠল। গলা দিয়ে পেটের মধ্যে একটা ঠান্ডা স্রোত একটা জ্বালাকে যেন ধুয়ে নিয়ে গেল। বিরক্তি লাগল মন্দিরার। গ্লাশটাকে কুঁজোর মুখের ওপর উপুড় করে রাখল সে।

তিনতলার ঘর। জানালা দিয়ে অনেকখানি দেখা যায়। জানালার কাছে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়ায় মন্দিরা। নিচে বস্তি। খোলার চাল-গুলো যেন এ ওর ওপর ভর দিয়ে বেঁকে-চুরে অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে আছে।

নিচে কোথাও বোধ হয় উনুনে আগুন দিলো। ধোঁয়ার গন্ধ, এক্ষুনি পাকানো ধোঁয়ার কুন্ডলী এই ঘরে ঢুকবে। দম আটকাবে মন্দিরার। জানালার পাল্লা দুটোর দিকে শিকের মধ্যে দিয়ে দুটো হাত বাড়িয়ে দেয় মন্দিরা।

ড্রেসিং টেবিল। চৌকো লম্বাটে আয়নার মুখোমুখি মন্দিরা। এলোমেলো রুক্ষ চুল। আজ মাথায় সাবান দিয়েছে সে। চুলগুলো ফেঁপে আছে, ফুলে আছে। রোগা দেখাচ্ছে তাকে, শুকনো দেখাচ্ছে। মাথায় সাবান দিলে এমনিই দেখায়। ঠোঁটদুটো শুকনো, মুখটা খসখসে। আয়নায় কোমর পর্যন্ত ছায়া পড়েছে। নিজের মুখটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো মন্দিরা। তারপর শরীর। ছিপছিপে পুষ্ট শরীর। মাজামাজা গায়ের রঙ, নিটোল চিবুক, হাত। দু হাতের তেলোয় মুখটাকে একবার ঘষে নিয়ে ক্রিমের শিশিটার দিকে হাত বাড়াল মন্দিরা।

শান্ত উঠবার আগেই ঠিকঠাক, ফিটফাট হয়ে নিতে হবে। শুধু শাড়িটা বদলানো বাকি থাকবে। তারপর চা। শান্ত বেরিয়ে যাবে। বাড়িটা নির্জন নিরিবিলি হবে। সন্ধ্যার মনোরম ছায়া পড়বে বাইরের ঝুল-বারান্দায়, ঘরের ভেতর বিকেলের যাই-যাই

আলোর একটু আভাস। তারপর শাড়ি বদলাবে মন্দিরা। যেমন খুশী তেমনি একটা শাড়ি পরবে। এইসব ভাবনাগুলো যেন রুটিনবাঁধা হয়ে মন্দিরার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল। এর চেয়ে নতুন কোন ভাবনা মনে আসেই না। মন্দিরা ক্রীমটাকে ঘষলো গালে, কপালে গলায়। পরে তেলতেলে হাতের তেলোদুটো দুই হাতে ঘষে হাতটা শুকনা করে নিলো।

শান্ত নড়ল; হাই তুলল। আড়মোড়া ভাঙ্গল। শান্তর শরীরের হাড়গুলো কটকট করে শব্দ করল। শব্দটা মন্দিরা শুনল। তার বিশ্রী লাগে এই শব্দটা। শান্ত চোখ মেলল। পায়ের দিকে দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার। শান্ত সেদিকে তাকাল। আজকে ছুটির দিন ছিল। হাওয়া আর স্রোতের অনুকূলে পাল-তোলা নৌকোর মত ছুটির দিনটা তরতর করে চলে গেল। শেষ হয়ে গেল। কাল সোমবার।

ক্যালেণ্ডার থেকে দৃষ্টিটা পিছলে নিচে নামে। ঘুরে যায় মন্দিরার দিকে। আর একটি আগতপ্রায় হাইকে চাপতে চাপতে শান্ত জিজ্ঞেস করলে, 'চায়ের কদ্দুর? সন্ধ্যে হয়ে এল যে।'

'আহা, মোটে তো চারটে বাজে'। মন্দিরার উত্তর।

শান্ত শরীরটাকে ওলটালো। উপুড় হয়ে শুয়ে কনুইতে ভর দিয়ে মাথাটাকে উঁচু করল। লেপটাকে টেনে নিলো কাঁধ পর্যন্ত। তারপর বলল, 'বুবুকে দেখছিনা যে। কোথায় গেল মেয়েটা?'

'সুখিয়ার সংগে খেলছে বোধ হয়, নয়তো পাশের ফ্ল্যাটে চন্দনাদের সংগে নাচ-গান হচ্ছে। যা আড্ডাবাজ মেয়ে তোমার।' ঠিক ভ্রূর সংগমে ছোট্ট তিলের মত কুঙ্কুমের একটি ফোঁটা বসিয়ে দিতে দিতে বলল মন্দিরা। খুব আস্তে আস্তে বলল, ভেঙে ভেঙে।

বাঁ হাত দিয়ে বাঁ গালের ওপর একটি ব্রণকে অনুভব করছিল শান্ত। বিরক্তিকর একটু ব্যথা। শান্ত মুখ ফেরাল দেয়ালের দিকে। একটু লঘুস্বরে বলল, 'একটিকেই সামলে রাখতে পারছ না।'

'তার মানে!' মন্দিরা একটু ঘুরে তির্যক-ভাবে শান্তর দিকে তাকাল। গলায় ঝাঁঝ। কয়েকটি সুস্পষ্ট ভাঁজ কপালে। শান্তও তার দিকে তাকাল। ড্রেসিং টেবিলের ওপাশের জানালাটা বন্ধ। শান্তর ডানপাশের বিছানার সঙ্গে লাগাও জানালাটা খোলা। শেষবেলার ম্লান রোদ সেই জানালাটা দিয়ে সোজাসুজি ঘরে ঢুকছে। আলোটা সোজা-সুজি মন্দিরার গায়ে পড়ছে না, কিন্তু একটা আভা মন্দিরার শরীরটাকে স্পষ্ট করে দেখাচ্ছে। শান্ত মন্দিরার দিকে তাকিয়ে রইল। মন্দিরা ভ্রূ কোঁচকাল। শান্তর দিকে তাকিয়ে রইল।

মন্দিরা বলল, 'আহা।'

শান্ত নড়ল। লেপের তলায় তার শরীরটা সরীসৃপের মত কয়েকবার পাক খেল। তার-পর লেপের খোলস থেকে বেরিয়ে এল সে। মেঝের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। সে অনেকটা লম্বা। শরীরটা পুষ্ট, বলশালী। রঙটা কালো। বেশ কালো। মুখটা ভালো নয়—দাঁতগুলো একটু উঁচু, নাকটা চাপা।

শান্ত কোমরে কাপড়টাকে ভালো করে জড়িয়ে নিল। তারপর মন্দিরার দিকে তাকাল, হাসল। মন্দিরা হাসল না। শান্ত বলল, 'তোমাকে আজ রানীর মত দেখাচ্ছে।' সে ড্রেসিং টেবিলটার দিকেই এগুচ্ছিল। মন্দিরার বেণী বাঁধা শেষ হয়েছিল। সে ঘুরে শান্তর দিকে তাকাল। শান্ত মাতালের মত হাসছিল। মন্দিরা কী বলল। এত জোরে বলল যে, শান্ত থমকে দাঁড়াল। লজ্জা পেল। প্রসারিত হাতদুটি নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।
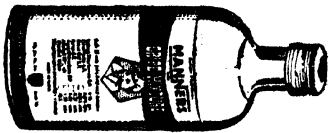
'আমার তোয়ালে আর সাবানটা কোথায়?'

'সব বাথরুমে।' আয়নার মুখ রেখে শান্তর দিকে না তাকিয়েই জবাব দেয় মন্দিরা। শান্ত ঝুল-বারান্দার দরজা দিয়ে মন্থর পায়ে বেরিয়ে যায়।

মন্দিরা ওঠে। সর্বশেষ কাঁটাটা খোঁপায় গুঁজে দিয়ে ঘরটার দিকে তাকায়। বিছানাটা এলোমেলো। বিছানার পাশে মাথার কাছে একটা নিচু ছোট টেবিল। লেসের ঢাকনা দেওয়া। তার ওপর সেদিনের পত্রিকাটা, দু-একটি ইংরিজী উপন্যাস, আর শান্তর হাতঘড়িটা। টেবিলটার পাশে জানালাটা খোলা। এটা পশ্চিম দিক। এদিকে এপাশের জানালাটার কাছে একটা টুলের ওপর কুঁজোটা আর তার পাশ ঘেঁষেই ড্রেসিং টেবিল। দুটো দরজা। একটি রান্নাঘরে যাওয়ার। এই দরজার পাশেই বারোয়ারী সিঁড়ি। অন্য পাশের দরজাটা দিয়ে ঝুল বারান্দায় যাওয়া যায়। এটুকু জায়গার সবটাই একটি জ্যামিতিক ভঙ্গিতে মন্দিরার মুখস্ত হয়ে গেছে। চোখ বেঁধে দিলেও যেদিকে খুশী ইচ্ছেমত যাওয়া যায়। হোঁচট খেতে হবে না, হাতড়াতে হবে না।

মন্দিরা সিঁড়ির দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দরজার কাছে যেতে যেতেই সে শব্দটা শুনল। জলের শব্দ। বাসনকোসনের ওপর জল পড়ার শব্দ। মৃদু, ধাতব, সুরেলা। একটা সুর বাজছে যেন। মন্থর বিষাদের সুর। বিকেলের সুর। শব্দটা মন্দিরার ভালোও লাগে আবার খারাপও লাগে। ভালো লাগে সুরটা আর খারাপ লাগে বিষাদটা।

মন্দিরা দরজা দিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে এল। তারপর রান্নাঘর। কিন্তু রান্নাঘরে ঢুকলোনা মন্দিরা। প্রায়ান্ধকার প্যাসেজটাতে দাঁড়াল।

পাশের ফ্ল্যাটে বাচ্চাদের হৈচৈ হচ্ছে। মন্দিরা কান পেতে শোনার চেষ্টা করল। হ্যাঁ বুবুর গলার স্বর শোনা যাচ্ছে; হাসি। মন্দিরা ডাকলো, 'বুবু, বুবু-উ।' হৈচৈটা হঠাৎ থেমে গেলো। একটা নিঃস্তব্ধতা, স্টোভের আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেলে যেমনটা হয়।

পাশের ফ্ল্যাটটা চন্দনাদের। সিঁড়ির দিকের দরজাটা খোলা। সেই দরজা দিয়ে খুব ভয়ে বুবু বেরিয়ে এল। রুখুকরা চুলগুলো এলোমেলো, ঠোঁটের পাশে কালো দাগ, জামা-কাপড় নোংরা। মেয়ের দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো মন্দিরা। তারপর বলল, 'ঘরে যাও।'

নোংরামি তার একদম পছন্দ হয় না। তার রান্নাঘরটা ঝকঝকে তকতকে। তার শোয়ার ঘরের মতনই। মন্দিরা জলচৌকিটা টেনে নিয়ে বসল। ডান পাশে ছোট্ট একটা জানালা। জানালা দিয়ে চন্দনাদের ফ্ল্যাটের ঝুল বারান্দাটা দেখা যায়। সেদিকে তাকিয়েই একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল মন্দিরা। কয়েক দিন আগেও বুড়ো মানুষটা ঐখানে ইজি চেয়ারে বসে থাকত, কাশত, আর হাঁফাত। চন্দনার দাদু। বুড়ো আর ওখানে বসে না। কে জানে হয়ত অসুখটা বেড়েছে ভদ্রলোকের। আজ ভদ্রলোককে দুপুরে স্বপ্নে দেখেছে মন্দিরা। হিজিবিজি কি যে দেখেছিল, তা এখন আর মনে নেই। কি যে সমস্ত স্বপ্ন। মাথামুণ্ডু। মাঝেমাঝে ফর্সা টকটকে রঙ আর প্রশান্ত, সৌম্য ভদ্রলোকটির কথা ভাবতে মন্দিরার ভাল লাগে।

ঝকঝকে কেটলিটা গনগনে উনুনের আঁচে বসানো। উনুনের আঁচটা মন্দিরার গায়ে লাগছে। গরমটা ভালো লাগছে মন্দিরার। ওপরের ফ্ল্যাটে একটা কুকুর ডাকছে আর তার সংগে সংগে চুড়ির আওয়াজের মত শেকলের মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুকুর জীবটাকে বিশ্রী লাগে মন্দিরার। কিন্তু দূর থেকে কুকুরের ডাকটা ভালো লাগে শুনতে। কেমন পৌরুষ আর গাম্ভীর্য মেশানো ডাক। বুকের ভেতরটা গুরগুর করে ডাকটা শুনলে, কিন্তু ভাল লাগে, রোমাঞ্চ হয়। ওপরের ফ্ল্যাটের কুকুরটাকে দেখেছে মন্দিরা; একটা বিদ্যুতের মত গতি যেন সংহত হয়ে আছে শরীরটাতে। রোমশ, লোভী, হিংস্র। গলার স্বরটা ভারী গম্ভীর। দেখলে গা সির-সির করে, মনে হয় এক্ষুনি যেন লাফিয়ে পড়বে গায়ের ওপর। ভাগ্যিস শেকল দিয়ে বাঁধা থাকে।

চায়ের পাট চুকলো। শান্ত বেরিয়ে গেল। তারপর বুবুকে নিয়ে পড়ল মন্দিরা। মেয়েকে সাজাতে মন্দিরার ভাল লাগে। কিন্তু যা নোংরা স্বভাব মেয়ের। মেয়ের স্বভাবের কথা চিন্তা করে আপন মনেই ভ্রূ কোঁচকায় মন্দিরা।

সাজ শেষ। বুবুকে সুন্দর দেখাচ্ছে। বুবু এমনিতেই ফরসা, গোলগাল, সুন্দর, লাল সোয়েটার আর ক্রিম রঙের ফ্রকে তাকে আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। তৃপ্ত চোখে বুবুর দিকে তাকিয়ে তারপর তাকে একটা চুমু খেল মন্দিরা। খুব আলতোভাবে চুমুটা খেল, পাউডারের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। বুবু ভয়ে ভয়ে মার দিকে তাকাল, 'চন্দনাদের ওখানে যাই মা?'

'যাও, কিন্তু ওখানে ঘুমিয়ে পড়ো না যেন।'

ঘাড়টা অনেকখানি হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে বুবু ছুট লাগাল। মন্দিরা একা। ঘরটা নির্জন। শুধু রান্নাঘরে সুখিয়ার বাটনা বাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একঘেয়ে বিশ্রী শব্দ। শব্দের তালে তালে ঘরটা যেন কাঁপছে।

মন্দিরা ঘরটার চারদিকে তাকাল। সব-কিছু সাজানো, ঝকঝকে। ঘরটা বড়ো, বেশ বড়ো। হাত-পা খেলিয়ে থাকা যায়। পাশের ফ্ল্যাটে চন্দনাদের ঘরের সংখ্যা বেশী, কিন্তু জিনিসপত্রের এত ঠাসাঠাসি যে মন্দিরার দম আটকে আসে। তাদের আসবাব বেশী নেই, মন্দিরা তৃপ্ত চোখে ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। আসবাব বেশী নেই, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা আছে। দুপুর বেলায় বন্ধ করে দেওয়া জানালাটা খুলে দিলো মন্দিরা। তারপর ট্রাঙ্ক খুলে পছন্দ মতো একটা শাড়ি বের করল।

এখন এই নির্জন ঘরে একা একা সাজবে মন্দিরা। একা একা সাজবে। কাউকে দেখানোর জন্যে নয়। কেউ দেখবে না। সাজবে সে নিজের জন্যে। গুনগুন করে একটা আধচেনা গানের সুর গাইতে গাইতে আস্তে আস্তে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে তার ভাল লাগে। তারপর একা নির্জন ঝুল-বারান্দার প্রায়ন্ধকার রেলিঙে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকবে আর একটা হালকা অন্ধকারের মুখোমুখি। সেই আধ-চেনা

গানের সুরটা গলায় তুলতে তুলতে গানের কথাটাকে মনে আনবার চেষ্টা করবে সে। কিন্তু মনে আসবে না, কিছুতেই আসবে না। মন্দিরা জানে কথাটাকে মনে পড়লেই গানটাকে আর ভালো লাগবে না, পুরনো মনে হবে।

ড্রেসিং টেবিলের সমনে দাঁড়ালো মন্দিরা। ঘি রঙের শাড়ি, মেরুন রংএর ব্লাউজ। আয়নার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকালো মন্দিরা। প্রথমটায় মুগ্ধতা, তারপর দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হল—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে বারবার দেখলো সে। কোন ত্রুটি নেই। জোরালো ইলেকট্রিকের আলোয় তার মাজা মাজা গায়ের রঙটাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। কত বয়েস হবে তার? পঁচিশ! কিন্তু তাকে দেখে কেউ কুড়ির বেশি বলবে না। না, কিছুতেই বলবে না।

টুলটা পেছন দিকে ঠেলে নিয়ে একটু বসল মন্দিরা। স্কুল কলেজের দিনগুলোকে মনে পড়ছে। চোরা চাউনি আর ফিসফাস কথার দিনগুলো। ক্লাসের ছেলেদের দিকে তাকাতে গিয়ে বুকটা টিপ টিপ করতো, গলা শুকিয়ে কাঠ হত। তবু তাকাতে ইচ্ছে করত। তাকাত। অসীম সেনকে মনে পড়ছে। লোভী কিন্তু ভীরু। কোনো দিন কাছে আসেনি, কথা বলেনি, শুধু তার দিকে তাকিয়ে ক্লাসের আর সব কিছুকে ভুলে যেত ছেলেটা। আসলে সাহসের অভাব। 'সাহস' কথাটা কতো ছোট, কিন্তু কতো দুর্লভ। কিন্তু এসব কথা ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

মন্দিরা উঠে দাঁড়াল। বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের দিকে একপলক তাকাল। একটা ফুল গাছ,—বড়ো গাছ আর থোকা থোকা সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে গাছটা। গাছটা মন্দিরার চেনা নয়। গাছের ওপাশে একটি হ্রদ, তার ওপাশে দু একখানা বাড়িঘর, অস্পষ্ট একটা শহরের আভাস, তার পেছনে পাহাড়, তুষারে ঢাকা সাদা পাহাড় আর নীল আকাশ। ছবিটাকে মন্দিরার ভালো লাগে।

ঘরের দরজায় টোকা। ঝুল-বারান্দা থেকে মন্দিরা ঘরে। দরজা খুলল। চন্দনাদের চাকরটা দাঁড়িয়ে আছে, কোলে ঘুমন্ত বুবু। ফ্রকের ভাঁজগুলো এলোমেলো হয়ে গেছে, কপালের ওপর চুলের ঘুরলি। হাত বাড়িয়ে বুবুকে কোলে নিল মন্দিরা।

খুব আস্তে আস্তে সোয়েটারটা বুবুর গা থেকে খুলে নেয় মন্দিরা। বুবু ঘুমের ঘোরেই আপত্তি করে কি যেন বলল।

খুব সাবধানে বুবুকে বিছানায় শুইয়ে দিল মন্দিরা। তারপর লেপটা টেনে দিল তার গলা পর্যন্ত। বুবুকে একটা চুমু খেল সে খুব আলতোভাবে। কিন্তু কেমন এক সন্দেহ হল। আবার নিচু হয়ে বুবুর মুখের ওপর বাতাসটা শুঁকলো সে।। বিড়ির গন্ধ। হঠাৎ যেন দম আটকে এল তার। নিশ্চয়ই ওদের চাকরটা আদর করেছে বুবুকে, চুমু খেয়েছে। একটা ঘেন্না যেন পাকিয়ে উঠল তার শরীরে।

মন্দিরা বাথরুমে গেল। সাবান দিয়ে ভাল করে মুখটা ধুলো। কি বিশ্রী, মনে মনে ভাবল সে। সুখিয়া ডিম রাঁধছে। গরম মশলার গন্ধ। মন্দিরা নিশ্বাস টানলো। জানালার কাছে এল। বাইরে কুয়াশা। ঘন কুয়াশা। হাত বাড়িয়ে যেন স্পর্শ করা যায়। কুয়াশা দেখতে তার ভালো লাগে না। কেমন যেন মন-খারাপ হয়ে যায়। সে জানালার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

এক্ষুনি শান্ত আসবে। মন্দিরা মনে মনে ভাবল। শান্ত এসে বিছানার একপাশে বসে পড়ে বুবুকে একটু আদর করবে। তারপর মন্দিরার দিকে তাকাবে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবে তাকে। চোখদুটো লোভী হয়ে উঠবে। মাতালের মতো অর্থহীন হাসবে, তারপর এগিয়ে আসবে। ভাবতেই যেন গাটা সির সির করে উঠল মন্দিরার। ভালো লাগবে না তার, একদম ভালো লাগবে না। আসলে শান্তকে তার কোন সময়েই ভালো লাগে না, শান্ত তাকে দেখুক, মুগ্ধ হোক, প্রশংসা করুক—মন্দিরার খারাপ লাগবে না। বরং ভালো লাগবে। খুব ভালো লাগবে। কিন্তু শান্তর লোভটা কদর্য। ভয়ঙ্কর কুৎসিত।

মন্দিরা একপা একপা করে দরজার কাছে এল। তারপর অন্ধকার প্যাসেজটাতে। ডান-দিকে অন্ধকার সিঁড়ি। লাইটটা বোধ হয় ফিউজ হয়ে গেছে। বাঁদিকে প্যাসেজের শেষটাতে রান্নাঘর। রান্নাঘরে আলো জ্বলছে। সুখিয়াকে দেখা যাচ্ছে। সুখিয়া গান গাইছে, দেহাতী গান। প্যাসেজটা পার হয়ে চন্দনাদের দরজার সামনে দাঁড়াল মন্দিরা। দরজাটা খোলা। ভেতরটা অন্ধকার। সুখিয়া দেহাতী গান গাইছে। গানের সুরটা অদ্ভুত, কথাগুলো দুর্বোধ্য। কিন্তু তবু মন্দিরার ভালো লাগছে।

ওপরতলার কুকুরটা ডাকছে। কলের জলে একটানা ধাতব, সুরেলা শব্দ। মন্দিরা চন্দনাদের অন্ধকার ঘরটার চৌকাটের ভেতর একটা পা বাড়িয়ে দিল। ঘরটা অন্ধকার। না, একেবারে অন্ধকার নয়, ওপাশের ঘরে আলো জ্বলছে তার আভা পড়েছে মেঝেতে। ঘরটাকে কুয়াশাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। মন্দিরা ভাবল, ওরা বোধ হয় কেউ নেই এখন। একবার পেছনদিকে তাকাল সে। খোলা দরজা দিয়ে খাটের একটা পাশ দেখা যাচ্ছে। ক্রিমরঙের ফ্রকের একটা অংশ আর বুবুর শান্ত নির্লিপ্ত, ঘুমন্ত মুখটাকে দেখা যাচ্ছে। সুখিয়া একমনে গান গাইছে। এক-টানা গান। সুরের কোথাও ভাঁজ নেই, মোচড় নেই। গানটার যেন শেষও নেই। মন্দিরা ভাবল, ফিরে যাই।

কিন্তু মন্দিরা ফিরলো না। ঘরটা অন্ধকার। মন্দিরা ভাবল এঘরে কেউ নেই। পাশের ঘরটায় আলো জ্বলছে। মৃদু আলো। সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার আগে নিজের চারদিকে একবার তাকাল সে। কতকগুলো ট্রাংক বাক্স থাকে থাকে সাজানো। ডানপাশের দেয়ালের কোণে একটা গোটানো মাদুর দাঁড় করানো, হঠাৎ দেখলে একটা মানুষের মত মনে হয়। কেন কে জানে মন্দিরার গাটা সির সির করল। মন্দিরা ডাকল, 'চন্দনা'। কেউ উত্তর দিল না।

জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। মৃদু ধাতব,

সুরেলা। বিষাদের সুর। মন্দিরার ভালো লাগছে না।

মৃদু আলো-জ্বলা ঘরটার দিকে এগোলো মন্দিরা। চৌকাঠে দাঁড়াল। মৃদু আলো। ঘরটা নোংরা, ছোট, এলোমেলো। দেয়ালে বিশ্রী দাগ।

জানালাগুলো বন্ধ, ঘরটা গুমোট। ওরা কেউ নেই। মন্দিরা ঘরের ভেতর এসে দাঁড়াল।

ঘরের কোণে কোণে ঝুল। ঘরটা ধোঁয়াটে। ওষুধের অস্বস্তিকর গন্ধ। এলোমেলো টেবিল-চেয়ার-খাটের কোণে কোণে বাদুড়ের মত অন্ধকার ঝুলছে। নিচু খাট। চন্দনার দাদু শুয়ে আছে। মন্দিরা সেদিকে তাকাল। একটা নকশা-কাঁথায় ভদ্রলোকের গলা পর্যন্ত ঢাকা। আলোটা এতো কম যে, ভদ্রলোকের মুখটা মন্দিরা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু আন্দাজ করতে পারছে। সেই প্রশান্ত, সুন্দর সৌম্য মুখ, সাদা ধবধবে চুল—লম্বা চওড়া কাঠামো, গায়ের রঙটা খুব ফরসা। সাহেবদের মতো।

কিন্তু হঠাৎ মন্দিরা চমকে উঠল। ভয় পেল। স্থির জলে ঢিল পড়ার মত চমকে ওঠা। সে শুনলো একটু শব্দ। অমানুষিক অস্বাভাবিক শব্দ। চন্দনার দাদু কিছু বলার চেষ্টা করছে। মন্দিরা খাটটার দিকে এগিয়ে গেল। ওর বুকটা ঢিপঢিপ করছে।

মন্দিরা খাটটার কাছে এসে ঝুঁকল। চন্দনার দাদু তাকিয়ে আছে। তার দিকে। চোখদুটো লাল, চোখের তারাদুটো ঘোলাটে। খুব বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে আছে। কপালের চামড়া শুকনো, কোঁচকানো, শিরাবহুল। মুখটা এবড়ো খেবড়ো গর্তে ভরা। ছোট ছোট সাদা দাড়ি বিজবিজ করছে মুখটাতে। অস্বাভাবিক মুখ। ভয়ংকর। এতো ভয়ংকর যে তাকানো যায় না। চমকে গিয়েও যেন অবশ হয়ে এলো মন্দিরা। হাতদুটো দিয়ে বিছানায় ভর দিল। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখা মুখটার সংগে এ মুখটার কোন মিল নেই।

মন্দিরা ঝুঁকল। ফিস ফিস করে বলল, 'কিছু বলবেন আমাকে? কাউকে ডেকে দেবো? চন্দনাকে ডাকবো? কিংবা ওদের কাউকে?'

ভদ্রলোক কিছু বলবার চেষ্টা করছেন। শব্দ হচ্ছে ঘর ঘর ঘর ঘর। শব্দটা যেন নিজের বুকে শুনতে পাচ্ছে মন্দিরা। ঠোঁট দুটো ফাঁক হল। নড়ল। গোঙানির মত শব্দ হল। মন্দিরা চারদিকে তাকাল। কেউ নেই। সুখিয়ার গানের শব্দটা শোনা যাচ্ছে না। কল থেকে জল পড়ার একটানা মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওদের চাকরটা নিশ্চয়ই নেই। মন্দিরা আরো একটু ঝুঁকে বলল, 'জল দেব আপনাকে? জল? কি খুঁজছেন আপনি? বলুন না।' মন্দিরার গলাটা যেন আটকে আসছে।

হলদে পিঁচুটি পড়া চোখদুটোয় টলটল করছে জল। মন্দিরা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। জল টলটল করা ভয়ংকর দুটো চোখ। যেন তাকে গিলে খাচ্ছে।

কাঁথাটা নড়ল। ভেতর থেকে একটা হাত বেরল। ধীরে ধীরে। হাতটা শূন্যে উঠল। মোটা হাড়ের হাত, চামড়ার ওয়াড় পরানো। মোটা হাড়, লম্বা আঙুল। মন্দিরার হাত-দুটো কাঁপছে। পাদুটো কাঁপছে। বুকটা কাঁপছে। মন্দিরা কথা বলতে গেল, গলাটা থরথর করে কাঁপল। ফিসফিস করে বলল, 'অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন? কেন ভয় দেখাচ্ছেন আমায়? দোহাই আপনার, অমন করে তাকাবেন না।'

অস্বাভাবিক মুখটা বিকৃত হল। চোখ-দুটো আরো বড় বড়। চোখের পলক পড়ছে না। শূন্যে ওঠা হাতটা হঠাৎ পড়ে গেল। ঠাণ্ডা একরাশ কিলবিলে সাপের মত আঙুলগুলো মন্দিরার কব্জিটায় জড়িয়ে গেল। মন্দিরা অস্ফুট একটা আওয়াজ করল।

মন্দিরার মনে হচ্ছে চোখদুটো তার ফেটে যাবে। হাত পা অবশ। ভারী। চুলের গোড়ায় গোড়ায় যেন সরীসৃপ চলছে। গলা শুকিয়ে কাঠ। মন্দিরা নড়তে চাইছে। পারছে না। মন্দিরা ফিস ফিস করে বলতে চাইছে, ছাড়ো, ছেড়ে দাও আমার হাত। জানো, তোমাকে আমি শেষ করে ফেলতে পারি? ওরা কেউ এসে পড়বার আগে তোমার সব শেষ হয়ে যেতে পারে। একটু পরে তুমি একটা কাঠের মতো মরে পড়ে থাকবে। আমাকে ছেড়ে দাও। তুমি কি বেঁচে আছ? তুমি কি শুনতে পাচ্ছো? তোমার ভয় করে না?

একটা অন্ধকার যেন মন্দিরার চোখের সামনে এগিয়ে এল। আবার পিছিয়ে গেল। ঘরটার ভেতর কি ভীষণ কুয়াশা। এত শীত আজকে? এত শীত! সুখিয়া গান গাইছে না কেন? জলের কলটা কেউ বন্ধ করছে না কেন? মন্দিরা নিজেকেই নিজে বলল, আঃ, এই বাড়িতে কি কেউ বেঁচে নেই।

আর কোন শব্দ নেই। সব চুপ। বিছানায় শোয়ানো দেহটা।

আমার শেষ শক্তি দিয়ে তোমাকে শেষ করে ফেলা যায়। তুমি কতটুকু? তুমি অথর্ব দুর্বল। আমার দিকে অমন করে তাকিও না। লোভী জানোয়ারের মত তাকিও না। যদি—

মন্দিরার হাতদুটো কঠিন। ভয়ংকর কঠিন। চোয়াল দৃঢ়। দাঁতে দাঁত ঘষছে মন্দিরা। এখন এই ঘরে কেউ আসবে না। ঘরটা ভীষণ নির্জন। মন্দিরার বুক থেকে একটা তরল আগুনের স্রোত মাথায় উঠে আসছে। পা দুটো ঠাণ্ডা, অবশ। মন্দিরাকে মেঝের দিকে টেনে নিচ্ছে কেউ। মন্দিরার হাতদুটো ভয়ংকর কঠিন, আঙুলগুলো বাঁকা হুকের মত।

না, কেউ দেখেনি। অন্ধকার প্যাসেজটা প্রায় লাফিয়ে পার হয়ে এসেছে সে। আবার সেই শান্ত ঘর। উজ্জ্বল আলো। সবকিছু সাজানো গোছানো। ফিটফাট। বুবু ঘুমোচ্ছে। প্রশান্ত, নির্লিপ্ত, গভীর ঘুম। সুখিয়া গান গাইছে। দেহাতী ধর্ম সংগীত।

ওপরতলার কুকুরটা ডাকছে। গম্ভীর, হিংস্র ডাক।

জলের কলে একটানা একঘেয়ে সুর। বিষাদের সুর।

ঝড়ের পর বিধ্বস্ত একটা গাছের মত মন্দিরা ড্রেসিং টেবিলের চৌকো আয়নাটার সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে।

আর্থিক সমীক্ষা

শ্রীকৌটিল্য

আমাদের দেশে মাঝে মাঝে এরকম কথা শোনা যায় যে, পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে বর্ধিত জাতীয় আয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সমানভাবে প্রতিফলিত না হয়ে কেবলমাত্র কয়েকটি অঞ্চলের সমৃদ্ধি সূচনা করছে। ভাষা সমস্যা এবং অন্যান্য কারণে এমনিতেই এদেশে কিছুটা আঞ্চলিক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে; তারপর যদি উন্নয়ন পরিকল্পনাতেও আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ যথেষ্ট গুরুত্ব পায়, তাহলে পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শর্ত অর্থাৎ দেশের মধ্যেকার ভাবাবেগগত সংহতি দুর্বলতর হবে এবং পরিকল্পনার রূপায়ণও সেই পরিমাণে ব্যাহত হবে। সুতরাং কথাটি ভেবে দেখা দরকার। তাছাড়া উন্নয়ন পরিকল্পনায় আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখা সমগ্র পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্যও অবশ্য প্রয়োজন। অতএব এদিক থেকেও বিষয়টি বিচার করে দেখবার প্রয়োজন আছে।

মোটামুটি দুইভাবে বিষয়টি বিচার করা যায়। উন্নয়ন পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের আঞ্চলিক বণ্টন হিসাব করে দেখা যেতে পারে বিভিন্ন অঞ্চলে লোকসংখ্যার অনুপাতে ব্যয় করা হচ্ছে কি না। কিন্তু সব প্রোজেক্টের আয়-উৎপাদন ক্ষমতা সমান নয়। সুতরাং বিভিন্ন অঞ্চলে পরিকল্পনার মাধ্যমে যে সমস্ত প্রোজেক্ট নেওয়া হয়েছে, তার ফলে নতুন আয় সৃষ্টির হার সব অঞ্চলে মোটামুটি একই ধরনের হচ্ছে কিনা সেটাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। এদিক থেকে দেখলে প্রতি বৎসর জাতীয় আয় হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক আয়ের হিসাবও করা উচিত। কিন্তু আঞ্চলিক আয়ের হিসাব জাতীয় আয়ের হিসাবের চেয়ে অনেক জটিল। অসুবিধাগুলি খানিকটা তত্ত্বগত, কিন্তু প্রধানত পরিসংখ্যানগত।

প্রথম অসুবিধা দেখা দেয় অঞ্চল বলতে আমরা কী বোঝাতে চাই সেটা নিয়ে। কয়েকটি সার্বভৌম রাষ্ট্র নিয়ে অঞ্চল গঠিত হলে যে সমস্ত অসুবিধা হয়, সেগুলি বর্তমান আলোচনায় আমাদের বিবেচ্য নয়। অঞ্চল বলতে আমরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্টেট বা প্রদেশের কথাই ভাবছি, যদিও প্রাকৃতিক সম্পদ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে প্রদেশগুলি আদর্শভাবে বিভক্ত নয়। সাধারণভাবে জাতীয় আয় ও আঞ্চলিক আয় হিসাবের পদ্ধতি মোটামুটি এক হলেও উদ্দেশ্য সব সময় এক নয়। আঞ্চলিক আয় নির্ণয়ের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী নাগরিকদের ব্যক্তিগত আয়ের পার্থক্য নির্ণয় করা এবং সেই অনুসারে উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবর্তন করে ব্যক্তিগত আয়ে আঞ্চলিক সমতা আনবার চেষ্টা করা। সুতরাং জাতীয় আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, যেখানে প্রধান লক্ষ্য থাকে জাতীয় সমষ্টিতে পৌঁছানো, আঞ্চলিক আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য থাকা উচিত আর্থিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব ভাগ করে নাগরিকদের ব্যক্তিগত আয় নির্ণয় করা।

আঞ্চলিক আয় নির্ণয়ের প্রধান বাধা পরিসংখ্যানগত হলেও কৃষিতে উৎপন্ন আয়ের আঞ্চলিক বণ্টনে পরিসংখ্যানগত বাধা বিশেষ নেই (মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশে জাতীয় আয়ের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ উৎপন্ন হয় কৃষিতে)। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতির অন্য সমস্ত বিভাগে অর্থাৎ খনি, শিল্প, পরিবহন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে যে আয় উৎপন্ন হয়, তার আঞ্চলিক বণ্টন জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। কেবলমাত্র জাতীয় আয় নির্ণয় করবার উদ্দেশ্যে খুব কম পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন এবং অন্যান্য কাজের প্রয়োজনে যে সমস্ত পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়, সেগুলিকে ব্যবহার করেই জাতীয় আয় নির্ণয় করা হয়। তাছাড়া কতকগুলি বিভাগের জন্য স্যাম্পল সার্ভের সাহায্যে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়, যেমন আমাদের দেশের স্যাম্পল সার্ভে অব ম্যানুফ্যাকচারিং ইণ্ডাস্ট্রিজ। এই পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যের আঞ্চলিক বণ্টন সম্ভব নয়। কারণ, সমগ্র দেশের জন্য গৃহীত নমুনা বা স্যাম্পলে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয় না।

জাতীয় আয়কে যদি আমরা দেশের সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক কার্যকলাপের নীট ফল বলে ধরি তাহলে দেখা যাবে যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলির আয় উৎপাদক কর্মকাণ্ড সব সময় প্রাদেশিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়। এরকম অবস্থায় একাধিক অঞ্চলে বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের কতটা অংশ কোন অঞ্চলের জন্য ধরা হবে, সেটা নির্ধারণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। জাতীয় আয় নির্ণয়ের পদ্ধতির সঙ্গে আঞ্চলিক আয় নির্ণয়ের পদ্ধতির একটা মৌলিক পার্থক্য হল এই যে, প্রথম ক্ষেত্রে আমরা আয় উৎপাদন-কেন্দ্র অথবা আয়গ্রহীতা যে কোন একটা দিক থেকে হিসাব করতে পারি, কিন্তু আঞ্চলিক আয় হিসাব করতে গিয়ে দেখা যায় যে, অনেক সময় উৎপাদন-কেন্দ্র এবং আয় গ্রহীতা বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে একই ব্যক্তি অথবা পরিবার একাধিক অঞ্চলে উৎপন্ন আয়ের গ্রহীতা হতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত আর্থিক কর্মকাণ্ডের আয় উৎপাদন ক্ষমতার তারতম্য ছাড়াও কোন অঞ্চলে উৎপন্ন এবং গৃহীত আয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে বোধ হয় এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, জাতীয় আয় নির্ণয়ের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করে আঞ্চলিক আয় নির্ণয় করলে তার থেকে যে ব্যক্তিগত গড় আয়ের পরিমাণ পাওয়া যাবে, সেটা ব্যক্তিগত আয়ের আঞ্চলিক পার্থক্য প্রকাশ করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং আঞ্চলিক ব্যক্তিগত আয় নির্ণয়ের জন্য কেবলমাত্র পরোক্ষ সূত্রে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর না করে বিশেষভাবে এই কাজের জনাই পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে হবে।

কৃষিজ আয়ের পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে বর্তমানে কেবলমাত্র জেলা পর্যন্ত উৎপাদনের হিসাব পাওয়া যায়; আরো ছোট প্রশাসনিক অঞ্চলের জন্য এই হিসাব প্রকাশ করা উচিত এবং পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন সংস্থার মারফৎ এই হিসাব সংগ্রহ করা উচিত।

জাতীয় আয়ে ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্পের অবদান সাধারণত সেন্সাস থেকে প্রাপ্ত এই বিভাগে নিযুক্ত লোকসংখ্যা থেকে নির্ধারণ করা হয়। স্বভাবতই এই হিসাব উন্নত করা প্রয়োজন এবং সম্ভব। এই শিল্পগুলিকে যতদূর সম্ভব ছোট ছোট গোষ্ঠীতে ভাগ করে স্যাম্পল সার্ভের ভিত্তিতে প্রতি বৎসর এই গোষ্ঠীগুলিতে নিযুক্ত লোকদের ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক আয় নির্ধারণ করা উচিত। পশুপালন, মৎস্যশিকার, ছোটখাটো ব্যবসা ইত্যাদি জীবিকার ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

॥ এক ॥

পাঁচ হাজার বৎসরের পুরানো সভ্যতার দেশ এই ভারতবর্ষ। একদিন এখানে লিখিত ইতিহাস রাখিবার কোন রীতি ছিল না। বিস্মৃতির কালগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে কত গৌরবময় কথা। কত অজানা, অলিখিত ও অপরূপ কাহিনী মিশিয়া রহিয়াছে দেশের প্রতিটি ধূলিকণার সহিত। কালের যাত্রা-পথে কত মানুষের হাসি ও কান্নার, ব্যথা ও বেদনার কাহিনী বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে বিরাট নীরবতার অবিচ্ছেদ্য আবরণে। সেই নীরবতার ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা সকলের নাই। সেইজন্যই প্রয়োজন লিখিত ইতিহাসের, যাহার মাধ্যমে পূর্বসূরীদের কথা উত্তরসূরীদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু লিখিত ইতিহাস রাখিবার পথে প্রধান অন্তরায় বৈচিত্র্যময় এই দেশের বিচিত্র জীবনদর্শন। আজও সেই বাধা অন্তর্হিত হয় নাই। অনৈতিহাসিকতা এখনও আমাদের মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই কারণেই ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের জীবনের লক্ষ বৈচিত্র্যময় কাহিনী থাকিয়া যায় লোকচক্ষুর অন্তরালে। স্পেন দেশের গৃহযুদ্ধ অথবা হাঙ্গেরীর জনবিপ্লবের অতি বিশদ বিবরণ পৌঁছিয়া যায় এই দেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে; কিন্তু দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অগণিত শহীদের অশ্রুতপূর্ব গাথা কোনদিনও পৌঁছাইবে না দেশবাসীর নিকট। পথে প্রান্তরে বুনো ফুলের মত এরা ফুটিয়াছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে আর ঝরিয়া পড়িয়াছিল ধরণীর ধূলির বুকে। শুনিবে না কেহ ইহাদের কথা, জানিবে না কেহই ইহাদের কাহিনী। ঠিক এমনিভাবে আজ বিলীন হইতে চলিয়াছে বিস্মৃতির বিশাল গর্ভে সেই সমস্ত মানুষের কথা, যাহারা সবকিছু সমর্পণ করিয়া গেল নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার গৌরবময় সংগ্রামে। প্রায় আট বৎসর পূর্বে প্রকৃতির লীলাভূমি নেপালের শান্ত উপত্যকা অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল সশস্ত্র গণবিপ্লবের গম্ভীর গর্জনে। বহিপৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন, হিমালয়ের গোপন গহ্বরে অবস্থিত এই দেশে বিপ্লবের ডাকে যাহারা সাড়া দিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন ভারতবাসীও ছিল। তাহাদের ভিতর সংগ্রাম শেষে অনেকেই ফিরিয়া আসিল; আর যাহারা আসিল না তাহারা পড়িয়া রহিল মধ্যনেপালের পাহাড়ে পর্বতে, তরাইয়ের জঙ্গলে অথবা বিরাটনগরের সমতলভূমিতে। সর্বস্ব উৎসর্গ করিয়া গেল তাহারা স্বৈরাচারী রাণাসাহীর বিরুদ্ধে নেপালবাসীর গৌরবময় সংগ্রামে। তাহাদের কথা স্মরণ করা প্রয়োজন। যে আদর্শ সেই অচেনা, অজানা দেশের মানুষের জন্য সবকিছু উৎসর্গ করিবার প্রেরণায় উদ্দীপিত করিয়াছিল তাহাদের সেই আদর্শকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা অবশ্য কর্তব্য। এতদিন আশায় ছিলাম, হয়ত কোন যোগ্যতর লেখনী এই সমস্ত মানুষের কথা লিখিবার জন্য আগাইয়া আসিবে, কিন্তু আমার সেই আশা ব্যর্থ হইয়াছে। এইজন্যই যোগ্যতার একান্ত অভাব সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টা।

তখন ১৯৫০ সাল। জুলাই মাসের কলিকাতার আকাশ বাদলের অঝোর ধারায় মুখরিত। সোস্যালিস্ট পার্টির মাদ্রাজ সম্মেলনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। হঠাৎ নেপালী কংগ্রেস নেতা বিশ্বেশ্বর কৈরালার নিকট হইতে একটি টেলিগ্রাম আসিয়া হাজির। পরের দিন তাঁহার কলিকাতা আগমন বার্তা এবং আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার অনুরোধ—এই ছিল তারবার্তার বিষয়বস্তু। পরের দিন যথাসময়ে স্বর্গীয় ফুলনপ্রসাদ ভার্মার (তদানীন্তন ডি ভি সি বোর্ড মেম্বার) আলিপুরের বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম। এইখানেই বিশ্বেশ্বর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রিয়দর্শন এই মানুষটি সাধারণ কুশল প্রশ্নাদির পরই বিশেষ ব্যগ্রতার সহিত কাজের কথা শুরু করিয়া দিলেন। নেপালে রাণাসাহীর অত্যাচার চরমে পৌঁছিয়াছে, সমগ্র নেপালের উপর প্রধানমন্ত্রী মোহন সামসের জঙ্গবাহাদুর রাণার মধ্যযুগীয় বর্বরতার তাণ্ডব নৃত্য চলিয়াছে। শ্বাসরোধকারী রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে নেপালী কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে রাণাসাহীর বন্দুকের বেয়নেট আর বুলেট। নেপালের রাজা সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন ক্রীড়নকে পরিণত হইয়াছেন। নেপালের কোটি মানুষ প্রতিকারহীন অত্যাচারে জর্জরিত। আকাশ বাতাস তাহাদের আর্তনাদে কম্পমান। শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের মাধ্যমে এই নারকীয় অত্যাচারের প্রতিকার সম্ভব নহে। মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থার অবসান করিয়া গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ততোধিক অসম্ভব। অতএব আজ নেপালের দলমত নির্বিশেষে সকলেরই জাতীয় প্রতিষ্ঠান নেপালী কংগ্রেসের সামনে সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন হইতেছে—নেপালে নিপীড়িত জনতার মুক্তি কোন পথে আসিবে? দূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। কিছু করা একান্ত প্রয়োজন। এবং কোনরূপ কালবিলম্ব না করিয়াই তাহা করিতে হইবে। ভারত সরকার এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ। নেপাল স্বাধীন দেশ। ইহার অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে—এই চিন্তা করিয়াই ভারত সরকার নেপাল সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকিতে দৃঢ়সংকল্প। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়াই এই কথা আলোচনা করিয়া বিশ্বেশ্বর কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। এই ক্ষীণ মানুষটির

সৌম্যদর্শন মুখাবয়ব একটা অস্বাভাবিক কঠিন ভাব ধারণ করিল। প্রায় কোটরাগত চক্ষু দুটিতে ছিল ঘৃণা ও দৃঢ়সংকল্পের প্রতিচ্ছায়া। ক্ষণকাল এইরকম নিশ্চুপভাবে কাটিবার পর আবেগলেশহীন স্বরে ধীরে ধীরে বিশ্বেশ্বর বলিতে শুরু করিলেন নেপালী কংগ্রেস নির্দেশিত সমস্যা সমাধানের কথা।

নেপালী কংগ্রেস এই বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত যে, স্বৈরাচারী রাণাসাহীর বর্বর শাসন ব্যবস্থাকে কেবলমাত্র গণবিপ্লবের সর্বগ্রাসী আগুনই ছারখার করিয়া দিতে পারে। নেপালী কংগ্রেসের শান্তি ও সত্যাগ্রহের জবাবে আসে বুলেট। যেমন সামসেরের খুনীর দল বুঝিতে পারে, বুলেট আর বেয়নেটের ভাষা, তাহাদের জবাব দিতে হইবে এই ভাষাতেই। নেপালের জনতা সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বিলোপ করিয়া স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করিবার জন্য আরও রক্ত দিতে এবং চরম আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত। রাণাসাহীর বিরুদ্ধে কঠিনতম আঘাত হানিতে প্রত্যেকটি নেপালী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শুধুমাত্র অভাব রহিয়াছে হাতিয়ারের এবং প্রয়োজনীয় সংগঠন কার্যের। যে কোন প্রকারেই হউক হাতিয়ার সংগ্রহ করিতে হইবে। বহু স্বার্থ-লোভী বিদেশীর সমর প্রাঙ্গণে লক্ষ লক্ষ নেপালবাসী বীরের ন্যায় প্রাণ দিয়াছে; দেশমাতৃকার বন্ধন মুক্ত করিতে সে আজ সমস্ত কিছু উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের গৌরবময় পথে নেপালবাসী নিজ দেশকে ফিরিয়া পাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইহা বলিয়া বিশ্বেশ্বর অতি সহজভাবে জানিতে চাহিলেন যে, আমি নেপালের এই সংগ্রামের সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে রাজী কিনা। কথা প্রসঙ্গে তিনি ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, ভারতীয় সমাজবাদী নেতা জয়-প্রকাশ নারায়ণ নেপালী কংগ্রেসের সশস্ত্র সংগ্রামের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেন। ইহার পর অন্য কথাবার্তায় কিছুক্ষণ সময় কাটাইয়া তাঁহার কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় লইলাম যে, পরের দিন সেই সম্পর্কে আমার মতামত তাঁহাকে জানাইব। সমস্ত বিষয়টা ভাবিয়া দেখিবার জন্য অন্ততপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বেশীর ভাগ ভারতবাসীর ন্যায় ডায়েরী রাখিবার অভ্যাস আমারও নাই। পরের দিন তারিখটা কি ছিল, তাহা বলিতে পারিব না। কিন্তু ইহা বেশ মনে আছে, কিছুটা দ্বিধার সহিত পরের দিন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। মনের ভিতর অনেকগুলি প্রশ্ন এক সাথে মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। কোথা হইতে হাতিয়ার সংগৃহীত হইবে? যদি বা হাতিয়ার জোগাড় করা সম্ভব হয় তবে কেমন করিয়া তাহা পৌঁছাইয়া দেওয়া হইবে মুক্তি-কামী যোদ্ধাদের হাতে? নেপালী কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন মানুষের নেপাল প্রবেশ নিশ্চিতভাবে নিষিদ্ধ। নেপালের সরকারী ফৌজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করিতে হইলে যে পরিমাণ সাংগঠিক কার্যের প্রয়োজন তাহা গোপনে করা সম্ভব নহে। সর্বোপরি অর্থসমস্যা ত রহিয়াছেই। বিশ্বেশ্বরের নিকট এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব চাহিলাম। উত্তরে তিনি যাহা বলিলেন তাহা হইতেছেঃ আপাতদৃষ্টিতে সমস্ত কাজটাই প্রায় অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে। কিন্তু ইহা জানিয়াই নেপালী কংগ্রেস কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছে। পথের বাধাবিপত্তি মনের দৃঢ় ইচ্ছার দ্বারা উত্তীর্ণ হইতে হইবে। মানবতা, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের বন্ধু যে যেখানে আছে, সকলের নিকট নেপালের মুক্তিকামী জনসাধারণের আবেদন পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। অর্থ এবং হাতিয়ার মিলিয়া যাইবে নিশ্চয়ই। যাহা হউক, আলাপ-আলোচনায় স্থির হইল, আমি সোস্যালিস্ট পার্টির মাদ্রাজ সম্মেলনে যোগ-দান করিবার জন্য কয়েকদিনের ভিতরই মাদ্রাজ যাত্রা করিব এবং সেখানে জয়প্রকাশের সহিত সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়া হায়দরাবাদ যাইব। ইহার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। কিছুকাল পূর্বে হায়দরাবাদে রাজাকারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন চলিবার সময় বেশ কিছু হাতিয়ার তথাকার সোস্যালিস্ট পার্টিকে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় এবং প্রায় পাঁচ ছয় মাস যাবৎ সেখানে থাকিয়া অরুণা আশফ আলী এবং মহাদেব সিং-এর নেতৃত্বে পরি-চালিত সেই আন্দোলনে আমি অংশ গ্রহণ করি। এখন সেই হাতিয়ারগুলি উদ্ধার করিয়া নেপালের সংগ্রামে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করা দরকার। অবশ্য স্থির হইল যে, যত অল্প সময়ের ভিতর সম্ভব কাজ সারিয়া আমি কলিকাতায় ফিরিবামাত্রই বিশ্বেশ্বরের সহিত পূর্ব নেপালে যাইব।

দুইদিন ট্রেনে কাটাইয়া জুলাই মাসের একটা গুমোট দিনে মাদ্রাজে উপস্থিত হওয়া গেল। সেই বৎসর অস্বাভাবিক বর্ষা এবং অসহ্য উত্তাপে মিলিয়া দেশের দক্ষিণ প্রান্তে

প্রকৃতি এক বিরক্তিকর রূপ ধারণ করিয়াছিল। কোরিয়ার যুদ্ধ এবং অরুণা আশফ আলীর দলত্যাগের সম্ভাবনা পার্টি সম্মেলনের কার্যেও প্রচুর উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়াছিল। সেইদিকে মনোযোগ দিবার বিশেষ অবসর ছিল না আমার। সম্মেলনের প্রথম দুইদিন জয়প্রকাশের সহিত নিভৃত আলোচনার কোন সময় মিলিল না। তৃতীয় দিবসে সকালবেলা জয়প্রকাশের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাক আসিল। সম্মেলন প্রাঙ্গণেরই এক প্রান্তে বসিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা জানাইলাম. স্বভাব-ধৈর্যের সহিত বক্তব্য বিষয় শুনিয়া তিনি হায়দরাবাদ পার্টির এক বন্ধুকে করণীয় কর্তব্য করিবার নির্দেশ দিলেন। এবং যাতায়াতের খরচ বাবদ আমাকে চারিশত টাকা দিবার জন্য ব্যক্তিগত সেক্রেটারীকে আদেশ করিলেন। পরদিন হায়দরাবাদের সাথীর সহিত আউরঙ্গাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। হায়দরাবাদের বিভিন্ন গ্রাম এবং শহর ঘুরিয়া বিশেষ কোন কাজ হইল না। যে সকল হাতিয়ার হায়দরাবাদের মুক্তি-সংগ্রামের সময় পেঁছাইয়া দিয়াছিলাম, তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বহু চেষ্টার পর যাহা উদ্ধার হইল, তাহা লইয়া জুলাই মাসের শেষদিকে কলিকাতায় ফিরিলাম। হায়দরাবাদে হাতিয়ার অন্বেষণের প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় হতাশার কারণ ছিল। এবং বিশ্বেশ্বর ইহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। নেপালী কংগ্রেসের অন্য দুইজন নেতা সুবর্ণ সামসের এবং সূর্যপ্রসাদ উপাধ্যায়ের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য স্থান হইতে হাতিয়ার সংগ্রহের যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহাও বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। এইরকম এক বিষাদ ও হতাশাময় অবস্থার ভিতর আগস্ট মাসের প্রথমদিকে বিশ্বেশ্বরের সহিত পূর্ব-নেপালের একমাত্র শিল্পনগরী বিরাটনগর অভিমুখে রওয়ানা হইলাম।
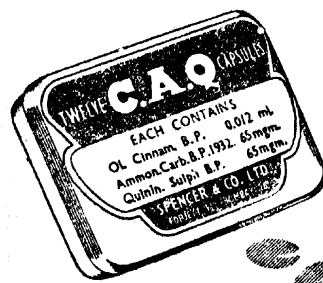
॥ দুই ॥

নেপালের বর্তমান রাজনৈতিক সীমানা বহুবিস্তৃত। কিন্তু সুদূর অতীতে কাঠমণ্ডু উপত্যকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তৎকালীন নেপালের সীমানা। কিরাত এবং নেওয়ার জাতি অধ্যুষিত এই উপত্যকার উল্লেখ পাওয়া যায় খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতেও। কথিত আছে, সম্রাট অশোক কাঠমণ্ডু উপত্যকাকে তাঁহার পাদস্পর্শ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। বর্তমানকালেও রুপমন্দেহি এবং নীলগ্রীবা অঞ্চলে সম্রাট অশোকের স্মৃতিবিজড়িত বহু ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সন্ধান করিলে এখনও নেপালী তরাই এলাকায় বাগমতি নদীর তীরবর্তী বিভিন্ন জায়গায় অশোকের স্তম্ভসমূহ দৃষ্টিগোচর হইবে। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের পার্বত্য জাতিগুলির সহিত কিরাত এবং নেওয়ারদের বহু বিষয়ে সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য যে, মঙ্গোলীয় জাতির প্রচুর প্রভাব পড়িয়াছে এই জাতিগুলির উপর। ভারতীয় কৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে এই উপত্যকার কৃষ্টি-জীবন। বহির্দেশ হইতে আগত নানা জাতির কৃষ্টির দ্বারাও পরিপুষ্ট হইয়াছে কাঠমণ্ডু উপত্যকার নেওয়ারী কৃষ্টি। বঙ্গদেশ এবং মিথিলা হইতে আগত বহু মানুষজনকে নিজ জীবনের সহিত সংযুক্ত করিয়া লইয়াছে এই উপত্যকার আদি অধিবাসিগণ। দেবভক্তগণ, যাহারা সম্ভবত খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছিল এবং মিথিলার ঝা সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণরূপে নেওয়ার জাতির জীবনের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কাঠমণ্ডু উপত্যকায় সর্বধর্মের সমন্বয় দৃষ্ট হয়। গোঁড়া বৌদ্ধ অথবা হিন্দু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগ হিন্দু অথবা বৌদ্ধমন্দিরে বুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া দক্ষিণাকালী ও বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি স্থাপিত রহিয়াছে। জাতিভেদ প্রথার

কঠোরতা কাঠমণ্ডু উপত্যকার জীবন প্রতি-পদে বিষময় করিয়া তুলে না।

সুদূর অতীতে কাঠমণ্ডু উপত্যকা কোনো সময়েই ভারতবর্ষের প্রভাবের বাহিরে ছিল না। ভারতবর্ষের সহিত এই উপত্যকার সম্পর্ক চিরদিনই বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিল। বৌদ্ধধর্ম শুরুতেই এই উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছিল। মৌর্য রাজাদের হাতে কাঠ-মণ্ডুর রাষ্ট্রব্যবস্থাও বহুদিন ন্যস্ত ছিল। এমন কি, কুশান এবং গুপ্ত বংশীয়েরাও কিছুকালের জন্য এই উপত্যকায় আধিপত্য বিস্তার করে। শুধুমাত্র ইহাই নহে, কাঠ-মণ্ডুর বিভিন্ন রাজবংশ—যথা মৌর্য, লিচ্ছবি, টাকুরি, কর্ণাটক, মল্ল এবং শাহ ইত্যাদি—ভারতবর্ষের সমতলভূমি হইতেই আসিয়াছিল। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতার নাগ-পাশে বাঁধা ছিল নেপাল। নেপালের স্বায়ত্ত শাসন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

সুপ্রাচীনকালে নেপাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হইতে কখনও বঞ্চিত হয় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে দিল্লীর প্রভাব নেপাল পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। অনেকের মতে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত নেপালের রাষ্ট্র-নৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গোর্খাগণ নেপাল বিজয় করিয়া স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৭শ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন রাজা যক্ষমল্লের মৃত্যুর পর নেপাল কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহার ফলে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সীমান্তের বাহির হইতে বহু উপজাতি এই সময় নেপালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে শুরু করে। সমসাময়িককালে মোগল অত্যাচারে উৎ-পীড়িত কিছুসংখ্যক রাজপুত রাজস্থান পরিত্যাগ করিয়া নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহার ফলে তথাকার আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। পরস্পর সংগ্রামে লিপ্ত এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি স্বভাবতই দিল্লীর দরবারের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিত। এবং ইহাই ছিল নেপালে দিল্লীর অবাধ প্রভাব বিস্তারের প্রধান সহায়ক।

গোর্খাদের নেপাল বিজয়ের পূর্বেকার ইতিহাস বিশেষ পরিষ্কারভাবে লিখিত নাই। কথিত আছে, তাহারা নেপালে আশ্রয় গ্রহণকারী রাজপুতদের বংশধর। ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, গোর্খা রাজবংশ উদয়পুরের রাজপুত রাজবংশেরই একটি শাখা। প্রথম গোর্খা রাজা পৃথ্বীনারায়ণ শাহ ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন নেপালের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গুর্খার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পরে শুরু হয় তাঁহার জয়যাত্রা। সমরকুশলী গোর্খাদের দুরন্ত অভিযানের ফলে নেপালের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি একের পর এক পরাভূত হইতে থাকে। শুধু তাহাই নহে, কাঠমণ্ডুর রাজা জয়প্রকাশের অনুরোধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি সামরিক বাহিনী পৃথ্বী-নারায়ণের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু পৃথ্বীনারায়ণের পরাক্রমে ইংরাজ ফৌজের অধিনায়ক কিনলক তাঁহার ফৌজ সমেত নেপাল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইংরেজ বিতাড়নের পর পৃথ্বীনারায়ণ কাঠমণ্ডু শহর অধিকার করিতে মনস্থ করেন। কাঠমণ্ডুর রাজা জয়প্রকাশ শহর পরিত্যাগ করিয়া পাটানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু অধিককাল পৃথ্বীনারায়ণের বিজয়ী গোর্খা বাহিনীর গতিরোধে অসমর্থ হইয়া জয়প্রকাশ পাটান পরিত্যাগ করিয়া ভাটগাঁওতে শিবির স্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। এই স্থানেও তিনি পরাজিত হইলেন। ক্ষণস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ভাটগাঁও পৃথ্বীনারায়ণের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইল। পৃথ্বী-নারায়ণ গুরুতররূপে আহত কাঠমণ্ডুর রাজা জয়প্রকাশের শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শেষশয্যা গ্রহণ করিবার পূর্বে জয়প্রকাশকে পশুপতিনাথের মন্দিরে যাইবার অনুমতি দিলেন পৃথ্বীনারায়ণ। ইহার পর সমগ্র নেপালাধীশ পৃথ্বীনারায়ণ রাজ্যে শান্তি ও একতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করিলেন। অবশ্য প্রথম হইতেই পৃথ্বীনারায়ণ নেপালে ইউরোপীয় প্রভাব বিস্তারের বিপক্ষে ছিলেন; এবং তজ্জন্য তিব্বত হইতে বিতাড়িত 'কাপুচিন মিশনারী'দের তিনি নেপাল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিংহ প্রতাপসাহ কিছুদিনের জন্য রাজত্ব করিলেন। অতঃপর ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রতাপসাহের শিশুপুত্র রাণা বাহাদুরশাহ নেপালের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। নেপালের ইতিহাস পুনরায় যুদ্ধ ও অশান্তির অকল্যাণময় পথে পরিচালিত হইল।

শিশুরাজার খুল্লতাত বাহাদুরশাহ পররাজ্য জয়ের অভিলাষে পশ্চিমের পথে তাঁহার গোর্খা সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করিলেন। একের পর এক, চৌবিসি রাজ্যের প্রধানবৃন্দ সমেত, দেশের পশ্চিমাংশের বাইশটি রাজ্য বাহাদুর শাহের নিকট দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইল। তথাপি বাহাদুর শাহের রক্তের তৃষ্ণা মিটিল না। যুদ্ধজয়ের নেশা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য বাহাদুর শাহ সিকিম এবং তিব্বতে অভিযান করিলেন। ইহার ফলে চীন সম্রাট ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে সত্তর হাজার চীনা সৈনিক নেপালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাহাদুর শাহ চীনের প্রাধান্য স্বীকার

করিয়া শান্তিচুক্তি করিতে বাধ্য হইলেন। এবং ইহাও স্থির হইল যে, প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর তিনি পিকিংয়েও একটি বাণিজ্য মিশন' প্রেরণ করিবেন। কিন্তু নেপালে শান্তি আসিল না। পররাজ্য জয়ের প্রচেষ্টাও থামিল না।
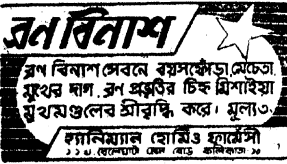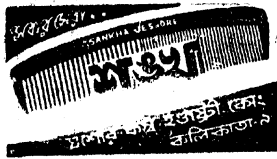
১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে খুল্লতাতকে অপসারণ করিয়া রাণা বাহাদুর শাহ রাষ্ট্রপরিচালনার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ইহার পর নেপালের ইতিহাসে এক অবর্ণনীয় হিংসা ও রক্তপাতের অধ্যায় শুরু হইল। তাঁহার দানবীয় কার্যকলাপ নেপালের সাধারণ মানুষের জীবনকে অসহনীয় করিয়া তুলিল। তাঁহার সহধর্মিণী রাণী ত্রিপুরাসুন্দরীর কোন সন্তান না থাকায় তিনি এক ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইহার ফলে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা নহে, তাঁহার অন্যান্য প্রজাবৃন্দও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে রাণা বাহাদুর শাহ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বারাণসীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রাহ্মণদের দ্বারা অবৈধ ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার ব্রাহ্মণ-পত্নীর গর্ভজাত শিশুপুত্র গির্বাণযুদ্ধ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইল। তাঁহার একজন উপপত্নীকে রাণা-বাহাদুর রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। কুমায়ুন বিজেতা চতুর ও বিশেষ কার্যক্ষম দামোদর পানরে প্রধান মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যতের অন্যান্য ক্ষমতালোভী ও স্বেচ্ছাচারী প্রধান মন্ত্রীদের পথপ্রদর্শক-রূপে আবির্ভূত হইলেন।

ইহার কিছুকাল পরে রাণাবাহাদুর শাহ বারাণসী হইতে নেপালে প্রত্যাগমন করিয়া সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই সময় ভীমসেন থাপা নামক জনৈক নির্বাসিত সম্ভ্রান্ত রাজপুত্রকে তিনি সঙ্গে লইয়া আসিলেন। ভবিষ্যতে এই ভীমসেন থাপা নেপালের একজন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াই ভীমসেন থাপা তাঁহার প্রধান শত্রু দামোদর পানরে এবং তাঁহার পুত্রদের হত্যা করিবার আদেশ দিলেন। তেত্রিশ বৎসর যাবৎ ভীমসেন থাপা নেপালের প্রধান মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন। বহু ক্ষুদ্র রাজ্য জয়ের সফলতায় বিভোর হইয়া ভীমসেন থাপা তাঁহার পিতা জেনারেল অমর সিং থাপাকে কাংগড়া জয় করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। কিন্তু পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংএর প্রচেষ্টায় অমর সিংএর বিজয় অভিযান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এদিকে নেপালের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও রাণা বাহাদুরের চরিত্রের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটিল না। রাণা বাহাদুর তাঁহার অবৈধ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার হস্তে নিহত হইলেন। কিন্তু রাণা বাহাদুরের পূর্ব-কথিত শিশুপুত্রই সিংহাসনের অধিকারী রহিলেন।

ভীমসেন থাপা তাঁহার যুদ্ধজয়ের নেশা এবং ইংরাজ-বিরোধিতা চরিতার্থ করিবার জন্য তৎকালীন ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষের অংশবিশেষে অভিযান শুরু করিলেন। **১৮০৪ হইতে ১৮১২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত** ভীমসেন থাপার গোর্খাবাহিনী ত্রিহুত এবং তরাই অঞ্চলের প্রায় দুইশত গ্রাম দখল করিল। ইহার ফলে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। যুদ্ধের প্রথম পর্যায় গোর্খাবাহিনীর নিকট ইংরাজ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইল। কিন্তু ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জেনারেল অক্টারলোনীর নিকট পরাজিত হইয়া জেনারেল অমর সিং থাপা সন্ধি-চুক্তি করিতে বাধ্য হইলেন। শতদ্রু হইতে কালী-নদী পর্যন্ত সমস্ত বিজিত ভূমি ইংরাজকে প্রত্যর্পণ করিতে হইল। এই সময় প্রথম শুরু হইল ইংরাজ সৈন্যবাহিনীতে গোর্খা-দের ভর্তি করা। কিন্তু নেপালের অন্তর্দ্বন্দ্ব থামিল না।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজমাতা রাণী ত্রিপুরা সুন্দরীর মৃত্যুর পর ভীমসেন থাপার দুর্দিন শুরু হইল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে গির্বাণ-যুদ্ধের পুত্র রাজেন্দ্র-বিক্রমশাহী নিজের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য ভীমসেন থাপার প্রধান মন্ত্রী হিসাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিবারণ করিলেন। ভীমসেন থাপার হস্তে নিহত দামোদর পানরের পুত্র রণজঙ্গ প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। ভীমসেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মাতব্বর সিং বন্দীশালায় প্রেরিত হইলেন। ইহার কিছুকাল পরে আত্মহত্যায় ভীমসেন থাপা মুক্তি পাইলেন। তথাপি নেপালের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রধান মন্ত্রিত্ব লইয়া থাপা এবং পানরেদের ভিতর অপরিসীম আত্মকলহ সৃষ্টি হইল। এই অবস্থার ভিতর ভীমসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র মাতব্বর সিং প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে মাতব্বর সিং নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র জঙ্গ-বাহাদুরের হস্তে নিহত হইলেন।

১৮৫৭ সাল। জঙ্গবাহাদুর সেই সময় নেপালের প্রধান মন্ত্রী : স্বাধীনতার দাবীতে ভারতবর্ষের আকাশ-বাতাস তখন কম্পমান। বন্ধনমুক্তি সংগ্রামের আগুন জ্বলিয়া উঠিল ভারতবর্ষের অগণিত নগরে ও গ্রামে। জঙ্গ-বাহাদুর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে ইংরাজকে সৈন্যসামন্ত দিয়া সাহায্য করিলেন। কেবলমাত্র ইহাই নহে, তিনি নিজে সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই সাহায্যের জন্য ইংরাজ উপাধি এবং তরাই এলাকায় কিছু জমি দান করিয়া জঙ্গবাহাদুরকে সম্মানিত করা হইল। তাঁহার প্রধান মন্ত্রিত্বকালে একটি আইন করা হয়। যাহার ফলে স্থির হয় যে, প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁহার জীবিত ভ্রাতাদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠই প্রধান মন্ত্রিত্বের অধিকারী হইবেন। এই আইনের জোরেই বর্তমান নেপালের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন মোহন সামসের জঙ্গ-

বাহাদুর রাণা। যাহা হউক কালের গতিতে এই প্রথা নেপালের প্রধান মন্ত্রীকে বহু ব্যাপারে রাজার অপেক্ষা বেশী ক্ষমতার অধিকারী করিয়াছে। প্রধান মন্ত্রীই দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। নেপালের জনসাধারণের নিকট রাজা এবং প্রধানমন্ত্রীর ভিতর পার্থক্য অতি অল্প। রাজাকে বলা হইয়া থাকে 'পাঁচ সরকার'; প্রধান মন্ত্রী হইতেছেন 'তিন সরকার'। রাজার নামের পূর্বে পাঁচটি 'শ্রী' এবং প্রধান মন্ত্রীর ভাগ্যে তিনটি 'শ্রী' বরাদ্দ রহিয়াছে। গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এই প্রথাই চলিতেছিল। প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল ক্ষমতা ব্যবহার করিবার জন্য কাহারও নিকট কোনপ্রকার কৈফিয়ত দিবার প্রয়োজন ছিল না। দেশে কোনরকম সংগঠিত শাসনব্যবস্থাও ছিল না। প্রধান মন্ত্রীর খেয়ালখুশীমাফিক ইহা পরিচালিত হইতে থাকে। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রধান মন্ত্রিত্ব বর্তাইবার ফলে একটি বংশের ভিতরই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের নেপালেও আদিম যুগের এই বর্বর প্রথার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

নেপালের অর্থনৈতিক জীবন একপ্রকার দাসপ্রথার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল। জমি সম্পর্কে 'বিরতা প্রথা' প্রচলিত ছিল বহুযুগ হইতে। 'বিরতা' জমির মালিক বিনা খাজনায় জমির স্বত্ব উপভোগ করিত। দেশের বেশীরভাগ জমি 'বিরতা' প্রথায় মুষ্টিমেয় কয়েক ঘর রাণার অধিকার-ভুক্ত ছিল। মুষ্টিমেয়র প্রাচুর্য এবং সাধারণের সীমাহীন দারিদ্র্য ছিল নেপালের অর্থনৈতিক জীবনের চিরাচরিত অভিশাপ। আয়ের উপর কোনপ্রকার আয়কর ছিল না. ফলে বিত্তশালীর বিত্ত স্ফীত হইতে স্ফীততর হইত। পৃথিবীতে নেপাল ব্যতীত অন্য কোন আয়করহীন দেশ আছে কিনা জানি না, তবে নেপালের এই ব্যবস্থায় আকৃষ্ট হইয়া বিরাটনগর এবং অন্যান্য স্থানে ভারতীয় পুঁজিপতিরাও ব্যবসায়ীগণও অর্থ নিয়োগ করিতে উৎসাহী হইত। দারিদ্র্যপীড়িত জনসাধারণের নিকট হইতে যে রাজস্ব আদায় হইত, তাহা প্রধান মন্ত্রীর কর্তৃত্বাধীনে রক্ষিত হইত। যথেচ্ছভাবে অর্থব্যয় করিবার অধিকার তাঁহার ছিল এবং তজ্জন্য কোনপ্রকার হিসাব দিবার প্রয়োজন ছিল না। এককথায় নেপাল ছিল রাজা, প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহাদের আত্মীয়দের পক্ষে মুষ্টিমেয় রাণার ব্যক্তিগত জমিদারী। এই দানবীয় অবস্থার বিপাকে নেপালের সাধারণ মানুষজনের জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। হিমালয়ের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এই দেশ বহির্জগতের দৃষ্টির বাহিরে ছিল এবং এই অবস্থায় রাখিবার প্রচেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে, কিছুদিন পূর্বেই কোন বিদেশীর পক্ষে নেপালে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। হয়ত অনন্তকাল পর্যন্ত এই দুর্বিষহ অবস্থার ভিতর নেপালের মানুষ নিষ্পেষিত হইত, যদি না ইতিমধ্যে একটি যুগান্তকারী ঘটনা এক অভূতপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করিত। ভারতবর্ষের বন্ধনমুক্তির স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হইল। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রভাবে ইতিহাসের চক্র অন্য পথে চালিত হইল। মুক্তি-সংগ্রামীর দুর্জয় সংকল্প নেপালের বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য দৃঢ়তর হইল।

(ক্রমশ)

চক্রদত্ত

সম্প্রতি লেনিনগ্রাডে পৃথিবীর সবচেয়ে খাঁটি এলুমিনিয়াম তৈরী করেছে। এই এলুমিনিয়ামের নাম সাতটা ৯। কারণ এটা শতকরা কতটা খাঁটি সেটা বোঝাবার জন্য সংখ্যায় লেখা হয় '৯৯·৯৯৯৯৯'। 'সাত নয় এলুমিনিয়ামে'র গুণাগুণ এখনও সঠিক-ভাবে জানা যায়নি। তবে এটা খুব নরম, প্রয়োজনে বেঁকানও যায় আবার চুম্বকের প্রতিরোধ ক্ষমতাও আছে। এই ধাতু ইলেকট্রোনিক্স, চশমার কাঁচ এবং রাসায়নিক কাজে খুব প্রয়োজন হবে।

*

বিজ্ঞানীদের মতে, আন্তর্জাতিক ভূপদার্থ বর্ষের তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে পৃথিবীর আবহাওয়া ক্রমশ উষ্ণ হচ্ছে। এর কোন সঠিক কারণ দিতে না পারলেও বিজ্ঞানীরা দুটি মত প্রকাশ করেছেন। একটি হচ্ছে, মানুষের সৃষ্টি পৃথিবীতে কয়লা ও তেল জ্বালাবার ফলে শূন্যে যে আস্তরণ সৃষ্টি হচ্ছে সেটি পৃথিবীর এই উত্তাপ বিকীরণের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করছে, ফলে পৃথিবীর তাপ বেড়ে যাচ্ছে। আর একটি কারণ, সূর্যের তাপ-বিকীরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

*

সাধারণত আমরা ক্যামেরার জন্য কাঁচের তৈরী লেন্স ব্যবহার করে থাকি। 'কোডাক অপটিকাল ওয়াকের' ডাঃ ম্যাকক্লিওড 'একটালাইট' নাম দিয়ে প্লাস্টিকের এক-রকম স্বচ্ছ জিনিস তৈরী করেছেন। এটি ঠিক ক্যামেরার কাঁচের মত কোন কিছু 'ফোকাস' করে ছবি তুলতে সাহায্য করবে। দেখতে এটা পাতলা চাদরের মত এবং প্রয়োজনে একে কাঁচি দিয়ে কেটে ঠিক জায়গায় লাগান যায়। একটালাইট টেলি-ভিশন যন্ত্রে ব্যবহার করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই একটালাইট আতসী কাঁচের চেয়ে অনেক বেশী পরিবর্ধিত করে এবং প্রায় ১০ গুণ বেশী উজ্জ্বল করে বস্তু দেখতে সাহায্য করবে। একটালাইটের সুবিধা যে, এটি খুব হাল্কা এবং ক্ষণভঙ্গুর নয়।

*

ভিলাই এবং রৌরকেলা ইস্পাত কারখানার কাজ রীতিমত আরম্ভ হয়েছে। এখানে বর্তমানে ঢালাই লোহা তৈরী করা হচ্ছে। এই বছরের শেষ থেকে এখানে ইস্পাত তৈরীর কাজ শুরু হবে। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার শেষে ভারতবর্ষে ৬০০০০০ টন ইস্পাত তৈরী হবে ব'লে আশা করা যায়। প্রত্যেক টন ঢালাই ইস্পাতের তাল থেকে যখন ইস্পাতের পাত তৈরী করা হয় তখন প্রত্যেক টনের তিন ভাগ ইস্পাত পাওয়া যায়। এই হিসাবে আমরা ৪৫০০০০ টন তৈরী ইস্পাত বছরে পাব ব'লে ধরে নিতে পারি। বর্তমানে 'টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল, ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড স্টীল এবং মাইসোর আয়রন এণ্ড স্টীল' কোম্পানীরা যা ইস্পাত তৈরী করছে তার দ্বিগুণ থেকে তিনগুণ বেশী তারা তৈরী করবে। তাছাড়া, নতুন তৈরী রৌরকেলা, ভিলাই এবং দুর্গাপুর কারখানা যা ইস্পাত তৈরী করবে সমস্ত মিলিয়ে ভারতে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে ৪,৫০০০০ টন ইস্পাত তৈরী হবে।

*

বম্বেতে 'এটমিক এনারজি কমিশন' তাদের দ্বিতীয় রিএকটার 'জারলিনা', যেটি জিরো এনারজি রি-একটার ফর ল্যাটিস্ ইনভেস্টিগেশন (Zero energy reactor for lattice investigation)-র সংক্ষিপ্ত নাম, তা তৈরীর কাজ খুব দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এর জন্য প্রায় ৮০০ জন ভারতীয় বিজ্ঞানী রাতদিন কাজ করছেন। আশা করা যাচ্ছে, এর কাজ ১৯৫৯ সালের মাঝামাঝি শুরু হবে। প্রায় দু বছর আগে থেকে এই কাজের জন্য প্রত্যেক বছরে ২৫০ জন করে তরুণ বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনীয়ারদের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে। এদের এক বছর করে শিক্ষা দিয়ে আণবিক গবেষণার জন্য নিযুক্ত করা হচ্ছে। গবেষণার জন্য যে সব যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে তার বেশীর ভাগই ট্রম্বেতে তৈরী করা হচ্ছে। অবশ্য ভারতের প্রথম এটমিক রিএকটার 'অপ্সরার' কাজ খুব সুষ্ঠুভাবেই চলেছে।

একটালাইটের পাতলা চাদর দু ভাগে কেটে দেখান হচ্ছে

মিশর-সুন্দরী

দিলীপ মালাকার

মিশর সুন্দরীদের নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল কাইরো শহরে বসে। আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন দুজন মিশরীয় বন্ধু। তাঁরাই বলছিলেন, দেখ নারীর সৌন্দর্য তারিফ করতে হলে সৌন্দর্যতত্ত্বের আইন-কানুন নিয়ে চুল চেরা বিচার করা পাগলামির লক্ষণ। দার্শনিকরা করেন করুন, আমরা নই। আমরা সাংবাদিক, দার্শনিক নই। সে সৌন্দর্য মিশরের নারীরই হক আর ভারতীয় নারীরই হক।'

আমি তাদের বলি, 'কাইরো এসে তোমাদের শহর দেখে যতখানি মুগ্ধ হয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশী মুগ্ধ হয়েছি তোমদের দেশের সুন্দরীদের দেখে। মিশর-সুন্দরীদের সৌন্দর্য তারিফ পাওয়ার যোগ্য।'

মিশর নারীদের সৌন্দর্যের সাথে ইউরোপীয় নারীদের সৌন্দর্যের তারতম্য অনেকখানিই, এমনকি আরব রাষ্ট্রগুলোর মূল মধ্যপ্রাচ্যের নারীদের থেকেও এরা পৃথক। ইউরোপের মেয়েরা সুন্দরী বলে খ্যাত। তাঁরা সুন্দরী বটেন কিন্তু তাঁদের গায়ের রং অত বেশী সাদা হওয়ায় ইউরোপীয়দের মতেই তাঁরা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা নন। তাই তাঁরা গায়ের রং আধ ময়লা করার জন্যেই গ্রীষ্মকালে সমুদ্রের ধারে রোদ পোহান আর গায়ে ক্রীমের প্রলেপ দেন রংটা তামাটে করার জন্যে। মধ্যপ্রাচ্যের মেয়েদের গায়ের রংও ইউরোপীয়দের মতন সাদা, নয়তো সাদা-হলুদে মেশান। তাদের চেহারায় থাকে রুক্ষতা যেমন থাকে ইউরোপীয়ানদের।

মিশর এসিয় দেশ নয়, নয় ইউরোপীয়। সে হল আফ্রিকায়। কিন্তু আফ্রিকার একাংশ হয়েও মিশর সুন্দরীদের চেহারায় নেই নিগ্রোদের মতো নাক থ্যাবড়া, ঠোঁট মোটা কুশ্রী রূপ। অবশ্য মিশরের মেয়ে বলতে সবাই ডানা কাটা পরী নয়। তবে সাধারণত ওদের মেয়েদের সৌন্দর্য তারিফ পাওয়ার মত। তার প্রধান কারণ হল ওদের রয়েছে গ্রীক রোমানদের মুখাবয়ব, ধপধপে সাদা নয় গায়ের রং, তার ওপরে রয়েছে ভারতীয় নারীর কমনীয়তা। এই তিনে মিলে মিশর সুন্দরীদের গড়ে তুলেছে অপরূপ। পরিবার ও সমাজ গঠনের মূলে ভিত নারী। মিশর-এর সমাজেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ওখানেও দেখেছি মিশরের মেয়েরাই সংসার চালনার ভার নিয়েছেন। মিশরের নারীসমাজে এখন চলছে বড় রকমের পরিবর্তন। তাকে বিপ্লব না বলে বলব আন্দোলন, যেমন হয় থাকে অন্য দেশে। ওখানেও দেখলাম শহরে নারীরা অনেক বেশী প্রগতিপন্থী, গ্রামের নারীদের তুলনায়। বড় শহরে আজকাল প্রায় শতকরা নব্বইটি কুমারী কিংবা যুবতী পুরোনো আমলের পোশাক জোব্বা ছেড়ে ইউরোপীয় পোশাকে সেজেছে। শুধু সেকেলে বুড়ি আর অশিক্ষিতা অল্পশিক্ষিতা নারীরাই তাদের পুরনো পোশাক পরে কাইরোর

ইউরোপীয় পোশাকে মিশর তরুণী

রাস্তাঘাটে বেড়াচ্ছে। অন্তঃপুরে যারা থাকে তাদের মধ্যেও তাই। আধুনিকারা পোশাকে-আশাকে পুরোদস্তুর ইউরোপীয়। প্রাচীনারা পুরোনো পোশাকে আবৃত। কিন্তু গ্রামে এখনও শতকরা আশিজনই চিরাচরিত পোশাকের পক্ষপাতী। শহরের সংখ্যা যত বাড়বে ততই বাড়বে মিশরে ইউরোপীয় পোশাকের প্রাধান্য।

সবচেয়ে মজার হল এই মিশর কুমারীরা পোশাকের সাজে পুরোপুরি ইউরোপীয় হলেও, ভিতর থেকে সেই। আমি তাই জিজ্ঞাসা করি বন্ধুবর ডক্টর ফারিদকে, 'কি ব্যাপার বলত, তোমাদের মেয়েদের দেখলে কে বলবে এরা প্রাচ্যের। চলা ফেরায় দেখছি একেবারে খাঁটি মেমসাহেব।' তার উত্তরে ফারিদ জানায়, 'দেখে মনে হচ্ছে কিন্তু আলাপ করে দেখ, তাহলেই বুঝবে।'

আমি বল্লাম,—'কেন ?'

'কেন আবার, আলাপ করেই দেখ না। যেমন ইউরোপে করে থাক। এই তো এই কাফেতেই বসে আছে ক'জন। আলাপ করলেই টেরটি পাবে। এ লণ্ডন বা প্যারী পাওনি, ইংরেজ বা ফরাসী নয়। মনটা হল খাঁটি মিশরী। তোমাদের দেশের মেয়েদের মতনই, কোন বিশেষ তফাত দেখবে না।'

আমি ফারিদের কথায় ইউরোপীয় মতে যেচে আলাপ করতে গেলাম। ওরে বাবা, এযে বোবা। না, হুঁ যেন কি বলল। এই পর্যন্ত। বুঝলাম পোশাকে ইউরোপীয় হলে হবে কি, ভিতরে পুরো প্রাচ্য।

বন্ধুটি আমায় আশ্বাস দিয়ে বললেন যে, তিনি আমাকে কয়েকটি মহিলা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সাথে আলাপ করিয়ে দেবেন। তিনি প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। মিশর সুন্দরীরা বললেন যে, তারা নাকি অনেক পেছনে পড়ে আছেন। খুব বেশী দিন হয়নি তারা ইউরোপীয় পোশাক ধরেছেন। কিন্তু তাহলেও তাদের রান্নাঘর প্রতিদিনই সাফ করতে হয়। রাজনীতিতে নেই তাদের বিশেষ অধিকার। মাদাম দোরিয়া সাফিক এই নিয়ে অনেক আন্দোলন করেছেন। তিনি কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষেও এসেছিলেন। তাঁর আন্দোলনের বলেই আজ মিশর নারীরা যাহোক কিছু রাষ্ট্রিক সুবিধা পাচ্ছে।

ডক্টর ফারিদের বাড়িতে সান্ধ্যভোজন সাঙ্গ করলাম একদিন। খাবার টেবিলে ফারিদের বাবা, দাদা ও বৌদি ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করলাম ফারিদের স্ত্রী সারাক্ষণ সকলকে পরিবেশন করছেন কিন্তু তিনি নিজে ভোজন শুরু করছেন না। তাই
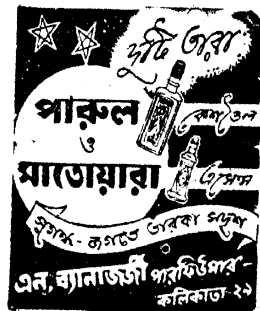
আমি জিজ্ঞাসা করলাম ফারিদকে 'কি হে, তোমার স্ত্রী আমাদের সঙ্গে খেতে বসবেন না?' তার উত্তরে ফারিদ জানায়, 'আরে ভাই ইউরোপীয় পোশাক পরলে হবে কি মনের গড়নটি তো প্রাচ্যের। বাড়িতে অতিথি এলে আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও পরিবেশন করে অথবা পরিবেশন করতে করতে নিজে আহার শুরু করে, তোমাদের দেশেও তো তাই।'

খাওয়া-দাওয়ার পর বৈঠকখানায় বসে গল্প-গুজব চলছে। আমি ঠোঁট কাটা মানুষ তাই জিজ্ঞাসা করলাম, 'মাফ করবেন, যদিও কথাটা অপ্রিয় সত্য তাহলেও না বলে থাকতে পারছি না। মিশরের সুন্দরী-দের দেখতে সত্যি সুন্দরী কিন্তু তাদের অনেকেই বেজায় মোটা। কারণটা কি বলতে পারেন?"

ফারিদের দাদা বাধা দিয়ে বললেন, 'এরা মোটা হবেন না তো কি ক্ষীণাংগী লবংগলতিকা হবেন! নিজের চোখেই তো দেখলেন মশাই আমাদের খানা। খানার বহর এখানেই শেষ নয়। তার ওপর আছে 'ফুল'। আমাদের শ্রীমতীরা সকালের জলখাবার সাংগ করবেন 'ফুল' দিয়ে। শুধু কি একটা বা দুটোতেই ফুল খাওয়া শেষ? তার সংখ্যার হিসেব নেই। অত ফুল খেলে, মোটা হবার খানা খেলে মোটা তো হবেই। তাতে আর আশ্চর্য কি।'

'ফুল' হল ভারি আটার রুটি তার ভেতরে থাকে ছোলার ডাল, মাংস, আরও নানান ধরনের তরকারি। আমার তো একটা খেলেই পেট ভরে যেতো। ওই ফুল ওরা খায় এক একজন অনেকগুলো করে। তাই মিশরের নারীরাই শুধু মোটা নয় পুরুষরাও। কেউ কেউ তো সাংঘাতিক রকমের মোটা।

আর একদিন গেলাম এক বিয়েতে। নিয়ে গিয়েছিলেন 'আল শব' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক আবদাল্লা। এ বিয়ে পুরাতন মতে নয়, আধুনিক মতে। বিবাহের পর হল প্রীতি সম্মেলন: কাইরোর প্রেস ক্লাবের বাড়িতে। পাত্র উকিল, পাত্রী সাংবাদিক। আবদাল্লা বললেন, 'দেখুন ওই মেয়েটির সঙ্গে একদিন আমারই বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হল শেষে উকিলটার সাথে। পাত্রী এককালে আমার বান্ধবী ছিলেন। কাজ করেছেন আমারই কাগজে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ে হল উকিল বাবুর সঙ্গে।' আমি বললাম, 'আফসোস হচ্ছে।' তার উত্তরে তিনি জানান যে, মনে ভাববেন না যে মিশরের সব বিয়েই বুঝি এভাবে ক্লাবেই সম্পন্ন হয়। তাদের সংখ্যা অল্প। এরা আধুনিকা তাই। প্রেম করে বিয়ে। কোর্টসীপ করে বিয়ের সংখ্যা অল্প। কারণ অনেক মেয়ের বাবা কোর্টসীপের নামে হাইকোর্টে ছোটেন মামলা রুজু করতে। গাঁয়ে বা অল্প শিক্ষিতদের মধ্যে এখনও সেই ছেলেমেয়ে বাছার ভার বাপ-মায়ের হাতে। ছেলেমেয়ের হাতে নয়। আরে মশাই গ্রাম কেন এই কাইরো শহরেই দেখবেন উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যেও বিয়ের সময়ে ছেলে ও মেয়ে বেছে দেন তাদের বাপ-মায়েরা। ছেলেদের যদিও একটু স্বাধীনতা আছে মেয়েদের তাও নেই। তবে আজ কাল মেয়েরাও আন্দোলন জুড়েছেন।'

বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি

মন্মথ ভট্ট

রোম্যাঁ গারী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ফরাসী সাহিত্যে উপন্যাস লিখে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, রোম্যাঁ গারী তাঁদের মধ্যে একজন। সার্ত্র, কামু কিংবা সাগাঁ-র মত তাঁর নাম সাগর ডিঙিয়ে আমাদের পাঠক মহলে এখনো না পৌঁছলেও নিজের দেশের সাহিত্যরসিক মহলে ইতিমধ্যেই তিনি যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছেন। ফরাসী যতই খামখেয়ালী হোক, অর্থারিটির ওপরে তাদের ভারী আস্থা। উপাধি, পুরস্কার, জ্ঞানীগুণীদের কাছ থেকে পাওয়া প্রশংসা-পত্র, এসবকে তারা খুব গুরুত্ব দেয়। ওদেশে কোনো ঔপন্যাসিকের পক্ষে সবচাইতে বড় সম্মান হল গঁকুর পুরস্কার পাওয়া। ১৯৫৬ সালে রোম্যাঁ গারীকে তাঁর "স্বর্গের শিকড়" নামে উপন্যাসের জন্যে উক্ত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

জন্মসূত্রে রাশিয়ান হলেও শিক্ষা এবং নাগরিকত্বসূত্রে গারী ফরাসী। ইউনাইটেড নেশন্স্-এ তিনি দীর্ঘকাল ধরে ফরাসী সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাঁর সমস্ত রচনার পিছনে যে জীবনদর্শন বর্তমান সেটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার মধ্যে থেকে গড়ে উঠেছে। এই যুদ্ধে তিনি তাঁর বেশীর ভাগ নিকট আত্মীয় এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুকে হারিয়েছেন। তাঁর অধিকাংশ লেখাই মানুষের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যে উপন্যাসটির জন্যে তাঁকে গঁকুর পুরস্কার দেওয়া হয় সেটির মূল বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "আমি ব্যক্তিস্বাধীনতা, পরমত-সহিষ্ণুতা এবং মানুষের অধিকারে বিশ্বাসী। অনেকের মনে হতে পারে আমার এসব বিশ্বাস নেহাৎ সেকেলে, আদিমকালের হাতীদের মত এযুগে একেবারেই অচল। তাঁদের মতে আমার মানবতন্ত্রী প্রত্যয় প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্মারক মাত্র। আমি নিজে একথা মানতে গররাজী।"

হাতীর উপমা গারী এ প্রসঙ্গে খুব সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন। তাঁর "স্বর্গের শিকড়" উপন্যাসের নায়ক মোরেল হাতী-শিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যুদ্ধোত্তর পশ্চিমের জাগ্রত বিবেককে বাঁচাতে চেয়েছিল। হাতী-শিকারের সঙ্গে বিবেকের কি সম্বন্ধ? যাঁরা জর্জ অরওয়েল-এর 'হাতী শিকার' নামে বিখ্যাত প্রবন্ধটি পড়েছেন তাঁদের কাছে বোধ হয় এ সম্বন্ধের কল্পনা ফরাসী রসিকতা বলে ঠেকবে না। মোরেলের চোখে হাতী স্বাধীনতার প্রতীক; বছর বছর যে সুসভ্য শিকারীর দল বনেজঙ্গলে এই হাতীদের শিকার করে ফেরে, তারা শুধু এই আশ্চর্য-রকমের স্নেহশীল, অভিজাত অথচ সেকেলে জীবদেরই যন্ত্রণা দেয় না, সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের মধ্যে যেটুকু মনুষ্যত্ব জন্মসূত্রে তারা লাভ করেছিল, তারও উচ্ছেদ ঘটায়। এই মনুষ্যত্বকেই গারী বলেছেন, "স্বর্গের শিকড়"। গারীর মতে পশ্চিমী সভ্যতা ক্ষমতার সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করে ক্রমেই হৃদয়হীন এবং নির্বিবেক হয়ে উঠছে। যে দেশের মানুষ এতই নিষ্ঠুর যে, চিড়িয়া-খানা সাজানোর জন্যে কিম্বা হাতীর দাঁতের লোভে প্রতি বছর তিরিশ হাজার হাতী খুন করতে তাদের বাধে না, সেখানে যে এক পুরুষের মধ্যে দুটো মহাযুদ্ধ ঘটবে, নাটসীদের মত বর্বরজনেরা সভ্যতার ভাগ্য-বিধাতা হয়ে উঠবে, লক্ষ লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে বন্দী হয়ে প্রাণ হারাবে অথবা বিকলাঙ্গ হবে, এ আর বিচিত্র কি?

গারীর নায়ক মোরেল ফরাসী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বছরগুলো তার কেটেছিল বন্দী অবস্থায় বিভিন্ন জার্মান কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে। "স্বর্গের শিকড়" শুকিয়ে গেলে মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় অন্য অসহায় মানুষদের ওপরে কতদূর নির্মম অত্যাচার করতে পারে, নিজের অভিজ্ঞতার দামে তা সে জেনেছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে সে তাই তার জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্য ঠিক করে নেয়: যা কিছু মনুষ্যত্বকে বিকৃত করে তারি বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম করবে। এই সময়ে আফ্রিকার জঙ্গলে সুসভ্য ইয়োরোপীয়ানদের বাৎসরিক শিকার-উৎসব ব্যাপারটা তার নজরে পড়ে। সে তখন ঠিক করে যে, হাতী শিকারের বিরুদ্ধে সে তার প্রথম জেহাদ শুরু করবে। কিন্তু এ বিষয়ে একটা আবেদন লিখে পরিচিতজনদের কাছে স্বাক্ষর চাইতে গিয়ে সে আবিষ্কার করল যে, এ ব্যাপারে তাদের শুধু যে কোন মাথাব্যথা নেই তাই নয়, এ নিয়ে মাথা ঘামানো তাদের চোখে পাগলামি। শুধু একটি মেয়ে তার এই আবেদনে সই করে। মেয়েটি জার্মান, নাম মীনা। তার যখন সতের বছর বয়েস, তখন বার্লিন-বিজয়ী রুশপুঙ্গবরা তাকে বলাৎকার করে তার দেহেমনে নিজেদের বীর্যবত্তার স্বাক্ষর রেখে যায়। তারপর তার স্বদেশ-বাসী জার্মানরা রক্ষণাবেক্ষণের অছিলায় তাকে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করে। মোরেলের মত মীনাও তিক্ততম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পশ্চিমী সভ্যতাকে চিনেছে। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও দুজনের মনে "স্বর্গের শিকড়" শুকিয়ে যায়নি। পৃথিবীতে যা কিছু সহজ, সুন্দর, প্রাণবান, মুক্তিকামী, তার প্রতি তাদের আনুগত্য কোন চতুর শুভ-মস্তিষ্কের প্রভাব নষ্ট করতে পারেনি। তার প্রতি তাদের সহজ মমতা।

হাতীদের স্বাধীনভাবে বাঁচবার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মোরেলকে আফ্রিকার শ্বেতকায় প্রভুদের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হল। কিন্তু একধারে বিরাট সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি, আর অন্যধারে সে একা। অন্য উপায় না দেখে সে বেছে নিল ব্যক্তিগত প্রতিশোধের পথ; বনজঙ্গলে লুকিয়ে থেকে সে একটি একটি করে হাতী-শিকারীকে হত্যার চেষ্টা করতে লাগল। এ যেন আফ্রিকার এক নব্য রবিন-হুড। কিন্তু গারী বিবেকী ঔপন্যাসিক। রবিনহুডদের যে এ-যুগে শেষ পর্যন্ত জয়ী হবার কোন আশা নেই, তা তিনি ভাল করেই জানেন। তাদের বিবেকের পুরস্কার অলঙ্ঘ্য নিঃসঙ্গতা, ব্যর্থতা এবং গৌরবহীন মৃত্যু। হাতীদের হয়ে লড়তে গিয়ে মোরেল তাদেরই মত অসহায় আফ্রিকানদের সঙ্গে পরিচিত হল; ক্রমে তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে সেও জড়িয়ে

জয় জগন্নাথ!
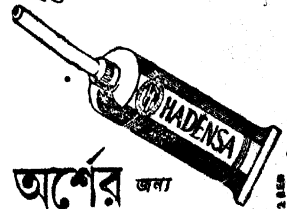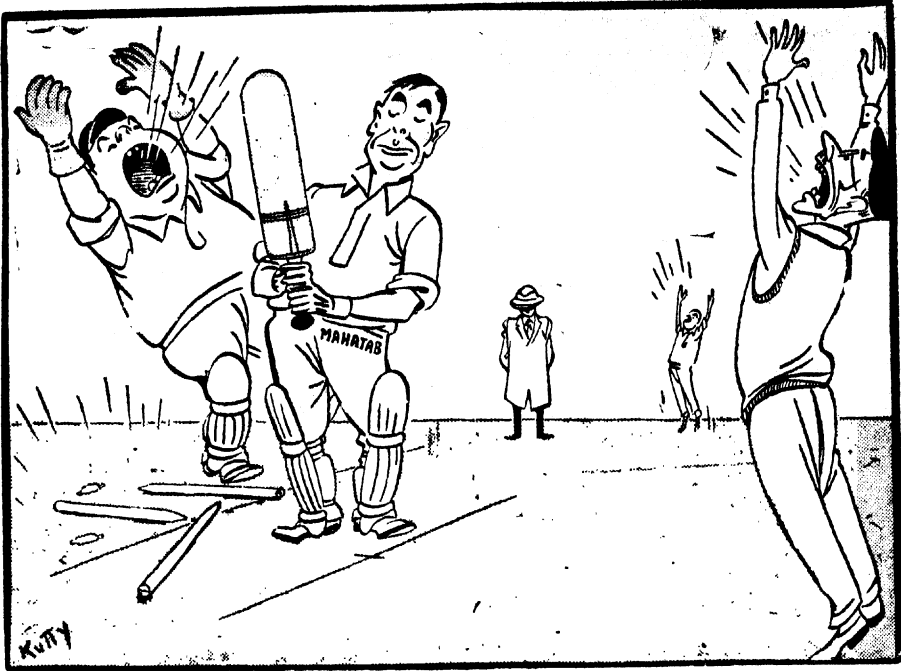
উড়িষ্যা বিধান-সভায় সম্প্রতি সামান্য কয়েক ভোটে সরকার পক্ষের পরাজয় ঘটিয়াছে

পড়ল। এর পর সভ্য পশ্চিমীদের কাছে আর তার ক্ষমা নেই; শ্বেতকায় প্রভুদের মতে সে শুধু সমাজদ্রোহী নয়, সে মানব-জাতির একজন পয়লা নম্বর শত্রু। অথচ হাতীদের হয়ে লড়তে গিয়ে মোরেলের মনে কোন দ্বন্দ্ব দেখা দেয়নি; কিন্তু আফ্রিকান-দের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর পর গভীর বেদনার সঙ্গে সে ধীরে ধীরে আবিষ্কার করল পশ্চিমের ক্ষমতামত্ত নিষ্ঠুরতার ব্যাধি এই আদিম মানুষদের অস্তিত্বেও সংক্রমিত হয়েছে। তার বন্ধু আফ্রিকান জাতীয়তা-বাদীদের মনেও "স্বর্গের শিকড়" খুব আর তাজা নেই। সাম্রাজ্যবাদ এবং তার প্রতি-ক্রিয়ার জাতীয়তাবাদ একই বিকৃতির দুই রূপ। শেষ পর্যন্ত রহস্যজনকভাবে মোরেলের মৃত্যু ঘটে।

গঁকুর পুরস্কার পাওয়া উপন্যাসটির কাহিনী সংক্ষেপে এই। "ঘরে-বাইরে"র টেকনিকে কাহিনীটি কয়েকটি চরিত্রের মুখ দিয়ে উত্তমপুরুষে বলানো হয়েছে। উপন্যাসে যাঁরা ঠাসবুনুনী গল্প খোঁজেন, তাঁদের প্রত্যাশা এ বইটি থেকে মিটবে না। ছোটখাট অনেক স্থানীয় চরিত্রের অবতারণা হলেও খোদ নায়কের চরিত্র অনেকটা ঝাপসা রয়ে গেছে। ঘটনার বিন্যাস সুসংলগ্ন নয়; বাক্যের গঠন কখনো অত্যন্ত পেঁচানো, কখনো ভাঙগাচোরা, অবিন্যস্ত। অথচ বইটা অন্তত আমার মনে গভীর দাগ ফেলেছে। এর একটা কারণ হয়ত গারীর চিত্রবহুল কল্পনা। এর অন্য কারণ সম্প্রতি গারীর মানবতন্ত্রী প্রত্যয়। আধুনিক লেখকরা, বিশেষ করে ফরাসী লেখকরা, কোন আদর্শ-বাদী মানুষকে বড় একটা তাঁদের উপন্যাসের নায়ক করেন না। তাঁদের প্রধান চরিত্রেরা চতুর, আত্মসচেতন এবং অভিলাষিক। গারীর নায়ক এদের ব্যতিক্রম।

কিন্তু এগুলোও আসল কারণ নয়। আসল কারণ হল গারী এই উপন্যাসে মানব-অস্তিত্বের একটি নিত্যকালীন সমস্যাকে কাহিনীর কেন্দ্রে উপস্থাপিত করেছেন এবং সেই সমস্যার চেতনা—যে-গভীর আবেগের জন্ম দেয়, নানা ছবি ঘটনা কথাবার্তা এবং চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সেই আবেগকে তিনি পাঠক-মনে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। সার্থক সাহিত্য সৃষ্টির এটিই বোধ হয় অন্যতম প্রধান লক্ষণ। মানুষের একটা চিরন্তন সমস্যা হল, মানুষ আদর্শের অনুসরণ করতে গিয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই আদর্শ-বিরোধী উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। মোরেল মানুষের হৃদয়-হীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল; সেই সংগ্রাম তাকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গেল গুপ্ত-হত্যার পথে। এই তার চরম ব্যর্থতা। এই জাতীয় ব্যর্থতার হাত থেকে মানুষ কোনও দিনই মুক্ত হবে কিনা জানা নেই। কিন্তু এই ব্যর্থতার বেদনার সঙ্গে পরিচয় আমাদের মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রায় অপরিহার্য। গারীর উপন্যাসটি মুখ্যত সেই কারণেই আমাদের মনে দাগ কাটে।

কিছুকাল হল ইংরেজিতে এই উপন্যাসটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।* ইংরেজি সংস্করণের জন্যে লেখক মূল রচনায় কিছু কাটছাঁট রদবদল করে দিয়েছেন। বাঙালী সাহিত্য-রসিক পাঠক-দের বইটি পড়ে দেখতে বলি। কোন উৎসাহী যদি তর্জমা করেন, তাহলে আরো ভালো।

---

* Romain Gary, **The Roots of Heaven,** translated by J. Griffin. Simon & Sehuster.

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

অতুলপ্রসাদের গান

গানের ব্যাপারে বৈশিষ্ট্যের মূল্য সবচেয়ে বেশি। এই বৈশিষ্ট্যের জন্যই রবীন্দ্র-সংগীত সম্বন্ধে আমাদের সাবধানতার শৈথিল্য নেই। যাঁরা রবীন্দ্রসংগীতে তান-বিস্তার করে থাকেন তাঁদের সম্বন্ধে আমরা কঠোর সমালোচনা করেছি, কেননা তাঁরা রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করেছেন। অনুরূপভাবে অপরাপর সংগীতের ক্ষেত্রেও যদি সুরকারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শিল্পীরা সচেতন না হন, তাহলে তাঁদের সম্বন্ধেও নীরব থাকা যায় না,—বিশেষ করে অতুল-প্রসাদের গানেই যখন এই ত্রুটি নানাভাবে দেখা দিতে আরম্ভ করেছে।

অতুলপ্রসাদের গান আজকাল রেডিওতে নিয়মিতভাবে শোনা যায় এবং গ্রামোফোন রেকর্ডেও কিছু কিছু শোনা যাচ্ছে। কিছু-কাল ধরে এই গানগুলি শুনে আমাদের ধারণা হয়েছে যে, অতুলপ্রসাদ এক দোটানায় পড়ে স্বীয় বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছেন। এই দোটানার একটি টান আসছে রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশকদের কাছ থেকে আর একটি আসছে আধুনিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। অতুলপ্রসাদের গান যাঁরা গাইছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রধানত রবীন্দ্র-সংগীত গেয়ে থাকেন। এঁদের কণ্ঠে যখনই অতুলপ্রসাদের গান শুনি, তখন রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য খুঁজে পাই না এবং এটাও লক্ষ্য করেছি যে, সচরাচর অতুলপ্রসাদের যেসব গানে রবীন্দ্রনাথের গানের ছায়া পড়েছে, সেগুলিই তাঁরা বিশেষভাবে বেছে নেন। অতুলপ্রসাদের ওপর রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট প্রভাব ছিল এটা সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় সব গানেই অতুলপ্রসাদের একটা নিজস্ব স্টাইল বর্তমান—এটা বলাই বাহুল্য। অতুলপ্রসাদের সেই স্বকীয়তার সম্পূর্ণ বিলোপসাধন করে তাঁকে একান্তভাবেই রবীন্দ্রনাথের অনুবর্তী করে দেখালে কবির প্রতি অতিশয় অবিচার করা হয়।

একদা আধুনিক সংগীতে অভ্যস্ত বেতার-শিল্পীদের কণ্ঠে রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্যও আধুনিক স্তরে সজ্জিত হতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু ব্যাধিটা সংক্রামক হবার আগেই কলকাতার সুজনবৃন্দ একাধিক রবীন্দ্র-সংগীতের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথের গৌরব বজায় রাখতে পেরেছেন। আমরা তখন সবিনয়ে সংগীতের দিক থেকে শিক্ষার পরিধি একটু বাড়াবার প্রস্তাব করেছিলুম, কেননা আমাদের এই ভয়টা বরাবরই ছিল যে, বিকৃতি যদি ঘটে, তবে সেটা কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সংগীতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। কিন্তু তার সার্থকতা এবং আবশ্যকতা যাঁদের বোঝবার কথা তাঁরা তা বোঝেন নি। আজ সেটা বোঝবার সময় এসেছে; কেননা সেই সব প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত শিল্পীরাও যে অবিকৃতভাবে অথবা বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রেখে অতুলপ্রসাদের গান প্রচার করছেন এমন নয়। এমনটা হতে পারত না, যদি বাঙলা গানের বিবিধ সুরকারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে এড়িয়ে গিয়ে তাঁরা কেবলমাত্র রবীন্দ্র-সংগীতের বৈশিষ্ট্যের সংগে পরিচিত না হতেন।

রেডিওতে যখন অতুলপ্রসাদের গান শুনি, তখন অনেক সময় বুঝতে পারি গানটি স্বরলিপি থেকে তোলা হয়েছে। অতুল-প্রসাদের গীতরীতির সংগে পরিচয় না ঘটায় এঁদের কণ্ঠে "ঝরিছে ঝর ঝর," "বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা", "কেন এলে মোর ঘরে" এমন কি "চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে"র মত গান পর্যন্ত অতুলপ্রসাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। অতএব স্বরলিপি থেকে গান তোলবার আগে সুরকারের সংগে পরিচয়টা নিবিড় হওয়া দরকার।

অপরপক্ষে অতুলপ্রসাদের গানকে আধুনিকের পর্যায়ে এনে ফেলতে পারলে অনেকের সুবিধা হয় বটে, কিন্তু সে কাজটা আরও পরিতাপজনক। এ বিষয়ে এ পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ না ওঠাতে আধুনিক দলপুষ্ট কয়েক ব্যক্তি অতুলপ্রসাদের গানের ওপর বেশ ভারি রকমের কর্তৃত্ব ফলাতে আরম্ভ করেছেন। কেমন করে যে তাঁরা অতুলপ্রসাদের গানের বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন জানি না; কিন্তু সেটা তাঁরা সব কিছু শাসনের ঊর্ধ্বে উঠেই প্রমাণ করছেন। অতুলপ্রসাদের গানে নাকি শিল্পীর নিজস্ব সৃষ্টির অবকাশ আছে;—অতএব নিজস্ব সৃষ্টি এমনি জোরালোভাবে অগ্রসর হচ্ছে যে, আসলের আর প্রায় কিছুই থাকছে না। অতুলপ্রসাদের ভাষার ওপর সুরের যে নানা-রকম ইমারত উঠতে দেখা যাচ্ছে, সেসব যে এই আধুনিক বিশ্বকর্মাদের কীর্তি, তা বিশেষজ্ঞদের বুঝতে দেরি হয় না; কিন্তু তাঁদের গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রীদের অটল

বিশ্বাসকে টলানো শক্ত। যাচাই করে দেখার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা বোধও করেন না, কেননা রেডিও তো বটেই, এমন কি গ্রামোফোন কোম্পানির কালো চাকতিতেও তাঁরা এই পরম গৌরবের স্বাক্ষর রেখে যেতে পারছেন।

বিবিধ নতুনত্বের মধ্যে আর একটি আদুরে মাখা মাখা ভাবের গায়কীও দেখা যাচ্ছে আজকাল। এটি সম্ভবত আভিজাত্যের পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের গানেও এক ধরনের স্নবদের মধ্যে এইভাবে চলে এসেছে এবং এখনো চলে। আসলে এই ন্যাকা ঢংটা একটি সম্প্রদায়ের পোশাকী স্টাইল—ওটা ওঁরা যখন ছাড়তে পারবেন না, তখন ওই ভঙ্গসর্বস্ব আভিজাত্য ওঁদের মধ্যেই বজায় থাকুক, অন্যান্য গায়ক-গায়িকার মধ্যে ওই বস্তুটির প্রচলন না হওয়াই ভাল। অতুলপ্রসাদের গলায় কোনরকম জড়িমার প্রশ্রয় ছিল না—বলিষ্ঠ জোরালো কণ্ঠে গাইতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। তাঁর জীবৎকালেই হরিপদ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, হরেন চট্টোপাধ্যায় তাঁর গান রেকর্ড করেছেন। স্বাভাবিক স্পষ্ট ঢঙেই গেয়েছেন তাঁরা এবং সেসব গানের আদরও হয়েছে। উচ্ছ্বাস বা আকুতির প্রকাশ এই কৃত্রিম নিয়মে নিয়ন্ত্রিত না হওয়াই ভাল।

শিল্পীদের মনে রাখতে বলি যে, আজ আকাশবাণীর প্রোগ্রামে অতুলপ্রসাদের গানের যে প্রাধান্যটুকু দেওয়া হয়েছে, সেটুকুও দাবি করে অর্জন করতে হয়েছে, সেটুকুও অতুলপ্রসাদের গানের প্রবর্তনে বেতার কর্তৃপক্ষের যে খুব আগ্রহ ছিল, এমন নয়। এক সময় এ বিষয়ে অনেক লেখালেখি করতে হয়েছে এবং বেতার-জগতের পাতায় চিঠি-পত্রও বড় কম বেরোয় নি। তখন যাঁরা এ নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের আশা ছিল বিভিন্ন সুরকারের গান বেতারে প্রচারিত হবার সুযোগ থাকলে গায়ক-গায়িকারা বাঙলা গানকে সমগ্রভাবে জানতে সচেষ্ট হবেন—প্রতিটি সুরকারের বিশেষত্বের সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ তাঁদের মনে জাগবে, কিন্তু শিল্পীরা সে আশা পূর্ণ করেন নি। সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় আজও পাওয়া গেল না। কয়েকটা বিশেষ গান খুব যত্নশীলভাবে শিখে সেগুলিরই পুনরাবৃত্তি করে যদি কণ্ঠটি বজায় রাখাটাই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আমাদের কথা বলাটাই মিথ্যা।

শিল্পীদের কাছ থেকে এই আগ্রহের পরিচয় যদি পাওয়া যেত, তাহলে আমরা বেতার কর্তৃপক্ষকে বলতাম যে, উনবিংশ শতাব্দীর "ওল্ড মাস্টার্স"দের সঙ্গে তাঁরা শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দিন। বেতার-কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত বাঙলা গানকে বিচ্ছিন্ন-ভাবেই দেখে এসেছেন। তাঁদের প্রোগ্রাম অধিকতর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক হত, যদি তাতে বাঙলা গান কিভাবে স্তরে স্তরে বিকশিত হয়ে উঠেছে, সেটি এক একটি সুরকারকে কেন্দ্র করে আলোচনাসহযোগে এবং গানের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেবার প্রচেষ্টা থাকত। বাঙলার সঙ্গীত-সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করবার পরিকল্পনাও তাঁরা করেন নি। কিন্তু এই অনুরোধ করতে ভয় পাই, কেননা আমাদের শিল্পীরা যদি সুরকারগণের বৈশিষ্ট্যই রক্ষা না করতে পারেন, তাহলে সেই বিকৃতির চেয়ে স্বল্পের মধ্যে সুরকারগণের সসম্মানে অবস্থান অনেকগুণে শ্রেয়।

ম রা গা ছ

দুর্গাদাস সরকার
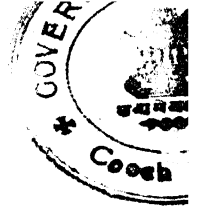
নগর-প্রান্তে গাছটাকে দ্যাখো। দাঁড়িয়ে একা।
বন্ধ্যা ভূমিতে শুষ্ক কাণ্ড পত্রবিহীন দু'হাত তুলে
কাকে সে ডাকছে সুনীল আকাশে? আলোর রেখা
নিয়ে তার বুকে আগুনে পুড়েছে; আমরা সবাই গেছি তা
ভুলে।

ধব্‌ধবে সাদা নদীর ওপরে কাঠের ব্রীজ।
বছর বছর ভাঙা বুকে রাখা হাজার লোকের পায়ের দাগ,
ভাবেনি, হঠাৎ কালের খাতায় হবে খারিজ।
গরম বালিতে পড়ে আছে ভাঙা সরু ডিঙিটার একটা
ভাগ।

সেই পথ ঠিক তেমনিই আছে। বালির স্তূপ
পায়ে ভেঙে যদি কাছে যায় কেউ কোনোদিন বুড়ো
সে-গাছটার,
দেখবে, কেমন সাদা স্তব্ধতা হয়েছে চুপ।
পাশেই আরেক গ্রহের কথায় টেলিগ্রাফের মুখর তার

ওই গাছ কেন পায়না দেখতে শহুরে ঢং,
সকালের পাখি রাতে থাকে না পাখিনীকে ডেকে
শুকনো ডালে,
বিকালের রোদ কেন তবু তাকে মাথায় রঙ:
গাছটা মরেছে। কেননা পারেনি নাচতে নতুন নৃত্যতালে।

ঘ নি ষ্ঠ

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

আরেকটু তফাতে হাঁটো, দুই পা আগে অথবা পশ্চাতে
ওরা দেখলে বলবে, ওই, প্রেম করছে যুবক-যুবতী,
এবং শ্লেষ্মার মত এক ঝলক পীতাভ ধিক্কার
ফুটপাথে ছিটিয়ে অমনি গলিতে সটকাবে, ক্ষিপ্রগতি।
পাশ কাটিয়ে সরে গেল সহৃদয় বন্ধুদের কেউ?
ও কি গিয়ে গল্প করবে? কী লজ্জা, যদি ও ভেবে থাকে
রমণীবিদ্বেষী লোকটা ডুবেছে নয়ননীল জলে:
একটু ব্যবধান রাখো, যেন তুমি চেনোনা আমাকে।

কার বাড়ি শাঁখ বাজছে? সন্ধ্যা এলো; তবে অন্ধকার
শ্যামল বরাঙ্গে লোভী লাঙ্গুল জড়াবে, দিনে দিনে
তোমার গ্রীবার পাশে জেগে উঠবে করুণ ত্রিবলী?
তার চেয়ে চল কোনো রেস্তোরাঁর উজ্জ্বল কেবিনে,

দেখ, দুটি পোষা বিড়ালের মত ঘনিষ্ঠ পেয়ালা; মনে হয়
এই পৃথিবীতে আমরা দুজন দুজন করে ভূমিষ্ঠ হলাম,
একজীবন দুঃখ দিয়ে পরস্পর পেয়ে গেছি একান্ত আশ্রয়
বাহিরে যাবো না, হয়ত লোলজিহ্ব জরজগৎ জেনে গেছে
আমাদের নাম॥

পুস্তক পরিচয়

উপন্যাস

ঝাপতাল—লীলা মজুমদার। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মূল্য দু' টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত লেখিকার একখানি গার্হস্থ্য উপন্যাস। বাস্তব জীবনের পটভূমিকায় চিত্রিত এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি চরিত্র লেখিকার সুনিপুণ তুলিকা সম্পাতে যেন জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলি অলিমাসিমা, কেয়া, আনন্দ, নেপু ও অলক লেখিকার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দক্ষতা ও জীবন মাধুর্যের পরিচয় বহন করে। পরাম্রপৃষ্ট কেয়া এবং অলিমাসিমার চরিত্র গ্রন্থখানির বিশেষ আকর্ষণ। অলিমাসিমা নিজস্ব একখানা ছোট বসত-বাড়ি নির্মাণের আশায় সুদীর্ঘকাল ধরিয়া অল্পে অল্পে যে কয়েক হাজার টাকা জমা করিয়াছিলেন, জীবনের সায়াহ্নে আকস্মিকভাবে তাঁহার আপন ভ্রাতুষ্পুত্র অলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং পরিচয়ের ফলে তাঁহার সেই আশা শূন্যে মিলাইয়া গেল। আসন্ন বিপদ হইতে অলককে উদ্ধার করিবার জন্য অলিমাসিমা বিনা দ্বিধায় তাঁহার কষ্ট-সঞ্চিত সাত হাজার টাকা অলকের অজ্ঞাতে অলকের সহকর্মী কেয়ার হাতে সমর্পণ করিয়া সকল দুর্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। স্বচ্ছন্দ এবং সাবলীল ভাষার মাধ্যমে গ্রন্থখানি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট প্রশংসার্হ। ৬৩০।৫৮

তিন চরিত্র—সঞ্জয় ভট্টাচার্য। সবিতা প্রকাশ ভবন, ১৭এ, মনোহরপুকুর রোড (দ্বিতল) কলকাতা-২৬ থেকে প্রকাশিত। মূল্য—তিন টাকা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর সৃষ্টিধর্মী উৎসাহে আমাদের বিস্মিত করে চলেছেন। তাঁর কল্পনায় ক্লান্তি নেই, শিল্প-বাহনেও সেই ক্লান্তিহীন বৈচিত্র্য। 'তিন চরিত্র' সেই সৃষ্টি ধর্মের উল্লেখ্য সংযোজন।

প্রচলিত অর্থে 'তিন চরিত্র' উপন্যাস নয়। আবার অধুনা-ব্যবহৃত অর্থে এটিকে 'কাব্যোপন্যাস' বললেও সমীচীন হবে না। কিন্তু 'তিন চরিত্র' একজন কবির লেখা একটি উপন্যাস, একথা বললে যথার্থ নির্ণয় হতে পারে। কবিত্বের ভাবলোক ও কথাশিল্পের বস্তুলোক এখানে মিলিত হয়েছে। একজন লেখকের শিল্পী-মানসের ঊর্দ্ধতন যে সমসাময়িক বস্তুজগত থেকে একেবারে নির্লিপ্ত নয়, সেই জগতের সঙ্গে সান্নিধ্যের কোনো-না-কোনো পরিচয় যে তাঁর রচনায় অঙ্কিত হবার অভিপ্রায়ে উন্মুখ, তারি বিচ্ছুরণ এই উপন্যাসটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। সংলাপ ও বর্ণনার নৈপুণ্যে 'তিন চরিত্র' সুচিহ্নিত। সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যে এই রচনা একটি স্মরণযোগ্য যোজনা। তরুণশিল্পী মনোজ চক্রবর্তীর প্রচ্ছদচিত্রণ অপূর্ব। প্রচ্ছদের ব্যঞ্জনা বইটির পূর্বাভাস বহন করছে। (৪০২।৫৮)

রাত্রি আমার সাক্ষী—শ্রীনীরেন বসু। প্রকাশক রমা বসু, ৭৩।এ, আমহার্স্ট রো, কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

অপমৃত্যুর পরে প্রেতযোনী প্রাপ্ত উল্লাসী ও জোনাকী নামক দুইজন গৃহস্থ বধূর ভৌতিক ক্রিয়া-কলাপের কাহিনী বর্তমান গ্রন্থের উপজীব্য। উপন্যাসাকারে বিবৃত আখ্যায়িকা প্রকৃত প্রস্তাবে ভৌতিক গল্পেরই নামান্তর। গল্পের বিষয়বস্তু সত্যই রোমাঞ্চকর। কাহিনী বিন্যাসে লেখকের পটুত্ব প্রচুর। সহজ সরস এবং সাবলীল ভাষায় লিখিত গ্রন্থখানি এক শ্রেণীর পাঠকের ভাল লাগিতে পারে। পরিশেষে অত্যন্ত দুঃখের সহিত আলোচ্য গ্রন্থের কর্ণ-

দৃষ্টির প্রতি গ্রন্থাকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইলাম। ৪৭।৫৭

গৃহ মুক্তি—শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীসত্যচরণ নাথ, ২।৩, হরিনাথ দে রোড, কলিকাতা-৯। মূল্য তিন টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থ লেখকের একখানি বাস্তবধর্মী গার্হস্থ্য উপন্যাস। উল্লেখযোগ্য চরিত্র—স্বামী ইন্দ্রজিত ও তাহার স্ত্রী তরুলতার জীবনালেখ্য পাঠককে আকর্ষণ করে। দম্পতি যুগলের চরিত্র পরস্পর বিপরীত ধর্মী। উদার প্রকৃতি ইন্দ্রজিতের চরিত্র ত্যাগ, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি সৎগুণে ভূষিত। তরুলতার চরিত্র স্বার্থ বিজড়িত। গ্রন্থের প্রত্যেকটি চরিত্রই বাস্তবানুগ। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখকের চেষ্টা প্রায়শই আছে। নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ইন্দ্রজিৎ-চরিত্রের অম্লান মহত্ত্বের বিকাশ গ্রন্থখানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থখানি পাঠক মহলের প্রশংসা অর্জন করিতে পারিবে বলিয়া আশা করি। প্রচ্ছদপট, মুদ্রণ এবং বাঁধাই মোটেই উল্লেখযোগ্য নহে। ৫৬৭।৫৬

ছোট গল্প

চৈত্রদিন : ননী ভৌমিক : প্রকাশক—ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলি-১২। দাম—চার টাকা।

দশটি গল্পের শেষ গল্পটি 'চৈত্রদিন'। লেখক প্রতিষ্ঠাবান। নতুন ক'রে পরিচয় দেবার দরকার নেই। গল্পগুলি দীর্ঘসময়ের মধ্যে নানা পত্র-পত্রিকায় ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য বইটি সেই গল্পগুলির সংকলন।

প্রত্যেকটি গল্পের একটি বিশেষ রাজনৈতিক পটভূমি আছে। লেখক ভূমিকায় কৈফিয়ত দিয়েছেন এ সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থন ক'রে। অবশ্য, এ বিষয়ে আমাদের কোনো শুচিবাতিক নেই। রাজনৈতিক গন্ধ থাকলেই গল্প-উপন্যাস মাটি হয়ে যায়, এ আমরা বিশ্বাস করি না। তবে সাহিত্যকর্মে রাজনীতির দাপট যদি সাহিত্যকে খর্ব করে তাহলেই আপত্তিকর হয় নিশ্চয়। যাই হোক, রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে ননী ভৌমিক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এবং আশার কথা, লেখক তাঁর অভিজ্ঞতাকে সার্থক শিল্পবস্তুতে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছেন। ননীবাবু যেন সমাজের বাস্তব প্রবাহের ওপর চোখ পেতে বসে আছেন। যেমনই সেই বিচিত্র প্রবাহে নাটকীয় ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়, অমনি তাকে আটকে ফেলেন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার একটি চিরন্তন মুহূর্তে। সেই কারণে শুধু ঘটনা তাঁর গল্পে অবশ্যম্ভাবীরূপে অত্যাবশ্যক নয় সর্বক্ষেত্রে। একটি চাহনি, একটু কথা বা একটি ভঙ্গী সমগ্র গল্পটিকে তাৎপর্যে জীবন্ত করে তোলে। নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে 'চেনা অচেনা' গল্পটির। গল্পের নায়ক অল্প শিক্ষিত প্রৌঢ় কৃষককর্মী অনন্তদা গাঁ ছেড়ে বড়ো বেশি বাইরে যাননি। সেই তাঁকে একবার যেতে হ'ল দক্ষিণ ভারতের এক জনপদে কৃষক সম্মেলনে। সেখানে এক পুত্রশোকাতুর বুড়িকে সান্ত্বনা দিলেন তিনি। কেউ কারুর ভাষা বোঝেন না। একজনের ভাষা বাংলা, আর একজনের তামিল। কিন্তু বেদনা ও সমবেদনার ভাষা এক। পরস্পরকে বুঝতে অসুবিধা হল না একটুকু। এই গল্পটি বর্তমান সমালোচকের মতে এই

সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প। প্লটের ভিতর কোনো স্টান্ট নেই, কেবল শেষ অংশে গভীর মানবিকতরা উজ্জীবনে গল্পটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

দ্বিধাহীনচিত্তে এই সংকলনের বহুল প্রচার কামনা করি। কিন্তু প্রকাশকদের সম্বন্ধে না বলে পারছি না যে তাঁরা বড় বেশি দাম হেঁকেছেন। প্রায় দেড়শো পৃষ্ঠা বইয়ের দাম চার টাকা! অবাক কাণ্ড! (৫৫৮।৫৮)

ছোটদের নাটক সংকলন

ছোটদের রঙমহল—সম্পাদক ঃ সুনীল দত্ত ও শ্যামাপ্রসাদ সরকার। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। মূল্য ৩·৫০ নঃ পঃ।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়-কলার দিকে উৎসাহিত করলে এবং এ বিষয়ে শিক্ষা দিলে ভবিষ্যৎ জীবনে তারা শুদ্ধভাবে মাতৃভাষা বলতে শিখবে, দেহমনের জড়তা কাটিয়ে মুখচোরা অপ্রতিভ ছেলেমেয়েরা সপ্রতিভ হ'য়ে সমাজে চলাফেরা করতে পারবে এবং এর ফলে ভবিষ্যতে নেতা ও বক্তার সৃষ্টি হবে—এই দৃষ্টিকোণ থেকে সংকলিত ছোটদের রঙমহল এক নতুন মূল্যবান এবং স্মরণীয় প্রচেষ্টা।

ছোটদের অভিনয়োপযোগী বাইশটি ছোট নাটক এ গ্রন্থে সংকলিত হ'য়েছে। রবীন্দ্রনাথ, যোগীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় থেকে শুরু করে অন্নদাশঙ্কর, নজরুল, সুনির্মল বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মন্মথ রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি বরণীয় কবি ও লেখকদের রচনা থেকে এই নাটকগুলি নির্বাচিত। বলা বাহুল্য এই ধরনের ছোটদের নাট্যসংকলনের প্রচেষ্টা আমাদের দেশে প্রথম। নাটকের মাধ্যমে ছোটদের সুস্থ চিন্তাধারার বিকাশ ঘটানোর দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখে—সামাজিক, ঐতিহাসিক, রূপক, বাস্তববাদী এবং ব্যঙ্গ, হাসির নাটক এ গ্রন্থে সংকলন করা হ'য়েছে। এই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষামূলক নাটকের সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সম্পাদকদ্বয় ধন্যবাদার্হ।

আমাদের দেশের বিদ্যালয়গুলিতে ছোটদের অভিনয় শিক্ষার ব্যবস্থা নেই আপাতত, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অভিনয় শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। এবং তখন এই ধরনের নাট্য সংকলনের অভাব যাতে না হয় তার জন্য এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। ছোটদের রঙমহল সেই প্রস্তুতির প্রথম এবং সার্থক প্রচেষ্টা। ৪০।৫৯

বিজ্ঞপ্তি দেশ

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক

২৪ পরগণা জেলার অধীন দমদম পোস্ট অফিসের অন্তর্গত বাগুইআটি গ্রামের বাসিন্দা ভারতীয় নাগরিক শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

প্লট নং ৬ সি আই টি স্কীম নং ৫১ কলিকাতা-৫ এর বাসিন্দা ভারতীয় নাগরিক শ্রীঅশোককুমার সরকার কর্তৃক সম্পাদিত।

শতকরা এক ভাগ বা তাহার বেশী সংখ্যক অংশের মালিকগণ ঃ—

সুরেশচন্দ্র মজুমদার (মৃত) প্লট নং ৬ সি আই টি স্কীম নং ৫১, কলিকাতা-৫।

অশোককুমার সরকার প্লট নং ৬ সি আই টি স্কীম নং ৫১, কলিকাতা-৫।

নির্ঝরিণী সরকার প্লট নং ৬ সি আই টি, স্কীম নং ৫১, কলিকাতা-৫।

আমি শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

স্বাক্ষর
প্রকাশক শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়
তারিখ—১।৩।৫৯

প্রেম ও প্রয়োজনের দ্বন্দ্ব

মানুষের মন আসলে যে ঠিক কি চায় তা সে নিজেই জানে না। আবার কারোর জীবনে পাওয়ার মুহূর্ত আসবার আগেই হয়তো হারিয়ে যায় তার চাওয়ার বস্তুটি। মানুষের জীবনের চাওয়া ও পাওয়ার এমনি এক জটিল নাট্যদ্বন্দ্বে বাংলা চিত্রের জনপ্রিয় শিল্পী সুচিত্রা-উত্তমকে নতুনভাবে দেখা যায় টাইম ফিল্মসের প্রথম নিবেদন "চাওয়া-পাওয়া"তে।

কাহিনীর নায়ক রজত দৈনিক খবরের কাগজের রিপোর্টার। কাগজে ছাপবার মতো খবর সে কোনদিনই আনতে পারে না। তাই সে কাগজের মালিকের বিরাগভাজন। একদিন দীর্ঘ পথ স্কুটারে দৌড়ে সে একটি 'স্কুপ' খবর নিয়ে এল। কিন্তু এসে দেখল তার আগেই খবরটা পৌঁছে গেছে—সেই খবরেরই টেলিগ্রাম-সংখ্যা বেরোতে আর দেরী নেই। মালিক তাকে শাসিয়ে বললেন, যেদিন সে সত্যিই কোন ভালো খবর আনতে পারবে সেদিনই যেন তার সামনে এসে দাঁড়ায়, তার আগে নয়।

লক্ষপতি কেশব চৌধুরী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের মালিক। তাঁর দুলালী কন্যা মঞ্জুকে তিনি পাত্রস্থ করতে চান এক ধনী-পুত্রের সঙ্গে। কিন্তু জেদী মেয়েকে রাজী করাতে পারেন না তিনি কিছুতেই। অগত্যা কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় তাঁকে। মিথ্যে কাজের অজুহাতে মেয়েকে নিয়ে রওনা হন কলকাতার বাইরে তিনদিনের জন্যে। পরে যখন মঞ্জু জানতে পারে বাবার নির্দিষ্ট পাত্রের সঙ্গে তাকে ঘনিষ্ঠ করে তোলার জন্যই এই পরিকল্পনা, তখন সে রাত্রে ট্রেন থেকে বাবাকে ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়।

বিনা টিকিটে সে গিয়ে ওঠে এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। সে কামরায় রয়েছে রজত। তার পাশে গিয়েই বসে মঞ্জু। জমকালো পোশাক পরা এই মেয়েটিকে রজতের কেমন যেন অদ্ভুত লাগে। তাকে সাহায্য না করেও পারে না সে। পরেরদিন ভোরবেলা রজত খবরের কাগজে পড়ে একটি নিরুদ্দিষ্টা মেয়ের সংবাদ। খবর দিতে পারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার। নিরুদ্দিষ্টার সব লক্ষণ মিলিয়ে রজত বুঝতে পারে এই সেই মেয়ে।

রজতের খবরের কাগজের চাকরীর কোন নিশ্চয়তা নেই। এই সময় তার টাকারও খুব দরকার। দশ হাজার টাকার লোভ ছাড়তে পারে না সে। তাই মঞ্জুকে তার হাতছাড়া করা চলে না। এদিকে মঞ্জুও নিঃসহায় অবস্থায় ছাড়তে পারে না রজতকে। রজতের লক্ষ্য কোন রকমে মেয়েটি'কে তার অভিভাবকের হাতে তুলে দিয়ে দশ হাজার টাকা উপায় করা।

চন্দ্রশেখর

এদিকে বড়লোকের তিরিক্ষি মেজাজের মেয়ে মঞ্জুকে অনেক সামলিয়ে চলতে হয় রজতকে। পাটনায় এক ছোট হোটেলে গিয়ে ওঠে ওরা স্বামী-স্ত্রী সেজে। সেখানে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় রজতের এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রী পরিচয়েই তারা শেষ পর্যন্ত এসে ওঠে বন্ধুর বাড়িতে। ওদের অভিনয় নিখুঁত। কিন্তু মঞ্জুর অভিনয় যে কখন অলক্ষ্যে অনুরাগে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে তা রজত টের পায় না। যখন জানতে পারে তখন তার মনেও আসে চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব। একদিকে অর্থ, অন্যদিকে মঞ্জুর ভালোবাসা—হয়তো তার নিজেরও দুর্বলতা। কিন্তু রজত ধরা দেয় না মঞ্জুর কাছে। নির্লিপ্ত রজতের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়

মঞ্জু। একা পালাতে সে পারে না। জোর রাত্রিতে রজতও এসে তার সঙ্গ নেয়। চিঠিতে বন্ধুকে জানিয়ে আসে সব কথা। আবার তারা এসে ওঠে পশ্চিমের কোন এক শহরের হোটেলে।

মঞ্জুর কাছ থেকে প্রস্তাব আসে, ওরা তার ছোটবেলার বান্ধবী মিতার বাড়িতে গিয়ে উঠবে। সেখানে গিয়ে তাদের আর অভিনয় করতে হবে না। মিতাকে চিঠিতে সব কথা জানিয়ে দেয় মঞ্জু। সে চিঠি ডাকে ফেলতে গিয়ে রজত পোস্ট অফিসে শোনে টেলিগ্রাফের 'টরে-টক্কা' আর তার সঙ্গে রূপোর টাকা বাজাবার আওয়াজ। তার মনে বুঝি তখন টাকার প্রয়োজনই আবার বড় হয়ে দেখা দেয়—হয়তো কর্তব্য-বুদ্ধিও। সে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেয় মঞ্জুর অভিভাবকের কাছে।

মিতার বাড়িতে বান্ধবীর নাম ধরে ডাকে মঞ্জু। কিন্তু সামনে এসে দাঁড়ান তার বাবা। রজতকে টেলিগ্রাম পাঠাবার জন্যে ধন্যবাদ জানান তিনি এবং তাকে এতদিন অকর্মণ্য ভেবে যে ভুল করেছেন তাও প্রকাশ করেন। কেশব চৌধুরীই যে মঞ্জুর বাবা তা জেনে অবাক হয়ে যায় রজত।

এদিকে রজতকে অর্থলোভী ভেবে ঘৃণায় মঞ্জুর মন বিষিয়ে ওঠে। পরে যখন দেখে, রজত তার বাবার দেওয়া দশ হাজার টাকার চেক মঞ্জুর আসন্ন বিয়েতে উপহার স্বরূপে দিয়ে চলে যায় এবং তার কাছে গচ্ছিত মঞ্জুর আংটিও ফেরত দিয়ে যায়, তখন মঞ্জুর মন আবার তার প্রতি অনুরাগে ভরে ওঠে। দৌড়ে গিয়ে সে আটকায় রজতকে। বলে জোর করেই তাকে বেঁধে রাখবে নিজের কাছে চিরদিন।

ছবির আখ্যানভাগের পটভূমিকা নায়ক-নায়িকার অন্তররাজ্যে যতখানি বিস্তৃত, বাইরের জগতে ঠিক ততখানি নয়। কাহিনীর নাট্যবস্তু খুঁজতে হয় নায়ক-নায়িকার মনে—তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বে ও মর্মব্যথায়। কাহিনীকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নাট্যরসটুকু দর্শকমনে সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁরই রচিত চিত্রনাট্যে সে রসের জোয়ার যেমনি আছে, তেমনি রয়েছে ভাঁটা। ছবির মূলে আখ্যানবস্তু গড়ে উঠেছে রজত ও মঞ্জুর স্বামী-স্ত্রীর ছদ্মপরিচয়ে। কাহিনীর এই রসাল উপাদান পূর্বেও অনেক ছবিতে দেখা গেছে। বিন্যাসের কৌশলে এই বহু-ব্যবহৃত উপাদানও নতুন নাটকীয় আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে এই ছবিতে।

তবে বিচারশীল দর্শকদের কাছে রজতের চরিত্রটি মাঝে মাঝে কষ্টকল্পিত মনে হওয়া বিচিত্র নয়। যে রজত ট্রেন ছাড়বার আগে কোনদিন স্টেশনে পৌঁছতে পারে না—এমনি আপনভোলা ও বোহিসেবী সে—সে

"বীরশা ও মায়াপুতুল" এই নামে চমৎকার একটি শিশুদের ছবি তুলেছেন লিট্‌ল সিনেমা। বিরিয়া নামক এই আদিবাসী ছেলেটি নাম-ভূমিকায় নেমেছে। ছবিটি গত সোমবার লাইটহাউসে এক বিশেষ প্রদর্শনীতে সাংবাদিকদের দেখান হয়। রাষ্ট্রীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের শিশুচিত্র বিভাগে ছবিটি অন্যতম প্রতিযোগী।

যেমন সচেতনভাবে ও পদে পদে সূক্ষ্ম-বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে মঞ্জুকে তার বাবার কাছে পেণছে দেয়, চরিত্রের সংগতি তাতে ঠিক বজায় থেকেছে বলা চলে না। তেমনি মঞ্জুর অনুরাগের সামনে তার নিজের অর্থলাভের চিন্তা এবং এই নিয়ে দ্বন্দ্ব সাধারণ দর্শকদের মনে অস্বস্তি আনতে পারে। প্রেম ও প্রয়োজনের দ্বন্দ্ব মানুষের জীবনে আসে, কিন্তু সে জটিল দ্বন্দ্ব যখন দশ হাজার টাকাকে উপলক্ষ করে আসে, তখন জীবন-নাট্যের গভীরতা কমে যায়। তবে কাহিনীকার মঞ্জুর চরিত্রটি সুন্দর-স্বাভাবিকভাবে কল্পনা করেছেন। তাঁর রচিত সংলাপও সাহিত্যরসপুষ্ট ও উপভোগ্য।

তরুণ পরিচালকগোষ্ঠী 'যাত্রিক' যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে কাহিনীকে রজতপটে উপস্থাপিত করেছেন তা সব দিক দিয়ে প্রশংসার যোগ্য। ছবির প্রথমভাগ তাঁদের সুষ্ঠু বিন্যাসের ফলে একখানি প্রথম শ্রেণীর 'কমেডি' ছবির মর্যাদা লাভ করেছে। দর্শকদের মনোযোগকে সর্বক্ষণ পর্দার দিকে নিবদ্ধ রাখবার কৃতিত্বও তাঁরা অর্জন করেছেন। বিভিন্ন দৃশ্যরচনায় তাঁদের মৌলিক চিন্তাশক্তি ও রসবোধ বিশেষ কৃতিত্বের দাবী রাখে। হোটেলে রাত্রিবেলায় পর্দার বুকে নায়ক-নায়িকার ছায়া ফেলে তাদের মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের ব্যঞ্জনাটি খুবই চমৎকার। তেমনি মনে রাখবার মতো একটি দৃশ্য জ্বলন্ত ধূপকাঠির ধূমায়িত পরিবেশে নায়ক-নায়িকার কথার মধ্য দিয়ে এক বিশেষ নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি। ছবিতে পরিচালকবৃন্দের কাজ সামগ্রিকভাবে সকলকার প্রশংসা পাবে। জনপ্রিয় শিল্পী-যোটককে নতুন দৃষ্টিভংগীর মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করবার চেষ্টা রয়েছে ছবিতে। শেষ দৃশ্যে তাদের মিলনটুকুই যা একটু পুরোন উপাদানের পুনরাবৃত্তি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু প্রথম দেখার পর ট্রেনে তাদের নিয়ে যে রসসঞ্চার তা নতুন পরিচালকগোষ্ঠীর এক অনিন্দনীয় কৃতিত্ব।

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারে পরিচালকদের সজাগ দৃষ্টি প্রশংসনীয়। রূপোর টাকার আওয়াজ ও টেলিগ্রাফের 'টরে-টক্কা' দিয়ে নাট্যমুহূর্ত রচনার প্রয়াস নজরে পড়বার মতো। তবে সংবাদপত্রের মালিক-সম্পাদকের পক্ষে 'টেলিগ্রাম' সংখ্যার মেক-আপ প্রুফ দেখাটা সংবাদপত্রসেবীদের কাছে বিসদৃশ লাগতে পারে। যেমন বিসদৃশ মনে হবে ব্যাঙ্কের টাকা তছরূপ নিয়ে কোন সংবাদপত্রের টেলিগ্রাম বের করা। এ সমস্ত ছোটখাটো ত্রুটি বাদ দিলে সর্বাংগীন-ভাবে ছবিখানি সুচিত্রা-উত্তম অভিনীত বিশিষ্ট চিত্রসৃষ্টিগুলির পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্য।

ছবির প্রথম ভাগে রজতবেশী উত্তমকুমার তাঁর সাবলীল ও প্রাণোচ্ছল অভিনয়ে দর্শকদের মন জয় করে নেন। শেষের দিকে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তিও মনে দাগ কাটে। লক্ষপতির জেদী, খামখেয়ালী মেয়ের চরিত্রটিকে সুচিত্রা সেন স্বাভাবিক করে তোলবার চেষ্টা করেছেন যথেষ্ট; কিন্তু তাঁর

অভিনয় দক্ষতার পরিচয় মেলে ছবির শেষের দিকে অনুরাগের কোরক বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে। ছোট একটি হোটেলের মালিকের চরিত্রে তুলসী চক্রবর্তী অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রাংশে অভিনয়ের জন্য প্রশংসা পাবেন ছবি বিশ্বাস, ভারতী দেবী, জীবেন বসু, অমর মল্লিক ও রাজলক্ষ্মী।

সংগীত পরিচালনায় নচিকেতা ঘোষ আবহসংগীতে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন। তাঁর সুরারোপিত দুটি গানই উল্লেখযোগ্য। হেমন্তকুমারের কণ্ঠে "যদি ভাবো, এতো খেলা নয়" গানের সুরে নতুন গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার রচিত এই গানটি সংশ্লিষ্ট দৃশ্যের নাট্যভাবের দিক দিয়ে অপূর্ব।

আলোকচিত্র পরিচালনায় অনিল গুপ্ত, চিত্রশিল্পে জ্যোতি লাহা, শব্দগ্রহণে সত্যেন চ্যাটার্জি, সম্পাদনায় দুলাল দত্ত ও শিল্প-নির্দেশে সুবোধ দাসের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। অন্যান্য কলাকৌশলের দিকেও ছবিখানি ঝকঝকে।

চিত্রালোচনা

এ হপ্তার মুক্তি-তালিকায় মাত্র দুখানি হিন্দী ছবির নাম—"কালাপানি" ও "জং-বাহাদুর"। শেষোক্ত ছবিটির মুক্তি ঘোষিত হয়েছিল দুহপ্তা আগে। কিন্তু সে সময়ে ছবিটি মুক্তি পায়নি।

নবকেতনের "কালাপানি" চিত্রতারকা দেবানন্দের নিজের প্রযোজনায় তোলা হয়েছে। নায়কের ভূমিকায়ও তিনিই অভিনয় করেছেন। মধুবালা ও নলিনী জয়ন্ত প্রধান দুটি স্ত্রী-চরিত্রে আছেন। অন্যান্য ভূমিকায় নেমেছেন কিশোর সাহু, নাজির হোসেন, সাপ্রু, আগা, মুক্রি প্রভৃতি। রাজ খোসলার পরিচালনায় ও শচীন দেব বর্মণের সুরযোজনায় ছবিখানি চলতি ছবির হাটে নতুন আবেদনের পসরা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

সি এম ত্রিবেদীর প্রযোজনায় তোলা "জং বাহাদুর" এক কাল্পনিক রাজ্যের চমকপ্রদ কাহিনী। শশীকলা, পূর্ণিমা, চন্দ্রশেখর ও বাবুরাও পালোয়ানকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। জি পি পাওয়ার ছবিটি পরিচালনা করেছেন। অবিনাশ ব্যাস এর সুরকার।

• • •

সত্যজিৎ রায়ের "মহাভারত" সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যেসব খবর পাওয়া গেছে, তা থেকে এইটে বোঝা যায় যে, পরিকল্পনার পর্যায় থেকে তা বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করতে এখনও বেশ কিছুদিন লাগবে। যেসব ঘটনা থেকে পাণ্ডব ও কৌরবদের দ্যূত-ক্রীড়ার সূচনা, ছবিটি আরম্ভ হবে তারই সূত্র ধরে। যুধিষ্ঠিরের সিংহাসন প্রাপ্তিতে ছবির সমাপ্তি। ১৯৬০ সালের শেষের দিকে ছবির শুটিং আরম্ভ হবার কথা। ছবিটিকে রঙীন করবার পরিকল্পনাও আছে। শোনা যাচ্ছে, মাদ্রাজের সুবিখ্যাত প্রযোজক এ ভি মায়াপ্পন "মহাভারত" তোলার ব্যাপারে সত্যজিৎ রায়ের পিছনে আছেন।

ওদিকে "গৌতম বুদ্ধ"-খ্যাত পরিচালক

রাজবন্স খান্না এক জার্মান প্রযোজক-প্রতিষ্ঠানের সংগে সহযোগিতায় "মহাভারতে"র ওপর একটি আন্তর্জাতিক ছবি তোলবার জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তেলেগুতে মহাভারতের ওপর একখানি ছবি তোলা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ছবিখানির নাম "কৃষ্ণ রায়াভরম্", চন্দ্রিকা পিকচার্সের প্রযোজনায় জগন্নাথ ছবিটি পরিচালনা করছেন।

* * *

মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রভাত প্রোডাকসন্সের বহু-প্রতীক্ষিত "বিচারক" মুক্তিলাভ করবে। তারাশঙ্করের এই বিখ্যাত গল্পের প্রধান চরিত্রগুলিতে দেখা যাবে উত্তমকুমার, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায় ও দীপ্তি রায়কে। প্রযোজক-পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় তিমিরবরণকে দিয়ে সুরযোজনা করিয়ে ছবিটিকে আর এক দিক থেকেও অনন্য করে তুলেছেন।

ডি-ল্যুক্সের আগামী নিবেদন "সাগর সংগমে"র মুক্তির তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে বাঙলা নববর্ষের গোড়ায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মর্মস্পর্শী কাহিনী অবলম্বনে দেবকী বসুর এই নবতম চিত্রসৃষ্টি ছবির জগতে নতুন আলোড়ন তুলবে বলে অনেকে মনে করেন। ভারতী দেবী ও একটি নতুন মেয়ে—মঞ্জু অধিকারী এই ছবিতে অবিস্মরণীয় অভিনয় প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

* * *

এস এম ফিল্ম ইউনিটের অভিনব প্রচেষ্টা "যাত্রী"র চিত্রগ্রহণ সচ্চিদানন্দ সেন মজুমদারের পরিচালনায় শেষ হয়েছে। সারা ভারত জুড়ে এর পশ্চাৎপট প্রসারিত। বহু অর্থব্যয়ে এবং সম্পূর্ণ নতুন আংগিকে ছবিটি তোলা হয়েছে। এর কলাকুশলী, শিল্পী প্রভৃতি সকলেই নবাগত। ছবির পর্দায় "যাত্রী"র যাত্রা অচিরেই শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নিরঞ্জন সেন এই সব দিক দিয়ে নতুন ছবিটির প্রযোজক।

চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

ভারত সরকারের কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আঞ্চলিক কমিটি ১৯৫৮ সালের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদানের উদ্দেশ্যে কাহিনীমূলক চিত্রের প্রাথমিক নির্বাচন শেষ করেছেন। বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেল, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যেরা সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনুমোদিত ছবিগুলি দেখতে শুরু করেছেন।

১৯৫৮ সালের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য কলকাতা থেকে ২২টি, বোম্বাই থেকে ২৩টি এবং মাদ্রাজ থেকে ২৩টি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি প্রতিযোগিতার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে এ-বাদে ২১টি প্রামাণ্য চিত্র ও ৯টি শিশু চিত্র ১৯৫৮ সালের বিশেষ রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শেষোক্ত ছবিগুলির গুণাগুণ একমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটিই বিচার করবেন।

কলকাতার আঞ্চলিক কমিটি যে তিনটি ছবি ১৯৫৮ সালের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের জন্য অনুমোদন করেছেন, গুণানুযায়ী সেগুলির স্থান এইরূপঃ দেবকী বসু পরিচালিত এবং মুক্তি-প্রতীক্ষিত "সাগর-সংগমে" (প্রথম); সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "জলসাঘর" (দ্বিতীয়); অগ্রগামী পরিচালিত "ডাক হরকরা" (তৃতীয়)। নির্ভরযোগ্যসূত্রে খবর পাওয়া গেল, "নীল আকাশের নীচে" ও "অযান্ত্রিক" ছবির প্রযোজকেরা পুনর্বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটিতে আবেদন করেছেন। কলকাতার যে দুটি শিশু-চিত্র প্রধান মন্ত্রীর স্বর্ণ-

এল বি ফিল্মস্ ইণ্টারন্যাশন্যালের নির্মীয়মান ছবি "বাড়ি থেকে পালিয়ে"র একটি দৃশ্যে পরম ভট্টারক লাহিড়ী ও পদ্মা দেবী।

পদকের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির বিবেচনাধীন সেগুলি হলঃ অগ্রদূত পরিচালিত "লালু-ভুলু" এবং কমল গাঙ্গুলী পরিচালিত ও মুক্তি-প্রতীক্ষিত "দেড়শো খোকার কাণ্ড"

বর্তমান বৎসরে দ্বাদশ সদস্যযুক্ত কেন্দ্রীয় কমিটিতে সভাপতিত্ব করছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নির্মল-কুমার সিদ্ধান্ত। প্রামাণ্য চলচ্চিত্র নির্বাচন কমিটিতে সভাপতিত্ব করছেন শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী।

নাট্যাভিনয়

দক্ষিণীর "রাসমণির ছেলে"

"দক্ষিণী" তাদের শিক্ষাভবন সম্প্রসারণ তহবিলের সাহায্যার্থে গত সপ্তাহে তিনদিন নিউ এম্পায়ারে রবীন্দ্রনাথের "রাসমণির ছেলে" মঞ্চস্থ করেন।

সামন্ত ঐশ্বর্য ও গৌরব থেকে বঞ্চিত ভবানীচরণের মনের প্রতিক্রিয়া ও হৃত সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার ব্যগ্রতা, দুর্ভাগ্যের দিনে রাসমণির ধৈর্য ও তাদের ছেলে কালী-পদের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও তার শোচনীয় মৃত্যুর মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে কাহিনীর নাট্যরস। রবীন্দ্রনাথের গল্পের মর্মরসটুকু এতে খুঁজে নিতে কষ্ট হয় না। দর্শকের অনুভূতিতে সাড়া এনে দেবার মতো কয়েকটি নাট্যমুহূর্তও রয়েছে কাহিনীর নাট্যরূপে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে নাট্যরূপ-খানি সুগ্রথিত হলে নাটকটি আরও মর্মস্পর্শী হতে পারত। মেসের কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় দৃশ্য নাটকটিকে ভারাক্রান্ত করেছে। আর রাসমণিও যেন এতে কাব্যের উপেক্ষিতা হয়ে পড়েছে। অপসৃয়মান সামন্ত বৈভব ও নিদারুণ দারিদ্র্যের সন্ধিক্ষণে রাস-মণির অটল স্থৈর্য ও ব্যক্তিত্বের রূপ নাটকটিতে স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়নি।

অভিনয়ের দিক দিয়ে ভবানীচরণের ভূমিকায় আশীষ মুখোপাধ্যায় চরিত্রটির মর্মব্যথা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পুত্রশোকাতুর অবস্থায় তাঁর অভিনয় চমৎকার। রাসমণির চরিত্রটিকে মাধবী রায় প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। চরিত্রটি সুকল্পিত হলে তাঁর কাছ থেকে আরও প্রশংসনীয় অভিনয় পাওয়া যেত আশা করা যায়। নোটোর চরিত্রটিকে মনোজ্ঞ করে তুলেছেন চিন্তামণি ভট্টাচার্য। কালীপদের বাল্যকালের অভিনয়ে মিঠু গুহঠাকুরতা প্রশংসার দাবী রাখেন; বড়ো কালীপদের চরিত্রেও ভালো অভিনয় করেছেন প্রীতিশ মুখোপাধ্যায়। শৈলেনের ভূমিকায় কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় চরিত্রানুগ। এ ব্যতীত তারাপদ, নরেশ, বগলাচরণ, উপেন্দ্র, শশধর, গগন, বিপিন প্রভৃতি চরিত্রগুলিও সুঅভিনীত।

পরিচালনায় আশীষ মুখোপাধ্যায় মোটামুটি প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আলোক সম্পাতে আশুতোষ বড়ুয়া এবং শিল্পনির্দেশে সুনীতি মিত্র ও অরূপ গুহঠাকুরতার কাজ উল্লেখযোগ্য। আবহ-সঙ্গীতে বেহালায় টুকরো টুকরো সুররচনা পরিবেশানুগ। জয়দেব বসুর কণ্ঠে একটি ঠুংরির অংশ উপভোগ্য।

ময়দানের নব রোমাঞ্চ

কলকাতার ময়দানের ঘাসে ঘাসে রোমাঞ্চ। ক্রিকেট, হকি, ফুটবলের মরসুমে সে রোমাঞ্চ চরমে ওঠে। কিন্তু খেলাধুলোর এই চিরাচরিত উত্তেজনার বাইরেও এমন ঘটনা সেখানে ঘটতে পারে, যা ময়দানের স্তব্ধ, রৌদ্রদগ্ধ বুকেও বিপুল উদ্দীপনার বন্যা বইয়ে দিতে পারে।

ময়দানে এই অঘটন ঘটিয়েছেন যে সমস্ত অঘটনঘটনপটীয়ানেরা তাঁদের প্রাণোচ্ছলতা প্রকাশ পায় রজতপটের মাধ্যমে। রজতপট ছেড়ে ময়দানের দূর্বাদল-পটেও যে তাঁদের প্রাণশক্তি সমান বেগে আলোড়ন আনতে পারে, তার প্রমাণ দিয়েছেন বাঙলা চিত্রের প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পী ও কলা-কুশলীবৃন্দ।

গত রবিবার টাউন ক্লাব মাঠে ক্রিকেট

খেলায় সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন প্রযোজক-শিল্পী ও কলাকুশলীদের দল। প্রযোজক-শিল্পীদের দলে নেমেছিলেন সত্যাজিৎ রায়, উত্তমকুমার, সুশীল মজুমদার, বিকাশ রায়, অসিত চৌধুরী, প্রভাত মুখার্জী, সুনীল বসু মল্লিক, অর্ধেন্দু সেন, প্রমোদ লাহিড়ী, অর্ধেন্দু মুখার্জী, বিমল ঘোষ, অনিল সরকার প্রভৃতি এবং কলাকুশলীদের দলে ছিলেন নচিকেতা ঘোষ, দিলীপ মুখার্জী, সত্যেন চ্যাটার্জী, মৃণাল গুহঠাকুরতা, দুর্গা মিত্র প্রভৃতি। খেলায় 'আম্পায়ার' হিসাবে ছিলেন পাহাড়ী সান্যাল ও সানু ব্যানার্জী।

খেলাটি ছেলে-খেলা মোটেই হয়নি। দর্শকেরা উপভোগ্য ক্রিকেট খেলার আনন্দ পেয়েছেন মাঠে। চলচ্চিত্র শিল্প নিয়ে যাঁদের দৈনন্দিন জীবনের বেশীরভাগ সময় কাটে, তাঁদের গতানুগতিকতার বাইরে এই

প্রযোজক বনাম কলাকুশলীদের ক্রিকেট খেলায় নচিকেতা ঘোষ ৪৫ রান তুলে স্কোরবোর্ডের শীর্ষস্থান অধিকার করেন

আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজন দর্শকদের কাছে শুধু চিত্তাকর্ষকই হয়নি, নতুন আদর্শও স্থাপন করেছে। প্রযোজক-পরিচালক-শিল্পীরা ও কলাকুশলীরা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই তাদের জীবনী-শক্তিকে আবদ্ধ রাখতে চান না, তারই প্রমাণ পাওয়া গেল এই ক্রিকেট খেলার অনুষ্ঠানে। আনন্দ তাঁরা সমানভাবেই পরিবেশন করতে পারেন খেলার মাঠে, যেমন পারেন চলচ্চিত্র-পটে।

এই খেলায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চলচ্চিত্র-শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। সাংবাদিকগণও মাঠে উপস্থিত থেকে বিশেষ-ভাবে উপভোগ করেছেন এই বিচিত্র আনন্দ-অনুষ্ঠান।

* * *

মহাত্মা গান্ধীর জীবন কাহিনী অবলম্বনে বিখ্যাত বৃটিশ পরিচালক ডেভিড লীন একটি আন্তর্জাতিক ছবি তুলবেন বলে মনস্থ করেছেন।

কলকাতায় খেলাধুলোর ক্ষেত্রে এখন উৎসাহ উদ্দীপনার অভাব থাকলেও ভারতের খেলাধুলোর বাজারে এখন মহাধুমধাম। মাদ্রাজে জাতীয় ফুটবলের শেষ পর্যায়ের খেলা, হায়দরাবাদে জাতীয় হকি, বোম্বাইতে জাতীয় ক্রিকেটের আসন্ন ফাইন্যাল খেলা। বলা যায় খেলার দেল, দোল, দুর্গোৎসবের সব আয়োজন চলছে এক সঙ্গে। জাতীয় ফুটবলে অংশ গ্রহণের জন্য বাঙলার ফুটবল দল অনেক আগেই মাদ্রাজ রওনা হয়ে গেছে, জাতীয় হকির জন্যও হকি টীম হায়দরাবাদ গেছে করেকদিন আগে। ক্রিকেটের জন্যও ক্রিকেট টীম বোম্বাই রওনা হয়ে গেছে। হকি ও ফুটবলের প্রথম দিকের খেলায় বাঙলা দল সাফল্যও অর্জন করেছে, এই আলোচনা করবার সময় পর্যন্ত ক্রিকেট খেলা আরম্ভ হয়নি।

এদিকে কলকাতার খেলাধুলোয় মন্দাভাব। ফুটবল এখনো অবশ্য আরম্ভ হয়নি। হকি খেলাকে কেন্দ্র করে ময়দান যেটুকু সরগরম হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন ক্লাবের খ্যাতনামা খেলোয়াড়ের অভাবে সেটুকু উঠে গেছে। ছোট ও মাঝারি ক্লাবের খেলার মধ্য দিয়েই হকি লীগের মরসুম জীইয়ে রাখা হয়েছে। যে সব বড় ক্লাব থেকে খেলোয়াড় নিয়ে বাঙলার দল গড়া হয়েছে তারা এখন মাঠে নামছেন না। হায়দরাবাদ থেকে খেলোয়াড়রা ফিরে না আসা পর্যন্ত নামবেনও না। কলকাতার অন্যান্য খেলাধুলোর ক্ষেত্রেও কোন তেজী ভাব নেই।

গত সপ্তাহের ছোট একটু খবর ইংলিশ চ্যানেল পার হবার প্রস্তুতি হিসাবে বাঙলার সাঁতারপটিয়সী কুমারী আরতি সাহা দেশবন্ধু পার্কের পুকুরে ৮ ঘণ্টা অবিরাম সাঁতার কেটেছেন। গত পয়লা মার্চ তিনি সকাল ৯টা ১৫ মিনিটের সময় জলে নামেন আর ৮ ঘণ্টা সাঁতার কাটবার পর বিকেল

খেলার মাঠে

একলব্য

৫টা ১৫ মিনিটের সময় সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে জল থেকে উঠে আসেন। ৮ ঘণ্টা অবিরাম সাঁতার কাটা মানে জলে ভেসে থাকা নয়। অবিরাম সাঁতার কেটে পুকুর এপার ওপার করা। ইংলিশ চ্যানেল পার হতে হলে তো আর জলে ভেসে থাকলে চলবে

ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের নির্বাচিত অধিনায়ক ডি কে গাইকোয়াড়

না। রীতিমত সাঁতার কেটেই ভয়াবহ ও দুরতিক্রম্য চ্যানেল জয় করতে হবে।

কুমারী আরতি সাহা এক সময়ে বাঙলার মেয়েদের সাঁতারে সব বিষয়ে রেকর্ডের অধিকারিণী ছিলেন। ইনি এখন সিটি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক কলা বিভাগের ছাত্রী। সম্প্রতি সাউথ ইস্টার্ন রেলে চাকরী নিয়েছেন। ইংলিশ চ্যানেল অভিযানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে তার কিছু অংশ কলকাতা ইউনিভার্সিটি স্পোর্টস বোর্ড এবং কিছু অংশ সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস ক্লাব দেবেন বলে শোনা যাচ্ছে। পাকিস্থানের ব্রজেন দাশ এবং ভারতের মিহির সেন চ্যানেল অতিক্রম করলেও আজ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্থানের কোন মহিলা ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের চেষ্টা করেননি। সারা এশিয়ার মধ্য থেকেও কোন মেয়ে প্রতিযোগী চ্যানেল অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন বলে মনে পড়ছে না। বিশকুড়ি বছর আগে সাঁতারু বীর প্রফুল্ল ঘোষ কুমারী বাণী ঘোষকে নিয়ে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমের এক পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু যে কারণেই হক তাঁরা শেষ পর্যন্ত ভারত ত্যাগ করতে পারেননি। কুমারী আরতি সাহা আজ যদি ইংলিশ চ্যানেল অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন তবে ভারতীয় নারীরাও যে বিপদসঙ্কুল অ্যাডভেঞ্চারে ভয় পান না সেই কথাই প্রমাণিত হবে। আর সাফল্য অর্জন করলে তো কথাই নেই। সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের খ্যাতনামা সাঁতারু ডাঃ বিমলচন্দ্রও আগামী-বার ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করবার সঙ্কল্প করেছেন। তারও প্রস্তুতি পর্ব আরম্ভ হয়ে গেছে। পাকিস্থানের চ্যানেল জয়ী সাঁতারু ব্রজেন দাশের মনেও নাকি ইংলিশ চ্যানেল পারাপারের সংকল্প আছে। অর্থাৎ ব্রজেন দাশ ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড এসে আবার ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স যাবার চেষ্টা করবেন। ভারতের আর কোনো সাঁতারুর মনে চ্যানেল জয় করবার সংকল্প আছে কি না জানি না। তবে ভারত ও পাকিস্থানের যে কয়জন সাঁতারু চ্যানেল জয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন তাঁরা অংশ গ্রহণ করলেই ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারের সময় ভারতে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে।

• • •

করাচীতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও পাকিস্থানের প্রথম টেস্ট খেলায় পাকিস্থান দল ১০ উইকেটে জয়লাভের পর কথা উঠেছে—'এখন নিঃসন্দেহেই প্রমাণ হ'ল ক্রিকেট খেলায় ভারতের চেয়ে পাকিস্থান অনেক শক্তিশালী'। ভারতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল সর্ববিষয়ে তাঁদের প্রাধান্যের পরিচয় দিয়ে পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে তিনটি খেলায় ভারতকে পরাজিত করেছে, বাকী দুটি খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা না হলেও আগন্তুক দলের প্রাধান্যেরই পরিচয় মিলেছে ব্যাটিং বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে। আর পাকিস্থানে পাকিস্থান দলের কাছে তাঁদের হয়েছে উল্টো বিপত্তি। অর্থাৎ এখানে পাকিস্থানের খেলোয়াড়রাই প্রাধান্যের পরিচয় দিয়ে শক্তিশালী ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে পরাভূত করেছেন ১০ উইকেটে।

ভারতের অঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র রাষ্ট্র পাকিস্থান ক্রিকেট খেলায় ভারতের চেয়ে উন্নত এ কথা আগেই প্রমাণিত হয়েছে। যদিও ভারতে পাকিস্থানের সফরে ভারতই রাবার লাভ করেছিল এবং ভারতের পাকিস্থান সফরের পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে একটি খেলাতেও জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি, তবুও অস্বীকার করবার উপায় নেই

ক্রিকেট খেলায় পাকিস্থান অনেক এগিয়ে গেছে আর ভারত অনেক পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু কথা ওঠে, শুধু ক্রিকেট কেন? কোন বিষয়ে পাকিস্থান এগিয়ে যায়নি? আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে অ্যাথলেটিকসে পাকিস্থান ভারতের চেয়ে অনেক বেশী সাফল্য অর্জন করেছে। মল্লক্রীড়ায়ও তাঁদের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। হকিতে পাকিস্থান পেয়েছে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানের খেতাব। ইংলিশ চ্যানেল অভিযানেও প্রথম টেক্কা দিয়েছেন পাকিস্থানের বাঙলা সাঁতারু ব্রজেন দাশ। তাহলে পাকিস্থান খেলাধূলার কোন্ বিষয়ে ভারত থেকে পিছিয়ে আছে? ফুটবল? না, সে কথাও স্বীকার করতে পারছি না। পাকিস্থানের ফুটবল মান ভারতের চেয়ে উন্নত না হলেও অবনত নয়। প্রশ্ন আসে কেন পাকিস্থান খেলাধূলার ক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে। কেনই বা ভারতের মান আশানুরূপ এগুচ্ছে না। এর উত্তরে সেই পুরনো কথায় ফিরে আসতে হয়। ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রে অব্যবস্থা। ক্রীড়া পরিচালকদের ঢিলেঢালা খেলার শাসন ব্যবস্থা। নীতির নামে দুর্নীতি। প্রেরণা বিহীন, স্বার্থদুষ্ট পরিচালনা আর আভ্যন্তরীণ কোঁদল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সংগে ক্রিকেট খেলায় দল গড়া এবং অধিনায়ক নির্বাচন নিয়ে ভারতের ক্রিকেট পরিচালকরা যে ভূমিকা অভিনয় করেছেন তা কারোই অজানা নেই। এ নিয়ে পার্লামেণ্টেও আলোচনা হয়েছে। আশা ছিল ইংলণ্ড সফরের জন্য ভারতের দল গঠনের ব্যাপারে আর কোন গোলযোগ দেখা দেবে না। কিন্তু যেভাবে ভারতের দল গড়া হয়েছে তাতে সন্দেহ করবার যথেষ্টই কারণ আছে পরিচালকদের ঘাড়ের ভূত এখনো নামেনি। কিম্বা এর পেছনে কোন অদৃশ্য হস্ত বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল।

ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশ থেকে প্রকৃত প্রতিনিধিমূলক একটি দল গড়া বেশ কষ্ট সাধ্য। যেখানে খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যগত পার্থক্য উনিশ বিশ সেখানে বিশের পরিবর্তে উনিশকে নিয়ে দল গড়লে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। তাই দুই একজন খেলোয়াড়ের পরিবর্তে অধিকতর দক্ষ আর দু'একজনকে দলভুক্ত করা হলে দল বেশী শক্তিশালী হত একথা জেনেও দল গড়ার ব্যাপারে আমার বিশেষ আপত্তি নেই। আমার আপত্তি যেভাবে অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছে সেই সম্পর্কে। বরোদার খেলোয়াড় ডি কে গাইকোয়াড়, যাকে টেস্ট খেলা থেকে এক রকম নির্বাসিত করা হয়েছিল, তিনি নির্বাচিত হয়েছেন ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলের নতুন অধিনায়ক। খেলোয়াড় হিসাবে গাইকোয়াড় কোনদিন ভারতীয় ক্রিকেটে প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়ের মর্যাদা পাননি। তার অধিনায়কত্বে গতবার বরোদা রাজ্য দল রণজি ট্রফি লাভ করলেও আন্তর্জাতিক টেস্ট খেলায় গাইকোয়াড় যে একজন যোগ্য অধিনায়ক এ কথাও প্রমাণিত হয়নি। অথচ অধিনায়ক হিসাবে যারা খ্যাতি অর্জন করেছেন তারা হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও গাইকোয়াড়কে অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছে। আমার দ্বিতীয় আপত্তি গোলাম আমেদকে দলভুক্ত করা সম্পর্কে; গোলাম আমেদের যোগ্যতা সম্পর্কে কারো সন্দেহ নেই। ইংলণ্ড টার্ফে অফ ব্রেক বোলার গোলাম আমেদের সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনাও খুব বেশী। কিন্তু ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক গোলাম আমেদের সাম্প্রতিক বিবৃতির পর আবার তাঁকে দলভুক্ত করা নির্বাচকদের মনের দৈন্যের পরিচায়ক। ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র খেলোয়াড়দের এক বড় সম্পদ, বিশেষ করে ক্রিকেট খেলায়। কলকাতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ভারতের তৃতীয় টেস্ট খেলার পর অধিনায়ক গোলাম আমেদ যে বিবৃতি

দিয়ে অধিনায়কের দায়িত্ব ত্যাগ করেছিলেন তা কেউ ভুলে যায়নি। তিনি বলেছিলেন—১৯৪৮-৪৯ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে কলকাতায় তিনি প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং এই বছর কলকাতাতেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তিনি শেষ টেস্ট খেলেছেন, তিনি আর টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করবেন না—ভারতের তরুণদের যায়গা করে দেবার জন্য তিনি টেস্ট খেলা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন। এই বিবৃতির পর তিনি কিভাবে আবার ইংলণ্ড সফরকারী দলে স্থান পাবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, কিভাবেই বা নির্বাচকমণ্ডলী তাঁকে দলভুক্ত করলেন তা সাধারণ বুদ্ধির অজ্ঞাত।

ভারতের যোগ্য অধিনায়ক পলি উমরিগরের সঙ্গে ক্রিকেট বোর্ডের মতবিরোধের জন্য তাঁকে অধিনায়ক করা হয়নি। বোর্ড কর্তৃপক্ষ গোলাম আমেদের বিবৃতির পর তাঁকে দলভুক্ত করলেন আর উমরিগরকে দলভুক্ত করেও তাঁকে অধিনায়ক করলেন না। অথচ যে কারণে উমরিগরের সঙ্গে বোর্ডের মতপার্থক্য সে কারণ এমন মারাত্মক নয়। মাদ্রাজ টেস্টে দলের অধিনায়ক হিসাবে তিনি একজন খেলোয়াড়ের শূন্য স্থানে তাঁর বিশ্বস্ত একজন খেলোয়াড়ের মনোনয়নের দাবী জানিয়েছিলেন। অধিনায়ক হিসাবে এ দাবীর যৌক্তিকতা অস্বীকার করবার উপায় নেই। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে গাইকোয়াড়ের অধিনায়ক নির্বাচনের ব্যাপারে কোন অদৃশ্য হস্ত বিশেষভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে।

দল গঠন সম্পর্কেও কিছু কিছু বলবার না আছে, এমন নয়। বিনু মানকড়ের সঙ্গে মানভঞ্জনের পালা শেষ করে ভারতের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ আবার তাঁকে দলভুক্ত করলেন। উমরিগর অধিনায়কের দায়িত্ব ছেড়ে দেবার পর মাদ্রাজ টেস্টে তাঁকে অধিনায়ক নির্বাচিত করা হল, অথচ ইংলণ্ড সফরকারী দলে মানকড়ের স্থান হল না! স্বীকার করি মানকড়ের বয়স হয়েছে। কিন্তু ন্যাচা অফ ব্রেক বোলার মানকড় ইংলণ্ডে সাফল্য অর্জন করতেন বলেই আমার বিশ্বাস। ব্যাটিংয়েও তাঁর হাত আছে। সর্বোপরি আছে ইংলণ্ড টার্ফে খেলার প্রচুর অভিজ্ঞতা। ৪ জন লেগ ব্রেক বোলারকে দলে স্থান দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অফব্রেক বোলারের সংখ্যা বেশী নেই। ভারতীয় ক্রিকেটের বিপদের কাণ্ডারী হেমু অধিকারীকেও দলভুক্ত করা হয় নাই। সার্ভিসদলের খেলোয়াড় অধিকারী এখনো যে ক্রিকেট খেলায় দক্ষ সে কথা দিল্লী টেস্টে ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। হয়তো তারুণ্যের উপর জোর দেওয়ার ফলেই বর্ষীয়ান খেলোয়াড় অধিকারী দলে পড়েননি। কিন্তু আমরা জানি তরুণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ খেলোয়াড়ের সমান সংখ্যায় দল গড়লেই দলের শক্তি বেশী বাড়ে। আর তারুণ্যের উপর যখন জোর দেওয়া হল তখন বোম্বাইয়ের উদীয়মান খেলোয়াড়, নিপুণ ব্যাটসম্যান হারদিকারকে বাদ দেওয়া হল কেন? সার্ভিস দলের খেলোয়াড় সেনগুপ্তই বা কি দোষ করলেন? আর জি নদকার্নীর বদলে হায়দিকারকে অথবা সেনগুপ্তকে দলভুক্ত করলে হয়তো ভাল হত।

যাই হক আগেই বলেছি যেখানে খেলোয়াড়দের গুণাগুণে উনিশ বিশ সেখানে বিশের পরিবর্তে উনিশের অন্তর্ভুক্ত এমন কিছু দোষনীয় নয়। দোষ নীতিতে, দোষ ক্রিকেট পরিচালকদের খামখেয়ালী-পনায়।

ইংলণ্ড সফরের জন্য ভারতীয় দলের পক্ষে যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁদের নাম:—

ডি কে গাইকোয়াড় (বরোদা)—অধিনায়ক; পি রায় (বাঙলা)—সহ-অধিনায়ক; বিজয় মঞ্জরেকার (বোম্বাই) সুভাষ গুপ্তে (বোম্বাই), পলি উমরিগর (বোম্বাই), এন এস তামানে (বোম্বাই) উইকেট কিপার; অরবিন্দ আপ্তে (বোম্বাই), আর বি দেশাই (বোম্বাই), নরী কণ্ট্রাক্টর (গুজরাট), পি জি যোশী (মহারাষ্ট্র) উইকেট কিপার; সি জি বোরদে (বরোদা), গোলাম আমেদ (হায়দরাবাদ), জয়সিমা (হায়দরাবাদ), জে এম ঘোরপাদে (বরোদা), এ জি কৃপাল সিং (মাদ্রাজ), আর জি নদকার্নী (মহারাষ্ট্র), সুরেন্দ্রনাথ (সার্ভিসেস)।

নির্বাচিত ১৭ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে সহ-অধিনায়ক পি রায়, গোলাম আমেদ, উমরিগর ও মঞ্জরেকার ১৯৫২ সালে ইংলণ্ড সফর করেছেন। পি জি যোশী, সুভাষ গুপ্তে ও জে এম ঘোরপাদে ১৯৫৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকারী দলের সভ্য ছিলেন। বাকী ১০ জন এই প্রথম সাগর-পারের সফরের জন্য মনোনীত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বোম্বাইয়ের অরবিন্দ আপ্তে ও হায়দরাবাদের জয়সিমার এ পর্যন্ত টেস্ট খেলায় সুযোগ ঘটেনি। বাকী সবাই টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। নির্বাচিত খেলোয়াড়দের গুণাগুণ সম্পর্কে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছে রইল।

* * *

করাচীতে নারকেলের দড়ির তৈরী উইকেটে পাকিস্থানের কাছে প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে শোচনীয়ভাবে ১০ উইকেটে পরাজয় স্বীকার করতে হবে এটা ক্রিকেট রসিকদের ধারণা-বহির্ভূত ছিল। বিশেষ করে ভারতের মাটিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়দের বিপুল সাফল্যের পর এমন শোচনীয় ব্যর্থতার কথা কল্পনা করা যায়নি। কিন্তু যা সত্য তাকে সত্য বলেই স্বীকার করতে হবে। পাকিস্থানে

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোন জারিজুরি খাটেনি। তাঁদের বোলিংয়ের সংহার শক্তি উবে গেছে, ব্যাটিংয়ের চটক ম্লান হয়ে গেছে। স্বীকার করি ম্যাটিং উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল খেলতে অভ্যস্ত নয়। ভারত থেকে পাকিস্থান যাত্রার মুখে তাঁদের কীর্তিমান ফাস্ট বোলার রয় গিলক্রিস্টকেও দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবু পাকিস্থানে তাঁদের ব্যাটিং ও বোলিংয়ের এই ব্যর্থতার কোন কৈফিয়ৎ নেই। পাকিস্থানের ফাস্ট বোলার ফজল মহম্মদ ও তরুণ স্পিন বোলার নাসিমুল গনির প্রশংসনীয় বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল প্রথম ইনিংসে ১৪৬ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি। টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত রান করার কৃতিত্বে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী গারফিল্ড সোবার্স সমেত পাঁচজন খেলোয়াড় কোন রান না করে আউট হয়েছেন। বেসিল বুচার, রোহন কানহাই ও জন হোল্ট—কেউই বেশী সময় ব্যাট ধরে টিকে থাকতে পারেননি। ১৪৬ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর পাকিস্থান দল ১ উইকেটে ৫৪ রান করলে প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়। দ্বিতীয় দিন পাকিস্থান আর দুইটি উইকেট হারিয়ে সংগ্রহ করে ২২৭ রান। আগের দিনের ৫৪ রান বাদ দিলে এইদিনের সংগৃহীত ১৭৩ রান অত্যন্ত মন্থর ব্যাটিংয়ের আওতায় পড়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলিংয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারলেও বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে পাকিস্থান ব্যাটস-ম্যানদের রান সংগ্রহ করতে দেখা যায়। কীর্তিমান ওপেনিং ব্যাটসম্যান হানিফ মহম্মদ, যিনি মাত্র কয়েকদিন আগে পাকিস্থানে ৪৯৯ রান করে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ব্যক্তিগত রানের বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন, তিনি ১০৩ রান করে জীবনের চতুর্থ টেস্ট সেঞ্চুরী করেন। পাকিস্থানের অপর খ্যাতিমান ব্যাটসম্যান সাঁয়দ আমেদের ব্যাটিংয়ে আরও নৈপুণ্যের ছাপ ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি ৭৮ রানের মাথায় রান আউট হয়ে যান।

তৃতীয় দিন মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পর্যন্তও পাকিস্থানের ব্যাটিংয়ে প্রচুর রান সংগ্রহের সম্ভাবনা ছিল। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় উঠেছিল ৪ উইকেটে ২৮২ রান। কিন্তু এরপর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলাররা ম্যাটিং উইকেটের মধ্যে আলোর সন্ধান পান এবং ঘন ঘন উইকেট দখল করতে থাকেন। পাকিস্থানের শেষ ৬টি উইকেটে ২২ রানের বেশী সংগৃহীত হয় না। ৩০৪ রানে তাঁদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ১৫৮ রান পিছনে থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করলে তৃতীয় দিনের শেষে ৮৪ রান সংগ্রহ করতেই তাঁদের ৪টি উইকেট পড়ে যায়। ইনিংস পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তাঁদের ৭৪ রানে প্রয়োজন থাকে।

পরের দিন খেলার বিরতি। বিরতির পর চতুর্থ দিনের খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ২৪৫ রানে দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করবার পর জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় ৮৮ রানের মধ্যে পাকিস্থান কোন উইকেট না হারিয়েই ২৭ রান করে। পরেরদিন আর ৬১ রান করে তাঁদের ১০ উইকেটে জয়লাভ করতে ৭৫ মিনিটের বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না।

চতুর্থ দিনের খেলায় বেসিল বুচার এবং জো সলোমান ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আর কোন ব্যাটসম্যানই ভাল রান করতে পারেননি। বিপর্যয়ের মুখে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করে বুচার ১১ বার বাউণ্ডারী মারার কৃতিত্ব সমেত ৬১ রান এবং সলোমান ৮ বার বাউণ্ডারী মেরে ৬৬ রান করেন। এইদিনের খেলার সবচেয়ে উল্লেখ করবার মত ঘটনা ছিল পাকিস্থানের অধিনায়ক এবং কীর্তিমান বোলার ফজল মহম্মদের শততম উইকেট লাভ। গারফিল্ড সোবার্সের উইকেট পাবার পর ফজলের টেস্ট খেলায় শত উইকেট পূরে যায়।

খেলাটির সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড:—

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস—১৪৬ (বেসিল বুচার নট আউট ৪৫, রোহান কানহাই ৩৩, জন হোল্ট ২৯; ফজল মহম্মদ ৩৫ রানে ৪ উইকেট, নাসিমুল গনি ৩৫ রানে ৪ উইকেট, এ ডিসুজা ৫০ রানে ২ উইকেট)

পাকিস্থান—প্রথম ইনিংস—৩০৪ (হানিফ মহম্মদ ১০৩, সাঁয়দ আমেদ ৭৮, ইমতিয়াজ আমেদ ৩১, ওয়াজির মহম্মদ ২৩; ওয়েসলী হল ৫৭ রানে ৩ উইকেট, ল্যান্স গিবস ৯২ রানে ৩ উইকেট, কোলী স্মিথ ৩৬ রানে ২ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস—২৪৫ (জো সলোমান ৬৬, বেসিল বুচার ৬১, কনরাড হান্ট ২১, ল্যান্স গিবস ২১; সুজাউদ্দিন ১৮ রানে ৩ উইকেট, ফজল মহম্মদ ৮৯ রানে ৩ উইকেট, মামুদ হোসেন ৫৯ রানে ২ উইকেট)

পাকিস্থান—দ্বিতীয় ইনিংস—(কোন উইকেট না হারিয়ে) ৮৮ (সাঁয়দ আমেদ নট আউট ৩৩, আইজাজ বাট নট আউট ৪১)

[পাকিস্থান ১০ উইকেটে বিজয়ী]

* * *

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ভারতে বিপুল সাফল্য অর্জন করে পাকিস্থানে যেমন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে ইংলণ্ড দল তেমন বিপরীতভাবে অস্ট্রেলিয়ায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে নিউজিল্যাণ্ডে সাফল্য অর্জন করেছে। নিউজিল্যাণ্ডের ক্রাইস্ট চার্চে ইংলণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলায় ইংলণ্ড দল বিজয়ী হয়েছে এক ইনিংস ও ৯৯ রানে। নিউজিল্যাণ্ড দল অবশ্য আজ পর্যন্ত কোন টেস্ট খেলায় জয়লাভ করতে পারেনি। ক্রিকেট-খেলিয়ে দেশগুলির মধ্যে নিউজিল্যাণ্ডই সবচেয়ে হীনবল। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে ক্রিকেট স্রষ্টা ইংলণ্ডের এই সাফল্যে গৌরবেরও বিশেষ কিছু নেই।

ইংলণ্ড দলের প্রথম ইনিংসের ৩৭৪ রানের প্রত্যুত্তরে ১৪২ রানে নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ফলো অন করে দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাতেও তারা ১৩৩ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারে না। ৪ দিনব্যাপী খেলার উপর যবনিকা পড়ে তৃতীয় দিন মধ্যাহ্ন ভোজের কিছু পরে।

ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যান টেড ডেক্সটারের ১৪১ রান, বোলার ফ্রেডি ট্রুম্যানের টেস্ট খেলায় শততম উইকেট লাভ এবং টনি লকের দুই ইনিংস মিলিয়ে ৮৪ রানে ১১টি উইকেট দখল খেলাটির উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড:—

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৩৭৪ (টেড ডেক্সটার ১৪১, পিটার মে ৭১, টম গ্রেভনি ৪২, ফ্রেড ট্রুম্যান ২১; জন রিড ৩৪ রানে ৩ উইকেট, হাগ ৯৬ রানে ৩ উইকেট, ব্লেয়ার ৮৯ রানে ২ উইকেট, মায়র ৮৩ রানে ২ উইকেট)

নিউজিল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস—১৪২ (জন রিড ৪০, বি বোল্টন ৩৩, কে হাগ নট আউট ৩১; টনি লক ৩১ রানে ৫ উইকেট, ফ্রাংক টাইসন ২৩ রানে ৩ উইকেট)

নিউজিল্যাণ্ড—১৩৩ (জে ডব্লিউ গায় ৫৬, বি বোল্টন ২৬; টনি লক ৫৩ রানে ৬ উইকেট, ফ্রাংক টাইসন ২৩ রানে ২ উইকেট)

[ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৯৯ রানে বিজয়ী]

দেশী সংবাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারী—আজ উড়িষ্যা বিধানসভায় 'উড়িষ্যা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন বৈধকরণ বিল (১৯৫৯)' উত্থাপনের চেষ্টা হইলে এক 'আচমকা' ভোট গ্রহণের ফলে মহতাব মন্ত্রিসভার পরাজয় ঘটে। বিরোধী দল ৫১—৪৩ ভোটে সরকার পক্ষের এই বিল উত্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেন।

সম্পূর্ণ একটি ভুল মানচিত্রকে অবলম্বন করিয়া এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মহলের ঔদাসীন্যে পূর্ণ ভ্রান্ত তথ্যাদির উপর নির্ভর করিয়া কিভাবে বেরুবাড়ি অঞ্চলটির অধিকাংশ পাকিস্তানের হাতে তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে সম্প্রতি প্রাপ্ত একটি পুরাতন নির্ভরযোগ্য মানচিত্র হইতে তাহা উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—মার্চ মাসের প্রারম্ভে বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য লইয়া গঠিত একটি প্রতিনিধি দল দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বেরুবাড়ি পাকিস্তানকে হস্তান্তরিত করার প্রস্তাব প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানাইবেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ রাজ্য পুনর্বাসন দপ্তরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন, উদ্বাস্তু সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য একশত কোটি টাকার অধিক খরচ হইলেও উহার অধিকাংশই সম্পূর্ণ অপচয় হইয়াছে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—এ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা গত বৎসরের তুলনায় কিছু কম। আগামী ৩০শে মার্চ হইতে ঐ পরীক্ষা আরম্ভ হইতেছে। এবার প্রায় ৯৭ হাজার ছাত্রছাত্রী স্কুল ফাইনালে পরীক্ষায় বসিতেছেন। গত বৎসর ঐ সংখ্যা ছিল এক লক্ষের কিছু বেশী।

উড়িষ্যা রাজ্য প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীরাজকিশোর সামন্তরায় অদ্য উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মহতাবকে তাঁহার পদ আঁকড়াইয়া থাকিতে বাধা দেওয়ার জন্য উড়িষ্যা হাইকোর্টে এক আবেদনপত্র পেশ করেন। আগামী কাল আবেদনের শুনানী হইবে।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ লোকসভায় বলেন যে, 'কোন রকম ক্ষতি না করিয়া' আয়ের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রকার আয়ের মধ্যে যে তারতম্য আছে নানারকমের কর ধার্য করিয়া তাহা বিলোপ ঘটানোর চেষ্টা করা হইতেছে।

আজ আসাম বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণ সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ হইলে বিরোধী দলের বহু সদস্য পাকিস্তানের খদ্দেরচ্ছ আক্রমণ হইতে আসামের সীমান্ত অঞ্চল রক্ষায় 'সরকারের ব্যর্থতার' তীব্র সমালোচনা করেন।

অদ্য রাজ্যসভায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে উদ্দীপনাময় বিতর্ককালে শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে. এল. শ্রীমালী ঘোষণা করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী শিক্ষার উচ্চমান যাহাতে বজায় থাকে সরকার সেদিকে লক্ষ্য রাখিবেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—প্রবল প্রতিবাদ ও বিরোধী পক্ষের সদস্যদের বাধার মধ্যে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই অদ্য লোকসভায় বেতন কমিশনের সুপারিশ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের আরও অন্তর্বর্তিকালীন সাহায্য মঞ্জুরের দাবী সরাসরি অগ্রাহ্য করেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে ভবিষ্যতে ২৩শে জানুয়ারী সাধারণ ছুটির দিবস বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য লোকসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ১৯৫৯-৬০ সালের যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করেন, তাহাতে ২৩.৩৫ কোটি টাকা নূতন কর ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। অর্থমন্ত্রী উদ্ভিজ্জ তৈল, সিগারেট, খন্দসারী চিনি, চা উদ্ভিজ্জ দ্রব্য, ডিজেল তৈল, রেয়ন, বড় আঁশের তুলা, কৃত্রিম রেশম বস্ত্র ও মোটর টায়ার প্রভৃতি ভোগ্য পণ্যের উপর অতিরিক্ত কর ধার্যের প্রস্তাব করিয়াছেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ভবিষ্যতে রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা পুনর্গঠনের ইঙ্গিত দেন এবং বলেন যে, ঐ নূতন পরিচালন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইলে তাঁহারা ভাড়া বৃদ্ধির প্রশ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন।

১লা মার্চ—অদ্য সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনের সমাপ্তি দিবসে সর্বক্ষেত্রে ও সর্বস্তরে মাধ্যমিক শিক্ষা অবৈতনিক করিবার এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করিবার দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিদেশী সংবাদ

২৩শে ফেব্রুয়ারী—পাকিস্তানে কোন বিদেশী শক্তির ঘাটি নাই বলিয়া পাকিস্তানের পক্ষ হইতে যে বিবৃতি প্রচার করা হইয়াছিল, গতকল্য লণ্ডনের বিশিষ্ট সংবাদপত্র ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান টাইমস-এ একটি মানচিত্র প্রকাশিত হওয়ায় উহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী—আজ এক নির্বাচনী সভায় বক্তৃতার সময় রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে ২০ অথবা ৫০ বছরের মেয়াদী অনাক্রমণ ও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করেন। তিনি জার্মানী সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের পরিবর্তে শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠানেরও প্রস্তাব করেন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী—ঢাকায় প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, গত সোমবার রাত্রে শ্রীহট্ট হইতে ৫০ মাইল দূরে শেওলামুখে পাক সীমান্ত ঘাটিতে ভারতীয় স্থলশুল্ক সংযোগ রক্ষাকারী অফিসার শ্রীদেবজিত সাইকিয়া কয়েকজন অপরিচিত লোকের হাতে গুরুতররূপে আহত হন। আহতাবস্থায় তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

২৬শে ফেব্রুয়ারী—অদ্য দক্ষিণ রোডেশিয়ায় জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইয়াছে এবং রোডেশিয়ান ফেডারেশনে যে চারিটি আফ্রিকান কংগ্রেস আছে, তাহাদের বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

আজ ব্রহ্ম পার্লামেন্টের উভয় পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন করিয়া একটি বিল গৃহীত হইয়াছে। ইহার ফলে জেনারেল নে উইন প্রধান মন্ত্রিরূপে কাজ চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী—কানাডার সরকারবিরোধী দলের নেতা শ্রীলিস্টার পিয়ার্সন গতকল্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুকে পাশ্চাত্য ও কম্যুনিস্ট দেশগুলির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বান করিবার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

চোরা বাজারে একখানি মোটর গাড়ি বিক্রয় করিবার অপরাধে পাকিস্থানের ভূতপূর্ব প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহম্মদ আয়ুব খুরোকে আজ পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

২৮শে ফেব্রুয়ারী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অদ্য 'ডিসকভারার' শ্রেণীর প্রথম উপগ্রহ ছাড়িয়াছেন। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর উপর দিয়া নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর পরিক্রমার উদ্দেশ্যে উপগ্রহটি ছাড়া হইয়াছে।

১লা মার্চ—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অবশিষ্ট দুই বৎসরে ভারতবর্ষের বৈদেশিক মুদ্রার যে ঘাটতি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা নূতন করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাঙ্কের উদ্যোগে বর্তমান মাসের মাঝামাঝি ওয়াশিংটনে ভারতবর্ষের পাঁচটি উত্তমর্ণ দেশের অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা, পশ্চিম জার্মানী এবং জাপানের একটি বৈঠক হইবে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ
প্রতি সংখ্যা—[illegible] নয়া পয়সা
কালকাতা বার্ষিক ২০ টাকা, [illegible] ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।
মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।
শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন [illegible] কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সহজেই ব'লে
দেওয়া যায়—
ফিলিপ্স
আর্জেন্টা
বাতির
চোখ-জুড়নো
উজ্জ্বল আলোয়
কে কাজ করছে
PHILIPS
Argenta
উচিত মূল্যে ফিলিপ্‌স-এর
সেরা জিনিস কিনুন
ফিলিপ্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড

REG. NO. C. 2109

দেশ

২৬ বর্ষ] শনিবার ৩০ ফাল্গুন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 14th March, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ২০

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
—তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেণা
সে তার সার্ট খুঁজে পেয়েছে। একবার কাপড়ের গাদাটির দিকে তাকিয়ে দেখুন— কেমন ঝকমক করছে।
মা নিশ্চয়ই এইসব কাপড়জামা একটুখানি সানলাইট সাবান দিয়ে কেচেছেন।
সানলাইটের প্রচুর ক্রিয়াশীল ফেণা প্রতিটি ময়লার কণা বার করে দেয় এবং প্রচুর জামাকাপড় সাদা এবং উজ্জ্বল করে কাচে। সানলাইটে কাচলে জামাকাপড় আছড়াবার দরকার হয়না।
সানলাইট সাবান জামাকাপড়কে
সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে
SUNLIGHT SOAP
S. 259-X52 BG

ভুতোদা বনাম আপিসের মেয়ে

বিমল আর বিনয় বসেছিল। উত্তেজিত হয়ে ঢুকলেন ভুতোদা।

ভুতোদা: ছ্যাঃ ছ্যাঃ! কালে কালে কি হোল!

বিমল: আবার কি হোল?

ভুতোদা: জানিস আমাদের ছোটবেলায় বড়লোকের বাড়ীর বৌ মেয়েদের পাল্কী শুদ্ধু নদীতে ডুবিয়ে আনা হোত যাতে মুখ কেউ না দেখতে পায়। আর এখন বুড়োধাড়ী মেয়েরা সব আপিসে কাজ করে বেড়াচ্ছে?

বিনয়: তাতে আপনার হোল কি?

ভুতোদা: আমাদের মধুপুরের কেলো এখানে এক সদাগরী আপিসে কাজ করে। কাল গিয়েছিলাম দেখা করতে। ঢোকার মুখেই এক রংচং মাখা আধুনিকা পথ আটকালো। ইংরিজীতে চটাং চটাং করে কি বলল। আমি বললাম "মা লক্ষী আমাদের কেলোর সঙ্গে একটু দেখা করব।" অনেক বোঝানোর পরে বলল "ও, মিষ্টার-রে—আপনার স্লিপ পাঠান।" চেয়ারে ঠ্যাং তুলে একটু আরাম করে বসেছি বলে—"ঠিক করে বসুন। আপিসটা কি বাড়ীঘর পেয়েছেন?"

বিমল: ঠিকই তো বলেছে?

ভুতোদা: কাজকরা মেয়েদের আমি দুচোখে দেখতে পারিনা। ওদের বাড়ীঘরে মন থাকেনা। শুধু এদিকওদিক ঘুরে বেড়ানো আর চটাং চটাং ইংরাজি বুলি।

বিমল আর বিনয়ের একবার চোখে চোখে চাওয়া চাওয়ি হয়ে গেল। ভুতোদাকে আর একবার জব্দ করা যাবে।

বিনয়: ভুতোদা, আজ তো রবিবার। চলুননা আমার পিসে মশায়ের বাড়ী। গড়পারের ওদিকটা আপনার দেখা হয়ে যাবে আর আলাপ পরিচয়ও হবে।

ভুতোদা: তা যাব এখন!

বিকালে গড়পারে বিনয়ের পিসের বাড়ীতে ভুতোদা, বিমল আর বিনয়।

বিনয়: এই যে ভুতোদা, আমার পিসতুতো বোন মিলি। একটা ব্যাঙ্কে চাকরী করে।

ভুতোদা (অপ্রসন্ন): চাকরী করে? তা বেশ, তা বেশ

মিলি: কেন চাকরী করা আপনি পছন্দ করেননা?

ভুতোদা: (ভয়পেয়ে): না, না, তা কেন করবনা। তবে মা আমরা বুড়ো মানুষ। মেয়েদের ঘরের কাজ কর্ম্ম করাই পছন্দ করি।

মিলি: (মুখ টিপে হেসে) ও এই কথা।

বিমল: মিলি, আমাদের খাওয়াবিনা?

মিলি: নিশ্চয়ই।

মিলি সযত্নে মেঝে পরিষ্কার করে সবাইকার আসন পেতে খাবার পরিবেশন করল। ভুতোদা অবাক হয়ে দেখছিলেন। হাবভাব দেখে তো ঘরের লক্ষীই মনে হচ্ছে!

বিমল: (আড়চোখে তাকিয়ে) ভুতোদা, চাকরী করা মেয়ে। কাছে যাবেননা। কামড়ে দিতে পারে।

ভুতোদা: থাম্।

খেতে বসে

ভুতোদা: খাবার তো অনেক করেছো মা মাছের ঝাল, মাংস, আলুপটলের ডালনা। ঠাকুর রেঁধেছে নিশ্চয়ই।

মিলি: না, বাড়ীর রান্নাবান্না আমিই করি।

ভুতোদা: তা বেশ। কিন্তু আমি বুড়ো মানুষ। এতো খেতে পারবনা। কিছুটা তুলে রাখো।

মিলি: খানই না আপনি। না খেতে পারলে পাতেই রেখে দেবেন।

ভুতোদা: বাঃ বাঃ খাসা স্বাদ হয়েছে তো। না, পড়ে আর কিছু থাকলনা। আর একটু ডালনা দাওতো। কি দিয়ে রেঁধেছ মা! তেল তো মনে হচ্ছেনা।

বিমল: কি দিয়ে আবার। 'ডালডা' দিয়ে।

ভুতোদা: (চটে) — আবার রসিকতা করছিস?

মিলি: না সত্যিই খাবার দাবার সব 'ডালডায়' রাঁধা।

ভুতোদা: আমি তো জানতাম ভাজাভুজি মিষ্টি, ফিষ্টিই 'ডালডায়' হয়।

মিলি: না সব রান্নাই 'ডালডায়' ভাল হয়।

বিনয়: শেষ শেষ ভুতোদা। শেষে চাকরী করা মেয়ের কাছে রান্না শিখতে হোল।

ভুতোদা: আহা, আমাদের মিলিমা তো একজন। আরো যে হাজার মেয়ে কাজ করে তাদের মধ্যে এমনটি—

মিলি: না ভুতোদা, মেয়েরা চাকরি করে জীবনযাত্রা স্বচ্ছল করার জন্যেই। বাড়ীর কাজে তারা কোন অংশে খারাপ নয়।

বিমল: ভুতোদা, এবার কি সব চাকুরে মেয়ের বাড়ীতেই খেয়ে দেখবেন নাকি?

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

পেপস্ মুখে রেখে দিন—এর আরোগ্যকারী ভাপ কি ভাবে গলার ক্ষত, ব্রণকাইটিস্, কাশি ও সর্দ্দিতে আরামপ্রদানে সাহায্য করে তা অনুভব করুন। পেপস এসবে সঙ্গে সঙ্গে আরামদান ও নিরাময় করে।

পরিবেশক—মেসার্স কেম্প এণ্ড কোং লিঃ
৩২সি চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্তের রচনাবলী

JUST OUT

TRIANGLE OF LOVE
Price 1.50 nP.

The bond of unification and relation between Divinity, Self and the manifested world have been dealt in this treatise in a lucid way. The careful reader will find how the essence amidst all variations from changeable manifestations a permanency is obtained which gives solace to the mind, peace and joy.

(1) TEMPLES AND RELIGIOUS ENDOWMENTS
Price .50 nP.

"....This is a thought provoking pamphlet which deals with a problem that must naturally compel attention of all Govts...."
The Mysore Economic Review.

(2) THEORY OF VIBRATION
Price 2.0 nP.

(3) MENTATION
Price 2.0 nP.

(4) NATURAL RELIGION
Price 1.0 nP.

(5) ENERGY
Price 1.0 nP.

(6) MIND
Price 1.0 nP.

(7) PRINCIPLES OF ARCHITECTURE
Price 2.50 nP.

(8) FORMATION OF THE EARTH
Price 2.50 nP.

৯। **পাশুপত অস্ত্রলাভ** ৫·০ ন. প.
মহাভারতের সামান্য ছায়া অবলম্বনে কবি-দার্শনিক মহেন্দ্রনাথ স্বকীয় কবিত্ব-শক্তি সহায়ে এই চিত্রকাব্য ছন্দায়িত করিয়াছেন। নিস্তেজ প্রাণহীন জাতিকে অর্জুনের আদর্শ বীরত্বপূর্ণ ক্ষাত্রভাব তথা ক্ষাত্রধর্ম দর্শাইয়া উদ্বুদ্ধ করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। ইহা ব্যতীত পাঠক ছন্দের মাধ্যমে মাধুর্যরসে সিঞ্চিত বহু নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইবেন এই গ্রন্থে।

১০। **গুরুপ্রাণ রামচন্দ্রের অনুধ্যান** ৫·০ ন. প.

১১। **শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান** (২য় সং) ·৫০ ন. প.

১২। **বদরীনারায়ণের পথে** ২·২৫ ন. প.

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিঃ-৬

জাতীয় স্বার্থে কলিকাতার ইণ্ডিয়া ও দেশবন্ধু হোসিয়ারী মিলস ও ফ্যাক্টরী কর্তৃপক্ষদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞাপিত।

(সি ১৪৫৫)

প্রকাশিত হইল

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের

সুলিখিত অধুনাতম উপন্যাস

রূপসী রাত্রি

দাম ঃ পাঁচ টাকা

রাত্রি শুধু অন্ধকারই নয়, নয় শুধু জ্যোৎস্নাময়ী। অন্ধকারেরও রূপ আছে, রাত্রিও রূপময়ী হয়; আর তারই প্রতিফলন 'রূপসী রাত্রি'। ঘটনার বিন্যাসে, ভাষার সৌন্দর্যে ও বর্ণনার সৌকর্যে একখানা রসঘন উপন্যাস।

আনন্দ পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
৫, চিন্তামণি দাস লেন ॥ কলিকাতা ৯

ভাইনো-মল্ট

 বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

সূচীপত্র
Cooch Behar

আমার নাম চা -
আপনাদের সহযোগিতাই আমার সমৃদ্ধি
চাষের জমি ও উৎপাদন
ভারতের চা-বাগানের সংখ্যা ৭,১৪৪ । প্রায় ৭,৯২,৫৩২ একর পরিমাণ জমিতে এই সব বাগান বিস্তৃত এবং তাতে বছরে প্রায় ৬৭ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয় ।
মূলধন
ভারতের চা-শিল্পে প্রায় ১১৩ কোটি টাকা মূলধন খাটান হচ্ছে ।
কর্ম-সংস্থান
শুধু চা-বাগানে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ভারতে ১০ লক্ষেরও বেশী । এছাড়া চা-এর ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বহু কর্মী জীবিকা অর্জন করেন ।
দেশে ব্যবহৃত চা
মাথা পিছু আধ পাউণ্ডেরও কিছু বেশী হিসেবে ভারতে বছরে প্রায় ২১০ কোটি পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হয় ।
রপ্তানি বাণিজ্যে চা
১৯৫৭ সালে ভারত থেকে গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, আয়ার, কানাডা, ইজিপ্ট, রাশিয়া, ইরাণ, অষ্ট্রেলিয়া, সুদান, পশ্চিম জার্মানী, নেদারল্যাণ্ডস, আফগানিস্তান এবং অন্যান্য দেশে ৪৯ কোটি পাউণ্ডেরও অধিক চা রপ্তানি করা হয় । এই রপ্তানির পরিমাণ ভারতের উৎপাদনের ২।৩ অংশেরও বেশী । এই সমস্ত দেশে ভারতীয় চায়েরই চাহিদা বেশী ।
বহির্বিশ্বে ব্যবহৃত চা
চীন এবং জাপান ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত চা-এর পরিমাণ বছরে প্রায় ১৪২ কোটি পাউণ্ড (আনুমানিক) । এই চাহিদার শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ মেটায় ভারত একা ।
বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়
১৯৫৭ সালে ভারতীয় চা-বাণিজ্য থেকে ১২৩ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকারও অধিক সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে ।
শিল্প-লব্ধ আয়
১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতীয় চা-শিল্পের রপ্তানি শুল্ক হিসেবে ২০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা এবং কেন্দ্রীয় শুল্ক হিসেবে ৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা জাতীয় অর্থ ভাণ্ডারে জমা হয় । এছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের আয়কর, কৃষিকর, পথকর, প্রভৃতি নানা খাতেও চা-শিল্প থেকে প্রচুর আয় হয় ।
আনুষঙ্গিক শিল্প
প্লাইউড, মৃৎশিল্প, কয়লা, সিমেণ্ট, সার, চা-কারখানার কলকব্জা, যানবাহন প্রভৃতি নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান ভারতীয় চা-শিল্পের উন্নতির সঙ্গে জড়িত ।
TEA BOARD INDIA
PST./210
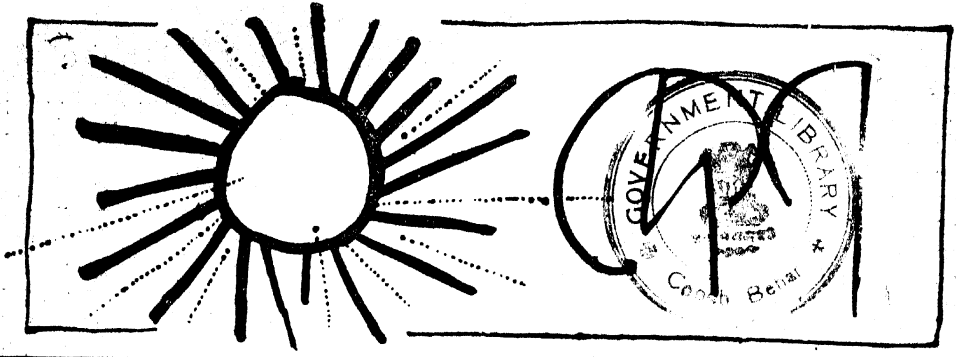
DESH 40 Naya Paisa.
Saturday, 14th March, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২০ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৩০ ফাল্গুন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

রাজনীতির ঊর্ধ্বে

একদা বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের কোন এক অধিবেশনের সভাপতিরূপে *আশুতোষ চৌধুরী মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই।" তখন এবিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল, বলা বাহুল্য, দেশের পরাধীন অবস্থায় মন্তব্যটা অনেকেরই ভালো লাগে নাই। এ মন্তব্য কতদূর যুক্তিসহ জানি না, কিন্তু ভাবিতেছি যে, উহার বিপরীতটাই কি খুব যুক্তিসহ, কতদূর সত্য, কতদূর স্বাস্থ্যপ্রদ—এ চিন্তা নিশ্চয় অনেকের মাথায় আসিয়াছে — আমাদের যে আসিয়াছে তাহা সরলভাবে স্বীকার করিতেছি, এই প্রবন্ধ ও আগের কোন কোন প্রবন্ধ তাহার প্রমাণ। দেশ স্বাধীন হইবার পর হইতে রাজনীতির গুরুত্ব আমাদের জীবনে বাড়তির মুখে—এখন সে প্রায় বামনের মতো তাহার তিন পায়ের চাপে আমাদের স্বর্গমর্ত্য ও সমস্ত ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান অধিকার করিয়া লইয়াছে। বর্তমানে ন্যায়ের দিকে নয় রাজনীতির দিকে চোখ রাখিয়া সরকার শাসন করেন; আবার জনকল্যাণের দিকে নয় রাজনীতির দিকে চোখ রাখিয়া সরকারবিরোধী বক্তৃতা করেন; এই জন্যই প্রয়োজনস্থলে সরকার কঠোর হইতে পারেন না। এমন হইবার একটি কারণ রাজনৈতিক বন্ধনে বদ্ধ স্বাধীন 'নেশান' হিসাবে আমরা এখনো নিতান্ত অপরিণত। দলের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল, কোথায় দলের শেষ, কোথায় দেশের শুরু, এসব বিষয়ে আমাদের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়, ফলে একটা অবাঞ্ছনীয় অবস্থার সৃষ্টি হইতে চলিয়াছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কিন্ত এমন অবস্থার আরও একটা কারণ আছে—সেটা খুব বৃহৎ ও গুরুতর।

সোভিয়েত রুশ রাষ্ট্রের প্রভাব আজ সর্বব্যাপী। যে-সব রাষ্ট্র তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে তাহারা তো বটেই এমন কি যে-সব রাষ্ট্র সোভিয়েত রাষ্ট্রনীতিকে পছন্দ করে না, তাহারাও জীবনের প্রায় সর্বস্তরে সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রভাব অনুভব করিতেছে—এবং যুগের দাবী স্বীকার করিয়া নিজ নিজ ঘর সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে। ভারত রাশিয়ার প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন হইয়াও কম্যুনিস্ট নহে, বস্তুত কম্যুনিস্টবিরোধী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কম্যুনিজমের মূল নীতিগুলিকে অনেক পরিমাণে সে আত্মসাত করিতে বদ্ধ-পরিকর। ইহার ভাল মন্দর দুই দিকই আছে। ভালর দিক স্পষ্ট। মন্দর দিক এই প্রবন্ধের বিষয়। আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম-এ তথা সোভিয়েত রাষ্ট্রে রাজনীতির বাটখারায় তৌল হয়। কোন্ও রাষ্ট্রের অতি তুচ্ছ বিষয়ও সেখানে রাজনীতির বাটখারায় তৌল হয়। কোন লেখকের কোন্ বই প্রকাশিত হওয়া উচিত, তাহাও রাজনৈতিক বিচারের বিষয়। সেখানে একটিমাত্র নীতি আছে, রাজনীতি, অন্য সমস্তই তাহার অন্তর্গত। আমাদের এসব কথা উল্লেখের উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম বা সোভিয়েত রাশিয়ার নিন্দা করা নয়; উদ্দেশ্য হইতেছে স্বধর্মরক্ষা। সোভিয়েত রাশিয়ার বর্তমান ব্যবস্থায় রাজনীতির একক প্রাধান্য অনিবার্য—তাহাই তাহার স্বধর্ম। আমাদের বর্তমান অবস্থায় রাজনীতির আত্যন্তিক প্রাধান্য অনিবার্য নয়—উহা আমাদের স্বধর্ম হইতেই পারে না। এখন যদি আমরা স্বধর্ম লঙ্ঘন করিয়া পরধর্ম গ্রহণ করিতে উদ্যত হই, জীবনের অন্যান্য কর্তব্য ও দায়িত্বকে লঙ্ঘন করিয়া রাজনীতিকে মুখ্যতা দান করি, তাহা হইলে আমরা স্বধর্মচ্যুত হইয়া অধোগতি লাভ করিব। সোভিয়েত রাশিয়ার দৃষ্টান্তে পৃথিবীর সর্বদেশে রাজনীতির প্রভাব বাড়িয়া গিয়াছে, এমন কি দীর্ঘকালের অভ্যাসে ও সংস্কারে অচল অটল ইংলণ্ডও এখন টলিতেছে। কিন্তু অপরের দুরবস্থা নিজের দুরবস্থার কৈফিয়ত বা সান্ত্বনা হওয়া উচিত নয়।

জীবনে ও রাষ্ট্রে রাজনীতির স্থান অবশ্যই আছে এবং মানুষ যতকাল সভ্য ও সমাজবদ্ধ অবস্থায় থাকিবে, ততকাল নিশ্চয় থাকিবে, কিন্তু তাহার আতিশয্যটা কল্যাণজনক নয়। আমাদের আপত্তি সেখানেই। মানুষ একাধারে একক ও দলবদ্ধ জীব, অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমষ্টি। যেখানে তাহার সমষ্টি রূপ, সেখানে রাজনীতিই তাহার ধর্ম, কিন্তু যেখানে সে ব্যক্তি ও একক, রাজনীতি সেখানে পদার্পণ করিলে সে ব্যক্তিত্ব হারাইয়া উচ্চাঙ্গের যন্ত্রে পরিণত হয়। ইহা কখনোই কাম্য হইতে পারে না। এখন আমাদের দেশে বর্তমানে রাজনীতির অবাঞ্ছিত গুরুত্ব সমস্ত সমাজটাকে যন্ত্রী-করণের দিকে ঠেলিতেছে। সরকার ও সরকারবিরোধী রাজনীতিকগণ সকলেই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে ঠেলার বল জোগাইতেছে। রাজনীতিকগণ রাজনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন, ইহা হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু ভারসাম্য নষ্ট হইলে চলিবে না। সমাজের চিন্তাশীল অংশ, সাহিত্যিক, শিল্পী, অধ্যাপক প্রভৃতি উদার চিন্তার বিবিধ বিদ্যা বর্ধনের ও নিরাশক্ত কর্মযোগের দ্বারা এমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যাহাতে ভারসাম্য রক্ষা সহজ হয়, রাজনীতি একান্ত হইয়া উঠিতে পারে না এবং ফলে সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য অটুট থাকিয়া সামাজিক দেহের বল বৃদ্ধি সম্ভবপর হয়। আর রাজনীতিও নিজের গোঁ ছাড়িয়া জীবনের আর দশটা অঙ্গের সহিত মিলিত হইয়া কল্যাণকর হইয়া ওঠে। এই অবস্থাকেই আমরা "রাজনীতির ঊর্ধ্বে" বলিয়াছি অর্থাৎ এমন অবস্থার সৃষ্টি করিতে হইবে, যাহাতে রাজনীতি আমাদের প্রভু না হইয়া আমাদের দাস হইবে।

প্রসঙ্গত

পুরো এক সপ্তাহের কাগজ ঘাঁটাঘাঁটি করে লেখার বিষয় খুঁজছিলুম। ছাইকে অনাদর করতে নেই, মহাজনেরা বলেছেন, দেখলেই উড়িও, অমূল্য রতন পেলেও পেতে পার। ক্রিয়াপদটির অনিশ্চিত ভঙ্গি লক্ষণীয়। পেলেও পেতে পার অর্থাৎ পাবেই যে এমন নিশ্চয়তা নেই, হয়ত বা ঘাঁটাঘাঁটিই সার হবে। গোটা সপ্তাহের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পরিক্রমা করে আমরাও এমন কিছু অমূল্য রত্নের হদিশ পেলুম না। তার মানে এই নয় যে, পৃষ্ঠাগুলি সাদা ছিল, দৈনিক পত্রিকাগুলি পাঠকের হাতে 'ব্ল্যাংক পেপার' সাবমিট করেছে। ও-কাজটা একমাত্র পরীক্ষার্থীরাই করে থাকেন, তাও কেউ-কেউ এবং মাঝে-মাঝে। পৃষ্ঠাগুলি ভরাই ছিল, নানা খবর সারে সারে সাজান স্তম্ভগুলির গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল। কেন্দ্রীয় বাজেট, আমদানী সম্পর্কে সরকারী নীতি ইত্যাদি ছোট-বড়-মাঝারি নানা সংবাদে চোখ বুলিয়ে দেখলুম, টিপ্পনীর পক্ষে কোনটা বেশী উপযুক্ত। যোগ্যতা, এখানে বলে রাখা ভাল, শুধু বিষয়ের নয় টিপ্পনিকারেরও বটে। ধরা যাক, কেন্দ্রীয় বাজেট ; বিষয় হিসাবে কুলীন, কিন্ত তা নিয়ে চট করে কিছু লিখতে যাওয়া সাজে না, তা হলে হয়ত অব্যাপারেষু ব্যাপারং হয়ে দাঁড়াবে, সোজা ভাষায় যাকে বলি অনধিকার চর্চা। আবার এ-ও ত ঠিক বিদেশী লোক-প্রসিদ্ধি যা বলে, দেবদূতরাও যে-পথ মাড়াতে ভয় পান, মূঢ়েরা সেখানেই ছুটে যায়।

অতএব বাজেট নিয়েই কিছু বলি। আগামী বৎসরে রাজস্ব খাতে ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৮২ কোটি টাকা, এ-খবর বড় আদার ব্যাপারীর কাছে জাহাজের খবরের জন্য নিষ্প্রয়োজন বোধ হতে পারে। কিন্ত সিগারেটের দাম বেড়েছে কিনা, এই খবর জানতে ধূমপায়ী মাত্রেরই উৎসাহ হওয়া স্বাভাবিক। এত দিনে অবশ্য তাঁরা সকলেই জানেন, বেড়েছে। কোম্পানী বিশদ বিজ্ঞাপন প্রচার না করলে এত দিনে আরও বাড়ত, এবং ধার্য অতিরিক্ত করের সঙ্গে তার কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকত না। যাঁরা গাড়িঘোড়া চড়ে থাকেন, (ঘোড়ার গাড়ি নয়, কিন্তু—মোটর), টায়ার ফাঁসলে তাঁদের কিছু বেশী খেসারত দিতে হবে, ডিজেল তেল ব্যবহারকারীদেরও। দামে যদি মান বাড়ে, তবে বনস্পতিরও কিছু মান অবশ্যই বেড়েছে। কৃত্রিম রেশম বস্তুটা সূক্ষ্ম হতে পারে, কিন্তু তার মূল্যের বৃদ্ধিটা স্থূল চোখেও নিশ্চয় ধরা পড়বে। সর্বসাকুল্যে নতুন করভারের পরিমাণ তেইশ কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা।

ঘাটতি তবে আসলে কত? বিরাশি থেকে তেইশ বাদ দিলে যত কোটি টাকা বাকী থাকে, তত, না আরও বেশী? বাজেটের খবরেই আছে, মূলধন খাতের আয়-ব্যয় মিলিয়ে ঘাটতির পরিমাণ একটা হৃৎকম্পক সংখ্যা—২৪৫ কোটি টাকা। তবু সংবাদ-পত্রের শিরোনামায় সেই ৮২ কোটি টাকা, অর্থাৎ রাজস্ব খাতে ঘাটতির হিসাবটাই উল্লিখিত হল কেন?—এই কারণে যে রাজস্ব খাতে আয়-ব্যয়ের হিসাবই অর্থনৈতিক অবস্থাটা ঠিকমত প্রতিবিম্বিত করতে পারে।

যেমন ধরা যাক, আমার মাসিক বেতন দুশো টাকা। কিন্তু খরচ দুশো পঁচিশ। ঘাটতি তবে পঁচিশ টাকা। এইটা আসল এবং মূল হিসাব, এবং এক অর্থে এইটাই ঠিক। অবশ্য সংসার চালানর প্রয়োজনে আমি পৈতৃক কিছু শেয়ার বেচে বা গহনা বন্ধক রেখে বাড়তি গোটা পঞ্চাশেক টাকা সংগ্রহ করতে পারি, তা হলে ঘাটতি উবে গিয়ে উদ্বৃত্ত দাঁড়াবে। পঁচিশ টাকা। কিন্তু এটা উদ্বৃত্তের মধ্যে গণ্যই নয় এবং আমার বৈষয়িক অবস্থা বা দুরবস্থার সঠিক চিত্র এতে পাওয়া যাচ্ছে না। সুতরাং ধ্রুব আয় এবং অপরিহার্য ব্যয়ের হিসাব ধরাই ভাল। রাজস্ব খাতের ঘাটতিকে সেই কারণেই মূল বলেছি।

* * *

অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্য লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে বাংলা চিত্র-জগতের যে ক্ষতি ঘটল, তা সহজে পূরণ হবার নয়। এবং এই মৃত্যুতে ক্ষতি শুধু চিত্র-জগতেরই হয় নি। ধীরাজের প্রতিভা ছিল বহুমুখী। জীবনের যে নানান ক্ষেত্রে সেই প্রতিভা তার প্রকাশের পথ খুঁজে নিয়েছিল, অভিনয় তার অন্যতম। প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে অভিনয়-শিল্পই যেহেতু সবচাইতে জনপ্রিয়, তাই ধীরাজকে অনেকে শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা বলেই জানেন। এ-পরিচয় অবশ্য সামান্য নয়, তবে আমাদের বলবার কথা এই যে, আরও অনেক অসামান্য পরিচয় তাঁর ছিল। দেশ পত্রিকার পাঠকেরা জানেন, তাঁর লিপিকুশলতাও বড় সামান্য ছিল না। আমাদের কাছে অবশ্য বন্ধু-বিয়োগের দুঃখটাই এখন সবচাইতে তীব্র হয়ে উঠেছে।

ধীরাজকে আমরা আমাদের বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম। এ যে আমাদের কত বড় সৌভাগ্য, মানুষ-ধীরাজকে যাঁরা চেনেন না, তাঁদের পক্ষে সেটা উপলব্ধি করা কঠিন হবে। তাঁরা কী করে জানবেন যে, বাইরের মানুষেরা যাঁকে শুধুমাত্র ধীরাজ বলে চিনেছিলেন, বন্ধু-মহলে তিনি ছিলেন রাজাধিরাজ। বন্ধুদের তিনি ভালবাসতেন, বন্ধুরাও তাঁকে ভালবাসত। সেই ভালবাসার ঘরে সব-কটি দরজাই ছিল অনর্গল। বুকের কথাগুলি সেখানে অনায়াসে মুখে উঠে আসিত। অনায়াসে সবাই হাসতে পারত, হাসাতে পারত। একটা কথা বলবার আগে তিনবার ভাবতে হত না। বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে বসে আছেন, এবং একটার-পর-একটা গল্প বলে যাচ্ছেন তিনি, শ্রোতৃবৃন্দের মুখের উপরে কখনও আনন্দের আলো ভেসে উঠছে, কখনও দুঃখের অন্ধকার ; চা আসছে, সিগারেট পুড়ছে, ঘড়ির দিকে তাকাবার কথা কারও মনে নেই—এই পরিচিত ছবিটি এখনও অনেক দিন আমাদের উন্মনা করে রাখবে। বিশ্বাস করা সত্যিই একটু শক্ত হবে যে, তিনি নেই, আর-কখনও তাঁকে দেখা যাবে না।

ধীরাজ লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর বিয়োগে আমরা নিজেরাই এতদূর শোকসন্তপ্ত হয়ে আছি যে, তাঁর স্বজনবর্গকে সান্ত্বনা জানাবার মতন ভাষা আমরা খুঁজে পাচ্ছিনা। তাঁর আত্মার আমরা শান্তি কামনা করি। দুঃখজর্জর এই পৃথিবীকে তিনি অনেক আনন্দের জোগান দিয়েছিলেন। যে নূতন বিশ্বে তিনি গিয়েছেন, প্রার্থনা করি, তাঁর পরমতম বন্ধুকে, পরমতম আনন্দকে তিনি সেখানে খুঁজে পাবেন

৫ই মার্চ আংকারায় মার্কিন সরকার এবং তুর্ক, ইরাণ ও পাকিস্তানের মধ্যে পৃথক পৃথক, কিন্তু একই মর্মে তিনটি দ্বি-পাক্ষিক সামরিক চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। এই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলিকে বাগদাদ চুক্তির ভস্মাবশেষ থেকে উত্থিত বলা যায়। গত জুলাই মাসে লণ্ডনে বাগদাদ চুক্তির মিনিস্টিরিয়াল কাউন্সিলের অধিবেশনের যে-দিন ধার্য ছিল তার প্রায় অব্যবহিত পূর্বে ইরাকে বিপ্লব সংঘটিত হয়। তখনই বুঝা যায় যে, বাগদাদ চুক্তির আসল ভিত্তি ধ্বসে গেছে। লণ্ডনের বৈঠকে যাঁরা সম্মিলিত হলেন তাঁদের তখন চিন্তা হোল এই লোকসান কীভাবে পূরণ করা যায়। তারই ফলে একটি ঘোষণা করা হয়, যাতে বলা হয় যে, বাগদাদ চুক্তির যারা অংশীদার ছিল, তারা আত্মরক্ষা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা করে এবং তার জন্য বিশেষ চুক্তি করতে পারবে। এরূপে ঘোষণাকারীদের নিরাপত্তা এবং আত্মরক্ষার কাজে সহায়তা করার জন্য মার্কিন সরকার তাদের সংগে চুক্তিবদ্ধ হবেন বলেও ঘোষণা করা যায়। সেই ঘোষণা অনুযায়ীই এই তিনটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। লণ্ডনের পরেও বাগদাদ চুক্তির মিনিস্টিরিয়াল কাউন্সিলের আর একটি অধিবেশন হয়েছে—করাচীতে। তখনও লণ্ডন বৈঠকের ঘোষণানুযায়ী মার্কিন সরকারের সংগে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলির সর্তের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় নি। করাচী বৈঠকের সময়েই চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হবে বলে একটা রব উঠেছিল বটে, কিন্তু কার্যত তা হয় নি। চুক্তির সর্ত নিয়ে তখনও মতদ্বৈধ চলছিল। কোনো কোনো বিষয়ে ইরাণ ও পাকিস্তানের আপত্তি থাকার দরুনই নাকি ব্যাপারটা আটকে ছিল। ইরাণ চায় যে চুক্তিতে ইরাকী আক্রমণের বিরুদ্ধে মার্কিনের সহায়তা পাওয়া যাবে—একথা পরিষ্কার লেখা থাকা চাই। পাকিস্তান চায় চুক্তিতে ভারতবর্ষকে সম্ভাব্য শত্রু বলে স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হোক। এই সবের জন্য আমেরিকার সংগে দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলির সম্পন্ন হতে এতো দেরী হোল।

চুক্তির প্রকাশিত সর্তগুলির মধ্যে ইরাণ বা পাকিস্তানের দাবির সুস্পষ্ট স্বীকৃতি নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী বলেছেন যে, এই নব-সম্পাদিত চুক্তি কেবলমাত্র কম্যুনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য হবে তা নয়, যে-কোন দিক থেকে আক্রমণের বিরুদ্ধেও তার প্রয়োগ চলবে। আক্ষরিক ভাবে দেখলে চুক্তির এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। কারণ চুক্তির মধ্যে 'কম্যুনিস্ট' কথাটির উল্লেখ কোথাও না থাকলেও যে-সব মার্কিন আইনের ইংগিতে উল্লেখ আছে, তা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে, এই চুক্তি অনুসারে প্রতিশ্রুত মার্কিন সামরিক

সাহায্য কম্যুনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধেই মাত্র প্রযুক্ত হতে পারে। চুক্তির বয়ান প্রকাশ করার সংগে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছেন তা থেকেও তাই প্রতিপন্ন হয়। পরে উক্ত দপ্তরের জনৈক মুখপাত্রকে প্রশ্ন করা হলে তিনিও বলেন যে এই চুক্তি কেবল কম্যুনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য হবে। তাঁকে যখন এই প্রশ্ন করা হয় যে, ভারত যদি পাকিস্তানকে আক্রমণ করে তাহলে কী হবে, তখন তার উত্তরে তিনি বলেন যে, সেরূপ পরিস্থিতি এই চুক্তির আমলে আসবে এরূপ মনে করা হয় নি। ভারত যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে, তাহলে একটা বিশেষ গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, কিন্তু সে অবস্থায় মার্কিন সরকার কী করবেন সে বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র বর্তমানে কোনো ভবিষ্যৎবাণী করতে রাজী হন না।

এদিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত নয়াদিল্লীতে পন্ডিত নেহরুকে এই বলে আশ্বস্ত করতে চান যে, নূতন চুক্তির দ্বারা পূর্বের অবস্থার কোনো পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে না। মার্কিন সামরিক সাহায্য পূর্বের মতোই কেবলমাত্র কম্যুনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য হবে এবং সে সাহায্যদানও পূর্বের ধরণেরই চলবে, নূতন বা পূর্বের চেয়ে বেশি কিছু দেবার কোনো কথা হচ্ছে না।

এটা কিন্তু ঠিক বলে মনে হচ্ছে না। কারণ, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে চুক্তির সংগে যে-বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়েছে তাতেই রয়েছে যে, এই সব দেশের সংগে বর্তমানে যে-সব দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি রয়েছে, নূতন চুক্তি সেগুলির স্থান নিচ্ছে না, নূতন চুক্তি সেগুলির পরিপূরক হবে, অর্থাৎ সেগুলির অপূর্ণতা দূর করবেঃ

"The agreements announced today supplement, but do not replace, the existing bilateral agreements which the United States has concluded with the three Governments."

এর সংগে "নূতন কিছু হচ্ছে না" উপরে কোনো সংগতি নেই। পাকিস্তান সরকার চুক্তির যে-ব্যাখ্যা করছেন তা করা পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কোনো গোপন প্রতিশ্রুতি না পেলেও অসম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে মার্কিন প্রদত্ত অস্ত্রাদি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা পাকিস্তান সরকারের নেই। কারণ কম্যুনিস্ট বহিরাক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা এবং নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য বিদেশী সামরিক সাহায্যের প্রয়োজন আছে একথা পাকিস্তানে কেউ বিশ্বাস করে বলে মনে হয় না। তবে কিছু লোক আছে যাদের কাছে ভারতের বিরুদ্ধে অস্ত্র সংগ্রহ করার নীতির একটা প্রবল আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণই পাকিস্তানী নীতির উপজীব্য। সুতরাং মার্কিনদত্ত সামরিক সাহায্য ভারতের বিরুদ্ধে প্রযোজ্য নয়, একথা স্বীকার করলে সেই নীতিরই মূলোচ্ছেদ হয়। সুতরাং পাকিস্তানকে যদি সামরিক সাহায্য যোগাতে হয়, তবে পাকিস্তানী গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক চুক্তির পূর্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যায় মার্কিন সরকারের পক্ষে শক্তভাবে বাধা দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এই রকম গোলেমালে হরিবোল চলতে থাকবে।

মার্কিন গভর্নমেণ্ট ভারতকে যা বুঝাচ্ছেন তাতে পাকিস্তান গভর্নমেণ্টের বিশেষ যায় আসে না, কারণ পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট মার্কিন সরকারের মনোভাব নিয়ে ব্যস্ত নয়, অস্ত্রগুলো পেলেই লোকদের বুঝানো যাবে যে, "আমেরিকা যাই বলুক অস্ত্রগুলো ত আমাদের হাতেই আসছে।" কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এই অবস্থায়ও বাকবিতণ্ডা যেভাবে চলছে তাতে ভারতের বিরুদ্ধেই এক ধরনের প্রপাগাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এমনভাবে প্রশ্নোত্তর চলছে, যাতে অজ্ঞাতসারেই পৃথিবীর লোকের মনে এই ধারণা জন্মাতে পারে যে, ভারতবর্ষেরই যেন পাকিস্তানকে কোনো দিন আক্রমণ করার মতলব আছে। তা না হলে যে-কোনো আক্রমণের বিরুদ্ধে না হয়ে কেবলমাত্র কম্যুনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রদত্ত সামরিক সাহায্য প্রযোজ্য হবে শুনলে আমরা অপেক্ষাকৃত আশ্বস্ত হই এরূপ ভাব আমরা দেখাচ্ছি কেন? ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করলে এই চুক্তি প্রযোজ্য হবে কি না এই রকম প্রশ্ন হতে দিতেই বা আমাদের আপত্তি হচ্ছে না কেন? ভারত সরকারের প্রচার-বিশেষজ্ঞদের এদিকে একটু দৃষ্টি দিলে ভালো হয়।

৯।৩।৫৯।

সন্তোষকুমার ঘোষ

১৯

সে দিন সৌর অনেক রাত অবধি ঘুমতে পারেনি। তাই বলে বলাও চলে না যে, সে জেগেছিল। আসলে তন্দ্রা আর জাগরণের মধ্যে একটা বিন্দু আছে যা, ধ্রুবতারার মত স্থির, সেখানে পেঁছে সৌরও স্থির হয়ে ছিল। অথবা সে যেন কোন সমুদ্রতীরে বালির শয্যায় শুয়ে আছে। জলের একেবারে কাছাকাছি—এক একবার অস্থির, উচ্ছ্বসিত ঢেউ তার শরীরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, সে তলিয়ে গেল, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য মাত্র, কেননা পরক্ষণেই সে ভেসে উঠছিল, ফেনা-মাখা চোখ মেলে আকাশের দিকে চাইছিল।

সমুদ্রতটে তার শরীর নিয়ে ঢেউ যা করতে পারত, তার নিজের ঘরে তার মন নিয়ে ঘুম তাই করছিল। পিছিয়ে গিয়ে গিয়ে নিরিখ করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। ঢেউ কেন, সেই ঘুমকে শিকারী বেড়াল বলেও কল্পনা করা যায়, তার চেতনাকে ছোট্ট একটা বল বলে। নরম থাবায় ধরা দেয়, ফের ছিটকে ছুটে বেরিয়ে যায়।

সৌর ছটফট করছিল আর বলছিল মনে মনে, 'আজ আর আমার ঘুম হবে না। তবু কেন শুয়ে আছি এই বিছানায়, কেন ছাতে চলে যাইনি, সেখানে আর কিছু না হক, তারাদের ত গুনতে পারতাম। গোনা শেষ হত না জানি, কারণ রাত ফুরয় কিন্তু তারা ফুরয় না। যদি আমাদের দেশের সেই বাড়ি হত, তবে এখন চলে যেতাম বাড়ির পিছনের বাগানে, লেবু পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে বুক ভরে তার গন্ধ নিতাম। সেই ছেলেবেলায়, যখন আমার প্রায়ই খুব জ্বর হত, যন্ত্রণায় ছটফট করে করে হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে যেতাম, আজও সেই রকম হলে মন্দ হয় না। অজ্ঞান হলেও আমি থাকব, কিন্তু আমার অস্থিরতা থাকবে না, এই যে মাথার ভিতরে ছুঁচ বিঁধছে, এটা থাকবে না, অজ্ঞানতা ঘুম নয়, কিন্তু ঘুমের চেয়েও গভীর। কালো একটি দহের উপরের স্তরে ঘুম, মাঝখানে জ্ঞান বিলোপ, সবচেয়ে নীচে মৃত্যু।'

অজ্ঞানতা নয়, মৃত্যু নয়, সৌর শেষে ঘুমকেই পেয়েছিল।

সৌর চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, মেয়েটিই ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় ওকে চুপ করতে বলল। ওই ভঙ্গি দেখেই সৌর তাকে চিনতে পারল। কিংবা এই রাত্রির চেয়েও কালো চোখ দেখে।

'মায়া, তুমি?'

মায়া হাসছিল। 'কি করে আমার নাম জানলে?'

'বা-রে, তোমার নাম মায়াই ত। আমি জানি।' সৌর বিছানার এক পাশে সরে গিয়ে ওকে বসতে বলল। মায়া কিন্তু বসল না। একটু সরে জানালার কাছে, যেখানে জ্যোৎস্নার একটুখানি অভ্র গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়েছিল, সেখানে জানালার শিক ধরে দাঁড়াল। তার ছায়াটাকে ঠেলে দিল সৌরের দিকে। সৌর হাত বাড়াল, কিন্তু অবাক হল সেই ছায়াটাকেও ছুঁতে পারছে না দেখে। দরজা এখনও ভিতর থেকেই বন্ধ, তবু ও কী করে এল—সৌরের বিস্ময়ের সেও একটা কারণ।

ছায়ার দিকে চোখ রেখে, কিন্তু জানলার কাছে দাঁড়ান কায়াকে উদ্দেশ করে সৌর বলল, 'আমি জানতাম, তুমি আজ আসবে।'

মায়া হাসছিল। ও পাশের জানালায় শিকের ওপর চোখ রেখে যেভাবে তাকায়, আজ এত কাছে এসেও সেই ভাবেই তাকিয়েছিল। 'জানলে কী করে?'

সৌর বলল, 'জানলাম! কিন্তু—কিন্তু তুমি বসবে না?'

মায়া মাথা নেড়ে বসতে অস্বীকার করল।

'কী করবে তবে?'

'দাঁড়িয়ে থাকব।'

'ওখানে—এইভাবে—সারা রাত? বেশ, থাক তবে।' সৌর যেন রাগ করল, 'আমি এই ও-পাশ ফিরলুম, চোখ বুজলুম।'

'আমি তবে যাই?'

শশব্যস্তে উঠে বসে সৌর বলল, 'না, না, না। আমি বরং চোখ খুলে রাখছি, তোমাকে দেখছি।'

সৌর সত্যিই দেখছিল, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মায়াকে কি সুন্দরী বলা যায়? যায় বই কি। এতদিন দূরে থেকে দেখেছি, টের পাইনিত, ওর চুল এত ঘন, কালো, যা মেঘ হয়ে অনায়াসে ওর সারা পিঠ ছেয়ে ফেলতে পারে। এখন অবশ্য ছেয়ে নেই, বিনুনির সাপ দুটিকে ও খোপার ঝাঁপিতে বন্ধ করে ফেলেছে। কাছে থেকে না দেখলে ত আমি টের পেতাম না যে, ওর থুতনির নীচে ছোট্ট একটি তিল আছে। কোমরটা একটু বেঁকিয়ে জানালার শিকে হাত রেখে ও যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, আমার দেখতে ভাল লাগছে। যেভাবে আছে, ও ওইভাবেই থাকুক, আমি ওকে ছোঁব না, ধরতে চাইব না। আকাশ জুড়ে যখন চাঁদের আলোর বাঁধ ভাঙে, তখনও ত চেয়ে চেয়েই দেখি, তাকে কি ছুঁতে চাই, হাতের মুঠোয় বন্দী করি? দুর্বা ঘাসে হাত দিলেই তার গজমোতি শিশির ঝরে পড়বেই।

আর তখনই লতাকে মনে পড়ল। সেই যে চাপা নাক, ছোট তিল, যেন সব সময়েই সাবানে ফাঁপানো ঈষৎ বাদামী চুলের রাশি, আর ঘন ভ্রূর মাঝখানে স্থিরায়ত দুটি চোখের মণি, চকচকে মাজা রঙ, পালিশ-করা ব্রাউন চামড়ার মত।

লতাকে মনে পড়তেই সৌর অস্থির হয়ে উঠল, লতা সেই মেয়ে যে তাকে কয়েকটি উত্তেজিত মুহূর্তের সান্নিধ্য ছাড়া কিছু দেয়নি, অথচ নিয়েছে অনেক। অনেক? প্রকৃতপক্ষে কতখানি? ভেবে কূল পেল না সৌর, বলে উঠল, যেন নালিশ করছে এমন সুরে, "জান মায়া, লতা আমাকে ভালবাসে না।"

মায়া বলল, "জানি।" জানে? কত জানে এই মেয়েটা, আরও কী জানে। সৌরর মনে হল, একদৃষ্টে মায়া ওর দিকে চেয়ে আছে, অপলকে ওকে লক্ষ্য করছে। কেন, ওকে কি বাজিয়ে দেখতে চায়? সৌরকে বিচার করবে এই একরত্তি একটা মেয়ে? ওর কতখানি সাহস? অধিকার ওকে কে দিয়েছে? সৌরই ত রোজ সন্ধ্যায় আলো জেলে ওকে চিঠি লিখতে মনে নেই? সে-ই আজ সময় বুঝে এসেছে, তোমার ভালবাসার মাপ নেবে।

কী মাপ, কিসের মাপ, জোরে জোরে মাথা নেড়ে সৌর বলল, কোন মাপ আমি দেব না। ওকে যখন চেয়েছি, চিঠি লিখেছি, তখনও বলতে কি, এই পৃথিবীর অনেক কিছুই দেখিনি আমি, এর রীতিনীতির প্রায় কিছুই জানতুম না। তাই ঢের ছেলেমানুষি করেছি—তোমাকে আমার চিঠি লেখার সখী করতে চেয়েছি। পাওয়ার সংজ্ঞা আমার কাছে কী নিরস্থি-নীরক্ত ছিল। আজ ত আমি জানি, পাওয়া কত নিবিড়, কী সর্বনাশী-সর্বগ্রাসী! রক্তের স্বাদ-পাওয়া বাঘের মত আজ আমি লোভী।

আমি এখন এই মুহূর্তে লোভ করছি তোমাকেও। তুমি, যাকে এতদিন দূরে রেখে, দূরে থেকে ভালবেসে এসেছি। কে জানে, হয়ত লোভ করছ তুমিও। ওই যে খানিক দূরে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছ, এটাও তোমার ছলনা। তুমি চাও, আমি উঠে পড়ি, তোমাকে ধরতে হাত বাড়াই। নইলে এই নিশুতি রাতে আসার আর কী মানে হতে পারে। আসবে, অথচ ধরা দেবে না, এ কেমন খেয়াল তোমার।

আমি তোমাকে ধরতে পারি। পারি, পারি পারি। তিনবার শব্দটা মনে মনে উচ্চারণ করে সৌর যেন তার সংকল্পটাকে কঠিন করল। স্ফীত হল নাসারন্ধ্র, দৃঢ় হল হাতের মুঠি। সৌর বিছানায় সোজা হয়ে বসল।

মায়া তখনও হাসছে।

হাস, আর এক মুহূর্ত বই ত নয়। এখুনি আমি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি জান, তোমার ওই ছলনাভরা মুখ আমার বুকে নুইয়ে আনতে পারি। পাওয়ার মানেটা আমি পুরোপুরি জেনে নেব। শুধু চোখ আর কতটুকু পায়। নাসিকা, কর্ণ, স্পর্শ—অন্য শরিকেরাও আছে না? তারাও তাদের ভাগ বুঝে নেবে। আমি তোমার বুকে কান পেতে হৃৎস্পন্দের ধ্বনি শুনব, সেই ধ্বনিকে ঈর্ষাও করব, কেননা ও তোমার অন্তরের অন্তস্তলে থেকে উঠে আসছে, সেখানে ত আমি পৌঁছতে পারি। আমার নাক যখন ঘ্রাণ নেবে তোমার কেশগুচ্ছের, তখনও তাকে আদরের সঙ্গে সঙ্গে হিংসাও করবে। কেননা, তোমার চুলের মূলেও যে গভীরে, সেখানে আমি নেই। আমার স্পর্শ দিয়ে তোমার ত্বকের শুধু ওপরের পরতটুকু পাব।

পাবই। সৌর বলল দাঁতে দাঁত চেপে। ওই শিকটাকে ধরে আছ বলেই তুমি নিরাপদ, এমন কথা ভেব না।

সৌর বিছানা ছেড়ে বুঝি উঠেও পড়েছিল, এগিয়েছিল টলতে টলতে, কিন্তু মায়া ওখানে ছিল না। আর কিছু মনে নেই।

* * *

পরদিন, আর কোনদিন, সৌর পাশের বাড়ির জানালার দিকে চাইতে পারেনি। একটা লজ্জা আর গ্লানিবোধ ওকে পাকে পাকে জড়িয়ে অবশ করে ফেলেছিল। আয়নার দিকে চেয়ে সৌর চোখের কোলের কালি দেখছিল আর বলছিল, কাল রাত্রে আমার সব গেছে। মায়াকে আমি হারিয়েছি।

না, মায়া যে আসেনি, মায়া যে কখনও ওখানে ছিল না, সবটাই যে সৌরর কল্পনা, তাতে ভুল নেই। মায়ার আসাটা ভুল হতে পারে, কিন্তু সৌর যে তাকে পাবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল, তাতে ত কোন ভুল নেই।

আর সেই লোভই তার কাল হল। দূরে থেকে দেখার, চিঠি-লেখার অলস বিলাস দিয়ে সূক্ষ্ম, প্রায়-অদৃশ্য যে সম্পর্কের ঊর্ণতন্তু সে রচনা করেছিল, তা সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে গেল।

লতা গেছে, মায়াও রইল না। কী থাকল তবে। কিছু না। নিজেকে বারবার ধিক্কার দিল সৌর, কেন, আমি ওকে ওভাবে পেতে গেলুম। অনন্তক্ষণের চাওয়া দিয়ে, ভাবনা মিশিয়ে একটি পাওয়ার জ্যোতির্ময়ী মূর্তি গড়ে তুলেছিলুম, তাকে কেন কাদামাটির প্রলেপ দিতে গেলুম। কেন আমাকে এমন নেশায় পেল, কেন, কেন।

সেই কারণটাও সৌর অবশ্য জেনেছিল, তার ক্ষোভের অবধি ছিল না। সেই কারণটাও লতা। লতা তাকে ঠকিয়েছে, এতক্ষণ তাই নিয়ে দুঃখ ছিল মনে, কিন্তু লতাই মায়াকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। সৌর আক্রোশে থরথর করে কাঁপছিল। নারীকে কামনা করার একটা অর্থই আমার কাছে স্পষ্ট ছিল, সে অর্থটা বিদেহী, লতাই তাকে শরীর দিল। তাকে স্থান আর কালের খাঁচায় পুরে ছোট করে ফেলল। সেই সঙ্গে স্থূলেও। তাকে ওভাবে পেলুম বলেই ত মায়াকেও একইভাবে পেতে গেলুম। লতা একদিন ওর ঠান্ডা হাত দিয়ে আমার চোখ চেপে ধরেছিল, সেদিন থেকে আমার দৃষ্টিই বিকৃত হয়ে গিয়েছে, সব মেয়েকেই আমি লতার মত দেখছি। পুরুষ আর রমণীর একটা সম্পর্কই আমার কাছে স্পষ্ট, সত্য, আর সব মিথ্যে হয়ে গেছে।

ওকে ভালোবাসা না দিয়ে লতা ঠকিয়েছে, এতক্ষণ সেই যন্ত্রণাই ছিল। এবারে সৌর অনুভব করল তার চেয়েও কত বড় ক্ষতি লতা তার করেছে। জীবনে কোন মেয়েকেই সৌর আর অন্য চোখে দেখবে না, দেখতে পারবে না। মায়াকে, মায়াদের, লতাই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। পাওয়ার যে-পথটা অপরিসর অন্ধ, সৌর সেটাই চিনল। শুধু চাওয়ার না-পাওয়ার আকাশটা যে আরও বড়, অপার, সৌরর অনুভবে তা রইল না। (ক্রমশ)

মেন্দা ছাহেব বললেন, "বাবু মিঞার দেখি মাস্টারী করতি করতি বুদ্ধির চিরাগে রোশনি ধরেছে। কথাডা বলছি বড় ভাল। এই যে আমার জামাইডে মুক্তারি পাশ ক'রে ঝিনেদার কোর্টে ঘ'ষ পাড়ছে। পিরেন পাতলুন ছাপ করার কড়িডা জুটাতি পারছে না। মোছলমান মুক্তারির

বার
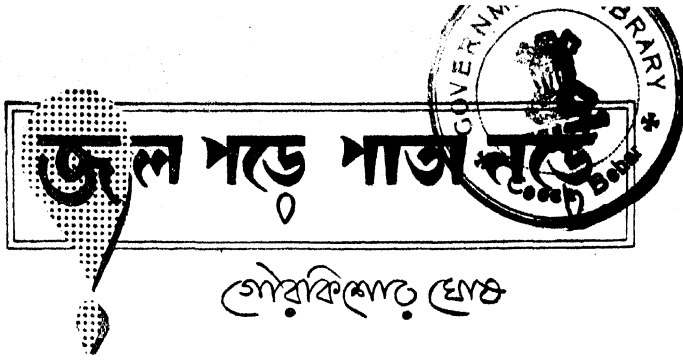
ভক্ত ঘোষ বলল, "হুজুর আমরা হলাম নিরেট গরুর শিষ্য। বিদের দৌড় যে কত সে তো ভালই জানেন। ঐ কয়ে কলাগাছ পর্যন্ত। বাবুগের ভাবের কথা কি সব বুঝতি পারি? তাও আবার কোন বাবু, না উকীল বাবু। মা-রে যিনারা কথার প্যাচে মাওই বানায়ে ছ্যাড়ে দ্যান।"

ভক্ত একটু থামল। শুধু হাতে চায়ের গেলাস ধরে বুঝল তাতটা কমে এসেছে। সুসুপ্ সুসুপ্ করে দুই চুমুকে গেলাস খালি করে দিল। তারপর পাগড়ির কোণা দিয়ে মুখটা বেশ করে মুছল।

বলল, "খুসোলের মামলার তদ্বির নিতি যোগেন মুহুরির কাছে গিছিলাম। যয়ে দেখি উকীলবাবুরা একখান খবরের কাগজের উপর হুমড়ি খায়ে পড়িছেন। মড়ির উপর শগুন পড়লি যেমন শোভা হয়, তেমনি হয়েছে। আর ব্যাঙাচির ন্যাজের মত মুহুরিরা সব নিজির নিজির বাবুর কাছার কাছে দাড়ায়ে আছেন। আর ঐ কুল বক্সী, অভয় বোস আর রামতারণ উকীলির ছাওয়াল গুড়গুড়ে চক্কোত্তি মুখ নাড়ে বাকির তুফান ছুটোয়েছেন। ভাবলাম, কলি উল্টোলো নাকি? শেষে শোনলাম, সে সব কিছু না, কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের প্যাকটো না কি ক্যাকটো, তাই হয়েছে। ভোট হবে। বাবুরা কাউন্সিলি যাবেন। হিন্দুরা হিন্দুগেরে ভোট দেবে, মুসলমানরা দেবে মুসলমানগেরে। হিন্দু মোছলমানে একত্তর হয়ে যাবেনে। এই তো বিত্তান্ত, আমি যা বুঝিছি, হাঁ, এইসব না কি সি আর দাস না কেডা, তিনার আজ্ঞে। যা জানি কলাম, এখন হুজুর, আপনারা বুঝে নেন।"

ভক্ত ঘোষের বয়ান শেষ হলে কিছুক্ষণের জন্য গদির মানুষদের মুখে কথা সরল না। এদিকের কথা থেমে যেতেই হাটের কোলাহল মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। হাটের তখন যৌবন অবস্থা। বেচাকেনা, দর কষাকষি, ছোটখাট তর্কবিতর্কের শব্দগুলো মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, কখনও একতাল শব্দপিণ্ডের সঙ্গে আরেক তাল শব্দপিণ্ডের প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধছে। প্রচণ্ড ধাক্কায় পিণ্ডাকৃতি গণ্ডগোল যেন আবার ভেঙ্গে ছোট ছোট শব্দে চুরচুর হয়ে যাচ্ছে। পরক্ষণেই ভাঙ্গাচোরা তোবড়ান শব্দগুলো আবার নতুন নতুন শব্দ সমষ্টির গায়ে লেপ্টে নতুন নতুন সব অর্থহীন অওয়াজ সৃষ্টি করছে।

মেজকর্তা অন্যমনস্কভাবে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ভক্ত ঘোষের কথার মর্ম বুঝতে চেষ্টা করছিলেন।

মেন্দা ছাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বোঝছেন মা'জে বাবু?"

এ সব রাজনীতির তত্ত্ব মেজকর্তা ভাল বোঝেন না। নিশানাহীন শিকারীরা বনের মধ্যে দুমদাম বন্দুকের দাওড় করে গ্রামের লোকেদের মনে যেমন সম্ভ্রমের সৃষ্টি করে, মেজকর্তার কাছে রাজনীতিকদের ক্রিয়াকলাপ অবিকল তেমনই ঠেকে।

মেন্দা ছাহেবের প্রশ্নে মেজকর্তা একটু হাসলেন।

বললেন, "বুঝলাম, হুজুগের আরেকটা ঢেউ আসছে।"

"ক্যান মা'জেবাবু, আপনি ইডারে হুজুগ বলছেন ক্যান?" সফীকুল মোল্লা এক পাশে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল, এবার খ্যানখেনে গলায় প্রশ্ন করল। কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে উঠল, "আমি তো মনে করি, আদ্দিন পরে হিঁদুগের আক্কেলের গড়ায় পানি পড়েছে। ভোট যদি সত্যিই আলাদা আলাদা হয়, মোছলেম জাহানের তাতে তরক্কিই হবে। চাকরি বাকরির সুবিধে আমাদের কিছু হতি পারে।"

মেজকর্তা বললেন, "সে তো এখনও হতে পারে সফীক মিঞা।"

সফীক একটু তিক্ত হাসি হাসল।

বলল, "পাগল হয়েছেন মা'জেবাবু, আমাগের কি চাকরি কেউ দেয়। গায় যে পিয়াজ রসুনির গন্ধ। তাছাড়া আপনাগের ঘরে ঘরে আই এ, বি এ, এম এ। মোছলমানের ছাওয়াল এনট্রান্স পাশ ক'রলো যদি, সে বড় পীর। সুজা রাস্তায় আপনাগের নাগাল ধরতি আমাগের দুডো তিনডে জনম কাবার হয়ে যাবে। তা তদ্দিনের এন্তেজারে কি কেউ থাকতি চায়।"

কেঁস্‌ হিঁদ্‌্‌তেউ দ্যায় না, মোছলমানেও দ্যায় না। ভদ্মসাই পায় না। তাইতো খায়ে না খায়ে ন্‌র্‌্‌রি কলকেত্তায় পাঠালাম। যাও বাপ, অন্তত গিরাজ্‌য়েট পাশ ক'রে আ'সোগে।"

সফীক বলল, "খোদা আপনার মনের ইচ্ছে প্‌রোয়ে দেন। কিন্তু দিনকাল যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে নিজির কোলে ঝোল টানার চিন্তা না করলি বাঁধা মার খাতি হবে। মোছলেমদের জান্য আলাদা ব্যবস্থা করার সত্যিই দরকার হয়ে পড়িছে।"

তর্কে বিতর্কে মেজকত্তা বড় একটা ভিড়তে চান না আজকাল। সফীকুলের কথা শ্‌নে তাঁর মনে হল, লোকটা যা বিশ্বাস করে তাই বলছে। এইসব লোক কোন কিছ্‌ তলিয়ে বোঝে না। আস্থা-ভাজন লোকেরা যা ব্‌ঝিয়ে দেয়, তাই এদের কাছে শেষ কথা। চাকরি চাকরি করেই এরা হন্যে হয়ে উঠেছে। শ্‌ধ্‌ এরা কেন, হিন্দ্‌ ম্‌সলিম সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড় দিয়েছে চাকরির ফল পাবার জন্য। কিন্তু কটা চাকরি আছে দেশে?

মেজকত্তা বললেন, "আমাদের দোষটা কি জান? আমরা বড় হাওয়ায় নেচে বেড়াই।

কোন জিনিসটাই তলিয়ে দেখার চেষ্টা করিনে। "সফীক মিঞা, তুমি জান বাংলায় সরকারী চাকুরের সংখ্যা মোট কত?"

সফীক মাথা নাড়ল। না, সে জানে না। সত্যিই জানে না।

মেজকর্তা বললেন, "সরকারী হিসেবেই, আমার যতদূর মনে পড়ছে, তিন লক্ষ একুশ হাজার, কি বাইশ হাজার। না হয়, ধর চার লক্ষই। আর বাংলায় লোকসংখ্যা এখন পাঁচ কোটি, তার মধ্যে মুসলমান ধর পৌনে তিন কোটি। এখন বল, ঐ চার লক্ষ চাকরিই যদি মুসলমানদের দেওয়া যায়, একটা পদও যদি হিন্দুদের না দেওয়া হয়, তাহলেই কি বাংলার মুসলমানদের সমস্যা মিটবে? তাহলেও যে দু কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মুসলমানের সমস্যা থাকে। তার ব্যবস্থা কি দিয়ে করবে?"

মেন্দা ছাহেব আর সফীকুল এক সংগে বলে উঠল, "বলেন কি মাজেবাবু! এমন কথা তো কেউ শুনোয় নি।"

মেজকর্তা বললেন, "আমাদের আসল সমস্যা কি এই যে, কার ভাগে কটা চাকরি পড়বে? সমস্যা তার চেয়েও ঢের ঢের বেশি জটিল। এই পাঁচ কোটি লোকের জন্য কিভাবে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা যায় তাই ভাবা, তার জন্যে ব্যবস্থা করা তাই হ'ল প্রকৃত সমস্যা। এখন বল, সরকারী চাকরি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিলেই কি দেশের তাবৎ লোককে দুধে-ভাতে রাখার ব্যবস্থা করা যাবে? দেশের আসল যা রোগ, দারিদ্র্য রোগ, তার চিকিৎসা না করে, কলকাতায় বসে কালনেমির লঙ্কা ভাগ হচ্ছে। কলকাতায় বসে ফতোয়া ঝাড়লে, তা সে যিনিই ঝাড়ুন, আমার ধারণা, তাতে দেশের লোকের এক তিল উপকার হবে না। সে তুমি প্যাক্টই কর আর যাই কর।"

মেজকর্তা অনেকদিন পর একটু গরম হয়ে উঠেছেন যেন। অনেকদিনের অনেক কথা উৎস মুখে জমে ছিল। ধীরে ধীরে যেন গলতে শুরু করেছে।

বললেন, "আশ্চর্য আশ্চর্য সব ব্যাপার ঘটছে। বাইরে থেকে দেখলে তার যেন কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না। এই পাটের কথাই ধর। ভাবলেই আমার কেমন অবাক লাগে। বাংলা দেশ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও পাট হয় না। অথচ পৃথিবীর সব দেশে বাংলার পাটের চাহিদা! এই পাট জন্মায় যে চাষী তাকে যদি পাটের দামের ন্যায্য হিস্যা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে এই একটা ফসল দিয়েই আমার ধারণা, আজ দেশের অর্ধেক চেহারা বদলে ফেলা যেত। সে তো দূরের কথা, আজ পাটের চাপে আমাদের চাষীর জিভ বেরিয়ে যাচ্ছে। একদিকে এই অবস্থা, আরেক দিকে চটকলের মালিকরা কোটি কোটি টাকা লাভ করছে। সাহেব কোম্পানীতে কাজ করলাম এত বচ্ছর। দেখলাম তো সব। এমন দরদী লোক থাকত যদি দেশে, এমন বিচক্ষণ সব নেতা, যারা এসে অভয় দিত চাষীদের, বুঝিয়ে বলত, তোমার গায়ের জল ফেলে তৈরী ফসল নিয়ে অন্য লোকে মোটা টাকা লাভ করছে, এই আমরা পাটের ন্যায্য দাম ঠিক করে দিলাম তার নিচে কেউ তোমরা পাট বেচো না। তোমরা সবাই যদি এক-মতে থাক, তবে ঐ দামেই ওরা পাট কিনতে বাধ্য হবে। না যদি কেনে তবে সাধের কারখানা বন্ধ করে দিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। তবে ইংরেজের জাত বেনের জাত, প্রাণ গেলেও ব্যবসা বন্ধ করবে না। ঐ দামেই পাট কিনবে বাধ্য হয়ে। ওরা শক্তের বড় ভক্ত। তাহলে দেখতে দেশের "ভোল" ফিরে যেত। কোন নেতা একদিনের জন্যও এ নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, এমন তো শুনিনি। দেশের লোক নিয়েই তো দেশ। এরাই তো দেশের লোক। এদের দুর্দশার লাঘবের কথা না ভেবে, তার সুরাহার ব্যবস্থা না করে, দেশ দেশ বলে চেঁচানো যদি হুজুগ না হয়, তো হুজুগ আর কাকে বলে। একবার বলছি হিন্দুর জন্য হিন্দুর ভোট, মুসলমানদের জন্য মুসলমানদের ভোট, আবার সেই সংগেই বলছি হিন্দু মুসলিম ঐক্য। এসব ব্যারিস্টারি ভেল্কিবাজিতে কাউন্সিলেই ঢোকা যায়। তার বেশি কিছু হয় বলে তো আমার মনে হয় না।"

মেজকর্তার হঠাৎ মনে হল, যেন কেরাসিন কাঠের বাক্সে দাঁড়িয়ে একটা লেকচার দিচ্ছেন। সেই পুরনো আমলের রোগ। অমনি তিনি মুখ বন্ধ করে ফেললেন। অনেক কথা মনের মধ্যে জমে উঠতে লাগল। কিন্তু না, আর বক্তৃতা নয়। সেসব দিন চুকে গেছে। তবু, মেজকর্তা ভাবলেন, লোকে যে বলে স্বভাব যায় না মরলে, কথাটা মিথ্যে নয়।

সফীকুলের চোখে সম্পূর্ণ আলাদা একটা ছবি ভেসে উঠল। এ ছবি সে দেখতে আদৌ অভ্যস্থ নয়। কিন্তু মেজবাবুর কথা এত পরিষ্কার, সফীক তা উড়িয়ে দিতে পারল না। ওর মনে কথাগুলো ধারাল কলম দিয়ে যেন লেখা হয়ে যেতে লাগল।

মেজকর্তা উঠে পড়লেন। বেলা যে গড়িয়ে গেল। হাট সারতে দেরি হয়ে যাবে।

শ্যাম রাণার দুখানা চিঠি তাঁর হাতে তুলে দিল। মেজকর্তা দেখলেন, একখানা চিঠি সুধাময়ের, কলকাতা থেকে আসছে। আরেকখানা ভূষণের, কোত্থেকে আসছে বোঝা গেল না। সুধাময়ের কলেজ বন্ধ কদিনের জন্য। সে আসছে বাড়িতে। ভূষণও আসছে বলে লিখেছে।

বেলা পড়ে আসছে। মেন্দা ছাহেবের সাঁঝের নেমাজের সময় প্রায় হয়ে এল। নিয়মিত দু ওখ্‌ত্‌ নেমাজ পড়েন মেন্দা ছাহেব। একটু পরেই তিনি উঠবেন।

মাথায় এবার একটা কাপড়ের টুপি পরবেন তারপর একখানা সতরঞ্জি আর বদনাটা নিয়ে উঠবেন। চলে যাবেন নদীর ধারে। বদনায় পানি ফিরিয়ে উজু করে নেবেন তারপর পরিষ্কার জায়গায় সতরঞ্জি বিছিয়ে আধঘণ্টা ধরে নেমাজ পড়বেন। ফকিরের দেওয়া একটা মালা আছে তাঁর। সেইটে জপতে জপতে গদিতে ফিরে আসবেন আবার।

সফীকুলও উঠব উঠব করছিল। মেজ-কত্তার কথাগুলো তখনও তার মগজে ঘোরাফেরা করছিল।

এমন সময় সোনামিঞা মুখটি চুন করে গদিতে ঢুকে পড়ল।

"আদাব আরজ বড় মিঞা", মেন্দা ছাহেবকে সে সালাম দিল।

"আদাব আরজ।" মেন্দা ছাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কি খবর, সোনা মিঞা?"

সোনা মিঞার বুক দুরদুর করে উঠল। কি করে কথাটা পাড়বে ভেবে পেল না। বদু কলুকে শেষ পর্যন্ত ধরতে পারেনি। রামকিষ্টোর সাহায্যে বলদটাকে অতিকষ্টে চাঙ্গা করে সে যখন খেয়া ঘাটে গেল, তখন সব ভোঁ ভাঁ। কোথায় বদু কলু আর কোথায় কে? চোখে অন্ধকার দেখল সোনা মিঞা। আগরওয়ালার খপ্পরে পড়তে ইচ্ছে হল না তার। গাড়ীটাকে অন্যের জিম্মায় রেখে নতুন ফড়ে ধরবার আশায় এদিক ওদিক ঘুরঘুর করতেই মেন্দা ছাহেবের গোমস্তা তুফান মিঞার সঙ্গে দেখা হ'ল। লালি পাট আছে শুনে সে সোনা মিঞাকে গদিতে আসতে পরামর্শ দিল। তাই সে এসেছে। টাকার তার বড় দরকার। আবার ছায়াদটাও আজ বড় খারাপ। কি আছে নছিবে কে জানে?

সাহস সঞ্চয় করে সোনা মিঞা বলল, "জে, মন পাঁচেক কুণ্টা ছিল—"

মেন্দা সাহেব কথা শেষ করতে না দিয়েই শোভান আল্লা বলে উঠে পড়লেন।

বললেন, "নেমাজের ওখ্‌তো হয়ে গেছে মিঞা। কুণ্টা এই সাঁঝে যাতে কিনতি পারি, যাই তার জন্যি আল্লাতালার কাছে আর্জি পেশ করে আসি গে। যা দিনকাল প'ড়েছে উপরআলার মেহেরবানি না পালি কিনাকাটা সব খতম করে দিতি হবেনে।"

শেষ ভরসাও হাত ছাড়া হয় দেখে সোনা মিঞা কি করবে বুঝে উঠতে পারল না। মেন্দা ছাহেব নিচে নেমে আসতেই হুড়মুড় করে তাঁর পায়ে গড়িয়ে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

বলল, "বড় মিঞা আপনি মেহেরবানি না করলি জানে মারা যাই যে।"

"আরে পা ছাড় পা ছাড়, বেকুব।"

মেন্দা ছাহেব অস্থির হয়ে উঠলেন।

বললেন, "গুণা হবে, গুণা হবে আমার। মুছলমান আল্লা রছুলের বান্দা, কারও পায়ে হাত দিলি দোজখে যাতি হয়। কোথাকার পাগল।"

সোনা মিঞা পা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তার রোগা চোখের দুকোণ বেয়ে মোটা মোটা চোখের জল বুকের হাড়তোলা খাঁচার উপর পড়ে এবড়ো খেবড়ো জমির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যেতে লাগল।

বলল, "গোস্তাকি মাফ করবেন বড় মিঞা। আজ আমার মাথার ঠিক নেই। ঘরে বিবি মর মর। ছাওয়াল নষ্ট হয়ে গিয়ে নাকি প্যাট পচে উঠিছে। ঝিনেদার বড় ডাক্তার না দেখালি বাঁচবে না। সরকারী ডাক্তাররে দেখাতি হবে। তা সে ষাট সত্তর টাকার ধাক্কা। কিছু কুণ্টা ধুয়ে আনিছিলাম। দোহাই খোদার, কুণ্টা কটা নিয়ে নেন। ভাল লালি কুণ্টা আছে, নিজির চোখি রঙ দেখে নেন।"

মেন্দা ছাহেব বললেন, "বড় বিপদেই ফেললে মিঞা। বিক্রি নেই, শুধু কিনেই যাচ্ছি। তা খোদার যা ইচ্ছে। বলি আজকের দর জান তো। তের টাকা।"

সোনা মিঞা আঁৎকে উঠল, "কন কি বড় মিঞা? জানে মরব তালি। এ যে লালি কুণ্টা। রেশমের মতন মুলায়েম। লম্বায় মাথা ছাড়ায়ে যায়। এর দাম তের টাকা! মাত্তর!"

মেন্দা ছাহেব এবার একটু উগ্র হলেন। "তুমি বড় ঘুঘু, মিঞা। তুমারে চিনিনে। আজ কারে পড়িছ তাই মেন্দার কথা মনে পড়িছে। ভাবিছ চোখির জলে পথ পিছল করে সড়সড়ায়ে চলে যাবা। সুখির দিনি আগরওয়ালা বাপ সাজে, কই, সে বাপ এখন দেখে না ক্যান। আঁ। আগরওয়ালার কাছে গিয়ে তো কই টাঁ ফোঁ কর না। যত তেড়পানি আমার কাছে। নরম মাটিতি বিড়েলে হাগে।"

বললেন, "দ্যাখ মিঞা, বাহাসের সুমায় নেই। নেমাজের ওখ্‌তো পার হয়ে যাচ্ছে। দিতি হয় দ্যাও, দিয়ে টাকা নিয়ে বিবির ইলাজ করো গে। আর না হয় রাস্তা দ্যাখ।"

উপায় কি? মেপে দিল সোনামিঞা। টাকা গুনে লুঙ্গির খুটে বাঁধতে বাঁধতে ভাবল, এই প্রথমবার ভাবল, এই পাটের দাম আগরওয়ালা সত্যিই কি এত কম দিত?

সফীকুলও বসে বসে ভাবছিল। একটু আগেই মেজবাবু এই ঘরে বসে বলে গেলেন, পাটের চাপে এদেশের চাষীর নাভিশ্বাস উঠেছে। মেজবাবু যা বলে গেলেন, তাই সোনামিঞা সফীকুলের চোখে আঙুল দিয়ে যেন দেখিয়ে দিয়ে গেল। সে ভাবছিল, সোনামিঞা আর মেন্দা ছাহেব দুজনেই কি মুসলমান? একই মুসলমান?

এমন কথা আগে আর ভাবেনি, এমন করে ভাবেনি সফীক। (ক্রমশ)

খালি পেয়ালা তুলতে এসে সুজাতা কথাটা পেড়েছিলো। হাতে পিরিচ নিতেই পেয়ালা ঈষৎ নড়ে ওঠে, কাচের ওপর কাচের টোকায় ঠুন্‌কো শব্দ বাজে ঘরে। কাগজ থেকে চোখ তোলে প্রশান্ত বলে—দেখো!

—ফেলিনি গো ফেলিনি।

—এই ফেললে ব'লে।

প্রশান্তর দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে নিজের হাতের দিকে চায় সুজাতা, দেখে পেয়ালাটা পিরিচের ওপর একদিকে কেত্‌রে রয়েছে। সামলে নিয়ে ও যখন তাকায় তখন প্রশান্ত আবার কাগজে মন দিয়েছে। সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে—'কালকের কথা মনে আছে তো?'

প্রশান্ত কোনো জবাব দেয়নি; সম্ভবত শোনেইনি সে কিছু। কেবল ঠোঁট দুটো তার নিঃশব্দে নড়ে, চোখের মণি চ'লে বেড়ায় সামনের কাগজের উপর। আনমনে, অভ্যস্ত হাতে, সে একটা সিগারেট ধরায়। সিগারেটটা টেনে যতক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ে ততক্ষণ তার মুখ থাকে স্বাভাবিক, অতঃপর আবার দুই ঠোঁট নড়ে, গোড়ায় অত্যন্ত অল্প, ক্রমান্বয়ে দ্রুত—কখনো অকস্মাৎ থমকায়—আর পাশে রাখা হাতের আলতো আঙুলে সিগারেট পুড়তে থাকে।

সুজাতা কাপ রেখে ফের ঘরে এসে বলে, 'কি, কিছু ব'লছো না যে?'

প্রশান্তর ঠোঁট নড়া এক নিমেষে বন্ধ হয়ে যায়, দৃষ্টি তখনো থাকে কাগজেই নিবদ্ধ। শেষে ও চোখ তোলে, কিছুটা বিমনা, সপ্রশ্ন চাউনি মেলে স্ত্রীর পানে। সুজাতা ওর চোখ দেখে মৃদু হাসলো, চেয়ারের হাতলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'আজ কিন্তু আমরা যাচ্ছি।'

—যাচ্ছি?

—বাঃ, ও-বাড়ি!

প্রশান্ত কিছু বলল না, ফের কাগজে চোখ ফেরালো। ক্ষণিক কাগজেই লক্ষ্য বিদ্ধ রইলো তার, চোখের মণি দুটো শুধু থাকলো স্থির, অনড়; ঠোঁট নিঃশব্দে ন'ড়লো না বিন্দুমাত্র। সুজাতা অপলক ওর মুখের পানে চেয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলে না, একটু অপেক্ষা করে, সময় নেয়। বিরতিটুকু কাটলে ও আস্তে কথা কয়, বলে, 'কই কি হ'লো?'

—কিসের?

—চুপ যে?

—তো কি ক'রবো?

সুজাতার হঠাৎ মন ঠোক্কর খায়; প্রথমটা কেমন দ'মে যায় সে। ফাঁকা-ফাঁকা, অবলম্বনহীন লাগে, ভিতরে ভিতরে। শূন্যতা বোধটুকু জড়িয়ে এলো তিক্ততা, বাতাসে, চাপা শীতকালের ধোঁয়ার মতো। ধীরে ধীরে একটু স'রে গিয়ে, খাটের বেড কভারটা টেনে মসৃণ ক'রে দিতে দিতে সে কথা কইলো, খাটো গলায় বলল, 'এই কাল বললে যাবে, আজ অমনি...!

—যাবো ব'লেছি...?

—অন্তত—ঃ সুজাতার গলা একটু অসহিষ্ণু শোনালো, বলল, 'যাবে না বলোনি।'

—না।

কয়েক পলক আর কোনো কথা হয়নি। সুজাতা পাশ বালিশটা মাথার বালিশের স্তূপের ভিতর থেকে টেনে বের ক'রে খাটের মাঝে, বেড কভারের তলায়, আড়া-আড়িভাবে গুছিয়ে রাখলো; তারপর বেড-কভার পেতে খাটে উঠে হাঁটু গেড়ে ব'সে টেনে মসৃণ ক'রে বিছাতে থাকে। কোনো কথা বলে নৈঃশব্দটুকু ভাঙে না। বরং প্রশান্তর শেষ কথায়, অন্তর্বর্তী স্তব্ধতায়, নিজের কাজের মধ্যে, আবার তার বিস্রস্ত আবেগ কেমন থই পায়, জোড়া লাগে। ভিতরে ভিতরে নম্র এক সংকোচও ঘেরে তাকে; কাজ সেরে স্বাভাবিকভাবে সে এদিকে ফিরতে পারে না, ব্রীড়ায় বাধে।

বাক্যালাপহীন বিরতির মধ্যে আলগা

আঙুলে চাপা সিগারেটটা একবার টানে প্রশান্ত, দেখে সেটা নিভে গেছে। পাশের টেবিলে রাখা দেশলাইয়ে কাঠি শেষ। তবু সেটাই তুললো সে, আপন মনে খুলে ফেললে: এবং দু'এক নিমেষ শূন্য খোলটার ভিতর দিয়ে এক চোখ বন্ধ ক'রে অন্য চোখে ঘরের মেজে লক্ষ্য করতে থাকে। অবশেষে খোল আর খাপটা না লাগিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে, পৃথক পৃথক দুই অংশ, টেবিলের ওপর সে ফেলে দেয়: অনামনা দৃষ্টিতে নিভে যাওয়া সিগারেটের ডগার দিকে চেয়ে থাকে। তবু সুজাতাকে ব'লতে পারে না দেশলাই দিতে। নিজেই ওঠে সে, আলনায় টাঙানো পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে একটা দেশলাই বের করে, সিগারেটটা ধরায়। অতঃপর চেয়ারে ফেরার মুখে প্রশান্তর নজর পড়ে খাটের ওপর কর্মরত স্ত্রীর পানে। অল্প ঝুঁকে, হাঁটুর ওপর ভর রেখে, নিটোল দু'বাহুতে চাদর ঠিক করছে। ঘাড় এক-দিকে ঈষৎ হেলানো, পিঠ ছাপিয়ে চুল, চুলের ফাঁকে কোমল শুভ্র কান।

নীরবে খাটের পাশে এসে দাঁড়ায় প্রশান্ত; সুজাতা টের পায় তার আসা, কিন্তু ফেরে না, কিছু বলেও না। কথা কয় প্রশান্তই, আর তার স্বরে হাসির আমেজ, সে বলে—'বিছনা তো ঠিকই আছে।' সুজাতা জবাব দেয় না; কাজ সেরে বিছানা থেকে নেমে আসে। চোখ রাখে নত, কিংবা অনাত্র নিবন্ধ। প্রশান্তর দৃষ্টি এড়ায় সে সযত্নে। খাট থেকে নেমে যখন সে চ'লে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায় নীরবে, তখন পিছন থেকে প্রশান্ত ওর দুই কাঁধের পাশে হাত রাখে। একটি নিমেষ কিছু বলে না সে, শুধু তার থুতনি প্রায় সুজাতার মাথা ছোঁয়; আর তারই নৈকট্য, পিঠের ওপর বুকের আলগা আবেশ, নিশ্বাসের স্পর্শ সুজাতার সমগ্র উপলব্ধিকে কেমন প্রাণবন্ত ক'রে তোলে।

—কি—ঃ সুজাতার কানের কাছে নিম্ন-স্বরে প্রশান্ত বলে, 'রাগ হ'লো?'

—না। সুজাতা সামান্য স'রে যায়।

—না তো হ্যাঁয়ের মতো শোনাচ্ছে!

সুজাতা ওর কথার কোনো উত্তর দেয় না, আলতোভাবে ডান কাঁধের পাশ-ধরা প্রশান্তর হাত সরাতে চেষ্টা ক'রে বলে, 'ছাড়ো।'

প্রশান্ত ছাড়ে না, মুঠিও শিথিল করে না, বরং ওকে আর একটু আকর্ষণ করে নিজের দিকে, বলে, 'শোনো না, ব'লছিলুম কি, আজ ছুটি তাই...।'

—থামলে কেন—ঃ সুজাতা কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে বলে, 'শুনি তাই কি?'

—না, সেই ও-বাড়ি, শোভাবাজারে...দূর তো কম নয়। সুজাতা এবার খানিকটা স'রে গিয়ে ফিরে দাঁড়ায়, স্বামীর পানে ক্ষণিক তাকিয়ে থাকে সোজা, অপলক তাকিয়ে থেকেই বলে, 'আমার বাপের বাড়িই শুধু দূর, না?'

—আঃ বোঝো না কেন!

—বুঝি। সুজাতা কথার মাঝে এক পলকের যতি আনলো, তারপর বললো—'বুঝি ব'লেই জিগ্যেস করছি।'

—তোমার এখন রাগ রয়েছে।

—কথা ঘুরিও না।

প্রশান্ত তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর দিলো না, স্তব্ধ হ'য়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, স্ত্রীর চোখের মধ্যে তাকিয়ে নির্নিমেষ, আর তার মুখ ঈষৎ শক্ত হ'য়ে এলো অলক্ষ্যে, শেষে সে কথা কইলো, বললো—বেশ।

—যতো দূরে শোভাবাজার, না, ও-বাড়ি?

—তা বলিনি—। প্রশান্ত ধীরে ধীরে স্ত্রীর দৃষ্টি এড়িয়ে চেয়ারে ফিরে আসে, ব'সতে ব'সতে বলে, 'তা ব'লবো কেন।'

তবে—ঃ সুজাতা খাটে ভর দিয়ে দাঁড়ালো, গলা কেমন কাঁপলো তার ঈষৎ; বললো, 'কই, আড্ডা, বন্ধু-বান্ধব ফুর্তি... কোনটা দূরত্বে আটকাচ্ছে?'

—বাপের বাড়ি যাওয়াই কি তোমার আটকায়?

—না, কিন্তু...।

—কিন্তু আবার কি...।

—আছে, তুমিও জানো আছে কিন্তু।

—না জানিনে।

—জানো না?

—না।

সুজাতা মুখে একটা চাপা উচ্ছ্বাস টলটল করে, এক মুহূর্ত সে বাক্য হারায়, হঠাৎ সব কিছু গুলিয়ে যায় তার ঠোঁকরে। নিমেষটুকু কাটলে পর, নিজেকে সামলাতে সামলাতে, কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ গলায় সে বলে—'তাহলে আমার বলার কিচ্ছু নেই।'

—নেই-ই, মিছিমিছি তুমি...।

—মিছিমিছি।

—ওই-ই...।

—ওই নয়...ও-বাড়ি যাই, যখন যাই একা, কেন?

—একা?

—খুকু আর আমি...যেন বিধবা...তুমি যাও? কবে শেষ গেছো মনে আছে? জামাইষষ্ঠির দিন পর্যন্ত যাওনি!

—সেদিন আমার শরীর ভালো ছিলো না।

—ও-কথা আমিই বলেছিলুম মাকে—। সুজাতার মুখ তিক্ত, কটু দেখায়, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে, দরজার সামনে সামান্য থমকে, গলা খাদে নামিয়ে, টেনে টেনে চিবিয়ে সে বলে, 'এখন আমায় শুনিও না।'

—সত্যি কথা শুনবে? প্রশান্ত এবার ঘাড় ঘুরিয়ে কথা বলে, তার স্বরে শ্লেষ।

সুজাতা দরজার মুখোমুখি, প্রায় চৌকাঠে, ঘুরে দাঁড়ায়; তার মুখ বিবর্ণ, উদ্বেলিত; ভাবাবেগ রুদ্ধ গলায় সে কোনোক্রমে বলে—'বলো।'

—ও বাড়ি যেতে আমার ভাল লাগে না।

—জানি...লাগবে কেন!

—ওঁরা বড় মানুষ, বনেদী—ঃ প্রশান্ত নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টায় চেয়ার থেকে উঠে পড়ে, খোলা জানলাটার পানে এগিয়ে যায়, গিয়ে বন্ধ হ'য়ে যাওয়া কপাটটা খুলতে খুলতে বলে, 'ওঁরা মনেপ্রাণে আমায় মানেন নি।'

—তুমি মেনেছো?

প্রশান্ত জানলাটার কাছ থেকে স্ত্রীর পানে অপলক তাকিয়ে থাকে এক মুহূর্ত, তারপর ধীরে ধীরে, গলা আরো নামিয়ে, প্রায় শান্ত স্বরে বলে, 'মান-অপমান আমারও আছে সুজাতা।'

সুজাতা নিমেষ কয় নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে রইলো নির্বাক; তার দৃষ্টি বিদ্ধ হয়ে থাকলো প্রশান্তর চাউনিতে, নড়লো না বিন্দুমাত্র।

প্রশান্তর দৃষ্টি ঠাণ্ডা, নৈর্ব্যক্তিক, ছায়াহীন। দু' একটি পলকের বেশি সুজাতা তাকিয়ে থাকতে পারেনি; প্রথমে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলো, অতঃপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। সেই যে বেরিয়ে এসেছিলো আর সে প্রশান্তর সান্নিধ্যে যায়নি বহুক্ষণ, প্রশান্তও আসেনি এদিকে; বাজারে যায়নি, বেরোয়নি, কিছু চায়নি বা কাউকে ডাকেনি। সমস্ত সময়টুকুই প্রায় কাটিয়ে ছিলো সে নিজের ঘরের চৌহদ্দির ভিতর, সাড়াশব্দহীন।

সুজাতাও যা ছিলো তা দিয়েই রান্না সারে, অসুস্থ ঠাকুরের পথ্য বানায়; এবং ঝি খুকুকে স্নান করিয়ে আনলে পর তাকেই বসে হাত ধুয়ে মেয়েকে খাইয়ে দিতে। নিজের সময় উধাও হ'লো আচ্ছন্ন মাথায়, একটা চাপা, ভার আবেশে। রান্নাঘরের পিঁড়িতে ব'সে জবলন্ত উনুনের পানে তাকিয়ে, কিংবা, রিক্ত দৃষ্টিতে উঠোনের পাঁচিলের ঊর্ধ্বে শূন্য আকাশে চেয়ে থেকে তার অবকাশটুকু অগোচরে কেটে যায়। খুকুর খাওয়া চুকলে, পাশের ছোটো ঘরের তক্তপোশে শোবার ঘর থেকে বিছানা আনিয়ে তাকে ঘুম পাড়ায় সে। ঝি-এর মুখে শোনে শোবার ঘরে খুকুর বাবা চুপচাপ শুয়ে আছে। বিছানা নিয়ে আসার সময়ও কোনো কথা বলেনি, বরং খুকুর ছোট্টো বালিশগুলো নীরবে ডাঁই করা স্তূপ থেকে বের ক'রে তার হাতে দিয়েছে। শুনে সুজাতা একটি কথাও বলে নি, গম্ভীরভাবে নিজের কাজ করে গেছে। ঝিও চুপ ক'রে গেছে আঁচরে, ভরসা পায়নি বেশি বকর-বকর করার। অবশেষে সুজাতা স্নানের ঘরে চ'লে যায়। স্নান সেরে তারপর সে এ-ঘরে আসে। ঘরে ঢুকেই সুজাতা বুঝেছিলো, ভালোভাবে লক্ষ্য না ক'রেও বুঝেছিলো, খাটের ওপর স্নান-টান কিছু না সেরেই শুয়ে শুয়ে প্রশান্ত অনর্গল সিগারেট খেয়েছে। সে ঘরে ঢোকবার পরও কিছু বলেনি। সেই যেমন ছিলো চিৎ হ'য়ে শুয়ে, বাঁ হাত কপালের উপর দিয়ে নিয়ে, তেমনি রইলো নিশ্চল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে চুলে একটু চিরুনি বুলিয়ে শেষে যখন সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়ার জন্যে সুজাতা একেবারে আয়নার মুখে এগিয়ে গেলো তখন আরশির ভিতর দিয়ে তার চোখে পড়লো প্রশান্তর নির্বাক, প্রায় স্থির ধূমপান।

সিঁদুরটা লাগিয়ে, আয়না থেকে মুখটা সরিয়ে এনে, পরনের শাড়ির লাল পাড়ে চিরুনির কানায় লেগে থাকা সিঁদুরটুকু মুছতে মুছতে কেমন জানি শ্লেষ্মা জড়িত স্বরে সুজাতা বলল, প্রায় স্বগতোক্তির মতো

বললে—এবার স্নান সেরে নিলে সবার পাট চোকে।

কথাটা বলার সংগে সংগে আপনা থেকেই সুজাতা আবার মুখটা আয়নার কাছে এগিয়ে নিয়ে আসে, কপালের উপরের চুলগুলিতে নিবিষ্ট যত্নে আস্তে আস্তে চিরুনি চালায়। দু' একটি নিশ্চল, নৈঃশব্দে ভরা, বাক্যহীন মুহূর্ত কাটে। প্রশান্ত অবিকল একই-ভাবে প'ড়ে থাকে, মনে হয় সে কিছু শোনেইনি, শোনার তার মনই নেই।

অথচ প্রশান্ত উঠলো। কোনো কথা কইলো না, ড্রেসিং টেবিলের দিকে এলো না, কেবল নিঃশব্দে উঠে সামনে ঝোলানো তোয়ালেটা টেনে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ওর আত্মগত, বিমনা বেরিয়ে যাওয়া সুজাতার দৃষ্টি এড়ায়নি। সে এগিয়ে এসে আলনা থেকে কাপড় আর গেঞ্জি নিয়ে স্নানের ঘরের দিকে এগিয়ে এলো। দরজাটা ঠিক চোখের ওপর বন্ধ হওয়ার আগে সে বলল—কাপড় নাওনি...।

অকস্মাৎ ওর পানে দৃষ্টি প'ড়ে ছিলো প্রশান্তর; উন্মন চাউনি মেলে সে নির্নিমেষ এক পলক সুজাতার চোখের মাঝে মধ্যে তাকিয়ে থাকে। অতঃপর চাউনি সরায়, হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর হাত থেকে ধুতি আর গেঞ্জিটা নেয়। সুজাতা ওগুলো দিতে দিতে, হাতের জিনিসের প্রতি চাউনি নিবন্ধ রেখে, আস্তে বলে—মাথার তেল কিন্তু এখানে নেই।

—মাথা ধোবো আজ, তেল লাগবে না।

স্নানের ঘরের দরজাটা বন্ধ হ'য়ে যাওয়ার পর, শোবার ঘরের পানে পা চালিয়ে ফিরে আসতে আসতে, এই সামান্য খুচরো ঘটনাগুলো স্পষ্ট হলো সুজাতার মনে। হঠাৎ ও প্রায় শারীরীভাবে অনুভব ক'রলো যে প্রশান্তর ঠান্ডা, ছায়াহীন, নৈর্ব্যক্তিক চাউনি কখন লুপ্ত, অন্তর্হিত; তার বদলে রয়েছে আত্মগত দৃষ্টির আড়ালে ব্যথার আভাস।

খেতে বসেছিলো সুজাতা তাই সংগে। একটু আড়াআড়িভাবে প্রায় মুখোমুখি ব'সে ছিলো ওরা সব বেড়ে নিয়ে; শুধু অতিরিক্ত ঝোল আর ভাত কাঁচের দুটো বড় পাত্রে রেখে ছিলো সামনে।

খেতে খেতেই মাঝখানে প্রশান্ত ব'লে-ছিলো, ভাত মাখতে মাখতে চোখ পাতে রেখে যেন নিজেকে নিজেই বলেছিলো—'আজ তাহলে যাওয়াই যাক, বিকেলে।'

এক দন্ড সুজাতা ওর পানে আপন দৃষ্টি তুলে রেখেছিলো, ঠিক সেই সময়টুকুই যতক্ষণ প্রশান্তর লক্ষ্য ছিলো নত, তারপরেই সে দৃষ্টি স'রিয়ে নিয়ে বড়ো চামচে ক'রে অল্প ভাত তুলে নিতে থাকলো থালায়; কোনো উত্তর দিলো না। নীরবে খাওয়া হ'লো খানিক, আদান-প্রদানহীন বিচ্ছেদে, জড়তায়। মন ভ'রে রইলো অস্বস্তিতে। সুজাতার গলা দিয়ে গ্রাস আর নামতে চায় না, মুখের চামড়া গরম হ'য়ে আসে। নিঃশব্দ মুহূর্তগুলো তার ভিতরে ভিতরে সজারুর কাঁটার মতো বেঁধে। অথচ মুখে কিছুই আসে না।

'—কিছু বলছো না যে?' জলের গেলাসটা মুখের কাছে তুলে, গেলাসের উপর দিয়ে স্ত্রীর মুখের পানে তাকিয়ে ছোট্টো, মৃদু প্রশ্ন করলো প্রশান্ত।

পলক মাত্র সুজাতাও তাকিয়ে ছিলো স্বামীর পরিপূর্ণ দৃষ্টির ভিতর, মর এক ঝলক তার মনে হয় সে বিভ্রান্ত হয়ে গেছে, কিছুটা অগোছালো। সামলে নিয়ে সে কথা কইলো, কথা কইলো নত নয়নে, নিম্ন কণ্ঠে বলল—কোথায় যাবে?

—ও-বাড়ি।

—না।

—কেন কি হ'লো?

—কি আবার, এমনি...।

প্রশান্ত অল্পক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, আঙুল দিয়ে মাছের কাঁটা বাছতে থাকলো নীরবে। কাঁটা বাছতে বাছতেই শেষে বলল, ধীরে ধীরে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'অযথা রাগ ক'রছো তুমি।'

—রাগ ক'রবো কেন!

—তবে?

—তবে কি?

—যাবে না কেন?

এবার সুজাতা তার দুই চোখ তুললো, মুহূর্তেক পূর্ণ চাউনি মেলে রাখলো প্রশান্তর চোখে, অতঃপর দৃষ্টি সরালো, আঙুল দিয়ে থালার শূন্য জায়গাটুকুতে দু-একটা দাগের কাটাকুটি টানলো, শেষে সেগুলো মুছতে মুছতে প্রায় শান্ত গলায় বলল—কি দরকার মিছিমিছি...।

—আমায় ভুল বুঝছো...।

—তোমায় দোষ দিচ্ছি না।

—দোষ আমি মানছি।

—কেন? সুজাতা আবার চাইলো, বলল—'দোষ ও'দেরই।'

—না-না।

—না না মানে—সুজাতা অকম্পিত, শান্ত, নিশ্চিত স্বরে বলল, 'মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই।'

—যাক্ যাক্ ও-সব কথা।

—যাক বল্লেই যায় না...ও'রা সত্যিই তোমার মানেননি, মানবেন না।

প্রশান্ত হাসার চেষ্টা ক'রলো, কথাটাকে হালকা করার প্রয়াসে উড়িয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'সেটাই স্বাভাবিক, মেয়ে নিয়ে পালিয়ে ছিলুম ও'দের।

—পালাওনি, মেয়ে সঙ্গে চ'লে এসেছিলো...তাকে বিয়ে ক'রেছো।

কেমন অপ্রস্তুতে প'ড়ে যায় প্রশান্ত, হঠাৎ। কথা আসে না তার তখুনি মুখে। সুজাতার স্বরের গাম্ভীর্য, হাসাহীন মুখ, অকপট বাক্য আর দৃষ্টির অনমনীয়তা মুহূর্তে কয়েকের জন্যে তাকে সম্পূর্ণ অবিনাস্ত ক'রে দেয়। ক্ষণকাল সে স্তব্ধ হ'য়ে থাকে; শেষে নীরবে খাওয়া প্রায় সাঙ্গ হ'য়ে এলে কথা কয়, পাতের অবশিষ্ট ভাতটুকু মেখে নিতে নিতে বলে, চাপা, ধীর স্বরে বলে,—'তুমি বড় সিরিয়স্ হ'য়ে যাচ্ছো।'

—অর্থাৎ?

—এ ব্যাপারটা নিয়ে এতোটা...।

—এতোটা!—প্রশান্ত কথা শেষ করার আগেই সুজাতা কথা কয়, তার স্বর যেন ঈষৎ কাঁপে, যেন চিড় খায়, বলে—, 'এতোটা কিসের? আমাদের মন নেই, মান নেই বোধ নেই।' প্রশান্ত দৃষ্টি সরায়; দু'জনের কাটাকাটা, পিঠোপিঠি কথার মধ্যে ঈষৎ বিরতি দেয়, ছেদ আনে সামান্য, তারপর অন্তে, মৃদু গলায় বলে—'তুমি একটু শান্ত হও।'

সুজাতা দু'দণ্ড কিছু ব'লতে পারে না। হঠাৎ বুকের মধ্যে তার ফাঁকা বাতাস পাক দিয়ে ওঠে, গলা ওঠে টাটিয়ে, আর দুই চোখ জলে আবছা হ'য়ে আসে দেখতে দেখতে। সে মাথা আরো নিচু ক'রে, চোখ নত, খাবার নাড়ে চাড়ে। নিমেষ কয় প্রশান্তও কিছু বলে না; নীরবে পৃথক পৃথক এক একটি ভাত এক আঙুলের ছোঁওয়ায় তুলে মুখে দেয়। মাঝে মাঝে দু' একটা ভাত আঙুলে টিপে থালায় চটকায়। ক্ষণকাল একইভাবে কাটে, কেউ কারু দিকে ভালোভাবে তাকায় না। প্রশান্তই প্রথম কথা কয় শেষে, আলতোভাবে বলে—'বিকেল-বিকেল গিয়ে, তাড়াতাড়ি চ'লে এলেই হবে।'

সুজাতা তখুনি, বাক্যের পিঠোপিঠি, কোনো উত্তর দেয় না, কথা বলে সামান্য যতির পর, একটু থেমে থেকে, বলল, নির্বিকার নিম্নকণ্ঠে বলল—যেও'খন।

—তুমি?

—আমি তো ব'লেইছি।

ওর কথায় প্রশান্ত চোখ তুলে স্ত্রীর পানে তাকিয়ে রইলো অনিমেষ এক পলক, তার দৃষ্টিতে ফুটলো চাপা দীপ্তি; গলাটাকে সে খাদে নামিয়ে, ব্যঙ্গের আমেজটুকু সংগোপনে রুদ্ধ রেখে বলল—

—যা বলা হয় তার বুঝি নড়চড় নেই?

—অন্তত প্রতি মুহূর্তে নেই।

—গুমোর একটু কমাও, তৃপ্তি পাবে।

—আমার গুমোর! সুজাতা স্বামীর দৃষ্টির মধ্যে সিধে তাকালো। চোখ তারও চকচক করে অনম্র বিভায়; প্রশান্তর দৃষ্টির সঙ্গে নিবদ্ধ রেখেই সে বলে—'না তুমি মহৎ সাজার জন্যে ব্যাকুল?'

প্রশান্তর মুখ হঠাৎ শক্ত হ'য়ে আসে,

চোয়ালের হাড় দুটো দেখায় বেশি জমাট, স্তব্ধ। সে দৃষ্টি আস্তে আস্তে সরিয়ে নেয়, সরিয়ে নিতে নিতেই বলে—

—অভদ্র না হওয়াই ভালো।

—অভদ্র জেনেই বিয়ে ক'রেছিলে।

—না, জানতুম না।

—জানছো তাহলে।

হঠাৎ প্রশান্ত খাওয়া বন্ধ করলো। কিছু বলল না, উত্তর-প্রত্যুত্তরে না গিয়ে ধীরে ধীরে হাতে লেগে থাকা ভাতগুলো পাতে ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ায়, তারপর খোলা দরজাটার পানে এগিয়ে যায়। আর সুজাতার মাথার মধ্যে অকস্মাৎ তপ্ত রক্ত ছলকে ওঠে। ওর, প্রশান্তর, এই আচমকা, নিরুত্তর উঠে পড়া, ফিরে না তাকানো, খাওয়া অসমাপ্ত রাখা, তার মুখ-চোখে উষ্ণ থমথমে ভাব আনলো; সে গলা ছেড়ে, স্বামীর চলায়মান মূর্তির পানে তাকিয়ে থেকে, চেপে চেপে টেনে টেনে বলে—'আমি কিন্তু তোমার মতো মেকি নই, মহৎ সাজিনে।'

প্রশান্ত যেতে যেতে একমুহূর্ত ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলো, এবং দরজা দিয়ে আসা আলোয় তার মুখ দেখিয়ে ছিলো পাংশু, সাদা। সে যেন কি বলতে গিয়েছিল, কিন্তু বলেনি; থমকানো সময়টুকুতে শুধু তার ক্ষত-বিক্ষত অন্তর্দ্বন্দ্ব মুহূর্তে থেকে মুহূর্তে বিদ্যুতের দীপ্র বেগে হারিয়ে যায়। কেবল ঠোঁটে ফুটলো তার শীতল, জমাট, ভাবাবেগহীন একটু হাসি; এবং নিরক্ত, ফ্যাকাসে মুখে চোখের মণি দুটো দেখালো নিশ্চল। অতঃপর প্রশান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো নিঃশব্দে।

সুজাতাও পাশের ছোটো ঘরে এসে খিল দিলো। এক আচ্ছন্ন ঘোরের মধ্যে তক্তপোশের শতরঞ্চির উপর, ঘুমন্ত খুকুর বিছানার পাশে, দুটো বালিশ রেখে সে বসলো প্রথমে। তারপর যখন তার মর্মমূল কেঁপে অন্তঃস্থল থেকে প্রবল কান্নার বেগ উঠে এলো তখন বালিশে মুখ গুঁজে, আওয়াজ রুদ্ধ রেখে, নিঃসাড়ে কাঁদিতে থাকলো অনেকক্ষণ। কাঁদতে কাঁদতে কখন সে ঘুমিয়ে গেছলো টেরও পায়নি। ঘুম ভাঙলো যখন তখন ঘর প্রায় অন্ধকার, চারিপাশ নিঝুম, শব্দহীন; আর অন্তর শূন্য। দু এক-মুহূর্তের মধ্যেই কিন্তু তার সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রখর ও স্পর্শকাতর হয়ে উঠলো। খুকুর কথা মনে হলো। শাড়ি সামলে নিতে নিতে সে উঠে পড়লো, তাড়াতাড়ি ভেজানো দরজা খুলে এলো বারান্দায়। বাইরে পা দিয়েই চোখ গিয়ে পড়লো উঠোনে, এঁটো বাসন যেখানে রাখে সেই কোণে। দেখলো খুকুর দুধের পাত্র ব্যবহৃত, নিচে তলানির দুধ-টুকু জমে সাদা হয়ে আছে।

অতঃপর সুজাতার মন হালকা হয়ে আসে। আকস্মিক যে এক উল্টোপাল্টা আবেগ চোখ মেলতেই তার ভিতরে ভেঙে পড়ে ছিলো, তা আপনা থেকেই অন্তর্হিত মনে হয়। সে কয়েক সেকেণ্ড ভাসা ভাসা, অন্য-মনা দৃষ্টিতে খুকুর দুধের পাত্রের পানে নীরবে তাকিয়ে থেকে শেষে ধীরে ধীরে শোবার ঘরের দরজার পাশে এসে দাঁড়ায়। দেখতে পায় ভিতরে, আঁধার হয়ে আসা ঘরের মধ্যে, জানলার সামনে আধো আলোর এ-দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে প্রশান্ত; শ্যামবর্ণ আবছা ছবির মতো।

আস্তে আস্তে নিঃশব্দ পায়ে সুজাতা ঘরে ঢুকে এলো, খাটের কাছে এসে দেখলো খুকুর অয়েলক্লথ, বিছানা, ছোটো বালিশ সব যত্নে তোলা রয়েছে ডাঁই করে রাখা বড়ো বিছানার কোলের কিনারে। দেখে নিজেকে কেমন রিক্ত মনে হলো এক দণ্ড, কিছু করার রইলো না ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া। সে যখন প্রায় পা বাড়াবে যাওয়ার জন্যে, যখন তার কাঁধ থেকে চাবিসুদ্ধ আঁচল শব্দ তুলে মাটিতে পড়লো তখন, প্রশান্ত কথা কইলো; ঘাড় না ফিরিয়ে, বিন্দুমাত্র না নড়ে নিম্ন কণ্ঠে সে বলল—'খুকু মাঠে...... মোতির মার সঙ্গে।' সুজাতা একটা অবলম্বন পেলো, আবার নিশ্বাস নেওয়ার সুযোগ হলো তার। এতক্ষণের ব্যবধানে হঠাৎ একটু ফাঁক হলো। সে বলল—দুধ খেয়েছে?

—খেয়েছে।

—কে খাওয়ালো?

—মোতির মা-ই......।

—একা? খেলো?

—আমিও একটু খাইয়েছি।

সামান্য বিরতি গেলো দু'জনের কথার মধ্যে। তবু এক দুর্মর ভার হালকা হয়ে আসে ভিতরে ভিতরে। অনেকটা সহজ লাগে।

—তুমি চা খেয়েছো? সুজাতা প্রশ্ন করে।

—না।

—মোতির মা-টা কী!

—ও বলেছিলো......। প্রশান্ত কথাটা শেষ করেনি, তার গলা শোনায় ভারী, গভীর।

সুজাতা নিমেষ মাত্র তাকালো ওর পানে, শেষে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে কেট্‌লিতে জল আনলো, ইলেকট্রিক স্টোভের প্লাগ লাগালো, স্টোভের উপর পাত্র ব'সিয়ে পেয়ালা-পিরিচ, চা-চিনি সব নিয়ে এলো। সাজিয়ে রাখলো সব স্টোভের এক দিকে। কোনো কথা কইলো না। কথা কইলো সব কিছু রাখা হ'লো পর, বলল, মুখটা একটু তুলে আবছায়ার মধ্যে প্রশান্তর পানে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল— 'আলোটা জ্বালবো?'

—জ্বালবে?

—আমার দরকার নেই......।

—তাহলে থাক্ না।

—থাক্।

সুজাতা উঠে পড়ে, ঈষৎ ইতস্তত ক'রে অবশেষে আবার ঘরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায়। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রশান্ত কথা কয়, বলে, 'যাচ্ছো?'

—এই একটু......।

—কাজ আছে?

—না......।

—বসো না এখানে এসে। প্রশান্ত খাটে রাখা তার হাতের ইঙ্গিত করলো। সুজাতা এসে বসলো ওর হাতের পাশটিতে। কয়েক মুহূর্ত কোনো আলাপ হ'লো না, দু'-জনেই রইলো নিশ্চুপ। ঘর আরো অন্ধকার হ'য়ে এলো; ঘরের বাইরেও সায়াহ্নের বিভা বিলুপ্ত। সুজাতার মন শুধু চাপা আবেগে স্ফুরিত হ'য়ে রইলো।

প্রশান্তই ফের প্রথম কথা কয়, নিচু গলায়, আলতো স্বরে ডাকে,—'সুজাতা।'

—হুঁ?

—রাগ কম্‌লো?

সুজাতা জবাবে কিছু বলতে পারলো না, কেবল ওর হাতের ওপর নিজের হাতটা রাখলো নিঃশব্দে। তার দুই চোখ অকস্মাৎ বাষ্পাচ্ছন্ন হ'য়ে আসে দ্রুত; আর, সে-আঁধারে অলক্ষ্যে সজোরে চোখ বন্ধ ক'রে, নিথর হ'য়ে রইলো ক্ষণকাল। কেউ কোনো কথা কইলো না। প্রশান্তও থাকলো অনড়। শুধু সুজাতার হাতটি নিলো নিজের মুঠোয়।

আত্মহারা

বিভা সরকার

গলে আশা-হিমালয়
বিদ্বেষের বিষাক্ত ফুৎকারে,
হিংসার মেঘেতে ঢাকে
প্রস্ফুটিত আনন্দের ফুল।

স্তম্ভিত নির্বাক প্রাণ
অন্য কোথা চায় উত্তরণ
জীবনের সমুদ্রমন্থনে
আহরণ বিষন্ন বকুল॥

এ আদিম ইতিহাসে
পথ হল বাঁকা-অন্ধগলি,
অনন্ত আকাশে জ্বলে
সান্ত্বনার শুভ ধ্রুবতারা–

সমুদ্রমন্থন-বিষে
নীলকণ্ঠ প্রশান্ত স্থবির,
বিক্ষুব্ধ জলধিশেষে
আত্মা তাই মহাকাশে হারা॥

হাসপাতাল

জয়শ্রী চৌধুরী

বিবর্ণ মৃত্যুর ছায়া চির গোধূলির দেশ এনে
সমস্ত সময় ব্যেপে দিয়ে গেছে এখানে বিছিয়ে
সব আশা আশঙ্কারা পাশাপাশি এখানে দাঁড়িয়ে
হাতে হাত দিয়ে, আর সমস্ত রহস্য গেছে জেনে॥

এখানে বিবর্ণ দিন, আকাশের চুরি করা নীল
একবার আনে যেন বিকেলের দু'তিন ঘণ্টায়
প্রতীক্ষা গভীর শব্দে, অগণিত পায়ের পাতায়
নিয়ে আসে আনন্দের বার্তা ভরা মুখর নিখিল।

বিকেল ছ'টার ঘণ্টা, পায়ে পায়ে বিদায়ের পালা
'আবার আসবে ত' কাল ?' তারপর স্তিমিত দিনের
কুড়িয়ে দু'চার স্মৃতি ঘরে নিয়ে গাঁথা চলে ফের
আশঙ্কা আশার বীজে, অন্তহীন রুদ্রাক্ষের মালা।

বিবর্ণ মৃত্যুর ছায়া, গোধূলির দেশের ওপারে
আর আছে এইখানে আশা আশঙ্কার ধারে ধারে॥

প্রদীপ্ত প্রহর

চিত্ত ঘোষ

এই অন্ধকার যেন উত্তাল বিশাল এক সমুদ্রের গাঢ় বিষণ্ণতা।
স্মৃতি কোনো অবলুপ্ত স্থাপত্যের জলমগ্ন সিঁড়ি।
মধ্যাহ্নের সাদা বালু ঘিরেছিল রোদের উষ্ণতা
কী হারিয়ে ঝাউবন কাঁদে তারপরই !

এ নিঃসঙ্গ বালিয়াড়ি পা-বাঁধা উদ্যম
এ মৃত্তিকা সাপেকাটা, বিষেনীল শিরা
কামনায় চিতাভস্ম, একটুকরো পশম
নিঃশ্বাসে ছড়ায় বিষ, দুরারোগ্য পীড়া॥

দিগন্তে ঠেকায় পিঠ একদল উলঙ্গ পাহাড় ঃ
হাওয়ায় জলের গন্ধ। হরিণেরা ডাকে
শালের অরণ্য থেকে ক্রোধবর্ণ পাথরের ঘাড়
ফেরায় রক্তাক্ত চোখ। কাকে খোঁজে ? কাকে ?

লাফায় হাওয়ার ঝর্ণা। বেঁকে ওঠে ধনুকের ক্রোধ
একসারি তারার চোখে নিবন্ত আগুন।
অন্ধকারে আঁকাবাঁকা বিদ্যুতের স্রোত
বিস্বাদ মাটির পিণ্ড জ্বালায় ফাল্গুন।

কোথায় জলের শব্দ ? ধারালো থাবার ঝড়–
সে প্রপাত কতদূরে তবে ?
বর্শাহাতে হে পাষাণ প্রদীপ্ত প্রহর
ঘুমন্ত বাঘের নদী পার হতে হবে॥

উল্টোরথে প্রকাশিত উপন্যাস

বড় গল্পকে উপন্যাস বলে উল্টোরথ কোনদিনই চালায়নি। সে-কথা যাঁরা জানেন না, তাঁদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি : উল্টোরথে প্রকাশিত উপন্যাসগুলি পুস্তকাকারে যখন প্রকাশিত হয়েছে—তখন প্রত্যেকটি উপন্যাসের দাম হয়েছে তিন টাকা থেকে চার টাকার মধ্যে। এমনি কয়েকটি উপন্যাসের নাম উল্লেখ করছি :

বুদ্ধদেব বসু : শেষ পাণ্ডুলিপি

প্রবোধকুমার সান্যাল : অভিজ্ঞান

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : বহ্নিপতঙ্গ

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : কদম

প্রতিভা বসু : মধ্যরাতের তারা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত : নূপুর, মায়ামৃগ, বধু

সমরেশ বসু : ভানুমতী, পুতুল খেলা

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় : অবরোধ

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য : নিছক মানুষ

সুবোধ ঘোষ : সুজাতা, বহুত মিনতি, শুন-বরনারী

বনফুল : জলতরঙ্গ, মহারাণী

বিমল মিত্র : মেয়ে মানুষ, সাহেব বৌদি

● ●

উল্টোরথের অষ্টম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (চৈত্র)

'সীমানা ছাড়িয়ে'

নামে একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস লিখছেন

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

[সুধীরঞ্জনের 'সীমানা ছাড়িয়ে' শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে — আর দাম বোধ হয় চার টাকারও বেশি হবে]

পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে যাঁদের উপন্যাস পড়তে পাবেন :

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য | আশাপূর্ণা দেবী
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী | বিমল কর | সঞ্জয় ভট্টাচার্য
নরেন্দ্রনাথ মিত্র | হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় | সন্তোষকুমার ঘোষ

এবং

বাংলাদেশের অন্যান্য খ্যাতনামা সাহিত্যিকবৃন্দ

উল্টোরথের বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা—১৫

সিনেমা জগৎ-এর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা—১২৲

উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ-এর একত্রে বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা—২৫৲

উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ-এর একত্রে যাঁরা গ্রাহক হবেন তারা উল্টোরথের বার্ষিক উৎসবে প্রবেশাধিকার পাবেন।

৩১শে মার্চের পর আর গ্রাহক করা হবে না।

দি ম্যাগাজিনস প্রাইভেট লিমিটেড : ২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ডেমোক্লিসের খড়্গ

গুরুপ্রসাদ রায়

কথিত আছে সিরাকিউসের অধিপতি ডিওনিসাসের সভাসদ ডেমোক্লিস অধিপতির সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে কাল্পনিক মন্তব্য করায়, ডিওনিসাস এক ভোজসভায় ডেমোক্লিসকে নিমন্ত্রণ করেন। ডিওনিসাসের পার্শ্বে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট দেখে ডেমোক্লিস খুবই আনন্দিত হন। কিন্তু নিমেষের মধ্যে সেই আনন্দ অন্তর্হিত হয়েছিল যখন শিরোপরি সামান্য সুতোর বাঁধনে একটি খড়্গ ঝুলতে দেখেন। সাইপ্রাসের স্বাধীনতার আনন্দও তাই।

লণ্ডন এয়ার পোর্টে দাঁড়িয়ে বলছিলেন আমার সাইপ্রিয়ট বন্ধুটি। পাঁচ বছর পর দেশে ফিরছেন। সাইপ্রাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শুরু থেকে তিনি দেশ ছাড়া। ইউরোপের নানা দেশ ঘুরে আমেরিকা যাবার পথে লণ্ডনে এসেছিলেন। কিন্তু উনিশে ফেব্রুয়ারীর সাইপ্রাস-চুক্তি সব বানচাল করে দিল। আমেরিকা যাত্রার আয়োজন বন্ধ করে তাই দেশে ফিরছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় যা বললেন তার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ, আমার মন ভোলায় রে।'

পূর্ব দিকে একবার তাকালাম। হয়ত সূর্য উঠছে। পূর্ব দিগন্ত রাঙা হয়ে আছে। কিন্তু লণ্ডনের আকাশে সূর্যোদয় দেখা অনেক সৌভাগ্য না থাকলে হয় না। কুয়াশায় ঢাকা চারিধার।

বন্ধু-স্ত্রীর কাছ হতে বিদায় নিয়ে এলাম। বারবার নিকোসিয়ায় তাঁর বাড়িতে যাবার নিমন্ত্রণ করলেন। কৌতুক ক'রলেন, "সাইপ্রাস তো স্বাধীন হল। এবার কোন বিষয় নিয়ে 'ট্রিবিউনে' চিঠি লিখবেন?" কিন্তু সত্যিই কি স্বাধীনতা পেয়েছে সাইপ্রিয়টরা? পাঁচ বছরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মূল্য কি এই?

সেদিনও লণ্ডন এয়ার পোর্টে দাঁড়িয়েছিলাম। কয়েকশত গ্রীক সাইপ্রিয়ট এসেছেন তাঁদের প্রিয় মুখপাত্রকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে। উদ্‌গ্রীব, উৎকণ্ঠিত সকলে। আলোচনার ফলাফলের জন্য আশংকা। বৃটিশ সরকারের নিমন্ত্রণে মাকারিয়স আসছেন লণ্ডনে। চারিধারে পুলিসের ছড়াছড়ি। তারই মধ্যে একটি গাড়ি থেকে একগোছা পুস্তিকা এসে পড়ল। ন্যাশনাল লেবার পার্টির।

"Cypriot murderers. How soft can we get!"

আর্চ বিশপ মাকারিয়স এলেন। তাঁকে নিয়ে গাড়ি ছুটল লণ্ডনের দিকে। পিছন পিছনে বেশ কিছু দূরে ন্যাশনাল লেবার পার্টির সেই গাড়িটি। লণ্ডনের অভিজাত হোটেল 'ডার্চেস্টারে' এসে উঠলেন মাকারিয়স। ফ্ল্যাটের চারিধারে পুলিস প্রহরা। হোটেলের বাইরে পথে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ন্যাশনাল লেবার পার্টির পুস্তিকা। দু-একবার তখনও শোনা যাচ্ছে, 'মাকারিয়স মার্ডারার—মাকারিয়স খুনী।'

নিকোসিয়ায় সাইপ্রাসবাসী তুর্কীদের দাঙ্গা—বছরখানেক পূর্বে আঙ্কারায় বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব সেলউইন লয়েড ও তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী মেণ্ডারেসের মধ্যে আলোচনা কালে সাইপ্রাসকে গ্রীক ও তুর্কীদের মধ্যে ভাগাভাগি করে দেওয়া হবে রটে যাওয়ায় নিকোসিয়ায় উল্লসিত তুর্কীরা মিছিল বের করে পরে খবরটি মিথ্যা জানতে পেরে ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে ওঠে

সাইপ্রাসের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটা অধ্যায় শেষ হল। যে আর্চ বিশপ মাকারিয়সকে বৃটেনের এই রক্ষণশীল সরকার নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন, যাঁর সাইপ্রাসে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, যাঁকে গ্রীক সাইপ্রিয়টদের মুখপাত্র বলে মেনে নিতে রক্ষণশীল সরকার অস্বীকার করেছিলেন, তাঁকেই অবশেষে সেই গ্রীক সাইপ্রিয়টদের মুখপাত্ররূপে লণ্ডনে আমন্ত্রণ জানান—নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদীতার জয় ঘোষণা করে না। তাই মুখরক্ষার জন্য যখন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী পার্লামেণ্টে বললেন, "I always said, when the proper time came, that we would deal with Archbishop Makarios as the representative of the Greek-Cypriot people...... This moment is a victory for co-operation. It is a victory for all."

তখন বিরোধী দলের নেতা হিউগেটস্কেল নীরব থাকতে পারেন নি। তিনি উত্তরে বললেন,

"....the Government deserved particular credit for eating so many words and even inviting Archbishop Makarios to the conference. I am sure that it is, therefore, in spite of our criticisms of the Government—and very well deserved criticism—in the past, extremely satisfactory that at long last they have seen the light."

সেই আলো শুধু রক্ষণশীল সরকারই দেখেন নি। সাইপ্রাসবাসীরাও সেই আলো দেখেছে। সেই আলো দেখেছে শত শত বন্দী, অন্ধকার জেলখানায় যারা দিন গুণেছে। 'ডিটেনশন্ ক্যাম্পে' যারা স্থায়ী আবাসস্থল গড়ে তুলেছে। এই 'ডিটেন্‌শন ক্যাম্পে'ই আন্দ্রে লুকাসের মৃত্যু হয়েছিল, সে মৃত্যু-রহস্যের আজও কোন সমাধান হয়নি।

এতদিন পর্যন্ত সাইপ্রাস নিয়ে গ্রীস এবং তুর্কীর মধ্যে তীব্র বিরোধ ছিল। একজন চেয়েছিল গ্রীসের সঙ্গে যুক্তিকরণ, অন্যজন দেশ বিভাগ। কিন্তু সাইপ্রাসের আয়তন এতই ক্ষুদ্র যে, বিভাগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু যুক্তিকরণের বিরুদ্ধেও বলার আছে। স্বাধীনতার অর্থ যদি দেশরক্ষা, আর্থিক বা বাক্-স্বাধীনতা হয় তাহলে যুক্তিকরণের প্রশ্নই ওঠে না। গ্রীসে এর একটিও নেই। এখনও শত শত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা বন্দী হয়ে আছেন। সেখানেও অত্যাচারের সীমা নেই। তাই তুর্কী

নিকোসিয়ার পথে বৃটিশ সৈন্যদের চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ তুলে নেবার পর পাহারাধীন একটি উপদ্রুত অঞ্চল

সংখ্যালঘুদের ভয় একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়।

তাই আটান্ন সালের সেপ্টেম্বর মাসে এথেন্সে আর্চ বিশপ মাকারিয়স বৃটেনের শ্রমিক সদস্যা বারবারা ক্যাসলের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে সাইপ্রাসের স্বাধীনতার প্রস্তাব তোলেন। বৃটেনের রক্ষণশীল সরকার তা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। মাকারিয়স চেয়েছিলেন সাইপ্রাসের স্বাধীনতা, তুর্কী এবং গ্রীক, দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি। বৃটেনের প্রচেষ্টা ছিল 'ম্যাকমিলান প্ল্যান' চালু করা। সাত বছর পর স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন উঠবে—এতদিন চলবে তারই প্রস্তুতি। কিন্তু রক্ষণশীল দলের আরও একটি আশা ছিল। এই সাত বছরের মধ্যে দুই সম্প্রদায়ের বিভেদ স্থায়ীভাবে আস্তানা নেবে সাইপ্রাসে।

শোনা যায়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গত অধিবেশনের পর আমেরিকার 'স্টেট ডিপার্টমেণ্ট' চঞ্চল হয়ে ওঠেন। গ্রীস, তুর্কী এবং বৃটেন ন্যাটোর সদস্য, গ্রীস এবং তুর্কী ও গ্রীস এবং বৃটেনের মধ্যে বিভেদ ক্রমাগতই বাড়ছিল। ন্যাটোর ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ছিল। তাই আমেরিকার চাপে গ্রীস এবং তুর্কী আলোচনায় সম্মত হয়ে জুরিখে তাদের বৈদেশিক মন্ত্রীদের পাঠাল। পরে এলেন দুই দেশের প্রধান-মন্ত্রী। আলোচনার পর চুক্তির খসড়া এল লণ্ডনে বৃটেনের মতামতের জন্য। আমেরিকার চাপে বৃটেনের রক্ষণশীল সরকার আলোচনায় সম্মত হয়েছিলেন। তবে একটি শর্ত ছিল। সাইপ্রাস সমস্যার যে সমাধানই হোক বৃটেনের স্বার্থ যেন রক্ষা করা হয়। দু-পক্ষ শুধু বৃটেনের স্বার্থই দেখেনি, নিজেদের স্বার্থের দিকেও লক্ষ্য রেখেছে। সাইপ্রাসে বৃটেনের দুটি ঘাঁটি থাকবে। গ্রীসের থাকবে একটি। তুর্কীরও একটি। সাইপ্রাস ন্যাটোর সদস্য না হলেও বা কোন সামরিক চুক্তিতে যোগ না দিলেও সামরিক দিকে পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে তার যোগ রয়ে গেল। আবার যদি কখনও সুয়েজের কাহিনী ঘটে তাহলে সাইপ্রাসবাসীদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাইপ্রাস সেই ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

মাকারিয়স এলেন এথেন্স থেকে। পরামর্শদাতারূপে গ্রীস এবং সাইপ্রাস থেকে এলেন প্রায় পঁয়ত্রিশ জন সাইপ্রিয়ট। তুর্কী সম্প্রদায়ের মুখপাত্ররূপে এলেন ফাদিল কুচুক। গ্রীস ও তুর্কীর প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ও এলেন। কিন্তু তুর্কী প্রধানমন্ত্রী আলোচনায় যোগ দিতে পারলেন না। লণ্ডনের পথে গ্যাডউইক এয়ার পোর্ট হতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে প্লেন দুর্ঘটনায় তিনি আহত হন।

জুরিখে যে চুক্তির খসড়া তৈরী হয়েছিল, মাকারিয়সের সম্পূর্ণ মত না থাকলেও বৃটেন, গ্রীস এবং তুর্কীর সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধতা বেশীক্ষণ করতে পারলেন না। তাঁর নিজের দলেও ভাঙ্গন ধরেছিল। তাই "....as the agreed foundation for the settlement of the problem of Cyprus."

—এই কথাটি লিখে তিনি সই করলেন চুক্তিতে। উনিশে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার। সন্ধ্যা সাতটার একটু পরে তিন দেশের প্রধানমন্ত্রী সই করলেন সেই চুক্তি। দেশ বিভাগ রদ হল, কিন্তু সরকারীভাবে জন্ম নিল দুই সম্প্রদায়। পৃথিবীর ইতিহাসে লেবাননের মত আর একটি দেশের সৃষ্টি হল।

বৃটেন, গ্রীস এবং তুর্কী, গ্রীক এবং তুর্কী সাইপ্রিয়টদের মধ্যে চুক্তির ফলে সাইপ্রাসের ক্ষমতা হস্তান্তর হবে উনিশে ফেব্রুয়ারী, ষাট সালের মধ্যে। স্বাধীন সাইপ্রাসের জন্ম হবে রিপাবলিক রূপে। কমনওয়েলথের সিদ্ধান্ত সাইপ্রাসবাসীদের উপর। ইতিমধ্যে কমনওয়েলথে অন্তর্ভুক্তির আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে তুর্কী সাইপ্রিয়ট নেতা ফাদিল কুচুকের নেতৃত্বে। সাইপ্রাসের আর্থিক অবস্থা বৃটেনের করতলে। পাঁচ বছরের এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে আর্থিক অবস্থারও অবনতি ঘটেছে। তাই বাধ্য হয়েই বোধ হয় সাইপ্রাসকে কমনওয়েলথে যোগদান করতে হবে।
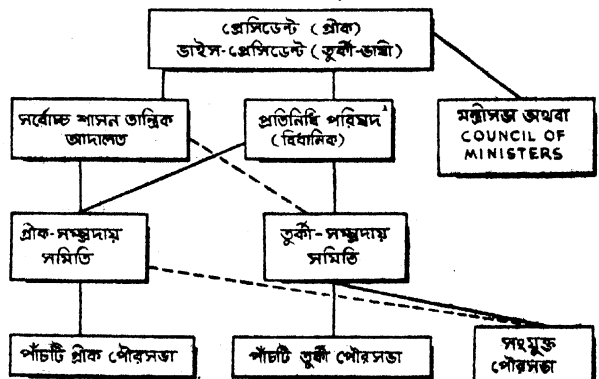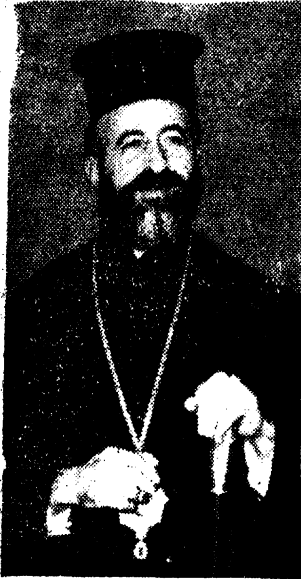
সাইপ্রাসের গ্রীকদের নেতা আর্ক বিশপ মাকারিওস

সাইপ্রাস-রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট হবেন গ্রীক ভাষী। ভাইস প্রেসিডেণ্ট হবেন তুর্কী ভাষী। আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সংস্থায় যোগদানের সিদ্ধান্ত ব্যতীত, প্রতিনিধি পরিষদ এবং মন্ত্রীসভার যে কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 'ভেটো' দেবার ক্ষমতা প্রেসিডেণ্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্টের থাকবে। প্রথমোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গ্রীস এবং তুর্কীরও সমান ক্ষমতা আছে। শাসন-কার্যে সহায়তার জন্য সাতজন গ্রীকভাষী এবং পাঁচজন তুর্কীভাষীর একটি মন্ত্রিসভা গঠন হবে। তাঁরা সকলেই প্রেসিডেণ্ট এবং ভাইস প্রেসিডেণ্টের মনোনীত হতে পারেন। পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধি পরিষদের অথবা বিধানসভার শতকরা সত্তরজন আসবেন গ্রীকভাষী এবং শতকরা ত্রিশজন তুর্কী সম্প্রদায় হতে। সর্বোচ্চ শাসনতান্ত্রিক অদালতে একজন গ্রীক, একজন তুর্কী এবং নিরপেক্ষ একজন উপস্থিত থাকবেন। গ্রীক এবং তুর্কী সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র সমিতি গঠিত হবে। কর ধার্য করার ক্ষমতা এই সমিতির আছে।
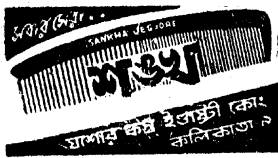
সাইপ্রাসে বৃটেনের দুটি সামরিক ঘাটি থাকবে। মধ্যপ্রাচ্যে বৃটেনের স্বার্থরক্ষার জন্য সাইপ্রাস অবশ্য প্রয়োজনীয়। সামরিক ঘাটির সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার জন্য সাইপ্রাস সরকার দায়ী থাকবেন। গ্রীস এবং তুর্কীর সৈন্যও সাইপ্রাসে থাকবে। সংকট-কালে তারা একত্রে কিংবা স্বতন্ত্ররূপে সাইপ্রাসের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। রিপাবলিক অব্ সাইপ্রাসের শাসনতন্ত্রের এই হল মূল আকার।

বৃটেনের কয়েকটি বিখ্যাত সংবাদপত্র এই চুক্তির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। প্রেসিডেণ্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেণ্টের 'ভেটোর' অপব্যবহারে অচল অবস্থার সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যকর নয়। দুই সম্প্রদায় হতে মনোনীত হওয়ায় এই শক্তির অপব্যবহারের আশংকাই প্রবল। তখন এই তিন দেশের সৈন্যদল নীরব থাকবে, এ আশা করা অন্যায়।"
"... going to put off the forest fire"
বলে সুয়েজ কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল। তখনও বলা চলবে
"taking action to re-establish the state of affairs."
এরিকো মালাটেস্টা একবার বলেছিলেন, "A man whose limbs have been bound from birth, but had nevertheless found out how to hobble about, might attribute to the very bands that bound him his ability to move." কিন্তু সে কথা কি এই তিন শক্তিকে তখন কেউ স্মরণ করিয়ে দেবে!

সাইপ্রাস চুক্তি সমর্থন করে এবং সাইপ্রাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের উপর যবনিকা টেনে আর্চ বিশপ মাকারিয়স যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আশা হয় তিনি কখনই সেই অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে দেবেন না। তাঁর সেই 'agreed foundation" কথাটি তাই বোধ হয় মূল্যবান। সাইপ্রাসে দুই সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি বোধ হয় একটি মাত্র কথার মধ্যে নিহিত আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অধ্যায়ের শেষ হল, অপর অধ্যায়ের সবে শুরু।

স্বাধীন সাইপ্রাসের ইতিহাসে আর্চ বিশপ মাকারিয়সের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। লেখা থাকবে জেনারেল গ্রিভাসের অনমনীয় দৃঢ়তা। আরও শত শত দেশ-প্রেমিক যাঁরা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করেছিলেন। সূর্য সেনকে আমরা আজও ভুলিনি। তেমনি সাইপ্রাসবাসীরাও মনে রাখবে তাদের সূর্য সেন গ্রিভাসের অন্যতম সহকারী কারিয়াকোস্ মাৎসিসকে। উনিশে নভেম্বর উনিশশো আটান্ন সালে বৃটিশ সৈন্য উত্তর সাইপ্রাসের ডিকোমো গ্রাম পরিবেষ্টন করলে মাৎসিস্ তাঁর দুজন সংগী সহ বন্দী হন। কিন্তু জীবিত অবস্থায় তাঁর গুপ্ত কক্ষ হতে বার হতে তিনি অস্বীকার করেন। বৃটিশ সৈন্যদল হাত-বোমা ছুড়ে তাঁকে মারবার আগে তিনি তাঁর সংগী দুজনকে সৈন্য দলের হাতে তুলে দেন তাদের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে। পরে প্রকাশ পায়, হাতবোমা ছোড়ার আগেই নিজের বন্দুকের গুলীতে তাঁর মৃত্যু হয়। কার্জন একবার লিখেছিলেন,
"In Empire, we have found not merely the way to glory and wealth, but the call to duty and the means of service to mankind." দেশে দেশে, যুগে যুগে এই মাৎসিসরাই বার বার প্রমাণ করে দিলেন, কার্জনের শেষ কথাটি কত অসত্য।

সাইপ্রাসের গভর্নর স্যার ফুট

তোপ

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

মেলাটা বেশ জমাটি হয়ে বসেছে। যেন উইপোকার মতো ঢিবি ভেঙে ছড়িয়ে লোকগুলি চারদিকে থিকথিক করছে। সরষে ছড়িয়ে দাও, ঘাড় গর্দানের ফাঁক গলিয়ে একটি কণাও নিচের দিকে নামবে না, এতো লোক জমেছে।

মাথা আর মাথা, গিসগিস করছে। আর মনে হচ্ছে, লোকগুলি যেন এ যুগেরই নয়, সেই দুপুরুষ কি চার পুরুষ, কি আরো বেশ কয়েক পুরুষ আগের, কোন যাদুকরের এক ফুঁয়ে সবাই ছোট্ট হয়ে যেতে যেতে এতটুকুন হয়ে গেল, তারপর মাছির চেয়েও ছোট্ট, আরো ছোট্ট বিন্দু বিন্দু আকার নিয়ে এই যে তোপটা দেখছ এর মধ্যে সেঁধিয়ে গেল, সেঁধিয়ে গিয়ে অনেককাল কাটালো, তারপর হঠাৎ বিদ্রোহ করার মতো ভঙ্গি করে সকলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে মেলাটা জম জমাটি করে তুলল।

তাই হঠাৎ উনুনে ফ্যান পড়ে যাওয়ার মতো ভসভসিয়ে চারদিক থেকে ধুলো উড়ছে। ধুলোয় ধুলোয় আকাশের নীল রংটাই যেন চটে গেছে। যেন খানিক এখানে খানিক ওখানে চলটা উঠে গেছে আকাশটা। আর বালি তাতা হাঁড়ির মধ্যে নুন মাখা চাল ফেলে মুড়ি ফোটাবার মতো অদ্ভুত একটানা একটা শব্দ উঠছে।

আর যাকে নিয়ে এই মেলা, সেই তোপটার গা থেকে এখন জ্যাবড়ানো তেলে গোলা ডগডগে সিঁদুর টুপ টুপ করে শান বাঁধানো বেদীর উপর পড়ছে। শাশুড়ী বউয়ে এত সিঁদুর মাখিয়েছে আজ। সিঁদুর মাখিয়েছে আর হাতের নোয়া তোপের গায় ছুঁইয়ে আমৃত্যু এয়োতি হওয়ার বাসনা মনে ধরেছে, আর ফুল ছড়িয়েছে। ফুল! থোকা থোকা, ডাট ভাঙা, ছেঁড়া, গোটা, পাপড়ি খোলা, ফুটব ফুটব করা অজস্র ফুল দিয়ে ডুবু-ডুবু করে ফেলেছে তোপটাকে। এত ফুল ছড়িয়েছে সবাই। এত শ্রদ্ধা দেখিয়েছে।

ভাবতেও অবাক লাগে, এই তোপটাই যে ধর্মের তিরিশ দিন এখানে একা একা পড়ে থাকে কে বলবে এখন! আর পড়ে পড়ে যে হাঁপায় তা কি বিশ্বাস করবে কেউ না। দেখলে? এইতো মাত্র দশ-পঁচিশ হাতও বুঝি হবে না গঙ্গার ঢালু পাড়, বুনো বিছুটি আর আঁশ-শেওড়ার ঝোপের গোড়ায় গোড়ায় গঙ্গার জল ঘোলাটে হয়ে ছুটছে সাগরের দিকে, এ কি তিনশ চৌষট্টি দিনই তোপটাকে ব্যঙ্গ করে নাচতে নাচতে ছুটো-ছুটি করেনি! আর অথৈ সিন্ধুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একি আর বলেনি, 'জানো আজ কি দেখে এলাম......' এমন যে গঙ্গা, সেও আজ কেমন অবাক হয়ে তোপটাকে দেখছে। আর বুঝবার চেষ্টা করছে ঘটনাটা। একিরে বাবা, একি হল, য়্যাঁ?

বাবা ঃ বাবা, অজ গাঁয়ের আশে পাশে এতো লোকও ছিল!

এদিক ওদিক সেদিক কোন দিকটার কথা বলি। ডালমুট থেকে চালমুগরার তেল, আরশি-কাকুই থেকে শুরু করে কালীমার্কা সাবান, জাল-পলুই-কুলো, সরা-পাতিল, আগড়ম বাগড়ম, মাটির-সোলার-কাগজের খেলনা, বিবিয়ানা-বাবুয়ানা নামধারী পুতুল।

আহাহা, পুতুল নাতো, চপ। আহ্লাদী। 'ওহে তোমার বিবিয়ানা কত করে দিচ্ছ?'

'ঘেটনি, ঘেটনি বাপু, বিনি পয়সার মাল, ঘেটনি।'

'কি?'

'কি আবার, লেবে তো লাও, না লেবে তো......দু' দু' আনা...দু' দু-আনা...দু' দু' আনা। বাবুআনা তামাক খাবে, বিবিয়ানা গান গাইবে, দু' দু' আনা......'

চকচকে চোখের মণি ঘুরছে। নোলক প্যাট্ প্যাট্ করে নাকের পাতলা পাতার ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই কোন ইজের-খসা বয়সে, সেই নোলক এখন পুরুন্টু মুখের শোভা হয়ে এপাশ ওপাশ দুলছে। কারো জামা গায়, কপালের পাতলা চামড়ায় কাঁচপোকার টিপ। কারো টুকটুকে রাঙা সায়া বেরিয়ে পড়া ঢুলঢুল হাঁটুনি। শাড়ি সামলানোই দায় হয়েছে কারো। কারো জামা নেই বুকে, জামা রাখবে কি, ঘাড়ে পিঠে প্যাচ-প্যাচে ঘাম আর ধুলো। ধুলো আর ঘামে ভারি হয়ে ফোঁটা জমেছে। চিবুকে, আকন্দর ডাঁটা পুট করে ভেঙে ফেললে যেমনি একটু সাদা আঠা আঠা কস বেরয়, তেমনি।

দ্যাখো দ্যাখো, কান্ডখানা দ্যাখো। এমন 'এখন-তখন' পোয়াতি হয়ে কেউ এখানে আসে!

ড্যাব ড্যাব করে ছোঁড়াগুলি দেখছে, আর চোখ দিয়ে অশ্লীল উত্তাপ টিপে টিপে বার করছে।

তা হোক; খেঁদির মা, কিংবা বুঁচির পিসী কিংবা নবার বউ যেই হোক না সে, তোপ-হাটার মেলা বছরে একবারই হয়, আর এই চৈত্র সংক্রান্তির দিনটিতেই। এই দিনটিতো ওর স্বস্তি পাবার জন্য অপেক্ষা করে প্রসবশেষে আসতে পারে না। তাই ওকেই আসতে হয়েছে ভারি পেটে, থপ থপ করে হাঁটতে হাঁটতে......

'চেরনখানা কত গো?'

প্লাস্টিকের দুধ-রাঙা চিরুনি, চিকন চিকন দাঁড়, কাটার মুখ বেশ ধারালো। আঙুল দিয়ে এপাশ ওপাশ টানতে বেশ

লাগে, যেন ভাদ্রের হাঁটু উঁচু ধাম গাছের ছুঁচলো চিকন পাতার উপর হাতের চেটো বুলিয়ে একবার ঢেউ খেলানো। উকুন অবধি উপরে ফেলবে এই চিরুনিতে।

'কত করে গো...ও কর্তা শুনছ?'

সওদা গুছোবার সময় পায়নি দোকানদার। ঝোলাঝুলি বার করতে না করতেই ঝিলি-ঝিলি। জানতুম এই হবে...কালিগঞ্জ মালিগঞ্জ মধ্যে তোপের হাট...অবশ্য হাট নয়, কোনকালেই হাট বসেনি এখানে। সবাই জানে বোস্টমপাড়ার মাঠ, যার দক্ষিণ কোণে বামুন-মারা দহ, সেখান থেকে আরো খানিক হেঁটে এসে গঙ্গার পাড় বরাবর এই সাবেকী কালের তোপ। রাত বিরেতেও আসে না কেউ এখানে, আর দিনে দুপুরে? হঠাৎ আসা বোলতা বা মৌমাছির মতো একজন কি দু'জন এলো আর অমনি হন্ হন্ করে চলে গেল।

গঙ্গার উপর দিয়েই তবু যা হোক কিছু মাঝি মাল্লারা হাটে গঞ্জে যাওয়ার পথে তোপের দিকে তাকিয়ে দেখে, আর দেখতে দেখতে ভাবে না জানি কত কথা! আর ছই ঢাকা পাল খাটানো নৌকায় সোয়ারী যদি তেমন কোন নয়া-কার্তিক থাকে তা' হলে বলবেই বলবে, 'ওটা কি হে?'

'এজ্ঞে, তোপ।' হাতের বৈঠা জল থেকে হাত দুই উপরে উঠে শক্ত হয়ে থাকে।

'তোপ! কার তোপ?'

এইবারই সমস্যা মাঝির। কি বলবে, কিইবা জানে সে! হ্যাঁ বলতে পারো, যেমন বলে ঝি-দহের জমিদারি খোয়ানো চাষীরা। চান্দ রাজার না না, এ সেই পুঁথিতে লেখা চান্দ নয়, এ আর ক দিনইবা আগের কথা, জনাবালীর দা-ঠাকুর যে বার হেঁদু থেকে মোছলেম হলেন, সেবার, চান্দ রাজা কিনে-ছিলেন এই তোপটা দিল্লীর লাটসাহেবের কাছ থেকে...জনাবালী বেঁচে নেই, থাকলে সে বলত, অনেক কালই সে বলেছে, 'বুয়েছ, দা-ঠাকুর এর গোলার মুখেই নিজেকে কোরবানী করেছেন প্রথম।'

'কেন গো কেন?'

'আরে ছাই আমার, তাও জানো না সুমুন্দির পুত! তা'হলে শোন--' জনাবালী সে এক মস্ত-মস্ত কেচ্ছা গাইত। কোন্ এক বাবু নাকি কেতাব বানিয়ে তাইতে সব লেখেছেল, জনাবালী সে সব কথাও বলত।

তবে যে দুলহান বিবির শ্বশুর বাড়ি-বাড়ি চামর দুলিয়ে গান গায়, 'জব্বার নামেতে এক ছেলে মোছলমান, বনবিবির কৃপা লাভে হয় মহীয়ান।' সর্বস্য খুইয়ে জব্বার নির্বাসিত হয়েছিল বনে। রাজা-পাট ধন-সম্পদ সাথী-সজ্জন সব হারালো জব্বার। হারিয়ে বনে বনে ঘোরে। ঘুরতে ঘুরতে বনমাতা বনবিবির সাথেই দেখা। এর কৃপা যে পায় তার মতো ভাগ্যবান আর কে? সাহস পেল জব্বার, শক্তি পেল, লোক লস্কর সৈন্য পেল, আর পেল এই যে তোপটা দেখছ, এটা।

কালো তেল কুচকুচে কড়াই, মেশিন ধোয়া জলের মতো রং হয়েছে তেলের, সেই তেল ফুটছে শব্দ করে। বেসনের কুচি-গুলো ঘিরে ফেনা জমছে। পাঁপর ফুলছে, আঁকা-বাঁকা অসমতল হয়ে মুচ মুচ করছে পাঁপর, ঝুড়িতে, হাতে হাতে পাঁপর ঘুরছে। ফুল বাতাসার মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে।

কাঁচি বাঁশের উপর দিয়ে এপার ওপার দড়ি টান-টান-টাঙানো। তার উপর ঝুঁক করে হাঁটতে হাঁটতে খেলা দেখাচ্ছে মাদারি।

মাদারি বউ ঢোল পিটছে ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি...রেকাবি হাতে মেয়েটা বাবুদের সামনে এসে করুণ চোখে তাকাচ্ছে। টুং টাং শব্দ হচ্ছে, পয়সা পড়ছে দুটো একটা...

খেলা বেশ জমছে। মেয়েটারই গলা কাটবে তার বাপ। তাজা রক্ত দু' হাতে লেপটে নিয়ে ঢাকা চাদরের বাইরে থেকে হাত দুটো দেখাবে। তারপর সে তার হাত দুটো পেটের উপর ঘষবে। পেটের জন্যই অনর্গল বকে খেলা দেখায় মাদারি। মাদারি বউ ঢোল বাজাচ্ছে ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি ডিমি...লোক থিকথিক করছে আর ধুলো উড়ছে ভসভস করে।

ধনাই গাজীর গীত, শুনতে শুনতে বিভোর হয়ে যেতে হয়। জব্বার গাজীর তোপ, ভাবতে ভাবতে কত দীন মনে হয় নিজেদের, তাই না?

আরে রাখো রাখো, মেলাই আর ব'কো না। যেমন দেশ তার তেমন সব ধানাই-পানাই। আসলে কি জানো, পর্তুগীজ দস্যুরা জাহাজে করে এই তোপ এনেছিল এ'দেশে। তারপর লড়াই করেছিল প্রতাপের বিরুদ্ধে। সে কি লড়াই! লড়তে লড়তে প্রতাপ দু'পা পেছয় তো লাল মুখোরা দশ পা এগোয়। আবার প্রতাপ এগোয় তো ওরা পেছয়। এই চলল কয়েক রাত। দিনে নিঃঝুম। বন্দুক হাতে, মুরগী খোঁজা চোখ নিয়ে, খায়-বসে-জিরোয় দু'পক্ষের সৈন্য। চার পাশ থমথম করে বারুদের আর পোড়া চামড়ার গন্ধে। আবার রাত হলে ডিঙ ডিঙ ডিঙ ডিঙ কাড়া নাকাড়ায় কাঠি পড়ে। উল্লাস আতঙ্ক চীৎকার সব মিশে বীভৎস হয়ে চেপে বসে মাথার উপর। আর এমন সময় তোপের মুখ থেকে গোলা বেরুতে শুরু করল। আগুন আগুন, অসংখ্য কুচি কুচি হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। লাল ডগডগে সিসে-গলা টুকরো, রক্তমুখী হাউয়ের মতো, তাজা মানুষের চামড়া, মাংস, হাড় পাঁজরা, মাথার খুলি লক্ষ্য করে সাঁই সাঁই করে ছুটে আসতে লাগল। আগুনের বৃষ্টি নামল যেন। ছুঁচলো, ধ্যাবড়ানো, তেকোণা, খইয়ের মতো কুচি কুচি, চারপাশ ফোটা ফোটা, ধারালো, লক্ষ লক্ষ টুকরো... এখানে ওখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

হ্যাঁ, একজন নয়, দুজন নয় এই তোপটাই অনেক অ-নে-ক মারল, আবার অনেকে মরা দেহের আবডাল দিয়ে বুকে হেঁচড়ে হেঁচড়ে এগোল, যেন পাঞ্জা লড়ল মৃত্যুর সাথে। এসো, কত মারবে, এসো দেখি!

তা বটে, লক্ষ লক্ষ সৈন্য প্রতাপের, আর তোমাদের কাছে কজন? শেষ পর্যন্ত গোলাগুলি ফুরিয়ে গেলে পর পিঠ বাঁকা করে, পেরেক ফোটা পায়ের মতো লাফাতে লাফাতে লালমুখোরা দে ছুট দে—ছুট।

তোপটা এলো প্রতাপের মুঠোয়।

তা জানো সেই যে বারুদের গলগলে ধোঁয়া, বৃষ্টি পড়ে হঠাৎ নিভে যাওয়া চিতার মতো ভ্যাপ্‌সানো ভ্যাপ্‌সানো গন্ধমাখা, সেটা যেন এখনো একটু একটু লেগে আছে ওর গায়। শুঁকে দেখ নি বুঝি তোপটাকে?

আর নলের মুখে মুখ দিয়ে কখনো 'কুক্‌' করে শব্দ করে দেখেছ? কুক্‌ কুক্‌ কুক্‌ কুক্‌ কতগুলি 'কুক' কান্নার মতো তোমার চারপাশে আছড়ে পড়ত, দেখতে!

জোনাকি পোকার মতো চুম্‌কি আঁটা শাড়ি, শঙ্খকলি, কল্কে-কলি, আঁশপাড় হিজল ডাঙ্গা, তা হোক, সবচে' বেশী বিকোচ্ছে কিন্তু কামরাঙ্গা-রং পাটের শাড়ি গুলোই। বিকোবে না, সস্তায় সস্তা, জেল্লাকে জেল্লা।

মাথার উপর ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ চড়ছে। আর সব দিনের মতো আজ আর ঢিকির ঢিকির করা ভাবটা একেবারেই নেই। দিনটা ছুটছে যেন ঘোড়ায় জিন থাটিয়ে। এইতো খানিক আগেও সূর্যটা কেমন টলটল করে নাচছিলো গঙ্গার ঢেউয়ের উপর। যেন টাটকা ইলিশের চকচকে আঁশের উপর রক্তের ছোপ ফেলেছে মাছউলি।

আর এখন, দ্যাখো দেখি কান্ড, মাথার ওপর যেন প্রকান্ড একটা তাতা কড়াই উপুড় করে ধরেছে কেউ। ইস্‌ কী তাত্‌ রোদের!

'মর জবালা, চোখে দ্যাখো না নাকি?'

'আহাহা, চটছো কেন মশাই। তা'লে বলি...'

'কি বলবে, কি কি?' দশজন এসে ছেঁকে ধরল। ঘাড়ের উপর দিয়ে, বগলের নিচ দিয়ে মাথা গলে গলে এগোতে লাগল।

'রক্ষে কর বাবা, দম চেপেই মারা যাব। দেখে আর কাজ নেই—'

'তা'হলে বলি, আদি কস্তুরী সালসা। হঠাৎ আছাড় খেয়েছো, মচকে গেছে পা, ঘাড়ের রস জমে জগদম্বা কালীর মতো ইয়ে হয়েছে...'

'ধুত্‌তোর নিকুচি করেছে...'

'বাতে ধরেছে, রক্ত দুষ্টি হয়েছে...'

'ধন্বন্তরীর গুষ্টির ইয়ে করেছে...'

'মাত্র চার আনা...আদি কস্তুরী...মাত্র চার আনা...'

হ্যাঁ যা বলছিলাম, তোপটা অনেক কালেরই পুরনো, কিন্তু ওর গায়ে একবার হাত বুলিয়ে দ্যাখো দেখি, একটু আঁচড় লাগেনি গায়ে। হতো আজকালকার তৈরি মাল, দেখতে দু'দিনেই কেমন ঘিয়ে ভাজা কুকুর হয়ে পড়ে রয়েছে চিত হয়ে। তা, অনেক কালই তোপটা পড়ে রইল, এই এখানেই। বুনো-বিছুটির ঝোপের ফাঁকে সারা গা ডুবিয়ে কেবল পাকা শিকারীর মতো নলটা তার আকাশের দিকে তাক করে পড়ে রইল। তারপর একদিন

ভারত স্বাধীন হ'লো। ভারত মাইজী—জয়, গান্ধী মহারাজ কী—জয়, জয় হিন্দ জয়—হিন্দ। আকাশ বাতাস যখন স্বাধীনতার আমেজে ডগমগ, ঠিক এমন দিনে এলো একদল বাঙালী আর পাঞ্জাবী সাহেব। কি সব তারা দেখল চারপাশ ঘুরে ঘুরে। তারপর চলে গেল। কিন্তু কি দেখলিরে বাবা, বল না, কি লিখলি সব তোদের খাতায়। মরুক গে যত্তসব উড়ন চণ্ডী।

ওমা, মাস কয় যেতে না যেতেই আবার আর একদল। তখন চৈত্র সংক্রান্তি ধরো ধরো। তোপের গোড়ায় কোদাল গাইতা চালাতে লাগল ওরা।

'কি হবে মশাই এখানে?'

'বাঁধাই হবে বিলিতি মাটি দিয়ে।'

'অ।'

বাঁধাই হয়ে গেল। ধাপ ধাপ সিঁড়ি কেটে গঙ্গার পাড় বাঁধা হলো। তোপের চারপাশ তকতকে ঝকঝকে হয়ে গেল। যতকালের বকশালিকের শুকনো চুনের মতো গু আর ফাটব ফাটব করা ফোড়ার মতো তেল সিঁদুরের চাপ ঘষে মেজে উঠিয়ে দিয়ে গেল। হাত পঁচিশের গণ্ডি করে একটা লোহার তারের বেড়াও দিয়ে গেল। আর সেই গণ্ডির মধ্যে দু' পাশে দু' জোড়া সিমেণ্টের বেঞ্চি বসিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল।

তোপটা নাকি উঠিয়েই নিয়ে যেত।

'কেন? এখন কি আর এসব তোপ গোলায় যুদ্ধ হয় নাকি?'

আরে না—না, এ সাবেকী কালের তোপ। এটা নাকি ওরা যাদুঘরেই রাখতো। রাজ্যের লোক তো আর এখানে এসে দেখে যেতে পারে না একে, যাদুঘরে গিয়েই আর দশটা জিনিসের সাথে এটাকেও দেখতো। তা, তোপ-হাটার কপাল ভালো, নিয়ে যায়নি ওরা!

প্যাঁখা লজেন্সের কাঠি বেয়ে মুখের লালা গড়িয়ে গড়িয়ে নাবছে। চিবুকের ডগায় পানের কষের মতো একটু আভা লেগেছে। কুচো কাচ্চাদের মাজার তাগায় রাজার মাথা আঁকা ফুটো করা তামার পয়সা ঝুলছে। ন্যাংটা ছেলেটার গায় হাঁটু ঢাকা জামা আর মেয়েটার সস্তা বুরুশের মতো চুলে ছেঁড়া পাড়ের গিঁঠ। প্যাঁখা লজেন্স হাতে হাতে ঘুরছে। ছেলে-ছোকরা, বুড়ো-হাবড়া, বউয়োরী—ঝিইয়োরী, বাবাঃ বাবা, ভিড়ের যেন এদিক সেদিক নেই।

'নাগর দোলায় চড়বি?'

'ওরে বাপ্‌রে, ভীষণ পেট গুলোয়, বুকের মধ্যে উরুম ধুরুম করে।'

'তা'লে চল কালীর নাচ দেখি, চল না!'

'ধুর ধুর, গায়ে কালি লেপে ল্যাঙ্গুটি পরে জিব বার করে ধেই ধেই নাচলেই কালী হয় নাকি! দেখিসনি জানকী ঠাকুরকে, কেমন রুপো ঢালাই স্বাস্থ্য ছিল বল দিকিনি? নারকেলের মালা বুকে বেঁধে যখন খাঁড়া হাতে এসে দাঁড়াতে চিনতে পেরেছ কখনো, মেয়ে না মরদ?'

'তা ঠিক, তা ঠিক।'

'আর এ যেমন মেলা তার তেমন কালী। গাল তোবড়ানো, শির ফোলা হাত পা, আরে বাপু, কালী সাজলেই কি আর কালী হওয়া যায়।'

'তালে চ' কাটা মুণ্ডুই দেখি।'

জোলাই গামছা দুলছে। ভাতের মাড়ে চড়বড়ে কাগজের মতো, দুলছে। আর লেজ দোলানো সোলার টিয়ে, মাথা নাচানো পুতুল, ডালের কাটা—কাঠেরও আছে লোহারও আছে...কাঠের দশ পয়সা, লোহার পাঁচ আনা।

'এই তো বাপু দশ টাকার খুচরো দিয়ে দিলুম খদ্দেরকে, আর নেই।'

'তা'লে?'

'তা'লে আর কি? যাও না বাপু ঘুরে এসে পয়সা নিয়ে যেও।'

'হ্যাঁ এদিক থেকে ওদিক যাই আর তোমার দোকান হাইরে ফেলি।'

'দাঁড়াও তবে দেখছি গণেশের কাছে।'

'এ্যাঁ খুউব ব্যবসা শিখেছিস গণশা, ব্যাটা দেব, গাছ থেকে আসে? ও দাদা দুটো পাঁচ টাকা ছাড় না গো।'

'এই যত্তে পুতুল খেলাটা দেখাবি? তোপের খেলা দেখাচ্ছে শুনলাম।'

'এই তো দেখে এলাম, মাইরী কি নাইস করেছে, গুটু গুটু করে হাঁটুনী, খুট খুট করে হাত পা নাড়া, নাইস নাইস।'

'পাড়া দাপানী ধনার বউ একটা কাণ্ডই করেছে।'

'কি করল আবার?'

'এই গেছিলো ড্যাং ড্যাং করে নাচতে নাচতে, হড়কে পড়ে মাজার হাড় ভেঙে এখন কেমন চেঁচাচ্ছে দেখগে যাও। কালী ডাক্তারের পুরিয়া গিলেও নাকি ব্যথা থামছে না। গাছতলায় বউকে শুইয়ে রেখে ধনা এখন তেল ডলছে ওর মাজায়। যা দেখে আয়!'

'মাইরী?'

'তোকে ছুঁয়েই বলছি।'

ট্যাং ট্যাং করে একটা কাঁসি বাজিয়ে অষুধ বিক্রি করছিল লোকটা। ভিড়ের চাপে ওদিকে এগোয় সাধ্যি কার। কিন্তু হঠাৎ যেন বেখাপ্পা হয়ে কাঁসিটা থেমে গেল। আর লোকগুলি পড়ি মরি করে ছুটতে শুরু করল।

'কি হ'লরে, এ্যাঁ?'

'এই, কি হয়েছে বল না?'

কে বলবে! 'পালা পালা পালা। ওরে বাপরে ষাঁড়টা কি ফোঁস ফোঁস করতে করতে তেড়ে আসছে, বাবাগো, গেছিগো, পালা পালা...'

ভিড়ের চাপে চরকির মতো আছড়ে

পাছড়ে বন্ বন্ করে সবাই ঘুরতে লাগল। বুড়োটা হড়কে চিত হয়ে পড়ল, বাচ্চাটা চিৎকার করে উঠল গলার রগগুলি টানটান করে। বউটা ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছে, সে যে কি সব বলছে বিড়বিড় করে বোঝা যাচ্ছে না।

যেন ঘূর্ণিভূতের ধুলোর মতো লোকগুলি বন বন করে পাক খাচ্ছে। পাক খেতে খেতে এক সময় আবার ফুস মন্তর হয়ে উত্তেজনাটা থেমে গেল। থিতোনী এল। ষাঁড়টা মাঠ ভেঙে দৌড়াচ্ছে, আর তার পেছন পেছন লাঠি হাতে ষণ্ডা ষণ্ডা কয়েকজন। বিপদটাতো কাটল, কিন্তু দিনটা যে এদিকে ঢল ঢল। গঙ্গার জলে আবার টকটকে লাল রংটা এখনি ভোজবাজির মতো আবির্ভূত হবে।

ট্যাং ট্যাং করে যে কাঁসিটা বাজছিল সেটা কিন্তু আর বাজতে শুরু করল না। থেমেই রইল। কিন্তু ডুগডুগিটা যেন আবার বাজছে, হ্যাঁ ঐতো ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ... ভালুক নাচ হচ্ছে...ডুগ ডুগ ডুগ ডুগ... ভালুকচন্দ্র শ্বশুরে বাড়ি যাবে। আজকে এই বুঝি তার শেষ শ্বশুর বাড়ি যাওয়া। এর পর তো রাত হবে, তখন কি আর ভালুকরা নাচে? ডুগডুগি বাজছে, ভালুক নাচ হচ্ছে, শেষ নাচ ভালুকের, শেষ খেল!

রামায়ণের তিরাশি পাতায় এবার চোখ ফেরাল মেয়েটা। এক পাতা থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে এতদূর এগিয়ে এসেছে সে।

গ্যাস বাতির ছিপি খুলে জল ঢালতে গিয়ে লোকটা কেমন হাবার মতো তাকিয়ে রইল, না তাকিয়ে উপায় নেই, কারণ সে দেখছে তার সামনেই মুখোশ পরা কিম্ভুত একটা লোক, তার টিকির চুলে বাঁধা গুচ্ছের লাল নীল ফুলানো গ্যাস বেলুন। লোকটা বেলুন বিক্রি করছে। টিকিটা তার আসল না নকল কিছুতেই বুঝতে পারছে না লোকটা, বুঝবার চেষ্টা করছে, কারণ ফন্দিটা তার মনে ধরেছে।

লোকটার ঘুঙুর বাঁধা পা নাচতে নাচতে চলে গেল। আর এমন সময় গ্যাস লাইটটা দপ করে জ্বলে উঠল। অন্ধকারটাকে বাঁধা দেবার জন্য চারদিকেই হ্যাজাক লণ্ঠন জ্বলে উঠছে। সমস্ত দিনের ক্লান্তি যেন অন্ধকার হয়ে সবার চোখে মুখে লেপটে বসতে চাইছে।

মেয়েটা সুর করে রামায়ণ গাইছে তবু। সামনে পেতে রাখা গামছায় পয়সা পড়ছে ঢের। ডাঁটো স্বাস্থ্যে জ্বল জ্বল করছে মেয়েটার মুখ। হ্যাঁ, ভুলে গেছি বলতে, বোষ্টম পাড়ার ছকড়ি বোষ্টম এক পালা গান গেয়েছিল মেলায়, গতবারইতো, মনে নেই! সেই যে রাম রাবণের যুদ্ধ, সীতা হরণের পরিণাম। মনে নেই লঙ্কাকাণ্ড! বিভীষণ যুদ্ধ করেছিল কি নিয়ে দেখিস নি?

'হ্যাঁ হ্যাঁ যত সব আজগুবি!'

'আজগুবি কেন? পুঁথি ঘেটেছো কখনো? তখন কি আর যুদ্ধ হতো না মেঘের আড়ালে, রথে চড়ে? আর মাটিতে যে অগ্নিবাণ নিয়ে লড়াই চলতো সেটা কি তোমার ছুঁচো বাজী নাকি?'

'তাই বলে এই তোপটা সে যুগের... অক্দিনের...ছকড়ি বোষ্টমেরও যা কাণ্ড!'

কথায় কথা বাড়ে। কথায় কথায় কাহিনী হয়। কথার যেমন মাথা নেই মুণ্ডু নেই...কাহিনীরই কি আছে! দেখনা কবেকার তোপ, কার তোপ কে জানে, কে মাথা ঘামিয়েছে এ নিয়ে। তো—প তোপ। তার আবার অতশত কিরে বাবা। তা কাল্লুর সাথে পচার একচোট হয়ে তো গেল!

'কেন কেন কি হল আবার?

'যাঃ চুলো, তাও জানিস না, কি দেখছিস তা হলে?' পচা নাকি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল এ মীরজাফরের তোপ। সেই যে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর। সোনার বাংলার পায়ে শেকল পরালো যে, এ নাকি তারই তোপ ছিল এককালে। তা বেশ! কাল্লু হয়তো হজম করেই যেত, কি আছে এতে চটবার! কিন্তু বাপু কাল্লুকে তুই মীরজাফরের বংশধর বলতে গেলি কেন?'

'তাই নাকি, খুঁচিয়ে ঘা বানাতে যাওয়া, মর মর।'

একটা অবসাদ নামছে। সারাদিন হেঁটে হেঁটে হাত পায়ের গাঁট টন টন করছে বুঝি লোকগুলির। নাগরদোলার শেষ পাক হয়ে গেছে। ভালুক নাচের ডুগডুগিটাও থেমে গেছে অনেকক্ষণ, ভালুকচন্দ্র শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে। তবু, হ্যাঁ তবুও বলব, হ্যাজাকগুলি জ্বল জ্বল করে জ্বলতে জ্বলতে সবাইকে ডাকছে; আরো, আরো একটু এগিয়ে এসে ঠাসাঠাসি হয়ে থাকো। এসো, এসো না! এতটুকুতেই হাঁপিয়ে গেলে?

'কি রে কথা বলছিস না যে?'

'কি বলব?'

'বেশ গাইছে না রে?'

'হুঁ।'

'হুঁ কি?'

'বেশ দেখতে কিন্তু!'

আর একটা পয়সা পড়ল ঠকাস করে, লাফিয়ে পয়সাটা ওর হাঁটুতে লাগল। মেয়েটা তবু রামায়ণের পাতা থেকে চোখ তুলল না। বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই গাইতে গাইতে ভাবতে লাগল, একশ পাতার আর কত দেরি? আর কতক্ষণ...

আলোগুলি এখন সাপুড়েদের মতো সাপ নাচানো খেলা খেলছে। লোকগুলি আবার ছোট্ট হয়ে যেতে যেতে মাছির মতো এই এতটুকু হয়ে যাচ্ছে। এইবার ধীরে ধীরে সবাই বিন্দু বিন্দু হয়ে গিয়ে সুড় সুড় করে এই তোপের খোলের মধ্যে ঢুকে যাবে। কাল থেকে আর টুঁ শব্দটিও থাকবে না। থাকবে না ততদিন যতদিন না আবার আর একটা চৈত্র সংক্রান্তি আসে।

অবশ্য কাল, তোপের চারপাশে তাকিয়ে থেকে শুধু একটা কথাই মনে হবে, তোপের মধ্যে যে অভিশপ্ত লোকগুলি আশ্রয় নিয়েছে, দু'পুরুষ কি চার পুরুষ কি বেশ কয়েক পুরুষ আগে, তারা একটু বাইরে বেরিয়ে এসে নিজেদের হাত পায়ের আঙুলের জং ছাড়িয়ে নিয়েছিল বুঝি শুধু একটি দিনেরই জন্য।

তোপের খোলের শক্ত কালো আবরণটা ভেঙে ওরা ছয় ঋতু বারমাসই ইচ্ছেমতো চলাফেরা করতে পারে না। সে শক্তি যেন ওদের নেইই।

পণ্ড্স
ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌ক
সারাদিন সতেজ ও
সুরভিস্নিগ্ধ
রাখবে
সুগন্ধভরা পণ্ড্স ড্রিমফ্লাওয়ার ট্যাল্‌কম পাউডার ব্যবহার করলে গা চট্‌চট-করা দুঃসহ গরমের দিনেও শরীরটি স্নিগ্ধ ও সতেজ আর মন প্রফুল্ল থাকবে। এই হালকা পাউডার আপনার গায়ে ছড়িয়ে দিন, আর কত তাড়াতাড়ি ঘাম শুষে নেয়, সারাদিন আপনাকে কেমন ফুলের মত তাজা ও সুগন্ধে মাতিয়ে রাখে দেখুন। ঝরঝরে অনুভব করতে হ'লে সব সময় পণ্ড্স ট্যালকম্‌ পাউডার ব্যবহার করুন।
POND'S
DREAMFLOWER TALC
DREAMFLOWER TALC

ঊনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

৩

পূর্বাঞ্চলে ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত যোগবাণী পর্যন্ত রেলওয়ে লাইন আছে। যোগবাণী হইতে কিছুদূরে যাইলেই নেপালে হাজির হওয়া যায়। যানবাহন বিশেষ কিছুই নাই। পদব্রজে অথবা ভাগ্যক্রমে যদি কোনও মাল বা যাত্রী-বাহী ট্রাক পাওয়া যায়, তবে কিছুটা আরামে বিরাটনগরে যাওয়া যায়। রাস্তানাম-ধারী যে পায়ে-হাঁটা কাঁচা পথটা যোগবাণী ও বিরাটনগরকে সংযুক্ত করিয়া দেয়, সেটাকে গৌরবে রাস্তা বলা হয়। বর্ষাকালে ইহার উপর দিয়া পায়ে হাঁটাও প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে। এই পথেই নেপাল-ভারত ব্যবসা-বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে বহু যুগ ধরিয়া। যাহা হউক, সন্ধ্যাবেলায় আমরা যোগবাণী পৌঁছিলাম। স্টেশনে বিশ্বেশ্বরের ছোটভাই গিরিজা উপস্থিত ছিল। সে আমাদের লইয়া গিয়া হাজির করিল একটা দ্বিতল মাঠকোটার বাড়িতে। সেখানে পরিচয় হইল বিশ্বেশ্বরের বড়ভাই নেপালী কংগ্রেসের তদানীন্তন সভাপতি মাতৃকাপ্রসাদ কৈরালার সহিত। কেরোসিন লণ্ঠনের আধো-আলো আধো-আঁধারে দেখা সেই মানুষটি সম্পর্কে বিশেষ কোন একটা রোমাঞ্চকর ধারণা হইল না। পরে বুঝিলাম, এই মানুষটি অতি সাধারণ মানুষের আবরণে এক অতি অসাধারণ ব্যক্তি। রাত্রে খাইবার সময় আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইল মাতৃকাপ্রসাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং বিস্ময়কর ধীশক্তি। আহারাদির পর প্রায় রাত্রি দুইটা পর্যন্ত আলাপ-আলোচনায় স্থির হইল যে, পরের দিন আমি বিশ্বেশ্বরের অপর ভাই তারিণীর সহিত বিরাটনগরে যাইব। মাতৃকা-প্রসাদ অথবা বিশ্বেশ্বরের বিরাটনগর যাইবার কোন প্রশ্নই উঠে না, কারণ জীবিত অবস্থায় রাণাশাহী তাহাদের নেপালে কোন-মতেই প্রবেশ করিতে দিবে না। গিরিজার উপদেশানুযায়ী ইহাও স্থির হইল যে, কৌতূহলী লোকের নিকট কৈফিয়তস্বরূপ বলা হইবে যে, বিরাটনগরে স্কুলমাস্টারী করিবার জন্য আমার আগমন এবং রাজনীতি আমার নিকট গ্রীক ভাষার ন্যায় অপরিচিত। ইহার প্রয়োজন ছিল। কেননা আমি বাঙালী এবং কৈরালা পরিবারের সহিত আমার বন্ধুত্ব—এই দুইয়ের সংযোগে পুলিসের কৃপাদৃষ্টি অচিরেই আমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। অনেকক্ষণ এইভাবে আলোচনা চলিবার পর গিরিজা আনিয়া

মাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা

হাজির করিল গুরুজীকে। উদ্দেশ্য, তিনি আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবেন সীমান্তে অবস্থিত এক কৃষাণের বাড়িতে। সেখানে সংগৃহীত হাতিয়ারগুলি ছিল এবং সেগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। অতএব রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরে আমরা সেই কৃষাণের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইলাম। কয়েকটা রিভলবার এবং রাইফেল ব্যতীত সেখানে আর কিছুই ছিল না। এমন কি সেগুলিকে জীবিত রাখিবার জন্য যে পরিমাণ বুলেটের প্রয়োজন তাহাও ছিল না। অবস্থা দেখিয়া মনটা আরও মুষড়াইয়া পড়িল। ভাবিলাম এই কয়েকটা হাতিয়ারের সাহায্যে নেপালের সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? একথা সত্য যে, কোনদিন কোন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অস্ত্রের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করিয়া সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় নাই। কিন্তু একথাও ঠিক, সামান্য পরিমাণ হাতিয়ারও যদি না থাকে তবে শুধুমাত্র মানসিক দৃঢ়তা ও সাহসের উপর নির্ভর করিয়া আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত শৃঙ্খলাবদ্ধ ফৌজের বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। এই সমস্ত কথা গিরিজার সহিত আলোচনা করিতে করিতে আমরা যখন বাসস্থানে ফিরিলাম, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

যোগবাণী হইতে একটা ঘোড়া যোগাড় করিয়া তারিণীর সহিত যখন বিরাটনগরে পৌঁছিলাম, তখন সূর্যদেব তাঁহার সান্ধ্য-পাটে বসিয়াছেন। পথটা আঁকিয়া বাঁকিয়া কখনও বা চাষীর ক্ষেতের পাশ দিয়া, কখনও বা পাটকল, চিনিকলের ধার দিয়া বিরাটনগর বাজার প্রান্তে আসিয়া শেষ হইয়াছে। পথে তারিণীর সহিত আলাপটা বেশ জমিয়া উঠিল। প্রাণখোলা ছেলে, হাসিতে জানে, আবার পরের ব্যথায় ব্যথিতও হয়। পাহাড় এবং সমতলভূমির মাঝখানে মানুষ হইয়াছে। বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি উভয়ের ছোঁয়া লাগিয়াছে তাহার যৌবন-উচ্ছ্বলিত মনলোকে। কয়েক ঘণ্টার পরিচয়ে বন্ধুত্বের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আমরা আবদ্ধ হইলাম। বাড়িতে পৌঁছাইয়া দেখা হইল বিশ্বেশ্বরের মায়ের সহিত। জীবনে অনেক নারীর সহিত পরিচয় ঘটিয়াছে। বিভিন্নরূপে তাঁহাদের দেখিয়াছি, মৃত সন্তানের শয্যায় মায়ের করুণ মুখের উপর বেদনা ও ব্যথায় মিশ্রিত অপার্থিব প্রতিচ্ছবি দেখিয়াছি। ছন্নছাড়া সর্বত্যাগী সন্তানের কল্যাণ-কামনায় নিরত অধীর নারীকেও দেখিয়াছি। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে নির্বাসিত মুক্তি-সংগ্রামী মায়ের সহিত পরিচয় হইয়াছে। দেখিয়াছি কেমন করিয়া তাঁহার নিকট সন্তান এবং দেশের কল্যাণ এক অবিচ্ছেদ্য রূপ লইয়াছে।

বিশ্বেশ্বরের মাকেও দেখিলাম। পশুশক্তির অত্যাচারে জর্জরিত লক্ষ নেপালবাসীর মায়েদের সমস্ত অশ্রুজলের প্রতিচ্ছবি দেখিলাম তাঁহার মুখাবয়বে। অনুকম্পার অভাব সেই মুখে দেখি নাই। কিন্তু সংকল্পের দৃঢ়তাও সেখানে পরিস্ফুট ছিল। নিজ সন্তানের চরম আত্মত্যাগের পরিবর্তে যদি নেপালের মুক্তি আসে, তবে সেই পথেই আসুক মুক্তি। যে কোন মূল্যেই হউক, নেপালের সর্বগ্রাসী অন্ধকার রজনীর অবসান হউক। স্বাধীনতা ও শান্তি ফিরিয়া আসুক নেপালের স্বভাব-সুন্দর উপত্যকায়। প্রথম পরিচয়ের দিনে বিশ্বেশ্বরের মা এই কয়েকটি কথা পরিষ্কার-ভাবে জানাইয়া দিলেন।

সেই দিন সকালে বিশ্ববন্ধুর বাড়িতে বিরাটনগর জিলা নেপালী কংগ্রেসের সভ্যদের একটি সভায় যোগদান করিবার কথা ছিল। তারিণীকে সঙ্গে লইয়া সভায় যাইবার উদ্দেশ্যে বাহির হইলাম। ফৌজি পুলিসের সতর্ক দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া যখন বিশ্ববন্ধুর বাড়িতে উপস্থিত হইলাম, সভার কার্য তখন শুরু হইয়া গিয়াছে। প্রায় পঞ্চাশজন সভ্যকে সেইখানে উপস্থিত দেখিলাম। পরিচয়ে প্রকাশ পাইল যে, উপস্থিত সকলেই তথাকার নেপালী কংগ্রেসের আভ'গার্দে অর্থাৎ মুখ্য সংগ্রামী। শিভারী ও শিবজঙ্গ রাণার সহিত কথা হইতেছিল। কিছুক্ষণ বাদে তারিণীর বোন ইন্দিরা এবং তাহার স্বামী স্থানীয় একজন ডাক্তার আলোচনায় যোগ দিলেন। বিরাট-নগরের তখনকার পরিস্থিতি এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তি-সংগ্রামের রূপ কি হইবে, ইহাই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু। সকলেই একটি বিষয়ে একমত ছিল যে, মুষ্টিমেয় ব্যক্তির বীরত্বপূর্ণ নাশকতামূলক কার্যের দ্বারা রাণাসাহীর অত্যাচারের অবসান ঘটান যাইবে না। কেবলমাত্র সশস্ত্র গণ-সংগ্রামের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই নেপালের মুক্তি-সংগ্রামকে সফলতাময় পরিণতির পথে লইয়া যাইতে পারে। প্রতিপক্ষের শক্তি সম্পর্কে সকলেই বিশেষ সচেতন ছিল এবং সেইজন্যই ক্ষণস্থায়ী সন্ত্রাসমূলক কার্য-কলাপের পরিবর্তে সংগঠিত গণফৌজের দ্বারা পরিচালিত সর্বাত্মক সংগ্রামের পক্ষে অভিমত প্রকাশিত হইল। একথাও তাহারা জানাইয়াছিল যে, অস্ত্রচালনায় অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবকের অভাব হইবে না। ভারতীয় সশস্ত্র পুলিস এবং ফৌজ বিভাগে ছিল এইরকম বহু নেপালবাসীই মুক্তি-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। সর্বাধিক প্রয়োজন হাতিয়ারের এবং যে কোনও প্রকারেই হউক উহা সংগ্রহ করিতে হইবে। বেলা প্রায় ১টা নাগাদ সভা শেষ হইল। বাসস্থানে ফিরিবার কোন তাগিদ ছিল না, কারণ তারিণী ও আমার মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ ছিল বিশ্ববন্ধুর বাড়িতে। বেশ সুন্দর মানুষ এই বিশ্ববন্ধু। প্রথম দর্শনেই মনে হইয়াছিল যে, তাহার উপর নির্ভর করা যায়। ভবিষ্যতে যখন সত্যই সেই প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল তখন দেখিয়াছি কত সহজে তিনি বিপদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারেন। যাহা হউক, আহারাদির পর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বেলাশেষে তারিণী এবং বিশ্ববন্ধুকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইলাম। উদ্দেশ্য ছিল বিরাটনগরের প্রধান জায়গাগুলি ঘুরিয়া দেখা—বিশেষ করিয়া ফৌজী আবাস, জেলখানা, ট্রেজারী এবং স্থানীয় রাজপ্রমুখের আবাসগৃহ। ফৌজী পুলিসের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়া এই সমস্ত ঘুরিয়া দেখিতে অনেক সময় লাগিল। বাড়ি ফিরিলাম একটা মেঠো পথ ধরিয়া। এই পথটা ছিল ভবিষ্যতের লড়াইয়ের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। রাজধানী কাঠ-মণ্ডুর সহিত বিরাটনগরের সংযোগ রক্ষিত হয় এই পথেরই মাধ্যমে। এইখান হইতে ধানকুঠার ভিতর দিয়া পাহাড়ের বুকে আঁকা-বাঁকা বহু জনপদ, মাঠ, নদী অতিক্রম করিয়া ইহা চলিয়া গিয়াছে কাঠমণ্ডু পর্যন্ত। ধানকুঠার নিকট পাহাড় অঞ্চলে নদীর উপর যে সেতুটি আছে, তাহা এই পথের প্রাণ-কেন্দ্র। এই সম্পর্কে নেপাল সরকারও

অত্যন্ত সজাগ। রাত্রি অনেক হইয়াছিল; পরদিন সকালে যোগবাণী ফিরিতে হইবে। অতএব মায়ের আদেশমত আহারাদির পর তারিণী আর এক প্রস্থ চায়ের আসর জমাইবার চেষ্টায় বিরত হইল।

যোগবাণী ফিরিলাম। ভবিষ্যতে আরও অনেকবার নেপাল-বিহার সীমান্তে অবস্থিত এই গ্রামীণ শহরে আসিতে হইয়াছে। কিন্তু কোনদিন এই স্থানকে ভালবাসিতে পারি নাই। কেমনধারা একটা খাপছাড়া আবহাওয়া সমস্ত স্থানটিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সীমান্ত এলাকার সমস্ত কুব্যাধিগুলি আছে এই অঞ্চলে, নাই শুধু তথাকার দুঃসাহসিক মনোবৃত্তি যাহা সৃষ্টি করিয়া দেয় খানিকটা রোমাঞ্চকর পরিবেশের। যাক্ সেকথা। বিশ্বেশ্বরের সহিত বিরাটনগরের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন ছিল। কালবিলম্ব না করিয়া তথাকার বাস্তব অবস্থা দেখিয়া আমার যে প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টভাষায় বিশ্বেশ্বর ও মাতৃকাপ্রসাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। ইহা পরিষ্কার করিয়া বলিতে হইল যে, বিরাটনগরের নেপালী কংগ্রেস-কর্মীদের দ্বারা যে কোনও কঠিন কার্য সাধিত হইতে পারে। বিপ্লবীর একান্ত প্রয়োজনীয় গুণগুলির কোনটিরই অভাব নাই তথাকার মুক্তি-সংগ্রামীদের ভিতরে। নির্ভীক অভিযাত্রীর প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত নেপালী কংগ্রেসের প্রত্যেক কর্মী। সাহস এবং সংকল্পের দৃঢ়তা, সর্বোপরি আদর্শের প্রতি অটল আনুগত্য ইহাদের আছে। পৃথিবীর কঠিনতম কার্য ইহাদের দ্বারা সাধিত হইতে পারে। কিন্তু যুদ্ধজয়ের জন্য ইহা একান্ত আবশ্যকীয় হইলেও শুধুমাত্র ইহার দ্বারা মুক্তি-সংগ্রামকে সফল করা সম্ভব নয়। সশস্ত্র শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামী প্রত্যেকটি মুক্তি-যোদ্ধাকে অন্ততঃ একটি করিয়া হাতিয়ার দিতে হইবে। প্রতিপক্ষ যেখানে মেশিনগান, ট্রেঞ্চমর্টার এবং চার ইঞ্চি কামানে সজ্জিত সেখানে অন্ততঃপক্ষে রাইফেল, স্টেনগান, ব্রেনগান এবং সম্ভব হইলে কয়েকটি মেশিনগান যে কোন উপায়ে সংগ্রহ করিতে হইবে। সুখের বিষয় মুক্তি-সংগ্রামীদের অনেকেরই এই সমস্ত হাতিয়ারের সহিত কিছুটা পরিচয় ছিল। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে কিভাবে এবং কোথা হইতে এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হইবে। অবস্থা দেখিয়া মনে হইল না যে, নেপাল অথবা ভারতবর্ষের অভ্যন্তর হইতে হাতিয়ার সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। অতএব দুঃসাহসীর দৃষ্টি লইয়া দেশের সীমান্তের বাহিরে হাতিয়ারের সন্ধান করিতে হইবে। ইতিহাসে এইরকম বহু নজীর আছে। এক দেশের আদর্শ পূজারী মানুষ অন্য দেশের মুক্তি-সংগ্রামীকে সর্বপ্রকার সাহায্য পৌঁছাইয়া দিয়াছে। বেশীদিনের কথা

জয়প্রকাশ নারায়ণ

নহে, যখন এই পূর্ব গোলার্ধের প্রায় আট কোটি মানুষের দেশ ইন্দোনেশিয়া, ওলন্দাজী দস্যুতার বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক সংগ্রামে ব্রতী হইয়াছিল, তখন মানবতা, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন কোন দেশ তাহাকে সাহায্য পৌঁছাইয়া দিয়াছিল। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে, প্রচুর বাধাবিপত্তি আছে এই পথে। কিন্তু অন্য কোন পথও খোলা নাই নেপালী কংগ্রেসের সম্মুখে। সীমাহীন বিপদ আছে এই পথের অভিযাত্রী মানুষের সামনে, তবে ইহাও সত্য যে, যুগ যুগ ধরিয়া আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ ছিনিমিনি খেলিয়াছে নিজ জীবনকে লইয়া। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস হইতেছে সংগ্রামের, ত্যাগের এবং সর্বোপরি আদর্শের জন্য তাহার জীবনোৎসর্গের। নেপালের সর্বগ্রাসী বিপর্যয়ের দিনে অভাব হইবে না সেই মানুষের, যে সমস্ত তুচ্ছ করিয়া আগাইয়া আসিবে মুক্তি-সংগ্রামের মহাযজ্ঞে নিজের শেষ রক্তবিন্দু আহুতি দিবার জন্য। কথার ভিতর কিছুটা আবেগ ছিল, যাহার জন্য খানিকটা লজ্জিত হইলাম। কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। আগ্রহের সহিত বিশ্বেশ্বরের উত্তরের অপেক্ষায় কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিবার পর জবাব পাইলাম। ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেপালী কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের সহিত আলোচনা না করিয়া কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হইবে না। স্থির হইল যে, আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া যাইব এবং তথায় জেনারেল সুবর্ণ সামসের এবং অন্যান্য কয়েকজনের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্যপদ্ধতি নির্ধারিত হইবে।

কলিকাতায় ফিরিলাম। খোঁজ লইয়া জানা গেল যে, জেনারেল সুবর্ণসামসের এবং সূর্যপ্রসাদ উপাধ্যায় প্রমুখ নেপালী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কলিকাতায় উপস্থিত। পরদিন সুবর্ণ সামসেরের বাড়িতে সকালে সমবেত হইলাম। বিশ্বেশ্বর পরিষ্কার

কাঠমাণ্ডু হইতে বিরাটনগরে যাইবার পথে পাহাড়ী নদীর উপর সেতু — ফটো: অজিত শ্রীমানী

ভাষায় বিরাটনগরের পরিস্থিতি ব্যক্ত করিলেন। ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, হাতিয়ার সংগ্রহের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এই চেষ্টা করিতে গিয়া বেশ কিছু অর্থের অপব্যয় হইয়াছে। দুই চারিটি পিস্তল ও রাইফেল ব্যতীত বিশেষ কিছুই সংগ্রহ করা যায় নাই। সূর্যপ্রসাদ তাঁহার নিজ চেষ্টার ব্যর্থতার কথা জানাইলেন, অর্থ তিনিও বেশ কিছু ব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও বৃথা হইয়াছে। সুবর্ণ সামসেরের নিকট কয়েকটি সন্ধান আছে, তবে যে-মূল্যে তাহা পাওয়া যাইবে তাহা নেপালী কংগ্রেসের সাধ্যাতীত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বেশ্বর আমার বক্তব্য তাঁহাদের নিকট পেশ করিলেন। খানিকটা অবিশ্বাসের সহিত সকলে শুনিলেন সমস্ত কথা। কেহ কেহ মন্তব্য করিলেন যে, বাহির হইতে হাতিয়ার সংগ্রহের প্রচেষ্টায় আরও কিছু অর্থের অপব্যয় হইবে মাত্র। ভিন্ন দেশ হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা করিয়া কোন লাভ নাই। বিদেশ হইতে হাতিয়ার সংগ্রহের চেষ্টা করিলে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গোলযোগ দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন কারণে এই প্রস্তাব বাস্তবে রূপায়িত করা যাইবে না। প্রথমত নেপাল সীমান্তের সহিত সরাসরি যোগ আছে যে-দেশের, সেই দেশ কম্যুনিস্ট-কবলিত। তাহাদের নিকট সাহায্য পাওয়া গেলেও উহা গ্রহণ করিতে নেতৃবৃন্দ একান্তই নারাজ। অন্য কোন দেশ হইতে সাহায্য পাওয়া গেলেও উহা সরাসরি নেপালে লইয়া যাওয়া যাইবে না। ভারতবর্ষের ভিতর দিয়া লইতে হইলে নানারকম গোলযোগ দেখা দিতে পারে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমনই জটিল যে, বিদেশ হইতে ভারতের মধ্য দিয়া নেপালে অস্ত্র আমদানীর কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে বিশেষ গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইবে। অতএব এই কার্য হইতে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। উপেক্ষা করিবার মত যুক্তি ইহা নহে। কিন্তু আদিমকাল হইতে যদি মানবজাতির সমস্ত কার্য যুক্তিসম্মত পথে হইত, তাহা হইলে পৃথিবীর ইতিহাস অন্য ধারায় রচিত হইত। সৃষ্টির ঊষাকাল হইতে আজ পর্যন্ত মানবসভ্যতার অগ্রগতি নির্দিষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য পথে নিশ্চয়ই হয় নাই। যন্ত্র চালিত হয় যুক্তির বাঁধানো রাজপথে। উহাকে যে চালনা করে সে যুক্তি এবং ভাব-প্রবণতার সংমিশ্রণে গঠিত এক অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি।

সমস্ত আলোচনা মনোযোগের সহিত শুনিয়া বলিলাম যে, তাহাদের শাণিত ইস্পাতের ন্যায় যুক্তিকে খণ্ডন করিবার মত ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু একথা বলিতে কোন বাধা নাই যে, দেশের বাহিরে স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর অনাদিকালের বাণীতে বিশ্বাসী সমধর্মী মানুষের অভাব হইবে না। দৃঢ়সংকল্প ও প্রচেষ্টা থাকিলে এমন মানুষ নিশ্চয়ই খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, যাহারা নেপালের মুক্তি-সংগ্রামীদের সাহায্য পৌঁছাইয়া দিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। শত বিপদাকীর্ণ এই পথ, কিন্তু তাঁহাদের অনুমতি থাকিলে সর্পিল নিশানাহীন পথের যাত্রী হইতে আমার কোন আপত্তি নাই। ইহাও উল্লেখ করিলাম যে, বিদেশের সহিত সংযোগ স্থাপনার কার্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের সাহায্য হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। জয়প্রকাশের সাহায্য এই ব্যাপারে পাইব কিনা, সে সম্বন্ধে প্রভূত সন্দেহ ছিল। কিন্তু

তাঁহাদের সম্মতি পাইবার আশায় এই হঠকারিতা করিতে বাধ্য হইলাম। কিছুক্ষণ বাদে সমস্ত সন্দেহের অবসান করিয়া বিশ্বেশ্বর বিশেষ জোরের সহিত আমার প্রস্তাবে সমর্থন জানাইলেন। ইহার পর অন্য নেতাদের মনস্থির করিতে বিশেষ সময় লাগিল না। যদিও তাঁহাদের মন হইতে তখনও সমস্ত সন্দেহের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে নাই। জয়প্রকাশ সেই সময় পাটনায় ছিলেন। স্থির হইল বিশ্বেশ্বর পাটনায় যাইয়া জয়প্রকাশের সহিত এই সম্পর্কে আলোচনা করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব পরবর্তী কর্তব্যের নির্দেশ দিবেন। উপস্থিত দেশের অভ্যন্তরে হাতিয়ার সংগ্রহ করিবার প্রচেষ্টাকে আরও দৃঢ়তার সহিত পরিচালনা করিতে হইবে।

তখন আগস্ট মাসের শেষ দিক। বহু প্রয়োজনীয় ঘটনার ন্যায় ঠিক তারিখটাও আজ মনে করিতে পারিব না। চেষ্টা করিলে হয়ত পুরাতন পুঁথিপত্র দেখিয়া সেটা উদ্ধার করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহার কোনও প্রয়োজন দেখিতে পাইতেছি না। খোঁজ পরিষদের কার্যকরী সমিতি অথবা সোস্যালিস্ট পার্টির জাতীয় সমিতির সভা উপলক্ষে জয়প্রকাশ কলিকাতায় আসিলেন। জরুরী কার্যে ব্যস্ত থাকার দরুণ দুইদিন বাদে জয়প্রকাশের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইলাম। ইতিমধ্যে বিশ্বেশ্বর পত্র মারফৎ খবর দিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত আলোচনার পর জয়প্রকাশ আমাদের প্রস্তাবে সম্মতি জানাইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রয়োজনীয় পরিচয় পত্রাদি যেন সংগ্রহ করিয়া লওয়া হয়। সেইদিন বৈকালে খোঁজ-পরিষদের চৌরঙ্গীস্থ তদানীন্তন দফতরে জয়প্রকাশের সহিত দেখা করিবার জন্য হাজির হইলাম। জীবনে বহু সুযোগ্য ও সম্মানিত ব্যক্তিকে ঘনিষ্ঠ-ভাবে জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও ঘটিবে। কিন্তু এই মানুষটিকে চিরকাল শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই নয় যে, জয়প্রকাশ মানবীয় দুর্বলতার ঊর্ধ্বে অবস্থিত একজন অতি-মানবীয় ব্যক্তি। সেই দিনের জয়প্রকাশ সমাজবাদী আন্দোলনের মধ্যমণি ছিলেন, আজ তিনি সেইখান হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার সহিত প্রচুর মতবিরোধ রহিয়াছে। তথাপি এই মানুষটি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন বহুবিধ কারণে। জয়প্রকাশের নিকট হইতে চিঠি পাইলাম। কতকগুলি একান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ে তিনি ওয়াকিবহাল করিয়া দিলেন।

এইবার শুরু হইল আলো-আঁধারের পথে এক নাতিদীর্ঘ অভিযান। ছাড়পত্র প্রস্তুত ছিল, অতএব বিদেশ যাত্রার আয়োজন করিতে বিশেষ কোন হাঙ্গামায় পড়িতে হইল না। যাত্রার পূর্বে বিশ্বেশ্বর এবং

নেপালের পার্বত্যপথে 'রোপওয়ে'র একাংশ ফটোঃ অজিত শ্রীমানী

সুবর্ণ সামসেরের সহিত কতকগুলি খুঁটি-নাটি ব্যাপার সম্পর্কে পরামর্শ করিয়া লইলাম। পুলিসের দৃষ্টি এড়াইবার জন্য তারবার্তা আদানপ্রদানের একটি গোপন ভাষা নির্ধারিত হইল। দ্বিতীয়ত, বিদেশী বন্ধুরা সাহায্য করিতে মনস্থ করিলে কি উপায়ে এবং কোথায় তাঁহারা সাহায্য প্রেরণ করিবেন তাহা স্থির করিবার দায়িত্ব সাগর-পারের বন্ধুদের উপর ন্যস্ত করা স্থির হইল। নির্দিষ্ট দিনে দমদম বিমানবন্দরে হাজির হইলাম। দিনের আলো তখন সবেমাত্র ফুটিয়াছে, কিন্তু বিমানবন্দর নানা জাতির বহু মানুষের বিভিন্ন ভাষার কোলাহলে মুখরিত। অল্পক্ষণের ভিতরই ছাড়পত্র, ডাক্তারী এবং শুল্ক বিভাগের পরীক্ষা শেষ হইল। বিদেশী যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ভোররাত্রিতে গৃহ হইতে বিদায় লওয়ার ফলে প্রাতঃকালীন চায়ের পেয়ালার মুখদর্শন ঘটে নাই। স্বাভাবিক উত্তেজনার সহিত চায়ের অভাব মনটাকে বিশেষ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হয়ত আমার মনোভাব বুঝিয়া বিদেশ যাত্রার পূর্ব-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক ব্যক্তি আশ্বাস দিলেন যে, বিমানবন্দর ত্যাগ করিবার পূর্বে এক পেয়ালা করিয়া চা পাওয়া যাইতে পারে। কয়েক মিনিট বাদে সত্যই চায়ের পেয়ালা লইয়া এক ব্যক্তি হাজির হইল এবং তাহা বিনামূল্যে পরিবেশন করিয়া গেল। চা-পান শেষ হইতেই বিমানে উঠিবার আদেশ হইল। দ্বিধা, আশঙ্কা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন মিলাইয়া অতি-বিচিত্র এক মানসিক চাঞ্চল্যের সহিত বিমানে চড়িলাম।

(ক্রমশ)

গত সপ্তাহে চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউস্থিত গভর্নমেণ্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়াম-এ ভারতীয় মহিলা শিল্পীদের পঞ্চম বার্ষিক চিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মহিলা শিল্পীরা ছবি এবং ভাস্কর্য পেশ করেছিলেন। সব-সুদ্ধ ১০৫টি নিদর্শন প্রদর্শন করা হয়েছিল। কোনও বিশেষ চিত্রধারার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে নিদর্শনগুলি নির্বাচিত হয়নি, আধুনিক চিত্রকলার বর্ণিকাভঙ্গের সমস্যা, ফর্মের সমস্যা এ সবকে যতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আবার প্রথাগত চিত্রকলার সাদৃশ্য লাবণ্য, ভাব প্রভৃতিকেও ততটাই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অ্যাবস্ট্রাক্ট আকৃতির পাশেই প্রাকৃত আকৃতির স্থান হয়েছে, আবার তার পাশে আধ্যাত্মিক ভারতীয় চিত্র-কলারও স্থান হয়েছে। গত বছরের মহিলা শিল্পীদের চিত্রপ্রদর্শনী অপেক্ষা এ প্রদর্শনীর মান নিশ্চিতভাবে অনেক উন্নত। এক সময় চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্প-কর্ম কেবল পুরুষদেরই আরাধনার বিষয় ছিল। কয়েক শত বছর ধরে মেয়েরা তাঁদের সুকুমার শিল্পপ্রবৃত্তি নিয়ে কেবল গৃহস্থালীই করে গেছেন। কিন্তু এখন তাঁরা কৃষ্টির সমস্ত ক্ষেত্রেই পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন প্রতিযোগী হিসেবে। পথিকৃৎ পুরুষ শিল্পীদের সমান প্রতিভার পরিচয় এঁরা দিতে পেরেছেন সে কথা বলার মত উদার দৃষ্টি কোন সমা-লোচকেরই নেই, তাহলেও মুক্তকণ্ঠে বলা যায়, শিল্পের দরবারে এঁদের আসনও সুপ্রতিষ্ঠিত। আর্টকে পাবার তপস্যা, আর্টকে বোঝবার তপস্যা, কারিগরির তপস্যা এবং সমঝদারের তপস্যা যে আত্মনিষ্ঠায় এঁরা করে চলেছেন তাকে অস্বীকার করা চলে না। শিল্পজগতে মহিলা শিল্পী আজ এমন একটি সুর দিচ্ছেন যা তাঁর একান্ত স্বকীয়, অত্যন্ত কোমল, সরল এবং কল্পনায় সমৃদ্ধ। তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল মন নিয়ে তিনি এ সুর বাজিয়ে চলেছেন।

এবারের প্রদর্শনীতে তৈল মাধ্যমের শ্রেষ্ঠ কাজ হিসাবে স্বর্ণপদক লাভ করেছে চিত্রা গুপ্তের 'গসিপ', শ্রেষ্ঠ প্রতিকৃতি হিসাবে রৌপ্য পদক লাভ করেছে সুধা সদনের 'পোরট্রেট অব সুলু', শ্রেষ্ঠ দৃশ্যচিত্র হিসাবে রৌপ্য পদক লাভ করেছে ইলা ঘোষের 'সুইট হার্ট', শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে রৌপ্য পদক লাভ করেছে রানী পুভিয়ার 'ইন দি রেইন' এবং শ্রেষ্ঠ স্টিল লাইফ ছবি হিসাবে রৌপ্য পদক লাভ করেছে প্রেমা পাথারের 'চম্পক'। জল রঙের শ্রেষ্ঠ কাজ হিসাবে স্বর্ণপদক লাভ করেছে আরতি সেনগুপ্তের 'এ গার্ল' এবং রৌপ্য পদক লাভ করেছে জসমীন রাজার 'স্টিল লাইফ' ও কুন্দ দুকলের 'হেড স্টাডী'। ভারতীয় চিত্রকলায় শ্রেষ্ঠ কাজের জন্য স্বর্ণপদকটি এ বছর কাউকেই দেওয়া হয়নি। রৌপ্য পদক লাভ করেছেন চিত্রনিভা চৌধুরী (চালতা ফুল) এবং মায়া রায় (লেডী উইথ পিচার)। আধুনিক চিত্রকলায় রৌপ্য পদক লাভ করেছেন হেমা জোশী (ফিসারম্যান), গ্রাফিক আর্ট-এ রৌপ্য পদক লাভ করেছেন মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায় (ন্যাপিং), ভাস্কর্য ও মডেলিং-এ রৌপ্য পদক লাভ করেছেন ইন্দু-মতী লাখাতে। এ বছরের সমগ্র প্রদর্শনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কাজের জন্য নির্দিষ্ট বাংলার রাজ্যপালের পদকটি বিতরণ করা হয়নি। কিন্তু আমাদের মনে হয় শ্রীমতী ইন্দুমতী লাখাতেকে ঐ স্বর্ণপদকটি দেওয়া হলে অপাত্রে দান হত না; এঁর 'এ গ্রুপ' ভাস্কর্যটির উৎকর্ষ স্বর্ণপদক লাভ করার মতন। নিঃসন্দেহে এটিকে এ প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা চলে।

আমাদের বিচারে উল্লেখযোগ্য চিত্র আরতি সেনগুপ্তের 'রীনা' ও 'লোনলী হার্ট', চিত্রা গুপ্তের 'গসিপ', কমল মহাদেশ্বরের 'হেড ফ্রম লাইফ', রানী পুভিয়ার 'ল্যাণ্ডস্কেপ', সুচন্দ্র রায়ের 'ডিকি ফ্রম সোজা থাম্বু', সুচিত্রা গুহের 'বাই দি সাইড অব দি ওয়েল', প্রেমা পাথারের 'রুইণ্ড হার্ট', চিত্রনিভা চৌধুরীর 'চালতা ফুল', হাসিরাশি দেবীর 'সেটিং সান অব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বেঙ্গল', মায়া রায়ের 'লেডী উইথ পিচার' এবং ফিলোমিনা গোমেজ-এর উডকাট 'এ বস্তিত কর্নার'।

ম্যাগ্নোলিয়া

বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি

মম্মটভট্ট

আধুনিক উপন্যাসের নায়ক

আধুনিকতার লক্ষণ কি তা-নিয়ে নানা মুনির নানা মত। যদি সম্প্রতিকালে যেখানে যা-কিছু ঘটেছে বা ঘটছে তার সব কিছুকেই আধুনিক সংজ্ঞার অন্তর্গত করা হয়, তাহলে অবশ্য আধুনিকতার লক্ষণ খোঁজা নিতান্ত পন্ডশ্রম। অপর পক্ষে কেউ যদি তা থেকে বিশেষ বিশেষ দিক বা ধারাকে যুগধর্মের চিহ্ন বলে অভিহিত করেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে খেয়ালখুশি কিম্বা নিজের সুবিধে মত বাছাই করার অভিযোগ ওঠা স্বাভাবিক। একজন জাতীয়তাবাদী আলজেরিয়ানের কাছে যে-ধারাটি বিশেষ অর্থপূর্ণ, একজন ক্যানাডিয়ান লিবর্যালের হয়ত তা নজরেই পড়বে না। এই দেশে বসে একজন মার্ক্সবাদী যে ঘটনাপ্রবাহের উপরে জোর দেবেন একজন কনজারভেটিভ অথবা একজন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট সম্ভবত তার উপরে ততখানি গুরুত্ব আরোপ করবেন না। আবার একই ঘটনাকে দুজনে দুভাবে ব্যাখ্যা করছেন, এও ত আখছার দেখা যায়।

এসব মুশকিল থাকলেও অনেক সমাজ-শাস্ত্রী এবং ঐতিহাসিক আমাদের যুগের বৈশিষ্ট্য কোনখানে, তা নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। এঁরা প্রায় সকলেই পশ্চিমী পণ্ডিত। এঁরা আধুনিক বলতে বোঝেন প্রথম মহাযুদ্ধের পরের যুগ। বছর চল্লিশ আগেও আধুনিক যুগের সূচনা ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সময় থেকে বলেই হিসেব করা হত। (আমি নিজে এখনো সেই হিসেবেই অভ্যস্ত)। কিন্তু এঁদের মতে প্রথম মহাযুদ্ধের সঙ্গে উক্ত অর্থে আধুনিক যুগ শেষ হয়ে গেছে। তারপর যে-যুগের শুরু সেটিই এখন আধুনিক আখ্যার প্রকৃত অধিকারী। এই অত্যাধুনিক যুগের চেহারাটা কেমন তা নিয়ে অবশ্য এই পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। তবে এঁদের অনেকেরই ধারণা যে আধুনিককালে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ যতখানি প্রকট হয়ে উঠেছে ইতিপূর্বে আর কখনো তেমন হয়নি। মধ্যযুগে ব্যক্তি নিজের স্বতন্ত্র সত্তার বিষয়ে সচেতন ছিল না; সমাজের অংশ হিসেবে টিঁকে থাকাকেই সে আদর্শ বলে মানত। রেনেসাঁসের যুগে ব্যক্তি নিজেকে নিজের ভাগ্যনিয়ন্তা হিসেবে আবিষ্কার করল। সমাজের সঙ্গে তখন তার বিরোধ ঘটেছিল বটে; কিন্তু তার মনে নিশ্চিত প্রত্যয় ছিল যে সমাজ ব্যক্তির চাইতে বড় নয়, ব্যক্তি চেষ্টা করলে সমাজকে নিজের প্রয়োজন মত বদলে বা শুধরে নিতে পারে। এই বিশ্বাসেরই চরম রূপ হল পশ্চিম ইয়োরোপে রোমাণ্টিক আন্দোলন। উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত লিবর্যাল সভ্যতা এই প্রত্যয়কে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আধুনিক মানুষের মনে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ব্যক্তি এখন নিজেকে ইতিহাসের নায়করূপে কল্পনা করতে অক্ষম। যুদ্ধের পর যে-সব সমাজদর্শন প্রবল হয়ে উঠেছে তাদের সকলেরই মূল কথা হল সমাজ সর্বদিক থেকেই ব্যক্তির চাইতে বড়। সমাজের গতি তার অন্ত-র্নিহিত নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই নিয়ম মেনে নেওয়া ছাড়া ব্যক্তির গত্যন্তর নেই। অর্থাৎ এ যুগের জীবনদর্শনে ব্যক্তি নায়কের ভূমিকা থেকে নির্বাসিত। এ যুগেও যদি সে তার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য আঁকড়ে থাকতে চায়, তাহলে তাকে যে শুধু সমাজদ্রোহী হতে হবে তাই নয়, সমাজের সামষ্টিক শাসনের চাপে তার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

যুদ্ধোত্তর যুগের এই মানস-পরিবর্তন ভাল কি মন্দ, অথবা তা কতখানি যুক্তি-সংগত তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। যাঁরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে এখনো বিশ্বাসী (যেমন রাসেল, গ্যাসেট, পপার) তাঁরা সকলেই এই পরিবর্তনকে অকল্যাণকর এবং অযৌক্তিক বলে মনে করেন। কিন্তু তা বলে এই ধরনের কোনো পরিবর্তন যে আদৌ ঘটেনি, এমন কথা বোধ হয় কেউই বলবেন না। এই পরিবর্তনের স্বাক্ষর নানা ক্ষেত্রে চোখে পড়ছে। সম্প্রতি একজন নামকরা আইরিশ ঔপন্যাসিক এবং সাহিত্য সমালোচক প্রথম যুদ্ধোত্তর পশ্চিমী উপন্যাসের বিচার-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই পরিবর্তনের একটা দিক দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

ভদ্রলোকের নাম সীন ও'ফাওলেন। এঁর বইটির নাম "দি ভ্যানিশিং হিরো"।* ১৯৫৩ সালে মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে গস্ অধ্যাপক হিসেবে ইনি ধারাবাহিকভাবে যে-সব বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেগুলিই সংস্কার সাধন করে ১৯৫৭ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেছেন। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরের দশকে যে-সব ব্রিটিশ এবং আমেরিকান লেখক উপন্যাস লিখে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে বাছাই করা আটজনের রচনা এই গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে যাঁদের খ্যাতি পরবর্তীকালে বেড়েছে বই কমেনি, তাঁদের মধ্যে আছেন জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্, অলডাস্ হাক্সলি, আর্নস্ট হেমিং-ওয়ে, উইলিয়াম ফকনার এবং গ্র্যাহ্যাম গ্রীন। ফাওলেন সাহেবের বিচারে উক্ত লেখকদের

---

* Sean O' Faolain, **The Vanishing Hero**; Little Brown.

বিশের দশকে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি সামান্য লক্ষণ বর্তমান এবং এই লক্ষণটির সূত্রে আধুনিক মনের পরিচয় পাওয়া সম্ভব। এ'দের কারো সঙ্গেই তাঁদের সমাজের যোগ নেই; সমাজের আদর্শ, বিশ্বাস, ধারা সব কিছুকে বর্জন করে এ'রা সমাজের বাইরে নিজেদের অস্তিত্বের সূত্র অনুসন্ধান করেছেন। ফলে পূর্ব প্রচলিত অর্থে এ'দের উপন্যাসে নায়ক অনুপস্থিত। এ'দের উপন্যাসের যারা প্রধান চরিত্র তারা শুধু সমাজবিরোধী নয়, তারা সমাজ-বিমুক্ত, সমাজ থেকে নির্বাসিত। কিন্তু এই বিরোধ, বিয়োগ অথবা নির্বাসন তাদের মনে ক্লাসিক ভারসাম্যের অথবা রোমাণ্টিক আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার করেনি। তাদের মন দ্বিধাবিভক্ত, তারা নিজেদের অস্তিত্বের সার্থকতা বিষয়ে সংশয়ী, তীব্র আত্মসচেতনতার ফলে তারা আপন আপন চরিত্রের প্রাতিস্বিক ঐক্য বিষয়েও নিশ্চিত নয়। অর্থাৎ কি ক্লাসিক কি রোম্যাণ্টিক কোনো অর্থেই এদের উপন্যাসের প্রধান চরিত্রদের নায়ক-নায়িকা আখ্যা দেওয়া চলে না।

ফাওলেন সাহেবের মতে ইংরেজ এবং মার্কিন সাহিত্যে এই ধরনের মনোভাব প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রকট হয়ে উঠলেও ফরাসী সাহিত্যে এর পূর্বাভাস উনিশ শতকেই চোখে পড়ে। তিনি উদাহরণ হিসেবে স্তাঁদালের "লাল-কালো" উপন্যাসটির উল্লেখ করেছেন। (বছর ছয় হল এই উপন্যাসটির একটি ভাল ইংরেজি তর্জমা পেঙ্গুইন সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে) কিন্তু এ মনোভাব যদি বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর যুগের লক্ষণ হয়, তবে ফরাসী সাহিত্যে এত আগে থেকেই তার আভাস এল কোথা থেকে? ফাওলেন তার জবাবে বলেছেন যে ফরাসী ঐতিহ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধটা গোড়া থেকেই কিছু উগ্র; ইংগ-মার্কিনদের মধ্যে এটা সম্প্রতি প্রবল হয়েছে। এ-ব্যাখ্যা খুব সংগত ঠেকে না। প্রথমত ইংরেজী অথবা মার্কিনি ইতিহাসে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারা অনেকদিন থেকেই যথেষ্ট প্রবল; দ্বিতীয়ত নায়কত্বহীন নায়ক যদি ফরাসী উপন্যাসে উনিশ শতকেই দেখা দিয়ে থাকে তবে যুদ্ধোত্তর ইংগ-মার্কিন উপন্যাসে তার আবির্ভাবকে অত্যাধুনিক মানসের পরিচায়ক বলে মানা শক্ত।

উনিশ শতকেই ফরাসী উপন্যাসে নায়ক কেন যে নায়কত্ব হারিয়েছিল, ফাওলেন সাহেবের বইটির চাইতে এ বিষয়ে অনেক বেশী সুচিন্তিত আলোচনার সন্ধান মিলবে ঐ একই সালে প্রকাশিত অধ্যাপক রেঁম জিরো-র "দি আন-হিরোইক হিরো" কেতাবে।* জিরো সাহেব সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটির বিচার করেছেন; কিন্তু তাঁরও সমস্ত উদাহরণ সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে আহৃত। তাঁর বইটির আলোচ্য বিষয় হল স্তাঁদাল, বালজাক্ এবং ফ্লোবেয়ার, উনিশ শতকী ফরাসী উপন্যাসের এই তিন দিকপালের নায়ক-পরিকল্পনা। তাঁর মতে উক্ত তিন ঔপন্যাসিকের নায়কেরা ফরাসী বুর্জোয়া সমাজের প্রতীক। তাদের না আছে রোমাণ্টিক আত্মপ্রত্যয়, না আছে সমাজ-দ্রোহিতার সাহস। স্তাঁদালের নায়কেরা অতিমাত্রায় আত্মসচেতন; এই আত্ম-সচেতনতা একধারে তাদের পৌরুষকে দ্বিধান্বিত করেছে, অন্যধারে তাদের কর্মক্ষমতাকে ব্যাহত করেছে। তারা সমাজ থেকে বিমুক্ত, অথচ সমাজকে ঢেলে গড়বার বীর্যবত্তায় তারা বঞ্চিত। বালজাক স্তাঁদালের ষোল বছর পরে জন্মগ্রহণ করে ফরাসী বুর্জোয়ার অবক্ষয়কে আরো স্পষ্টতার সংগে তাঁর উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি নিজেও এই ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়াদের একজন; তাঁর কল্পনায় সে কারণে মানুষের কমেডির দিকটাই ধরা দিয়েছে, তার ট্র্যাজিক রূপটা প্রায় অস্পষ্ট। কারণ যে-মানুষ অবস্থার ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য প্রয়াসী নয়, তার ব্যর্থতা সম্পূর্ণভাবেই ট্র্যাজেডির ব্যঞ্জনারিক্ত। তিনজনের মধ্যে সব থেকে শেষে এসেছেন ফ্লোবেয়ার। তাঁর কালে ফরাসী বুর্জোয়ার ক্লৈব্য চরমে পৌঁছেছে। তাদের আত্মরতি সম্ভোগের সামর্থ্যে একেবারেই বঞ্চিত। ফ্লোবেয়ার-এর উপন্যাস থেকে প্রচলিত অর্থে নায়ক-নায়িকারা তাই অন্তর্ধান করেছে।

অর্থাৎ আধুনিক যুগে এবং উপন্যাসে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিলোপের যে ধারাটি সুস্পষ্ট হয়েছে, উনিশ শতকের ফরাসী বুর্জোয়া সমাজে এবং ফরাসী উপন্যাসেই তার সূচনা ঘটেছিল। রেনেসাঁসের পর থেকে ইংল্যাণ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণী ধীরে ধীরে সমাজকে নিজের প্রয়োজন এবং আদর্শ অনুযায়ী গড়ে তুলেছে। ফ্রান্সে তা ঘটেনি; ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পরও তারা আত্মপ্রত্যয় অর্জন করতে পারেনি। তাই নির্বাসিত নায়কের পরিকল্পনা ফরাসী উপন্যাসেই আগে আকার পেয়েছিল।

এ জাতীয় আলোচনা যে মূল্যবান, তাতে সন্দেহ নেই। তবু মনে প্রশ্ন থেকে যায়। আধুনিক সমাজে ব্যক্তিত্ব বিলোপের ধারা খুব প্রবল, একথা সত্যি। কিন্তু ব্যক্তির সংগে সমাজের বিরোধ কি মানব-ইতিহাসের একটা চিরন্তন সত্র নয়? আধুনিককালের আগে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্ত্রীপুরুষদের মধ্যে অনেকেই কি নিজেদের সমাজ জীবন থেকে বিযুক্ত বা নির্বাসিত বোধ করেননি? সেই বিরোধ এবং বিয়োগ-বোধ তীব্র হয়ে ইতিপূর্বেও তাঁদের অনেকের মনে কি দ্বিধা, অপ্রত্যয় এবং জাড্যের সঞ্চার করেনি? এবং এই বিরোধ ও তজ্জনিত যন্ত্রণা কি প্রাগাধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের একেবারে অপরিচিত ছিল? "হ্যামলেট" কি আধুনিক অর্থে নির্বাসিত, দ্বিধাগ্রস্ত, আত্মপ্রত্যয়হীন, ক্ষয়িষ্ণু, নায়কত্বহীন নায়ক নয়? কিন্তু সে আরেক আলোচনা।

---

* Raymond Girand **The unheroic Hero in the Novels of Stendhal, Balzac and Flaubert.** Rutgers University Press.

আজমীরের একটি গ্রামে

নীরোদ রায়

আজমীরের একটি গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামটির নাম জানি না। জানবার প্রয়োজনও বোধ করিনি তখন। যেতে হয় গিয়েছি। এমনি তো কতবারই যেতে হয়েছে কত গ্রামে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কাজে হক, আর অকাজেই হক, এদিক-ওদিক ছুটে বেড়িয়েছি। কিছুকাল পরে সেইসব পরিবেশের চিত্র মন-মুকুর থেকে মুছে গেছে, গুলিয়ে গেছে দীর্ঘ রেল-যাত্রা-পথে ক্ষণিকের দেখা ছোট-ছোট স্টেশনগুলির মত। সব নাম, সব পরিবেশের কথা মনেও থাকে না। কিন্তু দু' একটার কথা মনে জেগে থাকে, বিশেষ কোন কারণকে কেন্দ্র করে। সেগুলি বাইরের বিচারে হয়তো তুচ্ছ, কিন্তু মন তাকে আঁকড়ে ধরে রাখে। এমনই কোন এক মন-জড়িত ব্যাপারে আজমীরের এই গ্রাম এসে গেছে।

আজমীর রাজস্থান দেশের। কে না জানে ও দেশটা ইতিহাসপূর্ণ। সে-সব ইতিহাসের পাতায় পাতায় গাঁথা আছে রাজপুত বীরপুরুষদের কথা আর কাহিনী। কিন্তু আমার লেখা ওসবের ধারে-কাছে দিয়েও যাবে না। আমার লোকজন একটি চাষী পরিবার। অর্থাৎ এক গ্রামের অতি তুচ্ছ যাদের জীবনধারা। যাদের সংগে দু' তিন ঘণ্টার পরিচয় শুধু ছবি তুলতে গিয়ে।

রাজস্থানের গ্রাম-দেশ এমনিতে সৌন্দর্য-বিহীন। বেজায় শুকে-রুক্ষ। গোটা দেশটাই নাকি তাই। এলাকাটা তো কম বড় নয়! হিসেব জুড়লে পাওয়া যায় একশ' ত্রিশ হাজার বর্গমাইল। আর এমনই বরাত যে, এত বিস্তীর্ণ জমির অনেকখানি জুড়ে আছে পাহাড় এবং বালুর মরুভূমি। গ্রহণ-যোগ্য জমি যেটুকু বা আছে, তার ভিতরও কিছুটা বন এলাকা, বাকী অংশ চাষ-আবাদের জমি। তাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ফলে, চাষীরা বড় গোছের পাড়া জোড়া দিয়ে গ্রাম তৈরী করতে পারেনি বাংলা দেশের মত।

লোভনীয় মোটেই নয় ওদেশের গ্রাম। ছবি তোলার দিক থেকে আকর্ষণীয় হচ্ছে দেহাতী লোকজনের বেশ-ভূষা। রঙচঙে রকমারী পোশাকে চলাফেরাটা স্থানীয় বৈশিষ্টপূর্ণ। এর একটা কারণ আছে। প্রকৃতির গায়ে রূপ ও রঙের কার্পণ্যকে রাজস্থানীরা পুষিয়ে নিয়েছে নিজেদের অংগাবরণে রঙের প্রাচুর্য দিয়ে। এসব কথা মনে করেই একদিন আজমীর শহর ছেড়ে কিছুদূরে এক গ্রামে গিয়ে হাজির হল্যম।

আগের দিন রাত্রিতে স্থানীয় এক স্বল্প-পরিচিত লোকের সংগে বন্দোবস্ত করে নিলাম। আমাকে নিয়ে যাবে গ্রামে। স্থানীয় লোক সংগী থাকলে অজ্ঞাতকুলশীল নানা ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পায়। তাছাড়া, প্রয়োজন হলে আমার বংগ-হিন্দী ভাষাকে তদ্দেশীয় তৃতীয় ভাষায় বুঝিয়ে দেবারও প্রয়োজন ছিল। নাহলে, অচেনা গ্রামে সংগীহীন পরদেশীকে দেখলে সবাই সন্দেহের চোখে নানা প্রশ্ন করবে, তার উপর ক্যামেরা দেখলে তো কথাই নেই।

সংগীকে ভরসা করেই চলে এসেছি নিশ্চিন্তমনে। দূর থেকে ঘর-বাড়ির দিকে নজর দিয়ে খুশী হতে পারলাম না। বেজায় খাপছাড়া ভাব। সামঞ্জস্যহীন খড়ের জীর্ণ ঘরগুলি। বাড়ির এলাকা ঘিরেছে মাটির দেওয়াল দিয়ে। আশে পাশে চাষের জমি, তারই এক খণ্ডে জোড়া-বলদে চাষ করছে পাগড়ি-আঁটা রাজস্থানের এক কৃষক। পশ্চাৎপটে দূরের উঁচু পাহাড় নজরে পড়ল — হেলান দিয়ে আছে নীল আকাশে। এই-টুকু পরিবেশ সুন্দর! বেশ সুন্দর লাগল নাম-না-জানা এক গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ।

মাঠের অপর প্রান্ত থেকে লাংগল ধরে কৃষক এ-প্রান্তে আসতেই, আমি ছবি তোলার কথা বললাম। সংগে সংগেই আমার সংগী তৃতীয় ভাষায় ওকে সব বুঝিয়ে বলল। লোকটার মুখের ভাব লক্ষ্য করে বুঝে নিল্যম—ছবি তোলায় আপত্তি নেই।

শুধু চাষীর ছবিতেই কি সন্তুষ্ট থাকা যায়! যে ছবি পেলে সন্তুষ্ট হব সে-কথাটা সহজেই বলে ফেললাম সরল চাষীকে—তোমাদের বাড়ির মেয়েরা যখন কুঁয়ো থেকে জল তোলে, তার একটা ছবি তোলায় ব্যবস্থা করে দিতে পার?

আমার এ-প্রস্তাবের জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাই সমস্যা নিয়ে একটু নীরব রইল। কিন্তু তার কাছ থেকে জবাব পাবার আগেই এক বৃদ্ধা এসে আমাদের সম্মুখে হাজির হল। আমার দিকে তাকিয়েই বলল—'বোল্ বেটা জয়রামজীকি।'

এ আবার কী? ব্যাপারটা বোধগম্য হল না। দাঁড়িয়ে এর-দিকে ওর-দিকে তাকাচ্ছি। চাষী হেসে বলল—তার মা আমাকে 'জয়-রামজীকি' বলতে বলছে।

বৃদ্ধা দ্বিতীয়বার চড়া কণ্ঠে হাঁকল—'বোল্ বেটা জয়রামজীকি।'

আমিও বলে ফেললাম, 'জয়রামজীকি'—ব্যাপারটা না বুঝেই।

এবার বৃদ্ধার খুশী মন। আমার কাছে এগিয়ে এসে জানতে চাইল—আমি কে এবং কী চাই।

আমার যা চাই তা জানাল ছেলেই, যাকে ক্ষণিক আগে বলেছিলাম কথাটা। বৃদ্ধা ত কথাটা শুনেই জিব বের করে গালে হাত দিল। মাথা নেড়ে বলল—না-না-না। সে হয় না বাছা। বাড়ির বহুদের ছবি তোলা

পাশের এক খণ্ড জমিতে চাষ করছে রাজস্থানী চাষী। দূরে নীল আকাশে হেলান দিয়ে আছে উঁচু পাহাড়

যাবে না। আমার তিন বেটার বহু ঘরে থাকে,—জল তোলার সময় বাইরের লোক থাকলে কখনও ওরা যাবে না ওদিকে। না বাছা না। তুমি বরং আমার ছবি তোল। এই নাও তোল। বৃদ্ধা তো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কোমরে হাত রেখে। ছবি তুললেই হয়।

অগত্যা তুললাম, আপত্তিতে ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে পারে ভেবেই। তারপরই আমার আবেদনের সুর—'তোমার বহুদের ছবি আর কেউ দেখবে না। দেখব আমরা। আমারও ঘরে বৌ আছে, ভাবী আছে। ওরা তোমার বহুদের ছবি দেখতে পেলে কত খুশী হত!

কথাটা কাজে লেগে গেছে। বৃদ্ধার মনকে যেন ঘায়েল করেছে কথাটা। মনে মনে বৃদ্ধা বোধ হয় আমার স্ত্রী-বৌদিকে কল্পনা করে নিল। মানুষের অন্তর্নিহিত মনের মিল এইখানটায় বুঝি পাওয়া গেল।

ঘাড় কাত করল বৃদ্ধা। মুখে বলল—'আচ্ছা, চলতো যাই, দেখি—।'

আর কথা নয়। বৃদ্ধা সরাসরি মাঠ কোণাকুণি পথে এগিয়ে চলল কুঁয়োর দিকে।

কলসী-ঘড়া মাথায় দুই বউ ছবি তুলতে দাঁড়িয়েছে, লজ্জানিবারণী ঘোমটায় মুখ ঢাকা

বউরা তখন জল তুলে কলসী-ঘড়া ভর্তি করছিল।

প্রায় কুঁয়োর কাছেই আমাকে নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধা বউদের জানাল—'ওগো বউরা!' শোন কথা। এই বিদেশী বাবু বলছে তোমাদের ছবি তুলবে জলের কলসী মাথায়। তা লেকে। তোমরা কলসী মাথায় দাঁড়াও দেখিনি।' তিনজনের দু' হাত করে ঘোমটার ভেতর কি যেন ফুসুর-ফাসুর শোনা গেল। দুই বউ কলসী মাথায় এগিয়ে এল—তৃতীয় উ এল না। সে জল তুলতে লাগল—যেন র গরজ নেই।

গরজ আমারই। ছবি তুলবার জন্য ক্যামেরা ক করলাম। কিন্তু ছবি তুলতে গিয়েই ঠকে গেলাম। কার ছবি তুলব? দেখি দুই উ সেই লম্বা ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ার বৃদ্ধা বলছে—'নাও ছবি তোল।'

একটু হেসে বৃদ্ধার দিকে তাকালাম। ভাবলাম বুঝি বা রহস্য করছে। কিন্তু না, বৃদ্ধা তখনও বলল—'কি হল? ছবি তোলা হয়েছে?'

আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়লাম। মুখ ঢাকা বউদের ছবি তুলে কী হবে? বৃদ্ধাকে একটু বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃদ্ধা তো নারাজ। মাথা নেড়ে নেড়ে বলে—'না বাবা, মুখ ওরা দেখাবে না। ওটা শরম। তুমি এভাবেই বরং ছবি তুলে নাও না।'

আবার ভবিষ্যৎ ভেবে একটা ছবি তুলতে হল অগত্যা।

বৃদ্ধা বলল—'নাও, হয়েছে তো?'

বললাম—'হ্যাঁ হয়েছে। তবে কি জান? এ ছবি ঠিক হবে না।'

আমার কথার সুরে গোলমাল দেখে বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করল—'কেন?'

সুযোগ পেলাম বলতে—'এ ছবি দেখে আমার বাড়ির মেয়েরা তোমার বহুদের চিনতে পারবে না যে!'

আবার বৃদ্ধা নীরব। আবার তার সমস্যা। নাছোড়বান্দা বিদেশী বাবুর পাল্লায় পড়ে কি যেন ভাবছে। বউরা তখন কলসী নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শাশুড়ীর আদেশের অপেক্ষায়। শাশুড়ী ওদেরই জিজ্ঞাসা করল—'কি গো! তোমরা কি ঘোমটা খুলতে রাজী?'

ঘোমটা দুটো অমনি কাত হয়ে গেল। ওরা রাজী।

'—আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে।'

বউরা যে ছবি তোলার জন্য আগ্রহ নিয়েই ছিল তা বোঝা গেল। এক বউ তখন ঘোমটা দুহাতে তুলে ধরেছিল, আর আমারও ক্যামেরার বোতাম টিপতে এক মুহূর্ত দেরি হয়নি।

তৃতীয় বউ তখন জল তোলা স্থগিত রেখে এসে গেছে আমার সম্মুখে। কিন্তু ওরা দুজন ঘোমটা তখনও খোলেনি। ওদের দেখাদেখি এই বউও ছেড়ে দিল ঘোমটা। তিনটে ঘোমটা আবার একত্রে ফুসফাস। একজন শাশুড়ীর কাছে গিয়ে কি যেন বলল,

শাশুড়ীর আদেশ পেয়ে এক বউ ঘোমটা দুহাতে তুলে ধরল

আর বৃদ্ধা সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল—'আচ্ছা, আচ্ছা, আমি দূরে সরে যাচ্ছি।'

শাশুড়ী অদূরে এক গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। মুখে তার হাসি। স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতে লাগল, তার বহুদের নতুন আনন্দ। তার বহুরা আনন্দে পরদেশীকে মনে করছে আপন, আর আপন শাশুড়ীকে মনে করছে পর। আপনাকে দূরে রেখে পরকে কাছে নিয়েছে। তখন পরিস্থিতি কিছুটা সহজ হয়ে এল। ছবি তুলতে অসুবিধা হল না যত রকমের খুশী। এভাবে, ওভাবে, নানা-ভাবে ছবি তুলেও যেন আশা আর মিটতে চাইছে না। সুযোগ যখন এসেই গেছে, তখন আরও ছবি তুলতে আপত্তি কিসের! তবে এখানে কুঁয়োর পারে আর নয়। বাড়িতে যাওয়া যাক। ওদের বাড়ির পরিবেশে কিছু ছবি তুলতে পারলে, ঘরে-বাইরে দু'রকমের ছবিই পাওয়া যাবে।

কথাটা বলে ফেললাম বউদের। ওরা সঙ্গে সঙ্গেই কলসী নিয়ে রওয়ানা হল বাড়িমুখো। চলার ভঙ্গিতে বোঝাল—শীগ্‌গির এসো বাড়িতে যাই। তোমার ছবি তোলার আর কোন অসুবিধে নেই। বেশ মজা হবে, বাড়িতেও ছবি তুলবে।

সত্যিই তখন আর যেন সংকোচ কোথাও নেই। ঘোমটা খুলে বউরা বাড়ির মুখে চলেছে, সঙ্গে শাশুড়ী আর আমি চলেছি। বহুদের এই আনন্দে শাশুড়ীর খুশীর অন্ত নেই যেন। চলতে চলতে বৃদ্ধা অনেক কথাই বলছে। একবার বলল—'বাড়িতে চল, তোমাকে দুধ মিঠাই খাওয়াব। তোমার ক্ষিদে পেয়েছে, তাছাড়া, ক্লান্তও হয়েছ তুমি।' এক ভিনদেশী আগন্তুকের প্রতি বৃদ্ধার মাতৃসুলভ মমতামাখানো স্নেহ যেন সেই কথাগুলির সঙ্গে ঝরে পড়ল।

কখনও আলপথে, কখনও বা ক্ষেত কোণাকুণি বাড়ি ফিরছি। কুঁয়ো থেকে ওদের বাড়ির দূরত্ব কতটা হবে আন্দাজ নেই। তবে মনে আছে, ঐটুকু দূরত্বের ভিতরেই আরও কয়েকটা ছবি তুলবার সুযোগ এল। বউদের চলার ভঙ্গি তুলতে ছুটে গেলাম আগে আগে। বললাম—'দাঁড়াও একটু।' দাঁড়াল। আবার বললাম—'চলে যাও।' চলল ওরা। এভাবেই ছবি তুলে ওদের বাড়ির ভিতরে এসে গেছি। তখন বউরা শরম জানাল ঘোমটা টেনে, চলে গেল সরাসরি অন্দর মহলে। বৃদ্ধা একটা খাটিয়া দেখিয়ে আমাকে বলল—'বসো বাবা এখানে। তোমার জন্য দুধ-মিঠাই আনছি।'

দুধ-মিঠাই নিয়ে বৃদ্ধা এল না। এল দুই বউ, হাতে করে থালা আর দুধের গ্লাস নিয়ে। তৃতীয় বউ এল এক গ্লাস জল হাতে করে। ঘোমটা টানা মুখ সকলেরই, কথাও নেই মুখে। কিন্তু কাজের ভিতর দিয়ে খুশী মনের পরিচয়টা স্পষ্ট। ওরা যেন বলতে

কুঁয়ো থেকে জল নিয়ে ঘরে চলেছে তিন বউ

চায়—তোমাকে একটু জলযোগ করতে দিতে পেরে আমরা খুশী।

থালা থেকে একটা মিঠাই তুলে নিলাম। শীতকালের শক্ত মিঠাই মুখে দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করবার চেষ্টা করছি, ঠিক সে সময় পিছনের দরজা দিয়ে প্রবেশ করল বৃদ্ধার এক ছেলে। বোধ করি, ছোট ছেলে। বেশ জোয়ান চেহারা। ছেলে সোজা এসে আমার সামনেই দাঁড়াল আর প্রশ্নও করল—'কি ছবি তুলছ তুমি?'

প্রশ্নে কড়া মেজাজের আভাস। আঁচ করলাম, ব্যাপারটা অন্যরকম। পালে উলটো হাওয়া। আমার সঙ্গীটি একটু দূরে ছিল কাছে এল। আমি স্বাভাবিকভাবে

বাড়ির ভিতর তিন বউ

বৃন্ধার কনিষ্ঠ পুত্র

জবাব দিলাম—'এই—তোমাদেরই গাঁয়ের লোকজন, মাঠ-ঘাট এসব—।'

'—এসব বুঝি সিনেমায় দেখাবে? বাড়ির বউদের ছবি তুলেছ না?' সেই মেজাজী জেরা।

বুঝলাম ব্যাপারটা। কু'য়োর পারে যখন বউদের ছবি তুলছিলাম, তখন ও নিশ্চয়ই মাঠ থেকে দেখতে পেয়েছে। বউদের দলে ওর স্ত্রীও আছে বলেই মেজাজ এত চড়ায় উঠেছে। পাছে ওর স্ত্রীর চেহারা সবাই দেখে ফেলে সিনেমায়! সত্যিই যে এটা শরম-ইজ্জতের কথা।

আমি শান্তভাবেই বোঝালাম তাকে—'তুমি যা ভাবছো তা নয়। সিনেমার ছবি এটা নয়। এ ছবি থাকবে আমাদের বাড়িতে।'

বৃন্ধা তখন ঘরেই ছিল। বউদের কাছে বোধ করি এই ব্যাপারটা জানতে পেরেছে। সংগে সংগেই ছুটে এসে হাঁক দিল—'কি রে! কি বলছিস্ ওকে?'

ছেলে যেন জুজু দেখল। ভয়ে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে উত্তর দিল—'না—আমি ছবি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম।'

রেগে ধমক দিল মা—'কোন দরকার নেই তোমার ওসব কথায়। তুমি কেন মাঠ থেকে এখন চলে এসেছ? ভেড়া-ছাগলগুলো দেখবে কে? যাও—মাঠে যাও।'

এর পর ছেলের সাধ্য কি আর কথা বলে! আবার চলে যেতে উদ্যত হতেই আমি ডাক দিলাম—'শোন, তোমার মাঠে আমিও যাব। ছবি তুলব তোমার ওখানে।'

মহা খুশী হল ছেলে। আমাকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। বৃন্ধা বলল—'দুধটুকু খেয়ে যাও। আর তুমি কিন্তু শীগ্‌গির ফিরে এস। রোদের ভেতর মাঠে বেশীক্ষণ থেকো না। এসে কিছু পুরী আর পায়েস খাবে।'

এ সমাদর মনকে আবার আচ্ছন্ন করে দিল। মুখে আপত্তি জানাতে পারলাম না। কিন্তু উপায় নেই, আমাকে ফিরে যেতেই হবে তখন। ভেবেছিলাম, বাইরে বাইরে মাঠ থেকেই ওধার দিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠব, তার পর টাংগা নিয়ে চলে যাব আজমীর শহরে।

উঠে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু বিদায় নিতে চোখ তুলে কথা বলতে পারছি না। অনেক কষ্টে বললাম—'আমার আর থাকার উপায় নেই। আমি আজ চলি। তোমাদের ছবি নিয়ে গেলাম—বাড়িতে দেখব, আর স্মরণ করব তোমাদের। তোমাদের ভুলব না। আর, আবার যদি এই মুলুকে কখনও আসি, তখন তোমাদের দেখতে আসব নিশ্চয়ই।'

বৃন্ধার চোখ দুটি জলে ভরে এল।

ছেলের সংগে পা বাড়িয়েছি, বৃন্ধাও যেন আমার পিছনে পা বাড়াল। নীরবে কয়েক পা চলার পর বৃন্ধা পেছনে ডাক দিল—'শোন বেটা। তুমি আবার এদিকে এলে, তোমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের নিয়ে এস। ওরা আমার বাড়িতে থাকবে। আমি সব ব্যবস্থা করব।'

আমার মুখ দিয়ে আর জবাব বের হল না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চললাম ছেলের সংগে মাঠের দিকে। ওখান থেকেই চলে যাব এই গ্রাম ছেড়ে।

ডায়েরির ছেঁড়া পাতা

ফাদার দ্যতিয়েন

দীপুর কান্না

আমি জানতাম বড় হলে ছেলে কাঁদে মাত্র দুটো কারণেঃ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে আর মার আসন্ন মৃত্যুতে। দীপু কিন্তু ফেল করেনি, আর দীপুর মাও স্বাস্থ্যে ভরপুর।

আজকে শনিবার, হস্টেল খাঁ-খাঁ করছে, ছাত্রেরা সব বেরিয়েছে আই-এফ-এর চ্যারিটি ম্যাচ দেখতে। দীপু তবু বের হয়নি, দীপু তবু কাঁদছে। কাঁদছে কেন? জিজ্ঞেস করলাম তাকে। উত্তর পেলাম অপ্রত্যাশিত। চোখ দুটি মুছে, বই দেখিয়ে সে বলল, 'লা মিজরবল্‌স পড়ছি'......

বাংলা দেশে 'ল্যে মিজেরাব্‌ল' পড়েনি আর তা পড়ে কাঁদেনি এমন ছাত্র বিরল। আমি ফরাসীভাষী, বইটির কিছু কিছু উদ্ধৃতি পড়েছি বটে কোন এক সংকলনে, বইটি কিন্তু পুরোপুরি পড়িনি—আমার বাবাও না। 'ল্যে মিজেরাব্‌ল' ছিল "ভীষণ-বিক্রি" এক উপন্যাস, আমার দাদুর যৌবন-কালে।

সংগীতচর্চা

গলির ওপারে নীলমণিদের বাড়ি। নীলমণির গলা নেই—এ কথাটি euphemism-এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পৃথিবীতে এত লোক বোবা হয়ে জন্মায়—কিন্তু হায়, বিধাতা নীলমণিকে গলা দিলেন কেন? আর যদি বা তার গলা-দান একান্ত আবশ্যক ছিল, তাহলে কোন্ জন্মের কোন্ অনাবিষ্কৃত পাপের জন্য এমন গলা তাকে দিলেন সৃষ্টি-কর্তা? অথবা পাড়ার সমস্ত ভাড়াটে কালা হয়ে জন্মাল না কেন?

নীলমণির কণ্ঠস্বর যেমন কর্কশ তেমনি বেসুরো এবং বেতালা। তার মুখ দিয়ে যত না সুর বেরোয় তার চেয়ে বেশী বেরোয় নাক দিয়ে। সে তবু দিনরাত সংগীতচর্চা করে। বীণাপাণির বেদীতে তার প্রথম বলি হল সেই 'ধনধান্যে পুষ্পেভরা' জন্মভূমি! জবাইটা খুব সার্থক না বলে উপায় নেই, সুরটি এত বিকৃত রূপ ধারণ করেছে যে গানের কথাগুলির দিকে মন না দিলে সুরটি চেনা এক-রকম অসম্ভব। আর ভাগ্যিস্ নীলমণির উচ্চারণটিও কোনদিন বিশেষ স্পষ্ট হয়নি।

আজ থেকে 'দুঃখের তিমিরে'র বলির আয়োজন শুরু হয়েছে। সুচিত্রা মিত্রের গলায় এই গানটি যাঁরা একবার শুনে থাকবেন তাঁরাই বুঝবেন আমার বাসান্তর গ্রহণের ইচ্ছা আজ এত প্রবল কেন।

লংকা-কাণ্ড

সাত, ছয় ও চার বছরের অন্তু সন্তু আর অধিকন্তু যেন এক সিঁড়ির তিনটি ধাপ। একই রঙের এক ডিজাইনের জামা পরে, মাঝে মাঝে পরে কেবলমাত্র ঘুনসি।

আজ দেখি তিনজনে, ধুলো-মাখা মুখ, উস্কোখুস্কো চুল, মারামারি করছে। হাতে ধরে পায়ে ধরে পিঠে চড়ে আর চেঁচায়, "মার্ মার্ রাক্ষসকে মার্।" আমার বাড়ির সামনেই এই লংকাকাণ্ড। যুদ্ধটি থামিয়ে পঞ্চশীল এবং সহাবস্থানের কথা পাড়তে যাচ্ছিলাম, অন্তু তখন, চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে, সহানুভূতির সংগে বলে উঠল, "ঠাট্টাও বোঝেন না?"

ঘোড়ার জোক

ইন্দুবাবু তাঁর ছাত্র ভেগ্‌নার সাহেবকে একটা হোম-ওয়ার্ক লিখতে দিয়েছেন। লেখাটার নাম "বিদেশীর চোখে বাঙালীর প্রধান দোষ"। বাঙালীর পক্ষে বিদেশীকে এমন এক কণ্টকিত সাবজেক্ট দেওয়াই বড় অন্যায়। এদিকে শাস্ত্রে আছে—মূল শ্লোকটি মনে আসছে না—গুরুর আদেশ শিরোধার্য। কী আর করেন? অনন্যোপায় হয়ে ভেগ্‌নার সাহেব লিখতে বসলেন। তাঁর লেখনী-নিঃসৃত প্রথম বাক্যের মর্ম এই হল যে, "বাঙালীরা জোক, ভীষণ জোক, বংশানুক্রমিক ঘোড়ার জোক..."

ভেগ্‌নার সাহেব বাঙালীদের অত্যন্ত

পক্ষপাতী। তার বইয়ের সেল্‌ফে দেখেছি বাইবেল ও শেক্‌স্পীয়ারের পাশাপাশি শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্যজীবন' ও রামকৃষ্ণের 'কথামৃত'; শেল্‌ফের ওপর ঝুলছে সুভাষ বসুর একটি ছবি। সম্প্রতি তাঁর পঞ্চ-চত্বারিংশৎ জন্মদিন উপলক্ষে পিঁপড়েখালির গলির চায়ের দোকানে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তবে বাঙালী-দের কাছে তাঁর এই একটিমাত্র সামান্য অভিযোগ—তারা নাকি জোঁক। আমি আপত্তি তুলতে যাচ্ছিলাম, ভেগ্‌নার সাহেব বলে উঠলেন, "নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি, শুনুন মশায়ঃ আমাকে জার্মান শিখিয়ে দিন...আমাকে পড়াবেন গ্রীক?...গায়ে তেল মাখেন না, ভেগ্‌নারদা? কিনে ফেলুন না এক শিশি; রোজই চেয়ে নেব আপনার কাছ থেকে...কালকে অমরেশের বোনের বিয়ে, আপনাকে নিয়ে যাব; আমরা সবাই মিলে একটা আধুনিক বাংলা কবিতা প্রেজেণ্ট করব, আপনি বইটি কিনবেন।...অধ্যাপক বিমলেন্দু বিদ্যাবতার কিছু কিছু লাতিন জানেন—অর্থাৎ আমি যে আণবিক পরিমাণে হিন্দী জানি তার দশাংশের একাংশ লাতিন জানেন তিনি। ভদ্রলোক স্থির করেছেন যে, আমার সঙ্গে সেণ্ট ওগাস্তিনের Confessions মূল ভাষায় পড়বেন। সপ্তায় 'স' দিয়ে যতগুলি বার আছে—সোম, শুক্র, শনি—তিনি ততবার আসবেন আমার এখানে পাঁচটা থেকে সাতটা। ভালমানুষের মত বিদ্যাবতার মশায় বলে গেলেনঃ আপনি বুঝতে পারবেন না, প্রফেসার, আমি আপনার কাছে কত কৃতজ্ঞ...আমার ঋণ কী করে শোধ করব ভাবতেই পারি না। আপনাকে টাকা দিতে পারতাম কিন্তু আপনি ত নিতে চাইবেন না (তাই না কি?). তবে হ্যাঁ, আপনারও লাভ হবে বটেঃ

I'll give you the consolation of thinking you are doing good to my soul.

জোঁক...নয়ত কী?"

আমার নিজের অভিজ্ঞতা কিন্তু কিছুটা অন্য ধরনের।

থ্যাংক ইউ

স্ট্যাম্প-পাগলদের কিউ আমার দরজায় দিন দিন বেড়ে যাচ্ছেঃ "ওলিম্পিক রবফ আছে?" "মোনাকোর একটা তিনকোণা দেবেন?" আর স্ট্যাম্প পেলেই দে-দৌড়। ওদের কী দোষ? ভাষারই দোষ—বাংলায় থ্যাংক ইউর প্রতিশব্দ নেই। যাক, গ্রহীতার আনন্দ প্রকাশই দাতার যথার্থ পুরস্কার।

টুনটুনি নয় পার হয়ে সবে দশে পা দিয়েছে; কাল স্ট্যাম্প নিতে এসেছিল। চব্বিশ ঘণ্টা যেতে-না-যেতে টুনটুনি হাজির। আমি বললামঃ "আমার স্ট্যাম্পের ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়, রোজ দিতে পারব না, দুদিন পরে পরে এসো।" —"স্ট্যাম্প নিতে আসিনি..." তারপর, মুখ নিচু করে, একটু লজ্জিত হয়ে টুনটুনি বললঃ "আপনার জন্য একটা জিনিস এনেছি..." কাঁচা হাতে আঁকা যীশুর একটি ছবি।

পাঁচ মিনিট পরে এল আর একজন স্ট্যাম্প-লোভী স্বপনঃ "চোখ বুজে মুখ খুলুন..." মুখে পড়ল চিউইংগাম আর চোখ খুলে দেখি স্বপন পালিয়েছে।

বিকেল বেলা ছোটকুনের পালা। ছোটকুন নীলমণির ভাই, বয়স সাতের কাছাকাছি আমি তাকে ছোট উকুন বলে ডাকি। "আপনার জন্য কিছু এনেছি" বলে সে বার করল নতুন একটা পেন্সিল। জিজ্ঞেস করলামঃ "মা জানেন?"—"মা আমাকে পয়সা দিয়ে বলেছেন পয়সা নিয়ে যা খুশি করতে পারিস।" আর অন্তর্যামী জানেন ছোটকুন লজেন্স কত ভালবাসে।

এখন বলুন ভেগনার সাহেব, জোক বলে কাকে?

ডবল ভাড়া

আমি একটা ভুল করেছি—মারাত্মক একটা ভুল। বৈশাখ মাসের এক গমেট অপবাহ্ন। একটা সুটকেস রিকশায় চাপিয়ে তার পিছন পিছন যাচ্ছি। যতদিন পা আছে আর যতদিন এই পায়ে বাত না ধরে, মানুষ-টানা রিকশায় আমি চাপতে নারাজ। রাস্তার পিচ রোদে গলে যাচ্ছে, আর আমি ভেসে যাচ্ছি নিজের ঘামে। রিকশাওয়ালার হাতে যা দিলাম সেটা তার প্রাপ্যের তিন না চার গুণ, রিকশাওয়ালাই জানে।

এখন যতদূর থেকেই আমাকে দেখে সে, 'নমস্—কার' বলে চেঁচিয়ে আকর্ণ হাসি হাসে।

সেদিনের উদারতার জন্য আমি অনুতপ্ত নই, কিন্তু উদারতা এবং ভালমানুষির মধ্যে যে সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে তা রিকশাওয়ালা নাও বুঝতে পারে।

কুটকুট আর টুকটুক

শ্রীরামপুরের অর্পণা আর অপর্ণা দুটি বোন—যমজ বোন, বিজ্ঞানীরা যাকে বলে

একেবারে homozygot, অর্থাৎ কিনা চেনার উপায় নেই। আমার এই মন্তব্য শুনে তাদের মা অত্যন্ত আশ্চর্য বোধ করে বলতে লাগলেন: "দেখতে পাচ্ছেন না? কুটকুটের কান একটু বড় আর নাক একটু চওড়া; টুকটুক ওর চেয়ে সিকি ইঞ্চি লম্বা। এছাড়া, সেদিনের পরীক্ষায় কুটকুটের চেয়ে টুকটুক দেড় নম্বর কম পেল, তার অ্যাপেণ্ডিসাইটিস হয়েছিল বলে।" দুই বোনের একই রঙের শাড়ি, একই ধরনের ব্লাউজ, কপালে টিপ, পায়ে আলতা, হাতে রিস্ট-ওয়াচ; চুল বাঁধে দুজনে ঘোড়ার লেজের মত। তবে হ্যাঁ, কুটকুটের গলায় পুঁতির মালা আছে।

জি-টি রোডের দু ধারে সাইকেল করে যমজেরা আসছিল। মিষ্টি গলায় সুপ্রভাত জানাল। মাথা লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট রাইট করে নাক কানের দিকে তুলনাত্মক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলাম। ব্যর্থ চেষ্টা... পুঁতির মালা পর্যন্ত দেখা গেল না।

এখনও ভাবি: অ্যাপেণ্ডিক্সহীন মেয়ে কোন্‌টি?

মেট্রিক সিস্টেম

এক কিলোগ্রাম মানে এক সেরের কাছাকাছি; এক মাইল হচ্ছে দেড় কিলোমিটারের একটু বেশি; এক দুয়ানির দাম বারো নয়া পয়সা; ফোর ও'ক্লকের অর্থ কিন্তু চার ঘটিকা নয়, এখানে দেখছি ফোর ও'ক্লকের অর্থ চারটের পরে যে কোন সময়।

বিশ্রী নিয়ম

স্থান: ডালহৌসী থেকে কালীঘাট, চলন্ত ট্রামের বেনামী ভিড়ের মধ্যে। কাল: বিশ্রম্ভালাপের কাল, অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা। কুশীলব: আমার ঝুলন্ত প্রতিবেশী ও ঝুলন্ত আমি।

প্রতিবেশী: আপনার দেশ কোথায়?

আমি পঞ্চশত একাশীতিতম বারের মত উত্তর দিলাম: বাংলা দেশ।

—কিন্তু আগে ছিলেন কোথায়?

—আমার আগের জন্মের খবর একটু ঝাপসা...তার ওপর ঐ ধরনের প্রশ্ন সন্ন্যাসীদের করতে নেই। তবে হ্যাঁ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপর্ব যুগে যে দেশ থেকে কাচ, স্টীল, বিলিতী মাটি ভারতে খুব আমদানি হত, সেই দেশে আমার জন্ম।

—আপনার বাবা মা ভাই আছে?

একটা গম্ভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে উঠলাম: সব আছে, বোন নেই। আমরা ছিলাম পাঁচ ভাই, আমি অর্জুন, ভীম আফ্রিকায়, আর পাঁচজনই সন্ন্যাসী বলে কুন্তীর দ্রৌপদীকে বাড়ি আনবার সুযোগ হয়নি।

—দেশে আর কোনোদিন ফিরবেন না?

—না।

—কেন?

—না-ফেরাই আমাদের নিয়ম। একবার এলেই—বস্‌।

—নিয়মটা বড় বিচ্ছিরি!—বলে ঝুলন্ত প্রতিবেশীটি চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে গেল।

বাড়ি ফিরে দেখি, আমার পকেট কাটা, মানিব্যাগ নেই। মানিব্যাগে ছিল আমার ডায়েরির দুয়েকটা পাতা, আমার দরজির ঠিকানা আর তেইশ নয়া পয়সা। সন্ন্যাসী মানুষ...টাকা নিয়ে যায় না...নিয়মটা বড়ই বিচ্ছিরি।

উইয়ে যদি না খায়

আমার এই ডায়েরির উড়ন্ত পাতাগুলি উইয়ে যদি না খায়, কোন এক আবর্জনাস্তূপের মধ্যে তা কেউ যদি পায়, বিশ্রী হাতের লেখা এবং উৎকট বাংলা দেখে বুঝবে —সাহেবের রচনা বটে।

বুঝবার আরও আছে। বাংলায় এসে প্রথম যে-চিঠি পেলাম তাতে দীপুর বাবা লিখেছিলেন, "পরকে করেছ আপন"। হাত দিয়ে ভাত খেতে শিখেছি—দরজার সামনে জুতো রাখতে শিখেছি (দুবার কুকুরে নিয়ে গিয়েছে), পদ্মাসন শিখতে গিয়ে পায়ে ব্যথা ধরিয়েছি, যে চা-কে দু চোখে দেখতে পারতাম না, তা গ্যালন গ্যালন গলাধঃকরণ করেছি, চারটের সভায় ছটায় আসতে শিখেছি, খোলা মুখে স্বীকার করেছি যে, রসগোল্লা শ্রেষ্ঠ মিষ্টি (আমার মতে কিন্তু একটু বেশী মিষ্টি) আর ইলিশকে বলেছি মৎস্যের সম্রাট (আমার মতে কিন্তু কাঁটা কম থাকলে চলত)। বিনিময়ে কিছু চাইনি, পেয়েছি কিন্তু অসীম ভালবাসা। বন্ধ্যা কুন্তীর কাছে পাঠিয়েছি আমার অজস্র বন্ধুর শুভকামনা—আর টুনটুনির আঁকা সেই যীশুর ছবি। বাঙালীদের প্রধান দোষ যে কী জানা গেল না; আমার জানায় কিন্তু তাদের একটি অমূল্য গুণ আছে: তারা বিদেশীকে করেছে নিকট বন্ধু, পরকে করেছে ভাই...

তেহরাণের কাছে কার তেপে নামক স্থানে সম্প্রতি আবিষ্কৃত সাত হাজার বছরের পুরণো একটি পুষ্পাধার তার আবিষ্কর্তা, ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের টি বার্টন-ব্রাউনের কাছে এক চমৎকার বিস্ময়ও উপস্থিত করে দেয়।

আধারটি পরিষ্কার করার পর ওটাকে তিনি এক বৈদ্যুতিক চুল্লির সামনে ধরেন শুকোবার জন্যে। প্রায় সংগে সংগে মনোরম সুগন্ধের প্রবাহে ঘরটি ছেয়ে যায়।

যে খুসবুটির তিনি ঘ্রাণ পান তার প্রচলন ছিল পাঁচ হাজার বছর আগে পর্যন্ত। প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলেন আধারটি আসলে হাতধোবার পাত্র ছিল এবং ওতে জল ঢেলে ফুলের পাপড়ি ভাসিয়ে রাখা হতো। পাত্রটি খরখরে হওয়ায় সুগন্ধটা তার গায়ে গায়ে জমে যেত এবং এই সাত হাজার বছর ধরে বালির নিচে থেকে তা বহন করে আসছে।

ব্যাভেরিয়ার প্যাশোতে জর্মান শিশুরা খেলতে খেলতে দুটি মাটির আধার কুড়িয়ে পাওয়ার পর মিউজিয়ামের কর্তারা ওগুলোকে প্রাচীন কালের পুষ্পাধার বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু পরে রাসায়নিক পরীক্ষায় পাত্রগুলির গায়ে বারুদের গুঁড়ো আবিষ্কৃত হয় এবং জানা যায় যে ওগুলো হচ্ছে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হাতবোমার খোল।

প্রত্যেক পাত্রের বেড় পাঁচ ইঞ্চি। বারুদ ভরে সলতেতে আগুন ধরিয়ে হানাদার শত্রুকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হতো এই হাতবোমা।

*

কিছুকাল ধরে বিলেতের বৈজ্ঞানিকরা মানুষের মুদ্রাদোষের প্রতি লক্ষ্য রাখতে আরম্ভ করেছেন। শত শত মানুষের বিবিধ ভংগী দেখে দেখে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ওর মধ্যে লোকের চরিত্র ও অনুভূতির অনেক কিছুই ধরতে পারা যায়। তারা বলেনঃ "নিজের মুদ্রাদোষ ও অংগভংগীর প্রতি লক্ষ্য রাখ তাহলেই নিজেকে এবং অপর লোকদেরও ভালভাবে চিনতে পারবে।"

অংগভংগীর বৈজ্ঞানিক অনুশীলন থেকে বোঝা যায় যে ওটা দুটি শ্রেণীতে পড়ে।

"মাথা, হাত, বাহু বা চোখের পাতা নিচের দিকে নামানোতে প্রকাশ পায় অপছন্দ বা বিরক্তির ভাব"—বিভিন্ন ক্ষেত্রের পাঁচশ পুরুষ ও পাঁচশ স্ত্রীলোকের অংগভংগী লক্ষ্য করে এক বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন—"ওপর দিকে সঞ্চালন অর্থে সাধারণত প্রশংসা বা পরিতোষের ভাব প্রকাশ পায়।"

এই বিশেষজ্ঞের মতে এর কিছু ব্যতিক্রমও অবশ্য দেখা যায়। যেমন চোখের পাতা তোলার একরকম ভংগী দেখা যায় যাতে বিদ্রূপ প্রকাশ পায়, তবে তিনি বলেন, বিদ্রূপ হচ্ছে অপমানের মধ্যে দিয়ে আসলে স্তুতি। বিদ্রূপ হচ্ছে ইচ্ছাকৃত কিন্তু অন্যান্য ভংগী বা বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ করে সেগুলি হয় স্বতঃস্ফূর্ত।

একজন বিশেষজ্ঞ একটি সুন্দরী মেয়ের কথা বলেন, বয়েস তার বিশের কোঠায়, নার্ভাস প্রকৃতির জন্যে হরদম মুখ কুঁচকানোর ফলে তার মুখের একদিকে একটা দাগ পড়ে গিয়েছে। অপর একটি মেয়ের সম্পর্কে এই বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করেন যেঃ "মেয়েটিকে আরো সুন্দর দেখাতো যদি হাসিটা একটু ছোট করতে পারতো! মেয়েটি মুখ খোলে অনেকখানি যাতে তার রূপটা
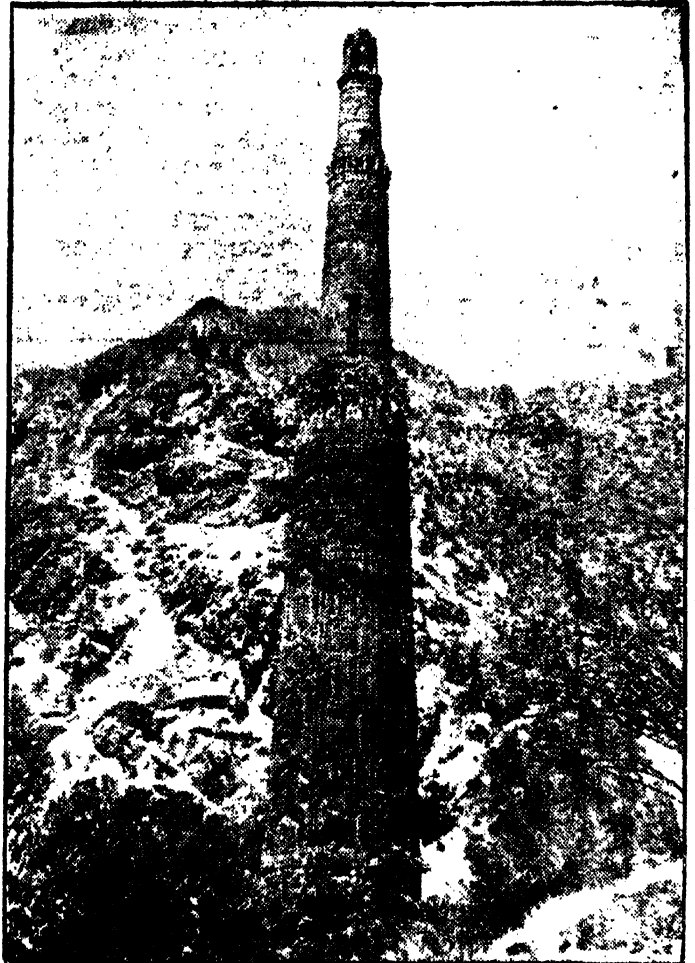
আফগানিস্তানের ঝম নদীর তীরে আবিষ্কৃত মিনার যার সংগে দিল্লীর কুতব মিনারের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। দুশ ফিট উঁচু এই মিনারটির অস্তিত্ব ১৯৫৭র অগাস্টের আগে পর্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। এর গায়ে খোদাই করা লিপিতে ঘোরিদ সুলতান গিয়াস-উদ দীনের নাম পাওয়া যায়। এই সুলতানের আমলেই ঘোরিদরা দিল্লী জয় করে এবং কুতব মিনারের গায়েও তার নাম পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে, কুতব মিনার (২৩৮ ফিট) নির্মাণে স্থপতি আলতামিশ ঝমের এই মিনারটির গঠন-আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন

ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। মুচকি হেসে হেসে কথা বলে যাওয়াও মেয়েদের পক্ষে ঠিক নয়। মুচকি হাসি সব সময়েই মিষ্টিহাসি হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের কতক চলচ্চিত্র ও টেলিভিসন তারকা অনবরত মুচকি হাসির অভ্যাস করার ফলে ওদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটা আর চোখে পড়ে না।"

একটি মেয়ে এই বিষয়ে অনুশীলন কাজে সাক্ষাৎকারে বলে যে, তার কর্কশ এবং অনর্গল হাসির জন্যে তাকে পতিলাভে বঞ্চিতা হতে হয়েছে। বিয়ের সব ঠিক ছিল, কিন্তু একদিন তার ভাবি স্বামী ওকে স্পষ্টই জানিয়ে দেয় যে, ওর হাসিটা অসহ্য—তার ফলেই সম্বন্ধ ভেঙে যায়।

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, "আমাদের বিশ্বাস, বহু মেয়েই তাদের কৃত্রিম হাসির জন্যে বিবাহের সুযোগ হারায়।"

*

লণ্ডনের টেডিংটনে অবস্থিত ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরিতে অঙ্ক কষার একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র বসানো হয়েছে যা এক সেকেণ্ডে তিরিশ হাজারটি যোগ বিয়োগ করতে পারে।

গুণের অঙ্কও যন্ত্রটি এত নির্ভুল ও দ্রুত করে ফেলতে পারে যা অতীতের অঙ্কযোগীদের বিস্মিত করে তুলবে। এতে সেকেণ্ডে দু হাজারটি গুণ কষা যায় তবে ভাগ কষতে গতি কমে দাঁড়ায় সেকেণ্ডে ছ'শটি। তের বছরের পরিশ্রম এবং প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই যন্ত্রটি প্রস্তুত হয়েছে।

যৌগিক প্রথায় অঙ্ক কষার বিস্ময়কর কৃতিত্ব আমাদের দেশে অনেকেই দেখিয়েছেন। কিছু বছর আগেও যোগী সোমেশ বসু মুখে মুখে বিরাট জটিল অঙ্ক কষে ইওরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের স্তম্ভিত করেছিলেন।

পাশ্চাত্যের কয়েকজন অঙ্কযোগীর কথা শোনা যায়। জেরা কোলবার্ন নামক এক যুবক আটচল্লিশ বছরে কত সেকেণ্ড হয়, মাত্র চার সেকেণ্ডের মধ্যে কষে দিয়ে বৈজ্ঞানিকদের স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন।

আর একজন অঙ্কবিশারদ কথার ছলে এক বন্ধুকে তার জন্মতারিখ জিগ্যেস করেন। তারিখটা তাকে জানাবার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বন্ধু শুনে অবাক হন যে, তার জন্মের পর থেকে সাতানব্বই কোটি সাতান্ন লক্ষ পনের হাজার দুশ সেকেণ্ডে অতিবাহিত হয়েছে।

বিলেতে রেকর্ড আছে যে, জর্জ পার্কার বিডার যিনি উত্তরকালে ইঞ্জিনীয়াররূপে খ্যাতি অর্জন করেন, স্কুলে পড়ার সময় অঙ্ক কষার চলতি পদ্ধতি পরিহার করে নিজের উদ্ভাবিত উপায়ে অদ্ভুত সব কঠিন অঙ্ক অতি সহজে কষে নিতেন।

একবার এক অঙ্কের অধ্যাপক পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি বেড়ের একটা চাকা আশি কোটি মাইলে কতবার ঘুরবে প্রশ্ন করেন। জর্জ এক মিনিটের মধ্যে সঠিক উত্তর দেন।

১৮৯৬ সনে আগেকার ওয়েস্টমিনিস্টার মৎস্যাগারের এক অধ্যাপকও অঙ্ক কষায় বিস্ময়কর কৃতিত্বের পরিচয় দিতেন। একবার এক দর্শক ওকে প্রশ্ন করেন, বাহান্নখানির এক প্যাকেট তাসকে কত বিভিন্নভাবে বিতরণ করা যাবে।

আঠারো মিনিট ধরে চোখ বুজে বসে থেকে অধ্যাপক উত্তর দেনঃ ৫৩৬৪৪৭৩৭৭ ৬৫৪৮৭৯২৪৩৯২৩৭৪৪০ হাজার ভিন্ন ভিন্নভাবে। সংখ্যার এই অদ্ভুত মিছিল পরে এক প্রখ্যাত অঙ্কবিশারদকে দিয়ে মেলানো হয় এবং দেখা যায়, উত্তর ঠিক হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য মনীষীদের মতো এই অধ্যাপকও বড় ভুলোমন ছিলেন এবং নিজের মাইনের হিসেব তিনি কখনো কষতে পারতেন না।

বাদল গেছে টুটি
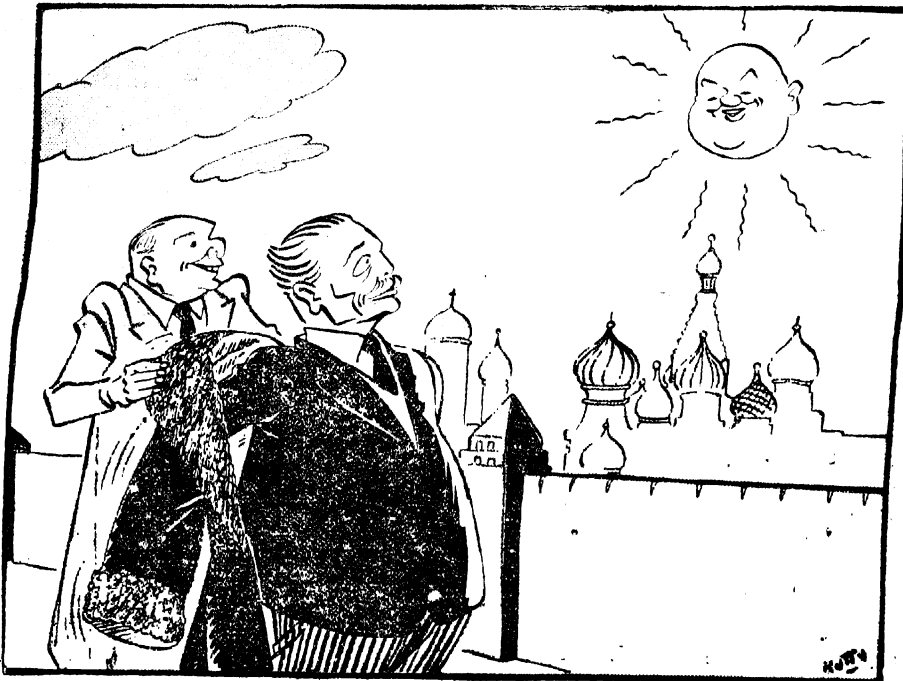
পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন পররাষ্ট্র-মন্ত্রী-বৈঠকে সম্মত হইয়াছে। সংবাদ

ট্রামে-বাসে

কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী বলিয়াছেন যে, রপ্তানী দ্রব্য বৃদ্ধি করিতে সরকার সকল প্রকার ন্যায্য সুযোগ দান করিবেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"বাঁদর রপ্তানীতে আমরা রপ্ত হয়েছি, সরকারী সাহায্য পেলে ডোদিড় পর্যন্ত পৌঁছনো অসম্ভব হবে না"!!

* * *

সিঙ্গাপুর হইতে আগত শ্রীমতী শিরিন ফৌজদার কলিকাতায় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—যে শিক্ষা অন্যকে নিজের ভাইয়ের মতো মনে করিতে শেখায় না, সে শিক্ষার সার্থকতা কোথায়। —"কিন্তু স্ত্রীর ভাই ব'লে মনে করবার একটি স্থানও যদি না থাকে তবে শিক্ষা ধুয়ে কি জল খাবো? আমাদের কিঞ্চিৎ লিখনং-এর অর্থই যে তাহলে ব্যর্থ হয়ে যাবে"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

সংবাদে শুনিলাম এবার এম, এ ও এম, এস, সি পরীক্ষায় কলা ও বিজ্ঞান শাখায় ছাত্রীরাই ভালো ফল করিয়াছে।—"ছাত্ররা বিয়েতে দেখে নেবে"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

দেশাইজীর বাজেটকে অনেকে নাম-গন্ধহীন বাজেট আখ্যা দিয়াছেন। আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"নামগন্ধের অভাব শব্দে পুষিয়ে নেওয়া হয়েছে, ঢক্কা নিনাদের অভাব নেই"!

* * *

অনেকে এই কথাও বলিয়াছেন যে এই বাজেটে সাধারণ মানুষেরই বোঝা বাড়িবে।—"সাধারণ মানুষ বোঝার ওপর শাকের আঁটিতে কিছু মনে করেনা, পিরিত

তাদের আঁটাআঁটি-ই থাকে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মন্ত্রী শ্রীবিমল-চন্দ্র সিংহকে আলালের ঘরের দুলাল আখ্যা দিয়াছেন জনৈক সদস্য। সংবাদে জানা গেল সিংহ মহাশয় তখন সভায় উপস্থিত ছিলেন না। —"উপস্থিত থাকলে সিংহ মশাই হতোম পেঁচার নক্সা দেখিয়ে দিতে পারতেন"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

রুশ প্রতিনিধিদের নেতা কর্তৃক আয়োজিত ভোজসভায় শ্রীনেহেরু তাঁর ভাষণে বলিয়াছেন যে, মহাশূন্য অভিযানে রাশিয়া অভাবনীয় সাফল্য লাভ করিয়াছে। অন্যান্য দেশও অনেক কিছুই জয় করিয়াছে। জয় করিতে পারে নাই শুধু হৃদয়। "কিন্তু হৃদয় জয় যে কেউ চান না, তাঁরা বলেন "মন দেয়া-নেয়া অনেক করেছি মরেছি হাজার মরণে"—সুতরাং মারণমন্ত্রেই সবাই মরিয়া হয়ে উঠেছেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

শ্রীনেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহারা

যেন ছাত্রাবস্থা হইতেই বিশ্বনাটকে যথোপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়।—কিন্তু মুশকিল এই, অনেকের ভাগ্যেই 'সাইড রোল' ছাড়া কোন ভূমিকাই মেলেনা"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

শ্রীনেহরু অন্যত্র মন্তব্য করিয়াছেন—আজকাল সমালোচনা অনেকের পেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।—"উপায় কি? ভয়াবহ বেকার সমস্যায় যা হোক একটা কিছু করতে হবে তো"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ছেলেমেয়েদের দিনে অন্ততঃ একটি করিয়া ডিম খাওয়াইবার পরিকল্পনায় রাজ্য সরকার হাত দিয়াছেন। অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"সুসংবাদ সন্দেহ নেই, তবে ডিমটা ঘোড়ার না হলেই হয়"!!

* * *

প্রসঙ্গত অন্য একটি সংবাদ মনে পড়িয়া গেল। শুনিলাম গোবরডাঙ্গায় হংস-প্রজননের ব্যবস্থা হইতেছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এটাও নিঃসন্দেহে সুসংবাদ। তবে মুশকিল হবে হাঁসেরা যদি পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে"!!

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় শ্রীজ্যোতি বসু-মহাশয় যখন সার প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতেছিলেন তখন ডাঃ আমেদ নাকি ঘুমাইতেছিলেন। বসুমহাশয় এদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে সভায় হাসির রোল উঠে। ডাঃ আমেদ ধড়মড় করিয়া জাগিয়া উঠেন।—"এতে হাসির কিছু নেই, লজ্জারও কিছু নেই। সার প্রসঙ্গে ডাঃ আমেদ সার-টুকুই গ্রহণ করেছেন—অর্থাৎ একটু দিবা-নিদ্রা। নাক ডাকালে বা মটকা মেরে পড়ে থাকলে বরং আপত্তি করা যেতো"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধিবেশনে পোকার কামড়ে উপদ্রুত জনৈক কংগ্রেস সদস্য—"বড্ড পোকায় কামড়াচ্ছে স্যার" বলিয়া স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সংবাদে প্রকাশ সরকার পক্ষে ঐ আসন সারিতে যে কয়জন সদস্য ছিলেন তাঁরাও পোকার কামড়ে অতিষ্ঠ হইয়া আসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"স্পীকার অবশ্য পরে ইহার একটা প্রতিবিধান করবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু তার আগে কোন একটা পোকা কমিটি বসিয়ে নিরপেক্ষ পোকা-তদন্তের প্রয়োজন: এ কোন্ পোকা যা বেছে বেছে কংগ্রেসী সদস্যদেরই শুধু কামড়ে গেল"!!!

চক্রদত্ত

আমরা সকলেই জানি যে, সর্দি ভাইরাস-জনিত রোগ, কিন্তু কোন্ ভাইরাসের দরুণ সর্দি হয়, একথা এতদিন ডাক্তাররাও বলতে পারতেন না। সম্প্রতি শেফিল্ড হাসপাতালের ডাঃ সাটন সর্দির জনক ভাইরাসটি নির্ণয় করতে পেরেছেন। জামাইকা দ্বীপের একটি তিন বছরের মেয়ে যখন সর্দিতে ভোগার জন্য হাসপাতালে ছিল তখন ডাঃ সাটন ঐ মেয়ের গলার কফ সংগ্রহ করে সেটি একটি বাঁদরের দেহে সংক্রামিত করেন। কয়েক সপ্তাহ পরে ডাক্তার লক্ষ্য করে দেখেন যে, ঐ বাঁদরের দেহের মধ্যের কোষগুলি সর্দি-জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়ে পাংশু হয়ে উঠেছে। এইবার ডাঃ সাটন ঐসব কোষ থেকে জীবাণু সংগ্রহের পর আরও একটি বাঁদরের সতেজ কোষকে বীজাণু দ্বারা সংক্রামিত করে সর্দির উৎপত্তি করেন। এইভাবেই জীবাণুগুলি অন্যান্য জীবাণু থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে সক্ষম হন। ডাঃ সাটন বলেন যে, তিনি যে ভাইরাসটি আবিষ্কার করেছেন, সেটি বহুপ্রকার সর্দির ভাইরাসের মধ্যে অন্যতম। বিশেষজ্ঞদের মতে ভাইরাস নিয়ে এই গবেষণার সুফল হিসাবে অন্ততঃ সর্দি রোগটির চিকিৎসা পদ্ধতির কিছু উন্নতিসাধন করা সম্ভব হবে।

*

এক নতুন ধরনের অটোমেটিক পিস্তল বার হয়েছে, যার গুলী প্ল্যাস্টিকের তৈরী। পিস্তলটির একবার ঘোড়া টেপবার সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকা ঘুরে যাবে আর একটা গুলী, গুলী ছোঁড়বার গর্তটার মধ্যে চলে আসবে। দ্বিতীয়বার ঘোড়া টেপার সঙ্গে সঙ্গে গুলী বের হয়ে আসবে। এক সঙ্গে কুড়িটা গুলী এই পিস্তলটিতে ছোঁড়া যাবে। এ ছাড়াও ২২ এবং ৩৮ বোরের ব্যারেল এতে বদলে বদলে লাগান যাবে।

*

বাড়িতে ইঁদুর ধরা কল লাগিয়ে বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সাবধান করে দিতে হয়। কোন কারণে হাত কিংবা পায়ের আঙুল এই কলের মধ্যে পড়লেই কেটে যাবে। এই অসুবিধা সহজেই দূর করা যায়। পুরান কোন চওড়া নলের খানিকটা টুকরো কেটে নিয়ে তার ভিতরে কলটা

ইঁদুর কল পেতে নলের টুকরোর মধ্যে রাখা হচ্ছে

পেতে রেখে দিলে আর ছেলেপিলেদের কলের কাছে এলেও কোন কিছু ক্ষতি হবার ভয় নেই।

*

অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়ি, কড়া, ডেকচি ইত্যাদি দেখতে দেখতে এই হাল্কা ধাতুটির সঙ্গে আমরা বিশেষ পরিচিত হয়ে পড়েছি। আমরা একথাও জানি যে, আকাশে ওড়ার জন্য এই হাল্কা ধাতুটি আকাশ-যান তৈরীর কাজে বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু সবচেয়ে মজবুত জিনিস তৈরীর জন্যও যে অ্যালুমিনিয়ম লাগে, তা আমরা নতুন জানলাম। আমেরিকার আওয়া শহরে পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম অ্যালুমিনিয়মের তৈরী সেতুর নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অন্যান্য ভারী ধাতুর তৈরী সেতুর সঙ্গে এই অ্যালুমিনিয়ম-তৈরী সেতুর কতখানি তফাৎ এবং ঐ সেতুগুলির তুলনায় এই সেতুটি কতখানি সুবিধাজনক, তা দেখবার জনাই আওয়া শহরের সেতুটি পরীক্ষামূলকভাবে তৈরী করা হয়েছে। অবশ্য এই নতুন সেতুর কাঠামো আর মেজেটা জমান সিমেন্ট ও ইস্পাত দিয়ে তৈরী, এছাড়া খিলান-রেলিং ইত্যাদি অন্যান্য জিনিসগুলি অ্যালুমিনিয়মের তৈরী।

*

বৃটেনে স্কুপেড্ নামে একটি নতুন ধরনের সাইকেল বার হয়েছে, যাকে যুগান্তকারী সাইকেল বলা যেতে পারে। অবশ্য এটি বর্তমানের নয় ভবিষ্যতের জনাই তৈরী হয়েছে। স্কুপেডটি ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরী এবং এর গঠন অনেকটা স্কুটারের মতন। এর আগে অন্যান্য অনেক জিনিস তৈরীর জনাই ফাইবার গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে, তবে সাইকেল তৈরীর জন্য এই প্রথম এই পদার্থ ব্যবহার করা হল। ফাইবার গ্লাস দিয়ে তৈরীর জন্য সাইকেলটি ওজনে খুব হাল্কা হয় এবং কোনওরকম আবহাওয়াতেই আরোহীকে অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। কারণ চাকার অর্ধেকটা, গিয়ার, ফর্ক, চেন ইত্যাদি ঢাকা থাকে। ঢাকা থাকার দরুণ কোনওরকম তেল ময়লা সাইকেল থেকে আরোহীর গায়ে লাগার সম্ভাবনা নেই। পাদানি ছাড়াও রাস্তার কাদা ইত্যাদি থেকে পা'কে বাঁচানর জন্য সামনের দিকে ফাইবার গ্লাসের তৈরী মাডগার্ড দেওয়া থাকবে। মোটরসাইকেল ও স্কুটারকে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য যে রকম স্ট্যান্ড থাকে, সেই রকম সুবিধাজনক স্ট্যান্ডের ব্যবস্থাও থাকবে। স্কুপেডের বসার সিটটায় এমন ব্যবস্থা আছে যে, প্রয়োজনানুসারে কিছুটা রদবদল করে নেওয়া যায়। ছোটছেলে বা পরিণত মানুষ নিজের উচ্চতানুযায়ী ব্যবস্থা করে নিতে পারে, এমন কী সময়ে সময়ে সিটে বসা অবস্থায় পা বাড়িয়ে সাইকেলটি দাঁড় করিয়ে রাখা যায়। সাইকেল আরোহীর পক্ষে এ ব্যবস্থাটি যে বিশেষ সুবিধাজনক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর এর জন্য দুর্ঘটনা ঘটার ভয় কম থাকে।
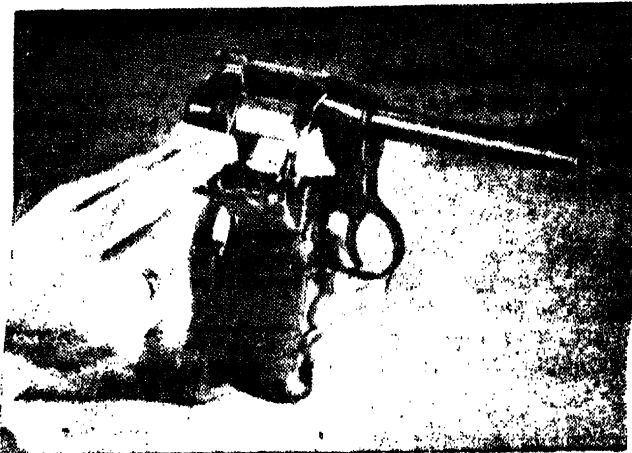
প্ল্যাস্টিক বুলেট ব্যবহারকারী পিস্তল

জীবনালেখ্য

বিপ্লবী তারকদাস—শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীমতী অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দির-নিবাস, রাজভবন, কলিকাতা-১। মূল্য এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি বাঙ্গালার বিখ্যাত বিপ্লবী তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য। রাজনীতি ক্ষেত্রে তারকদাস সহিংস এবং অহিংস উভয়বিধ নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিতেন। রাজনীতি ছাড়াও জনসেবা, সমাজ কল্যাণ, আর্ত সেবা প্রভৃতি নানাবিধ সংগুণে ভূষিত ছিল তারকদাসের চরিত্র। তারকদাস যুগান্তর দলভুক্ত ছিলেন এবং বিপ্লবী জীবনে বালেশ্বর-যুদ্ধখ্যাত বীর বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তারকদাসের আলোচ্য জীবনালেখ্য অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও মর্মস্পর্শী। ১৪০।৫৮

পাথেয় সন্ধানে—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশারী। প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্রকুমার ঘোষ, অধ্যয়ন, ২০এ, গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য এক টাকা বার আনা।

পুস্তিকাখানির লেখক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সাধক। বরিশাল কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় বরিশালের তৎকালীন প্রখ্যাত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই লেখকের ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহাদের এবং বিশেষভাবে কর্মবীর ও স্বদেশপ্রেমিক স্বর্গত অশ্বিনী কুমার দত্তের সাহচর্যের কাহিনীই সংক্ষেপে এই পুস্তিকাখানিতে বিবৃত হইয়াছে। পুস্তিকাখানির মূল্যের দিক বিবেচনা করিলে পাঠক সাধারণকে নিরাশ হইতে হয়।

৬৩২।৫৮

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন—শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৭ দাম—২৷৷০।

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল এখনও যথেষ্ট তীক্ষ্ণ। তার প্রধান কারণ তাঁর সাহিত্য। তাঁর গল্প-উপন্যাসে এমন বহুতর আভাস-ইঙ্গিত আছে যাতে পাঠকের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে তাঁর জীবন ঠিক আর পাঁচজনের মতো ছিল না। অথচ তিনি নিজে এই বিষয়ে মুখ খুলেছেন কদাচিৎ। ফলে, তাঁর জীবন সম্পর্কে রহস্য বেড়েছে, তথ্য ও কল্পনার সীমান্ত অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় যাঁরা তাঁর কাছাকাছি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন, তাঁদের মুখে শরৎচন্দ্র-উপাখ্যান শুনতে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। এই রকম টুকরো টুকরো ছবি থেকে আসল লোকটার আস্ত ছবিটা ফুটে উঠবে হয়তো।

লেখক নিজে পুরনো দিনের রাজনৈতিক কর্মী। কংগ্রেস সংগঠনের সঙ্গে ছিল শরৎচন্দ্রের নিবিড় আত্মীয়তা, যদিও রাজনৈতিক নেতা হবার প্রলোভন তাঁর ছিল না। লেখকের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের কংগ্রেসের কাজের মারফত আলাপ। সাধারণ আলাপের চেয়ে এরকম আলাপের মূল্য অনেক বেশি। মানুষকে যাচাই করার বহুতর সুযোগ আসে লড়াইয়ের ময়দানে। লেখক সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক মতামত, বিশেষত চরখা ও অহিংসা সম্পর্কে, লেখকের পরিবেষণের দক্ষতায় এতই উপভোগ্য হয়েছে যে নমুনা দেওয়ার লোভ সংবরণ করা গেল না। চরখা সম্পর্কে গান্ধীজীকে শরৎচন্দ্র বলছেন:

কাব্যগ্রন্থ

সুনির্মল বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত। মূল্য চার টাকা।

শিশুপাঠ্য কবিতা লিখতে গিয়ে সুনির্মল বসু শুধু সহজবোধিনী কবিতা লিখেই ক্ষান্ত হননি, এই দুরূহ কর্তব্যপালনকালে তিনি একটি বিশেষ রসলোক রচনা করেছেন। বৃষ্টি, সবুজ ফড়িং, ফিনিক-ফোটা-জ্যোৎস্না, তিন-চুড়ো পাহাড়ের দেশ, বুনো ছেলে, আলোর দেশ—আরো কতো চিত্র-চরিত্রের wonderland তাঁর সৃষ্ট সেই রসজগৎ। তাঁর কৌতুক বিব্ধ করেনা, সুস্থ করে। তাঁর ছন্দ-হিন্দোল ক্লান্ত করেনা, আন্দোলিত করে। সুকুমার রায়ের এই শ্রদ্ধেয় উত্তরসাধক বাংলা দেশের ছেলে-মেয়েদের খোলা হাসি আর ছড়ার প্রান্তরে একটি মুক্তির আস্বাদ দিয়েছেন। এই গ্রন্থে তাঁর সুনির্বাচিত কবিতাগুলি একত্রিত করে প্রকাশক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। যাদের জন্য এই সংকলন, তারা এই বই হাতে পেয়ে যে পুলকিত হয়ে উঠবে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদচিত্রণ অনবদ্য সুন্দর। (৩৫৯।৫৮)

শেষ সওগাত—নজরুল ইসলাম। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত। মূল্য—চার টাকা।

নজরুলের অপ্রকাশিত কবিতাবলীর এই সংকলনটি হাতে পেয়ে পাঠকমাত্রই কৃতজ্ঞ হবেন। এতে নানা রসের কবিতা আছে, যা শুধুই 'অগ্নিবীণা'র স্বাক্ষরবাহী নয়, যা কবিসত্তার ইতিহাসের পরিচয়বহ। গীতি-কবিতার সৌরভে সুরভিত অনেকগুলি কবিতা এই গ্রন্থের আকর্ষণ। 'ছন্দিতা' পর্যায়ের আঙ্গিক। যে আমেজী ঢং মুজতবা সাহেবের নাথ দত্তের সঙ্গে তিনিও ছন্দের পরীক্ষাসূত্রে স্মরণীয়। গানের মাদনশক্তি এই গ্রন্থের অধিকাংশ রচনাকে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। সবশেষের আগের 'কাবেরী-তীরে' নামক গীতি-বিচিত্রাটিতে 'কাবেরী নদীজলে কে গো বালিকা', 'এস চিরজনমের সাথী', 'নীলাম্বরি শাড়ী পরি' প্রভৃতি চিরস্মরণীয় গান একটি নূতন কাহিনীর প্রতিবেশে নতুন করে পাওয়া গেল। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুল এই সংকলনকে উপলক্ষ্য করে যেন আবার সজীব হয়ে উঠেছেন।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূমিকাটি সময়োপযোগী এবং সারগর্ভ। (৩৩৩/৫৮)

সৈনিকের প্রাণবীণা (প্রথম পর্ব)—চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। গাঙ্গুলী গ্রন্থাগার, ৬, বেনিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা-১৪। মূল্য পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বর্তমান পুস্তিকাখানি সৈনিক সাহিত্যিক চুনীলালের স্বরচিত দশটি ছোট কবিতার সংকলন। চুনীলাল সৈনিক-সাহিত্যিক হইলেও তাঁর রচিত কবিতাগুলি বীণার ঝংকারের ন্যায়ই শ্রুতিমধুর। আলোচ্য পুস্তিকার কোন কোন কবিতায় বিদ্রোহী কবি নজরুলের কবি-জীবনের প্রারম্ভে লেখা কবিতার গুরু-গাম্ভীর্যের ছোঁয়াচ আছে বলিয়া মনে হয়। প্রচ্ছদ-পট মনোরম। ১০৩।৫৮

বিদেশের কথা

নেপোলিয়নের দেশে—দিলীপ মালাকার। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা। দুই টাকা।

বাংলা সাহিত্যে বিদেশ ঘুরে এসে বিদেশ সম্বন্ধে লেখা বইয়ের আজকাল অভাব নেই। তাই এ বইখানি হাতে নিয়েও সাধারণভাবেই সময় কাটানোর জন্য পড়তে বসেছিলুম। কিন্তু কখন যে এর মধ্যে ডুবে গেছি তা নিজেও জানতে পারিনি। ফরাসী দেশের বিলাসপ্রিয়তার কথা ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি, শুনে এসেছি তাদের নীতিবোধের সাথে আমাদের নীতি-বোধের আকাশপাতাল পার্থক্যের কথা। বই-খানি শেষ করার পর নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জেগেছে, এত আজগুবি কথা লোকে কী করে বলে আর অন্যরা কী করেই বা তা এত সহজে বিশ্বাস করে। শ্রী মালাকার তাঁর এই বইটিতে ফরাসী দেশের যে ছবি এঁকেছেন তা পড়ে এই সত্যটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ফরাসী দেশটাও মাটির। সেই মাটির দেশের সাথে মালাকার মশাই যে নিবিড় একাত্মীয়তা বোধ করেছেন, লেখার সর্বত্র তা ফুটে উঠেছে, আর তা-ই পাঠকমনকে এত আকৃষ্ট করে। আর এই রচনার আরেকটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর আঙ্গিক। যে আমেজী ঢং মুজতবা সাহেবের লেখাকে আমাদের এত প্রিয় করেছে, সেই একই ঢং-এর জন্যই এই বইটি পাঠকের অজ্ঞাতেই পাঠকমনকে মুহূর্তে আকৃষ্ট করে নেয়। বুদ্ধি বা মননের সচেতন প্রয়াসের ফল নয়, বোধ ও অনুভূতির এক আশ্চর্য প্রকাশ এই বইখানি। ৫৫৬।৫৮

ইন্দোচীনের কথা—অজিতকুমার তারণ। প্রকাশক—পপুলার লাইব্রেরী, ১৯৫।১বি, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলি-৬। দাম—২৷৷০

শ্রী তারণ পেশাদার লিখিয়ে নন। মিলিটারিতে চাকরি করার সময় ১৯৫৪ সালে গিয়েছিলেন ইন্দোচীনে। সেখানে অনেকদিন থেকে নানা জায়গায় ঘুরে এই নবজাগ্রত দেশের সম্পর্কে লেখক যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, তাই সরল ভাষায় বলে গেছেন। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী প্রচারকের নয়, ভ্রাম্যমানের ও সহজ প্রীতির। বইটি এইজন্যেই সুখপাঠ্য হয়েছে। প্রেসিডেণ্ট হো-চি-মিনহের জীবন-কথা বিশেষ উপভোগ্য। তাঁর মানব-মিত্র রূপটি চমৎকার ফুটেছে। একটি ভিয়েৎনামী গানের বাংলা অনুবাদ লেখকের বই থেকে তুলে দেওয়া গেল :

যুবতী : হে প্রিয়, আমি তোমায় আংটি দিয়েছিলাম,
নাড়ি গিয়ে মা-বাবাকে বলবো
যখন সেতু পার হচ্ছিলাম
আংটি গেছে পড়ে।

REG. NO. C. 2109

এ নিশ্চয়ই 'ও-কে' সাবান...
-তা' আর বলতে! এঁর মাজা রং
আর হাসি খুসি ভাব দেখেই তা'
বোঝা যাচ্ছে। 'ও-কে' সাবান
ছাড়া আর কিছুতেই এ'
সম্ভব নয়।
'ও-কে' OK জোড়
জেসমিন
ও
ওরিয়েণ্টাল রোজ
OK
Oriental ROSE TOILET SOAP
Jasmine TOILET SOAP
প্রস্তুতকারক
দি ইষ্ট এসিয়াটিক কোং (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
একমাত্র পরিবেশক
জি. এথারটন এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১
KALPANA.OKB.
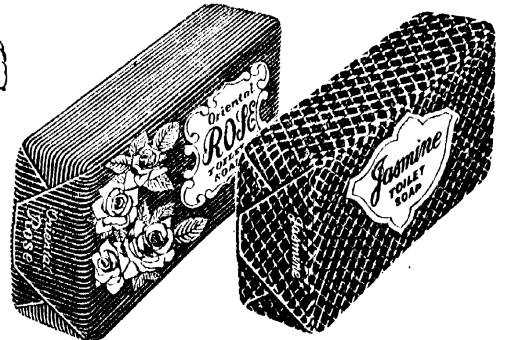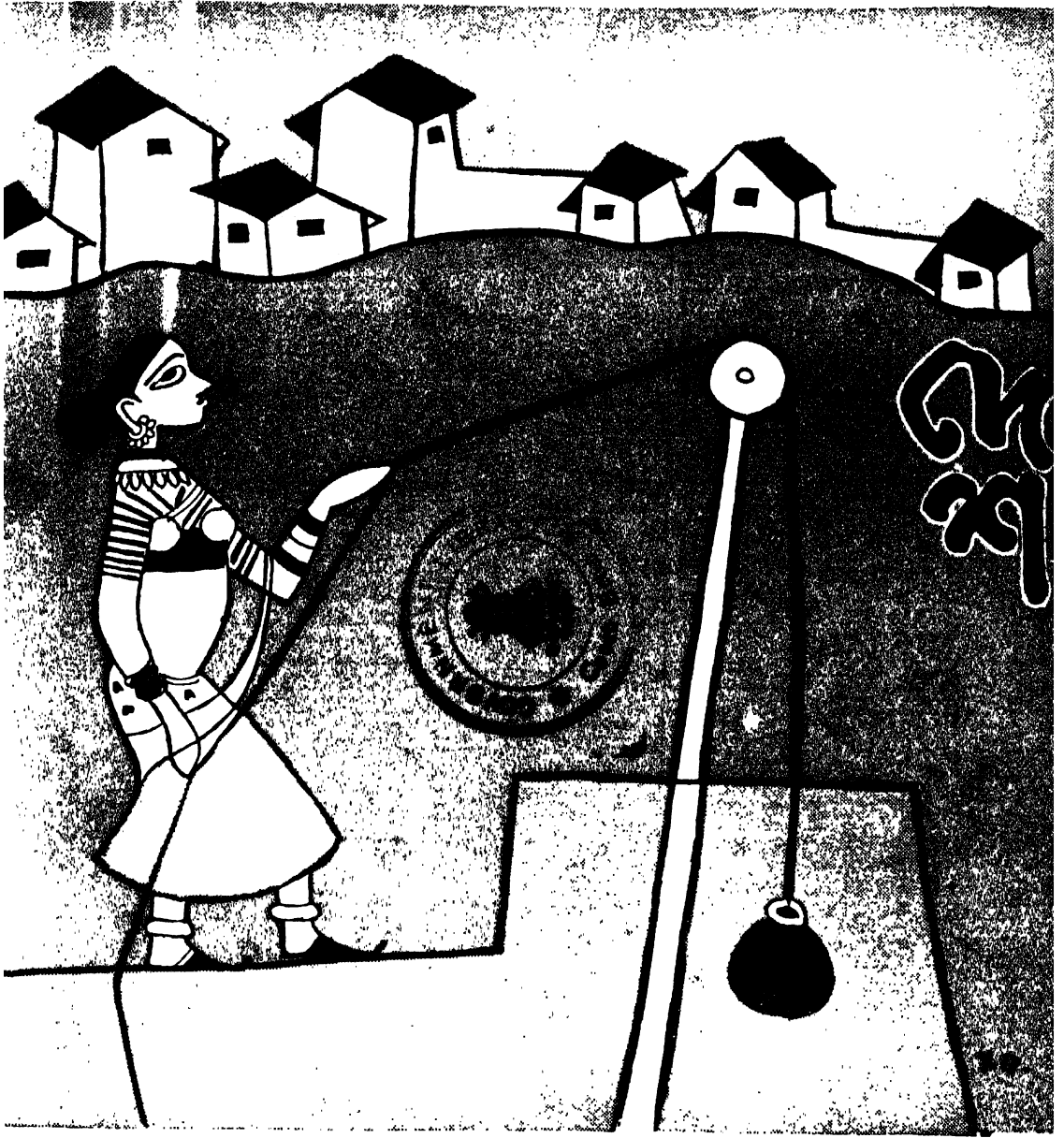
৬ বর্ষ] শনিবার, ৭ চৈত্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 21st March, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ২১
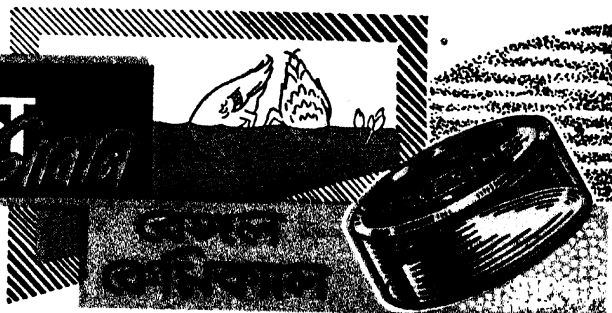
রমেশ গোল দিয়ে জিতিয়ে দিল

ভাল ফুটবল খেলোয়াড় হতে হলে আপনাকে দক্ষ, গতিশীল ও শক্তিশালী হতে হবে। রমেশ এই তিনটিরই অধিকারী-প্রচুরপরিমাণে। এই কারণেই তার দলকে সে জিতিয়ে দিতে পারল। নিয়মিত খেলার অভ্যাসে রমেশ দক্ষতা ও গতিশীলতা অর্জন করেছে। দৈনিক গ্লুকোভিটা গ্রহণ করে সে পেয়েছে তার শক্তি। কাজ-কর্মে খেলাধূলায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হলে শরীরে রক্তে যে শর্করা প্রয়োজন তা গ্লুকোভিটাতে আছে।

চা, কফি, দুধ বা শীতল পানীয়ের সহিত গ্লুকোভিটা গ্রহণ করুন। এক কাপ বা গ্লাসে এক থেকে তিন চা চামচ গ্লুকোভিটা মিশিয়ে নিন। সহজেই মিশ্রিত হয়।

গ্লুকোভিটা

অতিরিক্ত শক্তির জন্য

ভারতের এজেন্ট:—প্যারী এণ্ড কোং লিমিটেড

সূচীপত্র

সূচীপত্র

আগরতলা মিউনিসিপ্যাল এলাকায় মেট্রিক পদ্ধতির ওজন আইনতঃ চালু করা হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে ত্রিপুরার অন্যান্য এলাকায়ও এই পদ্ধতির ওজন চালু করা হইবে।

সরল হিসাব ও সঠিক মাপের জন্য

ত্রিপুরা প্রশাসন কর্তৃক প্রচারিত

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DESH 40 Naya Paisa.
Saturday, 21st March, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২১ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ৭ই চৈত্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

বঙ্গ সংস্কৃতি

কলিকাতায় বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন নামে একটি সংস্থার অধিবেশন চলিতেছে। গত কয়েক বছর হইল এই সংস্থাটি শহরে বার্ষিক অধিবেশন করিয়া আসিতেছেন। ইহাতে একদিকে যেমন গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বঙ্গ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া থাকেন তেমনি অন্যদিকে নৃত্য, গীত ও অভিনয়াদির অনুষ্ঠানও হয়। জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের দ্বারা এই সংস্থা একটি অত্যাবশ্যক কাজ করিয়া বাঙালীর মনকে বাংলার সংস্কৃতির প্রতি সচেতন করিয়া তুলিতেছে। ইহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এই উপলক্ষ্যে বাংলার সংস্কৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

এক সময় ছিল, নবাবী আমলে, বাংলার সংস্কৃতি ছিল প্রধানত গ্রামীণ। তখন দেশে শহর বলিতে দুটি মাত্র ছিল ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ, দুটিই রাজধানী। ঢাকাই মসলিন ও মুর্শিদাবাদের রেশম বহুমান্য পণ্য ছিল, বণিক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সে-সব জিনিস পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডে রপ্তানী করিত। কিন্তু ঐ দুই বস্তুই বাংলার একমাত্র পণ্য ছিল না। বিভিন্ন অঞ্চলে নানা জাতীয় পণ্য তৈয়ারী হইয়া বাঙালী কারিগরের অন্ন জোগাইত। আর তাহার পাশাপাশি সংস্কৃতির আর একটা ধারা ছিল, গীতিকবিতা, মঙ্গলকাব্য, পাঁচালি, যাত্রাগান ও লোকনৃত্য প্রভৃতি। কৃষ্ণনগরাধিপতির সভাকবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে ও গ্রাম্য কবির মঙ্গলকাব্যে, রামপ্রসাদের শাক্তগীতিকায় ও গ্রাম্য কবির শাক্তগীতিকায় যে প্রভেদ তাহা শক্তির প্রভেদ মাত্র, দুয়েরই মূল প্রেরণা গ্রাম্যজীবনরস।

তারপরে কোম্পানীর শাসন প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশে শহরের সংখ্যা ও গুরুত্ব বাড়িতে লাগিল। কলিকাতা কেবল বাংলার নয় কোম্পানীশাসিত ভারতের প্রধান শহর হইয়া উঠিল। বাংলা দেশের সর্বত্র ছোট বড় শহর দেখা দিতে লাগিল। আর এইভাবে পলাশীর যুদ্ধের একশত বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল, গ্রামীণ বঙ্গ ও নাগরিক বঙ্গ। তারপরে আরো একশত বৎসর গেল বাংলার এই দ্বিখণ্ডনের প্রভাব বাড়িল বই কমিল না। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে—এ যেন দুটা দেশ হইয়া গেল, দুয়ের আচার-ব্যবহার, ভাষাচিন্তা, চেষ্টাচর্চা সমস্তই যেন ভিন্ন। নবাবী আমলে বাংলার যে সংস্কৃতি এক ও অখণ্ড ছিল তাহা দুই ও খণ্ডিত রূপ ধারণ করিল। রাজসভাশ্রয়ী রামপ্রসাদের গীত ও পল্লী কবির গীত একই রসে পুষ্ট ছিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের গান ও পল্লী কবির গান এক রসাশ্রয়ী নয়। ভারতচন্দ্রের ও পল্লী কবির মঙ্গলকাব্যে এক রসে পুষ্ট ছিল, কিন্ত মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের দোসর পাওয়া গেল না পল্লীসাহিত্যে। আজকাল অনেকে এই ব্যাপারটাকে কেবল অর্থনৈতিক বনিয়াদের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। একথা সত্য নয় বা আংশিক সত্য মাত্র। প্রভেদের আসল কারণ ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রভাব। পূর্বোক্ত পক্ষ বলিবেন যে, ইংরাজী শিক্ষাও তো চাকরির চাহিদায়। এ যুক্তি সর্বত্র খাটিবে না। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিখিয়াই চাকরি পাইয়াছিলেন—ইংরাজি শিখিয়াছিলেন লোক-সেবার সুবিধার জন্যে। রবীন্দ্রনাথকে আর যাই হোক চাকুরি পাইবার আশায় ইংরাজী শিখিতে হয় নাই। কাজেই দেখা যাইতেছে বঙ্গ সংস্কৃতি খণ্ডিত হইবার মুখ্য কারণ ইংরাজী শিক্ষা, গৌণ কারণ ইংরাজের চাকুরি।

যে-কথা বলিতেছিলাম। ইংরাজশাসন কালে বাঙালীর অখণ্ড সংস্কৃতি খণ্ডিত হইল আর তাহার ফলস্বরূপ বঙ্গ-সংস্কৃতি সর্বাঙ্গীণতা হারাইল, নব্য-বঙ্গ সাহিত্যের অসাধারণ সাফল্য সত্ত্বেও পল্লীর সংস্পর্শ হারাইবার জন্য সম্পূর্ণ সবল হইতে পারিল না। ইহাকে বলা যাইতে পারে নব্য বঙ্গ সংস্কৃতির গ্রহের দোষ। এখন এই গ্রহদোষ খণ্ডাইবার উপায় আবিষ্কার করিতে হইবে, বাংলার সংস্কৃতিকে আবার অখণ্ড পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে। কাজটি সহজ নয়। গ্রামীণ সংস্কৃতিকে নাগরিক হইয়া উঠিলেই চলিবে না, কিম্বা নাগরিক সংস্কৃতিকে গ্রামীণ বাউল সাজিলেই চলিবে না। এরূপ কৃত্রিম উপায়ে কোন বৃহৎ সমস্যার সমাধান হয় না। যে প্রভেদ দীর্ঘকালে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করিতেও কিছু সময় আবশ্যক, সেই সঙ্গে আবশ্যক লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতনতা এবং আন্তরিকতা। শিল্পীতে শিল্পীতে শক্তির তারতম্য থাকিবেই, কিন্তু নাগরিক ও গ্রামীণ শ্রেণীভেদ লোপ পাওয়া উচিত। সুস্থ-সবল অখণ্ড বঙ্গ-সংস্কৃতিই হোক আমাদের লক্ষ্য। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রচেষ্টা আশা করি সেই সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইয়া দেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিবে।

প্রসঙ্গত

খবরের বাজারে একটু যেন মন্দা চলছিল। একটু যেন ঝিম ধরেছিল। তারপরেই হাওয়া আবার গরম হয়ে উঠেছে। হাওয়া মানে রাজনীতির হাওয়া। দেশে. এবং বিদেশে। সকলেরই গায়ে তার আঁচ লাগছে। রাজনীতির জ্বরো রোগীরাও দেখছি শয্যার উপরে উঠে বসছেন। উৎসাহে না হক. উত্তেজনায়।

সবচাইতে বড় খবর. নেহরু-নুন চুক্তি সম্পর্কে শ্রীনেহরু তাঁর মত পালটেছেন। এ শুধু বড় খবর নয়. শুভ খবরও। এমন কথা মনে করবার একাধিক কারণ।

নেহরু-নুন চুক্তি যখন স্বাক্ষরিত হয়. পাক-ভারত সীমান্তে তখন খুবই গোলযোগ চলছিল। পাকিস্তানের নিত্য-নূতন হামলায় সীমান্ত অঞ্চলের ভারতীয় অধিবাসীদের জীবন তখন বিপর্যস্ত। আমাদের প্রধানমন্ত্রী তখন নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন. দুই রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে এই যে চুক্তি সম্পন্ন হল. এর ফলে সীমান্তের গোলযোগ কিছুটা প্রশমিত হবে। হয়নি। হওয়া যে সম্ভব নয়. এমন আশঙ্কা আমরা বরাবরই ব্যক্ত করে এসেছি। পাকিস্তানের ভিতরকার পরিস্থিতিতে তারপর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ঠিক গণতন্ত্র বলতে যা বোঝায়. তা অবশ্য পাকিস্তানে কখনও ছিল না। গণতন্ত্রের একটা কঙ্কালকে সেখানে খাড়া করে রাখা হয়েছিল মাত্র। সেই কঙ্কালটাকেও অতঃপর ফাঁসিতে লটকে দিয়ে সেখানে সামরিক-শাসন কায়েম করা হয়েছে। পরিবর্তন আরও অনেক হয়েছে। তবে একটা ব্যাপারে তার আর কোনও পরিবর্তনই ঘটল না। ভারত সম্পর্কে তার মনোভাবের। সামরিক শাসন কায়েম হবার মত এত বড় একটা বিপর্যয় অবশ্য পাকিস্তানে এর আগে আর ঘটেনি। তবে এর আগেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ছোটখাট অনেক উত্থান-পতন সেখানে ঘটেছে। লিয়াকৎ আলীর হত্যাকাণ্ডের পর আজ ইনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন. কাল উনি। পায়ের তলায় ঘাস গজাবার আগেই তাঁদের একে-একে বিদায় নিতে হয়েছে। কিন্তু সেই একদিন-কা-উজিরের দল নিজেদের মধ্যে যতই মারামারি-কাটাকাটি করুন. ভারত সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ছিল এক ও অভিন্ন। প্রত্যেকেই তাঁর সাধ্যমত ভারত-রাষ্ট্রকে বিব্রত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁদেরই মধ্যে একজন অবশ্য আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে "দাদা" বলে সম্বোধন করেছিলেন. কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ছোট-ভাইটিরও দেখা গেল ভারত-বিদ্বেষ বড় কম নয়। সর্বশেষে সেখানে মিলিটারী-রাজ কায়েম হয়েছে। তার ফলে চালের দর কিছু কমেছে. এবং পুরনো দু-একজন ধুরন্ধর নেতাকে এখন ঘানি ঘোরাতে হচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানের যেটা মূল ব্যাধি. তার প্রকোপ কিছু কমেনি। ভারত সম্পর্কে তার হিংসা আজও সমান প্রবল। আগেকার তুলনায় হয়ত-বা একটু বেশী প্রবল।

এর কারণ আছে। কারণটা আর কিছুই নয়. পাকিস্তানের নিরন্ন জনসাধারণের সামনে কল্পিত বিপদের একটা ছবি সব সময়েই তুলে রাখা দরকার। নয়ত অন্য নানা সমস্যার দিকে তাদের দৃষ্টি পড়তে পারে। সেই সব সমস্যার সমাধানের জন্য রাষ্ট্র-প্রভুদের উপরে তারা চাপ দিতে পারে। রাষ্ট্র-প্রভুরা জানেন. সমস্যা সমাধানের সাধ্য তাঁদের নেই। তাঁরা জানেন. বিপদের জিগির তুলে জনতাকে যতদিন বিভ্রান্ত করে রাখা যায়. তাঁদের আয়ুষ্কালও ততদিনেরই। নেহাত বাধ্য হয়েই তাই তাঁরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিষোদ্গার করে চলেছেন। সীমান্তের হাঙ্গামাকে চিরস্থায়ী করে রাখবার চেষ্টা করছেন। এ-কথা আগেও আমরা বলেছি।

> **বিজ্ঞপ্তি**
>
> **সুসাহিত্যিক শ্রীদিলীপকুমার রায়ের কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি-কথা 'স্মৃতিচারণ' আগামী সংখ্যা হইতে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হইবে।**
>
> **সম্পাদক—দেশ**

অনুমান করি. শ্রীনেহরু সেটা জানতেন। জেনেও তিনি আশা করেছিলেন. নেহরু-নুন চুক্তির ফলে সীমান্তের গোলযোগ কিছুটা নিবারিত হবে। গোলযোগ নিবারিত হয়নি. বরং দিনে-দিনে তার তীব্রতা আরও বেড়েছে। এখন তিনি স্বীকার করছেন. চুক্তির উদ্দেশ্য সফল হয়নি। শ্রীনেহরু অবশ্য এ-কথা একটু বিলম্বে বুঝলেন। তবু. একেবারে না-বোঝার চাইতে বিলম্বে বোঝাও ভাল। মন্দের ভাল। অতঃপর পাকিস্তানের উপদ্রব বন্ধ করবার জন্য অন্য-কোনও পন্থা তিনি অবলম্বন করবেন. এইটেই আমরা আশা করব। তাঁকে বুঝতে হবে. তোষণ-নীতিতে কাজ হবে না। বন্ধুত্বের মর্যাদা যারা রাখবে না. তাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়ে কোনও লাভ নেই।

* * *

রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকীর সময় ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। শুধুই দেশে নয়. বিদেশেও আয়োজন চলেছে. যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে যাতে এই পুণ্য-অনুষ্ঠানের উদ্‌যাপন সম্ভব হয়। আমাদের ভাবনা বিদেশের আয়োজন নিয়ে নয়. দেশের আয়োজন নিয়ে। শত-বর্ষ-জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে কোথাও যদি আমাদের কোনও ত্রুটি ঘটে. ত আমাদের চিত্তবৃত্তির দারিদ্র্য ও চিন্তাশক্তির দৌর্বল্যই তাতে প্রকট হবে। শুধুই দেশবাসীদের কাছে নয়. বিদেশী বন্ধুদের কাছেও। এবং. আরও এক শ বছর অতিক্রান্ত হবার আগে আর সেই ত্রুটির ক্ষতিপূরণের কোনও সম্ভাবনা থাকবে না।

এই কারণেই আমরা মনে করি. রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের যে আয়োজন চলেছে. মাঝে-মাঝেই দেশ-বাসীর সামনে তার কর্মসূচী পেশ করা দরকার। কর্মসূচীতে যদি কোনও অপূর্ণতা থাকে. সেক্ষেত্রে সময় থাকতে সে-বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব হবে। এবং সেই অপূর্ণতার সংশোধনও দুরূহ হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য. কবির জন্মভূমি এই পশ্চিমবঙ্গেই এ-ব্যাপারে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। অথচ এই কমিটি এ-যাবৎ কী-কী কাজ করেছেন. জনসাধারণ তার সামান্যই খবর রাখে। সে-দোষ সর্বাংশে জনসাধারণের নয়। আমাদের অনুরোধ. অবিলম্বে এই কমিটি দেশবাসীর সামনে তাঁদের পরি-কল্পনার একটি খসড়া দাখিল করুন। এ-ব্যাপারে দেশবাসীর অভিমত কী. জানবার চেষ্টা করুন। এ-কাজ ব্যক্তি-বিশেষের বা গোষ্ঠীবিশেষের নয়. এ-কাজ সকলকে নিয়ে। তাই. সকলের সামনে যদি একটি খসড়া-কর্মসূচী দাখিল করা হয়. কমিটির তাতে উপকারই হবে। আর কিছু না হক. সর্বসাধারণের অভিমত অন্তত জানা যাবে। সেও বড় কম লাভ নয়।

প্রকারে টিকে থাকা।

মিঃ ম্যাকমিলানের সোভিয়েট ভ্রমণে আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী বা ফ্রান্স কেউই বিশেষ সুখী হয়েছে বলে মনে হয় না। মিঃ ম্যাকমিলান রাশিয়া থেকে ফিরে পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, কানাডা এবং

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ তৃতীয়বার বিদেশ ভ্রমণে গেছেন। তিনি পূর্বে জাপান এবং ইন্দোনেশিয়ায় গেছেন, এবার কাম্বোডিয়া, লাওস এবং দক্ষিণ ও উত্তর ভিয়েৎনামে ভ্রমণ করে আসবেন। এই সব দেশের রাষ্ট্রপতিরা বিভিন্ন সময়ে ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। এই দেশগুলি ইন্দোচীন যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজয়ের পরে স্বাধীন হয়েছে, অর্থাৎ ভারতবর্ষেরও পরে। এই প্রসঙ্গে জেনেভা চুক্তি স্মরণীয়। সেই চুক্তি অনুসারে নিযুক্ত আন্তর্জাতিক কমিশনের অস্তিত্ব এখনো বিলোপ করা হয়নি (কমিশনের চেয়ারম্যান ভারত) যদিও শান্তিরক্ষার কাজের জন্য বাহ্যত কমিশনের প্রয়োজন বোধ হয় আর নেই। তবে দ্বিধাবিভক্ত ভিয়েৎনামের দুই অংশের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। কারণ এদের দশা জার্মানীর মতো—জোড়া না লাগা পর্যন্ত পারস্পরিক বিদ্বেষ থাকবে, আবার জোড়া কীভাবে কবে লাগবে তাও বলা কঠিন কারণ ভিয়েৎনামের দুই অংশ "কোল্ডওয়ারের" দুইপক্ষের এলাকার মধ্যে পড়েছে। যাই হোক রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের আগমনে মন কষাকষির ভাবটা যদি কিছু কমে তবে সেটা খুবই আনন্দের কথা হবে। কিন্তু ভিয়েৎনামের পুনরেকীকরণের সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে দেখা যাচ্ছে না।

• • •

জার্মানীর সম্বন্ধেও তাই। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকমিলানের ১০ দিন সোভিয়েট ভ্রমণের আর যাই ফল হোক জার্মানীর জোড়া লাগার সম্ভাবনা তাতে কিছুমাত্র বাড়েনি। দুই জার্মানীর অস্তিত্ব আরো বেশি বদ্ধমূল হবার সম্ভাবনাই যেন দেখা যাচ্ছে। সোভিয়েট সরকার পূর্ব-পশ্চিম পররাষ্ট্রসচিব বৈঠকের সম্মেলনের প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে এটাও আরো পরিষ্কার হয়েছে যে, পূর্ব জার্মানীর রাষ্ট্রীয় সত্তা সোভিয়েট সরকার নষ্ট হতে দেবেন না যদিও বার্লিনের ব্যাপারে সাক্ষাৎ সংঘাতের সম্ভাবনা অনেকটা কমেছে। পশ্চিম জার্মানীর লোকেরা মেনে নিয়েছে যে, আপাতত জার্মানীর জোড়া লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই, পশ্চিম জার্মানীর বর্তমান লক্ষ্য হয়েছে বার্লিনে কোনো

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করতে ছুটেছেন। কানাডাকে বাদ দিলে পশ্চিমা শক্তিদের সকলেই মিঃ ম্যাকমিলানের মস্কো সফরের সুফল সম্বন্ধে কিঞ্চিদধিক সন্দিহান। মিঃ ম্যাকমিলান প্যারিস, বন, অটোওয়া এবং ওয়াশিংটনে তাঁর মস্কো সফরের লাভ ক্ষতির হিসাব দিতে যাচ্ছেন। বলা বাহুল্য, তিনি খরচের চেয়ে জমার দিকটাই একটু ভারী করে দেখাবেন।

ওয়াশিংটনে মিঃ ম্যাকমিলানের একটু বেশি সতর্ক হতে হবে। কারণ মিঃ ডালেসের পীড়া নিয়ে বিলাতের কাগজগুলির কয়েকটি মন্তব্যে আমেরিকার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। মিঃ ডালেসের অনুপস্থিতিতে পশ্চিমা শক্তিদের পলিসি পরিচালনার নেতৃত্ব করার সুযোগ বৃটেনের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার মিঃ ম্যাকমিলান করবেন এরূপ মন্তব্য বৃটেনের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়। তাতে আমেরিকা ক্ষুব্ধ হয়েছে। মিঃ ডালেস অসুস্থ হয়েছেন বলেই আমেরিকার নেতৃত্ব শিকেয় উঠল, এরূপ মন্তব্যে আমেরিকার আত্ম-সম্মান আহত হবেই। সুতরাং ওয়াশিংটনের কর্তাদের মিঃ ম্যাকমিলানকে একটু বেশি বুঝাতে হবে। এখানে আর একটি কথার উল্লেখ কর্তব্য। সেটি হচ্ছে এই যে, মিঃ ডালেসের শরীর সম্বন্ধে যতটা নিরাশার কথা পূর্বে শুনা গিয়েছিল এখন তার চেয়ে খবর ভালো শুনা যাচ্ছে, নিরাশার কারণ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে বলে মনে হয়। মিঃ ডালেসের পেটে ক্যানসার হয়েছে, তার জন্য যে চিকিৎসা হচ্ছিল তাতে অনেকটা উপকার হয়েছে। মিঃ ডালেস ভালো হয়ে যাবেন এরূপ আশা করার কোনো অবকাশ নেই বটে, কিন্তু মিঃ ডালেস আবার কাজে যোগ দিয়ে পশ্চিমা শক্তিদের কনফারেন্সে নেতৃত্ব করতে পারবেন এতদূর পর্যন্ত আশা করা যায় এরূপ শুনা যাচ্ছে। তবে পররাষ্ট্রসচিবদের কনফারেন্সের কাজ সমাপ্ত হবার পরে মিঃ ডালেস বোধ হয় আর কাজ করতে পারবেন না।

× × ×

ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক এবং ইরাকের সম্বন্ধ অত্যন্ত খারাপের দিকে চলেছে। ইরাকের মসুল অঞ্চলে সাময়িক বিদ্রোহীদের ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হবার পরে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মন কষাকষি আরো বেড়েছে। ইউনাইটেড আরব রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট নাসের কিছুদিন থেকে খোলাখুলি ইরাক এবং ইরাকের প্রধান মন্ত্রী কাসেমের কঠিন বিরুদ্ধ সমালোচনা করছেন। দুই দেশের রেডিয়োতে গালাগালের লড়াই তো আগে থাকতেই চলছিল। প্রেসিডেণ্ট নাসের বলছেন যে, কাসেম কম্যুনিস্টদের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। জুলাই মাসের বিপ্লবে কাসেম কোনো গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেননি, কাসেমের এই "দুর্বলতার" কথাও প্রেসিডেণ্ট নাসেরের নিজের মুখ থেকে প্রচারিত হচ্ছে। কম্যুনিস্টরা আরব জাতীয়তার শত্রু, তারা ইসলাম-বিরোধী এরূপ মন্তব্যও প্রেসিডেণ্ট নাসের করেছেন। প্রেসিডেণ্ট নাসেরের কম্যুনিস্ট-বিরোধী প্রচারে রাশিয়া অসন্তুষ্ট হয়েছে।

মস্কোতে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের সময় একটি বক্তৃতায় মিঃ খ্রুশ্চেভ প্রেসিডেণ্ট নাসেরের কম্যুনিস্ট-বিরোধী নীতির সমালোচনা করেন। তারপর তিনি নাসেরকে এ বিষয়ে একটি চিঠিও পাঠান বলে শুনা যায়। সম্প্রতি তিনি নাসেরকে আবার লিখেছেন বলে শুনা যাচ্ছে। কিন্তু নাসের সহজে থামছেন বলে মনে হয় না। পাল্টা তিনি খ্রুশ্চেভের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করতে পারেন যে, সোভিয়েট নেতা আরব জাতির আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন। যাই হোক, ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক এবং ইরাকের মধ্যে যে গোলমাল পেকে উঠল সেটা আরব জগতের পক্ষে খুবই গ্লানিকর সন্দেহ নেই এবং বিপজ্জনকও বটে। কারণ অতঃপর একে অপরের ঘরে গোলমাল বাঁধাবার চেষ্টা করবে। মসুলের বিদ্রোহে বহু প্রাণ নাশ হয়েছে।

• • •

"মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশনের" অন্তর্গত নায়সাল্যাণ্ড, দক্ষিণ রোডেশিয়া এবং উত্তর রোডেশিয়ার ঘটনাবলির আলোচনা আগামী সপ্তাহে করা যাবে।

১৬।৩।৫৯

সন্তোষকুমার ঘোষ

২০

সৌরর অনেক সাধের মধ্যে একটি এই ছিল যে, অনেক উপরে উঠে এই পৃথিবীটাকে কেমন দেখায়, তাই দেখবে। চিল যেমন দেখে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে এদেশের আকাশে যন্ত্র-পক্ষীর চিৎকার এমন অহরহ শোনা যেত না, তাই বিমানের কথা তার মনেও হয়নি। কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি তখনও স্বপ্নের অগোচর ছিল। চিলের মত উপরে উঠে, চিলের মত স্থির, সন্ধানী দৃষ্টিতে পৃথিবীকে দেখবে, সৌর ভেবেছিল, অনেক, অনেকক্ষণ ধরে। দিন-রজনী, সন্ধ্যা-সকাল জুড়ে। আসলে কিন্তু কতক্ষণ তার হিসাব থাকারও কথা নয়, কেননা, দিন-রাত্রির মাপে ত শুধু এই পৃথিবীরই সময় ছোট-ছোট চৌকো ঘরে কাটা, অথবা সময়কে যদি বিপুল একটি বৃত্ত বলে কল্পনা করি, তবে গোল-গোল বৃত্ত-চাপে, যেখানে উদয় নেই, অস্ত নেই, সেখানে সময়ও অপরিমেয়। নিরনুভব, অতএব তার অতি ধীর আবর্তনও প্রায় অলক্ষ্য।

সেখানে গিয়ে কী দেখতে চাইত সৌর? এই পৃথিবীকেই। সে কেন বদলায়, কেমন করে বদলায়, কতখানিই বা বদলায়, এইসব তার ধারণায় আনবে বলে। নিজের ভিতরে কিছু-কিছু পরিবর্তন তার নিজের কাছেই ধরা পড়ছিল, শুধু সে বুঝতে পারছিল না, পরিবর্তনটা ভাল, না মন্দ, বা এর জন্য সে নিজে কতখানি দায়ী। পরিবর্তনের স্বরূপ কী, সে নিজেই বা কী, এই জিজ্ঞাসার জবাব না পেয়ে সে ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে পড়ছিল। কারও কাছ থেকে যে জেনে নেবে, সে-উপায়ও ছিল না, কারণ তার পরিচিত কাউকে এই জিজ্ঞাসা যন্ত্রণা দিয়েছে বলে মনে হয়নি।

শূন্য থেকে এই পৃথিবীর ওপর সময়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যেত। মেঘে মেঘে কোন্ রঙ কখন জ্বলে, ঘাস কেন পিঙ্গল হয়, মরে মরে আবার বাঁচে, সবুজ হয়। প্রাণের আরও বিচিত্র লীলা সৌরর চোখে পড়ত। আবার এও হতে পারে, সৌর তখন জানতে পারত, এই চরাচর ব্যাপ্ত করে একটিই মাত্র বিপুল প্রাণ আছে, তার নাম সময়। অসংখ্য কোষ দিয়ে যেমন জীবদেহের সৃষ্টি, ব্রহ্মাণ্ড সময় তেমনই অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহের সমষ্টি। বিপুল জলধির তলে ছোট-ছোট নুড়ির মত এরা চুপ করে আছে। জল নড়ে বলেই মনে হয় নুড়িও নড়ে, আসলে তারা স্থির। সময়ের অভ্যন্তরে সূর্য-গ্রহ-ইত্যাদিরও তেমনই সত্যিকার কোন গতি নেই। গতিকল্প যে-বস্তুটা আছে, অতি-মাত্রায় সীমিত বলে তার কোন অর্থও নেই।

এই অস্পষ্ট বোধগুলিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পূর্ণ করবে, সৌরর এই বাসনা ছিল। বাসনা পূর্ণ হয়নি। যে-কারণে পর্বত বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হতে পারে না, তরুশ্রেণীর পাখা মেলে না, সেই কারণেই। সৌর বড় জোর উঁচু একটা গাছের ডালে বসে নীচের মাটির দিকে চাইতে পারে, কিংবা চিলেকোঠায় উঠে দেখতে পারে, দিগন্ত আরও কতখানি ছড়িয়ে গেল। যদি পাহাড়ে উঠি, সৌর ভাবত মনে মনে, এই দিগন্ত আরও ছড়িয়ে যাবে। জ্যোতির্লেখার একটি সম্পূর্ণ বৃত্ত আমাকে বেষ্টন করে থাকবে।

বিকেলের দিকে রোজই সৌরর মাথায় যন্ত্রণা হত। লতা বউদিদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যাবার পর, বিজন প্রবাসী হবার পর, আর বাইরে যেতে ইচ্ছে হত না। সৌর

চুপে চুপে ছাদে উঠে অনেকক্ষণ একা বসে থাকত। দেখত সব পাখি ঘরে ফিরছে, বেশির ভাগই দলবদ্ধ, কে যেন হাওয়ায় একের পর এক হার ভাসিয়ে দিয়েছে। ওরই মধ্যে কোন-কোন পাখি আবার দল-ছাড়া, একা। সৌরর চোখ তাকেই অনুসরণ করত। কোথায় গিয়েছিল ও। পাখিরা কোথায় যায়? খাবার খুঁজতে। এই একলা-পাখিটা বোধ হয় ক্লান্ত, তাই দল-ছাড়া হয়ে পিছিয়ে পড়েছে। কিংবা, এ-ও কি সম্ভব যে, এই পাখিটা আসলে খাবার খুঁজতেই যায়নি,, শুধু অপরিমাণ শূন্যকে পান করবে বলেই বাসা থেকে বেরিয়ে এসেছিল? অনেক দূরে ঘুরে এল ও, দেখল, কূল নেই, পার নেই, এই অপার আকাশে আর কোথাও নিশ্চিত ঠিকানা নেই, তাই যে-ঠিকানাটা সে জানে, যে-ঠিকানাটা নিশ্চিত, নিরাপদ, ধ্রুব, সেই ছোট্ট বাসার দিকেই ফিরে চলেছে।

ভাবতে ভাবতে সৌরর নজর-বন্দী আকাশটা কুমোরের চাকের মত ঘুরত, চোখ বুজে ফেলত সৌর, কার্নিশটা ধরে সামলে নিত।

এই ভাবটা মাস তিনেক স্থায়ী হয়েছিল। এর পরই ওরা নতুন বাসায় উঠে আসে।

সেখানে সৌরর জন্য আরও বিচিত্র অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করে ছিল।

ছাদে না উঠলে এত তাড়াতাড়ি জানাজানি হত না। এ-বাড়িতেও ছাদ কেমন, পরখ করবার জন্যে সৌর প্রথম দিনই ওপরে উঠেছিল।

ছাদটা বেশ বড়, সৌর দেখল, এখনও ধুলোবালি জমে আছে। একটু সাফ করে নিয়ে গোটাকতক টব বসালে চমৎকার হবে। জায়গাটা বেশ নিরিবিলিও।

ঠিক তখনই সৌর দেখতে পেল।

ছাদটার মাঝখানে গলা সমান উঁচু একটা গাঁথুনি। ও-পাশে কী আছে? বাড়িটার দুটি অংশ। অন্যদিকে অন্য বাসিন্দা আছে। তারা কারা?

সৌরর কৌতূহল হ'ল। গাঁথুনির দিকে এগিয়ে গেল। প্রথমে চোখে পড়ল কার্নিসে মেলে দেওয়া খান দুই শাড়ি, অস্থির, অভব্য হাওয়া কেবলই তাদের বিব্রত করছিল। তার পর সৌর দেখল, কালো চুলের রাশি।

ছাদে মাদুর পেতে, রোদে পিঠ দিয়ে দুটি মেয়ে কড়ি খেলছিল। ছোট-ছোট আঙুল দিয়ে ওরা কড়িতে-কড়িতে ঠোকা-ঠুকি করছিল। মাঝে মাঝে সবগুলো তুলে ছড়িয়ে ফেলছিল। কত-র দান পড়ল। ঝুঁকে পড়ে একজন বলল, 'চার।'

'তবে ত ভাই আমার হাত খুলেছে।'

'হাত-বরাত, সবই তো তোর খোলা। চাপা শুধু আমাদের।'

একটি মেয়ে হাই তুলল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই দীর্ঘশ্বাসটা বোধ হয় কপট। এরা আস্তে আস্তে কথা বলছিল, মাঝে মাঝে খিল-খিল করে হাসছিল। সৌর সব কথা শুনতে পাচ্ছিল না। যা শুনছিল, তারও সব মানে বুঝতে পারেনি।

একটু বিশ্রীও লাগছিল। মেয়ে দুটির হাতের আঙুলে লাল ছোপ। ওরা বুঝি খুব পান খায়? মুখ ফিরিয়ে বসে আছে, নইলে সৌর ঠিক ধরে ফেলত। গায়ে ওদের খাটো জামা। পিঠের অনেকটাই খোলা।

একবার একটা কড়ি এদিকেই ছিটকে পড়ল। মেয়ে দুটি ফিরে চাইল, দুজনেই এক সঙ্গে। পালাবার সময় ছিল না। সৌর তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে নিল। শুনল, একটি মেয়ে বলছে, "মরণ!"

বলার ধরনটা কছু অদ্ভুত, গলাও কেমন ভরা-ভরা, ভারী-ভারী। এই পরিচিত শব্দটি শুধু উচ্চারণ-ভঙ্গির জন্য সৌরর কানে অপরিচিত ঠেকল। এভাবে কথাটাকে তাদের পরিবারে কেউ বলে না। এরা বলে। এরা কারা?

মেয়ে দুটি আবার খেলছিল, মাঝে-মাঝে এদিকে ফিরে মুচকে হাসছিল। ওরা কি তাকে ঠাট্টা করছে? সৌর বুঝতে পারছিল না, ওর কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল, কিন্তু রোদের জন্য নয়।

একটি মেয়ে বলল, "ঘুম পাচ্ছে।" সে হাই তুলল।

আর একজন বলল, "আজ চিত্তবাবু আসবে।"

"ঘুমতে দেবে না।"

অন্য মেয়েটি বলল, "ইস্!"

সৌর এ-সব কথার মানে বুঝতে পারছিল না। ভাবছিল, সরে আসবে, ঠিক তখনই ও-দিকের চিলেকোঠার দরজায় মধ্যবয়সী স্ত্রীলোককে দেখা গেল। তার রঙ ময়লা, থপথপে চেহারা। মাত্র দুটি গামছায় অত বড় আর ভারী শরীরটাকে ঢেকেছে। খোনা গলায় সে বলে উঠল, "এখনও খেলছিস, ঘুমবি কখন মেয়েরা?"

একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি কড়ি ফেলে উঠে দাঁড়াল। আর একজন হাসতে হাসতে বলল, "আজ ঘুমব না।"

"বিকেলে গা ধুতে হবে না?"

"ধোব না!"

"চুল বাঁধা-টাধা সব পড়ে থাকবে?"

করতালি দিয়ে মেয়েটি বলে উঠল, "সব।"

কিন্তু সৌর দেখল, সে-ও মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটির পিছে পিছে চিলে-কোঠার ভিতরে অদৃশ্য হল।

নেমে এল সৌরও। এরা কারা? যাদের ভাব বোঝা যায় না, ভঙ্গিও না, সংলাপও কানে কেমন যেন ঠেকে, তারা একটু আলাদা ধরনের সন্দেহ নেই, কিন্তু সঠিক পরিচয়টা টের পেতে সৌরর কয়েকদিন লেগেছিল।

(ক্রমশ)

॥ রঞ্জন ॥

আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা এসেছিল অবিশ্বাস্যরকম শান্তিপূর্ণ উপায়ে। উচ্ছ্বসিত অমায়িকতার মধ্যে আলাপ আলোচনা হল তিন দলের মধ্যে, দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নিল একটি পরাধীনের বদলে, আর নয়াদিল্লীতে প্রায় স্বতঃস্ফূর্ত রব উঠল, "পণ্ডিত মাউণ্টব্যাটেন কী জয়!" হয়তো একান্তই সঙ্গত কারণে—ইতিহাসের রায় নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করব না—স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বাভাবিক উদ্দামতাকে মহাত্মা গান্ধী শান্ত ও পঙ্গু করে দিয়েছিলেন অনেক অনেক দিন আগে। আমাদের অধিকাংশের পক্ষে অহিংসা হিংসার পরিপূর্ণ পরিহার ছিল না, ছিল নেতৃত্বের নির্দেশে হিংসার দমন ও আন্দোলনে অহিংস পদ্ধতির চতুর প্রয়োগ।

অস্পষ্টভাবে এ প্রশ্ন আমার মনে বহুবার জেগেছে: গণ-আবেগের স্বাভাবিক উদ্দামতা বাইরে থেকে সাময়িকভাবে দমিত হতে পারে, কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ চিরকালের জন্য রোধ করা যাবে কি? বিস্ফোরণের গতিপরিবর্তন হয়তো অসম্ভব নয়, কিন্তু বৃহৎ ও রুদ্ধ আবেগের নিয়ন্ত্রিত উদ্গতি সম্ভব হলেও তার পরিপূর্ণ উদ্বায়ন বোধহয় সাধ্যাতীত। প্রমাণস্বরূপ দেখাতে পারি আজকের রাজনীতিতে বিতর্কের স্বর ও সুর, নিঃসন্দেহে তা আগের চেয়ে তীব্র, কোমলে কারো রুচি নেই আর, কড়িতে না কইলে তোমার কথা শুনবেই না কেউ।

তীব্রতা আবার শুধু রাজনীতিতেই আবদ্ধ নেই।

*

আচরণের উগ্রতা সাধারণত আভ্যন্তর আত্মবিশ্বাসশূন্যতার অক্ষম আবরণ মাত্র। এই কলকাতায় সেদিন রব উঠল অর্থাৎ কয়েকজন ব্যক্তি রব তুললেন যে, এই নগরীর বুকে বিদেশীদের কয়েকটি ক্লাব আছে যেখানে নানা অজুহাতে ভারতীয়দের সদস্য হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। বর্ণবিদ্বেষ মূর্খ ও পাষণ্ডের সর্বশেষ অবলম্বন, তার সমর্থনে আমার বিন্দুমাত্র বক্তব্য নেই। কিন্তু তার বিরুদ্ধে জনকয়ের আন্দোলনে বিদ্বেষের পরিমাণ বোধহয় আরও বেশি। বিদ্বেষীদের হাতে এখন রাজনৈতিক ক্ষমতা। তাই স্থির হয়েছে, ক্লাবগুলিকে শায়েস্তা করা হবে তাদের আবগারী অনুমতিপত্র বাতিল করে দিয়ে। সরকারী ক্ষমতার এই অপপ্রয়োগের প্রতিবাদী আমি।

প্রথম আপত্তি বিধিসম্পর্কিত। আবগারী কমিশনারের হাতে কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষমতা দেওয়া আছে কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগের জন্য। সে-সীমার বাইরে আমি তাঁকে যেতে দিতে নারাজ তা তাঁর উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক। বৈষম্য প্রদর্শন যদি অন্যায় হয়ে থাকে তবে তার অন্য প্রতিকার সন্ধান করতে হবে, নিয়োগ করতে হবে অন্য প্রতিকারী। তার জন্য অপরাধীর ধোপা-নাপিত বন্ধ বা জল বন্ধ বা মদ বন্ধ স্পষ্টতই অবৈধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সিদ্ধান্ত কার্যকর করলে বেআইনী কিছু করবেন। সরকারের কাজ আইন মানানো: আইন ভাঙা নয়, এক "অপরাধে" অপর অসংশ্লিষ্ট ক্ষমতার অবৈধ ও অসঙ্গত প্রয়োগ নয়।

*

সংখ্যালঘিষ্ঠ কয়েকটি বিদেশী সম্প্রদায়ের শাস্তিবিধান আজ এতই সহজ যে, এর সাধনে সামান্যতম বীরত্বের পরিচয় নেই। আলোচ্য ক্লাবগুলির পশ্চাতে আজ আর রাষ্ট্রের প্রতাপ নেই, আছে শুধু সমমানস ও সমরুচি কয়েকটি গোষ্ঠীর সামাজিক স্তরে নিভৃতে মেলামেশা করবার অধিকারের আবেদন। একদিন যা ঔদ্ধত্য বলে বর্ণিত হলেও হতে পারত, আজ তাকে ভয়ঙ্কর জাতীয় অবমাননা বলে মনে করার মধ্যে আমি দেখতে পাই আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। এতই সহজ একটা বৃহৎ জাতিকে অপমান করা? ব্যক্তিবিশেষের মান-অপমান অবশ্য আলাদা প্রশ্ন, জাতি তাকে আলাদা করে না দেখলে অপরিণত মনের পরিচয় দেয়।

প্রত্যেক ক্লাবেরই আইন-কানুন থাকে সদস্য হবার অধিকার নিয়ে। কোনো ক্লাবেরই—ভারতীয় বা মিশ্র ক্লাবগুলিরও—দ্বার অবারিত নয় প্রত্যেকের জন্য। কোথাও চাই জন্ম-আভিজাত্য কোথাও বা আর্থিক কৌলীন্য আর কোথাও বা পেশা বা ক্রীড়াগত সমকৌতূহল। ভারতীয় সমাজের অধিকাংশই কোনো ক্লাবের সভ্য নন। জনকয় আশাহতের নৈরাশ্য সমগ্র জাতির দুর্ভাবনার বিষয় হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়। বিপরীত ধারণার জন্য দায়ী কয়েকজনের কুশল প্রচার। জাতির প্রকৃত অবমাননা নিহিত আছে অনাহূতের প্রবেশাধিকারের জন্য করুণ আবেদনে ও তার চরিতার্থতার জন্য সরকারী ক্ষমতার অসংগত প্রয়োগে।

*

প্রশ্নটা অংশত শ্রেণীর, কিছুটা সংগতির, বাকিটা জীবনধারার। অতি অল্প পরিমাণে শাদা-কালোর। তাঁর অভিজ্ঞতা বড়োই পরিমিত যিনি এমন ভারতীয় দেখেননি যাঁর জীবনযাত্রা ও জীবনদর্শন একেবারেই য়ুরোপীয়। বরানগরে গেলেই দেখা যাবে ধুতিপরা ইংরেজ। শ্রেণীর দিক থেকে বিচার করলে কোনো কোনো ক্লাব আবার সাম্য আনে। অতি নিম্নবিত্ত শ্রেণীর বিদেশী ভারতীয় অভিজাতের সঙ্গে সমান তালে চলে শুধু ক্লাবে, সেই ক্লাবেই ওই ভারতীয় অভিজাত হয়তো অন্যান্য বহু ভারতীয়ের সঙ্গে কদাচ হেসে কথা কন। কোনো ক্লাবের সম্বন্ধেই আমার শ্রদ্ধা নেই কেন না সামাজিক স্নবারিতে আমার রুচি নেই।

ক্লাবগুলি আজ আর বিচরণের স্থান নয়, আরোহণের আঙিনা মাত্র। সে-অঙ্গনে প্রবেশ করতে আমার উৎসাহ অতি অল্প। প্রবেশ না করার কারণ অন্তরের অনীহা না বাইরের নিষেধ, তা নিয়ে উত্তেজিত হতে আমি অপারগ। যে বিদেশী মন এখনো কালো আদমীকে কালো বলেই বাইরে রাখতে অভ্যস্ত, সেই স্থাণু মনের জন্য আমার অনুকম্পা রইল। অভিমান বা রোষ দিয়ে তাকে আমি সম্মানিত করতে পারব না।

রাজহংসী * সুশীল রায় * *

বিশ্বাস করুন, কিছু পাওয়া বলতে যা বোঝায় তার কিছুই পাইনি—কানাকড়িও না। সেজন্যে আক্ষেপ আছে খুবই। কিন্তু সে-আক্ষেপ নিয়ে আন্দোলন করতে চাইনে।

অথচ, আমার কোলিগরা কেবলই বলে, "মিস্টার পাকড়াশির মত ফরচুনেট ক্রিচার আর নেই।"

সহকর্মীদের কাছ থেকে এই তারিফ পেয়েছি অবশ্য। কিছুই পাইনি কথাটা তাহলে হয়তো একটু ভুল। যা পেয়েছি মনে মনে আঁচ করে তারা আমার কপালে সৌভাগ্যের এই তিলক পরাচ্ছে, হায় তারা জানে না—

কী জানে না, সে-কথা বলতে বড় অস্বস্তি বোধ করছি।

যত জল্পনা-কল্পনা, সব একজনকে কেন্দ্র ক'রে। তার নাম মল্লিকা ঘোষ।

লোয়ার গ্রেডে ঢুকেছিলাম, ঘষতে ঘষতে পাঁচ বছর বাদে আপার গ্রেডে প্রোমোশন পেয়েছি। কেরানি-জীবনে এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর নেই। কিন্তু আমার কোলিগরা আমার যে ভাগ্যের কথা বলে সে কথা হচ্ছে অন্য।

তারা বলে, মল্লিকা ঘোষকে আমি কব্জা করেছি।

কথাটা শুনতে বড় মজাদার, ভাবতেও ভালো, কিন্তু রটে গেলেই পরিণাম সাংঘাতিক। একথা আমি জানি। জানি বলেই তাদের কথার প্রতিবাদ করে কথাটাকে বাড়তে দিতে চাইনি।

আমার তরফ থেকে কোনো বাধা না পেয়ে তারা মনে করে, মনে-মনে তারা যা আঁচ করেছে তার সেণ্ট পার্ সেণ্ট তাহলে সত্যি।

মল্লিকা ঘোষকে আমি অ্যাডমায়ার করি, অবশ্য চেঁচিয়ে না। মনে-মনেই করি। তার মত কুইক, তার মত অ্যাকিওরেট, তার মত স্মার্ট, এবং তার মত শার্প অফিসার আমি খুব কম দেখেছি। মেয়ের মধ্যে এমন তো দ্বিতীয় নেইই, পুরুষের মধ্যেও এমন এফিশিয়েণ্ট লোক আছে কিনা জানিনে।

একটা কথা বলতে ভুলেছি। যে মল্লিকা ঘোষকে ও আমাকে জড়িয়ে সহকর্মীদের এত উৎসাহ, সেই মিস ঘোষ আমাদের অফিসার।

খুব ভালো সিলেকশন হয়েছে। মেয়ে বলে হেলা করলে চলবে না, মেয়ের আণ্ডারে কাজ করছি বলে আত্মসম্মানের ধুয়ো তুললেও চলবে না। এমন অফিসার পাওয়া ভাগ্যের কথা।

এ-ভাগ্যে একই সঙ্গে ভাগ্যবন্ত হলাম আমরা। কিন্তু কিছুদিন বাদেই একটা বাড়তি ভাগ্যের ধুয়ো তুলে ওরা বলতে আরম্ভ করল, "মিস্টার পাকড়াশির মত ফরচুনেট—"

ব্যাপারটা আর কিছু না। মিস্ ঘোষ মাঝেমাঝেই আমাকে ডেকে পাঠান। দিনে অন্তত তিন-চার বার। তার উপর, যখন স্বয়ং সেকশনে আসেন, প্রথমেই আমার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আমারই সঙ্গে কথা বলেন। আর কারো সঙ্গে কথা যে বলেন না, এমন নয়। কথা হয়তো সকলের সঙ্গেই বলেন, কিন্তু সব-প্রথম আমার কাছে যে আসেন এইটেই সব-চেয়ে বড় বিভ্রাট।

এক সঙ্গে দু-জন মেয়ে অফিসার এলেন আমাদের অফিসে। এঁদের দু-জনের পরিচয় প্রথমে আমাদের কাছে ছিল—মিহি ও মোটা।

একসঙ্গে দু-জন এলেন—কিন্তু দু-জনের মধ্যে তফাত একেবারে আকাশ-পাতাল। একজন রোগা, যাকে বলে স্লিম, গায়ের রং আলো-আঁধারি গোছের—না ময়লা, না ফরসা; এঁর নাম মিস্ মল্লিকা ঘোষ। দ্বিতীয় জন এর ঠিক বিপরীত—যেমন মোটা তেমনি ফরসা; নামও একটু বিপরীতই—মিস্ তন্বী তবিলদার।

দ্বিতীয় জন তাঁর নামের ওজন দিয়ে অনেকের মনে চাপ দিলেন, শরীরের আয়তন দিয়ে অনেকটা জায়গা জুড়লেন, গায়ের রঙের জলুস দিয়ে অনেক ধাঁধা ছড়ালেন; তাঁকে নিয়ে আলোচনা চলতে আরম্ভ করল অনেক রকমের। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। এর বেশি কিছু না। যা করার ত করলেন মল্লিকা ঘোষ; তিনি তাঁর ফিগার দিয়ে আর আর ফিচার দিয়ে সকলের মন কাড়লেন।

অফিসের কাজের চাপ এত বেশি যে, আমার নিজের মনের খবর রাখার ফুরসতই আমি পাইনি। অনবরতই ও-ঘর থেকে ডাক আসে, সে-ডাকে সাড়া দেবার জন্যে তৈরি থাকতে হয় সর্বদা, সর্বদা তটস্থই থাকতে হয়। খালি হাতে গিয়ে মুখ দেখালেই তো ডাকের সাড়া দেওয়া হল না; ফাইল তৈরি রাখা চাই; প্রিভিয়াস পেপার্স গোছগাছ করে নেওয়া চাই।

এত ডাকাডাকিতে বিরক্ত হওয়ার কথা। কিন্তু নিজের মনের খবর রাখার ফুরসত না পেলেও, এটুকু বুঝতে পেরেছি যে, অত ডাকহাঁকেও আমি তিলমাত্র বিরক্ত হইনি। এমন কি, বলতে বাধা নেই, ডাক আসতে একটু দেরি হলে কেমন অস্বস্তি বোধ হত।

আমার কোলিগদের মধ্যে এ-ব্যাপারে উৎসাহী ছিল সবচেয়ে বেশি—নিখিল নন্দী। আর, এ-ব্যাপারে নিখিলের শাগরেদ

ছিল বিজন আর নীহার। এই তিনজনে মিলে আমার ফরচুন নিয়ে এমন তোলপাড় আরম্ভ করে দিল যে, মল্লিকা-ফুল আমার চোখে সরষে-ফুলের মত হয়ে উঠল প্রায়।

মাথা গুঁজে কাজ করছি, ঘাড়ের উপর গরম নিশ্বাস পড়তেই সোজা হয়ে বসে পিছন ফিরে তাকাতেই নিখিল হেসে উঠল, বলল, "তাও ভালো। অফিস-নোট লিখছ? আমি ভাবলাম—অফিসারকে বুঝি পত্র লিখছ।"

বললাম, "তা ভাববে বই-কি। কুড়ে মাথাই তো শয়তানের কারখানা—"

কথা কেড়ে নিল নিখিল, বলল, "যা কাণ্ড-কারখানা দেখছি, তাতে মন দিয়ে কাজ করার উপায় আছে? মাথা কুড়ে না হয়ে কেজো যে হবে তার পথ কই?"

কি কাণ্ড-কারখানা ওরা দেখছে তা ওরাই জানে। আমি এদিকে দম ফেলার সময় পাচ্ছিনে, সব-সময় নিজেকে নিয়ে বিব্রত। মেয়ে-অফিসার হওয়ায় তিন গুণ তৈরি থাকতে হচ্ছে। এতটুকু গলতি যাতে না থাকে তার জন্যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে চলেছি। কোনো পুরুষ হলে এতটা পরিশ্রমও করতে হত না, এত মাথাও ঘামাতে হত না। কোনো ত্রুটি দেখে যদি বিরক্ত হন উনি, তা হলে যে তিনগুণ অপমান। মেয়েদের কাছে এ-হার স্বীকার করতে চাইনে বলেই প্রাণের উপর এই নহবত বসিয়েছি।

অট্টহাস্য করে উঠল ওরা তিনজনে এক সঙ্গে, বলে উঠল, "নহবত তা হলে বসিয়ে ফেলেছ নাকি হে পাকড়াশি? পাকড়াও করা হয়ে গিয়েছে তাহলে ইতিমধ্যে? হাত বাড়াও, হাত বাড়াও; দেখি, একটু হ্যাণ্ড শেক করে নিই। কন্‌গ্র্যাচু—"

হাইহিল জুতোর খটাখট শব্দ শুনেই ওরা চট করে চুপ করে গেল, এবং এক নিমেষের মধ্যে যে-যার জায়গায় গিয়ে ফাইল খুলে নিয়ে বসে পড়ল।

ওদের কাণ্ড দেখে আমার হাসি পেল, কিন্তু হাসির সময় নেই এখন। দেখে ফেললাম, মৃদুলা মুখ টিপে হাসছে। চিঠি-পত্র ডকেট করে মৃদুলা। মেয়েটা বেশ মিষ্টি, আর বেশ লাজুক। সব বোঝে ও, কিন্তু চুপ-চাপ থাকে। তার মুখেও হাসি ফুটেছে দেখে বুঝতে পারলাম, ওদের আজকের এ-তামাশাটা বুঝি জমেছিল খুব।

এসে গেছেন মিস্ মল্লিকা। তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সেকশনটা চাপা আনন্দে যেন উচ্ছল হয়ে উঠল।

সেই চলার ধরন, বলার কায়দা, উচ্চারণের ভঙ্গি; আর তার সঙ্গে চোখমুখের সেই বর্ণনাতীত শার্পনেস—সব মিলে সে যেন নতুন একটা আশ্চর্য গ্রহের আবির্ভাবের মত। —যে-গ্রহের আলোয় সমস্ত আকাশ উল্লাসে হিল্লোলিত হয়ে ওঠে।

আমি হিল্লোলিত হয়ে উঠলাম। এখনি এসে আমাকে কিছু বলবেন বলে উত্তরের জন্যে নিজেকে চতুর্গুণ তৈরি রাখলাম।

কিন্তু আশ্চর্য, আমার দিকে এলেন না মিস্ ঘোষ। নিখিলের টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে তাকে কি-সব প্রশ্ন করতে লাগলেন।

নিখিলের টেবিল আমার টেবিলের চেয়ে বেশি দূরে না। মিস্ মল্লিকার গলার স্বরও চাপা না। এখানে বসে তাঁর সব কথা স্পষ্ট শুনতে পাওয়ার কথা। কিন্তু আমার কানের মধ্যে কেন-যেন একটা অদ্ভুত ঝাঁঝাঁ শব্দ বাজতে লাগল; আমি তাঁর কোনো কথা শুনতে পেলাম না।

মাথা নীচু করে, খুব ব্যস্ত আছি—এই রকম ভান করে বসলাম। এটা হয়তো ঠিক ভান না, নিখিলরা আমার এই সময়ের মনের অবস্থা টের পেলে সে অবস্থাকে নিশ্চয় অভিমান আখ্যা দিত।

মিস্ ঘোষের মতিগতি আজ একেবারেই যেন আলাদা দেখছি। নিখিলের সঙ্গে কথা বললেন তিনি, তার সঙ্গে কথা সেরে বিজনের কাছে গেলেন, নীহারের কাছে গেলেন, হরিপদ দিগিন্দ্র সমীর সকলের কাছে গিয়ে কি-সব সারমন দিতে লাগলেন। শেষ-বেশ বুঝলাম, তিনি ওদের, যাকে বাংলায় বলে তৎপর হওয়া, সেই রকম সুইফ্‌ট্ হতে উপদেশ দিচ্ছেন।

উপদেশ দেওয়া সাঙ্গ করে তিনি জুতোর আওয়াজ তুলে রওনা হলেন। আমি যেন সত্যি সত্যিই বসে পড়লাম, আমার সঙ্গে একটা কথাও না বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন সেকশন থেকে।

নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেব কি-না ভাবছি, এমন সময় আবার ঐ শব্দ শুনে

সামনের দিকে তাকাতেই দেখি—উনি ফিরছেন।

সোজা আমার কাছে চলে এলেন। হাতের চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে চটপট তার এক কোণে লিখলেন—pppls. লিখে তার নীচে সই করলেন।

চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, "এটা ডকেট করিয়ে কাগজপত্র নিয়ে শিগ্‌গির আসুন।"

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, "উইদিন ফিফটিন মিনিটস্, উইল ইউ?"

আমি যেন কেমন ভোঁতা হয়ে গিয়েছি আজকে। তাঁর কথার উত্তরই দিতে পারলাম না। শুধু ফাঁকা দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়লাম।

মল্লিকা ঘোষ রওনা হলেন। হাইহিলের আওয়াজ বেজে উঠল পাখোয়াজের মত। ওই ঝাঁকিতে তাঁর সারা শরীর নিশ্চয় তালে তালে দুলছিল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার সময় যখন উনি বাঁক নিচ্ছেন, স্পষ্ট দেখলাম, গায়ের ঝাঁকিতে মাথার এলো-খোঁপাটা তাঁর ঘাড়ের উপর ভেঙে পড়ল।

ভেঙে পড়লাম আমি। বসে পড়লাম স্তূপ হয়ে। বুঝতে পারলাম নিখিলরা একদৃষ্টে চেয়ে আছে আমার দিকে।

কিন্তু সময় নষ্ট করা যাবে না। পনর মিনিট সময় দিয়ে গেছেন মাত্র। চিঠিটার কোণে তিনটে পি অক্ষর আর একটা এল এবং সঙ্গে ছোট্ট একটা এস-ও। সব কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে। এর মানে ধরতে পারছিনে। আজকে আমার নিশ্চয় চরম বেকুব হবার পালা। এই কথা ভেবে যতই নারভাস হচ্ছি ততই সব আরো এলো-মেলো হয়ে যাচ্ছে।

ডাকলাম, "মিস বসাক।"

শব্দ করে চেয়ার পিছনে সরিয়ে দিয়ে মৃদুলা উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়াল।

বললাম, "এটা ডকেট করে দিন। কুইক।"

মৃদুলার মুখের দিকে তাকাইনি, তবু মনে হল সে যেন একটু হাসল।

বললাম, "কোণে এটা কি লিখলেন উনি, বলুন তো!"

চিঠিটা তুলে নিয়ে মৃদুলা মনোযোগ দিয়ে দেখল, বলল, "মনে হচ্ছে pp প্লিজ। ওঃ, বোধ হয় প্রিভিয়াস পেপার্স নিয়ে যেতে বলেছেন।"

এ-অফিসে কাজ করছি অনেক দিন। কত অফিসার এল-গেল, কত রকম কায়দা দেখা গেল—কত কসরত। আগের কাগজপত্র তাঁরা চেয়েছেন কেবল চিঠির কোণে একটা ছোট কনেক্ট লিখে। মল্লিকা ঘোষ এ আবার আলাদা কায়দা বার করল দেখছি—অবশ্য মৃদুলা বসাকের অনুমান যদি ঠিক হয়।

প্রিভিয়াস পেপার্স এই চিঠির সঙ্গে জুড়ে নিয়ে মিস ঘোষের ঘরের কাছে গিয়ে যখন দাঁড়ালাম, তখন ঠিক পনর মিনিট গত হয়-হয়।

ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। হাসাহাসির শব্দ শুনে একটু থতমত খেয়ে গেলাম।

আওয়াজ এল, "কাম ইন।"

ভিতরে ঢুকে দেখি, বিরাট শরীরটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তন্বী তবিলদার। কি নিয়ে যেন গল্প করছিলেন দুজনে।

তন্বী তবিলদারের আপাদমস্তক চেয়ে দেখে নিলাম এক নিমেষে। দুধে-আলতার রং গায়ের, কিন্তু সর্বাঙ্গের ঐ মাংস তার রংকে অনেকটা মেরে দিয়েছে। চোখমুখও মন্দ না। এত কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য আগে হয়নি। তাই কাছে পেয়েই এক নিমেষে যেন গোগ্রাসে গিলে নেবার চেষ্টা করলাম দুই চোখ দিয়ে। চোখ মুখ ভুরু নাক ঠোঁট চিবুক এবং গায়ের রং আলাদা আলাদা ভাবে দেখলে সবই প্রায় নিখুঁত; কিন্তু সব যোগ দিয়ে একসঙ্গে দেখলে মিস তবিলদারকে কেমন যেন বেঢপ দেখায়।

ঠিক তার পাশেই মিস্ মল্লিকা ঘোষ একেবারে স্পষ্ট ও জীবন্ত। আলাদা আলাদাভাবে ওঁর সারা শরীরের উপর চোখ বুলালে কোনো একটি বিশেষ অঙ্গ হয়তো বিশেষভাবে চোখকে টেনে ধরে না, অথচ ঐসব সাধারণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একসঙ্গে যোগ হয়ে যখন একটা পূর্ণাঙ্গ অবয়ব হয়ে ওঠে, তখন কী বলব, ঐ অঙ্গ হয়ে ওঠে—কি যেন কথাটা?—হ্যাঁ, তখন ঐ অঙ্গ হয়ে ওঠে অনঙ্গের নিকেতন।

হংস-মধ্যে বক যথা নয়, বক-মধ্যে হংস তুলাই এই দুই মেয়ে-অফিসার। কাঁচা-বয়সী মাঝ-বয়সী আর বুড়োহাবড়া দেশী ও বিদেশী অফিসারবাহিনীর মধ্যে এই দুটি মেয়ে যেন শাপলা আর কলমীর ঝাড়ের মাঝখানে টুকটুকে দুটি লাল-ফুল। কিংবা হয়তো এরা ঐ জলার মধ্যের দুটি রাজ-হংসী। দুজনে যখন ওরা হাসছিল তখন সত্যিই অবিকল দুটি রাজহংসীর ক্লেংকারের মতই আওয়াজ বাজছিল; কিন্তু সে আওয়াজে কর্কশ কাংস্য শব্দ নয়, নিখাদ সোনার সোনালি শব্দই যেন ধ্বনিত হচ্ছিল।

কিন্তু তার প্রতিধ্বনি আমার বুকের মধ্যে যে ভাবে বেজে উঠল, সে যেন পেটা-ঘড়ির ঘণ্টা।

মিস তবিলদারের মুখোমুখি কখনো পড়িনি, কিন্তু শুনেছি ইনি খুব রাশভারি আর খুব রাগী। কিন্তু হঠাৎ আমার যেন নতুন মানুষ বলে মনে হল তবিলদারকে—এমন প্রাণখোলা হাসি যে হাসতে জানে, সে রাশভারিই বা হবে কি করে, রাগীই বা হবে কী করে?

মিস্ ঘোষের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে তবিলদার চলে যাচ্ছিলেন, বিশ্বাস করুন, তাঁর ঐ মোটা শরীরের একটু ঘষা লেগে গেল আমার গায়ে, আমি শিউরে উঠতেই লাজুক হাসি হেসে তিনি বললেন, "সরি।"
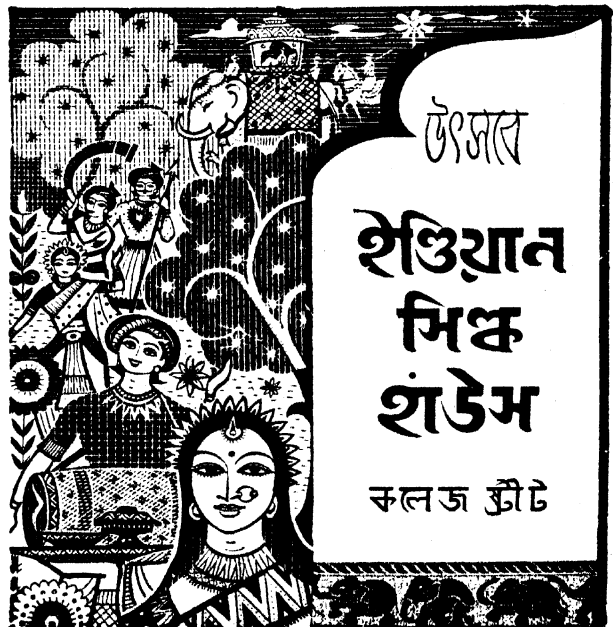
আমি প্রীতি-ভদ্রতা করার ভাষা না পেয়ে সরে দাঁড়াতেই মিস ঘোষ বললেন, "প্লিজ টেক ইয়োর সিট।"

বসলাম।

মিস ঘোষ আলগোছে হাত একটু বাড়িয়ে বললেন, "এনেছেন সব পেপার্স?"

ফাইল খুলে সন্তর্পণে মেলে ধরলাম তাঁর সামনে।

"ঠিক আছে। উঠতে হবে না আপনাকে। আপনি বসুন। দেখুন, এটা একটা কমপ্লিকেটেড কেস। একটা উত্তর ড্রাফট করতে হবে এক্ষুণি।"

কলম বাগিয়ে ধরে আমি বললাম, "লিখে ফেলি?"

"উঁহু। আগে আমি পুরো করেসপণ্ডেন্স পড়ে দেখি।"

বললাম, "তাই ভালো। চিঠিপত্র সব ফ্ল্যাগ ক'রে দিয়েছি। একটা ছোট সামারিও লিখে এনেছি—এতে কেসটার হিস্টরি—"

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিস ঘোষ কেমন ভাবে যেন হেসে উঠলেন, বললেন, "হিস্টরি জিয়োগ্রাফি অ্যানাটমি সব বুঝি? অফিসের লম্বা লম্বা নোট দেখলেই আমার বুদ্ধি ভেস্তে যায়। ও-সব থাক্। নিজেই পড়ে ফেলি-না?"

ঘাড় নেড়ে যেন সম্মতি জানালাম।

মিস ঘোষ পড়তে লাগলেন। ফরফর করে পাতা উল্টে যেতে লাগলেন, তাঁর চোখের পাতাও সেই সঙ্গে তর তর করে ওঠানামা করতে লাগল। আমি এই সুযোগে এক-দৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর ভুরু থেকে আরম্ভ ক'রে নীচের ঠোঁটের এক কোণের ছোট তিলটা পর্যন্ত খুঁটিনাটি করে দেখতে লাগলাম। আমার চোখ-দুটির দৃষ্টি বার-বারই পিছলে আরও নীচের দিকে নেমে যাচ্ছিল, আমি বার বার দৃষ্টিকে বেঁধে রাখছিলাম। কিন্তু ঐ মুখের লাবণ্য এমনই মসৃণ যে, সেখান থেকে পিছলে গেলে দোষ দেওয়া যায় না এই দৃষ্টিকে।

শেষ হয়ে গেছে ও'র পড়া। সোজা হয়ে বসলেন মিস ঘোষ। আমি ইতিমধ্যে যেন কিছু অন্যায় করে ফেলেছি হঠাৎ এই রকম মনে হল আমার। কিন্তু নিজেকে স্বাভাবিক করে নিয়ে পরবর্তী আদেশের জন্যে তৈরি হলাম।

মিস ঘোষ বললেন, "এক কাজ করা যাক, ইফ ইউ ডোণ্ট মাইন্ড্। আমি ডিক্টেট করি আপনি লিখে নিন।"

তথাস্তু। ড্রাফট প্যাড টেনে নিয়ে কলম বাগিয়ে বসলাম।

মিস ঘোষ বলে যেতে লাগলেন, আমি লিখতে লাগলাম। কেসটা একটু জটিল, সেইজন্যে অনেক ভেবে ভেবে ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন তিনি। লেখা সাঙ্গ করে তাঁর মুখ থেকে পরবর্তী সেনটেন্সটি শোনার জন্যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বসে আছি। এইভাবে চলেছে অনেকক্ষণ ধরে। হঠাৎ কখন আমার দৃষ্টি পিছলে নেমে পড়েছে, আমিই বুঝি টের পাইনি। ঐভাবেই বসে আমি ও'র নিশ্বাসের ওঠানামা দেখছি।

কতক্ষণ দেখেছি জানিনে। হঠাৎ মিস ঘোষের গলার স্বর শুনে চমকেই উঠলাম বুঝি, মিস ঘোষ কাঁধের উপর শাড়ির পাড়টা পাত করে ফেলে ঠিক হয়ে বসে—একটু হেসে, না, একটু গম্ভীর হয়ে?—বললেন, "একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন বুঝি মিস্টার পাকড়াশি?"

বেপরোয়া হয়ে স্বীকার করে ফেললাম, এবং হয়তো একটু হাসির মত মুখ করেই, বললাম, "হ্যাঁ।"

একটু শক্ত হয়ে বললেন মিস ঘোষ,

"লিখুন। উই এক্‌স্‌পেক্ট বেটার বিহেভিয়ার ফ্রম এ পার্টি লাইক ইউ। ইফ ইউ ডু নট মেণ্ড ইয়োর অ্যাটিচিউড, উই শ্যাল বি ফোর্সড টু—"

বেশ তাপ দিয়ে তিনি বলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ থেমে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "এর চেয়ে কড়া করে আর ভদ্রলোককে কি বলা যায় বলুন?"

বললাম, "সত্যি বেশ কড়া হয়েছে।"

"হয়েছে তো?" মিস্ ঘোষ একটু হেসে বললেন, "বেশ। তবে কেটে দিন ঐ পোর্শনটুকু। লিখুন, প্লিজ এক্‌স্‌কিউজ আস্ ফর দি ডিলে, উই আর সেন্‌ডিং দি গুড্‌স্ বাই এয়ার ইমিডিয়েটলি। প্লিজ অল্‌সো নোট দ্যাট দি ফ্রেট উড বি বোর্ন বাই আস্।"

খসখস করে লিখে আমি থামলাম। কাগজের দিকেই চেয়ে বসে রইলাম, তাঁর মুখের দিকে আর তাকাতে পারলাম না।

মিস ঘোষ বললেন, "এটুকু কার্টেসি আমাদের তরফ থেকে দেখানো দরকার। দোষ তো আমাদেরই। আমরাই দেরি করে ফেলেছি। তা ছাড়া কি জানেন? ব্যবসা করতে নেমে মেজাজ দেখানো ঠিক না।"

আমি উঠে পড়লাম। হ্যাঁ-না কিছু বলার আমার আর সাধ্য কুলালো না।

মিস ঘোষ বললেন, "চিঠিটার একটা কপি স্টোরে দেবেন। টাইপ করিয়ে এক্ষুণি আমার কাছে পাঠান।"

তা আর বলতে? এক্ষুণি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি। একটা গর্দাভ করে ফেলে তার যা কড়া উত্তর পেয়ে গেছি তা জীবনে ভুলবার নয়। সে অংশটা কলমের আঁচড় দিয়ে কেটে দিলাম বটে, কিন্তু তাতে ঐ পার্টিটা আঘাতের হাত থেকে বেঁচে গেল, অথচ বাড়তি আঁচড়গুলোও আমার বুকের মধ্যে দাগ কেটে রাখল।

দেড় ঘণ্টার উপর কাটিয়ে এসেছি ঐ নিভৃত কক্ষে। এ আমার জীবনের কম সৌভাগ্য নয়।

সেকশনে ফিরতেই নিখিল গম্ভীর হয়ে এগিয়ে এল আমার কাছে, আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল।

"কি দেখছ?"

"আঁচড়।" চাপা গলায় বলল নিখিল।

চমকে উঠলাম। ঐ নিভৃতে ছিলাম এতক্ষণ, ওখানে কী হল, না হল—সব জানল কী করে এই স্কাউন্‌ড্রেলটা?

নিখিল এবার হেসে ফেলল, বলল, "নিভৃত সে নিকেতনে, বসে ছিলে যার সনে, তিনি কি একটুও আদরযত্ন করেন নি এই সোনার চাঁদকে? দেখছিলাম আদর করতে গিয়ে তাঁর নেল-পালিশ-মাখা নখের দাগ পড়েছে কি না।"

তেতে বললাম, "রাবিশ।"

বিজন আর নীহার কাছেই ছিল, লক্ষ্য করেনি, তারা আমার কথা শুনে একসঙ্গে বলে উঠল, "সাবাস।"

নিজের কাটা ঘা নিয়ে নিজে জ্বলে মরছি, তার উপর এরা এসেছে এই নুনের ছিটে দিতে।

ওদিকে চোখ পড়তেই দেখি মুদুলো বসাক মৃদু মৃদু হাসছে।

কোনো দিকে না তাকিয়ে টাইপিস্টের কাছে চলে গেলাম অবিলম্বে কাজটা শেষ করার জন্যে।

আমাদের মিস তবিলদারের চেহারা যতই বেঢপ আমরা বলি-না কেন, ঐ চেহারা নিয়েই তিনি নিজের নামে অনেক স্ক্যান্ডাল রটিয়ে ফেলেছেন। কারা যেন তাঁকে কার কার সঙ্গে কখন কোথায় কি ভাবে দেখে ফেলছে প্রায় নিত্যই।

ও ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে আমার বিন্দু-বিসর্গ কৌতূহল নেই। তিনি জাহান্নামেই যান বা যেখানে ইচ্ছে সেখানে যান তাতে আমার পরোয়া করার কিছু নেই। আর-কিছু বলি নে, যাকে দু-হাতের বেড়ে বাগিয়ে ধরাই কষ্ট, তার সম্বন্ধে কোনোরকম চিন্তা করাই সময়ের অপচয়।

তবিলদারের নামে যতই নানারকম রটনা শুনি, বিশ্বাস করুন, মিস ঘোষের উপর ততই আমার—শ্রদ্ধা বলব না—আস্থা বাড়ে। তিনি আমার উপর যতই চাপা উষ্মা প্রকাশ করে থাকুন, এর দ্বারা তাঁর ক্যারেক্‌টারটা স্পষ্ট করে জানা হয়ে গেছে। তিনি যে খুব তেজস্বী এবং খুবই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন—একথা জানতে আর বাকি নেই। তার উপর ভদ্রতা সৌজন্য সবই তাঁর আছে। রেগেছিলেন, কিন্তু রাগটা সেদিন কেমন কায়দা করে চেপে গেলেন। সোজাসুজি সেদিন যদি আমাকে একা পেয়ে একটা ধমকই দিয়ে বসতেন, কে বাধা দিত তাঁকে। কই, তাঁর নামে তো কোনো কানা-ঘুষো শোনা যায় না। একটা স্ক্যান্ডাল অবশ্য তাঁর আছে—সেটা হচ্ছে আমাকে জড়িয়ে; এবং সেটা নিখিলদের একটা কন্‌স্‌পিরেসি।

খুলেই বলি, সেই স্ক্যান্ডালটাই ছিল আমার একমাত্র যখের ধন। আমি আমার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে আগলে রেখেছিলাম আমার সেই অপবাদটা। বলুন, একে কি আপনারাও অপবাদ বলেন?

সেদিন আপিসে গিয়ে পৌঁছানো মাত্র ত্রিমূর্তি ছুটে এলো কাছে, বলল, "শোনো হে মিস্টার, রামপ্রসাদী শোনো।"

বলেই চাপা গলায় সুর ধরল নিখিল, "আমায় দে মা তবিলদারী।"

ঐটুকু গেয়েই থেমে গেল, বলল, "নিমক-হারাম তোমাদের ঐ বেঢপ তবিলদার। পরশু ওকে দেখা গেল গ্রেট ইস্টার্ণ থেকে বেরুচ্ছে ইন্‌জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্টের অ্যাকাউণ্টস অফিসার—কি নাম যেন—শঙ্কর মৈত্রের

সঙ্গে। কাল দেখি, চ্যাংড়া ফিরিঙ্গিটার সঙ্গে নিউ এম্পায়ারে ঢুকতে। এক-একদিন এক-এক জনের নুন খেয়ে বেড়াচ্ছে। পরদিনই তাকে বরবাদ করে দিচ্ছে।"

নিখিলের ভুল শুধরে দিয়ে নীহার বলল, "নুন কি বলছ হে। বল, মধু মধু, ও° মধু! মধু লুটে বেড়াচ্ছেন আমাদের তন্বী শ্যামা, শিখরিদশনা।"

চ্যাংড়া ফিরিঙ্গি, অর্থাৎ মিস্টার রবার্টসন। খুব চালাক-চতুর, খুব জলি, আর খুব চৌকোশ এই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অফিসারটি। দেখতেও বেশ চমৎকার।

ওদের কথা কান দিয়েই শুনলাম। কিন্তু যেন কান দিলাম না, এমনি ভান করলাম। আমি যেন ওদের মত সাধারণ একজন নই, আমি যেন আলাদা, আমি যেন পৃথক, যেন স্বতন্ত্র একটি জীব আমি।

কেননা, মিস্ ঘোষের আমি অন্তরঙ্গ, আমাকে না হলে তাঁর এক মিনিট চলে না।

আমার নামে এই স্ক্যান্ডাল তো রটেছেই, তার উপর আর একটা কথা রটতে আরম্ভ করেছিল ইদানীং। আমার নাকি প্রোমোশন হবে। কথাটা আমি অবশ্য জানতাম। একদিন তাঁর ঘরে মিস্ ঘোষই কথাটা আমাকে বলেন। কিন্তু আমি চেপে আছি। তবু কী করে ওরা জানল, এইটেই আশ্চর্য। আমি নাকি অফিসার হব। এ কথায় আমার উল্লাস রোমাঞ্চ পুলক সবই হয়েছে, কিন্তু সব চেপে আছি। এই পদোন্নতির সঙ্গে আরো একটা সুন্দর সম্ভাবনা যে জড়িয়ে আছেই, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ আমার ছিল না। সে সম্ভাবনার কথা যতই ভেবেছি ততই চিন্তিত করে তুলেছি নিজেকে।

নিখিলরাও ইতিমধ্যে আপনা-আপনি শায়েস্তা হয়ে গিয়েছে। আমি অফিসার হব, সুতরাং এখন থেকেই তারা আমাকে সমীহ করতে শুরু করেছে।

হাইহিলের শব্দ তুলে তর তর্ করে মিস্ ঘোষ এলেন ঘরে, বললেন, "মিস্টার পাকড়াশি, মিস্টার নন্দী—আপনারা জরুরি চিঠিপত্র নিয়ে তাড়াতাড়ি আসুন। আমাকে একটু বাদেই বেরুতে হবে, হয়তো ফিরতে পারব না আজ।"

উৎসাহিত হতে গিয়েই দমে গেলাম। আমার নামের সঙ্গে আবার ঐ নন্দীটার নাম জুড়ে দিয়ে আমার ইজ্জৎ মারা হল কেন। খুব রাগ হতে লাগল মল্লিকার—সরি, মিস্ ঘোষের—উপর। আমাকে পদোন্নতির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, এবং তলে-তলে আরও কি সব ব্যবস্থা করে দেবে ঠিক করেছে বলে আমরা আন্দাজ করছি, হঠাৎ তাকে এভাবে নস্যাৎ করার অর্থ কি।

ক্রমশ

অর্থ সব জিনিসেরই পাওয়া যায়। এরও পাওয়া গেল।—আমাদের নামে যা-সব রটেছে তার কিছু অন্তত গিয়েছে ওর কানে। কিন্তু সেসব যে কিছু না, তাই জানান্ দেবার জন্যেই নিশ্চয় এই কায়দাটুকু করে গেল। কেবল একা আমার নাম করলে একটু অড্ লুকিং শোনায় না?

কথাটা বুঝি ভুল হল? তা হোক। কথা হচ্ছে বুঝতে পারার জন্যে। ওতে কি বোঝা গেল না?

দিনের পর দিন কাটছে। বড় উদ্বেগে আছি। আমার প্রোমোশনের চিঠিটা এবার নাকি এসে পড়বে। ঐ চিঠির উপর আমার জীবন শুধু না, জীবনের স্বপ্ন ও কল্পনা নির্ভর করছে।

বেশি কথা বলছিনে কারো সঙ্গে। বেশি হাসছিনে। কেবল কাজ করছি।

মৃদুলা কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল জানিনে। তার দিকে তাকাতেই সে বলল, "আপনি তো চললেন!"

"কোথায়?"

"কি জানি! প্রোমোশন পাচ্ছেন। অনেক উন্নতি হবে আপনার।"

বললাম, "হবে না কি?"

মৃদুলা একটু থেমে বলল, "হবে। কিন্তু মনে রাখবেন আমাদের।"

টিফিনের সময় এখন। সেকশনে কেউ নেই। আমি কাজ-পাগলা হয়েছি, তাই আছি।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "হঠাৎ একথার মানে কি, মিস বসাক?"

"মানে আর-কিছু না। আপনার কোলিগ তো? ভুলে যাবেন না যেন একেবারে।"

মৃদুলার চোখ যেন একটু ছলছল করে উঠল মনে হল।

বললাম, "ছি, ও কি?"

আমার এই কথার মধ্যে হয়তো কোনো দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে থাকবে, মৃদুলার দুই গালে দু-ধারা জল নামল। চোখে আঁচল তুলে নিয়ে সে চলে গেল তার সীট্-এ।

আমি ভাবতে লাগলাম ওর কথা, আহা বেচারা। যদি ঠিক বুঝে থাকি ওর কথা, তাহলে বুঝি শুধু সহকর্মিনী হিসেবেই ওকে মনে রাখতে বলছে না। হয়তো তার বাড়তি কিছু বলতে সে চায়। কিন্তু এতদিন তো কিছু বুঝতে পারিনি, এখন প্রায় শেষ মুহূর্তে হঠাৎ এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কেন সে এল? বড় মায়া হতে লাগল ওর জন্যে। কিন্তু অফিসে আমার যা পোজিশন হতে চলেছে, তাতে তো সামান্য একজন ডকেট-ক্লার্কের সঙ্গে—। তার উপর আরো একটা বিষয়ও চিন্তার আছে না?

ও কিছু না। গরিব কেরানি একজন। ভালো একটা শাড়ি কিনে উপহার দিলেই খুশী হয়ে যাবে।—এইরকম ভাবলাম আমি। আশ্চর্য, ও-কথা ভাবতে এতটুকু সংকোচ হল না আমার। কিন্তু দেখুন, তখনও আমার প্রোমোশনের চিঠিই এসে পৌঁছয়নি।

কিন্তু আর দেরি হল না। পরদিনই এসে পৌঁছল চিঠিটা। লাঞ্চ-আওয়ারের একটু আগে। সকলে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। এ'-ক্লাস অফিসার হয়েছি আমি। ঐ ভিড়ের মধ্যে থেকে উঁকি দিয়ে তাকালাম, দেখলাম, মৃদুলা মাথা নীচু করে চুপ করে বসে আছে।

লাঞ্চ-আওয়ারে অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া ঠিক না। তা হোক, এখন তো আমিও অফিসার। নিখিল, নীহার, বিজন এবং অন্যান্য সহকর্মীদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে ছুটলাম তার কাছে, এ-সংবাদে সবচেয়ে খুশী হবে যে।

এবার চলনে একটু ভারিক্কি ভাব এনে ফেলেছি। এক মুহূর্তের মধ্যে আমার বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান অভিজ্ঞতা সব যেন বেড়ে গেল। সাধারণের কোঠা থেকে আমি অনন্যসাধারণে উঠে এলাম।

ওঃ, গ্র্যান্ড। একটা নতুন জীবন এসেছে আমার। আজ মিস ঘোষ নিশ্চয় কৃপার চোখে তাকাতে পারবে না আমার দিকে। আমিও তার দিকে সমীহর চোখে তাকাব না। এখন আমরা সমান-সমান।

বলা যায় না, হয়তো মিস ঘোষ ঐ নিভৃত কক্ষে আজ তার অন্তরের কথাই বলে ফেলবে। মেয়েদের সংযম অত্যন্ত, কিন্তু বাঁধ ভাঙলে আর রোখা দায়। ঐ তো মৃদুলা বসাক তার প্রমাণ দিয়ে গেল। বহুদিনের চাপা কথাটা কেমন তোড়ের সঙ্গে বেরিয়ে এল হঠাৎ। আই পিটি দি পুওর গার্ল।

তরতর করে চলেছি, আমার পায়ে তো হাইহিল নয়, তাই খটখট শব্দ নেই। বেশ বেগেই চলেছি। ঠিক সেই বেগেই মিস ঘোষের ঘরে ঢুকে পড়লাম।

একটা যেন কাণ্ড হয়ে গেল মিস ঘোষের টেবিলের উপরে। একটা বিপর্যয়, একটা প্রলয়। হ্যাঁ, প্রলয়ই বলা যায় একে।

কি ব্যাপার, জিজ্ঞাসা করছেন?

ব্যাপার কিছু না। ঘরে ঢুকেই দেখি, টেবিলের দুই পারে দুইজন বসে—মিস ঘোষ আর মিস্টার রবার্টসন। একটা আপেল তারা দুজনে একসঙ্গে দু পাশ থেকে কামড়ে খাচ্ছে।

কাঁচের বাসনের দোকানে ষাঁড় ঢুকলে যেমন কাণ্ড হয়। অবিকল তাই ঘটে গেল যেন ঐ টেবিলে।

আমি আর দাঁড়ালাম না, বেরিয়ে এলাম। সত্যিই ষণ্ডের মতই বুদ্ধি আমার। মিস ঘোষকে চিনতেই পারিনি।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছেন কি মশাই?

এ কোন্ স্টেশন?

গঝাণ্ডি?

এতক্ষণ লাগল এইটুকু পথ আসতে? এটা ট্রেন, না, গোরুর গাড়ি মশায়?

কেমন লাগল বলুন কাণ্ডটা?

তারপর? কিসের? ঐ গল্পটার?

তারপর আর কিছু জানিনে। সেখান থেকে বেরিয়ে ট্রেন ধরেছি। চলেছি কোথায় জানিনে। আর জীবনে কখনো ফিরতে পারব কিনা বলতে পারছি নে।

হায়, পুওর গার্ল।

কার কথা বলছি? কে জানে! মে বি মৃদুলা, মে বি মল্লিকা।

চক্রদত্ত

টেলিফোনে কোন নম্বর পেতে হলে আমাদের টেলিফোনের রিসিভার তুলে আমাদের নম্বরটা অপারেটারকে বলতে হয় অথবা নম্বরটা ডায়াল করতে হয়। তাড়াতাড়িতে অনেক সময় আমাদের নম্বর বলতে অথবা ডায়াল করতে ভুল হয়ে যায়। এই অসুবিধা দূর করবার জন এক নতুন ধরনের স্বয়ংক্রিয় 'ডায়াল ফোন' বের হয়েছে। এর সাহায্যে নির্ভুলভাবে ডায়াল করে নম্বর পাওয়া যায়। কোন লোককে টেলিফোনে ডাকতে হলে এই যন্ত্রের সংগে লাগান একটা হাতল টিপে যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ লোক অথবা কোম্পানির নাম যন্ত্রের পর্দায় দেখা যাচ্ছে, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তারপর প্রয়োজনীয় নামটি আসার সংগে সংগেই আর একটি চাবি টিপলেই যন্ত্রটি নিজে নিজে নম্বরটি ডায়াল করে অপর প্রান্তের টেলিফোনের সংগে যোগ করে দেবে। দেখা গেছে যে, যাদের খুব বেশি বার একই টেলিফোন নম্বর দরকার হয়, তাদের পক্ষে এটা খুব কার্যকরী।
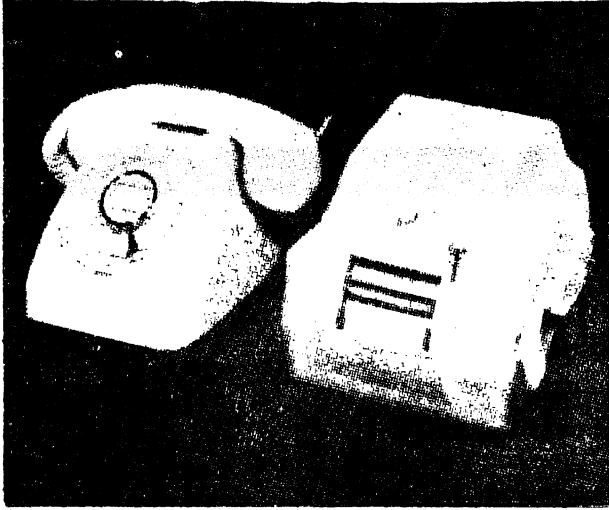
স্বয়ংক্রিয় ডায়াল ফোন

*

আমেরিকায় এক নতুন ধরনের মোটর গাড়ির টায়ার তৈরী হয়েছে। অদ্য পর্যন্ত যত টায়ার তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে এই নতুন টায়ারটি রাস্তায় চলবার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ। টায়ারটি আড়াআড়িভাবে কাটলে ডিম্বাকৃতিবিশিষ্ট হয়, ফলে এটার ওপর চাপ পড়লেও এটা কম বেঁকবে এবং টায়ারটি দ্রুত চলবার সময় ধারের চাপও বেশী সহ্য করতে পারবে। টায়ারটি তৈরী সাধারণ টায়ারের থেকে অন্য রকম ভাবে। সাধারণ চাকার চেয়ে এই চাকা শতকরা ষাট গুণ বেশী পথ চলতে পারবে। অবশ্য সাধারণ চাকা তৈরীর খরচের তুলনায় এই চাকা তৈরীর খরচ শতকরা আশি ভাগ বেশী। তা সত্ত্বেও এ চাকার স্থায়িত্ব অনেক বেশী, মোড় ফেরানর পক্ষে বেশী নিরাপদ বলে জনপ্রিয়তা বেশী হবে। যে কোম্পানি চাকাটি তৈরি করেছে, তারা আশা করে যে, ক্রমশ এই চাকা কম দামে সরবরাহ করতে সক্ষম হবে।

*

ভিটামিন 'এ' আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে একটি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা যখন এই ভিটামিন পাই না, তখন আমরা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ভিটামিন 'এ' খাই। এতদিন এই ভিটামিন ভারতবর্ষে প্রস্তুত হত না। সম্প্রতি 'সিবা' কোম্পানি ভারতীয় মূলধনের সাহায্যে ভারতে ভিটামিন 'এ' প্রস্তুত করছেন। এইটিই ভারতে ভিটামিন তৈরীর প্রথম কারখানা। এই কোম্পানি আশা করছেন যে, আমাদের প্রয়োজনীয় ভিটামিন এরা খুব সহজেই তৈরী করতে পারবেন।

*

সম্প্রতি ইংলণ্ডে গোরুর 'হাসক' রোগ প্রতিরোধ করবার এক নতুন ধরনের টিকা তৈরী করা হয়েছে। এই রোগটি গরুর ফুসফুসে হয়। একবার এই রোগ কোন গরুর হলে সেই স্থানের গরুর মধ্যে মড়কের মত দেখা যায়। বৈজ্ঞানিকরা এই রোগের শুকের ওপর রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে প্রায় পাঁচ বছর গবেষণা করার পর এই টিকা তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৫৭ সালে এই নতুন টিকা পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করার পর সাধারণের ব্যবহারের জন্য তৈরী করতে আরম্ভ করা হয়েছে।

*

হারভার্ডের যাদুঘরে সম্প্রতি একটি ১০০ কোটি বছরের পুরনো মাংসাশী সরীসৃপের প্রস্তরীভূত কংকাল রাখা হয়েছে। এটি হচ্ছে একটি 'ক্রোনোসাউরাস' এবং লম্বায় প্রায় ৪২ ফুট—তিমি মাছের পরই লম্বা। দেখতে একটা খুব বড় কুমীরের মত। ১৯৩১ সালে অস্ট্রেলিয়ায় এই জন্তুটির প্রস্তরীভূত কংকালের কিছু অংশ মাটির মধ্যে পোঁতা অবস্থায় দেখা যায়। ডিনামাইটের সাহায্যে পাথর ভেংগে হাড়গুলো বার করা হয়। তারপর কয়েক বছর ধরে এই সমস্ত টুকরো টুকরো অংশগুলো পরিষ্কার করে তারপর জোড়া শুরু হয়। যে সমস্ত জায়গার হাড় পাওয়া যায়নি, সেগুলো এসবেসটস ফাইবার, প্লাস্টার অব প্যারিস, তুলো, আঁঠা দিয়ে তৈরী করে নেওয়া হয়েছে।

আলোচনা

চারটি দেশের থিয়েটার

মহাশয়,—আপনার পত্রিকার ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত সংখ্যায় শ্রীশম্ভু মিত্রর অভিজ্ঞতা-বৃত্তান্ত পড়লাম। থিয়েটারের আলোচনায় রুশদেশ সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্য পড়ে তাঁকে কয়েকটি প্রশ্ন করছি।

শম্ভুবাবু সোভিয়েটে বড়ো বড়ো নির্দেশক ও অভিনেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েও, তাঁর যে-সব ব্যাপারে খটকা লেগেছে এবং যে-সব অভিনয়ে নিচু মান লক্ষ্য হয়েছে সে সম্বন্ধে তাঁদের সঙ্গে কোনো বিস্তৃত আলোচনা করেননি কেন? যদি করে থাকেন, তবে তাঁর দীর্ঘ বিবরণে সে ব্যাপারের উল্লেখ করে একটি লাইনও লেখেননি কেন? একজন দোভাষীর সঙ্গে তাঁর নিছক অপছন্দের মিল তাঁর নিজের বক্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট সমর্থন নয়। হ্যামলেটের আলোচ্য দৃশ্যে মেঘ ওড়ানোর যন্ত্র থেকে বিপরীত দিকে একই সঙ্গে মেঘ ওড়ানোর মতো অবিশ্বাস্য ব্যাপার যে-দেশের মঞ্চে সম্ভব হয়েছে, সেখানেই অপর এক নাট্যাভিনয় উপলক্ষে দানেচেঙ্কোর 'শেষ যাত্রা' রেলগাড়িটি তাঁকে অভিভূত করেছে। অভিনয় বিষয়ে যে-ঐতিহ্য এবং প্রথানুগ শিক্ষার ফলে আন্না কারেনিনায় স্টেজের উপর অবিশ্বাস্য কুশলতার সঙ্গে রেলগাড়িটি ওভাবে দেখানো সম্ভবপর হয়েছে সেই ঐতিহ্য ও শিক্ষার প্রসাদ আবার ক্ষেত্রবিশেষে এতটা হাস্যকর আদৌ হতে পারে কিনা, এ প্রশ্ন কারো মনে জাগলে তাকে দোষ দেবার কিছু নেই। এবং লেখক যখন এ রকম তথ্য সমালোচনার উদ্দেশ্যেই পরিবেষণ করেন, তখন আমরা আশা করব যে, তিনি এই সব বিষয় সম্বন্ধে ও-দেশের অভিনেতা ও পরিচালকদের সঙ্গে ইতিপূর্বেই আলোচনা করে থাকবেন ও তাঁদের স্বীকারোক্তি বা অন্য দুর্বলতা ইত্যাদিও খানিকটা আমাদের জানতে দেবেন।

আমরা আরো আশা করব যে, যে-দেশে অভিনয় বিষয়ে এত শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যেখানে অভিনেতা নির্বাচনের ব্যাপারে এত কড়াকড়ি, সেখানে অভিনয়ের মান একেবারেই সাধারণ কেন হচ্ছে এটাই বরং শম্ভুবাবুকে নানা-রকম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করবে। পরিচালক ও অভিনেতার শিল্পকর্মকে মোটামুটি ভাগ করা যায়, তাঁদের নাটকবোধের তরফ থেকে এবং তাঁদের স্টেজ পরিবেষণ সংশ্লিষ্ট কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে। শম্ভুবাবুর বিবরণ থেকে মনে হয় সোভিয়েটে এই দুই দিকেই সার্বিক দুর্বলতা, যদিও তাঁর লেখার সর্বত্রই তিনি একজন টেকনিশিয়ান-এর মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন। নাটকবোধের ব্যাপারটা সোভিয়েট অভিনয় ব্যবস্থায় কতটা উন্নত বা অবনত সে সম্পর্কে আলাদা মূল্যায়নের প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। শুধুমাত্র টেকনিশিয়ান-এর চাবুক হাতে নিয়ে চললে ঢেউয়ের আওয়াজকে কোথায় শুকনো ছোলার শব্দের মতো লাগছে—এ-ধরনের সমালোচনাই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য পায়। একথা শম্ভুবাবু জানেন।

আরেকটা কথা সবিনয়ে বলতে চাই। যে-কোনো ভালো নাটকের দৃশ্য বিশেষকেই হয়তো একাধিক মুড-এর প্রেক্ষিতে দেখা সম্ভব। সব মুড-এরই আপন মূল্য এবং বৈশিষ্ট্য আছে এবং একে অপরের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে দাবি করাটা প্রায়শই অনুচিত হতে পারে। ওফেলিয়ার সঙ্গে নির্দিষ্ট দৃশ্যে হ্যামলেটের অভিনয় নানা-রকম মানসতার আলোতে কল্পনা করা যায়। লরেন্স, অলিভিঅর ভায়োলেন্ট (বিশেষণটি কি উপযুক্ত হয়েছে?), সুতরাং খারাপ; আর সোভিয়েটের অমুক আর্টিস্টের মুড-এ প্রেম ও তিক্ততার চমৎকার মিশ্রণ হয়েছে, অতএব তাঁর অভিনয় ভালো—এ ধরনের মূল্যায়ন বিপজ্জনক। প্রসঙ্গত বলছি, রক্তকরবীতে শম্ভুবাবু তাঁর ইণ্টারপ্রিটেশন অক্ষুণ্ণ রেখেও হয়তো নন্দিনী, বিশু ও কিশোরের অভিনয়ে কোথাও কোথাও অন্য মেজাজ লাগাতে পারতেন। তিনি যে তা করেননি সেটা মোটেই আমাদের শিল্প-সমালোচনার উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে না। নানারকম কল্পনাযোগ্য মানসতার যে-কোনোটিকে অবলম্বন করেই শিল্প-নির্দেশক তাঁর রূপ সৃষ্টি করতে পারেন। আসল কথা, যে-কোন একটি মেজাজের দিক থেকেই শিল্পী বিষয়টিকে কত অন্তরঙ্গভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন সেটাই বিচার্য বিষয়। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন মুড-এ এ একই বিষয় খুব সার্থকভাবে পরিবেষণ করবার পরেও হয়তো বিভিন্ন অভিনেতার মধ্যে মান বিচারের জন্য অবজেক্টিভ নির্ণায়ক থাকতে পারে, আশা করি শম্ভুবাবু সে সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিতে পারবেন। ইতি—সমীর দাশগুপ্ত, কলিকাতা।

আমাদের উৎসব

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়,—'দেশ' পত্রিকায় (৯ই ফাল্গুন '৬৫) আপনাদের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 'আমাদের উৎসব' সংক্ষিপ্ত হলেও সময়োপযোগী হয়েছে। প্রবন্ধে শুধু কলকাতায় কিভাবে আজকাল বাঙালীর প্রধান প্রধান উৎসব-গুলো উদ্‌যাপিত হচ্ছে—তার কথাই বলা হয়েছে। বাংলার বাইরেও প্রবাসী বাঙালী কর্তৃক এই ক'টি উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে—খুব সমারোহের সঙ্গেই।—সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সত্য কিন্তু সুষ্মিত প্রাণপূর্ণরূপে নয়।

গত কয়েক বছর ধরেই এখানে, রাজধানীতে, আমাদের প্রধান ও সুন্দর উৎসবগুলোর যেরূপ পরিবর্তন ও পরিণতি দেখছি তা খুব সুখের নয়। শামিয়ানাসজ্জায়, আলোকসজ্জায় ও লাউড স্পীকারে 'অশ্রাব্য' হিন্দি গানের পরিবেশন ব্যবস্থায় কলকাতার মতো এখানেও প্রভূত অর্থের অপচয় হচ্ছে প্রতিটি উৎসবে। এবং এখানকার এই অপচয় একদিক থেকে, কলকাতার অপচয়ের চেয়েও পরিতাপের বিষয়। কলকাতার উৎসবে অপচয়ের একটা অংশ কলকাতাবাসীর (যার অধিকাংশই বাঙালী) হাতেই ফিরে যায় কোন না কোনো আকারে। কিন্তু এখানে প্রবাসী বাঙালীর প্রায় সমস্তটা টাকাই যাচ্ছে অবাঙালীর হাতে। সংক্ষ্যবৃদ্ধি বাঙালী এখন পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে দলাদলিতেই এত উৎসাহী যে, এ দিকে দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ তার নেই।

এর চেয়েও বেশি দুঃখের কথা হচ্ছে যে, এখানে উৎসবগুলোর সাংস্কৃতিক ও আনন্দ অনুষ্ঠানের একটা প্রধান অঙ্গ ও আকর্ষণ হয়ে উঠেছে মুক্ত আকাশের নীচে প্রবেশদক্ষিণা মুক্ত চলচ্চিত্র দেখানো—হিন্দি, বাংলা—যা ছবি পাওয়া যায়। এখানকার বাঙালীদের এই চলচ্চিত্র দেখার প্রতি আগ্রহও দেখছি দিন দিনই বেড়ে চলেছে। অবকাশ বিনোদনে সিনেমাশিল্পের জনপ্রিয়তার কারণ অবশ্যই বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জীবন-ধারা। এবং রাজধানীর দৈনন্দিন জীবন, আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের অন্য যে কোন নগরীর চেয়ে বেশি যান্ত্রিক। তাই বোধ হয় উৎসবেও এখানে সিনেমার আয়োজনই প্রধান। কিন্তু উৎসব—যা আমাদের প্রাণের উচ্ছলতার প্রকাশ, তার মধ্যে সিনেমা কি করে এতটা প্রাধান্য লাভ করছে দেখে আশ্চর্য হচ্ছি। উৎসবের সঙ্গে যদি আমাদের সজীব ও সক্রিয় সম্বন্ধই না রইল তাহলে তা উৎসব হল কি করে? উৎসব করতে গিয়ে পর্দায় ছবি দেখা ও যন্ত্রের গান শোনা, চড়ুইভাতি করতে গিয়ে হোটেলওয়ালাকে ফরমাস দিয়ে আসার মতোই নয় কি?

রাজধানীর উৎসবের দুটো মন্দ দিকের কথাই আমি লিখলাম। অন্য দিকে তার মধ্যে হয়ত কিছু ভালোও আছে—তবে বিশেষ করে লেখার মতো কিছু আছে কিনা জানি না। ইতি—নিবেদক—চিত্তরঞ্জন চৌধুরী, নতুন দিল্লী।

'কেরল' নয় 'কেরালা'

মহাশয়,—আপনাদের কাগজে যখনই কেরালার কোন উল্লেখ করা হয় (যেমন ১৬ই ফাল্গুন, পৃষ্ঠা ৩৩২) তার বানান লেখা হয় 'কেরল'। শুধু আপনাদের কাগজেই নয়, বাংলায় কেরালার স্থানে 'কেরল' লেখার অভ্যাস সর্বত্রই নজর করেছি। এই চিঠির মারফৎ কেরালানিবাসী বাঙালী হিসেবে আপনাদের পাঠকদের দৃষ্টিতে আনতে চাই যে 'কেরল' বানানটার কোনই যাথার্থ্য নেই। শব্দটির উচ্চারণ স্পষ্টতই কেরালা, এবং সে মতই লেখা উচিত।

এই বানান ভুল হওয়ার কারণ বোধহয় এই যে মালায়ালম্ ভাষায় শব্দটি যেভাবে লেখা হয় বাংলায় তার আক্ষরিক বিন্যাস হল 'কে-র-ল'। কিন্তু মালায়ালাম্ ভাষায় যখন 'র' অথবা 'ল' লেখা হয়, তখন তাদের উচ্চারণ করা হয় 'রা' এবং 'লা'। মালায়ালম ভাষায় যখন ব্যঞ্জন-বর্ণের পাশে আকার বসান হয়, তখন তাকে উচ্চারণ করা হয় যেমন হবে যদি বাংলা কোন অর্থাৎ মালায়ালম্ ভাষায় যখন লেখা হয় ব্যঞ্জনবর্ণের পাশে দুটো আকার বসান হয়। 'কে-র-ল' তখন তার উচ্চারণ হয় কেরালা। যদি লেখা হয় 'কে-রা-লা', তবে তার উচ্চারণ হবে কে-রাা-লাা। ইতি—অশোক রুদ্র, ত্রিবান্দ্রাম

একটি মৃত্যু

শংকর
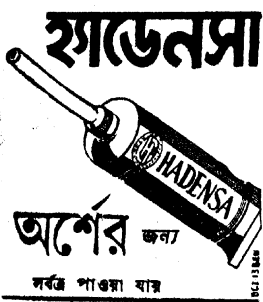
আমি তাঁর সমকালীন শিল্পী বা নিকটতম বন্ধু নই। তাঁর গুণমুগ্ধ সিনেমা দর্শকদেরও একজন বলে নিজেকে দাবি করতে পারি না। বাংলা ছবির নির্বাক যুগ আমার জন্মের পূর্বের ইতিহাস। আর যখন সবাক ধীরাজ ভট্টাচার্য নায়করূপে বাঙালী দর্শক হৃদয়ে পুলক ও বিস্ময়ের সঞ্চার করছেন, তখন আমি ইতিহাস, ভূগোল হস্তলিপি অঙ্ক ইত্যাদি নিয়ে নাস্তানাবুদ খাচ্ছি। সিনেমা তখন নিষিদ্ধ ফলের মতো—একমাত্র বড়রাই তার রসাস্বাদনের অধিকারী।

ফলে যে ধীরাজ ভট্টাচার্যের জন্য সমগ্র বাংলা দেশ আজ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করছেন, তার কোনো পরিচয় প্রদান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আর এক ধীরাজ ভট্টাচার্য ছিলেন—লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃসঙ্গ, ক্লান্ত অবসন্ন ধীরাজ ভট্টাচার্য। হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের বাড়িতে তাঁকেই আমি শেষ দেখে এসেছিলাম। ১লা মার্চ, রবিবার। পাঁচটার সময় পূর্ণ সিনেমার সামনে জনৈক বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অসুস্থ ধীরাজ ভট্টাচার্যের অন্যতম অন্তরঙ্গ তিনি। তাঁর সঙ্গেই দেখতে যাবো মৃত্যুপথযাত্রী প্রতিভাকে। কিন্তু তার আগেরও এক ইতিহাস আছে। আমার বাল্যস্মৃতির সেই অংশটুকু বলে রাখবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

আমাদের পাড়াতে এক নতুন বৌদি এলেন। তাঁকে প্রথমে পাড়ার গৃহিণীরা এমন কিছু খাতির করেননি। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে জানা গেল তাঁর বাপের বাড়ি পাঁজিয়া গ্রামে। যশোর জেলার পাঁজিয়া গ্রাম সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কৌতূহলী হবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু যখন বৌদি বললেন, ধীরাজ ভট্টাচার্য তাঁদের গ্রামের লোক, রাতারাতি তাঁর দাম বেড়ে গেল। পাড়ার গিন্নীরা জিজ্ঞাসা করলেন 'ও টুলুর মা, ধীরাজ ভট্টাচার্যকে দেখেছো তুমি?'

বৌদি কোনোরকম দ্বিধা না করে বললেন, 'কতবার দেখেছি। আমাদের গাঁয়ের ছেলে, দেখবো না তাকে!'

পাড়ার গিন্নীরা নিঃসন্দেহ হতে পারেননি। একটু শান্তি পাবার জন্য বলেছেন, 'তা তোমাদের বাড়ি থেকে নিশ্চয় কিছুটা দূর আছে।'

বৌদি তাঁদের বুকে আঘাত করে জানিয়েছেন, 'একেবারে ঠিক পাশেই ধীরাজ ভট্টাচার্যের বাড়ি।'

সে দিনের বাংলা দেশে ধীরাজ ভট্টাচার্যের অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তার একটা নমুনা পাওয়া গেল। কারণ পাড়ার সবাই বৌদির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিলেন। আমরাও বৌদিকে কেমন শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, অন্য পাড়াতে আমাদের দরও বেড়ে গিয়েছিল। আমরা যা-তা নই, আমাদের বৌদি ধীরাজ ভট্টাচার্যের গাঁয়ের মেয়ে।

এই বৌদির ভাই এক সময় পাঁজিয়া গ্রাম থেকে হাওড়ায় এসে হাজির হলেন। বৌদিদের বাড়িতে স্থানাভাব। কিন্তু তাঁর ভায়ের স্থানাভাব হলো না, পাড়ার অনেকেই তাঁকে রাত্রে থাকবার জায়গা দিতে চেয়েছিলেন। কেন জানি না, বৌদির ভাই আমাদের বাড়িটাই পছন্দ করলেন এবং তাঁর পাশে শুয়ে শুয়ে আমি মনে মনে কত দিন পাঁজিয়া গ্রামে চলে গিয়েছি। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ধীরাজ ভট্টাচার্যের একখানা ছবিও আমি তখনও দেখিনি। কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। ধীরাজ ভট্টাচার্যের নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার গিন্নী এবং কাকা, মেসো, দাদাদের মুখমণ্ডলে যে বিস্ময়কর পরিবর্তন হতে দেখেছি, তাতেই তিনি আমার মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে গিয়েছিলেন। পাড়ার গৃহিনীরা বলেছেন 'চেহারা, আহা যেন স্বয়ং কন্দর্প।'

কন্দর্পকে আমি দেখিনি। তাই কতদিন রাত্রে বৌদির ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছি, 'ধীরাজ ভট্টাচার্য বুঝি খুব ফরসা?' তিনি বলেছেন, 'সে তোকে কি করে বোঝাবো। খু-উ-ব।' আমি জিজ্ঞাসা করেছি, 'আপনি ওর সঙ্গে কথা বলেছেন?' নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে উনি বলেছেন, 'কতবার। এই যেমন তোর সঙ্গে কথা বলছি, ঠিক তেমনি ভাবে।' আমি জিজ্ঞাসা করেছি, 'আপনার সঙ্গে দেখা হলে চিনতে পারবে?' বৌদির ভাই এবার একটু রেগে উঠেছিলেন। বললেন, 'দেখা হলে শুধু চেনা কেন, বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়াবে; বাবা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করবে। তবে ছাড়বে।'

বৌদির ভাইকে এরপর আমি যথাসাধ্য সন্তুষ্ট রাখবার চেষ্টা করেছি। শর্ত ছিল, যদি কোনদিন ধীরাজ ভট্টাচার্যের বাড়িতে

তিনি যান, আমাকেও সংগে নিয়ে যাবেন।

নানা কর্মভারে বৌদির ভাইএর আর ধীরাজবাবুর বাড়িতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। আমার না দেখা মেপোজিয়নের সংগে কোনদিনই চাক্ষুষ পরিচয় হবে না, সে কেমন কথা। মনের মধ্যে একটু সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল—সত্যই ধীরাজবাবুর সংগে ও'র কোনো পরিচয় আছে কিনা।

বৌদির ভাই বোধ হয় আমার মনের ভাব আন্দাজ করেছিলেন। তখন পুজোর সময়। হঠাৎ বললেন, 'চল আমার সংগে পাঁজিয়াতে। নিজের চোখে না দেখলে তো বিশ্বাস করবি না।'

আর্থিক অনটন এবং অন্যান্য অসুবিধা সত্বেও সেই সুযোগ আমি নষ্ট করিনি। হাওড়া থেকে শিয়ালদহ স্টেশন, শিয়ালদহ থেকে যশোর এবং যশোর থেকে বাসে করে একদিন সত্যিই আমি পাঁজিয়াতে এসে হাজির হয়েছিলাম। ধীরাজ ভট্টাচার্যের বাড়িতে যাবার পথে একটা বাঁশের সাঁকো পড়ে। সেই সাঁকো পেরিয়ে বৌদির ভাই আমাকে বাড়িটা দেখালেন। আমি পরম বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে থেকেছি। এত সাধারণ বাড়ি। সাধারণ ইট কাঠের তৈরি। আমার সেদিনের মানসিক অবস্থা স্মরণ হলে আজও লজ্জা লাগে। সাধারণের সংসারেই যে অসাধারণের আবির্ভাব হয়, তা আমার জানা ছিল না।

আমি অবাক হয়ে শুনলাম, এই সাধারণ গ্রামে প্রতি বৎসর পুজোয় অসাধারণ ধীরাজ ভট্টাচার্যের আগমন হয়। তিনি আসবেনই। যেখানে যতো কাজ থাক, সব ফেলে গ্রামে ফিরে আসবেন এবং শুধু বেড়াতে আসা নয়, প্রতিদিন স্টেজ বেঁধে অভিনয় হবে। মায়ের পুজোর আঙিনাতে সন্ধ্যার আগে থেকেই দলে দলে লোক জমতে শুরু করবে। হিন্দু-মুসলমান কোন ভেদাভেদ থাকবে না। গৃহবধুরা বিকেলের মধ্যেই রান্না শেষ করে রাখবেন। অন্য সময় তো সূর্যাস্তের সংগে সংগেই গ্রামের চোখে ঘুম নেমে আসে। কিন্তু মহাপুজোর কয়েকদিন পাঁজিয়া হঠাৎ কলকাতা হয়ে উঠবে। সারারাত জেগে থাকবে। অভিনয় হবে। এবং গ্রামের ছেলে ধীরাজ, যে ধীরাজ বাংলা দেশকে জয় করেছে, সেও অভিনয় করবে।

সেই প্রথম দেখলাম ধীরাজ ভট্টাচার্যকে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে। কলকাতার স্টেজে, কলকাতার সিনেমাতে না দেখে, কলকাতার আমি গ্রাম্য পরিবেশে পেট্রোম্যাক্স এবং কারবাইডের আলোয় ধীরাজ ভট্টাচার্যকে প্রথম দেখলাম। সেই আমার প্রথম সম্পূর্ণ রাত্রি জাগরণ। কিন্তু একটুও বুঝতে পারিনি, ধীরাজ ভট্টাচার্য যাদুবলে আমাদের যেন মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। কতক্ষণ সেই-ভাবে ছিলাম জানি না। হঠাৎ মনে হলো পেট্রোম্যাক্সের আলো যেন নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। স্টেজ থেকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম পূর্ব আকাশে সূর্যের আগমনবার্তা ঘোষিত হয়েছে।

সেদিনের সে বিস্ময় ভোলবার নয়। আমার কল্পনার ধীরাজ ভট্টাচার্যের সংগে আসল ধীরাজকে মিলিয়ে নিয়েছিলাম। হাওড়া থেকে পাঁজিয়া পর্যন্ত ছুটে আসার শ্রম সার্থক হয়েছিল আমার।

বৌদির ভাই বলেছিলেন, "চল আলাপ করিয়ে দিই।" আমার সাহস হয়নি। এতো-দিনের পরিচিত হওয়ার সাধ যেন এক
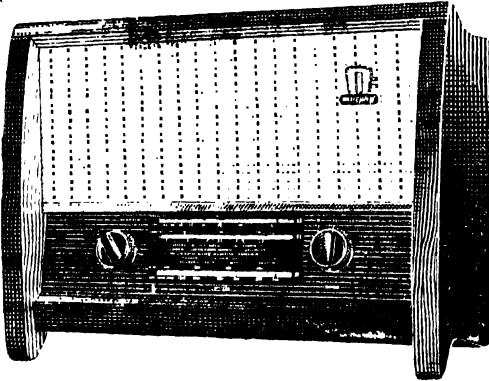
মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। দূর থেকে দেখেই পরিতৃপ্ত হয়েছি, এর থেকে বেশি সুখ আমার সহ্য হবে না। তাঁর গরবে গরবী পাঁজিয়ার লোকদের দেখেও আমার হিংসে হয়েছে। কোনো সম্পর্কের সূত্র ধরে যদি আমিও তাঁর খ্যাতির অংশীদার হতে পারতাম। একটি সম্পর্ক শীঘ্রই আবিষ্কার করেছিলাম এবং সেদিন আমার সৃজনী প্রতিভার তারিফ না করে থাকতে পারিনি। আমরা দুজনেই যশোহর জেলার লোক—সুতরাং প্রায় আত্মীয় বলা যেতে পারে!

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য সে দাবীও বেশি দিন টিকলো না। র‍্যাডক্লিফ সায়েবের এক কলমের খোঁচায় আমাদের আত্মীয়তা ছিন্ন হলো। আমার জন্মস্থানকে বিনাদ্বিধায় যশোহর থেকে কেটে নিয়ে অন্য এক জেলার সংগে জুড়ে দিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে একদিন জানলাম আমি চব্বিশ পরগণার লোক—মাইকেল মধুসূদন ও ধীরাজ ভট্টাচার্যের সংগে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। অনেকদিন পরে ধীরাজ ভট্টাচার্যকে গল্পচ্ছলে এ-কথা বলেছিলাম। আমার এই হাল্কা উক্তিকে কিন্তু হাল্কা ভাবে নিলেন না। গম্ভীর হয়ে উঠলো তাঁর মুখ। বললেন, "কি সোনার দেশই ছিল আমাদের, ভাই।" বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠেছিল। কি ভালই বাসতেন যশোরকে। র‍্যাডক্লিফ সায়েবের রায়ের পরও তিনি দেশে গিয়েছেন, অভিনয় করেছেন।

আমার সংগে ধীরাজ ভট্টাচার্যের সম্পর্ক র‍্যাডক্লিফ সায়েবের সংগেই শেষ হয়ে যেতো, যদি না দুজনেই এক অজ্ঞাত কারণে সাহিত্যের মালঞ্চে অনধিকার প্রবেশ করতাম। ধীরাজ ভট্টাচার্যের 'যখন পুলিস ছিলাম' দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হলো। লোকে চমকে উঠলো—একি সেই সিনেমা-থিয়েটারের ধীরাজ। মা সরস্বতীর সংগে এঁদের সম্পর্ক তো আদায় কাঁচকলায়। কিন্তু তবু বিস্মিত বাঙালী পাঠক দেখলেন জীবন-সায়াহ্নে সিনেমার এক কেষ্টঠাকুর অপরূপ ভঙ্গিতে লিখে চলেছেন। গৌড়জনের চিত্ত জয় করলেন লেখক ধীরাজ ভট্টাচার্য।

'যখন পুলিস ছিলাম', একদিন শেষ হলো। কিছুদিন পরে দেশ পত্রিকার সেই শূন্য স্থানটুকু অধিকার করল এক ব্যারিস্টারের বাবুর আত্মকথা। তারপর একদিন বর্মন স্ট্রীটের দেশ পত্রিকার আপিস থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এসেছিলাম জনৈক প্রকাশকের দপ্তরে। প্রকাশক একখানি বই দেখালেন আমাকে। বললেন, "আপনার বইটাও এই-ভাবে কম্পোজ করতে চাই।" কথা শেষ করে উঠে পড়লাম। বইটা টেবিলে রেখে চলে আসছিলাম। ভদ্রলোক হাঁ-হাঁ করে উঠলেন—"এ বইটা নিয়ে যান।" জীবনে সেই প্রথম বিনামূল্যে গ্রন্থপ্রাপ্তি—প্রথম প্রেমের মতোই অবিস্মরণীয়। আর সে বই-এর নাম—"যখন পুলিস ছিলাম।"

বই নিয়ে আবার বেরোতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এবারও বাধা পড়লো। মাথায় মাড়োয়ারী টুপি, আর যতদূরে মনে হচ্ছে, ফুলপ্যান্ট পরে ঘরে ঢুকলেন, এক তীক্ষ্ণ-নাশা প্রৌঢ়। আমার চিনতে দেরি হয়নি। যাঁর বই বিনামূল্যে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি তিনিই—স্বয়ং ধীরাজ ভট্টাচার্য। একটা চেয়ার নিয়ে বসে পড়লেন। প্রাণখোলা আত্মভোলা মানুষ। পুরো যশুরে টানে বললেন, "এক কাপ চা খেতেই হবে। টালিগঞ্জ থেকে সোজা আসছি।"

প্রকাশক পরিচয় করিয়ে দিলেন। আনন্দে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আমার হাতটা ধরে বললেন, "আহা কি মিষ্টি হাত তোমার। পরিচয় করে বড্ড খুশি হলাম।" আমার যে তাঁর থেকে শতগুণে আনন্দ হচ্ছিল, তা কিছুতেই তাঁকে বোঝাতে পারিনি। উনি বুঝতেও চাননি। বললেন, "আমার বইতে নিজেকে যেন বড্ড জাহির করে ফেলেছি। তোমার তা হয়নি। নিজেকে কেমন সুন্দর-ভাবে একপাশে সরিয়ে রেখেছো।"

একদিনের আলাপ যে এতোদূর গড়াতে পারে, তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা নিজেদের একান্ত পারিবারিক সংবাদ আদান-প্রদান আরম্ভ করে দিয়েছি। ও'র বাবা, ও'র মায়ের কথা

শুনিয়েছেন আমাকে। আমার বাবা, মা, ভাইদের কথাও সব বলে ফেলেছি ও'কে। কি অপরূপ কথা বলার ভংগী। বৈঠকী গল্পের রাজা। অথচ মনের মধ্যে সামান্য জটিলতা নেই, দম্ভ নেই। বললেন, "ভাই, আমাদের কি হবে বলতে পারো?" একটি প্রখ্যাত ইংরিজী সংবাদপত্রে জনৈক বাঙালী সমালোচকের একটি প্রবন্ধের উল্লেখ করলেন। বললেন, "উনি লিখছেন, দেশটা গোল্লায় গেল। সাহিত্যের কমলবনে মত্ত হস্তীরা বিচরণ করছে। সাহিত্যের আভিজাত্য বলে কিছু থাকলো না আর। জেলের প্রহরী, উকিলের মুহুরী, রঙ্গালয়ের নট সবাই ভদ্রলোক সেজে সাহিত্য-মন্দিরে ঢুকছে।" মনে হলো গভীর দুঃখ পেয়েছেন তিনি, লেখকের মন্তব্যে। আমি ও'কে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছিলাম, তার প্রয়োজন হলো না। উনিই আমাকে বললেন, "আমাদের আঘাত সহ্য হয়ে গিয়েছে। তোমরা যেন ভেঙে পোড়ো না।"

সেই থেকেই আলাপ। যতোবার দেখা হয়েছে জড়িয়ে ধরেছেন। বলেছেন, "আমার বাড়িতে এসো একদিন। তুমি আমার ঘরের লোক—যশোর জেলায় বাড়ি—তোমাকে আমি নেমন্তন্ন করতে পারবো না।" তারপর কলেজ স্ট্রীটে বসে বসেই গল্প শুরু হয়ে গিয়েছে। সে কি প্রচণ্ড আড্ডা। কথা যেন শেষ হতে চায় না। তিনি একাই একশ। একাই সকলকে কাঁদিয়ে, হাসিয়ে, চমকিয়ে মাত করে রাখেন। কি বিচিত্র অভিজ্ঞতা! কত অদ্ভুত মানুষকে দেখেছেন তিনি। আর অদ্ভুতভাবেই মনে রেখেছেন তাদের। বৈঠকের সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছেন। উনি বলেছেন, "আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সিনেমা-থিয়েটার করে যারা পেট চালায় তাদের এসব রপ্ত হয়ে যায়।"

সিনেমা থিয়েটার নিয়ে মাথা ঘামাইনি আমি। বলে ফেলেছিলাম, "সেই এলেন সাহিত্যে, কিন্তু বড্ড দেরিতে।" উনি আবার হা-হা করে হেসে উঠলেন। "যা বলেছো ভাই। যা রসকস ছিল টালিগঞ্জ তা নিঙড়ে বার করে নিয়েছে। লিখতে গেলেই কেমন যেন আর্টিফিসিয়েল হয়ে ওঠে। চোখের সামনে দেখি ক্যামেরা 'প্যান' করছে।"

ও'র বোধ হয় বিশেষ কাজ ছিল সেদিন। অনিচ্ছার সংগে বিদায় দিতে হলো। আমার জানা ছিল না, সেদিনই শুনলাম, এর থেকে বিশগুণ রসিয়ে গল্প বলেন উনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়ির আড্ডায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র সবারই প্রেমেনদা। তাঁর এই আড্ডাটিকে বাদ দিয়ে আধুনিক যুগের কোনো সাহিত্য-ইতিহাসই লেখা যাবে না। সিনেমা এবং সাহিত্যকে যারা উজ্জ্বল করেছিলেন, করেছেন বা করবেন তাঁদের সবারই পদার্পণে বিচিত্র এক পরিবেশ গড়ে উঠতো ও'র বাড়িতে। এবং ঐ আড্ডার সংগদোষেই অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের দেহে একদিন সাহিত্যের ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছিল।

আর একদিন দেখা হয়েছিল ও'র সংগে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। সেদিন শনিবার। দেখেই বললেন, "কেমন আছ ভাই?" তারপর আমাকে ও'র সংগে যেতে বললেন। ইউনিভার্সিটি, মেডিক্যাল কলেজকে ডান-দিকে রেখে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। উনি বললেন, "চলো না।" শেষ পর্যন্ত বৌবাজারের এক সোনার দোকানে নিয়ে এসে তুললেন। বললেন, "আমরা সেকেলে হয়ে গিয়েছি। তাই একটা মডার্ন ছোকরা খুঁজছিলাম। দেখি এবার তোমার পছন্দ কি রকম?" এইবার আসল রহস্যটি প্রকাশ করলেন, "প্রেমেনের মেয়ের বিয়ে। আহা বড় ভাল মেয়ে।" অনেকক্ষণ ধরে নানা রকমের অলংকার দেখলেন। আমার মতামত নিলেন। শেষে একটি অলংকার কিনে বেরিয়ে এলাম। বললাম, "এবার চলি।" ধীরাজবাবু ছাড়বার পাত্র নন। বললেন, "চলো, কলেজ স্ট্রীট ঘুরে আসি। এখন বাড়ি গিয়ে কী হবে?" সুতরাং আবার পদযাত্রা। যেতে যেতে বলেছেন, "প্রেমেন যে আমার কি, সে তোমরা জান না।" 'যখন নায়ক ছিলাম' এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়নি। বললেন, "ওতে শুধু নায়ক জীবনের কথা বলেছি। এইবার আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায়ের কথা লিখবো। নাম হবে 'যখন জোয়ার এল'। সে বইতে প্রেমেন সম্বন্ধে অনেক কথা লিখতে হবে।"

কলেজ স্ট্রীটের এক দোকানে বসে, আবার গল্প আরম্ভ করেছেন। সেদিন বেশি লোকজন ছিল না। বললেন, "ভালই হয়েছে। তোমাদের একটা জিনিস পড়িয়ে দিই। 'যখন নায়ক ছিলাম' বইটার ভূমিকাটা লিখে ফেলেছি।" সেইটে পড়ে শোনালেন। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। অমন দরদ দিয়ে আবৃত্তি করতে আমি কখনও কাউকে শুনিনি। আমার শরীরের রোমগুলো

পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে শেষ প্যারাটি। বাঁ হাতে কাগজটা ধরে, তিনি একবার আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর আমাদের সবাইকে ভুলে যেন কোথায় চলে গেলেন। নির্বাক যুগের বোবা নায়ক যেন এ-যুগের নায়কের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বলছেন—"ধীরে, বন্ধু ধীরে, একটু আস্তে—থেমে থমকে চারিদিক দেখে পথ চলো। আজ যে কুসুম বিছানো কংক্রিটের চওড়া রাস্তায় তোমার বেপরোয়া যাত্রা শুরু হয়েছে—একদিন তা ছিল আঁকাবাঁকা, এবড়ো-খেবড়ো—ছিল কাঁটায় ভরতি। আমরা, মানে বোবা যুগের হতভাগ্য নায়কের দল—কাঁটার আঘাত তুচ্ছ করে ক্ষতবিক্ষত হয়েও রোলারের মতো বুকে হেঁটে ঐ রাস্তা করে দিয়েছি সমতল, মসৃণ—কুসুম-বিছানো। কিন্তু বেপরোয়া গতি-বেগ বাড়াতে গিয়ে তোমরা ওটাকে করে তুলেছো বড্ড বেশি পিছল। তাই বলছিলাম—ধীরে, বন্ধু ধীরে।"

পড়তে পড়তে হঠাৎ যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। এবং সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। উপস্থিত ভদ্রলোকদের একজন বলেছিলেন, "অভিনেতার পড়া, সাধারণের থেকে তো ভালো হবেই।" কি জানি, হয়তো তাই। হয়তো আমি কেবল তাঁর বাচন ভঙ্গিতেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিল, কি সত্য ভাষণ। শুধু সিনেমা কেন? সে যুগের সাহিত্যিক, সে যুগের দেশপ্রেমিকও তো ঐ একই কথা বলতে পারেন। আমার মনে হলো, প্রাচীন পৃথিবী যেন নবীন সভ্যতাকে ডেকে বলছে, ধীরে, বন্ধু ধীরে।

তারপরও কয়েকবার দেখা হয়েছে তাঁর সঙ্গে। সব সময়ই হাসিমুখ। সব সময়ই যেন হৈ হৈ হট্টগোলে ডুবে থাকতে চান। মনে মনে আনন্দ পেয়েছি। এই তো হওয়া চাই। মনের সেই ভাব নিয়েই ১৯৫৯ সালের ১লা মার্চ পর্যন্ত ছিলাম। খবর পেয়েছি ধীরাজবাবু অনেকদিন থেকেই অসুস্থ। লিভারের সিরোসিস। নিজেদের অতিমাত্রায় বিজ্ঞ মনে করেন, এমন কয়েক-জন বলেছেন, "অভিনেতা ও সিরোসিস ওতো pair of wordsএর মতো। লিভারকে যারা কষ্ট দিচ্ছে, লিভার তাদের ছাড়বে না, প্রতিশোধ নেবেই।"

অতিবিজ্ঞরা চিরকালই পৃথিবীতে থাকবেন। তাঁদের কথাতে কান দিইনি। বিষণ্ণ মন নিয়েই রবিবারের বিকেলে হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে ও'র বাড়িতে হাজির হয়েছি। বাইরের ঘরে বসে থাকতে হলো কিছুক্ষণ। কিন্তু ক্লান্তি লাগেনি। টেবিলের কাঁচের তলায় অসংখ্য ছবি। যৌবনের ধীরাজ ভট্টাচার্য বিভিন্ন ছবির রূপসজ্জায়। এই প্রথম দেখলাম নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্যকে। সত্যি এতো সুন্দর দেখতে ছিলেন। কোনো একটি ছবিতে নায়িকার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন ধীরাজ। সত্যই অসাধারণ। 'যখন নায়ক ছিলাম' আমি পড়েছি। তার 'মাকাল ফলের' মতো রাঙা দেহ আর ঝাবরী চুলের জন্য কত দুঃখ করেছেন। কিন্তু সে দুঃখ কি এই দেহের জন্যে? বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য। অভিনেতার আত্মজীবনীতে অভিনয়ের একটি ছবিও স্থান পায়নি। যা শুধু অবাক হয়ে দেখবার, তার পরিবর্তে শুধু ঝুড়ি ঝুড়ি কথা।

এবার ডাক এল। ওপরে যেতে পারি আমরা। সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। কিন্তু এ কি! খাটের দিকে তাকিয়ে আমার সমস্ত মাথাটা যেন ঘুরে উঠলো। যে ছবিগুলো এইমাত্র দেখে এলাম, সে কি বিধাতার পরিহাস। কোথায় সেই ধীরাজ ভট্টাচার্য? বিছানায় পড়ে রয়েছে চামড়া দিয়ে ঢাকা একটি কঙ্কাল। কোথায় সেই কাঁচা সোনার মতো রঙ। চামড়ার উপর কে যেন কালো কালি মাখিয়ে দিয়েছে। চামড়ার মধ্য দিয়েও মুখের ভিতরের কঙ্কালটা যেন দেখতে পাচ্ছি। চুলগুলো রুক্ষ। বড় বড় চোখ-দুটো আজও রয়েছে। কিন্তু কোনো উজ্জ্বলতা নেই, যেন ধোঁয়াতে আচ্ছন্ন রান্না-ঘরের পঁচিশ পাওয়ারের বাতি। দেহটা চাদরে ঢাকা—কিন্তু পেটটা যে দশগুণ বড় হয়ে উঠেছে, বেশ বোঝা যায়।

আমাকে যেন দেখতে পেলেন না ধীরাজ ভট্টাচার্য। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন, দেওয়ালে বাঁধানো তাঁরই একটা ছবির দিকে—নায়ক ধীরাজ ভট্টাচার্য, সেখানে যৌবনের ভরা জোয়ার। হঠাৎ যেন ভেঙে পড়লেন। "বিশ্বাস কোরো না, এই দেহটাকে বিশ্বাস কোরো না। তোমরা বল, ঐ আমি আর এই আমি কি এক?"

হঠাৎ সামলে নিলেন নিজেকে। দরজার কাছে, কে যেন এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁকে দেখেই চিনতে পেরেছি। ধীরাজ ভট্টাচার্যের মা ছাড়া তিনি আর কে হতে পারেন? যে ভদ্রলোক ধীরাজবাবুর সেবা করছিলেন তিনি, একটা দুধের কাপ নিয়ে এলেন। ধীরাজ ছোটছেলের মতো বললেন, "এতোটা ...না, অতোখানি আমি খেতে পারবো না।" লোকটি বললে, "মা বলছেন খেতে।" "ও, মা বলছেন"—আর কোনো আপত্তি করলেন না, ধীরাজবাবু। এক অনাস্বাদিতপূর্ব প্রশান্তিতে আমার মন ভরে উঠেছিল। মা ও ছেলের এমন রূপ, যে দেখে সে ধন্য, যে

শোনে, বোধ হয়, সেও ধন্য। কৌতূহলী পাঠককে 'যখন নায়ক ছিলাম' গ্রন্থখানি আর একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করি। মাতা-পিতার প্রতি এমন অকৃত্রিম অনুরাগ ইদানীংকালের আর কোনো রচনাতে লক্ষ্য করেছেন কি?

দুধের কাপটা ফিরত দিয়ে, বললেন, "মা আমাকে রোজ তিন সের করে দুধ খাওয়ান। খাই আমি...মার কষ্ট যে দেখতে পারি না, ভাই।"

আমি তাঁর খবর নেবার জন্যই গিয়েছিলাম। কিন্তু চরম রোগযন্ত্রণার মধ্যেও পুরনো ধীরাজ ভট্টাচার্য নষ্ট হয়ে যাননি। আমার বই-এর খবর জিজ্ঞাসা করলেন। সিনেমা কতদূর এগুলো জানতে চাইলেন। লজ্জায় মাথা নত হয়ে আসছিল আমার। ভাইপোকে ডেকে পাঠালেন। এই ভাইপোটিই নিঃসন্তান ধীরাজবাবুর নয়নের মণি। তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছেন বুঝতে পারছি। তবু আলাপ করিয়ে দিলেন। বললেন, "ওদের হাতে-লেখা কাগজে একটা লেখা দিয়ো ভাই। ওর যে কি মুশকিল। সবাই বলে, তোমার জেঠু থাকতে আমাদের পত্রিকায় লেখা পাওয়া যাবে না? অথচ কিছুই করে উঠতে পারি না।"

বাঁচবার সে কি উদগ্র কামনা। আমার সুস্থ হয়ে উঠবেন, আবার অভিনয় করবেন। আবার যশোরে যাবেন, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন। যশোরের অবলাকান্ত মজুমদারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন। যশোরের ছেলে আমি, শুনলে অবলাবাবু যে কি খুশীই হবেন। যশোর থেকে আমরা সোজা পাঁজিয়ায় চলে যাবো। চারটে রাত পর পর অভিনয় হয়তো করতে পারবেন না। ডাক্তার বারণ করবে, মাও রাগ করবেন। কিন্তু নবমীর রাত্রে আদর্শ হিন্দু হোটেলটা একবার করবেনই।

উৎসাহিত হয়ে লেখার কথা তুললাম। 'যখন জোয়ার এল' কবে লিখবেন? উনি গম্ভীর হয়ে উঠলেন। "না ভাই, ও বইতে অনেকের সম্বন্ধে অপ্রিয় মন্তব্য করতে হবে। 'লাইনে' থেকে লেখা চলবে না। রিটায়ার করে লিখবো।"

হা ঈশ্বর, এখনও উনি 'লাইনে' রয়েছেন! তারপর উনি রিটায়ার করবেন। এইতো জীবন!

এতোক্ষণ আমরা দু'জন মাত্র ঘরের মধ্যে ছিলাম। আরও দু'জন ঘরে ঢুকলেন। তাঁদের চিনি না। ভাবে বুঝলাম, ও'র বিশেষ পরিচিত। নিকটতম আত্মীয় বা বন্ধুদের কেউ হবেন।

ও'রা বললেন, "বেজায় কাজের চাপ' তাই আসতে পারিনি।"

অভিমানী ধীরাজ ভট্টাচার্য বললেন, "তোমাদের দোষ নেই। নিত্য নেই দেয় কে? নিত্যরোগী দেখে কে?"

ও'দের দেখেই তিনি যেন কেমন হয়ে পড়লেন। চোখের কোণে জলের ফোঁটা। আমার দিকে তাকিয়ে সকরুণভাবে বললেন, "সারাজীবন শুধু আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলাম, ভাই। জীবন আমাকে কিছুই দিল না। শুধু বঞ্চনা।" নিজের দুঃখের কথা এই প্রথম শুনলাম তাঁর মুখে। বললেন, "অভিনয়? প্রশংসার বদলে, সেখানে পেয়েছি সমালোচনার নিষ্ঠুর কশাঘাত। সাহিত্য? লোকে বলেছে ধীরাজ ভট্টাচার্য লিখবে ঐ বাংলা! নিশ্চয় কেউ লিখে দিয়েছে।"

একটু থামলেন তিনি। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। পেটের উপর হাত রেখে আবার বললেন, "সব সহ্য করতে পারি আমি। কিন্তু বঞ্চনা...নাঃ,... বড় কষ্ট পেলাম, ভাই।"

বড় ক্লান্ত মনে হলো ধীরাজ ভট্টাচার্যকে। কত কিছু যেন বলার আছে। জীবনের কাছে কি যেন চেয়েছিলেন, অথচ পাননি। ও'র আত্মীয়রাও তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝলাম, তাঁরা কিছু বলতে চান ও'কে। সেই অবস্থায় আমার উপস্থিতি অস্বস্তিকর হতে পারে মনে করেই উঠে পড়লাম।

ধীরাজবাবু বললেন, "আবার আসবে তো ভাই?" বললাম, "নিশ্চয়ই আসবো, এবং খুব শীঘ্রই আসবো।"

মনে হলো, আমাকে তিনি বিশ্বাস করলেন না। মাথার কাছে রাখা টেলিফোনটা দেখিয়ে বললেন, "অন্ততঃ টেলিফোনে কোরো। করবে তো, কথা দাও।" নিজেই ওর নম্বরটা দিলেন—৪৮।১৩১৩। বললেন, একটা তেরো নয়, দুটো...doubly inauspicious."

বুধবার বিকেলে, কিংবা বৃহস্পতিবার সকালে টেলিফোন করবো কথা দিয়ে, বেরিয়ে এলাম। আমার তখনকার মানসিক অবস্থার বর্ণনা করা অসম্ভব। বাইরের আগুনে একটি প্রাণ যেন পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। অথচ সবই পেয়েছেন তিনি। মনে পড়ছিল সেই বিখ্যাত কবিতাটি—

"জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম-শিশু-গৃহ নয় সবখানি।
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে।"

হাওড়ার পথে ট্রামে বসে ভেবেছি, কে তাঁকে ক্লান্ত করেছে? কেন তিনি হঠাৎ ভেঙে পড়লেন? ওখানে জিজ্ঞাসা করা হয়নি, কিন্তু টেলিফোনে জেনে নেবো।

বুধবার ব্যক্তিগত কয়েকটি কাজে ছুটোছুটি করেছি, টেলিফোন করা হয়ে ওঠেনি। বৃহস্পতিবার সকালেই টেলিফোন করেছিলাম। কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। তার কিছু আগেই সজ্ঞানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য। আমাদের সকলকে অবজ্ঞা করে একটি জলের পোকা আবার জলে ফিরে গিয়েছে।

তের
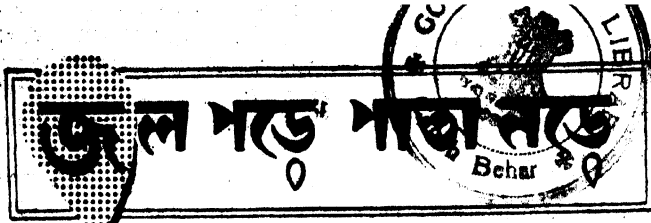
রামকিষ্টো মেছোহাটায় গিয়ে ছোলেমানকে খুঁজে বের করল। দেখল ছোলেমান, ছিরিপদ কৈবত্ত আর বুনো পাড়ার বিধু সদ্দার একত্র বসেছে। বুঝল, তিনজনে আজ জোট বেঁধে মাছ ধরতে গিয়েছিল। রামকিষ্টো খালুই এগিয়ে দিতেই ছোলেমান হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। রেখে দিল তার পাশে।

রামকিষ্টো বলল, "মা'জেবাবুর খালোই। কি মাছ ধরলি আ'জ ?"

ছোলেমান বলল, "ঐ দুই কল্লার পাল্লায় প'ড়ে আজ জান বেরোয়ে গেছে চাচা। সারাদিন জাল বয়ে পালাম গিয়ে তুমার শো'ল আর সরপুঁটি। শো'লগুলো বাড়িতি নিয়ে তো ছালুন রাঁধে খাতি হবে। হাট ভর্তি শো'ল, কেনবে কেডা ? সরপুঁটিগুলোই যা ভরসা। বড়ই আছে। চার আনা পাঁচ আনা কুড়িডউ যদি বেচতি পারি, তালি আড়াই দু টাকা হতি পারে।"

রামকিষ্টো বলল, "গিছিলি কোন পালি ?"

ছোলেমান টিটকিরি কাটল, "ঐ যে ছিরিপদ, উনি আ'সে খবর দেলেন, আঠারোখাদার বিলি রুই মাছ, কাতল মাছ, উনার হাতে ধরা পড়ার জন্যি ছটফট ছটফট করতিছে—"

ছিরিপদ বলল, "দ্যাখ ছুলেমা'নে তুই তখনের থে আমার কুষ্টি কাটতি বসিছিস, ইবারে ছাড়ান দে। আচ্ছা কওদিন রামকিষ্টো দাদা, জলের মনে কি আছে কেউ কতি পারে ? সবাই কয়, আঠারোখাদার বিলি বড় মাছ আছে। ভাবলাম দে'খে আসি, তাই তিনজনে গা'ছো জাল নিয়ে গিছিলাম। সত্যি দিনডা একেবারে মাঠে মারা গেছে।"

বোকার মত হাসতে লাগল ছিরিপদ। গা জ্বলে গেল ছোলেমানের।

বলল, "ক'স নে, ক'স নে, বড় মুখ করে ও কথা ক'স নে ছিরিপদ। শুনলি, লোকে তোর জন্মে সন্দ করবে। পানি দেখে মাছের তল্লাস নিতি পারিস নে, সে কথা আবার জানান দিতিছিস্। তুই ঠিক ঠিক কৈবর্তের ছাওয়াল তো ?"

এইবার ছিরিপদ বেশ রেগে গেল। বলল, "দ্যাখ, ফের যদি একটা কথা ক'স, এই কোচের এক ঘায় তোর মুখির দফা রফা করে দিবানে।"

বিধু সদ্দার বলল, "লাও ভাই লাল সুতোর বিড়িটো খাও, খে'ইয়ে মেজাজটো ঠান্ডা করো। লাও রামকিষ্টো ভাই, তুমহিও একটো ধরাও। ঝগড়া রাগ করলে শো'ল পুঁটি তো রুই কাতলা হ'য়ে উঠবে নাই।"

বিড়ি ধরিয়ে রামকিষ্টো বলল, "সরপুঁটি এক খালুই রাখিস ছোলেমান। মা'জেবাবুর জন্যেরে আমি এক্ষুনি আসতিছি।"

কোঁচেগুলো হাতে নিয়ে রামকিষ্টো ভিড় ঠেলে ঠেলে মেজকত্তার সন্ধানে বিশ্বেসদের দোকানের দিকে চলতে লাগল।

হাটের মধ্যে কেন, এই অঞ্চলের মধ্যেই বিশ্বেসদের দোকান সব থেকে বড়। বছর তিরিশ আগে অনুকূল বিশ্বেস এই দোকানের পত্তন করে। তার ছেলে মকর বিশ্বেস বুকের রক্ত ঢেলে দোকানটাকে এমনিভাবে বাড়িয়ে তোলে। মকর বিশ্বেসের বয়েস হয়েছে লোহাজাঙগার তাঁতি সমাজের সে এখন মাতব্বর ব্যক্তি। হাটবারে ভিড় বেশি হয়, ছেলে গোপাল বিশ্বেস যথেষ্ট লায়েক, সে-ই এখন দোকানের কাজ-কর্ম দেখে, তবু হাটবারের ভিড় ঠেকাতে এখনও বুড়ো এসে দোকানে বসে।

লোকে বলে মকর বিশ্বেসের টাকার সীমা নেই। বুড়ো হাড়-কেপ্পন। হাত দিয়ে জল গলে না। কিন্তু বিশ্বেসরা যে কোথায় টাকা রাখে সে সন্ধান কেউ জানে না। পড়েছে, একটা তামার পয়সাও কোনওবার পড়েছে, একটা তামার পয়সাও কোনবার

কেউ পায়নি। হাটের দোকান দুবার লুঠ হয়েছে, মাল ছাড়া নগদ টাকা মেঝে খুঁড়েও পাওয়া যায়নি।

বিশ্বেসদের দোকানের তিনটে ভাগ। এক পাশে কাপড়জামার দোকান, মাঝখানে মনোহারী, সাইকেল, তেল আর অন্য পাশে মুদীখানা।

গোপাল বিশ্বেস যুবক। বয়েস তিরিশ বত্রিশ। কিন্তু হাবেভাবে প্রৌঢ়। কালো মোটা চেহারা। পরনে ফিনফিনে রেলির ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ধুতি। তবুও তা পরার গুণে হাঁটুর উপর উঠেছে। গায়ে মলমলের পাঞ্জাবি, বোতামের ঘর বাঁ-কাঁধের দিকে। সোনার চেন বোতাম। হাতের আট আঙুলে আংটি। গলায় সরু চেন হার। পরিপাটি পাতা কাটা সিঁথি। খুব পান খায় গোপাল।

দোকানের মাঝখানে উঁচু বেদী। আগে এখানে মকর বিশ্বেস আটহাতি মোটা ধুতি আর ফতুয়া পরে একা একা বসত। এখন গোপাল সেখানে নবরত্ন সভা বসিয়েছে। জাতে তাঁতি হলেও, সেই এখন ও অঞ্চলটে হিন্দু সমাজের মাথা। সরকার মশাই, স্থান কবিরাজ, বুদো ভুঁয়ে, ইন্তক [illegible] ঠাকুরও গোপালের সভায় নিয়মিত সভাসদ। গোপাল আগরওয়ালাকে গ্রাহ্য করে না। এখানে ওর কোন সমাজ নেই। মেন্দা ছাহেবের গদির দিকেই গোপাল আড়চোখে মাঝে মাঝে চায়। ধনে দৌলতে নয়, মানে মর্যাদায় লোকটা দিন দিন বাড়ছে। সরকারের ঘরে মেন্দা ছাহেবের খাতির খুব। ঐ জায়গায়টায় গোপাল হার মেনেছে।

নইলে ওর তুল্য কে? এই হাটের ইজারা ওর, খেয়াঘাটের ইজারা ওর, কেরাসিন তেলের সোল এজেন্সি ওর। সমাজের বামুন-কায়েত ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ইচ্ছে করলে আঙুলের ইশারায় ওঠবোস করাতে পারে তাদের। কিন্তু সে ইচ্ছেই করে না গোপালের, কখনও করাবেই না। ব্রাহ্মণ বর্ণের শ্রেষ্ঠ, এ বিধির বিধান। সে বৈশ্য। বিদয় ঠাকুর বিধান দিয়েছেন বৈশ্যের জল, বিশেষ করে লক্ষ্মীর যে বরপুত্র, তার হাতের জল, সমাজে চল। বাপের উপর এইখানেই টেক্কা মেরেছে গোপাল। তার পরিবারকে সমাজে উঠিয়েছে। তার ছেলের অন্নপ্রাসনে ব্রাহ্মণ এসে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন। কায়স্থ বৈদ্য পাতা পেড়ে খেয়ে গিয়েছেন। আর তার জন্য গোপালকে বিদ্রোহ করতে হয়নি, ঘটা করে শুদ্ধি আন্দোলন করাতে হয়নি, ভিক্ষুকের মত কারো কৃপাপ্রার্থীও হতে হয়নি। শুধু সে একবার মনের ইচ্ছা সবিনয়ে প্রকাশ করেছিল মাত্র। শাস্ত্রমতেই সমাজ আপনা থেকেই তাকে কোলে তুলে নিয়েছে। এখন, সত্য বলতে কি, গোপালই এখানকার সমাজ। হাটের ইজারা খেয়া-ঘাটের ইজারা, কেরাসিন তেল, করোগেট টিন আর সিমেন্টের সোল এজেন্সি যেমন তার, গোপাল জানে, এই সমাজও তেমন তার, তারই। তার এখন একটিমাত্র বাসনা, সরকারের সঙ্গে একটু দহরম-মহরম করে। কিন্তু সেখানে যে ঐ মেন্দাটা আগে থেকেই পাত বিছিয়ে বসে আছে। লোকে যে বলে, নাড়েরা বড্ড সরকারের পা-চাটা হয়, তা সে কথাটা নিতান্ত মিথ্যে নয়। মেন্দা ব্যাটা আবার তা' সবার ঘাড়ে হাগে।

মেজকত্তা দোকানে ঢুকেই দ্যাখেন গোপালের মজলিস্ বেশ জমেছে। বুদো ভুঁয়ে হাত-পা নেড়ে কি যেন বলছিল, মেজ-কত্তাকে দেখেই কল কল করে উঠল।

"আসেন আসেন মাজে খুড়ো। বসতি আজ্ঞে হয়। ও গুপাল, তুমার এখেনে তো আবার চা'র বন্দোবস্ত নেই, মানী লোকরা আসবে ক্যান তুমার এখেনে, তা মাজে খুড়োর জন্যি টিকে ধরাতি কও।"

গোপাল গম্ভীরভাবে হুকুম দিল, "ওরে, খুড়ো মশাইরি তামুক দে।"

বুদো ভুঁয়ে বলল, "শুধু খুরো ঠ্যাকালি আজকাল আর চলবে না গুপাল, বুঝিছ, চা'র ব্যবস্থাও করে ফ্যাল। সত্যিই মেন্দার তুলনায় আমাগের আসরডা যেন শুষ্কং কাষ্ঠং, কি কম ম্যান মশাই?"

মেজকত্তা হাসতে হাসতে খোঁচাটা হজম করলেন।

বললেন, "সর্বনাশ! বুদো, তুমিও কি চাচার চর হয়ে উঠলে? সবাইকেই ঐ দলে ভেড়াবে নাকি শেষ পর্যন্ত!"

বুদো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল।

বলল, "ক্যান খুড়োমশাই, ও কথা কলেন ক্যান?"

মেজকত্তা বললেন, "এক চা দুবার চাইলেই তো চাচা হয়ে গেল হে।"

সভাসুদ্ধ সবাই হো-হো করে হেসে উঠল। বুদো ভুঁয়ের যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। বোকার মত হাসতে লাগল সে।

সরকার মশাই বললেন, "মা'জেবাবুর বোড়ের চালেই আমাগের বুদোবাবু মাত।"

মেজকত্তা বললেন, "গোপাল মণ দুয়েক চাল পাঠিয়ে দিও তো।"

সরকার মশাই বললেন, "কম কি মাজে-বাবু, ম্যাওলান বাড়ির এই অবস্থা হয়েছে নাকি আজকাল? এখনই চাল কিনে খাতি হচ্ছে?"

মেজকত্তা বললেন, "ভালপুকুর হয়ে উঠেছে দেওয়ানবাড়ি। ঘটিও ডুবছে না। গোপাল, আর এক টিন কেরাসিন তেল পাঠিয়ে দিও।"

গোপাল বলল, "খুড়োমশাই, কেরাসিনির টিন পরশু পালি কি খুব অসুবিধে হবে। সাদা তেল আর নেই। কুঠির সাহেবের ওখেনে চার রাত্তির যাত্তারা হবে। সকালে লোক পাঠায়ে বার টিন তেল নিয়ে গেছে।"

সবাই অমনি "কুথাকার দল, কুথাকার দল" করে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

গোপাল বলল, "কলো তো ছিরিচরণ ভাণ্ডারীর দল।"

তামাক দিয়ে গেল। মেজকত্তা দুটান দিতে না দিতেই রামকিস্তো এসে হাজির।

বলল, "মা'জেবাবু, দুধ কিনিছি। ছোলেমান ভাল সরপুঁটি আ'নেছে। খালোই রাখে আইছি। নেবেন নাকি?"

মেজকত্তা বললেন, "একখালোই ন্যাও গে যাও, আমি আসছি।"

রামকিস্তো বেরিয়ে যেতেই দোকানের এক কর্মচারী এসে জানাল, কত্তাবাবু মেজকত্তাকে ডেকেছেন।

যেখানে কাপড় বিক্রি হয় মকর বিশ্বেস এখন সেখানে বসেন। মেজকত্তা আসতেই তাঁকে একেবারে পাশে নিয়ে বসালেন।

এখনও তাঁর পরনে সেই চিরকেলে সাজ, সেই আটহাতি ধ্যুতি আর ফতুয়া।

মকর বিশ্বেস বললেন, "এই যে মহি, আহির খবর কি? আজকাল আর বেরোয় টেরোয় না, না কি? অনেকদিন দেখিনি।"

মেজকত্তা বললেন, "ম্যালেরিয়া ধরে বড়দাকে খুব কাবু করে দিয়েছে। পারত-পক্ষে বেরোন না।"

মকর বিশ্বেস জিজ্ঞাসা করলেন, "শীতল কনে এখন? ওর বউ নাকি সুস্থ হয়েছে একটু? সেই রকম যেন শুনলাম।"

মেজকত্তা বললেন, "শীতল এখন কালিগঞ্জ থানায় আছে। লিখেছে তো, শিগ্‌গির মাগরোয় বদলি হবে। তখন একবার বাড়ি আসবে। তা ওর কথা—"

মেজকত্তা থামলেন একটু।

তারপর বললেন, "ছোট বউমার ব্যাপারটা বড় আশ্চর্য। দশ বছর ধরে কত রকম চিকিৎসেই তো হল। কিন্তু কিছুতেই ভাল হলেন না। বুড়ির ছেলে হবার সময় কি যে হ'ল, একেবারে ভাল হয়ে গেলেন।"

মকর বিশ্বেস বললেন, "সব তাঁরই ইচ্ছে। কিসির থিকে যে কি হয়, বুঝা ভার। তা তুমার নাতি যাবে কবে? যাব যাব ভাবি নাতিরি দেখতি, তা সুমায় আর ক'রে উঠতি পারিনে। জামাই কি আয়েছেন?"

মেজকত্তা বললেন, "চিঠি এসেছে জামাইয়ের। আর কি, এসে পড়লেন ব'লে।"

মকর বিশ্বেস বললেন, "তুমার আর ছুটি কদিন আছে?"

মেজকত্তা বললেন, "ছুটি তো ফুরিয়েছে অনেকদিন। কাজে যাবার আর ইচ্ছে নেই। ভালও লাগে না, এই বয়সে বিদেশে একা একা পড়ে থাকতে। ভাবছি, এবারে গিয়ে ইস্তফা দেব।"

মকর বিশ্বেস বললেন, "তবে তো বড় সুমায় তুমারে ডাকিছি। সবই দেখছি ভগবানের ইচ্ছে। দ্যাখ মহি, অনেকদিন ধ'রে একটা কথা ভাবতিছি। আমাগের ধারে কাছে কোন ইস্‌কুল নেই। হয় মা'গরো আর না হয় গাঙ পেরোয়ে সেই হরিশঙ্করপুর। ইস্‌কুলির অভাবে এদিককার ছেলেপেলেরা মুখ্যু হয়ে থাক-তিছে। আমার ইচ্ছে একটা ইস্‌কুল হোক। টাকা দু পাঁচ হাজার লাগে, আমি দিবানে। আমার ভাবনা, ম্যাও ধরে কেডা। এখন তুমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভগবান হয়ত কাজডা করায়িউ করাতি পারেন। তুমি তো চাকরি ছাড়বারই ঠিক করিছ এখন ভাবে দ্যাখ, ব্যাগারডা থাটবা কি না?"

মকর বিশ্বেস চুপ করলেন। মেজকত্তা অপ্রত্যাশিত এ প্রস্তাবের জবাব চট করে দিতে পারলেন না। এই গ্রামে ইস্‌কুল করা, এ যে তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন। কিন্তু মকর বিশ্বেস এতদিন চুপ করে ছিল কেন? এখন তাঁর যৌবন বয়ে গিয়েছে, ভাটা পড়েছে উৎসাহ উদ্যমে? দেহযন্ত্রের নাট বল্টু আলগা হয়ে পড়েছে। এই শিথিল শরীর নিয়ে পারবেন কি এত বড় একটা দায়িত্বের ভার কাঁধে তুলে নিতে?

মকর বিশ্বেস বললেন, "এদিককার কেউ যদি এ কাজ পারে, তবে একমাত্র তুমিই পারবা। তুমি একটু ভা'বে দ্যাখ। যাওয়ার আগে জবাব দিও।"

মেজকত্তা কি একটা জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হাটের মধ্যে তুমুল গণ্ডগোল বেধে গেল।

ছোলেমানকে নিয়েই হাঙ্গামাটা পাকাল।

হাটের গোমস্তা নিরাপদ। রিসয় ঠাকুরের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। যেমন মাতাল তেমনি লোভী। ওর তোলা তোলার বিরুদ্ধে হাটসুদ্ধ ব্যাপারির মনে নালিশ জমে আছে। দুটো পেয়াদা নিয়ে হাটময় ঘুরে বেড়ায়, আর যার যা ভাল জিনিস, থপাথপ করে তুলে নিয়ে ধামায় ফেলে।

ছোলেমানের ডালায় বড় বড় সরপুঁটি দেখে লোভ সামলাতে পারেনি নিরাপদ। থপথপ করে চারটে মাছ তুলে নিতেই ছোলেমান "আরে আরে ঠাউর কর কি" বলে তার হাত থেকে মাছ কেড়ে নিয়েছে।

বলল, "মা'রে দিলি বড় ভাগটা না!"

নিরাপদ নেশায় টলছিল। তার মাথায় রক্ত চড়ে গেল।

চেঁচিয়ে বলে উঠল, "শালা নিকিরি, তোর এত বড় আস্পদ্দা, আমার হাটে ব'সে তুই আমার গায় হাত তুলিস। বামন হয়ে চাঁদ পাড়তি চা'স। বেচাচ্ছি তোর মাছ।"

নিরাপদ একটানে ডালার মাছ মাটিতে ফেলে দিল, আরেক টানে চুবড়ির মাছ দিল ছড়িয়ে। তারপর বড় বড় সরপুঁটি-গুলোকে দু পায়ে মাড়াতে লাগল।

আর বলতে লাগল, "ব্যাচ শালা মাছ ব্যাচ, ব্যাচ মাছ ব্যাচ্।"

আকস্মিক এই ব্যাপারে ছোলেমান থ হয়ে গেল। কিছু বুঝতে পারছিল না সে। তার চোখের সামনে চকচকে মাছগুলো শিলা বৃষ্টির মত ছড়িয়ে পড়ল। এই দ্যাখ করে কি, লাথি মেরে মেরে মাছগুলোর করে কি ঠাউর? একটু আগেই মাছগুলো তার ডালায় ছিল। রুপোর মত চকচক করছিল সরপুঁটিগুলো। পড়ন্ত রোদ্দুরে কি সুন্দর জেল্লা বেরুচ্ছিল ওগুলোর গা দিয়ে। ছোলেমান দেখল, মাছগুলো হঠাৎ যেন তার ডালা থেকে উড়ে গিয়ে প্যাচপেচে কাদায় গিয়ে পড়ল। যাঃ, ডালির মাছ-গুলোও গেল। ঐ যে, ঠাউর কি নিষ্ঠুর আক্রোশে পা দিয়ে দিয়ে থেঁতলে দিচ্ছে। আহা, অমন রুপোর শরীর কাদা লেগে কালো হয়ে উঠল। এই দ্যাখ, প্যাট প্যাট করে কেমন পিস্তি গলে যাচ্ছে! হঠাৎ তার মনে পড়ল মাছগুলো তার। তার আজকের পেটের ভাত জোগাবার একমাত্র সামগ্রী। আর তার ঐ দশা। বিস্ময়ের ভবটা কেটে যেতে লাগল ছোলেমানের। তার মাছের ঐ দশা করছে! ঐ মাতাল, বদমায়েশ তারই চোখের উপর তার সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলকে লাথিতে লাথিতে ঐভাবে বরবাদ করে দিচ্ছে।

খাবে কি সে? কিসের ভাগ দেবে ছিরি-পদকে? বিধু সন্দারকে?

হঠাৎ যেন ছোলেমানের ভাবনা চিন্তা বন্ধ হয়ে গেল। তার মাথাটা খালি, একে-বারে খালি হয়ে গেল। এক সেকেন্ড, দু সেকেন্ড, তিন সেকেন্ড। তারপর—

প্রচণ্ড ক্রোধের আগুন ছোলেমানের মগজে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। চৈত্র মাসে খড়ের ঘরে যেন আগুন জ্বলে উঠল। দমকে দমকে বেড়ে উঠল সে আগুন। ছড়িয়ে পড়ল তার শিরা উপশিরায়। খুন চেপে গেল তার। চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুতে লাগল।

বাঘের মত হুঙ্কার দিয়ে উঠল ছোলেমান, "শালার বামুন, তোর গুষ্টির জাত মারি।"

বাঘের মতই লাফিয়ে পড়ল নিরাপদর ঘাড়ে। ছোলেমানের এক চড়ে "বাবাগো" বলে নিরাপদ উল্টে পড়ল। ছোলেমান তার বুকে হাঁটু দিয়ে গলা টিপে ধরল। পেয়াদা দুটো প্রথমে হকচকিয়ে গিয়েছিল। সামলে নিয়ে তারাও ঝাঁপিয়ে পড়ল ছোলেমানের উপর। লাথি কিল চড় সমানে মারতে মারতে নিরাপদকে অতিকষ্টে ছোলেমানের কবল থেকে রক্ষা করল। লোকজনের ভিড় বাড়ল। মজা দেখতে অনেকে এগিয়ে এল। সাবধানীরা দশ হাত দূরে পালাল। লোকের পায়ের চাপে ছোলেমানের মাছের ডালা চুবড়ি, মেজকত্তার খালুই এক সঙ্গে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। এদিক ওদিক ছড়ান মাছ কিছু পায়ে পায়ে থেঁতলে গেল। কিছু গেল লোকের হাতে হাতে।

একটু দূরে, একটা পাগল গাছের ডালে সরসর করে উঠে গিয়ে নাচতে নাচতে বগল বাজাতে লাগল, "লাগ ভেল্কি লাগ, ঘুরে ফিরে লাগ, কার আজ্ঞে, বাবা নারদের আজ্ঞে।"

এক সময় পা ফস্কে পড়ে গেল পাগল। তখন সেদিকে সোরগোল উঠল। কিছু লোক দৌড়ল সেদিকে, কিছু লোক ভাগল।

রামকিষ্টো দু হাতের জোরে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে যখন মেছো হাটায় এল, তখন ছোলেমানের অবস্থা বেশ খারাপ। মারের চোটে তার কপাল ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে। দুটো যমদূতের মত পেয়াদা তাকে চ্যাং দোলা করে নিয়ে চলেছে বিশ্বেসদের দোকানে। নিরাপদর গাল ফুলে গেছে, নেশাও ছুটেছে। সে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে। আর পেয়াদা দুজনের আগে আগে যাচ্ছে। ছোলেমান পাথরের মূর্তির মত চুপ করে আছে। তা[র] চোখ দিয়ে শুধু আগুন ছুটেছে।

বিশ্বেসদের দোকানের সামনে ভিড় আ[র] ধরে না। পেয়াদা দুটো ছোলেমানে[র] হাত দুটো গামছা দিয়ে পিছমোড়া ক[রে] বেঁধে রেখেছে।

নিরাপদ কাঁদতে কাঁদতে নালিশ করল ছোলেমান তোলা দিতে চায়নি। সে অ[তি] ভদ্রভাষায় বলেছে, তোলা না দিলে হাটে[র] মালিকের চলবে কি করে। তার উত্তরে ছোলেমান অশ্রাব্য ভাষায় বাপ মা তুলে গালাগাল দিয়ে তাকে বেদম মেরেছে। পেয়াদা দুটো না থাকলে আজ নিরাপদর হয়ে যেত।

শোনামাত্র বুদো ভুঁয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কি, না'ড়ে হয়ে বামুনের গায়ে হাত তোলা, এত বাড় বা'ড়েছে না'ড়েরা! দেশে আর বাস করা যাবে না দেখছি! গুপাল এর নেহ্য বিচার তুমার করতি হবে।"

গোপাল নিরাপদর নালিশ শুনেই ঘটনার মধ্যে মেন্দা ব্যাটার উস্কানি আবিষ্কার করে ফেলেছে। নইলে সামান্য নিকিরি তোলা দিতে অস্বীকার করে! এত সাহস পায় কোথায়!

গোপাল নেমে এসে হুঙ্কার দিল, "শালা, তুমি ভাবিছ, বড় গাছে দড়া বাঁধিছ না? নিরাপদ, মার শালার মুখি দশ ঘা জুতো।"

ছোলেমান বলতে গেল, "বাবু——"

বুদো ভুঁয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "চোপ শালা।"

সে কথা শোনামাত্র নিরাপদ বীর বিক্রমে এক পাটি জুতো তুলে নিয়ে পটাপট করে মারতে লাগল ছোলেমানের মুখে। একটা কথাও বলল না ছোলেমান। কোন প্রতিবাদ করল না।

মেজকত্তা এসে মাঝপথে নিরাপদকে থামিয়ে দিলেন। তার মুখ চোখ থমথম করছে।

গোপালের দিকে চেয়ে শুধু বললেন, "গোপাল ওকে ছেড়ে দিতে বল। বিচার করে সাজা দিও। ন্যায় অন্যায়ের বিচার গরম মেজাজে করা যায় না। সময় লাগে।"

মেজকত্তার গলার স্বরে কি ছিল কে জানে, গোপাল তাঁর কথা অমান্য করতে পারল না। ছোলেমানকে ছেড়ে দিতে হুকুম দিল।

ছোলেমান ছাড়া পেয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল।

মেজকত্তা বললেন, "যা, বাড়ি যা।"

ছোলেমান মেজকত্তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইল। তার চোখ টলটল করে উঠল। কি একটা বলতে গিয়ে বলল না। নিদারুণ অপমানে, লজ্জায় মুখ নিচু করে তপ্ত গন-গনে একটা মন আর জর্জরিত দেহটা টানতে টানতে ভাঙ্গা হাটের ভিড়ে মিলে গেল

(ক্রমশ)

ঊনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

*

তন্দ্রাজাল কাটিলে দেখিলাম উপরে নির্মল নীল আকাশ, নীচে সীমাহীন সবুজের আস্তরণ। একটা দার্শনিকতার আমেজ উপভোগ করিতেছিলাম। এমন সময় স্টুয়ার্ড প্রাতঃরাশের সরঞ্জাম সামনে রাখিলেন। দর্শন হইতে মনোমুগ্ধকর বাস্তবে ফিরিয়া আসিয়া উহার সদ্ব্যবহারে মনোযোগ দিলাম। প্রাতঃরাশ সমাপন করিয়া আর একবার নিদ্রাদেবীর আরাধনা করিব কি না চিন্তা করিতেছি এমন সময় পাশের সহযাত্রী আগ্রহভরে আলাপ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। বাঁধা ধরা প্রশ্নের খাত বাহিয়া আলাপ শুরু হইল—গন্তব্যস্থান কোথায় এবং কি উপলক্ষে যাইতেছি। কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলাম। জুতসই একটি জবাবের অভাবে তৎক্ষণাৎ অনুভব করিলাম যে, এই রকম অবস্থার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন। যতদিন পর্যন্ত কার্যোদ্ধার না হইতেছে, ততদিন অনুসন্ধানীর কৌতূহল মিটাইবার জন্য প্রতিপদে সুষ্ঠুভাবে মিথ্যার আশ্রয় লইতেই হইবে, এবং সেই জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকাই বাঞ্ছনীয়। নিজ নাম এবং গন্তব্য স্থানের নাম জানাইবার পরও ভদ্রলোকের কৌতূহল মিটিল না—যাত্রার উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলেন। কতকটা বিরক্তির সহিত বলিলাম যে, ব্যবসা উপলক্ষেই আমার বিদেশ যাত্রা। তবে ইনি ইহা বিশ্বাস করিলেন বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হইল, বিরক্তি প্রকাশের জন্য সহযাত্রী এ-বিষয়ে বিশেষ আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। অবশ্য গন্তব্য স্থান সম্পর্কে অযাচিত অনেক উপদেশ দিলেন। সেই দেশের আবহাওয়া হইতে মনুষ্য চরিত্র পর্যন্ত সমস্ত বিষয়েই তাঁহার অল্পবিস্তর কিছু বলিবার ছিল, এবং কোনরূপ কার্পণ্য না করিয়া তাহা ব্যক্ত করিলেন। এতকথা এই ব্যক্তি সম্পর্কে বলিবার প্রয়োজন না থাকিলেও বলিতে হইল। জীবনে বিদেশ যাত্রা বহুবার করিতে হইয়াছে। কিন্তু এমন কোন যাত্রার কথা উল্লেখ করিতে পারিব না যখন এইরূপ কোন না অনুসন্ধানীর পাল্লায় না পড়িয়া ভ্রমণ সমাপ্ত হইয়াছে। এই ধরনের লোক অজ্ঞাতে আনন্দের পরিবর্তে বিরক্তি উদ্রেক করেন বেশী। কিন্তু এঁরা যে-কোনও ভ্রমণের একটা অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ। ঘণ্টাকয়েক এইভাবে কাটাইয়া বিমান যখন নির্দিষ্ট বন্দরে আসিয়া ভিড়িল, তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সহযাত্রীর নিকট বিদায় লইলাম। অবশ্য এই প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, তাঁহার প্রদত্ত ঠিকানায় দুই এক দিনের মধ্যেই তাঁহার সহিত দেখা করিব। বলা বাহুল্য, প্রতিশ্রুতি পালিত হয় নাই।

অচেনা, অদেখা দেশের মাটিতে অবতরণ করিলাম। অজানা ভাষার কোলাহলভরা বিমান বন্দরে সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে অবস্থিত বিভিন্ন কেন্দ্রের নানান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন বেষ্টনীর বাহিরে আসিলাম, তখন নিজের ভিতর কেমনধারা একটা অসহায় ভাব দেখা দিল। অনেক কথাই মনের ভিতর তোলপাড় করিতে লাগিল। অদম্য উৎসাহ লইয়া যাত্রা শুরু করিয়াছিলাম; তাহাতেও যেন টান পড়িল। একবার একথাও মনের কোণে উঁকি মারিল যে, এই পথে পদার্পণ করা বোধ হয় উচিত হয় নাই। আকাশ-পাতাল এইরকম ভাবিতেছিলাম এমন সময় শহরে যাইবার বাসে উঠিবার আদেশ হইল। অল্প কয়েকজন যাত্রী লইয়া বাস শহরাভিমুখে ছুটিল। সেই দেশের নাম জানিবার জন্য পাঠকের নিশ্চয়ই কৌতূহল হইতেছে। ভাবিতেছেন যে, এত কথা বলিবার পরও কেন দেশটির নাম উল্লেখ করিতেছি না। সত্যই ত, সব দেশেরই যখন নাম আছে, তখন সেই দেশটা ত আর নাম-গোত্রহীন নহে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই নামটি উল্লেখ করা চলিবে না। সমকালীন ইতিহাসের ঘটনা ইহা এবং সেই জন্যই দেশটির নাম জানাইতে পারিব না। নাম উল্লেখ করিয়া ঋণ স্বীকার করিবারও উপায় নাই। শুভানুধ্যায়ীদের ইহাই অভিমত যে, ছাপার অক্ষরে সেই দেশের নামোল্লেখ করিলে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সভামঞ্চে এখনও গোলযোগ দেখা দিতে পারে। সমস্ত সত্য ঘটনা উল্লেখ করিবার যোগ্য নহে। সুন্দর এই পৃথিবীতে এমনই পঙ্কিল আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছে যে, সত্যের উল্লেখ একটা মস্ত অপরাধ। ইতিহাসে লিখিত সমস্ত ঘটনা এতদিন সত্য বলিয়াই জানিতাম। কিন্তু এখন প্রায়শই সন্দেহ হয় যে, ইতিহাসের সমস্ত কথা হয়ত সত্য নহে; সত্যের অপলাপ অথবা অনুল্লেখ থাকাও সম্ভব।

প্রকাণ্ড একটি সাহেবী হোটেলে উঠিলাম। সমস্ত অপরাহ্ন কাটিয়া গেল নেতাদের সহিত টেলিফোনে সংযোগ স্থাপন করিতে। অনেক চেষ্টার পর একজনের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইল। পরিচয় দিয়া জয়প্রকাশের চিঠির কথা উল্লেখ

রাণাশাহীর অত্যাচারে জর্জরিত নেপালের দরিদ্র চাষী পরিবার

ত্রিশ মাইল দীর্ঘ পার্বত্য পথে কুলিরা রাণাদের প্রমোদ ভ্রমণের জন্য মোটরগাড়ী নেপালে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে

করিলাম। বলিলাম যে, জয়প্রকাশ-নির্দেশিত ব্যক্তির সহিত বিশেষ প্রয়োজনে সাক্ষাৎ করিতে চাই; এই উদ্দেশ্য লইয়াই কলিকাতা হইতে এত দূরে আসিয়াছি। এতকথা জানিবার পরও তিনি কিছুটা রূঢ়তার সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, শত কারণ থাকিলেও কোনমতে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিতে দিব না, কিন্তু তাহা সম্ভব হইল না। অধৈর্যের সহিত জবাব দিলাম যে, অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন না থাকিলে তাঁহাদের দেশে কোন মতেই আসিতাম না। এবং যদি মহাশয়ের সাক্ষাৎ করিবার ফুরসত না থাকে, তবে তখুনি দেশে ফিরিয়া যাইতে আমার কোন আপত্তি নাই। ফল হইল। পর দিন সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হইল। শুধু তাহাই নহে, আলাপকারী স্বয়ং আমাকে তথায় লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। পরদিন শহর পরিক্রমায় কিছু সময় অতিবাহিত হইল।

মানসিক অবস্থা শহর দেখিবার বিশেষ অনুকূল ছিল না। তবুও নূতন জায়গার আহ্বান উপেক্ষা করা যাইল না। বৈচিত্র্য আছে শহরে। ঘরবাড়ির ভিতর সেই বৈচিত্র্য দেখা যায় না, তাহা দেখা যায় নগরের অধিবাসীদের মধ্যে। পুরুষ মানুষের শহর কলিকাতার অধিবাসীর প্রথমেই চোখে পড়িবে সেই শহরের রাজপথে সংখ্যাহীন নারীর সমাগম। মনের কথা বলিতে পারিব না, তবে ইহাদের বেশভূষায় আছে প্রচুর রঙের সমাবেশ। পথ চলায় এদের ব্যস্ততা নাই, তবে ছন্দ আছে। অবিশ্রান্ত প্রবাহের মত চলিতে দেখিয়াছি তাহাদের নগরীর রাজপথে, আর চলার তালে তালে উত্থিত হইতে শুনিয়াছি এক অশ্রুতপূর্ব গীতি মূর্ছনা। উদ্দাম প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত সেই নগরীর জীবন। জানিনা কোনও প্রকারে জীবনধারণ করিয়াও কোন প্রাণশক্তিতে মনের এই আনন্দ উদ্বেলতা উপছাইয়া পড়িতেছে; এই ছন্দোবদ্ধ পথচলা তাহারা বজায় রাখিয়াছে। ভারতবর্ষের যে কোন নগরীর ন্যায় কুৎসিত দারিদ্র্যের নোংরা ছাপ সেই শহরের রাজপথের ধারে ধারে জীবন্ত বিভীষিকার ন্যায় রহিয়াছে। আর আছে সেই সীমাহীন পঙ্কিলতার মধ্যে প্রাচুর্যের ছোট ছোট বীভৎস বাগিচা। তথাপি ভারতবর্ষের জনতার জীবন হইতে সেই নগরীর জনতার জীবনে একটা বিরাট পার্থক্য আছে, অতি স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির চোখেও ইহা ধরা পড়ে। এখানকার জনস্রোতের মত তথাকার জনস্রোত নামহীন গোত্রহীন নহে। খানিকটা এলোমেলোভাবে শহরে ঘুরিবার পর হোটেলে ফিরিলাম। কর্মচারী খবর দিল যে, আমার জন্য এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করিতেছেন। দ্রুতপদে নিজের ঘরে পৌঁছিবামাত্র চেয়ার হইতে উঠিয়া তিনি সম্ভাষণ জানাইলেন। পরিচয়ে জানিলাম পূর্বদিনে তিনিই টেলিফোনে আলাপ করিয়াছিলেন। গত দিনের রূঢ়তার জন্য মাফ চাহিয়া তিনি বলিলেন যে, সাবধানতার জন্য উহা আবশ্যক ছিল। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিপজ্জনক এবং সেই কারণেই অচেনা মানুষ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। জয়প্রকাশের চিঠি তাঁহাকে দিলাম। পাঠান্তে সোজা প্রশ্ন করিয়া আমার আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলেন। প্রকৃত জবাব দিব কি না ইতস্তত করিতেছি লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন যে, পত্রোল্লিখিত ব্যক্তির আদেশেই আমার নিকট তাহার আগমন। অতএব কোন দ্বিধা না করিয়া সমস্ত কথা তাঁহাকেই জানাইতে হইবে। তথাপি সন্দেহ কাটিল না। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। উপায়ান্তর না দেখিয়া সংক্ষেপে তাঁহাকে আমার কথা বলিলাম। সমস্ত শুনিয়া তিনি কোন উত্তর না দিয়াই বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুটা চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। তাঁহার মুখের গম্ভীর ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না, তিনি শত্রু অথবা মিত্র পক্ষের লোক। আমাকে বিশেষ আর কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়াই তিনি বিদায় লইলেন। যাইবার সময় প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, সেইদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছটার সময় তিনি আমাকে নির্দিষ্ট ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য লইয়া যাইবেন। কিছুটা চিন্তিত হইলাম। কি জানি ভদ্রলোক বন্ধু না হইতেও পারেন। কার্যোদ্ধারের পূর্বেই যদি সমস্ত ফাঁস হইয়া যায় তবে নেপালের মুক্তি সংগ্রামীরা বিশেষ অসুবিধায় পড়িবে। অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বিপদের ঝুঁকি লইয়া বিদেশে পাড়ি দিয়াছিলাম। অবান্তর কথা অথবা কাজের ফলে যদি সমস্ত কিছু ব্যর্থ হয় তবে

অনুশোচনার সীমা থাকিবে না। হয়ত বা দেশে ফিরিবার পথও চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। এই রকম সাত পাঁচ চিন্তা করিতে করিতে মধ্যাহ্নভোজন সারিয়া নিদ্রাদেবীর অপার করুণাময় কোলে বেশ কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় লইলাম।

ঠিক সাড়ে ছয়টার সময় বন্ধু এক বিরাট গাড়ি লইয়া হাজির হইলেন। তিনি নিজেই চালক, এবং গাড়িতে দ্বিতীয় কোন যাত্রী নাই দেখিয়া খানিকটা আশ্বস্ত হইলাম। শহরের প্রায় অর্ধেকটা প্রদক্ষিণ করিয়া গাড়ি একটি বাগান বাড়ির নিকট থামিল। ফটকে পাহারারত একজন উর্দিপরা সৈনিক ফটক খুলিয়া গাড়ির চালককে সেলাম করিল। পরিচয় যাহাই হউক না কেন তিনি সেখানকার একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমাকে একটি ঘরে বসাইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কয়েক মিনিট বাদে তিনি আর একজন ব্যক্তিকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। নবাগত ব্যক্তিটির হাতে একটি ট্রেতে চা ও কিছু জলখাবার ছিল। আমাকে এক পেয়ালা চা আগাইয়া দিয়া তিনি নিজেও বেশ আগ্রহ-ভরে চা পান শুরু করিলেন। উদ্দেশ্যহীন-ভাবে নানা কথা আলোচনা করিতে ছিলাম। হঠাৎ ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন যে, হেমিংগ-ওয়ের "For whom the bell tolls." পুস্তকটি সম্পর্কে আমার কি অভিমত। প্রশ্নের অর্থ ঠিকমত বুঝিতে না পারায় বলিলাম যে, সাহিত্য হিসাবে উহা হেমিংগওয়ের সার্থক সৃষ্টি। তাহাতে সায় দিয়া তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে রবার্টের চরিত্র সম্পর্কে আমার কি ধারণা। এইবার তাঁহার প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ কিছুটা পরিষ্কার হইল। বুঝিলাম কেন তিনি এই প্রশ্ন করিয়াছেন। জবাবে বলিলাম, রক্তমাংসে গড়া এই পৃথিবীরই মানুষ রবার্ট, কিন্তু জীবনের যাত্রাপথে এমন মানুষ নিতান্তই অল্প দেখা যায়। রবার্টের মত মানুষ আছে জানিলে সুখী হইব, না থাকিলে বিশেষ দুঃখিত হইব না। চা পান শেষ হইয়াছিল। সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহার সহিত একটি মস্ত বড় হল ঘরে উপস্থিত হইলাম।

হল ঘরটির শেষ প্রান্তে একটা টেবিলের ধারে প্রায় সাত আটজন ব্যক্তি বসিয়াছিল। দূর হইতে মনে হইল তাঁহারা অত্যন্ত নিম্নস্বরে আলাপ আলোচনায় মগ্ন। ঘরে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহাদের দৃষ্টি আমাদের উপর নিবদ্ধ হইল। পরিচয় পর্ব শেষ হইলে পথ-নির্দেশিত ব্যক্তি নিজ ভাষায় অন্য সাথীদের সহিত পুনরায় কথা-বার্তা শুরু করিলেন। সেই ভাষা আমার অবোধ্য, তবে অনুমানে বুঝিলাম যে আলোচনা আমার 'উদ্দেশ্য' সম্পর্কে। ইহাও বুঝিতে কষ্ট হইল না যে, সেই দেশের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দের সামনে বক্তব্য পেশ করিবার জন্য আমাকে হাজির করা হইয়াছে। আলোচনা চলিতে থাকাকালে, এখানকার যিনি অবিসম্বাদী নেতা, তাঁহাকে কয়েক-বার চুপিসারে আপাদমস্তক লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইলাম। দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখে নিষ্কলঙ্ক নির্মলতার কোমল প্রতিচ্ছবি। প্রতিভাদীপ্ত চোখে সুদূরের দৃষ্টি। মনে হয় বহিরাবরণ ভেদ করিয়া সেই দৃষ্টি মানুষের অন্তর দর্শন করিতে পারে। সমস্ত কিছু মিলিয়া এমনই একটি ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহার তুলনা শুধুমাত্র হিমাদ্রি শিখরের সহিত সম্ভব; অন্য কিছুই কল্পনায় স্থান পায় না। উপস্থিত সকলের নাম আজ স্মরণ হয় না। বিস্মৃতির তুষার-শীতল গর্ভে সব কিছুই আজ বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে আক্ষেপ করা যাইতে পারে কিন্তু লড়াই করা যায় না। সমস্ত প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলে, শুধুমাত্র স্মরণশক্তির নির্মম বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে চলে না। এই প্রতিকারহীন অন্যায় নিষ্ফল আক্ষেপের সহিত সহ্য করিতে হইবে। অবশ্য সেই বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম ভুলি নাই। আজ হইতে অনন্তকাল পর্যন্ত সেই নাম স্মরণ থাকিবে। সযত্নে স্মৃতির মণিকোঠায় ধরিয়া রাখিব সেই নাম। সুযোগ হইলে সারা পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দিব সেই নাম। ব্যক্তিত্বের পূজারী আমি নহি, কিন্তু আশা-নিরাশার আলো আঁধারের সেই দিনে এই মানুষটির ভিতরে দেখিয়া-ছিলাম বিশ্বাসের ছবি। সুদূর হিমালয়ের কোলে লুক্কায়িত নেপালের নিষ্পেষিত জনতার মুক্তি আকাঙ্ক্ষা সহানুভূতি ও সমবেদনার সহিত এই মানুষটির হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী অনুরণিত হইয়াছিল।

যে কথা বলিতেছিলাম। নিজেদের ভিতর আলোচনা সমাপ্ত করিয়া একে একে আমাকে অনেকগুলি প্রশ্ন করা হইল। আবেগশূন্য

নেপালে থানকোটের একটি পল্লী

বয়নশিল্পকর্মে রত নেপালী পরিবার

ভাষায় নেপালী কংগ্রেসের নীতি, কার্যসূচী এবং গঠনতন্ত্র সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত কিছু জানিতে চাহিলেন। নেপালের তদানীন্তন শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হইল। স্বাভাবিকভাবেই জানিতে চাহিলেন যে, নেপালী কংগ্রেসকে সাহায্যের ফলে তথায় সমাজবাদী আন্দোলনের বুনিয়াদ জোরদার হইবে কি না? অনুভব করিলাম যে, প্রশ্নগুলির যুক্তিপূর্ণ জবাবের উপর অনেক কিছু নির্ভর করিতেছে। ভাঁওতা দিয়া কার্যোদ্ধার হইবে না। স্বার্থলেশহীন মানুষ জগতে আছে কি না জানি না। মানুষের সমস্ত কাজের পিছনে স্বার্থ আছে। একান্ত ব্যক্তিগত কাজের পিছনে যেমন স্বার্থ আছে, তেমনি মহৎ কাজের সহিতও স্বার্থ জড়িত। একটি ব্যক্তির স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া থাকে, অপরটি সমষ্টির, তথা সমগ্র সমাজের মঙ্গল সাধনের কারণ হয়। এই দুই প্রকার স্বার্থের ভিতর যে পার্থক্য তাহা একান্তই গুণগত। নেপালী কংগ্রেসকে সাহায্য করিবার মূলেও সেই দেশের নেতাদের মহত স্বার্থ ছিল। নেপালের মুক্তি সংগ্রামীদের সাহায্য করিলে যদি তথাকার গণতান্ত্রিক আন্দোলন জোরদার হয় তবে সে সাহায্য সার্থক হইবে। সমধর্মীর নিকটই সাহায্য চাওয়া ও পৌঁছাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

নেপালের রাণাশাহীদের অত্যাচার ও জনসাধারণের অবর্ণনীয় অসহায় অবস্থার কথা বিশদভাবে বুঝাইলাম। এই অত্যাচার হইতে জনসাধারণকে মুক্ত করিতে, নেপালের মুক্তি সংগ্রামীদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করিতে হইবে; এবং কোনরূপ কালবিলম্ব না করিয়া সেই সাহায্য তথায় পৌঁছাইয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাঁহারা সব কথা শুনিলেন। আরও দু'একটি প্রশ্নের পর সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে কথাবার্তা শুরু হইল। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা, তথাকার অন্যান্য সমস্যা সম্পর্কে কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর জিজ্ঞাসা করিলেন—কতদিন আমার পক্ষে সেই দেশে অবস্থান করা সম্ভব। প্রত্যুত্তরে আমি যত শীঘ্র সম্ভব নেপালে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক বলিয়া জানাইলাম। ইহার পর প্রয়োজনীয় আর বিশেষ কিছুই আলোচিত হইল না। প্রায় রাত্রি নয়টার সময় সকলে উঠিলেন। একে একে সবাই বিদায় গ্রহণের পর তিনি জানাইলেন যে, পরদিন সন্ধ্যার সময় বন্ধু আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ইঙ্গিত বুঝিলাম, আর অধিক সময় ব্যয় না করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইলাম।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সারাদিন নানা চিন্তায় কাটিয়াছে। তখন পর্যন্ত সাহায্য মিলিবে কি না তাহার কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। ব্যাপার অনেক দূর গড়াইয়াছে, অনেক আশা লইয়া এই বিদেশ অভিযান। যদি ব্যর্থ হয়? না, সেই কথা ভাবিয়া কোন লাভ নাই। আরও কত এই রকম এলোমেলো কথা মনে উদয় হইয়াছিল, তাহা আজ সব স্মরণে আসে না। এই বিস্মরণ হয়ত মঙ্গলের জন্যই হইয়াছে। জীবনের যাত্রাপথে মানুষকে কত নিরাশা, কত ব্যর্থতার কণ্টকাকীর্ণ পথের বাধা অতিক্রম করিতে হয়, তাহার সব স্মৃতি না থাকাই ভাল। অনাবশ্যক বেদনাময় স্মৃতির বোঝা বহিয়া লাভ কি। বন্ধু আসিলেন। স্বাভাবিক গম্ভীর মুখে একটি ক্ষীণ হাসির রেখা উঁকি মারিতেছিল। আশার কথা শুনাইলেন, দলের সর্বোচ্চ কর্মপরিষদ নেপলের মুক্তি সংগ্রামীদের সাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তবে কি ধরনের হাতিয়ার পাওয়া যাইবে তাহা স্থির হয় নাই। খুব সম্ভব কিছু ব্রেনগান এবং প্রয়োজনীয় স্টেনগান সংগৃহীত হইতে পারে। সমস্ত নির্ভর করিতেছে নির্দিষ্ট একজনের উপর। তিনি ঐদিন প্রাতে সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শনের কার্যোপলক্ষে গিয়াছেন, রাজধানীতে ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। ঠিক বলা যায় না কতদিন সময় লাগিবে। ইত্যবসরে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসা করা আবশ্যক। হাতিয়ার নেপালে লইয়া যাইবার জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। উহা নেপালী কংগ্রেসকেই করিতে হইবে। আরও জানাইলেন যে, যদি সেখানে অনিশ্চিত কালের জন্য অপেক্ষা করা সম্ভব না হয়, তবে আমি দেশে ফিরিয়া যাইতে পারি। একদিক দিয়া ইহা বাঞ্ছনীয় বটে, কেন না বেশী দিন পুলিসের সন্দেহভাজন না হইয়া সেখানে অবস্থান করা প্রায় অসম্ভব। অবশ্য ইহার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইবার কারণ নাই। তথাপি হাতিয়ার পরিবহনের ব্যবস্থা করিবার জন্য দেশে ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক। আর কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করিয়া তিনি বিদায় লইলেন। আশা-নিরাশার দোটানায় পড়িয়া এক অস্বাভাবিক উত্তেজনায় মন অবসাদে ভরিয়া উঠিল। গত কয়েকদিন রঙ্গীন স্বপ্নে বিভোর ছিলাম। বাধা বিপত্তির কথা যে চিন্তা করি নাই তাহা নহে, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লইবে। সে সম্ভাবনা দূর হয় নাই সত্য, কিন্তু আনুষঙ্গিক বাধা দৃঢ়তর হইয়াছে। অন্য উপায় যখন নাই, তখন যে কোন পথে ইহা অতিক্রম করিতে হইবে। অতএব দেশে ফিরিয়া যাওয়াই উচিত। **(ক্রমশ)**

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'মাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা' পরিচয়যুক্ত চিত্রটি বিশ্বেশ্বরপ্রসাদ কৈরালার।

লজ্জা

অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়

দোতালার এই জানলাটাই এখন সবচেয়ে প্রিয় বন্দনার। খুব কাছে শোবার খাট ঘেঁষে জানলার এই খোলাটুকুই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র পথ। চলতে তো পারে না বন্দনা তাই মনের হাটাকে ছুটিয়ে দেয় এই পথ দিয়ে অনেক খুশীতে, অনেক সুদূরে। তবু এক সময় ফিরে আসে বিষণ্ণ বিমর্ষ মন হতাশার শিশির নিয়ে। জানলাটা তাই বলে বন্ধ করে না বন্দনা। চেয়ে থাকে সারাক্ষণ। যতদূর দেখা যায়। যতখানি খোলা যায় বাইরে আলো-ঝলমল খুশীর পৃথিবীকে। অনেক চাওয়ার আকুলতাই ওর দুটো কালো চোখে

রাতে মা জানলাটা বন্ধ করতে আসে

বন্দনা বলে থাক মা।

থাক কিরে ঠাণ্ডা লাগবে যে।

লাগুক।

হুড়মুড়িয়ে ঝড় আসে। ছোট মাসী ব' জানলাটা বন্ধ করে দিই?

না।

যত রাজ্যের ময়লা ঘরে ঢুকবে যে।

আমিও তো একটা ময়লা মাসী।

আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আসে। মেজ বোন চন্দনা হয়ত ঘরে আসে। বলে, জানলাটা বন্ধ করছি বড়দি।

কেনরে?

জলের ছাটে সব ভিজে যাবে যে।

ভিজুক। শুকিয়ে নিলেই হবে।

জলে ভিজে অসুখ হবে যে।

হলে মরব। মরাই তো ভালরে।

কথা বলতে বাড়ীর সবাই ভয় পায়। বড় এ বাড়ীর সকলেরই তো সব চেয়ে আদরের ছিল বন্দনা। সব হাসিখুশী আর হৈহল্লারই পুরোভাগে ছিল। শুধু বাড়ীতেই কেন, বাইরে বন্ধুমহলে, কলেজে ওর মত ছটফটে চঞ্চল মেয়ে খুঁজে পাওয়া যেত না। তাই কি ভগবান জীবনের সমস্ত

চঞ্চলতাকে একটি আঘাতে অচঞ্চল ক'রে দিল চিরকালের মত? দুর্ঘটনাই, তা ছাড়া আর কি। সান্ত্বনা দিল সবাই। যে হাতে আদরের ছোঁয়া ছিল এতদিন, সেখানে লাগল করুণার পরশ। অসহ্য, অসহ্য। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল বন্দনা। আনন্দে কেঁদেছে অনেকবার, কান্নায় এমনি ক'রে অনেকদিন কাঁদেনি। হাসপাতালে সবাই যেত। সবাই কথা কতই তো বলতো। আশা আর খুশীর। বাড়ি এলো। কান্না না একটু কমেছিল, বিছানায় বসে খাটের পাশে ক্র্যাচটা দেখে ভূত দেখার মতই আতঙ্কে চীৎকার ক'রে উঠল বন্দনা। তারপর ভেঙে পড়ল কান্নায়।

কান্নার ঘুম দোতালার এই ছোট্ট ঘরেই ভাঙল। দোতালার এই ঘরেই নিজের নতুন পৃথিবী তৈরি করল বন্দনা। এতদিনের হাসিখুশীর উৎসবের পৃথিবী থেকে মমতাহীন বিদায়। তবু সেই পৃথিবীর গান, হাসি আর সুর অহরহ কানে আসে, দুঃস্বপ্নের মত চোখে ভাসে। কানে আসে নীচে মাঠে হৈহল্লা করছে ছেলের দল, খেলছে, দৌড়চ্ছে, প্রাণে প্রাণে উচ্ছল সজীবতা। হুড়মুড় ক'রে সিঁড়ি ভাঙে চন্দনা কলেজে যেতে ঃ পিঠে চুলের কালো বিনুনিটা উচ্ছ্বাসে দোল খায়; হাতের চুড়ি-গুলো শব্দ করে রিনিঝিনি। ছাদে বাচ্চার দল লুকোচুরি খেলে। দুপদাপ আওয়াজ হয়। দস্যির দল। ক্র্যাচটা দু' হাতে জড়িয়ে শোনে সব বন্দনা। সেও যদি ওদের মত দস্যি হতে পারত, সিঁড়ি উঠতে পারত ঢেউ তুলে চন্দনারই মত। হাতের ক্র্যাচটা বিষের মত জ্বলে। ইচ্ছে হয় ভেঙে ফেলে, ছুঁড়ে ফেলে, ওটা ভেঙে যাক কয়েক টুকরোয়। পারে কই?

টুনি, পুষু, মিনুর দল, গল্প শুনতে আসে। কোনোদিন ভূতের, কোনোদিন বাঘের, কোনোদিন আবার রাজপুত্র রাজকন্যার।

ওসব শুধু গল্পই নয়, নানা প্রশ্নও। তোমার পাটা ভাঙল কে পিসী?

কি জানি। হাসে বন্দনা।

তাকে যদি পাই, দেখে নোবো একবার।

আর একজন প্রশ্ন করে, তোমার পা কি আর ভাল হবে না?

হাসে বন্দনা। কি জানি।

ঠিক হবে, দেখো। না হ'লে, আমি যখন বড় হয়ে চাকরি করব, তোমাকে বিলেতে নিয়ে যাব, ভাল ডাক্তার দেখাব। তা হলে?

তা হলে নিশ্চই ভাল হয়ে যাবরে। বলে বন্দনা। ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদরে।

সাত সমুদ্দুর তের নদীর রাজকন্যার গল্প শুনতে শুনতে ওদের একজন প্রশ্ন করে, পা ভাঙ্গা রাজকন্যার গল্প বুঝি নেই পিসী?

খোঁড়া রাজকন্যাকে কোন রাজপুত্র ভালবাসবে বল। ম্লান হেসে বন্দনা জবাব দেয়।

আমি যদি রাজপুত্র হ'তাম ঠিক ভালবাসতাম।

খুশীতে তখন চিকচিক্ করে বন্দনার কালো চোখ দুটো। খুশী ওদের ভালবাসায়, ওদের আদরে। দোতালার ছোট্ট ঘরে ওর একলা পৃথিবীতে ওরা এক সময় ভিড় করে।

ওরাই শুধু নয়, সকলেই আসে। মা, বাবা, দাদা সব্বাই।

বাইরে বেরোনা একটু। এই এক ঘরের মধ্যে সব সময় বসে থাকা। মা বকাবকি করে।

হাসে বন্দনা। বলে, বাইরে খুব বেশী বেড়াতাম ব'লে খুব বকতে কিনা, তাই তো পা দুটোর একটা ভগবান ভেঙ্গে দিল।

চন্দনা আসে। বলে, ছাদে চল না দিদি। যাবি?

ছাদে গিয়ে কি দেখব, আকাশ?

হ্যাঁ।

আকাশ দেখলেই মাটি দেখবার আবার লোভ হবে। তখন? খোঁড়া মেয়েকে কে বেড়াতে নিয়ে যাবে রোজ রোজ।

দেখ দিদি, সব সময় খোঁড়া খোঁড়া করিসনি বলছি। আমাদের বুঝি শুনে কষ্ট হয় না? আমি তোকে রোজ বেড়াতে নিয়ে যাব।

কেন কষ্ট করবি আর কষ্ট পাবি। এইতো এখানেই বেশ ভালরে। আস্তে আস্তে জবাব দিল বন্দনা।

সত্যি, এই ভাল বন্দনার। দোতালার ঘরে সারাদিন বসে বসে নতুন এক কান্নার পৃথিবী তৈরি করা। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগ শুধু জানালাটা। জানে বন্দনা, তাকে সবাই ভালবাসে। আজও। ও যদি বলে, বাবা দাদারা কি চন্দনা রোজ তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে। কিন্তু যে পৃথিবীতে সে এতদিন দস্যি হয়ে ঘুরেছে, হৈহল্লা করেছে, ছুটেছে, ছুটিয়েছে, কত অনুরাগের উষ্ণ পরশ হাতে হাত ধরার সাক্ষী হয়ে রয়েছে, সে-পৃথিবীতে এখন অসহায় হয়ে ফিরে আসতে আর ইচ্ছে নেই। সেদিন যারা ভালবেসেছে, অনুরাগে হাত বাড়িয়েছে, সঙ্গ পাবার জন্যে প্রতিযোগিতা করেছে আজ তারা করুণাই করবে শুধু, কিংবা সহানুভূতির মামুলি কথা। এমন মমতাহীন দয়া চায় না বন্দনা, চায় না। জানে বন্দনা, তার মত সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে কতই না আশা ছিল মা বাবার, বাড়ির সকলের। এ বাড়ির খুশীতে আলোর অম্লান শিখা ছিল বন্দনা। স্বপ্ন কি ছিল না বন্দনার নিজেরও? সুন্দরী ব'লে গর্ব? কলেজে জনপ্রিয় ব'লে গর্ব? কোথাও তো ছুটতে হয়নি ওকে। যত ভাল আর বড় ছেলেই হ'ক, তার সঙ্গ পাওয়ার জন্যে আকুলতা সে সকলের মধ্যেই দেখেছিল। এ কি গর্ব করবার মত নয়। অন্য মেয়েদের ঘনিষ্ঠতা দেখে তাকে কোনোদিন হিংসা করতে হয়নি, সব মেয়েরাই তাকে হিংসা করেছে বার বার। এ কি গর্ব করবার মত নয়?

সে পৃথিবী শেষ হয়ে গেছে। ভেবে কি হবে। ভাবে না। এই ভাল। একলা ঘরে নতুন আর এক পৃথিবী। কান্নার। বাচ্চাদের দল আসে গল্প শুনতে ঃ এক গাদা হৈহল্লা করা যায় ওদের সঙ্গে। একটু লোভ। তবু জানে তো বন্দনা, ওরা বাইরের পৃথিবীর, আলো-ঝলমল পৃথিবীর মানুষ। ওদের এখানে ধরে রাখা যাবে না। দুটো পা আছে, ছুটে পালিয়ে যাবে ওরা। ওদের মত বন্দনা ছুটে পালিয়ে যেতে পারবে কি?

লোভ নেই বন্দনার আগের ফেলে-আসা পৃথিবীর। সে তো ওখান থেকে চলে আসতে চায়নি। পৃথিবীই ওকে ঠেলে দিয়েছে। ওখানে জায়গা নেই। সুন্দরী বলে গর্ব ছিল, সেই পাপেই কি এই সর্বনাশ? কি জানি। জানে বন্দনা দোতালার ছোট্ট ঘরে রাত আর দিন। এই ঘরের অন্ধকারের পৃথিবীই তার ভাল। এমনি

অন্ধই থাক। ফেলে-আসা সেই পৃথিবীর সুর এই জানলাটাই শুধু। ওটাকে বন্ধ ক'রে দিতে চায় রোজই সে। কোনদিনই পারে না। বাড়ির সবায়ের লোভ ওই জানলাটায়। ঠান্ডা আসবে, জলের ছাট আসবে, ধুলো আসবে। বন্ধ করে দে। ওই তো জানলা, কিইবা ওর থেকে দেখা যায়। আকাশ একটু। কয়েকটা তারা। একটু ঝুঁকলে কোনো রাতে চাঁদ। রাস্তা দিয়ে ডবল ডেকার গেলে বাতাসটা সোঁ করে বেরিয়ে যায়। নিম গাছটার কয়েকটা ডাল। আর সবচেয়ে বেশী দেখা যায় পাশের বাড়ীটা। অনেকগুলো ঘর, ভেতরের উঠোন। বাড়ীটা তালাবন্ধ। আগের ভাড়াটের বউ নাকি বিষ খেয়েছিল। তারপর থেকেই তালাবন্ধ। নতুন ভাড়াটে কবে আসবে, কি আর আসবেই না, কে জানে। এছাড়া, আর কিইবা দেখা যায় ওই জানলাটা দিয়ে? তবু এতদিনের আলো-উজ্জ্বল পৃথিবীর নির্বাসন নিয়েও জানলাটা তো বন্ধ করতে পারে না বন্দনা। তবে কি সে ভোলবার চেষ্টা করেও চিরতরে ভুলতে পারে না। যে পৃথিবীতে তার আদর ছিল, অভ্যর্থনা ছিল, প্রতিপত্তি ছিল, সে পৃথিবীকে দেখবার লোভ এখনো? কে জানে।

তারপর একদিন জানলা থেকে দেখল বন্দনা, পাশের বাড়ীটার তালা খুলেছে। লোকজন আনাগোনা করছে। পরিষ্কার হ'ল বাড়ীটা, চুনকাম শুরু হ'ল। তারপর একদিন নতুন ভাড়াটে এল। দেখল বন্দনা। বিধবা মা, ভাই, ভায়ের বউ, দুটো বাচ্চা, আর—। ভাল ক'রে ঝুঁকে দেখল। ছোটো ভাই। চমৎকার চেহারাটা। কটা চোখ দুটো, মাথায় সোনালী চুলের গোছা। দেখল তারপর থেকে রোজ। চঞ্চল ছটফটে ছেলেটা। একটা কথা বলে আর এক গাদা হাসে। কিছু কথা কানে আসে বন্দনার, কিছু আসে না।

তারপর আর একদিন ও-বাড়ীতে অবাক হয়ে আবিষ্কার করল চন্দনাকে। একটা একটা দিন ক'রে রোজ। দেখল চন্দনাকে সোনালী চুলের ছেলেটার সঙ্গে ঘন হয়ে কথা বলতে, দুজনকে এক সঙ্গে হাসিতে লুটিয়ে পড়তে।

প্রথম দেখায় ছিল কৌতূহল, তারপর লোভ। তারপরের দেখায় এল জ্বালা। ক্র্যাচটা হাতে নিয়ে, বুকে জড়িয়ে থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে বন্দনা। একদিন জানলাটা বন্ধই ক'রে দিতে চায়। পারে না। আরো কিছু দেখবে, অনেক কিছু, ওদের দুজনের।

পাশের বাড়ীর নতুন ভাড়াটেদের সঙ্গে তোর ভাব হয়েছে নাকিরে বড়দি? চন্দনাই বললে একদিন। খুব ভালরে ওরা। আর বৌটির দেওর চমৎকার ছেলে। আসবে একদিন বলেছে তোর সঙ্গে ভাব ক'রতে।

এলও একদিন সুমন্ত। চন্দনা আলাপ করিয়ে দিল। হাতজোড় করল। খুব কাছাকাছি দেখল বন্দনা। সত্যিই ভাল-বাসবার মতই ভাল চেহারা সুমন্তের।

তারপর সুমন্ত আসতে শুরু করল কাজে অকাজে, যখন তখন! আসত, বসত বন্দনার খাটে। গল্পও করত দু'চারটে। কিন্তু ওর খোঁজ থাকত অন্য কারো, চোখ থাকত অন্য কোথাও। উসখুস-ক'টাচোখ-দুটো খুশীতে ঝিকমিকিয়ে উঠত চন্দনার চেনা সেন্টের গন্ধ পেলে। পর্দা ঠেলে চন্দনা ঘরে এলে।

অসহ্য এ অবজ্ঞা, অসহনীয়। এ এক নতুন অসহায় অভিজ্ঞতা। কেউ তো কখনো তাকে এমন ক'রে অবজ্ঞা করতে সাহস করেনি। রূপের গর্ব ছিল বন্দনার। সব জায়গায় সে রূপের স্বীকৃতি ছিল। তাকে ছেড়ে অন্যদিকে চাইবার, অন্যদিকে এগোবার আর কিছু ছিল না। নিজের বোন হলেও লালিত্যে, কমনীয়তায় চন্দনা তার কাছে কিছু নয়। তবে কোথা থেকে পেলো সুমন্ত তাকে অবহেলা করার দুঃসাহস? খোঁড়া মেয়ে বলেই কি? সে যে হাঁটতে পারবে না, দৌড়তে পারবে না, উচ্ছল হয়ে অনুরাগে

লুটিয়ে পড়তে পারবে না—যৌবনের উজ্জ্বলতায়, প্রাণবন্যায়। ও কেবল একটা বোঝা শুধু, কাঁটার মতই বাধা শুধু। তাই কি? অসহ্য এ অবহেলা—এ অবজ্ঞা। যে পৃথিবীতে দুরন্ত ছিল পদক্ষেপ, লোভনীয় ছিল ওর কটাক্ষ, দুর্বার ছিল ওর প্রাণবন্যা, যেখানে সকলের মিলিত চাওয়ার ছিল' ও দুর্লভ সম্পদ, সেখানের এক মানুষের এ অবজ্ঞা বন্দনার কাছে অসহ্য জ্বালাই।

ওরা বেড়াতে যায়, বন্দনাকে ডাকে। ওরা সিনেমা গেলেও বন্দনাকে ডাকে। না, ঘাড় নাড়ে বন্দনা। হয়ত এ ডাকে ওদের আন্তরিকতা আছে—তবু চায় না দয়া বন্দনা, চায় না ওদের অনুকম্পা। এই ভাল। ঘরের এই অন্ধকারে কান্নার প্রহর গোনা। ইচ্ছে হয় দোতালার এই ঘরটা সব দিক থেকে বন্ধ করে দেয়। একটুও না আসে যাতে বাইরের আলো-হাওয়া। তবুও কি ভেসে আসবে না ওদের কথার টুকরো টুকরো রেশ, ওদের হাসির মিলিত কলোচ্ছ্বাস? এ জ্বালা বুকে জ্বলে। হাসির টুকরো-গুলো সারা দেহে বিষের ফলার মত ফোটে। এ বিদ্বেষ অশোভন, এ হিংসা অন্যায় জানে না কি বন্দনা? তবু তো মনকে সংযত করতে পারে না, সংযমের বেড়া ডিঙিয়ে অশান্ত হয়ে ওঠে অহরহ। যখন পা ছিল, ছুটে বেড়িয়েছে বন্দনা দুরন্ত উদ্দীপনায়, দুর্বার প্রাণবন্যায়—অবজ্ঞার আঘাত জানেনি কখনো, হিংসার জ্বালায় জ্বলতে হয়নি কখনো। তাই কি ভগবান সেই পরীক্ষাই আজ নিচ্ছেন? না না, বিশ্বাস করে না বন্দনা। যে পৃথিবী থেকে সে বিদায় নিয়েছে সম্মানের সঙ্গে, সে পৃথিবীতে এমন হীনতায় ফিরে আসতে চায় না। কিন্তু পারে কই? ওরা সারাদিন, সারাক্ষণ হাসে, কথা বলে। তার কান্নার কালো পৃথিবীকে বিষাক্ত ক'রে দেয়। দোষ নেই বন্দনার, ওরাই ষড়যন্ত্র করেছে, ওরাই। দোতালার ছোট্ট ঘরে ক্র্যাচ্‌টা বুকে জড়িয়ে ধরে থরথর ক'রে কাঁপে বন্দনা। এই বিষাক্ত জ্বালার সান্ত্বনা খোঁজে।

তারপর একদিন। রাত ক'টা কে জানে। বাবা মা দেশে গেছে। দাদা বৌদি বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গেছে। বাচ্চারা ওপরে ঘুমোচ্ছে। সিঁড়ি থেকে অনেকক্ষণ ওদের হাসির ঢেউ আসছে, এত কি কথা কইছে কে জানে। সারাদিন কথা, সারাক্ষণ হাসি। অসহ্য। হাসির শেষ করতে হবে, কথাকে বন্ধ করতে হবে। নইলে বাঁচবে না বন্দনা। জ্বালায় জ্বলে জ্বলে মরে যাবে। অবজ্ঞার আগুনে মরে যাবে। উঠে দাঁড়াল বন্দনা—ক্র্যাচ্‌টা বগলে নিল। এগোলো আস্তে আস্তে। বারান্দা পেরোলো। সিঁড়িটা অন্ধকার। কাছে আসছে কথা-গুলো, হাসির ঢেউ। আলো জ্বালল না। অন্ধকার সিঁড়িতে ওদের লক্ষ্য ক'রে ক্র্যাচ্‌টা ছুঁড়ে মারল। কিন্তু সামলাতে পারল না নিজেকে বন্দনা। গড়িয়ে গেল সেও সিঁড়িতে। একটা মুহূর্ত। হুড়মুড় শব্দ। দৌড়ে নিচের সুইচ্‌টা জ্বালিয়ে দিল চন্দনা। কিন্তু তার আগেই বন্দনাকে দু' হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে ফেলেছে সুমন্ত।

থমকে উঠল চন্দনা, তোমার কি আক্কেল বড়দি? একলা এই অন্ধকারে সিঁড়ি নামতে এসেছিলে। কেন, আমাদের ডাকলেই তো পারতে।

সুমন্তর উষ্ণ আলিঙ্গনে ভয়ার্ত পাখির মতই ওর বুকে থরথর ক'রে কাঁপছে বন্দনা আবেগে, উত্তেজনায়। এই না চেয়েছে বন্দনা! এমনি আদর, এমনি আশ্রয়। কিন্তু শিহরণ নয়, সিরসির করতে লাগল সারা দেহ অসহ্য জ্বালাতেই। কোনো ছেলের আলিঙ্গন যে এত বিষাক্ত হ'তে পারে, আগে কখনো জানা ছিল না বন্দনার। তাই তাড়াতাড়ি ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিল। ক্র্যাচ্‌টা ভেঙে দু' টুকরো হয়ে গেছে। চন্দনার কাঁধে হাত রেখেই নিজের ঘরে ফিরল।

চলে যাচ্ছিল চন্দনা, বন্দনা ডাকল, শোন। জানলাটা বন্ধ করে দে তো। অবাক হয়ে তাকাল চন্দনা। অবাক হবারই কথা। এই জানলা থেকে ফেলে-আসা পৃথিবীর দিকে তাকাতো বন্দনা ভয় আর কৌতূহলে নতুন পৃথিবীর অন্ধকার কোণ থেকে। আজ তাকাতে শুধু লজ্জা, আর লজ্জা। এ লজ্জার খবর জানবে কি ক'রে চন্দনা। সে নাই বা পেলো তা কোনোদিন।

চন্দনা চলে যেতে অনেকক্ষণ কাঁদল বন্দনা। হাসপাতালে যেদিন শুনেছিল একটা পা কেটে বাদ দিতে হবে, এত কান্না সেদিনও কাঁদেনি।
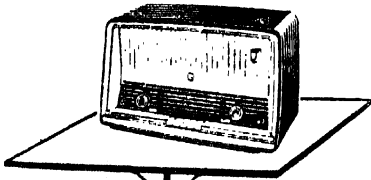
গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

ভজন বাংলার জিনিস নয়, কিন্তু ভজন গান বাঙালীর অতি প্রিয়। ভক্তিরসাশ্রিত বলেই যে প্রিয় তা নয় মধুর বলে প্রিয়। ভজনের মধ্যে এক অপরূপ সৌন্দর্য আছে আর আছে প্রসাদ গুণ। ভজনে শুধু সৌন্দর্যই নয় বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য প্রভৃতি বিবিধ বৈচিত্র্যের বিবিধ রসের প্রকাশ হয়েছে এবং সে প্রকাশ স্বতঃ-উৎসারিত। বাংলায় যদিও ভজনের পরিবর্তে কীর্তনেরই প্রচলন বেশি হয়েছে, কিন্তু তথাপি উৎকৃষ্ট ভজনের পরিচয় যখনই পাওয়া গেছে, তখনই বাঙালী শিল্পী মহলে তার আদর হয়েছে। সংগীতের দিক থেকে ভজন ক্রমে একটি চমৎকার আর্টে পরিণত হয়েছে। আজ ভজন আমাদের শ্রেষ্ঠ সংগীতের অন্তর্গত।

ভজন শব্দটি ভজ্ ধাতু থেকে এসেছে। ভজ্ ধাতুর অর্থ পুজো করা বা সেবা করা। ভজন শব্দের মানেও পুজো বা উপাসনা। এই পুজো বা উপাসনা শুধু ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। প্রাণের আকুতি কাব্যে সুরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রেও 'ভজন' বলে একটি শব্দ পাওয়া যায়। শাস্ত্রকার বলেছেন রঞ্জকত্ব গুণের আতিশয্য ঘটলে তাকে ভজন বলা হয়। এই মাধুর্য বিশেষ যত্নে সম্পাদিত হয়। শাস্ত্রের উক্তি—রাগস্যাতি-শয়াধানং প্রযত্নাৎ ভজনং মতম্।" এখানে রাগ শব্দের অর্থ রঞ্জকত্ব। অর্থাৎ ভজন হচ্ছে খুব মিষ্টি সুরের গান। সেকালে মধুর এবং সুললিত গান বলতে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লীলা সংগীত বোঝাত। এইভাবে এই বিশেষ ধারাটি ভজন আখ্যাতেই পরিচিত হয়ে এসেছে। ক্রমে শুধু রাধা-কৃষ্ণ নয় রামসীতা, শিব, শক্তি—ভক্তির বিবিধ মার্গেই ভজন গান ছড়িয়ে পড়ে। মীরাবাঈ, তুলসীদাস, কবীর নানক সুরদাস প্রভৃতি কত ভক্তজন কত বিচিত্র ভজনই না রচনা করেছেন। সুরদাসের একটি ভজনের কথা মনে পড়ছে। বৈচিত্র্যের দিক থেকে এটি অতুলনীয়। এই গানটি হচ্ছে—'দেখোরি এক বালা যোগী দ্বারে মেরে আয়া হ্যায়' বাংলায় টপ্পার ধরনে খাম্বাজে গাওয়া হয়। গানটির ভাবার্থ অতি সাধারণ—শিব বালক শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে গেলেন; কিন্তু ভজনটি চোখের সামনে একটি চমৎকার পৌরাণিক চিত্রকে উদ্ঘাটিত করে। মা যশোদা অন্দর মহলে আছেন, বালক শ্রীকৃষ্ণও সেখানে। দাসী গিয়ে যা খবর দিল তাতে যশোমতী ভয় পেয়ে গেলেন। বাইরে এক যোগী এসেছেন তিনি তাঁর গোপালকে দেখতে চান। সে যোগীর রূপ যেমনি মনোহর তেমনি ভয়ঙ্কর। তার পরনের বাঘাম্বর হাওয়ায় উড়ছে, বিষধর সর্প দেহকে বেষ্টন করে আছে, ললাটে চন্দ্র-কলা তিলকের মত জ্বল জ্বল করছে—আর তার জটা এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কী সাংঘাতিক। সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর যদি গোপালকেই ভীক্ষা চায় তবে কি হবে? কেন সে গোপালকে দেখতে চায়? না—এই যোগী ভিখারিকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদায় করতে হবে। নন্দরাণী নিজেই বেরিয়ে এলেন। হাতে তাঁর সাজানো থালা, সেই থালায় মোতি, মাণিক্য থরে থরে সাজানো। যশোদা বললেন—'যোগীবর আপনি এই রত্নসম্ভার গ্রহণ করুন—আমার গোপালকে দেখতে চাইবেন না, সে আপনাকে দেখলে বড় ভয় পাবে।' যোগী হাসলেন—'মা, আমি তোমার দুনিয়ার দৌলত চাই না আমি তোমার গোপালকে দেখতে এসেছি, তাকে দেখিয়ে দাও। আজি নিজেই যে দেখতে এসেছি।' শিব তাঁর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যশোমতীর সামনে প্রকাশ করে বললেন—

'না চাহিয়ে তেরি দুনিয়া দৌলত না
চাহিয়ে তেরি মায়া হ্যায়
আপনে গোপালজীকো দরশ করা দে
ম্যায় দরশন কো আয়া হ্যায়'

তখন নন্দরাণী গোপালকে যোগীর সম্মুখে নিয়ে এলেন। ভগবানের শ্রেষ্ঠভক্ত শংকর সেই বালক গোপালের রূপ চক্ষুভরে পান করলেন। শম্ভু সেই বালককে সাতবার পরিক্রমা করে তাঁর শৃঙ্গে হর্ষের নিনাদ তুলে অন্তর্হিত হলেন।

ভক্ত সুরদাস তার ভজনে এই রমণীয় চিত্রটি রূপায়িত করে গাইলেন—

সুরদাস বৈকুণ্ঠ লোকমে ধন্য যশোমতী
মাঈ হ্যায়।
তিন লোককো অন্তরযামী বালক
রূপ দিখায়া হ্যায়॥

এই লাইনগুলির ভাষান্তর অবশ্য আছে, কিন্তু সে থাক। সে বিচার এপ্রসঙ্গে নয়। মীরাবাঈ-এর গানগুলিতো সর্বপরিচিত।

মীরাও কত চমৎকার স্বীয় ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি বিখ্যাত গানে তিনি বলছেন—গিরিধারীলাল, আমাকে আর কিছু নয় তোমার ভৃত্য করে রাখ। আমি তোমার চাকর হয়ে থাকব, তোমার বাগানের গাছ-গুলির পরিচর্যা করব আর নিত্যই তোমার দর্শন পাব। বৃন্দাবনে কুঞ্জগলিতে আমি তোমার লীলা গেয়ে বেড়াব। তোমার চাকর হবার মত সৌভাগ্য কি আর আছে? রোজ তোমার দেখা পাওয়া যাবে, তোমার স্মরণে আমি থাকব, সামান্য চাকর হয়েও আমি ভাব পাব, ভক্তি পাব, জাগীরী পাব। তোমার মাথায় ময়ূরচূড়া, পরনে পীতাম্বর আর গলায় বৈজয়ন্তী মালা, তুমি সেই মোহন মুরলীধারী রাখাল বালক বৃন্দাবনের পথে ধেনু নিয়ে চলেছ। সেই রূপ আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আমার বাগানে কত কেয়ারি থাকবে, আমি সেখানে ফুলের মধ্যে ফুলতোলা শাড়ী পরে তোমার জন্য অপেক্ষা করব, সেই শ্যামল রূপের দরশন পাব।

আর্টের দিক থেকে এইসব গান মনো-মুগ্ধকর। এমন বহু ভজন উদ্ধার করা যেতে পারে, দুটি শুধু উদাহরণ মাত্র দেওয়া গেল। বাংলায় পশ্চিমের ভজন গান বহুকাল থেকে চলে এসেছে, কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত খুব পুরাতন ভজন পাওয়া যায় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সব গান রচিত হয়েছে, তার অনেকগুলিকে আমরা ভজন বলে নির্দেশ করতে পারি। এসব গানেরও অনেক মূলে সুরে হারিয়ে গেছে।

বর্ধমানের মহারাজ মহতাবচন্দ (১৮৪০—১৮৭৯) অনেক গান রচনা করেন যেগুলিকে ভজনের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। তাঁর একটি হোলীর গান উদ্ধৃত করছি।

এস গো কে যাবে হোরি খেলিতে কেশব সনে
কুঙ্কুম আবির লয়ে চল নিকুঞ্জ কাননে
শ্রীঅঙ্গে আবির দিব মনসাধ পুরাইব
সকলে হোরি খেলিব হাসিব নন্দনন্দনে।
বামে দিয়ে শ্রীমতীরে নয়ন জুড়াব হেরে
করতালি দিব ঘেরে মিলে সব সখীগণে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ বহু বিখ্যাত ভজন রচনা করেছেন। সেসব গান আজ আর শুনতে পাওয়া যায় না। গিরিশ ঘোষের নাটক-গুলির প্রচলন আজকের পরিবেশে হয়তো আর তেমনভাবে করা যাবে না, কিন্তু তাঁর কতকগুলি গান আছে, যা সব সময়ই গাওয়া যেতে পারে। এখনো খোঁজ করলে পুরোনো স্বরলিপির বই থেকে এসব গানের সুর এবং ধরণধারণ বোঝা যায়। একবার গিরিশ ঘোষ সম্বন্ধে আলোচনায় এ প্রসঙ্গ তুলেছিলুম বলেও মনে হচ্ছে। গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি বিখ্যাত গান—কেশব কুরু করুণা দীনে, কাঁহা মেরা বৃন্দাবন, ঘোর গভীর বিষাণ বাজে, মুড় চন্দ্রচূড় হর ভোলা, বনফুল ভূষণ শ্যাম মুরলীধর, ভূতনাথ ভব ভৈরব শঙ্কর। এইসব গানগুলির স্বরলিপি এখনো সংগ্রহ করা যায় বলে আমার বিশ্বাস।

এযুগে দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকটি সুন্দর ভজনাত্মক গান রচনা করেছেন। এর মধ্যে গিরিগোবর্ধন গোকুলচারী এবং পতিতো-দ্ধারিণী গঙ্গে বিশেষ বিখ্যাত। অনেকে —ঐ প্রণয় উচ্ছ্বাসী মধুর সম্ভাষি যমুনায় বাঁশি বাজে—এই গানটিকেও ভজনের মধ্যেই ধরে থাকেন।

কাজী সাহেব শেষের দিকে অনেক সুন্দর সুন্দর ভজন গান রচনা করেছিলেন। তাঁর স্বরলিপির বইগুলিতে সেসব গানের কিছু কিছু নমুনা পাওয়া যাবে। এছাড়া বহু পুরোনো রেকর্ড তো এখনো খোঁজ করলেই পাওয়া যায়।

ভজনের দিক থেকে বর্তমানে শ্রেষ্ঠ সুরকার এবং সংগীত রচয়িতা হচ্ছেন দিলীপকুমার রায়। যাঁরা তাঁর স্বরলিপি এবং গানের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাই জানেন কত বিচিত্র এবং বিস্তৃতভাবে তিনি এবিষয়ে অনুসন্ধান করেছেন এবং নিজস্ব দানে বাংলার সংগীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। একেবারে হাল আমলের ভজনশিল্পীদের মধ্যে আরও কয়েকজন আছেন, যাঁরা চমৎকার ভজন গাইতে পারেন, কিন্তু তাঁরা হিন্দী ভজনই গেয়ে থাকেন, বাংলা গানে কোনো নিজস্ব প্রচেষ্টার পরিচয় দেননি। অবশ্য এ প্রচেষ্টা করেননি বলে তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের কোন অভিযোগ নেই, কেননা হিন্দী গানের অবিকল তর্জমা করে তথাকথিত রাগপ্রধানের মত বৈশিষ্ট্যহীন বাংলা গান তৈরি করার চেয়ে প্রচলিত হিন্দী ভজন কৃতিত্বের সঙ্গে গাওয়া ঢের ভাল।

বাংলায় প্রচলিত যেসব গানের উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি, সেগুলিতে হিন্দী গানের প্রভাব হয়ত আছে, কিন্তু বাংলা গানের কয়েকটি বিশেষ ভঙ্গিও এমন চমৎকারভাবে আছে, যেসব মিলিয়ে সে একটা নতুন আর্টে পরিণত হয়েছে। এই নতুন ভঙ্গির কথায় ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্রের ভজনগুলির কথা মনে হল। বীরচন্দ্রের নাম অনেকেই জানেন না, তাঁর গানের পরিচয়ও খুব কম শিল্পী পেয়েছেন। কিন্তু একদা তাঁর খ্যাতি ছিল বঙ্গবিশ্রুত। তাঁর কয়েকটি গানের স্বরলিপি এক সময় সংগীত প্রকাশিকায় বেরিয়েছিল। এরই একটি গান উদ্ধৃত করছি। ১৩১১ সালের সংগীত প্রকাশিকার চৈত্র সংখ্যায় এই গানটির স্বরলিপি বেরিয়েছিল।

মল্লার

দেখো আজু নটবর ঝুলত রে
সঙ্গে বিধুমুখী প্যারী ঘন ঘন নয়ন ঢুলায়ে
কালিন্দী তীরে সুধীর সমীরণ
লহু লহু চাঁদিনী হাস
নাচত মত্ত ময়ুর মধুকর
সারিশুক পিককুল পঞ্চম ভাষ
রহি রহি দামিনী চমকত দূরে
সুদূরে গরজন শ্রবণ রসায়ে।
বরষে নবঘন হরষে
রিমিঝিমি রিমিঝিমি রহি রহি আয়ে।
তারাগণ সঙ্গ হেরি সুধাকর
লাজে লুকায়ত আপন ভাতি
দরশে বীরচন্দ্র হরষে বিহরই
যুগল কলপসম রাতি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গানের কথা মনে পড়ছে। কার রচনা বলতে পারব না। সাতাশ আটাশ বৎসর পূর্বে যাঁর কাছ থেকে গানটি শিখেছিলাম, তিনিও বহুদিন হল গত হয়েছেন। এমন চমৎকার ভজন খুব কমই মেলে।

শ্যামল শ্যামল অতি কোমল অমল
নব দূর্বাদল জিনি তনুরাগ
নবজলধর মেঘপাটলপর লটপট নটবর চারুরাগ
বিকচ পুলিনে শারদ যামিনী
জোছনা মুরছি পড়ি জনু
সরমে শিহরি সলাজ শিথিল
সে মুখ নলিনে নেহারে ব্রজকানু
চুয়াচন্দন তিল তিল অঙ্কন
মুখরাগ পূর্ণিমা পাতি পাতি তারা
মুখকলি কমল নিরমল নেহারে
স্নাত তনু রবিকর ধারা
শিরিষ সুঠাম ললাম লালিমা
অধরে মধু উষা হাসি রাঙা জাগে
মাধবমোহন আবিরে গাহন
চির তরুণ চির অরুণিমা ফাগে।

গানটি ভূপ-কল্যাণ রাগে রচিত বলে মনে হয়।

ভজনের একটি ধারা বরাবরই একটু রাগভঙ্গিম। বর্তমানে এটি অনেকে পুরোপুরি খেয়ালে পরিণত করেছেন বলা যায়। অবশ্য ভজনের মূল রূপটি বজায় রেখে কিছুটা খেয়াল বা টপ্পার ঢঙে গাইলে মন্দ শোনায় না, কিন্তু তাকে তীব্র তানকর্তব সহকারে দ্রুত খেয়ালে পরিণত করলে ভজনের আর কোন মাহাত্ম্য থাকে না। একজন প্রসিদ্ধ গায়কের গাওয়া একটি রেকর্ড আছে—'যোগী মৎ যা মৎ যা মৎ যা'। এটি যখনই শুনি, তখনই মনে হয় ভজনের পরিবর্তে দ্রুত খেয়ালের তান্ডব নৃত্য চলেছে। ভদ্রলোক ওস্তাদ সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি তিনি তাঁর খেয়াল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন, তাহলেই বোধ হয় ভাল হত। পালুসকরও খেয়ালের ঢঙে ভজন গাইতেন কিন্তু তাঁর চমৎকার রসবোধ ছিল, তান বিস্তারকে তিনি খুব সুন্দরভাবে মানিয়ে নিতেন। বাঙালী শিল্পীর কণ্ঠে গাওয়া 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' এই গানটিও মাধুর্যগুণে অতুলনীয়।

ভজনের আর একটি ধারা লোকসংগীতে প্রবহমান। এইসব ভজনে কোন সূক্ষ্ম কারুকার্য নেই, কবিতার দুচারটি কলি সুরে আবৃত্তি মাত্র। কিন্তু সেই আবৃত্তিটুকুর মধ্যে এমন একটি মাধুর্য আছে যা অনুভূতির বস্তু। সাধারণ শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এই ধরনের ভজন আজও বিশেষ প্রচলিত। দরোয়ানজী সকাল বেলা উঠে আপন মনে ছোট্ট একটি ভজন গাইছে—কাউকে শোনাবার জন্য নয়, কিন্তু তবু আপনার কানে যদি সে সুর আসে, তাহলে আপনিও যেন খানিকটা উদাস হয়ে যাবেন; আপনারও যেন মনে হবে—

আমি চাইনে হতে নববঙ্গে নব
যুগের চালক,
যদি পরজন্মে পাইরে হতে ব্রজের
রাখাল বালক।

এই মধুর মনভোলানো রূপসৃষ্টির জন্যই ভজন এত জনপ্রিয়।

Brooke
Bond
Tea
Brooke
Bond
A-1
Dust Tea
ব্রুক বণ্ড
A-1
এ-ওয়ান
গুঁড়ো চা
ব্রুক বণ্ড ইণ্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
BB 285

বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি

মম্মটভট্ট

এ-যুগের মহাকাব্য (১)

মহাকাব্যের যুগ বিগত। এ সিদ্ধান্ত ঠিক প্রথম কোন্ ব্যক্তি উপস্থিত করেছিলেন আমার জানা নেই। কিন্তু পশ্চিমী কাব্যাদর্শের ইতিহাসে আধুনিক মনোভাবের যিনি অন্যতম আদি প্রবক্তা, সেই মার্কিনী কবি-সমালোচক এডগার অ্যালান পো-র সময় থেকে কাব্য-রসিকদের মনে উক্ত প্রত্যয় ধীরে ধীরে শেকড় ছাড়িয়েছে। ফলত, সম্প্রতিকালে শুধু পাঠক এবং সমালোচক নয়, অধিকাংশ কবিরও বিশ্বাস যে, আজকের দিনে মহাকাব্য লেখার চেষ্টা নিতান্তই পণ্ডশ্রম।

এ বিশ্বাসের সমর্থনে যুক্তির অভাব নেই। যে-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশে অতীতে মহাকাব্য রচিত হত, অনেকদিন হল তা আগাগোড়া পালটে গেছে। আমরা মোটামুটি দু ধরনের মহাকাব্যের কথা জানি। প্রথম ধরনের মহাকাব্য আসলে কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়। একটি কাহিনীর সূত্রে সমাজ-প্রচলিত চিন্তার কিম্বদন্তী, ঘটনা এবং চরিত্র অনেকদিন ধরে গ্রথিত হয়ে ওঠার পর কোনো প্রতিভাবান ব্যক্তি যখন তার থেকে তাদের একটি সমগ্র রূপ দান করেন, তখন এই ধরনের মহাকাব্য জন্ম নেয়। এর সবচাইতে বিখ্যাত উদাহরণ হোমারের ইলিয়াড এবং বেদব্যাসের মহাভারত। এ ধরনের মহাকাব্য কোনো সভ্যতার আদিযুগেই সম্ভব। সমাজ-জীবনে ভালো-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনযাত্রায় যতখানি সর্বব্যাপী ঐক্য এবং কবিকল্পনায় যতখানি নৈর্ব্যক্তিকতা থাকলে এ ধরনের সাহিত্য সম্ভবপর হতে পারে, সভ্যসমাজ থেকে ততখানি ঐক্য এবং নৈর্ব্যক্তিকতা অনেককাল আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় জাতের মহাকাব্য মহাকবিদের ব্যক্তিগত সৃষ্টি। এর সুপরিচিত উদাহরণ ভার্জিল, দান্তে, তাসো এবং মিলটনের মহাকাব্য। কিন্তু এঁদের ক্ষেত্রেও কবির কল্পনা এবং জীবনবোধ আপন-আপন সমাজের ঐতিহ্যগত ঐক্য থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করতে পেরেছিল বলেই মহাকাব্য রচনা সম্ভবপর হয়েছিল। মিলটনের সময় থেকে কবিরা ক্রমেই সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। উক্ত কবির প্যারাডাইস লস্ট্ এবং প্যারাডাইস্ রিগেনড্ কাব্য দুটিতে মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য সেকারণে অনেকটা ম্রিয়মান। তারপর একধারে যন্ত্রবিপ্লব এবং অন্যধারে রোমান্টিক আন্দোলনের ফলে সমাজের ঐতিহ্যগত ঐক্য বহুবিভক্ত হয়ে গেছে। অতএব আধুনিক কবির পক্ষে লিরিক লেখা ছাড়া উপায় নেই।

তাছাড়া, অন্য কারণও আছে। মহাকাব্য মুখ্যত বীরপুরুষদের কাহিনী। আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে ভীম, অর্জুন জাতীয় মহাবীরদের কোনো ভূমিকা নেই। আধুনিক কল্পনা থেকে নায়কের নির্বাসনের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। অপরপক্ষে মহাকাব্যের চরিত্রলিপি শুধু মানুষ-মানুষীদের মধ্যে আবদ্ধ নয়; দেব-দেবী, যক্ষ-রক্ষ তাতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকে। তার ঘটনাস্থল মর্ত্যের সীমানা পেরিয়ে স্বর্গ এবং নরক পর্যন্ত বিস্তৃত। অথচ এ-যুগের বিজ্ঞানমার্জিত মন অলৌকিকে আস্থাহীন। পরিশেষে, মহাকাব্য হল ছন্দের লেখা বিরাট কাহিনী। ছাপাখানার দৌলতে এ-যুগের মানুষ বড় গল্প কানে শোনার চাইতে নিজের চোখে পড়তে বেশী অভ্যস্ত। তাই আধুনিককালে মহাকাব্যকে হটিয়ে দিয়ে উপন্যাস তার জায়গা নিয়েছে। এ যুগে যে-সাহিত্যিকের মন বেশী দিনও দীর্ঘ কাহিনী কবিতার আকারে না লিখে গদ্যে উপন্যাসের আকারে লিখে থাকেন।
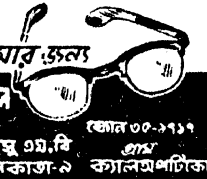
এসব হল সাহিত্যশাস্ত্রীদের কথা। কিন্তু পায়েসের পরিচয় যেমন রসনায়, তত্ত্বের প্রমাণ তেমনি অভিজ্ঞতার মধ্যে। গল্প আছে, কোনো এক বিশ্বকোষের জন্যে একজন রুশীয় দার্শনিককে হাতী সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তিনি "হাতী" শব্দের চৌষট্টি প্রকার সম্ভাব্য অর্থের বিচার করে প্রবন্ধের শেষে লিখলেন, "কিন্তু সত্যিই কি পৃথিবীতে হাতী বলে কোনো জন্তু আছে?" পাঠক তাঁর পাণ্ডিত্য এবং দার্শনিকতায় নিশ্চয়ই মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তার ফলে পৃথিবী থেকে হাতীরা কিছু আর লোপ পায়নি। সম্প্রতিকালে মহাকাব্যের অসম্ভাব্যতা বিষয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিদের যুক্তিবিস্তারকে তারিফ না করে উপায় নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য কিছুটা অন্যরকম।
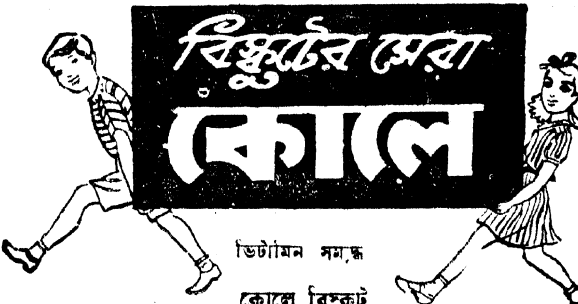
সাধারণ পাঠক হিসেবে আমার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করে বলতে পারি, প্রথম মহাযুদ্ধের পর গত চল্লিশ বছরের মধ্যে পশ্চিমের অন্তত তিনজন প্রধান কবি প্রত্যেকে একখানি করে মহাকাব্য রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে "সর্গমালা"-র (CANTOS) কবি এজ্রা পাউন্ড এদেশে সর্বাধিক পরিচিত। যতদূর মনে পড়ে, কয়েক বছর আগে শ্রীযুক্ত শিব-

নারায়ণ রায় তাঁর "প্রেক্ষিত" নামে একটি প্রবন্ধগ্রন্থে এ'র কাব্য বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম বিস্তারিত আলোচনা করেন। দ্বিতীয়জন হলেন পোল ভালেরির পর এ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ফরাসী কবি সাঁ-জন প্যার্স। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত এ'র মহাকাব্য "সৈকতচিহ্ন" (AMERS) গত বছর ওয়ালেস ফাউলি সাহেব ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। উক্ত কবি এবং তাঁর এই মহাকাব্য সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছেন গ্রীক কবি নিকস কাজানৎজাকিস। সদ্যপ্রকাশিত ইংরেজি তর্জমায় এ'র রচিত "দি ওডিসী" পাঠ করে আমার মনে আর এতটুকু সন্দেহ নেই যে, এযুগে শুধু মহৎ কবিতা নয়, প্রতিভাবান কবির পক্ষে শাস্ত্র-ব্যাখ্যাত অর্থেও প্রকৃত মহাকাব্য রচনা সম্ভব।*

গ্রীক ভাষা-ভাষী পাঠকদের কাছে কাজানৎজাকিসের প্রতিভা অনেকদিন আগেই স্বীকৃতিলাভ করে থাকলেও জীবদ্দশায় তাঁর খ্যাতি দেশের বাইরে বেশীদূর ছড়ায়নি। অনুবাদক কিমন ফ্রায়ার-এর লেখা থেকে জানা যায়, নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম তিন চারবার উত্থাপিত এবং বিবেচিত হয়েছে। প্রস্তাবক ছিলেন আলবার্ট শুভাইটজার। কিন্তু নোবেল কমিটির কোনো সদস্যই নাকি আধুনিক গ্রীক ভাষা জানেন না; এবং বর্তমান অনুবাদের পূর্বে শুধু কয়েকটি খণ্ডকবিতা এবং দুটি ছয় উপন্যাস ছাড়া কাজানৎজাকিসের অন্যান্য রচনা উক্ত কমিটি-সদস্যদের জানা কোনো ভাষায় অনূদিত হয়নি। (এর মধ্যে তিনটি উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।) অথচ কাজানৎজাকিস মুখ্যত ঔপন্যাসিক নন, তিনি কবি। শেষ বয়সে স্ত্রীকে খুশী করার জন্যে তিনি উপন্যাস লেখায় হাত দেন। তবে রবীন্দ্রনাথের মতই প্রধানত কবি হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক গ্রীক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর দান প্রচুর: আঠারোটি নাটক (অধিকাংশই কাব্যনাট্য), গল্প-উপন্যাস, পাঁচটি ভ্রমণবৃত্তান্তের বই, তিনখানি দার্শনিক গ্রন্থ। এছাড়া, তিনি বহু-ভাষাবিদ: ইংরেজি, ফরাসী, ইতালিয়ান, স্প্যানিস, জার্মান, রুশ এবং প্রাচীন গ্রীক থেকে অনেকগুলি ক্লাসিক গ্রন্থ তিনি আধুনিক গ্রীক ভাষায় তর্জমা করেছেন। তাঁর কৃত অনুবাদের তালিকার মধ্যে আছে হোমরের দুই মহাকাব্য, দান্তের ডিভাইন কমেডি এবং গোয়েটের ফাউস্ট। কবির নিজের মতে তাঁর এ সমস্ত রচনা আত্ম-প্রস্তুতির পথে এক একটি পরীক্ষা মাত্র; তাঁর সাহিত্যসাধনার চরম পরিণতি পূর্বোক্ত উত্তর-ওডিসী মহাকাব্য।

বইটি অল্প কিছুদিন হল হাতে এসেছে, এবং ইতিমধ্যে সমগ্র বইটি এক-বারের বেশী পড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। শুধু একটি দুটি অংশ কয়েকবার ফিরে ফিরে পড়েছি; এবং মনে হয়েছে অনুবাদে যে লেখা ভিনদেশী পাঠকের চেতনায় এত গভীর প্রভাব ফেলতে পারে, মূল ভাষাতে তার রস না জানি আরো কত প্রগাঢ়। সব মহৎ সাহিত্যের মত এ-গ্রন্থের নিহিত ঐশ্বর্যও বারংবার পাঠের দ্বারা আবিষ্কার-সাপেক্ষ। কিন্তু প্রথম পাঠেই পদে পদে ব্যঞ্জনাগর্ভিত উপমা, শব্দচিত্রের অসামান্যতা এবং বৈচিত্র্য, বিভিন্ন রসের সঞ্চার, মানুষ, প্রকৃতি এবং ইতিহাস বিষয়ে সুবিস্তৃত জ্ঞান এবং প্রোজ্জ্বল দার্শনিকতার সাক্ষাৎ পেয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, আমাদের কাছে এতাবৎ অপরিচিত এই বিদেশী লেখক ওয়াল্টার পেটারের সংজ্ঞা অনুসারে একাধারে সৎ এবং মহৎ কবি।

কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এ বইটি যে কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটি হল এই যে, এখানে একজন শ্রেষ্ঠ সমকালীন কবির কল্পনা ছোট ছোট লিরিক কিংবা সনেটে নয়, একটি সুদীর্ঘ কাহিনীর তরঙ্গহীন, বিচিত্র এবং বিলম্বিত রূপের মধ্যে সার্থক প্রকাশ লাভ করেছে। চব্বিশ সর্গে বিভক্ত এবং প্রায় তিরিশ হাজার চরণে গঠিত এই মহাকাব্যে কাজানৎজাকিস হোমরীয় নায়ক ওডিসিয়ুসের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনীর মধ্য দিয়ে একধারে শিল্পীর দৃষ্টিতে বিভিন্ন সমাজ-সভ্যতার আন্তর রূপকে উদ্ঘাটিত করেছেন, অন্যধারে অন্বিষ্ট দার্শনিকতায় মানুষের বহুমাত্রিক অস্তিত্বের মধ্যে সাধনার ঐক্য অনুসন্ধান করেছেন। এটি মুখ্যত কাব্য; কিন্তু সেই কাব্যের সঙ্গে এসে মিশেছে ইতিহাস, দর্শন, প্রকৃতিবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, তুলনামূলক সংস্কৃতি-বিচার, এবং নিতান্ত আধুনিক অর্থে উপন্যাস। অথচ এ-সব গুরুভার উপাদান কাব্যরসকে কচিৎ ব্যাহত করেছে। এদিক থেকে কাজানৎজাকিস এজ্রা পাউণ্ডের চাইতে অনেক বেশী বিবেকবান কবি। তাঁর কল্পনা বিশদ হয়েও অত্যন্ত সংযমী, এবং তার জারিকাশক্তি যথার্থই নৈসর্গিক। প্রাচীন মহাকবিদের তুলনায় একক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর কাহিনীর স্থান, কাল এবং পাত্র একটিমাত্র দেশ অথবা যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সময়ের এই ব্যাপ্তি এবং অনুসন্ধানের এই বিশ্ব-নাগরিকতায় তিনি একান্তভাবেই আধুনিক যুগের কবি।

হোমরের নায়ক ওডিসিয়ুস দশ বছর ট্রয়ের অবরোধ এবং যুদ্ধে কাটিয়ে এবং তারপর সমুদ্রদেব পোসেইডনের কোপে

*NIKOS KAZANTZAKIS, **The Odyssey a Modern Sequel**, Translated by Kimon Friar. Simon & Schuster. December, 1958.

আরো দশ বছর সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে নিজের রাজ্য ইথাকায় ফিরে আসেন। সেখানে দেবী আথেনির অনুগ্রহে তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিধন করে নিজের রাজ্য এবং পত্নী পেনেলোপিকে পুনরুদ্ধার করেন। হোমরের ওডিসি মহাকাব্য এখানে শেষ হয়েছে; কাজানৎজাকিসের কাহিনীর এখান থেকে শুরু। কুড়ি বছর ঘর ছেড়ে থাকার পর ওডিসিয়ুসের আর নিজের ছোট্ট রাজ্যে এবং সংসারে মন বসল না। তিনি আবার নতুন অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। পথে ইলিয়াডের ঘরছুট নায়িকা হেলেন দ্বিতীয়বার সংসার-পালিয়ে তাঁর সঙ্গী হল। (স্বীকার করতে হয়, বিশ বছরে হেলেনের নীতিজ্ঞানে বিশেষ উন্নতি না ঘটে থাকলেও, তার বিচারবুদ্ধি বেড়েছে। বীর্যে এবং বৈদগ্ধ্যে পারিসের চাইতে ইউলিসিস নিশ্চয়ই অনেক বেশী উত্তম নায়ক।) তারপর ওডিসিয়ুস ক্রীটের জরিষ্ণু সভ্যতাকে ধ্বংস করে ইজিপ্টে এসে পৌঁছলেন। (ক্রীটের "ক্নসস্" সভ্যতার চিহ্ন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এ শতকের গোড়াতে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেন। ক্নসস্ কালের দিক থেকে গ্রীক সভ্যতার চাইতেও প্রাচীন; ভগ্নাবশেষ থেকে অনুমান করা হয়, এই সভ্যতা লোপ পাবার আগে পরবর্তী গ্রীক সভ্যতার চাইতেও উন্নতি অর্জন করেছিল। পণ্ডিতদের ধারণা, কোনো প্রচণ্ড ভূমিকম্পের ফলে এ সভ্যতা লোপ পায়।) ইজিপ্টে নানাবিধ অ্যাডভেঞ্চারের পর ওডিসিয়ুস আবার বেরিয়ে পড়লেন, এবারে নীলনদের উৎস সন্ধানে। তারপর আফ্রিকার গহনে তিনি এক আদর্শ নগর পত্তন করলেন। কিন্তু নির্মাণের কাজ শেষ হতে-না-হতেই ভূমিকম্প এবং অগ্ন্যুৎপাতে সে নগর বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এবার রাজসিকতার সাধনা ছেড়ে ওডিসিয়ুস সন্ন্যাসের মার্গ গ্রহণ করলেন। সব ত্যাগ করে তিনি অনন্ত প্রান্তরে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরেছেন। মনে প্রশ্নঃ জীবনের উদ্দেশ্য কি? অস্তিত্ব কি শুধু আকস্মিক ঘটনা-প্রবাহ, না কি তার জটিলতা এবং অফুরন্ত অপচয়ের মধ্যে কোনো সার্থকতার সূত্র নিহিত আছে? পথে বিচিত্রচরিত্রের মানুষদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটল; তারা নানা আদর্শ, নানা জীবনযাত্রার প্রতীক। কেউ ভোগবাদী, কেউ সর্বত্যাগী, কেউ আদিম জীবনের পূজক, কেউ বা বুদ্ধের মত নির্বাণপন্থী, কেউ ডন কুইকজোটের মত অদম্য রোমান্টিক। পরিশেষে খৃষ্টের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল। কিন্তু কোনো তত্ত্বই এই অস্থিরচিত্ত পুরুষের কাছে শেষ উত্তর বলে ঠেকল না। শেষে আফ্রিকার দক্ষিণতম প্রান্তে পৌঁছে এই মহানায়ক একটি ভেলায় চড়ে অজানা সমুদ্রপথে দক্ষিণ মেরুর বরফ মহাদেশের দিকে পাড়ি দিলেন। পৃথিবীর সেই হিম সীমানায় মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখির মধ্যে এই নব-ওডিসীর পরিসমাপ্তি।

এই নিতান্ত নীরস এবং অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেও কাজানৎজাকিসের কল্পনার অসামান্য ব্যাপ্তির হয়ত খানিকটা সন্ধান মিলবে। কাব্য প্রসঙ্গে উপন্যাসের উল্লেখ অসঙ্গত; কিন্তু ব্যাপ্তিতে এবং গভীরতায় এই মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় বর্তমান শতাব্দীতে রচিত এমন আর একখানি মাত্র গ্রন্থ আমার জানা আছে। সেটি হল টমাস মানের জোসেফ সম্বন্ধে চার খণ্ডে লেখা উপন্যাস। স্থানকালের দিক থেকে কাজানৎজাকিসের জগৎ আরো বিস্তৃত, আরো বিচিত্র। নায়ক ওডিসিয়ুস ছাড়াও এই মহাকাব্যে আরো অসংখ্য পাত্র-পাত্রীর সমাবেশ ঘটেছে। আগেই বলেছি, কাজানৎজাকিস বহুভাষাবিদ ছিলেন; কিন্তু এই কাহিনী প্রসঙ্গে তার চাইতেও যা উল্লেখযোগ্য, নায়ক ওডিসিয়ুসের মত তাঁরও দেশভ্রমণের নেশা ছিল। তাঁর জন্মস্থান ক্রীট সভ্যতার আদিযুগ থেকেই এশিয়া, ইয়োরোপ এবং আফ্রিকার মিলন ক্ষেত্র। তিনি নিজে ইংল্যাণ্ড থেকে রাশিয়া, মিশর থেকে চীন এবং জাপান, বহুদেশ ঘুরেছিলেন। এই অসামান্য রকমের ব্যাপক এবং বিচিত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, বহুমুখী পাণ্ডিত্য, গভীর দার্শনিক প্রজ্ঞা এবং অমিত [illegible] মিলিত হয়ে তাঁর মহাকাব্যে সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এবং ভ্রমণের নেশাই শেষ পর্যন্ত এই মহাকবির মৃত্যুর কারণ হয়। ১৯৫৭ সালে তিনি সরকারের অতিথি হয়ে চীনদেশে বেড়াতে যান। তখন তাঁর বয়স বাহাত্তর বছর। হংকং-এ যাবার জন্যে টীকা নিতে হয়। তারপর টোকিও থেকে যখন বিমানে উত্তর মেরুর পথে ফিরছিলেন, আলাস্কায়, তিনি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে প্রথমে কোপেনহাগেনের হাসপাতালে এবং তারপর ফ্রাইবুর্গে চিকিৎসার জন্যে আনা হয়। এখানে ১৯৫৭ সালের ২৬শে অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাসপাতালে এযুগের হোমরের মৃত্যু ঘটে।

কাহিনীনির্ভর মহাকাব্য রচনায় কাজানৎজাকিস হোমরের উত্তরসাধক, যদিও এই মহাকাহিনীর অধিকাংশ ঘটনা এবং চরিত্র তাঁরই স্বকপোলকল্পিত। কবিকল্পনার সঙ্গে দার্শনিকতার মিলন ঘটিয়ে তিনি দান্তের অনুসরণ করেছেন। কিন্তু দান্তের মত কোনো প্রচলিত ধর্মতত্ত্বের তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। তাঁর কোনো দার্শনিক নিবন্ধ আমি পড়িনি; কিন্তু এই মহাকাব্য থেকে অনুমান করি, ইয়োরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গে তাঁর মেজাজের গভীর মিল আছে।

কাজানৎজাকিসের ওডিসি নিয়ে বাংলা ভাষায় ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরো অনেক চিন্তাশ্রিত আলোচনা হবে। আমি আপাতত এই আশ্চর্য বইটির দিকে কাব্যরসিক বাঙালী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই খুশী। কিমন ফ্রায়ার সাড়ে তিন বছর ধরে কবির সঙ্গে একত্রে বাস করে তাঁর সহযোগিতায় ইংরেজী তর্জমাটি তৈরী করেছেন। সেই তর্জমা মারফৎ এই গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর অন্তত আমার পক্ষে আর সাহিত্যশাস্ত্রীদের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া সম্ভব নয় যে, সার্থক মহাকাব্য রচনার যুগ একেবারেই বিগত। ইলেকট্রিক ট্রেন এবং জেট প্লেনের যুগে হাতী যে ক্রমেই দুর্লভ হয়ে উঠবে, এ-কথার মধ্যে যুক্তি আছে। কিন্তু যতক্ষণ চোখের সামনে জলজ্যান্ত তাকে দেখতে পাচ্ছি, ততক্ষণ শুধু পণ্ডিতদের কথায় কি করে হাতীকে একেবারে প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরের কোঠায় ফেলব?

উল্টোরথের অষ্টম বর্ষ
প্রথম সংখ্যা চৈত্রে
সম্পূর্ণ উপন্যাস
সীমানা ছাড়িয়ে

সিনেমা জগৎ-এর
ষষ্ঠ বর্ষ প্রথম সংখ্যা
চৈত্রের উপন্যাস
ঝড়ের জোনাকি

সিনেমা জগৎ-এর
নববর্ষ সংখ্যা (দাম দেড় টাকা)
বৈশাখের উপন্যাস
উত্তর ফাল্গুনী

উল্টোরথের নববর্ষ সংখ্যা
(দাম দু টাকা)
বৈশাখের উপন্যাস
ছাড়পত্র

উল্টোরথের নববর্ষ সংখ্যার
একটি বড় গল্প
আঠারো আনা

•

উল্টোরথের নববর্ষ সংখ্যার
আর একটি বড় গল্প
মহীয়সী

উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ-এর

আগামী সংখ্যাগুলিতে
যাদের উপন্যাস পড়তে পাবেন

•

নীহাররঞ্জন গুপ্ত
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
সুবোধ ঘোষ
বিমল কর
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী
সঞ্জয় ভট্টাচার্য
বিমল মিত্র
নরেন্দ্রনাথ মিত্র
মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
শক্তিপদ রাজগুরু
সমরেশ বসু
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

•

উল্টোরথ

চৈত্র মাস থেকে অষ্টম বর্ষ শুরু হচ্ছে
প্রতি সংখ্যা—১
বৈশাখী সংখ্যা—২, ঃ বড় দিন সংখ্যা—২,
পূজা সংখ্যা—৩৷৷৹
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা—১৫,
ষান্মাসিক গ্রাহক করা হয় না

•

সিনেমা জগৎ

চৈত্র মাস থেকে ষষ্ঠ বর্ষ শুরু হচ্ছে
প্রতি সংখ্যা—১
বৈশাখী সংখ্যা—২৷৷৹ ঃ বড়দিন সংখ্যা—২৷৷৹
পূজা সংখ্যা—২৷৷৹
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা—১২,
ষান্মাসিক গ্রাহক করা হয় না

•

উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ-এর

একত্রে গ্রাহক চাঁদা—২৫,

উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ-এর গ্রাহক হতে গেলে ১লা মার্চ থেকে ৩১শে মার্চের মধ্যে গ্রাহক হতে হবে। এরপর আর গ্রাহক করা হবে না। উল্টোরথ ও সিনেমা জগৎ-এর বার্ষিক গ্রাহক হলে উল্টোরথের বার্ষিক উৎসবে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। ষান্মাসিক গ্রাহক করা হয় না। টাকাকড়ি অথবা চেক পাঠাতে হলে এই ঠিকানায় পাঠাবেন ঃ

দি ম্যাগাজিনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
২২/১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

ভূ মি কা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ভয় ভাঙলে হে রাজন্ !
আমি জীবন চাইব না।
ঝুলিয়ে দিও তখন— আমায়
যীশুর ছবি ; যেন।
হয়ত মুখ একটি হত মুখ
দুঃখে নত হবে,
— আমি তখন ভুলেছি চেনা ঘর॥

ভয় ভাঙলে হে রাজন্ !
আমি কিছুই চাইব না।
—তাদের কোথা দুপুর নিয়ে ঘোরে
ধুলোর রেখা জড়াতে চায় ফুল,
একটি ছবি কোথায় গড়ে——কেউ
ভালবাসায় দিগ্বিজয়ী হল.....!

ভয় ভাঙলে বিস্মরণ।
আমি জীবন চাইব না॥

দে য়া ল চি ত্র

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

দেয়ালে যা আঁকা আছে সে তো এক হাওয়ার যৌবন,—
হয়তো ফাল্গুনী হাওয়া ; দেহ তার তখন মঞ্জরী ;
জানালায় ছাতে ঘরে যেখানেই থাকতো, অপ্সরী
মনে হতো তাকে দেখে ; সে হাওয়ায় সঁপেছিল মন।

রোদ-প্রজাপতি অঙ্গে এঁকেছিল প্রণয়-চুম্বন ;
শশকের লঘুপায়ে নেমে আসতো জ্যোৎস্না জাদুকরী ;
পড়ার টেবিলে বসে সে তখন শেখে মাধুকরী ;
মায়াবী আকাশে আজ অদৃশ্য সে স্বপ্নের ভুবন।

বর্ষা নেমেছিল, যেন অহল্যার হৃদয়-পাষাণে ;
প্রেমিক সমুদ্র হয়ে তুলেছিল তরঙ্গের গ্রীবা ;
সে-ও তারাদের কানে রেখেছিল গানের অঞ্জলি।

এখন শীতার্ত হাওয়া নোনাধরা দেয়ালে কেবলই
উষ্ণতার খোঁজে আসে ; গন্ধ পায় অর্থের যদি বা ;
তার নগ্ন অঙ্গ কাঁপে নির্বোধ রোদের স্তুতি-গানে।

শ্বে ত - ম ন্দি র

আলোক সরকার

বড়ো-বড়ো গাছ ছোটো-ছোটো পাখি অনেক দেখেছি
সকাল বেলায় বিকেল বেলায়।
যেন এক সাদা বাড়ির জ্যোৎস্না জানলা-দরজা
খোলা আর নীল পর্দা কাঁপছে বিদেশী হাওয়ায়।
অসীম বাগান অথবা মৃত্যু বিনীত লজ্জা
পরিচিত যেন দুপুরবেলার মেঘমন্থতায়, বাঁশি।

ঠিক কোনখানে শ্বেত-মন্দির বিকশিত আছি ?
সন্ধ্যায় শাঁখ বাজিয়েছি প্রীত আরতি প্রদীপ।
চৈত্র মাসের ঘূর্ণিধুলোর প্রহত শিখায়
লাল জিজ্ঞাসা—কখনো বৃষ্টি শেষের সজল টিপ।
আর স্বাভাবিক অভিসারিকার বাধিত নিশায়
তারা-জন্মা দেখা তারা নেভা দেখা, পথ, প্রবাহিত নদী।

অথবা হাওয়ার প্রতিবাদে ফুল অঞ্জলি যদি—
ভালোবাসা বক্ষে বিবেচিত হয় এক মুহূর্ত,
এক মুহূর্ত সমারোহ যেন মাটির উঠোন
খাঁচার পাখিটা উষ্ণ বিছানা নিবিড় সুপ্ত
জানালার নীল—এক মুহূর্ত।
নত হেমন্ত ধান-কাটা মাঠ, শ্মশান, উন্মোচন।
যেন ধু-ধু বালি গভীর নিশীথ ঘণ্টা বাজছে
চিরদিন, জল ঘণ্টা বাজছে।
সাদা শঙ্খের তরঙ্গ যায় এপার-ওপার—
খুব হাওয়া দিলো গোরুর গাড়িটা মগ্ন যাচ্ছে।
অথচ অসীম বাগান গাছের-পাখির বাগান ঃ
চারিদিক যেন জ্যোৎস্না, কান্না, প্রতিহত মন্দার।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় মৎস্য খাতে বরাদ্দ মঞ্জুরীর বিতর্ক প্রসঙ্গে সরকারবিরোধী দল হইতে এই মর্মে অভিযোগ করা হয় যে, জনসাধারণ সস্তায় মৎস্য ভক্ষণে বঞ্চিত হইয়া আছে। উত্তরে মৎস্যমন্ত্রী মহাশয় নাকি বলিয়াছেন—বরাদ্দ
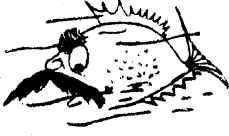
তো মাত্র ২৫ লাখ টাকা, ওতে অত হয় না। পয়সা দেবো একটা আর গান শুনবো অক্রুর সংবাদ? বিশুখুড়ো বলিলেন—"সুতরাং ভো জনসাধারণ, আপনারা রসনা সংযত করে কর্ণেন্দ্রিয়কে অক্রুর সংবাদের বদলে ছুঁচোর কেত্তনে পরিতৃপ্ত করার সাধনায় আত্মনিয়োগ করুন"!!

* * *

মন্ত্রী মহাশয় নাকি একথাও বলিয়াছেন যে, মাছ কেন বাজারে নাই এই প্রশ্নের আগে বলুন, ঝিল বিল কেন শুকাইয়া যায়, বৃষ্টি কেন হয় না। শ্যামলাল বলিল—"অতঃপর সেই ছেলেবেলার ছড়ার প্রশ্ন — — কেনরে মেঘ হোস না? ব্যাঙ কেন ডাকে না। কেনরে ব্যাঙ ডাকিস না? সাপে কেন খায়। প্রশ্ন করতে করতেই নটে গাছ মুড়িয়ে যায়। সুতরাং অতঃপর মাছের কাঁটার বদলে কাঁটা নটে"।

* * *

বঙ্গীয় চিকিৎসক সম্মেলনে ডাঃ ত্রিবেদী পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থার এক নৈরাশ্যজনক চিত্র দিয়াছেন। —"পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য ব্যবস্থার চিত্র-প্রদর্শনী হয়ত ডাঃ ত্রিবেদী দেখেন নি। কিন্তু শঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই,—মন্বন্তরে মরিনি আমরা, মারী নিয়ে ঘর করি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

জনৈক ভদ্রলোক বাংলার বাইরে একটি সরকারী চাকুরি পাইয়াছেন। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বাংলা দেশে থাকিয়াই অন্য কোন

ট্রামে-বাসে

চাকুরি জুটাইবার পরামর্শ দেন। স্বামী স্ত্রীর কথায় কান না দিয়া একদিন গোপনে স্ত্রী-পুত্র ফেলিয়া নূতন চাকুরিস্থলে যাইবার জন্য হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হন। সংবাদ পাইয়া স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে স্ত্রীও হাওড়া স্টেশনে উপস্থিত হন। এই সংবাদ পরিবেশন করিতে সংবাদ-দাতা শিরোনামা দিয়াছেন—"আসামী নয়, স্বামী"। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"একদিক থেকে স্বামীরাও আসামী বৈকি। কত স্বামী যে বিয়ে ক'রে চোর দায়ে ধরা পড়েন তার কি কোন লেখাজোখা আছে?"

* * *

চিড়িয়াখানার বিতর্কে প্রকাশ, সেখানে বাঘের ঘরে নাকি প্রচুর ইট জমা হইয়া আছে। বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না, এসব ইট ব্যাঘ্র-দর্শনার্থীরাই জমা করিয়াছেন। —"শুধু বোঝা গেল না, এসব ইট দিয়ে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা তৈরি হবে কি না"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

অভিযোগে প্রকাশ, চিড়িয়াখানার বনমানুষকে লক্ষ্য করিয়া অনেকে নাকি পোড়া সিগারেট ছুঁড়িয়া দেন।—"বন্ধুদের

সিগ্রেট অফার করতে হবে বৈকি; জানোয়ার যে জা-নরের বন্ধু ("রূপদর্শী" ক্ষমা করবেন)।

• • •

আসামের মঙ্গলদই নামক স্থানে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে একটি দ্রব্য, সেটা নাকি দেখিতে কেরোসিনের মতো, গন্ধেও অনেকটা তাই।—"মঙ্গলদইতে কেরোসিন! সেক্সপীয়র ঠিক বলেছেন, নামে কিছু আসে যায় না"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

• • •

চীফ সেক্রেটারীকে শুনাইবার জন্য শুনিলাম, বাঘের ডাকের টেপ্ রেকর্ড করা হইয়াছে। অনেকে প্রশ্ন করিয়াছেন বাঘের ডাকের টেপ্ রেকর্ডের কী প্রয়োজন ছিল? বিশুখুড়ো বলিলেন—
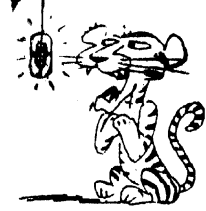
"প্রয়োজন ছিল বৈকি। রয়েল-বেঙ্গলরা আজ নিশ্চিহ্ন। ফেউ-ডাকা ফাঁকা মাঠে যে ব্যাঘ্র-গর্জন আজ দুর্লভ"!!

• • •

পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয়-কর উঠাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। —"এতে বেচারাম আর কেনারাম সবাই সন্তুষ্ট হয়েছেন, হন নি শুধু বক্তিয়াররা। অর্থাৎ বিধানসভার সরকার-বিরোধী দল। মুখ্যমন্ত্রী মশাই বাক্-তাল্লার আগেই প্রসঙ্গে তালা দিয়েছেন। আমরা শুধু বলব—মন্ত্রীমশাইর রসবোধ নেই, আর বলব—বাক্যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র টাইম্-বম্ হিসেবে রেখে দিতে, সুযোগ ঘটবেই"!!

* * *

লণ্ডনগামী ভারতীয় ক্রিকেট টিম সম্বন্ধে জনৈক ক্রীড়া-রসিক লিখিয়াছেন—এই দলে তারুণ্যের সঞ্চার হয় নাই, হইয়াছে কবরের ব্যবস্থা। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"মন্দ কি, ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া অ্যাশেস নিয়ে খেলেন, আমরা কবরের মাটি নিয়ে খেলার নূতন ইতিহাস গড়ব"।

• • •

এক সংবাদে শুনিলাম বোম্বাই সরকারের প্রচার বিভাগ ডিউক অব্ এডিনবরার সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের "ওগো মা, রাজার দুলাল গেল চলি মোর ঘরের সমুখ পথে" কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ আসনের তালিকা ও গাড়ি রাখার নক্শার পিছনে ব্যবহার করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এর চেয়ে হিং টিং ছট্ কবিতাটি ব্যবহার করলে সবার কাছে তা পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার হয়ে যেতো"!!

অনেক লোকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছোট বয়সের কোন ঘটনায় প্রভাব উত্তরকালে তাদের চরিত্রের বিশেষ রকম আচরণের কারণ হয়ে ওঠে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি'র নিউটন শহরের ভিভিয়ান মাস্টার্সে'র মত পুলিস দেখলেই ক্ষেপে ওঠার মত অদ্ভুত আচরণ বড় একটা শোনা যায় না। কৃশ চেহারা, দেখে মারপিটে স্বভাবের বলেও মনে হবে না। চেহারায় কিছুটা আকর্ষণ আছে, এবং হাসি হাসি মুখ দেখলে যে কোন লোকেরই মন গলে যাবে। কিন্তু পুলিস দেখলেই ওর আর এক মূর্তি হয়ে দাঁড়ায়।

পুলিসের ওপর ভিভিয়ানের আক্রোশ দেখা দেয় ১৯৪৯ সনের এক ঘটনায়, ওর বয়েস যখন তের। ভিভিয়েন তার এক সমবয়সী ছেলে বন্ধুর সংগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল, একজন পুলিস বেটন ঘোরাতে ঘোরাতে তার কর্তৃত্ব জাহির করতে এল। "হটে যাও, হটে যাও" বলে ছেলেটির পিঠে একটু ধাক্কা দিলে, "ফুটপাত আটকে রেখেছ তোমরা।"

আরক্ত চোখে ভিভিয়েন পুলিসটির দিকে এগিয়ে গেল, "ধাক্কা দেবার তুমি কে?"—ক্রুদ্ধ হয়ে প্রশ্ন করলে ভিভিয়েন।

পুলিসটি প্রথমে একটু যেন হকচাকিয়ে গেল। বললে, "সরে পড় তা না হলে আইনকে বাধা দেবার জন্যে তোমাদের—" কথা আর শেষ হল না, পুলিসটি বেদনায় উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল। ভিভিয়েন ওর একটা পায়ের নলিতে লাথি কষিয়ে দিলে এবং সংগে সংগেই অপর পায়ে। তারপর বন্ধুর হাত ধরে দুজনে সরে পড়ল, পুলিসটি তখন পায়ের আঘাতে অস্থির।

কাছেই আর একটি পুলিস ছিল সে ওদের দুজনকে ধরে থানায় নিয়ে গেল। সেদিন দুপুরে অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিচারালয়ে ম্যাজিস্ট্রেট কড়া রকমের ধমক দিয়ে ওদের ছেড়ে দেন।

এর তিন বছর পর আবার পুলিসের সংগে বিবাদ বাঁধলো আর এক ঘটনায়। ভিভিয়েন গিয়েছিল ছবি দেখতে, কিন্তু চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষ ওর বয়েস ষোলর বেশী বলে অভিহিত করে ওকে অপ্রাপ্তবয়স্কদের টিকিট দিতে অরাজী হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে ওর বয়েস ষোলর এক সপ্তাহ কম ছিল। ভিভিয়েন নিজের বয়েস যখন ষোলর কম সেক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বর্ধিত হারের টিকিট না কেনা তার অধিকার আছে বলে দাবী করতে থাকে। কোন উপায়েই তাকে হটাতে না পেরে শেষে ম্যানেজার পুলিস ডাকতে বাধ্য হয়।

পুলিস এসে ভিভিয়েনকে হটে যেতে বলে; কিন্তু ও নড়বার নামটিও [illegible] না। এরপরই পুলিসটি এক মহা ভুল ক'রে বসলো, ভিভিয়েনের হাতটি ধরে ওকে লবির বাইরে বের করতে গেল। আগুনে যেন ঘি পড়ল। রোগা হলে কি হবে ভিভিয়েন ডান হাতে মারলে পুলিসের নাকের ওপর এক ঘুষি আর সংগে সংগেই বাঁ হাত দিয়ে তলপেটে আর একটা। হতভম্ব পুলিসটি সামলে উঠতে না উঠতে তার একটা পায়ের নলিতে গোড়ালির এক লাথি এবং সংগে সংগে আরেক পায়ে আর এক লাথি এবং ডানহাতের এক ঘুষি বাঁ চোখের ওপর। পুলিসটি যত চেষ্টা করে ক্ষিপ্রভঙ্গী মেয়েটিকে ধরতে ততই ভিভিয়েন তার চারদিকে লাথি আর ঘুষি ছুঁড়ে ছুঁড়ে বক্সিং করার ভঙ্গীতে লাফিয়ে লাফিয়ে নিজেকে নাগালের বাইরে রেখে দিতে থাকে। ইতিমধ্যে সেখানে বেশ ভিড় জমে গেল এবং পুলিসটি তার রক্তাক্ত নাক, আধবোজা চোখ এবং আহত পা নিয়ে সাহায্যের জন্য আবেদন করলে, কিন্তু লোকে সাহায্য করবে কি, মজা দেখে হেসেই লুটোপুটি।
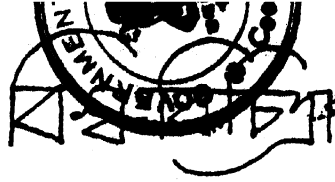
শেষে পুলিসটির হুইসিল শুনে আরো কজন পুলিস এসে উপস্থিত হল। তারপর যা ঘটল, নিউ জার্সি'র লোকের দীর্ঘকাল তা মনে থাকবে। পরিসমাপ্তি ঘটল আরো একজন পুলিস পায়ের যন্ত্রণায় লুটোপুটি খাবার পর দুজন পুলিস ভিভিয়েনের হাত ধরে ওকে ফুটপাতে ফেলে দিতে। আদালতে ভিভিয়েনের বাবাকে শ' পাঁচেক টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে রেহাই পেতে হল।

ঐ ঘটনার পর বছর পাঁচেক ভিভিয়েন বেশ শান্ত ছিল: নিউটনের লোকে এই পুলিস-প্রহারিনী মেয়েটির কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল। এরপর এল ১৯৫৭ সনের জানুয়ারীর এক সন্ধ্যা। ভিভিয়েন গিয়েছিল একটা নাচের পার্টিতে। সেখানে একটি মেয়েকে উপলক্ষ্য করে দুই যুবকের মধ্যে লড়াই আরম্ভ হয়ে যায়। ভিভিয়েনেরও মারপিটের প্রবৃত্তিটা হঠাৎ চাড়া দিয়ে উঠল এবং যখন দেখলে যে, একজন যুবকের হয়ে তার এক বন্ধু তাকে সাহায্য করতে এগিয়েছে তখন ভিভিয়েনের পক্ষে নিজেকে সামলে রাখা মুশকিল হল। ও চাইলে যা ন্যায্য তাই হোক এবং তখুনিই হাতাহাতির মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুজনের দঙ্গলটিকে উত্তমমধ্যম দিলে। পুলিস আসতে ভিভিয়েন তাদেরও আক্রমণ করলে। অনেক কষ্টে চারজন মিলে ওকে নিবৃত্ত করে থানায় নিয়ে গেল। ওর বিরুদ্ধে মারপিট ও আক্রমণের অভিযোগ দায়ের করা হল। এবারও ওর বাবা এসে ওকে জামিনে মুক্ত করে নিয়ে যান।

এরপর ভিভিয়েন কিছুদিন একটা কাজে লেগে রইল এবং আবার ওর খবর বের হল মে মাসে। ভিভিয়েন তার গাড়িখানা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে, এক বদমেজাজী পুলিস এসে ওকে ওর ঐ "পুরনো লোহার পাঁজাটা" সরিয়ে নিয়ে যেতে বললে। বলা বাহুল্য, এ ধরনের ভাষা সহ্য করার পাত্রী ভিভিয়েন নয়। কাজেই যা ঘটবার তাই ঘটল—মুখের কথা শেষ হতে না হতেই পুলিসটি পায়ের নলিতে লাথি খেলে। মিনিট দশেক উন্মত্ত লড়াইয়ে আরো একজন পুলিস এসে যোগ দেবার পর ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরে দেওয়া হল। সেদিন ওর জরিমানা হয় পাঁচশ টাকা এবং গাড়ি চালানোর লাইসেন্স ছ' মাসের জন্য রদ করে দেওয়া হয়। ভিভিয়েনকে ক্ষিপ্ত করে তোলায় এর চেয়ে বড় প্ররোচনা আর কি হতে পারে!

জুন মাসের এক সন্ধ্যায় ভিভিয়েন নিউটনের সদর থানায় গিয়ে হাজির টোটাভরা একটা বন্দুক নিয়ে, পাল্টা শিক্ষা দেবে বলে।

যে পুলিসটির জন্যে মারপিট করতে হয়েছিল ভিভিয়েন তার খোঁজ করতে লাগল। পুলিস অফিসার যারা ওকে নিবৃত্ত করতে এগিয়ে আসছিল তাদের দিকে বন্দুক তুলে চেঁচিয়ে উঠল গুলি করবো বলে। অফিসাররা বুঝলে যে, গোঁয়ার্তুমিতে কিছু হবে না, চাতুর্যের দরকার। বন্দুকটা ঘোরাতে ঘোরাতে যাবার সময়ে পালোয়ান গোছের তিনজন পুলিস পিছন থেকে ওকে ধরে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিলে। নিরস্ত্র হলেও কিন্তু ভিভিয়েন হতাশ হল না। ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মতো পুলিসগুলোর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘুষি মেরে, আঁচড়ে, কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে পালিয়ে যেতে গেল। একজন পুলিসকে জোরে ঘুষি মারতে উদ্যত হতে পুলিসটি নিচু হয়ে পড়তেই একটা দরজার কাঁচ ভেঙে ভিভিয়েনের [illegible] যেতে তবে লড়াইটা থামল। [illegible] হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে [illegible] শুশ্রূষা করার পর [illegible] বারশ টাকা জরিমানা এবং কুঠার [illegible] উদ্দেশ্যে মারাত্মক [illegible] আক্রমণ করার অপরাধে তিন বছর [illegible] থাকবার মুচলেকা সই করিয়ে ছেড়ে দেওয়া হল।

গত বছরের গোড়া পর্যন্ত বেশ শান্তভাবেই কেটে গেল। তারপর আবার, ওকে চেনে না এমন একজন পুলিস, ওকে ওর গাড়ির দরজা খোলবার জন্য টানাহাঁচড়া করতে দেখে বোধ হয় গাড়ি-চোর মনে করে ওর কাছ থেকে মালিকানা লাইসেন্স দেখতে চায়। পুলিসের কথার ধরনটি ভিভিয়েনের ভাল লাগেনি, তাই ওর নির্ঘাৎ লক্ষ্য পায়ের নলিতে এক লাথি মেরে নাকের ডগায় একটা ঘুষি লাগিয়ে দিলে। আদালতকে ভিভিয়েন জানায়, "লোকটা যদি ভালভাবে বলত, আমি কাগজপত্র দেখাতাম. কিন্তু ও বললে, 'কাগজপত্র দেখি, না গাড়িখানা তুমি চুরি করছ।'" ম্যাজিস্ট্রেট ওকে আড়াই শ টাকা জরিমানা করে দপ করে মেজাজ চড়ানোর জন্যে ধমক দিয়ে ছেড়ে দেন।

এততেও ভিভিয়েনের চৈতন্য হল না। কিছুদিন আগে ক্লারেন্স মেৎসজার নামে এক পুলিস মারপিটের একটা খবর পেয়ে ভিভিয়েনের ভাই ভার্জিল মাস্ট্যার্সের বাড়িতে উপস্থিত হয়। মেৎসজার গিয়ে দেখে, ভার্জিল মার খেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। মেৎসজার সাহায্যের জন্য বেরিয়ে যায়। মিনিট কয়েক পরে পুলিস [illegible] কর্পোরাল সি বি ফিশার এবং আর একজন পুলিশ উপস্থিত হয় এবং ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে এক প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে এমন সময় সামনের দরজাটা [illegible] রণচণ্ডী মূর্তিতে ভিভিয়েন এসে দাঁড়ায় ডান হাতে একটা কুঠার। এসে বলে, "আমি আগে থেকেই এখানে রইছি. কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে তর্কের এখনও শেষ হয়নি। এইবার তার নিষ্পত্তি করবো।"

পিস্তল বাগিয়ে পুলিস তিনজন সতর্কভাবে ভিভিয়েনের দিকে এগিয়ে চলল কিন্তু কুঠারটা ও বাগিয়ে ধরতেই ওরা পিছিয়ে গেল। একজন অফিসার বললে, কুঠারটা যদি ও ফেলে না দেয় তাহলে গুলি খেতে হবে। কিন্তু তাতেও ওর ক্রুদ্ধ চীৎকার নিবৃত্ত হল না। হঠাৎ পুলিসদের একজন ওর হাতের নিচে ঝুঁকে পড়ে এক ঝটকায় ওকে মাটিতে ফেলে দিলে, কুঠারটা ওর হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য পুলিসেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল কিন্তু তবু ওকে বাগে আনতে মিনিট পনের লাগল এবং শেষে যখন ক্ষান্ত করা গেল তখন পুলিস ক'জনের কারুর নাক দিয়ে রক্ত ঝরছে, কারুর চোখ ফুলে ঢিবি, কারুর চোয়াল আঁচড়ের চোটে রক্তাক্ত, কেউ বা ওর লাথির ঘায়ে পায়ের নলির যন্ত্রণায় কাতর। ওদের মধ্যে দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করার অপরাধে বিচারাধীন অবস্থায় জেলে থাকাকালেও পুলিসের ওপর ওর সমান রোষ। একজন ওয়ার্ডারের বেটন কেড়ে নিয়ে জানলার আধখানা চূর্ণ করে দেয়। ও বলে, "জীবনে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে পুলিসকে প্রহার দেওয়া। ওদের আমি সইতে পারি না। ওদের সঙ্গে আমাকে লড়তেই হবে।" এবারে ওর বাবা ওকে আর জামীনে মুক্ত করে আনেননি। তিনি বলেন, "ওকে বাইরে আনা মানে খাঁচা থেকে বাঘিনীকে বের করে আনা। জেলে থেকেই ও শান্ত হোক, ভাল হোক, তারপর বাইরে আনা যাবে।"

আর ভিভিয়েন? আদালতে ও বলে, "পুলিসকে যদি সহ্য করতে না পারি ত আমি কি করব? আমার চোখে পুলিস পড়া মানে কুকুরের সামনে বিড়াল পড়ার মত। স্বভাবতই লড়াই বেঁধে যায়!"

*

রেঙ্গুনের "বামাকাহিত" পত্রে এক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়ঃ "বন্ধুদের জ্ঞাত করা হচ্ছে যে, ১৯৫৯ সনের ১৩ই জানুয়ারী প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে যে বলা হয়েছিল, আমার সঙ্গে মা মিয়া সিয়াংয়ের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে সেটা করা হয়েছিল বিবাহবিচ্ছেদের জ্যোতিষলিখন কাটানোর জন্যে।"

*

ইন্দোনেশিয়ার ইন্দ্রমায়ু নগরের কর্তৃপক্ষ বিবাহের লাইসেন্সের নূতন ফি ঘোষণা করেছেনঃ পঁচিশটি ইঁদুরের লেজ।

প্রবন্ধ

চলন্তিকা—রাজশেখর বসু। **মিত্র ও ঘোষ,** ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। আড়াই টাকা।

চলমান সমাজের চলিত চিন্তাকেই বিভিন্ন বিষয়ক আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সামনে ধরে দিয়েছেন লেখক। আমাদের পরিচ্ছদ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গল্পেরবাজার, সাহিত্যের পরিধি, বানানের সমতা ও সরলতা, . আচার্য উপাচার্য, স্বাধীনতার স্বরূপ আমিষনিরামিষ, গ্রহণীয় শব্দ, শিক্ষার আদর্শ এই দশটি বিভিন্ন-মুখী রচনা এই বই-এ গ্রথিত হয়েছে। সহজ-কথা সহজে বলা কত শক্ত লেখকমাত্রেই তা অবগত আছেন। শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর মত বিশাল এবং গভীর পাণ্ডিত্য পশ্চাদপট হিসাবে সংযুক্ত হলে তবেই পাকা গল্প লিখিয়ের হাত দিয়ে প্রবন্ধ বিষয়ের এ জাতীয় রম্য প্রকাশ সম্ভব। খাদ্য থেকে ব্যাকরণ, শিল্প থেকে শিক্ষা সমাজের চতুর্দিকের আলোচনাই রাজশেখরবাবুর মসৃণ কলমে ধরা দিয়েছে। গুরুতর বিষয়কেও সহজপাঠ্য রসে রাঙিয়ে তুলতে লেখক অদ্বিতীয়। পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করে, স্বল্প পরিসরের মধ্যে কী আশ্চর্য উপায়ে যে তিনি তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং যুক্তিকে একাগ্র করে যে কোন বিষয়কে রহস্যময় ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারেন চলন্তিকা তার অন্যতম উদাহরণ। রম্য-রচনার ঢঙে, কখনো বা কথকতার শৈলীতে তিনি এগুলি রচনা করেছেন। সোমা ভাষায় লেখা এই দশঅবতারে প্রবন্ধগুলি যে-কোন গল্পের চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়। বইটি বাঙালী মাত্রেরই পড়ে দেখা উচিত। ২৩।৫৯

জীবনী

বিজ্ঞানী ঋষি জগদীশচন্দ্র—শরদিন্দু ঘোষ। সম্পাদনা : দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড, ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য—ছয় টাকা।

বাংলাদেশের জনসাধারণের কাছে বর্তমান সময়ে জগদীশচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বিস্মৃত-প্রায় মনীষী মাত্র। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনস্মৃতির ইতিহাস একই রকম। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের নাম শোনেনি এমন বাঙালী যেমন বাংলাদেশে নেই, তেমনি সমগ্র জীবনে জগদীশচন্দ্র যথার্থই কি ছিলেন তা সম্যকরূপে তরুণ বঙ্গসমাজ খুব অল্পই জানে। বিজ্ঞানী হিসাবেও জগদীশচন্দ্রের সারা জীবনের কর্মসূচী সাধারণের কাছে সুপরিজ্ঞাত নয়। জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হওয়ায় তাঁর সম্বন্ধে আমরা কিছুটা সচেতন হয়েছি মাত্র।

আলোচ্য গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য এই মনীষীর বহুমুখী জীবনকেই আলোকিত করা। কর্মময় জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও জগদীশচন্দ্র দেশের বিভিন্ন সাময়িক চেতনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন, এই দেশপ্রেমিক কলারসিকের জীবনীগ্রন্থ সেকথাই উদ্ধৃত করেছে। জগদীশচন্দ্রের বিভিন্ন রচনাংশ, অভিভাষণ, চিঠিপত্র এবং জগদীশ-চন্দ্রের প্রতি রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ও তাঁর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও এন বাদোভস্কি-র বিভিন্ন সময়ের লিখিত মন্তব্য এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ ছাড়া গ্রন্থ-শেষে মনীষী জীবনের কালানুক্রমিক ঘটনার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। পনেরটি আর্ট-প্লেট এই গ্রন্থের শোভা এবং মূল্যবৃদ্ধি

করেছে। এই গ্রন্থের মহৎ উদ্দেশ্যকে আমরা অভিনন্দন জানাই। ৬।১০।৫৮

ছোটগল্প

প্রথম পরশ—প্রবোধবন্ধু অধিকারী। সজনী প্রকাশক, কলিকাতা-১২। দুই টাকা।

চিহ্ন, দরজা, ছাপার অক্ষরে ফাঁকি, পূর্বাপর, চুরি, শামুক আর প্রথম পরশ—এই আটটি ছোট গল্পের সংকলন আলোচ্য গ্রন্থখানি। গ্রন্থের প্রারম্ভেই লেখক জানিয়েছেন যে, শামুক ছাড়া এই গ্রন্থের অন্যান্য গল্প তাঁর আগের লেখা, এবং সেদিক থেকে হয়তো বা কিছু অপরিণত।

কিন্তু গল্পগুলো পড়ে এটাই মনে হয়েছে, এই পূর্বেকার লেখাগুলোতেও ছোট গল্প লেখার আঙ্গিক যে তিনি ভালোভাবেই আয়ত্ত করেছেন তার স্বাক্ষর বর্তমান। প্রায় সব কয়টি গল্পই সুলিখিত এবং রসোত্তীর্ণ। লেখকের ভবিষ্যত সৃষ্টি সমৃদ্ধতর হয়ে উঠুক আমরা এই কামনাই করি। ৫।৫।১।৫৮

স্কেচ—মদন দাস। ইসারা প্রকাশনী, কলকাতা-২৩। দু'টাকা।

"স্কেচ" মদন দাসের প্রথম গল্পের বই। কিন্তু এই প্রথম বইটিতেই যে বিরাট সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি তিনি জানিয়েছেন, তাতে তাকে স্বাগত জানাতে হয়। স্বল্প আয়াসেই ছোট ছোট বাস্তব ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার এই গল্পগুলো ফুটে উঠেছে ভাস্বর হয়ে। বস্তু বৈচিত্র্যে প্রায় সবগুলোই হয়েছে আকর্ষণীয়। স্বল্প রেখার বলিষ্ঠতায় চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। আমরা আশা করি, শ্রীমদন দাসের ভবিষ্যত রচনা আরও সার্থক সুন্দর হয়ে উঠবে। ৫।৯।৪।৫৮

পঞ্চদশী—নির্মল দত্ত সম্পাদিত। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা-১২। দুই টাকা।

প্রখ্যাত ও স্বল্পখ্যাত পনের জন লেখকের পনেরোটি ছোট গল্পের সংকলন করেছেন শ্রীনির্মল দত্ত। লেখক ও গল্পের নাম যথাক্রমে দক্ষিণারঞ্জন বসুর প্রতিদান, আশাপূর্ণা দেবীর ফাউণ্টেন পেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রতিভূ, জ্যোতিকুমারের কুঁড়ি, কণপ্রভা ভাদুড়ীর ক্ষুধা, নন্দগোপাল সেনগুপ্তের কুসুমদি, অরুণ সরকারের দৈব ওষুধ, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের রাইচরণ, গোপালকৃষ্ণ রায়ের অনপত্যা, অখিল নিয়োগীর মাটি-মা, অন্নপূর্ণা গোস্বামীর ছোট, নীহাররঞ্জন সিংহের একতারা, রণজিৎকুমার সেনের আইড়ি, বাণী রায়ের উজ্জ্বল মুহূর্ত এবং নির্মল দত্তের অনুকম্প।

সংকলনটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এর কোন ভূমিকা নেই, তাই কি উদ্দেশ্যে বা ভিত্তিতে এই সংকলন তা বোঝা গেল না। তবে পনেরোটি গল্প একসঙ্গে পড়ে দেখল একটুকুই লাভ।

প্রচ্ছদপটটি সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ।

২৫।৫৯

রাজনীতি

The World by 1975—K. C. Banerjee, K. C. Banerjee & Co., 192|C, Cornwallis Street, Calcutta-6. Price Rs. 5.50.

ব্যক্তিগত হোক অথবা জাতিগত, ভবিষ্যতের ইতিবৃত্ত জানতে প্রত্যেকেরই কৌতূহল থাকে স্বাভাবিক। এই কৌতূহল থেকেই পুরো বইটি পড়ে যেতে এবং রাজনীতি সম্পর্কে কিছুমাত্র আগ্রহ থাকলে, পাঠকের উৎসাহ সবসময় বজায় থাকে। হয়ত উপন্যাস পাঠের মতই আনন্দ তিনি লাভ করেন।

গ্রন্থকার কে সি ব্যানার্জি বিশ্বপর্যটক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা। কোন দলের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা নেই, কোন ধর্ম, সম্প্রদায় বা জাতির প্রতি তাঁর বিরূপতা নেই। তাই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপুষ্ট বিশ্ব রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে মৌলিক চিন্তাধারা কেউ গ্রহণ করতে পারেন, কেউ অগ্রহণও। তথাপি তাঁর অভিমতগুলি যুক্তিসংগত ও একটি চারিত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সতেরোটি অধ্যায়ে সমৃদ্ধ এই বইটিতে গ্রন্থকার ভারতীয় ও বিশ্ব রাজনীতির অনেকগুলো সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, দৈনিক পত্রের উৎসাহী পাঠকদের কাছে এই আলোচনাগুলি চিন্তা ও আনন্দের খোরাক দেবে। শেষ অধ্যায়ে ১৯৭৫ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যে চেহারা হতে পারে, তার আলোচনা করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার বিশেষ বৈভব ও সাফল্যের পটভূমিকা ভারতের পাঠকদের ভাবিয়ে তুলবে। কিন্তু পাকিস্থানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি নির্বাক কেন? সে দেশের আকস্মিক ঘটনা-বৈচিত্র্যে হতচকিত হয়ে কি তিনি বাকরহিত? তাই পাঠকদের একটি কৌতূহলকে তিনি পূর্ণ করতে পারেননি।

৫১৯।৫৮

স্মৃতিচিত্র

সাত-সাঁতার—জহুরুল হক। প্রকাশনা : মুস্তফা জামাল, কথাবিতান, ১০১, আরমানিটোলা, ঢাকা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

লেখকের জীবনের অভিজ্ঞতার সরস আলেখ্য। স্মৃতিচিত্র বললেই হয়তো যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয়। 'সাতসাগর পেরিয়ে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি।' তা বলে নিছক ভ্রমণ-কাহিনী নয়। লেখকের মন আশ্চর্য একটি সমবেদনায় প্রোজ্জ্বল। বিশেষত 'জীবন-যৌবন' রচনাটিতে তাঁর মনের সেই উপলব্ধ জীবন-রস নির্ঝরিত হয়ে একটি অপূর্ব রসরূপ গ্রহণ করেছে। এঁর দেখবার চোখ শিল্পীমনের, বর্ণনারীতি শিল্পীজনের। লেখকের কাছে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা প্রচ্ছদ সুন্দর। (৩১৫/৫৮)

অনুবাদ

এডগার অ্যালেন পোর নির্বাচিত গল্প—অনুবাদক : শতদল গোস্বামী। গ্রন্থম, ২২।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। এক টাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা।

হাসির গল্প লেখক হিসাবে শ্রীযুক্ত শতদল গোস্বামীর নাম সুপরিচিত থাকলেও অনুবাদক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব আমাদের অজানা ছিল। এডগার অ্যালেনপোর সাতটি বিখ্যাত গল্প এই গ্রন্থে অনূদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবি, সম্পাদক এবং লেখক এডগার অ্যালেন পো ঊনিশ শতকের এক বিস্ময়কর প্রতিভা। দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যের সঙ্গে দৈবরথযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত পো মাত্র চল্লিশ বছর এই পৃথিবীতে ছিলেন, কিন্তু তাঁর এই স্বল্পায়ু জীবনের কাছ থেকে সাহিত্য পিপাসুর দল চিরকালীন রসদ পেয়ে গেছে। কি কবিতায় কি গল্পে তাঁর শিল্পনৈপুণ্য পরবর্তী বহু বিখ্যাত লেখকের রচনায় ছায়াপাত করেছে। চমকপ্রদ ও বিস্ময়সঞ্চারী আবহরচনায় ভাষা-শিল্পী অ্যালেনপোর জুড়ি নেই, গল্পের বুননিতেও তেমনি তাঁর ব্যূহরচনার কৌশল চিরস্মরণীয়। আলোচ্য গল্পগুলি সেই শ্রেণীর। অনুবাদক অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে মূলগল্পের রসবস্তু এবং ভাস্কর্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। 'সোনাপোকা' গল্পটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই নিষ্ঠাবান অনুবাদকের কাছে ভবিষ্যতে আমাদের অনেক প্রত্যাশা থাকল।

৩৩।৫৯

নির্বাচিত গল্প—ও হেনরি। অনুবাদক : রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থম, ২২।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

উইলিয়াম সিডনি পোর্টারের নাম আজ অনেকেই ভুলে গেছেন, কিন্তু ও'হেনরিকে ভাষা থেকে ভাষান্তরে দিনের পর দিন আবিষ্কার করা যাচ্ছে নতুন করে। আলোচ্য গ্রন্থে ও'হেনরির যে আটটি গল্প অনূদিত হয়েছে বাংলা ভাষায় তারা এই প্রথম নয়। কয়েকটি গল্প একাধিকবার বিভিন্ন লেখক কর্তৃক অনূদিত হয়েছে ইতিপূর্বে। শ্রীযুক্তা রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ সে বিষয়ে প্রথম না হলেও ভাষান্তকরণের সাবলীলতায় এবং সংযমে প্রায় প্রথম শ্রেণীর একথা বলা যায়। শ্রীযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা অভিনন্দন জানাই।

৩৪।৫৯

শান্তির নবদিগন্ত—চেস্টার বোলাজ। অনুবাদক : পরিমলকুমার ঘোষ। পার্ল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭০, মহাত্মা গান্ধী রোড, বোম্বাই—১। মূল্য—এক টাকা।

ভারতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বতন রাষ্ট্রদূত শ্রীযুক্ত চেস্টার বোলজ যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তির নবদিগন্ত খুঁজেছেন এই গ্রন্থে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সম্প্রতি যুদ্ধ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং চিন্তার দিক থেকে পৃথিবীর সকল দেশই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই চারশতাধিক পৃষ্ঠার বই-এ তিনি এশিয়া-আফ্রিকা, আমেরিকা-য়ুরোপের চলমান জীবনের কথা লিখেছেন, মার্কিনী দৃষ্টিতে তার সত্যাসত্য বিচার করেছেন, তাঁর এই রচনা তাঁর নিজেরই ভাষায়, "একজন ব্যক্তির প্রাথমিক প্রয়াসমাত্র, আর এ-ধরনের আলোচনা যা হওয়া উচিত—উন্নততর প্রত্যুত্তরের জন্য আহ্বান।" একথাও মনে রাখতে হবে। অনুবাদ সুখপাঠ্য হয়েছে। ছাপা সুন্দর।

৫১।৫৯

সাগরে মিলায় ডন (প্রথম খণ্ড)—মিখাইল শলোখফ। অনুবাদক : রথীন্দ্র সরকার। প্রকাশক : ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলি-১২। দাম—ছয় টাকা।

শলোখফের Don Flows Home To The Sea সর্বজনবন্দিত উপন্যাস। বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ প্রকাশ ক'রে প্রকাশকরা একটি কাজের মতো কাজ করেছেন। মূল উপন্যাসের আলোচনা এখানে অবান্তর। অনুবাদ-কর্মই আলোচ্য। সেদিক থেকে অনুবাদক সার্থক। ভাষা কোথাও আড়ষ্ট বা কষ্টার্জিত মনে হয়নি। ঔপন্যাসিকের মর্যাদা অনুবাদক সযত্নে রক্ষা করেছেন। তবু একটি অনুযোগ আছে। বাংলাদেশে এখন রুশ ভাষার চর্চা ক্রমেই বাড়ছে। অতএব মূল রুশভাষা থেকে অনুবাদ করার বিশেষ অসুবিধা আর নেই। প্রকাশকরা এদিকে উদ্যোগী হ'লে, অন্তত প্রতিষ্ঠাবান রুশ সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে, ভালো হ'ত।

দামের সম্বন্ধেও বলতে হচ্ছে। বাংলা বইয়ের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে বই কেনা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের পক্ষে ক্রমেই দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। বইয়ের ব্যবসায়ীদের সময় থাকতে সচেতন হওয়া প্রয়োজন মনে করি। (৫৫৭।৫৮)

বিবিধ

ডাক টিকিটের জন্মকথা—শচীবিলাস রায়-চৌধুরী। প্রজ্ঞা প্রকাশনী, পত্রিকা ভবন, কলিকাতা-৩। মূল্য ছ'টাকা।

ডাক টিকেট এককথায় চলতিকালের পায়ের ছাপ। সভ্য সমাজের ঘটমান বর্তমানকে সে বহন করে নিয়ে যায় ধাক্কা ও অর্থের মধ্য দিয়ে আগামীকালের কাছে। প্রতিটি ব্যক্তির স্বতন্ত্রতাকে মূল্য দিয়ে, ব্যক্তিগত নির্ভুতিকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সাংবাদিক জয়যাত্রা বিচিত্র পথে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ডাকটিকিট, সেই চতুষ্কোণ কাগজখণ্ড এর পিছনে পিছনে বহন করে এনেছে সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, বাণিজ্যের সমৃদ্ধি-অসমৃদ্ধি, রাজনৈতিক মানচিত্র, অর্থ-নৈতিক অভিযান। এককথায় বিশেষ বিশেষ ভূখণ্ডে সন্নিবিষ্ট মানবজাতির সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস চিহ্নিত করে চলেছে এই ডাকটিকিট। মাত্র একবার মূল্যলাভের জন্য যে জন্মায়, ওর্বাধর মত; একবার ব্যবহারে যে অচল হয়ে স্মৃতি-চিহ্ন সার হয়ে থেমে যায়, একটি ঠিকানায় পৌঁছেই গতি যার হয় স্তব্ধ। কিন্তু সেই ডাকটিকেটেরও দ্বিতীয় জন্ম আছে, আছে দ্বিতীয় জীবন। ঐতিহাসিকের সংগ্রহশালায় সে তখন আসন পায় এবং সেই অচলিত সংগ্রহে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার মূল্য বাড়ে। পেশার চেয়ে মানুষের কাছে নেশার দাম চির-কালই বেশি। এবং ডাকটিকেট জমানোর নেশা সারাপৃথিবী জুড়ে এক বৃহৎ নেশা। শ্রীযুত শচীবিলাসবাবু এই ডাকটিকেট নেশাচারী-দের মধ্যে অন্যতম, যিনি ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা এবং লিপিকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে, য়ুরোপে ডাক-টিকেটের ওপরে সচিত্র আলোচনাগ্রন্থের অভাব নেই, কিন্তু বাংলা ভাষায় বোধহয় শচীবিলাস-বাবুই এ বিষয়ের প্রথম গ্রন্থকার। অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শুধু ভারতবর্ষেই ডাকটিকেটের চেহারা কম বদলায়নি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যুষ থেকে শুরু করে শচীবিলাসবাবু সুযোগ্য ঐতিহাসিকের মতই ডাকটিকেটের গতিপথ ফুটিয়ে তুলেছে। বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের ডাক-ইতিহাস এই গ্রন্থে সচিত্র গ্রন্থিত হয়েছে। 'ডাকটিকেটের জন্মকথা' নিঃসন্দেহে একটি তথ্যবহুল মূল্যবান গ্রন্থ হয়েছে বলে মনে করি। বহু ইংরেজী বাক্য এবং শব্দ রয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে, সেগুলির বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে ভাল হত, অন্যথায় বাংলা হয়েছে। ৫৪৩।৫৮

যৌন প্রসঙ্গে—ডাঃ মদন রাণা। প্রকাশক ক্লাসিক প্রেস, ৩।১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

'যৌন প্রসঙ্গে' ব্যতীত 'জন্ম নিয়ন্ত্রণ' এবং 'পরিবার পরিকল্পনা' গ্রন্থের লেখক ডাঃ মদন রাণা যৌন-বিজ্ঞান রচনায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বহু সমস্যা জর্জরিত আমাদের দেশে যৌন সমস্যাও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কি পুরুষ, কি নারী প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রকার যৌন সমস্যার দ্বন্দ্ব-দ্বিধায় নিপীড়িত। কাজেই যৌন বিজ্ঞান সম্পর্কে সকলেরই অল্প-বিস্তর জ্ঞান লাভ করা অত্যাবশ্যক।

আলোচ্য গ্রন্থে যৌন-জিজ্ঞাসা এবং তাহার মীমাংসা সম্পর্কে গ্রন্থকার ২৩ খানি চিত্র সহযোগে গবেষণাপূর্ণ বহু জটিল যৌন-তত্ত্বের পর্যালোচনা করিয়াছেন। কাজেই আপাত-দৃষ্টিতে যাহা যৌন-সমস্যা বলিয়া সাধারণের কাছে প্রতিভাত, তাহা যে আদবে যৌন সমস্যা নহে এবং সমস্যা হইলেও তাহা যে অল্পায়াসে অতিক্রম-যোগ্য, এই গ্রন্থে তাহা সুষ্ঠু যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বিষয়ের আলোচনা গ্রন্থখানির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান যুগে এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার ও প্রসার দ্বারা সমাজ-জীবন নিঃসন্দেহে উপকৃত হইবে। ছাপা বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট প্রশংসার্হ। ১৭৮।৫৮

সাময়িকী—অনিলবরণ গঙ্গোপাধ্যায়। দে'স পাবলিশিং কনসার্ন, কলিকাতা-১৪। তিন টাকা।

ভারত সরকারের তরফ থেকে যে সমস্ত সর্ব-ভারতীয় সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয়েছে বাঙালী পাঠকের সাথে তার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই প্রধানত এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলো লিখিত। এতে আছে ১৯৫৬, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের সর্ব-ভাষা কবি সম্মেলন, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের সর্বভারতীয় সাহিত্য সমারোহ, ১৯৫৫, ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালের মুদ্রণ প্রদর্শনী এবং ১৯৫৭ সালের সংগীত সম্মেলনের বিবরণ। তৃতীয়টি ছাড়া অন্য তিনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে আকাশ-বাণীর প্রযোজনায়। তৃতীয়টির আয়োজন করে-ছেন ভারত সরকার। এছাড়াও যে তিনটি প্রবন্ধ আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তা হল—তানসেন, আলবেয়ার কামু ও আঁদ্রে জিদ্ এবং লোকমান্য তিলক। এই প্রবন্ধগুলোকে এই সংকলনে প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়।

সংকলনের ভূমিকায় হুমায়ুন কবির লিখে-ছেন, "সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রের কথা ছেড়ে দিলেও তাঁর এ প্রচেষ্টার ফলে বাঙালী পাঠক ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য প্রয়াসের সঙ্গে পরিচিত হবার যে সুযোগ পাবে, সেটা কম লাভের নয়।" কিন্তু প্রবন্ধকটিতে সম্মেলনগুলোর যে তথ্যসমৃদ্ধ অন্তরঙ্গ বর্ণনা লেখক এঁকেছেন তা পড়তে পড়তে স্বভাবতই যে কথা মনে হয় তা হল, সর্বভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে শ্রেষ্ঠ ধন আহরণের ভার যাদের ওপর পড়ে এইসব সম্মেলন উপলক্ষে, তাঁরা কী তাঁদের কর্তব্য যথাযথ পালন করেন? রাজবন্দনাই কী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কর্ম? ৬০৫।৫৮

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

পূর্বতনী—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।
সাত ভাই চম্পা—সমর চট্টোপাধ্যায়।
মা—শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র চক্রবর্তী।
আদিগন্ত—সরদার জয়েন উদ্দীন।
চেনা অচেনায়—সলিমুল্ হক খান মিল্কী।
দুই দেশ দুই মন—অজিত সান্যাল।
দাসপুরের ইতিহাস—শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ।
শেষ সংলাপ—গিরিশংকর।
মেঘ-পাহাড়ের গান—অনিলকুমার ভট্টাচার্য।
বাংলার ডাকাত—২য় খণ্ড—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
হিমতীর্থ—সুকুমার রায়।
আমার শাস্ত্র পাঠ—শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস।

গত সপ্তাহে চিত্তরঞ্জনে সেখানকার কর্মিবৃন্দের উদ্যোগে একটি চারু ও কারু-কলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। চিত্তরঞ্জন-বাসীদের শিল্পকর্মের সংগে বাইরের শিল্পীদেরও কিছু কিছু কাজ প্রদর্শন করেছিলেন এ'রা। অবনীন্দ্রনাথ, অন্নদা-মুন্সী, যামিনী রায় এবং দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী প্রমুখ পথিকৃত শিল্পীদেরও কয়েকটি শিল্পকর্ম প্রদর্শন করা হয়েছিল।

চারুকলায় ছিল তৈল-মাধ্যমের রচনা, জল রঙের রচনা, কালী-কলমের স্কেচ, পেন্সিলের স্কেচ, প্যাস্টেলের রচনা এবং মডেলিং। কারুশিল্পে ছিল সূচের কাজ, এমব্রয়ডারী, বোনা প্রভৃতি নানাবিধ হাতের কাজ। এছাড়া কিছু ফটোগ্রাফীরও নিদর্শন টানানো হয়েছিল স্বতন্ত্রভাবে।

একথা ঠিক যে, চিত্তরঞ্জনবাসীদের রচনার সংগে পেশাদার শিল্পীদের রচনার তুলনা করা চলে না—তা হলেও এ'দের শিল্পী-প্রবৃত্তি এবং শিল্পরসিক মনের যে পরিচয় পাওয়া গেছে এ প্রদর্শনী দেখে, সেটা অগ্রাহ্য করার মতন মোটেই নয়। এ'দের মধ্যে কোন কোন শিল্পী যদি শিল্পটাকেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করতেন, তা হলে পাকা শিল্পীর মতই এ'দের কাজ পরিপূর্ণ হয়ে উঠতো, সে বিষয় আমি নিঃসন্দেহ। বিশেষ করে প্রফুল্লকুমার মজুমদারের কাজে লক্ষ্য করেছি পরিণত টানটোন, পরিণত বর্ণিকা ভংগ, পরিণত রূপভেদ এবং পরিণত প্রমাণভাব। এ সব গুণ স্কুলের বা কলেজের অনেক পাশকরা শিল্পীর কাজের মধ্যেও সব সময় লক্ষ্য করা যায় না। ইনি নিজের প্রবৃত্তি ও রসবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হয়ে স্বাধীনভাবে রচনা করে চলেছেন। বিভিন্ন মাধ্যমের ক্রিয়াকৌশল ঠিকভাবে আয়ত্ত করতে পারলে ইনি সত্যই রসোত্তীর্ণ রচনার সৃষ্টি করতে পারবেন, সেকথা জোর দিয়েই বলা যায়। অকৃত্রিমভাবে সহজে ক্রিয়া করে চলার আর্ট বড় কম আর্ট নয়, কিন্তু অনেক সময় শিল্পী যে ভাবকে ব্যক্ত করতে চান তার সহায়তার জন্যে প্রথাপ্রকরণে বৈচিত্র্যের প্রয়োজন হয়ে পড়ে; সুতরাং নতুন নতুন প্রথা-প্রকরণের অর্জনে দোষ নেই। শ্রীমজুমদারকে এ বিষয়েও একটু চিন্তা করতে অনুরোধ করি। নীহার সরকার, সুরেশচন্দ্র পাল, কে কে রাও এবং অঞ্জলি বাগচী এ ক'জনের কাজেও যথেষ্ট সম্ভাবনার লক্ষণ রয়েছে। ঠিকমত অনুশীলন করলে এ'রাও ভবিষ্যতে রসোত্তীর্ণ রচনা করতে পারবেন। বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য ছবি প্রফুল্লকুমার মজুমদারের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড, মহাত্মা, ল্যান্ডস্কেপ, হাঙ্গার এবং অ্যাংজাইটি, নীহার সরকারের সান ফ্লাওয়ার, ল্যান্ডস্কেপ এবং নর্তকী, কে কে রাওয়ের প্রতিকৃতি-গুলি এবং অঞ্জলি বাগচীর বুদ্ধ ও রা পুত্তানী। ফটোগ্রাফী বিভাগে প্র শ্রেণীর কাজের অভাব ছিল না। ডি রায়ের মাদার্স হবী এবং দি লীডার কোনও প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাবার যো এন গুহ নিয়োগীর ফ্রলিক, এস কে ভ নগরের আই রাইট যা এবং হামারা মু এ গুহর লাইফ অ্যান্ড শেড এ ক'টি ছবিও চিত্তাকর্ষক। মডেলিং-এ আর রামচন্দ্রনের রাইনো এবং মায়া মালিনী সিনহার
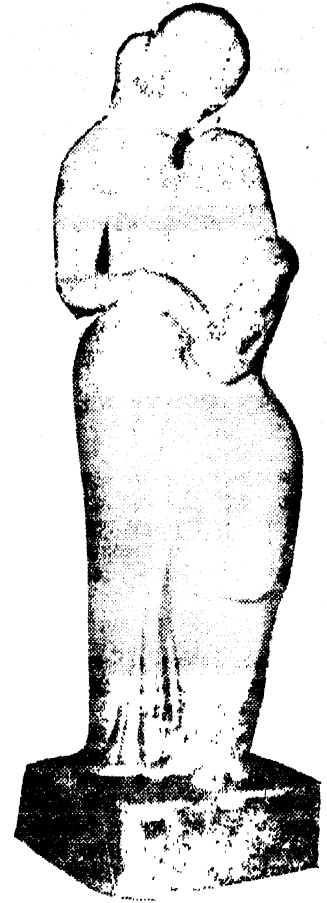
'কনসোলেশন' —মায়ামালিনী সিনহা

কনসোলেশন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারুশিল্পের মানও বেশ উন্নত। বিশেষ করে এমব্রয়ডারী, ক্রুসের বোনার কাজ, কাঁটার বোনার কাজ, ফেল্ট ক্রাফ্‌ট প্রভৃতিতে শিল্পীরা সত্যই পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীমতী শেঠীর কটন প্লাকার্ড এবং ইংলিশ হান্টিং সীন বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পীর রুচি সত্যই প্রশংসনীয়। লিলি ব্যানার্জীর বেড কভার ও ক্রুশের ফ্রক এবং মৃদুলা দত্তের উলের পুতুলগুলিও যথার্থ উত্তম কারুশিল্প। হাতের কাজে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষণ করেছিল শম্ভু শর্মার কাঠের তালা এবং চাবি। এমন নিখুঁত গঠন সচরাচর দেখা যায় না। এটি কোনও অপেশাদার শিল্পীর কাজ বলে মনেই হয় না। কাঠ কেটে তালা চাবি এবং চেনের এমন গঠন সৃষ্টি করা যথার্থই বাহাদুরীর বিষয়। ছাত্রছাত্রীদের কাজের মধ্যে মাধুরী সেঠীর 'ডাকস' এবং সমীর রায়ের রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা পাবার যোগ্য।

—চিত্রগ্রীব

মাদার অ্যান্ড চাইল্ড—প্রফুল্লকুমার মজুমদার

চন্দ্রশেখর

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বৈরাচার

প্রতি বছর ফরাসী গভর্নমেন্টের উদ্যোগে প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক নাট্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের নাটক সেখানে অভিনীত হয় এবং গুণানুসারে তাদের সম্মানিত করবার ব্যবস্থাও থাকে। এ পর্যন্ত ভারতবর্ষ থেকে কোন দল ঐ সম্মেলনে যোগ দেবার সুযোগ পায় নি, যদিও আমন্ত্রণ এসেছে একাধিকবার। এর প্রধান কারণ আমন্ত্রণ আসে সরকারীভাবে উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে আমন্ত্রিত দেশের গভর্নমেন্টের কাছে। ভারত গভর্নমেন্টের ঔদাসীন্যের ফলে নিমন্ত্রিত হয়েও ভারতবর্ষ এতদিন প্যারিসের আন্তর্জাতিক নাট্য-আসরে অনুপস্থিত থেকেছে।

এই বছর প্রথম ভারত সরকার প্যারিসের ডাকে সাড়া দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সুবুদ্ধির উদয় বিলম্বে হলেও অভিনন্দনীয়। ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে উল্লাস বোধ করলেও যে দুটি দলকে তাঁরা প্যারিসে পাঠাচ্ছেন বলে জানা গেছে তাকে সরকারী নির্বাচনের তারিফ করতে পারছি না। প্যারিসের আন্তর্জাতিক নাট্য-উৎসবে যথাক্রমে নাটক ও নৃত্য এই দুই বিভাগে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার ও চিত্রতারকা বৈজয়ন্তীমালার নৃত্য সম্প্রদায়।

ভারতের অধিবাসী হয়েও ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটারের কোন কৃতিত্বের সংবাদ আমরা জানি না। বৈজয়ন্তীমালার নৃত্য ফিল্মের মাধ্যমে আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। উচ্চাঙ্গ নৃত্যের আসরেও তাঁর নাচ দেখবার আমাদের সুযোগ হয়েছে। যেখানে পৃথিবীর সংগে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে হবে, সেখানে ভারত সরকারের এই নির্বাচন খুশিমনে নিতে পারছি না।

এই সম্পর্কে তাই স্বতঃই প্রশ্ন ওঠে, নির্বাচন কে বা কারা করেন এবং কি পদ্ধতিতে তা করা হয়। কোন ব্যক্তি-বিশেষের খেয়াল-খুশির ওপর তা যদি নির্ভর করে, তাহলে ভেবে দেখবার সময় এসেছে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের গৌরব তাতে বাড়বে কিনা।

নাট্য-আন্দোলনের পীঠস্থান এই কলকাতায় কেউ জানতেও পারলো না প্যারিসের নাট্য-উৎসবে ভারতবর্ষের নিমন্ত্রিত হবার সংবাদ,—সেখানে দল পাঠানো তো দূরের কথা। অথচ দেশ-বিদেশের নাট্য-প্রতিনিধির দল বাঙলা থিয়েটারের অভিনয় দেখে পঞ্চমুখে প্রশংসা করে গেছেন। এখানে অবৈতনিক অভিনয়ের আসরে নিত্য যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং দলগত নৈপুণ্যের যে নতুন নতুন পরিচয় মিলছে, তা তো স্বচক্ষেই দেখছি। যাঁদের হাতে একাধারে দেশ-শাসন করবার ক্ষমতা এবং দেশের সংস্কৃতি প্রসারের ভার, তাঁরা বাঙলা দেশের নাট্য-আন্দোলনের এই ভরা জোয়ারের কোন খোঁজ-খবর রাখেন না—এটা দেশের ও জাতির কারুর পক্ষেই আশার কথা নয়।

যদি ভারত গভর্নমেন্ট বাস্তবিকই ভারতীয় নাট্য-সংস্কৃতির যথার্থ পরিচয় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে উপস্থাপন করতে চান, তাহলে তাঁদের উচিত প্রত্যেক প্রদেশের নাট্য-আন্দোলনের

বিশ্বরূপায় অভিনীত শিশু-নাটিকা "মায়া-ময়ূরে"এর একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্য।

রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার চেষ্টা করা। তা হবার দুটি মাত্র উপায় আছে। এক নিখিল ভারত নাট্য-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, অপর দেশের দিকে দিকে উপযুক্ত প্রতিনিধি পাঠিয়ে। এইভাবে বাছাই-করা সেরা দলকে আন্তর্জাতিক নাট্য-প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে দিলে ভারতের সম্মান বাড়বে বই কমবে না। কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় এর উল্টোটাই ঘটবার সমধিক সম্ভাবনা।

শিশু মনোরঞ্জন

চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে শিশু মনোরঞ্জনের প্রয়াস এদেশে খুব বেশী হয় নি। যা হয়েছে তাও হাল আমলে। তাই এ বিষয়ে এখনও আমাদের কোন ঐতিহ্য গড়ে ওঠে নি। প্রতীচ্যে এ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। তার ঢেউ ভারতের বেলাভূমিতেও যে এসে লাগবে তা বিচিত্র নয়। তাই বলে বিলিতী ছড়াকে ভাষান্তরিত করলেই তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠবে না—শিশু মনে দোলা দেবার মত উপাদান না থাকলে কেবলমাত্র অন্যের অনুকরণে এ বিষয়ে সাফল্যলাভ করা শক্ত।

শিশু রংমহল গত কয়েক বছর ধরে এ বিষয়ে নিয়মিতভাবে গবেষণা করে আসছেন। তা যে সুফলপ্রসূ হয়েছে তা শিশু রংমহলের বাৎসরিক নাট্যোৎসবে যাঁরা উপস্থিত থেকেছেন তাঁরাই স্বীকার করবেন। সুখের কথা, কেবলমাত্র একটি প্রতিষ্ঠানের চেষ্টার মধ্যেই বর্তমান আন্দোলন সীমাবদ্ধ নয়। সম্প্রতি তার দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ পেয়েছি।

শান্তিসাদ চৌধুরী ও দীপক সেনের যুগ্ম প্রযোজনায় লিট্‌ল সিনেমা (ক্যালকাটা) "বীরশা ও মায়াপুতুল" নামে একটি ছোট্ট ছবি তৈরী করেছে—দৈর্ঘ মোটে বারোশ' ফুট। ছবিটি ছোট হলে হবে কি, তার মধ্যে বৃহৎ সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে। ছোটদের জন্যে আমাদের অধিকাংশ প্রচেষ্টাই বিফল হয়, সেগুলি বড়দের দৃষ্টিকোণ থেকে তোলা হয় বলে। ছোটরা তাই আশানুরূপ আনন্দ আহরণ করতে পারে না সে সবের ভেতর থেকে। "বীরশা ও মায়াপুতুল"কে এ নিয়মের সম্মানীয় ব্যতিক্রম বলা চলে। ছোটদের গল্প ছোটদের মত করেই বলা হয়েছে এর মধ্যে।

বীরশা একটি আদিবাসী ছেলে। জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে একদিন অদ্ভুত একটা পুতুলের সঙ্গে তার আলাপ হল। পুতুলটি তার সাহচর্য চায়, কিন্তু কুরূপ বলে বীরশার দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখে। বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠল। শিশুসুলভ কৌতুহলের বশে বীরশা পিছন থেকে কিন্তু বন্ধুটিকে দেখে ফেলল। এতখানি কুশ্রীতা সে কল্পনাও করতে পারে নি। বিতৃষ্ণায় সে ছুটে পালাল। পার্বত্য নদী লাফিয়ে পার হতে গিয়ে খরস্রোতের মধ্যে বীরশা পড়ে গেল। যাদুবলে সেই পুতুলটি বীরশার প্রাণরক্ষা করল। কৃতজ্ঞতায় বীরশার মন ভরে উঠল—অন্তরের সুষমা দৈহিক কুশ্রীতাকে সহনীয় করে তুললো বীরশার চোখে। সে প্রাণের আবেগে পুতুল বন্ধুকে আলিঙ্গন করল। সঙ্গে সঙ্গে তার কুশ্রীতার আবরণ খসে পড়ল। জানা গেল, এক ঋষির শাপে তার এই দুর্দশা হয়েছিল। ভালবাসার স্পর্শে তার শাপমোচন হল।

যেমন সরল কাহিনী, তেমনি সহজ তার বিন্যাস। কোথাও চমক দেবার চেষ্টা নেই। যে আদিবাসী ছেলেটি বীরশার ভূমিকায় নেমেছে, তাকে অভিনয় করতে দেওয়া হয় নি কোথাও। পালামৌ অঞ্চলের অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রাকৃতিক দুলালের স্বচ্ছন্দ বিচরণ ক্ষেত্র প্রায় গীতি-কাব্যের আকার নিয়েছে এই ছবিতে।

রচনা ও পরিচালনার কৃতিত্ব শান্তিপ্রসাদ চৌধুরীর প্রাপ্য। আলোক-চিত্রের কাজে উল্লেখযোগ্য দক্ষতা দেখিয়েছেন বারীন সাহা ও গোপাল সান্যাল। মৃণাল চক্রবর্তীর সুরারোপে সূক্ষ্ম রসবোধের সন্ধান মেলে।

মৌমাছি রচিত ও পরিচালিত "মায়া ময়ূর" নাট্যাভিনয় বাংলার শিশুনাট্য আন্দোলনকে একটি নতুন বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। মণিমেলার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই মায়া-নাটিকা যখন প্রথম অভিনীত হয়, তখনই আমরা এর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলুম। বিশ্বরূপা প্রবর্তিত ভারতের প্রথম শিশুনাট্যশালার অভিনয় আসরে এর যে অঙ্গসজ্জা দেখলুম তা শুধু যে অনাস্বাদিত পুলকে মনকে ভরিয়ে দিয়েছে তা নয়, আমাদের কলাকুশলীদের দক্ষতা সম্বন্ধে নতুন করে সচেতন করে তুলেছে সকলকে। সুযোগ ও সুবিধা পেলে আমাদের কলাকুশলীরাও যে অপরূপ "স্টেজ এফেক্ট" সৃষ্টি করতে পারেন তার অনিন্দ্য নিদর্শন রয়েছে "মায়াময়ূর" নাট্যাভিনয়ের সর্বাঙ্গে।

"মায়াময়ূরে"র প্রযোজকদের ধন্যবাদ, শিশুনাট্য আন্দোলনকে এমনিভাবে সার্থক করে তুলতে এগিয়ে এসেছেন ব'লে। বিমল ঘোষ ওরফে মৌমাছিকে ধন্যবাদ তাঁর সৃজনৈপুণ্য ও পরিচালনা-সৌকর্যের জন্যে। যে সব শিশুশিল্পী গাছ, পাখী, প্রজাপতি, ময়ূর, হংসেরা প্রভৃতি স্টেজে আমাদের মন ভুলিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ তাঁদের প্রাণময় অভিনয়ের জন্যে। আর সব শেষে ধন্যবাদ অন্তরালবর্তী সেই সব কলাকুশলীদের যাঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় "মায়া ময়ূর" সত্যিকার মায়া সৃষ্টি করতে পেরেছে।

শিশু নাট্যশালা ও মিউজিয়ম

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু সম্প্রতি বোম্বাই-তে নেতাজী সুভাষ রোডে একটি শিশু রঙ্গালয় ও মিউজিয়মের উদ্বোধন করেন। রঙ্গালয়-মিউজিয়মটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু মন্তব্য করেন, ভারতের অন্যান্য শহরেও শিশুদের জন্য এ-রূপ আমোদ-কেন্দ্র স্থাপিত হওয়া উচিত।

প্রায় এক হাজার দর্শকের স্থান সংকুলান হতে পারে এমন একটি প্রেক্ষাগৃহের ব্যবস্থা থাকবে রঙ্গালয়টিতে। এতে শিশুদের উপযোগী চলচ্চিত্র দেখাবার ব্যবস্থা থাকবে এবং নাট্যাভিনয়ের জন্য একটি ঘূর্ণায়মান মঞ্চেরও ব্যবস্থা রাখা হবে। মিউজিয়ম বিভাগে আর্ট গ্যালারী, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, ভূগোল, ভূ-তত্ত্ব, ভাস্কর্য, হস্তশিল্প, স্বাধীনতার ইতিহাস ও জাতীয় প্রগতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকবে।

আর্ট এণ্ড কালচার পিকচার্সের "অগ্নি-সম্ভবা"র ল্যাবরেটরী দৃশ্যে বিজ্ঞান-সাধিকার বেশে মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা যাচ্ছে। কমলা মুখোপাধ্যায় ও বনানী চৌধুরী অন্য দুটি মুখ্য ভূমিকায় নেমেছেন।

এই রঙ্গালয় ও মিউজিয়মটি প্রতিষ্ঠার মূলে বোম্বাই-এর মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চাবন ও সমাজকল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী শ্রী ত্রিপদ উদ্যোগী ছিলেন। শ্রী নেহরু তাঁদের অভিনন্দন জানান।

চিত্রালোচনা

ডি এস ফিল্মসের হিন্দী ছবি "হাতকড়ি" এ হপ্তার একমাত্র নতুন আকর্ষণ। মানুষের অপরাধপ্রবণতার জন্যে পারিপার্শ্বিক প্রভাবই যে মূলত দায়ী—এই বক্তব্যের ওপর এর নাটকীয় কাহিনী বিস্তারলাভ করেছে।

এম এম মুভিজের নির্মীয়মান ছবি "এ জহর সে জহর নয়"-এর একটি বিশিষ্ট চরিত্রের রূপসজ্জায় পাহাড়ী সান্যাল।

রূপ-জ্যোতির ভক্তিচিত্র "ঠাকুর হরিদাস"-এর একটি দৃশ্যে সুমিত্রা দেবী ও তপতী ঘোষ।

এর বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন শাকিলা, মতিলাল, সজ্জন, জবীন, অমরনাথ, মির্জা মুশারফ, কাক্কু প্রভৃতি। সুদর্শন ভাটিয়া পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন। সুর-সৃষ্টি করেছেন নাশাদ।

• • • •

শ্রীকান্তের কৈশোরের কাহিনী অবলম্বনে শ্রীমতী পিকচার্স "ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদি" তুলতে আরম্ভ করেছেন। এই ছবির বহির্দৃশ্য তুলতে পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ৩৪ জনের একটি দল ভাগলপুরে গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। এই দলে আছেন ক্যামেরাম্যান জি কে মেহতা, মুখ্য অভিনেতৃদ্বয় শ্রীমান পার্থপ্রতিম ও শ্রীমান সজল, এবং অন্যান্য শিল্পী ও কলা-কুশলীবৃন্দ। গত সপ্তাহ থেকে নিয়মিত-ভাবে এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে ভাগলপুরের আশে-পাশে ও গঙ্গার ধারে— যে সব জায়গার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বাল্যস্মৃতি জড়িত রয়েছে। প্রায় এক মাস লাগবে এইসব বহির্দৃশ্য তুলতে। তারপর শুরু হবে স্টুডিওর কাজ। ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তর ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্যে সাড়ে তিন হাজার আবেদনকারীর মধ্য থেকে শ্রীমান পার্থপ্রতিম ও শ্রীমান সজলকে বেছে নেওয়া হয়েছে।

গ্রেস পিকচার্সের "শশীবাবুর সংসার"এর এই কৌতুকোজ্জ্বল দৃশ্যে আছেন— অনুপকুমার, জীবেন বসু, অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও চন্দ্রাবতী।

• • •

পরিচালক তপন সিংহ তাঁর নতুন ছবি "ক্ষণিকের অতিথি"র বহির্দৃশ্য তুলতে শিউড়ী অঞ্চলে যাত্রা করেছেন। একদা এক তরুণ ও তরুণী সামাজিক কারণে বিবাহ বন্ধনে মিলিত হতে পারল না। দীর্ঘকাল পরে তাদের যখন আবার দেখা হল, তখন নায়িকা বিধবা এবং একটি পঙ্গু সন্তানের জননী। ডাক্তার নায়ক তার চিকিৎসার ভার নিজের হাতে তুলে নিলো এবং সেই সূত্রেই তাদের নতুন করে ঘনিষ্ঠতা হলো। এক করুণ পরিণতিতে কাহিনীর শেষ। মুখ্য ভূমিকাটিতে অভিনয় করছেন নির্মলকুমার ও রুমা দেবী। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, অতনু ঘোষ প্রভৃতি।

• • •

গত সপ্তাহে দু'খানি নতুন ছবির মহরৎ সুসম্পন্ন হয়েছে।

প্রথম মহরৎটি অনুষ্ঠিত হয় ১১ই মার্চ রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের মঞ্চ-সফল নাটক "মায়ামৃগ" অবলম্বনে এম কে জি প্রোডাকসন্স ঐ নামেই তাঁদের পঞ্চম চিত্রের কার্যারম্ভ করেন ঐদিন। ছবিটির পরিচালনা ভার ন্যস্ত করা হয়েছে চিত্ত বসুর ওপর।

কেমিরা ফিল্মস নামক একটি নতুন প্রতিষ্ঠান তাঁদের প্রথম নিবেদন "শহরের ইতিকথা"র মহরৎ সম্পন্ন করেন ১৪ই মার্চ নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে। বিনয় চট্টো-পাধ্যায়ের কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি তোলা হবে। পরিচালনা করবেন বিশু দাশগুপ্ত। উত্তমকুমার, মালা সিংহ, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, ভানু বন্দ্যো-পাধ্যায়, জহর রায়, বাণী হাজরা প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে।

মহাপুরুষ প্রসংগ

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লীলাসহচরদের মধ্যে বৈষ্ণব দীনতা ও নামসাধনার মূর্ত প্রতীক ঠাকুর হরিদাস অন্যতম। এই লোকোত্তর সাধকের সাধনা ও সিদ্ধির কাহিনী অবলম্বনে তৈরী রূপজ্যোতির "ঠাকুর হরিদাস"। ভক্তিরসপিপাসুদের কাছে এই ছবির আবেদন অবশ্যই আছে।

ঠাকুর হরিদাস শৈশবে হালিমুদ্দিন নামে পরিচিত ছিলেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি এক কাজীর ঘরে লালিত-পালিত হন। বাল্যকাল থেকেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর ছিলেন। তাই স্বজাতি মুসলমানদের কাছে তিনি ছিলেন বিধর্মী, আর হিন্দুদের কাছে

"হলিডে অন আইসে"র পিটার প্যান নামক নৃত্যের একটি দৃশ্য। তুষার মঞ্চে এই নৃত্যটি সকলকার প্রশংসা পেয়েছে।

ছিলেন অস্পৃশ্য। কৃষ্ণনাম প্রচারের দৈব-আদেশ পেয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন পথে।

বেনাপোলে তিনি যখন আসেন তখন সেখানকার বৈষ্ণববিদ্বেষী জমিদার রামচন্দ্র খাঁ তাঁর প্রাণনাশে ব্যর্থ হয়ে তাঁকে অপদস্থ করবার জন্য নিযুক্ত করলেন রূপজীবিনী লক্ষহীরাকে। লক্ষহীরা এই তরুণ সাধকের পূত প্রভাবে তাঁর শিষ্যা হল।

এর পর গৌড়ের নবাব-দরবারের কাজীর বিচারে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করলেন হরিদাস। কিন্তু লাঞ্ছনার মধ্যেও প্রকাশ পেল তাঁর অলৌকিক মাহাত্ম্য; যা দেখে নবাব তাঁর অনুরক্ত হলেন।

তারপর ছবিতে হরিদাসকে দেখা যায় চাঁদপুরের বলরাম আচার্যের সান্নিধ্যে। সেখানে অবস্থানকালে তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণদের নতুন সাধনার পথের ইঙ্গিত দেন এবং পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর অন্যতম ভক্ত রঘুনাথকে বাল্যকালে আধ্যাত্মিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করেন। পরে অদ্বৈত আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হরিদাসের জীবনের এক বিশেষ ঘটনা। উভয়ে নাম-সাধনায় কিছুকাল কাটাবার পর হরিদাসের শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় লাভ ও জগন্নাথধামে বৃদ্ধ বয়সে তাঁর লীলাসম্বরণ দিয়েই চিত্রনাট্যের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হরিদাসের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে চিত্রনাট্যে এসে জড়ো হয়েছে। ফলে ছবির রস দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। চিত্রনাট্যকার বিপ্রদাস ঠাকুর জীবন-কাহিনীটি সাজাতে গিয়ে প্রথমার্ধে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন অনেক জায়গায়। লক্ষহীরা ও হরিদাসের বাল্যসাথী রহিমার চরিত্র দুটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে বেশী। ভক্তিমূলক এই ছবি ভাবসম্পদের দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারত যদি বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত হরিদাসের জীবনের আরও কয়েকটি ঘটনা চিত্রনাট্যে স্থান পেত।

হিন্দী ফিল্মের উদীয়মানা নায়িকাদের অন্যতমা শাকিলা।

হরিদাসের দেহত্যাগের পর মহাপ্রভুর মধ্যে ভাবের স্ফুরণ (চৈতন্যচরিতামৃতে যার উল্লেখ আছে: "হরিদাসের তনু প্রভু কোলে উঠাইয়া, অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা"), সমুদ্রের তীরে তাঁর দেহ মহা-সমারোহে নিয়ে যাওয়া ("আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে") ও পরে হরিদাসের মহোৎসবের জন্য মহাপ্রভুর ভিক্ষা করা ও নিজে পরিবেশন করে ভক্তদের ভোজন করানো প্রভৃতি থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ হিসাবেই হরিদাস পূজিত; ছবিতে উভয়ের আধ্যাত্মিক সম্পর্কের গভীরতাও তেমনভাবে কাহিনীতে স্থান পায়নি। হরিদাস কর্তৃক মহাপ্রভুর অবতার-লীলা বর্ণন ("তোমার গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল") ও মহাপ্রভু কর্তৃক হরি-দাসের গুণকীর্তন প্রভৃতি অনেক কিছুই ছবিতে নেই। ফলে ভক্তিরসাস্বাদের দিক দিয়ে ছবির আবেদন ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

পরিচালক গোবিন্দ রায় চিত্রনাট্যটিকে সহজ, সরলভাবে বর্ণনাত্মক পদ্ধতিতে পর্দায় উপস্থাপিত করেছেন। ঘটনা বিন্যাসে পরিচালকের শুভবুদ্ধি ও বাহুল্যবর্জন প্রশংসনীয়। মহাপ্রভুর জন্ম থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত কয়েকটি চিত্র-প্রতীক ও নেপথ্যসংগীতের মাধ্যমে চমৎকারভাবে দেখানো হয়েছে। তবে দেহত্যাগের আগে হরিদাসের বৃদ্ধ বয়স দেখানো হয়। যৌবন থেকে হরিদাসের হঠাৎ বার্ধক্যে পদক্ষেপ দর্শকদের কাল-চেতনাকে ঠোক্কর মারে।

নাম-ভূমিকায় নির্মলকুমার নিষ্ঠা ও দরদের সংগে চরিত্রটিকে রূপায়িত করেছেন। হরিদাসের বৈষ্ণবজনোচিত দীনভাব তিনি সুন্দর ফুটিয়েছেন। লক্ষ-হীরার বেশে সুমিত্রা দেবী চরিত্রটির মোহিনীরূপ ও পরে ঈশ্বর-ভক্তির অভিব্যক্তি প্রশংসনীয়ভাবে প্রকাশ করেছেন। অদ্বৈত আচার্যরূপে অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচন্দ্র খাঁর ভূমিকায় কমল মিত্র, রহিমাবেশিনী তপতী ঘোষের অভিনয় চরিত্রানুগ। পার্শ্ব-চরিত্রে শোভা সেন, তুলসী চক্রবর্তী, খগেন পাঠক এবং ছোট হরিদাসের ভূমিকায় মাঃ বিভু উল্লেখযোগ্য। নবাগত মলয়কুমার মহাপ্রভুর চরিত্রে দর্শকমনে কোন রেখাপাত করেন না।

অনিল বাগচীর সুরারোপে কয়েকটি গান শ্রুতিমধুর। "চলো চলো মধু বৃন্দাবন ধন" গানটি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও প্রতিমা

নার্গিস অভিনীত "লাজবন্তী" ছবিটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সংগীত। ছবি বন্দোপাধ্যায়ের গাওয়া "আমি কৃষ্ণপ্রেমের সায়র থেকে" সুখশ্রাব্য। তবে ছবিতে পরিবেশানুগ মুহূর্তের অভাবে ছবির সাংগীতিক আবেদনে মন দোলা দেয় না।

আলোকচিত্রে প্রবোধ দাস, সম্পাদনায় রাজেন চৌধুরী ও শিল্পনির্দেশে কার্তিক বসুর কাজ মোটামুটিভাবে উল্লেখযোগ্য। ছবির অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ নিন্দনীয় না হলেও খুব প্রশংসনীয় হয়নি।

বিবিধ সংবাদ

ফ্রান্সের কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতের তরফ থেকে "লাজবন্তী" ছবিটিকে পাঠানো হয়েছে বলে এইমাত্র খবর পাওয়া গেল। কেউ ঠেকে শেখে, আবার কেউ কেউ দেখে শেখে। এ ব্যাপারে ভারত গভর্নমেণ্ট ঠেকেও শেখেন নি, দেখেও শেখেন নি বোঝা যাচ্ছে। কানের উৎসবে একত্রিশটি দেশের ছবি দেখান হবে! ভারতের "লাজবন্তী" ৩১শ স্থান অধিকার না করলেই বাঁচি। ৩০শে এপ্রিল থেকে ১৫ই মে পর্যন্ত এই উৎসব চলবে। •

• • •

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং নটগুরু গিরিশচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে ২১শে মার্চ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বিশ্বরূপায় একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ঐদিনই বেলা আড়াইটায় ড্রামাটিক ক্লাব অফ ক্যালকাটা নামক ইউরোপীয় নাট্যসংস্থা গিরিশ নাট্যোৎসবে "দি ফোর্থ ওয়াল" নামের ইংরেজী নাটকটি অভিনয় করবেন।

গীতবিতানের সমাবর্তন উৎসব

গত পূর্ব রবিবার গীতবিতানের দশম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব রাজভবনের প্রাঙ্গণে মনোরম পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু উৎসবে পৌরোহিত্য করেন।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর প্রেরিত বাণীতে বলেন, রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গীতবিতানই অগ্রণী। তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন।

প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, রবীন্দ্রনাথের সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ রয়েছে তাঁর গানের মধ্যে। সেই গান সুরে ও রসে বাঙলার প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।

রাজ্যপাল তাঁর ভাষণে সারা ভারতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী যাতে যথাযোগ্যভাবে উদ্যাপিত হয় তার জন্যে আবেদন জানান। তিনি আরো মনে করিয়ে দেন যে, এ বিষয়ে বাঙালী মাত্রেরই এক বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব রয়েছে।

সংগীতের বিভিন্ন বিভাগে গীতবিতানের ১৯৫৮ সালের অন্ত্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৩৯ জন ছাত্রছাত্রী ঐদিন উপাধিপত্র ও ১৭ জন অভিজ্ঞান-পত্র লাভ করেন। কয়েকজন বিশেষ কৃতিত্বের জন্যে পদক ও পুরস্কার পান।

গীতবিতানের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীপ্রভাত গুপ্ত আশা প্রকাশ করেন যে, অদূরভবিষ্যতে গীতবিতানকে অবলম্বন করে রবীন্দ্র-সংগীতের একটি কেন্দ্রীয় পর্ষৎ বা বিশ্ব-বিদ্যালয় গড়ে উঠতে পারে।

সংগীতানুষ্ঠানের পর উৎসবের সমাপ্তি হয়।

একলব্য

ভারতের জাতীয় ফুটবল এবং জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হয়ে গেছে। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলাও শেষ হয়ে এলো।

এ সপ্তাহে আলোচনার বিষয় ছিল অনেকগুলি। ভারত সরকার পুনর্গঠিত নিখিল ভারত ক্রীড়াসংস্থার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেছেন। কলকাতার ফুটবল খেলোয়াড়দের দল অদল বদলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ক্রিকেট নির্বাচক সমিতির অন্যতম সদস্য শ্রীরামস্বামী পদত্যাগ করে এক বিবৃতি দিয়েছেন। নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান লালা অমরনাথ দিয়েছেন তার পাল্টা বিবৃতি। কলকাতায় স্টেডিয়াম নির্মাণের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। এ সবের আলোচনা সময়সাপেক্ষ। স্থানেরও প্রয়োজন। তাই এ সপ্তাহে জাতীয় ক্রিকেট, জাতীয় ফুটবল এবং পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্টের পর্যালোচনা করে লেখা শেষ করছি।

রণজি প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠত্ব

ভারতের জাতীয় ক্রিকেট—রণজি প্রতিযোগিতার উদ্বোধন বছরে যে বোম্বাই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিল রণজি প্রতিযোগিতার রজত জয়ন্তী বছরেও সেই বোম্বাই ফাইনালে বাংগলাকে ৪২০ রানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছে। আর রণজি প্রতিযোগিতার ২৫ বছরের ইতিহাসে বোম্বাই বিজয়ী হয়েছে ১০ বার। এ ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেট ক্ষেত্রে বোম্বাইয়ের ক্রিকেট খেলোয়াড়দের একচ্ছত্র প্রাধান্যের সাক্ষ্য দেয়। সত্যই ক্রিকেটে বোম্বাই ভারতের সর্বাগ্রগণ্য রাজ্য। উমরিগর, রামচাঁদ, সুভাষ গুপ্তে, বালু গুপ্তে প্রমুখ নামকরা খেলোয়াড়দের সাহায্য না নিয়েও বোম্বাই এবার ফাইনালে বাংগলাকে যেভাবে পরাজিত করেছে তা যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—সর্ববিষয়ে বাংগলার খেলোয়াড়দের নৈপুণ্য ম্লান করে দিয়ে বোম্বাই বিজয়ী হয়েছে। বোম্বাইয়ের পক্ষে এ খেলায় প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী করেছেন তরুণ খেলোয়াড় আমরোলীওয়ালা। দ্বিতীয় ইনিংসে মাধব আপ্তে ও আর বি কেনী। বাংগলার পক্ষে অধিনায়ক মাত্র ৫ রানের জন্য দ্বিতীয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করতে পারেননি।

বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে বোম্বাই বাংগলা দলের ফাইনাল খেলাটি আরম্ভ হয় মার্চ মাসের ৭ তারিখে। ১১ই মার্চ মধ্যাহ্নভোজের কিছু আগে পাঁচ দিনব্যাপী খেলার উপর যবনিকা পড়ে। খেলাটির ধারাবাহিক আলোচনার স্থানাভাব। তাই সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড এবং আগের ফাইনাল খেলাগুলির বিজয়ী ও বিজিত দলের খতিয়ান দিয়ে আলোচনা শেষ করছি।

বোম্বাই—প্রথম ইনিংস ২৯৪ (এইচ আমরোলীওয়ালা ১৩৯, এম এম ডালভী ৫৮,

রণজি ট্রফি

এম এস হার্দিকার ৩৮, এ এল ওয়াদেকার ২৪; পি চ্যাটার্জী ৭৬ রানে ৬ উইকেট, ডি এস মুখার্জী ৮৯ রানে ৩ উইকেট)।

বাংগলা—প্রথম ইনিংস ১৭৬ (পি রায় ৫৩, পি ভাণ্ডারী ৩৬, জে গিলক্রিস্ট ২২, পি চ্যাটার্জী ২১; এম এস হার্দিকার ২৪ রানে ৪ উইকেট, আর দেশাই ৫৮ রানে ৩ উইকেট)।

বোম্বাই—দ্বিতীয় ইনিংস (৯ উইঃ ডিক্লেঃ) ৫৩৬ (এম এল আপ্তে ১৫৭, আর বি কেনী ১১১, এ এল ওয়াদেকার ৮৫, এইচ আমরোলীওয়ালা ৪৪, এম এম ডালভী নট আউট ৩৬, এন এস তামানে ৩১, আর বি দেশাই নট আউট ৩০; পি চ্যাটার্জী ১১৯ রানে ৪ উইকেট, ডি এস মুখার্জী ৫৩ রানে ২ উইকেট, এস বসু ১২৫ রানে ৩ উইকেট)।

বাংগলা—দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩৪ (পি রায় ৯৫, কে সিলেট ৫৮, পি ভাণ্ডারী ৩৮; পই ৪৬ রানে ৪ উইকেট, আর দেশাই ৩৭ রানে ৪ উইকেট)।

(বোম্বাই ৪২০ রানে বিজয়ী)।

আগের ফাইন্যালের বিজয়ী ও বিজিত

সাল	বিজয়ী	রানার্স
১৯৩৫	বোম্বাই	উত্তর ভারত
১৯৩৬	বোম্বাই	মাদ্রাজ
১৯৩৭	নবনগর	বাংগলা
১৯৩৮	হায়দরাবাদ	নবনগর
১৯৩৯	বাংগলা	দক্ষিণ পাঞ্জাব
১৯৪০	মহারাষ্ট্র	উত্তর প্রদেশ
১৯৪১	মহারাষ্ট্র	মাদ্রাজ
১৯৪২	বোম্বাই	মহীশূর
১৯৪৩	বরোদা	হায়দরাবাদ
১৯৪৪	পশ্চিম ভারত	বাঙলা
১৯৪৫	বোম্বাই	হোলকার
১৯৪৬	হোলকার	বরোদা
১৯৪৭	বরোদা	হোলকার
১৯৪৮	হোলকার	বোম্বাই
১৯৪৯	বোম্বাই	বরোদা
১৯৫০	বরোদা	হোলকার
১৯৫১	হোলকার	গুজরাট
১৯৫২	বোম্বাই	হোলকার
১৯৫৩	হোলকার	বাঙলা
১৯৫৪	বোম্বাই	হোলকার
১৯৫৫	মাদ্রাজ	হোলকার
১৯৫৬	বোম্বাই	বাঙলা
১৯৫৭	বোম্বাই	সার্ভিসেস
১৯৫৮	বরোদা	সার্ভিসেস

জাতীয় ফুটবলে বাঙলার প্রাধান্য

ভারতের ক্রিকেটে যেমন বোম্বাইয়ে শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না, ফুটবলেও তেমন প্রশ্ন ওঠে না বাঙলার প্রাধান্য সম্পর্কে।

ফাইনালে বোম্বাইকে ১—০ গোলে পরাজিত করে বাঙলা দল এবারও জাতীয় ফুটবলে বিজয়ী হয়েছে। এবার নিয়ে বাঙলা দল সন্তোষ ট্রফি ঘরে তুলেছে ৯ বার আর তিনবার হয়েছে ফাইন্যালে পরাজিত। সন্তোষ ট্রফির ১৫ বছরের খেলায় বাঙলার এই সাফল্যের ইতিহাস বিশেষভাবেই উল্লেখ করবার ঘটনা। আগের সপ্তাহে জাতীয় ফুটবলের শেষ পর্যায়ের লীগ খেলার পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ সপ্তাহে সেমি-ফাইন্যাল ও ফাইন্যালের পর্যালোচনা করছি।

প্রথম সেমি-ফাইন্যাল

সার্ভিসেস (৫) হায়দরাবাদ (২)
(জয়রামণ—২ ও লাহিড়ী—৩)
(ইউসুফ খাঁ ও হামিদ)

লীগের খেলায় সার্ভিসেস দল মহীশূরকে ২—০ গোলে পরাজিত করে বিহার ও

সন্তোষ ট্রফিসহ জাতীয় ফুটবলের বিজয়ী বাঙলা দল

বোম্বাইয়ের সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে খেলা শেষ করেছিল সেই সার্ভিস দলের পক্ষে সেমি-ফাইনালে গত দু বছরের সন্তোষ ট্রফি বিজয়ী শক্তিশালী হায়দরাবাদকে ৫—২ গোলে পরাজিত করা সত্যই অপ্রত্যাশিত ফলাফল। সার্ভিস দল ফুটবল খেলে অনেকটা মেকানিক্যাল পদ্ধতিতে। গোল করবার জন্য যেমন থাকে এদের সদাজাগ্রত তৎপরতা, গোল আটকাবার জন্যও তেমন এদের সতত ব্যস্ততা। যেদিন পা খুলে যায়, সেদিন এদের আটকিয়ে রাখা খুবই শক্ত। হায়দরাবাদের সঙ্গে সেমি-ফাইনালে এদের পা খুলে গিয়েছিল। তাই যেমন এরা সংঘবদ্ধ আক্রমণে হায়দরাবাদের রক্ষণভাগকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, তেমনি নিজেদের রক্ষণবিভাগ জোরদার করে তুলেছিল তিন ব্যাক প্রথার সুসমঞ্জস ক্রীড়াধারায়।

খেলা আরম্ভের পর ১৭ মিনিটের সময় হায়দরাবাদের লেফট-হাফ ইউসুফ খাঁ ২০ গজ দূর থেকে জোরালো শট করে হায়দরাবাদের পক্ষে প্রথম গোল করেন। তিন মিনিটের মধ্যে সার্ভিসেস দলের লেফট-আউট জয়রামন গোলটি শোধ করে দেন। এর পর ২৫, ৩০ ও ৩২ মিনিটের সময় রাইট-ইন লাহিড়ী পর পর তিনটি গোল করে হ্যাটট্রিক করলে সার্ভিস দল ৪—১ গোলে অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয়ার্ধের ৯ মিনিটের সময় হামিদ একটি গোল শোধ করলে খেলার শেষ মুহূর্তে জয়রামন বিজয়ী দলের পঞ্চম গোল করেন। লাহিড়ীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় গোল দুটি হয় দর্শক চোখের আনন্দদায়ক। পরেন বাহাদুরের উঁচু পাসে চমৎকারভাবে ভলি মেরে তিনি এই দুটি গোল করেন। এখানে বলা যেতে পারে, জাতীয় ফুটবলের শেষ পর্যায়ের খেলায় এক লাহিড়ী ছাড়া আর কেউ হ্যাট্রিক করতে পারেননি।

দ্বিতীয় সেমি-ফাইনাল

বাঙলা (১) (২) (২) বোম্বাই (১) (২) (১)
(বলরাম—২, সি গোস্বামী—২ ও দামোদরন) (জাফর, বালান, দেবদাস ও নরিস)

বাঙলা ও বোম্বাইয়ের সেমি-ফাইনাল খেলাটি মীমাংসিত হতে তিন দিন সময় লাগে। প্রথম দিন দুই দলই একটি করে গোল করে। দ্বিতীয় দিন করে দুটি করে গোল। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় আর কোন গোল হয় না। একদিন বিরতির পর তৃতীয় দিনের খেলায় বাঙলা ২—১ গোলে বিজয়ী হয়ে সন্তোষ ট্রফির ১৫ বারের প্রতিযোগিতার মধ্যে ১২ বার ফাইনালে উঠে।

বিশেষভাবে বলবার বিষয়, বোম্বাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের সেমি-ফাইনাল খেলার প্রতিদিনই বাঙলা দল প্রতিপক্ষের তুলনায় অনেক ভাল খেলে এবং প্রতিদিনই প্রথম গোল করে অগ্রগামী হয়। দুই দলই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিন ব্যাক প্রথায়।

প্রথম দিনের খেলায় ২০ মিনিটের সময় লেফট-আউট বলরাম বাঙলার পক্ষে প্রথম গোল করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ১৭ মিনিটের সময় বোম্বাই দলের রাইট-আউট জয়াকর গোলটি শোধ করে দেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় ২৬ মিনিটের সময় সেণ্টার ফরোয়ার্ড দামোদরন গোল করায় বিরতির সময় বাঙলা দল ১—০ গোলে এগিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের পাঁচ মিনিটের সময় বোম্বাইয়ের লেফট-ইন বালান হেড করে গোলটি পরিশোধ করবার পর ১৮ মিনিটের সময় চুনী গোস্বামী আবার বাঙলার পক্ষে গোল করেন। খেলাটি শেষ হবার মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগে দেবদাস এ গোলটিই পরিশোধ করায় বোম্বাই দল এদিনের মত পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পায়। অতিরিক্ত সময়ে আর কোন গোল হয় না।

তৃতীয় দিন ১৪ মিনিটের সময় চুনী গোস্বামী বাঙলার পক্ষে যে গোল করেন, ৩০ মিনিটের সময় নরিস সে গোলটি শোধ করে দেন। দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিটে লেফট-আউট বলরাম করেন বাঙলার বিজয়সূচক গোল।

ফাইন্যাল

বাঙলা (১) সার্ভিসেস (০)
(বলরাম)

স্টেডিয়াম-ঠাসা দর্শক সমাগমের মধ্যে জাতীয় ফুটবলের ফাইন্যাল খেলায় বাঙলা দল ১—০ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে ৯ বার সন্তোষ ট্রফি লাভ করবার কৃতিত্ব অর্জন করে। খেলা আরম্ভের পাঁচ মিনিটের সময় লেফট-আউট বলরাম যে গোলটি করেন, তাতেই ১৯৫৮ সালের জাতীয় ফুটবলের ফাইন্যাল খেলার ফলাফল নির্ধারিত হয়ে যায়। খেলায় আগাগোড়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস থাকলেও বাঙলার প্রাধান্য সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। তবে প্রথমে গোল করার ফলে বাঙলা দল সময়ে সময়ে আত্মরক্ষামূলক খেলার অবতারণা করে। আক্রমণাত্মক খেলার রীতি গ্রহণ করলে বাঙলার পক্ষে বেশী গোলে বিজয়ী হওয়া কষ্টসাধ্য ছিল না। জাতীয় ফুটবলের ফাইনালে সার্ভিসেস দলের এটি ছিল দ্বিতীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ইতিপূর্বে ১৯৫৪ সালে জাতীয় ফুটবলের ফাইনালে ভারতের সামরিক ফুটবল দল বোম্বাইয়ের কাছে ২—১ গোলে পরাজিত হয়।

সাম্পাংগী কাপ

হায়দরাবাদ (৪) বোম্বাই (৩)
(জুলফিকার—২, হামিদ ও কানন) (দেবদাস, সুগুনম ও ফ্রাংকো)

জাতীয় ফুটবলের বিজয়ী রাজ্য নিঃসন্দেহে ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল দলের মর্যাদা পায়। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হয় বিজিত দল। তৃতীয় স্থান নির্ণয়ের জন্য আছে একটি অতিরিক্ত খেলার ব্যবস্থা। সেমি-ফাইনালের পরাজিত দুটি দল এই খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং বিজয়ী দল ভারতের তৃতীয় দল হিসাবে লাভ করে সাম্পাংগী কাপ।

এবার সাম্পাংগী কাপের খেলায় হায়দরাবাদ ৪—৩ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করেছে। খেলাটির মধ্যে আগাগোড়াই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রত্যক্ষ করা যায়। হায়দরাবাদের পক্ষে জুলফিকার দুটি এবং হামিদ ও কানন একটি করে গোল করেন। বোম্বাইয়ের পক্ষে একটি করে গোল করেন দেবদাস, সুগুনম ও ফ্রাংকো।

জাতীয় ফুটবলে বাঙলা ও বোম্বাইয়ে সেমি-ফাইন্যাল খেলায় বাঙলার লেফ্‌ট আউট বলরাম অলিম্পিক গোলরক্ষক নারায়ণকে পরাজিত করছেন

নিচে জাতীয় ফুটবলে আগের ফাইন্যাল খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল। আর বিভিন্ন দলের পক্ষে এবার যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন, তাঁদের নাম দেওয়া হল। প্রথম খেলার পরে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের নাম বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

পূর্ববর্তী ফাইন্যালের ফলাফল

১৯৪১—কলিকাতায় বাংগলা দল ৫—১ গোলে দিল্লীকে পরাজিত করে।

১৯৪৪—দিল্লীতে দিল্লী দল ২—০ গোলে বাংগলাকে পরাজিত করে।

১৯৪৫—বোম্বাইতে বাংগলা দল ২—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে।

১৯৪৬—ব্যাংগালোরে মহীশূর দল ০—০ ও ২—১ গোলে বাংগলাকে পরাজিত করে।

১৯৪৭—কলকাতায় বাংগলা দল ০—০ ও ৪—১ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে।

১৯৪৯—কলকাতায় বাংগলা দল ৫—০ গোলে হায়দরাবাদকে পরাজিত করে।

১৯৫০—কলকাতায় বাংগলা দল ১—০ গোলে হায়দরাবাদকে পরাজিত করে।

১৯৫১—বোম্বাইয়ে বাংগলা দল ১—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে।

১৯৫২—ব্যাংগালোরে মহীশূর দল ১—০ গোলে বাংগলাকে পরাজিত করে।

১৯৫৩—কলকাতায় বাংগলা দল ০—০ ও ৩—১ গোলে মহীশূরকে পরাজিত করে।

১৯৫৪—মাদ্রাজে বোম্বাই দল ২—১ গোলে সার্ভিসেস দলকে পরাজিত করে।

১৯৫৫—এর্নাকুলামে বাংগলা দল ১—০ গোলে মহীশূরকে পরাজিত করে।

১৯৫৬—ত্রিবান্দ্রামে হায়দরাবাদ দল ১—১ ও ৪—১ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে।

১৯৫৭—হায়দরাবাদে হায়দরাবাদ দল ২—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে।

বিভিন্ন দলে এবার যাঁরা খেলেছেন

পশ্চিম বাংগলা—আর গুহ; মুস্তাক আমেদ ও রহমান; কেম্পিয়া, আমেদ হোসেন ও রাম বাহাদুর; পি কে ব্যানার্জি, রহমতুল্লা, দামোদরন, চুনী গোস্বামী ও বলরাম।

(এস গুহ, নারায়ণ, এন নন্দী, মহম্মদ আলী ও এ সোম)।

হায়দরাবাদ—নবী; আজিজ, কাশিম ও আবদুল হাসান; প্যাট্রিক ও ইউসুফ খাঁ; মইন, হামিদ, কানন, সত্যনারায়ণ ও ইউসুফ। (জুলফিকার)।

মহীশূর—নন্দন; শাহির ও মুথু; সেবাস্তিয়ান বাসবন ও নানজাপ্পা; জন, উজিরুল্লা, এন্টনী, লতিফ, অরুমানয়াগম।

বোম্বাই—নারায়ণ; চন্দ্রশেখরন ও লতিফ ও আয়ুব; সনিল ও এন্টনী; ফ্রান্কো, জাফর, ডিসুজা, চার্লস ও দেবদাস। (লিংডো, বি নারায়ণ, এন্টনী, সুগুনম চেট্টি, অরুণ, বালান ও নরিস)

সেমি-ফাইন্যালে বোম্বাইয়ের গোলকিপার বাঙলার সেণ্টার ফরোয়ার্ড দমোদরণের জোরালো সট প্রতিরোধ করছেন

বিহার—গুহঠাকুরতা; জি দাশ ও মহম্মদ গালিব; সুর, চক্রবর্তী ও হাবিব; জব্বর আলী, পি চ্যাটার্জি, মহম্মদ রমজান ধনবাহাদুর ও এস ঘোষ।

সার্ভিসেস—রবীন্দ্র সিং; নায়ার, ভি পল ও মমতাজ হোসেন; অরুলদাশ ও আবুবকর; চাকো, লাহিড়ী, এথিরাজ, পুরেন বাহাদুর ও জয়রামন।

(চেরিয়ান, থংগরাজ ও ডোরাইস্বামী)।

মাদ্রাজ—মুনুস্বামী; বালগোপাল ও উইলিয়াম; বীর রাঘবন, জানকীরাম, পুরুষোত্তম ও পদ্মরাজ; অরুমুগম, টমাস, শিব ও এডওয়ার্ড।

(ফার্নাণ্ডেজ, স্টিফেন, কুপ্পুস্বামী, রাঘবন, রামস্বামী ও পদ্মনাভন।

দিল্লী—আর বিশ্বাস; ইন্দ্রজিত ও যশোবন্ত; আদিব, সুরেন্দ্র ও হান্ডা; ইন্দ্রপাল, সুজাত, আসলম, সরবন্ত কুমার ও আর ম্যাথুস।

(রোশনলাল, সচদেব, দুর্গা ও প্রকাশ)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে পাকিস্থানের 'রাবার'

করাচীতে প্রথম টেস্ট খেলায় পাকিস্থানের কাছে দশ উইকেটে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকারের পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট টীমকে ঢাকায় দ্বিতীয় টেস্টেও পাকিস্থানের কাছে ৪১ রানে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ফলে দুই দেশের তিন টেস্ট পর্যায়ের খেলায় পাকিস্থান লাভ করেছে সম্মানজনক 'রাবার'। দুই দলের তৃতীয় টেস্ট খেলা এখনো বাকী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও পাকিস্থানের টেস্ট-যুদ্ধের এটা দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার। গত বছর পাকিস্থান সর্বপ্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করে। অবশ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজে পাকিস্থান আশানুরূপ খেলতে পারেনি। পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জেতে তিনটি খেলায়; পাকিস্থান একটিতে, আর একটি খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়।

ঢাকা টেস্টে জয়লাভের সুযোগ এসেছে দুই দলের সামনেই সমানভাবে। কখনো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, কখনো পাকিস্থান খেলায় প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং বিজয়লক্ষ্মী দুই দলকেই দেখিয়েছেন রঙীন আশার হাতছানি। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে শেষ পর্যন্ত পাকিস্থানই বিজয়ী হয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হানিফ মহম্মদের সাহায্য ব্যতিরেকে। করাচী টেস্টে হাতের আঙুলে চোট লাগায় পাকিস্থানের পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হানিফ ঢাকা টেস্টে খেলতে পারেননি। সেই দিক দিয়ে জয়লাভের ক্ষেত্রে পাকিস্থানের কৃতিত্ব বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। অবশ্য ম্যাটিং উইকেট খেলার ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা স্বাভাবিক ক্রীড়ানৈপুণ্য

দেখাতে পারেননি, একথা স্বীকার করতেই হবে। কারণ পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা ম্যাটিং উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত নন। রৌদ্রোজ্জ্বাসিত মাঠে প্রকৃতির শ্যামলিমার মধ্যেই এরা খেলতে অভ্যস্ত।

ঢাকার ম্যাটিং উইকেটে ব্যাটসম্যান অপেক্ষা বোলাররা বেশী সাফল্য অর্জন করায় পাঁচ দিনব্যাপী টেস্ট খেলা তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হবার নির্দিষ্ট সময়ের ৩৫ মিনিট আগেই শেষ হয়ে যায়। খেলাটি আরম্ভ হয় মার্চের ৬ তারিখে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ফ্রাঞ্জ আলেকজাণ্ডার 'টসে' জিতেও প্রথম ব্যাট করবার সুযোগ গ্রহণ করেন না। ফলে পাকিস্থানকেই প্রথম ব্যাট করতে হয়। কিন্তু পাকিস্থানের খেলার সূচনা হয় অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। মাত্র ২২ রানের মধ্যে তাদের পাঁচটি উইকেট পড়ে যায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফাস্ট বোলার ওয়েসলী হলের মারাত্মক বোলিং এই বিপর্যয়ের কারণ। তিনি ৮ ওভারের মধ্যে মাত্র তিন রান দিয়ে একাই চারটি উইকেট দখল করেন। বিপর্যয়ের মুখে পাকিস্থানের ষষ্ঠ উইকেটের দুই ব্যাটসম্যান ওয়ালিশ ও সুজাউদ্দিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করতে থাকেন। তাঁদের সতর্কতা ও দৃঢ়তা-মূলক খেলার মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আক্রমণের ধার ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ফস্কে মারবার উপযোগী বল মারতে তাঁরা কসুর করেন না। দু ঘণ্টায় সুজাউদ্দিন ও ওয়ালিশ ম্যাথিয়াজের যোগসাজসে ৮৮ রান যোগ হয়। ম্যাথিয়াজ নিজে ১৬০ মিনিট উইকেটে টিকে থেকে আটটি বাউণ্ডারীর সমন্বয়ে ৬৪ রান করে আউট হন। ১৪৫ রানে শেষ হয় পাকিস্থানের প্রথম ইনিংস। প্রত্যুত্তরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দু উইকেট হারিয়ে ৪৬ রান করলে প্রথম দিনের খেলা শেষ হয়।

দ্বিতীয় দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভাল রান করবে, এইটাই ছিল ক্রিকেট রসিকদের ধারণা। কিন্তু ফজল মামুদ ও নাসিমুল গনির মারাত্মক বোলিংয়ের ফলে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এক-একটি উইকেট পড়তে থাকে। নট আউট খেলোয়াড় সোনী রামাধীন সমেত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের চারজন খেলোয়াড় কোন রান করতে পারেন না। ফজল মামুদের 'কাটার' এবং গনির স্লো স্পিনের বিরুদ্ধে অস্বস্তিবোধ করতে করতে এক-একজন আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যান। এক সময়ে অধিনায়ক ফজল ১২ রানে ৫টি উইকেট পান এবং শেষ পর্যন্ত ৩৩ রানে দখল করেন ছয়টি উইকেট। মাত্র ৭৬ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। টেস্ট ক্রিকেট ইতিহাসে এটা তাঁদের হ্রস্বতম ইনিংস। পাকিস্থান তাদের বোলিং-সাফল্যে উল্লসিত হয়ে ওঠে। যে পাকিস্থানের ২২ রানে পাঁচটি উইকেট পড়ে

জাতীয় ফুটবলের লীগ খেলায় সার্ভিসেস দলের গোলকীপার থংগরাজকে বোম্বাইয়ে এম ডি'সুজার তীব্র সট আটকাতে দেখা যাচ্ছে

গিয়েছিল, সেই খেলাতেই ৬৯ রানে এগিয়ে থাকে। কিন্তু হলে কি হবে। দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্থানের ব্যাটিংয়ে আবার ব্যর্থতার পরিচয় পাওয়া যায়। এবার বোলিংয়ে সাফল্য অর্জন করেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এরিক অ্যাটকিনসন। ৭১ রানের মধ্যে এবার পাকিস্থান হারায় পাঁচটি উইকেট। কিন্তু আবার ষষ্ঠ উইকেটে বিপদ-ত্রাতা হিসাবে দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে থাকেন ওয়ালিশ ম্যাথিয়াজ ও সুজাউদ্দিন। প্রথম ইনিংসে এঁরাই পাকিস্থানের বিপর্যয় রোধ করেছিলেন। এবারও রোধ করেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে পাকিস্থান সংগ্রহ করে পাঁচ উইকেটে ১২০ রান। ম্যাথিয়াজ সুজাউদ্দিন একত্রে ৮০ মিনিট খেলবার পরও নট আউট থেকে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসেন।

তৃতীয় দিন বাকী পাঁচটি উইকেটে পাকিস্থান ২৪ রানের বেশী যোগ করতে পারে না। ১৪৪ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ওয়েসলী হল আগের দিন যাঁর উইকেটের কোঠা ছিল শূন্য, তিনি এইদিন আবার প্রশংসার সঙ্গে বোলিং করে একাই চারটি উইকেট পান। পাকিস্থান এগিয়ে থাকে ২১৩ রানে। জয়লাভের জন্য ২১৪ রানের প্রয়োজন এবং আড়াই দিনের মত সময় হাতে, এই অবস্থায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করতে নামে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে চলে ব্যাট-বলের লড়াই। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার সূচনা অবশ্য ভাল হয় না। ৪৮ রানের মধ্যেই চারজন খেলোয়াড় আউট হয়ে যান। এর পর সোবার্স ও স্মিথ পঞ্চম উইকেটে যখন প্রশংসার সঙ্গে ব্যাট করতে থাকেন, তখন পাকিস্থান জয় সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। টেস্ট খেলায় রানের বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টিকারী গারফিল্ড সোবার্স উইকেটে টিকে থাকলে কত রান করবেন, কে জানে। কিন্তু ভরসা ফজল মামুদের মত বোলার আছেন। যাই হক, বেশী রান করতে পারলেন না সোবার্স। ৪৫ রান করে আউট হয়ে গেলেন। কোলী স্মিথ আউট হলেন ৩৯ রানে। পাঁচ উইকেটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১১৩ রান উঠলো। পাকিস্থানের জয়ের আশাও রঙীন হয়ে উঠলো। আবার অ্যাটকিনসন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে আরম্ভ করলে জয় সম্পর্কে দেখা দিল সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত ১৭২ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস শেষ হল—বেশ উত্তেজনার মধ্যে পাকিস্থান জয়লাভ করলো ৪১ রানে। অধিনায়ক ফজল মামুদ যিনি প্রথম ইনিংসে ৩৩ রানে ছয়টি উইকেট পেয়েছিলেন, তিনি দ্বিতীয় ইনিংসে পেলেন ৬৬ রানে ছয়টি উইকেট।

দ্বিতীয় টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড

পাকিস্থান—প্রথম ইনিংস ১৪৫ (ওয়ালিস ম্যাথিয়াজ ৬৪, সুজাউদ্দিন ২৬; ওয়েসলী হল ২৮ রানে ৪ উইকেট, সোনী রামাধীন ৪৫ রানে ৩ উইকেট)

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—প্রথম ইনিংস ৭৬ (গারফিল্ড সোবার্স ২৯, ফ্রাঞ্জ আলেকজাণ্ডার ১৪; ফজল মামুদ ৩৩ রানে ৬ উইকেট, নাসিমুল গনি ৪ রানে ৩ উইকেট)।

পাকিস্থান দ্বিতীয় ইনিংস ১৪৪ (ওয়ালিশ ম্যাথিয়াজ ৪৫, সঈদ আমেদ ২২, ইজাজ বাট ২১; এরিক অ্যাটকিনসন ৪২ রানে ৪ উইকেট, ওয়েসলী হল ৪৯ রানে ৪ উইকেট, সোনী রামাধীন ১০ রানে ২ উইকেট)।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস ১৭২ (গারফিল্ড সোবার্স ৪৫, কোলী স্মিথ ৩৯, এরিক অ্যাটকিনসন ২০; ফজল মামুদ ৬৬ রানে ছয় উইকেট, মামুদ হোসেন ৪৮ রানে ৪ উইকেট)।

পাকিস্থান ৪১ রানে বিজয়ী।

দেশী সংবাদ

৯ই মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় 'দুর্ভিক্ষ' ও 'ভারতে অতিরিক্ত ব্যয়'—খাদ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দের দাবি উত্থাপিত হইলে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ উল্লিখিত দুইটি বিষয়ে রাজ্য সরকারের নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং কালোবাজারী ও অতি মুনাফাখোর ব্যবসায়ী-দের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে সরকারের দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাবের নিন্দা করেন।

১০ই মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় এক প্রশ্নের উত্তরে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জানান যে, সরকার উৎপাদকদের নিকট হইতে মজুত ধান চাউল হুকুম-তলব (রিকুইজিশন) করিবার কাজ শুরু করিয়া দিয়াছেন। সরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজন হইলে মজুত ধান চাউল হুকুম-তলব করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছেন।

আজ লোকসভায় সহকারী প্রতিরক্ষামন্ত্রী সর্দার সুরজিৎ সিং মাজিথিয়া বলেন যে, কয়েক বৎসর পূর্বে ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদেশ হইতে কেনা এক লক্ষ রাউন্ড গোলাগুলি কতকগুলি ত্রুটিযুক্ত ছিল বলিয়া আদৌ ব্যবহার করা যায় নাই।

আজ সকল দলের হর্ষধ্বনির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকার উপর হইতে বিক্রয় কর প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১১ই মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ বোম্বাইতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, বে-সরকারী কোন শিল্পের একচেটিয়া কারবার ও ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের তিনি ঘোরতর বিরোধী। তিনি বলেন, ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এই জন্যই আমার আপত্তির কারণ।

উদারনৈতিক নেতা, আইনজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদ ডাঃ এম আর জয়াকর গত রাত্রে পরলোকগমন করেন। তাঁহার শেষকৃত্য আজ বোম্বাইতে সম্পন্ন হয়।

১২ই মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় এইরূপ আভাস দিয়াছেন যে, পাকিস্তান কর্তৃক সীমান্তে গুলী বর্ষণের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-পাকিস্তান সীমান্ত রক্ষার ভার "আরও সুনির্দিষ্টরূপে" সৈন্যবাহিনীর উপর দেওয়া হইতে পারে।

উন্নয়ন কর সম্পর্কে রাজ্য সরকারের দৃঢ় মনোভাব এবং কম্যুনিস্ট সমর্থিত কিষাণ সভার বিরোধিতার ফলে পাঞ্জাবে এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে। প্রকাশ কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে পাঞ্জাব সরকারের কার্য-কলাপ সমর্থন করেন। এদিকে কিষাণসভাও আন্দোলন চালাইয়া যাইতে বদ্ধপরিকর। কিষাণ সভা ইতিমধ্যেই ১২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার বরণের জন্য উপস্থিত করিয়াছেন।

১৩ই মার্চ—লোকসভা এবং রাজ্য সভার মিলিত অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য বলেন যে, পাক-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পর্কে পাকিস্তান যে ভাষ্য করিয়াছে উহার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট অনুরোধ করে এবং উহার উত্তরেই মার্কিন গভর্নমেণ্ট পাক-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ভারতের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইবে না বলিয়া সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

নিখিল ভারত কিষাণ সভার সভাপতি সংসদ সদস্য শ্রী এ কে গোপালনকে এক বৎসরের জন্য পাঞ্জাব হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পাঞ্জাব সরকার আজ এক আদেশ জারি করিয়াছেন। তাঁহাকে অবিলম্বে পাঞ্জাব ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৪ই মার্চ—কলিকাতা পৌর এলেকায় বাড়ি ও জমির উপর যে নূতন কর নির্ধারণ করা হইতেছে তাহাতে বর্তমানের তুলনায় করের হার শতকরা ২০ হইতে ৪০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আপত্তি-নিষ্পত্তির পর চূড়ান্তভাবে যে কর ধার্য হইয়াছে সেই ভিত্তিতেই এই অনুপাতের হিসাব করা হইয়াছে।

অদ্য রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ দুর্গাপুরে নব নির্মিত কয়লাচুল্লীর উদ্বোধন উপলক্ষে ক্ষুদ্র একটি রুপালী প্রদীপের শিখা হইতে হেমবর্ণ গ্যাস মশালে অগ্নিসংযোগ করিলেন, অমনি অনতিদূরে অবস্থিত অর্ধশতাধিক ফুট উচ্চ গ্যাস চিমনীর আকাশমুখী শিখা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এই শিখা অনির্বাণ।

১৫ই মার্চ—ইন্দোচীনের বিভিন্ন রাজ্যে সরকারীভাবে ১২ দিনব্যাপী সফরের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ অদ্য প্রাতঃকালে কলিকাতা বিমান বন্দর হইতে কাম্বোডিয়ার পথে ব্যাংককে যাত্রা করেন। প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার কিছু পরে রাষ্ট্রপতির 'রাজহংস' বিমান রাষ্ট্রপতির ও ভারতের জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়া বিমান বন্দর ত্যাগ করে।

পাঞ্জাবের গুরুদ্বারসমূহের কার্য পরি-চালনায় গভর্নমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতেছেন বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদস্বরূপ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আগত ৫০ হাজারেরও অধিক শিখ আজ নয়াদিল্লীতে একটি মিছিল বাহির করেন।

বিদেশী সংবাদ

৯ই মার্চ—ইরাক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে গতকাল রাত্রে তৈল-সমৃদ্ধ উত্তর ইরাকের সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ করিয়াছে। এই বিদ্রোহের নায়ক উত্তর ইরাকের মসুলে মোতায়েন পঞ্চম আর্মি ব্রিগেডের কম্যাডার কর্নেল আবদুল ওয়াহাব সাওয়াফ। পশ্চিম এশিয়া সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান জানাইতেছেন যে, নূতন বিপ্লবী বাহিনী সমগ্র মসুল অঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং জনগণের সমর্থন লাভ করিয়াছেন।

১০ই মার্চ—বাগদাদে সাধারণভাবে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, মসুল বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করা হইয়াছে। রাজধানীর সর্বত্র গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোরতর করা হইয়াছে এবং সরকারী বেতারে প্রচার করা হইতেছে যে, 'বিদ্রোহী' কর্নেল আবদুর ওয়াহাব-এর মৃত্যু হইয়াছে।

১১ই মার্চ—প্রেসিডেণ্ট নাসের অদ্য ইরাকের প্রধান মন্ত্রী মেজর জেনারেল কাশেমের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, ইরাকের প্রধান মন্ত্রী যে নীতি অনুসরণ করিতেছেন, তাহা সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের স্বার্থ-বিরোধী।

দামাস্কাস হইতে প্রাপ্ত সংবাদের উল্লেখ করিয়া পঃ এশিয়া সংবাদ সংস্থা গতকল্য জানাইয়াছে যে, ইরাকের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল কাশেম বিদ্রোহে যোগদানকারী সকল অফিসারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন এবং তদনুযায়ী অদ্য সকালে কর্নেল সাওয়াফ সহ ৬০ জন অফিসারের প্রতি প্রদত্ত প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়।

১২ই মার্চ—অদ্য করাচীতে রুশ দূতাবাস মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, সোভিয়েট রাশিয়া পাকিস্তানের নিকট এক কড়া পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ পত্রে পাকিস্তানকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলা হইয়াছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সামরিক চুক্তি করায় পাকিস্তানকে উহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

১৩ই মার্চ—মালদ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণাংশে অবস্থিত তিনটি দ্বীপের জনসাধারণ মাল-দ্বীপের সাধারণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া একটি নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নূতন রাষ্ট্রের নাম দেওয়া হইয়াছে সংযুক্ত সোদ্বীপপুঞ্জ।

১৪ই মার্চ—কায়রোর 'আখবর' পত্রিকা এই মর্মে এক সংবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, ইরাকের প্রধান মন্ত্রী মেজর জেনারেল আবদুল করিম কাশেম কম্যুনিস্টদের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়া ইরাকে কেবলমাত্র কম্যুনিস্টদের লইয়া সরকার গঠনে সম্মত হইয়াছেন।

১৫ই মার্চ—অদ্য কায়রোর সরকারী মহলের খবরে প্রকাশ, গত সপ্তাহে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের কম্যুনিস্ট বিরোধী প্রচারকার্যের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী শ্রীনিকিতা খ্রুশ্চেভ প্রেসিডেণ্ট নাসেরের নিকট একটি 'গুরুত্বপূর্ণ পত্র' প্রেরণ করিয়াছেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার **সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০, টাকা, ষাণ্মাসিক ১০, ও ত্রৈমাসিক ৫, টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২, টাকা, ষাণ্মাসিক ১১, টাকা, ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬নং সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সব ঘরেই দরকার ...
সংসারের সব কিছুই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে থাকুক সব গৃহিণীই তো তা' চান—কিন্তু কি করে এ' সম্ভব, তার জন্য তাঁদের মাথাব্যাথার অন্ত নেই। 'ও-কে' সাবান ব্যবহারে কাপড় ভাল থাকে, পরিষ্কারও হয় অনেক বেশী, সংসারের রূপটাই যেন খুলে যায়।
OK
'ও-কে'মার্কা
'বার' কিংবা কুচো
কাপড়-কাচা সাবান
OK
SOAP CHIPS
Manufactured by
THE EAST ASIATIC CO.(INDIA) PRIVATE LTD
MADRAS
OK
প্রস্তুতকারক
দি ইষ্ট এসিয়াটিক কোং
(ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
একমাত্র পরিবেশক
জি. এথারটন এ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১
KALPANA.OK.B.
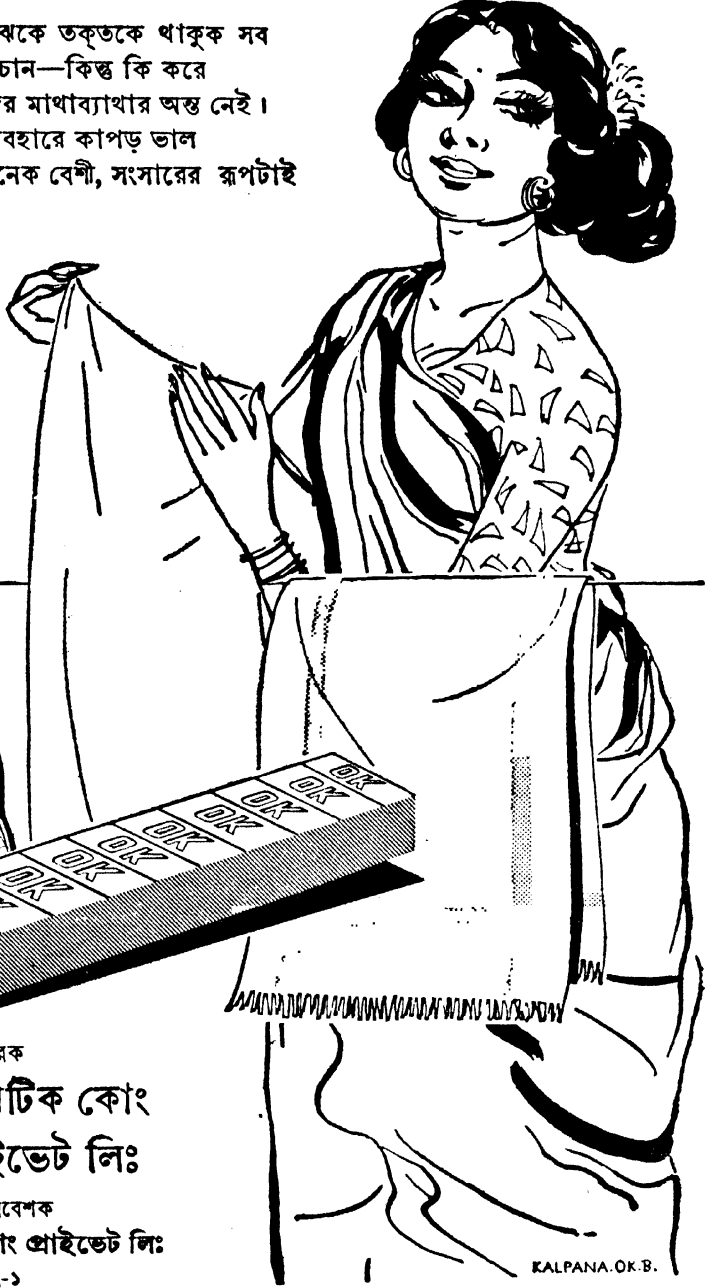
REG. NO. C. 2109

দেশ

] শনিবার, ১৪ চৈত্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 28th March, 1959 মূল্য—৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ২২

চীজব্রো-পণ্ড্‌স ইনক (সীমিত দায়সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত)

P 7729

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

চুলের যত্ন প্রয়োজন— বাহুল্য ক্ষতিকর
চুলের সৌন্দর্য প্রতিদিনের সস্নেহ যত্নে বর্দ্ধিত হয়। কয়েকটি সাধারণ নিয়ম মেনে চল্লে মোটামুটি ভাবে চুলের সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব। যেমন—চুল আঁচড়ানো, চুল বেঁধে শোওয়া, দিনে অন্ততঃ একবার ভাল করে জবাকুসুম তেল চুলের গোড়াগুলিতে মালিশ করা আর সপ্তাহে একবার মাথা ঘসা। চুলের যত্ন বলতে এই নিয়মগুলিই বোঝায় কিন্তু অনেকে এতে সন্তুষ্ট না হয়ে বাহুল্য সুরু করে অহেতুক বিপদ ডেকে আনেন। অনেকের ধারণা বার বার মাথা ঘসলে উপকার পাওয়া যায় কিন্তু এতে চুলের গোড়ায় যে জন্মগত তৈলাক্ত ভাব থাকে তা শুকিয়ে যায় আর চুলের সৌন্দর্যও ক্রমে ম্লান হয়ে আসে। নানারকম তেল আর সুগন্ধিও চুলের পক্ষে ক্ষতিকর।
জবাকুসুম
কেশ তৈল
সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২
KALPANA 64.B
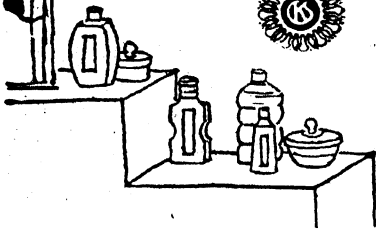
সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

DESH 40 Naya Paisa.
Saturday, 28th March, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২২ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ১৪ই চৈত্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

প্রস্তাবিত ভূমিসংস্কার

কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে গৃহীত ভূমিসংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বদ্ধপরিকর। কংগ্রেসের এই সংকল্প আইনমোতাবেক কার্যকর হইতে এখনো বিলম্ব আছে। লোকসভা বিচারবিবেচনা করিয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলে তখন রীতিমত ইহা আইনে পরিণত হইবে। ইতিমধ্যে নানা মহল হইতে বিষয়টির উপযোগিতা সম্বন্ধে গুরুতর প্রশ্ন উঠিয়াছে। নেহরুজীর ভাষায় প্রশ্নকারীদের সকলেই বড় বড় শহরবাসী, গ্রামের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা সাধারণত উদাসীন হইলেও এক্ষেত্রে অগ্রণী। তাঁহার মতে এই আপত্তি হয় স্বার্থপ্রণোদিত নয় স্বাভাবিক সংরক্ষণশীলতার ফল, অর্থাৎ নূতন পরীক্ষা সম্বন্ধে ভীতি হইতে উৎপন্ন। কিন্তু কংগ্রেস কিছুতেই পশ্চাদপদ হইবে না বলিয়া পণ্ডিতজী জানাইয়াছেন, আর কংগ্রেসও কর্মিগণের প্রতি আদেশ দিয়াছে, গ্রামে গ্রামে প্রস্তাবটির উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা সম্বন্ধে প্রচারকার্য চালাইতে। এ সমস্ত দেখিয়া মনে করিলে অন্যায় হইবে না যে, প্রস্তাবটি সত্যই বাস্তবরূপ লাভ করিবে। ইহাতে ভারতে গ্রামীণ বৈষয়িক জীবনে বৃহত্তম বিপ্লব সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। এই ভূমিসংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবটির স্বরূপ কী? ইহার তিনটি ধাপ। প্রথম ধাপে জমি 'রেশন' ও মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ। দ্বিতীয় ধাপে 'সার্ভিস কো-অপারেটিভ' বা সেবা সমবায় প্রতিষ্ঠা। আর তৃতীয় ধাপ বা সর্বশেষ লক্ষ্য হইতেছে দেশব্যাপী সমবায়মূলক কৃষিকার্য। বর্তমানে আমরা তৃতীয় বা শেষ ধাপটিকে আলোচনা হইতে বাদ দিতে পারি। **যেহেতু ঐ অবস্থা এখন বাস্তব-**বিচারের অতীত, উহার সম্বন্ধে খুব সম্ভব এখনো কাহারো স্পষ্ট ধারণা নাই। তা-ছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের সাফল্যের উপরে উহার অস্তিত্বের নির্ভর। প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের কাজ অনেকটা অগ্রসর হইলে ধীরে সুস্থে তৃতীয় ধাপের আলোচনা করা যাইতে পারিবে।

প্রথম ধাপের লক্ষ্য হইতেছে জমি 'রেশন' ও মধ্যস্বত্বভোগীর লোপ সাধন। দেশে যত জমি, চাহিদা তার অনেক বেশী। কাজেই জমি 'রেশন' করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। আর যে বস্তু রেশন করা হইতেছে তাহাতে মধ্যস্বত্বভোগীর স্থান থাকিতেই পারে না। থাকিলে রেশনের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হয়।

কিন্তু কোন্ প্রদেশে জমির রেশন বা পরিবার পিছু জমি কত হইবে তাহার নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া যায় না। তাছাড়া জমির প্রকৃতির উপরে রেশনের পরিমাণ বা বরাদ্দ নির্ভর করে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, ভূমিহীন কৃষকের হাতে যাহাতে কিছু জমি যায়। জমি এত কম আর ভূমিহীন কৃষক এত বেশী যে জমি ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত হইতে বাধ্য। এইবারে এবং এইখানে দ্বিতীয় ধাপ অপরিহার্য হইয়া ওঠে। ছোট ছোট টুকরা জমিতে চাষ লাভজনক হইতে পারে না, তেমনভাবে চাষ হইলে উৎপাদন কমিবে, উৎপাদনের খরচ বাড়িবে। কাজেই টুকরা জমিগুলিকে সমাবিষ্ট করিয়া জমির মালিকদের অর্থ ও সামর্থ্য সমাবিষ্ট করিয়া চাষ করিবার নামই হইতেছে সেবাসমবায়। রামের জমি তিন বিঘা, শ্যামের চার বিঘা, হরি, মধু, যদু প্রত্যেকের পাঁচ বিঘা। এখন এই সব জমি একত্র করিলে দাঁড়ায় **বাইশ বিঘা। ছোটখাট বেশ একটি খামার** হইল। মালিকগণ টাকা ও **শারীরিক** পরিশ্রম দ্বারা **চাষবাস করিল—আর** উৎপন্নদ্রব্য জমির পরিমাণ **অনুসারে ভাগ** করিয়া লইল। এখন **বিশেষজ্ঞগণ মনে** করেন ইহাতে অপেক্ষাকৃত **কম অর্থ ও** সামর্থ্য ব্যয় করিয়া অধিক **ফসল ফলানো** যাইবে। কাজেই এ **ব্যবস্থা অবশ্যই কাম্য।** আপাতত ইহাই **কংগ্রেসের অভীষ্ট লক্ষ্য।**

তবে বাধা কী? প্রথম বাধা পূর্বসংস্কার—ইহা প্রধানত **মনস্তত্ত্বঘটিত।** দ্বিতীয় বাধা কোন কোন **মহলের স্বার্থ**হানি। জমি 'রেশন' **হইলে অতিভূমিক** ব্যক্তির **স্বার্থহানি না হইয়া যায় না।** কাজেই **তেমন লোক নানাপ্রকার অবান্তর** ও ভীতিজনক আপত্তি **তুলিবে। তৃতীয়** বাধা—এই বৃহৎ দেশে এই নূতন **ব্যবস্থা** প্রবর্তনের ভার গ্রহণ করিবে কে? সরকারী **কর্মশক্তি** বা State machinery-র কর্মদক্ষতার সুনাম নাই। তারপরে পথটি নূতন ও **অপরীক্ষিত।** কাজেই খুব হুঁশিয়ার হইয়া না **চলিলে** প্রথমদিকে একটা অরাজকতা **হওয়াও** অসম্ভব নয়। চতুর্থ বাধা—**অনেকে** আশঙ্কা করিতেছেন, সেবাসমবায় **প্রথমে** যে নামেই আসুক না কেন **খুব সম্ভব** এই পথে চীন ও রাশিয়ার **জবরদস্তি** ব্যবস্থা আসিয়া পড়িবে। **তাঁহারা বলেন,** ইহা কম্যুনিজম্ প্রতিষ্ঠার **পরোক্ষ** পন্থা।

বলা বাহুল্য—চার শ্রেণীর **আপত্তির** মূলেই কিছু গুরুত্ব **আছে অর্থাৎ সেই** সেই সূত্রে বাধা আসা **অসম্ভব নয়।** কিন্তু সেজন্য ভীত **হইয়া বসিয়া থাকিলে** চলিবে না। ভারতের **বৃহত্তম সমস্যা** সমাধান **যখন করিতেই হইবে, তখন পথে** নামিয়া পড়াই **শ্রেয়, হয়তো দেখা যাইবে** যে সংসারের অধিকাংশ ভীতির **মত এই-**
সব ভীতিও মূলত কাল্পনিক।

প্রসঙ্গত

...লক্ষ কথা নইলে নাকি বিয়েই হয় না। বিধানসভার একটা অধিবেশন পুরো হয় কত কথায়? লেখা-জোখা নেই, তবে কয়েক কোটি ত হবে। সদস্যদের জিহ্বাগ্রে তখন সরস্বতী ভর করেন কিনা! কথায় যত কথার প্যাঁচ কাটা চলে, ততই বাহাদুরি। বিরোধীদলের অনেককেই তখন বাচস্পতি বলা যায়, যাঁদের একমাত্র প্রতিপাদ্য এই যে, অপর পক্ষে, অর্থাৎ সরকারী দলে, ন্যায়-রত্ন একটিও নেই।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট-বৈঠক শেষ হল। বিতর্কক্লান্ত সদস্যেরা অনেকেই স্বস্থানে প্রস্থান করবার উদ্যোগ করছেন। বাজেট-বিতর্ককে যদি আর্ট বলি, তবে স্বীকার করতেই হবে, এই আর্টও আর্টস সেক, অর্থাৎ উপায়টা কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করে না, আলোনার সার্থকতা আলোচনাতেই। ছাঁটাই প্রস্তাব আর ক'টা মঞ্জুর হয়? আসলে তীব্র-তিক্ত, কটু-কষায়, কখনও বা ঈষৎ-মধুর রসের যে-স্রোত বয়ে যায়, আমরা, ইতরজনেরা, তাই দিয়েই মুখ-রোচন করি। অনেক গুহ্য তত্ত্ব জানাজানি, অভিযোগের পাল্টা-অভিযোগ শোনা যায়, নানা ডার্টি লিনেন প্রকাশ্যে কাচাকাচি হয়। আপামর জনসাধারণ সকৌতূহলে দেখে। কথাতেই বলে না, মক্ষিকা ব্রণমিচ্ছন্তি?

* * *

স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাব নিয়ে এবার আসর শেষের দিকে রীতিমত সরগরম হয়ে উঠেছিল। অনাস্থা-প্রস্তাবটি এনেছিলেন সকল বিরোধী দল সমবেত হয়ে। তাঁদের অভিযোগ ছিল এই যে, স্পীকার একটি চিনি-কলের ডিরেক্টর, এভাবে শ্যাম-কুল বজায় রাখা অবৈধ। ইত্যাদি।

কিঞ্চিৎ অভিনব বলে প্রস্তাবটি সভার অভ্যন্তরে বিলক্ষণ উত্তেজনা এবং বাইরে সবিশেষ ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করেছিল। স্পীকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা-প্রস্তাবের নজির পার্লামেণ্টারি ইতিহাসে নেই, বহুকাল আগে প্রাকস্বাধীনতাকালে আর একবার অনুরূপ একটা উদ্যোগ হয়েছিল। নতুবা দলগত রাজনীতির ঊর্ধ্বে আসীন স্পীকার সচরাচর সকল পক্ষেরই শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম ও আনুগত্য পেয়ে থাকেন। কূটনীতিক্ষেত্রে বা রণনীতিতে দূত যেমন অবধ্য, পার্লামেণ্টারি ক্ষেত্রে স্পীকারও তেমনই নিরপেক্ষতার দরুণ স্বতন্ত্র মর্যাদা পান। অনাস্থা-প্রস্তাব সম্পর্কে তাই সাধারণের কৌতূহলের অবধি ছিল না।

বিতর্ক অবশ্যই প্রাণবন্ত হয়েছিল। বড় বড় বক্তারা তূণ উজাড় করে শরসন্ধান করেছিলেন। সওয়াল হল, জবাব হল, উত্তেজনা বাড়ছে, সেই সঙ্গে উদ্বেগ আর ঔৎসুক্যও—কী হয়, কী হয় ভাব। ভিজিটর্স গ্যালারির দর্শকজন ভাবলেন, এবার হয়ত স্পীকার রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়ে বলবেন, 'গোলা খা ডালা, এই দেখ, তোমাদের শব্দভেদী বাণ আমার কিছুই করতে পারেনি।'

না, নাটকীয় বিতর্কের অবসান হল, চূড়ান্ত নাটকীয় ভাবেই। স্পীকার অকস্মাৎ যা ঘোষণা করলেন তার অর্থ কতকটা এই দাঁড়ায়—'প্রজানুরঞ্জন তরে জানকীরে দিব বিসর্জন।' অর্থাৎ চিনি-কলের ডিরেক্টরের পদ তিনি ছেড়ে দেবেন।

সভাকক্ষে হর্ষোল্লাস বয়ে গেল, শত্রুপক্ষের মহারথীরাও একে অপরের দিকে চাইলেন—এ কি সত্যি? একটু অপ্রস্তুতও তাঁরা হয়ে থাকবেন, এতক্ষণ তবে কি সাঙ্কো পাঞ্জার মত হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করলেন নাকি? তাড়াতাড়ি যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করতে হল, প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হল। অবশ্য প্রত্যাহারকালে বিরোধী দলের ঐক্যে চিড়-ধরার লক্ষণ ক্ষণতরে দৃষ্ট হয়েছিল, প্রাসঙ্গিক বলেই তারও উল্লেখ করছি।

তবু, সব ভাল যার শেষ ভাল। এ-দেশের পার্লামেণ্টারি রীতি-নীতি এখনও কিছু পরিমাণে অনির্দিষ্ট-অনিশ্চিত। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার স্পীকার একটা নজির স্থাপন করলেন।

• • •

স্পীকার সম্পর্কিত আলোচনাকালে বার বার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারি প্রথার কথা উঠেছে—স্বাভাবিক কারণেই। নানা বিদেশী তরু-লতা-ফুলের মত পার্লামেণ্টারি প্রশাসন-নীতি আমাদের দেশে বিলাত থেকেই আমদানী, যদিও পরে মার্কিন সারও ছড়িয়েছি। "স্পীকার" শব্দটিই ত সেই যুগের স্মারক, যখন হাউস অব লর্ডসের প্রতি সদস্য রাজসকাশে যেতে পারতেন, কিন্তু কমন্সের সভ্যরা পারতেন না। তাঁদের হয়ে কথা বলবার অধিকার ছিল মাত্র একজনের—সেই মুখপাত্রের নাম সেই কারণেই "স্পীকার।" নতুবা "স্পীকিং" অর্থাৎ বক্তৃতাদানের দায় অধুনা স্পীকারেরই সবচেয়ে কম, বিধানসভায় বাক্য অন্যেরাই সচরাচর কয়ে থাকেন। স্পীকারের করে থাকে ন্যায়ের দণ্ড, আদিতে পার্টি-মনোনীত হলেও একবার আসনাসীন হলে সকলের প্রতিই তাঁর সমদৃষ্টি। বলা বাহুল্য, এর ফলে স্পীকারের সক্রিয় বা দলগত রাজনৈতিক জীবনের অবসান ঘটে যায়। এই পদ-গ্রহণ এক প্রকারের ত্যাগ-স্বীকারও বটে। ব্রিটেনে স্পীকার ত্যাগের বিনিময়ে কিছু পুরস্কারও পান, নির্বাচনে কোন পক্ষই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করায় না। এই জাতীয় সুস্থ প্রথা সৃষ্টি হতে এদেশে সম্ভবত আরও কিছুদিন সময় লাগবে। আমরা বিদেশী সংবিধান থেকে তিল-তিল নিয়ে প্রতিমা যখন গড়তে পেরেছি, প্রাণপ্রতিষ্ঠাও তখন করতে পারব, লেটারের পিছে-পিছে স্পিরিটও আসবে—পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দৃষ্টান্ত সেই সম্ভাবনারই সূচনা।

* * *

হোলির জয়টিকা পরে বসন্ত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হল। এই অভিষেক অবশ্য আনুষ্ঠানিক। অভিষেক তার কবেই শুরু হয়ে গিয়েছে। সারা মাথায় আবির মেখে শিমুল আর কৃষ্ণচূড়া মাতামাতি করছে, সে কি মাত্র আজ থেকে? বনে-বনে ফাগুনের আগুন লাগানোর বহ্ন্যুৎসবের সূচনাও দেখেছি।

তবু মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে, এত ঘটা করে যাকে রাজ্যপাটে বসালুম, সে কে? লোকে বলে বসন্ত, আমরাও ওই নামেই তাকে ডাকছি। আসলে সে গ্রীষ্মেরই ছদ্মবেশী অনুচর নয় ত? সে নিজেই ত গ্রীষ্ম নয়? আজ যার ভেলভেট গ্লাভস দেখছি কাল তারই হয়ত মেলড্ ফিস্ট মুষ্টিবদ্ধ হবে। ধূলিজালে গগন ছেয়ে যাবে। রুদ্ধশ্বাস, ঊর্ধ্বনেত্র আমরা তখন হয়ত চাতক পাখির মত শুধু প্রার্থনা জানাব—বৃষ্টি হেঁকে আসুক, আষাঢ়ের প্রথম দিনটির সওয়ার হয়ে বর্ষাঋতু ধারাজলে সব ধুলো ধুইয়ে দিক। বর্গী যাক, পাড়া জুড়োক।

বিজ্ঞপ্তি

'সবুজপত্র'কে অবলম্বন করিয়া এক সময়ে যে সাহিত্যিক-গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারই ইতিকথা লিখিয়াছেন সবুজপত্রের অন্যতম পত্রী শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব। প্রমথ চৌধুরীর শতাধিক পত্রসংবলিত এই রচনা 'সবুজপাতার ডাক' আগামী সংখ্যা হইতে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদক 'দেশ'
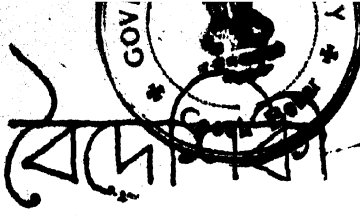
কিছুকাল ধরেই তিব্বতে গোলমালের কথা শুনা যাচ্ছিল। পূর্ব-দক্ষিণ তিব্বতে খাম্পাদের সঙ্গে চীনাদের সংঘর্ষ বেশ কিছুদিন ধরে চলে আসছিল। মধ্য তিব্বতে সশস্ত্র সংঘর্ষ না হলেও চীনাদের যে তিব্বতীদের বশ মানাতে বেগ পেতে হচ্ছিল, সে সম্বন্ধে নানা কথার রটনা হচ্ছিল, ইচ্ছামতো কেউ বিশ্বাস করেছে, কেউ গুজব বলে উড়িয়ে দিয়েছে। কলিকাতা একটা গুজবের ডিপো বলে অনেকের ধারণা হয়ে গিয়েছিল। কলিকাতা থেকে যে বাজে গুজব অনেক সময়ে রটেছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। একজন বিদেশীকে গবর্নমেণ্ট এ বিষয়ে বিশেষভাবে দায়ী মনে করে তাঁকে আদেশ দেন যে, বাইরে কোনো খবর পাঠাবার আগে তাঁর লেখাগুলি গবর্নমেণ্টের কাছে পেশ করতে হবে। সম্ভবত চীন সরকারের অভিযোগের ফলেই এই ব্যবস্থা করা হয়। ১৭ই মার্চ তারিখেও পার্লামেণ্টে প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তিব্বত প্রসঙ্গে বলেন যে, তিব্বতে গোলমালের যেসব খবর বেরুচ্ছে, সেগুলো অতিরঞ্জিত এবং তিব্বতে 'এখন পর্যন্ত অস্ত্রের অথবা দৈহিক সংঘর্ষের চেয়ে দুই বিরোধী ইচ্ছার সংঘর্ষই চলছে।' একথা বলার তিন দিনের মধ্যেই কিন্তু পণ্ডিতজীর খাস দপ্তর পররাষ্ট্র সচিবালয় থেকেই এই মর্মে সংবাদ বিতরিত হয় যে, লাসার ভিতরেই চীনা-তিব্বতী সংঘর্ষ চলেছে। ২৩শে মার্চ তারিখে পণ্ডিতজী লোকসভায় একটি বিবৃতি দান করেন, তাতে জানা যায় যে, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব থেকেই লাসাতে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে আরম্ভ হয়। দলাই লামা সম্বন্ধে কতকগুলি গুজবের ফলে এই উত্তেজনা। পণ্ডিতজীর বিবৃতিতে গুজবগুলি কী ছিল, সেটা স্পষ্ট বলা হয়নি। তবে অন্যান্য সূত্রের সংবাদ থেকে জানা যায় যে, দলাই লামার নিরাপত্তা সম্বন্ধেই লোকের ভয় ও সন্দেহই উত্তেজনার প্রধান কারণ। দলাই লামাকে পিকিং-এ যাবার জন্য চীনা কর্তৃপক্ষ কিছুদিন থেকে পীড়াপীড়ি করছিলেন। বিদ্রোহী খাম্পাদের বিরুদ্ধে দলাই লামা স্পষ্ট করে কিছু বলছেন না, তাতে চীনা কর্তৃপক্ষ খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। এই অবস্থায় নাকি দলাই লামাকে লাসায় অবস্থিত চীনা সামরিক অধিকর্তার ভবনে নিমন্ত্রণ করে বলা হয় যে, তিনি যেন তাঁর দেহরক্ষীদের না নিয়ে আসেন। এতে তিব্বতীদের সন্দেহ হয় যে, চীনারা দলাই লামাকে হস্তগত করে তিব্বত থেকে সরিয়ে নেবার মতলব করেছে। সপ্তাহ দুয়েক পূর্বে বহুসংখ্যক তিব্বতী লাসায় অবস্থিত ভারতীয় কন্সাল-জেনারেলের ভবনে উপস্থিত হয়ে ভারতীয় কন্সালকে দলাই লামা সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ ও আশংকার কথা জানায়। তার দিন তিনেক পরে একজন তিব্বতী মেয়ে এসে ভারতীয় কন্সাল জেনারেলকে তাদের সঙ্গে লাসায় অবস্থিত চীনা বৈদেশিক দপ্তরে Foreign Bureau-তে যেতে অনুরোধ করে। তারা চায় যে, ভারতীয় কন্সাল-জেনারেলের উপস্থিতিতে তারা চীনাদের কাছে তাদের দাবি পেশ করবে। ভারতীয় কন্সাল-জেনারেল তাদের জানান যে, কোনো তিব্বতী বিক্ষোভ প্রদর্শনের সঙ্গে তিনি জড়িত হতে পারেন না, সেজন্য তিব্বতী নারীদের সঙ্গে চীনা কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে এই সব ঘটনার বিষয় ভারতীয় কন্সাল-জেনারেল চীনাদের জানান। এর পরে ২০শে মার্চ হঠাৎ লাসায় চীনা সৈন্যদের সঙ্গে তিব্বতী-

দের সংঘর্ষ বাধে এবং সেটা ভারতীয় কন্সালেট-জেনারেল ভবনের সন্নিকটেই ঘটে। ভারতীয় কন্সালেট-জেনারেল ভবনের উপরও কয়েকটা গুলী এসে পড়ে, তবে তাতে কেহ আহত হয়নি। কিছুকালের জন্য কন্সাল-জেনারেল ঘরের বা'র হতে পারেন নি। নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ভারতীয় কন্সাল-জেনারেল চীনা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানালে তাঁরা ভারতীয়দের কন্সালেট ছেড়ে চীনা ফরেন ব্যুরোতে আশ্রয় নিতে বলেন, তাতে ভারতীয় কন্সাল-জেনারেল সম্মত হন না। কন্সালেট জেনারেল ভবনেই তাঁদের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করতে চীনা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়, এ বিষয়ে ভারত সরকার ও ভারতস্থ চীনা রাষ্ট্রদূত এবং পিকিং-এ অবস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত মারফৎ চীনা সরকারকেও জানিয়েছেন। পণ্ডিতজী তাঁর বিবৃতিতে দলাই লামার নিরাপত্তা কামনা করেছেন, কিন্তু দলাই লামা সত্যই নিরাপদ অবস্থায় আছেন কিনা, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি, বরং দলাই লামার নিরাপত্তা সম্বন্ধে একটি অনিশ্চয়তা এবং আশংকার ভাবই পণ্ডিতজীর বিবৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে, তৎসত্ত্বেও তিব্বতের গোলমাল শান্তিপূর্ণভাবে মিটে যাবে বলে পণ্ডিতজীর বিবৃতিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু সেই আশা কি পূর্ণ হবে?

তিব্বতের এই রকম সংবাদে ভারতচিত্ত ব্যথিত। ১৯৫০ সালে চীন যখন তিব্বতকে 'মুক্ত' করার জন্য সশস্ত্র অভিযান করে, তখন ভারতের প্রধান মন্ত্রী চীন কর্তৃপক্ষের উদ্দেশে একটি সবিনয় প্রতিবাদ প্রেরণ করেন, তাতে চীনাদের সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগের নিন্দা ছিল। তাতে চীনা কর্তৃপক্ষ রেগে গিয়ে ভারতের প্রতিবাদ অতি কর্কশ ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেন। বলা বাহুল্য, তার বিরুদ্ধে ভারতের করার কিছু ছিল না। তিব্বত সম্পর্কে চীনাদের সঙ্গে পরে ভারতের যে চুক্তি হয় (এই চুক্তিরই মুখবন্ধরূপে 'পঞ্চশীল' প্রথম কথিত হয়), সেটা তিব্বতে চীনাদের সার্বভৌমত্বের দাবির স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত সন্দেহ নেই। কিন্তু একথাও সত্য যে, এই চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে চীন কর্তৃপক্ষ তিব্বতী-দের স্বাধিকার—autonomy—রক্ষা করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যদি দেখা যায় যে, চীনাদের সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার কোনো ইচ্ছা নেই, তাহলে চীনাদের প্রতি ভারতীয় মনোভাব পূর্বের মতো থাকবে না। তিব্বতীদের তাদের স্বকীয় জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অধিকার অবশ্যই আছে। গায়ের জোর বা আইনের কূট-কচালির দ্বারা সেই অধিকার নস্যাৎ করার চেষ্টা করলে ভারত গবর্নমেণ্টের তা ঠেকাবার সাধ্য না থাকতে পারে, কিন্তু তাতে ভারতীয় মনে একটা কঠিন আঘাত লাগবে। তিব্বতে সামাজিক সংস্কারের প্রয়োজন থাকতে পারে, নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে প্রয়োজন সাধন করতে হলে তা তিব্বতীদের ইচ্ছার সঙ্গে আপোষ করেই করতে হবে। দলাই লামার শারীরিক নিরাপত্তা বা তাঁর স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয়েছে এরূপ সন্দেহ এলে ভারতীয় চীনাদের মধ্যে যে বন্ধুভাব বর্তমান, তার উপর একটা কঠিন আঘাত পড়বে। এ বিষয়ে চীনারা কতটা সচেতন অথবা আদৌ সচেতন কিনা, তার শীঘ্রই পরখ হয়ে যাবে।

২৪।৩।৫৯

সন্তোষকুমার ঘোষ

(২১)

সৌর পরদিনও হাতে উঠেছিল। কতটা স্বেচ্ছায়, বলা কঠিন, দুর্বারণ একটা কৌতূহল বা টান তাকে টেনে এনেছিল।

ক্লাস বিকালে, আগে সৌর তবু প্রথম দিকেই কলেজে চলে যেত, কমন রুমে বসে বই বা কাগজপত্র পড়ত। সেদিন বলল, 'এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কোন মানে হয় না, কমন রুমে খালি হৈ-হুল্লোড়, ভিড়, ওখানে কোন কাজ করা যায় না, তা ছাড়া ও-ঘরটায় রোদ পড়ে না, কেমন শীত-শীত করে।'

সৌর বলল, মানে নিজেকে বলল, যেন কড়া মনিব একজন ভিতরেই আছে, তাকে কৈফিয়ত দিল। এই মনিবের নাম, গুরুজনদের মুখে শুনে শুনে সৌর অনুমান করেছিল, বিবেক। তাকে কখনও দেখেনি, তাকে দেখাও যায় না, কেননা, সে অন্তরালবর্তী, কিন্তু তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়, একটা পর্দার আড়ালে বসে সে—

না, কোন হুকুম করে না, কৈফিয়ত-তলবও না। শুধু মাঝে মাঝে এক-একটা প্রশ্ন করে বসে। দুরূহ প্রশ্ন। মর্মভেদী, জবাব দিতে গিয়ে সৌরর অন্তস্তল অবধি কেঁপে ওঠে।

সৌর তাকে এড়াতে চায়। এলোমেলো, অবান্তর কৈফিয়ত দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে রাখতে চায়। তার হাতে থেকে রেহাই পাবার অছিলাও খোঁজে। দুষ্টু ছেলেরা যেমন মা ঘুমিয়েছে কিনা আড় চোখে দেখে নিয়েই পাড়ায় পাড়ায় টো-টো করতে ছোটে। সৌরও সেইভাবেই তার বিবেককে ফাঁকি দিতে চাইত, ভাবত, এই ত একটুখানি মাত্র, ও কি আর টের পাবে?'

আশ্চর্য, টের পেত কিন্তু। পর্দার আড়ালবাসী মানুষটার চোখ দুটি ভয়ংকর রকমের সজাগ আর তীক্ষ্ণ, সব দেখত, তখন হয়ত কিছু বলত না, কিন্তু পরে, অনেক রাত্রে সৌর যখন বিছানায় এসে একলাটি শুয়ে পড়েছে, তখন কড়া গলায় প্রশ্ন করত। কু'কড়ে যেন এতটুকু হয়ে যেত সৌর—আসামী মন তোতলামি করত জবাব দিতে গিয়ে। বলত, কই, আমি—আমি ত—

কখনও মিছে কথাও বলত। জিহ্বার জড়তাকে জয় করে, গড়গড় মুখস্থ বলার সুরে। জানত, ধরা পড়ে যাবে, পার পাবে না, তবু বলত। যার চোখ দুটির নজর এত তীক্ষ্ণ, তার কান দুটিও অবশ্যই সজাগ হবে, একথা জেনেও বলত।

এই বিবেক কম-বয়সে সৌরকে বড় যন্ত্রণা দিয়েছে। মাঝে মাঝে সৌরর মন বিদ্রোহ করত। বলত, 'মানি না, তোমাকে মানি না আমি।' কখনও বলত, 'তুমি নেই। যেটা আছে, সেটা আমার ভীরুতা। আমার ভিতু মন যেমন ভূত সৃষ্টি করে এখন তাকেই ভয় পায়, তেমনই ভয় পায় ভূতের দোসর বিবেককে।' কখনও বা ভাবতে ভাবতে সৌরর হাতের আঙুল কঠিন হত। বিড়বিড় করে সে বলত, 'যেভাবে ভূতের ভয়কে জয় করছি, সেই ভাবে ওকেও জয় করব। দূর করব। মারব, ওকে মারব আমি।'

তন্দ্রার ঘোরে, প্রশ্নের পর প্রশ্নে অস্থির হয়ে, সৌর কতদিন সেই ছায়াসত্তার গলা টিপে ধরেছে। ভেবেছে, 'মেরেছি, আমার

বিবেককে মেরেছি আমি। এখন আমি স্বাধীন। পাপ-পুণ্য যা খুশি করব, কেউ জবাবদিহি করতে বলবে না।' নিশ্চিন্ত হয়ে সৌর জুড়োন স্নায়ুদের সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তবু পরদিন আবার, মুখোমুখি হতে হয়েছে সেই বিবেকের সঙ্গে। সেই রূঢ় ছায়াকণ্ঠ শুনে ওর শরীরে কাঁটা দিয়েছে। মরেনি, মরে না অথবা মরে মরেও বার বার যে বেঁচে ওঠে, তারই নাম বিবেক, সৌর উপলব্ধি করেছে।

অতএব সেদিন ছাদে ওঠবার আগে যে-বৈরী মরেও মরেনি, তাকেই সৌর বলল, 'আমি ছাদে নিরিবিলিতে বসে পড়ব, বলে যাচ্ছি। এই ঘরটা ঠান্ডা, রোদে পিঠ দিয়ে বসব।'

সে-দিনও ওরা ছাদে ছিল, ওরা খেলছিল। সৌর শব্দ করেই ছাদে উঠেছিল, ওরা তাকায়নি। কাক তাড়ানোর ছুতোয় সৌর একবার ছোট একটা লাঠি তুলে একবার ঠুক করে আওয়াজ করল, ওরা তবু ফিরে চাইল না। যেমন খেলছিল, তেমনই খেলতে থাকল। সৌর অপমানিত বোধ করল, সৌর রেগে উঠল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, ওরা টের পেয়েছে সৌর ওপরে এসেছে, ওরা দেখতেও পেয়েছে। নিশ্চয় ওদের পিঠেও দুটি লুকোন চোখ আছে, কোঁকড়ানো কালো ভিজে চুলের আড়াল থেকে সেই চোখ দুটি সৌরকে লক্ষ্য করছে।

কড়িগুলো একটা আর একটার সঙ্গে লাগছিল, ঠোকাঠুকির ফলে টক-টকাস শব্দ হচ্ছিল, সৌর শুনছিল। তন্ময় হয়ে ওরা খেলছে। ভারী ত খেলা, আমিও খেলতে পারি, সৌর বলল আপনমনে, যে-কাকটা তখন কোনখানে নেই, তাকে তাড়াতে আবার লাঠি নিয়ে দৌড়ে গেল। কার্নিস থেকে ঝুঁকে দেখল, এ-বাড়ির ছায়া ও-বাড়ির দেওয়াল বেয়ে বেয়ে কতখানি উঠেছে।

ওরা তখনও তাকাল না। ছন্দের তালের মত নিয়মিত দান গড়তে থাকল, অনেকক্ষণ ধরে, শুনতে শুনতে সৌরর মনে হল, যেন কতক্ষণ ধরে একটানা বৃষ্টি পড়ছে, এই টুপটাপ কখনও শেষ হবে না।

বোবা দুটি মেয়ে কী খেলছে? সৌরর সহসা মনে হল, মেয়ে নয়, ওরা ডাইনি। ডাইনি বলেই ওদের মুখে 'রা' নেই। ভরা দুপুর, তবু সৌরর কেমন ভয়-ভয় করে উঠল, কড়ি ত মেয়েরা বাজী রেখে খেলে, ওদের বাজী কী? কে জানে, বাজী হয়ত সে নিজেই। সৌরকে পণ রেখে নির্বাক দুটি মেয়ে জুয়া খেলছে। যে জিতবে, সৌর তারই।

একজন হাততালি দিয়ে হেসে উঠল, সে জিতেছে। সৌর তার। সৌর তার? মাথা ঘুরছিল, সৌর ভয় পেয়েছিল, সৌর পিছনে সরে সরে ছাদের কার্নিসে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ওই যে, রোগা মেয়েটা হঠাৎ পিছন দিকে তাকাল, যার চোখে সুর্মা-আঁকা, যার হাতে লাল গালার বালা, সৌর তার? না-না, সৌর অস্ফুট গলায় বলে উঠল, না। আমি ওর না। ওর নাকটা কেমন যেন, ওর চাউনি কেমন যেন, সুর্মা লেগেও সুন্দর হয়নি, আমি ওর হতে পারব না। আমি তবে কার—কটকটে ফরশা ওই থপ্‌থপে মেয়েটার? ওর চোখ কটা, ওর নাকে নাকছাবি, ওর হাতে উল্কি: আমি ওরও হব না।

আমি তবে কার?

ভাবতে ভাবতে, কাঁপতে কাঁপতে সৌর ধুলো-ছড়ান ছাদেই বসে পড়ল, ওর সম্বিত আর রইল না।

তখনও ওদের খেলা চলছে।

যে মেয়েটার চোখে সুর্মা, হাতে লাল গালার বালা, সে কোঁচড়ে কতকগুলো তেঁতুল-বীচি নিয়ে বসেছে। জোরে-জোরে নেড়ে বলছে, 'বল্ ত, জোড় না বিজোড়?'

ফরসা মেয়েটা, যার হাতে উল্কির ছাপ, নাকে নাকছাবি, সে ঝুঁকে পড়ে বলে উঠল, 'জোড়।'

অমনই রোগা মেয়েটা তার হাতের মুঠি খুলে হেসে উঠল। —"বিজোড়! পারলিনি।"

অন্য মেয়েটি এবার বলল, 'এবার আমি, এবার আমি। জোড় না বিজোড়?'

"বিজোড়!"

হাত খুলে ফরসা মেয়েটি বলল, "ঠিক বলেছিস ত? কী করে ঠিক বললি, ভাই?" বলতে বলতে সে তার সখীর গলা জড়িয়ে ধরল।

গালার বালা-পরা মেয়েটি মুখ-ঝামটা দিয়ে বলে উঠল., "মরণ!" ঠিক আগের যে-সুরে সৌরর কানে বিশ্রী লেগেছিল।

"বল্ না ভাই, তোরটা কী-করে ঠিক?" আধো আধো আবদারের সুরে অন্যজন বলল।

"আন্দাজে। আমাদের বিজোড় ত হবেই, জোড় জোটাব কোথা থেকে, বল?

আকাশের দিকে চেয়ে একটি মেয়ে বলল, "আজ বিষ্টি হবে। যা মেঘ করেছে।"

"আমি বলছি, বিষ্টি হবে না।"

"বাজী?"

"বাজী। কত দিবি?"

একসঙ্গে খিল খিল করে হেসে উঠে ওরা আবার খেলায় মন দিল। "আমার দিকে ওরা তাকাবে না," সৌর বলল, "অথচ আমার অদৃষ্ট নিয়ে রোজ খেলবে। এরা কারা? এই নিষ্ঠুর দু-জন মায়াবিনীর পরিচয় কী?"

ওদের টুকরো টুকরো কথা তখনও কানে আসছিল।

"ওই চিলটা এবার সামনের। এই ছাতেই বসবে।"

"না ওই ছাতে।"

"আমি বসেছি এই ছাতে। বাজী?"

"বাজী।"

অবসন্ন দেহ নিয়ে সৌর অনেকক্ষণ পরে নীচে নেমে এসেছিল।

মধ্যবয়সী স্ত্রীলোকটি সেদিনও ছাদে এসেছিল, ফিসফিস করে কী যেন বলেছিল মেয়ে দুটিকে, ওরা কাঠবিড়ালির মত তর-তর করে নীচে চলে গিয়েছিল।

তারও প্রায় এক ঘণ্টা পরে সৌর অপরিচিত মোটা গলায় আবৃত্তি শুনতে পেল। প্রথমে মনে হয়েছিল কবিতা। পরে মন দিয়ে খানিক শুনে সৌর বুঝতে পারল, কবিতা নয়, নাটক। কেউ থিয়েটারের পার্ট করছে।

লোকটা থামল। হাততালি পড়ল। শ্রোতারা তারিফ করছে।

লোকটিকে সৌর বলতে শুনল, "এ বইটা ডায়না থিয়েটারে নেবে। কথা ঠিক হয়ে আছে।"

"আমরা পার্ট পাব না? ও নিশিবাবু, বলুন না, আপনার প্লে-তে আমাদের পার্ট দেবেন কি না?"

মেয়ে-গলায় কে যেন জিজ্ঞাসা করল, লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "দেব।"

"কবে দেবেন—"

"রোসো, রোসো। থিয়েটারের ম্যানেজারকে বলি আগে।"

"কবে বলবেন, কাল।"

"অত তাড়াতাড়ি কী হয়?"

"তবে পরশু?"

"আচ্ছা।" কতকটা বিব্রতভাবে, কতকটা যেন রেহাই পেতেই লোকটি যেন বলল, "আচ্ছা।"

"উঁহু, মুখে বললে হবে না। পিতিজ্ঞে করুন, ও নিশিবাবু, আমাকে ছুঁয়ে আপনাকে পাকা কথা দিয়ে যেতে হবে।"

"ছুঁয়েই ত বলছি।"

"ছাই। নেহাত দায়সারা ঢঙ-এ বলছেন। মিছে কথা বললে দেখবেন, আমি ঠিক মরে যাব। অবিশ্যি, আমি ম'লে আপনার কী আসে-যায়?"

"সব যায়, নয়ন।" লোকটা ধরা ধরা গলায় বলল, একটু আগে যেভাবে থিয়েটারের পার্ট বলছিল, তেমনই আবেগ মিশিয়ে দরদ দিয়ে। "সব যায়, নয়ন।"

আর তখনই সৌর টের পেল, একটি মেয়ের নাম নয়ন। কোন্‌টির? যার হাতে উল্কি, তার, না, যার নাকে নাকছাবি, তার? সৌর অনুমান করল, যার চোখ দুটি ঢল-ঢল, তার নামই নয়ন হবে। চোখ বুজে সৌর ভাবতে চেষ্টা করল, কার চোখ বেশি ঢলঢল।

*

প্রতিবেশী কারা সৌর জানত না, তাই নতুন বাসায় ওর কৌতূহলে, কল্পনায় একটুখানি রহস্যের ছিটে লেগেছিল। খানিকটা মাধুর্য আর মমতা দিয়ে মেয়ে দুটিকে ওর ভাবনা ঘিরে রেখেছিল।

আরও কয়েক মাস পরে যখন ওই বাসা ছেড়ে আসে, সৌরর মনে তখন মমতা বা রহস্যের লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

(ক্রমশ)

॥ রঞ্জন ॥

সাহিত্য-কৌতূহলী ভারতীয় বাইরে না গিয়েও নিশ্চয়ই জানেন যে, ভ্লাডিমির নাবোকভের "ললিতা" নামক উপন্যাস নিয়ে সম্প্রতি য়ুরোপ ও আমেরিকায় যেসব বিতর্ক ও আলোড়ন হয়েছে একমাত্র জেমস জয়সের "য়ুলিসিস" ছাড়া তেমনটি আর সাম্প্রতিক ইতিহাসে হয়নি। চার চারটি সম্ভ্রান্ত মার্কিন প্রকাশক কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হবার পরে বইটি প্রকাশ করেন প্যারিসের ওলিম্পিয়া প্রেস—১৯৫৫-র সেপ্টেম্বর মাসে। তখন বিশেষ কেউ এ-বই নিয়ে উত্তেজিত হননি। নিঃশব্দ অবহেলায় বইটি পড়ে ছিল প্যারিসের স্বল্পজ্ঞাত গ্রন্থালয়ে। মাস চারেক পরে "সাণ্ডে টাইমস" পত্রিকায় গ্রেহাম্ গ্রীন বইটির প্রথম উল্লেখ করেন আর তাই নিয়ে "সাণ্ডে এক্সপ্রেস" কাগজের জন গর্ডন অশ্লীলতার প্রশ্রয় নিয়ে রোল তোলেন। তারপর "ললিতা" আমেরিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও সে বেস্ট-সেলার তালিকায় শীর্ষের কাছাকাছি। বৃটিশ সংস্করণ এখনও প্রকাশিত হয়নি, কখনও হবে কি না জানা নেই। ভারতে এ-বই কবে পৌঁছোবে—আদৌ পৌঁছোবে কি না—কে জানে?

এবার বলি, সম্প্রতি প্যারিসে সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে আমি বইটি পড়েছি। নিষিদ্ধ পুস্তকের আবেদন আমার কাছে অপরিমিত নয়। "ললিতা" অন্য, একান্তই সাহিত্যিক কারণে পাঠ্য। এমন উপভোগ্য উপন্যাস প্রতিদিন লিখিত হয় না।

*

উপভোগের বৃহদংশ বিস্ময়জাত। অত্যন্ত দুঃসাহসিক এ-বইয়ের বিষয়, যদিও কোথাও একটিও তথাকথিত অশ্লীল শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। অবৈধ প্রেম উপন্যাস-সাহিত্যে আর নিষিদ্ধ বিষয় নেই। কিন্তু "ললিতা"-র বিষয়বস্তু বেআইনী, দণ্ডনীয় অপরাধ। এ-উপন্যাসের নায়ক মধ্যবয়স্ক বুদ্ধিজীবী, য়ুরোপ থেকে নির্বাসিত হয়ে আমেরিকাবাসী। আর নায়িকা? একটি মার্কিন মেয়ে, বয়স—বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—বারো। এ-প্রেম নিকষিত হেম নয়, স্পষ্টত শারীর। শুচিবাইগ্রস্ত পাঠকের জন্য আরও আতঙ্ক সঞ্চিত আছে, "ললিতা" সাধারণ খবরের কাগজের আইন আদালতের কথা বিভাগের বালিকা-ধর্ষণের কাহিনী নয়। উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের শেষের দিকে নায়ক বলছেন—

.. "Frigid gentlewomen of the jury! I had thought that months, perhaps years, would elapse before I dared to reveal myself to Dolores Haze; but by six she was wide awake, and by six fifteen we were technically lovers. I am going to tell you something very strange: it was she who seduced me."

এবার বোঝা গেল নিশ্চয়ই "ললিতা" নিয়ে কেন এত উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছে। উপন্যাসটির বিষয়ের অস্বাভাবিকত্বজাত ঘৃণার শিহরণ কাটিয়ে উঠতে না পারলে কাউকে দোষ দেব না। পারলে পাঠকের জন্য মহার্ঘ পুরস্কার অপেক্ষা করছে।

*

নাবোকভের উদ্দেশ্য যে অশ্লীল সাহিত্য রচনা নয় তা অচিরেই স্পষ্ট হয়। লেখক সীরিয়স শিল্পী। বিদেশী হয়েও ইংরেজী ভাষার উপর তাঁর দখল অনস্বীকার্য। শব্দ ধ্বনি তিনি ভালবাসেন, শব্দ নিয়ে খেলা করেন তিনি— মাঝে মাঝে অর্থ নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে। সাধারণত উপন্যাস যে-গদ্যে লেখা হয়—অরওয়েল যার নাম দিয়েছিলেন জেনীভা প্রোজ—নাবোকভ তাতে বিশ্বাস করেন না। তাঁর গদ্য স্মরণ করিয়ে দেয় জেমস জয়স বা হেনরি মিলারের কথা যদিও অশ্লীল কথার উচ্ছৃংখল প্রয়োগের জন্য মিলারের পর পর চার লাইন উদ্ধৃত করা অসম্ভব এবং নাবোকভে এমন একটি কথাও নেই। দুয়ের সাদৃশ্য দৃষ্টি-ভঙ্গীতে যা একান্তই অ্যানার্কিক।

আগেই বলেছি, নাবোকভ পর্নোগ্রাফি পরিবেশন করতে বসেননি। এখন যোগ করা দরকার, সমাজ-সংস্কারও তাঁর উদ্দেশ্য নয়। আধুনিক মার্কিন জীবনের নানা উপাস্য দেবতার প্রতি শ্লেষ আছে প্রচুর—যেমন মনস্তত্ত্বের প্রতি, মোটেল সভ্যতার প্রতি, শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি—কিন্তু সবই প্রসংগত। কোথাও এতটুকু ইংগিত নেই লেখক কী শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস করেন। বোধ হয় কিছুই না। এই বিশাল অবিশ্বাসের পশ্চাতে আছে বৃহৎ আশাভংগ। নইলে দ্বাদশবর্ষীয় বালিকার কুমারীত্বের স্বপ্নও চূর্ণ হয়ে যায় অমন করে?

শেষের দিকে কাহিনীটিকে একটু ট্র্যাজিক প্রকৃতি দেবার অসফল প্রয়াস আছে। তবু সন্দেহ থাকে না, নাবোকভ আসলে কমিক জীনিয়াস। আগাগোড়া তিনি হাসছেন—নিজেকে দেখে, চার দিকের সব কিছু, সব কাউকে দেখে। কোনও মানবীয় সম্পর্ক তাঁর কাছে পবিত্র নয়, অন্তত পরিহাসের ঊর্ধ্বে নয়। নায়ক অনায়াসে একটি মহিলাকে দেখে ভাবতে পারেন—একে কি বিয়ে করব, তারপর খুন? তাঁর কল্পনার বীভৎস চপলতা আরও পরিষ্কার হবে যদি যোগ করি যে, যে-ললিতা হাম্বার্ট হাম্বার্টের উন্মত্ত প্রেমের উৎস সে-ললিতার মাকে সে বিয়ে করেছিল, ললিতাকে পাবার জন্যই! হাম্বার্ট হাম্বার্ট যে অমানুষ সে সম্বন্ধে তার নিজের মনেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সে জানে ললিতা অতি সাধারণ ও বুদ্ধি-হীনা, চরিত্রের কথা না তোলাই ভাল। তবে কেন এই আবেশ বা অবসেশন?

মনোবিজ্ঞানের প্রতি লেখকের অশেষ ঘৃণা। তাই প্রশ্নের উত্তর নেই উপন্যাসে, উত্তর দেবার চেষ্টা পর্যন্ত নেই। এখানেই যোগ করি, সাহিত্যবিচারে প্রশ্নটি পুরোপুরি প্রাসংগিকও নয়। যেমন প্রাসংগিক নয় নৈতিক বা সামাজিক মান। নীতিবাদী ও সমাজনেতার অধিকার নিশ্চয়ই আছে সাহিত্য সম্বন্ধে মত প্রকাশের, সে-কথা অস্বীকার করব না, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁদের রায় চূড়ান্ত বলে মানিনে।

*

"ললিতা" সাহিত্য হিসাবেই উল্লেখ-যোগ্য উপন্যাস। প্রথম পুরুষে লেখা, নায়কের জবানবন্দি যেন। আশ্চর্য নায়কের আত্মবিশ্লেষণের শক্তি, প্রায় নিষ্ঠুর। মোহ নেই কিছু সম্বন্ধে, প্রখর দৃষ্টি নিজের ও আর সকলের প্রতিটি ত্রুটির উপর। প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত। পরিবেশও নয় অবহেলিত। বিরাট দেশ আমেরিকার পথের জীবন লেখক পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন অসাধারণ কৃতিত্বের সংগে। সব চেয়ে বড়ো সাফল্য, হাম্বার্ট হাম্বার্টকে পুরোপুরি পাষণ্ড হিসাবে চিত্রিত করা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তার জন্য কিঞ্চিৎ অনুকম্পা পাঠকের মনে উদ্রিক্ত হয়।

উপন্যাসটি বাস্তবধর্মী, কিন্তু ললিতা শুধু বারো বছরের একটি মেয়ে নয়। সে একটি আইডিয়া ও সে আইডিয়ার সমাধি। ললিতার শুচিতাপহরণের জন্য উপন্যাসে একটি ব্যক্তিকে নায়ক হত্যা করেছে। ললিতার আসল ধর্ষক বর্তমান সভ্যতা এবং সে-সভ্যতাকে মার্কিন বলে উড়িয়ে দিলে আত্মবঞ্চনা হবে।

কৈশোর যৌবন-স্মৃতি

এক

কয়েকমাস আগে যখন স্মৃতিচারণ করতে প্রথম কলম ধরি, তখন মনের মধ্যে একটা পঞ্জিকা মতন তৈরি করি। মনে হল আমার জীবনস্মৃতিকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা মন্দ নয় ঃ প্রথম ভাগ—বাল্যস্মৃতি, দ্বিতীয় ভাগ কৈশোর ও যৌবন, তৃতীয় ভাগ—প্রৌঢ়, চতুর্থ ভাগ—বৃদ্ধ না ব'লে বয়স্কই বলি—অরিকুলের আপত্তি সত্ত্বেও।

তাহ'লে দাঁড়াল আমার বাল্য-পর্ব দশ বৎসর থেকে ষোল বৎসর—পিতৃদেবের দেহান্ত পর্যন্ত (১৯০৭ থেকে ১৯১৩)। তারপর কৈশোর পর্ব আসুক—কলেজে ভর্তি হওয়া থেকে বিলাতযাত্রা ও বিলাত থেকে ফিরে এসে সংগীত চর্চার কাহিনী, অর্থাৎ ষোলো থেকে একত্রিশ ঃ যখন আমি পণ্ডিচেরিতে আমার গুরুদেবের চরণে আশ্রয় নিই যোগজীবনে দীক্ষা নিয়ে (১৯১৬ থেকে ১৯২৮)। তারপরে প্রৌঢ় পর্ব হবে একত্রিশ থেকে পঞ্চান্ন বৎসর—আমার আশ্রমজীবন ঃ (১৯২৮ থেকে ১৯৫২)। তারপরের বয়স্ক পূর্ব—আমেরিকা গমন ও ফিরে পুণায় হরিকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৫৪ থেকে এখন পর্যন্ত—১৯৫৮ সালের শেষ।

আপাতত কৈশোর পর্ব শুরু করা যাক্। তবে থেকে থেকে এ-পর্বে স্মৃতি-চারণ কৈশোরে শুরু হ'য়ে যৌবনে সারা হবে ব'লে রাখছি। এ-পর্বের উপনাম হোক কৈশোর যৌবন স্মৃতি—যেমন এর আগের পর্বের নামকরা হয়েছে "বাল্যস্মৃতি"।

কৈশোর শব্দটি বাংলায় বড় বেশি ব্যবহার হয় না, যদিও পৌগণ্ড শব্দটির চেয়ে এর প্রতিষ্ঠা বেশি। সচরাচর আমরা তরুণ শব্দটিই ব্যবহার ক'রে থাকি কৈশোরের স্থলে। কিন্তু তরুণ বলতে যৌবনও বোঝায়। কৈশোর হ'ল আসলে ইংরাজী "অ্যাডলেসেন্স" শব্দটির অনুবাদ। কৈশোরের সঙ্গে যৌবনের একটি মূলগত প্রভেদ আছে ঃ কৈশোরে বালক বালিকা সচরাচর খানিকটা লাজুক তথা স্পর্শকাতর হ'য়ে থাকে। তাই এ-অধ্যায়ে তরুণ মন থাকে খানিকটা ডাঁশা-র কোঠায়—পাকার ঠিক আগেই।

সংসারে কেউ বেশি বয়সে পাকে, কেউ কম বয়সে। আমি বাল্য-পর্বে একটু তাড়া-তাড়িই পেকে উঠেছিলাম তর্কাতর্কিতে, মুরুব্বিয়ানায়, অজস্র সারগর্ভ তথা বাজে বই পড়ায়—যেকথা আমি আমার "বাল্য-স্মৃতি"-তে বলেছি। কিন্তু কৈশোরের বয়ঃসন্ধিকালে আমি পাকা হ'লেও যে সেয়ানা ছেলে ছিলাম না একথা প্রথম বুঝি যৌবনে—বিলেত পৌঁছে নানা চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার পরে—তার আগে নয়। কেন একথা বলছি তা শনৈঃ শনৈঃ প্রাঞ্জল হ'য়ে উঠবে আশা করি।

পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলালকে নিষ্ঠুর কাল আমাদের কাছ থেকে হরণ করে নিয়ে যায় অকালেই বলব—পঞ্চান্ন না পেরুতেই। তখন আমার বয়স ষোলো বৎসর চার মাস। পিতৃদেবের বড় ইচ্ছা ছিল ম্যাট্রিকে আমি প্রথম দশজনের মধ্যে হই—কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়ে। কিন্তু এ-কীর্তি অর্জন করতে হ'লে পরীক্ষার্থীকে যে-ভাবে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে ডুব দিতে হয়, আমার পক্ষে সে-ভাবে সব মন ও ইন্দ্রিয়কে প্রত্যাহার করে ডুবুরি হওয়া সম্ভব ছিল না। আমার যে ছিল হাজারো বায়নাই, রকমারি ঔৎসুক্য—ফুটবল, টেনিস, পুরাণ, মহাভারত, গোয়েন্দা কাহিনী, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, বৈষ্ণব পদাবলী, পিতৃদেবের কবিতা নাটক তর্কাতর্কি, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, মঠ দক্ষিণেশ্বর সাধুসন্ত—সর্বোপরিঃ গান-পাগলামি। মনে আছে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার দিন পনের আগে বড়বাজার হঠাৎ এক মাড়োয়ারি বন্ধুর বাড়িতে আসেন—বিখ্যাত জানকী বাই—যাঁর কাছে আমি পরে এলাহাবাদে গান শিখি। পিতৃদেবকে ধরলাম, "এলাহাবাদের ছপ্পন ছুরির গান

না শুনলে প্রাণ গেলেও মন থাকবে না।" পিতৃদেব হেসে বললেন, "কিন্তু...সামনে পরীক্ষা—কম্‌পীটি—,"

"সে হবে-বাবা। না শিখলে মনঃকষ্টে যা জানি তাও লিখতে পারব না। কম্‌পীট না ক'রে হয়ত চম্পটই দিতে হবে।"

অগত্যা তিনি যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। গ্রামোফোন থেকে আমি জানকী বাইয়ের কয়েকটি ঠুংরি ও ভজন শিখেছিলাম : বাঁসরিয়া বাজায়ে যায় এ রী, কনহৈয়া, পানি ভরে রী কোন অলবেলীকী নার, শ্রীরামচন্দ্র কৃপাল...ইত্যাদি। বড়বাজারে বন্ধুভবনে জানকী বাইয়ের কালো কুৎসিত চেহারা দেখে ঘা খেলেও যেই তিনি গান ধরে দিলেন, আবেগে আমি যেন বিহ্বল হ'য়ে গেলাম, মনে রইল না তাঁর বাইয়ের মুখে অজস্র কাটা দাগ। শোনা যায় তাঁর অপরূপ কণ্ঠ শুনে ঈর্ষান্বিত কয়েকজন শত্রু গুণ্ডা লাগিয়ে তাঁকে খুন মারে। ছাপান্ন ছুরির দাগ বসে তাঁর সর্বাঙ্গে, মুখেও চার পাঁচটা। তাই তাঁর নাম হয় ছপ্পন ছুরি। এ-ঘটনা সত্য না আষাঢ়ে গল্প জানি না, তবে তাঁর মুখে কয়েকটি কাটা দাগ তাঁর কালো কুশ্রী মুখকে আরো কুরূপ করে ফেলেছিল নিশ্চয়। কিন্তু ঐ যে বললাম, কান যখন পেয়ে বসে তখন চোখকে বলতেই হয়—"হার মেনেছি।" জানকী বাই একটি গান শেষ করতে না করতে আমার কাছে তিনি হয়ে দাঁড়ালেন সাক্ষাৎ কিন্নরী। বাড়ির কর্তা (মাড়োয়ারী) আমাকে পেশ ক'রে দিলেন: "বাই সাহেব, য়হ লড়কা বহুৎ আচ্ছা গাতা।"

গায় অনেকেই, কিন্তু বাঙালী ভদ্রঘরের ছেলে গাইতে পারে এহেন গুজব শুনে বাই সাহেবা মুচকে হাসলেন, বললেন, "ঐ সা?" আমার পৃষ্ঠপোষক দমবার পাত্র নন, বললেন, "ডর ক্যা? ঔর খাস করকে আপকা গানা গাতা।" বাইসাহেবার ঔদাসীন্য-মিশেল অবজ্ঞা একটু ফিকে হয়ে এল, আমার দিকে চেয়ে বললেন : "কৌন্‌সা গানা?" আমি বললাম। বাই সাহেব অতঃপর গাইতে বললেন। আমি কোন্ গানটা গেয়েছিলাম মনে নেই, তবে মানের দায়ে প্রাণের মায়া ছেড়ে গেয়েছিলাম মনে আছে—অবশ্য সারঙ্গির সঙ্গতে নয়, হার্মোনিয়ম বাজিয়ে।

গান শুনে বাই সাহেবার ভুরু তেরছা হয়ে উঠল। প্রসন্ন হেসে বললেন, "বহুৎ আচ্ছা বেটা—তুম্ লায়েক লড়কা হো।" তারপরেই : "কভি এলাহাবাদ আওগে?" আমি আহ্লাদে আটাত্তর খানা। সাক্ষাৎ জানকী বাইয়ের নেকনজরে প'ড়ে গেছি, আটাত্তর খানা কি—তার দশগুণ সাতশো আশি খানা হ'য়ে নির্বাণ লাভ করবার অবস্থা। বললাম যেতে পারি যদি তিনি গান শেখান। জানকী বাই এবার স্নেহে গ'লে গেলেন, মাথা নেড়ে পিঠে দিলাসা দিয়ে বললেন, "মগর আনা, ভুলনা নহি। আচ্ছা?"

এ-ঘটনাটি আমার গীতিজীবনের একটি কীর্তিস্তম্ভ বলবই বলব, লোকে হাসলেও গ্রাহ্য না ক'রে। কারণ লোকে কী জানে—জানকী বাইকে আমি গ্রামোফোন শুনেই আমার বালক হৃদয়ের কোন্ ময়ূরসিংহাসনে বসিয়েছিলাম পনের ষোলো বৎসর বয়সে?

তারপর জানকী বাই বললেন : "ক্যা গাউঙ্গি?" আমি উৎফুল্ল হ'য়ে বললাম: "ঝমাঝম্।" জানকী বাই ধ'রে দিলেন—গারা রাগিনীতে :

পানি ভরে রী কোন অলবেলী কী আর
ঝমাঝম...

ঘরে ফিরে কেবলই তান সোমে ফিরে আসে—"ঝমাঝম"। আর মনে হয় যেন সৌন্দর্যের বারিপ্রপাত হচ্ছে তরল সোনায়। রাতে ঘুমিয়ে স্বপ্নেও শুনি—"ঝমাঝম্"!

ম্যাট্রিকে পরীক্ষা দিতে গিয়েও কেবলই মনের তারে বেজে ওঠে ঝমাঝম...ঝমাঝম। ফলে কম্‌পীট করা হ'ল না, সাতশোর মধ্যে পাঁচশো চুয়ান্ন পেয়ে দশ টাকা বৃত্তি পেলাম। আমার উপরে ছিল জনকুড়িক ছাত্র। আমার সতীর্থ ক্ষিতীশপ্রসাদ (চট্টোপাধ্যায়) পেল ছশো আঠার, হ'ল সপ্তম। সুভাষ তার চেয়েও বেশি নম্বর পেয়ে হ'ল দ্বিতীয়। শ্রীপ্রমথনাথ সরকার হ'লেন প্রথম—কত নম্বর পেয়ে বলতে পারি না। গান পড়া-শুনোর ক্ষতি করে না একথা আদর্শবাদীর মুখে রটতে পারে, কিন্তু বাস্তববাদীর অভিজ্ঞতা তাতে সায় দেয় না।

পরীক্ষায় ফল আশানুরূপ না হ'লেও দুঃখ হ'ল ভাবতে যে পিতৃদেব আমার বৃত্তি পাওয়া দেখে গেলেন না। তবে হয়ত তিনি দুঃখ পেতেন আরো বেশি যে, আমি কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়ে কম্পীট করলাম না—যা তিনি চেয়েছিলেন। হয়ত বলতেন : "বললাম পরীক্ষার ঠিক আগে এখানে ওখানে গানের জলসায় না যেতে—"

যাহোক বৃত্তি পাওয়ার দরুণ সুবিধা হল—প্রেসিডেন্সি কলেজে স্থান পেলাম। না পেলে আমার কৈশোর জীবনের সবচেয়ে বড় লাভ—সুভাষের সঙ্গে আলাপ হ'ত না হয়ত। কিন্তু তার কথা বলবার আগে আমার কৈশোর জীবনের পরিবেশের কথা সংক্ষেপে কিছু বলা চাই।

১৯১৩ সালে যখন সন্ন্যাস রোগে পিতৃদেবের মৃত্যু হয়, তখন আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। মনে আছে—পিতৃদেবের মাঝে মাঝে বিষম লাগত ও কাশতে কাশতে মুখ লাল হ'য়ে উঠত। সে সময়ে আমার সে যে কী উদ্বেগ হ'ত ভাষায় বোঝাতে পারব না। মনে হ'ত যদি হঠাৎ তিনি মারা যান?—অমনি নিশ্বাস যেন আমার বন্ধ হয়ে আসত।

তাঁকে ভালোবেসেছিলাম আমার পবিত্র পিতৃভক্ত বালক হৃদয়ের সংহত ঐকান্তিকতা দিয়ে। মনে আছে পিতৃহারা হবার পরে মনে হত বুকের মধ্যে কোথায় যেন খালি হয়ে গেছে। গান হাসি গল্প কিছুই ভালো লাগত না। কিন্তু কারুর সামনে কখনো কাঁদি নি, এক পিতৃদেবের দেহান্তের দিন ছাড়া। একদিন গিরিশ মেসোমহাশয় এসে বললেন, "মণ্টু বাবা! অমন কোরো না। মাঝে মাঝে খুব কেঁদে নিও, নইলে ভেঙে পড়বে। বেশি চেপে রাখা ভাল না।" বলতেই নিরুদ্ধ অশ্রু উথলে উঠল, তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে সে কী কান্না! তিনিও চোখের জল মোছেন আমাকে বুকে চেপে ধ'রে।...

আমার মাতামহ বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এসময়ে তাঁর কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়িটি বড়মামাকে ছেড়ে দিয়ে মেজমামা খগেন্দ্রনাথ ও ছোটমামা নরেন্দ্রনাথ ও অবিবাহিত ছয় মাসিকে নিয়ে থিয়েটার রোডের বাড়িতে আসেন। থিয়েটার রোডের বাড়ি ছিল প্রাসাদ-বিশেষ। সে সময়ে থিয়েটার রোডে আর একটিও বাঙালীর বাস ছিল না। কাছাকাছি ক্যামাক স্ট্রীটে ছিলেন বটে কয়েকটি বাঙালী ওমরাও—অফিশিয়াল, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমাদের আলাপ ছিল না। তাই যখন দাদামহাশয় আমাকে ও মায়াকে থিয়েটার রোডে নিয়ে এলেন, তখন আমার প্রথম প্রথম এ-নির্জন পাড়াটি অত্যন্ত খারাপ লাগত। তবে আমরা প্রায়ই সকালে এসে জুটতাম ২০৩।১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে আমার বড় মামিমার কাছে। তিনি ১৯০৩ সালে আমার মার মৃত্যুর পর থেকে আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করতেন। থিয়েটার রোডে আমার ব্যারিস্টার মেজ মামাও আমাকে গভীর স্নেহ করতেন বটে, কিন্তু তিনি ঈষৎ চাপা প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলে প্রথম দিকে তাঁর স্নেহের গভীরতা আমি

বুঝতে পারি নি। মেজমামার নাম বলেছি—খগেন্দ্রনাথ মজুমদার। তিনি যাঁকে বিবাহ করেন তাঁকে আমরা ডাকতাম মন্দামামিমা ব'লে—এখানে তাঁকে মেজমামিমাই বলব। সে সময়ে তাঁর বয়স ষোলো—ছিপছিপে গড়ন, মুখশ্রী লাবেণ্য ভরা, হৃদয়টি স্নেহ দিয়ে গড়া। বড় মামিমার মতন মেজ মামিমাও আমাকে স্নেহ করতেন সর্বান্তঃকরণে। তাঁর মুখে কখনো একটি কড়া কথা শুনি নি আজ পর্যন্ত। তার উপর মেজমামিমা ছিলেন আমার প্রায় খেলার সাথী বললেই হয়—দৌড়ঝাঁপ করতাম তাঁর সঙ্গে থিয়েটার রোডের মস্ত ছাদে। কিন্তু বাঙালী মেয়ে তো—ষোলোতেই গিন্নি—আমাকে ডাকতেন "মণ্টুবাবা" বলে—যেন তিনি সত্যিই আমার নাড়ী কেটেছিলেন। বাংলার জলহাওয়ায় অল্পবয়সী মেয়ের মধ্যেও যে মাতৃস্নেহ এত সহজে বিকশিত হ'য়ে উঠতে পারে এ আমি প্রথম উপলব্ধি করি মেজমামিমাকে দেখে।

মেজমামা তাঁকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। চল্লিশ বৎসরের বিবাহিত জীবনে তিনি মামিমাকে ছেড়ে পাঁচ সাতদিনের বেশি থাকেন নি বললেও অত্যুক্তি হবে না। বড় মামা বড়মামিমা ও আমার মাসিরা তাঁকে ঠাট্টা করতেন স্ত্রীর নেওটা বলে। কিন্তু মেজমামা গ্রাহ্যও করতেন না, হেসে বলতেন মেজমামিমাকে : "সাত পাকে যাকে জড়িয়েছ সাতান্ন উল্টো পাকেও তার হাত থেকে ছাড়ান পাবে না।"

মেজমামা সত্যি খুব রসিক ছিলেন। নইলে তাঁকে আমি অত ভালোবাসতে পারতাম কি না সন্দেহ। একটি দৃষ্টান্ত দেই তাঁর রসিকতার। একদিন নির্মলদা এসেছেন আমাদের এখানে থিয়েটার রোডে। মেজমামা বললেন, "কী নির্মল, বিয়ে করছ কবে?"

নির্মলদা, "আর মামা বিয়ে! থিয়েটারের কাণ্ড তো জানেন না : কেঁপেই অস্থির ভয়ে—কে কী বলে।"

মেজমামা, "তবে আর কি, বিষে বিষক্ষয়। বিয়ে করো—কাঁপুনিতেই কাঁপুনি ছাড়বে।"

নির্মলদা, "সে কি, মামা?"

মেজমামা (হেসে), "শোনো তবে। জানো তো দশ বৎসর আগে তোমার এই মামিমাটিকে ঘরণী করি? আচ্ছা। এখন হ'ল কি জানো? বাসর ঘরে ছিল একটি মাত্র লেপ। সে কী দারুণ শীত রে বাবা! রাতে দুজনে মিলে এক লেপে অঙ্গ মুড়ে শুলাম বটে, কিন্তু মাঝ রাতে উঠে দেখি তোমার মামিমা খাটের এক কোণায় গুটিয়ে গেছেন লেপটিকে দুবার জড়িয়ে। না যায় তাঁর ঘুম ভাঙানো, না লেপ ছাড়ানো। তারপর বাকি রাতটা সে কী কাঁপুনি বলব কী? আজও সে কাঁপুনি থামে নি—তবে শীতে নয়, ও'র ভয়ে।" কিন্তু মেজমামার কথা পরে আরো বলতে হবে, তাই এখানে থিয়েটার রোডের পরিবেশের কথাটা আর একটু গুছিয়ে ব'লে নিই।

আমার মা ছিলেন বাড়ির বড় মেয়ে। তাঁর পরে আসেন আমার নয় মাসি ও তিন মামা। দিদিমা বলতেনঃ "জানিস সুরেন (আমার মা), বলব বড় গলা করেঃ আমরা তের ভাই-

বিজ্ঞপ্তি

গতবারের ন্যায় এই বৎসরও আগামী ২৫শে বৈশাখের 'দেশ' পত্রিকা (৯ মে ১৯৫৯) বিশেষ সাহিত্য-সংখ্যা-রূপে প্রকাশিত হইবে। প্রায় দুইশত পৃষ্ঠার এই সংখ্যায় সাহিত্য ও সাহিত্যসম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে খ্যাতনামা কথাশিল্পী ও সমালোচকগণের আলোচনা প্রকাশিত হইবে।

গত এক বৎসরে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য-গ্রন্থের একটি সুনির্বাচিত তালিকা উক্ত সংখ্যায় অনুমোদন করা হইবে। তজ্জন্য পুস্তক প্রকাশকদের নিকট অনুরোধ যে, ১লা বৈশাখ ১৩৬৫-র পর যে সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একটি তালিকা অবিলম্বে আমাদের নিকট পাঠাইয়া সংখ্যাটিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিতে অনুগ্রহ করিয়া সহায়তা করিবেন। তালিকায় গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম, মূল্য, রচনার বিভাগ (যথা কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ) এবং গ্রন্থের প্রকাশ তারিখ ইত্যাদির উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

সাহিত্য-সংখ্যার বিজ্ঞাপনের হার বর্ধিত হইবে না। সাধারণ সংখ্যার ন্যায় এই বিশেষ সংখ্যারও হার প্রকাশকদের ক্ষেত্রে প্রতি কলমইঞ্চির জন্য কণ্ট্রাক্ট ৬·০০ টাকা ও অন্যথায় ৮·০০ টাকা ধার্য হইয়াছে। বিজ্ঞাপনের কপি, ব্লক ইত্যাদি আগামী ৩রা বৈশাখ ১৩৬৬ (ইংরাজী ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫৯) তারিখের মধ্যে দেশ পত্রিকা বিজ্ঞাপন-বিভাগে পৌঁছাইয়া দিলেই চলিবে।

সম্পাদক 'দেশ'

বোন। সবাই বেঁচে ছিল রে—আঁতুর ঘরে কেউ মরে নি। তবু মুখপোড়ারা বলে বেশি ছেলেমেয়ে ভালো নয়। কেন গা! ছেলেমেয়ে তো ভগবানের দান। এই এত বড় বাড়ি—খাঁ খাঁ করত নাকি যদি পেটে দুচারটে গুঁড়ো গাঁড়া না ধরতাম?"

এই রকম ছিল তাঁর বেপরোয়া সেকেলে কথার ভঙ্গি। যথা, আর একটা উদাহরণ : "মোটা?" বলতেন তিনি, "তাই হয়েছে কী? আমাদের এমনিই গড়ন—ছিনে-পড়া গড়ন নিয়ে যারা জন্মায় সে মুখপোড়ারা চিঁ চিঁ করে মরুকঃ আমরা

রোগা হ'তে যাব কী দুঃখে [illegible]?" দিদিমা ছিলেন বহরে দশাসই। শ্রীকে বলে, গজেন্দ্রগামিনী এ[illegible] অক্ষরে অক্ষরে।

কখনো খুব হাসতেন [illegible] ধনদৌলতকে ঈর্ষা করত ব[illegible] বলতেন :
"আমাদের জাতের এ স্বভাব গো, আর স্বভাব যায় না মলে—বলে না! কোথায় পড়েছিলাম, জানিস মণ্টু, এক গিন্নি জ্বলে পুড়ে মরত পাড়াপড়শীর শ্রীবৃদ্ধি দেখে, বলত রাত্তিদিন সুর করে।

ওলো দাসী সর্বনাশী!
ছাতে এসে দেখ আসি'
যত পাড়া প্রতিবাসী হাসি হাসি মুখ লো!
দেখ্—শাদা ভাতে ওলো কী সুগন্ধ,
আরে মোলো
খাঁটি দুধ, নয় জোলো—
জ্বলে যায় বুক লো!

আমাকে নানা জায়গায় গাইতে যেতে হত। দিদিমার সদাসর্বদাই ভয়, পাছে গাইতে গাইতে আমার গলা ভেঙে যায়, কি অসুখ করে। বলতেন, "দেখ্, ওরা তোর সামনে হার্মোনিয়ম দিয়ে যদি বলে—'চেঁচা', তুই বলবি—'না বাপু, চেঁচালে আমার গলা ভেঙে যায়।' যদি বলে, 'পচা মাছ খা', তুই বলবি : 'না, পচা মাছ খায় বাগদিরা—খেলে অসুখ করে ভদ্দরঘরের ছেলের।'
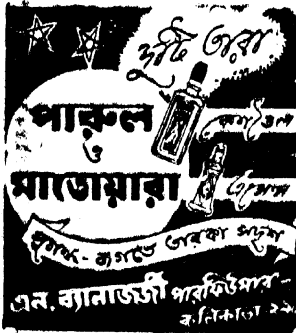
দিদিমা যে এই ভাবে নিত্য নতুন কত রকম সম্ভব অসম্ভব বিপদ আপদের কথা আগে থেকে ভেবে তাদের কাটান বাতলে দিতেন, শুনে আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম—যদিও বলাই বাহুল্য যে, তিনি কিছু কৌতুকরসের উদ্রেক করতে বলতেন না এসব। হয়েছিল কি, তাঁর কল্পনা ছিল শুভবুদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি জোরালো। যথা : হঠাৎ লোহার সিন্দুকের চাবি পাওয়া যাচ্ছে না, চেঁচিয়ে উঠলেন : "ঐ হয়েছে—শিবু (চাকর) রেখেছে লুকিয়ে ময়দার মধ্যে। চাবির ছাপ রেখে ফেরত দেবে তারপর সেই মাপের চাবি গড়িয়ে আমি কোথাও গেলে লোহার সিন্দুক খুলে......" ইত্যাদি। মেজমামিমা হেসে বলতেন: "মা, চাকরদের মাথায় এত বুদ্ধি খেলত না যদি না আপনি ঢুকিয়ে দিতেন।" কখনো বা দিদিমা মেজমামিমাকে বলতেন : "বৌমা, দুধ জ্বাল দেবার সময়ে ঘর ছেড়ে যেও না একবারও—যদি যেতে হয় কাত্তিকে বসিয়ে তবে যাবে, নইলে চাকর বামুনে হাতায় করে সরিয়ে রাখবেই রাখবে......" ইত্যাদি। পরে একদিন মেজমামিমা আমাকে বলেন, "মণ্টু-বাবা! জানিস—মা মিথ্যে বলেননি, ওরা সত্যিই দুধ সরায়—হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে আজ......" সেদিন আমার মাসিদের মধ্যে সে কী উত্তেজনা—যেন জাপানে হাতী পড়েছে!

উত্তেজনা না হবে কেন? পাঁচ পাঁচটি জলজ্যান্ত মাসি! একটি বিবাহিতা, স্বামী নিয়ে থাকেন থিয়েটার রোডের এক ঘরে। তাঁর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। আরো অজস্র ছেলেমেয়ে আসত বড় মামার ও অন্য নানা আত্মীয়ের। বাড়ি সরগরম। এহেন পরিবেশে কাকচিলে একটা কচুরি ছোঁ মেরে উধাও হলেও সবাই অট্টরবে পালা গান ধরে হায়রাণিণীর—বামুন চাকর চোরা-গোপ্তা দুধ খেয়ে যায় এ তো চিত্তোন্মাদী—সেনসেশনাল!

থিয়েটার রোডে একটি মস্ত হল ঘর ছিল। এখানে পরে—যৌবন অধ্যায়ে—আমি বিলেত থেকে ফিরে গানের আসর জমাতাম। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন আই এস সি পড়া শুরু করি তখন কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে গিয়ে হিন্দি গান শিখতাম বকুবাবুর কাছে। এই প্রথম জলজ্যান্ত ওস্তাদের কাছে হিন্দি গান শিখে আমার সে কী ফুর্তি!—"আজি রে মোহন বংশী বাজি রে আরে—সা নি ধা পা মা গা রে পা রে রে মা। বকুবাবু ছিলেন বিখ্যাত অ্যাকাউন্টান্ট জেনেরাল এম এ, পি আর এস উপেন্দ্রলাল মজুমদারের ভাইপো। অল্প বয়সে ব'কে যান। রাতে ঘরের রেলিং ফাঁক ক'রে থিয়েটারে ছুটতেন। মদ গাঁজা সবতাতেই ছিলেন সমান পটু। উপেনদা—যিনি কোনো পরীক্ষায় জীবনে সেকেণ্ড হননি—বিবাহ করেছিলেন আমার বড় জেঠামহাশয়ের মেয়ে ঊষাদিকে। ঊষাদির কাছে শুনতাম কীভাবে বকুবাবু ব'কে গেলেন। ঊষাদি গল্প করতে একবার শুরু করলে আর থামতেন না। বিশেষ আমাকে পেলে। আমাকে তিনি কী যে ভালোবাসতেন! কেবল তাঁর ভয় ছিল পাছে বকুবাবুর মতন গান গান ক'রে আমারও ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়। আমি সন্ন্যাসী হ'য়ে পণ্ডিচেরি চ'লে গেলে তিনি কেঁদে সারা। উপেনদা তখন তাঁকে না কি ধমকে ছিলেন : "সংসারী ঢের আছে ও হবে গো তোমাদের বংশে। একটি মাত্র ছেলে হয়েছে সাধু, আনন্দ করো—'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা' গেয়ে।"

আমার দাদামহাশয় ছিলেন একটু সেকেলে লোক। তিনি নিজেকে নিশ্চয়ই সেকেলে ভাবতেন না। আমরাও তো আজ ষাটের কোঠা পেরিয়ে পেয়েছি তাঁর পদবী। তবে আজকাল যখন তরুণেরা জনান্তিকে বলাবলি করে—"আহা বেচারি! ওল্ড ফ্যাশণ্ড!" তখন কেবল পোপের শ্লোকটি মনে করে সান্ত্বনা পাই :

We think our fathers fools,
so wise we grow!
Our wiser children will, too,
think us so.

দাদামহাশয়কে কেন সেকেলে বলছি? প্রধান কারণ—তিনি চাইতেন আমার বিবাহ দিতে বিলাত যাবার আগেই। দ্বিতীয়—বেশি গান বাজনা করা নিরাপদ নয় ও কেন নয় নানা যুক্তি দিয়ে আমাকে বোঝাতেন। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন থিয়েটার রোডে কোনো গানের আসর বসাই নি। এমন কি আমার গানও সামনে ব'সে তিনি কোনোদিন শোনেন নি। শুনবার সময়ই বা তাঁর ছিল কই? ভোর পাঁচটায় তিনি উঠে হাত মুখ ধুয়ে, প্রার্থনা করে প্রাতরাশ সেরে রাউণ্ডে বেরুতেন, বারটা একটার সময়ে ফিরে দিদিমার হাতে একরাশ টাকা দিতেন—চৌষট্টি টাকা ফী। বিকেলেও ফের আর এক রাউণ্ড। প্রতিদিনে তিনি কম ক'রেও ন' দশটা ফী পেতেন বই কি। তাছাড়া কর্পোরেশন স্ট্রীটের বিখ্যাত ডিস্পেন্সারিতে অজস্র ওষুধ বিক্রির টাকা। যিনি নিযুতপতি হয়েছিলেন অনেকদিনই, থিয়েটার রোডে এসে তাঁর প্রতিপত্তি আরো বেড়ে গেল—বাঙালী জেঁকে বসল সাহেবী পাড়ায়—জমবে না খাতির?

তবে সত্যিই খাতির করবার মতন মানুষ ছিলেন তিনি। আমার দিদিমা আট

বৎসর বয়েসে বিধবা হন। বার বৎসরে দাদামহাশয় তাঁকে বিবাহ করেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাক্ষাৎ সমর্থনে। ফলে তিনি জাতে-ঠেলা হ'লেও টাকার জোর বড় জোর—মাসিদের বিবাহ আটকায়নি। কিন্তু অত টাকা যাঁর তাঁকে কখনো একদিনও টাকার জাঁক করতে দেখিনি। মাটির মানুষ ছিলেন তিনি। ফি বছরে কুষ্টিয়ায় স্বগ্রামে যাবেন পুজো করতে। গ্রামের জীবনের নানা সুখ শান্তির কথা প্রায়ই বলতেন আমাদের কাছে—যে সরল জীবনযাত্রার পাঠ এ-যুগে উঠে যাবার জো হয়েছে। শহরের হাজারো উত্তেজনা আতিশয্যের ডামাডোলেও তাঁর কোনোদিন চিত্তবিক্ষেপ হয় নি—ঘড়ির মতন চলতেন এই অশ্রান্ত কর্মী, বিখ্যাত ধন্বন্তরী, অমায়িক পরোপকারী। দরিদ্রের কাছে ফী নিতেন না, কিন্তু ধনীকে রেহাই দিতেন না। ফলে ধনীরাও তাঁকে খুব খাতির করত—আরো এই জন্যে যে তিনি একবারে নিঃস্ব অবস্থা থেকে উঠেছিলেন ঐশ্বর্যের শিখরে—যাকে ইংরাজীতে বলে self-made man.

বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন দাদামহাশয়ের আদর্শ। প্রায়ই বলতেন : "জানিস আমিও ঠিক তাঁরই মতন নিরাশ্রয় ছিলাম। এই কলকাতায় হেদোর ধারে একটা বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটিয়েছি কতদিন। আমি উঠেছি শুধু ঐ মহাপ্রাণ মানুষটির আশীর্বাদে, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ ক'রে। বিধবা-বিবাহ করবার মতন বুকের পাটা কি আমার হ'ত রে যদি তিনি না থাকতেন পিছনে?"

দিদিমা শুনে সময়ে সময়ে হেসে টুকতেন : "বিধবাকে বিয়ে ক'রেই বেঁচে গেলে গো—আমার প-য়ে, বুঝলে? নইলে তোমার মতন রোগা পটকাকে পুছত কে শুনি? জানিস মণ্টু, উনি এমন রোগা ছিলেন যে যখন আমার ফের বিয়ে হয় তখন শত্রুরা বলেছিল : এ-মেয়ে আবার বিধবা হবেই হবে—এ লিকলিকে বর কি বাঁচবে গা?" ব'লেই বড় গলা ক'রে : "এ আমার কথার কথা নয় ধন! বাবা আমাকে ব'লে গিয়েছিলেন : 'তুই যে বড় সেই বড়ই থাকবি।' তাই তো বাবুর (দাদামহাশয়কে তিনি 'বাবু' বলতেন) এত বোলবোলা। নইলে ও'র কী ছিল সেদিন শুনি?—শুধু কি রোগা? তারপর দেখ খাঁদা নাক—" ব'লে দিদিমার সে কী হাসি! তারপরেই আমাকে : "তাই তো বলি মণ্টুবাবু, গিন্নি হ'ল বাড়ির লক্ষ্মী। অমুকের মেয়েটি দেখে এসেছি—(তিন মাস অন্তর একটি নতুন হবু-নাৎবৌ তাঁর পছন্দ হ'ত আর আমাকে এসে ধরতেন বৌ আনতেই হবে)—টুকটুকে বৌ রে, দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারবি নে। লক্ষ্মীটি ধন! রাজি?"

আমি (শিউরে উঠে) : বলছ কি নানি? এ-যুগে রোজগেরে না হ'লে কেউ বিয়ে করে?"

দিদিমা (মুখ ভার ক'রে), "এ যুগের কথা আর বলিসনে তুই—যেমন মেয়েরা হচ্ছে ধিঙ্গি তেমনি ছেলেগুলো হাবাতে। তাছাড়া তোর আবার রোজগারের ভাবনা কী শুনি? তুই বিলেত গেলে তোর বৌ থাকবে আমার কাছে—তাকে এক গা গহনা দেব, তোর বাবাও যে রেখে গেছেন তোর পক্ষে অঢেল। তাছাড়া আমি তোকে একটা বাড়ি দেব—লক্ষ্মীটি ধন! আর অমত করিসনে—অমুকের বাপ আজ নিজে এসেছিলেন ধরনা দিতে।" আমি বললাম : "কিন্তু সে যে বড় মানুষের মেয়ে নানি, ঘোড়ায় চড়া মেয়ে!" দিদিমা ঝংকার দিয়ে বলতেন : "আর আমরা বুঝি ভিখিরি? যা যাঃ, বড় মানুষ ঢের দেখেছি। বউ কাটা হ'য়ে থাকে যদি বর মানুষের মতন মানুষ হয়।"

দাদামহাশয় (তৎক্ষণাৎ ফোড়ন কাটতেন) : "আর যদি বউ হয় দশাসই তবে বর হ'য়ে পড়েন মিইয়ে-পড়া মুড়ি—যেমন আমি।"

দিদিমা (খুশি হয়েও অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে) "তাই বটে! তোমাকে যে না চিনেছে সে এখনো মার গর্ভে আছে, বুঝলে? ওরে মণ্টু, বাবুর কথায় কান দিস নে—উনি দেখতেই ভালো মানুষ—ভিতরে ভিতরে জানিস নে তো কী—"

দাদামশায় : "জানবে না কেন—চোখে রোজ দেখে? জানিস মণ্টু, আমি ছেলেবেলা থেকেই ও'র অন্নে মানুষ হয়ে ও'র নেওটা। হবে না? ঘর জামাই ছিলাম তো সেই থেকে—জানিস তো গল্প : "অভ্যেস"?

আমি : "অভ্যেস?"

দাদা মহাশয় : "জানিস নে বুঝি? আমাদের গ্রামের জমিদার ছিলেন জাঁক-সাইটে ধানদাদুরন্ত। বলতেন : আমার কী যে স্বভাব—রোজ দুটি ক'রে বোম্বাই আম দুপুরে, দুটি রাতে। এ না হ'লেই নয়।' আমরা কেউ কেউ যেই জিজ্ঞাসা করতাম : 'কিন্তু শীতকালে বোম্বাই আম পেতেন কোত্থেকে?'—অমনি তিনি মুচকে হেসে পিট পিট জবাব দিতেন : "ও কি জানেন? ও কেমন অভ্যেস!"

দিদিমাও উঠতেন হেসে। (ক্রমশ)

শ্রী কৌটিল্য

আমাদের দেশের সেচ পরিকল্পনা ও তার সাফল্য সম্বন্ধে নানা বিরক্তি দেখা দিয়েছে। এরকম মন্তব্য শোনা যাচ্ছে যে, এত বিরাট বিরাট রিভার ভ্যালী প্রোজেক্ট-এর ঢক্কানিনাদ শেষ পর্যন্ত গরীব চাষীদের সামনে যে কার্যকরী সাহায্য এনে ধরেছে, তা মর্মান্তিক হাস্যকর। প্রথমত নদীর জল মোট চাষের জমির সামান্য অংশমাত্রই স্পর্শ করতে পারছে; দ্বিতীয়ত সেচ করের হার দরিদ্র চাষীদের পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয়। এইসব নিয়ে তুমুল সমালোচনা হয়েছে। সুতরাং প্রজেক্ট-রাজনীতি এড়িয়ে কী করতে পারলে এদেশে সেচ ব্যবস্থার খানিকটা উন্নতি হতে পারে, সে সম্বন্ধে সরকারী বেসরকারী উভয় মহলেই খানিকটা মুক্ত চিন্তার অবিলম্বে প্রয়োজন আছে।

প্রথমে সমালোচকদের একথা বোঝা দরকার যে, আমাদের দেশের এই প্রজেক্টগুলোর সেচন ছাড়া আরো অনেক গুরু-দায়িত্ব আছে। সেসব দায়িত্ব পালন করতে পারলে এবং সেচের ব্যাপারে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করতে না পারলেও প্রজেক্টগুলোর অবস্থিতি অবাঞ্ছিত হবে না। তথাপি একথাও ঠিক যে, সেচের ব্যবস্থার গুরুত্বও কম নয়; এবং আমাদের দেশে বিশেষত দেশ বিভাগের পর চাষের ক্ষেত্রে যে বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে তাতে উপযুক্ত জলের বন্দোবস্ত সরকারকে যেমনভাবেই হোক, স্থির করতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা ভালো করে পড়লে দেখা যাবে যে, সরকার এই রিভার ভ্যালী প্রজেক্টগুলোর সেচন ক্ষমতা সম্পর্কে খুব একটা বৈপ্লবিক আশা পোষণ করেন নি। এবং নলকূপ ইত্যাদি খননের প্রয়োজনের উপর বেশ জোর দিয়েছেন। এটা দুঃখের কথা যে, একমাত্র উত্তরপ্রদেশ ছাড়া অন্য কোন রাজ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় নলকূপ খনন করা হয়নি, যদিচ বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্ধমানের সেচ ব্যবস্থা শোচনীয় থেকে গেছে। বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমানের নাম বিশেষত উল্লেখ করবার কারণ সহজেই অনুধাবনযোগ্য। কারণ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুর চাপের সঙ্গে সঙ্গে অল্প জায়গার উপর অনেক বেশি চাষ করবার দায় পড়েছে।

যাই হোক, মোট কথা, সরকারের গোড়ার থেকেই খেয়াল রাখা উচিত ছিল যে, সমস্ত ভারতবর্ষে সেচ ব্যবস্থার দ্রুত গঠনের জন্য গালভরা প্রজেক্ট নিলেই যথেষ্ট হবে না, অন্য ব্যবস্থার অনিবার্য প্রয়োজন। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে, প্রথম পঞ্চবর্ষ পরিকল্পনার সময়ে শ্রদ্ধেয় মানবেন্দ্রনাথ রায় এই মর্মে এক সাবধান-বাণী জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, যা আমাদের দেশের পক্ষে অনেক বেশি করে দরকার, তা হচ্ছে অসংখ্য আঞ্চলিক জল সংরক্ষণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা শুধু যে বড়ো বড়ো জাতীয় প্রজেক্টগুলির পরিপূরকই হতে পারে তা নয়, এ ধরনের ছোট ব্যবস্থা সর্বত্রই স্থানীয় জনসাধারণ ও চাষীদের মাধ্যমে হতে পারবে বলে দেশের পরিকল্পনায় সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের সহযোগিতার একটা নির্দিষ্ট যোগসেতু তৈরি হতে পারে। যে কোনো আঞ্চলিক উন্নয়নবিষয়ক ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার সঙ্গে জাতীয় স্তরে গৃহীত বিরাট পরিকল্পনাগুলির তুলনা করলেই উপরের মন্তব্যের যাথার্থ্য বোঝা সম্ভব হবে। প্রথমটি জনসাধারণের স্তর থেকে আসে এবং বিষয়টির সাফল্যের উপর জনসাধারণের আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতার ইচ্ছা নির্ভর করে। তাছাড়া এ ধরনের কাজে বহুদিনের জন্য দেশের সব অঞ্চলে প্রচুর শ্রম-নিয়োগ সম্ভবপর হতে পারে। ভারতবর্ষে যে এরকম প্রচেষ্টা কোথাও হয়নি তা নয়, তবে সে প্রচেষ্টা অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। চীনে এই উপায়ে শুধু সেচ ব্যবস্থা নয়, অন্য অনেক পরিকল্পনা আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছে। সরকারী মহলে আমার এই আলোচনার উত্তরে হয়তো বলা হবে যে, ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থা তদারকের অভাবে এদেশে প্রচুর নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আমার বক্তব্যে এর পাল্টা উত্তরও নিহিত আছে। আলোচ্য ছোট ছোট সেচ ব্যবস্থাগুলো প্রথম পরিকল্পনার সময় সরকারী খরচে তৈরী করে জনসাধারণকে ছেলে-ভুলানো বখ্‌শিসের মতো দেওয়া হয়েছিল, জনসাধারণ তাদের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এসব উপলব্ধি করেনি এবং এসব ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের আত্মীয়তাও গড়ে ওঠেনি। এমন কি তদারকের দায়িত্বের জন্য জনসাধারণকে অনুরোধও করা হয়নি।

সুতরাং আমাদের দেশের চাষে জলাভাব দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজন এখনই এমন কোন ব্যাপক উৎসাহের (ইনসেনটিভ) সৃষ্টি করা,' যাতে সারা দেশে আঞ্চলিক স্তরে অসংখ্য জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা তৈরীর জন্য জনসাধারণ সচেতন প্রচেষ্টা পায়। এর জন্য স্থানীয় নেতাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য; তাঁরাই পরিকল্পনা ও আর্থিক উন্নয়নের সঙ্গে এইসব আঞ্চলিক প্রচেষ্টার সম্পর্ক জনসাধারণের কাছে বোধগম্য করে দেবেন। নলকূপ ইত্যাদি বসানোর ব্যাপারে সরকারকে পূর্বাহ্নেই সারা দেশকে প্রয়োজনের তীব্রতা অনুসারে অঞ্চলে বিভক্ত করতে হবে। তারপর খেয়াল রাখতে হবে, যাতে সবচেয়ে অভাবগ্রস্ত অঞ্চল সবচেয়ে আগে সাহায্য পায়।

এই প্রসংগে একথার উল্লেখ করা চলে যে, সম্প্রতি জনৈক আই এল ও বিশেষজ্ঞের সঙ্গে,, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সূত্রে জানতে পেরেছি যে, কেরালায় জনসাধারণ আঞ্চলিক ভিত্তিতে ছোট ছোট সেচব্যবস্থা সৃষ্টির ব্যাপারে প্রশংসনীয় উদ্যম ও সাফল্য দেখিয়েছে। তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, সরকার প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণকে প্রথমেই সাহায্য করছেন না। জনসাধারণ কাজ শুরু করে প্রতিশ্রুতি দেখাতে পারলে সরকারের কাছ থেকে অর্ধেক ব্যয়সংস্থান ও অন্যান্য সাহায্য পাচ্ছে। এর পিছনে উৎসাহী নেতৃত্বের ভূমিকা বিরাট। কেরালা সরকারের দারিদ্র্য এবং প্রত্যক্ষ সাহায্য-ক্ষমতার অভাব সত্ত্বেও এতটা উন্নতি জনসাধারণের স্তরে সম্ভবপর হচ্ছে—এটা ধাঁধা নয়, তলিয়ে ভাবলে বোঝা যাবে এটাই স্বাভাবিক। ভারত সরকারের কল্যাণ-রাষ্ট্র যা কিছু করেছেন, তা সবই উপর থেকে চাপানো বখ্‌শিস্‌, সাধারণ লোকের দায়িত্বের মর্যাদা থেকে তার জন্ম নয়।

দড়বড়িয়ে ঘোড়া দাবড়ে এই অবেলায় যিনি এসে পৌঁছালেন, তাঁকে এ বাড়ির কেউ আশাই করেন নি।

ট্রামে-বাসে

আই. এস-সি পরীক্ষা হলে একদল ছাত্র টেবিল চেয়ার প্রভৃতি জিনিস-পত্র তছনছ করিয়াছে, নিজেরা পরীক্ষা হল্ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া এবং অন্যদের বাহির হইয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছে। কারণ, পরীক্ষার একটি প্রশ্নপত্র নাকি খুব

জটিল হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন—"উত্তর-পত্রটাও মোটেই সোজা হয়নি, উত্তরের মান আই এস-সি ছাড়িয়ে এম. এ. হয়েছে !!"

• • •

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী জনৈক সদস্যকে "আনাড়ি" বলায় বিধান-সভায় তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়।—"আনাড়ি আখ্যাতে সদস্য মশাইর রসবোধ থাকলে তিনি বলতে পারতেন,—আনাড়ির আর কোন গুণ না থাকলেও তার মার কিন্তু দুনিয়ার বা'র"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

বিধানসভার অন্য খবরে শুনিলাম সুন্দরবনে অনেক জোতদাররা জমি দেবোত্তর করিয়া নিতেছেন। স্পীকার এই প্রসঙ্গে নাকি বলিয়াছেন—তেত্রিশ কোটি দেবতার উপরে নয় আর কিছু বাড়ল, ক্ষতি কি?—"ক্ষতি আছে বৈ কি, সংখ্যা বাড়তে থাকলে "দেবতার গ্রাস" নিয়ে সরকারকেই শেষ পর্যন্ত হিম সিম খেতে হবে"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

আগ্রা শহরে সহসা একটি বাঘের আবির্ভাবে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে খুব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। —"বাঘটি

ট্যুরিস্টদের সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন পড়ে আগ্রার তাজ দেখতে এসেছে কিনা সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান হওয়া উচিত"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

• • •

কলিকাতায় মশার উপদ্রব বাড়িয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। —"অতঃপর কামান দাগার সংবাদ শুনবার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি"—মন্তব্য করিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

• • •

মুর্শিদাবাদ সীমান্তে চর রাজনগরে পাকিস্তানীরা যে গুলী চালাইয়াছে তার বুলেটগুলি কোন্ দেশে প্রস্তুত সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে অনুসন্ধান চালাইবার ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া সংবাদ শুনিলাম। বিশু খুড়ো বলিলেন—"কোন্ দেশে বুলেট তৈরি হয়েছে সেটাইতো আগে জানা দরকার; বুলেট মাত্রই তো আর মারাত্মক নয় !!"

* * *

একটি সংবাদ শিরোনামা—"বেলডাঙ্গা চিনির কল সম্বন্ধে মন্ত্রীদের অস্পষ্ট উত্তর।" শ্যামলাল বলিল—"কাজে কাজেই; চিনি সম্বন্ধে কথা একটু অস্পষ্টই হয়। চিনি গো চিনি বলে স্পষ্ট উত্তর কবি-ই দিয়েছিলেন !"

* * *

এক সংবাদে শুনিলাম, জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রত্যেকেই নাকি প্রত্যেক রাত্রে স্বপ্ন দেখে। শ্যামলাল বলিল—"রাতের স্বপ্ন সংবাদই নয়। জোর খবর হলো দিবা স্বপ্ন আর সেই সঙ্গে দেয়ালা।"

• • •

কলিকাতায় আমেরিকার ক্ষুদ্র-শিল্প প্রদর্শনী চলিতেছে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"বৃহৎ-শিল্প প্রদর্শনীটি লেনিন-গ্রাদের জন্য তোলা আছে কিনা তা ঠিক বোঝা গেল না" !!

• • •

সরকারবিরোধী দল কলিকাতা স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করিয়াছেন বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম। —"কিন্তু তাঁরা হয়ত জানেন না যে, কলকাতায় স্টেডিয়াম অনেকটা রাধার নাচের সামিল, ন'মণ ঘি-ও সংগ্রহ করা যায় না, রাধাও নাচেন না। তার চেয়ে বন মহোৎসবের প্রস্তাব করুন। গাছ বেঁচে থাকলে খেলা দেখা কে রোখে?"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

হিমালয়ে নাকি সম্প্রতি প্রজাপতির ভিড় হইয়াছে। —"হবারই কথা। প্রজাপতির নির্বন্ধে এখন আর কারু আস্থা নেই। মনের দুঃখে প্রজাপতিরা বনং ব্রজেৎ নীতি গ্রহণ করেছে"—বলেন বিশু-খুড়ো।

• • • •

ভিডি-আই-পি'র পরে নূতন কথা শুনিলাম—পি আই পি। কথাটার অর্থ নাকি পোস্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পেট্রিয়ট্।

শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু এতে হাসির কিছু নেই, পি-আই-পিরা গাইতে পারেন—হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন" !!

বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি

মন্মথ ভট্ট

জাঁ জেনে : অলঙ্কারিত প্রতিভা

কবিরা দৈবপ্রেরণার অধিকারী, একথা অসংকোচে স্বীকার করার পরও গ্রীক-দার্শনিক প্লেটো তাঁর কল্পিত সাধারণতন্ত্রে কবিদের আশ্রয় দিতে সাহস পাননি। তিনি হিসেব করেছিলেন যে, কবিদের অন্য যে-গুণই থাক, তাদের না-আছে বিবেকের বালাই, না-আছে যুক্তির নির্দেশ মেনে জীবনযাপনের সামর্থ্য। সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদকে তারা থোড়াই গ্রাহ্য করে। তাদের চরিত্রে সততা এবং নিষ্ঠার অভাব অত্যন্ত প্রবল। ফলে সজ্জন সমাজ থেকে কবিদের বিতাড়িত না করে উপায় নেই।

প্লেটোর এই যুক্তি কতখানি সংগত অথবা আদৌ সংগত কি না, তা নিয়ে এখানে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি এটুকু জেনেই আপাতত খুশী যে, হোমর-কালিদাস-লিপো কিম্বা সেক্সপীয়র যে-সমাজে ব্রাত্য সে-সমাজ যত কুলীনই হক তার আশ্রয়ে ডেরা বাঁধতে আমার অন্তত এতটুকুও প্রবৃত্তি নেই। তবু যে প্লেটোর প্রসংগ নিয়ে এ আলোচনা শুরু করেছি তার কারণ সম্প্রতি একজন অসামান্য প্রতিভাধর সাহিত্যিকের রচনা পড়তে গিয়ে বারবার কবিদের বিরুদ্ধে প্লেটোর অভিযোগের কথা স্মরণে এসেছে। কবিদের প্রতি প্লেটোর কটূক্তি এ'র সম্বন্ধে পুরোপুরি প্রযোজ্য। অথচ তা সত্ত্বেও (সার্ত্র-এর মতে সেই কারণেই) এ'র সাহিত্য-প্রতিভার সান্নিধ্যে এসে রসিক পাঠক বিচলিত এবং মুগ্ধ না হয়ে পারেন না।

লেখকটির নাম জাঁ জেনে। ১৯১০ সালে পারী শহরে এ'র জন্ম। পিতৃপরিচয়হীন শিশুকে তার মা জন্মের পর ফেলে রেখে কেটে পড়ে। এক চাষী তারপর সরকারী অনাথাশ্রম থেকে শিশুটিকে চেয়ে নিয়ে পালন করে। কিন্তু তুখোড় সংগীদের পাল্লায় পড়ে বালক জেনে অল্পবয়েসেই চুরিবিদ্যায় পাঠ নেয়। দশ বছর বয়েসের সময়ে হাতেনাতে ধরা পড়ায় তাকে এক সংশোধনাগারে চালান দেওয়া হয়। এখানে আরো অনেক বিদ্যায় পোক্ত হয়ে জেনে পাকা পাপী হিসেবে জীবন শুরু করেন। বার-কয়েক ধরা পড়ার পর তিনি গিয়ে জোটেন ফ্রান্সের কুখ্যাত ফরেন লেজিয়নে; কিন্তু বিশেষ সুবিধে না ঠেকায় সেখান থেকে ভেগে পড়ে তিনি ইয়োরোপের এক দেশ থেকে আরেক দেশে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। চুরি, ভিক্ষাবৃত্তি, বেশ্যার দালালী, চোরাই মালের কারবার ইত্যাদি বিচিত্র বেআইনি পেশায় তিনি হাত পাকিয়েছেন এবং ফলে ইয়োরোপের হেন দেশ তাঁর জানা নেই যেখানকার জেলে তাঁকে কিছুদিন ধরে বিশ্রাম নিতে হয়নি।

গত মহাযুদ্ধের সময়ে এমনি এক জেলের ঘানি টানতে টানতে জাঁ জেনের হঠাৎ সাহিত্য-চর্চার শখ হয়। ১৯৪২ সালে জেলের মধ্যে বসে তিনি তাঁর প্রথম বই লেখেন : "নোতর্‌দাম্‌ দে ফ্লার্‌।" তারপর ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৮-এর মধ্যে জেনে অনেকগুলো বই লিখে ফেলেন। তিনটি উপন্যাস : "গোলাপের অলৌকিক কাহিনী"; "সমাধি অনুষ্ঠান"; "কোয়েরেল"। একখানি কাব্যগ্রন্থ। দুটি নাটক : "পরিচারিকা"; "কড়া পাহারা"। এবং সব-শেষে তাঁর সবচাইতে বিখ্যাত রচনা : "চোরের রোজনামচা"। কয়েকজন গুণগ্রাহী ব্যক্তি তাঁর এসব বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়ে মুগ্ধ হয়ে অল্প কিছু গ্রাহকের জন্যে বিশেষ সংস্করণ হিসেবে সেগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। ফলে ফরাসী সাহিত্য-রসিক সমাজে হু হু করে তাঁর নাম ছড়িয়ে যায়। অনেক বিদগ্ধ সমালোচকের মতে গত বিশ বছরের মধ্যে ফরাসী গদ্যসাহিত্যে জেনে-র সঙ্গে তুলনীয় প্রতিভা নাকি আর একটিও দেখা দেয়নি।

কিন্তু গল্প-নাটক লিখতে গিয়েও জেনে

তাঁর মূল পেশা ছাড়েননি। ১৯৪৮ সালে তিনি আবার ধরা পড়েন; ফ্রান্সে এই নিয়ে তাঁর বারবার দশমবার ধরা পড়া। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। তখন ফ্রান্সের অনেক নামজাদা সাহিত্যিক রাষ্ট্রপতির কাছে তাঁর মুক্তিভিক্ষা করে এক যুক্ত-আবেদন পেশ করেন। এই আবেদনকারীদের মধ্যে ছিলেন ক্লোদেল, জিদ্, কক্তো এবং জাঁ-পল সার্ত্র্। আবেদনের ফলে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির নির্দেশে জেনে-কে মুক্তি দেওয়া হয়।

কিন্তু ছাড়া পাওয়ার পর থেকে জেনে তাঁর সাহিত্যচর্চাও ছেড়ে দিয়েছেন। তবে ইতিমধ্যে বিখ্যাত ফরাসী প্রকাশক প্রতিষ্ঠান গালিমার থেকে তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলীর একটি সাধারণ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া ১৯৫২ সালে জাঁ-পল সার্ত্র্ জেনের জীবন এবং সাহিত্য-কর্ম বিষয়ে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেন; ফলে ফরাসী সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন সম্পর্কে এখন আর কোন সংশয়ের অবকাশ নেই। * গত কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর অধিকাংশ রচনার ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে।

* Jean Genet, Notre-Dame des Fleurs; Miracle de la Rose; Pompes Funebres; Querelle de Brest; Les Bonnes; Haute Surveillance; Journal du Voleur.
Jean-Paul Sartre, Saint Gent, Comedien et Martyr.

এই-ত' গেল জীবনকথা। সন্দেহ নেই কোনো সজ্জন ব্যক্তিই এমন মানুষের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবেন না। প্লেটো যদি ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট হতেন তাহলে জেনে-র কি দশা হত অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু মানুষটি দুর্জন বলে কি তাঁর লেখাও অপাঠ্য? একমাত্র মোরিয়াক্ ছাড়া আর কোনো সমকালীন ফরসী সাহিত্যরথী তা' মনে করেন না। শুধু যে তাঁর গদ্যরীতি ব্যঞ্জনা-সম্পদে আশ্চর্য রকমের সমৃদ্ধ, তা নয়; তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে যে জীবনবোধ সক্রিয়, তা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ঠেকুক-বা-না-ঠেকুক, তার সততা, গভীরতা এবং সৃজনসামর্থ্য অনস্বীকার্য। ফলে অন্তত আমার মত যে-সব পাঠক কোনো সাহিত্যিকের দার্শনিক, নৈতিক অথবা রাজনৈতিক প্রত্যয়ে সায় না দিয়েও তাঁর অনুভূতি, কল্পনা এবং বাকশৈলী সম্ভোগে আগ্রহশীল, তাদের পক্ষে জেনে-র প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ না করা অসম্ভব।

বিদেশী পাঠকের পক্ষে জেনে-র গদ্যরীতির গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করার বিশেষ সার্থকতা নেই; কিন্তু তাঁর কল্পনা, অনুভূতি এবং জীবনবোধের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দু'এক কথা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। সার্ত্র্ জেনে-কে অস্তিত্ববাদী বলে ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু এ ধরনের কোনো দর্শনের নির্দিষ্ট লেবেল তাঁর রচনাবলীর গায়ে সাঁটা আমার কাছে সংগত ঠেকে না। জেনে-র অনুভূতি, ভাবনা, কল্পনার মালমসলা একান্তভাবে নিজের জীবন থেকেই পাওয়া; কেতাবের পরোক্ষ জগৎ থেকে তিনি বিশেষ কিছু আহরণ করেন নি। কোন দর্শনগ্রন্থ পাঠ করে নয়, সমাজের সবচাইতে নীচ এবং ঘৃণ্য স্তরে সারা জীবন কাটানোর ফলে তিনি অনুভব করেছেন যে, এই জটিল এবং নিয়ত পরিবর্তশীল জগতে নিত্য সত্য বলে কিছু নেই। আমরা যা কিছু দেখি, কল্পনা করি, কিম্বা ধরে নেই, তা সবই আসলে প্রাতিভাসিক এবং আপেক্ষিক সত্য। যেহেতু তিনি আসলে ঔপন্যাসিক এবং নাট্যকার (দার্শনিক নন), সে কারণে এ ব্যাপারটি তিনি বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন। যেমন, যে মানুষটিকে আমরা চোর বলি সে প্রকৃতপক্ষে যারা তাকে চোর বলে এবং চোর বলে শাস্তি দেয়,—তাদেরই কল্পনার সৃষ্টি: ঐ কল্পনায় ছাড়া চোর বলে কোন জীবের অস্তিত্ব নেই। তেমনি, পুলিস, বেশ্যা, ধনী, লম্পট, সাধু, খুনী, বীর, জ্ঞানী ইত্যাদি। প্রহরীত্ব, বেশ্যাগিরি, লাম্পট্য, সাধুত্ব, ইত্যাদি বিদেহী কল্পনার কোন শারীর অস্তিত্ব নেই। এমন কি আমরা যে স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে ভেদ করি, তা-ও আসলে আপেক্ষিক কল্পনা মাত্র।

তবে কি জেনে মনে করেন যে, এইসব কল্পনাকে অতিক্রম করে ব্যক্তির কোন স্বকীয় সত্তা আছে? না, ব্যক্তির চরিত্রগত ঐক্যও তাঁর কোন আস্থা নেই। প্রত্যেক চরিত্র-ই অন্য মানুষদের কল্পনাসম্ভূত; চরিত্র মানুষের মুখোশ মাত্র এবং সে-মুখোশ বাইরে থেকে পাওয়া। মুখোশ খসালে আরেক মুখোশ—কেননা মুখের আদল এবং তার আড়ালে মনের আদল আসলে অন্যের কল্পনা এবং প্রত্যাশার ছাঁচে ঢালা। যৌন-সংগম, প্রেম, চৌর্যবৃত্তি কিম্বা বেশ্যাবৃত্তি, খুন, ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা, আদর্শের অনুসরণ, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—ইত্যাদির ভিতর দিয়ে মানুষ মুখোশের দম-আটকানো আড়াল সরাবার প্রয়াস পায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব চেষ্টার পরিণতি হল এক মুখোশ পাল্টে আরেক মুখোশের আশ্রয় নেওয়া। ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় নিয়ে আমাদের যে-দ্বন্দ্ব, তা আসলে এই অলংঘ্য-শূন্যতার ভয়াবহ চেতনাকে চাপা দেবার চেষ্টা মাত্র। প্রতি মানুষই অন্য মানুষদের কল্পনার প্রতিচ্ছায়া; সুতরাং কি ব্যক্তিচরিত্রে, কি সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে নিত্য সত্যের অনুসন্ধান আত্মবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়।

জেনে-র জীবনবোধ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে সার্ত্র্ প্রাচীন গ্রীক-দর্শন থেকে একটি তুলনামূলক উদাহরণ দিয়েছেন। "ক্রীট্ দেশের দার্শনিক এপিমেনিদেস বলেছিলেন, ক্রীট্‌বাসীরা মিথ্যাবাদী। কিন্তু এপিমেনিদেস নিজে ক্রীটের মানুষ। সুতরাং তাঁর উক্তি সত্য নয়। অতএব ক্রীটের লোকেরা মিথ্যাবাদী নয়। তাহলে ক্রিটদেশী এপিমেনিদেস সত্য বলেছেন। অর্থাৎ ক্রীটবাসীরা মিথ্যাবাদী। সুতরাং এপিমেনিদেসও মিথ্যাবাদী। ইত্যাদি, ইত্যাদি।" অর্থাৎ সত্য এবং মিথ্যা একই চাকায় ঘুরছে, সত্যে শুরু করলে মিথ্যায় পৌঁছতে হয় এবং মিথ্যায় শুরু করলে সত্যে। এবং এই চাকাকে থামাবার উপায় নেই।

উপরোক্ত যুক্তির ত্রুটি নির্দেশ করা হয়ত খুব কঠিন নয়। কিন্তু জেনে যখন দার্শনিক নন, তখন তাঁর যুক্তির গলদ দেখানোর চেষ্টা পণ্ডশ্রম। আসলে প্রশ্ন হল, এমনতর বন্ধ্যাশূন্যবাদে আশ্রয় নিয়ে কোন লেখক কি করে সাহিত্য সৃষ্টি করবেন? জেনে-র লেখা তারই উত্তর। আসলে কোন দার্শনিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা জেনে-র উদ্দেশ্য নয়, সে কাজ তাঁর সাধ্যায়ত্তও নয়। তাঁর নিজের জীবনে এবং যাদের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে তাঁদের জীবনে তিনি যে ভয়াবহ শূন্যতা অনুভব করেছেন, তারই আর্ত, উলঙ্গ রূপটিকে তিনি তাঁর কল্পনা এবং শিল্পশৈলীর সামর্থ্যে আমাদের মনে প্রত্যক্ষ করাতে পেরেছেন। এই অনুভূতির মধ্যে
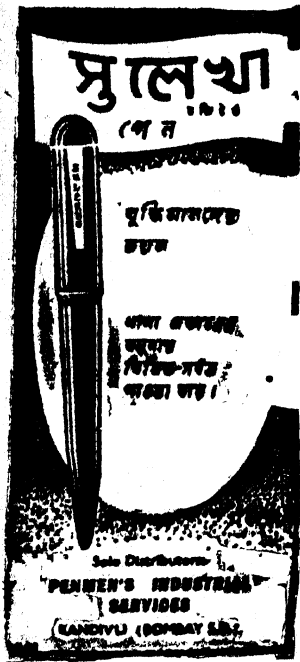
কোন খাদ নেই; এই রূপের মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। এই শূন্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আমাদের কাছে ভ্রান্ত বা অর্ধসত্য বা আতিশয্যপুষ্ট ঠেকতে পারে; কিন্তু তাঁর উপন্যাস, নাটক এবং রোজনামচা পাঠ করার পর শূন্যতার এই অনুভূতি এবং তজ্জনিত যন্ত্রণার সুগভীর সততা আমাদের অপ্রস্তুত কল্পনাতেও গভীর আলোড়ন তোলে। ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভ্যাসাশ্রয়ী তামসিক প্রশান্তি অন্তত সাময়িকভাবেও ঘুচে গিয়ে জীবন সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল জাগ্রত হয়ে ওঠে। এই জাগরণে সাহিত্যের সার্থকতা; এবং এই জাগরণের আনন্দের সঙ্গে অন্বিত হওয়ার ফলে শূন্যতার যন্ত্রণাও আমাদের কাছে অকাম্য ঠেকে না।

তত্ত্বালোচনার ভিতর দিয়ে নয়, চরিত্র এবং ঘটনার মাধ্যমেই জেনে আমাদের মনে এই দুঃসহ শূন্যতার বোধ জাগ্রত করেন। অথচ তিনি পদে পদেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাঁর উপন্যাস এবং নাটকের প্রতিটি চরিত্রই সম্পূর্ণ অবাস্তব, তারা তাঁর কল্পনার সৃষ্টি মাত্র। তারা যার প্রতীক তার কোন অস্তিত্বই নেই। তাদের এই নিরালম্বতা তাদের অনতিক্রম্য শূন্যতারই একটি দিক মাত্র। কিন্তু ব্যাপারটা শুধু যদি তাই হত, তবে এসব চরিত্র এবং ঘটনা আমাদের মনে কোন দাগ কাটত না। আসলে জেনের জীবনব্যাপী শূন্যতাবোধের যন্ত্রণা শিল্পবোধের দ্বারা পরিশ্রুত হয়ে তাঁর কল্পিত রূপে সত্যের অনিবার্যতা সঞ্চারিত করেছে। শূন্যের পক্ষে শূন্যতাবোধের যন্ত্রণা অনুভব করা সম্ভব নয়। স্রষ্টার অস্তিত্বে সেই যন্ত্রণার অনুভূতি সত্য হওয়ার ফলে শূন্যতার কল্পনা শূন্যতাকে অতিক্রম করে বাস্তবের সংক্রমণশীলতা অর্জন করেছে।

জেনে-র যে কোন লেখা নিয়ে একটু আলোচনা করলে আমার বক্তব্যটা স্পষ্টতর হবে। সার্ত্র-এর মতে যেটি তাঁর সবচাইতে নিপুণ সাহিত্যসৃষ্টি সেই "পরিচারিকা" নামে নাটকটির কথাই ধরা যাক। (কিছুকাল আগে এটির একটি ইংরেজি অনুবাদ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।*) নাটকটিতে তিনটি মাত্র চরিত্রঃ গৃহকর্ত্রী বা মাদাম (বছর পাঁচিশেক বয়েস); এবং তার দুই দাসী বা পরিচারিকা, সোলাঁজ্ এবং ক্লেয়ার্। এই পরিচারিকারা সহোদর বোন, বয়েস ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে, সোলাঁজ্ ক্লেয়ারের থেকে বয়েসে সামান্য বড়। এছাড়া রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত নেই, কিন্তু নাটকের কাহিনীতে প্রধান অংশ নিয়েছে, এমন একটি নেপথ্য চরিত্র আছেঃ ইনি হলেন মাদামের প্রেমিক, মঁশিয়ে। যবনিকা উঠলে দেখা যায় মাদামের শোবার ঘরে সোলাঁজ এবং ক্লেয়ার-কে; গৃহকর্ত্রীর অনুপস্থিতে ক্লেয়ার গৃহকর্ত্রী সেজে মাদামের চরিত্রে অভিনয় করছে, আর সোলাঁজ্ ক্লেয়ারের ভূমিকায় মাদাম-রূপী ক্লেয়ারের ফরমাস খাটছে। তাদের কথাবার্তা এবং অভিনয় থেকে দুটো ব্যাপার ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে ওঠেঃ প্রথমত এদের দুজনেরই মাদামের ওপরে যেমন টান তেমনি আক্রোশ; দ্বিতীয়ত, এরা দুজনে পরস্পরকে যেমন ভালবাসে, তেমনি ঘেন্না করে। এদের নিজেদের জীবনে কোন রস নেই; অথচ সেই জীবনের ঊর্ধ্বে মাত্র এক রকমের জীবনই এরা কল্পনা করতে পারে, সে হল মাদামের জীবন। এদের চরিত্র এবং এদের স্বপ্ন, দুইই মাদামের সঙ্গে এদের সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সেই সম্পর্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেও সে-সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবার সামর্থ্য এদের নেই। ক্রমে আমরা জানতে পারি যে, ক্লেয়ার বেনামী চিঠি মারফৎ পুলিসের কাছে মাদামের প্রেমিকের বিরুদ্ধে নানা কাল্পনিক দুষ্কর্মের অভিযোগ পাঠিয়েছে এবং তার ফলে মঁশিয়েটি সম্প্রতি হাজতবাস করছেন। অন্যধারে সোলাঁজ্ রাতের অন্ধকারে মাদামকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল; কিন্তু তার ঘুমন্ত রূপ দেখে শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে আসে। এসব কথা যখন চলছে, এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে। মঁশিয় টেলিফোনে জানায় যে, প্রমাণাভাবে পুলিস তাকে ছেড়ে দিয়েছে। দুই বোনের তখন দুশ্চিন্তা যে, এবার তাদের বেনামী চিঠি পাঠানোর ষড়যন্ত্র নিশ্চয়ই ফাঁস হয়ে যাবে। তারা তখন ঠিক করে যে মাদাম ফিরে এলে তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে। তারপর মাদাম ফিরে আসে; কিন্তু তাকে বিষ খাওয়ানোর আগেই ক্লেয়ার অসাবধান মুহূর্তে মঁশিয়র মুক্তির কথা বলে ফেলে। মাদাম তখন তাড়াতাড়ি মঁশিয়র সঙ্গে মেলার জন্যে আবার বেরিয়ে যায়। মাদামের জন্যে বানানো বিষ-মেশানো চা মিছিমিছিই ঠাণ্ডা হতে থাকে। অবসন্ন ক্লেয়ার শেষ মুহূর্তে সেই চা পান করে আত্মহত্যার মধ্যে দিয়ে নিজের বিশৃঙ্খ শূন্যতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা পায়। রঙ্গমঞ্চে একা দাঁড়িয়ে প্রায়োন্মাদিনী সোলাঁজ্ ক্লেয়ারের মৃত্যুর মধ্যে মাদামের মৃত্যুর স্বপ্ন দেখেঃ এই মৃত্যুর মধ্যেই নামের নাগপাশ থেকে সত্তার মুক্তি।

নাটকটিতে প্রতি চরিত্রই অন্যের ছায়া। একধারে পরিচারিকাদের ঘৃণা, আকর্ষণ এবং সক্রিয় কল্পনা এবং অন্যধারে দুশ্চরিত্র প্রেমিকের প্রত্যাশা মাদামের শূন্যতাকে চারিত্র্যের আবরণ দান করেছে। মঁশিয়-র চরিত্রও মাদাম এবং পরিচারিকাদের কল্পনারই সৃষ্টি। আবার সোলাঁজ এবং ক্লেয়ার একধারে মাদামের সঙ্গে সম্পর্কের ছাঁচে গড়া, অন্যধারে তারা পরস্পরের সৃষ্টি। ফলত এ নাটকের প্রতিটি চরিত্রই এলিয়টের ফাঁপা মানুষদের আত্মীয়। কিন্তু যেহেতু তাদের শূন্যতার কেন্দ্রে স্রষ্টার শূন্যতাবোধের যন্ত্রণা সক্রিয়, সে কারণে এই ফাঁপা মেয়েদের কাহিনী আমাদের কল্পনাকে বিমথিত করে।

জেনে-র অনেক ভক্ত এই ছোট নাটকটির মধ্যে আধুনিক ইয়োরোপের তিক্ত ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করেছেন। এ ধরনের ব্যাখ্যার স্বপক্ষে হয়ত যুক্তি আছে, কিন্তু আমার মনে হয় জেনে-র জীবনবোধ কোন যুগবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শূন্যতাবোধের যন্ত্রণা বোধ হয় মানুষের নিত্য অনুভূতির অন্যতম। হয়ত আজকের দিনের ইয়োরোপে নানা কারণে এই অনুভূতি বেশী তীব্র হয়ে উঠেছে।

বাঙালী পাঠকদের মধ্যে যাঁরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম যুগের রচনার বিশেষ অনুরাগী, জেনে-র নাটক এবং উপন্যাস তাঁদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে।

* Jean Genet, The Maids with an introduction by Jean-Paul Sartre. Translated from the French by Bernard Frechtman. Grove Press.

গত সপ্তাহে কলকাতায় ডাচ্ ওল্ড মাস্টার রেমব্র্যান্ট-এর চিত্রকলার একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল মিউজিয়াম-এ। বলাই বাহুল্য আসল ছবি একটিও প্রদর্শন করা হয়নি। নিদর্শনগুলি সবই ছিল প্রিন্ট। যদিও প্রিন্টগুলি খুবই উচ্চ শ্রেণীর তা হলেও রেমব্র্যান্টের আর্টের উৎকর্ষ প্রিন্ট দেখে বোঝা মুশকিল। তার ওপর বেশীর ভাগ নিদর্শনই ছিল এক রঙা প্রিন্ট সুতরাং কতটুকুইবা আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি রেমব্র্যান্ট-এর আর্ট এ প্রদর্শনী থেকে।

সারা পৃথিবীতে রেমব্র্যান্ট-এর নাম শোনেনি এমন চিত্ররসিক নেই বললে নিশ্চয় অত্যুক্তি হবে না। রেমব্র্যান্টের জন্ম হয় নেদারল্যান্ডের শহর লীডেন-এ ১৯০৭ সালে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর ছবি আঁকার দিকে ঝোঁক দেখে রেমব্র্যান্টের পিতা তাঁকে প্রথমে জ্যাকব ফান সোয়ানেনবার্ক এবং পরে পীটার লাস্টম্যান-এর কাছে ছবি আঁকা শেখার জন্যে আমস্টারডাম-এ পাঠান। পীটার লাস্টম্যান সে সময় অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে প্রসিদ্ধ প্রতিকৃতি চিত্রকর হিসাবে। ছ মাসের মধ্যেই লাস্টম্যানের কাছে যা শেখার ছিল তা শিখেফেলে রেমব্র্যান্ট আবার লীডেন-এ ফিরে আসেন এবং কোনও বড় শিল্পীর শিক্ষাধীনে না থেকে নিজে নিজেই চিত্রবিদ্যা চর্চা করতে থাকেন। সেই সময়েই ইনি 'সেণ্ট পল ইন প্রিজন' ছবিটি আঁকেন। পরিণত অবস্থায় যে আলো আঁধারের খেলা প্রধান হয়ে ওঠে তাঁর আর্টে তার লক্ষণ 'সেণ্ট পল ইন প্রিজন' ছবিতেই প্রকাশ পায় প্রথম। কিছুকাল পরে লাস্টম্যান-এর মত ইনিও প্রতিকৃতি চিত্রকর হিসাবে অভিজাত মহলে বেশ নাম করেন এবং সেই সময় সাসকিয়া ফান উলোনবার্গের প্রতিকৃতি আঁকার কাজে নিযুক্ত হন। পরে সাসকিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পর তিনি রচনা করেন স্যামসন ডিলাইয়া সিরিজ। দেখা যায় ডিলাইলার রূপে সাসকিয়াকে স্যামসনের রূপে স্বয়ং শিল্পীকে এবং ফিলিস্টিনদের রূপে সাসকিয়ার আত্মীয়বর্গকে। সাসকিয়ার আত্মীয়বর্গ রেমব্র্যান্টের সঙ্গে সাসকিয়ার বিয়ে সমর্থন করেনি। তাই এই প্রতিক্রিয়া। তাঁর চরম সুখের সময়ের রচনা 'শিল্পীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট প্রথমা পত্নী সাসকিয়া'। কিন্তু এ সুখ তাঁর বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। উপর্যোপরি তাঁর দুটি সন্তান মারা যাবার পর ১৬৪২ সালে তৃতীয় সন্তান টিটাসকে প্রসব করেই সাসকিয়াও মারা যান। সেই বছরেই রেমব্র্যান্ট রচনা করেন তাঁর সবচেয়ে বিতর্কমূলক চিত্র 'সরটি' অথবা 'নাইট ওয়াচ'। ছবিটির বিষয়বস্তু, ফ্র্যান্স ব্যানিং কক প্রধান সেনাপতির রূপে তাঁর সহকারী সেনাপতিকে হুকুম দিচ্ছেন সৈন্যবাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে চলার জন্যে। কিন্তু অসামরিক পোশাকে এই বাহিনীর রাস্তায় বেরিয়ে আসার উদ্দেশ্যে ঠিক যে কি তা না বোঝা যাওয়ায় বিশেষজ্ঞরা ধারণা করলেন রাত্রিকালে এই বাহিনী বেরিয়েছে শহর পাহারা দিতে সুতরাং 'সরটি' নাম পালটে নতুন করে ছবিটির নামকরণ হল 'নাইট ওয়াচ'। কিন্তু অধ্যাপক ব্যালডুইন ব্রাউন পরে বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, যেভাবে প্রধান সেনাপতির বাঁ হাতের ছায়া এসে পড়েছে সহকারী সেনাপতির গায়ে তা একমাত্র সূর্যালোকেই সম্ভব এবং অন্য সব যায়গাতেও যেভাবে আলো ছড়িয়ে পড়েছে ছবিটির মধ্যে তাও তখনকার কালের কোনও কৃত্রিম আলোকে সম্ভব হত না। রেমব্র্যান্টের স্বরচিত নামকরণ 'দি সরটীজ' থেকেও বিষয়বস্তু যে রাত্রিকালের ঘটনা এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এতো গেল সমালোচকদের তর্ক-বিতর্ক। ব্যানিং কক্ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের উষ্মার কারণ হল, তাদের কাউকেই চেনা যাচ্ছে না এ ছবিতে। দূরে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা তো একেবারেই অস্পষ্ট। অথচ তাঁরাই টাকা দিয়ে রেমব্র্যান্টকে নিয়োগ করেছিলেন তাঁদের ছবি আঁকার জন্যে। এইভাবে অভিজাত সম্প্রদায়ের দম্ভের প্রতি আঘাত হানার ফলে প্রতিকৃতি চিত্রকর হিসাবে রেমব্র্যান্টের যে জনপ্রিয়তা গড়ে উঠেছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। তাই এরপর কিছুকাল তাঁকে নিসর্গ চিত্ররচনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়। যাই হোক, প্রায় সারাজীবন ধরেই রেমব্র্যান্ট মানুষের চরিত্রকেই বোঝবার চেষ্টা করে গেছেন। নারী বা পুরুষের প্রতিকৃতির মধ্য দিয়ে চরিত্রকে প্রকাশ করবার যে শক্তি তাঁর ছিল সে শক্তি আজও অন্য কোন শিল্পীর কাজে দেখা যায়নি। তিনি ছিলেন মনস্তাত্ত্বিক। জীবনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বৃদ্ধদের প্রতিকৃতিই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয়বস্তু। তাই তিনি বারবার এঁকেছিলেন তাঁর নিজের প্রতিকৃতি। তাঁর পরিচারিকা হেনড্রিকয়ে স্টোফেলের (পরে যাঁকে তিনি দ্বিতীয়া পত্নী হিসাবে গ্রহণ করেন) নিউড অবস্থার রচনা থেকে রেমব্র্যান্টের প্রতিভার আর একটি দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পরিণত বয়সের রচনায় যে 'ডেইল অব ব্রেডথ্'-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় তা অনেক সমালোচকের মতে তাঁর প্রতিভার অন্তর্গামীতার পরিচায়ক। কিন্তু সার জন এডারেট মিলেজ-এর মতে ঐ 'ডেইল অব ব্রেডথ'-এর অন্তরালে চিত্রবিজ্ঞানের প্রতিটি লক্ষণ বর্তমান। পূর্বে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা দিয়ে যেসব রচনা করেছিলেন সেগুলির তুলনায় এ রচনাগুলি কারিগরির দিক থেকে এবং ভাব প্রকাশের দিক থেকেও অনেক উন্নত।

এক সময় রেমব্র্যান্ট মুঘল কলমের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর অনেক রচনা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'সেণ্টুরিয়ান কর্নেলিয়াস' ছবিতে রোমের শতবর্ষজীবীকে যে মুঘল পরিচ্ছদে দেখানো হয়েছে তা ঐ মুঘল কলমেরই প্রভাব।

—চিত্রগ্রীব

'নাইট ওয়াচ' বা 'দি সরটীজ'

ইন্দোচীন

অজিতকুমার তারণ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ এবং ইন্দোচীনের মধ্যে রয়েছে আত্মিক সম্বন্ধ।

ভারতবাসীদের কাছে ব্রহ্মদেশ, সি-য়াম (বর্তমানে থাইল্যাণ্ড) ও ইন্দোচীন প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের অংশসমূহ স্বর্ণভূমি বা স্বর্ণদ্বীপ বলেই পরিচিত ছিল। সেকালে ধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী ও পরিব্রাজকের বেশে অসংখ্য ভারতবাসী স্থলপথে ও জলপথে গিয়েছিলেন ইন্দোচীনের নানান জায়গায়। আমি সুযোগ পেয়েছিলাম আন্তর্জাতিক তদারকী কমিশনের সঙ্গে ওখানকার শান্তিরক্ষার কাজে যাবার এবং অনেকদিন থাকবার।

ভারতের পূবে পাকিস্তান, পরে ব্রহ্ম ও থাইল্যাণ্ড এবং তা'র পরে রয়েছে ইন্দোচীন। দেশটি বিশালই বটে; আয়তন দু' লক্ষ প'চাশী হাজার আটশ' বর্গমাইল। এর উত্তরে চীনদেশ, পশ্চিমে ব্রহ্ম আর থাইল্যাণ্ড আর পূবে ও দক্ষিণে রয়েছে তংকিন্ উপসাগর, দক্ষিণচীন সাগর ও শ্যাম উপসাগর। ওখানকার লোকসংখ্যা প্রায় তিন কোটি।

বড় বড় দু'টি নদী সং হোং হা (অর্থাৎ লাল নদী) ও মেকংএর তীরবর্তী স্থানগুলি সমতল ও উর্বরা। তা' ছাড়া বাকী প্রায় সব জায়গাই গভীর অরণ্য ও পাহাড়ময়। মেকংএর দৈর্ঘ্য ২৭৩৪ মাইল, এটা এশিয়ার বড় বড় নদীগুলির মধ্যে অন্যতম; লাল নদীর দৈর্ঘ্য কিন্তু মাত্র ৭০০ মাইল। বর্ষাকালে এটি অতি উগ্রমূর্তি ধারণ করে আর বন্যায় করে দেশের দারুণ ক্ষতি।

ওদেশটা মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত, যেমনঃ—ভিয়েৎনাম, কম্বোডিয়া (বা কম্বোজ) এবং লাওস। বহু পূর্বে আমাদের দেশের বিহার অঞ্চলের লোকেরা ইন্দোচীনের পূর্বাংশে একটা এলাকা নিয়ে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করে তার নাম দেন 'চম্পা', ঐ জায়গাটা শেষে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চামদের দখলে আসার পর থেকে আনুনাম নামে পরিবর্তিত এবং পরিচিত হয়। সেই আনুনাম, কোচীন চীন এবং তংকীন্ নিয়েই বর্তমান ভিয়েৎনাম গঠিত হ'য়েছে। ভিয়েৎনামটি আবার অনেকটা আমাদের ভারত-পাকিস্তান অথবা পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় দ্বিধা বিভক্ত। একে নিয়েই এখনও কিছু গোলযোগ রয়েছে; তা' ছাড়া ভারত চেয়ারম্যান আর ক্যানাডা ও পোল্যাণ্ড মেম্বার বা সদস্য থেকে কমিশনের মাধ্যমে ফরাসী কবলমুক্ত ইন্দোচীনের অপরাপর জায়গায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হ'য়েছে। ভিয়েৎনামের '১৭ অক্ষাংশের উত্তরাংশ উত্তর ভিয়েৎনাম নামে পরিচিত, প্রেসিডেণ্ট হো-চি-মিন্-হের প্রজাতন্ত্র শাসিত এলাকা। দক্ষিণাংশ নামে মাত্র গণতন্ত্র শাসিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবাধীনে প্রেসিডেণ্ট দ্যো দিন্ দিয়েমের এলাকা। উভয় ভিয়েৎনামের পুনর্মিলনের ওপরই নির্ভর করছে ভিয়েৎনাম তথা সারা ইন্দোচীনের নানাবিধ উন্নতি এবং শান্তিলাভ।

ইন্দোচীনের কৃষক

ইন্দোচীনের দক্ষিণ ও পূর্বাংশ দেখতে অনেকটা বাংলা দেশেরই মত। নদী-নালার দেশ। সেখানে পালের নৌকো চালিয়ে নরনারীরা গান গেয়ে গেয়ে যায়! দাঁড়ি টানে দাঁড়, কেউবা টানে গুণ। সবুজ মাঠের পরে রয়েছে সবুজ মাঠ, তা'র পরে আরো কত মাঠ, কতোই না সুন্দর! অপরূপ! ওখানে ধান জন্মে থাকে প্রচুর, বছরে তিনবার। খাদ্যের অভাব নেই। ওখান থেকে ধান-চাল রপ্তানি হয়ে থাকে নানান দেশে। ভিয়েৎনাম ও কম্বোজের পাহাড় অঞ্চলে পর্যাপ্ত কফি জন্মে থাকে। প্রায় জায়গাতেই উৎকৃষ্ট রবার পাওয়া যায়। কম্বোজেই অধিক। বনে জঙ্গলে আছে যথেষ্ট মূল্যবান কাঠ। খনিতে রয়েছে প্রচুর টীন, অ্যাণ্টিমনি, চুনাপাথর, দস্তা, সীসে, কয়লা আর সোনা প্রভৃতি। ওদেশে আমাদের দেশের পাটজাত দ্রব্যাদির খুবই কদর।

দিল্লীতে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ও ইন্দোচীনের প্রেসিডেন্ট হো চি মিন

ইন্দোচীনের হাত পাখা নিয়ে নাচ

ওখানকার বাসিন্দাদের উপরে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারত ও চীনের সংস্কৃতি বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার ক'রে এসেছে। তাই দেশটার নামকরণও হ'য়েছে ওরূপ অর্থাৎ 'ইন্দোচীন'।

ওখানকার উত্তরাঞ্চল শীতপ্রধান, দক্ষিণ গ্রীষ্মপ্রধান।

সেখানকার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী, কিছু কিছু খৃষ্টানও আছে, মুসলমান খুবই কম।

দেশটি মন্দিরময়। মন্দিরগুলি পান্ডা পুরুষদের জ্বালাতন হ'তে মুক্ত। কম্বোজের (সি-আম্‌রিপ বিমান বন্দরের সন্নিকটে) আংকোরওয়াতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্মের বহু পৌরাণিক ও প্রামাণ্য নিদর্শন রয়েছে। একবার নেহরুজী সকন্যা ওই বিষ্ণু মন্দির ও তার সুচারু কারুকার্য আর চিত্রাবলী দেখে বিশেষভাবে মুগ্ধ ও বিহ্বল হন। আমাদিগকে বলেন,—'ইন্দোচীনে অবস্থিত সকল ভারতবাসীরই এ মন্দির-গুলি দেখে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য।'

ভিয়েৎনামীরা, বিশেষ করে উত্তরদিকের লোকরা, খুবই কর্মঠ, পরিশ্রমী, সাহসী, সৎ, অতিথিবৎসল এবং সময়ানুবর্তিতার বিষয়ে খুবই সজাগ। দক্ষিণ এলাকার লোকেরা নৈতিক ব্যাপারে অনুন্নত। প্রথমে লাওসের লোকেরা এসেছিল থাইল্যান্ড থেকে, তাই ওদেশের সঙ্গে এখনও ওদের রয়েছে অতি নিকট সম্বন্ধ ও বন্ধন। এরাও পরিশ্রমী বটে। কম্বোজবাসীদিগকে দেখতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট মনে হ'লেও ওরা অতিশয় অলস প্রকৃতির এবং জীবনযাত্রায় বিলাসী। তবে এরা খুবই অতিথিবৎসল।

উত্তরাঞ্চলের লোকের অনুস্বার বহুল ক্যান্টনী ভাষার সঙ্গে মেশানো নিজেদের ভাষা ব্যবহার করে থাকে। পশ্চিম ও দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা কম্বোজ বা খামির ভাষা ব্যবহার করে, ওটা পালি ও সংস্কৃতের সংমিশ্রণ, হরফ তেলেগু। পাহাড় এলাকার লোকেরা ব্যবহার করে থাকে মালয়, ব্রহ্ম ও তিব্বতীয় ভাষায় মিশ্রিত এক অপূর্ব 'জগা-খিচুড়ী' ভাষা। গ্রামের চাইতে শহরের লোকেরাই অধিক ফরাসী ভাষা জানে। ওখানে ইংরেজী জানা লোকের সংখ্যা খুবই কম। অনেকে আমাদের সঙ্গে মিশে আজকাল হিন্দীও অনেকে শিখছে।

শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে উত্তর-ভিয়েৎনামই অধিক যত্নশীল ও অগ্রগামী।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ইন্দোচীন-বাসীরা বেশ উদার। সাধারণ মাছ মাংসাদি ছাড়াও তা'রা কুকুর, বেড়াল, সাপ, ইঁদুর, ব্যাঙ ও গুইসাপ প্রভৃতির মাংস এবং ঝিনুক, শামুক, আরশুলা ও ফড়িং ইত্যাদি খাদ্য-রূপে সদ্ব্যবহার করে থাকে।

ওখানে ভারতবাসীদের খুবই সম্মান। কথা প্রসঙ্গে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম, মহাত্মা গান্ধী, তেগোর, চন্দ্র বোস (নেতাজী), রাজেন্দ্র প্রসাদ ও নেরু সম্বন্ধে এবং ভাষাবিদ শান্তি চ্যাটার্জি (ডাঃ সুনীতি চ্যাটুজ্জ্যে)র বিষয়ে প্রশ্ন করে থাকে।

ওখানকার সুস্থ সবল শিশুরা লাল টুক টুক গালভরা হাসি নিয়ে কিচ্ মিচ্ চুংচাং করতে করতে ও চাও অং চাও অং, বাতায় বাতায় অর্থাৎ নমস্কার নমস্কার, হাত মেলাও, হাত মেলাও বলতে বলতে যখন চারদিক থেকে এসে আমাদের জড়িয়ে ধরে তখন বাস্তবিকই আনন্দ পাওয়া যায়।

ইন্দোচীনে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। এঁ'রা কৃষি, বাণিজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্র এবং দফতরেও কাজ করে থাকেন। অনেকে স্বামীর সঙ্গী অথবা পৃথকভাবে মিলিটারীতেও কাজ করে থাকেন। দেশের স্বাধীনতা যজ্ঞে ইন্দোচীনের ললনাদের ত্যাগ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ওদেশের নরনারীরা নাচগানেও বেশ পটু। এ বিষয়ে রাষ্ট্র থেকেও বিশেষ উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

গেল বছরে ইন্দোচীনের মহান নেতা ডক্টর হো-চি-মিন্‌হ ভারত সফর ক'রে গিয়ে ভারত ও ইন্দোচীনের মিত্রতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে গিয়েছেন। বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদও ইন্দোচীনে সফররত রয়েছেন; এতে উভয় দেশেরই নানাবিধ মঙ্গল সাধিত হ'বে বলে আশা করা যায়।

ইন্দোচীনের নর্তকীদের ছাতা নিয়ে নাচ

অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্বের কথা অনেকে তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে নানা গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। নিদারুণ বিপদের সময় কোথা থেকে কে যেন এসে উদ্ধারের পথ দেখিয়ে তারপর কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। ১৯৩৩ সনের এভারেস্ট অভিযাত্রী ফ্রাংক স্মাইদ তার এমন এক অভিজ্ঞতার কথা তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করে গিয়েছেন। এভারেস্ট শিখরের প্রায় কাছাকাছি পেঁাচেছেন (২৮০০০ ফিট)। উঠতে কষ্টের সীমা নেই—এক পা এগনো প্রাণান্ত-কর তখন। মাথা ঘুরছে, বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করছে। একটা দারুণ অবসাদ তাঁকে পেয়ে বসলো। স্মাইদের চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে এল এবং এরপর নির্ঘাৎ বরফে চাপা পড়ে মৃত্যু—কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল যেন সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে। একটা ব্যাপারে স্মাইদ পুলকিত হলেন—তাঁর মনে হল যেন তিনি আর একা নন। অনুভব করলেন যে কে যেন একজন তার পিছনে রয়েছে, তাকে দাঁড়াতে টেনে ধরে রেখেছে। হোঁচট খেয়ে পড়লে সেই অজ্ঞাতপরিচয় পর্বতারোহী তাকে দড়ির সাহায্যে পতন থেকে রক্ষা করবে বলে স্মাইদের বিশ্বাস হতে লাগল। প্রত্যেক পা আগিয়ে ফেলার সঙ্গে স্মাইদের মনে আগন্তুকের অস্তিত্বটা আরো বাস্তব ও নিশ্চিত প্রতিপন্ন হতে লাগলো।

এত বাস্তব মনে হতে লাগলো যে স্মাইদ তার পকেটে হাত পুরে একটা মিণ্ট-কেক বের করে সেটা দুটুকরো করে অর্ধেকটা তার সঙ্গীকে দেবার জন্য ফিরে দাঁড়ালেন। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে স্মাইদ দেখলেন কেউ তার পিছনে নেই। শেষ ধাপটা ওঠার মুখে কোন সময়েই কেউই তার পিছনে থাকেনি! কিন্তু এই 'অদৃশ্য মানুষটির' সহায়তায় স্মাইদ ২৮১০০ ফিট উঠতে সক্ষম হন—তখন সেইটাই মানুষের সর্বোচ্চ আরোহণ—সেটা ছিল ১৯৩৩এর জুন। বাকি হাজার ফিট আর তিনি ওঠেননি কারণ তার মনে হয়েছিল আর এগনো অসম্ভব।

*

জুল ভার্নের 'এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড'এর নায়ক ফিলিয়াস ফগের বিচিত্র পরিচয় উদ্ঘাটন করেছে সুইটজারল্যাণ্ডের এক পত্রিকা। পত্রিকাটির মতে ফিলিয়াস বাস্তব চরিত্র ছিল এবং তার আসল পরিচয় হচ্ছে সে কবি বায়রনের জারজ সন্তান। জুল ভার্ন তার নায়ক সম্পর্কে বলেছেন, "কথিত আছে ওকে বায়রনের মত দেখতে—তবে কেবল মুখের অবয়বে কারণ বায়রনের মত সে পঙ্গু ছিল না।

পত্রিকাটি তাদের নির্ধারণ সম্পর্কে কতকগুলি প্রামাণিক দলিল উদ্ধার করতে পেরেছে। ১৮০৯ সনে জর্জ কর্ডোন (লর্ড বায়রন) প্রাচ্য ভ্রমণে বেরিয়ে মালটা দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে ফিশার কিং নামক এক ইংরাজ পরিবারের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। এদের চৌদ্দ বছরের মেয়ে অলথিয়া ছিল খুবই সুন্দরী। বায়রন এদেরই পরিবারে থেকে যান।

বছর কতক পরে হেনলি ফগ নামে জামাইকার এক ধনী ভূস্বামীর সঙ্গে

আফ্রিকার প্রাচীন শিল্পনিদর্শন—ওপরের ছবিটি পশ্চিম আফ্রিকার বেনিন থেকে প্রাপ্ত সপ্তদশ শতাব্দীতে তৈরী এক ওবার ব্রোঞ্জ-মূর্তি

অলথিয়ার বিয়ে হয়। হেনলি ও অলথিয়ার রাজনীতির প্রতি খুব ঝোঁক ছিল এবং ১৮২৩ সনে গ্রীক বিদ্রোহ হতে ওরা বিদ্রোহীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে শেফালোনিয়াতে উপস্থিত হন। বায়রনও গ্রীকদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন এবং তিনিও ১৮২৩এর ডিসেম্বরে শেফা-লোনিয়া দ্বীপে এসে উপস্থিত হন। সেখানে ফগ দম্পতির সঙ্গে দেখা হতে তিনি ওদের সঙ্গেই থেকে যান।

১৮২৪ সনে বায়রন মিসোলাংঘতে মারা যান। সন্তানসম্ভবা শ্রীমতী ফগ খবরটি শুনে বড় হতাশ হয়ে পড়েন। ১৮২৪ সনে সেপ্টেম্বরে ভূমিষ্ঠ অলথিয়ার সেই সন্তানের নামকরণ হয় ফিলিয়াস।

ভ্রমণে উগ্র ঝোঁক থাকায় ফিলিয়াস নাবিকের জীবন গ্রহণ করে এবং ১৮৫০ সনে প্যারিসে অবস্থিত বৃটিশ নৌ দূতা-বাসে সহকারীরূপে প্রেরিত হয়। কিন্তু হঠাৎ মায়ের অসুখের জন্য তাকে লণ্ডনে ফিরে যেতে হয়। পুত্রের আসবার কয়েক-দিন পর অলথিয়ার মৃত্যু হয়। মায়ের কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে ফিলিয়াস তাকে সম্বোধন করে লেখা তার মায়ের একখানি চিঠি পায়, তিন জায়গায় শীলমোহর আঁটা। অতি সংক্ষিপ্ত চিঠি :

"প্রিয় পুত্র, তুমি লর্ড বায়রনের সন্তান। কখনো প্রকাশ করো না, কিন্তু কখনো এটা ভুলেও থেক না। তোমার মা।"

সঙ্গে সঙ্গেই ফিলিয়াস লর্ড বায়রনের বংশের ইতিবৃত্ত অনুশীলনে রত হয়। একটা অস্বস্তি ওকে পেয়ে বসলো কারণ দেখলে বায়রনের বংশে পাগলামীর একটু আঁচ রয়েছে। এ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য ফিলিয়াস বনবাসী হয়ে যায়। নিজের সম্পর্কে কঠিন সংযম রক্ষা করে করে ওর জীবন বড় দুঃখময় হয়ে উঠল। কেবলই তখন স্মরণ করতো ওর ভ্রমণ ও বিভিন্ন অভিযানগুলির কথা। অবশেষে ১৮৭২ সনের ২রা অক্টোবর আশী দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণে যাত্রা করে।

*

দীর্ঘ কেশ দীর্ঘায়ু, সম্পদ ও সুখের আকর, বলে কেশের উদ্গম ও সংরক্ষণের সার্থকতা প্রচারের জন্য কোরিয়ায় একটি সমিতি গঠিত হয়েছে। সমিতির বর্তমান সভ্য সংখ্যা ত্রিশ এবং এর সভাপতির মাথার চুলের দৈর্ঘ্য তিন ফিট এবং শ্মশ্রু দু ফিট।

মানুষের মাথার চুল কত দীর্ঘ হতে পারে সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের মত হচ্ছে, দৈর্ঘ্যের একটা মাত্রা আছে—যদি একেবারে কোন দিন কাটা না হয় তাহলে বার থেকে চৌদ্দ ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়তে পারে।

অবশ্য এর চেয়ে দীর্ঘ কেশের দৃষ্টান্তও আছে। দক্ষিণ ভারতের এক সন্ন্যাসী পয়ষট্টি বছর বয়সে ছাব্বিশ ফিট দীর্ঘ কেশ উদ্গত করেছিলেন। ১৯৪৮ সনে তাঁর একখানি ছবি দেখা গিয়েছিল—মাথার চুল পাক দিয়ে দিয়ে তিনি পাগড়ীর মত বেঁধে রেখেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, যে কোন কারণেই হোক বর্তমানে মানুষের চুলের বৃদ্ধি হচ্ছে দ্রুততরভাবে। বর্তমান বৃদ্ধির হার হচ্ছে বছরে সাত ইঞ্চি, যা একশ বছর আগে ছিল বছরে ছ ইঞ্চি।

পাখীর ডাক

বিষ্ণু দে

একটি পাখীর ডাক। সেই মুহূর্তেই
পাহাড়ে পাহাড়ে চড়ে চতুর অন্তরা।
আলোতেও বেজে ওঠে তারই ধরতাই,
সূর্যোদয়ে চলে সেই সুরের লহরা।

জানি না কি পাখী। আঁকা তুষারের পটে
কালোর একটি বিন্দু, শুভ্র শিবালিকে
যেন বা তৃতীয় নেত্র, ধবল সংকটে
নিজে স্থির, অগ্নিবেগ হানে চতুর্দিকে।

ধ্বনিতে আলোতে মহাসঙ্গীতে সঙ্গতে
হেসে ওঠে, দুলে ওঠে, বুঝি মাথা নাড়ে
নন্দা দেবী, নীল শিলা, কালো কালো ঢিপি
খুশির শিশির শত দেওদার ঝাড়ে।

অনেক পড়েছি পৃথিবীর স্বরলিপি
সজল হাওয়ার পাড়ে উজ্জ্বল ভঙ্গীতে
সূর্যে সূর্যে জাতিস্মর সিন্ধুতে গঙ্গাতে
সম্বাদী স্বরটি তার মুহূর্তেই লিখি॥

তিলোত্তমা

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

তিলোত্তমা থাকে মায়া দ্বীপে,
মায়ায় ধরেছে অঙ্গ নরম ছিপছিপে
আসঙ্গের কামনায়।

মোহিনী সে
তরুণী নদীর মতো খরস্রোতা,
নিবিড় চুলের বনে একাকিনী পাতা
একুশ বর্ষার ভিড় ঠেলে ঠেলে
কাঁচা শরীরের টলটলে
জোড়া বুকে কোমল চূড়ায়
দুই ঢেউয়ে নিজেকে খেলায়
চোখে আঁকে কাজলের মেঘ।

আমার বিবেক
শরীরের ছিপ নিয়ে গভীর আবেগে
যতবার বিকারের ঘোরে
আদিম জেলের মতো গেছে কাছাকাছি
অমনি সে মায়াবিনী ফুটফুটে আঁশের
জলাঙ্গী মীনাক্ষী তিলোত্তমা
জলের মাছের মতো
গিয়েছে পালিয়ে।

হতে পারে গন্ধর্বের নারী,
দ্বীপের পাহাড় থেকে নদী হয়ে
আমার চোখের জল নিয়ে
আমার মনের পাড়ে ঝাড়ে চুল,
দিনে দিনে লাবণ্য-লতার
জলে ভাসা মগ্ন-শোভা ফুল,
ভুল নয়, তবু মায়াবিনী,
মায়ায় ধরেছে অঙ্গ সুন্দরী কামিনী।

আসঙ্গ কামনা যদি, ওগো নদি,
আমার যৌবন যায় দ্যাখো চেয়ে
আমার শরৎ আসে চুলের সাদায়
কাশ বনে একা আমি আকাশের গায়
তুমি বরষার নদী দূরে
তোমাকে দেখেছি আমি আগরতলায়
শেষবার বিমান বন্দরে।

চোদ্দ
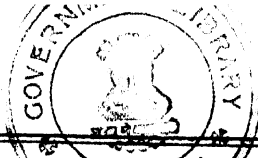
দুই ভাই মুখোমুখি বসেছিলেন। অনেকক্ষণ। কথা ফুরিয়ে গিয়েছে। এখন বিশ্রাম। দুপুরে গড়ানো রোদ এখন আলস্য ঢালছে। মেয়েদেরও হেঁসেলের পাট চুকে গেছে। ঘরে ঘরে তারা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে।

দুই ভাই শুধু বসে আছেন মুখোমুখি। বড়কর্ত্তা স্বভাবতই কৃশ। সম্প্রতি ম্যালেরিয়া তাঁকে আরও কাবু করেছে। তাঁরও মাথায় টাক, তবে সে শুধু চাঁদিটুকুতে। তারপরেই বেশ চুল আছে। যাত্রাদলের রাজমন্ত্রীরা যে ধরনের পরচুলো মাথায় পরে, অনেকটা সেই ধরনের। কানেও উঁকি-মারা চুল এবং বুকে লোমের বাহার। সবেতেই পাক ধরেছে।

বড়কর্ত্তা চুপচাপ বসে বুকের খাঁচায় পুরনো ঘি ডলতে লাগলেন। শ্লেষ্মা-কুপিত হওয়ায় ক'দিন ধরে বড় কষ্ট পাচ্ছেন। রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে।

কিন্তু সেই কারণে বেশি ভাবছেন না বড়কর্ত্তা। শরীর থাকলেই আধি ব্যাধি থাকবে। শরীর ব্যাধির মন্দির। যত বয়েস বাড়বে ততই পাড়ু হবেন রোগে। হতেই হবে, এ তো জানা কথা। না, সেজন্যে ভাবছেন না বড়কর্ত্তা। তিনি ভাবছেন, হাজরাহাটির সাত বিঘে জমির কথা। বড় ভাল আমনে জমি। রাখতে পারলে বছরে অন্তত চল্লিশ পঞ্চাশ মণ চাল ঘরে উঠত। কিন্তু ও জমি রাখা যাবে না। এই বয়সে, এই শরীরে, ছয় সাত মাইল ঠেঙিয়ে ঐ জমিতে চাষের তদারক করা আর পোষায় না। আর নিজে না দেখলে কি চাষ ওঠে?

তিন চার বছর ধরে কাহিল হয়ে পড়েছেন বড়কর্ত্তা। তেমন চলাফেরা করার তেজ ফুরিয়ে এসেছে তাঁর। তাই, যে মুহূর্তে ঢিল দিয়েছেন তিনি, সেই মুহূর্ত থেকে চারিদিকে ছড়ান জমিজমা বাপের বেয়াড়া ছেলের মত ব্যবহার শুরু করেছে। আয়ত্তে রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে ক্রমশ। আয় কমে আসছে সংসারের। বড়কর্ত্তার ক্ষমতা যতদিন অটুট ছিল, ততদিন সংসারের চাকা গড়গড়িয়ে গড়িয়ে গিয়েছে। কাউকে কিছু ভাবতে হয়নি। ভাবনা চিন্তার ছোঁয়া ভাইয়েদের গায়ে যাতে না লাগে প্রাণপণে সে চেষ্টা তিনি করে এসেছেন। বুড়ির বিয়েতে দেনা করতে হয়েছে, সুধাময়ের কলকাতার খরচ চালাতে দেনা করতে হয়েছে, ছোট বউয়ের চিকিৎসাতেও দেনা জমেছে, দেনা করেই তো পৈতৃক দুর্গোৎসব চালিয়ে যেতে হচ্ছে। কি করে টাকা এসেছে, আসছে, তার খবর সামান্য কিছু মহি জানে, পুরো জানেন তিনি, আর জানেন বুড়ো মকর বিশ্বেস।

মহি হুট্ করে কলকাতার পড়া ছেড়ে দিয়ে এল, এম এ-টা আর পড়ল না। গ্রামে এসে ইস্কুল খুলল বিনা পয়সার। ছোট-লোকদের উন্নতি নিয়ে মেতে উঠল। জাতি-ভেদ উঠিয়ে দেবার জন্য কোমর বেঁধে লেগে পড়ল। বছর দুয়েক গ্রামে ছিল। কি বক্তৃতাটাই না করেছে। শুধু বক্তৃতা দিয়ে বেড়ালে হয়ত অতটা হৈ চৈ উঠত না। যা ও তখন বলেছে, তা কাজেও করেছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাঁড়াল, মুচি, ডোমের হাতের জল খেয়েছে। মুসলমানের রাঁধা খাদ্য খেয়েছে। বাবা বেঁকে দাঁড়ালেন ওর কাজে, সমাজ মারমার করে উঠল। রটে গেল, মহি বেহ্ম হয়েছে। কলকাতায় নাকি এক বেহ্ম মেয়ের সঙ্গে বিয়েও ঠিক করে এসেছে। কিন্তু কোথায় কি? বেহ্ম মেয়ে নয়, বাবার ঠিক করা পাত্রীকেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে করল মহি। তিক্তবিরক্ত হয়ে একদিন গ্রামও ছাড়ল। বার্কমায়ার কোম্পানীতে সামান্য চাকুরি জুটিয়ে ডোমার রওনা দিল। কলকাতায় গেল না কেন, সে এক রহস্য। সেখানে গেলে একটা ভাল চাকরিই পেতে পারত। ছেলে তো সে ভাল।

অবশ্য কলকাতায় গেলেও গ্রাম ছাড়তে হ'ত। ডোমার গিয়েও তাই করেছে মহি। বাবা মধুপুরের সাহেবকে ধরে শীতলকে দিলেন পুলিসে ঢুকিয়ে। আর সংসারের বড় ভারী জোয়ালটা দিলেন তাঁর কাঁধে চাপিয়ে। সেই জোয়ালই তিনি এতদিন টেনে এসেছেন সাধ্যমত। টেনেছেন মুখ বুজে। এখন বড় ঠেকে পড়েছেন।

শুধু শরীরের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকেও ঠেকে পড়েছেন বড়কর্ত্তা। এখন কেবল মনে হয়, হিসেবে বুঝি ভুল হয়ে গিয়েছে। জমির উপর জোর না দিয়ে ব্যবসা ট্যাবসায় মন দিলেই ভাল হ'ত হয়ত।

মকর আর তিনি তো একই বয়সি, একই সঙ্গে জীবন আরম্ভ করেছেন, অথচ দ্যাখ, শেষ বয়সে মকর কি জমালো আর তিনি কি জমাতে পারলেন।

যে ভাবনাটা তাঁর এখন হচ্ছে, সেটা জীবনের শুরুতেই কেন ভাবেন নি? এখন বড় আপশোষ হয় তাঁর।

জমিদারি করবার সাধ কখনো মনে জাগেনি তাঁর। তবু-যে জমির পিছনে ছুটেছেন সারাজীবন, সে শুধু নিশ্চিন্তে, অনায়াসে দুধে ভাতে থাকবার লোভে। ক্ষেতের ধানের ভাত খাবো, বাড়ির পুকুরের মাছ খাবো, নিজের গোয়ালে গরু থাকবে, সেই গরুর দুধ খাবো, আর বারবাড়িতে সতরঞ্জি বিছিয়ে দাবা পাশা খেলবো; কোন ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে যাবো না, এই ছিল আশাটা। সে আশা যে মরীচিকা, সে আশা কুহক স্বপ্ন, তাতো জানা ছিল না আগে। যখন জানা গেল, তখন বেড়াজালে ভয়ানক জড়িয়ে পড়েছেন বড়কর্ত্তা। জাল কেটে বেরিয়ে আসবার আর উপায় নেই।

ধীরে ধীরে অনেক কিছুই শিখলেন। বুঝলেন, ভদ্র গৃহস্থ যারা, নিজে হাতে লাঙল ঠেলতে যারা পারে না, পারবেও না, তারা যদি গৃহস্থালি রাখতে চায় তবে তাঁদের দয়া ধর্ম ভদ্রতা বিসর্জন দিতে হবে। কিষাণকে এমনভাবে দাবিয়ে রাখতে হবে, যাতে সে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে না পারে। চোখে ঠুলি বাঁধা কলুর বলদের অবস্থায় চাষীকে নিয়ে যেতে না পারলে, ও হারামজাদাদের কাছ থেকে আর কাজ পাওয়া যাবে না। বড়কর্তার নরম মন, তিনি কখনোই পুরো পাওনা আদায় করতে পারেন নি তাঁর প্রজা চাষীদের কাছ থেকে। তাঁর ভদ্রতা, তাঁর মমত্ববোধের সুযোগ নিয়ে প্রচুর ঠকিয়েছে তারা বড়কর্তাকে। শয়তান, আস্ত শয়তান সব। মহিটা পাগল, এইসব স্বার্থ-সর্বস্ব, কুটিল লোকগুলোর হিত করবার আশায় সময় নষ্ট করেছে। মহির ধারণা, চাষা ব্যাটারা খুব সরল, এক একটা ধোয়া তুলসীর পাতা! হুঃ!

এখনকার বড়কর্তা যেন সেই আগের আমলের নাবালক বড়কর্তাকে সেরেস্তার কাজ বুঝাতে বসলেন। তোমার নিজের যদি কিষাণ থাকে তবে তাকে এমনভাবে রাখো, যাতে সে পুরো পেট খেতে না পারে. তার পেটে খিদের আগুন জ্বলতে থাকলে সে আরেকবার খাবার আশায় তোমার কাজটি হাসিল করে দেবে। পেট ভরে খেতে দিয়েছ কি মরেছ। সে তখন একটু গড়াতে চাইবে, বসে বসে তামাক পোড়াবে, দু চারটে খোস গল্প করে সময় নষ্ট করবে। যদি ভাগচাষে জমি করো, তবে দেখো, চাষীর ঘরে যেন ছিটেফোঁটাও বাড়তি খাবার না থাকে। ঋণের দায়ে সে যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে তোমার কাছে বাঁধা থাকে। তবে চাষীর জাত শায়েস্তা হবে। তবে তোমার গোলা ভরবে। বুদো ভুঁয়েকে দ্যাখ, সরকার মশাইদের ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য কর। তোমার চেয়ে অনেক কম জমি বুদো ভুঁয়ের, অনেক খারাপ জমি সরকার মশায়ের, কিন্তু তারা চাষীদের চিনেছে, ঠিক চিনেছে, ভদ্রতা ছাড়তে পেরেছে. পেরেছে বলেই ধান খন্দ তাদের গোলা থেকে উপচে পড়ছে।

কিন্তু বড়কর্তাকে তার গৃহস্থালি ভাসিয়ে দিতে হচ্ছে কারণ তিনি লোকটি বড় ভদ্র। দয়ামায়াটা তিনি ছাড়তে পারেন নি। খাতকরা তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার নেয়, তিনি সে টাকা সব সময় আদায় করতে পারেন না। সময় বুঝেই যেন ব্যাটাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে, আর এমনই খারাপ হয় যে, নিতান্ত পাষাণ হৃদয় না হলে টাকার কথা উচ্চারণই করা যায় না। বেশ, অসময়ে না হয় টাকা দিতে না পারলি, সময় ফিরলে শোধ দে। তখন কোন ব্যাটার টিকিও দেখা যায় না। ভাগচাষীরা বীজ নিয়ে যায়, সারের টাকা নিয়ে যায়, অথচ পারতপক্ষে তাঁর জমি চষে না। বীজ, সারের টাকা খেয়ে ফেলে। তারপরে এসে পায় ধরে। বদমায়েসগুলো জানে গ্রামের মধ্যে এই একটা মানুষ আছে, বড়কর্তা, পা জড়িয়ে ধরতে পারলেই যার কাছ থেকে মাফ পাওয়া যায় সব অপরাধের।

আর কৃতজ্ঞতার বদলে এইসব চাষীরা তাঁকে ধান দেয় না, কলাই সরষে দেয় না. তবে কি দেয়? দেখা হলেই সেলাম দেয়, দেবতার মত খাতির করে। ভাগের ভাগ ফসল কড়ায় ক্রান্তিতে শোধ দেয় তাদেরই, যারা নাদনা উঁচিয়ে বসে থাকে, দেনা-পাওনায় কড়া-ক্রান্তি কারচুপির চেষ্টা করলে যারা বুকে বাঁশ ডলে তা আদায় করে নেয়, যাদের ওরা দুবেলা গাল না দিয়ে জল খায় না। এই আমাদের চাষী!

এসব জানা সত্ত্বেও জমির কুহকে ভুললেন কেন বড়কর্তা। কেন শুধু জমির পর জমিই কিনে চললেন? ভুল ভুলই। হয়ত ভেবে থাকবেন, জমির পরিমাণ বেশি থাকা ভাল। কিছু কিছু করেও ফসল যদি সব জমি থেকে আসে তাহলে ঐ যে যাকে রাই কুড়িয়ে বেল বলে তাই হতে পারে।

আজ বুঝেছেন, সে হিসেবেও ভুল হয়েছে তাঁর। তাই কয়েক বছর ধরে জমি বেচতে শুরু করেছিলেন। দূরের দূরের জমিই বেচে দিচ্ছেন প্রথমে। দিয়ে দেনা শোধ করছেন।

হাজরাহাটির এই জমি মহির টাকার কেনা। বড়কর্তা জানেন, মহি এসব ব্যাপারে তাঁর কথার উপর কথা বলবে না। তবু যে তাঁর মতামত জানতে চাইছেন সে জমিটা মেজকর্তার টাকায় কেনা হয়েছে বলে নয়, মেজকর্তা বাড়িতে আছেন বলেই। বড়কর্তার সিদ্ধান্তের কোন প্রতিবাদ মেজকর্তা করেন নি।

কথাবার্তা চুকে গিয়েছে। দুই ভাই মুখোমুখি বসে আছেন চুপ করে। বড়কর্তা বুকে পুরনো ঘি সমানে ডলে যাচ্ছেন। তার দুর্গন্ধে ঘরের দুপুর ভারী হয়ে উঠেছে। একটা জলচৌকির উপর তামার টাটে কতক-গুলো পুরু পুরু আকন্দ পাতা পড়ে আছে। পুরনো ঘিটুকু ডলা শেষ হলে ওগুলোর কাজ শুরু হবে।

বড়কর্তা ঘড়ঘড় করে কেশে উঠলেন। বুকের খাঁচাটা কাশির দমকে ফুলে ফুলে উঠে আবার চুপসে গেল। বড়কর্তার অর্শের ব্যথাটায় চাড় লাগায় জায়গাটা দপ দপ করতে লাগল। কি রকম একটা বিরক্তি সারা শরীরে ছাড়িয়ে পড়ল। ঘি ডলে ডলে হাতটাও ধরে এসেছে।

মেজকর্তা আগুনের মালসাটা চুপিসাড়ে টেনে নিলেন। একটা আকন্দের পাতা

আগনের আঁচে গরম করে বড়কর্ত্তার হাতে দিলেন।

বললেন, "হয়েছে, এবার সেঁক দিতে থাকুন।"

বড়কর্ত্তা হাত বাড়িয়ে গরম পাতাটা নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। একটা কাশির বেগ এল, কিন্তু কাশিটা এবার চাপতে পারলেন বড়কর্ত্তা। চাপতে পেরে খুশীই হলেন। আকন্দের তাতটায় বেশ আরাম লাগছে।

কারো মুখে কথা নেই। দুজনে শুধু বসে থাকলেন মুখোমুখি।

জমিজমার ব্যাপারে মেজকর্ত্তা কোনদিনই কোন কথা বলেন নি, আজও বললেন না। ও জিনিস তাঁর মাথায় একদম ঢোকে না। বড়কর্ত্তা যা বললেন তিনি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে তাতেই সায় দিয়ে গেলেন। সব না জানলেও এটা তিনি জানেন, সংসারের মাথায় একটা বিরাট দেনার বোঝা চেপে আছে।

চাকরিটা ছেড়ে এলে এক থোক টাকা পাওয়া যাবে তাঁর কোম্পানীর কাছ থেকে। একটু বুঝে চলতে পারলে সুধাময়ের রোজগার পর্যন্ত ঐ টাকায় চালানো যেতে পারবে। অবশ্য আরেকটা খরচ আছে, চাঁপার বিয়ের। তার এখন দেরি আছে, বছর তিন চার তো বটেই। তার মধ্যে সুধাই দাঁড়িয়ে যেতে পারবে। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে সুধাময়। ফাইন্যাল দেবে এবছর। ক'টা দিন আর!

সুধা খুব বুদ্ধিমান ছেলে, তার জন্য মেজকর্ত্তার কোন দুর্ভাবনা নেই।

মেজকর্ত্তার মনে দুর্ভাবনা দেখা দিয়েছে অন্য কারণে। গহর এসে আজ সকালে যে খবর দিয়েছে, সেটা মোটেই সুবিধের নয়। তখন থেকে তিনি সেই কথাটাই ভাবছেন।

ছোলেমানের ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে। কতদূর যেতে পারে, মেজকর্ত্তা সেই কথাই ভাবছিলেন।

গোপালের নির্দেশে নিরাপদ দশজনের সামনে ছোলেমানকে যখন জুতোর বাড়ি মারছিল, মেজকর্ত্তার চোখে তখন জুতো মারার বর্বরতাটাই খুব প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছিল। ছোলেমান কোনও অপরাধ করেছে কি করেনি, সেটা তিনি জানেন না। সেটা তাঁর কাছে বড় বলে মনে হয়নি। একটা অত্যন্ত বর্বর পদ্ধতিতে একটা মানুষকে অপমান করা হচ্ছে, দশজনের সামনে একটা প্রবল পক্ষ জুতো মারছে একজনের মুখে, এইটেই তাঁর কাছে বড় হয়ে ফুটে উঠেছিল। তাই তিনি গোপালের কাছে আবেদন করেছিলেন ছোলেমানকে নিষ্কৃতি দিতে। বলেছিলেন, বিচার করে সাজা দিতে। গোপাল এক অর্থে তাঁর দুটো অনুরোধই রক্ষা করেছে। তৎক্ষণাৎ ছোলেমানকে মুক্তি দিয়েছিল সে এবং পরে সে ছোলেমানকে সাজাও দিয়েছে, বিচার করেই দিয়েছে। নিরাপদ অভিযোগ করেছিল, ছোলেমান তোলা দিতে অস্বীকার করেছে, আর হাটের ইজারাদারের গোমস্তাকে মেরেছে। দুজন পেয়াদাই একবাক্যে হলপ করে সাক্ষী দিয়েছে, নিরাপদর কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। এবং যেহেতু দুটো অপরাধই গুরুতর, গোপাল তাই বিশেষ বিবেচনাপূর্বক ছোলেমানকে নামমাত্র সাজা দিয়েছে, ও হাটে ছোলেমান আর বসতে পারবে না।

মেজকর্ত্তা ভাবছিলেন, বর্বরতার যা সংজ্ঞা, গোপালের বিচারকে তার মধ্যে ফেলা যায় কিনা? অনেক ভেবেও এটাকে বর্বর বলতে তিনি পারলেন না। একেবারে খাঁটি সভ্য জগতের বিচার করেছে গোপাল। ইংরেজের আদালতেও অনেক সময় এমন সূক্ষ্ম বিচারই ঘটে থাকে। মেজকর্ত্তার আর কিছু বলার মুখ রাখেনি।

কিন্তু এই বিচারে নিকিরিকুল ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। ওরা দরবার করতে গিয়েছিল গোপালের কাছে। গোপাল ওদের হাঁকিয়ে দিয়েছে। এখন নিকিরিরা এক-জোট হয়ে বলছে, বিনাদোষে ছোলেমানকে মারা হয়েছে, ওর মাছ নষ্ট হয়েছে, ওকে অপমান করা হয়েছে, আবার ওকেই সাজা দেওয়া হ'ল! বেশ বিচার বটে!

গহর এসেছিল এই ব্যাপারে মেজকর্ত্তাকে মধ্যস্থ মানতে। মা'জেবাবুর উপর ওদের পাড়ার সকলেরই নাকি অগাধ বিশ্বাস। তিনি নাকি কারো পক্ষ টেনে কথা বলবেন না। সাক্ষী সাবুদ ডেকে তত্ত্ব তালাস নিয়ে যে রায় মা'জেবাবু দেবেন, গহররা মাথা নিচু করে তা মেনে নেবে।

মধ্যস্থ হতে মেজকর্ত্তা রাজি হন নি। গহর ক্ষুণ্ণ মনে চলে গিয়েছে। মেজকর্ত্তা গহরকে বোঝাতেই পারেন নি যে, এক পক্ষের আস্থা থাকলেই মধ্যস্থ হওয়া যায় না, মধ্যস্থতা করতে গেলে দুপক্ষের আস্থাই দরকার। গহররা যেন এমন লোককে সালিশ মানে যার কথা দুতরফেই মানবে।

বলাই বাহুল্য, গহর খুশী হয়নি একথায়। কি ভাবল কে জানে? একথা ভাবল না তো, বিরোধটা গোপালের সঙ্গে লেগেছে বলেই মেজকর্ত্তা কৌশলে পাশ কাটিয়ে গেলেন? ভাবল কি তাই? মনটা খচখচ করতে লাগল তাঁর। বুড়ো হ'লে মানুষ অনেক ভীতু হয়! একথাও তো গহর ভাবতে পারে। কিন্তু এটাই বা কি এমন সান্ত্বনার বাক্য! নিজের উপর মেজ-কর্ত্তা বিরক্ত হলেন। সংকটের মুখে যে হাল ধরতে না পারে তার আবার বড় বড়

কথা বলার সাধ কেন? নিজেকেই তিরস্কার করলেন মেজকর্তা।

গহর যাবার সময় বলে গেল, ছোলেমানের অপমান, তাদের সকলের অপমান বলেই তারা ধরে নিয়েছে। তিল থেকেই ব্যাপারটা আবার তালের আকার না ধরে?

বেলা পড়তেই বদো ভুঁয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে হাজির।

বলল, "এই যে মা'জে খুড়ো, আপনি নাকি গহররে ক'য়েছেন, গুপালের বিচার অন্যায় হয়েছে। ন্যায্য বিচার না হলি তুমরা ওর হাটে ব'সে না।"

বুদো ভুঁয়ের কথা শুনে মেজকর্তার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করলেন। পাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলেন, তাই চুপ করে থাকলেন।

বুদো ভুঁয়ে বলল, "গুপালের গোমস্তার অপমান করাউ যা, গুপালের অপমান করাউ তাই। ও একই কথা। তুমি যার খাবা তার বুকি ব'সে দাড়ি উপড়াবা, এতো হয় না। আর বিচারডা এমন অনেহ্যই যা কি হয়েছে, যারে জেলে পাঠানো উচিত ছিল, তারে হাটে বসতি বারণ করা হয়েছে। আমি আরউ গুপালরে কলাম, গুপাল, হারামজাদা খুনেটারে এত অল্পে ছা'ড়ে দিলে। বিট্টা না'রে, বামুনের গায়ে হাত তুলিছে! এত বড় আস্পর্দা! এই সুযোগে বিটার বিষ দাঁত ক'টা ভাঙ্গে দেওয়া যা'তো। তা গুপাল ক'লো, দাদা, ওগের মত একতা আমাগের যদি থাকতো তো দ্যাখতেন, কি কত্তাম। মা'জে খুড়ো বোধ হয় আমার উপর সেদিন একটু অসন্তুষ্টই হয়ে গেছেন। আমি কলাম, আরে না না, উডা তুমার ভুল। আজ আবার এই কথা শুনছি। বলি ব্যাপারডা কি?"

মেজকর্তা বিরক্তি চেপে বললেন, "গোপালের চোখ তোমার চেয়ে দেখি ভালোই। এখন দেখছি, শুধু চোখ না, তোমার কানেও দোষ আছে।"

মেজকর্তার কথার ধরণে, বুদো ভুঁয়ের উৎসাহ খানিকটা নিভে গেল।

একটু থতমত খেয়ে বলল, "ক্যান খুড়োমশাই, আমার কানের দোষটা দ্যাখলেন কিসি?"

মেজকর্তা বললেন, "আমি যে গহরকে ওকথা বলেছি, তা তুমি শুনলে কার কাছ থেকে? গহর তোমাকে বলেছে?"

বুদো ভুঁয়ে এতক্ষণে জোর পেল।

বলল, "গহরের মুখির থে আমার শুনতি হবে ক্যান? গহর কি আমার মিতে না গুরুঠাউর? আমি যে কথা কলাম, তা বাজারের সবাই জানে। আপনি কি কতি চান, বাজার সুদ্ধ সবারই কানের দোষ হয়ে গেল?"

মেজকর্তা এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না। সম্ভবত একটু বিব্রতই বোধ করলেন। আবার কি সবাই তাঁর বিরুদ্ধে ঘোঁট পাকাচ্ছে নাকি? তাঁর সঙ্গে সবার লড়াই শুরু হবে নাকি আবার? কিন্তু কেন? এবার তাঁর অপরাধ কি? আর তো কারো ভাল করবার বাসনা তাঁর নেই? তাঁর মাথার সেই পোকা মরেছে। তাঁর যৌবনও ফুরিয়েছে। এখন তো তিনি একটা হাটু ভাঙ্গা দ।

না না, আর কারো সঙ্গে বিরোধ নয়, আর কোন ঝামেলা ঝঞ্ঝাট নয়! এবার তিনি নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে চান ক'টা দিন। শেষের ক'টা দিন নিরুপদ্রবে এই গ্রামেই, একটা পরিচিত, তাঁর অত্যন্ত আপন গণ্ডির মধ্যেই কাটাতে চান। যতদিন তেজ ছিল তাঁর, যৌবন ছিল, অফুরন্ত বল ছিল মনে, ততদিন এই গ্রামের বিরুদ্ধে তাঁর একটা প্রবল অভিযোগ ছিল, এককালে তাঁর বিদ্বেষও ছিল। ভেবেছিলেন, আর কখনো পা দেবেন না গ্রামে। ডোমারকেই আপন করে নেবেন। কিন্তু বয়স যখন বাড়ল, স্ত্রীর মৃত্যু হ'ল, তখন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, এতদিন যেখানে কাটালেন, সেটা নিতান্তই বিদেশ। সেখানে তাঁর কোন শিকড় নেই। জন্মসূত্রে যে মাটিতে তিনি বাঁধা পড়েছেন, সেই তাঁর আপন মাটি। একা, সম্পূর্ণ একা, বিদেশে আর থাকতে ভাল লাগে না। তাই তো ঠিক করেছেন, গ্রামেই এসে বাস করবেন।

এখন, বুদো ভুঁয়ের কথা শুনে মেজকর্তা তাই কিছু শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

মেজকর্তা বললেন, "বাজারে কি রটেছে, তা আমি জানিনে। তুমি যা বললে সেই কথাই যদি রটনা হয়ে থাকে, তাহলে শোন, আমি ওর একটা বর্ণও বলিনি।"

কথাটা বলেই মেজকর্তার মনে হ'ল, তিনি কি কৈফিয়ৎ দিতে বসলেন নাকি? কে কি

মিথ্যে কথা রটিয়ে বেড়াবে আর তার জন্য তাঁকে যার তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কেন, কি এমন চোরের দায়ে ধরা পড়েছেন তিনি? তাছাড়া, কে এই বদো? একটা অর্বাচীন, অশিক্ষিত গ্রাম্য গোঁয়ার। ওর আস্পর্দাও তো কম নয়। হঠাৎ দপ্ করে রাগ চেপে গেল তাঁর। ইচ্ছে হ'ল, তক্ষুনি উঠে চলে যান বদো ভুঁয়ের সামনে থেকে।

বদো ভুঁয়ে তৎক্ষণাৎ অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল। মেজকত্তার জবাব শুনে এক গাল হেসে ফেলল সে।

বলল, "খুড়োরে কি আমি চিনিনে। আমি কথাডা শুনা মাত্তর গুপালরে কয়ে দিছি, মা'জে খুড়ো এ ধরনের কথা কওয়ার লোকই না। গুপালের অপমান যে আমাদের সবারই অপমান, সেকথা মা'জে খুড়ো জানেন। আমারে কয়েছেন তিনি।"

মেজকত্তা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললেন, "সেকথা আমি আবার কখন বললাম?"

বদো ভুঁয়ে চোখ টিপে বলল, "আহা,
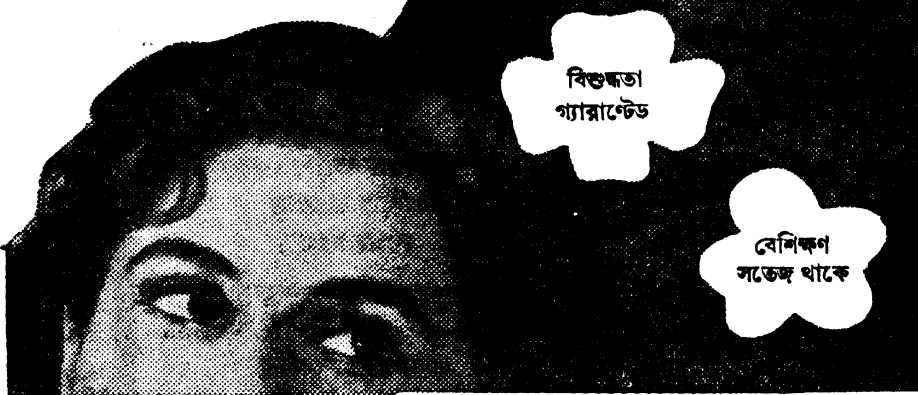
আপনি কবেন ক্যান? আপনার জবানিতি আমিই গুপালরে কইছি। কথাডা তো মিথ্যে নয়। গুপাল এখন আমাগের সমাজের মাথা। ওর মান অপমানে আমাদের সকলেরই মান অপমান।"

মেজকত্তার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল ঠাস করে একটা চড় বুদো ভুঁয়ের গালে কষিয়ে দেন। কিন্তু তা পারলেন না। পারলেন না বলেই রাগের ঝাঁঝটাও বেড়ে উঠল। আরেকবার ভাবলেন, ওটাকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। তাও শেষ পর্যন্ত পারলেন না। বুদো ভুঁয়ে গ্যাঁট হয়ে তাঁর সামনে বসে রইল। তারপর স্থির করলেন, ও যা বকে বকুক, চুপ করে থাকাই শ্রেয়।

বুদো ভুঁয়ে বলল, "অনেক খবরই রাখি। মেন্দা উস্কোয়েছে নিকিরিগের। উরা নাকি আর হাটে বসবে না মাছ বেচতি। না বসলি তো ভারি ক্ষেতি। কোট ধরে ক'দিন থাকো দেখি। গুপাল বলেছে, অন্য জায়গার থে জালে আনবে হাটে। একটা পয়সা হাট-খাজনা নেবে না তাগের থে। দেখি মিঞাগের আস্লানি কদ্দিন থাকে। তুরা আমাগের জাতে মারার চিন্তা করিস, ইবার আমরা তোগের ভাতে মারব।"

সর্বনাশ! এইসব মতলব চলছে নাকি? বলে কি বুদো!

মেজকত্তা বললেন, "দ্যাখ বুদো, তোমরা কি একটা হাঙ্গামা বাধাবে নাকি শেষ পর্যন্ত?"

বুদো হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেজকত্তার মুখের কাছে।

জিজ্ঞাসা করল আওয়াজ চেপে, "উরা কি সেইরকম উয্যুগ করতিছে নাকি? মেন্দা বিটার মনের ইচ্ছেটা কি, কন দেখি মা'জে খুড়ো?"

মেজকত্তা হঠাৎ খুব শীতল হয়ে গেলেন। বললেন, "দ্যাখ বুদো, একটু হিসেব করে কথা বলতে শেখ। মেন্দার মনের খবর তুমি আমাকে জিজ্ঞেস কর কোন সাহসে?"

বুদো ভুঁয়ে বলল, "আপনি আমার উপর রাগই করেন, আর যাই করেন, উচিত কথা কতি বুদো ডরায় না। গুপাল কয়, মেন্দার হাড়ির খবর এই গিরামে শুধু এক মা'জে-বাবুই জানেন। তর সে তো মিথ্যে বলার লোক না। আপনার তো আমাগের সঙ্গে কোন ওঠবোস নেই, যা কিছু ঐ মেন্দার সঙ্গে। তা যাক গে সে কথা, উরা কি সত্যিই হাঙ্গামার জুগাড়যন্তর করতিছে নাকি? তা বাধাক না ইবার কাজিয়া, মুগুরির গুঁতো কারে কয়, মিঞাগেরে বুঝোয়ে দিবানে।"

মেজকত্তা এতক্ষণে বুঝলেন, জল অনেক-দূর গড়িয়েছে। কিসের থেকে কোন ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেল। মেজকত্তার মনের রাগ পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। দুশ্চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

বললেন, "দ্যাখ বুদো, একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে তোমরা কি পাগলামি শুরু করলে। ছোলেমানের বিষয়টা তার চেয়ে একটা নিরপেক্ষ সালিশের হাতে তুলে দাও না। যারা নিজের চোখে ঘটনাটা দেখেছে তাদের সবাইকে ডেকে, বেশ করে খোঁজ-খবর নিয়ে, একটা বিচার হোক। সাজা যার প্রাপ্য, সে পাক।"

বুদো ভুঁয়ে এবারে বেজায় উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, "ব্যাপারটা আপনি যত তুচ্ছ মনে করতিছেন, তত তুচ্ছ নয়। এর ভিতরে অনেক বড় জিনিস লুকোয়ে আছে। আপনি তা জানেন না। হয়ত বোঝবেনও না। মা'জেখুড়ো, এই গিরামে আপনার জন্ম হতি পারে, তবুও আমি কব, আপনি এখেনে বিদেশীর মতনই নতুন। আপনি যদি আমাগের সমাজের লোক হতেন তো বোঝতেন, আমাগের মনে কি আগুন জ্বলতিছে। যারা চিরকাল পায়ের তলায় ছিল, তারা যখন দল পাকিয়ে চোখ রাঙ্গাতি আসে, তখন বুকি অপমানের শেল যে কেমন জোরে বাজে, তা আপনি কি করে বোঝবেন? জমির খাজনা চালি যখন চোখ পাকায়, ফসলের ন্যায্য ভাগ চালি যখন ন্যায্য অন্যাযার বিচার করতি চায়, আমাগের মেয়েদের ধরে ধরে নিয়ে যায়, তখন বুকি যে কি আগুন জ্বলে ওঠে, তার আঁচ আপনি টের পাবেন কি করে? যদি পাতেন তালি আর ইটারে তুচ্ছ বলে উড়োয়ে দিতি পারতেন না। ভা'বে দ্যাখেন, দিনকাল কতদূরি গড়ায়েছে? নিকিরির ব্যাটা ছোলেমান, হারামজাদার বাড় কতদূরে বা'ড়েছে, সে নিরাপদর গায়ে হাত তোলে! আর আপনি ইটারে কন তুচ্ছ। আপনার কাছে তুচ্ছ হতি পারে, আপনি জা'ত মানেন না, আমাগের সমাজের পরোয়াও করেন না। করলি ওগের মোড়ল, ঐ ভেড়ার দলের বাছুর পরামানিক, ঐ মেন্দার ওখানে বসে অম্লানবদনে চা খাতি আপনার বা'ধত, ওগের পক্ষ টা'নে কথা বলতিও পারতেন না। আমাগের মনে আগুনের ছ্যাঁকা অনেক আছে। ছোট ছ্যাঁকাতেও পোড়ে, বড় ছ্যাঁকাতেও পোড়ে। কোনটাই তুচ্ছ নয়।"

বুদো ভুঁয়ে একটু গরম হয়েই উঠে পড়ল। মেজকত্তা লেখাপড়া জানেন। বুদো ভুঁয়ে তাই শ্রদ্ধা করত তাঁকে। সেই শ্রদ্ধায় ভিতে ফাটল ধরেছিল ইদানীং, আজ বেশ নড়ে উঠল। একটা কাপুরুষ, ভেকধারী বুড়ো। মেন্দার চরও হতে পারে। ঘর-শত্রু বিভীষণ। লেখাপড়া শেখার এই পরিণাম! দূর দূর! তাঁর স্বর্গত পিতা যে তাকে লেখাপড়া শেখান নি, সেই

কৃতজ্ঞতায় তাঁর নিরাকার পায়ে ভক্তিভরে প্রণাম জানাল মনে মনে।

বুদো ভুঁয়ের পেটে যে এত কথা থাকতে পারে, এমনভাবে যে সে তা বলতে পারে, সেটা আশা করেন নি মেজকর্তা। বুদো ভুঁয়ের সম্পর্কে তাঁর ধারণা কিছু বদলাল। বুদোর অভিযোগ হয়ত অস্পষ্ট, কিন্তু ঐসব অভিযোগ যে বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে তার মনে তা অতি সুস্পষ্ট। বুদো ভুঁয়ের যা নালিশ, তা এ গ্রামের প্রায় সকলের, বিশেষ করে মাতব্বরদের নালিশ। খাতকরা টাকা দিতে চায় না, চাষী তাদের পরিশ্রমে চাষ করা ফসলের ভাগ অন্যের হাতে তুলে দিয়ে ফতুর হবার সময় অসন্তোষ জানায়, কিছু দুর্বৃত্ত স্বভাবের লোক কখনো কখনো নারীহরণ করে, তাদের উপর অমানুষিক বর্বরোচিত অত্যাচার করে। এ সবই সত্যি। এই গ্রামের, এই মহকুমার, এই জেলার অধিকাংশ চাষীই মুসলমান। তাই অধিকাংশ অপরাধে মুসলমানরাই অপরাধী। মেজকর্তা জানেন, এটাও সত্যি। মেজকর্তার একটা কথা মনে হ'ল, মনে হল যেখানে মুসলমান নেই, সেইসব জায়গাতেও যে এই একই ধরনের অপরাধ (বুদোর চোখে যেগুলো গুরুতর অপরাধ ব'লে মনে হয়) ঘটে বুদো যদি তার খবর রাখত, তাহলে সে এত জোরে কার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করত?

সফীকুলের কথা মনে পড়ল মেজকর্তার। সফীকুলের প্রবল নালিশ হিন্দুদের বিরুদ্ধে। তার ধারণা সরকারী চাকরির সব ধান হিন্দু বুলবুলিতে লোপাট করে দিচ্ছে, তাদের ভাগে আর কিছুই জুটছে না। ব্যবসার সবটুকু হিন্দুরা খেয়ে ফেলছে। মুসলমান চাষীর মুখের গ্রাস খাজনার নামে, সুদের নামে হিন্দুরা জবরদস্তি কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ছোলেমানকে অপমান করল নিরাপদ, তাকে সাজা দিল গোপাল। ন্যায় করুক আর অন্যায় করুক তার দায় দায়িত্ব তো নিরাপদর আর গোপালের। কিন্তু গহর তা মানবে না। তার কাছে ছোলেমানও কেউ না, গোপাল নিরাপদও কেউ না। সে ধ'রে নিয়েছে, বিশ্বাস করেছে, মুসলমানের উপর অবিচার করেছে হিন্দু। বলা যায় না, হয়ত মেম্দা ছাহেবও এই কথাই বিশ্বাস করেন। এরা এভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত এই বিশ্বাস নিয়েই এরা জন্মেছে। মরতেও চায় বিশ্বাসের কোলে মাথা রেখে।

ছোলেমান আর গোপাল। দুজনে ছিল দুটো মানুষ। দুটো সুস্পষ্ট অবয়ব ছিল তাদের। তাদের ধরা যেত, ছোঁয়া যেত। কথা বলা যেত তাদের সঙ্গে। বলা যেত, গোপাল ছোলেমান অপরাধ করেনি। তোমার বোঝার ভুল হয়েছে। ছোলেমানকে ডাক। ভুল করে যাকে সাজা দিয়েছ তাকে কাছে ডেকে দুটো মিষ্টি কথা বল। তাকে বুঝিয়ে দাও, নিরাপদর গায়ে হাত তোলা তোমার উচিত হয়নি ছোলেমান। নিরাপদ অন্যায় করেছে তোমার মাছ ফেলে দিয়ে, তুমি এসে নালিশ করলেই পারতে। তোমার মাছের দাম আমি ওর কাছ থেকে আদায় করে দিতাম। ছোলেমান অমনি দোষ স্বীকার করত। অমনি হাত দুটো জোড় করে বিনীতভাবে বলত, হুজুর, কসুর হয়ে গিয়েছে, মাপ করে দিন। ঐ মাছ ক'টাই ছিল সম্বল হুজুর, তার ঐ দুর্দশা দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। ঘরে হুজুর উপোষ চলছে। ছোলেমানের চোখ টলটল করে উঠত। ওরা যে এই স্বভাবের লোক। গোপাল, ঐ কথা শুনে তোমারও বুক টনটন করে উঠত। নিরাপদকে তুমি ছি ছি করতে। ব্যাপারটা ঐখানেই চুকে যেত। মানুষের দুঃখ মোচন করতে মানুষের আর কতটুকু সময় লাগে।

কিন্তু মানুষ যে মানুষ থাকতে চায় না। ভালবাসে নুনের পুতুল হতে। সমুদ্রের নোনা জলে মিলিয়ে যেতেই তার আগ্রহ প্রবল। তাতে প্রবল গর্জন সহজেই তোলা যায়। ঢেউয়ের গুঁতোয় অস্থির করে দেওয়া যায়। একটা নিরাবয়ব সমষ্টি সম্পর্কে নিদারুণ সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে তোলা যায় সকলের মনে।

তাই তো গোপাল আর গোপাল থাকল না। সে হিন্দু সমাজের বিস্তীর্ণ সমুদ্রের জলে নুনের পুতুলের মতই গলে গেল। ছোলেমানও মিলিয়ে গেল মুসলমান সমাজের মধ্যে।

মেজকর্তা জানেন, বিতর্কে বিশ্বাসের ভিত নড়ানো যেমন যায় না, তেমনি নুনের পুতুলকে যুক্তি দিয়ে বোঝানোও যায় না।

কিন্তু এখন কি কর্তব্য তাঁর?

বুদো ভুঁয়ে মিথ্যে বলে নি। এ গ্রামে তিনি অতিথি। আগে তাঁর একথা মনে হয়নি, এখন, বুদো ভুঁয়ের চাঁছাছোলা কথা শুনে মনে হচ্ছে, সত্যিই তিনি এ গ্রামের কেউ না। কেউ না? এ তাঁর গ্রাম নয়? তবে তিনি কোন্ গ্রামের লোক? মেজকর্তা সে-কথা জানেন না। তবে এটা বুঝেছেন, এ গ্রামের কেউ নন তিনি। কিন্তু কেন, কেন তিনি কেউ নন? এখানে কি তিনি জন্মান নি, এই বাড়ি কি তাঁর নয়? হ্যাঁ তাঁরই। তবে?

গ্রাম কি শুধু একটা নিরেট বাড়ি আর

একটুখানি জন্মাবার জায়গা? গ্রামের লোক, গ্রামের সমাজ, এদের নিয়েই গ্রাম! এরাই হ'ল গ্রাম। এদের সংগে যোগ কোথায় তাঁর? এখানকার সুখ দুঃখে কি বুদোর মত উদ্বেলিত হন তিনি? না। এখানকার ভাবনা চিন্তার শরিক কি তিনি? না। এদের সিদ্ধান্তে কি সায় দিতে পারেন তিনি? না না। তবে, এদের সংগে তাঁর যোগ কোথায়? এই মাটিতে তাঁর শিকড় কোথায়?

মেজকর্তার মনে হল, সত্যিই তাঁর এখানে কোন শিকড় নেই। নেই বলেই এখানকার ঘটনাপ্রবাহে ভাসমান ভেলায় তাঁর ভূমিকা অসহায় এক যাত্রীর। ভাল মন্দ যা-ই কিছু ঘটুক না কেন, কোন কিছুরই মোড় ফেরাবার সাধ্য তাঁর নেই। বুদো ভুঁয়ের এই মাটিতে শিকড় আছে, শক্ত শিকড়। যতই মারাত্মক হোক, একটা ঘটনার সৃষ্টি সে করতে পারে। মেন্দা ছাহেবও পারেন। কারণ ওরা সব নুনের পুতুল। নিজের নিজের সমাজের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে ওরা সহজেই গলে যেতে পারে।

তিনি তা পারেন না। তাঁর শিক্ষা দীক্ষা, তাঁর বিচার বিবেচনা, তাঁর বিবেক তাঁকে নিটোল একটি ব্যক্তিত্ব দিয়েছে। সেটি গোষ্ঠির সমুদ্রে গলে না। গলে না বলেই তো সমাজের সংগে মিলে মিশে পিণ্ডকার হতে তিনি পারেন না। আর গোষ্ঠির সমুদ্র তাঁকে হজম করতে পারে না বলেই তো ঢেউয়ের গুঁতোয় তাঁকে কিনারে ফেলে দেয়। সেই কারণেই তিনি এখানে অপাংক্তেয়। এদের লোক নন। সিন্ধবাদ নাবিকের গল্পের সেই মায়াবী বৃদ্ধের মত ব্যক্তিত্বের এই বোঝাটি মেজকর্তার কাঁধে চেপে আছে। এটি কলকাতার দান। এককালে এই বোঝাটি ছিল তাঁর গর্বের বস্তু। আজ যখন তাঁর বয়স বেড়েছে, শক্তি কমেছে, নিঃসংগ হয়ে পড়েছেন, তখন কি দুর্বহই না হয়ে উঠেছে এই বোঝা!

মেজকর্তাকে কে নিঃসংগ করেছে? এই ঘাড়ের বোঝাটি। কে তাকে তাঁর গ্রাম থেকে, তাঁর সমাজ থেকে, তাঁর আপন জনেদের কাছ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে? এই, এই, এই দৈত্যটি, যাকে তোমরা বিবেক বল, ব্যক্তিত্ব বল, মনুষ্যত্ব বল, সেই দুরারোগ্য ব্যাধিটি।

এখন, এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায় যাবেন তিনি? কোথায় গিয়ে শান্তিতে একটু আশ্রয় নিতে পারবেন? এমন কি, কোথাও জায়গা আছে, যেখানে তিনি তাঁর আপন সমাজ পাবেন? এমন কোন রাজ্য আছে কি, বিবেক যার রাজা? যাত্রাদলের বিবেক নয়, যুক্তি আর বিচারের যে সন্তান, সেই বিবেক।

কেন কলকাতা? কলকাতা! কলকাতাতেও তো সেই নুনের পুতুলদেরই রাজত্ব। মূলে কোন তফাৎ নেই। গ্রামের লোকের বিদ্যে কম, তারা নিজেদের চেহারা ঢাকতে পারে না, কলকাতা ছদ্মবেশ ধরবার কায়দাটা বেশ রপ্ত করেছে। প্রায় তিরিশ বছর আগেই তিনি কলকাতার ছল ধরে ফেলেছিলেন। সে কি যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা! মেজকর্তার কাছে একদিন সভ্যতা আর কলকাতার অর্থ একই ছিল। যে আলোকে তিনি একদিন নতুন জীবনের পথ দেখান আলো বলে মনে করেছিলেন, সেটা যে রং মশাল ছাড়া আর কিছু নয়, এটা যেদিন আবিষ্কার করলেন, সেইদিনই তিনি কলকাতা ছেড়েছেন। কি নিদারুণ ব্যথাই না সেদিন তাঁর বুকে বেজেছিল। এখন আর সে ব্যথা নেই। আছে আতংক। অচেনা ঘরে একা একা রাত কাটাতে শিশুর যে আতংক হয়, সেই আতংক। কোথায় যাবেন তিনি?

কখন তাঁর ঘরে সন্ধ্যা ঢুকে পড়েছে মেজকর্তা তা টের পাননি। এই আরেক জ্বালা। দিনে প্রচুর আলো থাকে। পৃথিবী তখন কত বড় হয়ে যায়। কত প্রসারিত! আর সন্ধ্যা তাকে গুটোতে গুটোতে কত সংকীর্ণ এক ঘরে পুরে ফেলে। তাঁর এই ছোট্ট ঘরখানির মাপে বাঁধা পড়ে পৃথিবী। না, তাও না। আরও অন্ধকার বাড়ে, পৃথিবী আরও গুটোয়। চলে আসে মশারি ঢাকা খাটের চৌহদ্দির ভিতরে। মেজকর্তার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসে। নিঃসংগতা

অসহ্য ঠেকে। অসহ্য। অসহ্য। বড় ইচ্ছে হয়, কেউ এসে কাছে বসুক। গায়ে পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিক। কারোর শরীরের উত্তাপ পেয়ে তাঁর এই নিঃসঙ্গতের ভয় দূর হোক। কেউ এসে দুটো কথা বলুক। তাঁর ক্ষতবিক্ষত মনে একটু স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ুক।

বাড়ির সকলে এখন কাজে ব্যস্ত। মেয়েরা রান্নাঘরে। দাদার বোধ হয় ঘুম এসেছে। সন্ধ্যার সময়টাতেই ঘুম আসে বড়কর্ত্তার। একমাত্র মেজকর্ত্তাই এখন বেকার। একেবারে একা।

হঠাৎ মনে পড়ল নাতির কথা। মনে পড়ল জামাইয়ের চিঠি এসে গেছে। এবার যে কোনদিন সে এসে পড়বে। তার মানে মেয়েরও যাবার দিন ঘনিয়ে এল। তাঁর বুকটা শিন শিন করে উঠল।

বাড়িটা বেশ কিছুদিন ঝিমিয়ে পড়বে। ঐটুকু এক শিশু সমস্ত বাড়িটাকে কেমন ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছিল এতদিন। এবার বাড়িসুদ্ধ সবাই একেবারে বেকার হয়ে পড়বে।

ক্ষুদে ডাকাতটা এ বাড়ির সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে পালাবে। মেজকর্ত্তার মনে হ'ল তাঁকেও ভরত রাজার দশায় ধরেছে। শিশু হরিণের মায়ার শিকল তাঁর পায়েও জড়িয়ে গেছে। বুঝলেন, এবার তাঁর কর্মনাশ হবে।

হঠাৎ মেজকর্ত্তার ইচ্ছে হ'ল, ওকে একটু দেখেন। ইচ্ছে হ'ল, একবার বুকে জড়িয়ে ধরেন ওকে। আবার ভাবলেন, কি আর আছে দেখবার। মেয়ের ছেলে কার ঘরে ক'টা থাকে? স্বভাবের নিয়মেই একদিন তাকে নিজের ঘরে যেতে হবে। যেতে হবে, যাবে! যাবে? এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে? এখনও যে কোলে নিতে পারলেন না নাতিকে? একদিনের তরেও যে বদমায়েসটা উঠল না তাঁর কোলে।

ওদের যে একদিন চলে যেতে হবে, মেজকর্ত্তা একথা তো জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জামাইয়ের চিঠি পাওয়ার আগে পর্যন্তও তো জিনিসটা তাঁর কাছে এমন মারাত্মক সত্যে প্রকট হয়ে ওঠেনি। তা যদি উঠত, তাহলে তিনি কি এত ঢিল দিতেন নাতির সঙ্গে ভাব করতে? মোটেই না। চেষ্টার মাত্রা আরও না হয় বাড়িয়ে দিতেন। দিয়ে দেখতেন কি ফল হয়।

মেজকর্ত্তা আর বসে থাকতে পারলেন না। গুটি গুটি চললেন নাতির ঘরের উদ্দেশে। ঘরে তখন কেউ ছিল না। তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু ঘুমকে তাড়িয়ে সে আপন মনে খেলা করছিল। মেজকর্ত্তা ঢুকে দেখলেন, ঘর ফাঁকা। জোরালো লণ্ঠনটা আরেকটু উস্কে দিয়ে, আস্তে আস্তে তার বিছানার কাছে গিয়ে খপ্ করে তুলেই তাকে এক চুমু খেলেন। আচমকা সেই দাড়ির জঙ্গলে তার মুখটা ডুবে যেতেই সে ভয়ে তারস্বরে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। এ পাশের ঘর থেকে কি হ'ল, কি হ'ল করে ছোট বউ ছুটে এসে মেজ ভাশুরের কোলে তাকে দেখেই জিভ কেটে ঘোমটা টেনে বেরিয়ে গেলেন। প্রায় সেই সঙ্গেই আরেক ঘর থেকে বড় বউ আর গিরিবালাও এসে পড়ল।

বাবার দাড়ি দু মুঠোয় শক্ত করে ধরে ছেলে চোখ বুঁজে চেঁচাচ্ছে আর বাবা তাকে না পারছেন কোলে রাখতে, না পারছেন নামাতে। তাদের দেখে বাবা আরও অপ্রস্তুত হলেন। যেন চোরের দায়ে ধরা পড়েছেন। বাবার মুখ চোখের ভাব দেখে গিরিবালা আর স্থির থাকতে পারল না, খিল খিল করে হেসে ফেলল।

বড় বউ হাসতে লাগলেন।

বললেন, "ও, তুমি? সেউ ভাল। আমি আরউ ভাবলাম, ছেলেরে বুঝি বাঘে ধরল। তা তুমি এখেনে আইছ কোন কম্মে। চুরি ক'রে নাতিরি আদর খাওয়াতি না কি? মাজেবাবু, ইবার বড় কলে পড়িছ। ঐ দাড়ি ইবার মাটিতি গড়াগড়ি দেবে, বুঝিছ। নাতিরি যদি কোলে তুলে নাচাবার শখ থাকে তাহালি পরামানিক ডাকে ঐ জঙ্গল ঝড়ে আ'সোগে।"

সামান্য ব্যাপারটা এতদূর গড়াল দেখে প্রথমটায় অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলেন মেজকর্ত্তা। তার পরে মনে মনে রাগ হ'ল তাঁর। রাগ হ'ল ঐ বিচ্ছুটার উপর।

বড় বউয়ের কথার উত্তরে বললেন, "বয়ে গেছে আমার। লাট সাহেব সামান্য লোকের কোলে উঠতে বড়ই নারাজ দেখছি। তা থাকুন, তিনি পালঙ্কেই থাকুন।"

নাতিকে বিছানায় শুইয়ে দিতেই তার কান্না থেমে গেল। চোখ বড় বড় করে সে দেখতে লাগল মেজকর্ত্তাকে। সেই চাউনিতে মেজকর্ত্তার ব্যক্তিত্ব যেন হেলে পড়ল। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মনকে প্রবোধ দিলেন, তুমি আপন আপন ভাবলে হবে কি, আসলে এ সংসারে কেউ কারো নয়। কি আশ্চর্য, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তামাক খাবার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে উঠল। বড় বাজে কাজে দিনটা গিয়েছে। এতক্ষণে তবু একটা কাজের মত কাজ পাওয়া গেল। (ক্রমশ)

ঊনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

৫

কলিকাতায় ফিরিয়া শুনিলাম, বিশ্বেশ্বর বীরগঞ্জ এলাকায় গিয়াছেন। সুবর্ন সামসেরের সহিত দেখা করিয়া সমস্ত খবর জানাইলাম। তিনি বীরগঞ্জ এলাকায় যাইতে পরামর্শ দিলেন। পশ্চিম নেপালের সবচেয়ে বড় শহর বীরগঞ্জ। স্থির হইয়াছিল যে, এইখানে মুক্তি-সংগ্রামীদের দ্বিতীয় ঘাঁটি স্থাপিত হইবে। সেই উপলক্ষে বিশ্বেশ্বর ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত রক্সৌল গিয়াছেন। অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া বীরগঞ্জে সাংগঠনিক কার্য সম্পূর্ণ করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। বিরাটনগরের তুলনায় বীরগঞ্জে নেপালী কংগ্রেসের সংগঠন দুর্বল ছিল। ইহার বিশেষ কতকগুলি কারণ ছিল। দলের নেতৃত্ব সেইখানে এমন কয়েকজন ব্যক্তির উপর ছিল, যাঁহারা ঐতিহাসিক সম্ভাবনাপূর্ণ সেই সময়কার দাবী মিটাইতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম ছিলেন না। ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মুক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্বে নেপালের রাজনৈতিক জীবন দুইটি পৃথক দলে বিভক্ত ছিল। নেপালের রাজনৈতিক জীবনের ক্রমাবনতি এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তি-সংগ্রামের অনিবার্যতা এই দুইটি দলের মিলন সম্ভব করিয়া দেয়। মিলনের ফলে একমাত্র সংগ্রামী জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে জন্মগ্রহণ করে নেপালী কংগ্রেস। ইহা সত্ত্বেও বিশেষ কয়েক জায়গায় নেতৃত্বের ভিতর নানা-প্রকার গোলযোগ থাকিয়া যায়। এবং ইহার ফলে দলের সাংগঠনিক কার্য সকল স্থানে সমান সুদৃঢ় হয় নাই। বীরগঞ্জ এলাকার বিশেষ সামরিক গুরুত্ব ছিল। নেপালের দ্বিতীয় শিল্প-শহর হিসাবেও ইহা পরিগণিত হইত। এই স্থান হইতে কাঠমাণ্ডু পর্যন্ত সরাসরি একটি রাস্তা থাকিবার ফলে রানাশাহীর পক্ষে বীরগঞ্জের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও আপেক্ষিকভাবে সহজ ছিল। আশা ছিল, এই এলাকায় বিশ্বেশ্বরের উপস্থিতি দলের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করিয়া সংগ্রামের প্রস্তুতি কার্যে প্রাণ সঞ্চার করিবে।

কলিকাতা হইতে ক্লান্তিকর ভ্রমণের পর রক্সৌল পৌঁছিলাম। উত্তর প্রদেশের এই গ্রামীণ শহরটিতে ভবিষ্যতে আরও কয়েক-বার আসিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই স্থানের এমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই, যাহা মনের উপর কোন দাগ কাটিয়া দেয়। সেইজন্য এই শহরটির কোন প্রকার বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করি না। দারিদ্র্য, বস্তি, গরুর গাড়ি, বিশৃঙ্খলা ও ধুলা ভারত-বর্ষের অন্য যে কোন জায়গার ন্যায় এই-

মেজর জেনারেল সুবর্ন সামসের জং বাহাদুর
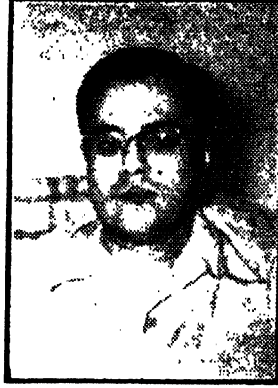
স্থানে প্রচুর। মুষ্টিমেয়ের অমানুষিকতায় কোটি মানুষের জীবনের লক্ষতন্ত্রী বীণা অনাদৃত অবস্থায় নীরবে, নিভৃতে পড়িয়া আছে। মানব-সভ্যতার ঊষার আলোয় উদ্ভাসিত ধন্য এই দেশ ভারতবর্ষ। যুগ-যুগ ধরিয়া বিভিন্ন জাতির পাদস্পর্শে পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে বেদ-বেদান্তের এই দেশ। বুদ্ধ, অশোক, শংকরাচার্য, চৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী ও সুভাষের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ একান্তভাবেই মানবতার দেশ। লক্ষ যুগের সাধনায় প্রাণের ক্ষুধা মিটাইবার বিচিত্র আয়োজন হইয়াছে এই ভারতবর্ষে। বারানসী ও বুদ্ধগয়া ইহার অবিনশ্বর সাক্ষী। কিন্তু মানুষের পেটের ক্ষুধা মিটাইবার আয়োজনে দয়াহীন নিষ্ঠুর কার্পণ্য দেশের সমস্ত শুভ প্রচেষ্টার উপর লেপিয়া দিয়াছে অন্তহীন কালিমা। জানি না কোন অদৃশ্য বিধাতার খামখেয়ালী নির্দেশে করুণা ও নিষ্ঠুরতার এই জঘন্য সমাবেশ হইয়াছে এই দেশে। যাহা হউক, নেপালের মুক্তি-সংগ্রামের কাহিনী লিখিবার প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ অবান্তর। বিশ্বেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহার নিকট পূর্বাপর সমস্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি করিতে হইল। সকল কথা শুনিয়া কিছুটা নিরাশ হইলেও অতি শীঘ্র পরবর্তী কর্তব্য নির্ধারণ করিলেন। স্থির হইল পরদিন কলিকাতায়

ভবিষ্যতের আশা-ভরসাহীন নেপালী দম্পতি
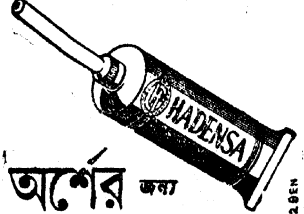
ফিরিয়া সুবর্ণ সামসের এবং মহাবীর সামসেরের সহিত আলোচনা করিয়া পরিবহন সম্পর্কিত জটিলতার নিষ্পত্তি করিতে হইবে। আপাতত স্থানীয় কর্মীদের নিকট এই ব্যাপার উল্লেখ করিতে নিষেধ করিলেন তিনি, পরন্তু ঐদিন রাত্রে দলের কার্যালয়ে স্থানীয় কর্মীদের একটি সভা আহ্বান করিয়া ঐ সমাবেশে কিছু আশার কথা বলিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার সহিত ইহাও তিনি স্পষ্টরূপে জানাইলেন যে, অন্যথায় তথাকার সংগঠনের কার্যে অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। বলা বাহুল্য, নির্দেশানুসারে কর্তব্য সম্পাদিত হইল। সেই এলাকার মুক্তি-সংগ্রামীদের সহিত মিলিত হইয়া প্রচুর উৎসাহ পাইলাম। কিন্তু হাতিয়ার সংগ্রহের প্রারম্ভিক প্রচেষ্টার অসাফল্যের দরুণ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত আশাব্যঞ্জক কথা বলিতে পারিলাম না। মুক্তি-সংগ্রামের সফল পরিণতি সম্বন্ধে তাঁহাদের বলিষ্ঠ বিশ্বাস মুগ্ধ করিল বটে, কিন্তু আমার মনের দ্বন্দ্ব মিটাইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট ছিল না। যদিও সেই রাত্রে বিশ্বেশ্বর বিশ্বাসের মূর্তিহীন প্রতীকে পরিণত হইয়াছিলেন।

আধুনিক সভ্যতার প্রতীক বাষ্পীয় ইঞ্জিন পুনরায় আমাদের কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিল। সন্ধ্যায় সুবর্ণ সামসেরের গৃহে সাক্ষাৎ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া স্টেশন হইতে বিশ্বেশ্বরের নিকট বিদায় লইলাম। কয়েকটি ব্যক্তিগত কাজ অবশ্যকরণীয় ছিল। ইহা শেষ করিয়া বৈকালে সুবর্ণ সামসেরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। বিশ্বেশ্বর এবং সুবর্ণ সামসের উপস্থিত, মহাবীর সামসের তখনও পৌঁছায় নাই। চা-পান ও খোশগল্প করিয়া কিছু সময় অতিবাহিত হইল। আরও খানিক সময় কাটিল তাঁহার নিজস্ব গ্রন্থাগার দেখিয়া। রানা বংশে জন্মগ্রহণ এবং জন্মগত অধিকার সূত্রে জেনারেল পদবীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এই মার্জিত রুচিসম্পন্ন মানুষটি বিশেষ উচ্চশিক্ষিত। নিজ দেশ হইতে নির্বাসিত এই মিষ্টভাষী মানুষটি তদানীন্তন নেপালের কার্যত মালিক—বর্বরতার প্রতিমূর্তি মোহন সামসেরের স্বজন। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় বিশ্বাসী সুবর্ণ সামসের অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া নেপালের মুক্তি-সংগ্রামকে সফল করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থাগারে বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক রক্ষিত হইলেও উহার দ্বার বন্ধু-বান্ধবের নিকট সর্বদাই খুলিয়া রাখা হইত। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর মহাবীর সামসের আসিলেন।

কতক মানুষ আছে, যাহাদের চেহারা স্বভাবতই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। লক্ষ মানুষের ভিতর থাকিলেও এই মানুষগুলিকে চিনিয়া লইতে কোন কষ্ট হয় না। মহাবীর সামসের ইঁহাদেরই একজন। সুবর্ণ সামসেরের এই নিকটআত্মীয়টি একই অবস্থা বিপর্যয়ে কলিকাতায় নির্বাসিতের জীবনযাপন করিতেছিলেন। বিশেষ প্রভাবশালী এই ব্যক্তির নিকট নেপালী কংগ্রেস মুক্তি-সংগ্রামে উপযুক্ত পরিমাণ সাহায্যের আশা করিত। সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা জ্ঞাপন করিয়া পরিবহণ সমস্যার কথা উল্লেখ করা হইল। বলা বাহুল্য যে, বিদেশ হইতে হাতিয়ার খুব সম্ভব মিলিতে পারে, কিন্তু উহা তথা হইতে নেপালে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সমস্যা অত্যন্ত জটিল এবং সেই কারণেই তাঁহাকে ইহার সমাধানের ভার লইতে হইবে। সমস্ত কথা শুনিবার পর জেনারেল মহাবীর সামসের জঙ্গ বাহাদুর রানা কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। আশা হইল, পথের সন্ধান হয়ত বা মিলিয়া যাইতে পারে। মার্জিত রুচিসম্মতভাবে সজ্জিত সুবর্ণ সামসেরের সেই শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত বৈঠকখানা ঘরের আবহাওয়া, সিগারেটের ধোঁয়া এবং মহাবীর সামসেরের নীরবতায় বিশেষ ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। টেবিলের উপর রক্ষিত ডিবা হইতে একটি সিগারেট লইয়া বিশ্বেশ্বর ধূমপান করিতে শুরু করিলেন। বুঝিলাম, উত্তেজনা দমনের জনাই এই উপায় অবলম্বন। কারণ বহুদিন ধরিয়া গলদেশে কঠিন ক্যান্সার ব্যাধিতে ভুগিবার জন্য তাঁহার ধূমপান করা নিষিদ্ধ ছিল। ইদানীং প্রায়শই উত্তেজনা দমনের জন্য ধূমপান করিতে দেখিতাম। কয়েকবার তাঁহাকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছি। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। কেমনধারা এক বেপরোয়া ভাব তাঁহার ভিতর আসিয়াছিল,

যাহার ফলে নিজের সম্পর্কে ক্ষমাহীন উপেক্ষা তাঁহার কাজে এবং কথায় বারে বারে পরিলক্ষিত হইত।

মহাবীর সামসের নীরবতা ভঙ্গ করিলেন। অত্যন্ত ধীরে, চিন্তাবিজড়িত-স্বরে সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা পেশ করিলেন। তাঁহার মতে জাহাজযোগে বিদেশ হইতে হাতিয়ার আনিবার ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয় হইবে। উহা খিদিরপুর ডকে হাজির করিতে পারিলে সেইখান হইতে রেলযোগে নেপাল লইয়া যাওয়ার বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। অবশ্য পুলিস এবং শুল্ক বিভাগকে ফাঁকি দিবার প্রশ্ন রহিয়াছে। যেভাবেই হউক, ইহার একটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। উপযুক্ত ব্যক্তির মারফতই এই কার্যোদ্ধার সম্ভব এবং এজন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু করিতে তিনি প্রস্তুত। অবশ্য উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া কঠিন। কিন্তু ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় তাঁহার অজ্ঞাত। তাঁহার কথা শেষ হইলে বিশ্বেশ্বর এই সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানিতে চাহিয়া আরও কয়েকটি প্রশ্ন করিল। তিনি জবাব দিলেন বটে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে এই পরিকল্পনা উপস্থিত কাহারও বিশেষ মনঃপূত হইল না। জাহাজে করিয়া হাতিয়ার আনিতে হইলে কোন জাহাজ কোম্পানীর সহিত গোপন চুক্তি করিতে হইবে। কিন্তু এই ধরনের কোন জাহাজ ব্যবসায়ীর সহিত কাহারও সংযোগ ছিল না। তদুপরি সময়ের প্রশ্ন আছে। প্রস্তাবে রাজী হইবে এইরূপ কোন জাহাজীর সন্ধান মিলিলেও, ইহা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। পরিবহণ স্থির করিতে সময় সংক্ষেপ করা বিশেষ প্রয়োজন, কেননা বিদেশ হইতে যে-কোনও দিন আহ্বান আসিতে পারে। সর্বোপরি স্থানীয় পুলিস এবং শুল্ক বিভাগকে ফাঁকি দিয়া কার্যোদ্ধার করা নিশ্চিতভাবে অসম্ভব বলিয়াই পরিগণিত হওয়া উচিৎ। এতগুলি বাধার একত্র সমাবেশ যে পরিকল্পনায়, সেই সম্পর্কে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক, অতএব অধিক সময় ব্যয় না করিয়া অন্য-কোন উপায় নির্ধারিত হউক। উত্তরে মহাবীর সামসের জানাইলেন যে, এই বিষয়ে অন্য-কোন পথ নির্দেশ করা তাঁহার চিন্তাবহির্ভূত। অবশ্য উপস্থিত কাহারও অন্য-কোন যুক্তিপূর্ণ পরিকল্পনা থাকিলে তিনি উহা বিবেচনা করিতে প্রস্তুত। এতক্ষণ বিশ্বেশ্বর টেবিলের উপর রক্ষিত একটি ক্ষুদ্রাকৃতি বিমান লইয়া নাড়াচাড়া করিতে ছিলেন। মহাবীর সামসেরের কথা শেষ হইবামাত্র বিশ্বেশ্বর বলিলেন যে, একটি বিমানের ব্যবস্থা করিতে পারিলেই পরিবহণ সমস্যার সহজ সমাধান করা যাইতে পারে। চুক্তিবদ্ধ বিমান প্রায়শই দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিয়া থাকে। এইক্ষেত্রেও একটি চুক্তিবদ্ধ বিমান সাহায্যকারী দেশে

নিঃসহায় জননী কঠিন পরিশ্রমের উপার্জনে সন্তান পালন করে কোনো রকমে

পাঠান যাইতে পারে। অবশ্য এই পরি-কল্পনাতেও প্রচুর বিপদ আছে। কিন্তু বিদেশী বন্ধুরা যদি তাঁহাদের প্রান্তে পুলিস এবং শুল্ক বিভাগকে ফাঁকি দিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন, তবে অধিক অসুবিধা অন্তর্হিত হইবে। এই প্রান্তে কোন নিয়মিত বিমান-বন্দরে অবতরণ না করিয়া বিমানটি নেপাল সীমান্তের নিকট অবস্থিত বিহারের স্বল্প-ব্যবহৃত যে কোনও অবতরণ-ঘাটিতে অবতরণ করিতে পারে, বিহিটাতে এইরূপ একটি অবতরণ-ঘাটি আছে, যাহা কচিৎ কখনও ব্যবহৃত হয় এবং সেইখানে পুলিস অথবা শুল্ক বিভাগের কোন প্রকার দপ্তরও নাই। বিহিটায় অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছাইয়া দিলে তথা হইতে রেলযোগে উহা বিরাট নগর এবং বীরগঞ্জে প্রেরণ করা বিশেষ অসুবিধা-জনক হইবে না। বিশেষ করিয়া বিমানের ব্যবস্থা সহজেই করা যাইতে পারিবে। হিমালয়ান অ্যাভিয়েশন নামক যাত্রী ও মালবাহী বিমান প্রতিষ্ঠানটির প্রধান পরিচালক মহাবীর সামসের এবং এই

শীতকালে উদরপূর্তির জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা : রোদে শুকিয়ে রাখা হচ্ছে

প্রতিষ্ঠান হইতে চুক্তিবন্ধ একটি বিমান সংগৃহীত হইতে পারিবে। সুবর্ণ সামসের এই পরিকল্পনা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিলেন। মহাবীর সামসের আপত্তি জানাইলেন না, তবে কোনরূপ মতামত প্রকাশ করিলেন না। পরদিন নিজ মত জানাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলে, সেই রাত্রির মত আলোচনা মুলতুবী রহিল।

পরদিন বৈকালে মহাবীর সামসেরের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। তিনি বলিলেন যে, নিজ কোম্পানী হইতে একটি বিমানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার কোন অসুবিধা নাই কিন্তু কোন প্রকারে ইহা কর্তৃপক্ষের গোচর হইলে প্রতিষ্ঠানের সমূহ বিপদ হইতে পারে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অপরিসীম দণ্ড হইবেই, অধিকন্তু সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি সরকার বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবে। তাঁহার কথার যুক্তি স্বীকার করিয়া বিশ্বেশ্বর কিছুটা আবেশের সহিত বলিলেন যে, নেপালের লক্ষ মানুষের সমস্ত কিছু নির্ভর করিতেছে মুক্তি-সংগ্রামীদের সাফল্যের উপর। প্রতিপদেই সীমাহীন অন্তরায় আছে, তথাপি এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। অন্য-কোন উপায় থাকিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই এই অনুরোধ করা হইত না। সহস্র বিপদের সম্ভাবনা থাকিলেও তাঁহাকে একটি বিমানের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। বিদেশী বন্ধুরা যে কোনও দিন টেলিগ্রাম করিতে পারে সুতরাং আর কালক্ষেপ না করিয়া সেইদিনই এই সম্পর্কে একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। সুবর্ণ-সামসেরও ইহাতে সায় দিলেন। অতঃপর মহাবীর সামসের বিশেষ বাক্য ব্যয় না করিয়া একটি চুক্তিবন্ধ বিমান সংগ্রহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। স্থির হইল তিনি হিমালয়ান অ্যাভিয়েশনের কর্মসচিব মিঃ টমসেট্‌কে টেলিফোনযোগে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবেন এবং সুবর্ণ সামসেরের ভাগিনেয় থিরবম্ মল্লকে সঙ্গে লইয়া আমি কর্মসচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই বিষয় চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিয়া লইব। থিরবম্ মল্ল নিকটেই ছিল। তাহাকে আহ্বান করিয়া সুবর্ণ সামসের আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তেইশ বৎসর বয়স্ক এই নেপালী যুবক অতঃপর পরবর্তী কর্মসূচী স্থির করিল। ঠিক হইল যে রাত্রি দশটা নাগাদ গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে যাইয়া মিঃ টমসেট্-এর সহিত আমরা সাক্ষাৎ করিব।

বিশ্বেশ্বরের সহিত এক হোটেলে আহারাদি সারিয়া নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই মল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। মল্ল সেই সময় চৌরঙ্গী রোড়ের উপর কনক বিল্ডিং-এর পাশে একটি অতি পুরাতন বাড়িতে বাস করিত। নীচের তলায় তাহার দুইখানি ঘর। প্রায় স্পার্টান সরলতার সহিত সজ্জিত বৈঠকখানায় মল্ল আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। থিরবম্ মল্লের চেহারায় বিশেষ কোন অসাধারণত্ব তখন লক্ষ্য করি নাই। দেরাদুন সামরিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত এই যুবক রাজনীতির শতরঞ্চে বিশেষ আকৃষ্ট হইত না; নেপালের মুক্তি-সংগ্রাম অবশ্য সম্পূর্ণ অন্য বিষয় ছিল। আত্মীয়স্বজনের সহিত সেও দেশ হইতে নির্বাসিত; কিন্তু বিদেশী নগরীর শত

বিলাসিতায় দিন যাপিত হইলেও নির্বাসিতের জীবন অসহ্য। ইহা অপেক্ষা নেপালের দারিদ্র্য ও পাহাড় একান্ত কাম্য। অতএব শিকল ভাঙিতে হইবে। নেপালকে বন্ধনমুক্ত করিতে হইবে। সেইদিন তাহাকে দেখিয়া চিন্তাও করি নাই যে, অদূর ভবিষ্যতে এই মানুষটি অবিশ্বাস্য সাহসের পরিচয় দিবে বীরগঞ্জের ধূলিধূসরিত রণক্ষেত্রে। অবশ্য তাহার কথাবার্তায় সৈনিকের স্বাভাবিক শৃংখলতা লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যাহা হউক, মল্লের সহিত গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে হাজির হইলাম। মিঃ টমসেট তখনও হোটেলে ফেরেন নাই। তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। মুখ্যত বিদেশীদের জন্য পরিচালিত হোটেলগুলিতে রাত্রিবেলায় একটা রম্য পরিবেশের সৃষ্টি হইয়া থাকে। সুরার ঝাঁঝাল গন্ধ ও পশ্চিমী যন্ত্রসংগীতের মূর্ছনা, কোমল আলো ও সান্ধ্য বেশভূষায় সজ্জিত নরনারীর সমাগম,—সমস্ত মিলিয়া প্রায় একটি স্বপ্নরাজ্য গড়িয়া উঠে। সেই পরিবেশের মধ্যে নিজেকে বেশ খানিকটা বেমানান লাগিতেছিল। নীতিবাগীশ নহি এবং ইহা বিশ্বাস করি যে, জীবনটাকে সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিবার জন্য সবকিছুরই প্রয়োজন আছে। নীতির দোহাই দিয়া উপভোগ্য কোন বস্তু হইতেই মানুষকে বঞ্চিত করা উচিত নহে। কিন্তু নিশ্ছিদ্র জমাট অন্ধকারের মাঝে তীক্ষ্ম আলোর বিন্দু যেমন চোখ ঝলসিয়া দেয়, ঠিক সেইভাবেই অন্তহীন দারিদ্র্যের ভিতর অফুরন্ত প্রাচুর্যের অতি সীমাবদ্ধ সমাবেশ বিশেষ দৃষ্টিকটু। যাহা হউক, বেশীক্ষণ এই ধরনের উদ্দেশ্যহীন চিন্তা করিয়া কাটাইতে হইল না; মিঃ টমসেট হোটেলে ফিরিলেন।

পরিচয় পর্ব শেষ করিয়া মল্ল আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল। মিঃ টমসেট সমস্ত খবর মহাবীর সামসেরের নিকট পূর্বেই শুনিয়াছিলেন, অতএব অনাবশ্যক আলোচনার কোন প্রয়োজন ছিল না। মধ্যবয়সী এই ইংরেজ ভদ্রলোকটি তাঁহার জাতিগত বাক্‌শৃংখলার সহিত অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, চুক্তিবদ্ধ বিমান বিদেশে প্রেরণ করিতে বিশেষ অসুবিধা হইবে না। খুঁটিনাটি কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। মালবহন করিবার উদ্দেশ্যে বিমানটি চুক্তিবদ্ধ করা হইবে। কিন্তু বিদেশী বিমান বন্দর হইতে মাল সংগ্রহ করিবার পরিবর্তে হাতিয়ার বোঝাই করিয়া বন্দর পরিত্যাগের পূর্বে সরকারী লগ্‌বুকে বিমানটি খালি ফিরিয়া যাইতেছে বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে। আরও একটি বিষয় নজর রাখা প্রয়োজন। বিদেশী বন্দর পরিত্যাগের সময় বেতারে কলিকাতা বিমান বন্দরকে জানাইয়া দেওয়া হইবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টার ভিতর বিমানটি ফিরিয়া না আসিলে কর্তৃপক্ষ বিপদ আশংকা করিয়া অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করিতে পারেন; অতএব এই সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। হিসাব করিয়া দেখা গেল, যে বিদেশী বিমান বন্দর হইতে বিহিটা পৌঁছাইতে এবং তথা হইতে কলিকাতা বন্দরে অবতরণ করিতে বিমানটির নির্দিষ্ট সময়ের চাইতে এক ঘণ্টারও কিছু বেশী সময় লাগিতে পারে। অবশ্য অনুকূল আবহাওয়ায় সময় সংক্ষেপ করা সম্ভব হইতে পারে। অন্যথায় বিপদের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। উপায় নাই, অতএব অপর বাধা-বিপত্তির সহিত এই বিপদের ঝুঁকিও লইতে হইবে। স্থির হইল, এই সম্পর্কে যাবতীয় করণীয় কর্তব্য তিনি যত শীঘ্র সম্ভব সমাপ্ত করিয়া রাখিবেন, যাহাতে বিদেশী বন্ধুদের সংকেত পাইলেই একটি বিমান তথায় প্রেরণ করা যায়। মিঃ টমসেটের নিকট যখন আমরা বিদায় লইলাম তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর।

আশংকা এবং দুশ্চিন্তা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছিল। বিদেশ হইতে ফিরিবার প্রায় দুই সপ্তাহ পরেও বিদেশী বন্ধুদের নিকট হইতে কোন সংবাদ আসিল না। বুঝিবার কোন উপায় ছিল না যে, কতদিনের মধ্যে হাতিয়ার পাওয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আরও একবার বিরাটনগর গিয়াছিলাম। নেপালের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি আরও বিভীষিকাময় আকার ধারণ করিতেছিল। রাজনৈতিক বাস্তুহারার সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতেছিল। কাঠমাণ্ডু হইতে সংবাদ আসিল যে, জেলের ভিতর রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলিতেছে। নেপালী কংগ্রেস নেতা গণেশমান সিং-এর সহিত আরও কয়েকজন মুক্তি-সংগ্রামী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এবং যে কোনও দিন তাঁহাদের জীবনাবসান হইতে পারে। গণেশমান কিছুদিন পূর্বে নেপালী কংগ্রেসের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া ছদ্মবেশে কাঠমাণ্ডুতে গিয়াছিলেন। অতি গুরুত্বপূর্ণ "উদ্দেশ্য" লইয়া তিনি সেইখানে গিয়াছিলেন। সমস্ত বিপদ তুচ্ছ করিয়া এই স্বল্পভাষী মানুষটি নিজের জীবনের বিনিময়ে দেশের মুক্তি ক্রয় করিবার জন্য কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর কয়েকটি চরম বিপজ্জনক কার্যের ভার ন্যস্ত ছিল, এবং ইহাও স্থির ছিল যে, সম্ভব হইলে প্রধানমন্ত্রী মোহন সামসেরের প্রাণহীন দেহ কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় রাখিয়া আসিবেন। ভাবপ্রবণ সাহস নহে, কঠিন ইস্পাতের ন্যায় হিসাব করা সাহসের অধিকারী এই মানুষটির জীবন প্রদীপ তিলে তিলে কাঠমাণ্ডুর আলোহীন, বাতাসহীন, মধ্যযুগীয় পাষাণ কারায় নির্বাপিত হইতেছে। হয়ত আজ, আগামীকাল, অথবা তাহার পরদিন আত্মীয়স্বজন, বন্ধুর সমবেদনাময় স্নেহদৃষ্টির বাহিরে কাঠমাণ্ডুর সেই তুহিন শীতল পাষাণ কারায় জল্লাদের কুঠারাঘাতে গণেশমানের তপ্ত রক্ত এই মাটির পৃথিবীর এক তৃষ্ণার্ত কোণের পিপাসা মিটাইবে। শোক প্রকাশ করিবার জন্য কোন বন্ধু সেখানে থাকিবে না, ফুলের মালা দিবার

নেপালের এক পল্লী অঞ্চল

জন্য অনুরাগী জুটিবে না—কোন স্বজনের দীর্ঘশ্বাসে আকাশ বাতাস ভরিয়া উঠিবে না। আরও কত এমনি গণেশমান নেপালের পাহাড়ে জঙ্গলে মুক্তির স্বপ্ন দেখিতেছে, কে জানে! বিরাটনগরের বন্ধুরা সকলেই সমস্বরে সংগ্রাম শুরু করিবার দাবী জানাইল। সকলেই একমত যে, আর কালক্ষেপ কিছুতেই করা যাইতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বেশ্বরের সহিত আলাপ হইতেছিল নেপালী কংগ্রেসের যোগবাণীর অফিসে। অন্যান্য অনেকেই উপস্থিত ছিলেন সেইখানে। অবশ্য বিদেশী সাহায্য সম্পর্কে কোন কথাবার্তা হইল না। এই বিষয়টি অতি সতর্কতার সহিত গোপন রাখা হইয়াছিল। বিশ্ববন্ধু এবং বিশেষ করিয়া তারিণী বলিল যে, যদি হাতিয়ার না পাওয়া যায় তবে কিছু গ্রেনেড এবং ডিনামাইট্ সংগ্রহ করিয়া দিলে তাহারা সেই অঞ্চলে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ শুরু করিতে পারে। সরকারী ফৌজের সংখ্যা প্রত্যহই বৃদ্ধি পাইতেছে; এই অবস্থায় অন্ততপক্ষে জনসাধারণের, বিশেষ করিয়া মুক্তি-সংগ্রামীদের মনোবল বজায় রাখিবার জন্য কিছু আক্রমণাত্মক কাজ করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহাদের কথাবার্তা শুনিয়া কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম। তারিণীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলাম যে, কলিকাতা পেণছিয়া যে-কোন উপায়ে হাতিয়ার এবং অন্যান্য আবশ্যক জিনিস সংগ্রহ করিয়া, শীঘ্রই বিরাটনগর ফিরিব। ততদিন পর্যন্ত সে যেন অপেক্ষা করিয়া থাকে।

কলিকাতা ফিরিবার পথে ট্রেনে বিশ্বেশ্বরকে বলিলাম যে, বিদেশী বন্ধুদের নিকট হইতে কোন সংবাদ না পাইলেও, পুনরায় সেইখানে যাওয়া প্রয়োজন। অকুস্থলে হাজির থাকিলে তাগাদা দিয়া কার্যোদ্ধার করা সম্ভব হইতে পারে। প্রয়োজন নিজেদের, সুতরাং কিছুটা সময় এবং অর্থের অপচয় অবশ্যই সহ্য করিতে হইবে। তাঁহার এই বিষয়ে কোন অমত ছিল না। শুধু বলিলেন যে, বিদেশযাত্রার পূর্বে যে কোন উপায়ে বেশ কিছু পরিমাণে বিস্ফোরক পদার্থ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে প্রয়োজনানুযায়ী শক্তিশালী বোমা তৈয়ারী করিতে সক্ষম—এমন একজন ব্যক্তি জুটাইতে হইবে। কলিকাতায় বেশী-দিন অপেক্ষা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না, একবার দিল্লী যাওয়া দরকার। হাতিয়ার আনিবার জন্য চুক্তিবদ্ধ বিমানের প্রয়োজন এবং এই বিষয় পরামর্শ করিবার জন্য দিল্লীতে কয়েকজন সহানুভূতিশীল বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক। দিল্লীর এই বন্ধুদের পরিচয় আমার অজ্ঞাত নহে। কিন্তু যে কারণে বিদেশী বন্ধুদের নামোল্লেখ করা অনুচিত, ঠিক সেই একই কারণে এইখানেও নীরব থাকিতে হইবে।

কলিকাতায় ফিরিয়া দুই তিনদিনের ভিতর কিছু বিস্ফোরক পদার্থ জোগাড় হইল। ইতিমধ্যে নিজ পল্লীবাসী প্রভাত বসু এবং অন্য একজন তরুণ বন্ধু পানাগড় হইতে প্রচুর পরিমাণে ৩০৩ রাইফেল বুলেট সংগ্রহ করিয়াছিল। সোস্যালিস্ট পার্টির বিশিষ্ট সভ্য সত্যব্রত সেন এই ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেন। পানাগড় হইতে ফিরিবার পথে তাহারা বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছিল; অবশ্য বিপদের জন্য তাহারা প্রস্তুত ছিল। অল্প বয়স হইতে প্রভাত এবং অপর বন্ধুটি সক্রিয়ভাবে সোস্যালিস্ট পার্টির সহিত জড়িত। যাহা হউক, সংগৃহীত জিনিসগুলি বিশ্বেশ্বরের নির্দেশমত ডালহৌসী স্কোয়ারে এক বাড়িতে বিজয়লক্ষ্মীর নিকট পেণছাইয়া দিলাম। সে বিশ্বেশ্বরের ছোট বোন। বিজয়লক্ষ্মী এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে এম এ পড়িতেছিল। মাতৃভূমির বন্ধন মুক্তির যজ্ঞে সেও ব্রতী ছিল। সবেমাত্র জীবনের চলার পথে শুরু হইয়াছিল তাহার যাত্রা। কিন্তু বাধাবন্ধনহীন যাত্রাপথের শুরুতেই আসিল দুর্দমের ডাক, দেখা দিল কালবৈশাখীর উন্মত্ততা। অপূর্ব লাবণ্যময়ী সেই তরুণী তাহার প্রাণোচ্ছল হাসির আবরণের আড়ালে পেণছাইয়া দিল মুক্তি সংগ্রামীদের রাইফেল, বুলেট আর বোমার বিস্ফোরক। বিশ্বেশ্বর তাহার কর্মসূচীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিল। ঠিক হইল, দুই একদিনের ভিতরই আমাকে পুনরায় বিদেশ যাত্রা করিতে হইবে। বিজয়লক্ষ্মীকে সঙ্গে লইয়া বিশ্বেশ্বর বিরাটনগরে সংগৃহীত জিনিসগুলি পেণছাইয়া দিয়া পাটনার পথে দিল্লী যাত্রা করিবে। বোমা তৈয়ারীর জন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তির সন্ধানের ভার সুবর্ণ সামসেরের উপর অর্পিত হইল। (ক্রমশ)

আজমীরে সর্বোদয় সম্মেলন

চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী

গত ২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী ও ১লা মার্চ আজমীরে একাদশ সর্বোদয় সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। আজমীরে খাজা মঈনুদ্দীন সানজারির দরগাহ্ (সমাধিস্থান)। তিনি ইসলামের প্রথম যুগের এক প্রধান সন্ত ছিলেন। অন্য যেসব সন্ত ভারতে ধর্মপ্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ধর্ম প্রচারের পর আরব বা পারস্যে তাঁহাদের স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু খাজা মঈনুদ্দীন সানজারি ফিরিয়া যান নাই। তিনি ভারতকেই নিজের বাসস্থান করিয়া লইয়াছিলেন। এখানেই তাঁহার তিরোধান হয়। কথিত আছে যে, তিনি ও তাঁহার গুরু খাজা ওসমান হারুনি মাক্কি চিশ্তি একদা হজরত মোহম্মদের দরগাহ্ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তখন সেই দরগাহের মধ্য হইতে এক বাণী তাঁহারা শুনিতে পান। ঐ বাণীতে খাজা মঈনুদ্দীন সানজারিকে ভারতবর্ষে গিয়া ধর্ম প্রচার করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহা রসুলের তিনশত বৎসর পরের ও এখন হইতে ৮ শত বৎসর পূর্বের কথা। তাঁহাকে নবাব-ই-রসুল বলা হইত (অর্থাৎ রসুলের প্রতিনিধি)। এজন্য আজমীরে তাঁহার সমাধিস্থান ভারতীয় মুসলমানদের নিকট দ্বিতীয় মক্কা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা মক্কা তীর্থদর্শনে যাইতে পারেন না, তাঁহারা আজমীর দরগাহ্ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। ১৯৪৯ সালের সাম্প্রদায়িক অশান্তির সময়ে আজমীর দরগাহের উপর আক্রমণ হওয়ার আশংকা থাকায় উহার রক্ষার জন্য বিনোবাজী সেখানে গিয়া ৭ দিন অবস্থান করেন। ইহার ফলে দরগাহের বিপদাশংকা দূরীভূত হয়। তাহাতে মুসলমানগণ কৃতজ্ঞতায় এরূপ অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে নামাজের পর বিদায় দেওয়ার সময়ে সমবেত মুসলমানগণ শ্রদ্ধাভরে তাঁহার হস্ত চুম্বন করেন। দেড় ঘণ্টা যাবৎ অনবরত হস্ত-চুম্বন চলিতে থাকে। ১০ বৎসর পরে বিনোবাজী আবার আজমীরে আসিয়াছেন। তাই দরগাহের পরিচালকগণ তাঁহাকে সদলবলে দরগাহ্ পরিদর্শন করিবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ করেন। সম্মেলনের শেষ দিনে প্রত্যূষে বিনোবাজী পদব্রজে সেখানে (সম্মেলনের স্থান হইতে ৩ মাইল দূরে) যান। দরগাহ্ প্রাঙ্গণে দরগাহের পরিচালকগণের পক্ষ হইতে বিনোবাজীকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয়। উত্তরে বিনোবাজী যে ধর্মের যাহা ভাল তাহা অন্যান্য ধর্মকে গ্রহণ করিবার জন্য উপদেশ দেন। তাহাতে সেই সব ধর্ম সমৃদ্ধ হইবে। যেমন মুসলমান ধর্মে সুদ লওয়া অধর্ম বলিয়া গণ্য করা হয়, খৃষ্ট-ধর্মীয় মিশনরীগণ যেমন দেশ ও সমাজ নির্বিশেষে কুষ্ঠ সেবা প্রভৃতি সমাজ সেবার কাজ গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ জিনিস অন্য সকল ধর্মের পক্ষে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তাহাতে সেসব ধর্ম সমৃদ্ধ হইবে।

গত বৎসর সম্মেলনের ঠিক পূর্বে ৩ দিনব্যাপী একটি সেমিনার (আলোচনা-বৈঠক) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এবারেও ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৫ দিন আজমীর শহরের ৭ মাইল দূরে হটুণ্ডী আশ্রমে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের অধ্যক্ষতায় এক আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দেশের মুখ্য মুখ্য সর্বোদয় সেবক ও বিচারকগণ উহাতে যোগদান করেন। ভূদানযজ্ঞ আন্দোলনের গতির পর্যালোচনা ও মূল্য নির্ধারণ, সর্বোদয় পাত্র, শান্তি-সেনা, সর্বসেবা সংঘের সংগঠন ও স্বরূপ কি রূপ হওয়া উচিত, স্থানীয় সমস্যায় সর্বোদয় কর্মীদের অংশ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয় কিনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। বিনোবাজী তাঁহার পূর্ববর্তী অবস্থানস্থল হইতে ২৬শে সকালে হটুণ্ডী পৌঁছান। ২৬শে তাঁহার সমক্ষে হটুণ্ডীতে সর্বসেবা সংঘের বৈঠক হয়। ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্বন্ধে তিনি ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে, গ্রামদান, সর্বোদয়পাত্র ও শান্তিসেনা এই তিনই আমাদের কার্যক্রম হইবে। এই তিনের মধ্যে ওতপ্রোত সম্পর্ক। তাই এই তিন কার্যক্রম এক সংগে চালাইতে চাই। একের জন্য অপর দুইটি অপরিহার্য। শান্তি সৈনিক না হইলে গ্রামদানের আব-হাওয়া তৈয়ারী করা যাইবে না। আবার গ্রামদান হইলে তাহার রক্ষণ শান্তি সৈনিকের দ্বারাই সম্ভব হইবে। সর্বোদয়-পাত্র শান্তি সৈনিকের নৈতিক ও আর্থিক আধার। এইভাবে এই তিন কার্যক্রমের অংগাংগী সম্পর্ক এবং উহারা ঐভাবে একীভূত হইয়া এক স্বয়ং সম্পূর্ণ কার্যক্রম। ২৭শে ফেব্রুয়ারী সকালে বিনোবাজী আজমীরে সম্মেলনস্থলে (সর্বোদয় নগরে)

আচার্য বিনোবা ভাবে সম্মেলনে উদ্বোধনী অধিবেশনে ভাষণরত

সর্বোদয় প্রদর্শনীর মূল তোরণ

পেৌছান। সম্মেলন ২॥টার সময় আরম্ভ হয়। শহরের উপকণ্ঠে বিরাট এক খোলা স্থানে ৯।১০ হাজার লোকের আবাসিক ব্যবস্থাযুক্ত এক সুদৃশ্য বাঁশ-চাটাই-এর নির্মিত নগর গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। খদ্দি গ্রামোদ্যোগ প্রদর্শনীও ছিল। এবারে তাহার আকারপ্রকার অন্যান্যবার অপেক্ষা বৃহৎ হইয়াছিল। এবারে সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন কেরালার সর্বজন সমাদৃত জননেতা ও বর্ষীয়ান সর্বোদয় নেতা শ্রীকেলপ্পনজী। যখন বিনোবাজী কেরালায় পদযাত্রা করিতেছিলেন, তখন কেলপ্পনজী লোকসভার সদস্যপদ পরিত্যাগ করিয়া ও রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করিয়া অনন্যনিষ্ঠভাবে ভূদানযজ্ঞমূলক অহিংস ক্রান্তির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তখন পি এস পি দলভুক্ত ছিলেন। তথাপি সমস্ত রাজনৈতিক দলের ও উহার নেতৃবৃন্দের উপর তাঁহার প্রভূত নৈতিক প্রভাব আছে। এজন্য কিছুদিন পূর্বে ছাত্রদের আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া কেরালায় যে হাঙ্গামা হইয়াছিল, তাহাতে শান্তি সৈনিকস্বরূপ তাঁহারই প্রচেষ্টায় সর্বদলকে মিলিত করাইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হইয়াছিল। কেরালায় থাকাকালীন বিনোবাজী যখন শান্তিসেনা গঠন করার কল্পনা করেন, তখন কেলপ্পনজী ও তাঁহার সাথীরা প্রথম শান্তি সৈনিক হন। কেরালার সর্বশ্রেণী ও সর্বদল তাঁহাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

এবারে সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়সমূহের আলোচনা-ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হইয়াছিল। পূর্ব পূর্ব বৎসর প্রথম দিন বিনোবাজীর ভাষণের পর দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য বিষয়গুলির আলোচনার জন্য সম্মেলনকে কয়েকটি আলোচনাচক্রে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা হইত। তাহাতে একাধিক বিষয়ে যাঁহাদের আগ্রহ থাকিত, তাঁহাদের পক্ষে একাধিক আলোচনাচক্রে যোগদান করা সম্ভব হইত না। কারণ সময় অভাবে সব বিষয়ের আলোচনা একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে হইত। এজন্য এবার সমস্ত আলোচনা সম্মেলনেই হয়। আলোচনার জন্য বিষয় অনুসারে গ্রুপ বিভাগ করা হয় নাই। সর্বোদয় পাত্র, শান্তিসেনা ও গ্রাম স্বরাজ্য, এই তিনটি বিষয়ে আলোচনা প্রথমত তিনজন বক্তা শুরু করেন এবং অতঃপর ঐ সম্পর্কে যাঁহারা বলিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিতে থাকেন। প্রত্যেক দিন আলোচনার পর সর্বশেষে বৈকালে বিনোবাজী ভাষণ দিতেন। সম্মেলনে আলোচনার পদ্ধতির আর একটি ব্যতিক্রম করা হয়। অন্যান্য বারে বিনোবাজীর ভাষণ ও সাধারণ আলোচনার গতি অনুসারে সর্বসেবা সঙ্ঘ নিবেদনস্বরূপ এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া উহা সম্মেলনে উপস্থাপিত করিতেন।

সম্মেলনের বাণী হিসাবে উহা মানিয়া লওয়া হইত। এবারে সর্বসেবা সংঘ প্রস্তাব আকারে কোন নিবেদন রচনা বা গ্রহণ করেন নাই। সমস্ত আলোচনার সার নিবেদন আকারে লিপিবদ্ধ করিবার জন্য একটি সাবকমিটি গঠন করা হয়। তাঁহাদের রচিত নিবেদন শেষ দিনের বৈকালের অধিবেশনে পেশ করা হয় এবং তাহার পরিসমাপ্তি হয়।

সম্মেলনে বিনোবাজীর ভাষণসমূহ এবং সম্মেলন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সর্বসেবা সংঘের আলোচনায় যে বিষয়টির উপর বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়

তাহা হইতেছে এই যে, কিভাবে সর্বসেবা সংঘকে ব্যাপক করা যায় এবং লোকসেবক ও শান্তি-সৈনিকের সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিবার পথ সুগম করা হয়। গত আগস্ট মাসে বোম্বাই প্রদেশের চাল্লিশগাঁও নামক স্থানে দেশের মুখ্য সর্বোদয় কর্মী ও গঠনমূলক সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে খাদি প্রভৃতি রচনাত্মক কার্যকে ভূদান-যজ্ঞমূলক অহিংস ক্রান্তির অভিমুখী করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গঠন-সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের সমস্ত গঠনকর্ম প্রচেষ্টাকে ক্রান্তি অভিমুখী করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই পরিবর্তিত অবস্থায় গঠনমূলক কর্মিগণকে সর্বসেবা সংঘের অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন। তাহাতে সর্বসেবা সংঘ ব্যাপক হওয়ার পক্ষে সুবিধা হইবে। সেজন্য লোকসেবক ও শান্তিসৈনিকের নিষ্ঠাপত্রের নিষ্ঠাসমূহকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করাও আবশ্যক। এই-সব বিচারের মূলে সর্বসেবা সংঘের বৈঠকে সর্বসেবা সংঘকে ব্যাপক করিবার জন্য উহার নূতন গঠনবিধির একটি খসড়া আলোচিত হয়।

সর্বসেবা সংঘকে ব্যাপক করার উপরোক্ত কল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলনে বিনোবাজী ভাষণ দেন। এবারের সম্মেলনে বিনোবাজীর প্রায় সমস্ত ভাষণের ধুয়া ঐ দিকেই ছিল। নিজেদের গণ্ডিকে আর সংকুচিত রাখা চলিবে না। ব্যাপক হইতে হইবে। বিনোবাজীর কথায় দরজা বড় করিতে হইবে। এবারে সম্মেলনের বাণীও তাহাই। নিজেকে আর সংকুচিত করিয়া রাখিও না। ব্যাপক হও। এখন দরজা বড় কর। সকলকে আসিবার সুযোগ দাও। বিশ্বাস কর। বিশ্বাস শক্তির স্মরণ লও। তবেই আমরা সিদ্ধির পথে অগ্রগতি লাভ করিতে পারিব। বিনোবাজী এই কথা বার বার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিনোবাজী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের ভাষণে বলেন, অতঃপর আমাদের পক্ষে সংকীর্ণ হইয়া থাকা আদৌ সুখের বিষয় হইবে না। বর্তমানে বিজ্ঞানের শক্তি আমাদের সহায়তা করিতেছে। আর আত্ম-জ্ঞানের শক্তি তো পূর্ব হইতেই আমাদের দেশে ছিল। আত্মজ্ঞান আমাদিগকে ব্যাপকতা শিক্ষা দিয়াছে। কিন্তু এখন বিজ্ঞান ব্যাপকতার যে ভৌতিক প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা বুঝাইতেছে। এই যুগে যদি আমরা ব্যাপক না হইতে পারি তবে আমাদের ভৌতিক জীবন অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। বিজ্ঞান এইরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। কারণ আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞান একই হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া

সর্বোদয় সম্মেলনে ভাষণরত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

তৃতীয় একটি শক্তি আছে। এই তৃতীয় শক্তিকে আমি 'বিশ্বাস শক্তি' বলিয়া থাকি। বিজ্ঞানের যুগে রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা ও সমাজশাস্ত্রের ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস শক্তির বহু প্রয়োজন আছে। আমাদের মধ্যে যে পরিমাণ বিশ্বাসশক্তি থাকিবে, আমরা সেই পরিমাণে এ যুগের উপযোগী হইতে পারিব। কিন্তু আজকাল পরস্পরের মধ্যে খুব অবিশ্বাস দেখা যাইতেছে। বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক, ধর্মিক ও পান্থিক ক্ষেত্রে ইহা পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু উহা আর থাকিবে না। রাজনীতিতে অবিশ্বাসকে এক বড় শক্তি বলিয়া মনে করা হয়। উহাকে সাবধানতার লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয়। কিন্তু আমি মনে করি যখনই আমাদের অন্তরে একটুও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয় তৎক্ষণাৎ উহা আমাদের পক্ষে অসাবধানতা হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ণ বিশ্বাস ব্যতীত রাজনীতির সংশোধন হইবে না। অবিশ্বাসের ফলে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে বিবাদ বাড়িবে, পন্থাগত ঝগড়া বাড়িবে, আর বিজ্ঞানের যুগে উহার পরিণাম বিপজ্জনক হইবে।

সর্বোদয় পাত্র সম্পর্কে এরূপ আপত্তি উঠিতে পারে যে, উহা একরূপ ভিক্ষাবৃত্তি। সর্বোদয় পাত্রকে কর্মীর আর্থিক আধার করা ভিক্ষা বটে, কিন্তু সাধারণ অর্থে যাহাকে ভিক্ষা বলে উহা তাহা নহে। নিষ্কাম সেবকের এই জাতীয় ভিক্ষাই জীবিকা।

সম্মেলন ১লা মার্চ সমাপ্ত হয়। ভোরে বিনোবাজী আজমীর ত্যাগ করিয়া পরবর্তী অবস্থানস্থলে (গগওয়ান গ্রাম) গমন করেন। পূর্ব ব্যবস্থামত ৮৮২ জন শান্তিসৈনিক ৪॥ মাইল পথ বিনোবাজীর অনুসরণ করিয়া গগওয়ান নামক গ্রামে গমন করেন। চার চারজন করিয়া সারিবদ্ধ হইয়া তাঁহারা শান্তিসৈনিকের গান ও উপযোগী ধ্বনি করিতে করিতে চলিতে থাকেন। গন্তব্য-স্থলে পৌঁছিয়া বিনোবাজী এক মঞ্চের উপর দণ্ডায়মান থাকিয়া শান্তিসৈনিক দলের আগমন মুগ্ধদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। সমস্ত শান্তিসেনা সমবেত হইলে তিনি ভাবাবেগে এত অভিভূত হন যে, কিছু বলিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি "জয় জগৎ" ধ্বনি করিয়া উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল শান্তিসেনার মুখনিঃসৃত "জয় জগৎ" ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। এরূপ অনুমান করা গিয়াছিল যে, সম্মেলন পর্যন্ত ৫ শতের অধিক শান্তিসৈনিক হইবে না। কিন্তু আশাতীতভাবে প্রায় ১ হাজারের উপর শান্তিসেনা হইয়াছে ও তন্মধ্যে ৮৮২ জন পদযাত্রার র‍্যালিতে যোগদান করেন। এই র‍্যালি এক অপূর্ব জিনিস। "জয় জগতের" মন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া অহিংসার পথে নিজেকে বলিদান করিবার সংকল্প লইয়া জগতের ইতিহাসে এই প্রথম শান্তি-সৈনিকের সমাবেশ।

মোটা কথায় একাদশ সম্মেলন হইতে আমরা কি পাইলাম? সর্বসেবা সংঘ তথা আন্দোলনে যুক্ত হইবার পথ প্রশস্ত কর। উহাতে প্রবেশ করিবার দরজা বৃহৎ কর। আত্মজ্ঞান ও বিজ্ঞানশক্তির সহিত বিশ্বাস-শক্তি যুক্ত কর। এই তিনের সম্মিলিত শক্তি হইবে এই যুগের উপযোগী শক্তি। সর্বোপরি এখন কর্মযোগ সাধনের শুভ লগ্ন উপস্থিত। তাই গ্রামদান, সর্বোদয় পাত্র ও শান্তিসেনার—এই তিন মাত্রার মিলিত "প্রণব" (ওঁকার) আমাদের পরবর্তী বৎসরের জপ ও তপ হউক।

ভুল খতিয়ান

আর্য দেব

বেলা বাড়ছিল। নীল আকাশে মেঘ ছিল না। মাঠের ওপর এ-জায়গাটায় গাছ বিরল, ছায়া বিরল। শুধু এক জায়গায় গোল হয়ে দাঁড়িয়েছিল অনেকগুলো লোক। তাদের মাঝখানে ছিল আমিনের তিনপেয়ে টেবিলখানা। টেবিলের নীচে নতুন মার্কিন-মোড়া একটা বস্তা, তার থেকে উঁকি দিচ্ছিল খানকয়েক পুরোনো খতিয়ান। টিনের চোঙার মত লম্বা একটা কৌটো পড়েছিল ওদিকে, তার থেকে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভের নতুন ম্যাপখানা বার করে আমিন প্রাণকৃষ্ণ রায় পেতে রেখেছিলেন টেবিলে। ম্যাপটার সবটাই প্রায় কালো রেক্সিনে ঢাকা, শুধু মাঝখানের একটা ছোট ঢাকা খুলে ম্যাপের ওপর কাজ করছিল আমিন। ম্যাপভর্তি নীলকালিতে চৌকো চৌকো ঘর কাটা, আর এদিকে সেদিকে অনেকরকম সাংকেতিক চিহ্ন। আমিন দাগ নম্বর বসাচ্ছিল ম্যাপে, আর চেনম্যান চেন-হাতে মাঝে মাঝে মেপে আসছিল এ-জমি সে-জমি—আমিনও ম্যাপের ওপর কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাপছিল এ-দাগ সে-দাগ, মিলিয়ে নিচ্ছিল জমির মাপের সংগে।

ঠিক সেই সময়েই দক্ষিণের নাবাল থেকে এক বুড়ি প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে হাজির, গলা তার সপ্তমে চড়া : "আমি আশি বছরের থুরিস বুটি, আমার জমি নিতে তুরা সাহস করিস?"

কী হল? জিগ্যেস করলো আমিন।

কেনে, আপনি ত হরু ঠাকুরকে আমার জমিটা লিখাই দিছ, উ জমি আমার।

কোন জমি, কোন জমি তোমার? আমিনের চোখদুটো কুঁচকে গেল। পাশ থেকে কে একজন বললো : উই যে যার পাশে দুটো অর্জুন গাছ আর দুটো পলাশ গাছ দাঁইড়ে আছে, যার লাগোয়া উয়ার বাড়ি, সিটি উ চায়। আমিন ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপে জমিখানা খুঁজে বার করলো। হ্যাঁ, দাগ নম্বর পঁয়ত্রিশ। ওর উত্তরে অমুকের জমি, পশ্চিমে অমুকের বেগুনবাড়ি, দক্ষিণে একটা ডাঙা। পুরোনো খতিয়ান, খসড়াই বার করলো আমিন। কিন্তু সেখানে ত হরু ঠাকুর অর্থাৎ হারাধন চক্রবর্তীরই নাম লেখা আছে। হরু ঠাকুর এখন ছাড়বে কেন?

বুড়ি আবার চেঁচিয়ে উঠলো, "আমার বয়স আশি, আমি ইখানের সব খবর রাখি।"

বাংলা-বিহার সীমান্তের এই অঞ্চলটায় মানুষেরা দীর্ঘজীবী হয় কিনা আমিন জানে না, কিন্তু আর সবই ত শক্ত, দীর্ঘস্থায়ী। শুনেছে এখানকার মাটির দেয়াল ভয়ানক শক্ত, একশো-দুশো বছর ধরে একভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর সবটাই ত প্রায় পাহাড়ে জমি, একগোছা ঘাসও নেই কোথাও যে একটু চেপে বসা যাবে; কেবল কাঁকর আর কাঁকর, আর তার মধ্যে চিকচিক অভ্রের ছোট বড় টুকরো টুকরো পাত। এদিকে ওদিকে বড় বড় জায়গাজুড়ে উইয়ের ঢিপি জমে রয়েছে—তার গায়ে কার্বাংকলের মত অজস্র ফুটো, আর সেই এক একটি ফুটোতে নাকি লুকিয়ে আছে খরিস সাপ। আর ঐ যে পাহাড়—ওর এক একটা পাথর উল্টোলে নাকি কাঁকড়াবিছে বেরোয়—।

রামঠাকুর বললো চুপিচুপি, "ও-বুড়ির ধরনই ওমন বুঝলেন কর্তা। উয়ার মুখ উই পাহাড়ের বিছার মতন—কামড়ের জোর চৌবিশ ঘণ্টার বেশি থাকে না।"

বুড়ির রকম দেখে আরো কে কে যেন ছুটে এসেছিল। রামঠাকুর, হরুঠাকুর তাড়া করলো কয়েকজনকে, কি রে কুটেগুলা আবার আসিস কেনে ইদিকে? নাকমুখ চাপা দিল কেউ কেউ। তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেল কুষ্ঠরোগগ্রস্ত কয়েকজন লোক।

আবার মুখ খুললো রামঠাকুর, "উয়ার কথা বাদ দিন। আমার উ জমিটা দেখেন—উটা পুর্বে বাইদ ছিল, উয়ার পর কেটে কেটে ওকে কানালী আর এখন বহাল করলাম।"

আবার খতিয়ান খুললো আমিন। হ্যাঁ, চব্বিশ খতিয়ানে বিয়াল্লিশ দাগ ছিল রামঠাকুরের বাপ সাধু ঠাকুরের। মৃত সাধু ঠাকুরের তিন ছেলে। আর দু ছেলে অন্য জমি নিয়েছে আপোসে। এটা রাম ঠাকুরের। খতিয়ানে সবুজ কালিতে রাম ঠাকুরের নাম উঠলো। জমির শ্রেণী বাইদ কেটে আমিন লিখলো বহাল। তারপর জিগ্যেস করলো : আচ্ছা কটা গাছ আছে গোণো ত—

দুটো আম, দুটো বাবলা—চটপট জবাব দিল রামঠাকুর।

আমিন আবার পুরোনো খতিয়ান খুললো: কিন্তু এখানে দেখছি কাষ্ঠ-ফল দং গ্রামের জনসাধারণ। কাঠ ও ফলের দখল গ্রামের জনসাধারণের।

রামঠাকুরের মুখটি যেন একটু চুপসে গেল কথাটা শুনে।

সকলেই মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। ওদিকে শিবমন্দিরের সামনে প্যাঁ প্যাঁ করে বাঁশি বাজাচ্ছিল—আর ঢোলকে চাঁটি পড়ছিল—ডুম-ডুম-ডুম। রোদের তেজ বাড়ছিল, আর বুড়ো আমিনের কাজের উৎসাহ দেখে মনে মনে তারিফ করছিল ওরা।

আমিনবাবু আমাদেরটা তাড়াতাড়ি সারি লন—বললো হরু ঠাকুর।

কেন?

আমাদের চক্রবর্তীর ঘরে আজ বিয়া আছে। ই বিয়া কিন্তু আপনকার দেশের মত নয়। আমাদের সর্বোচ্চ কন্যাপণ মাত্র তেরো টাকা চার আনা। বরপক্ষেরা পাঁচ দিন থাকবে ইখানে। আর উ গো-গাড়িগুলা দেখছেন ত—

শিবমন্দিরের পাশে অনেকগুলো গরুর গাড়ির ওপর চোখ পড়লো আমিনের। হ্যাঁ, কতকগুলো বস্তা চাপানো ছিল তাতে।

ইটাও আমাদের দেশের ব্যেবস্থা—

কী ব্যবস্থা?

উ সব বস্তায় চাল আছে, ডাল আছে। প্রথম দিন আমরা উয়াদের সকলকে খাওয়াইবো, কিন্তু বিয়ার পর উয়ারা আমাদের গ্রামভর সকলকে খাওয়াইবে—তাই চাল-ডাল আনছে। আর আমরা কানাকুব্জী ব্রাহ্মণ আছি, ইখানে আমাদের পাল্টাঘর বেশি নাই। দেখেন না উয়ারা আসছে আট কোশ দূর থেকা।

বুড়ি ওদিকে চুপ করে বসেছিল, এবার মুখ খুললো, "লিখে লিন আমার জমিতে আনজির (পেয়ারা) গাছ আছে দুটা, টাভা (কাগজী লেবু) গাছ আছে তিনটা—উয়াদের বয়স আমার সমান হবে—"

হরুঠাকুর, রামঠাকুর মুচকি মুচকি হাসলো, "হাঁ হাঁ সি ত ঠিক কথা, তুর যা আছে সব লিখাই দিবে, তুয়ার ঘটি-বাটি সব—"

বুড়ি রেগে উঠলো, "তুরা চুপ কর কেনে—আর লিখে লিন দুটা করঞ্জ আর একটা ভালাগাছ আছে, লিখা থাকলে উরা কাটতে লারবে—"

এবার হেসে উঠলো হরুঠাকুর, রামঠাকুর, শিবু বাউরি, খন্তা বাউরি—আরো কে কে যেন। রামঠাকুর বললো, "উ গাছ লিয়ে তু করবি কী? উ গাছের ছাল থেকা যে তেল হয় উ ত লাঙলে লাগায়, তা বুড়ি তু কি গায়ে মাখবি?"

আমিন একফাঁকে চেনম্যানকে নিয়ে ওপাশে একটা জমি মাপছিল। এরা পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। আলের ওপর লগা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল চেনম্যান। আর আমিন ফিল্ড গ্লাস চোখে ধরে চেনের সঙ্গে সমরেখায় দাঁড়িয়ে দেখছিল দূরের সাদা ফ্ল্যাগ। লগা দিয়ে মেপে দেখা গেল জায়গাটার বিস্তার হয়েছে দশ লিংক।

আমিন ফিরে গেল টেবিলে। পুরোনো ম্যাপের মাপ তুলে নিল কাঁটা দিয়ে, তারপর গুনিয়া আর স্কেলের ওপর কাঁটা ফেলে দেখলো ও জায়গাটার মাপ ছিল প্রায় বিশ লিংক। এখানটায় একটা রাস্তা ছিল—সাধারণের ব্যবহার্য একটা রাস্তা।

চমকে উঠলো আমিন। "এ কি করেছ তোমরা?"

আবার হেসে উঠলো হরুঠাকুর, "কিন্তুক উ দিকটা দেখেন কর্তা, ইখানে যা গেছে উদিকে তা পুরাইছে।"

সত্যি, ও-পাশটায় আর একটা রাস্তা পড়েছে দেখা গেল। এত উঁচুতে বস্তুত কারো কোন ভাগকরা জমি নেই, কোন সীমারেখা নেই। চারদিকেই লাল মাটি আর কাঁকর, কেউ অত মাথা ঘামায় না নিজের সীমানা নিয়ে।

আমিন বললো, "তা ওদিকের জমিটা করলে কী?"

শোনেন কর্তা, আমরা ত লিখাপড়ি জানি না। উ জমি আমার ঠাউরে উয়ারে পাশের জমির সঙ্গে চাষ করতে করতে এখন গোড়া এক করে ফেলছি।

গোড়া-এক। গোড়া-দুই। গোড়া-তিন। পাহাড়ী জমির শ্রেণীভেদ। ভাল থেকে মন্দ। এই পাহাড়ী জমির সবটাই প্রায় গোড়া-তিন পর্যায়ভুক্ত। মাঝে মাঝে চাষ করে অপেক্ষাকৃত ভাল জমি হয়েছে—সেই ধরনের ভাল জমিগুলিই গোড়া-এক পর্যায়ের।

হরুঠাকুর বললো, "উটা আর অত দেখবেন না কর্তা। উ জমি অনেক দিন থেকা উরকম দেখছি। আর উয়ার বদলে ত ডি রাস্তা পড়েছে। ইখানে ত আপনকার দেশের মত ধান-পাট কিছু হবেক না। শুধু বিরি-কলাই। পুব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ যতটা দেখছেন সবখানে শুধু বিরিকলাই ফলে। ধানী জমি, মানে বহাল, বাইদ, কানালী ত বেশি নাই।

আমিন আবার খতিয়ান খুললো। নতুন পাতায় লিখলো জের। পুরোনো পাতায় লিখলো ইজা। অমুক জমিদারের অধীনে রায়ত স্থিতিবান হরু ঠাকুর, না, নামটা কেটে দিল আমিন, হরু ঠাকুর নয়, হারাধন চক্রবর্তী, পিং অমুক আর সাং ত পরে লেখাই আছে। উল্টো পাতার কলমগুলো ভরিয়ে ফেললো আমিন—জমির শ্রেণী গোড়া-এক, উত্তরে অমুক, পরিমাণ এত শতক ইত্যাদি ইত্যাদি।

লাঠিতে ভর করে রোগা চিমসে আর এক বুড়ো এসে হাজির হয়েছিল অনেকক্ষণ থেকে। সে এবার মুখ খুললো, "আগেকার সেটেলমেন্টের সময় উদিকটায় একটা আম-বাগান ছিল, উয়ার ভিতর তাঁবু পড়েছিল লালমুখ সাহেব অফিসারদের। আরে বাপরে বাপ—উয়াদের কি যোলবোলাও। ঘোড়ার পর ঘোড়া আমদানি হত। উয়ারা প্রত্যেকদিন ঘোড়া বদল করতো।"

আমিনের বয়স হয়েছিল, কিন্তু শরীর

ও-রকম চিমসে হয়ে যায়নি। আর গলার আওয়াজও ওর অত খনখনে নয়। এখানকার গরুগুলো পর্যন্ত কেমন চিমসে চিমসে রোগা-রোগা। ওদের গলার স্বরও কেমন ঘড়ঘড়ে। জলাবাংলার গরুদের মত হাম্বা-হাম্বা রব নেই এখানকার গরুদের।

আমিন বিরক্ত হয়ে আগন্তুক বৃদ্ধকে বললোঃ চুপ করুন, আমার এখন আরো মৌজা পড়ে আছে।

ওরা অবাক হল একটু। মৌজা পড়ে আছে! মৌজা কি গাছের ফল যে পড়ে আছে? ওরা সেটেলমেণ্টের ঘরোয়া কথা জানে না। কোন মৌজার একগাদা খতিয়ান, কাগজপত্র দিয়ে গিয়ে এই ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা বলে—অমুক মৌজা দিয়ে গেলাম।

কৌতূহল দমন করলো হরুঠাকুর, রামঠাকুর, শিবু বাউরি। আমিনকে না ঘাটানোই ভাল—আগেকার দিনে অনেক আমিন বাড়ির দেয়াল ফুঁড়ে চেন চালিয়ে দিত।

রোদের তেজ ক্রমশই বাড়ছিল। এ মৌজাটা ছোট। কাজ শেষ করেই আবার ওদিকে যেতে হবে, এখন অনেক মৌজার কাজ বাকি আছে—মৌতোর, শালতোড়, বিন্দুইডি, গোয়ালাডি আরো কত গ্রাম। রিভিসন্যাল সেটেলমেণ্টের কাজে আমিনের নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই।

আমিন এবার খতিয়ান বন্ধ করে আর একটা রেজিস্টার খুললো, হরু ঠাকুর, বলুন আপনার কটা গরু আছে।

দুটো—খসখস করে লিখে নিল আমিন।

বলদ কটা?

একটা।

হাল?

একখানা।

গো-গাড়ি আছে?

নাই।

সমস্ত বৃত্তান্ত টুকে ফেললো সেই রেজিস্টারে।

চারদিক রোদে ঝিমঝিম করছে। দূর-দিগন্তের দিকে তাকানো যায় না, তাকালেই চোখ জ্বালা করে, আর আকাশের নীলটা যত বেলা বাড়ে ততই কেমন পাংশু হয়ে যায়। ও-পাশ দিয়ে গ্রামের মেয়ে-বউরা একে একে হেঁটে যাচ্ছিল ওদিকে নাবালের এক পুকুরে। এখনো জল আছে, আরো গরম পড়লে থাকে না। তা-ও জল কি হাঁটু পর্যন্ত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ হাঁটু পর্যন্ত দাঁড়িয়েই মাথায় ঘটি করে জল ঢালতে হয়। আমিন কিন্তু কিন্তু করছিলঃ কিন্তু, কিন্তু......

রামঠাকুর চালাক লোক, সে-ই বললোঃ *না, উ আপনার ভয় করার কিছু নাই। কুটেদের জন্য উই দেখুন, উই উপাশের গেড়িয়াটা (ছোট পুকুর) আছে—*

আমিন জিগ্যেস করে, "এখানে ও-রোগটা খুব বেশি, না?"

তা আছে বটে, কিছু কিছু আছে। বাউরি-দের ভিতরেই বেশি, বামুনদের ঘরে দু-একটা আছে।

কিন্তু খাবার জলও কি ঐ পুকুর থেকে?

হাসলো রামঠাকুর, "না। উ যে আমগাছ দেখছেন, উয়ার তলাতেই বালিমত জায়গা আছে, উ থেকা জল উঠে। বালি সরায়ে আপনি যদি বাটি পাতি দেন ত আপনার বাটি জলে ভরে যাবেক। হাঁ হাঁ টাইম ত লাগবেই, তবে কি জানেন কর্তা আমাদের টাইমের দরকার ত নাই।"

হরুঠাকুর বলে, "ই বড় কঠিন স্থান, ই আপনকার বাংলা দেশের মত নয় যে চারি-দিকে পুকুর আর পুকুর। ইখানে টিউব-অয়েল বসে না, আর কুয়া করতে বারুদ দিয়ে জমিন ফাটাতে হয়—বিস্তর খরচ।"

এতক্ষণ বুড়ি একপাশে বসেছিল। ওদিকে শিবতলায় কাঁসি আর ঢোলক বাজতেই সেদিকে গেল। ওখানেই দুপক্ষের লোকেরা বসেছে। মন্দিরের একপাশে একটা বিরাট শিমুল গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার থেকে শিমুল ফুল পড়ছে ধপধপ শব্দে। আর ওদিকে কয়েকটা পলাশ গাছ চীনা শিল্পীর আঁকা গাছের মত এঁকেবেঁকে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ডালে ডালে চুনে-হলুদ রঙের প্রদীপশিখার মত অজস্র ফুল। আরো কত গাছ ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে। গাছগুলোর স্থানীয় নাম হল চড়রা, আসন, আকড়া, চাকলতা, সরাল, কাঁচমালা।

মাথার ওপর চনচন করে রোদ বাড়ছিল। রোদে কাজ করা অভ্যাস থাকলেও, শুধু অভ্যাস কেন, চিরজীবনের অঙ্গীকার থাকলেও, আজ যেন অসহ্য মনে হচ্ছিল আমিনের। আজই দুটি রেঁধে-বেড়ে খেয়ে নিয়ে আবার অন্য মৌজায় ছুটতে হবে। ভেবেছিল আজ শালতোড়ের হাটে গিয়ে দেখে আসবে মাছ পাওয়া যায় কিনা—কিন্তু ফুরসত কই?

রামঠাকুর বললোঃ শালতোড়ের হাটে গেলে মাছ পাইতেন আজ। এখন গেড়িয়াতে জল কমছে, আর মাছও উঠে পড়ছে। জোড়েও (ছোট পাহাড়ী নদী) এখন মাছ ধরছে অনেক লোক।

ওপাশে বাউরিরা দাঁড়িয়েছিল। আমিন হাঁকলোঃ এ জমি কার?

আমার—। বললো শিবু বাউরি।

কী করে পেলে?

চাষ করে—

চাষ করে?

হাঁ হাঁ চাষ করে, ই ত আমার জনমকাল থেকাই দেখা আসছি যে আমার বাপ-পিতামো ই জমি চাষ করে।

হরু ঠাকুর বললো, "না কর্তা, উটো আমাদের জমি ছিল—"

আমিন জিগ্যেস করলো, "কিগো ও'কে খাজনা দাও?"

না, না আমরা কাউকো খাজনা দিই না—ঠাকুরেরা উ-রকম বলেন, কিন্তু ই জমি আমরা বরাবর চাষ করছি।

ভোগসূত্রে দখল। জবরদখল হয়ত ছিল এককালে, এখন ভোগসূত্রে দখল। ওর নামে খতিয়ানে একটা নতুন পাতা খুললো আমিন। সবুজ কালিতে বেশ পাকা হাতে নাম, পিতার নাম, দাগ, জমির শ্রেণী, জমির পরিমাণ লেখা হয়ে গেল। আর নীলকালিতে ক্ষুদে সংখ্যায় দাগ নম্বর পড়ে গেল ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপে।

আচ্ছা এবার বলো—ও জমিটা কার, আর ওর পরেরটা,

শিবু বাউরি বললোঃ উটাও আমার। উ পগারের ধার থেকা ও সব জমিগুলো আমার। উপাশটা এখন আমার সাধুবাড়ি বটে, হাঁ

হাঁ খামার, আর ইদিকে আছে গোবর-গাড়হা —উখানে গোবর, ছাই ফেলা হয়।

আমিন বললো, 'কিন্তু আগের ম্যাপে ত দু-জমির মাঝে একটা আল ছিল হে!'

উ সব কি আর এতদিন পরে ঠিক থাকে কর্তা।

বেশ, বেশ—তোমার যতটা জমি তার পাড়ে পাড়ে চলে এসো।

প্রথমটায় কথাটা বুঝতে পারেনি শিবু বাউরি। পরে বুঝতে পেরে নিজের জমির সীমানায় ঘুরে এলো, আর কলম তুলে নিল আমিন।

হরু ঠাকুর বললো, "আগে ই-সবই আমাদের ছিল বুঝলেন কিনা। আর ই গোড়া-তিন জমি নিয়ে করবো কি আমরা। আমাদের বাপ-পিতামো ইসব দেখতো না, আর বাউরিরা দখল করে চাষবাস করতো। আমাদের আছে ত অনেক জমি—কিন্তু ই জমির দাম কী? উই যে উচা পাহাড়মত টিপি দেখছেন উ ত আমার, ত উ নামেই আমার। যুদ্ধের সময় কিছু কাছ দিছিল, আশা করে আছি যদি ফির ব্যারিকেড (ব্যারাক) দিবার কন্টাক্টারীর দিকে যায়। কিন্তু এতদূরে ব্যারিকেড নিতে কে আসবে বলুন। ওই জন্য আমরা বাউরিদের কিছু বলি না। গরীবলোক, কিছু কিরিককাই পাড়বে ত আমরা ঠেকাই কেনে—"

বাউরিরা করেই বা কী? কারুর কিছু কিছু জমি আছে, ঐরকম জবরদখল কিংবা ভোগদখলে দখল জমি। অনেকেই ভাগে চাষ করে • ঠাকুরদের জমি। কাজ পেলে জনমজুরও খাটে।

শিবু বাউরি টুপ করে ছুড়ে দিল, 'তা বুঝলেন কর্তা, ঠাকুররা যদি কিরূপা করেন ত বাউরিদের অবস্থা ফিরা যায়। উয়াদের এত জমি, কিছু কিছু দিলে—'

হেসে উঠলো হরু ঠাকুর। 'হাঁ তুমারে জমি লিখাই দি, আর তুমি জমি বেচো, আর প্যাটের ভিতর আবগারীকে ঢুকাই লও। জানলেন কর্তা, উয়াদের স্বভাব যাবে না। সাঁঝবেলায় শুঁড়িখানায় না গেলে উদের চলবে না। প্যাটে ভাত নাই, পরনে কানি নাই, ত শুঁড়িখানা ঠিক আছে, আর ঘরেও চোলাই আছে।'

এবার হা-হা করে হাসলো শিবু, "কথাটা ঠিক কইছো ঠাকুর, তবে আমরা বড় গরীব আছি—"

দুপুর এগিয়ে আসছিল। মাথার চাঁদি একটু গরম হতেই গ্রামের দিকে নাবাল জমিতে নেমে গিয়ে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়ালো ওরা। পোড়া দেশে একটা চিল নেই আকাশে, কাকও নেই। শুধু খরিস আছে, খরিস সাপ, ফণা তোলে না, এমনি পাশ থেকেই কামড় দেয়, আর কামড়ালে বাঁচায় কার সাধ্যি! গায়ের চামড়া পচে পচে খসে পড়বে। জলাবাংলার গোখরো কিংবা কেউটের চেয়েও ভয়ংকর। ঝাড়ফুঁক, তুকতাক কিছুই কাজে আসে না। একটা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আবার নেমে এল আমিন। কে জানে এই চাঙড়টার তলায় বিছে আছে কিনা। ঐ পাহাড়ের প্রত্যেকটি চাঙড়ের তলাতেই নাকি বিছে আছে—কাঁকড়া বিছে। তবে ওদের কামড়ে ভয়ের কিছু নেই, যন্ত্রণার মেয়াদ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। আজ দশটায় কামড়ালো ত কাল দশটায় সব যন্ত্রণা কমে যাবে।

বুড়ি এতক্ষণে ফিরে এসেছিল শিবতলা থেকে—এবার মুখ খুললো। 'তা আমারটা কী করলেন কর্তা?'

কোন জমি তোমার? জিগ্যেস করলো আমিন।

উ যে আমার ঘরের লাগোয়া আছে, যাতে আমজির গাছ আছে দুটা, উচ্চা গাছ আছে তিনটা।

মিটিমিটি হাসছিল রামঠাকুর আর হরু-ঠাকুর, আর হাসিটা ছড়িয়ে যাচ্ছিল বাউরি-দের মুখে মুখে।

বুড়ি চটে উঠলো: হাসিস কেনে রে?

ওরা আবার কপটগাম্ভীর্যে মুখ ফিরিয়ে রাখলো, কিন্তু চাপাহাসির সবক আন্দাজ করা যাচ্ছিল প্রত্যেকটি মুখে।

কী নাম তোমার?

হরিমতী দাসী।

খতিয়ান খুঁজেও ওর নাম পাওয়া গেল না। আমিন জিগ্যেস করলো আবার

কী নাম তোমার স্বামীর?

স্তিলোককে সোয়ামীর নাম করতে নাই; ওরে ও শিবু, ও রাম তরা কইয়ে দে না ঠাকুরের নামটো।

হরুঠাকুর বললো, "তর সোয়ামীর নাম আমরা জানবো কেমনে? তু ত ভিনগাঁ থেকা আইছিলি—"

হরিমতী জ্বলে উঠলো, "ইটা কেমন কথা হল রে! তুদের কোলেপিঠা করে বড় করলাম, আর তরা কইছিস আমি ভিন-গাঁর লোক বটি—

হরুঠাকুর বললো, "তু রাগিস কেনে?"

না, রাগবো না—ত আমার সোয়ামীর নাম কয়ে দে না—

আমিন আবার জিগ্যেস করলো, "কী জাত তোমার?"

কেনে, আমি বামুন আছি—বামুনের ঘরের বহু বামনী হবো না ত কী হবো!

আবার একটা চাপাহাসির দমক খেলে গেল মুখে মুখে। বামুন, বাউরি সবাই হেসে উঠলো। কেউ কেউ হাসি চাপতে না পেরে দূরে সরে গেল, আর কেউ আকাশের দিকে মুখ করে গলা চুলকোতে আরম্ভ করলো।

আমিন ফের জিগ্যেস করলো, 'তোমার স্বামীর নাম কী?'

এমন সময় শিবতলায় আবার প্যাঁ প্যাঁ শব্দ হচ্ছিল বাঁশির। কাঁসিও পিটছিল কেউ। আর বোধহয় মাঙ্গলিক মন্ত্র পড়ছিল পুরুত।

হরুঠাকুর বললো, উ শুনছিস বুড়ি?"

কী?

উই মন্তর, তর চিনা-চিনা লাগছে উ মন্তর? তর উ রকম মন্তর পড়ে বিয়া হইছিল?

হাঁ হাঁ সব মন্তর-তন্তর পড়ে বিয়া হইছিল—

তা তর সাক্ষী আছে? উ বুড়োটা কুথায় গেল—উ ত অন্যরকম কয়—

তু বকর বকর করিস না—আমার বিয়ার সাক্ষী কেউ নাই, সব মরে গিছে।

আমিন তাড়া লাগালো, "তার নামটাই বলো না তুমি—"

এইবার মরিয়া হয়ে উঠলো হরিমতী, "কেনে, উয়ারা সবাই উয়ার নাম জানে।"

আবার চিকচিক করে ছড়িয়ে পড়লো হাসি। একটা মজার ইতিহাস যেন বেরিয়ে পড়ছিল মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে। বয়সের স্তর জমেছে হরিমতীর মুখে, চোখের কোলে, গায়ের চামড়ায়। আমিনের সামনে ওর ফেলে-আসা দিনগুলো যেন ফুটে বেরোচ্ছিল।

হরিমতী নিজেই শেষে বললো, "উয়ার নাম ছিল শশোধর—হাঁ হাঁ ইয়াদের খুড়োতো দাদা শশোধর চকরবরতী। উ আজ বেঁচা থাকলে সব জমি আমার নামে লিখাই দিত।"

শশধর চক্রবর্তী। হ্যাঁ, আগেকার রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে ওর ছেলেপুলে ছিল না—আর ওরা ছিল দুভাই। অন্য ভায়ের ছেলের ছেলে এরা। নাতিপুতি আরো সাত-সতেরো গণ্ডা। কিন্তু কোথাও ত হরিমতীর নাম নেই। হরিমতী কে? শশধর চক্রবর্তীর সঙ্গে ওর সম্পর্কই বা কী—বুঝতে পারছিল না আমিন। কিন্তু রেকর্ডে কোথাও ওর নাম নেই। কোন আশা নেই। পুরোনো রেকর্ড বিনাকারণে অমান্য করতে পারে না আমিন। আমিন নতুন ম্যাপখানা গুটিয়ে ফেললো—তারপর ঝোলায় তুলে ফেললো গুণিয়া, স্কেল, হার্ড পেন্সিল। যখন খতিয়ানটা তুলে ফেলছিল আমিন, তখনই আবার চেঁচিয়ে উঠলো হরিমতী, "আমার নাম হবেক নাই? আমার নামে কাগজ আসবেক নাই?"

হরুঠাকুর ফিসফিসিয়ে বললো, "কয়ে দিন উয়ার নাম লিখছেন, না কইলে আপনারে ছাড়বেক না।"

ওদিকে হরিমতী বিড়বিড় করছিল: আমি আশি বছরের খরিস, আমার সঙ্গে ইয়ারা ঠকবাজি করে—

আমিন চেঁচিয়ে উঠলো, "ঠিক আছে, হরিমতীর নাম লিখলাম। হাঁ, হরিমতী দাসী, স্বামী মৃত শশধর চক্রবর্তী।"

বুড়ি জিগ্যেস করলো, "গাছের কথা লিখছেন ত?"

আমিন বললো, "হাঁ হাঁ, সব লিখেছি।"

এইবার খুশী মনে মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে নাবাল বেয়ে নেমে গেল বুড়ি।

সব গুটোনো হয়ে গেলে ওরাও এগোতে এগোতে বাউরিপাড়া ছাড়িয়ে বামুনপাড়ায় ঢুকলো। রামঠাকুর, হরুঠাকুরের বাড়ি পাশা-পাশি। হরুঠাকুরেরই বাড়ির সংলগ্ন সুন্দর দুটি মাটির কুঠরি দেখিয়ে রামঠাকুর বললো, "ইটাই হল উ বুড়ির বাড়ি। ইটাও ত খতিয়ানে নাই, ত আমরা উয়ারে ইথান থেকা তাড়াই নাই। আমাদের খুড়োতো দাদা উই শশোধর উয়ারে বাউরির ঘর থেকাই আনছিল, কিন্তু এখন আমরা উটাকে ফেলি কেমন করে? উ আমাদের মানুষ করছে, আমাদের ছেলাপিলার যত্ন করছে—ত উ আমাদের আপন হইয়ে গেছে। উ বাউরিণী হইলেও এখন বামনী হইয়ে গেছে।'

হরুঠাকুর যোগ দিল, "উকে ফেললে আমাদেরই বদনামি হইত, ঘরের কথা ছড়াইত, বুঝলেন কর্তা—ত উ চায় উয়ার নামটো খতিয়ানে লিখা থাক। উকে যে আপনি কইলেন উয়ার নাম লিখা হইছে ত সেই নিয়াই উ আনন্দ করবেক, খুশী থাকবেক। উয় ত বয়স অনেক হইছে, উয়ার খুশীর দিনও ফুরাইছে বহুকাল।"
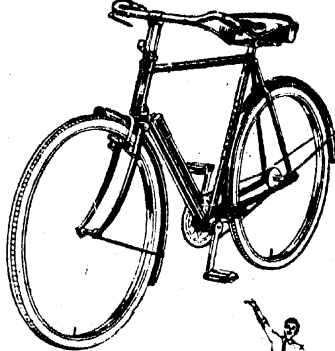
'নীল দর্পণের' অনুবাদ ও আলোচনা

NIL DURPAN—By Dinabandhu Mitra; and translated by Michael Madhusudan Dutt; edited by Sudhi Pradhan. Published by Eastern Trading Co., 64 A Dharamtalla St., Cal.-13. Price Rs. 10/-

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীল দর্পণ' নাটকখানি কেবলমাত্র বাঙলার রঙ্গমঞ্চেই নয় রাজনীতির ইতিহাসের ক্ষেত্রেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৮৬১ সনে প্রথম ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গেই ইংরাজ শাসক মহলে এক প্রচন্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। প্রকাশক ছিলেন রেভারেন্ড জেমস লঙ যাকে তাঁর এই কাজের জন্য রাজদ্রোহিতার অপরাধে শাস্তি ভোগ করতে হয়। এক বছর পর অনূদিত নাটকখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় লন্ডনে এবং দ্বিতীয় ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সনে ট্রায়াল অফ রেভারেন্ড লঙ গ্রন্থে। পঞ্চাশ বৎসর পর প্রকাশিত আলোচ্য সংস্করণটির ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে মূল্য আছে। পূর্ববর্তী সংস্করণগুলিতে রাজরোষের আশঙ্কায় নাটকখানির সম্পূর্ণ অনুবাদ হয়নি, কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল; আলোচ্য সংস্করণে সম্পাদক সুধী প্রধান নাটকখানির এই অসম্পূর্ণতা দূর করেছেন। এ ছাড়া নীল চাষের বিবরণ, লঙের মামলার পূর্ণ বিবরণ; বঙ্কিমচন্দ্র রচিত দীনবন্ধু মিত্রের জীবনীর অনুবাদ; দ্বিতীয় সংস্করণের ভুলগুলির শুদ্ধিকরণ এবং লঙের মামলা সম্পর্কে তৎকালীন পত্র-পত্রিকার অভিমত সংকলিত করে সম্পাদক গ্রন্থখানির মূল্য বাড়িয়েছেন। (৫৭৯।৫৮)

নাটক

রুপোলী চাঁদ—ধনঞ্জয় বৈরাগী। আর্টস অ্যান্ড লেটার্স পাবলিশার্স, ৩৫নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১২। মূল্য—২.৫০।

ধনঞ্জয় বৈরাগী সাম্প্রতিক নাট্যকারগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য নাম। আলোচ্য নাটকে নাট্যকার হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। বাস্তব জগতের প্রতিবিম্বন তাঁর বৈশিষ্ট্য। 'Realist' আখ্যাজ্ঞাপন করতে গিয়ে দিলীপকুমার রায় দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত অর্থে তিনি নিছক 'বস্তুবাদী' নন। মানুষের মনুষ্যত্ব যে বস্তুজগতের মধ্যেও পরিদৃশ্যমান—এই তত্ত্বটি তাঁর নাটকে রসরূপ পেয়েছে। নাটকের নিয়ম সম্বন্ধে তিনি সচেতন এবং তাঁর মধ্যে যে সম্ভাবনা দেখা গেল সেটি সমাজবুদ্ধি-সম্পন্ন সার্থক নাট্যকারের লক্ষণ। জীবনের যাথার্থ্য এই নাটকের রস। (৩৮/৫৮)

ত্রিনয়ন—সুনীল দত্ত। জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। এক টাকা।

আধুনিক বাংলা নাট্যসাহিত্য প্রচুর সমৃদ্ধ না হলেও, ভালো নাটক যে একেবারেই নেই তা নয়। বিশেষত, একাংকিকার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কালে যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হয়েছে তাতে আশান্বিত হবারই কারণ রয়েছে। এমনি আর একটি উল্লেখযোগ্য একাংকিকা সংকলন সুনীল দত্তের ত্রিনয়ন।

কুয়াশা নিশির ডাক ও স্মৃতিচিহ্ন—এই তিনখানি নাটকই সমৃদ্ধ। এর যে কোনটিই অভিনীত হলে দর্শকবৃন্দ নতুনত্বের স্বাদ পেয়ে তৃপ্ত হবেন। ৪১৭।৫৮

ধন্বন্তরী ক্লিনিকস্—নিরংকুশ। অশোক পুস্তকালয়, কলিকাতা-৯। এক টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

ধন্বন্তরী ক্লিনিকস্ হাসির নাটক। কিন্তু নাট্যকার এর হাসির আড়ালে হাল আমলের বিভিন্ন ক্ষেত্রচারীর ভোল লক্ষ্য করে তির্যক ব্যঙ্গ করে গেছেন গোটা নাটকটিতেই। তবে এই ব্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যই হল এ আমাদের গায়ে বেঁধে, কিন্তু তাতে বিষ নেই—গায়ে তাই জ্বালা ধরায় না। শুধু নিজেদের যাথার্থ্য চিনতেই তা সাহায্য করে, বর্তমান সম্বন্ধে আমাদের ভাবিয়ে তোলে। এখানেই নাট্যকারের কৃতিত্ব।

ভূমিকায় বাণীকুমার যা লিখেছেন তার সঙ্গে আমরাও একমত। বইখানি চিরকুমার সভার কথা স্বভাবতই মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এটা গৌণ, এই নাট্যবস্তুর গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই মূলত নাট্যকারেরই মৌলিক সৃষ্টি। আর এই সৃষ্টি সার্থক সুন্দর। ৩৬৭।৫৮

ইতিহাস

সম্রাট বাহাদুর শাহের বিচার—অপূর্বমণি দত্ত, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা-১২। তিন টাকা।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ যে তাতে যোগ দিয়েছিলেন তা সকলেরই জানা। বিদ্রোহ দমন করে ইংরেজ যখন আবার দিল্লী অধিকার করে তখন সম্রাট ও পুত্রেরা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরে। সেখান থেকে ইংরেজ সেনাপতি হডসন তাঁদের বন্দী করেন, পথে সম্রাটের পুত্রদের তিনি নৃশংসভাবে গুলী করে হত্যা করেন এবং পরে বিচারে বাহাদুর শাহ অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে নির্বাসন দণ্ড মাথায় নিয়ে চলে যান সুদূর ব্রহ্মদেশে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটানোর জন্য—এসব খবরও সকলেরই জানা। কিন্তু যে খবর অনেকেরই অজ্ঞাত তা হল এই বিচারের বিস্তৃত বিবরণ। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সেই বিবরণকেই সুখপাঠ্য করে উপস্থিত করেছেন সাধারণ বাঙালী পাঠকের জন্য। আর সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদার্হ।

যে বিষয়বস্তু নিয়ে গ্রন্থখানিতে আলোচনা করা হয়েছে তা হচ্ছে—(ক) সম্রাটের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ, (খ) চুণীলাল বলে এক ব্যক্তির লেখা সমসাময়িক দিনপঞ্জীর কিয়দংশ, (গ) সম্রাটের বিবৃতি, (ঘ) বিচারকালে গভর্নমেণ্ট প্রসিকিউটর মেজর এফ জে হ্যারিয়েটের বক্তৃতা এবং (ঙ) বিচারের রায়। পরিশিষ্টে অপর দুই অপরাধী মোগল বেগ এবং হাজী খাঁর বিচারেরও বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। এদের দুইজনেরই বিচারে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা হয়েছিল।

বইখানি বাংলা ঐতিহাসিক সাহিত্যে একখানি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ২৪।৫৯

ঐতিহাসিক কাহিনী

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ—নরেন্দ্রনাথ রায়। সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা-৯। এক টাকা প'চাত্তর নয়া পয়সা।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের উল্লেখ থাকলেও সেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী আমাদের খুব বেশী জানা নেই। হাণ্টার প্রভৃতির গ্রন্থে অবশ্য এই বিদ্রোহের বহু প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায়। এইসব গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সেই মশলা নিয়ে এবং তার সাথে খানিকটা কল্পনার রং মিশিয়ে আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনী ছোটদের জন্য গড়ে তুলেছেন লেখক। ইতিহাসের এক অবজ্ঞাত পাতা লেখকের রচনার গুণে রঙিন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আর তা পড়তে পড়তে এক নিমেষে সময়ের স্রোত পেরিয়ে অন্য যুগে অন্য জগতে গিয়ে উপস্থিত হতে হয়।

যাদের জন্য বইখানি লেখা তারা বইখানি পড়ে নিঃসন্দেহে আনন্দিত হবে। ১০।৫৯

জীবনী-সাহিত্য

রামমোহন—মণি বাগচী। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-২৯। চার টাকা।

অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ আগমনের ফলে একদিকে যেমন বৈদেশিক ভাবধারার আঘাতে ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবনাদর্শ, সামাজিক মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি ভেঙেগ পড়েছিল, তেমনি আবার এই ইংরেজ অভিঘাতে এক নতুন অন্তর বেদনায় বাংলা ও বাঙালী উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, কালপ্রবাহের সঙেগ সঙেগ নতুন প্রেরণায় গোটা সমাজ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতকে এই বিচিত্র সমাজ-সংঘাত প্রত্যক্ষ জীবনের ক্ষেত্রে যেসব ব্যক্তিকে টেনে এনেছিল, যাঁরা এই সংঘাতের মর্মবাণী আত্মস্থ করে ইতিহাসের গোপন ভাষাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলেছিলেন, ভারত-পথিক রাজা রামমোহন তাঁদেরই পুরোধা। আলোচ্য গ্রন্থখানি এই পটভূমিকায় রামমোহনের ধ্যান-ধারণা-মনন-কল্পনার নবমূল্যনিরূপণের এক সার্থক প্রয়াস।

আলোচ্য গ্রন্থখানি চিরাচরিত অর্থে চরিত-কথা মাত্র নয়। একদিকে তা রামমোহনের জীবনীকথা, অন্যদিকে তা রামমোহনের জীবন-ভাষ্য, তাঁর সর্বাত্মক কর্মপ্রয়াসের নিপুণ ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণ। একদিকে এতে যেমন রয়েছে বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের ক্ষেত্রে রামমোহনের শিক্ষা প্রচারে, ধর্ম ও সমাজসংস্কারে, রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে দানের বিচিত্র কাহিনী, তেমনি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার ও চেতনার উদার মানবিকতার কথাও লেখক স্বল্পপরিসরে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন।

প্রত্যেক বিদগ্ধ পাঠকই বইখানি পড়ে তৃপ্ত হবেন। ৫৮।৫৯

মাইকেল—মণি বাগচী। জিজ্ঞাসা, কলিকাতা-২৯। চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি কবি শ্রীমধুসূদন সম্বন্ধে সর্বাধুনিক গ্রন্থ। ইহা মধুসূদনের সাহিত্য-কর্মের ইতিহাস মাত্র নয়। আবার শুধুমাত্র মধুসূদনের জীবন কাহিনী রচনার মধ্যেও ইহার বিষয়বস্তু সীমিত নয়। উনিশ শতকের রেনেসাঁসের পটভূমিকায় এ এক বিচিত্র জীবনালেখ্য। অথচ কোথাও অতি-পাণ্ডিত্যের ভারে বইখানি ভারাক্রান্ত হয়নি। সেখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

বইখানির প্রথম চার অধ্যায়ে লেখক বাংলার নবজাগরণের এক সংক্ষিপ্ত পটভূমি অঙ্কন করেছেন সার্থকভাবে। আর এই পটভূমিতেই মধুসূদনের জীবন, জীবনবোধ ও সাহিত্য-কর্মের বর্ণনা, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ তিনি উপস্থিত করেছেন সমগ্র বইটিতে। তাঁর এই প্রয়াসের ফলও সার্থক হয়েছে।

বইখানি মধুসূদনের জীবনী বা সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে উৎসুক পাঠকমাত্রেরই সমাদৃত হবে। ৫৯।৫৯

শিক্ষাবিজ্ঞান

শিক্ষা পরিক্রমা—ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য। আক্ষরিক, ১৫, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। চার টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি শিক্ষাবিষয়ক দশটি প্রবন্ধের একখানি সংকলন। মূলত প্রবন্ধগুলিতে আমাদের দেশের বর্তমান প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রসঙেগ এই ব্যবস্থা ভালোভাবে বুঝবার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় সাম্প্রতিক মুদালিয়র কমিশন ও দে কমিশনের রিপোর্ট, কংগ্রেস কর্তৃক ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট এবং যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন-কল্পে প্রবর্তিত ১৯৪৪ সালের বাটলার আইন প্রভৃতি সম্পর্কেও স্বল্পপরিসরে সুষ্ঠু আলোচনা এই বইখানিতে স্থান পেয়েছে। বইখানি সুলিখিত এবং আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক পাঠকমাত্রেরই কৌতূহল মেটাতে সক্ষম হবে। বিশেষত, শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীরা বইখানি থেকে তাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু বিষয় সম্পর্কেই সহজে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। ৩৫।৫৯

শিশুসাহিত্য

বাহাদুর—ননীগোপাল মজুমদার। অভিজিৎ প্রকাশনী, কলিকাতা-১২। দুই টাকা।

বাজারে যখন সস্তা চটকদার ডিটেকটিভ গল্পের ছড়াছড়ি, সেই সময় ছোটদের জন্য লেখা এই ডিটেকটিভ কাহিনীটি ছাপিয়ে প্রকাশক ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। স্কাউটদের একখানা ইংরেজী গল্পের ছায়া এই বইখানিতে থাকলেও, বইখানি মূলত লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি।

বইখানি দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে রয়েছে সহায়রাম, অসিত আর রমেন—এই তিনটি বালকের দুঃসাহসিক কৌতূহল নিবৃত্তির বিচিত্র কাহিনী। এই কাহিনীর কোথাও অবাস্তব কল্পনাবিলাসের বাহুল্য নেই, নেই অহেতুক গোলাগুলি খুন জখমের কাহিনী যা না থাকলে গোয়েন্দা কাহিনী বুঝি জমেই না। এ শুধুই তিনটি বালকের সম্ভাব্য কৌতূহল চরিতার্থ করার নিতান্তই সম্ভাব্য কাহিনী। অথচ, বইখানি পড়তে বসলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাতে ডুবে যেতে হয় এবং শেষ পাতা পর্যন্ত সে আকর্ষণ বর্তমান থাকে।

আরম্ভেরও আরম্ভ আছে। প্রথম খণ্ডে তাই যে কাহিনীর অবতারণা তার নায়কত্রয় তাদের কৌতূহল মেটাতে গিয়ে যে বিচিত্র ঘটনার সাথে জড়িত হয়ে পড়ল, তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে দ্বিতীয় খণ্ডে। এদিক থেকে তা প্রথম খণ্ডের পরিপূরক।

বইখানি যাদের জন্য লেখা তারা এই বই পড়ে খুশী হবে। ৩৭।৫৯

কলকব্জার গল্প। এম্. ইলিন ও ই. সেগাল। প্রভাসকুমার রায় ও অনিমেষ পাল মূল রুশভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাইভেট) লিমিটেড, কলিকাতা-১২ থেকে প্রকাশিত। মূল্য ৬২ নয়া পয়সা।

কলকব্জার যুগে বয়স্ক ব্যক্তি যেমন আরাম-বোধ করেন তেমনি তাদের রহস্য-ভেদ করার কথাটা হয়তো তাঁদের মনে থাকে না। পক্ষান্তরে, শিশুদের ধর্মই হলো কৌতূহল, বিস্ময়। সেই শিশুদের বিস্ময়জড়িত নানা স্বাভাবিক প্রশ্নের গল্পচ্ছলে উত্তর এখানে দেওয়া হয়েছে। অনুবাদকদ্বয়ের ভাষাসৌকর্য প্রশংসনীয়।

(৫০২/৫৭)

ধর্মগ্রন্থ

রামায়ণ কথামৃত—সুরেন্দ্রমোহন ভৌমিক। ডি এম লাইব্রেরী কলিকাতা-৬। ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত মূল সংস্কৃত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত বাংলা সংস্করণ। বইখানিতে মূল গ্রন্থের কাহিনীকে অবিকৃতভাবে সহজ ভাষায় পরিবেশন করে লেখক ভক্ত পাঠকমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। বইটির আরেকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য, কাহিনীর বিবৃতি প্রসঙ্গে মাঝে মাঝেই মূল সংস্কৃতের প্রচুর উদ্ধৃতি ও তার বাংলা অনুবাদ। অনুবাদ স্বচ্ছ ও হৃদয়গ্রাহী।

তবে বইটির ভূমিকা সম্পর্কে একটা কথা বলা প্রয়োজন। উক্ত ভূমিকায় রামায়ণ ও মহাভারতের কাল নির্ণয়ের যে প্রচেষ্টা করা হয়েছে, তা' অসংগত বলেই মনে হয়। 'এখন পর্যন্ত যে প্রমাণাদি আমাদের হাতে এসেছে তাতে লেখকের নির্ণীত কালকে কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। ৫।৫৯

ভ্রমণকাহিনী

উৎকল তীর্থে—স্বামী সিদ্ধানন্দ। সারস্বত মঠ, কোকিলামুখ, জোরহাট, আসাম। তিন টাকা।

'উৎকল তীর্থে' ভ্রমণ কাহিনী সত্য, কিন্তু শুধু মাত্র ভ্রমণ বৃত্তান্তেই তার শেষ নয়। পুরুষোত্তমক্ষেত্র পুরী, কোণার্ক, ভুবনেশ্বর, নীলাচল প্রভৃতি উৎকলের বিভিন্ন ও বিশিষ্ট ক্ষেত্রগুলির বর্ণনা যেমন এতে স্থান পেয়েছে, তেমনি আবার এইসব তীর্থের ক্রম ও পর্বাদি, এদের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পটভূমি, বিভিন্ন মন্দির, মন্দিরগাত্রের বিভিন্ন লিপি ও চিত্র প্রভৃতি সম্পর্কেও বহু তথ্য এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। শুধু তাই নয়; প্রসংগত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদ পর্যালোচনাও লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় স্থানে স্থানে করেছেন। এইদিক থেকে বইখানি অভিনবত্বের দাবী রাখে। বইখানির যে পরিচিতি প্রফুল্লচন্দ্র ভঞ্জদেব মশাই লিখেছেন তাও উল্লেখযোগ্য। বিশেষত উড্ডীয়ানা কুরুকুল্লা মূর্তির যে ছবিটি এই সংগে স্থান পেয়েছে ও সেই প্রসংগে উৎকলে তন্ত্রসাধনার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে।

বহু তথ্যসমৃদ্ধ এই বইখানির সকল মতের সাথে সকলে একমত না হতে পারলেও উৎকল সম্পর্কে বহু প্রামাণ্য তথ্যই বইখানি থেকে সকলেই সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। সেদিক থেকে বইখানি সমাদৃত হবে বলেই আশা করা যায়। ১৫।৫৯

কবিতা

সূর্যমুখী—অরুণ গুপ্ত। নবচেতনা, ৩৯, ক্ষেত্র ব্যানার্জি লেন, শিবপুর, হাওড়া। এক টাকা। **দেবধূপ**—গোষ্ঠবিহারী কুইলা। গ্রন্থ-সমাজ, ৩৫ খেলাতবাবু লেন, কলকাতা—২। দু টাকা। **অস্তাচল**—নকুলেশ্বর পাল। যোগেশ-চন্দ্র সাহা। ২২ডি, শ্রীনাথ মুখার্জি লেন, কলকাতা—৩০। ২·২৫।

যমুনার জলে জাগে রক্তের ঢেউ—মাধবনারায়ণ বসু। বিভূতিভূষণ সরকার ঃ ১৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলকাতা—৭। দু টাকা।

সৌনিকের প্রাণবীণা (দ্বিতীয় পর্ব) চুনী-লাল গঙ্গোপাধ্যায়। গাংগুলী গ্রন্থাগার, ৬, বেনিয়া পুকুর লেন, কলকাতা—১৪। পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

পাঁচখানিই কবিতার বই। তবে এক জাতীয় কবিতার বই নয়। অপরিণত রচনার সূত্রেই পরস্পরের মধ্যে যা মিল। তবু অরুণ গুপ্তের কবিতার মধ্যে কিছু কিছু ক্ষমতার পরিচয় আছে। ভংগীর দিক থেকে তিনি বাকি সকলের চেয়ে আধুনিক। 'দেবধূপ' ও 'অস্তাচলে'র মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সুর লেগেছে। মুদ্রণ পারি-পাট্যে 'অস্তাচল' যথেষ্ট রকম প্রশংসনীয়। মাধবনারায়ণ বসুর দীর্ঘ কবিতাগুলি উপজাতি নিপীড়নের বিরুদ্ধে কাব্য প্রতিবাদ। চুনীলাল-বাবুর পদ্যগুলিও বিপ্লবের ভিত্তিতেই রচিত। ৬৫৩।৫৬, ৫৯।৫৯, ৩১২।৫৭, ৫৭০।৫৮, ৬২৩।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে ঃ—

চতুষ্টয়—হিমাংশুবালা ভাদুড়ী।

বাস্তবের দু' পৃষ্ঠা—দেমুখৎ।

শিক্ষা বিচার—বিনোবা। অনুবাদক রণেন্দ্র-কুমার দাস।

সরোজরঞ্জন ভজনাবলী—শ্রীসরোজরঞ্জন ঘোষ।

কবির্মনীষী—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় পুস্তক পরিচয় বিভাগে শ্রীরাজশেখর বসু প্রণীত গ্রন্থ "চলচ্চিন্তা"-র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রণ প্রমাদ-বশতঃ উক্ত গ্রন্থের নাম 'চলন্তিকা' ছাপা হওয়ায় আমরা দুঃখিত। —সম্পাদক, দেশ

চন্দ্রদত্ত

আমেরিকার গোয়ালাদের ধারণা যে, গরুর দুধ দুইবার সময় যদি কোন রকম গানের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তারা আরো বেশী দুধ দেবে। এই বিষয় নিয়ে সেদিন একটা আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই আলোচনায় ডাঃ স্মিথ বলেন যে, ব্যাপারটা ঠিক উল্টো—দুধ দোহনের সময় গান বাজনার ব্যবস্থা করলে গরু কম দুধ দেবে। কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন যে, দুধ দেবার সময় বাইরের কোন রকম শব্দ গরুর মনোযোগ আকর্ষণ করলে তার শরীরের ভিতর যে হর্মোন দুধ দিতে সাহায্য করে, তার কম ক্ষরণ হবে, ফলে কম দুধ দেবে। সাধারণ অবস্থায় দুধের থলির পেশীসমূহ বেশ নরম থাকে, কারণ হর্মোন রক্তের সঙ্গে মিশে দুধের থলির ওপর চালিত হয়।

*

আমেরিকায় সম্প্রতি মহাশূন্যে যাত্রা করার উপযোগী যে নতুন রকেটটি তৈরী করা হয়েছে, সেটি শব্দ অপেক্ষা পাঁচ গুণ বেশী গতিবিশিষ্ট। খুব শীঘ্রই এই

মহাশূন্যের যাত্রী রকেট প্লেন এক্স—১৫

রকেটটিকে পরীক্ষামূলকভাবে ৪০০ মাইল পথ পরিভ্রমণের জন্য শূন্যে পাঠানো হবে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, তখন ঘণ্টায় ৩৬০০ মাইল গতিতে যেতে পারবে। অতিরিক্ত গতির ফলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হবে, তৎসত্ত্বেও চালককে শীতল আবহাওয়ার মধ্যে রাখার জন্য রকেটটির ভিতরে শূন্য ডিগ্রীর চেয়ে ৩০০° ডিগ্রী কম উত্তাপবিশিষ্ট তরল নাইট্রোজের রাখা হবে।

*

ডাঃ পলওয়েস্ত বলেন যে, দেহের অভ্যন্তরের তাপ যদি খুব বেশী না হয় বস্তুত শীতল হয়, তাহলে বাইরের তাপ দেহ সহ্য করতে পারে অর্থাৎ শরীরের ভেতরের তাপ যত কম হয় বাইরে থেকে তত বেশী তাপ শরীর সহ্য করতে পারে। অবশ্য কি উপায়ে শরীর-ভেতরটা ঠাণ্ডা রাখা যায়, তার কোনও সঠিক নির্দেশ আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেননি। দেখা গেছে যে, মহাশূন্যে যাত্রী পরীক্ষামূলক যানবাহনগুলির আরোহীদের দেহের মধ্যে তাপ ১০২° ডিগ্রী হয়, তখন বাইরের উত্তাপ তাদের কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। আরও একটা জিনিস ডাঃ ওয়েস্ত লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, যখন আবহাওয়ার উত্তাপ ১৬০° হয়, তখন প্রত্যেক ২০ মিনিটে শরীরের ভেতর তাপ এক ডিগ্রী করে বেড়ে যায়।

*

জন্মের পরমুহূর্তেই শিশুর মৃত্যু হওয়া খুব অসম্ভব ঘটনা নয়। নানা কারণেই এই মৃত্যু ঘটে। বিশেষত প্রসূতি যদি অনেকক্ষণ প্রসব-বেদনা ভোগ করে, তাহলে মাতৃ-জঠরেই শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাসের বিঘ্ন ঘটে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শ্বাস-প্রশ্বাস কোনওমতেই নিতে পারে না। তখন কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে পারলেই শিশুকে বাঁচান সম্ভব হয়। রাশিয়ায় দুটি ভদ্রলোক কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণোপযোগী "আর, ডি, এ এবং এক" নামে একটি যন্ত্র বার করেছেন। যে সব নবজাত শিশু স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস নিতে পারে না, তাদের পক্ষেই এই যন্ত্রটি বিশেষ কার্যকরী হবে। এই যন্ত্রটিকে রাশিয়ার অনেক হাসপাতালে, বিশেষত প্রসূতি সদনে ব্যবহার করে দেখা গেছে যে, যখন কোনও উপায়েই শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয় না, তখন এই যন্ত্রটিই একমাত্র শিশুর জীবন দান করতে পারে।

*

চিরদিনই শোনা যায় যে, জল স্বাভাবিক-ভাবে স্বাদ-গন্ধ-বর্ণ বিহীন। এখন আবার নতুন তর্ক উঠেছে। সুইডেনের বৈজ্ঞানিকরা সম্প্রতি, জল সত্যই স্বাদবিহীন কি না, এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন এবং তাদের মতে এই প্রশ্নের উত্তরে হাঁ-না দুইই হতে পারে। প্রাণীকুলের মধ্যে বিড়াল, কুকুর, শুয়র এবং ব্যাঙের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এদের জিভের স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা খুব বেশী থাকায় এরা জলের স্বাদ টের পায়, কিন্তু মানুষ, বাঁদর, ইঁদুর ইত্যাদি জীব জলের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য দুটিমাত্র মানুষের ওপর পরীক্ষা করেই বর্তমানের মতামত জানা গেছে। আরও কিছুকাল পরীক্ষার পর সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান যাবে।
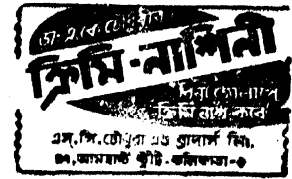
চলচ্চিত্রের রাষ্ট্রীয় সম্মান

চলচ্চিত্র শিল্পে বাঙালীর প্রতিভা আবার নতুন করে স্বীকৃতি পেয়েছে ১৯৫৮ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র নির্বাচনের ব্যাপারে।

রাষ্ট্রের তরফ থেকে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবিকে যে সম্মান ও পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, সেই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে দু'খানি বাংলা ছবি—দেবকী বসু পরিচালিত "সাগর সংগমে" ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "জলসাঘর।" প্রথমোক্ত ছবিটি পাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ছবিকে দেওয়া হবে অল ইন্ডিয়া সার্টিফিকেট অফ মেরিট। দুটি ছবির প্রযোজক ও পরিচালক নগদ পুরস্কারও লাভ করবেন।

গত ছ' বছর যাবৎ শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ছবিকে এমনিভাবে রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করা হচ্ছে। বাংলা ছবি এবার নিয়ে তিনবার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করবার যোগ্যতা অর্জন করল। ১৯৫৫ সালে "পথের পাঁচালী" ও ১৯৫৬ সালে "কাবুলিওয়ালা" এই সম্মান লাভ করে। ১৯৫৮ সালের জন্যে পেলো "সাগর সংগমে।" শেষোক্ত ছবিটি সম্বন্ধে অনেকের মনে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তার কারণ ছবিটি এখনও মুক্তি-লাভ করে নি। এই প্রসংগে বলা দরকার, যে বছরের জন্যে প্রতিযোগিতা, সেই বছরের মধ্যে ছবিটি যদি সেন্সর সার্টিফিকেট পায় তাহলেই তা প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। "সাগর সংগমে" এই হিসাবে ১৯৫৮ সালের ছবি। "কাবুলিওয়ালা" ১৯৫৭ সালে সাধারণ্যে প্রদর্শিত হলেও তার আগের বছরে সেন্সর সার্টিফিকেট পাওয়ায় ১৯৫৬ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে সম্মানিত হয়েছিল। তবু "কাবুলিওয়ালা" নিয়ে সাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়নি শুধু এই কারণে যে রাষ্ট্রীয় নির্বাচনের আগেই ছবিখানি দেখবার সুযোগ পেয়েছিল সকলে। "সাগর সংগমে"র বেলায় তা হয়নি।

"সাগর সংগমে"র বর্তমান সম্মানে বাংলা ছবি নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করল ছবারের মধ্যে তিনবার রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করে। যে বছরে রাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতার প্রথম প্রবর্তন হয় সেই বছরে শ্রেষ্ঠ সম্মান পায় একটি মারাঠী ছবি—পি কে আত্রে প্রযোজিত ও পরিচালিত "শামচী আই।" এ পর্যন্ত মাত্র দুখানি হিন্দী ছবি এই সম্মান লাভ করতে পেরেছে—১৯৫৪ সালে সোরাব মোদীর "মির্জা গালিব" ও ১৯৫৭ সালে ভি শান্তারামের "দো আঁখে বারা হাথ।"

চন্দ্রশেখর

হিন্দী ছবির দৈন্যদশা এ বছরে আরো সুপ্রকট হয়েছে। সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ছবিগুলিকে দেওয়া হয় অল ইন্ডিয়া সার্টিফিকেট অফ মেরিট। এ বছরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান যথাক্রমে অধিকার করেছে বাংলা "জলসাঘর" ও কানাড়ী ছবি "স্কুল মাস্টার।"

অনংগ পিকচার্সের "শ্রীরাধা"র নাম ভূমিকায় সবিতা চট্টোপাধ্যায়

বোম্বাই ও মাদ্রাজের ঢক্কানিনাদিত হিন্দী ছবিগুলি কল্কে পায়নি শিল্প-কৌলীন্যের বিচারে।

শিশুচিত্রের ক্ষেত্রে এ বছরে কোন ছবিই প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক লাভ বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করবার যোগ্য বিবেচিত হয়নি। এই বিভাগে মাত্র একটি ছবিকে অল ইন্ডিয়া সার্টিফিকেট অফ মেরিট দেওয়া হয়েছে। ছবিটির নাম "বীরশা এন্ড দি ম্যাজিক ডল"—শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী এর লেখক, পরিচালক ও অন্যতম প্রযোজক। গত সংখ্যায় ছবিখানির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা পাঠকদের কাছে পেশ করেছি। গত বছরে এই বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক লাভ করে এ-ভি-এম প্রযোজিত হিন্দী ছবি "হাম পঞ্ছী এক ডাল কে" এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বাংলা ছবি "জন্মতিথি।"

আঞ্চলিক ভাষায় গুণানুক্রমে "সাগর সংগমে", "জলসাঘর" ও "ডাক হরকরা" শ্রেষ্ঠ তিনটি স্থান অধিকার করেছে—এ খবর আগেই বেরিয়েছে। হিন্দী বিভাগে "মধুমতী", "সাজসন্তী" ও "কারিগর" যথাক্রমে এই সম্মান লাভ করেছে।

যাঁরা এ বছরে রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করেছেন তাঁদের সকলকে অভিনন্দন জানাই।

চিত্রালোচনা

পৌরাণিক ছবির জয়-জয়কার এ হপ্তায়। মোট পাঁচখানি নতুন ছবির মধ্যে তিনখানি পুরাতন কাহিনীর চিত্ররূপ, বাকী দুটির গল্প হাল আমলের।

বাঙলা ছবির সংখ্যা দুটি—সুলতা পিকচার্সের "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু" ও অনঙ্গ পিকচার্সের "শ্রীরাধা"। প্রথমখানি পরিচালনা করেছেন অসীম পাল, দ্বিতীয়খানি সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার।

"শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু" গৌরাঙ্গদেবের লীলা-সহচর নিত্যানন্দের পুণ্য জীবন কথা তুলে ধরেছে ছবির পর্দায়। নাম-ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন। শ্রীচৈতন্য, বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীদেবীর ভূমিকায় নেমেছেন যথাক্রমে নবগোপাল, সন্ধ্যা রায় ও চন্দ্রাবতী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন তরুণকুমার, রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শীলা পাল, অপর্ণা দেবী, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি। কীর্তনকলানিধি রথীন ঘোষ এই ছবিতে সুরযোজনা করেছেন। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে ভক্তিমধুর গান এই ছবির অন্যতম সম্পদ।

সবিতা চট্টোপাধ্যায়কে আজকাল কালে-ভদ্রে ছবিতে দেখা যায়। বৃন্দাবনলীলার অধিনায়িকার বেশে তাঁকেই দেখা যাবে "শ্রীরাধা" ছবিতে। এর ভূমিকালিপিতে ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী, রেণুকা রায়, গীতশ্রী, মহেন্দ্র গুপ্ত, সমীরকুমার, নব-কুমার, শ্যাম লাহা, নবদ্বীপ হালদার, মণি শ্রীমাণী—এঁরাও আছেন। তাছাড়া নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখো-পাধ্যায়, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্তকুমার, ধনঞ্জয়, সতীনাথ, মানবেন্দ্র, শচীন গুপ্ত, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত সংগীত-শিল্পীরা। পবিত্র চট্টোপাধ্যায় "শ্রীরাধা"র সংগীত পরিচালক।

• • •

এম জি এ প্রোডাকশন্সের "পতি পরমেশ্বর" হিন্দীতে তোলা পৌরাণিক চিত্র। মূল ভূমিকাগুলিতে অভিনয় করেছেন নিরূপা রায়, মনোহর দেশাই এবং বোম্বাইয়ের সবিতা চ্যাটার্জী। মনু দেশাই একাধারে এর প্রযোজক ও পরিচালক। সুর-সৃষ্টির দায়িত্ব বহন করেছেন অবিনাশ ব্যাস।

সিলভার উইংসের হিন্দী চিত্রার্ঘ্য "দো ফুল" তিনটি কিশোর শিল্পীর মর্ম-

সুলতা পিকচার্সের "শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু"র একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্যে শচীমাতা ও নিমাইয়ের ভূমিকায় যথাক্রমে চন্দ্রাবতী ও নবগোপাল

স্পর্শী অভিনয়ে সমুজ্জ্বল। তাদের নাম—বেবি নাজ, রোমী ও বিজয়া চৌধুরী। বড়দের ভূমিকায় নেমেছেন বিপিন গুপ্ত, উল্লাস, জীবন, প্রতিমা দেবী, নীলম প্রভৃতি। এ আর কারদার ছবিটি পরিচালনা করেছেন এবং সুর সৃষ্টি করেছেন বসন্ত দেশাই।

ফিল্মিস্তানের হিন্দী ছবি "ঘর-গৃহস্থী"র মূল উপাদান একটি ঘরোয়া কাহিনী। গুঞ্জল ও সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

* * *

অনেকদিন বাদে অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় আবার ছবির পরিচালনাভার গ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি তুলছেন দে প্রোডাকসন্সের দ্বিতীয় চিত্রার্ঘ্য "রায় বাহাদুর"। আনন্দ কিশোর মুন্সী এর রচয়িতা। মুখ্যাংশে নির্বাচিত হয়েছেন কিশোরকুমার ও মালা সিংহ। সহ-শিল্পীদের মধ্যে জীবেন বসু, সমীরকুমার, রেণুকা রায় ও জহর রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে এর শুটিং চলছে। হেমন্তকুমার সংগীত পরিচালনার ভার নিয়েছেন।

"ভানু পেলো লটারী"-খ্যাত কনক মুখোপাধ্যায় এবারে তুলছেন "এ জহর সে জহর নয়"। তিনি নিজেই এর লেখক ও পরিচালক। বলা বাহুল্য, জহর রায় এ ছবির নায়ক (যেমন "ভানু পেলো লটারী"র নায়ক ছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়)। নায়িকার ভূমিকায় নামছেন সুপ্রিয়া চৌধুরী। অন্যান্য চরিত্রে আছেন পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, রবীন মজুমদার ও চন্দ্রাবতী। ক্যালকাটা মুভি-টোন স্টুডিওতে এর শুটিং চলছে। ভি বালসারা সুরযোজনা করবেন এ ছবিতে। এম এম মুভিজের পতাকাতলে ছবিটি নির্মিত হচ্ছে।

"ভিজে বেড়াল" জি বি প্রোডাকশন্সের পরবর্তী কৌতুক-চিত্রের নাম। নবাগত অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয়া সরকার, জহর রায়, বাণী গাঙ্গুলী প্রভৃতিকে নিয়ে এর ভূমিকালিপি গঠিত হয়েছে। ইউ-সি এই নামে এর পরিচালক পরিচিত হতে চান। সম্প্রতি নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে "ভিজে বেড়াল"-এর কাজ আরম্ভ হয়েছে।

* * *

যে সব নতুন ছবির তোড়জোড় চলছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলির নামই উল্লেখযোগ্য।

"নীল আকাশের নীচে"র দেশজোড়া খ্যাতির পর পরিচালক মৃণাল সেন কল্লোল চিত্রের "বাইশে শ্রাবণ"-এর কাজে হাত দিয়েছেন। কানাইলাল বসুর একটি ছোট গল্প অবলম্বনে এটি তোলা হবে। এপ্রিলে এর শুটিং আরম্ভ হবার কথা।

মানু সেন তুলবেন "কমলে কামিনী"। ইতিমধ্যেই এর মহরৎ হয়ে গেছে। স্টুডিওর কাজ আরম্ভ হবে অচিরেই।

এপ্রিল থেকে আর একটি নতুন ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হবে। ছবির নাম "বুনো" এবং এস এ প্রোডাকশন্স এর নির্মাতা। গল্পটি লিখেছেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী এবং পরিচালনাও তিনিই করবেন। উত্তমকুমার ও অনীতা গুহকে এর শ্রেষ্ঠাংশে দেখা যাবে। হিন্দী চিত্র-খ্যাত ওমপ্রকাশও একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবেন।

তারাশঙ্করের "সপ্তপদী" অবলম্বনে তোলা হবে আলোছায়া প্রোডাকশন্সের পরবর্তী ছবি। এ'দের প্রথম ছবি "হারানো সুর"-এর মত উত্তমকুমারই এর প্রযোজক এবং অজয় কর এর পরিচালক। মুখ্যাংশ দুটিতেও আছেন সুচিত্রা সেন ও উত্তমকুমার।

কিশোর প্রাণের জয়

সিলভার উইংগস্-এর "দো ফুল" মামুলী ধরনের হিন্দী ছবির ভিড়ের মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বহুপঠিত বিদেশী গল্প "হাইডি" থেকে এই হিন্দী শিশু চিত্রটির আখ্যানভাগ আহরণ করা হয়েছে।

কিশোর প্রাণের আবেগ, স্বপ্ন ও আশার মনোরম পটভূমিতে গড়ে উঠেছে ছবির কাহিনী। জনপদ থেকে দূরে প্রকৃতির কোলে জংগু ও পূর্ণিমা অভিন্নহৃদয় বন্ধু হয়ে ওঠে দিনে দিনে। কিন্তু সংসারের নীচতা সেখানেও তাদের রেহাই দেয় না। পূর্ণিমাকে সেখান থেকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে তার এক নির্দয়া আত্মীয়া তাকে বিক্রী করে দেয় এক বড়লোকের বাড়ীতে। পূর্ণিমা সেই বাড়ীতে বড়-লোকের পংগু মেয়ে রূপার সহচরী হয়ে থাকে। উভয়ের সম্পর্ক অবশ্য নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয় সহজেই। পূর্ণিমা রূপার সংগে লেখাপড়া শিখে রূপার বাবার মন জয় করে এবং ফিরে আসার অনুমতি পায় তার পুরনো আবেষ্টনে। রূপাও পূর্ণিমাকে ছেড়ে থাকতে না পেরে চলে আসে একদিন সেখানে। সমাজের বাইরে সেই পাহাড়ী অঞ্চলে রূপো কি করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে এবং পূর্ণিমা ও জংগু রূপার বাবার সাহায্যে কি করে তাদের জীবনের পরিপূর্ণতার পথ খুঁজে পায় তা-নিয়েই চিত্রনাট্যের পরিসমাপ্তি।

বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ছবিখানিকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছে। শিশুচিত্র হিসাবে এর আবেদন শুধু শিশুরাই নয়, বয়স্কদের কাছেও অনস্বীকার্য। আংগিক পারিপাট্য ও পরিবেশানুগ দৃশ্যরাজির দিক দিয়েও ছবিখানি নিঃসংশয় সাধারণ হিন্দী ছবির তুলনায় অনেক উঁচুদরের। তবে হিন্দী ছবির অনেক গতানুগতিকতা—তা গানের ব্যাপারেই হোক আর কষ্টকল্পিত 'মেলো-ড্রামা'র ক্ষেত্রেই হোক্—পরিচালক এ আর কারদার সম্পূর্ণ পরিহার করতে পারেননি। পূর্ণিমা ও জংগুর মধ্যে নির্মল ভালোবাসার সম্পর্ক বিন্যাসের দোষে শিশুসুলভ স্বাভাবিকতা কিছুটা হারিয়ে ফেলেছে।

অভিনয়ে দুটি প্রধান শিশু চরিত্রে বেবী নাজ (পূর্ণিমা) ও রোমি (জংগু) প্রশংসনীয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রূপার চরিত্রটিকেও ভালো লাগার মতো করে রূপায়িত করেছেন বিজয়া চৌধুরী। প্রধান পার্শ্বচরিত্রে বিপিন গুপ্ত, প্রতিমা দেবী ও উল্লাসের অভিনয় প্রাণবন্ত। অন্যান্যদের মধ্যে জীবন, এস এন ব্যানার্জি, নীলম ও আমির বানু উল্লেখযোগ্য।

বসন্ত দেশাই-এর সংগীত পরিচালনায় দুয়েকটি গান সুখশ্রাব্য। আলোকচিত্র ও অন্যান্য কলাকৌশলের কাজ উঁচু দরের।

স্টারে "ডাক বাংলো"

স্টার থিয়েটারের নতুন নাট্য-নিবেদন "ডাক বাংলো" মনোজ বসুর "বৃষ্টি বৃষ্টি" উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। নাট্যরূপ দিয়েছেন এই ব্যাপারে সুখ্যাত দেবনারায়ণ গুপ্ত। গল্প হিসেবে "বৃষ্টি বৃষ্টি" যেমন মনোজ বসুর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়, তেমনি ঐতিহ্যদীপ্ত স্টার রংগমঞ্চে ইতি-পূর্বে যেসব বলিষ্ঠ নাটক অভিনীত হয়েছে, তাদের সংগে এক পংক্তিতে স্থান পাবার যোগ্যতাও বর্তমান নাটকের নেই। তবে একটি নির্ভেজাল আমুদে গল্পের মনোরম নাট্যরূপ হিসেবে প্রমোদপ্রিয় দর্শকদের কাছে এর আবেদন অনস্বীকার্য। তাছাড়া এই নাটকের মাধ্যমে প্রখ্যাত নট ছবি বিশ্বাসের দীর্ঘকাল পরে মঞ্চাবতরণ স্টারের এই নবতম নাট্য-উপহারটিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

মগ্ন আপনভোলা ঐতিহাসিক বিশ্বেশ্বর সরকার পুরোনো নথিপত্র ঘেঁটে ভারতে ইংরেজ আমলের ইতিহাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর অনলস সাধনার ফল একটি প্রকাণ্ড তথ্যপূর্ণ বই—"ভারতে ইংরাজ"। এই গ্রন্থে লেখক নীল-বিদ্রোহ সময়কার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তার পিতামহ রামনিধির স্বদেশপ্রেমের কাহিনী বর্ণনা করেন। আর কলঙ্কমোচন করেন রামনিধির সময়ে ইংরেজের চর বলে কুখ্যাত কাশীশ্বর রায়ের।

কাশীশ্বর রায়ের এই কলঙ্কের জন্যে তাঁর পৌত্র ডাঃ অম্বুজাক্ষ রায়ও কোনদিন শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেননি তাঁর স্বগ্রামবাসীদের কাছ থেকে। ডাঃ অম্বুজাক্ষ তাঁর গ্রামাঞ্চল থেকে অ্যাসেম্বলী নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য নমিনেশন পান না সহজে। তাঁর পিতামহ কাশীশ্বরের কলঙ্ক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। পরে যখন তিনি শুনতে পান যে "ভারতে ইংরাজ" বইয়ে কাশীশ্বরের কলঙ্ক-মোচন করেছেন বিশ্বেশ্বর সরকার, তখন তিনি বিশ্বেশ্বরকে নিয়ে দেশের বাড়িতে গিয়ে বিরাট সভা করেন। ডাঃ অম্বুজাক্ষের বাড়ি থেকে বিশ্বেশ্বর বিস্তর পুরনো কাগজপত্র নিয়ে এলেন কলকাতায়।

এর আগে থেকেই ডাঃ অম্বুজাক্ষের ছেলে অরুণাক্ষ বিশ্বেশ্বরের মেয়ে ইরার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। তার অনুরাগের কথা সে প্রকাশও করেছিল ইরার মার কাছে। ইরা'র মা পঞ্চাননকে দিয়ে সে কথা তুলেছিলেন ডাঃ অম্বুজাক্ষের কাছে।

পঞ্চানন "যুগচক্র" সাময়িক পত্রের সহযোগী সম্পাদক। 'যুগচক্রে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় "ভারতে ইংরাজ" বইটি। "যুগচক্রে'র সম্পাদক কৃতান্ত বিশ্বাস ও পঞ্চানন বিশ্বেশ্বরের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কৃতান্ত বিশ্বাসের লক্ষ্য

ষ্টারের নতুন নাটক "ডাক বাংলো"-র একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস

নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের স্বপক্ষে লিখে কাগজের আয় বাড়ানো।

ইতিমধ্যে বিশ্বেশ্বর ডাঃ অম্বুজাক্ষের বাড়ি থেকে আনা পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে জানতে পারলেন তাঁর পূর্ব গবেষণা ছিল ভুল। কাশীশ্বর ছিলেন বাস্তবিকই ইংরেজের চর। নতুন করে ইতিহাস রচনা করতে চান তিনি। খবর পেয়ে ডাঃ অম্বুজাক্ষ ছুটে গেলেন বিশ্বেশ্বরের কাছে ইরার সংগে অরুণাক্ষের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। শর্ত হল কাশীশ্বরের কলঙ্কের কথা ফাঁস করা চলবে না। অনেক অন্তর্দ্বন্দ্বের পর সত্যসন্ধানী ঐতিহাসিক সমস্ত নথিপত্র দিয়ে দিলেন অরুণাক্ষকে।

অরুণাক্ষ এই সমস্ত নথিপত্র পেয়ে "বিষকুম্ভ" ছদ্মনামে কাশীশ্বরের কলঙ্ক নিয়ে লিখল "যুগচক্র" কাগজে। অরুণাক্ষের উদ্দেশ্য ছিল স্বনামখ্যাত দেশকর্মী প্রতুল দত্তের সহযোগিতায় তার বাবার নমিনেশন পাওয়া বন্ধ করা। কারণ প্রতুল দত্তের উদ্দেশ্য ছিল এই নমিনেশনের পরিবর্তে অম্বুজাক্ষের ছেলের সংগে নিজের মেয়ে সুনন্দার বিয়ে দেওয়া। তখন বিশ্বেশ্বর দেশের বাড়িতে। ডাঃ অম্বুজাক্ষ "যুগচক্রের" এই প্রবন্ধ নিয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বিশ্বেশ্বরের ওপরে। এমনি সময়ে তিনি খবর পেলেন ইরার সংগে দেশের বাড়িতে অরুণাক্ষের বিয়ে। বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন অরুণাক্ষের দাদামশায়। ডাঃ অম্বুজাক্ষ সেখানে পৌঁছবার আগেই তাদের বিয়ে হয়ে যায়। ইরা কি করে সহজেই অম্বুজাক্ষের মন জয় করে নেয় তাই নিয়ে নাটকের মধুর পরিসমাপ্তি।

কাহিনীর নাট্যরূপদাতা ও পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত নাটকটিকে একটি সহজ স্বচ্ছন্দ গতি দিতে পেরেছেন। সামগ্রিকভাবে রসসৃষ্টির দিক থেকেও তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। বিভিন্ন দৃশ্যে অনাবিল হাস্যরসের উপাদান এনে তিনি একটি সরস কমেডির পর্যায়ে এনে ফেলেছেন নাটকটিকে। পরিচালনার দিক দিয়েও নাটকটি বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। নাট্যরূপ ও পরিচালনার মস্ত বড় গুণ এই যে, নাটকটির প্রতি দর্শকদের মনোযোগ কখনও শিথিল হয় না।

তবে নাটকের কাহিনীর কতকগুলি অসংলগ্নতা ও বৈসাদৃশ্য বিচারশীল দর্শকদের পীড়া না দিয়ে পারে না। বর্তমানকালে পূর্বপুরুষের কলঙ্ক নিয়ে নির্বাচনে নমিনেশন পাওয়াতে বাধাসৃষ্টির ব্যাপারটা কষ্টকল্পিত। প্রার্থীর নিজস্ব গুণাগুণের বিচারের চেয়ে তার পিতামহের

কলঙ্কের বিচার আজকালকার যুগে নির্বাচনের ব্যাপারে জনসাধারণ ও খবরের কাগজের একমাত্র আলোচ্যবস্তু হতে পারে কিনা সেটাও বিচার্য। কাহিনীর প্রয়োজনে এ-জিনিস মেনে নিলেও এটা নাটকের খুব সুস্থ এবং বলিষ্ঠ পটভূমি নয়। কাহিনীর কৌতুক উপাদানের দিক দিয়ে মূল্য থাকলেও "যুগচক্রে"র সম্পাদকের পক্ষে কোন নির্বাচন-প্রার্থীর স্বপক্ষে লেখার বিনিময়ে অর্থ আদায়ের চেষ্টা সাময়িক পত্র তথা সংবাদপত্রের দায়িত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে। অরুণাক্ষ ইতিহাসের ছাত্র। সত্যসন্ধানী হিসাবে ইতিহাসের বিকৃতি দূর করবার জন্যে যদি সে "বিষকুম্ভ" নামে প্রবন্ধ লিখে কাশীশ্বরের সত্য-পরিচয় উদ্ঘাটিত করত, তবে চরিত্রটি সহজেই দর্শকদের সহানুভূতি লাভ করতে পারত। শুধু কোন এক মেয়ের প্রতি অনুরাগের জন্য এবং তার সঙ্গে বিয়ের পথ প্রশস্ত করার জন্য তার পিতৃকুলের বিরুদ্ধে এই প্রবন্ধ লেখার ব্যাপারটি হাস্যকর। বিশেষত সে যখন জানে কী গভীর বেদনায় বিশ্বেশ্বরকে এই তথ্য উদ্ঘাটনের আশা ত্যাগ করতে হয়েছে এবং এর জন্যে নিজের বিবেকের কাছে সে নিজকে কত অপরাধী ভেবেছে।

"দো ফুল"-এর একটি দৃশ্যে প্রতিমা দেবী ও বেবী নাজ

দীর্ঘকাল বাদে ছবি বিশ্বাসের অনবদ্য মঞ্চাভিনয়ের স্বাক্ষর বহন করছে এই নাটক। বিশ্বেশ্বরের মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, আশা-অভীপ্সা এবং সর্বোপরি তার আত্মভোলা সরলপ্রকৃতি তিনি অপূর্ব নিষ্ঠা ও কৃতিত্বের সঙ্গে রূপায়িত করেছেন। তাঁর অভিনয় মঞ্চে কয়েকটি গভীর নাট্য-মুহূর্ত সৃষ্টি করে সহজেই। "যুগচক্রে"র সম্পাদকবেশী ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অননুকরণীয় কৌতুকাভিনয়ে দর্শকদের সর্বক্ষণ মাতিয়ে রাখেন। সম্পাদকের স্ত্রীর ভূমিকায় গীতা দে'র স্বচ্ছন্দ অভিনয় প্রশংসনীয়। আশীষকুমার ও সন্ধ্যা রায় ছবির প্রণয়োপাখ্যানে রয়েছেন। এই শিল্পী-জোড়কে ভালো লাগবে সকলেরই। যদিও নির্দিষ্ট ভূমিকায় তাঁরা যথাযথ ব্যক্তিত্ব আরোপ করতে পারেন নি। ডাঃ অম্বুজাক্ষের ভূমিকায় অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় কৃতিত্বের দাবী রাখে। অন্যান্যদের মধ্যে পঞ্চানন, গোবিন্দভূষণ, সতীশ, হরিহর ও সরমার (বিশ্বেশ্বরের স্ত্রী) ভূমিকায় যথাক্রমে অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর, পঞ্চানন ভট্টাচার্য ও অপর্ণা দেবী দর্শকদের প্রশংসা পাবেন। ছোট পার্শ্ব-চরিত্রে প্রেমাংশু বোস, শ্যাম লাহা, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, সাধনা রায়চৌধুরী উল্লেখ-যোগ্য। সুনন্দাবেশিনী মিতা চট্টোপাধ্যায় দর্শকমনে রেখাপাত করেন না।

দৃশ্য-সজ্জার দিক দিয়ে নাটকটি অকৃপণ প্রশংসার দাবী রাখে। মঞ্চে বহিপ্রকৃতির রূপ দেখাবার কৌশল এক কথায় চমৎকার। রাত্রিবেলায় ডাক-বাঙলো ও ঝড়-বৃষ্টির দৃশ্যটি নয়নাভিরাম। বিশ্বেশ্বরের স্বপ্নে রামনিধি ও কাশীশ্বরের আগমনের দৃশ্যটি খুবই সুন্দর। নাটকটির মঞ্চ-সজ্জা আঙ্গিক সুষমা এবং আলোকসম্পাত বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।

সংগীত পরিচালনায় মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নতুন কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। গীতশ্রী শ্যামলী মুখোপাধ্যায়ের গানখানি শুনতে ভাল লাগে। অন্য দুটি গান সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।

বাঙলায় 'মৃচ্ছকটিক' অভিনয়

শনিবার, ২৮শে মার্চ, সকাল ১০টায় থিয়েটার ইউনিট সম্প্রদায় মহাকবি শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক'-এর বঙ্গানুবাদ নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ করবেন।

"মৃচ্ছকটিক" বিদেশী বহু ভাষায় অনূদিত এবং অভিনীত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, কিন্তু বাঙলায় সম্পূর্ণ নাটকটির অভিনয়ের প্রচেষ্টা এই প্রথম।

বঙ্গানুবাদ জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুরের। পরিচালনা করছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, আলোক-সম্পাতে আছেন তাপস সেন, শিল্প-নির্দেশনায় সলিল ভট্টাচার্য এবং সংগীত পরিচালনা করবেন ওস্তাদ আলি আকবর খাঁর পুত্র আশীষকুমার। অভিনয়াংশে আছেন: সাধনা রায়চৌধুরী, যোগমায়া বেদজ্ঞ, গীতা রায়, দীপিকা ভট্টাচার্য, নরেন্দ্র গুপ্ত, রথীন ভট্টাচার্য, অরুণ চক্রবর্তী, দীপেন রায়, অহীন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও ত্রিশজন শিল্পী।

"নীল আকাশের নীচে" সম্বন্ধে একখানি চিঠি

মহাশয়,

"নীল আকাশের নীচে" সম্বন্ধে আপনাদের সমালোচনা পড়েছি। ছবিটির পরিচালনা ও অন্যান্য কুশলতা সম্বন্ধে আপনারা যা লিখেছেন, সে সম্বন্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।

হিন্দী হৈ-হল্লা-ওয়ালা ছবির যুগে "নীল আকাশের নীচে"র মত সুপরিচ্ছন্ন ও সুপরিচালিত ছবি অবশ্যই অভিনন্দন পাবার যোগ্য। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অনবদ্য অভিনয়ে এবং সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর কণ্ঠের অপূর্ব গান দিয়ে আমাদের মন ভরিয়ে দিয়েছেন। তবুও ছবিটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার মনে করছি, যা আপনারা বলেন নি।

প্রথমেই বলতে হয়, মহাদেবী বর্মার ছোট গল্প—যাকে ভিত্তি করে "নীল আকাশের নীচে" রচিত হয়েছে—তার ওপর নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের "কাবুলিওয়ালা"র ছাপ পড়েছে। "কাবুলিওয়ালা"তে সেই ছোট্ট মেয়েকে দেশে ফেলে আসা, তারপর এখানকার মেয়ে মিনিকে দেখে নায়কের পুরনো স্মৃতির স্পন্দন, হোটেলওয়ালার সঙ্গে মারামারি, জেল, তারপর দীর্ঘদিন

অসাক্ষাতের পর আবার মিনির সঙ্গে দেখা শেষকালে স্বদেশে ফিরে যাওয়া। এই ঘটনাগুলির সঙ্গে আলোচ্য ছবির মূল ঘটনাগুলিকে মিলিয়ে দেখুন—এখানেও বাঙালী এক 'সিস্তার' চীনা ফেরিওয়ালার দেশে ফেলে-আসা বোনের স্মৃতি টেনে আনছে।" তারপর সিস্তারের জেল হওয়ার জন্য দীর্ঘদিন অসাক্ষাত— তারপর দেখা ও দেশে ফিরে যাওয়া। দুটি গল্পের মূল কাঠামো কি একই ধরনের নয়?

রবীন্দ্রনাথের "কাবুলিওয়ালা"র আবেদন সর্বকালীন ও সার্বজনীন, তাই তা এতখানি মর্মস্পর্শী এবং এখনও তা গভীরভাবে মনকে দোলা দেয়। যে রাজনৈতিক টানা-পোড়েনের পটভূমিকায় "নীল আকাশের নীচে" রূপায়িত হয়েছে, তা কারুর কারুর কাছে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক 'প্রোপ্যাগান্ডা মনে হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ইতি—শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য, কলিকাতা—৬।

গত সংখ্যায় শ্রীমতী পিকচার্সের পরবর্তী ছবির যে বিবরণ বেরিয়েছে, তাতে ছবির নামটি অনবধানতাবশত ভুল ছাপা হয়েছে। ছবির নাম রাখা হয়েছে "ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত" ("ইন্দ্রনাথ ও অন্নদা-দিদি" নয়)।

বিবিধ সংবাদ

লণ্ডনে প্রতীচ্যের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের একটি সংস্থা আছে যার নাম—ইণ্টারন্যাশন্যাল ফেডারেশন অফ ফিল্ম প্রোডিউসার্স এসোসিয়েশনস্। ওদেশের বিভিন্ন জায়গায় আজকাল যে সব চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এই সংস্থা তার শ্রেণী বা সংজ্ঞা নির্দেশ করে দেন। ওদেশের খ্যাতিমান প্রযোজকেরা কোন চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁদের ছবি পাঠাবেন, এই শ্রেণী বিভাগের ওপর তা নির্ভর করে। সম্প্রতি চিত্র প্রযোজকদের এই সংস্থা কারলভি ভেরি ও মস্কোর চলচ্চিত্র উৎসবকে 'অননুমোদিত' পর্যায়ে ফেলেছেন। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবকে তাঁরা রাজনৈতিক প্রভাবের বাইরে রাখতে চান—এই তাঁদের অজুহাত। এই সংস্থার অনুমোদিত চলচ্চিত্র উৎসবগুলিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে পশ্চিম বার্লিন, কান, স্যান সেবাস্তিয়ান ও ভেনিসের উৎসবগুলিকে। ম্যানহাইম, কর্ক, স্যান ফ্রানসিস্কো ইত্যাদি অন্য কয়েক জায়গায় অনুষ্ঠিত চলচ্চিত্র উৎসবগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎসবে যোগ দেবার নিয়ম-কানুনের কড়াকড়ি প্রথম শ্রেণীর তুলনায় কিছুটা কম।

*

বিশ্বরূপা নাট্য উন্নয়ন কমিটির নানা গঠনমূলক কাজের জন্যে কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের শিক্ষা দপ্তর এই কমিটিকে এক হাজার টাকা token grant স্বরূপ দিয়েছেন।

খেলার মাঠে

একলব্য

রামায়ণে পড়েছি লংকা কাণ্ডের পর হনুমান লেজের আগুন নিভোতে গিয়ে নিজের মুখ পুড়িয়েছিলেন। সেই পোড়া-মুখ স্ব সমাজের কাছে কি ভাবে দেখাবেন এই আক্ষেপে যখন সীতার শরণাপন্ন হয়েছিলেন, তখন সীতা বলেছিলেন—'আমার বরে (অভিশাপে) তোমাদের জাতির সবারই মুখ পোড়া হবে।' তাই নাকি হনুমান বংশেরই আজ মুখ পোড়া। কার বরে কি অভিশাপে জানি না ভারতের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষও আগুন নিয়ে খেলতে খেলতে নিজেদের মুখ পোড়াতে আরম্ভ করেছেন। এই আগুনে সবার মুখ পুড়বে কি না জানি না। তবে এক এক করে পুড়তে আরম্ভ করেছে তার প্রমাণ পাচ্ছি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের চরম ব্যর্থতা, খেলার সময় অধিনায়ক অদল বদল এবং ইংলণ্ডগামী ভারতীয় দলের নির্বাচনের ব্যাপার নিয়ে ভারতের জনমত আজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। খেলাধুলার ব্যাপার নিয়ে দেশের সাধারণ মানুষকে এমন সচেতন হতে দেখিনি এর আগে কোনবার, যেমন দেখছি এবার ক্রিকেটের ব্যাপারে। সংবাদপত্রে সংবাদপত্রে প্রতিবাদের তীব্র ধ্বনি উঠেছে। লোকসভায় ও রাজ্যসভায় উঠেছে বিচারের দাবী। বহু কণ্ঠের ধিক্কারে নির্বাচকদের নেপথ্য ভূমিকার আবরণ আলগা হয়ে গিয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত যোগসাজসের রহস্য এবং খামখেয়ালীর স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছেন নির্বাচক সমিতিরই অন্যতম সদস্য রামস্বামী এবং প্রাক্তন অধিনায়ক পলি উমরিগর।

প্রথম বিবৃতি দিয়েছেন পলি উমরিগর। পরে বিবৃতি দিয়েছেন রামস্বামী। সর্বশেষ বিবৃতি পেয়েছি আর একজন প্রাক্তন অধিনায়ক গোলাম আমেদের কাছ থেকে। নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান লালা অমরনাথ বিবৃতি দেবার জন্য কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির অনুমতি চেয়েছেন। সব চেয়ে চালাক মানুষ নির্বাচক সমিতির অন্যতম সদস্য এম দত্ত রায়। তিনি এখনো মুখ খোলেননি।

উমরিগর বলেছেন—অধিনায়কের কর্তব্য করতে গিয়েই মাদ্রাজ টেস্টের প্রাক্কালে তাকে অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। ফলে তিনি নির্বাচক সমিতির বিরাগভাজন হয়েছেন। উমরিগরের বিবৃতি থেকে নির্বাচক সমিতির নেপথ্য ভূমিকার অনেক কিছু রহস্যও উদ্ঘাটিত হয়ে পড়েছে। বুঝতে কষ্ট হয় না ভারতীয় ক্রিকেটের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের বিরাগভাজন হয়েও উমরিগর যখন ইংলণ্ডগামী ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়েছেন, তখন তিনি ভারতের পক্ষে যতই অপরিহার্য হোন তার কাজের পেছনে যুক্তি আছে। যুক্তি যেখানে প্রবল, সেখানে কর্তৃপক্ষ হার মানতে বাধ্য। তাই উমরিগরের অধিনায়কের পদ ত্যাগ একদিকে যেমন কর্তৃপক্ষের খাম-খেয়ালীর কথা প্রমাণ করেছে, অন্যদিকে তেমন ইংলণ্ডগামী দলে তার অন্তর্ভুক্তি প্রমাণ করেছে উমরিগরের দাবী অযৌক্তিক ছিল না। এতে উমরিগরের মুখ রক্ষা হয়েছে, কিন্তু মুখ পুড়েছে নির্বাচক সমিতির।

নির্বাচক সমিতির অন্যতম সদস্য রামস্বামী ইংলণ্ড সফরকারী দলের নির্বাচন পর্ব শেষ হবার পর সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে বলেছেন, কাণপুর টেস্টের সময় এল পি জয়ের পদত্যাগের পর নির্বাচক সমিতি এক প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। অমরনাথ এবং দত্ত রায়ের যোগসাজসে সব কিছুই করা হয়েছে। তার কোন কথাই খাটেনি। রামস্বামীকে জিজ্ঞাসা করি তাই যদি হয়, তবে তিনি এতদিন নির্বাচক সমিতির সদস্যপদ আঁকড়ে ছিলেন কি শোভা বর্ধনের জন্য? এতদিন তিনি কেন সদস্য পদে ইস্তফা দেননি? এদিক দিয়ে এল পি জয়ের প্রশংসা করি। তিনি কোন বিবৃতি না দিলেও অসহযোগিতার মনোভাব নিয়ে নির্বিবাদে সরে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু রামস্বামী? সন্দেহ করবার কারণ আছে কোন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যই এতদিন তিনি সদস্য পদ আঁকড়ে ছিলেন। অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি তাই সদস্যপদে ইস্তফা দিয়েছেন; নির্বাচক সমিতির কার্যকলাপও সমর্থন করেননি। এতে রামস্বামীর নিজেরই মুখ পুড়েছে। নির্বাচক সমিতির মুখেও আগুনের আঁচ লেগেছে।

প্রাক্তন অধিনায়ক গোলাম আমেদেরও মুখ রক্ষা হয়নি। তিনি বলেছেন ইংলণ্ড সফরকারী দলে নির্বাচনের জন্য তিনি লালা অমরনাথ ও এম দত্ত রায়ের কাছে গেছিলেন, যদি তিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন, তবেই তিনি ইংলণ্ড সফরকারী দলে স্থান গ্রহণ করবেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক গোলাম আমেদ, যিনি কলকাতা টেস্টের পর অধিনায়কের পদ ত্যাগ করে বলেছিলেন—এইটাই তার জীবনের শেষ টেস্ট খেলা—১৯৪৮-৪৯ সালে কলকাতায় যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম টেস্ট খেলেছিলেন, সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধেই কলকাতায় তিনি শেষ টেস্ট খেলেছেন, তিনি আবার ইংলণ্ড সফরকারী দলে মনোনীত হবার জন্য এমন কাঙালপনা দেখালেন কেন? আর নির্বাচিত হয়ে পদ-ত্যাগই বা করলেন কেন? গোলাম আমেদের অস্থির চিত্ততায় এ কথা দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, অপরের চাকের ঘুটি হয়ে তিনি কাজ করেছেন। ফলে খেলোয়াড়-জীবনের সায়াহ্নে তিনি হারিয়েছেন সাধারণের প্রীতি ও শ্রদ্ধা।

দণ্ডের উপর ২১১ দিন—১৭ বছর বয়স্কা মেরি রোজ ৭১ ফুট উঁচুতে দণ্ডের উপর ২১১ দিন ৯ ঘণ্টা অতিবাহিত করেছেন

নির্বাচক সমিতির চেয়ারম্যান লালা অমরনাথের বিবৃতির জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি। দেখা যাক তাঁর বিবৃতির আগুনে আর কার মুখ পোড়ে, আর কেই বা রক্ষা পায়।

* * *

ইডেন উদ্যানে মোহনবাগান ও এলবার্ট স্পোর্টিং ক্লাবের সি এ বি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ খেলাটি দর্শকরা যেভাবে পণ্ড করে দিয়েছেন, খেলাধুলোর ক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্রিকেট খেলায় তার নজির অল্প। দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খল ও অশোভন আচরণে কলকাতার খেলাধুলোর ক্ষেত্রে অবশ্য ইতিপূর্বেও বহু কলঙ্ক-মলিন ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এবারকার ঘটনা একটু পৃথক ধরনের। বোধ করি এ ঘটনা আগের সব ঘটনাকেই ছাড়িয়ে গেছে। খেলার সময় রেফারী বা আম্পায়ারকে তাড়া করা কিছুদিন থেকেই এক শ্রেণীর দর্শকদের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু খেলার সময় 'স্টাম্প' নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার কথা আগে কোনদিন শুনিনি। মাঠ খুঁড়ে ফেলে খেলার 'পীচ' নষ্ট করে দেবার ঘটনাও আগে দেখিনি। মোহনবাগান ও এলবার্ট স্পোর্টিংয়ের খেলায় দুই ঘটনাই দেখতে পেলাম।

খেলাটির উপর সি এ বি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপের প্রশ্ন নির্ভর করছিল। লীগের তিনটি গ্রুপ বিজয়ীর তিনটি খেলার মধ্যে এটি ছিল দ্বিতীয় খেলা। একটি খেলায় মোহনবাগান মিলন সমিতিকে পরাজিত করেছে। এ খেলায় এলবার্ট স্পোর্টিংকে পরাজিত করলে মোহনবাগানই লাভ করত সি এ বি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ। এলবার্ট ও মিলন সমিতির খেলায় মীমাংসিত হত রানার্সের প্রশ্ন। আর মোহনবাগান এলবার্টের কাছে পরাজয় স্বীকার করলে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের জন্য এলবার্টকে খেলতে হত মিলন সমিতির সঙ্গে। এই অবস্থায় মোহনবাগান ও এলবার্টের খেলাটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই খেলার সময়কার ঘটনাও হয়েছে গুরুতর।

প্রথম ইনিংসের ফলাফলে নিষ্পত্তিমূলক খেলার প্রথম ইনিংসে মোহনবাগান ২৩৩ রান করবার পর এলবার্ট স্পোর্টিং দ্বিতীয় দিনের শেষে ৪ উইকেট হারিয়ে ৯৯ রান করে। তৃতীয় দিন এলবার্টের নির্ভরযোগ্য দুই নট আউট খেলোয়াড় এস কে গিরিধারী এবং ডি জি ফাদকার প্রশংসার সঙ্গে ব্যাট করে মধ্যাহ্ন ভোজের সময়ও নট আউট থাকেন। এই সময়ে ৪ উইকেটে এলবার্টের রান ওঠে ১৬৯। এস কে গিরিধারী, গতবার রণজি প্রতিযোগিতার খেলায় আসামের পক্ষে যিনি ডাবল সেঞ্চুরী করেছিলেন তাঁর হাতে ব্যাট; অপরদিকে ব্যাট খ্যাতনামা খেলোয়াড় ফাদকারের হাতে। এরা মোহনবাগানের রান সংখ্যা অতিক্রম করে এলবার্ট স্পোর্টিংকে জয়যুক্ত করে তুলতে পারেন মাঠে এমন ধরনের একটি গুঞ্জন আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে কিছু দর্শকও চঞ্চল হয়ে ওঠেন। দর্শক বললে অবশ্য ভুল বলা হয়। কারণ দর্শকদের চঞ্চল হবার কি আছে? যারা সত্যিকারের ক্রীড়ানুরাগী দর্শক কোনো দলের হারজিতে তাদের কি আসে যায়? আসে যায় তাদের, যারা ক্লাব-সমর্থক। ক্লাবের উগ্র সমর্থক। এখানে কারা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন তা না লিখলেও কারো বুঝতে কষ্ট হবে না। সমর্থকদের গায়ে তো ক্লাবের জামা থাকে না। তাদের আচরণেই বোঝা যায় তারা কাদের সমর্থন করছেন। কথাটা খোলাখুলি বলতেও আমার আপত্তি নেই। যাঁরা চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা মোহনবাগানেরই চপলমতি কিছু সমর্থক। মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির সময় তাঁরা আম্পায়ারের উদ্দেশ্যে কটু কাটব্য ভাষা প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলেন। জটলা পাকিয়ে অশোভনীয় আচরণ করতেও কসুর করলেন না। এই অবস্থায় আম্পায়ারদ্বয় পুলিসের সাহায্য ব্যতিরেকে পুনরায় মাঠে নামতে অস্বীকার করলেন। লালবাজারে টেলিফোন করা হল। পুলিস যখন মাঠে উপস্থিত হল, তখন দেখা গেল মাঠের স্টাম্পগুলি অপসারিত হয়েছে। ব্যাটিং করবার জায়গা এবড়ো খেবড়োভাবে খোঁড়া। নতুন স্টাম্প সংগ্রহ করা সম্ভব হলেও এ অবস্থায় তো আর খেলা হতে পারে না। তবু আম্পায়াররা দুই অধিনায়কের মতামত জিজ্ঞাসা করলেন। এলবার্টের অধিনায়ক ফাদকার এবড়ো-খেবড়ো এবং খোঁড়া 'পীচেই' খেলতে রাজী হলেন, কিন্তু মোহনবাগানের অধিনায়ক পি চ্যাটার্জি খেলতে নারাজ। সুতরাং সেখানেই খেলার ইতি হল।

অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ন ইন্দোনেশিয়ার খেলোয়াড় তান জো হক

এখন কথা হচ্ছে কিছুসংখ্যক চপলমতি সমর্থক নিজেদের প্রিয় ক্লাবকে সমর্থন করতে গিয়ে অজান্তে সেই ক্লাবের যে ক্ষতি করেছেন তা তাঁদের ধারণা বহির্ভূত। এখানে মোহনবাগান ক্লাবের যাঁরা নেতৃস্থানীয়, তাঁদের কিছু করবার ছিল না। পি চ্যাটার্জি খেলতে রাজী না হয়ে আমার মনে হয় ভালই করেছেন। কারণ, খেলা হলে সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলতা হয়তো আরও রুদ্রমূর্তিতে প্রকাশ পেত। তবে মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষের এখন কিছু করবার আছে এবং সেটা করলে সমর্থকদের হীন কাজের প্রত্যুত্তর দিয়ে তাঁরা এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন।

গত বছর এলাহাবাদে আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার সময় এলাহাবাদের ছাত্র সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের প্রতিবাদে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ রাতারাতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পাঞ্জাবকে বিজয়ী
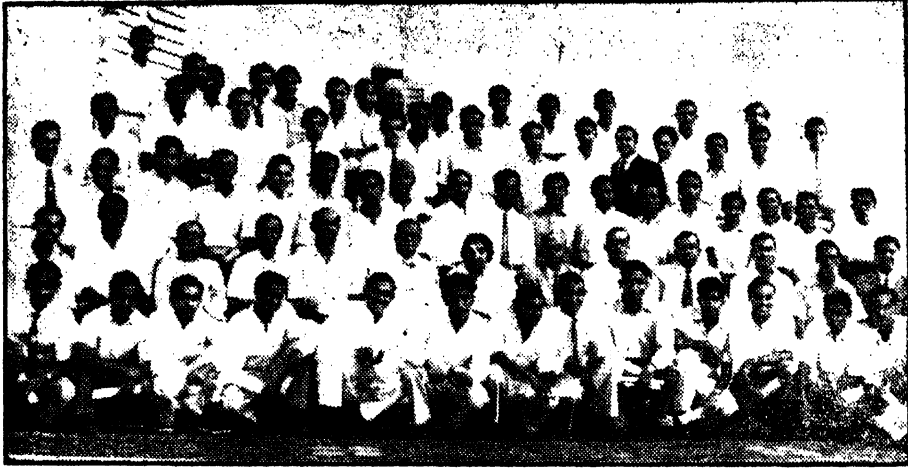
রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু ও উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত সহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ব্লু' প্রাপ্ত ৯২ জন খেলোয়াড়, অ্যাথলীট ও সাঁতারু

বলে ঘোষণা করেছিলেন। আজ মোহনবাগান ক্লাব কর্তৃপক্ষ যদি এলবার্ট স্পোর্টিংকে বিজয়ী বলে স্বীকার করে নেন, তবে সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলতার সমুচিত উত্তর দেওয়া হয় আর মোহনবাগানেরও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে। ভারতের শ্রেষ্ঠ ক্লাব মোহনবাগানের কাছ থেকে এই উদার মনোবৃত্তি সকলেই আশা করে।

এই খেলা প্রসংগে আরও একটি কথা। খেলা আরম্ভের দিন দেখা যায় পীচের ব্যাট করবার দুই জায়গা রীতিমত ভিজে। চৈত্র মাসের প্রখর রৌদ্রতাপে পীচ ভিজে থাকবার কথা নয়। স্পষ্টই বোঝা যায় পীচে জল দিয়ে পীচকে স্পিন বোলারের সহায়ক করে তোলা হয়েছিল। কার নির্দেশে এবং কার প্ররোচনায় এই ভাবে পীচে জল দেওয়া হয়েছিল তা এখনো অজ্ঞাত আছে। 'পীচ' ভিজে থাকার ফলে নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে খেলা আরম্ভ হয় এবং এলবার্ট স্পোর্টিং টসে জিতেও প্রথম ব্যাটিং করে না। যদিও কে টসে জিতবে তা আগে জানা ছিল না এবং মোহনবাগান টসে জিতলেও প্রথম ফিল্ডিং করতে পারতেন, তবুও চৈত্র মাসে ঠিক খেলার আগে এই ভাবে পীচে জল সিঞ্চনের পেছনে কিছু অভিসন্ধি থাকা স্বাভাবিক। ভিজে পীচে মোহনবাগান ক্লাবকে প্রথম ব্যাট করতে হয়েছে বলে তাঁদের কিছু সমর্থক স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। দর্শকদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের পরবর্তী ঘটনা প্রথম ঘটনার প্রতিক্রিয়া বলেও সন্দেহ করবার কারণ আছে। মোটের উপর ক্রিকেট খেলা নিয়ে আমাদের দেশে যে খেয়ালখুশির রাজত্ব চলছে—মোহনবাগান ও এলবার্ট স্পোর্টিংয়ের সি এ বি লীগের খেলায় তারই এক ছোট্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। আর এই ঘটনা কলকাতার ক্রিকেট ইতিহাসে রচনা করেছে এক কলঙ্ক-মলিন অধ্যায়।

* * *

ইন্দোনেশিয়ার কীর্তিমান খেলোয়াড় তান জো হক অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে বিশ্বশ্রেষ্ঠ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়ের মর্যাদা পেয়েছেন। আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টনে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা হচ্ছে অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপ। সুতরাং টেনিসের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়নের মত ব্যাডমিণ্টনেও অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নের সম্মান অনন্য।

তান জো হক ফাইন্যালে পরাজিত করেছেন তাঁর দেশেরই অপর খেলোয়াড় ফেরি সোনেভিলকে। সোনেভিল অবশ্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেই পরাজয় স্বীকার করেছেন। ১৫—৮ পয়েণ্টে তান জো প্রথম গেমটি লাভ করলেও এক সময় সোনেভিল খেলায় প্রাধান্যের পরিচয় দেন। পরের গেমে সোনেভিল এগিয়ে যান ১০—৩ পয়েণ্টে এবং শেষ পর্যন্ত ১৫—১০ পয়েণ্টে গেম লাভ করেন। কিন্তু জয়-পরাজয়ের মীমাংসাসূচক তৃতীয় গেমে সোনেভিল তাঁর হাতের অনেকখানি নৈপুণ্য হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মারে ভুল চুক হতে থাকে। অপরদিকে নতুন উদ্যমে খেলতে থাকেন তান জো হক। তাঁর স্ম্যাশসুলভ চাপ মারে বিধ্বস্ত করে তোলেন সোনেভিলকে। ১৫—৩ পয়েণ্টে গেম পেয়ে অল ইংলণ্ডের নতুন চ্যাম্পিয়ন হন তান জো হক।

মেয়েদের সিংগলস ফাইন্যালে তিন বছরের চ্যাম্পিয়ন এবং গতবারে বিজয়িনী আমেরিকার মিস জুডি ডেভানানকে ১১—৭, ৩—১১ ও ১—১৪ পয়েণ্টে পরাজিত করে গ্রেট ব্রিটেনের মিস হেদার ওয়ার্ড নতুন চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এখানে বলা যেতে পারে গত ২০ বছরের মধ্যে ব্রিটেনের কোন তরুণী অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপে বিজয়িনীর সম্মান লাভ করেননি।

অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের আলোচনা প্রসংগে একটা কথা বার বারই মনে আসছে। কথাটা হচ্ছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন বিশ্বখ্যাত ডেনিস খেলোয়াড় আরল্যাণ্ড কপসকে এবারকার খেলায় নিমন্ত্রণ না করা। অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপের কর্তৃপক্ষ কপসকে কেন আমন্ত্রণ জানাননি জানি না। কয়েক মাস আগে কপস পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য কলকাতায় এসেছিলেন। এখান থেকে চ্যাম্পিয়নশিপও লাভ করে গেছেন। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। শুধু চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করাই

কপসের কলকাতায় আসার উদ্দেশ্য ছিল না। তার উদ্দেশ্য ছিল ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা। কপস জানতেন তাকে ইংলণ্ডে আমন্ত্রণ করা হয়নি অথচ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ের খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার খেলোয়াড়দের কলকাতাতেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। তাই অল ইংলণ্ডের সম্ভাবিত চ্যাম্পিয়ন তান জো হক অথবা ফেরি সোনেভিলের সঙ্গে কলকাতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করা ছিল কপসের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু তান জো হক, সোনেভিল বা এডি ইউসুফ ইন্দোনেশিয়ার কোন খেলোয়াড় নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেও কলকাতায় আসেননি। ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড়রাও এখানে অনুপস্থিত ছিলেন। ফলে অরল্যাণ্ড কপস চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেও মনোকষ্ট নিয়ে ফিরে গেছেন। তান জো হক ব্যাডমিণ্টনের একজন সুনিপুণ শিল্পী। দু'বছর আগে ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে যখন তার প্রথম খেলা দেখেছিলাম, তখনই তাঁকে ভবিষ্যৎ চ্যাম্পিয়নশিপ হিসাবে স্বীকার করে নিয়েছিলাম। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কপসকে পরাজিত করে এবার তান জো অল ইংলণ্ডের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে পারবেন কি না সে প্রশ্ন অবান্তর। তবে কলকাতায় তান জো হকের সঙ্গে অরল্যাণ্ড কপসের খেলা হলে সে খেলা যে অল ইংলণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের চেয়েও আকর্ষণীয় হত এ কথা অনস্বীকার্য। খেলা হয়নি তাই আমাদেরও দুঃখ রয়ে গেছে।

✱

ভারতীয় রেলওয়েজ হকি দল উপর্যুপরি তিন বছর জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। হায়দরাবাদের গোসা মহল পুলিশ স্টেডিয়ামে এবারকার ফাইনাল খেলায় রেল দল ১—০ গোলে পরাজিত করেছে ১৯৫৫ ও ১৯৫৬ সালের বিজয়ী সার্ভিসেস হকি টীমকে। রেল দল ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের ফাইনালে বোম্বাইকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিল।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় এবার যোগ দিয়েছিল রেলওয়ে, সার্ভিসেস ও স্কুল টীম সমেত ভারতের ২৪টি হকি দল। এর মধ্যে উড়িষ্যা শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেনি। সুতরাং ২০টি রাজ্য এবং রেল, সার্ভিস ও স্কুল টীমকে নিয়ে মোট ২৩টি দলের মধ্যে এবার ভারতের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার খেলাও হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। অনেকগুলি খেলাই একদিনে মীমাংসিত হয়নি। সব চেয়ে বেশী ম্যাচ খেলেছে বাঙলা দল। বাঙলা দল তৃতীয় রাউণ্ড থেকে খেলবার সুযোগ পেয়ে প্রথম খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে। এর পর বাঙলাকে কোয়ার্টার ফাইন্যালে উত্তর প্রদেশের সঙ্গে এবং সেমি ফাইন্যালে রেলওয়েজ দলের সঙ্গে তিনদিন করে খেলতে হয়। উত্তর প্রদেশ ও রেল টীমের সঙ্গে বাঙলার খেলোয়াড়রা প্রতিদিনই ভাল খেলেছেন। সেমি ফাইন্যালে রেল দলের কাছে বাঙলাকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে অনেকটা ভাগ্য দোষে। কারণ পূর্ণশক্তি নিয়ে এরা শেষদিন শক্তিশালী রেল টীমের সঙ্গে খেলতে পারেননি। সেণ্টার হাফ ভোলা চক্রবর্তী, লেফট ইন পিয়ারা সিং এবং রাইট আউট কুন্দুস আগের খেলায় চোট খেয়ে শেষ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। তবুও বাঙলা দল প্রশংসার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রেল দলের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। সেমি ফাইন্যালের পরাজিত দুটি দলের খেলায় পাঞ্জাবকে ৩—১ গোলে হারিয়ে বাঙলা লাভ করেছে জাতীয় হকির তৃতীয় স্থান।

জাতীয় হকির অনেকগুলি খেলায় এবার উন্নত নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। কয়েকজন খেলোয়াড়ও ক্রীড়া চাতুর্যে দর্শকদের প্রশংসা পেয়েছেন। সবচেয়ে প্রশংসা পেয়েছেন স্কুল দলের কয়েকজন তরুণ খেলোয়াড়। এদের মধ্যে ভূপালের ১৭ বছর বয়স্ক খেলোয়াড় ইমাম আসামের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করার কৃতিত্ব সমেত একাই ৪টি গোল করেছেন। মহারাষ্ট্রের সেণ্টার ফরোয়ার্ড গাইকোয়াড় কেরালার বিরুদ্ধে এবং বিদর্ভের সেণ্টার ফরোয়ার্ড আর কে তেওয়ারী অন্ধ্র দলের বিরুদ্ধেও হ্যাটট্রিক করেছেন।

নীচে জাতীয় হকির সমস্ত খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল—

প্রথম রাউণ্ড

মহাকোশল (২) : হায়দরাবাদ (১)
মহারাষ্ট্র (৬) : কেরালা (০)
মধ্য ভারত (৪) : গুজরাট সৌরাষ্ট্র (০)
বিদর্ভ (৫) : অন্ধ্র (০)
পাতিয়ালা (০) (১) (২) : ভূপাল (০) (১) (১)
রাজস্থান (ওঃ ওঃ) : উড়িষ্যা (স্ক্র্যাচড)
স্কুল একাদশ (৮) : আসাম (০)
মাদ্রাজ (১) : বিহার (০)

দ্বিতীয় রাউণ্ড

মহারাষ্ট্র (২) : মহাকোশল (১)
মধ্য ভারত (০) (১) : বিদর্ভ (০) (০)
রাজস্থান (২) : স্কুল একাদশ (১)
মাদ্রাজ (৩) : পাতিয়ালা (১)

তৃতীয় রাউণ্ড

দিল্লী (১) : মাদ্রাজ (০)
সার্ভিসেস (১) : রাজস্থান (০)
মহীশুর (২) : মধ্য ভারত (০)
বাঙলা (২) : মহারাষ্ট্র (১)

কোয়ার্টার ফাইন্যাল

রেলওয়েজ (S) : মহীশুর (০)
বাঙলা (০) (০) (২) : উত্তর প্রদেশ (০) (০) (১)
সার্ভিসেস (০) (২) : বোম্বাই (০) (০)
পাঞ্জাব (৪) : দিল্লী (১)

সেমি ফাইন্যাল

রেলওয়েজ (১) (০) (১) : বাঙলা (১) (০) (০)
সার্ভিসেস (১) (২) : পাঞ্জাব (১) (১)

সেমি ফাইনালে পরাজিত দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বাঙলা (৩) : পাঞ্জাব (১)

ফাইন্যাল

রেলওয়েজ (১) : সার্ভিসেস (০)

দেশী সংবাদ

১৬ই মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জানান যে, বাঙালীদের জন্য যাহাতে সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয় সে উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হইতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাইয়া পত্র লেখা হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনের সন্তোষকুমার ব্যানার্জি নামক জনৈক অস্থায়ী বেলিফকে কর্পোরেশনের ২৫ হাজার টাকা তছরূপ করিবার অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

১৭ই মার্চ—অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকারের সামরিক দপ্তর মুর্শিদাবাদ সীমান্ত এলেকায় অসামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সামরিক দপ্তরকে ঐ মর্মে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন।

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ কে এল শ্রীমালী আজ লোকসভায় বলেন যে, দেশের ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়সের বালক-বালিকাদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার অনুন্নত রাজ্যগুলিকে অর্থ এবং অতিরিক্ত শিক্ষক সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

১৮ই মার্চ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রি পরীক্ষায় দ্বিতীয় প্রশ্নপত্র অত্যধিক কঠিন ও পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত হইয়াছে বলিয়া অদ্য অপরাহ্নে প্রধানত উত্তর ও মধ্য কলিকাতার অনেকগুলি কেন্দ্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং এই গোলমালের মধ্যে এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী প্রবল বিক্ষোভে কোথাও টেবিল চেয়ার আলো ইত্যাদি ভাঙে। তারপর দলবদ্ধভাবে বাহির হইয়া আসিয়া অন্য কোন কেন্দ্রে গিয়া হানা দেয়।

কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাপ্য বকেয়া রাজস্ব বর্তমানে ৫ কোটি টাকা। তন্মধ্যে কর্পোরেশনের কর বাবদ ৩ কোটি ১০ লক্ষ টাকার বিল আদায়কারীদের নিকট পড়িয়া আছে। ইহা ছাড়া এসেসমেণ্ট সংক্রান্ত মামলার জন্য আটক আছে দেড় কোটি টাকা এবং লাইসেন্স ফি ইত্যাদি বাবদ অনাদায়ী আছে ৪০ লক্ষ টাকা।

১৯শে মার্চ—বাঙলা কথাচিত্র 'সাগর সঙ্গমে' ১৯৫৮ সনের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছে। এই চিত্রের প্রযোজক ও পরিচালক যথাক্রমে নগদ ২০ হাজার টাকা ও ৫ হাজার টাকা পুরস্কার পাইবেন। শ্রীসত্যজিৎ রায়ের পরিচালিত 'জলসাঘর' দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। উহার প্রযোজক ও পরিচালক যথাক্রমে নগদ ১০ হাজার টাকা ও আড়াই হাজার টাকা পাইবেন।

অদ্য কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় বাজেট আলোচনাকালে মেয়র ডাঃ ত্রিপুণা সেন সভাকক্ষে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়া জানান যে এমন এক ব্যক্তি আছেন যিনি তাঁহার অপেক্ষা

অধিকতর প্রভাবশালী এবং যাঁহার প্রভাব বিস্তারের ফলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় করের হার সংশোধন সংক্রান্ত তাঁহাদের দাবিটি মানিয়া লইতে রাজি হন নাই।

২০শে মার্চ—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ আজ লোকসভায় আইন কমিশনের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন যে, শাসন কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের ও হাইকোর্টসমূহের জজদের মধ্যে কয়েকজনের নিয়োগ ব্যাপারে প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জির বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ হইতে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হইয়াছিল অদ্য এক নাটকীয় পরিবেশে উভয় পক্ষের বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তাহা প্রত্যাহৃত হয়। স্পীকার শ্রী ব্যানার্জি অকস্মাৎ ঘোষণা করেন যে, তিনি স্পীকার পদে অধিষ্ঠিত থাকিলে সুগার মিলের ডিরেক্টরের পদে ইস্তফা দিবেন।

অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে শ্রীশশাঙ্কশেখর সান্যাল 'পাকিস্তানী পঞ্চমবাহিনীর' কার্যকলাপ সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করিয়া অভিযোগ করেন যে, পাকিস্তানী গুপ্তচরে সারা পশ্চিমবঙ্গ ছাইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, বন্দর, শিল্প সংস্থা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও শাসন পরিচালনায় পাকিস্তানী গুপ্তচরেরা ঘাটি গাড়িয়া বসিয়াছে; এমন কি কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী পাকিস্তানের বেতনভুক গুপ্তচর হিসাবে কাজ করিয়া দেশের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিতেছেন।

২১শে মার্চ—আজ রাত ১১টায় সামান্য সাংসারিক ঝগড়াকে কেন্দ্র করিয়া গোলাবাড়ী থানার অন্তর্গত মাধবচন্দ্র ঘোষ লেনের কোন এক বস্তীবাড়ির এক ভাড়াটিয়া দম্পতির আক্রমণে ঐ বাড়িরই ৬০ বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা, ১৩ বৎসর বয়স্ক এক কিশোর এবং ২২ বৎসর বয়স্ক এক যুবক ঘটনা স্থলেই প্রাণ হারাইয়াছে বলিয়া এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতার সার্ভে অব ইণ্ডিয়া কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির কার্য পরিচালনায় কয়েকটি অনিয়ম ও অব্যবস্থার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ নিয়মতন্ত্রবিরোধী উপায়ে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচনের জন্য কোন সাধারণ অধিবেশন ডাকা হয় নাই।

২২শে মার্চ—আজ বিকালে পাক-সীমান্তের মাত্র এক ফার্লং দূরে, পাঙ্গা নদীর তীরে, মানিকগঞ্জ হাটে, দশ হাজার লোকের জাতীয় সম্মেলন দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করে, "জান দিব, বেরুবাড়ী দিব না।" "বেরুবাড়ীর সমস্যা আজ আর সাম্প্রদায়িক বা আঞ্চলিক সমস্যা নহে—ইহা জাতীয় সমস্যা।"

বিদেশী সংবাদ

১৬ই মার্চ—প্রেসিডেণ্ট নাসের গতকাল দামাস্কসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে তীব্রতর আক্রমণ চালান এবং ইরাকী-গণতন্ত্রকে রক্তের গণতন্ত্র, ফাঁসির গণতন্ত্র, কম্যুনিস্ট পথ-আদালতের গণতন্ত্র নামে অভিহিত করেন। অপর পক্ষে বাগদাদের সংবাদে জানা যায়—কম্যুনিস্ট দুনিয়ার সহিত ইরাকের মৈত্রী ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছে।

১৭ই মার্চ—প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার গত রাত্রিতে বলিয়াছেন যে, তিনি বার্লিন ও জার্মানী সম্বন্ধে গ্রীষ্মকালে এক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক বৈঠকে শীর্ষ সম্মেলন আহ্বানের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবে ইহা ধরিয়া লইয়াই তিনি শ্রীনিকিতা খুশ্চেভের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছুক।

১৮ই মার্চ—বিশ্ব ব্যাঙ্ক গতকল্য ঘোষণা করেন যে, ভারতকে ঋণদানকারী পাঁচটি প্রধান প্রধান দেশ এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক ভারতকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, ভারত তাহার অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ চালাইয়া যাইতে পারে—ইহাতে তাহার বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের উপর অযথা চাপ পড়িবে না।

১৯শে মার্চ—সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী শ্রীনিকিতা খুশ্চেভ আজ মস্কোতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, জার্মানীর সহিত শান্তি চুক্তি সম্পাদন ও পশ্চিম বার্লিনে দখলকার শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য রাশিয়া যে প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা শীতল যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার সূচনা।

২০শে মার্চ—মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ গতকল্য স্বীকার করিয়াছেন যে, পৃথিবীর শত শত মাইল ঊর্ধ্বে মহাকাশে আমেরিকা তিনটি আণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে।

উন্নয়ন ঋণ ভাণ্ডারের জন্য ২২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মঞ্জুরের জন্য প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, প্রতিনিধি পরিষদের ব্যয় বরাদ্দ কমিটি অদ্য তাহা অগ্রাহ্য করেন।

২১শে মার্চ—প্রেসিডেণ্ট নাসের গতকল্য দামাস্কাসে এক জনসমাবেশে বলেন যে, রুশ প্রধানমন্ত্রী যদি এখন আমাদের দেশের জনসাধারণের সর্বসম্মত অভিমতের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের এক ক্ষুদ্র দলকে সমর্থন করেন, তাহা হইলে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র শ্রীনিকিতা খুশ্চেভের হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করিবে না।

২২শে মার্চ—বেসরকারীভাবে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, গত বুধবার হইতে তিব্বতের সর্বত্র চীনাদের সহিত ব্যাপক সংঘর্ষ আরম্ভ হয় এবং গতকল্য প্রাতঃকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার

সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা

কলিকাতা বার্ষিক ২০ টাকা ষাণ্মাসিক ১০ টাকা ত্রৈমাসিক ৫ টাকা।

মফঃস্বল (সডাক) বার্ষিক ২২ টাকা ষাণ্মাসিক [illegible] ও ত্রৈমাসিক ৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক আনন্দ প্রেস, ৬ [illegible] সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক [illegible] পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

যে পরিবারে ছেলেবুড়ো সবাই সবসময় হাসিখুসী সে পরিবার সত্যিই সুখী। কিন্তু স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে লোকে হাসিখুসী থাকবে কেমন করে? ময়লা ধুলো বালি স্বাস্থ্যের পরম শত্রু। আপনি যতই সাবধানী হোন না কেন, ময়লার হাত কিছুতেই এড়াতে পারবেন না। এই ময়লায় থাকে রোগের বীজাণু। লাইফবয় সাবান এই ময়লাজনিত বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে। প্রতিদিন **লাইফবয়** সাবান দিয়ে স্নান করুন এবং ময়লা জনিত বীজাণুর হাত থেকে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন। এটি আপনাকে তাজা ঝরঝরে করে তোলে।
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP

REG. NO. C. 2109

র্ষ]   শনিবার, ২১ চৈত্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ   **DESH**   Saturday, 4th April, 1959   মূল্য—৪০ নয়া পয়সা   [সংখ্যা ২৩

সূচীপত্র

সূচীপত্র

কল্‌গেট্ ক্লোরোফিল্
মাড়ীর
দৃঢ় তন্তুবিধানের উন্নতি করে!
COLGATE
CHLOROPHYLL TOOTH PASTE
আর কোনও টুথপেস্টে
এতো বেশী ক্রিয়াশীল ক্লোরোফিল্ নেই!
CTPA/G/7 8

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ : আলফা বিটা

DESH 40 Naya Paisa.
Saturday, 4th April, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৩ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২১ চৈত্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' ও জাতীয় নাট্যশালা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গেই বাংলাসাহিত্য ও শিল্পের সাহায্যার্থে সরকারী পরিকল্পনাও প্রকাশিত হয়। বিশেষত 'জাতীয় নাট্যশালা' সম্পর্কে সদস্যগণের মধ্যে যে বাদানুবাদ হয় তাহা নানা কারণে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'জাতীয় নাট্যশালা' সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য পেশ করিব।

মুখ্যমন্ত্রী জানাইয়াছেন যে, ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতককে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে নৃত্য, নাট্য ও সংগীত শিক্ষাদানের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। বর্তমানে রবীন্দ্রভারতী নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। মহর্ষিভবনের রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অংশ ও বিশ্বভারতী গ্রন্থনভবন (যাহা লাল বাড়ি নামে খ্যাত) ক্রয় করিয়া লইবার উদ্যোগ চলিতেছে। ইহা ছাড়া নৃত্যনাট্যসংগীত আকাদামির একটি নিজস্ব বাড়ি আছে। ডাঃ রায় জানাইতেছেন যে, এইসব বাড়ি লইয়া প্রস্তাবিত 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইলে সেখানে রীতিমত উক্ত বিষয়সমূহ শিক্ষাদানের ও উপাধিদানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে।

এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য দুইটি। উক্ত প্রতিষ্ঠানকে 'বিশ্ববিদ্যালয়' বলা যাইবে কিনা সন্দেহ। বিশ্ববিদ্যালয় 'গ্র্যাণ্টস্ কমিশন' বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কাঠামো ও মান নির্ণয় করিয়াছেন প্রস্তাবিত 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের' মান ও কাঠামো তাহা হইতে ভিন্ন। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাণ্টস কমিশন বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় বলিতে কলা ও বিজ্ঞান বিদ্যার নিকেতন বুঝেন। 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' সে ছকে পড়ে না। কাজেই তাহা বিশ্ববিদ্যালয়রূপে গণ্য হইবে না। সেইজন্য গ্র্যাণ্টস কমিশনের তহবিল হইতে সাহায্যও পাইবে না। আমাদের বক্তব্য যদি সত্য হয় (সত্য বলিয়া আমরা মনে করি), তবে বিষয়টি পুনরায় নূতনভাবে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয় গ্র্যাণ্টস কমিশনের তহবিল হইতে সাহায্য না পাইলে 'রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের' চলিবে কি?

দ্বিতীয় বিষয় হইতেছে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকিবে, আনুষঙ্গিকভাবে নৃত্য ও অভিনয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু রবীন্দ্রকীর্তির প্রধান অংশ রবীন্দ্রসাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে না ইহা সত্যই বিস্ময়কর। ইহা অনেকটা 'ডেনমার্কের রাজকুমারকে' বাদ দিয়া হ্যামলেট নাটক অভিনয়ের মত। কথা উঠিতে পারে রবীন্দ্রসাহিত্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তো অন্যত্র আছে। তাহার উত্তর এই যে, রবীন্দ্রসংগীত প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও অন্যত্র আছে। আবার কথা উঠিতে পারে, এখানে ওসব বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হইবে। আবার তাহারও উত্তর এই যে, তবে বিশেষভাবে রবীন্দসাহিত্য শিক্ষাদানই বা এখানে না হইবে কেন? অন্যত্র সে রকম ব্যবস্থা তো নাই। আমাদেব মনে হয় রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য অধ্যাপনার ব্যবস্থা না থাকা বিশেষ লজ্জার কারণ হইবে আর তাহাতে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মানেরও লাঘব হইবে। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যের অধ্যাপকপদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এবারে 'জাতীয় নাট্যশালা'। বাংলা নাট্যসাহিত্য ও নাট্যশালার উদ্ভব ও অধোগতি সম্বন্ধে বিরোধীদলের নেতা শ্রীযুক্ত জ্যোতি বসু মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার সহিত বাস্তবের লেশমাত্র সম্পর্ক নাই। রাজনীতির রঙ মাখাইয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইলে এমন হওয়া অপরিহার্য। বাংলা নাট্যসাহিত্য কোনকালেই খুব সমৃদ্ধ ছিল না সত্য, কিন্তু তাহার কারণ বসুমহাশয় বর্ণিত কারণ নয়। তাহার কারণ বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের মধ্যে সন্ধান করিতে হইবে। এখানে গবেষণার মধ্যে আমরা যাইতে রাজী নই। আমাদের বক্তব্য এই যে, 'জাতীয় নাট্যশালা' প্রতিষ্ঠার আমরা সরাসরি বিরোধী। ইহা আমাদের নূতন খেয়াল নয়। গোড়া হইতেই আমরা শিল্প ও সাহিত্যে সরকারী তদারকের বিরুদ্ধে। ইহার পরিণাম শুভ হয় না। যে-সব দেশে চিন্তা ও কল্পনা 'কনট্রোলড্' হইয়া এ দুটি বস্তু 'রেশনে' পরিণত হইয়াছে সেখানকার অবস্থা বসুমহাশয়ের না জানিবার কথা নয়। বসুমহাশয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 'সংস্কৃতির শত্রু' বলিয়াছেন। কিন্তু যে-দেশে সরকার সংস্কৃতির পরমমিত্র সেই দেশেরই সাহিত্যিক বরিস পাস্তেরনাক। বসুমহাশয় বলিয়াছেন যে, এ-দেশে পাবলিক স্টেজে অভিনয়ের পূর্বে সরকারের অনুমতি আবশ্যক হয়। কিন্তু তিনি সেই দেশেরই রাজনীতির ধারক ও বাহক যেখানে সাহিত্যিক নিজের দেশে নিজের ভাষায় পুস্তক প্রকাশের অনুমতি না পাইয়া অন্যদেশে অন্যভাষায় বই প্রকাশ করিতে বাধ্য হন—এবং তাহার ফলে জগদ্বরেণ্য পুরস্কার পাইলেও তাহা প্রত্যাখান করিতে বাধ্য হন। আমাদের এসব কথা বলার উদ্দেশ্য সরকারের সমর্থন নয়, উদ্দেশ্য এসব ব্যাপারে সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদ। সরকার প্রতিষ্ঠিত ও সরকারী অর্থে পরিচালিত নাট্যশালা আর একটি সরকারী দপ্তরে পরিণত হইবে।

প্রসঙ্গত

ক্লাসে ঢুকে ইন্সপেক্টর যখন জিজ্ঞাসা করতেন, তোমাদের ক্লাসের সেরা ছাত্র 'কে', আমরা একসঙ্গে আঙুল তুলে প্রথম সারিতে যে ছেলেটি একটু আলাদা হয়ে বসে আছে, তাকে দেখিয়ে দিতুম। এই সেদিন অবধিও তেমনি কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেছে, তোমাদের সাহিত্যে গর্বের বস্তু কী, আমরা সমস্বরে বলেছি, কেন, কবিতা! প্রশ্ন হয়েছে, 'আর কী', তখন বলেছি, কথা-শিল্প। কিন্তু নাটকের নামোল্লেখমাত্র অধোবদন হয়েছি। নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের গর্ব করবার বিশেষ কিছু নেই।

এ নিয়ে যাঁরা বিলাপ করেন, তাঁদের অনেকেই ব্যাপারটাকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখেন না। আমাদের ভাল নাটক নেই। এখন প্রশ্ন করে দেখা যাক, ভাল নাটক আসলে কী। সাহিত্য হিসাবে যা উপাদেয় না, যা দেখে দর্শকজন মুদিত-নয়ন হয়ে হাততালি দেন। তাহলে বলি, এই দুরকমের নাটকই একদা বাংলায় ভূরি ভূরি রচিত এবং অভিনীত হয়েছে। উনিশ শতকের যে জাগরণ নিয়ে আমাদের বড় বড়াই, তার সার্থকতার রূপ তো দেখা গেছে সাহিত্যে? সেই সাহিত্য বলা বাহুল্য নাটক-বর্জিত ছিল না। আমাদের সংস্কৃতি আন্দোলনের একটি বড় ধারা নাট্য আন্দোলনের খাতেই প্রবাহিত হয়েছে। সমাজ সংস্কার প্রয়াসের আদিপর্বে তাই দেখা দিয়েছে কুলসর্বস্বতা বিরোধী নাটক। দেশাত্মবোধের বেদনায় জন্ম নিয়েছে নীল-দর্পণ, দেশের ঠাকুর ফেলে বিদেশের কুকুর ভজনাই যাঁরা সার করেছিলেন তাঁদের ধিক্কার দিতে একাদশী করেছে সধবা সাধ্বীরা। একেই কি বলে সভ্যতা —নব্যবঙ্গীয় যুবক এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিমূঢ় হয়েছে। জাতীয় আত্মোপলব্ধির ছাপ পাই গিরিশচন্দ্রে, পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলালেও। মঞ্চ-সফল এই নাটকগুলি সাহিত্য হিসাবেও সাদরণীয়। রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত নাট্য-সাধনার এই ধারাটি অব্যাহত ছিল। তারপরে হাওয়া বদল হ'ল কেন? কেন প্রথিতযশা কবি বা কথা-শিল্পীদের প্রায় কেউই নাটক রচনা করতে এগিয়ে এলেন না? শরৎচন্দ্র মঞ্চলোক থেকে শত হস্ত দূরেই ছিলেন, যদিও তাঁর বহু উপন্যাসের নাট্যরূপও অসাধারণ জনপ্রিয় হয়েছে।

মঞ্চ সম্পর্কে সাহিত্য-স্রষ্টাদের এই বিরাগের হেতু কি? দর্শকদের রুচির বিষয়ে অনিশ্চয়তা? অথচ এই দর্শকেরাই তো পাঠক। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তির মূল্য নিরূপণে তারা কদাচিৎ ভু[illegible]ছে। ঘরে বসে বই পড়ার বেলায় এক রুচি আর দলে বসে হাত-তালি[illegible] [illegible]র, একথা অবিশ্বাস্য। [illegible] হয়, মঞ্চের বিধাতারাই আপনাদের রুচি সকলের উপর চাপিয়ে থাকবেন, গ্রেসামের নিয়মে তাই সস্তাই কিস্তিমাত করেছে।

নাট্য আন্দোলন পরিণত হ'ল মঞ্চ ব্যবসায়ে। অধিকারীদের লক্ষ্য সাহিত্যের উপর থেকে সরে গিয়ে কেবল অভিনয় চাতুর্যের উপরই নিবদ্ধ হ'ল। (এই চাতুর্য সেকালেও কম ছিল না, কিন্তু একালে একমেব হয়ে দাঁড়াল) অতএব ভাল নাটক রচনা একরকম রহিত হ'ল। যা দেখে দর্শকেরা চক্ষু-কর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করতে থাকলেন তা জীবন থেকে যতদূরে শিল্পকলা থেকেও তত। আদর্শবাদের বালাইও বিশেষ থাকল না।

এখন রব উঠেছে, জাতীয় নাট্যশালা চাই। অবশ্যই চাই কিন্তু নাট্যশালা জাতীয় হলেই যে নাটক সাহিত্য-মূল্য ফিরে পাবে, সে গ্যারান্টি কই?

অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে, সাহিত্য-মূল্য বিরহিত নাটক দিয়ে, শুধুমাত্র আমোদের উপচার বিতরণ করে মঞ্চের ব্যবসায় প্রথম প্রথম হাতে হাতে নগদমূল্য পেলেও, তার ভিত খুব পাকা খুঁটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ায় না। অনিবার্য ভাবেই, কিছুকাল আগে মঞ্চের কামধেনু মালিকদের প্রতি বাম হয়েছিল। আর তখন, আপন অক্ষমতা ঢাকতে এঁরা চলচ্চিত্রের প্রতিযোগিতার ধুয়ো তুলেছিলেন। একটু বিচার করলে দেখা যাবে, এদের উক্তিতে গলার জোর যত ছিল যুক্তি তত ছিল না। শিল্পক্ষেত্রে ভাল জিনিস পাশাপাশিও টি'কে থাকে। সহাবস্থিতির অজস্র নমুনা ছড়িয়ে আছে একই কালে সৃষ্ট বহু কাব্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কীর্তিতে। শুধু পর্দাই বা মঞ্চের সতীন হবে কেন? চলচ্চিত্রও তো এই সেদিন টেলিভিশনকে ভয় পেয়েছে, সংবাদপত্র আতঙ্কিত হয়েছে বেতারের প্রসারে। অথচ শেষ অবধি দেখা গেল, এই বিপুলা পৃথিবীতে সকলেরই, বৈশিষ্ট্য যদি থাকে, স্থানও আছে।

এতো গেল পেশাদারী মঞ্চের দিক। ভাল নাটক উৎসাহী তরুণ এমেচার দলগুলির আনুকূল্যেও র[illegible] হতে পারত। এঁরা অভিনয় পদ্ধ[illegible] [illegible]রিবর্তন করেছেন প্রয়োগ কৌশলে এঁদের আশ্চর্য নিপুণতা দেখা গেছে, তবু নাটকে সাহিত্য-মূল্য যোজনা করতে এঁরাও সক্ষম হননি। রবীন্দ্রনাথকে সফলভাবে মঞ্চস্থ করেছেন, কোনও কোনও দলের কৃতিত্ব মাত্র এইটুকু। নতুনকালের লেখকেরা নাটক রচনায় আজও বিমুখ। আবার প্রশ্ন উঠবে, কেন? এমনও তো হতে পারত মঞ্চে সিদ্ধি নেই দেখেও নবীন নাট্যকার আপন সৃষ্টির তাগিদে নাটক রচনা করেছেন। তাই বা দেখি না কেন? নাটক যে শুধু চোখে দেখার, তা তো নয়,-সাহিত্যরসিকদের সে যে চেখে দেখারও বস্তু। অভিনয় দর্শনে আনন্দ যতখানি, পাঠেও যে ততখানি, এর সাক্ষী দিতে আজও বেঁচে আছেন ভাস আর কালিদাস, সফোক্লিস এবং সেক্সপীয়র। শ বা ওনীল অথবা পিরানদেল্লো—এদের কয়জনকে আমরা এদেশের মঞ্চে দেখেছি। অথচ এই দেশেই এদের গুণানুরাগীদের সংখ্যা নেই। নাটক মঞ্চস্থ না হোক, অন্তত মুদ্রিত এবং পঠিত হবে, এই আশ্বাসটুকু পেলেও কৃতী লেখকদের আমরা হয়ত এপথে সোৎসাহে পা বাড়াতে দেখতে পেতাম। সুতরাং শুধু মঞ্চকর্তাদের নয়, ভাল নাটক সৃষ্টির দায়িত্ব প্রকাশকদেরও অংশত।

* * *

আসামে ভীষণ দুর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের শোকার্ত পরিজনের প্রতি সান্ত্বনা জ্ঞাপন করে আমরা অদ্যাপি অবহেলিত একটি প্রশ্নের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তদন্তে অবশ্যই প্রকাশ পাবে, কী অবস্থায় বিমানটি ঝড়ের মুখে পড়েছিল, বা যান্ত্রিক কোন গোলযোগ আছে কিনা। আমাদের সংশয় বিমানটির যোগ্যতা নিয়ে। দূর পাল্লার রুটগুলির জন্য কর্পোরেশন আধুনিক বিমান আমদানী করেছেন, কিন্তু অল্প-দূরত্বের রুটগুলিতে এখনও সচরাচর যে ধরনের বিমান ব্যবহৃত হয়ে থাকে, অন্যান্য দেশে সেগুলি বহুকাল পূর্বেই নভোচারিতার অযোগ্য বলে বাতিল হয়েছে। স্মরণ রাখতে হবে, আসাম এবং উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রেলপথে যোগসূত্রটি নিতান্তই ক্ষীণ, এবং চলাচল ও সরবরাহ এই উভয় বিষয়ে আসাম ও উত্তরবঙ্গ আকাশপথের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অতএব এই পথে যাতায়াতে যথাসম্ভব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের প্রধান কর্তব্য ছিল। এই রুটগুলি আজও উপেক্ষিত রয়ে গিয়েছে। দৈবের উপর হাত নেই। কিন্তু সতর্কতা অবলম্বনে বাধা কোথায়? উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রুটগুলিতে যেন অচলিত বিমানের সংগ্রহ। ব্যবস্থাটাকে ঠিক প্রাজ্ঞ জনোচিত বলে মেনে নিতে পারছি না।

বৈদেশিকী

তিব্বত সম্পর্কে পিকিং থেকে যে ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে বিস্মিত হবার মত কিছুই নেই। তবে এ থেকে একথা বিশেষভাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে ২৩শে মার্চ আমাদের প্রধানমন্ত্রী লোকসভায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতে তিব্বতের প্রকৃত পরিস্থিতির গুরুত্ব অত্যন্ত লাঘব করা হয়েছিল। চীন থেকে প্রচারিত বিবৃতি-গুলিতে 'বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী এবং প্রতি-ক্রিয়াশীলদের' চক্রান্তের উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী-রূপেই রয়েছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে তিব্বতে যা ঘটেছে বা ঘটছে তা জাতীয় বিদ্রোহ বই আর কিছুই নয়; এবং চীনারা এ বিদ্রোহ দমনের জন্য অকপটভাবে অপরিমিত বলপ্রয়োগে দৃঢ়সংকল্প। এই নীতিতে কেউ সন্দেহ প্রকাশ করুক চীনারা তা চায় না এবং এ সম্পর্কে যে কোন ধরনের সমালোচনাকেই তারা চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশীয় হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। কিন্তু স্বাধীনতাকামী বিশ্বাসী চীনা সরকারের এই মনোভাব সমর্থন করতে পারে না—ভারতবাসীও পারে না। চীনা সরকারের বুঝা উচিত যে ভারত-বাসী তিব্বতের উপর চীনা সার্বভৌমত্ব মেনে নিলেও তিব্বতবাসীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিলোপের কোন প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে না।

সরকারী চীনা বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে বিদ্রোহী চক্রান্তকারীদের চাপে পড়ে দলাই লামা "১৭-দফা" সম্বলিত চীনা-তিব্বতী চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন। বিদ্রোহীরা নাকি প্রতিক্রিয়াশীল ধ্বনি তুলে বলতে থাকে হান্ (চীনা)দের বিতাড়ন কর',

'তিব্বত স্বাধীন হক' ইত্যাদি। এই সকল ধ্বনি সত্যই 'প্রতিক্রিয়াশীল' কিনা তার বিচার করতে হলে দেখা দরকার তিব্বতের স্বাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখার যে প্রতিশ্রুতি চীনা সরকার দিয়েছিলেন তা কীভাবে প্রতিপালিত হয়েছে। সম্প্রতি ঘটনাবলী থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে তিব্বতে চীনা সরকারের পিছনে বিশেষ কোন গণসমর্থন নেই এবং তিব্বতকে বলপূর্বক পদানত রাখার চেষ্টায় এখন পর্যন্ত সফলতা লাভ ঘটেনি। তিব্বতে চীনা সরকার এই বল-প্রয়োগের নীতি অনুসরণ করে চলতে থাকলে অদূরভবিষ্যতে নূতন কতকগুলি জটিলতা দেখা দেবার আশঙ্কা রয়েছে; ভারত সরকার যদি অবিলম্বে সম্ভাব্য ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারতের প্রকৃত মনোভাব চীন সরকারকে না জানিয়ে দেন, তবে এই জটিলতা আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র চীনের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোন ইচ্ছা ভারতের নেই বলে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু লোকসভায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন চীনারা তার যে ব্যাখ্যা করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রকৃত মনোভাব সম্পর্কে চীনা সরকারক অবহিত করা বিশেষ জরুরী হয়ে পড়েছে। অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার অর্থ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ঘটনাবলী সম্পর্কে উদাসীন থাকা নয়। চীনের অপরাপর অঞ্চলে—যেমন হোনান বা ক্যান্টনের ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারত যেরূপ নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারে সীমান্তবর্তী তিব্বতের ঘটনাবলী সম্পর্কে সেরূপ উদাসীন থাকতে পারে না।

তিব্বতকে উপলক্ষ্য করে ঠাণ্ডা লড়াই চাগিয়ে তুলতে অনেকেই যে সবিশেষ আগ্রহান্বিত একথা ভারতবাসীর অজ্ঞাত নয়। কিন্তু চীনা সরকারের বুঝা উচিত যে, ঠাণ্ডা লড়াই জীইয়ে রাখার পিছনে ভারতের কোন স্বার্থ নেই এবং ভারত তা চায় না। বস্তুত ঠাণ্ডা লড়াই-এর উদ্যোক্তাদের স্বার্থ এবং ভারতের স্বার্থ বিভিন্ন বলেই ভারতের স্বার্থের গুরুত্ব আরও বেশি। তিব্বত চিরকাল পশ্চাদ্‌পদ দেশ হিসাবে থাকুক ভারত তা চায় এরকম ধারণা করা ভুল। তিব্বতের জাতীয় সংস্কৃতিতে এরূপ বহু মূল্যবান উপাদান আছে যার সংরক্ষণ অবশ্য প্রয়োজনীয়; পক্ষান্তরে তিব্বতের সামাজিক জীবনের নানাবিধ রীতিনীতির পরিবর্তনের আশু প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এই পরিবর্তন সাধনের অধিকার একমাত্র তিব্বত বাসীদেরই আছে; আর কারও এই অধিকার থাকতে পারে না। বাইরে থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া পরিবর্তনে স্থায়ী সুফল লাভ সম্ভব হয় না—তিব্বতের ক্ষেত্রেও এই সত্যের ব্যতিক্রম হ'তে পারে না। তিব্বতের সঙ্গে ভারতের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিব্বতবাসীর সহিত ভারতবাসী যে একাত্ম অনুভব করে চীনের অপর কোন অংশের জনসাধারণের সঙ্গেই তা করে না; অপরপক্ষে চীনের অপর কোন অংশের জনসাধারণও তিব্বতবাসীদের সঙ্গে ঐরূপ একাত্ম অনুভব করে না। যদি আভ্যন্তরীন প্রয়োজনের তাগিদে তিব্বতে কোন পরিবর্তন সূচিত হয়, তবে তার ফলে ইন্দো-তিব্বতীয় সংস্কৃতির বৃহত্তর ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসবে, যার ফলে উভয় সংস্কৃতিই অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করবে।

চীনা বন্ধুদের জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, চীন এবং ভারতের মধ্যে তিব্বত একটি "বাফার" (Buffer) রাষ্ট্র হিসাবে থাকে এইটিই ভারতের বিশেষ অভিপ্রেত। পরাক্রমশালী চীন সরকার যে বলপ্রয়োগে তিব্বতের উপর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং জনসংখ্যাগত পরিবর্তন চাপিয়ে দিতে পারেন এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভারত সরকারের উচিত চীন সরকারকে একথা বুঝিয়ে দেওয়া যে, এরূপ বলপূর্বক পরিবর্তনে ভারত এবং চীনের মধ্যে সৌহার্দ্য নষ্ট হ'বার আশংকা দেখা দিতে পারে, যার থেকে ভবিষ্যতে আরও নানারূপ জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চীনের প্রতি ভারতের মনোভাব পরিবর্তিত হলে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও চীন সম্পর্কে মত পরিবর্তন ঘটতে পারে।

বর্তমানে যে সকল প্রশ্ন উঠতে পারে তার মধ্যে অন্যতম প্রশ্ন হ'ল দলাই লামা যদি ভারতের সীমান্তে পৌঁছাতে পারেন, তবে তাঁকে ভারতে প্রবেশ করবার অনুমতি দেওয়া হবে কি না এবং অন্যান্য তিব্বতীয় আশ্রয়প্রার্থীদেরও ভারতে আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে কি না। তিব্বতে যদি সংঘর্ষ চলতে থাকে, তবে চীন সরকার ভারতে অবস্থিত তিব্বতীদের উপর নানারূপ বিধি-নিষেধ আরোপের দাবী জানাতে পারেন। ইতোমধ্যেই চীনা সরকারী প্রচারে বলা হয়েছে যে, তিব্বতে চীনা-বিরোধী আন্দোলনের উৎস হচ্ছে কালিম্পঙ্‌স্থিত তিব্বতীগণ। ভারত সরকার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু দলাই লামা ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করলে যে এই ভারত-বিরোধী প্রচারের তীব্রতা বিশেষ বৃদ্ধি পাবে তাতে সন্দেহ নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও দলাই লামা আশ্রয় প্রার্থনা করলে তাঁকে ভারতে থাকবার অনুমতি দেওয়ার যৌক্তিকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অবশ্যই একথা সত্য যে, ভারত সরকার ভারতভূমি থেকে কোন যুদ্ধপ্রচেষ্টা সংগঠিত হ'তে দিতে পারেন না; কিন্তু তিব্বতের স্বাধীনতা এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের জন্য তিব্বতীগণ যদি কোন শান্তিপূর্ণ চেষ্টা করে, ভারতবাসী তাতে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করবে না।

পূর্ব আফ্রিকা থেকে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি যথেষ্ট রকম উদ্বেগজনক। নিয়াসাল্যাণ্ডের ঘটনাবলীর প্রভাব থেকে পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলি বাদ পড়েনি। কেনিয়াতে সরকার ইতোমধ্যেই নাইরোবি পিপ্‌ল্‌স্ কনভেনশন পার্টির দুইজন নেতাকে আটক করেছেন এবং উক্ত দলের মুখপত্র উহুরু (স্বাধীনতা)র প্রচার নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কেনিয়ার সংবিধান প্রণয়ন সম্পর্কে আলোচনায় বৃটিশ সরকারের অনিচ্ছাতে ক্ষুব্ধ হয়ে কেনিয়া বিধান পরিষদের নির্বাচিত আফ্রিকান সদস্যগণ বিধানসভার অধিবেশন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে কেনিয়ার আইন ও শৃংখলা প্রশাসন বিভাগের কয়েকটি গুরুতর ত্রুটীবিচ্যুতির দৃষ্টান্ত জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়ায় আফ্রিকান জনসাধারণ বিশেষভাবে বিচলিত হয়েছেন। মার্চ মাসের গোড়ার দিকে জানানো হয় যে, বিষাক্ত জলপানে হোলা বন্দীশিবিরের দশজন আফ্রিকান বন্দীর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু পরে ময়নাতদন্তে প্রকাশ পায় যে, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ বন্দীদের উপর কঠোর বলপ্রয়োগ। উল্লেখযোগ্য যে, বিলাতের লেবর পার্টীর চেয়ারম্যান শ্রীমতী বার্বারা ক্যাসল কিছুদিন পূর্বে এক প্রবন্ধে কেনিয়ার বন্দী শিবিরে নির্যাতনের উল্লেখ করেছিলেন।

মধ্যপ্রাচ্যের সংবাদে কিঞ্চিৎ আশার সূচনা দেখা দিয়েছে; সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র এবং ইরাকের মধ্যে যে মনকষাকষি চলছিল, আরব লীগের মধ্যস্থতায় লেবাননের রাজধানী বেইরুটে সেই সম্পর্কে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মধ্যে ৩১শে মার্চ এক আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইরাক আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদাদ চুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। গত জুলাই মাসে ইরাকে বিপ্লবের পর থেকে বাগ্‌দাদ চুক্তির সঙ্গে ইরাকের কোন প্রকৃত সম্পর্ক ছিল না; এখন কাসেম সরকার বাগদাদ চুক্তি থেকে ইরাকের নাম কাটিয়ে শেষ বন্ধনটুকুও ছিন্ন করে দিলেন। ইরাক সরকারের মনোভাব সম্পর্কে পূর্বাহ্নে সকলেই অবহিত থাকায় এই সিদ্ধান্তে কেউই বিস্মিত হয় নি।

৩০।৩।৫৯

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

॥ এক ॥

যখন থেকে চিঠি পড়বার মতন লেখা-পড়া শিখেছি, তখন থেকেই লক্ষ্য করে আসছি যে, নিমন্ত্রণ পত্রের শেষাংশে লেখা থাকে, 'পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়।' অথচ, পত্রের দ্বারাই আমি বীরবলের সান্নিধ্য লাভ করি। প্রথমত, প্রমথ চৌধুরীর ছাপা 'সবুজপত্র', দ্বিতীয়ত, ডাক মারফতে পাওয়া তাঁর হাতের লেখা চিঠি। ১৯১৬ সালে যখন কলেজের লেখা-পড়ায় একরকম ইস্তফা দিয়েছি, আমার চোখে পড়ল সবুজপত্রে বাংলা লেখার ঢঙ, আর কানে এল একটি গুজব যে, প্রমথ চৌধুরী ল' কলেজে বাংলায় লেখ-চার (lecture) দিতে উৎসুক। কপাল ঠুকে এক পত্রাঘাত করলুম সেই তেজস্বী বাঙালীকে, তাঁর শুভ উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা জানিয়ে। উত্তরে পেলুম তাঁর পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ। প্রমথ চৌধুরীর এই প্রথম পত্রটি অনেকদিন সযত্নে রক্ষা করেছিলুম, কিন্তু কোন্ এক দুর্বল মুহূর্তে সেটি হাতছাড়া হয়ে যায়। চিঠিতে অনেক কথাই লেখা ছিল। তার মধ্যে শুধু এই কথাটি বিশেষ করে মনে আছে—

"ল' কলেজে বাংলায় Jurisprudence পড়াতে আমি খুবই চাই, তবে সেটা ঠিক prudence হবে কি-না জানিনে।"

সে চিঠি অনাথকাকাকে[১] দেখাই এবং তিনি খুশী হন। কেননা, প্রমথ চৌধুরী ছিলেন তাঁর বাল্য-বন্ধু ও "সুহৃৎ সমিতি"র প্রবর্তিনী সভা। ঐ সমিতির বৈঠক বসত অনাথকাকাদের ঘরে: উৎসাহী সভ্যদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রমথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, জ্ঞানচন্দ্র গুপ্ত। তাঁরা সকলেই এখন স্বর্গগত। সেই "সুহৃৎ সমিতি" রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানে "সাহিত্য-পরিষদে" পরিণত।

নিমন্ত্রণ রক্ষা করলুম স-শরীরে 'কমলালয়ে' উপস্থিত হয়ে। চিঠিতে ঠিকানা ছিল "১নং ব্রাইট স্ট্রীট, বালিগঞ্জ।" কিন্তু রাস্তাটিতে কোন ব্রাইট লাইট দেখেছি বলে তো স্মরণ হয় না। ট্রামের দৌড় তখন এলিয়ট রোডের মোড় পর্যন্ত—যেখানে এখনো দেখা যায়, জোড়া-গির্জের চুড়ো আকাশের দিকে উচ্চাভিলাষী হয়ে দণ্ডায়মান; আর দেখা যায় প্রকাণ্ড সমাধি-ক্ষেত্র, যেখানে মাটির সঙ্গে মিশে আছে বিশ্বাসী মানুষের দেহাবশেষ, আর তাদের পরিচয় খোদাই করা আছে প্রস্তর-ফলকে। মনে পড়ল মোপাসাঁর সেই স্বপ্ন-বর্ণনা, যাতে তিনি দেখেছিলেন এই রকম একটি সমাধিক্ষেত্র থেকে প্রেতাত্মাগুলো উঠে এসে পাথরের গায়ে লেখা মিথ্যা প্রশংসা মুছে দিচ্ছেন এবং সত্য কথা ব্যক্ত করছেন। আমার সৌভাগ্য, এ-ধরনের দুঃস্বপ্ন কখনো দেখিনি। আর সৌভাগ্য, সেদিন আমায় গন্তব্যস্থানে বহন করবার বাহনও মিলেছিল নিকটেই: কেননা, গোরস্থানের পাশেই দাঁড়িয়েছিল গোটাকয়েক ভাড়াটে ফীটন গাড়ি, যার সহায়তা না পেলে সবুজ-সভায় যোগদান করা সেদিন আমার পক্ষে সম্ভব হত না। আধ ঘণ্টার হাঁটা পথ কতক্ষণে অতিক্রম করেছিলুম, তা মনে নেই, তবে অশ্বের গতি মন্থর থাকায় রাস্তার আশে-পাশে কিছু বাগানওয়ালা বাড়ি দৃষ্টিগোচর হল, যে-গুলো সাহেবী ফ্যাশানে সাজানো। বেশির ভাগ বাড়ির সামনে টিয়াপাখি টাঙানো, যার অর্থ বুঝতে গেলে শরণ নিতে হয় বাৎস্যায়নের, কেননা, সেগুলো নাকি ইউরোপীয় পণ্যা স্ত্রীদের বাসভবন। এই বেশ্যালোকের চাইতে বেশি আলোক ও-রাস্তায় কেউ পরিবেশন করেনি।

[১] অনাথকৃষ্ণ দেব—"বঙ্গের কবিতা"র লেখক।

এক নম্বর রাইট স্ট্রীটে প্রবেশ করে যে আলো পেলুম, তার ঔজ্জ্বল্য কম, কিন্তু মিষ্টতা অনেক। মনকে সরস, সবল, সতেজ রাখার জন্যে সে-আলোকের সৃষ্টি। ফটকে 'কমলালয়' নামটি লিখিয়েছিলেন কে, তা আমার জানা ছিল না, তবে অন্দরে ঢুকে বেশ মনে হল, এটি যেন লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলন-কেন্দ্র। উঁচু ফ্লোরের উপর (Demi-floor) একতলা বাড়ি, সম্মুখেই থাম-ওয়ালা গাড়ি-বারান্দা। সোজা চলে গেলে ড্রইং-রুম, আর ডান দিকে মোড় ফিরলে আপিস-ঘর। সেই আপিস-ঘরে বসে আছেন একজন সুপুরুষ এবং তাঁর পিছনের দেয়ালে লাগানো আছে একটি সুন্দরীর উত্তমাঙ্গের পাষাণী আভাস; কেননা, marble bas-relief-এ রূপের আভাস-মাত্রই মেলে। তবে মূর্তিটি যে লক্ষ্মী-স্বরূপা, তার প্রমাণ, ওটি গৃহলক্ষ্মীর প্রতিকৃতি। লক্ষ্মীর নামান্তর কমলা ও ইন্দিরা। সুতরাং শিল্পীর ভাষায় এই কথাই বলা হয়েছে যে, কমলালয়ের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী। এই শ্রীমতীর পটভূমিকায় যে শ্রীমান্ পুরুষকে দেখলাম, তাঁর বর্ণ গৌর, নাক টিকলো, গোঁফ বেনাপাতি, পরনে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি, পায়ে চটি, আর বাঁ হাতে অগ্নিমুখ ধূমায়মান প্রহরণ—অর্থাৎ একটি জ্বলন্ত সিগারেট।

—কি হে, হারীত, এসো এসো। আচ্ছা, অনাথ কেমন আছে?

যেন অনেক দিনের আলাপ!

সুহৃৎ সমিতির কথা তিনিও বললেন। আর বললেন,

—তোমার জন্মের পূর্বেই তোমাদের বংশের সঙ্গে আমার একটা যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। আমি তখন কৃষ্ণনগরে। নবীনকৃষ্ণ বোসকে জানতে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তিনি ছিলেন আমার বাবার পিসেমশায়, কৃষ্ণনগরে তিনি কি একটি সরকারী চাকরি করতেন।

—ঠিক্। তাঁরই মারফতে আমার হাতে আসে একখানি বাংলা উপন্যাস, যাঁর লেখক ছিলেন তোমার ঠাকুরদাদা, উপেন্দ্রকৃষ্ণ। সেই "হরিদাসের গুপ্তকথা" চলিত বাংলায় লেখা দেখে তখন থেকেই আমার শখ হয় যে, বড় হয়ে ঐরকম ভাষায় আমিও রচনা করব। তখন আমার বয়েস ষোল।

আতিথেয়তার সরঞ্জাম হাজির করলে ওঁর ননী নামক ভৃত্যটি—অর্থাৎ চা, চিঁড়ে-ভাজা আর একটি মিষ্টি। কি মিষ্টি, তা মনে নেই, বোধহয় চমচম্। কেননা, অনুপ্রাসের জের গ্রাসে থাকা খুবই উচিত, বিশেষত অলংকারভক্ত সাহিত্যিকের বাড়িতে। অমন মুচমুচে চিঁড়ে-ভাজা চায়ের সঙ্গে কী যে ভাল লাগল, তা ভাষায় বলা যায় না। শুনেলুম, ও'রা বিস্কুটে বিরূপ। একটা পুরনো কথার বাতাস মনের মধ্যে বয়ে গেল। ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছিলুম, মহাভারত লেখার কালে গণেশের লেখনী থেকে উদ্ভূত হয়েছিল অনেক ব্যাস-কূট। ভাষাতত্ত্বের অজ্ঞতার ফলে আমার প্রাণে রসসঞ্চার হওয়ায় তৃপ্তিলাভ করলুম। বিস্-কুট যে ব্যাস-কূটের নামান্তর হতে পারে, এ সন্দেহ এখন ঘনীভূত হয়েছে। কেননা, ও দুই পদার্থের কোনোটিতেই আমি দন্তস্ফুট করতে পারি না।

সবুজ-সভায় সেদিন আর কে-কে এসে-ছিলেন, তা ঠিক স্মরণ নেই। সম্ভবত ধূর্জটি মুখুজ্জ্যে, কিরণশঙ্কর রায়, সোমনাথ মৈত্র, সতীশচন্দ্র ঘটক উপস্থিত ছিলেন। সবুজের ক্লাসে যে রোল্-কলের ব্যবস্থা ছিল না, একথা আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, তবে কল-রোলের অ-ব্যবস্থা কখনো কখনো কানে ধরা দিত, বিশেষত ধূর্জটির অট্টহাস্যে যখন আমার সাহিত্যিক নৈরাদবীকে ঢাকা দেবার চেষ্টা চলত।

ধূর্জটির প্রাণখোলা হাসিকে আমি অট্টহাস্য নামে অভিহিত করেছি, তার কারণ দেবতার মধ্যে কেবল মহাদেব (ধূর্জটি) ঐ হাসি হাসেন। কাজী নজরুল যখন সবে 'বিদ্রোহী' হয়েছেন, একটি সভায় তাঁর আবৃত্তি শুনতে শুনতে আমার হাসি পেয়েছিল তাঁর আত্মপরিচয়ে এই উক্তি শুনে—"আমি ধূর্জটি!" তবে সে হাসি চেপে রেখেছিলুম—পাছে কাজীর বিচারে কনটেম্পট অফ কোর্টের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হই। এখন দেশশুদ্ধ সকলেই জানে যে, কাজী কখনো ধূর্জটি ছিল না, এবং ধূর্জটিও কখনো কাজী হয়নি। কাজীর মাথায় বড় চুল রাখার ফলে যেটুকু জট পড়েছিল, কেবল তারই বলে তাকে ধূর্জটি বলা চলত না। আর ধূর্জটির মাথায় টাক পড়ায় এবং হাতে টাক সাকার হয়ে এসে পড়ায় তাকে বড়জোর কাজের কাজীই বলা সংগত।

কিন্তু সংগীত সম্বন্ধে নজরুল ও ধূর্জটির মধ্যে মনের মিল অ-সাধারণ। আসরে অনুরোধ করলে ও'দের কাউকেই গান গাইতে অ-রাজী দেখিনি। অন্তত গলা খারাপের অজুহাতে দুজনেই সমান অনভ্যস্ত। অনেক জলসায় মন খোলসা করে শিরঃকম্পন এবং নাসিকা-কুঞ্চন কার্যে সম-ভাবেই ব্যাপৃত থাকতে দেখা গিয়েছে দুজনকে।

সমঝদার শ্রোতা হিসেবে সবুজ সভার গানের আসরে ধূর্জটিকে পেলে সবাই খুশী হতেন। সেখানে ধ্রুপদাঙ্গ গানেরই তারিফ ছিল বেশি। তার কারণ বোধ হয় রবীন্দ্র-নাথের গান অধিকাংশই ঐ জাতীয়। তখনকার কালে রবিবাবুর গানের কদর ছিল এত কম যে, আমার মতন স্বল্প-পুঁজি লোককেও কোনো কোনো মিটিং-এ ধরে নিয়ে যেত রবি-

ঠাকুরের গান গাইবার জন্যে। মাত্র তাঁর তিনটি গান আমি শিশু-বয়সে বাবার কাছে শিখেছিলুম—"কেন জাগে না অবশ পরাণ," "যাদের চাহিয়ে তোমারে ভুলেছি," আর "গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে।", এ ছাড়া "নৈবেদ্য" থেকে কয়েকখানি গান আমার সংগে গলা মিলিয়ে শিখিয়ে দিয়েছিল আমার একটি কলেজ-সহপাঠী, 'প্রফুল্ল চক্রবর্তী'। প্রফুল্ল'র গুরু ছিলেন তাঁর মেজমামা, 'গিরিজা চক্রবর্তী', যিনি পরে ঠুংরি ও খেয়াল গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। বহু বৎসর পরে গিরিজাবাবুর সংগে আমার পরিচয় হয়, এবং যে-কটি রবিবাবুর গান প্রফুল্ল আমাকে দিয়েছিল, সে-কটি যে ভাগিনেয়সূত্রে তার পাওয়া, একথা বাজিয়ে নেবার সুযোগ পেয়েছিলুম। এই সব গানেরই কিছু বোধ হয় আমার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল 'কমলালয়ে'। সন-তারিখ মনে নেই, তবে এই সূত্রে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

চৌধুরী মহাশয়ের ড্রইং-রুমে সেদিন সংগীত-সভার আসর জমেছিল বেশ। গান হচ্ছে, এমন সময়ে হঠাৎ আমার মাথার উপরে একটা আরশোলার আবির্ভাব। আমি সন্ত্রস্ত-ভাব ক্ষিপ্রগতিতে সভাস্থল ত্যাগ করতে উৎসুক হওয়ায় প্রথমটা অন্য সকলে হতভম্ব হলেন। পরক্ষণেই দেখা গেল, একটা হাসির স্রোত বইছে, সমবেত ভদ্রমহিলাদের মধ্যে "আরশোলাকে এত ভয়?" —এ-প্রশ্ন অস্ফুট-স্বরে উচ্চারিত হল একটি বামা-কণ্ঠে। আমি পুরুষ, কিন্তু কাপুরুষ, এ-ধারণা অনেকেরই সেদিন হয়ে থাকবে। জোড়া-সাঁকোর ঠাকুর-গোষ্ঠীর অন্দর-মহলে এ-ঘটনার স্মৃতি যে সুরক্ষিত, তার প্রমাণ পেলুম মাত্র বছর চার-পাঁচ আগে, শ্রীমতী ইন্দিরাদেবী চৌধুরানীর মুখে, যখন বহু-কাল বাদে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে যাই জোড়াসাঁকোতে। তিনি একটি ষোড়শীকে বললেন—"তোমার মাকে খবর দাও, শোভা-বাজার থেকে একজন এসেছেন, যিনি আরশোলাকে ভয় করতেন।" বলা বাহুল্য, ষোড়শীটির মাতা আমার ৪০ বৎসর আগেকার আরশোলা-ভীতি প্রত্যক্ষভাবে দেখেছিলেন 'কমলালয়ে'। এই উপলক্ষ্যে জানালুম, ভীতিটি আমার ঠাকুরদাদার (উপেন্দ্রকৃষ্ণের) কাছ থেকে পাওয়া। মনের ভয় জিনিসটা সংক্রামক ব্যাধির পর্যায়ে পড়ে কি-না জানি না। তবে Mendelism মেনে নিলে এ-ক্ষেত্রে ধরা যায় যে, ঠাকুরদাদার এই বিশেষ ব্যারামটি আমায় অর্শেছে। তিনি চাকরদের ওপর ঢালা হুকুম দিয়ে রেখে-ছিলেন, তাঁর ঘরে কোনো আরশোলা যদি অনধিকার প্রবেশ করে, তাকে হত্যা করলে চার পয়সা বকশিশ দেওয়া হবে। একদিন একটা আরশোলা বেরল, তখন কোনো চাকরের অপেক্ষা না রেখেই তিনি স্বয়ং হত্যা-কার্যে উদ্যত হলেন। অব্যর্থ প্রহরণ—এক পাটি চটি-জুতো—তাঁর মুষ্টি-মধ্যে। আরশোলাটা বেশ খানিক লুকোচুরি খেললে, অবশেষে যখন তার প্রাণবায়ু চটির আঘাতে নির্গত হল, তখন আমার ঠাকুরদাদা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—Conclusion! সেই থেকে তিনি আরশোলার নতুন নাম দিলেন—"Conclusion."

বীরবলের সংগে প্রথম সাক্ষাতের পরে যে চিঠি তিনটি পাই তা হচ্ছে এই:—

১

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
৩১।৪।১৬

কল্যাণীয়েষু,

তুমি সামনে শনিবারে যদি বিকেলে আমার ওখানে এসো ত' পাঁচজনে মিলে সাহিত্য আলোচনা করা যাবে। তোমাকে যে লেখাটা লিখতে বলেছি আশা করি সেটি সংগে নিয়ে আসবে।

যদি চাও ত আমার সংগেই আসতে পারো অর্থাৎ তুমি যদি বেলা সাড়ে তিনটের সময় ল' কলেজে উপস্থিত থাকো ত' আমার গাড়িতেই আসতে পারো। যেমন তোমার ইচ্ছে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

২

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
১১।৮।১৬

সবিনয় নিবেদন,

আপনার চিঠি পেলুম। কাল আমার সময় আছে সুতরাং বিকেলে আপনি এখানে আমার সংগে দেখা করতে এলে খুসি হব। ইতি

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৩

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালিগঞ্জ
২৫।৮।১৬

কল্যাণীয়েষু,

যদি বিশেষ কোনও অসুবিধা না থাকে ত' আসছে রবিবারে যদি আমার ওখানে এসো ত' সুখী হই। সংগে তোমার দাদামহাশয়ের হরিদাসের গুপ্তকথা এক-খণ্ড নিয়ে এসো। বইখানি আর একবার পড়ে দেখবার ইচ্ছে আছে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

[ক্রমশ]

সেদিন রাত্রে সিনেমায় গিয়েছিলাম অনেক দিন পরে। বিদেশী ভাষার ছবি এবং ছবির কথাগুলি ছিল মূল্যবান, যা না বুঝলে উপভোগ আংশিক হতে বাধ্য। এমন আশা করা অন্যায় যে, কানে শুনে দ্রুত-কথিত বিদেশী ভাষা সবাই সমান অনায়াসে অনুধাবন করতে পারবেন। অপর পক্ষে প্রতিবেশীর এ-দাবিও নিশ্চয়ই পুরোপুরি অন্যায় নয় যে, তার অধিকার আছে পর্দার কথা বিনা বাধায় শোনবার। বলা বাহুল্য, আমার সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা এই দ্বিবিধ সংগত অধিকারের সংঘর্ষের পরিণাম। এখানেই কবুল করা প্রয়োজন, প্রতিবেশীর অধিকারের সংগতি এখনও সম্পূর্ণ বলে স্বীকার করিনে এবং ছবি দেখার সময় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্নোত্তরমালা আমার মনে তাঁর বিরক্তি ছাড়া আর কিছুর সঞ্চার করেনি।

আমার প্রতিবেশী নিঃসন্দেহে অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ পিতা। তিনি ছবি দেখতে গেছেন অন্তত চারটি বিভিন্ন বয়সের অতিমাত্রায় অনুসন্ধিৎসু সন্তান নিয়ে। তাঁদের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই, অন্ত নেই পিতার ধৈর্যের। "বাবা, ওটা কী হোলো?" "বাবা, ও কী বলল?" সামান্যতম বিরক্তি প্রদর্শন না করে পিতা প্রতিটি কথার বিস্তৃত ও সটীক বঙ্গানুবাদ করে চলেছেন সন্তানদের উপকারার্থে। জোরে, কেননা চার জনের প্রত্যেকের শোনা চাই তো। পঞ্চম আমার পক্ষেও ব্যাখ্যা না শুনে উপায় ছিল না। আর শোনার উপায় ছিল না দূরের পর্দার নিজের কথা। এক্ষেত্রে প্রতিবেশীকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ দিতে না পেরে থাকলে আমার অপরাধ অক্ষমনীয় বলে মানব না।

*

শব্দ সম্বন্ধে আমাদের বোধহয় একটা জাতিগত বধিরতা আছে। এদেশে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপরত দুটি ব্যক্তি যে-পরিমাণ গোলমালের সৃষ্টি করে, পশ্চিমে বা জাপানে বিবদমান দুশো ব্যক্তিকে তা করতে শোনা যাবে কিনা সন্দেহ। ট্রামে বা ঘরে বসে আমাদের আলাপ যেন ময়দানের মহতী জনসভায় তারস্বরে বক্তৃতা—যে-সভায় সমাবেশ হয়েছে দশ লক্ষ লোকের এবং যেখানে আয়োজন নেই (বা বিকল হয়েছে) লাউডস্পীকার ব্যবস্থার। আলাপের বিষয় হয়তো একান্তই ব্যক্তিগত—তোমার একাদশ শিশুটি কেমন আছেন বা আমি প্রতি দু' মাস নতুন জুতো কিনি কিনা। এবিষয়ে তুমি আর আমি ছাড়া বিশ্বের আর কারো নিশ্চয়ই কণামাত্র কৌতূহল নেই। তবু আমাদের কণ্ঠস্বর কড়িতে বাঁধা, সবাইকে না শুনিয়ে আমাদের শান্তি নেই।

তজ্জনিত অপরের অশান্তি সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য অপরিসীম। অফিসে একজনের সঙ্গে বাজে কথা কইতে গেলে আমি আমার ও তার সময় নষ্ট করি, সে-কথাই উচ্চগ্রামে ও সবিস্তার ঘোষণা করলে আমি গোটা অফিসের কাজে বাধা হই। ভদ্রতার নির্দেশে বা সরবতর বিবাদের ভয়ে অধিকাংশ সময় অনেকে আপত্তি করেন না, যেমন সিনেমায় আমি সেদিন করিনি, কিন্তু আমি সজ্ঞান না হলেও আমি আমার উচ্চকণ্ঠের কল্যাণে কতজনের যে অভিশাপ কুড়োই, তার ইয়ত্তা নেই। প্রশ্নটা শুধুমাত্র কণ্ঠের বা তদ্‌জাত কাজে বাধার নয়। আমি দেখেছি, গোলমাল যার কানে বাজে না, কর্কশ শব্দ যার কর্ণে পীড়া দেয় না, সে-ব্যক্তি সাধারণত ইনসেনসিটিভ।

*

রেডিও সেটের মতো মানুষকে আমি তিন শ্রেণীতে ভাগ করি। শর্টওয়েভ, মিডিয়ামওয়েভ আর লংওয়েভ। সুবেদিতার এই পর্যায়ক্রম যে কোনোদিন আমি প্রমাণ করতে পারি। যে-লোক অকারণে চেয়ার থেকে ওঠবার সময় শব্দ করে, ঘর থেকে বেরুবার সময় দরজা বন্ধ করে এমন করে যেন ঘর ভেঙে পড়বে, অফিসের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে অবস্থিত সহকর্মীর সঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে চেঁচিয়ে আলাপ করে, বোধে সে সূক্ষ্ম না হয়ে স্থূল হবে। সে শব্দ করে সুপ খাবে, হাপুস হুপুস শব্দে দই খাবে এবং একবারও মনে রাখবে না যে, এতে অপরের অস্বস্তি হতে পারে। অপরের অস্বস্তি ও অসুবিধার প্রতি উদাসীন হবার অপর নাম নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞানকৃত হলেও নিষ্ঠুরতা। অপ্রীতিকর আওয়াজে যার বিরাগ নেই, মধুর ধ্বনি সম্বন্ধে তার অনুরাগ পরিমিত হতে বাধ্য এবং যে-ব্যক্তি সংগীত ভালোবাসে না, সে কী করতে পারে তার কথা শেকসপীয়র লিখেছেন।

শহরবাসী আমরা এমনিতেই বিরাট কোলাহলের মধ্যে থাকি। গাড়ির শব্দ, ট্যাক্সির হর্নের আর্তনাদ, ফেরিওয়ালার চিৎকার, আরো কত কী। এগুলি এড়াবার উপায় নেই। এই অপরিহার্য গোলমালেই আমাদের শ্রুতিশক্তি তার তীক্ষ্ণতার অনেকখানি হারিয়েছে। তার উপর মনুষ্যসৃষ্ট, একান্ত পরিহার্য, গোলমাল যোগ করলে আমরা আমাদের সকল সূক্ষ্মতা শুধু—কানের নয়—হারিয়ে অচিরেই সবাই লংওয়েভ সেটে পরিণত হব। কাছের স্টেশনের 'সি এ টি ক্যাট, ক্যাট মানে বিল্লি' শুনব, দূরের স্টেশনের সিমফনি থাকবে অশ্রুত। আমাদের স্লোগানের অন্ত নেই। তবু আমি একটি যোগ করবঃ

আস্তে কথা বলুন।

*

নীরবতার পক্ষে আমার এই সরব ওকালতির প্রেরণা সেদিনকার সিনেমার অভিজ্ঞতা আর প্রতিদিনের অফিসের অভিজ্ঞতা। কিন্তু গভীর রাত্রে সিনেমা থেকে বাড়ি ফেরার সময় দ্বিতীয় চিন্তারও উদয় হয়েছিল এবং সেটা এবার লিপিবদ্ধ না করলে নিজের প্রতি অন্যায় করা হবে।

আমিও তো কতবার সিনেমায় গিয়েছি কনিষ্ঠদের সঙ্গে। ওরা কখনো হয়তো কোনো কথা বুঝতে না পারায় আমায় জিজ্ঞাসা করেছে। আমি প্রতিবেশীদের কথা ভেবে ওদের থামিয়ে দিয়েছি রূঢ়ভাবে, ভদ্র নাগরিক হতে শিখিয়েছি। কিন্তু তাই কি সব? হতে পারে আমিই স্বার্থপর, প্রশ্নের দ্বারা বিরক্ত হতে চাইনি বলেই ওদের নীরব করে দিয়েছি। হতে পারে আমার উপভোগ—শুধু প্রতিবেশীদের উপভোগ নয়—ব্যাহত হয়েছে বলেই আমি কনিষ্ঠদের উপর নৈঃশব্দ্য জারী করেছি।

আর আমার সেদিনের প্রতিবেশী?

তিনি আমার ও অন্যান্য দর্শকের অসুবিধার কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু আপন প্রিয়জনের জন্য তিনি আপন উপভোগ সানন্দে খণ্ডিত করেছেন। প্রতিটি দৃশ্য, প্রতিটি বাক্য সন্তানদের না দিয়ে নিজে গ্রহণ করেননি। এমন আচরণকে স্বার্থপর বলা পূর্ণ সত্য নয়, নিশ্চয়ই। একথা মনে হতেই সঞ্চিত ক্ষোভের অনেকখানি উপশম হোলো। মনে মনে একবার আবৃত্তি করলামঃ You're a better man than I am, Gunga Din! যদিও পূর্বতন অকথিত অনুরোধ অপ্রত্যাহৃত রইল যে, তিনি এর পরে সর্বত্র আস্তে কথা কইবেন এবং সিনেমায় নীরব থাকবেন।

দুই
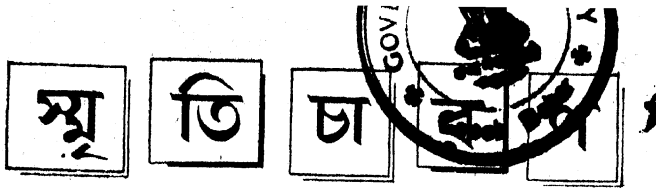
থিয়েটার রোডে এসে আমার জীবনের ছন্দ একেবারে বদলে গেল। পিতৃদেবের সুরধামে আমাকে ঘিরে ছিল সাহিত্য সংগীত ও ধর্মের আবহাওয়া। থিয়েটার রোডের প্রাসাদোপম বিলাস-নিলয়ে আমার চারদিকে শুধু উপকরণের অজস্রতা, ঐশ্বর্যের ঝংকার, সংসারিয়ানার ঘর্ঘর। আমার ঘরটিতে একটি পরমহংস-দেবের ছবির সামনে রোজ ধ্যান করতাম বটে, কিন্তু দু চার মাসের মধ্যেই দেখি মন আর তেমন ধ্যানে বসছে না। থেকে থেকে চোখের জলে নিবেদন জানাই : "ঠাকুর, দেখো তোমার প্রার্থনা যেন না ভুলি : যেন এই ভুবনমোহিনী মায়ার ফাঁদে পা না দিই, কোনো বড় মানুষের মেয়েকে কি সুন্দরী ষোড়শীকে বিয়ে না ক'রে বসি। মন যদি দুর্বল হয় তুমি জোর দিও।"

তবু মন হয়ত আমার দুর্বল হ'য়ে যেত (কে না জানে বিলাসের আবহে ইচ্ছাশক্তির মেরুদণ্ড ঋজু রাখা দুরূহ?) যদি না কলেজে এর কাটান মিলত সুভাষের সংস্পর্শে। আমার জীবনের প্রথম রোমান্স নির্মলদা। দ্বিতীয় সুভাষ। নির্মলদাকে আমি ভালোবেসেছিলাম আমার বালক মনের উন্মুখ কোমলতা দিয়ে। সুভাষকে ভালোবেসেছিলাম সমৃদ্ধতর কৈশোর জীবনের সবে-জানা আদর্শবাদ দিয়ে।

এমন কথা বলছি না যে আদর্শবাদ আমার কাছে অজানা ছিল। পিতৃদেব শুধু মনে প্রাণে নয়, অস্থিতে মজ্জায় ছিলেন আদর্শবাদী। সাহিত্য, দেশভক্তি ও বন্ধু-বৎসলতার আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল—বিশেষ ক'রে মাতৃদেবীর দেহান্তের পর থেকে। কিন্তু দেশসেবার জন্যে সর্বস্ব নিয়োগের আদর্শ বলতে যা বোঝায় তা তো তাঁর ছিল না। বস্তুত দেশকে ভালোবাসলেও দেশের চেয়েও তিনি ভালোবেসেছিলেন সাহিত্য ও সংগীতকে। সুভাষই প্রথম আমার সামনে এসে দাঁড়ালো দেশভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ হ'য়ে, দেশাত্মবোধের প্রাণোন্মাদী প্রতীক হ'য়ে। তার মতন দেশভক্ত আমাদের দেশে আর জন্মায়নি এমন অত্যুক্তি করব না, কিন্তু আমার কাছে তার দেশভক্তি ও পবিত্রতার দৃষ্টান্ত যেভাবে জীবন্ত ও জ্বলন্ত হ'য়ে উঠেছিল, যেভাবে তার ব্যক্তিরূপের আশ্চর্য চুম্বকে আকৃষ্ট হয়ে আমি তার আদর্শে আমার মনকে রাঙিয়ে তুলবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে উঠেছিলাম, তার প্রতি কথা, হাসি, ভঙ্গি যেভাবে দিনের পর দিন আমার মনকে উদ্দীপ্ত ও প্রাণকে আবিষ্ট ক'রে তুলত তার বর্ণনা করব কোন্ ভাষা দিয়ে?

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণশক্তির উদ্দামতা ক'মে আসেই আসে। কৈশোরে ও যৌবনে যে-স্বপ্ন, যে আদর্শ আমাদের ডাকে সব ছেড়ে তার অভিসারে চলতে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাদের উন্মাদনা ক'মে আসেই আসে। হাজারো সাবধানী যুক্তি, সুবিধাবাদী প্ররোচনা, স্থিতিশীল বিচার পথ আগলে দাঁড়ায় ভয় দেখিয়ে, ভুল বুঝিয়ে, সুর নামিয়ে। কিন্তু কৈশোরে ও যৌবনে মহত্ত্বের দীপ্ত প্রভা প্রথম দিকে আসে যেন চোখ ধাঁধিয়ে। সুভাষকে আমার কিশোর মন এইভাবেই বরণ ক'রে নিয়েছিল উচ্ছল হ'য়ে—বিহ্বল হ'য়ে। তার রূপে, কণ্ঠস্বরে, সমগ্র ব্যক্তিরূপের টানে আমি উধাও হ'তে চেয়েছিলাম তার নির্দিষ্ট পথে তার নায়কতা মেনে—সর্বান্তঃকরণে। কোনো সমবয়সী কিশোর যে আমার মতন একগুঁয়ে কিশোরকে এভাবে অভিভূত করতে পারে এ আমি সুভাষকে দেখবার আগে বিশ্বাসই করতে পারতাম না। কিন্তু কীভাবে তার প্রভাব আমার উপর এত গভীর হয়েছিল একটু ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করি—যদিও মানব চরিত্রের অনির্দেশ্য চুম্বকের ঠিকমত ব্যাখ্যা হয় কি না বলা কঠিন। তবু চেষ্টা করি বলতে যতটা পারি।

আমি তো রেগে অগ্নিশর্মা, কারণ ক্লাসে পড়তাম যখন নিবারণ মৈত্র ব'লে আমার একটি সহপাঠী কথায় কথায় আমাকে বলে : "কী তোমাদের ফার্স্ট বয় ক্ষিতীশ চাটুজ্জে! কটকে আমার বন্ধু সুভাষ বোস পড়ছে—এ-বৎসরে সেও ম্যাট্রিক দেবে। তোমার ক্ষিতীশকে মারিবে যে কটকে বাড়িছে সে, বুঝলে?"

আমি তো রেগে অগ্নি শর্মা, কারণ ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যে ম্যাট্রিকে
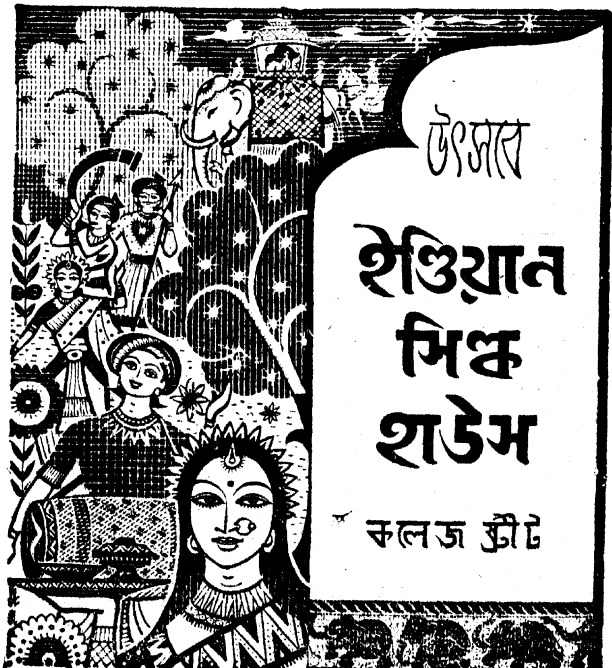
প্রথম হবেই হবে এ সম্বন্ধে আমার মনে সংশয়ের বাষ্পও ছিল না। তার উপরে এ সময়ে ক্ষিতীশ নব্বইটি ইংরাজী প্রবন্ধ মুখস্থ ক'রে ফেলেছে, অঙ্কে ১০০-র মধ্যে ১০০ পায়, সংস্কৃত ইংরাজী বাংলা সবতাতেই চৌখস। শুধু কি তাই? সে খোদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রপৌত্র! সে-সময়ে ক্ষিতীশ আমার কাছে আদর্শ সুবোধ বালক। তার কথায় আমি উঠি বসি—মানে, স্কুলে। তাকে এমনিই মানতাম যে একবার সে আমাকে এমন কি বাইজির গান শুনতে মানা করায় আমি যেতে সাহস পাইনি। হয়েছিল কি, স্কুলে মানিক ব'লে একটি সহপাঠী ছিল আমাদের। সে ছিল সুবর্ণ বণিক—বড় মানুষ। তাদের বাড়িতে এক মস্ত বাইজির গান হবে এক বিবাহে। আমি তো পা বাড়িয়েই আছি। এ-হেন সময়ে, হা হতোস্মি ক্ষিতীশ সভ্রূভঙ্গে বলল: "ধিক, ভালো ছেলে বাইজির গান শুনবে!" আমি অমনি ব'সে পড়লাম। ফার্স্ট বয় ক্ষিতীশের চোখে সেকেণ্ড বয় দিলীপ ছোট হ'য়ে মান যাবে কি? সুতরাং যাওয়া হ'ল না। দ্বিতীয়বার যখন জানকী বাইয়ের গান শুনতে যাই—ক্ষিতীশকে বলিনি ঘুণাক্ষরেও ভালো ছেলের মন্দ বনবার দুর্দম দুরভিসন্ধির কথা। সর্বোপরি, ক্ষিতীশকে আমার পিতৃদেবও অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

এ-হেন ক্ষিতীশকে হারিয়ে দেবে কি না সুভাষ? কোথায় কলকাতা ভারতের রাজধানী, আর কটক, পাড়া গাঁ। এহেন পরিস্থিতিতে গ্রাম্য অবোধ শহুরে সুবোধকে কোণঠাসা করবে? দূরে দূর! নিবারণের সঙ্গে কথা বলাই ছেড়ে দিলাম।

কিন্তু ওমা! ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল বেরুতেই চক্ষুস্থির: সুভাষই তো! সন্দেহের অবকাশ কোথায়? হয়েছে দ্বিতীয়। ক্ষিতীশ সপ্তম। দাদামহাশয়ের গল্প মনে পড়ল: "হা আল্লার ভিরকুটি!"

ভ্রুকুটিই বটে। তবে আল্লার নয়—সুভাষের। সেদিন রাতে তাকে স্বপ্নে দেখলাম—কোথায় [illegible] ফটো দেখেছিলাম, সম্ভবত নিবারণেরই [illegible]ছে—শুভ্র, সুন্দর উজ্জ্বল নির্মল। [illegible] নিবারণের কাছে আরো শুনেছিলাম সু[illegible] —বিবেকানন্দ-প্রীতি, গঙ্গাজ[illegible] [illegible]য়ে সংস্কৃত [illegible] পাঠ, দেশভক্তি [illegible]। ফলে পূর্বরাগ মনে [illegible] আবছা দ্যুতির মায়া বিছিয়ে দিল। সুভাষকে স্বপ্নে দেখেই বরণ করলাম তার ম্যাট্রিক কীর্তির টানে। না, শুধু এই কীর্তির টানে কেন বলছি? সুভাষের নাম তখনই একটু একটু ক'রে ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। মস্ত বাপের ছেলে, অধ্যাপকের প্রিয়, সহপাঠীদের হিরো, সর্বোপরি দেশের শ্রেষ্ঠ কিশোর সেবকদের মধ্যে অগ্রণী। তার উপর সে কি না ক্ষিতীশকে হারিয়ে দিল পরীক্ষায়? এ যে-সে মনুষ্য নয় বলল আমার বিনত মন উচ্ছ্বসিত বিস্ময়ে।

অঘটন এ-যুগে ঘটে না? কে বলল? না ঘটলে প্রেসিডেন্সি কলেজে আসতে না আসতে তার দেখা মিলল কেমন ক'রে? প্রথম দিন মনে আছে—এক সহপাঠী বললে: ঐ ঐ ঐ সুভাষ! তখন সুভাষ ছাত্র-জগতের নামজাদাদের মধ্যমণি, পড়ে আই এ। আমি আই এস সি। কিন্তু এ-ক্লাস থেকে ও-ক্লাস যেতে দৃষ্টি বিনিময় হয়। আলাপ করতে কী যে তৃষ্ণা জাগে—অথচ সাহস পাই কই? এমন সময়ে বিধাতা সদয়নেত্রে তাকালেন। হ'ল কি, কলেজের কী একটা সভায় আমি গান করতে নিমন্ত্রিত হই। তাতে সুভাষ জোর হাততালি দেয়। আমার তো হাতে চাঁদ আসে! সুভাষের কাছে চিহ্নিত হলাম—তবু হব না আত্মহারা? মনে পড়ত বৈষ্ণব পদাবলীর গান: "দুঁহু দোঁহা দরশনে উপজিল প্রেম—দারিদ্র্য বেড়ল যেন ঘটভরা হেম!" অর্থাৎ শুভদৃষ্টিতে প্রেম—সে কেমন? না, যেমন দরিদ্রের হাতে এক ঘড়া মোহর! এ না হ'লে প্রথম প্রেম? মার্লোর বিখ্যাত লাইনেরও সায় আছে: "Who ever loved that loved not at first sight?"

এক একজন মানুষ আসে—বহু দুঃখ কষ্ট ঝড় ঝাপটার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে, কখনো বা ভূমিকম্পের ফলে সহসা-উচ্ছ্রিত গিরিশৃঙ্গের মত। যেমন বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ। আর এক জাতের মানুষ আছে যারা আঁতুড় ঘরেই পরে সোনার টোপর। এদের বিলাতি নাম born leader: এরা জন্মালে যে শাঁখ বাজে সে মামুলি আনন্দের শাঁখ নয়—বিস্ময়ের তূর্য, ঘোষণা করে: এ যেরে ক্ষণজন্মা—বরণ করে ঘরে তোলো—যাদের দেখলেই মনে হয় টেনিসনের Sir Galahad-এর ঘোষণা:

My strength is as the strength of ten because my heart is pure.

আমি এমন ইঙ্গিত করছি না যে এই জাতের মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের অন্তিম বিচার সমসাময়িক মানুষের হাতে নয়—মহাকালের দরবারে চরম অনুমোদনের পাঞ্জায় তার রেজিস্টারি। কিন্তু এই সদাচলমান অধ্রুব ভবজগতেও এক একজন বরেণ্য কীর্তিমান আসেন যাঁদের নিয়ে ধুমধাম না ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যায় না। উৎসবের কৌস্তুভ হ'য়েই যে এসেছে তারা—তাদের নিয়ে উৎসব করব না তো করব কাকে নিয়ে? তাদের জীবনই একটা জয়যাত্রা। সুভাষ ছিল এই জাতের মানুষ। ঐ টেনিসনেরই ভাষায় এ-জাতের মানুষকে দেখলেই আমাদের প্রাণ যেন গান গেয়ে ওঠে, বলে: "Lead, and I Follow"

এর প্রমাণ মিলল হাতে হাতে। প্রেসিডেন্সি কলেজে আসতে না আসতে সুভাষ ডিবেটিং ক্লাবের দিকপাল হয়ে উঠল। শুনলাম সে নাকি চমৎকার ডিবেট করে। তার সুগৌর ব্রহ্মচর্যপূত উজ্জ্বল মুখকান্তি যখন বক্তৃতা দিতে উঠতে ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠত তখন আমার চোখ শিউরে উঠত আনন্দে বিস্ময়ে। মনে হ'ত এ আমি পারতাম না—ইংরাজীতে তর্ক—উঃ!

কিন্তু হবি তো হ সুভাষের সঙ্গে প্রথম বাক্যালাপ হয় আমার এই ডিবেটিং ক্লাব নিয়েই। সে থাকত ৩৮।২ এলগিন রোডের বাড়িতে। আমি ৩৪ থিয়েটার রোডে। তার বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হয়েছে কতবারই—যাই সুভাষের সঙ্গে আলাপ করে আসি। কিন্তু সে সময়ে আমি সত্যিই অত্যন্ত লাজুক ছিলাম। তার উপর সর্বসমক্ষে সুভাষের সঙ্গে যেচে আলাপ! অতটা বুকের পাটা আর যারই থাকুক আমার ছিল না। শুধু মনে মনেই কল্পনা করতাম তার সঙ্গে গল্প করছি, বিদ্যা জাহির করছি সংস্কৃত আউড়ে, আর গুণপনা জাহির করছি গান গেয়ে।

এমন সময়ে থিয়েটার রোডে হঠাৎ সুভাষের অভ্যুদয়—পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ! বুকের মধ্যে হৃদ্দণ্ড বেজে উঠল আমার যখন সুভাষ বলল: "আপনার গান শুনেছি। খুব ভালো। কিন্তু আরো চাই, আমাদের ডিবেটিং ক্লাবে আপনাকে যোগ দিতে হবে ও অ্যাক্টিভ পার্ট নিতে হবে।"

ঠিক এই ক'টি কথা—আজো স্মৃতির ফলকে খোদাই করা আছে। সেই যে প্রথম পরিচয়—ভোলা যায় কি?

আমি ভয়ে মিইয়ে গেলাম: "অ্যাক্টিভ পার্ট? কিন্তু......আমি যে আদৌ বলতে পারি না। শুধু গান গাইতেই পারি।"

সুভাষ হাসল। আহা, কী মিষ্টি হাসি!

এর আগে তাকে হাসতে দেখিনি। কারণ কলেজে ছাত্রদের মাঝে সে বিষম গম্ভীরানন হয়ে থাকত। কিন্তু সেদিন তার মনের প্রসার, নির্মল ঔদার্য যেন তার হাসিতে চিকিয়ে উঠল। অমন অপরূপ হাসি আমি জীবনে বেশি দেখিনি, পিতৃদেবের হাসির পরে। সে বললঃ "কিন্তু ডিবেটিং ক্লাবে তো গানের ডিবেট হয় না, হয় কথার ডিবেট। অতএব আপনাকে বলতেই হবে।— না আম্‌তা আম্‌তা নয়। পারবেন না? সে কি? পারতেই হবে। আমাদের দেশে ডেমোক্র্যাসি আনতে হলে তার মহলা দিতে হবে প্রথম ডিবেটিং ক্লাবে—যেমন ওরা দেয় কেম্ব্রিজে, অক্সফোর্ডে।......" আরও এক-গংগা কথা বলে গেল সে—সব উদ্ধৃত করার দরকার নেই। তবে মোট কথা দাঁড়াল এই যে আমাকে হতে হল ডিবেটিং ক্লাবের সভ্য। সুভাষ যখন কাউকে একবার উপরোধ করত তখন তাকে 'না' বলতে পারত খুব কম লোকেই।

কিন্তু ইংরাজীতে বলে নাঃ

You can take a horse to the water but you cannot make him drink?

আমারও হল তাই। ডিবেটিং ক্লাবে যাওয়া আর ডিবেট করা তো সমার্থক নয়। তাছাড়া ডিবেট করব কী ছাই? যে যা বলে তখনকার মতন মনে হয় সত্যিই তো। কিন্তু কী আশ্চর্য, যেই সুভাষ ওঠে অমনি মনে হয় তার প্রতিপক্ষ শয্যা নিয়েছে সুভাষের তর্কবাণে ছিন্নভিন্ন হয়ে। সত্যিই যেমন চমৎকার ছিল তার বলবার ভঙ্গি, তেমনি নিপুণ ছিল তার ওকালতি। পরের জীবনে সিংগাপুরে সে জর্মন ভাষায় এক ঘণ্টা চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিল—তার সহকারিণী শ্রীমতী লক্ষ্মীর মুখে শোনা। লক্ষ্মীর নাম শুনে মাদ্রাজে তার সংগে দেখা করতে গিয়েছিলাম সুভাষের দেহান্তের পর। সে বলেছিল উদ্দীপ্ত ভাষায় সুভাষের সম্বন্ধে কত কথাই যে! খেদ হয়—টুকে রাখিনি বলে। যাক যা বলছিলাম।

তারপর সুভাষের সংগে আলাপ শুরু হয়। মাঝে মাঝেই সে থিয়েটার রোডে আসত ডিবেটিং ক্লাব কি অন্য নানা কাজের প্রস্তাব নিয়ে। আমরা বেড়াতে বেরুতাম—চৌরংগীর মাঠে বসে দুই বন্ধুতে কথা হত সূর্যাস্ত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আহা, সে যে কী আনন্দের দিনই গেছে। সুভাষ কত কথাই যে বলত—দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন, ব্রহ্মচর্যের প্রয়োজনীয়তা, আদর্শনিষ্ঠা, অধ্রুবের জন্যে ধ্রুবকে ত্যাগ......কত কী। ওর কয়েকটা উদ্ধৃতি কেবল মনে আছে। কখনো বলত রবীন্দ্রনাথের একটি পদ উদ্ধৃত করে যে নির্ভীক হতে হবেঃ "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" কখনো বাইরনের থেকে উদ্ধৃতি দিত—বাইরনের Child Harold ও মুগ্ধ হয়ে পড়ত স্কুলেই—

Fair Greece! sad relic of departed worth! Immortal, though no more; though fallen, great!

(কান্তিময়ী গ্রীস!
যার অস্ত গেছে অবর্ণ্য মহিমা!
চিরঞ্জীবী, তবু নাস্তি।
ধূলিলীন, তবু মহীয়ান্‌!)

বলত গ্রীসের স্থলে Ind লেখা যেতে পারত এখানে।

কখনো বা উদ্ধৃত করত রোম সম্বন্ধে বাইরনের উচ্ছ্বাসঃ

Oh Rome! my country! city of my soul!

(রোম! ওগো স্বদেশ আমার—
হৃদয়ের বৃন্দাবন!)

বলত ধরা গলায়, "দিলীপ! তোমার পিতৃদেব কী অপরূপ কথা লিখেছেন, 'এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি।' তোমাকে গাইতে হবে এই সব গানঃ

ভারত আমার ভারত আমার
যেখানে মানব মেলিল নেত্র
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র!"

পরের জীবনে কতবারই সে নানা সভায় আমাকে বলেছে পিতৃদেবের স্বদেশী গান গাইতে ও গান শুরু হতে না হতে দেখেছি তাকে নিস্পন্দ তন্ময়। দেশকে এভাবে ভালোবাসতে পারে কজন? আজকের দিনে দেশধ্বজের অবশ্য অপ্রতুল নেই, কথায় কথায় যাঁরা দেশ দেশ করে গদগদ্গদ্‌ হতে সক্ষম। কিন্তু দেশের জন্যে সত্যি প্রাণ কাঁদে কজনের?

শুধু প্রাণ কাঁদাই নয়। পরের দুঃখে, দেশবাসীর দুঃখে দুঃখ বোধ করেন হয়ত অনেকে, কিন্তু আমাদের দরদের মধ্যে প্রায়ই লুকিয়ে থাকে এক নিশ্চেষ্ট তামসিক আত্মপরতা কিংবা বেঁচে বর্তে থাকার দুরন্ত
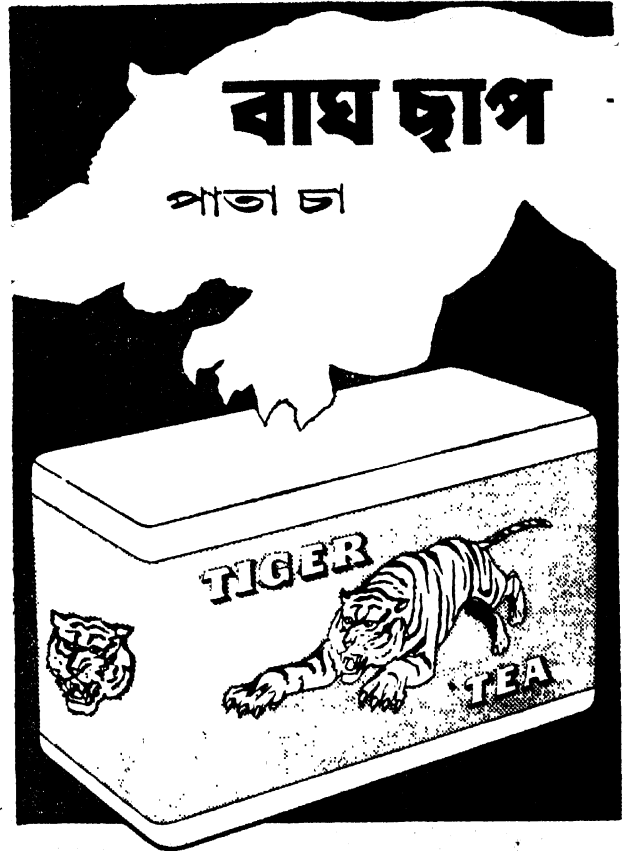
আগ্রহ। এমন কথা বলছি না যে আমরা যখন দেশের দুঃখে দুঃখিত হই তখন আমাদের মন আর্দ্র হয় না, কি 'আহা আহা' যখন বলি তখন বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে না। কিন্তু তারপর যদি কেউ প্রশ্ন করেঃ "তা তো হল, এখন করবে কি শুনি দেশোদ্ধারের জন্যে?"—তখন আমরা মাথা চুলকে বলি ইন্দ্রনাথের ভাষায় "দেশ তো দেশেই আছে, কী আর উদ্ধার?" এক কথায় একে বলে playing safe. আমার মনে আছে একদিন শ্রীশরৎ বসুর বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত এক বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে রাত তিনটে অবধি আমাদের গল্প। আমি তখন পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে মাস কয়েকের জন্যে কলকাতা ফিরেছি। সুভাষ বলল কথায় কথায় যে আমাদের দেশের দুর্গতির একটি প্রধান কারণ এই যে, আমাদের দেশের আদর্শবাদী ছেলেরাও আদর্শকে কাজে খাটানোর সময় কিন্তু কিন্তু করে।

আমিঃ "অন্য দেশেও কি করে না?"

সুভাষঃ "করে—যারা গড়পড়তা—যারা আদর্শবাদী নয়। আইরিশদের মধ্যে দেখতে পাবে কী অদ্ভুত তাদের পণ—মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন যাকে বলে। জাপানীরা মুখে ভুলেও উচ্ছ্বাস করে না কিন্তু suicide squadএ যোগ দিতে তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এদের কথা মনে করেই লিখেছিলেন না কিঃ 'ওরে সবুজ ওরে আমার কাঁচা, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'? দেখ না অমুকের কথা—আদর্শবাদী বলে আমরা এক সময়ে তার কী জয়ধ্বনিই করেছি। বিবাহের আগে সে সত্যিই ছিল আদর্শবাদী। কিন্তু বিবাহের পরে কী করছে বলো তো—একটা চাকরি ছেড়ে অন্য চাকরি নেবার সময়েও কী আপ্রাণ চেষ্টা তার বলো তো যাতে দুই কূলেই বজায় থাকে! আমার সঙ্গে কী ঝগড়াটাই না সে করল যাতে অমুককে তার ছেড়ে-দেওয়া-কাজে বহাল করা না হয়! Playing safe, playing safe, দিলীপ, কেউ চায় না আদর্শের জন্যে কিছু পণ রাখতে—আমাদের মেরুদণ্ডেই ঘুণ ধরেছে যে ভাই, চলতে গিয়ে না টলে পারি?"

আমি সুভাষকে বললাম—যে কথা বিলাতেও ওকে বলতাম প্রায়ইঃ "সুভাষ, তোমার একটা মস্ত দোষ এই যে তুমি প্রত্যেকের কাছেই আশা করো যে সে চলবে তোমার চলার ছন্দে—'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনা হীন' গান গেয়ে অভীঃ সুরে।"

যারা অস্থিতে মজ্জায় আদর্শবাদী তারা প্রায়ই এই ভুলটি করে থাকে কেননা যে-ত্যাগ তাদের কাছে শুধু কর্তব্য নয় স্বভাব-সিদ্ধ সে-ত্যাগ যে অপরের কাছে দুরূহও হতে পারে এটা তারা ভুলে যায় সহজেই। তাই সুভাষের সম্বন্ধে অনেকেই বলত যে, সে মানুষ চিনতে পারে না। কিন্তু এই মানুষ চিনতে পারা কি চাট্টিখানি কথা? বহু ঘা খেয়ে, তবে মানুষ এই সাদা কথাটি বুঝতে শেখে যে "যা চকচক করে তাই সোনা নয়।" শুধু তাই নয়, আদর্শবাদী-দের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় এক ধরনের অসহিষ্ণুতা। যেমন ওয়াশিংটন—বলতাম আমি প্রায়ই সুভাষকে। একদিন তাঁর পুরোনো বিশ্বাসী সেক্রেটারি কয়েক মিনিট দেরি করে হাজিরি দেন। ওয়াশিংটন তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেনঃ "আমার ঘড়িটা লেট ছিল, স্যার।" তাতে ওয়াশিংটন বলেনঃ "তাহলে হয় তোমাকে ঘড়ি বদলাতে হবে, নয় আমাকে—সেক্রেটারি।" সুভাষ শুনে হাসত, কিন্তু স্বীকার করত না যে ওয়াশিংটন বাড়াবাড়ি করেছিলেন। দেশসেবার প্রসঙ্গে সে ছিল যে স্বভাবে একরোখা। যা কিছু দেশের কাজের অন্তরায় তার কাছে বর্জ্জনীয়—কতকটা যেমন বৈরাগীর কাছে সংসার। একটা উদাহরণ দেই আমার যৌবন অধ্যায় থেকে। তখন আমি বিলেতে। আমার বাসায় আসতেন প্রায়ই আমার এক কবিবন্ধু যিনি ছিলেন একটু সুরাসক্ত। সুভাষ বলত তার সঙ্গে না মিশতে। আমি বলতামঃ "সুভাষ তোমার এই এক আবদার—সংসারে নিখুঁত মানুষ নৈলে তার সঙ্গে মিশব না এ ধনুর্ভঙ্গ পণ নিলে যে শেষটায় ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হবে ভাই?" সুভাষ অম্লান, জবাব দিতঃ "তাই বলে জেনেশুনে ঠককে কোল দিতে হবে না কি? না দিলীপ, তোমারও এই এক মস্ত দোষ আছে, তুমি যার তার সঙ্গে মিশে তোমার মূল্যবান সময় নষ্ট করো। মনে রেখো—" একথাটি বলত সে প্রায়ই জোর দিয়ে—"দেশ তোমার কাছে অনেক কিছু আশা করে, আর আমাদের দেশের এতই দুর্দশা যে, আমাদের অনেককেই মরে তবে দেশকে জাগাতে হবে। এ ছাড়া পথ নেই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়, ভাই। তোমার ঐ কবিবন্ধুটি কবিতা লেখেন। হয়ত অনবদ্য। কিন্তু রবিবাবুর গান তুমিই কি গাও না 'এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি, কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি?' না দিলীপ, তোমাকে আমাকে আমি অব্যাহতি দেব না এখনো আমরা নাবালক বলে। এই বয়স থেকেই তৈরি হতে হবে দেশের সেবক হতে। যেমন—তোমার মুখেই তো শুনেছি—প্রহ্লাদ বলেছিল দৈত্য-বালকদের যে শিশুকাল থেকেই বিষ্ণু না ভজলে বড় হবার পর আর ভজবার তাগিদই পাবে না ভিতর থেকে। শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রীর পত্র পড়েছ?"

আমি, "না।"

সুভাষ (অধীর হয়ে), "ঐ দেখ। এসব না পড়ে পড়বে তুমি টুর্গেনিভ, ডিকেন্স, বালজাক। দেখ ভাই, একটা কথা বলি। আমাকে ভুল বুঝো না। আর্টের আমি বিরোধী না। কিন্তু সব কিছুরই একটা সময় আছে। শ্রীঅরবিন্দের স্ত্রীর পত্রে আছে এই কথাটাই যে যদি কোনো রাক্ষস আমার বুকে চেপে বসে তখন কি আমি অন্য সব কাজ ফেলে সব আগে সে-রাক্ষসের মুণ্ড-পাত করতে ছুটব না? আমারও ঐ কথাঃ আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ দেশবাসী উদয়াস্ত হাড় ভাঙা পরিশ্রম করেও এক বেলাও পেট ভরে খেতে পায় না, দুর্বৎসরে ঘাস পাতা খেয়ে জীবন যাপন করে পশুর মতন। অথচ আমরা শহুরে বন্ধুরা শহরে মোটর, ফিটন হাঁকিয়ে বেড়াই। তোমাকে বলছি দিলীপ, এ চলবে না, রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেননিঃ

"হে মোর দুর্ভাগা দেশ,
যাদের করেছ অপমান
অপমানে হ'তে হবে
তাহাদের সবার সমান।"

(ক্রমশ)

২৮

ওদের ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সৌরর খারাপ লেগেছিল; সৌর আঘাত পেয়েছিল।

তখনকার ভাল বা খারাপ লাগার রীতিই আলাদা ছিল। সময়, বয়স ইত্যাদির সংগে ওটা আপনা থেকেই বদলে যায়। খুব কম বয়সে মাটিতে পড়ে গেলে বা খিদে পেলে আমরা কেঁদেছি। আমাদের হাসানোর জন্য কাতুকুতুই যথেষ্ট ছিল। (হাসি কি মানসিক ক্রিয়ার ফল, না কয়েকটি পেশীর কুঞ্চন-প্রসারণ?) সঙ দেখে আগে হাসি পেত, এখন পায় না কেন? আগে আমি কত সহজে কাঁদতে পারতাম, এখন পারি না কেন। তার মানে কি এই যে, আমি আগে যতটা সজীব ছিলাম, এখন ততটা নেই? সৌর প্রশ্ন করত নিজেকে, ভাল আর খারাপ লাগার রহস্যের অন্ত পেত না। ওরা তারই মনোজাত, দেহহীন, কিন্তু অশাসন প্রজার মত, কাউকে কাজের কৈফিয়ত দেয় না।

কোন মেঘলা দিনে সারাদিন ঘুমিয়ে উঠে বিকেলটাকে যদি ভোরের মত লাগে, আমার মন খুশি হয়, নেচে ওঠে। আমি জানি না কেন। আবার বৃষ্টির জন্য যদি কোনদিন বাড়িতে বন্দী থাকতে হয়, যদি জানালায় বসে বসে দেখি, মরা বিকেলটাকে রাত্রি হঠাৎ এসে ঢেকে দিল, আমার দুঃখের অবধি থাকে না। কেন? সে কি জীবনে একটা সন্ধ্যা কম দেখতে পেলাম বলে? এই ছোট্ট একটা লোকসানের শোকে? জানি না।

জানি না, ম্রিয়মান সৌর বলত, আমার মনের কোন খবর আমি রাখি না।

ওদের ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সৌরর খারাপ লেগেছিল।

ওরা বসেছিল, ঠিক সন্ধ্যার মুখে, রকে পা ঝুলিয়ে। যার হাতে গালার চুড়ি, সে। যার হাতে উল্কি, সে-ও। একজনের নাম ত সৌর জানে, নয়ন। আর একজনের নাম কী? একজনের পরনে টুকটুকে লাল শাড়ি, অন্যজনের নীলাম্বরী। দু-জনের কারুর জামায়ই হাতা নেই। এ-সব সৌর লক্ষ্য করে দেখেছিল তা নয়, ছবিটা আপনা থেকেই এক লহমাতেই ওর মনে আঁকা হয়ে গিয়েছিল। অনেক কবিতা একবার পড়লে যেমন মুখস্থ হয়ে যায়, এ-ও তেমনই।

সৌর আলাদা করে ওদের দেখছিল না, হাতের বালা না, উল্কির ছাপ না, হাত-কাটা ব্লাউজ না, টকটকে লাল শাড়িও না। সৌর ওদের বসে থাকাটাই দেখছিল। আরও ভাল করে দেখবার লোভে নিচু হয়ে জুতোর ফিতে বাঁধতে বসেছিল।

লাল শাড়ি মেয়েটার কোলে একটা বিড়াল ছিল, তার রোঁয়াগুলোয় লালচে ছোপ—হোলির দিনে কেউ রঙ দিয়ে থাকবে। বিড়ালটা ককিয়ে ককিয়ে তাই দুঃখ জানাচ্ছিল, আর মেয়েটি ওর ঘাড়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছিল, 'কেঁদ না সোনা, কেঁদ না মানিক, এই বোশেখেই ঘটা করে তোর বিয়ে দেব।'

বিড়ালটা তবু থামছিল না, থেকে থেকে কেঁদে উঠছিল।

আর একটু দূরে, ওই রকেই পা ঝুলিয়ে বসে যে মেয়েটি বিড়ি টানছিল, সে থেকে থেকে কাশছিল আর হাসছিল।

'হাসছিস যে?'

'তোর রকম দেখে।'

'রকমটা আবার কী দেখলি?'

'বেরালের আবার বিয়ে?'

অন্য মেয়েটি রেগে উঠল, 'দেবই ত, বিয়ে দেবই ত আমি। এই বোশেখেই ঘটা করে বিয়ে দেব, কত লোকজন ডেকে খাওয়াব, দেখিস।'

তার সখী বিড়িটা ফেলে দিয়েছিল, তখন আর কাশছিল না, শুধু হাসছিল।

'তবু হাসছিস?'

'তোর সাধের কথায়। বেরালের বে' দিবি কেন? তোর নিজের বে' কোনদিন হবে না বলে? নিজের শখ পরকে দিয়ে মেটাবি?'

কোলে যার বিড়াল ছিল, সে রাগ করে বলল, 'মুখপুড়ি।' আসলে রাগ করেনি, পরে সে নিজেই হাসতে থাকল, বে-বিড়িটা নিবেও নেবেনি, উঠে গিয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে সেটাকে থেতলে দিয়ে ফের রকে উঠে বসল।

বলল, 'তুই হাসছিস, কিন্তু দেখিস, কনে হলে ওকে কি চমৎকার মানাবে।' বলে লাল আঁচলের কোণা দিয়ে বিড়ালটাকে ছোট্ট একটা ঘোমটা পরিয়ে দিল।

গৃহবধূ হতে বিড়ালটার বোধ হয় কিছু আপত্তি ছিল, কেননা, সে সংগে সংগেই

লাফিয়ে রাস্তায় পড়ল। মেয়ে দ্বটি এল পিছে-পিছে, তারাও রাস্তায় নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু সৌরকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

একজন ইশারায় কী বলল আর একজনকে। জ্বতোর ফিতে বাঁধা কখন শেষ, সৌর এখন দেয়ালে 'জবরের যম'-লেখা বিজ্ঞাপনটা পড়ছিল, বা পড়বার ভান করছিল, কান গরম হয়ে উঠেছিল, ছ্বটে পালাবার শ্বধ্ব একটা অছিলা খ্বঁজছিল সৌর।

একজন বলল, 'সাহস পাচ্ছে না।'

অন্য জন বলল, 'ডাকি?'

'সাহস আছে?'

'সাহস না থাক, জোর আছে। হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনেও আনতে পারি।'

'খ্ব যে বড়াই, আন্ ত?'

'বাজি?'

'বাজি।'

ছাতে যারা নিত্য সৌরকে পণ রেখে কড়ি খেলে, আজ তারাই ওর হাত ধরে টানাটানি করবে বলে বাজি ধরেছে।

সৌর এক-পা দ্ব-পা করে এগিয়ে যাচ্ছিল।

ওদের কেউ সত্যি-সত্যিই ওর হাত ধরে টানবে বলে পিছনে আসছে কিনা, সেটা দেখে নেবার জন্যেই সৌর খানিক এগিয়ে ফিরে তাকাল। আসছে না, এ-ওর কাঁধে হাত দিয়ে দ্বই সখী চৌকাঠে দাঁড়িয়ে আছে।

ওকে ফিরে তাকাতে দেখে একজন অর্থপূর্ণভাবে গলা দিয়ে খ্বক্ খ্বক্ শব্দ করল।

সৌর জোরে জোরে চলতে শ্বর্ব করেছিল। সন্ধ্যার হাওয়া গলির ধ্বলো দ্ব-হাতে তুলে তুলে আবীরের মত ছড়িয়ে ফেলেছিল।

সৌর ওদেরই একজনকে বলতে শ্বনল, 'ভয় পেয়েছে।'

আর একজন খিলখিল করে হেসে উঠে সায় দিল।

•

পাছে আবার ছাদে উঠতে হয়, সেই ভয়ে সৌর পরদিন তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। পকেটে যে ক'টি খ্বচরো পয়সা ছিল, তাই দিয়ে পর-পর খেয়েছিল অনেকগ্বলো সিগারেট, পার্কে গিয়ে শ্বয়ে পড়েছিল। •

পাছে ওদের সঙ্গে দেখা না হয়, সেই ভয়ে দ্বিতীয় দিন সকাল-সকালই উঠেছিল ছাদে। ওরা তখন ছিল না, কেউ ছিল না, ও-পাশের ছাদের তারে ওদেরই জামা-কাপড় শ্বকোচ্ছিল। এ-পাশের ছাদটায় একটি কাক একলা বসে পাহারা দিচ্ছিল। সৌরকে দেখে কাকটা উড়ে পালাল।

ওরা এল তারও অনেক পরে। সৌরকে দেখল, কিন্তু ম্বখ ফিরিয়ে নিল। যেন আগে দেখেনি, যেন চেনে না। লাল গালার বালাজোড়া একজন আজ খ্বলে রেখে এসেছে, অন্যজনের নাকেও নাকছাবি নেই। তবে ফরসা হাতে উল্কি ঠিকই আছে। মাদ্বর পাতাই ছিল।

ওরা এইবার বসবে, আমাকে নিয়ে খেলবে, সৌর বলল মনে মনে, ভয় পেল, তব্ব নড়ল না, কখন প্রথম কড়ির দান পড়ে, সেই অপেক্ষায় চেয়ে রইল।

দান পড়ল, ঠক করে তার আওয়াজ পড়ল সৌরর কলজেয়।

আরও একজন সাক্ষী ছিল। কেই কাকটা। সেটা ফের উড়ে-এসেছিল। কার্নিসে বসে কড়ি খেলা দেখছিল। খেলাটা ওর মনোমত হচ্ছিল না, মাঝে মাঝে কা-কা করে ডেকে উঠে টিটকারি দিচ্ছিল।

একটি মেয়ে মাথা তুলে বিরক্ত গলায় বলে উঠল, "হ্ব-উস।" কাকটা তব্ব নড়ল না, ঘাড় ন্বইয়ে নিজের গলার পালকগ্বলো ঠোঁট দিয়ে খ্বঁটতে থাকল।

আর একটি মেয়ে তখন কাকটাকে তাড়াবে বলে লাঠি তুলল। ম্বখ নেড়ে বলল, 'মরণ!'

ঠিক তখনই হাওয়া উঠল, ও-পাশের তার থেকে ওদেরই একটা জামা ছিটকে এসে এদিকে পড়ল। সৌর দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু কুড়োবে বলে হাত বাড়াল না।

মেয়ে দ্বটি নিচু পাঁচিলের এদিকটায় ঝ্বঁকে পড়ে দেখছিল। লাঠি বাড়িয়ে তুলে নিতেও চেষ্টা করল শাড়িটাকে, পারল না। তখন বলল, 'শ্বনছেন?'

সৌর শ্বনল না।

মেয়েটি আবার বলল, আবার—সৌর তখন ম্বখ তুলল।

'তুলে দিন না!' ইশারায় একজন জামাটা দেখিয়ে দিল।

তুলে দেবে না, এমন কোন প্রতিজ্ঞা ছিল না সৌরর, তব্ব সে হাত বাড়াল না। সেই বিশ্রী ছবিটা চোখে ভাসছিল। রকে বসে বিড়ালকে আদর করছে একজন, আর একজন বিড়ি টানছে। এর মধ্যে কুৎসিত কিছ্ব নেই, তব্ব ছবিটা সৌর সহজভাবে নিতে পারছিল না। ওদের খিলখিল হাসি বাজছিল কানে।

দ্বষ্ট্ব কাকটা এদিকে এসে জামাটাকে ঠোকরাচ্ছিল, সৌর তাড়া দিতেই কাকটা উড়ল, কিন্তু জামাটাকে তুলে নিল ঠোঁটে। তুলল, কিন্তু ধরে রাখতে পারল না, জামাটা খসে পড়ল গলিতে।

মেয়ে দ্বটি তখন চেঁচিয়ে উঠল।

আর সৌর কি ভেবে, অথবা কিছ্ব না ভেবেই, নিচে ছ্বটল।

• • •

সৌর কাঁপছিল। সৌরর ম্বখে কথা ফ্বটছিল না। জামাটা ওর হাতের ম্বঠোয় দলা পাকিয়ে গিয়েছিল, জামাটায় গলির নোংরা জল লেগেছিল, সেই নোংরা লাগছিল সৌরর আঙ্বলেও, আর সে আড়ষ্ট, বিব্রত হ্বয়ে উঠছিল।

অনেক পরে সৌর বলল, 'এনেছি।'

মেয়েটি বলল, 'দিন।' হাত বাড়িয়ে দিল। তার হাত সৌরর হাতে ঠেকল। সৌর কেঁপে উঠল।

ময়লা মেয়েটি বলল, 'পাখি, ওটা ফের ধ্বয়ে আন্।'

পাখি। ফরসা মেয়েটি তবে পাখি। ময়লা মেয়েটিই তবে নয়ন। ওরই চোখ দ্বটি ঢ্বল্ব-ঢ্বল্ব কি না, দেখবে বলে সৌর নিজের চোখ তুলল। বলবার মত কথা ভেবে না পেয়ে বলল, 'যাই।'

'যাবে? এখ্বনি যাবে কী? এই ত এলে। আমাদের জন্যে কত কষ্ট করেছ, ছ্বটেছ, এখনও ঘামছ। এক গ্লাস জল খাও, একটু বস।'

সৌর লক্ষ্য করল, ওরা তাকে 'তুমি' বলছে। প্রথম আলাপেই। আলাপের শ্বর্বতেই।

মাদ্বরে বসে একটি মেয়ে বলল, 'আমার নাম নয়ন।'

অন্য মেয়েটি বলল, 'আমার নাম পাখি।'

সৌর বলল, 'জানি।'

'জান?' গালে আঙ্বল রেখে পাখি অবাক হবার ভঙ্গি করল। —'কেমন করে?'

'ডাকতে শ্বনলাম।'

বড় স্বচ্ছন্দ হবার চেষ্টা করে সৌর হাসল।

নয়ন বলল, 'এই ত ব্বলি ফ্বটেছে। আমরা কী—' শ্বধরে বলল, 'আমরা কে, তাও জান বোধ হয়?'

'তা-ও জানি।' সৌর অতঃপর যোগ করল, 'কাল টের পেয়েছি।'

নয়ন তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখছিল, বলল, 'ও, তুমিই সেই। কাল পালিয়ে গিয়েছিলে।'

'পালাইনি। আমার খারাপ লাগছিল।'

'আমরা দ্বজনে খ্ব—ব হেসেছিল্বম। পাখি বলেছিল, ঝ্বটো নয়, একদম সাচ্চা। আমি কী বলেছিল্বম জান?'

'কী?'

'সাচ্চা নয়, বাচ্চা। ভয় পেয়েছে।' নয়ন হাসতে থাকল।

'আমার খারাপ লাগছিল।' সৌর আবার বলল, 'তোমরা বেরাল নিয়ে খেলছিলে। বিড়ি টানছিলে। আর বিড়ি খেও না।'

'ও মা, বিড়ি খাব না? ও পাখি, এ বলে কী! বিড়ি খাব না, তবে কি রকে ঠান্ডায় বসে থেকে থেকে শীতে শিটিয়ে মরব?'

সৌর নির্বোধ গলায় বলল, 'রকে বসো কেন?'

'বসি কেন?' নয়ন প্রশ্নটাকে নিজেই উচ্চারণ করল, জবাবেও বলল, 'বসি।'

পাখি বলে উঠল, 'রোজ ত চিত্তবাব্ব আসে না। নিশিবাব্বও না।'

সৌর বলল, 'ও।'

'চিত্তবাবু আসেন ফী বেস্পতিবারে, শুক্কুরবারে, আর রোববার দুপুরে। নিশিবাবুর শনিবার বাঁধা, তা ছাড়া মঙ্গলবারে।'

নয়ন বলল, 'তুমি কিন্তু রোজ আসবে, এই দুপুরে।'

'কেউ কিছু বলবে না?'

'কে আবার বলবে। বললেও বয়ে গ্যাছে। তুমি ত আমার ভাইয়ের মত।'

নয়নের একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল। বলল, 'আমার ভাই নেই। একজন ছিল। মাসি তাড়িয়ে দিয়েছে।'

'তাড়াল কেন?'

'চুরি করেছিল বলে। আর ফিরে আসেনি। অথচ—অথচ গয়নাগুলো গিল্টির ছিল।'

'সোনা নয়?'

'উঁহু, পেতল, সব পেতল। তুমি জান না ভাই, আমরা পেতলের গয়না পরে থাকি?'

'তার মানে ফাঁকি?'

নয়ন বলল, 'তার মানে ফাঁকি।'

'তোমাদের ভালবাসার মত।' সৌর বলল রুদ্ধস্বরে, 'তোমরা ত টাকা নাও।'

নয়ন বলল, 'আমরা টাকা-ই নিই। দু-চারজন আহাম্মি জাল নোটও চালায়।'

'আমার টাকা নেই।' সৌর উঠে পড়ল, 'আমি আর আসব না।'

'আসবে,' নয়ন বলল জোর দিয়ে, 'রোজ আসবে। তুমি ত ভাই। তোমার সঙ্গে হল আলাদা সম্পর্ক।'

সৌর বলল, 'ও।' সৌরর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। মনে মনে বলছিল, 'জিতেছে, আমাকে নিয়ে ওরা কড়ি খেলত, আমাকে ও জিতে নিয়েছে।'

চলে আসবে বলে সৌর পা বাড়িয়েছিল, তখন গোঙানিটা ওর কানে এল।

চমকে বলে উঠল, 'ও কী!'

পাখি বলে উঠল, 'কাঁদছে। ও রোজ কাঁদে।'

'কে?'

'মালা। নতুন যে এসেছে। যাকে ধরে আনা হয়েছে।'

'ধরে এনেছে?'

পাখি ইশারায় একটা ঘর দেখিয়ে দিল। বাইরে থেকে শিকল-টানা। ভিতরে অসুখের ককানির মত একঘেয়ে কান্নার সুর।

সৌরর মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, বলল, 'জোর করে এনেছে?'

'ঠিক জোর করে নয়, নিশিবাবুর বন্ধু আছে না, ললিতবাবু? তার দেশের মেয়ে। ললিতবাবুর সঙ্গে ভালবাসাবাসি ছিল। ললিতবাবু পরে নিশিবাবুর হেফাজতে ফেলে পালিয়েছে। নিশিবাবুই ওকে এনে তুলেছে এখানে।'

'তাই কাঁদে?'

নয়ন বলল, 'তাই। এখনও পোষ মানেনি যে।'

পাখি বলল, 'মানবে, মানবে। নিশিবাবু বলেছেন, পোষ মানবে। বলেন, অনেকেই প্রথম-প্রথম ওই রকম থাকে, পরে সিধে হয়।'

'যতদিন হয় না, ততদিন কাঁদে?'

পাখি বলল, 'কাঁদে। থামেও। এই ত নয়ন, তোর ভাই যখন পালিয়ে গেল, তখন তুই ত খুব কেঁদেছিলি। পরে থেমে যাসনি, চুপ করিসনি?'

মাথা নিচু করে নয়ন বলল, 'করেছি।' সৌরর মনে হল ওর চোখ দুটি বিষণ্ণ, গলায় অনেক দিন আগে থেমে-যাওয়া কান্নার ছোঁয়া লেগেছে।

(ক্রমশ)

এই রাত

উমা দেবী

এ দৃষ্টি গিয়েছে ডুবে—নিশীথের অতল গভীরে,
—এ রাত্রি তুলনাহীন,
—এ রাত্রি তুলনাহীন—হে অতীত চেয়োনা চেয়োনা ফিরে ফিরে,
হৃদয়ের অন্তর্বাষ্পলীন।
এ রাত্রি তুলনাহীন, তুলনাবিহীন এই রাত—
নিশীথের নামাবে প্রভাত!

ছায়ায় ,রহস্যঘেরা আকাশের আঁধার চত্বরে
প্রহরে প্রহরে
জ্যোতির কণিকাগুলি জেগে উঠে ঘুমায় আবার—
ওরা কি সৃষ্টির দেখে স্বপন আবার?
আবার কি হৃদয়ের রঙিন্ ছায়ায়
বাসনার ফুলগুলি ছড়াবে অলস বেদনায়—
আবার কি হবে শেষে সব কিছু হৃদয়ের অন্তর্বাষ্পলীন—
তবু—তবু—এই রাত্রি তুলনাবিহীন!
এ রাত্রি নীরব এত! মাঝে মাঝে উড়ে আসা উদ্দাম বায়ুর
পাখার ঝাপট লেগে মুহূর্তে চঞ্চল হয়ে
আবার স্তিমিত হয় স্পন্দন স্নায়ুর।
যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণা
রেখেছে আড়ষ্ট ক'রে ভুবনের গোপন মন্ত্রণা।
রাত্রি দিন—মূক কণ্ঠ কাঁদে ভাষাহীন—
তবু—তবু—এই রাত্রি তুলনাবিহীন—আহা তুলনাবিহীন!

আমাকে ডুবিয়ে দাও আঁধারের নিশীথ-প্রচ্ছায়,
আমাকে ডুবিয়ে দাও—এ নিশীথ-সুষমার সুধার ধারায়—
আমাকে চপল করো, আমাকে উদ্দাম করো
সমস্ত ভাসিয়ে-নেওয়া উড়িয়ে-নেওয়ার এই উদ্দাম হাওয়ায়
আমাকে স্তিমিত করো নক্ষত্রের জ্যোতির মতন—নিথর নিলীন—
তুলনাবিহীন এই রাত—এই রাত তুলনাবিহীন!

রিক্‌শাওয়ালা

অরুণ মিত্র

রিক্‌শার চাকা দুটো ঘুরতে ঘুরতে এইখানটায় এসে দাঁড়ায়। আমার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করে। যে লোকটা চালায় একদিনও তার কামাই নেই, এই বিষম ঠাণ্ডাতেও না। এমনিতে তাকে দেখে আমার চেনবার কথা নয়, কারণ তার মুখটা রোজই বদলায়। চাকা দুটোর ঘোরা থেকে চিনি।

সন্ধ্যের পর ছেলেবউকে অন্ধকারের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়ে। কোন্ মহল্লা থেকে তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়। শুধু এইটুকু বুঝতে পারি, ভুতুড়ে আলোগুলো পার হয়ে গেলে একটা যে প্রকাণ্ড শীতের রাত পড়ে তার ওপারে সে থাকে। যেখানেই থাকুক কিছু আসে যায় না। আমার বাড়িটা যে তার চেনা, আমাদের দুজনের পক্ষে এটাই বড় কথা।

শীতের ঢেউ যে সব রাস্তায় আছড়ে পড়ে সেই সব রাস্তা দিয়ে রিক্‌শা চ'ড়ে আমি অনেকবার গিয়েছি। তখন মানুষটার মধ্যে আগুন গনগন করতে দেখেছি, যেন তার অস্থিমজ্জা জ্বলছে। আমার গায়ে সেই আঁচ এসে লেগেছে। তার সুতীর ফতুয়াটা তখন তীব্রভাবে উড়তে থাকে এবং আমার ভয় হয় আমার গরম জামাকাপড় বুঝি দাউদাউ ক'রে জ্বলে উঠবে। কিন্তু না, প্রত্যেকবারই সে ভুতুড়ে আলোগুলোর ভেতর দিয়ে আমাকে আবার এখানে ঠিকমতো পৌঁছে দিয়েছে। এমন কি, তার বাড়িটা যে একসময় খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছিল, এ অনুভূতিটাও আর লেশমাত্র থাকেনি। আজও সে আমাকে নিয়ে শীতের রাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং নিরাপদে আবার ফিরিয়ে আনবে।

খুব সম্ভব কোনো একদিন সে আর আসতে পারবে না। ভেতরের আগুনটা নিবে গিয়ে সে ঠাণ্ডায় জ'মে পাথর হ'য়ে কোথাও প'ড়ে থাকবে। কিন্তু তা ব'লে রিক্‌শার চাকা দুটো তো মাটিতে গেড়ে যাবে না। তারা আবার ঘুরবে এবং তাই থেকে আমি বুঝব সেই রিক্‌শাওয়ালা [illegible] হয়েছে, এখন যেমন বুঝি। এটাই আমার কাছে এক স্বস্তি।

অন্যমনে

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

যে-ফুলগুলি অন্যমনে ভাসিয়ে দিলে গভীর সুখে
বিকেলবেলার শান্ত নীল জলে
অথচ তার পাপড়িগুলি, জান না, কার গোপন বুকে
তীব্র কোন্ ইচ্ছা হয়ে জ্বলে।

যে-গানগুলি অন্যমনে হাওয়ার স্রোতে ভাসিয়ে দিলে
গাঢ় গভীর সুখে,
জানলে না সেই সুরে যে কোন্ যন্ত্রণাকে রাঙিয়েছিলে
কার গোপন বুকে।

বিকেলবেলার শান্ত স্রোতে ভাসিয়ে দিলে ভালবাসা
মুগ্ধতাকে সহজ গাঢ় সুখে——
জানবে না তার আলতো ছোঁয়ায় তৃপ্তিবিহীন কোন্ পিপাসা
জেগে উঠল গোপনে কার বুকে।

বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতি

মন্মথভট্ট

স্রষ্টা বনাম সৃষ্টি : বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্‌-এর একটি নাটক

সাহিত্য যদি হয় ভাষার মাধ্যমে সৃষ্টিশীল প্রতিভার সার্থক স্ফুরণ, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা চলে সাহিত্যের সবচাইতে বড় শত্রু হল মতবাদ বা ইডিওলজী। কারণ মতবাদ মাত্রই গুটি-কয়েক স্থির সিদ্ধান্তের মধ্যে এই বিচিত্র, পরিবর্তনশীল এবং বহুবেধ অস্তিত্বকে ছকে ফেলতে উদ্যোগী। মতবাদের কাছে প্রথম বলি জিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় বলি কল্পনা, তৃতীয় বলি অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান আহরণের সামর্থ্য। মতবাদগ্রস্ত মন সংসারে যা-কিছু অপ্রত্যাশিত, অভিনব, এবং সে-কারণে বিস্ময়কর, তাকেই অবান্তর, নিরর্থ অথবা মতিভ্রমজাত মায়া বলে উড়িয়ে দেয়। অথচ সামান্যের মধ্যে অনন্যের আবিষ্কার, অথবা অভ্যাস থেকে উদ্ভাবনায় উত্তরণ ছাড়া সাহিত্য অকল্পনীয়। ফলত সাহিত্যিকের পক্ষে মতবাদে আশ্রয় নেওয়া আর বাঘের পক্ষে বোষ্টম বনা, প্রায় একই ব্যাপার। ওটা হয় স্রেফ ভান, আর না হলে আত্মহত্যা।

এক সময় পৃথিবীর বেশিরভাগ সভ্য দেশে মতবাদের প্রধান রূপ ছিল ধর্মশাস্ত্র। বলা বাহুল্য, ধর্মবোধ এবং ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। ধর্মের প্রধান উৎস অপরোক্ষানুভূতি: এবং যতক্ষণ এ উৎস না শুকিয়ে যায়, ততক্ষণ ধর্মবোধ এবং সৃষ্টিশীলতার মধ্যে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী নয়। কবীর, চণ্ডীদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর বিস্তর উদাহরণ বর্তমান। এঁরা ধার্মিক হয়েও কোনো নির্দিষ্ট ধর্মশাস্ত্রে আস্থাশীল ছিলেন না। অপরপক্ষে ধর্মশাস্ত্রের প্রধান লক্ষণ হল গুটিকয়েক প্রশ্নোর্ধ্ব প্রত্যয়ের দ্বারা অস্তিত্বের সর্বাত্মক ব্যাখ্যার অপচেষ্টা। ফলে যখনি কোনো সভ্যতায় ধর্মশাস্ত্রের প্রতাপ অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে, তখনি সেখানে মানুষের সৃজনশক্তি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে এসেছে। এ প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় ইওরোপের কথা সহজেই স্মরণে আসে।

ধর্মবোধ এবং ধর্মশাস্ত্রের প্রভাব আজো পৃথিবীব্যাপী। কিন্তু এযুগে মতবাদের অন্য আরো রূপও দেখা যাচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপে যে-দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী মতবাদ অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে, তাদের মধ্যে একটি হল ফাসিজম্‌, অন্যটি কম্যুনিজম্‌। এদের মধ্যে প্রথমটি সাহিত্যের কা সর্বনাশ ঘটিয়েছিল, মুসোলিনীর আমলে ইতালি এবং হিটলারের আমলে জার্মানির বিবরণ পড়লেই তা জানা যায়। মৌনব্রত, কারাবাস, মৃত্যু অথবা নির্বাসন—এই ছিল বিবেকবান সাহিত্যিকদের সামনে বাছাই করার বিকল্পগ্রাম। অপর পক্ষে ইয়োরোপে একদা যে-সব সাহিত্যিক কম্যুনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, আজ তাঁদের প্রায় সকলেই উক্ত মতবাদের বিরূপ সমালোচক। এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে উক্ত মতবাদের প্রচণ্ড প্রভাবের ফলে রুশ ভাষায় সৃষ্টিশীল রচনা এখন প্রায় অতীত-স্মৃতিতে পর্যবসিত। এ অভিযোগ আমার পূর্বসংস্কার-প্রসূত নয়। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মস্কোতে সোভিয়েট সাহিত্যিকদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে শোলোকভ, কাভেরিন, বারগোলংজ্‌, আলিগার, ওভেচ্‌কিন প্রমুখ অনেক লেখকই সাম্প্রতিক রুশ-সাহিত্যের মুমূর্ষু দশার উল্লেখ করে আত্মবিলাপ করেছিলেন।

সুতরাং মতবাদের খপ্পর থেকে না-বেরোতে পারা পর্যন্ত সাহিত্য-প্রতিভার বিকাশ প্রায় অসম্ভব। কিন্তু নিয়মকে প্রমাণ করার জন্যেই বোধহয় মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম দেখা দেয়। দান্তের কল্পনার ওপরে টমাস আকুইনাসের ধর্মশাস্ত্রের গভীর প্রভাব ভুবনবিদিত; কম্যুনিস্ট মতবাদ ম্যাক্সিম গোর্কির জীবনবোধের ওপরে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। অথচ যে-সব পাঠক ক্রিশ্চান-ও নন, কম্যুনিস্টও নন, তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, দান্তে এবং গোর্কি উভয়েই মহৎ লেখক। ব্যাপারটার নানাভাবে ব্যাখ্যা সম্ভব। আমার কাছে যে-তিনটি কারণ প্রধান মনে হয়, তাদেরই উল্লেখ করি। প্রথমত, বিশেষ মতবাদে আস্থাশীল হয়েও উক্ত লেখকেরা আপন আপন কল্পনার স্বাধীনতাকে খর্ব করেননি। ব্রুনো নার্দি বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, দান্তের চিন্তা টমিসম্‌-এর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; এবং গোর্কির "ক্লিম সাম্‌গিন" উপন্যাস গোঁড়া কম্যুনিস্ট মতবাদের নির্দেশকে অনেক ক্ষেত্রেই লঙ্ঘন করেছে। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যসৃষ্টি ব্যাপারটা পুরোপুরি সজ্ঞান মনের ক্রিয়া নয়। সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে সাহিত্যিকের সচেতন উদ্দেশ্য অবচেতন নানা বৃত্তি, আবেগ এবং অনুভূতির রসায়নে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যাঁর সাহিত্যপ্রেরণা দুর্বল তিনি হয়ত উদ্দেশ্যকে আগাগোড়া আঁকড়ে ধরে থাকতে পারেন; কিন্তু তার ফলে তাঁর রচনায় দার্শনিকতা কিংবা সাংবাদিকতার লক্ষণ ক্রমেই প্রকট হয়ে ওঠে। স্রষ্টার অবচেতন থেকে সম্ভোক্তার অবচেতনে অনুরণন ওঠার ওপরে সাহিত্যের রস এবং ব্যঞ্জনা অনেকটা নির্ভর করে। প্রেরণার অবচেতন দিকটি লক্ষ্য করে গ্রীক কবি পিণ্ডার লিখেছিলেন, কাব্যসৃষ্টির আগে কবি স্বয়ং জানেন না সৃষ্টির শেষে তিনি কোথায় গিয়ে পৌঁছবেন। ফলে একজন সাহিত্যিক কোনো নির্দিষ্ট মতবাদে আশ্রয় নিলেও তাঁর মধ্যে যদি প্রেরণার শক্তি প্রবল হয়, তাহলে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে মতবাদের প্রভাব তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারে গৌণ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তৃতীয়ত, সাহিত্য ব্যাপারটা শুধু সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ নয়; তার একটা সম্ভোগের দিক আছে। স্রষ্টার কল্পনার সঙ্গে সহৃদয় পাঠকের অনুভূতির যোগসাধন ঘটলে তবেই রসের উদ্ভব হয়। কিন্তু সহৃদয় পাঠক নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা নন; আস্বাদনের কালে পাঠকের কল্পনাও বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। সার্থক সাহিত্যকর্মের মধ্যে রসিক পাঠক এমন অনেক সম্পদ আবিষ্কার করে উৎফুল্ল হন, যে-বিষয়ে স্বয়ং লেখকও সচেতন নন। তারই ফলে স্থান-কাল-পাত্রের পরিবর্তনে একই লেখার বিভিন্ন রকমের ব্যাখ্যা সম্ভবপর হয়। রসিক পাঠকের পক্ষে যে-কারণে কোনো লেখকের মতবাদকে সরাসরি বর্জন করেও ঐ লেখকের রচনার অন্য গূঢ় সম্পদ আবিষ্কার এবং উপভোগ করা অকল্পনীয় নয়। অবশ্য যদি সে রচনায় সত্যিই কোনো সম্পদ নিহিত থাকে।

আমার বক্তব্যের সমর্থনে পশ্চিমী সাহিত্য থেকে নানাবিধ উদাহরণ দেওয়া চলত, কিন্তু আপাতত এ প্রসঙ্গে শুধু একজন বিখ্যাত আধুনিক সাহিত্যিকের একটি স্বল্পখ্যাত রচনার উল্লেখ করব। যদিচ বার্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্‌-এর কোনো বই বাংলায় অনূদিত হয়েছে বলে শুনিনি, তবু আমার ধারণা ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাম শিক্ষিত বাঙালী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। বাংলা দেশের বেশিরভাগ শৌখিন নাট্য-সম্প্রদায়ের ওপরে এক সময়ে কম্যুনিস্ট মতবাদের খুব প্রভাব পড়েছিল; এবং তাদেরই মুখে মুখে এদেশে ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাম কিছুটা প্রচার লাভ করেছে। আর্নস্ট টোলারকে বাদ দিলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে এতাবৎকালের মধ্যে জার্মান ভাষায় ব্রেখ্‌ট্‌-এর সঙ্গে তুলনীয় আর একজনও নাট্যকার চোখে পড়ে না। ব্রেখ্‌ট্‌-এর জীবনদর্শনের যাঁরা কড়া সমালোচক তাঁরাও নাট্যকার হিসেবে তাঁর

অসামান্য প্রতিভার কদর করে থাকেন। নাটক রচনা এবং প্রযোজনা ব্যাপারে তাঁর বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশে কমবেশী প্রভাব ফেলেছে। তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে পারী শহরে ১৯৫৫ সালে আন্তর্জাতিক থিয়েটার উৎসবে "ককেশিয় খড়ির গণ্ডী" নামে তাঁর নাটকটির অভিনয় হওয়ার পর সমস্ত সমালোচক তাঁকে একবাক্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের একজন বলে ঘোষণা করেন।

প্রথম যৌবনে ব্রেখ্‌ট্‌-এর কোনো মতবাদের বালাই ছিল না। ভাইমার রিপাবলিকের আমলে লেখা তাঁর সমস্ত রচনার মধ্যে শূন্যতাবোধের যন্ত্রণা অত্যন্ত প্রবল। জার্মানীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় সমকালীন অন্য লেখকদের মত তাঁর মনেও গভীর আলোড়ন তুলেছিল। তাঁর প্রথম নাটক "রাতের দামামা" ভাইমারী মেকী উদারতন্ত্র নিয়ে একটা নিষ্ঠুর প্রহসন। তাঁর এই যুগের সমস্ত রচনার মূল কথা হল, পৃথিবীতে আজ আর এমন কোন কিছুই টিঁকে নেই, যা আঁকড়ে মানুষ সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই শূন্যনাস্তিক মনোভাব নিয়ে লেখা তাঁর সবচাইতে শক্তিমান রচনা "তিন পয়সার অপেরা" (Die DREIGROSCHENOPER) ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়ে তাঁকে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা দান করে। গোর্কির "না দুনিয়ে" বা "নীচের তলা" নাটকের মত এটিরও কুশীলব হল চোর, বেশ্যা, ঠগ ইত্যাদি। ব্রেখ্‌ট্‌-এর এই নাটকটির একটি চরণ তখনকার দিনের জার্মানদের মুখেমুখে ঘুরত : ERST KOMMT DAS FRESSEN UND DANN DIE MORAL (আগে চাই পেটঠাসা, তার পরে ত নীতিচিন্তা)।

পোড়ো জমিতে ফসল ফলানোর আশায় এলিয়ট ধর্মে আশ্রয় নিয়েছিলেন; শূন্যতার দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষায় ব্রেখ্‌ট্‌ অবশেষে মার্ক্সবাদ অবলম্বন করলেন। ১৯৩০ সালে তিনি কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। ফলে তাঁর নাটকগুলিও ক্রমে প্রচারধর্মী হয়ে ওঠে। কিন্তু মতবাদের বিষ তাঁর লিরিক প্রেরণা এবং শিল্পবোধকে কোনো সময়েই সম্পূর্ণ জীর্ণ করতে পারেনি। তবে মতবাদে আশ্রয় নেওয়ার ফলে তাঁর নাটকে চরিত্র সৃষ্টি অনেকটা ব্যাহত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ নাটক প্রতীকধর্মী এবং তত্ত্বপ্রধান। তাদের মূল বক্তব্য হল, ব্যষ্টির চাইতে সমষ্টি বড়, বিবেকের চাইতে ইতিহাসের নির্দেশ অনেক বেশী ক্ষমতাশীল। নাটকের মধ্যে নাটক, ঘটনার পাশাপাশি সেই ঘটনার বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন, প্রাচীন নাট্যরীতি অনুসরণে স্বগতোক্তি এবং কোরাসের সংগীতব্যঞ্জিত ভাষ্য ইত্যাদি বিবিধ রীতিপ্রকরণের সাহায্যে তিনি তাঁর পাঠক এবং দর্শক সম্প্রদায়কে উক্ত মতবাদে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেছেন। "মানুষ মানুষই" নামে নাটকটির একটি আশ্চর্য উক্তির মধ্যে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে : ES IST GANZ EGAL AUF WEN DIE SONNE SCHIEN (সূর্য কার ওপরে আলো ছড়াল, তাতে কিছুই আসে যায় না)। অর্থাৎ ব্যক্তি অবান্তর, সমষ্টির তৃপ্তিই আসল কথা।

কিন্তু আগেই বলেছি লেখকের উদ্দেশ্য এবং তাঁর লেখার বক্তব্যের মধ্যে সব সময়ে মিল নাও থাকতে পারে। ব্রেখ্‌ট্‌-এরই একটি নাটকের কথা ধরা যাক। কাজ-চলা বাংলা তর্জমায় এটির নামকরণ করা যেতে পারে "ব্যবস্থা" অথবা "বিধান"।* ১৯২৭-২৯ সালে চীনে কম্যুনিস্ট পার্টির বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতা এই নাটকটির আখ্যানবস্তু। এই ব্যর্থতার জন্যে রুশ কম্যুনিস্ট পার্টির পরস্পরবিরোধী নির্দেশ মুখ্যত দায়ী। এই ব্যর্থতার ফলে অনেক কম্যুনিস্ট রুশ-নেতৃত্বের বিরোধী হয়ে ওঠে। তৎকালীন ইতিহাসের সংগে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে, রুশ-নেতৃত্বের দোষ ঢাকতে অনিচ্ছুক হওয়ার জন্যে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক চেন-তু-হ্সিউ-কে পদচ্যুত করা হয়। এই বিরোধীদের দমন করার জন্যে রুশ নেতারা নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাটকটি এই শাস্তিবিধানের সমর্থনে রচিত।

যবনিকা উঠলে আমরা দেখি, মঞ্চের পশ্চাৎ অংশে অবস্থিত কোরাসের সামনে চারজন কম্যুনিস্ট কর্মী তাদের কাজের হিসেব-নিকেশ পেশ করছে। এই হিসেব নিকেশের সূত্রে ইতিপূর্বে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলি দেখানো হয়। কর্মীরা কোরাসকে জানায়, কাজের প্রয়োজনে তারা নিজেদের মধ্যে একজনকে খুন করতে বাধ্য হয়েছে। কাজটা ঠিক হয়েছে কি না, সে বিষয়ে তারা কোরাসের কাছে বিচারপ্রার্থী। তখন ঘটনাটা কিভাবে এবং কেন ঘটেছিল, কোরাস তা জানতে চায়। একটির পর একটি ফ্ল্যাশব্যাকের মধ্যে দিয়ে আমরা ঘটনা-প্রবাহের সংগে পরিচিত হই।

প্রথম দৃশ্যে দেখি চীনের সীমান্তে পার্টির শিক্ষাশিবিরে রুশ থেকে পাঠানো তিনজন কর্মীর সংগে একজন তরুণ কমরেড আলোচনা করছে। কর্মীরা তাকে জানায় যে, চীনের মজুরদের বিপ্লবী আদর্শে এবং কর্মপন্থায় শিক্ষিত করে তোলার জন্যে তাদের পাঠানো হয়েছে। তাদের হাতে একমাত্র অস্ত্র "কম্যুনিজম-এর ক খ গ"। দ্বিতীয় দৃশ্যে পার্টি শিক্ষা শিবিরের পরিচালক ঐ তিনজন কর্মী এবং তরুণ কমরেডটিকে বিপ্লবী মতবাদের মূল সূত্রটি ভাল করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। "এখন থেকে তোমাদের আর কোনো ব্যক্তিসত্তা রইল না। তুমি এখন থেকে আর বার্লিনের কার্লশ্মিট নও, কাজানের আনা কিএরস্ক্ নও, মস্কোর পিটার সাভিচ নও। তোমাদের নাম নেই, পিতৃ পরিচয় নেই। তোমরা এখন থেকে শুধু এক এক টুকরো শাদা কাগজ যার ওপরে বিপ্লব তার হুকুমনামা লিখে দেয়।" পরিচালক তখন প্রত্যেক কর্মীর মুখে একটি করে মুখোস এঁটে দেয়। কোরাস সম্মতি জানিয়ে প্রতিধ্বনি তোলে: "কম্যুনিজম-এর যারা সৈনিক দরকারমত তারা সত্য বলতে পারে, সত্য না বলতে পারে, প্রতিশ্রুতি রাখতে পারে, প্রতিশ্রুতি ভাঙতে পারে।"

চারজন কর্মী এবার চীনে প্রবেশ করে। তাদের প্রথম কাজ হল একটা শহরতলীতে শ্রমিকদের শ্রেণীসচেতন করে তোলা। অভিজ্ঞ কর্মী তিনজন তরুণ কমরেডকে সাবধান করে দেয়, এপথে মায়া-মমতার কোনো স্থান নেই। স্থানীয় কুলিরা নদী থেকে একটা ভারী নৌকো ডাঙায় তোলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু তারা বারবার পা পিছলে কাদায় পড়ে যাচ্ছিল। তরুণ কমরেড প্রথমে কাদার মধ্যে একটা বড় পাথর রেখে তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করে। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে না হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে সে বিক্ষোভ সৃষ্টি করতে চায়। ফলে মালিকরা তাদের বিপ্লববাদী বলে চিনে ফেলে এবং তখন পুলিসের হাত এড়াবার জন্যে তাদের সেখান থেকে পালাতে হয়। তারপর তারা এক কারখানায় খণ্ডভাবে প্রচারের কাজ শুরু করে। কিন্তু এখানেও একদিন একজন মজুরকে এক পাহারাওয়ালা অকারণে নির্দয়ভাবে পিটছে দেখে তরুণ কমরেড আত্মবিকৃত হয়ে তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সুতরাং সেখান থেকেও তাদের কেটে পড়া ছাড়া উপায় থাকে না।

* Bertolt Brecht, Gesammelte Werke, II. "Die Massnahme," Malik-Verlag.

হিটলার ক্ষমতায় আসার পর ব্রেখট ১৯৩৩ সালে জার্মানী থেকে পালিয়ে যান। ১৯৪০ পর্যন্ত ডেনমার্ক-এ তাঁর ডেরা ছিল। হিটলার ডেনমার্ক আক্রমণ করার পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেন। ফলে তাঁর অধিকাংশ রচনা জার্মানীর বাইরে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ইতিমধ্যে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে স্থানীয় বিদেশী শাসকশক্তির পদে পদে সঙ্ঘর্ষ ঘটছিল। কম্যুনিস্টরা ঠিক করে এই সঙ্ঘর্ষের সুযোগে ব্যবসায়ীদের সাহায্য নিয়ে শ্রমিকদের জন্যে তারা অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করবে। এই উদ্দেশ্যে আলোচনা করার জন্যে সেখানকার সবচাইতে বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ীর কাছে তরুণ কমরেডকে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান হয়। আলাপসূত্রে ব্যবসায়ী তাকে বলে, মানুষের আবার কী দাম, আসল দাম টাকার। আর মানুষকে শোষণ না করতে পারলে টাকা আসবে কোথা থেকে? একথা শুনে তরুণ কমরেড উত্তেজিত হয়ে খাওয়া ফেলে টেবিল থেকে উঠে পড়ে। এতবড় নির্লজ্জ শ্রেণীশত্রুর সংগে কোনো কারণেই সহযোগিতা করতে সে প্রস্তুত নয়। তার এই কাণ্ডজ্ঞানহীন বিবেকবুদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীর সংগে না হল রফা, না পেল মজুররা অস্ত্রশস্ত্র। এপর্যন্ত শুনে কোরাস গান ধরেঃ "অন্যায়ের উচ্ছেদ করার জন্যে এমন কোন্ অন্যায় আছে, যা আমরা না করতে পারি?... পাঁকের মধে ডুবে যাও, কসাইকেও বুকে টেনে নাও, কেননা দুনিয়াটাকে বদলাতে হবে, ইতিহাসের তাই নির্দেশ।"

যাই হোক, কম্যুনিস্টরা প্রস্তুত হবার আগেই দুর্ভিক্ষ এবং অত্যাচারের চাপে শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে প্রজা-বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। তরুণ কমরেড চায় এই বিদ্রোহে সাধারণ মানুষদের সংগে যোগ দিতে; কিন্তু পার্টির নির্দেশ এল, এখনো অবস্থা ঠিকমত তৈরী হয়নি, সুতরাং অপেক্ষা করতে হবে। অভিজ্ঞ কর্মী তিনজন তরুণ কমরেডকে আদেশ দেয়, বিদ্রোহীদের সে-যেয়ে বোঝাক এখন বিদ্রোহ করা মূঢ়তা। কমরেড তাতে আপত্তি তোলায় তারা বোঝাল ব্যক্তির বিবেকের চাইতে পার্টির নির্দেশ অনেক বড়। কেননা 'প্রত্যেক মানুষের মোটে এক জোড়া চোখ, আর পার্টি হল সহস্রাক্ষ। ব্যক্তি দেখতে পায় একটা শহর। পার্টির নজরের মধ্যে আছে সাত সাতটা দেশ। ব্যক্তির মোটে একটা জীবন, এবং তার মৃত্যু সুনিশ্চিত। পার্টির অসংখ্য জীবন এবং তার মৃত্যু নেই।' সুতরাং ব্যক্তির বিচারের কোন মূল্য নেই, কিন্তু পার্টি অভ্রান্ত।

তরুণ কমরেডের বিবেক এই সম্মিলিত মন্ত্রপাঠেও শান্ত হল না। সে "কম্যুনিজমের ক খ গ" ছিঁড়ে ফেলে চেঁচিয়ে উঠল, পার্টির হুকুমের চাইতে মানবতার দাবী অনেক বড়। এই বলে সে তার মুখোষ ছুঁড়ে ফেলে দিল।

কোরাসের প্রশ্নঃ তখন তোমরা কি করলে?

তিন কর্মীঃ গোধূলির আলোয় আমরা তার আনবৃত মুখ দেখতে পেলাম। নিষ্পাপ, নিরাবরণ, মানবীয় সেই মুখ। আমরা তাকে প্রচণ্ড আঘাত করে রাস্তায় ফেলে দিলাম। তারপর তার অচেতন দেহ কুড়িয়ে নিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে এলাম।

শেষ দৃশ্যের নাম 'বিধান'। কর্মিরা কোরাসকে বলল, তারপর আমরা সিদ্ধান্ত করলাম তাকে একেবারে নিঃশেষে মুছে ফেলতে হবে। সুতরাং তখন তাকে গুলী করে মেরে ফেলা হল। আর তার দেহটাকে আমরা একটা চুনের গাদার মধ্যে লুকিয়ে ফেললাম যাতে সেদেহ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে চুনের মধ্যে মিলিয়ে যেতে পারে। ...আমরা জানতাম হত্যা অন্যায়, কিন্তু আমরা তার চাইতেও ভালভাবে জানতাম যে, পৃথিবীকে বদলাবার প্রয়োজনে এ হত্যা না-করা আরো বড় অন্যায়। সেই প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এই শাস্তিবিধান ন্যায়সংগত।

কিন্তু তরুণ কমরেড কি সেকথা বুঝতে পেরেছিল? কর্মিরা কোরাসকে জানান, হ্যাঁ, মৃত্যুর আগে নিজের ভুল সে বুঝতে পেরে-ছিল। মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে সে স্বীকার করেছিল, সে ভ্রান্ত। পার্টির বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে সে নিজের মৃত্যুকে স্বাগত করেছিল।

অতঃপর কোরাসের স্বস্তিবাচন। এবং তারপর যবনিকা।

নাটকটি যে অত্যন্ত সুপরিকল্পিত ওপরের নিতান্ত অপটু সংক্ষিপ্তসার থেকে পাঠকরা আশা করি তা অনুমান করতে পারবেন। শুধু বিষয়বস্তুর গুরুত্বে নয়, ঘটনা সংস্থানের নৈপুণ্যে, কোরাসের গম্ভীর সংগীত এবং প্রধান চরিত্রটির আবেগক্ষিপ্র কথোপকথনে আমাদের মন গভীরভাবে বিচলিত না-হয়ে পারে না। কিন্তু ব্রেখ্‌ট যে উদ্দেশ্যে নাটকটি লিখে-ছিলেন, তা এখানে কতখানি সার্থক হয়েছে? ব্রেখ্‌ট কম্যুনিস্ট মতাবলম্বী একথা যদি আমাদের না জানা থাকত, তাহলে কি আমাদের মনে হত না যে, এই নাটকটির ভেতর দিয়ে তিনি কম্যুনিস্ট মতবাদের বীভৎস আত্মঘাতী রূপটিকে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছেন? এবং তাঁর উদ্দেশ্য জানার পরও এ নাটকটি পড়ে আমরা কি কম্যু-নিজম-এর ট্র্যাজেডি সম্বন্ধেই সচেতন হয়ে উঠি না? কোয়েসলার তাঁর "ডার্কনেস অ্যাট নুন" উপন্যাসে অথবা সার্ত্র্ তাঁর "লে সেঁ সাল" নাটকে কম্যুনিজম-এর ব্যর্থতা সম্বন্ধে কি এই একই কথা বলেননি? আমার ত "বিধান" নাকটটি পড়তে পড়তে বারবার রবীন্দ্রনাথের "চার অধ্যায়"-এর কথা স্মরণে এসেছে। অথচ ব্রেখ্‌ট কোনোদিনই কোয়েসলার কিম্বা সার্ত্রের মত কম্যুনিজম-এর বিরূপ সমালোচনা করেননি। অর্থাৎ সৃষ্টি এখানে স্রষ্টার নির্দেশ অগ্রাহ্য করে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অর্জন করেছে। এবং রসিক পাঠকের কাছে স্রষ্টার চাইতে সৃষ্টি অনেক বেশী মূল্যবান॥

ট্রামে-বাসে

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কমলা' বক্তৃতামালার বক্তারূপে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাঃ নীলরতন ধর খাদ্য সমস্যা ও উহার সমাধান সম্পর্কে বক্তৃতা কালে সুষম খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন। বিশুখুড়ো সংক্ষেপে মন্তব্য করিলেন—"মনে না করে উপায় নেই—মোটে মা রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা!"

* * *

ন্যাটো বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধিকল্পে পশ্চিম জার্মানীতে "রেডস্টোন ব্যালিস্টিক" ক্ষেপণাস্ত্র সমাবেশের ব্যবস্থা হইতেছে। শ্যামলাল বলিল—"রেডস্টোন ব্যালিস্টিক

জিনিসটা বোধ হয় থান ইট। আর তাই যদি হয় তাহলে যুদ্ধও হবে আবার প্রতিরক্ষা খাতে খরচও পড়বে নামমাত্র। তবে অস্ত্রটি ভারতের সৌজন্যে প্রাপ্ত এই রকম একটা স্বীকৃতি থাকলে আমরা খুশী হ'তে পারতাম।"

* * *

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এক ভোজ-সভায় বক্তৃতা দানকালে বলিয়াছেন—রাশিয়া যুদ্ধ চাহিলে পাইবে।—"স্বীকার

করতেই হবে দানে তাঁরা একবারে কল্পতরু! তবে দক্ষিণা না দিলে দান অসম্পূর্ণ থাকে সে কথাটা যেন দাতারা মনে রাখেন"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

রাশিয়া হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, শান্তি চুক্তি সম্পাদনে পশ্চিম জার্মানীতে দখলকার শাসনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা "শীতল" যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার সূচনা মাত্র।—"কিন্তু এটা "গরম" যুদ্ধের ভূমিকা নয় তো"—প্রশ্ন করেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

ক্যান্টারবেরির আর্চ বিশপ ভারতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করিয়াছেন—যুদ্ধ ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। শ্যামলাল বলিল—"তা জানি, যুগে যুগে অনেক যুদ্ধ ক'রে বেচারা ঈশ্বর নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, সুতরাং তাঁর অনভিপ্রায়টা বুঝি। কিন্তু যে-যুদ্ধে হচ্ছে-হবো হচ্ছে সেটা যে একমাত্র মানুষেরই অভিপ্রেত কিনা সেই হচ্ছে মুশকিল"!

* * *

আরব্য উপসাগরের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচলে বাধা দেওয়া সম্পর্কে ইস্রায়েল সংযুক্ত আরবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। বিশুখুড়ো দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ছোটবেলার ছড়া আবৃত্তি করিলেন, "ছাগল ছানা লাফিয়ে চলে, জাহাজ ভাসে সাগর জলে"!!

* * *

সম্প্রতি এক সংবাদে শুনিলাম—আলিপুর চিড়িয়াখানায় একটি গীর বনের সিংহী চারিটি শাবক প্রসব করিয়াছে।—"পরিবার পরিকল্পনার কথাটা নিশ্চয়ই সিংহ দম্পতীকে শোনানো হয়নি"—বলে শ্যামলাল।

* * *

বিগত এক হাজার বছরের মধ্যে সভ্য মানুষ নাকি কোন সত্যিকারের নূতন বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করিতে পারে নাই, কথাটা শুনিলাম একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধের মারফতে।—"শুধু পারেনি তা নয়, পুরনো কোন কোন বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে সভ্য মানুষের লোভ যেন আরো উৎকট হয়ে পড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নাম করা যায়—ঢাক। অবশ্য ঢাকের নাম তাঁরা পাল্টেছেন। এটা এখন স্ব-ঢাক নামেই চালু হয়েছে"—বলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় সরকার ও বিরোধী দলের সদস্যরা এক জোটে "অবোলা" প্রাণীদের সংরক্ষণের জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। আমাদের শ্যামলাল বুঝাইয়া বলিল—"প্রকাশ থাকে যে, 'অবোলা' কিন্তু স্বামী জাতীয় প্রাণী নয়"!!

* * *

আসাম বিধান সভায় জনৈক সদস্য নাকি কল্কি অবতারের একটি ফটোগ্রাফ সবাইকে দেখাইয়াছেন।—"যাঁরা দেখেছেন তাঁরা ঠিক্ দেখেছেন তো, ওটা ঠিক্ কল্কে নয়তো, হয়ত ধূমকেতুমিব-র ধূমের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

"**ক**মলাকান্ত" বলিতেছেন— সারগর্ভ উপন্যাসও পড়া চলবে না, আবার জ'লো উপন্যাস পড়াও চলবে না। বাকী থাকলো উপনিষদ, টাইম টেবল, পার্লা-

মেন্টের ব্লু বুক। বিশুখুড়ো বসিলেন—"কমলাকান্ত ভায়া হয়ত জানেন না। বাকী আরো অনেক থাকে। এই যেমন ধরুন, "ফণী-তরো" বুক্। এই বুক্ কা'কে বলে তা যেন ভায়া যে-কোন বুকিকে জিজ্ঞেস করেন"!!

আলোচনা

পেশাদার শিশুনাট্য সংস্থা

সবিনয় নিবেদন,

গত সপ্তাহের দেশ পত্রিকায় রঙ্গজগতের পাতায় শিশু নাটক সম্বন্ধে মন্তব্য পড়লাম। ইতিপূর্বে অন্যান্য পত্রিকায় বিশ্বরূপায় স্থায়ীভাবে শিশুনাট্য সমিতি স্থাপনের ঘোষণা দেখেছি। প্রতি রবিবার ও ছুটির দিনে বেলা ১২॥টায় বিশ্বরূপাতে শিশু নাটিকা চলেছে এবং তাঁরা নাকি ক্ষুদে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের পারিশ্রমিকও দিচ্ছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা যুগান্তকারী বলে প্রচারিত হয়েছে এবং আশ্চর্য এর ফলাফল না ভেবেই আমরাও বাহবা দিয়ে যাচ্ছি।

কয়েক বছর আগে ইংলণ্ডের প্রথিতযশা অভিনেত্রী ডেম সিবিল থর্নডাইক ও স্যার লুই ক্যাশন কলিকাতায় আসেন এবং ডায়োসিশান স্কুলে শিশু রংমহলের 'অবন পটুয়া' দেখেন। আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি প্রশ্ন করেন "বাচ্চারা কি সারা বছরই এ রকম থিয়েটার করে থাকে?" উত্তরে জানানো হয় "না, এ শুধু বছরের শেষে স্কুল ছুটি হবার প্রাক্কালে ছেলেমেয়েদের নিয়ে আমোদ করবার একটা আসর মাত্র। এটি এরা শিশু রংমহলের মাধ্যমেই করে থাকে—" শুনে আশ্বস্ত হয়ে ডেম থর্নডাইক বলেন—"এইটেই হওয়া উচিত। ইংলণ্ডে বা বিদেশে কোথাও ১২ বৎসরের অনধিক শিশুদের পেশাদারী মঞ্চে উঠতেই দেওয়া হয় না—আইনত বারণ।" এই আইন এখনো অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও বলবৎ আছে। এর পর শিশু রংমহলের বাচ্চাদের বিদেশে নিয়ে যাবার অনেক অনুরোধ এসেছে। শিক্ষামূলক ভ্রমণ দেশের মধ্যে সম্ভব হলেও বিদেশে সম্ভব নয় বলে শিশু রংমহল সে চেষ্টা করেননি।

বিশ্বরূপায় শিশুনাট্য সংস্থা স্থাপিত হওয়ার সংবাদ শুনে আশা হয়েছিল যে বোধ হয় বাচ্চাদের ও স্কুলসমূহের ছোট ছোট অনুষ্ঠানগুলি মঞ্চস্থ হবার সুযোগ হল। এঁরা এটাও ঘোষণা করেছিলেন যে, এই নাকি ভারতের ইতিহাসে প্রথম শিশুদের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ। কিন্তু হায়! প্রথম উদ্বোধনেই বলা হল এবার থেকে প্রতি রবিবার ও ছুটির দিনে বেলা ১২॥টায় শিশু নাটিকা মঞ্চস্থ করা হবে এবং ক্ষুদে অভিনেতারা এজন্য পারিশ্রমিকও পাবে। এক কথায় বিশ্বরূপার কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে প্রথম স্থায়ী পেশাদার শিশুনাট্য সংস্থার প্রবর্তন করলেন।

এই যুগান্তকারী (?) ব্যাপারটি তলিয়ে কেউ দেখেছেন কি না জানি না। কিন্তু মনে হয় সমস্ত ঘটনাটুকু শুধু কাগজের পাতায় চোখ বুলিয়েই বাবা, মা ও শিক্ষাবিদ্‌রা ক্ষান্ত হয়েছেন।

বিশ বছর আগেও স্কুলের বার্ষিক পারিতোষিকবিতরণী সভা ছাড়া বাচ্চাদের কোন অভিনয় বা নাচ গান নিষিদ্ধ ছিল। এখন সময় বদলেছে। আজ শিক্ষাবিদ্‌রাও স্বীকার করেন যে, Extra-curricular কাজের মধ্যে নাচ, গান, অভিনয় একটা অপরিহার্য অংশ; কেন না এতে শিশুদের মানসিক উৎকর্ষ বাড়ে এবং স্কুল ঘরগুলিও এক কথায় ছন্দ ও রঙে ভরে ওঠে। শিশুদের এই যে নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষার ব্যবস্থা, তা ভালো ভালো স্কুলে থাকলেও সাধারণ স্কুলে মোটেই নেই। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া এমনি নিষ্প্রভ যে তাতে শিক্ষার আসরে শিশুরা কোন উৎসাহই পায় না। তার একটি কারণ স্কুলগুলির আর্থিক অস্বচ্ছলতা, অন্যটি উপযুক্ত মাল মসলার অভাব। ছড়া, গান, নাটিকা বিভিন্ন বয়সোপযোগী করে লেখা, তার স্বরলিপি তৈরী করে স্কুলগুলিকে দেওয়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য কোন সংস্থাই এদেশে ছিল না। সাত বছর আগে শিশু রংমহলের জন্ম হল। তাদের কার্যক্রমের প্রধান কথাই হল স্কুলগুলিকে রঙে, রসে, ছন্দে ভরিয়ে দাও—শিশুগোষ্ঠীকে আনন্দ পরিবেশের ভেতর বাড়িয়ে তোল যাতে তারা পড়ে লিখেও আনন্দ পায়। এই যে পরিবেশ পৃথিবীর সবগুলি 'এগিয়ে যাওয়া' দেশের স্কুলের প্রধান রসদ; প্রমাণ তাদের শিশুপাঠ্য রচনা, তাদের নাটিকা, তাদের স্বরলিপির প্রাচুর্য, তাদের স্কুলঘরের বাজনার আসর, নাচের আসর। শিশুনাট্য সংস্থা স্থায়ীভাবে গড়বার গোড়ার কথা—এই নতুন পরিবেশের সৃষ্টি। এটা সহজ কাজ নয়, বিশেষ করে যেখানে প্রারম্ভিক কাজে বিন্দুমাত্র সরকারী সাহায্য পাওয়া যায় না। তাহলেও এ কাজে হাত পড়েছে। নতুন স্কুলগুলিতে নতুন শিক্ষাব্রতীরা এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে যথাসাধ্য নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আজ প্রায় সব স্কুলেই মিউজিক টিচার আছেন, নৃত্য শিক্ষক বহাল আছেন যাতে আঁক কষা ও ভূগোল পড়ার মাঝখানে শিশুরা গাইছে 'আজ আমাদের ছুটি' বা নাচছে 'ধন ডিগ্ ডিগ্ ধেত্তের, ধিনিক ধিনিক ধা'।

প্রশ্ন উঠবে যদি স্কুলঘরেই শিশু রঙ্গমঞ্চ থাকবে তাহলে স্থায়ী শিশু রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন হত না যদি আমাদের সব স্কুলেই শিশুদের উপযোগী অডিটোরিয়াম থাকত। সারা কলকাতা শহরে ৩।৪টি স্কুলে ছাড়া কোন অডিটোরিয়াম নেই। যেগুলি আছে সেগুলিও শিশুদের উপযোগী নয়, সেগুলি ছোটদের নাম করে বড়দের নাট্যমঞ্চ। শিশুদের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ এজন্যেই দরকার যাতে সুন্দর সুষ্ঠু পরিবেশের মধ্যে দেশের ক্ষুদে অভিনেতারা তাদের নিজস্ব নাটিকা, নাটক, নৃত্যরঙ্গ দেখাতে পারে। যেখানে সারা বছরের কার্যক্রমের সার্থক পরিণতি হয় বার্ষিক উৎসবে। যেখানে শিশুমনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমস্ত রঙ্গমঞ্চ ও অডিটোরিয়ামটি তৈরী হয়—যার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় এলেই মনে হবে আমরা শিশুতীর্থে এসেছি। এই শিশুতীর্থে যে ছোটরা অভিনয়, আবৃত্তি, নৃত্য ও সঙ্গীতে অংশ নিতে হয় তারা কেউ দৈনিক পারিশ্রমিকের লোভে আসে না,—আসে আনন্দের তাগিদে। তাদের পিতামাতা ও শিক্ষিকা যাঁরা তাদের আনন্দোজ্জ্বল অভিনয় দেখতে আসেন তাঁরাও প্রচুর পারিশ্রমিক নিয়ে গৃহে ফেরেন—সেটা নয়া পয়সার হিসেবে ধরা যায় না।

বিশ্বরূপার স্থায়ী শিশুনাট্যমঞ্চের পরিবেশ উপরোক্ত পরিবেশের সাথে আকাশ পাতাল তফাৎ। প্রথম কথা পেশাদারী বড়দের রঙ্গমঞ্চের যে আবহাওয়া তাতে তার দুশো গজের মধ্যে কোন শিশুর যাওয়া কর্তব্য কি না তা যে কোন পিতামাতা বিচার করবেন। বিশ্বরূপা মঞ্চের সবটুকু বড়দের জন্যে তৈরী। সেখানে বেলা ১২॥টায় শিশুরা অভিনয় করছে এবং তার একটু পরেই আসছেন পেশাদারী অভিনেতা ও অভিনেতৃবৃন্দ। কোন সময়েই সেখানে শিশুসুলভ পরিবেশ নেই। দ্বিতীয়ত বেলা ১২॥টা ছুটির দিনে শিশুদের দিয়ে অভিনয় করাবার মত এমন অদ্ভুত পরিকল্পনা একমাত্র পেশাদার রঙ্গমঞ্চেই সম্ভব। তাও একদিন দুদিন নয়, সারা বছর ধরে। শিশুদের যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা কখনই এমনি উদ্ভট খেয়ালের পৃষ্ঠপোষক হবেন মনে হয় না। শুধু প্রচারপত্রের মাধ্যমে ১২॥টায় একটি পেশাদার রঙ্গমঞ্চকে কাজে লাগানো ছাড়া কোন শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে শিশুনাট্য সংস্থা স্থাপিত হয়েছে বলে কোন সুস্থ পিতামাতা বা নাগরিক বিশ্বাস করবেন না।

তৃতীয়ত শিশুদের পারিশ্রমিক দান। দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থার ফেরে ছোট ছোট ছেলেরা 'জুতো বুরুশও' করছে। প্রতি রবিবার বেলা ১২॥টায় শিশু অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা বিশ্বরূপার সাজঘরে মুখে রঙ মেখে নানা রকম পোশাক পরে মঞ্চে ঢোকবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে এবং সপ্তাহ বা মাস শেষ হলে সই করে পারিশ্রমিক নিচ্ছে, এ দৃশ্য মনে মনে আন্দাজ করে নিলেই দেখা যাবে এরা আর শিশু নেই।

Children's Theatre অনেক রকম আছে। তার মধ্যে আছে "Children's Theatre by the Adults and for the children" অর্থাৎ শিশুদের জন্যে বড়দের অভিনয়। বিলেতে Punch and Judy এই শ্রেণীর। রুশদেশেও এ অভিনয় হয় এবং বন্ধুবর শ্রীশম্ভু মিত্র এঁদের কথাই বলেছিলেন; এঁরা উঁচুদরের পেশাদার

শহরের আর্লস ফ্রেণ্ড নামে এক ব্যক্তি ঠিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক খালি টিউব সংগ্রহ করে উপস্থিত হতেই কোম্পানীটিকে মহা বিপদে পড়তে হল। অথচ বিজ্ঞাপনে যা বলা হয়েছে সে-সর্ত রক্ষা না করেও উপায় নেই। সবাই মিলে তখন মানচিত্র আর জায়গার নামের তালিকা নিয়ে পড়ল। অবশেষে পাওয়া গেল মঙ্গল (Mars) নামে জর্মানীর রাইনল্যাণ্ডে একটা গ্রামের নাম। ছোট্ট গ্রাম, অধিবাসী মাত্র বাহাত্তর জন।

আর্লস ফ্রেণ্ডকে পাঠানো হলো বিমানে ডুসেলডর্ফে এবং সেখান থেকে মোটরে মার্সে। ওখানে গিয়ে ফ্রেণ্ড সেই সাবান বিলি করে অধিবাসীদের তুষ্ট করে ফিরে এল।

উল্কিতে দেহ চিত্রবিচিত্র করার প্রথা বহু প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আদিবাসীদের মধ্যে আজও এ প্রথা ব্যাপকভাবে দেখা যায়। তাছাড়া আলোকপ্রাপ্ত সভ্য জগতেও যে এ প্রথা নেই তা নয়। মধ্য প্রাচ্যের নানা দেশের অভিভাবকরা বিবাহ ব্যাপারে প্রবঞ্চনা রোধ করার জন্য জামাতাদের পিঠে উল্কির চিত্র এঁকে দেবার প্রথা প্রবর্তন করতে আন্দোলন করছে।

অভিভাবকরা একটা আইন প্রণয়ন করাতে চাইছে যে, কোন পুরুষ প্রথম বিবাহ করলেই যেন তার পিঠে উল্কি দিয়ে চিহ্ন করে দেওয়া হয় এবং তার পর যতবার সে বিবাহ করুক প্রতিবারই যেন বিবাহের চিহ্ন এঁকে দেওয়া হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদ হলে উল্কির ওপর একটা ঢেরা টেনে দেওয়া হবে।

এর দ্বারা অভিভাবক এবং কন্যারা জানতে পারবে যে হবু স্বামীর এই প্রথম বিবাহ অথবা (ইসলাম ধর্মে যা আইন-সিদ্ধ) দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ বিবাহ এবং কজন স্ত্রী বর্তমান।

*

পোষা বানরকে লোকের পকেট মারতে বা কোন জায়গা থেকে অলক্ষ্যে সামগ্রী তুলে আনতে শিখিয়ে রোজগার করার একটা অসৎ উপায়ের ঘটনা মাঝে মাঝে এদেশেও শোনা যায়। এখানেই শুধু নয়, ফ্রান্সের মত দেশেও বানরকে দিয়ে চুরি করানোর ঘটনা জানতে পারা যায়। খ্যাতনামা অপরাধতত্ত্ববিদ্ ডাঃ হ্যারি সডারমান এমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন।

একবার লায়ন্সে কতগুলি অদ্ভুত ধরনের চুরিতে পুলিস বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। চুরি হয় দিনের বেলায়, জানালা খোলা ঘর থেকে এবং সাধারণত অপহৃত হতে থাকে আংটি, সোনার ঘড়ি জাতীয় চকচকে সামগ্রী।

ঘটনাক্রমে এক গোয়েন্দা একস্থানে চুরির পর আঙুলের ছাপ পায়। কিন্তু ছাপের রেখাগুলি এমন যা তারা কোনদিন দেখেনি। পুলিস বিভাগের এক বৈজ্ঞানিক অনুমান করে বলেন ছাপটি কোন বানরের আঙুলের হতে পারে। এই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে শহরের সমস্ত বানরকে ধরে এনে তাদের আঙুলের ছাপ নেওয়া হল। অপরাধীর সন্ধান পাওয়া গেল। দেখা গেল খুবই ছোট একটি বানর যার মালিক এক ইতালীয় গায়ক-ভিক্ষুক। অপহৃত সামগ্রীর কিছু কিছু লোকটির ঘর তল্লাসী করে পাওয়া যেতে সে স্বীকার করে যে বানরটিকে সে চুরি করতে শিখিয়েছিল।

পনের

দড়বড়িয়ে ঘোড়া দাবড়ে এই অবেলায় যিনি এসে পৌঁছলেন, এ বাড়ির কেউ তাকে আশা করেন নি।

রামকিষ্টোই তাঁকে প্রথমে দেখল। কিন্তু চিনতে পারে নি। ঘোড়াটা গোয়ালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার কালে রামকিষ্টো সওয়ারের মুখ দেখতে পায়নি। গাছের আড়াল পড়ে গিয়েছিল।

বাড়ির সকলেরই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গিয়েছে। তা বেলা তিনটে সাড়ে-তিনটে হল বৈকি। শুভদা ছাড়া আর সবাই যে যার ঘরে ঢুকে গড়িয়ে নিচ্ছে। বড়কত্তার একটু তন্দ্রা এসেছে, মেজকত্তা প্রবাসী পত্রিকাখানা খুলে দু'পাতা পড়ছিলেন, ঘুমের আক্রমণে সেই পাতা-খোলা প্রবাসী তাঁর বুকের উপর ঢলে পড়েছে। বড় বউয়ের ঘরে ফুলির মার সঙ্গে বড় বউ গল্প করছিলেন একটু আগে, চাঁপা আর ফুলিতে সমানে খুনসুটি চলছিল, এখন সব বন্ধ হয়ে গেছে। ফুলির মার নাক ডাকছে এখন। বড় বউয়ের চোখ বুজে এসেছে, ঠোঁট ফাঁক হয়ে সামনের দাঁত দুটো বেরিয়ে পড়েছে। চাঁপা আর ফুলি গলা জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ফুলির মুখ থেকে লালার একটা ঘন স্রোত গালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়েছে। একটা গুয়ে মাছি বার বার ফুলির গালে গিয়ে বসছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ফুলির গালটা নড়ে নড়ে ওঠায় আবার সেটা উড়ে উড়ে যাচ্ছে।

আরেকটা ঘরে ছেলেকে নিয়ে শুয়েছিল গিরিবালা। ছোটবউও পাশে শুয়েছিল। গিরিবালা ঘুমে অচেতন। ছোটবউ ঘুমিয়ে কিনা কে জানে, তবে একেবারে নিশ্চল।

হাত-পা নেড়ে ঘুমকে প্রাণপণে প্রতিরোধ করছিল একমাত্র ছেলেই। বড়রা যার আক্রমণে কাবু, সেই ঘুমকে সে যেন কচি কচি হাত-পা নেড়ে বেদম শায়েস্তা করছে। দু-একবার ধমক দিল যেন কাকে? বুবো বুবো। তার শরীরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছে সে। মুমুমু, জানাতে চাইল সে কথা। কেউ তার কথায় কর্ণপাত করল না। দিবানিদ্রা ভঙ্গ হল না কারো। সেই অস্বস্তিটা প্রবলভাবে বেড়ে উঠছে তার শরীরে। বিরক্ত লাগছে তার। যন্ত্রণা বোধ হচ্ছে। এবার খুঁত খুঁত করে কেঁদে উঠল। তাতেও কেউ দৃষ্টি দিল না তার দিকে। এবার হয়ত সে তার কান্নার স্বরগ্রাম চড়াতে তুলে দিত, কিন্তু তার আগেই চূড়ান্ত উপশম হয়ে গেল। আর কাঁদল না সে। কাঁথাটি জবজবে করে ভিজিয়ে পরমানন্দে আঙুল চুষতে শুরু করল। না, আর কোন উদ্বেগ, কোন অভিযোগ নেই তার। বেশ আরামই লাগছে।

এ বাড়িতে দিনের কাজ শেষ হতে সবার চেয়ে দেরী হয় শুভদার। বিধবা মানুষ। কাজকম্ম সেরে নাইতে-খেতে রোজই বেলা গড়িয়ে যায়। সেদিনও হেঁসেলে শিকল তুলে বারান্দায় নামছিলেন, ঘোড়ার পায়ের শব্দ বাইরের উঠোনে এসে থামতেই চৌকাঠ ধরেই দাঁড়িয়ে পড়লেন। কে আবার এল? ডিঙিগ মেরে চেগারের ওপাশে উঁকি মেরেই অবাক হয়ে গেলেন।

খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ও মা, শীতল। ওলো, ও বড় বউ, বড় বউ, ওঠ্ ওঠ্, শীতল আয়েছে!"

শুভদার চিৎকারে বড় বউয়ের ঘুম ছুটল। কে? ছোট্ ঠাকুরপো? ওমা! ধড়মড়িয়ে উঠে গায়ের আঁচলটা সামলে নিলেন, এলোচুল জড়িয়ে নিলেন তাড়াতাড়ি, একটা বড়সড় হাই তুললেন। তারপর ফুলির মাকে ঠেলেঠুলে তুলে দিলেন।

বললেন, "ও ফুলির মা, আখাটা ধরাওগে দিন, ছোট্ ঠাকুরপো আয়েছেন।"

আবার একটা হাই তুললেন বড় বউ।

ফুলির মাকে বললেন, "এট্টু গুড়ো দাও তো, দাঁতে ঘষি।"

ফুলির মা কৌটো খুলতে খুলতেই বড় বউ পাশের ঘরে হাঁক দিলেন, "ওরে, ও ছোট, ওঠ্, ছোট্ঠাকুরপো আয়েছেন রে। উঠে পড়।"

কথাটা কানে গেল ছোটবউয়ের। কিন্তু অর্থটা তাঁর কাছে তেমন পরিষ্কার হল না। কোনরকম চঞ্চলতা জাগল না তাঁর মনে। কেউ একজন এসেছে, সেটা বেশ বুঝলেন। কে এসেছে, সেটা তত পরিষ্কার হল না। তিনি তেমনি নিশ্চলভাবেই শুয়ে রইলেন। তাড়াহুড়ো করে উঠবার কোন তাগিদ তিনি বোধ করলেন না।

কে এসেছে? বড়দি বলল, ছোট্-ঠাকুরপো। ছোট্ ঠাকুরপো? হ্যাঁ, ছোট বউয়ের মনে পড়ল, মনে পড়ছে, ধীরে ধীরে, একটু একটু করে মনে পড়তে লাগল, ছোটকত্তাকে বড়দি এই নামেই ডেকে থাকেন বটে। তার মানে ছোটকত্তা এসেছেন। বুঝলেন ছোটবউ। তবু কেন তাঁর আগ্রহ জন্মাচ্ছে না ছোটকত্তা সম্পর্কে? কেন ছোটকত্তার ছবিটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে

বাড়ির মধ্যে এই অসময়ে কলরব শুনে মেজকত্তার ঘুমটি ছুটে গেল। উঠে এসে শোনেন শীতল এসেছে। জামা কাপড় ছাড়তে গেছে তার ঘরে। বাইরে বেরিয়ে দেখেন, শীতলের ঘোড়াটা ল্যাজ উঁচু করে নাদছে আর ঘরের খুঁটিতে ঘাড় ঘষছে।

মেজকত্তা রামকিষ্টোকে ডাক দিলেন জোরে। গোয়াল থেকে সে সাড়া দিল।

মেজকত্তা বললেন, "এদিকে আয় দিকি একবার।"

রামকিষ্টোর হাতে অনেক কাজ। সে ভাবল মা'জেবাবুর বোধ হয় তামাকের তেষ্টা পেয়েছে। ছেলেটাকে পাঠাতে চাইল। কিন্তু সে 'নবাবের বিটা' যে কোথায় এখন আছেন তা ভগবানই জানেন।

তবু, কছে পিটে যদি থাকে, তাই হাঁক পাড়ল, "ওরে ও নরা!"

নরা কাছেই ছিল। গোপালভোগ আমগাছটার সাফ সোফ তলায় বসে নালসে পিঁপড়ের আনাগোনা মনোযোগ দিয়ে দেখছিল। পিঁপড়ে সম্পর্কে নরার আগ্রহ প্রবল। ফাঁক পেলেই এই অদ্ভুত ক্ষুদে ক্ষুদে প্রাণীগুলোর ক্রিয়া কলাপ খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করে থাকে।

নরা অনেকদিন ধরে, একটু একটু করে, অনেক কীর্তিই দেখেছে ওদের। কি করে ওরা বাসা বাঁধে? আচ্ছা শোন, যা দেখেছি, তাই বলছি। ওদের মধ্যে অনেকগুলো বড় বড় পিঁপড়ে আছে। ওরাই বোধ হয় মোড়ল। শুঁড় নেড়ে নেড়ে ওরা যা বলে আর সবাই তা মান্য করে। বর্ষার আগে দেখো, এই গোপালভোগ আমগাছের পাতায় পাতায় ঐ বড় বড় পিপ'ড়েগুলো ঘুরে ঘুরে কি যেন খোঁজে। বল তো, কি খোঁজে? বাসা বানাবার জায়গা। যেই জায়গা ঠিক হয়ে গেল, জায়গা মানে কি, আমগাছের গোটা কতক শিয়ারা, যে সব শিয়ারা পেড়ে এনে ঠাকুরমশাই পুজোর সময় ঘটের মুখে দেন সেই শিয়ারা। দেখে দেখে নরা এখন বুঝে গেছে কোন ধরনের শিয়ারায় নালসে পিঁপড়ে বাসা বাঁধে আর কোথায় বাঁধে না। ওদের তরিবৎ খুব। বড়ো ডালে, খুব শক্ত রুক্ষ পাতায় ওরা পারতপক্ষে বাসা বাঁধতে চায় না। একেবারে ফুল কচি পাতাতেও না। শক্ত সমর্থ যুবো পাতা আর নরম ডালই ওদের পছন্দ। নরাকে আমের শিয়ারা আনতে বললে সে এসব ডাল কক্ষনো ভাঙেগ না। বাবা, কেষ্টর জীব! ওদের ঘর-ভেঙেগ দেওয়া কি যে সে কথা! পাপ লাগবে না!

হ্যাঁ, তারপর যা বলছিল নরা, শোন। বাসা বাঁধার জুৎমত শিয়ারাগুলো ঠিক করা হ'ল। তারপর কি যেন একটা হুকুম দেয় মোড়লগুলো আর দলে দলে পিঁপড়ে এসে বাসা বাঁধবার শিয়ারাগুলোর উপর ঘুরে বেড়াতে থাকে। ঘুরছে তো ঘুরছেই। শুধু ঘুরছেই। দিনরাত শুধু ঘোরাফেরাই চলছে। তারপর হঠাৎ একদিন দেখবে, আম শিয়ারার নরম পাতাগুলো একের পিঠে আরেকটা জুড়ে জুড়ে গিয়েছে। আর সমস্ত শিয়ারাটা ধীরে ধীরে ফুলে উঠে, গুটিয়ে গুটিয়ে একটা বড় সড় টোপরের মত হয়ে উঠছে। এই অদ্ভুত দৃশ্যটা কতদিন যে গোপালভোগের শিকড়ে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে দেখেছে নরা, তার সীমা সংখ্যা নেই। এই সময় নাওয়া খাওয়া ভুলে যায় সে। কাজকর্মে মন থাকে না তার। বাবার বকুনি বেড়ে যায়। কুঁড়ে বলে তার বদনাম হয়। চড় চাপড়ও খায়। তবু এ নেশা তার যায় না। বড়রা কিছু দেখে না, দেখতে চায় না। ওরা শুধু চড়ই মারতে পারে। আচ্ছা বলুক দেখি বাবা, কেন আমের শিয়ারাগুলো একদিন এমন করে গুটিয়ে যায়, বলুক দেখি, কোন কায়দায় এমন ঘটে? সে বেলায় মুখ ভোঁতা।

পিঁপড়েরা পালে পালে ঐ যখন পাতায় পাতায় ঘোরে, ওরা কি বিনা কাজে ঘোরে ভেবেছো! মোটেই না, ওরা বিনা কাজে ঘোরে না, ওরা তখন আঠা মাখায় পাতায়। একদিন হাত দিয়ে দেখেছিল নরা তাই জেনেছে। সেই আঠা যত শুকিয়ে আসে, শিয়ারার পাতাও তত গায়ে গায়ে জুড়ে যায়। ততই শিয়ারাটা ফুলে ফুলে ওঠে। একদিন সব ফাঁক যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন মালপত্তর মুখে মুখে বয়ে এনে পিঁপড়েরা সব তার ভিতরে ঢুকে পড়ে। দু একটা বাইরে থাকে পাহারায়। ভিতরে অন্যেরা বোধ হয় ডিম পাড়ে।

এই দিনও নরা শুয়ে শুয়ে দেখছিল। তবে এখন সে চিৎ হয়ে শোয়নি। শুয়েছিল উপুড় হয়ে। নরার চোখের সামনে একটা কচু পাতার উপর বড় একটা নালসে পিঁপড়ে। পিঁপড়েটার চোট লেগেছে বলে নড়তে পারছে না। নরার পিঠের চাপেই

খেতলে গেছে পিঁপড়েটা তাই নরার দুঃখের অন্ত নেই। নরা তাকে কচুর পাতায় তুলে দিয়েছে।

কচুর পাতায় গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছিল পিঁপড়েটা। দাঁড়াতে পারছে না। উবুদো হয়ে, পাগুলো উপরে তুলে পিলপিল করছে। নরা জানে না এ অবস্থায় কি করলে পিঁপড়েটা ভাল হয়ে উঠতে পারে। পিঁপড়ের রোগের ওষুধ আছে বলে তো সে শোনেনি। বাবা হয়ত জানতে পারে। কিন্তু তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করাটা নিরাপদ কি না বুঝতে পারছিল না। বাবার হাতের চড়গুলো খুব কড়া এবং সেগুলো তার পিঠে পড়বার এত কারণ চর্তুর্দিকে ছড়ান আছে যে একা সে সামাল দিতে পারে না। তাই যেচে আরেকটা সুযোগ সে বাবার হাতে তুলে দিতে চাইছিল না। হঠাৎ পিঁপড়েটা কচু পাতার উপর উঠে দাঁড়াল। উত্তেজনায় নরার বুক ধুকপুক করে উঠল। উঠেছে! উঠতে পেরেছে!

পিঁপড়েটা উঠে দাঁড়াল বটে কিন্তু এক পাও নড়তে পারল না। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল প্রায় একটি ঘণ্টা। মাঝে মাঝে পাগুলোর মধ্যে শুঁড় দিয়ে কি করছিল কে জানে। ভাঙ্গা পা মেরামত করছে নাকি? সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে, পাতার উপর হুমড়ি খেয়ে, নরা দেখবার চেষ্টা করল। নাঃ কিছুই দেখা গেল না। নরা কিঞ্চিৎ নিরাশ হ'ল।

পরক্ষণেই নরা দেখল নালসেটা টিপ টিপ করে মাজা নাচাচ্ছে। কিরে বাবা, বাহ্যি করবি না কি? আবার নরার হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হ'ল। এটা নরার মনের অনেক দিনের প্রশ্ন : পিঁপড়ে কি বাহ্যি পেচ্ছাব করে? আজ সে প্রশ্ন নিরসনের জন্য ভগবান এই পিঁপড়েটাকে তার হাতে তুলে দিয়েছেন। জয় ভগবান!

ঠিক কোনখানটি দিয়ে যে পিঁপড়েরা ঐ সব কাজ কম্ম হাসিল করে সেটি মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য নরা যে মুহূর্তে তৈরী হ'ল, ঠিক সেই সময় তার কানে বাপের ডাকটি দূরবার মত এসে বিঁধল। ডাকটি শুনেই বুঝল বাবা একটু গরম হয়েছে। এবং এ জগতে গরম বাবা যেহেতু ঈশ্বরের চাইতে শক্তিমান, সেই কারণেই নরা ভগবানের ইচ্ছেটা তাঁর হাতেই অর্পণ করে ক্ষুণ্ণ মনে বাবার হুকুম তামিল করতে ছুটল।

নরাকে দেখে রামকিষ্টোর মনে বাৎসল্য-ভাব বিন্দুমাত্র জাগরূক হ'ল না। কারণ, খেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে গোয়াল পরিষ্কারের কাজে লাগতে হয়েছে। পচা গোবর আর চোনায় ভেজা মাটি কোদাল দিয়ে চেঁছে ওগুলোকে সারগাদায় নিয়ে ফেলা যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য কাজ। কোমর পিঠ টন টন করতে থাকে। মেজাজ ভাল থাকার কথা নয়। শালার গরুগুলোও হয়েছে তেমনি। দুধ তো সব কটা বন্ধ করেছে। হাটবাজার থেকে কিনে আনতে হয় রোজ, কেন, ঐ সঙ্গে নাদাটাও বন্ধ করলে পারতে। তাহলে রামকিষ্টোর আর এত ঝামেলা পোয়াতে হয় না। হারামজাদীরা দুধ দেবার কেউ না, জাবনা খাওয়ার মা গোঁসাই।

রামকিষ্টোর মনের অবস্থা যখন এই রকম ঠিক সেই সময়ে তার সামনে নরা এসে ব্যাজার মুখে দাঁড়াল। রামকিষ্টো তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। পেট পুরে খেতে দাও, বিছানা পেতে ঘুমোতে দাও অমনি ছেলের মুখে হাসি উথলে ওঠে। আর কাজের গন্ধ পেলেই মুখখান একেবারে অমাবস্যা। মারে ঐ মুখে এক লাথি!

রামকিষ্টো অবশ্য লাথি মারল না। ছেলের সঙ্গে যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহারই করল। গোবরমাখা হাত দিয়ে নরার চুলের ঝুঁটি ধরে দুটো ঝাঁকানি দিল।

দাঁত কিড়মিড় করে বলল, "এক ডাকে আসা হয় না, বাবুর মন কোন গাছে বাঁধা, অ্যাঁ। যাও, মাজেবাবু ডাকতিছেন, বোধ হয় তামাকু খাবেন, সাজে দ্যাও গে। তারপর এক কল্কে এখেনে আনে দ্যাও। দেরি করলি মাজা সুজা থাকবেনানে।"

ঝাঁকির জন্য নয়, পচা গোবরের গন্ধে নরার পেট গুলিয়ে উঠল ও কান্নার একটা প্রবল ইচ্ছা মনে গুঁতো মারতে লাগল। নিতান্ত মাজেবাবুর সামনে পড়তে হবে তাই সামলে নিল। তবে বিলক্ষণ চটে গেল তার উপর। মানুষটা কেমন ধারা গো! তামুক খাবার সময় অসময় নেই! এক-মুঠো আশ-শ্যাওড়ার পাতা ছিঁড়ে মাথা ঘষতে ঘষতে মেজকত্তার সামনে গিয়ে হাজির হ'ল নরা।

মেজকত্তা বললেন, "নরা, তোর বাবা কোথায় রে?"

নরা মিন মিন করে বলল, "গুয়াল ফিরেচ্ছে।"

মেজকত্তা বললেন, "ও। তা তুই ঘোড়াটা মাঠে বেঁধে দিয়ে আসতে পারবি?"

ঘুড়া! নরা চমকে উঠল। কয় কি মাজেবাবু। কার ঘুড়া? নরা হকচকিয়ে চাইতেই দেখে মস্ত একটা ঘোড়া বার-বাড়ির পুব ছামুতে বাঁধা আছে। দেখেই চিনল, ছোটবাবুর ঘোড়া। কখন এলেন ছোটবাবু? নরার মনে পড়ল, খানিকক্ষণ আগে ঘোড়ার টগবগি একটু শুনেছিল বটে। তেমন খেয়াল করেনি।

মাজেবাবু তারে ঐ ঘুড়া বাঁধতি কচ্ছেন! নরার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। উরে সব্বোনাশ! উডা যে ডাকাত। অমন জুয়ানমদ্দ ছাওয়াল বড়বাবুর, তারেই মারিছিল এক আছাড়। নরা কি আর আস্ত থাকবে নাকি? ঐ দ্যাখ, খালি মাটিতেই কেমন খটাস খটাস লাথি ঝাড়তিছে। ওর একখান নরার প্যাটে পড়লি, প্যাট গলে যে ডাল ভাতে হয়ে যাবেনে।

মেজকত্তার কথা শুনে শরীরে কাঁপুনি ধরে গেল নরার।

অতিকষ্টে বলল, "বাবু, বাবারে ডাকে নিয়ে আসব?"

মেজকত্তা বললেন, "যা।

আর নরা অমনি প্রাণপণে দিল ছুট। যেন মেজকত্তার হুকুম এখনই বদলে যাবে।

হাঁফাতে হাঁফাতে গোয়ালের দরজায় গিয়ে নরা উত্তেজিতভাবে ডাক দিল, "বাবারে, শিগ্‌গির আয়, ছোটবাবু আয়েছেন।"

রামকিষ্টো বেরিয়ে এসে দেখল, নরার মুখ চুবসে গেছে। থরথর করে কাঁপছে ছেলে।

অবাক হ'ল রামকিষ্টো।

বলল, "ছোটবাবু আয়েছেন তা তোর পিরাণডা বেরোয়ে যাচ্ছে ক্যান? তুই কি খুনী আসামী? তোরে জেলে দেবে নাকি ছোটবাবু?"

হাঁফাতে হাঁফাতে নরা বলল, "ছোট-বাবুর সেই ঘোড়াটাও আয়েছে যে। মা'জে-বাবু কয়, নরা ঘুড়াডা বাঁধে দিয়ে আয় দিন মাঠে।"

নরার ভয়ের কারণডা এতক্ষণে বুঝল রামকিষ্টো। ছেলের তড়া'সে ভাবটা আর কাটল না। বড্ড ভীতু। এবার কিন্তু আর রাগ হ'ল না রামকিষ্টোর। জীবনে কিছু করতে পারবে না ও। মায়ের আদর খেয়ে খেয়ে একেবারে ননীগোপাল হয়ে উঠেছে। নরার ভবিষ্যৎ ভেবে দুঃখ হ'ল রাম-কিষ্টোর। কেমন যেন আলাভোলা গোছের হয়ে উঠেছে ছেলেটা। মায়া হ'ল তার।

রামকিষ্টো হঠাৎ গোবরমাখা হাতখানা দিয়ে পরম আদরে নরার গালটা টিপে দিল।

বলল, "তালপাতার সিপাই! তোর ঐ বয়েসে আমি শিঙেল মো'য চরাইছি, বুঝলি।"

গালে পচা গোবর লাগতেই নরা বেজায় চটে গেল।

চেঁচিয়ে উঠল, "করিস কি? উঃ, গন্ধ! থু থু।

নরা দুহাতে গাল ঘষতে লাগল। ছেলের রকম দেখে হো হো করে হেসে উঠল রামকিষ্টো। বাপকে হাসতে দেখে নরা একটু অবাক হ'ল প্রথমে। পরক্ষণেই খুশী হয়ে উঠল। বাবাকে হাসতে দেখলে খুব আনন্দ হয় নরার। কি আশ্চর্য, যেই খুশী খুশী ভাবটা নরার মনে জেগে উঠল, অমনি পচা গোবরের গন্ধটাও ওর নাকে আর অত বিকট লাগল না। সেও বাপের সঙ্গে ফিক ফিক করে হাসতে লাগল।

রামকিষ্টো বলল, "চল দিন দেখি কনে তোর ঘুড়া।"

রামকিষ্টোর হাত ধরে নরা গুটিগুটি বারবাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। এখন সে এই দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না। মা'জে-বাবুকেও না, ছোটবাবুর ঐ ঘোড়াটাকেও না। (ক্রমশ)

শুধু চেহারা দেখে কেন, মানুষটার সঙ্গে কথা বলেও সমিতা কিছু বুঝতে পারেনি।

সারাটা রাত ভেবেছে। এপাশ ওপাশ করেছে বিছানায়। একদিনের আলাপ, তাও পুরো এক দিন নয়, মাত্র কয়েক ঘণ্টা।

ছবির প্রদর্শনী আর্ট স্কুলে। সমিতা এক বন্ধুর মারফত একটা কার্ড পেয়েছিল। ছবির শখ ওর চিরকালের। আগে ছিল আঁকার, এখন দেখার। স্কুল কলেজে একটু নামও হয়েছিল। কিন্তু রঙ আর তুলি কলেজের ফটকের ওপারেই প্রায় রেখে এসেছিল সমিতা। বিয়ের পরে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছুটোছুটি করতে করতে ছবি আঁকার উৎসাহ নিভে গিয়েছিল। ছবি আঁকার হাতটা নিস্তেজ হয়েছিল বটে, কিন্তু মন নিরুৎসাহ হয়নি। কোথাও ছবির গন্ধ পেলে ঠিক গিয়ে জুটেছে।

কলকাতায় ফিরে সমিতা আবার খুঁজে খুঁজে বের করেছে, ইজেল, রং আর তুলি। খবরের কাগজের পাতা রোজ তন্ন তন্ন করে দেখেছে। কোথাও যদি ছবির প্রদর্শনী থাকে। ছোট, বড়, মাঝারি যে কোন রকমের।

সুযোগ জুটে গেল।

খুব বড় গোছের কিছু নয়, তবে একেবারে উপেক্ষা করার মতনও না। মাদ্রাজের রামলিংগম রয়েছে, বোম্বাইয়ের মিনু সারাবাই। দুজনেই তেলরংয়ে ওস্তাদ। এছাড়া রয়েছে বাংলার বিজয় মল্লিক, বন্যা রাহা, ইউ পির কান্তা প্রসাদ আর আসামের বরকাকই।

শুধু ক্যানভাসের ওপরই এরা তুলির আঁচড় টানে না, সে আঁচড় মানুষের মনকে টানে আরো বেশী।

যাবার আগে সাজগোজ করে সমিতা একবার স্বামীকে বলতে গিয়েছিল। সঙ্গে যে যাবেন না, তা সমিতার খুব জানা, তবু ভেবেছিল শনিবারের এমন একটা বিকেলে হয়তো ল্যাবরেটরির অন্ধকূপে গিয়ে ঢুকবেন না।

সাদা লম্বা কোটটা গায়ে চড়িয়ে মহীতোষ শোবার ঘর থেকে বেরোচ্ছিলেন, সমিতার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা।

সমিতা গলায় আবদারের সুর ঢেলে বলল, এই, কি বসে বসে টেস্ট টিউব আর বুনসেন বার্নার নিয়ে সময়টা নষ্ট করবে, এমন চমৎকার বিকেলটা, তার চেয়ে চল ছবির এক্সজিবিশন দেখে আসি। এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব।

অ্যাপ্রনের পকেট থেকে একটা হাত বের করে মহীতোষ চশমাটা ঠিক করে নিলেন। কিছুক্ষণ দুচোখে বিস্ময়ের রোশনাই জেলে সমিতার দিকে চেয়ে রইলেন তারপর বললেন, ছবির এক্সজিবিশন? আশ্চর্য, ছবির ভূত এখনও নামল না তোমার ঘাড় থেকে। কতকগুলো কাগজে রংয়ের হিজিবিজি আঁচড়, তলায় লেখা, গাছ, ফুল, পর্বতে সন্ধ্যা, আর তোমরা তাই দেখে বিগলিত।

বুঝতে পারল সমিতা। মহীতোষ পুনার কথা বলছেন। একবার সমিতা টেনে হিঁচড়ে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল এক ছবির প্রদর্শনীতে। ফিউচারিস্ট আর্টিস্টদের ব্যাপার। গোটা পাঁচ ছয় ছবি দেখে মহীতোষ ক্ষেপে উঠেছিল। সমিতার দিকে ফিরে বলেছিলেন, আমি মোটরে গিয়ে বসছি, তোমার ইচ্ছে হয়, তুমি দেখ।

কেন? সমিতা অবশ্য খুব অবাক হয়নি।

কেন? আর দু একটা ছবি দেখলে কর্মকর্তাদের সঙ্গে হাতাহাতি হয়ে যাবে। বলা যায় না, শিল্পীর মুখোমুখি পড়ে গেলে খুনোখুনি হওয়াও বিচিত্র নয়।

সমিতা রুমালে হাসি চেপে বলেছিল, A bull in a China shop.

তারপর অনেক অনুনয় বিনয় করেও মহীতোষকে আর কোন প্রদর্শনীতে সমিতা নিয়ে যেতে পারেনি।

শুধু কি প্রদর্শনী! কোথায় বা মহীতোষ গিয়েছেন। নামকরা কেমিস্ট কেউ এলে অবশ্য

একেবারে প্রথম সারিতে গিয়ে বসে বক্তৃতা শুনেছেন। অফিস আর ল্যাবরেটরি, ল্যাবরেটরি আর অফিস। আর মাঝরাত অবধি হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন দেশী বিদেশী কেমিক্যাল জার্নালগুলোর ওপর।

সমিতা আর অপেক্ষা করেনি। অপেক্ষা করেও লাভ হত না। সমিতা পিছন ফেরার সংগে সংগেই মহীতোষ ল্যাবরেটরির মধ্যে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

বরাত সমিতার। প্রদর্শনীর ফটক পার হতেই সুবিমলবাবুর সংগে দেখা হয়ে গেল। কলেজজীবনের অধ্যাপক। পড়াতেন দর্শন, কিন্তু হেন বিষয় নেই যা তাঁর জানা ছিল না। বিজ্ঞান, ফটোগ্রাফি, ছবি আঁকা, ইদানীং নাকি এরোনটিকস্ নিয়েও নাড়াচাড়া করছেন।

সমিতাকে তিনি সংগে করে ছবি দেখাতে লাগলেন। কোন ছবিতে পাশ্চাত্ত্য ধারার প্রভাব বেশী, কোন ছবি নির্ভেজাল প্রাচ্যরীতিতে আঁকা, কোনটায় দু-ধারা এসে মিশেছে গংগাযমুনার মতন, তার বিশ্লেষণও করলেন।

একটা ছবির সামনে এসে সমিতা থমকে দাঁড়াল।

অন্য কোন রং নেই। চাইনিজ ইংকের মোটা আঁচড়। একটি ভিখারিনী পড়ে আছে ফুটপাথের ওপর। দুটি চোখ বিস্ফারিত, আকাশের দিকে নিবদ্ধ। সৃজনের দেবতাকে অভিশাপই দিচ্ছে হয়তো। ডান হাতের কাছে একটা মাটির ভাঁড়, ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে, শিরা প্রকট দুটি হাতে, পড়ে থাকার ভংগীতে অসহায় কাকুতি নয়, কেমন একটা চ্যালেঞ্জের ভাব। ছবিটির নামও 'চ্যালেঞ্জ'। এ চ্যালেঞ্জ বিধাতার বিরুদ্ধে না কি মানুষের হাতে গড়া একচোখো সমাজের বিরুদ্ধে, বোঝা মুশকিল, কিন্তু ছবিটার সামনে বেশ কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। চট করে চোখ ফেরানো যায় না। সেই জন্যই ভিড়ও এই ছবিটার সামনেই বেশী।

পকেট থেকে আতশ কাচ বের করে সুবিমলবাবু খুব কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করলেন প্রতিটি রেখা তারপর সমিতার দিকে ফিরে বললেন, অপূর্ব, আর্যর মাস্টারপীস।

আর্য? আর্য কে? নামটা সমিতার অচেনা লাগল।

আর্য রায়। আর্ট স্কুল থেকে এ বছর পাশ করে বেরিয়েছে। ভারি চমৎকার হাত ওর, আরো দু-একটা ছবি আমি দেখেছি, কিন্তু এমন একটাও উতরোয়নি।

একেবারে নতুন তাই সমিতা নাম শোনে নি। কিন্তু হোক নতুন, এ ছবিতে নতুনের প্রতিশ্রুতি নয়, পাকা শিল্পীর আঁচড় ফুটে উঠেছে। এমন একটা ছবি হাজারে চোখে পড়ে না।

বাঁক ঘুরতেই দেখা।

সমিতা একটু অন্যমনস্ক ছিল। হাতের প্রোগ্রামটার ওপর চোখ বোলাচ্ছিল হঠাৎ সুবিমলবাবুর গলার আওয়াজে মুখ তুলল।

আরে এই যে আর্য, অপূর্ব হয়েছে তোমার ছবি। এ এক্সজিবিশনের সেরা জিনিস।

দেয়ালের পাশে দীর্ঘ চেহারার একটি ভদ্রলোক। ব্যাকব্রাশ চুল, তীক্ষ্ণ নাসা, দুটি চোখ আয়ত ততটা নয়, কিন্তু উজ্জ্বল। গায়ের রং শ্যাম।

সাদা পাঞ্জাবির ওপর সাদা শাল। মুখে অমায়িক হাসি।

এস সমিতা, আলাপ করিয়ে দিই, সুবিমলবাবু এগিয়ে গেলেন, এই হচ্ছে সমিতা, মিসেস সমিতা সান্যাল। ডক্টর মহীতোষ সান্যালের স্ত্রী। এক সময়ে আমার ছাত্রী ছিল। ছবি আঁকার হাতও ছিল চমৎকার। আর এ হচ্ছে আর্য রায়, যার আঁকা ছবির আমরা এতক্ষণ তারিফ করছিলাম।

সমিতা নমস্কার করার আগেই আর্য হাত জোড় করলে। হেসে বলল, এখন আঁকেন না বুঝি?

না। সমিতা ঘাড় নাড়ল।

হাত থেকে তুলি ফেললেন কেন? আর্য অন্তরংগ ভংগীতে প্রশ্ন করল।

তুলি না ফেললে, হাতা খুন্তি ধরব কি করে? সমিতা হাসতে হাসতে উত্তর দিল।

তারপর এক সংগে তিনজন অনেকক্ষণ ধরে ঘুরল। মাঝখানে সমিতা, দুপাশে সুবিমলবাবু আর আর্য।

প্রদর্শনী থেকে বেরিয়েও আর্য সংগ ছাড়ল না। পাশের ক্যাফেটেরিয়াতে ঢুকল। সমিতার আপত্তিতে একটুও কান দিলে না।

ছাড়াছাড়ি হবার সময় সমিতা বলেছিল। নিছক ভদ্রতা হিসাবেই। তার এক চুল বেশী কিছু নয়।

একদিন আসুন না আমাদের বাড়ি। সতেরো, উড এভেনিউ।

মন্ত্র জপ করার মতন বিড়বিড় করে আর্য ঠিকানাটা মুখস্থ করেছিল।

আসবার আগে একবার ফোন করে নেবেন। তাহলে বাড়িতে থাকব। ফোন নম্বরটা সমিতা বলেছিল আর সংগে সংগে পকেট থেকে কাগজ বের করে আর্য লিখে নিয়েছিল।

এটুকু পর্যন্ত স্বাভাবিক। প্রথম পরিচয়ের পরে এটুকু মানুষের জীবনে অহরহ ঘটছে।

কিন্তু সমিতা বিস্মিত হয়েছে তার পরের দিন।

খাওয়া দাওয়া সেরে কৌচে হেলান দিয়ে একটা বিলিতি ম্যাগাজিন পড়ছিল। মেয়েদের ফ্যাসন সম্বন্ধে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল।

বান্ধবীদের কেউ মনে করে সমিতা আস্তে আস্তে উঠে ফোন ধরেছিল, কে?

আমি আর্য। মিসেস সান্যাল আছেন?

স্পষ্ট উচ্চারণ। গম্ভীর গলার স্বর। সমিতার মনে হল আর্য রায় যেন চৌকাঠের ওপারে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

সমিতা একটু সামলে নিল নিজেকে। হাতল ধরা হাতটা অল্প কাঁপছে। বুঝি মনটাও। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে বলল, বলুন, আমি মিসেস সান্যাল কথা বলছি।

সমিতা দেবী। আরো কাছে মনে হল গলার আওয়াজ। যেন একেবারে পাশে।

হুঁ। বলুন।

আপনি দেখা করার কথা বলেছিলেন? আগ্রহে কেঁপে উঠল আর্যর গলা। সমিতা একটু দম নিল। আশ্চর্য লোক তো। কাল বলেছে বলে আজই দেখা করতে হবে এ কেমন কথা।

সমিতা বিরক্তিতে ভ্রূ কোঁচকাল কিন্তু গলায় বিরক্তির রেশ ছোঁয়াল না। বলল, কবে আসবেন বলুন?

সংগে সংগে ওদিক থেকে আওয়াজ এল, আজ? অসুবিধা হবে আপনার?

আবার সমিতা দম নিল। আজই, আজই দেখা করতে চায় আর্য রায়! এত তাড়াতাড়ি। ঠোঁট চেপে সমিতা ভাববার ভান করল। একটু পরে বলল, আজ, আজ অসুবিধা রয়েছে। বিকেলে মিস্টার থাডানির বাড়িতে একটা পার্টি আছে।

বেশ, আর্য রায়ের সপ্রতিভ গলার আওয়াজ শোনা গেল, তবে কাল দেখা হতে পারে।

কাল? কখন? সমিতা জড়িয়ে জড়িয়ে কথাগুলো বলল।

ধরুন, সন্ধ্যার দিকে। এই সাতটা নাগাদ।

আচ্ছা, ঠিক আছে। টেলিফোনটা নামিয়ে রাখার মুখেই সমিতা বাধা পেল। আর্য রায়ের কথা শেষ হয়নি।

আর একটা কথা।

বলুন?

বাড়িতে যাব না আপনার।

সমিতা বিস্মিত হল। এ আবার কি কথা। বাড়িতে আসবে না তো কোথায় দেখা করতে হবে। অন্যায় আবদারেরও একটা সীমা থাকা দরকার।

দাঁত দিয়ে সমিতা ঠোঁটটা কামড়াল। দেহের ভংগীই শুধু নয়, আপনা থেকেই গলার স্বরও রুক্ষ হয়ে গেল।

বাড়িতে নয় তো, কোথায় দেখা করতে হবে আপনার সংগে? আর্য রায়ের উৎসাহ অম্লান। রুক্ষ গলার স্বরটা যেন কানেই তুলল না, একটু হেসে বলল, বাইরে কোথাও যেখানে হোক। ধরুন, আর্য একটু যেন ভাববার চেষ্টা করল, আর্ট স্কুলের সামনের ফুটপাথের ওপর। সাড়ে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে। আমি অবশ্য সাড়ে ছটার আগে থেকেই অপেক্ষা করব। সমিতার কপালে

ঘামের বিন্দু। তালু পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ। আঁচল দিয়ে কপাল মুছে নিল, তারপর প্রত্যেকটি কথার ওপর জোর দিয়ে বলল, কিন্তু বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। যদি দেখা করতে হয়, বাড়িতেই করবেন। নম্বর তো আপনার জানা।

সমিতার কথা শেষ হবার আগেই আর্যর গলা ভেসে এল।

দোহাই আপনার। একটা অনুরোধ। কেন বাড়িতে দেখা করতে চাইছি না তা কাল দেখা হলে বলব। তাহলে ওই কথাই রইল। কাল, আর্ট স্কুলের সামনে, সাড়ে ছটা থেকে সাতটা।

খুব আস্তে, প্রায় অস্পষ্ট গলায় সমিতা বলল, আচ্ছা।

আর উত্তরটা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সমিতা শিউরে উঠল। ছি, ছি, এ কি করল সে। এমন একটা অন্যায় অনুরোধে কি করে রাজী হল। সমিতার ইচ্ছা হল, টেলিফোনের ওপর মাথাটা ঠুকবে। হাতলটা তখনও হাতে ধরা। নামিয়ে রাখার কথাটাও মনে হয়নি। আর্য রায়ের টেলিফোন নম্বরটাও তার জানা নেই, যে আবার টেলিফোন করে যেতে পারব না সে কথাটা তাকে জানিয়ে দেবে।

আস্তে হাতলটা রেখে দিয়ে দু-হাতে মাথা চেপে সমিতা পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। মাথাটা ঘুরছে। চোখের সামনে অজস্র কালো কালো হিজিবিজি আঁচড়। অসংখ্য বীজাণুর মতন।

কি করল সমিতা। এ কি করল?

অনেকক্ষণ পরে সমিতার খেয়াল হল চাকরের ডাকে। চায়ের কাপ হাতে করে গণেশ এসে দাঁড়িয়েছে। ঠিক তিনটেয় চা খাওয়া সমিতার বহুদিনের অভ্যাস।

আয়েস করে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সমিতা সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখেছে। অনুরোধটা অস্বাভাবিক শুধু নয়, যথেষ্ট পরিমাণে অশোভন। মর্যাদা আছে সমিতার, সম্ভ্রমবোধ আছে। শুধু নিজের নয়, তার সঙ্গে একটা পারিবারিক সম্মানও জড়িয়ে রয়েছে। এইভাবে পথেঘাটে মানুষের সঙ্গে দেখা করতে হবে এই বা কি কথা। তাও পরিবারের কোন আত্মীয় হয়, কিংবা বহুদিনের চেনা কোন বন্ধু, তা হলেও ব্যাপারটা কিছুটা ভদ্র হত। তা নয়, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আলাপের উটকো এক আর্টিস্ট।

সমিতার নিজের হাতটা কামড়াতে ইচ্ছা করল। দেখা করতে পারবে না অনায়াসেই তো একথাটা বলে দিতে পারত। এমন একটা লোকের সঙ্গে বাড়িতেও দেখা করা উচিত নয়। স্পষ্ট বলে দেওয়া উচিত, কঠিন গলায়। কণ্ঠস্বরে নিস্পৃহতার তুষার ঢেলে।

চেয়ার ছেড়ে সমিতা জানলায় গিয়ে দাঁড়াল। পাশের বাড়ির ছাদে ছোট ছোট ছেলেদের জটলা। একটা ঘুড়ি নিয়ে সবাই টানাটানি করছে। চিৎকার করছে সমস্বরে।

নিশ্বাস ফেলে সমিতা সরে এল। চেয়ে চেয়ে ঘরটার এদিক ওদিক দেখল। সাজানো গোছানো ফিটফাট ঘরদোর। প্রত্যেকটি জিনিস ঠিক জায়গায়। জিনিস সরাবার, ফেলবার, ভাঙবার কোন উপদ্রব এ বাড়িতে নেই। নিস্তব্ধ সব কিছু। কোন শিশুর কাকলিতে এ নিস্তব্ধতা ভাঙবে এমন আশাও ক্ষীণ।

আঁচল দিয়ে চোখ চেপে সমিতা খাটের ওপর গিয়ে বসল। অসম্ভব জ্বালা করছে দুটো চোখ। রাগ, লজ্জা, ঘৃণা, বিতৃষ্ণা সব মিলিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি।

বাড়ির মানুষটা শুধু বাড়িরই মানুষ, কাছের কেউ নয়। অফিস থেকে ফিরে কোনরকমে চা জলখাবার মুখে ঠেকিয়েই ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢোকে। মাস ছয়েক তো একেবারেই সময় নেই। কোন তরল পদার্থের মধ্যে কি একটা কালো বিন্দু বুঝি দেখা গেছে। বিন্দু নয়, অমিত সম্ভাবনা। আরো কতকগুলি রঙীন তরল পদার্থের মিশ্রণে সেই বিন্দু বিধাতার আশীর্বাদে রূপান্তরিত হবে, বিশেষ করে ডায়াবেটিক রোগীদের কাছে। প্যানক্রিয়াসের ক্ষরণ যে রোগীর দেহে প্রায় নিশ্চিহ্ন, এই তরল সোনার রশ্মি পুনরুজ্জীবিত করবে সেই ক্ষরণের ধারা। ফলে রক্তের সঞ্চারিত বাড়তি শর্করার ভাগ বিলুপ্ত হবে। তিল তিল করে ক্ষয়ের সম্ভাবনা থেকে রোগী মুক্তি পাবে।

ব্যাপারটা আরো বিস্তারিতভাবে মহীতোষ একদিন সমিতাকে বুঝিয়েছিলেন। ডিনার টেবিলে। রসায়নের সুক্ষ্মতম রহস্যের জাল মেলে ধরেছিলেন তার সামনে। দুরূহ ফরমুলার গোপন ইঙ্গিত। ধাপে ধাপে কিভাবে গবেষণার পথে এগোচ্ছেন তার কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী। আর

দেরী নেই। শুধু গোটা চল্লিশ পঞ্চাশ কেমিকেলের স্পর্শে কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটুকু মহীতোষ লক্ষ্য করবেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ডায়বেটিসকে ধরাশায়ী করার পাশুপত অস্ত্র এই কয়েকটি কেমিকেলের মধ্যেই রয়েছে। তারপর, তারপরের কথা বলতে বলতে মহীতোষ উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। এক হাতে চামচ নিয়ে আর একটা হাত শূন্যে ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলেছিলেন, সারা পৃথিবীতে হৈ চৈ পড়ে যাবে এ আবিষ্কার নিয়ে। লোকে আমাকে নিয়ে কি যে করবে তাই ভাবছি।

সমিতা একটি কথাও বলেনি। বলেনি কারণ, ব্যাপারটার অর্ধেকের বেশীই সে বোঝেনি, মহীতোষের যথেষ্ট সরল করে বুঝিয়ে বলা সত্ত্বেও।

কেবল মহীতোষ যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত গলায় বলেছিলেন, বল, বল, এখন আমি কি করি? তখন সমিতা শান্ত, নিস্পৃহ গলায় বলেছিল, এখন পরিজটা তো খেয়ে নাও।

মহীতোষ আর একটি কথাও বলেননি। চুপচাপ চেয়ারে বসে পরিজটা শেষ করেছিলেন।

দু একটা খুচরো কথাবার্তা তবু চলত চায়ের টেবিলে। তাও মহীতোষ বেশীর ভাগ বলতেন অফিসের কথা। বাড়ির গবেষণার কথাটা তিনি ঘুণাক্ষরেও অফিসের লোকদের জানতে দেননি। এ তাঁর নিজস্ব। এ প্রায় তাঁর সাধনার সগোত্র। অফিসে ফরমায়েসী ওষুধ তৈরীর ব্যাপার। বাঁধা ফরমুলার মাপা ডোজের কারবার। আইন বাঁচিয়ে পরের ফরমুলা হাতড়ানোর কারসাজি। ওখানে মহীতোষের শুধু দুটো হাতই কাজ করে, মস্তিষ্ক থাকে প্রায় নিষ্ক্রিয়। কিন্তু বাড়িতে একেবারে অন্য ব্যাপার। চিন্তার তরঙ্গে শরীরের প্রতি অণু পরমাণু চঞ্চল। নিজেকে প্রায় সৃষ্টিকর্তার সমপর্যায়ের বলে মনে হয়। ওই ছোট্ট কালো বিন্দুর আড়ালে সমস্ত সংসার চাপা পড়ে যায়। মহীতোষ পরিবেশ ভুলে যান।

দরজায় গাড়ির শব্দ হ'তেই সমিতা সচকিত হ'য়ে উঠল। মহীতোষ ফিরেছেন। অফিসের গাড়ি তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

অনেকদিনই এই সময়টা সমিতা বাড়ি থাকে না। হয়তো ইংরেজ-পাড়ার কোন সিনেমায় গিয়ে বসে থাকে কিংবা পুরনো কোন বান্ধবীর বাড়ি। সেদিন কিন্তু সমিতা এগিয়ে গেল। মনটা চঞ্চল। গল্পগুজবে যদি মন ঠিক হয়। কিন্তু বিধি বাম।

মহীতোষ নামলেন। তার পিছনে গনেশ। হাতে জাল ঢাকা বাক্স।

বাক্সের মধ্যে কি আছে সমিতার অজানা নয়। এর আগেও এমন ব্যাপার বহু হ'য়ে গেছে। এক জোড়া খরগোশ। একটা একটা করে হত্যা করবেন মহীতোষ। এরা তাঁর বিজ্ঞানের বলি। শুধু হত্যা করেই শেষ নয়, পেট কেটে নাড়ি ভুঁড়ি বের করে বিশ্রী এক কাণ্ড। কতদিন অন্ত্রগুলো যে আরক ভর্তি কোরে ডোবানো থাকবে তার ঠিক নেই। ল্যাবরেটরিতে পা দেওয়াই দুষ্কর।

আবার তুমি নিরীহ খরগোশ এনেছ? বিরক্তি চাপতে পারল না সমিতা।

নিরীহ মানুষ আর পাচ্ছি কোথায়, বল? মানুষ পেলে তো আমার খুবই সুবিধা হ'ত। প্যানক্রিয়াসের রি-অ্যাকশনটা স্টাডি করতে পারতাম। গ্ল্যাণ্ডের ব্যাপারটা বোঝার পক্ষেও সুবিধা হ'ত।

দু হাতে কান চাপা দিয়ে সমিতা সরে এল। সরে না এলে নিস্তার নেই। এখনি অজস্র গ্ল্যাণ্ডের নাম ঝরে পড়বে। থাইমাস, থাইরয়েড, পিটুইটারি।

চা জলখাবার নিয়ে সমিতা আর একবার চেষ্টা করল। মহীতোষ ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়লে অকূলে পড়বে সমিতা। দুপুরের চিন্তাটা আবার সহস্রপাকে তাকে জড়িয়ে ধরবে। সেই অজগর-চাপে দেহ মন দুইই নিষ্পেষিত।

আমার একটা কথা শুনবে? সমিতা ঝুঁকে পড়ল মহীতোষের দিকে। চায়ের কাপ এগিয়ে দেবার ছুতোয় তার দেহটা ছুঁয়ে দিল।

মহীতোষ নির্বিকার। অফিস থেকে খবরের কাগজের কি একটা টুকরো কেটে এনেছিলেন, চোখ আর মন দুইই সেদিকে।

সমিতার দু ভ্রূর মাঝখানে বিরক্তির আঁচড়। হায়রে, এমন একটা মানুষকে আঁকড়ে ধরে সে বাঁচবার চেষ্টা করছে।

অনেকক্ষণ পরে মহীতোষ মুখ তুললেন। কাগজটা ভাঁজ করে হাতের মুঠোর মধ্যে রেখে বললেন, কিছু বলছিলে আমায়?

মহীতোষের কথার ভঙ্গীতে সমিতার দু চোখে জল এসে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, কাল বিকেলে তোমার কোন কাজ আছে?

মহীতোষ হাসলেন। পাইপ ধরাবার ফাঁকে বললেন, আমাকে কি অকাজের ঢিপি বলে মনে হচ্ছে তোমার?

না, না, তা নয়। মেট্রোয় একটা ভাল ছবি এসেছে। চল না দুজনে যাই।

মহীতোষ রীতিমত বিস্মিত হলেন। নিভে যাওয়া পাইপটা নতুন করে জ্বালাতেও ভুলে গেলেন। পাইপটা ঠোঁট থেকে সরিয়ে সমিতার আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে বললেন, ব্যাপারটা কি? সব যেন কেমন নতুন ঠেকছে? কবে আবার আমি তোমার সঙ্গে সিনেমা থিয়েটারে যাই? মনটাকে মোগল যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গেলে কবে থেকে?

কেবল বাজে কথা। সমিতা খিঁচিয়ে উঠল, কেন একদিন আমার সঙ্গে গেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হবে তোমার।

মহাভারত অশুদ্ধ হবে না, মহীতোষের হাসি অম্লান, কিন্তু খরগোশের দেহটা বাসি হবে। শুভকর্মে বিলম্ব করা শাস্ত্রের নিষেধ। কাল বিকেলেই একটাকে ডিসেক্ট করব।

একটা স্যাণ্ডউইচ সমিতা মুখে তুলতে যাচ্ছিল, মহীতোষের কথায়, গা ঘিন ঘিন করে উঠল। প্লেটের ওপর স্যাণ্ডউইচটা আছড়ে ফেলে সমিতা উঠে পড়ল।

পরেরদিন ভোরে সমিতা মন ঠিক করে ফেলল। দেখা করবে না আর্য রায়ের সঙ্গে। এরপরে যদি কোনদিন মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়, শরীর খারাপের একটা অজুহাত দিলেই হবে।

দুপুরে পর্যন্ত ভালই কাটল। কেবল বেলা আড়াইটে নাগাদ টেলিফোনটা বেজে উঠতেই সমিতা চমকে উঠে বসল। আর্য রায় আবার নতুন কোন মতলব বের করল নাকি। কিংবা হয়তো বুঝতে পেরেছে এতক্ষণ পরে যে স্বল্পজানা কোন মেয়েকে পথে ঘাটে এভাবে দেখা করার কথা বলা অশালীন।

দুরু দুরু বুকে সমিতা ফোন ধরল। না, আর্য রায় নয়। বান্ধবী বিশাখা। বিশাখা সেন। সারাজীবন বিয়ে করবে না এমন একটা দুরূহ পণ করে, শেষকালে যৌবনের চৌকাঠ প্রায় পার হবার মুখে স্কুলের আধবুড়ো কেরানী ভবতারণবাবুর গলায় মালা দিল। বিশাখা সমিতার চেয়ে বড়। বয়সের চেয়েও গম্ভীর, কিন্তু বিয়ে করার পর থেকে কেমন প্রগলভা হয়ে গেছে। কথায় কথায় খিল খিল হাসি। মাঝে মাঝে ফোন করে সমিতাকে। নিজে রঙে ডগমগ, ইচ্ছা করেই সে রঙের ছিটে সমিতার দিকে ছড়িয়ে দেয়।

বেলা পড়তেই সমিতা নীল কাঞ্জিভরম শাড়ীটা অঙ্গে জড়াল। গায়ে দিল সেই রঙেরই ব্লাউজ। পরিপাটি সাজল। ফুলদানি থেকে পট-লোটাস নিয়ে খোঁপায় গুঁজল। অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ফিরে আয়নায় নিজেকে দেখল।

বাড়িতে থাকা চলবে না। ওষুধের গন্ধে এখনি ঘরের বাতাস ভারি হয়ে উঠবে। খরগোশ-হত্যার পালা শুরু হবে। বাড়ি থেকে সমিতাকে পালাতেই হবে। যেখানে হোক, যার কাছে হোক। যে কোন একটা সিনেমার সামনে নেমে টিকেট কেটে ভিতরে গিয়ে বসবে। দীর্ঘ আড়াই ঘণ্টার জন্য নিশ্চিন্ত।

বাস থামতেই কতকটা অনামনস্কভাবেই সমিতা নেমে পড়ল। নেমেই কপাল চাপড়াল। যখন সচেতন হ'ল তখন বাস ছেড়ে দিয়েছে। আর্টস্কুলের সামনে ফুটপাথের ধারে কাছে কেউ নেই।

আশ্চর্য যে লোকটাকে এড়াবার জন্য এত তোড়জোড়, মনকে পলে পলে এত ধমক দেওয়া, তাকে ঠিক জায়গায় দেখতে না পেয়ে সমিতা বেশ হতাশ হ'ল। আচ্ছা, ভদ্রলোক তো! কথা দিয়ে কথা রাখার বালাই নেই। এর পরে কোনদিন সামনা-সামনি হ'লে সমিতা ঠিক মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। হাজার ডাকেও ঘাড় ফেরাবে না।

রাস্তা পার হ'তে গিয়েই সমিতার নজরে পড়ল। ময়দানের এক বেঞ্চের ওপর আর্য বসে রয়েছে।

সমিতা এগিয়ে লোকটার মুখোমুখি দাঁড়াল, তারপর চটিটা ঘাসের ওপর ঘসতে ঘসতে বলল, কি, ডেকেছেন কেন, বলুন?

আর্য বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হেসে বলল, অমনভাবে উকিলের জেরা করলে মানুষ উত্তর দিতে পারে কখন? আসুন ময়দানের ঘাসের ওপর বসি, তারপর সব বলব।

সামান্য একটু দ্বিধা আর জড়তা, কিন্তু সব কাটিয়ে সমিতা ঘাসের ওপর বসল। আর্যর সঙ্গে অনেকটা ব্যবধান রেখে।

কি এবার আমার কথার উত্তর দিন? সমিতা পুরানো প্রশ্নের জের টানল। আর্য হাতযোড় করল। বলল, যদি অপরাধ না নেন তো বলি।

সমিতা ভ্রূ কোঁচকাল। ভদ্রলোকের মাথার ঠিক আছে তো। নয়তো পরিচয়ের দ্বিতীয় দিনে এমন সুরে কেউ কথা বলে!

সমিতা অসহিষ্ণু গলায় বলল, কি বলবেন বলুন। আমার বেশীক্ষণ বসার উপায় নেই। বাড়িতে অতিথি আসবে।

আর্য হাসল। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল আর গাল মুছে নিয়ে বলল, বাড়িতে পাইনি তার কারণ সেখানে আপনি বড্ড মিসেস সান্যাল। সারা গায়ে আপনার সংসারের গন্ধ।

এবার সমিতা চটল। ভদ্রলোক মাত্রা ছাড়াচ্ছে। সাধারণ ভদ্রতা জ্ঞানটুকুও হারিয়েছে।

কি পাগলের মতন যাতা বকছেন? আমি তো মিসেস সান্যাল। কি ঘরে, কি বাইরে। সংসারী মানুষের গায়ে সংসারের গন্ধ থাকবে না?

আর্য বলল, না আপনাকে আমি সেভাবে দেখতে চাইনি। এই যে এখানে আপনি বসেছেন। ওপরে সন্ধ্যার আকাশ, হাজার তারার চুমকি বসানো। আশে পাশে দূর প্রসারিত প্রান্তর। আধো অন্ধকারে আপনাকে দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না ভাল করে। আপনি বৃন্তহীন পুষ্প। পৃথিবীর অনন্ত সমারোহের একটা অংশ। ক্যানভাসের ওপর কয়েকটা আঁচড়ে এই মুহূর্তে আপনার যে রূপ ফুটে উঠতে পারে তা বিশেষ কোন সংসারের নয়। কোন একটা মানুষের তাতে দাবী থাকতে পারে না।

সমিতা অভিভূত হ'ল, সেই সঙ্গে কিছুটা নিশ্চিন্তও। মনে ছিল না আর্য আর্টিস্ট। সাধারণ পথে ঘাটে দেখতে পাওয়া যায়, এমন অজস্র লোকের কেউ নয়। সবার থেকে স্বতন্ত্র। মনের গড়নও অন্য রকমের। সমিতার যে রূপ ওর চোখে ফুটে উঠেছে তা শাড়ি ব্লাউজ জড়ানো, প্রসাধন করা নারী দেহ নয়, সম্পূর্ণ আলাদা একরূপ, যে রূপ শুধু বুঝি আর্টিস্টরাই দেখতে পায়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছু নয়, অতীন্দ্রিয় সত্তা।

সমিতা সহজ হ'ল। কোমল করল

কণ্ঠস্বর, কি ব্যাপার, আমাকে মডেল করে ছবি আঁকবেন নাকি?

উহুঁ, আর্য ঘাড় নাড়ল, মডেল হবার যোগ্যতা আপনার নেই।

একটু বিব্রত হ'ল সমিতা। লোকটার মুখের কোন আগঢাক নেই।

মডেল আর মডেলের ছবিতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। মডেলের সংগুণটুকু শুধু আমরা নিই, ধরুন তার প্রোফাইল, কিংবা চোখের দৃষ্টি, নয়তো অধরের গড়নটুকু। নিও ওইটুকু, তাকে সম্বল করে আমরা তুলির আঁচড়ে নতুন রূপ ফোটাই। অবশ্য ফটোগ্রাফ আর ছবি যে এক নয়, এই প্রাথমিক জ্ঞানটুকু আশা করি আপনার আছে।

সমিতা কোন উত্তর দিল না। উত্তর দেবার মতনও কিছু নেই। আর্যর বলার ভঙ্গিটি ভারি মনোরম। আপত্তি জানাতে ইচ্ছা করে না, তর্কের ঢেউ তুলতেও নয়, শুধু কান ভরে শুনতে সাধ হয়, প্রাণভরেও।

এবার যখন আসবেন তখন আপনার হাতের আঁকা ছবি দু একটা নিয়ে আসবেন দেখব।

সমিতা হাসল। খুব লঘু কণ্ঠে বলল, আমার আঁকা ছবি? সে সব কবে উনুনে চলে গেছে।

যেগুলো উনুনে গেছে, সেগুলো নিশ্চয় উনুনে যাবারই যোগ্য ছিল। কিন্তু সত্যি-কারের ছবি যেগুলো হ'য়েছিল, তা নিশ্চয় আপনার কাছেই আছে।

সমিতা চমকে উঠল। আর্য রায় দৈবজ্ঞ নাকি। এমনভাবে কথা বলে যে সামনে বসা সমিতাকেই শুধু নয়, তার ভূত ভবিষ্যৎ সব কিছু যেন তার কাছে দিনের আলোর মতন স্পষ্ট।

কথাটা সত্যি। আঁকার অভ্যাস সমিতা একেবারে ছাড়তে পারেনি। এখনো অলস মধ্যাহ্নে হাতে কোন কাজ না থাকলে রং আর তুলি নিয়ে বসে হিজিবিজি কাটে কাগজের ওপর। কোনটা ছবি হয়, কোনটা যে কি হয়, সমিতাও জানে না। নানা রঙের আঁচড় মনের পটে যে ছবি ফোটে আর একটু আভাসও কাগজের বুকে ফুটে ওঠে না। সমিতার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তুলি আছড়ে ফেলে, কাগজগুলো দলা পাকিয়ে জানলা দিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। দু একটা সত্যি সত্যিই উনুনের মধ্যেও যে না যায়, এমন নয়।

দু এক মিনিট কি চিন্তা করল সমিতা তারপর বলল, ঠিক আছে, ছবি আপনাকে দেখাতে পারি, কিন্তু এক শর্তে।

শর্ত বলুন?

আমাদের বাড়ি আপনাকে যেতে হবে। আপনার কথা আমি রেখেছি, এবার আমার কথা রাখবার পালা আপনার। ছবি আমি পথে ঘাটে বয়ে নিয়ে আসতে পারব না।

আর্য হাত দিয়ে নিজের মাথার চুলগুলো টানতে টানতে বলল, বেশ ঠিক আছে। এবারে আমি যাব আপনাদের বাড়ি। সতেরো, উড এভিনিউ।

সমিতা পরিহাস করার লোভ সামলাতে পারল না। বলল, ঠিকানাটা দেখছি বেশ মুখস্থ আছে।

আর্য হাসল, সব ঠিকানা মনে রাখবার জন্য নয়। কত ঠিকানা যে হারিয়ে গেছে তার আর লেখাজোখা নেই। ঠিকানা, মানুষ সব কোথায় তলিয়ে গেছে। কিন্তু এ ঠিকানা আলাদা, এ ঠিকানায় আসল মানুষটার সন্ধান মেলবার ষোল আনা সম্ভাবনা।

সমিতার সারা মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। ভাগ্য ভাল যে অন্ধকারে আর্যর চোখে পড়বার কথা নয়। ধরা পড়বার আশঙ্কাও কম। কিন্তু ধরা কি কেবল মানুষ বাইরের লোকের কাছেই পড়ে? নিজের কাছে ধরা পড়াটা আটকাবে কি ক'রে?

সমিতা দাঁড়িয়ে উঠল। হাত ঘড়ির ওপর আলতো নজর বুলিয়ে বলল, অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। এবার আমি বাড়ি যাব।

চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। সঙ্গে সঙ্গে আর্যও উঠে দাঁড়াল।

কোথায় এগিয়ে দেবেন? আমি তো বড় রাস্তা থেকে বাসে উঠব।

বাস এসে দাঁড়াতেই সমিতা লাফিয়ে উঠে পড়ল, আর্যকে অনুসরণের অবকাশ না দিয়ে।

আর্য বাড়ীতে এল দিন পাঁচেক পর। সমিতা সাজগোজ করে বেরোচ্ছিল, দরজা খুলেই দেখে আর্য দাঁড়িয়ে। আজ আর কাঁধে সাদা শাল নেই, পরিবর্তে রঙীন একটা নকশাকাটা র‍্যাপার। ব্যাকব্রাশ চুলে শুধু চিরুনি নয়, হেয়ার ক্রীমের ছোঁয়াও যেন রয়েছে।

আর্য দুটো হাত জোড় করে হাসল। অমায়িক হাসি।

একি আপনি? শুধু বিস্মিত নয়, সমিতা যেন একটু বিরক্তও হল, আগে খবর দেন নি তো?

কালবোশেখীর ঝড় দেখেছেন? কোথাও কিছু নেই, ঈশান কোণে সামান্য মেঘের টুকরো। একটু বুঝি বিদ্যুতের ঝিলিক তারপর হঠাৎ দমকা হাওয়ায় পৃথিবী বেসামাল। জানালা দরজার আছড়ানি, মানুষের চিৎকার, জিনিসপত্র তছনছ। খবর দিয়ে এলে কি এমন কাণ্ড হতে পারে।

তুলনাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারল না সমিতা। তা ছাড়া সদর দরজায় দাঁড়িয়ে এমনভাবে কাব্য করতেও তার ভাল লাগল না। রুমাল দিয়ে আলতোভাবে কপাল মুছে নিয়ে বলল, কিন্তু আজ তো আমাকে এখনি বেরোতে হবে। এক বান্ধবীর বাড়ি।

সামাজিক কোন ব্যাপার? আর্য আরো এক পা এগিয়ে এল।

না, সমিতা ঘাড় নাড়ল, এমনি, যাই নি অনেকদিন।

আর্য হাসল, তা হ'লে নাই বা গেলেন। তা ছাড়া, আমি এতদূরে থেকে যখন এসেছি।

আর্যর নরম গলার স্বরে সমিতা চমকে মুখ তুলল। কেমন ভিজে ভিজে গলা। দু চোখে অসহায় দৃষ্টি।

সমিতা দু এক মিনিট কি ভাবল, তারপর ফিরে সিঁড়ির ধাপে পা রেখে বলল, আসুন, ওপরে আসুন।

আর্য সমিতার পিছন পিছন ওপরে উঠে এল।

কৌচে বসেই আর্য বলল, কই, নিয়ে আসুন আপনার আঁকা ছবি।

সমিতা হাত দিয়ে জানালার পাল্লাটা খুলে দিতে দিতে বলল, দাঁড়ান, দাঁড়ান, আগে গৃহস্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।

গৃহস্বামী? আর্যর গলায় বিস্ময়ের ছোঁয়াচ।

কি, অবাক হলেন যে? সমিতা খিলখিলিয়ে হেসে উঠল, বৃন্তহীন পুষ্প যে নই তার প্রমাণ এখনি দিচ্ছি। একটু বসুন।

দ্রুতপায়ে সমিতা বেরিয়ে গেল। এ পাশের সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে ল্যাবরেটরির সামনে। আস্তে ভেজানো দরজাটা ঠেলে ভেতরে গিয়ে মহীতোষের পাশে দাঁড়াল।

একটা টেস্ট টিউবে তরল পদার্থ নিয়ে মহীতোষ বুনসেন বার্নারের ওপর ধরে নিবিষ্ট মনে কি লক্ষ্য করছিলেন। মাঝে মাঝে পেন্সিল দিয়ে সামনে রাখা খাতার ওপর কি সব লিখেও নিচ্ছিলেন।

একটু দাঁড়িয়ে সমিতা গলার শব্দ করল। নকল কাশি।

মহীতোষ মুখ তুললেন না। হাত নেড়ে সমিতাকে বিরক্ত করতে বারণ করলেন।

একটু পরে আবার সমিতা চটির আওয়াজ করল, কিন্তু মহীতোষ নির্বিকার, আর একটা তরল পদার্থ সাবধানে টেস্ট টিউবের মধ্যে ঢালতে শুরু করলেন।

সমিতা বুঝল অপেক্ষা করা বৃথা। কাজ শেষ না হলে মহীতোষ মুখও তুলবে না। ওঠা তো দূরের কথা।

অনেক বেছে বেছে সমিতা নিজের গোটা চারেক ছবি নিয়ে আবার ঘরে ঢুকল।

আর্য চেয়ারে নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো একটা ফটো দেখছে।

সেদিকে চোখ ফিরিয়েই সমিতা লাল হয়ে গেল লজ্জায়। সমিতার ফটো। অনেক বছর আগে তোলা। কালো পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পিছনে শান্ত আরব সাগর।

ইচ্ছা করে চেয়ারটা সমিতা টানল। শব্দ করে।

আর্য মুখ ফেরাল। দু চোখে বিস্ময়ের আমেজ। বলল, আমার চোখ প্রথম দিনই ভুল দেখে নি। সত্যিই আপনি সুন্দরী।

সমিতার মনে হল সারা দেহের রক্ত যেন মুখে এসে জমেছে। বেতসপাতার মতন কাঁপছে শরীর। কথা বলার চেষ্টা করে লাভ নেই। কোন কথাই বলতে পারবে না।

আর্য সামনে এল। দুটো হাত সমিতার কাঁধে রেখে মোলায়েম গলায় বলল, নিন, মুখটা তুলুন। আর একবার দেখি। আর্টিস্টের চোখ কখনও ভুল দেখে না।

সমিতা শিউরে উঠল। হাত নয় যেন প্রাগৈতিহাসিক কোন জন্তুর দুটো থাবা এসে পড়েছে গায়ের ওপর। দুঃসহ টানে অতল অন্ধকারে নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হাত থেকে ছবিগুলো ছিটকে মাটির ওপর পড়ে গেল। সমিতা নিজেকে সরিয়ে নিল আর্যর সান্নিধ্য থেকে। আঁচল দিয়ে মুখটা ঢেকে কৌচের ওপর বসে কিছুক্ষণ দম নিল। বুকের মধ্যে দ্রুত স্পন্দন। দু হাত দিয়ে বুক চেপেও নিজেকে শান্ত করতে পারল না।

কি লোক আপনি? সমিতা চিৎকার করে উঠল।

আর্য নির্বিকার। মেঝে থেকে ছবিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এক মনে দেখছে।

চেয়ে চেয়ে সমিতা দেখল।

পৌরুষব্যঞ্জক চেহারা। জ্ঞান নেই আর্যর। দু চোখের দৃষ্টিতে একাগ্রতার প্রদীপ।

একটা কথা।

সমিতা কথা বলল না, কেবল আর্যর দিকে ঝুঁকে পড়ল।

এত চড়া রঙ ব্যবহার করেন কেন? আর্য একটা ছবি তুলে নিয়ে সমিতার সামনে ধরল, দর্শকের চোখ রঙেতেই আটকে যায়, ছবির বিষয়বস্তু, রেখা, কম্পোজিশন এগুলো যেন চাপা পড়ে যায় রঙের আড়ালে।

সমিতা ছবির দিকে দেখল। বোধ হয় শিলঙে আঁকা। পাইন গাছের গুঁড়িতে একটি খাসিয়া মেয়ে। সামনে স্তূপীকৃত কমলালেবু। রঙ ছড়াবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল তাই সমিতা যথেচ্ছা রঙ ছিটিয়েছে। ছবিটা দু একজনের ভালও লেগেছিল, কিন্তু আর্যর চোখ আলাদা। তার জিনিসকে দেখার ভঙ্গীও বিচিত্র।

হঠাৎ যেন খেয়াল হ'য়েছে এইভাবে আর্য জিজ্ঞাসা করল, কই ডক্টর সান্যাল এলেন না?

বিরত হ'ল সমিতা। যে ক্ষত স্থানটা সে প্রাণপণে ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে, মানুষ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কেবল সেখানটাই অনাবৃত করতে চায়।

কুণ্ঠিত গলায় বলল, উনি ল্যাবরেটরিতে ব্যস্ত রয়েছেন।

সমিতার কথা শেষ হবার আগেই আর্য হেসে উঠল। প্রাণখোলা দরাজ হাসি। একজন কাটান ল্যাবরেটরিতে, আর একজন স্টুডিয়োয়, কি বিচিত্র জীবন আপনাদের!

সমিতা শিউরে উঠল। আপাদমস্তক। মনে হল সামনে বসা লোকটা শুধু রং আর রেখার ব্যাপারেই কুশলী তাই নয়, গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান সম্বন্ধেও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। নয়তো সমিতার দৈনন্দিন দীনতার যথার্থ রূপ কি করে জানতে পারল।

সমিতা কোন উত্তর দিল না। আর্য কোন উত্তর প্রত্যাশাও করে নি। ততক্ষণে অন্য ছবির দিকে চোখ ফিরিয়েছে।

এক সময়ে ছবিগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে সমিতার দিকে ফিরে বলল, আপনি ছবি আঁকতে সত্যি ভালবাসেন, না এমনি মর্জি মতন আঁকেন? নেহাত চারুকলা দু-একটা শিখে রাখা রেওয়াজ, তাই বসেন রং আর তুলি নিয়ে?

এক সময় আঁকতে ভাল লাগত। সমিতা প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিষ মেশান কণ্ঠে বলল, এখন মোটেই ভাল লাগে না। মনে হয়, আঁকতে বসা শুধু রং আর সময়ের অপব্যবহার।

আপনার ছবি দেখেও অবশ্য তাই মনে হয়। ছবি আঁকার পদ্ধতির যে মূলে কনসেপশন তাই আপনার নেই।

কথাটা চাবুকের মতন সমিতার গায়ে লাগল। এই অহঙ্কারী, দুর্বিনীত লোকটার স্পর্ধা ক্রমেই আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা করছে। সমিতারই বাড়িতে বসে, তার ছবি সম্বন্ধে অহেতুক এমন সমালোচনা করার সাহস কোথা থেকে আর্য রায় অর্জন করল।

সমিতা কঠিন হল, মিস্টার রয়, আপনি গোড়াতেই একটু ভুল করছেন। আমি ছবিগুলো শাড়িতে ঢেকে আপনার বাড়ির

দরজায় গিয়ে দাঁড়াই নি, আপনার মতামতের অপেক্ষায়। আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন, আর ছবিগুলো দেখতে চেয়েছেন বলেই এগুলো আপনাকে দেখিয়েছি। ছবি আঁকার পদ্ধতির মূল কনসেপশন হয়তো আমার নেই, কিন্তু সাধারণ ভদ্রতার কনসেপশনটুকু যে আপনার আছে, হাবে ভাবে এমন তো মনে হ'চ্ছে না।

সমিতা আশা করেছিল, এমন একটা আঘাতে আর্য হয় তো গুটিয়ে যাবে, নীল হবে বেদনায়, কিন্তু তেমন কিছুই হ'ল না। আর্য হেসে উঠল, সত্যি রাগ করলে আপনাকে এত সুন্দর দেখায়। মনে হয় দু গালে কে যেন গোলাপী রং উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে। স্বীকার করছি, আমার নাম আর্য হ'লে কি হবে, কথাবার্তাগুলো আমার একটু অনার্যজনোচিত, কিন্তু বিশ্বাস করুন উদ্দেশ্য আমার অসাধু নয়। ছবি আঁকার পিছনে যদি পলায়নী মনোবৃত্তি থাকে তবে সে ছবি থেকে নিজে হয়তো কিছুটা পরিতৃপ্তি পেতে পারেন, কিন্তু ছবি হিসাবে তার মান খুব বেশী উঁচুতে নয়।

তার মানে?

মানে, পৃথিবী থেকে বাঁচবার জন্য তুলি নিয়ে বসবেন না, পৃথিবীকে ভালবেসে রংয়ের আসর সাজান।

এবারেও বুঝলাম না। সমিতা সত্যিই বোঝে নি। সেটা তার দু চোখের তারায় অকপটে ফুটে উঠল।

এর চেয়ে ভাল করে বোঝানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সৌন্দর্যতত্ত্বের সোজা মানে-বই কিনে নেবেন, এখন বরং চা খাওয়ান এক কাপ।

সমিতা অপ্রস্তুত হ'ল। ছি, ছি, এমনিভাবে অতিথিকে বাড়িতে বসিয়ে একি কথা কাটাকাটির খেলা শুরু করেছে।

উঠে দাঁড়াল সমিতা, এক মিনিট, এখনি চা নিয়ে আসছি। দোষ তো আপনারই। এমনভাবে মেজাজটা খারাপ করে দিলেন কেন?

আর্য যখন উঠল তখন সাড়ে নটা। সমিতা হিসাব করে দেখল প্রায় তিন ঘণ্টার কাছাকাছি সে ছিল। এর মধ্যে ছবির কথা ছাড়া আরো অনেক কথা হয়েছে। সব কথাই যে প্রয়োজনীয় এমন নয়। আর্যর বলার ভংগীতে নিরর্থক কথাগুলোও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, অন্তত সমিতার কাছে। সপ্রতিভ আর অদ্ভুতভাবে সচেতন। সব কথায় সমিতার মন সায় দেয় নি, কিন্তু প্রতিবাদ করার জোরও সে পায় নি, অবকাশও নয়, কারণ প্রসংগ থেকে প্রসংগান্তরে দ্রুত বিচরণ করেছে আর্য।

গণেশের ডাকে সমিতা উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণ দু হাতের মধ্যে মাথাটা রেখে চুপচাপ বসেছিল। চিন্তার ঢেউ আছড়ে পড়ছিল মনের বেলাভূমিতে। শুক্তি নয় অজস্র ঝিনুক ছড়িয়ে পড়ছিল ঢেউয়ের অঞ্জলিতে।

খাবার টেবিলে গিয়ে দেখল মহীতোষের খাওয়া প্রায় শেষ। তিনি কাঁটা দিয়ে শশার কুচি মুখে তুলছেন।

আমাকে আরো আগে ডাকলে না কেন? সমিতা অনুযোগ করল।

মহীতোষ মুখ তুলে দেখলেন। শশার কুচিটা গিলে ফেলে বললেন, তুমি কোথায় বেরিয়েছিলে না?

সমিতার ইচ্ছা হ'ল এই লোকটার সামনে ঠক ঠক করে দেয়ালে মাথা ঠোকে। রক্তপাত না হওয়া পর্যন্ত। আশ্চর্য লোক তুমি, সমিতা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে কোনরকমে উচ্চারণ করল, আর্য রায় এসেছিলেন, আলাপ করিয়ে দেবার জন্য ডাকতে গেলাম তোমাকে, তুমি হাত নেড়ে আমায় বিদায় করে দিলে। ছি, ছি, কি মনে করলেন ভদ্রলোক?

মহীতোষ শেষ শশার কুচিটা গালে ফেলে হাসলেন, কিছু মনে করেন নি ভদ্রলোক, বরং খুশীই হয়েছেন।

খুশী হয়েছেন? তেরচা চোখে সমিতা স্বামীর দিকে চেয়ে দেখল। গলার সুরটা যেন নতুন ঠেকছে! মুখের ভাষাটাও।

আমি তো মূর্তিমান বিঘ্ন। তোমাদের আসরে বেমানান। আনকোরা সিনেমার খবরও রাখি না, হালের ফ্যাশনের বিষয়ও নয়।

তোমার কি ধারণা আমাদের আলোচনার পরিধি ওইটুকুই। জানো, আর্য রায় কত বড় নামকরা শিল্পী।

চেয়ার নেড়ে মহীতোষ উঠছিলেন, সমিতার কথায় আবার বসে পড়লেন, শিল্পী অর্থাৎ?

অর্থাৎ আর্টিস্ট। ছবি আঁকেন এবং সে ছবি গুণী সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়।

মহীতোষ চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, দেশ স্বাধীন হবার পরে শিল্পী কথাটার প্রকৃত মানে বোঝা একটু মুশকিলের ব্যাপারই হ'য়েছে। যে মাদুর বোনে সেও শিল্পী আবার যে ইঁদুর ধরা কল তৈরী করে, সেও।

একটা শক্ত উত্তর সমিতার মনে হয়েছিল কিন্তু এই মুহূর্তে ভাল লাগছে না বাদ প্রতিবাদ করতে। মহীতোষের কেমন একটা ধারণা দুনিয়ার যত রস কেবল রসায়নে। ল্যাবরেটরির চৌকাঠের এ পাশের মানুষগুলো পৃথিবীর অনাবশ্যক আবর্জনা। তারা শুধু কেমিস্টদের কষ্টার্জিত সাধনার ফলভোগ করে। আর কিছু মূল্য তাদের দিতে মহীতোষ নারাজ।

সেদিন সকাল থেকে সমিতার মনটা খিঁচড়ে ছিল। ছোট বোন বাসবী এসেছিল স্বামীকে সংগে নিয়ে। তাদের মেয়ে রুমার জন্মদিন তারই নিমন্ত্রণ করতে। তাদের সামনে মহীতোষ একটি কথাও বলেনি। হাসি ঠাট্টা করেছে, কিছু কিছু গল্প গুজব। অবশ্য মাত্রানুযায়ী, যেটুকু মহীতোষের ধাতে সয়। কিন্তু তারা সিঁড়ি দিয়ে নামবার সংগে সংগেই সমিতাকে বলেছে, বললাম বটে যাব তবে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

সমিতা ফুলদানির জল বদলাচ্ছিল, ফিরে বলল, কেন?

কেন তাতো তোমার অজানা নয়। হাতে জরুরী কাজ রয়েছে, তা ছাড়া বিলেতের ন্যাশনাল কোম্পানীর ডিরেক্টর কলিনস্ আসবে আজ সকালে। কাল তাঁর বক্তৃতা আছে আমাদের অফিসে। আমি যাই কি করে?

কেন, বক্তৃতা তো আটটার মধ্যে শেষ হবে; তারপর যাবার ঢের সময় আছে।

আটটায় বক্তৃতা শেষ কিন্তু বক্তৃতায় আর কতটুকু বলবে কলিনস্। ওসব তো বাঁধা গৎ। লোকরঞ্জনের প্রয়াস। আমি তাঁর হোটেল অবধি ধাওয়া করব। মনের কথা নির্জন ছাড়া বলা যায়।

ফুলদানিটা সমিতা আছড়ে রাখল টেবিলের ওপর। ফুলগুলো ছিটকে পড়ল। কিছুটা জলও। পড়ুক। চুলোয় যাক ঘর সংসার। এ সবের ওপর সমিতার একটু মায়ামমতা নেই।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে সমিতা বলল, এ কথাটা সোজাসুজি বাসবী আর পুলকেশকে বলে দিলেই হত। ওদের কাছে মিথ্যে বললে কেন? খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রাখতে রাখতে মহীতোষ

হাসলেন, আত্মরক্ষার্থে মিথ্যে বলা ক্ষমার্হ। তুমি কাল ব্যাপারটা ম্যানেজ কর। কিছু একটা বলে দিও, যাতে সাপের আয়ু শেষ হয় আর লাঠির পরমায়ুও বজায় থাকে।

দায় পড়েছে আমার। কেন আমি তোমার জন্য লোকের কাছে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলতে যাব। যা বলবার তুমিই গিয়ে বলে এস। আমি যাবোও না, কিছু বলতেও পারব না।

সমিতার দু চোখে জলের ছিটে। আঁচল চাপা দিয়ে সে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বিকেল হতে মনটা সমিতা ঠিক করে নিল। আর কেউ যাক বা না যাক, বয়ে গেল সমিতার। নিজের বোন ভগ্নিপতির বাড়ি সে যাবেই। মহীতোষের কথা জিজ্ঞাসা করলে, স্পষ্ট জানিয়ে দেবে আর কে এল না এল, তার কৈফিয়ত সে দিতে পারবে না।

রোদ পড়তেই ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে নিয়ে সমিতা বেরিয়ে পড়ল। নাইলনের একটা ফ্রক কিনতে হবে। কাল বৃহস্পতিবার। দোকানপাট বন্ধ। কেনাকাটা আজকেই সারতে হবে। অনেক পছন্দ করে সমিতা একটা ফ্রক কিনল। ঠিক মনের মত রং অবশ্য পেল না, তবে এ রংটাও নিন্দার নয়। ফর্সা রুমার গায়ে ভালই মানাবে।

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে রাস্তা পার হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিপদ! সমিতা লক্ষ্য করেনি। একটু একটু করে মেঘ জমেছিল আকাশে। আচমকা বর্ষণ শুরু হল। শীতকালে এমন ব্যাপার সমিতা আশা করেনি। প্যাকেটটা শাড়ির আঁচল দিয়ে ঢেকে সমিতা দ্রুত পায়ে চলতে শুরু করল।

কিন্তু অসম্ভব। তীরের ফলার মতন বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে এসে পড়ছে। চুল বেয়ে, গাল বেয়ে জলের ধারা।

পাশে একটা বাড়ির প্রশস্ত গাড়িবারান্দা। ইতিমধ্যেই পথচলতি কিছু লোক আশ্রয় নিয়েছে। সমিতা ছুটে গিয়ে সেখানে দাঁড়াল। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে নিতে নিতেই চোখে পড়ল। কিন্তু তখন আর বাইরে বেরোনো যায় না। অজস্র ধারায় বর্ষণ নেমেছে।

আর্যরও হাতে একটা প্যাকেট। খাকি কাগজে মোড়া। গালে, কপালে বৃষ্টির ফোঁটা জমে রয়েছে। ব্যাক ব্রাশ চুলেও কয়েকটা বিন্দু।

সমিতা দেখেও না দেখার ভান করল, কিন্তু আর্য নাছোড়বান্দা। সমিতার পিছনে সরে এসে বলল, হায় পথবাসী, হায় গৃহহারা!

সমিতা সন্ত্রস্ত হ'ল। কিছু বলা যায় না, হয়তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের সব কটা বর্ষার কাব্য আবৃত্তি করবে। এমন লোকের কিছু অসাধ্য নেই।

আপনিও আটকে পড়েছেন? সমিতা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল।

এতক্ষণ আচমকা বর্ষণকে অভিসম্পাত দিচ্ছিলাম, এখন মনে হ'চ্ছে, বর্ষণ নয় বিধাতার আশীর্বাদ।

আশপাশে দাঁড়ান দু একজন মুখ টিপে হাসল। কেউ কেউ ফিরে আর্য আর সমিতাকে দেখল।

সমিতা তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ল, হাতে ও কিসের প্যাকেট?

আর্য প্যাকেটটা এক হাত থেকে আর এক হাতে নিল। হেসে বলল, আমার গোটা দুই ছবি আছে এতে। এক বিরাট ধনীর ছবি কেনার শখ হ'য়েছে, বন্ধুর মারফত খবর পেয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম।

হ'ল কিছু? বৃষ্টির ছাট থেকে বাঁচবার জন্য সমিতা একটু পিছিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল। হ'লে আর ছবিগুলো বগলদাবা করে নিয়ে আসি। ভদ্রলোক বেডরুম সাজাতে চান, নতুন বিয়ে করা তৃতীয় পক্ষের মনোরঞ্জন করবার জন্য। বললাম, সে সব ছবি আঁকি না। ভদ্রলোক মোটা টাকার লোভ দেখালেন, পাছে মেজাজ খারাপ হ'য়ে মারধোর করে বসি এই ভয়ে বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু ছবিগুলো ভিজবে বলে আর বেশী এগোতে পারলাম না, আর এক ধনীর গাড়িবারান্দার তলায় আশ্রয় নিয়েছি।

হঠাৎ আর্য গলার স্বর পালটাল, আপনার হাতে কি? ছবি নয় নিশ্চয়? সমিতা ঘাড় নাড়ল, না, ছবি নয়। ছবি সব ছিঁড়ে ফেলেছি। এটা ফ্রক, বোনঝির জন্য।

শেষের কথাটা আর্য কানে তুলল না। সমিতার দিকে দু পা এগিয়ে বলল, ছবিগুলো ছিঁড়লেন কেন?

ভাল হয়নি বলে?

কে বলল ভাল হয়নি?

এবার সমিতা ঘুরে দাঁড়াল, আপনি কি ভেবেছেন বলুন তো? আমি কি কচি খুকি?

আর্য হাসল, ফ্রকটা তো বোনঝির জন্য বললেন, না?

ওরই মধ্যে ভিড় একটু পাতলা। বৃষ্টি একটু কমেছে, সেই ফাঁকে কয়েকজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। কিছু লোক এখনও দাঁড়িয়ে। ছড়ানো ছিটোনোভাবে। ভাগ্যিস সকলের নজর বাইরের আবহাওয়ার দিকে তাই আর্যর কথাটা কারু কানে যায়নি। গেলে সমিতা মুখ লুকোবার ঠাঁই পেত না।

বৃষ্টি একটু কমেছে, দয়া করে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিতে পারবেন? সমিতার গলায় অনুরোধের ছোঁয়াচ।

এ আবার একটা কথা, একটু এগিয়েই আর্য পিছিয়ে এল, বলল, এই ছবির প্যাকেটটা একটু ধরবেন? দেখবেন বেশী চাপ দেবেন না, এমনিতেই ভিজে গিয়েছে, আপনার স্পর্শে বিগলিত না হয়।

মাথায় রুমাল বেঁধে আর্য বেরিয়ে পড়ল। ধারে কাছে ট্যাক্সির চিহ্ন নেই। দ্রুত পা ফেলে আর্য চৌরাস্তার দিকে এগোল।

মিনিট কুড়ি। আর্যর দেখা নেই। এর মধ্যে থেমে যাওয়া বৃষ্টি আবার জোরে এল। গাড়ি বারান্দার তলায় জল আসতে আরম্ভ করেছে। পায়ে পায়ে পিছিয়ে সমিতা বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

হঠাৎ বৃষ্টি ছাপিয়ে তীক্ষ্ন গলায় স্বর, সমিতা, সমিতা।

সমিতা চমকে উঠল। দেখল এদিক ওদিক, তারপরই নজরে পড়ল। পর্দা ফেলা এক রিক্শার ভেতর থেকে আর্য চেঁচাচ্ছে। ট্যাক্সি খুঁজে পায়নি তাই রিক্শা নিয়ে এসেছে। তা না হয় নিয়ে এল, কিন্তু এক রিক্শায় পাশাপাশি দুজনে বসে যাবে, এটা ভাবতে পারল কি করে?

উপায় নেই। ধারে কাছে দাঁড়ানো লোকগুলো চেয়ে রয়েছে। অন্তত এদের দৃষ্টি থেকে বাঁচবার জন্যও সমিতাকে রিক্শার মধ্যে আত্মগোপন করতে হবে। ঠিক আছে, মনে মনে সমিতা ভেবে নিল। একটু এগিয়ে আর্যকে নেমে যেতে বললেই হবে।

মাথায় আঁচলটা তুলে দিয়ে সমিতা ছুটে রিক্শায় গিয়ে উঠল। স্বল্প পরিসর। এদিক ওদিক না করলেও পাশে বসা লোকটার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়। রিক্শা ডাকতে গিয়ে বেশ ভিজেছে আর্য। পাঞ্জাবি চুপসে লেগে গেছে গায়ের সঙ্গে।

ছবি আর ফ্রকের প্যাকেটটা কোলের ওপর রেখে সমিতা যথাসম্ভব সরে বসল এক-পাশে।

কি অত ধারে যাচ্ছেন কেন? রিক্শা চলতে আর্য জিজ্ঞা করল।

আপনার ছবিগুলোকে বাঁচাতে।

ছবিগুলোকে না নিজেকে? আর্যর দ্বিধাহীন কণ্ঠস্বর।

তার মানে? সমিতা চোখ তুলেই অবাক।

এক দৃষ্টে আর্য সমিতার দিকে চেয়ে রয়েছে। দু চোখে যেন তরল আগুন। রিক্শার দোলানিতে বার বার সমিতার দেহটা আর্যর গায়ের ওপর গিয়ে পড়ছে। ভয় হ'ল সমিতার। পাশে বসা মানুষটার জন্য নয়, নিজের জন্য।

একটু পরেই সমিতা চমকে উঠল। আর্য একটা হাত রেখেছে সমিতার পিছনে। বোধ হয় ঝাঁকানি থেকে নিজেকে সামলাবার জন্য। সমিতার আলগোছে বাঁধা খোঁপাটা ভেঙে পড়েছে আর্যর হাতের ওপর। সমিতারও হাত জোড়া। হাত তুলে চুলটা জড়িয়ে নেবে সে সাহস হ'ল না। তা হ'লে হাত ঠেকবে আর্যর গায়ের ওপর। রিক্শার অন্ধকার কোটরে বিপর্যয় ঘটবে।

হঠাৎ বিপর্যয়ই ঘটল। পকেট থেকে রুমাল বের করে আর্য সাবধানে সমিতার গাল আর কপাল মুছে দিল। ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়েছে।

আ, কি করছেন আপনি? ওরই মধ্যে সমিতা একটু সরে বসবার চেষ্টা করল।

কি করছি? আর্য আর একটা হাত রাখল সমিতার কাঁধে। আপ্রাণ প্রয়াসেও সমিতা নিজেকে ছিনিয়ে নিতে পারল না আর্যর কবল থেকে। সারা দেহে বিদ্যুতের দাহ। সমিতার মনে হ'ল শরীরের অসংখ্য কোষ ফেটে চৌচির হ'য়ে যাবে। আলাদা কোন সত্তাই তার থাকবে না।

আর্যর কথায় যখন খেয়াল হ'ল তখন সমিতা সর্বস্ব হারিয়েছে। কখন ঘন হ'য়ে বসেছে আর্যর কাছে, তার বুকে মাথাটা রেখেছে খেয়ালই নেই।

কিন্তু একি অনন্ত যাত্রা নাকি? কোথায় যাবে রিক্শা সেটা অন্তত বলে দিন?

সমিতা সাবধানে পর্দা সরিয়ে দেখল। সামান্য কমেছে বৃষ্টি। রিক্শা বাড়ি ছাড়িয়ে অনেকটা চলে এসেছে।

আবার রিক্শা ঘুরল। সমিতা সরে

বসল। নিজের দু হাতে মাথাটা ঢেকে নির্জীবের মতন বসে রইল।

রিক্‌শা থামল। প্রথমে আর্য নেমে সমিতার হাত থেকে প্যাকেট দুটো নিল। সমিতা নেমে দাঁড়াতে আর্য বলল, এই নিন আপনার ফ্রকের প্যাকেট। আমি এবারে চলি।

এতক্ষণ পরে সমিতা কথা বলল। ক্লান্ত কণ্ঠস্বর।

সেকি, এখনও বৃষ্টি পড়ছে যে। তার চেয়ে একটু বসবেন চলুন। এমন ওয়েদারে এক কাপ গরম চা খুব খারাপ লাগবে না।

সমিতার নির্দেশে আর্য ভিজে পাঞ্জাবিটা খুলে ফেলল। সমিতা একবার জিজ্ঞাসা করল, ও'র একটা পাঞ্জাবি নিয়ে আসি, ততক্ষণ গায়ে দিয়ে নিন।

আর্য হাসল, ডক্টর সান্যালের সব কিছুই আমাকে ফিট করবে কে বলল আপনাকে?

কি ভেবে আর্য কথাটা বলেছিল কে জানে। সমিতার দুটো গাল কিন্তু লাল হ'য়ে উঠল।

বৃষ্টি থামার অনেক পরেও আর্য গেল না। প্যাকেট খুলে তার ছবি দুটো নিয়ে বসল।

এবার চাইনিজ ইংক নয়, হালকা রঙের খেলা। অপূর্ব ছবি। জানালায় দাঁড়ান একটি মেয়ে। চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার। রাস্তায় একটি মাত্র গ্যাসের বাতি। তারই ম্লান নিস্তেজ আলোয় সব কিছু দেখা যাচ্ছে। মেয়েটির শরীর প্রায় অস্পষ্ট, শুধু কতকগোলো বলিষ্ঠ আঁচড়ে তার প্রতীক্ষমানা মূর্তিটি তুলে ধরা হ'য়েছে। শুধু যে মেয়েটি দয়িতের অপেক্ষা করছে এমন নয়, মনে হ'চ্ছে সারা পৃথিবী বুঝি রাত্রি আসার আশায় উন্মুখ। ধূপছায়া অন্ধকারে মেয়েটি প্রায় অদৃশ্য, প্রকৃতিরই একাংশ বলে মনে হ'চ্ছে।

আর্য'র সেদিনের কথাটা সমিতার মনে পড়ল। ছবিতে চড়া রঙ ব্যবহার করলে দর্শকের চোখ সেখানেই আটকে যায়। রঙের প্রলেপ পার হ'য়ে আসল ছবিতে পৌঁছতে পারে না। ঠিক কথা, খুব খাঁটি কথা. আর সে কথা আর্য'র মতন আর্টিস্টই বলতে পারে।

দুজনে এত তন্ময় যে, ব্রিটিশ ফার-মাকোপিয়ার সন্ধানে মহীতোষ ঘরে ঢুকলেন, কেউ জানতেও পারল না। মহীতোষ চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন। এক কোচে দুজন কাছাকাছি বসেছে। সমিতার কোলের ওপর কয়েকটা ছবি। হাত নেড়ে ভদ্রলোক কি এক তত্ত্বকথা বোঝাচ্ছেন আর এক মনে সমিতা শুনছে।

মহীতোষ দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা কামড়ে একটু দাঁড়ালেন। বইটার কথা আর মনেও রইল না। [illegible] পিছনে রেখে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন।

আর্য চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সমিতা চুপচাপ বসে রইল, ছবি দুটো সামনে নিয়ে। ছবি দুটো আর্য সমিতাকে দিয়ে গেছে। কিন্তু এ দুটো নিছক ছবিই বুঝি নয়, আর্য'র ব্যক্তিত্ব, তার শিল্পিমন, তার দেহের মাদকতার টুকরো সে ছড়িয়ে গেছে সমিতার পাশে। তার ধুলোছিটোন সংসারে দুটো মন্ত্রের কণা।

সমিতা খাবার আগে মহীতোষকে ডাকতে গেল। মহীতোষ চেয়ারে নেই। টেস্টটিউবে কি একটা তরল পদার্থ টগবগ করে ফুটছে। চক্রাকারে উঠছে কালো ধোঁয়া। জানলা দিয়ে মহীতোষ বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

তুমি খেতে আসবে না, সাড়ে নটা বাজে।

তুমি খেয়ে নাও। আমার দেরি হবে। মহীতোষ মুখ ফেরালেন না।

তবু সমিতা একবার অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করল, কি একটা পুড়ছে যে?

পুড়ছে না, পোড়াচ্ছি। ব্যস্ত হয়ো না। মহীতোষের গলা আরো গম্ভীর।

সমিতা আর দাঁড়াল না। খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ওই শোয়াই সার। ঘুম এল না চোখে। দু হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ পড়ে রইল। সেলুলয়েডের ছবির সার দ্রুত আবর্তিত হ'ল মনের সামনে। আর্য'র কথা, আর্য'র হাসি, আর্য'র স্পর্শ। সমিতার বুভুক্ষু মনকে দুঃসহ বেগে টানতে শুরু করল। তার তাপিত দেহে অবিরল বারি-সিঞ্চন। স্বামী, সংসার, এতদিনের চেনাজানা পরিবেশ সব ধূসর, অস্পষ্ট। ইজেল, তুলি, প্যালেট আর আর্টিস্ট আর্য'র বিরাট ক্লোজ আপ!

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতে সমিতা হাতড়ে হাতড়ে খুঁজল। না, পাশের মানুষটা বিছানায় নেই। মশারির ফাঁক দিয়ে সমিতা দেখার চেষ্টা করল। নীলচে আলোয় সব কেমন রহস্যময়। অনেকক্ষণ ধরে সমিতা চোখ কুঁচকে দেখল। কোণের চেয়ারে মহীতোষের অর্ধস্পষ্ট কাঠামো। পাইপের ধোঁয়া উঠছে কুণ্ডলী পাকিয়ে।

একবার সমিতা ভাবল উঠে গিয়ে মহীতোষকে ডাকবে কিন্তু তন্দ্রায় জড়িয়ে এল দুটি চোখ। বিছানা ছাড়তে ইচ্ছা করল না। সমিতা পাশ ফিরে শুল।

দিন দুয়েক পর। ছুটির দিন। অফিসে বেরবার হাঙ্গামা নেই। ভোরে চা মুখে ঠেকিয়েই মহীতোষ ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকেছেন। এ দুদিন সমিতার সঙ্গে প্রায় কথাই হয়নি। কোন রকমে হুঁ, হাঁ দিয়ে সেরেছেন। মুখোমুখি হওয়াটা এড়িয়ে গেছেন কোন রকমে।

এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। মাঝে মাঝে মহীতোষ এমনি করেন। তখন বোঝা যায় গবেষণার ব্যাপারে মগ্ন রয়েছেন। সংসারের দিকে চোখ তুলে চাইবার, কিংবা সংসারকে কথা ছুঁড়ে দেবার তাঁর অবসর নেই।

দেড়টায় ফোন এল। খাওয়া দাওয়া সেরে সমিতা বালিশটা টেনে সবে একটু শোবার আয়োজন করছে ঠিক এমনি সময়ে।

হ্যালো কে? সমিতা ঘুম-ছোঁয়া গলায় জিজ্ঞাসা করল।

আমি আর্য। সমিতার কানের পর্দা যেন কেঁপে উঠল।

বলুন।

আজ বিকেলে সময় হবে?

একটু ইতস্তত ভাব, সামান্য জড়তা, কিন্তু সমিতা দু হাত দিয়ে সে সব সরিয়ে দিল। নিজেকে তিল তিল করে হত্যা করার কোন মানে হয় না। সমাজের মুখ চেয়ে, বধির সংসারের মুখ চেয়ে পলে পলে এই হেমলক পান নিরর্থক। নিজে বাঁচবে সমিতা। দুর্বল, ভীরু, ক্লীব বিবেকের অনুশাসন মানতে সে রাজি নয়।

নিশ্চয়, অঢেল সময়। কেন বলুন?

সমিতার উচ্ছ্বাসে আর্যও যেন একটু দমে গেল। ঝরনার কলরোলে বন্যার আবর্ত।

একটা ভাল বই হচ্ছে টিভোলিতে। আর্টিস্ট রেমব্রাণ্টের লাইফ। যাবেন?

নিশ্চয় যাব। বইটা কেমন হয়েছে শুনেছেন কিছু?

বইটা যেমনই হোক তাতে আমার তত আগ্রহ নেই।
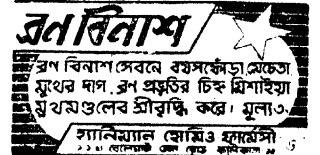
তাহ'লে?

আপনি পাশে থাকবেন আড়াই ঘণ্টা, চোরের রাত্রিবাসই লাভ।

আপনি যে চোর সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

বামালসুদ্ধ ধরা পড়লে আর অস্বীকার করি কি করে বলুন। যাক, তা হ'লে আজ পাঁচটার মধ্যে আপনাদের বাড়ি যাব, তৈরী থাকবেন।

থাকব।

আর্য টেলিফোন ছেড়ে দেওয়ার পরেও সমিতা হাতলটা কানের কাছে ধরে রইল। তারের ভাঁজে ভাঁজে এখনও যেন পুঞ্জীভূত রয়েছে আর্যর গম্ভীর কণ্ঠ।

চারটে থেকে সমিতা সাজতে শুরু করল। আলমারি খুলে শাড়ির গোছা বের করল। ব্লাউজের স্তূপ। অনেকক্ষণ ধরে রং পছন্দর পালা চলল। শাড়ি ব্লাউজ পরা শেষ হ'লে সমিতা অলংকার বাছাই শুরু করল। দু কানে মুক্তোর দুল। গলায় জড়োয়া হার। হাতের সব চুড়ি খুলে ফেলে শুধু একগাছা করে ব্রেসলেট। চুলে ডোনাট।

সাজগোজ শেষ করে সমিতা হাতঘড়ির দিকে চোখ ফেরাল। পাঁচটা বাজতে এখনও মিনিট কুড়ি। ঘামে আবার প্রসাধন নষ্ট না হয়ে যায়। পাখাটা খুলে দিয়ে সমিতা তার নিচে বসল। এখনও তেমন গরম পড়েনি। বাতাসে শীতের আমেজ। পাখার হাওয়ায় ঠান্ডা-ঠান্ডা লাগে, কিন্তু উপায় নেই। সমিতা একটু গরমে আবার ঘামতে শুরু করে।

দুপুর থেকে মহীতোষ ল্যাবরেটরিতে। ভেতর দরজা বন্ধ। পর্দা টানা। উঁকি দিয়েও সমিতা কিছু দেখতে পায়নি। মানুষটাকে দেখা যায়নি, কিন্তু তাঁর অস্থির পদচারণার শব্দ কানে এসেছে।

পর পর অনেকগুলো কেমিকেল মহীতোষ ঢেলে চলেছেন, একটার পর একটা। কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কাল বিন্দুটো তেমনি জ্বল জ্বল করছে সলিউশনের তলায়।

আবার মহীতোষ নিজের লেখা নোটস-এর ওপর ঝুঁকে পড়লেন। কলম দিয়ে অনেকগুলো লাইন কাটলেন নির্মমভাবে, তারপর র‍্যাক থেকে গোটা তিনেক কেমিকেলের শিশি টেনে নিলেন। মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত হ'চ্ছে মনটা। বিকার, বুনসেনবার্নার, টেস্ট-টিউব, কেমিকেল সব কিছু ছাড়িয়ে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে। আর এক জগতে।

শিশি থেকে ফোঁটা তিনেক কেমিকেল টেস্টটিউবে ঢালবার সংগে সংগে মহীতোষ টুল ছেড়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন। একি আশ্চর্য পরিবর্তন। না, কাল বিন্দুটার কোন রূপান্তর হয়নি। তেমনি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু অপূর্ব এক রং। এ রং তাঁর খুব পরিচিত। জীবনের সংগে অচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে এ রং বাঁধা।

একটু ভাবতেই মহীতোষের মনে পড়ে গেল। হালকা বাসন্তী রং। সামান্য গেরুয়ার ছোঁয়া। এ রং মহীতোষের ভারি প্রিয় আর তার প্রিয় বলে বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে তার সংগে কোথাও যেতে হ'লেই সমিতা এই রংয়ের শাড়ি আর ব্লাউজ পরত। মহীতোষও দোকান থেকে শাড়ি কিনতে হ'লেই খুঁজে খুঁজে এই রংটাই বেছে আনতেন।

মহীতোষ দাঁড়িয়ে উঠলেন। পা দিয়ে টুলটা সরিয়ে দিলেন। আজকাল সমিতা আর ও রংয়ের পোশাক পরে না। বোধ হয় পরে না, ঠিক কি রং যে পরে মহীতোষ অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। ভাল করে যেন সমিতার দিকে অনেকদিন তিনি চোখই ফেরান নি।

ল্যাবরেটরির দরজা খুলে মহীতোষ বাইরে বেরিয়ে এলেন। আসবার আগে বুনসেন বার্নারটা নিভিয়ে দিলেন।

পায়ে রাবার সোলের চটি। নিঃশব্দে বাইরের ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলেন। পাখা স্বল্পগতিতে ঘুরছে। তার তলায় সেক্রেটুজে কোচে হেলান দিয়ে সমিতা। পরনে হালকা বাসন্তী রংয়ের শাড়ি আর ব্লাউজ। গেরুয়া-ঘেঁষা। হাতের বটুয়াটাও সেই রংয়ের। একটা মাসিক পত্রিকার ওপর ঝুঁকে রয়েছে। এ পাশ থেকে ডোনাট খোঁপাটা দেখা যাচ্ছে। সুগৌর মসৃণ ঘাড় আর বাহুমূলে। কানের দুলটা কাঁপছে অল্প বাতাসে।

দু এক মিনিট, তারপরই মহীতোষ একেবারে সমিতার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দু হাত দিয়ে তার দুটো কাঁধ চেপে ধরলেন।

কে? সমিতা চমকে মুখ ফেরাল।

আমি, বাইরের কেউ নয়। মহীতোষ হাসলেন।

সমিতা মহীতোষের দিকে চেয়ে দেখল। মহীতোষেরও চোখে প্রেমালস দৃষ্টি। যে দৃষ্টি দিয়ে বুনসেন বার্নারের নীল শিখা কিংবা ফুটন্ত কেমিকেল দেখেন সে দৃষ্টি উধাও। অনেক আগের মহীতোষ, যখন সমিতার জীবন থেকে ল্যাবরেটরির নির্জন পরিবেশে মহীতোষ সরে দাঁড়াননি।

কি করছ, ছাড়ো। সাজপোশাক সব নষ্ট হয়ে যাবে। সমিতা মৃদু প্রতিবাদ করল।

যাক গে। তুমি তো ঠিক থাকবে। মহীতোষ সবেগে সমিতাকে টেনে আনলেন বুকের ওপর। তার সযত্ন-বিন্যস্ত চুল, গালের পাউডার, রুজ সব এলোমেলো হ'য়ে গেল।

ঠিক এমনি সময়ে কলিংবেলের শব্দ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে।

এই ছাড়ো, ছাড়ো, আর্য রায় এসেছেন। ও'র সংগে আমার বাইরে যাবার কথা।

না। মহীতোষ আরো নিবিড় করলেন বাহুবন্ধন। সমিতার মাথাটা চেপে ধরলেন নিজের বুকের ওপর। খুব অস্পষ্ট গলায় বললেন, না, আর্য অনার্য শক হূন যারাই আসুক, আজ আর কোথাও নয়।

সমিতা স্বামীর দিকে চোখ ফেরাল। দুটি চোখে প্রতিজ্ঞার বহ্নি। এ বাঁধন কোনদিন শিথিল হবে না তার অংগীকার। পরম তৃপ্তিতে সমিতা চোখ বন্ধ করল।

আর একবার বেলের শব্দ হ'তেই সমিতা মাথা তুলল, মহীতোষের দুটো হাত নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বলল, একটু দাঁড়াও ভদ্রলোককে বিদায় করে আসি।

তর তর করে সমিতা সিঁড়ি বেয়ে নামল। দরজা খুলতেই আর্য অমায়িক হাসল, কি ব্যাপার, সেজেগুজে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?

সমিতা সে কথার কোন উত্তর দিল না। গম্ভীর গলায় বলল, মাপ করবেন, আজ আমার কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়।

সমিতার গলার স্বরে সংকুচিত হ'ল আর্য, তবু আস্তে আস্তে বলল, বেশ তো আজ অসুবিধা থাকে তো কাল? কাল আমি আসব।

না, না, সমিতা সবেগে ঘাড় নাড়ল, কাল নয়, পরশু নয়, আর কোনদিন নয়।

বিস্মিত, বিব্রত আর্যকে আর কিছু বলার অবকাশ না দিয়েই সমিতা দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল। মহীতোষের সাগ্রহ আলিংগনে ধরা দিতে।

ঊনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

৬

পুনরায় বিদেশ যাত্রা। সেই দমদমের বিমান বন্দর এবং আনুষঙ্গিক ঝামেলা মানসিক চাঞ্চল্যের আধিক্য বারে বারে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করিতেছিল। চেষ্টা করিয়াও উত্তেজনা দমন করিতে অসমর্থ হইলাম। সহযাত্রীদের আলাপের প্রচেষ্টা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে প্রত্যাখান করিলাম। চিন্তার কোন কূল-কিনারা পাইতেছি না। বিদেশী বন্ধুরা বিনা আহ্বানে আগমন কিভাবে গ্রহণ করিবেন জানা নাই। অথচ তাঁহাদের নিমন্ত্রণের অপেক্ষায় চুপ করিয়া গৃহে অবস্থান করাও সম্ভব ছিল না। যাহা হইবার তাহা হইবে, সুতরাং চিন্তা নিষ্প্রয়োজন। এই প্রকার একটা মানসিক স্থবিরত্বের ভিতর দিয়া কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। অবতরণের সময় হইয়া ছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদেশী রাজধানীতে উপস্থিত হইলাম। সাবধানতার জন্য পূর্ব-পরিচিত হোটেলে না উঠিয়া অন্য একটি হোটেল খুঁজিয়া লইলাম। হোটেলে পৌঁছিয়াই বন্ধুর সন্ধান নিলাম, কিন্তু কোন খোঁজ মিলিল না, অগত্যা অপেক্ষা করা ব্যতীত অন্য কিছুই করিবার ছিল না। অনেক রাত্রিতে বন্ধুর সহিত সংযোগ স্থাপিত হইল। আমার হঠাৎ আগমনে কিছুটা বিস্মিত হইলেও পরদিন প্রাতে সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। দুশ্চিন্তার ভিতর রাত্রি অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রাতরাশের পূর্বেই বন্ধু আসিলেন। ক্ষমা চাহিয়া তিনি বলিলেন যে ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা কোন খবর দেন নাই। প্রতিদিনই আশা করিতেছিলেন যে, আয়োজন সম্পূর্ণ হইবে এবং সেই সুসংবাদ প্রেরণ করিয়া আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ জানাইবেন। কতকগুলি কারণে ইহা সম্ভব হয় নাই। যাঁহার উপর হাতিয়ার সংগ্রহের ভার ছিল, তিনি অত্যন্ত জরুরী কার্যোপলক্ষে রাজধানীতে ফিরিয়া পুনরায় সীমান্ত অঞ্চলে যাইতে বাধ্য হইয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া এই কারণেই অপ্রত্যাশিত বিলম্ব। এখনও এই সম্পর্কে কোন নিশ্চিত কথা দেওয়া অসম্ভব। আবার ইহাও ঠিক যে, যে-কোনদিন সমস্যার সমাধান হইতে পারে। সময় থাকিলে কয়েকদিন রাজধানীতে অপেক্ষা করাই সমীচীন। পরিবহনের কি ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা জানিতে চাহিলেন। সমস্ত শুনিয়া খুশী হইয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের বিমান বন্দরে যাহাতে কোন রকম অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি না হয়, সেই ব্যবস্থা করিবেন। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াও তাঁহারা এই সম্পর্কে অন্য কোন ব্যবস্থা করিতে একান্তই অপারগ। ইহার জবাবে আমার বিশেষ কিছুই বলিবার ছিল না। সেইখানে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করাই যুক্তিসংগত মনে করিলাম এবং বন্ধুকে ইহা জানাইলাম। তিনি বিদায় লইবার পর সুবর্ণসামসেরকে সংক্ষেপে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া টেলিগ্রাম পাঠাইলাম। তারপর শুরু হইল কয়েক-দিনের জন্য দুশ্চিন্তাময়, অবসাদগ্রস্ত বিদেশবাস। অবশ্য মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বিভিন্ন সভায় যোগদান করিবার সুযোগ পাইলাম। আবার কোনদিন বা ভোজের নিমন্ত্রণ মিলিল। এইভাবে কয়েকদিন কাটিবার পর বন্ধু খবর দিলেন যে, আয়োজন সম্পূর্ণ করিতে আরও কিছুদিন সময় লাগিবে। এই অবস্থায় অধিকদিন অপেক্ষা করা সম্ভব হইবে না জানাইয়া শূন্য হাতে দেশে ফিরিলাম।

প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে এমন এক-একটি সময় আসে, যখন অতীতের অন্ধকার এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা মিলাইয়া এক সীমাহীন নৈরাশ্য জীবনকে অসহনীয় করিয়া তুলে। এই দিনগুলি আমার জীবনেও ঠিক এই ধরনের এক অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। বন্ধুদের অনুযোগ, অভিযোগ এবং নিজের অসামর্থ্য নৈরাশ্যের বোঝা শতগুণে

কাঠমাণ্ডুর সন্নিকটে গণেশ মন্দির
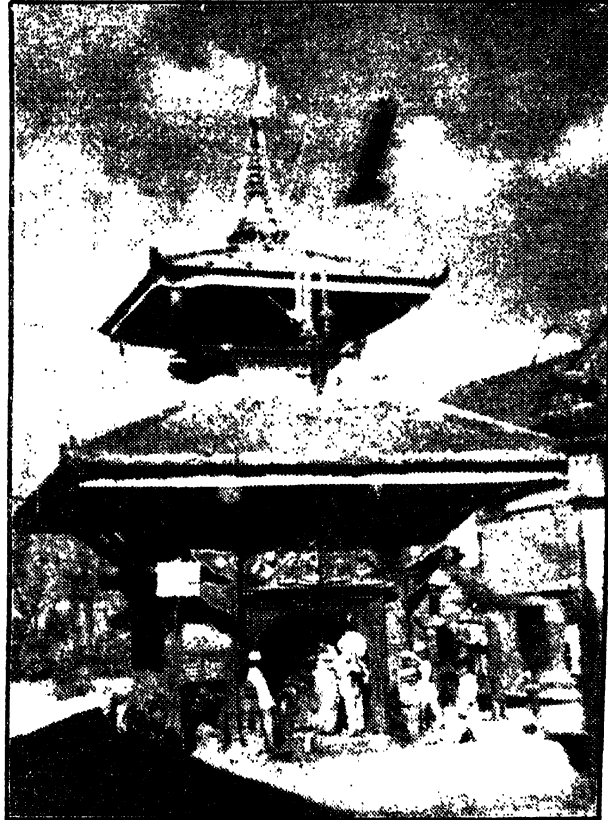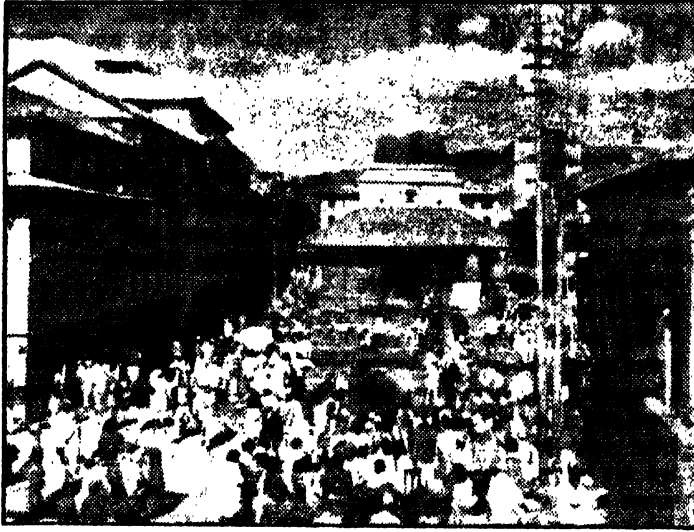
কাঠমাণ্ডুর প্রধান বাজার ইন্দ্রচক্

বাড়াইয়া দিয়াছিল। প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল যে, এই ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছুই নাই। যতদিন বিদেশী বন্ধুদের অনুগ্রহ না হইতেছে, ততদিন কিছুই করা যাইবে না, এইভাবেই বিরাটনগর এবং কলিকাতার মধ্যে সেই অভিশপ্ত দিনগুলি অতিবাহিত হইতেছিল। ইতিমধ্যে আরও বার তিনেক বিদেশ যাত্রা করিলাম, কিন্তু প্রতিবারই অসফলতা অভিশাপের ন্যায় চলার পথকে বন্ধুর করিয়া দিল। তবুও আশা ছাড়ি নাই। সময়টা তখন শরৎকাল। পূজা আগতপ্রায়। বিরাটনগর হইতে ফিরিতেছিলাম।

ট্রেন বিহারের রুক্ষ প্রান্তর ছাড়িয়া যখন বাংলা দেশের ভিতর পেঁছাইল, প্রকৃতির শ্যামলরূপ তখন অতি স্থূল-দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মনেও ক্ষণিকের জন্য চাঞ্চল্য জাগায়।

শিয়ালদহ স্টেশন হইতে বাড়ি না গিয়া সোজা পার্টি অফিসে পেঁছাইলাম, সেই সময় গণেশ এভেন্যুর একটি বাড়িতে পার্টি দফ্তর ছিল. সেন্সর বিভাগের অপ্রীতিময় দৃষ্টি এড়াইবার জন্য বিদেশী বন্ধুদের এই ঠিকানায় সংবাদ আদান-প্রদান করিতে বলিয়াছিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম যে, আমার নামে একটি বিদেশী টেলিগ্রাম আছে, কিন্তু দফ্তর সম্পাদক হাজির না থাকায় উহা হস্তগত হইল না। তিনি কখন ফিরিবেন ঠিক নাই, তবুও অপেক্ষা করাই সমীচীন বোধ করিলাম। কি জানি ইহাই হয়ত প্রত্যাশিত নিমন্ত্রণ-পত্র। দোদুল্যমান চিত্তে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর টেলিগ্রামটি পাইলাম। এক লাইনের টেলিগ্রাম। একবার,, দুই-বার, দশবার উহা পড়িলাম, তবুও আশা মিটিল না, উপস্থিত সাথীদের অধিক কৌতূহল বৃদ্ধি না করিয়া, সোজা একটি ট্যাক্সিতে উঠিলাম। বাক্স বিছানা পার্টি দফ্তরে পড়িয়া রহিল।

হ্যাঁ, এটা সেই টেলিগ্রাম। জরুরী আহ্বান আসিয়াছে বিদেশী বন্ধুর নিকট হইতে; যতশীঘ্র সম্ভব সেইখানে পেঁছান দরকার। আজ সেই দিনের মনের অবস্থা বর্ণনা করা অসম্ভব। আশা, আনন্দ, উত্তেজনা এবং সব কিছু হারাইবার এক অপার্থিব ভীতি মিলিয়া একটি অবর্ণনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। কথায় আছে 'চায়ের পেয়ালা আর চুমুকের ভিতর অনেক বাধা', কি জানি যদি তীরে আসিয়া তরী ডুবিয়া যায়। সামান্য ত্রুটি, ছোট একটা ভুল অথবা একটা বেহিসাবী কথার ফলে সব কিছু নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। অপরিসীম সাবধানতা, সীমাহীন সতর্কতার প্রয়োজন; কিন্তু ঠিক কতটা হইলে নির্বিঘ্নে কার্যোদ্ধার হইবে, তাহা কে বলিয়া দিবে, সর্পিলগতিতে এইরকম সহস্র চিন্তা মনের ভিতর পাক খাইতে লাগিল। নিজেকে বিশেষ একজন দুঃসাহসী ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিলাম না, তবে ভরসা এই যে, মানুষের মনের সমস্ত কথা সকলে পড়িতে পারে না। নতুবা সেইদিন আমার মনের অবস্থা দেখিয়া মহাবীর সামসের বিশেষ ভরসা পাইতেন না। সুবর্ণ সামসের বীরগঞ্জ এলাকায় গিয়াছিলেন, সেই জনাই মহাবীর সামসেরের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না। স্থির হইল যে, পরদিনই আমি রওয়ানা হইব এবং তাহার পরদিন বেলা এগারটার ভিতর একটি চুক্তিবদ্ধ বিমান তিনি প্রেরণ করিবেন। আরও দুই একটি আবশ্যকীয় কথার পর বিদায় গ্রহণ কালে তিনি প্রায় আবেদনের সুরে আমাকে কঠোর সাবধানতা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ করিলেন। ইহার জন্য নিজেই দৃঢ়সংকল্প ছিলাম, তবুও এই বিষয়ে তাঁহার আন্তরিকতা ভালই লাগিল। কিন্তু পরমুহূর্তে যাহা কর্ণগোচর হইল, তাহাতে বিশেষ আনন্দিত হইবার কিছু ছিল না। তাঁহার দুশ্চিন্তা অসাবধানতার ফলে অবাঞ্ছনীয় কিছু ঘটিলে, তাঁহার বিমান কোম্পানীর অপরিসীম ক্ষতি হইবে। মুখের ভিতর একটা তিক্ত স্বাদ লইয়া সেই গৃহ পরিত্যাগ করিলাম।

সমস্ত কিছু সহ্যের একটা সীমা আছে, দুঃখ, কষ্ট, আশা, নিরাশা, ব্যথা ও বেদনা মানুষকে ততক্ষণই বিচলিত করে, যখন উহা সহ্যের সীমার ভিতর থাকে; ঐ সীমা অতিক্রান্ত হইলে মানুষ হয় উন্মাদ হইয়া যায় নতুবা মানসিক স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়। উভয়ের যে কোন অবস্থায় চিন্তার হাত হইতে রেহাই পাওয়া যায়। এই ধরনের মানসিক স্থবিরত্ব লইয়া সন্ধ্যার সময় বিদেশী রাজধানীতে পেঁছাইলাম। অনেক রাত্রে বন্ধু হোটেলে আসিলেন। বিশেষ আগ্রহের সহিত বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলাম। লক্ষ্য করিলাম পূর্ব-পরিচিত গম্ভীর মুখে বেশ একটা ঘনিষ্ঠ হাসির রেখা। ভরসা পাইলাম। তিনিই কথা শুরু করিলেন। হাতিয়ার সংগৃহীত হইয়াছে যে কোন মুহূর্তেই উহা মিলিতে পারে। বিমান বন্দরের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করা হইয়াছে। আমাদের বিমান তথায় পেঁছিবামাত্র সৈন্য বিভাগের জনৈক পদস্থ কর্মচারী একটি সামরিক ট্রাকে করিয়া হাতিয়ার বিমানে উঠাইয়া দিবেন। সুতরাং তৎক্ষণাৎ বিমান পাঠাইবার জন্য কলিকাতায় টেলিগ্রাম করা প্রয়োজন। বিমান সকাল বেলা তাঁহাদের বিমান বন্দরে পেঁছাইলেই চলিবে। নির্দিষ্ট দিনে অপর এক বন্ধুর সহিত আমাকে বিমান বন্দরে হাজির থাকিতে হইবে। আবেগহীন ভাষায় এই কথাগুলি বলিয়া তিনি আমার দিকে তাকাইলেন। বলিলাম—টেলিগ্রাম পাঠাইবার কোন আবশ্যকতা নাই। আগামীকাল বেলা এগারটার ভিতর আমাদের একটি চুক্তিবদ্ধ বিমান হাজির হইবে। শুনিয়া খুশী হইলেন। কি ধরনের হাতিয়ার পাওয়া যাইবে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করিব কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় তিনি

নিজেই বলিলেন যে, স্টেনগান, কিছু ব্রেনগান এবং প্রয়োজনীয় বুলেট উপস্থিত সংগ্রহ হইয়াছে, ইচ্ছা ছিল কয়েকটি ট্রেঞ্চ-মর্টার এবং মেসিনগান দিবার, কিন্তু নানা কারণে উহা সম্ভব হয় নাই। বলা-বাহুল্য হাতিয়ারগুলির জন্য কোন মূল্য লাগিবে না। আবশ্যকীয় কথাবার্তা শেষ হইয়াছিল। আগামীকাল তাঁহাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, সুতরাং বিদায় গ্রহণ তখনি সারিতে হইবে। বিদায় গ্রহণের একটা নির্দিষ্ট রীতি আছে। জীবনে কোনদিন ইহা রপ্ত করিতে পারি নাই। পারিলেও সেই রাত্রে উহা নিশ্চয়ই কোন কাজে আসিত না। সমধর্মী বন্ধু এ'রা সুতরাং রীতিসম্মত বিদায় গ্রহণের কোন প্রশ্নও উঠে না। অল্প দুই এক কথায় সেই কার্য সমাধা করিলাম, বন্ধু বিদায় হইলেন।

উষার বিনম্র আলো রাজধানীর ইস্পাত ও কংক্রীটের লক্ষ বাধা পার হইয়া সেই ইউরোপীয় হোটেলের কামরায় অতি সলজ্জ পদে প্রবেশ করিল। ইহার সংকেত বুঝিলাম। সময় উপস্থিত। সুতরাং এই স্বল্প দিনের পরিচিত পথের শেষযাত্রার জন্য প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। প্রভাতের স্নিগ্ধ আলো ক্রমশ দিনের প্রখর সূর্য-কিরণে রূপান্তরিত হইল। এইবার বিমান-বন্দরের দিকে রওয়ানা হওয়া উচিত, কিন্তু সেই দিনের সাথী তখনও অনুপস্থিত, আশ্চর্যরকম উত্তেজনা ও উদ্বেগহীন ছিল সেইদিন মনের অবস্থা। কোন চিন্তা নাই। এবং করিবারও বিশেষ কোন কাজ নাই। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা ঘটিবেই, সহস্র চেষ্টাতেও এখন উহার গতিরোধ করা যাইবে না। বোধ হয় এই ধরনের কোন এক চিন্তা অন্য সমস্ত চিন্তার পথের কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সাথী আসিলে তাঁহার গাড়িতে আমরা উভয়ে বিমানবন্দর অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

বিমানবন্দরে যখন পোঁছিলাম, এগারটা বাজিতে তখনও অনেক দেরি। শরতের মেঘশূন্য আকাশ দেখিয়া ভরসা পাইলাম যে ঝড়-ঝঞ্ঝার সম্ভাবনা নাই। অতএব আমাদের বিমান নিশ্চয়ই সময় অনুযায়ী হাজির হইবে। সাথীকে লইয়া রেস্তোরাঁয় ঢুকিলাম, কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়া সাথী আলাপ শুরু করিল। ভারতবর্ষের কথা সমাজবাদী দলের অবস্থা, দামোদরের বাঁধ হায় তাজমহল—যেটা সাজাহানের প্রেম অথবা দম্ভের নিদর্শন—এমনি অনেক প্রশ্নই করিল। নেপালের কথাও বাদ পড়িল না, এই ধরনের কথাবার্তা চলিতেছিল, হঠাৎ সাথী জিজ্ঞাসা করিল যে, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ দলমত-নির্বিশেষে সকলেই হিংসার বিরোধী।

শুধু তাহাই নহে, তাহারা অহিংসার পূজারীও বটে। তাহাদের লেখায়, বক্তৃতায়, আন্তর্জাতিক আলাপ-আলোচনায় অহিংসার দর্শন প্রচারিত হইয়া থাকে, এই পরি-প্রেক্ষিতে নেপালী কংগ্রেসের হিংসাত্মক কার্য কোন যুক্তিবলে সমর্থিত হইয়াছে। ঠিক এই ধরনের প্রশ্ন আশা করি নাই, বিশেষ করিয়া ঐ সময় হাল্কা কথার উপর দিয়া সময়টা কাটিয়া যাক—এই ছিল মনের ইচ্ছা এবং সাথীকেও সেই কথা জানাইলাম, ইহা তাহার মনঃপূত হইল না, অতএব বলিলাম যে, অহিংসায় বিশ্বাস তিলমাত্র কমে নাই, গান্ধীর দেশ বলিয়া নহে, ভারত-বর্ষ যুগ-যুগ ধরিয়া অহিংসার বাণী প্রচার করিয়াছে। ভারতবর্ষের চিন্তায়, দর্শনে, সভ্যতায়, তাহার সংস্কৃতি ও সাহিত্যে শান্তি এবং অহিংসার সাধনা যুগে যুগে হইয়াছে। গোতম বুদ্ধের অহিংসার বাণী অশোকের রাষ্ট্রনীতিতে রূপায়িত হইয়াছে, কিন্তু ইহা অত্যাচারিতের নিরুপায় আত্ম-সমর্পণের অহিংসা নহে, ইহা সক্ষমের ক্ষমার প্রতীক। মানবতাবাদী ভারতবর্ষ অনন্তকাল পর্যন্ত অহিংসার পূজারী থাকিবে—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে মুষ্টিমেয়ের সমস্ত পশুশক্তি আদিম কালের বর্বরতার অন্ধকারে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে মানুষের সমস্ত মৌলিক মূল্য-বোধকে হত্যা করিতেছে, সেখানে অহিংসার প্রচার এবং ভীরুর অকর্মণ্যতা একই বস্তু। কোন প্রাণবান বস্তুকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। অহিংসা শ্মশানযাত্রীর নামাবলী নহে, ইহা জীবিতের জীবন-দর্শন। যে রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষিত হয়, তথায় হিংসার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু নেপালে ইহার বিপরীত অবস্থাই বর্তমান। সেইখানে মুষ্টিমেয় সভ্যতাবিরোধী উন্মাদ আজ শান্তি ও অহিংসাকে হত্যা করিতে বদ্ধপরিকর, অহিংসা ও সত্যাগ্রহের পথে গোরস্থানের শান্তি নিশ্চয়ই মিলিবে, কিন্তু নেপালবাসী ইহা চাহে না এবং সেইজন্য হাতিয়ারের সম্মানজনক পথে দেশকে বন্ধনমুক্ত করিতে তাহারা আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বন্ধু কিভাবে ইহা গ্রহণ করিল, তাহা জানি না, তবে আর কোনও প্রশ্ন করিল না। সময় হইয়া-ছিল, বন্ধুর সহিত বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

প্রায় বেলা এগারটার সময় আমাদের বিমান পৌঁছাইল, দুইজন ইউরোপীয় এবং একজন ভারতীয় ডাকোটা বিমানটির পরিচালক ছিলেন। প্রশ্নে বুঝিলাম যে, আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল। বিমানবন্দরের সরাবখানায় তাঁহাদের বসাইয়া, সৈন্যবিভাগের পূর্বনির্দিষ্ট কর্মচারীকে টেলিফোন করিতে গেলাম। ফোন উঠাইয়াই বলিলেন যে, আধ ঘণ্টার ভিতর তিনি হাজির হইবেন। ফিরিয়া শুনিলাম যে, বন্ধু ইতিমধ্যেই লগবুক সংক্রান্ত কাজ সারিয়াছেন। একটা মস্ত দুশ্চিন্তার অবসান হইল। আর আধ ঘণ্টা সময় কাটাইতে পারিলেই কার্যোদ্ধার হয়, এইটুকু মাত্র নির্বিঘ্ন সময় অনন্তকালের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে ভিক্ষা মিলিবে না? মনকে প্রবোধ দিলাম যে, লক্ষ মানুষের আশীর্বাদসিক্ত এই কাজ নিশ্চয়ই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। সৈন্যবিভাগের কর্মচারী যথাসময়ে ট্রাকসমেত বিমানটির নিকট হাজির হইলেন। বিমানের ইঞ্জিন চলিতে-ছিল এবং চক্ষের নিমেষে হাতিয়ারের বাক্সগুলি উঠাইয়া দেওয়ার পর, ইহা সেই বিদেশী রাজধানীর বিমানবন্দর ত্যাগ করিল। বন্ধুর নিকট বিদায় লওয়া হইল না।

বিহিটায় পূর্ব-কল্পনা অনুসারে সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ ছিল। বিদেশ হইতে প্রেরিত আমার টেলিগ্রামও তাঁহারা সময়মত পাইয়াছিলেন, তাঁহারা স্থির করিয়াছিলেন যে, হাতিয়ারগুলি প্রথমে পাটনায় লইয়া যাওয়া হইবে। পরে সেইখান হইতে সংগ্রামের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরিত হইবে। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে, তাহা জানা নাই, কিন্তু উপস্থিত আকাশ-বাতাস মুক্তির সম্ভাবনায় মধুর হইয়া উঠিল। বিহিটায় অবতরণ ঘাঁটিতে উপস্থিত সকলের মনের ভাবটা এই রকম ছিল যে, হাতিয়ার মিলিয়াছে—এইবার ইহা কাজে লাগাইতে হইবে। (ক্রমশ)

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

কিছুদিন পূর্বে খেয়ালের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি গদ্যবন্ধ খাড়া করেছিলুম। খেয়ালের আলোচনায় কাওয়ালের কথা উঠেছিল এবং সেই সঙ্গে আমীর খস্রুর নামও এসে গিয়েছিল স্বাভাবিকভাবে, কেননা, আমীর খস্রুই কাওয়াল নামক গীতিরীতির প্রবর্তক—এ সম্বন্ধে সন্দেহের প্রায় কারণ নেই। আমার বক্তব্য ছিল এই যে, কাওয়াল এবং তারানা—এই দুই ব্যাপারেই কবি হিন্দুস্থানে প্রচলিত "কায়বাল" নামক গীত থেকে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এবং দুটি নামের যে ঐক্য রয়েছে, সেটি দেখানোও আমার উদ্দেশ্য ছিল।

নিবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর কাওয়াল সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর কাছ থেকে যে আহ্বান পাওয়া যাবে, আমি তা কল্পনাই করিনি। ইনি যে কেবলমাত্র স্বনামধন্য সাহিত্যিক তাই নন, সুপণ্ডিত এবং বহুভাষাবিদ্। অপরপক্ষে ফৈয়াজ খাঁর মত ওস্তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং আরও অনেক প্রসিদ্ধ শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগও তাঁর হয়েছে।

তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তার মোদ্দা কথা এই যে, কাওয়াল নামক যে গানের প্রচার আমীর খস্রু করেছেন, সেটি "কওল" নামক একটি আরবী পদ্ধতি থেকে এসেছে। হিন্দুস্থানী যে পদ্ধতিই তিনি গ্রহণ করে থাকুক, এই কওল-এর রীতিটিই কাওয়াল গানে প্রধান। কওল জিনিসটা অনেকটা আমাদের কথকতার সঙ্গে তুলনীয়। এছাড়াও কথা আছে। আমীর খস্রুর পিতৃপুরুষ এবং জ্ঞাতিগোষ্ঠীরা ছিলেন তুর্কী এবং তাঁদের দেশ ছিল সেই অঞ্চল, যা এখন রুশ-অধিকৃত তাসকেন্দ বলে পরিচিত। এই সব স্থানের প্রচলিত গীতরীতিও নিশ্চয়ই আমীর খস্রুকে কম প্রভাবিত করেনি। অতএব কবি যে সংগীত সৃষ্টি করেছিলেন, সেটি বিচার করতে গেলে এই সব অঞ্চলের গীত সম্বন্ধে ধারণা থাকাও দরকার। আমার কাছে সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় হচ্ছে এই, "কৈবাল", "কওল" প্রভৃতি গীতের নামগত সাদৃশ্য। কত দেশের প্রভাব কত ভাবে কত দেশে ছড়িয়ে পড়েছে কে বলবে? হয়ত অনুসন্ধান করলে এই সব যোগসূত্রের সন্ধান মিলতে পারে, কিন্তু এ-দায়িত্ব স্বীকার করবে কে?

যাক, এই আলোচনার পর মনে পড়ল, কোন বাংলা বইতে—এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ দেখেছি। বইগুলি তালাস করতে করতে চোখে পড়ল রাধামোহন সেন বিরচিত গ্রন্থ—সংগীত তরঙ্গ। হ্যাঁ, এই বইটি—তথা কাব্যটিই বটে। এরই ছায়া ভাসছিল মনে। রাধামোহনের পাণ্ডিত্য কতখানি ছিল, জানি না, তবে তাঁর পড়াশোনা মোটামুটি মন্দ ছিল না। ফারসী ভাষায় দখল তাঁর নিশ্চয়ই ছিল—অতএব মূলে ফারসী বই যে তিনি কিছু পড়েছিলেন, সেটা আমরা অনুমান করতে পারি। ফারসী ভাষা আমার কিছুমাত্র জানা নেই, সেটি সলজ্জে স্বীকার করি। অতএব উক্ত গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যে কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ দেওয়া আছে, তার বর্ণনা করলে বিষয়টির অপর এক দিক সম্বন্ধে কিছু জানা যেতে পারে। বইখানি প্রায় ১৮১৮ সালে মুদ্রিত—লেখা শুরু হয়েছিল তারও বেশ কিছুকাল আগে এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। অতএব এটি যে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সংগীত-গ্রন্থ, এটি আমরা স্বীকার করে নিতে পারি।

কওল সম্বন্ধে রাধামোহন বলছেন—
কওল না মেনে যেই প্রকারের গান।
শুদ্ধ আরবীভাষায় তাহার বিধান॥

এই কওল নামক গানের পরিচয় অবশ্য রাধামোহন দেননি, কিন্তু কাওয়ালের লক্ষণ দিয়েছেন।

যেরূপে কাওয়াল নাম হইল সৃজন।
নিবেদন করি শুনে তার বিবরণ॥
গীত হৈতে কওয়াল উপাধি সংঘটন।
গীতের বিশেষে বলি করহ শ্রবণ॥
প্রথমেতে কওল দ্বিতীয় কালবানা।
তৃতীয়েতে নস্কগুল চতুর্থে তারাণা॥
তারাণাকে তেরেণা বলিয়া কেহ কয়।
কেহ বা তেলেনা বলে—এই তো বাত্যয়॥
ইত্যাদি গীতের মধ্যে কওল প্রধান।
কওল আরবী শব্দ শুনে মতিমান॥
কওল ইত্যাদির গায়ক যেই জন।
কাওয়াল উপাধি তার—এই তো শাসন॥

এই সব গীতের মধ্যে নক্সগুল বা কওল-কালবানা এখন প্রায় লুপ্ত বললেই চলে। প্রথমটি ফারসী বা উর্দুতে রচিত হত এবং গানে "গুল" শব্দটির প্রয়োগ আবশ্যিক ছিল। দ্বিতীয়টি নাকি খাস আরবীতেই রচিত হত। তবে তারানা যে বাইরে থেকে নেওয়া নয় এবং এটি আমাদের কৈবালেরই একপ্রকার রীতি—এটি আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

আমীর খস্রু যে ভারতীয় সংগীতের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন, গোপাল নায়কের সঙ্গে দ্বন্দ্ব থেকে তার সূত্রপাত হওয়াও আশ্চর্য নয়। এই ব্যাপারটি রাধামোহন সেন বেশ রসিয়ে বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনা কতখানি সত্য, তা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু ঘটনাটি বিবৃত করবার মত।

দিল্লীর সিংহাসনে তখন দুর্ধর্ষ সুলতান গিয়াসুদ্দিন তোগলক অধিষ্ঠিত এবং কবি আমীর খস্রুও গৌরবের চরম শিখরে বিরাজমান। বয়স তাঁর ষাট পেরিয়ে গিয়েছে। বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং

জ্ঞানলাভ করেছেন তিনি। সঙ্গীত-তরঙ্গ বলছেন—

মহামহোপাধ্যায় খোশরো দহলবি।
সর্বশাস্ত্র বিশারদ-মহা মহাকবি॥

তেরোটি বিদ্যায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল—যথা তর্কশাস্ত্র, রেখা-গণিত, গণনা, নক্ষত্র-বিদ্যা, জ্যোতিষ, নানা বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান, চিকিৎসা-বিদ্যা, চক্ষু-চিকিৎসা, হাকিমি, ধর্মশাস্ত্র, কোরান দর্শন এবং আইন। এরও ওপরে আর-একটি বিদ্যায় দক্ষতা তাঁর ছিল, সেটি হচ্ছে সঙ্গীত।

বাদশার অধিকারে ছিল সাতটি প্রধান এলাকা। তার মধ্যে ছটি এলাকায় যত বড় বড় গায়ক ছিলেন, সবাই হার স্বীকার করলেন নায়ক গোপালের কাছে। নায়ক কারা? রাধামোহন তাও বলেছেন।

ব্যাকরণাদিতে জ্ঞান থাকিবে মণ্ডিত।
সঙ্গীত বিদ্যায় গণ্য পরম পণ্ডিত॥
জানিবেন অলঙ্কার পিঙ্গলাদি যত।
গানে হইবেন যেন কিন্নরের মত॥
থাকিবে কবিতা শক্তি তাহে কবীশ্বর।
বীণাদি তাবৎ যন্ত্রে হবেন তৎপর॥
মার্গ-দেশী দুই জানে দেশী সৃষ্টি করে।
নর্তা আদি নানা বিদ্যা নানা গুণ ধরে॥
অর্থাৎ সঙ্গীতের তাবৎ বিদ্যা জানে।
এই মত গায়কে নায়ক বলি মানে॥

নজন গায়ককে নায়ক বলে স্বীকার করা হয়েছে। এঁরা হচ্ছেন—গোপাল, বৈজু, খস্রু, লোহঙ্গ, চারজু, ভগবান দুধি খাঁ দানো এবং বখসু। এঁদের মধ্যে গোপাল অবিসম্বাদীরূপে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

ছয়টি জনপদে আধিপত্য বিস্তার করে গোপাল সপ্তম খণ্ডে অর্থাৎ সুলতানের খাস এলাকায় প্রবেশ করলেন।

সঙ্গীতের বিদ্যায় জিনিয়া ছয় দেশ।
ধারণ করিয়া দিগ্বিজয়ীর বেশ॥
ছয় তুম্বি বান্ধা শিরে উপস্থিত আসি।
বাদশার নিকটেতে কহিতেছে হাসি॥
আমাকে জিনিয়া ছয় তুম্বি লহ খুলি।
কিম্বা আর এক তুম্বি শিরে দেহ তুলি॥

সুলতান বললেন—"আচ্ছা আজকের দিনটা আরাম করো কাল যা করবার করা যাবে।"

এদিকে মুশকিল, —গোপালকে সামলানো যায় কি করে। পরামর্শ করে আমীর খস্রুকে ডাকা হল। সুলতান বললেন—"কবি, তুমি এর একটা বিহিত করো। শুনেছি সঙ্গীতে তুমি মহা ধুরন্ধর ব্যক্তি।" সুলতানের পক্ষে এ এক সমস্যা বৈকি! সারা জীবন তরোয়ালের চর্চা করেছেন, গান-বাজনার চর্চা করেননি। চতুর কবি বললেন—

"সোজাসুজি হারানো শক্ত হবে, একটা কৌশল করলে হয়।"

"—কি কৌশল?"

কবি বললেন—

গোপনে শুনিতে পাই গোপালের গান।
তবে তো করিতে পারি ইহার বিধান॥

পরামর্শটা সুলতানের পছন্দ হল।

বাদশা কহেন অতি আনন্দিত মনে।
আমার তক্তের নীচে থাকহ গোপনে॥

তারপর, পরের দিনে—

খোশরোকে কহিলা—তক্তের নীচে থাক।
উজিরের আজ্ঞা দিলা গোপালেরে ডাক॥

গোপাল সাড়ম্বরে অনেক গান শুনিয়ে গেলেন—সুলতান খুশী হলেন। কিন্তু ভাবনাও ছিল কম নয়। তক্তের নিচে থেকে কীভাবে খস্রু কার্যোদ্ধার করবেন, সেটা সুলতান ঠিক আন্দাজ করতে পারছিলেন না। শ্রুতিধর কবি কিন্তু সুলতানকে অভয় দিলেন।

আমীর খোশরো কহে—শুভ সমাচার।
কল্য প্রাতে সাক্ষাতে করিব প্রতিকার॥
গোপাল স্বকৃত দেশী রাগ গায়াছিল।
খোশরো তাহাতে অন্য মিশ্রিত করিল॥
আরবের রাগ আর পারসীক রাগ।
সেই হিন্দী রাগে মিলাইলা দুই ভাগ॥
দ্বাদশ রাগের সৃষ্টি হইল তাহাতে।
দুজনে হইল যোগ রজনী প্রভাতে॥

সকালে দরবারে গান করলেন আমীর খস্রু। গান যতই অগ্রসর হচ্ছে গোপাল ততই আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছেন—এ কী তাজ্জব ব্যাপার! গোপালের ঘরানা তুর্কীর ঘরে গেল কি করে? শুধু যাওয়া নয়, তার আবার নানান রকমফেরও স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। গোপালের মুখে কথা সরে না। গান শেষ হল। নায়কের কণ্ঠে একটি শব্দও ফুটল না।

সুলতান মুচকি হেসে শুধোলেন—"হিন্দুস্থানের নায়ককে বড় চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?"

গোপাল মাথা চুলকে জবাব দিলেন—

......মম রাগ রত্নপুরী।
গত রাত্রে কিরূপে তাহাতে হৈল চুরি।
বুঝিতে না পারিলাম শঠের চাতুরী।
চেতনেরে বাঁধাছিল দিয়া ধন্দড়ি॥

আমরী খস্রু যে অপরূপ শ্রুতিধর, এ সম্বন্ধে গোপালের কোন সন্দেহ ছিল না। অসামান্য গুণী নায়ক গোপাল অপর এক গুণীর অভূতপূর্ব গুণপনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন।

এমন চোখের গুণ সর্বকাল ঝরি।
ধন্য ধন্য ধন্য রে চোরের বাহাদুরি॥
দেখিতেছি আমারি তাবৎ রত্নপ্রায়।
কিঞ্চিৎ মিশ্রিত কৈল অন্য রত্ন তায়॥
তত্রাপি সে কোন রত্ন চিনিতে না পারি।
এ নিমিত্তে পণের অর্ধেক হৈল হারি॥
আমারি সামগ্রী আমাকে বিক্রয় করে।
এ হেন চোরেরে কেবা চোর বল্যা ধরে॥
সে যাহা হউক এ আমারি তুল্য জন।
ছয় তুম্বি সমভাগে লইব দুজন॥
এত বলি তিন তুম্বি শিরে হৈতে লয়্যা।
আমির খোশরোকে দিলেন তুষ্ট হয়্যা॥

গোপাল নাকি বারটি বড় বড় রাগ গেয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি সেই "রাগ-কদম্ব" গান করেছিলেন, যার জন্য তাঁর খ্যাতি ছিল ভারতবিশ্রুত। খস্রু তাতে পারসীক এবং আরবীয় রীতির মিশ্রণ করে আরো বারটি ধুনের সৃষ্টি করলেন। শুধু কি ফারসী এবং আরবী রীতি? তাতে কি তুর্কী রীতির মিশ্রণ ছিল না? ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ সেই মোহিয়র, সাজগির, ওসাক, মাওয়াফেক, গানম জিলফ ফর্গাগণা শরফরদা বাজরি ফরোদস্ত সনম প্রভৃতি সুর ওস্তাদদেরই জানা নেই তো অন্যদের কথা আর কি বলা যাবে। এছাড়া দুটি তালের প্রকারভেদও খস্রুর কীর্তি বলে প্রসিদ্ধ—একটি সওয়ারি, অপরটি ফরোদস্ত। এসব বোধ হয় হারিয়েই গেল। ইতিহাসের চর্চা আমরা করি, কিন্তু ফারসী আমরা শিখি না, তার বদলে সংস্কৃত শিখি। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নানা অভিজ্ঞতায় বহুবার মনে হয়েছে শুধু সংস্কৃতই যথেষ্ট নয়, ফারসী জানাও প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আবার এই প্রয়োজনীয়তার কথা মনে পড়ল। এই দুটি মহৎ ভাষার অভিজ্ঞতা নিয়ে ইতিহাস জগতে প্রবেশ করলেই বোধ হয় আমাদের গবেষণা সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

আমীর খস্রু তাঁর নিজস্ব এই সব সৃষ্টির ওপর তেমন গুরুত্ব অর্পণ করেছিলেন বলে মনে হয় না। এটা বোধ হয় তাঁর কাছে একটা স্পোর্ট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর যে বয়সে তিনি এসব সুর তৈরি করে-ছিলেন, সেটা নতুন প্রেরণার বশে কিছু করবার বয়স নয়; বরঞ্চ সে সময়টা শেখ নিজামুদ্দিন আওলিয়ার চরণতলে বসতে পারলে তিনি শান্তিলাভ করতেন। কিন্তু প্রবল শেখবিদ্বেষী সুলতানের বৃত্তিভোগী সভাসদ ছিলেন তিনি; অতএব সুলতানকে খুশী করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না তাঁর। অসামান্য প্রতিভাবলে সুলতানের গৌরব যাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, তার একটা উপায় করে দিলেন তিনি। তাঁর দিক থেকে ব্যাপারটা বোধ হয় সেখানেই মিটে গিয়ে-ছিল। অনেকে কিন্তু এই সব সুর, রীতি এবং ছন্দকে প্রতিভার অবদান বলেই স্বীকার করেছেন এবং যতদিন পেরেছেন এসব সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন। ক্রমে কালের নিয়মে এই সব গান, সুর হারিয়ে গেছে। সংস্কৃত শাস্ত্র এসব ব্যাপারে নীরব। রক্ষণশীল আচার্যগণ বোধ হয় যাবনিক সঙ্গীতোদ্যমের মূল্যায়ণে প্রস্তুত ছিলেন না।

কওল শব্দের তত্ত্ব দিয়ে আরম্ভ করে-ছিলুম এক আখ্যায়িকায় শেষ করলুম। তবে আখ্যায়িকারও মূল্য আছে, কেননা, অনেক ইতিহাসের মূলকথা এই সব আখ্যায়িকাতেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

ছোটগল্প

চেনামুখ। রূপদর্শী। বর্তিক, কলকাতা ২৬। দাম তিন টাকা।

চলিত অর্থে যাকে উপন্যাস বলে, 'চেনামুখ' সে-অর্থে উপন্যাস নয়; ছোটগল্পের বইয়ে সংকলিত পর পর কয়েকটি গল্পের মধ্যে যে বিষয়বৈচিত্র্য ও প্রকৃতিভেদ সাধারণত বর্তমান থাকে 'চেনামুখে' তাও নেই, ফলে এই গ্রন্থটির সরল, গোত্রবিচার আপাতত সম্ভব হল না, পাঠক তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শ্রেণী ভাগ করে নিতে পারেন।

গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, আরও প্রাঞ্জলভাবে সে-উদ্দেশ্য বলা হয়েছে ভূমিকায়ঃ "ব্যক্তি আর পার্টি—এ দুই-এর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত বিরোধ বর্তমান আমার চেনামুখগুলি তারই সাক্ষী।"

মফঃস্বল শহরের নিরীহ এক কিশোর স্কুলে পড়ার বয়স থেকে রাজনীতির চুম্বকে আকৃষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে কি ভাবে রাজনৈতিক দল বা পার্টির আওতায় এসে পড়ল, এবং এই দলীয় রাজনীতির জগতের বাসিন্দে হিসেবে তার যে-সব বিয়োগান্ত অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে, 'চেনামুখ' সেই সব অভিজ্ঞতার কাহিনী। বলা বাহুল্য, এই ধরনের কাহিনীর মধ্যে একটি ঐক্য, অর্থাৎ প্রকৃতির ও উদ্দেশ্যের মিল থাকা স্বাভাবিক, পরন্তু একটির সঙ্গে অপরটির সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। 'চেনামুখের' কাহিনীগুলির মধ্যে সেই অন্তর ঐক্য ও সম্পর্ক বর্তমান। সম্পূর্ণ ধারণার পক্ষে কাহিনীগুলির একত্র সংকলন খুবই উপযোগী হয়েছে।

এই গ্রন্থের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ বাঞ্ছনীয়। লেখক যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী বলেছেন তাতে দেখা যায়—তাঁর প্রাথমিক আকর্ষণ রাজনৈতিক দলের প্রতি নয়—ব্যক্তির প্রতি। অর্থাৎ প্রথম থেকেই কোনো না কোনো ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর আকর্ষণ তাঁকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দলীয় রাজনীতিতে! লেখকের ভাষায় বলা যায়, এই সব গোসাইরা তাঁকে 'সংসারের পথে হাঁটা শিখিয়েছেন।'...মূলতঃ এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে রাজনীতির কাহিনীগুলি ব্যক্তি কাহিনী হয়ে উঠেছে। তার চেয়েও বড় কথা, ব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর কৌতূহল আকর্ষণ শ্রদ্ধা প্রবল থাকায়, প্রধান হওয়ায়—রাজনীতির সার্কাস খেলায় ব্যক্তিচরিত্রের উত্থান পতন, লোভ চাতুর্য, ব্যর্থতা বিষাদ, শূন্যতার হাহাকার স্বভাবতই আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। বুঝতে কষ্ট হয় না, ব্যক্তি এবং পার্টির মধ্যে যে বিরোধ—(ব্যক্তিত্ব ও দলগত আঙ্গিক আদর্শের বিরোধ) এবং যার পরিণাম এতখানি ভয়ংকর নির্মম হৃদয়হীন—লেখক কোন সহানুভূতি বশে তার কথা লিখেছেন। ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে ব্যক্তিত্ব সংহারের এই বেদনার কথা কে লেখে।

'রূপদর্শী'র রচনা রীতির সঙ্গে 'চেনামুখে'র রচনারীতির খুব একটা মিল নেই। যা আছে সেটুকু বোধ হয় অভ্যাসের দুর্বলতা। মুশকিল এই, বিষয় অনুসারে এ-ধরনের রচনাকে যতটা গাম্ভীর্যমণ্ডিত চিন্তাপ্রধান করার রেওয়াজ এদেশেও অল্পাবিস্তর চলতি আছে—গৌরকিশোর ঘোষ তার ছায়া মাড়াননি। সম্ভবত কৃত্রিম দমবন্ধ গম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি অপেক্ষা সরল সহজ অনাড়ম্বর ভাবেই তিনি তাঁর কাহিনীগুলি বিবৃত করতে চেয়েছেন। যাঁরা 'সিরিঅস' লেখার ভঙ্গি থেকেই মহত্ত্ব আবিষ্কার

করতে প্রয়াস পান তাঁরা 'চেনামুখে' প্রীত হবেন কি? আর গোঁড়া পার্টিভক্তরা? আমরা আনন্দ পেয়েছি।

অবশ্য 'চেনামুখ' ত্রুটিহীন নয়। কয়েকটি ত্রুটির মধ্যে সব সময় গভীরভাবে অন্তত একটি ত্রুটি চোখে পড়ে, তীব্রতা ও যন্ত্রণা বোধের দুঃসহ আবহাওয়া গড়তে লেখক প্রায়ই ব্যর্থ হয়েছেন। মনে হয়, লেখক তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে যতখানি দেখেছেন, ততখানি 'ন্যারেশানের' অন্তর্ভুক্ত বলে উতরে গেছে, কিন্তু যেখানে চরিত্রের নিজস্ব মনলোক গড়ে উঠেছে, সেই মনলোকের দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা, বিক্ষোভ হতাশা যেখানে কূলপ্লাবী—সেখানে লেখক হাত বড় একটা বাড়াননি, সাহস করেননি, ফলে আমরা হতাশ হয়েছি। গৌরকিশোর ঘোষকে 'রূপদর্শী' না করতে পারলে প্রকাশক স্বস্তি পান না দেখতে পাচ্ছি। তার দুর্ভাগ্য!...বইয়ের ছাপা, বাঁধাই ভাল। অহিভূষণের প্রচ্ছদ অনন্যসাধারণ।

(৫৯৫।৫৮)

আঙুরলতা—বিমল কর। নিউ স্ক্রিপ্ট, কলিকাতা-২৯। দু'টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

যে কয়জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক দরদ ও নিষ্ঠার সাথে বাংলা ছোট গল্প সাহিত্যকে পুষ্ট করে চলেছেন, বিমল কর তাঁদের অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁর সর্বাধিক পরিণতির সাক্ষ্য বহন করছে। আঙুরলতা, যযাতি, খড়ের দাগ, জানোয়ার ও শূন্য—মোট পাঁচটি গল্প এতে আছে। সব কয়টি গল্পেই লেখকের চিন্তাশক্তির গভীরতায় সমৃদ্ধ। গল্পবলার মৌলিকতার সঙ্গে সঙ্গে লেখকমনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য ও সংযমবোধ গল্পগুলিকে সুষমামণ্ডিত করেছে।

সুবোধ দাশগুপ্তের আঁকা প্রচ্ছদপটটি মনোরম।

৫৬।৫৯

কালাপানি—জীবানন্দ ভট্টাচার্য। প্রকাশক—এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, কলি-১২। দাম—দু' টাকা।

সাতটি ছোট গল্পের সংকলন। প্রথম গল্পটির নামে বইয়ের নাম-করণ। বিষয়-বৈচিত্র্য গল্পগুলির প্রধান সম্পদ। শেষ গল্প 'ব্রিটেশিয়া' ব্যতীত অন্যান্য সব গল্পের পাত্র-পাত্রী আন্দামানের কয়েদী এবং পটভূমি আন্দামান। কয়েদীদের মধ্যে যে সকলেই সমাজের আবর্জনা নয়, এমন কি তাদের অনেকের কারাবাস কোনো মহৎ মানবিকতা-সঞ্জাত—লেখক এটাই ফুটিয়ে তুলেছেন সহানুভূতি দিয়ে। আন্দামানের পুরনো কয়েদী 'বুড়ীমা' যে একদিন নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ্যাসক্ত দারোগা স্বামীর প্রাণ নিয়েছিলেন, তা হয়তো অজ্ঞাত থেকে যেত লেখকের আনুকূল্যের অভাবে। 'এলেমদার' প্রণয়িনীর কল্যাণের জন্যে 'খুনে' বদনাম নিয়ে এল দ্বীপান্তরে; সে এখন আন্দামানের শ্রদ্ধেয় মৌলভী সাহেব। সব গল্পগুলিই সুলিখিত। তবু প্রথম কয়েকটি গল্পে আঙ্গিক একটু প্রাচীন পন্থী হওয়ায় লেখককে কতকটা দ্বিধাগ্রস্থ মনে হয়েছে। শেষের গল্পগুলিতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, তিনি মাটি ছুঁয়েছেন। লেখক বয়স্ক, কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাগত। কিন্তু নবাগত হলেও অপরিণত নন। তাই তাঁকে সাগ্রহে স্বাগত জানাই।

(৫৬৯।৫৮)

মনোমর্মর—শ্রীনীহাররঞ্জন সিংহ। ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা-১২। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

আলোচ্য গ্রন্থখানি লেখকের চব্বিশটি ছোট গল্পের একটি সংকলন।

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে সংকলনখানি সমৃদ্ধ। কিন্তু বৃহত্তর জীবনবোধের অভাবে গল্পগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। মাঝে মাঝে কাহিনীর অবাস্তবতা মনকে পীড়িতই করে। তবে মন-বিশ্লেষণের ব্যাপারে গ্রন্থখানির অনেক ক্ষেত্রেই লেখক তাঁর কৃতিত্বের স্বাক্ষর যে রেখেছেন, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভালো। প্রচ্ছদপটটি চমৎকার।

৫৩।৫৯

বাস্তুহারা—বিমল বিশ্বাস। প্রকাশক—শীতল দেব রায়, ৫০ জয়নন্দিন মিস্ত্রী লেন, চেতলা। এক টাকা চার আনা।

বাস্তুহারা জীবনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প বা বড় গল্প কম লেখা হয়নি; উপন্যাসের সংখ্যা তত বেশী না হলেও কম নয়। কিন্তু এদের বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রয়েছে হয় বাস্তুহারা জীবনের একপেশে ছবি অথবা ওপর থেকে দেখা তাদের জীবনের ওপর কল্পনার রঙগীন আলোকপাত। আলোচ্যগ্রন্থের লেখক তাঁর এই প্রথম রচনায় বাস্তুহারা জীবনের এক ঘনিষ্ঠ বাস্তব চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছেন এবং তাতে তিনি মোটামুটিভাবে সার্থকই হয়েছেন। বইটি পড়তে পড়তে চোখের সামনে যে বাস্তুহারাদের ছবি ফুটে ওঠে, তারা কল্পলোকের সৃষ্টি নয়, বাস্তব পৃথিবীর মানুষ। আর এখানেই লেখকের কৃতিত্ব।

৪৮।৫৭

উপন্যাস

জীবনস্বপন—গজেন্দ্রকুমার মিত্র। কথামালা প্রকাশনী, কলিকাতা-১২। চার টাকা।

আমাদের বাড়িতে যারা ঝি-চাকরের কাজ করে, জল তোলে, বাসন মাজে, ঘর ঝাঁট দেয় তাদের সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি! অথচ এরাও মানুষ। এদের জীবনেও স্বপ্নের অবকাশ রয়েছে। এরাও দারিদ্র্যের মাঝেও একটি সুখী ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখে। একটু স্নেহ ভালোবাসা এরাও কামনা করে, আর তা পেলে তার বিনিময়ে জীবনের বৃহত্তম ত্যাগ-স্বীকারও এরা অম্লানবদনেই করতে পারে। কানু আর চাঁপাকে কেন্দ্র করে এমনি এক জীবন-স্বপ্নের বিচিত্র কাহিনী এঁকেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থখানিতে।

লেখকের গল্প বলার স্বকীয় ভঙ্গি বইটিতে একটি বিশেষ আমেজের সৃষ্টি করেছে, যা অল্প সময়ের মধ্যেই মনকে টেনে নেয়। কানুর বড় হওয়ার স্বপ্ন, সুন্দর সুখী একটি ঘর বাঁধবার স্বপ্ন যা তার জীবনে আর সার্থক হয়ে উঠল না—পাঠকমনকে যেমন সহমর্মীতার বাঁধনে মুহূর্তে বেঁধে দেয়, তেমনি ললিতা বৌদির সামান্য স্নেহের বিনিময়ে কানুর বিরাট ত্যাগ, অম্লান বদনে দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও পংগুতাকে স্বীকার করে নেওয়া [illegible] পাঠকমনকে স্বভাবতই সহানুভূতিতে [illegible]। তার জীবনের বিচিত্র মানসিক দ্বন্দ্ব [illegible] সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে [illegible]খানিতে।

প্রসংগত [illegible]ড়র বহু কেচ্ছাও গ্রন্থে [illegible] কাহিনী হিসাবে তাদের [illegible] এবং সেই প্রসংগে যেসব চরিত্র গ্রন্থকার এঁকেছেন তাদের সার্থকতা স্বীকার করে নি[illegible] থেকে, [illegible] মূল চরিত্রের বিকাশের জন্য [illegible] এইসব [illegible] এত বিস্তৃত বর্ণনার একান্তই প্রয়োজন ছিল?

৫৫০।৫৮

এক মুঠো আকাশ—ধনঞ্জয় বৈরাগী। গ্রন্থম, কলিকাতা-৬। পাঁচ টাকা।

যে পংগু সমাজ ব্যবস্থার মাঝে আমাদের বাস, যার আনাচে-কানাচে বাসা বেঁধে রয়েছে দুর্নীতি, যার মাঝে সৎ জীবন যাপনের চেষ্টা করার অর্থ মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়া, দারিদ্র্যের চরম আঘাত বরণ করে নেওয়া, সেই সমাজেরই এক বিচিত্র আলেখ্য অপূর্ব দরদ ও নিপুণতার সংগে এঁকেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। বইটির আগাগোড়া এই পচনশীল ঘুণেধরা সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি তীব্র কশাঘাত করেছেন। একদিকে তিনি সমাজের উচ্চ মঞ্চে যারা বসে আছে তাদের ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়ে তাদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন নিপুণ দক্ষতার সাথে। আর তারই পাশাপাশি সমাজের নীচু তলার অধিবাসীদেরও স্থান করে দিয়েছেন তাঁর রচনায়। তারা ভিড় করে এসেছে, তারপরে তাঁর সংবেদনশীল মনের ছোঁয়ায় তারা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কাহিনী পরিকল্পনায় যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন লেখক, তা' আজকের দিনে দুর্লভ। এক গভীর প্রত্যয় ও বলিষ্ঠ জীবনবোধে কাহিনীটি সমুজ্জ্বল।

সমাজের ক্লেদ-গ্লানি সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তুললেও লেখকের জীবন-দর্শন তাকেই শাশ্বত বলে স্বীকার করে নেয়নি, নিতে পারেনি। কাহিনীর সমাপ্তিতে তাই শোনা যায় জীবনের জয়গান, সকল ক্লেদ-নোংরামীর ওপর তাই বড় হয়ে উঠেছে মানুষের ভালোবাসা। দেখা দিয়েছে "নির্মল পবিত্র এক মুঠো আকাশ।" পাঠকমনও বইখানি শেষ করার পর আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে অনাগত দিনের এই নির্মল পবিত্র এক মুঠো আকাশেরই আশায়। এইখানেই লেখকের সব চাইতে বড় কৃতিত্ব।

৫৪১।৫৮

কান্নার প্রহর—অনুপম বন্দ্যোপাধ্যায়। কথামালা প্রকাশনী, কলিকাতা-১২। দুই টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

কালো মেয়ে সীতা। তা সে নিজেও জানে, যেমন জানে অন্যে। তবু মনটা তার কালো নয়, স্নেহ-মমতা-ভালোবাসায় তা' ভাস্বর। সেও ভালোবাসতে চায়, ভালোবাসা পেতে চায়। বাঁধতে চায় একটি ছোট্ট সুখী নীড়। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার; সুরজিৎ, সুবীর প্রভৃতি যারাই তার জীবনে এলো তারা তার গায়ের রংটাকেই দেখলো বড় করে, দেখতে পেলো না তার মনের ঔজ্জ্বল্য। তাদের অবজ্ঞা আর গ্লানিতে তার বুকের ভালোবাসার রংও বুঝি শেষ পর্যন্ত গেল কালো হয়ে। তাই শেষ পর্যন্ত সুপাবিত্র এল যখন ঘর বাঁধার প্রস্তাব নিয়ে, তাকে গ্রহণ করতে পারল না সীতা, বুঝিবা ওকে প্রত্যাখ্যান করেই যারা সারাজীবন কালো আর কুৎসিত বলে তাকে আঘাত করে এসেছে সেই পুরুষ জাতটার বিরুদ্ধেই সে নিল প্রতিশোধ। কান্নার প্রহর গুনেই কেটে গেল তার জীবন।

এক বিচিত্র আঙ্গিকে কাহিনীটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক আলোচ্য গ্রন্থখানিতে। কাহিনীর গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তা মনকে ধরে রাখে। মূল চরিত্রের বিকাশে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাব এমন ভাবে আঁকা হয়েছে, যাতে তার পরিণতি অবাস্তব মনে হয় না।

বইটির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

৫৪৯।৫৮

ভ্রমণ কাহিনী

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে—সম্পাদক: গোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য—সাড়ে পাঁচ টাকা।

গোপালদাস মজুমদার প্রকাশক হিসাবে প্রখ্যাত। দীর্ঘকাল তিনি প্রকাশনা ব্যবসায়ের সংগে যুক্ত থেকে সাহিত্যের সহিত পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। তাঁর সম্পাদিত এই ভ্রমণ কাহিনীর সংকলনটি ব্যবসায়গত দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা কিনা জানা নেই, কিন্তু ভ্রমণার্থী ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে উৎসাহী পাঠকদের কাছে এটি বিশেষ আকর্ষণীয় হবে নিঃসন্দেহে।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে দর্শনীয় আঠারোটি স্থানের ভ্রমণ কাহিনী এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সবগুলি লেখাই বিভিন্ন সাময়িকপত্র ও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সাধারণত একজনের লেখা ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশিত হয়ে থাকে। তাই এ বইটি কিছুটা অভিনব। আঠারোজন লেখক নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে স্বতন্ত্র ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। এ যেন আঠারো জন গাইড নিয়ে আঠারোটি স্থান ভ্রমণ করার মত। কারোর লেখা সাহিত্য-রসে সঞ্জীবিত, কারোর বা সরল প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ, কারোর বা বিশদ বর্ণনার সাদাসিধে বিবরণী। কিন্তু সবগুলো রচনাই মূল্যবান, কোনটি রমণীয়রূপে, কোনটি 'গাইড' হিসাবে। এই বইটি পাঠ করার পর বিরাট ভারতবর্ষের বহু দ্রষ্টব্যস্থানের মনোরম পরিচয় মনের মধ্যে

সঞ্চারিত হয়ে থাকে। অনেকগুলি আলোক-চিত্র সংযোজিত হওয়ায় বইটি আরো মূল্যবান হয়েছে।

ভূমিকায় অন্নদাশঙ্কর রায় গ্রন্থটিতে ভারতের দুই সীমান্ত অঞ্চল আসাম ও পাঞ্জাবের অনুপস্থিতি উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় সংস্করণে বা দ্বিতীয় সংকলনে এই স্থানগুলি সংযোজিত হলে খুশি হব। অন্নদাশঙ্কর লিখেছেন, 'আশকরি পাঠকদের ভ্রমণের সাধ মিটবে। না মিটলে গোপালদাসবাবু আরো ভ্রমণ কাহিনী প্রকাশ করবেন।'

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণ বৃত্তান্তের শাখা এখনও অপুষ্ট। গোপালদাসবাবু এ ধরনের আরো বই প্রকাশ করলে পাঠকসাধারণ সুখী হবেন নিঃসন্দেহে। ৭১।৫৯

অনুবাদ

১। **ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন।** ২। **এরাউন্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেজ্**—জুলে ভার্ন। অনুবাদক—মণীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—প্রতিটি দু' টাকা।

ফরাসী লেখক জুলে ভার্নের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁর বিজ্ঞান-নির্ভর উপন্যাস-গুলো একদা বয়সনির্বিশেষে সকলকে আনন্দ দিয়েছে। মানুষের বহু তর কল্পনা অজ বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে বাস্তবে রূপ নিয়েছে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বিগত দিনের অসম্ভব কল্পনাকেও বাস্তব-ক্ষেত্রে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। আজ আশি দিনে পৃথিবী-প্রদক্ষিণ অসম্ভব দ্রুত মনে হয় না, বরং মনে হয় বড্ডই শ্লথগতি। তবুও ভার্নের লেখার গুণে তাঁর কাহিনীগুলো পুরনো হয়ে যায়নি। আর 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন' তো হাল আমলের লেখা বলে মনে হয়। যাই হোক, অনুবাদক ইংরেজিতে সংক্ষেপিত বইয়ের অনুবাদ করেছেন। সেই কারণে মূল বইয়ের স্বাদ অনেকটা পানসে হয়ে গেছে। এটুকু অনুযোগ করেও বলা যায়, অনুবাদ চলনসই ভালো।

(৬১।৫৯ ও ৬০।৫৯)

কিশোর সাহিত্য

কেমন করে স্বাধীন হলাম—মণি বাগচী। প্রকাশক—বসু প্রকাশনী, ১১৯, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা—৬। দাম—দু' টাকা।

অল্পবয়স্কদের জন্যে অতি সংক্ষেপে লেখা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস। কোথাও মৌলিক গবেষণা কিছু নেই এবং ভূমিকায় লেখক সে রকম কিছু দাবি করেননি। লেখক ভাষায় আবেগসঞ্চার করতে পারেন; সুতরাং জ্বলজ্বলে ভাষায় লেখা বইয়ের কথা-গুলো ছেলেমেয়েদের মনে গেঁথে যাবে সহজে। পাঠ্যপুস্তকের বক্তব্য অনেক সময় সরস হয় না বলে অনেক ক্ষেত্রে ছোট ছোট ছাত্র-ছাত্রীদের যথার্থ শিক্ষালাভ ব্যাহত হয়। কিন্তু এই ধরনের বই থেকে তারা শিখতে পারে সহজে। লেখক সেই কারণে ধন্যবাদার্হ।

বক্তব্যকে খুব সরস করতে গিয়ে দু' একটি ক্ষেত্রে ইতিহাসের কিছু অঙ্গহানি ঘটেছে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের ডিরেক্ট অ্যাকসন ও তার রক্তাক্ত ফলাফলের কথা বাদ পড়ে গেছে ইতিহাস থেকে। এই অধ্যায়টুকুর সঙ্গে পরিচয় না হলে আমাদের আগামী দিনের নাগরিকেরা একটি অবশ্য শিক্ষণীয় অংশ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে।

বইয়ের ছাপা ও দাম সম্পর্কে অভিযোগ করার কিছু নেই। (৬৮।৫৯)

ছোটদের বিধানচন্দ্র : শ্রীনিশাপতি মাঝি ও শ্রীরবিদাস সাহারায়, এন ভট্টাচার্য এণ্ড কোং, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম এক টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ।

বিধানচন্দ্র রায় প্রতিভাবান ব্যক্তি, তাঁর সুদীর্ঘ-জীবন কর্মব্রতে উদ্বুদ্ধ। চিকিৎসক, সংগঠক ও শাসনযন্ত্রের কর্ণধাররূপে তিনি অসামান্য কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। বাংলার বিগত গৌরবোজ্জ্বল যুগের তিনি সর্বশেষ শিখা। ছোটদের জন্য গল্পের ভংগীতে বিধানচন্দ্রের কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী লিখেছেন লেখকদ্বয়। প্রসাদগুণসমৃদ্ধ ভাষা ও চিত্তা-কর্ষক আঙ্গিকের জন্য বইটি ছোটদের ভালো লাগবে।

বিধানচন্দ্র বর্তমানে একটি রাজনৈতিক দলের নেতা এবং দেশ নানা মতে বিচ্ছিন্ন। এই গ্রন্থ-রচনায় লেখকদ্বয় সচেতনভাবেই কোনপ্রকার রাজনৈতিক প্রচারের প্রশ্রয় দেন নি। তাতে বইটির মর্যাদা বেড়েছে। গ্রন্থটির জন্য ভূমিকা লিখেছেন মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন। ৪৩৩।৫৮

জীবনী-সাহিত্য

দরদী শরৎচন্দ্র—মণীন্দ্র চক্রবর্তী। প্রকাশক—বসুধারা প্রকাশনী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—৪.৫০ ন. প.

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবনী। মূলত, মানব-প্রেমিক হিসাবেই শরৎচন্দ্রকে উপস্থিত করা হয়েছে। তাঁর সাহিত্যের সমালোচনা বা বাংলাসাহিত্যে তাঁর মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়নি। সমগ্র জীবনী লেখা হয়েছে উপন্যাসের ঢঙে। অনেকটা আঁদ্রে মরোয়ার রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সেদিক থেকে লেখক সার্থক। তবে আমাদের দেশের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে বাক্তিপূজার যে বাহুল্য প্রায় সর্বত্র দেখা যায়, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তথাপি সুখ-পাঠ্য একটি জীবনী-রচনার কৃতিত্ব লেখকের প্রাপ্য। শরৎ-প্রেমিকমাত্রেরই বইটি ভালো লাগবে।

শরৎচন্দ্রের কয়েকটি ছবি এই বইটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। তাঁর পরিজনদের ছবিও আছে। বইয়ের শেষের তথ্যপঞ্জী গবেষকদের কাজে লাগবে। (৬৩/৫৯)

পত্রিকা

নতুন পত্র (মাঘ, ১৩৬৫)—যুগ্ম সম্পাদক: শংকর সেন ও জীবন দত্ত। প্রকাশক : সলিল-কুমার সেনগুপ্ত, বদ্রিনাথ লেন, মিঠাপুর পাটনা। প্রতি সংখ্যা ২৫ নয়া পয়সা।

'নতুন পত্র' প্রবাসী বাঙালী সাহিত্য চক্রের মুখপত্র। ইহাতে গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, কবিতা প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। প্রথম গল্পটি উল্লেখ-যোগ্য। রম্যরচনাটি উপাদেয় হইয়াছে। পত্রিকাটি কলেবরে ক্ষুদ্র হইলেও প্রতিশ্রুতি বহন করিতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

জাগরী। ১৷এ হরলাল মিত্র স্ট্রীট, কলি—৩। দাম—৩১ নয়াপয়সা।

'জাগরী' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় বস্তুত শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার কথাই আলোচিত হইয়াছে। পত্রিকাটির কলেবর এতই শীর্ণ যে কোনো বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা প্রকাশ সম্ভব নহে। 'জাগরী' তাহার ক্ষুদ্র সামর্থে যতটা সম্ভব করিয়াছে। নামী লেখকদের রচনা ও নতুন লেখকদের রচনাও দেখিলাম।

বিবিধ

Sree Ramakrishna and World-Culture—Tamoshranjan Ray. Publishers — Ramkrishna Vedanta Ashrama, Darjeeling. Price Rs. 2|12|-

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে নতুন করে জানার ব্যাপক চেষ্টা চলেছে। দেশের বিদগ্ধ-সমাজ তাঁদের গবেষণায় পরম পুরুষকে ধরবার চেষ্টা করছেন। তার ফলে তিনি আমাদের চোখে নানাভাবে এসে ধরা দিচ্ছেন। এ সময়ে লেখক এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করে পাঠকদের যথেষ্ট উপকার করলেন। বিশ্ব সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে এই পূজ্যপাদ মহান পুরুষের জীবন ও বাণীর আলোচনা আজ বিশেষভাবেই প্রয়োজন। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিদেশেও এ-গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ৫৪।৫৭

Son of the Working Class: The autobiography of Wu Yun-To: Foreign Languages Press, Peking

প্রাপ্তিস্থান — ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলি-১২। দাম—১৸৹

নতুন চীনের এক শ্রমিকের আত্মজীবনী। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে অপরাজেয় মানবাত্মা। অঙ্গহানি ঘটেছে, দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছে তবু হার মানেনি। লেখকের আন্তরিকতা মর্মস্পর্শী। বাচনভঙ্গী সরল ও অনাড়ম্বর। আত্মজীবনী হলেও পড়তে-পড়তে মনে হয় যেন উপন্যাস। অনুবাদকদের মার্জিত ইংরিজী প্রশংসার্হ। আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের বই এই রকম সার্থকভাবে ইংরিজীতে যদি অনুবাদের ব্যবস্থা থাকত, তাহলে আমাদের সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মর্যাদা নিঃসংশয় বৃদ্ধি পেত। কয়েকখানি উড-কাট ছবি বইটির আর একটি উল্লেখ্য সম্পদ। (১৬০।৫৭)

Self-knowledge: Swani Abhedananda. Published by Ramkrishna Vedanta Math, 19 B, Raja Rajkissen Street, Cal-6, Price—Rs.4|-

আমাদের দেশে স্বামী অভেদানন্দকে চিনিয়ে দেবার দরকার নেই। রামকৃষ্ণ-শিষ্য ও বিবেকানন্দের সমব্রতী স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় জ্ঞানযোগী। এই গ্রন্থে স্বামীজী বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে আবিষ্কার করেছেন যে দর্শন, বিজ্ঞান বা যে কোনো বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান লাভের প্রাথমিক শর্ত আত্ম-জ্ঞান। নিজেকে না জানলে অন্য কোনো বিষয়ই জানা সম্ভব নয়। প্রগতিকামী ব্যক্তিদের দেহ ও আত্মা, বস্তু ও মনের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে হবে প্রথম, তবেই বিশ্বের মূলাধার সেই অবিনশ্বর আত্মাকে উপলব্ধি করা সম্ভব। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী উপনিষদের শিক্ষা-গুরুদেব তত্ত্বদর্শনের দ্বারা পুষ্ট ও বস্তুবাদী দর্শনের পরিপন্থী। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুমাত্রেই এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন। বইটি ইংরিজীতে লেখা। বোধ হয় বিলাতের পাঠকদের জন্যেই লেখা হয়েছিল। এইখানি অষ্টম সংস্করণ,—এটা নিঃসংশয়ে জনপ্রিয়তার স্বাক্ষর। বইখানির বাংলায় অনুবাদ হয়েছে কি না জানি না। না হয়ে থাকলে প্রকাশকদের কর্তব্য বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা। ভারতীয় পুস্তক ব্যবসায়ে ১২৫ পৃষ্ঠা বইয়ের দাম চার টাকা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আশা করি প্রকাশকরা এদিকে দৃষ্টি দেবেন। (৬০০।৫৮)

A concept of planned free press: Shiva Chandra Jha, Bookland, Private Ld., 1, Sankar Ghosh Lane, Calcutta-6. Price Rs 3.50 nP.

আধুনিক সমাজজীবনে সংবাদপত্রের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। সংবাদ পরিবেশন করার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র প্রতিদিন জনসাধারণের মতকে প্রভাবান্বিত করে। এই প্রভাবের প্রতি-ক্রিয়া শুভ হওয়া যেমন সম্ভব, অশুভ হওয়াও বিচিত্র নয়। তাই নিরপেক্ষ ও কল্যাণদায়ক সাংবাদিকতা সম্পর্কে বুদ্ধিজীবী মহলে নানা অভিমত রয়েছে। এই অভিমতগুলি অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ দ্বারা অনুভাবিত। লেখক আমেরিকার কালিফোর্নিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার উচ্চতম পাঠ গ্রহণ করে-ছেন, কিন্তু তিনি আমেরিকান আদর্শে বিশ্বাসী নন। অন্য নিরপেক্ষ স্বাধীন সাংবাদিকতার আদর্শ সম্পর্কে ব্রিটিশ, আমেরিকান ও রাশিয়ান ধারণা বিশ্লেষণ করে তিনি নতুন সমাজতান্ত্রিক বোধে অনুপ্রাণিত। সাংবাদিকতার ছাত্র ও অগ্রণী পাঠকগণ এই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। ৪৯০।৫৮

Face your life with confidence—Willian E. Hulme. Published by Jaico Publishing House, 125, Mahatma Gandhi Road, Bombay-1. Price—Rs. 2.50 net

যৌবনের সমস্যা বহুতর। লেখক সমস্যা-গুলি সমাধানের পথ-নির্দেশ দিয়েছেন। খাঁটি মার্কিন পদ্ধতিতে প্রথমে সমস্যাবলীর শ্রেণী-বিভাগ করা হয়েছে, তারপর প্রত্যেক জাতের সমস্যার জন্য দেওয়া হয়েছে ব্যবস্থাপত্র। আধুনিক যুগের মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিশেছে নীতি-উপদেষ্টার উৎসাহ। ভাষা খুব সহজ, কথ্যভাষার নিকটবর্তী। প্রথম শুরু হয়েছে অধ্যাত্ম-সমস্যা নিয়ে,—নিদান 'হোলি বাইবেল'। তারপর আছে পারিবারিক সমস্যা, ও ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিগত সমস্যাবলী। কুমারী মেয়েরা কেন যে 'ডেটে' পায় না, তাও ব্যাখ্যাত হয়েছে। আবার কী করলে বিবাহিতাদের 'ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয়' হবে, তাও লেখক খুব ধৈর্য সহকারে বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কিন দেশে এই রকম বইয়ের কদর আছে হয়তো। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো অধ্যাত্মচিন্তার লীলাক্ষেত্রে এ রকম পেশাদার ধর্মপ্রচারকের কপালে কতখানি সমাদর জুটবে বলা মুশকিল। (১৮৯।৫৮)

Indian Thought (a critical study) — Samaren Roy. Publishers — Institute of Political and Social studies. 211, Park Street, Cal.-17. Price Re. 1|- only.

ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক লোকায়ত সাংখ্য ও বৌদ্ধ দর্শন নিয়ে আলোচনা করেছেন। যুগ যুগ ধরে বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা যে সব বিষয় আলোচনায় তাঁদের সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন, নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে সে সব বিষয়কে প্রাঞ্জলরূপে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। তথাপি এ গ্রন্থটি সম্বন্ধে বলা যায়, দর্শন শাস্ত্রে যাঁদের প্রাথমিক জ্ঞান আছে, ভারতীয় দর্শনের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায়ও তাঁরা নতুন কিছু চিন্তার খোরাক পাবেন। ৩৬৩।৫৮

Whispers from Eternity — Paramahansa Yogananda. Publishers — Self-Realization Fellowship, Los Angeles, California, U.S.A. Price — $ 3.00.

পরমহংস যোগানন্দ দীর্ঘদিন পূর্বে আমেরিকা গিয়ে তাঁর সাধনালব্ধ জ্ঞান প্রচার করেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থ সেই জ্ঞানেরই সুন্দর একটি প্রকাশিত রূপ। গভীর অনুভূতি মন্ত্রের মতো উচ্চারিত হয়েছে নানা খণ্ডে। তাকে কবিতা বলা চলে, মন্ত্র বললেও দোষ নেই। সমান অনুভূতি ও বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরোপলব্ধির এই শান্ত সুন্দর বাঙময় রূপকে গ্রহণ করতে পারলে পাঠক মনেপ্রাণে অনাবিল আনন্দের আস্বাদ পাবেন। ৫৭১।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে:—

শতাব্দীর আশীর্বাদ—শ্রীমদনমোহন গোস্বামী।
গান্ধীজী কী চান—নির্মলকুমার বসু।
স্থিতপ্রজ্ঞ দর্শন—বিনোবা—অনুবাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ গুহ।
যাত্রার পথে—শ্রীচারুচন্দ্র ভাণ্ডারী।
রাষ্ট্র জ্ঞানের মধুভাণ্ড—মৌমাছি।
ছায়ানট—উৎপল দত্ত।
অমরাবতী—জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়।
ক্রীড়া জগতে দিকপাল বাঙালী—অজয় বসু।
রক্তিতলক—স্টিফেন ক্রেন। অনুবাদক—সত্য-ব্রত বসু।
নির্বাচিত গল্প—ন্যাথানিয়েল হথর্ন। অনু-বাদক—সুনীলকুমার ধর।
বিশ্লেষণ—শ্রীহরিবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়।
মনমনসিংহ গীতিকার গল্প—ডাঃ যামিনী-কান্ত সিংহ।

গত ২৮শে মার্চ থেকে মহাজাতি সদনের দোতলায় একটি চিত্রপ্রদর্শনী চলছে। এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছেন সদ্যগঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সমাবেশ। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সৃষ্টিশীল শিল্পীদের সঙ্গে চিন্তাশীল শিল্পরসিকদের ঘনিষ্ঠতর যোগাযোগ স্থাপন করা। এ'রা বছরে চারটি করে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবেন এবং একটি চিত্রকলা ও ভাস্কর্য বিক্রয়ের বিপণিও স্থাপন করবেন সংকল্প করেছেন। শিল্প বিষয়ক আলোচনা-চক্রেরও ব্যবস্থা হবে। তিনজন তরুণ শিল্পী করুণা সাহা, প্রকাশ কর্মকার এবং সনৎ করের চিত্রকলা স্বতন্ত্র-ভাবে তিনটি ঘরে সাজিয়ে এ'রা এ'দের প্রথম প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। এই তিনজন শিল্পীই কলকাতার কলারসিক মহলে সুপরিচিত। করুণা সাহা কলকাতার গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট থেকে তাঁর শেষ ডিপ্লোমা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। ইনি নানা শিল্প প্রতিযোগিতায় বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। এর আগে বহু প্রতিনিধিত্ব-মূলক চিত্রপ্রদর্শনীতে এ'র চিত্রকলা দেখা গেছে। ১৯৫৭ সালে ইনি এ'র প্রথম একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন আর্টিস্ট্রী হাউস-এ। এ'র রচনার মূল ভিত্তি বাস্তবতা হলেও রচনাগুলি ভাবপ্রধান এবং শিল্পীর ব্যক্তিত্বের রসে পরিপূর্ণ। তবে ভাবের তাড়নায় তাঁগী এ'র উন্মত্ত ঘোড়ার মত ছুটে চলেনি, লাবণ্য তাকে সংযত করেছে। লাবণ্যের কোমল স্পর্শে সে এখানে শান্ত। শ্রীমতী সাহার চিত্রের বর্ণনীয় বিষয় নরনারীর মুখশ্রী, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে আবৃত দেহ-ভঙ্গিমা এবং প্রকৃতির দৃশ্য-বৈচিত্র্য। জলরঙ, তেল রঙ, এবং প্যাস্টেল এ তিনটি মাধ্যমেই এ'র সমান দখল। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচনা 'কোম্বিং', 'ইমপর্টেণ্ট নিউজ', 'এ পোরট্রেট', 'গ্রে গ্যাংটক' এবং 'হাউস টপস'।

প্রকাশ কর্মকার গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট-এ শিল্প শিক্ষা শুরু করেন বটে কিন্তু সেখানকার শিক্ষা সমাপ্ত না করেই দু বছর পর সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। ইনি প্রখ্যাত চিত্রকর প্রহ্লাদ কর্মকারের পুত্র। সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেও চিত্রচর্চা থেকে ইনি কখনও বিরত হননি। বর্তমানে ইনি একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিল্পী। এর আগে বহু প্রদর্শনীতে যোগদান করেছেন এবং ১৯৫৭ সালে আর্টিস্ট্রী হাউস-এ ইনিও প্রথম একক

করুণা সাহা অঙ্কিত একটি চিত্র

প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। এ'র রচনার ধারা বহুধা বিভক্ত। কখনও ফরাসী ইম্প্রে-শনিজম-এর প্রভাব পড়েছে, কখনও দুতিনরকম পাশ্চাত্ত্য ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে, আবার স্বকীয় আইডিয়ালিজম-এ কখনও বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে এ'র রচনা। 'দি বুল অ্যাণ্ড দি নিউড', 'নেচার', 'নাইট হস্টেসেজ', 'লা পি...' এবং 'দি ক্যাট' এই পাঁচটি ছবিতেই শিল্পীর মনের আসল পরিচয় পাওয়া যায়। রচনাগুলির মাল-মশলা বাস্তবজগতধর্মী হলেও কিছুটা অত্যুক্তিমূলক ভাবব্যঞ্জনায় শিল্পী যে মেজাজের পরিচয় দিয়েছেন তা এ'র একান্তই স্বকীয়। অথচ দর্শকের কাছে শিল্পীর বক্তব্য অতি সরল। সব ক'টি ছবি এক সঙ্গে বিচার করলে মনে হয়, শিল্পীর মতি অসহিষ্ণুতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। তবে চিত্রবিজ্ঞান যে এ'র বেশ আয়ত্তের মধ্যে সে প্রমাণও পাওয়া যায় ঐ বহুধা বিভক্ত চিত্রকল্পের মধ্যে থেকেই।

সনৎ করের রচনার মধ্যেই মডার্নিস্টিক চিত্রকল্পের ভাব সবচেয়ে বেশী। ইনিও গভর্নমেণ্ট আর্ট কলেজ থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন। ইনি কলকাতার 'আর্টিস্টস সার্কল' শিল্পীগোষ্ঠীর সভ্য। আর্টিস্টস সার্কলের প্রদর্শনী থেকে এবং আরও কয়েকটি প্রদর্শনী থেকে আমরা তাঁর শিল্পশক্তির পরিচয় আগেই পেয়েছি। যদিও এ'র পরীক্ষণ নিরীক্ষণের পালা শেষ হয়নি, তা হলেও একথা অনস্বীকার্য যে, ইনিও যথেষ্ট পরিণত শিল্পী। বর্তমানে ইনি কলকাতার কোনও এক শিক্ষায়তনে শিক্ষকতা করেন। তৈল মাধ্যমই এ'র সবচেয়ে প্রিয়। ইনি বিশ্বাস করেন চাক্ষুষ রূপকে শিল্পে ব্যক্ত করাটাই শিল্পীর কাজ নয়। শিল্পীর কর্তব্য তাঁর অনুভূতিকে রঙ এবং রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা। বাস্তব জগতের জীবিত বা নির্জিত সব রূপের কেবল প্রকারটুকুই ধরে বিচিত্র সব আকারের সৃষ্টি করেছেন ইনি। চতুষ্কোণ ফ্রেমের মধ্যে ঐসব অত্যুক্তিপূর্ণ আকৃতি, রঙ, রেখা প্রভৃতি যাতে সুসংস্থিত হয় এবং সব মিলে যাতে একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের ভাব আসে শুধু সেইদিকেই এ'র লক্ষ্য। এ'র প্রত্যেকটি ছবিতে একটা ডাইমেনশন অনুভব করা যায়। এ'র রচনা থেকে মানে খুঁজে বার করা চলে না। সঙ্গীত-শিল্পী যেমন সুর দিয়ে গেয়ে যান কথার মালা শ্রবণেন্দ্রিয়কে প্রীত করার উদ্দেশ্যে, ইনিও তেমনি দর্শনেন্দ্রিয়কে প্রীত করার উদ্দেশ্যে কখনও অনুরঞ্জন করে, কখনও অতিরঞ্জন করে, কখনও টেনে, কখনও ফেনিয়ে রূপকে মুক্ত করেছেন। এ'র বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য রচনা 'ক্রাউন অ্যাণ্ড দি মাদার', 'ফাদার মাদার অ্যাণ্ড সন্' এবং 'রিক্লাইনিং'।

প্রদর্শনীটি আগামী ৬ই এপ্রিল অবধি জনসাধারণের জন্য খোলা থাকবে। বিকেল ৪টা থেকে রাত্রি ৯টা। কোনও প্রবেশমূল্য নেই। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি সমাবেশের পরবর্তী চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে আগামী জুন মাসে।

চন্দ্রশেখর

বাংলার নাট্য-আন্দোলন

বাংলা নাটক ও নাট্য-আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে গত সপ্তাহে।

বাংলা সাহিত্যকে কেন্দ্র করে সাহিত্যিকদের সম্মেলন অনেকদিন ধরেই অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে দেশের নানাস্থানে। কিন্তু কেবলমাত্র নাট্য সাহিত্যকে আলোচনার বিষয় করে কোন সম্মেলন এতাবৎ হয়নি। গত ইস্টারের ছুটিতে কলকাতায় ২৭শে থেকে ২৯শে মার্চ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী বঙ্গ-নাট্যসাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে বিশ্বরূপা নাট্য-উন্নয়ন কমিটি নাট্যামোদী সাধারণের সে ক্ষোভ দূর করেছেন।

সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ভাষণের এক জায়গায় তিনি বলেন, "বৈষয়িক দিক থেকে বাংলা নাটক যে সাবালক হয়ে উঠেছে তার কিছু কিছু প্রমাণ আমরা ইদানীংকালে পেয়েছি। খুব শুভ লক্ষণ; কারণ অস্তিত্বের জন্য বৈষয়িক সাফল্যের প্রয়োজন। শুধু সতর্ক থাকতে হবে যেন উল্টোটা না ঘটে—অর্থাৎ বৈষয়িক সাফল্যের জন্যই অস্তিত্ব, এই বোধ যেন কায়েম না হয়। সবে লায়েক-হয়ে-ওঠা আধুনিক বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে বিষয়বুদ্ধির এই অতি পরিলুব্ধতা থেকে মুক্ত রাখতে হলে একটি গঠনমূলক সমালোচনা ও সমীক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমান উদ্যোগ সেই দিক থেকে সহায়ক হবে বলে আমি আশা করি।"

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বৈষয়িক সাফল্য ও একান্তভাবে মননশীলতা—এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথটি বেছে নেবার পরামর্শ দিয়েছেন আগামী যুগের নাট্যকারকে। তিনি আরও বলেছেন, "বাংলা সাহিত্যে নাটক সৃষ্টির যে আবেগ এসেছে, দর্শকের দাক্ষিণ্য যাকে উৎসাহিত করছে, তা যেন ক্ষণভঙ্গুর সৃষ্টির মধ্যে অপচয়িত না হয়। স্থূলে ভানুমতীর খেল অথবা বুদ্ধিস্পর্ধীর হিং-টিং-ছটের মোহ কাটিয়ে বাংলা নাটককে এগিয়ে যেতে হবে।"

তারাশঙ্করের এই কথাগুলিও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্যঃ "আমাদের জীবনের পরিধিও বাড়ছে, বৈচিত্র্য বাড়ছে স্বাভাবিকভাবেই এবং আমাদের নাটকের কাঁচামাল সেইখান থেকেই সংগ্রহ করতে হবে। পাশ্চাত্য জীবনের কুশপুত্তলিকাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রঙ্গমঞ্চের ওপর কসরৎ দেখানোর মধ্যে আমি শিল্প, সাহিত্য, রুচি, আত্ম-মর্যাদা অথবা সমাজবোধকে খুঁজে পাইনে। আমাদের নিজেদের জীবন আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভাবনা-ঐতিহ্যকে নিয়ে আমাদের নাটক গড়ে উঠুক। একমাত্র তাহলেই বাংলা নাটকের দৈন্য সম্বন্ধে যে নালিশ তা একদিন ঘুচতে পারে।"

তিন দিনে বঙ্গনাট্য সাহিত্য সম্মেলনের সাতটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক অধিবেশনে বিভিন্ন বক্তা নাটক ও নাট্যশালার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেন। শেষ অধিবেশনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়।

* * *

গত সপ্তাহের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা। জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি বেসরকারী প্রস্তাবের উত্তরে ডাঃ রায় বলেন যে, ১৯৫৩ সাল থেকেই তিনি এবিষয়ে চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু পেশাদার রঙ্গমঞ্চের বিরোধিতায় তা সফল হয়নি। তিনি ইতিমধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জাতীয় নাট্যশালা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং সরকারের সমগ্র পরিকল্পনাটি শীঘ্রই চূড়ান্ত আকার গ্রহণ করবে বলে তিনি পরিশেষে সদস্যদের আশ্বাস দেন।

ডাঃ রায় আরও একটি ঘোষণা করেন, জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যার মূল্য অসামান্য। তিনি বলেন যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুরবাড়ীর একাংশে রবীন্দ্রনাথের নামে নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীতের একটি বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের আছে।

সংস্কৃতির অনুরাগী মাত্রেই এইসব ঘোষণায় উল্লসিত হবেন।

সানরাইজ ফিল্মসের "কিছুক্ষণ" চিত্রের অধিকাংশ দৃশ্যই তোলা হয়েছে একটি রেল স্টেশনে। তারই একটি উদাহরণ এটি

চিত্রালোচনা

এ সপ্তাহে মাত্র একখানি নতুন হিন্দী ছবির মুক্তি। ছবিখানির নাম 'চৈতক ও রাণা প্রতাপ'। চিতোরাধিপতি বীর প্রতাপ সিংহ ও তাঁর প্রিয় অশ্বকে কেন্দ্র করে বুস্টার মুভিজ এই ছবির মধ্যে রাজপুত ইতিহাসের এক জ্বলন্ত অধ্যায় চিত্রামোদীদের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন অমরনাথ,

ইংকা প্রোডাকসন্সের "নূত্যেরই তালে তালে"র অন্যতমা নায়িকা সুকুমারী।

নীরু, শ্যাম, নাজ্জী, কামরাজ প্রভৃতি শিল্পীরা। মতি নামক ঘোড়াটি নিয়েছে চৈতকের ভূমিকা। এ ছবির অন্যতম আকর্ষণ এটি।

• • •

বছরকার শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে সম্মানিত এবং রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদকে ভূষিত বাংলা ছবি 'সাগর সংগমে'র বহু প্রতীক্ষিত মুক্তি ঘোষিত হয়েছে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে (১৫ই এপ্রিল)। যাঁরা ছবিটি ইতিমধ্যে দেখবার সুযোগ পেয়েছেন, তাঁদের মতে এটি পরিচালক দেবকীকুমার বসুর দীর্ঘ চলচ্চিত্র জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত কাহিনীর মূলে চরিত্র দুটি—এক আচারপরায়ণা বিধবা কুলবধূ ও বারনারী-লালিতা একটি ছোট মেয়ে। এদের দুজনকার স্নেহ বন্ধনের মানবীয় আবেদনে ছবিটি সমুজ্জ্বল। ভারতী দেবী ও নবাগতা মঞ্জু অধিকারীর অপূর্ব অভিনয় ছবিখানিকে অসামান্যতা দান করেছে। রাইচাঁদ বড়াল সৃষ্ট সুরের ইন্দ্রজালও ছবিটির আকর্ষণ বাড়িয়েছে। নীতিশ মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, তুলসী লাহিড়ী, শ্রীমান বিভু প্রভৃতি এর পার্শ্ব-চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন।

• • •

বাদল পিকচার্সের নতুন ছবি 'দীপ জেলে যাই'র মুক্তিও সমাসন্ন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচিত কাহিনীকে চিত্রান্তরিত করেছেন পরিচালক অসিত সেন। মুখ্য ভূমিকা দুটিকে ছবির পর্দায় প্রাণময় করে তুলেছেন সুচিত্রা সেন ও বসন্ত চৌধুরী। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন পাহাড়ী সান্যাল, কাজরী গুহ, চন্দ্রাবতী, নমিতা সিংহ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী প্রভৃতি। ছবিখানি হেমন্তকুমার, লতা মঙ্গেশকর ও মান্না দের গানে সমৃদ্ধ। সংগীত পরিচালনাও করেছেন হেমন্তকুমার স্বয়ং।

• • •

আগামী ১লা মে সত্যজিৎ রায়ের নবতম চিত্রার্ঘ্য 'অপুর সংসার' একসঙ্গে কলকাতা, বোম্বাই ও দিল্লীতে মুক্তিলাভ করবে। বাংলা ও বাংলার বাইরে এই ধরনের যুগপৎ প্রদর্শন বাংলা ছবির ক্ষেত্রে এই প্রথম। বোম্বাই ও দিল্লীর জন্যে অবশ্য হিন্দী সাব-টাইটেল যোগ করা হবে। 'অপুর সংসার' আগামী ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবেও প্রদর্শিত হবে। তার জন্যে ফরাসী সাব-টাইটেল প্রয়োজন। তাছাড়া ইংরেজী সাব-টাইটেল যোগ হবে ঐ ভাষাভাষী দেশগুলির জন্যে। এইসব সাব-টাইটেলের জন্যে সত্যজিৎ রায় শীগগিরই লণ্ডনে যাবেন।

• • •

নবোদয় ফিল্মসের 'বিভ্রান্ত' এপ্রিলের মাঝামাঝি সাধারণের কাছে আত্মপ্রকাশ করবে। আজকের সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত-পূর্ণ এক বাস্তবধর্মী কাহিনী এতে রূপ পেয়েছে। বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, আশীষকুমার, অসিত-

ধুম্রাচক্রের "পার্সোন্যাল এসিস্ট্যান্ট" ছবিতে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুমা দেবী। চিত্রকরের পরিচালনায় ছবিটি নির্মাণপথে

বরণ, তপতী ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মিত্র, পদ্মা দেবী এবং আরো অনেকে। জগবন্ধু বসুর প্রযোজনায় ও চিত্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনাধীনে ছবিখানি তোলা হয়েছে। সুর ও আবহ সংগীতের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন যথাক্রমে সুজিত নাথ ও কাজী অনিরুদ্ধ।

• • •

এম পি প্রোডাকসন্সের পতাকাতলেই হয় অগ্রদূত পরিচালকগোষ্ঠীর উদ্ভব ও খ্যাতিলাভ। সাময়িক বিচ্ছেদের পর এই দুই প্রযোজক ও পরিচালকগোষ্ঠীর পুনঃসংযোগ ঘটেছে 'কুহক' ছবিতে। সমরেশ বসুর গল্প অবলম্বনে এম পির এই নতুন ছবিটি তুলছেন অগ্রদূতগোষ্ঠী। এর নায়ক চরিত্র বিভিন্নমুখী দুই প্রবৃত্তির সমন্বয়ে গঠিত। নতুন ধরনের এই দ্বিমুখী চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন উত্তমকুমার। তাঁর বিপরীতে আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও তরুণকুমার। এম পি স্টুডিওতে ছবিটির স্যুটিং দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। হেমন্তকুমারের ওপর এর সুর-সংযোজনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

দিব্য-জীবন চিত্রায়ন

দ্বাপরে নরদেহধারী শ্রীকৃষ্ণের সংগে যিনি বলরাম, কলিতে বৈষ্ণবদের মতে শ্রীচৈতন্যের সংগে তিনিই নিত্যানন্দ অবধূত। শ্রীচৈতন্যাবতারে নিত্যানন্দই ভক্ত-অবতার, মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গীদের মধ্যে তিনি 'সভাতে আগল (অগ্রগণ্য)'। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের এই লোকোত্তর সম্বন্ধের ভিত্তিতে তৈরী হয়েছে সংলতা পিকচার্সের 'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু'। ভক্তিপ্রবণ দর্শকদের আধ্যাত্মিক প্রেরণা জোগাবে ছবিখানি।

বৈষ্ণবগ্রন্থে নিত্যানন্দের বাল্যকালে ঈশ্বর-ব্যাকুলতা এবং পরে তীর্থ পর্যটন ও সদ্‌গুরু লাভ সম্বন্ধে যতটুকু উল্লিখিত আছে, আলোচ্য ছবির আখ্যানভাগে তারই প্রতিফলন পাওয়া যায়। মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদদের সংগে নিত্যানন্দের মিলন, তাঁর জগাই-মাধাই উদ্ধার, মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী নাম-সাধনার প্রচার ও আধ্যাত্মিক সাধনার সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য পরে গার্হস্থ্য ধর্ম পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়েই চিত্রনাট্যের পরিসমাপ্তি।

কাহিনী-সূত্রকার পণ্ডিত দ্বিজপদ গোস্বামী মহাপ্রভুর সংগে নিত্যানন্দের আবির্ভাবের গূঢ় রহস্য প্রশংসনীয়ভাবে রক্ষা করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতন্যকে অভিন্ন জেনেও নিত্যানন্দের গৌরাংগ-মাহাত্ম্য প্রচারের আধ্যাত্মিক সংকল্পের পরিচয় পাওয়া যায় ছবিতে সুন্দরভাবে। তবে নিত্যানন্দ পরম বৈষ্ণব বলে পূজিত হলেও তিনি যে অবধূত এবং তাঁর স্বভাব ও প্রকৃতি যে শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য পার্ষদদের চাইতে ভিন্ন ছিল, ছবিতে চরিত্রটির উপস্থাপনে সেরকম কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দের যে চিত্তবৈকল্য দেখানো হয়েছে, প্রামাণ্য বৈষ্ণবগ্রন্থে ঠিক তেমনটি পাওয়া যায় না। গৌড়ে নিত্যানন্দের নাম-প্রচার ও জীবোদ্ধার কার্যের ব্যাপকতার কোন রূপই ছবিতে নেই। বৈষ্ণবগ্রন্থে উল্লিখিত তাঁর প্রধান ভক্তগণ ও তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কাহিনীতে নাট্যাবেগ সৃষ্টির অবকাশ ছিল যথেষ্ট। তার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা হয়নি।

ছবির চিত্রনাট্য অনেকটা বিবরণধর্মী। ভগবানের নরলীলাই যেখানে তাঁর শ্রেষ্ঠ অলৌকিকত্ব, সেখানে অলৌকিক দর্শনের দিকে ঝোঁক (একাধিকবার শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের রূপ পরিগ্রহণ) রসসৃষ্টিকে ব্যাহত করে। এই ধরনের কয়েকটি ত্রুটির কথা বাদ দিলে নাম-কীর্তন ও দিব্য জীবনের পরিচ্ছন্ন চিত্ররূপ হিসাবে ছবিখানি দর্শকদের কাছে আদরণীয় হবে। ভক্তিমূলক চিত্র-পরিচালনায় পরিচালক অসীম পালের নিষ্ঠা ও রসবোধ প্রশংসনীয়।

নাম-ভূমিকায় অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করবে। তাঁর বিরহ-কাতরতার অভিব্যক্তি মর্মস্পর্শী। নিত্যানন্দের পিতা-মাতার ভূমিকায় শিশির

চিত্রাঞ্জলি পিকচার্সের মুক্তি-প্রতীক্ষিত ছবি 'জল জংগল'-এর একটি নাটকীয় মুহূর্তে অসীম কুমার ও মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্তিক চট্টোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করেছেন

পটব্যাল ও অপর্ণা দেবীর স্বচ্ছ অভিনয় হৃদয়গ্রাহী। শচীমাতার চরিত্রটি চন্দ্রা দেবী সংবেদনশীলতার মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ারূপিণী সন্ধ্যা রায়ের অভিনয় চলনসই। তাঁর মুখে গান একান্ত বেমানান লাগে। শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় নবগোপালের অভিনয় সংযত হলেও মনকে নাড়া দিতে পারে না। অন্যান্য পার্শ্বচরিত্রে পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার, রবীন ব্যানার্জী ও রাজা মুখার্জীর নাম উল্লেখযোগ্য।

সংগীত পরিচালনায় রথীন্দ্রনাথ ঘোষ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। প্রচলিত সুরে গাওয়া কীর্তন, বৈষ্ণব মহাজন রচিত গান ও নাম-গান দর্শক মনে যথোচিত ভক্তি-ভাবের সৃষ্টি করে।

চিত্রগ্রহণে অনিল ব্যানার্জী ও সম্পাদনায় কমল গাঙ্গুলীর কাজও প্রশংসা পাবার যোগ্য। কলাকৌশলের অন্যান্য বিভাগের পরিচ্ছন্নতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

চ্যাপলিনের 'লাইমলাইট'

চলচ্চিত্র-নির্মাণক্ষেত্রে মনস্বিতা ও রস-বোধের সুষ্ঠু সমন্বয় অল্প যে কয়েকজনের মধ্যে পাওয়া যায় চার্লি চ্যাপলিন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। চ্যাপলিন রসিকজনের কাছে শুধু যে একজন মহান শিল্পী বা চিত্র-পরিচালক হিসাবেই অভিনন্দিত হয়েছেন তা নয়, চিন্তানায়ক হিসাবেও তাঁর ভূমিকা রয়েছে চলচ্চিত্রবিশ্বে। গত সপ্তাহে মুক্তি-প্রাপ্ত তাঁর "লাইম লাইট" ছবিখানি এই অনন্যসাধারণ স্রষ্টার বহুমুখী প্রতিভার একটি অক্ষয় কীর্তি। তাঁর আগেকার ছবিগুলি যেমন সমকালীন সমাজ-প্রবাহের ওপর স্বচ্ছ আলোকসম্পাতে অনেকটা যুগধর্মী, "লাইম লাইট" তেমনি চিরন্তন জীবনবোধের গভীরতায় একটি রসোত্তীর্ণ ও কালোত্তীর্ণ চিত্রসৃষ্টি।

নায়কের ভূমিকায় অবতরণ করেছেন চ্যাপলিন নিজে। এক বিখ্যাত রঙ্গাভিনেতার জীবনের কাহিনী এটি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের আনন্দদানের ক্ষমতা তাঁর কমে এসেছে। এমনি দিনে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্তা, পঙ্গু এক ব্যালে নর্তকীর। বলিষ্ঠ জীবনবাদের সঞ্জীব মন্ত্রে মেয়েটিকে অনুপ্রাণিত করলেন তিনি। তারই ফলে সাধারণ ব্যালে নর্তকী একদিন দর্শক-মনলোভা শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পীর মর্যাদা লাভ করল। জীবনদাতার প্রতি নর্তকীর অন্তরের কৃতজ্ঞতা রূপ নেয় প্রণয়ে। রঙ্গাভিনেতা নিজের বয়সের কথা ভেবে মেয়েটির প্রেম-নিবেদন স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারেন না। জীবনের শেষ দিনে আসে এক দুর্লভ মুহূর্ত—দুকান ভরে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেন তিনি। শিষ্যার শিল্পী-জীবনের চরম সাফল্যের মধ্যে রঙ্গাভিনেতা খুঁজে পান তাঁর শিল্প-অভীপ্সার পরিপূর্ণতা।

নাটকীয় ভূমিকায়ও চ্যাপলিন যে একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই ছবিতে। শুধু অভিনেতা বা চিত্র-পরিচালক হিসাবেই নয়, কাহিনীকার,

কে জি প্রোডাকসন্সের পূর্ণাঙ্গ শিশুচিত্র "দেড়শো খোকার কাণ্ড"-তে মুষ্টিযুদ্ধরত তিলক

সংগীত পরিচালক, গীতিকার ও নৃত্য-পরিচালক রূপে চ্যাপলিনের অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে ছবিখানি। স্থবির নর্তকীর ভূমিকায় ক্লেয়ার ব্লুমের অভিনয়ও ছবির এক বিশেষ আকর্ষণ।

ছবিখানির দুর্বার নাট্যসংবেদন, বলিষ্ঠ জীবনবাদ ও স্নিগ্ধ মানবিক রস দর্শকদের পুলকিত ও বিস্মিত করে রাখে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত। জীবন-জিজ্ঞাসার নিবিড় অনুভূতিতে সমৃদ্ধ এই ছবির সংলাপ। যে-কথা এমনিতে যে কোন ছবিতে হয়তো শূন্য ভাবালুতা বলে মনে হত, "লাইম লাইটে"র স্বতঃস্ফূর্ত নাট্যপ্রবাহে চ্যাপলিনের কণ্ঠে সেগুলি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে। দর্শকের হৃদয়, মন ও চিন্তাধারাকে উদ্দীপ্ত করার মতো এমন চিত্রসৃষ্টি বিশ্বচলচ্চিত্রে খুব বেশী নেই। "লাইমলাইট" চ্যাপলিনের শ্রেষ্ঠ অবদান-গুলির মধ্যে অন্যতম।

হীরেন বসু প্রোডাকসন্সের "নারদের সংসার" চিত্রে মায়া চক্রবর্তীকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে। ছবিখানি শীগ্‌গিরই মুক্তিলাভ করবে

আদর্শের জয়

এ্যালান বার্জেসের বহুপঠিত উপন্যাস "দি স্মল ওম্যান"-য়ে রয়েছে সেবাব্রতে অনুপ্রাণিতা এক আদর্শ রমণীর কাহিনী। যুদ্ধবিধ্বস্ত চীনে সেবার ব্রত নিয়ে চলে আসেন এই নারী। সেখানে তাঁর বহুরকম জনহিতকর কাজ এবং এক সৈনিকের সঙ্গে তার প্রণয় নিয়েই গড়ে উঠেছে এলিট সিনেমার বর্তমান আকর্ষণ টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরী-ফক্সের "দি ইন অব দি সিক্সথ হ্যাপিনেস"।

ছবিটির মুখ্য নারী চরিত্রে ইনগ্রিড বার্গম্যান তাঁর অননুকরণীয় অভিনয়-দক্ষতার স্বাক্ষর রেখে দিয়েছেন। তাঁর প্রণয়ীর চরিত্রটিকে সুন্দরভাবে রূপায়িত করেছেন কার্ট জার্গেনস। ছবির একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রবার্ট ডোনাট দর্শকদের তাঁর শেষ অভিনয় দেখবার সুযোগ দিয়েছেন। এ ছবিতে ডোনাটের শেষ কথাঃ "বিদায়, আর আমাদের দেখা হবে না।" এই কয়টি কথা ছবিতে একটি বেদনা-বিধুর পরিবেশ রচনা করে। ডোনাটের এই কথা যেন তাঁর গুণমুগ্ধদের উদ্দেশ্যেই বলা।

এই বিদেশী ছবিটির সহজ, স্বচ্ছন্দ মানবীয় আবেদন ও নাট্যরস দর্শকদের অভিভূত করে। বিদেশী চিত্র প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে এই ছবির মুক্তি একটি স্মরণীয় ঘটনা।

একখানি চিঠি

মহাশয়,—গত একুশে মার্চের 'রঙ্গজগৎ' বিভাগে আপনারা "সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্বৈরাচার" প্রসঙ্গে যেসব মন্তব্য করেছেন, সেজন্য আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। বোম্বাইয়ের 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার' এর নামই শুধু অজানা নয়, এর পরিচালক শ্রীপার্বতীকুমারের ভারতীয় নাট্য জগতে অবদান সম্পর্কেও আমরা অজ্ঞ। শ্রীপার্বতী-কুমার প্যারিসের নাট্য উৎসবে 'দেখ তেরি বোম্বাই' দেখাবেন। কী অদ্ভুত রুচি!

ইণ্টারন্যাশনাল থিয়েটার এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় দপ্তর প্যারিসে অবস্থিত। নাট্যা-মোদীরা জেনে অবাক হবেন যে, শ্রীকমলা-দেবী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযমুনা দাস, যাদের

এন এস জি প্রোডাকসন্সের প্রথম নিবেদন "খেলাঘর"-এর প্রধান দুটি নারীচরিত্রে অভিনয় করেছেন মালা সিংহ ও মানসী সোম। ছবিখানি সমাপ্তপ্রায়

সঙ্গে ভারতবর্ষের নাট্য জগতের কোনো সম্পর্কই নেই, এই সমিতিতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভারত আজ আর পিছিয়ে নেই, ভারত সরকার ইচ্ছে করলেই এর প্রমাণ দিতে পারেন। কিন্তু কি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার চলচ্চিত্র মনোনয়নে, কি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল নির্বাচনে ভারত সরকার অনেক সময়েই ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছেন।

এবিষয়ে আজ সংস্কৃতি অনুরাগীদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। ইতি—সুশান্ত লাহিড়ী, লোদী রোড, নতুন দিল্লী-৩।

"নীল আকাশের নীচে" প্রসঙ্গে

মহাশয়,—গত সংখ্যায় শ্রীদেবব্রত ভট্টাচার্য প্রেরিত পত্রে "নীল আকাশের নীচে" ছবি সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত পড়লাম। "নীল আকাশের নীচে" কথাচিত্রের সঙ্গে তিনি "কাবুলিওয়ালার" মিল খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর এ আবিষ্কারের জন্য তিনি নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু আরো একটু বেশী চিন্তা করলে তিনি দেখতে পেতেন যে, ছবি দুটির মধ্যে কিছু মিল থাকলেও, বিষয়বস্তুতে দুটো ছবি সম্পূর্ণ পৃথক—আর ঐটুকু মিল ছবির মধ্যে মুখ্য বিষয় নয়—হয়ত গৌণও নয়। কাবুলি রহমতের মত চীনা ওয়াংলুও ভারতে এসেছিল আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য এবং তাদের আত্মজা-অনুজার মিল খুঁজে পেয়েছিল, মিনি ও সিসতারের মধ্যে। ছবি দুটির মধ্যে মূলে সাদৃশ্য এইটুকুই।

কাবুলি রহমত জেলে গিয়েছিল অন্য একজনকে ছুরিকাঘাত করে—সিসতার জেলে গিয়েছিলেন তাঁর নিজের দেশকে ভালোবাসার জন্য। দীর্ঘদিন অসাক্ষাতের পর কাবুলিওয়ালা দেখল মিনি অনেক বড় হয়েছে, তাকে সে চিনতে পারেনি; তখনই তার স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে তার মেয়ে, মনে হয়েছে সেও বড় হয়েছে—হয়ত সেও তাকে চিনতে পারবে না। এই ভাবনাই তাকে বিচলিত করেছে—দেশে ফিরে যাবার জন্য তাই সে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। চীনা ওয়াংলু প্রথম থেকে তার সিসতারকে দেখে এসেছে দেশের জন্য কাজ করতে, দেশের জন্য কারাবরণ করতে—আর তাই থেকে তার অবচেতন মনে দেশপ্রীতি জেগে উঠেছে। সে যখন জানতে পেরেছে তার চীন দেশে যুদ্ধ লেগেছে—তখন তার দেশপ্রীতি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। বিবেকের দংশন অনুভব করেছে সে—মনে হয়েছে তার মত শত শত ওয়াংলু চীনদেশের বাইরে বাস করছে, আর সেই সুযোগে তার দেশে চলেছে ক্ষমতালোভীর অমানুষিক অত্যাচার। তাই তার দেশের ডাক তার কানে এসে পৌঁছেছে। কাবুলি রহমতের দেশে ফিরে যাবার মূলে যে কারণ ছিল তা' নিতান্তই ব্যক্তিগত—আর ওয়াংলুর প্রশ্ন ব্যক্তিগত নয়, দেশগত।

কেমিয়া ফিল্মসের নতুন প্রচেষ্টা "শহরের ইতিকথা"-র তিনটি মুখ্য নারীচরিত্রে দেখা যাবে (বাঁ দিক থেকে) কমলা মুখোপাধ্যায়, মালা সিংহ ও বাণী হাজরাকে

শ্রীভট্টাচার্য "নীল আকাশের নীচে" ছবির মধ্যে "পলিটিক্যাল প্রোপ্যাগাণ্ডা" খুঁজে পেয়েছেন। আমার মতে, শুধু আমার কেন যে কোন চিত্রামোদীর কাছে এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলেই মনে হবে। ইতি—শ্রীনীলরতন শর্মা, কলিকাতা-৫।

বিবিধ সংবাদ

গত বছরে (১৯৫৮-৫৯) চারখানি পূর্ণ-দৈর্ঘ্যের এবং তিনখানি ডকুমেন্টারি মোট সাতখানি ভারতীয় চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিক সম্মানলাভ করেছে—এই তথ্য সম্প্রতি পার্লামেন্টে তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ডাঃ বি ভি কেশকার জনৈক সদস্যের প্রশ্নের জবাবে জানান। পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবিগুলির মধ্যে বাংলা "পথের পাঁচালী" তিনটি (নিউ ইয়র্ক, স্ট্র্যাটফোর্ড, ভ্যাংকুভার), হিন্দী "দো আঁখে বারা হাথ" তিনটি (বার্লিনে ২টি, হলিউডে ১টি), বাংলা "অপরাজিত" (স্যানফ্রানসিস্কো) এবং হিন্দী "মাদার ইণ্ডিয়া" (কার্লোভি ভেরি) একটি করে সম্মান অর্জন করেছে। ডকুমেন্টারি তিনখানির নাম "স্টার্স ম্যান হ্যাজ মেড" (রোম), "বিজি হ্যাণ্ডস্" (মিলান) ও "খাজুরাহো" (ইয়র্কটন, কানাডা)। ছবিগুলি যেসব জায়গায় সম্মানিত হয়েছে তাদের নাম বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হল।

• • •

পাকিস্তানে ৬১৮ খানি ভারতীয় ছবির প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়েছে। এই ছবিগুলি ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসের আগে পাকিস্তানে প্রেরিত হয়েছিল। ছবিগুলি পাঁচ বছর ধরে ওদেশে প্রদর্শিত হলেও এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকার করে রয়েছে। ফলে পাকিস্তানী ছবি কদের পাচ্ছে না দর্শকদের কাছে। পাকিস্তান সরকার এই কারণেই এই ছবিগুলির প্রদর্শন নিষিদ্ধ করেছেন—একথা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করতে পাকিস্তান সরকারের বাধেনি।

• • •

দিল্লীর চিলড্রেন্‌স্ ফিল্ম সোসাইটি সম্প্রতি তাঁদের তোলা দুখানি হিন্দী শিশু চিত্র বাংলায় ভাষান্তরিত করেছেন। ছবি দুখানির নাম—"হরিয়া" ও "গুলাবের ফুল।" গত পূর্ব সপ্তাহে দিল্লীতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে এই ছবি দুখানি প্রদর্শিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইন সচিব শ্রীঅশোককুমার সেন। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁর প্রেরিত বাণীতে চিলড্রেন্‌স্ ফিল্ম সোসাইটির এই নূতন প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করেন। সোসাইটির স্থায়ী সভাপতি শ্রী আর আর দিবাকর বলেন, জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে হিন্দী ছবি দুখানি মুক্তি পায় এবং এ পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার ছেলেমেয়ে তা দেখেছে। বাংলা ভাষান্তরিত হয়ে ছবি দুখানি এবার পশ্চিম বাংলা স্টেট কমিটি কর্তৃক এ অঞ্চলে প্রদর্শিত হবে।

*

এই সপ্তাহ থেকে জয়পুরে আর্থার র‍্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের ইংরেজী ছবি "নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার"-এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়েছে। রবিন এস্টিজের লেখা এই কাহিনীর কেন্দ্রস্থল উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের একটি কাল্পনিক শহর হালেরাবাদ। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই শহরে অবস্থিত বৃটিশ সেনা-নিবাসের বিরুদ্ধে এক কাল্পনিক বিক্ষোভের কাহিনী এতে বর্ণিত হয়েছে। প্রখ্যাত ইংরেজ অভিনেতা কেনেথ মোর গল্পের নায়ক এক আর্মি ক্যাপ্টেনের ভূমিকায় নামছেন। সাত বছরের এক ভারতীয় রাজকুমারের মার্কিন গভর্নেসের ভূমিকায় মনোনীত হয়েছেন লরেন বেকল। এই ছবির জন্যে জয়পুরের মহারাজা তাঁর প্রাসাদটি ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়েছেন। ছবিটি তোলা হচ্ছে জে লী টমসনের পরি-চালনাধীনে।

নূতন রেকর্ড

এইচ এম ভিঃ

এন ৮২৮১৫—শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষের কণ্ঠে দুখানি আধুনিক গান—"ও নীল সাগরের নেয়ে" ও "সপ্ত সাগর পার হয়ে।" এন ৮২৮১৬—দুখানি পল্লীগীতি "নাইয়ারে কত গুণে" ও "বাঁশে যদি ঘুণে ধরে" গেয়েছেন সনৎ সিংহ। এন ৮২৮১৭—শ্রীমতী শ্রীলা সেনের কণ্ঠে গাওয়া "এসহে এসহে প্রাণে" ও "মনরে আমার"—অতুল-প্রসাদী গান। এন ৭৬০৮২—"লালুভুলু" চিত্রের দুখানি গান—গেয়েছেন মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য শিল্পী।

কলম্বিয়াঃ

জি ই ২৪৯২৭ এবং জি ই ২৪৯২৮ রেকর্ড দুখানি পশ্চিমবঙ্গ লোকরঞ্জন শাখার শিল্পীদের গাওয়া চারখানি লোকসংগীত—পরিচালনা করেছেন পঙ্কজ মল্লিক। জি ই ২৪৯২৯—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দুখানি আধুনিক গান—"ঐ চাঁদ যদি ডুবে যায়" ও "ঐ দেবদারু বন।" জি ই ২৪৯৩০—নবাগতা শিল্পী মন্দিরা ঘোষের দুখানি আধুনিক গান—"ঐ তো আকাশ এই যে মাটি" ও "বকুল বনে ভিড় জমালো।" জি ই ২৪৯৩২—"আকাশ অনেক দূরে" ও "কত ছন্দ করা"—দুখানি আধুনিক গান—গেয়েছেন আরতি মুখোপাধ্যায়।

খেলার মাঠে

একলব্য

পরীক্ষার সময় প্রশ্নপত্র কঠিন হলে ছাত্ররা যেমন পরীক্ষা-হলে হৈচৈ করে আর কাগজ-পত্র লণ্ডভণ্ড করে পরীক্ষা পণ্ড করে দেয় খেলার সময় তেমন আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মনোমত না হলে খেলোয়াড়রা হৈচৈ করে আর আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে খেলার মাঠ থেকে বেরিয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দর্শকরাও কম উচ্ছৃংখল আচরণ করে না যেমন পরীক্ষার ক্ষেত্রে অপরীক্ষার্থীও চুপ করে বসে থাকে না। দুই ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় একই ধরনের মনোবৃত্তির পরিচয়। ব্যাপারটা অবশ্য সচরাচর ঘটে না। আবার ঘটনার সংখ্যাও কম নয়।

মোহনবাগান ও এলবার্ট স্পোর্টিংয়ের মধ্যে সি এ বি লীগের চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় ইডেন উদ্যানে দর্শকদের উচ্ছৃংখল আচরণের কথা গতবার আলোচনা করেছি। এবার আলোচনা করছি ময়দানের ভলিবল ফেডারেশন মাঠে রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ সিনিয়র ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলার সময় খেলোয়াড় ও দর্শকদের আচরণের কথা। কলকাতার ছাত্র সমিতি ক্লাব এবং লখনৌয়ের আর্মি মেডিক্যাল ক্লাব ছিল ফাইন্যালের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল। ভলিবল ক্ষেত্রে দুটি দলই বেশ শক্তিশালী। দুই দলের খেলার মধ্যেও ছিল উৎকর্ষের পরিচয়। কিন্তু খেলাটির সন্তোষজনক পরিসমাপ্তি ঘটেনি। দুই দল দুটি করে গেম পাবার পর চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসাসূচক পঞ্চম গেমে ছাত্র সমিতি ১২—৭ পয়েন্টে এগিয়ে থাকা সময়ে লখনৌ দল আম্পায়ারের একটি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মাঠ থেকে বেরিয়ে যায়। সংগে সংগে হৈচৈ করে মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে একদল অবাঙালী দর্শক। অবস্থা বেশ ঘোরালো হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত অশ্বারোহী পুলিসকে মাঠে ঢুকে অবস্থা আয়ত্তে আনতে হয়। কিন্তু লখনৌ দলকে আর খেলান সম্ভব হয় না। ফলে কর্তৃপক্ষ ছাত্র সমিতিকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করেন।

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠিন হলে পরীক্ষা না দিয়ে হল থেকে বেরিয়ে যাওয়া আর আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত মনোমত না হলে খেলা ছেড়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাওয়া—এই দুই ঘটনার মধ্যেই পরাজয়ের মনোভাব বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ ছাত্ররা তখনই পরীক্ষা কেন্দ্র পরিত্যাগ করে যখন পরীক্ষায় সাফল্য সম্পর্কে তারা হয়ে ওঠে সন্দিহান, ঠিক একই ভাবে খেলোয়াড়রা তখনই মাঠ ত্যাগ করে যখন খেলায় তাদের পরাজয় আসন্ন হয়ে আসে। দুই ক্ষেত্রেই রাগ দেখিয়ে মুখরক্ষার মনোবৃত্তি। কিন্তু এতে যে মুখরক্ষা হয় না একথা বুড়ো খোকার দল শিখবে কবে? অতীতে খেলার মাঠে এমন বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে এবং প্রতিক্ষেত্রেই উচ্ছৃংখল আচরণকারী ক্লাব ধিক্কৃত হয়েছে সাধারণ ক্রীড়ামোদীর কাছে।

রেফারী ও আম্পায়ারদের পরিচালনা এবং সমস্ত সিদ্ধান্ত ত্রুটিহীন এবং পক্ষপাতশূন্য হওয়া সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। সাধারণত হয়েও থাকে। তবু কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের ভুল হয় না, এমন নয়। মানুষ মাত্রেরই ভুলচুক আছে। রেফারী এবং আম্পায়াররাও মানুষ। সুতরাং তাদের যদি কোন ভুলচুক হয়ই তবে উচ্ছৃংখল আচরণ করে খেলা পণ্ড করতে হবে এ মনোবৃত্তিকে কোনভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তি খেলোয়াড়-চরিত্রের অন্যতম মাপকাঠি। সেই খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে যারা অক্ষম তারা যত গুণসম্পন্ন খেলোয়াড়ই হন প্রকৃত খেলোয়াড় নন। পশ্চিমবঙ্গ ভলিবল ফেডারেশনের কর্তৃপক্ষ লখনৌ আর্মি মেডিক্যাল দলকে বাতিল করে দিয়ে এবং ছাত্র সমিতিকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করে ঠিক কাজই করেছেন। প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোন দুর্বলতা দেখাননি এজন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

* * *

হায়দরাবাদে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলা শেষ করে বাঙলা দল কলকাতায় ফিরে আসবার পর হকি লীগের খেলা আবার পুরোদমে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু হকির উন্মাদনায় ময়দান এখনো সরগরম হয়ে ওঠেনি। হবেই বা কি করে? কোনো ক্লাব খেলেছে মাত্র চার পাঁচটি ম্যাচ, কোনো ক্লাব লীগের খেলা প্রায় শেষ করে এনেছে। এ অবস্থায় লীগ খেলা জমতে পারে না। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার জন্যই এই অবস্থা। জাতীয় হকিতে বিভিন্ন ক্লাব থেকে বাঙলা দলের পক্ষে যারা মনোনীত হয়েছিলেন সেই সব ক্লাবের খেলা এতদিন বন্ধ

মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মধ্যে হকি লীগের প্রদর্শনী খেলায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের লেফ্ট-আউট বি দফাদার একক প্রচেষ্টায় নিজ দলের তৃতীয় গোল করছেন
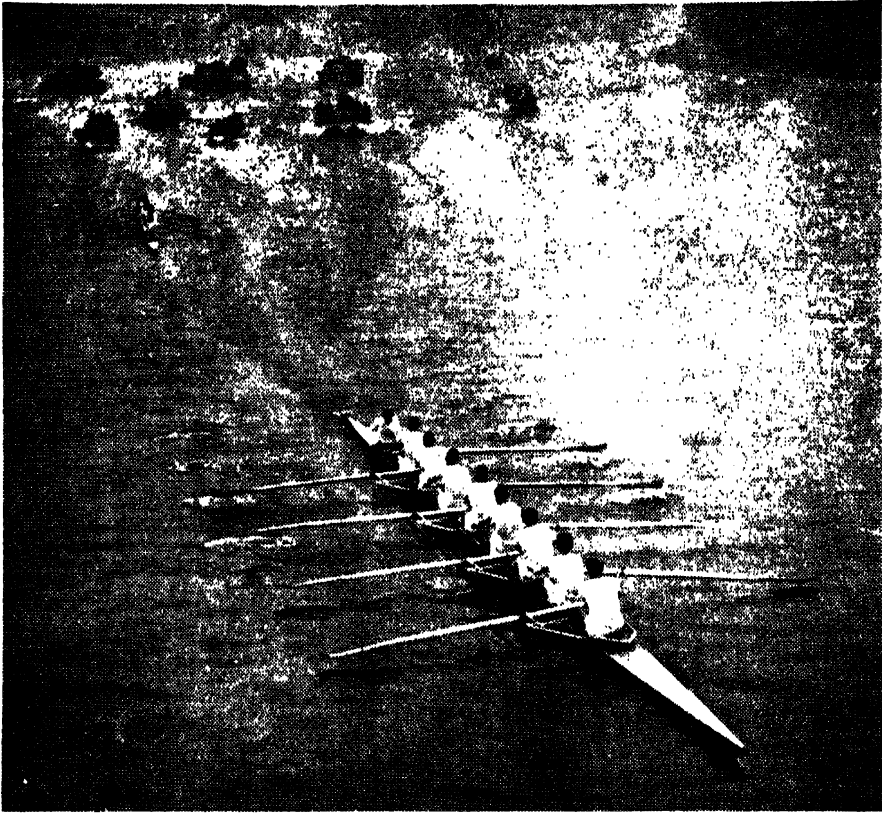
টেমস নদীর উপর অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গতবারের নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার এক দৃশ্য

ছিল। এখন তাদের এক আধদিনের ব্যবধানে সপ্তাহে চার পাঁচটি করে ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। এতে খেলোয়াড়দের কাছ থেকে নৈপুণ্য আশা করা যায় না। খেলাও জমে না, প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধুর্যও ক্ষুন্ন হয়। আগামীবার অবশ্য বাঙলাকে এ অসুবিধায় পড়তে হবে না। কারণ আসছে বার ভারতের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা এই কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বাঙলার অসুবিধা না হলেও অসুবিধা হবে সেই সব রাজ্যের যেখানে লীগ খেলার ব্যবস্থা আছে। তাই আমার মনে হয় সব রাজ্যের সুবিধার জন্য হকি মরসুমের শেষ দিকে জাতীয় হকির ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। কিংবা বিভিন্ন রাজ্য এসোসিয়েশন এ ব্যবস্থাও করতে পারেন জাতীয় হকির জন্য যে ক্লাব থেকেই রাজ্য দলে খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হক তাদের লীগের খেলা বন্ধ থাকবে না। এই দুই ব্যবস্থার এক ব্যবস্থা না করলে সব রাজ্যেই লীগের খেলা ব্যাহত হতে বাধ্য। বাঙলার অসুবিধা সবচেয়ে বেশী। কারণ এখানকার লীগ খেলা দীর্ঘস্থায়ী। এখানে প্রথম ডিভিশনেই খেলে ১৯টি ক্লাব। প্রতি ক্লাবকে খেলতে হয় ১৮টি করে ম্যাচ। আশা করি বিভিন্ন রাজ্যের হকি-কর্তৃপক্ষ কথাটা ভেবে দেখবেন।

* * *

এবার অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতায় অক্সফোর্ড বিজয়ী হয়েছে। বাইচ আরম্ভের শুরু থেকে অফফোর্ডের দাঁড়িরা জোর জোর দাঁড়ের টানে কেম্ব্রিজের নৌকা থেকে এগিয়ে যায় এবং আগাগোড়াই এগিয়ে থেকে শেষ পর্যন্ত বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। গত ২৮শে মার্চ তারিখে এই নৌকাবাইচ দেখবার জন্য টেমস নদীর দুই তীরে প্রায় আড়াই লক্ষ দর্শকের সমাবেশ হয়। টেমস নদীর উপরে পাটনী থেকে মর্টলেক পর্যন্ত কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের এই নৌ-প্রতিযোগিতার পাল্লা পথের দূরত্ব চার মাইলের কিছু বেশী। টেমস শান্ত থাকলে এই দূরত্বটুকু অতিক্রম করতে তীরগতি বাইচের নৌকার বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু নদীতে ঝড় উঠলে এই পথটুকু অতিক্রম করতেই হিমসিম খেয়ে উঠতে হয়।

নৌকাবাইচ গ্রেট ব্রিটেনের এক জনপ্রিয় স্পোর্টস। এর মধ্যে কৌলীন্যে ও মর্যাদায় কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের বার্ষিক প্রতিযোগিতা অনন্য। সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ নৌ-চালনা প্রতিযোগিতা পৃথিবীর নৌ-প্রতিযোগিতার ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান লাভ করেছে। ১৮২৯ সাল থেকে এই প্রতিযোগিতার শুরু হয়েছে এবং এই প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ জিতেছে ৫৮ বার আর অক্সফোর্ড ৪৬ বার। দুর্ঘটনা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্য কয়েকবার প্রতিযোগিতা হয়নি। দুর্ঘটনার কথা বলতে হলে ১৯১২ ও ১৯৫১ সালের দুর্ঘটনার কথা বলতে হয়। প্রথমবার দুটি দলই জলের মধ্যে ডুবে যায়। • দ্বিতীয়বার ঝড়ের মধ্যে আধ মাইল পথ অতিক্রম করবার পর শুধু অক্সফোর্ড দল তলিয়ে যায় জলের নীচে। এইসব ঘটনা এবং দীর্ঘকালের ইতিহাস কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ড নৌ-চালনা প্রতিযোগিতাকে বিশেষ আভিজাত্য দান করেছে। না হলে শুধু দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতায় এত হৈচৈ এত উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হত না। এটা কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা নয়। বিশ্বের নামকরা দাঁড়ি-মাঝিরাও এতে যোগদানের অধিকারী নয়। জাতিধর্ম নির্বিশেষে শুধু কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের ছাত্ররাই এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকারী। ইংলণ্ডে গ্রীষ্ম শুরু হতেই

এই প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিপর্ব আরম্ভ হয়। প্রতি নৌকায় থাকে ৮ জন করে দাঁড়ি ও একজন করে হাল বা মাঝি। এই ৯জন দক্ষ নৌ-চালককে উন্নত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই অভিজ্ঞ 'কোচ' রয়েছেন। তাদের অভিজ্ঞতা এবং নৌ-চালকদের নৈপুণ্যের উপরই নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানের প্রশ্ন।

অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ নৌ-প্রতিযোগিতার সময় প্রতি বছরই লণ্ডনে বিপুল সাড়া জাগে। কাতারে কাতারে দর্শকের সমাবেশ হয় টেমস নদীর দুই তীরে। লণ্ডন পোর্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রতিযোগিতার সময় টেমস নদীর উপর সমস্ত রকমের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। তীরগতি নৌকার দাঁড়ের টান নদীর নিস্তব্ধতা ভংগ করে এগিয়ে যাবার সংগে সংগে নদীর দুই কুল মুখরিত হয়ে ওঠে দর্শকদের আনন্দ রোলে, কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ডের এবারকার প্রতিযোগিতায়ও এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। এই জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই অক্সফোর্ডের কুশলী দাঁড়িরা পরাজিত করেছে কেম্ব্রিজের দাঁড়িদের।

* * *

কলকাতায় বহুআকাঙ্ক্ষিত স্টেডিয়ামের দাবীতে ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে যে নতুন আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে সেই সম্পর্কে কবিগুরুর শাজাহান কবিতার ছন্দে 'ছাত্র পরিষদ' কর্তৃক লিখিত একটি কবিতা আমার হাতে এসে পড়েছে। কবিতাটি এখানে ছেপে দিচ্ছি।

মোহনবাগান ও ইস্টবেংগল ক্লাবের হকি খেলার সময় ক্যালকাটা মাঠের চারিপাশে স্টেডিয়ামের দাবীতে ছাত্র-সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ প্রদর্শনের দৃশ্য

স্টেডিয়াম

দুর্গম খেলার মাঠ,
দুর্গ, তাই তব বক্ষ পরে
যুগ যুগ ধরে
লক্ষ লক্ষ দুর্গতের ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাস—
সকরুণ করিয়াছে ময়দানের আকাশ বাতাস।

তব সহচর বৃক্ষশাখে
ঝুলিতে দেখেছি ঝাঁকে ঝাঁকে
কতশত মানবক শাখামৃগসম
টলমল করিয়াছে
আশংকায় ভীরু চিত্ত মম
আই এফ এ, তবুও টলে নাই
হেড্‌ওয়ার্ড-চিত্ত গলে নাই।

ইডেন গার্ডেন প্রান্তে
দর্শকের অশান্ত আগ্রহ
শান্তচিত্তে বরিয়াছে
লাঞ্ছনার শতেক নিগ্রহ,
কুগ্রহের ফেরে
বারংবার পড়িয়াছে
অশ্বারোহী পুলিসের ঘেরে।
কেহ বা হয়েছে স্বর্গারোহী
অন্তরের অন্তস্তলে
অদৃষ্টে খেলার স্মৃতি বহি।

ঘোর কলিকাল!
তাই সেই বেদনার অভিশাপে
বিশিষ্ট ব্যক্তির থলি'
অশিষ্ট উপায়ে নিত্য ফাঁপে!

বিত্তের বিচিত্র লীলা
কত তুমি দেখেছ, ময়দান!
নূতন দিনের প্রান্তে
সে লীলার হবে অবসান!
নূতন আলোর তাপে
কারো বা ঝরিবে কাল ঘাম,
তবু জানি শেষ সত্য—
আসন্ন আসন্ন স্টেডিয়াম॥

কবিতাটির প্রতিটি ছত্রে সাধারণের মনের কথা প্রতিফলিত হয়েছে। স্টেডিয়ামের অভাবে কত লোককে যে কত দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়েছে, কতজনকে ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়তে হয়েছে, কতশতকে পুলিসের মৃদু লাঠিচালনা সহ্য করতে হয়েছে তা কারো অজানা নেই। স্টেডিয়ামের অভাবে গাছে চড়ে খেলা দেখতে গিয়ে কেউ বা জীবনের খেলা শেষ করেছেন। অপরদিকে দর্শকের পয়সাতেই কোবাগার ফেঁপে উঠেছে আই এফ এ আর মাঠ কর্তাদেরের।

স্টেডিয়াম নিয়ে কলকাতায় আন্দোলন কম হয়নি। স্টেডিয়াম করার জন্য রাজা-মহারাজা চেষ্টা করেছেন, মন্ত্রী-উজির চেষ্টা করেছেন, শিল্পপতিরা চেষ্টা করেছেন, খেলোয়াড়রা চেষ্টা করেছেন, খেলার-পরিচালকরাও চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কিছুই হয়নি। আজও কলকাতার স্টেডিয়ামের জায়গা খালি পড়ে আছে। স্টেডিয়াম রচনার দাবী নিয়ে এবার আসরে নেমেছেন কলকাতার ছাত্র সম্প্রদায়। পশ্চিম বংগ সরকারের হালচাল সম্পর্কে যতটুকু জানা আছে তাতে আজ স্টেডিয়াম রচনার কোন আশা দেখি না। তবে দাবীর পেছনে যেখানে যুক্তি আছে আর দাবীদারদের পেছনে আছে দেশের সমস্ত তরুণ শক্তি সেখানে নিরাশ হবারও কারণ নেই। ছাত্র-সম্প্রদায় সত্যই যদি সংকল্পে অটুট থাকেন তবে রাজ্য সরকার তাদের স্টেডিয়াম উপহার দিতে অবশ্যই বাধ্য হবেন। পশ্চিমবংগ সরকার তো দূরের কথা, ছাত্র-সম্প্রদায়ের ন্যায্য দাবী উপেক্ষা করার ক্ষমতা কোন সরকারেরই নেই।

দেশী সংবাদ

২৩শে মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় তিব্বতের হাঙ্গামা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিতে গিয়া বলেন যে, দলাই লামা বর্তমানে কোথায় আছেন তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তবে তিনি নিরাপদে আছেন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। শ্রীনেহরু বলেন, "চীনের সহিত আমাদের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় তাহাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ইচ্ছা আমাদের নাই।"

আজ জলপাইগুড়িতে হাজার হাজার লোকের এক জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বেরুবাড়ী পাকিস্তানে হস্তান্তরের প্রস্তাব পরিত্যক্ত না হইলে দেশব্যাপী সক্রিয় আন্দোলন শুরু করার সংকল্প গ্রহণ করা হয়।

২৫শে মার্চ—কেন্দ্রীয় সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট মহল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তানী গুপ্তচর চক্র রাজ্যময় ঘাটি স্থাপন করিয়া রাজনৈতিক নেতা ও পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের যোগসাজসে নাশকতামূলক কার্যে তৎপর রহিয়াছে। ইহাদের পিছনে বিদেশীদের গোপন হস্ত রহিয়াছে বলিয়া কোনো কোনো মহল সন্দেহ প্রকাশ করিতেছে।

পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আস্থার অভাবমূলক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীসত্যপ্রিয় রায় অদ্য রাজ্য বিধান পরিষদে এই অভিযোগ করেন যে, সরকারী শিক্ষানীতি পরিকল্পনাহীন ও কর্ণধারহীন। ঐ নীতির ফলে এই রাজ্যে সর্বাঙ্গীণভাবে শিক্ষামানের অবনতি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সংকোচন ঘটিতেছে। শিক্ষা দপ্তর ও কোন কোন স্কুল বোর্ডের বিরুদ্ধে তিনি দুর্নীতির অভিযোগও আনয়ন করেন।

২৬শে মার্চ—নেহরু-নুন চুক্তিবলে বেরুবাড়ী ইউনিয়নের একাংশ এবং কোচবিহারের ছিট-মহল পাকিস্তানকে সমর্পণ করার প্রশ্ন সংবিধানসম্মত কিনা জানিবার জন্য ভারত সরকার সুপ্রীম কোর্টের অভিমত গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গতকল্য এই সিদ্ধান্তের কথা জানিতে পারিয়া পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মহলে কিছুটা স্বস্তির ভাব দেখা দিয়াছে।

গত দশ বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি, বাড়ি প্রভৃতি যেসব সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন, সেইসব ব্যাপারে সরকার অনেক ক্ষেত্রে 'প্রিয়-পাত্রদের' ঋণমুক্তির জন্য অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের 'তুষ্ট' করার জন্য ন্যায্যমূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী দাম দিয়া সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া গতকল্য পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বিরোধী সদস্যরা অভিযোগ করেন।

২৭শে মার্চ—কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ আজ সাংবাদিকদের নিকট বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে গমনাগমনের জন্য যে ছাড়-পত্রের ব্যবস্থা আছে আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ভারতীয় নাগরিকদের ক্ষেত্রে তাহা বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। তবে বিদেশীর ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই পাসপোর্ট ও ভিসা ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে।

কলিকাতার কোন কোন কলেজ ও স্কুলের কর্তৃপক্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণের অজ্ঞতা, অবিবেচনা ও গাফিলতির ফলে ফি দিয়াও পাঁচ শত আই এ পরীক্ষার্থী পরীক্ষাদানে বঞ্চিত হইয়াছে এবং মানিকতলার একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের গুরুতর ত্রুটির ফলে প্রায় পঞ্চাশ জন পরীক্ষার্থী আসন্ন স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার মুখে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে।

২৮শে মার্চ—কুখ্যাত "মধুচক্র" নানারূপ ঘৃণ্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে বিভাগীয় গোপন তদন্ত সমাপ্ত হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত রিপোর্টে তদন্তকারী অফিসার "মধু চক্রের নাটের গুরু" বলিয়া অভিযুক্ত শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের কিউরেটর শ্রী জি মহীউদ্দিনকে বরখাস্ত করিবার সুপারিশ করিয়াছেন। এই দুষ্টচক্রে রাজ্য সরকারের যে সকল পদস্থ অফিসার জড়িত বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের কার্যকলাপ সম্পর্কেও তদন্তের জন্য পৃথক একটি কমিটি গঠনের কথা রাজ্য সরকারের ঊর্ধ্বতন মহল চিন্তা করিতেছে।

২৯শে মার্চ—কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি শহর হইতে অনতিদূরে মানিকনগর চা-বাগানে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনসের এক ডাকোটা বিমান দুর্ঘটনায় চারজন বিমানকর্মীসহ চব্বিশ জন আরোহী অদ্য মারা গিয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। ২০ জন বিমানযাত্রীসহ একজন আরোহীও মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পান নাই।

বিদেশী সংবাদ

২৩শে মার্চ—অদ্য লণ্ডনে ঘোষিত হইয়াছে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের সহিত সম্ভাব্য বৈঠকের পূর্বে মত বিনিময়ের উদ্দেশ্যে আগামী ৩১শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল ওয়াশিংটনে বৃহৎ চতুঃশক্তির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠক হইবে।

তাসের সংবাদে প্রকাশ, সোভিয়েট দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রীদল পৃথিবীর শীতলতম স্থানটি আবিষ্কার করিয়াছেন—১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে ভোস্টকের সোভিয়েট ঘাটিতে তাপমাত্রা ছিল শূন্য ডিগ্রী হইতে ৮৭·৪ সেণ্টিগ্রেড ডিগ্রি কম। পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেই কোনদিন ইহা হইতে কম তাপ পরিলক্ষিত হয় নাই।

২৪শে মার্চ—ইরাকের প্রধানমন্ত্রী জেনারেল আবদুল করিম কাশেম অদ্য রাত্রে ইরাক কর্তৃক বাগদাদ চুক্তি ত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। বাগদাদ চুক্তির সদস্যদের ইরাকের সিদ্ধান্তের কথা জানানো হইয়াছে। বাগদাদ চুক্তির অন্যান্য সদস্য হইতেছে পাকিস্তান, বৃটেন, ইরান ও তুরস্ক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

২৫শে মার্চ—করাচীর সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খান অদ্য রাত্রে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর যাঁহারা সরকারী কার্যে নিযুক্ত ছিলেন অথবা এখনও আছেন, তাঁহাদের সম্পর্কে তদন্তের এবং যে কোন অপরাধের জন্য তাঁহা-দিগকে দোষী বলিয়া ঘোষণা করার ব্যবস্থা সম্পর্কিত এক আদেশ জারী করিয়াছেন। এই আদেশের বিধানসমূহ সঙ্গে সঙ্গে বলবৎ হইবে এবং পাকিস্তানের সর্বত্র ইহা প্রযোজ্য হইবে।

২৬শে মার্চ—বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানী অদ্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠক ও শীর্ষ বৈঠকের প্রস্তাব সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারের নিকট লিপি পেশ করিয়াছে। লিপি-সমূহের বয়ান একরূপ না হইলেও উহাদের বিষয়বস্তু মূলত এক। প্রকাশ, পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ গ্রীষ্মকালে শীর্ষ বৈঠকের আশা ব্যক্ত করিয়া ১১ই মে তারিখে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বৈঠকের প্রস্তাব করিয়াছেন।

সোভিয়েট সরকার মস্কোতে এক বিবৃতিতে বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ইরান, তুরস্ক এবং পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি সম্পাদন এবং এই ব্যাপারে বৃটেনের প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি শত্রুতা-মূলক কার্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

২৭শে মার্চ—পাক প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আয়ুব খাঁ আজ লাহোরে সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোন যুদ্ধ হইবে না বলিয়া তিনি ব্যক্তিগতভাবে মনে করেন। জেনারেল আয়ুব খাঁ আরও বলেন যে, দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তানকে যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করা হয়, তাহার জন্য ভারতের দেউলিয়া নেতৃত্বই দায়ী হইবে।

আজ মালয় সরকার চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে স্থানীয় সরকারকে উচ্ছেদের গোপন ষড়যন্ত্রে স্থানীয় কম্যুনিস্টদের সাহায্য করার অভিযোগ করিয়াছেন।

২৮শে মার্চ—আজ চীনের রাষ্ট্রীয় পরিষদ ঘোষণা করেন যে, তিব্বতের সৈন্যদল এবং বিদ্রোহীরা লাসাস্থিত চীনা সৈন্যদলের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার পর তিব্বতের স্থানীয় সরকার ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, তিব্বতের ২৩ বৎসর বয়স্ক ধর্মগুরু দলাই লামাকে বিদ্রোহীরা বলপূর্বক আটক করিয়া রাখিয়াছে।

২৯শে মার্চ—নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি কর্তৃক অদ্য রাত্রিতে ঘোষিত হইয়াছে যে, তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতা দলাই লামা তিব্বতে অশান্তি আরম্ভ হওয়ার সাত দিন পর অপহৃত হইয়া রাজধানী লাসার দক্ষিণ-পূর্ব লোহা অঞ্চলে নীত হইয়াছেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার **সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ**

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০,, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, টাকা, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ২৩—২২৮৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।

REG. NO. C. 2109

দেশ

র্ষ] শনিবার, ২৮ চৈত্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ **DESH** Saturday, 11th April, 1959 মূল্য ৪০ নয়া পয়সা [সংখ্যা ২৪

একটু সানলাইটেই অনেক জামাকাপড় কাচা যায়
—তার কারণ এর অতিরিক্ত ফেণা
বিরাট সমস্যা! বিছানার চাদর, তোয়ালে আরও কত কি। শেষ পর্য্যন্ত মা ডাকলেন উমা আর রুমাকে ইস্ত্রী করায় সাহায্য করার জন্য। হাঁ, অনেক জামাকাপড়। কিন্তু কতটুকু সাবানই বা মা ব্যবহার করেছেন? মা সানলাইট সাবান দিয়ে জামাকাপড় কাচেন। এর অতিরিক্ত ফেণা বিনা আছাড়েই জামাকাপড় থেকে সব ময়লা দূর করে দেয়।
আপনার জামাকাপড় কাচার জন্যে সানলাইট সাবান ব্যবহার করুন।
SUNLIGHT SOAP
সানলাইট সাবান জামাকাপড়কে সাদা ও উজ্জ্বল করে কাচে

ভারতবর্ষের বৃহত্তম পরিবার
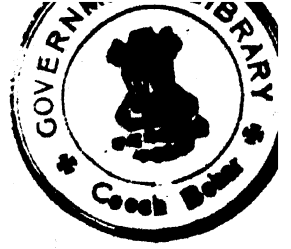
একের সামান্য সামর্থ্য সমষ্টিগতভাবে কি বিরাট ক্ষমতার সৃষ্টি করতে পারে তা' নিয়ে পৃথিবীর সব দেশেই নানারকম উপকথা প্রচলিত আছে। আমাদের রামায়ণেও রয়েছে সেই কাঠবিড়ালীর গল্প, রামের সৈন্যবাহিনীর জন্য সেতু রচনায় যে সহায়তা করেছিল। ধীর, পরিশ্রমী, কর্মব্যস্ত এই সুন্দর কাঠবিড়ালী নিতান্ত নগণ্য হ'লেও সমুদ্রের দুর্বার স্রোত-বন্ধনে সাহায্য করেছিল। কল্পনাতীত এই সাফল্যের গোপন মন্ত্র ছিল—পরিকল্পনা ও সংগঠন, সেই বিরাট কর্ম-প্রচেষ্টায় প্রত্যেকের বিশ্বস্ততা, দায়িত্বজ্ঞান এবং পারিবারিক ঐক্যবোধ।

কালক্রমে কাঠবিড়ালী হারিয়ে গেছে আমাদের মন থেকে, শুধু সেতুর স্মৃতিটুকু বেঁচে আছে।

ট্রেনের গর্জনে আর রেলস্টেশনের [illegible]-কোলাহলে এই দেশব্যাপী লৌহবর্ত্মের নিয়ামক সাধারণ কর্মীদের কথা [illegible] চাপা পড়ে গিয়েছে। রেলের এই বিরাট কর্মকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশটাই শুধু আমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু কখনও কি আমরা মনে করি কর্তব্যসমাহিত কোন নিঃসঙ্গ কেবিন 'এ-এস-এম'কে, দিন ও রাত্রির প্রতিটি মুহূর্তে সজাগ ও সতর্ক সিগন্যালম্যানকে, ইঞ্জিনের আগ্নেয়ক্ষুধার আহার যোগাতে গলদঘর্ম ফায়ারম্যানকে অথবা গাড়ীকে যথাসময়ে পৌঁছে দেবার দায়িত্বে উৎকণ্ঠিত কোন গার্ডকে? টিকিট ঘরের ভিতর থেকে যে হাত আপনার টিকিটটি এগিয়ে দিল তাকে হয়ত বা কখনও আপনার মনে পড়তে পারে, কিন্তু যে দুখানি বলিষ্ঠ হাত সিগন্যাল বাক্সের লিভার টানে অথবা রেলপথের কঠিন লোহাকে কার্যকর রাখে তারা তো আপনার চোখে পড়ে না। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে, দিনরাত্রি মাল ও মানুষ বহন করে চলেছে যে যন্ত্র, তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছে রেলের দশলক্ষাধিক কর্মীর কর্ম-সমন্বয়, তাদের সুশৃঙ্খলা এবং কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রম। একই পরিবারভুক্ত এরা, ভারতবর্ষের বৃহত্তম পরিবার, আর, পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম তো নিশ্চয়ই! দেশের অগণিত পরিবারের সেবায় উৎসর্গিত এই পরিবার:
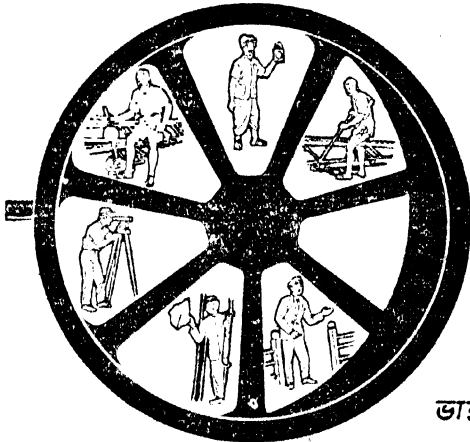
ভারতীয় রেলওয়ে

দেশের সেবায় ও দেশের সংগঠনে উৎসর্গিত

জাতির সেবায়

১০৬ বছর

ভারতীয় রেলপথ—দেশের ভবিষ্যতের নিয়ামক

PHOENIX/IR/B2/59

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

GOVERNMENT LIBRARY
Cooch Behar

সূচীপত্র

ইলেকট্রিক মোটর
ও
ডিজেল ইঞ্জিন
লিস্টার, ব্ল্যাকস্টোন ডিজেল ইঞ্জিন ও পাম্পিং সেট এবং
"বিকো" ইলেকট্রিক মোটর সর্বদা পাওয়া যায়
বামা লরী এণ্ড কোম্পানীর এজেণ্ট
এস. কে. ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং
১৩৮, ক্যানিং ষ্ট্রীট - দোতালা. কলিকাতা-১

সূচীপত্র

DESH 40 Naya Paisa.
Saturday, 11th April, 1959.

২৬ বর্ষ ॥ সংখ্যা ২৪ ॥ ৪০ নয়া পয়সা
শনিবার, ২৮ চৈত্র, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

পরলোকে আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী

গত শনিবার ২১শে চৈত্র মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় পরিণত বয়সে লোকান্তর প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন কৃতী সন্তান এবং ভারতবর্ষের পণ্ডিত সমাজ একজন সুধী ব্যক্তিকে হারাইল। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রী মহাশয়কে ব্যক্তিগতভাবে জানেন, তাঁহারাই জানেন সত্যকার কী হারাইলেন। কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্য তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়, তাঁহার যথার্থ পরিচয় মনুষ্যত্বে। এমন মানুষ আর হয় না। এমন নির্লোভ তেজস্বী, বন্ধুবৎসল, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি সত্যই বিরল।

তরুণ বিধুশেখর যখন কাশীতে পাঠ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন শান্তিনিকেতন
তাঁহাকে আহ্বান করিলেন শান্তিনিকেতন
আশ্রমে—সে ১৯০৪ সালের কথা। সেই হইতে ত্রিশ বৎসরকাল কাটে তাঁহার শান্তিনিকেতনে। যে-সব মনীষীর সহ-যোগিতায় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন তথা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, শাস্ত্রী মহাশয়কে তাঁহাদের মুখ্যতম বলিলে অন্যায় হইবে না। বস্তুত বিশ্বভারতীর ন্যায় একটি প্রতিষ্ঠানের আইডিয়া প্রথমে শাস্ত্রী মহাশয়ই পরিকল্পনা করেন—রবীন্দ্রনাথও এ-ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে বলিলেই শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনাদর্শের ব্যাখ্যা করা হইবে। কিছুকাল শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করিবার পর প্রাচীন গুরু-গৃহের আদর্শে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া স্বগ্রামে যান। সেখানে ভারতীয় বিদ্যার একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন। কিন্তু বৎসরকাল পরেই পুনরায় কবিগুরুর আহ্বানে তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পরিকল্পনা শুনিয়া

ও মনোভাব বুঝিয়া বলেন, শাস্ত্রী মহাশয় আপনার পরিকল্পনাকে আমি এখানেই মূর্তিদান করিব। ইহাই বিশ্ব-ভারতী প্রতিষ্ঠার সংকল্প। পরবর্তী ইতিহাস সুবিদিত।

প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র সাহিত্য ধর্ম ও ঐতিহ্য শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবনের প্রধান প্রেরণা। এই একটি সূত্রকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার জীবনাদর্শকে ব্যাখ্যা করা চলে। শান্তিনিকেতন আশ্রম যে তাঁহার কর্মস্থল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কারণ এই প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে তিনি প্রাচীন গুরু-গৃহের আদর্শ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তৎকালীন বিশ্বভারতীও এই কারণেই তাঁহার কর্মস্থল হইয়াছিল; শান্তি-নিকেতনের স্বাভাবিক পরিণাম বিশ্ব-ভারতী। আবার রবীন্দ্রনাথ যে শাস্ত্রী মহাশয়কে সুহৃদ ও সহকর্মীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহারও কারণ ইহাই, জ্ঞানতপস্বীর যে সন্ধান তিনি করিতে-ছিলেন, তরুণ বিধুশেখরের মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাইলেন। এমন যোগাযোগ দুর্লভ। এক্ষেত্রে সেই দুর্লভ যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। দীর্ঘকাল জ্ঞানসত্র রচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন; শান্তিনিকেতন ও শাস্ত্রী মহাশয় অভিন্ন ছিলেন।

যদিচ তিনি পরবর্তী জীবনে ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান প্রকরণ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন, তবু বলিলে অন্যায় হইবে না যে, প্রধানত ভারতীয় শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই তাঁহার জীবন ও ব্যক্তিত্ব গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রধানত ভারতীয় জ্ঞানচর্চার দ্বারা এ-যুগেও যে একজন পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া সম্ভব, যুগের দাবী ও যুগধর্মের সহিত নিজের 'জীবনধারা'কে মিলাইয়া লওয়া সম্ভব, শাস্ত্রী মহাশয় তাহার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ। শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে স্বদেশী-বিদেশী, নানা ধর্মের ও মতের লোকের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও বন্ধুত্ব হইয়াছে, কিন্তু কেহ একদিনের জন্যও তাঁহাকে সংকীর্ণ-চিত্ত বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। আচারনিষ্ঠ, স্বধর্মপরায়ণ এই তেজস্বী ব্রাহ্মণের আচরণের মধ্যে, হৃদয়ের মধ্যে কোথাও কুণ্ঠা ছিল না—ইহাতে ভারতীয় জীবনরীতির সর্বজনীনতা প্রমাণিত হয়।

শেষ জীবনে তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও জ্ঞানচর্চার বিরাম ছিল না তাঁহার। কলিকাতায় স্বভবনে জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত তিনি জ্ঞানচর্চায় নিমগ্ন ছিলেন। আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে পরলোকে তাঁহার শান্তি কামনা করিতেছি এবং তাঁহার শোকার্ত পুত্র, কন্যা ও পরিজনগণের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রসঙ্গত

বছর শেষ হয়ে এল। বর্ষশেষের এই সপ্তাহটি আমাদের মনে বড় বেদনার একটি স্মৃতিকে আবার নতুন করে জাগিয়ে তোলে। আজ থেকে পনর বছর আগে বর্ষবিদায়ের এই বেদনাময় মুহূর্তটিতেই সাংবাদিক ও সাহিত্যিক প্রফুল্লকুমার সরকার আমাদের কাছ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। দেশবাসী তাঁকে চেনেন এক অগ্রগণ্য দেশপ্রেমিক হিসেবে, দেশপ্রেমের বেদীতে আপন জীবনের প্রায় সমস্ত স্বার্থকেই যিনি

বলি দিয়েছিলেন; চেনেন এক শক্তিধর সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসেবে, সাহিত্য ও সংবাদপত্রের কল্যাণচিন্তায় যাঁর চিত্ত কখনও বিশ্রাম মানেনি। আমাদের সৌভাগ্য, এই মহান মানুষটিকে আরও একটু কাছের থেকে দেখবার সুযোগ আমরা পেয়েছিলাম। দেখেছি, অত্যন্ত সঙ্কটের মুহূর্তেও তিনি নত হননি, আবার তাঁর পরম সমৃদ্ধির মুহূর্তেও তিনি নম্র ছিলেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার তিনি ছিলেন অন্যতম কর্ণধার। যা ছিল অত্যন্তই সীমিত একটি সম্ভাবনা, তারই মধ্য থেকে স্বল্প-সম্বল কয়েকটি পত্রিকাকে ধীরে-ধীরে তিনি বড় করে তুলেছিলেন—পিতার ধৈর্যে, মাতার স্নেহে। এ-কাজে তাঁর সহায় ছিলেন স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদার। প্রফুল্লকুমার ও সুরেশচন্দ্র—কর্মযোগের সাধনায় এই দুই মহান পুরুষের যে মিলন ঘটেছিল, সমগ্র দেশ তার সুফল আহরণ করেছে।

প্রফুল্লকুমারের সবচাইতে বড় পরিচয়, তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ। যে-সমস্ত গুণের সমাবেশ ঘটলে মানবচরিত্র একটি সুন্দর তাৎপর্য লাভ করে, প্রফুল্লকুমারের মধ্যে তারই সন্নিহিতি সবাই লক্ষ্য করেছেন। বীতরাগভয়ক্রোধ সেই পরিপূর্ণ মানুষটি আর আজ আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর আদর্শের দীপশিখাটি আজও অম্লান হয়ে রয়েছে। তারই আলোকে আমাদের পথ আমরা চিনে নেব।

* * *

খবরের বাজারে দিনকয়েক ধরে ঈষৎ মন্দা চলছিল। দেশের বাজারে ত বটেই, বিদেশী বাজারেও। পাকিস্তানীরা ইতিমধ্যে ভারত-সীমান্তে এসে বারবার হানা দিয়েছে, নেহরু-নুন চুক্তি নিয়ে জনসাধারণের অসন্তোষ ক্রমেই আরও ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছে, ফরাক্কা বাঁধ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের গড়িমসিতে বাঙালী জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছে, এবং এই রকমের আরও অনেক কিছুই হয়েছে বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এমন কিছু ঘটেনি, জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা কোনও গভীর আলোড়ন অথবা পরিবর্তনের সূচনা হিসেবে গৃহীত হতে পারে। আর এই মন্দার মুহূর্তেই এসেছে তিব্বতের খবর, দেশ আর বিদেশের রাজনৈতিক আত্মতুষ্টির মূলে যা একটা প্রবল নাড়া দিয়ে দিয়েছে।

তিব্বত নিয়ে ভারত ও চীনের সম্পর্কে যে খানিকটা চিড় ধরেছে, তাতে সন্দেহ নেই। এ-ব্যাপারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কী মনোভাব অবলম্বন করবেন, তাঁর প্রথম-দিককার কিছু উক্তির পর তা নিয়ে কিছু সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সংশয় বর্তমানে কেটে গিয়েছে। সংসদে তাঁর সর্বশেষ ঘোষণা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়তাব্যঞ্জক। তারপর সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁর সাম্প্রতিক বৈঠকে যে-সব কথা তিনি বলেছেন, এবং যেমনভাবে বলেছেন, তাতে বুঝতে পারা যায়, দৃঢ়ই তিনি থাকবেন। ব্যাপক অর্থে চীনের কর্তৃত্বাধীনে থাকা সত্ত্বেও তিব্বতকে একটি আত্মশাসিত রাষ্ট্র হিসেবে রাখা হবে বলে চীনের তরফ থেকে যে-প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত না-হওয়ায় শ্রীনেহরু আদৌ প্রীত হননি; চীনা কর্তৃপক্ষ তিব্বতে এখন যে-নীতির আশ্রয় নিয়েছেন, তাকে তিনি কিছুমাত্র সানজরে দেখেননি; এবং ভারত সম্পর্কে চীনা-মহল এখন যে-ধরনের প্রচারকার্য চালাচ্ছেন, তাতে তিনি—স্পষ্টতই—অতি অপ্রীত হয়েছেন। এটা বিস্ময়ের কথা নয়। অপ্রীত তিনি যদি না হতেন, তাহলেই বরং বিস্ময়ের কারণ ঘটত। শ্রীনেহরু অত্যন্তই দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, দলাই লামাকে এখানে আশ্রয় দেওয়া হবে; দলাই লামার নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন ভারত-সরকারের। তিব্বত সম্পর্কে ভারতের মনোভাব শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে, অনেকের মনেই তা নিয়ে অনেক সংশয় ছিল। সমস্ত সংশয়েরই এখন অবসান ঘটা উচিত।

সমস্ত অসন্তোষেরও। যদিও জানি, ভারতীয় কমিউনিস্টদের অসন্তোষ এতে মিটবে না। বরং আরও বৃদ্ধি পাবে। তার কারণ, তিব্বতের ব্যাপারটাকে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরা দেখেননি। মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকেও না। দেখেছেন চীনা দৃষ্টিকোণ থেকে। এবং এ নিয়ে এমন অনেক কথাই তাঁরা বলেছেন, যা শুনলে মনে হয়, কমিউনিজমের প্রতি যত প্রেমই তাঁদের থাক, দেশপ্রেম তাঁদের নেই। লোকসভায় কৃপালনীজী সে-কথা বলেছেন। কমিউনিস্টদের সে-কথা ভাল লাগেনি। কিন্তু জেনে রাখা ভাল যে, কৃপালনীজী যা বলেছেন, তা শুধু তাঁর একার কথা নয়। ভারতীয় কমিউনিস্টদের সম্পর্কে সকলেই এখন ওই একই কথা বলবেন।

* * *

কলকাতা ও হাওড়া শহরের অধিবাসীদের সেদিন বড় তীব্র এক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। স্টেট-বাসকর্মী ও পুলিস-কর্মচারীদের মধ্যে তুচ্ছ একটা কলহের ফলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এই শহরের পরিবহণ-ব্যবস্থা সেদিন অচল হয়ে থেকেছে। যতদূর জানি, বাসের কাজ হল প্রয়োজনের মুহূর্তে আমাদের এক-জায়গা থেকে অন্য-জায়গায় নিয়ে যাওয়া। সেই বাস দিয়ে সেদিন ব্যারিকেড রচনা করা হয়েছিল। অন্যান্য বহু যানের পক্ষেই তাই স্থান থেকে স্থানান্তরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কারও উপরে কোনও অন্যায় যদি ঘটে, সে-অন্যায় মুখ বুজে মেনে নিতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। প্রতিবাদ জানাবার, প্রতিকার দাবি করবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু প্রতিবাদটা এমনভাবে জানানো এবং প্রতিকারটা এমনভাবে দাবি করা দরকার, জনসাধারণের যাতে কোনও অসুবিধে না ঘটে। অথচ দেখছি, ক্রোধের মুহূর্তে এই সহজ সত্যটাই সকলে বিস্মৃত হয়। বিস্মৃতিটা লজ্জাজনক এবং ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি না ঘটাই বাঞ্ছনীয়। যদি ঘটে, তার পরিণাম নিশ্চয়ই শুভ হবে না। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকেই এ-কথা মনে রাখতে বলি।

দালাই লামার ভারতে পৌঁছানোর সংবাদে তিব্বত ও ভারত উভয় দেশই একটা প্রকাণ্ড স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। তিব্বতে যে শোকাবহ অবস্থা পিছনে ফেলে দালাই লামাকে আসতে হয়েছে, তার জন্য দুশ্চিন্তা ও দুঃখবোধ তিলমাত্র কমেনি; কিন্তু দালাই লামার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং জীবন যে আপাতত বিপন্মুক্ত হয়েছে, এও একটা মস্ত বড়ো সান্ত্বনার কথা। এ বিষয়ে ভারত সরকার এবং ভারতের জনসাধারণ একই মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, যদিও সরকারী মুখপাত্রগণকে অনেক সাবধানে আঁটঘাঁট বেঁধে কথা বলতে হচ্ছে। দালাই লামার ভারতে আশ্রয় গ্রহণের ফলে নানারকম কূটনৈতিক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে এবং যে-রাষ্ট্রের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ার সম্ভাবনা সেই চীনের সঙ্গে ভারত বন্ধুভাব বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত আগ্রহশীল, তা সত্ত্বেও ভারত সরকার কেবল দালাই লামার আশ্রয় প্রার্থনা অকুণ্ঠভাবে মঞ্জুর করেছেন তা নয়, গভীর সহানুভূতি এবং সম্মানের সঙ্গে তাঁর আগমন অভিনন্দিত করেছেন। গোড়া থেকেই চীনা কর্তৃপক্ষ প্রচার করে আসছেন যে, দালাই লামা কাম্পা বিদ্রোহীদের কবলে পড়েছেন এবং তারা তাঁকে দিয়ে যা করাচ্ছে, তিনি তাই করতে বাধ্য হচ্ছেন। দালাই লামার ভারতে আশ্রয় গ্রহণের সংবাদ প্রচার করার সময়েও চীনা সরকারী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেন যে, দালাই লামা "under duress" —অর্থাৎ নিজের ইচ্ছায় নয়, অপরের শক্তির দ্বারা বাধ্য হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

(এইখানে দালাই লামার ভারতে পৌঁছানোর সংবাদ পরিবেশন সম্পর্কে যে-বিচিত্র ব্যাপার ঘটেছে তার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যেতে পারে। চীনা সরকারী মহল থেকে প্রথম খবরটা বেরোয় যে, অমুক তারিখে দালাই লামা অমুক জায়গায় ভারতে প্রবেশ করেছেন। এর প্রায় দুদিন পরে লোকসভায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী প্রথম সরকারীভাবে এই সংবাদ দেন। তিনি বলেন যে, সংবাদ ভারত গবর্ণমেণ্টও পেয়েছিলেন; কিন্তু সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হয়ে তাঁরা খবর প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত বোধ করেন নি এবং সেটা দালাই লামার নিরাপত্তার জন্য। এখন প্রশ্ন উঠেছে যে, চীনারা যে সংবাদ দিয়েছিল, তার সূত্র কোথায় ছিল। চীনারা দালাই লামার ভারতে প্রবেশের দিনটি পর্যন্ত ঠিক মতো বলে দিয়েছিল, যদি তিব্বতের দিক থেকেই তারা খবর পেয়ে থাকে তাহলে ধরতে হয় যে, দালাই লামার গতিবিধি চীনাদের অজানা ছিল না এবং তাহলে দালাই লামা তাঁর চীনা অনুসরণকারীদের এড়িয়ে এলেন কি করে? সংবাদের রকম, সময় ইত্যাদি থেকে এই অনুমানই যথার্থ বলে মনে হয় যে, চীনারা ভারতের দিক থেকেই খবরটা সংগ্রহ করেছে। সীমান্তের যেখান দিয়ে দালাই লামা ভারতে প্রবেশ করেছেন, সেই অঞ্চলে চীনা গুপ্তচর আছে অথবা সীমান্ত থেকে দিল্লীতে খবর পৌঁছানোর পরে অথবা মাঝপথে কোনো-ভাবে চীনাদের কোনো চর সংবাদটি হস্তগত করে। দিল্লীতে পৌঁছানোর পরে সংবাদটি বেহাতে পড়েনি বলে প্রধান মন্ত্রী বলেছেন। অবশ্য এইরকম ব্যাপারে যখন ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই একটা তদন্ত চলছে তখন—রাজ-পুরুষদের কোনো উক্তিকে শেষ কথা বলে ধরে নেওয়া যায় না।)

কিন্তু দালাই লামা “under duress” ভারতে এসেছেন, এরকম কথার সত্য চিন্তা তো অচিরেই প্রমাণিত হয়ে যাবে। অবশ্য কথাটার মধ্যে আদৌ কোনো যুক্তিযুক্ততা খুঁজে পাওয়া যায় না, একমাত্র তিব্বত-বাসীদের কাছে চীনা কর্তৃপক্ষের সাময়িক প্রোপাগাণ্ডার উদ্দেশ্য ছাড়া। কাম্পা বিদ্রোহীদের কবলে যদি দালাই লামা পড়েই ছিলেন এবং তাদের ইচ্ছানুসারেই যদি তাঁকে চলতে হয়ে থাকে, তবে তারা দালাই লামাকে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল কেন? তাদের স্বার্থ ছিল দালাই লামাকে যতদিন সম্ভব নিজেদের মধ্যে রাখা। দালাই লামা যদি তিব্বতেই থাকতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং ভারতে আসতে চান নি তাহলে তো তিনি ভারতে পৌঁছেই সে কথা ব্যক্ত করে দেবেন—এটা কাম্পা বিদ্রোহীদের ধরে নেওয়া উচিত। চীনাদের ঘোষিত “duress”এর অভিযোগের সঙ্গে ঘটনা-বলীর কোনো সংগতি দেখা যাচ্ছে না। ভারতে প্রবেশ করার পূর্বে ভারত সরকারের নিকট আশ্রয় চেয়ে দালাই লামার দূত আসে এবং ভারত সরকার সম্মতি জ্ঞাপন করেন। দালাই লামাকে বাধ্য হয়ে তিব্বত ছাড়তে হয়েছে তো বটেই, কিন্তু ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করতে কাম্পা বিদ্রোহীরা তাঁকে বাধ্য করেছে অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাম্পারা তাঁকে ভারতের ভিতরে ঠেলে দিয়েছে—এরূপ ধারণা করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। ভারত সরকারের মনে যে এরূপ কোনো সন্দেহ আছে, তারও কোনো লক্ষণ নেই। চীনাদের প্রচারের মধ্যে যদি সত্যতা থাকত, তবে দালাই লামা কাম্পাদের কবল থেকে মুক্ত হওয়া মাত্র অর্থাৎ ভারতে পৌঁছানোমাত্রই ঘোষণা করতে পারতেন যে, তাঁর ভারতে আশ্রয় প্রার্থনা করার কোনো ইচ্ছা ছিল না। তিনি এখনই কম্যুনিস্ট-কবলিত লাসায় ফিরে যেতে চান। তাহলে ভারত গভর্নমেণ্টের কোনো ঝামেলা থাকবে না। তাঁরা দালাই লামাকে লাসায় পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেবেন, কারণ দালাই লামা যদি স্বেচ্ছায় লাসায় ফিরে যেতে চান, তবে ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষে তাঁকে আটকে রাখার কোনো কথাই থাকতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দালাই লামাকে আশ্রয় দানের ব্যাপারটার এই রকমভাবে মিটবার যে কোনো নিকট সম্ভাবনা আছে, ভারত গভর্নমেণ্টের বাক্য বা আচরণ থেকে তার এতটুকু মাত্র আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। পক্ষান্তরে অনির্দিষ্টকালের জন্য দালাই লামার ভারতে অবস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে এবং তার ফলে যে-সব সমস্যা উদ্ভবের সম্ভাবনা রয়েছে, তার জন্য ভারত গভর্নমেণ্ট প্রস্তুত হচ্ছেন বলেই মনে হয়। দালাই লামা ভারতে অবস্থানকালে স্বভাবতই এমন কিছু করতে চাইবেন না, যাতে তাঁর নিজের পক্ষে এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে খামকা একটা অসুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু ব্যাপারটা আবার এত সহজও নয়। দালাই লামা একটি ব্যক্তিবিশেষ মাত্র হিসাবে এখানে আশ্রয় নেন নি, তাঁকে দালাই লামা হিসাবেই ভারত সরকার রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছেন। কাউকে রাজনৈতিক আশ্রয় দানের অর্থ কেবল এই মাত্র নয় যে, যে-শক্তির বিরুদ্ধে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে, দাবি করলেও আশ্রিতকে তার হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না। রাজনৈতিক আশ্রয়দান বলতে এও বুঝায় যে, আশ্রিতের রাজনৈতিক সত্তাকে পুরোপুরি শৃংখলিত করে রাখা হবে না। কোনো আশ্রিত ব্যক্তিরই আশ্রয়-দাতা রাষ্ট্রের নীতিবিরোধী কার্যে লিপ্ত হয়ে ঐ রাষ্ট্র এবং বন্ধুস্থানীয় অপর কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করার অধিকার নেই। সুতরাং সাধারণভাবে বলতে গেলে ভারত ও চীনের সম্বন্ধ তিক্ততর বা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রী বিপন্ন হয় এমন কার্য ভারতে অবস্থানকালে দালাই লামার অকর্তব্য হবে।

কিন্তু এখানে অবস্থা এরূপ সরল নয়। প্রথমত, দালাই লামার পদ থেকেই কতক-গুলি জিনিস নির্বাহ হয় যেগুলির কার্য অন্ততপক্ষে নৈতিক প্রভাব। বাধানিষেধের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আটক বন্দী করে রাখা যাবে না, অর্থাৎ দালাই লামাকে মাত্র ব্যক্তি-বিশেষ বা private individualএর শ্রেণীতে জোর করে আনা যাবে না এবং সেরূপ করার ইচ্ছাও বোধ হয় সরকারের নেই: আর থাকলেও এক্ষেত্রে তা করা সম্ভব হোত না। দালাই লামা কোথায় থাকবেন, কী অবস্থায় থাকবেন তা এখনো ঠিক হয় নি; কিন্তু প্রধান মন্ত্রী বলেছেন যে, দালাই লামার উপর কোনো অযৌক্তিক বাধানিষেধ প্রয়োগ করা হবে না।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, ভারত সরকার যাই করুন, সব সময়েই একটা কথা মনে রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে এই যে, এক্ষেত্রে ভারতবর্ষের পক্ষে নিরপেক্ষতার ভাব—অর্থাৎ এটা তিব্বতী ও চীনাদের ব্যাপার, আমাদের কিছু নয়—এরকম ভাব অবলম্বন সম্ভব নয় এবং সরকার সে-ভাব দেখাবার চেষ্টা করলেও কোনো লাভ নেই, কারণ যার জন্য করা সেই চীনই তার বিশ্বাস করবে না। ভারতবর্ষ তিব্বতের ব্যাপারে যেরূপ বিচলিত হয়েছে, গত কয়েক বছরের মধ্যে অন্য কোনো ঘটনার দ্বারা এরূপ বিচলিত হয়নি। চীন কর্তৃক তিব্বতীদের স্বাধিকার লোপের চেষ্টায় ভারতের বিক্ষোভ প্রধানত ধর্মীয় এবং কৃষ্টিগত হলেও তার রাজনৈতিক দিকটাও ভারতবর্ষের পক্ষে উপেক্ষনীয় নয়। তিব্বতের সামাজিক সংস্কার এবং অর্থনৈতিক উন্নতি ভারতেরও কাম্য, কিন্তু সে তা দেখতে চায় তিব্বতীদের স্বাধিকারের পটভূমিকায়। কম্যুনিস্ট ব্লকের অংশ হিসাবে চীনেরও Cold Warএ একটা অংশ আছে, সুতরাং তিব্বতের ব্যাপার নিয়ে সেই Cold Warর ঢাকের বাজনা কিছু শোনা যাচ্ছে এবং আরো যাবে। তার জন্য অবশ্য চীনের কোনো দুর্ভাবনা নেই কারণ এটা দেখা গেছে যতক্ষণ না পর্যন্ত পালের গোদারা পরস্পরের সংগে নিউক্লিয়ার যুদ্ধ বাধাতে প্রস্তুত নয় ততদিন পর্যন্ত যে যার এক্তিয়ারের মধ্যে দুর্বলের প্রতি যা-খুশি করতে পারে, দু দলের মধ্যে “মুখ খারাপ” অনেক হবে, কিন্তু দুর্বলকে বাঁচাতে কেউ আসবে না। কিন্তু এই Cold Warএর সংগে ভারতের কোনো সম্পর্ক নেই, বিনা কারণে চীনকে বিপাকে ফেলার কল্পনাও ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু তিব্বত সম্বন্ধে ভারতের মনোভাব চীনের পরিষ্কাররূপে জানা উচিত। তিব্বত সম্পর্কে ব্যথিত ও উদ্বিগ্ন ভারতের কথা পূর্ব-পশ্চিম Cold Warএর বুলির সংগে এক পর্যায়ে ফেললে পিকিং ভারত-চীন মৈত্রীর উপর যে আঘাত দিবে তার ফল কারো পক্ষেই ভালো হবে না।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে রবীন্দ্রনাথ জাপানী অভ্যুদয়ে আনন্দিত হয়েও জাপানের প্রতি একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে ভুলে যাননি। তিনি জাপানী “প্রগতি”র মধ্যে কতকগুলি পশ্চিমা প্রবৃত্তির নির্মম অনুকরণ দেখে শংকিত হয়েছিলেন। জাপানীরা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় বিরক্তি প্রকাশ করেছিলেন। পরবর্তী ইতিহাসের প্রমাণ সকলের জানা আছে। চীনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দরদের অন্ত ছিল না। জীবিত থাকলে তিনি চীনের বর্তমান অভ্যুদয়েরও অভিনন্দন জানাতেন, কিন্তু সেই সংগে যেমন জাপানের প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন তেমনি চীনের প্রতিও বোধ হয় করতেন। এবং হয়ত জাপানেরই মতো চীনেরও কর্তৃপক্ষের দ্বারা রবীন্দ্র-বাণী উপেক্ষিত ও উপহসিত হোত।
৭।৪।৫৯

আচার্য বিধুশেখর

সুশীল রায়

"শান্তিনিকেতনে আমরা ছিলাম রাজার হালে। টাকাকড়ি কম ছিল, তাতে আমরা কোন অভাব বোধ করিনি। উৎকৃষ্ট কামিনী চালের ভাত খেয়েছি, সোনামুগের ডাল খেয়েছি, খাঁটি গব্যঘৃত খেয়েছি—এর বেশী আর কী খেলে রাজা হওয়া যায়?"

একটু থেমে রহস্য করে বলেছিলেন, "হাতি খেলে, না, ঘোড়া খেলে?"

যখনই তাঁর কাছে গিয়েছি, তখনই তিনি বলতেন, শান্তিনিকেতনের কথা। তাঁর জীবনের সঙ্গে, তাঁর অস্থিমজ্জার সঙ্গে, এই ভাবেই মিশে ছিল শান্তিনিকেতন।

১৩১১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে (১৯০৫ খৃীষ্টাব্দে) ছাব্বিশ বছর বয়সের যুবক বিধুশেখর সংস্কৃতের অধ্যাপক-রূপে যোগ দেন শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। ব্রহ্ম--চর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের তখন একেবারেই শিশু অবস্থা। এই শিশু-প্রতিষ্ঠানে এসে যোগ দেন নবযুবক বিধুশেখর---অনেক স্বপ্ন কল্পনা উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে। সেই নবযুবকের সমস্ত স্বপ্নকল্পনা যে বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছিল, সে কথা বৃদ্ধ বিধুশেখরের সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও যেমন জানেন, যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যের সুযোগ পান নি, তাঁরাও এই জ্ঞানাচার্যের গভীর জ্ঞানের পরিচয় যদি জেনে থাকেন তাহলে তাঁদের পক্ষেও বিধুশেখরকে সুস্পষ্ট রূপ জানা সম্ভব হয়েছে।

শাস্ত্রী মশায় আরও বললেন, "মাইনে বলে যা পেতাম তা হয় ত সামান্যই, কিন্তু অভাব ছিল না কোন। কিন্তু এখন আমরা আমাদের অভাব সৃষ্টি করতে শিখেছি, তাই দুঃখও বারোমেসে সঙ্গী হয়েছে।"

সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনই ছিল পণ্ডিত বিধুশখর শাস্ত্রীর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। আড়ম্বর দিয়ে জীবনকে জটিল করে তুললে জীবনের চলার পথ বুঝি রুদ্ধ হয়ে যেত। তাহলে হয়ত তাঁর পক্ষে তাঁর জীবনের এবং জ্ঞানের এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছন সম্ভব হত না।

গত ৪ঠা এপ্রিল (২১শে চৈত্র, ১৩৬৫) শনিবার রাত্রে ৮১ বৎসর বয়সে শাস্ত্রী মহাশয় পরলোকগমন করেছেন।

১৭৭৮ খৃীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর (২৫শে আশ্বিন ১২৮৫) মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে বিধুশেখরের জন্ম। তাঁর শিশুকালের পাঠ আরম্ভ হয় স্বগ্রামের মধ্যইংরাজি স্কুলে। এখানকার পাঠ শেষ হবার পর তিনি তাঁর পিতার অভিপ্রায় অনুসারে সংস্কৃতপাঠ আরম্ভ করেন। এবং মাত্র সতেরো বৎসর বয়সে তিনি কাব্যতীর্থ পাশ করেন। সংস্কৃত পাঠের সময়ে সংস্কৃত কাব্যাদি পাঠ করে তাঁর কাব্যরচনার আগ্রহ হয়। এবং এই আগ্রহ আগ্রহেই শেষ না হয়ে কার্যেও পরিণত হয়। তিনি কিছুদিনের মধ্যে তিনটি সংস্কৃত কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। বললেন, "প্রথমটির নাম দিই চন্দ্রপ্রভা। দ্বিতীয়টি হরিশচন্দ্রচরিত কাব্য। তৃতীয়টি পার্বতী-পরিণয়।"

এর পরে তিনি প্রেরিত হন কাশীতে। কাশীতে গিয়ে দর্শন ইত্যাদির চাপে পড়ে কাব্যরচনার ঝোঁক সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয়; কিন্তু তারই মধ্যে তিনি যৌবনবিলাস নামে একটি কাব্য রচনা করেন। তখন তাঁর বয়স আঠারো বৎসর মাত্র। তারপর রচনা করেন আর একটি কাব্য—চিত্তদূত।

বিধুশেখরের পিতামহ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সাধক ছিলেন। কাশীতে পণ্ডিত-মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল, পণ্ডিতবর্গ তাঁকে আগমচূড়ামণি বলে সম্বোধন করতেন। বিধুশেখরের জন্মের বছর পাঁচ আগে, ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে, তাঁর পিতামহ স্বগ্রাম হরিশ্চন্দ্রপুরে ত্রিশক্তি স্থাপনা করেন। তখন রেল-স্টিমার ছিল না, কাশী থেকে নৌকোযোগে তিনি এই ত্রিশক্তি আনেন। পিতামহর কয়েক ঘর শিষ্য ছিল।

বললেন, "আমার পিতার নাম ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য। তিনিও কিছুদিন শিষ্যপালন করেছেন। কিন্তু আমি সে-ধারা রক্ষা করতে পারিনি। আমার পিতার আগ্রহ ছিল যে, তিনি তাঁর অন্তত একটি ছেলেকে সংস্কৃত পড়াবেন। তাঁর সেই আগ্রহ তিনি আমার উপরেই প্রয়োগ করেন। টোলের ছাত্র হিসাবেই আমার সংস্কৃত শিক্ষা শুরু।"

কাশীর সঙ্গে এই যোগ পূর্ব থেকেই ছিল, এবং পুত্রকে সংস্কৃত পড়াবেন বলে পিতার আগ্রহ ছিল, এই কারণেই বিধুশেখর প্রেরিত হয়েছিলেন কাশীতে।

মহাপণ্ডিতগণের মহামিলন ক্ষেত্র এই কাশীধাম। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিতমণ্ডলী এখানে যাপন করতেন কাশীসন্ন্যাস। এইজন্যেই কাশী পণ্ডিত ব্যক্তিদের মিলনতীর্থে পরিণত হয়। তাঁদের ধর্ম ছিল—যেন অন্য কিছু না—অধ্যাপনা ও অধ্যয়নই ছিল তাঁদের ধর্ম। আকাশে সপ্তর্ষির দ্বারা যেমন ধ্রুবতারকার সন্ধান মেলে, কাশীতে তেমনই জ্ঞানের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন ঋষিতুল্য সপ্ত মহা-মহোপাধ্যায়ের দ্বারা। শিক্ষার্থীদের এঁরা জীবনের ধ্রুবসত্যের সন্ধান দিতে পেরেছেন।

এই সপ্তমহামহোপাধ্যায় হচ্ছেন তারারত্ন বাচস্পতি, বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী, কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি, রামমিশ্র শাস্ত্রী, গঙ্গাধর শাস্ত্রী, শিবকুমার শাস্ত্রী ও শ্রীসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী

বিধুশেখর বললেন, "আমার অধ্যাপক ছিলেন শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ও শ্রীসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। শিরোমণি মহাশয়ের কাছে ন্যায়, ও শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে বেদান্ত পাঠ করি।"

সে আমলের গুরু ও শিষ্যের মধ্যে সহৃদয় সম্পর্কের অনেক গল্প বললেন। শিক্ষাপদ্ধতির বিষয়ে অনেক কাহিনী বর্ণনা করলেন।

তারপর আক্ষেপ করে বললেন, "কিন্তু আমাদের আজকালকার শিক্ষা? কী করে সব গোলমাল হয়ে গেল তাই ভাবি। এখন সমাজে কেবল মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা দেখা দিয়েছে।"

কাশী থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। কী উদ্দেশ্যে তিনি কাশী থেকে শান্তিনিকেতনে আসবার জন্যে উদ্যত হয়েছিলেন, তা তিনি জানতেন না। ভবিষ্যতে সেখানে তাঁর ভালোমন্দ কী হবে না-হবে, সে কথাও তাঁর মনেই আসেনি।

"টাকা-পয়সা রোজগারের কোনো প্রয়োজনও তখন মনে হয়নি। কেননা, পিতা তখন জীবিত, আর জ্যেষ্ঠাগ্রজ সংসারের যাবতীয় ভার গ্রহণ করেছেন।"

কাশীতে অ্যানি বেসান্তের থিওসফিক্যাল সোসাইটি দেখে তাঁর মনে হত, তিনি যদি অনুরূপ একটি নিভৃত নিরালা জায়গা পান, এবং এখানকার মত একটি লাইব্রেরি, তাহলে বুঝি জীবন তাঁর ধন্য হয়।

বললেন, "অন্তর্যামী আমার অন্তরের প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুনেছিলেন। তাই আমার আহ্বান এল শান্তিনিকেতন থেকে। আগে বুঝিনি, সেখানে পৌঁছে বুঝতে পারলাম। এখানে এসে দেখলাম, আমার মন যা চায়, এ-স্থানটি তাই।"

কাশীতে তাঁরা জনকয়েক বিদ্যার্থী মিলে একটি সংস্কৃত কাগজ বের করেন।

তার নাম দেন মিত্রগোষ্ঠী পত্রিকা। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন কাশীতে এসে এই উদ্যমে যোগ দেন।

শান্তিনিকেতনে এসে প্রথম দেখাতেই স্থানটি তাঁর চোখে লেগে গেল। শাল ও তালের শ্রেণীর দ্বারা পরিবেষ্টিত আশ্রমটি। আশ্রমের বহু স্থানে উপনিষদের বহু কথা উৎকীর্ণ অথবা লিখিত। অদূরেই পুস্তকালয়। তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর মনের চাহিদার সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে।

বললেন, "তাই আত্ম-উৎসর্গ করলাম এই স্থানটিতে।"

সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্যই এখানে তাঁর আগমন। এখানে নিভৃত ও মনোমত পরিবেশ পেয়ে তিনি পুস্তকাগারের সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে নিজের নীড় রচনা করলেন। নিজেকে পুস্তকালয়ের একটি অংশেই যেন রূপান্তরিত করে নিলেন।

আরও বললেন, "প্রথমে রবিঠাকুরের কাছে এসেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তায় ক্রমশই তাঁর দিকে বেশি আকৃষ্ট হই। কিছুদিনের মধ্যে এমন হল যে, কেউ রবিঠাকুর বললে কানে বাধত। যেমন দিন কাটতে লাগল মনের গতিও সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হতে লাগল। তাঁকে গুরুদেব বলে উল্লেখ করতে লাগলাম।"

আমাদের আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতির কথা বলেছেন কিছুক্ষণ আগে, সেই প্রসঙ্গ তুলে আবার বললেন "এখন চারদিকে কম্পালসারি ফ্রী এডুকেশনের রব উঠেছে। কিন্তু এতে কম্পালশনও হচ্ছে, ফ্রীও হয়তো হচ্ছে। কিন্তু এডুকেশন হবে কিনা, তা ভাববার কথা। আমাদের দেশের সেই ব্রহ্মচর্যপালন ও গুরুগৃহে বাসই হচ্ছে আসলে নির্ভেজাল কম্পালসারি ফ্রী এডুকেশান। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার এই সূত্রটি ধরতে পেরেছিলেন, তাই স্থাপনা করেছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও শান্তিনিকেতন।"

ত্রিশটি বৎসর তিনি কাটিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। এখানেই তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত শক্তি ও সাধনা উজাড় করে দেন। তাঁদের সমবেত চেষ্টায় যেমন গড়ে ওঠে এই প্রতিষ্ঠান, তেমনি তাঁরা নিজেও ক্রমশ গঠিত হয়ে ওঠেন এখানে। 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেক-নীড়ম্'—এই বেদবাক্যটি সার্থক হয়ে উঠেছে যেখানে সেই বিশ্বভারতীর কথায় তিনি পঞ্চমুখ।

বিশ্বভারতী এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত, এই কথার উল্লেখ করে তিনি বললেন, "টাকা দিয়ে সহজেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, কিন্তু বিশ্বভারতী স্থাপন করা যায় না। আমার ত মনে হয়, যা প্রকৃত বিপদ তাই সম্পদের আকারে এখন দেখা দিয়েছে ওখানে।"

তিনি যখন শান্তিনিকেতনে আসেন তখন সংস্কৃতের জ্ঞান অর্জন করেই আসেন। এখানে এসে চর্চার দ্বারা সে জ্ঞান গভীরতর হয়। কিন্তু পালি তিনি জানতেন না। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তিনি পালি পাঠ আরম্ভ করেন। এবং ক্রমশ এই ভাষাতেও সবিশেষ জ্ঞান অর্জিত হয় এবং গ্রন্থও রচনা করেন।

জ্ঞান অর্জন করে তিনি নিজের মধ্যে তা পুঁজি করে রাখেন নি। ছাত্রদের মধ্যেও যেমন বিতরণ করেছেন, গ্রন্থরচনার দ্বারাও তেমনি সে জ্ঞানের বিস্তারসাধন করেছেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে তিনি সম্মানিত ও সংবর্ধিত হয়েছেন। ১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের বিভিন্ন স্থানের এবং ভারতের বাহিরের কয়েকজন মনীষীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে ডক্টরেট উপাধি দেন, বিধুশেখর তাঁদের একজন। ১৯৫৮ সালে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারত সরকার ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে বিশেষ বৃত্তি দেন—বিধুশেখর এঁদের অন্যতম। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আচার্য স্বরূপে শ্রীজওহরলাল নেহরু এঁকে 'দেশিকোত্তম' (ডি লিট) উপাধিতে ভূষিত করেন।

অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটির নাম এই—

১. ন্যায়প্রবেশ
২. ভোটপ্রকাশ
৩. আগম শাস্ত্র
৪. দি বেসিক কনসেপশান অব বুদ্ধিজম
৫. তত্ত্বসংগ্রহ
৬. মিলিন্দপ্রশ্ন
৭. পালিপ্রকাশ
৮. প্রাতিমোক্ষ
৯. মহাযানবিংশক
১০. বিবাহমঙ্গল
১১. চতুঃশতক
১২. মধ্যান্তবিভাগ সূত্র টীকা
১৩. যোগাচারভূমি
১৪. দি হিস্টোরিক্যাল ইনট্রোডাকশন টু দি ইন্ডিয়ান স্কুলস অব বুদ্ধিজম
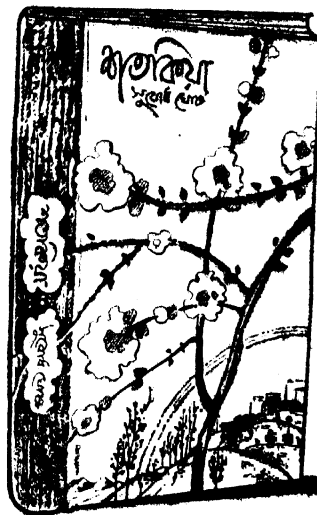
দ্বিতীয় মত

॥ রঞ্জন ॥

ডাক্তার বিধান রায় বাঙলা ও বাঙালীকে অনেক দিয়েছেন—ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ধন্বন্তরির থেকে নীচে নয়। নানা দাতব্য ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের কর্ণধাররূপেও তিনি পরিচিত। মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকায় তাঁর প্রতিশ্রুতি ও সাফল্য সমপরিমাণ বলে যদি সবাই মনে না করেন তা ডাক্তার রায়ের উপর বহুর আস্থারই প্রমাণ। আশা করি তো তারই কাছে যার উপর বিশ্বাস আছে। এখন বলা বাহুল্য, আমি ডাক্তার রায়ের অবিমিশ্র সমালোচক নই। তবু ডাক্তার রায়ের "নবতম অবদান" সম্বন্ধে অবিমিশ্র নিন্দা ছাড়া আর কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

রবীন্দ্রজন্মের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জোড়াসাঁকোয় একটি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার প্রস্তাবে একটাও কিছু ভালো খুঁজে বের করা শক্ত। আমার ধারণা ছিল, জোড়াসাঁকোয় একদিন একটি রবীন্দ্র-মিউজিয়াম হবে। আশঙ্কা করি, আমার ধারণা সত্যে পরিণত হতে চলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিই মিউজিয়াম হবে। নৃত্য, নাটক ও অভিনয়ের বিশাল ও ব্যয়বহুল আয়োজনে রবীন্দ্র-স্মৃতি সম্মান পাবে সামান্যই। শ্রদ্ধার অভিনয় হবে নির্লজ্জ এবং সে-শ্রদ্ধার লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ হবেন না। হবেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এবং তাঁর পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রিগণ। ভারতের রাজ-

কবির সম্মান রক্ষা রাজভবনের কাজ নয়।

*

অনুমান করা অসংগত নয় যে, ডাক্তার রায়ের নব বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-সংগীত, রবীন্দ্র-নৃত্য ও রবীন্দ্রনাট্য অপেক্ষাকৃত গুরুত্ব পাবে। তাহলে আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার ধ্বংসের যুক্তি প্রয়োগ করে বলব, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় এমন কাজ হবে যা বিশ্বভারতীতে ও কলকাতার একাধিক গানের ইস্কুলে ইতিমধ্যেই হচ্ছে—করদাতার উপর নতুন অত্যাচার ছাড়াই—আর তা নয়তো এমন কাজ হবে যা রবীন্দ্রবিরোধী বা রবীন্দ্রনাথের বিকৃতি। এ যুক্তির নৈয়ায়িক ফ্যালাসি ফার্স্ট ইয়ারের ছেলেরও জানা, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে আমার আশঙ্কা আদৌ অমূলক বলে মানতে পারছিনে।

বিশ্বভারতীর নানা ত্রুটি আজ আর অপ্রকাশিত নেই। আপন দোষে সে নিজের নামের উপর কলঙ্ক এনেছে। সহস্র বিচ্যুতি সত্ত্বেও আজো বিশ্বভারতীতে এমন কিছু থাকা সম্ভব যা অন্যত্র স্থানান্তরিত করা অসম্ভব। একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ও ঐতিহ্য পোর্টেবল সুটকেস বা চারাগাছ নয়তো যে তাকে এখান থেকে ওখানে সরানো যাবে। নতুন করে তাকে গজানো তো আজগুবি আশা। ডাক্তার রায় যা করতে উদ্যত হয়েছেন তা হয় বিশ্বভারতীর একটি প্রতিদ্বন্দ্বীর সৃষ্টি যা হবে কি না অতি-পরিমিত অর্থের অক্ষমনীয় অপচয়—আর তা নইলে এ-বস্তু হবে ডাক্তার রায়ের হট-হাউস প্লাণ্ট বা তারও অধম কাগজের ফুল। সদা-উত্তেজিত জনৈক বন্ধু বললেন, তার চেয়ে রবীন্দ্র-স্টেডিয়ামও হোতো ভালো। বন্ধুর উত্তেজনার কারণ বুঝি।

*

হতে পারে বিশ্বভারতীর অস্বাস্থ্য ডাক্তার রায়েরও চিকিৎসার অতীত। তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বভারতী সৃষ্টি করার অর্থ আরো দুর্বোধ। কবির জাগ্রত প্রহরা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনে যে-ব্যাধি সংক্রামিত হয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরর অক্ষম পাহারাদারির ভয়ে জোড়াসাঁকোর বাইরে থাকবে, এমন কথা মুহূর্তের বিবেচনারও যোগ্য নয়। বরং নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে না থাকবে বিশ্বভারতীর বৈশিষ্ট্য না অন্যান্য আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণাগুণ। তার সঙ্গে যুক্ত হবে সরকারী তত্ত্বাবধানের অবধারিত ও অতি-পরিচিত অভ্যাসগুলি। কাব-জমিদার অক্ষমের প্রতি কঠোর হতে পারতেন, তাঁর ক্ষমতাও ছিল সামর্থ্যের পারমাপ-গ্রহণ ও পুরস্কার-বিধানের। সরকারী বিভাগের চোখে উত্তম ও অধমের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই। মধ্যম সেখানে শীর্ষে এবং অনড়।

স্পষ্ট করেই বলা যাক, ডাক্তার রায়ের নানা বৃহৎ গুণের মধ্যে বিশুদ্ধ সাহিত্য বা কলাপ্রীতি অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর আকস্মিক সাহিত্যানুরাগ বা সংগীত-প্রীতি প্রকাশিত হলে আমার সন্দেহী চিত্ত তাই শঙ্কা গোপন করতে পারে না। জিজ্ঞাসা জাগে—এ কি সফল চিকিৎসকের বিফল বিলাস, না প্রতাপশালী মুখ্যমন্ত্রীর অতি উদার কাঙালী-বিদায়? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আদিম যুগের অতিকায় প্রাণীর মতো খর্বমস্তিষ্ক ও বহুল্লাঙ্গুল. কিন্তু তরুণতর প্রতিষ্ঠান-গুলিতে না দেখি তারুণ্যের উদ্দামতা না প্রৌঢ়ত্বের স্থৈর্য। কারণও আবিষ্করণাতীত নয়।

*

জানি সরকার প্রবলভাবে অস্বীকার করবেন—Believe nothing until it has been officially denied—তবু আমার এ-সন্দেহ অকারণ নয় যে স্বাধীন ভারতের অধিকাংশ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সরকার সৃষ্টি করেছেন কোনো আইডিয়ার প্রেরণায় না। প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ছিল বাধিতের উদ্ধার বা অনুগৃহীতের সংস্থান। অন্তত একটি প্রতিষ্ঠানের কথা স্মরণ করতে পারি যেটি রুদ্ধদ্বার হয়েছিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিদায় গ্রহণের পরপ্রভাতে। আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্প্রীতির আর বুঝি প্রয়োজন ছিল না।

নির্বাসিত সামন্তের ভূমিকায় আধুনিক রাষ্ট্রের আবির্ভাব হয়তো বর্তমান যুগে অংশত অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শিল্প ও সাহিত্য এখন বহুলাংশে স্বাবলম্বী হ'তে পারে—ব্যাপকতর শিক্ষা ও অর্থের বিস্তৃততর বিতরণ আজ সাধারণ পাঠককে লেখকের পৃষ্ঠপোষক করতে পারে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন তবু হ'তে পারে, কিন্ত সে-সাহায্যে লেখকের ও সমাজের অধিকার আছে। সমাজ ও লেখক আজ ট্যাক্স দেয়। সমস্ত ব্যাপারটা অপমানকর হয় যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সামান্য ব্যক্তি সাহায্য দেন কৃপাভরে, যখন শিল্পী তা গ্রহণ করেন আপন অধিকার বিস্মৃত হয়ে নতমেরু হয়ে, যখন ডাক্তার রায় নামী লেখকের নাম পর্যন্ত সঠিক মনে রাখতে পারেন না। শিক্ষার বিকিরণের অর্থ শিক্ষকের ও শিল্পীর বিক্রয় হতে দেওয়া উচিত নয়।

শ্রীহারীতকৃষ্ণ দেব

॥ দুই ॥

প্রমথবাবুর কাছে যখন আমার প্রথম প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি পেশ করি, তখন আমার মনে খুব সংকোচ ছিল নিজের অক্ষমতার জন্যে। তিনি স্বয়ং আমার লেখা দেখেশুনে কাটকুট করে দেবেন এই ভরসা পেয়ে তবেই কলম ধরি। লেখাটি তাঁর হাতে দেওয়ার উপযুক্ত করতেই অনেক সময় লেগে গেল। ফলে তাঁর মনেও হয়ত ঘাটতি পড়েছিল আমার প্রতি স্নেহের ও প্রীতির। কেননা তাঁর ১৯।৮।১৬ তারিখের চিঠিতে 'কল্যাণীয়েষু'র স্থানে 'সবিনয় নিবেদন' বসিয়েছিলেন, এবং 'তুমি' পাঠ ছেড়ে দিয়ে 'আপনি' পাঠ ধরেছিলেন। পরে অবশ্য তিনি সেটাকে শুধরে নেন। এ-প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট রকমের অভিমানের পালাও হয়ত করেছিলুম। তবে সে-পালা আমার স্মৃতিপটে কোন ছাপ রেখে যায়নি।

সবুজপত্রে আমার প্রথম প্রবন্ধ 'বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষা' যখন ছাপার অক্ষরে বেরোয়, তখন গর্বের চেয়ে আনন্দ অনুভব করি বেশি, কারণ তার মধ্যে প্রমথবাবুর সম্পাদকীয় হস্তের নিপুণ কারিগরি যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান। এই সূত্রে আমারও কিঞ্চিৎ শিক্ষা হল, কি প্রণালীতে প্রবন্ধ লিখতে হয়। আর প্রমথবাবু নিজের লেখার উপরও যে নির্মম-ভাবে কলম চালাতে অভ্যস্ত, এ-সত্যের স্বীকৃতি তাঁরই মুখে পাওয়ায় আমার আশা জাগল যে, ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যে বাংলা ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ আমার মতন অনধিকারীর পক্ষেও অসম্ভব নয়। আমাদের সবুজ মন যাতে অ-বুঝ না হয়, এই উদ্দেশ্যেই প্রমথবাবু স্বকীয় রচনা সম্বন্ধে এই আত্মকথাটি আমাদের কাছে প্রকাশ করেন।

বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক হবার ইচ্ছে থাকলেও কেন তা হতে পারিনি, এমন গুরু পেয়েও কি জন্যে সে সুবর্ণসুযোগটি হারালুম, এর কৈফিয়ত দিচ্ছি। সবুজপাতা প্রায় সব গাছেই গজায়, তবে 'গাছে না উঠতেই কাঁদি' এ-বাক্যটি বোধহয় দুরারোহ কদলী বৃক্ষ সম্বন্ধেই বিশেষ প্রযোজ্য। প্রমথবাবু সবুজ-পত্রের সম্পাদনা-কার্যে কলা-বিশারদরূপে আমাদের কাছে প্রতীয়-মান হলেও লক্ষ্য করেছি যে, তিনি 'কলা' শব্দটি বড় একটা ব্যবহার করতেন না; তার পরিবর্তে ইংরেজী art শব্দটি বাংলা হরফে 'আর্ট'রূপে দেখা দিত। আমার বিশ্বাস, ওঁর চলিত কথার উপর ভক্তি থাকায় উনি কলা এবং কলা-পাতা উভয়কেই সম-ভাবে, পরিহার করেছিলেন, তার কারণ, 'কলা-দেখানো' আর 'কলা-পাতে লেখা' এই দুটি বাক্যাংশের চলিতার্থকে চরিতার্থ

করবার দরকার তখন বেশি ছিল না। তবু আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি যে, আমার ক্ষেত্রে কলার কাঁদি মিথ্যেবাদী হয়নি। সত্যিকথা বলতে কি, ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণের চিন্তায় পিতৃদেব মগ্ন থাকতেন, কিন্তু সে-বিষয়ে আমার চিত্তে আকাঙ্ক্ষার অত্যন্ত অভাব ছিল। যে ঘটনাচক্রে আমি পৈতৃক চিন্তাধারায় অধিকার লাভ করলুম, এবং তৎসহ মাতৃভাষার সাধনাকে অস্বীকার করলুম, তার প্রথম আবর্তন আরম্ভ হয় সেদিন, যেদিন মহিলা-কবি 'গিরীন্দ্রমোহিনীর পুত্র প্রকাশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বাবার কাছে 'চন্দ্রগুপ্ত,' 'চাণক্য,' 'বিন্দুসার' আর অশোক শীর্ষক প্রবন্ধ চাইলেন সুবল মিত্রের বাংলা অভিধানের নূতন সংস্করণে সন্নিবিষ্ট করবার জন্যে। সেই সংস্করণটি তখন নিউ বেংগল প্রেসে ছাপা হচ্ছিল, এবং প্রকাশবাবু ছিলেন সম্পাদক।

এই প্রসংগে প্রকাশবাবুর একটু পরিচয় দেওয়াটা বোধ করি অবান্তর হবে না। তিনি ছিলেন 'অক্রূর দত্তের বংশধর হিসেবে আমাদের কুটুম্ব, সেই সূত্রে আমাদের এখানে তাঁর গতিবিধি ছিল। 'শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবর্তিত 'Reis and Rayyat' পত্রিকার সম্পাদনা-কার্যভার শিরোধার্য করে নেওয়ার ফলেই সম্ভবত তাঁর মাথার চুল অকাল-পক্কতা লাভ করেছিল। তামাক খেতে খেতে প্রায়ই তিনি বাবার সংগে গল্প জমাতেন।

যেদিনের কথা উল্লেখ করেছি সেদিন বাবা মৌর্যযুগের ইতিহাস নিয়ে গল্প বলে যাচ্ছিলেন।

প্রকাশবাবু হঠাৎ বললেন,—আচ্ছা, আপনি আমাদের অভিধানের জন্যে এ-সম্বন্ধে কিছু লিখুন না।

বাবা বললেন,—আমি তো লিখি না, কেবল পড়ি আর পাঠের ফল শ্রুতিগোচর করি তাঁদের, যাঁরা পড়ার চেয়ে শোনার প্রতি বেশি শ্রদ্ধাশীল।

প্রকাশবাবু উত্তর করলেন,—বেশ, আমি একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি যিনি আপনার কথা শুনে নেবেন আর আমায় প্রবন্ধ লিখে দেবেন।

প্রস্তাবটি আমার আত্মসম্মানে আঘাত দিলে। প্রকাশবাবু চলে যাবার পর আমি বললুম—বাবা, আমারও তো বাংলা লেখা চলছে সবুজপত্রের জন্যে, আমিই আপনার মুখের কথা লিখে দিতে পারি।

বাবা বললেন,—ভালই তো।

কিন্তু শ্রুতির সংগে স্মৃতির বিরোধ শ্রুতি বলবত্তর, শাস্ত্রের এ-উক্তি মেনে নেওয়া গেল না। বাবা যা বলেছিলেন আমি তাই শুনে লিখেছিলুম, তবু তাঁর স্মৃতিশক্তির উপরে নির্ভর করে ছাপার অক্ষরে তা প্রকাশ করা যায় না,—কি জানি, যদি স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে থাকে! সুতরাং ইম্পীরিয়াল

লাইব্রেরির শরণাপন্ন হলুম। প্রথমেই পিতৃ-নির্দেশ অনুসারে টার্নার-এর "মহাবংশ" নিয়ে বসে গেলুম, সেখানে অশোকের জন্মবৃত্তান্ত পাওয়া যায় কিনা। বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে এলুম। পরদিন আবার পিতার আদেশে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "নেপালী বৌদ্ধ সাহিত্য" গ্রন্থ নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলুম এবং সানন্দে আবিষ্কার করলুম যে, বিন্দুসারের ঔরসে ব্রাহ্মণ-কন্যা সুভদ্রাঙ্গীর গর্ভে অশোকের জন্মকথা সেখানে লিপিবদ্ধ—ঠিক যেমনটি বাবার মুখে শুনেছিলুম। রাজেন্দ্রলালের বইটি ইংরেজিতে লেখা, এবং যে পাতাই পড়ি না কেন তাঁর ভাষা অনবদ্য। সেই বিদেশী ভাষার মোহে তাঁর অন্যান্য প্রাচীন ইতিহাস-বিষয়ক রচনা পড়তে আকৃষ্ট হলুম। ফলে ক্রমে ক্রমে পল্লী-তত্ত্বে বিমুখ হয়ে প্রত্ন-তত্ত্বের প্রেমে পড়ে আজও হাবুডুবু খাচ্ছি। এবং সেই বিদেশী ভাষা অবলম্বন করেই অধিকাংশ লেখা লিখি।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা বাবার কাছে পূর্বেই অনেকবার শুনেছিলুম। তিনি নাকি সহজেই রেগে যেতেন, কিন্তু তাঁর রাগ ছিল ক্ষণস্থায়ী। শোভাবাজার ডিবেটিং ক্লাবে একদিন তাঁকে সভাপতিত্ব করতে আহ্বান করা হয়। সেদিনকার তর্কযুদ্ধে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (এন এন ঘোষ)। ঘোষ সায়েব তখন সবে বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরেছেন। রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধ হওয়ায় তিনি চোস্ত ইংরেজিতে নিজের মত প্রকাশ করেন।

মীটিং শেষ হওয়ার পর রাজেন্দ্রলাল জিজ্ঞেস করলেন,—ঐ ফাজিল ছোকরাটি কে হে? জিজ্ঞাসার সুরে ক্রোধের আভাস পেয়ে এন এন ঘোষকে একজন চুপি চুপি বললেন,—আপনি যে-ভাবে ওঁর সঙ্গে কথা কয়েছেন, উনি তাতে চটেছেন; আপনি একটু ক্ষমা প্রার্থনা করে আসুন।

ঘোষ সায়েব তৎক্ষণাৎ মাফ চাইতে গেলেন। রাজেন্দ্রলাল শিবের মতন তুষ্ট হয়ে ঘোষ সায়েবের চমৎকার ইংরেজির তারিফ করেছিলেন এবং বোধ হয় বরও দিয়েছিলেন যে, উত্তরকালে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করবেন।

রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মুখেও উচ্চপ্রশংসা শোনবার সুযোগ পেয়েছিলুম। প্রমথ চৌধুরীর সবুজ-শিষ্য হিসেবে কবি-গুরুর কাছে আমার প্রথম পরিচয় হবার পরে জোড়াসাঁকোতে রবিবাবুর বৈঠকখানায় প্রায়ই যেতুম। লক্ষ্য করতুম, তিনি বহু বিষয়ে কথোপকথন সূত্রে কবি-ভাব ত্যাগ করে পণ্ডিতজনোচিত তর্কে যোগদান করতেন, অথচ মাঝে মাঝে বলতেন,

—আমি তো ইউনিভার্সিটির দোরগোড়া

মাড়াই নি, তোমরা জানো।

ব্যবহার ও উক্তির মধ্যে অসংগতি অনুভব করে একদিন তাঁকে আমার মানসিক দ্বন্দ্বের কথা জ্ঞাপন করলুম।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন,—ওহে, যে-জ্ঞানের কথা আমার মুখ দিয়ে বেরোয়, সে-জ্ঞান বই পড়ে পাওয়া নয়, শুনে শুনে শেখা। ভাগ্যক্রমে বহুদিন ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছিলুম এমন একজন পণ্ডিতের সংগে, যাঁর তুলনা নেই।

সে পণ্ডিত কে তা জানতে চাইলে রাজেন্দ্রলালের নাম করলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু তার আগে কিছুক্ষণ আমাকে রহস্য-কুজ্ঝটিকার মধ্যে থাকতে বাধ্য করেছিলেন।

সে যাই হক্, তখনকার মতন সুবল মিত্রের অভিধানের জন্যে যে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছিলুম, তার সমাপ্তির পূর্বেই পুজোর সময় একবার দার্জিলিং ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ি। দিন কয়েক বাদে কতকগুলো প্রুফ এল আমার কাছে দার্জিলিঙে। প্রুফ্‌গুলো বাবা পাঠিয়েছেন এবং পত্রে আদেশও দিয়েছেন, শীঘ্র সংশোধন করে ফেরত পাঠাতে। প্রুফ্ পড়ে দেখি, আমার লেখায় চলিত-ভাষার সম্পূর্ণ লোপ হয়ে গেছে। তার স্থানে বসেছে, সাধুভাষার গোটাকয়েক 'অতঃপর', 'সমভি-ব্যাহারে' এই ধরনের পণ্ডিতী শব্দ, যা ছিল আমার দুচক্ষের বিষ। পত্রে প্রকাশ, সমগ্র প্রবন্ধটি এক নবীন পণ্ডিতের লেখনীপ্রসূত, এবং সে-পণ্ডিত প্রকাশ দত্ত মহাশয়েরই প্রেরিত। ভাবলুম, আমার সাধনায় তিনি বাদ সেধেছেন।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে : To every cloud there is a silver lining; এবং দার্জিলিঙের মেঘেও একটা রুপোলী লাইনিং দেখা গেল। কাঞ্চন-জঙ্ঘার সোনালী রং রোজই চোখে পড়ত। কিন্তু "অতঃপর"-বহুল প্রুফ্ পাওয়ার পর আমার মনে যে কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল, তার মধ্যেও একটা ক্ষণপ্রভার আভাস পেলুম। প্রমথ চৌধুরীর ভাই ব্যারিস্টার অমিয় চৌধুরী দার্জিলিঙে তাঁর ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন আমাকে আর আমার পিসতুতো ভাই ব্যারিস্টার শচীন ঘোষকে[১]। মিঃ চৌধুরী তাঁর স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে আমায় সাবধান করে দিলেন যে, উনি ইংরেজিতেই কথাবার্তা কইবেন—সবেমাত্র বাংলা শিখতে শুরু করেছেন শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর কাছে। মহিলাটি কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠাতা W. C. Bonerji-র কন্যা।

বাবার কাছে শোনা, ডব্লিউ সি বনার্জি সাহেবিয়ানার এত উচ্চস্তরে উঠেছিলেন যে, বাঙালীর মতন তিনি তর্জনীর দ্বারা নির্দেশ করতেন না কোনো ব্যক্তিবিশেষকে, সাহেবের মতই অংগুষ্ঠ চালনার দ্বারা অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন। মনে পড়ে অমৃত-লাল বোসের কথা। তিনি একবার ছোকরা বয়েসে সুযোগ পেয়েছিলেন ডব্লিউ সি বনার্জির সংগে রেলগাড়িতে বসে গল্প করার। সেই উপলক্ষে অমৃতলাল বলেন, —আমায় যদি অভয় দেন, একটা প্রশ্ন করি।

বাঁড়ুয্যে-সাহেব তৎক্ষণাৎ অভয় দান করায় অমৃতলাল তাঁর প্রশ্ন জ্ঞাপন করলেন : —আচ্ছা, যদি কোনো গণনা করবার সময় নামতার দরকার হয়, যেমন 'পাঁচ পনেরং পঁচাত্তর', তখন আপনি মনে মনে কি বলেন? 'পাঁচ পনেরং পঁচাত্তর' না ইংরেজি ভাষায় ওর সমার্থক কোনো কথা?

ডব্লিউ সি বনার্জি অমৃতলালকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন,—বড় জবর প্রশ্ন করেছ হে। বাঙালীর ছেলে আমি, বাল্যকালে যে-নামতা মুখস্থ করেছি সেই নামতাই মুখস্থ আছে। মনে মনে 'পাঁচ পনেরং পঁচাত্তরই' বলি।

সেই ডব্লিউ সি বনার্জির মেয়ে যে প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রীর কাছে বাংলা শিখছেন, একথা শুনে আমার মনে একটা আশার সঞ্চার হল। ঐ আশা নিয়ে ১৯১৬ সালের নবেম্বর মাসে আমি কলকাতায় ফিরে আসি।

প্রসংগত উদ্ধৃতির উপযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর চিঠি চারটি এই :—

৪

1. Bright street
Ballygunge
৬।৯।১৬

কল্যাণীয়েষু,

আমি এইমাত্র আবিষ্কার করলুম যে, বঙ্কিমের নভেল 'রামগতি ন্যায়রত্ন ভাষা হিসেবে হুতুম পেঁচার কোঠায় ফেলে দিয়েছিলেন। যদি বল ত আমি ঐ কথাটি তোমার প্রবন্ধের মধ্যে ঢুকিয়ে দেই।

আসছে রবিবারে বিকেলে এখানে এলে দেখতে পাবে যে, আমার edit করা তোমার প্রবন্ধ কি আকার ধারণ করেছে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৫

১নং ব্রাইট স্ট্রীট
বালীগঞ্জ
১৫।৯।১৬

কল্যাণীয়েষু,

কাল বিকেলে তুমি যদি আমার ওখানে একবার আসতে পারো ত ভাল হয়। তোমার লেখার proofটা কাল পাবো—তুমি এলে আর একবার চোখ বুলিয়ে দেখতে পারো কিছু বদল সদল আবশ্যক কিনা। যদি এসো ত ল' কলেজে বেলা পৌনে চারটের মধ্যে উপস্থিত হলে আমার সংগেই আসতে পারো। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৬

1. Bright street
Ballygunge
১লা অক্টোবর, ১৯১৬

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি কাল পেয়েছি। আমি বিজয়া পর্যন্ত এখানে আছি, সম্ভবত তার পরেও থাকতে পারি। সুতরাং এক কাল ছাড়া যেদিন খুশি বিকেলে এলে আমার দেখা পাবে। আমি ছটা সাড়ে ছটার আগে বাড়ি থেকে বেরুইনে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৭

1. Bright street
Ballygunge
১১।১০।১৬
বুধবার

কল্যাণীয়েষু,

তুমি আজও কলকেতায় আছ কিনা জানিনে। যদি থাকো ত কাল বিকেলে আমার এখানে এলে খুশি হব। ধূর্জটিকেও আসতে লিখে দিলুম। ইচ্ছে আছে একটু 'গান-বাজনা' করা যাবে। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

(ক্রমশ)

১ ইনি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকায় পরলোকগমন করেন।

(২৩)

ঘটনাগুলি ঘটল প্রায় পর পর। মাঝখানে মাত্র একটি কি দু'টি দিনের ফাঁক দিয়ে। সব দিনগুলি সৌরর মনে থাকার কথা নয়। তবু অনেক ছাইয়ের আড়ালে কয়েকটা ফুলকির মত তারা সৌরর মনের কোণে লুকিয়ে ছিল। পরে, অনেক কাল পরে সৌর যখন এই দিনের শিকলে হাত ছুঁইয়েছে তখন তারা একসঙ্গে বেজে উঠেছে। সৌর অবাক হয়েছে। স্মৃতির বিচিত্র লীলার কথা ভেবে সৌর অবাক না হয়ে পারেনি। ছোট বড়র কথা নয়, যে ঘটনা, যে দৃশ্য মনের গায়ে আঁচড় কাটে তা আবার একদিন মনে পড়বেই এ তত্ত্ব সৌরর জানা, কিন্তু ঘটনা হিসাবে এরা কী? এদের মর্যাদা কতটুকু? নয়ন, পাখি নেহাতই একই বাড়ির আরেক পিঠের বাসিন্দা বলে সৌরর সঙ্গে ওদের দেখা হয়েছিল। এই দেখাশোনার ব্যাপারে সৌরর কৌতূহল যেটুকু বা ছিল বিস্ময় যে মোটেই ছিল না সৌর সেটা জানত। কি দেখে অবাক হবে সৌর? রূপ? কিন্তু নয়ন পাখির আগে সৌর লতা বৌদিকে দেখেছে। শুধু দূর থেকে দেখা নয়, কাছে গিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা। লতা বৌদিকে আগে দেখা ছিল বলেই হয়ত ওদের মধ্যে রূপের কঙ্কালকে দেখতে পেয়ে সৌরর প্রথম দিন অতটা খারাপ লেগেছিল। কিন্তু আশ্চর্য অরূপা নয়ন পাখির কথা সৌরর মনে থেকে গেছে। পরে যখন ওদের কথা সৌর ভেবেছে তখন একটা দৃশ্য প্রায়ই ওর মনে পড়ত। যেন দুপুরের রৌদ্রজ্বলা কলকাতারই কোন একটা বড় রাস্তা। লোকজন নেই। শুধু রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওরা জটলা করছে। ওরা তিনজন, নয়ন, পাখি আর নিশিকান্ত। সেই নাটুকে নিশিকান্ত। লম্বা ফরসা চেহারা। মাথায় পাতলা কটাশে চুল। গায়ে নকশা সিল্কের ঢোলা পাঞ্জাবী। সৌর অনেক ভেবেও এ দৃশ্যের মানে করতে পারেনি। দুপুরের চড়া রোদের কথা কেন মনে হত? রোদের সঙ্গে নিশিকান্তর চকচকে জামার কি কোন মিল ছিল? নাকি ওরা তিনজনই এক অর্থে রোদে পোড়া মানুষ বলেই দৃশ্যটা মনে পড়ত সৌরর? সৌর আর বেশি ভাবতে পারেনি। কিন্তু স্মৃতি সম্বন্ধে সৌর মনে মনে এক নতুন তত্ত্ব খাড়া করেছে। অনুরাগের কি বিরাগের কোন ঘটনাই মন থেকে একেবারে মুছে যায় না। মনের তলায় তারা লুকিয়ে থাকে। অনুরূপ কোন ঘটনার ছোঁয়া পেয়ে তারা জেগে উঠতে পারে তো ভাল। না পারলেও মরে যায় না। যে বিস্মৃতিকে আমরা মৃত্যু বলে মনে করি, আসলে তা রূপান্তর ছাড়া কিছু নয়। স্মৃতির সেই ধ্বংসাবশেষ আমাদের চরিত্রে আমাদের মানসিকতায় সঞ্চারিত হয়ে থাকে।

মাঝে একটা দিন শুধু বাদ গেল। পরের দিন দুপুর বেলা সৌর সোজা গিয়ে নয়নদের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ল। অথচ এটা ওর কলেজে যাওয়ার সময়। দরজা খুলে দিয়ে নয়ন বলল, 'এস ভাই, কি কপাল আমাদের, ভাই যেচে এসেছে দিদিদের খোঁজ নিতে।'

সৌর জানে নয়ন ঠাট্টা করছে না। তবু ঢংটা সৌরর ভাল লাগল না। নিচু হয়ে জুতো খুলে সৌর পাশের তক্তপোশের ওপর উঠে বসল, বলল, 'পাখি কোথায়? তাকে দেখছি না।'

'আসবে এক্ষুণি, পাখি ওদিকের ঘরে থাকে।' নয়ন আঙুল দিয়ে পাখির ঘর দেখিয়ে দিল। তারপর একটু হেসে বলল, 'তুমি বুঝি ভেবেছিলে ছাদে একসঙ্গে কড়ি খেলি বলে আমরা থাকিও এক ঘরে। তাই থাকা যায় নাকি?'

'যায় না কেন?' কথাটা বলতে গিয়েও সৌর ফিরিয়ে নিল। এক ঘরে দুজনে থাকবে কি করে? ওদের প্রত্যেকের এক একখানা আলাদা ঘর দরকার। অন্তত রাত্রে দরকার। নয়নের ঘরের দিকে সৌর তাকিয়ে দেখল। আসবাব সামান্যই। তক্তপোশ ছাড়া বসবার মত আর আছে একটা চেয়ার। পুরনো, তেলচিটে চেয়ার। সৌরর সেটাতে বসার সাহস হয়নি। এক কোণে কলাই-করা ডিস ঢাকা দেওয়া এলুমিনিয়মের ডেকচি। ভাতের হাঁড়ি, তার পাশে কিছু রান্নার সরঞ্জাম। খাওয়া শোয়া বোধ হয় একই ঘরে। দেয়ালে দু'খানা ক্যালেণ্ডার। একটার তারিখের পাতাগুলি উড়ে গেছে। আদর শুধু ছবিটার। ক্যালেণ্ডারের মাথায় কাঠের গুলিওয়ালা আলনায় দু'খানা রঙিন শাড়ি, একটা ব্লাউজ। আর সম্পত্তির মধ্যে এই আকাঠার তক্তপোশ। তক্তপোশের কথা রাত্রির কথা সৌরর মনে পড়ল। কেমন যেন অস্বস্তি লাগল সৌরর। কিন্তু এখন অস্বস্তি লাগলে কি হবে? তুমি কি অন্য কিছু দেখবে বলে ভেবেছিলে? সব জেনে শুনে, অনুমানে সব জানতে পেরেই কি কলেজ ফাঁকি দিয়ে তুমি এখানে আসনি? সৌর বুঝতে পারল এ গলা ওর বিবেকের। বিবেকের শাসনকে সৌর এখন আর ভয় করে

না। হ্যাঁ, সৌর নিজে থেকেই আজ এসেছে। কোন লোভে পড়ে নয়, কোন প্রত্যাশা নিয়ে নয়। সৌর এমনি এসেছে, এসেছে আরেকটি জীবনকে জানবে বলে। এমন করে না এলে একই বাড়ির বাসিন্দা হয়েও যে-জীবন সৌর কোনদিনই দেখতে পেত না সৌর সেই জীবনকে দেখতে এসেছে।

একটু পরেই পাখিও এসে জুটল। নয়নই বোধ হয় ওকে ডেকে আনল। দুজনেই আজ একটু সকাল সকাল চুল বেঁধেছে, গা ধুয়েছে, শাড়িরও সেই ঢিলে ঢালা ভাবটা এখন ওদের নেই! ওরা যেন তৈরী। কিন্তু কার জন্যে তৈরী?

সৌর বলল, 'আজ তোমরা কড়ি খেলতে গেলে না?'

নয়ন আর পাখি চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। নয়নই জবাব দিল। 'খেলবে একদিন আমাদের সঙ্গে?'

সৌর বলল, 'না না, আমি কড়ি খেলব কি? তোমরা খেললে না তাই জিজ্ঞেস করছিলাম।'

'আহা খেললেই বা দোষ কি? ভাই বোনে বুঝি কড়ি খেলে না?'

'খেলবে না কেন, খেলে।'

'তুমিও একদিন আমাদের সঙ্গে খেলবে।' সৌর এবার একটু হাসল।

'আমি কি খেলতে জানি যে খেলব?'

পাখি ঠোঁট টিপে বলল, 'কড়ি খেলার আবার জানাজানি কি? কড়ি খেলতে কি মন্তর লাগে? লাগে তো সে মন্তর তোমাকে আমরা শিখিয়ে দেব।'

সৌর বলল, 'আচ্ছা সে দেখা যাবে। কিন্তু হঠাৎ আজ খেলা বন্ধ কেন?'

পাখি বলল, 'আজ যে তুমি এসেছ।'

নয়ন ধমক দিয়ে বলল, 'থাম, তোকে আর পাকামো করতে হবে না। আজ ভাই আমাদের খেলা হবে না। খেলব কি করে, একটু বাদেই তো নিশিবাবু এসে উঠবেন। আজ না শনিবার?'

সৌর তাড়াতাড়ি বলল, 'আমি তাহলে আজ যাই। আরেকদিন বরং আসব।'

নয়ন অবাক হয়ে বলল, 'ওমা নিশিবাবু আসবে তো তোমাকে যেতে হবে কেন? সে তো এখন আসবে সেই থিয়েটারের বই শোনাতে। তোমাকে উঠতে হবে না, বস। একটু চা আনাই। চা খাও।'

আরেকটু হলেই নয়ন বাড়িউলীকে ডাকতে ছুটত। কিন্তু সৌর হাত তুলে তাকে থামাল।

'না না, চা আনাতে হবে না। চা আমি খেয়ে এসেছি।'

পাখি ফোড়ন কাটল, 'খেয়ে এসেছি।' তারপর নয়নের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুইও যেমন! আমাদের ঘরে এসে বসেছে বলেই যেন আমাদের হাতে চা-ও খাবে।'

সৌর কেমন করে ওদের বোঝাবে দোষটা ওদের হাতের নয়? ওদের হাতের ছোঁয়া চা খেলে সৌরর জাত যাবে না। কিন্তু নোংরা গ্লাসে করে কোথা থেকে কি চা নিয়ে আসবে কে জানে? সে চা সৌর ঠোঁটে ছোঁয়াতে পারবে না। মরে গেলেও না।

সৌর বলল, 'সত্যি আমি একটু আগে চা খেয়েছি।'

এবার বোধ হয় সৌরকে ওরা অবিশ্বাস করল না।

উঠে যাওয়ার ইচ্ছাটা সৌরকে আবার যেন ঠেলতে শুরু করল। কি হবে বসে বসে। নিশিকান্ত এলে বসে বসে তার নাটক শুনতে হবে। সে নাটকের নমুনা সৌর ছাদে দাঁড়িয়েই দুদিন শুনতে পেয়েছে। সব জেনে সব বুঝেও সেই অদেখা নিশি-কান্তকে না দেখে সৌর উঠতে পারল না, সৌর থেকে গেল।

নিশিকান্ত এল একটু বাদে। ঢ্যাঙা লম্বা চেহারা। গায়ে ঢোলা হাতা সিল্কের পাঞ্জাবী। গলার দিকের দুটো বোতাম খোলা। রোলগোল্ডের বোতামের অবলম্বন যে কালো ফিতেটা সেটা গলার পাশে মুখ বার করে রয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে জালি গেঞ্জির ওপরটা চোখে পড়ে। গেঞ্জির আড়ালে ঠেলে ওঠা কণ্ঠার হাড়ের আভাস। সৌরকে দেখে নিশিকান্ত ভুরু কোঁচকাল। নয়নের দিকে তাকিয়ে ইশারায় জানতে চাইল, কে?

নয়ন হেসে বলল, 'ও নিশিবাবু, অমন করে ওর দিকে তাকাচ্ছ কেন। ও যে আমাদের পাতান ভাই। এই বাড়িরই ওপাশটাতে থাকে।'

'ভাই, তাই বল, আমি ভাবলাম কে না কে।'

'ভয় ধরেছিল বুঝি।'

'তা ভয় একটু হয়ই তো।'

নিশিকান্ত নিশ্চিন্ত হয়ে চেয়ারটায় বসল। সৌর লক্ষ্য করল, নিশিকান্তর হাতে মোটা একটা বাঁধান খাতা। বোধ হয় সেই নাটকটা। নিশিকান্ত গায়ের ভর গায়ে রেখে সেই নড়বড়ে চেয়ারটাতে বসল। ভয় পেল না। অথচ সৌরর ভয় করছিল। ভাবছিল ওটায় বসতে গিয়ে ভেঙে চুরে না পড়ে যায়।

খাতাটা কোলের ওপর রেখে নিশিকান্ত সৌরর সঙ্গে আলাপ শুরু করল।

'কি নাম?'

সৌর নাম বলল।

'কি করা হয়?'

'কলেজে পড়ি।'

কলেজের কথায় একটু বোধ হয় ভক্তি

হল নিশিকান্তর। মুখের-মায়মুখো ভাবটা যেন কাটল এতক্ষণে।

সৌর সাহস পেয়ে বলল, 'আপনি কি করেন?'

'আমি? আমি চাকরি করি। মার্চেন্ট অফিসের চাকরি। তা শালা নামেই চাকরি। না হলে দেখ, আজ শনিবার। একটায় ছুটি হয়েছে। উঠতে উঠতে দুটো বেজে গেল। মাস গেলে দিবি তো সেই গোনা আশিটি টাকা। একটা ফুটো পয়সা বেশি নয়। কিন্তু খাটাবার বেলা? হাড় কালি করে ছাড়বে। চাকরি-বাকরি করে কিছু হয় না বুঝলে? হ্যাঁ ভাল কথা, তোমাকে কিন্তু ভাই তুমিই বলব। আপনি টাপনি আমার আসে না। আর বলবই বা না কেন। বয়সে তো তুমি ঢের ছোট। নয়নের যখন ভাই তখন তুমি আমারও ভাই। না কি বলিস নয়ন?

নয়ন সায় দিল।

নিশিকান্ত ফের শুরু করল, হ্যাঁ, চাকরির কথা বলছিলাম। চাকরি করে কিস্সু হবে না। তাইতো একটা নতুন লাইনের চেষ্টা করছি। বরাতে যদি থাকে! লেখার বাতিক আমার গোড়া থেকে একটু ছিল। কাগজে কিছু কিছু ছাপাও হয়েছে। তারপর ভাবলাম ও খুচরো লেখার কাজ নয়। পারত গোটা বই লিখে ফেল একটা। লিখেছি। নিজের মুখে নিজের গীত গাইব না। কিন্তু ভাই বইটা সত্যি ওদের পছন্দ হয়েছে। ডায়নার মালিক আমাকে বলেছে, এ বইয়ের মার নেই, এ বই আমি করব। কিরে নয়ন, তোকে বলিনি সে-কথা?

'বলেছ। কিন্তু আমার পার্টের কি হল?'

নিশিকান্ত অভয় দিয়ে বলল, 'পাবি পাবি। বই যখন ধরাতে পেরেছি, তখন তোরা পার্ট পাবি না, পাবে কে? তবে হ্যাঁ, শেষের দিকে একটু বদলাতে হয়েছে। ডায়নার মালিকের আবদার শেষটা আরেকটু চড়া করে দাও। দিলাম বদলে। আরে সবই পারি; মরতেও জানি, গরতেও জানি। শেষটা শোন দেখি একবার নয়ন। তুমিও শুনো ভাই। কানে কোথাও খচ্ করে লাগলেই আমাকে বলবে।'

নিশিকান্ত স্বরচিত নাটক পড়তে লাগল। সৌরর মনে পড়ল এই নাটকেরই গোড়ার অংশ সেদিন ছাদ থেকে শুনতে পেয়েছিল। আজ শেষটা শুনছে। গলায় দরদ আছে নিশিকান্তর। শুধু পড়া তো নয়, সেই সঙ্গে হাতের মুদ্রা, মুখের ভাব, নিশিকান্ত যেন স্টেজে দাঁড়িয়ে নিয়েছে। নয়ন আর পাখি মন দিয়ে ওর পড়া শুনল। আর সৌর বসে বসে তিনটি মুখের ভাব ভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগল।

পড়া শেষ হলে মনে হল, নিশিকান্তর রোগা শরীরও যেন ঘেমে উঠেছে। পকেট থেকে রুমাল বার করে নিশিকান্ত মুখ, ঘাড় মুছে ফেলল, তারপর সৌরর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন লাগল?'

সৌর বলল, 'খুব ভাল।'

আসলে সৌরর ভাল লাগেনি। মন দিয়ে সবটা সৌর শোনেইনি। তবু কর্তব্য বলতে হল, ভাল লেগেছে। পুরনো সামাজিক প্রেমের নাটক। হাস্যকর কিছু কিছু বড় বড় কথা ছাড়া আর কি আছে ওর মধ্যে? আর কি থাকা সম্ভব? তবু এই মুহূর্তে বিরূপ সমালোচনা করে নিশিকান্তকে নিভিয়ে দিতে সৌরর মন সরল না। ওর নাটক ভাল না হতে পারে, কিন্তু ওর এই ঘাম মিথ্যা নয়, উত্তেজনা অনুভূতি মিথ্যা নয়।

নিশিকান্ত খুশি হয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার করে সৌরর হাতে দিল। বলল, 'খাও, লজ্জা কি? আমার সামনে আর লজ্জা করতে হবে না।'

নিশিকান্তর মেজাজ এসে গেছে। শুধু সিগারেট নয়, এর পরে নিশিকান্ত হয়তো আরও কিছু সৌরকে খেতে বলবে। কিন্তু তার আগেই সৌর ওখান থেকে চলে যেতে চায়।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সৌর বলল, 'চলি।'

নিশিকান্ত বলল, 'যাবে? আচ্ছা এসো। মঙ্গলবার এসো কিন্তু আবার। আরে এখানে এলে কিছু লোকসান নেই। চেহারা চেহারা ভাল আছে। পার্ট ফার্ট একটা লেগেও যেতে পারে। বলত ডায়নার মালিকের কাছে যেতে পারি।'

সৌর একটু হাসল। তারপর যাওয়ার আগে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল। হঠাৎ জানলার ফাঁকে একজোড়া চোখের সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। ঘরের মধ্যে বন্ধ থেকে এই মেয়েটিই তো সেদিন কাঁদছিল। নয়ন, পাখি ছাড়াও আরেক পাখিকে আজ দেখে গেল সৌর। পিঞ্জরের পাখি। (ক্রমশ)

পণের ভারে পুষিয়ে দেওয়া গেল ত আলাদা, তা না হলে, প্রচোর নানা দেশের মতো সিসিলিতেও কনের নামে অপবাদ রটলে আর রক্ষে নেই। একুশ বছরের ভিন্সেঞ্জিনা দা'উরশোর বিয়ে ঠিক হয় কিন্তু পণের পরিমাণ পাত্রপক্ষের মনোঃপুত হল না। দু-পক্ষের মধ্যে কথাকাটাকাটি হল এবং একুশ বছরের ট্রাক-ড্রাইভার এঞ্জো দা'অগস্তিনোর সঙ্গে ভিন্সেঞ্জিনার বিয়ে ভেঙে গেল।

বিয়ে ভাঙলেও ওরা দুজনে পরস্পরকে ভালবাসতো এবং অভিভাবকদের বিরোধ অগ্রাহ্য করে ওরা গৃহত্যাগী হয়। এর পরই ওঠে ভিন্সেঞ্জিনার সতীত্ব নিয়ে কথা। ভিন্সেঞ্জিনা চোখের জলে জানায় যে ছ'বছর আগে, ওর বয়েস যখন পনের, তখন আর্নেস্টো নামে একটি ছেলের ও প্রেমে পড়েছিল—আর্নেস্টো, "এত সুন্দর দেখতে যে মেয়েরা ওকে যেন চোখ দিয়ে গিলতো।" কিন্তু এখন সব শেষ, আর্নেস্টোর বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ভিন্সেঞ্জিনার সঙ্গে তখনও বিয়ে না হলেও ওর স্বীকারোক্তিতে ক্ষিপ্ত হয়ে এঞ্জো ওকে নিয়ে ওর বাড়িতে হাজির করে দিলে। ভিন্সেঞ্জিনার বাবা বংশের মান মর্যাদা খুইয়ে দেবার অপরাধে ভিন্সেঞ্জিনাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়ে দরজায় কাল কাপড় জড়িয়ে দিলেন যাতে লোকে বোঝে মেয়ে তাদের মরেছে।

সেই মুহূর্তেই ভিন্সেঞ্জিনা ঠিক করে নিলে তার পথ। দোকান থেকে কশাইয়ের মাংস-কাটা একখানা ছুরি কিনে কাগজে মুড়ে ভিন্সেঞ্জিনা রাস্তা ধরে চলতে আরম্ভ করলে। ওর প্রথম প্রণয়ী আর্নেস্টোকে দেখতে পেলে একটা বাস স্টপে। ভিন্সেঞ্জিনাকে দেখেই আর্নেস্টো বললে "আগের চেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে", কিন্তু কথা আর ওর শেষ হল না। ভিন্সেঞ্জিনা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বুকে আমূল পেটে ছুরি বসিয়ে দিলে।

আদালতে ভিন্সেঞ্জিনা বিচারপতিকে বলে, "ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছি আমার সম্মান ফিরে পেতে। এছাড়া আর উপায় ছিল না।" সৌভাগ্যবশত আর্নেস্টোর আঘাত খুব গুরুতর হয়নি এবং ও ভাল হয়ে উঠল। "নারীর নিজের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব তার নিজের", এই মন্তব্য করে বিচারপতি ভিন্সেঞ্জিনাকে তিন বছর হাজতবাসের লঘু সাজা দেন।

এমন স্পষ্টভাবে সম্মান উদ্ধার করায় এঞ্জোর মন টললো। কাটানিয়া জেলের গির্জায় ভিন্সেঞ্জিনাকে ও বিয়ে করলে। এখন এঞ্জো ভিন্সেঞ্জিনার মুক্তির আশায় দিন গুণছে। ওকে খুব বেশী দিনও অপেক্ষা করতে হবে না বোধহয়। কারণ ভিন্সেঞ্জিনার সম্মান উদ্ধারের কাহিনীটি সারা ইতালিকে এমন নাড়া দিয়েছে যে প্রেসিডেন্ট গিওভান্নি গ্রোঞ্চি সম্ভবত ভিন্সেঞ্জিনার সাজা মকুব করে দেবেন।

●

খাজুরাহের মূল্যবান প্রাচীন শিল্প নিদর্শন অসৎভাবে পাচার হয়ে যাবার একটা খবর ক'দিন আগে বেরিয়েছিল। বিদেশী পরিব্রাজকরাই এব্যাপারে বেশী প্ররোচনা দেয়। শুধু এদেশেই নয় পৃথিবীর সর্বত্রই একই ব্যাপার।

বছর দুই আগে মেক্সিকো উপসাগরের একটা দ্বীপে চল্লিশজনের একটি দল উপস্থিত হয় মাটি খুঁড়ে সপ্তম শতাব্দীর মায়া সভ্যতার নিদর্শন বের করার জন্য। সরকারি অনুমতিপত্র দেখিয়ে তারা কাজ আরম্ভ করলে। পঁয়তাল্লিশ দিন ধরে মাটি খুঁড়ে দলটি হাজার হাজার চমৎকারভাবে তৈরী মায়াদের দেবদেবীর মূর্তি উদ্ধার করলে। তারপর সেই অমূল্য সম্পদগুলি স্টীমারে ভর্তি করে ওরা নিয়ে চলে গেল। ক'দিন পর জানতে পারা গেল যে সেই দ্বীপের তদারকে নিযুক্ত কর্মচারিরা ভীষণ প্রবঞ্চিত হয়েছে। যারা এসেছিল তারা কেউই 'নৃতত্ত্ববিদ' নয় আর অনুমতিপত্র যা দেখিয়েছিল সেও জাল।

প্রাচীন শিল্প সামগ্রীর ব্যবসা এত লাভজনক হয়ে দাঁড়ায় যে মেক্সিকানরা দলে দলে লোক নিযুক্ত করে মাটি খুঁড়ে বের করতে থাকে। অবস্থা দেখে এবং প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে মেক্সিকোর কর্তৃপক্ষ প্রাচীন মূল্যবান শিল্পসামগ্রীর রপ্তানি নিষিদ্ধ করে দেন। তাতে ফল হল, চোরাই কারবারের মাত্রা আরও বেড়েই গেল।

গত দশ বছরে শিল্প সামগ্রী পাচার করে দেওয়ার হিড়িক এমন বৃদ্ধি লাভ করে যে কর্তৃপক্ষ মেক্সিকোর সম্পদ মেক্সিকোতে রাখার আশাই ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সরকারি কর্মচারিরাই অনেকে এই কারবার নিয়ে মেতে ওঠে। তাছাড়া এই সূত্রে দু-পয়সা চোরাই কারবারিদের কাছ থেকে করেই বা নেবে না কেন! এদের জন্যে জিনিস পাচার করা খুব সহজ হয়ে দাঁড়ায়। বিলি পিয়ার্সন নামে এক শিল্পসামগ্রী সংগ্রাহক একটা স্টেশনওয়াগন ভর্তি নানা শিল্পসামগ্রী নিয়ে যাবার সময় নির্বিঘ্নে পার হয়ে যেতে টাকা ছড়াবার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু শুল্ক বিভাগের কর্মচারিরা জানায় যে তারা খাদ্যবস্তু পেলেই খুসী। পিয়ার্সন তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, "এক কেস লংকা দিয়েই সীমান্ত পার হয়ে আসতে পারলুম।"

অনেকে বিমানও নিয়োগ করে। সিন্দেলরাও বেশ সুযোগ করে নিলে। গভর্নমেণ্টকে উইল করে দেওয়া সামগ্রীও ওরা সরিয়ে ফেলতে আরম্ভ করলে। বিখ্যাত শিল্পী দিয়েগো রিভেরা তার যাবতীয় সংগ্রহ গভর্নমেণ্টের নামে উইল করে দেন, কিন্তু গভর্নমেণ্টের হাতে সেগুলি পৌঁছবার আগেই চুরি হয়ে যায়। প্রাক-কোলম্বির শিল্পের এত চাহিদা দেখে স্থানীয় রেড ইণ্ডিয়ানরা মৌলিকের অনুকরণ করে নানা রকমের সামগ্রী ভ্রমণকারি দলদের কাছে বিক্রী করছে। কতকগুলি এত নিখুঁত হয় যে অনেক সময় শিল্পবিশেষজ্ঞেরাও মায়া শিল্পের নকল বলে ধরতে পারে না।

■

যুক্তরাজ্য বার্লিংটন শহরের কৃষি সম্পর্কিত এক পত্রিকা একটি জবাই করা ষাঁড়ের পাকস্থলী থেকে প্রাপ্ত সামগ্রীর যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে আছেঃ সেফটিপিন, কার্তুজের খোল, দুটো রবারের জুতোর গোড়ালি, চাবির চেন একটি, একসেট সোনার দাঁতের ফ্রেম, নটা পেনি, ষোলটি পেরেক, দুটো প্লাস্টিক ব্যাগ, একটা খেলার হাতঘড়ি, একটা সোনার ঘড়িবন্ধনী, ছটা কৌটোর ঢাকনা, দুটো ইঞ্জেকসনের ছুঁচ, দুটো কানের দুল, একটা ভাঙা বোতল, চব্বিশটা বোতলের ছিপি, একটা রবারের পুতুল।

★

অণ্টারিওর ব্যারি শহরে বেআইনীভাবে রাস্তায় ট্যাক্সী দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে ধরা পড়ায় পুলিস জানতে পারে যে, ড্রাইভার রস গ্রাণ্টের গাড়ি চালাবার লাইসেন্স নেই, ট্যাক্সীর জন্য রোড-লাইসেন্স নেই, এবং লোকটি কানাডার অন্ধদের সাহায্যের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পেনসন পাচ্ছে।

স্মৃতিচারণ

দিলীপকুমার রায়

তিন

সুভাষ একটু "চাপা" প্রকৃতির মানুষ ছিল বরাবরই—ইংরাজীতে যাকে বলে রিজার্ভড্। কিন্তু মনের মানুষ পেলে সে উজিয়ে উঠত সহজেই। পরে রাজনৈতিক জনতা-কল্লোলে সদাসর্বদা ভেসে চলতে বাধ্য হওয়ার দরুণ ওর স্বভাবের একটু পরিবর্তন হয়েছিল বটে কিন্তু সে বাহ্য। ও অন্তরে চিরদিনই ছিল নিঃসংগ বৈরাগীই —যাকে টানত ভারতের অন্তর্মুখী সাধকদের ভাবধারা। এইখানেই ওর জীবনে এসেছিল খানিকটা অন্তর্দ্বন্দ্ব। কারণ ওর সমৃদ্ধ ব্যক্তিরূপের নানা দিক ছিল। একটা দিক ছিল জ্ঞানার্থী, একটা দিক চাইত অশ্রান্ত কর্ম, কীর্তিপ্রতিষ্ঠ হতে, আর একটা দিক হতে চাইত ধ্যানী সাধক। ও আমাকে বলত যে, ঘুমের আগে প্রায়ই ও দুই ভ্রূর মধ্যে দেখে জ্যোতি। বিবেকানন্দেরও এমনি জ্যোতিদর্শন হত। একটি পত্রে ও আমাকে লিখেছিল যে, ওকে টানত কখনো কালী কখনো কৃষ্ণ কখনো শিব। এও সমৃদ্ধ ব্যক্তিরূপের একটি চিহ্ন, যে-কথা একবার শ্রীঅরবিন্দ বিশদ করেই আমাকে লিখেছিলেন। আমার 'অনামী'র দ্বিতীয় সংস্করণে সুভাষের পুরো পত্রটি ও শ্রীঅরবিন্দের মন্তব্য প্রকাশ করেছি। এ থেকে দেখতে পাওয়া যাবে ওর মধ্যে নানা প্রবণতাই সক্রিয় ছিল, যেমন উচ্চবিকশিত চেতনার মধ্যে হয়ে থাকে প্রায়ই। এককথায় ইংরাজীতে যাকে বলে "ওয়ান্-ট্র্যাক্ মাইন্ড" —সুভাষের মনকে সে-লেভেল দেওয়া চলে না। তাই ওকে বাইরে কর্মবীর বলে যদি অন্তরে ধ্যানী উপাধি দিই তাহলে তাতে করে কোনো স্বতঃবিরোধী উক্তির অভিযোগে পড়তে হবে না।

এই আদর্শ বিরোধের ফলে মানুষ অনেক সময়েই আরো বিচিত্র হয়ে ফুটে ওঠে। সুভাষের মধ্যে দুটি মূল আদর্শের স্রোত বইত নিরন্তরই—এক ভারতের ধর্মজীবন, যার টানে ও একবার সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যায়। আর এক হল ওর দেশাত্মবোধ—যার নিষেধে ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে কিছুতেই পুরোপুরি বরণ করতে পারেনি। অথচ এজন্যে ওর মনের অতলে একটা চাপা বেদনা ছিল বরাবরই। একটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিই। যখন কংগ্রেস থেকে নেতারা অন্যায় করে ওকে নির্বাসিত করলেন তখন আমি কলকাতায়। ওর কাছে ছুটে গিয়ে বলি, "সুভাষ, এবার চলো আমার সঙ্গে পন্ডিচেরি—মাস কয়েকের জন্যে। আমার ফ্ল্যাটেই থাকবে। একটু জুড়োবে—শান্তি পাবে। দেখলে তো রাজনীতি কী ব্যাপার?"

সুভাষ একটু চুপ করে থেকে বলল, "দিলীপ, আমার সঙ্গে যেতাম এখনি—জুড়োতে। কিন্তু পারব না। ও হয় না।"

আমিঃ কেন সুভাষ?

সুভাষ (ম্লান হেসে)ঃ কারণ একবার যদি যাই তোমাদের আশ্রমে তাহলে আর ফিরতে পারব না। আমার কাজ এখনো অনেক বাকি আছে।

এই একটি প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে দিশা পাওয়া যায়, কী গভীরভাবে ওকে টানত ধ্যানের জগৎ যাকে ও সরিয়ে রাখত দেশের দুর্গতির কথা ভেবেই। এ-দেশপ্রেমকে প্রণাম না করবে কে—যার জন্যে ও দেশের কাজে সর্বস্ব নিয়োগ করে অকৃতজ্ঞ ঈর্ষান্বিতদের চক্রান্তে নাস্তানাবুদ হওয়া সত্ত্বেও এমন কি শান্তির ক্ষুধাকে বর্জন করতেও পেছপা হয়নি?

কিন্তু তা বলে বলব না যে ওর একান্ত দেশপ্রেম দিয়েও ওর মহত্ত্বের পরিমাপ হতে পারে। "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"—একথা সুভাষের ব্যক্তিরূপের সম্বন্ধেও অক্ষরে অক্ষরে খাটে। দেশসেবায় ও কখনো সফল হয়েছে কখনো বিফল, যে-ব্রত ও উদ্‌যাপন করতে চেয়েছিল তার সবটা হয়ত সাধিত হয় নি। না-ই হল। মানুষের বাহ্য কীর্তি দিয়ে তার চরম বিচার নয়—সে অন্তরে কী হয়ে উঠল তাই দিয়েই তাকে মাপতে হবে—যেকথা শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন একটি পত্রে: "The ultimate value of a man is not to be measured by what he says, not even by what he does but by what he becomes."

সুভাষের অন্তরপুরুষ হয়ে উঠেছিল মহিমান্বিত, শিখাময় এই-ই হল ওর মহত্ত্বের চরম তর্পণ। এ শুধু আমার মুখের কথা নয়। যখন ও বিলেতে আর পাঁচজনার মতন একটি পরীক্ষার্থী ছাত্ররূপে লোকচক্ষুর অন্তরালে দিনের পর দিন পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছিল—তখনও ওর কাছে যে আসত, ওর চৈত্যপুরুষের মহত্ত্বের আঁচ পেত। আমি ও ক্ষিতীশপ্রসাদ তো ওর প্রবল প্রভাবের পরিধির মধ্যে আসার দরুনই আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার সংকল্প ত্যাগ করি। লণ্ডনে কত যুবকই যে ওকে দেখতে না দেখতে বরণ করেছিল নেতারূপে সে কী বলব? ওর দেহান্তের পরে দেশ ওকে ভক্তিভরে যে "নেতাজী" উপাধি দিয়েছিল সে উপাধিমুকুট এ-যুগে আর কার মাথায় বসানো যায় ভেবে পাই না। কলকাতায় ফেরার পরেও কত দেশধ্বজই যে ওর

আলোকিত প্রতিভার কাছে আসতে না আসতে মিইয়ে পড়েছিলেন না জানে কে! তবে অগ্নিশিখার ধর্মই এই যে, সে আশপাশের হাজারো স্ফুলিংগকেই নিষ্প্রভ করে দেয় এক মুহূর্তে। এমন কি তীক্ষ্ণবুদ্ধির দাম্ভিকতাও ওর চরিত্রের মধ্যে এক অগ্নিগর্ভ বাহ্যির স্পর্শে স্তম্ভিত হত। কেম্ব্রিজে একটি পাঞ্জাবী র‍্যাংলার ছিল দারুণ অশ্লীল-ভাষী। একদিন আমার কাছে এসে সে চুপি চুপি বলে: "আমি সব পারি দিলীপ, কিন্তু সুভাষকে দেখলেই কেমন যেন মুখ-চোরা হয়ে পড়ি!" দৃষ্টান্ত বৃদ্ধি করবার প্রয়োজন দেখি না, কেন না সুভাষ শুধু যে তার জীবনের সাধনা দিয়ে তার ত্যাগের দলিল সই করে গেছে তাই নয়, মরণের সিলমোহর দিয়ে সে-স্বাক্ষরকে পাকা করে রেখে গেছে। বিলাতে আমার এক বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সাংঘাতিক সাহেব। তিনিও সুভাষের কথা উঠলে বলতেন: "ওকে দেখলে ভরসা হয় যে, হয়ত বাঙালী বাঙালী থাকলেও বাংলাদেশ বাঁচাতে পারে।" এঁর মত ছিল এই যে, আমাদের সভ্যতার ভিতরে ভিতরে ঘুন ধরেছে, তাই বাঁচতে হলে আমাদের সবাইকেই সাহেবি ধরনধারণ ও ডিসিপ্লিনকে পুরোপুরি বরণ করে নিতে হবে—জাতীয়তার অভিমান ছেড়ে। (শ্রীঅরবিন্দের পিতৃদেব শ্রীকৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয় এই মতের বশবর্তী হয়েই তাঁকে বিলেতে পাঠিয়ে অ-ভারতীয় করে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন)। সুভাষের সঙ্গে এ নিয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত আলোচনা হত বিলেতে। সে বলত, "অমুকের কথার সবটাই অসার নয়। তবে কি জানো? আমাদের জাতীয় জীবনের যে-ঘুনের কথা সে বলছে সে আর কিছুই নয়—শুধু ব্যাপক তামসিকতা। এর কাটান মিলতে পারে শুধু অশ্রান্ত কর্মিষ্ঠতায়। কিন্তু কর্মিষ্ঠতা রাজসিক হলেও কিছু সাহেবদের একচেটে সম্পত্তি নয়। আমাদের জাতীয়তা বর্জন করলে চলবে না, শুধু সাহেবদের রাজসিকতাটুকু ছেঁকে নিয়ে পরিপাক করতে হবে। কেমন জানো? হার্বার্ট স্পেন্সরের কাছে ত্রিশ বৎসর আগে জাপানীরা এসে জিজ্ঞাসা করে—তারা মাথায় ছোট, দেশসুদ্ধ লোক য়ুরোপীয় মেয়ে বিয়ে করা ছাড়া উপায় কি? তাতে হার্বার্ট স্পেন্সর হেসে বলেন: "তার ফলে তোমাদের সন্তানেরা মাথায় লম্বা হতে পারে কিন্তু জাপানী নানা গুণের দৈন্যে খাতিরে খাটোই হয়ে যাবে। 'Be yourselves—take from us what you need but assimilation and not imitation be your motto.'

আমি অবশ্য নিজের ভাষায়ই পেশ করলাম সুভাষের ভাবধারা—কিন্তু তাই বলে আমার ভাব ওর স্কন্ধে চাপাই নি। অপিচ, এ-সব লিখলাম যে কোনো নতুন কথা জানাতে তা-ও নয়, লিখ[illegible] শুধু এইজন্যে যে সুভাষের মতন [illegible] মানুষের সম্বন্ধে খুঁটিনাটি কথা[illegible] মননীয় স্মরণীয়। তাছাড়া জীবনের [illegible] লাগে যে-স্মৃতিকথায় তাঁর [illegible] কিছু মূল্য বর্তায়ই। এই-[illegible] সুভাষের সম্বন্ধে আরো কিছু দামী কথা [illegible] খানিকটা নিষ্পরোয়া ঢঙেই। অন্যত্র নানা রচনায় তার সম্বন্ধে অনেক কিছুই বলেছি—কোথায় কবে কি লিখেছি সব মনেও নেই। না থাকুক—যদি এখানে ওখানে পুনরুক্তি থাকে তাহলেও আমার এই সাফাই থাকবেই যে, মহৎ চরিত্রপ্রভাব নানা রশ্মিতে নানা দিক থেকে দেখলেও খতিয়ে লাভই হবার কথা—লোকসান না।

বলেছি থিয়েটার রোডে আমি যে-আবহাওয়ার মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিলাম সে-আবহাওয়া আমার অন্তর বিকাশের অনুকূল ছিল না। কারণ বিদ্যা জ্ঞান সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প দর্শন এ-সব চর্চার কোনো পাটই ছিল না সেখানকার একান্ত বহির্মুখী আবহাওয়া। এক যা আমার মেজমামা একটু আধটু পড়াশুনো করতেন, কিন্তু আর সবাই চলতেন নিজের নিজের তালে—যেমন চলে গড়পড়তা মানুষ তেল নুন লকড়িরর সন্ধানে। নির্মলদা মাঝে মাঝে আসতেন বটে, কিন্তু তিনি আবার সদ্য ঢুকেছিলেন থিয়েটারে, কাজেই তাঁর সাহচর্যে আরাম পেলেও পেতাম না সে-প্ররণা যা তিনি জোগাতেন সুরধামে। হয়ত এর জন্যে আমি নিজেও খানিকটা দায়ী, কিন্তু কারণ যাই হোক, বাইরের পরিবেশ প্রতিকূল হওয়ার দরুন আমাকে হাত পাততে হ'ত আমার অন্তরের অন্তঃপুরে। গাইতাম নিজের মনে পরমহংসদেবের প্রিয় গান:

আপনাতে মন আপনি থেকো যেও নাকো কা'রো ঘরে
যা চাবে তাই ঘরেই পাবে খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।

এর একটা সুফল ফলেছিল এই যে, "শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" হ'য়ে উঠল আমার গীতা—রোজ রাতে কয়েকটি অধ্যায় পড়ে তবে শুতে যেতাম। এইভাবে কথামৃতের প্রথম চার খণ্ড আমার চল্লিশ পঞ্চাশ বার পড়া শেষ হয়। আর বহু পাঠের ফলে যা হয়—তাঁর উক্তিগুলি হ'য়ে উঠল জীবন্ত—যেমন জাপকের কাছে হ'য়ে ওঠে জপমন্ত্র। (আমাদের শাস্ত্রে স্বাধ্যায়কে দৈনিক সাধনার অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে যে এই জন্যেই এ-বিষয়ে সন্দেহ রইল না আর। স্বাধ্যায় মানে অবসর সময়েও নিয়মিত সৎকথা-বরণ মহাবাক্য-স্মরণ ও সশ্রদ্ধ মনন—নিদিধ্যাসন আসে সব শেষে স্মরণ মনন থিতিয়ে গেলে তবে।)

কিন্তু দিনের আলোয় আবার চারদিকের সেই হট্টগোল ওঠে ফেঁপে। কোথায় সেই সাহিত্য আলোচনা, সংগীতচর্চা, শিল্পী গুণী কবির সভা—যা সুরধামকে ক'রে তুলেছিল আনন্দধাম? কিছু ক্ষতিপূরণ মিলত বটে আমার মেজমামা ও মেজমামীর অমল স্নেহে। দিদিমার স্নেহও ভাল লাগত বইকি, কিন্তু তিনি আর সবাইয়ের মতনই চাইতেন আমার সাংসারিক প্রতিষ্ঠা, বিবাহিত সমৃদ্ধি। এককথায়, সে-স্নেহ ছিল যেন বড় বেশি অন্ধ, সংসারী, জৈবিক। তাতে আদৌ মনের পরশ ছিল না। সুরধামে আমি মানুষ হয়েছিলাম আদর্শবাদী বুদ্ধির দীপ্ত পরিবেশে। থিয়েটার রোডের আবহে মিলত না বুদ্ধির রম্য প্রভা। তাই না আরো আঁকড়ে ধরেছিলাম সুভাষকে—খানিকটা যেমন মজ্জমান আঁকড়ে ধরে ভেসে যাওয়া গাছের গুঁড়িকে। উপমাটা যথাযথই এসে গেছে। কারণ সুভাষকে পরমহংসদেবের ভাষায় বলা চলে বই কি 'বাহাদুরি কাঠ'—যে শুধু নিজে ভেসে চলতে পারে তাই নয় যারা তাকে আশ্রয় করে তাদেরও পারে তরাতে—'হাবাতে কাঠ' নয় যার উপর একটা পাখি বসলেও টুপ ক'রে ডুবে যায়।

জানি না সুভাষ সম্বন্ধে এ-তর্পণ এ-যুগের বাস্তববাদীদের কাছে উচ্ছ্বাস ব'লে মনে হবে কি না। মনে হ'লে আমি নাচার, কারণ আমাকে আঁকতেই হবে তাকে আমি যেমনটি দেখেছি, জেনেছি, বুঝেছি।

শাস্ত্রে বলে—আমাদের নানা ঋণ আছে: দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, গুরু-ঋণ, পিতৃ-ঋণ। আমি মনে করি, বন্ধু-ঋণও একটি মস্ত ঋণ। সুভাষের মতন বন্ধু। সময়ে সময়ে যখন আশেপাশের গড়পড়তা-দের দেখি তখন একটু গর্ব বোধ না করেই পারি না যে, যৌবনে এমন একজনের স্নেহ পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল যার সঙ্গে কাঁধ মেলাবার লোক [illegible] আমাদের দেশে নয়, যে-কোনো দেশে [illegible] কমই মেলে। ওর উদ্দীপনা ছিল অলক্ষ্য স্পর্শমণির মত—অজান্তে কত লোকের কত খাদকেই না রেখে গেছে সোনা ক'রে!

কত কথাই মনে আসে ভিড় ক'রে। কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা বলি? তার নানা সময়ে হাসি ঠাট্টা তিরস্কার অনুরোধ—কত কী, যার প্রতি স্পর্শই আমার মনকে সচকিত ক'রে তুলত। সবচেয়ে বেশি ক'রে মনে পড়ে তার গভীর স্নেহ। মন ভিজে যেত তার এক একটি স্নেহের ডাকে। তার উপর যদি স্পর্শ এসে যোগ দিত তাহ'লে তো আর কথাই নেই। মনে পড়ে ১৯৩৭ সালের একটি অবিস্মরণীয় দিনের কথা। কিন্তু এ-গল্পাংকের ছবি ফোটাতে হ'লে আর আগের দু একটি অংকের কথা কিছু বলতে হবে।

বলেছি সুভাষ ছিল বিবেকানন্দের ভক্ত। পরমহংসদেবকে সে ভক্তি করত না এমন নয়, তবে মনে করত যে, অন্তত জাতের দুর্দিনে

দিশ্বারি এক বিবেকানন্দই হতে পারেন আর কেউ নয়। শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে সে ছিল দোমনা। কখনো কখনো তাঁর নানা গভীর বাণীতে অভিভূত হ'ত বটে, কিন্তু তাঁর দেশের কাজ ছেড়ে একান্তভাবে অজ্ঞাতবাস বরণ ক'রে নেওয়াতে কিছুতেই তার মনপ্রাণ সায় দিত না। বলত প্রায়ই: "তাঁর আধ্যাত্মিকতার ঐশ্বর্য ও শক্তি নিয়ে তিনি যদি আমাদের তামসিকতার রূপান্তর ঘটাতে না পারেন তবে তিনি কিসের যোগী?"

আমি সুভাষকে বলতাম, "কিন্তু সে-শক্তির শরিক হ'তে হলে আমাদেরও খানিকটা প্রস্তুতি চাই না কি?" সুভাষ কিন্তু কিন্তু ক'রে বলত, "জানি না ভাই। কেবল এইটুকু বলতে পারি যে, বেশিদিন সর্ববিস্মিত হয়ে থাকার ফলে মানুষের কর্মশক্তি নিস্তেজ হয়ে যায় ব'লেই আমার ভয় হয় যে, শ্রীঅরবিন্দকে আমরা হারিয়েছি বা। সামাজিকতা ও নিঃসঙ্গতা দুয়ের হার্মনিতেই একজন মস্ত মানুষ গড়ে ওঠে, যেমন বিবেকানন্দ, তিলক, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ মহাপ্রতিভাবান্ সন্দেহ নেই কিন্তু—" ব'লেই থেমে যেত পাছে আমি ঘা খাই। আমার উত্তর জীবনে ওর নানা চিঠিতেই ও শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে একটু লিখেই থেমে যেত, আমি তাঁকে গুরুবরণ করেছিলাম ব'লে।

আমি যখন ১৯২৮ সালে সংসার ছেড়ে পণ্ডিচেরি আশ্রমে গিয়ে একাদিক্রমে আট বৎসর অজ্ঞাতবাস করি তখন ও খুবই দুঃখ ক'রে মাঝে মাঝে আমাকে লিখত ফিরে আসতে। আমার সে-সময়ে বৈরাগ্য প্রবল ও গুরুভক্তি খানিকটা গোঁড়ামির কোঠায় পৌঁছেছিল—যার সম্বন্ধে আমি সচেতন হই গুরুদেবের দেহান্তের পরে। তাই সুভাষের প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে আমি তার সঙ্গে পত্রালাপ বন্ধ করি। এতে ও মনে আঘাত পায় আরো এই ভেবে যে, আমাকে ও আঘাত দিয়েছে। আমার মনও উৎসুক হয়ে ছিল ওর সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্যে—আরো এই জন্যে যে, সুভাষ আমাকে যে-সব কথা লিখেছিল তার মধ্যে অনেকটা সত্য ছিল। অর্থাৎ সে-সময়ে গুরুবাদের গোঁড়ামি সম্বন্ধে যা যা বলেছিল সে-সব মন্তব্যের মধ্যে এমন অনেক সারগর্ভ কথা ছিল যা পরে একটু একটু করে আমার কানের মধ্যে দিয়ে মরমে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু সে অন্য কথা।

এই সময়ে—১৯৩৭ সালে—পণ্ডিচেরি আশ্রমের সম্বন্ধে একটু একটু ক'রে নিরাশ হ'তে আরম্ভ করি—যার জন্যে আমার নিজের দোষও ছিল বইকি। কিন্তু নিজের দোষের কথা মানুষ বেশ একটু সদয় হয়ে বিচার করে ব'লে আমি ভাবতাম, অপরের দোষ সাড়ে পনের আনা যদি নাও হয়, সাড়ে তের আনা তো বটেই। যাই হোক, এইভাবে কিছুদিন কাটবার পরে খবরের কাগজে পড়ি যে, সুভা[illegible]। চঞ্চল হয়ে উঠে আ[illegible] অমত সত্ত্বেও খানিকটা আবদার ধ'রেই তৎক্ষণাৎ কলকাতায় চলে আসি ১৯৩৭ সালে ফেব্রুয়ারীতে।

৩৪ থিয়েটার রোডে আমার দাদামহাশয়ের দেহান্তের পরে দিদিমাই হন সর্বেসর্বা। তিনি আমাকে সাগ্রহে পুনর্বরণ ক'রে নিলেন। দীর্ঘ প্রবাসের পরে ফিরেই আমি থিয়েটার রোডের প্রকাণ্ড হলঘরে গানের আসর জমানো শুরু করি। (১৯২২ থেকেই এ-গানের আসর শুরু হয়, এখন যেন আরো জেঁকে বসলাম—মাস কয়েক বাদে আশ্রমে ফিরতে হবে ভেবে আরো মজলাম গানের আনন্দে।)

কিন্তু মন আমার কেবলই খচ খচ করে। সুভাষের মুক্তি হ'ল কই? আমি আনন্দে আছি কিন্তু সে যে এখনো জেলে। গুজব রটেছিল তার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে। এমন সময় একদিন হঠাৎ এলগিন রোড থেকে টেলিফোন এল—সুভাষকে ছেড়ে দিয়েছে, সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সেদিনটি—১৭ই মার্চ—আমি ভুলব না কোনোদিন।

তৎক্ষণাৎ গেলাম এলগিন রোডে সব কাজ ফেলে।

সুভাষের দেহ শীর্ণ হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি। কিন্তু মুখে অবসাদের চিহ্নও নেই। আমার সঙ্গে দেখা হ'তে না হ'তে সে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেলল। সে কী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না! সুভাষ কাঁদবে এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমার চোখের জলও বাধা মানল না। আট বৎসর পরে আমাদের পুনর্মিলন। তার পরের কথা আমার The Subhash I know বইটিতে ফলিয়েই লিখেছি, তার এক অনুবাদ বেরিয়েছিল, কাজেই সে-সব কথার পুনরুক্তি করব না।

তবু সুভাষের অশ্রুপাতের কথার উল্লেখ করলাম এইজন্যে যে, খুব অল্প লোকের কাছেই সে তার হৃদয়ের দুয়ার খুলত ব'লে তার চোখে জল প্রায় কেউই দেখেনি। সবাই জানত যে, সে একজন আত্মবিশ্বাসদীপ্ত, অচলপ্রতিষ্ঠ মহাবীর। তার সুগম্ভীর, শান্তোজ্জ্বল মুখ দেখলে সব আগে তার প্রতি সমীহই বোধ করত মানুষ। কিন্তু যাদেরই তার স্নেহ পাবার পরম সৌভাগ্য হয়েছিল তারাই জানে সে-স্নেহ তৃষিতকে অমৃতে ভ'রে দিতে পারত। আমি নানা লেখায় বলেছি—একটুও অত্যুক্তি নয়—যে, সুভাষের এক কথায় আমি এমন কি রাজনীতিতেও প্রবেশ করতে পারতাম। আমার কাছে চিরদিনই রাজনীতির আবহাওয়া ছিল শুধু অপ্রীতিকর নয়—একান্ত দুঃসহ। কিন্তু একবার কে আমাকে বলে যে, সুভাষ চায় আমি কংগ্রেস ইলেকশানে দাঁড়াই চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ পার্টিতে নাম লিখিয়ে। আমার সেদিন রাতে ঘুম হয়নি। পরদিন সুভাষকে এক চিঠি লিখি—ও কোথায় ছিল মনে নেই—ও যদি চায় তবে আমি ইলেকশানে দাঁড়াব আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও। সুভাষ তার করে: দরকার নেই, ও ফিরলে কথা হবে।

ফিরে ও বলল যে, ও মোটেই চায় না আমি পলিটিক্সে ঢুকি, আমি বাইরে থেকেই দেশের কাজ বেশি করতে পারব। বলল: "আমাদের এত সংকীর্ণ মনে কোরো না দিলীপ। তুমি পলিটিক্সের জন্যে তৈরি নও এ আমি বুঝি। কিন্তু তুমি তোমার গানের প্রচারের মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশের কাজ করবে এ আমি চাইবই চাইব। আমার অনুরোধ তুমি অশ্রান্তভাবে গাইবে উদ্দীপক গান—তোমার বাবার অতুলনীয় স্বদেশী গান—মাতিয়ে দেবে সবাইকে গান গেয়ে..." ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাই সে আরো বিশদ ক'রে লিখেছিল তার একটি দীর্ঘ পত্রে মান্দালয় জেল থেকে ১৯২৫ সালে। সে-চিঠিটি অনামীতে ছাপিয়েছি—পড়লে কারুর সন্দেহ থাকবে না ওর অন্তরে ঔদার্য সম্বন্ধে। কিন্তু এসব রেখে আজ বলি—থিয়েটার রোডে ফিরে আসায় ওর সঙ্গে কীভাবে এক নব সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠল। (ক্রমশ)

১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এ দেবকুমার দাসের একটি চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেছে গত সপ্তাহে। ইনি মাত্র ১৮ মাস আগে প্রথম ছবি আঁকা শেখেন। কেমব্রিজ-এ প্রাচ্য-দেশীয় কয়েকজন শিল্পীর সীনথিসিস্ট গ্রুপ নামে একটি গোষ্ঠী গঠিত হয় ১৯৫৮ সালে, শ্রী দাস সেই গোষ্ঠীর প্রথম সভ্যদের মধ্যে একজন। এঁদের উদ্দেশ্য, প্রাচ্য ভাব ধারায় মডার্নিস্টিক চিত্রকলা প্রবর্তন করা। এঁরা দাবী করছেন সীনথিসিস কথাটি এঁরাই প্রথম চালু করেছেন আর্টের অভিধানে, কিন্তু সেটা কি ঠিক? শুনেছি ১৮৮৮ সালে পন্তাভ্যা-তে অবস্থানের সময় পল গগ্যা তাঁর পরীক্ষণ নিরীক্ষণকে আকারগতরূপ এবং বর্ণের সীনথিসিস বলে প্রচার করেছিলেন। তাঁর রচনায় আকার এবং বর্ণের মধ্যে কোনটিই অন্যটির ওপর আধিপত্য লাভ করেনি। একই রচনার মধ্যে আকার এবং বর্ণ সমান প্রাধান্য পেয়েছে। ইমপ্রেশনিস্টরা বর্ণের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আখ্যান বস্তুর আকারগত রূপটাকে বিসর্জন দিয়ে ফেলায় গগ্যা এই সীনথিসিস প্রবর্তন করেন এবং শেষ জীবন পর্যন্ত এই সীনথিসিস-এর ওপর ভিত্তি করেই সমস্ত ছবি রচনা করে গেছেন। শ্রী দাসের লক্ষ্যও তাই, বর্ণের প্যাটার্ন এবং আকৃতি এঁর রচনায় সমান প্রধান। লক্ষ্য এক হলেও আঙ্গিকে ইনি গগ্যাকে অনুসরণ করেননি। ব্যাপারটি কতকটা দাঁড়িয়েছে 'ওল্ড ওয়াইন ইন-এ নিউ বটল'-এর অনুরূপ। শ্রী দাস কোনও স্কুলে বা কোনও শিল্পীর কাছে বাঁধা ধরা নিয়মে চিত্রবিদ্যা চর্চা করেননি। নিজে নিজেই ছবি আঁকা শিখেছেন। প্রথম ছবি আঁকার এক বছরের মধ্যেই ইনি বিদ্রোহ ঘোষণা করে নব্য তন্ত্র প্রবর্তন করতে চাইছেন, কিন্তু আমার মনে হয় কঠোর তপস্যা না করলে আর্টকে পাওয়া যায় না। আর্টকে বুঝতেও তপস্যার প্রয়োজন এবং তা সময় সাপেক্ষ। পৃথিবীতে যে সব পথিকৃৎ শিল্পী নব্যতন্ত্র প্রবর্তন করেছেন তাঁরা সকলেই চিত্রবিদ্যার ব্যাকরণ পূর্ণভাবে আয়ত্তের মধ্যে এনে তারপর নিজেদের অভিমত পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। সেই কারণেই ছবিগুলি অদ্ভুত মনে হলেও তাঁদের রচনায় নির্ভুল চিত্রবিজ্ঞান অনুভব করা যায়। শ্রী দাসও যদি ভালভাবে ছবি আঁকার ব্যাকরণ আয়ত্ত করে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন তাহলে আমাদের কিছু বলবার থাকতো না। অপরিণত প্রথা প্রকরণের ফলে এঁর বেশীর ভাগ রচনায় আকৃতি এবং বর্ণের মধ্যে কোনটিরই নিজস্ব মূল্য এবং বিশেষত্ব প্রকাশ পায়নি। কৃষ্ণবর্ণের স্থূল কতকগুলি রেখার বেষ্টনীর মধ্যে অস্পষ্ট অপরিচিত কতকগুলি ফর্ম এবং লাল নীল প্রভৃতি বর্ণের এলোমেলো কতকগুলি পোঁচ, এ সবে মিলে এমন আকৃতি হয়েছে রচনা-গুলির যা নন্দনতত্ত্বের বিচারে নিশ্চয় রসোত্তীর্ণ বলে ধার্য হতে পারে না। তবে একথা ঠিক যে শিল্পী যদি নব্যতন্ত্র প্রবর্তন করার বাসনা ত্যাগ করে প্রকৃত আর্টকে পাবার চেষ্টা করেন কঠোর অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে তা হলে ইনি বাস্তবিকই রসোত্তীর্ণ রচনা করতে পারবেন। শিল্পীর যে শিল্পরসিকের দৃষ্টি আছে তা লক্ষিত হয় এঁর 'কফী হাউস', 'স্টুডেণ্ট ডান্স অ্যালেকজান্দ্রিয়া', 'টু ফর কফী', 'গার্ল অন উইন্ডোসিল', 'স্টীমার ডেক', 'স্টাডী ফ্রম ফটোগ্রাফ' 'পিয়ানিস্ট অ্যান্ড অডিয়েন্স' এবং 'টুইলাইট অ্যাট হুগলী' এ কটি রচনা থেকে। আখ্যান বস্তুর আকারগত রূপ এবং বর্ণের প্যাটার্নকে একই রচনার মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ করলেই কি রচনায় প্রাচ্য ভাবধারা প্রকাশিত হয়? আমার ব্যক্তিগত ধারণা, তা হয় না। প্রাচ্য শিল্পের অঙ্গ আটটি, রস, ছন্দ, রূপ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ। প্রত্যেকটি অঙ্গই বিশেষভাবে জানবার এবং বোঝবার বিষয়। এখনো এগুলির বিস্তারিত বিশ্লেষণ করার অবকাশ নেই। যাই হোক, যদি কোন শিল্পী প্রাচ্য চিত্রকলা চর্চা করতে চান তা হলে এই অষ্টাঙ্গের একটিকেও বাদ দেওয়া চলবে না। এ ব্যাকরণ অত্যন্ত দাটো, সুতরাং আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রাচ্য আর্টের মেজাজ বজায় রেখে চিত্র রচনা করা কতটা সম্ভব তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। আরেকটা কথা, এই সীনথিসিস্টরা বলেন,

the object of the process of synthesis itself should be to merge the different intrinsically abstract processes in an approach toward reality.

ঠিক ধরতে পারলাম না কি বোঝাতে চাইছেন এঁরা। মন্ত্রবলে অলৌকিক কিছু ঘটাতে চাইছেন নাকি?

শ্রী দাসের চিত্রকলার আত্মা যে প্রাচ্য চিত্রকলার নয় সে বিষয় কোনই সন্দেহ নেই কিন্তু একথা ঠিক যে, এঁর রচনাভঙ্গীতে অভিনবত্ব আছে। এর পরীক্ষণ নিরীক্ষণ সম্বন্ধে কৌতূহল রইল।

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস পরিচালিত 'স্কেচ ক্লাব'-এর দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে গত সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম হাউস-এ।

এ প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু মূলত নগ্ননারী দেহের রূপ। মডেলকে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বসিয়ে বিভিন্ন কোণ থেকে দেখে শিল্পীরা স্টাডী করেছেন। রচনাগুলি থেকে বিভিন্ন শিল্পীর ব্যক্তিমানসের পরিচয় পাওয়া যায়। কেউ দেখেছেন নারীদেহের ছন্দ প্রধান রূপ, কেউ দেখেছেন তার যৌনতা, আবার কেউ দেখেছেন শুধুই শারীরস্থান। জীবন্ত মডেল দেখে ছবি আঁকার রেওয়াজ বহুদিনের। গ্রেকো-রোমান ভাস্কর্যেরও উৎস ছিল জীবন্ত মডেল। পরে ইতালীর রেনেসাঁস-এর শিল্পীরা মানবতাকে আর্টে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে আবার জীবন্ত মডেল সামনে রেখে ছবি আঁকার রেওয়াজ চালু করেন। তার পর থেকে নগ্ন নারীদেহ এঁকেছেন প্রায় পাশ্চাত্যের সব পথিকৃৎ শিল্পীই। সেই থেকেই নিউড স্টাডী পাশ্চাত্য শিল্পের একটি বিশেষ অঙ্গ। অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস পরিচালিত স্কেচ ক্লাব-এর সভ্য সভ্যারা সকলেই পাশ্চাত্য শিল্পধারার পক্ষপাতী, সুতরাং নিউড স্টাডী এঁদের কাছেও অপরিহার্য। এঁদের মধ্যে কয়েকজনকার রচনা সত্যই বলিষ্ঠ। পুরুষের শারীরস্থানও অনেকে স্টাডী করেছেন বেশ দক্ষতার সঙ্গে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বধূরাণী নন্দচন্দ্রা রায়ের স্টাডীগুলি, ভূদেব বিশ্বাসের স্টাডী—নং ৯ এবং ১০, অনিলবরণের স্টাডী নং ৭, এন এস জে রবার্টস-এর সব কয়টি স্টাডী, সরমা ভৌমিকের স্টাডী নং ২৩ অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের স্টাডী নং ৩২, উমাপদ সেনের স্টাডী নং ৪৬, মুরারী গুহর স্টাডী নং ৫৬, অমিতাভ দত্তের স্টাডী নং ৫৯ এবং গৌরগোপাল বন্দ্যো-পাধ্যায়ের স্টাডী নং ৬২। একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় কোনও রচনাতেই বিকৃত কামনার লক্ষণ নেই। এটা সত্যই প্রশংসনীয়।

মন্মথভট্ট

উদারতন্ত্রের অবক্ষয়
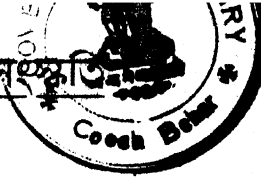
এখন থেকে শ'পাঁচেক বছর আগে পশ্চিম য়োরোপে আধুনিক সভ্যতার সূচনা হয়েছিল। পরের যুগে সেই সূচনারই নাম-করণ হয় রেনেসাঁস বা পুনর্জন্ম। গ্রীকরা য়োরোপে মনুষ্যত্বের যে জাগরণ ঘটিয়েছিল রোমান সভ্যতার পতনের পর তা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসে। একধারে আর্থিক ব্যবস্থা একান্তভাবে কৃষি নির্ভর হয়ে ওঠার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনের মান নেমে যেতে থাকে; অন্যধারে রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সুযোগে খুদে খুদে জমিদারদের অত্যাচার বেড়ে চলে। জনসাধারণের হতাশার সুযোগে পুব থেকে আমদানি নতুন এক ধর্মমত দ্রুত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এ ধর্মমত জীবন-বিমুখ এবং মানুষের সৃষ্টিশীলতায় অবিশ্বাসী। এরই আওতায় ইয়োরোপের বুদ্ধিমান মানুষরাও ক্রমে ভাবতে শেখে যে মানুষ পাপগ্রস্ত জীব; আনন্দ নয়, বিকাশ নয়, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাই হল মনুষ্য-জীবনের সাধনা; এবং তারি জন্যে স্বেচ্ছায় ব্যক্তিসত্তার বিলোপ ঘটিয়ে, সহজাত কৌতূহলকে সম্মোহিত করে, বুদ্ধির নির্দেশ এবং প্রবৃত্তির তাগিদকে আতঙ্কিত নিগ্রহের সংগে দমন করে, কল্পিত দৈবের প্রতিনিধি পুরোহিতকুলের বিধান নির্বিচারে মেনে যাওয়া মানুষের অবশ্য কর্তব্য। ফলে য়োরোপ থেকে বিজ্ঞান এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঐতিহ্য প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুছে যায়; শিল্প এবং সাহিত্য পুনরাবৃত্তি-প্রধান হয়ে ওঠে; ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্র ক্রমেই সংকীর্ণতর হয়ে আসে; ভৌগোলিক এবং সামাজিক গতি-শীলতার পথে বিধিনিষেধের বাধা বেড়ে চলে; দুর্ভিক্ষ, মহামারী, নিরক্ষরতা, অত্যাচার এবং সর্বব্যাপী দুর্নীতিকে মানুষ দৈবের অমোঘ বিধান বলে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়।

এই দুর্দশা থেকে ইয়োরোপের উদ্ধার শুরু হল রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে। গ্রীকদের বিস্মৃত সাধনার উত্তরাধিকার পুনরাবিষ্কৃত হওয়ার ফলে চার্চের একচ্ছত্র শাসনে ফাটল দেখা দিল; সমুদ্রপথ খুলে যাওয়ায় সমাজ-জীবনে এল গতিশীলতা; বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে নতুন করে অনুসন্ধান শুরু হল; উদ্যোগী বণিক এবং কৌতূহলী বুদ্ধি-জীবীরা দাবি তুলল স্বাধীন চিন্তার, স্বাধীন প্রচেষ্টার, স্বাধীন সংগঠনের। আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটল; এবং ষোল শতক থেকে উনিশ শতকের মধ্যে এই সভ্যতা শুধু পশ্চিম ইয়োরোপের জীবন-যাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আনল না, তার প্রভাব ছড়িয়ে গেল পৃথিবীর দিকে দিকে, এসিয়া এবং আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকায়। পশ্চিম ইয়োরোপের আধুনিক সভ্যতার আদলে গড়ে উঠতে লাগল মানব ইতিহাসের প্রথম বিশ্বজনীন সভ্যতা।

আধুনিক সভ্যতার প্রবর্তন এবং বিকাশের মূলে যে জীবন-দর্শন, তারি নাম উদার-তন্ত্র বা লিবর‍্যালিজম্। এর মূল বৈশিষ্ট্য কী, তা নিয়ে গত আড়াইশো বছর ধরে পশ্চিমের মনীষীরা বিস্তর আলোচনা করেছেন। মোটামুটি ভাবে বলা চলে লিবর‍্যাল জীবনদর্শনের মূল কথা হল, ব্যক্তির বিকাশই সর্ববিধ কল্যাণের উৎস এবং মানদণ্ড; এই বিকাশের জন্য একধারে দরকার ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং অন্যধারে জীবনের সবক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োগ। বিচিত্র, বহুবাচনিক এবং নিয়ত পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতার জগতে যুক্তি ঐক্যের সূত্র আবিষ্কার করে; এবং এই ঐক্যের ওপরে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে জ্ঞান, নীতিবোধ, আইনকানুন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠান। কিন্তু সংগে সঙ্গে যুক্তির প্রয়োগের ফলে এটাও স্পষ্ট যে সংসারে কোনো সিদ্ধান্তই চরম সত্য নয়; প্রতিটি ধারনা, ব্যবস্থা, রীতি-নীতি পরিবর্তন সাপেক্ষ। ফলে উদারতন্ত্রী ব্যবস্থায় কোনো একটি মতবাদ বা বিধানকে সর্বজনদীপ্ত করে সকলের ঘাড়ে চাপানো হয় না; বিভিন্ন বিকল্প চিন্তাধারাকে সহ্য করা হয়, প্রশ্রয় দেওয়া হয়, যাতে নানা ধারনার ঘাতপ্রতিঘাত এবং বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষার ভেতর দিয়ে প্রকৃষ্টতর ধারনা এবং ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। প্রতিটি সিদ্ধান্তকে অভিজ্ঞতা এবং সমালোচনার কষ্টিপাথরে বারবার নতুন করে যাচাই করে নেওয়ার প্রবণতা উদারতন্ত্রের একটি প্রধান লক্ষণ। পুরোহিততন্ত্রের অসহিষ্ণু সর্বজ্ঞতার দাবীকে সযত্নে পরিহার করে উদারতন্ত্রী মনীষীরা বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাবকে শ্রদ্ধার সংগে বিচার করতে এবং তাদের মধ্যে যুক্তি-সংগত সমন্বয় ঘটাতে উৎসুক।

তাছাড়া উদারতন্ত্রীর দৃষ্টিতে প্রতি ব্যক্তিই অনন্য এবং সে কারণে সমান মূল্যবান। প্রতি ব্যক্তিই সৃজন সামর্থ্যের অধিকারী; এই সামর্থ্যের সার্থকায়ন সমাজ সংগঠনের উদ্দেশ্য। প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশের ফলে সমগ্র মানবজাতির জীবন সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা ছাড়া ব্যক্তির বিকাশ সম্ভব নয়; তাই উদারতন্ত্রী সমাজের একমাত্র কর্তব্য হল ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা এবং সম্প্রসারণ। চিন্তার স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা। যুক্তি একধারে যেমন অভিজ্ঞতার সমন্বয় ঘটিয়ে

জ্ঞানকে সম্ভবপর করে, অন্যধারে বিভিন্ন ব্যক্তির বিকাশ সাধনার মধ্যে সামঞ্জস্য এনে সমাজ ব্যবস্থা, নীতি-রীতি, আইন-কানুনের উদ্ভাবনা ঘটায়। সমাজের জন্যে ব্যক্তি নয়। ব্যক্তির জন্যেই সমাজ। সমাজ-ব্যবস্থায় অধিক সংখ্যক মানুষের অধিকতর বিকাশের সুযোগকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার নাম প্রগতি। এই প্রগতি কোনো মানবোধর্ব দৈবশক্তি বা ঐতিহাসিক নির্দেশের ফল নয়। এর উৎস হল মানুষের স্বাধীনতাস্পৃহা এবং যুক্তিশীলতা এবং উভয়ের মিলনের ফলে মানুষের সৃজনধর্ম।

উক্ত জীবনদর্শন পেরিক্লেসের আথেন্সে প্রথম স্বীকার লাভ করলেও তার ব্যাপক প্রয়োগের সম্ভাবনা রেনেসাঁস-উত্তর পশ্চিম য়ুরোপেই প্রথম সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবং [illegible]র ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন অভূত-[illegible] উন্নতি দেখা দেয়, শিল্প এবং সাহিত্যের [illegible] তেমনি নিত্য নূতন প্রতিভার উন্মেষ [illegible]বপর হয়। রাষ্ট্রীয় জীবনে মুষ্টিমেয় [illegible]ভজাতদের একচেটিয়া ক্ষমতা ক্রমে [illegible]পসৃত হয়ে সাধারণ নাগরিকদের নানা মৌল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পায়, সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নত হয়, ব্যাধি এবং অকাল-মৃত্যুর প্রকোপ কমে, শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটে, গ্রামীণ সংকীর্ণতার লোপসাধন করে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের সুযোগ বাড়তে থাকে। যন্ত্রবিপ্লবের পর উদারতন্ত্র আর পশ্চিম ইয়োরোপে আবদ্ধ না থেকে দূরদূরান্তরের দেশে প্রভাব ফেলতে শুরু করে। পশ্চিম থেকে আগত উদারতন্ত্রের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে আমাদের দেশেও উনিশশতকে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে প্রাণের সাড়া জেগেছিল। এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে অধ্যাপক হবহাউস তাঁর লিবর্যালিজম্ নামে প্রামান্য গ্রন্থে তাই নিঃসংকোচে লিখেছিলেন, "উদারতন্ত্র হল আধুনিক সভ্যতার সর্ব-ব্যাপী প্রাণশক্তি।"

তারপর এল প্রথম মহাযুদ্ধ। এক যুদ্ধের পরিসমাপ্তি এবং আরেক যুদ্ধের সূচনার মাঝখানে বিশ বছরের মধ্যে একটির পর একটি দেশে উদারতন্ত্র বিরোধী মতবাদ এবং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। রাশিয়া, ইতালী, পর্তুগাল, জার্মানী, স্পেন প্রমুখ দেশে সমষ্টিগত স্বার্থের নামে মুষ্টিমেয় কিছু কিছু লোক সর্ববিধ ক্ষমতা দখল করল। ফাসিজম্ এবং কম্যুনিজম্ দুই-ই সুস্পষ্টভাবে উদারতন্ত্র বিরোধী। মতবাদের দিক থেকে প্রথমটি জাতির কাছে এবং দ্বিতীয়টি শ্রেণীর কাছে ব্যক্তিকে বলি দিতে উদ্যোগী; ব্যবহারের দিক থেকে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তি সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের ক্রীতদাস মাত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে প্রধান কয়েকটি ফাসিস্ত রাষ্ট্র পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি। এসিয়া, আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে কোথাও-বা ফাসিজম্ কোথাও-বা কম্যুনিজমের প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। এধারে যুগোস্লাভিয়াকে বাদ দিলে সমস্ত পূর্ব ইয়োরোপ আজ কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যতন্ত্রের কুক্ষিগত। আবার ফ্রান্সে এই ত সেদিন দ্যগলের নেতৃত্বে ফ্যাসিজম্ প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

উদারতন্ত্রের এই ব্যাপক অবক্ষয়ের কারণ কি? গত তিরিশ চল্লিশ বছর ধরে পশ্চিমের মনীষীরা নানা দিক থেকে এ প্রশ্নের বিচার করেছেন। নানাজনের নানা মত। ইতালিয়ান দার্শনিক মাসিমো সাল্ভাদোরীর একটি সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে* এবিষয়ে কিছু মূল্যবান আলোচনা চোখে পড়ল। সাল্ভাদোরী আজীবন ফ্যাসিজম্-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং ফলে তাঁকে দীর্ঘকাল স্বেচ্ছানির্বাসনে কাটাতে হয়েছে। কিন্তু তাতে উদারতন্ত্রের ওপরে তাঁর আস্থা কমেনি। উদারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অনিবার্য, এ জাতীয় ঐতিহাসিক জ্যোতিষে তিনি বিশ্বাস করেন না; কিন্তু মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্যে উদারতন্ত্র অপরিহার্য, এবিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

সাল্ভাদোরীর মতে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা স্ফুরিত না হওয়া পর্যন্ত উদারতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। উদারতান্ত্রিক আদর্শের কোনো মৌল ত্রুটির জন্যে আজকের যুগে উদারতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়েনি; আসলে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের মানুষ আজো স্বাধীনতার অর্থ হৃদয়ংগম করে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি বলেই উদারতন্ত্র-বিরোধী নানা মতবাদ এবং আন্দোলন এত প্রবল হয়ে উঠতে পেরেছে। আদিম যুগ থেকে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ অবস্থায় থাকতে অভ্যস্ত; বেশীর ভাগ মানুষ এখনো আপন আপন অনন্যতা বিষয়ে সচেতন পর্যন্ত হয়নি। গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতি-কেন্দ্রিক স্বাধীনতার আন্দোলন তাদের মনে আবেগ সৃষ্টি করে; কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা তাদের কাছে এখনো একটা শব্দ মাত্র। যন্ত্রবিপ্লবের ফলে পৃথিবীর দেশে দেশে মানুষের অবস্থার উন্নতি ঘটেছে; তাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় এবং আর্থিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে; কিন্তু সেই হিসেবে মানুষের মন পরিণত হয়ে ওঠেনি। পৃথিবীর অধিকাংশ সমাজে বহু শতাব্দী ধরে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার মূল প্রত্যয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নয়, তার আদর্শ হল গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তির আত্ম-বিলোপ। যারা বহু পুরুষ ধরে শাস্ত্রের অনুশাসন এবং গুরু কিম্বা পুরোহিতের নির্দেশ মানতে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে রাতা-রাতি নিজের বিচারবুদ্ধির ওপরে নির্ভর-শীল হয়ে ওঠা সহজসাধ্য নয়। উদারতন্ত্রের প্রসারের ফলে এইসব গোষ্ঠীবাদী এবং কর্তা-ভজা প্রাচীন ঐতিহ্যের মূলে ধাক্কা লেগেছে; ফলে এইসব ঐতিহ্য আজ একযোগে উদার-তন্ত্রের বিনাশে উদ্যোগী।

---

* MASSIMO Salvadori, **Liberal Democracy**, Doubleday.

তাছাড়া যন্ত্রবিপ্লবের ফলে অনেক নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। যদি সাধারণ মানুষদের মধ্যে স্বাধীনতার প্রবৃত্তি এবং স্বাধীনতার অর্থবিষয়ে বোধ বিকশিত হত, তাহলে এসব সমস্যা মানুষকে বিভ্রান্ত না করে তার সৃষ্টিপ্রতিভাকে সক্রিয় করে তুলত। কিন্তু ব্যক্তির বিকাশ না ঘটায় যন্ত্রবিপ্লব সমাজজীবনে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়েছে। অন্যধারে, উদারতান্ত্রিক আদর্শের প্রভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে আইনের চোখে সাধারণ মানুষের নানা অধিকার স্বীকৃত হয়েছে বটে; কিন্তু সেসব অধিকারের অর্থ আজো তাদের কাছে অস্পষ্ট। ফলে সাধারণ মানুষের এই মানসিক অপরিনতির সুযোগে রাষ্ট্র জনকল্যাণের নামে নিজের হাতে নানা দায়িত্ব এবং ক্ষমতা গ্রহণ করে চলেছে। এ-যুগের সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার এই হল পটভূমি।

সাল্‌ভাদোরীর বিচারে উদারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কোনো সমাজের আর্থিক উন্নতির ওপরে নির্ভরশীল নয়। উদারতন্ত্রের প্রধান শর্ত হল মানুষের মনে ব্যক্তিস্বাধীনতার মূল্য সম্বন্ধে চেতনার উন্মেষ। আর্থিক উন্নতি সত্ত্বেও দাসব্যবস্থা সম্ভব; প্রাচীন বহু অত্যাচারী রাষ্ট্র এবং আধুনিককালে নাট্‌সী জার্মানী এবং কম্যুনিস্ট রাশিয়া তারই প্রমাণ। কিন্তু স্বাধীনতার মূল্যবোধ জাগ্রত হলে তারই তাগিদে আর্থিক, রাষ্ট্রিক এবং সামাজিক অবস্থার উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের স্ফুরণের ফলে মানুষ বুঝতে শেখে যে, কোনো একটি-মাত্র উদ্দেশ্যের ছাঁচে সব মানুষের সাধনাকে ঢালার চেষ্টা সম্ভবও নয়, কর্তব্য নয়। তাছাড়া একই উদ্দেশ্য সামনে রেখেও বিভিন্ন উপায় অনুসরণ করা সম্ভব। এবং ফলাফলের দিক থেকে উদ্দেশ্যের চাইতে উপায়ের মূল্য কম নয়। বিভিন্ন বিকল্পের ঘাতপ্রতিঘাত মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধতর করে তোলে। অধিকাংশ লোকের সমর্থনের জোরে কোনো সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয় না। গোঁড়ামির অভ্যাস থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত উদারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। পৃথিবীর জনসাধারণকে স্বাধীন চিন্তায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তবেই আধুনিক সভ্যতা বিশ্বব্যাপী উদারতান্ত্রিক সভ্যতায় পরিণতিলাভ করবে।

সাল্‌ভাদোরী উদারতন্ত্রের সংকট নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন। প্রশ্ন ওঠে, এসিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় না-হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের অভাব উদারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছে; কিন্তু পশ্চিম ইয়োরোপে উদারতন্ত্রের সমকালীন অবক্ষয়ের কারণ কি? প্রথম মহাযুদ্ধের পর একধারে কম্যুনিজ্‌ম্‌ এবং অন্যধারে ফাসিজ্‌ম্‌-এর আঘাতে ইয়োরোপে উদারতন্ত্র এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ল কেন? গোয়েটের জন্মভূমি জার্মানীতে নাট্‌সীরা কি করে ক্ষমতায় এল? তার চাইতেও বিস্ময়কর, স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর দেশ ফ্রান্স কেন দ্যগলের একনায়কত্ব মেনে নিয়েছে? এক ইংল্যান্ড, সুইট্‌জারল্যান্ড এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ কটি বাদ দিলে পশ্চিম ইয়োরোপের কোথায়-বা উদারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে?

অধ্যাপক শাপিরো তাঁর একটি গ্রন্থে * এ-প্রশ্নের আংশিক জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। আংশিক, কেননা তাঁর আলোচনা শুধু ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া তিনি উদারতন্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে শুধু ফাসিজ্‌ম্‌-এর উদ্ভবের কয়েকটি সূত্র নিয়ে বিচার করেছেন। শাপিরো-র বিশ্লেষণ অনুসারে বিংশ শতাব্দীতে ফাসিজ্‌ম্‌-এর আবির্ভাব ঘটে। আবার ঐ একই কালে শতকের ইতিহাসের মধ্যে তার ব্যাপক প্রস্তুতি চোখে পড়ে। মধ্যযুগের গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা এবং নিগ্রহনির্ভর জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে কিছু মনীষীর বিদ্রোহ হিসেবেই পশ্চিম ইয়োরোপে প্রথম উদারতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। আবার ঐ একই কালে কৃষিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নগরবাসী বণিকদের সংগ্রাম শুরু হয়। এই সংগ্রামে শেষোক্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ বুর্জোয়া-রা নিজেদের স্বার্থের প্রয়োজনে উদারতান্ত্রিক আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক হয়ে ওঠে। কিন্তু উদারতন্ত্র কোনো শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের দর্শন নয়; তার নির্দেশ হল সবমানুষের মধ্যে মুক্তিস্পৃহা এবং যুক্তিশীলতার বিকাশ ঘটানো। যে-সমাজে উদারতন্ত্রের এই সার্বজনীন নির্দেশ স্বীকার লাভ করেছে, সেখানে উদারতন্ত্র পরিণতি পেয়েছে লিবর‍্যাল গণতন্ত্রে। কিন্তু যে-দেশে বুর্জোয়া শ্রেণী উদারতন্ত্রের এই নির্দেশ মেনে নেয়নি, সেখানে জনসাধারণের দাবী-দাওয়ার চাপে বুর্জোয়া-রা ক্রমেই উদারতন্ত্র-বিরোধী হয়ে উঠে অবশেষে ফাসিজ্‌ম বা জুলুমতন্ত্রের আশ্রয়ে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা পেয়েছে।

এই পার্থক্য বোঝাবার জন্যে শাপিরো সবিস্তারে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের রক্তহীন বিপ্লবের মধ্যদিয়ে ইংল্যান্ডে উদারতন্ত্রের জয়যাত্রা শুরু হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত আড়াইশো সোয়া তিনশো বছরের মধ্যে ও-দেশে এক-শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর, এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্যধর্মসম্প্রদায়ের, এক-দলের সঙ্গে অন্যদলের বহুবার বিরোধ ঘটেছে বটে, কিন্তু কোনো পক্ষ বিজয়ী হয়ে অন্যপক্ষের উচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা করেনি। একচেটিয়া ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পথে নয়, রফার মাধ্যমে বিলেতে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রীয় এবং আর্থিক, বহুবিধ সংস্কার সাধিত হয়েছে। ইংরেজ বুর্জোয়া কোনো আকস্মিক বিপ্লব ঘটিয়ে জমিদারদের ধ্বংস করার প্রয়াস পায়নি; তাদের ক্ষমতা এবং বিত্তপসার ধীরে ধীরে কমিয়ে এনে বুর্জোয়াসমাজের অংশীভূত করেছে। পরে উনিশ শতকে যখন বুর্জোয়াদের সঙ্গে শ্রমিকদের সংগ্রাম দেখা দিল তখন এই রফার অভ্যেসের ফলে সে-সংগ্রাম গৃহযুদ্ধে পর্যবসিত না হয়ে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণে

* J Salwyn Schapiro, **Liberalism and the Challenge of Fascism**, McGraw-Hill Book Company.

পরিণতি লাভ করল। বিলেতেও যে ফাসিজম্-এর কোনো প্রবক্তা দেখা দেয়নি, তা নয়; শাপিরো উদাহরণ হিসেবে কার্লাইলের উদারতন্ত্রবিরোধী চিন্তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে ফাসিজম্ কোনো প্রভাব ছড়াতে পারেনি। কারণ ও-দেশে রক্ষণশীল দলও উদারতন্ত্রে বিশ্বাসী। ফলে স্রেফ জনসমর্থনের জোরে ও-দেশে শ্রমিকদল ক্ষমতায় আসতে পারে; তার জন্যে কোনো রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রয়োজন ঘটে না। ইংল্যাণ্ড তাই মহাসঙ্কটের সময়েও ডিক্টেটরী ব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি।

অপরপক্ষে ফ্রান্সে বুর্জোয়ারা উদারতন্ত্রকে শ্রেণীস্বার্থ প্রতিষ্ঠার উপায়মাত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিল; উদারতন্ত্রী জীবনবোধের দ্বারা তারা উদ্বুদ্ধ হয়নি। ফলে ফরাসী বিপ্লব পর্যবসিত হল "রেন্ অব্ টেরর"-এ এবং তারি প্রতিক্রিয়ায় জন্ম নিল নাপোলিয়নী ডিক্টেটরশিপ। বুর্জোয়ারা চার্চ এবং অভিজাতশ্রেণীকে উৎখাত করার ফলে নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতি শেষোক্তদের কোনো আনুগত্য গড়ে উঠল না; এ ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটানোই হয়ে উঠল এদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অন্যধারে উনিশ শতকে যন্ত্রবিপ্লবের ফলে বুর্জোয়াদের নতুন শত্রু হিসেবে দেখা দিল শ্রমিক শ্রেণী। কিন্তু ফরাসী বুর্জোয়ারা রফা করতে শেখেনি। ফলে দুধার থেকে আক্রান্ত হয়ে তারা ক্রমেই সমাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিতে লাগল। উদারতন্ত্রের সম্প্রসারণশীল জীবনবোধকে বর্জন করে তারা রাষ্ট্রকে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ টিঁকিয়ে রাখার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করল। সুতরাং ফ্রান্সে উদারতন্ত্র বুর্জোয়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় সামাজিক ঐতিহ্য হিসেবে গড়ে না উঠে শুধু নিষ্প্রাণ নিয়মকানুনে পর্যবসিত হল। ১৮৩০ থেকে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ ফরাসী বুর্জোয়াদের আত্মপরীক্ষার যুগ। ১৮৪৮-এর পর থেকে ফরাসী বুর্জোয়ারা সম্পূর্ণভাবে প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতৃত্ব ত্যাগ করে শুধু নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ রক্ষায় ব্রতী হল। ফরাসী জনসাধারণও উদারতান্ত্রিক সহনশীলতা এবং সহযোগীতার আদর্শে দীক্ষিত হয়নি। ফলে ঘটল বিপ্লবের ব্যর্থ চেষ্টা, আর তারি প্রতিক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হল লুই নাপলিয়ঁ-র ডিক্টেটরশিপ। ফ্রান্সে গণতন্ত্রের সঙ্গে উদারতন্ত্রের মিলন ঘটল না। দক্ষিণপন্থা এবং বামপন্থার উগ্র সংঘাতের মধ্যে উদারতন্ত্রের সমাধি রচিত হল।

শাপিরোর মতে ইতিহাসের ধারায় এই পার্থক্যের ফলে ইংল্যাণ্ডে জন স্টুয়ার্ট মিলের মত মনীষী বুর্জোয়া উদারতন্ত্র থেকে গণতান্ত্রিক উদারতন্ত্রে বিবর্তনের পথ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে পেরেছিলেন; এবং সে কারণে তাঁর চিন্তা শ্রেণী এবং দলনির্বিশেষে ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনে গভীর প্রভাব ফেলতে পেরেছে। অপরপক্ষে তাঁরই সমসাময়িক ফরাসী উদারতন্ত্রী আলেক্সিস দ তকভিল স্বদেশে উদারতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে বিরোধ দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন, এবং এ-দুয়ের মধ্যে মিলন ঘটানোর জন্যে তাঁর আজীবন প্রয়াস তাঁর আপন দেশবাসীর ওপরে প্রায় কোনো প্রভাব ফেলেনি। আবার যে-ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডে কার্লাইলের বীরপূজার আদর্শ সমাজের বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি, সে-ক্ষেত্রে ফ্রান্সে প্রুধোঁ-র প্রচ্ছন্ন শক্তিবাদ বৈনাশিকতার ধারাকে পরিপুষ্ট করেছে। ফরাসী দেশে উদারতান্ত্রিক জীবনবোধ শেকড় ছড়াতে না-পারার ফলে সেখানে অভিজাত সম্প্রদায়, বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সাধারণ মানুষদের মধ্যে কোনো সহযোগীতার ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। হিটলারী আক্রমণের সামনে ফ্রান্সের পতন তাই আকস্মিক নয়, প্রত্যাশিত।

উদারতন্ত্রের অবক্ষয়ের ফলে ফরাসী সমাজে বুর্জোয়ারা কি করে ফাসিজম্-এর প্রতি আকৃষ্ট হল, শাপিরো তারি আলোচনা করেছেন। কিন্তু ফ্রান্সে শুধু ফাসিজম্-ই প্রবল হয়ে ওঠেনি; সম্প্রতিকালে সেদেশে কম্যুনিজম্-এর প্রতিপত্তিও অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের ওপরে। কি করে তা সম্ভব হল, সম্প্রতি একটি গ্রন্থে ফরাসী সমাজবিজ্ঞানী রেমঁ আঁর সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আরঁ-র কথা আগামীবারে বলব।

উনিশ শ পঞ্চাশের নেপাল

ভোলা চট্টোপাধ্যায়

॥ ৭ ॥

পাটনায় দেবেন্দ্রপ্রসাদ সিং-এর গৃহ নেপালী কংগ্রেসের সাময়িক হেড-কোয়ার্টার্সে পরিণত হইয়াছিল। এই পৃথিবীতে কতকগুলি মানুষ সব সময়েই দেখা যায় যাহারা অপরের জন্য বাঁচিয়া থাকে, ইহার জন্য কোন কৃতজ্ঞতা অথবা লোকস্তুতির প্রত্যাশা তাহারা করে না। ইহারা পরোক্ষে আদর্শের পূজা করিয়া থাকে প্রত্যক্ষভাবে সেই আদর্শে বিশ্বাসী মানুষের কাজে নিজেদের উৎসর্গ করিয়া। ইহা ভাল কি মন্দ জানি না, তবে এই ধরনের মানুষকে শ্রদ্ধা না করিয়া উপায় নাই। আইনজ্ঞ দেবেন্দ্রপ্রসাদ এই ধরনের মানুষ। সমাজবাদীদের প্রিয় সাথী, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বিশিষ্ট সৈনিক বিশ্বেশ্বরের প্রিয়তম বন্ধু। এই দেশে এই মানুষটির গৃহই ছিল বিশ্বেশ্বরের সর্বপ্রধান আশ্রয়। বিশ্বেশ্বরের অত্যন্ত কঠিন দুর্দিনে দেবেন্দ্রের বন্ধুত্ব অধিকতর ঘনিষ্ঠতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। বিশ্বেশ্বরের সুদিনে তিনি নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়াছেন। বিশেষ সুখময় ছিল না দেবেন্দ্রপ্রসাদের জীবন, কোথায় যেন একটা ছোট বেদনা লুকানো ছিল তাঁহার জীবনে। অনুভব করিয়াছি; কিন্তু কোন দিন ইহা জানিবার চেষ্টা করি নাই। ভবিষ্যতে বহুবার দেবেন্দ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে; কিন্তু কখনও তাঁহার নিকট জ্যেষ্ঠের স্নেহ ও বন্ধুর প্রীতি হইতে বঞ্চিত হই নাই। সমস্ত হাতিয়ার এইখানে হাজির করা হইল। বাড়িটি ছিল ছোট এবং ইহার সবগুলি কক্ষই মানুষ ও জিনিসে ভর্তি হইয়া গিয়াছিল। উহারই ভিতর হাতিয়ারের বাক্সগুলি রাখিয়া দেওয়া হইল। একটি ঘরে মাঝারি আকারের একটি শক্তিশালী ট্রান্সমিটার বসান হইয়াছিল; এবং ইহার মারফত মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন ঘাঁটিতে মুখ্য কর্মীদের পাটনায় আসিবার জন্য সংবাদ দেওয়া হইল। হাতিয়ার এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবার জনাই ছিল এই আহ্বান।

তারিণীদের গৃহে সভা হইতেছে, বিরাটনগরের মুখ্য মুক্তি সংগ্রামীরা সকলেই উপস্থিত। হাতিয়ার মিলিয়াছে, অতএব পরবর্তী কার্যসূচী নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক—ইহাই ছিল আলোচনার বিষয়-বস্তু। বিভিন্ন প্রকার প্রস্তাব সভার সামনে রাখা হইয়াছিল। নেপালী কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের উপর বিরাটনগর এলাকার সংগ্রামের কার্য পদ্ধতি নির্ধারণ করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছিলেন। এই দায়িত্বের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলেই সমানভাবে সচেতন। সামান্য হটকারিতাও অশেষ ক্ষতিসাধন করিতে পারে; অতএব বিশেষ সতর্কতার সহিত সংগ্রাম পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। এই কথাগুলি বলিয়া গিরিজা অন্যান্য সাথীদের নিজ নিজ অভিমত জানাইবার জন্য অনুরোধ করলেন। খানিক সময় অন্যান্য কথাবার্তায় কাটিবার পর শিভারী নিজের মতামত জ্ঞাপন করিলেন। ত্রিশ বৎসরের স্বল্পভাষী এই যুবকটিকে শত্রুমিত্র সকলেই শ্রদ্ধা করিত। চেহারা অথবা কথাবার্তা হইতে এই মানুষটিকে সমস্ত প্রকার হিংসাত্মক কার্যাবলীর বিরোধী বলিয়াই অনুমিত হইত। কঠোর আদর্শবাদী এই মানুষটির

নেপালের পুরাতন রাজপ্রাসাদ : বর্তমানে ট্রেজারী

সহিত বহুদিন বিভিন্ন ব্যাপারে মতবিরোধ হইয়াছে। অতিনিষ্ঠা আমার জীবনে কোন দিন স্থান পায় নাই। সত্য কথা বলিতে আপত্তি নাই যে, অতিনৈষ্ঠিকদের সম্পর্কে আমি কিছুটা অশ্রদ্ধামূলক ধারণাই পোষণ করিয়া থাকি। শিভারী বহু বিষয়েই অতিনৈষ্ঠিক। তথাপি কোনদিন এই মানুষটিকে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ইহার মস্ত কারণ ছিল যে, এই মানুষটির রুক্ষ বহিরাবরণের ভিতরে ছিল একটি চিরন্তন ব্যথা-কাতর ত্যাগীর অন্তর। আর একটি গুণ তাহার ছিল, যাহা সেই সময়কার পরিস্থিতিতে একান্তই দুর্লভ। যত দুর্দিনই হউক, প্রয়োজনের সময় শিভারী সকলের অজান্তে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিত। কেমন করিয়া সংগ্রহ করিত তাহা আজও আমার কাছে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য।

শিভারী যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, সাংগঠনিক অবস্থার দুর্বলতা ও সংগৃহীত হাতিয়ারের স্বল্পতা মিলাইয়া বর্তমানের যে বাস্তব পরিস্থিতি তাহাতে রাণা ফৌজের বিরুদ্ধে সম্মুখ সংগ্রাম বিশেষ সফল হইবে না। সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপে রাণাসাহীর অত্যাচার বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে সাধারণ মানুষের জীবন অনাবশ্যকভাবে বিপন্ন হইবে। অবশ্য ইহা ঠিক যে, রাণা-সাহীর পাশবিকতা কাল বিলম্ব না করিয়া প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। কিন্তু তাহার পূর্বে যে কোন উপায়ে প্রস্তুতি আবশ্যক। শিভারীর যুক্তি উপস্থিত কাহারও মনঃপূত হইল না। তরুণ সাথী শিবজঙ্গ রাণা উত্তেজিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সংগ্রাম করিবার জন্য আবেগময়ী বক্তৃতার ঢঙে নিজের মত প্রকাশ করিল। অন্যান্য রাণাদের ন্যায় রাণা বংশের সন্তান এই শিবজঙ্গও মোহন সামসেরের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। কিন্তু মোহন সামসেরের প্রতি তাহার হৃদয়ে ছিল সীমাহীন ঘৃণা এবং শত্রুতা। লড়াই একমাত্র জিনিস যাহা সে বুঝিতে পারে, এবং ইহাতে তাহার অপরিসীম আস্থা। আরও অনেকেই কালক্ষেপ না করিয়া সংগ্রাম শুরু করিবার পক্ষে মত জানাইল।

তারিণী এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল। সকলে তাহার মতামত জানিতে চাহিল এবং ইহার কতকগুলি বিশেষ কারণ ছিল। কাহারও ইহা অবিদিত ছিল না যে, দৈনন্দিন রাজনীতির গোলক-ধাঁধায় সে সময় ব্যয় না করিলেও মুক্তি সংগ্রামে তাহার সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য। অমানুষিক সাহস, ক্ষুরধার উপস্থিত বুদ্ধি এবং সর্বোপরি নিজের জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার মত মনোবল এই লঘুভাষী মানুষটির ছিল। শুধু তাহাই নহে, তারিণীর কয়েকজন নিজস্ব গুপ্তচর ছিল যাহাদের মারফত শত্রু-পক্ষের অনেক গোপন সংবাদ তাহার নিকট পৌঁছাইত। তাহার ভগ্নী ইন্দিরার স্বামী বিরাটনগরের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় ডাক্তার এবং এই ব্যক্তিও তাহাকে শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের কার্যে বিশেষ সাহায্য করিতেন। তারিণী অতি সংক্ষেপে তাহার বক্তব্য শেষ করিল। বিরাটনগর এলাকার মুক্তি-সংগ্রামীদের শক্তি সম্পর্কে সঠিক সংবাদ না থাকার ফলে, স্থানীয় রাজপ্রমুখ মুক্তি-সংগ্রামী ও তাহাদের আত্মীয় স্বজনকে ধরপাকড় করিতেছে না। কিন্তু নির্ভরযোগ্য সূত্রে সংবাদ মিলিয়াছে যে, অল্প কয়েক দিনের মধ্যে কাঠমাণ্ডু হইতে যথেষ্ট সংখ্যক রাণা সৈন্য বিরাটনগরে পৌঁছাইলেই মুক্তি সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হইবে।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারী ফৌজ ও পুলিসের বিরুদ্ধে আক্রমণের ফলে পরিস্থিতি বিশেষ জটিল আকার ধারণ করিয়াছে; সুতরাং শত্রুর আক্রমণের পূর্বেই মুক্তি সংগ্রামীদের আঘাত হানা উচিত। তারিণীর ভাষা ভাবপ্রবণতা-শূন্য কিন্তু যুক্তি অকাট্য। বিশ্ববন্ধু এবং গিরিজা সাগ্রহে ইহা সমর্থন করিল। সংগ্রাম পরিষদের উপর একটি পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য ভার দেওয়া হইল। শহীদের রক্তে বিরাটনগরের তৃষিত মাটির তৃষ্ণা মিটিবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

সেইদিন গভীর রাত্রে গিরিজা, বিশ্ববন্ধু, শিভারী, তারিণী এবং অন্যান্য কয়েকজনকে লইয়া পরিকল্পনা স্থির করিবার জন্য বৈঠক হইল। হিসাব করিয়া নির্ধারিত হইল যে, সব মিলাইয়া একশতের মত হাতিয়ার আছে। ইহার মধ্যে স্টেনগানের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক। হাতিয়ারসমূহ ব্যবহার করিতে সক্ষম এইরূপ দেড়শতেরও অধিক সংগ্রামী যে-কোন প্রকার আদেশ পালন করিতে প্রস্তুত। চেষ্টা করিলে এই সংখ্যা বাড়ান যাইতে পারিবে। শত্রুপক্ষের ফৌজ এবং পুলিস মিলাইয়া সর্বসাকুল্যে দেড় হইতে দুই হাজারের মত সশস্ত্র মানুষ আছে। ইহারা সমগ্র এলাকায় ছড়াইয়া আছে। অবশ্য লড়াই শুরু হইলে ইহাদের মধ্যে অনেকেরই দলত্যাগ করিয়া মুক্তিসংগ্রামীদের পক্ষে যোগদান করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অবশ্য এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থিতিশীল সংগ্রামে লিপ্ত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। ন্যূনতম সময়ের ভিতর সরকারী ক্ষমতার ঘাঁটিগুলি যথা, পুলিস আস্তানা, অস্ত্রাগার, ট্রেজারী, ফৌজী পদস্থ কর্মচারীদের ছাউনি, জেল এবং রাজপ্রমুখের প্রাসাদ ধ্বংস করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। ইহাতে কৃতকার্য হইলে এই অঞ্চলে অরাজকতা সৃষ্টি হইবে এবং তাহার ফলে মুক্তিসংগ্রামীদের বিশেষ সুবিধা হইবে। অবশ্য সরকারী ফৌজের প্রশ্ন রহিয়াছে কিন্তু শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিকল করিয়া দিতে পারিলে, নেতৃত্ব এবং নির্দেশের অভাবে সরকারী ফৌজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। ফৌজী বিভাগে প্রচুর অসন্তোষ রহিয়াছে রাণাসাহীর বিরুদ্ধে। নিয়মিত রসদ এবং বেতনের অভাবে ফৌজের ভিতর প্রচুর বিশৃঙ্খলা রহিয়াছে। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দুর্নীতি এবং দুর্ব্যবহারে এই বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছিয়াছে। এই সকল সংবাদ তারিণীর গুপ্তচরদের মারফত সংগৃহীত হইয়াছে। শুধু ইহাই নহে ফৌজের ভিতর নেপালী কংগ্রেসের সমর্থকেরও অভাব নাই। তাহাদের মারফত এই প্রস্তাব প্রেরণ করা প্রয়োজন যে, যদি তাহারা মুক্তিসংগ্রামীদের বিরুদ্ধে হাত না উঠায় তবে বিরাটনগরে রাণাসাহী শাসন

নেপালী তরুণী : পিঠে ধানের বোঝা

খতম হইবার পর, মুক্তিসংগ্রামীরা রাণা ফৌজের সাধারণ সৈনিকের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা লইবে না। ইহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে ফৌজের বিরুদ্ধে গেরিলা সংগ্রাম ব্যতীত গত্যন্তর নাই। স্থির হইল যে, তিন দিনের ভিতর সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার পর ঐ দিন রাত্রিতে অভিযান শুরু হইবে। নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার সময় মুক্তিসংগ্রামীদের বিরাটনগর হইতে প্রায় চারি মাইল দূরে একটি বন্ধুভাবাপন্ন গ্রামে জমায়েত হইবার নির্দেশ দেওয়া হইল। গিরিজা এবং আমার উপর হাতিয়ারগুলির কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করিবার দায়িত্ব রহিল। আলোচনা যখন সমাপ্ত হইল, ঊষার আলো ফুটিতে তখন বেশী দেরি নাই।

এখনও চব্বিশ ঘণ্টা বাকি আছে। ঝড়ের পূর্বাভাস সর্বত্রই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। কখন ঝড় উঠিবে, কেহই ঠিকমত বলিতে পারে না, কিন্তু ঝড় যে উঠিবে এই সম্পর্কে সাধারণ মানুষ একমত। কোনদিক হইতে আঘাত আসিবে অথবা কোনপক্ষ প্রথমে আগুন জ্বালাইবে সে সম্পর্কে মুক্তিসংগ্রামীরা ব্যতীত অন্য কাহারও কোন নিশ্চিত ধারণা ছিল না। এই অজ্ঞতার শূন্যস্থান পূরণ করিয়াছিল রঙিন গুজব।

মুক্তিসংগ্রামীদের ক্ষমতা সম্পর্কে বহু অতিরঞ্জিত কাহিনী লোকের মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। অনেকের বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছিল যে, দিল্লী সরকার মুক্তিসংগ্রামীদের সমর্থন করেন। শুধু ইহাই নহে, প্রয়োজন হইলে মুক্তিসংগ্রামীরা বোমারু বিমানের সাহায্যে সরকারী ফৌজকে ধ্বংস করিয়া দিবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এইরকম গুজব প্রচারিত হইয়াছিল। ইহা অলস মনের কল্পিত কাহিনী। এই সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনের গোপন ইচ্ছার প্রতিচ্ছবিও যে ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য বিরাটনগরের পাটকল আর চিনিকলের ভারতীয় মালিকদের এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্য ধারণা। একটি ছোট ঘটনা হইতে ইহা পরিষ্কার হইবে। বিরাটনগর জুটমিলের মালিক রাণাসাহীর সক্রিয় সমর্থন হইতে কোনদিন বঞ্চিত হন নাই। আয়করহীন দেশে জুটমিলের মুনাফা চক্রাকারে বাঁধি পাইত এবং মিলের মালিকও কোনদিন মোহন সামসেরকে ইহার অংশ দিতে কার্পণ্য করিতেন না। মুক্তিসংগ্রামীরা নেপালী কংগ্রেসকে কিছু অর্থ সাহায্য করিবার জন্য এই ব্যক্তিকে

অনুরোধ জানায়, জবাবে তাজিহুল্যের সহিত তিনি বলিয়াছিলেন যে, রাণাসাহেবকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার পর সাহায্য ভিক্ষা করিলে তিনি চিন্তা করিয়া দেখিবেন। যাহা হউক আবেগ, উত্তেজনা ও গুজবে মিলিয়া এক রহস্যময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বরের মা নির্লিপ্ত নির্বিকার-ভাবে অন্যান্য সময় অতিথি ও আমার ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

অসংখ্য নক্ষত্রখচিত আকাশের অতৃপ্ত আলোর তৃষ্ণা সমস্ত পৃথিবীকে নিশ্ছিদ্র, নিবিড় ও অন্তহীন অন্ধকারে ঢাকিয়া দিয়াছিল। ঘন কালো জমাটবাঁধা সেই অন্ধকার। শুনেরাছিলাম অন্ধকারের এক অপরূপ রূপ আছে যাহা মনের চক্ষুকে ফাঁকি দিতে পারে না। কিন্তু সেই রাত্রিতে বাহিরের অন্ধকার মনের আঁধারকে আরও অসহনীয় করিয়া তুলিল, তাহার বিশ্ব-ভুলানো মোহনরূপ একান্তভাবেই অন্ধকারের গভীরে লুক্কায়িত রহিল। (ক্রমশ)

ষোল

ছোটকর্তাকে ভয় খায় না, সমীহ করে না, এমন লোক কমই আছে এ অঞ্চলে। বড় ডাকাবুকো লোক। ডাকসাইটে দারোগা। অসুরের মত তাঁর চেহারা! একটু খাটো কিন্তু শরীরখানা যেন পেটা লোহায় তৈরী। কালো রং, চোখ-দুটো লালচে লালচে, নাকের নিচে প্রকাণ্ড এক কাইজারি গোঁফ। গলার আওয়াজে যেন মেঘ গুড়গুড় করে। কে বলবে, বয়েস তাঁর চল্লিশ পার হয়েছে।

অনেক দিন পরে বাড়ি এলেন ছোট-কর্তা। এসে দেখলেন ভালই লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও তাঁর নজরে পড়ল, বাড়িটার জৌলুস যেন আগের মত আর নেই। যেন বুড়ো হয়ে পড়ছে বাড়িটা। আগে গুদোম বাড়ির মাঠকোঠার গায়ে প্রতি বছর চুনের কলি ফেরানো হ'ত। চকচক করত কোঠাটা। এখন কেমন ভোঁতা ভোঁতা দেখাচ্ছে। কে জানে কতদিন চুন পড়েনি তার গায়ে। সিমেণ্টের সিঁড়ির দুপাশে হাতির শুঁড়ের বর্ডার। ফরমায়েস দিয়ে বানিয়েছিলেন বড়দা। অযত্নে সেই হাতির মাথার সিমেণ্ট খসে গিয়েছে। একটা দাঁতও কি করে যেন ভেঙেগেছে। চোট খেয়েছে শুঁড়ের ডগাটা। পৈঠেগুলোও একের পর এক এবড়ো খেবড়ো হয়ে উঠছে। বল্টু বসানো বসানো মজবুত দরজার নক্‌শাগুলো আগে কেমন চমক মারত। এখন লোহার বল্টুতে মর্চে ধরেছে। নক্‌শার রং উঠে গেছে। দরজার কব্জা ঢিলে হয়েছে। চৌকাঠে কুমরে পোকার মাটির দুর্গ একের পর এক সংখ্যায় বেড়েছে।

ঢেঁকি ঘরের চারধারে আগে সুন্দর করে বেড়া দেওয়া ছিল। দুধারের বেড়া এখন ভেঙে পড়ছে। ধান সিদ্ধ করার মাটির বড় বড় মাটগুলোর একটাও আস্ত নেই।

তাঁর নিজের ঘরটার অবস্থাও ভাল না। মেজদার ঘর তো কবেই পড়ে গিয়েছে। গুদোমে আশ্রয় নিয়েছে মেজদা।

ছোটকর্তা ভাবলেন, বড়দা নিরন্তর থাকেন বাড়িতে, তাই হয়ত এসব জিনিস এমন করে তাঁর নজরে পড়ে না। অবিশ্যি বড়দার বয়েসও হয়েছে। এসব নজরে পড়লেও, তদারকি আর তাঁর সামর্থে কুলায় না। মেজদা তো চিরকালের উদাসীন।

এত বড় বাড়ির তদারক করা জোয়ান লোকের কর্ম। তাঁর সময় থাকলে হাত লাগাতেন এ কাজে। কিন্তু তিনি কি জোয়ান? জোয়ান ছাড়া কি? বয়েস বেড়েছে, সেই জন্যই কি এই প্রশ্ন? এই সন্দেহ? তা বাড়ুক না বয়েস। বয়েস বাড়লেই লোক বুড়ো হয় নাকি? এখনও তিনি একটানা তিরিশ চল্লিশ মাইল ঘোড়া দাবড়াতে পারেন। একটুও হাঁফ ধরে না।। তাঁর হাতের রুদ্দা খেলে এখনও জাঁহাবাজ বদমায়েস গুণ্ডা ত্রিভুবন অন্ধকার দেখে। এক জায়গায় বসে একটা গোটা পাঁঠা খেয়ে নিতে পারেন। পুরো এক বোতল বিলিতি মদ সাবাড় করলেও কর্তব্যে তিলমাত্র ত্রুটি হয় না। কালিগঞ্জে দুটো মেয়েমানুষ তাঁর বাঁধাই ছিল। না, বুড়ো হবার কোন লক্ষণ নেই, সময়ও নেই তাঁর। বুড়ো হতে যাবেন কোন দুঃখে।

তাঁর হাতে যে সময় নেই, নইলে বাড়িটার ছিরি ফিরিয়ে দিয়ে যেতেন। তবে, ছোটকর্তা মনে মনে ঠিক করলেন, ঝিনেদায় যদি কালিগঞ্জের মত অতদিন থাকতে পারেন, যদি তাঁকে হুট্‌ করে বদলি না করে, তবে বাড়ি ঘরের চেহারা পাল্টে ফেলবেন। এ কী কথা! তাঁরা এখনও সবাই জীবিত! এর মধ্যেই বাড়িটা অনাথা বিধবার সম্পত্তির মত হয়ে উঠবে কেন? এ বাড়ির হাল এখনই যদি এই হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে শেষ বয়সে দাঁড়াবেন কোথায়? ছেলেপুলেরা ভোগ করবে কি?

ছেলেপুলে? চকিতে ছোটকর্তার মনে হালকা একটা বেদনার ছাপ পড়ল। একটি মুহূর্ত মাত্র স্থায়ী হ'ল সেটা, তারপর এক ফুঁয়ে উড়ে গেল। ছোটকর্তা মনে মনে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, সুধা, সুধাই তো এ বাড়ির [illegible]। আমরা থাকতে এ বাড়ির হাল যদি এই হয়, সুধা তাহলে দাঁড়াবে কোথায়?

না, বড়দাকে বলে যেতে হবে, বাড়িটা যেন মেরামত করে ফেলেন। যতদিন আমরা জীবিত আছি ততদিন দেওয়ানবাড়ি যেন দেওয়ানবাড়ির মতই থাকে।

এর আগেও তো মাঝে মাঝে বাড়িতে এসেছেন ছোটকর্তা। এসেছেন, কিন্তু কত-ক্ষণ আর থেকেছেন বাড়িতে। ছোটকর্তার প্রাণের টান, টানের রশিটা তখন অন্যত্র,

অন্য গাছে টনটনে হয়ে বাঁধা ছিল। অন্য কোথাও, আর কিছুতে মন দেবার ফুরসত ছিল কোথায়?

এবার সেই বাঁধা নিয়ম পালটে গেল। এই প্রথম, বাড়িটার উপর যেন তাঁর চোখ পড়ল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতে লাগলেন ছোটকর্তা। ঘুরতে ঘুরতে তিনি কুঁয়োতলায় এসে পড়লেন। ভবল চাড়ির কুঁয়ো। কিন্তু ভাঙতে ভাঙতে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, ভয় হয়, একদিন না একেবারে ধসে পড়ে। কুঁয়োতলাটায় ঢেঁকিশাকের জঙ্গল জমে গেছে। যে বাঁশের ডগায় বালতি বেঁধে জল তোলা হয়, সেটা এত পুরনো, এমন নড়বড়ে হয়েছে আর এমন মচ্‌মচ্‌ করে, যে মনে হয় এই বুঝি সবসুদ্ধ মাথায় ভেঙে পড়ল। দেখে তো ছোটকর্তা অবাক। এ কুঁয়োয় তো মানুষ খুন হল বলে! না না, এ সব চলবে না। বড়দাদাকে একটা পাকা ইঁদারা বানাতে বলে যেতে হবে। এমন ইঁদারা, যা পঞ্চাশ ষাট বছর অনায়াসে টিঁকবে। সুন্দর একটা কপিকল লাগাতে হবে ইঁদারায়। তাহলে আর বাঁশের ঢেঁকিকলে জল তুলতে হাত ব্যথা হবে না কারো, মাথায় বাঁশ ভেঙে কারো মরার ভয় আর থাকবে না। সুধার বউ এসে কপিকলে জল তুলবে। মোটেই কষ্ট হবে না তার। সুধার নাতিরা এসেও সেই ইঁদারার জল খাবে। শুনবে, তাঁদের ঠাকুরদাদার বাপ কাকারা এই ইঁদারা বানিয়ে গিয়েছে। কি ছিল তাঁদের নাম? অহি, মহি আর শীতল। তিন ভাই ছিল একেবারে হরিহর আত্মা। ছোটকর্তা ভাবলেন, ইঁদারাটার গায়ে তাঁদের নাম খোদাই করে রাখলে কেমন হয়? যতদিন ইঁদারাটা থাকবে, ততদিন তাঁরা বেঁচে থাকবেন তাঁদের বংশধরদের মধ্যে। কত পুরুষ ধরে কে জানে?

এ এক নতুন অনুভূতির স্বাদ পাচ্ছেন ছোটকর্তা। দিনরাত চোর ছেঁচড় ডাকাত, খুন জখম, জালিয়াতি জুয়াচুরি, বাটপাড়ি তদন্ত তল্লাসী মামলা মোকদ্দমা কোর্ট কাছারি নিয়েই তাঁকে পড়ে থাকতে হয়। নিয়ত বিচরণ করতে হয়, হিংস্র, নৃশংস, রুক্ষ এক জগতে। তাঁর দিনরাতের ভাবনা থেকে স্নেহ প্রেম ভালবাসা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছে কবে!

আজ এ কী হ'ল? বুড়ির ছেলেটাকে কোলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সে অপকর্ম করে দিল তাঁর পোশাকে। পাষণ্ডদমন খাকির পোশাকটা ছাড়তে যেন বাধ্য করল তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সত্তার দারোগাগিরির খোলসটা যেন জোর করেই ছাড়িয়ে দিল ঐ শিশু। তাঁর মধ্য থেকে বের করে আনল স্নেহময় মমতাময় অন্য একটা শীতলকে। এই নতুন শীতলের কোনখানেও আর দারোগার ছাপ লেগে নেই। এই শীতল এখন পুরোপুরি এক গৃহস্থ, এক দাদু।

জীবনের এ এক নতুন স্বাদ পাচ্ছেন ছোটকর্তা। এক নতুন বর্ণ, নতুন গন্ধ, নতুন অর্থ। এই প্রথম তিনি বুঝতে পারলেন, হঠাৎ বুঝলেন, শুধুমাত্র দারোগাগিরিতেই, তার অশুচি পরিবেশেই, শেষ হয়ে যাবে না তাঁর জীবন। তাঁর যদি মৃত্যু হয় এখন, তবুও বিনষ্ট হবে না তাঁদের পারিবারিক জীবনের ধারা। আজ বুড়ির ছেলে হয়েছে, কাল সুধার ছেলে হবে, পরশু হবে চাঁপার। ওদের নাতিপুতি হবে। অনেক ঝরনার জল যেমন নানা স্রোতে বয়ে এসে, একটা বড় নদীতে মেশে, তারপর আবার ছড়িয়ে যায় নানা শাখায় প্রশাখায়, বয়ে নিয়ে যায় মূলস্রোতের জলধারা, তেমনি ওরাও ছোটকর্তাদের বংশের ধারাটি বয়ে বয়ে নিয়ে মিশে যাবে হাজারটি পরিবারে। এই হাজারটি পরিবারের মধ্যেই এঁদের অংশ কিছু না কিছু গচ্ছিত থাকবে। ছোটকর্তার অংশও থাকবে। অনেককাল থাকবে। হয়ত সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত। তার মধ্যে কারো না কারো চেহারায় কোন এক অজ্ঞাত, কি এক রহস্যময় প্রক্রিয়ার ফলে যখন তাঁর সাদৃশ্য দেখা দেবে, তখন সেই পুরুষের লোকেরা বলাবলি করবেঃ আরে! এর চেহারাটা দেখি শীতল দারোগার মত, অবিকল তাঁর মতই হয়েছে। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই গড়ন! হুবহু! কোন শীতল? না, ঐ যে আমাদের দেশের ভিটেবাড়িতে অক্ষয় ইঁদারার গায়ে তিন ভাইয়ের মধ্যে যাঁর নাম আছে, সেই।

ছোটকর্তা লেখাপড়া শেখেননি। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে এ জিনিস সঠিক কিনা, তা নিয়ে তাঁর মনে কোন প্রশ্ন দেখা দিল না। মন বরং বিনাদ্বিধায় এই সিদ্ধান্ত মেনে নিল। মেনে নিয়ে সুখ পেল।

বেলা পড়তেই এক জামবাটি গরম দুধ খেয়ে জিভ দিয়ে গোঁফ মুছতে মুছতে বারবাড়িতে এসে বসলেন। বড়কর্তা পাশার ছক পরিপাটি করে পেতেই রেখেছিলেন। একমাত্র শীতল এলেই এই খেলা যা জমে। শীতল বড়কর্তার মনের মত খেলুড়ি। আগে অনেকেই এ খেলাটা জানত। তাঁদের অনেকে মরে হেজে যাওয়ায় বড়কর্তা এ পাট প্রায় তুলেই দিয়েছেন। আনাড়িদের সঙ্গে খেলে সুখ হয় না।

শীতল এসে বসতেই খেলা শুরু হ'ল।

আর দু চার দানের পরেই খেলা জমে উঠল।

ছোটকর্তার ইচ্ছে ছিল, খেলতে বসেই বাড়ি সারাবার কথাটা বড়কর্তার কাছে পাড়বেন। কিন্তু তার আগেই, বড়কর্তা এমন তেড়ে দান ফেলতে লাগলেন যে সামলাতে সামলাতে বাড়ির চিন্তা ছোটকর্তার মাথায় উঠে গেল।

অনেক দিন পরে বাড়ি এসেছে শীতল। বদলি হবার কথা ছিল মাগুরোয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝিনেদাতেই বদলি হয়ে এল। ভালই হ'ল, বড়কর্তা ভাবছিলেন, এখন অঘরে সঘরে দেখা সাক্ষাৎটাও তো হবে। শীতল অবশ্যি বলছিল, এটা টেম্পোরারি বদলি। কবে কোথায় যেতে হয়, ঠিক নেই। বড়কর্তার ইচ্ছে ছিল, শীতলকে জিজ্ঞাসা করবেন, ঝিনেদায় পাকা বদলি নিতে পারবে কি না সে। কিন্তু, বাপরে, শীতল করছে কি? পর পর এমন সব মোক্ষম দান ফেলছে যে বড় কর্তা কাহিল। প্রায় পাকান ঘুঁটিও মারবে নাকি শীতল? অচিরেই পাশার দানে ডুবে গেলেন বড়কর্তা।

খাওয়ার ডাক যখন পড়ল, তখন দুই ভাইয়ের ধ্যান ভাঙল। ছোটকর্তা আজ সুবিধে করতে পারেন নি। দুটো দান চটিয়ে দিয়েছেন, একটা দানে হেরেছেন। কাজেই হারই হয়েছে তাঁর। হার হ'ত না, যদি না মাঝে মাঝে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন, অন্যমনস্ক তিনি হতেন না, যদি গলাটা ভিজিয়ে নিতে পারতেন। এটা তাঁর গলা ভেজাবার সময়। একটি পাঁট দিশী টেনে যদি বসতে পারতেন, তো দেখতেন কোন শালা পাশা খেলায় শীতল দারোগাকে হারায়। বড়কর্তা তাঁর দাদা, দাদাদের সামনে মদ খেয়ে এসে বসতে তাঁর এখনও বাধে। সে জ্ঞানটা তাঁর আছে। সে জ্ঞানটা তাঁর আছে বলেই তৈরী হয়ে বসতে তাঁর বেধেছে। তাই তিনি বার বার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন, খেলায় ভাল করে গা-ই লাগাতে পারেন নি। ভাল ভাল দান ফেলেও কাজের বেলায় গড়বড় করে ফেলেছেন। তাই তো হেরে গেলেন। এতো প্রায় ষড়যন্ত্র করে হারানো। মেজাজটা খচে গেল ছোটকর্তার।

রাগের চোটে হার্মোনিয়মের খিঁচে খিঁচে রীডের মত হাতির দাঁতের পাশা তিনটে নিয়ে দুহাতের তেলোয় এমন জোরে ঘষলেন যে সেগুলো খড়মড় করে আর্তনাদ করে উঠল। তারপর থপাস করে ওগুলোকে পাটির উপর ফেলে, বিরক্তি চেপে বেরিয়ে গেলেন।

এ বিরক্তি খাওয়া দাওয়ার পরও কাটল না ছোটকর্তার। একটা অস্বস্তি, একটা দুনিয়া-হারানো ফাঁকা ফাঁকা ভাব, মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। রাত নটা, সাড়ে নটা হবে। কালিগঞ্জ থানার হাবিলদার ব্যাটা এতক্ষণে বসন্ত সাউয়ের দোকানে খুব জমিয়েছে। তিনি তো নেই, আর কি, এখন ও ব্যাটাই রাজা হয়ে বসেছে। আর কালিন্দী মাগীও এতক্ষণে গণপতি বেনের পালোয়ান ছেলেটাকে বুকে তুলে নিয়েছে নিশ্চয়। হারামজাদী কি কম শয়তান! ছোটকর্তা জানেন, ইদানীং ছোকরাটা খুবই ঘোরাঘুরি শুরু করেছিল। কিন্তু তাঁর ভয়ে বেশিদূর এগোতে সাহস করেনি। জানে তো সবাই, সদ্য বিয়োনো বাঘিনীর কোলে তবুও হয়ত শোয়া যায়, কিন্তু শীতল দারোগার মেয়েমানুষের পাশে—উহুঁ, একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আজ আর কালিন্দীর কোন ভয় নেই। বাঘ সরে গেছে চিরকালের মত। শিয়াল কুকুর এখন স্বচ্ছন্দেই চড়তে পারবে তার নাগরদোলায়। একথা চিন্তামাত্রই ছোটকর্তার গায়ে বিরক্তি যেন বিছুটির চাবুক মারল।

মরুক গে কালিন্দী। যার সঙ্গে খুশি শুগে যাক। কিন্তু তিনি এই রাতটা যাবেন কার কাছে? অনেককাল গ্রাম ছাড়া। তাঁর ভাবের মানুষ যে ছিল, সে অনেক দিন আগেই এ পথ ছেড়ে ধর্মে মতি দিয়েছে। আগের বারই তা দেখে গিয়েছেন। তিলক কেটে কণ্ঠি পরে সে এখন গোঁসাই বষ্টুমি হয়েছে। এ গ্রামে তার এখন মান সম্মান খুব। যত ব্যাটা বদমায়েস কৃতকর্মের যন্ত্রণার হাত এড়াতে তার পায়ে হত্যে দিতে যায়। ছোটকর্তার কাছে সত্যিই এ একটা বড় বিস্ময়! কি করে লোকের এমন আশ্চর্য পরিবর্তন হয়! মানুষ চরিয়ে খেতে হয়, ছোটকর্তাকে। আসল নকল চিনতে ভুল হয় না। গোঁসাই বষ্টুমির ধর্মে কর্মে এক ফোঁটাও খাদ নেই। সে তিনি সেবার তাকে নতুন রূপে দেখামাত্র বুঝতে পেরেছিলেন।

সেবারও এই রকম অনেকদিন বাদে বাড়িতে ফিরেছিলেন ছোটকর্তা। সন্ধ্যাবেলায় দেহের কামড়ে এমনি অস্থির হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন গোপালদাসীর কাছে। কিন্তু গোপালদাসীর বাড়িতে পা দেবামাত্র বুঝলেন অন্য কোথাও, অন্য কারোও কাছে এসে পড়েছেন। বাড়িটাই শুধু বদলে যায়নি। মানুষটাও বদলেছে। ইস্তক ওর অথর্ব স্বামীটা পর্যন্ত।

বাড়িটার সদরে একটা আখড়া বসেছে। গোপালের মন্দির হয়েছে। আরতি হচ্ছিল তখন। নানা রকম ফুলের সুবাস বাড়িময় ভুরভুর করছে। আর পরিষ্কার তকতকে করে নিকানো উঠোন। কোথাও ছিটেফোঁটা ময়লা নেই।

ওখানে গিয়ে একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ছোটকর্তা। জুতো পায়ে উঠোন মাড়াতেই বাধ বাধ ঠেকল তাঁর। গোপালদাসী মিলের পাছাপেড়ে ফিনফিনে শাড়ি ভালবাসত। একখানা শাড়ি এনেছিলেন হাতে করে। এক বোতল মদ তাতে জড়ান ছিল। একখানা শাড়ি, এক বোতল মদ, গোপালদাসীর আশ্চর্য সুন্দর একটা দেহ, এই ছিল ছোটকর্তার গ্রামে এসে একটা রাত কাটাবার উপকরণ। যখনই আসতেন ছোটকর্তা, দেখতেন, তার অথর্ব স্বামীটা বারান্দায় বসে বসে ভুড়ুক ভুড়ুক তামাক খাচ্ছে। ছোটকর্তাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্য ভুড়ুক ভুড়ুক থামাত জরাগ্রস্ত, তার চোখে বিদ্বেষ আর ঘৃণা আর জিঘাংসার অদৃশ্য তীক্ষ্ণধার ছুরির ফলাটা

লিকলিক করে ছুটে বেড়াত। কিন্তু একটা শব্দও সে উচ্চারণ করত না। পর মুহূর্তেই তার হুকো আবার ভুড়ুক ভুড়ুক ডাক ছাড়তে শুরু করত। কিন্তু সেই লিকলিকে হিংস্র ছুরির ফলাটা সে আর গুটিয়ে নিত না। তিনি তার সেই ধারাল চোখের উপর দিয়েই গটগট করে গোপালদাসীর ঘরে ঢুকে যেতেন। গোপালদাসী হাসতে হাসতে আসত। তাঁর জুতোর ফিতে খুলে দিত। কাচানো একখানা, ছোটকর্ত্তারই দেওয়া শাড়ি কাপড় ছাড়বার জন্য এগিয়ে দিত। হাত মুখ ধোয়ার জল এনে বারান্দায় ছোট একটা জল-চৌকি পেতে দিত, পরিষ্কার একখানা গামছা ভাঁজ করে মাজা চকচকে গাড়ুর মুখে রেখে যেত। ছোটকর্ত্তা হাত-মুখ ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে, গোপালদাসীর পরিপাটি করে পাতা নক্সিকরা, বড়, ফর্সা কাঁথা দিয়ে মোড়া বিছানায় এসে আরাম করে বসতেন।

গোপালদাসী মুচকি হেসে ছোটকর্ত্তার প্রাণ কেড়ে নিত। বলত: তিষ্টা পায়েছে বুঝি? শিকের উপরকার হাঁড়ির মধ্যি গিলাসটা আছে, পা'ড়ে নিয়ে তিষ্টা মিটাতি থাক। আমি তামুক সা'জে আনি।

ছোটকর্ত্তা এলেই গোপালদাসীর দেহে পিরীতের ঢল নামত। প্রবল সেই জোয়ারের টানে টানে সে একখানা নতুন সরার মত বাড়িময় যেন ভেসে ভেসে বেড়াত। আর আশ্চর্য, তাই দেখতে দেখতে ছোটকর্ত্তার দেহের তাড়না একেবারে কমে যেত। ধীরে ধীরে যে নতুন অনুভূতিটার জন্ম হ'ত তাঁর মনে সেটা রুক্ষ নয়, রাক্ষস নয়, সেটা অনেক স্নিগ্ধ, অনেক প্রাণ জুড়ানো, মন ভরানো। তখন ছোটকর্ত্তার কাছে শুধুমাত্র সুন্দর, আঁটসাঁট দেহসর্বস্ব গোপালদাসীর আকর্ষণটা আর তত প্রবল থাকত না। এমন সুন্দর করে উঠোন নিকুতে পারে যে গোপালদাসী, যে এত ভাল কাঁথা সেলাই করতে পারে, শিকে বুনতে পারে, এত ভাল কথা বলে যে, এত সেবা করে, যত্ন করে যে, আব্দার করে যে, সেই গোপাল-দাসী পাটরানীর রূপ ধরে ছোটকর্ত্তার মনের সিংহাসনে বিরাজ করতে থাকত। মায়া মমতায়, প্রেমে ছোটকর্ত্তা কেমন যেন দুর্বল হ'য়ে পড়তেন, যেন পঙ্গুই হয়ে পড়তেন। অসাড় শিকারকে শিকারী বিড়াল যেমন খেলা করে গোপালদাসী তেমনি ছোটকর্ত্তার শিথিল ব্যক্তিত্ব নিয়ে ইচ্ছেমত খেলা করত। পিরীতের মানুষের হাতে নিজেকে স্বেচ্ছায় এমন বিলিয়ে দিয়ে যে কি অপূর্ব সুখ, গোপাল-দাসীর মত ভাবের মানুষের সংস্পর্শে যে কখনো আসেনি, সে কি করে বুঝবে? এ সুখের কাছে ঘর সংসার, প্রতাপ প্রতি-পত্তির সুখ বিলিতি মদের পাশে যেন বেলের পানা বলেই ছোটকর্ত্তার মনে হ'ত।

গোপালদাসী এমনি খানিক ছোটকর্ত্তার সামনে নানা ছন্দে ঘুরে, খানিক খানিক করে ঘরের কাজ সেরে, প্রায় মাঝ রাত্রে এসে যখন হুড়কো বন্ধ করত, তখন যে লোকটি ঢুলু ঢুলু চোখে, তার বিছানায় মোটা একটা পাশবালিশ কোলে নিয়ে বসে বসে দুলত, সে কিন্তু ছোটকর্ত্তা নয়; মদের নেশায় তার পুলকের আবেশে জরে যাওয়া সে একতাল পুতুল গড়ানো মাটি। গোপালদাসীর কারি-গরীতে সেই মাটি থেকে একটা নতুন পুতুল জন্ম নিত। গোপালদাসীর দেহের উত্তাপে তাতে নতুন করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ত। ভোর-রাত্রে একটা নতুন ছোটকর্ত্তা, বন্দর থেকে রং ফেরানো জাহাজের মত, বেরিয়ে যেত গোপালদাসীর বাড়ি থেকে। পুবের পাড়ার মুসলমান বাড়ির রাত প্রহরী কুঁকড়ো কোঁকোর কোঁ ডাক ছেড়ে তাকে বিদায় করত।

কিন্তু অভ্যাসবশে, দীর্ঘকালের অনুপ-স্থিতির পর, গোপালদাসীর বাড়িতে পা দিয়েই ছোটকর্ত্তা দেখলেন, আগেকার দুনিয়ার যাবতীয় দলিল তামাদি হয়ে গিয়েছে। পিছন ফিরে গেরুয়া কাপড় গায়ে জড়িয়ে গোপালের আরতি করছে গোপাল-দাসী, না না, গোঁসাই বষ্টুমি। ভক্তবৃন্দ তাকে ঘিরে বসে আছে। বারান্দায় জয়রাম বসে। তার স্থাণু দেহেও পরিবর্তনের রং লেগেছে। পাতলা পাতলা লম্বা চুলে ঝুঁটি বাঁধা। গায়ে নামাবলী। কপালে তিলক। গলায় তুলসীকাঠের মালা। হুঁকোর শব্দ স্তব্ধ। ছোটকর্ত্তার দিকে চেয়ে জয়রাম হাসল। তার চোখের ছুরি কোথায় গেল?

পুষ্পচন্দনে সুবাসিত সেই পরিবেশে সেদিন অনধিকার প্রবেশ করে ছোটকর্ত্তা বিলক্ষণ বোকা বনে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখের মদের গন্ধ, দেহের ঘামের গন্ধ যেন চারিদিক থেকে তাড়া খেয়ে আশ্রয় নেবার জন্য নিরীহ পোষা কুকুরের মত তাঁরই চার-পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বিলাতী মিলের মিহি শাড়ির মোলায়েম ভাঁজের মধ্যে লুকানো মদের বোতলটির কাঠিন্য এই প্রথমবার নিজের অস্তিত্ব জাহির করল।

ছোটকর্ত্তা কি আর করবেন, চুপচাপ সেই উঠানের এক পাশেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

আরতি শেষ হল। সবাই হরিধ্বনি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করল। গোঁসাই বষ্টুমি চরণামৃতের পাত্রটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতেই ছোটকর্ত্তার সঙ্গে তার চোখাচোখি হল। সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাই বষ্টুমির চোখ মুখে
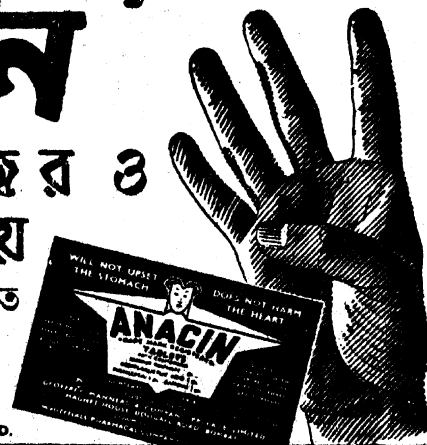
হাসির আলো জ্বলে উঠল। এ বড় স্নিগ্ধ আলো। এতে আভা আছে, তাপ নেই। এ হাসি ছোটকর্তার অচেনা।

দেখেই ছোটকর্তা বুঝলেন, এ হাসির বয়েস অনেক, চরিত্রও ভিন্ন। যার মুখে এ হাসি ফুটল, সে লোক আর যেই হোক, ছোটকর্তার সেই আগের মানুষটি নয়। ছোটকর্তার মনে ক্ষোভ হল না, তাঁর রাগও হল না। একটা আশা নিয়ে, একটা পিপাসা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। সে আশা মিটবার সম্ভাবনা নেই বুঝে তাঁর মনে হঠাৎ একটা শূন্যতার সৃষ্টি হ'ল। তারপর প্রচণ্ড ক্ষিধের সময় খাদ্য না পেলে পাকস্থলিতে যেমন জারক রস ঝরে ঝরে পড়ে, তেমনি তাঁর শূন্য মনে বেদনার রস ঝরে পড়তে লাগল।

গোসাই বষ্টুমি ধীরে সুস্থে ভক্তবৃন্দের হাতে চরণামৃত বিলোতে বিলোতে এক সময় ছোটকর্তার সামনেও এসে দাঁড়াল। বলল: খুব তিষ্টা পায়েছে না? হাত পাত তো, নাও তো এই চন্নামেত্ত, দ্যাখ তো তিষ্টা মেটে কি না?

এতক্ষণ নিজেকে ফিরে পেলেন ছোটকর্তা। কি ভাবে আমাকে, অ্যাঁ। আমাকেও কি ওদের দলে চালান করে দিল? না কি ঠাট্টা করছে বষ্টুমি? প্রবল একটা অট্টহাসি বুকের ভিতর থেকে ঠেলে বেরুতে চাইল। কিন্তু না, বষ্টুমি ঠাট্টা করেনি। ওর মুখে, চোখে, ওর ঠোঁটের কোথাও ঠাট্টা নেই। সেখানে গভীর এক বিশ্বাস। তাই আকাশ ফাটানো হাসিটা আর হাসলেন না ছোটকর্তা। বষ্টুমির এই গভীর বিশ্বাসটাই যে একটা চরম রসিকতা,, ও বেচারি তা জানে না। বোধ করি ভেবেছে, এই এক ফোঁটা চরণামৃতে জগাইমাধাইয়ের মত ছোটকর্তাও উদ্ধার হয়ে যাবে।

গোসাই বষ্টুমির মুখে সেই হাসি। হাতে ছোট্ট একটা পঞ্চপাত্রের হাতা। সেই হাতায় সুবাসিত চরণামৃত এক ফোঁটা শিশির-বিন্দুর মত টলটল করছে। হাতাটা সে এগিয়ে ধরল ছোটকর্তার দিকে। ভক্তবৃন্দেরা অধীর আগ্রহে কি হয় দেখবার জন্য, স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তাঁদের দিকে। ছোট-কর্তার খুব মজা লাগল এই খেলা দেখে। একবার ভাবলেন, চলে যাবেন। কিন্তু গোসাই বষ্টুমির মুখের দিকে চেয়ে সে ইচ্ছে চলে গেল তাঁর। ছোটকর্তার উপর কত গভীর আস্থা যে বষ্টুমি রাখে, তা তার মুখে আঁকা রয়েছে। সে যদি চরণামৃত না দিয়ে বিষও দেয়, তবুও সেটা ছোটকর্তা তার হাত থেকে অম্লানবদনে নিতে পারেন। বষ্টুমির মুখে সে কথা যেন পাকা কালিতে লেখা রয়েছে। এ বিশ্বাসটা ভেঙে দেবার কথা মনে হতেই ছোটকর্তার মনে কষ্ট হ'ল। ছোটকর্তার বয়েস হয়েছে। ও সব ছ্যাংড়ামি করতে ইচ্ছে হ'ল না; তা ছাড়া ঐ গাড্ডাল ভক্তগুলোর সামনে বষ্টুমিকে অপদস্থ করতেও মন চাইল না ছোটকর্তার। তিনি হাত বাড়িয়ে চরণামৃতটুকু নিয়েই গলায় ঢেলে দিলেন। তারপরে আন্তরিকভাবেই বললেন: না গো, গোসাই বষ্টুমি, আমার তিষ্টা এতে মিটবে না।

গোসাই বষ্টুমি খুব খুশী হয়েছিল। বলেছিল: আজ না মিটুক, গোপাল একদিন তুমার তিষ্টা মিটাবেনই মিটাবেন। দেখো, এ আমি কয়ে দিলাম।

তারপর ভাঁজ করা শাড়িটা দেখে ছেলে-মানুষের মত খুশী হয়েছিল বষ্টুমি। বলেছিল: বেশ সুন্দর কাপড়খান দ্যাও আমারে। আমি ওখান ছুপোয়ে পরব। শাড়িটা দিতেই বষ্টুমি টের পেল ওর মধ্যে মদের বোতল আছে। তেমনি হাসি হেসেই সে বলেছিল: আমি সবই রাখে দিলাম। জয় গুপোল বলে শাড়ি সুদ্ধু হাত তুলে গোপালকে প্রণাম করল বষ্টুমি। ছোটকর্তাও হাঁটা দিলেন। যেতে না যেতেই পিছন থেকে থেকে ভক্তরা জয় জয় রাধেকৃষ্ণ। হরি হরি বোল বলে ধ্বনি দিয়ে উঠল।

এবার আর ছোটকর্তা হাসি চাপতে পারলেন না। ব্যাটারা ভেবেছে, নিশ্চয়ই ভেবে নিয়েছে, তাদের গোসাই বষ্টুমি আরেক অধমকে তরিয়ে দিলেন। হাঃ হাঃ হাঃ। খুব একটা মজার খেলাই খেললেন বটে। হাঃ হাঃ হাঃ। হাসতে হাসতে তিনি টের পেতে লাগলেন, সেই বেদনার ধারটা একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে।

পুরনো কথা মনে পড়তেই ছোটকর্তার বিরক্তি একটু যেন কমে এল। গোপাল-দাসীতে যে সুখ পেয়েছিলেন ছোটকর্তা, কালিন্দী তা দিতে পারেনি। আর কোন মেয়েমানুষে তা দিতে পারবেও না। পাম্প-সু'র সুখ কি চটি জুতোয় মেলে। তা না মিলুক, তবু চটিতেও তো পা বাঁচে। তাই গোপাল দাসী ধর্মে কর্মে মন দিতে, বৃথা হা হুতাশে কালক্ষেপ করেন নি। কালিগঞ্জে বদলি হতে কালিন্দীকে জুটিয়ে নিয়ে-ছিলেন। সে ছাড়া আরও একজন ছিল। কালিগঞ্জের সঙ্গে তিনি এখন তাঁদেরও ছেড়েছেন।

গোপাল দাসীর কথা তাঁর মনে পড়ল আজ। কিন্তু বিশেষ কিছু আলোড়ন তুলল না। দেখবার ইচ্ছাও জাগল না মনে। এই গ্রামে, আর কোনও মেয়েমানুষের সন্ধান তিনি আপাতত রাখেন না বলেই তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন। এখন সে বিরক্তি কিছুটা কমল।

কিন্তু শরীরের অস্বস্তি গেল না। হজমের ওষুধ পেটে পড়ল না, ওদিকে গঞ্জের হাবিজাবি গিলে পেটে এখন গজগজ করছে। ম্যাজম্যাজ করছে সর্বাঙ্গ। শরীরের বাঁধনটাই ঢিলে হয়ে গেছে। একটা বড় বিছানার বাণ্ডিল শক্ত করে না বেঁধে কাঁধে করে বয়ে নিতে যেমন অসুবিধে লাগে, ছোটকর্তারও শরীরটা সয়ে বেড়াতে তেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল।

সঙ্গে করে কিছু আনেন নি। সেইটেই মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে। ভেবেছিলেন বেলা পড়লে লোহাজাঙ্গায় যাবেন, নবীন তাঁতির বাড়ি। নবীন ছোটকর্তার বহুদিনের সঙ্গী। তার ঘরে সরঞ্জাম সব সময় মজুত থাকে।

গেলেই হ'ত লোহাজাঙ্গায়। বাজে কাজে সারাদিন সময় নষ্ট হ'ল। এখন, এত রাত্তে আর যাওয়া যায় না। গায়ে গতরে ব্যথা ধরেছে এতটা পথ ঘোড়া ঠেঙিয়ে। এখন বাসিমুখে কোথাও বেরুবার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন ছোটকর্তা। দু এক ঢোঁক গিলতে পারলেও উৎসাহটা চাঙ্গা হয়ে উঠত। এমন নিরামিষ রাত বহুদিন তিনি কাটাননি।

বারবাড়িতে তক্তপোশের উপর বিষণ্ণ মনে দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে ছোটকর্তা রাম-কিষ্টোকে ডাক দিলেন। ডাক শুনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল রামকিষ্টো। এ বাবা, ছোট-বাবু, একেবারে কাঁচাখেগো দেবতা। পান থেকে চুন খসলেই অনর্থ।

রামকিষ্টো বলল, "ছোটবাবু, ডাকলেন?"

ছোটকর্তা বললেন, "হ্যাঁ। গা হাত পা একটু টেপেক তো। বড্ড চাবাচ্ছে।"

রামকিষ্টো ছোটকর্তার হাত পা যত্ন করে টিপতে লাগল। বেশ আরাম পেলেন ছোটকর্তা।

জিজ্ঞাসা করলেন, "তারপর এদিককার খবরাখবর কি, ক' দিন একটু শুনি। আছিস কেমন?"

রামকিষ্টো ফোঁস করে লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

বলল, "আর খবর? কি বা কব ছোটবাবু, অভাব অভিযোগ সে তো লাগেই আছে। ধান পাটের দর নেই। ম্যালোয়ারি আমাগের চিবোয়ে ছিবড়ে বের করে ফেলতিছে। কি সব চিহারা ছিল এক একজনের, আর কি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। হাত পা কাঠি কাঠি। রক্তশূন্যি। পেটটা ডাগর ডাগর। এক একজন যেন তালপাতার সিপোই। সুখ আর কোনদিকিই নেই। দাঙ্গা কাজেটাই এ দিগরে ছিল না, ইবার সিটাউ বোধ হয় হয়ে ছাড়বে?"

দাঙ্গার নাম শুনে ছোটকর্তা উৎকর্ণ
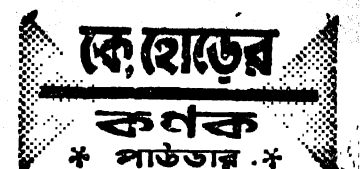
হলেন। এতক্ষণ পরে তাঁর দারোগা সত্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। গোঁফে চুমকুড়ি দিতে দিতে যেন ক্রমশ সজাগ হয়ে উঠতে লাগলেন।

বললেন, "দাঙ্গা! দাঙ্গা বাধাচ্ছে কিডা।" গলায় যেন শ্রাবণের মেঘ ডেকে উঠল।

রামকিষ্টো বলল, "কিডা আবার বাধাবে। অবস্থা গতিকে বাধে যাতি পারে।"

ছোটকর্তা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। এই একটা মহৎ দোষ ব্যাটার। আসল কথায় আসতে আসতে রাত পুইয়ে দেবে।

রাম্‌কিষ্টোকে ধমক মারলেন ছোটকর্তা। বললেন, "কথাগুলোরে দাঁতের ফাঁকে না পুরে বাইরে ছাড়ে দ্যাও। কি, দাঙ্গা করার শখটা চাপল কার?"

রামকিষ্টো বলল, "নিকিরিগের সঙ্গে গুপাল বিশ্বেসগের। নিকিরিরা আলাদা হাট বসাবে এই হাটের দিন। গুপালবাবুরা নাকি ভাঙ্গে দেবে সিডা। ছুঁয়ে মশাই, বিশ্বেসগের দলের পাণ্ডা হয়েছেন। ধনেশ্বর গাতির উদিক থে নাকি ন্যমসুন্দর লাঠেল আনায়েছে। এই তো সব শুনতিছি। ইবার রক্তারক্তি একটা না হয়েই নাকি যায় না।"

(ক্রমশ)

বাসটা বাগানবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াবার পর গোলমালে কি ঝাঁকুনিতে শংকরের তন্দ্রা ভেঙে গেল। সে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসে বলল, 'আমরা পৌঁছে গেছি তাহলে?'

বন্ধু প্রভাত পাশেই বসে ছিল। সে বকে উঠল, 'পৌঁছাবো না? তুমি কি ভেবেছিলে অনন্তযাত্রা? আচ্ছা মানুষ যা হোক। বেলগাছিয়া থেকে এই সুখচর পঁয়ত্রিশ মিনিটের জার্নি। এই সময়টুকুও তুমি না ঘুমিয়ে পারলে না? বেলা দশটার সময় আমার কাঁধে মাথা রেখে দিব্যি এক ঘুম।'

শংকর একটু হাসল, 'তাই নাকি? কিন্তু তোমার কাঁধটা বড় শক্ত। বালিস হিসেবে মোটেই উপভোগ্য নয়। কাল সারারাত জেগেছি যে। তাই বড্ড ঘুম পেয়েছিল।'

প্রভাত চাপাগলায় বলল, 'জেগে তো একেবারে দেশোদ্ধার করেছ। ফ্লাশ খেলে যথাসর্বস্ব খুইয়ে—।'

শংকর নিজের ঠোঁটে তর্জনী ছোঁয়াতে প্রভাত থেমে গেল।

পিকনিক পার্টির যাত্রীরা ততক্ষণে নামতে শুরু করেছে। এ বাসটায় প্রায় সবই পুরুষ। দুএকজন মহিলা যা আছেন তাঁরা প্রৌঢ়া। চোখ মেলে দেখবার মত কিছু নেই। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এসে এমন কিছু লোকসান হয়নি ভেবে শংকর নিজের মনেই একটু হাসল।

প্রভাত তাড়া দিল, 'কই হে ফোটোগ্রাফার, ওঠো। নাকি আবার ঘুমিয়ে পড়লে?'

বাস প্রায় খালি হয়ে গেছে। ক্যামেরা কাঁধে শংকর বন্ধুর পিছনে পিছনে এবার নেমে এল। নেমে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। শোভাবাজারের কোন এক রাজার বাগানবাড়ি। বাগান এখন আর বলা যায় না। যারা অযত্নেও বাড়ে সেই ঘাস আর লতাগুল্মই প্রাঙ্গণজুড়ে রাজত্ব করছে। পুকুরটা মজে গেছে। ঘাটের সিঁড়িগুলি ফাটল ধরা। গঙ্গার ধার ঘেঁষে যে দোতলা বড় বাড়িটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে তার জীর্ণ দেহে এখন আর কোন আভিজাত্যের ছাপ নেই। কতকাল যে কলি ফেরানো হয় না তার ঠিক কি। উদ্যান না বলে একে অরণ্য বলাই ভাল।

অন্যমনস্ক নিস্পৃহ শংকর হঠাৎ চমকে উঠল। ওই সেকেলে বাড়িটার ভিতর থেকে একদল একেলে তরুণী বেরিয়ে এসেছে। অরণ্যে সত্যিই ফুল ফুটেছে এবার। সেকালের বাগানে একালের মঞ্জরী। সতের থেকে সাতাশের মধ্যে পাঁচ-ছটি নানা বয়সের মেয়ে প্রভাতের সামনে এসে দাঁড়াল। তিনটির সিঁথিতে সিঁদুর আছে। কিন্তু মাথায় কারো আঁচল নেই। শংকর দেখে খুশি হল—এরা শুধু অনবগুণ্ঠিতা নয় আজ অকুণ্ঠিতাও বটে। বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত ঘরের। দু'একটি আছে যারা দু'চার ইঞ্চি উঁচু ধাপের। কিন্তু আজ আর তা বুঝবার উপায় নেই। প্রত্যেকের পরনে জমকালো শাড়ি, চোখে মুখে উৎসবের উজ্জ্বলতা। কমবেশি স্বচ্ছল সংসারের অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে পারিবারিক রীতি-নীতি বিধিনিষেধের বাইরে এরা আজ একটি শিকল-ছেঁড়া বেপরোয়া দিন কাটাতে এসেছে।

তারা এগিয়ে এসে প্রভাতকে ঘিরে ধরল। পঁচিশছাব্বিশ বছরের সিঁদুরবতী সুন্দরী মেয়েটিই বোধহয় দলের নেত্রী। সে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'এত দেরি করলে যে প্রভাতদা। আমরা সেই কখন থেকে এসে বসে আছি।'

প্রভাত বলল, 'বসে আর আছ কই, রঙীন প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছ। আমরা তো আর তোমাদের মত পাখি হয়ে জন্মাইনি। জিনিসপত্র বাসনকোসন সব জোগাড় করে, বাজারটাজার সেরে তবে আসতে পেরেছি। তোমাদের মত সারা গায়ে রঙ মেখে পাখা মেলে—'

মেয়েটি হেসে উঠে বলল, 'থাক থাক, আপনাকে আর কবিত্ব করতে হবে না। আপনি যে কত কাজের লোক তা যেন আমি আর জানি না। আপনার মুখেই সব।' ভ্রু বাঁকিয়ে অপূর্ব ভঙ্গিতে মেয়েটি আবার হাসল।

এতক্ষণে বন্ধুকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা মনে পড়ল প্রভাতের।

'তোমরা জানো ইনি কে? বিখ্যাত ফোটোগ্রাফার শংকর সেন। মেসে পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিলেন। জোর করে ধরে তুলে নিয়ে এলাম। জানো পদ্মা, আমাদের এই পিকনিক পার্টি নিয়ে আমরা একটি ফিল্ম তৈরি করব। তার ক্যামেরাম্যান এই শংকরপ্রসাদ।'

পদ্মা বলল, 'আর আপনি? আপনি বুঝি স্বয়ং ডিরেক্টর?'

'উঁহু, তুমি যদি হিরোইন হও আমি তাহলে নায়কের রোলটির জন্যে আবেদন করব।'

পদ্মা বলল, 'আবেদন এক কথায় নামঞ্জুর হবে। নায়ক এখানে সশরীরে আছেন।'

প্রভাত বলল, 'তাহলে উপনায়ক। শাখা-প্রশাখায় যেখানেই হোক একটু জায়গা রেখ। শংকর, ইনি আমার বউদির সহোদরা শ্রীমতী পদ্মা মৈত্র। দুই বোন যদি দুই জা হতেন তাহলে সম্পর্কটা বড়ই মধুর হত। কিন্তু ইনি আগে থেকেই বাক দান করে রেখেছিলেন। শুধু বাক্য নয়, কায় আর মনও।'

পদ্মা এবার লজ্জিত হয়ে বাধা দিয়ে

বলল, 'আঃ কি হচ্ছে প্রভাতদা। আপনি বক বক করুন; আমি চললাম।'

প্রভাত বলল, 'দাঁড়াও না। পরিচয় পর্বটা এখনো শেষ হয়নি। ইনি শ্রীমতী কুমকুম রায় পদ্মার মাসতুতো বোন, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই হয়। আর যারা রাহাজানি করে তারা দুই মাসতুতো বোন হয়ে জন্মায়। ইনি সর্বানী দত্ত; রসায়নের অধ্যাপিকা। চশমা আর চেহারা দেখে নিশ্চয়ই চিনতে পারছ। আরে ছায়া তুইও এসে পড়েছিস দেখছি। আমার কনজারভেটিভ পিসেমশাই তোকে ছেড়ে দিলেন? এইসব মেয়েদের সঙ্গে মিশলে তোর যে আর বিয়ে হবে না রে?'

কালো ছিপছিপে চেহারার মেয়েটি লজ্জায় চোখ নামাল। বড় শান্ত আর স্নিগ্ধ দুটি চোখ। বেলা দশটার এই কড়া রোদকেও যেন ভুলিয়ে দেয়। ছোট এই ছবিটুকু ক্যামেরায় ধরে নিতে পারলে মন্দ হত না। মাথায় অনেক চুল, সরু-সিঁথি এখনো সাদা। প্রভাতের পিসেমশাই খুব যে রক্ষণশীল তাতো মনে হয় না। তাহলে এ-মেয়ে এতো দিনে অরক্ষণীয়া হয়ে উঠত। দেখতে রোগাটে হলেও এর বয়সই বা কোন্ বাইশ তেইশ বছর না হবে। —

লাজুক মুখচোরা মেয়েটির হয়ে পদ্মাই জবাব দিল, 'কী যে বলছেন প্রভাতদা। ওসব অলক্ষুনে কথা আর বলবেন না। এমনিতেই পিসেমশাই ওর বর খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলেন।'

ছায়া মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলল, 'বাজে কথা।' শংকরের মনে হল পদ্মার কথা বাজে হতে পারে কিন্তু ছায়ার মুখের ওই দুটি শব্দ যেন গান হয়ে বেজে উঠেছে। ওর গলার সুরটুকুতো ভারি মিষ্টি।

ঘরের ভিতর থেকে এবার একজন স্থূলাংগী প্রৌঢ়া মহিলা বেরিয়ে এলেন, 'ও প্রভাত, তোরা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল গল্পই করবি। খাবারটা খেয়ে নিয়ে আমাকে অবসর করে দিয়ে যা। কত বেলা হয়ে গেল। এরপর কখন যে রান্না চড়বে, কখন যে কি হবে কিছু জানিনে বাপু।'

প্রভাত বলল, 'যাই মাসীমা। চল হে শংকর চল ব্রেক ফাস্ট সেরে ফেলা যাক। পদ্মা তোমরাও এসো।'

পদ্মা বলল, 'আপনারা যান। আমাদের হয়ে গেছে। আমরা যারা আগের বাসে এসেছি তারা আগেই খেয়ে নিয়েছি।'

প্রভাত বলল, 'কী অন্যায়। বেশ খাওয়াটা না হয় সেরেছ, পরিবেশনটা এবার হোক।'

পদ্মা হেসে বলল, 'তার জন্যে ঠাকুর-চাকর আছে। আমাদের আলা আর করবেন না।'

মাসীমার তাড়া খেয়ে প্রভাত এবার ভিতরের দিকে এগিয়ে গেল। শংকরও চলল পিছনে।

বাসের সহযাত্রীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে খাবার খাচ্ছে। শংকর মনে মনে ভাবল এরা শুধু ভোজন রসিক, দর্শন রসিক নয়। একটু আগে কী যে আশ্চর্য কান্ড ঘটে গেল তা এরা টেরও পেল না। এরা শুধু খেতেই ব্যস্ত।

খাওয়ার ব্যবস্থাটা অবশ্য প্রাতর্ভোজ হিসাবে ভালোই হয়েছে। একটি করে ডিমসিদ্ধ, দুটি করে কলা, রুটি মাখন আর মাটির খুরিতে করে চা। ভাঁড়ার সামলাচ্ছেন তিন চারজন বয়স্কা মহিলা। দেখলেই মনে হয় এঁরা পাকাপোক্ত গৃহিণী। স্বর্গে এসেও ধান ভানতে শুরু করেছেন।

চা শেষ করে খুরিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল শংকর। পোড়া মাটির একটা অদ্ভুত গন্ধ। ট্রেনে যেতে যেতে নাম না জানা কিংবা জেনেও মনে না রাখা ছোট ছোট স্টেশন-গুলিতে বিচিত্র অবস্থায় চা খাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। একবার তাড়াতাড়ি চা খেতে গিয়ে ঠোঁট পুড়ে গিয়েছিল, আর একবার এক শৌখিন সহযাত্রীর সিল্কের পাঞ্জাবির ওপর পড়ে গিয়েছিল চায়ের ভাঁড়, কুরুক্ষেত্র বেঁধে যায় আর কি! আর একবার চা খাওয়াটা নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছিল কিন্তু বেচারা চাওয়ালার হাতে চারটে পয়সা পৌঁছে দেওয়ার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল। বুকটা পুড়ে উঠেছিল এক মুহূর্তের জন্যে।

উঠানে নেমে প্রভাত বলল, 'এখানে আমাদের নিয়ম কারো সংগে কারো আলাপ করিয়ে দেব না। যে যাকে দেখে উৎসুক হয় সে তার সংগে নিজেই আলাপ করে নেবে। দেখতে পাচ্ছ এরই মধ্যে কতগুলি দল হয়ে পড়েছে। তুমি যে দলে খুশি ভিড়ে পড়তে পার। দু-মিনিট বাদে যদি দেখ যে ভুল করেছ, তুমিও খুশি হচ্ছ না, কি তুমিও কাউকে খুশি করতে পারছ না, তুমি নিঃশব্দে কি 'ধত্তোর' বলে সশব্দে সরে আসতে পার। কেউ কিছু মনে করবে না, আর করলেই বা কি এসে যায়।'

শংকর হেসে বলল, 'তোমার নিয়ম-কানুন আমি সব বুঝে নিয়েছি। তোমাকে আর বক্তৃতা করতে হবে না।'

প্রভাত বলল, 'বালবৃদ্ধবনিতায় এখানে আমরা পঁয়ষট্টি জন এসেছি। সংখ্যাটা এইরকমই ঠিক হয়েছিল। জানি না, পরে আরো দু-চারজন বেড়েছে কিনা। এদের মধ্যে আমি প্রায় টুথার্ড ধরো জন চল্লিশকে চিনি। তাঁদের সবগুলি নাম যদি গড়গড় করে বলে যাই, তুমি কি আজ বাদে কাল তা মনে রাখতে পারবে?'

শংকর বলল, 'ছেলেদের নাম অবশ্য শোনার সংগে সংগে ভুলে যাব। কিন্তু মেয়েদের নামের বেলায় আমি শ্রুতিধর। কানের ভিতর দিয়ে সেই যে মরমে প্রবেশ করে আর কিছুতেই বেরোতে চায় না।'

প্রভাত হেসে উঠে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে

দিয়ে বলল, 'বেশ বলেছ। তা তুমি এক কাজ কর। অর্ডার দিয়ে এক নতুন নামাবলী তৈরী করাও। তাতে রাম নামের ছিটেগন্ধও থাকবে না। শুধু রমা, মনোরমা, হৃদি-রমাদের হাজার হাজার নাম লেখা থাকবে। সেই নামাবলী দিনরাত গায়ে জড়িয়ে রেখে তুমি সব জ্বালা জুড়োতে পারবে।'

শংকর হেসে বলল, 'কথাটা মন্দ বলনি। কলিযুগে আমাদের মত বেকার যুগন্ধরদের শুধু নামই ভরসা। কায়াতো ভালো সিনেমায় গিয়ে যে ছায়া দেখব সে পয়সাটি পর্যন্ত যাদের জোটে না তাদের 'নাম ধর্ম, নাম কর্ম নাম কর সার'—এ মন্ত্র জপ করা ছাড়া আর উপায় কি।'

প্রভাত বলল, 'থাক থাক, ওসব কথা আজ নয়। দেখি পদ্মারা সব কোথায় গেল।'

বন্ধুকে পাশ কাটিয়ে সরে পড়তে দেখে শংকর নিজের মনেই একটু হাসল।

প্রভাত রায় কলেজে এক সময় তার সহপাঠী বন্ধুই ছিল। আজ বাইরে মাঝে মাঝে ডাকে খোঁজ করলেও ভিতরে ভিতরে অনেক দূরে সরে গেছে। যাবেই তো। নামজাদা তেল কোম্পানীতে এখন কাজ করে প্রভাত। ছশো টাকা মাইনে পায়, অফিসের গাড়িতে যাতায়াত করে। জীবনের পথ এখন ওর তৈল মসৃণ। শংকরের মতই প্রভাতও তিরিশ পার হয়েছে। কিন্তু এত বড় চাকরি করেও বিয়েতে ওর গরজ নেই। এদিকে ওদের ড্রয়িংরুমে অনূঢ়া কন্যার বাপ-খুড়োদের ভিড় বেড়ে চলেছে। কিন্তু প্রভাতের মন পড়ে আছে নাকি সমুদ্রপারে, লণ্ডনে কোন এক মনস্তত্ত্বের বিদ্যার্থিনীর কাছে। বিমান ডাকে ফি সপ্তাহে চিঠি যায় আসে। প্রভাত নাকি মাঝে মাঝে তাকে শাড়িও পাঠায়। শাঁখা সিঁদুর দেলে ফিরিয়ে এসে দেবে।

আর নারী তার দেহ মন নিয়ে শংকরের কাছ থেকে বহু দূরে সরে রয়েছে। তাদের ব্যবধান শুধু সাত সমুদ্র তের নদীর নয়, এক গ্রহ থেকে আর এক গ্রহের। তার কাছে নারী নির্বিশেষে এক সাধারণ সত্তা; বিশেষ কেউ নেই, নির্দিষ্টা উদ্দিষ্টা কেউ নেই। ট্রামে বাসে রাস্তার মোড়ে পার্কে, কলেজে ইউনিভার্সিটির সামনে সেই সত্তা বিস্ময়ে ছড়িয়ে রয়েছে কিন্তু বিশেষ একটি মূর্তি নিয়ে কেউ তার কাছে আসছে না, কাউকে শংকর তার কাছে একান্ত করে টানতে পারেনি। বাপ মা অনেক দিন মারা গেছেন। ভাইবোন কেউ নেই। দূর-সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন যাঁরা আছেন তাঁদের নৈকট্যের জন্যে শংকরের মনে কোন আগ্রহ নেই। স্বচ্ছল সম্পন্ন স্বজন বন্ধুদের কাছে শুধু অনুকম্পা কুড়িয়ে লাভ কি। তার চেয়ে নিজের মেসের ঘরের নিঃসংগতা অনেক নিবিড় এবং অকৃত্রিম, হোটেলের ডাল-তরকারি রাজভোগের মত উপভোগ্য।

পারতপক্ষে কোন সামাজিক নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে যায় না শংকর। অনুষ্ঠান-উৎসব কি জন্য কোন কাজকর্মের অজুহাতে এড়িয়ে যায়। তবু মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে টানাটানি চলে। তার নিজের জন্যে নয়, তার ক্যামেরাটির জন্যে। মোটামুটি ভালো ফোটো তুলতে পারে বলে একটু খ্যাতি আছে শংকরের। দু-একটা প্রদর্শনীতে কি পত্র-পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যায় তার তোলা ছবি সমাদৃত হয়েছে। আয়নায় নিজের মুখ দেখার মত নিজের এবং আত্মীয় বন্ধুর প্রতিকৃতি দেখার যে প্রচণ্ড সাধ আছে, মানুষের সেই সাধই তাকে সমাজে যা একটু সম্মান দিয়েছে। আর তার ফলেই পরিচিত বন্ধুবান্ধব কি তাদের আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়িতে মাঝে মাঝে ডাক পড়ে শংকরের। বিয়েতে, অন্নপ্রাশনে, জন্মদিনে, নামকরণে, শ্রাদ্ধবাসরে কি বিবাহবার্ষিকীতে এই ক্যামেরাই সমাজজীবনের সংগে মাঝে মাঝে শংকরের সংযোগসেতু হয়েছে। এখন আর তত উৎসাহ নেই। অনর্থক ফিল্ম নষ্ট। ফোটো তোলাটা শংকরের পেশা হলেও সব জায়গায় তা তো আর জাহির করে বলা যায় না। ফলে অন্যের শখ নিজের গাঁটের টাকায় মেটে। কেউ কেউ বলেন, 'কিছু ভাববেন না, আপনার ফিলমের দামটা নিশ্চয়ই দিয়ে দেব। তাতো আর আপনার ঘরে তৈরি হয় না।' কিন্তু অনেকেই শেষ পর্যন্ত নিজের প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যান। আর এর জন্যে তশীলদারি করতে শংকরের বড় খারাপ লাগে।

এই ফোটো তোলবার জন্যেই প্রভাত তাকে পিকনিক পার্টিতে নিয়ে এসেছে। পার্টির যারা সদস্য তাদের দশ টাকা করে চাঁদা। যারা এখনো হাফ প্যাণ্ট ফ্রক পরে তাদের পাঁচ টাকা। কিন্তু প্রভাত বলেছে, 'তোমাকে ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। তুমি আমাদের দু-চারখানা ফোটো তুলে দেবে তাহলেই চলবে। হৈ চৈ করতে করতে দিনটা বেশ চমৎকার কাটবে। বাগানবাড়ি গংগার ধারে, মাঝে মাঝে দু-একটি অচেনা তরুণীর মুখ, দু-একটি মধুরকণ্ঠ জীবনে নতুন স্বাদ এনে দেবে। তুমি যদি আর একটু চড়া রকমের আমোদ ফুর্তি চাও সে ব্যবস্থাও আছে। তাস খেলতে তুমি তো ভালোবাস। পাঁচ সাত জোড়া তাস অলরেডি যাচ্ছে। আমাদের দলে পাকা খেলোয়াড় আছে। শুধু পুরুষ না মেয়েরাও খেলবেন। তুমি স্টেকেও খেলতে পার। তবে তোমার বোধ হয় হৃদয় ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই। বিদ্যা যেমন যতই দান কর ততই বেড়ে যায়, হৃদয়ের বেলাতেও তেমনি। যতই হারাবে ততই ফিরে পাবে।'

শংকর বলেছিল, 'সে ভরসা তোমার আছে। তুমি রূপবান বিত্তবান পুরুষ। তোমার হৃদয়টা বড়শী। তা জলে ফেললেই বড় বড় রুই কাতলা উঠে আসবে। কিন্তু

আমার মত নিঃস্ব শ্রীহীন বিদ্যাবুদ্ধিহীন মানুষের হৃদয় ভিতরে ভিতরে মাখনের মত নরম হলেও দেখতে তো একটা পাথরের নুড়ির মত। জলে যদি একবার পুড়ে কোথায় যে তলিয়ে যাবে তার আর কোন চিহ্ন থাকবে না। আমাদের হৃদয় হারানো মানে একেবারেই সর্বস্বান্ত হওয়া। একটি কাণা-কড়িও ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা নেই।'

প্রভাত জবাব দিয়েছিল, 'তুমি একটি আস্ত বোকা। হৃদয় যে তোমার ছিল তা তুমি তখনই টের পাও যখন তা হারাও। আমি সেই পাওয়ার কথা বলছি। হৃদয় হারিয়ে আমরা আমাদের অস্তিত্বকে টের পাই। তাই আমি ও-বস্তু হারাবার জন্যে সব সময় তৈরি হয়ে বসে থাকি।'

সুখী মানুষের মুখে কখনো কথার অভাব হয় না। কিন্তু হাহাকারই দুঃখের একমাত্র ভাষা।

আস্তে আস্তে দু চার পা করে এগোতে লাগল শঙ্কর। এই পোড়ো বাগানবাড়িতে সত্যিই যেন হঠাৎ এক ঝাঁক রঙীন পাখি আর প্রজাপতি এসে পাখা মেলে দিয়েছে।

একদল কিশোরী মেয়ে আলাদা আলাদা জোড় বেঁধে কি যেন খেলছে। কতকগুলি ফুলের নাম তাদের মুখে শোনা গেল। বোধ হয় ফুল মেলানোর খেলা। এক একজন একটি ফুল হয়েছে।

আর এক পাশে একটি ছেলের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তাকে কে যেন মাথায় ঠোকর দিয়ে গেছে। সে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে এক একজনের গায়ে তার হাত পড়ছে কিন্তু কিছুতেই তার নামটা সে ঠিক করে বলতে পারছে না।

ছেলেটি দেখতে বেশ সুন্দর হলেও বোধ হয় তত চালাক চতুর নয়। ওকে অনেকক্ষণ ভুগতে হবে।

'তোমরা ছায়ায় এসো, ছায়ায় এসে খেলো। এই রোদের মধ্যে তোমাদের অসুখ করবে। এই মিন্টু চলে আয়। তুই তো সেদিন জ্বর থেকে উঠেছিস। এই পিন্টু।'

শঙ্কর মুখ ফিরিয়ে দেখল বড় কাঁঠাল-গাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনিই মাঝে মাঝে সাবধান করে দিচ্ছেন ছেলেদের। তাঁর সব চুল পাকা। দু চারটি ছাড়া দাঁত সব গেছে। অনাবৃত দুটি হাঁটু দুদিক থেকে উপরের দিকে উঠেছে। নুয়েপড়া ভদ্রলোকের ছোট্ট মাথাটুকুর সঙ্গে যেন তাদের প্রতিযোগিতা।

তরুণ তরুণী কিশোর কিশোরীদের এই মেলায় বুড়ো কেন এসেছেন কে জানে। আজ কে তাঁর ধমক শুনবে? অনুরোধ উপরোধে কান দেবে? যে ছেলেটির চোখ বাঁধা তার নামই কি পিন্টু? সে বোধ হয় আজ কানেও তুলো গুঁজে নিয়েছে।

শঙ্কর ক্যামেরা বার করে ফোটো তুলল, একটি ছেলেদের আর একটি মেয়েদের, যারা ফুল মিলাবার খেলা খেলছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে তারা খেলা ফেলে ছুটে এসে ফটোগ্রাফারকে ঘিরে ধরল।

'আমার একখানা ছবি তুলে দিন। আমার আলাদা একখানা ছবি তুলুন।'

পিন্টু তার চোখের বাঁধন এতক্ষণে খুলে ফেলেছে।

ছেলেরা মেয়েরা দুদিক থেকে এসে শঙ্করকে বেড়াজালে ঘিরে ফেলল। তারা আর আলাদা আলাদা নেই। ঘেঁষাঘেঁষি করে মিশে দাঁড়িয়েছে। যে যেখানে পারে জায়গা করে নিয়েছে। জামার রঙ কারো নীল, কারো সবুজ, ফ্রকের রঙ কারো হলদে কারো গোলাপী। মুখের রঙ কারো শ্যামলা কারো গৌর। চোখের রঙ সকলেরই কালো। শঙ্করের মনে হয় ফুলই বটে। তার দুপাশে দুটি শতদল ফুটেছে। পাপড়িগুলির রঙ কেবল আলাদা আলাদা।

শঙ্কর তাদের আর একখানি গ্রুপ ফোটো তুলল। কিন্তু তাতে কেউ খুশি নয়। প্রত্যেকেরই আলাদা ফোটো চাই। শঙ্কর তাদের ভরসা দিল, পরে তুলবে। খাওয়া-দাওয়ার পরে।

ছেলেরা আবার তাদের খেলায় ফিরে গেল। কিন্তু খেলাটা এবার আর তেমন জমে উঠছে না। পিন্টু আর চোর হতে রাজী নয়। আর একজন কেউ চোর হোক।

পুকুরের ধারে কাঁঠাল গাছের ছায়ায় মাদুর বিছিয়ে জোর তাসের আসর বসেছে। ফোটো তোলার হৈচৈ-তে খেলোয়াড়দের বিন্দুমাত্র ধ্যান ভাঙেনি।

একজন ভদ্রলোক নিজে থেকেই শঙ্করকে ডাকলেন, 'আরে আসুন না মশাই এদিকে। প্রভাত বলছিল আপনি নাকি খুব ভালো খেলতে জানেন। আসুন এসে বসে যান।'

কিন্তু শঙ্কর ওদিকে ঘেঁষল না। একটু দূরে মেয়েদের গানের আসর বসেছে। সেদিকে তার চোখ পড়ল। আমন্ত্রণটা সেখান থেকেও আসতে শঙ্কর সেদিকেই এগিয়ে চলল। তা দেখে তাসের আসরের মোটা ভদ্রলোকটি মন্তব্য করলেন, 'দেখলে তো কানাই, উনি নতুন খেলা খেলতে চললেন। নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভালো নহে তাহা, আমি যা খেলিতে বলি সে খেলা খেলাও হে।'

ছিপছিপে চেহারার কানাই হেসে জবাব দিল, 'দাদা ও-খেলাকে নতুন বলছেন কেন। শুধু ওই যা নামেই আদি ও-খেলা অনাদি কাল ধরে চলছে—অনন্ত কাল ধরে চলবে।'

শুনতে শুনতে মৃদু হেসে এগিয়ে চলল শঙ্কর। খানিকটা দূরে একটি হারমোনিয়ামো ঘিরে পাঁচ-ছটি মেয়ে জড়ো হয়ে বসেছে। শঙ্কর লক্ষ্য করল তাদের মধ্যে পদ্মা, কুমকুম আর ছায়াও আছে। আর যারা তারা

অপরিচিতা। কিন্তু ওই তিনজনের সংগেই যা শংকরের কতটুকু পরিচয়। চেনা-অচেনার কথা মনে পড়ায় শংকর নিজেই একটু হাসল।

দলের মধ্যে প্রভাতও আছে। সেই ডেকে নিল শংকরকে। বলল, 'এসো হে ফটো-গ্রাফার এসো।, এখানে তুলে রাখবার মত অনেক মুখ আছে।'

পদ্মা বলল, 'আপনি সুপারিশ করলে হবে কি প্রভাতদা, আপনার বন্ধুর মন উঠছে না। উনি কতজনের ফোটো তুললেন কিন্তু আমাদের দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না।'

সাতাশ আঠাশ বছরের আর একটি যুবক বলে উঠল, 'তাকাবার সময় হলেই তাকাবেন। আমাদের যে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেল, কই তার জন্য তো তোমার একটুও সহানুভূতি দেখছি না পদ্মা।'

পদ্মা বলল, 'থাক মণ্টুদা, থাক, তোমার আর বাড়াবাড়ি করতে হবে না। অত করে বললাম তোমার ক্যামেরাটা নিয়ে এসো। তা গ্রাহ্যই করলে না। বিয়ের পর তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ মণ্টুদা।'

মণ্টু এই অভিযোগ স্বীকার করে নিয়ে বলল, 'ঠিক বলেছ। বিয়ের পর আমি স্ত্রী ছাড়া আর কারো মুখের দিকে তাকাইনে। এমন কি ক্যামেরার ভিতর দিয়েও না।'

একথায় সবাই হেসে উঠল। শংকর লক্ষ্য করল লুকিয়ে লুকিয়ে ছায়াও হাসছে। দাঁতগুলি বড় সুন্দর তো মেয়েটির। হাসলে বেশ দেখায়।

প্রভাত বলল, 'গানটা তাহলে বন্ধই হয়ে গেল তোমাদের।'

কুমকুম বলল, 'হবে না বন্ধ। মণ্টুবাবু যা আরম্ভ করেছেন! ওর সামনে কে গাইবে?'

পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছরের আর একটি মহিলা বললেন, 'সত্যি মণ্টু, তোমার জন্যে আমাদের গান শোনাটাই হল না। ছায়া তুমি একখানা গাও না। রবীন্দ্রসংগীত তুমি তো বেশ ভালো গাইতে পার।'

ছায়া অনুনয়ের সুরে বলল, 'না বউদি, আজ আমাকে মাফ করুন।'

মহিলাটি বললেন, 'আজ মাফ করলে তোমাকে কাল কোথায় পাব। তুমি কি আর বাড়ি থেকে কোথাও বেরোও। পিকনিক পার্টির বহু ভাগ্য তোমার মত অসূর্য-ম্পশ্যাকেও ধরে এনেছে।

ছায়া বলল, 'বেরোতে ইচ্ছা কি আর করে না? সময় পাইনে বউদি। বাবা তো কেবলই ভোগেন। তারপর ভাইবোনগুলি, যে কী দুরন্ত তাতো জানেনই। যদি একটু চোখের আড়াল হই— ।'

মহিলাটি সহানুভূতির সংগে বললেন, 'তা ঠিক। মাসীমা চলে যাওয়ার পর থেকে তুমিই তো সব আগলাচ্ছ। আমরা সবাই সেকথা বলাবলি করি। তোমার মত মেয়ে হয় না।'

ছায়া লজ্জিত হয়ে বলল, 'কী যে বলছেন বউদি।'

মণ্টু অধীর হয়ে উঠে বলল, 'এবার ঘর-সংসার রান্নাবান্নার কথা শুরু হবে। এই জন্যেই আমি মেয়েদের কাছে ঘেঁষতে চাইনে। তারা পিকনিকে এসেও রান্নাঘর আর আঁতুড়ঘরের কথা ভুলতে পারে না।'

কুমকুম বলল, 'একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না মণ্টুবাবু?'

হারমোনিয়ামটা নিজের কোলের কাছে টেনে নিয়ে মণ্টু বলল, 'ওটা আপেক্ষিক। একজনের কাছে যা বাড়াবাড়ি আর একজনের কাছে তা নিতান্তই ছিটে-ফোঁটা। নায়িকা-দের সাধাসাধি করে যখন কোন ফল হল না আমি নিজেই একটু গলা সাধি।'

সারে গামা পাধা নিসা নয়,—গলা সাধার নাম করে মণ্টু একেবারে রবীন্দ্রসংগীত ধরে বসল, 'যদি তারে নাই চিনি গো—সে কি আমায় নেবে চিনে—।'

ইচ্ছা করেই গলাটা বিকৃত আর বেসুরো করে তুলল মণ্টু।

পদ্মার আর সহ্য হল না। সে হাত বাড়িয়ে মণ্টুর মুখ চেপে ধরে বলল, 'খবর-দার, আপনি গুরুদেবের গান নিয়ে অমন কারিকেচার করতে পারবেন না।'

মণ্টু আস্তে আস্তে পদ্মার হাতখানা সরিয়ে দিয়ে হেসে বলল, 'শুনেছি ভক্ত হয়ে ভজন করলে সাতজন্মে, আর শত্রু হয়ে ভজন করলে তিনজন্মে মুক্তি মেলে। একথার হাতে হাতে প্রমাণ পেলাম। আমার মুক্তি তিন জন্মে নয়, এক জন্মেই হয়ে গেল। অমন একখানা হাত যদি মুখের ওপর চাপা থাকে আমি সারাজীবন বোবা হয়ে কাটিয়ে দিতে পারি।'

অনেকেই হেসে উঠল। পদ্মার মুখখানা লজ্জায় টুকটুক করতে লাগল। 'অসভ্য' এই শব্দটি অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করে আসর থেকে উঠে পড়ল পদ্মা।

কুমকুম আর ছায়াও উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই মহিলাটি ওদের জোর করে ধরে রাখলেন। হেসে বললেন, 'তোমরা ভেব না, ওদের বিবাদ ওরা নিজেরাই মিটিয়ে নেবে।'

তারপর ছায়াকে ফের তিনি গান গাওয়ার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত ছায়া মণ্টুর ছেড়ে দেওয়া গানখানিই তুলে নিল। 'যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে, এই নব ফাগুনের দিনে।'

এই বহুশ্রুত গান আর একবার মুগ্ধ হয়ে শুনল শংকর। ভারি মিষ্টি সুরেলা গলা তো মেয়েটির। কণ্ঠ তো নয় যেন রুপার ঘণ্টা।

একখানা গান গেয়েই ছায়া থামতে চেয়ে-ছিল কিন্তু শ্রোতারা তাকে থামতে দিল না। দ্বিতীয় গান 'রোদন ভরা এ বসন্ত।'

পিকনিক পার্টির প[illegible] গান নিশ্চয়ই উপযোগী নয়। কি[illegible] শুনতে সে কথা আর শংকরের মনে রইল না। গানটির কথায় আর সুরে একই সঙ্গে যে বাসনা বেদনার স[illegible] রয়েছে শংকর শুনতে শুনতে তার সঙ্গে যেন একাত্ম হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ বাদে গান থামলে যৌথ বউদি আবার ছায়ার পরিচয় দিতে শুরু করলেন, 'শুধু রেডিও আর রেকর্ড শুনে শুনে শিখেছে। এমন গলা, যদি তেমন সুযোগ-সুবিধা পেত—। কিন্তু সংসারই সামলাবে না আর কোন দিকে মন দেবে। বুড়ো বাপ আর আটটি ভাই-বোন, সব ওর একার ঘাড়ে। কোথাও কি ওর বেরোবার জো আছে। যেটুকু অবসর পায় ঘরে বসে বসে বই পড়ে আর নিজের মনে গুন গুন করে। আজও আসতে চাইছিল না, আমরা জোর করে ধরে এনেছি তাই এল।'

ছায়া মুখ নিচু করে বলল, 'বউদি, ওসব থাক, ও সব কথা রাখুন।'

আরো দু' একটি মেয়েকে গাইবার জন্যে সাধাসাধি চলল, কিন্তু কেউ গাইতে রাজী না হওয়ায় গান বন্ধ হয়ে গল্প শুরু হল। বারাসতে গতবারের পিকনিক পার্টিতে কি রকম মজা হয়েছিল, এক ভদ্রলোক সেই গল্প জুড়ে বসলেন।

'মাসীমারা রান্নাঘরে কী করছেন দেখে আসি বলে ছায়া উঠে পড়ল। কুমকুমও তার সঙ্গে গেল। শংকরেরও ইচ্ছা হল ওই সঙ্গেই উঠে পড়ে। কিন্তু পাছে কেউ কিছু ভাবে তাই মিনিট পাঁচেক চুপ চাপ সেখানে কাটিয়ে, শংকর গল্পের আসর থেকে আস্তে আস্তে সরে এল।

বেলা প্রায় বারটা বাজে। ফাল্গুনের শুরুতে বেশ কড়া রোদ উঠেছে। বসন্তের রমাতার চেয়ে গ্রীষ্মের তাপই এখন বেশি। বাগানের যে জায়গাটা একেবারে খোলা, যেখানে ঘাস নেই দূর্বা নেই, সেখানটাকে মনে হচ্ছে শুষ্ক মরুভূমির মত। এখানে ওখানে ওয়েসিস অবশ্য আছে, যেমন গল্পের আসর তাসের আড্ডা। কিন্তু এই মুহূর্তে কোথাও যেতে ইচ্ছা করল না শংকরের। তার চেয়ে নিঃসঙ্গ থাকাতেই তার ভালো লাগছে। নিঃসঙ্গই সে থাকে। ভিড়ের মধ্যেও সে একা।

পিকনিকের যা অবস্থা শোনা যাচ্ছে তাতে দুটোর আগে খাওয়া-দওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। একটা ডাল, ভাজা, আর মাংস ভাত। তারপর চাটনি, দই মিষ্টি। শেষের দুটি পদ তো আর রাঁধতে হবে না। কলকাতা থেকে তা কিনেই নিয়ে আসা হয়েছে। তবু অপরাহ্নের আগে আজ মধ্যাহ্নভোজন হবে না। এত লোকের রান্না। সময় লাগবে বই কি। এগারটার আগে বোধ হয় হাঁড়িই চাপেনি। কেউ তো এখানে রাঁধতে খেতে আসেনি। সবাই বেড়াতে গল্প করতে, বন্ধুবান্ধব নিয়ে আড্ডা দিতে এসেছে। অন্য সব উদ্যোগ আয়োজন কারা করছে শংকর জানে না। প্রভাতের দুই মাসীমা এসেছেন। মেসোমশাইরাও নিশ্চয়ই এসে থাকবেন। শংকর শুনেছে তাঁরাই এ যজ্ঞের কর্মকর্তা। করণ-কারক তাঁদেরই দুটি চাকর আর একটি বামুন। আর সবাই চাঁদা দিয়েই খালাস। শংকর তো তাও দেয়নি। বাইরে হোটেল টোটেল থেকে কিছু খেয়ে চলে যাওয়াটাই বোধ হয় তার পক্ষে ভদ্রতা হবে। কিন্তু এ অঞ্চলে কোথায় হোটেল আছে তা সে জানে না। আছে কি না তাই বা কে জানে।

ঘুরতে ঘুরতে বাগানের ফটকের কাছে এসে দাঁড়াল শংকর। দেউড়ি-দারোয়ান কেউ নেই। একটি পাল্লা বন্ধ হলেও আর একটি পাট খোলাই আছে। শংকর তার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ হল সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোন দোকান-পাট পাওয়া যাবে।

বাগানের বাইরেই রাস্তা। পুবে পশ্চিমে প্রসারিত। দুপাশের সারি সারি বাড়িগুলির দরজা বন্ধ। কোন একটা বাড়ি থেকে রান্নার গন্ধ ভেসে এল। কিন্তু ধারে কাছে পান-সিগারেটের দোকান চোখে পড়ল না। রাস্তা পার হয়ে আর একটা সরু গলিতে পড়তেই ফের তিনটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পদ্মা কুমকুম আর ছায়া। দেখে অবশ্যই খুশি হল শংকর। তাপদগ্ধ এই মরুভূমির মধ্যে একটি নয়, দুটি নয়, তিন তিনটি ওয়েসিস। কিন্তু একটি থাকলেই সব চেয়ে ভালো হত। প্রমীলা রাজ্য তো শংকর চায় না। শুধু একটি প্রমীলাকেই চায়। কিন্তু আশ্চর্য মেয়েরা কি দল বেঁধে ছাড়া চলতে পারে না।

ওরা আরো কাছাকাছি এসে পদ্মাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি আপনি এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?'

শংকর বলল, 'সিগারেটের খোঁজে বেরিয়েছি। আপনারা?'

পদ্মা বলল, 'আমরা কিছুর খোঁজে বেরোইনি। বলতে পারেন নিখোঁজ হওয়ার জন্যে বেরিয়েছিলাম।'

শংকর হেসে বলল, 'বেশ তো। তাহলে এততাড়াতাড়ি ফিরে যাচ্ছেন যে? হারাবার মত জায়গা পেলেন না?'

পদ্মা হেসে বলল, 'কই আর পেলাম? পৃথিবীটাকে মানুষ একেবারে গৃহস্থবাড়ির উঠানের মত করে ফেলেছে। কোথাও আর কোন রহস্য নেই।'

শংকর বলল, 'চলুন আর একটু খুঁজে দেখা যাক গুহা-গহ্বর কোথাও আছে কি না। চলুন আর একটু ঘুরে আসি।'

কথাটা পদ্মাকে বলে শংকর ছায়ার দিকে তাকাল। ছায়া সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল। শান্ত স্নিগ্ধ দুটি চোখ, সরু টানা দুটি ভ্রূ যেন তুলি দিয়ে আঁকা।

ওর কাছ থেকে কোন জবাব না পেয়ে শংকর কুমকুমকে জিজ্ঞাসা করল, 'যাবেন তো?'

কুমকুম বলল, 'যেতে পারি তবে একটি শর্তে। আপনি আমাদের ফোটো তুলে দেবেন। প্রথমে একখানা গ্রুপ, তার পরে আলাদা আলাদা।'

শংকর সঙ্গে সঙ্গে শর্তটা মেনে নিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই দেব।'

পদ্মা বলল, 'চলুন, সামনে আমরা আর

আর একটা বাগান দেখে এসেছি। সেকেলে বাগান নয়, হাল-আমলের বাগান। নতুন একটা বাড়ি উঠছে, এখনো শেষ হয়নি, পুকুরটুকুর সব আছে। ব্যাকগ্রাউণ্ডটা বেশ হবে।'

শংকর বলল, 'চলুন, আপনার যখন চেনা-জায়গা আপনিই পুরোবর্তিনী হন।'

পথের দুদিকে একতলা ছোট ছোট পুরনো বাড়ি। এই ভর দুপুরে কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। সবাই বোধ হয় খেয়ে-দেয়ে ঘুমুচ্ছে। পথেও লোকজন দেখা যায় না।

ছায়াকে এক সময় নিজের পাশে দেখে শংকর বলল, 'এই রোদে আপনার বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্ছে।'

ছায়া ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, 'না না।'

শংকর বলল, 'আপনার গান দুখানি আমার খুব ভালো লাগল। দুটিই আমার খুব প্রিয় গান।'

ছায়া তেমনি মৃদু স্বরে বলল, 'হয়তো সেই জন্যেই আপনার অত ভালো লেগেছে।'

শংকর বলল, 'তা কেন। আপনি গেয়েছেনও খুব ভালো।'

পদ্মা পিছন ফিরে তাকিয়ে একটু বিশেষ-ভঙ্গিতে হাসল, 'শংকরবাবু, এ সব কি ভালো হচ্ছে?'

শংকর বলল, 'কোন সব?'

পদ্মা বলল, 'আমাদের তিনজনকে ডেকে এনে একজনের সঙ্গে অমন গুন গুন করা? আমরা গান গাইতে পারিনে বলে কি গুন-গুন করতেও জানিনে?'

শংকর বলল, 'আপনার সেই গুনগুন-টুকু তা হলে নিশ্চয়ই শোনাবেন।'

পদ্মা বলল, 'কোন লোভ নেই। ছায়া আজ বাজার মাত করে রেখেছে। রান্নাবান্নার দেরি দেখে আমার স্বামী চলে গেছেন ব্যারাকপুর। বলে গেছেন খানিকক্ষণের জন্যে তুমি অনাথা হলেও একেবারে নিরাশ্রয় হবে না। কিন্তু এখানকার রকম সকম দেখে এখন ভাবছি তাঁর সঙ্গে চলে গেলেই পারতাম।'

কুমকুম হেসে বলল, 'যেতে চাইলেই তুমি পারতে কি না? প্রণববাবুর বুঝি তার সেখানে কেউ নেই? এই রোদে তিনি বুঝি মিছিমিছিই সেখানে ছুটেছেন?'

পদ্মা হতাশার ভঙ্গি করে বলল, 'ঠিক বলেছ, আমার একূলও গেল ওকূলও গেল।'

বাঁদিকে একটা মজা পুকুর। পানায় ভরতি। ধার থেকে বোঝাই ভরা একটা আম-গাছ হেলে পড়েছে। মোড় ঘুরে পুবমুখী হতে রাস্তাটা আরো চওড়া হল। এবার শুধু দুজনে নয় তিনজনেই পাশাপাশি চলা যায়।

পদ্মার ঠাট্টার ভয়ে ছায়া শংকরের পাশ থেকে সরে গেছে। কুমকুম চলছে তার সঙ্গে সঙ্গে। ফর্সা, একটু বেঁটে ধরনের চেহারা। নাকটা তিলফুলকে জয় করতে না পারলেও একেবারে খাঁদাও নয়। সব মিলিয়ে দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। পদ্মার মত প্রগলভা নয়, আবার ছায়ার মত মৌনব্রত নিয়েও বসেনি। সব দিক থেকেই মধ্যবর্তিনী।

বাঁ দিকে সারি সারি কয়েকটি বাড়ি। হঠাৎ কুমকুম বলে উঠল, 'ওই যে সেই পোস্ট অফিসটা।'

একটি টিনের ঘরের মাথার উপর পোস্ট অফিসের সাইন বোর্ড এঁটে দেওয়া হয়েছে। দরজা তালাবন্ধ। তার পাশে লালরঙের চিঠির বাক্স।

কুমকুম বলল, 'জানেন এ রকম অচেনা সব জায়গায় এ ধরনের পোস্ট অফিস দেখলে আমার মনটা যেন কেমন হয়ে যায়।'

শংকর বলল, 'কি রকম?'

কুমকুম বলল, 'মনে হয় এই পোস্ট অফিসের ছাপ নিয়ে কোন দিন আমার নামে চিঠি যাবে না। আমিও কোনদিন এই বাক্সে চিঠি ফেলব না। এ পোস্ট অফিস শুধু আমার দেখবার জন্যে, ব্যবহার করবার জন্যে নয়।'

শংকর এবার কি জবাব দেবে ভেবে পেল না। তবে কুমকুমের বলবার ভঙ্গিটুকু তার মনকে স্পর্শ করল।

পদ্মা হেসে বলল, 'জানেন আমাদের কুমকুম বাড়িতে ফিরে গিয়ে নিশ্চয়ই এই নিয়ে একটা কবিতা লিখে ফেলবে।'

শংকর বলল, 'উনি কবিতা লিখতে জানেন নাকি?'

পদ্মা বলল, 'জানে আবার না? কলেজের ফার্স্ট ইয়ার থেকে ও কবিতা লেখে। আর মফস্বলে এসে পোস্ট অফিস দেখলেই ওর সব উদাস হয়ে যায়। অল্প বয়সে নিশ্চয়ই গাঁয়ের কোন পোস্ট মাস্টারকে ভালোবেসে-ছিল।' 'এখন container for the content.'

কুমকুম বাধা দিয়ে বলল, 'যাঃ।'

পদ্মা বলল, 'এখানে কেউ কবি, কেউ গায়িকা— ।'

শংকর হেসে বলল, 'আর আপনি সাক্ষাৎ কথাশিল্পী।'

ডান দিকে আর একটা বাগানবাড়ি। বাড়িটা এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। এ বাড়িরও ফটক খোলা। তরুণ বয়সী মালীকে বেশি অনুরোধ করতে হল না। মেয়েদের দেখে সে নিজের গরজেই পথ ছেড়ে দিল এবং আরও কিছু কাজ করে দেওয়ার জন্যে উৎসুক হয়ে রইল।

সুরকি ঢালা পথের দু দিকে মরসুমী ফুলের কেয়ারী। মাঝে মাঝে লাল আর সাদা গোলাপ। এখানেও পুব দিকে পুকুর। নতুন কাটা হয়েছে। নতুন বাঁধানো ঘাট। স্বচ্ছ জল তীব্র রোদে ইস্পাতের মত ঝক ঝক করছে। দক্ষিণে ছায়াঘন নারকেলের সারি।

পদ্মা সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'নিন, এবার টপ টপ করে কয়েকটা ফোটো তুলে নিন। আমরা অনেকক্ষণ এসেছি। আমাদের না পেয়ে পিকনিক পার্টির কর্তারা হয়তো থানায় ডায়েরি করতে ছুটেছেন। একটি ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে তিনটি তরুণী উধাও। বেশি দেরি করবে না। শেষে হাতকড়া পড়ে যাবে।'

শঙ্কর হেসে বলল, 'তবু তো কিছু পড়ুক।'

এত রোদে ফোটো তোলা যায় না। তাই খানিকটা ছায়ার সন্ধান করতে হল।

বাড়িটার আড়ালে ওদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে ক্যামেরা নিয়ে শঙ্কর সরে আসছে। পদ্মা বলে উঠল, 'কি রকম মানুষ আপনি। এত ফুল থাকতে আমরা বুঝি খালি হাতে ফোটো তুলব?'

শঙ্কর বলল, 'আমি ভেবেছিলাম ফুলদের আর ফুল দিয়ে কী সাজাব।'

এর পর মালীকে ডেকে শঙ্কর কিছু ফুল আনতে বলল, মালীর বুদ্ধি আছে। তিনটি তোড়া ছাড়াও তিনটি রক্তগোলাপ নিয়ে এসেছে।

শঙ্কর বলল, 'তোড়াটি হাতে আর গোলাপটি মাথে—ঠিক করে পরে নিন।'

ছায়া হঠাৎ বেঁকে বসল, 'পদ্মাদি, আপনারা ফোটো তুলুন। আমার তুলে কাজ নেই।'

কুমকুম বলল, 'কেন, তোমার আমার কী হল।'

ছায়া বলল, 'আমার ছবি ভালো হয় না। ভারি বিশ্রী হয়।'

পদ্মা বলল, 'শঙ্করবাবুর হাতে মোটেই বিশ্রী হবে না। উনি এমন করে ছবি তুলে দেবেন যে ফোটো দেখেই বরপক্ষ দিশেহারা হয়ে ছুটে আসবে।'

হাতে ফুলের তোড়া, খোঁপায় গোলাপ ফুল গুঁজে তিনজনে তৈরি হয়ে দাঁড়াল। ছায়ার ফুলটা মাটিতে পড়ে যেতে পদ্মা হেসে বলল, 'দেখলেন তো। আপনি পরিয়ে না দিলে ওর ফুল কিছুতেই খোঁপায় থাকতে চাইছে না।'

ছায়া চাপা গলায় মৃদু ধমকের সুরে বলল, 'ছিঃ কী হচ্ছে পদ্মাদি।'

শঙ্কর পাছে সত্যিই ফুলটা পরিয়ে দিতে আসে সেই ভয়ে ছায়া তাড়াতাড়ি নিজেই আবার ফুলটা গুঁজে নিল।

খানিকটা দূরে এসে শঙ্কর একবার ক্যামেরাটা ঠিক করে নিতে গিয়ে টের পেল আর ফিল্ম নেই। আসার সময় নতুন করে ফিল্ম আর কিনে নিয়ে আসেনি। ভেবেছিল যা দু চারখানা আছে তাতেই চলে যাবে। অনর্থক পয়সা খরচ করে কী হবে। এর আগে শঙ্করের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে দেখেছে এ সব ফোটো কেউ আর টাকা খরচ করে নেয় না। হয় বিলিয়ে দিতে হয় না হয় ঘরেই পড়ে থাকে। তার শ্রম আর অর্থ মিছিমিছি নষ্ট হয়।

কিন্তু এমন একটি চমৎকার মুহূর্তে এসে তার সব ফিল্ম ফুরিয়ে যাবে শঙ্কর তেমন আশঙ্কা করেনি। একমুহূর্ত সে স্তব্ধ হয়ে রইল। কথাটা যদি প্রকাশ করে তাহলে ওরা হতাশ হয়ে পড়বে। হয়তো ভাববে ফিল্ম নেই জেনেও ফোটো তোলার নাম করে সান্নিধ্যের লোভে শঙ্কর ওদের ডেকে নিয়ে এসেছে। এর চেয়েও বেশি খারাপ ধারণা করা অসম্ভব নয়। তাতে লাভ কি হবে। একটি সুন্দর গানের সুর শুধু মিছিমিছি কেটে যাবে। তার চেয়ে একটি মধুর মিথ্যায় এই মুহূর্তটি মধুরতর করে রাখা ঢের ভালো।

শঙ্কর নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল, 'রেডি?'

পদ্মা বলল, 'অনেকক্ষণ।'

তারপর শঙ্কর ওদের ফোটো তুলে নিল।

গ্রুপ শেষ হলে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা। তাও একখানা করে নয়। বসিয়ে রেখে দাঁড় করিয়ে নানাভাবে ওদের ফোটো তুলল শঙ্কর। এখন আর তার কোন ভয় নেই। এখন পুরোমাত্রায় তার সাহস বেড়ে গেছে।

ফোটো তোলার পর্ব শেষ হলে মালীকে কিছু বকশিশ দিয়ে শঙ্কর ওদের নিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

ছায়া শঙ্করের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মৃদুস্বরে বলল, 'আমার ফোটো আপনাকে পাঠাতে হবে না।'

শঙ্কর বলল, 'কেন?'

'আমার ফোটোগুলি আপনার কাছেই রেখে দেবেন!'

'আপনার ফোটো ভালো উঠবে না এই ভয়ে বলছেন?'

ছায়া বলল, 'না, এমনিই।'

পম্মা আর কুমকুম আগে আগে যাচ্ছিল। একবার মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, 'শঙ্করবাবু ফের পক্ষপাত? ছায়াকে বাড়ি পর্যন্ত এখন নিয়ে যেতে পারলে হয়।'

রোদের তাপ বেড়েছে বলে পম্মা আর কুমকুম দুজনে মাথায় আঁচল তুলে দিল।

শঙ্কর বলল, 'আপনিও আঁচল দিন মাথায়।'

ছায়া বলল, 'না না না, আমার লাগবে না।

শঙ্কর পকেট থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে বলল, 'তাহলে এইটা মাথায় বাঁধুন।'

ছায়া এবার হেসে বলল, 'সে বড় বিশ্রী দেখাবে।'

শঙ্কর তখন রুমালটা পকেটে রেখে ছায়ার আঁচলটাই তার মাথায় তুলে দিল।

ছায়া আড়ষ্ট হয়ে মৃদু তিরস্কারের সুরে বলল, 'কী যে করছেন। কেউ যদি দেখে ফেলত।'

রাজাদের বাগানবাড়িতে শঙ্কররা যখন ফিরল তখনও সব রান্না নামেনি। প্রভাত তাসের আড্ডায় ভিড়ে পড়েছে। মণ্টুর চার পাশে ছেলেমেয়েরা জড়ো হয়েছে। সে একবার শিশির ভাদুড়ী, আর অহীন্দ্র চৌধুরী আর একবার নরেশ মিত্র এবং সর্বশেষে সরযূবালার গলার অনুকরণ করে অভিনয় করছে। মেয়েরা ক্ষুধাতৃষ্ণা তুলে হেসে লুটিয়ে পড়ছে। তাদের মায়েরা মুখে আঁচল গুঁজে কোন রকমে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন মণ্টুই এই পার্টির হিরো। কিন্তু সেজন্যে শঙ্করের মোটেই ঈর্ষা হল না।

আরো আধ ঘণ্টা বাদে খাওয়ার ডাক পড়ল। ছেলেদের নয়, মেয়েদেরই আগে খাইয়ে দেওয়া হবে। তারপরে তারা পরিবেশন করবে। মেয়েদের দলে বাচ্চা ছেলেরাও পড়ল। সেই বুড়ো ভদ্রলোকেরও ওই দলভুক্ত হবার সৌভাগ্য ঘটল। শোনা গেল আরো একটা আইটেম বেড়েছে। প্রভাতের ছোট মেসোমশাই গঙ্গার মাঝিদের কাছ থেকে একেবারে টাটকা দুটি ইলিশ মাছ কিনে নিয়েছেন।

মেয়েদের খাওয়া শেষ হলে পুরুষদের ডাক পড়ল। ঘরের সামনের দিকের দালানে দুই সারিতে খান পঞ্চাশেক পাতা পড়েছে। কলারপাতা, মাটির গ্লাস, বসবার জন্যে কারো খবরের কাগজ করো নিজের রুমাল কেউ বা বিনা পিঁড়িতেই আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন।

আশেপাশে সামনে যাঁরা বসেছেন কাউকেই চেনে না শঙ্কর। দু চারজনের সঙ্গে এখানে যা এক আধটু পরিচয় হয়েছে। হোটেলেও এমনি অপরিচিতদের সঙ্গে শঙ্কর রোজ দুবেলা খায়। কিন্তু আজকে খাওয়ার স্বাদ আলাদা।

প্রভাত বসেছে একটু দূরে। সে সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'শঙ্কর, মেয়েরা যখন খাচ্ছিল তুমি তাদের একটা ফোটো নিয়েছ তো?'

তার পাশ থেকে আর এক ভদ্রলোক বললেন, 'ওঁকে আর শিখিয়ে দিতে হবে না। উনি কেবল মেয়েদের ফোটো নেওয়ার জন্যেই এখানে এসেছেন।'

মণ্টু সামনের সারি থেকে মেয়েলী গলায় বলল, 'আমার নাম মণ্টুরানী। দয়া করে আমারও একটা ফোটো নেবেন শঙ্করবাবু।' অনেকেই হেসে উঠল।

পাশের এক ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'নাঃ কী যে শুরু করেছ মণ্টু। তোমার জ্বালায় সবাই আমরা বিষম খেয়ে মরব।'

মণ্টু বলল, 'আগে ভাত আসুক তবে তো বিষম খাবেন। কলাপাতা সামনে নিয়ে আমি তো শুধু ক্ষিদেয় খাবি খাচ্ছি।'

ভাত তরকারি সবই এল। নানা বয়সের তিন চারটি মহিলা পরিবেশনের ভার নিয়েছেন। শঙ্কর দেখে খুশি হল তাঁদের মধ্যে ছায়াও আছে। কোমরে আঁচল জড়ানো, হাতে ভাতের থালা। ভারি চমৎকার মানিয়েছে ওকে, বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। শঙ্করের ফিল্ম থাকলে সত্যিই একখানা ফোটো তুলে নিত।

প্রথমবার ছায়া শঙ্করকে পরিবেশন করতে এল না অন্য দিক দিয়ে ঘুরে গেল। দ্বিতীয়বার এল ফিরতি ভাত নিয়ে।

শঙ্কর বলল, 'আমার আর লাগবে না।'

ছায়া তবু সাদা ফুলের মত এক হাতা গরম ভাত শঙ্করের পাতে ঢেলে দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না। সবই যে পড়ে রইল।'

এই কথা কটি তো আর সুর দিয়ে বলেনি ছায়া, তবু যেন সুরের ধারা গলে পড়ল। শঙ্করের মনে হল, অনেক কাল অনেক যুগ বাদে অন্নের সঙ্গে সুধাকণ্ঠের 'একটি অন্তরের' স্নিগ্ধ মাধুর্যের সংযোগ ঘটল তার ভাগ্যে।

ডান দিকে দু তিনখানা আসন পরে দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোক খাচ্ছিলেন। সবাই তাঁকে খাওয়াবার জন্যে ব্যস্ত। 'দিলীপবাবুকে দাও, দিলীপবাবুকে দাও। যিনি খেতে পারেন তাকে দাও। যিনি খেতে পারেন তাকে দাও।'

আর এক ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ আর্টিস্ট বটে আমাদের দিলীপবাবু। পুরুষের মত খান, পুরুষের মত বাঁচেন, পুরুষকে নিয়ে ছবি আঁকেন। বসে বসে কাঁঠাল গাছটার কেমন স্কেচ এঁকেছেন দেখেছ আর প্রভাতের বুড়ো মেসোমশাইর? চমৎকার হয়েছে। লতা পাতা নয়, ওঁর 'সাবজেক্ট' শাল তাল, তমাল, বট অশ্বত্থ সব বনস্পতি। আর

মানুষের বেলায় সব পুরুষ। মেয়েদের ছবি এ'কে চোখ ভোলানো খুব সহজ। কিন্তু শক্তিমান রহস্যময় পুরুষকে যিনি আঁকতে পারেন তিনি সত্যিকারের আর্টিস্ট। ও'র স্টুডিওতে গিয়েও দেখেছি বাবা ছাড়া কোন মেয়ে নেই।'

মণ্টু খেতে খেতে মাংসের টুকরোটুকু পাতে নামিয়ে দাঁত দিয়ে জিভ কাটল, তারপর বলল, 'ছি ছি ছি ওঁকে আর মেয়ে বলবেন না।'

এ'টো ডান হাত আর বাঁ হাত মিলিয়ে কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'উনি মা। বাবা তাঁর কাছে কে'চো।'

শংকর বুঝতে পারল না এ সব আলোচনায় তার ওপর কটাক্ষ আছে কিনা। হয়তো আছে। কিন্তু শংকর তা গ্রাহ্য করল না। উত্তক্ষণে সন্দেশের থালা নিয়ে ছায়া আবার তার পাতের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

শংকর বলল, 'না না না, আমাকে মিষ্টি দেবেন না। মিষ্টি আমি খাইনে।'

ছায়া বলল, 'আপনি তাহলে কী খান।'

জোর করেই দু'টি সন্দেশ তার পাতে দিয়ে গেল ছায়া। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মিষ্টি আজ খেতে হয়।'

শংকরের মনে হল এই কথাটুকু তৃতীয় সন্দেশ, কিন্তু স্বাদে সর্বোত্তম।

খাওয়াদাওয়ার পর খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে নিতে বেলা পড়ে এল। মাটি থেকে রোদ লাফিয়ে উঠল গাছের আগডালে।

কয়েকজন ফের গিয়ে তাদের আসরে বসলেন। কিন্তু আজ আর তাসে রুচি নেই শংকরের।

আশ্চর্য পদ্মারা আর তার কাছে ঘে'ষছে না। মৃদু হেসে দূরে দিয়ে চলে যাচ্ছে। শংকর টের পেল মেয়ে মহলে ছায়াকে নিয়ে খুব হাসাহাসি চলছে। কে জানে পদ্মা আর কুমকুম কতখানি বানিয়ে বলেছে, কোন্ অসম্ভবকে বিশ্বাস্য করে তুলেছে কে জানে।

সন্ধ্যার আগে আগে দু খানা ডিঙি নৌকো এলো ঘাটে। প্রভাতের ছোট মেসোমশাই শৌখিন মানুষ। তিনি এগিয়ে এসে শংকরের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'চলুন গঙ্গার ওপরে বসে সূর্যাস্তের ছবি তুলবেন চলুন।'

শংকর তাঁর অনুরোধ এড়াতে পারল না। মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারল না তার ফিল্ম ফুরিয়ে গেছে। পাছে জেরায় জেরায় ধরা পড়ে যায়। কোন মুহূর্তে সে সর্বস্বান্ত হয়েছে পাছে সেই কথা উঠে পড়ে।

পার্টির লোকেরা দুই নৌকোয় ভাগ হয়ে গেল। একখানা নৌকো কাছাকাছি ঘুরবে। প্রত্যেকটি গ্রুপকে চান্স দেবে। কিন্তু ছোট মেসোমশাই তিনজন সহযাত্রী নিয়ে গঙ্গা পার হবার সংকল্প করেছেন।

ঘাটের ভিড়ের মধ্যে শংকরের চোখ যাকে খুজল কিছুতেই তার সংগে চোখাচোখি হল না। লজ্জায় কোথায় সে লুকিয়ে আছে কে জানে?

ঘণ্টাখানেক গঙ্গার মধ্যে বেড়িয়ে বিন ফিল্মে দশ বারখানা ছবি তুলবার অভিনয় করে শংকর যখন ফিরল তখন সন্ধ্যা ঘোর হয়ে গেছে। নদীর ওপারে মিল এলাকাগুলিতে সারি সারি আলো জ্বলে উঠেছে বিদ্যুতের বৈজয়ন্তীমালা। কিন্তু এপারে রাজাবাবুদের বাগানবাড়িতে কোন আলো নেই। এখানে ইলেকট্রিসিটি আসেনি। দু তিনটি টর্চ জোনাকির মত মাঝে মাঝে জ্বলছে নিভছে।

যে বাসটায় করে শংকর এসেছিল সেই বাসটাই অন্ধকারে রাক্ষসের মত দাঁড়িয়ে আছে। খোলা দরজাটা মনে হচ্ছে তার মুখগহ্বর। কোন এক মেয়েস্কুলের এই বাসটাকে পিকনিক পার্টি ভাড়া করে এনেছিল। একদল যাত্রীকে সে কলকাতায় পে'ছে দিয়ে এসেছে দ্বিতীয় দল যাত্রার জন্যে উদ্যত।

প্রভাত বাসে উঠবার আগে বলল, 'আরে শংকর। তুমি এখনো যেতে পারনি?'

শংকর বলল, 'না। মেয়েরা পদ্মাদেবীরা কি চলে গেছেন?'

প্রভাত বলল, 'অনেকক্ষণ। তাদের সবাইকে ফার্স্ট ট্রিপেই পাঠিয়ে দিয়েছি। ছায়া তো সেই বেলা চারটে থেকেই যাব যাব করছিল। রোগা বাপ আর দুষ্টু ভাইগুলিকে ফেলে এসেছে সেই চিন্তায় অস্থির। নাও উঠে বসো। বাসে আর জায়গা নেই। কষ্ট করে যেতে হবে।' একটু চুপ করে থেকে শংকর বললে, 'আমি একটু পরে যাব প্রভাত।'

প্রভাত বলল, 'সে কি। এইটাই যে লাস্ট ট্রিপ। বড় মেসোমশাইর যে গাড়িখানা ছিল তাও তো চলে গেছে। এর পর তুমি যাবে কি করে।'

শংকর বলল, 'বি টি রোড পর্যন্ত হে'টে গিয়ে আমি একটা পাবলিক বাসে চলে যাবো।'

প্রভাত বলল, 'কেন এত কষ্ট করবে। একসংগে গেলেই তো হতো।'

শংকর বলল, 'না। আমার একটু দরকার আছে। একজনের সংগে দেখা করে যেতে হবে।'

প্রভাত হেসে বলল, 'তাই বল। তোমার এখনো দেখা সাক্ষাৎ বাকি আছে।'

তারপর অন্ধকারে পুকুরের দিকে দু পা এগিয়ে গিয়ে বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রভাত বলল, 'তুমি না কি আজ এক আচ্ছা খেল দেখিয়ে দিয়েছ!'

প্রভাত বলল, 'তুমি না কি বিনা ফিল্মে'

শংকর দুরুদুরু বুকে বলল, 'কি রকম।'

'খানেক ফোটো।'

শংকর বলল, 'না না না। কে বলল।'

প্রভাত বলল, 'কে যেন বলছিল। তাই নিয়ে খুব হাসাহাসি। তুমি আমাদের মণ্টুকে হার মানিয়েছ। সাবাস। আচ্ছা তুমি তাহলে

ধীরেসুস্থে দেখা সাক্ষাৎ সেরে এসো। আমরা এগোই।'

প্রভাত গিয়ে বাসে উঠল। ছোট মেসোমশাই আর তাঁর সংগীরা আগেই গিয়ে উঠে বসেছেন।

একটু বাদেই বাসটা স্টার্ট নিল। তারপর চওড়া ফটক দিয়ে অন্ধকার বাগানের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘুরেফিরে কখন একসময় আবার সেই রাজাবাবুদের বাড়িতে এল শংকর। বাগানে আসতেই অন্ধকারে প্রশ্ন হল 'কে?'

শংকর সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'তুমি কে?'

লোকটি বলল, 'আমি মালী।'

শংকর বলল, 'ও। না, আমি যাইনি, তোমাদের বাগানটা একটু দেখছি।'

মালী বলল, 'দেখবার আর কিছু নেই বাবু। সে বাগানের আর কিছুই নেই।'

মালী তার কালিপড়া হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরল। পিকনিক পার্টির এঁটো কলাপাতা, ভাঙা মাটির গ্লাস আর কতকগুলি জঞ্জাল একধারে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে?

শংকর বলল, 'তোমার নাম কি মালী?'

মালী হেসে বলল, 'আমার নাম কন্দর্প।'

শংকরও হাসল, 'কন্দর্প! বাঃ বেশ নাম।'

মনে মনে ভাবল গ্রীক পুরাণে মনসিজ হল শিশু আর শংকরের ভাগ্যে সে এক বৃদ্ধ মালী হয়ে দেখা দিয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে শংকর বলল, 'তুমি তোমার নামের মানে জানো কন্দর্প?'

মালী বলল, 'আজ্ঞে না বাবু।'

শংকর অন্ধকারে সেই কাঁঠাল গাছের তলায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গাছটাকে এখন মনে হচ্ছে অতিকায় এক ভূতের মত। বাড়িটা ভুতুড়ে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিনের বেলায় রাজাবাবুদের এই প্রায় পরিত্যক্ত বাড়ির ভিতরটা আরও কয়েকজনের সংগে ঘুরে ঘুরে দেখেছিল শংকর। ছোট-বড় অনেকগুলি ঘর। যে সব ঘর একদিন বিলাসকক্ষ ছিল তা আজ মাকড়শা আর পোকামাকড়ের বাসরঘর হয়েছে। বাড়ির খানিকটা গংগা এরই মধ্যে ভেঙে নিয়েছে। আরো নেবে, সব নেবে। শতাব্দী জুড়ে রাজাবাবুদের কীর্তিকাহিনীভরা ইতিহাসের সংগে একদিনের এই পিকনিক পার্টির ছোট্ট ইতিবৃত্তটুকুও কালস্রোতে কোথায় যে ভেসে যাবে তার কোন চিহ্নও আর থাকবে না।

কিন্তু সেই বন্যাস্রোতের আগেই কি সব শেষ হয়েছে। তার অনেক আগেই কি একটু মধুর মুহূর্ত ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে? যাওয়ার আগে ছায়া কি সব জেনে গেছে? বঞ্চক শংকরের স্বরূপ ধরা পড়ে গেছে তার কাছে?

কিন্তু হাতে হাতে কোন প্রমাণ তো পায়নি। কেউ তাকে হাতে হাতে ধরতে পারেনি। কাউকে সে নিজের ক্যামেরা ছুঁতে দেয়নি। তার ভাবভঙ্গি দেখে কেউ হয়তো অনুমান করে থাকবে। কিন্তু সেই শত্রুর কথা কি ছায়া বিশ্বাস করেছে? একটি মধুর মিথ্যার রঙীন ইন্দ্রজালের চেয়ে এক নিষ্ঠুর রূঢ় স্থূল সত্যকে পরম নির্ভরযোগ্য ভেবে বিদায় নিয়ে চলে গেছে ছায়া? সেইজন্যেই কি যাওয়ার আগে একবার দেখা করেও যায়নি, একটি কথা বলবারও তার সাধ হয়নি?

হঠাৎ নিজেকে বড় রিক্ত আর নিঃসহায় বলে মনে হল শংকরের। এই বিপুল বিশ্বে তার আর কেউ নেই, কিছু নেই। সব পুড়িয়ে দিয়ে সে এক শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে নীচে চতুর্দিকে অন্ধকার উগ্র অনন্ত শূন্যতা।

ছোট একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে কে এসে সামনে দাঁড়াল। চমকে উঠল শংকর অস্ফুটস্বরে বলল, 'কে?'

স্ফুটতর কণ্ঠে প্রতিধ্বনি এল, 'কে? তুমি কে?'

তারপর একটু বাদেই নরম গলায় বলল, 'ও বাবু! আপনি ওই দলের মধ্যে ছিলেন না? আপনি যাননি? সবাই তো চলে গেছে।'

শংকর বলল, 'তুমি হলে প্রেমের দেবতা। কোন দিন তুমি নিজে প্রেমে পড়েছ?'

বুড়ো মালী লজ্জিত হয়ে জিভ কাটল, 'না বাবু। আমি গরীব মানুষ। ও সব আপনাদের জন্যে।'

শংকর বলল, 'তোমার এই বাগান আমার খুব ভালো লেগেছে। বাড়িটাও বেশ ভালো।'

মালী আরো কাছে এগিয়ে এসে নিচু গলায় বলল, 'আপনার কেউ আছে নাকি? আসতে চান।'

শংকর বলল, 'হ্যাঁ।'

মালী বলল, 'আসুন না বাবু। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। অনেক দিন এখানে তেমন কারো পায়ের ধুলো পড়ে না। এ বাগানে ফুল ফুটবে কি করে বাবু? এ বাড়ির শ্রী ফিরবে কী করে?'

শংকর বলল, 'ঠিক বলেছ। আমি তাহলে তাকে নিয়ে দু একদিনের মধ্যেই আসব। তুমি সব ঠিকঠাক গোছগাছ করে রাখবে তো?'

মালী বলল, 'নিশ্চয়ই রাখব বাবু। দেখবেন আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না। আমি সব সাজিয়ে রেখে দেব।'

শংকর বলল, 'তাই রেখো।'

তারপর কি ভেবে ঘড়ির পকেটের ভিতর থেকে তার শেষসম্বল পাঁচ টাকার নোটখানা মালীর সামনে তুলে ধরে বলল, 'নাও।'

মালী জিভ কেটে বলল, 'সে কি বাবু, আমি তো আপনার জন্যে এখনো কিছুই করিনি।'

শংকর বলল, 'আহা করবে তো। হয় কাল, না হয় পরশু। তুমি আগাম নিয়ে রাখো। তুমি আমার আপনজন। বিশ্বাসী মানুষ, নাও লজ্জা করো না।'

মালী টাকাটা নিয়ে প্রায় সাষ্টাংগে শংকরকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। তারপর হেসে বলল, 'চলুন বাবু, আজ তাহলে আপনাকে এগিয়ে দিই।'

হ্যারিকেন হাতে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মালী বলল, 'খুব সাবধান, খুব গোপনে থাকে যেন কথাটা।'

শংকর বলল, 'নিশ্চয়ই। তোমার কোন ভয় নেই।'

মালী বলল, 'আপনারও কোন ভাবনা নেই বাবু। আমি আপনাদের জন্যে সব ঠিক করে রাখব।' শংকর হেসে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা।'

তারপর গেট পার হয়ে রাস্তায় নেমে অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে চলল শংকর।

পৃথিবীতে কেউ কোথাও তার জন্যে প্রতীক্ষা করে বসে নেই। কোন দিন হয়তো থাকবেও না। না প্রেমে, না অর্থে, না শক্তিতে কোন নারীকেই সে হয়তো কোন দিন আকর্ষণ করতে পারবে না। কিন্তু এই বুড়ো মালী তার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে থাকবে। সে সারা বাড়ি পরিষ্কার করবে। একটি ঘরকে ধুয়ে মুছে সত্যিই বাসযোগ্য করে তুলবে। রাশি রাশি ফুল আনবে, মোমবাতি আনবে তারপর ফুলের মত সুন্দর আর মোমের মত নরম একটি মেয়ের মুখ দেখবে রাত্রির স্বপ্নে আর দিনের স্মৃতিতে।

বেশ হবে। শংকর নিজের মনেই হাসল। এ যাত্রায় এই তার লাস্ট ব্লাফ।

দ্বিচারিণী

আনন্দ বাগচী

নিস্তুপ মৈহাটি দুলেছে মনে মনে, তার নখদর্পণে এখন
ধরাতলে রূপসী কে সকলের চেয়ে তার মুখ,
প্রোৎপারাবতী সুখে সখী, প্রিয়সখী গলে গেছে ;
মাধবী এখন যেন সুগভীর জলের ইঁদারা
একটি নিশ্চল বৃন্তে দেহে বৈরি ছিল যে যৌবন
সমাহিত এই কথা পৃথিবীর সকলে জানুক।
রূপবতী তাকে ঘিরে সামনে কালো যমুনার জল।
বেতারে দুপুরে চলছে মৃদুচালে, বিলাসী রৌদ্দুরে
জ্বলছে শবাধারতুল্য শহরতলিটা। কেউ নেই
পিছনে আসলে না কেউ, মুছে গেছে তিনটি যুবক
একে একে, তিনশূন্য এক হয়ে গেছে।
এখন পরমহংস সুখী দিন চোখের জলের
দাগ মুছে ফেলে এসে কূলে উঠলো, কাম্য অন্ধকারে
অসংখ্য যুবক ডুবলো জীবনকে সমুদ্র সফেন
জেনে জেনে।
স্মৃতি তবু দ্বিচারিণী কখনো- কখনো॥

একটি গাছ একশ ফুল

দুর্গাদাস সরকার

ঝাপসা আকাশ তলে
নগর-চূড়া হঠাৎ এ কোন অগ্নিশিখায় জ্বলে।
সারাটা দিন ট্রামের দাপাদাপি,
তারি পাশেই শূন্য মাথায় ভর্তি ফুলের ঝাঁপি।
একটি গাছে এক শ' ফুলের ঘর,
চৈত্রদিনে হৃদয়-কোণে তারাই আনে ঝড়!
ব্যস্ত প্রহর, সমস্ত দিন দু' পাশে লেনদেন,
কেনা-কাটা, রিকশা, অফিস, লম্বা পায়ে হাঁটা,
পথের মাথায় পুলিস মোতায়েন,
হঠাৎ সবাই থমকে দাঁড়ায়, বন্ধ জোয়ার-ভাঁটা,
এক চমকে শক্ত মনের গিঁট গেছে যে কাটা,
কোন বিধাতা এমনি করেই ফুলের আয়ু দেন!
একটি পাখি চেয়েছিল কোন সকালে আশা :
ভেজা দুটি ঠোঁটের একটি বাঁকে
ছড়িয়ে আছে শহর জুড়ে বনের ভালবাসা!!

তোমার নামে

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

তোমার নামে আকাশদীপ রাখবো আমি জ্বেলে :
তারি আলোর সোহাগ পেয়ে ফুটবে ফুল বনে,—
মদির হাওয়া মুখর হবে দিকে—দিগঙ্গনে ;
দিগ্বধূরা দেখবে তাকে অবাক চোখ মেলে।

তারি আলোর সোহাগ পেয়ে ফুটবে ফুল বনে,
গানের পাখি ভোলাবে মন কূজনে প্রাণ ঢেলে ;
দিগ্বধূরা দেখবে তাকে অবাক চোখ মেলে,
বুনবে কোন স্বপ্নজাল তখন মনে মনে!

গানের পাখি ভোলাবে মন কূজনে প্রাণ ঢেলে :
তারারা এসে দেবেই উঁকি খুশির বাতায়নে,
বুনবে কোন স্বপ্নজাল তখন মনে মনে!
পৃথিবী হবে দীপ্তিমতী তাকেই কাছে পেলে।

তারারা এসে দেবেই উঁকি খুশির বাতায়নে ;
ঝরাবে তারা অশ্রুজল সে-দীপ নিবে গেলে।
পৃথিবী হবে দীপ্তিমতী তাকেই কাছে পেলে,—
জ্বালবো সেই আকাশদীপ আমার এ-জীবনে।

প্রসিদ্ধ মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ সাইমন কুজনেট্‌স্ সম্প্রতি কিছু উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যান আমাদের জ্ঞানগোচর করেছেন। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রচুর মানসিক ব্যায়াম করে তিনি যে তথ্যাবলী সাজিয়েছেন তা থেকে আমরা জানতে পেরেছি কী-ভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনীতিক অঞ্চলের অধিবাসীরা মোট পৃথিবীর আয়কে ভাগাভাগি করে নিতে পারছে। এই ভাগা-ভাগির অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের অবস্থাকে তিনি আবার তুলনা করেছেন এক দশকেরও আগেকার আমলের অবস্থার সংগে। নিচে আমরা এই সব পরিসংখ্যানের সামান্য কিছু প্রয়োজনীয় অংশ দিচ্ছি যা থেকে ঐসব অঞ্চলের মাথাপিছু ধন বণ্টনের একটা ধারণা পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, কুজনেট্‌স্ সাহেবের এই তথ্যাবলীই সম্ভবত প্রথম আমাদের চোখের সামনে আঞ্চলিক ধন বণ্টনের গতি-প্রকৃতির মোটামুটি একটা সহজবোধ্য ছবি তুলে ধরেছে। তিনি ১৯৩৮ সনের পরিস্থিতির সংগে ১৯৪৯ সনের তুলনা করেছেন, এবং উভয় বছরের জন্যই পৃথকভাবে তৎকালীন সারা পৃথিবীর মাথাপিছু আয়কে ১০০ ধরে তার তুলনায় আঞ্চলিক আয়গুলোকে নির্ধারিত করেছেন।

অঞ্চল	১৯৩৮			১৯৪৯		
	পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ভাগ	পৃথিবীর মোট আয়ের শতকরা ভাগ	আপেক্ষিক মাথাপিছু আয় (পৃথিবী ১০০)	পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা ভাগ	পৃথিবীর মোট আয়ের শতকরা ভাগ	আপেক্ষিক মাথাপিছু আয় (পৃথিবী= ১০০)
১। খানিকটা অগ্রসর অঞ্চল (রুশ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ইওরোপ)	১৬·৩	১৮·৯	১১৬	১৪·৮	১৭·২	১১১
২। অনগ্রসর অঞ্চল (লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকা)	৬৬·৫	২৩·৮	৩৬	৬৭·৬	১৬·৯	২৫

অগ্রসর অঞ্চল বলতে কুজনেট্‌স্ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইয়োরোপ বুঝেছেন; মাঝারি-গরীব অঞ্চলের মধ্যে পড়ছে ইওরোপের অন্য অংশ এবং লাতিন আমেরিকা; দরিদ্র অঞ্চল হচ্ছে এশিয়া ও আফ্রিকা।

অগ্রসর ছাড়া অন্য অঞ্চলগুলিকে একটু অন্যভাবে সাজালে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে এই রকম :

অঞ্চল	১৯৩৮			১৯৪৯		
	পৃথিবীর মোট জন-সংখ্যার শতকরা হিসাব	পৃথিবীর মোট আয়ের শতকরা হিসাব	আপেক্ষিক মাথাপিছু আয় (পৃথিবী= ১০০)	পৃথিবীর মোট জন-সংখ্যার শকতরা হিসাব	পৃথিবীর মোট আয়ের শকতরা হিসাব	আপেক্ষিক মাথাপিছু আয় (পৃথিবী= ১০০)
১। অগ্রসর অঞ্চল	১৭·২	৫৭·৩	৩৩৫	১৭·৫	৬৫·৯	৩৭৫
২। রুশদেশ	৭·৯	৮·১	১০২	৮·৪	১১·২	১৩৩
৩। মাঝারি গরীব অঞ্চল	১৪·৪	১৫·০	১০৪	১৩·০	১০·৪	৭৯
৪। দরিদ্র অঞ্চল	৬০·৫	১৯·৬	৩২	৬১·০	১২·৫	২১

উপরে পরিবেশিত তথ্যের প্রথম বিন্যাসটির গুণ এই যে এতে রুশদেশকে আলাদা বিচার করা হয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রুশকে ইয়োরোপের অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলগুলির সংগে একত্রে রাখা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক হয়েছে। আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অনগ্রসর অঞ্চলের মধ্যে এশিয়া-আফ্রিকার সংগে লাতিন আমেরিকাকে ধরে এক ধরনের অর্থনীতিক সমস্যাজর্জরিত দেশগুলিকে এক গোষ্ঠীতে আনা হয়েছে। লাতিন আমেরিকা বরং এশিয়ার সংগে সাদৃশ্যযুক্ত, পূর্ব ও দক্ষিণ ইয়োরোপের অর্থনীতিক সংগঠনের সংগে নয়।

যাই হোক এই দুই পরিসংখ্যান-বিন্যাস থেকেই প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ সম্ভব। একদিকে যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মার্কিন দেশ ও পশ্চিম ইয়োরোপের আপেক্ষিক গড়পড়তা আয় ১৯৩৮-এর তুলনায় ১৯৪৯-এ অনেকটা বেড়েছে, তেমনি অন্যদিকে মাঝারি-গরীব ও গরীব এই উভয় অঞ্চলেই তা গুরুতরভাবে নিম্নমুখী হয়েছে। রুশদেশের আপেক্ষিক মাথাপিছু আয়ও যথেষ্ট বেড়েছে এবং হয়তো প্রকৃত বৃদ্ধির পরিমাণ কুজনেট্‌স্-এর অনুমানের চেয়ে বেশিই হয়েছে। পূর্ব ও দক্ষিণ ইয়োরোপের মান, কুজনেট্‌স্-এর মতে, এত নিম্নগামী হয়েছে যে রুশদেশের উন্নতিকে তার সংগে যুক্ত করবার পরে মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলক অবস্থা আলোচ্য দুই সময়ে অপরিবর্তিত থেকেছে। কুজনেট্‌স্ সাহেব যদি অবিলম্বে তাঁর আর একটি প্রবন্ধে সাম্প্রতিককালের পূর্ব ও দক্ষিণ ইওরোপের পরিস্থিতির নির্দেশ দিতে পারেন তবে আমরা সত্যিকার উপকৃত হব। উপরন্তু, পূর্ব ইয়োরোপের উত্তর-১৯৫০ পরিস্থিতির পৃথকভাবে জানা একান্ত দরকার। তাহলে সাম্যবাদী সরকার শাসিত অঞ্চলের আর্থিক গতি-প্রকৃতির সংগে ইয়োরোপের পশ্চিম (অগ্রসর) ও দক্ষিণ (অনগ্রসর) অঞ্চলগুলির তুলনা করা ও তার অতিপ্রয়োজনীয় অনুসিদ্ধান্তগুলি জানা সম্ভবপর হবে।

লাতিন আমেরিকার আর্থিক সংগঠন

সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলও এই প্রসঙ্গে বেড়ে গেছে! কারণ যদিও কুজনেট্‌স্‌-এর অন্যান্য তথ্য থেকে দেখা যায় যে লাতিন আমেরিকার আপেক্ষিক মাথাপিছু আয় এই দুই সময়ের মধ্যে কমে গেছে, তথাপি তার বাস্তবিক absolute পরিমাণ এশিয়া-আফ্রিকার তুল্য পরিমাণের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে এবং বরং ইওরোপের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের বাস্তবিক আয়ের কিছুটা কাছাকাছি। হয়তো লাতিন আমেরিকার উৎপাদন সংগঠন বিশ্লেষণ করলে আমাদের দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও গ্রহণযোগ্য শিক্ষা পেতে পারব। কারণ এই সত্যটি এখনই আমাদের উপলব্ধি হওয়া দরকার যে, আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়নের পক্ষে উপযুক্ত জ্ঞান ও কৌশল অগ্রসর দেশগুলির চেয়েও অনগ্রসর (কিন্তু আমাদের চেয়ে অনগ্রসর) দেশগুলির কাছ থেকে আমরা অনেক সময় বেশি করেই গ্রহণ করতে পারব।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যার 'আর্থিক সমীক্ষা'র শেষ, ৩ লাইন মুদ্রাকরের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির ফলে ছাপা হয়ে গেছে।

আলোচনা

'ললিতা'

সবিনয় নিবেদন,

নাবোকোভের 'ললিতা' প্রসঙ্গে রঞ্জনের দ্বিতীয় মত (১৪ই চৈত্র) পড়লাম। বইটির মূল্য বিচারে তিনি গ্রাহামগ্রীনের পন্থাই অনুসরণ করেছেন। বইটি তাঁর নিজের ভাল লেগেছে, এটা তাঁর নিজস্ব, ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেখানে কারও কিছু বলবার নেই। কিন্তু এই ব্যক্তিগত ভাল লাগার ভিত্তিতে বইটির সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে তিনি এত নিঃসন্দেহ হলেন কি করে! বইটি সুপাঠ্য এবং সর্বোপরি নায়কের দুষ্কৃতির কথা জেনেও বইয়ের শেষে তার প্রতি আমাদের মনে কিঞ্চিৎ অনুকম্পা উদ্রেক হয়—এ দুটো বিশেষত্বই কি ভাল বইয়ের মাপকাঠি? তাই যদি হয়, তাহলে বলব, ঐ দুটি বিশেষত্ব না থাকা সত্ত্বেও ডাঃ জিভাগো পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে বিবেচিত হয়েছে।

বুঝতে পারলাম না ঠিক কি কারণে 'ললিতা' সাহিত্য হিসাবেই উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। সদ্য আমেরিকা প্রত্যাগত এক বন্ধুর কল্যাণে বইটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করার সৌভাগ্য আমারও হয়েছে। রঞ্জনের মতে 'ললিতা শুধু একটি বার বছরের মেয়ে নয়। সে একটি আইডিয়া ও আইডিয়ার সমাধি।'

কিন্তু তার বইএর মধ্যে সাংকেতিকতার অনুসন্ধান করতে নাবোকোভ নিজেই পাঠকদের বারণ করেছেন; অন্তত Encounterএ LIONEL TRILLINGএর প্রবন্ধ পড়লে তাই মনে হয়।

মনোবিজ্ঞানের প্রতি নায়কের অশেষ ঘৃণা, অথচ ললিতার প্রতি তার আসক্তির উৎসানুসন্ধান করতে গিয়ে হাম্বার্ট তার ছোটবেলাকার একটি ঘটনার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটা ত মনোবিজ্ঞানীদেরই সুচিন্তিত রীতি, যার মাধ্যমে তারা মানুষের অবসেশনের মূলসূত্র আবিষ্কার করে তা দূর করতে প্রয়াসী হন। কাজেই ঘৃণাটা তাহলে একজাতীয় ভাবের ঘরে চুরি!

আর একটা কথা, 'উপভোগের বৃহদংশ বিস্ময়জাত', এটা সত্যি কথা, কিন্তু অসম্ভাব্যতার মধ্যেও যে আমাদের উপভোগের উপকরণ খুঁজে নিতে হবে, এ কেমনতর আব্দার! ১২ বছরের মার্কিন মেয়ের এ ধরনের sexual precocity সম্ভব কি করে! শরীর বিজ্ঞানীদের মতে ওদের দেশের মেয়েদের যৌবনোদ্গমের (এবং সেইহেতু Libido) বয়স ত আমাদের দেশের চাইতেও বেশী। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও যদি ঘটনাটাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে বইটিকে "বাস্তবধর্মী" বলতে হয়, তাহলে বইটির মূল্য উপন্যাসের চাইতেও Gynaecological Case-report হিসেবে অনেক বেশী হয়ে দাঁড়ায়। ইতি—

সত্যব্রত চৌধুরী, মধুপুর

জনসংখ্যার সমস্যা

মহাশয়,—অষ্টাদশ সংখ্যা সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় (২৮শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার) আমার লেখা 'জনসংখ্যার সমস্যা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত প্রবন্ধে 'ম্যালথাসে'র পরিচয় প্রসঙ্গে আমি তাঁকে 'জার্মান পণ্ডিত' বলে উল্লেখ করেছিলাম। ধানবাদ থেকে শ্রীপুলিন-বিহারী চক্রবর্তী নামে জনৈক পাঠক পত্রযোগে জানাতে চেয়েছেন যে, 'ম্যালথাস' প্রকৃতপক্ষে জার্মান না ইংরেজ!

এসম্পর্কে আপনাকে আমি জানাতে চাই যে, পত্র লেখকের অনুমানই ঠিক এবং তিনি জে কে মিত্রের 'জেনারেল ইকনমিকস' থেকে যে উদ্ধৃতিটি তুলে দিয়েছেন, সেটাই নির্ভুল। টমাস রবার্ট ম্যালথাস ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন এবং মারা যান ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে এবং তিনি একজন যাজক ছিলেন।

আমার প্রবন্ধে আরও উল্লেখ ছিল যে, এক শতাব্দী পূর্বে তিনি এক যুগান্তকারী প্রবন্ধ লেখেন। পত্রলেখক সে সম্পর্কেও আমার ভুল ধরে বলেছেন যে, দুই শতাব্দী পূর্বে তিনি ঐ প্রবন্ধ লেখেন (১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে)। সময়ের হিসেবে বলতে গেলে ওটা দেড় শতাব্দীর মত হয়। প্রকৃতপক্ষে আমি কোন নির্দিষ্ট বৎসরের উল্লেখ করিনি। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ১৭৯৮ সালকে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক বলা যেতে পারে। আর উনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর ব্যবধান এক শতাব্দীরই মাত্র। অধিকন্তু ম্যালথাসের মৃত্যু হয় ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে।

যাই হোক, এই অসাবধানতার জন্য আমি দুঃখিত এবং ভুল স্বীকার করে নিচ্ছি—ইতি, জিতেশ বসু।

ট্রামে-বাসে

তিব্বতে রাষ্ট্র-বিপ্লব হইল হালের জোর খবর। বিশুখুড়ো এই প্রসঙ্গে বলিলেন—"তিব্বতকে পৃথিবীর ছাদ বলা হয়। পেটানো ছাদ, না ঢালাই ছাদ কোন্‌টা ভালো এবারে তার একটা পরীক্ষা হয়ে যাবে"।

* * *

সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গে একটি "সর্বার্থসাধক" খাদ্য উৎপাদনের জন্য দুই লক্ষ টাকায় একটি যন্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। শ্যামলাল বলিল—"কিন্তু আমাদের মনে হয় এর চেয়ে একটি পক্ক হরিতকী অন্বেষণ কমিটি স্থাপনের ব্যবস্থা করলে ভালো কাজ হতো"!!

* * *

পুলিস ও বাস কর্মচারীদের মধ্যে পুলিশ ও বাস কর্মচারীদের মধ্যে জন্য কলিকাতা-হাওড়া পরিবহন সংযোগ বিপর্যস্ত হয় এবং তাহাতে জনসাধারণের অশেষ দুর্গতি হয়। —অর্থাৎ সাদামাটা বাঙলায় উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়ে"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

শ্রীনেহরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, আমাদের যুদ্ধ শুধু দারিদ্র্যের সঙ্গে। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কিন্তু দারিদ্র্য যে বহুদিন আগে থেকেই আমাদের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি মেনে নিয়েছে"!!

* * *

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর লোকসভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, মহীশূরে কেন্দ্রীয়

খাদ্য গবেষণাগার ঘিয়ে ভেজাল নির্ধারণ সম্বন্ধে একটি সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন। "কিন্তু গবেষক ডালে ডালে ঘুরলেও ভেজালকারী ঘোরেন পাতায় পাতায়। তাদের হাতে পড়ে ফলিত বিজ্ঞান দুদিনেই "ছলিত" বিজ্ঞান হয়। আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আমরা 'ছলিত' বিজ্ঞানের কথা পাঠ করেছি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

মাকড়দহে দেশলাইয়ের বাক্স দিয়া "দেশলাইয়েশ্বরী" প্রতিমা নির্মাণ করা হইয়াছিল এবং তাহাতে বেশ দু'পয়সা প্রণামীও নাকি অর্জিত হইয়াছে। —"বিধানসভার স্পীকার সম্প্রতি মন্তব্য করেছেন—তেত্রিশ কোটি দেবতার উপর আর দু'একটি হলে ক্ষতি কি? কিন্তু দু'একটিতে থামবে কি? আমাদের যে নাকেপ সুখমস্তি। দেশলাইয়েশ্বরীর পর বিড়িশ্বরী আবির্ভূতা হওয়াও অসম্ভব নয়"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

আমের আকৃতির তিনটি হাঁসের ও একটি মুরগীর ডিমের ছবি আমরা সংবাদপত্রে দেখিয়াছি। এই আম-ডিমের খবর আসিয়াছে ভগবানগোলা হইতে। —"সত্যিই ভগবানগোলা! এখানকার এক একটি খবরে মানুষের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয়ে যায়। আমের আকৃতির ডিমের পর যদি আমরা ঘোড়ার ডিমের ছবি দেখি, তাহলেও বিস্মিত হব না"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

আমরা একটি সাম্প্রতিক সংবাদে পড়িয়াছিলাম যে, সোভিয়েৎ প্রধান মন্ত্রী মহাশয় নেহেরুজীকে রাশিয়া ভ্রমণের আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী সংবাদে শুনিলাম দিল্লীতে নাকি এই সংবাদ সমর্থিত হয় নাই। আমাদের শ্যামলাল বলিল—"শুনেছি নিমন্ত্রণটা করা হয়েছে আসন্ন গ্রীষ্মের সময়। সুতরাং পাকা খবর নির্ভর করবে রাশিয়ার আমের ফলনের ওপর। আমটি আমি খাবো পেড়ে-র সুবিধে না থাকলে নিমন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত বাতিল হওয়া অসম্ভব নয়। এটি হলো রাজনীতির অ-আ"!!!

* * *

শুনিলাম রাশিয়ায় নাকি হাসির পরিমাণ অতি অল্প। —"কিন্তু নিশ্চয়ই সব ধরনের হাসি নয়। আমরা
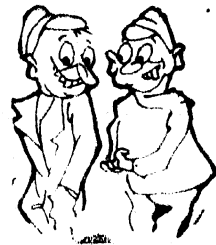
বরং সেখানে দেঁতো হাসির প্রাচুর্য খুব বলেই সংবাদ পেয়েছি। যদি তা-ই হয়, তাহলে রাশিয়া মোক্ষম হাসিটি কাল্‌চার করেছেন, কেননা সবাই জানেন দেঁতো হাসির তুলনা নেই"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

একটি সংবাদ—"দিল্লীতে চিড়িয়াখানা দর্শকদের জন্য সরকারীভাবে খোলা হবে। অর্থাৎ আর বিনা দর্শনীতে চিড়িয়াখানা দেখা চলবে না"। শ্যামলাল মন্তব্য করিল—"দর্শকদের দিব্যদৃষ্টি থাকলে দিল্লীতে বিনা দর্শনীতে চিড়িয়াখানার দর্শন পাবেন বৈকি"!!

* * *

বিশুখুড়ো সম্প্রতি "হলিডে অন আইস" দেখিয়া আসিয়াছেন। প্রচেষ্টাটা আমেরিকার। রাশিয়া অনুরূপ

কোন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে পারে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে খুড়ো বলিলেন—"শুনেছি হলিডে অন্ আইসের বদলে রাশিয়া নাকি "ওয়ার্ক অন্ ফায়ার" প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করছে। তোমরা তারিখের প্রতীক্ষা করতে পার।"

* * *

পুস্তক পরিচয়

বাংলা পরিভাষা কোষ

পরিভাষা কোষ—সুপ্রকাশ রায়। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাইভেট লিমিটেড। ৭২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা—৯। ৩৯১ পৃষ্ঠা (নির্ঘণ্ট সমেত), মূল্য দশ টাকা।

পুস্তকটি বাঙলা শব্দকোষ। ভূমিকায় লেখক নিজেই বলেছেন, 'ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব ও দর্শন—এই পাঁচটি বিষয়ের যে সকল পরিভাষা আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন হয়, কেবল সেইগুলিই এই অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বিজ্ঞানশাস্ত্র উপরোক্ত বিষয়গুলির সহিত সাধারণভাবে সম্পর্কহীন বলিয়া তাহা এই অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।'

ভূমিকাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছেন, "প্রাচীন গ্রীক যুগ থেকে আরম্ভ করে অতি আধুনিক পঞ্চশীল দুনিয়া পর্যন্ত যে সব মতবাদ ও আদর্শ বারবার আলোড়ন এনেছে, তাদের সংক্ষিপ্তসার খুব সহজবোধ্য করেই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।" এর সঙ্গে তিনি একথাও যোগ করেছেন, "অবশ্য একথা সত্য যে, একাধিক ক্ষেত্রে লেখকের ব্যাখ্যা ও টীকার সঙ্গে অনেকের মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে।"

এই মত-পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, লেখকের ভাষাতেই, "পরিভাষা নির্বাচন সম্পর্কে একটি বিশেষ নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে। বর্তমান কালে মানবসমাজের সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারকে দৃষ্টিকোণ ও ব্যাখ্যার দিক হইতে মোটামুটি দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা, প্রচলিত (ভাষান্তরে—বুর্জোয়া) ও মার্কসীয়।"

পুস্তকটিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির এই মার্কসীয় ব্যাখ্যার ও দৃষ্টিকোণের প্রাধান্য হয়ত 'তথাকথিত' 'বুর্জোয়া'দের পছন্দ না হতে পারে—তবু 'বুর্জোয়া' ব্যাখ্যাও ত দেওয়া আছে। সুতরাং এরূপ একটি 'জ্ঞানভাণ্ডার' সকলের ঘরেই থাকা ভাল, তাতে সাধারণ জ্ঞান সম্পূর্ণ হবে। পুস্তকটি প্রণয়নে লেখককে প্রচুর শ্রম ও অধ্যবসায় করতে হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে একালে মূল্য এমন কিছু বেশী নয়, যদিও মূল্য আর একটু কম হলে পুস্তকটির আরও বেশী প্রচার হত।

৩৮৮।৫৮

নাটক

কন্যাকা : চিত্তরঞ্জন ঘোষ। বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী। মূল্য আড়াই টাকা।

তিনটি একাঙ্কিকার সমষ্টি কন্যাকা। চিত্তবাবুর নাট্যরচনা এই প্রথম। এর আগে তাঁর নহবত এবং কলাবতী গ্রন্থে তিনি কতকগুলি ব্যঙ্গরসাত্মক গল্প উপহার দিয়েছিলেন। কলাবতী সুধীজনের প্রশংসা লাভ করে। সুখের বিষয় নাট্যরচনাক্ষেত্রে চিত্তবাবুর এই পদচারণা প্রথম হলেও তা নির্ভীক এবং বলিষ্ঠ।

বলা বাহুল্য ব্যঙ্গরচনা সহজসাধ্য নয়। এ-জাতীয় রচনায় যে উদ্দেশ্যমূলকতা থাকে তা অনেক সময়েই রচনার স্বভাবসিদ্ধ পথকে দুরারোহ করে তোলে। মতবাদের কণ্টকে সজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল্য সন্তর্পণে ইঙ্গিত করতে হয়। প্রকাশ অপেক্ষা অপ্রকাশের মাধুর্যও ব্যঙ্গরসাত্মক রচনায় উপেক্ষনীয় নয়। চিত্তবাবুর এই তিনটি একাঙ্কিকা নাটকে সে গুণ বর্তমান। সমস্যায় পীড়িত বর্তমান সমাজের দু-একটি কথাকে মুখর করেছেন নাট্যকার। প্রথম নাটক 'কন্যাকা'তে বাঙ্গালী ঘরের কন্যার নির্বাচন পরীক্ষা, দ্বিতীয় নাটকে বনমহোৎসবের কথা, তৃতীয়টিতে আছে প্রেমের বক্রগতি। বিষয়গুলি লঘু। লেখকের বলবার ভঙ্গিও লঘু। কিন্তু লঘু চালে লেখক গভীর সত্যের প্রকাশ করেছেন। কনে-দেখার মধ্যে যে বণিক বৃত্তিসুলভ হিসাব নিকাশের প্রশ্নটি বড়, মানুষের মূল্য অপেক্ষা যে বিষয়টাই মুখ্য এই ফলশ্রুতিই দর্শককে নাড়া দেয় বেশি। এ-যে সভ্যতার অন্তঃসারশূন্যতার প্রমাণ এ-নাটকে তাই দেখান হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'দাও ফিরে সে অরণ্য'-কে ব্যঙ্গ করেছেন লেখক দ্বিতীয় নাটকে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি লেখকের বিদ্বেষ নেই। মঙ্গল চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমান সভ্যতার ভণ্ডামি দেখিয়েছেন চিত্তবাবু তাঁর এই নাটকে। তৃতীয়টির আবেদনও গভীর। একাঙ্ক নাটক বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই। পাশ্চাত্ত্য one act play-র দিকে তাকালে নিজেদের দৈন্যের কথা স্বতই মনে আসে। ছোটগল্পে যে সাফল্য অর্জন করেছি একাঙ্কিকার ক্ষেত্রে সে আশা

এখনও করতে পারি না। আনন্দের বিষয় চিত্তবাবু বাংলা সাহিত্যের এ-অভাব অংশত ঘোচাবার দায়িত্ব নিয়েছেন। ১৩৭।৪৯

আকাশ-বিহংগী—অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। সেনগুপ্ত বুক স্টল, গভর্নমেণ্ট স্টল নং ৩৬, মানিকতলা, কলকাতা-৬। দু টাকা।

বিভিন্ন শ্রেণীর দশটি চরিত্র এই চার অঙ্কের নাটকের মধ্যে অভিনয়-উপলক্ষ্যেই একত্র হয়েছে এবং সেখান থেকেই তাদের মধ্যে নানান সম্পর্কের উদ্ভব এবং দ্বন্দ্ব। কিন্তু সমস্যা মূলত একটিই। সেটি আত্মপ্রকাশের, তরুণ প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়নের এবং স্বীকৃতি লাভের সমস্যা। তার পাশে পাশে ছায়াসঙ্গিনীর মত রয়েছে প্রেমের আক্ষেপানুরাগ। অভিনেত্রী মাতা এবং নাট্যকার পুত্রের মধ্যের অন্তর্দ্বন্দ্বই আগাগোড়া নাটকের স্পন্দন। কিন্তু সাহিত্যযশ প্রার্থনার উচ্ছ্বসিত আকাঙ্ক্ষা এই ভাব পরিবেশকে লঘু, অগভীর ও অসাংঘাতিক করে তুলেছে; হ্যামলেটীয় হৃদয়মন্থনের নাট্যসম্ভাবনাকে হতাশ করেছে। কাহিনী একাগ্রতা ও ঘূর্ণ্যমানতা এই নাটকে দেখা গেল না। লিরিকের প্রাধান্যই শেষ পর্যন্ত সংলাপগুলিকে সুদীর্ঘ করে তুলেছে এবং নাট্যোক্তি থেকে স্খলিত করেছে। অজিতবাবু যদি কোন বিদেশী নাটকের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও বাধিত না হয়ে আগাগোড়া কাহিনীকে তাঁর মৌলিক চিন্তার ছকে সাজিয়ে তুলতেন তাহলে বোধহয় বহমানতায় স্বাচ্ছন্দ্য আসতো। উপসংহারে এমন কথা নিশ্চয়ই মনে হত না যে এই সক্ষম লেখকের হাত দিয়ে আকাশ-বিহংগী উপন্যাসাকারে দেখা দিলেই বোধহয় সার্থক হত।

উপন্যাস

দূরেত্তমা—উষাদেবী সরস্বতী। প্রকাশক—এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। দাম—আড়াই টাকা।

লেখিকা উপন্যাসে যে-সমস্যাটি উত্থাপন করেছেন, তা নিঃসংশয়ে বাস্তব। আমাদের দেশে স্বাধিকারের ক্রমবিকাশের সংগে সংগে নর-নারীর সম্পর্কেও পরিবর্তন এসে গেছে। আধুনিকরা প্রাচীন নীতিবোধ হারিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু নতুন নীতিবোধ এখনও খুঁজে পাননি। সেইজন্য স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার অন্ধ আবেগে তাঁরা স্বাধিকার ও স্বেচ্ছাচারের ভেদ রেখাকে প্রায়ই অগ্রাহ্য করেন। বধূ শর্মিলা বিয়ের পরেও এই স্বাধিকার রক্ষার অত্যুগ্র মোহে স্বেচ্ছাচারী হয়ে পড়ল, ভুলে গেল যে ব্যক্তিগত সুখসন্ধান সামাজিক কল্যাণকে অগ্রাহ্য করে সার্থক হয় না। ফলে সে নিজে তো সুখী হতে পারেনি, উপরন্তু তার স্বামী ও একটি সুখী পরিবারকে বিষিয়ে তুলেছে। নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে একটা সামাজিক দিক আছে। তার সংগে সামঞ্জস্য আনতে না পারলে ট্রাজেডি অবশ্যম্ভাবী। শর্মিলা ও সুভদ্রার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল শর্মিলার এই মিথ্যা স্বাধিকার অর্জনের মোহে। লেখিকা আদর্শ নারী হিসেবে উপস্থিত করেছেন স্বাতী ও সুলেখাকে। এরা সেই জাতের মেয়ে যাঁরা নিজের ক্ষুদ্রসুখের ওপর স্থান দিয়েছে ব্যষ্টির কল্যাণ। এরাই সমাজের জীবনীশক্তি।

কিন্তু লেখিকার দুঃসাহসের প্রশংসা না করে পারি না। এই রকম এক জটিল সমস্যাকে রসোত্তীর্ণ করে তুলতে পারেন একমাত্র কোনো মহাশক্তিধর প্রতিভা। লেখিকার অনুরূপ প্রতিভা নেই। সুতরাং এক মহৎ উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিয়ে এগিয়ে এসেও তিনি আমাদের একখানি সার্থক উপন্যাস দিতে পারেননি। তবুও তাঁর উত্তরসূরীদের কাছে তিনি শ্রদ্ধেয় হয়ে থাকবেন পথিকৃৎ হিসেবে। (৬১৯।৫৪)

তিন মাসের কাহিনী—গোপাললাল সান্যাল। অশোক পুস্তকালয়, কলিকাতা-৯। তিন টাকা।

বুধবার, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ, ১৯২১ সাল। ১৭ই নভেম্বরের আসন্ন হরতালকে কেন্দ্র করে গোটা বাংলা দেশ উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সরকার দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকদের বন্দী করে আন্দোলনকে স্তব্ধ করার ব্যর্থ প্রয়াস করে চলেছেন। এমনি এক পটভূমিকায় কাহিনীর শুরু। এই আন্দোলনের ঢেউ এসে লাগলো বি এ ক্লাসের ছাত্র সুকুমারেরও মনে। তারপর স্বেচ্ছাসেবক দলে নাম লিখিয়ে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাকে এসে উপস্থিত হতে হলো জেলখানায়। কিন্তু খুব বেশীদিন তাকে আটক থাকতে হলো না। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই একদিন আবার সে মুক্তি পেয়ে গেল। সেদিনটাও বুধবার, ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ, ১৯২২ সাল।

এই তিন মাসে জেলখানার ভেতর সুকুমারের

বিচিত্র অভিজ্ঞতাই এই বইটির মূল বিষয়বস্তু। লেখক নিপুণ শিল্পীর মত কলমের স্বল্প আঁচড়ে জেলের ভেতরকার বহু ছোট ছোট অথচ সুন্দর ছবি এ'কে গেছেন সারা বইটিতে। এতে যেমন একদিকে রয়েছে রাজবন্দীদের বিভিন্ন শ্রেয় দিকগুলোর আলেখ্য, তেমনি আবার জেলের ভেতর তাদের বহু হাস্যোদ্দীপক আচরণের কাহিনীও পাশাপাশিই স্থান পেয়েছে। প্রসংগত, জেলকর্মচারীদের ও সাধারণ বন্দীদের চরিত্রচিত্রণও স্বল্পপরিসরে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বইখানি পাঠকমাত্রকেই তৃপ্ত করবে।

৫৮৬।৫৮

আমরা দু'জনা—অবনীনাথ রায়। প্রকাশক—শ্রীঅবনীনাথ রায়। রিজেণ্ট হোটেল, ২০৮, হরিশ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬। মূল্য তিন টাকা।

ষাট বৎসরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক লেখকের রচিত আলোচ্য পুস্তিকা একটি ক্ষুদ্রকায় প্রেমোপাখ্যান। নায়িকা যুবতী চন্দ্রা এবং নায়ক তাহার মেসোমশাই প্রৌঢ় অমিতাভ। প্রেম নাকি অন্ধ, কাজেই বয়স এবং সম্পর্কের সীমা অতিক্রম করিয়া যে কোন লোকের স্কন্ধে ইহা চাপিয়া বসিতে পারে। চন্দ্রা এবং অমিতাভ'র প্রেম শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও লেখক আলোচ্য গ্রন্থে প্রেমিক যুগলের চরিত্র বিশ্লেষণে ভয়ানক দুঃসাহস দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। মাত্র ৭২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র কলেবর গ্রন্থের মূল্য অত্যধিক মনে হইতেছে। ছাপা বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট মনোরম।

৩৯২।৫৮

তামসী—জরাসন্ধ। বেংগল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪ বংকিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

লৌহকপাটের লেখক জেলার জরাসন্ধ মাত্র কয়েকখানি উপন্যাস লিখেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর সম্মানিত আসন স্থায়ী করে নিয়েছেন। এর কারণ তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, দরদী মনের এবং সহজ শিল্প-ভঙ্গির মিশ্রণ। আলোচ্য পুস্তকটিতেও এই গুণ-গুলির দর্শন মিলবে। বইটি লেখক উৎসর্গ করেছেন "শ্রীঘরে বসেও যারা ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখে সেইসব হতভাগিনীর উদ্দেশে।" কিন্তু ঘর বাঁধবার স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ায় হেনা, কমলার মত যেসব হতভাগিনী শ্রীঘরে আসে, তাদের নিয়েই এই মর্মস্পর্শী কাহিনী। উপন্যাস-সাহিত্যে জরাসন্ধ যে একটি নূতন দিক এনে দিয়েছেন, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

৩৭৯।৫৮

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ হস্তগত হইয়াছে :—

যতদূর পৃথিবী ততদূর পথ—রবি গুহ মজুমদার।
ধূলি—রবি গুহ মজুমদার।
বন হরিণীর কান্না—রবি গুহ মজুমদার।
কক্ষপথ—সুনীল সরকার।
অর্ঘ্য—গৌরীমাতার শতবর্ষ জয়ন্তী।
ঝড়—অন্নদামোহন বাগচী।
এ' মনের নানা রং—জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়।
রাধা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
শাঁপবেগম—শক্তিপদ রাজগুরু।
রূপসী রাত্রি—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

রঙ্গজগৎ

চন্দ্রশেখর

উদ্যান—নাট্যশালা "অবন মহল"

বেশ কিছুকাল ধরে শিশুদের মানসিক গঠন ও বিকাশের উপযোগী বিভিন্ন আমোদ-ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশু রংমহলের কর্তৃপক্ষ শিশুদের জন্য তাদেরই মনের মতো রঙ্গজগৎ গড়ে তোলার কাজে ব্যাপৃত আছেন। তাঁদের শুভ-প্রচেষ্টা সুধীজনের প্রশংসা অর্জন করেছে।

সম্প্রতি শিশু-রংমহল শিশুদের জন্য একেবারে নতুন ধরনের উদ্যান শোভিত একটি স্থায়ী রংমহল তৈরী করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। এই শিশু-উদ্যানটি অবনীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করা হবে। তদনুসারে এর নাম হবে "অবন মহল"। এই "অবন মহলে" খেলা, গান, অভিনয় করবার সর্ববিধ আয়োজন থাকবে। এতে একটি স্থায়ী প্যাভিলিয়ন ও রঙ্গমঞ্চও থাকবে। প্রায় দেড় হাজার শিশুর একসঙ্গে অক্লেশে অভিনয়, নাচ, গান দেখবার সুবিধার জন্য এই শিশু-উদ্যানে একটি প্রেক্ষাগৃহ থাকবে। শিশু-উদ্যানে শিশুদের নাচ, গান ও বাজনা শেখার ব্যবস্থাও থাকবে এবং শিশুদের তৈরী সবরকমের চারুকলা প্রদর্শন করবার আয়োজন থাকবে। শিশু-রংমহলের কার্যকরী সমিতির এঞ্জিনীয়ার সভ্যগণ "অবন মহল" গঠনের দায়িত্ব নিয়েছেন।

শিশু-রংমহলের এই "অবন মহল" পরিকল্পনাটি নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিছুদিন পূর্বে বোম্বাইতে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু শিশুদের জন্য তৈরী একটি রংমহলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। মাদ্রাজে রাজ্যসরকারের উদ্যোগে অনুরূপ একটি শিশু-রংমহল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু শিশু-রংমহল তাঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র কলকাতায় আজও "অবন মহল" পরিকল্পনাটি সফল করে তুলতে পারেন নি। "অবন মহলে"র মতো পরিকল্পিত শিশু-উদ্যান ভারতে আর নেই। এর প্রয়োজনীয়তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। আজকালকার দিনে সাধারণ আমোদ-আয়োজনের মধ্যে শিশুদের মানসিক গঠনের উপযোগী বিশেষ কিছুই থাকে না। "অবন মহল" সেদিক দিয়ে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ জাতীয় অভাব দূর করবে। শিশু-রংমহলের এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে জনসাধারণ এবং রাজ্যসরকারের অগ্রণী হওয়া উচিত।

শিশু-উদ্যানটির "অবন মহল" নামকরণও প্রশংসার দাবী রাখে। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ভালোবাসতেন শিশুদের। শিশুদের কাছেও তাঁর নাম খুব প্রিয়। অবনীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শিশু-উদ্যানে শিশুরা তাদের প্রাণবিকাশের পথ খুঁজে পাবে শিক্ষা ও আমোদের বিচিত্র আয়োজনের মধ্য দিয়ে। সহৃদয় দেশবাসীর সহযোগিতায় ও সরকারের সাহায্যে এই অভিনব পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ সকলেরই কাম্য হওয়া উচিত।

"অবন মহল" নির্মাণকল্পে শিশু-রংমহল দেশবাসীর কাছে অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করেছেন। এই মহৎ প্রচেষ্টার সমর্থকেরা অকৃপণ হাতে তাদের অর্থ-সাহায্য-ভাণ্ডারে দান করবেন বলেই আমরা আশা রাখি। "অবন মহলের" জন্য অর্থ-সংগ্রহের প্রচেষ্টায় শিশু-রংমহল আগামী ইংরেজী মে মাসের ১, ২ ও ৩ তারিখে মহাজাতি সদনে এবং ১০ই মে নিউ এম্পায়ারে চারটি নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। শিশু-রংমহলের এই অনুষ্ঠানগুলি জনসাধারণের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হবে না আশা করি।

বিদেশের সম্মান

গত বছর বিদেশে ভারতের চারটি কাহিনী-চিত্র ও তিনটি প্রামাণ্য-চিত্র বিশিষ্ট সম্মানে ভূষিত হয়েছে। সম্মানপ্রাপ্ত ছবি-গুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সত্যজিৎ রায়ের, "পথের পাঁচালীর" নাম। এই ছবি বিদেশে জনপ্রিয়তার যে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে তাঁর তুলনা নেই। গত বছর ছবিটি নতুন করে এই তিনটি সম্মানে ভূষিত হয়েছে:—(১) ভ্যানকুভার (ক্যানাডা) চলচ্চিত্র-উৎসবে প্রথম পুরস্কার; (২) স্ট্র্যাটফোর্ড চলচ্চিত্র-উৎসবে সমালোচকদের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান এবং (৩) ষষ্ঠ বার্ষিক জোসেফ বার্স্টিন অ্যাওয়ার্ড (নিউ ইয়র্ক) কমিটির বিবেচনায় বিদেশী ভাষায় তৃতীয় শ্রেষ্ঠ বহিরাগত চিত্রের পুরস্কার।

বিদেশের সম্মান লাভ করেছে আরও যে তিনটি ছবি সেগুলি হল: "দো আঁখে বারহ্ হাত", "মাদার ইণ্ডিয়া" ও "অপরাজিত"। ভি শান্তারাম পরিচালিত ও প্রযোজিত "দো আঁখে বারহ্ হাত" (১) বার্লিন চলচ্চিত্র-উৎসবে সামাজিক সমস্যার মনোজ্ঞ বিন্যাসের জন্য বিশেষ পুরস্কার এবং সাতটি দেশের প্রতিনিধিদের দ্বারা তৈরী আন্তর্জাতিক ক্যাথলিক সিনেমেটো-গ্রাফিক ব্যুরো কর্তৃক গভীর এবং কাব্যময় রূপ-রীতির জন্য বিশেষ পুরস্কার; (২) হলিউডের ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশনের স্যামুয়েল গোল্ডউইন ইণ্টারন্যাশনাল ফিল্ম অ্যাওয়ার্ডের প্রথম পুরস্কার পেয়েছে।

মেহ্বুবের "মাদার ইণ্ডিয়া" কার্লোভি ভারি চলচ্চিত্র-উৎসবে অভিনয়-উৎকর্ষের জন্য পুরস্কার লাভ করেছে। পুরস্কারটি পেয়েছেন শ্রীমতী নার্গিস মুখ্য-নারীচরিত্রে হৃদয়গ্রাহী অভিনয়ের জন্য।

স্যান ফ্রান্সিসকো চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অপরাজিত" শ্রেষ্ঠ-পরিচালনার জন্য পুরস্কার লাভ করেছে। শ্রেষ্ঠ পরিচালক হিসাবে সত্যজিৎ রায় একটি রৌপ্যাধার ও সার্টিফিকেট লাভ করেন।

প্রামাণ্য চিত্রগুলির মধ্যে বিদেশী সম্মান লাভ করেছে "স্টার্স ম্যান হ্যাজ মেড্", "বিজি হ্যাণ্ডস্" ও "খাজুরাহো।"

"স্টার্স ম্যান হ্যাজ মেড্" ছবিখানি রোমের অনুবিদ্যা পারমাণবিক সমস্যার ইণ্টারন্যাশনাল সেমিনারে কলাকৌশলের উৎকর্ষ এবং শিল্পমনের জন্য পুরস্কার লাভ করে।

"বিজি হ্যাণ্ডস্" ছবিটি মিলানের অষ্টম আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র, প্রচার, চলচ্চিত্র-বাণিজ্য ও কলাকৌশলের ব্যবহার সম্পর্কিত প্রদর্শনীতে "সম্মানজনক উল্লেখে"র পুরস্কার লাভ করেছে।

"খাজুরাহো" ক্যানাডার ইয়র্কটন প্রামাণ্য-চিত্র-উৎসবে শিল্পসৃষ্টির জন্য "সম্মানজনক উল্লেখ" পুরস্কার পেয়েছে।

চিত্রালোচনা

ঈদের ছুটি উপলক্ষে এ হপ্তায় চারখানি নতুন হিন্দী ছবির মুক্তি ঘোষিত হয়েছে। ছবিগুলির নাম—"শরারত", "কালি টোপী লাল রুমাল", "নাচঘর" ও "জয়সিংহ"।

রোশনী ফিল্মসের "শরারত"-এর মুখ্যাংশে অভিনয় করেছেন মীনাকুমারী ও কিশোরকুমার। এইচ এস রাওয়েল একাধারে এর প্রযোজক, পরিচালক, কাহিনীকার ও চিত্রনাট্য-লেখক। সুরযোজনা করেছেন যুগ্ম সঙ্গীত-পরিচালক শঙ্কর ও জয়-কিষণ।

"কালি টোপী লাল রুমাল" তুলেছেন জনতা চিত্র। শাকিলা, কুমকুম, চন্দ্রশেখর, কে এন সিং ও আগাকে নিয়ে এর ভূমিকা-লিপি গঠিত হয়েছে। হরিশ ও চিত্রগুপ্ত যথাক্রমে এর পরিচালক ও সুরকার।

কোয়ালিটি ফিল্মসের "নাচঘর"-এর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছেন অশোককুমার, অনুপকুমার, শুভা খোটে, ধুমল, মীরু

মুশারফ প্রমুখ কুশলী নটনটীরা এবং গোপীকৃষ্ণ, কমলা লক্ষ্মণ ও হেলেন—এই তিনজন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী। প্রযোজনা ও পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন আর এস তারা। এন দত্তের সৃষ্ট সুর "নাচঘর"-এর অন্যতম আকর্ষণ।

"জয়সিংহ" দক্ষিণ ভারতের ছবি—আর আর প্রোডাকশন্সের পতাকাতলে নির্মিত। ওয়াহিদা রেহমন অঞ্জলি দেবী ও এন টি রামারাও এর মুখ্য চরিত্রগুলিকে রূপায়িত করেছেন। পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেছেন যোগানন্দ, সংগীতের রমেশ নাইডু।

অপরূপ পিকচার্স নামক একটি নবগঠিত চিত্র প্রতিষ্ঠান নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে তাঁদের প্রথম ছবি "চলন্তি পথের গ্রন্থি"র চিত্রগ্রহণ শুরু করে দিয়েছেন। ছবিটির প্রধান দুই চরিত্র পিতা ও পুত্র—অভিনয় করছেন যথাক্রমে অসিতবরণ ও অনিল চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন ছবি বিশ্বাস, দীপ্তি রায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ও "বাঘা যতীন"-খ্যাত রবীন রায়। মনোরঞ্জন ঘোষ লিখিত একটি গল্প অবলম্বনে ছবিটি তোলা হচ্ছে। পরিচালনা করছেন নির্মল চৌধুরী।

অনেকদিন বাদে অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় আবার পরিচালনার ক্ষেত্রে ফিরে এসেছেন। দে প্রোডাকশন্সের পতাকাতলে তিনি তুলছেন "রায় বাহাদুর"। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় কিশোরকুমার ও মালা সিংহকে নির্বাচন করা হয়েছে। জহর গাঙ্গুলী, জীবেন বসু, রেণুকা রায়, সমীরকুমার ও জহর রায়কে তারকাদ্বয়ের সহ-শিল্পী হিসাবে দেখা যাবে। ছবিখানি ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে তোলা হচ্ছে।

প্রযোজক-পরিচালক সুকুমার দাশগুপ্ত টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে তাঁর নতুন ছবি "হাত বাড়ালেই বন্ধু"-র শুটিং আরম্ভ করেছেন। ছবির কাহিনী লিখেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করছেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, তরুণকুমার, শান্তি ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

* * *

সুনির্বাচিত বহির্দৃশ্য যে ছায়াছবির কত বড় সম্পদ তা বাংলা ছবির নির্মাতারা হাল আমলে বুঝতে শিখেছেন। আজকাল তাই অধিকাংশ ছবিতেই কিছু-না-কিছু বহির্দৃশ্যের সমাবেশ দেখা যায়।

দেবকী বসু পরিচালিত "সাগর-সংগমে" ছবিতে গংগা-সাগরের দৃশ্যাবলী নতুনতর রসের সন্ধান দেবে চিত্ররসিকদের। ছবিখানি আগামী বুধবার মুক্তিলাভ করবে। রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করে ছবিখানি ইতিমধ্যেই চিত্রামোদী মহলে যথেষ্ট আশা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে।

এবছরে একমাত্র যে শিশু-চিত্রটি সর্বভারতীয় সার্টিফিকেট অফ মেরিট পাবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছে শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী পরিচালিত সেই "বাঁশী ও মায়া-পুতুল" সম্পূর্ণভাবে বাইরে তোলা হয়েছে। এর আলোকচিত্র গ্রহণে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন বারীন সাহা। সম্প্রতি ইনি নিজস্ব প্রযোজনা ও পরিচালনায় তুলতে শুরু করেছেন "তেরো নদীর পারে" নামে একটি পূর্ণাংগ ছবি। মেদিনীপুরে বেশ কিছুদিন ধরে এর বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে। কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রিয়ম হাজারিকা নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

এম এম মুভিজের "এ জহর সে জহর নয়" ছবির বহির্দৃশ্য তুলতে জহর রায়, সুপ্রিয়া চৌধুরী, রবীন মজুমদার প্রমুখ শিল্পীদের নিয়ে পরিচালক কনক মুখোপাধ্যায় গেছলেন জামসেদপুরে। এই ইস্পাত নগরীর অন্তর্গত জুবিলি পার্ক ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্যান। অধিকাংশ বহির্দৃশ্যই এই উদ্যানের মধ্যে ও আশে-পাশে তোলা হয়। দেওজীভাই এই ছবির ক্যামেরাম্যান।

* * *

দৃঢ়চেতা এক নারীর জীবন যুদ্ধে বিজয়িনী হবার অদম্য বাসনা কিভাবে অশেষ বাধা-বিপত্তির মাঝে সার্থক হয়েছিল, তারই বলিষ্ঠ কাহিনী রূপায়িত হয়েছে আর্ট অ্যান্ড কালচার পিকচার্সের নতুন ছবি "অগ্নি সম্ভবা"-তে। সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় ছবিখানা তোলা হয়েছে।

বিভিন্ন চরিত্রে চিত্রাবতরণ করেছেন ছবি বিশ্বাস, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, কমলা মুখোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, তিলক দেবাশীষ প্রভৃতি। ছবিটি শীগ্‌গিরই মুক্তিলাভ করবে।

চিরন্তন কৃষ্ণকথা

বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের দিব্যলীলার অমৃতরস অনন্তকাল ধরে অগণিত ভক্ত, দার্শনিক ও ভাবুকেরা আস্বাদন করে আসছেন। এই লীলা-মাহাত্ম্য ভক্তিপ্রাণ হিন্দু নরনারীর কাছে অতি পবিত্র। অনন্ত পিকচার্সের নিবেদন "শ্রীরাধা", শ্রীরাধার অলৌকিক আবির্ভাব এবং ব্রজধামে শ্রীরাধা-কৃষ্ণ লীলাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

ছবির কাহিনীর শুরু রাজ বৃষভানুর কন্যারূপে শ্রীরাধার অতি-প্রাকৃত জন্ম-কাহিনী নিয়ে। অন্ধপ্রায়—মুদিত নয়নে শ্রীরাধার জন্ম। বৈদ্যরা যখন শিশুর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনতে ব্যর্থ হলেন, তখন বালক শ্রীকৃষ্ণের স্পর্শে শ্রীমতী প্রথম চোখ খুলে কৃষ্ণ-রূপ দর্শন করলেন।

কৈশোরেই শ্রীরাধার সঙ্গে বিবাহ হয় আয়ানের। শ্রীরাধাকে আয়ানের পত্নীরূপে পাওয়ার পূর্ব-রহস্যও বর্ণনা করা হয়েছে ছবিতে। বৈকুণ্ঠের দেবী লক্ষ্মীকে পত্নী-রূপে কামনা করেছিলেন আয়ান। শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় আয়ানের সে কামনা পূর্ণ হয়। তাই দ্বাপরে দেবী লক্ষ্মী শ্রীরাধারূপে নরদেহ ধারণ করলেন এবং শ্রীবিষ্ণু হলেন শ্রীকৃষ্ণ। বিবাহের পর শ্রীরাধাকে প্রথমবার স্পর্শ করার পরই শ্রীবিষ্ণুর দেওয়া বরের শর্ত অনুযায়ী আয়ানের মনে পড়ল পূর্ব-জন্মের কথা। অতএব পত্নী হলেও শ্রীরাধাকে পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী দেবী-রূপে দেখার সংকল্প গ্রহণ করেন আয়ান।

এর পর যমুনা-পুলিনে রাইকিশোরীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-যাত্রার পর শ্রীমতীর যোগিনী-সাজে বিরহ-কাল উদ্‌যাপন ও পরে পরম বাঞ্ছিত ও ইষ্টের সঙ্গে আত্মিক মহামিলন নিয়েই চিত্রনাট্যের পরিসমাপ্তি।

ছবিতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের দিব্যপ্রেমের লীলা উপস্থাপনে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য চিত্রে শ্রীকৃষ্ণকে চিতচোর, গোপীজনবল্লভ ও মদনমোহনরূপে দেখা যায় না। এখানে তিনি জ্ঞানী, ধর্ম-সংস্থাপক ও আধ্যাত্মিক গুরু। গোপিনীদের তিনি আত্মিক বিষয়ে উপদেশ দেন এবং আদর্শ গৃহিণী হবার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ চরিত্র কল্পনা বৈষ্ণব তত্ত্বাভিজ্ঞদের কাছে উদ্ভট মনে হবে। বৃন্দাবনে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের দিব্য প্রেমলীলা নিয়ে অশোভন ভাবধারার আধিক্য অনেক অভিনয়-আসরে এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেখা গেছে, তা পরিহার করে "শ্রীরাধা"র নির্মাতারা সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সেই অজুহাতে যে ঐশ্বরিক প্রেমলীলার ক্ষেত্র হিসাবে বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধি, তাকে কাহিনী থেকে বাদ দেওয়া বা তার বিকৃত ব্যাখ্যা করা নিশ্চয়ই ভক্তজনের অনুমোদন লাভ করবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও অন্যান্য প্রামাণ্য ভাগবত সাহিত্যে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ রাইকিশোরী ও অন্যান্য গোপবালাদের কাছে প্রেমময়রূপে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বাক্য অনুধাবন করলেও বোঝা যায় যে, গোপিনীরা ছিলেন তাঁর কান্তা ও দয়িতা। বৃন্দাবনের গোপনারীদের পরকীয়া প্রেম ও

বাদল পিকচার্সের নবতম নিবেদন "দীপ জ্বেলে যাই" চিত্রের নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী ও সুচিত্রা সেন। ছবিখানি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে

মাধুর্য সাধনা তাই ঈশ্বর সাধনারই অংগীভূত। তাদের অভিসার, কৃষ্ণ-সংগের জন্যে তাদের ব্যাকুলতা মধুর-রহস্য উপাসনারই প্রকার ভেদ। বৃন্দাবনলীলার এই মাধুর্য-রসের ধারা যুগে যুগে প্রেমিক-ভক্তকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, রসিকচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করেছে। সেই রসের যিনি মূলাধার সেই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের এমনিধারা রূপায়ণ বৈষ্ণব বা রসিক কেউই প্রসন্নমনে গ্রহণ করবেন না। কুরুক্ষেত্র বা দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণ আর বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যে রসগত পার্থক্য, এই ছবির চিত্রনাট্যকার তা অনুধাবন করতে পারেন নি।

ছবিতে কুটিলা ও জটিলার চরিত্র দুটিকেও মানবীয় রসে সিঞ্চিত করা হয়েছে। অনেক দর্শকের কাছে এটা ভাল লাগবে। কিন্তু এতে শ্রীরাধার প্রেমলীলার রসমাধুর্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। জটিলা কুটিলা যেন অনেকটা কুল ও সমাজের জটিলতা ও কুটিলতারই অনারূপ—যার নিরন্তর বাধা-নিষেধের মধ্য দিয়ে শ্রীমতীর প্রেমাভিসার কণ্টকণ্টকিত ও দুশ্চর হয়ে উঠেছিল। "দারুণ ননদিনী" না থাকলে পরকীয়া প্রেম মাধুর্য হারায়—এটাই বৈষ্ণব-রসিকজনের বিশ্বাস। ছবিতে এটা না থাকায় কৃষ্ণ-কলঙ্কিনী শ্রীরাধাকে তেমনভাবে পাওয়া যায় না।

চন্দ্রাবলী কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থান নিয়ে শ্রীরাধার যে উদার ভাব দেখানো হয়েছে ছবিতে তাও রসিকজনের কাছে বিসদৃশ লাগবে। এই ঘটনায় শ্রীরাধার দুর্বার অভিমান নিয়ে যে নিবিড় প্রেমরসের গীতি-কবিতা রচনা করেছেন বৈষ্ণব-কবিরা, ছবিতে সে গান শ্রীমতীর মুখে না দিয়ে সখী বৃন্দার মুখে দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি বৃন্দাবন-ধাম ত্যাগ করে শ্রীরাধার দ্বারকায় যাওয়ার ঘটনাটি ভক্তজনকে পীড়িত করবে। শ্রীকৃষ্ণ-বিরহিনী শ্রীরাধার কাছে বৃন্দাবনের প্রতি ধূলিকণা শ্রীকৃষ্ণ-ভাবের উদ্দীপক ছিল। তিনি কখনও বৃন্দাবন ছেড়ে যাননি, কারণ শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি"। বৃন্দাবন তাই যোগিনী শ্রীরাধার পূতস্পর্শে ও শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-বিহারে ভক্তদের কাছে পরম তীর্থ।

আখ্যানভাগের এই অসংগতি বাদ দিলে মোটামুটিভাবে ছবিটি পরিচ্ছন্ন এবং ভাব-বিন্যাসের দিক দিয়ে হৃদয়গ্রাহী। আয়ান ঘোষের সংগে শ্রীরাধার পরিণয়ের দিব্য-রহস্যটি ছবিতে সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আয়ান ঘোষের চরিত্র-কল্পনাটিও সুধীজনের প্রশংসা লাভ করবে। ছবির সংলাপে আধুনিককালের শব্দসমষ্টি থাকার ফলে এর গাম্ভীর্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হলেও, সখী বৃন্দার সংগে সুবল সখার ছড়ায় কথা কাটাকাটি বেশ উপভোগ্য। সামগ্রিকভাবে ছবিখানিকে প্রাণধর্মী করে তোলার চেষ্টা

এশিয়ান ফিল্মসের "গলি থেকে রাজপথ"-এর একটি দৃশ্যে অনুপকুমার ও উত্তমকুমার।

করেছেন পরিচালক সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার। পৌরাণিক চিত্র-পরিচালনায় তাঁর নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাবুদ্ধি প্রশংসনীয়।

ছবিটির প্রধান আকর্ষণের দিক এর সংগীত। পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় প্রায় সব ক'টি গানই সুরসমৃদ্ধ। অধিকাংশ গানই কীর্তনাংগ এবং এগুলির মধ্যে বৃন্দার মুখে ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাওয়া গানগুলি মনকে বিশেষভাবে নাড়া দেয়। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া "মরিব মরিব সখি" গানটিও সুখশ্রাব্য। এমন মন-মাতানো সাংগীতিক আবেদন খুব কম ছবিতেই পাওয়া যায়।

নাম-ভূমিকায় সবিতা চট্টোপাধ্যায়ের শান্ত সংযত অভিনয় প্রশংসা পাবার যোগ্য। অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কুটিলার চরিত্রে গীতশ্রী। সখী বৃন্দার চরিত্রটিকেও বিশ্বাসযোগ্যভাবে রূপায়িত করেছেন গীতা সিং। শ্রীকৃষ্ণবেশী [illegible]র আড়ষ্ট অভিনয় দর্শকমনে কোন রেখাপাত করে না। জটিলার ভূমিকায় রেণুকা রায়ের অভিনয় চরিত্রোচিত। পার্শ্বচরিত্রে উল্লেখ-যোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন ছায়া দেবী, পদ্মা দেবী, মহেন্দ্র গুপ্ত, পঞ্চানন, শৈলেন মুখোপাধ্যায় ও শিখারাণী বাগ।

ছবির সংগীতগ্রহণ এবং বিশেষত সংগীতানুলেখন উঁচুদরের। এর জন্যে পরিতোষ বসু ধন্যবাদার্হ। শিল্পনির্দেশ, সম্পাদনা, চিত্রগ্রহণ ও সর্বাঙ্গীণ অঙ্গসজ্জা চলনসই।

আর্ট এণ্ড কালচার শিকচালের "অগ্নি সম্ভবা"র একটি দৃশ্যে ছবি বিশ্বাস, নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও মঞ্জুলা বন্দ্যোপাধ্যায়

রঙমহলের নূতন নাট্যোপহার

রঙমহলের পরবর্তী আকর্ষণ ধনঞ্জয় বৈরাগী লিখিত "এক মুঠো আকাশে"র নাট্যাভিনয়। উপন্যাস হিসাবে বইখানি সুধীজনের প্রশংসা পেয়েছে। এর নাট্যরূপ দিয়েছেন তরুণ রায়। পরিচালনার দায়িত্বও তিনিই গ্রহণ করেছেন। তরুণবাবু শৌখীন নাট্য-আন্দোলনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। পেশাদার মঞ্চের সংগে এই তাঁর প্রথম সংযোগ। তিনি নিজে একজন কুশলী অভিনেতা। "এক মুঠো আকাশে"র অন্যতম প্রধান চরিত্রে তিনি অভিনয়ও করবেন। অনেকগুলি চেনামুখের সংগে অনেক অচেনা মুখও দেখা যাবে এর ভূমিকালিপিতে। বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনেই সম্ভবত নাটকটি মঞ্চস্থ হবে।

বাংলায় অভিনীত "মৃচ্ছকটিক"

থিয়েটার ইউনিট দল গত ২৮শে মার্চ নিউ এম্পায়ারে শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' বাংলায় অভিনয় করেন। মূল সংস্কৃত নাটকটি আয়তনে খুবই বড়। আড়াই ঘণ্টা কালের মধ্যে অভিনয় করার জন্য স্বভাবতই তার কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনুবাদ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

'মৃচ্ছকটিক'-এর একটি প্রধান চরিত্র সংস্থানক (শকার) বা 'রাজার শ্যালক'। 'রাষ্ট্রীয় শ্যালক' এই আখ্যাও সে পেয়েছে। প্রাচীন ভারতের যে-রাজ্যের পটভূমিতে নাটকটি রচিত, তার শাসন-ব্যবস্থায় দুর্নীতির কথা নাট্যকার প্রকাশ করেছেন এই অদ্ভুত চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। সকল রকম হীন প্রবৃত্তির প্রতিমূর্তি সে। প্রথমে, সংস্থানকের আচরণে এবং আস্ফালনে দর্শক হাসেন, পরে তার নীচতা ও পাপাচার দর্শকের মনে ঘৃণার উদ্রেক করে এবং সবশেষে 'রাষ্ট্রীয় শ্যালকের' অসহায় অবস্থা তাকে করুণার পাত্র করে তোলে। শূদ্রক-কল্পিত, বহু-আলোচিত এই চরিত্র আজও দর্শককে চিন্তার খোরাক জোগায়। থিয়েটার ইউনিটের বাংলা 'মৃচ্ছকটিক'-এ সংস্থানক চরিত্রটি এবং রাষ্ট্র-বিপ্লবের সমগ্র ব্যাপারটি যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কালজয়ী 'মৃচ্ছকটিক'-এর আখ্যানভাগে আছে একটি মহৎ প্রেমের কথা। দরিদ্র বণিক চারুদত্তকে ভালবাসতে পেরে বার-নারী বসন্তসেনা কিভাবে পরের সুখের জন্য নিজের প্রাপ্য বিসর্জন দিতে শেখে, কিভাবে ত্যাগ ও দুঃখের মধ্য দিয়ে জীবনকে সত্য ও সার্থকতার পথে নিয়ে যায়—সেই কাহিনী। মূল নাটকের এই অংশটি থিয়েটার ইউনিট দল সংক্ষেপে উপস্থিত করেছেন। বসন্তসেনাকে ঘিরে মূল নাটকের কয়েকটি আবেগময় পরিস্থিতির আবেদন একান্তভাবেই মানবীয়—তাই চিরন্তন। পরবর্তী অভিনয়ে এই দিকটার প্রতি পরিচালক শেখর চট্টোপাধ্যায় আরও বেশী করে নজর দেবেন বলে আশা করা যায়।

নাটকটি মোটামুটি সু-অভিনীত। বিশেষ করে যার অভিনয় নাটকটি জমিয়ে রাখে, তিনি হলেন সংস্থানকবেশী শেখর চট্টোপাধ্যায়। বসন্তসেনার ভূমিকায় সাধনা রায় চৌধুরীর অভিনয় মনোজ্ঞ। চারুদত্তের চরিত্রে অহিন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুন্দর মানিয়েছে। অন্যান্য চরিত্রে রূপ দিয়েছেন সলিল ভট্টাচার্য, সৌমেন চক্রবর্তী, যোগমায়া বেদজ্ঞ প্রভৃতি। নাটকটির অংগসজ্জা ও কলা-কৌশলের বিভিন্ন বিভাগের কাজ সন্তোষজনক।

একলব্য
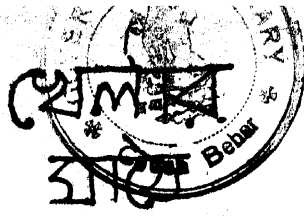
পশ্চিম জার্মানীর ডর্টমান্ডে সদ্য অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেবল টেনিস প্রতিযোগিতায় জাপান এবারও সর্ববিষয়ে প্রাধান্যের পর্যাপ্ত পরিচয় দিয়েছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় ও বিশ্ব-প্রাধান্য প্রতিযোগিতার ৭টি পুরস্কারের মধ্যে ৬টি পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফিরেছে জাপানের পুরুষ ও মহিলা খেলোয়াড়রা। শুধু পুরুষদের একক প্রতিযোগিতায় জাপান এবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে পারেনি। টেবল টেনিসের নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন প্রজাতন্ত্র চীনের উদীয়মান খেলোয়াড় জাং কুয়ো তুয়ান। তুয়ান ফাইন্যালে পরাজিত করেছেন ১৯৫৩ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হাঙ্গেরীর কীর্তিমান খেলোয়াড় ফেরেঙ্ক সিডোকে। ১৯৫২ সালে বিশ্বটেবল টেনিসে জাপানের আবির্ভাবের পর আজ পর্যন্ত একক প্রতিযোগিতার পুরস্কার জাপানের হাতছাড়া হয়নি। জাপানের খেলোয়াড় হিরাজী স্যাটো একবার এবং তোশিয়াকী তানাকা ও ইচিরো ও গিমুরা দুইবার করে বিশ্বজয়ীর সম্মান লাভ করেছেন। ১৯৫৩ সালে জাপান বিশ্ব প্রতিযোগিতা থেকে দূরে সরে ছিল। সেই বছরই সিডো বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। ১৯৫৭ সালে স্টকহোমে বিশ্ব প্রতিযোগিতার পর ঠিক হয় এখন থেকে প্রতি দু'বছরে একবার করে বিশ্ব-প্রতিযোগিতার আসর বসবে। নতুন বিধানের এটা প্রথম প্রতিযোগিতা। পরের বারের অর্থাৎ ১৯৬১ সালের আসর বসবে নয়া-চীনের পিকিং শহরে।

ডর্টমান্ডে এবারকার বিশ্বপ্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন ৪০টি দেশের বহুসংখ্যক মহিলা ও পুরুষ খেলোয়াড়। দলগত ভিত্তিতে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় সোয়েদলিং ও কর্বিলন কাপের আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতা। পরে আরম্ভ হয় পুরুষ ও মহিলাদের সিংগলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলসে প্রাধান্যের লড়াই।

সোয়েদলিং কাপ হচ্ছে দেশের ভিত্তিতে পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় পুরস্কার। আর কর্বিলন কাপ আন্তঃরাষ্ট্রীয় পুরস্কার মহিলাদের।

৩৭টি দেশকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে লীগ প্রথায় সোয়েদলিং কাপের খেলা পরিচালনা করা হয়। চারটি গ্রুপ বিজয়ী দেশ সেমি ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নক আউট প্রথায়। এখানে সেমি ফাইন্যাল ও ফাইন্যাল খেলা সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করছি।

সেমিফাইন্যালে "এ" গ্রুপের বিজয়ী হাঙ্গেরী 'বি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন চীনকে ৫-৩ খেলায় এবং 'সি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন জাপান 'ডি' গ্রুপের বিজয়ী ভিয়েৎনামকে পরাজিত করে ফাইন্যালে ওঠে। ফাইন্যালে জাপান ৫-২ খেলায় ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়ন শক্তিশালী হাঙ্গেরীকে পরাজিত করে সোয়েদলিং কাপ লাভ করে। এখানে বলা যেতে পারে ১৯৫৭ সালেও স্টকহোমে ফাইন্যালে জাপান ৫-২ খেলায় হাঙ্গেরীকে পরাজিত করেছিল।

সেমিফাইন্যালে ও ফাইন্যালের কয়েকটি খেলার কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেমিফাইন্যালে হাঙ্গেরী চীনকে পরাজিত করলেও হাঙ্গেরীর প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন সিডোকে চীনের অখ্যাত খেলোয়াড় ইয়াং হুই হুয়ার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। অবশ্য চীনের কাছে শক্তিশালী হাঙ্গেরীর পরাজয় স্বীকারেরও আশংকা ছিল। কারণ চীনে এবং হাঙ্গেরীতে দুই দেশের খেলায় দুই-বারই হাঙ্গেরীকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। অপর সেমিফাইন্যালে জাপান ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়। কিন্তু এখানেও ভিয়েৎনামের খ্যাতনামা খেলোয়াড় এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন মাই ভ্যান হুয়া স্ট্রেট গেমে দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইচিরো ওগিমুরাকে পরাজিত করেন। জাপান ও হাঙ্গেরীর ফাইন্যাল খেলাতেও অপ্রত্যাশিত ফলাফল প্রত্যক্ষ করা না গেছে, এমন নয়। হাঙ্গেরীর সুনিপুণ খেলোয়াড় জোল্টান বার্জিক, বিশেষজ্ঞদের হিসাব মত বিশ্ব-প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় যিনি এক নম্বর খেলোয়াড় হিসাবে বিবেচিত হয়েছিলেন, তিনি জাপানের দুই নামহীন খেলোয়াড় নয়ো হোসিনো থেরুয়ো মুরাকামির কাছে হার স্বীকার করেন।

সোয়েদলিং কাপে ভারত এবার ভালই খেলেছে বলতে হবে। পরম শক্তিশালী জাপান ও যুগোশ্লাভিয়ার গ্রুপে থেকে ১০টি দেশের গ্রুপের মধ্যে ভারত লাভ করেছে তৃতীয় স্থান। ভারত পরাজিত করে ক্যানাডা, ডেনমার্ক, পূর্ব জার্মানী, অস্ট্রিয়া, লুক্সেমবার্গ ও ইটালীকে আর পরাজিত হয় জাপান, যুগোশ্লাভিয়া ও হল্যান্ডের কাছে। সোয়েদলিং কাপে ভারতের সমস্ত খেলার বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু একটি খেলার কথা আলোচনা করা অবশ্যই কর্তব্য। সে খেলাটি হচ্ছে জাপ-চ্যাম্পিয়ন মেইজি নরিতার সঙ্গে ভারত চ্যাম্পিয়ান গৌতম দেওয়ানের খেলা। বিশ্বনাথ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের জাপান চ্যাম্পিয়ন নরিতাকে বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র দেওয়ানের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। গৌতম দেওয়ান, কে নাগরাজ, সুধীর থ্যাকার্সে ও জয়ন্ত ভোরাকে নিয়ে ভারতের সোয়েদলিং কাপ টীম গঠিত হয়েছিল।

কর্বিলন কাপের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ২৭টি দেশ। তিনটি গ্রুপে লীগ খেলার পর গ্রুপ বিজয়ী জাপান, কোরিয়া ও চীন আবার লীগ প্রথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জাপান কোরিয়া ও চীনকে পরাজিত করে লাভ করে মহিলাদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় পুরস্কার। মার্সেল কর্বিলন কাপ।

পুরুষদের সিংগলস, ডাবলস, মহিলাদের সিংগলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের প্রাধান্যের প্রতিযোগিতায় এক পুরুষদের সিংগলস ছাড়া জাপান আর চারটি বিষয়েই বিজয়ী হয়েছে একথা আগেই বলেছি। কিন্তু একথা বলিনি—এর মধ্যে আবার পুরুষদের সিংগলস এবং ডাবলস ছাড়া আর তিনটি বিষয়ের রানার্সের পুরস্কারও গিয়েছে জাপানে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় অন্যান্য দেশের তুলনায় জাপানের টেবল টেনিস মান কত উন্নত। শুধু জাপান কেন, প্রাচ্যের দেশগুলির মধ্যে ভিয়েৎনাম এবং চীনও টেবল টেনিস খেলায় প্রভূত উন্নতি করেছে।

রাজনৈতিক কারণে প্রজাতন্ত্র চীন খেলা-ধুলার ৮টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেও আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস ফেডারেশনের সঙ্গে এখনো সম্পর্ক ছেদ করেনি। প্রজাতন্ত্র চীনে টেবল টেনিস এখন খুবই জনপ্রিয় খেলা। সোয়েদলিং কাপ ও কর্বিলন কাপে তাদের গ্রুপ চ্যাম্পিয়নশিপ লাভও অপ্রত্যাশিত ফলাফল নয়। চীনের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় জাং কুয়ো তুয়ানের বিশ্বজয়ের গৌরবও নয় প্রতিযোগিতার অপ্রত্যাশিত ফলাফল। অবশ্য বিশেষজ্ঞদের বিচারে জাং কুয়ো তুয়ান ভবিষ্যৎ চ্যাম্পিয়ন বলে বিবেচিত হননি। তবে হাঙ্গেরী ও পূর্ব জার্মানীর খেলোয়াড়রা চীন সফরে গিয়ে চাইনিজ খেলোয়াড়দের কাছে নাকাল হবার পর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবার চীনেরই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের সম্ভাবনা বেশী। শুধু চীনে কেন, হাঙ্গেরীর খেলোয়াড় জোল্টান বার্জিক, বিশেষজ্ঞদের মতে যিনি ভবিষ্যৎ চ্যাম্পিয়ন বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন সেই বার্জিককে হাঙ্গেরীতে চীনের খেলোয়াড় য়ুঙ্গ চুয়ান ইয়ার কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। বিশ্বের কোন খেলোয়াড়ই আজ

পর্যন্ত বার্জিককে পর পর ও বার পরাজিত করতে পারেননি। ওয়াং চুয়ান ইয়া, জাং কুয়ো তুয়ান, হু চি ফাং, চু চাং লু প্রভৃতি চাইনিজ খেলোয়াড় টেবল টেনিসের নিপুণ শিল্পী। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় জাং কুয়ো তুয়ান কোয়ার্টার ফাইন্যালে বার্জিককে, সেমি-ফাইন্যালে যুক্তরাষ্ট্রের রিচার্ড মিলসকে এবং ফাইন্যালে হাঙ্গেরীর খ্যাতনামা খেলোয়াড় প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ফেরেঙ্ক সিডোকে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—সোয়েদলিং কাপে হাঙ্গেরী ও চীনের সেমি-ফাইন্যাল খেলায় কিন্তু নতুন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জাং কুয়া তুয়ানকে সিডো ও বার্জিক দুজনের কাছেই হার স্বীকার করতে হয়েছিল। বাছাই তালিকার এক নম্বর খেলোয়াড় বার্জিক অবশ্য কোয়ার্টার ফাইন্যালে তুয়ানের সঙ্গে ভাল খেলতে পারেননি। সোয়েদলিং কাপেও বার্জিককে রুমানিয়ার নামহীন খেলোয়াড় রাদু নিগো-লেস্কুর কাছে এবং জাপানের টেরুয়ো মুরাকামি ও নবুয়া হোসিনোর কাছে হার স্বীকার করতে হয়। বাছাই তালিকার দুই নম্বর খেলোয়াড় ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইচিরো ওগিমুরাও এবার সুবিধা করতে পারেননি। ওগিমুরাকে সোয়েদলিং কাপে ভিয়েৎনাম চ্যাম্পিয়ন ভাই ভ্যান হুয়ার কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছিল একথা আগেই বলেছি। বিশ্ব-চ্যাম্পিয়নশিপের সেমি-ফাইন্যালে ওগি-মুরাকে ফেরেঙ্ক সিডোর কাছে হার স্বীকার করতে হয়। ওগিমুরা অবশ্য টি মুরাকামির সঙ্গে খেলে পুরুষদের ডাবলসে এবং মহিলা চ্যাম্পিয়ন ফুজি এগুচির সঙ্গে খেলে মিক্সড ডাবলসের বিজয়ীর পুরস্কারের অংশীদার হয়েছেন।

বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় ভারতের খেলোয়াড়দের মধ্যে কে নাগরাজ ছাড়া আর তিনজনকেই প্রথম রাউণ্ডের খেলা থেকে বিদায় নিতে হয়। সুধীর থ্যাকার্সে পরাজিত হন ব্রেজিলের 'বিস্ময় বালক' ১৪ বছরের খেলোয়াড় উবিরেসি দা'কস্টার কাছে। চেকোশ্লোভাকিয়ার জে পোসেপজাল পরাজিত করেন ভারত চ্যাম্পিয়ন গৌতম দেওয়ানকে আর ব্রেজিলের আই সেভরো পরাজিত করেন জয়ন্ত ভোরাকে। কে নাগরাজকে চতুর্থ রাউণ্ডে হাঙ্গেরীর বুবেল্লইয়ের কাছে পরাজিত হতে হয়।

ডাবলসের প্রথম রাউণ্ডে দেওয়ান ও থ্যাকার্সে চীনের হু পিং চুয়ান ও মে ইংগ সেনের কাছে পরাজিত হন। দ্বিতীয় রাউণ্ডে ডোরা ও নসিরাজ পরাজিত হন জাপানের নরিতা ও হোসিনোর কাছে। কোরিয়ার দুইজন মহিলা খেলোয়াড়কে সঙ্গী হিসাবে নিয়ে দেওয়ান এবং থ্যাকার্সে [illegible] করেন। থ্যাকার্সে ও হাওয়ার্ড জর্জ জা প্রথম রাউণ্ডে এক রুমানিয়ান জুটির কাছে পরাজিত হন। দেওয়ান ও চুং হি লীকে চতুর্থ রাউণ্ডের খেলা থেকে বিদায় নিতে হয়।

ব্রেজিলের বিস্ময় বালক ১৪ বছরের খেলোয়াড় দা'কস্টা সম্বন্ধে কিছু না বললে লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উবিরেসি রডরিগস দা'কস্টা ব্রেজিলে যিনি 'বিরিবা' নামে পরিচিত তিনি অপূর্ব টেবল টেনিস নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে বিশ্বের অনেক নাম-করা খেলোয়াড়কে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। গত বছর ব্রেজিলে দা'কস্টা যখন দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তোশিয়াকী তানাকাকে ৭টি খেলার মধ্যে ৪টি খেলায় পরাজিত করেছিলেন তখনই তার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের উচ্চ ধারণা জন্মেছিল। এখন তাকে অনেকে ভবিষ্যৎ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বলে কল্পনা করছেন। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দা'কস্টা ওগিমুরার কাছে পরাজয় স্বীকার করেন বটে, কিন্তু প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে প্রতি পয়েণ্টের জন্য দা'কস্টার সঙ্গে তীব্র সংগ্রাম করতে হয়।

নীচে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইন্যাল খেলাগুলির ফলাফল দেওয়া হল:—

সিংগলস ফাইন্যাল—সেণ্ট ব্রাইড ভেস

জাং কুও তুয়ান (লাল চীন) ১৯-২১, ২১-১২, ২১-১৫ ও ২১-১৪ পয়েণ্টে ফেরেঙ্ক সিডোকে (হাঙ্গেরী) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ফাইন্যাল—গিস্ট প্রাইজ

কামাকো মাৎসুজাকি (জাপান) ২১-১৩ ২১-৭, ১৮-২১ ও ২১-১৮ পয়েণ্টে ফুজি এগুচিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস—ইরাণ কাপ

ইচিরো ওগিমুরা ও টি মুরাকামি (জাপান) ১৭-২১, ১৯-২১, ২১-১৯, ২১-১৯ ও ২১-১৪ পয়েণ্টে এল স্টিপেক ও লিভোনেস্কিকে (চেকোশ্লোভাকিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস—পোপ কাপ

টি নাম্বা ও কে ইয়ামাইজুমি (জাপান) ২১-১৯, ২১-১৫ ও ২১-১৪ পয়েণ্টে ফুজি এগুচি ও কে মাৎসুজাকিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস—হেদুসেক কাপ

ইচিরো ওগিমুরা ও ফুজি এগুচি (জাপান) ২১-১৪, ২১-১৭ ও ২১-১৪ পয়েণ্টে টি মুরাকামি ও কে মাৎসুজাকিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

× × ×

পাকিস্তান সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের তিনটি টেস্ট খেলার মধ্যে পাকিস্তান করাচীর প্রথম টেস্ট খেলায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে ১০ উইকেটে এবং ঢাকার দ্বিতীয় টেস্টে [illegible] জয়লাভ করে। কিন্তু লাহোরের তৃতীয় টেস্ট খেলায় পাকিস্তানকে এক ইনিংস ও ১৫৬ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

করাচী ও ঢাকায় টেস্ট খেলা হয়েছিল নারকেলের দড়িতে তৈরী বিশেষ ধরনের উইকেটে। আর লাহোরে খেলা হয়েছে ঘাসের উইকেটে। একই দলের দুইরকমের উইকেটে খেলার ফলাফলের কি বিরাট পার্থক্য! অবশ্য ক্রিকেটের গ্লোরিয়াস আনসার্টেনিটির কথা বিবেচনা করলে একই ধরনের উইকেটে একই দলের খেলায় ফলা-ফলের পার্থক্য মোটেই বিচিত্র নয়। জুট ম্যাটিং বা কয়ের ম্যাটিং ক্রিকেট আইনসম্মত উপকরণ হলেও এটা হচ্ছে দুধের অভাবে ঘোল দিয়ে প্রয়োজন মেটাবার মত। যেখানে মাঠে ঘাস তৈরী করা সম্ভব নয় সেখানেই পাটের দড়ি বা নারকেলের দড়ির ম্যাট পেতে খেলার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা হয়তো আর বেশী দিন চলবে না। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা ভাবতে আরম্ভ করেছেন ম্যাটিং উইকেটে টেস্ট খেলা উচিত কিনা! যারা ক্রিকেট খেলবে, বিশেষ করে টেস্ট খেলবে তাদের খেলার মাঠকেই প্রকৃতির নিয়মে টেস্ট খেলার উপযোগী করে তুলতে হবে। পাকিস্তানে ক্রিকেট খেলা যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। ক্রিকেট খেলায় পাকিস্তান সুনামও অর্জন করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বোলার ফজল মামুদ এবং ওপেনিং ব্যাটসম্যান হানিফ মহম্মদের প্রতিষ্ঠাও অনস্বীকার্য; কিন্তু ক্রিকেট খেলার মাঠ তৈরীর ব্যাপারে পাকিস্তান এখনো তেমন উদ্যোগী হয়নি। না হলে শস্যশ্যামল বলে যে বাংলাকে অভিহিত করা হয়ে থাকে সেই পূর্ব বাংলার প্রধান শহর ঢাকার মাঠে টেস্ট খেলার জন্য 'ম্যাট' পাততে হবে কেন? ম্যাটিং উইকেটে খেলতে খেলতে পাকিস্তান ম্যাটিংয়ে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। টার্ফ বা ঘাসের উইকেটেও এদের নৈপুণ্য না দেখাবার কারণ নেই। তাই পাকিস্তান যদি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আরও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে চায় তবে প্রকৃতির কোলেই তাকে ক্রিকেট খেলায় আরও পারদর্শী হয়ে উঠতে হবে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা ম্যাটিং উইকেটে খেলতে অভ্যস্ত নয়। তাই পাকিস্তানের ম্যাটিং উইকেটে যে দুটি খেলা হয়েছে সে দুটি খেলাতেই তাদের হার স্বীকার করতে হয়েছে। টার্ফ উইকেটে তারা দেখিয়েছে ক্রিকেটের স্বাভাবিক নৈপুণ্য—তাদের ব্যাটিং ও বোলিংয়ের সাবলীল লাবণ্য।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলোয়াড়দের একটা বিশেষত্ব বিপর্যয়ের মুখেও তারা কোন সময় অতি ভয়ে ভীত হয়নি—কোন সময় অতি সতর্কতা অবলম্বন করেনি। সহজ ও

স্বাভাবিকভাবেই খেলে থাকেন। তাঁরা খেলেন আনন্দের জন্যই খেলা—জয়-পরাজয়ের জন্য নয়। তাই ক্যাপ্টেনের টাফ উইকেটে ৩৮ রানের মধ্যে তাদের দুটি উইকেট পড়ে গেলেও তৃতীয় উইকেট জুটিতে রোহান কানহাই ও গারফিল্ড সোবার্স হাত খুলে ব্যাটিং করেছেন। দুইজনই ওয়েস্ট ইন্ডিজের কীর্তিমান ব্যাটসম্যান। ব্যাটিংয়ের স্বাভাবিক লাবণ্যে দু'জনই সুন্দর। মারের উৎকর্ষে কেউ কারো চেয়ে কম নন। দর্শকদের অনাবিল আনন্দ দিয়ে দু'জন তৃতীয় উইকেটে যোগ করেন ১৬২ রান। টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত রানে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী সোবার্স ৭২ রান করে আউট হয়ে যান। কিন্তু প্রথম দিনের খেলায় কানহাই ১৭৪ রান করেও নট আউট থাকেন। দিনের শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল সংগ্রহ করে ৫ উইকেটে ৩২৫ রান। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা অর্থাৎ ৩৩০ মিনিটে টেস্ট খেলায় ৩২৫ রান নিশ্চয়ই উন্নত ব্যাটিংয়ের উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

একদিন বিরতির পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল দ্বিতীয় দিনের খেলা আরম্ভ করে সমান লাবণ্যে। বাকী পাঁচটি উইকেটে আর ১৪৪ রান যোগ করে ৪৬৯ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। প্রত্যুত্তরে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসের খেলায় ২ উইকেট হারিয়ে ৮৬ রান করলে দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হয়। রোহান কানহাই, যিনি ভারতের বিরুদ্ধে কলকাতায় তৃতীয় টেস্টে ২৫৬ রান করেছিলেন তাঁর ২১৭ রান করবার ঘটনা বিশেষভাবেই উল্লেখ করবার মত। ইনিংসের সূচনায় কানহাই কিছুটা অস্বস্তি বোধ করলেও কিছু রান সংগ্রহের পর তিনি বেপরোয়া খেলোয়াড় হয়ে ওঠেন এবং পাকিস্তানের খ্যাতনামা বোলারদের আক্রমণের বিরুদ্ধে একবারও নিজের আউট হবার সুযোগ না দিয়ে নিপুণ হাতে মেরে খেলে ডাবল সেঞ্চুরী করেন।

তৃতীয় দিন পাকিস্তানের ব্যাটিং করবার বেলায়ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল প্রাধান্য প্রকাশ করে বোলিংয়ে। ফলে ২০৯ রানে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ওয়েসলী হল মারাত্মকভাবে বোলিং করে হ্যাটট্রিক লাভের কৃতিত্ব সমেত একাই পান ৮৭ রানে ৫টি উইকেট। টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক লাভ বোলারের পক্ষে দুর্লভ সম্মান। পাকিস্তান বাবার পেলেও হল সেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই হ্যাট্রিক করে তার কৃতিত্বকে বেশী উজ্জ্বল করেন।

প্রথম ইনিংসের খেলায় ২৬০ রান পিছনে থাকায় পাকিস্তানকে ফলো-অন করে ঐদিনই দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করতে হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসেও পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের সূচনা হয় নৈরাশ্য-জনক। ৫ রানের মধ্যেই তারা হারায় দুটি উইকেট। ২ উইকেটে ৫৫ রান উঠলে তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হয়। এখানে বলা যেতে পারে তৃতীয় দিন সময়ে সময়ে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ায় পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল।

চতুর্থ দিন বৃষ্টির জন্য একরকম সারা-দিনই খেলা বন্ধ ছিল। এইদিন মাত্র ১৫ মিনিট খেলা হয় এবং এই ১৫ মিনিটের মধ্যেই পাকিস্তান হারায় আর একটি উইকেট।

পঞ্চম দিনও মাঠ ভিজে থাকায় মধ্যাহ্ন ভোজের সময় পর্যন্ত খেলা হয়নি। মধ্যাহ্ন ভোজের পর খেলা আরম্ভ হলে গিবস ও রামাধীনের মারাত্মক স্পিন বোলিংয়ের ফলে মাত্র ১০৪ রানে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায়। ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলায় বিজয়ী হয় এক ইনিংস ও ১৫৬ রানে।

লাহোর টেস্টে কি ব্যাটিং, কি বোলিং, কি ফিল্ডিং কোন বিষয়েই পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের সংগে এঁটে উঠতে পারেননি। তবু বলবো, এ খেলায় ভাগ্যদেবীও পাকিস্তানের সহায়ক হননি। বৃষ্টির ফলে মাঠ জলসিক্ত হওয়ায় দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাটিং করে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করবার আশা তাদের বিলীন হয়ে যায়। তারপর তাদের পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হানিফ মহম্মদও এ খেলায় যোগ দিতে পারেননি। হাতে চোট থাকায় ঢাকা টেস্টেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন।

অবশ্য হানিফ মহম্মদ না খেললেও তার দুই ভাই ওয়াজির মহম্মদ ও মুস্তাক মহম্মদ লাহোর টেস্টে খেলেছেন। মুস্তাক হানিফের কনিষ্ঠ সহোদর। এর বয়স মাত্র ১৪ বছর। ১৪ বছর বয়সে টেস্ট খেলার সুযোগ পাওয়া যেমন খেলোয়াড়ের পক্ষে গৌরবের পরিচায়ক টেস্ট ম্যাচে তিন ভাইয়ের খেলারও বিরল ঘটনা। তিন ভাই অবশ্য একসংগে খেলার সুযোগ পাননি। তবে আশা করা যেতে পারে, ভবিষ্যতে হানিফ, ওয়াজির ও মুস্তাক একই সংগে টেস্টে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

আগেই বলেছি, টেস্ট খেলায় তিন ভাইয়ের এক সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রিকেট ইতিহাসের বিরল ঘটনা। এর আগে মাত্র তিন ত্রয়ী একযোগে নিজ দেশের পক্ষে খেলেছেন। ১৮৮০ সালে ওভালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলেছেন গ্রেস ত্রয়ী—ডব্লিউ জি, ই এম এবং জি এফ। অপর দুই 'ত্রয়ী' হচ্ছেন ইংলণ্ডের এ হার্ন, জি ও জি হার্ন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার টানক্রেড, এল জে টানক্রেড ও ভি এম টা

পাকিস্তান সফর শেষ করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল বোম্বাই হয়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেছে। এই উপমহাদেশে প্রায় পাঁচ মাসব্যাপী সফরে তারা ক্রিকেট খেলার যে স্মৃতি রেখে গেছে তা অনেকদিন ক্রিকেট রসিকদের মনে থাকবে।

নীচে লাহোরে পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের তৃতীয় টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড দেওয়া হল।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ইনিংস ৪৬৯ (রোহান কানহাই ২১৭, গারফিল্ড সোবার্স ৭২, জো সলোমান ৫৬, কোলী স্মিথ ৩১, ফ্রাঞ্জ আলেকজান্ডার ২১, এরিক অ্যাটকিনসন ২০; নাসিমুল গনি ১০৬ রানে ৩ উইকেট, ফজল মামুদ ১০৯ রানে ২ উইকেট, সুজাউদ্দিন ৮১ রানে ২ উইকেট, সয়িদ আমেদ ১৯ রানে ১ উইকেট)।

পাকিস্তান প্রথম ইনিংস ২০৯ (ইমতিয়াজ আমেদ ৪০, ওয়াকার হাসান ৪১, ইজাজ বাট ৪৭, সয়িদ আমেদ ২৭; ওয়েসলী হল ৮৭ রানে ৫ উইকেট—হ্যাটট্রিক সমেত)।

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস ১০৪ (সয়িদ আমেদ ৩৩, ওয়াকার হাসান ২৮; সোনী রামাধীন ২৫ রানে ৪ উইকেট, ল্যান্স গিবস ১৪ রানে ৩ উইকেট, এরিক অ্যাটকিনসন ১৫ রানে ৩ উইকেট)।

[ওয়েস্ট ইন্ডিজ এক ইনিংস ও ১৫৬ রানে বিজয়ী]

দেশী সংবাদ

৩০শে মার্চ—তিব্বতের গুরুতর ঘটনাবলী সম্পর্কে ভারত সরকারের নীতির দুইটি দিক আজ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় প্রকাশ পায়। কোন কোন কংগ্রেস সদস্যের মনে নৈরাশ্য সৃষ্টি করিয়াও তিনি পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন যে, তিব্বতের কোন রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রার্থীকেই এদেশে আশ্রয় দেওয়া হইবে না এবং প্রয়োজন হইলে সীমান্তবর্তী পরীক্ষা ঘাটিসমূহের শক্তি বৃদ্ধি করা হইবে।

অদ্য লোকসভায় ইস্পাত, খনি ও ইন্ধন মন্ত্রণালয়ের ব্যয় মঞ্জুরী দাবী সম্বন্ধে আলোচনার সময়ে বিরোধী দলের সদস্য শ্রী এন সি ভারুচা সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত তিনটি ইস্পাত কারখানার কণ্ট্রাক্টসমূহ সম্পর্কে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়া বলেন যে, তিনটি ইস্পাত কারখানার সমগ্র কাহিনী পরিকল্পনার অভাব, দারুণ অবহেলা ও অপরাধজনক অপব্যয়ের কাহিনী।

৩১শে মার্চ—অদ্য এপ্রিল-সেপ্টেম্বর জন্য যে আমদানি নীতি ঘোষণা করা হইয়াছে উহাতে শিল্পের কাঁচা মাল আমদানির লাইসেন্স নয় মাস হইতে বার মাস করা হইয়াছে। ইহার ফলে শিল্প সংস্থাসমূহ তাহাদের উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে ও কিছুটা সস্তা দরে কাঁচা মাল ক্রয় করিতে পারিবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী কাল (১লা এপ্রিল) হইতে ডাইরী ও হিসাবের বই ছাড়া অন্যান্য সমস্ত প্রকার ছাপা বইয়ের উপর হইতে বিক্রয়কর রহিত করার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

১লা এপ্রিল—বিভিন্নসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়, তিব্বতের ধর্ম ও রাষ্ট্রগুরু দলাই লামা যদি শেষ পর্যন্ত ভারতে পৌঁছাইতেই পারেন, তাহা হইলে তিনি ভারত সরকারের নিকট রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করিবেন। ঐ সকল সূত্রে আরও প্রকাশ যে দলাই লামার গতি এখন আসাম সীমান্তের দিকে। তিনি শীঘ্রই আসামের পথে ভুটানে প্রবেশ করিতে পারেন।

কলিকাতা হইতে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশনের সদর কার্যালয় স্থানান্তরিত করার প্রচেষ্টা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতা মহানগরীর গুরুত্ব হ্রাসের এই নূতন প্রয়াসে সংশ্লিষ্ট মহলগুলিতে উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে।

২রা এপ্রিল—হাওড়া ষ্টেশনের সম্মুখের রাস্তায় একটি ষ্টেট বাস দাঁড় করাইয়া রাখার ফলে জনৈক ড্রাইভার ও মেকানিক এবং কয়েকজন পুলিস কর্মচারীর মধ্যে বচসায় যে গোলমালের সূত্রপাত হয় তাহার ফলে অদ্য [illegible] ষ্টেট বাস কর্মচারিগণ বাস চালান বন্ধ করিয়া দিলে কয়েক ঘণ্টার জন্য [illegible] হাওড়ার মধ্যে পরিবহন সংযোগ প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।
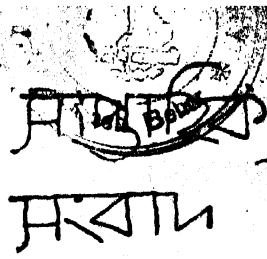
[illegible] বিশ্বস্তসূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গিয়াছে যে, তিব্বতে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইয়াছে এবং চীন কম্যুনিস্টরা বিদ্রোহীদের প্রতি ভারী আগ্নেয়াস্ত্রের গোলা বর্ষণ করিতেছে।

৩রা এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, দলাই লামা আটজন লোকের একটি ক্ষুদ্র দলসহ ৩১শে মার্চ সন্ধ্যায় সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন অদ্য সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, কলিকাতার আশে পাশে এবং গ্রামাঞ্চলে যে সকল চাউল কল ধানের অভাবে বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল, সরকার সেই কলগুলিকে ধান সরবরাহ আরম্ভ করার ফলে ঐগুলির অধিকাংশই পুনরায় চলু হইয়াছে।

৪ঠা এপ্রিল—বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সাধক সুপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁহার গড়িয়াহাটাস্থিত 'ধ্রুব-বিহার' বাসভবনে অদ্য রাত্রি ৯-৩৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৮১ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

অদ্য দিন দুপুরে বড়বাজারের একটি জনবহুল ব্যবসায় অঞ্চলে জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ২০ হাজার টাকা ছিনাইয়া লইবার ব্যর্থ চেষ্টার পর পলায়নরত এক দুর্বৃত্তকে পাকড়াও করিতে গিয়া জনৈক পথচারী ঐ দুর্বৃত্তের ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

৫ই এপ্রিল—পার্ক সার্কাস অঞ্চলে একটি রোডের একটি বাড়িতে গতকল্য রাত্রে পুলিস হানা দিয়া বিভিন্ন জাতির সাতটি তরুণীসহ ১৪ জনকে পতিতা বৃত্তি নিরোধ আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করে। এই বাড়িটি দিনের বেলায় জনমানবহীন থাকে কিন্তু রাত্রে বাড়ির বিভিন্ন কক্ষ হইতে নাচ গান ও মত্ত কোলাহলের শব্দে নিষ্প্রাণ বাড়িটি মুখরিত হইয়া উঠে।

নেতাজীর অন্যতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও নেতাজী তদন্ত কমিটির সদস্য শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু গত কাল এক জনসভায় বলেন যে নেতাজী সশরীরে জীবিত আছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

বিদেশী সংবাদ

৩০শে মার্চ—বার্লিনের ভবিষ্যৎ, জার্মানীর সমস্যা এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহ আলোচনার জন্য রুশিয়া আগামী ১১ই মে জেনেভায় বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হইতে সম্মত হইয়াছে।

রেঙ্গুনের সরকারী সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, উত্তর ব্রহ্মের ওয়া রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী আনুমানিক তিন হাজার কুওমিণ্টাং সৈন্যের উপর বর্মী সেনাবাহিনী আক্রমণ চালায়।

৩১শে মার্চ—আজ লণ্ডনে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটেন ইরাকের হাব্বানিয়াস্থ ঘাটি হইতে বৃটিশ বিমান বহরের বিমান ও বিমান বাহিনীর সরঞ্জামাদি সরাইয়া আনার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

প্যারিসের এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত মহাসাগরে মাদাগাস্কার দ্বীপে এক বন্যার ফলে দুই সহস্র হইতে তিন সহস্র ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে এবং ৫০ সহস্র ব্যক্তি গৃহহীন হইয়াছে। প্রধানমন্ত্রী তিরানানার নির্দেশে রাজধানীর অধিকাংশ অধিবাসীই শহর ত্যাগ করিয়াছে।

১লা এপ্রিল—ব্রহ্ম সরকার গত সপ্তাহে ৩০০ পাকিস্তানীকে পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত পাঠাইয়া দিয়াছেন। ব্রহ্ম বহিরাগত আইন লঙ্ঘন করিয়া ইহারা ব্রহ্মের অন্তর্গত আরাকান প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। এই একই অপরাধে আরও ৭০০ পাকিস্তানী বর্তমানে আকিয়াব জেলে আটক আছে।

২রা এপ্রিল—নয়াচীন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান অদ্য এই মর্মে এক সংবাদ প্রচার করিয়াছেন যে, দলাই লামা এবং অন্যান্য কয়েকজন ৩১শে মার্চ তারিখে ভারতে পৌঁছিয়াছেন। বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাঁহার নিকট পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ওয়াশিংটনের খবরে প্রকাশ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনৈক মুখপাত্র ঘোষণা করেন যে, পারস্পরিক নিরাপত্তা রক্ষা কার্যসূচী অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে কিছু সংখ্যক জেট জঙ্গী ও হালকা জেট বোমারু সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়াছে।

৩রা এপ্রিল—দলাই লামার তিব্বত হইতে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশের সংবাদে পিকিং-এ বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি হয় নাই। পিকিংয়ের অদ্যকার সংবাদপত্রগুলিতে কোনরূপ মন্তব্য ছাড়াই সংক্ষেপে কেবল সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

৪ঠা এপ্রিল—হাজারা জেলাস্থিত হরিপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে লালকোর্তা দলের নেতা খান আবদুল গফফর খান অদ্য বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের অব্যবহিত পরেই সীমান্ত নেতা চরসদা তহশীলে তাঁহার পল্লীভবন অভিমুখে যাত্রা করেন।

৫ই এপ্রিল—মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী এন ম্যাকেলরয় গত ১০ই মার্চ প্রতিনিধি পরিষদের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির এক গোপন সভায় বলেন যে, বার্লিনে যদি বড় রকমের যুদ্ধ বাধে তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করিবে এবং স্থল বাহিনীও নিয়োগ করিবে।

সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার		সহকারী সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ

প্রতি সংখ্যা—৪০ নয়া পয়সা। কলিকাতা : বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০, ও ত্রৈমাসিক—৫, টাকা।
মফস্বল : (সডাক) বার্ষিক—২২, টাকা, ষাণ্মাসিক—১১, টাকা ও ত্রৈমাসিক—৫ টাকা ৫০ নয়া পয়সা।
মুদ্রক ও প্রকাশক : শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ প্রেস, ৬ সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১।
টেলিফোন : ৩৩—২২৪৩। স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাইভেট) লিমিটেড।